সংক্ষিপ্ত মহাভারত

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সংক্ষিপ্ত মহাভারতের বিষয়-সূচী

সভাপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

বিরাটপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

উদ্যোগপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

ভীষ্মপর্ব

দ্রোণপর্ব

भगवान् नारायण, नर, भगवती सरस्वती और (महाभारत) के वक्ता व्यासदेवको नमस्कार
Salutations to Lord Nārāyaṇa, Nara, Goddess Saraswatī and Vyāsadeva
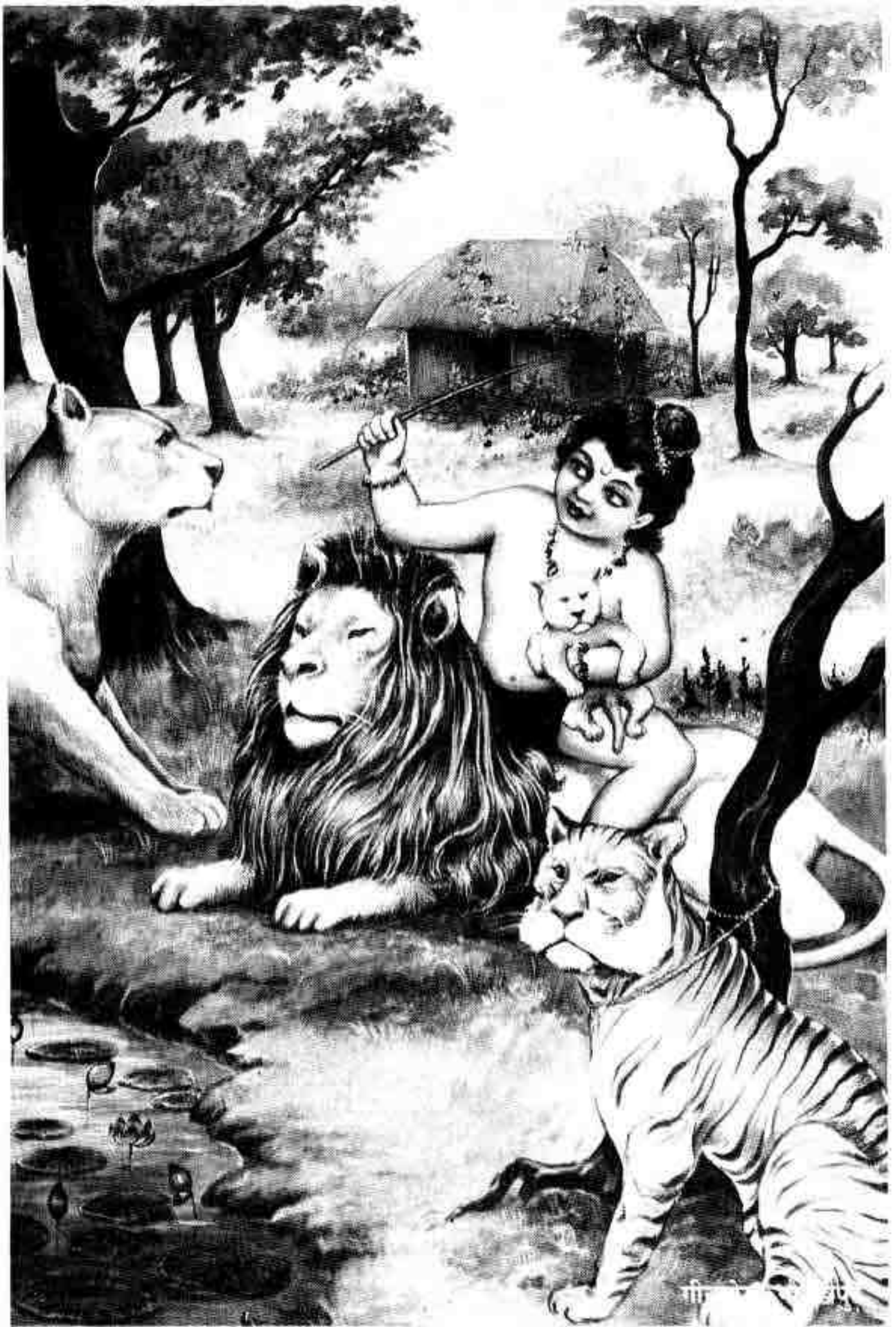
सिंह-बाघोंमें बालक भरत

Bharata among the lion-cubs
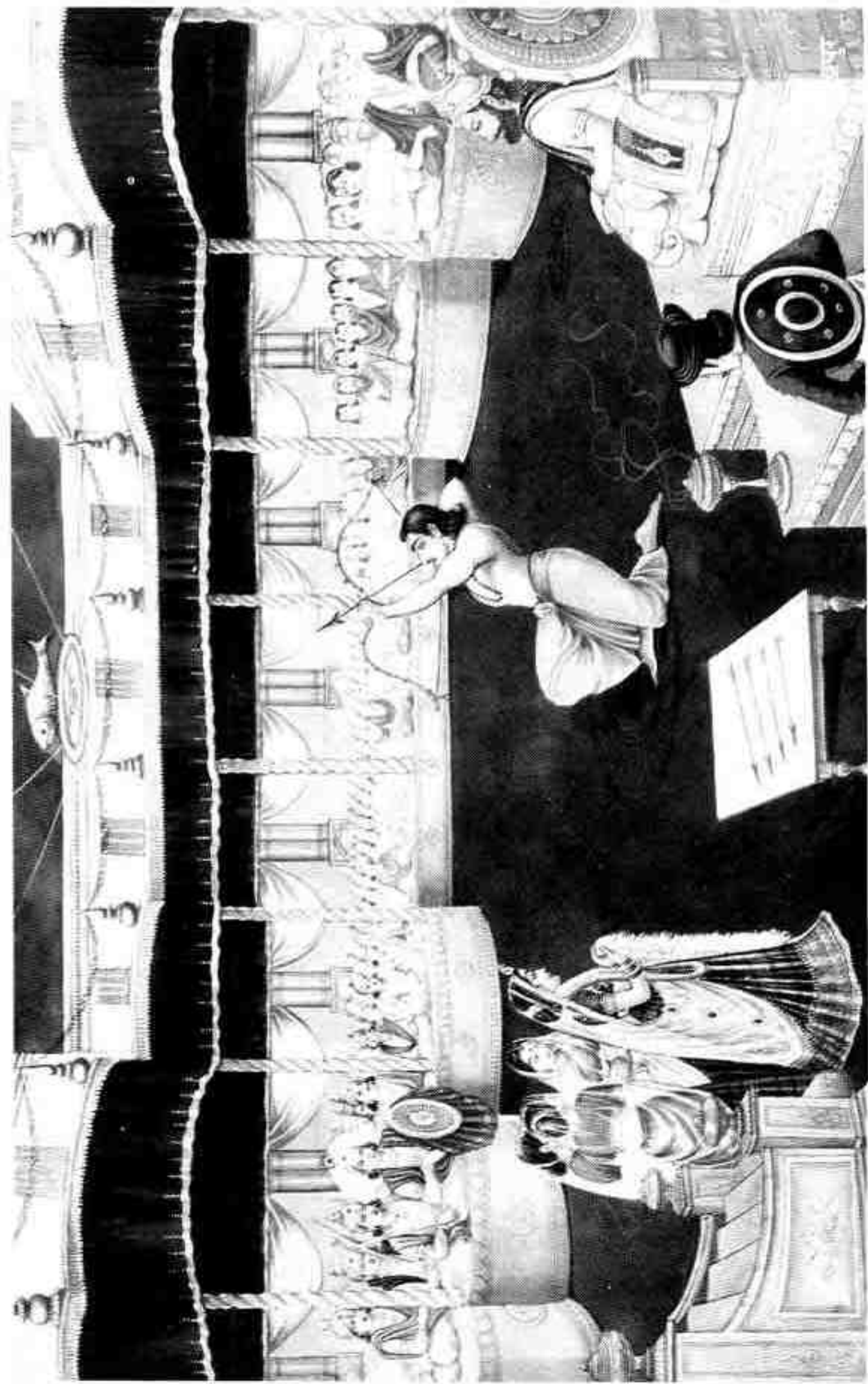
द्रौपदी-स्वयंवर

Draupadī-Swayaṁvara
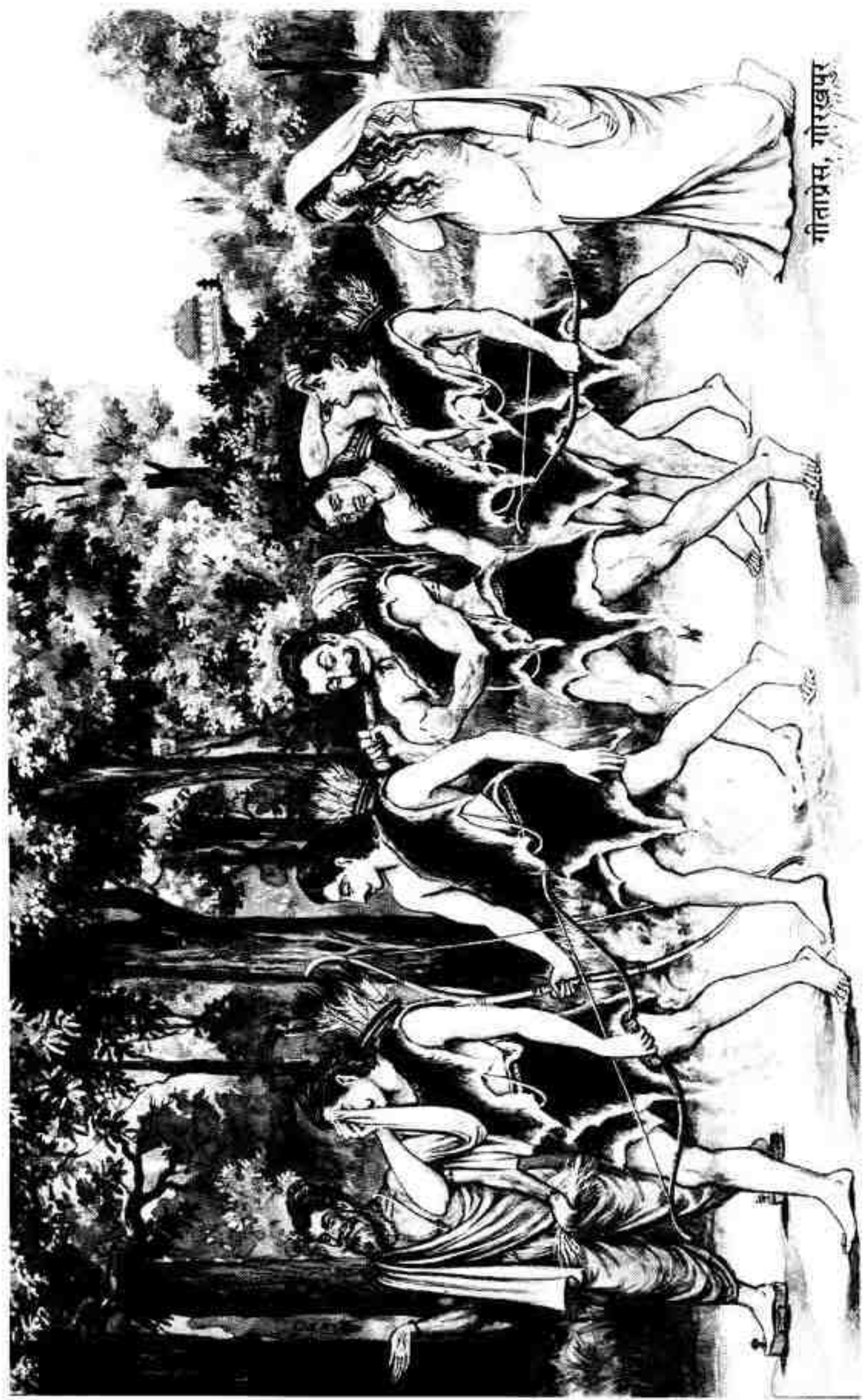
गीताप्रेस, गोरखपुर

पाण्डवोंका वनगमन

Pāṇḍavas on the way to forest

नलका अपने पूर्वरूपमें प्रकट होकर दमयन्तीसे मिलना

Nala meets Damayantī in his original form
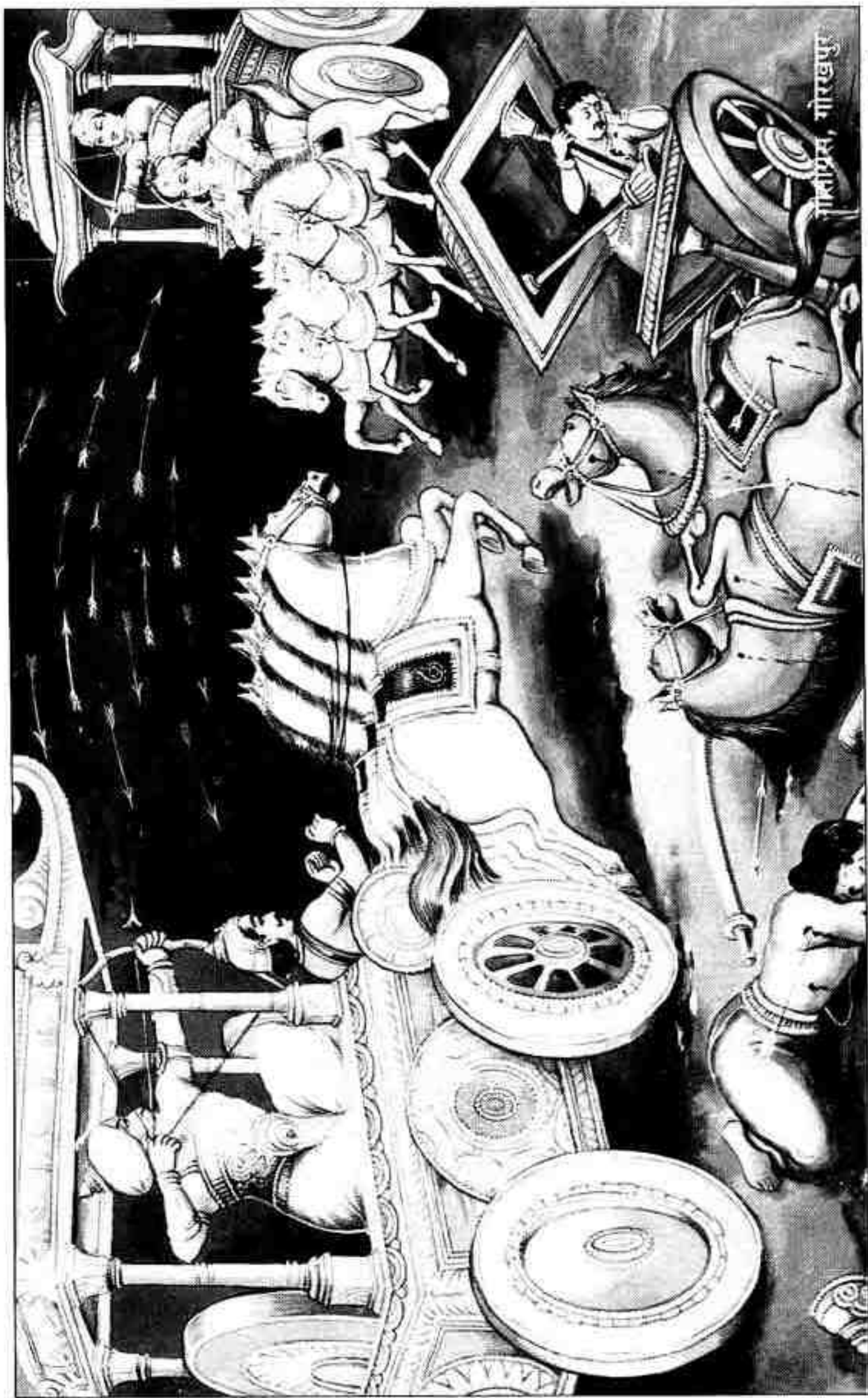
भीष्म और अर्जुनका युद्ध

Fight between Bhīṣma and Arjuna

गीताप्रेस, गोरखपुर
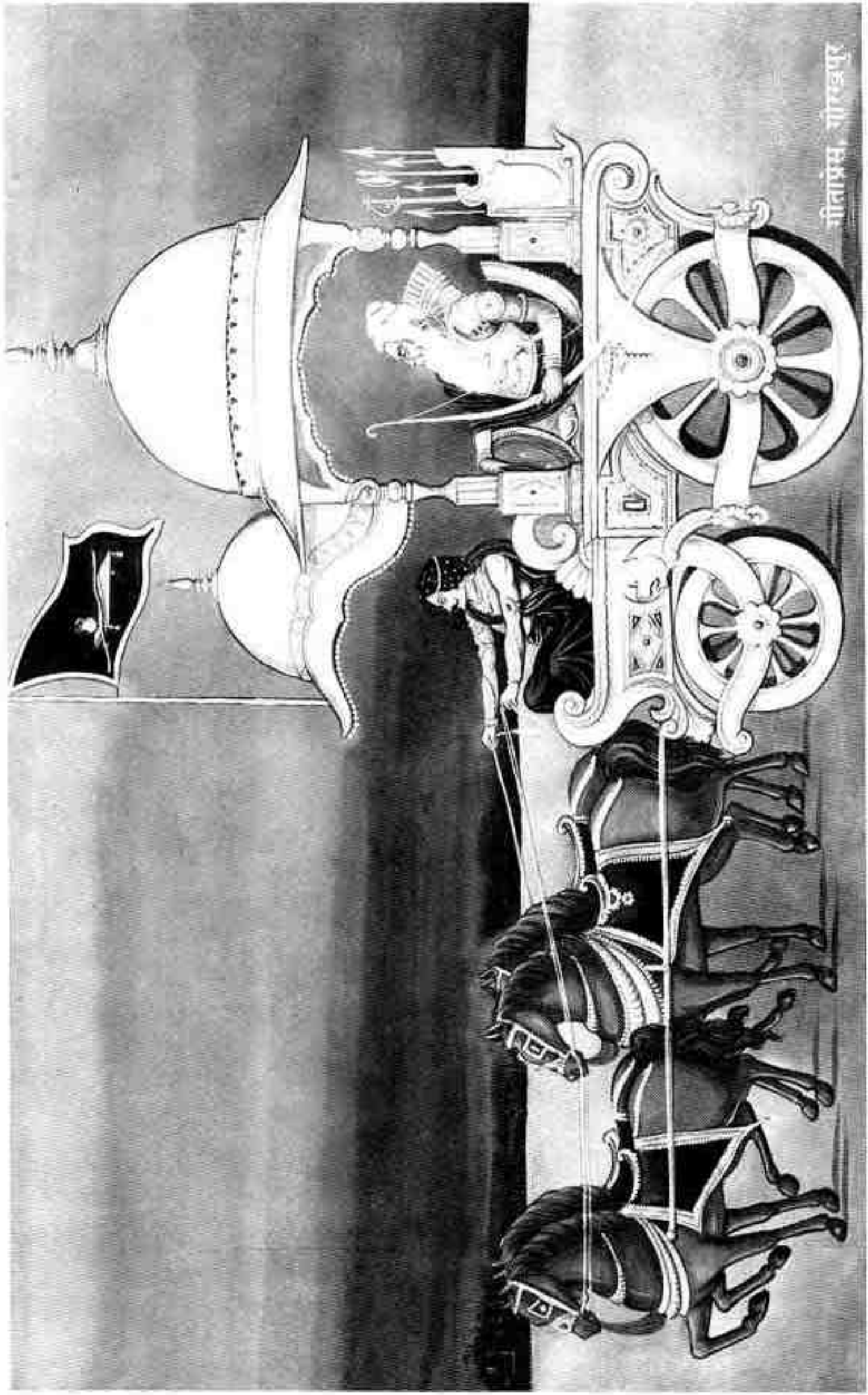
सेनापति द्रोणाचार्य

Droṇācārya the commander-in-chief

अर्जुनका जयद्रथके मस्तकको काटकर समन्त-पञ्चक क्षेत्रसे बाहर फेंकना   Arjuna propels the head of Jayadratha out of Samanta-Pañcaka

।। শ্রীগণেশায় নমঃ ।।

সংক্ষিপ্ত মহাভারত

আদিপর্ব

গ্রন্থের উপক্রম

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
ওঁ নমঃ পিতামহায়। ওঁ নমঃ প্রজাপতিভ্যঃ।
ওঁ নমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায়। ওঁ নমঃ সর্ববিঘ্নবিনায়কেভ্যঃ।

লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূতবংশের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক যখন দ্বাদশ বৎসরব্যাপী সৎসঙ্গের অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন উগ্রশ্রবা সুখাসনে আসীন ব্রতনিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদের দর্শন করতে এলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ঋষিগণ উগ্রশ্রবাকে তাঁদের আশ্রমে দেখে, তাঁর কাছ থেকে নানা চিত্র-বিচিত্র কাহিনী শোনার আশায় সমবেত হলেন। উগ্রশ্রবা সকলকে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সব মুনিঋষি নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন এবং তাঁদের অনুরোধে উগ্রশ্রবাও আসন গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কোনো এক ঋষি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন ? এখন কোথা থেকে আসছেন ?' উগ্রশ্রবা বললেন—'আমি পরীক্ষিৎ-তনয় রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়েছিলাম। সেইখানে আমি শ্রীবৈশম্পায়নের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত মহাভারত গ্রন্থের নানা বিচিত্র ও পবিত্র কাহিনী শুনেছি। তারপর বহু তীর্থ ও আশ্রম ঘুরে সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে গিয়েছি, এইখানেই কৌরব ও পাণ্ডবদের মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখান থেকেই আমি আপনাদের দর্শন করার জন্য এখানে এসেছি। আপনারা সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং চিরায়ু। আপনাদের ব্রহ্মতেজ সূর্য ও অগ্নির ন্যায়। আপনারা স্নান, জপ, যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা পবিত্র হয়ে একাগ্রতার সঙ্গে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করে আছেন। কৃপা

করে আপনারা বলুন আমি আপনাদের কোন কাহিনী শোনাব।'

ঋষিগণ বললেন—'সূতনন্দন ! পরমঋষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণ যার সমাদর করেছেন, যা বিচিত্র পদ পরিপূর্ণ পর্বসমূহ, যেগুলি সূক্ষ্ম অর্থ ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ, যার পদে পদে বেদার্থ

বিভূষিত এবং যা আখ্যানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাতে ভরত-বংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস আছে, যা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের আদেশানুসারে শ্রীবৈশম্পায়ন যা রাজা জনমেজয়কে শুনিয়েছিলেন, ভগবান ব্যাসের সেই পুণ্যময়, পাপনাশক এবং বেদময় সংহিতা আমরা শুনতে চাই।'

উগ্রশ্রবা বললেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকলের আদি। তিনি অন্তর্যামী, সর্বেশ্বর, সকল যজ্ঞাদির ভোক্তা, সকলের দ্বারা প্রশংসিত, তিনি পরম সত্য ওঁ-কার স্বরূপ ব্রহ্ম। তিনিই সনাতন ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপ। তিনি অসৎও আবার সৎও, তিনি সৎ-অসৎ দুই-ই এবং এই দুয়েরও অতীত। তিনিই এই অনন্ত বিশ্ব। তিনিই এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্মের রচনাকারী। তিনিই সকলের জীবনদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী। তিনি মঙ্গলকারী, মঙ্গলস্বরূপ, সর্বব্যাপক, সবার প্রিয়, নিষ্পাপ এবং পরম পবিত্র। সেই চরাচরগুরু নয়নমনোহরণকারী হৃষিকেশকে প্রণাম করে সর্বলোক-পূজিত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ভগবান ব্যাসের পবিত্র রচনা মহাভারতের বর্ণনা করছি। পৃথিবীতে অনেক প্রতিভাবান বিদ্বান এই ইতিহাস আগে বর্ণনা করেছেন, এখনও করেন এবং পরেও করবেন। এই পরমজ্ঞানস্বরূপ গ্রন্থ ত্রিলোকে প্রতিষ্ঠিত। কেউ একে সংক্ষেপে আবার কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এর শব্দাবলী অত্যন্ত শুভ। এতে নানা ছন্দ এবং দেবতা ও মনুষ্যদের মর্যাদার স্পষ্ট বর্ণনা আছে।'

এই জগৎ যখন জ্ঞান ও আলোকশূন্য এবং অন্ধকারপূর্ণ ছিল, সেইসময় এক বিশাল অণ্ডরূপী শক্তিকোষ উৎপন্ন হয়েছিল, সেই শক্তিকোষই সমস্ত জড় ও জীবের উৎপত্তির কারণ। সেই কোষ অত্যন্ত দিব্য এবং জ্যোতির্ময় ছিল। সেই কোষে অনাদি, নির্বিকার, সত্যস্বরূপ, জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম প্রবেশ করলেন। এই ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, সর্বত্র সম, অব্যক্ত কারণ স্বরূপ এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই। পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা এই শক্তি থেকেই প্রকটিত হয়েছেন ; তারপর দশ প্রচেতা, দক্ষ, তাঁর সাত পুত্র, সাত ঋষি এবং চোদ্দ জন মনুর উৎপত্তি হয়েছে। বিশ্বদেবা, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যক্ষ, সাধ্য, পিশাচ, গুহ্যক, পিতৃ, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, জল, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত এবং জগতে যত বস্তু আছে সবই এই কোষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ প্রলয়ের সময় পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয় এবং সেই পরমাত্মাতেই লীন হয়ে যায়। ঋতু সমাগম হলে যেমন তার নানা লক্ষণ প্রকটিত হয় এবং চলে গেলে তা লুপ্ত হয়, তেমনই এই কালচক্র, যার দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি ও বিনাশ হয়, অনাদি ও অনন্তরূপে সর্বদা চলতে থাকে। দেবতাদের সংখ্যা সংক্ষেপে ছত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ। বিবস্বানের বারো জন পুত্র—দিবঃপুত্র, বৃহদ্‌ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি এবং মনু। মনুর দুই পুত্র—দেবভ্রাট এবং সুভ্রাট। সুভ্রাটের তিন পুত্র—দশজ্যোতি, শতজ্যোতি, সহস্রজ্যোতি। তিন জনই ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান এবং প্রজ্ঞাবান। দশজ্যোতির দশ হাজার, শতজ্যোতির এক লাখ এবং সহস্রজ্যোতির দশ লাখ পুত্র জন্ম নেয়। এদের থেকেই কুরু, যদু, ভরত, যযাতি এবং ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি রাজর্ষি বংশ চলে এসেছে। নানা বংশ এবং প্রাণী সৃষ্টির এই হল পরম্পরা।

ভগবান ব্যাস সম্পূর্ণ লোক ; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের রহস্য, কর্ম-উপাসনা-জ্ঞানরূপ বেদ, যোগ-ধর্ম-অর্থ-কাম, শাস্ত্র এবং লোকব্যবহার সম্পূর্ণভাবে তাঁর জগৎ । তিনি এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাসহ সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং শ্রুতির কথা জানিয়েছেন। তিনি এই জ্ঞান কোথাও বিস্তারিতভাবে আবার কোথাও সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কারণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ জ্ঞান বিভিন্নরূপে প্রকাশ করে থাকেন। তিনি তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বেদবিভাজন করে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, পরে তিনি চিন্তা করেছেন শিষ্যদের কীভাবে এটি অধ্যয়ন করাবেন ! ভগবান বেদব্যাসের চিন্তা নিরসন করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা লোকহিতার্থে তাঁর কাছে এলেন। ভগবান ব্যাস তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রণাম করলেন। পরে ব্রহ্মার নির্দেশে তিনি তাঁর কাছে আসন গ্রহণ করলেন। ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে আনন্দের সঙ্গে জানালেন, 'ভগবান ! আমি এক অতি সুন্দর কাব্য রচনা করেছি, বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত বিষয় এতে আছে। এতে বেদাঙ্গ-সহ উপনিষদ, বেদাদির ক্রিয়া-কলাপ, ইতিহাস-পুরাণ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের বিষয়, জরা-মৃত্যু, ভয়-ব্যাধি ইত্যাদির ভাব-অভাবের বিচার, আশ্রম-বর্ণাদির ধর্ম, পুরাণের সার, তপস্যা-ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ, নক্ষত্র এবং যুগাদির বর্ণনা, ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ,

অধ্যাত্ম, ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দান, পাশুপতধর্ম, দেবতা ও মানবসকলের উৎপত্তি, পবিত্র তীর্থ-দেশ-নদী-পর্বত-বন-সমুদ্র, পূর্বকল্প, দিব্য নগর, যুদ্ধকৌশল, বিভিন্ন ভাষা, বিবিধ জাতি, লোকব্যবহার এবং ব্যাপ্তস্বরূপ পরমাত্মার বর্ণনাও করা হয়েছে ; কিন্তু পৃথিবীতে এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ

করার উপযুক্ত কাউকে পাচ্ছি না ; এই হল আমার চিন্তার বিষয়।'

ভগবান ব্রহ্মা বললেন—'মহর্ষি ! আপনি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন। আমি সকল তপস্বী এবং শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষির মধ্যেও আপনাকে শ্রেষ্ঠতম বলে মনে করি। জন্ম থেকেই আপনি সত্য ও বেদার্থ আলোচনা করে থাকেন। তাই আপনার গ্রন্থকে কাব্য বলাই উচিত হবে। এটি কাব্য নামেই প্রসিদ্ধ হবে। আপনার এই কাব্য থেকে আর কোনো কাব্যই জগতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে না। আপনি এখন এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার জন্য শ্রীগণেশকে স্মরণ করুন।' এই বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। ব্যাসদেব তখন একান্ত মনে শ্রীগণেশের ধ্যান করতে লাগলেন। ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগণেশ স্মরণ করা মাত্রই সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব তাঁকে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে পূজা করে তাঁকে বসালেন এবং আর্জি জানালেন—'ভগবান ! আমি নিজ মনে মহাভারত রচনা করেছি। কিন্তু এগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য আমি চিন্তিত। বিশ্বচরাচরে এই কাজ শুধুমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব। কৃপা করে আপনি এই ভার গ্রহণ করুন।' শ্রীগণেশ বললেন—'মহাত্মা ! আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি এই কাজের ভার নিলাম—কিন্তু আমার কলম যেন মুহূর্তের জন্যও না থেমে যায়, কলম থেমে গেলে আমি তখনই লেখা বন্ধ করে দেব, আর লিখব না।' ব্যাসদেব বললেন—'ঠিক আছে, কিন্তু আপনি অর্থ না বুঝে একটি কথাও লিখবেন না।' গণেশ

'তথাস্তু' বলে তাই মেনে নিলেন। ভগবান ব্যাস মহাভারত রচনার সময় মাঝে-মধ্যে কিছু গূঢ় (ব্যাসকূট) শ্লোক রচনা করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'আট হাজার আটশত শ্লোকের অর্থ আমি জানি, শুকদেব জানেন। সঞ্জয় জানেন কিনা, তা আমি ঠিক জানি না।' এই শ্লোকগুলি এখনও এই গ্রন্থে রয়েছে। গণেশ যখন এই ব্যাসকূট শ্লোকগুলির অর্থ উদ্ধারের জন্য কিছুক্ষণ থামতেন ততক্ষণে ব্যাসদেব আরও অনেক শ্লোক রচনা করে ফেলতেন।

মহাভারত হল জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা যার সাহায্যে অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ আলোর দিশা পায়। এই মহাভারতরূপ দিব্যজ্ঞান মহাধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা করে লোকের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই গ্রন্থে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, দুর্যোধনের দুরাচারিতা, পাণ্ডবদের সত্যপালনের বর্ণনা করেছেন। এর প্রত্যেক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় মহিমা প্রকটিত হয়। মহাভারতরূপ

এই কল্পবৃক্ষ সমস্ত কবির আশ্রয়স্থল। সকল কবি এর ওপর নির্ভর করে নিজের কাব্য সৃষ্টি করে থাকেন।

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে মহাভারত পাঠ করেন তাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়। কারণ এতে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবতা ইত্যাদির পরম পবিত্র কর্ম বর্ণিত আছে ; এর মধ্যে সনাতন পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী কীর্তন করা হয়েছে। তিনি সত্য, ঋত, পরম পবিত্র এবং মঙ্গলময় ; তিনি অবিনাশী, অবিচল, অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর লীলাগান করেন, তিনি সৎ ও অসৎ দুই-ই। জগতের সমস্ত কাজ তাঁর শক্তিতেই সংঘটিত হয়। পঞ্চভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং প্রকৃতির মূলব্রহ্মস্বরূপ—এ সবই তাঁর স্বরূপ। সন্ন্যাসীগণ ধ্যানে তাঁকে স্মরণ করেই মুক্তিলাভ করেন এবং দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় সম্পূর্ণ প্রপঞ্চকে তাঁর মধ্যেই অবস্থিত আছে দেখে থাকেন। মহাভারত তাঁর চরিত্রেই পরিপূর্ণ, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। মহাভারত গ্রন্থ সত্য ও অমৃতস্বরূপ। ইতিহাসে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইতিহাস এবং পুরাণাদির সাহায্যেই বেদার্থের নির্ণয় করা উচিত। বেদ থেকে অল্পজ্ঞানী ব্যক্তি দূরে থাকে, পাছে তারা এর অর্থ সম্যকরূপে অনুধাবন করতে না পারে। দেবতাগণ একে বেদের সঙ্গে সমজ্ঞানে দেখেন। এর গুরুত্ব এবং মহত্ত্বের জন্য একে মহাভারত বলা হয়েছে। তপস্যা, অধ্যয়ন, বৈদিক কর্মানুষ্ঠান সবই চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় যদি তা ভাবশুদ্ধি সহ করা হয়। এই গ্রন্থে ভাবশুদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, তাই মহাভারত গ্রন্থ পাঠের সময় ভাবশুদ্ধি বজায় রাখা উচিত।

—— o ——

জনমেজয়ের ভ্রাতাদের শাপ ও গুরুসেবার মাহাত্ম্য

উগ্রশ্রবা বললেন—হে ঋষিগণ ! পরীক্ষিৎ নন্দন জনমেজয় ভাইদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এক বিশাল যজ্ঞ করছিলেন। তাঁর তিন ভাই ছিল—শ্রুতসেন, উগ্রসেন এবং ভীমসেন। সেই যজ্ঞস্থানে একটি কুকুর ঢুকে পড়েছিল।

জনমেজয়ের ভায়েরা তাকে মারলে সে চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গেলে তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, তুমি কাঁদছ কেন ? কে তোমাকে মেরেছে ?' কুকুরটি বলল—'মা, আমাকে জনমেজয়ের ভায়েরা মেরেছে।' মা বলল—'তুমি কোনো অন্যায় করেছ বোধহয় !' কুকুরটি বলল—'মা, আমি পূজার দিকেও যাইনি আর কোনো কিছুতে মুখও দিইনি। আমি তো কোনো অন্যায়ই করিনি।' তার কথা শুনে মা খুব দুঃখ পেল। সে তখনই জনমেজয়ের যজ্ঞস্থলে গেল এবং ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করল—'আমার ছেলে পূজাস্থলে যায়নি আর কোনো কিছুতে ব্যাঘাত করেনি। সে তো কোনো অন্যায়ই করেনি, তাহলে তাকে মারা হয়েছে কেন ?' জনমেজয় এবং তার ভায়েরা তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারল না। তখন সেই কুকুরটির মা বলল 'যেহেতু বিনা দোষে তোমরা আমার সন্তানকে মেরেছ, অতএব তোমাদেরও হঠাৎ কোনো ভীষণ বিপদ আসবে।' দেবতাদের কুকুর সরমার শাপ শুনে জনমেজয় খুব দুঃখ পেলেন এবং ভয়ও পেলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে তিনি হস্তিনাপুরে এসে একজন উপযুক্ত পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন, যিনি এই অভিশাপ দূর করতে সক্ষম। একদিন জনমেজয় যখন শিকার করতে গেছেন, তখন ঘুরতে ঘুরতে নিজরাজ্যেই একটি আশ্রমের সন্ধান পেলেন। সেই আশ্রমে শ্রুতশ্রবা নামে এক ঋষি বাস করতেন, তাঁর তপস্বীপুত্র সোমশ্রবাকে জনমেজয় পুরোহিতরূপে বরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শ্রুতশ্রবা ঋষিকে প্রণাম করে বললেন—'ভগবান ! আপনার পুত্রকে আমি পুরোহিতরূপে প্রার্থনা করি।' ঋষি

বললেন—'আমার পুত্র খুব বড় তপস্বী এবং

স্বাধ্যায়সম্পন্ন। সে আপনার সকল অভিশাপ-অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম। শুধুমাত্র মহাদেবের অভিশাপ দূর করার শক্তি তার নেই। এছাড়া তার আর একটি ব্রত আছে। যদি কোনো ব্রাহ্মণ এর কাছে কিছু চায়, তাহলে আমার পুত্র তাকে সেটি প্রদান করে থাকে। তুমি যদি এগুলি মেনে নিতে পার, তাহলে ওকে নিয়ে যাও।' জনমেজয় ঋষির আদেশ শিরোধার্য করে সোমশ্রবাকে সঙ্গে করে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। তিনি ভাইদের বললেন—'আমি এঁকে পুরোহিতরূপে স্বীকার করেছি, তোমরা বিনাবিচারে এঁর নির্দেশ পালন করবে।' ভাইয়েরা তাঁর কথা মেনে নিলেন। তিনি তক্ষশীলা অভিযান করে তক্ষশীলা অধিকার করলেন।

সেইসময় সেখানে আয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি বাস করতেন। তাঁর তিনজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—'আরুণি, উপমন্যু এবং বেদ। আরুণি ছিলেন পাঞ্চালদেশের। তিনি একদিন আরুণিকে ক্ষেতে বাঁধ বাঁধতে বললেন। গুরুর আদেশে আরুণি ক্ষেতে গিয়ে বাঁধ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি বাঁধ দিতে পারলেন না। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি এক উপায় ভেবে নিজেই বাঁধের জায়গায় শুয়ে পড়লেন। তার ফলে ক্ষেতে জল ঢোকা বন্ধ হল। কিছু সময় পরে আয়োদধৌম্য তাঁর শিষ্যদের কাছে আরুণির খোঁজ করলেন, তাঁরা জানাল যে, 'আপনি তাঁকে বাঁধ দেওয়ার জন্য ক্ষেতে পাঠিয়েছেন।' আচার্য শিষ্যদের বললেন—'চলো, আমরাও সেখানে যাই।' ক্ষেতে গিয়ে আচার্য ডাকতে লাগলেন—'আরুণি, তুমি কোথায় ? এখানে এসো পুত্র !' আচার্যের গলা শুনে আরুণি বাঁধের থেকে উঠে এসে বললেন—'ভগবান ! আমি এখানেই ছিলাম। ক্ষেতে জলভর্তি হয়ে যাচ্ছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও সেই জল আটকাতে পারিনি। তাই বাঁধের মুখে যেখান দিয়ে জল ঢুকছিল, আমি সেখানে জল বন্ধ করার জন্য শুয়ে ছিলাম। আপনার ডাক শুনে বাঁধ থেকে উঠে এসেছি। আমার প্রণাম নিন। আদেশ করুন আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?' আচার্য বললেন—'পুত্র ! তুমি ক্ষেতের বাঁধ উদ্দলন করে (ভেঙে-চুরে) উঠে এসেছ, তাই আজ থেকে তোমার নাম 'উদ্দালক'।' পরে কৃপাপরবশ হয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার আদেশ পালন করেছ। তোমার মঙ্গল হোক।

সমস্ত বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রে তুমি পারঙ্গম হবে।' আচার্যের আশীর্বাদ লাভ করে তিনি নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করলেন।

আয়োদধৌম্যের অপর শিষ্যের নাম উপমন্যু। আচার্য তাঁকে গোরুগুলি দেখাশোনা করতে পাঠালেন। আচার্যের আদেশে তিনি গো-পালন করতে লাগলেন। সারাদিন গোরু দেখাশোনা করে সন্ধ্যায় আশ্রমে এসে উপমন্যু আচার্যকে প্রণাম করলেন। আচার্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র ! তোমাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে, তুমি খাওয়া-দাওয়া কী করছ ?' উপমন্যু বললেন—'প্রভু ! আমি ভিক্ষা দ্বারা ক্ষুধা নিরসন করি।' আচার্য বললেন—'পুত্র ! আমাকে নিবেদন না করে তোমার ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা উচিত নয়।' তিনি আচার্যের কথা মেনে নিলেন। তখন

থেকে উপমন্যু ভিক্ষা নিয়ে আচার্যকে নিবেদন করতেন এবং আচার্য সমস্ত ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে রেখে দিতেন। উপমন্যু প্রত্যহ গোরুর দেখাশোনা করে সন্ধ্যার সময় গুরুগৃহে ফিরে আসতেন এবং আচার্যকে প্রণাম করতেন। একদিন আচার্য বললেন—'পুত্র ! আমি তোমার সমস্ত ভিক্ষা দ্রব্য নিয়ে নিই। এখন তুমি কী খাও-দাও ?' উপমন্যু বললেন—'ভগবান ! আমি প্রথমে ভিক্ষা করে যা পাই তা আপনাকে নিবেদন করি। পরে আবার ভিক্ষা করে তাই গ্রহণ করি।' আচার্য বললেন—'অন্তেবাসীদের (গুরুগৃহে থাকা ব্রহ্মচারীর) এমন করা ঠিক নয়। তুমি অন্য ভিক্ষার্থীদের জীবিকাতে বাধা সৃষ্টি করছ, এছাড়া এতে তোমার লোভ প্রকাশ পাচ্ছে।' উপমন্যু গুরুর আদেশ মেনে নিলেন এবং পুনরায় গো-পালন করতে লাগলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি পুনরায় গুরুগৃহে এলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। আচার্য বললেন—'পুত্র উপমন্যু ! আমি তোমার সমস্ত ভিক্ষা দ্রব্য নিয়ে নিই, তুমি আর দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, তা সত্ত্বেও তোমাকে বেশ স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে, এখন তুমি কী খাওয়া-দাওয়া কর ?' উপমন্যু বললেন—'আমি এখন এই গোরুদের দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করি।' আচার্য বললেন—'পুত্র ! আমার আদেশ ছাড়া তোমার গোরুর দুধ নেওয়া উচিত নয়।' উপমন্যু আচার্যের এই আদেশও মেনে নিলেন এবং প্রত্যহের ন্যায় সন্ধ্যায় গো-পালন করে আচার্যের নিকট উপস্থিত হলেন এবং প্রণাম জানালেন। আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র, তুমি আমার নির্দেশে ভিক্ষা তো দূরের কথা, দুধও খাও না। তাহলে এখন কী খাওয়া-দাওয়া কর ?' উপমন্যু বললেন—'প্রভু ! গো-বৎসেরা মায়ের দুধ খাবার সময় তাদের মুখ থেকে যে ফেনা নিঃসৃত হয়, তাই আমি পান করে থাকি।' আচার্য বললেন—'আহা ! এই দয়ালু বাছুরেরা তোমার ওপর কৃপা পরবশ হয়ে বেশি করে ফেনা নিঃসরণ করে ; তুমি তো এইভাবে ওদের জীবন-ধারণে বাধার সৃষ্টি করছ। তোমার ফেনা খাওয়া উচিত নয়।' শিষ্য আচার্যের নির্দেশ শিরোধার্য করে নিলেন। এখন খাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপমন্যু ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে একদিন আখের পাতা খেয়ে নিলেন। সেই তীক্ষ্ণ, কটু, রুক্ষ পচারসযুক্ত পাতা খেতে খেতে তাঁর চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেল। অন্ধ হয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে একদিন উপমন্যু কুয়ায় পড়ে গেলেন। সূর্যাস্ত হয়ে গেল, তখনও উপমন্যু আশ্রমে ফিরে এলেন না দেখে আচার্য শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন—'উপমন্যু আসেনি ?' শিষ্যেরা উত্তর দিল—'প্রভু ! ও তো গোরু চরাতে গেছে !' আচার্য বললেন—'আমি উপমন্যুর খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছি। তাই ও বোধহয় রাগ করেছে, এখনও আসেনি। চলো, ওকে খুঁজে নিয়ে আসি।' আচার্য শিষ্যদের নিয়ে বনে গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন—'উপমন্যু ! তুমি কোথায় ? পুত্র, এসো !' আচার্যের গলার
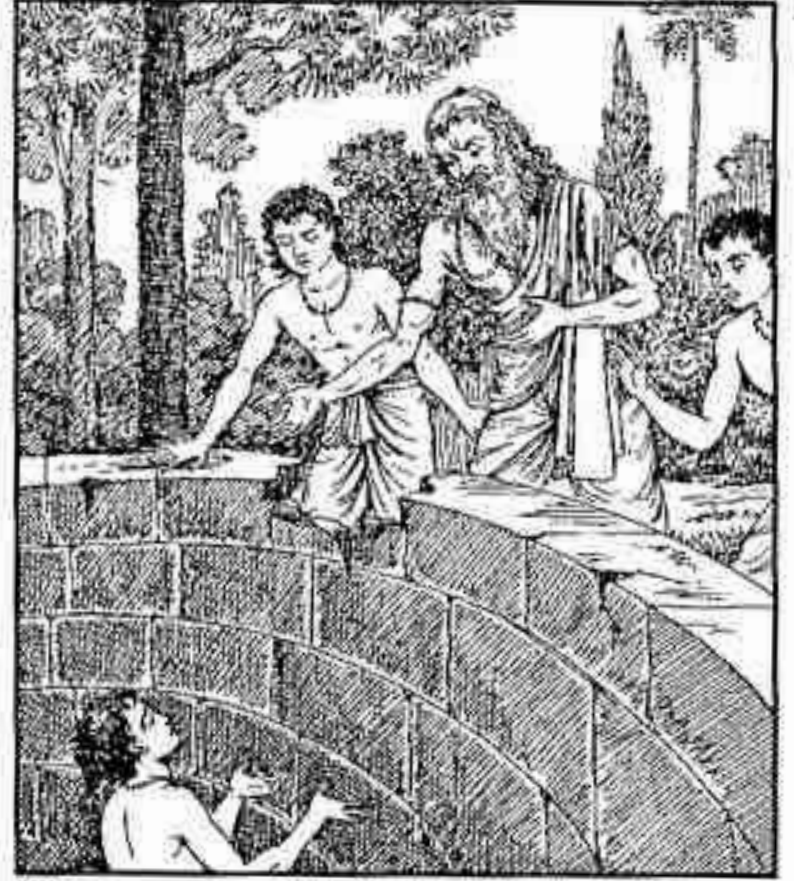
স্বর শুনে উপমন্যু চেঁচিয়ে বললেন—'আমি এখানে, কুয়োতে পড়ে গেছি !' আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কুয়োর মধ্যে পড়লে কী করে ?' উপমন্যু বললেন—'আখের পাতা খেয়ে খেয়ে আমি অন্ধ হয়ে গিয়ে এই কুয়োয় পড়ে গেছি।' আচার্য বললেন—'তুমি দেবতাদের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করো, তাঁরা তোমার চোখ সারিয়ে দেবেন।' উপমন্যু তখন বেদের মন্ত্র থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করতে লাগলেন।

উপমন্যুর স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর কাছে এসে তাঁকে পরমান্ন দিয়ে বললেন—'তুমি এটি খেয়ে নাও।' উপমন্যু বললেন—'দেববর ! ঠিক আছে, কিন্তু আমি আচার্যকে নিবেদন না করে আপনাদের আদেশ পালন করতে পারছি না।' অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন—'তোমার আচার্যও আগে আমাদের বন্দনা করেছিলেন এবং আমরা তাঁকেও পরমান্ন দিয়েছিলাম। তিনি তো গুরুকে নিবেদন না করেই খেয়েছিলেন। অতএব তোমার

আচার্য যা করেছিলেন, তুমিও তাই করো।' উপমন্যু বললেন— 'আমি হাতজোড় করে বলছি, আমি আচার্যকে নিবেদন না করে পরমান্ন খেতে পারব না।' অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন—'তোমার গুরুভক্তি দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি।

তোমার দাঁত সোনার হবে, তোমার চোখ ভালো হয়ে যাবে এবং তোমার সর্বপ্রকার কল্যাণ হবে।' অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নির্দেশানুসারে উপমন্যু আচার্যের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন। আচার্য প্রসন্ন হয়ে বললেন—'অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের কথা অনুযায়ী তোমার কল্যাণ হবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার স্মৃতিতে স্বতই স্ফুরিত হবে।'

আয়োদধৌম্যের তৃতীয় শিষ্যের নাম বেদ। আচার্য তাঁকে বললেন—'পুত্র, তুমি কিছুদিন আমার কাছে থাক, সেবা-শুশ্রূষা করো, তোমার কল্যাণ হবে।' তিনি বহুদিন সেখানে থেকে গুরুসেবা করলেন। আচার্য প্রত্যেক দিন তাঁর কাঁধে বলদের মতো ভার চাপিয়ে দিতেন আর বেদ প্রত্যহ শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে তাঁর সেবা করতেন। কখনো আচার্যের আদেশ লঙ্ঘন করেননি। বহুদিন এইরকম কষ্ট করায় আচার্য প্রসন্ন হয়ে তাঁকে কল্যাণকারী ও সর্বজ্ঞ হওয়ার বর প্রদান করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে তিনি গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এলেন। বেদেরও তিনজন শিষ্য ছিল, কিন্তু তিনি কখনো তাদের কোনো কাজ বা গুরুসেবার জন্য আদেশ করতেন না। কেন-না তিনি গুরুগৃহের দুঃখগুলি জানতেন তাই শিষ্যদের দুঃখ দিতে চাইতেন না। রাজা জনমেজয় এবং পৌষ্য একবার আচার্য বেদকে পুরোহিত রূপে বরণ করেন। বেদ যখন পুরোহিত কর্মের জন্য কোথাও যেতেন তখন তিনি তাঁর শিষ্য উতঙ্ককে ঘরের দেখাশোনার জন্য রেখে যেতেন। একবার আচার্য বেদ ঘরে ফিরে তাঁর শিষ্য উতঙ্কের সদাচার পালনের অনেক প্রশংসা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন—'পুত্র! তুমি ধর্মপথে দৃঢ় থেকে আমার পর্যাপ্ত সেবা করেছ। আমি তোমার কাজে প্রসন্ন হয়েছি। তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি নিত্যকর্মে মন দাও।' উতঙ্ক জিজ্ঞাসা করলেন—'আচার্য! আমি আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আপনাকে দিতে চাই।' আচার্য প্রথমে নিতে রাজি ছিলেন না, পরে বললেন—'তোমার গুরু-মাকে জিজ্ঞাসা করো।' উতঙ্ক তখন গুরু-মায়ের কাছে গেলেন, তিনি বললেন—'তুমি রাজা পৌষ্যের কাছে গিয়ে তাঁর রানির কানের কুণ্ডল চেয়ে আনো। আমি চারদিন পরে যে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাব, সেইদিন সেটি পরে খাদ্য পরিবেশন করব। তুমি যদি এইটি পার, তাহলেই তোমার কল্যাণ হবে, নচেৎ নয়।'

উতঙ্ক ওখান থেকে গিয়ে দেখলেন একজন খুব লম্বা-চওড়া ব্যক্তি এক বিশাল বলদের ওপরে বসে আছে। সে উতঙ্ককে ডেকে বলল—'তুমি এই বলদের গোবর খেয়ে নাও।' উতঙ্ক তাতে রাজি না হওয়ায় সে বলল—'উতঙ্ক, তোমার আচার্যও এটি আগে খেয়েছেন। অত চিন্তা কোরো না, খেয়ে নাও।' উতঙ্ক বলদের গোবর এবং গোমূত্র খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে মুখ ধুয়েই সেখান থেকে রওনা হয়ে গেলেন। উতঙ্ক রাজা পৌষ্যের কাছে গিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—'আমি আপনার কাছ থেকে কিছু নিতে এসেছি।' পৌষ্য উতঙ্কের মনোবাসনা জেনে তাঁকে অন্তঃপুরে রানির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রানিমহলে গিয়ে উতঙ্ক রানিকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। তিনি ফিরে এসে রাজাকে একথা জানালে রাজা বললেন—'আমার রানি অত্যন্ত পতিব্রতা। কোনো মিথ্যাচারী, অপবিত্র মানুষের পক্ষে তাঁর সাক্ষাৎলাভ সম্ভব নয়।' উতঙ্ক তখন স্মরণ করে বললেন—'ঠিক তো, আমি পথে আসতে আসতে কিছু খেয়েছিলাম।' পৌষ্য বললেন—'পথ চলাকালীন খাওয়া নিষিদ্ধ, অতএব আপনি অপবিত্র।' তখন উতঙ্ক পূর্বমুখী হয়ে হাত-পা-মুখ ধুয়ে, তিনবার সম্যকভাবে আচমন করে দুবার ভালো করে মুখ ধুলেন।

তারপর তিনি অন্তঃপুরে গেলে রানির সাক্ষাৎলাভ করলেন।

রানি উতঙ্ককে সৎপাত্র বুঝে তাঁর কর্ণের কুণ্ডল দান করলেন এবং সতর্ক করে দিলেন যে এই কুণ্ডল নাগরাজ তক্ষকেরও খুব পছন্দ, তক্ষক যেন উতঙ্কের অসাবধানতার সুযোগে এটি নিয়ে না যায়।

পথ চলতে চলতে উতঙ্ক লক্ষ্য করলেন এক নগ্ন সন্ন্যাসী তাঁর পিছন পিছন আসছে, সে কখনো দৃশ্যমান আবার কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। উতঙ্ক একবার কুণ্ডলটি রেখে জল খেতে গেলে সন্ন্যাসী কুণ্ডলটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নাগরাজ তক্ষকই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে এসেছিল। উতঙ্ক ইন্দ্রের বজ্রের সাহায্যে নাগলোকে পৌঁছলেন। তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তক্ষক তাঁকে কর্ণের কুণ্ডল ফেরত দিলেন। উতঙ্ক ঠিক সময়মতো গুরুপত্নীর কাছে গিয়ে তাঁকে কর্ণের কুণ্ডল প্রদান করলেন। তারপর আচার্যের আদেশ নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। তিনি তক্ষকের ওপরে খুব রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছিলেন। সেইসময় জনমেজয় তক্ষশীলা জয় করে ফিরে এসেছিলেন। উতঙ্ক বললেন— 'মহারাজ ! তক্ষক আপনার পিতাকে দংশন করেছিল, আপনি তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যজ্ঞ শুরু করুন। কশ্যপ আপনার পিতাকে রক্ষা করার জন্য আসছিলেন,

কিন্তু তক্ষক তাঁকে ফিরিয়ে দেন। আপনি এবার সর্প-যজ্ঞ করুন আর তার জ্বলন্ত অগ্নিতে সেই পাপীকে ভস্ম করে

দিন। এই দুরাত্মা আমারও কম ক্ষতি করেনি। আপনি সর্প-যজ্ঞ করলে আপনার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে এবং আমিও প্রসন্ন হব।'

——०——

সর্পের জন্ম-বৃত্তান্ত

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন উগ্রশ্রবা ! আপনি আমাকে আস্তিক ঋষির কথা বলুন, যিনি জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞে নাগরাজ তক্ষককে রক্ষা করেছিলেন। আপনার মুখনিঃসৃত ভাষা অত্যন্ত মধুর এবং শ্রুতিনন্দন। আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁর মতো করে আমাদের সব বলুন।'

উগ্রশ্রবা বললেন—'আয়ুষ্মন্ ! আমি আমার পিতার কাছে আস্তিকের কথা শুনেছি। আপনাদের সেই কথাই বলছি। সত্যযুগে প্রজাপতি দক্ষের দুই কন্যা ছিল। তাঁদের নাম—কদ্রু এবং বিনতা। কশ্যপ ঋষির সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়। কশ্যপ পত্নীদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'তোমরা যা চাও বল।' কদ্রু বললেন—'আমার যেন এক

হাজার তেজস্বী নাগ পুত্র হয়।' বিনতা বললেন—'তেজস্বিতা, বল ও বিক্রমে কদ্রুর পুত্রদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমার যেন দুটি পুত্র হয়।' কশ্যপ বললেন—'তাই হবে।' দুজনেই খুব খুশি হলেন। গর্ভাবস্থায় সাবধানে থাকতে বলে কশ্যপঋষি বনগমন করলেন।

যথাসময়ে কদ্রু এক হাজার এবং বিনতা দুটি ডিম্বকোষ প্রসব করলেন। ধাত্রীরা সেগুলি উষ্ণ পাত্রে যত্ন করে রাখল। পাঁচশত বছর পূর্ণ হলে কদ্রুর হাজার পুত্র জন্ম নিল কিন্তু বিনতার পুত্র ডিম্বকোষ থেকে বার হল না। বিনতা অসিহষ্ণু হয়ে একটি ডিম হাত দিয়ে ভেঙে ফেললেন। সেই ডিমটিতে শিশুর অর্ধ শরীর পরিপুষ্ট হলেও নীচের অর্ধাংশ পুষ্ট হয়নি। নবজাত শিশু ক্রোধপরবশ হয়ে মাকে অভিশাপ দিল—'মা ! তুমি লোভবশত আমার অর্ধপুষ্ট শরীরকে ডিম থেকে বার করেছ। তাই তুমি পাঁচশত বছর ধরে তোমার সতীনের, যাকে তুমি হিংসা কর তাঁর দাসী হয়ে থাকবে। যদি তুমি আমার মতো অন্য ডিমটি ভেঙে ওই শিশুটির অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ না করো, তাহলে সেই তোমাকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করবে। তোমার যদি এমন আশা থাকে যে তোমার অন্য পুত্রটি বলশালী হোক তাহলে তুমি ধৈর্যসহকারে পাঁচশত বছর প্রতীক্ষা করে থাক।' এই অভিশাপ দিয়ে সেই শিশু আকাশে চলে গেল এবং সূর্যের সারথি হল। প্রাতঃকালের রক্তবর্ণ তারই ছটা, তার নাম হল অরুণ।

একদিন কদ্রু ও বিনতা দুই বোন একত্রে ভ্রমণে বেরিয়ে উচ্চৈঃশ্রবা নামে এক ঘোড়া দেখতে পেলেন। এই অশ্বরত্ন সমুদ্রে অমৃত-মন্থনে উৎপন্ন হয়েছিল এবং সমস্ত অশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলবান, বিজয়ী, সুন্দর, অজর, দিব্য এবং সর্বসুলক্ষণযুক্ত। তাকে দেখে দুই বোন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! দেবতারা অমৃতমন্থন কোথায় এবং কেন করেছিলেন ? উচ্চৈঃশ্রবা অমৃত-মন্থনে কীভাবে উৎপন্ন হল ?'

উগ্রশ্রবা মহর্ষি শৌনকের এই প্রশ্ন শুনে তাঁকে অমৃত-মন্থনের কথা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

সমুদ্র-মন্থন এবং অমৃতপ্রাপ্তি

উগ্রশ্রবা বললেন—শৌনক ঋষিগণ ! মেরু নামে এক অতিসুন্দর মনোরম পর্বত ছিল, দেখলে মনে হত বিদ্যুতে তৈরি। তার সুন্দর শিখরের ছটার কাছে সূর্যের প্রভাও হীনপ্রভ হয়ে যেত। তার গগনচুম্বী শিখরগুলি রত্নখচিত ছিল। তারই একটি শিখরে দেবগণ একত্রিত হয়ে অমৃত-প্রাপ্তির জন্য পরামর্শ করছিলেন। ভগবান নারায়ণ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মাও সেখানে ছিলেন। নারায়ণ বললেন—'দেবতা এবং অসুর মিলিতভাবে সমুদ্র-মন্থন করুক, এই মন্থনের ফলে অমৃত-লাভ হবে।' দেবতারা নারায়ণের পরামর্শ অনুসারে মন্দার পর্বতটি তোলার চেষ্টা করলেন। এই পর্বত মেঘের ন্যায় উচ্চ শিখর যুক্ত, এগারো হাজার যোজন উচ্চ, নীচেও তেমনই তার ব্যাপ্তি। সমস্ত দেবতা তাঁদের সকল শক্তি একত্রিত করেও যখন পর্বতটিকে তুলতে পারলেন না তখন তাঁরা ভগবান বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন—'ভগবান ! আপনারা দুজনে আমাদের কল্যাণের জন্য মন্দার পর্বত তোলার উপায় করুন এবং আমাদের কল্যাণের জন্য উপদেশ দিন।' দেবতাদের প্রার্থনা শুনে শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীব্রহ্মা শেষনাগকে মন্দার পর্বত তোলবার জন্য পাঠালেন। মহাবলশালী শেষনাগ সকলের সঙ্গে গিয়ে মন্দার পর্বত উপড়ে দিলেন। তারপর দেবতাগণ মন্দার পর্বতকে নিয়ে সমুদ্রতীরে গেলেন এবং সমুদ্রকে বললেন—'আমরা অমৃতলাভের উদ্দেশ্যে আপনার জল মন্থন করব।' সমুদ্র বললেন—'অমৃতে যদি আমারও কিছু ভাগ রাখেন, তাহলে মন্দার পর্বত মন্থন করতে আমার যে কষ্ট হবে, তা আমি সহ্য করে নেব।' দেবতা এবং অসুরগণ সমুদ্রের এই কথা মেনে নিলেন এবং কচ্ছপরাজকে বললেন—'আপনি এই পর্বতের আধার রূপে থাকুন।' কচ্ছপ তা মেনে নিয়ে মন্দার পর্বতকে নিজের পিঠের ওপর স্থান দিলেন। এইভাবে সমুদ্র মন্থনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল।

এইভাবে দেবতা ও অসুরগণ মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকি নাগকে রজ্জুর মতো ব্যবহার করে সমুদ্র-মন্থন করতে আরম্ভ করলেন। বাসুকি নাগের মুখ যেদিকে সেইদিকে অসুরেরা আর লেজের দিকে দেবতারা অবস্থান

করছিলেন। বারংবার টান পড়াতে বাসুকি নাগের মুখ থেকে ধোঁয়া এবং নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে আগুনের মতো হল্কা বেরোচ্ছিল। সেই ধোঁয়া ও আগুনের হল্কা কিছু

পরে মেঘে পরিণত হয়ে দেবতাদের ওপর বৃষ্টি ঝরাতে থাকল। পর্বত শিখরে ফুলের পাহাড় হয়ে গেল, মেঘের গম্ভীর গর্জন শোনা যেতে লাগল। পাহাড়ের ওপর গাছগুলি উপড়ে পড়তে লাগল, তাদের একে অপরের ঘর্ষণে দাবানল সৃষ্টি হল। ইন্দ্র মেঘ ও বৃষ্টির সাহায্যে সেই আগুন নিভিয়ে দিলেন। বৃক্ষের রস জলে বাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়তে থাকল। ঔষধের ন্যায় বৃক্ষের সেই রস এবং সুবর্ণময় মন্দার পর্বতের নানা দিব্য মণি-মুক্তা ধৌত জলের স্পর্শেই দেবতাগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হতে থাকলেন। সেই উত্তম রসের সংমিশ্রণে সমুদ্রের জল দুধে পরিণত হল এবং দুধের থেকে ঘি তৈরি হতে লাগল। দেবতারা মন্থন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন—'নারায়ণ ছাড়া অন্য সব দেবতা এবং অসুররা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে! অনেক সময় ধরে সমুদ্র-মন্থন করতে থাকলেও, এখনও পর্যন্ত অমৃত পাওয়া যায়নি।' ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুকে বললেন—'ভগবান ! আপনি এদের শক্তি জোগান। কারণ আপনিই এঁদের একমাত্র আশ্রয়।' ভগবান বিষ্ণু বললেন, 'যাঁরা এই কাজে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁদের শক্তি দেব। সকলে মিলে পূর্ণ শক্তিতে মন্দার পর্বতকে আন্দোলিত করুক এবং সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তুলুক।'

ভগবান বিষ্ণুর এই কথায় দেবতা এবং অসুরদের শক্তি বৃদ্ধি হল এবং তাঁরা অত্যন্ত বেগে মন্থন করতে লাগলেন। সমস্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তখন সমুদ্র থেকে অজস্র কিরণসম্পন্ন, শীতল আলোযুক্ত, শ্বেতবর্ণ চন্দ্রের উদয় হল। চন্দ্রের পর দেবী লক্ষ্মী এবং সুরাদেবী আবির্ভূতা হলেন। সেই সময় উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াও উত্থিত হল। ভগবান নারায়ণের বক্ষ সুশোভনকারী দিব্য কিরণে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি এবং বাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনুরও আবির্ভাব হল। লক্ষ্মী, সুরা, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবা —এগুলি সবই আকাশপথে দেবলোকে চলে গেল। তারপর প্রকটিত হলেন দিব্যশরীরধারী ধন্বন্তরি দেব। তিনি হাতে শ্বেতকমণ্ডলুতে অমৃত নিয়ে আবির্ভূত হলেন। এই অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখে দানবেরা 'আমার', 'আমার' করে কোলাহল করে উঠল। এরপর চার-শ্বেত দন্তবিশিষ্ট ঐরাবত আবির্ভূত হল। ইন্দ্র তাকে নিয়ে নিলেন। যখন বহুক্ষণ ধরে সমুদ্র-মন্থন চলতে লাগল, তখন অবশেষে কালকূট বিষ উত্থিত হল। তার তীব্র গন্ধেই লোকে অচেতন হয়ে পড়ল। ব্রহ্মার অনুরোধে মহেশ্বর শিব তাকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করলেন। তখন থেকেই ইনি 'নীলকণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ। এই সব দেখে অসুরেরা হতাশ হল। অমৃত এবং লক্ষ্মীকে পাবার জন্য তাদের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়ে গেল। সেই সময় ভগবান বিষ্ণু মোহিনী নামে নারী বেশধারণ করে অসুরদের মধ্যে এলেন। মূর্খ দানবেরা তাঁর মায়া বুঝতে না পেরে মোহিনীরূপধারী ভগবানকে অমৃত পাত্র প্রদান করল, সেই সময় তারা মোহিনীর রূপে মোহিত হয়ে গিয়েছিল।

ভগবান বিষ্ণু এইভাবে মোহিনীরূপ ধারণ করে দৈত্য-দানবদের কাছ থেকে অমৃত হরণ করে আনলেন এবং তা দেবতাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। সেই সময় রাহু নামক এক অসুর দেবরূপ ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে থেকে অমৃত পান করছিল, কিন্তু অমৃত তার কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই সূর্য এবং চন্দ্র তাঁকে চিনে ফেলেন। ভগবান বিষ্ণু অতি সত্বর তাঁর চক্রদ্বারা রাহুর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেন। পর্বত-শিখরের মতো বৃহদাকার রাহুর মস্তক

আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগল আর তার দেহটি পৃথিবীতে পড়ে সমস্ত কিছু কম্পিত করে ছটফট করতে লাগল। তখন থেকেই রাহু চন্দ্র ও সূর্যের স্থায়ী শত্রু হয়ে বিরাজ করতে লাগল। অমৃত পরিবেশন করার পর ভগবান

বিষ্ণু তাঁর মোহিনীরূপ ত্যাগ করলেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা মাঝে মাঝে অসুরদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে থাকলেন।

সমুদ্র কিনারে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ হতে লাগল। বিষ্ণুর চক্রের আঘাতে অসুরেরা রক্তাক্ত হতে লাগল আবার কোনো অসুর গদা বা খড়্গর আঘাতে ঘায়েল হতে থাকল। চারদিক থেকেই 'মার, মার' প্রবল হুঙ্কার শোনা যেতে লাগল। এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যখন হচ্ছিল তখন ভগবান বিষ্ণুর দুই রূপ 'নর' ও 'নারায়ণ' সেখানে উপস্থিত হলেন। নরের দিব্য ধনুক দেখে নারায়ণ তাঁর চক্রকে স্মরণ করলেন। তখনই আকাশে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী গোলাকার এক চক্র উপস্থিত হল। ভগবান নারায়ণ দ্বারা চালিত হয়ে চক্র শত্রুমধ্যে ঘুরে ঘুরে কালাগ্নির ন্যায় শত-সহস্র অসুর সংহার করতে লাগল। অসুরেরাও পাথরের আঘাতে দেবতাদের আহত করতে লাগল। কিন্তু নর ও নারায়ণের বীরত্বে অসুরগণ ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পৃথিবী ও সমুদ্রের গুহা-কন্দরে লুকিয়ে পড়ল। দেবতাদের জয় হল। মন্দার পর্বতকে সসম্মানে তার নিজ স্থানে নিয়ে রাখা হল। সকলেই যার যার স্থানে ফিরে গেল। দেবতা এবং ইন্দ্র তাঁদের সুরক্ষায় যুদ্ধ করার জন্য নরকে অমৃত দিলেন। এই হল সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী।

—o—

কদ্রু ও বিনতার কাহিনী এবং গরুড়ের জন্ম

উগ্রশ্রবা বললেন—'শৌনক ঋষিগণ ! অমৃত মন্থনের কথা, যাতে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, তা আপনাদের শুনিয়েছি। এই উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াকে দেখে কদ্রু বিনতাকে বললেন—'বোন ! তাড়াতাড়ি বলো তো এই ঘোড়া কি রঙের ?' বিনতা বললেন—'বোন ! এই অশ্বরাজ সাদা রংয়ের। তোমার কি রং বলে মনে হয় ?' কদ্রু বললেন—'ঘোড়ার রং সাদাই, কিন্তু এর লেজটি কালো রংয়ের। এসো এই নিয়ে আমরা বাজী ধরি। যদি তোমার কথা ঠিক হয় তাহলে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব, আর আমার কথা ঠিক হলে তুমি আমার দাসী হবে।' এইভাবে দুই বোন নিজেদের মধ্যে বাজী ধরে আর একদিন ঘোড়া দেখবেন ঠিক করে বাড়ি ফিরে গেলেন। কদ্রু বিনতাকে বোকা বানাবার জন্য তাঁর হাজার পুত্রকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাড়াতাড়ি কালো চুলের মতো হয়ে উচ্চৈঃশ্রবার লেজের রং ঢেকে ফেলে, নাহলে তাঁকে বিনতার দাসী হয়ে থাকতে হবে। যেসব সাপ তাঁর নির্দেশ

মেনে নিল না, তাদের তিনি অভিশাপ দিলেন—'যাও, জনমেজয় তোমাদের তাঁর সর্প-যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি দেবেন।' দৈবসংযোগে কদ্রু এইরূপ অভিশাপ তাঁর নিজ পুত্রদের দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা এবং সমগ্র দেবকুল এই কথা শুনে তা মেনে নেন। সেই সময় বিষধর সর্পের পরাক্রম অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাদের জন্য সকলেই খুব ভীত হয়ে থাকত। প্রজাদের হিতার্থে এই অভিশাপ মঙ্গলদায়কই ছিল। যারা অন্যের ক্ষতি করে, বিধাতা তাদের প্রাণান্ত দণ্ড দিয়ে থাকেন। এই বলে ব্রহ্মা কদ্রুর প্রশংসা করলেন।

কদ্রু এবং বিনতা নিজেদের মধ্যে বাজী ধরে অত্যন্ত ক্রোধ ও আশঙ্কায় রাত কাটালেন। পরদিন প্রাতে তাঁরা দুজনে ঘোড়াটিকে দেখার জন্য রওনা হলেন। সর্পগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করল যে, 'আমাদের মাতৃ আজ্ঞা পালন করা উচিত। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ না হলে তিনি স্নেহ ত্যাগ করে রাগে আমাদের পুড়িয়ে মারবেন। আর যদি প্রসন্ন হন, তাহলে আমাদের শাপমুক্ত করবেন। অতএব চলো, আমরা ঘোড়ার লেজটিকে কালো রং-এ ঢেকে ফেলি।' এই স্থির করে তারা উচ্চৈঃশ্রবার লেজে আশ্রয় নিল, যার ফলে লেজটিকে কালো দেখাতে লাগল। এদিকে কদ্রু এবং বিনতা আকাশপথে সমুদ্র দর্শন করতে করতে অন্য পারে এসে ঘোড়াটিকে দেখতে পেলেন। তাঁরা দেখলেন ঘোড়ার রং চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল, কিন্তু লেজটি কালো। তাই দেখে বিনতা বিমর্ষ হলেন এবং কদ্রু তাঁকে দাসী করে রাখলেন।

সময়কাল পূর্ণ হলে মহা তেজস্বী গরুড় তাঁর মায়ের সাহায্য ছাড়াই ডিম্বকোষ ভেঙে বাইরে এলেন। তাঁর প্রভায় দশদিক আলোকিত হয়ে উঠল। তাঁর শক্তি, গতি, দীপ্তি ও বুদ্ধি সবই অত্যন্ত বিশিষ্ট ছিল। চোখদুটি বিদ্যুতের মতো এবং শরীর অগ্নির ন্যায় তেজপূর্ণ। তিনি জন্মেই আকাশে উঠে গেলেন, তাঁকে তখন অগ্নির ন্যায় মনে হচ্ছিল।

দেবতারা মনে করলেন স্বয়ং অগ্নিদেবই এই রূপে এসেছেন। তাঁরা অগ্নিদেবের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন—'প্রভু ! আপনি আপনার শরীরকে আর বাড়াবেন না। আপনি কি আমাদের সব কিছু ভস্মে পরিণত করতে চান ? দেখুন, আপনার ওই মূর্তি আমাদের দিকেই অগ্রসর হয়ে আসছে।' অগ্নিদেব বললেন—'দেবগণ ! এটি আমার মূর্তি নয়। উনি হলেন বিনতানন্দন পরম তেজস্বী পক্ষীরাজ গরুড়। ওঁকে দেখে আপনাদের এই ভ্রম হয়েছে। ইনি নাগেদের নাশকারী, দেবগণের হিতৈষী এবং অসুরদের শত্রু । আপনারা এঁকে দেখে ভয় পাবেন না। আসুন, আমার সঙ্গে গিয়ে এঁর সঙ্গে মিলিত হন।' অগ্নিদেবের সঙ্গে গিয়ে দেবতা ও ঋষিগণ গরুড়ের বন্দনা করতে লাগলেন।

দেবতা ও ঋষিদের স্তুতি শুনে গরুড় বললেন—'আমার ভয়ংকর শরীর দেখে আপনারা যেন ভয় পাবেন

না। আমি আমার এই দেহ এবং তেজ সংবরণ করছি।' সকলে খুশি হয়ে ফিরে গেলেন।

এক দিন বিনতা তাঁর পুত্রের কাছে বসেছিলেন, কদ্রু তাঁকে ডেকে বললেন—'সমুদ্রের মধ্যে নাগেদের এক দর্শনীয় স্থান আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।' তখন

বিনতা কদ্রুকে এবং মাতৃ আজ্ঞায় গরুড় সর্পদের কাঁধে নিয়ে সেই স্থানে রওনা হলেন। গরুড় অনেক ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, সূর্যের প্রখর তাপে সর্পেরা অচেতন হয়ে পড়ল। কদ্রু ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে দিলেন। বৃষ্টি হওয়ায় সবাই খুশি হলেন। তাঁরা অভীষ্ট স্থানে গিয়ে লবণ সাগর, মনোহর বন ইত্যাদি দর্শন করে যথেচ্ছ বিহার করলেন এবং অনেক খেলাধুলার পর গরুড়কে বললেন—'তুমি আকাশপথে আসার সময় অনেক সুন্দর দ্বীপ নিশ্চয়ই দেখেছ, আমাদের তার কোনো এক স্থানে নিয়ে চলো।' গরুড় চিন্তিত হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মা, আমাকে কেন এদের আদেশ মানতে হবে?' বিনতা বললেন—'বাবা! এই সাপেদের ছলনায় আমি বাজী হেরে দুর্ভাগ্যবশত আমার সতীন কদ্রুর দাসী হয়েছি।' মায়ের দুঃখে গরুড়ও দুঃখিত হলেন। তিনি সাপেদের বললেন—'সর্পগণ! ঠিক করে বলো আমি তোমাদের জন্য কী নিয়ে আসব! তোমাদের কী জানার আছে! তোমাদের কী উপকার করতে পারি, যাতে মাকে আর আমাকে তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে?' সর্পেরা বলল—'গরুড়! তুমি যদি নিজ পরাক্রমে আমাদের জন্য অমৃত নিয়ে আসো তবেই আমরা তোমাকে এবং তোমার মাকে মুক্ত করে দেব।'

—o—

অমৃত আনার জন্য গরুড়ের যাত্রা এবং গজ-কচ্ছপের কাহিনী

উগ্রশ্রবা বললেন—শৌনক ঋষিগণ! সর্পদের কথা শুনে গরুড় তাঁর মা বিনতাকে বললেন—'মা, আমি অমৃত আনতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি ওখানে কী খাব?' বিনতা বললেন—'বাবা! সমুদ্রে নিষাদদের একটি বসতি আছে। তাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তুমি অমৃত নিয়ে এসো। তবে একটা কথা মনে রেখো, কখনো ব্রহ্ম হত্যা কোরো না। তাঁরা সকলের অবধ্য।' গরুড় তাঁর মায়ের নির্দেশানুসারে সেই দ্বীপের নিষাদদের খেয়ে রওনা হলেন। ভ্রমবশত এক ব্রাহ্মণ তাঁর মুখবিবরে ঢুকে গিয়েছিল, তাতে তাঁর তালু জ্বালা করতে লাগল। তাঁকে ছেড়ে দিয়ে গরুড় কশ্যপ মুনির কাছে গেলেন। কশ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র! তোমরা সব কুশলে আছ তো? প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যবস্তু পাচ্ছ তো?' গরুড় জানালেন—'আমার মা কুশলে আছেন। আমিও আনন্দে আছি। যথেচ্ছ খাদ্যদ্রব্য না পাওয়ায় একটু দুঃখ আছে। আমি আমার মাকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করার জন্য সর্পদের কথা অনুযায়ী অমৃত আনতে যাচ্ছি। মা আমাকে বলেছিলেন নিষাদদের খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে, কিন্তু তাতে আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়নি। আপনি আমাকে বলুন কী খেলে আমার পেট ভরবে, তাই খেয়ে আমি অমৃত আনতে যেতে পারি।' কশ্যপ ঋষি বললেন—'পুত্র! এখান থেকে কিছু দূরে এক বিশ্ববিখ্যাত হ্রদ আছে। তাতে একটি হাতি ও এক কচ্ছপ বাস করে। এরা দুজনে পূর্ব-জন্মে ভাই ভাই ছিল কিন্তু এখন একে অপরের শত্রু। এরা সবসময় একে অপরের ওপর রেগে থাকে। তুমি এদের পূর্বজন্মের কাহিনী শোন—

পুরাকালে বিভাবসু নামে অত্যন্ত ক্রোধী এক ঋষি ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক ছিলেন একজন বড় তপস্বী। সুপ্রতীক তাঁর ধন-সম্পদ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

বিভাবসুর সঙ্গে একত্রে রাখতে চাননি। তিনি রোজই ভাগাভাগির জন্য বলতেন। বিভাবসু ছোট ভাইকে বললেন—'সুপ্রতীক ! অর্থের মোহের জনাই লোক তা ভাগাভাগি করতে চায় এবং সম্পত্তি ভাগ হলেই একে অপরের বিরোধী হয়ে ওঠে। শত্রুরা তাদের সঙ্গে পৃথকভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ভাই-ভাইয়ে শত্রুতা লাগিয়ে দেয়। তাদের মনে শত্রুতার বীজ রোপণ করে মিত্র হওয়া এই সব শত্রুরা শত্রুতা বাড়িয়ে তোলে। পৃথক হওয়ার ফলে শীঘ্রই তাদের অধঃপতন হয়। কারণ তখন তারা আর একে অপরের মর্যাদা এবং সৌহার্দের দিকে নজর দেন না। সেইজন্য সৎ ব্যক্তিগণ ভাইয়েদের পৃথক হওয়াকে ভালো মনে করেন না। যেসব ব্যক্তি গুরু এবং শাস্ত্র উপদেশের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে একে অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন তাঁদের বশে রাখা কঠিন। তুমি এই তিনটি কারণের জন্যই পৃথক হতে চাও। সুতরাং তুমি হাতি হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।' সুপ্রতীক বললেন—'ঠিক আছে, আমি হাতি হলে তুমিও কচ্ছপ হয়ে জন্মাবে।' গরুড় ! এইভাবে দুই ভাই অর্থের লালসায় একে অন্যকে অভিশাপ দিয়ে হাতি ও কাচ্ছপ হয়ে জন্মগ্রহণ করল। তাদের পারস্পরিক দ্বেষের এই হল পরিণাম। এই দুই বিশালাকার জন্তু এখনও যুদ্ধ করে চলেছে। হাতি ছয় যোজন উচ্চ আর বারো যোজন লম্বা। কচ্ছপ তিন যোজন উচ্চ আর দশ যোজনব্যাপী গোলাকার। এরা দুজনেই দুজনের প্রাণ হরণ করতে চায়। তুমি এই দুই ভয়ংকর জন্তুকেই খেয়ে ফেল তারপর অমৃত নিয়ে এসো।'

কশ্যপ ঋষির আদেশপ্রাপ্ত হয়ে গরুড় ওই সরোবরে
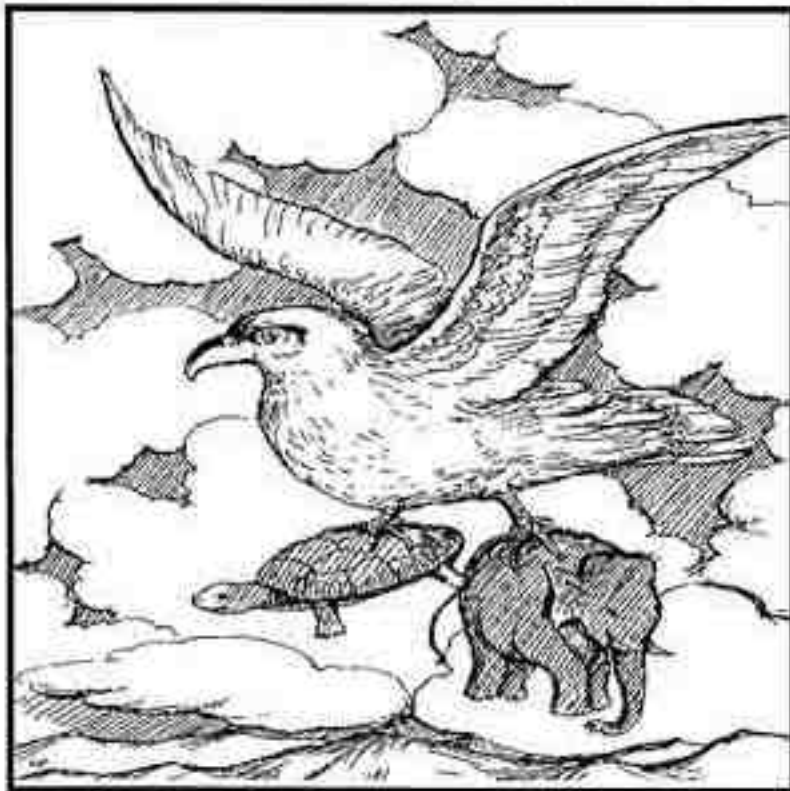
গেলেন। তিনি তাঁর এক নখে হাতি ও অন্য এক নখে কচ্ছপকে ধরে আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে অলম্ব তীর্থে পৌঁছালেন। সেইখানে সুবর্ণগিরির ওপরে অনেক দেবদারু হাওয়ায় দুলছিল, তারা গরুড়কে দেখে ভয় পেল, কী জানি এঁর ধাক্কায় আমরা না উৎপাটিত হই ! তাদের ভীত হতে দেখে গরুড় অন্য পথ দিয়ে গেলেন। সেদিকে এক বৃহদাকার বটবৃক্ষ ছিল। বটবৃক্ষ গরুড়কে মনের ন্যায় তীব্র বেগে উড়তে দেখে বলল, 'তুমি আমার শত যোজন ব্যাপী লম্বিত শাখায় আরোহণ করে হাতি ও কচ্ছপ ভক্ষণ করো।' গরুড় যেই শাখাটির ওপর বসেছেন তৎক্ষণাৎ সেই শাখাটি মড়মড় শব্দ করে ভেঙে পড়তে লাগল। গরুড় পড়ে যেতে যেতে সেই শাখাটি ধরে নিলেন এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলেন বালখিল্য নামক ঋষিগণ সেই শাখা ধরে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে আছেন। গরুড় ভাবলেন শাখাটি যদি নীচে পড়ে যায়, তাহলে এই ঋষিদের মৃত্যু হবে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর
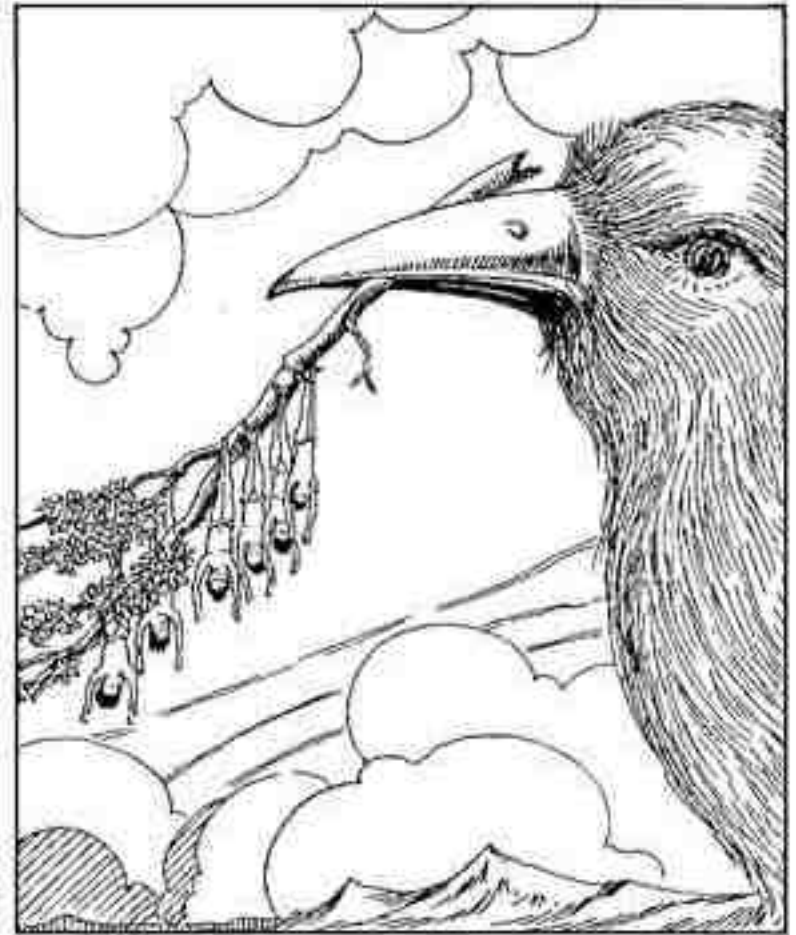
ঠোঁট দিয়ে ডালটি ধরে নিলেন আর হাতি ও কচ্ছপকে নখে ধরে উড়তে লাগলেন। কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে তিনি উড়তেই থাকলেন আর তাঁর ওড়ার বেগে পাহাড়ও কাঁপতে লাগল। বালখিল্য ঋষিদের ওপর মমতাবশত তিনি কোথাও না বসে উড়তে উড়তে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে কশ্যপ ঋষি বললেন—'হঠাৎ করে যেন কোনো সাহস দেখাতে যেও না। সূর্যকিরণ পান

করে তপস্যা করছেন যে সব বালখিল্য ঋষি তাঁরা যেন ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে ভস্ম করে না ফেলেন।' গরুড়কে এই কথা বলে কশ্যপ ঋষি তপঃসিদ্ধ বালখিল্য ঋষিদের কাছে অনুরোধ জানালেন, 'হে তপোধনগণ ! গরুড় প্রজাদের হিতার্থে এক মহৎ কাজ করতে চায়। আপনারা ওকে অনুমতি দিন।' বালখিল্য ঋষিগণ তাঁর অনুরোধ স্বীকার করে বটবৃক্ষের শাখা পরিত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য হিমালয়ে চলে গেলেন। গরুড় তখন শাখাটি ফেলে দিয়ে পর্বত শিখরে বসে হাতি ও কচ্ছপ ভক্ষণ করলেন।

গরুড় খাওয়া শেষ করে পর্বতের সেই শৃঙ্গ থেকেই আরও ওপরে উড়তে লাগলেন। সেই সময় দেবতারা দেখলেন তাঁদের ওখানে ভয়ংকর উৎপাত শুরু হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন—

'ভগবান ! এখানে নানাপ্রকার ঝামেলা কেন হচ্ছে ? এমন কোনো শত্রু দেখছি না, যে আমাকে হারাতে পারে।' বৃহস্পতি বললেন—'ইন্দ্র ! তোমার অপরাধ ও প্রমাদবশত এবং মহাত্মা বালখিল্য ঋষিদের তপের প্রভাবে বিনতানন্দন গরুড় এখানে আসছেন অমৃত নিয়ে যাবার জন্য। তিনি আকাশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে পারেন।'

ইনি নিজ শক্তিদ্বারা অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম। তাঁর অমৃত হরণ করার যথেষ্ট শক্তি আছে। বৃহস্পতির কথা শুনে ইন্দ্র অমৃত রক্ষাকারীদের সতর্ক করে বললেন—'দেখো, পরম পরাক্রমশালী পক্ষীরাজ গরুড় অমৃত নিয়ে যাবার জন্য এখানে আসছেন, সাবধানে থাকো। তিনি যেন অমৃত নিয়ে যেতে না পারেন।' ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা অমৃত রক্ষা করার জন্য তাঁকে ঘিরে রইলেন।

গরুড় সেখানে পৌঁছলে তাঁর পাখার হাওয়ায় এত ধুলো উড়ল যে, সব দেবতার চোখ ধুলোয় বন্ধ হয়ে গেল। ধুলোয় ঢেকে গিয়ে তাঁরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। চোখ খারাপ হয়ে যাওয়ায় রক্ষকেরা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ গরুড়কে দেখতেই পেলেন না। সমস্ত স্বর্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ঠোঁট এবং ডানার আঘাতে দেবতাদের শরীর জর্জরিত হয়ে গেল। ইন্দ্র বায়ুকে নির্দেশ দিলেন—'তুমি এই ধুলোর পরদা সরিয়ে দাও, এসব তোমার কাজ।' বায়ু ইন্দ্রের নির্দেশ পালন করলেন।

চারদিক আবার পরিষ্কার হলে দেবগণ গরুড়কে আঘাত করতে লাগলেন। গরুড় উড়তে উড়তে গর্জন করতে লাগলেন এবং তাঁদের আঘাত সহ্য করে অনেক ওপরে উঠে গেলেন। দেবতাদের শস্ত্রাঘাতে গরুড় একটুও বিচলিত হননি। তিনি তাঁদের আক্রমণ বিফল করে নিজ

ঠোঁট ও পাখার আঘাতে দেবতাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তাক্ত করে দিলেন। দেবতারা ভীত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। এর পর গরুড় ক্রমশ অগ্রসর হয়ে দেখলেন অমৃতের চারদিকে আগুন জ্বলছে। গরুড় তখন নিজ শরীরে আট হাজার একশত মুখ সৃষ্টি করে বহু নদীর জল সেইসব মুখে পান করলেন। তারপর অগ্নির ওপর দিয়ে উড়ে গেলেন, সেই জলে অগ্নি শান্ত হলে তখন নিজ শরীর ক্ষুদ্র করে এগিয়ে গেলেন।

——০——

গরুড়ের অমৃত আনয়ন এবং বিনতার দাসীত্ব থেকে মুক্তি

উগ্রশ্রবা বললেন—সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর দেহ ধারণ করে গরুড় সবেগে অমৃতের স্থানে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন অমৃতের কাছে এক লৌহচক্র নিরন্তর ঘুরে যাচ্ছে। তার ধারগুলি তীক্ষ্ণ এবং তাতে বহু অস্ত্র সন্নিবেশিত হয়ে রয়েছে। সেই ভয়ংকর চক্র সূর্য এবং অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। সেটি অমৃত রক্ষা করার জন্য ছিল। গরুড় সেই চক্রের মধ্যে প্রবেশ করার রাস্তা খুঁজতে লাগলেন। তিনি নিজ দেহ অত্যন্ত ছোট করে মুহূর্তের মধ্যে চক্রের একটি ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ভেতরে গিয়ে তিনি দেখলেন দুটি ভয়ংকর বিষধর সর্প অমৃত রক্ষায় নিযুক্ত, তাদের জিভ এবং চোখ লকলক করছে, শরীর আগুনের মতো দীপ্যমান। তাদের দৃষ্টিতেই যেন বিষ ঝরে পড়ছে। গরুড় ধুলো ছুঁড়ে তাদের চোখ বন্ধ করে দিলেন, চঞ্চু এবং ডানার ঝাপটায় তাদের ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত বেগে অমৃত নিয়ে উড়ে চললেন। তিনি নিজে অমৃত পান করলেন না। আকাশপথে উড়তে উড়তে সর্পদের কাছে চললেন।

আকাশপথে তাঁর সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর দর্শনলাভ হল। গরুড়ের অমৃতপানের লোভ নেই জেনে ভগবান বিষ্ণু অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'গরুড় ! আমি তোমাকে বর দিতে চাই ! তোমার ইচ্ছানুযায়ী বর নাও।' গরুড় বললেন—'আপনি আমাকে আপনার ধ্বজাতে রাখুন। আর অমৃতপান না করেও আমি যেন অজর-অমর হই।' ভগবান বললেন—'তথাস্তু !' গরুড় বললেন—'আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই। আপনার যা ইচ্ছা চেয়ে নিন।' ভগবান বললেন—'তুমি আমার বাহন হয়ে থাক।' 'তাই হবে'—বলে গরুড় তাঁর অনুমতি নিয়ে অমৃত সহ যাত্রা করলেন।

এর মধ্যে ইন্দ্রের চোখ খুলল। তিনি গরুড়কে অমৃত নিয়ে যেতে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে বজ্র-নিক্ষেপ করলেন। গরুড় বজ্রাহত হয়েও সহাস্যে কোমল স্বরে বললেন—'ইন্দ্র ! যাঁর অস্থিদ্বারা এই বজ্র নির্মিত, তাঁর সম্মান রক্ষার্থে আমি আমার একটি ডানা ত্যাগ করছি। তবুও আমি আপনার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বজ্রাঘাত আমাকে কোনোভাবে আঘাত দিতে পারেনি।' গরুড় তাঁর একটি ডানা পরিত্যাগ করলেন। তাই দেখে লোকে অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা বলতে লাগল—'এই ডানাটি যাঁর, সেই পক্ষীর নাম 'সুপর্ণ' রাখা হোক।' ইন্দ্র চমকিত হয়ে ভাবলেন—'এই পরাক্রমশালী পক্ষী ধন্য !' তিনি গরুড়কে ডেকে বললেন—'পক্ষীরাজ ! আমি আপনার শক্তি সম্পর্কে জানতে এবং আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক।' গরুড় বললেন—'দেবরাজ ! আপনি চাইলে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে। নিজের শক্তির সম্বন্ধে আর কী বলব ? নিজ মুখে নিজের গুণের কথা, বলের প্রশংসা সৎপুরুষের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। আপনি আমাকে বন্ধু ভেবে জিজ্ঞাসা করছেন তাই আপনাকে জানাচ্ছি যে, পর্বত, বন, সমুদ্র-সহ সমগ্র পৃথিবী এবং তার উপরে স্থিত আপনাদের আমি নিজের এক ডানাতে উঠিয়ে বিনা পরিশ্রমে উড়তে

সক্ষম।' ইন্দ্র বললেন— 'আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। আপনার নিজের যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে এই অমৃত আমাদের দিয়ে দিন। কারণ আপনি এই অমৃত যাদের দেবেন, তারা আমাদের অনেক কষ্ট দেবে।' গরুড় বললেন—'দেবরাজ ! অমৃত নিয়ে যাওয়ার এক বিশেষ কারণ আছে। আমি এই অমৃত কাউকে পান করতে দিতে চাই না। আমি যেখানে নিয়ে গিয়ে এই অমৃত রাখব, আপনি সেখান থেকে এটি তুলে আনবেন।' ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'গরুড় ! আপনি আমার কাছ থেকে খুশিমতো বর প্রার্থনা করুন।'

গরুড়ের তখন সর্পদের অনিষ্টের কথা ও মায়ের দুঃখ দুর্দশার কথা মনে পড়ল। তিনি তাই ইন্দ্রের কাছে বললেন—'এই বলশালী সর্পগুলিই যেন আমার খাদ্য হয়।' দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—'তথাস্তু।'

ইন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে গরুড় সর্পদের কাছে এলেন, তাঁর মা-ও সেখানে ছিলেন। তিনি খুশিভরে সর্পদের বললেন—'এই নাও, আমি তোমাদের জন্য অমৃত নিয়ে এসেছি। কিন্তু তাড়াহুড়ো কোরো না। আমি কুশাসনের ওপর এটি রাখছি। তোমরা স্নান করে পবিত্র হয়ে এটি খাবে। এখন তোমাদের কথা অনুসারে আমার মা দাসীত্ব থেকে মুক্তি পেলেন, যেহেতু আমি আমার কথা রেখেছি।' সর্পেরা তাঁর কথা মেনে নিল। সর্পেরা যখন আনন্দ সহকারে স্নান করতে গেল, সেইসময় ইন্দ্র অমৃত কলস নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। স্নানাদি সমাপন করে সর্পেরা ফিরে এসে দেখল অমৃত কলস নেই। তারা বুঝতে পারল যে তারা বিনতাকে দাসী বানাবার জন্য যে কপটতার আশ্রয় নিয়েছিল, এ তারই ফল। পরে ভাবল যে, এই স্থানে অমৃত রাখা হয়েছিল, কিছু নিশ্চয়ই এখানে পড়ে আছে, তাই তারা সেই কুশাসনটি চাটতে শুরু করল। এর ফলে কুশের ধারে তাদের জিভ কেটে দুটুকরো হয়ে গেল। অমৃতের স্পর্শে কুশও পবিত্র হয়ে উঠল। গরুড় তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মায়ের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি পক্ষীরাজ হলেন, চতুর্দিকে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁর মাও অত্যন্ত সুখী হলেন।

—o—

শেষনাগের বরপ্রাপ্তি এবং মায়ের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্পদের আলোচনা

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! সর্পেরা যখন জানতে পারল যে, মাতা কদ্রু তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, তখন তারা তা নিবারণের জন্য কি করল ?'

উগ্রশ্রবা বললেন—'সেই সর্পদের মধ্যে শেষনাগও ছিলেন। তিনি কদ্রু ও অন্যান্য সাপেদের ছেড়ে কঠিন তপস্যা শুরু করলেন। তিনি শুধু হাওয়া খেয়ে তাঁর ব্রত পালন করতেন। ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, হিমালয় ইত্যাদির তরাইয়ে তিনি একান্তে বাস করতেন এবং পবিত্র তীর্থ ও ধাম পরিক্রমা করতেন। ব্রহ্মা দেখলেন শেষনাগের শরীরের মাংস, ত্বক এবং শিরা উপশিরা শুকিয়ে গেছে। তাঁর এই ধৈর্য এবং তপস্যা দেখে তিনি শেষনাগের কাছে গেলেন এবং বললেন—'শেষ ! তুমি তোমার তীব্র তপস্যা দ্বারা প্রজাদের কেন সন্তপ্ত করছ ? কী উদ্দেশ্যে তুমি এই ভীষণ তপস্যা করছ ? প্রজাদের হিতার্থে কিছু করছ না কেন ? তোমার মনের কী ইচ্ছা বলো !' শেষনাগ বললেন,

'ভগবান ! আমার ভাইয়েরা সকলেই মূর্খ ; আমি তাদের সঙ্গে থাকতে চাই না। আপনি আমার এই ইচ্ছাটি পূর্ণ করুন। এরা একে অন্যের সঙ্গে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে। বিনতা এবং তাঁর পুত্র গরুড়কে এরা হিংসা করে। আমি তাই ওদের থেকে পৃথক হয়ে তপস্যা করছি। বিনতানন্দন গরুড়ও আমাদের ভাই। আমি তপস্যা দ্বারা এই দেহত্যাগ করব। কিন্তু আমার চিন্তা এই যে, মৃত্যুর পরেও না আমাকে ওদের

সঙ্গে থাকতে হয়।' ব্রহ্মা বললেন—'শেষ ! আমি তোমার ভাইদের কীর্তি সবই জানি। মাতৃ আদেশ লঙ্ঘন করে এরা খুবই বিপদে পড়েছে। তুমি ওদের কথা বাদ দিয়ে তোমার জন্য কী চাও বলো। আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি, কারণ সৌভাগ্যবশত তোমার বুদ্ধি ধর্মে অটল আছে। তোমার বুদ্ধি যেন সর্বদা এমনই থাকে।' শেষনাগ বললেন—'পিতামহ ! আমি সেই বরই চাই যাতে আমার বুদ্ধি, ধর্ম, তপস্যা এবং শান্তিতে সংলগ্ন হয়ে থাকে।' ব্রহ্মা বললেন—'শেষনাগ ! আমি তোমার ইন্দ্রিয় ও মনসংযমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার আদেশে তুমি প্রজাদের হিতের জন্য এক কাজ করো। এই পৃথিবী সমস্ত পর্বত, বন, সমুদ্র, গ্রাম, মন্দির ও নগর সহ হিল্লোলিত হচ্ছে। তুমি একে এমনভাবে ধারণ করে থাক, যাতে এই পৃথিবী অচল হয়ে বিরাজ করে।' শেষনাগ বললেন—'আপনি সকল প্রজার উপযুক্ত প্রভু। আমি আপনার আদেশ পালন করব। আমি পৃথিবীকে এমনভাবে ধারণ করে থাকব যাতে এটি হিল্লোলিত না হয়। আপনি এটি আমার মস্তকের ওপর রেখে দিন।' ব্রহ্মা বললেন—'শেষনাগ ! পৃথিবী তোমাকে রাস্তা দেবে। তুমি এর ভেতরে ঢুকে পড়। তুমি এই পৃথিবীকে ধারণ করে আমার অত্যন্ত প্রিয় কাজ করবে।' ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে শেষনাগ ভূগর্ভে প্রবেশ করলেন এবং নীচে চলে গিয়ে সমুদ্র-বেষ্টিত পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে তাকে মাথার ওপরে তুলে নিলেন। তিনি তখন থেকে স্থির হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁর ধর্ম, ধৈর্য এবং শক্তির প্রশংসা করে নিজস্থানে ফিরে গেলেন।

মায়ের অভিশাপ শুনে বাসুকিনাগ অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কী করে এর প্রতিকার করা

যায়। তিনি ভাইদের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। বাসুকি বললেন—'ভাই ! তোমরা জান মা আমাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আমাদের ভেবেচিন্তে তার এক প্রতিকারের উপায় বার করতে হবে। সব অভিশাপের প্রতিকার হতে পারে, কিন্তু মায়ের অভিশাপের কোনো প্রতিকার দেখছি না। আমাদের এখন আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বিপদ আসার আগেই তার উপায় ভাবলে কাজ হতে পারে। তখন সমস্ত বুদ্ধিমান ও চালাক সর্পরা 'ঠিক-ঠিক' বলে আলোচনা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল,

'চলো, আমরা ব্রাহ্মণ সেজে জনমেজয়ের কাছে গিয়ে অনুরোধ করি যেন তিনি এই যজ্ঞ না করেন।' কেউ আবার বলল—'আমরা মন্ত্রী হয়ে তাঁকে পরামর্শ দেব, যাতে এই যজ্ঞ হতে না পারে।' কেউ বলল—'তাঁর পুরোহিতকেই দংশন করব যাতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন আর যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়।' ধর্মাত্মা এবং দয়ালু নাগেরা বলল—'ছি ! ছি ! ব্রহ্মহত্যা করার কথা ভাবা অত্যন্ত মূর্খতা ও অশুভবুদ্ধির পরিচায়ক। বিপদের সময় ধর্মই একমাত্র রক্ষা করে। অধর্মের আশ্রয় নিলে সমস্ত জগতেরই সর্বনাশ হয়।' কিছু নাগ বলল— 'আমরা বৃষ্টি হয়ে যজ্ঞের আগুন নিভিয়ে দেব।' কেউ বলল—'আমরা যজ্ঞ সামগ্রী চুরি করে নেব।' কেউ বলল—'আমরা লাখ লাখ ব্যক্তিকে দংশন করব।' সবশেষে সর্পেরা বলল—'হে বাসুকি ! আমরা সকলে মিলে এর থেকে বেশি আর কিছু ভাবতে পারছি না। এখন আপনি যা ভালো বোঝেন তাড়াতাড়ি করে তাই করুন।' বাসুকি বললেন—'তোমাদের কোনো পরামর্শই আমার মনোমতো নয়। এইসব চিন্তার মধ্যে কোনো সদ্বুদ্ধি নেই। চলো আমরা পিতা কশ্যপের কাছে যাই, তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর নির্দেশানুসারে কাজ করব। আমাদের যাতে মঙ্গল হয় সেই ভাবেই কাজ করা উচিত। আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বড়, তাই ভালো-মন্দের দায়িত্বও আমার, তাই আমি খুব চিন্তায় আছি।'

এদের মধ্যে এলাপত্র নামে এক নাগ ছিল। সে সব সর্প এবং বাসুকির আলাপ-আলোচনা শুনে বলল—'ভাইসব! এই যজ্ঞ বন্ধ করা অথবা জনমেজয়কে রাজি করানো সম্ভবপর নয়। আমাদের ভাগ্যের দোষ ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। অন্যের সাহায্যে কিছু হয় না। এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় আমি বলছি, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। মা যখন এই অভিশাপ দিচ্ছিলেন, আমি তখন ভয় পেয়ে তাঁর কোলে লুকিয়ে ছিলাম। সেই ভীষণ অভিশাপ শুনে দেবতারা ভগবান ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—'ভগবান ! কঠিন হৃদয়া কদ্রু ছাড়া এমন কোনো নারী নেই যিনি নিজ সন্তানকে এইরূপ ভয়ংকর শাপ দিতে পারেন ! পিতামহ ! আপনি নিজেও তাতে বাধা দেননি, তার কারণ কী ?' ব্রহ্মা বললেন—'দেবগণ ! সেই সময় জগতে সর্পদের খুব বাড়বৃদ্ধি হয়েছিল। তারা অত্যন্ত রাগী ও বিষধর। প্রজাকুলের হিতের জন্যই আমি কদ্রুকে কোনো নিষেধ করিনি। এই শাপে যেসব ক্ষুদ্রমনা, পাপী এবং বিষধর সর্প আছে তাদেরই নাশ হবে। ধর্মাত্মা সর্পেরা সুরক্ষিত থাকবে। আর একটি কথা, যাযাবর বংশে জরৎকারু নামে এক ঋষি আছেন, তাঁর পুত্রের নাম আস্তিক। তিনিই জনমেজয়ের এই সর্প-যজ্ঞ বন্ধ করতে সক্ষম হবেন। তাতেই ধার্মিক সর্পেরা মুক্তি পাবে।' দেবতাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা জানালেন—'জরৎকারু ঋষির স্ত্রীর নামও জরৎকারুই হবে। তাঁর গর্ভেই আস্তিক জন্মগ্রহণ করে সর্পদের মুক্ত করবেন। এই জরৎকারু বাসুকির ভগিনী।' এইরূপ আলোচনা করে ব্রহ্মা এবং দেবতাগণ নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। 'অতএব ! সর্পরাজ বাসুকি ! আমার বুদ্ধিতে আপনার ভগিনী জরৎকারুর সঙ্গে ঋষি জরৎকারুর বিবাহ হওয়া উচিত। তিনি যখন ভিক্ষারূপে পত্নী চাইবেন, তখনই আপনি তাঁর হাতে আপনার ভগিনীকে সমর্পণ করবেন। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার এটিই একমাত্র উপায়।'

এলাপাত্রের কথা শুনে সকল সর্পই প্রসন্ন চিত্তে তা অনুমোদন করল। তখন থেকে বাসুকি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ভগিনীকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। তার কিছুদিন পরেই সমুদ্র-মন্থন করা হল, যাতে বাসুকি নাগকে মন্থন-রজ্জু করা হয়েছিল। তাই দেবগণ বাসুকি নাগকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন এবং এলাপাত্র যা বলেছিল সেই কথাই বাসুকিকে জানিয়ে দিলেন। বাসুকি সর্পদের জরৎকারু ঋষির সন্ধানে নিযুক্ত করে বলে দিলেন—'যখনই জরৎকারু ঋষি বিবাহ করতে ইচ্ছা করবেন, তখনই তোমরা আমাকে জানাবে। আমাদের কল্যাণের এই একমাত্র উপায়।'

———o———

জরৎকারু ঋষির কথা এবং আস্তিকের জন্মবৃত্তান্ত

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! আপনি যে জরৎকারু ঋষির নাম বললেন, তাঁর নাম জরৎকারু কেন হল ? তাঁর নামের অর্থ কি এবং আস্তিকের জন্ম হল কীভাবে ?'

উগ্রশ্রবা বললেন—'জরা' শব্দটির অর্থ হল ক্ষয়, আর 'কারু' শব্দটির অর্থ দারুণ ; অর্থাৎ তাঁর শরীর আগে দারুণ অর্থাৎ হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল। তারপর তপস্যা করায় তাঁর শরীর জীর্ণ-শীর্ণ এবং ক্ষীণ হয়ে গেছে, তাই তাঁর নাম

'জরৎকারু' ; বাসুকি নাগের বোনেরও প্রথমে ওই রকম রূপই ছিল। তিনিও তপস্যা দ্বারা তাঁর শরীর ক্ষীণ করে ফেলেছেন, তাই তাঁকেও 'জরৎকারু' বলা হয়। এবার আস্তিকের জন্মবৃত্তান্ত শুনুন।

জরৎকারু ঋষি বহুদিন ব্রহ্মচর্য পালন করে তপস্যায় রত ছিলেন। তিনি বিবাহ করতে চাননি। তিনি জপ-তপ ও স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত ছিলেন এবং নির্ভীকভাবে সর্বত্র বিচরণ করতেন। সেই সময় রাজা পরীক্ষিতের রাজত্বকাল ছিল। জরৎকারু মুনির নিয়ম ছিল যে, ভ্রমণ করতে করতে যেখানে সন্ধ্যা হবে, তিনি সেইখানেই রাত্রিবাস করবেন। তিনি পবিত্র তীর্থে গিয়ে স্নানাদি সমাপন করে কঠোর নিয়ম পালন করতেন ; সেই নিয়ম এতই কঠিন যে বিষয়াসক্ত মানুষের কাছে তা প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি বায়ু পান করে নিরাহারে থাকতেন। এতেই তাঁর শরীর শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একদিন রওনা হওয়ার সময় তিনি দেখলেন কয়েকজন পিতৃপুরুষ নীচের দিকে মুখ করে এক পরিখার মধ্যে ঝুলছেন। তাঁরা একটি শুষ্ক তৃণ ধরে বেঁচে আছেন, কিন্তু সেই তৃণটিকে একটি ইঁদুর ধীরে ধীরে কাটছে। তাঁরা অনাহারে দুর্বল এবং দুঃখী ছিলেন। জরৎকারু তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন—'আপনারা যে তৃণের সাহায্যে ঝুলে আছেন, সেটি একটি ইঁদুর কেটে দিচ্ছে। আপনারা কে ? এই ঘাসটির মূল কেটে গেলে আপনারা মাথা নীচের দিকে করে পরিখার মধ্যে পড়ে যাবেন। আপনাদের এই অবস্থা দেখে আমি খুব দুঃখ বোধ করছি। আমি আপনাদের সেবার জন্য কী করতে পারি ? আমার তপস্যার চতুর্থ ভাগ, তৃতীয় ভাগ বা অর্ধভাগের সাহায্যে যদি এই বিপদ থেকে বাঁচতে সক্ষম হন তাহলে বলুন। আমি এমনকী তপস্যার সমস্ত ফল দিয়েও আপনাদের বাঁচাতে চাই। আপনারা আমাকে দয়া করে আদেশ করুন।'

পিতৃপুরুষেরা বললেন—'আপনি একজন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, আমাদের বাঁচাতে চান ; কিন্তু আমাদের এই বিপদ তপস্যার দ্বারা নির্মূল হওয়ার নয়। আমাদেরও তপস্যাকৃত বল আছে। কিন্তু বংশপরম্পরা নষ্ট হওয়ায় আমরা এই ঘোর নরকে পতিত হচ্ছি। আপনি বৃদ্ধ বলে করুণাবশত আমাদের কথা চিন্তা করছেন, আমাদের কথা শুনুন। আমরা যাযাবর নামক ঋষি। বংশপরম্পরা ক্ষীণ হওয়ায় আমরা পুণ্যলোক থেকে পতিত হয়েছি। আমাদের বংশে এখন একজন ব্যক্তিই আছে, যে না থাকারই মতো। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সে তপস্বী হয়ে গেছে, তার নাম জরৎকারু। সে বেদ-বেদাঙ্গে পারঙ্গম, সংযমী, উদার এবং ব্রতশীল। সে তপস্যা করার লোভে আমাদের এই সংকটে ফেলে দিয়েছে। তার কোনো ভাই-বন্ধু, পুত্র-পত্নী নেই। সেইজন্য আমরা বেহুঁশ হয়ে অনাথের মতো এখানে পড়ে আছি। আপনি যদি তার দেখা পান তাহলে তাকে বলবেন—জরৎকারু ! তোমার পিতৃপুরুষেরা হেঁটমুণ্ড হয়ে খালের মধ্যে পড়ে আছে। তুমি বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করো, তুমিই আমাদের বংশের একমাত্র আশ্রয়। ব্রহ্মচারী মহাশয় ! এই যে ঘাসের মূল আপনি দেখছেন, এই হল আমাদের বংশের রক্ষাকর্তা। যারা আমাদের বংশ পরম্পরায় নষ্ট হয়েছে, এগুলি তারই খণ্ডিত মূল। এই অর্ধখণ্ডিত মূলটি জরৎকারু। মূল খণ্ডিতকারী ইঁদুর হচ্ছে মহাবলী কাল। সে একদিন জরৎকারুকেও নষ্ট করবে, তখন আমরা আরও বিপদে পড়ব। আপনি যা দেখলেন এসব জরৎকারুকে বলবেন। দয়া করে বলুন, আপনি কে আর প্রকৃত বন্ধুর মতো কেন শোক করছেন ?'

পিতৃকুলের কথা শুনে জরৎকারু অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন। তাঁর বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আবেগপূর্ণ স্বরে তাঁদের বললেন—'আপনারা আমারই পিতা এবং পিতামহ। আমিই আপনাদের অপরাধী পুত্র জরৎকারু। আপনারা আমার অপরাধের শাস্তি দিন আর আমার কী করা উচিত, তাই বলুন।' পিতৃপুরুষেরা বললেন—'পুত্র ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে তুমি আজ এখানে এসে পড়েছ! বেশ, এখন বলো তুমি এখনও বিবাহ করনি কেন ?' জরৎকারু বললেন—'পিতামহ ! আমার হৃদয়ে সবসময় এই ইচ্ছাই ছিল যে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে আমি স্বর্গলাভ করব। আমি সংকল্প করেছিলাম যে আমি কখনো বিবাহ করব না। কিন্তু আপনাদের এইভাবে ঝুলতে দেখে আমি ব্রহ্মচর্যের সিদ্ধান্ত বদল করেছি। আপনাদের জন্য আমি নিশ্চয়ই বিবাহ করব। ভিক্ষালব্ধ কোনো কন্যা, যার নাম আমারই নামে হবে, আমি তাকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করব, কিন্তু তার ভরণ-পোষণের ভার নিতে পারব না। এই সব সুবিধা পেলেই বিবাহ করব, অন্যথায় নয়। আপনারা আর চিন্তা করবেন না। আপনাদের কল্যাণার্থে আমার পুত্র হবে এবং আপনারা সুখে পরলোকে বাস করবেন।'

জরৎকারু তাঁর পিতৃকুলকে কথা দিয়ে পৃথিবীতে

বিচরণ করতে লাগলেন। কিন্তু একে তো তাঁকে বৃদ্ধ মনে করে কেউ কন্যা সমর্পণ করতে চাইল না আর তাঁর অনুরূপ কন্যা পাওয়াও যাচ্ছিল না। তিনি হতাশ হয়ে বনে প্রবেশ করে পিতৃপুরুষের হিতার্থে ধীরে ধীরে তিনবার বলতে লাগলেন, 'আমি একটি কন্যা প্রার্থনা করছি। এখানে যে সব চর-অচর, গুপ্ত-প্রকটিত প্রাণী আছেন, আমার কথা শুনুন ! আমি আমার পিতৃপুরুষের দুঃখ দূর করার জন্য তাঁদের প্রেরণায় একটি কন্যাকে ভিক্ষা চাইছি, যাঁর আমার নামে নাম, যাঁকে ভিক্ষা হিসাবে আমাকে প্রদান করা হবে এবং যাঁর ভরণ-পোষণের ভার আমার ওপর থাকবে না, এরূপ কন্যা আমাকে প্রদান করুন।' বাসুকি নাগের নিযুক্ত সর্প জরৎকারু ঋষির এই কথা শুনতে পেয়ে বাসুকির কাছে গেলেন এবং বাসুকি অতি শীঘ্রই তাঁর ভগিনীকে নিয়ে এসে জরৎকারুর হাতে ভিক্ষারূপে প্রদান করলেন। জরৎকারু ঋষি তাঁর নাম না জেনে এবং ভরণ-পোষণের ভার নিতে

হবে কিনা না জেনে নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে তাঁকে বিবাহ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এঁর নাম কী ?', আরও বললেন 'আমি এর ভরণ-পোষণ করতে পারব না।'

বাসুকি নাগ বললেন—'এই তপস্বিনী কন্যার নামও জরৎকারু এবং ইনি আমার ভগ্নী। আমি এঁর ভরণ-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করব। আপনার জন্যই আমি এতদিন এঁর বিবাহ দিইনি।' জরৎকারু বললেন—'আমি এঁর ভরণ-পোষণ করব না, তাতো ঠিকই হল। এছাড়াও আমার আর একটি শর্ত হল এই যে ইনি কখনো যেন আমার কোনো অপ্রিয় কাজ না করেন, করলে আমি ওঁকে ছেড়ে চলে যাব।' নাগরাজ বাসুকি তাঁর শর্ত মেনে নিলে তাঁরা বাসুকির গৃহে গেলেন। সেখানে বিধি-পূর্বক বিবাহ সম্পূর্ণ হল। জরৎকারু ঋষি এবং তাঁর স্ত্রী জরৎকারুকে নিয়ে বাসুকি একটি সুন্দর ভবনে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে শর্ত জানিয়ে দিলেন যে তিনি যেন কখনো তাঁর রুচির বিরুদ্ধে কিছু না বলেন বা না করেন। তাঁর স্ত্রী যদি তা করেন তাহলে জরৎকারু ঋষি তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাবেন। জরৎকারু ঋষির স্ত্রী এই শর্ত মেনে নিলেন এবং পরম যত্নে স্বামীর সেবা করতে লাগলেন। সময়মতো তিনি গর্ভধারণ করলেন। দিন অতিবাহিত হতে থাকল।

একদিন জরৎকারু ঋষি ক্লান্ত হয়ে তাঁর পত্নীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সূর্যাস্তের সময় হলে ঋষি-পত্নী ভাবতে লাগলেন—'স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করা ধর্মের অনুকূল হবে কী না ! ইনি অত্যন্ত কঠিনভাবে ধর্মপালন করেন। এঁকে জাগালে অথবা না জাগালে, কোনো ভাবে আমি অপরাধিনী হয়ে যাব না তো ? জাগালে এঁর ক্রোধের ভয়, আর না জাগালে ধর্মলোপের আশঙ্কা।' পরে তিনি ঠিক করলেন যে ঋষি ক্রোধ করলেও তাঁকে ধর্ম-লোপ থেকে রক্ষা করা স্ত্রীরই কর্তব্য, তাই তিনি অত্যন্ত কোমলভাবে বললেন—'মহাভাগ ! উঠুন, সূর্যাস্ত হচ্ছে। স্নানাদি করে সন্ধ্যার্চনা করুন। এখন পূজাপাঠ করার সময়। পশ্চিম গগন রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে।' ঋষি জরৎকারুর নিদ্রাভঙ্গ হল। ক্রোধে তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল, তিনি বললেন—'সর্পিণী ! তুমি আমার অপমান করেছ, আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না। যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানে চলে যাব। আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম আমি ঘুমিয়ে থাকলে সূর্য কখনই অস্ত যেতে পারে না। অপমানিত হয়ে থাকা সম্ভব নয়। এখন আমি চললাম।' স্বামীর এই হৃদয় বিদারক কথা শুনে ঋষি-পত্নী কম্পিত গলায় বললেন—'প্রভু ! আমি আপনাকে অপমান করার জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলিনি। আপনার ধর্মের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্যই আমি এই কাজ করেছি।' জরৎকারু ঋষি বললেন—'আমার মুখনিঃসৃত বাক্য কখনো মিথ্যা হবে না। তোমার আমার মধ্যে আগে থেকেই এই শর্ত করা ছিল। আমি চলে যাবার পরে তুমি তোমার ভাইকে জানিয়ো যে আমি চলে গেছি, একথাও বোলো যে আমি এখানে খুব সুখেই ছিলাম। আমি চলে গেলে তুমি

আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না।'

ঋষি-পত্নী অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল, বাক্যহরণ হল, চোখে জল ভরে এলো, তিনি কম্পিত হৃদয়ে ধৈর্য সহকারে হাত জোড় করে বললেন—'ধর্মজ্ঞ ! এই নিরপরাধ নারীকে ছেড়ে যাবেন না। আমি ধর্মে অটল থেকে আপনার প্রিয় ও হিত কর্ম সাধন করব। আমার ভাই এক বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছেন। তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আমার ভাইয়েরা মাতা কদ্রুর শাপগ্রস্ত হয়ে আছেন। আপনার থেকে আমার একটি পুত্র লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, তার দ্বারাই আমাদের জাতির কল্যাণ হবে। আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ যেন নিষ্ফল না হয়। এখনও আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি ! তাহলে আপনি কেন এই নিরপরাধ অবলাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ?' পত্নীর কথা শুনে ঋষি উত্তর দিলেন—'তোমার গর্ভে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সন্তান আছে। সে মস্ত বড় বিদ্বান এবং ধর্মাত্মা ঋষি হবে।' এই কথা বলে জরৎকারু ঋষি প্রস্থান করলেন।

ঋষি চলে গেলেই ঋষি-পত্নী তাঁর ভাই বাসুকির কাছে গেলেন এবং স্বামীর গৃহত্যাগের কথা জানালেন। এই অপ্রিয় ঘটনার কথা শুনে বাসুকি খুব দুঃখ পেলেন। তিনি বললেন—'বোন ! যে উদ্দেশ্যে ওঁর সঙ্গে আমরা তোমার বিবাহ দিয়েছিলাম, তাতো তুমি জানোই। যদি ওঁর ঔরসে তোমার একটি পুত্র হত, তাহলে নাগেদের ভালোই হত। ব্রহ্মার কথানুসারে সেই পুত্র নিশ্চয়ই আমাদের জনমেজয়ের যজ্ঞাগ্নি থেকে রক্ষা করত। বোন ! তুমি গর্ভবতী হয়েছ কি ? আমরা চাই যাতে তোমার বিবাহ নিষ্ফল না হয়। নিজের বোনকে একথা জিজ্ঞাসা করা কোনো ভাইয়েরই উচিত নয়, কিন্তু প্রয়োজনের গুরুত্ব দেখে আমাকে এইসব প্রশ্ন করতে হচ্ছে। আমি জানি উনি যখন একবার চলে গেছেন, তখন তাঁকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। আমি তাঁকে একথা বলতেও পারছি না, পাছে তিনি আমাকে অভিশাপ দেন। বোন ! তুমি আমাকে সব কথা জানিয়ে আমার আশঙ্কা দূর করো।'

ঋষি-পত্নী তাঁর ভাই বাসুকিকে বললেন—'ভাই ! আমিও তাঁকে একথা বলেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন আমি গর্ভধারণ করেছি, উনি হাস্যচ্ছলেও কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, তাই এই সংকটের সময়ও তাঁর কথা কখনো মিথ্যা হবে না। যাওয়ার সময় উনি আমাকে বলেছেন—'নাগকন্যা ! তোমার প্রয়োজনের বিষয়ে চিন্তা কোরো না, তোমার গর্ভে অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় পুত্র আছে। তাই তুমি মনে কোনো দুঃখ রেখো না।' এই কথা শুনে বাসুকি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে স্নেহ সহকারে বোনকে যত্ন আদর করতে লাগলেন। আর ঋষি-পত্নীর গর্ভে শুক্ল পক্ষের চাঁদের মতো সন্তান বাড়তে লাগল।

যথা সময়ে বাসুকির বোন জরৎকারুর গর্ভ থেকে এক দিব্যকুমার জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর জন্ম নেওয়ায় তাঁর পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলেরই ভয় দূর হল। ক্রমশ বড় হলে তিনি চ্যবন মুনির কাছে বেদ অধ্যয়ন করলেন। সেই ব্রহ্মচারী বালকবয়স থেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাত্ত্বিক ছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভে থাকার সময় তাঁর পিতা তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন 'অস্তি' (আছে) ; তাই তার নাম হল 'আস্তিক'। নাগরাজ বাসুকি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও সতর্কতার সঙ্গে পালন করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বালক ইন্দ্রের ন্যায় বিশাল হয়ে নাগেদের হর্ষবৃদ্ধি করতে লাগলেন।

———o———

পরীক্ষিতের মৃত্যুর কারণ

শ্রীশৌনক বললেন—সূতনন্দন ! রাজা জনমেজয় উতঙ্কের কথা শুনে পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিস্তারিতভাবে সেটি আমাদের বলুন।

শ্রীউগ্রশ্রবা বললেন—রাজা জনমেজয় তাঁর মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আমার পিতার জীবনে কী ঘটেছিল ? তাঁর মৃত্যু হল কীভাবে ? আমি তাঁর মৃত্যু বৃত্তান্ত শুনে এমন কাজই করব, যাতে জগতের মঙ্গল হয়।'

মন্ত্রীরা বললেন—'মহারাজ ! আপনার পিতা অত্যন্ত ধার্মিক, উদার এবং প্রজাপালক ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁর সম্বন্ধে আপনাকে জানাচ্ছি। আপনার ধর্মজ্ঞ পিতা মূর্তিমান ধর্ম ছিলেন। তিনি ধর্ম অনুসারে তাঁর কর্তব্যপালনে রত চার বর্ণের প্রজাদের রক্ষা করতেন। তাঁর অতুলনীয় পরাক্রম ছিল, তিনি সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করতেন। তিনি কাউকে হিংসা করতেন না, তাঁকেও কেউ হিংসা করত না। সবার প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই প্রসন্ন মনে নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। বিধবা, অনাথ, পঙ্গু এবং গরিবদের খাওয়া-পরার ভার তিনি নিজের হাতে রেখেছিলেন। তাঁর প্রজারা সকলেই সুস্থ-সবল ছিল। রাজা অত্যন্ত শ্রীমান এবং সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কৃপাচার্যের কাছ থেকে ধনুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে

অত্যন্ত ভক্তি করতেন, তিনি সকলের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কুরুবংশ পরিক্ষীণ হওয়ার সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম হয়েছিল পরীক্ষিৎ। তিনি রাজধর্ম এবং অর্থশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ধর্মসেবী, জিতেন্দ্রিয় এবং নীতিনিপুণ ছিলেন। ষাট বছর ধরে তিনি প্রজাপালন করেছিলেন। তারপর সমস্ত প্রজাকুলকে দুঃখসাগরে ভাসিয়ে তিনি পরলোক গমন করলেন। তারপরে আপনি রাজা হলেন।'

জনমেজয় বললেন—'মন্ত্রীগণ ! আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলেন না ! আমাদের বংশের সকল রাজাই তাঁদের পূর্বপুরুষদের সদাচারের কথা স্মরণে রেখে প্রজাদের হিতৈষী এবং প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমি আমার পিতার মৃত্যুর কারণ জানতে চাই।'

মন্ত্রীরা বললেন—'মহারাজ ! আপনার প্রজাপালক পিতা মহারাজ পাণ্ডুর ন্যায় শিকারবিলাসী ছিলেন। তিনি সমস্ত রাজকার্যই আমাদের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। একবার শিকারের জন্য বনে গিয়ে, তিনি একটি হরিণকে বাণবিদ্ধ করেন। হরিণটি যখন ছুটে পালাচ্ছিল, উনি তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। তিনি একলাই পদব্রজে হরিণটিকে খুঁজতে খুঁজতে বহুদূর চলে গেলেন, তা সত্ত্বেও তিনি হরিণের দেখা পেলেন না। রাজার বয়স তখন ষাট বৎসর, তাই তিনি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় তিনি একজন মুনির দর্শন পেলেন, যিনি মৌনাবস্থায় ছিলেন। রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলে মুনি কোনো উত্তর দিলেন না। রাজা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং পরিশ্রমে কাতর ছিলেন, তাই মুনি কথা না বলায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে ঋষি মৌনী হয়ে অবস্থান করছেন। তিনি ক্রোধভরে এক মৃত সাপকে ধনুকের একধার দিয়ে তুলে ঋষির কাঁধের ওপর রেখে দিলেন। মৌনী ঋষি রাজার এই কাজে ভালো-মন্দ কিছুই বললেন না। তিনি শান্ত হয়ে বসে থাকলেন। রাজা এরপর রাজধানীতে ফিরে এলেন।

মৌনী ঋষি শমিকের পুত্রের নাম ছিল শৃঙ্গী। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী এবং শক্তিশালী ছিলেন। মহাতেজস্বী শৃঙ্গী যখন তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে এই কথা শুনলেন যে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর পিতার মৌন ও নিশ্চল অবস্থায় থাকাকালীন

তাঁকে অপমান করেছেন তখন তিনি রেগে জ্ঞানহারা হয়ে গেলেন। তিনি হাতে জল নিয়ে আপনার পিতাকে (পরীক্ষিৎকে) অভিশাপ দিলেন—'যে ব্যক্তি আমার নিরপরাধ পিতার কাঁধে মৃত সাপ জড়িয়ে রেখেছিল, সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে তক্ষক নাগ ক্রোধান্বিত হয়ে সাত দিনের মধ্যে বিষে জর্জরিত করে দেবে। লোকে দেখুক আমার তপস্যার কী ক্ষমতা!' এই শাপ দিয়ে শৃঙ্গী তাঁর পিতার কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। শমীক মুনি এই সব শুনে একটুও খুশি হলেন না, তিনি তখন তাঁর সুশীল ও গুণী শিষ্য গৌরমুখকে আপনার পিতার কাছে পাঠালেন। গৌরমুখ আপনার পিতার (পরীক্ষিৎ-এর) কাছে গিয়ে বললেন, 'রাজন্! আমাদের গুরুদেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন কারণ ঋষির পুত্র আপনাকে (পরীক্ষিৎকে) অভিশাপ দিয়েছেন, আপনি যেন সাবধানে থাকেন। তক্ষক নাগ সাত দিনের মধ্যে তার ভয়ানক বিষে আপনার মৃত্যু ঘটাবে।' আপনার পিতা সতর্ক হয়ে রইলেন।

সপ্তম দিনে তক্ষক যখন আসছিল তখন তার সঙ্গে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হল। তক্ষক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্রাহ্মণদেব! আপনি এত তাড়াতাড়ি করে কোথায় যাচ্ছেন?' কাশ্যপ উত্তর দিলেন, 'আজ রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষক সাপ বিষে জর্জরিত করবে, তাই সেখানে যাচ্ছি। আমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ জীবন ফিরিয়ে দেব। আমি সেখানে পৌঁছে গেলে সাপ তাঁকে কামড়াতেও পারবে

না।' তক্ষক বলল—'আমিই তক্ষক। আমি রাজাকে কামড়াবার পরে আপনি তাঁকে বাঁচাতে চাইছেন কেন? আমার শক্তি দেখুন, আমি কামড় দেবার পর আপনি তাঁকে বাঁচাতে সক্ষম হবেন না।' এই কথা বলে তক্ষক এক বৃক্ষকে ছোবল মারল। তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কাশ্যপ ব্রাহ্মণ তাঁর বিদ্যার সাহায্যে সেই বৃক্ষকে তখনই ফুলে ফলে ভরে তুললেন। তখন তক্ষক ব্রাহ্মণকে প্রলোভিত করতে লাগল। সে বলল—'তুমি যা চাও আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও।' ব্রাহ্মণ বললেন—'আমি তো অর্থের জন্যই ওখানে যাচ্ছি।' তক্ষক বলল—'তুমি রাজার কাছে যত অর্থ আশা কর, আমার থেকে তাই নিয়ে নাও আর এখান থেকেই ফিরে যাও।' তক্ষকের এই কথায় কাশ্যপ ব্রাহ্মণ প্রভূত অর্থ নিয়ে সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। তারপর তক্ষক ছলনা করে পরীক্ষিতের মহলে এসে আপনার সতর্ক, ধার্মিক পিতাকে বিষে জর্জরিত করে মেরে চলে গেল। তারপরে আপনার রাজ্যাভিষেক হল। এইসব অত্যন্ত দুঃখপ্রদ ঘটনা। কিন্তু আপনি শুনতে চাওয়ায় আপনার নির্দেশে এই কথা বললাম। তক্ষক আপনার পিতাকে দংশন করেছিল এবং উতঙ্ক ঋষিকেও খুব কষ্ট দিয়েছিল। এবার আপনার যা করা উচিত মনে হয়, তাই করুন।'

জনমেজয় বললেন—'মন্ত্রীগণ! তক্ষক দংশন করায় বৃক্ষের ভস্ম হওয়া এবং তারপর তা আবার জীবিত হয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখের কথা। একথা আপনারা কোথায় শুনলেন? তক্ষক অবশ্যই খুব খারাপ কাজ করেছে। সে যদি অর্থ দিয়ে ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে না দিত, তাহলে কাশ্যপ আমার পিতাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করত। ঠিক আছে, আমি তাকে শাস্তি দেব। প্রথমে আপনারা এই ঘটনার মূল কারণটি বলুন।'

মন্ত্রীরা বললেন—'মহারাজ! তক্ষক যে বৃক্ষকে দংশন করেছিল, সেই গাছের ওপর আগে থেকেই এক ব্যক্তি শুকনো কাঠের জন্য উঠেছিল। এই ব্যাপার তক্ষক বা কাশ্যপ কারোরই অবিদিত ছিল না। তক্ষকের দংশনে বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তিটিও ভস্মীভূত হয়ে গেল এবং কাশ্যপের মন্ত্রের প্রভাবে বৃক্ষের সঙ্গে সেই ব্যক্তিও জীবিত হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি তক্ষক ও কাশ্যপের কথা-বার্তা শুনেছিল, সে-ই এসে আমাদের এইসব কথা জানিয়েছিল। এবার আপনি আমাদের বক্তব্যকে যথার্থ মনে করে কী করণীয় ভেবে দেখুন!'

—০—

সর্পযজ্ঞের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যজ্ঞের সূচনা

উগ্রশ্রবা বলতে লাগলেন—শৌনক ঋষিগণ ! পিতার মৃত্যুর কাহিনী শুনে জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ এবং অস্থির চিত্ত হয়ে উঠলেন। শোকগ্রস্ত হওয়ায় তিনি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন, চোখ জলে ভরে এল। তিনি দুঃখ-শোক ও ক্রোধে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে শাস্ত্র বিধি মতে হাতে জল নিয়ে বললেন—'আমি বিস্তারিতভাবে জানলাম যে আমার পিতার মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল। যে দুরাত্মা তক্ষকের জন্য আমার পিতার মৃত্যু হয়েছিল আমি তার প্রতিশোধ নিশ্চিতভাবে নেব। সে আমার পিতাকে দংশন করেছিল, শৃঙ্গী ঋষির শাপ তো উপলক্ষ মাত্র। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল যে, তক্ষক ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে, যিনি বিষ নামাবার জন্য আসছিলেন, যিনি এলে আমার পিতা অবশ্যই প্রাণ ফিরে পেতেন, অর্থের লোভ দেখিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আমাদের মন্ত্রীরা যদি অনুনয়-বিনয় করে কাশ্যপের সাহায্যে বাবার প্রাণ ফিরে পেতেন, তাহলে সেই তক্ষকের কী ক্ষতি হত ? ঋষির অভিশাপ পূর্ণ হত আর আমার পিতাও জীবিত হয়ে যেতেন। আমার পিতার মৃত্যুর সমস্ত অপরাধই তক্ষকের, তাই আমি আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে কৃতসংকল্প।'

তখন রাজা জনমেজয় পুরোহিত এবং ঋত্বিকদের আহ্বান করে বললেন—'দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতাকে দংশন করে হত্যা করেছে। আপনারা এমন উপায় করুন, যাতে আমি প্রতিশোধ নিতে পারি। আপনারা কি এমন কোনো যজ্ঞ জানেন, যাতে লেলিহান অগ্নিতে আমি ওই ক্রূর সর্পকে উৎসর্গ করতে পারি ?' ঋত্বিকেরা বললেন—'মহারাজ ! দেবতারা পূর্ব থেকেই আপনার জন্য এক মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই কথা পুরাণেও উল্লেখ আছে। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান আপনি ব্যতীত কারো দ্বারাই সম্ভব নয়। আমরা সেই যজ্ঞবিধি জানি।' ঋত্বিকদের কথায় জনমেজয়ের দৃঢ়বিশ্বাস হল যে তাহলে এবার তক্ষককে আহুতি দেওয়া সম্ভব হবে। রাজা ব্রাহ্মণদের বললেন—'আমি যজ্ঞ করব। আপনারা তার সব ব্যবস্থা করুন।' বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ-মণ্ডপ তৈরি করার জন্য জমির মাপ করলেন, যজ্ঞশালার জন্য শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ প্রস্তুত করলেন এবং রাজা জনমেজয় যজ্ঞের উদ্দেশ্যে দীক্ষিত হলেন।

এই সময় এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। কলা-কৌশলে পারঙ্গম, বিদ্বান, অনুভবী এবং বুদ্ধিমান সূত বললেন—'যে সময়ে এবং যে স্থানে এই যজ্ঞ-মণ্ডপ মাপ-জোপের ক্রিয়া শুরু করা হয়েছে, তা দেখে আমার মনে হয়েছে কোনো ব্রাহ্মণের জন্য এই যজ্ঞ পূর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না।' এই কথা শুনে রাজা জনমেজয় তাঁর দ্বাররক্ষীদের বলে দিলেন, তাঁকে না জানিয়ে যেন কেউ যজ্ঞস্থলে প্রবেশ না করে।

এবার শাস্ত্রসম্মতভাবে সর্পযজ্ঞ শুরু হল। ঋত্বিকগণ নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত হলেন। তাঁদের মুখ-চোখ ধোঁয়ায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তাঁরা কালো বস্ত্র পরিধান করে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যজ্ঞ করতে শুরু করলেন। তখন সকল সর্পই ভীতসন্ত্রস্ত হতে লাগল। তারপর বেচারী সর্পরা গর্জন করে করে লাফিয়ে, দীর্ঘশ্বাস নিয়ে, লেজ ও ফণায় জড়িত হয়ে আগুনের মধ্যে এসে পড়তে লাগল। সাদা, কালো, নীল, হলুদ, ছোট, বড় সর্বপ্রকারের সর্প আর্তনাদ করতে করতে আগুনের মধ্যে পড়তে লাগল। কোনো সর্প চার

ক্রোশ লম্বা আবার কেউ বা গোরুর কানের মতো ছোট, ওপর থেকে কুণ্ডের মধ্যে আহুতি হয়ে পড়তে লাগল।

সর্পযজ্ঞের হোতা ছিলেন চ্যবন বংশীয় চণ্ড ভার্গব।

কৌৎস, উদ্‌গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মা, শার্ঙ্গরব এবং পিঙ্গল ছিলেন অধ্বর্যু। পুত্র এবং শিষ্যকুল সহ ব্যাসদেব, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, অসিত, দেবল প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। নাম ধরে আহুতি দিতেই বড় বড় ভয়ানক সর্পগুলি এসে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হচ্ছিল। সর্পদের চর্বি এবং মেদের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল, তীব্র দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছেয়ে গেল এবং সর্পদের চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল। তক্ষকও এই খবর পেল। সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইন্দ্রের শরণাগত হয়ে বলল—'দেবরাজ ! আমি অপরাধী, ভীত হয়ে আপনার শরণ নিয়েছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমি তোমার রক্ষার জন্য আগে থেকেই ভগবান ব্রহ্মার কাছে অভয় বচন নিয়ে রেখেছি। সর্পযজ্ঞে তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না।' ইন্দ্রের কথা শুনে তক্ষক আনন্দিত মনে ইন্দ্রভবনে বাস করতে লাগল।

——o——

আস্তিকের বর প্রার্থনায় সর্পযজ্ঞ বন্ধ এবং সর্পকুল থেকে বাঁচার উপায়

উগ্রশ্রবা বলতে লাগলেন—জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পদের আহুতি হতে থাকায় অনেক সর্প ধ্বংস হয়ে গেল। সামান্য কিছু বেঁচে থাকল। বাসুকি নাগ এতে বড়োই কষ্ট পেলেন। তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হল। তিনি তাঁর ভগিনী জরৎকারুকে বললেন—'বোন ! আমার সমস্ত অঙ্গ জ্বালা করছে। কোনো দিক দেখতে পাচ্ছি না, মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আমি হতজ্ঞান হয়ে ওই লেলিহান আগুনে গিয়ে পড়ব। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য তো তাই। আমি এই বিপদের জন্যই তোমার বিবাহ জরৎকারু ঋষির সঙ্গে দিয়েছিলাম। এবার তুমি আমাদের রক্ষা করো। ভগবান ব্রহ্মার কথানুসারে তোমার পুত্র আস্তিক এই সর্পযজ্ঞ বন্ধ করতে সক্ষম। সে বালক হলেও শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধদেরও মাননীয়। তুমি এখন তাকে গিয়ে আমাদের রক্ষা করতে বলো।' ভাইয়ের কথা শুনে ঋষি-পত্নী জরৎকারু আস্তিককে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে নাগেদের রক্ষা করার জন্য পাঠালেন। আস্তিক মাতার নির্দেশে বাসুকির কাছে গিয়ে বললেন—'নাগরাজ ! আপনি শান্ত হোন। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি যে এই শাপ থেকে আমি আপনাদের মুক্ত করে দেব। আমি হাস্য-পরিহাসেও কখনো অসত্য-কথন করিনি। অতএব আমার কথা অসত্য বলে মনে করবেন না। আমি মধুর বাক্যে রাজা জনমেজয়কে প্রসন্ন করব এবং যজ্ঞ বন্ধ করে দেব। মাতুল মহাশয়, আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

বাসুকি নাগকে এইভাবে আশ্বাস দিয়ে আস্তিক সর্পদের

রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞশালার দিকে রওনা হলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখলেন সূর্য এবং অগ্নিসম সভাসদ দ্বারা যজ্ঞশালা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। দ্বাররক্ষক তাঁকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিল না। তিনি তখন ভেতরে প্রবেশ করার জন্য যজ্ঞের স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর যজ্ঞস্তুতি শুনে জনমেজয় তাঁকে যজ্ঞে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। আস্তিক যজ্ঞ-মণ্ডপে প্রবেশ করে

যজমান, ঋত্বিক, সভাসদ এবং অগ্নির আরও স্তুতি করতে লাগলেন।

আস্তিকের স্তুতি শুনে রাজা, সভাসদ, ঋত্বিক এবং অগ্নি সকলেই প্রসন্ন হলেন। সকলের মনোভাব বুঝে জনমেজয় বললেন—'যদিও এ বালক, কিন্তু এর কথা যে কোনো অভিজ্ঞ বৃদ্ধেরই মতো। আমি একে বালক নয়, কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেই মনে করি। আমি একে বর দিতে চাই, এ বিষয়ে আপনাদের কী মত ?' সভাসদেরা বললেন—'ব্রাহ্মণ যদি বালকও হয়ে থাকেন, তাহলেও তিনি রাজার কাছে সম্মানীয়। তার ওপর যদি বিদ্বান হন, তাহলে তো বলার কিছু নেই। সুতরাং আপনি এই বালক যা চায় তা দিতে পারেন।' জনমেজয় বললেন—'আপনারা যথাসম্ভব চেষ্টা করুন যাতে আমার এই কাজ ঠিক মতো শেষ হয় এবং তক্ষক নাগ অগ্নিকুণ্ডে এসে পড়ে। সে-ই আমার প্রধান শত্রু।' ঋত্বিকেরা বললেন—'অগ্নিদেব বলেছেন তক্ষক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছে। ইন্দ্র তক্ষককে অভয় দিয়েছেন।' জনমেজয় দুঃখিত হয়ে বললেন—'আপনারা এমন মন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞ করুন যাতে ইন্দ্র-সহ তক্ষক নাগ এসে অগ্নিতে ভস্ম হয়ে যায়।' জনমেজয়ের কথা শুনে যজ্ঞ হোতারা আহুতি দিতে থাকলেন। সেইসময় আকাশে ইন্দ্র ও তক্ষককে দেখা গেল। ইন্দ্র সেই যজ্ঞ দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে তক্ষককে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। তক্ষক প্রতিমুহূর্তে অগ্নির সমীপ হতে থাকল। তখন ব্রাহ্মণেরা বললেন—'রাজন্ ! আপনার কাজ ঠিক মতো চলছে। এই ব্রাহ্মণকে এবার বর দিন।'

জনমেজয় বললেন—'ব্রাহ্মণকুমার ! তোমার মতো সৎপাত্রকে আমি উপযুক্ত বর দিতে চাই। এখন তোমার যা ইচ্ছা, প্রসন্ন মনে চেয়ে নাও। যত শক্তই হোক আমি তোমাকে তা প্রদান করব।' আস্তিক যখন দেখলেন তক্ষক অগ্নিকুণ্ডে প্রায় পড়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি বললেন—'রাজন্ ! আমাকে এই বর প্রদান করুন যে আপনার এই যজ্ঞ এখনই বন্ধ হোক এবং তাতে পড়তে থাকা সব সর্প যেন রক্ষা পায়।' এতে জনমেজয় একটু অপ্রসন্ন হয়ে বললেন—'ওহে ব্রাহ্মণ ! তুমি সোনা-রূপা-গোধন অথবা তোমার ইচ্ছানুসারে অন্য যে কোনো বস্তু চেয়ে নাও। আমার ইচ্ছা এই যজ্ঞ যেন বন্ধ না হয়।' আস্তিক বললেন—'আমার সোনা-রূপা অথবা অন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই ; আমার মাতৃকুলের কল্যাণের নিমিত্ত আপনার এই যজ্ঞ আমি বন্ধ করতে চাই।' জনমেজয় বার বার তাঁর কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু আস্তিক অন্য কোনো বর চাইতে রাজি হলেন না। তখন সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে বলতে লাগলেন—'এই ব্রাহ্মণ যা চাইছেন, একে তাই দেওয়া উচিত।'

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! ওই যজ্ঞে তো অনেক বড় বড় বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু আস্তিকের সঙ্গে কথা বলার সময় তক্ষক কেন অগ্নিতে পড়েননি, তার কী কারণ ? তাঁরা কি মন্ত্র বুঝতে পারেননি ?'

উগ্রশ্রবা বললেন—ইন্দ্র ছেড়ে দেওয়ামাত্র তক্ষক

মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। আস্তিক তিন বার 'দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! দাঁড়াও !' বলতে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে আটকে ছিলেন, অগ্নি কুণ্ডে পতিত হননি।' শৌনক ! সভাসদগণ বারংবার বলায় জনমেজয় বললেন—'ঠিক আছে ! আস্তিকের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এই যজ্ঞ সমাপ্ত করো। আস্তিক প্রসন্ন হোক। আমাদের সূত যা বলেছিলেন তাও সত্য হোক।' জনমেজয়ের মুখে এই কথা শুনে সকলে আনন্দ প্রকাশ করে উঠলেন। সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজা, ঋত্বিক এবং অন্য সভাসদগণকে ও

ব্রাহ্মণদের অনেক দানধ্যান করলেন। যে সূত যজ্ঞ বন্ধ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁকেও যথোচিত সৎকার করলেন। যজ্ঞান্তে পুণ্যস্নান করে আস্তিকের সম্মান ও সৎকার করে তাঁকে সর্বপ্রকারে প্রসন্ন করে বিদায় জানালেন। যাবার সময় জনমেজয় তাঁকে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে রাখলেন। আস্তিক তাঁকে 'তথাস্তু' বলে বিদায় নিলেন। তারপরে তিনি মাতুলালয়ে গিয়ে মাতা জরৎকারুকে সবিস্তারে সব জানালেন। সেই সময় বাসুকি নাগের সভা সেই সব সর্পে পরিপূর্ণ ছিল, যারা জনমেজয়ের যজ্ঞ থেকে বেঁচে ফিরেছিল। আস্তিকের মুখে সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে আস্তিককে বলল—'পুত্র ! তোমার ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করো।' তারা বারংবার বলতে লাগল—'পুত্র ! তুমি আমাদের মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছো। আমরা তোমার কাজে অত্যন্ত খুশি হয়েছি, বলো তোমার জন্যে আমরা কী করতে পারি ?' আস্তিক বললেন—'আমি আপনাদের কাছে এই বর প্রার্থনা করি যে, যে কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যা ও সকালে প্রসন্ন চিত্তে এই ধর্মময় উপাখ্যান পাঠ করবে, তার যেন সর্প থেকে কোনো ভয় না থাকে।' তার কথা শুনে সকলেই প্রসন্ন হয়ে বলতে লাগল—'প্রিয়বর ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমরা প্রসন্ন চিত্তে স্নেহসহকারে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। যে ব্যক্তি অসিত, আর্তিমান এবং সুনীথ মন্ত্রগুলির মধ্যে যে কোনো একটি দিনে বা রাত্রে পাঠ করবে, তার সর্প হতে কোনো ভয় থাকবে না। সেই মন্ত্রগুলি এইপ্রকার'—

যো জরৎকারুণা জাতো জরৎকারৌ মহাযশাঃ।
আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তঃ মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ॥

(৫৮।২৪)

'জরৎকারু ঋষির ঔরসে জরৎকারু নামক নাগকন্যার গর্ভে আস্তিক নামে এক যশস্বী ঋষি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সর্পযজ্ঞে তোমাদের সকল সর্পকে রক্ষা করেন। হে মহাভাগ্যবান সর্পকুল ! আমি তাঁকে স্মরণ করছি। তোমরা আমাকে দংশন কোরো না।'

সর্পাপসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ।
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর॥

(৫৮।২৫)

'হে মহাবিষধর সর্প ! তুমি চলে যাও, তোমার কল্যাণ হোক, জনমেজয়ের যজ্ঞের সমাপ্তিকালে আস্তিক যা বলেছিল, তাই স্মরণ করো।'

আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ততে।
শতধা ভিদ্যতে মূর্ধ্নি শিংশবৃক্ষফলং যথা॥ (৫৮।২৬)

'যেসব সর্প আস্তিকের শপথ বাক্য মেনে ফিরে যাবে না, তার ফণা শিশুবৃক্ষফলের ন্যায় শতধাবিভক্ত হবে।'

ধার্মিক শিরোমণি আস্তিক ঋষি এইভাবে সর্পযজ্ঞ থেকে সর্পদের রক্ষা করেছিলেন। শরীরের প্রারব্ধ পূর্ণ হলে পুত্র-পৌত্র রেখে আস্তিক স্বর্গাগমন করেন। যিনি আস্তিক চরিত্র পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁর আর সর্পভয় থাকে না।

—— o ——

বেদব্যাসের আদেশে বৈশম্পায়ন দ্বারা মহাভারতের কথা আরম্ভ করা

শৌনক বললেন—'সূতনন্দন ! মহাভারতের কথা অত্যন্ত পবিত্র। এতে পাণ্ডবদের যশকীর্তন করা হয়েছে। সর্পযজ্ঞের পরে জনমেজয়ের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বৈশম্পায়নকে এই কথা জনমেজয়কে শোনাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরা এখন সেই কাহিনী শুনতে চাই। ভগবান ব্যাসের মনসমুদ্র থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এই কাহিনী সর্বরত্নময়। আপনি সেই কাহিনী বলুন।'

উগ্রশ্রবা বললেন—শৌনক ! ভগবান বেদব্যাস রচিত মহাভারতের কাহিনী আমি আপনাদের প্রথম থেকেই শোনাব। এটি বর্ণনা করতে আমার বড়ই আনন্দ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন জানতে পারলেন যে, রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করার জন্য দীক্ষা নিয়েছেন, তখন তিনি সেখানে গেলেন। ভগবান ব্যাসের জন্ম শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে যমুনা তটে হয়েছিল। তিনি পাণ্ডবদের পিতামহ। তিনি জন্মগ্রহণ করে স্বেচ্ছায় বয়োপ্রাপ্ত হলেন এবং বেদাদি সর্বশাস্ত্র ও ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করলেন। তিনি যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তা কারোর দ্বারাই তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, এর দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। অখণ্ড বেদকে চার ভাগে তিনিই ভাগ করেছিলেন। তিনি মহাব্রহ্মর্ষি, ত্রিকালদর্শী, সত্যব্রত,

পরমপবিত্র এবং সগুণ-নির্গুণ স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কৃপাতেই পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিষ্য সহ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রাজর্ষি জনমেজয় তাঁর সভাসদদের

নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং শিষ্টাচার সহকারে তাঁকে মণ্ডপে নিয়ে এলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সুবর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে বিধিপূর্বক তাঁর পূজা করলেন। তাঁর বংশের আদি পুরুষকে পাদ্য-অর্ঘ্য, আচমন এবং গোধন প্রদান করে জনমেজয় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। তাঁরা দুজনেই দুজনের কুশল সমাচার আদান-প্রদান করলেন। সভাসদগণ সকলেই মহামতি ব্যাসের যথাযোগ্য পূজা ও সৎকার করলেন।

জনমেজয় তারপরে সভাসদগণকে নিয়ে হাত জোড় করে ব্যাসের কাছে গিয়ে বললেন—'ভগবান ! আপনি কৌরব এবং পাণ্ডবদের দেখেছেন। আমার ইচ্ছা আপনার কাছ থেকে ওঁদের সম্বন্ধে কিছু শুনি। তাঁরা তো খুব ধর্মাত্মা ছিলেন, তাহলে তাঁদের কেন এমন অবনমন হল ? কীজন্য এই মহাসংগ্রাম হল ? এর জন্যই তো বহু প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কোনো দৈবকারণবশত তাঁদের মন যুদ্ধে অগ্রহী হয়েছিল। আপনি কৃপা করে আমাদের সেই সমগ্র কাহিনী বলুন।' এই কথা শুনে বেদব্যাস তাঁর পাশে উপবিষ্ট নিজ শিষ্য বৈশম্পায়নকে বললেন—'বৈশম্পায়ন ! কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে তিক্ততা হয়েছিল, তা তুমি আমার কাছে শুনেছ। তুমি এখন জনমেজয়কে সেই সব শোনাও।' নিজ গুরুদেবের নির্দেশ শুনে সেই পরিপূর্ণ সভায় বৈশম্পায়ন বলতে শুরু করলেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—আমি সংকল্প, বিচার এবং সমাধির দ্বারা গুরুদেবকে প্রণাম জানাই এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্মান জানিয়ে পরম জ্ঞানী ভগবান ব্যাসের কথা শোনাচ্ছি। ভগবান ব্যাস রচিত এই ইতিহাস অত্যন্ত পবিত্র ও বিস্তৃত। তিনি পুণ্যাত্মা পাণ্ডবদের চরিত্র এক লক্ষ শ্লোকে বর্ণনা করেছেন, এর বক্তা ও শ্রোতা ব্রহ্মলোকে গমন করে দেবতাদের সমকক্ষতা লাভ করেন। এই পবিত্র এবং উত্তম পুরাণ বেদ-তুল্য, শ্রবণীয় কাহিনীর মধ্যে সর্বোত্তম এবং বিখ্যাত ঋষিগণ এর প্রশংসা করেছেন। এই ইতিহাস-গ্রন্থে অর্থ এবং কাম- প্রাপ্তির ধর্মানুকূল উপায়ও কথিত আছে আর এর দ্বারা মোক্ষতত্ত্ব জানার উপযুক্ত জ্ঞানও লাভ করা যায়। এটির শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা মানুষ সকল পাপ হতে মুক্তিলাভ করে। এই ইতিহাসের নাম হল 'জয়'। জগতে পরম বিজয় অর্থাৎ কল্যাণপ্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁরা করেন তাঁদের এই ইতিহাস অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। এটি ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র—সব কিছুর সমাহার। যে এর শ্রবণ-বর্ণন করে, তার পুত্র সেবক এবং সেবক প্রভুভক্ত হয়ে ওঠে। যে এটি শ্রবণ করে, তার বাচিক, মানসিক ও শারীরিক পাপ দূর হয়ে যায়। এতে ভরতবংশীয়দের মহান জন্মের কীর্তন করা হয়েছে, তাই এর নাম মহাভারত। যে ব্যক্তি ব্যুৎপত্তিযুক্ত নামের অর্থ জানতে পারে, সে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিদিন সকালে উঠে স্নান-পূজা ইত্যাদি সমাপন করে মহাভারত রচনা করতেন, তিন বছর এইভাবে কাজ করার পর এটি সম্পূর্ণ হয়। তাই ব্রাহ্মণদেরও নিয়ম করে সময় মতো এটি শ্রবণ ও বর্ণনা করা উচিত। সমুদ্র এবং সুমেরু যেমন রত্নের খনি, এই গ্রন্থও তেমনই কথা ও কাহিনীর মূল-স্বরূপ। মহাভারত দান করলে সমগ্র পৃথিবী দানের ফল পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার উপযোগিতা সর্বকালেই বর্তমান। যা নেই মহাভারতে, তা নেই ভারতে বা পৃথিবীতে। অতএব, আপনারা আমার এই মহাভারতের উপাখ্যান মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

—০—

পৃথিবীর ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে দেবতাদের অবতারত্ব গ্রহণ করার স্থির সিদ্ধান্ত

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! জামদগ্নিপুত্র পরশুরাম একুশ বার পৃথিবীর ক্ষত্রিয়দের বধ করেছিলেন। তারপর তিনি মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে তপস্যারত হন। ক্ষত্রিয়

সংহার হওয়ার পর তাঁদের বংশরক্ষা হয় তপস্বী, ত্যাগী এবং সংযমী ব্রাহ্মণদের সাহায্যে। কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষত্রিয় রাজা পুনঃস্থাপিত হয়। ক্ষত্রিয়গণ ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমধর্মীগণ সুখী হন। রাজাগণ কাম-ক্রোধাদি দোষ বিমুক্ত হয়ে ধর্মানুসারে শাসন ও পালন করতে থাকেন। সময়মতো ঋতু পরিবর্তন হত, অকালমৃত্যু ছিল না এবং যুবকাবস্থার পূর্বে কেউই নারী-সংসর্গের কথা চিন্তা করত না। ক্ষত্রিয়গণ বড় বড় যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণা দিতেন এবং ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ ত্রিকাণ্ড বেদ পঠন-পাঠন করতেন। সেই সময় কেউই অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা করতেন না। শূদ্রদের শুনিয়ে কেউ বেদ উচ্চারণ করতেন না। বৈশ্যেরা অন্যের দ্বারা বলদের সাহায্যে চাষবাস করতেন। নিজেরা বলদের কাঁধে জোয়াল রাখতেন না এবং কোনো গাছ দুর্বল হলেও কেটে ফেলতেন না। গো-বৎস্য যতদিন মাতৃদুগ্ধ পান করত, ততদিন সেই গাভীর দুধ দোহন করা হত না। ব্যবসায়ীগণ লাভের আশায় তাঁদের ব্যবসায়ে কোনো কারচুপি করতেন না। সকলেই নিজ বর্ণ, আশ্রম ও ধর্ম অনুযায়ী অধিকার অনুসারে নিজ নিজ কাজ করতেন। ধর্ম-হানির কোনো প্রসঙ্গই আসত না। গাভী এবং স্ত্রীজাতির যথাসময়ে সন্তান হত। ফল-ফুল-লতা সবই সময়মতো পল্লবিত হত। সেই সময় ছিল সত্যযুগ।

এই আনন্দপূর্ণ সময়কালে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে থেকে রাক্ষসের প্রাদুর্ভাব হতে থাকল। সেই সময় দেবতাগণ বারংবার যুদ্ধে দৈত্যদের পরাজিত করে ঐশ্বর্যচ্যুত করেছিলেন। তারা শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, এমনকী বলদ, ঘোড়া, গাধা, উট, মহিষ এবং হরিণের মধ্যেও জন্ম নিয়েছিল। পৃথিবী তাদের ভারে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। দৈত্য-দানবেরা মদোন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল হয়েও রাজা হতে থাকল। তারা নানা প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি এবং প্রজাকুলকে পীড়িত করতে থাকে। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় পীড়িত ও উদ্বিগ্ন প্রজাকুল ব্রহ্মার শরণাগত হলেন। সেইসময় পৃথিবী এত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে শেষনাগ, কচ্ছপ এবং দিগ্‌গজও সেই ভার বহনে অসমর্থ হয়ে পড়ে। প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন শরণাগত পৃথিবীকে বললেন, 'দেবী ! তুমি যে কাজের জন্য আমার কাছে এসেছ, আমি সকল দেবতাকে সেই কাজে নিযুক্ত করব।' পৃথিবী ফিরে গেলেন।

ব্রহ্মা তখন দেবতাদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য নিজ নিজ অংশে পৃথকভাবে পৃথিবীতে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করো।' তারপর তিনি গন্ধর্ব ও অপ্সরাদেরও ডেকে বললেন, 'তোমরাও ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ অংশে জন্মগ্রহণ করো।' সকল দেবতাই ভগবান ব্রহ্মার সত্য, হিতকারক এবং প্রয়োজন অনুকূল উপদেশ স্বীকার করে নিলেন। তারপর সকলেই শত্রুনাশক ভগবান নারায়ণের কাছে যাবার জন্য বৈকুণ্ঠ যাত্রা করলেন। প্রভুর করকমলে চক্র এবং গদা ; তাঁর দেহবর্ণ নীল এবং তিনি পীতবস্ত্র পরিহিত ; তাঁর উচ্চ বক্ষঃস্থল এবং মোহময় নেত্র। তাঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন বিরাজমান, তিনি সর্বশক্তিমান এবং সকলের প্রভু। সকল

দেবতাই তাঁর পূজা করেন। ইন্দ্র তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন যে, 'আপনি পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য অবতার রূপ গ্রহণ করুন।' ভগবান 'তথাস্তু' বলে তা মেনে নিলেন। ইন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে অবতার গ্রহণ প্রসঙ্গে পরামর্শ করলেন, সেই অনুসারে দেবতাদের নির্দেশ দিলেন। তখন দেবতারা প্রজাদের কল্যাণ এবং রাক্ষসদের বিনাশের জন্য ক্রমশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মর্ষি বা রাজর্ষি বংশে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্য-খাদক অসুরদের সংহার করতে থাকলেন। তাঁরা শিশুকাল থেকেই এত বলশালী হয়ে উঠতেন যে, অসুরগণ তাঁদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারত না।

——○——

দেবতা, দানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর উৎপত্তি

জনমেজয় বললেন—প্রভু ! আমি দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মানুষ, যক্ষ, রাক্ষস এবং সমস্ত প্রাণীদের উৎপত্তির কথা শুনতে চাই। আপনি কৃপাপূর্বক উৎপত্তি থেকেই তার বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—বেশ তাই হবে। আমি স্বয়ম্ প্রকাশ ভগবানকে প্রণাম করে দেবতাদির উৎপত্তি ও নাশের কথা বলছি। ভগবান ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতুর কথা তো তুমি জানোই। মরীচির পুত্র ছিলেন কশ্যপ এবং কশ্যপ থেকেই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে। দক্ষ প্রজাপতির তেরোজন কন্যা, তাঁদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু। এঁদের থেকে উৎপন্ন পুত্র-পৌত্রাদির সংখ্যা অত্যধিক। অদিতি থেকে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হলেন। তাঁদের নাম—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু। এঁদের সর্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দিতির এক পুত্র ছিলেন, নাম হিরণ্যকশিপু। তাঁর পাঁচ পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি এবং বাষ্কল। প্রহ্লাদের তিন পুত্র—বিরোচন, কুম্ভ, নিকুম্ভ। বিরোচনের পুত্র বলি আর বলির পুত্র বাণাসুর। বাণাসুর ভগবান শিবের মহান সেবক, তাই মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ। দনুর চল্লিশটি পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বিপ্রচিত্তি যশস্বী রাজা ছিলেন। দানবেরা সংখ্যায় অত্যন্ত বেশি। সিংহিকার পুত্র রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে। ক্রোধার থেকে সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্রপ্রমর্দন প্রমুখ পুত্র-পৌত্রাদি জন্মায়। ক্রোধবশ নামে এক গণও জন্মায়। দনায়ুর চার পুত্র— বিক্ষর, বল, বীর এবং বৃত্রাসুর। কালার পুত্রগণ বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, ক্রোধশক্র এবং কালকেয় প্রমুখ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

অসুরদের গুরু ও পুরোহিত শুক্রাচার্য জন্মগ্রহণ করেন ভৃগু ঋষির ঔরসে। তাঁর চার পুত্র ; এঁদের মধ্যে ত্বষ্টাধর এবং অত্রি প্রধান, তাঁরাই অসুরদের যাগযজ্ঞ করাতেন। অসুর ও সুরবংশীয়দের উৎপত্তি পুরাণ অনুসারেই হয়েছিল। এঁদের পুত্র-পৌত্র সংখ্যায় এত যে তা গণনায় আনা সম্ভব নয়। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি এবং বারুণি—এদের বলা হয় বৈনতেয়। শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, ভুজঙ্গম, কূর্ম, কুলিক প্রভৃতি সর্পগণ হল কদ্রুর পুত্র। ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, নারদ প্রমুখ ষোড়শ দেব-গন্ধর্ব হলেন কাশ্যপ-পত্নী মুনির পুত্র। এঁরা সকলেই অত্যন্ত কীর্তিমান, বলবান এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। প্রাধা নামক দক্ষকন্যার গর্ভে অনবদ্যা, মনুবংশা ইত্যাদি কন্যাগণ এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হি প্রমুখ দেবগন্ধর্ব জন্মগ্রহণ করেন। প্রাধার থেকেই অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা, সুপ্রিয়া প্রমুখ অপ্সরা এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু এবং তুম্বুরু—এই চার গন্ধর্ব জন্মগ্রহণ করেন। কপিলার থেকে জন্ম নেয় গাভী, ব্রাহ্মণ, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ। আমি তোমাকে সকলের উৎপত্তির কথা শোনালাম। এর মধ্যে সর্প, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ, গাভী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সবই আছে।

ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয় ঋষির নাম আগেই বলা হয়েছে, তাঁর সপ্তম পুত্রের নাম স্থাণু। স্থাণুর পরম তেজস্বী এগারোজন পুত্র ছিল—মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু এবং ভব। এঁদের বলা হয় একাদশ রুদ্র। অঙ্গিরার তিন পুত্র—বৃহস্পতি, উতথ্য এবং সংবর্ত। অত্রির বহুপুত্র ছিল। পুলস্ত্যের পুত্রগণ হল—রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষ। পুলহের—শলভ, সিংহ, কিম্পুরুষ, ব্যাঘ্র, যক্ষ

এবং ঈহামৃগ (ভেড়া) জাতের পুত্র জন্ম নেয়। ক্রতুর পুত্র হল বালখিল্য। ভগবান ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুলি থেকে দক্ষ এবং বাম অঙ্গুলি থেকে তাঁর পত্নীর জন্ম হয়। সেই পত্নীর গর্ভে দক্ষের পাঁচশত কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্র নাশ হওয়ায় প্রজাপতি দক্ষ তাঁর কন্যাদের এই শর্তে বিবাহ দেন যে, তাঁদের প্রথম পুত্র দক্ষ পাবেন। তাঁর দশটি কন্যার বিবাহ হয় ধর্মের সঙ্গে, সাতাশজন কন্যার বিবাহ হয় চন্দ্রের সঙ্গে, তেরোজনকে কশ্যপ ঋষি বিবাহ করেছিলেন। ধর্মের দশ পত্নীর নাম এইপ্রকার—কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি। ধর্মের দ্বার-স্বরূপ বলে এঁদের ধর্মপত্নী বলা হয়। সাতাশটি নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী, এঁরা সময়ের সঙ্কেত দেন।

ভগবান ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির পুত্র আট বসু—ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ এবং প্রভাস। ধর এবং ধ্রুবের মায়ের নাম ধূম্রা, সোমের মা মনস্বিনী, অহের মা হলেন রতা, অনিলের মা শ্বসা, অনলের মা শাণ্ডিল্য এবং প্রত্যূষ ও প্রভাসের মায়ের নাম ছিল প্রভাতা। ধরের দুই পুত্র—দ্রবিণ এবং হুতহব্যবহ। ধ্রুবের পুত্র কাল ; সোমের পুত্র বর্চা, বর্চার শিশির, প্রাণ ও রমণ নামক তিন পুত্র। অহের চার পুত্র—জ্যোতি, শম, শান্ত এবং মুনি। অনলের পুত্র কুমার। কৃত্তিকা এঁর মাতৃত্ব স্বীকার করায় ইনি কার্তিকেয় নামেও পরিচিত। তাঁর তিন পুত্র—শাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয়। অনিলের পত্নী শিবার গর্ভে দুই পুত্র জন্মায়—মনোজব এবং অবিজ্ঞাতগতি। প্রত্যূষের পুত্র হলেন দেবল ঋষি। দেবল ঋষির দুই পুত্র—ক্ষমাবান এবং মনীষী। বৃহস্পতির দুই ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগিনী, এঁরা প্রভাসের পত্নী। এঁদের থেকেই দেবতাদের কারিগর বিশ্বকর্মার জন্ম হয়। ইনিই দেবতাদের ভূষণ এবং বিমান নির্মাণ করেন। মানুষও তাঁর কারিগরী বিদ্যা নিয়ে নিজের জীবিকা গড়ে তোলে। ভগবান ধর্ম ভগবান ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন থেকে মনুষ্যরূপে প্রকাশমান । এঁর তিন পুত্র— শম, কাম এবং হর্ষ। তাঁদের পত্নীদের ক্রমশ নাম হল— প্রাপ্তি, রতি এবং নন্দা। সূর্যের পত্নী বড়বার (ঘোটকীর) গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। অদিতির দ্বাদশ পুত্রের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, প্রজাপতি এবং বষট্কার—এঁরা হলেন প্রধান তেত্রিশ প্রকার (কোটি) দেবতা। এদের গণও আছে—যেমন রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, ভার্গবগণ এবং বিশ্বদেবগণ। গরুড়, অরুণ এবং বৃহস্পতির গণনা আদিত্যর মধ্যেও করা হয়। অশ্বিনীকুমার, ওষধি এবং পশু ইত্যাদিকে গুহ্যকগণে গণনা করা হয়। এই দেবতাদের কীর্তন করলে সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়।

মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয় থেকে প্রকটিত হয়েছিলেন। ভৃগুর শুক্রাচার্য ছাড়াও চ্যবন নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি মাতাকে রক্ষা করার জন্য গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পত্নী ছিলেন আরুষি, তাঁর গর্ভে ঔর্ব জন্মগ্রহণ করেন। ঔর্বের পুত্র ঋচীক, ঋচীকের পুত্র জামদগ্নি। জামদগ্নির চার পুত্রের মধ্যে পরশুরাম সর্বকনিষ্ঠ হলেও গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি শাস্ত্র এবং শস্ত্রকুশলও ছিলেন। এই পরশুরামই ক্ষত্রিয়কুলের নাশক। ব্রহ্মার ধাতা ও বিধাতা নামে আরও দুই পুত্র ছিলেন। তাঁরা মনুর সঙ্গে থাকতেন। কমলবাসিনী লক্ষ্মী তাঁর ভগিনী। শুক্রের কন্যা দেবী, বরুণের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র হল বল এবং কন্যার নাম সুরা। প্রজারা যখন অন্নের লোভে একে অন্যের খাদ্য খেয়ে নিচ্ছিল তখন এই সুরা থেকেই অধর্মের উৎপত্তি হয়, যার থেকে সমস্ত প্রাণী নাশ হয়ে যায়। অধর্মের পত্নী নির্ঋতি, তার হল তিনটি ভয়ঙ্কর পুত্র—ভয়, মহাভয় এবং মৃত্যু। মৃত্যুর কোনো স্ত্রী বা পুত্র নেই।

তাম্রার পাঁচটি কন্যা—কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী এবং শুকী। কাকীর গর্ভে উলুক, শ্যেনীর গর্ভে বাজ, ভাসীর গর্ভে কুকুর এবং শকুন, ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস-কলহংস এবং চক্রবাক এবং শুকীর গর্ভে তোতা জন্মগ্রহণ করে। ক্রোধার নয় জন কন্যা জন্মায়—মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি এবং সুরসা। মৃগী থেকে মৃগ, মৃগমন্দা থেকে ভালুক এবং সৃমর (ছোট জাতির মৃগ), ভদ্রমনা থেকে ঐরাবত হাতি, হরী থেকে ঘোড়া, বানর এবং গোরুর ন্যায় পুচ্ছসম্পন্ন অন্য পশু এবং শার্দূলী থেকে সিংহ, বাঘ এবং গণ্ডার উৎপন্ন হয়। মাতঙ্গী থেকে সর্বপ্রকার হাতি এবং শ্বেতা থেকে শ্বেত দিগ্‌গজ উৎপন্ন হয়েছে। সুরভির চার কন্যা—রোহিণী, গন্ধর্বী, বিমলা এবং অনলা। রোহিণী থেকে গাভী-বলদ, গন্ধর্বী থেকে ঘোড়া, অনলা থেকে খেজুর, তাল, হিন্তাল, সুপারী, নারকেল ইত্যাদি সাত পিণ্ডফলসম্পন্ন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। অনলার কন্যা শুকী তোতাদের জননী। সুরসা থেকে কঙ্ক পক্ষী এবং নাগেদের উৎপত্তি হয়েছে। অরুণের পত্নী শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ুর জন্ম। কদ্রুর থেকে যে

নাগেদের উৎপত্তি তা আগেই বলা হয়েছে। এইভাবে প্রধান সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করলে পাপীরা পাপ হতে মুক্ত হয় এবং সর্বজ্ঞতা লাভ করে ও দেহান্তে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।

---o---

দেবতা, দানব প্রমুখের মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ এবং কর্ণের উৎপত্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! আমি এবার কোন কোন দেবতা ও দানব কোন কোন মানুষের রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর বর্ণনা করছি। দানবরাজ বিপ্রচিত্তি জরাসন্ধ এবং হিরণ্যকশিপু শিশুপাল হয়ে জন্মেছিলেন। সংহ্লাদ শল্যরূপে এবং অনুহ্লাদ ধৃষ্টকেতু হয়ে জন্মেছিলেন। শিবি দৈত্য দ্রুমরাজার রূপে এবং বাস্কল ভগদত্ত হয়ে জন্মেছিলেন। কালনেমি দৈত্যই কংস রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ভরদ্বাজ মুনির ঔরসে বৃহস্পতির অংশ থেকে দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়, ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, উত্তম শাস্ত্রবেত্তা এবং অত্যন্ত তেজস্বী। তাঁর ঔরসে মহাদেব, যম, কাল এবং ক্রোধের সম্মিলিত অংশ থেকে মহাবলী অশ্বত্থামার জন্ম হয়েছিল। বশিষ্ঠ ঋষির শাপ এবং ইন্দ্রের নির্দেশে অষ্টবসু রাজর্ষি শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্ম নেন। ভীষ্ম ছিলেন তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন কৌরবদের রক্ষক, বেদবিদ জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ বক্তা। তিনি ভগবান পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। রুদ্রের এক গণ কৃপাচার্য রূপে অবতরণ করেছিলেন। দ্বাপরযুগের অংশে শকুনির জন্ম। মরুদ্গণের অংশে জন্ম নিয়েছিলেন বীরবর সত্যবাদী সাত্যকি, রাজর্ষি দ্রুপদ, কৃতবর্মা এবং রাজা বিরাট। অরিষ্টের পুত্র হংস নামক গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র রূপে জন্ম নিয়েছিলেন এবং তাঁর ছোট ভাই পাণ্ডু রূপে। সূর্যের অংশ ধর্মই বিদুর নামে প্রসিদ্ধ। কুরুকুল কলঙ্ক দুর্যোধন দুরাত্মা কলিযুগের অংশ থেকেই জন্ম নেন। তিনি নিজেদের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে পৃথিবীকে ভস্ম করে দেন। পুলস্ত্যবংশের রাক্ষসেরা দুর্যোধনের শত ভ্রাতা রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আর এক পুত্র যুযুৎসু, বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অন্য ভাইদের মতো ছিলেন না। যুধিষ্ঠির ধর্ম, ভীমসেন বায়ু, অর্জুন ইন্দ্র এবং নকুল-সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রের পুত্র বর্চা অভিমন্যু রূপে জন্ম নেন। বর্চার জন্মের সময় চন্দ্র দেবতাদের বলেছিলেন, 'আমি আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে পাঠাতে চাই না, যদিও জানি এই কাজে দ্বিধা করা উচিত নয়। অসুরদের বধ করা তো আমাদেরই কাজ। তাই বর্চা মানুষ রূপে যাবে নিশ্চয়ই কিন্তু বেশি দিন থাকবে না। ইন্দ্রের অংশে নরাবতার অর্জুন জন্মাবেন, যাঁর সঙ্গে নারায়ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুত্ব করবেন। আমার পুত্র অর্জুনের পুত্র রূপে জন্ম নেবে। নর-নারায়ণের অনুপস্থিতিতে আমার পুত্র চক্রব্যূহ ভেদ করবে এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে মহারথীদের ধরাশায়ী করবে। সারাদিন যুদ্ধের পর সন্ধ্যার সময় সে আমার কাছে ফিরে আসবে। এরই পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, সে হবে কুরুকুলের বংশধর। সকল দেবতাই চন্দ্রের কথা মেনে নিলেন। হে জনমেজয় ! তিনিই আপনার পিতামহ অভিমন্যু। অগ্নির অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং রাক্ষসের অংশে শিখণ্ডীর জন্ম। বিশ্বদেবগণ দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীকে এবং শ্রুতসেন রূপে জন্মেছিলেন।

বসুদেবের বাবা ছিলেন শূরসেন। তাঁর এক অপরূপ রূপবতী কন্যা ছিল, পৃথা। শূরসেন অগ্নির সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রথম সন্তানকে তাঁর পিসিমার সন্তানহীন পুত্র কুন্তিভোজের নিকট সমর্পণ করবেন ; পৃথাই ছিলেন শূরসেনের প্রথম সন্তান, তাই তিনি পৃথাকে কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করেন। বালিকাবয়সে, পৃথা যখন কুন্তিভোজের কাছে থাকতেন, তখন তিনি সাধু ও অতিথিদের সেবা-সৎকার করতেন। একবার দুর্বাসা মুনি সেখানে আতিথ্য স্বীকার করেন এবং পৃথার সেবায় জিতেন্দ্রিয় মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তিনি পৃথাকে এক মন্ত্র শিখিয়ে বললেন—'কল্যাণী ! আমি তোমার সেবায় প্রসন্ন হয়েছি। তোমাকে আমি যে মন্ত্র বলে দিলাম, তার সাহায্যে তুমি যে কোনো দেবতাকে আবাহন করতে সক্ষম হবে এবং তাঁর কৃপায় পুত্রলাভ করতে পারবে।' দুর্বাসার কথায় পৃথা অত্যন্ত কৌতূহলী হলেন। তিনি এক নির্জন স্থানে

গিয়ে সূর্যদেবকে আবাহন করেন। সূর্যদেব তাঁর মন্ত্রে সন্তুষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ পৃথার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর গর্ভোৎপাদন করে অদৃশ্য হয়ে যান। সূর্যের প্রভাবে তাঁর ন্যায় তেজস্বী, কবচ-কুণ্ডল পরিহিত এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশুর জন্ম হয়। কলঙ্কের ভয়ে পৃথা সেই শিশুকে সকলের অজ্ঞাতে নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। অধিরথ নদীর জলে ভেসে যাওয়া শিশুপুত্রটিকে উদ্ধার করে তাঁর স্ত্রী রাধার হাতে সমর্পণ করলে, রাধা তাঁকে নিজ পুত্র রূপে পালন করেন। তাঁরা পুত্রটির নাম রাখেন বসুষেণ, ইনিই পরে কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম এবং বেদবেদাঙ্গ জ্ঞাতা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার, সত্যবাদী, পরাক্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি যখন পূজা করতেন, সেই সময় কোনো ব্রাহ্মণ এসে তাঁর কাছে যা চাইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাই দিয়ে দিতেন।

একদিন, কর্ণ যখন পূজা করছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত প্রজা এবং নিজ পুত্র অর্জুনের হিতার্থে ব্রাহ্মণের বেশধারণ করে সেখানে এলেন এবং কর্ণের অঙ্গের কবচ-কুণ্ডল, যা তিনি সঙ্গে নিয়ে জন্মেছিলেন তা চেয়ে নিলেন। কর্ণ তাঁর শরীর থেকে ছিন্ন করে কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রকে প্রদান করেন। তাঁর এই উদারতায় প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্র তাঁকে এক বিশেষ শক্তি দান করে বললেন—'হে অজিত ! তুমি এই শক্তিটি দেবতা, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস অথবা যে কোনো লোকের ওপর প্রয়োগ করবে, সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হবে।' তখন থেকে তিনি বৈকর্তন নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, দুর্যোধনের মন্ত্রী, সখা এবং শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি সূর্যের অংশে উৎপন্ন হয়েছিলেন। দেবাদিদেব সনাতন পুরুষ ভগবান নারায়ণের অংশে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাবলী বলদেব শেষনাগের অংশভূত। সনৎকুমার প্রদ্যুম্ন হয়ে জন্মেছিলেন। যদুবংশে আরও অনেক দেবতা মনুষ্য রূপে জন্মেছিলেন। ইন্দ্রের নির্দেশে অপ্সরাদের অংশে ষোলো হাজার নারীর জন্ম হয়। রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী রূপে লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। দ্রুপদের যজ্ঞকুণ্ড থেকে দ্রৌপদী রূপে ইন্দ্রাণী জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তী ও মাদ্রী রূপে সিদ্ধি ও ধৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা দুজন পাণ্ডবদের মাতা, পৃথাই কুন্তী নামে পরিচিতা। রাজা সুবলের কন্যা মতি গান্ধারী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং রাক্ষসগণ নিজ নিজ অংশে মনুষ্য রূপে জন্ম নিলেন।

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার গান্ধর্ব-বিবাহ

জনমেজয় বললেন—ভগবান ! আপনার শ্রীমুখ থেকে আমি দেবতা, দানবদের অবতার রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত শুনলাম ; এখন আপনি পূর্বের কথা অনুযায়ী কুরুবংশের কথা শুনিয়ে আমায় ধন্য করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পরম প্রতাপশালী রাজা দুষ্যন্ত ছিলেন পুরুবংশের প্রবর্তক। সমুদ্রবেষ্টিত বহু প্রদেশ এবং ম্লেচ্ছাধীন দেশও তাঁর অধীনে ছিল। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে তাঁর প্রজাদের পালন ও শাসন করতেন। তাঁর রাজ্যে বর্ণসংকর ছিল না। চাষ-বাসের জন্য তেমন কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন হত না। সকলেই ধর্মপথে চলত, কেউই পাপকাজ করত না, তাই ধর্ম-অর্থ স্বতই বিরাজ করত। অনাহার-রোগ অথবা চুরির ভয় ছিল না। সকলেই নিজ কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং রাজার আশ্রয়ে নির্ভয়ে বসবাস করে নিষ্কাম-ধর্ম পালন করতেন। সময়মতো ঋতু পরিবর্তন হত, পৃথিবী সর্বপ্রকার রত্ন এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, ছল-কপট বা পাষণ্ডভাব তাঁদের স্পর্শ করতে পারত না। দুষ্যন্ত নিজেও ধার্মিক ও বলশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর এমন শক্তি ছিল যে, গাছপালাসহ মন্দার পর্বতকে তিনি উপড়ে ফেলতে পারতেন। তিনি গদাযুদ্ধের প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, পরিক্ষেপ, অভিক্ষেপ এই চার প্রকার এবং অন্য শস্ত্র বিদ্যাতেও অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ঘোড়া বা হাতির সওয়ারি হিসেবেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি বিষ্ণুর ন্যায় বলবান, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং অক্ষোভ্য ও পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল ছিলেন। নগরবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন এবং রাজাও ধর্মপালন করে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রজাপালন করতেন।

একদিন রাজা দুষ্যন্ত তাঁর চতুরঙ্গ সেনাসহ গভীর জঙ্গলে গিয়েছিলেন। জঙ্গল পার হবার পর তিনি এক মনোহর উপবনে একটি আশ্রম দেখতে পেলেন। সেখানে বৃক্ষরাজি ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। শ্যামল দূর্বাদলে ধরিত্রী মনোহর

রূপ ধারণ করেছিল। পাখিরা মধুর স্বরে গান গেয়ে ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছিল, কোথাও ভ্রমরকুল গুঞ্জন করছিল। সেই উপবনের শোভা দেখতে দেখতে রাজার দৃষ্টিগোচর হল আশ্রমে যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত রয়েছে। ঋষি, যজ্ঞশালা, পুষ্প এবং জলাশয়ে পূর্ণ সেই আশ্রম অত্যন্ত মনোরম লাগছিল। আশ্রমের সামনে মালিনী নদী তার স্বাদু জল নিয়ে বহমানা। মুনি-ঋষিগণ আসনে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেব-পূজায় আত্মমগ্ন। রাজার মনে হচ্ছিল তিনি যেন ব্রহ্মলোকে এসেছেন। তাঁর এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তৃপ্তির আশা মিটছিল না। রাজা এইভাবে সব দেখতে দেখতে কাশ্যপগোত্রীয় ঋষি কণ্বের আশ্রমে মন্ত্রী ও পুরোহিতসহ প্রবেশ করলেন।

দুষ্যন্ত মন্ত্রী ও পুরোহিতকে দ্বারের কাছে রেখে একাই আশ্রমে এলেন। ঋষি কণ্ব সেইসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রাজা সেখানে কাউকে না দেখে উচ্চস্বরে বললেন—'এখানে কে আছেন ?' দুষ্যন্তের গলা শুনে লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী এক কন্যা তপস্বিনীর বেশে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি রাজাকে দেখে সসম্মানে বললেন—'আপনাকে স্বাগত।' তারপর আসন ও পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অতিথি সৎকার করে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। স্বাগত-

সৎকারের পর তপস্বিনী কন্যা মৃদু হাস্যে রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি আপনার কী সেবা করতে পারি !' রাজা দুষ্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দরী, মধুরভাষিণী কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমি পরম ভাগ্যশালী মহর্ষি কণ্বের দর্শনলাভের জন্য এসেছি। কৃপা করে বলুন উনি এখন কোথায় ?' শকুন্তলা উত্তর দিলেন—'পিতা ফল-ফুল আহরণ করতে আশ্রমের বাইরে গেছেন। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, তিনি এসে পড়বেন।' শকুন্তলার অনুপম রূপ-যৌবন দেখে দুষ্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরী, তুমি কে ? কে তোমার পিতা ? তুমি এখানে কেন ? তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ। আমি তোমার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে চাই।' শকুন্তলা মধুর স্বরে বললেন—'আমি মহর্ষি কণ্বের কন্যা।' রাজা বললেন—'কল্যাণী ! বিশ্ববন্দিত মহর্ষি কণ্ব অখণ্ড ব্রহ্মচারী। ধর্ম তাঁর স্থান থেকে বিচলিত হতে পারেন, কিন্তু কণ্ব নন। তাহলে তুমি কী করে তাঁর কন্যা হলে ?' শকুন্তলা বললেন—'মহারাজ ! এক ঋষি প্রশ্ন করায় আমার পূজনীয় পিতা তাঁকে আমার জন্মের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তাতে আমি জেনেছি যে, যখন পরম তেজস্বী বিশ্বামিত্র তপস্যারত ছিলেন, সেইসময় ইন্দ্র তাঁর তপস্যায় বাধাপ্রদানের উদ্দেশ্যে মেনকা নামক এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। তাঁদের মিলনেই আমার জন্ম। মাতা মেনকা আমাকে সেই বনেই ফেলে রেখে যান, তখন শকুন্তেরা (পক্ষীরা) আমাকে সিংহ, ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক পশুর থেকে রক্ষা করে, তাই আমার নাম শকুন্তলা। মহর্ষি কণ্ব আমাকে সেইস্থান থেকে উদ্ধার করে লালন-পালন করেছেন। শরীরের জনক, প্রাণরক্ষক এবং অন্নদাতা—এই তিনজনকেই পিতা বলা হয়। আমি তাই মহর্ষি কণ্বের কন্যা।'

দুষ্যন্ত বললেন—'কল্যাণী ! তুমি যা বললে, তাতে তুমি তো ব্রাহ্মণ কন্যা নও, তুমি রাজকন্যা। অতএব তুমি আমার পত্নী হও ! সুন্দরী ! গান্ধর্ব-রীতিতে তুমি আমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। রাজাদের পক্ষে গান্ধর্ব-বিবাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়।' শকুন্তলা বললেন—'আমার পিতা এখন এখানে নেই, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। উনি এসে আমাকে আপনার হাতে সমর্পণ করবেন।' দুষ্যন্ত বললেন—'আমি তোমাকে চাই এবং এও চাই যে, তুমি নিজেই আমাকে বরণ করো। মানুষ নিজেই তার হিতৈষী এবং জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের অধিকারী। তুমি ধর্ম অনুসারে নিজেই নিজেকে দান করো।' শকুন্তলা বললেন—'রাজন্ ! যদি আপনি একেই ধর্ম-পথ বলে মনে করেন এবং আমার নিজেকে দান করার অধিকার থাকে তাহলে আপনি আমার শর্ত শুনুন। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, 'আমার গর্ভজাত সন্তানই সম্রাট হবে এবং আমার জীবিতকালেই সে যুবরাজ হবে।' তাহলে

আমি আপনাকে বরণ করব।' দুষ্যন্ত আর কিছু চিন্তা না করেই প্রতিজ্ঞা করলেন এবং গান্ধর্ব-রীতিতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করলেন। দুষ্যন্ত তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আনন্দে অতিবাহিত করে তাঁকে আশ্বাস দিলেন—'আমি তোমার জন্য চতুরঙ্গ সেনা পাঠাব এবং অতি শীঘ্র তোমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাব।' এইরূপ বলে রাজা দুষ্যন্ত তাঁর রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। তাঁর মনে অত্যন্ত চিন্তা ছিল মহর্ষি কণ্ব এইসব শুনে না জানি কী করবেন !

কিছুদিন পরে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলেন। কিন্তু শকুন্তলা লজ্জাবশত তাঁর কাছে এলেন না। ত্রিকালদর্শী কণ্ব দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জেনে প্রসন্ন স্বরে শকুন্তলাকে বললেন—'পুত্রি ! তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে গোপনে যে কাজ করেছ, তা ধর্মবিরুদ্ধ নয়। ক্ষত্রিয়ের কাছে গান্ধর্ব-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। দুষ্যন্ত ধর্মাত্মা, উদার এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর ঔরসে তোমার সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র হবে এবং সে সমস্ত পৃথিবীর রাজা হবে। যখন সে শত্রুবিজয়ে যাবে, কেউ তার পথ রোধ করতে পারবে না।' শকুন্তলার অনুরোধে মহর্ষি কণ্ব দুষ্যন্তকে বর দিলেন যে তাঁর বুদ্ধি যেন ধর্মে দৃঢ় থাকে এবং রাজ্য অবিচল থাকে।

—— o ——

ভরতের জন্ম, দুষ্যন্তের ভরতকে স্বীকৃতিদান ও রাজ্যাভিষেক

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যথাসময়ে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। সেই পুত্র অত্যন্ত সুন্দর এবং শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিল। মহর্ষি কণ্ব শাস্ত্রমতে তার জাতি-কর্ম সংস্কার করলেন। সেই শিশুর সুন্দর দাঁত এবং সিংহের ন্যায় বলিষ্ঠ কাঁধ, দুই হাতে চক্র চিহ্ন, ললাট উচ্চ ছিল। তাকে দেখে মনে হত কোনো দেবপুত্র। ছয় বৎসর বয়সেই সে সিংহ, বাঘ, শূকর, হাতিকে এনে আশ্রম বৃক্ষে বেঁধে রাখত। কখনো তাতে উঠে

বসত, কখনো ধমক দিত, কখনো তাদের সঙ্গে খেলা করত। সমস্ত হিংস্র জন্তুকে দমন করত বলে আশ্রমবাসীরা তাঁর নাম রাখলেন সর্বদমন। বালকের অত্যন্ত বিক্রম ছিল, সে ওজস্বী এবং বলবান ছিল। বালকের অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে বললেন—'এখন সে যুবরাজ হওয়ার যোগ্য হয়েছে।' তিনি তখন তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন শকুন্তলাকে পুত্রসহ তার পতিগৃহে রেখে আসার

জন্য। কেন-না কন্যার বেশিদিন পিতৃগৃহে অবস্থান করা কীর্তি, চরিত্র ও ধর্মের ঘাতক হয়। শিষ্যগণ আদেশ অনুসারে শকুন্তলা ও সর্বদমনকে নিয়ে হস্তিনাপুর রওনা হলেন।

পরিচয় আদান-প্রদানের পর শকুন্তলা রাজসভায় গেলেন। কণ্ব ঋষির শিষ্যেরা আশ্রমে ফিরে গেলেন। শকুন্তলা সসম্মানে রাজাকে জানালেন, 'রাজন্ ! এই বালক আপনার পুত্র। আপনি এখন একে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করতে পারেন। এই দেবতুল্য কুমারের সম্পর্কে

আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন।' শকুন্তলার কথা শুনে দুষ্যন্ত বললেন—'ওরে দুষ্ট নারী! তুমি কার স্ত্রী? আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম-অর্থ বা কাম কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই। তোমার যেখানে খুশি তুমি যাও।' দুষ্যন্তের কথা শুনে তপস্বিনী শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ মুখ লজ্জায় দুঃখে লাল হয়ে গেল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তিনি নিশ্চুপ হয়ে দুষ্যন্তের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর দুঃখ ও ক্রোধমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—'মহারাজ! আপনি সব জেনে-শুনেও কেন এমন করছেন, তা আমি জানি না। নীচ ব্যক্তিরাই এমন কাজ করে থাকে। আপনার হৃদয় জানে সত্য কী, আর মিথ্যা কী। আপনি আপনার আত্মার অবমাননা করবেন না। আপনি আপনার হৃদয়ে হাত রেখে দেখুন, সত্য কথা হৃদয়ই জানিয়ে দেবে। আপনি ভীষণ পাপ করছেন। আপনি মনে করছেন বিবাহের সময় আমি একা ছিলাম, আমাদের কোনো সাক্ষী ছিল না। কিন্তু আপনি কি জানেন না পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে আছেন? তিনি সকলের পাপ-পুণ্যের খবর রাখেন। আপনি তাঁর কাছেই পাপ করছেন।' সবার অলক্ষ্যে পাপ করে যদি মনে করা হয় যে কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে তা ঘোর অন্যায়। দেবতা এবং অন্তর্যামী পরমাত্মাও এই সব দেখছেন এবং শুনছেন। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, জল, হৃদয়, যমরাজ, দিন, রাত, সন্ধ্যা, ধর্ম—এঁরা সব মানুষের শুভ-অশুভ কর্মগুলি জানেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা যার ওপরে সন্তুষ্ট থাকেন, যমরাজ স্বয়ং তার পাপনাশ করেন। কিন্তু অন্তর্যামী যার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন না যমরাজ তার পাপের ঘোর দণ্ড দেন। যে ব্যক্তি নিজে তার আত্মার অপমান করে যা কিছু করে বসে, দেবতা কখনো তার সহায়তা করেন না। আমি নিজে আপনার কাছে এসেছি, তাই মনে করে আমার ন্যায় পতিব্রতা রমণীর অপমান করবেন না। আপনি এই জনপূর্ণ সভায় সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আপনার আদরণীয়া পত্নীর অবমাননা করছেন! আমি কি অরণ্যে রোদন করছি? আপনি যদি আমার কথা না শোনেন, তাহলে আপনার মাথা বহু টুকরো হয়ে যাবে। পত্নীর গর্ভে পুত্রের রূপে স্বয়ং পতিই জন্মগ্রহণ করে, তাই বিদ্বানেরা পত্নীকে 'জায়া' বলেন। সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তান পিতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করে, তাই তাকে 'পুত্র' বলা হয়। (পুত্র থেকে স্বর্গ এবং পৌত্র থেকে অনন্ত লাভ হয়। প্রপৌত্র থেকে অনেক পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।)'

'পত্নী তাকেই বলা হয়, যিনি কাজকর্মে বুদ্ধিমান, পুত্রবতী, পতিকে প্রাণের সমান মনে করেন এবং সত্যকার পতিব্রতা। পত্নী পতির অর্ধাঙ্গ, তাঁর শ্রেষ্ঠতম সখা। পত্নীর সাহায্যে ধর্ম-অর্থ-কাম সিদ্ধিলাভ করে এবং মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিতেও পত্নীর সাহায্য লাগে, সুখলাভ হয়, সংসার গড়ে ওঠে এবং লক্ষ্মীলাভ হয়। পত্নীই পতির মধুরভাষী সখা, ধর্মকার্যে পিতা এবং রোগ দুঃখে মাতার ন্যায় সেবা করে। সংসাররূপ ভয়ঙ্কর স্থানে পত্নীই বিশ্রামস্থল। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে স-পত্নীক ব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়া হয়। ঘোর বিপদের সময়ও পত্নীই স্বামীর অনুগমন করে। স্বামীর সুখের জন্য পত্নী সতী হয়ে যায় এবং স্বর্গে গিয়ে স্বামীকে আপ্যায়নে প্রস্তুত থাকে। ইহলোকে এবং পরলোকে পত্নীর ন্যায় সাহায্যকারী আর কেউ নেই। পত্নীর গর্ভে জন্মানো পুত্র দর্পণে দেখা নিজ মুখের সমান। তা দেখে সকলেই আনন্দ লাভ করে। রোগ এবং মানসিক দুঃখে ব্যাকুল ব্যক্তি স্ত্রীকে দেখে শান্তিলাভ করে। তাই ক্রোধান্বিত হলেও পত্নীর অপ্রিয় কাজ করা যায় না। কেন-না, প্রেম, প্রশান্তি এবং ধর্ম তাঁরই অধীন। নিজকুলের উৎপত্তিও তাঁর সাহায্যেই হয়। ঋষিগণেরও এমন শক্তি নেই যে বিনা-পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করেন। ধূলি-ধূসরিত সন্তানকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে যে সুখ, তার থেকে বড় সুখ আর কি হতে পারে? আপনার পুত্র আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার কোলে ওঠার জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আপনি কেন তার অপমান করছেন? পিঁপড়েও তার ডিম্বকোষগুলি পালন ও রক্ষা করে। আপনি কেন আপনার পুত্রের পালন-পোষণ করছেন না! পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করলে যে সুখ পাওয়া যায়, তা কোমল বস্ত্র, পত্নী অথবা শীতল জলের স্পর্শেও পাওয়া যায় না। আমার পুত্র আপনাকে স্পর্শ করুক।

'রাজন্! আমি এই পুত্রকে তিন বৎসর গর্ভে ধারণ করেছি। এ আপনাকে সুখী করবে। এর জন্মের সময় আকাশবাণী হয়েছিল যে, 'এই বালক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে।' জাতকর্মের সময় যে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়, তা আপনি জানেন। পিতা পুত্রকে অভিমন্ত্রিত করে বলেন, 'তুমি আমার সর্বাঙ্গ দ্বারা উৎপাদিত পুত্র। তুমি আমার হৃদয়নিধি। আমারই নাম, পুত্র! তুমি শতবৎসর জীবিত থাক। আমার জীবন এবং পরবর্তী বংশ পরম্পরা তোমার

অধীন হোক। তুমি সুখী থাক ও শতজীবি হও।' এই বালক আপনার অঙ্গ থেকে, আপনার হৃদয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। আপনি কেন এর মধ্যে আপনারই মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন না! আমি মেনকার কন্যা। আমি নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে কোনো পাপ করেছিলাম, যার জন্য শিশুকালেই আমি মায়ের দ্বারা পরিত্যক্তা। এখন আপনিও আমাকে গ্রহণ করছেন না। বেশ, এই যদি আপনার মনের ইচ্ছা, তাহলে আপনি আমাকে ত্যাগ করুন। আমি আমার আশ্রমে চলে যাব। কিন্তু এই বালক আপনার পুত্র। একে আপনি পরিত্যাগ করবেন না।'

দুষ্যন্ত বললেন—'শকুন্তলে! আমার মনে নেই আমি তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিলাম কী না। নারীরা প্রায়শই মিথ্যা বলে থাকে, তোমার কথায় কে বিশ্বাস করবে? তোমার কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোথায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কোথায় অপ্সরা মেনকা আর কোথায় তোমার মতো এক সাধারণ নারী! যাও, এখান থেকে চলে যাও! এই কয়েক বৎসরে কি এমন শালগাছের মতো সন্তান হওয়া সম্ভব? যাও, যাও, এখান থেকে যাও!' শকুন্তলা বললেন—'কপটতা করবেন না। সত্য এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকেও শ্রেষ্ঠ! সমস্ত বেদপাঠ করলে অথবা সমস্ত তীর্থ দর্শন করলেও সত্যের সমকক্ষ হয় না। সত্যের থেকে কোনো ধর্ম বড় নেই। সত্যের থেকে কোনো কিছুই বড় নয়। মিথ্যার থেকে নিন্দনীয় আর কিছু নেই। সত্য স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমাত্মা। সত্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা। আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না। সত্য সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকে। যদি মিথ্যার প্রতি আপনার এত ভালোবাসা এবং আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে আমি নিজেই চলে যাব। মিথ্যার সঙ্গে আমি বাস করতে চাই না। রাজন্! আমি বলে দিলাম আপনি এই বালককে গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার এই পুত্রই সমস্ত পৃথিবী শাসন করবে।' এই কথা বলে শকুন্তলা সেখান থেকে চলে গেলেন।

সেইসময় ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য ও পুরোহিতের সঙ্গে উপবিষ্ট দুষ্যন্তকে সম্বোধন করে আকাশবাণী হল—'মাতা কেবল ধাত্রী সমান হয়ে থাকে। পুত্র পিতারই হয়, কারণ পিতাই পুত্ররূপে জন্ম নেয়। তুমি পুত্রের পালন-পোষণ করো। শকুন্তলাকে অপমান কোরো না। নিজ ঔরসজাত পুত্র যমরাজের কাছ থেকে পিতাকে ছিনিয়ে আনে। তুমি সত্যই এই বালকের পিতা, শকুন্তলার কথা সর্বতোভাবে সত্য। আমার নির্দেশ তোমাকে মানতেই হবে। তুমি ভরণ-পোষণ করবে, তাই এর নাম হবে ভরত।' আকাশবাণী শুনে দুষ্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি পুরোহিত ও মন্ত্রীদের বললেন—'আপনারা নিজে এই দৈববাণী শুনলেন। আমি ঠিকই জানতাম যে, এই আমার পুত্র। আমি যদি শুধু শকুন্তলার কথাতেই একে স্বীকার করে নিতাম, তাহলে সব প্রজাই এটি সন্দেহের চোখে দেখত এবং এর কলঙ্ক দূর হত না। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম।'

তখন রাজা দুষ্যন্ত বালককে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করে নিলেন এবং তার জাতি-সংস্কার করলেন। তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করে তার মস্তক চুম্বন করলেন। চতুর্দিকে আনন্দ ও জয়ধ্বনি হতে লাগল। দুষ্যন্ত ধর্ম অনুসারে পত্নীকে গৃহে স্বাগত জানালেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'দেবী! তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক হয়েছিল, তা কারোরই জানা ছিল না। তোমাকে যাতে সকলেই রানি বলে মেনে নেয়, তার জন্যই আমি তোমার সঙ্গে ওইরূপ দুর্ব্যবহার করেছিলাম। লোকে মনে করত আমি মোহগ্রস্ত হয়ে তোমার কথা মেনে নিয়েছি। সকলে আমার পুত্রকে যুবরাজ বলে মেনে নিত না। আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছিলাম, যার জন্য তুমি প্রণয় কোপবশত আমাকে অনেক অপ্রিয় বাক্য বলেছ, কিন্তু আমি তাতে কিছু মনে করিনি।' এই কথা বলে দুষ্যন্ত তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে বস্ত্র-অলংকার দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

সময়কালে যুবরাজ পদে ভরতের অভিষেক হল। দূর-দূরান্তে ভরতের শাসন চক্র প্রসারিত হল। তিনি বহু রাজ্য জয় করলেন এবং সাধু-সম্মত ধর্মপালন করে মহাযশ লাভ করলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবীর রাজচক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন। ভরত ইন্দ্রের মতো অনেক যজ্ঞ করেছিলেন। মহর্ষি কণ্বও ভরতকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে ভরত সকল ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়েছিলেন, উপরন্তু মহর্ষি কণ্বকেও সহস্র পদ্ম দান করেছিলেন। ভরতের থেকেই এই দেশের নাম হয়েছে ভারত, ভরত এই ভরতবংশের প্রবর্তক। তাঁর বংশে বহু ব্রহ্মচারী রাজর্ষি জন্মেছিলেন। আমি তাঁদের প্রধান কয়েকজন সত্যনিষ্ঠ, শীলবান রাজার কথা বর্ণনা করছি।

———o———

প্রজাপতি দক্ষ থেকে যযাতি পর্যন্ত বংশ-বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এবার আমি ভরত, কুরু, পুরু প্রভৃতি বংশগুলির বর্ণনা করছি। এটি অত্যন্ত পবিত্র এবং কল্যাণপ্রদ। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে উৎপন্ন দক্ষ প্রজাপতিই প্রাচেতস দক্ষ। তাঁর থেকেই সমস্ত প্রজাকুল উৎপন্ন হয়েছে। প্রথমে তিনি তাঁর পত্নী বীরণীর গর্ভে এক সহস্র পুত্রের জন্ম দেন। নারদ মুনি তাঁকে মোক্ষ জ্ঞান প্রদান করে সংসার বিরাগী করে তোলেন। তখন তাঁর পঞ্চাশটি কন্যা জন্ম নেয়। তিনি তাঁদের প্রথম পুত্রকে নিজে রাখবেন এই শর্তে বিবাহ দেন। আগেই বলা হয়েছে যে, কশ্যপের সঙ্গে তাঁর তেরোটি কন্যার বিবাহ হয়। কশ্যপের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্নী অদিতির গর্ভে ইন্দ্র ও বিবস্বান প্রমুখের জন্ম হয়। বিবস্বানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনু এবং কনিষ্ঠ যমরাজ। মনু অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। তাঁর থেকেই মানবজাতির উৎপত্তি এবং সূর্যবংশ মনুবংশ নামেই কথিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি সকলকেই মানব বলা হয়। ব্রাহ্মণগণ সাঙ্গ বেদ ধারণ করেন। মনুর দশ পুত্র ছিল—বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্যাতি, ইলা, পৃষধ্র এবং নাভাগারিষ্ট। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব করে শেষ হয়ে যায়। ইলার পুত্র পুরুরবা। ইলা তাঁর মা ও বাবা উভয়ই ছিলেন। পুরুরবা সমুদ্রের তেরোটি দ্বীপের শাসক ছিলেন। তিনি মানুষ হলেও অমানুষিক ভোগবিলাসী ছিলেন। তিনি নিজ বলে উন্মত্ত হয়ে বহু ব্রাহ্মণদের ধন-রত্ন অপহরণ করেছিলেন। ব্রহ্মলোক থেকে এসে সনৎকুমার তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে পুরুরবার কোনোই পরিবর্তন হয়নি। ঋষিগণ তখন ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন এবং তাঁর বিনাশ হয়। এই পুরুরবাই স্বর্গ থেকে তিনপ্রকার অগ্নি এবং অপ্সরাকে এনেছিলেন। উর্বশীর গর্ভে তাঁর ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে—আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, শতায়ু। আয়ুর পত্নী ছিলেন স্বর্ভানবী। তাঁর পাঁচ পুত্র—নহুষ, বৃদ্ধশর্মা, রজি, গয় এবং অনেনা।

আয়ুর পুত্র নহুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বড় বীর ছিলেন। তিনি ধর্ম অনুসারে তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর রাজ্যে সকলেই সুখী ছিলেন, চোর ডাকাতের ভয় ছিল না। তিনি অহংকারবশত ঋষিদের তাঁর পালকি বহনের কাজে নিযুক্ত করেন। সেটিই তাঁর বিনাশের কারণ হয়। তিনি তেজ, তপস্যা এবং বল-বিক্রমের সাহায্যে দেবতাদের পরাজিত করে ইন্দ্র হয়েছিলেন। নহুষের ছয় পুত্র—যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি এবং ধ্রুব। যতি যোগ-সাধনা করে ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়েছিলেন। তাই নহুষের দ্বিতীয় পুত্র যযাতি রাজা হয়েছিলেন। তিনি অনেক যজ্ঞ করেছিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তিসহকারে দেবতা এবং পিতৃপুরুষের আরাধনা করে প্রসন্নভাবে প্রজাপালন করেন। তাঁর দুই পত্নী ছিলেন—দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মায়—যদু ও তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র—দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু।

———o———

কচ ও দেবযানীর কাহিনী

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! আমাদের পূর্বপুরুষ যযাতি ব্রহ্মা থেকে দশম পুরুষ ছিলেন[1]। তিনি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে কী করে বিবাহ করলেন, তিনি তো ব্রাহ্মণী ছিলেন ! এই ঘটনা কীভাবে ঘটল ? আপনি আমাকে তা বিস্তারিতভাবে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! আপনার পূর্বপুরুষ রাজা যযাতি শুক্রাচার্য এবং বৃষপর্বার কন্যাদের কী করে বিবাহ করলেন, তা শ্রবণ করুন। সেই সময় দেবতা এবং অসুরগণ ত্রিলোকের অধিকার পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছিলেন। দেবতারা বিজয়লাভের জন্য আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে এবং অসুরেরা ভার্গব শুক্রকে নিজ নিজ গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণও নিজেদের মধ্যে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতেন। যুদ্ধে যখন দেবতারা অসুরদের বধ করেছিলেন, তখন শুক্রাচার্য

[1]ব্রহ্মা থেকে দক্ষ, দক্ষ থেকে অদিতি, অদিতি থেকে সূর্য, সূর্য থেকে মনু, মনু হতে ইলা নামক কন্যা, ইলার থেকে পুরুরবা, পুরুরবা থেকে আয়ু, আয়ু হতে নহুষ এবং নহুষ থেকে যযাতি—এইভাবে যযাতি প্রজাপতি থেকে দশম পুরুষ।

তাঁর বিদ্যার সাহায্যে তাঁদের জীবিত করেছিলেন। কিন্তু অসুরেরা যে দেবতাদের মেরে ফেলেছিলেন, তাঁদের বৃহস্পতি জীবিত করতে পারেননি। কারণ শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্র জানতেন, বৃহস্পতি জানতেন না। এতে দেবতাগণ খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁরা ভয় পেয়ে বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের কাছে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'ভগবান ! আমরা আপনার শরণাগত।

আপনি আমাদের সাহায্য করুন। অমিত তেজস্বী বিপ্রবর শুক্রাচার্য যে সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, আপনি সেই বিদ্যা শীঘ্রই আয়ত্ত করুন ; আমরা আপনাকে যজ্ঞের ভাগীদার করে নেব।' শুক্রাচার্য তখন বৃষপর্বার নিকটে ছিলেন। দেবতাদের অনুরোধে কচ শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে আবেদন করলেন—'আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র এবং দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ। আপনি আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন, আমি সহস্র বৎসর আপনার কাছে থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করব। আপনি আমাকে স্বীকার করুন।' শুক্রাচার্য বললেন—'স্বাগত পুত্র ! আমি তোমার আবেদন স্বীকার করছি। তুমি আমার পূজনীয়। আমি তোমার সৎকার করব, কেন-না তোমাকে সৎকার করলে দেবগুরু বৃহস্পতিকেই সৎকার করা হবে বলে আমি মনে করি।'

কচ শুক্রাচার্যের নির্দেশানুসারে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করলেন। তিনি গুরুকে তো প্রসন্ন রাখতেনই সঙ্গে গুরুকন্যা দেবযানীকেও খুশি রাখতেন। পাঁচশত বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর দানবেরা কচের অভিপ্রায় জানতে পারল। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে গোচারণের সময় বৃহস্পতির ওপর দ্বেষবশত এবং সঞ্জীবনী বিদ্যা রক্ষার অভিপ্রায়ে কচকে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং নেকড়ে বাঘকে খাইয়ে দিল। গোরু-বলদেরা রক্ষকহীন অবস্থাতেই আশ্রমে ফিরে এল। দেবযানী দেখলেন গো-বলদ এলেও, কচ ফিরলেন না। তখন তিনি পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন—'পিতা ! আপনি সন্ধ্যা-পূজা সমাপন করেছেন, সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, গো-বলদ আশ্রমে ফিরে এসেছে কিন্তু কচ কোথায়, সে তো আসেনি ? তাকে নিশ্চয়ই কেউ হত্যা করেছে বা সে নিজেই মারা গেছে। পিতা ! আমি আপনার কাছে শপথ করে বলছি আমি কচকে ছাড়া বাঁচব না।' শুক্রাচার্য বললেন, 'তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি এখনই ওকে জীবিত করে দেব।' শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে ডাকলেন—'পুত্র, এসো।' কচের শরীরের এক একটি অংশ শৃগাল ও নেকড়ের শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে এলো এবং কচ জীবিত হয়ে শুক্রাচার্যের সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। দেবযানী জিজ্ঞাসা করায় কচ তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। এইভাবে অসুরেরা কচকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার পরও শুক্রাচার্য কচকে পুনরায় জীবন দান করেন।

তৃতীয় বার অসুরেরা অন্য এক নতুন উপায় বার করল। তারা কচকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে সেই ভস্ম সুরাতে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে পান করাল। দেবযানী পিতার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতা ! কচ যে ফুল আনতে গিয়েছিল, এখনও ফিরে আসেনি। তাকে আবার হত্যা করা হয়নি তো ? তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।' শুক্রাচার্য বললেন—'মা, আমি কি করি বল ? অসুরেরা বার বার তাকে মেরে ফেলছে।' দেবযানী অনুনয় করায় তিনি পুনরায় সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে ডাকলেন। কচ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শুক্রাচার্যের পেটের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে তাঁর অবস্থান জানালেন। শুক্রাচার্য তাঁকে বললেন—'পুত্র ! তোমার সিদ্ধিলাভ হোক। দেবযানী তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। তুমি ইন্দ্র নও, ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করছি, তুমি গ্রহণ করো এবং আমার পেট থেকে বেরিয়ে এসো। তুমি আমার পেটের মধ্যে আছ, তাই তুমি আমার

পুত্রের মতো। সুযোগ্য পুত্রের মতোই তুমি বেরিয়ে এসে সঞ্জীবনী মন্ত্রের সাহায্যে আমাকে পুনরায় জীবিত করে দিও।' কচ শুক্রাচার্যের নির্দেশ মতো পেট থেকে বেরিয়ে এলেন এবং শুক্রাচার্যকে জীবিত করলেন। কচ শুক্রাচার্যকে প্রণাম করে বললেন—'যিনি আমাকে সঞ্জীবনী বিদ্যারূপ অমৃতধারা প্রদান করেছেন, তিনিই আমার মাতা-পিতা। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কখনো আপনার সঙ্গে অকৃতজ্ঞতার কাজ করব না। যে ব্যক্তি বেদস্বরূপ উত্তম জ্ঞানদাতা গুরুর সম্মান করে না, সে কলঙ্কভাগী হয় এবং নরকে গমন করে।'

শুক্রাচার্য যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে ছলনা করে কচের ভস্ম-সহ সুরা পান করানো হয়েছিল, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ঘোষণা করলেন—'এখন থেকে জগতে কোনো ব্রাহ্মণ যদি সুরা পান করেন, তাহলে তিনি ধর্মভ্রষ্ট হবেন এবং তাঁর ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে। ইহলোকে সে কলঙ্কিত তো হবেই, পরলোকেও কিছু পাবে না। হে ব্রাহ্মণ, দেবগণ এবং মনুর সন্তান ! সতর্ক হয়ে শোনো, আজ থেকে আমি ব্রাহ্মণদের ধর্ম এবং মর্যাদা সুনিশ্চিত করে দিলাম।' কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করে সহস্র বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিলেন। সময় পূর্ণ হলে শুক্রাচার্য তাঁকে স্বর্গে যাবার আদেশ দেন।

কচ যখন সেখান থেকে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত তখন দেবযানী কচকে বললেন—'ঋষিকুমার ! তুমি সদাচার, কৌলিন্য, বিদ্যা, তপস্যা এবং জিতেন্দ্রিয়তার উজ্জ্বল আদর্শ। আমি তোমার পিতাকে নিজের পিতার মতো মান্য করেছি। গুরু-গৃহে থাকাকালীন তোমার সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করেছি তা বলার প্রয়োজন নেই। এখন তুমি স্নাতক হয়েছো ; আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার সেবিকা। তুমি আমাকে বিধিসম্মতভাবে বিবাহ করো।' কচ বললেন—'ভগিনী ! ভগবান শুক্রাচার্য তোমার মতো আমারও পিতা। তুমি আমার পূজনীয়া। যে গুরুদেবের শরীর থেকে তোমার জন্ম, তাঁর শরীরে আমিও বাস করেছি। ধর্ম অনুসারে তুমি আমার ভগ্নী। আমি তোমার স্নেহপূর্ণ ছত্রছায়ায় অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ছিলাম। আমাকে গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি দাও ও আশীর্বাদ করো। মাঝে মাঝে আমার কথা স্মরণ কোরো এবং সাবধানে আমার গুরুদেবের সেবা কোরো।' দেবযানী বললেন—'কচ আমি তোমার কাছে প্রেম-ভিক্ষা করেছিলাম। তুমি যদি ধর্ম এবং কামসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাকে অস্বীকার করো তাহলে তোমার এই সঞ্জীবনী বিদ্যা সিদ্ধ হবে না।' কচ বললেন—'ভগ্নী ! আমি গুরুকন্যা বলেই তোমাকে অস্বীকার করেছি, কোনো দোষের জন্য নয়। গুরুদেবও আমাকে তেমন কোনো নির্দেশ দেননি। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে অভিশাপ দাও। আমি তোমাকে ঋষিধর্মের কথাই বলেছি। আমি তোমার শাপের যোগ্য নই।' তবুও দেবযানী কচকে শাপ দেওয়ায় কচ বললেন, 'তুমি ধর্ম অনুসারে নয়, কামবশত শাপ দিয়েছ ; তোমার কামনা কখনো পূর্ণ হবে না। কোনো ব্রাহ্মণকুমার তোমার পাণিগ্রহণ করবেন না। আমার বিদ্যা সফল না হলে কী হবে, আমি যাকে শেখাব, তার বিদ্যা তো সফল হবে !' এই কথা বলে কচ স্বর্গে চলে গেলেন। দেবতাগণ তাঁদের গুরু বৃহস্পতি এবং তাঁর পুত্র কচকে অভিনন্দন জানালেন, কচকে যজ্ঞের হোতা করলেন এবং যশস্বী হবার বর দিলেন।

—o—

দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কলহ এবং তার পরিণাম

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কচ সঞ্জীবনী বিদ্যায় সিদ্ধ হওয়ায় দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা কচের কাছে সেই শিক্ষা নেওয়ায় তাঁদের সুবিধা হল। দেবতারা এবার একত্রিত হয়ে ইন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন অসুরদের আক্রমণ করার জন্য। ইন্দ্র আক্রমণ করলেন। পথে এক উপবন ছিল, সেই উপবনে বহু নারী সরোবরের জলে স্নান করছিলেন। ইন্দ্র বায়ুরূপে সরোবরের তীরে রাখা সকল বস্ত্র এক জায়গাতে নিয়ে মিশিয়ে রাখলেন। কন্যা ও নারীগণ যখন স্নান করে উঠলেন, তখন অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ভ্রমবশত তাঁদের গুরুকন্যা দেবযানীর পোশাক পরিধান করেন। বস্ত্রগুলি যে মিশে গেছে শর্মিষ্ঠা তা বুঝতে পারেননি। দেবযানী খুব রেগে গেলেন, তিনি বললেন—'এক, তুমি অসুর কন্যা, তার ওপর তুমি আমার শিষ্যা। তুমি আমার পোশাক পরলে

কোন সাহসে ? তুমি আচারভ্রষ্ট হয়েছ, এর ফল অত্যন্ত খারাপ হবে।' শর্মিষ্ঠাও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'বাঃ, তোমার বাবাও সর্বদা আমার পিতাকে সমীহ করে চলেন ; সিংহাসনের নীচে দাঁড়িয়ে স্তুতি করে থাকেন, তোমার এত অহংকার !' দেবযানী প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে শর্মিষ্ঠার পোশাক ধরে টানতে লাগলেন। তাইতে নির্বোধ শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে ধাক্কা

দিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নগরে ফিরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর রাজা যযাতি শিকার করতে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে জলপান করার জন্য কুয়োটির কাছে গেলেন। কুয়োতে জল ছিল না। যযাতি দেখলেন এক সুন্দরী নারী কুয়োতে পড়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরী, তুমি কে ? কুয়োতে কীভাবে পড়লে ?' দেবযানী উত্তর দিলেন—'আমি মহর্ষি শুক্রাচার্যের কন্যা। দেবতারা যখন অসুরদের বধ করেন, তখন আমার পিতা সঞ্জীবনী মন্ত্রের সাহায্যে তাদের জীবন দান করেন। আমি যে এই বিপদে পড়েছি, তা উনি জানেন না। আপনি আমার দক্ষিণ বাহু ধরে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন। আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি কুলীন, শান্ত, বলশালী এবং যশস্বী। আপনার কর্তব্য হল আমাকে এই কুয়ো থেকে বাইরে আনা।' ব্রাহ্মণ কন্যা জেনে যযাতি তাঁকে কুয়ো থেকে তুলে আনলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

এদিকে দেবযানী শোকে অধীর হয়ে নগরের নিকটে এলেন এবং তাঁর দাসীকে বললেন—'শোন দাসী ! তুমি শীঘ্র আমার পিতার কাছে যাও এবং তাঁকে বল যে, আমি বৃষপর্বার নগরে আর যাব না।' দাসী শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে শর্মিষ্ঠাঘটিত সমস্ত কথা জানালো। দেবযানীর দুর্দশার কথা শুনে শুক্রাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি কন্যার কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন—'মা ! সকলকেই তার নিজ নিজ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। মনে হয় তুমিও কিছু অনুচিত কর্ম করেছ, যার জন্য তোমাকে এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।' দেবযানী বললেন—'পিতা, এটি প্রায়শ্চিত্ত হোক বা না হোক আমাকে একটা কথা বলুন, বৃষপর্বার কন্যা ক্রোধে রক্তচক্ষু করে রুক্ষ স্বরে আমায় যে বলল—'তোর বাপ আমাদের স্তুতি করে, ভিক্ষা চায়, প্রতিগ্রহ নেয়। তার কথা কি ঠিক ? যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি এখনি শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে তাকে সন্তুষ্ট করব।' শুক্রাচার্য বললেন, 'মা, তুমি স্তাবক, ভিখারি বা দান গ্রহণকারীর কন্যা নও। তুমি এই পবিত্র ব্রাহ্মণের কন্যা, যে কখনো কারো স্তুতি করে না, বরং সকলেই তাকে স্তুতি করে। বৃষপর্বা, ইন্দ্র এবং রাজা যযাতি এসব কথা জানেন। অচিন্ত্যনীয় ব্রাহ্মণত্ব এবং নির্দ্বন্দ্ব ঐশ্বর্যই আমার বল। ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে আমাকে এই বল দিয়েছেন। ভূলোক এবং স্বর্গলোকে যা কিছু আছে আমি সব কিছুরই স্বামী। আমিই প্রজাহিতের উদ্দেশ্যে বর্ষার সৃষ্টি করি এবং আমিই বৃক্ষাদির পোষণ করি। আমি এই সত্য কথা বলছি।'

তারপরে শুক্রাচার্য দেবযানীকে বোঝাতে লাগলেন — 'যে ব্যক্তি নিজের নিন্দা শুনে বিচলিত হয় না, সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজয়ী হয় জেনো। যে জ্বলন্ত ক্রোধকে ঘোড়ার মতো বশ করে, সেই সত্যকার সারথি। যে ব্যক্তি ক্রোধকে ক্ষমার দ্বারা শান্ত করে, সেই সত্যকার পুরুষ। যে ক্রোধকে দাবিয়ে রেখে নিন্দা সহ্য করে এবং অন্যে বিরক্ত করলেও দুঃখিত হয় না, সে সব পুরুষার্থের অধিকারী হয়। একজন ব্যক্তি যদি শতবৎসরব্যাপী যজ্ঞ করেন এবং অন্যজন কোনো কিছুতে ক্রোধ না করেন, তাহলে এদের মধ্যে যিনি ক্রোধ করেন না তিনিই শ্রেষ্ঠ। অবোধ বালকেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, তাদের এইরূপ করা উচিত নয়।' দেবযানী বললেন, 'আমার জ্ঞান যত কমই হোক তবুও ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য বুঝি। ক্ষমা এবং নিন্দার সবলতা ও দুর্বলতা আমার জানা আছে। হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুর শিষ্যের ধৃষ্টতা ক্ষমা করা উচিত নয়। আমি এই ক্ষুদ্র বিচার সম্পন্নদের সঙ্গে সেইজন্য আর থাকতে রাজি নই। যারা কারো সদাচার ও কৌলিন্যের নিন্দা করে, আমি তাদের মধ্যে বাস করতে রাজি নই। সেখানেই থাকা উচিত যেখানে সদাচার ও কৌলিন্যের প্রশংসা হয়।'

দেবযানীর কথা শুনে কোনো কিছু বিচার বিবেচনা না করে শুক্রাচার্য বৃষপর্বার সভাস্থলে গেলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন—'রাজন্ যে অধর্ম করে, সে যদি তৎক্ষণাৎ তার ফল নাও পায়, পরে তাকে তার ফল ভুগতেই হয়। একে তো তোমরা সেবাপরায়ণ বৃহস্পতির পুত্র কচকে বধ করেছ, তারপরে আমার কন্যাকেও বধ করার চেষ্টা করেছ। আমি আর এই দেশে থাকতে পারব না। আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি হয়ত ভাবছ যে আমি বৃথাই এই সব বলছি, তাই অপরাধ করা বন্ধ না করে তুমি ক্রমশ অবজ্ঞাই করে চলেছ।' বৃষপর্বা বললেন, 'ভগবান ! আমি কখনো আপনাকে মিথ্যাবদী বা অধার্মিক বলে মনে করিনি। আপনাতে সত্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করে যান, তাহলে আমি সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন দেব। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।' শুক্রাচার্য বললেন—'দেখো রাজা ! তুমি সমুদ্রে ডুবে মরো অথবা দেশান্তরী হও, আমি আমার প্রিয় কন্যার অপমান সহ্য করতে পারব না। আমার কন্যাই আমার প্রাণ। তুমি যদি ভালো চাও তাহলে ওকে প্রসন্ন করো।'

বৃষপর্বা দেবযানীর কাছে গিয়ে বললেন—'দেবী ! তুমি

প্রসন্ন হও, তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব।' দেবযানী বললেন—'এক হাজার দাসীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠা আমার সেবা করবে। আমি যেখানে যাব, সেখানেই সে যেন আমার অনুগমন করে।' বৃষপর্বা শর্মিষ্ঠার কাছে এই খবর পাঠালেন। সংবাদদাত্রী গিয়ে জানাল বৃষপর্বা বলে পাঠিয়েছেন—'কল্যাণী ! এসো, নিজের জাতির কল্যাণ করো। শুক্রাচার্য তাঁর শিষ্যদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তুমি এসে দেবযানীর মনোবাসনা পূর্ণ করো।' শর্মিষ্ঠা বললেন—'ঠিক আছে, আমি রাজি। আচার্য এবং দেবযানী এখান থেকে যেন চলে না যান, আমি ওঁদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করব।' শর্মিষ্ঠা দাসীর বেশে দেবযানীর কাছে গিয়ে বললেন—'আমি এখানে এবং তোমার শ্বশুরালয়ে গিয়েও তোমার সেবা করব।' দেবযানী বললেন—'কেন, আমি তো তোমার পিতার ভিক্ষা প্রত্যাশী, স্তাবক এবং প্রতিগ্রহ গ্রহণকারীর কন্যা আর তুমি রাজকন্যা ; এখন আমার দাসী হয়ে থাকবে কী করে ?' শর্মিষ্ঠা বললেন—'আমি আমার বিপদগ্রস্ত জাতির কথা ভেবেই তোমার দাসী হতে রাজি হয়েছি। বিবাহের পরেও আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার সেবা করব।' তখন দেবযানী সন্তুষ্ট হয়ে পিতার সঙ্গে নিজেদের আশ্রমে ফিরে এলেন।

—o—

যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ, শুক্রাচার্যের অভিশাপ এবং পুরুর যৌবনদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একদিন দেবযানী তাঁর দাসীগণ এবং শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সেই উপবনে ক্রীড়ার জন্য গেলেন। তাঁরা যখন বিহার করছিলেন তখন নহুষনন্দন রাজা যযাতি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি খুব পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত ছিলেন। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা এবং দাসীদের সেখানে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাসী-পরিবৃত হয়ে আপনারা দুজন কে ?' দেবযানী উত্তর দিলেন—'আমি দৈত্যগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের কন্যা, আর এ হল আমার সখী-দাসী, দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা, আমার

সেবার জন্য সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকে ; নাম শর্মিষ্ঠা। আমি আমার সব দাসী ও শর্মিষ্ঠা-সহ আপনাকে বরণ করছি, আপনাকে আমি সখা ও স্বামীরূপে স্বীকার করছি। আপনিও আমাকে স্বীকার করুন। আপনার কল্যাণ হোক।' যযাতি বললেন—'শুক্রনন্দিনী, তোমার কল্যাণ হোক, কিন্তু আমি তোমার যোগ্য নই। তোমার পিতা কোনো ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন না।' দেবযানী বললেন—'রাজন্ ! আপনার আগে কেউ আমার হাত ধরেনি। কুয়ো থেকে তোলার সময় আপনি আমার হাত ধরেছিলেন। সেইজন্য আমি আপনাকে স্বামীরূপে বরণ করেছি। এখন আমি আর কী করে অন্য পুরুষের হাত স্পর্শ করব ?' যযাতি বললেন—'কল্যাণী ! যতক্ষণ না তোমার পিতা তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করেন, আমি কী করে তোমাকে স্বীকার করব ?'

দেবযানী তখন তাঁর ধাত্রীকে পিতার নিকট পাঠালেন। তার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে শুক্রাচার্য রাজা যযাতির কাছে এলেন। যযাতি শুক্রাচার্যকে প্রণাম করে হাতজোড় করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। দেবযানী বললেন—'পিতা ! ইনি নহুষনন্দন রাজা যযাতি। আমি যখন কুয়োতে পড়েছিলাম, তখন ইনিই আমার হাত ধরে টেনে তুলেছিলেন। আমি আপনার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, এঁর সঙ্গে আপনি আমার বিবাহ দিন। আমি এঁকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতে পারব না।' দেবযানীর কথা শুনে শুক্রাচার্য যযাতিকে বললেন—'রাজন্ ! আমার আদরের কন্যা

তোমাকে পতিরূপে বরণ করেছে। আমি কন্যাদান করছি, তুমি একে পাটরানি রূপে স্বীকার করো।' যযাতি বললেন, 'মহর্ষি ! আমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করলে আমার বর্ণসংকর দোষ লাগবে। আপনি কৃপা করে আমাকে এমন বর দিন যাতে এই মহাদোষ আমাকে স্পর্শ

না করে।' শুক্রাচার্য বললেন, 'তুমি এই সম্বন্ধ স্বীকার করে নাও, কোনো চিন্তা কোরো না। আমি তোমার পাপ নাশ করে দিচ্ছি। তুমি আমার কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করে ধর্মপালন করো এবং সুখভোগ করো। পুত্র, বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাও তোমার সঙ্গে যাবে কিন্তু তুমি কখনো তাকে শয্যাসঙ্গিনী করো না।' তারপর শাস্ত্র বিধিমতে দেবযানীর সঙ্গে যযাতির বিবাহ সুসম্পন্ন হল। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা এবং দাসীদের নিয়ে যযাতি রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

যযাতির রাজধানী অমরাবতীর মতো সুদৃশ্য ছিল। রাজধানীতে এসে রাজা যযাতি দেবযানীকে রাজ-অন্তঃপুরে অধিষ্ঠিত করলেন এবং তাঁর সম্মতি নিয়ে অশোকবাটিকার কাছে শর্মিষ্ঠা এবং দাসীদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করে তাদের অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থা করে দিলেন। রাজকার্য করতে করতে অনেক বছর পার হয়ে গেল। সময়মতোই দেবযানীর গর্ভে পুত্র জন্ম নিল। একবার রাজা দৈবক্রমে অশোকবাটিকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে শর্মিষ্ঠাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাজাকে একান্তে দেখে শর্মিষ্ঠা তাঁর কাছে এসে হাতজোড় করে বললেন—'চন্দ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম এবং বরুণের মহলে যেমন কোনো নারী সুরক্ষিত থাকে, এখানে আমিও তেমনই সুরক্ষিত। এখানে আমার প্রতি কেউই কুদৃষ্টি দিতে পারবে না। আপনি তো আমার রূপ, কুল, শীল সবই জানেন। এখন আমার ঋতুর সময়, আমি আপনার কাছে ঋতুর সফলতার জন্য অনুরোধ করছি, আপনি আমার এই প্রার্থনা স্বীকার করুন।' রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার অনুরোধের ঔচিত্য ভেবে দেখলেন এবং পরে তাঁর প্রার্থনা মেনে নিলেন।

দেবযানীর গর্ভে রাজা যযাতির দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—যদু এবং তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র জন্মায়—দ্রুহ্যু, অনু, এবং পুরু। এইভাবে বহু বছর কেটে গেল। একদিন দেবযানী রাজা যযাতির সঙ্গে অশোক-বাটিকায় গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন দেবশিশুর ন্যায় তিনটি বালক খেলা করছে। দেবযানী আশ্চর্যান্বিত হয়ে যযাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর্যপুত্র, এই সুন্দর বালকগুলি কার ? এদের সৌন্দর্য আপনার মতোই লাগছে।' পরে তিনি বালকগুলিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাদের নাম কি ? কোন বংশের সন্তান ? তোমাদের পিতা-মাতা কে ?' বালকেরা রাজার দিকে আঙুল তুলে দেখাল এবং বলল—'শর্মিষ্ঠা আমাদের মা।' তারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রাজার কাছে দৌড়ে গেল কিন্তু দেবযানী সঙ্গে থাকায় রাজা তাদের কোলে তুলে নিলেন না। দেবযানী অত্যন্ত

বিমর্ষ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শর্মিষ্ঠার কাছে গেলেন। রাজা একটু লজ্জা পেলেন। দেবযানী সমস্ত কিছু বুঝতে পারলেন; তিনি শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে বললেন—'শর্মিষ্ঠা ! তুমি আমার দাসী। আমার অপ্রিয় কাজ তুমি কেন করলে ? তোমার আসুরি স্বভাব গেল না ? তুমি আমাকে ভয় করো না ?' শর্মিষ্ঠা বললেন—'মধুরহাসিনী ! আমি রাজর্ষির সঙ্গে যে সমাগম করেছি, তা ধর্ম ও ন্যায় অনুসারেই। তাহলে আমি কেন ভয় পাব ? তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও রাজাকে নিজের স্বামী বলে মেনে নিয়েছি। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা বলে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও রাজর্ষি তোমার থেকে আমারই অধিক প্রিয়।' দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বলতে লাগলেন—'আপনি আমার অপ্রিয় কাজ করেছেন। আমি আর এখানে থাকব না।' তিনি সাশ্রুলোচনে পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। যযাতি দুঃখিত হলেন এবং ভয়ও পেলেন। তিনি দেবযানীর সঙ্গে বোঝাতে বোঝাতে চললেন। কিন্তু দেবযানী তাতে কর্ণপাতও করলেন না। দুজনে শুক্রাচার্যের কাছে পৌঁছলেন।

পিতাকে প্রণাম করে দেবযানী বললেন—'পিতা ! অধর্ম ধর্মকে জয় করেছে, অধর্ম উচ্চাসনে আরোহণ করেছে। শর্মিষ্ঠা আমার থেকে এগিয়ে গেছে। এই রাজার

ঔরসে শর্মিষ্ঠার তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। এই রাজা ধর্মজ্ঞ হয়ে ধর্ম-মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করেছেন। আপনি এর বিচার করুন।' শুক্রাচার্য বললেন—'রাজন্ ! তুমি জেনে শুনে ধর্ম-মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করেছ, তাই আমি তোমাকে শাপ দিচ্ছি, তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাও।' শুক্রাচার্য শাপ দিতেই যযাতি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তখন তিনি শুক্রাচার্যের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—'আমি এখনও আপনার কন্যা দেবযানীর সঙ্গলাভে তৃপ্ত হইনি। আপনি আমাদের দুজনকে

কৃপা করুন আমি যেন বৃদ্ধ হয়ে না যাই।' আচার্য বললেন—'ভগবানের কথা মিথ্যা হবে না। তবে তুমি অন্য কাউকে তোমার বৃদ্ধত্ব দিয়ে দিতে পারো।' যযাতি বললেন—'ভগবান ! আপনি আদেশ দিন যাতে যে পুত্র আমাকে তার যৌবন দিয়ে বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করবে, সেই আমার রাজ্য, পুণ্য এবং যশের ভাগীদার হবে।' আচার্য বললেন—'ঠিক আছে। শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে স্মরণ করলে তোমার বৃদ্ধত্ব অন্য কারো ওপর বর্তাবে এবং যে পুত্র তোমাকে তার যৌবন দেবে, সে রাজা, যশস্বী এবং আয়ুষ্মান হয়ে তোমার কুলের মুখোজ্জ্বল করবে।'

রাজা যযাতি রাজধানীতে ফিরে এসে প্রথমেই যদুকে ডেকে বললেন—'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। সারা দেহে বলিরেখা দেখা দিয়েছে। চুল সাদা হয়ে গেছে কিন্তু আমার ভোগবাসনার আকাঙ্ক্ষা এখনও মেটেনি। তুমি আমার বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করো এবং তোমার যৌবন আমাকে দাও। এক হাজার বৎসর পূর্ণ হলে আমি তোমাকে তোমার যৌবন ফিরিয়ে দেব।' যদু বললেন—'বৃদ্ধত্বর নানাপ্রকার অসুবিধা থাকে। তখন ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করা যায় না। শরীর দুর্বল হয়ে যায়, চুল সাদা হয়ে যায়, সারা দেহে কুঞ্চন দেখা দেয়। কোনো শক্তি বা আনন্দ থাকে না। যুবক-যুবতীরা অবহেলা করে। তাই আমি আপনার বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করতে অক্ষম।' যযাতি বললেন—'পুত্র ! আমার দ্বারাই তোমার জন্ম হয়েছে, তা সত্ত্বেও তুমি তোমার যৌবন আমাকে দিলে না ! যাও, তোমার পুত্র এই রাজ্যলাভের অধিকারী হবে না।' তারপর তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুকে ডেকেও সেই এক কথাই বললেন, কিন্তু সে-ও বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। যযাতি তাকেও অভিশাপ দিয়ে বললেন—'তোমার বংশ থাকবে না। তুমি মাংসাহারী, দুরাচারী এবং বর্ণসংকর ম্লেচ্ছদের রাজা হবে।' দেবযানীর দুই পুত্রকে শাপ দিয়ে তিনি এবার শর্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্রুহ্যকে ডাকলেন এবং তাকেও তাঁর বৃদ্ধত্ব নিয়ে যৌবন দিতে বললেন। দ্রুহ্য বললেন—'বৃদ্ধের হাতি, ঘোড়া, রথ অথবা যুবতী কোনো কিছুতেই সুখ হয় না। আমি বৃদ্ধ হতে চাই না।' যযাতি বললেন— 'তুমি পিতাকে এই সব কথা বলছ ? তোমাকে এমন স্থানে বাস করতে হবে যেখানে হাতি, ঘোড়া, রথ, পালকি তো দূরের কথা বলদ, ছাগল এবং গাধাও যেতে পারবে না। সেখানে নৌকা করেই শুধু যাওয়া যাবে। তুমিও রাজ্য পাবে না। তোমাকে লোকে ভোজ বলবে। শুধু তুমিই নয়, তোমার বংশেরই এই গতি হবে।' শর্মিষ্ঠার দ্বিতীয় পুত্র অনুও অস্বীকার করায় রাজা তাকে শাপ দিলেন—'তুমি আমার কথা মেনে নিলে না, তাই তোমার সন্তান যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে মারা যাবে। তোমার অগ্নিহোত্র করার কোনো অধিকার থাকবে না।'

এই পুত্রদের থেকে হতাশ হয়ে যযাতি শেষকালে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার অত্যন্ত আদরের। তুমি সবার থেকে ভালো। আমি শাপবশত বৃদ্ধ হয়ে গেছি, কিন্তু এখনও আমার ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। তুমি আমার বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করে তোমার যৌবন আমাকে দান করো। এক হাজার বছর ধরে আমি বিষয় ভোগ করে আমার পাপের সঙ্গে বৃদ্ধত্ব আমি ফিরিয়ে নেব।' পুরু অত্যন্ত প্রসন্ন মনে পিতার আদেশ মেনে নিলেন। যযাতি তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন—

'আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমার প্রজারা সর্বদা সুখী থাকবে।' এই কথা বলে তিনি শুক্রাচার্যের ধ্যান করলেন এবং তাঁর বৃদ্ধত্ব পুরুকে প্রদান করে পুরুর যৌবন গ্রহণ করলেন।

———o———

যযাতির ভোগ ও বৈরাগ্য, পুরুর রাজ্যাভিষেক

বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন—জনমেজয় ! নহুষ-নন্দন রাজা যযাতি পুরুর যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে প্রেম, উৎসাহ এবং ইচ্ছানুসারে সময়-অনুকূল ভোগবিলাস করতে থাকলেন। কিন্তু তিনি কখনো ধর্ম উল্লঙ্ঘন করেননি। তিনি যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের, শ্রদ্ধা দ্বারা পিতৃপুরুষকে, দান-মান এবং বাৎসল্যের দ্বারা দীন-দরিদ্রদের, ব্রাহ্মণদের তাঁদের ইচ্ছানুসার বস্তু দ্বারা, অতিথিদের পান-ভোজন দ্বারা, বৈশ্যদের সংরক্ষণের দ্বারা এবং শূদ্রদের সুব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলেন। তস্করদের যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করতেন। সমস্ত প্রজা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিল। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালন করতেন। রাজা যযাতি মনুষ্যলোকে যতপ্রকার ভোগ ছিল সেগুলি ভোগ করার পর নন্দনবন, অলকাপুরী এবং সুমেরু পর্বতের উত্তর শিখরে বাস করে সেখানকার ভোগ্য উপভোগ করেন। ধর্মাত্মা যযাতি দেখলেন হাজার বছর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি পুত্র পুরুকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আমি তোমার যৌবনলাভ করে ইচ্ছানুযায়ী আমার প্রিয় বিষয়গুলি ভোগ করেছি। কিন্তু আমি এখন নিশ্চিত হয়েছি যে, বিষয় ভোগ করার কামনা ভোগ করলেই শান্ত হয় না। আগুনে যত ঘি দাও না কেন, আগুন শুধু বাড়তেই থাকে। পৃথিবীতে যত অন্ন, স্বর্ণ, পশু ও নারী আছে, তা একজন কামুকেরও কামনা পূর্ণ করতে অক্ষম। সুখ কামনাপ্রাপ্তি করলে হয় না, সুখলাভ হয় ত্যাগে। দুর্বুদ্ধিযুক্ত লোকেরা বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করতে পারে না। বৃদ্ধ হলেও তারা বৃদ্ধ হতে চায় না। এ এক প্রাণান্তকর রোগ। এটি ত্যাগ করলে তবেই সুখ পাওয়া যায়[১]। দেখো বিষয় ভোগ করতে করতে এক হাজার বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, তবুও আমার তৃষ্ণা না কমে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এখন আমি এইসব ত্যাগ করে নিজের মনকে ব্রহ্মে নিবিষ্ট করব এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি থেকে মুক্ত হয়ে শরীরাদিতে নির্মোহ হয়ে বনে বনে পশুদের সঙ্গে বিচরণ করব। আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি তোমার যৌবন এবং এই রাজ্য গ্রহণ করো। তুমি আমার প্রিয় পুত্র।' তারপর যযাতি তাঁর বৃদ্ধত্ব পুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করে, পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিলেন।

প্রজারা যখন দেখল যে, মহারাজ যযাতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষেক করতে যাচ্ছেন, তখন তারা ব্রাহ্মণদের পুরোধা করে রাজা যযাতির কাছে গিয়ে বলল—'রাজন্ ! আপনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বঞ্চিত করে পুরুকে কেন রাজ্য সমর্পণ করছেন ? আমরা আপনাকে সচেতন করতে এসেছি, আপনি ধর্মরক্ষা করুন।' যযাতি বললেন—'আপনারা সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন, এক বিশেষ কারণে আমি যদুকে রাজা করতে পারছি না। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার নির্দেশ পালন করেনি। যে পুত্র তার পিতার আদেশ অবমাননা করে সৎপুরুষের চোখে সে পুত্র হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার আদেশ মেনে নেয়, তাঁদের জন্য হিতকার্য করে, তাঁদের সুখী করে, সেই প্রকৃত পুত্র। পুরু ছাড়া কোনো পুত্রই আমার আদেশ মেনে নেয়নি। একমাত্র পুরুই আমার আদেশ পালন করে আমাকে সম্মান করেছে। তাই পুরুই আমার উত্তরাধিকারী। যদু ও তুর্বসুর মাতামহ শুক্রাচার্য আমাকে এই বর দিয়েছেন যে, যে আমার আদেশ পালন করবে, সেই রাজা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। তাই আমি সকল প্রজার কাছে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন পুরুকেই রাজা বলে মেনে নেন।' প্রজারা সন্তুষ্ট হয়ে পুরুর রাজ্যাভিষেক করলেন। রাজা যযাতি তারপর দীক্ষাগ্রহণ করে বাণপ্রস্থে

---

[১]ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্যতি জীর্যতঃ। যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥
(মহাভারত, আদিপর্ব ৮৫।১২-১৪)

গেলেন, তাঁর সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ ও তপস্বীও গেলেন। যদু থেকে রাজ্য অধিকার হীন যদুবংশ, তুর্বসু থেকে যবন, দ্রুহ্যু থেকে ভোজ এবং অনু থেকে ম্লেচ্ছদের উৎপত্তি হয়। জনমেজয় ! পুরু থেকেই পৌরবংশের শুরু, যাতে তোমার জন্ম হয়েছে।

রাজা যযাতি বনে গিয়ে ফল-মূল-কন্দ আহার করে দিনাতিপাত করতেন। তিনি মন ও ক্রোধকে বশে এনেছিলেন। তিনি প্রত্যহ দেবতা ও পিতৃপুরুষের আরাধনা এবং অগ্নিহোত্র করতেন। ক্ষেতের থেকে শস্য আহরণ করে তাই রন্ধন করে অতিথি সৎকার করতেন, পরে যজ্ঞাদির শেষে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতেন। এইভাবে এক হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হল। ত্রিশ বছর তিনি মন ও বাক্যকে নিজের অধীন করে শুধু জল খেয়ে জীবন নির্বাহ করেছিলেন। এক বৎসর না ঘুমিয়ে শুধু বায়ুপান করে কাটালেন। তারপর এক বৎসর পঞ্চাগ্নির মধ্যে বসে কাটালেন। ছয় মাস এক পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু বায়ুপান করেছিলেন। তাঁর পবিত্র কীর্তি ত্রিলোকে অবিদিত হল। দেহত্যাগের পর তাঁর স্বর্গলাভ হয়।

যযাতির স্বর্গবাস, ইন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন, পতন, সৎসঙ্গ এবং স্বর্গে পুনর্গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা যযাতি স্বর্গে অত্যন্ত আনন্দে বাস করতে লাগলেন। সেখানে ইন্দ্র, সাধ্য, মরুৎ, বসু এঁরা সকলেই তাঁকে খুব সম্মান করতেন। এইভাবে হাজার বৎসর কেটে গেল। একদিন রাজা যযাতি বেড়াতে বেড়াতে ইন্দ্রের কাছে গেলেন। নানাপ্রকার আলোচনার পর ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! আপনি যখন আপনার পুত্র পুরুকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে নিজের বৃদ্ধত্ব নিয়ে নিলেন ও পুরুকে রাজা করলেন, তখন তাঁকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?' যযাতি বললেন—'দেবরাজ ! আমি আমার পুত্রকে বললাম, পুরু ! আমি তোমাকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানের রাজা করে দিলাম। সীমান্ত দেশ তোমার ভাইয়ের। জেনে রাখো, ক্রোধী ব্যক্তির থেকে ক্ষমাশীল শ্রেষ্ঠ, অসহিষ্ণু থেকে সহিষ্ণুতা, মনুষ্যেতর জাতির থেকে মনুষ্য এবং মূর্খ থেকে বিদ্বান সর্বদা শ্রেষ্ঠ। কেউ যদি খুব বিব্রত করে, তাহলেও তাকে বিরক্ত করা উচিত নয়, কারণ দুঃখপ্রাপ্ত প্রাণীর দুঃখই সেই জ্বালাতনকারীকে নাশ করে থাকে। মর্মবিদারক এবং কটুবাক্য যেন মুখ থেকে না বেরোয়, অনুচিতভাবে শত্রুকেও বশীভূত করা উচিত নয়। পাপীরাই কষ্ট দেবার জন্য কটুবাক্য বলে। যে ব্যক্তি কটু, তীক্ষ্ণ এবং মর্মবিদারক বাক্যে লোককে বিরক্ত করে, কষ্ট দেয় তার দিকে তাকিয়ে দেখাও পাপ, কারণ সে তার বাক্যরূপে এক পিশাচকেই জন্ম দেয়। এমন আচরণ করা উচিত যে, সকলে সামনে ভালো কথা তো বলবেই, পিছন থেকেও যেন সে তোমাকে রক্ষা করে। দুষ্টব্যক্তি যদি কটু কথা বলে তবে তা সর্বদা সহ্য করা উচিত এবং সদাচারের আশ্রয় নিয়ে সর্বদা সৎপুরুষদেরই অনুকরণ করা উচিত। বাক্যের দ্বারাও বাণ-বৃষ্টি হয়। যার ওপর এই বাণ-বৃষ্টি হয়, সে রাত-দিন দুর্ভাবনাতে কাটায়। তাই সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কখনো উচিত নয়। ত্রিলোকের সব থেকে বড় সম্পত্তি হল সকল প্রাণীর ওপর দয়া ও মৈত্রীভাব রাখা, যথাশক্তি সকলকে সাহায্য করা ও মধুর ব্যবহার করা। সারাংশ হল কঠোর বাক্য না বলা, মিষ্ট বাক্য বলা, সম্মান করা, দান করা এবং কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা না করা। এটাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার।'

যযাতির কথা শুনে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'নহুষ-নন্দন ! আপনি গৃহস্থাশ্রম ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করে বাণপ্রস্থাশ্রমে এসেছিলেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে আপনি তপস্যায় কার সমকক্ষ ?' যযাতি বললেন—'দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, এবং মহর্ষিগণের মধ্যে আমার সমকক্ষ কোনো তপস্বী আমি দেখতে পাচ্ছি না।' ইন্দ্র বললেন—'ছিঃ, ছিঃ ! আপনি আপনার সমকক্ষ, বড়, ছোট সকলের প্রভাব না জেনে সকলের অপমান করেছেন। নিজ মুখে নিজের কাজের ব্যাখ্যা করায় আপনার পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেছে। এখানে সুখ-ভোগের সীমা আছে, এবার পৃথিবীতে আপনি ফিরে যান।' যযাতি বললেন—'ঠিক আছে। সকলের অপমান করার ফলে যদি আমার পুণ্য

ক্ষীণ হয়ে থাকে, তাহলে আমি যেন পৃথিবীতে সাধুদের মধ্যে গিয়ে অবস্থান করি।' ইন্দ্র বললেন—'ঠিক আছে।'

তারপর রাজা যযাতি পবিত্র লোক থেকে চ্যুত হয়ে সেই

স্থানে এসে পড়লেন যেখানে অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান এবং শিবি নামক তপস্বীগণ তপস্যা করছিলেন। তাঁকে সেখানে আসতে দেখে অষ্টক বললেন—'যুবক ! তুমি ইন্দ্রের মতো সুন্দর। তোমাকে এখানে আসতে দেখে আমরা চমকিত হয়ে গেছি। যখন এসেই পড়েছ, তখন এখানে থাক এবং দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ করে তোমার কথা বলো। এই সব সাধুব্যক্তিদের সম্মুখে ইন্দ্রও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দীন-দুঃখীদের জন্য সাধুরাই পরম আশ্রয়। সৌভাগ্যবশত তুমি তাদের মধ্যেই এসে পড়েছ। তুমি তোমার পরিচয় ঠিকমতো বলো।'

যযাতি বললেন—'আমি সমস্ত প্রাণীকে অপমান করায় স্বর্গচ্যুত হয়েছি। আমার মধ্যে অহংকার ছিল, অহংকারই নরকের আসল কারণ। সৎব্যক্তিদের কখনো দুষ্ট ব্যক্তিদের অনুকরণ করা উচিত নয়। যে অর্থ-সম্পদের চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজের আত্মার হিতসাধন করে, সে-ই বুদ্ধিমান। অর্থলাভ হলে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। বিদ্বান হলেও তা নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। নিজ চিন্তাধারা ও চেষ্টার থেকেও দৈবের গতি বেশি বলবান, তাই ভেবে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। দুঃখে কাতর হবে না, সুখে গর্বিত হবে না, দুয়েতেই সমভাবে থাকবে। অষ্টক ! আমি এখন মোহগ্রস্ত নই। আমার মনে কোনো জ্বালাবোধও নেই। বিধাতার বিধানের বিপরীতে তো আমি যেতে পারি না, তাই ভেবেই আমি সন্তুষ্ট থাকি। অষ্টক ! সুখ-দুঃখের অনিত্যতা আমি জানি, তাহলে আমার কীসের দুঃখ ! কী করব, কী করলে সুখী হব—আমি এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকি ; তাই দুঃখ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।'

অষ্টক জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি তো নানা লোকে বাস করেছেন এবং আত্মজ্ঞানী নারদের মতো আপনার কথাবার্তা। আপনি বলুন, প্রধানত কোন কোন লোকে আপনি ছিলেন ?'

যযাতি উত্তরে বললেন—'আমি প্রথমে পৃথিবীর সার্বভৌম রাজা ছিলাম। এক সহস্র বৎসর ধরে মহালোকে ছিলাম, পরের এক সহস্র বৎসর একশত যোজন ব্যাপী সহস্রদ্বার সমন্বিত ইন্দ্রপুরীতে ছিলাম। তারপর প্রজাপতিলোকে গিয়ে এক সহস্র বৎসর ছিলাম। নন্দনবনে স্বর্গীয় ভোগবিলাসে এক লাখ বৎসর কাটিয়েছি। সেখানকার সুখে আমি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, পরে পুণ্যক্ষীণ হয়ে যাওয়াতে পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। ধননাশ হলে যেমন আত্মীয়-কুটুম্ব সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনই পুণ্য ক্ষীণ হওয়ায় ইন্দ্রাদি দেবতাও পরিত্যাগ করেন।'

অষ্টক জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! কোন কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ? তা তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত হয়, না জ্ঞানের দ্বারা ?'

যযাতি উত্তর দিলেন—'স্বর্গের সাতটি দ্বার আছে—দান, তপ, শম, দম, লজ্জা, সারল্য এবং সবার ওপর দয়া। অহংকারে তপস্যা ক্ষীণ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নিজের বিদ্যার জ্ঞানের অহংকারে গর্বিত হয় এবং অপরের ঈর্ষায় কাতর হয়, তার উত্তমলোক প্রাপ্তি হয় না। তার বিদ্যা মোক্ষ প্রদানেও অসমর্থ হয়। অভয়ের চারটি সাধন আছে—অগ্নিহোত্র, মৌন, বেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞ। যদি অনুচিত রীতির দ্বারা অহংকারের সঙ্গে এটি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তা ভয়ের কারণ হয়। সম্মানিত হলে সুখী এবং অপমানিত হলে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। জগতে সৎব্যক্তিরা এইরূপ লোকেদেরই সম্মান করে। দুষ্টব্যক্তিদের কাছে শিষ্টবুদ্ধি

প্রত্যাশা করা নিরর্থক। আমি দেব, আমি যজ্ঞ করব, আমি জেনে ফেলব, এ আমার প্রতিজ্ঞা—এই ধরনের উক্তি খুবই ক্ষতিকর। এগুলি ত্যাগ করাই শ্রেয়।'

অষ্টক জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী কোন ধর্ম পালন করলে মৃত্যুর পর সুখলাভ হয় ?'

যযাতি বললেন—'যে ব্রহ্মচারী আচার্যের নির্দেশ অনুসারে অধ্যয়ন করে, গুরুকে সেবা করার জন্য তাকে আদেশ দিতে হয় না ; যে আচার্যের ঘুম ভাঙার আগে জেগে যায় এবং আচার্য ঘুমোবার পরে ঘুমোতে যায়, যার স্বভাব মিষ্ট, যে জিতেন্দ্রিয়, ধৈর্যশালী, সাবধানী এবং প্রমাদরহিত, সে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তি ধর্মানুকূল ধনলাভ করে যজ্ঞ করে, অতিথি সেবা করে, কাউকে কোনো বস্তু দিয়ে ফেরত চায় না, সেই সত্যকার গৃহস্থ। যে ব্যক্তি নিজে সংগ্রহ করে ফল-মূলের সাহায্যে নিজ জীবিকা নির্বাহ করে, কোনো পাপকাজ করে না, অন্যকে কিছু-না-কিছু সাহায্য করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, স্বল্পাহারী এবং নিয়মিত পূজার্চনাদি করে সেই বানপ্রস্থাশ্রমী শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তি কলা-কৌশল, ভাষণ, চিকিৎসা, কারিগরী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে না, সদ্‌গুণাবলী যুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, আসক্তিহীন, পরবাসী নয়, নানাদেশ ভ্রমণকারী—সেই সত্যকার সন্ন্যাসী।'

এইরূপ নানা কথাবার্তার পর যযাতি বললেন—'দেবতারা বিলম্বে রাজি নয়। আমি এখন এখান থেকে আরও নীচে পতিত হব। ইন্দ্রের বরে আমি আপনাদের মতো সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছি।'

অষ্টক বললেন—'স্বর্গে আমার যতলোক প্রাপ্ত হওয়ার আছে, অন্তরীক্ষে অথবা সুমেরু পর্বতের শিখরের ওপর—পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ আমার যেখানে যাওয়ার কথা—সে সবই আমি আপনাকে প্রদান করছি, আপনার আর পতন হবে না।'

যযাতি বললেন—'আমি তো ব্রাহ্মণ নই, দান গ্রহণ করব কীভাবে ? আমি নিজে এই প্রকার দান অনেক করেছি।'

প্রতর্দন বললেন—'আমার অন্তরীক্ষ অথবা স্বর্গলোক যা যা প্রাপ্ত হওয়ার ছিল, সে সব আপনাকে দিলাম। আপনি পতিত না হয়ে পুনরায় স্বর্গে গমন করুন।'

যযাতি বললেন—'কোনো রাজাই তাঁর সমকক্ষ কোনো ব্যক্তির থেকে দান গ্রহণ করতে পারেন না। ক্ষত্রিয় হয়ে দান নেওয়া অত্যন্ত অধর্ম। কোনো শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় আজ পর্যন্ত এরূপ কাজ করেননি, তাহলে আমি কী করে করব ?'

বসুমান বললেন—'রাজন্ ! আমার সমস্ত লোক আপনাকে দিচ্ছি। আপনি যদি দান মনে করে এটি নিতে ইতস্তত করেন, তবে একটি তৃণের বদলে সব কিনে নিন।'

যযাতি বললেন—'এই সব কেনা-বেচা তো সর্বভাবেই মিথ্যা। আমি এরূপ মিথ্যাচার কখনো করিনি। কোনো সৎ ব্যক্তিই এইপ্রকার কাজ করতে পারে না, আমি কী করে করব !'

শিবি বললেন—'আমি ঔশীনর শিবি। আপনি কেনা-বেচা করতে যদি রাজি না থাকেন, তাহলে আমার পুণ্যফল স্বীকার করুন। আমি আপনাকে উপহার স্বরূপ দিচ্ছি। আপনি না নিলেও আমি এটি আর ফেরত নেব না।'

যযাতি বললেন—'আপনি অত্যন্ত প্রভাবশালী। কিন্তু আমি অন্যের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি না।'

অষ্টক বললেন—'মহারাজ ! আপনি একজনের পুণ্যফল যদি নিতে না চান, তাহলে সকলের একত্রে যে পুণ্যফল তাই স্বীকার করুন। আমরা আপনাকে সমস্ত পুণ্যফল দিয়ে নরকে যেতেও প্রস্তুত।'

যযাতি বললেন—'ভাই ! আমার পক্ষে যা উচিত হবে, তোমরা সেই কাজই করো। সৎ ব্যক্তিগণ সত্যেরই পক্ষপাতী হন। আমি আগে যা কখনো করিনি, তা এখন কী করে করব ?'

অষ্টক বললেন—'মহারাজ ! আকাশে সোনার পাঁচটি রথ যে দেখা যাচ্ছে, এগুলির সাহায্যেই কি পুণ্যলোকে যাত্রা করা হয় ?'

যযাতি বললেন—'হ্যাঁ, এই স্বর্ণনির্মিত রথ তোমাদের পুণ্যলোকে নিয়ে যাবে।'

অষ্টক বললেন—'আপনি এই রথে করে স্বর্গলোকে যাত্রা করুন, আমরা সকলেও সময়মতো যাব।'

যযাতি বললেন—'আমরা সকলেই স্বর্গ জয় করেছি, চলো, আমরা সবাই একসঙ্গেই যাই। দেখতে পাচ্ছ, স্বর্গের

প্রশস্ত পথ দেখা যাচ্ছে!'

অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান এবং শিবির দান অস্বীকার করায় যযাতিও স্বর্গের অধিকারী হলেন। অতঃপর তাঁরা সকলেই রথে করে স্বর্গের দিকে রওনা হলেন। সেই সময় তাঁদের ধার্মিক তেজে স্বর্গ এবং আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল। ঔশীনর শিবির রথ এগিয়ে যাচ্ছে দেখে অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজন্! ইন্দ্র আমার প্রিয় মিত্র। আমি ভেবেছিলাম আমিই তাঁর কাছে আগে পৌঁছব। শিবির রথ কেন এগিয়ে যাচ্ছে?' যযাতি বললেন, 'শিবি তাঁর যথাসর্বস্ব সৎপাত্রকে দান করেছেন। দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম, হ্রী, শ্রী, ক্ষমা, সৌম্যভাব, সেবার ইচ্ছা—এই সবগুণই শিবিতে বিদ্যমান। এতৎসত্ত্বেও অহংকারের লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাই তিনি সব থেকে এগিয়ে আছেন।' তখন অষ্টক জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্! সত্যি করে বলুন, আপনি কে, কার পুত্র? আপনার মতো ত্যাগ আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শোনা যায়নি।' যযাতি উত্তরে জানালেন—'আমি সম্রাট নহুষের পুত্র যযাতি। পুরু আমার পুত্র। আমি সার্বভৌম চক্রবর্তী ছিলাম। দেখো, তোমাকে আমি এইসব গোপনীয় কথা বললাম; কারণ তুমি আমার আপন জন। আমি তোমাদের মাতামহ।' এই প্রকার আলাপ আলোচনা করতে করতে সকলেই স্বর্গে গেলেন।

———o———

পুরুবংশের বর্ণনা

জনমেজয় বললেন—ভগবান! আমি এখন পুরুবংশের যশস্বী রাজাদের বংশের বিবরণী শুনতে আগ্রহী। আমি জানি এই বংশের কোনো রাজাই কুল, মান, শীল, শক্তি অথবা সন্তানভাগ্যে হীন নন।

বৈশম্পায়ন বললেন—যথার্থ বলেছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন আপনাদের বংশের বর্ণনা আমার কাছে করেছেন। আমি সেই পুণ্যকথা আপনাকে শোনাচ্ছি। দক্ষ থেকে অদিতি, অদিতি থেকে বিবস্বান্, বিবস্বান্ থেকে মনু, মনু থেকে ইলা, ইলা থেকে পুরুরবা, পুরুরবা থেকে আয়ু, আয়ু থেকে নহুষ এবং নহুষ থেকে যযাতি জন্মগ্রহণ করেন। যযাতির দুজন স্ত্রী ছিলেন—দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর দুই পুত্র—যদু এবং তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র—দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু। যদু থেকে যাদব এবং পুরু থেকে পৌরব বংশের সৃষ্টি। পুরুর পত্নীর নাম কৌশল্যা। তাঁর থেকেই জনমেজয়ের জন্ম হয়। ইনি তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একটি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। জনমেজয়ের পত্নীর নাম অনন্তা। তাঁর পুত্র প্রাচিন্বান্। প্রাচিন্বানের স্ত্রী ছিলেন অশ্মকী, তাঁর থেকে সংযাতির জন্ম হয়। সংযাতির পত্নী বরাঙ্গী থেকে জন্ম অহংযাতি নামক পুত্রের। অহংযাতির পত্নী ভানুমতী, তাঁর পুত্র সার্বভৌম। সার্বভৌমের পত্নী সুনন্দা, তাঁর গর্ভে জন্ম হয় জয়ৎসেনের। জয়ৎসেনের বিবাহ হয় সুশ্রুবার সঙ্গে। তাঁর পুত্র অবাচীন। অবাচীনের পত্নী মর্যাদার পুত্র হল অরিহ। অরিহের পত্নী খল্বাঙ্গী, তাঁর পুত্র মহাভৌম, মহাভৌমের পত্নী সুযজ্ঞা। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে অযুতনায়ী। অযুতনায়ীর স্ত্রী কামা, তাঁর পুত্র অক্রোধন। অক্রোধনের বিবাহ হয় করম্ভার সঙ্গে, তাঁদের পুত্র দেবাতিথি। দেবাতিথির সঙ্গে মর্যাদার বিবাহ হয়, তাঁদের পুত্র অরিহ। অরিহের সুদেবা পত্নী থেকে ঋক্ষ নামক পুত্রের জন্ম হয়।

ঋক্ষের জ্বালা নামক পত্নীর গর্ভে মতিনারের জন্ম হয়। তিনি সরস্বতী নদীর তীরে দ্বাদশ বৎসর ধরে সর্বগুণসম্পন্ন যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সরস্বতী তাঁকে বিবাহ করেন, তাঁর গর্ভে জন্ম নেয় তংসু। তংসুর পত্নী কালিঙ্গীর পুত্র ইলিন। ইলিনের পত্নী রথন্তরীর গর্ভে দুষ্যন্তাদি পাঁচ পুত্র জন্মায়। দুষ্যন্তের পত্নী শকুন্তলার পুত্র ভরত। ভরতের পত্নী সুনন্দার গর্ভে ভুমন্যু জন্ম নেয়। ভুমন্যুর পত্নী বিজয়ার পুত্র হল সুহোত্র। সুহোত্র সবর্ণাকে বিবাহ করায় তাঁর পুত্র হস্তী জন্মগ্রহণ করে। তিনিই হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। হস্তীর পত্নী যশোধরার গর্ভে বিকুণ্ঠন এবং বিকুণ্ঠনের পত্নী সুদেবা থেকে অজমীঢ় জন্ম নেয়। অজমীঢ়ের নানা পত্নীর গর্ভে একশত চব্বিশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এক একজন এক একটি বংশের প্রবর্তক হয়। তাদের মধ্যে ভরতবংশের প্রবর্তকের নাম ছিল সংবরণ। সংবরণের পত্নী তপতীর গর্ভে কুরু জন্ম নেন। কুরুর পত্নী শুভাঙ্গীর গর্ভে বিদুরথ, বিদুরথের পত্নী সংপ্রিয়ার গর্ভে অনশ্চা, অনশ্চার পত্নী

অমৃতার গর্ভে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পত্নী সুযশার গর্ভে ভীমসেন, ভীমসেনের পত্নী কুমারীর গর্ভে প্রতিশ্রবা এবং প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীপের পত্নী সুনন্দার গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে—দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যকালেই তপস্যা করতে চলে যান। শান্তনু রাজা হন। তিনি কোনো বৃদ্ধ লোককে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেই ব্যক্তি যুবক ও সুখী হয়ে উঠতেন। সেই জন্যই তাঁর নাম হয়েছিল শান্তনু। ভাগিরথী গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ হয়েছিল। দেবব্রত নামে তাঁদের যে পুত্র জন্মান, তিনিই পরবর্তীকালে ভীষ্ম নামে প্রসিদ্ধ হন। পিতার প্রসন্নতার জন্য তিনি সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর পিতা শান্তনুর বিবাহ দেন। সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য এবং চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মায়। চিত্রাঙ্গদ অল্পবয়সেই গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য রাজা হলেন। তাঁর দুই পত্নী ছিলেন—অম্বিকা এবং অম্বালিকা। অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্য মারা যান। তাঁর মাতা সত্যবতী ভাবলেন যে রাজা দুষ্যন্তের বংশ লোপ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় তিনি ব্যাসদেবকে স্মরণ করলেন। ব্যাসদেব এলে তিনি বললেন—'তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য সন্তানহীন অবস্থায় পরলোকে গমন করেছে। তুমি তার বংশরক্ষা করো।' ব্যাসদেব মাতৃআজ্ঞায় অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং তাঁর দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম দিলেন। ব্যাসদেবের বরে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে চারজন প্রধান—দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং চিত্রসেন। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তীর গর্ভে তিন পুত্র জন্ম নেন—যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং অর্জুন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রীর গর্ভে দুই পুত্র হয় নকুল ও সহদেব। দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রেরই বিবাহ হয়। দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচ পাণ্ডবেরই ক্রমশ প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীক এবং শ্রুতকর্মা নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

যুধিষ্ঠিরের আর এক পত্নী ছিলেন, তাঁর নাম দেবিকা। তাঁর গর্ভে যৌধেয় জন্মায়। ভীমসেনের পত্নী কাশী-রাজকন্যা বলন্ধরার গর্ভে সর্বগ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করলে তাঁর গর্ভে অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত গুণবান এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। নকুলের পত্নী করেণুমতীর গর্ভে নিরামিত্র এবং সহদেবের পত্নী বিজয়ার গর্ভে সুহোত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভীমসেনের আর এক স্ত্রী হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামক পুত্র জন্মেছিল। পাণ্ডবদের এইভাবে মোট এগারো জন পুত্র জন্মেছিল। কিন্তু বংশবৃদ্ধি হয়েছিল শুধু অভিমন্যুর দ্বারাই। এছাড়া অর্জুনের আরও দুই পুত্র ছিল—উলূপীর গর্ভে ইড়াবান্ এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন। এঁরা দুজন তাঁদের মাতাদের সঙ্গে মাতামহের কাছে থাকতেন এবং তাঁদেরই উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বিরাট রাজকন্যা উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ হয়েছিল। তাঁর গর্ভে এক মৃত সন্তান জন্ম নেয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সে প্রাণ ফিরে পায়। অশ্বত্থামার অস্ত্রে তার মৃত্যু ঘটেছিল। কুরুবংশ পরিক্ষীণ হওয়াতে তাঁর জন্ম, তাই তিনি পরীক্ষিৎ নামে প্রসিদ্ধ। পরীক্ষিতের পত্নী মাদ্রবতীর পুত্র হলেন আপনি। আপনার বপুষ্টমা নামক পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে শতানীক এবং শঙ্কুকর্ণ। শতানীকেরও এক পুত্র—অশ্বমেধদত্ত। আপনার জানবার আগ্রহে আমি পুরুবংশের বর্ণনা করলাম।

রাজর্ষি শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার বিবাহ এবং তাঁদের পুত্র ভীষ্মের যুবরাজ পদে অভিষেক

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ইক্ষ্বাকুবংশে মহাভিষ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি অনেক অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। একদিন বহু দেবতা এবং মহাভিষসহ সকল রাজর্ষি ব্রহ্মার চরণে উপস্থিত হলেন। সেইসময় গঙ্গাদেবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বায়ু তাঁর হাওয়ার দাপটে গঙ্গাদেবীর শ্বেতবস্ত্র শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। উপস্থিত সকলেই লজ্জা পেয়ে চক্ষু নত করেছিলেন, কিন্তু মহাভিষ নিঃশঙ্ক হয়ে তা দেখতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাই লক্ষ্য করে বললেন—

'মহাভিষ ! তুমি এবার পৃথিবীতে যাও। যে গঙ্গার দিকে তুমি তাকিয়ে আছ, সে তোমার অপ্রিয় কাজ করবে। তুমি তার ওপর যখন ক্রোধান্বিত হবে তখন তুমি এই শাপ থেকে মুক্তিলাভ করবে।'

মহাভিষ ব্রহ্মার নির্দেশ শিরোধার্য করে ঠিক করলেন যে, তিনি পুরুবংশের রাজা প্রতীপের পুত্ররূপে জন্মাবেন। গঙ্গাদেবী সেখান থেকে ফিরে আসার সময় পথে বসুদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা বশিষ্ঠের শাপে শ্রীহীন অবস্থায় ছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা মনুষ্য হয়ে জন্মাবেন। গঙ্গাদেবী বসুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করলেন যে, তিনি বসুদের গর্ভে ধারণ করবেন এবং জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুক্ত করে দেবেন। সেই আট বসুগণও নিজেদের অষ্টমাংশ থেকে এক পুত্রকে মর্ত্যলোকে থাকতে দেবার অঙ্গীকার করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে তিনি অপুত্রক থাকবেন।

পুরুবংশের রাজা প্রতীপ তাঁর পত্নীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে তপস্যা করছিলেন। ভগবতী গঙ্গা একদিন সুন্দরী মূর্তি ধারণ করে তাঁর কাছে এলেন। কুশল বিনিময়ের পর নানা আলোচনার মধ্যে প্রতীপ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তিনি যেন তাঁর ভাবী পুত্রের পত্নী হন। গঙ্গাদেবী প্রতীপের কথা মেনে নিলেন এবং রাজা প্রতীপ পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর তপস্যা করলেন। বৃদ্ধাবস্থায় মহাভিষ তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সেইসময় রাজা প্রতীপ প্রশান্তরত অথবা তাঁর বংশও লুপ্তপ্রায়, সেই অবস্থায় পুত্র জন্মানোতে তাঁর নাম হল 'শান্তনু'। শান্তনু যৌবন প্রাপ্ত হলে রাজা প্রতীপ তাঁকে জানালেন—'এক রমণীয় দিব্য নারী তোমার কাছে পুত্র কামনায় আসবে। তুমি তাকে কোনো কিছু প্রশ্ন না করে সে যা করবে, তাই মেনে নিও।' এই বলে তিনি শান্তনুকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থে গমন করলেন।

রাজর্ষি শান্তনু একবার শিকার করতে করতে গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি এক পরমা সুন্দরী নারীকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে স্বর্গের লক্ষ্মীদেবী মনে হচ্ছিল। তাঁর রূপ দেখে শান্তনু বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হল, তিনি তাঁকে অপলক নেত্রে দেখতে লাগলেন। সেই দিব্য নারীর মনেও শান্তনুর জন্য প্রেম উদয় হল। শান্তনু তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বললেন—'তুমি আমাকে পতিরূপে স্বীকার করো।' সেই দিব্য নারী বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনার রানি হতে রাজি আছি, কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, আমি ভালো-মন্দ যে কাজই করি, আপনি আমাকে বাধা দেবেন না, কিছু বলবেন না। যতদিন আপনি এটি মেনে চলবেন, ততদিন আমি আপনার কাছে থাকব। যে দিন আপনি বাধা দেবেন বা কটুকথা বলবেন, সেই দিন আমি আপনাকে ছেড়ে চলে যাব।' রাজা তাঁর কথা মেনে নিলেন। গঙ্গাদেবী অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজাও তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

রাজর্ষি শান্তনু গঙ্গাদেবীর শীল, সদাচার, রূপ, সৌন্দর্য, উদারতা ইত্যাদি সদ্গুণ এবং সেবা দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন ও আনন্দিত হলেন। তিনি গঙ্গাদেবীর প্রেমে এমনই মগ্ন ছিলেন যে, বহু বর্ষ কেটে গেলেও তিনি তা অনুভব করতে পারলেন না। গঙ্গাদেবীর গর্ভে একে একে শান্তনুর সাত পুত্র জন্মাল। কিন্তু পুত্র জন্মগ্রহণ করলেই গঙ্গাদেবী 'আমি তোমার প্রসন্নতার কাজ করছি' বলে তাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিতেন। রাজা শান্তনুর এই কাজ পছন্দ ছিল না কিন্তু পাছে গঙ্গাদেবী তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান, সেইজন্য তিনি কোনোপ্রকার বাধা দিতেন না। সাত পুত্রকে এইভাবে বিসর্জন দেওয়া হলে, গঙ্গাদেবীর অষ্টম পুত্র জন্মাল। এবার রাজা শান্তনু দুঃখিত হলেন এই পুত্রের পরিণামের কথা ভেবে। তাঁর মনে ইচ্ছা হল যে 'এই পুত্রটি আমার কাছে থাক।' তিনি গঙ্গাদেবীকে বললেন—'তুমি কে ? কার কন্যা ? কেন এই শিশুদের হত্যা করছ ? আরে, পুত্রাঘ্নি ! এ তো মহাপাপ।' গঙ্গাদেবী বললেন—'ওহে পুত্রাভিলাষী ! ঠিক আছে, তোমার এই প্রিয়পুত্রকে হত্যা করব না। শর্ত অনুযায়ী আমি আর এখানে থাকতে পারি না। আমি জহ্নুকন্যা জাহ্নবী। বড় বড় মহর্ষিরা আমার সেবা করেন। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যই আমি এতদিন তোমার কাছে ছিলাম। আমার এই আট পুত্র হল অষ্টবসু। বশিষ্ঠের শাপেই তাদের মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়েছিল। এই পৃথিবীতে এদের তোমার মতো পিতা এবং আমার মতো মাতা পাওয়া সম্ভব ছিল না। বসুদের পিতা হওয়ায় তুমি অক্ষয় ধাম লাভ করবে। আমি এঁদের অতি শীঘ্র মুক্ত করে

দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাই এই কাজ করেছি। এখন এঁরা অভিশাপমুক্ত হয়েছেন, আমিও স্বর্গে ফিরে চললাম। এই পুত্র অষ্টমাংশ। তুমি একে পালন করো।'

শান্তনু জিজ্ঞাসা করলেন—'বশিষ্ঠ ঋষি কে ? তিনি কেন বসুদের অভিশাপ দিয়েছিলেন ? এই শিশুটি এমন কী কাজ করেছে, যার জন্য ও এই পৃথিবীতে থাকবে ? বসুদের মনুষ্যজন্ম হল কেন ? আমাকে এই সব কথা বলো।' গঙ্গাদেবী বললেন—'বিশ্ববিখ্যাত বশিষ্ঠ মুনি বরুণের পুত্র। মেরু পর্বতের নিকট তাঁর অত্যন্ত পবিত্র, সুন্দর এবং সুখদায়ক আশ্রম আছে। উনি সেখানেই তপস্যা করতেন। কামধেনুর কন্যা নন্দিনী তাঁর যজ্ঞ হবিষ্য প্রদানের নিমিত্ত সেখানেই থাকত। পৃথু ইত্যাদি বসুগণ একবার তাঁদের পত্নীদের নিয়ে সেই বনে এলেন। এক বসুপত্নীর দৃষ্টি সর্বকামনাপূরণকারী নন্দিনীর ওপর পড়ল। তিনি তাঁর স্বামী দ্যৌ নামক বসুর দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করেন। দ্যৌ তাঁর স্ত্রীকে বললেন—'প্রিয়তমা ! এই উত্তম গাভীটি বশিষ্ঠ মুনির। কেউ যদি এর দুধ পান করে, তাহলে সে যৌবন লাভ করে এবং দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকে।' বসুপত্নী বললেন—'আমি আমার সখীকে এটি উপহার দিতে চাই, তুমি একে হরণ করে আনো।' পত্নীর কথায় দ্যৌ তাঁর ভাইয়েদের সঙ্গে করে এসে নন্দিনী গাভীকে চুরি করে নিয়ে গেলেন। তখন তাঁদের একথা মনে ছিল না যে, বশিষ্ঠ মুনি অত্যন্ত তেজস্বী ঋষি, তিনি তাঁদের শাপ দিয়ে দেবলোক-চ্যুত করতে পারেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ফল-ফুল নিয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সবৎসা নন্দিনী নেই, সমস্ত বন খুঁজেও তার কোনো খোঁজ পেলেন না। তখন তিনি দিব্য দৃষ্টিতে সব দেখে বসুদের অভিশাপ দিলেন—'বসুরা আমার গাভীকে হরণ করে নিয়ে গেছে, তাই তাদের মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে।' পরম তপস্বী ও প্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বসুদের শাপ দিয়েছেন জেনে বসুরা তাঁর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে নন্দিনী-সহ মহর্ষির আশ্রমে এলেন। বশিষ্ঠ বললেন— 'অন্য সব বসুরা এক এক বছরের জন্য মর্ত্যলোকে গিয়েই মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু দ্যৌকে তাঁর কর্মফল ভোগ করার জন্য অনেক দিন মর্ত্যে থাকতে হবে। আমার মুখনিঃসৃত বাক্য কখনো মিথ্যা হবে না। এই বসুর মর্ত্যলোকে কোনো সন্তান হবে না। পিতার প্রসন্নতার জন্য সে কখনো স্ত্রীলোকে আসক্তও হবে না।' বশিষ্ঠের কথা শুনে সকলে আমার কাছে এসে আমাকে অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা জন্মালেই আমি তাঁদের একে একে জলে বিসর্জন দিই। আমি তাঁদের কথা মেনে নিয়ে সেই কাজই করেছি। শেষের এই শিশুই দ্যৌ নামক বসু। এ বহুকাল পৃথিবীতে থাকবে।' এই বলে গঙ্গাদেবী শিশুটিকে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

হে জনমেজয় ! রাজা শান্তনু অত্যন্ত মেধাবী, ধর্মাত্মা এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। অনেক বড় বড় দেবর্ষি এবং রাজর্ষি তাঁর সৎকার করতেন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, ক্ষমা, জ্ঞান, সংকোচ, ধৈর্য এবং তেজ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি ধর্মনীতি এবং অর্থনীতিতেও নিপুণ ছিলেন। শুধু ভরতবংশেরই নয়, সমস্ত প্রজাকুলেরই তিনি একমাত্র রক্ষক ছিলেন। তাঁকে দেখে সকলেই বুঝত যে, কাম এবং অর্থের থেকেও শ্রেষ্ঠ হল ধর্ম। সেই সময় তিনিই ছিলেন ধার্মিক শ্রেষ্ঠ। প্রজাদের ভয়, শোক, প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছিল, তারা সুখে দিনাতিপাত করত। তাঁর তেজঃপূর্ণ শাসনে প্রভাবিত হয়ে অন্যান্য সামন্ত রাজন্যবর্গও যজ্ঞ-দান ইত্যাদিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের সেবা করতেন, বৈশ্য ক্ষত্রিয়দের অনুগামী থাকতেন এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের আনন্দের সঙ্গে সেবা করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। সেখান থেকেই শান্তনু সমস্ত পৃথিবী শাসন করতেন। তাঁর রাজত্বে কেউ পশু-পক্ষী, শূকর, হরিণ শিকার করতে পারত না। তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল এবং তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে প্রজাপালন করতেন। দেবতা, ঋষি, এবং পিতৃপুরুষদের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করা হত। রাজা শান্তনু দুঃখী, অনাথ এবং পশু-পক্ষী সকল প্রাণীদেরই রক্ষা করতেন। সেই সময় সকলেই সত্যাশ্রিত ছিল এবং সকলের মনই দানে উৎসাহী ছিল। রাজা শান্তনু ছত্রিশ বছর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করে বনবাসীর মতো জীবন নির্বাহ করেছিলেন।

একদিন রাজা শান্তনু গঙ্গাতীরে বিচরণ করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন গঙ্গানদীতে সেদিন খুব কম জল বয়ে যাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত এবং চিন্তিত হলেন যে 'আজ দেবনদী গঙ্গা কেন এত ক্ষীণ !' অগ্রসর হয়ে রাজা

অনুসন্ধান করতে গেলেন, সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন এক সুন্দর বিশালকায় যুবক তার দিব্য অস্ত্রের অভ্যাস করছেন ; তিনি তাঁর বাণ দিয়ে গঙ্গার ধারা রুদ্ধ করেছেন। এই অলৌকিক কর্ম দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে শুধু জন্মের সময়ই দেখেছিলেন, তাই চিনতে পারলেন না। সেই কুমার রাজাকে তাঁর মায়ায়

মুগ্ধ করে অন্তর্হিত হলেন। রাজর্ষি শান্তনু গঙ্গাদেবীকে বললেন—'কুমারকে আবার দেখাও।' গঙ্গাদেবী সুন্দর রূপ ধারণ করে নিজ পুত্রের দক্ষিণ হস্ত ধরে রাজার সামনে এলেন। কুমারের অনুপম সৌন্দর্য, দিব্য বসন-ভূষণ দেখে রাজা তাঁকে চিনতে পারলেন না। গঙ্গাদেবী তখন তাঁকে বললেন—'মহারাজ ! এ আপনার অষ্টম পুত্র, যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। আপনি একে গ্রহণ করুন এবং আপনার রাজধানীতে নিয়ে যান। এই পুত্র বশিষ্ঠ ঋষির কাছে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেছে এবং অস্ত্র শিক্ষাও সম্পূর্ণ করেছে। এই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের সমকক্ষ। দেবতা এবং অসুর সকলেই একে সম্মান করে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এবং দেবগুরু বৃহস্পতি যা কিছু জানেন, এই পুত্রের সে সবই প্রাপ্ত হয়েছে। স্বয়ং ভগবান পরশুরামের যে শস্ত্রের জ্ঞান আছে এ তার সমকক্ষ। আপনি এই ধর্মনিপুণ ধনুর্ধর বীরকে নিজের রাজধানীতে নিয়ে যান। আমি একে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম।' রাজর্ষি শান্তনু পুত্রকে রাজধানীতে নিয়ে এসে অত্যন্ত সুখী হলেন এবং সত্বর তাঁকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। গঙ্গাপুত্র দেবব্রত তাঁর শীল এবং সদাচার দ্বারা দেশের সমস্ত প্রজাকে সুখী করলেন। এইভাবে আনন্দের সঙ্গে চার বছর কেটে গেল।'

—o—

ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞা এবং শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একদিন রাজর্ষি শান্তনু যমুনা নদীর তীরে বিচরণ করছিলেন, সেখানে তিনি অতি উৎকৃষ্ট এক সুগন্ধ পেলেন, কিন্তু সেই গন্ধ কোথা থেকে আসছিল তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তিনি সেই সুগন্ধের উৎস সন্ধান করছিলেন। সেখানে নিষাদদের মধ্যে তিনি একটি দেবাঙ্গনার ন্যায় সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কল্যাণী ! তুমি কার কন্যা, এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছ ?' কন্যা জবাব দিলেন—'আমি নিষাদ কন্যা। পিতার নির্দেশে ধর্মার্থ নৌকা চালাই।' তাঁর সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে রাজর্ষি শান্তনু তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন এবং কন্যার পিতার কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। নিষাদরাজ বললেন—'রাজন্ ! যেদিন থেকে এই দিব্য কন্যাকে আমি পেয়েছি, তখন থেকে আমি এর বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে আছি। কিন্তু এই সম্পর্কে আমার মনে একটি ইচ্ছা আছে। যদি

আপনি একে ধর্মপত্নী করতে চান, তাহলে আপনাকে শপথ নিয়ে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমি জানি আপনি সত্যবাদী। আপনার মতো পাত্র আমি আর কোথায় পাব ! তাই আপনি প্রতিজ্ঞা করলে এর সঙ্গে আপনার বিবাহ দেব।' শান্তনু বললেন—'আপনি আগে শর্ত কী সেটা বলুন। দেবার মতো প্রতিশ্রুতি হলে নিশ্চয়ই দেব।' নিষাদরাজ বললেন—'এর গর্ভে যে পুত্র হবে, আপনার পরে সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে, আর কেউ নয়।' যদিও রাজা শান্তনু সেই সময় কামপীড়িত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি এই শর্ত মেনে নিলেন না। তিনি কামনাবশত অচেতনের ন্যায় হয়েছিলেন, নিষাদকন্যার কথা চিন্তা করতে করতে তিনি হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। দেবব্রত পিতাকে চিন্তিত দেখে তাঁর কাছে এসে বললেন—'পিতা ! পৃথিবীর সকল রাজাই আপনার বশীভূত। আপনার সবই কুশলে আছে। তাহলে আপনি কেন বিষণ্ণ হয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করছেন ? আপনি চিন্তায় এতই মগ্ন যে আমার সঙ্গেও কথা বলেন না বা ঘোড়ায় চড়ে বাইরেও যান না। আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে, আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। দয়া করে বলুন, আপনার কী হয়েছে, আমি তার প্রতিকার করব।' শান্তনু বললেন—'পুত্র ! আমি সত্যই চিন্তিত। আমার এই মহৎ বংশে তুমিই একমাত্র বংশধর। তুমি সর্বদা সশস্ত্র হয়ে বীরের কাজ করে থাক। জগতে সর্বক্ষণই লোক মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, তার জন্য আমি সবসময় চিন্তিত থাকি। ভগবান এমন না করেন, কিন্তু যদি তোমার কোনো বিপদ আসে তাহলে আমার বংশ লোপ পেয়ে যাবে। তুমি অবশ্যই শত-শত পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর আমিও বৃথা বিবাহ করতে চাই না, তবুও বংশপরম্পরা রক্ষার জন্য চিন্তা তো হয়।'

দেবব্রত তখন রাজ্যের বয়স্ক ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে নিয়ে দাসরাজার নিবাসস্থলে গেলেন এবং সেখানে পিতার জন্য তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করলেন। নিষাদরাজ দেবব্রতকে অত্যন্ত সমাদর করে বসালেন এবং সভাস্থলে এসে বললেন, 'ভরতবংশ-শিরোমণি ! রাজর্ষি শান্তনুর বংশরক্ষার জন্য আপনি একাই যথেষ্ট। তবুও এমন সম্বন্ধ ভেঙে গেলে ইন্দ্রকেও অনুতাপ করতে হবে। এই কন্যা যে শ্রেষ্ঠ রাজার কন্যা, তিনি আপনাদেরই সমমর্যাদা-সম্পন্ন। তিনি বারবার আমাকে অনুরোধ করছেন যাতে আমি সত্যবতীর বিবাহ রাজা শান্তনুর সঙ্গে দিই। দেবর্ষি এই কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি রাজি হইনি। পালনপোষণকারী হওয়ায় আমিও এই কন্যার পিতার মতো, তাই আমি বলছি এই বিবাহ-সম্বন্ধে একটাই দোষ আছে, তা হল সত্যবতীর পুত্রের শত্রু বড় প্রবল হবে। যুবরাজ ! আপনি যাঁর শত্রু হবেন, তিনি গন্ধর্ব বা অসুর যাই হোন না কেন, সে কখনো জীবিত থাকবে না। সেই কথা চিন্তা করেই আমি আপনার পিতাকে কন্যা সমর্পণ করিনি।' গঙ্গানন্দন দেবব্রত নিষাদরাজের কথা শুনে ক্ষত্রিয় সভার মধ্যে তাঁর পিতার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন—'নিষাদরাজ ! আমি শপথ নিয়ে এই প্রতিজ্ঞা

করছি যে, এঁর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, সেই আমাদের উত্তরাধিকারী হবে। আমার এই প্রতিজ্ঞা অভূতপূর্ব, আমার মনে হয় আমার আগে এমন প্রতিজ্ঞা কেউ কখনো করেননি।' নিষাদরাজের তখনও চাওয়ার কিছু বাকি ছিল, তিনি বললেন—'যুবরাজ ! আপনি সত্যবতীর জন্য যে প্রতিজ্ঞা করলেন, তা আপনারই উপযুক্ত, এতে কোনো সন্দেহই নেই। তবে আমার মনে আর একটি চিন্তা আছে, পাছে আপনার পুত্র সত্যবতীর পুত্রের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়।' দেবব্রত নিষাদরাজের মনের কথা বুঝে সেই ক্ষত্রিয়পূর্ণ সভায় দেবব্রত বললেন—'হে ক্ষত্রিয়গণ ! আমি প্রথমেই আমার

পিতার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করেছি, এবার তাঁর সন্তানদের জন্য প্রতিজ্ঞা করছি, নিষাদরাজ ! আজ থেকে আমি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করব। সন্তান না হলেও আমি অক্ষয় ধাম লাভ করব।'

দেবব্রতের এই কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনে নিষাদরাজ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন—'আমি কন্যা সমর্পণ করছি।' সেইসময় আকাশ থেকে দেবগণ, ঋষি এবং অপ্সরাগণ দেবব্রতের ওপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন এবং সকলে বলতে লাগলেন—'ইনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছেন, এঁর নাম 'ভীষ্ম' হওয়া উচিত।' তারপর দেবব্রত-ভীষ্ম সত্যবতীকে রথে করে হস্তিনাপুরে এনে পিতার হস্তে সমর্পণ করলেন। দেবব্রতের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা সর্বলোকে প্রচারিত হল। সকলেই বলতে লাগলেন ইনি সত্যই ভীষ্ম। ভীষ্মের এই দুষ্কর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে রাজা শান্তনু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বর দিলেন—'আমার নিষ্পাপ পুত্র ! তুমি যতদিন বাঁচতে চাও, ততদিন মৃত্যু তোমাকে কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার কাছে অনুমতি পেলেই সে তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে অর্থাৎ তুমি ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী হবে।'

—o—

চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের চরিত্র, ভীষ্মের পরাক্রম ও প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজর্ষি শান্তনুর পত্নী সত্যবতীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য। দুজনেই খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। চিত্রাঙ্গদ যৌবনপ্রাপ্তির আগেই শান্তনু স্বর্গলাভ করেন। সত্যবতীর সম্মতি নিয়ে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তিনি নিজ পরাক্রমে সকল রাজাকে পরাজিত করেন। কাউকেই তিনি নিজ সমকক্ষ বলে মনে করতেন না। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ যখন দেখলেন শান্তনু-নন্দন চিত্রাঙ্গদ নিজ বল পরাক্রম দ্বারা দেবতা, মানুষ এবং অসুরদের হীনবল করছেন তখন তিনি শান্তনু-পুত্রের ওপর আক্রমণ করলেন, কুরুক্ষেত্রের ময়দানে দুই চিত্রাঙ্গদের প্রচণ্ড লড়াই হল। তিন বৎসর ধরে সরস্বতী নদীর তীরে লড়াই চলল। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ খুব বড় মায়াবী ছিলেন, তাঁর হাতে রাজা চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হল। ভীষ্ম ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে ছোট ভাই বিচিত্রবীর্যকে রাজসিংহাসনে বসালেন। বিচিত্রবীর্য তখন বালক, তিনি ভীষ্মের নির্দেশানুযায়ী রাজ্যশাসন করতেন। আসলে তিনি ভীষ্মের নির্দেশ পালন করতেন, ভীষ্মই ছিলেন প্রকৃত রক্ষক।

ভীষ্ম যখন দেখলেন বিচিত্রবীর্য যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর বিবাহের কথা চিন্তা করলেন। সেই সময় তিনি সংবাদ পেলেন কাশীরাজের তিন কন্যার স্বয়ংবর হবে। তিনি মাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে একাকী রথে করে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। স্বয়ংবর সভায় যখন রাজাদের পরিচয় করানো হচ্ছিল তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে বৃদ্ধ এবং একাকী দেখে সুন্দরী কন্যারা হতচকিত হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁরা মনে করলেন এই বৃদ্ধ বিবাহের উদ্দেশ্যে এসেছে ! সেখানে উপস্থিত রাজন্যবর্গও নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাশা করে বলতে লাগলেন—'আরে, এই ভীষ্ম তো ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা করেছিল, এখন চুল সাদা করে, গায়ে লোলচর্ম নিয়ে লজ্জা পরিত্যাগ করে এখানে উপস্থিত হয়েছে কেন ?' এই সব দেখে শুনে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি বলপূর্বক তিন কন্যাকে তাঁর ভাইয়ের জন্য রথে তুলে নিলেন এবং বললেন—'ক্ষত্রিয়গণ ও বড় বড় ধর্মজ্ঞ মুনি ঋষি স্বয়ংবর বিবাহের প্রশংসা করে থাকেন। কিন্তু হে রাজন্যবর্গ ! আমি তোমাদের সামনে থেকে এই তিন কন্যাকে হরণ করলাম। তোমরা সকলে মিলে পারো তো আমাকে পরাজিত কর,

নাহলে এখান থেকে সরে যাও। আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি।' এইভাবে তিনি সমস্ত রাজা ও কাশীনরেশকে আহ্বান করে সেখান থেকে কন্যাদের নিয়ে রওনা হলেন।

ভীষ্মের কথায় সমস্ত রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর দিকে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এলেন। অত্যন্ত রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল। সকলে একত্রে ভীষ্মের ওপর হাজার হাজার বাণ নিক্ষেপ

করতে লাগলেন। ভীষ্ম একাই সমস্ত বাণ প্রতিহত করলেন। বাণের দ্বারা তাঁরা ভীষ্মকে আটকাতে চাইলেন, কিন্তু ভীষ্মের সামনে কোনো প্রতিরোধই দাঁড়াতে পারল না। সেই ভয়ানক যুদ্ধ দেবাসুর যুদ্ধের মতোই ছিল। ভীষ্ম এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র ধনুক, বাণ, ধ্বজা, কবচ এবং নরমুণ্ড কেটে ফেলেন। ভীষ্মের এই অলৌকিক যুদ্ধকৌশল এবং শক্তি দেখে শত্রুপক্ষের যোদ্ধারাও তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। বিজয়ী হয়ে ভীষ্ম কন্যাগণসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। তিনি কন্যা তিন জনকে বিচিত্রবীর্যের হাতে সমর্পণ করে বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। তখন কাশীনরেশের প্রথমা কন্যা অম্বা ভীষ্মকে বললেন—'ভীষ্ম ! আমি আগে থেকেই মনে মনে শল্যরাজকে পতি বলে মেনে নিয়েছি। আমার পিতারও এতে সম্মতি ছিল। আমি স্বয়ংবর সভাতে তাঁর গলাতেই বরমাল্য দিতাম। আপনি তো ধর্মজ্ঞ, আমার সর্বকথা শুনে আপনি ধর্মানুসারে আচরণ করুন।' ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে অম্বাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। অন্য দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরে বিচিত্রবীর্য অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দুই পত্নী তাঁকে সেবা করতে থাকেন। সাত বছর বিষয় ভোগ করার পর যৌবনকালেই বিচিত্রবীর্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং বহু চিকিৎসা করালেও তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ধর্মাত্মা ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি বিচিত্রবীর্যের অন্তিম-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন।

কিছুদিন পর সত্যবতী বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে ভীষ্মকে ডেকে পাঠালেন এবং ভীষ্ম এলে বললেন—'পুত্র ! ধর্মনিষ্ঠ পিতার পিণ্ডদান, যশ এবং বংশরক্ষার ভার তোমার ওপরেই নির্ভর করছে। আমি বিশ্বাস করে তোমাকে একটি কাজে নিযুক্ত করছি। তুমি সেই কাজ সম্পূর্ণ করো। তোমার ভাই বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেছে। তুমি কাশীরাজের পুত্রকামিনী কন্যাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে বংশ রক্ষা করো। আমার আদেশ মনে করে তোমার এই কাজ করা উচিত। তুমি রাজসিংহাসনে বসে প্রজাপালন করো।' শুধু মাতা সত্যবতী নয়, আত্মীয়-স্বজন সকলেই ভীষ্মকে এই কথা বলতে লাগলেন। তখন দেবব্রত-ভীষ্ম বললেন—'মাতা আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি তো জানেন আমি আপনার বিবাহের সময় কী প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ! আমি আবার প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি ত্রিলোকের রাজ্য, ব্রহ্মপদ এবং এই দুয়ের অধিক যে মোক্ষ তাও পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করব না। ভূমি গন্ধ ত্যাগ করতে পারে, আকাশ শব্দ ত্যাগ করতে পারে, চন্দ্র তার শীতলতা

ত্যাগ করতে পারে, ইন্দ্র তাঁর বল-বিক্রম ত্যাগ করতে পারেন, এমন কী স্বয়ং ধর্মরাজও তাঁর ধর্ম ত্যাগ করতে পারেন ; কিন্তু আমি আমার সত্যপ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করতে পারি না।' ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি শুনে সত্যবতী তখন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যাসদেবকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করতেই ব্যাসদেব এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—'মাতা ! আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?' সত্যবতী বললেন—'পুত্র ! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেছে তুমি তার স্থানে পুত্র উৎপাদন করো।' ব্যাসদেব মাতার নির্দেশ মেনে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর গর্ভসঞ্চার করেন। নিজ নিজ মাতার দোষে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং পাণ্ডু হরিৎবর্ণ হয়ে জন্মালেন। তখন অম্বিকার প্রেরণায় এক দাসীর গর্ভে ব্যাসদেবপুত্র বিদুর জন্মগ্রহণ করলেন। মহাত্মা মাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্মরাজ বিদুররূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন।

মাণ্ডব্য ঋষির কথা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! ধর্মরাজ এমন কী করেছিলেন, যার জন্য তাঁকে ব্রহ্মর্ষি অভিশাপ দিলেন এবং তাঁকে শূদ্রের গর্ভে জন্ম নিতে হয় ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! বহু দিন পূর্বের কথা, মাণ্ডব্য নামের এক যশস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, ধর্মজ্ঞ, তপস্বী এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর আশ্রমের দরজার সামনে এক বৃক্ষের নীচে তিনি হাত ওপরে তুলে তপস্যা করতেন এবং মৌনব্রত ধারণ করেছিলেন। কিছুদিন পরে এক দিন এক দল ডাকাত কিছু মালপত্র নিয়ে সেখানে এল। অনেক সিপাহী তাদের পিছন পিছন আসছিল, ডাকাতেরা তাদের ভয়ে মাণ্ডব্যঋষির আশ্রমে ডাকাতির জিনিসপত্রসহ লুকিয়ে রইল। সিপাহীরা এসে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করল 'ডাকাতেরা কোথায় গেল ? তাড়াতাড়ি বলুন, আমরা তাদের অনুসরণ করে আসছি।' মাণ্ডব্য কোনো উত্তর দিলেন না। রাজকর্মচারীরা তাঁর আশ্রম তল্লাশ করে চার জন ডাকাত এবং মালপত্র পেয়ে গেল। সিপাহীরা মাণ্ডব্য ঋষি এবং ডাকাতদের রাজার কাছে ধরে নিয়ে এল। রাজা বিচার করে সকলকেই শূলে চড়াবার আদেশ দিলেন। ঋষিকেও শূলে চড়ানো হল। অনেক দিন কেটে গেলেও বিনা খাওয়া-দাওয়াতেই মাণ্ডব্য শূলে বসে থাকলেন, তাঁর মৃত্যু হল না। তিনি প্রাণত্যাগ করেননি। ওখান থেকেই তিনি বহু ঋষিকে আমন্ত্রিত করতেন। রাত্রিযোগে ঋষিরা পক্ষীরূপে তাঁর কাছে আসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি কী অপরাধ করেছিলেন ? মাণ্ডব্য বলতেন—'আমি কার দোষ দেব ? এ আমারই অপরাধের ফল।'

প্রহরীরা দেখল ঋষিকে অনেকদিন শূলে চড়ানো হয়েছে, কিন্তু এ এখনও মরেনি। তারা গিয়ে রাজাকে সব জানাল। রাজা মাণ্ডব্যঋষির কাছে এসে প্রার্থনা জানালেন, 'আমি অজ্ঞানতাবশত অত্যন্ত অন্যায় করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর প্রসন্ন হোন।' মাণ্ডব্য রাজাকে কৃপা করে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি শূল থেকে

নেমে এলেন। যখন কোনোভাবেই তাঁর শরীর থেকে শূল বার করা গেল না, তখন সেটি কেটে দেওয়া হল। সেই শূলবিদ্ধ অবস্থায় তিনি তপস্যা করে দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হলেন। তখন থেকে তাঁর নাম হল অণীমাণ্ডব্য। মহর্ষি মাণ্ডব্য ধর্মরাজের সভায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি না জেনে

এমন কী কাজ করেছি, যার জন্য আমাকে এই ফল পেতে হল ? শীঘ্র উত্তর দিন, নচেৎ আপনি আমার তপস্যার ফল দেখবেন।' ধর্মরাজ বললেন—'আপনি একটি ছোট ফড়িংয়ের লেজে লোহার শিক ফুটিয়ে দিয়েছিলেন, এ তারই ফল। যেমন অল্প দানে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়, তেমনই অল্প অধর্মের কাজ করলেও তার জন্য অনেক বেশি ফল ভোগ করতে হয়।' অণীমাণ্ডব্য জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি এই কাজ কবে করেছি ?' ধর্মরাজ বললেন, 'শিশু বয়সে !' তখন অণীমাণ্ডব্য বললেন—'বালক বারো বছর বয়স পর্যন্ত যা কিছু করে, তাতে অধর্ম হয় না ; কারণ তখনও তার ধর্ম-অধর্মের কোনো জ্ঞান থাকে না। আপনি ছোট্ট অপরাধের অনেক বড় শাস্তি দিয়েছেন। আপনার জানা উচিত যে অন্য সমস্ত প্রাণীবধের থেকেও ব্রাহ্মণবধ অত্যন্ত গুরুতর। তাই আপনাকে শূদ্রযোনিতে জন্ম নিয়ে মানুষ হতে হবে। আজ থেকে আমি জগতে কর্মফলের মর্যাদা স্থাপন করছি। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত যে কর্ম করা হবে, তাতে কোনো পাপ হবে না, তার পরে যে কর্ম করা হবে তার ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।'

এই অপরাধের জন্য মাণ্ডব্য শাপ দিয়েছিলেন এবং ধর্মরাজ শূদ্রযোনিতে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিদুর ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ক্রোধ কিংবা লোভ তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী, শান্তির পক্ষপাতী এবং সমগ্র কুরুবংশের হিতৈষী ছিলেন।

—o—

ধৃতরাষ্ট্রদের বিবাহ এবং পাণ্ডুর দিগ্বিজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর জন্মগ্রহণ করায় কুরুবংশ, কুরুজাঙ্গল দেশ এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনেরই প্রভূত উন্নতি হয়। ধন-ধান্যে দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সময়মতোই ঋতু-পরিবর্তন হত। বৃক্ষাদি ফলে-ফুলে ভরে থাকত। পশু-পক্ষীও সুখে বসবাস করত। নগরে ব্যবসায়ী, কারিগর এবং বিদ্বানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সাধু-সন্তেরা সুখী হলেন, চোর-ডাকাতের ভয় থাকল না, পাপকর্মও কমে গিয়েছিল। শুধু রাজধানীতেই নয়, সারা দেশেই যেন সত্যযুগ ফিরে এসেছিল। কৃপণ ব্যক্তি বা বিধবা স্ত্রীলোক নজরে পড়ত না। ব্রাহ্মণদের গৃহে সর্বদা পূজা-অর্চনা হত। ভীষ্ম অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ধর্মরক্ষা করতেন। সেই সময় সর্বত্রই ধর্মের শাসন ছিল। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের কার্যে পুরবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। ভীষ্ম সযত্নে রাজকুমারদের রক্ষা এবং পালন-পোষণ করতেন। সকলেই নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। সকলেই গজশিক্ষা এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইতিহাস, পুরাণ এবং অন্য নানা বিদ্যায় তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত বিষয়েই তাঁরা তাঁদের নিশ্চিত মতামত রাখতে সক্ষম ছিলেন। পাণ্ডু ছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। সবথেকে বলশালী ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। ত্রিলোকে বিদুরের সমকক্ষ ধর্মজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি আর কেউই ছিলেন না। সেই সময় সকলেই বলতেন যে, বীরপ্রসবিনী মাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন কাশীনরেশের কন্যাগণ, দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুরুজাঙ্গল, ধর্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এবং নগরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হস্তিনাপুর। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ, বিদুর

ছিলেন দাসীপুত্র, তাই এঁরা দুজনে রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না, সেইজন্য পাণ্ডুই রাজা হলেন।

ভীষ্ম শুনেছিলেন গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী সর্বগুণসম্পন্না ও সুলক্ষণযুক্তা। তিনি মহাদেবের আরাধনা করে শতপুত্র লাভের বর লাভ করেছিলেন। তাই ভীষ্ম গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। প্রথমে সুবল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু পরে নানাদিক বিচার বিবেচনা করে এবং ধৃতরাষ্ট্রের কুল, শীল, সদাচার দেখে তিনি বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন। গান্ধারী যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর ভাবী স্বামী অন্ধ, তখন তিনি একটি বস্ত্র কয়েক ভাঁজ করে নিজের চোখ বেঁধে নিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন তিনিও তাঁর স্বামীর মতো নেত্রহীন হয়েই জীবন কাটাবেন। তাঁর ভ্রাতা শকুনি ভগিনী গান্ধারীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলে ভীষ্মের অনুমতিতে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। তিনি তাঁর চরিত্র এবং সদ্‌গুণে নিজ পতি এবং পরিজনদের প্রসন্ন করেছিলেন।

যদুবংশে পৃথা নামে অত্যন্ত সুন্দরী এক কন্যা ছিলেন।

বাসুদেব তাঁর ভ্রাতা। শূরসেন তাঁর পিসিমার ছেলে। কুন্তিভোজকে তাঁর কন্যা পৃথাকে দত্তক দিয়েছিলেন। কুন্তিভোজের ধর্মকন্যা পৃথা কুন্তী নামে পরিচিত হলেন। তিনি অত্যন্ত সাত্ত্বিক, সুন্দরী এবং সর্বগুণসম্পন্না ছিলেন। অনেক রাজাই তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাই কুন্তিভোজ স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। স্বয়ংবর সভায় কুন্তী বীরবর পাণ্ডুকে বরণ করলেন। রাজা পাণ্ডু বহু মূল্যবান সামগ্রীসহ নববধূ কুন্তীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। মহাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডুর আর একটি বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ; সেইজন্য তিনি সপরিষদ চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে মদ্ররাজার রাজধানীতে গেলেন। মাদ্রীর ভ্রাতা শল্য ভীষ্মের কথায় প্রসন্ন হয়ে মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ দিলেন। পাণ্ডু দুই স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

কিছুদিন পর রাজা পাণ্ডু দিগ্বিজয়ের কথা ভাবলেন। তিনি ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র এবং শ্রেষ্ঠ কুরুবংশীয়দের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে চতুরঙ্গ সেনাসহ দিগ্বিজয়ে বার হলেন। ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলপাঠ করে আশীর্বাদ করলেন। পাণ্ডু সর্বপ্রথম তাঁর শত্রু দশার্ণ রাজাকে আক্রমণ করলেন এবং জয়লাভ করলেন। তারপর রাজগৃহে গিয়ে প্রসিদ্ধ বীর মগধরাজকে বধ করলেন। সেখানে বহু ধন-রত্ন, যান-বাহন ইত্যাদি আহরণ করে তিনি বিদেহরাজকে আক্রমণ করে তাঁকে পরাস্ত করেন। এরপরে কাশী, পুণ্ড্র ইত্যাদি জয় করে বিজয় পতাকা অব্যাহত রাখেন। বহু রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। সকল পরাজিত রাজাই তাঁকে পৃথিবীর সম্রাটরূপে স্বীকার করে নেন এবং মণি, মাণিক্য, সোনা-রূপা, অশ্ব-রথাদি উপঢৌকনরূপে প্রদান করেন। পাণ্ডু সেইসব ধন-সম্পদ উপহারস্বরূপ পেয়ে রাজধানী হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। পাণ্ডুকে সুস্থ শরীরে রাজ্যে ফিরতে দেখে ভীষ্মের দুচোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। পাণ্ডু তাঁর আহরিত সমস্ত ধন-সম্পদ ভীষ্ম এবং সত্যবতীকে উপহার দিলেন।

ভীষ্ম রাজা দেবকের কাছ থেকে তাঁর এক সুন্দরী দাসীপুত্রী এনে পরম জ্ঞানী বিদুরের সঙ্গে বিবাহ দিলেন, তাঁর গর্ভে বিদুরের ন্যায় কয়েকজন গুণবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

———০———

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রাদির জন্ম এবং তাঁদের নাম

বৈশম্পায়ন বললেন—মহর্ষি ব্যাস একবার হস্তিনাপুরে গান্ধারীর কাছে এলেন। গান্ধারীর সেবা-যত্নে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গান্ধারীকে বর চাইতে বললেন। গান্ধারী তাঁর

পতির ন্যায় বলশালী একশত পুত্র হওয়ার বর চাইলেন। তার ফলে গান্ধারী গর্ভধারণ করলেন, কিন্তু দুবছর পর্যন্ত তা গর্ভেই থাকল, সন্তান জন্ম নিল না। ইতিমধ্যে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেছেন। নারী-স্বভাববশত গান্ধারী এতে দুঃখিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে গর্ভপাত করে দেন। তাঁর পেট থেকে লৌহপিণ্ডের ন্যায় এক মাংস পিণ্ড বেরিয়ে আসে। দুবছর গর্ভধারণ করার পরও সেটিকে ওই অবস্থায় দেখে গান্ধারী সেটি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভগবান ব্যাস যোগদৃষ্টিতে সব জানতে পেরে সেখানে এসে বললেন—'পুত্রী ! তুমি এ কী কাজ করছ ?' গান্ধারী ব্যাসদেবকে সব কথা জানিয়ে বললেন—'ভগবান ! আপনার আশীর্বাদে আমি আগে গর্ভধারণ করলেও কুন্তীর পুত্র প্রথমে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। দুবছর গর্ভধারণ করার পর একশত পুত্রের পরিবর্তে এই মাংসপিণ্ডটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এ কী হল ?' ব্যাসদেব বললেন—'আমার বর কখনো মিথ্যা হবে না, আমি পরিহাস করেও কখনো মিথ্যা কথা বলি না। এখন তুমি শীঘ্র একশতটি কুণ্ড ঘি দিয়ে পূর্ণ করো এবং সুরক্ষিত স্থানে সেটি রেখে এই মাংস পিণ্ডে ঠান্ডা জল ছেটাও।' ঠান্ডা জল দেওয়াতে পিণ্ডটি একশত টুকরো হল। প্রত্যেকটি টুকরো একটি আঙুলের গাঁটের সমান। তাতে আর একটি টুকরো বেশি ছিল। ব্যাসদেবের নির্দেশানুসারে সমস্ত টুকরোগুলি সেই ঘৃতকুণ্ডগুলিতে রাখা হল। তিনি বললেন 'দুবৎসর পরে এগুলি খুলবে'—বলে তিনি তপস্যা করতে হিমালয়ে চলে গেলেন। দুবছর পর সেই মাংস পিণ্ড হতে প্রথমে দুর্যোধন ও পরে অন্য পুত্রেরা জন্ম নেন। যুধিষ্ঠির এঁদের আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। দুর্যোধন যেদিন জন্ম নেন, সেই দিনই প্রবল পরাক্রমশালী ভীমসেনও ভূমিষ্ঠ হন।

দুর্যোধন জন্মেই গর্দভের মতো সুরে ডাকতে লাগলেন। সেই আওয়াজে গর্দভ, শিয়াল এবং কাক ডাকতে লাগল, ঝড় উঠল, কয়েক স্থানে আগুন লেগে গেল। এইসব শুনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হয়ে ব্রাহ্মণ, ভীষ্ম, বিদুর এবং আত্মীয়-পরিজন ও কুরুকুলের প্রধান ব্যক্তিদের ডেকে বললেন—'আমাদের বংশে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। নানাগুণের জন্য সে তো রাজা হবেই, তার সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু তারপরে আমার পুত্র রাজা হবে কি না, তা আপনারা বলুন।' ধৃতরাষ্ট্রের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাংসভোজী শিয়ালের দল ডেকে উঠল। অমঙ্গলসূচক অশুভ ইঙ্গিত দেখে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিদুর বললেন—'রাজন্ ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মের সময় যেরূপ অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যে আপনার এই পুত্র কুলনাশক হবে। তাই একে ত্যাগ করা উচিত। একে পালন করলে দুঃখই বাড়বে। আপনি যদি বংশের কল্যাণ চান তাহলে একশতের মধ্যে একজনকে ত্যাগ করাই ভালো, এই মনে করে একে ত্যাগ করুন এবং নিজ কুল ও জগতের মঙ্গলসাধন করুন। শাস্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, সমস্ত কুলের জন্য একজন মানুষ, সমস্ত গ্রামের জন্য একটি কুল এবং দেশের জন্য একটি গ্রাম এবং আত্মকল্যাণের জন্য পৃথিবীই পরিত্যাগ করা কর্তব্য।' সকলে একত্র হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক বোঝালেও পুত্রস্নেহবশত রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারলেন না। সেই একশত এক টুকরো মাংসপিণ্ড থেকে একশত পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়। গান্ধারী গর্ভবতী থাকার সময় এক বৈশ্য-কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করত, তার

গর্ভে যুযুৎসু নামক ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র জন্ম নেন। সেই পুত্র অত্যন্ত যশস্বী ও বিচারশীল ছিলেন।

জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের নাম হল—দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুস্সহ, দুশ্শল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্য, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রবাণ, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, দুর্বিমোচন, আয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদঃসুবাক, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ডী, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্মা, দৃঢ়থাশ্রয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবি, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢোরস্ক, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী এবং বিরজা। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যার নাম ছিল দুঃশলা। এঁরা সকলেই বড় বীর, যুদ্ধকুশল এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এঁদের সকলেরই যথাযোগ্য সময়ে সুন্দরী কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করেন। কন্যা দুঃশলার বিবাহ হয় রাজা জয়দ্রথের সঙ্গে।

—o—

ঋষিকুমার কিন্দমের শাপে পাণ্ডুর বৈরাগ্য

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! আপনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্মকথা এবং তাঁদের নাম জানালেন। আমি এখন পাণ্ডবদের জন্মকথা শুনতে চাই।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা পাণ্ডু একবার বনে বিচরণ করছিলেন। সেই বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে তিনি দেখলেন এক যূথপতি মৃগ তার পত্নী মৃগীর সঙ্গে মৈথুনে রত। পাণ্ডু তাদের ওপর পাঁচটি বাণ ছুঁড়লেন, মৃগ-মৃগী দুজনেই বাণবিদ্ধ হল। মৃগ বলল—'রাজন্ ! যারা অত্যন্ত কামাসক্ত, ক্রোধী, বুদ্ধিহীন এবং পাপী তারাও এমন ক্রূর কর্ম করে না। আপনার তো এইসব পাপী ও ক্রূরকর্মা ব্যক্তিদের দণ্ড প্রদান করা উচিত। আমার মতো নিরাপরাধকে মেরে আপনার কী লাভ হল ? আমি কিন্দম নামের এক তপস্বী। মানুষ হয়ে আমার এই কাজ করতে লজ্জাবোধ হওয়ায় মৃগ হয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিহার করছিলাম। আমি প্রায়শই এইরূপ বেশধারণ করে বেড়াতে বার হই। আমাকে বধ করার জন্য আপনি ব্রহ্মহত্যার পাতক হবেন না, কারণ আপনি তা জানতেন না। কিন্তু যে অবস্থায় আপনি আমাকে হত্যা করছেন, তা অত্যন্ত অনুচিত কাজ। অতএব আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেন, তাহলে সেই অবস্থায় আপনার মৃত্যু হবে এবং আপনার স্ত্রীও আপনার সহগামী হবেন।' এই বলে কিন্দম প্রাণত্যাগ করলেন।

মৃগরূপধারী কিন্দম মুনির মৃত্যুতে সপত্নীক পাণ্ডু এত দুঃখিত হলেন, যেন তাঁর কোনো প্রিয় আত্মীয় মারা গেছেন। পাণ্ডু শোকার্ত হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'অনেক কুলীন ব্যক্তিও নিজ চিত্তকে বশ

করতে না পেরে এই কামের ফাঁদে আবদ্ধ হয় এবং নিজেদের দুর্গতি নিজেরাই ডেকে আনে। আমি শুনেছি ধর্মাত্মা শান্তনুর পুত্র, আমার পিতা বিচিত্রবীর্যও কামবাসনার জন্য অল্পবয়সেই মারা যান। আমি তাঁরই পুত্র। হায় হায় ! আমি কুলীন এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তবুও আমার বুদ্ধি এত ক্ষীণ হয়ে গেল। আমি এবার সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ করে মোক্ষলাভ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হব এবং আমার পিতা মহর্ষি ব্যাসের মতো আমার জীবন-নির্বাহ করব। আমি ঘোর তপস্যা করব, এক একটি বৃক্ষের নীচে এক একদিন নির্জনে বাস করব এবং মৌনী সন্ন্যাসী হয়ে আশ্রমগুলিতে ভিক্ষা করে দিন কাটাব। প্রিয়-অপ্রিয়ের চিন্তা ত্যাগ করে শোক-হর্ষের অতীত হয়ে উঠব, নিন্দা ও স্তুতি উভয়ই আমার কাছে সমান হবে। আশীর্বাদ, নমস্কার, সুখ-দুঃখ এবং পরিগ্রহ রহিত হয়ে কারো প্রতি ক্রোধ এবং বিদ্বেষ রাখব না। সর্বদা প্রসন্ন থাকব, সকলের মঙ্গল করব এবং চরাচরের কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেব না। সকল প্রাণীকে নিজের সন্তানের মতো দেখব। মিতাহারী হব, কখনো উপবাসে থাকব। লাভ-অলাভে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হব। কেউ যদি আমার একটি হাত কেটে অন্য হাতে চন্দন লেপন করে, তাহলেও আমি কিছু বলব না। আমি বাঁচতেও চাইব না,

মরতেও নয়। জীবিত অবস্থায় মানুষ নিজ মঙ্গল কামনায় যেসব কর্ম করে, আমি তার কোনোটাই করব না ; কারণ এগুলি সবই কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অবিদ্যার জাল কেটে ফেলব। প্রকৃতি ও প্রাকৃত পদার্থের অধীনতা থেকে মুক্ত হব এবং বায়ুর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করব। যে সব ব্যক্তি সম্মান ও অপমানে প্রভাবিত হয়ে কামনার বশবর্তী হয়ে সেই অনুসারে চলতে চেষ্টা করে, তারা কুকুরের প্রদর্শিত পথে চলে।'

এইসব চিন্তা-ভাবনা করে পাণ্ডু দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্তী ও মাদ্রীকে বললেন, 'তোমরা রাজধানীতে যাও, সেখানে আমার মাতা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহী সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিত, ব্রাহ্মণ, মহাত্মা, আত্মীয়-স্বজন, নগর-বাসীগণ সকলকে প্রসন্ন করে বলবে পাণ্ডু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে।' কুন্তী এবং মাদ্রী পাণ্ডুর কথা শুনে এবং তাঁর বনে বাস করা নিশ্চিত জেনে বললেন, 'আর্যপুত্র ! সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়াও এমন আশ্রমও তো আছে, যেখানে আপনি আমাদের সঙ্গে মহাতপস্যা করতে পারেন। আমরা আপনার সঙ্গে স্বর্গেও যাব এবং সেখানে আপনাকেই পতিরূপে লাভ করব। আমরা দুজনেই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে কামজনিত সুখ/ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গেও আপনাকে পাবার আশায় আপনার সঙ্গেই মহাতপস্যা করব। মহারাজ ! আপনি যদি আমাদের ছেড়ে চলে যান, তাহলে আমরা অতি অবশ্যই প্রাণ বিসর্জন দেব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

পত্নীদের দৃঢ়সিদ্ধান্ত দেখে পাণ্ডু বললেন—'তোমরা যদি ধর্মানুসারে তাই করবে বলে নিশ্চিত হয়ে থাক, তাহলে তাই হোক। আমি সন্ন্যাস না নিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনেই থাকব। বিষয়সুখ এবং উত্তেজক খাদ্য পরিহার করে ফল-মূল গ্রহণ করব, বল্কল পরিধান করব এবং ঘোর তপস্যা করে বনে বনে বিচরণ করব, দিনে দুবার স্নান-সন্ধ্যাদি করব এবং জটাধারণ করব। গরম-ঠাণ্ডা বা বৃষ্টিবাদলে ভয় পাব না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় লক্ষ্য দেব না এবং দুশ্চর তপস্যা করে শরীর কৃশ করব। নির্জনবাস করে পরমাত্মার চিন্তা করব। ফল-মূল, জল ও বাক্যে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের সন্তুষ্ট করব। কোনো বনবাসীর অপ্রিয়কর্ম করব না। আমি বানপ্রস্থের কঠোর থেকে কঠোরতম নিয়ম আমৃত্যু পালন করব।' পত্নীদের এইসব বলে পাণ্ডু তাঁর উত্তম বসন ও অলংকারাদি ব্রাহ্মণদের দান করে বললেন—'হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা হস্তিনাপুরে গিয়ে

বলুন যে, পাণ্ডু অর্থ, কাম এবং বিষয়সুখ পরিত্যাগ করে পত্নীদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছে।' তাঁর এই বাক্যে তাঁর পরিচারক ও পরিজনেরা দুঃখপ্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁদের চোখে জল এসে গেল। তাঁরা বিমর্ষ বদনে পাণ্ডুর মূল্যবান জিনিস-পত্র নিয়ে হস্তিনাপুর এসে পাণ্ডুর অনুপস্থিতিতে রাজকার্য পরিচালনকারী ধৃতরাষ্ট্রকে সব দিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। নিজের ভাইয়ের এই খবর শুনে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি সর্বক্ষণ পাণ্ডুর কথাই ভাবতে লাগলেন।

এদিকে পাণ্ডু পত্নীসহ নানা দেশ ঘুরে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। তিনি শুধু ফল-মূল খেয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। মাটিতে শয্যা নিতেন। বড় বড় সাধু-মহাত্মা তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখতেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ছেড়ে হংসকূট শিখর পার হয়ে তিনি শতশৃঙ্গ পর্বতে এসে তপস্যারত হলেন। সেখানে সিদ্ধ-চারণগণ তাঁর প্রতি প্রীতিপূর্ণ ছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডু সকলের সেবা করতেন এবং মন-ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে কাজ করতেন, কখনো অহংকার দেখাতেন না। সেখানে কেউ তাঁকে ভাই, কেউ বন্ধু, আবার কেউ পুত্রের মতো দেখাশোনা করতেন। এইভাবে পাণ্ডুর তপস্যা চলতে লাগল।

পাণ্ডবদের জন্ম এবং পাণ্ডুর পরলোক-গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সেদিন অমাবস্যা তিথি। ব্রহ্মাকে দর্শনের নিমিত্ত অনেক বড় বড় ঋষি-মহর্ষি ব্রহ্মলোক যাত্রা করছিলেন। পাণ্ডু তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?' সকলে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার দর্শনে যাচ্ছেন শুনে পাণ্ডুও তাঁর পত্নীদের নিয়ে তাঁদের অনুগামী হলেন। ঋষিরা বললেন—'রাজন্ ! পথ অতি দুর্গম। বিমানের ভীড়ে ভর্তি অপ্সরাদের ক্রীড়াস্থল, ভীষণ দুর্গম-পর্বত, নদীপাত। চতুর্দিকে বরফ, কোনো বৃক্ষ সেখানে নেই। পশু-পক্ষীও নজরে পড়ে না। সেখানে শুধু বায়ু এবং সিদ্ধ ঋষি ও মহর্ষিরা যেতে পারেন। এরূপ দুর্গম পথে রাজকুমারী কুন্তী ও মাদ্রী কীভাবে হাঁটবেন ? আপনি আপনার পত্নীদের নিয়ে এই দুর্গম যাত্রা করবেন না।' পাণ্ডু বললেন—'আমি জানি সন্তানহীনের জন্য স্বর্গের দ্বার বন্ধ। এই কথা ভেবে আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছি। মানুষ চার ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে—পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ এবং মনুষ্য-ঋণ। যজ্ঞদ্বারা দেবতা, স্বাধ্যায় এবং তপস্যা দ্বারা ঋষি, পুত্র এবং শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃপুরুষ এবং পরোপকার দ্বারা মনুষ্য ঋণ শোধ করা যায়। আমি সব ঋণ থেকে মুক্ত হলেও পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পাইনি। আমার ইচ্ছা যে আমার পত্নীর গর্ভে পুত্র জন্ম নিক।' ঋষিরা বললেন— 'ধর্মাত্মন্ ! আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার দেবসদৃশ পুত্র হবে। আপনি আপনার এই দেবদত্ত অধিকার ভোগ করার চেষ্টা করুন। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।' পাণ্ডু ঋষিদের কথা শুনে চিন্তিত হলেন। কেননা তিনি জানতেন কিন্দম ঋষির অভিশাপে স্ত্রী-সহবাস করতে তিনি অক্ষম।

একদিন পাণ্ডু তাঁর যশস্বিনী পত্নী কুন্তীকে বললেন—'প্রিয়ে ! তুমি পুত্রলাভের জন্য চেষ্টা কর।' কুন্তী

বললেন —'আর্যপুত্র ! আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার পিতা আমাকে অতিথিদের সেবা-শুশ্রূষা করার ভার সমর্পণ করেন। সেই সময় আমি দুর্বাসা নামক ঋষিকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলাম। তাতে তিনি আমাকে বর প্রদান করে এক মন্ত্র শিখিয়ে দেন এবং বলেন, 'এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনি চান বা না চান তোমার অধীন হবেন।' আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে আমি কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারি, তাঁর

সাহায্যেই আমার সন্তান হবে। আপনি বলুন, কোন দেবতাকে আহ্বান করব ?' পাণ্ডু বললেন—'আজ তুমি বিধিপূর্বক ধর্মরাজকে আহ্বান কর। ত্রিলোকে তিনিই শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা। তাঁর দ্বারা যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, নিঃসন্দেহে সে ধার্মিক হবে, তার মন কখনো অধর্মপথে যাবে না।'

কুন্তী তখন ধর্মরাজকে আহ্বান করে দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। সেই মন্ত্র প্রভাবে ধর্মরাজ সূর্যের ন্যায় আভাযুক্ত বিমানে করে কুন্তীর কাছে এলেন এবং প্রসন্ন হাস্যে বললেন—'কুন্তী ! বলো তুমি কী চাও ?' কুন্তী বললেন, 'আমাকে একটি পুত্র সন্তান দিন।' ধর্মরাজের সংযোগে কুন্তী গর্ভধারণ করেন এবং শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথি, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, অভিজিৎ মুহূর্তে তুলারাশিতে তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন[১]। জন্ম হতেই আকাশবাণী হল—'এই বালক ধর্মাত্মা মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন ; ইনি সত্যবাদী এবং বীর তো হবেনই, সমগ্র পৃথিবী ইনি শাসন করবেন। পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্রের নাম হবে 'যুধিষ্ঠির', ত্রিলোকে ইনি যশস্বী হবেন।'

কিছুদিন পর পাণ্ডু আবার কুন্তীকে বললেন—'প্রিয়ে ! ক্ষত্রিয় জাতি বলপ্রধান হয়ে থাকে। সুতরাং এমন পুত্রের জন্ম দাও, যে বলশালী হবে।' পতির নির্দেশে কুন্তী বায়ুকে আহ্বান করলেন। মহাবলী পবনদেব হরিণে চড়ে এলেন। কুন্তীর অনুরোধে তাঁর দ্বারা কুন্তীর গর্ভে ভীষণ পরাক্রমশালী এবং বলশালী ভীমসেন জন্ম নিলেন। সেই সময়ও দৈববাণী হল 'এই পুত্র বলবানদের শিরোমণি হবে।' জনমেজয় ! ভীমসেন জন্মগ্রহণ করতেই এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। ভীমসেন তাঁর মাতার ক্রোড়ে ঘুমোচ্ছিলেন। সেইসময় সেখানে একটি বাঘ এলো, কুন্তী ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। ভীমসেনের কথা তাঁর মনে ছিল না। ভীম মাতার ক্রোড় থেকে পাথরের চাতালে পড়ে গেলেন আর চাতালটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ পাথরের টুকরো দেখে পাণ্ডু চমকিত হলেন। যেদিন ভীমসেনের জন্ম হয় সেদিনই দুর্যোধন জন্মেছিলেন।'

পাণ্ডু এবার চিন্তা করলেন 'আমার যাতে এমন একজন পুত্র হয় যাকে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানা হবে ! ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি যদি কোনোরূপে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এক সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র দান করেন !' এরূপ চিন্তা করে তিনি কুন্তীকে এক বছর ধরে ব্রত করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং স্বয়ং সূর্যের সামনে এক পায়ে দণ্ডায়মান হয়ে একাগ্রভাবে উগ্র তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র প্রকটিত হয়ে বললেন, 'তোমাকে আমি এক জগদ্‌বিখ্যাত, ব্রাহ্মণ, গো এবং সুহৃদের সেবাকারী

এবং শত্রু সন্তাপকারী শ্রেষ্ঠ পুত্র দান করব।' তখন পাণ্ডু কুন্তীকে বললেন—'প্রিয়ে ! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে বরলাভ করেছি। এবার তুমি পুত্রের জন্য তাঁকে আহ্বান করো।' কুন্তী পাণ্ডুর নির্দেশ মেনে নিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রকটিত হলেন এবং অর্জুনের জন্ম হল। অর্জুনের জন্মের সময় আকাশকে প্রকম্পিত করে আকাশবাণী হল—'কুন্তী ! এই বালক কার্তবীর্য অর্জুন এবং ভগবান শংকরের মতো পরাক্রমশালী এবং ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজিত থেকে তোমার যশ বৃদ্ধি করবেন। বিষ্ণু যেমন তাঁর মাতা অদিতিকে প্রসন্ন করেছিলেন, এই বালকও তেমনই তোমাকে প্রসন্ন করবেন। এই বালক বহু সামন্ত এবং রাজাদের পরাজিত করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। স্বয়ং ভগবান রুদ্র এঁর পরাক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে অস্ত্রদান করবেন। এই বালক ইন্দ্রের নির্দেশে নিবাত কবচ নামক অসুরদের বধ করবেন এবং বহু দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি

[১]এই যোগ সাধারণত আশ্বিন শুক্ল পঞ্চমীতে হয়।

প্রাপ্ত হবেন।' এই আকাশবাণী শুধু কুন্তীই নয় সকলেই শুনতে পেলেন। এতে মুনি-ঋষি, দেবতা ও সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ইন্দ্রাদি দেবগণ, সপ্তর্ষি, প্রজাপতি, গন্ধর্ব, অপ্সরা—এঁরা সকলেই দিব্য বস্ত্রভূষণে সুসজ্জিত হয়ে অর্জুনের জন্মের জন্য আনন্দোৎসব করতে লাগলেন। দেবতাদের এই উৎসব শুধু মুনি-ঋষিরাই দেখতে পেলেন, সাধারণ মানুষরা নয়।

পরে একদিন মাদ্রীর অনুরোধে পাণ্ডু কুন্তীকে একান্তে ডেকে বললেন—'তুমি প্রজা ও আমার প্রসন্নতার জন্য এক কঠিন কাজ করো, এতে তোমার যশবৃদ্ধি হবে। লোকে যশের জন্য আগেও অনেক কঠিন কঠিন কাজ করেছে। কাজটি এই যে, মাদ্রীর গর্ভে যেন পুত্র উৎপন্ন হয়।' পাণ্ডুর আদেশ শিরোধার্য করে কুন্তী মাদ্রীকে বললেন—'বোন ! তুমি একবার কোনো দেবতাকে স্মরণ করো। তাঁর দ্বারা তুমি সেই মতো পুত্র লাভ করবে।' মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করলেন। তখন অশ্বিনীকুমারেরা এসে মাদ্রীর গর্ভে দুটি পুত্র উৎপাদন করলেন। দুই অনুপম রূপবান বালক নকুল ও সহদেব মাদ্রীর ক্রোড়ে জন্ম নিলেন। সেই সময় আকাশবাণী হল, 'এই দুই বালক বল, রূপ এবং গুণে অশ্বিনীকুমারদের থেকেও বড় হবে। এরা রূপ, দ্রব্য, সম্পত্তি এবং শক্তিতে জগতে শ্রেষ্ঠ হবে।'

শতশৃঙ্গ পর্বতে বসবাসকারী ঋষিগণ পাণ্ডুকে ধন্যবাদ এবং বালকদের আশীর্বাদ দিয়ে তাঁদের নামকরণ করলেন—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। এঁরা সকলে এক বছরের ছোট ছিলেন। এঁরা ছোট বয়সে ঋষি ও ঋষিপত্নীদের খুব প্রিয় ছিলেন। রাজা পাণ্ডুও পত্নী ও পুত্রদের সঙ্গে সুখে বসবাস করছিলেন।

বসন্ত ঋতুর আগমনে সমস্ত বন পুষ্পভারে সজ্জিত হয়েছিল। সেই শোভা দেখে সকল প্রাণীই মুগ্ধ ও আনন্দিত। রাজা পাণ্ডু বনে বিচরণ করছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন পত্নী মাদ্রী। সুন্দর সাজসজ্জা করায় তাঁকে খুব সুন্দর লাগছিল। একে যৌবনকাল, তাতে সুন্দর সাজসজ্জা, মুখে মনোহর হাসি, এইসব দেখে পাণ্ডুর মনে কামভাবের সঞ্চার হল, যেন বনে আগুন লেগে গেছে। তিনি সবলে মাদ্রীকে কাছে টেনে নিলেন, মাদ্রী যথাশক্তি তাঁকে সংযত করার এবং নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। কামের নেশায় পাণ্ডু এত মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন যে অভিশাপের কথা তাঁর মনে ছিল না। কামবশ হয়ে তিনি মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেন, তখনই তাঁর চেতনা নষ্ট হয়ে গেল। মাদ্রী তাঁর শব জড়িয়ে ধরে আর্তকণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন। কুন্তী পাঁচ পুত্রকে সঙ্গে করে সেখানে এলেন। তাঁরা কিছু দূরে থাকতেই মাদ্রী বললেন—'দিদি, পুত্রদের একটু দূরে রেখে তুমি এসো।' এই অবস্থা দেখে কুন্তী শোকগ্রস্ত হলেন। তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন—'আমি সর্বদাই আমার স্বামীকে রক্ষা করেছি, শাপের কথা জেনেও উনি আজ কেন তোমার কথা শুনলেন না ?' মাদ্রী বললেন—'দিদি ! আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলাম, কিন্তু এটিই হওয়ার ছিল, তাই উনি মনকে বশে রাখতে পারেননি।' কুন্তী বললেন—'এখন তুমি পতিদেবকে ছেড়ে এদিকে এসে পুত্রদের দেখাশোনা করো। আমি এঁর প্রথমা স্ত্রী, তাই আমারই সতী হওয়ার অধিকার, আমি এঁর অনুগমন করব।' মাদ্রী বললেন—'দিদি, ধর্মাত্মা পতির সঙ্গে আমিই সতী হব। আমি এখন যুবতী, আমারই এঁর সঙ্গে সহগমন করা উচিত। তুমি আমার বড়, এটুকু অধিকার আমাকে দাও। আমার পুত্রদের তুমি নিজের পুত্রের মতো দেখো। আমার ওপর আসক্তির জন্যই এঁর মৃত্যু ঘটেছে, তার জন্যও তাই আমারই সতী হওয়া উচিত।' এই কথা বলে মাদ্রী তাঁর পতির চিতায় আরোহণ করে পরলোক গমন করলেন।

—o—

কুন্তী এবং পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আগমন এবং পাণ্ডুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডুর মৃত্যুতে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। তাঁরা চিন্তা করলেন যে, 'পরম যশস্বী মহাত্মা পাণ্ডু নিজ রাজ্য ও দেশ ছেড়ে এই স্থানে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে আমাদের শরণ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছোট ছোট রাজপুত্র এবং পত্নীকে মর্ত্যে রেখে স্বর্গগমন করেছেন। আমাদের উচিত পত্নী-পুত্র এবং তাঁর অস্থি হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেওয়া। এ আমাদের ধর্ম।' এই পরামর্শ করে তাঁরা ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডবদের সমর্পণ করার জন্য হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা হস্তিনাপুরের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছলেন। নগরবাসীরা দেবতা, চারণ ও মুনিদের আগমন বার্তা পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হল। তারা ঘর-দ্বার ছেড়ে এঁদের দর্শন করতে দলে দলে চলে এল। সেই সময় কোনো ভেদ-ভাব ছিল না। ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সত্যবতী, কাশীরাজের কন্যাগণ, গান্ধারী, দুর্যোধন ও তাঁর ভাইয়েরা সকলেই হাজির হলেন। সকলে আগত মহর্ষিদের প্রণাম করলেন। কোলাহল শান্ত হলে ভীষ্ম ঋষিদের আপ্যায়ন করে কুশল-সংবাদ আদান-প্রদান করলেন। তখন সকলের সম্মতিক্রমে একজন ঋষি বলতে লাগলেন—'কুরুবংশ শিরোমণি রাজা পাণ্ডু বিষয়াদি ত্যাগ করে শতশৃঙ্গ পর্বতে বাস করছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। কিন্তু দিব্য মন্ত্রের প্রভাবে ধর্মরাজের অংশে যুধিষ্ঠির, পবনরাজের অংশে ভীমসেন, ইন্দ্রের অংশে অর্জুন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। প্রথম তিনজন কুন্তীর গর্ভে এবং শেষের দুজন মাদ্রীর গর্ভে জন্ম নেন। এঁদের জন্ম, বৃদ্ধি, বেদাধ্যয়ন দেখে পাণ্ডু অত্যন্ত খুশি হতেন ; কিন্তু আজ সতেরো দিন হল তিনি পিতৃলোকে গমন করেছেন। মাদ্রীও তাঁর সঙ্গে সহগমন করেছেন। এখন আপনাদের যা উচিত বলে মনে হয়, তাই করুন। এইগুলি ওঁদের দুজনের অস্থি আর এঁরা হলেন পাণ্ডুর পুত্র। আপনারা এই শিশুদের এবং তাঁদের মায়ের ওপর কৃপাদৃষ্টি দিন। প্রেতকার্য সমাপ্ত হলে রাজা পাণ্ডুর জন্য পিতৃমেধ যজ্ঞ করবেন।' এই বলে ঋষি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অন্তর্ধান করলেন। সকলেই এই সিদ্ধ তপস্বীদের দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুরকে নির্দেশ দিলেন, 'বিদুর ! মহারাজ পাণ্ডু এবং মহারানি মাদ্রীর রাজোচিত সম্মানের সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করো এবং পশু, বস্ত্র, অন্ন এবং ধন দান করো।' বিদুর তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়ে ভীষ্মের সম্মতিক্রমে গঙ্গার পবিত্র তীরে পাণ্ডু ও মাদ্রীর ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করালেন। পাণ্ডুর বিয়োগব্যথায় নগরবাসী সকলেই ক্রন্দন করতে লাগলেন। পাণ্ডব, কৌরব, আত্মীয়-কুটুম্ব, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, পুরবাসী সকলেই বারোদিন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভূমিশয্যায় শয়ন করলেন। নগরে কোনো স্থানে হর্ষ বা উল্লাসের লেশমাত্র ছিল না। কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম একত্রে পাণ্ডুর ও মাদ্রীর শ্রাদ্ধকার্য করলেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন এবং বহু ধন-রত্ন দান করলেন। পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হলে সকলে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

—o—

সত্যবতীর দেহত্যাগ এবং ভীমসেনকে দুর্যোধনের বিষপ্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডুর প্রয়াণে আত্মীয়েরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। পিতামহী সত্যবতী দুঃখ শোকে উন্মত্তপ্রায় হয়ে গেলেন। ব্যাসদেব তাঁর মাতাকে শোকে ব্যাকুল দেখে বললেন—'মাতা ! এখন সুখের সময় চলে গেছে, দুঃখের দিন আগত। দিন দিন পাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবী বৃদ্ধা হচ্ছে, ছল-চাতুরী-কপটতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ম-কর্ম-সদাচার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কৌরবদের অন্যায় কর্মের ফলে ভীষণ যুদ্ধ হবে। তুমি এখন সংসার ত্যাগ করে যোগকর্মে মনোনিবেশ করো। নিজ চক্ষে বংশের নাশ দেখা উচিত নয়।' মাতা সত্যবতী তাঁর কথা মেনে নিয়ে অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে এই সব কথা জানালেন এবং ভীষ্মের অনুমতি নিয়ে এঁদের দুজনকে নিয়ে বনগমন করলেন। বনে ঘোর তপস্যা করে তাঁরা তিন জনে দেহত্যাগ করলেন এবং অভীষ্ট গতি লাভ করলেন।

পাণ্ডবদের বৈদিক সংস্কার সম্পন্ন হল। তাঁরা পিতৃগৃহে থেকে বড় হতে লাগলেন। বাল্যকালে তাঁরা আনন্দে দুর্যোধনদের সঙ্গে খেলাধুলা করে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। ভীমসেন দৌড়ে, লক্ষ্যভেদে, খাওয়া-দাওয়াতে সর্ব-ব্যাপারেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ভীমসেন একাই সব ভাইয়ের চুল ধরে টেনে আনতেন, এতে অনেকেরই শরীরে আঘাত লাগত। দশজন বালককে একাই দুহাতে জলে ডুবিয়ে নাকাল করতেন। দুর্যোধনাদি বালকগণ যখন গাছে উঠতেন ফল পাড়ার জন্য, ভীম হাতে করে গাছ এমন দোলাতেন যে, ফলের সঙ্গে বালকরাও গাছ থেকে পড়ে যেত। ভীমসেনের সঙ্গে কুস্তী বা দৌড়ে কেউই সমকক্ষ ছিল না। ভীমসেনের মনে কোনো শত্রুভাব ছিল না। কিন্তু দুর্যোধন ভীমের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন। অন্তঃকরণের মালিন্যবশত তিনি ভীমের সব কাজেই দোষ ধরতেন। মোহ ও লোভবশত দোষ চিন্তা করতে করতে দুর্যোধন নিজেই দোষী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে, নগর উদ্যানে ভীমসেন ঘুমিয়ে পড়লে তাঁকে গঙ্গায় ফেলে দেবেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে বন্দি করে সমগ্র পৃথিবীর রাজা হবেন। এই স্থির করে দুর্যোধন সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

একবার দুর্যোধন জলবিহার করার জন্য গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটিতে বড় বড় তাঁবু ফেলেছিলেন। সেখানে সকলের জন্য পৃথক পৃথক ঘর তৈরি করা হয়েছিল। সেই জায়গাটির নাম রাখা হয়েছিল উদকক্রীড়ন। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার খুব ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুর্যোধনের অনুরোধে যুধিষ্ঠির সেখানে যেতে রাজি হয়েছিলেন। তারপর সকলে মিলে রথে, হাতিতে, ঘোড়ায় করে রওনা হলেন। প্রজারা সঙ্গে যেতে চাইলে দুর্যোধন তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন। নানা বন-উপবন ও সরোবর দেখতে দেখতে তাঁরা গঙ্গাতীরের উদ্যানে এসে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে রাজকুমারগণ খাওয়া-দাওয়া, হাসি-গল্পে মেতে উঠলেন। দুরাত্মা দুর্যোধন ভীমসেনকে হত্যা করার বদ মতলবে তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে রেখেছিলেন। তারপরে অত্যন্ত মিষ্টভাষায় ভাইয়ের মতো আগ্রহ করে ভীমকে সব পরিবেশন করে খাওয়ালেন, ভীমও সবকিছু আনন্দের সঙ্গে খেয়ে নিলেন। দুর্যোধন ভাবলেন, 'ঠিক হয়েছে, এবার কাজ হবে।' তারপর সকলে মিলে জলক্রীড়া করতে

গেলেন। জলক্রীড়া করতে করতে ভীমসেন ক্লান্ত হয়ে তীরে এসে শুয়ে পড়লেন। তাঁর শিরায় বিষ প্রবাহিত হওয়ার ফলে তিনি চেতনাশূন্য হয়ে পড়লেন। দুর্যোধন তখন তাঁকে মৃতের মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। সেই অবস্থাতে ভীম নাগলোকে গিয়ে পৌঁছলেন, সেখানে বিষধর সাপেরা তাঁকে খুব দংশন করল। সাপের বিষ মিশে যাওয়ায় ভীমের দেহের কালকূট বিষের তেজ স্তিমিত হয়ে গেল এবং ভীমসেনের চেতনা ফিরে এল। ভীম তখন আবার সতেজে সাপেদের ধরে মারতে লাগলেন। অনেক সাপ মরে গেল, অনেকে পালিয়ে বেঁচে গেল। সেই সাপেদের কাছে নাগরাজ বাসুকি সব বৃত্তান্ত শুনলেন।

বাসুকি নাগ নিজে ভীমসেনের কাছে এলেন। তাঁর সঙ্গী আর্যক নাগ ভীমসেনকে চিনতে পারলেন। আর্যক নাগ ভীমের মাতামহের মাতামহ ছিলেন। তিনি ভীমকে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করলেন। বাসুকি আর্যককে জিজ্ঞাসা করলেন ভীমকে কী উপহার দেওয়া যায় ? ভীমকে প্রচুর ধনরত্ন দেওয়া হোক। আর্যক বললেন, 'কিন্তু ইনি ধনরত্ন নিয়ে কী করবেন ? তার থেকে এঁকে যদি পবিত্র কুণ্ডের রস খাওয়ানো যায়, তাহলে ইনি সহস্র হাতির বল লাভ করবেন।' নাগেরা ভীমসেনকে দিয়ে স্বস্তিবাচন করালেন এবং পূর্বমুখে

বসিয়ে কুণ্ডের রস দিলেন। শক্তিশালী ভীম আটটি কুণ্ডের রস খেয়ে ফেললেন। তারপর নাগেদের নির্দেশে তিনি এক দিব্য শয্যায় গিয়ে শয়ন করলেন।

এদিকে পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করে কৌরব ও পাণ্ডবগণ নানারকম খেলাধুলার পর হস্তিনাপুর রওনা হলেন। ভীমকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা মনে করলেন, তিনি আগেই চলে গেছেন। দুর্যোধন তাঁর কৌশল সফল হয়েছে ভেবে আনন্দিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের মনে কোনো খারাপ ভাবনাই এল না, কেন-না তিনি দুর্যোধনকে নিজের মতোই সৎ মনে করতেন। হস্তিনাপুরে ফিরে এসে তিনি মাতা কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন ভীম কখন ফিরেছে কারণ তাঁরা ওখানে ভীমকে দেখতে পাননি। এই কথায় কুন্তী একটু ভয় পেলেন, তিনি বললেন—'ভীম এখানে ফিরে আসেনি, তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি খোঁজার চেষ্টা করো।' মাতা কুন্তী বিদুরকে ডেকে পাঠালেন, বিদুর এলে তিনি বললেন—'বিদুর ! ভীমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্যোধনের চোখে আমি মন্দ অভিপ্রায় দেখেছি, ও বড় ক্রূর, লোভী এবং নির্লজ্জ। সে আমার বীর পুত্রকে হত্যা করেনি তো ? আমার বড় চিন্তা হচ্ছে।' বিদুর বললেন—'কল্যাণী ! এইসব কথা বলবেন না। অন্য পুত্রদের রক্ষা করুন। দুর্যোধনকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে সে আরও ক্রূর হয়ে উঠবে, অন্য পুত্রদের ওপরও বিপদ নেমে আসবে। মহর্ষি ব্যাসের বাক্যে আপনার পুত্র দীর্ঘায়ু হবে। ভীম যেখানেই থাক, সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।' বিদুর কুন্তীকে এইভাবে প্রবোধবাক্য দিয়ে চলে গেলেন। মাতা কুন্তী চিন্তিত হয়ে রইলেন।

নাগলোকে অষ্টম দিনে বলবর্ধক রস পরিপাক হওয়ার পরে ভীমের ঘুম ভাঙল। নাগেরা ভীমকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—'আপনি যে রস পান করেছেন তা অত্যন্ত বলকারক, আপনি দশ হাজার হাতির মতো শক্তিশালী হয়ে যাবেন। কেউ আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। আপনি এখন দিব্য জলে স্নান করে পবিত্র শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে নিজ গৃহে গমন করুন। আপনার ভাইয়েরা আপনার জন্য চিন্তিত।' তখন ভীম স্নান করে দিব্য বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া করে নাগেদের অনুমতি নিয়ে ওপরে এলেন। নাগেরা তাঁকে প্রমোদ উদ্যান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। ভীম তখন মায়ের কাছে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। সকলে তাঁকে দেখে আনন্দিত হলেন। ভীম তাঁর সমস্ত ঘটনা, দুর্যোধনের অপকর্ম, নাগেদের সঙ্গে থাকার কাহিনী, আনুপূর্বিক মা ও ভ্রাতাদের জানালেন। যুধিষ্ঠির সব শুনে উপদেশ দিলেন, 'তুমি এই-সব কথা কখনো কাউকে বলবে না। এখন থেকে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে একে অপরকে রক্ষা করতে হবে।'

দুরাত্মা দুর্যোধন ভীমের সারথিকে গলা টিপে মেরে ফেললেন। ধর্মাত্মা বিদুরও যুধিষ্ঠিরকে চুপ করে থাকতে পরামর্শ দিলেন। ভীমসেনের খাদ্যে আর একবার বিষ প্রদান করলে, যুযুৎসু পাণ্ডবদের সেই খবর দিয়ে দেন। কিন্তু ভীম সেই বিষ খেয়ে হজম করে ফেলেন। ভীমসেন বিষে না মারা যাওয়ায় দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি অন্যভাবে তাঁকে বধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। পাণ্ডবরা সব জেনেশুনেও পিতৃব্য বিদুরের পরামর্শে চুপ করে থাকলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দেখলেন রাজপুত্রেরা শুধু খেলাধুলাতেই মগ্ন, তাই তিনি কৃপাচার্যকে নিয়ে এসে তাঁর হাতে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে রাজপুত্রদের সমর্পণ করলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবগণ কৃপাচার্যের কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে ধনুর্বেদ শিক্ষালাভ করতে লাগলেন।

———o———

কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এবং অশ্বত্থামার জন্ম বৃত্তান্ত এবং কৌরবদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! আপনি কৃপা করে কৃপাচার্যের জন্মকাহিনী আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়, মহর্ষি গৌতমের পুত্র শরদ্বান। তিনি বাণের দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছিলেন। ধনুর্বেদে তিনি যত মনোযোগী ছিলেন, বেদাভ্যাসে তত নয়। তিনি তপস্যা দ্বারা সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করেছিলেন। শরদ্বানের ভীষণ তপস্যা এবং ধনুর্বেদে নৈপুণ্য দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তিনি শরদ্বানের তপস্যায় ব্যাঘাত করার জন্য জানপদী নামে এক দেবকন্যা প্রেরণ করেন। তিনি শরদ্বানের আশ্রমে এসে নানাভাবে তাঁকে প্রলোভিত করতে থাকেন। সেই সুন্দরী যুবতীকে এক বস্ত্রে দেখে তাঁর রোমাঞ্চ হয়, হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে যায়। শরদ্বান অত্যন্ত বিবেচক এবং তপস্যার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ধৈর্য সহকারে নিজেকে দমন করলেন। কিন্তু তাঁর মনে বিকার এসেছিল। তাই অজান্তেই তাঁর শুক্রপাত হল। তিনি ধনুর্বাণ, মৃগচর্ম, আশ্রম ও সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করে সত্বর সেখান থেকে রওনা হলেন। তাঁর বীর্য সরকণ্ডোর ওপরে পড়ল, তাই এটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে একটি কন্যা ও একটি পুত্রের জন্ম হল।

দৈবক্রমে রাজর্ষি শান্তনু সপারিষদ শিকার করতে সেখানে এলেন। কোনো এক পারিষদ সেইদিকে তাকিয়ে বালকদের দেখল এবং ভাবল যে, এই বালক হয়তো কোনো ধনুর্বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণপুত্র। রাজা শান্তনু সংবাদ পেয়ে সেই বালকদের সযত্নে নিয়ে এলেন। তিনি সেই শিশুদের পালন-পোষণ করে যথোচিত সংস্কার করলেন এবং দুজনের নাম রাখলেন কৃপ এবং কৃপী। শরদ্বান তপপ্রভাবে সব জানতে পেরে রাজর্ষি শান্তনুর কাছে এসে তাঁদের নাম-গোত্র জানালেন এবং তাঁদের চার প্রকার ধনুর্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্রাদির শিক্ষা দিলেন। অল্প দিনেই বালক কৃপ সকল বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন এবং কৌরব, পাণ্ডব, যদুবংশীয় ও অন্যান্য রাজকুমারদের ধনুর্বেদ অভ্যাস করাতে লাগলেন।

ভীষ্ম চিন্তা করলেন যে পাণ্ডব ও কৌরবদের আরও বেশি অস্ত্র-জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু কোনো সাধারণ ব্যক্তি এঁদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে সক্ষম নন। এঁদের জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ অস্ত্র শিক্ষকই প্রয়োজন ! তাই তিনি এঁদের শিক্ষার ভার দ্রোণাচার্যের হস্তে সমর্পণ করলেন। দ্রোণাচার্য ভীষ্মের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই রাজকুমারেরা সকল শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! দ্রোণাচার্যের জন্ম কী করে হয়েছিল ? তিনি অস্ত্র কোথায় পেলেন এবং কৌরবদের সঙ্গে তাঁর কেমন সম্পর্ক ছিল ? এছাড়া শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ অশ্বত্থামা কী করে জন্মালেন, দয়া করে তাও বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! প্রথম যুগে গঙ্গাদ্বার নামক স্থানে মহর্ষি ভরদ্বাজ বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ এবং যশস্বী ছিলেন। একবার যজ্ঞের সময় তিনি মহর্ষিদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন। সেখানে তিনি ঘৃতাচী অপ্সরাকে স্নান করতে দেখলেন। তাই দেখে তাঁর মনে কামনা জাগরিত হয়। তখন তাঁর বীর্যস্খলন হয়। তিনি সেই বীর্য দ্রোণ নামক যজ্ঞপাত্রে রেখে দেন, তাতেই দ্রোণ জন্ম নেন। দ্রোণ সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গ স্বাধ্যায় করেছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ আগেই অগ্নিবেশ্যকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। গুরু ভরদ্বাজের নির্দেশে তিনি দ্রোণকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন।

পৃষৎ নামে এক রাজা ছিলেন ভরদ্বাজ মুনির মিত্র। দ্রোণের জন্মের সময়ই তাঁর এক পুত্র হয় তাঁর নাম দ্রুপদ। তিনিও ভরদ্বাজ আশ্রমে এসে দ্রোণের সঙ্গেই শিক্ষালাভ করেন। দ্রোণের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়। পৃষতের মৃত্যুর পর দ্রুপদ উত্তর-পাঞ্চাল দেশের রাজা হলেন। ভরদ্বাজ ঋষি ব্রহ্মলীন হলে দ্রোণ আশ্রমে থেকে তপস্যায় রত হলেন। তিনি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। কৃপী অত্যন্ত ধর্মশীলা এবং জিতেন্দ্রিয়া ছিলেন। অশ্বত্থামা কৃপীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মেই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় 'স্থাম' অর্থাৎ শব্দ করেছিলেন, তাই তাঁর নাম রাখা হয় 'অশ্বত্থামা'। অশ্বত্থামার জন্মে দ্রোণ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং স্বয়ং অশ্বত্থামাকে ধনুর্বেদ শিক্ষা দিতে থাকেন।

সেই সময় দ্রোণাচার্য জানতে পারলেন যে, জামদগ্নি-নন্দন ভগবান পরশুরাম তাঁর সর্বস্ব ব্রাহ্মণদের দান

করছেন। দ্রোণাচার্য তাঁর কাছ থেকে ধনুর্বেদ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং দিব্য অস্ত্রাদি সম্পর্কে জানার জন্য রওনা হলেন।

শিষ্যাদিসহ মহেন্দ্র পর্বতে পৌঁছে তিনি পরশুরামকে প্রণাম করে বললেন—'আমি মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রে ভরদ্বাজ ঋষির দ্বারা অযোনি সম্ভূত পুত্র। আমি আপনার কাছে কিছু পাবার আশায় এসেছি।' পরশুরাম বললেন—'আমার কাছে যা ধন-রত্ন ছিল, তা আমি ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিয়েছি। সমস্ত পৃথিবী আমি ঋষি কাশ্যপকে প্রদান করেছি। আমার কাছে এখন এই শরীর ও অস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নেই। এর মধ্যে যেটি তোমার প্রয়োজন চেয়ে নাও।' দ্রোণাচার্য বললেন—'ভৃগুনন্দন! আপনি আমাকে সমস্ত অস্ত্র, তার প্রয়োগ, রহস্য এবং উপসংহার বিধি-সহ প্রদান করুন।' পরশুরাম 'তথাস্তু' বলে তাঁকে সমস্ত শিক্ষা-সহ অস্ত্র দিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করে দ্রোণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তারপর তাঁর প্রিয় মিত্র দ্রুপদের কাছে ফিরে এলেন।

দ্রোণাচার্য দ্রুপদের কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্! আমাকে চিনতে পারছেন? আমি আপনার প্রিয় সখা দ্রোণ।' পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণের কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি চক্ষু লাল করে ভ্রু কুঞ্চিত করে বললেন—'ব্রাহ্মণ! তোমার কোনো বুদ্ধি নেই! আমাকে বন্ধু বলতে তোমার একটুও লজ্জা হল না? গরিবের সঙ্গে রাজার কীসের

বন্ধুত্ব? যদি কখনো হয়ে থাকে, তা এখন অতীত স্মৃতি মাত্র।' দ্রুপদের কথা শুনে দ্রোণ ক্রোধে কম্পিত হলেন। তিনি মনে মনে এক দৃঢ় সংকল্প করে কুরুবংশের রাজধানী হস্তিনাপুরে এলেন। সেখানে তিনি কিছুদিন কৃপাচার্যের গৃহে আত্মগোপন করে রইলেন।

একদিন যুধিষ্ঠির ও সকল রাজপুত্র মিলে নগরের বাইরে ময়দানে বল খেলতে গেলেন। অকস্মাৎ বলটি একটি কুয়ার মধ্যে পড়ে গেল। রাজকুমারেরা বহু চেষ্টা করেও বলটি তুলতে পারলেন না। তাঁরা লজ্জায় একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন তাঁরা এক ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন, যিনি নিত্যকর্ম সবে সমাপ্ত করেছেন। ঈষৎ কৃশকায়, শ্যামলবর্ণের সেই ব্রাহ্মণকে রাজকুমারেরা ঘিরে ধরলেন। রাজকুমারদের বিষণ্ণ মুখ দেখে ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্যে বললেন—'তোমাদের ক্ষত্রিয় বল এবং অস্ত্র কৌশলকে ধিক্! তোমরা সকলে মিলেও কুয়া থেকে একটি বল তুলতে পারলে না! দেখো, আমি তোমাদের বল এবং এই আংটিটিকে এখনই কুয়া থেকে তুলে আনব। তোমরা আমার খাবার ব্যবস্থা করো।' এই বলে তিনি তাঁর আংটিকেও কুয়াতে ফেলে দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'ভগবান! কৃপাচার্যের অনুমতি হলে আপনি সর্বদাই এখানে

থেকে পান-ভোজনাদি করতে পারবেন।' তখন দ্রোণাচার্য বললেন—'দেখো, এগুলি কয়েকটি শিক। এগুলি আমি মন্ত্রপূত করে রেখেছি। আমি একটি শিক দিয়ে তোমাদের বলে ছিদ্র করছি, পরে অন্য শিকগুলি একের পর এক সংলগ্ন করে বলটি তুলে আনছি।' দ্রোণ এই কথা বলে বল তুলে আনলেন। রাজকুমারেরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন—'ভগবান ! আপনার আংটি বার করুন !' দ্রোণাচার্য বাণ প্রয়োগ করে বাণ-সহ আংটি বার করে আনলেন। রাজকুমারেরা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন—'এমন আশ্চর্য অস্ত্রবিদ্যা আমরা আগে কখনো দেখিনি। আপনি কৃপা করে আপনার পরিচয় দিন, আর বলুন আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি।' দ্রোণাচার্য বললেন—'তোমরা এইসব কথা ভীষ্মকে বোলো, আশা করি তিনি আমার স্বরূপ চিনতে পারবেন।'

রাজকুমারেরা নগরে ফিরে এসে পিতামহ ভীষ্মকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। তিনি সব শুনেই বুঝলেন যে, ইনি আর কেউ নন, মহারথী দ্রোণাচার্য। ভীষ্ম তখন ঠিক করলেন

এখন থেকে দ্রোণাচার্যই রাজকুমারদের অস্ত্র-শিক্ষা দেবেন। তিনি সত্বর গিয়ে দ্রোণাচার্যকে নিয়ে এলেন এবং তাঁর খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। ভীষ্ম তারপর দ্রোণাচার্যকে তাঁর হস্তিনাপুরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দ্রোণাচার্য জানালেন—'আমি যখন ব্রহ্মচর্য পালনের সময় শিক্ষালাভ করছিলাম, সেইসময় পাঞ্চাল রাজপুত্র দ্রুপদও আমার সঙ্গে ধনুর্বিদ্যা শিখছিলেন। আমাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তখন সে আমাকে খুশি করার জন্য বলত, 'আমি যখন রাজা হব তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আমি সত্য শপথ করে বলছি আমার রাজ্য, সম্পত্তি এবং সুখ—সবই তোমার হাতে থাকবে।' তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আমি খুব খুশি এবং আনন্দিত ছিলাম। কিছুদিন পরে আমি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করি এবং তাঁর গর্ভে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করে।

একদিন এক ঋষিকুমার তাঁর গাভীর দুধ পান করছিলেন, তাই দেখে অশ্বত্থামা দুধ খাবার জন্য অত্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকে। তখন আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। কোনো গরিব গোয়ালার কাছ থেকে আমি দুধ নিতে চাইনি, তাতে তাদের ধর্ম-কর্মে বাধা পড়বে। অনেক চেষ্টা করেও একটি গাভী আমি জোগাড় করতে পারিনি। ফিরে এসে দেখি ছোট ছোট শিশুরা আটা জলে গুলে অশ্বত্থামাকে দুধ বলে লোভ দেখাচ্ছে আর অশ্বত্থামাও সেটি দুধ মনে করে খেয়ে আনন্দে নাচছে। নিজের শিশুকে এইভাবে হাসি-আনন্দ করতে দেখে আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। আমি আমার এই দরিদ্র জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছিল।

'হে ভীষ্ম ! আমি যখন শুনলাম আমার প্রিয় সখা দ্রুপদ রাজা হয়েছেন, তখন আমি পত্নী ও পুত্র-সহ আনন্দিত চিত্তে দ্রুপদ রাজার রাজধানী গেলাম, কারণ দ্রুপদের শপথের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমি যখন দ্রুপদের কাছে গেলাম, তিনি তখন অপরিচিতের ন্যায় আমাকে বললেন, 'ব্রাহ্মণ ! তোমার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয়নি এবং লোক-ব্যবহারেও তুমি অনভিজ্ঞ, তুমি কী করে বললে যে আমি তোমার সখা ! সেইসময় তুমি আর আমি দুজনেই সমান সমান ছিলাম, তাই বন্ধুত্ব ছিল। এখন আমি ধনী রাজা আর তুমি গরিব ব্রাহ্মণ ! মিত্রতার দাবি একেবারেই ভুল। তুমি বলছ আমি তোমাকে রাজ্য দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না। যদি চাও এখানে একদিন ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করো।' দ্রুপদের দ্বারা অপমানিত হয়ে আমার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। সেখান থেকে চলে আসার সময় আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এবং আমার প্রতিজ্ঞা শীঘ্রই পূর্ণ করব। আমি গুণবান শিষ্যদের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। আপনি আমার কাছে কী আশা করেন ? আমি

আপনার জন্য কী করতে পারি ?' পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'আপনি আপনার ধনুকের ছিলা খুলে রাখুন আর এখানে থেকে রাজকুমারদের ধনুর্বাণ এবং অস্ত্রশিক্ষা দিন। কৌরবদের ধন, বৈভব এবং রাজ্য আপনারই। আমরা সকলেই আপনার নির্দেশ-পালনকারী। আপনার শুভাগমন আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যজনক হোক।'

রাজকুমারদের শিক্ষা, পরীক্ষা এবং একলব্যের গুরুভক্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রোণাচার্য পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা সম্মানিত হয়ে হস্তিনাপুরে বাস করতে লাগলেন। ভীষ্ম তাঁকে ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ এক সুন্দর বাড়িতে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদের শিষ্যরূপে স্বীকার করে ধনুর্বেদ শিক্ষা দিতে লাগলেন। একদিন তিনি তাঁর সকল শিষ্যকে ডেকে বললেন—'আমার মনে একটি আকাঙ্ক্ষা আছে। অস্ত্র-শিক্ষা শেষ করে তোমরা আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে তো ?' সব রাজকুমার চুপ করে থাকলেও অর্জুন অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আচার্যের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। দ্রোণাচার্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি অর্জুনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যদের নানা প্রকার দিব্য ও অলৌকিক অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগলেন। দ্রোণাচার্যের কাছে সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যদুবংশের রাজকুমার ও অন্যান্য দেশের রাজকুমারেরাও অস্ত্রশিক্ষা করতেন। সূতপুত্র বলে পরিচিত কর্ণও সেখানে অস্ত্রশিক্ষা করতেন। এঁদের মধ্যে অর্জুন সব থেকে মনোযোগী ছিলেন, তিনি গুরুকে সেবাও করতেন প্রসন্ন হৃদয়ে। তাই শিক্ষা, বাহুবল এবং উদ্যোগের দৃষ্টিতে সমস্ত অস্ত্রাদির প্রয়োগ এবং বিদ্যায় অর্জুনই সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি দ্রোণাচার্যের বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি সকল শিষ্যদের আগে অশ্বত্থামাকে জল আনতে পাঠাতেন। তাই অশ্বত্থামা সবার আগে জল নিয়ে আসতেন এবং দ্রোণাচার্য অন্য শিষ্যদের অগোচরে তাঁর পুত্রকে গুপ্তবিদ্যা শেখাতেন। অর্জুন এই ব্যাপারটি জেনে ফেলেন। তখন তিনিও বরুণাস্ত্রের সাহায্যে তাড়াতাড়ি জল সংগ্রহ করে গুরুর কাছে ফিরে আসতেন। তাই তিনিও অশ্বত্থামার মতোই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। একদিন রাতে খাবার সময় প্রবল বাতাসে প্রদীপ নিভে যায়। অন্ধকারেও হাত ঠিকই খাদ্য নিয়ে মুখে তুলছে দেখে অর্জুন উপলব্ধি করেন যে, লক্ষ্য ঠিক করার জন্য আলোর প্রয়োজন নেই, অভ্যাসই যথেষ্ট। তিনি তখন অন্ধকারে বাণ নিক্ষেপ করা অভ্যাস করতে থাকেন। একদিন রাত্রে অর্জুনের ধনুকের টংকার শুনে দ্রোণ আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন— 'পুত্র ! আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যে, তোমার মতো ধনুর্ধর পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। এইকথা আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি।' আচার্য তাঁর সব শিষ্যদের হাতি, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ ইত্যাদির প্রয়োগ এবং সংকীর্ণ-যুদ্ধ শিক্ষা প্রদান করেন। সব শিক্ষা প্রদানের সময়ই তাঁর অর্জুনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকত। তাঁর শিক্ষা-কৌশলের কথা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। দূর-দূরান্ত থেকে রাজা ও রাজকুমারেরা তাঁর কাছে শিক্ষালাভের জন্য আসত। একদিন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য তাঁর কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে এলেন। কিন্তু একলব্য নিষাদ জাতির ছিলেন, তাই দ্রোণ তাঁকে শিক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন। একলব্য বিষণ্ণ মনে বনে ফিরে গিয়ে দ্রোণাচার্যের এক মাটির মূর্তি তৈরি করে তাঁকে আচার্যরূপে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে নিয়মিত অস্ত্রাভ্যাস করতে করতে দক্ষ তীরন্দাজ হয়ে উঠলেন।

আচার্যের অনুমতিক্রমে একবার সব রাজকুমারেরা বনে শিকার করতে গেলেন। রাজকুমারদের মালপত্র সহ একজন অনুচর একটি কুকুরকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে চলল। কুকুরটি ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের আশ্রমের কাছে পৌঁছাল। একলব্য দেখতে কালো, মলিন বস্ত্র পরিহিত, মাথায় জটা।

এইরকম এক অচেনাকে দেখে কুকুরটি ডাকতে শুরু করল। একলব্য সাতটি বাণ দিয়ে কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু আর কোনো স্থানে তার আঘাত লাগেনি। কুকুরটি বাণবিদ্ধ মুখে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে এল। এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে পাণ্ডবেরা বলতে লাগলেন—'বাণ প্রয়োগ-কারীর শব্দ-ভেদ এবং পটুতা তো আশ্চর্য করার মতো!' খোঁজ করতে করতে তাঁরা বনের মধ্যে একলব্যকে দেখতে পেলেন, তিনি তখন একাগ্র হয়ে শরনিক্ষেপ অভ্যাস করছিলেন। পাণ্ডবেরা একলব্যকে চিনতে পারলেন না, তাঁদের জিজ্ঞাসায় একলব্য তাঁর নাম বললেন এবং জানালেন তিনি ভীলরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্যের শিষ্য। সকলেই তখন তাঁকে চিনতে পারলেন। ফিরে এসে তাঁরা দ্রোণাচার্যকে সব কথা জানালেন। অর্জুন বললেন—'গুরুদেব! আপনি তো বলেছিলেন আমার থেকে বড় শিষ্য আপনার আর কেউ থাকবে না, কিন্তু আপনার এই শিষ্য তো সবার থেকে, এমনকি আমার থেকেও উন্নত শিক্ষালাভ করেছে।' অর্জুনের কথা শুনে দ্রোণ কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর তাঁকে সঙ্গে করে বনের মধ্যে গেলেন।

দ্রোণাচার্য অর্জুনকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, জটা-বল্কল পরিহিত একলব্য বাণের পর বাণ মেরে অভ্যাস করে যাচ্ছেন। শরীরে ময়লা জমে গেছে, কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। আচার্যকে দেখে একলব্য তাঁর কাছে এসে চরণে প্রণত হলেন। তাঁকে শাস্ত্রসম্মত পূজা করে হাত জোড় করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার শিষ্য আপনার সেবায় উপস্থিত। আদেশ করুন।' দ্রোণাচার্য বললেন, 'তুমি যদি সত্যই আমার শিষ্য হও, তাহলে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।' একথায় একলব্য খুব খুশি হলেন, তিনি বললেন—'আদেশ করুন, আমার কাছে এমন কোনো বস্তু নেই যা আপনাকে দিতে পারব না।' দ্রোণাচার্য বললেন—'একলব্য, তোমার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও।' সত্যবাদী একলব্য নিজ প্রতিজ্ঞায় স্থির থেকে আনন্দের সঙ্গে তাঁর দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে গুরুর হাতে সমর্পণ করলেন। এরপরে একলব্যের আর বাণ

চালানোর সেই তীক্ষ্ণতা ও ক্ষিপ্রতা থাকল না।

দ্রোণাচার্য এবার তাঁর শিষ্যদের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তিনি কারিগরদের দিয়ে একটি নকল পাখি তৈরি করিয়ে রাজকুমারদের অজ্ঞাতে গাছের ওপরে রেখে দিলেন। তারপর রাজকুমারদের ডেকে বললেন—'ধনুক বাণ নিয়ে প্রস্তুত হও, পাখিটির মাথা কেটে ফেলতে হবে।' তিনি সর্বপ্রথম যুধিষ্ঠিরকে ডাকলেন এবং বললেন—'যুধিষ্ঠির, গাছের ওপর পাখিটিকে কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?' যুধিষ্ঠির

বললেন—'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি।' দ্রোণ বললেন—'তুমি আর কী দেখছ, এই বৃক্ষ, আমাকে, তোমার ভাইয়েদের সবাইকে দেখছ কি ?' যুধিষ্ঠির বললেন—'হ্যাঁ প্রভু ! আমি এই বৃক্ষ, আপনাকে এবং আমার ভাইয়েদেরও দেখতে পাচ্ছি।' দ্রোণাচার্য অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'সরে যাও, তুমি লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না।' তারপর তিনি একে একে সব রাজকুমারদের ডাকলেন এবং তাঁদেরও সেই একই প্রশ্ন করলেন, তাঁরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের মতোই একই উত্তর দিলেন। আচার্য তাঁদেরও সেখান থেকে সরে যেতে বললেন।

শেষে তিনি অর্জুনকে ডাকলেন এবং বললেন—'নিশানার দিকে দেখ, ভুল কোরো না। ধনুকে তীর লাগিয়ে আমার নির্দেশের অপেক্ষা করো।' কিছুক্ষণ পরে আচার্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অর্জুন, তুমি এই বৃক্ষ, পাখি আর আমাকে দেখতে পাচ্ছ কি ?' অর্জুন বললেন—'আমি পাখি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'অর্জুন বলো তো পাখিটি কেমন দেখতে ?' অর্জুন বললেন—'প্রভু ! আমি শুধু তার মাথাটাই দেখছি, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' দ্রোণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন—'পুত্র ! বাণ চালাও।' অর্জুন তৎক্ষণাৎ বাণ ছুঁড়ে পাখির মাথা কেটে ফেললেন। অর্জুনের সাফল্যে খুশি হয়ে দ্রোণাচার্য বুঝলেন অর্জুনই দ্রুপদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম।

একদিন গঙ্গাস্নানের সময় কুমীর এসে দ্রোণের পা কামড়ে ধরে। দ্রোণ নিজেই তার থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু তিনি শিষ্যদের ডেকে তাঁকে বাঁচাতে বললেন। তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই অর্জুন পাঁচটি বাণ মেরে

কুমীরটিকে মেরে ফেললেন। অন্য সব রাজপুত্রেরা দর্শকের মতো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কুমীরটি মরে যেতে আচার্য মুক্ত হলেন। তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'অর্জুন ! আমি তোমাকে দিব্য ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহারের কথা জানাচ্ছি। এটি অমোঘ অস্ত্র। এটি কোনো সাধারণ মানুষের ওপর প্রয়োগ করবে না। সারা পৃথিবীকে এটি পুড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে।' অর্জুন সশ্রদ্ধচিত্তে সেই অস্ত্র গ্রহণ করলেন। দ্রোণাচার্য বললেন—'পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ ধনুর্ধর আর কেউ হবে না।'

—o—

রাজকুমারদের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন এবং কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজ্য সমর্পণ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যায় রাজকুমারদের নিপুণতা দেখে কৃপাচার্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস এবং বিদুরের সামনে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'রাজন্ ! সকল রাজকুমারই সর্বপ্রকার বিদ্যায় নিপুণ হয়েছে। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, অনুমতি দিলে এঁদের অস্ত্রবিদ্যার কৌশল সবার সামনে দেখাতে চাই।' ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন হয়ে বললেন— 'আচার্য ! আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন। আপনি যখন, যেখানে যেরূপ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করা উপযুক্ত মনে করেন, তাই করুন। তার জন্য যা প্রয়োজন বলুন তার ব্যবস্থা হবে।' তারপর তিনি বিদুরকে বললেন—'বিদুর ! আচার্যের নির্দেশানুসারে সব আয়োজন করো। এই কাজ আমার খুব

পছন্দ।' দ্রোণাচার্য গাছপালা-বিহীন এক সমতল স্থান নির্বাচিত করলেন। জলাশয় কাছে থাকায় জমিটি নরম ছিল। শুভ মুহূর্তে পূজা অর্চনা করে রঙ্গমণ্ডপের ভিত্তি স্থাপন হল। রঙ্গমণ্ডপ তৈরি হলে নানা অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সেটি সাজানো হল। রাজা ও রাজপুরুষদের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্বাচন করা হল। নারী-পুরুষদের পৃথক পৃথক আসন এবং সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ স্থান ঠিক করা হল। নির্দিষ্ট দিনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, বিদুর সকলে এলেন। তাঁদের রথে মুক্তা ঝালর লাগানো চাঁদোয়া ঝলমল করছিল। গান্ধারী, কুন্তী এবং রাজপরিবারের অন্য মহিলারাও তাঁদের দাসীসহ এলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ যার যার নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। অগণিত জনতা সমুদ্রের রূপ ধারণ করেছিল। বাজনা বাজতে লাগল। দ্রোণ শ্বেতবস্ত্র, শ্বেত যজ্ঞোপবীত এবং শ্বেতপুষ্পের মালা পরিধান করে পুত্র অশ্বত্থামাকে নিয়ে এলেন। দ্রোণের চুল-দাড়িও তাঁর বস্ত্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ।

উপযুক্ত সময়ে দ্রোণাচার্য দেবতাদের পূজা করলেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা মঙ্গলপাঠ করালেন। রাজকুমারেরা প্রথমে ধনুক বাণ দিয়ে কৌশল প্রদর্শন করলেন। তারপর রথ, হাতি ও ঘোড়ায় চড়ে নিজ নিজ যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কুস্তী লড়লেন। তারপর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে নানাপ্রকার কৌশল দেখালেন। সকলেই তাঁদের ক্ষিপ্রতা, চাতুরী, শোভা, স্থৈর্য এবং হাতের কায়দা দেখে প্রসন্ন হলেন। ভীম এবং দুর্যোধন দুজনে হাতে গদা নিয়ে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা দুজনেই পর্বত শিখরের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট বীর, দীর্ঘ হাত ও সুন্দর কোমরের জন্য অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন হয়েছিলেন। তাঁরা মদমত্ত হাতির মতো দুজনে দুজনকে পরাজিত করার চেষ্টা করছিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধারীকে সব ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। সেই সময় দর্শকেরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছু দর্শক ভীমের পক্ষে ছিলেন, কিছু দর্শক দুর্যোধনের। সমুদ্রের মতো জনতার কোলাহল শুনে দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামাকে বললেন—'পুত্র! এবার এদের থামাও। বেশি কিছু হলে দর্শক উত্তেজিত হয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে।' অশ্বত্থামা তাঁর নির্দেশ পালন করলেন।

দ্রোণাচার্য দাঁড়িয়ে বাদ্য শব্দ বন্ধ করালেন এবং গম্ভীর স্বরে বললেন—'আপনারা এবার অর্জুনের অস্ত্রকৌশল দেখুন। এ আমার সবথেকে প্রিয় শিষ্য।' অর্জুন রঙ্গভূমিতে এলেন। তিনি প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে আগুন উদ্গিরণ করলেন, তারপর বরুণাস্ত্র দিয়ে তাকে নির্বাপিত করলেন। ভৌমাস্ত্র দিয়ে পৃথিবী এবং পর্বতাস্ত্র দিয়ে পর্বত প্রকটিত করলেন। অন্তর্ধান অস্ত্রের সাহায্যে অর্জুন নিজেই অন্তর্ধান করলেন। কখনো তিনি ভীষণ লম্বা হয়ে গেলেন কখনো বা অত্যন্ত ছোট। লোকে চমকিত হয়ে দেখতে লাগল যে, অর্জুন কখনো রথের ওপর আবার কখনো রথের মধ্যে থেকে পলক পড়তে না পড়তেই মাটিতে দাঁড়িয়ে অস্ত্রকৌশল দেখাচ্ছেন। তিনি অত্যন্ত বেগে, নিপুণতার সঙ্গে সূক্ষ্ম এবং ভরী নিশানাগুলি উড়িয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে লাগলেন। তিনি লৌহ নির্মিত একটি শূকরকে এত দ্রুত পাঁচটি বাণ মারলেন যে, লোকেরা দেখল যে অর্জুন যেন একটিমাত্র বাণই নিক্ষেপ করেছেন। তারপর খড়্গযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ এবং নানাপ্রকার ধনুর্যুদ্ধ দেখালেন।

সেই সময় কর্ণ প্রবেশ করলেন রঙ্গভূমিতে। মনে হল যেন এক সচল পর্বত প্রবেশ করল। কর্ণ অর্জুনকে ডেকে বললেন—'অর্জুন, অহংকার কোরো না, আমি তোমার প্রদর্শিত কৌশল, আরও বিশেষ ভাবে দেখাব।' দর্শকরাও সব উত্তেজিত হয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল, মনে হল যেন কোনো যন্ত্র দ্বারা তাদের একসঙ্গে দাঁড় করানো হয়েছে। কর্ণের কথায় অর্জুন প্রথমে লজ্জিত হলেও পরে তাঁর রাগ হল। কর্ণ দ্রোণাচার্যের নির্দেশে সমস্ত কৌশলই দেখালেন যেগুলি আগে অর্জুন দেখিয়েছেন। দুর্যোধন কর্ণের অস্ত্রনৈপুণ্যে খুব খুশি হলেন। তিনি কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'আমার সৌভাগ্য যে আপনি এখানে এসেছেন। আমরা এবং আমাদের রাজ্য আপনারই, আপনি ইচ্ছামতো একে উপভোগ করুন।' কর্ণ বললেন—'আমি আপনার সঙ্গে মিত্রতা করতে আগ্রহী। আমি এখন অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই।' দুর্যোধন বললেন— 'আপনি আমার সঙ্গে থেকে সব কিছু উপভোগ করুন। মিত্রের প্রিয় কাজ করুন আর শত্রুকে অবদমিত করুন।'

অর্জুনের মনে হল যেন কর্ণ তাঁকে সভার মধ্যে অপমান

করছেন। তিনি কর্ণকে ডেকে বললেন—'কর্ণ ! অনাহুত ব্যক্তি এবং অবাঞ্ছিত বাক্য প্রয়োগকারীর যে গতি হয়, আমার হাতে মৃত্যুর পর তোমার তাই হবে।' কর্ণ বললেন—'আরে ! এই রঙ্গমণ্ডপে তো সকলেরই অধিকার আছে। তুমি কি ভাবছ এর ওপর তোমার একারই অধিকার ? দুর্বলের মতো কথা বলছ কেন ? সাহস থাকে তো ধনুর্বাণ নিয়ে এসো। তোমার গুরুর সামনেই আমি তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করব।' গুরু দ্রোণাচার্যের আদেশে অর্জুন কর্ণের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

তখন নীতিবাগীশ কৃপাচার্য দুজনকেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রস্তুত দেখে বললেন—'কর্ণ ! পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কুন্তীর কনিষ্ঠ পুত্র। তোমার সঙ্গে এই কুরুবংশশিরোমণির যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, এখন তুমি তোমার মা বাবার নাম এবং বংশপরিচয় জানাও। তারপরই ঠিক হবে, যুদ্ধ হবে কি হবে না। কেননা রাজপুত্র কোনো অজ্ঞাতকুলশীল অথবা নীচবংশের ব্যক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন না।' এই কথায় কর্ণ যেন অথৈ জলে পড়ে গেলেন। লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেলেন। দুর্যোধন বললেন—'আচার্যদেব ! শাস্ত্রানুসারে উচ্চকুলজাত ব্যক্তি, শূরবীর এবং সেনাপতি—এই তিনজনই রাজা হতে সক্ষম। কর্ণ রাজা নয় বলে যদি অর্জুন যুদ্ধ করতে না চায়, তাহলে আমি কর্ণকে অঙ্গদেশ প্রদান করছি।' এই বলে দুর্যোধন কর্ণকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে তৎক্ষণাৎই তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করলেন। তাই দেখে কর্ণের ধর্মপিতা অধিরথ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর জামাকাপড় ছেঁড়া, শরীর দুর্বল, পাঁজর দেখা যাচ্ছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে কর্ণের কাছে এসে—'পুত্র-পুত্র' বলে আদর করতে লাগলেন। কর্ণ ধনুক ত্যাগ করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁর চরণে প্রণিপাত করলেন। কর্ণের মাথায় অভিষেকের জল লেগেছিল, অধিরথ তাই সেই জলের যাতে অবমাননা না হয়, নিজের পা কাপড়ে ঢাকা দিলেন এবং কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দাশ্রুতে তিনি কর্ণের মাথা ভিজিয়ে দিলেন। অধিরথের ব্যবহার দেখে পাণ্ডবেরা বুঝতে পারলেন যে, কর্ণ সূতপুত্র। ভীম হেসে বললেন—'ওহে সূতপুত্র ! তুমি অর্জুনের হাতে মরারও উপযুক্ত নও। তোমাদের বংশ তো শুধু ঘোড়ার চাবুকই সামলাতে পারে। তুমি অঙ্গদেশের রাজা হওয়ারও যোগ্য নও। কুকুর কখনো যজ্ঞপিণ্ডের অধিকারী হয় ?' কর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তখন দুর্যোধন মদমত্ত হাতির ন্যায় ভাইদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে ভীমের নিকটে গিয়ে বললেন— 'ভীম ! তোমার এমন কথা বলা উচিত নয়। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বাহুবলের শ্রেষ্ঠতাই সর্বজনমান্য। তাই নীচকুলের হলেও শূরবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করাই উচিত। শূরবীর এবং নদীর উৎপত্তি জানা বড়ই কঠিন। কর্ণ স্বভাবতই কবচ কুণ্ডলধারী এবং সর্বসুলক্ষণযুক্ত। এই সূর্যের ন্যায় তেজ সম্পন্ন কুমার কী কখনও সূতপুত্র হতে পারে ! কর্ণ তাঁর বাহুবলে এবং আমার সহায়তায় শুধু অঙ্গদেশই নয়, সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে সক্ষম। আমি কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করেছি। যাদের কাছে এটি অসহ্য, তারা রথে আরোহণ করে কর্ণের সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধ করতে পারে।' সমস্ত রঙ্গমণ্ডপে হাহাকার ধ্বনি উঠল। এর মধ্যে সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। দুর্যোধন কর্ণের হাত ধরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, পাণ্ডব এঁরা সকলেই যে যার আবাসে ফিরে গেলেন।

—o—
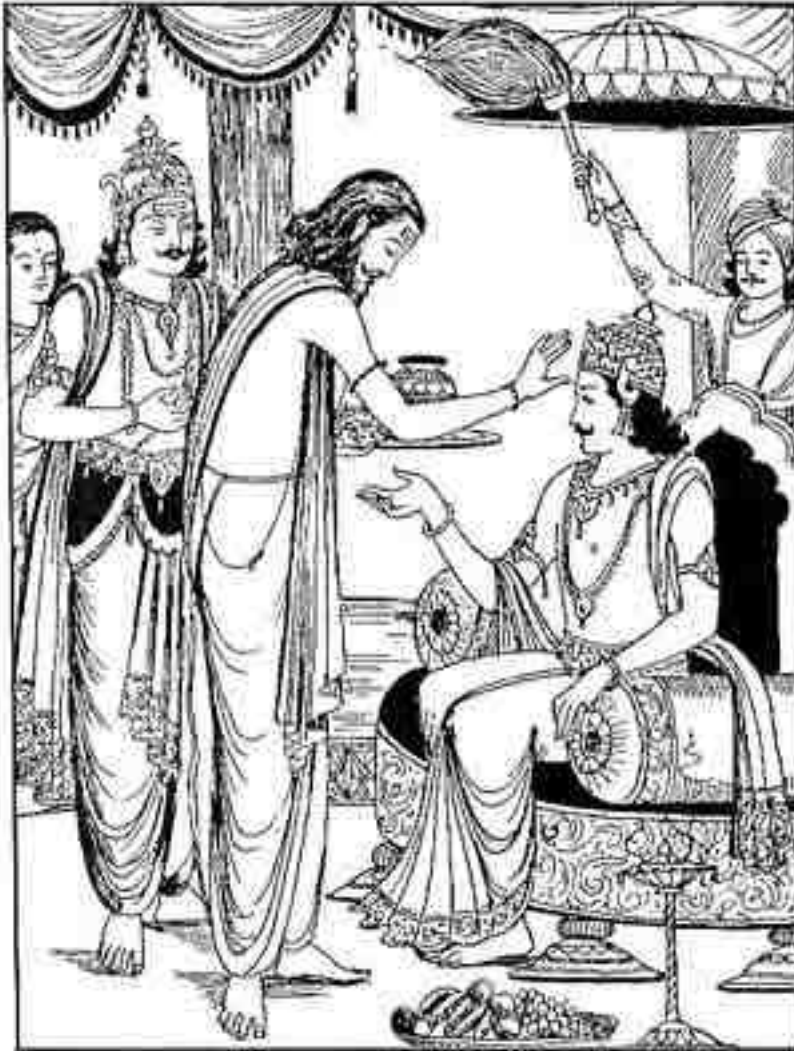
দ্রুপদের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রোণাচার্য যখন দেখলেন যে, সমস্ত রাজকুমারই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন, তখন তিনি স্থির করলেন এবার গুরুদক্ষিণা নেবার সময় হয়েছে। তিনি সব রাজকুমারদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন—'তোমরা যাও, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজিত করে ধরে নিয়ে এসো। এই হবে আমার সবথেকে বড় গুরুদক্ষিণা।' সকলেই প্রসন্নমনে তাঁর আদেশ মেনে নিলেন। তারপর সকলে রথে চড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দ্রোণের সঙ্গে দ্রুপদনগরের দিকে রওনা হলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, যুযুৎসু, দুঃশাসন এবং অন্যান্য রাজকুমারেরা 'আমিই প্রথম দ্রুপদকে ধরব'—বলে আস্ফালন করতে লাগলেন। তাঁরা সকলে ক্রমশ দ্রুপদনগরের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে ভাইদের নিয়ে দুর্গের বাইরে এলেন। তখন দুপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল।

অর্জুন দুর্যোধনদের অহংকার করতে দেখে দ্রোণাচার্যকে বললেন—'গুরুদেব ! এরা আগে নিজেদের পরাক্রম দেখাক। পাঞ্চালরাজকে এদের কেউই ধরতে সক্ষম হবে না। তারপরে আমরা চেষ্টা করব।' অর্জুন তাঁর ভাইদের নিয়ে নগর থেকে আধ ক্রোশ দূরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দ্রুপদ তাঁর বাণের বৃষ্টিতে কৌরব সেনাদের চকিত করে রাখলেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাণ ছোঁড়ার ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত কৌরবগণ তাঁকে বিভিন্ন রূপে দেখছিল। সেইসময় রাজধানীতে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ বেজে উঠছিল। ধনুকের টংকার যেন গগন স্পর্শ করছিল। দুর্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু এবং দুঃশাসনেরা বাণযুদ্ধে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। দ্রুপদ একলাই ঘুরে ঘুরে সকলের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। সেইসময় পাঞ্চালরাজের রাজধানীর প্রত্যেক সাধারণ, এবং বিশিষ্ট নাগরিক এবং বালক-বৃদ্ধ-নারীও —হাতে যে যা অস্ত্র পেয়েছে, সব নিয়ে কৌরব সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কৌরবসেনা সেই বৃষ্টির ধারার মতো আক্রমণের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না পেরে যেখানে পাণ্ডবেরা অপেক্ষা করছিলেন, সেখানে পালিয়ে এলেন।

কৌরবদের করুণ বিলাপ শুনে পাণ্ডবেরা তখন দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে রথে আরোহণ করলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে সেখানেই থাকতে বলে নকুল ও সহদেবকে নিয়ে রওনা হলেন। ভীম গদা নিয়ে আগে আগে চললেন। দ্রুপদ এবং অন্যান্য সকলে কৌরবদের পরাজিত করে জয়ধ্বনি করছিলেন, সেই সময় অর্জুনের রথ সেইখানে এসে হাজির হল। ভীম দণ্ডপাণি কালের ন্যায় গদা হাতে দ্রুপদসেনার মধ্যে ঢুকে পড়ে গদার আঘাতে হাতি এবং সৈন্য উভয়েরই মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে লাগলেন। সেইসময় অর্জুন সেই মহাযুদ্ধে এমন বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন যে সমস্ত সৈন্য তাতে ঢাকা পড়ে গেল। প্রথমে সত্যজিৎ অর্জুনের ওপর ভীষণভাবে আক্রমণ চালালেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্জুন তাঁকে পরাজিত করলেন। তারপর অর্জুন দ্রুপদরাজার ধনুক এবং ধ্বজা দুটুকরো করে ফেললেন এবং পাঁচটি বাণের সাহায্যে চারটি ঘোড়া ও সারথিকে মেরে ফেললেন। দ্রুপদ রাজা আর একটি ধনুক নিতে গেলে অর্জুন হাতে খড়্গ নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রুপদের রথে উঠে তাঁকে ধরে ফেললেন। অর্জুন যখন দ্রুপদকে নিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে যাচ্ছিলেন, সেই সময় অন্যসব রাজকুমারেরা দ্রুপদের রাজধানীতে লুটপাট করতে আরম্ভ করে। অর্জুন বললেন—'ভাই ভীম ! রাজা দ্রুপদ কৌরবদের আত্মীয়, তাঁর সেনাদের বধ কোরো না, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শুধু দ্রুপদরাজাকেই গুরুর কাছে হাজির করা হবে।' ভীম যদিও যুদ্ধ করে ক্লান্ত হননি, তবুও তিনি অর্জুনের কথা মেনে নিলেন।

অর্জুন দ্রুপদকে ধরে দ্রোণাচার্যের হাতে সমর্পণ করলেন। দ্রুপদের অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তাঁর অর্থ-সম্পদও নিয়ে নেওয়া হল। দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন। রাজা দ্রুপদের পরাভব দেখে দ্রোণ বললেন—'দ্রুপদ ! আমি বলপূর্বক তোমার দেশ ও নগর জয় করেছি। তোমার জীবন এখন আমার হাতে। তুমি কি তোমার পুরাতন মিত্রতা বজায় রাখতে চাও ?' তারপর একটু হেসে বললেন—'তুমি তোমার প্রাণের ভয় করো না, কারণ আমরা স্বভাবত ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ। বালকবয়সে আমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম। সেই বন্ধুত্ব সম্পর্ক আজও আছে। রাজন্ ! আমার ইচ্ছা যে আমরা আবার আগের মতো বন্ধু হয়ে যাই। অর্ধেক রাজত্ব তোমার থাক, কেননা তুমি বলেছিলে যে, যে রাজা নয় সে কখনো রাজার বন্ধু হতে পারে না। তাই আমি তোমার অর্ধেক রাজ্য নিজের কাছে রাখছি। তুমি গঙ্গার দক্ষিণতীরের রাজ্য নাও, আমি উত্তরতীরের রাজ্য নিলাম। এখন থেকে তুমি আমাকে বন্ধু বলে ভাববে।' দ্রুপদ বললেন—'ব্রাহ্মন্ ! আপনার মতো উদার হৃদয়, পরাক্রমী মহাত্মার কাছে একথা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। আমি আপনার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি আর আপনার ভালোবাসা

কামনা করি।' তখন দ্রোণ তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে অর্ধেক রাজ্য সমর্পণ করলেন। দ্রুপদ মাকন্দী প্রদেশের শ্রেষ্ঠ নগর কাম্পিল্যতে বসবাস করতে লাগলেন, তাকে দক্ষিণ পাঞ্চাল বলা হত, সেটি চর্মম্বতী নদীর ধারে। এইভাবে যদিও দ্রোণ দ্রুপদকে পরাজয়ের গ্লানি হতে রক্ষা করলেন, কিন্তু দ্রুপদ মনে মনে এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলেন। দ্রোণাচার্য এদিকে অহিচ্ছত্র প্রদেশের অহিচ্ছত্রা নগরীতে বাস করতে লাগলেন। অর্জুনের পরাক্রমেই তিনি এই রাজ্য লাভ করেন।

যুধিষ্ঠিরের যুবরাজপদ, তাঁর প্রভাববৃদ্ধিতে ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগ, কণিকের কূটনীতি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রুপদকে পরাজিত করার এক বছর পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, নম্রতা, অবিচল ভালোবাসা ইত্যাদি নানাপ্রকার গুণ ছিল, প্রজারা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসত, তারা চাইত যুধিষ্ঠির যুবরাজ হোন। যুবরাজ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর শীল, সদাচার, সদ্‌গুণের এবং বিচারশীলতার এমন ছাপ ফেলেন যে, প্রজারা তাদের উদারহৃদয় পিতাদেরও ভুলতে বসল।

ভীম বলরামের কাছে খড়্গ, গদা এবং রথযুদ্ধ শিক্ষা করলেন। যুদ্ধ শিক্ষালাভ করে তিনি ভাইদের কাছে ফিরে এলেন। কিছু বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র চালানোতে, তীক্ষ্ণতা এবং ক্ষিপ্রতায় সেই সময় অর্জুনের সমকক্ষ কেউ ছিল না। দ্রোণাচার্যের সেটিই অভিপ্রেত ছিল। তিনি একদিন কৌরবদের সভায় অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! আমি মহর্ষি অগস্ত্যের শিষ্য অগ্নিবেশ্যের শিষ্য। তাঁর কাছ থেকেই আমি ব্রহ্মশির অস্ত্র লাভ করেছিলাম, যা তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তার নিয়মও তোমাকে জানিয়েছি। তুমি এবার তোমার ভাই ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে এই গুরুদক্ষিণা দাও যে, যুদ্ধে যদি তোমাকে আমার সম্মুখীন হতে হয় তাহলেও তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করতে ইতস্তত করবে না।' অর্জুন গুরুদেবের নির্দেশ মেনে তাঁর চরণস্পর্শ করে বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পৃথিবীতে এই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, অর্জুনের সমান শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর আর কেউ নেই।

ভীম এবং অর্জুনের মতো সহদেবও বৃহস্পতির কাছ থেকে সম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অতিরথী নকুলও অত্যন্ত বিনীত এবং নানাপ্রকার যুদ্ধকুশলী ছিলেন। সৌবীর দেশের রাজা দত্তামিত্র, যিনি অত্যন্ত বলশালী এবং মান্য ছিলেন এবং গন্ধর্বদের উপদ্রবে তিন বছর একনাগাড়ে যুদ্ধ করেছিলেন, যাঁকে পাণ্ডুও যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেননি, অর্জুন তাঁকে পরাজিত করেন। পরে ভীমের সাহায্যে পূর্ব দিক এবং কারো সাহায্য ছাড়াই একক প্রচেষ্টায় দক্ষিণ দিক বিজয় করেন। অন্যান্য দেশের ধন-সম্পদ কৌরব রাজ্যের অর্থ ভাণ্ডার বৃদ্ধি ঘটায়, রাজ্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশে দেশে পাণ্ডবদের খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং সকলেই তাঁদের জয়গান করতে থাকলেন।

এইসব দেখে শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব পরিবর্তিত হতে থাকল। ঈর্ষার উদ্রেক হওয়ায় তিনি চিন্তিত হলেন। যখন তাঁর ঈর্ষা অত্যন্ত বেড়ে গেল, তখন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী রাজনীতিবিশারদ কণিককে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'কণিক ! দিনদিন পাণ্ডবরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এতে আমার মনে এক জ্বালার সৃষ্টি হচ্ছে। তুমি ঠিক করে বলো আমি কী করব। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ না সন্ধি ? তুমি

যা বলবে, তাই করব।'

কণিক বললেন—'রাজন্! আপনি আমার কথা শুনুন, আমার ওপর রাগ করবেন না। রাজাকে দণ্ড দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় এবং দৈবের ওপর নির্ভর না করে বীরত্ব দেখাতে হয়। নিজের মধ্যে কোনো দুর্বলতা আসতে দিতে নেই আর যদি আসেও কাউকে জানাতে নেই। অন্যের দুর্বলতা জানতে হয়। শত্রুর অনিষ্ট করতে আরম্ভ করলে, তার মধ্যপথে থামতে নেই। কাঁটার টুকরো যদি দেহের ভেতরে থেকে যায়, তাহলে তা অনেকদিন ধরে কষ্ট দিতে থাকে। শত্রুকে দুর্বল ভেবে চোখ বন্ধ করে থাকতে নেই। সময় যদি অনুকূল না হয় তাহলে তার দিকে চোখ-কান বন্ধ করে থাকতে হয়। কিন্তু সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। শরণাগত শত্রুর ওপরও দয়া করতে নেই। শত্রুর তিন (মন্ত্র, বল এবং উৎসাহ), পাঁচ (সহায়, সহায়ক, সাধন, উপায়, দেশ এবং কালের বিভাগ) এবং সাত (সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রয়োগ এবং শত্রুর গুপ্ত কাজ) অঙ্গকে নষ্ট করে দিতে হয়। যতক্ষণ সময় অনুকূল না হয়, ততক্ষণ শত্রুকে কাঁধে করেও বেড়ানো যায়। কিন্তু সময় এলে মাটির কলসের মতো তাকে ফেলে ভেঙে দিতে হয়। সাম, দান, দণ্ড, ভেদ ইত্যাদি প্রয়োগে যে কোনোভাবে শত্রুকে নাশ করাই রাজনীতির মূলমন্ত্র।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'কণিক ! সাম, দান, ভেদ অথবা দণ্ড দ্বারা কীভাবে শত্রুনাশ করা হয় তা তুমি ঠিক করে বলো।'

কণিক বললেন—'মহারাজ ! আমি এই বিষয়ে একটি কাহিনী শোনাচ্ছি। এক বনে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, স্বার্থপর শৃগাল বাস করত। তার চার বন্ধু—বাঘ, ইঁদুর, ভেড়া এবং নেউলও সেখানে থাকত। একদিন তারা সেখানে একটি বলবান হৃষ্টপুষ্ট হরিণের দল দেখতে পেল। প্রথমে তারা সেই হরিণগুলিকে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তখন তারা নিজেরা ঠিক করল কী করবে। শিয়াল বলল—'এই হরিণগুলি খুব দ্রুতগামী এবং চালাক। ভাই বাঘ ! তুমি তো একে মারতে অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। এখন এমন কোনো উপায় বার করো যাতে এরা যখন ঘুমোবে, সেই সময় ইঁদুর গিয়ে এদের পায়ে ক্ষত করে দেবে, তখন তাকে তুমি ধরে ফেলবে আর আমরা সকলে মজা করে খাবো।' সকলে একত্রে তাই করল। হরিণ মরে গেল। খাওয়ার সময় শিয়াল বলল—'যাও, তোমরা স্নান করে এসো। আমি ততক্ষণ এখানে আছি।' সকলে চলে যাবার পর শিয়াল কিছু চিন্তা করতে লাগল। এর মধ্যে বাঘ নদীতে স্নান করে ফিরে এলো।

শিয়ালকে চিন্তিত দেখে বাঘ জিজ্ঞাসা করল—'ও আমার বুদ্ধিমান সখা ! তুমি কী চিন্তা করছ ? এসো আজ আমরা মজা করে এই হরিণটিকে খেয়ে নিই।' শিয়াল বলল—'শক্তিমান বন্ধু ! ইঁদুর আমাকে বলেছে বাঘের শক্তিকে ধিক্কার দিই, হরিণকে তো আমি মারলাম। আর বাঘ আমার উপার্জন খাবে। তাই ভাই, তার এই অহংকারের কথা শুনে আমার হরিণকে খাওয়া ভালোবোধ হচ্ছে না।' বাঘ বলল—'এই ব্যাপার ? ও তো আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি এবার থেকে নিজের ক্ষমতাতেই পশুবধ করে খাব।' এই বলে বাঘ চলে গেল। তারপর ইঁদুর এল। শিয়াল বলল—'ইঁদুর ভাই ! নেউল বলছে যে বাঘ হরিণকে মারায় সেই হরিণের মাংসে নাকি বিষ মিশে গেছে। তাই সে খাবে না। সে নাকি তোমাকেই খাবে। এখন তুমি ঠিক করো, কী করা যায়।' ইঁদুর ভয় পেয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর ভেড়ার পালা এল। শিয়াল বলল—'ভাই ভেড়া ! বাঘ আজ তোমার ওপর খুব রেগে গেছে, আমার তো ভালো মনে হচ্ছে না। সে এখনই বাঘিনীকে সঙ্গে করে আসবে। তুমি যা ভালো বোঝ, করো।' শুনেই ভেড়া এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। এরপর এলো নেউল। শিয়াল তাকে বলল—'ওরে নেউল ! দেখ, আমি বাঘ, ভেড়া আর ইঁদুরকে মেরে তাড়িয়েছি। তোমার যদি কিছু ক্ষমতা থাকে, তাহলে এসো, আমার সঙ্গে লড়াই করো তারপর হরিণের মাংস খাও।' নেউল বলল—'তুমি যখন সকলকেই লড়াই করে হারিয়েছ, তখন আমি আর কী করে সাহস করি !' এই বলে সে চলে গেল, তখন শিয়াল একাই হরিণের মাংস খেয়ে নিল।

'রাজন্ ! বুদ্ধিমান রাজাদের পক্ষেও সেই কথা খাটে। যারা ভীরু তাদের ভয় দেখাও আর বীরদের কাছে হাতজোড় করে থাক। লোভীদের কিছু দিয়ে দাও আর দুর্বলের কাছে পরাক্রম দেখিয়ে তাদের বশ কর। শত্রু যেমনই হোক, তাকে মেরে ফেলা উচিত। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, অর্থের লোভ দেখিয়ে, বিষ কিংবা প্রতারণা করেও শত্রুকে শেষ করে দেওয়া উচিত। মনে রাগ থাকলেও শত্রুর সঙ্গে হেসে কথা বলা উচিত। মেরে ফেলার ইচ্ছা থাকলেও মিষ্টি কথা বলবে। মেরে কৃপা করবে, আফসোস করবে এবং কাঁদবে। শত্রুকে সন্তুষ্ট রাখবে কিন্তু সুযোগ পেলেই বদলা নেবে। যার ওপর কোনো আশংকা করার কিছু নেই, তাকেই বেশি সন্দেহ করা উচিত। এইরূপ লোকই বেশি ঠকায়। যে লোক বিশ্বাসের পাত্র নয়, তাকে তো বিশ্বাস করবেনই না, যারা

বিশ্বাসের পাত্র, তাদেরও বিশ্বাস করা উচিত সতর্কভাবে। সর্বত্র ভণ্ড, তপস্বী ইত্যাদির বেশে বিশ্বাসযোগ্য গুপ্তচর রাখা উচিত। বাগান, বেড়াবার স্থান, মন্দির, রাস্তা, তীর্থ, চৌরাস্তা, পাহাড়, জঙ্গল, জনসমাবেশের জায়গা সর্বত্র গুপ্তচরদের পরিবর্তন করে করে রাখা উচিত। বাক্যে বিনয় এবং হৃদয়ে কঠোরতা, ভীষণ কঠিন কাজ করলেও হেসে কথা বলা—এই হল নীতি নৈপুণ্যের চিহ্ন। হাতজোড় করা, প্রতিজ্ঞা করা, আশ্বাস দেওয়া, পদধূলি নেওয়া, আশান্বিত করা—এগুলি সবই ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির উপায়। যে ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে নিশ্চিত হয়ে থাকে, তার সর্বনাশ হলে তবেই তার ভুল ভাঙে। নিজের গোপন কথা শুধু শত্রুর কাছে নয়, বন্ধুর কাছেও গোপন রাখা উচিত। কাউকে যদি আশ্বাস বাক্য দিতে হয় তবে তা যেন দীর্ঘকালের হয়। এর মধ্যে অন্য কথা বলবে না। বিভিন্ন সময়ে নানা কারণ-অজুহাত দেখাবে। রাজন্ ! পাণ্ডুপুত্রদের থেকে আপনার নিজেকে রক্ষা করা উচিত। ওরা দুর্যোধনদের থেকে বলশালী। আপনি এমন কিছু করুন যাতে ওদের থেকে ভয় পাবার কিছু না থাকে আর পরে অনুতাপ না করতে হয়। আর বেশি কী বলব!' এই বলে কণিক ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইলেন।

—o—

পাণ্ডবদের বারণাবত যাবার নির্দেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দুর্যোধন দেখলেন ভীমের শক্তি অসীম এবং অর্জুনের অস্ত্র-জ্ঞান এবং অভ্যাসও অত্যন্ত কুশলী। তাঁর হৃদয়ে আগুন জ্বলতে লাগল। তিনি কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের মারবার নানা উপায় স্থির করলেও পাণ্ডবেরা প্রতিবারই বেঁচে যেতেন। বিদুরের পরামর্শে তাঁরা একথা কাউকে জানাতেন না। নগরবাসী এবং পুরবাসীগণ পাণ্ডবদের গুণে মুগ্ধ হয়ে রাজসভাতে তাঁদের গুণকীর্তন করতেন। নগরবাসীগণ যেখানেই একত্রিত হতেন, সেখানেই তাঁরা জোরের সঙ্গে বলতেন 'পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরেরই রাজা হওয়া উচিত। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই রাজা হতে পারেননি, এখন তিনি রাজা থাকেন কী করে ? শান্তনু পুত্র ভীষ্ম অত্যন্ত সত্যবাদী এবং প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ; তিনি তো আগেই রাজা হতে অস্বীকার করেছেন, তাই তিনি আর রাজত্ব গ্রহণ করবেন না। আমাদের কর্তব্য হল সত্য আর দয়ার প্রতিমূর্তি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরকেই রাজা বলে মেনে নেওয়া। তিনি রাজা হলে ভীষ্ম বা ধৃতরাষ্ট্র কারোরই কোনো অসুবিধা হবে না। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাইকে দেখাশোনা করবেন।'

প্রজাদের কথা দুর্যোধনের কাছে পৌঁছলে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। তিনি রাগে গর্জন করতে করতে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন—'পিতা, লোকেরা নানা ভালোমন্দ কথা বলছে। তারা ভীষ্মকে এবং আপনাকে সরিয়ে পাণ্ডবদের রাজা করতে চায়। ভীষ্মের এতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের কাছে তো এ এক সমস্যা। প্রথমেই ভুলবশত অন্ধত্বের জন্য আপনি রাজ্যগ্রহণে অস্বীকার করায় পাণ্ডুকে রাজা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এখন যুধিষ্ঠির যদি রাজা হয়, তাহলে তার বংশ-পরম্পরাতেই রাজা চলতে থাকবে। আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা অপরের আশ্রিত হয়ে নরক সমান কষ্ট ভোগ করতে থাকব, আপনি এর একটা উপায় করুন। প্রথমেই যদি আপনি রাজা হতেন, তাহলে এসব ভাবনা হত না। এখন কী করা যায় ?' ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের কথা এবং কণিকের পরামর্শ শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। দুর্যোধন কর্ণ,

শকুনি এবং দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—'পিতা, আপনি কোনো একটি

উপযুক্ত উপায় ভেবে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠান।' ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! আমার ভাই পাণ্ডু অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। সকলের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর নিজের খাওয়া-দাওয়ার কোনো চাহিদা ছিল না, সব কিছু আমাকে বলতেন এবং আমারই রাজ্য বলে মনে করতেন। তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠিরও তেমনই ধর্মাত্মা, গুণবান, যশস্বী এবং বংশের অনুরূপ। আমরা জোর করে কীভাবে বংশপরম্পরাভাবে তাঁদের রাজ্যচ্যুত করব ! তাছাড়া অনেক বড় বড় লোক তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। পাণ্ডুও মন্ত্রী, সেনা এবং সকলকেই খুব ভালোভাবে ভরণপোষণ করেছেন। সমস্ত নগরবাসীও যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রসন্ন। তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারেন এবং রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটার আশঙ্কা আছে।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! এই অনাগত বিরোধের কথা ভেবেই আমি আগে থেকেই অর্থ ও সম্মান দিয়ে প্রজাদের সন্তুষ্ট করেছি। তাঁরা প্রধানত আমাদেরই সাহায্য করবেন। মন্ত্রীগণ এবং রাজকোষ আমাদেরই অধীন। এখন যদি আমরা বিনীতভাবে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাই তাহলে রাজ্যকে আমরা সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করতে পারব। তারপরে যখন তারা ফিরে আসবে, তখন আর কিছু করতে পারবে না।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! আমিও তো তাই চাই। কিন্তু এই পাপকাজ আমি কী করে করব ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং বিদুরেরও এতে সম্মতি নেই। তাঁদের কৌরব ও পাণ্ডবদের ওপর সমান ভালোবাসা। এই বৈষম্য তাঁদের পছন্দ হবে না। আমি এরূপ করলে আমার ওপর ওঁরা এবং পুরবাসী সকলেই ক্ষুব্ধ হবেন।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! ভীষ্ম তো নিরপেক্ষ, অশ্বত্থামা আমাদের দিকে, তাই দ্রোণ এর বিরুদ্ধতা করবেন না। কৃপাচার্য তাঁর বোন, ভগিনীপতি এবং ভাগিনেয়র বিপক্ষে কীভাবে যাবেন ? একলা বিদুর, তিনি যতই পাণ্ডবদের পক্ষে থাকুন, একা কী করবেন ? অতএব আপনি অত্যধিক ভাবনা-চিন্তা না করে কুন্তী ও পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠিয়ে দিন, তবেই আমি শান্তি পাব।'

এই কথা বলে দুর্যোধন প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে লাগলেন আর ধৃতরাষ্ট্র কয়েকটি এমন ধূর্ত মন্ত্রীদের নিযুক্ত করলেন, যাঁরা বারণাবতের প্রশংসা করে পাণ্ডবদের বারণাবতে যাওয়ার জন্য রাজি করাতে থাকলেন। কেউ সেই সুন্দর সম্পন্ন দেশটির প্রশংসা করতে লাগলেন, কেউ আবার নগরটির। কেউ সেখানকার মেলার বর্ণনা করতে লাগলেন। এইভাবে বারণাবত নগরের প্রশংসা শুনে পাণ্ডবদের মনে কিছু কিছু কৌতূহল জন্মাল। সুযোগ দেখে ধৃতরাষ্ট্র একদিন তাঁদের বললেন—'প্রিয় পুত্রগণ ! লোকে বারণাবতের খুব প্রশংসা করছে। তোমরা যদি সেখানে বেড়াতে যেতে চাও, তাহলে ঘুরে আসতে পারো। এখন ওখানে খুব বড় একটি মেলা হচ্ছে। তোমরা যদি যাও, ব্রাহ্মণ এবং গরিবদের দুহাতে দান কোরো। তেজস্বী দেবতাদের মতো বেড়িয়ে এসো।' যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের চালাকি অতি সহজেই বুঝে গেলেন। তিনি নিজেকে অসহায় দেখে বললেন—'যেমন আপনার ইচ্ছা ! আমাদের আর কীসের আপত্তি !' তিনি কুরুবংশের বাহ্লীক, ভীষ্ম, সোমদত্ত প্রমুখ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ, দ্রোণাচার্য ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণ এবং গান্ধারী প্রমুখ মাতৃ-স্থানীয়াদের বিনীতভাবে বললেন—'আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সঙ্গীদের নিয়ে বারণাবতে যাচ্ছি। আপনারা প্রসন্নচিত্তে আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন সেখানে কোনো পাপ আমাদের স্পর্শ না করে।' সকলে বললেন—'সর্বত্র তোমাদের কল্যাণ হোক। কারো দ্বারা যেন কোনো অনিষ্ট না হয়। তোমাদের মঙ্গল হোক।'

—o—

বারণাবতে লাক্ষাগৃহ, পাণ্ডবদের যাত্রা, বিদুরের গোপন উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—হে জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বারণাবতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় দুর্যোধন খুব খুশি হলেন। তিনি তখন তাঁর মন্ত্রী পুরোচনকে একান্তে ডেকে তার হাত ধরে বললেন—'পুরোচন ! এই পৃথিবী

ভোগ করার আমার যা অধিকার, তোমারও তাই। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ সাহায্যকারী ও বিশ্বাসযোগ্য নেই। আমি তোমাকে আমার শত্রুর মূলসহ তুলে ফেলার কাজে নিযুক্ত করছি। সতর্ক হয়ে কাজ করবে, কেউ যেন জানতে না পারে। পাণ্ডবেরা পিতার নির্দেশে কিছুদিন বারণাবতে বসবাস করবে। তুমি তার আগেই সেখানে চলে যাও ; নগরের একধারে শণ, খড়, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে এমন সুন্দর এক গৃহ নির্মাণ করো যাতে সেটি আগুনে শীঘ্রই পুড়ে খাক হয়ে যায়। তার ভিত্তি স্থাপনের সময় ঘি, তেল, চর্বি এবং লাক্ষা মিশিয়ে মাটিতে লেপন করবে। পাণ্ডবরা যেন কিছু বুঝতে না পারে। সেই গৃহে কুন্তী, পাণ্ডব এবং তাদের বন্ধুদের রাখবে। সেই গৃহ উত্তম আসন ও শয্যা দ্বারা সাজিয়ে দেবে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ততার সঙ্গে সেখানে বাস করবে। সময়মতো তাদের গৃহে আগুন লাগিয়ে দেবে। এতে তারা নিজেদের গৃহেই যখন পুড়ে মারা যাবে, তখন কেউ আর আমাদের নিন্দা ও সন্দেহ করবে না।' পুরোচন সেইমতো ব্যবস্থা করার কথা দিয়ে সেখান থেকে রওনা হল। বারণাবতে গিয়ে সে দুর্যোধনের কথামতো এক সুন্দর ভবন নির্মাণ করল।

সময়মতো পাণ্ডবেরা রওনা হবার জন্য তেজী, দ্রুতগামী ঘোড়ার রথে উঠলেন। তাঁরা বিনীতভাবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রণাম করে, ছোটদের আলিঙ্গন করে রওনা হলেন। তখন কুরুবংশের বহু ব্যক্তি, বিদুর সহ তাঁদের অনুসরণ করতে লাগলেন। পাণ্ডবদের বিমর্ষ দেখে নির্ভীক ব্রাহ্মণেরা বলাবলি করতে লাগলেন যে, 'রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তাই তিনি ছেলের পক্ষপাতিত্ব করছেন। তাঁর ধর্মলুপ্ত হয়েছে। পাণ্ডবেরা তো কারো কোনো ক্ষতি করেনি, তাদের পিতার রাজ্যই তাদের পাওয়া উচিত, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের এত ঈর্ষা কেন ? জানিনা, ধর্মাত্মা ভীষ্ম এই অন্যায় কী করে সহ্য করছেন। আমরা তো সইতে পারছি না। চলো, যুধিষ্ঠির যেখানে থাকবেন আমরা সবাই সেখানে চলে যাই।' পুরবাসীদের কথা শুনে এবং তাঁদের দুঃখের কথা জেনে যুধিষ্ঠির বললেন—'পুরবাসীগণ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতা, পরম সম্মানীয় গুরু। তিনি যা করতে বলবেন আমরা নিঃসংকোচে তাই করব। এই আমাদের কর্তব্য। আপনারা যদি আমাদের হিতৈষী এবং বন্ধু হন তাহলে আমাদের উৎসাহিত করুন এবং আশীর্বাদ দিয়ে ফিরে যান। আমাদের কাজে যদি কোনো বাধা আসে তখনই আপনারা আমাদের প্রিয় ও হিতকার্য করবেন।' যুধিষ্ঠিরের ধর্মসম্মত কথা শুনে সকল পুরবাসী তাঁদের আশীর্বাদ করে নগরে ফিরে গেলেন।

সকলে ফিরে গেলে বহুভাষাবিদ্ বিদুর সাংকেতিক ভাষায় বললেন—'নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের শত্রুর মনোভাব বুঝে তার থেকে নিজেদের রক্ষা করা উচিত। এমন অস্ত্র আছে, যা লোহার না হলেও দেহ নষ্ট করে দিতে পারে। শত্রুর এই আধিপত্য যদি কেউ বুঝতে পারে তবে সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়[১]। আগুন ঘাস-পাতা ও জঙ্গলকে পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু

---

[১]শত্রুরা তোমাদের জন্য এমন এক গৃহ নির্মাণ করেছে, যা সামান্য আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

সুড়ঙ্গে বাসকারী জীব রক্ষা পায়। জীবিত থাকার এই হল উপায়।[১] অন্ধের রাস্তা ও দিকের জ্ঞান থাকে না। ধৈর্য হারালে বুদ্ধি লুপ্ত হয়, আমার কথা ভালো করে বুঝে নাও[২]। শত্রু প্রদত্ত বিনা লোহার হাতিয়ার যারা গ্রহণ করে, তারা শজারুর গর্তে ঢুকে আগুন থেকে রক্ষা পায়[৩]। চলা-ফেরা করলে রাস্তা চেনা হয়ে যায়, নক্ষত্র থেকে দিক জ্ঞান হয়। যার পাঁচ ইন্দ্রিয় বশে থাকে, শত্রু তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।'[৪] বিদুরের সঙ্কেত বাক্য শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি আপনার কথা ভালোভাবে বুঝে গেছি।' বিদুর হস্তিনাপুর ফিরে গেলেন। সেই দিনটি ছিল ফাল্গুনের শুক্লা অষ্টমী, রোহিণী নক্ষত্র।

পাণ্ডবদের লাক্ষাগৃহে বাস, সুড়ঙ্গ খনন এবং আগুন লাগিয়ে পলায়ন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবদের শুভাগমনের সমাচার শুনে বারণাবতের নাগরিকগণ শাস্ত্র-বিধি অনুসারে মঙ্গলময় জিনিস উপহার নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত মনে উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে গেলেন। তাঁদের জয়-জয় ধ্বনিতে চতুর্দিক গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। পুরবাসীদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র উপস্থিত। অভ্যর্থনাকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে ভাইদের নিয়ে যুধিষ্ঠির এবং মাতা কুন্তী বারণাবত নগরীতে প্রবেশ করলেন। প্রথমে তাঁরা বেদবিদ এবং যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর ক্রমশ নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যোদ্ধা এবং বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি পুরবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। পুরোচন তাঁদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং তাঁদের খাদ্য-শয্যা ইত্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন। পাণ্ডবেরা সুখে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। পুরবাসীরা প্রায়শই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। দশদিন কেটে যাবার পর পুরোচন তাঁদের সেই লাক্ষাগৃহে নিয়ে এলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভবনটির চতুর্দিক ভালো করে নিরীক্ষণ করে ভীমকে বললেন—'ভাই ভীম ! দেখতে পাচ্ছ, এই বাড়িটি চতুর্দিকে কেমন আগুন লাগার মতো বস্তু দিয়ে তৈরি ! ঘি, লাক্ষা এবং চর্বির গন্ধ থেকে তাই প্রমাণিত হচ্ছে। শত্রুপক্ষের কারিগর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শণ, ঘাস, খড়, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে এটি তৈরি করেছে। পুরোচন ভেবেছে আমরা যখন নিঃসন্দেহ হয়ে এখানে বসবাস করতে থাকব, তখন সে এখানে আগুন লাগিয়ে আমাদের পুড়িয়ে মারবে। বিদুর প্রথমেই এই ব্যাপার আন্দাজ করেছিলেন/তাই তিনি স্নেহবশত আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন।' ভীম বললেন—'দাদা ! যদি তাই হয়, তাহলে আমরা আগের বাড়িতেই ফিরে যাই না কেন ?' যুধিষ্ঠির বললেন—'ভাই ! অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এই কথাটি গোপন রাখতে হবে। আমাদের চালচলন দেখে যেন কারো সন্দেহ না হয়। এখান থেকে বার হবার রাস্তা খুঁজতে হবে। আমাদের ভাব-ভঙ্গীতে পুরোচন যদি জানতে পারে, তাহলে সে বলপূর্বক আমাদের হত্যা করতে পারে। তার তো লোকনিন্দা অথবা অধর্মের ভয় নেই। আমরা যদি মরে যাই তাহলে পিতামহ ভীষ্ম অথবা অন্যান্যেরা কৌরবদের ওপর রাগ করে কী করবেন ? সেই সময় ক্রোধ তো বৃথাই হবে। আমরা যদি

[১]এর থেকে রক্ষা পাবার জন্য তোমরা একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করে নিও।

[২]আগেই দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকবে, যাতে দিকভ্রম না হয়।

[৩]তুমি যদি ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে চলে যাও, তাহলে বাড়ির আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

[৪]তোমাদের পাঁচভাই যদি একমতে থাক, তাহলে শত্রু তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।

ভয় পেয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই, তাহলে দুর্যোধন গুপ্তচর লাগিয়ে আমাদের হত্যা করবে। এখন ওদের হাতেই রাজকোষ এবং সৈন্য-সামন্ত, মন্ত্রী সবই—আমাদের কিছুই নেই। চলো, আমরা এখানে ঘুরে বেড়িয়ে সব রাস্তা চিনে রাখি। উত্তম এক সুড়ঙ্গ তৈরি করে আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব, কেউ যেন জানতে না পারে যে পাণ্ডবেরা এখান থেকে বেঁচে ফিরে গেছে।' ভীম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশ মেনে নিলেন।

বিদুরের পরিচিত এক সুড়ঙ্গ খননকারী ব্যক্তি ছিল। সে

পাণ্ডবদের কাছে এসে বলল, 'আমি খননকার্যে নিপুণ, বিদুরের আদেশে এখানে এসেছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। বিদুর সাংকেতিক ভাষায় আমাকে বলেছিলেন যে, যাবার সময় তিনি যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছ ভাষায় কিছু বলেছিলেন আর যুধিষ্ঠিরও তার উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি বিদুরের কথা ভালোমতই বুঝেছেন। পুরোচন সত্বরই এখানে আগুন লাগাবেন। এখন আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি ?' যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। বিদুর যেমন আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তুমিও তেমন আমাদের আপন বলে জেনো। বিদুর যেমন আমাদের রক্ষা করেন, তেমনভাবে তুমিও আমাদের রক্ষা করো। অগ্নিভয় থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও। এই গৃহের চার দিকে উঁচু দেওয়াল, একটাই মাত্র দরজা।' সুড়ঙ্গ খননকারী ব্যক্তিটি যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে নোংরা গর্ত পরিষ্কার করার অজুহাতে কাজে লেগে গেল। সে ঘরের মধ্যে থেকে একটি বড় সুড়ঙ্গ তৈরি করল এবং তাতে একটি দরজা লাগিয়ে দিল। পুরোচন সর্বদা সেই ভবনের দরজাতে থাকত, সে যাতে এসে না দেখে, তাই সুড়ঙ্গের মুখ সবসময় বন্ধ রাখা হত।

পাণ্ডবেরা সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে সেই ভবনে রাত কাটাতেন। সারা দিন শিকার করার ছলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। সেই খননকারী ছাড়া পাণ্ডবদের এইসব খবর আর কেউ জানত না।

পুরোচন দেখল বছর প্রায় ঘুরতে চলল, পাণ্ডবেরা তাকে বিশ্বাস করে নিঃশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। সে খুব খুশি হল। তার এই খুশিভাব দেখে যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের ডেকে বললেন—'পাপাচারী পুরোচন ভাবছে, সে আমাদের খুব ঠকিয়েছে। চলো, এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। অস্ত্রাগার এবং পুরোচনকে পুড়িয়ে মেরে গুপ্ত ভাবে পালাতে হবে।'

কুন্তী একদিন ব্রাহ্মণদের দান-ভোজন করালেন। অনেক স্ত্রীলোক তাতে এসেছিলেন। সকলে খেয়ে-দেয়ে চলে যাবার পর দৈবক্রমে এক ভীলের স্ত্রী তার পাঁচপুত্রসহ সেখানে খাবারের জন্য এল। তারা সকলে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিল। বেহুঁশ হয়ে তারা লাক্ষাগৃহেই ঘুমিয়ে পড়ল। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঝড় বইছিল, ভীষণ অন্ধকার রাত্রি। যেখানে পুরোচন ঘুমোচ্ছিল, ভীম সেখানে গেলেন। ভীম প্রথমে সেই গৃহের দরজাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন, তারপর চার দিকে আগুন ছড়িয়ে দিলেন। বিকট আগুন ছড়িয়ে পড়ল। পাঁচভাই মাতা কুন্তীকে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলেন। আগুনের অসম্ভব তাপ এবং তার ভীষণ আলো যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং বাড়ি পোড়ার আওয়াজ

হতে লাগল তখন নগরবাসীদের ঘুম ভেঙে গেল এবং সকলে দৌড়ে সেখানে আসতে লাগল। ভবনটির ভীষণ দশা দেখে সকলে বলতে লাগল যে 'দুরাত্মা দুর্যোধনের কথায় পুরোচন এই ফন্দী এঁটেছিল। এসব তারই কাজ। ধৃতরাষ্ট্রের এই স্বার্থপরতাকে ধিক্। হায় হায় ! তারা এই সহজ সরল পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারল ! পুরোচনও উচিত শাস্তি পেয়েছে ! সেই নির্দয় ব্যক্তিও জ্বলে ছাই হয়ে গেছে।' বারণাবতের নগরবাসীরা সারারাত সেখানে ক্রন্দন ও আলাপ আলোচনায় কাটিয়ে দিল।

পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে এক বনে এসে হাজির হলেন। সকলেই তাড়াতাড়ি সেই বন থেকে বেরোতে চাইছিলেন। কিন্তু ক্লান্তি এবং লোক জানাজানির ভয় ও মাতা কুন্তীর জন্য তাঁরা শীঘ্র এগোতে পারছিলেন না। তখন ভীম মাকে কাঁধে এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে, যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনকে দুহাতে ধরে তাড়াতাড়ি করে চলতে লাগলেন। এইভাবে ক্ষিপ্র গতিতে ভীম সকলকে নিয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছলেন।

পাণ্ডবদের গঙ্গা পার হওয়া, কৌরবদের দ্বারা পাণ্ডবগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং বনমধ্যে ভীমের বিষাদ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সেই সময় বিদুর প্রেরিত এক বিশ্বাসী ব্যক্তি পাণ্ডবদের কাছে এলেন। তিনি পাণ্ডবদের বিদুরের বলা সংকেত বাক্য শোনালেন এবং বললেন—'আমি বিদুরের বিশ্বাসী সেবক। আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। বিদুরের কথা অনুযায়ী আপনারা নিশ্চয়ই শত্রুদের পরাস্ত করবেন। নৌকা প্রস্তুত আছে, আপনারা এতে করে গঙ্গা পার হয়ে যান।' পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তীসহ নৌকাতে উঠলে তিনি বললেন—'বিদুর অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে বলেছেন যে, আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের পথে যান। ভয় পাবার কিছুই নেই।' সেই ব্যক্তি পাণ্ডবদের গঙ্গা পার করে জয়ধ্বনি দিলেন এবং তাঁদের কুশল সংবাদ নিয়ে বিদুরের কাছে ফিরে এলেন। পাণ্ডবগণও গঙ্গা পার হয়ে গোপনে এগিয়ে চললেন।

এদিকে বারণাবতে সারারাত কেটে যাওয়ার পর সমস্ত পুরবাসী পাণ্ডবদের দেখবার জন্য এল। আগুন নেভাতে গিয়ে তারা বুঝে গেল যে, এই ভবনটি লাক্ষা দিয়ে তৈরি এবং পুরোচনও তাতেই পুড়ে মরে গেছে। তারা নিশ্চিত হল যে 'পাপী দুর্যোধনই এই ষড়যন্ত্র করেছে। ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই এই ব্যাপার জানতেন। ভীষ্ম, বিদুর এবং অন্যান্য কৌরবেরাও ধর্মের পক্ষে নেই। চলো, আমরা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাই যে, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন তাঁর কুকর্মের দ্বারা পাণ্ডবগণ পুড়ে মারা গেছেন।' সকলে যখন ভস্মরাশি সরাল তখন পাঁচপুত্রসহ ভীলনারীর মৃতদেহ দেখতে পেল। তারা ভাবল ওই মৃতদেহগুলি পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের মা কুন্তীর। সুড়ঙ্গ খননকারী ব্যক্তিটি জায়গা পরিষ্কার করার সময়ে আবর্জনা দিয়ে সুড়ঙ্গ বুজিয়ে দিয়েছিল, তাই

কেউই সুড়ঙ্গের কথা জানতে পারল না। পুরবাসীরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সব খবর পাঠাল।

এই অশুভ সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র আনন্দ পেলেও বাহ্যত খুব দুঃখপ্রকাশ করলেন। তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন, 'হায় হায় ! পাণ্ডব এবং তাদের মায়ের মৃত্যুতে আমি পাণ্ডুর মৃত্যুর থেকেও বেশি শোক অনুভব করছি !' তিনি কৌরবদের নির্দেশ দিলেন—'তোমরা শীঘ্র বারণাবতে যাও এবং কুন্তীসহ পাণ্ডবদের শাস্ত্রসম্মত অন্তিম ক্রিয়াকর্ম করো। পুরোচনের আত্মীয়রাও যেন সেখানে গিয়ে তার অন্তিম কাজ সম্পন্ন করে। পাণ্ডবদের কাজ এমনভাবে করো, যাতে তারা সদ্গতিলাভ করে।' সব আত্মীয়স্বজন এবং ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করতে করতে শ্রাদ্ধতর্পণ করলেন। পুরবাসীরা এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হল। বিদুর সবকিছু জানলেও কোনো কিছু প্রকাশ না করে শোকপ্রকাশ করলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা নদী পার হয়ে দক্ষিণদিকে চলতে লাগলেন। সকলেই সেইসময় ঘুমে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ঘন জঙ্গল, দিক ঠিক করা যাচ্ছিল না। যদিও পুরোচন পুড়ে মারা গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও তাঁরা গোপনভাবেই চলছিলেন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম আবার সেইভাবে সবাইকে কাঁধে, কোলে নিয়ে বেগে চলতে লাগলেন। তিনি এত বেগে চলছিলেন যে, সারা বন কম্পিত হচ্ছিল। সেই সময় পাণ্ডবেরা তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে এবং ঘুমে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁদের পক্ষে এগোনো মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। তাঁরা এমন ভয়ংকর জঙ্গলে গিয়ে পড়লেন, যেখানে জলের চিহ্নমাত্র ছিল না। কুন্তী সেইসময় অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে জলপান করতে চাইলেন। ভীম তখন তাঁদের এক বটবৃক্ষের নীচে রেখে বললেন, 'তোমরা কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করো, আমি জল আনতে যাচ্ছি। এখানে কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও জলাশয় আছে। কেননা জলের পাখি সারসের মধুর ডাক শোনা যাচ্ছে।' যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ পেয়ে ভীম সারস পাখিদের আওয়াজ অনুসরণ করে এক সরোবরের কাছে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি জলপান করে, স্নান করে অন্য সকলের জন্য কাপড় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন।

বটবৃক্ষের কাছে পৌঁছে ভীম দেখলেন যে, মা এবং অন্যান্য ভাইয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি তাইতে দুঃখ পেয়ে ভাবতে লাগলেন, 'যাঁদের বহুমূল্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করেও ঘুম আসত না, আজ তাঁরা মাটির বিছানায় খোলা আকাশের নীচে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন, আমার কাছে এর থেকে কষ্টের আর কী হতে পারে ! আমার মা বসুদেবের ভগ্নী আর কুন্তিরাজের কন্যা। ইনি বিচিত্রবীর্যের ন্যায় সুখী ব্যক্তির পুত্রবধূ, মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, আমাদের মতো পুত্রদের মাতা। তিনিও মাটিতে শয্যা পেতেছেন। এর থেকে দুঃখের আর কী হতে পারে, যাঁর ধর্মপালনের ফলস্বরূপ ত্রিলোক শাসন করা উচিত, সেই যুধিষ্ঠির ক্লান্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো ধুলায় শয়ন করে আছেন। হায় ! আজ আমাকে নিজের চোখে দেখতে হল যে, বর্ষার মেঘের মতো শ্যামসুন্দর নররত্ন অর্জুন এবং দেবতাদের মধ্যে অশ্বিনীকুমারের ন্যায় রূপসম্পন্ন নকুল ও সহদেব আশ্রয়হীনের মতো বৃক্ষের নীচে নিদ্রা যাচ্ছেন। দুরাত্মা দুর্যোধন আমাদের নিরাশ্রয় করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যবশত আমরা বেঁচে গেছি। এখন আমরা বৃক্ষের ছায়ায়, জানি না কোথায় যাব, কী করব। ওরে দুর্যোধন, তুই সুখী হ ! যুধিষ্ঠির তোকে বধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না, নাহলে আজই আমি তোকে তোর আত্মীয় বন্ধু সহ যমের ভবনে পাঠাতাম। ওরে পাপী, যুধিষ্ঠির যখন তোর ওপর রাগ করছেন না, আমি আর কী করব ?' ভীম ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন, জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন এবং হাতে হাত ঘষতে লাগলেন। ভাইদের নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখে ভাবলেন, 'হায় বারণাবত কিছু দূরে অবস্থিত, এঁদের সতর্কভাবে জেগে থাকার কথা, তাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঠিক আছে, আমি জেগে থাকি। জলের কী হবে, ঠিক আছে, ঘুম ভাঙলে পান করবেন।' এই ভেবে ভীম জেগে পাহারা দিতে লাগলেন।

—— ০ ——

হিড়িম্বাসুর বধ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যে বনে পাণ্ডবেরা ঘুমোচ্ছিলেন, তার একটু দূরে এক শালবৃক্ষ ছিল। তার ওপরে হিড়িম্বাসুর বসে ছিল, সে অত্যন্ত ক্রূর, পরাক্রমী এবং মাংসভুক ছিল। তার দেহবর্ণ কালো, চক্ষু হলুদ এবং ভীষণ আকৃতি ছিল। দাঁড়ি-গোঁফ-চুল সব রক্তবর্ণের আর বড় বড় দাঁতের জন্য তার মুখ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। সে তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। মানুষের গন্ধ পেয়ে সে পাণ্ডবদের দেখতে পেল এবং বোন হিড়িম্বাকে ডেকে বলল—'বোন, আজ অনেকদিন পরে আমার প্রিয় খাদ্য মানুষের মাংস খাওয়ার সুযোগ এসেছে। জিভে জল আসছে। ওদের শরীরে দাঁত বসিয়ে প্রথমে গরম রক্ত পান করব। তুমি যাও, ওদের মেরে নিয়ে এস। তারপর আমরা দুজন মজা করে খেয়ে নাচব-গাইব।'

ভাইয়ের আদেশে হিড়িম্বা রাক্ষসী অতি সত্বর পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। সে গিয়ে দেখল কুন্তী এবং যুধিষ্ঠিরসহ

চার ভ্রাতা ঘুমে আচ্ছন্ন হলেও মহাবলী ভীম জেগে আছেন। ভীমসেনের বিশাল শরীর এবং সুন্দর রূপ দেখে তার মন পরিবর্তিত হল। সে ভাবতে লাগল যে, 'এঁর এই সুন্দর শ্যামবর্ণ, প্রলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ, শঙ্খের ন্যায় ঘাড় এবং কমল নয়ন বিশিষ্ট মুখশ্রী, ইনি অবশ্যই আমার পতি হবার উপযুক্ত। আমি ভাইয়ের হিংস্র আদেশ মানব না, ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়ে পতিপ্রেম শ্রেষ্ঠ। এঁকে বধ করে ভোজন করলে আমরা কিছু সময়ের জন্য তৃপ্ত হব কিন্তু যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে এঁর সঙ্গে থেকে আমি বহু বছর সুখ-ভোগ করতে পারব।'

এই ভেবে হিড়িম্বা মানবীরূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে ভীমের কাছে গেলেন। দিব্য বসন-ভূষণ পরিধান করে হিড়িম্বা কিছু সঙ্কোচের সঙ্গে মৃদুহাস্যে বললেন—'পুরুষ শিরোমণি ! আপনি কে ? কোথা থেকে এসেছেন ? এখানে যাঁরা নিদ্রিত তাঁরা কে ? বৃদ্ধা আপনার কে হন ? এঁরা এই ভয়ানক জঙ্গলে নিঃশঙ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন, এঁরা কি জানেন না যে, এখানে বড় বড় রাক্ষসের বাস, কাছেই হিড়িম্ব রাক্ষস থাকে ! আমি তারই বোন। সেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে আপনাদের মাংস খাবার জন্য। আমি আপনার দেবোপম সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি সত্যশপথ করে বলছি যে, আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে পতিরূপে স্বীকার করব না। আপনি ধর্মজ্ঞ, যা উচিত বলে মনে করেন, তাই করুন। আমি আপনাকে ভালোবেসেছি, আপনিও আমার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করুন। আমি এইসব নরমাংসভোজী রাক্ষসদের থেকে আপনাদের রক্ষা করব এবং আমরা দুজন পর্বতগুহায় সুখে দিন যাপন করব। আমি ইচ্ছামতো আকাশমার্গে বিচরণ করতে পারি। আপনি আমার সঙ্গে অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করুন।' ভীম বললেন, 'ওহে রাক্ষসী ! আমার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। আমি এঁদের রাক্ষসের উদর পূর্তির জন্য ছেড়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে কাম-ক্রীড়া করতে যাই, তা কী করে সম্ভব ?' হিড়িম্বা বললেন—'আপনি যাতে সন্তুষ্ট হবেন, আমি তাই করব। আপনি এঁদের নিদ্রা ভঙ্গ করুন, আমি এঁদের রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাব।' ভীম বললেন—'বাঃ, বেশ বলেছ ! আমি আমার সুখনিদ্রিত মা এবং ভাইদের দুরাত্মা রাক্ষসদের ভয়ে জাগিয়ে দেব ? জগতে কোনো মানুষ, রাক্ষস বা গন্ধর্ব আমার সামনে

দাঁড়াতেই পারবে না। সুন্দরী, তুমি এখানে থাক অথবা চলে যাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

এদিকে রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব ভাবল 'আমার বোন তো অনেকক্ষণ গেছে!' তখন সে গাছ থেকে নেমে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সেই ভীষণ রাক্ষসকে আসতে দেখে হিড়িম্বা ভীমকে বললেন, 'দেখুন, দেখুন, নরমাংসলোলুপ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে এদিকেই আসছে! আপনি আমার কথা শুনুন। আমার মধ্যে রাক্ষসীমায়া আছে, তাই আমি ইচ্ছানুসারে চলাফেরা করতে পারি। আমি আপনাদের সকলকে নিয়ে আকাশপথে উড়ে যাব।' ভীম বললেন, 'সুন্দরী, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি থাকতে কোনো রাক্ষসই এদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার সামনেই আমি একে হত্যা করব। আমার হাত দেখ, পা দেখ, যে কোনো রাক্ষসকে এর সাহায্যে আমি পিষে মারব। আমাকে মানুষ মনে করে অপমান কোরো না।' এইসব কথাবার্তার মধ্যেই হিড়িম্ব রাক্ষস সেখানে এসে হাজির হল। সে দেখল তার বোন মানুষের মতো সুন্দর রূপ ধারণ করে সেজে-গুজে ভীমের বউ হতে চাইছে। সে ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'ওরে হিড়িম্বা! আমি এর মাংস খেতে চাইছি আর তুই তাতে বাধা দিচ্ছিস, তোকে ধিক্! তুই আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করছিস। যার সহায়তায় তোর এই সাহস, দেখ তোর সঙ্গে তাকেও আমি মেরে ফেলব।' এই বলে দাঁতে দাঁত ঘসে সে হিড়িম্বা আর পাণ্ডবদের দিকে তেড়ে এল।

তাকে আক্রমণ করতে দেখে ভীম ধমক দিয়ে বললেন—'দাঁড়াও, দাঁড়াও, মূর্খ! তুমি আমার নিদ্রিত ভাইদের জাগাচ্ছ কেন? তোমার বোন এমন কী অপরাধ করেছে? হিম্মত থাকে তো আমার সামনে এস। তোমার জন্য আমি একাই যথেষ্ট। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়ো না।' ভীম অট্টহাস্য করে হাত ধরে তাকে টানতে টানতে বহুদূরে নিয়ে গেলেন। এইভাবে একে অপরে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে অনেক দূরে চলে গেল, গাছ উপড়ে মারামারি করতে লাগল। তাদের দুজনের গর্জনে কুন্তী এবং পাণ্ডবদের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন পরমা সুন্দরী হিড়িম্বা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে

কুন্তী মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'সুন্দরী, তুমি কে? এখানে এসেছ কেন?' হিড়িম্বা বললেন—'এই ভীষণ ঘন জঙ্গল আমার এবং আমার ভাই হিড়িম্বের বাসভূমি, আমার ভাই আপনাদের হত্যা করার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল। এখানে এসে আমি আপনার পরম রূপবান পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি মনে মনে তাঁকে পতিরূপে বরণ করেছি এবং তাঁকে এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি তাতে বিচলিত হননি। আমার বিলম্ব দেখে আমার ভাই নিজে এখানে চলে এসেছে আর আপনার পুত্র তাকে টানতে টানতে বহু দূরে নিয়ে গেছেন। দেখুন, ওরা দুজনে কীরকম যুদ্ধ করছে।' হিড়িম্বার কথা শুনে চার ভাই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং দেখলেন ভীম এবং হিড়িম্বাসুর একে অন্যকে হারাবার জন্য চেষ্টা করছে। ভীমকে একটু পিছু হটতে দেখে অর্জুন বললেন—'ভাই, ভয় নেই, নকুল ও সহদেব মাকে রক্ষা করবে। আমি এখনই এই রাক্ষসকে মেরে ফেলছি।' ভীম বললেন— 'ভাই অর্জুন! ভয় পেয়ো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ। আমার হাত থেকে এ বাঁচতে পারবে না।' তারপর ভীম ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ঝড়ের ন্যায় প্রবল হয়ে তাকে তুলে আকাশে কয়েকবার ঘোরালেন। ভীম

বললেন—'ওরে রাক্ষস ! তুই বৃথাই মাংস খেয়ে এত হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিস। তোর বেড়ে ওঠাও বৃথা, ঘোরা ফেরাও বৃথা। তোর জীবনই যখন ব্যর্থ হয়ে গেছে, তোর মৃত্যু হওয়া উচিত।' এই বলে ভীম তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেললেন। হিড়িম্ব রাক্ষস তাতেই মারা গেল। অর্জুন এসে ভীমকে আলিঙ্গন করে বললেন—'ভাই, বারণাবত নগর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাই। দুর্যোধন না আবার আমাদের খবর পেয়ে যায় !' তারপর তাঁরা সকলে মাকে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। হিড়িম্বাও তাঁদের পিছন পিছন চলতে লাগলেন।

—o—

হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের বিবাহ, ঘটোৎকচের জন্ম এবং পাণ্ডবদের একচক্রা নগরীতে প্রবেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাক্ষসীকে পিছন পিছন আসতে দেখে ভীম বললেন—'হিড়িম্বা ! আমি জানি রাক্ষসেরা মোহিনী মায়ার সাহায্যে পূর্বের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়। অতএব তুমি যাও, নিজের ভাইয়ের পথ দেখ।' যুধিষ্ঠির বললেন—'ছি, ছি ! ক্রোধবশেও কোনো নারীর ওপর হাত তোলা উচিত নয়। আমাদের শরীর রক্ষার থেকেও বড় হল ধর্মরক্ষা করা। তুমি ধর্মরক্ষা করো। তুমি এর ভাইকে হত্যা করেছ, এখন এই স্ত্রীলোক আর আমাদের কী করবে ?' তখন হিড়িম্বা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে হাতজোড় করে কুন্তীকে বললেন—'আর্যে ! আপনি তো জানেন নারীদের কামদেবের পীড়া কীরূপ দুঃসহ হয়। আমি আপনার পুত্রের জন্য অনেকক্ষণ থেকে কষ্ট পাচ্ছি, এখন আমার সুখ পাওয়া উচিত। আমি আমার আত্মীয়-কুটুম্ব, ধর্ম সব কিছু পরিত্যাগ করে আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ করেছি। আমি আপনার এবং আপনার পুত্রের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য। যদি আপনারা আমাকে স্বীকার না করেন, তাহলে আমি প্রাণত্যাগ করব। আমি শপথ করে একথা বলছি। আপনি আমাকে কৃপা করুন। আমি মূঢ়, ভক্ত বা সেবক যাই হই, তা আপনারই। আমি আপনার পুত্রকে নিয়ে যাব আর কিছুদিন পরেই ফিরে আসব, আমাকে বিশ্বাস করুন। যখনই স্মরণ করবেন, আমি এসে যাব। যেখানে বলবেন, সেখানে পৌঁছে দেব। যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক, আমি আপনাদের রক্ষা করব। কোথাও আপনাদের তাড়াতাড়ি যাওয়ার থাকলে পিঠে করে পৌঁছে দেব। যিনি আপৎকালেও নিজ ধর্মকে রক্ষা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'হিড়িম্বা ! তোমার কথা ঠিক। সত্যকে কখনো উলঙ্ঘন কোরো না। প্রতিদিন সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত তুমি পবিত্রভাবে ভীমের সেবায় রত থাকবে। ভীম সারাদিন তোমার সঙ্গে থাকবে, সন্ধ্যা হলেই তুমি তাঁকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে।' রাক্ষসী এইকথা মেনে নিলে ভীম বললেন—'আমার একটি শর্ত আছে।

যতক্ষণ পুত্র না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে থাকব। পুত্র জন্মালে আর নয়।' হিড়িম্বা সে কথাও মেনে নিলেন। তখন তিনি ভীমকে নিয়ে আকাশ মার্গে চলে গেলেন। এবার হিড়িম্বা অতি সুন্দর রূপ ধারণ করে দিব্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে মিষ্ট ভাষায় কথা বলতে বলতে পর্বত শিখরে, জঙ্গলে, সরোবরে, গুহাতে এবং নগরে ভীমের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। সময়মতো তাঁর গর্ভে এক

পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তার ছিল বিকট চোখ, বিশাল শরীর, কুলোর মতো কান, লাল ঠোঁট, তীক্ষ্ণ দাঁত, লম্বা লম্বা হাত, অপরিমিত শক্তি, বিকট আওয়াজ। সে তৎক্ষণাৎ বড় বড় রাক্ষসদের থেকেও বড় হয়ে উঠল এবং সেই সময়েই যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে সর্বশাস্ত্রবিদ এবং বীর হয়ে উঠল। জনমেজয় ! রাক্ষসীরা অতি সত্বর গর্ভধারণ করে বাচ্চার জন্ম দেয় এবং যেমন খুশি রূপ ধারণ করতে পারে।

হিড়িম্বার পুত্রের মাথায় চুল ছিল না। সে ধনুক হাতে করে মা-বাবার কাছে এসে প্রণাম করল। মা-বাবা তার 'ঘট' অর্থাৎ মাথা 'উৎকোচ' অর্থাৎ কেশহীন দেখে তার নাম রাখল 'ঘটোৎকচ'। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত, পাণ্ডবেরাও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হিড়িম্বা ভাবলেন এখন ভীমের শর্ত পূর্ণ হয়েছে, তাই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। ঘটোৎকচ মাতা কুন্তী এবং পাণ্ডবদের প্রণাম করে বললেন—'আপনারা আমার পূজনীয়। আপনারা নিঃসঙ্কোচে বলুন আমি আপনাদের কী

সেবা করতে পারি।' কুন্তী বললেন—'পুত্র ! তুমি কুরুবংশে জন্মেছ এবং ভীমের মতোই বীর। এই পাঁচটি পুত্রের তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। তাই সময় এলে এদের সাহায্য করবে।' কুন্তীর কথার উত্তরে ঘটোৎকচ বলল—'আমি রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বিশালকায়। যখন আপনাদের প্রয়োজন হবে, আমাকে স্মরণ করবেন, আমি উপস্থিত হব।' এই বলে সে উত্তরদিকে গমন করল। জনমেজয় ! দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের শক্তির আঘাত সহ্য করার জন্যই ঘটোৎকচকে উৎপন্ন করেছিলেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এরপর পাণ্ডবেরা মাথায় জটাধারণ করলেন এবং বল্কল বস্ত্র ও মৃগচর্মও গ্রহণ করলেন। এইরূপ তপস্বীবেশে তাঁরা মাতা কুন্তীসহ পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কখনো মাকে পিঠে করে দ্রুত চলতেন, কখনো ধীরে ধীরে আনন্দ করে হাঁটতেন। একবার তাঁরা শাস্ত্রের স্বাধ্যায়ে রত ছিলেন, তখন ভগবান শ্রীবেদব্যাস তাঁদের কাছে এলেন। পাণ্ডবেরা তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্যাসদেব বললেন—'যুধিষ্ঠির, তোমাদের বিপদের খবর আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম দুর্যোধনেরা অন্যায়ভাবে তোমাদের রাজধানী থেকে নির্বাসিত করেছে। আমি তোমাদের হিতার্থে এখানে এসেছি। তোমরা এই বিষাদময় পরিস্থিতিতে দুঃখিত হয়ো না। এসব তোমাদের সুখের জন্যই হচ্ছে। তোমরা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা উভয়ই আমার কাছে সমান, এতে কোনো সন্দেহই নেই। তবু তোমাদের দীনতা এবং অসহায় অবস্থা দেখে তোমাদের ওপর স্নেহ বেশি হচ্ছে। তাই তোমাদের হিতের কথা বলছি। এখানে কাছেই এক সুন্দর নগর আছে, তোমরা সেখানে গোপনভাবে থাক এবং আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করো।'

পাণ্ডবদের এইভাবে আশ্বাস দিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে করে একচক্রা নগরীর দিকে রওনা হলেন। একচক্রা নগরীতে এসে তিনি কুন্তীকে বললেন—'কল্যাণী, তোমার পুত্র যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধর্মাত্মা, সে ধর্মপালনে রত থেকে সমস্ত পৃথিবী জয় করে সকল রাজাদের ওপর শাসন করবে। তোমার এবং মাদ্রীর পুত্রেরা মহারথী হবে এবং নিজ রাজ্যে সুখে জীবন কাটাবে। এরা রাজসূয়, অশ্বমেধ ইত্যাদি বড় বড় যজ্ঞ সম্পন্ন করবে। নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সুখী করবে এবং চিরকাল পরম্পরাগতভাবে রাজ্য ভোগ করবে।' ব্যাসদেব এইসব বলে পাণ্ডবদের কুন্তীসহ এক ব্রাহ্মণের গৃহে থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং যাবার সময় বললেন—'একমাস আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি আবার আসব। দেশ-কাল অনুযায়ী ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। তোমরা সুখী হবে।' সকলে হাত জোড় করে তাঁর নির্দেশ মেনে নিলেন। তারপর ব্যাসদেব চলে গেলেন।

আর্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ওপর কুন্তীর দয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—যুধিষ্ঠির তাঁর চার ভাই ও মাকে নিয়ে একচক্রা নগরীতে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নগরবাসীগণ যুধিষ্ঠিরাদির গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পাণ্ডবেরা সারাদিন ভিক্ষা করে সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে মায়ের কাছে ভিক্ষা সামগ্রী সমর্পণ করতেন। মায়ের নির্দেশে তার অর্ধেক ভীমসেন খেতেন আর অর্ধেক সামগ্রী বাকী সকলে। এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

একদিন সকলে ভিক্ষায় বার হলেও ভীম কোনো কারণবশত মায়ের কাছে ছিলেন। সেইদিন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে করুণ ক্রন্দন শোনা গেল। তাঁরা বিলাপ করতে করতে কাঁদছিলেন। তাই শুনে কুন্তীর দয়ার্দ্র হৃদয় দ্রবীভূত হল, তিনি ভীমকে বললেন—'পুত্র ! আমরা এঁদের গৃহে থাকি, এঁরা আমাদের অনেক আপ্যায়ন করে থাকেন। আমি প্রায়ই ভাবি এঁদের জন্য আমাদের কিছু করা দরকার, কৃতজ্ঞতাই মানুষের জীবন। যদি কেউ কোনো উপকার করে, তার পরিবর্তে তাদের বেশি উপকার করা উচিত। এই ব্রাহ্মণ পরিবার নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন। আমরা যদি এঁদের কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারি তাহলে কিছু ঋণশোধ হয়।' ভীম বললেন—'মা ! তুমি ব্রাহ্মণদের কী হয়েছে জেনে এসো। যত কষ্টই হোক ওদের জন্য যা করার আমি তা করব।' কুন্তী সত্বর ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন, তিনি দেখলেন ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী ও পুত্রকে নিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছেন আর বিলাপ করছেন—'আমার এই জীবনকে ধিক্, এই জীবন অসার, ব্যর্থ, দুঃখী এবং পরাধীন। জীব একাই ধর্ম, অর্থ, কাম ভোগ করতে চায়। এসব না পেলেই সে মহাদুঃখ পায়। মোক্ষ অবশ্যই সুখস্বরূপ। কিন্তু আমার তা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় দেখছি না, পত্নী এবং পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে যেতেও পারছি না। তুমি আমার জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা সহচরী। দেবতারা তোমাকে আমার সখী ও সহায়ককারিণী করে দিয়েছেন। আমি মন্ত্রপাঠ করে তোমাকে বিবাহ করেছি। তুমি কুলীন, সুশীল এবং আমার পুত্রের মা। তুমি সতীসাধ্বী এবং আমার হিতৈষিণী। রাক্ষসের হাত থেকে আমার জীবন রক্ষা করার জন্য আমি তোমাকে তার কাছে পাঠাতে পারব না।'

পতির কথা শুনে ব্রাহ্মণী বললেন—'স্বামীন্ ! আপনি সাধারণ মানুষদের মতো কেন শোক করছেন ? সকলকেই একদিন মরতে হবে, অতএব এই অবশ্যম্ভাবী গতির জন্য শোক কীসের ? পত্নী, পুত্র অথবা কন্যা সবই আপন, আপনি বিবেচনা করে এইসব চিন্তা ত্যাগ করুন। আমি নিজে ওর কাছে যাব। পত্নীর এর থেকে বড় কর্তব্য আর কী হতে পারে। তাঁর নিজের প্রাণ দিয়েও পতির ভালো করা কর্তব্য। আমার এই কাজে আপনি সুখী হবেন এবং আমারও পরলোকে সুখ ও ইহলোকে যশপ্রাপ্তি হবে। আমি আপনার ধর্ম এবং লাভের কথা বলছি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাহ করা হয়, তা এখন পূর্ণ হয়েছে। আমার গর্ভে আপনার এক পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে। আপনি এদের যেভাবে মানুষ করতে পারবেন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। যদি আপনি না থাকেন তাহলে হে প্রাণেশ্বর ! আপনাকে ছাড়া আমি কীভাবে বাঁচব আর সন্তানদের কী দশা হবে ? আমি যদি অনাথ হয়ে বেঁচেও থাকি তাহলে এদের কীভাবে রক্ষা করব ? যখন অযোগ্য শয়তান ব্যক্তি একে বিবাহ করতে চাইবে, আমি কী করে তাকে রক্ষা করব ? বিধবা নারীর ওপর দুষ্ট পুরুষেরা মাংসলোভী জন্তুর মতো আক্রমণ করে। আমি কী করে সেই জীবন কাটাব। কন্যাকে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করা আর পুত্রকে সদ্‌গুণসম্পন্ন করে তোলা আমার পক্ষে কী করে সম্ভব ? আপনি না থাকলে আমিও থাকব না আর আমরা না থাকলে সন্তানেরা কীকরে বাঁচবে ? আপনি চলে গেলে আমরা চারজনেই মরব, সুতরাং আপনি আমাকে পাঠান। পতির আগে পরলোক গমন করা স্ত্রীদের পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি ছেলে ও মেয়ের ওপরে ভরসা না রেখে একমাত্র আপনারই আশ্রিত। নারীর পক্ষে যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের থেকেও বড় হল নিজ পতির হিত ও প্রিয় কাজ করা। আমি যা বলছি তা আপনার এবং আপনার বংশের ভালোর জন্যই। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই স্ত্রী-পুত্র-মিত্র ও ধন সংগ্রহ করা হয়। বিপদের জন্য ধনরক্ষা, ধন খুইয়েও স্ত্রীকে রক্ষা করা এবং পত্নী ও ধন উভয় ত্যাগ করে আত্মকল্যাণ সম্পাদন করা কর্তব্য। আর এও হতে পারে যে, স্ত্রীলোক অবধ্য ভেবে রাক্ষস আমাকে না মারতেও পারে। তাই আমাকেই আপনি পাঠিয়ে দিন। আমার জীবনে আর কী বা বাকি আছে ? ধর্ম-কর্ম করেছি, পুত্র-কন্যা

হয়েছে, আমি মরলে দুঃখ কীসের! আমার মৃত্যু হলে আপনি পুনর্বিবাহ করতে পারেন, কারণ পুরুষদের বহুবিবাহ ধর্মসম্মত, কিন্তু নারীদের পক্ষে তা মহা-অধর্ম। এইসব ভেবেচিন্তে আপনি আমার কথা মেনে নিন এবং এই শিশুদের রক্ষা করার জন্য আপনি থাকুন। আমাকে রাক্ষসের কাছে যেতে দিন।' পত্নী এইসব বললে ব্রাহ্মণ তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

মা-বাবার এই দুঃখময় কথা শুনে কন্যা বলল—'আপনারা দুজনে শোকার্ত হয়ে কেন অনাথের মতো কান্নাকাটি করছেন ? দেখুন, ধর্ম অনুসারে একদিন তো আমাকে আপনারা বিদায় করবেন, অতএব আজই আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কেন রক্ষা করছেন না ? লোকে সন্তান এইজন্যই চায় যে, সে তাদের দুঃখ থেকে রক্ষা করবে। এখন আপনারা কেন সেই সুযোগ নিচ্ছেন না ? আপনারা পরলোকগমন করলে আমার এই প্রিয় ছোট ভাইটি বাঁচবে না। মা-বাবা এবং ভাইয়ের মৃত্যুতে আপনার বংশনাশ হয়ে যাবে। কেউ না থাকলে আমিও থাকতে পারব না। আপনারা থাকলে সকলেরই মঙ্গল। আমি রাক্ষসের কাছে গিয়ে এই বংশকে রক্ষা করব। এতে আমার ইহলোক পরলোক দুই-ই থাকবে।' কন্যার কথা শুনে মা-বাবা উভয়েই কাঁদতে লাগল। কন্যাও না কেঁদে পারল না। সকলকে কাঁদতে দেখে ছোট্ট শিশু পুত্র মিষ্ট গলায় আধো আধো বাক্যে বলতে লাগল—'বাবা, মা, দিদি, কেঁদো না', সকলের কাছে গিয়ে সে এইকথা বলতে লাগল। একটি তৃণ নিয়ে হেসে বলল—'আমি এইটা দিয়ে রাক্ষসকে মেরে ফেলব।' শিশুর কথায় সেই দুঃখের মধ্যেও ক্ষণিক প্রসন্নতা জেগে উঠল।

কুন্তী এইসব কিছুই দেখছিলেন এবং শুনছিলেন। তিনি এবার সুযোগ পেয়ে সামনে এলেন এবং মৃতের ওপর অমৃতবারি সেচনের মতো বলতে লাগলেন—'হে ব্রাহ্মণ-দেব ! আপনাদের দুঃখের কারণ কী ? তা বলুন, সম্ভব হলে দূর করার চেষ্টা করব।' ব্রাহ্মণ বললেন—'তপস্বিনী ! আপনি সজ্জন ব্যক্তির মতোই কথা বলেছেন। কিন্তু আমার দুঃখ মানুষের পক্ষে দূর করা সম্ভব নয়। এই নগরের কাছেই বক নামে এক রাক্ষস থাকে। সেই বলশালী রাক্ষসের জন্য প্রত্যহ এক গাড়ি অন্ন ও দুটি মোষ পাঠাতে হয়। যে ব্যক্তি এগুলি নিয়ে যায়, রাক্ষস তাকেও খেয়ে ফেলে। প্রত্যেক গৃহস্থকেই পালা করে এই কাজ করতে হয়। কিন্তু এর পালা বহুদিন পর আসে। যে এর থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করে, রাক্ষস তার সমস্ত আত্মীয়দের খেয়ে ফেলে। রাজা এখান থেকে কিছু দূরে বেত্রকীয়গৃহ নামক স্থানে থাকে, সে খুবই পাপী এবং এই বিপদ থেকে প্রজাদের রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই করে না। আজ আমাদের পালা। রাক্ষসের খাওয়ার জন্য আমাকে এক গাড়ি অন্ন এবং একটি মানুষকে পাঠাতে হবে। আমার এত অর্থ নেই যে, কাউকে অর্থ দিয়ে কিনে পাঠাব এবং নিজের আত্মীয়দেরও পাঠাবার শক্তি নেই। তাই নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় না দেখে আমরা সবাই একসঙ্গে যেতে চাই। দুষ্ট রাক্ষস সকলকেই খেয়ে ফেলুক।' কুন্তী বললেন—'ব্রাহ্মণদেব ! আপনি ভয় পাবেন না, শোকও করবেন না। এর থেকে রক্ষা পাবার উপায় আমি জানি। আপনার মাত্র একই কন্যা আর একটি পুত্র, এদের মধ্যে কারো যাওয়াই আমার ঠিক বলে মনে হয় না। আমার পাঁচটি পুত্র, তার মধ্যে একজন সেই পাপী রাক্ষসের জন্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যাবে।'

ব্রাহ্মণ বললেন—'হায়, হায় ! আমি আমাদের জীবনের জন্য অতিথিকে হত্যা করতে পারি না। আপনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং কুলীন, তাই তো আপনি এই ব্রাহ্মণের জন্য নিজ পুত্রকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আমার কল্যাণের কথাও ভাবতে হবে। আত্মবধ ও ব্রাহ্মণবধের মধ্যে আমি আত্মবধই শ্রেয় বলে মনে করি। কারণ ব্রহ্মহত্যার কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। অজানতেও ব্রহ্মহত্যা করার থেকে নিজেকে ধ্বংস করা শ্রেয়। আমি তো নিজেকে নিজে মারতে চাইছি না, অন্য কেউ আমাকে বধ করলে তার পাপ আমার লাগবে না। যে গৃহে আশ্রয় নিয়েছে, শরণাগত হয়েছে কিংবা রক্ষার জন্য অনুনয় করেছে—এমন ব্যক্তি যে কেউই হোক না কেন তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া অত্যন্ত নৃশংসতা। বিপদের সময়েও এমন নিন্দাযোগ্য কর্ম করা উচিত নয়। আমি যদি স্ত্রীসহ মৃত্যু বরণ করি তাও ভালো কিন্তু ব্রাহ্মণ বধ করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।' কুন্তী বললেন—'ব্রাহ্মন্ ! আমিও নিশ্চিত যে, ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা উচিত। আমিও আমার পুত্রের অনিষ্ট চাই না। কিন্তু সেই রাক্ষস আমার বলবান, মন্ত্রসিদ্ধ ও তেজস্বী পুত্রের কোনো অনিষ্টই করতে পারবে না। সে রাক্ষসকে খাবার পৌঁছে দিয়েও নিজেকে রক্ষা করতে পারবে—এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আজ পর্যন্ত অসংখ্য বিশালকায়, বলবান রাক্ষস আমার পুত্রের হাতে

মারা পড়েছে। তবে একটি অনুরোধ যে, আপনি এই ব্যাপারটি কাউকে জানাবেন না, তাহলে অনেকেই এই বিদ্যা শেখার জন্য পীড়াপীড়ি করবে।'

কুন্তীর কথায় ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলেই খুব খুশি হলেন। কুন্তী ব্রাহ্মণকে নিয়ে ভীমের কাছে এসে বললেন, 'ভীম, তুমি এঁদের কাজটি করে দাও।' ভীম অত্যন্ত খুশি মনে মায়ের কথা মেনে নিলেন। যখন ভীম এই কাজ করবেন বলে স্বীকার করলেন সেইসময় যুধিষ্ঠিরেরা ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে দেখেই সব বুঝতে পারলেন। তিনি মাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মা, ভীম কী করতে চাইছে ? এ তার নিজের ইচ্ছা নাকি আপনার নির্দেশ ?' কুন্তী বললেন—'আমার নির্দেশ।' যুধিষ্ঠির বললেন—'মা, আপনি অপরের জন্য নিজের পুত্রকে বিপদের মধ্যে পাঠিয়ে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।' কুন্তী বললেন—'পুত্র ! ভীমের জন্য চিন্তা করো না। আমি অবিবেচকের মতো এই কাজ করিনি। এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে আমরা বড় আরামেই আছি, সেই ঋণ শোধ করার এই হল একটি সুযোগ। মনুষ্যজীবনের সাফল্য এতেই, যেন সে কখনো উপকারীর উপকার না ভুলে যায়। উপকারের থেকেও বেশি উপকার তার করা উচিত। ভীমের ওপর আমার আস্থা আছে। জন্ম হওয়ামাত্র সে আমার কোল থেকে পড়ে গিয়েছিল, তার সেই পতনের ফলে পাহাড়ের চাতাল ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ভীমের এই কাজের সাহায্যে প্রত্যুপকার করা হবে এবং ধর্মও পালন হবে।' যুধিষ্ঠির বললেন— 'মা ! আপনি সব কিছু ঠিকমতো বুঝে সুঝেই করেছেন। ভীম নিশ্চয়ই রাক্ষসকে মেরে ফেলবে। কেননা আপনার মনে ব্রাহ্মণকে রক্ষার বিশুদ্ধ ধর্মভাব আছে। তবে ব্রাহ্মণকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তাঁরা যেন নগরবাসীদের এইকথা না জানান।'

—o—

বকাসুর বধ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একটু রাত্রি হলে ভীম রাক্ষসের খাবার নিয়ে বকাসুরের বনে গেলেন এবং সেখানে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। বকরাক্ষস বিশালকায়, বলশালী এবং খুবই গতিশীল। তার চোখগুলি লাল, কুলোর মতো কান, কান পর্যন্ত লম্বা মুখ, দেখলেই ভয় হয়। ভীমসেনের আওয়াজ শুনেই সে চমকিত হল। সে ভ্রূ কুঁচকে, দাঁতে দাঁত পিষে, ধরণী কাঁপিয়ে ভীমের দিকে দৌড়ে এল। ভীমের কাছে এসে রাক্ষস দেখল যে, ভীম তার ভাগের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। সে ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে চোখ লাল করে বলল—'আরে, তুই কে, যে আমার সামনে আমারই খাবার খাচ্ছিস ? তুই কি যমপুরী যেতে চাস ?' ভীম হাসতে লাগলেন এবং তাকে গ্রাহ্য না করে মুখ ঘুরিয়ে আবার খেতে লাগলেন। রাক্ষস দুহাত তুলে ভীষণ গর্জন করে ভীমকে মারার জন্য ছুটে এল। কিন্তু ভীম তবুও তাকে অগ্রাহ্য করে খেয়েই চললেন। তখন বকাসুর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে এক গাছ উপড়ে নিয়ে তাঁর ওপর মারতে এল। ভীম ধীরে ধীরে খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। রাক্ষস যেই গাছ দিয়ে তাঁকে মারতে গেল, ভীম বাঁ হাতে গাছটি ধরে নিলেন। এবার দুপক্ষেই গাছ দিয়ে মারামারি চলতে লাগল। ভীষণ যুদ্ধ চলল, বনের সব বৃক্ষই প্রায় উপড়ে ফেলা হল, বকাসুর দৌড়ে এসে ভীমকে ধরল, ভীম তাকে ধরে টেনে নিয়ে চললেন। বক যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল তখন ভীম তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে হাঁটু দিয়ে চাপ দিতে থাকলেন। তার গলা টিপে, কোপিন ধরে কোমর মুচড়ে ভেঙে দিলেন। তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, হাড়-গোড় ভেঙে গেল এবং সে ছটফট করতে করতে মরে গেল।

বকাসুরের চিৎকারে তার পরিবারের সদস্যরা ভয় পেয়ে সকলকে নিয়ে বাইরে এল। ভীম তাদের ভয়ে কম্পমান দেখে ধমক দিয়ে শর্ত করালেন যে 'আজ থেকে আর

কোনো দিন তোমরা মানুষকে বিরক্ত করবে না। যদি ভ্রমক্রমেও কোনোদিন এরকম করো তা এইভাবে তোমাদেরও মরতে হবে।' রাক্ষসেরা ভয়ে ভয়ে ভীমের শর্ত মেনে নিল। ভীম বকাসুরের মৃতদেহ নিয়ে নগরদ্বারে এলেন এবং তাকে সেখানে ফেলে দিয়ে চুপচাপ গৃহে ফিরে গেলেন। তখন থেকে কখনো একচক্রা নগরবাসীদের ওপর আর রাক্ষসদের উপদ্রব হয়নি। বকাসুরের আত্মীয়-স্বজনও অন্যস্থানে পালিয়ে গেল। ভীম ব্রাহ্মণের গৃহে এসে যুধিষ্ঠিরকে সব ঘটনা সবিস্তারে জানালেন।

নগরবাসীরা পরদিন প্রাতঃকালে উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখল যে, পাহাড়ের মতো বিশাল সেই রাক্ষসের দেহ রক্তে মাখামাখি হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাই দেখে সকলের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল, চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার জনতা এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাই দেখতে ছুটে এল। সকলে এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে লাগল। সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আজ কার পালা ছিল ?' তারপর ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগল। ব্রাহ্মণ সত্য ঘটনা গোপন করে বললেন—'আজ আমারই পালা ছিল। আমি আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে কান্নাকাটি করছিলাম। তখন এক উদারচিত্ত মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে আমাকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সব ঘটনা শুনে তিনি খুশি মনে বলেন যে, তিনি রাক্ষসকে খাবার পৌঁছে দেবেন, আমি যেন তাঁর জন্য চিন্তা না করি। তিনিই রাক্ষসের জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। এ নিশ্চয়ই তাঁরই কাজ।' সকলেই এই ঘটনা শুনে আনন্দিত হয়ে ব্রহ্মোৎসব করতে লাগলেন। পাণ্ডবেরাও সেই আনন্দোৎসবউপভোগ করলেন এবং সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন।

—— ০ ——

দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের সংবাদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু ! বকাসুর বধ করার পরে পাণ্ডবেরা কী করলেন ? কৃপা করে তার বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! বকাসুরকে বধ করার পরে পাণ্ডবগণ বেদাধ্যয়ন করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সেই একচক্রা নগরীতে তাঁদের গৃহে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ এলেন। সকলে তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করে থাকতে দিলেন। কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডব তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণ কথা প্রসঙ্গে দেশ, তীর্থ, নদ-নদী এবং রাজাদের কথা বলতে বলতে দ্রুপদের কথা বলতে লাগলেন এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের কথা বললেন। পাণ্ডবেরা বিস্তারিতভাবে দ্রৌপদীর জন্ম-কথা শুনতে চাইলেন, তাইতে সেই ব্রাহ্মণ দ্রুপদের পূর্বচরিত্র বলে বলতে লাগলেন—যখন থেকে দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের দ্বারা দ্রুপদকে পরাজিত করিয়েছিলেন, তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও দ্রুপদ শান্তি পাননি। চিন্তার ফলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং দ্রোণাচার্যের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য কর্মসিদ্ধ ব্রাহ্মণের খোঁজে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলেন। তিনি শোকমগ্ন হয়ে কেবলই ভাবছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ সন্তান কী করে লাভ করবেন। কিন্তু কোনোভাবেই তিনি দ্রোণাচার্যের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা এবং চরিত্রকে খর্ব করতে সমর্থ হননি।

গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করতে করতে রাজা দ্রুপদ কল্মাষী নামে এক ব্রাহ্মণদের বসতি দেখলেন। সেই বসতিতে সকলেই বিধিবৎ ব্রহ্মচর্য পালনকারী স্নাতক। তাঁদের মধ্যে নাম ছিল যাজ ও উপযাজ-এর। দ্রুপদ প্রথমে ছোটোভাই উপযাজের কাছে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করেন এবং অনুরোধ করেন যে, 'আপনি এমন কিছু করুন, যাতে আমার দ্রোণ বধকারী এক পুত্র জন্ম নেয় : আমি আপনাকে দশকোটি গাভী দেব। শুধু তাই নয়, আপনি আরও যা চান, তাও আমি দেব।' উপযাজ বললেন —'আমি তা করতে পারব না।' দ্রুপদ আরও একবছর তাঁর সেবা করলেন। উপযাজ বললেন—'রাজন্ ! আমার বড় ভাই যাজ একদিন বনে বিচরণ করতে করতে মাটিতে পড়ে থাকা একটি ফল কুড়িয়েছিলেন। সেই ফলটির শুদ্ধি-

অশুদ্ধির ব্যাপারে তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না। আমি তাঁর এই কাজ দেখে বুঝতে পারলাম যে, তিনি কোনো

বস্তু গ্রহণ করার সময় শুদ্ধ-অশুদ্ধের বিচার করেন না। আপনি ওঁর কাছে যান, উনি আপনার যজ্ঞ করিয়ে দেবেন।' তিনি তখন যাজকে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা প্রসন্ন করে অনুরোধ জানালেন, 'আমি দ্রোণের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁকে যুদ্ধে বধ করার মতো এক পুত্র চাই। আপনি সেইরকম যজ্ঞ আমাকে দিয়ে করান। আমি আপনাকে এক অর্বুদ (দশ কোটি) গাভী দেব।' যাজ তা স্বীকার করে নিলেন।

যাজের নির্দেশমতো দ্রুপদের যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হয় এবং অগ্নিকুণ্ড থেকে এক দিব্যকুমার উৎপন্ন হন। তাঁর গাত্রবর্ণ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, মাথায় মুকুট এবং দেহে কবচ ছিল। তাঁর হাতে ছিল ধনুক-বাণ এবং খড়্গ। তিনি বারংবার গর্জন করছিলেন। অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়েই তিনি রথে চড়ে এদিক ওদিক বিচরণ করতে লাগলেন। সমস্ত পাঞ্চালবাসী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে 'সাধু-সাধু' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। সেই সময় আকাশবাণী হল—'এই পুত্র জন্মানোয় রাজা দ্রুপদের সমস্ত শোক দূর হবে, এই কুমার দ্রোণকে বধ করার জন্যই উৎপন্ন হয়েছেন।'

সেই বেদিতেই পাঞ্চালীরও জন্ম হয়, তিনি সর্বাঙ্গ সুন্দরী, কমল নয়না এবং শ্যামবর্ণের ছিলেন। নীলাভ কুঞ্চিত কেশ, রক্তবর্ণের নখ, উন্নত বক্ষ, বাঁকানো ভুরুতে বড়ই মনোহর দেখাত। মনে হত কোনো দেবাঙ্গনা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণা হয়েছেন। তাঁর দেহ থেকে কমলের ন্যায় সুন্দর গন্ধ ক্রোশখানেক দূর থেকেও পাওয়া যেত। সেই সময় তাঁর মতো সুন্দরী পৃথিবীতে আর ছিল না। তাঁর জন্মের সময় আকাশবাণী হয়—'এই কৃষ্ণা রমণীরত্ন দেবতাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য ক্ষত্রিয় সংহারের উদ্দেশ্যে জন্মেছেন। কৌরবেরা এঁর জন্য ভীতসন্ত্রস্ত থাকবেন।' এই শুনে সমস্ত পাঞ্চালবাসী সিংহের ন্যায় গর্জন করে হর্ষধ্বনি করলেন। সেই দিব্যকুমার ও দিব্যকুমারীকে দেখে দ্রুপদরাজার রানি যাজের কাছে এসে অনুরোধ করলেন, 'এঁরা দুজনেই যেন আমাকে এঁদের মা বলে মেনে নেন।' যাজ তাঁদের খুশি করার জন্য বললেন—'তাই হবে।'

ব্রাহ্মণেরা এই দিব্য কুমার ও দিব্যকুমারীর নামকরণ করলেন, তাঁরা বললেন—'এই কুমার খুব ধৃষ্ট (বেয়াদপ) এবং অসহিষ্ণু ; বল, রূপ, ধন এবং কবচ-কুণ্ডলাদি-সম্পন্ন। অগ্নির দ্যুতি থেকে এর উৎপত্তি, তাই এর নাম হবে 'ধৃষ্টদ্যুম্ন'। আর কুমারী কৃষ্ণবর্ণের, তাই এর নাম হবে 'কৃষ্ণা'।' যজ্ঞ সমাপ্ত হলে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজের কাছে নিয়ে এসে তাকে বিশেষভাবে অস্ত্র-শস্ত্রের শিক্ষা দিলেন। পরম বুদ্ধিমান দ্রোণাচার্য জানতেন যে, প্রারব্ধে যা হবার তাতো হবেই। তাই তিনি তাঁর কীর্তি অনুযায়ী সেই শত্রুকেও অস্ত্রশিক্ষা দিলেন যাঁর হাতে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।'

—— ০ ——

ব্যাসদেবের আগমন এবং দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের কথা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রৌপদীর জন্মের কথা এবং তাঁর স্বয়ংবরের কথা শুনে পাণ্ডবরা উতলা হলেন। তাঁদের ব্যাকুলতা এবং দ্রৌপদীর প্রতি তাঁদের অনুরাগ দেখে কুন্তী বললেন, 'পুত্র ! আমরা অনেকদিন ধরে এই ব্রাহ্মণের গৃহে আনন্দসহকারে বাস করছি। এখানকার সবই আমরা দেখে নিয়েছি ; যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তো চলো পাঞ্চাল দেশে যাই।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'সকলের সম্মতি থাকলে যাওয়া যেতে পারে।' সকলে সম্মত হয়ে যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে একচক্রা নগরীতে এলেন। সকলে তাঁকে প্রণাম করে

হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। ব্যাসদেব পাণ্ডবদের আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের ধর্ম, সদাচার, শাস্ত্রাজ্ঞা-পালন, পূজনীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন ইত্যাদি অবগত হয়ে ধর্মনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন এবং নানা কাহিনী শোনালেন। তারপরে প্রসঙ্গক্রমে বললেন—'অনেক দিন আগেকার কথা, এক বড় মহাত্মা ঋষির সুন্দরী গুণবতী এক কন্যা ছিল। কিন্তু রূপবতী, গুণবতী এবং সদাচারসম্পন্ন হলেও পূর্বজন্মের কুকর্মের ফলস্বরূপ কেউ তাকে পত্নীরূপে মেনে নিতে চায়নি। তাতে দুঃখ পেয়ে সে তপস্যা শুরু করে। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শংকর প্রকটিত হয়ে বলেন—'তুমি তোমার ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করো।' সেই কন্যা ভগবানের দর্শন লাভে এবং তিনি বর দেবার ইচ্ছাপ্রকাশ করায় এত আনন্দিত হল যে, বার বার বলতে লাগল, 'আমি সর্বগুণ সম্পন্ন স্বামী চাই।' ভগবান শংকর বললেন—'তুমি ভরতবংশীয় পাঁচজনকে পতি হিসাবে লাভ করবে।' কন্যা বলল—'আমি তো একজন পতি প্রার্থনা করছি।' ভগবান বললেন—'তুমি আমার কাছে পাঁচবার পতির জন্য প্রার্থনা করেছ, আমার কথার অন্যথা হবে না। পরের জন্মে তুমি পাঁচ পতিই লাভ করবে।' হে পাণ্ডব ! সেই দেবরূপিণী কন্যাই দ্রুপদের যজ্ঞবেদী থেকে প্রকটিত হয়েছে। সেই সর্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যাই বিধিসম্মতভাবে নিশ্চিত রূপে তোমাদের উপযুক্ত। তোমরা গিয়ে পাঞ্চাল নগরীতে বাস করো, দ্রৌপদীকে লাভ করে তোমরা সুখী হও।' এই বলে পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন।

—o—

পাণ্ডবদের পাঞ্চাল যাত্রা এবং অর্জুনের হাতে চিত্ররথ গন্ধর্বের পরাজিত হওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ব্যাসদেব চলে যাওয়ার পর পাণ্ডবেরা অত্যন্ত খুশি হয়ে মাতা কুন্তীকে নিয়ে পাঞ্চাল দেশে রওনা হলেন। প্রথমেই তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের অনুমতি নিলেন এবং রওনা হওয়ার সময় সসম্মানে তাঁকে প্রণাম করলেন। তাঁরা উত্তরদিকে যাত্রা করলেন। সারাদিন রাত চলার পর তাঁরা গঙ্গাতীরে সোমশ্রয়ায়ণ তীর্থে পৌঁছলেন। তাঁদের আগে আগে অর্জুন মশাল নিয়ে হাঁটছিলেন। সেই তীর্থের কাছে পরিষ্কার এবং নির্জন গঙ্গাতীরে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ (চিত্ররথ) তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে বিহার করছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের পদধ্বনি

শুনে এবং নদীর দিকে এগোতে দেখে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ধনুকে টংকার দিয়ে বললেন—'ওহে, দিনের শেষে যখন গোধূলি লগ্নে লাল রং মেখে সন্ধ্যা নামে, তার চল্লিশ ক্ষণের পর সমস্ত সময় গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের জন্য নির্দিষ্ট। সারাদিন মানুষের জন্য। যে ব্যক্তি লোভবশত আমাদের এই নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঘাত ঘটায় তাকে আমরা এবং রাক্ষসেরা বন্দী করে রাখি। সেইজন্য রাত্রিকালে জলে নামা নিষিদ্ধ। খবরদার ! দূরেই থাক। তোমরা কি জানো না, আমি গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ এখন গঙ্গাজলে বিহার করছি। আমি আমার শক্তির জন্য বিখ্যাত ; কুবের আমার প্রিয় সখা এবং আমি আত্মসম্মান পছন্দ করি। এই বন আমার নামে প্রসিদ্ধ। এই গঙ্গার তীরে যে কোনো স্থানে আমি আরামে বিচরণ করতে পারি। এইসময় এখানে রাক্ষস, রুদ্রগণ, দেবতা অথবা মানুষ কেউই আসতে পারে না ; তোমরা কেন আসছ ?'

অর্জুন বললেন—'আরে মূর্খ ! সমুদ্র, হিমালয়ের তরাই এবং গঙ্গানদীর তট দিন-রাত অথবা সন্ধ্যাকালে কার জন্য সুরক্ষিত থাকবে ? ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, ধনী-গরিব সকলের জন্যই গঙ্গাতীর সবসময় উন্মুক্ত ; এখানে আসার কোনো নিয়ম নেই। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, তুমি ঠিক কথা বলছ, তা হলেও আমরা শক্তিমান পুরুষ, যে কোনো সময় তোমাকে পিষে মারতে পারি। দুর্বল, নপুংসকেরাই তোমাকে ভয় পায়। দেবনদী গঙ্গা সকলের কল্যাণকারিণী মাতা এবং সকলের জন্য সবসময় উন্মুক্ত। তুমি যে এর বিরোধিতা করছ, তা সনাতন ধর্মবিরুদ্ধ। তুমি ভেবেছ তোমার এই ধমকে ভয় পেয়ে আমরা গঙ্গাজল স্পর্শ করব না ? তা সম্ভব নয়।' অর্জুনের কথা শুনে চিত্ররথ ধনুকের ছিলা টেনে বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন। অর্জুন তাঁর মশাল এবং ঢালের সাহায্যে এমন হাত ঘোরাতে লাগলেন যে সমস্ত বাণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

অর্জুন বললেন—'ওরে গন্ধর্ব ! অস্ত্র চালনায় নিপুণ ব্যক্তির কাছে আস্ফালনে কাজ হয় না। আমি দিব্য অস্ত্র ব্যবহার করছি, তোমার সঙ্গে মায়া-যুদ্ধ করব না। এই আগ্নেয়াস্ত্র বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ অগ্নিবেশকে, অগ্নিবেশ আমার গুরু দ্রোণাচার্যকে এবং তিনি এটি আমাকে দিয়েছেন। নাও, একে সামলাও।' এই বলে অর্জুন
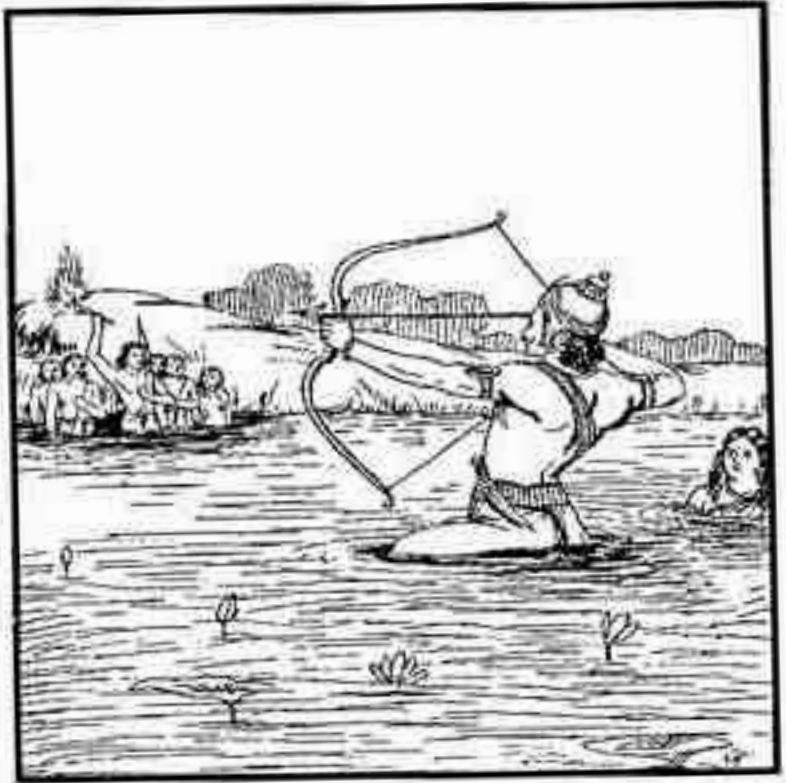
আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। চিত্ররথের রথ দগ্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি রথচ্যুত হলেন। অস্ত্রের তেজে তিনি এতই হতভম্ব হয়ে গেলেন যে রথ থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। অর্জুন লাফ দিয়ে এসে তাঁর চুল ধরে টেনে ভাইদের কাছে নিয়ে এলেন। গন্ধর্ব-পত্নী কুম্ভীনসী পতিকে রক্ষার জন্য যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হলেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিলেন—'অর্জুন ! এই যশোহীন, পরাক্রমহীন, স্ত্রীরক্ষিত গন্ধর্বকে মুক্তি দাও।' অর্জুন তাঁকে মুক্ত করে বললেন—'গন্ধর্ব ! যাও, দুঃখ কোরো না, তোমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দিয়েছেন।'

গন্ধর্ব বললেন—'আমি পরাজিত হয়েছি, তাই আমার অঙ্গারপর্ণ নাম আমি পরিত্যাগ করছি। একটি ব্যাপার খুব ভালো হয়েছে যে আমি দিব্য অস্ত্রের মর্মজ্ঞ বন্ধু পেয়েছি। আমি অর্জুনকে গন্ধর্ব-মায়া শেখাতে চাই। আমি আজ চিত্ররথ থেকে দগ্ধরথ হয়েছি। আজ আমাকে হারিয়েও আপনি জীবনদান দিয়েছেন তাই আপনি সমস্ত কল্যাণের অধিকারী। এই গন্ধর্ব নাম চাক্ষুষী। এই বিদ্যা মনু সোমকে, সোম বিশ্ববসুকে, বিশ্ববসু আমাকে দিয়েছেন। এই বিদ্যার প্রভাব হল এর সাহায্যে জগতের যে কোনো বস্তু, তা যতই সূক্ষ্ম হোক চক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে। ছয়মাস এক পায়ে দণ্ডায়মান থাকলে তবেই এই বিদ্যালব্ধ করা

সম্ভব হয়। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি বিদ্যা গ্রহণ করতে, আপনাকে এর জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে না। এই বিদ্যার জন্যই আমরা, গন্ধর্বেরা মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হই। আমি আপনাদের সব ভাইকেই একশত করে গন্ধর্বদের দিব্য বেগ বিশিষ্ট এবং কৃশ অথচ সদা প্রাণবন্ত ঘোড়া প্রদান করছি। স্মরণ করা মাত্রই এগুলি উপস্থিত হবে, প্রয়োজন না হলে চলে যাবে এবং প্রয়োজনে এরা গাত্রবর্ণ পরিবর্তন করতেও সক্ষম।' অর্জুন বললেন—'গন্ধর্বরাজ! আমি তোমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছি বলে যদি কিছু দিতে চাও তাহলে আমি তা নেওয়া পছন্দ করি না।' গন্ধর্ব বললেন—'যখন সমমর্যাদার ব্যক্তিরা একত্রিত হন, তখন তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমি প্রীতিবশত আপনাকে

এই উপহার দিতে চাই। আপনিও আমাকে আপনার আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করুন।' অর্জুন বললেন—'বন্ধু! তাই হোক, আমাদের বন্ধুত্ব অনন্তকাল থাকুক। তোমার কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে। একটা কথা তুমি বলো, তুমি আমাদের কী কারণে আক্রমণ করেছিলে?'

গন্ধর্ব বললেন—'আপনারা অগ্নিহোত্রী নন আর প্রত্যহ স্মার্ত যজ্ঞও করেন না। আপনাদের সঙ্গে কোনো ব্রাহ্মণও নেই, তাই আমি আপনাদের আক্রমণ করেছিলাম। আপনাদের যশস্বী বংশকে সকলেই জানেন। নারদাদির কাছেও শুনেছি এবং আমি নিজেও পৃথিবী পরিক্রমার সময় অবগত হয়েছি। আমি আপনার আচার্য, পিতা এবং গুরুজনদের সঙ্গেও পরিচিত। আপনাদের বিশুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ অন্তঃকরণ এবং শ্রেষ্ঠ সংকল্প জেনেও আমি আপনাদের আক্রমণ করেছি। প্রথমত, স্ত্রীলোকের সামনে অপমান সহ্য করা যায় না ; দ্বিতীয়ত, রাত্রিকালে শক্তি বেড়ে যাওয়ায় ক্রোধও বেশি হয়। কিন্তু আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ব্রহ্মচর্যের পালনকারী, সেইজন্যই আমাকে হারতে হল। ব্রহ্মচর্যহীন কোনো ক্ষত্রিয় রাত্রিবেলা আমার সামনে এলে তাকে মরতেই হবে। ব্রহ্মচর্যহীন হলেও তিনি যদি কোনো ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে এখানে আসেন তবে সেই ব্রাহ্মণই তাঁকে রক্ষা করবেন। তপতীনন্দন! মানুষের উচিত অভিলাষিত কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য অতি অবশ্যই জিতেন্দ্রিয় পুরোহিতকে নিযুক্ত করা। অপ্রাপ্তকে লাভ করতে এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার্থে উপযুক্ত পুরোহিত নিযুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। হে তপতীনন্দন! ব্রাহ্মণের সাহায্য ছাড়া শুধু নিজ পরাক্রমে অথবা পুরজন-পরিজনের সাহায্যে পৃথিবীতে বিজয় প্রাপ্তি করা যায় না। তাই আপনি নিশ্চিতরূপে জেনে নিন যে, ব্রাহ্মণের চরণাশ্রিত থেকেই চিরকাল পৃথিবী পালন করা সম্ভবপর।'

—o—

সূর্যপুত্রী তপতীর সঙ্গে রাজা সংবরণের বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! গন্ধর্বের মুখে 'তপতীনন্দন' সম্বোধন শুনে অর্জুন বললেন, 'গন্ধর্বরাজ! আমরা তো কুন্তীর পুত্র। তুমি আমাকে তপতীনন্দন বলছ কেন? তপতী কে, যাঁর জন্য আমাদের তপতীনন্দন বলছ?'

গন্ধর্বরাজ বললেন—অর্জুন! আকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতি সূর্য, স্বর্গ পর্যন্ত এর প্রভা ছড়িয়ে আছে, তাঁর কন্যার নাম তপতী। ইনিও সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়ী। তিনি সাবিত্রীর ছোট বোন এবং তপস্যার জন্য ত্রিলোকে ইনি 'তপতী' নামে বিখ্যাত। তাঁর মতো রূপবতী কন্যা দেবতা, অসুর, অপ্সরা, যক্ষ ইত্যাদি কারো মধ্যে ছিল না। সেইসময় তাঁর যোগ্য এমন কোনো পুরুষ ছিলেন না, যাঁর সঙ্গে সূর্য তাঁর বিবাহ দিতে পারেন। তাই তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন।

সেইসময় পুরুবংশে রাজা ঋক্ষের পুত্র সংবরণ অত্যন্ত

বলবান এবং ভগবান সূর্যের সত্যকার ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় পাদ্য-অর্ঘ-পুষ্প-উপহার-সুগন্ধ ইত্যাদি দিয়ে পবিত্রতার সঙ্গে সূর্যের পূজা করতেন। নিয়ম, উপবাস, তপস্যা দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতেন আর ভক্তিভাবে পূজা করতেন। সূর্য মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, এই রাজাই তাঁর কন্যার যোগ্য পতি হবেন। আকাশে সবার পূজ্য সূর্য যেমন দীপ্যমান তেমনই সংবরণও পৃথিবীতে অত্যুজ্জ্বল।

সংবরণ একদিন ঘোড়ায় করে পর্বতের তরাই অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে শিকার করছিলেন। এমন সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তাঁর সব থেকে তেজী ঘোড়াটি মারা গেল। তিনি পদব্রজেই চলতে লাগলেন। সেইসময় তিনি এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেলেন। রাজা তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর মনে হচ্ছিল এ যেন সূর্যের প্রভা পৃথিবীর ওপরে এসে পড়েছে। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এমন সুন্দরী নারী তো তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। রাজার চোখ এবং মন তাতে স্থির হয়ে গেল ; তিনি নড়াচড়া করতেও ভুলে গেলেন। চেতনা ফিরে আসতে তাঁর মনে হল ব্রহ্মা ত্রিলোকের রূপ ও সৌন্দর্য মন্থন করে এই মধুর মূর্তি তৈরি করেছেন। তিনি বললেন—'সুন্দরী ! তুমি কার কন্যা ? তোমার নাম কী ? এই নির্জন জঙ্গলে কেন বিচরণ করছ ? তোমার অনুপম রূপে অলংকারও লজ্জা পাচ্ছে। ত্রিলোকে তোমার মতো সুন্দরী আর কেউ নেই। তোমার জন্য আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও আকুল হচ্ছে।' রাজার কথা শুনে সেই কন্যা কিছু না বলে, বিদ্যুতের মতো তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন। রাজা তাঁকে অনেক খুঁজলেন, শেষে না পেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

রাজা সংবরণকে হতচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তপতী আবার ফিরে এলেন এবং মধুর স্বরে বললেন—'রাজা, উঠুন, উঠুন ! আপনার মতো সজ্জন ব্যক্তির এরূপ হতচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা উচিত নয়।' সেই মিষ্ট বাক্য শুনে সংবরণ উঠে পড়লেন। তিনি বললেন—'সুন্দরী ! আমার জীবন এখন তোমার হাতে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি আমাকে দয়া করো, আমাকে পরিত্যাগ কোরো না। গন্ধর্ব বিবাহ করে তুমি আমাকে পতিরূপে মেনে নাও, আমার জীবন দান করো।' তপতী বললেন, 'রাজন্ ! আমার পিতা জীবিত। আমি খুশিমতো বিয়ে করাতে স্বাধীন নই। যদি আপনি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন, তাহলে

আমার পিতাকে বলুন। অন্যের শাসনাধীন হয়ে আমি আপনার কাছে থাকতে পারব না। আপনার ন্যায় কুলীন, ভক্তবৎসল ও বিশ্ববিশ্রুত রাজাকে পতিরূপে স্বীকার করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনি সবিনয়ে নিয়ম-পালন ও তপস্যা দ্বারা আমার পিতাকে প্রসন্ন করে আমাকে লাভ করুন। আমি বিশ্ববন্দিত সূর্যের কন্যা এবং সাবিত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নী।' এই বলে তপতী আকাশপথে চলে গেলেন। রাজা সংবরণ সেখানেই মূর্ছিত হলেন।

সেই সময় রাজা সংবরণকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মন্ত্রীগণ, পারিষদগণ ও সেনা দল এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলে মিলে বহু কষ্টে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। জ্ঞান ফিরলে রাজা একজন মন্ত্রীকে কাছে রেখে অন্য সকলকে ফিরে যেতে বললেন। তিনি পবিত্রভাবে হাতজোড় করে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ভগবান সূর্যের আরাধনা করতে লাগলেন। তিনি একান্ত মনে তাঁর পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের ধ্যানে মগ্ন হলেন। দ্বাদশ দিনে মহর্ষি বশিষ্ঠ আবির্ভূত হলেন। তিনি রাজা সংবরণের মানসিক অবস্থা জেনে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং সূর্যের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সূর্যের কাছে গিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং সূর্যের স্বাগত প্রশ্নের পর প্রার্থনা পূরণ করার আশ্বাস পেয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রণাম করে বললেন—'ভগবান ! আমি রাজা সংবরণের জন্য আপনার কন্যা তপতীকে প্রার্থনা করছি। আপনি রাজার উজ্জ্বল যশ,

ধার্মিকতা এবং নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে পরিচিত। আমার বিচারে উনিই আপনার কন্যার যোগ্য পতি।' ভগবান সূর্য তখনই তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করলেন এবং বশিষ্ঠের সঙ্গেই তাঁর সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা তপতীকে পাঠিয়ে দিলেন।

বশিষ্ঠের সঙ্গে তপতীকে আসতে দেখে রাজা সংবরণ

নিজের খুশি ধরে রাখতে পারলেন না। এইভাবে ভগবান সূর্যের আরাধনা এবং পুরোহিত বশিষ্ঠের শক্তিতে রাজা সংবরণ তপতীকে লাভ করেন এবং বিধিসম্মতভাবে বিবাহ করে সস্ত্রীক পর্বতশিখরে সুখে বিহার করতে থাকলেন। দ্বাদশ বৎসর তাঁরা সেখানেই বসবাস করলেন। মন্ত্রী ততদিন রাজত্ব চালালেন। ইন্দ্র এই দেখে তাঁর রাজ্যে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিলেন। অনাবৃষ্টির জন্য প্রজানাশ হতে থাকল, শিশিরপাত পর্যন্ত না হওয়ায় অন্ন উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। প্রজাগণ নিজ মর্যাদা ভুলে একে অপরকে লুঠ করতে লাগল। তখন বশিষ্ঠ মুনি তাঁর তপস্যার প্রভাবে বারিপাত করালেন এবং সংবরণকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে আগের মতোই বৃষ্টি হওয়ার আদেশ দিলেন। শস্য উৎপাদন হতে লাগল। রাজদম্পতি বহু বর্ষ ধরে সুখে কালযাপন করলেন।'

গন্ধর্বরাজ বললেন—'অর্জুন ! সেই সূর্যকন্যা তপতী আপনার পূর্বপুরুষ রাজা সংবরণের পত্নী ছিলেন। এই তপতীর গর্ভেই রাজা কুরুর জন্ম হয়, যাঁর হতে কুরুবংশের সূচনা হয়। সেইজন্যই আমি আপনাকে 'তপতীনন্দন' নামে সম্বোধন করেছি।

ব্রহ্মতেজের মহিমা এবং বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের নন্দিনীর সংঘর্ষ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কাছে মহর্ষি বশিষ্ঠের মহিমার কথা শুনে অর্জুনের মনে তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহল হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'গন্ধর্বরাজ ! আমাদের পূর্বপুরুষের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ কেমন ছিলেন ? কৃপা করে তাঁর সম্পর্কে আমাকে জানান।'

গন্ধর্ব বললেন—'মহর্ষি বশিষ্ঠ ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁর পত্নী অরুন্ধতী। তপস্যাদ্বারা তিনি দেবতাদেরও অজেয় কাম এবং ক্রোধ জয় করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়কে বশ করেছিলেন বলে তাঁর নাম বশিষ্ঠ হয়েছিল। বিশ্বামিত্র বহু অপরাধ করলেও বশিষ্ঠ কখনো ক্রোধান্বিত হননি, তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যদিও বিশ্বামিত্র তাঁর একশত পুত্রকে বধ করেছিলেন এবং বশিষ্ঠের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল তার প্রতিশোধ নেওয়ার, তা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। তাঁর ক্ষমতা ছিল যমপুরী থেকে সন্তানদের ফিরিয়ে আনার তবুও তিনি যমরাজের নিয়ম লঙ্ঘন করেননি। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজাগণ তাঁকে পুরোহিত করে পৃথিবী জয় করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে অনেক যজ্ঞ করিয়েছিলেন। আপনারাও এমনই কোনো ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করুন।'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—'গন্ধর্বরাজ ! বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র উভয়েই তো আশ্রমবাসী ছিলেন, তাহলে তাঁদের শত্রুতার কী কারণ ?' গন্ধর্ব বললেন—'এই কাহিনী অতি প্রাচীন এবং বিশ্ববিশ্রুত। আমি আপনাকে বলছি। কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামক এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তিনি রাজর্ষি কুশিকের পুত্র। বিশ্বামিত্র তাঁরই পুত্র। বিশ্বামিত্র একবার মন্ত্রীকে নিয়ে মরুধন্ব দেশে শিকার করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে এলেন। বশিষ্ঠ আন্তরিক আতিথ্যে তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং তাঁর কামধেনু নন্দিনীর সাহায্যে নানাপ্রকার চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা তাঁদের তৃপ্ত করলেন। বিশ্বামিত্র এই আতিথ্যে অত্যন্ত খুশি হয়ে বশিষ্ঠকে বললেন, 'ব্রহ্মন্ ! আপনি এক

কোটি গাভী অথবা চাইলে রাজ্যও আমার কাছ থেকে নিতে পারেন, শুধু তার পরিবর্তে আমাকে আপনার কামধেনু নন্দিনীকে প্রদান করুন।' বশিষ্ঠ বললেন, 'এই দুগ্ধবতী

গাভীকে আমি দেবতা, অতিথি, পিতৃপুরুষ এবং যজ্ঞের জন্য রেখেছি। আপনার সমস্ত রাজ্যের পরিবর্তেও একে আমি দিতে পারি না।' বিশ্বামিত্র বললেন, 'আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ। আপনি শান্তচিত্ত, মহাত্মা, সর্বদাই তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন, আপনি কী করে একে রক্ষা করবেন ? এক কোটি গাভীর পরিবর্তেও যদি একে না দেন, তাহলে আমি বলপূর্বক একে হরণ করব, তার অন্যথা হবে না।' বশিষ্ঠ বললেন—'আপনি বলবান ক্ষত্রিয়, যা চান তা করতে পারেন, তাহলে চিন্তা কীসের ?' বিশ্বামিত্র যখন বলপূর্বক নন্দিনীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বশিষ্ঠের কাছে এল। বশিষ্ঠ বললেন—'কল্যাণী, আমি তোমার ক্রন্দন শুনেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন। কী করব, আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, নিরুপায় !' নন্দিনী বলল, 'এরা আমাকে চাবুক আর লাঠি দিয়ে প্রহার করছে। আমি অনাথের মতো ক্রন্দন করছি। আপনি কেন আমাকে রক্ষা করছেন না?' বশিষ্ঠ তার করুণ-ক্রন্দন শুনেও ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন—'ক্ষত্রিয়ের বল হল তেজ আর ব্রাহ্মণের ক্ষমা। ক্ষমাভাবই আমার প্রধান বল। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি যেতে পারো।' নন্দিনী বলল—'আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেননি তো ? যদি না করে থাকেন, তাহলে কেউ আমাকে বলপূর্বক নিয়ে যেতে পারবে না।' বশিষ্ঠ বললেন—'কল্যাণী ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিনি ; তোমার যদি শক্তি থাকে, তাহলে তুমি থাক ; দেখ তোমার বাছুরদের ওরা কীরকম শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।'

বশিষ্ঠের কথা শুনে নন্দিনীর মাথা উঁচু হয়ে গেল, চোখ রক্তবর্ণ হল, সে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকতে লাগল। তার সেই

ভীষণ মূর্তি দেখে সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেল। যখন তারা আবার তাকে ধরতে এল তখন সে সূর্যের মতো তেজ ছড়াতে লাগল। তার সর্ব অঙ্গ দিয়ে যেন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিল। তার এক এক অঙ্গ দিয়ে পহ্লব, দ্রাবিণ, শক, যবন, শবর, পৌণ্ড্র, কিরাত, চীন, হূণ, সিংহলী, বর্বর, খস, য়ুনানী এবং ম্লেচ্ছ প্রকটিত হল এবং অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিশ্বামিত্রের এক এক সৈন্যের ওপর পাঁচ, সাতজন করে লাফিয়ে পড়ল। সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, নন্দিনীর সৈন্যেরা কাউকেই বধ করল না। সৈন্যেরা যখন বহু দূরে পালিয়ে গেল, তাকে রক্ষা করার কেউ রইল না, তখন বিশ্বামিত্র এই ব্রহ্মতেজ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন। তখন তাঁর ক্ষত্রিয়তেজের ওপর বড় গ্লানি হল। তিনি বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে লাগলেন—'ধিক্কার এই ক্ষত্রিয়বলকে। জগতে ব্রহ্মতেজই আসল বল। এই দুইয়ের জন্য তপোবলই প্রধান।' এইসব চিন্তা করে তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য, সৌভাগ্যলক্ষ্মী এবং সাংসারিক সুখভোগ পরিত্যাগ করে তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি সর্বলোক নিজের তেজে পরিপূর্ণ করে দিলেন এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপানও করেছিলেন।

———০———

মহর্ষি বশিষ্ঠের ক্ষমা—কল্মাষপাদের কথা

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ বললেন—'অর্জুন ! রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশে কল্মাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। একবার তিনি শিকার করতে বনে গিয়ে ছিলেন। ফেরার সময় তিনি এমন একটি পথ ধরলেন যাতে কেবল একজন মানুষই চলতে পারে। তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত ছিলেন। সেই-সময় তিনি দেখলেন সেই রাস্তায় শক্তিমুনি আসছেন। শক্তিমুনি ছিলেন বশিষ্ঠ মুনির শত পুত্রের সর্বজ্যেষ্ঠ। রাজা বললেন—'সরে যাও, আমার পথ ছেড়ে দাও।' শক্তিমুনি বললেন—'মহারাজ ! সনাতন ধর্ম অনুসারে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হল ব্রাহ্মণের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া।' এইভাবে দুজনে কিছু কথা-কাটাকাটি হল, ঋষিও সরলেন না, রাজাও নয়। রাজার হাতে চাবুক ছিল, তিনি কোনো কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই ঋষিকে চাবুক দ্বারা আঘাত

করলেন। শক্তিমুনি রাজার অন্যায় কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—'আরে নৃপাধম ! তুমি রাক্ষসের মতো তপস্বীর ওপর চাবুকের আঘাত করছ ; তুমি প্রকৃতই রাক্ষসে পরিণত হও।' ফলে রাজা রাক্ষসভাবাক্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—'তুমি আমাকে অযৌক্তিক শাপ দিয়েছ ; তাই আমি তোমার থেকেই রাক্ষসের কাজ আরম্ভ করছি।' এই বলে কল্মাষপাদ শক্তিমুনিকে মেরে খেয়ে ফেললেন। শুধু তাঁকেই নয়, বশিষ্ঠ মুনির যত পুত্র ছিল, সকলকেই মেরে খেয়ে ফেললেন।

শক্তিকে এবং বশিষ্ঠের অন্য পুত্রদের ভক্ষণে কল্মাষপাদের রাক্ষসভাবের প্রাপ্তি হল, উপরন্তু বিশ্বামিত্রও পূর্বের ঈর্ষাবশত কিঙ্কর নামক এক রাক্ষসকে আদেশ করেছিলেন কল্মাষপাদের মধ্যে প্রবেশ করতে, যার জন্য সে এইরূপ নীচকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল। বশিষ্ঠ জানতেন যে, এই কাজে বিশ্বামিত্রের অনুমোদন রয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি শোকাবেগ সংযত করেছিলেন, যেমন সুমেরু পর্বত পৃথিবী ধারণ করে সংযত থাকে। প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকলেও তিনি তা করেননি।

একবার মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর আশ্রমে ফিরছিলেন, তখন তাঁর মনে হল যেন তাঁর পিছন পিছন কেউ ষড়ঙ্গাদি-সহ বেদপাঠ করতে করতে আসছে। বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার পিছনে কে ?' উত্তর এল—'আমি

আপনার পুত্রবধূ শক্তি-পত্নী অদৃশ্যন্তী।' বশিষ্ঠ বললেন—'পুত্রবধূ ! আমার পুত্র শক্তির মতো স্বরে কে সাঙ্গ বেদ পাঠ করছে ?' অদৃশ্যন্তী বললেন—'আমার গর্ভে আপনার পৌত্র। সে দ্বাদশ বৎসর ধরে আমার গর্ভেই বেদাধ্যয়ন করছে।' বশিষ্ঠ মুনি এই কথায় অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ভাবলেন—'ভালো কথা, আমার বংশ-পরম্পরা নষ্ট হয়নি।' এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ফিরছিলেন। পথে এক নির্জন বনে কল্মাষপাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। কল্মাষপাদ বিশ্বামিত্র প্রেরিত উগ্ররাক্ষসে আবিষ্ট হয়ে বশিষ্ঠ মুনিকে খাবার জন্য দৌড়ে এল। সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষসকে দেখে অদৃশ্যন্তী ভয় পেয়ে বললেন—'ভগবান ! দেখুন,

শুকনো কাঠের দণ্ড হাতে নিয়ে এক ভয়ংকর রাক্ষস কেমন দৌড়ে আসছে। আপনি এর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' বশিষ্ঠ বললেন—'মা, ভয় পেয়ো না, এ রাক্ষস নয়, কল্মাষপাদ।' এই বলে বশিষ্ঠ এক হুংকারেই তাকে

থামালেন এবং হাতে জল নিয়ে সেটি মন্ত্র পড়ে কল্মাষপাদের ওপর ছুঁড়ে দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত হয়ে গেল। দ্বাদশ বৎসর পর শাপমুক্তি হতেই তার তেজ বৃদ্ধি পেল এবং চেতনা ফিরে এল। সে হাত জোড় করে মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলতে লাগল, 'মহারাজ ! আমি সুদাসের পুত্র কল্মাষপাদ, আপনার যজমান। আদেশ করুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি !' বশিষ্ঠ বললেন—'বাবা, যা হবার হয়েছে। এখন যাও, তুমি তোমার রাজ্যের ভার গ্রহণ করো। খেয়াল রেখো, কখনো কোনো ব্রাহ্মণকে যেন অপমান কোরো না।' রাজা প্রতিজ্ঞা করে বললেন—'মহানুভাব ঋষিশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার নির্দেশ পালন করব। ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধাসহ আপ্যায়ন করব।' ক্ষমাশীল মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই পুত্রঘাতী রাজার সঙ্গে অযোধ্যায় এলেন এবং নিজ কৃপায় তাকে পুত্রবান করলেন।

বশিষ্ঠের আশ্রমে অদৃশ্যন্তীর গর্ভ হতে পরাশর জন্মগ্রহণ করলে ভগবান বশিষ্ঠ স্বয়ং পরাশরের জাতকর্ম সংস্কার করেন। ধর্মাত্মা পরাশর বশিষ্ঠকে নিজের পিতা বলে মনে করতেন এবং 'পিতা' বলেই ডাকতেন। একদিন অদৃশ্যন্তী বললেন—'ইনি তোমার পিতা নন, পিতামহ', তাতেই পরাশর জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতাকে রাক্ষস খেয়ে নিয়েছে। এতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং স্থির করলেন সমস্ত রাজাদের তিনি পরাজিত করবেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ পূর্বের কথা বলে তাঁকে বোঝালেন এবং আদেশ দিলেন যে 'তুমি এদের ক্ষমা করো, এতেই তোমার কল্যাণ, কাউকে পরাজিত কোরো না। তুমি তো জানো এই জগতে রাজাদের কত প্রয়োজন।' বশিষ্ঠ তাঁকে বোঝানোতে পরাশর রাজাদের পরাজিত করার সংকল্প ত্যাগ করলেন, কিন্তু রাক্ষস-বিনাশের জন্য ভয়ানক যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সে যজ্ঞে রাক্ষসেরা বিনাশপ্রাপ্ত হতে লাগল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁকে বোঝালেন—'পরাশর, ক্ষমাই পরম ধর্ম। তোমার সমস্ত পূর্বপুরুষেরা ক্ষমার প্রতিমূর্তি। মানুষ অকারণেই কারো না কারো মৃত্যুর নিমিত্ত হয়ে যায়, তুমি এই ভয়ংকর ক্রোধ পরিত্যাগ করো।' ঋষিদের নির্দেশে পরাশরও সকলকে ক্ষমা করে দিলেন এবং যজ্ঞাগ্নিকে হিমালয়ে রেখে এলেন। সেই অগ্নি এখনও রাক্ষস, বৃক্ষ এবং পাথরকে দগ্ধ করে থাকে।'

—— o ——

ধৌম্য মুনিকে পাণ্ডবদের পুরোহিত পদে বরণ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! গন্ধর্বরাজের কাছে পুরোহিতের মহিমা এবং প্রসঙ্গত মহর্ষি বশিষ্ঠের ক্ষমাশীলতা শুনে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—'গন্ধর্বরাজ ! তুমি তো সবই জানো, বলো, আমাদের উপযুক্ত বেদজ্ঞ পুরোহিত কে হতে পারেন।' গন্ধর্ব বললেন, 'অর্জুন ! এই বনের উৎকোচক তীর্থে দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য তপস্যায় রত আছেন। আপনারা তাঁকে পুরোহিত পদে বরণ করতে পারেন।' তখন অর্জুন গন্ধর্বরাজকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করলেন এবং প্রসন্ন হয়ে বললেন—'গন্ধর্বরত্ন ! তুমি যেসব ঘোড়া প্রদান করতে চাইছ, সেসব এখন তোমার কাছেই থাক, সময়মতো আমরা সেগুলি নেব।' এইভাবে উভয়ে একে অপরকে আপ্যায়ন করে গন্ধর্ব এবং পাণ্ডবরা ভগবতী গঙ্গার রমণীয় তীর থেকে অভীষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবগণ উৎকোচক তীর্থে ধৌম্য মুনির আশ্রমে গিয়ে তাঁকে পুরোহিত পদ গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানালেন। ধৌম্য নানা ফলমূল সহকারে পাণ্ডবদের আপ্যায়ন করলেন এবং পুরোহিত হতে স্বীকার করলেন। পাণ্ডবগণ এতে এত খুশি হলেন যে, মনে হল তাঁরা যেন পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য জয় করেছেন। তাঁদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হল যে, তাঁরা এবার স্বয়ংবর সভায় নিশ্চয়ই দ্রৌপদীকে লাভ করবেন। ধৌম্য মুনির মনে হল যে, এই ধর্মাত্মা বীরগণ নিজেদের বিচারশীলতা, শক্তি এবং উৎসাহের ফলস্বরূপ শীঘ্রই রাজ্য লাভ করবে। মঙ্গলাচরণের পর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

—o—

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যখন নবরত্ন পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের মায়ের সঙ্গে রাজা দ্রুপদের সুন্দর দেশ, তাঁর কন্যা দ্রৌপদী এবং তাঁর স্বয়ংবর মহোৎসব দেখার জন্য রওনা হলেন, সেইসময় পথে অনেক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথা হতে আসছেন, কোথায় যাবেন ?' যুধিষ্ঠির বললেন, 'পূজ্য ব্রাহ্মণগণ ! আমরা পাঁচ ভাই একত্রে থাকি, এখন একচক্রা নগরী থেকে আসছি।' ব্রাহ্মণেরা বললেন—'আপনারা আজই পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের রাজধানীতে গমন করুন। ওখানে স্বয়ংবর সভা হবে, আমরা ওখানে যাচ্ছি। চলুন, আমরা একসঙ্গে যাই।' যুধিষ্ঠির তাঁদের কথা মেনে নিলেন এবং সকলে একসঙ্গে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁরা মহর্ষি বেদব্যাসের

দর্শন পেলেন। পথে নানা জঙ্গলের শোভা, প্রস্ফুটিত পদ্মে শোভিত সরোবর দেখতে দেখতে, নানা স্থানে বিশ্রাম নিতে নিতে সকলে দ্রুপদ নগরীর দিকে এগোতে থাকলেন। সঙ্গের ব্যক্তিরা পাণ্ডবদের পবিত্র চরিত্র, মধুর স্বভাব, মিষ্ট বাক্য এবং স্বাধ্যায়-শীলতায় অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। পাণ্ডবেরা যখন দেখলেন দ্রুপদনগরে এসে গেছেন, নগরীর প্রাচীর দেখা যাচ্ছে, তখন তাঁরা সেখানে এক কুমোরের ঘরে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেই গৃহে থেকে ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। কেউই জানতেন না যে, তাঁরা পাণ্ডুর পুত্র।

রাজা দ্রুপদের বাসনা ছিল যেন তাঁর কন্যা দ্রৌপদীর বিবাহ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সঙ্গে হয়। কিন্তু তিনি তাঁর এই ইচ্ছা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অর্জুনকে চেনার জন্য তিনি এমন একটি ধনুক তৈরি করিয়েছিলেন, যাতে কারো দ্বারাই গুণ পরানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়াও দ্রুপদ অনেক ওপরে একটি যন্ত্র লাগিয়েছিলেন, যেটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল, তারও অনেক ওপরে একটি লক্ষ্য রাখা ছিল বিদ্ধ করার জন্য। দ্রুপদ ঘোষণা করেছিলেন যে, 'যে বীর এই ধনুকে ছিলা পরিয়ে ঘূর্ণমান যন্ত্রের ছিদ্রমধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হবেন, তিনিই আমার কন্যাকে লাভ করবেন।' নগরের ঈশান কোণে এক সুন্দর সমতল স্থানে স্বয়ংবর সভা নির্মিত হয়েছিল। তার চারদিকে বড় বড় মহল, গড়, সিংহদ্বার প্রস্তুত করা হয়েছিল। চতুর্দিকে ফুল পাতা ও পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। উচ্চভিতের ওপর প্রস্তুত এই অনুপম মহল হিমালয়ের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। রাজা দ্রুপদের আমন্ত্রিত নরপতি এবং রাজকুমারগণ স্বয়ংবর সভায় এসে যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁর ভাইদের নিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজা দ্রুপদের ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে সেখানে এসে আসন গ্রহণ করলেন। ষোলো দিন ধরে সেই উৎসব চলেছিল। দ্রুপদ-কন্যা কৃষ্ণা সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে হাতে বরমালা নিয়ে ধীরে ধীরে স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগ্নী দ্রৌপদীর কাছে দাঁড়িয়ে মধুর, গম্ভীর স্বরে বললেন—'স্বয়ংবরের উদ্দেশ্যে সমাগত নরপতি এবং রাজকুমারগণ ! আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই ধনুক এবং বাণ রাখা হয়েছে আর ওপরে ওই লক্ষ্য। আপনারা এই ঘূর্ণমান যন্ত্রের ছিদ্রপথে সর্বাধিক পাঁচটি বাণের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করবেন। যে বলশালী, রূপবান এবং কুলীন ব্যক্তি এই মহৎ কর্ম করবেন, আমার প্রিয় ভগ্নী দ্রৌপদী তাঁর অর্ধাঙ্গিনী হবেন। আমার এই কথার অন্যথা হবে না।' এই ঘোষণা করে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'ভগ্নী, দেখো, ধৃতরাষ্ট্রের বলবান পুত্রগণ দুর্যোধন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, দুঃশাসন, যুযুৎসু ইত্যাদি বীরগণ কর্ণসহ এখানে উপস্থিত। যশস্বী এবং কুলাধিপতি নরপতিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য শকুনি, বৃষক, বৃহদবল প্রমুখ স্বয়ংবরে তোমাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। অশ্বত্থামা, ভোজ, মণিমান, সহদেব, জয়ৎসেন, রাজা বিরাট, সুশর্মা, চেকিতান, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, শল্য, শিশুপাল, জরাসন্ধ এবং আরও অনেক সুপ্রসিদ্ধ রাজা-মহারাজা
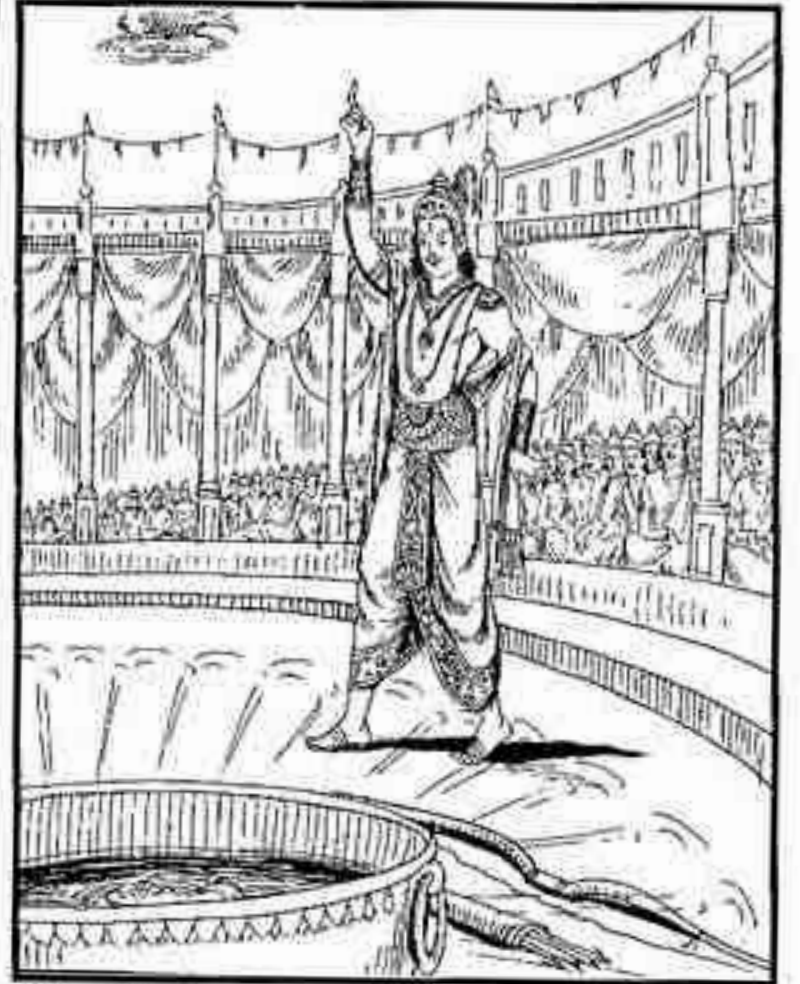
এখানে উপস্থিত। এই পরাক্রমী রাজাদের মধ্যে যিনি এই লক্ষ্য ভেদ করবেন, তাঁর গলায় তুমি বরমালা পরাবে।' ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন ভগ্নীকে এইভাবে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন, তখন রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, মরুদ্‌গণ, যমরাজ এবং কুবেরাদি দেবতাগণও বিমানদ্বারা আকাশপথে সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। দৈত্য, গরুড়, নাগ, দেবর্ষি এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্বও উপস্থিত ছিলেন। বসুদেবনন্দন বলরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রধান প্রধান যদুবংশী এবং অন্যান্য বহু মহানুভব ব্যক্তি স্বয়ংবর মহোৎসব প্রত্যক্ষ করার জন্য আগমন করেছেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্তব্য শুনে দুর্যোধন, শাল্ব, শল্য প্রমুখ রাজা এবং রাজকুমারেরা তাঁদের বল, শিক্ষা, গুণ অনুযায়ী ক্রমানুসারে ধনুকে গুণ পরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন ; কিন্তু ধনুকের দাপটে তাঁরা ছিটকে পড়ে যেতে থাকলেন এবং হতচেতন হয়ে তাঁদের সমস্ত উৎসাহই চলে গেল। তাঁদের মুকুট অঙ্গদাদি মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। ফলে আশা ত্যাগ করে অবনত মস্তকে তাঁরা নিজ নিজ স্থানে এসে উপবেশন করলেন। দুর্যোধনদের হতাশ ও বিষণ্ণ দেখে ধনুর্ধর শিরোমণি কর্ণ উঠলেন। তিনি ধনুক হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাতে গুণ লাগিয়ে ফেললেন। তিনি যখন লক্ষ্য স্থির করছেন, সেই সময় দ্রৌপদী বলে উঠলেন, 'আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না।' কর্ণ তাই শুনে বিদ্রূপের সঙ্গে হেসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধনুক নামিয়ে রাখলেন। অনেকেই যখন হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন তখন শিশুপাল এলেন। কিন্তু ধনুক ওঠাতে গিয়েই তিনি হাঁটুভেঙে নীচে পড়ে গেলেন। জরাসন্ধেরও একই দশা হল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ংবর সভা ত্যাগ করে ফিরে গেলেন। মদ্র দেশের রাজাও ব্যর্থ হলেন। যখন এইভাবে সমস্ত বড় বড় রাজা লক্ষ্য ভেদে অপারগ হলেন, তখন সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল, লক্ষ্যভেদের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় অর্জুন মনে মনে সংকল্প করলেন যে, 'এবার আমি গিয়ে লক্ষ্যভেদ করব।'

—o—

অর্জুনের লক্ষ্যভেদ এবং অর্জুন ও ভীমসেনের দ্বারা অন্যান্য রাজাদের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ব্রাহ্মণদের মধ্যে অর্জুন দাঁড়িয়ে উঠলেন। পরম সুন্দর এবং বীর অর্জুনকে ধনুক নিতে প্রস্তুত দেখে ব্রাহ্মণেরা চমকিত হলেন। কেউ ভাবলেন 'ইনি আমাদের হাস্যাস্পদ করে না তোলেন', কেউ ভাবলেন 'রাজারা এঁর জন্য আমাদের আবার দ্বেষ করতে না শুরু করেন', আবার অনেকে বলতে লাগলেন 'এ খুব উৎসাহী বীর, এর মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। দেখ এর চলা সিংহের মতো, শক্তি হাতির মতো, এ সব কিছু করতে পারে। এর যদি শক্তি না থাকত, তাহলে কি এ সাহস করত ? তপস্বী এবং সংকল্পে দৃঢ় ব্রাহ্মণদের পক্ষে অসাধ্য কোনো কাজ নেই। নিজ শক্তি বলে তারা ছোট বড় সব কাজই করতে পারে। পরশুরাম যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করেছিলেন, অগস্ত্য সমুদ্র পান করেছিলেন। আপনারা এঁকে আশীর্বাদ করুন যাতে ইনি লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হন।' ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করে অর্জুনকে ভরিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণেরা যখন এইসব বলাবলি করছিলেন, ততক্ষণে অর্জুন ধনুকের কাছে চলে গিয়েছেন। তিনি প্রথমে ধনুকটিকে প্রদক্ষিণ করলেন, পরে ভগবান শংকর ও শ্রীকৃষ্ণকে মস্তক অবনত করে মনে মনে প্রণাম করলেন এবং ধনুক তুলে নিলেন। বড় বড় বীর যে ধনুক তুলতে পারেননি, গুণ চড়াতে পারেননি, অর্জুন অনায়াসেই সেই ধনুক তুলে তাতে গুণ পরিয়ে ফেললেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ ভালো করে দেখতে না দেখতেই অর্জুন পাঁচটি বাণ তুলে তার মধ্যে একটি লক্ষ্যপথে পাঠালেন, সেটি যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করল। চারদিকে হই চই শুরু হল, অর্জুনের মাথার ওপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, ব্রাহ্মণেরা উত্তরীয় দোলাতে লাগলেন। অর্জুনকে দেখে দ্রুপদের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি মনে মনে স্থির করলেন প্রয়োজন হলে তিনি সমস্ত সৈন্য দ্বারা এই বীরকে সাহায্য করবেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে লক্ষ্যভেদ করতে দেখে নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে করে তাঁদের আশ্রয়স্থলে ফিরে এলেন। দ্রৌপদী বরমাল্য হাতে নিয়ে আনন্দিত চিত্তে অর্জুনের কাছে এসে তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণেরা অর্জুনকে আপ্যায়ন করে দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ংবর সভার বাইরে এলেন।

রাজারা যখন দেখলেন যে, দ্রুপদ এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরকে বলতে লাগলেন—'দেখ, রাজা দ্রুপদ আমাদের তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর এই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্না কন্যার বিবাহ দিতে চাইছেন। আমাদের আমন্ত্রণ করে এনে এরূপ অপমান করা উচিত হয়নি। দ্রুপদ আমাদের গ্রাহ্য করে না, অতএব সমীহ না করে ওকে মেরে ফেলাই উচিত। এই রাজদ্বেষী দুরাত্মাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের মধ্যে কি কাউকেই

দ্রুপদ তাঁর কন্যার উপযুক্ত বলে মনে করেন না ? স্বয়ংবর সভা ক্ষত্রিয়দের জন্য, সেখানে ব্রাহ্মণদের কোনো অধিকার নেই। এই কন্যা যদি আমাদের বরণ না করে তাহলে একে আগুনে সমর্পণ করা হোক। ব্রাহ্মণ-কুমার যদিও চাপল্যবশত এই অপ্রিয় কাজ করেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।' রাজারা এরূপ স্থির করে অস্ত্র ধারণ করে দ্রুপদ রাজাকে মারবার জন্য উদ্যত হলেন। রাজাদের ক্রুদ্ধ হতে দেখে দ্রুপদ ভীত হয়ে ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হলেন। দ্রুপদকে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে দেখে এবং তাঁকে আক্রান্ত দেখে ভীম ও অর্জুন তাঁদের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। রাজারা তাঁদের ওপরই আক্রমণ হানলেন। ব্রাহ্মণেরা একযোগে মৃগচর্ম এবং কমণ্ডলু ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন—'ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি।' অর্জুন মৃদুহাস্যে বললেন—'হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখুন। এঁদের জন্য আমি একাই যথেষ্ট।' অর্জুন ধনুক হাতে ভীমকে নিয়ে পর্বতের মতো দাঁড়ালেন। মদোন্মত্ত কর্ণ প্রমুখ বীরদের আসতে দেখে তাঁরা যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। যুদ্ধে ব্রাহ্মণদের মারা অধর্ম নয় এই বলে সভায় উপস্থিত বীরেরা তাঁদের আক্রমণ করতে লাগলেন। অর্জুন ও কর্ণ সামনা সামনি এলে অর্জুন এমন বাণ মারলেন যে, কর্ণ প্রায় হতচেতন হয়ে গেলেন। দুজনে বীরত্বের সঙ্গে একে অপরকে পরাজিত করার জন্য নানাপ্রকার কৌশল দেখাতে লাগলেন। কর্ণ বললেন—'ওহে ! আপনি ব্রাহ্মণ হয়েও এমন কৌশল দেখাচ্ছেন,

যাতে আমার আনন্দের সীমা নেই। আপনার মুখে কোনো বিষাদ চিহ্ন নেই আর হস্তকৌশলও অত্যন্ত নিপুণ। আপনি স্বয়ং ধনুর্বেদ অথবা পরশুরাম নন তো ? আমার তো মনে হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু অথবা ইন্দ্র ছদ্মবেশে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। আমি নিশ্চিত যে, আমি যদি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করি তবে একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্র অথবা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ছাড়া কেউই আমার সম্মুখীন হতে পারবে না।' অর্জুন বললেন—'কর্ণ, আমি ধনুর্বেদ অথবা পরশুরাম কেউই নই। আমি সমস্ত শস্ত্রের রহস্যজ্ঞ এক যোদ্ধা। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ব্রহ্মাস্ত্র এবং ইন্দ্রাস্ত্রেও আমি অভিজ্ঞ। তোমাকে হারাবার জন্যই আমি উপস্থিত হয়েছি, তুমি তোমার জোর দেখাও।' মহারথী কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্রবিশারদ প্রতিদ্বন্দ্বীকে অজেয় মনে করে নিজেই পিছু হটলেন।

যখন কর্ণ এবং অর্জুন একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, সেইসময় আর এক দিকে শল্য এবং ভীমসেন দুজনেই দুজনকে আহ্বান করে মত্ত হাতির ন্যায় যুদ্ধ করছিলেন, নানাপ্রকার কসরৎ করে একে অন্যকে ভূপাতিত করার চেষ্টা করছিলেন। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির মতো করে দুজনের শরীরে আঘাত লাগছিল। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে ভীমসেন শল্যকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ব্রাহ্মণেরা হেসে উঠলেন। ভীম শল্যকে মাটিতে ফেলে দিলেও তাঁকে বধ করলেন না, তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন।

এইভাবে ভীম শল্যকে মাটিতে আছাড় দিলেন এবং কর্ণও যুদ্ধ থেকে সরে গেলেন দেখে সকলেই সশংক হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধ বন্ধ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগেই পাণ্ডবদের চিনতে পেরেছিলেন, তাই তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে সব রাজাদের বোঝাতে লাগলেন যে 'এই ব্যক্তি ধর্ম অনুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন, অতএব এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে এবং ভীমসেনের পরাক্রমে ভীত হয়ে সকলেই যুদ্ধ বন্ধ করে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। ক্রমে পরিবেশ শান্ত হল। ভীমসেন এবং অর্জুন ব্রাহ্মণপরিবৃত হয়ে দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে তাঁদের আশ্রয়স্থল কুমোরের গৃহের দিকে চললেন।

সেদিন ভিক্ষা করে ফেরার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। মাতা কুন্তী পুত্রেরা না ফিরে আসায় আশংকায় সময় কাটাচ্ছিলেন, স্নেহময়ী মায়ের এমনই স্বভাব। তিনি নানারকম বিপদের আশংকা করছিলেন। তারপর দিনের তৃতীয় প্রহরে ভীম ও অর্জুন দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে গৃহে ফিরলেন।

কুন্তীর নির্দেশে দ্রৌপদীর সম্বন্ধে পাণ্ডবদের আলোচনা এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভীমসেন এবং অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে কুমোরের ঘরে প্রবেশ করে মাকে বললেন—'মা, আজ আমরা এই ভিক্ষা নিয়ে এসেছি।' কুন্তী সেইসময় ঘরের মধ্যে ছিলেন, তিনি তাঁদের না দেখেই ঘর থেকে বললেন—'পুত্র ! যা এনেছ, পাঁচভাই মিলে উপভোগ করো।' বাইরে বেরিয়ে তিনি যখন দেখলেন যে, এই ভিক্ষা সাধারণ কিছু নয়, স্বয়ং রাজকুমারী দ্রৌপদী, তখন তাঁর খুব অনুতাপ হল। তিনি বলতে লাগলেন—'হায় ! আমি কী করলাম ?' তিনি দ্রৌপদীকে হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—'পুত্র ! ভীমসেন এবং অর্জুন এই রাজকুমারীকে নিয়ে যখন ভেতরে এলেন, তখন আমি না দেখেই বলে দিয়েছি যে তোমরা সবাই মিলে উপভোগ করো। আমি আজ পর্যন্ত কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। এখন তুমি এমন কোনো উপায় বার করো, যাতে দ্রৌপদীর অধর্ম না হয় এবং আমার কথাও মিথ্যা না হয়।' যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাকে আশ্বস্ত করে অর্জুনকে ডেকে বললেন, 'ভ্রাতা ! তুমি মর্যাদা অনুসারে দ্রৌপদীকে লাভ করেছ। এখন বিধিসম্মতভাবে অগ্নি সাক্ষী করে এঁর পাণিগ্রহণ করো।' অর্জুন বললেন—'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ! আপনি আমাকে অধর্মের ভাগী করবেন না। সৎ ব্যক্তিরা কখনো এমন কাজ করেন না। প্রথমে আপনি তারপর ভীমসেন, পরে আমার বিবাহ হবে। তারপরে হবে নকুল এবং সহদেবের। সুতরাং এই রাজকুমারীর আপনার সঙ্গেই প্রথমে বিবাহ হওয়া উচিত। আপনার কাছে অনুরোধ যে, সব কিছু বিবেচনা করে ধর্ম, যশ এবং যা হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে হয় তাই করার নির্দেশ দিন। আমরা আপনার আজ্ঞা-পালনকারী।' সব ভাইয়েরা অর্জুনের প্রীতিপূর্ণ স্নেহভরা কথা শুনতে শুনতে দ্রৌপদীকে দেখতে লাগলেন। দ্রৌপদীও তাঁদের দেখছিলেন। দ্রৌপদীর সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং সুশীলা ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পাঁচভাই একে অপরকে দেখতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির সব ভাইদের মুখভাব দেখে এবং মহর্ষি বেদব্যাসের কথা স্মরণ করে নিশ্চিতভাবে বললেন—'দ্রৌপদীর সঙ্গে আমাদের পাঁচভাইয়েরই বিবাহ হবে।' এই কথায় সব ভাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা মনে মনে এই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংবর সভাতেই পাণ্ডবদের চিনে ফেলেছিলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে পাণ্ডবদের আশ্রয়স্থলে এলেন। তাঁরা পাঁচভাইকে সেখানে দেখে প্রথমে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের পরিচয় দিলেন। পাণ্ডবেরা অত্যন্ত

সমাদর সহকারে তাঁদের আপ্যায়ন করলেন। দুই ভাই তাঁদের পিসীমাতা কুন্তীকে প্রণাম করলেন। কুশল প্রশ্নাদির পরে যুধিষ্ঠির তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান ! আমরা তো এখানে আত্মগোপন করে আছি, আপনি কী করে

চিনতে পারলেন ?' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন— 'মহারাজ ! লোকে কি লুক্কায়িত অগ্নিকে খুঁজে পায় না ? ভীমসেন ও অর্জুন আজ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা পাণ্ডব ছাড়া আর কার দ্বারা সম্ভব ? অত্যন্ত সৌভাগ্য এবং আনন্দের কথা এই যে, দুর্যোধন এবং তার মন্ত্রী পুরোচনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। আপনারা জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে গিয়েছেন। আপনাদের সংকল্প পূর্ণ হোক এবং আপনারা সার্থক হোন। আমরা আর বেশিক্ষণ থাকব না, তাহলে লোকে জেনে যাবে। আমাদের এবার ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন।' যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ফিরে গেলেন।

ভীমসেন ও অর্জুন যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে কুমোরের ঘরে যাচ্ছিলেন, তখন রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে তাঁদের অনুসরণ করছিলেন। তিনি সর্বত্র রাজকর্মচারী নিযুক্ত করে রেখেছিলেন এবং নিজেও সতর্ক হয়ে পাণ্ডবদের কাছাকাছি ছিলেন। সবকিছুই তিনি সাবধানে লক্ষ্য করছিলেন। চার ভাই ভিক্ষা এনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কাছে সমর্পণ করেন। কুন্তী দ্রৌপদীকে বলেন—'কল্যাণী ! ভিক্ষা থেকে প্রথমে তুমি দেবতাদের অংশ তুলে রাখো, ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দাও, আশ্রিতদের ভাগ দাও। যা থাকবে তার অর্ধেক ভীমসেনকে দাও। বাকী অর্ধেক ছয় ভাগ করে আমাদের জন্য রাখো।' সাধ্বী দ্রৌপদী শ্বশ্রূমাতার নির্দেশে কোনো দ্বিধা না করে আনন্দের সঙ্গে তা পালন করেন। আহার গ্রহণের পরে সকলের জন্য কুশাসন পেতে তার ওপর মৃগচর্ম পেতে দিলে, সকলে তার ওপর বিশ্রাম করেন। পাণ্ডবেরা দক্ষিণ দিকে মাথা করে শয়ন করেন, মাথার কাছে মাতা কুন্তী এবং পায়ের কাছে দ্রৌপদী শয়ন করেন। শয়নের সময় এঁরা নিজেদের মধ্যে রথ, হাতি, তরোয়াল, গদা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন, যেন সেনাধ্যক্ষগণ আলোচনা করছেন।

—o—

ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রুপদের আলাপ-আলোচনা, পাণ্ডবদের পরীক্ষা এবং পরিচয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের খুবই নিকটে ছিলেন এবং তিনি তাঁদের কথা শুনছিলেন ও দ্রৌপদীকেও দেখছিলেন। তাঁর কর্মচারীরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সব কিছু শুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের কাছে গেলেন। দ্রুপদ সেইসময় অত্যন্ত চিন্তামগ্ন ছিলেন। তিনি পুত্রকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র, দ্রৌপদী কোথায় গেল, কারা তাকে নিয়ে গেল ? আমার কন্যা কোনো শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের হাতে পড়েছে তো ? কোনো বৈশ্য বা শূদ্রের হাতে পড়েনি তো ? যদি নররত্ন অর্জুনের হাতে আমার সৌভাগ্যশালী কন্যা পড়ত তাহলে কত ভালো হত !'

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'পিতা ! যে কৃষ্ণমৃগ চর্মধারী পরম সুন্দর নবযুবক লক্ষ্যভেদ করেছেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও বীর। যখন তিনি ভগ্নী দ্রৌপদীকে নিয়ে ব্রাহ্মণ এবং রাজাদের মধ্যে এলেন তখন তাঁর মধ্যে কোনো ভয় বা সংকোচ ছিল না। তাঁর এই ধৃষ্টতা দেখে রাজারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে আক্রমণ করেছিল। তাঁর সঙ্গী পুরুষটি এক বিশাল বৃক্ষ উপড়ে নিয়ে রাজাদের প্রহার করতে থাকলেন। কোনো রাজাই তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁরা দুজনে আমার ভগ্নীকে নিয়ে নগরের বাইরে এক কুমোরের ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে এক অগ্নি সমা তেজস্বিনী নারী ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এঁদের মাতা। আরও তিনজন সুন্দর যুবক সেইখানে ছিলেন। তাঁরা তিনজনে মাতার চরণে প্রণাম জানিয়ে দ্রৌপদীকেও বললেন প্রণাম করতে, তারপর তাঁকে মায়ের কাছে রেখে সকলে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে গেলেন। ভিক্ষা করে ফিরলে মায়ের নির্দেশে দ্রৌপদী দেবতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকে অংশ দিয়ে সবাইকে পরিবেশন করার পর আহার গ্রহণ করেন। দ্রৌপদী এঁদের পায়ের কাছে শয়ন করেন। নিদ্রার পূর্বে এঁরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন, তা ব্রাহ্মণ-বৈশ্য অথবা শূদ্রের মতো নয়। ওঁরা যুদ্ধ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কুলীন ক্ষত্রিয়রাই এই ধরনের কথাবার্তা বলে থাকেন। আমার তো মনে হচ্ছে যে, আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে এবং পাণ্ডবেরাই অগ্নিদহন থেকে রক্ষা পেয়ে আমার ভগ্নীকে লাভ করেছেন।'

ধৃষ্টদ্যুম্নের কথায় রাজা দ্রুপদ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁদের পরিচয় জানার জন্য সত্বর রাজ পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলেন। পুরোহিত পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বললেন—'আপনারা দীর্ঘজীবি হোন। পাঞ্চালরাজ মহাত্মা দ্রুপদ আশীর্বাদপূর্বক আপনাদের পরিচয় জানতে চেয়েছেন। বীর যুবকগণ ! মহারাজ দ্রুপদের মনে বহুকাল ধরে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিশালবাহু নররত্ন অর্জুন তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি আমাদ্বারা এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে তাঁর ভগবৎকৃপায় যদি প্রার্থনা পূর্ণ হয়ে থাকে, তা অত্যন্ত আনন্দের কথা, এতে আমার যশ, পুণ্য এবং হিত হবে।' যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম পুরোহিতকে সম্মান ও সমাদর করলেন, তিনি আনন্দের সঙ্গে তা স্বীকার করে উপবেশন

করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন— 'ভগবান ! রাজা দ্রুপদ যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করে তাঁর কন্যার বিবাহ স্থির করেছেন, তা ক্ষত্রিয়ের ধর্মের অনুকূল। কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হয় না। এই বীরব্যক্তি সমস্ত নিয়ম পালন করে পরিপূর্ণ সভার মধ্যে দ্রুপদের কন্যাকে লাভ করেছেন। এতে রাজা দ্রুপদের অনুতাপ করার কিছু নেই, এই বিবাহের দ্বারা তাঁর মনের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে এই কথা বলছিলেন, সেইসময় রাজা দ্রুপদের কাছ থেকে আর এক ব্যক্তি সেখানে এলেন। তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ দ্রুপদ আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, আপনাদের নিত্যকর্ম সমাপন হলে রাজকুমারী কৃষ্ণাকে নিয়ে চলুন, বাইরে সুন্দর অশ্বযুক্ত রথ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মাতা কুন্তী এবং দ্রৌপদীকে একটি রথে তুলে দিয়ে অন্য এক বিশাল রথে সকলে রাজভবনের দিকে রওনা হলেন।

রাজা দ্রুপদ পাণ্ডবদের পরীক্ষা করার জন্য নানাপ্রকার বস্তু দিয়ে রাজমহল সাজিয়ে ছিলেন। ফল, ফুল, আসন, গাভী, বীজ, কৃষি উপযোগী বস্তু একদিকে সাজানো। অন্য কক্ষে শিল্পকলা সামগ্রী সাজানো ছিল, একটি ঘরে নানাপ্রকার খেলার জিনিস, অন্যত্র যুদ্ধ-সামগ্রী শোভমানা ছিল। অপর একটি কক্ষে উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার রাখা ছিল। পাণ্ডবগণ সেখানে পৌঁছালে দ্রৌপদী ও কুন্তী রানিমহলে চলে গেলেন। সব রানিরা অত্যন্ত সমাদরে তাঁদের মহলে নিয়ে এলেন। এদিকে রাজা, মন্ত্রী, রাজকুমার, পারিষদবর্গ, আত্মীয় সকলেই পাণ্ডবদের শারীরিক গঠন, চাল-চলন, প্রভাব-পরাক্রম দেখে আনন্দিত হয়ে তাঁদের স্বাগত জানালেন। যে বহুমূল্য রাজোচিত আসন সেখানে সাজানো ছিল পাণ্ডবেরা একটুও ইতস্তত না করে সেখানে বসলেন। বহুমূল্য বস্ত্র-অলংকারে সজ্জিত হয়ে দাস-দাসীরা স্বর্ণথালা করে খাদ্য পরিবেশন করতে এল এবং পাণ্ডবেরাও রাজোচিত কায়দায় তা গ্রহণ করলেন। আহারের পর যখন বস্তু-সামগ্রী দেখার সময় এল, পাণ্ডবেরা তখন প্রথমেই যুদ্ধ-সামগ্রী রাখার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁদের এই ব্যবহার দেখে উপস্থিত সকলে
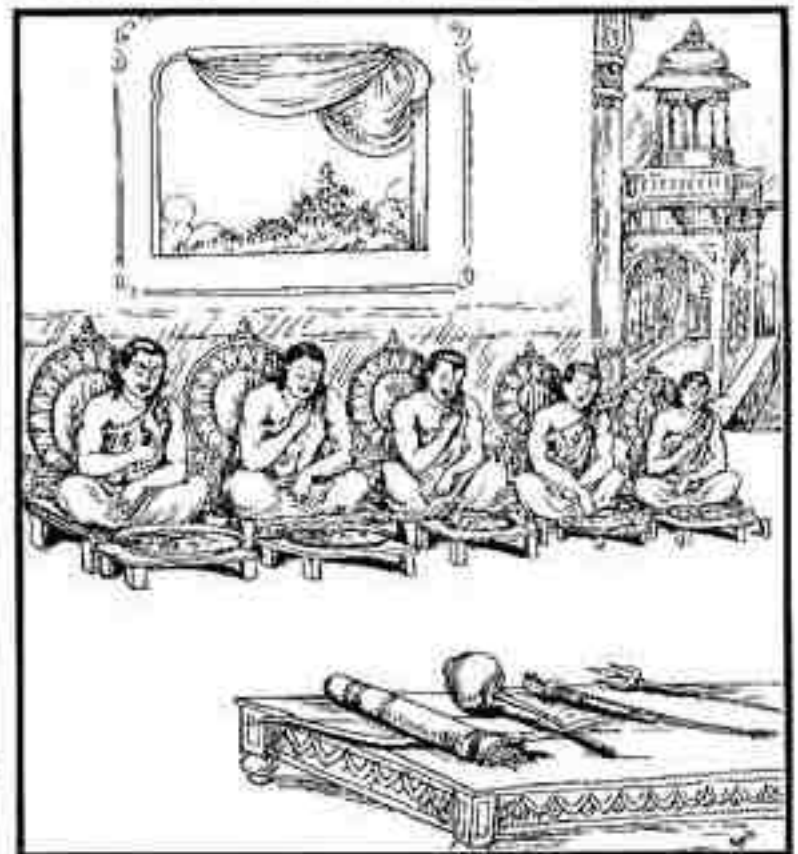
নিশ্চিত হলেন যে, এঁরা অবশ্যই পাণ্ডব-রাজকুমার।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নির্জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় না শূদ্র—তা আমরা কীভাবে জানব ? আপনারা দেবতা নন তো, যে আমার কন্যাকে পাবার জন্য এই বেশে এসেছেন !' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজেন্দ্র ! আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, আপনি প্রসন্ন হোন, আমি মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির ; এঁরা আমার চার ভাই ভীমসেন, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব। আমার মা কুন্তী দ্রৌপদীর সঙ্গে রানিমহলে গেছেন।'

—o—

বেদব্যাস কর্তৃক দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিবাহের অনুমোদন

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দ্রুপদরাজা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন। তাঁর বাক্রুদ্ধ হয়ে গেল। কোনোরকমে তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে তাঁদের বারণাবতের লাক্ষা-গৃহ থেকে নির্গত হওয়া এবং সেখান থেকে এসে কীভাবে এত দিন তাঁরা জীবন নির্বাহ করেছেন, সেই সব সংবাদ শুনলেন। যুধিষ্ঠির সংক্ষেপে সব বৃত্তান্ত তাঁকে জানালেন। দ্রুপদ ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'তোমাদের রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করব।' তারপর তিনি বললেন—'যুধিষ্ঠির, তুমি এবার অর্জুনকে বলো তিনি যেন দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'রাজন্ ! আমারও বিবাহ করতে হবে।' দ্রুপদ বললেন—'এ তো খুব ভালো কথা, তুমিই আমার কন্যাকে নিয়মসম্মতভাবে বিবাহ করো।' যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজন্ ! আপনার রাজকন্যা আমাদের সবার পাটরানি হবেন। আমার মা সেইরকম আদেশ দিয়েছেন। এখন আপনি অনুমতি দিন যাতে আমরা এক এক করে এঁকে বিবাহ করতে পারি।' রাজা দ্রুপদ বললেন—'কুরুবংশভূষণ ! তুমি এ কেমন কথা বলছ ? একজন রাজার অনেক রানি থাকতে পারেন, কিন্তু এক নারীর অনেক পতি—এ কথা কখনো শোনা যায়নি। তুমি ধর্মজ্ঞ এবং পবিত্র, লোকমর্যাদা এবং ধর্মের বিপরীত এমন কথা তোমার চিন্তা করা উচিত নয়।' যুধিষ্ঠির বললেন—'মহারাজ ! ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমরা তা ঠিকমতো বুঝতে পারি না। আমরা সেই পথই অনুসরণ করি যা পূর্বসূরীগণ পালন করেছেন। আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আমার মন কখনো অধর্মের দিকে যায় না। আমার মায়ের এই আদেশ আমরা মন থেকে মেনে নিয়েছি।' দ্রুপদ বললেন—'ঠিক আছে, আগে তুমি, তোমার মা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাই মিলে কর্তব্য স্থির করো, পরে জানাও। সেই অনুসারে যা কিছু করার আগামীকাল ঠিক করা হবে।'

সকলে একত্রিত হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। ভগবান বেদব্যাস অকস্মাৎ সেখানে এলেন। সকলে আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন সিংহাসনে সমাদরপূর্বক বসালেন। ব্যাসদেব সবাইকে বসতে বললে, সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। কুশল সমাচার বিনিময়ের পরে রাজা দ্রুপদ বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান ! একজন নারী কি বহু পুরুষের ধর্মপত্নী হতে পারেন ? এরূপ করলে সংকর দোষে দূষিত হবে না তো ? আপনি কৃপা করে আমার এই ধর্মসংকট দূর

করুন।' ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! এক নারীর বহু পতি, এটি লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ। সমাজেও প্রচলিত নয়। এই ব্যাপারে তোমরা কী ভেবেছ আগে তাই বলো।' দ্রুপদ বললেন—'ভগবান, আমি মনে করি এরূপ করা অধর্ম। লোকাচার, বেদাচার, সদাচারের প্রতিকূল হওয়ায় এক স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হতে পারে না। আমার বিচারে এরূপ করা অধর্ম।' ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'আমারও তাই বিশ্বাস। কোনো সদাচারী ব্যক্তি তাঁর ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে কী

করে সহবাস করতে পারেন ?' যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমি আপনাদের কাছে আবার বলছি যে, আমি কখনো মিথ্যা বাক্য বলিনি, আমার মন কখনো অধর্মের দিকে যায় না। আমার বুদ্ধি আমাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে যে, এ অধর্ম নয়। শাস্ত্রে গুরুজনের বাক্যকে ধর্ম বলা হয়েছে, মাতা গুরুজনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার মা-ই আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, ভিক্ষাসামগ্রীর ন্যায় এঁকেও তোমরা মিলে মিশে উপভোগ করো। আমার কাছে তো এটা করাই ধর্মসঙ্গত।' কুন্তী বললেন—'আমার পুত্র যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধার্মিক। সে যা বলছে, ঘটনা তাই ; আমার বাক্য মিথ্যা হওয়ার ভয় হচ্ছে। এখন আপনারা বলুন এমন কী উপায় আছে যাতে আমি অসত্যের হাত থেকে রক্ষা পাই।' বেদব্যাস বললেন—'কল্যাণী, তোমার বাক্য অসত্য হওয়া থেকে রক্ষা পাবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। দ্রুপদ ! রাজা যুধিষ্ঠির যা কিছু বলেছেন, তা ধর্মের প্রতিকূল নয়, অনুকূলই। কিন্তু এই রহস্য আমি সকলের সামনে বলতে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে অন্যত্র চলো।' এই বলে ব্যাসদেব দ্রুপদকে নিয়ে অন্যত্র গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নেরা সকলে সেখানেই থাকলেন।

ব্যাসদেব দ্রুপদকে একান্তে নিয়ে গিয়ে দ্রৌপদীর পূর্বের দুই জন্মের বৃত্তান্ত শোনালেন এবং বললেন ভগবান মহাদেবের বরদানের জন্যই দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী হবেন। তারপর তিনি বললেন—'দ্রুপদ ! আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি। তার সাহায্যে তুমি পাণ্ডবদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অবলোকন করো।' রাজা দ্রুপদ ভগবান ব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে দেখলেন যে পঞ্চ পাণ্ডবের দিব্য রূপ চমকিত হচ্ছে। নানা দিব্য বসন ভূষণ পরিহিত হয়ে এঁরা স্বয়ং ভগবান শিব, আদিত্য অথবা বসুর ন্যায় বিরাজমান। তার সঙ্গে তিনি দেখলেন তাঁর কন্যা দ্রৌপদী দিব্যরূপে চন্দ্রকলা অথবা অগ্নিকলার ন্যায় দেদীপ্যমান, যেন তাঁর রূপে ভগবানের দিব্য মায়াই প্রকাশিত হচ্ছে। সেই রূপ, তেজ ও সুকীর্তিতে পাণ্ডবদের অনুরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই দর্শন লাভ করে দ্রুপদ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তিনি ব্যাসদেবের চরণে পতিত হলেন, বললেন—'ধন্য ! ধন্য ! আপনার কৃপায় এরূপ অনুভূত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।' তারপর বললেন—'আমি আপনার কাছ থেকে যতক্ষণ নিজ কন্যার পূর্বজন্মের কথা না শুনেছি এবং এই বিচিত্র দৃশ্য না দেখেছি, ততক্ষণ আমি যুধিষ্ঠিরের কথার প্রতিবাদ করছিলাম। কিন্তু বিধাতার যখন এইরূপই বিধান, তখন কে তাকে টলাতে পারে ? আপনার যা আদেশ, তাই হবে। ভগবান মহাদেব যে বরদান করেছেন, তা ধর্ম হোক বা অধর্ম তাই হওয়া উচিত। এখন এতে আমার কোনো অপরাধ হবে না। সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব প্রসন্ন হয়ে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন। কেননা দ্রৌপদী পাঁচভাইয়ের পত্নী হবার জন্যই জন্ম নিয়েছেন।'

—o—

পাণ্ডবদের বিবাহ

ভগবান বেদব্যাস তখন দ্রুপদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরদের কাছে এসে বললেন—'আজই বিবাহের শুভদিন এবং শুভমুহূর্ত আছে। চন্দ্র আজ পুষ্পনক্ষত্রে অবস্থান করছে, অতএব যুধিষ্ঠির আজ তুমি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করো।' আজই বিবাহ সুসম্পন্ন হবে স্থির হতেই দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলে বিবাহের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। দ্রৌপদীকে স্নান করিয়ে উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত করা হল। সময়মতো তাঁকে মণ্ডপে আনা হল। রাজপরিবারের সদস্য এবং মন্ত্রী, পারিষদ পরিজন, পুরজন সকলেই আনন্দ-সহকারে এসে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করলেন। বিবাহ মণ্ডপ অবর্ণনীয় সাজে সজ্জিত হয়েছিল। স্নান ও স্বস্ত্যয়নের পর পঞ্চপাণ্ডব বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে বিবাহ মণ্ডপে এলেন। তাঁদের আগে আগে এলেন তেজস্বী পুরোহিত ধৌম্য। বেদীর ওপর হোমকুণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রথমে যুধিষ্ঠির বিধিপূর্বক দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করলেন, হোম সুসম্পন্ন হল, পরে সপ্তপদী হয়ে বিবাহ কর্ম সম্পন্ন হল। এইভাবে বাকী চার ভ্রাতা একে একে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করলেন। এখানে একটি কথা বলার আছে, দেবর্ষি নারদের কৃপায় দ্রৌপদী প্রতিদিন কন্যাভাব প্রাপ্ত হতেন। বিবাহের পরে রাজা দ্রুপদ যৌতুক হিসাবে বহু ধন-রত্ন দিলেন। রত্ন সজ্জিত একশত রথ, হাতি, বস্ত্রভূষণ সজ্জিত একশত করে দাসী প্রত্যেক জামাতাকে দিলেন। এছাড়াও পাণ্ডবদের আরও অনেক সামগ্রী দিলেন। পঞ্চপাণ্ডব অপার সম্পত্তি এবং নারীরত্ন লাভ করে দ্রুপদের কাছে সুখে কালাতিপাত করতে

লাগলেন।

দ্রুপদের রানিরা কুন্তীকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। দ্রৌপদীও প্রত্যহ সুন্দর রেশম বস্ত্র পরিধান করে নম্রভাবে
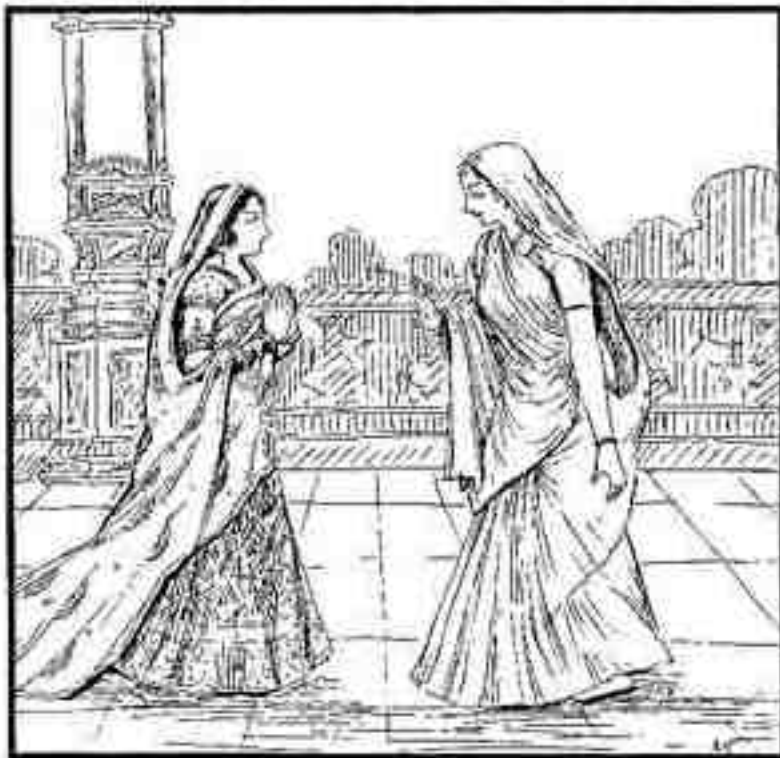
এসে কুন্তীকে প্রণাম করতেন। কুন্তীও অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁর সুশীলা পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে বলতেন—'ইন্দ্রাণী যেমন ইন্দ্রকে, দময়ন্তী নলকে, স্বাহা অগ্নিকে, রোহিণী চন্দ্রকে, অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে, লক্ষ্মী নারায়ণকে প্রেমভরে দেখে থাকেন, তুমিও তোমার পতিদের সেইভাবে দেখবে। তুমি আয়ুষ্মতী, বীরপ্রসবিনী, সৌভাগ্যবতী এবং পতিব্রতা হয়ে সুখভোগ করো। অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, বালক-বৃদ্ধদের অভ্যর্থনা এবং পালন পোষণেই তোমার সময় ব্যতীত হোক। তুমি সম্রাট পতিদের পাটরানি হও, একশত বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত সুখ তুমি ভোগ করো।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বিবাহের পরে তাঁদের উপহার স্বরূপ বৈদূর্যমণি সমন্বিত স্বর্ণালংকার, মহার্ঘ বস্ত্র, শয়নের উপযোগী সামগ্রী ও বহু ঘোড়া, হাতি, রথ ইত্যাদি উপহার দিলেন। যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করার জন্য অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেই সব উপহার গ্রহণ করলেন।

পাণ্ডবদের রাজ্য দেওয়ার জন্য কৌরবদের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সব রাজাই তাঁদের গুপ্তচর মারফৎ জানতে পারলেন যে, পাণ্ডবদের সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ হয়েছে। লক্ষ্যভেদকারী স্বয়ং বীররত্ন অর্জুন। তাঁর সঙ্গী, যিনি শল্যকে আছাড় মেরেছিলেন এবং বড় বড় গাছ উপড়ে রাজাদের হতচকিত করেছিলেন, তিনি মহাবীর ভীম। এই খবরে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তাঁরা পাণ্ডবদের অগ্নিদাহ থেকে রক্ষা পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং কৌরবদের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে ধিক্কার দিলেন।

দুর্যোধন এই সংবাদে বিষণ্ণ হলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী অশ্বত্থামা, কর্ণ, শকুনি প্রমুখ সমভিব্যাহারে তাঁদের রাজধানী হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। দুঃশাসন শান্ত কণ্ঠে বললেন—'ভ্রাতা, আমার এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যই বলবান। চেষ্টা দ্বারা কিছুই হয় না। পাণ্ডবেরা সেইজন্যই আজও জীবিত।' সেইসময় সকল কৌরবই অত্যন্ত হতাশ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা হস্তিনাপুরে পৌঁছে সমস্ত সংবাদ জানালে বিদুর অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ ধন্য হোক ! কুরুবংশীয়দের এখন বৃদ্ধি হচ্ছে।' ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্ন হয়ে বলতে লাগলেন—'অত্যন্ত আনন্দের কথা, অত্যন্ত আনন্দের কথা।' ধৃতরাষ্ট্র মনে করেছিলেন দুর্যোধনই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন, তাই তিনি নানাপ্রকার গহনা পাঠানোর নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন—'বর-বধূকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

বিদুর জানালেন দ্রৌপদীর পাণ্ডবদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে এবং তাঁরা অত্যন্ত আনন্দে দ্রুপদের রাজধানীতে আছেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর, পাণ্ডবদের আমি নিজের পুত্রদের থেকেও বেশি স্নেহ করি। তাদের জীবন রক্ষায়, বিবাহ হওয়ায় এবং দ্রুপদের মতো কুটুম্বলাভ হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। দ্রুপদের আশ্রয়ে থেকে তারা খুব শীঘ্র নিজেদের উন্নতি করতে পারবে।' বিদুর বললেন—'আমি প্রার্থনা করি এই রকম বুদ্ধি যেন আপনার সারাজীবন থাকে।'

বিদুর সেখান থেকে চলে যাবার পর দুর্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ, বিদুরের সামনে আমরা আপনাকে কিছু বলতে পারিনি। আপনি তাঁর সামনে শত্রুদের উন্নতিকে নিজের উন্নতি মনে করে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন ? আমাদের তো দিন-রাত শত্রুদের বল খর্ব করার কথা চিন্তা করা উচিত। আমাদের এখন থেকে এমন কিছু করতে হবে, যাতে তারা পরবর্তীকালে আমাদের এই রাজ্য হাতিয়ে নিতে না পারে।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! আমিও তো তাই চাই। কিন্তু বিদুরের সামনে একথা বলা তো দূরে থাক, হাব ভাবেও যেন প্রকাশিত না হয় ! সে যেন আমার ভাব বুঝতে না পারে, তাই আমি তার সামনে পাণ্ডবদের গুণগান করি। তোমরাই বলো এখন কী করা উচিত।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! আমার তো মনে হয় কিছু বিশ্বাসী গুপ্তচর এবং বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণদের পাঠিয়ে কুন্তী এবং মাদ্রীর পুত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য উৎপন্ন করানোর চেষ্টা করা অথবা রাজা দ্রুপদ, তাঁর পুত্র এবং মন্ত্রীদের লোভে বশীভূত করে, তাঁদের দিয়ে পাণ্ডবদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। কোনোভাবে দ্রৌপদী যাতে ওদের ত্যাগ করেন, তাও করা যেতে পারে। কিংবা ভীমকে যদি হত্যা করা যায় তাহলে তো সব কাজই ঠিক হয়ে যাবে। ভীম না থাকলে অর্জুন কর্ণের সিকিও নয়। আপনার যদি এইসকল পরামর্শ ঠিক বলে মনে না হয় তাহলে কর্ণকে ওর কাছে পাঠিয়ে দিন। যখন ওরা কর্ণের সঙ্গে এখানে আসবে তখন আগের মতো কোনো একটা উপায় বার করতে হবে এবং এইবার ওরা আর রক্ষা পাবে না। দ্রুপদের পূর্ণ বিশ্বাস এবং সহানুভূতি অর্জন করার আগেই ওদের মেরে ফেলা উচিত। আমার তো এই মত। কর্ণ ! এ ব্যাপারে তোমার কী মত ?'

কর্ণ বললেন—'দুর্যোধন ! তোমার মত আমার পছন্দ নয়। তোমার পরামর্শ মতো পাণ্ডবদের বশে আনা সম্ভব বলে মনে হয় না। এদের ভাইদের মধ্যে প্রীতি এত বেশি যে সেখানে মনোমালিন্যের কোনো কারণই নেই। একই নারীকে তারা বিবাহ দ্বারা লাভ করেছে এবং তাকেই সকলে ভালোবাসে, এর ফলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজা দ্রুপদ একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ধনলোভী নন। তুমি সমস্ত রাজ্য দিয়েও তাঁকে পাণ্ডবদের বিপক্ষে নিয়ে যেতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ না তাঁর যাদব সৈন্যদের নিয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য দেবার জন্য রাজা দ্রুপদের কাছে পৌঁছচ্ছেন, ততক্ষণ তুমি তোমার পরাক্রম দেখাতে পার। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্য তাঁর অগাধ সম্পত্তি, সমস্ত রাজ্য ত্যাগ করতে ইতস্তত করবেন না। তাই আমার মত হল যে, আমরা এখনই এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুপদের রাজ্যে চড়াও হই এবং দ্রুপদকে পরাজিত করে পাণ্ডবদের বধ করি ; কারণ পাণ্ডবদের সাম, দান ও ভেদনীতির দ্বারা বশীভূত করা সম্ভব নয়। এই বীরেদের বীরত্বের সাহায্যেই মেরে ফেলা উচিত।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র কর্ণ ! তুমি শস্ত্রকুশলই শুধু নও, নীতিকুশলও। তোমার কথা তোমারই অনুরূপ, তুমি ঠিকই বলেছ। তবুও আমার মনে হয় যে, আচার্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর এবং তোমরা দুজন, সকলে মিলে এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে এমন এক উপায় স্থির করো, যাতে পরিণামে ভালো হয়।'

ধৃতরাষ্ট্র পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য সকলকে সেখানে ডেকে পাঠালেন। সকলে মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করা আমার পছন্দ নয়। আমার কাছে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু আর তাদের পুত্রেরা সবাই সমান। আমি এদের সকলকেই স্নেহ করি। আমার ধর্ম হল এদের সকলকেই রক্ষা করা, তাই আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সমর্থন করি না। তুমি ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে ওদের অর্ধেক রাজ্য প্রদান করো। তুমি যেমন এই রাজ্য তোমার পিতা ও পিতামহের বলে জানো, তেমনই ওদেরও তাই। দুর্যোধন ! এই রাজ্য যদি পাণ্ডবেরা না পায়, তাহলে তুমি অথবা ভরতবংশের অন্য কেউ কীভাবে এই রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হতে পার ? তুমি যে এখন রাজা হয়েছ, তা ধর্মবিরুদ্ধ । তোমার থেকে আগে ওরাই এই রাজ্য পাওয়ার অধিকারী। তোমার খুশি মনে এই রাজ্য ওদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এছাড়া অন্য কোনোভাবে তোমাদের মঙ্গল হবে না। তুমি

কেন নিজের মাথায় কলঙ্ক লেপন করছ ? আমি যখন থেকে শুনেছি যে কুন্তী তার পাঁচপুত্রসহ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে, তখন থেকে আমার চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। তাদের দগ্ধ করার জন্য তোমাকে যতটা দায়ী করা হয়েছে ততটা পুরোচনকে নয়। এখন পাণ্ডবেরা জীবিত থাকায় এবং তাদের খোঁজ পাওয়ায় তোমার অপকীর্তি দূর হতে পারে। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকলে স্বয়ং ইন্দ্রও তাদের রাজ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। ওরা বুদ্ধিমান এবং ধর্মাত্মা, নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধও খুব বেশি। আজ পর্যন্ত তুমি ওদের যে রাজ্য থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছ, তা অধর্ম। ধৃতরাষ্ট্র ! আমি স্পষ্ট করে তোমাকে আমার মত জানিয়ে দিলাম। যদি তোমার ধর্মে এতটুকুও মতি থাকে, তুমি আমার এবং নিজের কল্যাণ চাও, তাহলে যত শীঘ্র পার ওদের অর্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দাও।'

দ্রোণাচার্য বললেন—'ধৃতরাষ্ট্র ! মিত্রদের কাছে কোনো পরামর্শ চাওয়া হলে তাঁরা ধর্ম-অর্থ ও যশবৃদ্ধিকারী পরামর্শই দিয়ে থাকেন, এটিই হল ধর্ম। আমি মহাত্মা ভীষ্মের কথাই অনুমোদন করছি। সনাতন ধর্ম অনুসারে আমি পাণ্ডবদের অর্ধ রাজ্য সমর্পণ করাই ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করি। আপনি কোনো হিতৈষী ব্যক্তিকে রাজা দ্রুপদের রাজধানীতে পাঠান। তিনি পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর জন্য নানাবিধ রত্নালঙ্কার নিয়ে যাবেন এবং দ্রুপদকে বলবেন যে, 'মহারাজ দ্রুপদ ! আপনার পবিত্র বংশের সঙ্গে কুটুম্বিতা হওয়ায় সমস্ত কুরুবংশ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। এতে তাঁরা তাঁদের কুল ও গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করেন।' তারপরে তিনি কুন্তী ও পাণ্ডবদের আশ্বাস দেবেন এবং বোঝাবেন। তাঁদের মনে আপনার প্রতি বিশ্বাস জাগরিত হলে তাঁদের এখানে আসার জন্য প্রস্তাব করবেন। দ্রুপদ সম্মতি দিলে দুঃশাসন এবং বিকর্ণ সৈন্য সামন্ত নিয়ে দ্রৌপদী ও কুন্তীসহ পাণ্ডবদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনবেন। ওঁদের পৃথক রাজ্য দিয়ে দিতে হবে, তাঁদের সম্মান জানালে রাজ্যের সমস্ত প্রজাই আপনাদের ওপর প্রসন্ন হবে, কারণ তারাও তাই চায়। আমিও পিতামহ ভীষ্মের পরামর্শই মেনে নিয়ে আপনার হিতের জন্য বলছি। এতে আপনার বংশের ভালো হবে।'

পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের কথা শুনে কর্ণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি বললেন—'মহারাজ ! পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ আপনার দ্বারা সর্বপ্রকারে সম্মানিত। আপনি প্রায়শই এঁদের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। যদি বিধাতা আপনার ভাগ্যে রাজ্য লিখে থাকেন, তাহলে সমস্ত জগৎ শত্রু হলেও কেউ আপনার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কেউ যদি মনোভাব গোপন করে কুমতলবে অমঙ্গলকে মঙ্গল বলে তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির তা মানা উচিত নয়। আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। মন্ত্রীদের পরামর্শ ভালো না মন্দ তা আপনি নিজেই স্থির করুন। কেননা আপনি নিজের হিত ও অহিত ভালোমতোই বুঝতে সক্ষম।'

দ্রোণাচার্য বললেন—'আরে কর্ণ ! আমি তোমার দুর্বুদ্ধি বুঝতে পারছি। তোমার হৃদয় কুমতলবে পূর্ণ। তুমি পাণ্ডবদের অনিষ্ট করার জন্য আমাদের পরামর্শকে অনিষ্টকারক বলছ। আমি আমার বুদ্ধিতে কুরুবংশের রক্ষা এবং হিতের কথা বলছি। আমার বুদ্ধিতে যদি কুরুবংশের অহিত বলে তোমার মনে হয়, তাহলে কীসে হিত হবে, বলো। আমি বলে রাখছি, আমার পরামর্শ মেনে না নিলে শীঘ্রই কৌরববংশ বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'

বিদুর বললেন—'মহারাজ ! হিতৈষী বন্ধুদের কর্তব্য হল নিঃসঙ্কোচে হিতের কথা বলা। কিন্তু আপনি তো ভালো কথা শুনতেই চান না। তাই হিতৈষীদের কথা হৃদয়ে স্থান দেন না। পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত প্রিয় এবং হিতকথা বলেছেন। কিন্তু আপনি এখনও তা মেনে নেননি। আমি খুব ভেবে দেখলাম যে, ভীষ্ম এবং দ্রোণের থেকে বেশি হিতৈষী আপনার আর কেউ নেই। এই দুই মহাপুরুষই অবস্থা, বুদ্ধি এবং শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যাদি সবেতেই সকলের থেকে ওপরে। এঁদের হৃদয়ে আপনার ও পাণ্ডুর পুত্রদের প্রতি সমান স্নেহ ভাব আছে। বামহস্তেও বাণ চালাতে পারদর্শী অর্জুনকে অন্য কেউ দূরের কথা, ইন্দ্রও তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে অক্ষম। মহাবাহু ভীম, যাঁর বাহুতে দশহাজার হাতির বল, দেবতারাও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারেন না। রণাকাঙ্ক্ষী নকুল-সহদেব অথবা ধৈর্য, ক্ষমা, সত্য এবং পরাক্রমের মূর্তিমান বিগ্রহ যুধিষ্ঠিরকেও যুদ্ধে কীভাবে পরাজিত করা সম্ভব ? আপনার বোঝা উচিত যে, পাণ্ডবদের পক্ষে স্বয়ং শ্রীবলরাম এবং সাত্যকি আছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওদের পরামর্শদাতা। অসংখ্য বলশালী যদুবংশীয় সৈন্য তাঁদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যুদ্ধ হলে পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, আপনার পক্ষ শক্তিহীন নয়, তাহলেও যে

কাজ মিলেমিশে করা সম্ভব, তাকে ঝগড়া-বিবাদ করে সন্দেহভাজন করা কোন্ বুদ্ধিমানের কর্ম ? প্রজারা যখন থেকে জানতে পেরেছে যে, পাণ্ডবেরা জীবিত, তখন থেকে তারা তাদের দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। এখন ওদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে রাষ্ট্রবিপ্লব হবে। আপনি প্রথমে আপনার প্রজাদের প্রসন্ন করুন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এরা সবাই অধার্মিক এবং দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। এদের কথা শুনবেন না। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম যে, দুর্যোধনের অন্যায় কর্মে সমস্ত প্রজার সর্বনাশ হবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ঋষিতুল্য ব্যক্তি। এঁদের পরামর্শ আমার পক্ষে অত্যন্ত হিতের। তুমি যা বলেছ, আমি তা স্বীকার করি। যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাইয়েরা যেমন পাণ্ডুর পুত্র তেমন আমারও পুত্র। আমার পুত্রের মতোই তাদের এই রাজ্যে অধিকার আছে। তুমি পাঞ্চাল দেশে যাও এবং রাজা দ্রুপদের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী এবং পঞ্চপাণ্ডবকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো।' ধৃতরাষ্ট্রের আদেশপ্রাপ্ত হয়ে বিদুর দ্রুপদের রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

—o—

বিদুর কর্তৃক পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আনয়ন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁদের রাজ্য স্থাপন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাত্মা বিদুর রথে করে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে রাজা দ্রুপদের রাজধানীতে গেলেন। বিদুর দ্রুপদ, পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর জন্য নানা রত্ন-অলঙ্কার ও উপহার সামগ্রী সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিয়মানুসার প্রথমে দ্রুপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দ্রুপদ বিদুরকে সসম্মানে আপ্যায়ন করলেন। কুশল প্রশ্নের পর বিদুর শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের হয়ে তাঁদের কুশল সংবাদ নিলেন এবং তাঁদের জন্য যেসব উপহার সামগ্রী এনেছিলেন, সেগুলো সমর্পণ করলেন।

সময়মতো বিদুর শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের উপস্থিতিতেই দ্রুপদকে বললেন—'মহারাজ ! আপনি কৃপা করে আমার অনুরোধ শুনুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্র ও মন্ত্রীগণ আপনাদের কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছেন। আপনার সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্কিত কুটুম্বিতা হওয়ায় তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণও আপনাদের কুশল জানতে উৎসুক। তাঁরা এতই আনন্দিত যে, রাজ্যলাভেও তার তুলনা হয় না। আপনি এখন পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। কুরুবংশে সকলেই ওঁদের দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন। কুরুবংশের নারীরা নববধূ দ্রৌপদীকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। পাণ্ডবেরা বহুদিন নিজ দেশ ছাড়া হয়ে রয়েছেন, তাঁরাও নিশ্চয়ই দেশে ফেরার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন। আপনি এবার সবাইকে ফিরে যেতে আদেশ দিন। আপনার নির্দেশ পেলেই আমি খবর পাঠাব যে, পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তী এবং নববধূ দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন।'

রাজা দ্রুপদ বললেন—'মহাত্মা বিদুর, আপনার কথাই ঠিক। কুরুবংশীয়দের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমি কম খুশি হইনি। পাণ্ডবদের নিজের রাজধানীতে ফিরে যাওয়াই উচিত, কিন্তু আমি সে কথা ওঁদের বলতে পারব না। ওঁদের চলে যেতে বলা শোভনীয় নয়।' যুধিষ্ঠির বললেন—'মহারাজ, আমরা স্বপারিষদ আপনারই অধীন। আপনি যে আদেশ দেবেন, আমরা প্রসন্নতার সঙ্গে তাই পালন করব।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আমি মনে করি পাণ্ডবদের এখন হস্তিনাপুর যাওয়াই উচিত। রাজা দ্রুপদ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং ধর্মজ্ঞ। তিনি যা বলবেন, তাই করা উচিত।' দ্রুপদ বললেন—'পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেশকাল বিবেচনা করে যা বলছেন, আমার মনে হয় তাই করাই উচিত। আমি পাণ্ডবদের যত স্নেহ করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ততটাই করেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের যত মঙ্গলকামনা করেন, স্বয়ং পাণ্ডবরাও নিজেদের জন্য তত করেন না।'

এইরূপ পরামর্শের পরে পাণ্ডবগণ রাজা দ্রুপদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মা বিদুর, মাতা কুন্তী এবং নববধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এঁদের আসার খবর পেয়ে অভ্যর্থনা করার জন্য বিকর্ণ, চিত্রসেন এবং অন্যান্য কৌরবদের নগরদ্বারে পাঠালেন। দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্যও গেলেন। সকলে নগরদ্বারে মিলিত হলেন এবং বহু পুরবাসী সকলে একত্রিত হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। নগরবাসীরা তাঁদের দর্শনের আশায় অধীর হয়েছিলেন, তাঁদের দেখে সকল প্রজার শোক ও দুঃখ প্রশমিত হল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে 'যদি আমরা দান-তপ-হোম বা কোনোপ্রকার পুণ্যকর্ম করে থাকি, তাহলে তার ফলস্বরূপ পাণ্ডবগন যেন সারা জীবন এই নগরীতে বাস করেন।'

পাণ্ডবরা রাজসভায় গিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্মসহ সকল পূজনীয় ব্যক্তিদের প্রণাম করলেন। তাঁদেরই নির্দেশে পাণ্ডবরা আহার ও বিশ্রামের পরে আবার রাজসভায় এলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'যুধিষ্ঠির, তুমি তোমার ভাইদের নিয়ে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমাদের সঙ্গে দুর্যোধনদের যাতে কোনোপ্রকার বিবাদ বা মনোমালিন্য না হয়, তাই তোমরা অর্ধরাজ্য নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদের রাজধানী তৈরি করে সেখানেই বসবাস করো। সেখানে তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই ; কারণ ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রক্ষা করেন, তেমনই অর্জুনও তোমাদের রক্ষা করবে।' পাণ্ডবরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা মেনে নিলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে খাণ্ডবপ্রস্থে বসবাসের আয়োজন করতে লাগলেন।

ব্যাস এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ শুভ মুহূর্তে জমি মাপ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে রাজভবনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। অল্প দিনেই রাজভবন নির্মিত হয়ে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগল। যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম রাখলেন 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। নগরের চতুর্দিকে সমুদ্রের মতো গভীর খাল এবং গগনচুম্বী প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল। বহুদূর থেকে তার বিশাল সিংহদ্বার, উচ্চ ভবনসমূহ এবং ওপরের চূড়াগুলি দেখা যেত। স্থানে স্থানে অস্ত্রশিক্ষার আখড়া ছিল। নগরের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুব কঠোর। রাজপথ অত্যন্ত প্রশস্ত এবং গাছপালাদ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী সুন্দর ভবনদ্বারা সুশোভিত ছিল। নগর তৈরি হতেই নানা ভাষা-ভাষী ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, কারিগর এবং গুণীগণ এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। নগরীর স্থানে স্থানে উদ্যান, ফল-ফুলের বৃক্ষে পরিপূর্ণ উপবন, সেই সব স্থানে ময়ূর, কোকিল সারাদিন নাচ-গান করে বেড়াত। পাখিদের কলরব, মৌমাছির গুণ-গুণ মানুষকে মুগ্ধ করত। রাজপথের ধারে কোথাও শীশমহল, কোথাও চিত্রশালা, কোথাও কৃত্রিম পাহাড় ও ঝরনা শোভা পেত। নগরীর সাজসজ্জা এবং প্রজাদের ব্যবহারে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। অর্ধেক রাজত্ব লাভ করে নগর পত্তন করে, তাঁরা দিন দিন উন্নতি করছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

—o—

ইন্দ্রপ্রস্থে দেবর্ষি নারদের আগমন, সুন্দ ও উপসুন্দের কথা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যলাভ করার পর পাণ্ডবেরা কী করলেন ? তাঁদের ধর্মপত্নী দ্রৌপদী তাঁদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন ? তাঁরা একই পত্নীতে আসক্ত হয়েও পারস্পরিক বিরোধ থেকে দূরে ছিলেন কী করে ? আপনি কৃপা করে তাঁদের সেই সকল কথা সবিস্তারে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাতেজস্বী সত্যবাদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বসবাস করে ভ্রাতাদের সাহায্যে প্রজাপালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর বশীভূত ছিল এবং ধর্ম ও সদাচার পালন করায় তাঁর আনন্দে কোনো ঘাটতি ছিল না। একদিন পাণ্ডবরা সকলে রাজসভায় বহুমূল্য আসনে বসে রাজকাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সেইসময় নারদ আপন মনে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এলেন। যুধিষ্ঠির আসন থেকে উঠে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন। শাস্ত্রসম্মতভাবে দেবর্ষি নারদকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করা হল। যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে তাঁকে তাঁর রাজ্যের সব সংবাদ জানালেন। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের পূজা গ্রহণ করে তাঁকে বসতে বললেন। দ্রৌপদীকে দেবর্ষির শুভাগমনের সংবাদ পাঠানো হল। লজ্জাশীলা দ্রৌপদী পবিত্রভাবে এসে দেবর্ষিকে প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়ালেন। দেবর্ষি নারদ তাঁকে আশীর্বাদ করে রানিমহলে ফিরে যেতে বললেন।

দ্রৌপদী ফিরে গেলে দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের একান্তে ডেকে বললেন—'হে বীর পাণ্ডবগণ ! যশস্বিনী দ্রৌপদী তোমাদের পাঁচ ভাইয়েরই একমাত্র ধর্মপত্নী, তাই তোমাদের এমন একটা নিয়ম ঠিক করতে হবে যাতে তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ না হয়। প্রাচীন কালে অসুর বংশে সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুভাই ছিল। দুজনে এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে সাহস পেত না। তারা একসঙ্গে রাজ্য চালাত, একসঙ্গে শয়ন করত, একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। কিন্তু তারা দুজনেই তিলোত্তমা নামক এক সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়েছিল ফলে একে অপরকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হয়েছিল। অতএব তোমরা এমন কোনো ব্যবস্থা করো, যাতে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা বজায় থাকে আর বিবাদ না হয়।'

যুধিষ্ঠির বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে দেবর্ষি নারদ

সুন্দ এবং উপসুন্দের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বলতে লাগলেন—'হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে এক মহাবলশালী, প্রতাপবান দৈত্য ছিল। তার দুই পুত্র ছিল সুন্দ এবং উপসুন্দ। দুজনে অত্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রমী, ক্রূর এবং দৈত্যের সর্দার ছিল। তাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য, কার্য, ভাব, সুখ, দুঃখ সবই এক প্রকারের ছিল। একজন অন্যজনকে ছাড়া কোথাও যেত না বা খাওয়া-দাওয়াও করত না। তাদের দুজনের দেহ আলাদা হলেও তারা ছিল একমন, একপ্রাণ। দুজনের বুদ্ধিও প্রায় একরকম ছিল। তারা দুজনে ত্রিলোক জয়ের কামনায় শাস্ত্রমতে দীক্ষা নিয়ে বিন্ধ্যাচলে তপস্যা করতে আরম্ভ করে। তারা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে জটা বল্কল ধারণ করে কঠোর তপস্যায় রত হয়েছিল। তাদের শরীরে মাটি ভরে উঠল। বুড়ো আঙুলের ভরে দাঁড়িয়ে দুহাত ওপরে তুলে তারা সারাদিন সূর্যের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকত। দীর্ঘদিনের তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে, বরদানের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন এবং তাদের বর চাইতে বললেন। সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মাকে দেখে হাত জোড় করে বলল—'প্রভু, যদি আমাদের তপস্যায় আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং বর দিতে চান তাহলে এমন বর দিন যাতে আমরা দুজন শ্রেষ্ঠ মায়াবী, শ্রেষ্ঠ শস্ত্রজ্ঞ, ইচ্ছানুসারে রূপ পরিগ্রহকারী, বলশালী এবং অমর হতে

পারি।' ব্রহ্মা বললেন—'অমর হওয়া দেবতাদের বৈশিষ্ট্য। তোমাদের উদ্দেশ্যেও তা নয়, তাই অমর হওয়া ছাড়া আর যা কিছু তোমরা প্রার্থনা করেছ, তা লাভ করবে।' তখন দুই

ভাই বলল—'পিতামহ, তাহলে আমাদের এমন বর দিন যাতে পৃথিবীর কোনো প্রাণী বা পদার্থ থেকে আমাদের মৃত্যু না হয়। আমাদের যদি মরতেই হয়, তাহলে আমরা যেন একে অন্যের হাতেই মৃত্যুবরণ করি।' ব্রহ্মা তাঁদের সেই বর দিয়ে নিজ লোকে ফিরে গেলেন। সুন্দ ও উপসুন্দও নিজ আবাসে ফিরে এল।

সুন্দ এবং উপসুন্দর বন্ধু-বান্ধবগণ এই বরপ্রাপ্তিতে আনন্দে উল্লসিত হল। দুই ভাই উৎসব করতে ব্যস্ত রইল, নগরও তাদের সঙ্গে মেতে উঠল। ঘরে ঘরে যখন এইরকম আনন্দ উৎসব হচ্ছে তখন গুরুজনদের পরামর্শে সুন্দ ও উপসুন্দ দিগ্বিজয়ের জন্য রওনা হল। তারা ইন্দ্রলোক, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি সবাইকে পরাজিত করে সমস্ত পৃথিবী নিজেদের বশে আনার চেষ্টা করেছিল। দুই ভাইয়ের নির্দেশে অসুররা সমস্ত জগৎ ঘুরে ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষিদের সর্বনাশ করতে লাগল। তারা ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের অগ্নি জলে ফেলে দিল। তপস্বীদের আশ্রমগুলি নষ্ট করে দেওয়া হল। ঋষিরা দুর্গম জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই, অসুররা জঙ্গলে গিয়ে খুঁজে বার করে তাঁদের হত্যা করতে লাগল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সকলকেই তারা হত্যা করত। যজ্ঞ, স্বাধ্যায় এবং সর্ব প্রকার উৎসব বন্ধ হয়ে গেল ; বাজার, লোকালয় লোকশূন্য হয়ে পড়ল। সৎকর্মাদি লোপ হওয়ার এবং লোকেদের অস্থির যত্রতত্র স্তূপীকৃত দৃশ্যে পৃথিবী ভয়ংকর হয়ে উঠল।

এই ভয়ানক হত্যালীলা দেখে মুনি-ঋষি, মহাত্মাগণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁরা সকলে মিলে ব্রহ্মলোকে গেলেন। সেই সময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, বৈশ্বানর, বালখিল্য প্রমুখ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষিগণ এবং দেবতাগণ বিনীতভাবে ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলেন সুন্দ এবং উপসুন্দ কীভাবে নিষ্ঠুরতাপূর্বক প্রজাদের ধ্বংস করছে। ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন। বিশ্বকর্মা এলে তাঁকে বললেন এক অনুপম সুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে, যিনি সকলের নয়ন মুগ্ধকারী হবেন। বিশ্বকর্মা বহুযত্নে এক ত্রিলোকসুন্দরী অপরূপা নারী সৃষ্টি করলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের তিল তিল নিয়ে সেই সুন্দরীর এক এক অঙ্গ সৃষ্ট হল। ব্রহ্মা তাঁর নাম রাখলেন 'তিলোত্তমা'। তিলোত্তমা ব্রহ্মার সামনে হাত জোড় করে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান, আমাকে কী করতে আদেশ করেন ?' ব্রহ্মা বললেন—'তিলোত্তমা, তুমি সুন্দ উপসুন্দের কাছে যাও এবং তোমার মনোহর রূপে ওদের মনহরণ করো। তোমার সৌন্দর্য ও কৌশলে ওদের দুজনের মধ্যে যাতে বৈরিতার সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থা করো।' তিলোত্তমা ব্রহ্মার আদেশ মেনে নিয়ে তাঁকে এবং উপস্থিত সকল দেবতাদের প্রণাম করলেন। তাঁর রূপের শোভা দেখে দেবতা ও ঋষিরা বুঝলেন যে, এবার আর ওদের বিনাশে বিলম্ব নেই।

সুন্দ, উপসুন্দ দুজনে পৃথিবী জয় করে নিষ্কণ্টক হয়ে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে লাগল। তাদের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না, তাই তারা আলস্য-বিলাসে দিন কাটাতে লাগল। দুইভাই একদিন বিন্ধ্যাচলের উপত্যকায় পুষ্পবিতানে প্রমোদ ভ্রমণ করতে গেল, সেইসময় তিলোত্তমা অপূর্ব সাজে সেজে ফুল তোলার জন্য সেই উদ্যানে এল। দুই ভাই মদের নেশায় মত্ত ছিল, তিলোত্তমার দিকে নজর পড়তেই তারা কামতাড়িত হয়ে সেইখানে এল। তারা এমন উন্মত্ত হয়েছিল যে, দুজনেই তিলোত্তমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। দুজনেই শারীরিক বল, ধন এবং নেশায় উন্মাদ হয়ে বলতে লাগল—'আরে ! এই নারী আমার, তোর ভ্রাতৃবধূ।' দুজনেই নিজ নিজ বাক্যে অনড় হয়ে 'তোর নয় আমার' বলে ঝগড়া করতে লাগল। ক্রোধের বশে দুজনেই স্নেহ ও সৌহার্দ্য ভুলে গদা তুলে নিয়ে 'আগে আমি ওর হাতে ধরেছি' বলে একে অপরের ওপর লাফিয়ে

পড়ল। দুজনের শরীর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই দুই ভয়ংকর অসুরকে মৃত পড়ে থাকতে দেখা গেল।

তাদের এই দশা দেখে তাদের সঙ্গী সাথীরা পাতালে পালিয়ে গেল। দেবতা, মহর্ষি এবং স্বয়ং ব্রহ্মা তিলোত্তমার প্রশংসা করে তাঁকে বর দিলেন যে, কোনো মানুষের দৃষ্টি তার ওপর বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন, জগতের কাজ-কর্ম ঠিকমতো চলতে থাকল। ব্রহ্মা নিজলোকে গমন করলেন।

নারদ বললেন—'সুন্দ এবং উপসুন্দ দুজনে দুই দেহ হলেও এক মন, এক প্রাণ ছিল। কিন্তু এক নারীর জন্য তাদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং তা বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে। তোমাদের ওপর আমার স্নেহ ও অনুরাগ আছে, সেইজন্য আমি তোমাদের এই কথা বলতে এসেছি যে, তোমরা এমন নিয়ম তৈরি কর যাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনো কারণ না ঘটে।' দেবর্ষি নারদের কথা শুনে পাণ্ডবরা তা মেনে নিলেন এবং নারদের সামনেই তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এক এক ভাই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দ্রৌপদীর কাছে থাকবেন। কোনো এক ভাই যখন দ্রৌপদীর কাছে থাকবেন তখন অন্য কোনো ভাই সেইখানে যাবেন না। কোনো ভাই যদি অন্য ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর একান্ত বাসের সময় যান তাহলে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বারো বছর বনবাসে থাকতে হবে। পাণ্ডবরা এই নিয়মে রাজি হলে নারদ প্রসন্ন হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। জনমেজয় ! এই জন্যই পাণ্ডবদের মধ্যে দ্রৌপদীকে নিয়ে কোনো মনোমালিন্য হয়নি।

নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য অর্জুনের বনবাস এবং উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডবরা এইরূপ নিয়ম মেনে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁরা নিজেদের শারীরিক বল এবং অস্ত্রকৌশলের সাহায্যে একে একে সমস্ত রাজাকে বশীভূত করলেন। দ্রৌপদী সকলের মনোমত হয়ে চলতেন। পাণ্ডবরা তাঁকে লাভ করে খুশি ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করতেন, ফলে কুরুবংশীয়দের পূর্বের দোষ দূর হতে লাগল।

একবার ডাকাতরা একটি ব্রাহ্মণদের গ্রামে গোরু ডাকাতি করে পালাতে থাকে। ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে পাণ্ডবদের জানালেন—'পাণ্ডব ! তোমাদের শাসনে দুষ্ট এবং নীচ ডাকাতরা আমাদের গোরুগুলিকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তোমরা সেগুলিকে রক্ষা করো। যে রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর নিয়েও তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে না, তাদের পাপ স্পর্শ করে। আমরা ব্রাহ্মণ, গোরু হরণ করে নিয়ে গেলে আমাদের ধর্মের ক্ষতি হবে। অতএব পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তোমরা এইসময় আমাদের গোধন রক্ষা করো।' অর্জুন তাঁদের কাতর আবেদন শুনে ভরসা দিলেন। কিন্তু মুস্কিল হল যে, যে ঘরে অস্ত্র-শস্ত্র থাকে, সেই ঘরে সেইসময় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী একান্তে ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী অর্জুন তখন সেই ঘরে প্রবেশ করতে পারেন না। একদিকে এই নিয়ম পালন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের দুরবস্থা। অর্জুন বড় দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তিনি ভাবলেন—'ব্রাহ্মণদের গোধন ফিরিয়ে দিয়ে তাদের অশ্রুমোচন করা আমার কর্তব্য, এটি উপেক্ষা করা রাজার পক্ষে অধর্ম। এতে আমাদের নিন্দা হবে, পাপও হবে। অন্যদিকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলেও পাপ হবে, বনেও যেতে হবে। যাইহোক, ব্রাহ্মণদেরই রক্ষা করব, বাধা আসে তো আসুক। নিয়মভঙ্গের জন্য যত কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা হোক,

তাতে প্রাণও যদি যায় তবু এই ব্রাহ্মণদের গোধন রক্ষা করা আমার ধর্ম, আমার জীবন রক্ষার থেকেও তা মহত্ত্বপূর্ণ।' অর্জুন নিঃসঙ্কোচে রাজা যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন। রাজার

অনুমতি নিয়ে ধনুক তুলে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ! শীঘ্র চলুন, এখনও দুষ্ট ডাকাতরা বেশি দূরে চলে যায়নি। ওদের কাছ থেকে গোধন উদ্ধার করে আনি।' অল্পক্ষণের মধ্যে অর্জুন বাণ দ্বারা ডাকাতদের মেরে গোধন ব্রাহ্মণদের ফিরিয়ে দিলেন। পুরবাসীরা অর্জুনের খুব প্রশংসা করল, কুরুবংশীয়েরা অভিনন্দন জানাল। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন—'ভ্রাতা, আমি আপনার একান্ত গৃহে এসে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি। সুতরাং আমাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাওয়ার আদেশ দিন। আমাদের মধ্যে এই রকম নিয়মই করা হয়েছে।' অর্জুনের মুখে এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির শোকগ্রস্ত হলেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন—'অর্জুন! তুমি যদি আমার কথা মেনে চলো, তাহলে আমি যা বলি শোনো। তুমি নিয়মভঙ্গ করে থাকলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করছি, তার জন্য আমার মনে একটুও ক্ষোভ নেই, গোরুগুলি উদ্ধার করে তুমি যে কাজ করেছ তা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি তার পত্নীর সঙ্গে বসে থাকে সেখানে কনিষ্ঠ ভ্রাতার যাওয়াতে কোনো অপরাধ হয় না। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা পত্নীর সঙ্গে বসে থাকলে সেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যাওয়া উচিত নয়। তুমি বনবাস যাওয়ার চিন্তা পরিত্যাগ করো। তোমার ধর্মও লোপ হয়নি এবং আমারও কোনো অপমান হয়নি।' অর্জুন বললেন—'আপনি বলে থাকেন যে, ধর্মপালনে কোনো দ্বিধা করা ঠিক নয়। আমি অস্ত্র ছুঁয়ে শপথ করছি যে, আমি এই সত্যপালনে অটল থাকব।' অর্জুন বনবাস যাওয়া স্থির করে বারো বছরের জন্য রওনা হলেন। অর্জুনের সঙ্গে বহু বেদ-বেদান্ত পণ্ডিত,

অধ্যাত্মচিন্তক, ভগবদ্ভক্ত, ত্যাগী ব্রাহ্মণ, কথক পণ্ডিত, বানপ্রস্থী এবং ভিক্ষাজীবিও চললেন। পথে নানা কথাবার্তা হত। তাঁরা বহু বন, সরোবর, নদী, পুণ্যতীর্থ, দেশ এবং সমুদ্র দর্শন করলেন। শেষে হরিদ্বারে পৌঁছে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞবেদী স্থাপন করে যজ্ঞ করতে শুরু করলেন।

একদিন অর্জুন গঙ্গাস্নানের পর স্নান-তর্পণ করে যজ্ঞ করার জন্য উঠে আসছিলেন, সেইসময় নাগকন্যা উলুপী কামাসক্ত হয়ে তাঁকে পাতালে টেনে নিয়ে তাঁর ভবনে নিয়ে গেলেন। অর্জুন দেখলেন সেখানে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত রয়েছে। সেখানে তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন এবং অগ্নিদেবকে প্রসন্ন করে নাগকন্যা উলুপীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সুন্দরী, তুমি কে ? তুমি এমন সাহস করে আমাকে কোথায় আনলে ?' উলুপী বললেন—'আমি ঐরাবত বংশের কৌরব্য নাগের কন্যা উলুপী। আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনি ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই। আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, আমাকে স্বীকার করুন।' অর্জুন বললেন—'দেবী ! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনে রত আছি। আমি স্বাধীন নই। তোমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি না থাকলেও আজ পর্যন্ত আমি কোনোপ্রকারে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আমার যাতে মিথ্যা বলার পাপ না হয়, ধর্মলোপও না হয়, এমন কাজই তোমার করা উচিত।'

উলূপী বললেন—'আপনারা দ্রৌপদীর জন্য যে মর্যাদা রেখেছেন, তা আমি জানি। কিন্তু সে নিয়ম দ্রৌপদীর সঙ্গে ধর্মপালনের জন্যই। এই লোকে আমার ক্ষেত্রে সেই ধর্মযুক্তি প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া আর্তকে রক্ষা করাও তো পরম ধর্ম। আমি দুঃখিনী, আপনার সামনেই ক্রন্দন করছি। আপনি যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ না করেন, তাহলে আমি প্রাণ হারাব। আমার প্রাণরক্ষা করলে আপনার ধর্মলোপ হবে না, আর্তকে রক্ষা করার পুণ্যই হবে। আপনি আমাকে প্রাণ দান করে ধর্ম উপার্জন করুন।' অর্জুন উলূপীর প্রাণরক্ষা করাকে ধর্ম মনে করে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে সারারাত সেখানে কাটালেন।

পরের দিন তিনি সেখান থেকে হরিদ্বারে ফিরে এলেন। যাবার সময় নাগকন্যা উলূপী অর্জুনকে বর দিলেন যে, 'কোনো জলচর প্রাণী হতে আপনার কোনো ভয় নেই। সব জলচর প্রাণী আপনার অধীন থাকবে।' অর্জুন ফিরে এসে ব্রাহ্মণদের সব ঘটনা জানালেন। তারপর তাঁরা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে গেলেন। অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্বত, ভৃগুতুঙ্গ ইত্যাদি পুণ্যতীর্থে স্নান করে ঋষিদের দর্শন করে বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁরা বহু গোধন দান করলেন এবং অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের তীর্থসমূহ দর্শন করলেন। যেসব ব্রাহ্মণরা অর্জুনের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা কলিঙ্গের সীমা থেকে ফিরে গেলেন।

অর্জুন মহেন্দ্র পর্বত হয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলতে চলতে মণিপুরে পৌঁছলেন। মণিপুরের রাজা চিত্রবাহন অত্যন্ত ধর্মাত্মা ব্যক্তি, তাঁর সুন্দরী কন্যার নাম চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন একদিন তাঁকে দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, ইনি এখানকার রাজকুমারী। তিনি রাজা চিত্রবাহনের কাছে গিয়ে বললেন, 'রাজন্! আমি কুলীন ক্ষত্রিয়। আপনি আপনার
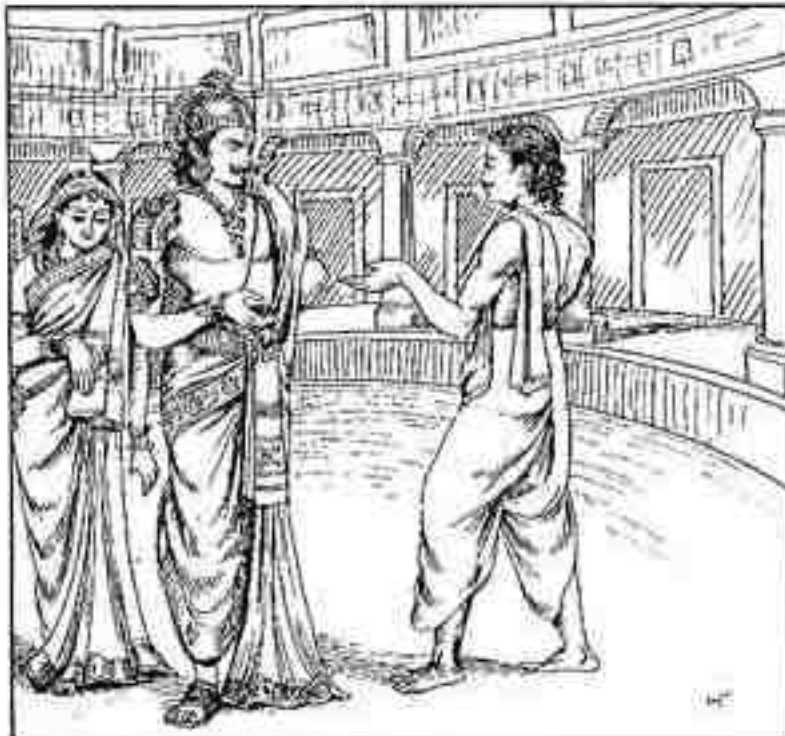
কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিন।' চিত্রবাহনের জিজ্ঞাসার উত্তরে অর্জুন বললেন—'আমি পাণ্ডুপুত্র অর্জুন।' চিত্রবাহন বললেন—'বীরবর, আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় ভীষণ তপস্যা করে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করেন। মহাদেব তাঁকে বর প্রদান করেন যে, আমাদের বংশে সকলেরই একটি করে সন্তান হবে। বীরবর ! তখন থেকে এই বংশে সেইরূপই হয়ে আসছে। আমার একটিই কন্যা, তাকে আমি পুত্র বলে মনে করি। এর আমি পুত্রিকাধর্ম অনুসারে বিবাহ দেব, যাতে এর পুত্র আমার দত্তকপুত্র হয়ে আমার বংশ প্রবর্তক হয়।' অর্জুন রাজার শর্ত মেনে নিলে শাস্ত্রসম্মতভাবে তাঁদের বিবাহ হল। পুত্রের জন্মের পর অর্জুন রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে আবার তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

অর্জুন সেখান থেকে রওনা হয়ে সমুদ্রতীর ধরে অগস্ত্য তীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ, পৌলমতীর্থ, কারন্ধতীর্থ এবং ভারদ্বাজতীর্থে গেলেন। সেই তীর্থের মুনি ঋষিরা সমুদ্রে স্নান করতেন না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, সেখানে বড় বড় কুমীর আছে, তারা ঋষিদের মেরে খেয়ে ফেলে। তপস্বীরা বাধাপ্রদান করলেও অর্জুন সৌভদ্রতীর্থে গিয়ে স্নান করলেন। যখন কুমীর তাঁর পায়ে কামড়াল, তখন তিনি তাকে ওপরে নিয়ে এলেন। কিন্তু তখনই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, সেই কুমীর তৎক্ষণাৎ এক সুন্দরী অপ্সরাতে পরিণত হল। অর্জুনের জিজ্ঞাসায় সে জানাল, 'আমি কুবেরের অপ্সরা, প্রেয়সীবর্গা। একবার আমি চার সখীর সঙ্গে কুবেরের কাছে যাচ্ছিলাম, পথে এক তপস্বীকে দেখে আমরা তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন করার চেষ্টা করেছিলাম। তপস্বীর চিত্তে কামের উদয় তো হয়ইনি, উপরন্তু তিনি আমাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যে 'তোমরা পাঁচজন কুমীর হয়ে একশত বছর জলে থাক।' দেবর্ষি নারদ জানতেন যে অর্জুন এখানে এসে আমাদের উদ্ধার করবেন, তাই আমরা এই তীর্থে কুমীর হয়ে বাস করছি। আপনি আমাকে উদ্ধার করেছেন, এবার আমার অন্য চার সখীকেও উদ্ধার করুন।' উলূপীর বরে অর্জুনের কোনো জলচর প্রাণী থেকে ভয় ছিল না, তিনি সকল অপ্সরাকে উদ্ধার করলেন এবং তাঁর চেষ্টায় সমস্ত তীর্থই ভয়শূন্য হয়ে গেল।

সেখান থেকে অর্জুন আর একবার মণিপুর গেলেন। চিত্রাঙ্গদার পুত্রের নাম বভ্রুবাহন রাখা হয়েছিল। অর্জুন

রাজা চিত্রবাহনকে তাঁর অঙ্গীকার অনুসারে পুত্র বভ্রুবাহনকে সমর্পণ করলেন। তিনি চিত্রাঙ্গদাকেও বভ্রুবাহনের দেখা শোনার জন্য সেখানে রেখে এলেন। অর্জুন রাজসূয় যজ্ঞে চিত্রাঙ্গদা এবং তাঁর পিতাকে ইন্দ্রপ্রস্থে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে এবার গোকর্ণ ক্ষেত্র তীর্থে গেলেন।

দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরতীরবর্তী তীর্থগুলি ভ্রমণ করে পশ্চিম সমুদ্রতীরের তীর্থগুলির উদ্দেশ্যে অর্জুন যাত্রা করলেন। তিনি যখন প্রভাসক্ষেত্রে পৌঁছলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রভাসে এলেন। নর ও নারায়ণের মিলনে আনন্দের জোয়ার এল, দুজন পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। কুশল-সংবাদ, তীর্থযাত্রা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। দুই বন্ধু কিছুদিন পর রৈবতক পর্বতে গিয়ে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুচরেরা আগে থেকেই সেখানে থাকা-খাওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রাজোচিত সম্মান জানালেন এবং নানাপ্রকার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত্রে শোবার সময় অর্জুন তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতেন।

সেখান থেকে দুই বন্ধু রথে করে দ্বারকা গেলেন। অর্জুনের সম্মানের জন্য দ্বারকাপুরী সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। যদুবংশীয়েরা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অর্জুনকে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। দ্বারকাপুরীতে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভবনেই থাকতেন এবং একত্র শয়ন করতেন।

—○—

সুভদ্রাহরণ এবং অভিমন্যু ও প্রতিবিন্ধ্য প্রমুখ কুমারদের জন্ম বৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! বৃষ্ণি, ভোজ এবং অন্ধক বংশের যাদবেরা একবার রৈবতক পর্বতের ওপর খুব বড় উৎসব করেছিল। সেই সময় ব্রাহ্মণদের বহু বস্ত্র ও সম্পত্তি দান করা হয়। যদুবংশীয় বালকেরা সুন্দর পোশাক পরে আনন্দে বেড়াচ্ছিল। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, নিশঠ, বিদুরথ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, হার্দিক্য, উদ্ধব, বলরাম এবং অন্যান্য যদুবংশীয়রা তাঁদের পত্নীসহ উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গান-বাজনা, নাচ-রঙ্গ-তামাশায় চারদিক মুখরিত ছিল। এই উৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন অত্যন্ত আনন্দে একসঙ্গে বিচরণ করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাও সেখানে ছিলেন। তাঁর রূপে মোহিত হয়ে অর্জুন অপলকে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় জেনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ক্ষত্রিয়দের মধ্যে স্বয়ংবরের রীতি আছে, কিন্তু সুভদ্রা তোমাকে বরণ করবে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই। কারণ সবার রুচি সমান নয়। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করার

রেওয়াজ আছে। তোমার পক্ষে এই পথই শ্রেষ্ঠ।' তারপর

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন পরামর্শ করে যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুমতি নেওয়ার জন্য দূত পাঠালেন। যুধিষ্ঠির সানন্দে তা অনুমোদন করলেন। দূত ফিরে এলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেইরূপই করতে বললেন।

সুভদ্রা একদিন রৈবতক পর্বতে পূজা করার পর পর্বত প্রদক্ষিণ করলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবাচন সম্পন্ন করলেন। সুভদ্রা যখন রথে করে দ্বারকার দিকে রওনা হবেন, সেই সময় অর্জুন বলপূর্বক তাঁকে নিজের সুবর্ণমণ্ডিত রথে

তুলে নিয়ে নিজ নগরীর দিকে রওনা হলেন। সেনারা সুভদ্রাহরণের দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে দ্বারকায় সুধর্মার সভায় গিয়ে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করল। সভাপাল যুদ্ধের ডংকা নিনাদের আদেশ দিলেন। সেই নিনাদে ভোজ, অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশের যাদবেরা নিজেদের কাজ-কর্ম ফেলে একত্রিত হতে লাগল। সভা ভরে গেল। সেনাদের কাছে সুভদ্রাহরণের বৃত্তান্ত শুনে যাদবদের মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল। তারা এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। কেউ রথ ঠিক করতে লাগল, কেউ বর্ম পরতে লাগল, কেউ ঘোড়াগুলোকে সবল করতে লাগল, যুদ্ধের সামগ্রী জোগাড় করা হতে লাগল। বলরাম বললেন, 'ওহে যদুবংশীয়গণ ! শ্রীকৃষ্ণের কথা না শুনে তোমরা এমন অবুঝের মতো কাজ কেন করছ ? এই মিথ্যা গর্জনের প্রয়োজন কিসের ?' তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন ! তোমার এই ভাবে নির্বাক থাকার কী অভিপ্রায় ? তোমার বন্ধু ভেবে অর্জুনকে আমরা এত আপ্যায়ন করলাম আর সে যে বাসনে খেল সেটাই কলঙ্কিত করল ? সে তো অভিজাত বংশের কৃতকর্মা পুরুষ, তার সঙ্গে আত্মীয়তা করায় আমাদের কোনোই আপত্তি ছিল না। তা সত্ত্বেও সে এমন কাজ করল যাতে আমরা অসম্মানিত এবং অপমানিত হয়েছি। তার এই কাজ আমাদের মাথায় পা রাখার সমান মনে হচ্ছে। আমি এটি সহ্য করতে পারছি না। আমি একাই কুরুবংশীয়দের পক্ষে যথেষ্ট। আমি অর্জুনের এই অপরাধ ক্ষমা করব না।' বলরামের এই বীরোচিত কথা সকলেই অনুমোদন করল।

সবার শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন

আমাদের বংশের অপমান নয়, সম্মান করেছেন। তিনি আমাদের বংশের মহত্ত্ব বুঝেই আমার ভগ্নীকে হরণ করেছেন। কেননা স্বয়ংবরের মাধ্যমে ওকে পাওয়া নিশ্চিত ছিল না। তাঁর কাজ ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুকূল এবং আমাদের যোগ্যও বটে। সুভদ্রা এবং অর্জুনের বিবাহ খুবই উপযুক্ত হবে। মহাত্মা ভরতের বংশধরের সঙ্গে কুন্তিভোজের দৌহিত্রের কন্যার সম্পর্ক কার অপছন্দ হবে ? অর্জুনকে জয় করাও ভগবান মহাদেব ছাড়া আর কারও পক্ষে অসম্ভব। এই সময় ওই বীর যুবক যোদ্ধার কাছে আমার রথ এবং ঘোড়া রয়েছে। আমার মনে হয় এখন ওর সঙ্গে যুদ্ধ না করে বন্ধুভাবে তার হাতে কন্যা সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ। যদি অর্জুন একাই তোমাদের পরাজিত করে সুভদ্রাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে যায় তাহলে যদুবংশের খুবই অসম্মান হবে। আর যদি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হয় তাহলে আমাদেরও যশবৃদ্ধি হবে।' সকলেই শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি মেনে নিলেন। অর্জুনকে সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে আনা হল। দ্বারকাতে

সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ সুসম্পন্ন হল। বিবাহের পর তাঁরা এক বছর দ্বারকায় কাটালেন, কিছু সময় পুষ্করে গিয়েও থাকলেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হলে অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

অর্জুন শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। দ্রৌপদী সপ্রেম অনুযোগ জানালেন এবং তাঁরাও দ্রৌপদীকে প্রসন্ন করলেন। সুভদ্রা লাল রংয়ের রেশমী শাড়ি পরে রানিমহলে গিয়ে কুন্তীর চরণ

স্পর্শ করলেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী পুত্রবধূকে দেখে কুন্তী তাঁকে আনন্দচিত্তে আশীর্বাদ করলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর চরণ স্পর্শ করে বললেন, 'ভগ্নী ! আমি তোমার দাসী।' দ্রৌপদী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অর্জুন ফিরে আসতে মহলে এবং নগরে আনন্দের হিল্লোল উঠল। দ্বারকায় যখন এই সংবাদ পৌঁছাল যে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছে গেছেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, বহু অভিজাত যদুবংশী, তাঁদের পুত্র-পৌত্র এবং বহু সেনা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থের জন্য রওনা হলেন। তাঁদের শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেবকে অভ্যর্থনা করতে পাঠালেন। সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ফুল-পতাকা দিয়ে সাজানো হল। রাস্তা চন্দন ও ধূপের গন্ধে ভরিয়ে দেওয়া হল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাজভবনে পৌঁছে সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আশীর্বাদ জানালেন। সকলের কুশল সংবাদ বিনিময় হল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রার বিবাহ উপলক্ষে অনেক উপহারসামগ্রী দিলেন। কিঙ্কিনী জালমণ্ডিত চার ঘোড়া যুক্ত সারথিসহ সুবর্ণখচিত এক সহস্র রথ, মথুরার দুগ্ধবতী দশ হাজার গাভী, একহাজার স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত শ্বেতবর্ণের ঘোড়া, এক হাজার উত্তম খচ্চর, সর্বপ্রকার কর্মে নিপুণা এক সহস্র দাসী এবং বহুমূল্য কাপড়, কম্বল, দশভার সোনা এবং এক সহস্র হাতি প্রদান করলেন। এর ফলে পাণ্ডবদের সম্পদ আরও বাড়ল। সকলে রাজভবনে থেকে আমোদ-আহ্লাদ করতে লাগল। পাণ্ডবদের আনন্দের সীমা রইল না। যদুবংশীয়গণ কিছুদিন সেই আনন্দ উপভোগ করে দ্বারকাতে ফিরে গেলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য অর্জুনের কাছে ইন্দ্রপ্রস্থেই থেকে গেলেন। কিছুদিন পরে সুভদ্রার গর্ভে এক পুত্র জন্মাল, তার নাম রাখা হল অভিমন্যু। তাঁর জন্মের আনন্দে যুধিষ্ঠির দশ হাজার গাভী, বহু সোনা এবং ধন-রত্ন দান করেন। অভিমন্যু পাণ্ডবদের, শ্রীকৃষ্ণের এবং পুরবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জাত কর্ম সংস্কার করেন। বেদাধ্যয়নের পর তিনি পিতা অর্জুনের কাছেই ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন। অভিমন্যুর অস্ত্র-কৌশল দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হতেন। তিনি অনেক গুণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য ছিলেন।

দ্রৌপদীর গর্ভেও পাঁচ পাণ্ডবের ঔরসে এক এক বছর পরে পরে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণরা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ ! আপনার পুত্র শত্রুদের প্রহার সহ্য করায় বিন্ধ্যাচলের সমান হবেন, তাই তার নাম 'প্রতিবিন্ধ্য'। ভীমসেন এক সহস্র সোমযাগ করে পুত্রলাভ করেন, তাই তাঁর ছেলের নাম রাখা হল 'সুতসোম'। অর্জুন অনেক প্রসিদ্ধ কাজ করে ফিরে আসার পর তাঁর পুত্র হয়, তাই তাঁর নাম 'শ্রুতকর্মা'। কুরুবংশে আগে শতানীক নামে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। নকুল তাঁর পুত্রের সেই নামই রাখতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর নাম হল 'শতানীক'। সহদেবের পুত্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম নেন, তাই তাঁর নাম 'শ্রুতসেন'। পাণ্ডবদের পুরোহিত ধৌম্য এই বালকদের জাত-সংস্কার সুসম্পন্ন করলেন। বালকেরা বেদপাঠ সমাপ্ত করে অর্জুনের কাছ থেকে দিব্য এবং লৌকিক অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। পাণ্ডবরা বালকদের এই কাজে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।'

———o———

খাণ্ডব-দহনের কথা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! জীব যেমন শুভ লক্ষণ সমূহ এবং পবিত্র কর্মেযুক্ত মানব শরীর লাভ করে সুখে বসবাস করে এবং নিজের উন্নতি করে, তেমনই প্রজারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজারূপে লাভ করে সুখ এবং শান্তির সঙ্গে উন্নতি করতে থাকেন। তাঁর রাজত্বকালে সামন্ত রাজাদের রাজলক্ষ্মী অবিচলভাবে বিরাজ করতেন। প্রজাবৃদ্ধি অন্তর্মুখী হয়েছিল, ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। পূর্ণিমার সুন্দর চন্দ্র দেখে যেমন লোকের চক্ষু ও মন শীতল হয়, যুধিষ্ঠিরকে দেখে সমস্ত প্রজাকুল তেমনই আনন্দিত হত। যুধিষ্ঠিরকে শুধু রাজা বলেই নয়, তিনি প্রজাদের মনের অনুকূল সব কাজ করতেন বলেই প্রজারা তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত। ধর্মরাজ কখনো অনুচিত, অসত্য এবং অপ্রিয় বাক্য বলতেন না। তিনি যেমন নিজের ভালো চাইতেন, তেমনই প্রজাদেরও। সব পাণ্ডবরাই এইভাবে তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত রাজাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে নিজেরাও আনন্দে থাকতেন।

একদিন অর্জুনের ইচ্ছায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে যমুনার পবিত্র তীরে জলবিহার করতে গেলেন। যমুনাতীর সমস্ত পুণ্যার্থীর জন্য সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। সেই সুসমৃদ্ধ বন্য প্রদেশ এবং তার বিশ্রামভবন বীণা, মৃদঙ্গ ও বাঁশীর সুমধুর ধ্বনিতে ধ্বনিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেখানে উৎসব পালন করলেন। তাঁরা দুজনে পাশাপাশি বসে ছিলেন, সেইসময় এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হলেন, তাঁর শরীর যেন দগ্ধ সোনা। মাথায় পিঙ্গলবর্ণ জটা, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ এবং পরনে বল্কল।
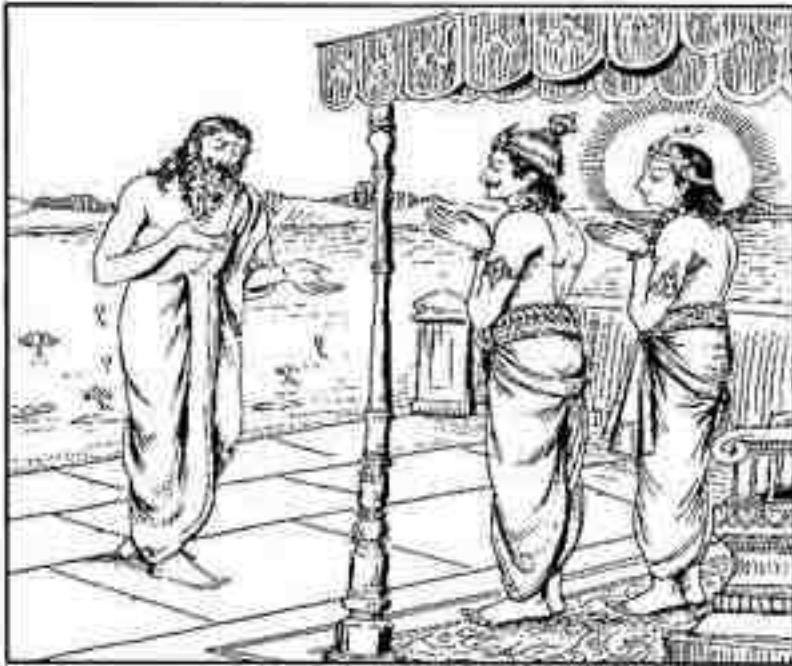
সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ বললেন—'আপনারা দুজনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর এবং মহাপুরুষ। আমি এক বহুভোজী ব্রাহ্মণ। খাণ্ডব বনের কাছে উপবিষ্ট আপনাদের নিকট আমি খাবার চাইতে এসেছি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী প্রকার খাদ্যে আপনার তৃপ্তি হবে ? আদেশ করুন, আমরা তার আয়োজন করছি।' ব্রাহ্মণ বললেন—'আমি অগ্নি, সাধারণ খাদ্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমার জন্য আপনারা সেই খাদ্যের ব্যবস্থা করুন, যা আমার যোগ্য। আমি খাণ্ডববনকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই। কিন্তু এই বনে সপরিবারে তক্ষক নাগ তাঁর মিত্রদের সঙ্গে বাস করেন, তাই ইন্দ্র সর্বদা এই বনকে তৎপরতার সঙ্গে রক্ষা করেন। যখনই আমি এই বনটিকে পোড়াবার চেষ্টা করি, তখনই ইন্দ্র জলধারায় তা নিভিয়ে দেন আর আমার খাওয়া অপূর্ণ থেকে যায়। আপনারা দুজনে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, আপনাদের সাহায্য পেলে আমি একে পোড়াতে পারি। আমি আপনাদের কাছে এই খাদ্যই চাইছি।'

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! বহু প্রাণী অধ্যুষিত এবং ইন্দ্র দ্বারা সুরক্ষিত খাণ্ডব বনকে অগ্নিদেব কেন পোড়াতে চাইলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এ বহু পুরানো দিনের কথা, শ্বেতকি নামে এক মহা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। সেইসময় তাঁর মতো যজ্ঞপ্রেমিক, দাতা এবং বুদ্ধিমান রাজা আর কেউ ছিল না। তিনি বড় বড় যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞ করতে করতে ঋত্বিকগণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন, ক্লান্ত হতেন আবার কখনো যজ্ঞ করতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু রাজার যজ্ঞ চলতেই থাকত। তিনি অনুনয় বিনয় করে এবং দান-দক্ষিণা দিয়ে ব্রাহ্মণদের প্রসন্ন রাখতেন। শেষে সমস্ত ব্রাহ্মণই যখন যজ্ঞ করতে করতে হার মেনে গেলেন, তখন রাজা ভগবান শংকরকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে তাঁর নির্দেশে দুর্বাসা ঋষিকে দিয়ে মহাযজ্ঞ করালেন। প্রথমে দ্বাদশ বৎসর এবং পরে একশত বৎসরের মহাযজ্ঞে দক্ষিণা দান করে রাজা ব্রাহ্মণদের তৃপ্ত করেছিলেন। দুর্বাসা প্রসন্ন হলেন। রাজা শ্বেতকি সপরিবারে ঋত্বিকদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করলেন। সেই যজ্ঞে দ্বাদশ বৎসর ধরে অগ্নিদেবকে ঘৃতের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে পান করতে হয়েছিল ; তাতে তাঁর

হজমশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, রং হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং দীপ্তি কমে এসেছিল। অজীর্ণতার জন্য যখন তাঁর শরীর খারাপ হয়েছিল, তখন তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন যে 'আপনি এমন কোনো উপায় বলুন যাতে আমি আগের মতো সুস্থ সবল হয়ে উঠি।' ব্রহ্মা বললেন—'অগ্নিদেব ! যদি তুমি খাণ্ডববন পোড়াতে পার, তাহলে তোমার অজীর্ণভাব দূর হবে এবং গ্লানিও কেটে যাবে।' সেখান থেকে এসে তিনি সাতবার খাণ্ডববন পোড়াবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইন্দ্র রক্ষা করায় তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। অগ্নি হতাশ হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলে উনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন পোড়াবার উপায় জানিয়ে দেন। তাই অগ্নিদেব যমুনা তীরে এসে ওঁদের পূর্বোক্ত কথা জানালেন।

ব্রাহ্মণবেশধারী অগ্নিদেবের প্রার্থনা শুনে অর্জুন বললেন—'অগ্নিদেব ! আমার কাছে দিব্যাস্ত্রের অভাব নেই, তার সাহায্যে আমি ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি। কিন্তু আমার কাছে সেরকম ধনুক নেই এবং সেই অস্ত্রের উপযুক্ত তত বাণও নেই। বাণের বোঝা বইবার মতো সেরকম রথও নেই। এইসময় শ্রীকৃষ্ণের কাছেও এমন কোনো অস্ত্র নেই যার দ্বারা ইনি যুদ্ধে নাগেদের এবং পিশাচদের বধ করতে পারেন। খাণ্ডব বন পোড়াবার সময় ইন্দ্রকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা আছে। বল এবং কৌশল আমাদের আছে, যুদ্ধ সামগ্রী আপনি দিন।' অর্জুনের সময়োপযোগী কথা শুনে অগ্নিদেব জলের দেবতা বরুণকে স্মরণ করলেন। বরুণ তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হলেন। অগ্নি বললেন—'আপনাকে রাজা সোম অক্ষয় তূণীর, গাণ্ডীব ধনুক এবং বানর চিহ্নযুক্ত ধ্বজা মণ্ডিত দিব্য রথ দিয়েছেন, সেগুলি আপনি আমাকে দিন, তার সঙ্গে চক্রও দিন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন চক্র এবং গাণ্ডীব ধনুকের সাহায্যে আমার এক বড় কাজ সম্পন্ন করবেন।' বরুণ অগ্নিদেবের অনুরোধ মেনে নিয়ে অর্জুনকে অক্ষয় তূণীর এবং গাণ্ডীব ধনুক দিলেন, এই ধনুকের অদ্ভুত মহিমা। কোনো শস্ত্রের সাহায্যেও একে খণ্ডিত করা যায় না, কিন্তু সকল শস্ত্রকেই এটি খণ্ডিত করতে সক্ষম। এর দ্বারা যোদ্ধার যশ-কান্তি-বল বৃদ্ধি পায়। এটি একাই লাখো ধনুকের সমান, ক্ষতরহিত এবং ত্রিলোকে পূজিত ও প্রশংসিত। তিনি সমস্ত সামগ্রী সমন্বিত, সবার অজেয়, সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং রত্নজড়িত এক দিব্য রথও প্রদান করলেন। সেই রথটি মন ও বায়ুর ন্যায় বেগযুক্ত, গন্ধর্ব দেশের শ্বেত অশ্বযুক্ত ছিল। রথের ওপর সুবর্ণ দণ্ডে মহাবীর বানরের চিহ্নঅঙ্কিত ধ্বজা উড়ছিল। এইসব পেয়ে অর্জুনের আনন্দের সীমা রইল না। অর্জুন যখন সেই রথে উঠে ধনুক তুলে তাতে ছিলা পরালেন, তখন তার গম্ভীর আওয়াজ শুনে লোকের হৃদয় কেঁপে উঠল। অর্জুন বুঝতে পারলেন যে, এবার তিনি অগ্নিদেবকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতে পারবেন। অগ্নিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দিব্য চক্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বললেন—'মধুসূদন ! এই চক্রের দ্বারা আপনি যাকে চাইবেন, তাকেই মারতে পারবেন। এই চক্রের সামনে দেবতা, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ ও মানুষের শক্তিও তুচ্ছ। এই চক্রটি প্রতিবার প্রয়োগের পর শত্রুনাশ করে ফিরে আসবে।' বরুণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দৈত্যনাশিনী এবং বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ দ্বারা শত্রুর হৃদয় কম্পমান করার মতো কৌমোদ গদা অর্পণ করলেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন অগ্নিদেবকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন এবং খাণ্ডববন দহন করতে বললেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সম্মতি লাভ করে অগ্নিদেব তেজোময় দাবানলের প্রদীপ্তরূপ ধারণ করে তাঁর

সপ্ত অগ্নিশিখার লেলিহান রূপে খাণ্ডব বন ঘিরে প্রলয়দৃশ্য উপস্থিত করে ভস্মসাৎ করতে আরম্ভ করলেন। সেই বনের শত-সহস্র প্রাণী চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। বহু প্রাণীর অঙ্গ ভস্মীভূত হতে লাগল। কেউ আগুনে পুড়ে গেল, কতজনের চোখ অন্ধ হয়ে গেল, অনেকের শরীরে ফোস্কা পড়ল। বহু প্রাণী আপনজনের

সঙ্গে সেখানেই পুড়ে মরল। খাণ্ডব বনের আগুন এত জোরে জ্বলতে লাগল যে তার উচ্চ শিখাগুলি আকাশ ছুঁতে লাগল। দেবতাদের হৃদয়ও তাই দেখে কেঁপে উঠল। আগুনের তাপে আতঙ্কিত হয়ে সমস্ত দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন—'দেবেন্দ্র ! এই আগুন কি সমস্ত প্রাণীকেই সংহার করবে ? প্রলয়ের সময় কি এসে গেল ?' দেবতাদের ভীত দেখে এবং তাঁদের প্রার্থনায় প্রভাবিত হয়ে এবং অগ্নির এই ভয়ংকর কার্য দেখে

স্বয়ং ইন্দ্র খাণ্ডব বনকে বাঁচাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইন্দ্রের আদেশে দলে দলে মেঘ খাণ্ডব বনের ওপর জড়ো হল এবং গুড়গুড় আওয়াজ তুলে বড় বড় ফোঁটায় বর্ষণ শুরু করল। অর্জুন অস্ত্রকৌশলে বাণের দ্বারা জলধারা বন্ধ করে দিলেন। সমস্ত বন বাণ দিয়ে এমনভাবে ঘিরে রাখলেন যাতে কোনো প্রাণীই বাইরে যেতে না পারে। সেই সময় নাগরাজ তক্ষক সেখানে ছিলেন না, কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র অশ্বসেন ওখানেই ছিলেন, বাঁচার বহু চেষ্টা করেও অর্জুনের বাণের পরিধি থেকে বার হতে পারেননি। অশ্বসেনের মাতা তাকে গলাধঃকরণ করে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। তিনি মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে লেজ পর্যন্ত গিলেছিলেন, কিন্তু অগ্নির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্য পথেই পালাতে শুরু করেন। অর্জুন তাঁকে বাণ দিয়ে বিদ্ধ করেন। ইন্দ্র অর্জুনের কাজ লক্ষ্য করছিলেন। তিনি অশ্বসেনকে বাঁচাবার জন্য এত জোরে ঝড় তুললেন এবং বৃষ্টির তেজ বাড়িয়ে দিলেন যে অর্জুনও ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অশ্বসেন সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। ইন্দ্রের এইরূপ বোকা বানানোর চেষ্টায় অর্জুন ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আকাশ ঢেকে ইন্দ্রকে কোণঠাসা করে দিলেন। ইন্দ্রও তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের বর্ষণে উত্তর দিতে লাগলেন। প্রচণ্ড হাওয়া ভয়ংকর গর্জন করে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বাজের কড়কড়াৎ ধ্বনিতে সকলের হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল। অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ইন্দ্রের বজ্র তার কাছে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, জলধারা শুকিয়ে গেল, বিদ্যুৎ চমক লুকিয়ে পড়ল, অন্ধকার কেটে গেল। অর্জুনের এই অস্ত্র-কৌশল দেখে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সর্প কোলাহল করতে করতে সামনে চলে এল। তারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর নানাপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ চক্র এবং অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সকলের সেনাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

এইসব দেখেশুনে ইন্দ্রের ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি শ্বেতবর্ণ ঐরাবতের পিঠে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কাছে এলেন এবং তড়িৎ গতিতে তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করলেন, দেবতারা উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'এখনই এরা দুজন মরে যাবে।' সকল দেবতা নিজ নিজ অস্ত্র নিলেন, যমরাজ কালদণ্ড, কুবের গদা, বরুণ পাশ এবং বিচিত্র বজ্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও এদিকে ধনুক নিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়ালেন। এই দুই সখার সামনে ইন্দ্রাদি দেবতাদের কোনো অস্ত্রই কার্যক্ষম হল না। মন্দার পর্বতের একটি শিখর তুলে অর্জুনকে মারতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পর্বতের শিখর পড়ার আগেই অর্জুন বাণের আঘাতে তাকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। সেই পাথরের টুকরোতে খাণ্ডব বনের দানব, রাক্ষস, নাগ, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সিংহ, মৃগ, মহিষ এবং অন্যান্য বন্য পশু ও পক্ষী ক্ষত-বিক্ষত হল এবং ভয়ে পালাতে লাগল। একদিকে আগুন সকলকে পোড়াতে আসছে অন্য দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বাণবর্ষণ। কেউই পালাতে পারল না। শ্রীকৃষ্ণের চক্র এবং অর্জুনের বাণে টুকরো টুকরো হয়ে জীব-জন্তু অগ্নিতে ভস্ম হতে থাকল। দেবতা এবং দানব সকলেই তাঁদের পৌরুষ দেখে হতবাক হয়ে রইল।

সেইসময় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ইন্দ্রকে সম্বোধন করে এক আকাশবাণী শোনা গেল—'ইন্দ্র ! তোমার মিত্র তক্ষক কুরুক্ষেত্রে যাওয়ায় এই ভয়ংকর আগুনে দগ্ধ হয়নি, সে প্রাণে বেঁচে গেছে। তুমি অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে কোনোভাবেই হারাতে পারবে না। তোমার বোঝা উচিত যে এঁরা চিরপরিচিত নর-নারায়ণ, এঁদের শক্তি ও পরাক্রম

অসীম। এঁরা সকলের অজেয় এবং দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ এবং সর্প সকলের কাছেই পূজনীয়। তুমি দেবতাদের নিয়ে এখান থেকে প্রস্থান করো, এতে তোমার সম্মান রক্ষা পাবে। খাণ্ডব বন দহন বিধির-বিধান।' দৈববাণী শুনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন, দেবতারাও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

দেবতাদের রণভূমি থেকে চলে যেতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন হর্ষধ্বনি করলেন। তীব্র আগুনে অনাথের ন্যায় খাণ্ডববন পুড়তে লাগল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন ময়দানব তক্ষকের নিবাসস্থল থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং মূর্তিমান হয়ে অগ্নি তাকে পুড়িয়ে মারবার জন্য তাকে অনুসরণ করছেন, তিনি ময়দানবকে মারার জন্য চক্র তুললেন। সামনে চক্র এবং পিছনে লেলিহান অগ্নিকে দেখে ময়দানব প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল, তারপর কিছু চিন্তা করে চিৎকার করে বলল—'বীর অর্জুন ! আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম।' অর্জুন বললেন—'ভয়

পেয়ো না।' অর্জুন অভয়দান করাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্র ফিরিয়ে নিলেন এবং অগ্নিও তাকে ভস্ম করলেন না। ময়দানব রক্ষা পেয়ে গেলেন। খাণ্ডব বন পনেরো দিন ধরে জ্বলতে লাগল। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি প্রাণীই মাত্র বেঁচে গিয়েছিল—অশ্বসেন সর্প, ময়দানব এবং চার শার্ঙ্গ পক্ষী। শার্ঙ্গ পক্ষীদের পিতা মন্দপাল এবং সেই পক্ষীদের সবথেকে বড় পক্ষী জরিতারি অগ্নিদেবের স্তুতি করে নিজেদের প্রাণরক্ষার কথা আদায় করেছিল।

অগ্নিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সাহায্যে প্রজ্বলিত হয়ে খাণ্ডব বনকে দহন করতে সক্ষম হলেন ; তারপর ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও সেই সময় অন্য দেবতাদের সঙ্গে সেখানে এলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বললেন—'আপনারা এমন এক কঠিন কাজ করেছেন, যা দেবতাদের পক্ষেও করা অসাধ্য ছিল। আমি আপনাদের ওপর অত্যন্ত খুশি হয়েছি। অতএব মানুষের কাছে যা অত্যন্ত দুর্লভ, আপনারা সেই বস্তু আমার কাছে প্রার্থনা করুন।' অর্জুন বললেন—'আপনি আমাকে সর্বপ্রকারের অস্ত্র প্রদান

করুন।' ইন্দ্র বললেন—'অর্জুন, দেবাদিদেব মহাদেব যখন তোমার ওপর প্রসন্ন হবেন, তখন তোমার তপস্যার প্রভাবে আমি তোমাকে আমার সমস্ত অস্ত্র দিয়ে দেব। সেই সময় কখন আসবে, আমি জানি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'দেবরাজ ! আপনি আমাকে এই বর দিন যাতে অর্জুন ও আমার বন্ধুত্ব অটুট থাকে, কখনো যেন বিচ্ছেদ না হয়।' ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে বললেন—'এবমস্তু' (বেশ তাই হবে)। দেবতারা চলে গেলে অগ্নিদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং ময়দানব যমুনার পবিত্র তীরে এসে উপবিষ্ট হলেন।

আদিপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

সভাপর্ব

ময়াসুরের প্রার্থনা স্বীকার এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ময়াসুর তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপবিষ্ট অর্জুনের বারংবার প্রশংসা করতে লাগলেন এবং হাতজোড় করে মধুর স্বরে বললেন—'বীরবর অর্জুন ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা আমাকে বধ করতে চাইছিলেন আর অগ্নিদেব আমাকে দগ্ধ করতে চাইছিলেন। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। কৃপা করে বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?' অর্জুন বললেন—'অসুর শ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার সেবা করতে স্বীকার করায় অত্যন্ত উপকার করলে। তোমার কল্যাণ হোক। আমরা তোমার ওপর খুশি হয়েছি, তুমিও আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাক। এখন তুমি যেতে পার।' ময়াসুর বলল, 'কুন্তীনন্দন ! আপনার কথা আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই অনুরূপ। কিন্তু আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে আপনার কিছু সেবা করতে চাই। আমি দানবদের 'বিশ্বকর্মা', প্রধান শিল্পী ; আপনি আমার সেবা স্বীকার করুন।' অর্জুন বললেন—'ময়াসুর ! আমি তোমাকে প্রাণ সংকট থেকে রক্ষা করেছি, এই অবস্থায় আমি তোমার কোনো সেবা গ্রহণ করতে পারি না। তুমি বরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিছু সেবা করে দাও, তাতেই আমার সেবা করা হবে।'

ময়াসুর যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি খানিকক্ষণ এটি নিয়ে চিন্তা করলেন যে, ময়াসুরের কাছ থেকে কী সেবা নেওয়া যায়। তিনি মনে মনে স্থির করে ময়াসুরকে বললেন—'ময়াসুর ! তুমি শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি যদি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কোনো প্রিয় কাজ করতে চাও, তাহলে তোমার মন মতো তাঁর জন্য একটি সভাগৃহ তৈরি করে দাও। সেই সভাগৃহ কৌশলে তৈরি করো যাতে কোনো চতুর শিল্পীও তার অনুকরণ করতে না পারে। তাতে দেবতা, মানুষ এবং অসুরদের সমস্ত কলা কৌশল প্রকটিত হওয়া চাই।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

আদেশ শুনে ময়াসুর অত্যন্ত আনন্দিত হল। সে

সেইরূপই এক সভাগৃহ তৈরি করবে স্থির করল।

তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জানালেন এবং ময়াসুরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। যুধিষ্ঠির তার যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন। ময়াসুর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দৈত্যদের অদ্ভুত সব চরিত্র কথা শোনালেন। কিছুদিন সেখানে থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের পরামর্শ অনুযায়ী সভা তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং শুভ মুহূর্ত দেখে মঙ্গল-অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং দানাদি কার্য সম্পন্ন করে সর্বগুণসম্পন্ন এবং দিব্য সভা নির্মাণ করার জন্য দশ হাজার হাত প্রশস্ত জমি মেপে নিলেন।

জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতপক্ষে পরম পূজনীয়। পাণ্ডবরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদর আপ্যায়ন করলেন, তিনিও কিছুদিন আনন্দে সেখানে থাকলেন। তারপর তিনি পিতা মাতাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে দ্বারকা যাওয়ার জন্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিলেন। বিশ্ববন্দনীয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমা কুন্তীর চরণধূলি মাথায় নিলেন, কুন্তী তাঁকে আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রার কাছে গেলেন। সেইসময় দুজনেরই চক্ষু ছিল অশ্রুসজল। ভগবান তাঁর মধুরভাষিণী সৌভাগ্যবতী বোন সুভদ্রাকে অল্প কথায় যুক্তিযুক্ত এবং অকাট্য বাক্যে তাঁর দ্বারকা যাওয়ার প্রয়োজনের কথা জানালেন। সুভদ্রাও মাতা-পিতার কাছে জানাবার জন্য নানা বিষয়ে বললেন এবং দাদাকে সম্মান জানিয়ে প্রণাম করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নীকে প্রসন্ন করে যাবার অনুমতি আদায় করলেন এবং পুরোহিত ধৌম্যের কাছে গেলেন। পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত ধৌম্যকে নমস্কার করে দ্রৌপদীকে ভরসা দিলেন এবং তারপরে পাণ্ডবদের কাছে এলেন। ভাইদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শোভা এমনই দেখাচ্ছিল যেন দেবতাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। স্নানাদি সমাপন করে বসন-ভূষণ পরিধান করলেন। পুষ্পমালা, গন্ধদ্রব্যে সজ্জিত হয়ে দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। সব কাজ সমাপন করে তিনি বহির্দ্বারে এলেন। ব্রাহ্মণরা স্বস্তিবাচন করলেন। তিনি দধি, আতপ চাল, ফল, পাত্র এবং দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁদের পূজা করলেন, প্রদক্ষিণ করে স্বর্ণ নির্মিত রথে চড়ে রওনা হলেন। সেই অতি দ্রুতগামী রথ গরুড় চিহ্নে চিহ্নিত ধ্বজা, গদা, চক্র, তলোয়ার, শার্ঙ্গধনুক ইত্যাদি আয়ুধ দ্বারা সজ্জিত এবং শৈব্য, সুগ্রীব ইত্যাদি ঘোড়ায় সঞ্চালিত। তাঁর প্রস্থানের সময় তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি সবই মঙ্গলময় ছিল। রওনা হওয়ার আগে যুধিষ্ঠির প্রেমভরে রথে উঠে বসলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুককে সরিয়ে স্বয়ং ঘোড়ার রাস হাতে নিলেন। অর্জুনও আনন্দে সেই রথে লম্ফ দিয়ে উঠলেন এবং শ্বেত চামর হাতে নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ঋত্বিজ

এবং পুরবাসীরা রথের পেছন পেছন চলতে লাগলেন। সেই সময় নিজ ভাইদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যেন গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যাত্রা করেছেন। ভগবানের বিচ্ছেদ ব্যথায় অর্জুন অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। ভগবান তাঁকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত কষ্টে যাওয়ার অনুমতি আদায় করলেন। যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনকে সম্মান জানালেন, তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। নকুল, সহদেব তাঁকে প্রণাম করলেন। রথ ততক্ষণ দুক্রোশ রাস্তা পার হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ফিরে যেতে রাজি করলেন এবং তাঁর চরণে প্রণাম জানালেন, যুধিষ্ঠির তাঁকে আশীর্বাদ করে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার আসার প্রতিজ্ঞা করে অনুচরদের সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে পাঠিয়ে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। যতক্ষণ রথ দেখা গেল, পাণ্ডবরা একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। রথ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে তাঁদের প্রেমপূর্ণ মন হতাশায় ভরে গেল। জীবন সর্বস্ব
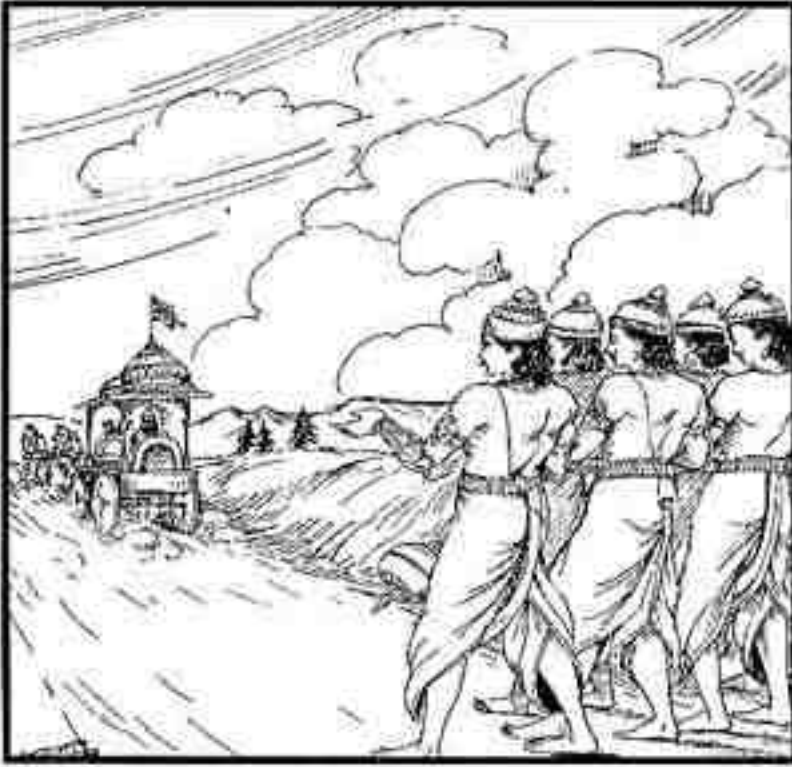
শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। পাণ্ডবদের কোনো স্বার্থ ছিল না, তবুও তাঁদের অন্তরের টান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলে তাঁরা নীরবে নগরীতে ফিরে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী রথ দ্বারকার দিকে এগিয়ে চলল। তাঁর সঙ্গে সারথি দারুক ছাড়াও বীর সাত্যকিও ছিলেন। কিছু সময় পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত মনে দ্বারকাতে পৌঁছলেন। উগ্রসেন প্রমুখ যদুবংশীয়গণ নগরীর বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেন, মাতা, পিতা, দাদা বলরামকে প্রণাম করে পুত্র প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ প্রমুখকে আলিঙ্গন করে গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে রুক্মিণী মহলে প্রবেশ করলেন।

—o—

দিব্য সভা নির্মাণ এবং দেবর্ষি নারদের প্রশ্নরূপে প্রবচন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করার পর ময়াসুর অর্জুনকে বললেন—'হে মহাবাহু ! আমি এখন আপনার অনুমতি নিয়ে মৈনাক পর্বতে যেতে চাই। সেখানে বিন্দুসরের কাছে দৈত্যরা এক যজ্ঞ করেছিলেন। সেই স্থানে আমি একটি মণিময় পাত্র তৈরি করেছিলাম, সেটি দৈত্যরাজ বৃষপর্বার সভায় রাখা হয়েছিল। যদি সেটি এখনও সেখানে থেকে থাকে, তাহলে সেটি নিয়ে আমি শীঘ্রই এখানে ফিরে আসব। সেখানে এক অদ্ভুত রত্ন-মণ্ডিত, সুখদ, মজবুত গদাও আছে, তা স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত। বৃষপর্বা শত্রুদের সংহার করে অন্য গদার আঘাত সহনকারী সেই ভারী গদা ওখানেই রেখে দিয়েছেন। সর্বপ্রকার গদার মধ্যে এই গদা অতুলনীয়। আপনার গাণ্ডীব ধনুকের মতোই এটি ভীমের জন্য যোগ্য গদা। দেবদত্ত নামে একটি শঙ্খও সেখানে আছে, আমি সেটি এনে আপনাকে অর্পণ করব।' এই বলে ময়াসুর ঈশান কোণের দিকে যাত্রা করে পূর্বোক্ত বিন্দুসরে পৌঁছলেন। রাজা ভগীরথ গঙ্গা অবতরণের জন্য ওইখানেই তপস্যা করেছিলেন এবং প্রজাপতি ওই স্থানেই একশত যজ্ঞ করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ওইখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ওইস্থানে সহস্র সহস্র প্রাণী ভগবান শংকরের উপাসনা করে থাকেন ; ওই একই স্থানে নর-নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম, শিব সহস্র চতুর্যুগ ধরে যজ্ঞ করেন এবং স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সারা বছর যজ্ঞ করে ওইখানেই সুবর্ণমণ্ডিত যজ্ঞস্তম্ভ ও বেদি দান করেছেন।

জনমেজয় ! ময়াসুর সেখানে গিয়ে সভা-তৈরি করার সমস্ত জিনিসপত্র, পূর্বোক্ত গদা, দেবদত্ত শঙ্খ এবং অপরিমিত ধন অধিকার করে যুধিষ্ঠিরের জন্য বিশ্ববিশ্রুত মণিময় দিব্য সভা নির্মাণ করেন। তিনি সেই শ্রেষ্ঠ গদা ভীমসেনকে এবং দেবদত্ত শঙ্খ অর্জুনকে সমর্পণ করেন। সেই শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনিতে ত্রিলোকে আলোড়ন উঠত। সেই সভাগৃহ দশ হাজার হাত দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল। তাতে সুন্দর বৃক্ষ সমূহের সবুজ পাতার ছায়ায় মনে হত যেন সূর্য, চন্দ্র অথবা অগ্নির সভা বসেছে। সেই অলৌকিক দৃশ্য শোভার সামনে সূর্যের দীপ্তিও ম্লান হয়ে যায়। ময়াসুরের নির্দেশে আট হাজার কিঙ্কর রাক্ষস সেই দিব্য সভা দেখা-শোনা করত। প্রয়োজন হলে সেটি অন্য স্থানেও নিয়ে যাওয়া যেত। সেই সভা ভবনে এক দিব্য সরোবরও ছিল।

সেটি নানাপ্রকার মণি-মাণিক্যযুক্ত সিঁড়িতে শোভিত, জলরাশি পদ্মপুষ্পে শোভিত এবং মলয় পবনে তরঙ্গায়িত। বহু দিকপাল রাজাগণও সেই জলকে স্থল মনে করে হতবুদ্ধি হয়ে যেত। তার চারদিকে গগনচুম্বী বৃক্ষরা পান্না-সবুজ পাতায় ছাওয়া ছিল। সভার চারদিকে সুগন্ধি পুষ্পবিতান বিদ্যমান ছিল। পাশে ছোট ছোট কুণ্ড ছিল, তাতে হংস, সারসরা খেলা করত। জল-স্থলের পুষ্পের সুগন্ধে লোকে মুগ্ধ হত। মাত্র চোদ্দমাসে ময়াসুর এই দিব্য সভাগৃহ নির্মাণ করে যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করেন।

জনমেজয় ! শুভ মুহূর্ত দেখে যুধিষ্ঠির দশ হাজার ব্রাহ্মণকে ফল-মূল-ক্ষীর ইত্যাদি নানাপ্রকার খাদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করলেন। তাঁদের বস্ত্র, পুষ্পমালা এবং নানাবিধ সামগ্রী দিয়ে তুষ্ট করলেন, প্রত্যেককে এক হাজার করে গাভী দান করলেন। তারপরে যুধিষ্ঠির যখন সভাগৃহে প্রবেশ করলেন তখন ব্রাহ্মণরা সম্মিলিতভাবে স্বস্তিবাচন করতে লাগলেন। নানাপ্রকার ফল-ফুল দিয়ে দেবতাদের পূজা করা হল। লাঠিয়াল, পালোয়ান, মল্লবীর, নট-নটী, বৈতালিকগণ নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেন। তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সভায় আসীন হলেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক মুনি-ঋষি এবং রাজা-মহারাজাও ছিলেন। ঋষিদের মধ্যে প্রধানত অসিত, দেবল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, জৈমিনি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী, ধর্মজ্ঞ, সংযমী প্রবচনকার উপস্থিত ছিলেন। কক্ষসেন, ক্ষেমক, কমঠ, কম্পন, মদ্রকাধিপতি জটাসুর, পুলিন্দ, অঙ্গ, পুণ্ড্রক, অন্ধক, পাণ্ড্য এবং ওড়িশা ইত্যাদি দেশের অধিপতিরা যুধিষ্ঠিরের সেবায় উপস্থিত ছিলেন। অর্জুনের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাকারী রাজকুমাররা এবং যদুবংশীয় প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি প্রমুখও সেখানে ছিলেন। তুম্বুরু, চিত্রসেন প্রমুখ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণও ধর্মরাজকে প্রসন্ন করতে সেখানে এসেছিলেন নৃত্য-গীত প্রদর্শন করার জন্য। সেই সময় মহর্ষি এবং রাজর্ষিদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে দেখে মনে হল যেন স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর সভায় বিরাজমান।

জনমেজয় ! একদিন পাণ্ডব এবং গন্ধর্বগণ সেই দিব্য সভায় আনন্দে বসেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ আরও কয়েকজন ঋষিকে সঙ্গে করে সেইখানে উপস্থিত হলেন। রাজন্ ! দেবর্ষি নারদের মহিমা অপার, তিনি বেদ ও উপনিষদে পারদর্শী ও বিদ্বান, বহু শ্রেষ্ঠ দেবতাও তাঁকে পূজা করতেন। ইতিহাস, পুরাণ, প্রাচীন, কল্প এবং পূর্বোত্তর মীমাংসার জ্ঞানে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তিনি বেদের ছয়টি অঙ্গ ব্যাকরণ, কল্প, শিক্ষা ইত্যাদি তো জানতেনই, ধর্মেরও সবকিছুতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রগলভ বক্তা, স্মৃতিযুক্ত মেধাবী, নীতিকুশল এবং সহৃদয় কবি ছিলেন। কর্ম এবং জ্ঞানের বিভাগ সম্পাদনেও তিনি সমর্থ। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচনের দ্বারা সব বিষয় ঠিক ঠিক নির্ণয় এবং প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন—এই পাঁচ অঙ্গদ্বারা যুক্ত বাক্যের গুণ দোষও তিনি খুব ভালো বুঝতেন। বৃহস্পতির সঙ্গে কথাবার্তাতেও তিনি উত্তর-প্রত্যুত্তরে বিশারদ ছিলেন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সুসঙ্গত ছিল। তিনি চতুর্দশভুবনের অণু-পরমাণু প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন। সাংখ্য ও যোগ উভয়-মার্গই তাঁর জানা ছিল। দেবতা ও অসুরদের প্রত্যেকটি নির্ণয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও তিনি জানতেন। মেলামেশা এবং শত্রুতার ভিতরের তাৎপর্য তাঁর ভালোমত জানা ছিল। শত্রু-মিত্রের শক্তির যথার্থ জ্ঞানও তাঁর ছিল। রাজনীতি ও কূটনীতি সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। যুদ্ধ এবং গীত—দুইয়েতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। কোথাও আসা-যাওয়াতে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। তিনি আরও বহুগুণে গুণান্বিত ছিলেন। সেইদিন তিনি লোক-লোকান্তরে ঘুরে ফিরে পারিজাত, পর্বত, সুমুখ প্রমুখ ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁদের সভায় এলেন। সেখানে এসে স্নেহভরে ধর্মরাজকে

আশীর্বাদ করে বললেন—'জয় হোক ! জয় হোক !'

সর্ব ধর্মের মর্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে দেখে ভ্রাতাগণ সহ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন, বিনীতভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করে তাঁকে উপযুক্ত আসনে বসালেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর পূজা ও আপ্যায়ন করলেন। দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের আপ্যায়নে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি করার সময় তাঁদের ধর্ম-অর্থ ও কাম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন—'ধর্মরাজ ! আপনার অর্থের

সদ্ব্যবহার হয় তো ? আপনার মন ধর্ম কার্যে ব্যাপৃত, আশাকরি আপনি সুখী হবেন। আপনার মনে নিশ্চয়ই কোনো খারাপ চিন্তা আসে না। আপনার পিতৃ-পিতামহগণ যে সদাচার পালন করেছেন, আপনিও নিশ্চয়ই সেই ধর্ম-অর্থের অনুকূল উদার নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ! অর্থে প্রীতির জন্য ধর্মপালনে, ধর্মে প্রীতির জন্য অর্থের এবং কামপ্রিয়তা ধর্ম ও অর্থের প্রতিবন্ধক যেন না হয়। আপনি তো সময়ের মূল্য বোঝেন। অর্থ, ধর্ম এবং কামের জন্য পৃথক পৃথক সময় স্থির করেছেন তো ? রাজার মধ্যে ছয়টি গুণ থাকা উচিত—ব্যাখ্যা করার শক্তি, বীরত্ব, মেধা, পরিণামদর্শিতা, নীতি-নৈপুণ্য এবং কর্তব্য-অকর্তব্য-বিবেক। সাতটি উপায় হল—মন্ত্র, ওষধি, ইন্দ্রজাল, সাম, দান, দণ্ড এবং ভেদ। পূর্বোক্ত গুণাদির সাহায্যে এই উপায়গুলি নিরীক্ষণ করা উচিত এবং চোদ্দটি দোষের ওপর নজর রাখা উচিত। সেগুলি হল—নাস্তিকতা, মিথ্যা, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানীদের সঙ্গ না করা, আলস্য, ইন্দ্রিয় পরবশতা, শুধু অর্থেরই চিন্তা করা, মূর্খের সঙ্গে পরামর্শ, নিশ্চিত কার্যে ঢিলেমি, পরামর্শ গুপ্ত না রাখা, সময়মতো উৎসব না করা এবং একসঙ্গে অনেক শত্রুর ওপর আক্রমণ করা। এই দোষ থেকে রক্ষা পেয়ে নিজ শক্তি এবং শত্রুর শক্তি সম্পর্কে ঠিক ঠিক জ্ঞান রাখেন তো ? নিজ শক্তি এবং শত্রুর শক্তি অনুমান করে সন্ধি বা যুদ্ধ দ্বারা আপনি আপনার জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাতি-ঘোড়া, হীরা-জহরত ইত্যাদির জন্য নিয়োজিত লোকদের কার্যাদি ঠিকমতো দেখাশোনা করেন তো ? যুধিষ্ঠির ! আপনার রাজ্যের সাতটি অঙ্গ—স্বামী, মন্ত্রী, মিত্র, অর্থকোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও পুরবাসীরা শত্রুদের সঙ্গে মিলে যায়নি তো ? নগরের ধনী ব্যক্তিরা কুপ্রভাব থেকে দূরে আছে তো ? আপনার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাসম্মান বজায় আছে তো ? আপনার শত্রুর গুপ্তচর আপনার উপর বিশ্বাস সৃষ্টি করে আপনার কাছ থেকে অথবা আপনার মন্ত্রীদের কাছ থেকে গোপন পরামর্শ জেনে যায় না তো ? আপনি আপনার মিত্র, শত্রু এবং উদাসীন লোকের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খোঁজ খবর রাখেন তো, তাঁরা কী করেন না করেন ? আপনি ঠিক সময় অনুসারে মেলামেশা এবং শত্রুতা করেন তো ? আপনার মন্ত্রী আপনার সমানই জ্ঞানবৃদ্ধ, পুণ্যাত্মা, বুদ্ধিমান, কুলীন এবং সম্মানীয় তো ?

যুধিষ্ঠির ! বিজয়ের মূল হল বিচারের গোপনতা। আপনার শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রীরা আপনার বিচার এবং সংকল্পগুলি গোপন রাখে তো ? এর দ্বারাই দেশরক্ষা হয়। শত্রুরা আপনার কথা সব জেনে যায় না তো ? আপনি অসময়ে নিদ্রাসক্ত হন না তো ? সময়মত জেগে যান তো ? রাত্রের শেষপ্রহরে ঘুম থেকে উঠে আপনি অর্থ চিন্তা করেন কি ? আপনি একলা কিংবা অনেকের সঙ্গে যে মন্ত্রণা করেন আপনার পরামর্শগুলি শত্রুদের কাছে পৌঁছে যায় না তো ? একটু চেষ্টা করলেই অনেক বড় কাজ করা যায়, সেই ভেবেই কাজ আরম্ভ করেন তো ? সেই কাজে আলস্য করেন না তো ? যারা চাষ করে, তাদের সুবিধা-অসুবিধার খবর রাখেন তো ? তাদের ওপর আপনার বিশ্বাস আছে তো ? তাদের প্রতি ঔদাসীন্য যেন না থাকে, তাদের ভালোবাসাই রাজ্যের উন্নতির কারণ। চাষীদের কাজ বিশ্বাসী, নির্লোভ এবং কুলীনদের দিয়ে করানো উচিত। আপনার কাজ শেষ হবার আগেই

লোকে জেনে যায় না তো ?

আপনার আচার্য ধর্মজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রনিপুণ হয়ে কুমারদের ঠিকমতো অস্ত্র-শিক্ষা দিচ্ছেন তো ? আপনি সহস্র মূর্খের পরিবর্তে একজন বিদ্বানকে কি গুরুত্ব দেন ? কেননা বিদ্বানই বিপত্তির সময় রক্ষা করতে পারে। আপনার সমস্ত দুর্গে ধন-ধান্য-অস্ত্র-শস্ত্র-জল-যন্ত্র-কারিগর এবং সৈনিকের সঠিক আয়োজন আছে তো ? যদি একজন মন্ত্রীও মেধাবী, সংযমী এবং বুদ্ধিমান হয় তাহলে তা রাজা অথবা রাজকুমারকে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী করে দেয়। আপনি শত্রুপক্ষের মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দ্বারপাল, কারাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, কার্য নির্ণায়ক, উপদেষ্টা, নগরাধিপতি, কার্যনির্মাণ কর্তা, ধর্মাধ্যক্ষ, সভাপতি, দণ্ডপাল, দুর্গপাল, সীমাপাল এবং বনবিভাগের অধিকারীদের ওপর তিনজন করে গুপ্তচর রেখে থাকেন তো ? প্রথম তিনজনকে বাদ দিয়ে নিজ পক্ষের বাকি অধিকারীদের ওপরও তিনজন করে গোপন গুপ্তচর রাখা উচিত। আপনি স্বয়ং সতর্ক থেকে নিজের কথা শত্রুদের কাছে গোপন রাখবেন এবং তাদের কাজের খবর রাখবেন। মহাত্মা ! আপনার পুরোহিত কুলীন, বিদ্বান এবং বিনয়ী তো ? তিনি নিন্দুক এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় নন তো ? আপনি নিশ্চয়ই তাঁকে যথোচিত মর্যাদা দেন। আপনি বুদ্ধিমান সরল এবং বিধিনিয়ম জানেন এমন ব্যক্তিকেই ঋত্বিক নিযুক্ত করেছেন তো ? তিনি যজ্ঞ করার সামগ্রীগুলি সঠিকভাবে নিবেদন করেন তো ? আপনার জ্যোতিষী সমস্ত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ এবং নক্ষত্রের অবস্থান ও প্রভাব নিপুণভাবে জানেন তো ? আপনি রাজকার্যে অযোগ্য কর্মচারীদের নিযুক্ত করেননি তো ? আপনি আপনার মন্ত্রীদের সমসময় কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তো ? মন্ত্রীরা শীল-সৌজন্য এবং ভালোবাসা পরিত্যাগ করে প্রজাদের কঠোরভাবে শাসন করেন না তো ? পবিত্র যাজ্ঞিক পতিত যজমানের এবং নারী ব্যভিচারী পুরুষকে অপমান করে, তেমনই প্রজারা বেশি কর দেওয়ার জন্য আপনাকে দোষারোপ করে না তো ?

আপনার সেনাপতি তেজস্বী, বীর, বুদ্ধিমান, ধৈর্যশালী, পবিত্র, কুলীন, রাজভক্ত এবং চতুর তো ? আপনার সেনাদের দলপতিরা সর্বপ্রকার যুদ্ধে চতুর, নিষ্কপট, শূরবীর এবং আপনার দ্বারা সম্মানিত তো ? আপনি আপনার সেনাদের খাদ্য ও বেতনের ঠিকমতো ব্যবস্থা করেন তো ? বেতনে বিলম্ব বা কম হয়ে যায় না তো ? খাদ্য ও বেতন ঠিক সময়মতো না পেলে সৈনিকদের কষ্ট হয় এবং তারা বিদ্রোহ করে বসে। আপনার কর্মচারীরা কি আপনার প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল যে তারা আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ? এদের মধ্যে এমন কেউ নেই তো, যে তার ইচ্ছানুসারে সমস্ত সেনা চালনা করছে, আপনার নির্দেশ মানছে না ! কোনো কর্মচারী কোনো বিশেষ ভালো কাজ করলে তার বেতন বৃদ্ধি হয় তো ? রাজন্ ! যারা আপনাকে রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন করেন বা সংকটের মধ্যে পড়েন, তাদের পরিবারকে আপনি রক্ষা করেন তো ? বলহীন শত্রু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যখন আপনার শরণাগত হয় তখন আপনি তাকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করেন তো ? সমস্ত প্রজা আপনাকে নিরপেক্ষ, হিতকারী এবং পিতা-মাতার সমকক্ষ মনে করে তো ?

প্রথমে নিজের ইন্দ্রিয়কে জয় করে তারপর ইন্দ্রিয়াদির অধীন শত্রুদের জয় করা যায়। শত্রুদের বশ করার জন্য সাম-দান-দণ্ড সর্বপ্রকার উপায় প্রয়োগ করা উচিত। নিজ রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করে তবে শত্রুর ওপর হামলা করতে হয় এবং জয়লাভ করে সেই রাজ্যে নিজ অধিকার স্থাপন করা উচিত। আপনি নিশ্চয়ই তাই করে থাকেন !

আপনি আপনার আত্মীয়-কুটুম্ব, গুরুজন-বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী-কারিগর, আশ্রিত-দরিদ্রদের সদা-সর্বদা ভরণ-পোষণ ও দেখা-শোনা করেন তো ? যে ব্যক্তি প্রতিদিন অর্থের আয়-ব্যয়ের কাজে নিযুক্ত থাকেন, তিনি প্রত্যহ আপনার কাছে হিসাব পেশ করেন তো ? কখনো যোগ্য এবং হিতৈষী কর্মচারীকে বিনা অপরাধে পদচ্যুত করেননি তো ? কখনো কোনো কাজে লোভী, চোর, শত্রুকে নিয়োগ করেননি তো ? কোনো চোর, লোভী রাজকুমার, রানি বা স্বয়ং আপনি দেশবাসীদের দুঃখ দেন না তো ? আপনার রাজ্যে জলপূর্ণ পুষ্করিণী বহুল পরিমাণে আছে তো ? আপনি চাষের জমি বর্ষার জলের ভরসায় রাখেননি তো ? চাষের বীজ ও ফলনের উপযুক্ত পরিবেশ কখনো নষ্ট করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলে অল্প সুদের বিনিময়ে তাদের অর্থ সাহায্য করা উচিত। আপনার রাজ্যে কৃষিকাজ, গোরক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে করা হয়ে থাকে তো ? ধর্মানুকূল ব্যবস্থাতেই প্রজারা সুখী হয়। আপনার রাজ্যে বিচারপতি, তহশীলদার, পঞ্চায়েত প্রধান, পেশকার এবং সাক্ষী—এই পাঁচ ব্যক্তি প্রজাদের হিতে

তৎপর এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে থাকেন তো ? নগর রক্ষার জন্য গ্রামরক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজ্যসীমা রক্ষা করাও গ্রামরক্ষার সঙ্গে সমানভাবে করা উচিত। সেখানকার খবর ঠিক সময়মতো সংগ্রহ করেন তো ? আপনার রাজ্যে অপরাধী, চোর, উচ্চনীচ ব্যক্তি গ্রামগুলি লুট করে না তো ? আপনি নারীদের সুরক্ষিত এবং প্রসন্ন রাখেন তো ? এঁদের ওপর বিশ্বাস করে গুপ্তকথা বলে দেন না তো ? আপনি ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে বিপদকে উপেক্ষা করেন না তো ? আপনার সেবক সর্বদা আপনার রক্ষায় তৎপর থাকে তো ? আপনি অপরাধীদের কাছে যমরাজ এবং পূজনীয়দের কাছে ধর্মরাজরূপে বিরাজ করেন তো ? প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিদের ভালোমতো পরীক্ষা করে তারপর তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন তো ? শরীরের ব্যাধি দূর হয় নিয়ম পালন ও ঔষধ সেবন করলে আর মনের পীড়া দূর হয় জ্ঞানী পুরুষদের সৎসঙ্গে। আপনি তা যথাযোগ্য করে থাকেন তো ?

আপনার চিকিৎসক অষ্টাঙ্গ-চিকিৎসায় নিপুণ, হিতৈষী, শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং শরীরের দেখাশোনায় পারঙ্গম তো ? আপনি লোভ, মোহ বা অহংকারবশত অর্থী এবং প্রত্যর্থীদের উপেক্ষা করেন না তো ? আপনি লোভ, মোহ, বিশ্বাস অথবা ভালোবাসার দ্বারা আপনার আশ্রিত জনদের জীবিকায় বাধাপ্রদান করেন না তো ? আপনার দেশবাসীরা গোপনে শত্রুদের কাছে উৎকোচ নিয়ে আপনার বিরোধিতা করছে না তো ? প্রধান প্রধান রাজারা প্রেমপরবশ হয়ে আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন কি না ? আপনার বিদ্যাবত্তা এবং গুণাদির জন্য ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ আপনাকে প্রশংসা করেন তো ? আপনি তাঁদের দক্ষিণা দিয়ে থাকেন তো ? এরূপ করলে আপনার স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হবে। আপনার পূর্বপুরুষগণ যেমন বৈদিক সদাচার পালন করেছিলেন, আপনি সেইরূপ পালন করেন তো ? আপনার মহলে গুণবান্ ব্রাহ্মণ রুচিকর আহারের পরে দক্ষিণা পান তো ? আপনি সময় সময়ে পূর্ণ সংযম নিয়ে একাগ্র মনে যাগ-যজ্ঞাদি করে থাকেন তো ? ভাই, গুরু, বৃদ্ধ, দেবতা, তপস্বী, দেবস্থান, শুভ বৃক্ষ এবং ব্রাহ্মণদের নমস্কার করেন তো ? আপনার জন্য কারো মনে শোক বা ক্রোধ উৎপন্ন হয় না তো ? মঙ্গলকারী দ্রব্য নিয়ে আপনার সঙ্গে সর্বদাই কেউ থাকে তো ? আপনার মঙ্গলময় ধর্মানুকূল বৃত্তি সর্বদা একপ্রকার থাকে তো ? এইরূপ বৃত্তি আয়ু এবং যশবৃদ্ধিকারী এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পূরণকারী। যে রাজা এই বৃত্তি রাখেন, তাঁর দেশ কখনো সংকটগ্রস্ত হয় না। সমস্ত পৃথিবী তাঁর বশীভূত হয়, তিনি সুখী হন।

ধর্মরাজ ! আপনার কোনো শাস্ত্র-কুশল মন্ত্রী অজ্ঞতা-বশত কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে চোর মনে করে কষ্ট দেয় না তো ? আপনার কোনো কর্মচারী ঘুষ নিয়ে অপরাধী ব্যক্তিকে বিনাদণ্ডে ছেড়ে দেয় না তো ? ধনী দরিদ্রের বিবাদে আপনার কর্মচারী ধনলোভে দরিদ্রের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে না তো ? আমি আগে যে চোদ্দটি দোষের বর্ণনা করেছি, তার থেকে আপনার অবশ্যই রক্ষা পাওয়া উচিত। বেদের সাফল্য যজ্ঞে, ধনের সাফল্য দান এবং ভোগে, পত্নীর সাফল্য আনন্দ এবং সন্তানে এবং শাস্ত্রের সাফল্য শীল এবং সদাচার দ্বারা হয়।

দূর থেকে যেসব ব্যবসায়ী আসেন তাঁরা ঠিকমতো কর দেন তো ? রাজধানী এবং সর্বত্র ব্যবসায়ীদের সম্মান দেওয়া হয় তো ? তাঁরা প্রতারিত হয়ে যান না তো ? আপনি গুরুজনদের কাছ থেকে প্রতিদিন ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র শ্রবণ করেন তো ? চাষের থেকে উৎপাদিত অন্ন, ফুল, ফল, মধু, ঘৃত ইত্যাদি ধর্ম-বুদ্ধি যুক্ত রেখে ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয় তো ? আপনি আপনার কারিগরদের ঠিকমতো কাজের জিনিস, বেতন, কাজ দেন তো ? যাঁরা আপনার ভালো করেন, পূর্ণ সভাকক্ষে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে আপ্যায়ন করেন তো ? আপনি সর্বপ্রকার সূত্রগ্রন্থ যেমন হস্তিসূত্র, রথসূত্র, অশ্বসূত্র, অস্ত্রসূত্র, যন্ত্রসূত্র এবং নাগরিকসূত্র অভ্যাস করেন নিশ্চয়ই ! আপনি সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, মারণপ্রয়োগ, ঔষধিপ্রয়োগ জানেন নিশ্চয়ই ? আপনি অগ্নি, হিংস্র জন্তু, রোগ এবং রাক্ষসদের থেকে সমস্ত রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন তো ? অন্ধ, বোবা, খঞ্জ, অনাথ এবং সাধু সন্ন্যাসীদের ধর্মত রক্ষক আপনিই। মহারাজ ! রাজাদের অনর্থকারক ছয়টি দোষ হল—নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃদুতা এবং দীর্ঘসূত্রতা।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দেবর্ষি নারদের বাণী শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর পদস্পর্শ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমি আপনার আদেশ পালন করব। আজ আমার বুদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল।' এই কথা বলে তিনি তখন থেকেই দেবর্ষির কথা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করলেন। দেবর্ষি নারদ বললেন—'যে রাজা এইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করে, সে ইহলোকে তো সুখী হয়ই, পরলোকেও সুখ পায়।'

——০——

দেবসভার কথা এবং স্বর্গীয় পাণ্ডুর সংবাদ

বৈশম্পায়ন বললেন—'জনমেজয় ! দেবর্ষি নারদের উপদেশ শুনে ধর্মরাজ তাঁকে অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন জানলেন। বিশ্রাম করার পর আবার তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মরাজ প্রশ্ন করলেন—'দেবর্ষি ! আপনি সর্বদা মনের ন্যায় গতিবেগে পর্যটন করে থাকেন এবং ব্রহ্মার সৃষ্ট সমগ্রলোক পরিদর্শন করেন। আপনি কোথাও এইরূপ অথবা এর থেকে সুন্দর সভা দেখেছেন ? কৃপা করে বলুন।' ধর্মরাজের এই প্রশ্ন শুনে দেবর্ষি নারদ মধুর হেসে মিষ্ট বাক্যে বললেন—'ধর্মরাজ ! মনুষ্য লোকে আমি এরূপ মণিময়যুক্ত সভা দেখিনি এবং শুনিওনি। আমি আপনাকে যমরাগ, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের এবং ব্রহ্মার সভাসমূহের বর্ণনা শোনাচ্ছি। এগুলি আপনাকে যমরাজ, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের এবং ব্রহ্মার সভাসমূহের বর্ণনা শোনাচ্ছি। এগুলি লৌকিক ও অলৌকিক কলা-কুশলযুক্ত। সূক্ষ্ম তত্ত্ব দ্বারা তৈরি হওয়ায় এক একটি সভা নানারূপে প্রতিভাত হয়। দেবতা, পিতৃ পুরুষ, যাজ্ঞিক, বেদ, যজ্ঞ, ঋষি, মুনি ইত্যাদি মূর্তিমান হয়ে তাতে নিবাস করেন।' দেবর্ষি নারদের কথা শুনে পঞ্চ পাণ্ডব এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী সেই সভার বর্ণনা শোনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হলেন। তাঁরা হাতজোড় করে অনুরোধ করলেন—আপনি সেই সভার বর্ণনা করুন। আমরা তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। সেই সভা কি কি বস্তু দ্বারা তৈরি এবং দৈর্ঘ প্রস্থে কত বড় ? কারা এর সভাসদ ? এতে আর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে ? ধর্মরাজের প্রশ্ন শুনে দেবর্ষি নারদ দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্যপুত্র যম, বুদ্ধিমান বরুণ, যক্ষরাজ কুবের এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মার অলৌকিক সভার বর্ণনা করলেন।[১]

জনমেজয় ! দিব্যসভার বর্ণনা শুনে ধর্মরাজ দেবর্ষি নারদকে বললেন—'ভগবন্ ! আপনি যমরাজার সভায় প্রায় সমস্ত রাজাদের উপস্থিত থাকার বর্ণনা করেছেন। বরুণের সভায় নাগ, দৈত্যরাজ, নদী এবং সমুদ্রের উপস্থিতির কথা বলেছেন। কুবেরের সভায় যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, গুহ্যক এবং রুদ্রদেবের উপস্থিতির খবরও আমরা জেনেছি। আপনি বলেছেন ব্রহ্মার সভায় ঋষি-মুনি, দেবতা এবং শাস্ত্র-পুরাণ নিবাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবতা, গন্ধর্ব এবং ঋষি-মুনিদের কথাও বলেছেন। আপনি বলেছেন সেখানে রাজর্ষিদের মধ্যে শুধু হরিশ্চন্দ্রই ছিলেন। তিনি এমন কি সৎকর্ম, তপস্যা অথবা ব্রত পালন করেছেন যার ফলে তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ হলেন। ভগবন্ ! আপনি পিতৃলোকে আমার পিতা পাণ্ডুকে কেমন দেখেছেন ? তিনি আমার জন্য কি সংবাদ পাঠিয়েছেন ? আপনি কৃপা করে তাঁর কথা বলুন।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—রাজন্ ! আপনার প্রশ্ন অনুসারে আমি আপনাকে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মহিমা শোনাচ্ছি। তিনি প্রতাপশালী এবং একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। পৃথিবীর সকল নরপতি তাঁর কাছে মাথা নত করে থাকতেন। তিনি একাই সবার ওপর বিজয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং মহান্ যজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সকল রাজাই তাঁকে কর দিয়েছিলেন এবং যজ্ঞে সব কাজে সহায়তা করেছিলেন। যাচকরা তাঁর কাছে যা চেয়েছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণদের খাদ্য, বস্ত্র, মণি-মুক্তা এবং তাঁদের ইচ্ছামত দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে প্রসন্ন করেছিলেন, তাঁরা দেশ-বিদেশে রাজার উদার মনের কথা বলতে থাকলেন। যজ্ঞের ফল এবং ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদস্বরূপ হরিশ্চন্দ্র সম্রাটপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। যে রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করেন, সম্মুখ সংগ্রামে পিছু হটেন না এবং তীব্র তপস্যা দ্বারা শরীর ত্যাগ করেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির ! আপনার পিতা পাণ্ডু হরিশ্চন্দ্রের ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে মনুষ্যলোকে গমন করতে দেখে তিনি আপনাকে বলার জন্য কিছু কথা বললেন তা শ্রবণ করুন, 'ভাইয়েরা তোমার অনুগত এবং মহারথী অতএব তুমি সমস্ত পৃথিবী জয় করতে সক্ষম। আমার জন্য তোমাকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ করতে হবে। যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার পুত্র, তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় চিরকাল দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় আনন্দ উপভোগ করব।' ধর্মরাজ ! আমি আপনার পিতার কাছে স্বীকার করে এসেছি যে আপনাকে তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানাব। রাজন্ ! আপনি আপনার পিতার এই বাসনা পূর্ণ করুন। এই যজ্ঞের ফলস্বরূপ শুধু আপনারই পিতাই নয়, আপনিও সেই স্থান লাভ করবেন। এই যজ্ঞে যে অনেক বড় বিঘ্ন আসে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যজ্ঞদ্রোহী রাক্ষসেরা এই কাজের প্রতীক্ষায় থাকে। একটুও

---

[১]মহাভারতে দেবসভাগুলির বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর এবং বিস্তৃত। পরলোক জিজ্ঞাসুদের কাছে তা অতি কাম্য বস্তু। মূল গ্রন্থেই সেটি পাঠ করা উচিত।

নিমিত্ত পেলে বড় ভয়ঙ্কর ক্ষত্রিয়কুলনাশক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যাতে পৃথিবীর প্রলয় উপস্থিত হয়। ধর্মরাজ ! এইসব ভালো করে ভেবে চিন্তে আপনার পক্ষে যা কল্যাণদায়ক বলে মনে হয়, তাই করবেন। রাজাসনে থেকে চার বর্ণের মানুষকে রক্ষা করে উন্নতি ও আনন্দ লাভ করুন এবং ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট রাখুন। আপনি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন, এবার আমাকে অনুমতি দিন, আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীতে যাব।'

জনমেজয় ! দেবর্ষি নারদ তারপর তাঁর সঙ্গী ঋষিদের নিয়ে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন ভাইদের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

—o—

রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দেবর্ষি নারদের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর সভাসদদের আপ্যায়ন করলেন, নিজেও তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হলেন ; কিন্তু তাঁর মন রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্পে মগ্ন হয়ে রইল। তিনি নিজ ধর্মের কথা চিন্তা করে যাতে প্রজাদের মঙ্গল হয়, তাই করতে লাগলেন। তিনি কারোরই পক্ষপাতিত্ব করতেন না। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ক্রোধ এবং অহংকার পরিত্যাগ করে সকলের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীতে যুধিষ্ঠিরের জয়জয়কার হতে লাগল। তাঁর সাধু ব্যবহারে প্রজারা তাঁকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সঙ্গে কারো শত্রুতা না থাকায়, তাঁকে অজাতশত্রু বলা হত। যুধিষ্ঠির সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন। ভীম সকলকে রক্ষার কাজে এবং অর্জুন শত্রুসংহারে ব্যস্ত থাকতেন। সহদেব ধর্ম অনুসারে শাসন করতেন আর নকুল তাঁর স্বভাব অনুসারে সবার সামনে নত হয়ে থাকতেন। প্রজাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, ভয়-অধর্ম বলে কিছু ছিল না। সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করত, ঠিক সময়ে বর্ষা আসত, সকলেই সুখী ছিলেন। সেই সময় যজ্ঞশক্তি, গোরক্ষা, কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিল। প্রজারা কর বকেয়া রাখত না, কর বাড়ানোও হত না, কর আদায়ের জন্য কাউকে পীড়ন করা হত না। রোগ বা অগ্নি ভয় ছিল না। ডাকাত, ঠগ, প্রতারকরা কোনোভাবেই প্রজার ওপর অত্যাচার করতে পারত না। দেশের সব সামন্তগণ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এসে ধর্মরাজের করদান, সেবা এবং অন্যান্য সহযোগিতা করতেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যে রাজ্য অধিকার করতেন সেখানকার ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত প্রজারা তাঁকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

জনমেজয় ! ধর্মরাজ তাঁর মন্ত্রী এবং ভাইদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন 'রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে আপনাদের কী মত ?' মন্ত্রীরা সকলেই একযোগে বললেন—'রাজসূয়

যজ্ঞের অভিষেকে রাজা সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যান, যেমন বরুণ জলের একচ্ছত্র অধিপতি। আপনি সম্রাট হবার যোগ্য। রাজসূয় যজ্ঞ করার এই সঠিক সময়। যিনি বলশালী, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী। তাই আপনার অতি অবশ্য যজ্ঞ করা উচিত। এতে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।' মন্ত্রীদের কথা শুনে ধর্মরাজ তাঁর ভাই, ঋত্বিক, ধৌম্য এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের সঙ্গে আলোচনা করলেন। সকলেই তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে 'আপনি রাজসূয়ের ন্যায় মহাযজ্ঞ করার সম্পূর্ণ যোগ্য।' সকলের সম্মতি পেয়ে পরম বুদ্ধিমান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সকলের কল্যাণের জন্য মনে মনে চিন্তা করলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হল যে, নিজের শক্তি-সামর্থ, পরিস্থিতি, আয়, ব্যয় সমস্ত ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে তবেই কিছু স্থির করা। এরূপ করলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কেবলমাত্র আমার একার সিদ্ধান্তে যজ্ঞ হয় না, এই কথা ভেবে যজ্ঞের জন্য চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে

মনে মনে চিন্তা করতে করতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এর সঠিক পরামর্শ দিতে সক্ষম। তিনি জগতের সমস্ত লোকেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর স্বরূপ এবং জ্ঞান অগাধ, শক্তির তুলনা নেই। তিনি অজ হয়েও জগতের কল্যাণের এবং লীলা মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম। ভার যত বড় হোক না কেন, তিনি তা বহন করতে সক্ষম। এসব ভেবে যুধিষ্ঠির মনে মনে ভগবানের শরণ গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত জেনে তা পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তারপর ধর্মরাজ ত্রিলোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আনবার জন্য অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দূত প্রেরণ করলেন। দূত দ্রুতগামী রথে করে দ্বারকাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিশ্চিত হলেন যে 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমার স্বয়ং দেখা করা উচিত।' তিনি তখনই ইন্দ্রসেন দূতের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে যাত্রা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে শীঘ্রই পৌঁছতে চাইছিলেন। তাই দ্রুতগামী রথে চড়ে নানা দেশ পার হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্মরাজের কাছে উপস্থিত হলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীম তাঁকে পিতার ন্যায় আপ্যায়ন করলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর পিসিমা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং প্রিয় বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দে বাস করতে লাগলেন। অর্জুন, নকুল ও সহদেব গুরুজ্ঞানে তাঁকে সেবা করতে লাগলেন।

একদিন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করে উঠেছেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে নিজ অভিপ্রায় জানালেন। তিনি বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাই। কিন্তু আপনি তো জানেন শুধু ইচ্ছা করলেই রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব হয় না। যিনি সব কিছু করতে সক্ষম, যাঁকে সর্বত্র পূজা করা হয়, যিনি সর্বেশ্বর, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারেন। আমার মিত্ররা একযোগে বলছেন আমাকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে। কিন্তু আপনি সম্মতি দিলে তবেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অনেকেই আমার সঙ্গে প্রীতি সম্পর্কে এবং কিছু লোক স্বার্থের জন্য আমার ত্রুটির কথা না বলে আমার প্রশংসা করে। কিছু লোক তো তাদের ভালো কাজগুলিতেও আমার কাজ বলে মনে করে বসে। লোক এইরূপ নানাকথা বলে। কিন্তু আপনি সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে। আপনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তাই আমি রাজসূয় যজ্ঞ করতে সক্ষম কি না, তা আপনিই সঠিক বলতে পারেন।'

——০——

জরাসন্ধের বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আলোচনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজকে বললেন—'মহারাজ ! আপনার মধ্যে সকল গুণই বিদ্যমান, তাই আপনি প্রকৃতপক্ষে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী। আপনি সবই

জানেন, তা সত্ত্বেও আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি। এখন রাজা জরাসন্ধ তাঁর বাহুবলে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে তাঁর রাজধানীতে বন্দী করে রেখেছেন এবং তাদের দিয়ে নিজের বিভিন্ন সেবাকার্য করাচ্ছেন। এখন উনিই রাজাদের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী। প্রতাপশালী শিশুপাল এখন তার সেনাপতি। করূষ দেশের রাজা, যিনি মহাবলী এবং মায়াযুদ্ধে পারঙ্গম, তিনি শিষ্যের ন্যায় জরাসন্ধের সেবা করছেন। পশ্চিমের পরাক্রমী মূর এবং নরক দেশের শাসক যবনাধিপতিও তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছেন। আপনার পিতার বন্ধু ভগদত্তও তাঁর কাছে মাথা হেঁট করে থাকেন এবং তাঁর ইশারায় রাজ্য শাসন করেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং কিরাতের রাজা মিথ্যাবাসুদেব অহংকার বশত আমার চিহ্ন ধারণ করে নিজেকে পুরুষোত্তম বলে থাকে, আমার শক্তিতেই সে বেঁচে আছে ; তবুও সে এখন জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শত্রুদের কথা ছেড়ে দিন, আমার নিজের শ্বশুর ভীষ্মক, যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশের প্রভু

এবং ইন্দ্রের সখা, ভোজরাজ এবং দেবরাজ যাঁর সঙ্গে মিত্রতার জন্য লালায়িত, যিনি নিজ বিদ্যাবুদ্ধি বলে পাণ্ড্য, ক্রথ এবং কৌশিক দেশের ওপর বিজয় লাভ করেছেন, যাঁর ভাই পরশুরামের ন্যায় শক্তিশালী, তিনিও এখন জরাসন্ধের অধীন। তবুও আমরা তাঁর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তাঁর মঙ্গল কামনা করি ; তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সঙ্গে নয়, আমাদের শত্রুর সঙ্গেই বন্ধুত্ব রাখেন। তিনি জরাসন্ধের কীর্তিতে প্রভাবিত হয়ে নিজ কুলের অভিমান ও শক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে জরাসন্ধের শরণ নিয়েছেন। ধর্মরাজ ! উত্তর দিকের অধিপতি অষ্টাদশ ভোজ পরিবার জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করেছে। শূরসেন, ভদ্রকার, শাল্ব, যোধ, পটচ্চর, সুস্থল, সুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শাল্বায়ন প্রমুখ রাজা, দক্ষিণ পাঞ্চাল এবং মৎস্য, সংন্যস্তপাদ ইত্যাদি উত্তর দেশগুলির রাজারাও জরাসন্ধের ভয়ে নিজ নিজ দেশ পরিত্যাগ করে পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে পলায়ন করেছে। দানবরাজ কংস আত্মীয়-পরিজনদের বহু পীড়ন করে রাজা হয়েছিলেন। যখন তাঁর দুর্নীতি খুব বেড়ে গেল, তখন আমি বলরামকে সঙ্গে করে তাঁকে বধ করি। এতে কংসভয় দূর হলেও জরাসন্ধ প্রবলতর হয়ে উঠল। তার সৈন্য সেই সময় এত বিশাল হয়ে উঠেছিল যে আমরা তিন শত বছর ধরে তাদের সংহার করতে থাকলেও পুরো শেষ করতে পারতাম না। সে নিজ শক্তিতে রাজাদের পরাজিত করে পর্বতদুর্গে কয়েদ করে রাখে। ভগবান শংকরের তপস্যা করেই সে এই শক্তিলাভ করেছে। এখন তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। কয়েদী রাজাদের দিয়ে সে যজ্ঞ সম্পন্ন করতে চায়। তাই আরও রাজ্য জয় করার আগে ওইসব কয়েদপ্রাপ্ত রাজাদের মুক্ত করতে হবে। ধর্মরাজ, আপনি যদি রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান তাহলে সর্বপ্রথম কর্তব্য হল কয়েদপ্রাপ্ত রাজাদের মুক্ত করা এবং জরাসন্ধ বধ। এই কাজ না করলে রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব নয়। আপনি বুদ্ধিমান, রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে এই হল আমার মত। আপনি সব দিক ভালো করে ভেবে চিন্তে নিজেই সিদ্ধান্ত নিন এবং তারপর আপনার মত জানান।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'হে পরমজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমাকে যে ভাবে সমস্ত বিষয় উপস্থাপন করলেন, তেমন করে আর কেউ বলেনি। আপনার মতো সংশয় দূরকারী পৃথিবীতে আর কে আছে ? এখন ঘরে ঘরে রাজা, সকলেই নিজ নিজ স্বার্থে মগ্ন ; কিন্তু তারা কেউ সম্রাট নয়। সেই পদ পাওয়া সহজসাধ্য নয়। ভগবান ! জরাসন্ধ সত্যই চিন্তার কারণ। সত্যই সে খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। আমরা তো আপনার শক্তিতেই নিজেদের বলবান বলে মনে করি। আপনি যখন জরাসন্ধের জন্য শঙ্কিত, তখন আমরা নিজেদের তার তুলনায় শক্তিশালী বলে মনে করতে পারি না। আমি ভাবছিলাম যে আপনি, বলরাম, ভীম বা অর্জুন—আপনাদের মধ্যে কেউ ওকে বধ করতে সক্ষম কি না। আমি এই কথা নিয়ে অনেক ভেবেছি। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি সব কাজ করে থাকি। দয়া করে বলুন, এখন কী করা যায় !'

ধর্মরাজের কথা শুনে শ্রেষ্ঠ বক্তা ভীম বললেন— 'যে রাজা চেষ্টা করে না, দুর্বল হয়েও বলবানের দলে মিশে যায়, যুক্তির দ্বারা কাজ করে না, সে হেরে যায়। সতর্ক, উদ্যোগী এবং নীতিনিপুণ রাজা শক্তি কম হলেও বলবান শত্রুকে হারিয়ে দিতে পারে। দাদা ! শ্রীকৃষ্ণ নীতিজ্ঞ, আমার মধ্যে বল, অর্জুনের মধ্যে বিজয় লাভ করার যোগ্যতা রয়েছে। অতএব আমরা তিন জনে মিলে জরাসন্ধ বধের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলব।' ভীমের কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! শত্রুকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। আপনার মধ্যে শত্রুকে জয় করার ক্ষমতা, প্রজাপালন, তপস্যা শক্তি এবং সমৃদ্ধি—সব গুণই আছে। জরাসন্ধের শুধু একটিই গুণ—তা হল শক্তি। যারা তাঁর সেবায় ব্যাপৃত, তারাও জরাসন্ধের ওপর সন্তুষ্ট নয়। কারণ সে তাদের প্রতি বার বার অন্যায় আচরণ করে। সে যোগ্য ব্যক্তিদের অযোগ্য কাজে লাগিয়ে তাদের নিজের শত্রুতে পরিণত করেছে। আমরা তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে হারিয়ে দিতে পারি। ছিয়াশীজন রাজাকে সে বন্দী করে রেখেছে আরও চোদ্দোজন বাকি। তারপর সবাইকে বলি দিতে চায়। যে ব্যক্তি এই নিষ্ঠুর কর্ম বন্ধ করতে পারবে, সে খুবই যশোলাভ করবে। যে ব্যক্তি জরাসন্ধকে পরাজিত করবে, সে নিশ্চিত সম্রাট হবে।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আমি চক্রবর্তী সম্রাট হওয়ার জন্য কোন সাহসে আপনাকে, ভীম বা অর্জুনকে ওখানে পাঠাব ? ভীম এবং অর্জুন আমার দুটি চোখ, আপনি আমার মন। আমি আমার নেত্র এবং মনকে হারিয়ে কী করে বেঁচে থাকব ? যজ্ঞের ব্যাপারে আমি অন্য রকম চিন্তা করেছিলাম। এখন যজ্ঞ করার সংকল্প ত্যাগ করাই উচিত। আমার তো সেই কথা ভাবলেই মন বিষণ্ণ হয়।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ইতিমধ্যে অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক, অক্ষয় তূণীর, দিব্য রথ ধ্বজার অধিকারী হয়েছেন । এতে তাঁর উৎসাহ এবং বল বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ধর্মরাজের কাছে এসে বললেন—'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা !

ধনুক, অস্ত্র, বাণ, পরাক্রম, সাহায্য, ভূমি, যশ এবং সেনা বড় কষ্টে লাভ হয়। আমরা তা মনোমতই পেয়েছি। লোকে কৌলিন্যের প্রশংসা করে। কিন্তু আমার তো ক্ষত্রিয়ের বল এবং বীরত্বই প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। আমরা যদি রাজসূয় যজ্ঞকে নিমিত্ত করে জরাসন্ধকে বধ করি এবং বন্দী রাজাদের রক্ষা করতে পারি তাহলে এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ ! ভরতবংশ শিরোমণি কুন্তীনন্দন অর্জুনের যেমন বুদ্ধি থাকা উচিত, তা প্রত্যক্ষ। আমাদের মৃত্যু দিনে হবে না রাত্রে, তার জন্য আমরা পরোয়া করি না। আজ পর্যন্ত যুদ্ধ না করেও কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাই বীরপুরুষদের কর্তব্য হল নিজের সন্তুষ্টির জন্য বিধি ও নীতি অনুসারে শত্রুকে আক্রমণ করে বিজয়লাভ করার পূর্ণ চেষ্টা করা। সফল হলে ইহলোক, বিফল হলে পরলোক—উভয় অবস্থাতেই মঙ্গল।'

জরাসন্ধের উৎপত্তি এবং তাঁর শক্তির বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! এই জরাসন্ধ কে ? এঁর এত শক্তি ও পরাক্রম কী করে হল ? জ্বলন্ত অগ্নিতে যেমন পতঙ্গ পুড়ে মরে, তেমনি আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেও তার পতন হয়নি—এর কারণ কী ?' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ধর্মরাজ ! জরাসন্ধের বল-বীর্যের কথা শ্রবণ করুন, সে কেন এত অনিষ্ট করা সত্ত্বেও আমি তাকে বধ করিনি। পূর্বে মগধদেশে বৃহদ্রথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, বীর, রূপবান, ধনবান, শক্তিসম্পন্ন এবং যাজ্ঞিক তথা তেজস্বী, ক্ষমাশীল, দণ্ডধর এবং ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। তিনি কাশীরাজের দুই সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি দুজনকেই সমান প্রীতির চোখে দেখবেন। এইভাবে বিষয় ভোগ করতে করতে তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত হল। মঙ্গলপ্রদ হোম, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ইত্যাদি করেও তাঁর কোনো পুত্র জন্মাল না। একদিন তিনি শুনলেন যে, গৌতম কক্ষীবাণের পুত্র মহাত্মা

চণ্ডকৌশিক তপস্যায় বিরত হয়ে এদিকে এসে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছেন। রাজা তাঁর দুই রানির সঙ্গে সেখানে গিয়ে তাঁকে বস্ত্র ইত্যাদি প্রদান করে সন্তুষ্ট করলেন। সত্যবাদী চণ্ডকৌশিক ঋষি রাজা বৃহদ্রথকে বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার যা অভিলাষ আমার কাছে চেয়ে নাও।' রাজা বললেন—'মুনিবর ! আমি সন্তানহীন অভাগা, রাজ্য ছেড়ে তপোবনে এসেছি। বর নিয়ে আমি কী করব ?' রাজার কাতর বাণী শুনে চণ্ডকৌশিক কৃপাপরবশ হয়ে ধ্যানে বসলেন। তিনি যে আম্রবৃক্ষের নীচে ধ্যানে বসেছিলেন, সেই গাছের একটি আম ধ্যানের সময় তাঁর কোলের ওপর পড়ল। সেই ফলটি অত্যন্ত সরস হলেও পাখির ঠোঁটে খুটো করা ছিল। মহর্ষি সেটি তুলে মন্ত্রপূত করে রাজাকে প্রদান করলেন।

প্রকৃতপক্ষে রাজার পুত্রলাভের জন্যই সেটি পড়েছিল। মহাত্মা চণ্ডকৌশিক রাজাকে বললেন—'এবার তুমি গৃহে

ফিরে যাও, শীঘ্রই তোমার পুত্রলাভ হবে।' প্রণাম করে বৃহদ্রথ রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং শুভমুহূর্তে দুই রানিকে ফলটি ভাগ করে খেতে দিলেন। রানিরা দুজনে সেই ফলটি টুকরো করে খেলেন। মহর্ষির সত্যবাদিতার প্রভাবে দুই রানিই গর্ভধারণ করলেন। রাজা বৃহদ্রথের আনন্দের সীমা রইল না। ধর্মরাজ! গর্ভপূর্ণ হলে দুই রানির গর্ভ থেকে

শরীরের এক এক অংশ বার হতে লাগল। প্রত্যেকের গর্ভে একটি করে চোখ, একটি করে হাত, একটি পা, অর্ধেক পেট, অর্ধেক মুখ এবং অর্ধেক কোমর জন্মেছিল। তাই দেখে দুই রানি ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা দুঃখে হতাশ হয়ে দেহাংশ দুটি ফেলে দেবার নির্দেশ দিলেন। দাসীরা নির্দেশ মতো সজীব টুকরোগুলি রানিমহলের বাইরে ফেলে দিয়ে এল।

রাজন্! সেখানে জরা নামে এক রাক্ষসী বাস করত। সে মাংস খেত আর রক্ত পান করত। সে টুকরোগুলি তুলে, নিয়ে যাবার সুবিধার জন্য সেগুলি জোড়া লাগিয়ে নিল। ব্যাস্! টুকরোগুলি জোড়া লেগে এক মহাপরাক্রমশালী, বলবান রাজকুমার তৈরি হল। জরা রাক্ষসী হতচকিত হয়ে গেল। সে সেই বজ্রকর্কশশরীরধারী রাজকুমারকে ওঠাতেই পারল না। কুমার হাতের মুঠি বন্ধ করে মুখে ঢুকিয়ে বর্ষার মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে ক্রন্দন শুরু করল। রানির মহলের সকলে এবং রাজা সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনে কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে বাইরে এলেন। রানিরা যদিও পুত্র সম্পর্কে হতাশ হয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁদের স্তন দুগ্ধে ভরে গিয়েছিল। তাঁরা উদাস হয়ে পুত্র মুখ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বাইরে এলেন। জরা রাক্ষসী রাজপরিবারের পরিস্থিতি, মমতা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা এবং বালকটির মুখ দেখে ভাবতে লাগল—'আমি এই রাজার দেশেই থাকি। এদের সন্তানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর এরা অত্যন্ত ধার্মিক এবং মহাত্মা। অতএব এই নবজাত সুকুমার শিশুটিকে হত্যা করা উচিত নয়।' তখন সে মনুষ্যরূপ ধারণ করে শিশুটিকে কোলে

করে রাজার কাছে এসে বলল—'রাজন্! এই নিন আপনার পুত্র। মহর্ষির প্রসাদে আপনি একে প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি একে রক্ষা করেছি, আপনি একে গ্রহণ করুন।' রাক্ষসী বলামাত্র রানিরা তাকে কোলে নিয়ে স্তন্যদান করতে শুরু করলেন।

রাজা এইসব দেখেশুনে আনন্দে পূর্ণ হলেন। তিনি মনোহর রূপধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ওহে, পুত্রপ্রদানকারিণী তুমি কে? আমার তো মনে হচ্ছে তুমি কোনো দেবী। একথা কি সত্য?' জরা বলল—'রাজন্! আপনার কল্যাণ হোক। আমি জরা নামক রাক্ষসী। আমি সম্মানের সঙ্গে আপনার রাজ্যে থাকি এবং সুমেরু পর্বতেও উড়ে যেতে পারি। আমি আপনার রাজ্যে সর্বদা যত্ন পাই, আপনার ওপর আমি প্রসন্ন, তাই আপনার পুত্রকে আপনার কাছে নিবেদন করছি।' হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই বলে জরা রাক্ষসী অন্তর্ধান করল। রাজা নবজাত পুত্রকে নিয়ে মহলে ফিরে এলেন। বালকের জাতকর্মাদি সংস্কার শাস্ত্রসম্মতভাবে করা হল, জরা রাক্ষসীর নামে সমস্ত মগধদেশে উৎসব পালন করা হল। বৃহদ্রথ তাঁর পুত্রের নামকরণ করার সময় বললেন 'এই বালককে জরা সন্ধিত (জোড়া) করেছেন, তাই এর নাম হবে জরাসন্ধ।' বালক জরাসন্ধ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় এবং যজ্ঞের অগ্নির ন্যায় আকৃতি ও বলে দিন

দিন বৃদ্ধি পেয়ে পিতাকে এবং মাতাদের আনন্দিত করতে লাগল।

কিছুদিন পর মহর্ষি চণ্ডকৌশিক পুনরায় মগধে এলেন। রাজা তাঁকে খুব আদর ও আপ্যায়ন করলেন। তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'রাজন্! জরাসন্ধের জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত আমি দিব্যদৃষ্টিতে জেনে গিয়েছি। তোমার পুত্র অত্যন্ত তেজস্বী, ওজস্বী, বলবান এবং রূপবান হবে। তার বাহুবলে কোনো কিছুই অপ্রাপ্য থাকবে না। কেউই এর শক্তির সমকক্ষ হবে না এবং বিরোধীরা নিজেরাই নাশ হবে। দেবতারাও একে আঘাত করতে সক্ষম হবে না। সকলেই এর আদেশ মেনে নেবে। সর্বোপরি, এর আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং মহাদেব একে দর্শন দেবেন।' এই বলে মহর্ষি চণ্ডকৌশিক চলে গেলেন। রাজা বৃহদ্রথ জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক করালেন এবং তিনি তাঁর রানিদের নিয়ে বানপ্রস্থে চলে গেলেন। জরাসন্ধের শক্তি প্রকৃতই মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের কথামতোই ছিল। আমরা যদিও বলবান, তবুও নীতির দৃষ্টিতে এ পর্যন্ত তাকে আমরা উপেক্ষাই করেছি।'

———o———

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুনের মগধ যাত্রা এবং জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ! জরাসন্ধের প্রধান সহায়ক ছিলেন হংস এবং ডিম্বক। তারা হত হয়েছে। সঙ্গী সাথী সহ কংসেরও সর্বনাশ হয়েছে। এবার জরাসন্ধ নাশের সময় উপস্থিত। সম্মুখ যুদ্ধে তাকে পরাজিত করা দেব-দানব সকলের পক্ষেই কঠিন। তাই তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্থাৎ কুস্তি করেই হারাতে হবে। তিন প্রকার অগ্নির সাহায্যে যেমন যজ্ঞ কাজ সমাপন হয়, তেমনই আমার নীতি, ভীমের বাহুবল এবং অর্জুনের রক্ষাশক্তির সাহায্যে জরাসন্ধ বধ হওয়া সম্ভব। যখন একান্তে তার সঙ্গে আমাদের তিনজনের সাক্ষাৎ হবে তখন সে অবশ্যই আমাদের কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি হবে। একথা নিশ্চিত যে, সেই অহংকারী ভীমের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে। ভীম যে তার কাছে যমরাজের মতো প্রাণান্তক, এতে কোনো সন্দেহই নেই। আপনি যদি আমার হৃদয়ের কথা উপলব্ধি করেন, আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে ভীম ও অর্জুনকে আমার সঙ্গে দিন। আমি এ কাজ সম্পন্ন করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের কথায় ভীম ও অর্জুন আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ! উঃ, এমন কথা বলবেন না। আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার আশ্রিত ও সেবক। আপনার বাক্যের প্রতিটি অক্ষরই সত্য। আপনি যে পক্ষে আছেন, তাদের বিজয় নিশ্চিত। আপনার নির্দেশ মেনে নিয়ে আমার ইচ্ছে যে জরাসন্ধ বধ, বন্দী রাজাদের মুক্তি, রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন—সব কিছু কুশলেই সমাপ্ত হোক। প্রভু! আপনি সেই কাজই করুন, যাতে কার্য উদ্ধার হয়। আপনারা তিনজন ছাড়া আমি বাঁচতেও চাই না। অর্জুন ব্যতীত আপনি এবং আপনাকে ছাড়া অর্জুনের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আপনাদের দুজনের ওপর বিজয়লাভ করা কারোরও পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা দুজন থাকলে ভীম অসাধ্য সাধন করতে পারে। আপনি নীতি-নিপুণ। আপনার শরণ নিয়েই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করব। অর্জুন আপনার এবং ভীম অর্জুনের অনুগমন করবে। নীতি, ধর্ম এবং শক্তির মিলনে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন—তিনজনে মগধের দিকে রওনা হলেন। পদ্মসর, কালকূট, গণ্ডকী, মহাশোণ, সদনীরা, গঙ্গা, চর্মণ্বতী ইত্যাদি পর্বত এবং নদ-নদী পেরিয়ে তাঁরা মগধে এসে পৌঁছলেন। সেই সময় এঁরা বল্কল পরিধান করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ পর্বত গোরথে এসে পৌঁছলেন। সেখানে অনেক বড় বড় গাছ এবং সুন্দর জলাশয় ছিল। গোচারণের পক্ষে সেটি এক সুন্দর স্থান। সেইস্থান থেকে মগধরাজার রাজধানী স্পষ্ট দেখা যেত। সেখানে পৌঁছেই তাঁরা সর্বপ্রথম রাজধানীর পুরানো স্মৃতিগুলি নষ্ট করে দিলেন, তারপর তাঁরা মগধপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেই সময় ওখানে অনেক অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণরা জরাসন্ধের কাছে আবেদন করে অরিষ্ট শান্তির উদ্দেশ্যে জরাসন্ধকে হাতির পিঠে চাপিয়ে অগ্নি প্রদক্ষিণ করালেন। স্বয়ং মগধরাজও অরিষ্ট শান্তির জন্য অনেক নিয়ম পালন ও ব্রত উপবাস করলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করে তপস্বীবেশে জরাসন্ধের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নগরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের বিশাল বক্ষ দেখে নাগরিকরা বিস্মিত ও চমকিত হল। তাঁরা ক্রমশ জন সঙ্কীর্ণ এবং সুরক্ষিত নগরদ্বার পার হলেন এবং নির্ভীক চিত্তে

জরাসন্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। জরাসন্ধ তাঁদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং পাদ্য-অর্ঘ্য, মধুপর্ক ইত্যাদি দ্বারা তাঁদের আপ্যায়ন করলেন।

জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং ভীমের বেশবাসের সঙ্গে আচরণের কোনো মিল ছিল না। তাই জরাসন্ধ একটু ধমকের সুরে বললেন—'ওহে ব্রাহ্মণগণ ! আমি জানি যে স্নাতক ব্রহ্মচারীরা সভায় যাওয়া ছাড়া আর কোনো সময় মালা-চন্দন ধারণ করে না। বলুন, আপনারা কে ? আপনাদের বস্ত্র লাল, অঙ্গে পুষ্পমালা এবং অঙ্গরাগ। আপনাদের বাহুতে ধনুকের নিশান স্পষ্ট উঁকি মারছে। আপনারা সদর দিয়ে কেন এলেন না ? নির্ভয় হয়ে বেশ পরিবর্তন করে আর বুরুজ ধ্বংস করে আসার কারণ কী ? আপনাদের পরিধেয় ব্রাহ্মণের মতো হলেও আচরণ তার বিপরীত। ঠিক আছে, কারণ যাই হোক, আপনাদের আগমনের কারণ কী ?'

জরাসন্ধের কথা শুনে কুশল বক্তা শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ, গম্ভীর বাক্যে বললেন—'রাজন্ ! আমরা যে স্নাতক ব্রাহ্মণ, সে তো আপনি বুঝতেই পারছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তিনজনই স্নাতকের বেশ ধারণ করতে পারে। পুষ্পমালা ধারণ করা শ্রীমানদের কাজ। ক্ষত্রিয়দের বাহুই তাদের বল। আমরা বাক্যে বীরত্ব দেখাই না। আপনি যদি আমাদের বাহুবল দেখতে চান তাহলে এখনই দেখে নিন। ধীর, বীর ব্যক্তিরা শত্রুগৃহে অন্য পথে এবং মিত্র গৃহে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন। আমরা যা কিছু করেছি সবই সুসঙ্গত।'

জরাসন্ধ বললেন—'আমি কখনো আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা বা দুর্ব্যবহার করেছি তা মনে পড়ছে না। আমার মতো নিরপরাধকে শত্রু ভাবার কারণ কী ? সৎ ব্যক্তিদের পক্ষে কি এটি উচিত ? আমি আমার ধর্মে তৎপর, প্রজাদের অপকার করি না। তাহলে আমাকে শত্রু মনে করার কী কারণ ? আপনারা ভ্রমবশত একথা বলছেন না তো ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! তুমি ক্ষত্রিয়দের বলি দিতে উদ্যত হয়েছ, এটা কি ক্রূর কর্ম বা অপরাধ নয় ? তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হয়েও নিরপরাধ রাজাদের হিংসা করাকে কি উচিত বলে মনে কর ? কিন্তু বাস্তবে তাই। আমরা দুঃখীদের সাহায্য করতে চাই আর তুমি ক্ষত্রিয়দের নাশ করতে চাও। আমরা জাতির বৃদ্ধির জন্য তোমাকে বধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে এসেছি। তুমি যে অহংকারে পূর্ণ হয়ে ভাবছ যে, তোমার মতো যোদ্ধা ক্ষত্রিয়কুলে আর নেই, তা তোমার ভ্রম। এই বিশাল পৃথিবীর বুকে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীরও আছে। তোমার এই অহংকার আমাদের কাছে অসহ্য। নিজের সমকক্ষদের সম্মুখে এই অহংকার ত্যাগ করো। নাহলে তোমাকে পুত্র-মন্ত্রী ও সেনাসহ যমপুরী যেতে হবে। আমাদের আসার উদ্দেশ্যই হল যুদ্ধ করা। আমরা ব্রাহ্মণ নই। আমি বসুদেব পুত্র কৃষ্ণ, এঁরা দুজন পাণ্ডু-নন্দন ভীম এবং অর্জুন। আমরা তোমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছি। তুমি হয় সমস্ত নরপতিকে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দাও নচেৎ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরলোকে গমন কর।'

জরাসন্ধ বললেন—'বাসুদেব ! আমি কোনো রাজাকে পরাজিত না করে আনিনি। তুমি বল আমি কাকে পরাজিত করিনি, কে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে ? আমি কি তোমার ভয়ে এই রাজাদের মুক্তি দেব ? তা সম্ভব নয়। তুমি ইচ্ছা করলে সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে পার। আমি একাই একজন বা তিনজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি। চাও তো এক সঙ্গে এস অথবা পৃথক ভাবে ?' এই বলে জরাসন্ধ তাঁর পুত্রের রাজ্যাভিষেকের নির্দেশ দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন দৈববাণী অনুসারে যদু-বংশীয়দের হাতে জরাসন্ধ বধ হওয়া উচিত নয়। তাই তিনি জরাসন্ধকে নিজে বধ না করে ভীমের দ্বারা বধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

—o—

জরাসন্ধ-বধ এবং বন্দী রাজাদের মুক্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, জরাসন্ধ যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! তুমি আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও ? আমাদের মধ্যে কে প্রস্তুত হবে ?' জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি মালা ও মাঙ্গলিক তিলক পরলেন, আঘাত প্রতিরোধ করার জন্য বাজুবন্ধ পরলেন, ব্রাহ্মণরা এসে স্বস্তিবাচন করলেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুযায়ী তাঁরা মুকুট খুলে রেখে চুল বেঁধে নিলেন। জরাসন্ধ বললেন—'ভীম এসো ! বলবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে গেলেও যশ লাভ হয়।'

মহাবলী ভীম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে জরাসন্ধের সঙ্গে লড়াই করার জন্য মল্লযুদ্ধের স্থানে গেলেন। উভয়েই বিজয় লাভ করতে আগ্রহী ছিলেন। দুজনেই নিজ নিজ বাহুকে অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার শুরু করলেন। হাত ধরার আগে দুজনেই একে অন্যের পা স্পর্শ করলেন। তারপর দুজনেই তাল ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁরা তৃণপীড়, পূর্ণযোগ, সমুষ্টিক ইত্যাদি নানা মারপ্যাঁচ কষলেন। দুজনের এই মল্লযুদ্ধ অপূর্ব হয়েছিল। তাঁদের মল্লযুদ্ধ দেখার জন্য হাজার হাজার পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র, আবালবৃদ্ধবনিতা একত্রিত হয়েছিল। তাঁদের মারামারি, টানাটানি, ধস্তাধস্তিতে কর্কশ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কখনো তাঁরা হাত দিয়ে একজন অপরকে ধাক্কা মারেন, আবার ঘাড় ধরে ঘুরিয়ে দেন, কখনো একে অপরকে তাড়া করে টেনে আনেন, হাঁটু দিয়ে ধাক্কা মারেন এবং হুংকার দিয়ে ঘুসির আঘাত করেন। তাঁরা যেদিকে যান, জনতা সেদিক থেকে পালিয়ে অন্য দিকে চলে আসে। দুজনেই হৃষ্ট-পুষ্ট, বিশাল বক্ষ এবং দীর্ঘ বাহুসম্পন্ন, তাঁরা এমনভাবে যুদ্ধ করছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন দুটি লোহার গদা পরস্পর ঠোকাঠুকি খাচ্ছে।

সেই যুদ্ধ কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে শুরু হয়ে একনাগাড়ে তেরো দিন-রাত ধরে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে লাগাতার চলতে থাকল। চতুর্দশ দিনে রাত্রের সময় জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর দশা দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বীর ভীমসেন ! শত্রু ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে বেশি চাপ দেওয়া উচিত নয়। আরে ! বেশি জোর দিলে তো ও মরে যাবে। এখন তুমি আর ওকে বেশি চাপ না দিয়ে শুধু বাহুদ্বারা যুদ্ধ করো।' শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনেই ভীম জরাসন্ধের অবস্থা বুঝে গেলেন এবং তাঁকে মেরে ফেলার সংকল্প নিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে আরও উৎসাহ দেবার জন্য সংকেত করলেন—'ভীম ! তোমার মধ্যে দৈববল এবং বায়ুবল উভয়ই বিদ্যমান। তুমি জরাসন্ধের ওপর একটু সেই বিদ্যা দেখাও তো।' শ্রীকৃষ্ণের ইশারা বুঝতে পেরে বলবান ভীম তাঁকে উঠিয়ে অত্যন্ত বেগে শূন্যে ঘোরাতে লাগলেন। অনেকবার ঘোরাবার পর তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর পিঠের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পাঁজরগুলো টুকরো টুকরো করে দিলেন। তার সঙ্গে হুংকার দিয়ে উঠে এক পা দিয়ে জরাসন্ধের একটি পা চেপে অন্য পা-টিকে তুলে তাকে দুখণ্ড করে ফেললেন। জরাসন্ধের এই দুর্দশা দেখে এবং ভীমের গর্জন শুনে উপস্থিত জনতা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। নারীগণ এই সব ঘটনা দেখে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়লেন, সন্তানসম্ভবাদের গর্ভপাতের উপক্রম হল। সকলে চমকে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল যে, হিমালয় ভেঙে পড়েনি তো, নাকি পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে !

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং ভীম শত্রু নাশ করে তাঁর প্রাণহীন দেহ রানিমহলের দেউড়িতে রেখে এলেন এবং রাত্রি থাকতে থাকতেই সেইখান থেকে বেরিয়ে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের ধ্বজামণ্ডিত দিব্যরথ অধিগ্রহণ করে নিলেন। সেই রথে ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে সেখান থেকে বন্দী রাজাদের উদ্ধার করতে পাহাড়ী দুর্গে এলেন। তাঁদের

মুক্ত করে সেই রথেই রাজাদের সঙ্গে রওনা হলেন। রথটির নাম ছিল সৌদর্যবান। দুজন মহারথী একসঙ্গে তার ওপরে বসে যুদ্ধ করতে পারতেন। সেই রথে ভীম ও অর্জুন বসলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সারথি হলেন। এই রথে করেই ইন্দ্র এর আগে নিরানব্বই বার দানব সংহার করেছিলেন। এর মাথায় একটি ধ্বজা ছিল, যেটি আধার বিনাই উড়তে থাকত, ইন্দ্রধনুর মতো সেটি চমকাত এবং এক যোজন দূর থেকে দেখা যেত। এই রথ ইন্দ্র বসু নামক রাজাকে, বসু বৃহদ্রথকে, বৃহদ্রথ জরাসন্ধকে দিয়েছিলেন। সেই দিব্যরথ পেয়ে তিন জন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেখান থেকে রওনা হলেন।

পরম যশস্বী করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথ চালিয়ে গিরিব্রজের বাইরে বেরিয়ে ময়দানে এলেন। সেখানে ব্রাহ্মণ ও অন্য নাগরিকগণ এবং বন্দীমুক্ত রাজাগণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা ভক্তিতে পূজা করলেন। রাজারা বললেন—'হে সর্বশক্তিমান ! ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে করে আপনি আমাদের মুক্ত করে ধর্ম রক্ষা করেছেন। এ আপনারই উপযুক্ত কাজ। আমরা জরাসন্ধরূপ বিশাল সরোবরের কর্দমে আবদ্ধ ছিলাম। আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। সর্বশক্তিমান যদুনন্দন ! আমরা দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করেছি। আপনি

উজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করেছেন। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়েছি। আমাদের আদেশ দিন, আপনার জন্য কোনো কঠিন কাজ সম্পন্ন করি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন—'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজচক্রবর্তীপদ লাভ করার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান। আপনারা তাঁকে সাহায্য করুন।' রাজাদের আনন্দের সীমা রইল না। সকলে আন্তরিকভাবে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। তাঁরা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রত্নরাশি উপহার দিতে লাগলেন। ভগবান অনুগ্রহ করে তাঁদের উপহার গ্রহণ করলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব মন্ত্রীদের সঙ্গে করে বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীতবিহ্বল সহদেবকে অভয় প্রদান করে তাঁর প্রদত্ত উপহার স্বীকার করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন সেখানে সহদেবের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। সহদেব প্রসন্ন হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্ঞাতি দুই ভাই এবং রাজাদের নিয়ে ধনরত্নপূর্ণ রথে শোভিত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছলেন। তাঁদের দেখে ধর্মরাজের আনন্দের সীমা রইল না। ভগবান বললেন—'রাজেন্দ্র ! অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, বীর ভীম জরাসন্ধকে বধ করে এবং বন্দীরাজাদের মুক্ত করে যশলাভ করেছে। ভীম এবং অর্জুন যে কার্যসিদ্ধি করে কুশলে ফিরে এসেছে, এর থেকে বেশি আনন্দ আর কী হতে পারে ?' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং ভাইদের অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুতে পাণ্ডবরা সকলেই আনন্দিত হলেন। তাঁরা সকলে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত রাজাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের যথোচিত আদর আপ্যায়ন করলেন। রাজারা ধর্মরাজের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বাহনে করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

পরম জ্ঞানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে জরাসন্ধকে বধ করিয়ে ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং ধৌম্যের থেকে বিদায় নিয়ে, জরাসন্ধের যে রথটি তাঁরা এনেছিলেন, যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সেই রথেই আরোহণ করে দ্বারকায় রওনা হলেন। যাত্রার সময় পাণ্ডবরা সেই আনন্দমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথোচিত অভিবাদন এবং পরিক্রমা করলেন। জনমেজয় ! এই ঐতিহাসিক বিজয়প্রাপ্তি এবং বন্দী রাজাদের মুক্তি দিয়ে অভয় দান করায় পাণ্ডবদের যশ দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সময়ানুকূল ধর্মে দৃঢ় থেকে প্রজাপালন করতে লাগলেন। ধর্ম-অর্থ এবং কাম—এই তিন পুরুষার্থই তাঁর সেবায় সংলগ্ন ছিল।

—o—

পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একদিন অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ি এবং আপনার জন্য পৃথিবীর সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায় করে আসি।' যুধিষ্ঠির অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—'অবশ্যই, তোমার নিশ্চিত বিজয়লাভ হবে।' যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লাভ করে চার ভাই দিগ্বিজয়ের জন্য রওনা হলেন। জনমেজয় ! যদিও চার ভাই একই সময়ে চতুর্দিকে বিজয় লাভ করেছিলেন, তবুও আমি তোমাকে তাঁদের বর্ণনা একে একে শোনাব।

জনমেজয় ! অর্জুন উত্তর দিক জয় করার ভার নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণভাবেই প্রথমে আনর্ত, কালকূট এবং কুলিন্দ দেশ জয় করে, সৈন্যসহ সুমণ্ডল রাজাকে পরাজিত করলেন। সুমণ্ডলকে সঙ্গী করে শাকলদ্বীপ এবং প্রতিবিন্ধ্য পর্বতের রাজাদের পরাজিত করলেন। সাতদ্বীপের রাজাদের মধ্যে শাকলদ্বীপবাসীরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করল। কিন্তু অর্জুনের বাণের মুখে তাদের হার স্বীকার করতে হল। তাঁদের সহায়তায় অর্জুন প্রাগজ্যোতিষপুরে আক্রমণ চালালেন। সেখানকার প্রতাপশালী রাজা ভগদত্ত, তাঁর পক্ষে কিরাত, চীন ইত্যাদি অনেক সামুদ্রিক দেশের লোক ছিলেন। আট দিন ভয়ংকর যুদ্ধ হবার পরেও অর্জুনের

উৎসাহ পূর্ববৎ দেখে ভগদত্ত হেসে বললেন—'মহাবাহু অর্জুন ! তোমার পরাক্রম তোমারই যোগ্য, তুমি তো দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ! ইন্দ্রের সঙ্গে আমার মিত্রতা আছে আর আমিও তাঁর তুলনায় কম বীর নই। তাই আমি আর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। পুত্র ! আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব ; বল, কী চাও ?' অর্জুন বললেন, 'রাজন্ ! কুরুবংশশিরোমণি, সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে আগ্রহী। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি চক্রবর্তী সম্রাট হন। আপনি তাঁকে কর প্রদান করুন। আপনি আমার পিতা ইন্দ্রের মিত্র এবং আমার হিতৈষী। তাই আমি আপনাকে তো আদেশ দিতে পারি না, আপনি বন্ধুভাবেই ওঁকে উপহার দিন।' ভগদত্ত বললেন—'অর্জুন ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তোমার মতো আমার প্রিয়পাত্র। আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। আর কিছু বলার থাকলে বল।' বীর অর্জুন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রওনা হয়ে গেলেন।

অর্জুন কুবের সুরক্ষিত উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে পর্বতের আভ্যন্তর, বাহিরের এবং আশে-পাশের সব স্থান অধিকার করে নিলেন। উলূক দেশের রাজা বৃহন্ত ভীষণ যুদ্ধ করে পরাজয় স্বীকার করে অর্জুনের শরণ নিলেন। অর্জুন তাঁর রাজ্য তাঁকেই সমর্পণ করে তাঁর সাহায্যে সেনাবিন্দুর দেশ আক্রমণ করে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করলেন। তারপর ক্রমশ মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুসংকুল এবং উত্তর উলূক দেশগুলির রাজাদের বশীভূত করে পঞ্চগণদের নিজের বশে আনলেন। তিনি পৌরব নামক রাজা এবং পাহাড়ী হানাদার এবং ম্লেচ্ছ, যারা সাত প্রকারের ছিল, তাদেরও জয় করলেন। কাশ্মীরের বীর ক্ষত্রিয় এবং দশমণ্ডলের অধ্যক্ষ রাজা লোহিতও তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেন। ত্রিগার্ত, দারু এবং কোকনদের নরপতিগণ নিজেরাই অধীনতা স্বীকার করলেন। অর্জুন অভিসারীর ওপর অধিকার করে উরগ দেশের রাজা রোচমানকে হারালেন এবং বাহ্লীক বীরদের নিজের অধীন করে দরদ, কম্বোজ এবং ঋষিক দেশকে নিজের অধীন করলেন। ঋষিক দেশ থেকে টিয়াপাখির পেটের মতো সবুজ রংয়ের আটটি ঘোড়া নিলেন। নিকূট এবং সম্পূর্ণ হিমালয়ে বিজয় পতাকা উড়িয়ে ধবলগিরির ওপরে সেনাদের ছাউনি করলেন।

ক্রমশ অর্জুন কিম্পুরুষবর্ষের অধিপতি দ্রুমপুত্র এবং হাটক দেশের রক্ষক গুহ্যকদের হারিয়ে মানসসরোবর পৌঁছলেন। সেখানে তিনি ঋষিদের পবিত্র আশ্রমগুলি দর্শন

করলেন। ওখান থেকে হাটক দেশের আশপাশের প্রান্তগুলিও অধিকার করলেন। তারপর অর্জুন উত্তরে হরিবর্ষকে জয় করতে চাইলেন। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করতেই সেখানকার বিশালকায়, বীর দ্বাররক্ষক এসে প্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি নিশ্চয়ই কোনো অসাধারণ ব্যক্তি ! কেননা এখানে কেউ সহজে পৌঁছতে পারে না। আপনি এখানে এসেছেন, এতেই বিজয়লাভ করেছেন। এখানকার কোনোবস্তুই মনুষ্য-শরীরে দেখা যায় না। অতএব দিগ্বিজয়ের কথা ওঠে না। আমরা আপনার ওপর প্রসন্ন। আপনার কোনো কাজ থাকলে বলুন।' অর্জুন হেসে বললেন—'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে চক্রবর্তী সম্রাট করার উদ্দেশ্যে আমি দিগ্বিজয়ে বার হয়েছি। তোমাদের এখানে যদি মানুষের আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ হয়, তাহলে আমি ভেতরে ঢুকব না ; তোমরা শুধু কিছু কর দিয়ে দাও।' হরিবর্ষের লোকেরা অর্জুনকে করবাবদ অনেক দিব্য বস্ত্র, অলংকার, মৃগচর্ম ইত্যাদি দিলেন। এইভাবে উত্তর দিকে বিজয় লাভ করে বীরবর অর্জুন মহান চতুরঙ্গিণী সেনা

সহ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। সমস্ত অর্থ-সামগ্রী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করে তাঁর নির্দেশে নিজ মহলে গেলেন।

জনমেজয় ! অর্জুনের সঙ্গে ভীমও ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে বহু সৈন্যসহ পূর্ব দিকে রওনা হয়েছিলেন। দশার্ণদেশের রাজা সুধর্মা বিনা অস্ত্রে ভীমের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ভীম তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজের সেনাপতি করে নিলেন। তাঁরা ক্রমশ অশ্বমেধ, পুলিন্দনগর ইত্যাদি অধিকাংশ প্রাচ্য রাজ্য অধিকার করলেন। চেদিদেশের রাজা শিশুপালের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়নি। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়-সম্পর্ক থাকায় ধর্মরাজের খবর পেয়েই তিনি কর দিতে স্বীকার করে নিলেন। তারপর ভীম কুমার দেশের রাজা শ্রেণিমানকে, কোশল দেশের অধিপতি বৃহদ্‌বলকে এবং অযোধ্যাপতি ধর্মাত্মা দীর্ঘযজ্ঞকে অনায়াসে বশীভূত করলেন। তারপর উত্তর কোশল, মল্লদেশ, হিমালয়-তটবর্তী জলোদ্ভবদেশের প্রান্ত নিজের অধীন করলেন। কাশিরাজ সুবাহু, সুপার্শ্ব, রাজেশ্বর ক্রথ, মৎস্য এবং মলদদেশের বীরদের এবং বসুভূমিকেও নিজের অধীনে আনলেন। উত্তর-পূর্বের দেশগুলির মধ্যে মদধার, সোমধেয় এবং বৎসদেশকেও নিজ বশে আনলেন। ভর্গদেশের অধিপতি নিষাদরাজ এবং মণিমানের ওপর বিজয়প্রাপ্ত হয়ে দক্ষিণমল্ল এবং ভোগবান পর্বতের ওপরও তিনি নিজ শক্তি কায়েম করেন। শর্মক ও বর্মকের ওপর বিজয় লাভ করে মিথিলা জয় করেন এবং সেখান থেকে কিরাত রাজাদেরও নিজ বশে আনেন। সুহ্ম, প্রসুহ্ম, দণ্ড, দণ্ডধার প্রমুখ নরপতিগণ অনায়াসে পরাজিত হন। গিরিব্রজ থেকে জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে মোদাচলের রাজাকে সংহার করেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব এবং কৌশিক নদীর দ্বীপে বসবাসকারী রাজাও পরাজিত হলেন। বঙ্গদেশের রাজা সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, কর্বটাধিপতি তাম্রলিপ্ত এবং সকল সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছগণও তাঁর অধীনস্থ হলেন। এইভাবে নানাদেশে বিজয়লাভ করে ভীম

লৌহিত্যের কাছে এলেন। সমুদ্রতট এবং সমুদ্রের মধ্যে থাকা ম্লেচ্ছগণ বিনাযুদ্ধেই তাঁকে নানাপ্রকার হীরা, মতি, মাণিক্য, সোনা, রূপা, বস্ত্র ইত্যাদি প্রদান করলেন। বহু-ধন দিয়ে তাঁরা ভীমকে সন্তুষ্ট করলেন। ভীম সমস্ত ধন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে সমস্ত ধন-রত্নাদি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজকে অর্পণ করলেন।

জনমেজয় ! সেই সময় অন্য ভ্রাতা সহদেবও বিশাল সৈন্যদল নিয়ে দিগ্বিজয়ের জন্য দক্ষিণে যাত্রা করেন। তিনি ক্রমশ মথুরা, মৎস্যদেশ এবং অধিরাজের অধিপতিদের বশে এনে করদ সামন্ত করে নেন। রাজা সুকুমার এবং সুমিত্রের পরে দ্বিতীয় মৎস্য এবং পটচ্চরেদের জয় করেন এবং বলপূর্বক নিষাদভূমি গোশৃঙ্গপর্বত এবং শ্রেণিমান রাজাকে নিজের অধীন করেন। নররাষ্ট্রের ওপর বিজয়লাভ করার পরে তিনি কুন্তিভোজের ওপর আক্রমণ করেন এবং কুন্তিভোজ সানন্দে ধর্মরাজের শাসন মেনে নেন। সহদেব তারপরে নর্মদার দিকে এগোলেন। উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ বীর বিন্দ এবং অনুবিন্দকে পরাজিত করে বশে আনেন। নাটকীয় এবং হেরম্বককে পরাস্ত করে মারুধ এবং মুঞ্জগ্রাম অধিকার করেন। ক্রমশ তিনি অর্বুদ, বাতরাজ এবং পুলিন্দকে পরাজিত করে পাণ্ড্যনরেশকে পরাজিত করেন এবং কিষ্কিন্ধার ময়ন্দ এবং দ্বিবিদকে পরাজিত করে মাহিষ্মতীর ওপর আঘাত আনেন। ভয়ংকর যুদ্ধের পর মহারাজ নীল তাঁর করদ সামন্ত হওয়াকে মেনে নিলেন। আরও এগিয়ে তিনি ত্রিপুর-রক্ষক এবং পৌরবেশ্বরকে বশীভূত করেন। সুরাষ্ট্রদেশের অধিপতি কৌশিকাচার্য আকৃতিকে পরাজিত করে ভোজককটকে রুক্মী এবং নিষদের ভীষ্মকের কাছে দূত পাঠালেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় আনন্দের সঙ্গে সহদেবের নির্দেশ মেনে নিলেন। সেখান থেকে এগিয়ে শূর্পারক, তালাকূট, দণ্ডক এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তীদের নিজ অধীন করে ম্লেচ্ছ, নিষাদ, পুরুষাদ, কর্ণপ্রাবরণ এবং কালমুখসংগক মানুষ এবং রাক্ষসদেরও পরাজিত করেন। কোল্লাচল, সুরভীপট্টন, তাম্রদ্বীপ, রামপর্বত তাঁর বশীভূত হল। রাজা তিমিঙ্গিল, জঙ্গলাকীর্ণ কেরল, একপদ বিশিষ্ট মানুষ এবং সঞ্জয়ন্তী নগর তাঁর অধীন হল। পাষণ্ড এবং করহাটকও বাদ থাকল না। পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উণ্ড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্রকর্ণিক, আটবীপুরী এবং আক্রমণকারী যবনদের রাজধানীও তাঁর

বশে এল। সহদেব দূত মারফৎ লঙ্কায় খবর পাঠালে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বিভীষণ তা মেনে নিলেন। সহদেব এগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বলে মনে করলেন। সব জায়গা থেকেই তাঁরা নানা মহার্ঘ বস্তু উপহার হিসাবে পেলেন। সব জিনিস নিয়ে, সব রাজাদের সামন্ত করে বুদ্ধিমান সহদেব অতি শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। সমস্ত উপহার সামগ্রী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনি মহানন্দে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করতে লাগলেন।

জনমেজয় ! নকুলও সেইসময় খুব বড় সৈন্যদল নিয়ে পশ্চিমে প্রস্থান করেন। স্বামিকার্তিকের প্রিয় ধন-ধান্য-গোধন পরিপূর্ণ রোহিতকে দেশের মত্তময়ূর শাসকের সঙ্গে তাঁর ঘোর যুদ্ধ হল। শেষে নকুল মরুভূমি, শৈরীষক এবং অন্নভাণ্ডার মহেত্থ দেশ সম্পূর্ণ অধিকার করেন। রাজর্ষি আক্রোশকে বশীভূত করে দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান এবং দ্বিজদের জয় করলেন। সেখান থেকে ফিরে পুষ্কর নিবাসী উৎসব-সংকেতকে, সিন্ধুতটবর্তী গন্ধর্বকে এবং সরস্বতী তীরবর্তী শূদ্র এবং আভীরদের বশীভূত করলেন। সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট নগর এবং দ্বারপাল তাঁর অধীন হল। পশ্চিমের রামঠ, হার এবং হূণ প্রমুখ রাজা
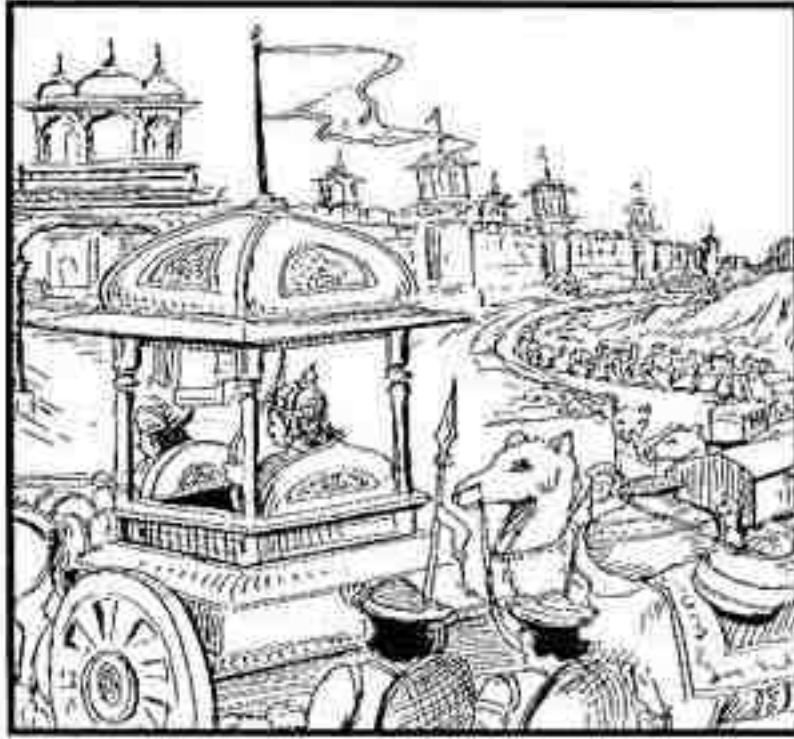
নকুলের আদেশমাত্রই অধীনে এলেন। দ্বারকাবাসী যদু-বংশীয়গণ এবং শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নকুলের শাসন মেনে নিলেন। নকুলের মামা শল্যও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। সবার কাছ থেকে ধন-রত্ন নিয়ে নকুল সমুদ্রতীরের ভয়ানক ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্বর, কিরাত, যবন এবং শকরাজাকে পরাজিত করেন। সবার কাছ থেকে বহুমূল্য উপহার নিয়ে তিনি খাণ্ডবপ্রস্থে এলেন। নকুল এত জিনিস উপহার নিয়ে এলেন যে, তা দশহাজার হাতি অতি কষ্টে বহন করে নিয়ে এল। ইন্দ্রপ্রস্থে এসে তিনি বরুণ সুরক্ষিত ও শ্রীকৃষ্ণ অধিকৃত পশ্চিম দিক জয় করে সমস্ত ধনরাশি যুধিষ্ঠিরকে অর্পণ করলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজের সত্য নিষ্ঠা, প্রজাপালনে অনুরাগ এবং শত্রুসংহার দেখে প্রজারা নিজেরাই নিজ নিজ ধর্মে নিরত থাকত। শাস্ত্র অনুসারে কর আদায় এবং ধর্মপূর্বক শাসন করার ফলে সময়মতো বর্ষা হত, রাষ্ট্র সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল ; রাজার পুণ্য প্রভাবে চাষ-বাস, ব্যবসা এবং গোপালন ঠিকমতো হতে থাকল। প্রজাদের মধ্যে প্রতারণা, চুরি এবং ছিনতাইয়ের কোনো ব্যাপারই ছিল না। রাজকর্মচারীরা মিথ্যাভাষী ছিল না। ধর্মরাজের ধর্মাচরণের ফলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ ও অগ্নিভয় ছিল না। লোকে তাঁর কাছে উপহার দিতে অথবা তাঁর প্রিয় কার্য করার জন্যই আসতেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নয়। রাজকোষ ধর্মানুকূল অর্থে পূর্ণ এবং অক্ষয় হয়ে থাকত।

ধর্মরাজ যখন দেখলেন যে, তাঁর ভাণ্ডার অন্ন-বস্ত্র-রত্নে পরিপূর্ণ, তখন তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন। মিত্ররা সকলে পৃথকরূপে এবং একত্রিতভাবে তাঁকে যজ্ঞ করার জন্য আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, এখন শীঘ্রই যজ্ঞ আরম্ভ করা উচিত। লোকের আগ্রহ যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এসে পৌঁছলেন। জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ, তিনি বেদস্বরূপ এবং জ্ঞানীরা তাঁকে ধ্যানে দর্শন করেন। জড় চেতনময় এই জগতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অধিপতি, দৈত্যনাশক, ভক্তবৎসল

এবং আপৎকালে শরণ প্রদায়ক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত যুধিষ্ঠিরকে কৃপা করার জন্য অসীম ধন, অক্ষয় রত্নরাশি এবং মহান সেনা নিয়ে রথধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে পৌঁছলেন। সকলে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইরা পুরোহিত ধৌম্য এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সহ মুনি ঋষিরা তাঁর কাছে গেলেন। বিশ্রাম ও কুশল প্রশ্নাদির পরে ধর্মরাজ বললেন—'ভগবান ! আপনার কৃপাতেই সমস্ত ভূমণ্ডল আমাদের অধীন হয়েছে। বহু ধন-সম্পত্তিও আমরা লাভ করেছি ; এসবই আপনার কৃপায়

হয়েছে। এখন আমার ইচ্ছা এর দ্বারা আমি যাগ-যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাই। আপনি এখন ইঙ্গিত রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমাকে অনুমতি দিন। গোবিন্দ ! আপনি যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করুন। আপনার যজ্ঞে আমি নিষ্পাপ হয়ে যাব, অথবা আমাকেই যজ্ঞদীক্ষা নেওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। আপনার ইচ্ছানুসারে সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন হবে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের গুণাদির বর্ণনা করে বললেন—'মহারাজ ! আপনি সম্রাট। আপনারই এই মহাযজ্ঞ করা উচিত। এখন আপনি এই যজ্ঞের দীক্ষা নিন।' যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে বললেন—'হৃষিকেশ ! আপনি আমার ইচ্ছানুসারে নিজেই এসে পড়েছেন। এতেই আমার সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে, এখন যজ্ঞ যে ঠিকমতো সম্পন্ন হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই।'

তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সহদেব এবং মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন যে, ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত ধৌম্যের আদেশ অনুসারে যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী যেন সুসজ্জিত করা হয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, সহদেব বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে—'প্রভু ! আপনি নির্দেশ দেওয়ার আগেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।' তখন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তেজস্বী, তপস্বী এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিয়ে এলেন। তিনি নিজে যজ্ঞের ব্রহ্মা হলেন এবং সুসামা সামদেবের উদ্গাতা। ব্রহ্মজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু হলেন, পৈল এবং ধৌম্য হোতা। এইসব ঋষিদের বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী শিষ্য এবং পুত্রগণ সদস্য হলেন। স্বস্তিবাচনের পরে যজ্ঞের শাস্ত্রোক্ত বিধি সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা করে বিশাল যজ্ঞশালার পূজা করা হল। শিল্পীরা নির্দেশানুসারে সুগন্ধে পরিপূর্ণ দেবমন্দিরের মতো অনেক অট্টালিকা তৈরি করলেন। তারপর ধর্মরাজ সহদেবকে নিমন্ত্রণ করার জন্য দূত পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। সহদেব দূতদের পাঠাবার সময় বলে দিলেন যে, 'দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের নিমন্ত্রণ করে এসো আর বৈশ্য এবং সম্মানীয় শূদ্রদের সঙ্গে করে নিয়ে এসো।' দূতরা তাই করল।

জনমেজয় ! ব্রাহ্মণরা ঠিক সময়ে ধর্মরাজকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষা দিলেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ, ভাই, আত্মীয়-পরিজন, সখা-সহচর, সমাগত ক্ষত্রিয় এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন। চতুর্দিক থেকে শাস্ত্র-পারঙ্গম, বেদ-বেদান্ত নিপুণ ব্রাহ্মণ দলে দলে আসতে লাগলেন। তাঁদের বসবাসের জন্য হাজার হাজার স্থপতি এমন বাসস্থান তৈরি করেছিলেন যাতে অন্ন-জল-বস্ত্রাদি সহ সর্বঋতুর যোগ্য সুখকর সামগ্রী পরিপূর্ণ ছিল। সেই নিবাস স্থানে ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন চিত্তে কথাবার্তা, ভোজন-শয়ন করতে পারতেন। সেই স্থানটি আন্তরিকতা এবং প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ছিল।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্রদের আমন্ত্রণ করার জন্য নকুলকে হস্তিনাপুরে পাঠালেন। নকুল সেখানে গিয়ে সকলকে বিনয় সহকারে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁরাও অত্যন্ত প্রসন্ন সহকারে নিমন্ত্রণ স্বীকার করে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে সেখানে এলেন। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, কৃপাচার্য, দুর্যোধন প্রমুখ সমস্ত কৌরব, গান্ধার দেশের রাজা সুবল, শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শাল্য, ভগদত্ত, পার্বত্য প্রদেশের নরপতি, বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, কুন্তিভোজ, কলিঙ্গাধিপতি, বঙ্গ, আকর্ষ, কুন্তল, মালব, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, সিংহল, কাশ্মীর ইত্যাদি দেশের রাজা, গৌরবাহন, বাহ্লীক দেশের রাজা, বিরাট এবং তাঁর পুত্র মাবেল্ল, শিশুপাল এবং তাঁর পুত্ররা সকলেই যজ্ঞস্থলে এলেন। যজ্ঞে সমাগত রাজা এবং রাজকুমারদের গণনা করা কঠিন। সকলেই বহুমূল্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, কঙ্ক, সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, উল্মুক প্রমুখ সমস্ত যাদব মহারথীও এসেছিলেন। ধর্মরাজের নির্দেশে সমস্ত সমাগত রাজাদের অভ্যর্থনা করে পৃথক পৃথক স্থানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁদের থাকার জায়গায় খাওয়া দাওয়া এবং শয়নের উত্তম ব্যবস্থা ছিল এবং ভবনগুলি মনোহর বৃক্ষদ্বারা সজ্জিত ছিল। স্বাগত অভ্যর্থনার পর সকলেই নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভবনে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণাচার্যের চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন—'আপনারা এই যজ্ঞে আমাকে সাহায্য করুন। এই বিশাল ধনাগার নিজেদের বলে মনে করুন এবং এমন কাজ করুন যাতে

আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।' যজ্ঞে দীক্ষিত ধর্মরাজ তাঁদের সম্মতি নিয়ে সকলকে এক একটি কাজের দায়িত্ব দিলেন। দুঃশাসন আহার ব্যবস্থার দেখাশোনায়, অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণদের সেবা-শুশ্রূষায়, সঞ্জয় রাজাদের আদর-অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হলেন। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য সমস্ত কার্য এবং কর্মচারীদের দেখাশোনা করতে লাগলেন। কৃপাচার্য বহুমূল্য

অলঙ্কারাদির দেখাশোনা এবং দক্ষিণা দেওয়ার ব্যাপারে নিযুক্ত হলেন। বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত, জয়দ্রথ গৃহের প্রভুর ন্যায় অবস্থান করলেন। ধর্মের মর্মজ্ঞ বিদুর খরচ-খরচার ব্যাপারে এবং দুর্যোধন উপহার সামগ্রী ঠিকমতো রাখার কাজে ব্যাপৃত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণদের পদ-প্রক্ষালনের ভার নিলেন। এইভাবে সকল ব্যক্তিই কোনো না কোনো কার্যভার গ্রহণ করলেন।

জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করে কৃতকৃত্য হওয়ার আশায় সেখানে বহু লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা কেউই সহস্র মুদ্রার কম উপহার দেননি। তাঁরা সকলেই চাইছিলেন যেন তাঁর অর্থেই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সেনার বেষ্টনী বিচিত্র রথের সারি, রত্নরাশি, লোকপালকের রথ, ব্রাহ্মণদের স্থান এবং রাজাদের ভিড়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের শোভা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য লোকপাল বরুণের সমান ছিল। তিনি যজ্ঞস্থলে ছয়টি অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করে পুরো দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করলেন। অতিথি-অভ্যাগতদের আশা অনুযায়ী উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। সবার খাওয়া হয়ে গেলেও বহু অন্ন উদ্বৃত্ত হয়েছিল। সেই উৎসব সমারোহে চতুর্দিকেই ধনরত্নের বাহার দেখা যাচ্ছিল। মহর্ষি এবং মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণরা উত্তম রীতিতে ঘি-তিল-শাকল্য ইত্যাদি আহুতি দিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করলেন। দক্ষিণা হিসাবে বহু ধনরাশি পেয়ে ব্রাহ্মণরাও সন্তুষ্ট হলেন। জনমেজয় ! সেই যজ্ঞে সকলেই তৃপ্ত হয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বাগ্রেপূজা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যজ্ঞের অন্তে অভিষেকের দিনে অভ্যর্থনাযোগ্য মহর্ষি এবং ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞশালার অন্তর্বেদীতে প্রবেশ করলেন। নারদাদি মহাত্মা রাজর্ষিদের সঙ্গে অত্যন্ত শোভমান হয়েছিলেন। সেই অন্তর্বেদী দেখে মনে হচ্ছিল যেন নক্ষত্রখচিত আকাশ। সেইসময় সেখানে কোনো শূদ্র অথবা দীক্ষাহীন ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ধর্মরাজের রাজ্যলক্ষ্মী এবং যজ্ঞবিধি দেখে দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ক্ষত্রিয়দের সমাবেশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন এঁদের রূপে সমস্ত দেবতা একত্রিত হয়েছেন। তখন তাঁরা মনে মনে কমল নয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। দেবর্ষি নারদ ভাবতে লাগলেন—'ধন্য ! সর্বব্যাপী, অসুরবিনাশক, অন্তর্যামী

ভগবান নারায়ণ তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য ক্ষত্রিয়কুলে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। যিনি পূর্বেই দেবতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সংহার কার্য সম্পূর্ণ করো এবং পরে নিজ লোকে ফিরে এসো, সেই কল্যাণকারী জগন্নাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্রাদি সকলেই যাঁর বাহুবলের উপাসনা করেন, সেই প্রভু এখানে মানুষের ন্যায় উপবেশন করে আছেন। স্বয়ংপ্রকাশ মহাবিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) এই বলশালী ক্ষত্রিয়বংশকে অবশ্যই আত্মসাৎ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত যজ্ঞদ্বারা আরাধ্য, সর্বশক্তিমান এবং অন্তর্যামী।' দেবর্ষি নারদ এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। সেই সময় মহাত্মা ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্! এবার তুমি সমাগত রাজাদের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করো। আচার্য, ঋত্বিক, আত্মীয়, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয় ব্যক্তিদের বিশেষ পূজা-অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত। এঁরা আমাদের এখানে অনেক দিন পরে এসেছেন সুতরাং তুমি সকলকে পৃথকভাবে পূজা করো এবং যিনি এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে সর্বপ্রথমে।' ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ, কৃপা করে বলুন, সমাগত সজ্জনদের মধ্যে কাকে সর্বপ্রথম পূজা করব? আপনি কাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন?' শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বললেন—'ধর্মরাজ! যদুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীতে সর্বাগ্রে শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র। তুমি দেখছ না উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

তেজ, বল, পরাক্রমে তেমনই দেদীপ্যমান, যেমন তারাদের মধ্যে সূর্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান যেমন সূর্যের শুভাগমনে এবং বায়ুহীন স্থান যেমন বায়ুসঞ্চারে জীবন জ্যোতি দ্বারা ভরে ওঠে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আমাদের সভা আহ্লাদিত ও উদ্ভাসিত হচ্ছে।' পিতামহ ভীষ্মের আদেশ পেয়েই প্রতাপশালী সহদেব বিধিপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তা স্বীকার করলেন। চতুর্দিকে আনন্দ উৎসব হতে লাগল।

—০—

শিশুপালের ক্রোধ, যুধিষ্ঠির কর্তৃক শিশুপালের ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা এবং পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্যদের বক্তব্য

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! চেদিরাজ শিশুপাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা দেখে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সেই পরিপূর্ণ সভাতে পিতামহ ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন—'বড় বড় মহর্ষি এবং রাজর্ষিরা উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণ রাজার ন্যায় রাজোচিত পূজার পাত্র হতে পারে না। মহাত্মা পাণ্ডবরা কৃষ্ণের পূজা করে তাদের যোগ্য কাজ করেনি। পাণ্ডবগণ! তোমরা এখনও বালক! সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে তোমরা অনভিজ্ঞ। ভীষ্ম পিতামহও বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর সেই দূরদৃষ্টি আর নেই। ভীষ্ম! তোমার মতো সর্বজ্ঞ ধর্মাত্মাও যখন ইচ্ছামতো কাজ করতে আরম্ভ করে, তাহলে তাকেও জনসমক্ষে হেয় হতে হবে। কৃষ্ণ রাজা নয়, তাহলে সে রাজাদের মধ্যে সম্মানের পাত্র হল কী করে? সে তো বয়সেও তেমন বড় নয়। ওর বাবা বসুদেব এখনও জীবিত। যদি একে তোমরা তোমাদের একজন হিতৈষী বলে মনে করে এর সম্মান করে থাক, তাহলে এ কি দ্রুপদের থেকেও বড়? যদি কৃষ্ণকে তোমরা আচার্য মনে কর তাহলেও দ্রোণাচার্যের উপস্থিতিতে একে পূজা করা একেবারেই অনুচিত। ঋত্বিকের দৃষ্টিতেও সর্বপ্রথম বিদ্যায় এবং বয়সে বৃদ্ধ ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই পূজা হওয়া উচিত ছিল। যুধিষ্ঠির! ইচ্ছামৃত্যু পুরুষশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্মের বর্তমানে তুমি কৃষ্ণের পূজা কীভাবে করলে? শাস্ত্র

পারদর্শী বীর অশ্বত্থামার উপস্থিতিতে কৃষ্ণের পূজা কোন দৃষ্টিতে উচিত মনে হল ? পাণ্ডবগণ ! রাজাধিরাজ দুর্যোধন, ভরতবংশের আচার্য মহাত্মা কৃপ, কিম্পুরুষগণের আচার্য দ্রুম এবং পাণ্ডুর সমান সম্মানীয় সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন ভীষ্মকে বাদ দিয়ে, তাঁর উপস্থিতিতে তোমরা কৃষ্ণের পূজার মতো অনর্থ কাজ কী করে করলে ? এই কৃষ্ণ ঋত্বিক নয়, রাজা নয়, আচার্যও নয়। তাহলে কোন বিবেচনায় তোমরা এর পূজা করলে ? কৃষ্ণকেই যদি তোমাদের অগ্রপূজা করার ছিল, তাহলে এই রাজাদের, আমাদের ডেকে এনে এইভাবে অপমান করা উচিত হয়নি। আমরা ভয় বা লোভের জন্য তোমাদের কর প্রদান করি না ; আমরা তো ভাবলাম যে, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সহজ-সরল ধর্মাত্মা ব্যক্তি যদি সম্রাট হয় তাহলে ভালোই হবে। তাই তোমরা এই গুণহীন কৃষ্ণের পূজা করে আমাদের অপমান করছ। তুমি হঠাৎই ধর্মাত্মারূপে বিখ্যাত হয়েছ। তাই তুমি এই ধর্মচ্যুত ব্যক্তির পূজা করে নিজ বুদ্ধির দেউলিয়া ভাব প্রকাশ করছ।'

শিশুপাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন—'কৃষ্ণ ! আমি মানছি যে, বেচারী পাণ্ডবরা ভীতু এবং তপস্বী। এরা যদি ভালোভাবে বুঝে না থাকে তাহলে তোমার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে, তুমি কোন পূজার অধিকারী। যদি কাপুরুষতা এবং মূর্খতাবশত এরা তোমার পূজা করেও থাকে তবে তুমি অযোগ্য হয়ে তা কেমন করে
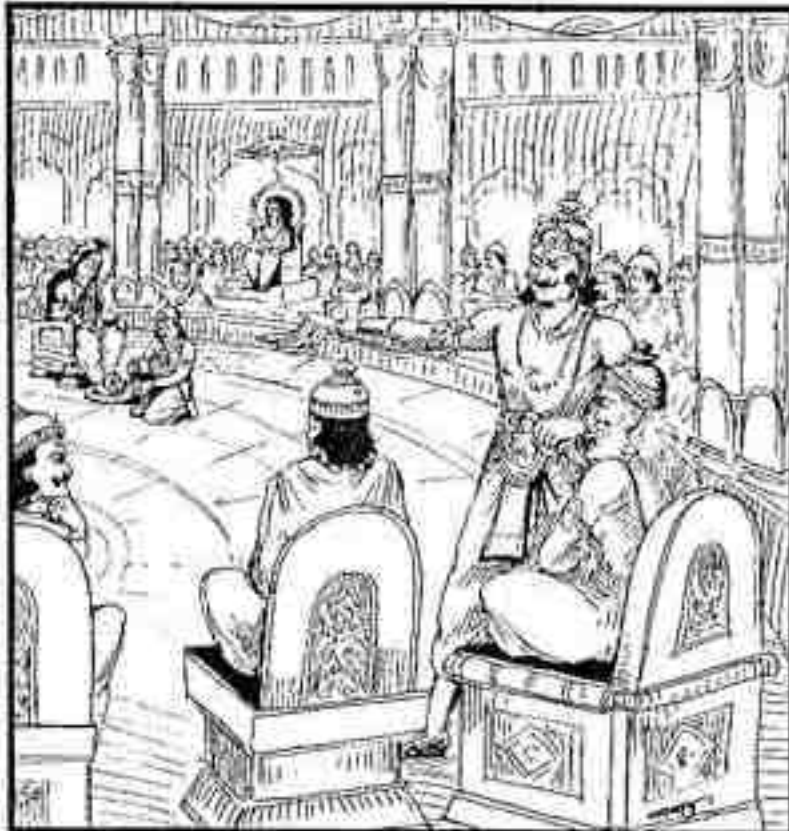
স্বীকার করলে ? কুকুর যেমন লুকিয়ে চুরিয়ে একটু ঘি চেটে খেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে, তেমনই তুমি এই অযোগ্য পূজা স্বীকার করে নিজেকে বড় বলে মনে করছ। তোমার এই অনুচিত পূজাতে রাজাদের শুধু অসম্মানই হয়নি বরং পাণ্ডবরা তো তোমাকেও স্পষ্টই অপমান করছে। নপুংসকদের বিবাহ দেওয়া, অন্ধদের রূপ দেখানো, রাজ্যহীনকে রাজাদের মধ্যে স্থান দেওয়া যেমন অপমান, তোমার এই পূজাও তেমনই। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম আর তোমাকে বুঝে নিয়েছি। তোমরা কেউ কারও থেকে কম নও।' এই বলে শিশুপাল আসন ত্যাগ করে কিছু রাজাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ শিশুপালের কাছে গিয়ে মধুর কণ্ঠে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন—'রাজন্ ! আপনার কথা ঠিক নয়। কটুকথা নিরর্থক তো বটেই, অধর্মও। আমাদের পিতামহ ভীষ্ম যে ধর্মের রহস্য জানেন না, তা নয়। আপনি অকারণ তাঁকে দোষারোপ করবেন না। দেখুন, এখানে আপনার থেকেও বিদ্যা এবং বয়সে বৃদ্ধ অনেক রাজা উপস্থিত আছেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে অন্যায় মনে করেননি। আপনারও তাঁদের মতো এ ব্যাপারে কিছু বলা ঠিক নয়। চেদি নরেশ ! পিতামহ ভীষ্মই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে তাঁর মতো তত্ত্ব-জ্ঞান আপনার নেই।' যুধিষ্ঠির যখন এই কথা বলছিলেন তখন পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—'ধর্মরাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ। যে তাঁকে সম্মান দেওয়াকে অনুচিত মনে করে, তাকে অনুরোধ করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে যিনি অন্যকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উপস্থিত রাজাদের মধ্যে কাকে পরাজিত করেননি ? একজনের নাম বলুন ? ইনি কেবল আমাদের পূজনীয় নন, সারা জগৎ এঁর উপাসনা করে। ইনি সকলের ওপরই বিজয়লাভ করেছেন, শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ জগৎ সর্বাত্মা এই কৃষ্ণেরই আধারের ওপর অবস্থিত। আমি জানি যে, এখানে বহু গুরুজন এবং পূজনীয় ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। তা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কারণে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজায় বাধা দেবার অধিকার কারোরই নেই। আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে অনেক বড় বড় জ্ঞানীর সঙ্গলাভ করেছি এবং তাঁদের কাছ থেকে সর্বগুণসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যগুণাদির বর্ণনা শুনেছি। এখানে সমাগত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মতিও আমি পেয়েছি। ইনি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যা যা করেছেন, তা আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছেই শুনেছি। শিশুপাল ! আমরা শুধু স্বার্থবশত আত্মীয় সম্পর্ক

অথবা উপকারী হওয়াতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করছি না ; আমাদের পূজা করার কারণ হল যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের সমস্ত প্রাণীর সুখপ্রদানকারী এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর পূজা করেন। এখানে যত মানুষ উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি পরীক্ষা করেছি। যশ, শৌর্য ও বীরত্বে কেউ-ই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ নয়। জ্ঞান এবং শক্তি—উভয় দৃষ্টিতেই কেউ-ই কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। দান, কুশলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, শূরভাব, শীলতা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, লক্ষ্মী, ধৈর্য, তুষ্টি, পুষ্টি সমস্ত গুণই নিত্য-নিরন্তর তাঁর মধ্যে বিরাজ করে। পরমজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ঋত্বিক, গুরু, বৈবাহিক, স্নাতক, রাজা, প্রিয়, মিত্র সবকিছুই। তাই আমরা এঁর অগ্রপূজা করেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। তাঁর ক্রীড়ার জন্যই এই সমস্ত জড়-চেতন সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি এবং সনাতন কর্তা। জন্ম ও মৃত্যু হওয়া সমস্ত পদার্থের অতীত, তাই সর্বাপেক্ষা বড় এবং পূজনীয়। বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, বায়ু, তেজ, জল, আকাশ, পৃথিবী এবং চারপ্রকারের সকল প্রাণীই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আধারে স্থিত। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক, বিদিক সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র। বেদে যেমন অগ্নিহোত্র, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মানুষের মধ্যে রাজা, নদীর মধ্যে সমুদ্র, নক্ষত্রের মধ্যে চাঁদ, জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য, পর্বতের মধ্যে মেরু এবং পক্ষীর মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, তেমনই ত্রিলোকের ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধোলোকরূপ ত্রিবিধ গতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। শিশুপাল তো অল্পবয়স্ক বালক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বদা, সর্বত্র, সর্বরূপে বিদ্যমান শিশুপালের এই জ্ঞান নেই। তাই সে এইসব কথা বলছে। সদাচারী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যাঁরা ধর্মের মর্ম জানতে চান, তাঁদের যেমন ধর্ম-জ্ঞান হয়ে থাকে, শিশুপালের তা হয়নি। এর তো এখনও তেমন প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয়ই হয়নি। এখানে ছোট বড় যত মহর্ষি-রাজর্ষি আছেন, তাঁদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূজনীয় বলে মনে করেন না এবং তাঁকে পূজা করেন না ? শিশুপালই একমাত্র তাঁর পূজা করাকে অনুচিত বলে মনে করে। ও মনে করে ও যা ঠিক ভাবে, তাই ঠিক।'

এইসব বলে পিতামহ ভীষ্ম চুপ করলেন। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব বললেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পরাক্রমশালী। আমরা তাঁর পূজা করেছি। যিনি এটি সহ্য করতে পারবেন না তাঁকে আমি গ্রাহ্য করি না। আমার এই কথার যিনি বিরোধিতা করতে চান, তিনি বলুন। আমি তাঁকে বধ করব। সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাদের আচার্য, পিতা, গুরু এবং পূজনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমর্থন করেন।' সহদেব এই কথা বলে জোরে পদাঘাত করলেন। কিন্তু সেই সম্মানীয় বলবান রাজারা কেউ একটু শব্দও করলেন না। সহদেবের মাথায় আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং অদৃশ্য থেকে 'সাধু-সাধু' ধ্বনি শোনা গেল। দেবর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সর্বজ্ঞতা সর্বপ্রসিদ্ধ। তিনি সবার সামনে স্পষ্টভাষায় বললেন—'যাঁরা কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন না, তাঁর বেঁচে থাকলেও মৃত বলে মনে করতে হবে। তাঁদের সঙ্গে কখনো বাক্যালাপ করা উচিত নয়।' তারপর সহদেব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন। এই ভাবে পূজাকার্য সমাপ্ত হল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজাতে শিশুপাল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন, তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি রাজাদের ডেকে বললেন—'আমি সেনাপতি রূপে দণ্ডায়মান। এখন আপনারা কী ভাবনাচিন্তা করছেন ? আসুন, আমরা দাঁড়িয়ে যাদব এবং পাণ্ডবদের সম্মিলিত সেনাকে হারিয়ে দিই।' এইভাবে শিশুপাল যজ্ঞে বিঘ্ন প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজাদের উৎসাহিত করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। সেইসময় তারা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়েছিল, চেহারা রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবছিল কীভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞান্ত অভিষেক পণ্ড করবে।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেখলেন অনেকেই ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় যুদ্ধ করতে উৎসুক। তখন তিনি পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়ে বললেন—'পিতামহ ! এখন আমার কী কর্তব্য ? আপনি যজ্ঞের নির্বিঘ্ন সমাপ্তি এবং প্রজাদের হিতের কোনো উপায় বলুন।' পিতামহ ভীষ্ম বললেন— 'পুত্র ! ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। কুকুর কি কখনো সিংহকে বধ করতে পারে ? আমি আগেই তোমার কর্তব্য নিরূপণ করেছি। সিংহ ঘুমিয়ে পড়লে যেমন কুকুর ডাকতে থাকে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপ করে থাকাতেই এরা চিৎকার করছে। মূর্খ শিশুপাল না জেনে এই রাজাদের যমপুরী পাঠাতে চাইছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে শিশুপালের তেজহরণ করতে চাইছেন। তিনি যাকে আকর্ষণ করেন, তার বুদ্ধি এরূপই হয়ে থাকে। তিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ এবং প্রলয় স্থান। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

পিতামহ ভীষ্মের কথা শিশুপালও শুনলেন। তিনি ভীষ্মকে তিরস্কার করে বললেন—'ভীষ্ম ! সমস্ত রাজাকে তিরস্কার করতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ? আরে ! বৃদ্ধ হয়ে কুলে কেন কলঙ্ক লাগাচ্ছ ? মূর্খ ও অহংকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করতে গিয়ে তোমার জিভ শত টুকরো হচ্ছে না

কেন ? অতি মূর্খ ব্যক্তিরাও যার নিন্দা করে থাকে জ্ঞানী হয়েও তুমি সেই গোয়ালার কী করে প্রশংসা করছ ? ও যদি বালকবয়সে কোনো পাখি (বকাসুর), ঘোড়া (কেশী) অথবা বলদকে (বৃসভাসুরকে) মেরে থাকে, তাতে কী হয়েছে ? ও কোনো যুদ্ধের ওস্তাদ নয়। ও যদি কোনো অচেতন গাড়িকে (শকটাসুরকে) লাথি মেরে উলটে দিয়ে থাকে, তাতে এমন কী আশ্চর্যজনক কাজ করেছে ? যদি গোবর্ধন পর্বতকে সাতদিন তুলে ধরে থাকে তাতেই বা কী অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে ? এ তো উইপোকার কাজ। তবে আমি আশ্চর্য হয়েছি শুনে যে, পেটুক কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের ওপর অনেক খাবার-দাবার খেয়েছে। যে মহাবলী কংসের নুন খেয়ে এ বড় হয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে। কৃতঘ্নতার সীমা আছে কি ? ধর্মজ্ঞানী মহাশয় ! ধর্ম অনুসারে নারী, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং যার অন্ন খাওয়া হয়, যার আশ্রয়ে থাকা হয়, তাকে মারা উচিত নয়। যে জন্ম নিয়েই স্ত্রীলোক (পূতনা) কে মেরে ফেলেছে, তাকেই তুমি জগৎপতি বলছ ? বুদ্ধির বলিহারী! ওহে মশায়, তোমার কথায় এই কৃষ্ণও নিজেকেও তাই মনে করছে। ওহে, ধর্মধ্বজী ! তোমার নিজ নীচ স্বভাবের জন্যই পাণ্ডবরা এইরকম হয়েছে। তুমি ধর্মের আড়ালে যেসব দুষ্কর্ম করেছ, তা কোন জ্ঞানীর দ্বারা সম্ভব ? কাশীরাজের কন্যা অম্বা শাল্বকে স্বামীপদে বরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে বলপূর্বক হরণ করে এনেছিলে। মশায়, এ কেমন ধর্ম ? তোমার ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ। তুমি নপুংসকতা অথবা মূর্খতাবশত এই জেদ ধরে বসে আছ। আজ পর্যন্ত তুমি কী উন্নতি সাধন করেছ ? হ্যাঁ, ধর্মের কিছু বকুনি তুমি দিতে থাক ! সকলেই জরাসন্ধকে সম্মান করত। তিনি কৃষ্ণকে দাস ভেবেই তাকে হত্যা করেননি। তাঁকে হত্যা করার জন্য কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে মিলে যে ষড়যন্ত্র করেছে, তাকে কে ঠিক বলবে ? আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, তোমার কথায় পাণ্ডবরাও কর্তব্যচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। কেনই বা হবে না, তোমার মতো নপুংসক, পুরুষত্বহীন এবং বুড়ো যখন পরামর্শদাতা হয়, তখন তো এমনিই হবে।'

শিশুপালের রুক্ষ এবং কঠিন বাক্য শুনে প্রতাপশালী ভীম ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। সকলে দেখল প্রলয়কালীন কালের মতো ভীম দাঁতে দাঁত ঘষছেন। তিনি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শিশুপালকে আক্রমণ করতে আসছিলেন, মহাবাহু ভীষ্ম তাঁকে আটকালেন ! এত সব হলেও শিশুপাল এতটুকু নিজের স্থান থেকে নড়লেন না। তিনি একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি হেসে বললেন—'ভীষ্ম ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এখনই সবাই দেখতে পাবে যে এ আমার ক্রোধের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে যাবে।' পিতামহ ভীষ্ম শিশুপালের কথায় আর কোনো গুরুত্বই দিলেন না। তিনি ভীমকে বোঝাতে লাগলেন।

—o—

শিশুপালের জন্মকথা এবং তার বধ

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'ভীম ! এই শিশুপাল যখন চেদিরাজের বংশে জন্মেছিল, তখন তার তিনটি চক্ষু এবং

চার হাত ছিল। জন্মেই সে গাধার মতো চিৎকার করতে শুরু করল। তার আত্মীয়-স্বজনরা এই দশা দেখে ভয় পেয়ে তাকে পরিত্যাগ করার কথা ভাবতে লাগল। বাবা-মা, মন্ত্রী প্রমুখ সকলেরই এক মত দেখে দৈববাণী হল—'রাজন্ ! তোমার এই পুত্র অত্যন্ত শ্রীমান এবং বলশালী হবে। ভয় পেয়ো না, নিশ্চিন্ত মনে এর পালন-পোষণ করো।' এই কথা শুনে তার মা ভালোবাসায় উন্মাদ হয়ে গেল। সে হাতজোড় করে বলল—'যিনি আমার পুত্রের সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, তিনি যেই হোন স্বয়ং ভগবান, দেবতা বা অন্য কেউ আমি তাঁকে প্রণাম করি এবং এটুকু জানতে চাই যে, আমার পুত্রের মৃত্যু কার হাতে হবে ?' দ্বিতীয়বার দৈববাণী শোনা গেল—'যার ক্রোড়ে উঠলে তোমার পুত্রের বাকী দুটি হাত খসে পড়বে এবং তৃতীয় নয়নটি লুপ্ত হবে, তার হাতেই তোমার পুত্রের মৃত্যু

হবে।' সেই সময় এই বিচিত্র শিশুর খবর শুনে পৃথিবীর অধিকাংশ রাজা তাকে দেখতে এলেন। চেদিরাজ সকলেরই যথাযোগ্য আপ্যায়ন করে সকলেরই ক্রোড়ে শিশুপালকে দিলেন। কিন্তু এতে তার অবশিষ্ট দুই বাহু ও নেত্র থেকেই গেল, লুপ্ত হল না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাবলী বলরামও তাঁর পিসিকে এবং তাঁর পুত্রকে দেখতে চেদিপুরীতে এলেন। প্রণাম, আশীর্বাদ, কুশল সমাচারের পর পিসিমা তাঁর পুত্রকে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে স্নেহভরে রাখলেন। তখনই শিশুপালের বাহু দুটি পড়ে গেল এবং তৃতীয় নয়নও লুপ্ত হল। শিশুপালের মাতা ভীত ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি। তুমি আর্তদের আশ্বস্ত করো আর ভীতদের অভয়প্রদান করো। অতএব আমাকে একটি বর দাও, তুমি আমার কথা ভেবে শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবে। আমি শুধু এইটুকুই তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পিসিমা, তুমি দুঃখ কোরো না। আমি তোমার পুত্রের এরকম শত অপরাধও ক্ষমা করব, যার প্রতিটি অপরাধের জন্য ওকে বধ করা যায়।' হে ভীম শোন ! এইজন্যই কুল-কলঙ্ক শিশুপাল এই পরিপূর্ণ সভায় আমাকে অপমান করল। নইলে কোন রাজার এমন সাহস আছে যে আমাকে এইভাবে অপমান করতে পারে ? এই কুলকলঙ্ক এখন কালের গ্রাস হতে প্রস্তুত। এখন এই মূর্খ আমাদের নস্যাৎ করে সিংহের মতো হাঁক দিচ্ছে, কিন্তু এ জানে না যে কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ এর তেজ হরণ করবে।'

ভীষ্মের কথা শিশুপালের সহ্য হল না। সে ক্রোধে জ্বলে উঠে বলল—'ভীষ্ম ! তুমি গর্ব ভরে বার বার যার গুণগান করছ, সেই কৃষ্ণ কেন তার প্রভাব দেখাচ্ছে না ? আমি অবশ্যই তাকে হিংসা করি। তোমার স্বভাব যদি প্রশংসা করারই হয়ে থাকে, তাহলে অন্যদের প্রশংসা করছ না কেন ? দরদরাজ বাহ্লীকের স্তুতি করো, যে জন্মাতেই পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। অঙ্গবঙ্গাধিপতি কর্ণ, মহারথী দ্রোণ এবং অশ্বত্থামা—এঁদের যত খুশি স্তুতি করো। তুমি কি আর কাউকে প্রশংসা করার জন্য পাচ্ছ না ? তুমি নিজের মনে ভোজপতি কংসের রাখাল দুরাত্মা কৃষ্ণকেই সব কিছু মেনে নিয়ে গর্ব করছ। আসলে তুমি তো এই রাজাদের দয়াতেই বেঁচে আছ। এরা চাইলে এখনই তোমার প্রাণ নিতে পারে ! সত্যি তুমি অত্যন্ত অধম।' পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'শিশুপাল ! তুমি বলছ আমি রাজাদের দয়াতে বেঁচে আছি, অথচ আমি এই রাজাদের তৃণসমও মনে করি না। আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছি, তিনি সকলের সামনেই বসে আছেন। যে মরার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, সে চক্র-গদাধারী শ্রীকৃষ্ণকে কেন যুদ্ধে আহ্বান করছে না ? আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, ওঁকে যে আহ্বান করবে সে রণভূমিতে অবশ্যই ধরাশায়ী হবে।' শিশুপাল উত্তেজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধেয়ে গিয়ে বললেন—'কৃষ্ণ ! আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি, এসো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি তোমাকে যমপুরী পাঠাব। পাণ্ডবরা মূর্খতাবশত তোমার মতো দাস, মূর্খ এবং অযোগ্যের পূজা করেছে। এখন তোমাদের বধ করাই উচিত।'

শিশুপালের কথা শেষ হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত গম্ভীর ও মধুর স্বরে বললেন—'হে রাজাগণ ! এই ব্যক্তি আমাদের আত্মীয়। তা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত শত্রুতা করে থাকে। এ যদুবংশীয়দের সর্বনাশ করেছে। আমি প্রাগজ্যোতিষপুরে চলে গেলে এ বিনা অপরাধে দ্বারকাপুরী জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। ভোজরাজ যখন রৈবতক পর্বতে বিহার করতে গিয়েছিলেন, তখন এ তাঁর সাথীদের মেরে ফেলেছিল এবং কয়েকজনকে বেঁধে নিজের রাজধানীতে নিয়ে গিয়েছিল। আমার পিতা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তখন এ যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য যজ্ঞের অশ্বকে হরণ করেছিল। যদুবংশের তপস্বী বভ্রুর পত্নী যখন সৌবীর দেশে যাচ্ছিল, তখন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলপূর্বক হরণ করেছিল। এর ভগ্নী ভদ্রা করূষরাজের জন্য তপস্যা করছিল, এ ছলনা করে রূপ পরিবর্তন করে তাকেও হরণ করে। এইসব ঘটনায় আমি বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার পিসিমার কথা স্মরণ করে আমি আজ পর্যন্ত সহ্য করে এসেছি। এখন এই দুষ্ট আপনাদের সামনেই উপস্থিত। এই পরিপূর্ণ সভায় শিশুপাল আপনাদের সামনে আমার প্রতি যে ব্যবহার করল, তা আপনারা দেখলেন। এতেই আপনারা অনুমান করুন যে, আপনাদের অনুপস্থিতিতে ও কী না করেছে ! আজ এই সম্মানীয় রাজ সমাজের মধ্যে অহংকারবশত ও যে দুর্ব্যবহার করেছে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করব না।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই সব কথা বলছেন তখন শিশুপাল উঠে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ ভরে হাসতে লাগলেন এবং

বললেন—'কৃষ্ণ ! যদি তোর একশবার প্রয়োজন থাকে তাহলে তুই আমার কথা শোন আর সহ্য কর। যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে যা খুশি করে নে। তোর ক্রোধ বা খুশিতে

আমার কিছু লাভ বা ক্ষতি নেই।' শিশুপাল যখন এইভাবে কৃষ্ণকে বলে চলেছেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্রকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করামাত্রই দিব্য চক্র এসে তাঁর হাতে উপস্থিত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'নরপতিগণ ! আমি আজ পর্যন্ত একে ক্ষমা করে এসেছি, তার কারণ এর মায়ের অনুরোধে আমি এর শত অপরাধ ক্ষমা করব বলে অঙ্গীকার করেছিলাম। আজ সেই সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে। তাই আপনাদের সামনেই আমি এর মাথা দেহ থেকে পৃথক করে দিচ্ছি।' এই বলে ভগবান অবিলম্বে চক্র দিয়ে শিশুপালের মাথা কেটে ফেললেন এবং দেখতে দেখতেই সেই দেহ বজ্রবিদ্ধ পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হল। সেই সময় রাজারা দেখলেন শিশুপালের শরীর থেকে সূর্যের মতো এক দেদীপ্যমান জ্যোতি বেরিয়ে জগৎবন্দিত কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে সকলের চোখের সামনেই শ্রীকৃষ্ণের শরীরে মিশে গেল। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে উপস্থিত জনতা হতচকিত হয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করতে লাগলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম তখনই তাঁর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত নরপতির সঙ্গে শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পরম প্রতাপশালী যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ বিপুল ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাই দেখে উৎসাহী বীরেরা খুব খুশি হলেন। এর ফলে যজ্ঞের সম্ভাব্য বাধা বিঘ্ন আপনিই দূর হয়ে গেল। সমস্ত কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন হল। অর্থসম্পদ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। বহু মানুষ ও প্রাণীকে খাওয়ানো সত্ত্বেও ভাণ্ডার অন্নে পরিপূর্ণ ছিল। তার কারণ শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাঁদের সংরক্ষক। অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। যজ্ঞ চলা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই যজ্ঞ রক্ষায় তৎপর ছিলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন যজ্ঞান্তে অবভৃত স্নান করলেন, তখন সমস্ত রাজা তাঁর কাছে এসে বললেন—'ধর্মজ্ঞ সম্রাট ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, আপনার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। আপনি সম্রাটপদ লাভ করে আজমীঢ় বংশীয় রাজাদের যশ বৃদ্ধি করেছেন। রাজেন্দ্র ! এই যজ্ঞের মাধ্যমে মহাধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। যজ্ঞে আমাদেরও সর্বপ্রকারে আদর-আপ্যায়ন করা হয়েছে, কোনো কাজে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়নি। অনুমতি দিন, আমরা এবার আমাদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাই।' ধর্মরাজ তাঁদের অনুরোধ মেনে নিয়ে ভাইদের বললেন তাঁদের রাজ্যসীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। ভীম এবং অন্য ভাইরা তাঁর নির্দেশে প্রত্যেক রাজাকে সসম্মানে রাজ্যের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

সমস্ত রাজাগণ এবং ব্রাহ্মণগণ যখন সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজেন্দ্র ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, আপনার রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। এবার আমি দ্বারকা ফিরে যাবার অনুমতি চাইছি।' ধর্মরাজ বললেন—'আনন্দরূপ গোবিন্দ ! এ যজ্ঞ আপনার অনুগ্রহে সম্পূর্ণ হতে পেরেছে, আপনার কৃপাতেই সব রাজারা আমার বশ্যতা স্বীকার করে কর দিয়েছে এবং নিজেরাও এই যজ্ঞে উপস্থিত থেকেছে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! আমি কী করে আপনাকে যেতে বলব ? আপনি

ছাড়া আমার এক মুহূর্তও প্রাণে আনন্দ থাকে না। কিন্তু কী করব, আমি নিরুপায়। আপনাকে দ্বারকাতে তো ফিরে যেতেই হবে।' তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমা কুন্তীর কাছে গিয়ে প্রসন্নভাবে বললেন—'পিসিমা ! আপনার পুত্রের সম্রাট পদ প্রাপ্তি হয়েছে, তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, ধন-সম্পত্তিও অনেক প্রাপ্তি হয়েছে। আপনারা এখন ভালো থাকুন। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এবার দ্বারকা ফিরে যেতে চাই।' এইভাবে সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাহির মহলে এসে স্নান-জপ করে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করালেন। তাঁর সারথি দারুক মেঘবরণ রথ সাজিয়ে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ রথের কাছে এসে সেটি প্রদক্ষিণ করে উঠে বসলেন। রথ রওনা হল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে রথের পিছন পিছন অনুসরণ করতে লাগলেন। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ রথ থামিয়ে বললেন—'রাজেন্দ্র ! মেঘ যেমন সকল প্রাণীতে জল সিঞ্চন করে, বিশাল বৃক্ষ যেমন সমস্ত প্রাণীকে আশ্রয় দেয়, আপনিও সেইরকম সতর্কভাবে প্রজাপালন করুন। সকল দেবতা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুগমন করেন, তেমনই আপনার সব ভ্রাতারা আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।' এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

—o—

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণী

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হওয়া সহজ নয়। এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হওয়ার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ধর্মরাজ

যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন, যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাই সসম্মানে তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন এবং স্বর্ণ আসনে বসালেন। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইদের বসতে বললেন। সকলে বসার পর ভগবান ব্যাস বললেন—'কুন্তীনন্দন ! তুমি পরম দুর্লভ সম্রাটপদ লাভ করে এই দেশের অনেক উন্নতি সাধন করেছ। অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তোমার ন্যায় সৎপুত্রের দ্বারা এই কুরুবংশের কীর্তি বর্ধিত হল। এই মহাযজ্ঞে আমারও খুব সম্মান ও আপ্যায়ন হয়েছে। আমি এখন তোমার কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইছি।' ধর্মরাজ হাত জোড় করে পিতামহ ব্যাসের চরণস্পর্শ করে বললেন—'ভগবান ! আমার একটি বিষয়ে সংশয় আছে। আপনিই তা দূর করতে সক্ষম। দেবর্ষি নারদ বলেছেন যে, বজ্রপাত ইত্যাদি দৈবিক, ধূমকেতু ইত্যাদি অন্তরীক্ষ এবং ভূকম্প ইত্যাদি পার্থিব উৎপাত হচ্ছে। আপনি কৃপা করে বলুন শিশুপালের মৃত্যুতে তার সমাপ্তি হয়েছে না এখনও কিছু বাকি আছে !' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে ভগবান কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বললেন—'রাজন্ ! এই উৎপাতের ফল ত্রয়োদশ বৎসর পরে হবে এবং তা হবে ক্ষত্রিয়কুলের সংহার। সেই সময় দুর্যোধনের অপরাধে তুমিই নিমিত্ত হবে এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় একত্রিত হয়ে ভীম এবং অর্জুনের বলে শেষ হয়ে যাবে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন এই কথা বলে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চিন্তা ও শোকে বিহ্বল হয়ে রইলেন, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি মাঝে মাঝেই ভগবান ব্যাসের কথা স্মরণ করে ভাইদের বলতেন—'ভাই ! তোমাদের কল্যাণ হোক ! আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি কারো প্রতি কটু-বাক্য প্রয়োগ করব না। নিজ পুত্র এবং শত্রুর প্রতি একই প্রকার আচরণ করব। ভাই এবং বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করব। আমার মধ্যে কোনো ভেদ-ভাব থাকবে না, এই ভেদ-ভাবই হল যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল !'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাইদের কাছে এই নিয়মের কথা বলে প্রজাপালন করতে লাগলেন। তিনি নিয়মমতো পিতৃপুরুষের তর্পণ এবং দেবপূজা করতে লাগলেন। একে একে সকলে নিজ নিজ রাজধানীতে ফিরে গেলেও দুর্যোধন এবং শকুনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে কিছুদিনের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে গেলেন।

দুর্যোধনের ঈর্ষা এবং শকুনির পরামর্শ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা দুর্যোধন শকুনির সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে ধীরে ধীরে সব কিছুই ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তাঁরা এখানে এমন সব কলা কৌশল দেখলেন যা হস্তিনাপুরে কখনো দেখেননি। একদিন সভায় তাঁরা বেড়াতে গিয়ে এক স্ফটিকের প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখানে জল আছে মনে করে কাপড় গুটিয়ে নামতে গেলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে আবার অন্যদিকে ঘুরতে লাগলেন। পরে তাঁরা জলভূমিকে স্থল ভেবে তাতে পড়ে গেলেন এবং অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলেন। ধর্মরাজের নির্দেশে সেবকরা তাঁদের উত্তম নতুন বস্ত্র এনে দিলেন। তাঁদের এই অবস্থা দেখে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই হাসতে লাগলেন। অসহিষ্ণুচিত্ত দুর্যোধন তাঁদের এই হাসিতে কষ্ট পেলেন কিন্তু মনোভাব লুকিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তারপরে স্ফটিকের দেওয়ালকে দরজা ভেবে তা দিয়ে ঢুকতে গেলে এত জোরে ধাক্কা খেলেন যে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। এক জায়গায় বড় বড় দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলতে গেলে, অন্য দিকে গিয়ে পড়লেন। একবার ঠিক দরজায় গিয়েও সেটিকে দেওয়াল মনে করে ফিরে এলেন। এইভাবে বার বার ঠকে যাওয়ায় এবং যজ্ঞের অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধনের মনে অত্যন্ত ঈর্ষা ও কষ্ট হল। তিনি যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। যাওয়ার সময় পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য এবং সম্পত্তির চিন্তায় দুর্যোধনের মনে ভয়ংকর সংকল্প জন্ম নিল। পাণ্ডবদের প্রসন্নতা, রাজাদের বশ্যতা স্বীকার, আবাল-বৃদ্ধের তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখে দুর্যোধনের মনে এমন হিংসার উদয় হল যে তাঁর শরীরের কান্তি নষ্ট হয়ে গেল।

শকুনি তাঁর ভাগিনেয়র বৈকল্য লক্ষ্য করে বললেন — 'দুর্যোধন ! তুমি এত দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন ?'

দুর্যোধন বললেন—'মাতুল ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের শস্ত্র কৌশলের সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করেছেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় রাজসূয় যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করলেন। তাঁদের এই ঐশ্বর্য দেখে আমার শরীর ও মন দিন রাত জ্বলে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ সকলের সামনেই শিশুপালকে বধ করলেন। কিন্তু কোনো রাজার একটু শব্দ করারও সাহস হল না। অসুবিধা হচ্ছে এই যে, আমি একলা ওদের রাজ্যলক্ষ্মী কেড়ে নিতে সমর্থ নই, আর আমাকে সাহায্য করে এমন কাউকে দেখছি না। তাই আমি প্রাণত্যাগের কথা চিন্তা করছি। যুধিষ্ঠিরের এই বিপুল ঐশ্বর্য দেখে আমার মনে হয়েছে যে প্রারব্ধই প্রধান, পুরুষার্থ ব্যর্থ। আমি আগে পাণ্ডবদের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এরা সমস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেছে এবং এখন আরও দিন দিন উন্নতি করছে। এ তো দৈবের প্রাধান্য এবং পুরুষার্থেরই নিরর্থকতার প্রমাণ ! দৈবের আনুকূল্যেই এরা বেড়ে উঠছে আর পুরুষার্থ থাকলেও আমার অবনতি হয়ে চলেছে। মাতুল ! এখন আপনি এই দুঃখীকে প্রাণত্যাগ করার অনুমতি দিন, ক্রোধের ও অপমানের আগুনে আমি ছারখার হয়ে যাচ্ছি। আপনি পিতার কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেবেন।'

শকুনি বললেন—'দুর্যোধন ! পাণ্ডবরা তাদের ভাগ্য অনুসারে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য ভোগ করছে, তাতে ঈর্ষা করা উচিত নয়। তোমার এই কথা ভাবাও ঠিক নয় যে, তোমার কেউ

সাহায্যকারী নেই। কেননা তোমার সব ভাই-ই তোমার অধীন এবং অনুগত। মহাধনুর্ধর দ্রোণ, তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা, সূতপুত্র কর্ণ, মহারথী কৃপাচার্য, রাজা সোমদত্ত এবং তাঁর ভাই সকলেই তোমার পক্ষে। তুমি যদি চাও তবে এঁদের সাহায্যে সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করতে পারো।'

দুর্যোধন বললেন—'মাতুল ! আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে আপনাকে এবং আপনার দ্বারা উল্লিখিত রাজাদের এবং অন্যদের সাহায্যে আমি পাণ্ডবদের পরাজিত করে আমাকে উপহাস করার প্রতিশোধ নিতে পারি। এখন যদি ওদের হারাতে পারি তাহলে সমস্ত পৃথিবী আমার হয়ে যাবে। সমস্ত রাজা এবং ওই দিব্য সভাগৃহও আমার হবে।'

শকুনি বললেন—'দুর্যোধন ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখকে যুদ্ধে পরাজিত করা বড় বড় দেবতাদের পক্ষেও অসম্ভব। এই সব মহারথী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, অস্ত্রবিদ্যায় কুশল এবং উত্তম যোদ্ধা। ঠিক আছে, আমি তোমাকে যুধিষ্ঠিরকে হারাবার উপায় বলছি। যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার খুব শখ, কিন্তু তেমন খেলতে পারেন না। যদি তাঁকে পাশা খেলায় আহ্বান করা হয়, তাহলে উনি ক্ষত্রিয় মর্যাদায় 'না' বলবেন না। আমি তো পাশাখেলায় এত পারদর্শী যে ভূমণ্ডলে কেন ত্রিভুবনেও আমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই তুমি ওঁকে আমন্ত্রণ করো, আমি চালাকি করে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য কেড়ে নেব। দুর্যোধন ! তুমি তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলো, তাঁর আদেশ পেলে আমি অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে দেব।'

দুর্যোধন বললেন—'মাতুল ! আপনিই বলুন ! আমি বলতে পারব না।'

দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের আলাপ-আলোচনা এবং বিদুরের পরামর্শ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! হস্তিনাপুরে ফিরে এসে শকুনি প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ ! শ্রবণ করুন দুর্যোধন দিন দিন দুর্বল এবং কৃশ হয়ে যাচ্ছে। আপনি তার এই দুঃখ, চিন্তা এবং অন্তরের কষ্ট কেন বুঝতে পারছেন না ?' ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন—'পুত্র ! তুমি এত বিষণ্ণ হচ্ছ কেন ? তুমি কি শকুনির কথা অনুযায়ী দুর্বল এবং বিবর্ণ হয়ে গেছ ? আমি তো শোকের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার ভাই বা বন্ধুরা তো তোমার কোনো অনিষ্ট করেনি, তাহলে তোমার এই বিষণ্ণতার কারণ কী ?' দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! আমি রাজপোশাক পরে সাধারণের মতো কেবলমাত্র আহার নিদ্রায় দিন কাটাচ্ছি। আমার অন্তরে ঈর্ষার আগুন জ্বলছে। যেদিন থেকে আমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-সম্পদ দেখেছি, সেই থেকে আমার খাওয়া-পরা কিছুই ভালো লাগছে না। আমি দীন-হীন হয়ে রয়েছি। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে রাজারা এত ধনদৌলত দিয়েছে, তা আমি দেখা তো দূরের কথা, কখনো শুনিনি। শত্রুর এই অতুল ধনসম্পত্তি দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। শ্রীকৃষ্ণ যে সব বহুমূল্য সামগ্রী দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করেছেন, তার জন্য আমি এখনও ঈর্ষা অনুভব করছি। লোকে সবদিকে দিগ্বিজয় করতে পারে, কিন্তু উত্তরদিকে পাখি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। পিতা ! অর্জুন সেখান থেকেও অপার ধনরাশি সংগ্রহ করেছে। লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনের পরে সংকেতরূপে যখন শঙ্খধ্বনি করা হত তা শুনে আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত। যুধিষ্ঠিরের মতো ঐশ্বর্য, ইন্দ্র, যম, বরুণ বা কুবেরেরও নেই। তাঁর ধনসম্পদ দেখে আমার চিত্ত অশান্ত।'

দুর্যোধনের কথা শেষ হলে ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই শকুনি বললেন—'দুর্যোধন ! সেই রাজলক্ষ্মী পাওয়ার উপায় আমি তোমাকে বলছি। আমি পাশাখেলায় পৃথিবীতে সবার থেকে দক্ষ। যুধিষ্ঠির এই খেলা খেলতে খুব আগ্রহী, কিন্তু খেলতে জানে না। তুমি তাঁকে আহ্বান করো। আমি পাশা খেলায় তাঁকে কপটতায় পরাজিত করে অবশ্যই তাঁর সম্পত্তি দখল করব।' শকুনির কথা শেষ হলে দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! দ্যূত-ক্রীড়াকুশল মাতুল শুধুমাত্র দ্যূতের সাহায্যেই পাণ্ডবদের সমস্ত রাজ্য সম্পদ নিয়ে নেওয়ার কথা বলছেন। আপনি এঁকে অনুমতি দিন।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন —'আমার মন্ত্রী বিদুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি তাঁর পরামর্শ অনুসারেই কাজ করে থাকি। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি ঠিক করব এই ব্যাপারে কী করা উচিত। বিদুর দূরদর্শী, দুপক্ষের জন্য যা হিতকারী, তিনি তাই করবেন।' দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! বিদুরকে একথা জানালে, তিনি নিশ্চয়ই বাধা দেবেন। তাহলে আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করব। তারপর আপনি সুখে বিদুরের

সঙ্গে রাজ্য ভোগ করবেন। আমাকে আপনার আর কি প্রয়োজন ?' দুর্যোধনের কঠোর বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কথা মেনে নিলেন। তবুও জুয়া নানা অনর্থের মূল জেনে বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করা স্থির করলেন এবং তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন।

বিদুর সংবাদ পেয়েই বুঝলেন যে, এবার কলিযুগ বা কলহ-যুগ আরম্ভ হতে যাচ্ছে। বিনাশের শিকড় বিকশিত হচ্ছে। তিনি অতি শীঘ্রই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে বললেন—'রাজন্ ! আমি জুয়া খেলাকে বড়ই অশুভ লক্ষণ বলে মনে করি। আপনি এমন কিছু করুন যাতে আপনার পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে কোনো শত্রুতা না জন্মায়।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'আমি তো সেই চেষ্টাই করছি। কিন্তু যদি দেবতা আমাদের অনুকূলে থাকেন তাহলে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্য কোনো অশান্তি হবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং তোমার-আমার উপস্থিতিতে কোনোপ্রকার দুর্নীতি হবে না।' এরপর ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র দুর্যোধনকে একান্তে ডেকে বললেন— 'পুত্র ! বিদুর অত্যন্ত জ্ঞানী এবং নীতি-নিপুণ। সে আমাকে কখনো অন্যায় সম্মতি দেবে না। সে যখন জুয়াকে অশুভ বলছে, তখন তুমি শকুনিকে দিয়ে জুয়া খেলানোর সংকল্প পরিত্যাগ করো। বিদুর আমাদের পরম হিতকারী। তাঁর কথা অনুসারে কাজ করা তোমার পক্ষে হিতকারক। ভগবান বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে নীতি-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, বিদুর তার মর্মজ্ঞ। যাদবদের মধ্যে যেমন উদ্ধব, কৌরবদের মধ্যে তেমন বিদুর। আমার তো জুয়া খেলায় পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। জুয়া হল মনোমালিন্যের মূল। কাজেই তুমি এর আয়োজন থেকে বিরত হও। দেখো, পিতা-মাতার কাজ হল সন্তানকে ভালো মন্দ বোঝানো। আমি তাই করছি। বংশ-পরম্পরায় তুমি এই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছ, আমি তোমাকে শিক্ষা-দীক্ষায় রাজ্য শাসনের যোগ্য করে দিয়েছি। জুয়াতে কী আছে ? এইসব ঝামেলা পরিত্যাগ কর।' দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! আমাদের যা সম্পদ তা তো খুবই সাধারণ, এতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য লক্ষ্মী এবং তার অধীনস্থ সমস্ত রাজা দেখে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছে। আমার হৃদয় পাথরের, তাই এত কথা বলতে পারছি আর সব কিছু সহ্য করতে পারছি। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, যুধিষ্ঠিরের কাছে নীপ, চিত্রক, কৌকুর, কারস্কার এবং লৌহজঙ্ঘ প্রমুখ রাজা দাসদের মতো সেবাকার্য করছে। সমুদ্রের বহু দ্বীপের এবং হিমালয়ের রাজারা বিলম্বে আসায় তাদের উপহার সামগ্রী স্বীকার করা হয়নি। যুধিষ্ঠির আমাকেই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ মনে করে আপ্যায়নের সঙ্গে রত্নাদি উপহারগুলি নেওয়ার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তাই আমি সব জানি। হীরা-মণি-মাণিক্য এত রাশিকৃত হয়েছিল যে, তার কোনো
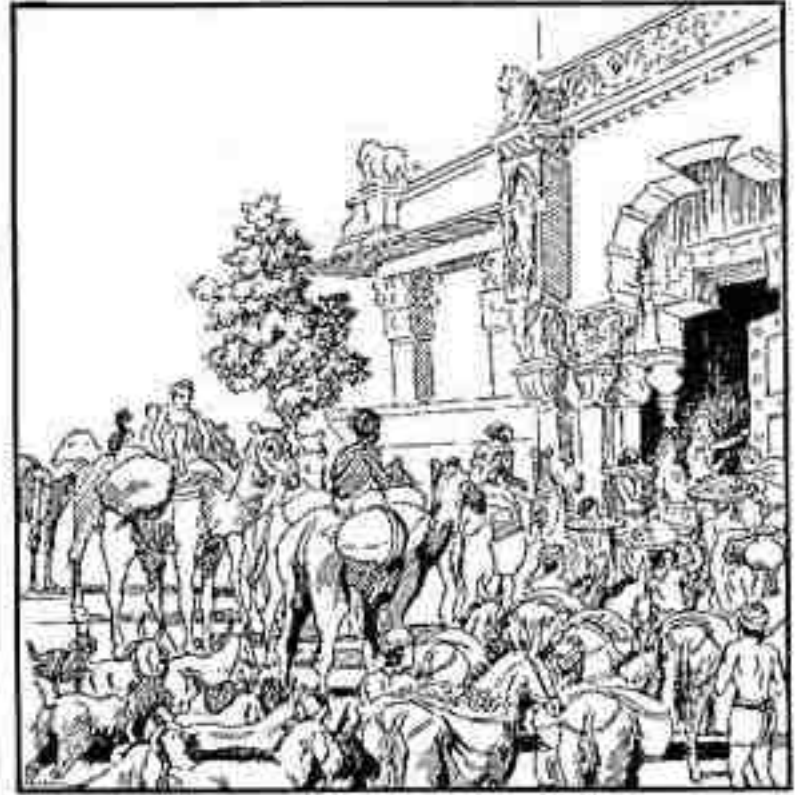
সীমা-সংখ্যা করা যায় না। রত্নাদি উপহার গ্রহণ করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে যখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন উপহার প্রদানকারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ময়দানব বিন্দুসরোবর থেকেও অনেক রত্ন নিয়ে এসেছে, স্ফটিকের পাথর বসিয়ে সভাগৃহকে অত্যন্ত সুন্দর করে তৈরি করেছে। এক স্থানে আমি জল ভেবে কাপড় উঠিয়ে হাঁটছিলাম, ভীম তাই দেখে হেসে উঠল, ভাবল আমি তাদের সম্পত্তি দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি এবং রত্ন চিনি না। যখন আমি জলকে স্ফটিক ভেবে জলে গিয়ে পড়লাম, তখন শুধু ভীমই নয়, কৃষ্ণ-অর্জুন-দ্রৌপদী এবং উপস্থিত আরও নারীপুরুষ হেসে উঠল। এতে আমি মনে বড় দুঃখ পেয়েছি। যেসব রত্নের আমি কখনো নাম শুনিনি, পাণ্ডবদের কাছে তা আমি নিজ চোখে দেখে এলাম। সমুদ্র পারের অথবা সমুদ্র ধারের জঙ্গলে বসবাসকারী বৈরাম, পারদ, আভীর এবং কিতবজাতির মানুষরা, যারা বর্ষার জলে চাষ-বাস করে, তারা বহু রত্ন, গবাদি পশু, সোনা, কম্বল, বস্ত্র ইত্যাদি উপহার নিয়ে রাজদ্বারের বাইরে ভিড় করেছিল। কিন্তু তাদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

ম্লেচ্ছাধিপতি প্রাগ্জ্যোতিষ-নরেশ ভগদত্ত বহু উচ্চজাতের ঘোড়া এবং অন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকেও ভিতরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। চীন, শক, ঔড্র, জঙ্গলী বর্বর-হূণ, পাহাড়ী, নীপ এবং অনুপ দেশের রাজারা ভিতরে আসতে না পেরে নগর দ্বারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আরও অনেক লোক দুরন্ত হাতি, আরবী ঘোড়া, সোনা উপহার নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরও সেই একই দশা। পিতা! আপনি তো জানেন মেরু এবং মন্দারচলের মধ্যবর্তী স্থানে শৈলদা নামে এক নদী আছে। তার দুই তীরে বাঁশীর মতো আওয়াজকারী বাঁশের ঘন ছায়াতে খস, একাসন, অর্হ, প্রদর, দীর্ঘবেণু, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গণ এবং পরতঙ্গণ ইত্যাদি জাতি বসবাস করেন। তাঁরা যা সঞ্চয় করেছিলেন সেই সমস্ত স্বর্ণরাশি যুধিষ্ঠিরকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। উদয়াচলনিবাসী করুষরাজ এবং ব্রহ্মপুত্র-নদের উভয়তীরবাসী কিরাতগণও যারা শুধু চর্মবস্ত্র পরে, অস্ত্রবহন করে এবং কাঁচা ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে তারাও উপহার নিয়ে এসেছিল। বহু রাজাই বাহিরে দাঁড়িয়েছিলেন ভিতরে প্রবেশের প্রতীক্ষায়, দ্বারপাল যজ্ঞের শেষে তাঁদের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর সম্মান রক্ষার্থে চৌদ্দ হাজার হাতি উপঢৌকন দেন। পিতা! অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের আত্মা, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যে কাজ করতে বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তা সম্পূর্ণ করে দেন। বেশি আর কী বলব, অর্জুনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গও ত্যাগ করতে পারেন আর শ্রীকৃষ্ণের জন্য অর্জুন তাঁর প্রাণও হাসতে হাসতে ত্যাগ করতে পারেন। এখন, এই চারবর্ণের প্রদত্ত প্রেম-উপহার, বিজাতীয়দের উপস্থিতি এবং তাঁদের দেওয়া সম্মান দেখে আমার হৃদয় বিদারিত হচ্ছে। আমি মরতে চাই। পিতা, আর কত বলব ! রাজা যুধিষ্ঠির যাদের ভরণ পোষণ করেন, তাদের মধ্যে কয়েক কোটি হাতি ঘোড়ার সওয়ার, কয়েক কোটি রথী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য আছে। চতুর্বর্ণের লোকের মধ্যে এমন কাউকে আমি দেখিনি যাঁরা যুধিষ্ঠিরের কাছে আহার এবং আদর-আপ্যায়ন গ্রহণ করেননি। যুধিষ্ঠির অষ্টাশি হাজার গৃহস্থ স্নাতককে ভরণ-পোষণ করে

থাকেন। দশ হাজার তপস্বী মুনিকে স্বর্ণপাত্রে প্রতিদিন আহার করিয়ে থাকেন। পিতা, দ্রৌপদী স্বয়ং আহারের পূর্বে খোঁজ-খবর করেন যে, কোনো ভিক্ষুক, দুঃস্থ, পঙ্গু তাঁদের রাজ্যে অনাহারে নেই তো!

পিতা! পাঞ্চালদের সঙ্গে পাণ্ডবদের বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে আর অন্ধক এবং বৃষ্ণি-বংশীয়রা এঁদের সখা। তাই এই দুই পক্ষই কেবলমাত্র ওঁদের কর দেন না। বাকি সকলেই এঁদের করদ সামন্ত। অনেক বড় বড় সত্যবাদী, বিদ্বান, ব্রতী, বক্তা, যাজ্ঞিক, ধৈর্যবান, ধর্মাত্মা এবং যশস্বী রাজাও যুধিষ্ঠিরের সেবায় সদা তৎপর। রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় বাহ্লীক স্বর্ণমণ্ডিত রথ নিয়ে এসেছিলেন। রাজা সুদক্ষিণ তাতে কম্বোজ দেশের সাদা ঘোড়া জুতেছিলেন। মহাবলী সুনীথ তাতে রাস লাগিয়েছিলেন আর শিশুপাল দিয়েছিলেন ধ্বজা। দাক্ষিণাত্যের রাজা কবচ, মগধের রাজা মালা-উষ্ণীষ, বসুদান হাতি, একলব্য জুতা, অবন্তীরাজ অভিষেকের জন্য নানা তীর্থের জল,

এনে দিয়েছিলেন। শল্য সুন্দর হাতলযুক্ত তরোয়াল এবং সুবর্ণমণ্ডিত পেটি, চেকিতান তূণীর এবং কাশীরাজ দিয়েছিলেন ধনুক। তারপরে পুরোহিত ধৌম্য এবং মহর্ষি ব্যাস নারদ, অসিত এবং দেবল মুনির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেই অভিষেক স্থলে মহর্ষি পরশুরামের সঙ্গে বহু বেদপারদর্শী ঋষি-মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান ছিলেন। অভিষেকের সময় সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের ছত্র ধরেছিলেন, অর্জুন ও ভীম ব্যজন আর নকুল এবং সহদেব দিব্য চামর ধরেছিলেন। বরুণ দেবতার শঙ্খ, ব্রহ্মা যেটি ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন এবং সহস্র ছিদ্রের ফোয়ারা, বিশ্বকর্মা যা অভিষেকের জন্যই তৈরি করেছিলেন, কৃষ্ণ সেটি যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন, তার দ্বারাই তাঁর অভিষেক ক্রিয়া হয়। পিতা, এসব দেখেশুনে আমার খুব দুঃখ হয়েছে। অর্জুন অত্যন্ত খুশি হয়ে ব্রাহ্মণদের পাঁচশত গোধন দান
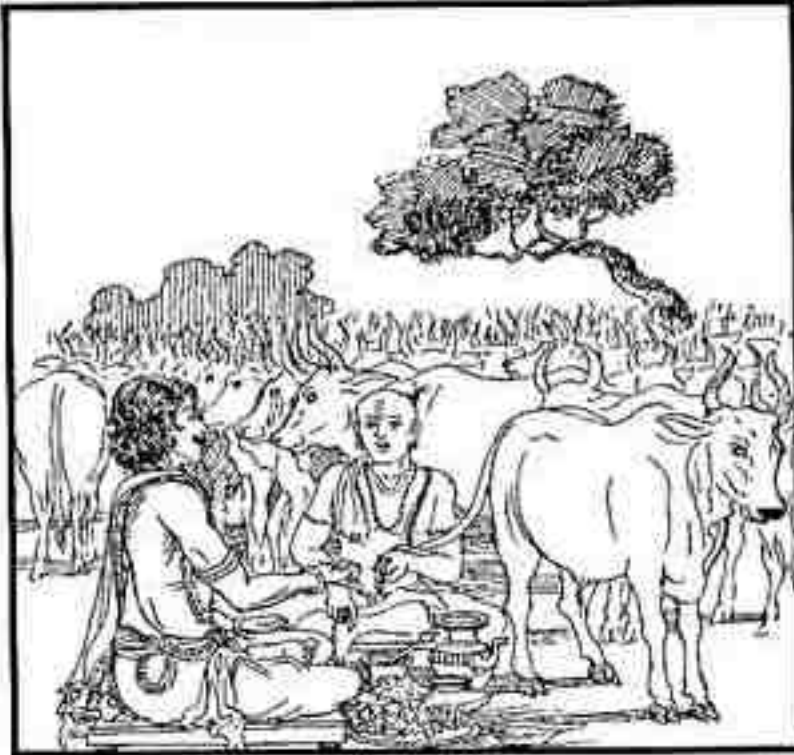
করেন। সেগুলির শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য এমন চমকিত হচ্ছিল যে তেমন হয়তো রন্তিদেব, নাভাগ, মান্ধাতা, মনু, পৃথু, ভগীরথ, যযাতি এবং নহুষেরও ছিল না। পিতা, এইসব কারণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, শান্তি পাচ্ছি না। আমি দিন দিন দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাচ্ছি, শোকের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

দুর্যোধনের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাণ্ডবদের ঈর্ষা কোরো না। ঈর্ষাকাতর ব্যক্তিদের মৃত্যুতুল্য কষ্ট ভোগ করতে হয়। ওরা যখন তোমাদের হিংসা করে না, তুমি তবে কেন ওদের মোহবশত হিংসা করে অশান্তি পাচ্ছ ? কেন তুমি ওদের সম্পত্তি নিতে চাইছ ? তুমি যদি ওদের মতো যজ্ঞ এবং বৈভব চাও, তাহলে ঋত্বিকদের নির্দেশ দাও, তোমার জন্যও তাঁরা রাজসূয় যজ্ঞ করুন। তোমাকেও রাজারা নানাপ্রকার উপহার দেবেন। পুত্র ! অন্যের অর্থের প্রতি লোভ করা তস্করের কাজ। যে ব্যক্তি নিজধনে সন্তুষ্ট থেকে ধর্মে স্থির থাকে, সেই সুখী হয়। অপরের ধনের আশা কোরো না। নিজের কর্তব্যে ব্যাপৃত থাক আর যা তোমার আছে, তাই রক্ষা করো। এই হল আসল সম্পদশালীর লক্ষণ। যে কোনো বিপদে দিশেহারা হয় না, নিজের কুশলতাপূর্বক নিজের কাজ করে, সকলের উন্নতি চায়, যে সাবধানী এবং বিনয়ী, তার সর্বদা মঙ্গল হয়ে থাকে। আরে পুত্র ! ওরা তোমার রক্ষাকারী সহায় হস্ত, তাকে কাটতে চেষ্টা কোরো না, ওদের অর্থসম্পদও তোমারই। এই গৃহযুদ্ধে শুধু অধর্মই হয়ে থাকে। ওদের আর তোমাদের পিতামহ একজনই। কেন তুমি অনর্থের বীজ বপন করছ ?'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ। জিতেন্দ্রিয় থেকে গুরুজনদের সেবা করেছেন। আমার কাজে কেন আপনি বাধা দিচ্ছেন ? ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজই হল শত্রুবিজয়। তাহলে এই স্বকর্মে ধর্ম-অধর্মের প্রশ্ন তোলার অর্থ কী ? শত্রুকে অবদমিত করার শস্ত্র হল

গুপ্তভাবে বা প্রকটিতভাবে আঘাত করা। শুধু মারামারি করাই আসল শস্ত্র নয়। অসন্তোষের দ্বারাই রাজলক্ষ্মী লাভ হয়। তাই আমি অসন্তোষকেই ভালোবাসি। সম্পত্তি থাকলেও তা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করাই উচিত। যে অসাবধানতাবশত শত্রুর উন্নতিতে উদাসীন থাকে সে তাদের হাতেই সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। বৃক্ষের শিকড়ে যে

উইপোকা বাসা বাঁধে তারা সেই আশ্রয় বৃক্ষটিকেই খেয়ে ফেলে। তেমনই সাধারণ শত্রুও বল-বীর্যে শক্তিশালী হয়ে অনেক বড় আকার ধারণ করে। শত্রুর ধন-সম্পদ দেখে প্রসন্ন হওয়া উচিত নয়। সব সময় ন্যায়ের কথাও মাথায় রাখা উচিত নয়। ধনবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা হল উন্নতির সোপান। পাণ্ডবদের রাজ্য-সম্পদ না নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমার সামনে এখন মাত্র দুটি রাস্তা খোলা আছে—হয় পাণ্ডবদের সম্পত্তি হস্তগত করা নচেৎ মৃত্যু বরণ করা। আমার বর্তমান দশায় মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! শক্তিমানদের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া আমি কখনই উচিত বলে মনে করি না। কারণ শত্রুতার দ্বারা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। আর তা কুলনাশের পক্ষে এক মারাত্মক অস্ত্র।' দুর্যোধন বললেন—'পিতা, এ কোনো নতুন কথা নয়। আগেকার দিনেও দ্যূত-ক্রীড়া হত। তাতে ঝগড়া-ঝামেলাও হত না বা যুদ্ধও হত না। আপনি মাতুলের কথা মেনে নিয়ে শীঘ্রই সভামণ্ডপ তৈরি করার নির্দেশ দিন।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! তোমার কথা আমার ভালো লাগছে না, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। দেখো, পরে যেন অনুতাপ করতে না হয়। কারণ তুমি ধর্মের বিপরীতে যাচ্ছ। মহাত্মা বিদুর তাঁর বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে সব কিছু আগেই জেনে গেছেন। ঘটনাক্রমই এমন, আমি নিরুপায়। ক্ষত্রিয় ধ্বংসের মহাভয়ংকর সময় আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন দৈব অত্যন্ত বলশালী। দৈবের প্রতাপেই দুর্যোধনের চিন্তা-ভাবনা অন্য দিকে যাচ্ছে। পুত্রের কথা মেনে নিয়ে তিনি লোকদের আদেশ দিয়ে বললেন—'তোমরা তাড়াতাড়ি তোরণস্ফটিক নামে একটি সভাগার তৈরি করাও। তাতে একসহস্র স্তম্ভ এবং সুবর্ণ ও বৈদুর্যমণ্ডিত একশত দরজা থাকবে। তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হবে এক এক ক্রোশ করে।' রাজার নির্দেশ অনুসারে কারিগররা সভা তৈরি করল এবং নানা সুন্দর বস্ত্র দিয়ে তাকে সাজিয়ে দিল।

—o—

যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ এবং কপটদ্যূতে পাণ্ডবদের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন তাঁর প্রধানমন্ত্রী বিদুরকে ডেকে বললেন—'বিদুর ! তুমি

ইন্দ্রপ্রস্থে যাও এবং পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসো। যুধিষ্ঠিরকে বলবে যে, আমি এক রত্ন খচিত সভাগার নির্মাণ করিয়েছি, যা সুন্দর শয্যা এবং আসনে সুসজ্জিত। যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে এসে সেটি পরিদর্শন করুক এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু পাশা খেলা করুক।' মহাত্মা বিদুরের কাছে এই কথাগুলি ন্যায়যুক্ত বলে মনে হল না। তিনি তার প্রতিবাদ করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'আপনার এই আদেশ আমার উচিত বলে মনে হচ্ছে না। কখনো এমন করবেন না। এর ফলে আপনার পুত্রদের শত্রুতা এবং গৃহে কলহ বেধে যাবে, যার ফলে সমস্ত বংশ লোপ হবার সম্ভাবনা।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! যদি ভাগ্য প্রতিকূল না হয় তাহলে দুর্যোধনের শত্রুতা-বিরোধিতায় আমার কোনো দুঃখ হবে না। জগতে কেউই স্বাধীন নয়, সবকিছুই দৈবের অধীন। তুমি বেশি চিন্তা-ভাবনা না করে আমার নির্দেশানুযায়ী কাজ করো। পরম প্রতাপশালী পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ করে আনো।'

বিদুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে বিবশ হয়ে দ্রুতগামী রথে চড়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে সাদরে আহ্বান করে ধর্মরাজের ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজমহলে নিয়ে গেলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে আপ্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে তাত ! আপনাকে বিমর্ষ মনে হচ্ছে, আপনি কুশলে আছেন তো ?' বিদুর বললেন—'দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়

প্রতাপশালী ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনসহ কুশলেই আছেন। তোমার কুশল এবং আরোগ্য কামনা করে তিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, 'যুধিষ্ঠির ! আমিও তোমার মতো এক সুন্দর এবং বৃহৎ সভাগার নির্মাণ করিয়েছি। তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে এসে সেটি পরিদর্শন করো এবং ভাইদের নিয়ে দ্যূতক্রীড়া করো।' ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদ শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'তাত ! আমার মনে হয় দ্যূতক্রীড়া মঙ্গলকারী নয়। এ কেবল ঝগড়া-বিবাদের মূল। কোন্ সৎ ব্যক্তি এই খেলা পছন্দ করবে ? এতে আপনার কী মত ? আমরা আপনার পরামর্শ মতোই কাজ করতে চাই।' বিদুর বললেন—'ধর্মরাজ ! আমি খুব

ভালোভাবেই জানি যে, পাশাখেলা সমস্ত অনর্থের মূল। আমি এটি বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হইনি। আমি ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে বিবশ হয়ে এখানে এসেছি। তোমরা যা ভালো বোঝ, তাই করো।' যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাত্মন্ ! ওখানে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি ছাড়া আরও কারা পাশা খেলতে একত্রিত হয়েছে ? আমাদের কাদের সঙ্গে খেলার আমন্ত্রণ করা হয়েছে ?' বিদুর বললেন—'গান্ধাররাজ শকুনিকে তো তুমি জানই, সে পাশা খেলতে ওস্তাদ। তাছাড়া ওখানে আছে বিবিংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় প্রমুখ সকলে।' যুধিষ্ঠির বললেন—'তাত ! তাহলে আপনার কথাই ঠিক। এখন তো দেখছি ওখানে ভীষণ বড় বড় মায়াবী ক্রীড়াবিদরা একত্র হয়েছে। যাহোক, সমস্ত পৃথিবীই দৈবের অধীন। কেউই স্বাধীন নয়। যদি ধৃতরাষ্ট্র আমন্ত্রণ না করতেন, তাহলে আমি কখনো শকুনির সঙ্গে পাশা খেলতে যেতাম না।'

ধর্মরাজ বিদুরকে এই কথা বলে নির্দেশ দিলেন যে—'কাল প্রাতঃকালে দ্রৌপদী এবং অন্যান্য রানিদের নিয়ে আমরা পাঁচ ভাই হস্তিনাপুর রওনা হব।' সকলে প্রস্তুত হলে তাঁরা রওনা হলেন। হস্তিনাপুরে পৌঁছে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও কুশল বিনিময় করলেন। তারপর তিনি সোমদত্ত, দুর্যোধন, শল্য, শকুনি, সমাগত রাজা, দুঃশাসন, জয়দ্রথ এবং সমস্ত কুরুবংশীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। মাতৃসমা পতিব্রতা গান্ধারী এবং পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণাম করলেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহভরে পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করলেন। পাণ্ডবরা আসায় কৌরবরা খুব খুশি হল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের রত্নমণ্ডিত মহলে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। দ্রৌপদী প্রমুখ নারীগণও অন্তঃপুরে নারীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে সকলে তাঁদের নিত্যকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নতুন সভাগৃহে এলেন। পাশাখেলার জন্য সমবেতরা সকলকে সহর্ষে স্বাগত জানাল। পাণ্ডবরা সভায় পৌঁছে সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য প্রণাম-আশীর্বাদ, আদর-আপ্যায়ন বিনিময় করলেন। তারপর সকলে বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। তারপর মাতুল শকুনি প্রস্তাব দিলেন—'ধর্মরাজ ! এই সভা আপনার প্রতীক্ষায় ছিল। এবার পাশা ফেলে খেলা শুরু করুন।' যুধিষ্ঠির বললেন —'রাজন্ ! জুয়া খেলা তো ছলনা আর পাপের মূল। এতে ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ব প্রদর্শনের অবকাশও নেই এবং এর কোনো নির্দিষ্ট নীতিও নেই। জগতের কোনো সৎব্যক্তিই পাশাখেলার কপটতা পূর্বক আচরণের প্রশংসা করেন না। আপনি পাশা খেলার জন্য এত উতলা কেন ? নিষ্ঠুর মানুষের মতো আমাদের অন্যায়ভাবে পরাজিত করার চেষ্টা করা আপনার উচিত নয়।' শকুনি বললেন—'যুধিষ্ঠির ! দেখুন, বলবান এবং অস্ত্রকুশল ব্যক্তি দুর্বল এবং শস্ত্রহীনদের পরাজিত করে। সব কাজেই এরূপ ধূর্ততা আছে। যে পাশা খেলাতে চতুর, সে যদি কৌশলে অপটুকে হারিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ধূর্ত বলা হবে কেন ?' যুধিষ্ঠির বললেন—'বেশ, এখন বলুন, এখানে যাঁরা একত্রিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কার সঙ্গে আমাকে খেলতে হবে ? এবং পণ ধরবে কে ? কেউ যদি প্রস্তুত থাকে, তাহলে খেলা

আরম্ভ করা যাক।' দুর্যোধন বললেন—'বাজি ধরার জন্য ধন-রত্ন আমি দেব কিন্তু আমার হয়ে খেলবে মাতুল শকুনি।'

পাশা খেলা শুরু হল, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বহু রাজা এসে

সভায় আসন গ্রহণ করলেন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং বিদুরও, যদিও তাঁরা মনে মনে খুবই দুঃখিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'সাগরাবর্তে উৎপন্ন, স্বর্গের যত অলংকার আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরম সুন্দর এক মণিহার আমি পণ রাখছি। এবার আপনি বলুন, আপনি কী বাজি রাখছেন ?' দুর্যোধন বললেন—'আমার কাছে বহু ধন-রত্ন আছে, আমি তার নাম বলে অহংকার করতে চাই না, আপনি আগে এই দানটি জিতুন তো!' পণ ধরার পর পাশা বিশেষজ্ঞ শকুনি হাতে পাশা নিয়ে বললেন—'এই বাজি আমার।' বলে পাশা ফেলতে দেখা গেল সত্যিই তাঁর জয় হয়েছে। যুধিষ্ঠির বললেন—'শকুনি ! এ তোমার চালাকি ! ঠিক আছে, আমি এবার এক লাখ আঠারো হাজার মোহর ভর্তি থলি, অক্ষয় ধন-ভাণ্ডার এবং বহু স্বর্ণরাশি পণ রাখছি।' শকুনি 'এগুলিও জিতে নিলাম' বলে পাশা ফেললেন এবং সব ধন জিতে নিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার কাছে তামা ও লোহার সিন্দুকে পূর্ণ চারশত কোষাগার আছে। এক একটিতে পাঁচদ্রোণ সোনা ভর্তি আছে। তাই আমি পণ রাখছি।' শকুনি বললেন—'নাও, এগুলিও আমি জিতে নিলাম।' এবং সত্যিই জিতে গেলেন। এইভাবে খেলা উত্তরোত্তর চলতে লাগল। বিদুর এই অন্যায় সহ্য করতে না পেরে বোঝাতে শুরু করলেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'মহারাজ ! মরণাপন্ন রোগীর ঔষধ ভালো লাগে না। তেমনই আমার কথাও আপনাদের ভালো লাগবে না। তবু আমি অনুরোধ করছি, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। এই পাপী দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করে গর্দভের মতো শব্দ করেছিল। এই কুলক্ষণযুক্ত সন্তান কুরুবংশের নাশের কারণ হবে। কুলের এই কলঙ্ক আপনার গৃহে বাস করে, কিন্তু মোহবশত আপনার তা জানা নেই। আমি আপনাকে নীতির কথা জানাচ্ছি। মাতাল যখন মদ খেয়ে মদোন্মত্ত হয়, তখন তার নিজের কোনো হুঁশ থাকে না, তখন সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জলে পড়ে মরছে কী মাটিতে পড়ে মরছে, তা জানে না। দুর্যোধনও তেমনই জুয়ার নেশায় এত উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যে, সে বুঝতে পারছে না পাণ্ডবদের সঙ্গে কলহ বিবাদের ফলে তার কী ভীষণ দুর্দশা হবে ? একজন ভোজবংশীয় রাজা পুরবাসীদের মঙ্গলের জন্য নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ভোজবংশীয়রা দুরাত্মা কংসকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বধ করায় তাঁরা শান্তি পেয়েছিলেন। রাজন্ ! আপনি অর্জুনকে আদেশ দিন সে পাপী দুর্যোধনকে শায়েস্তা করুক। একে শাস্তি দিলেই কুরুবংশের লোকেরা বহু বছর সুখে থাকবে। কাক অথবা গর্দভের সমান দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করে ময়ূর অথবা সিংহের ন্যায় পাণ্ডবদের আপনার কাছে রাখুন। এই একটিই পথ রয়েছে যাতে ভবিষ্যতে দুর্ভোগ না হয়। শাস্ত্রে স্পষ্টভাষায় লেখা আছে যে, কুল রক্ষার জন্য একটি ব্যক্তিকে, গ্রাম রক্ষার জন্য একটি কুলকে, দেশ রক্ষার জন্য একটি গ্রামকে এবং আত্মরক্ষার জন্য দেশকে পরিত্যাগ করা উচিত। সর্বজ্ঞ মহর্ষি শুক্রাচার্য জম্ভ দৈত্যকে পরিত্যাগের সময় অসুরদের একটি খুব সুন্দর কাহিনী বলেছিলেন, আমি সেটি আপনাকে শোনাচ্ছি।

তিনি বলেছিলেন, কোনো বনে অনেক পাখি বাস করত, তারা সকলেই স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব করত। সেই দেশের রাজা অত্যন্ত লোভী এবং মূর্খ ছিল। সে লোভবশত অনেক স্বর্ণ পাবার আশায় ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক পাখিকে হত্যা করল। তার ফল কী হল ? সে সেইসময় সোনা তো পেলই না, বরং ভবিষ্যতে সোনা পাওয়ার রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট করে বলছি, পাণ্ডবদের বিশাল ধনরাশি পাওয়ার লোভে আপনারা ওদের সঙ্গে শত্রুতা করবেন না।

তাহলে সেই লোভান্ধ রাজার মতো আপনাদেরও পরে অনুতাপ করতে হবে। হে রাজর্ষি ভরতের পবিত্র সন্তানগণ! বাগানের মালী যেমন বাগানের গাছপালায় জল সেচন করে এবং মাঝে মাঝে প্রস্ফুটিত ফুল তুলে আনে, তেমনই আপনারাও পাণ্ডবদের স্নেহধারায় সিঞ্চন করে উপহারস্বরূপ তাদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ধন নিতে থাকুন। বৃক্ষের মূলে আগুন লাগিয়ে তাকে ভস্ম করার মতো এইভাবে পাণ্ডবদের সর্বনাশ করার চেষ্টা করবেন না। আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করার ফল হবে এই যে আপনার সব লোক, মন্ত্রী এবং পুত্রগণকে যমপুরে যেতে হবে। এঁরা একত্রিত হয়ে রণভূমিতে অবতীর্ণ হলে দেবতাগণের সঙ্গে ইন্দ্রও এঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম নন।

'সভ্যবৃন্দ! পাশা রূপী কপট জুয়া খেলা সকল কলহের মূল। জুয়াতে পরস্পরের ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দুর্যোধন এখন সেই পথেই এগোচ্ছে। তার এই অপরাধের ফলে প্রতীপ, শান্তনু এবং বাহ্লীক বংশীয়রা ভীষণ সংকটে পড়বে। উন্মত্ত বলদ যেমন নিজ শৃঙ্গের আঘাতে নিজেকেই আহত করে, তেমনই দুর্যোধন উন্মাদ হয়ে নিজ রাজ্য থেকে মঙ্গল লক্ষ্মীকে বহিষ্কার করছে। আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন। মোহবশত নিজের চিন্তাধারাকে অসম্মান করবেন না। মহারাজ! এখন আপনি দুর্যোধনের জয় দেখে প্রসন্ন হলেও এর ফলেই অতি শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ হবে ; যাতে বহু বীর নিহত হবে। আপনি মুখে এই খেলার বিরোধিতা করলেও, অন্তরে এটাই চান। পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা খুবই অনর্থের কারণ হবে।

প্রতীপ এবং শান্তনুর বংশধরগণ! আপনারা এই সভায় দুর্যোধনাদির ব্যঙ্গোক্তি বা কটুবাক্য সহ্য করুন, তবুও এই মূর্খের কথা অনুযায়ী জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেবেন না। এই জুয়ায় উন্মত্ত ব্যক্তিগণ যখন পাণ্ডবদের ভীষণভাবে অপমান করবে এবং তারা যখন নিজেদের ক্রোধ সামলাতে পারবে না, সেই ঘোর বিপদের সময় আপনাদের কে রক্ষা করবে? মহারাজ! জুয়া খেলার আগে তো আপনি দরিদ্র ছিলেন না, ধনীই ছিলেন। তাহলে আপনি কেন জুয়ার সাহায্যে ধন আহরণের উপায় ভাবলেন? আপনি যদি পাণ্ডবদের ধনরাশি জিতেও যান, তাতে আপনার কি ভালো হবে? পাণ্ডবদের ধন-সম্পদ নয়, পাণ্ডবদেরই আপনি আপন করে নিন। তাহলে তাদের সম্পত্তি সহজেই আপনার হয়ে যাবে। আমি এই পাহাড়-নিবাসী শকুনির দ্যূত-কৌশলে অপরিচিত নই। এ অনেক ছল জানে। এখন অনেক হয়েছে। ও যে পথে এসেছে, সেই পথেই বিদায় করুন। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার কথা চিন্তা করবেন না।'

দুর্যোধন বললেন—'বিদুর! এ কী ব্যাপার, আপনি সর্বদা শত্রুর প্রশংসা আর আমাদের নিন্দা করেন! নিজ প্রভুর নিন্দা করা অকৃতজ্ঞতা! আপনার জিভই আপনার মনের কথা বলছে। আপনি মনে মনে আমাদের বিরোধী। আপনি আমাদের কাছে কোলে সাপ নিয়ে থাকার মতো, পালনকারীকে দংশনে উদ্যত। এর থেকে বড় পাপ আর কী হতে পারে? আপনার কি পাপের ভয় নেই? আপনি জেনে রাখুন, আমার যা ইচ্ছা, তাই করতে পারি। আমার অসম্মান করবেন না এবং কটু বাক্য বলবেন না। আমি কবে আপনার কাছে নিজের হিতের কথা জানতে চেয়েছি? অনেক সহ্য করেছি। সীমা পার হয়ে গেছে, আর আমাকে দোষ দেবেন না। সংসারে শাসন করার জন্য একজনই থাকেন, দুজন নয়। তিনি মাতৃগর্ভে সন্তানকেও শাসন করেন। আমি তাঁর শাসন অনুসারেই কাজ করছি। মাঝখানে আপনি আস্ফালন করে শত্রু হবেন না। আমার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সরে যেতে হয়, নাহলে তার ভস্মাবশেষও খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনার মতো শত্রুপক্ষের লোককে কাছে রাখা ঠিক নয়। অতএব, আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। এখানে আপনাকে আর কোনো প্রয়োজন নেই।'

বিদুর বললেন—'দুর্যোধন! ভালো-মন্দ সবেতেই
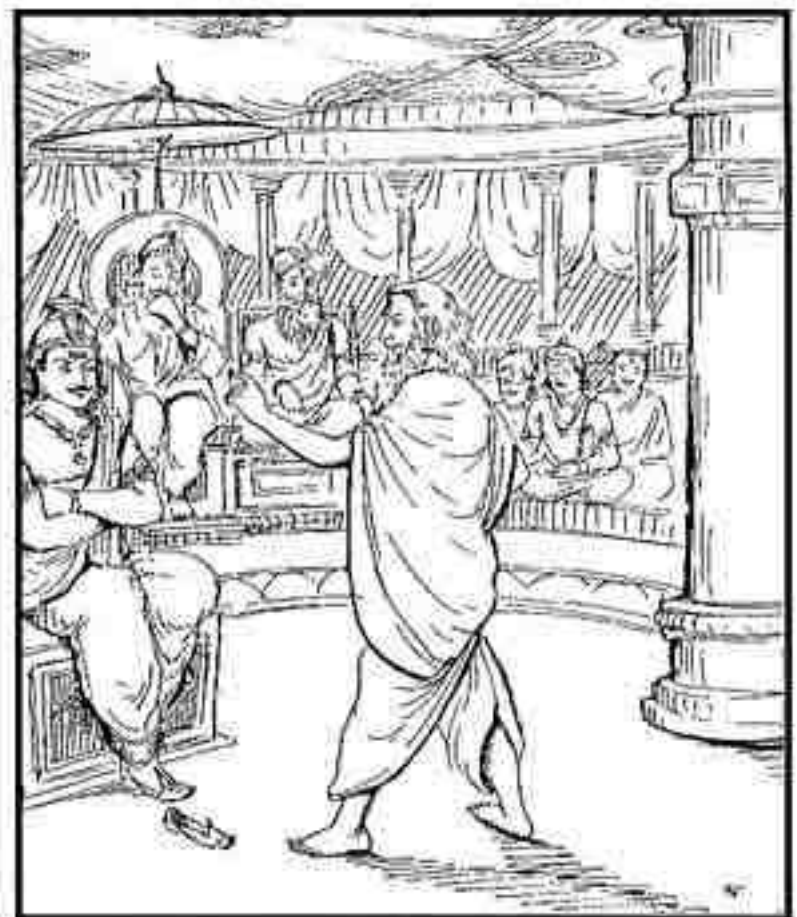
তুমি মিষ্ট বাক্য শুনতে চাও ? আরে, তাহলে তোমাকে নারীদের অথবা মূর্খদের পরামর্শ নিতে হবে। দেখো মিষ্টি কথা বলা পাপী ব্যক্তিদের সংখ্যা কিছু কম নেই। কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা অনেক কম যারা অপ্রিয় অথচ হিতকারী কথা বলে বা শোনে। যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর প্রিয় অপ্রিয় খেয়াল না করে ধর্মে অটল থাকে এবং অপ্রিয় হলেও হিতকারী কথা বলে, সেই রাজার প্রকৃত সহায়ক। দেখো, ক্রোধ হল এক তীক্ষ্ণ জ্বালা, এটি সকল রোগের উৎস, কীর্তিনাশক এবং বিপত্তিকারক। সৎব্যক্তিরা একে দমন করতে পারে, দুর্জনেরা নয়। তুমি এটি দমন করো এবং শান্তি লাভ করো। আমি সর্বদা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রদের ধন ও যশবৃদ্ধি কামনা করি, এখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। আমি তোমাকে দূর থেকেই নমস্কার করছি।' এই বলে বিদুর মৌন হয়ে গেলেন।

শকুনি বললেন—'যুধিষ্ঠির ! এখন পর্যন্ত আপনি বহু সম্পদ খুইয়েছেন। আর যদি কিছু থাকে তাহলে পণ রাখুন।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'শকুনি ! আমার অজস্র ধন আছে, সেসব আমি জানি, আপনি জিজ্ঞাসা করার কে ? অযুত, প্রযুত, পদ্ম, অর্বুদ, খর্ব, শঙ্খ, নিখর্ব, মহাপদ্ম, কোটি, মধ্যম এবং পরার্ধ, এছাড়াও এর থেকে অধিক ধন আমার আছে। আমি সবই পণ রাখছি।' শকুনি পাশা ফেলে বললেন—'এই নাও, আমি সবই জিতে নিলাম।' যুধিষ্ঠির বললেন—'ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁদের সম্পত্তি বাদ দিয়ে নগর, দেশ, ভূমি, প্রজা এবং তাদের ধন আমি পণ রাখছি।' শকুনি আগের মতোই ছলনা করে পাশা ফেলে বললেন, 'নাও, এগুলিও আমার।' তখন যুধিষ্ঠির বললেন—'যার চোখ রক্তবর্ণ, সিংহস্কন্ধ, শ্যামবর্ণের নবযুবক, সেই নকুলকে—আমার প্রিয় ভাই নকুলকে আমি পণ রাখলাম।' শকুনি বললেন—'আচ্ছা, প্রিয় ভাই রাজকুমার নকুলও আমার অধীন হল।' যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার ভাই সহদেব ধর্মের ব্যবস্থাপক, তাকে সকলেই পণ্ডিত বলে থাকে। সে কখনোই পণ রাখার যোগ্য নয়, তবুও আমি তাকেই পণ রাখছি।' শকুনি আগের মতোই সহদেবকেও জিতে নিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার প্রতাপশালী বীর ও সংগ্রাম বিজয়ী ভাই অর্জুনও পণ রাখার যোগ্য নয়, কিন্তু আমি তাকেও পণ রাখছি।' শকুনি পুনরায় ছলনা করে পাশা ফেলে তাঁর জয় ঘোষণা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'ভীমসেন আমাদের সেনাপতি, অনুপম বলশালী, সিংহের ন্যায় স্কন্ধ, গদা যুদ্ধে পারদর্শী, সর্বদা শত্রুদের সন্ত্রস্ত রাখে, তাকেও পণ রাখার যোগ্য মনে করি না, তবুও এবার আমি তাকেই পণ রাখলাম।' শকুনি এবারও তাঁর জয় ঘোষণা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সবার প্রিয় ভাই। আমি নিজেকে পণ রাখছি, যদি হেরে যাই, তাহলে তোমার সেবা করব।' শকুনি—'এই জিতলাম', বলে পাশা ফেলে নিজের জয় হয়েছে জানালেন।

শকুনি ধর্মরাজকে বললেন—'রাজন্ ! আপনি জুয়ায় নিজেকে হারিয়ে বড় অন্যায় করেছেন, কারণ অন্য ধন থাকতে নিজেকে হারানো অন্যায়। এখনও বাজি রাখার জন্য আপনার প্রিয়া দ্রৌপদী বাকি আছে। আপনি তাকে পণ রেখে এবার বাজি জিতে নিন।' যুধিষ্ঠির বললেন—'শকুনি ! দ্রৌপদী সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদীতা ইত্যাদি গুণে পরিপূর্ণ। তিনি সর্বশেষ নিদ্রা যান, সর্বাগ্রে জাগেন, সর্বকর্মের খেয়াল রাখেন। হ্যাঁ, আমি এখন সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী, লাবণ্যময়ী দ্রৌপদীকে পণ রাখছি, যদিও এতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।' যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে চতুর্দিক থেকে ধিক্কার ধ্বনি শোনা গেল। সমস্ত সভা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সভা রাজারা শোকমগ্ন হলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রমুখ মহাত্মাদের শরীর ঘামে ভিজে উঠল। বিদুর মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্র হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—'আমরা কি জিতে গেছি ?' দুঃশাসন, কর্ণ ইত্যাদি খল ব্যক্তিরা হাসতে লাগল। কিন্তু সভাসদদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা পড়ছিল। দুষ্টাত্মা শকুনি বিজয় উল্লাসে মত্ত হয়ে 'এই নিয়ে নিলাম' বলে ছলনা করে পাশা ফেলে নিজের জয় ঘোষণা করলেন।

—— ০ ——

কৌরব সভায় দ্রৌপদী

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! তখন দুর্যোধন বিদুরকে ডেকে বললেন—'বিদুর ! আপনি এখানে আসুন, যান পাণ্ডবদের প্রিয়তমা সুন্দরী দ্রৌপদীকে শীঘ্রই নিয়ে আসুন। সেই অভাগিনী এখানে এসে আমাদের মহল ঝাড়-মোছ করবে আর দাসীদের সঙ্গে থাকবে।' বিদুর বললেন—'মূর্খ ! তুমি জান না তুমি ফাঁসীতে ঝুলতে যাচ্ছ, মৃত্যু সন্নিকট। তাই তোমার মুখ দিয়ে এমন কথা বার হচ্ছে। আরে, তুমি এই পাণ্ডব-সিংহদের কেন ক্রোধান্বিত করছ ? তোমার মাথার ওপর বিষধর সর্প ক্রোধে ফণা দুলিয়ে ফুঁসছে, তুমি তাকে খুঁচিয়ে যমপুরীতে যাবার কাজ কোরো না। দেখ, দ্রৌপদী কখনো দাসী হতে পারেন না। যুধিষ্ঠির তাঁকে অনধিকারভাবে পণ রেখেছেন। সভাসদগণ ! বাঁশ যখন ধ্বংস হওয়ার হয়, তখন তাতে ফল ধরে। মত্ত দুর্যোধন সবংশে ধ্বংস হওয়ার জন্যই জুয়া খেলার মাধ্যমে ভয়ানক শত্রুতা ও মহাভয়ের সৃষ্টি করেছে। মরণাপন্ন ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কাউকে মর্মভেদী দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। কঠোর এবং দুঃখদায়ক বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। এইসব অধঃপতনের হেতু কটুকথা মুখ থেকে বেরোলেও, যার ওপর প্রয়োগ করা হয়, তার মর্মস্থানে গিয়ে বিঁধে তাকে দিনরাত কষ্ট দেয়। তাই এরূপ কখনো করা উচিত নয়। ধৃতরাষ্ট্র বড় ভয়ংকর এবং ভীষণ সংকটে পড়েছেন। দুঃশাসনরাও এতে সায় দিয়েছেন। যদি কাঠ জলে ডুবে যায়, পাথর জলে ভাসে ; তবুও এই মূর্খ আমার হিতকারক বাক্য শুনবে না। এ বন্ধুর কল্যাণকর এবং শ্রেষ্ঠ বাক্য শোনে না, লোভ বেড়েই যাচ্ছে। এর দ্বারা দৃঢ়নিশ্চিত যে, শীঘ্রই কৌরবদের সর্বস্বনাশের হেতু ভয়ংকর যুদ্ধ হবে।'

এতে মদমত্ত দুর্যোধন বিদুরকে ধিক্কার দিয়ে সেই লোকভর্তি সভায় প্রতিহারীকে বললেন—'তুমি যাও এখনই দ্রৌপদীকে নিয়ে এসো, পাণ্ডবদের থেকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।' প্রতিহারী দুর্যোধনের আদেশ অনুসারে দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন—'সম্রাজ্ঞী, সম্রাট যুধিষ্ঠির জুয়াখেলায় সব কিছু হেরে গেছেন। যখন বাজি রাখার আর কিছু ছিল না, তখন তিনি ভাইদের, নিজেকে এবং সবশেষে আপনাকেও পণ রেখে হেরে গেছেন। এখন আপনি দুর্যোধনের জিতে নেওয়া বস্তুর মধ্যে একটি, আপনাকে সভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে কৌরবদের ধ্বংসের সময় এসে গেছে।' দ্রৌপদী বললেন—'সূতপুত্র ! বিধাতার বিধান নিশ্চয়ই তাই। বালক-বৃদ্ধ সকলকেই সুখ-দুঃখ সহ্য করতে হয়। জগতে ধর্মই সব থেকে বড়। আমরা যদি ধর্মে দৃঢ় থাকি তাহলে ধর্মই আমাদের রক্ষা করবে। তুমি সভায় গিয়ে সেখানে উপস্থিত ধর্মাত্মাদের জিজ্ঞেস করে এসো আমার কী করা উচিত। আমি ধর্মকে উলঙ্ঘন করতে চাই না।' দ্রৌপদীর কথা শুনে প্রতিহারী সভায় ফিরে এসে সভাসদদের দ্রৌপদীর কথা জানাল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, সে দ্রৌপদীকে গিয়ে কী উত্তর দেবে ? তখন সভাসদ্গণ সকলেই মাথা নত করে বসলেন। দুর্যোধনের জেদ জেনে কেউ কোনো কথা বলল না। পাণ্ডবরা সেই সময় অত্যন্ত দুঃখী এবং দীনভাবে ছিলেন। তাঁরা সত্যবদ্ধ থাকায় কী করা উচিত, তা স্থির করতে পারলেন না। পাণ্ডবদের বিমর্ষতার সুযোগ নিয়ে দুর্যোধন বললেন—'প্রতিহারী ! যাও, দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এসো, এখানেই তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।' প্রতিহারী দ্রৌপদীর ক্রোধকেও ভয় পেত। তাই দুর্যোধন বলা সত্ত্বেও সে আবার সভাসদদের জিজ্ঞাসা করল—'আমি দ্রৌপদীকে কী বলব ?' দুর্যোধনের এই কথা ভীষণ খারাপ লাগল। তিনি প্রতিহারীর দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে ছোট ভাই দুঃশাসনকে ডেকে বললেন—'ভাই ! এই ক্ষুদ্র প্রতিহারী ভীমকে ভয় পাচ্ছে, তুমি নিজে গিয়ে দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে এসো, এই পরাজিত পাণ্ডবরা তোমার কিছু করতে পারবে না।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশ শুনেই দুঃশাসন রক্তচক্ষু করে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং পাণ্ডবদের নিবাস স্থানে গিয়ে বললেন—'কৃষ্ণা ! চলো, তোমাকে আমরা জিতে নিয়েছি ! লজ্জা পরিত্যাগ করে দুর্যোধনের দিকে তাকাও। সুন্দরী ! আমরা ধর্মত তোমাকে পেয়ে গেছি। এখন সভায় চলো এবং কৌরবদের সেবা করো।' দুঃশাসনের কথা শুনে দ্রৌপদীর অন্তর দুঃখে ভরে উঠল, মুখ মলিন হয়ে গেল। তিনি আর্তভাবে মুখে চাপা দিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রানিমহলের দিকে দৌড়ে গেলেন। পাপাচারী দুঃশাসন ক্রোধভরে তাঁকে ধমক দিয়ে পিছনে দৌড়ে গিয়ে তাঁর

কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশ মুঠি করে ধরল। হায় ! এই চুল কিছুদিন পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রপূত জলে ধোওয়া হয়েছিল। দুরাত্মা দুঃশাসন পাণ্ডবদের অপমান করার উদ্দেশ্যে সেই চুল বলপূর্বক ধরে দ্রৌপদীকে অনাথের মতো টানতে টানতে নিয়ে গেল। দ্রৌপদীর সমস্ত রোম শিহরিত, শরীর ঝুঁকে পড়েছিল, দ্রৌপদী ধীর কণ্ঠে বললেন—'ওরে মূঢ় দুরাত্মা দুঃশাসন, আমি রজস্বলা, একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান করে আছি। এই অবস্থায় আমাকে ওই জনসমাকীর্ণ সভায় নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।' দুঃশাসন দ্রৌপদীর কথা গ্রাহ্য না করে আরও জোরে চুল ধরে বলল—'দ্রুপদনন্দিনী, তুমি রজস্বলাই হও অথবা একবস্ত্র পরিহিতা, না হয় উলঙ্গ, আমরা তোমাকে জুয়াতে জিতেছি, এখন তুমি আমাদের দাসী। এখন থেকে তোমাকে নীচ জাতির স্ত্রীলোকদের মতো

দাসীদের সঙ্গেই থাকতে হবে।' দুঃশাসন দ্রৌপদীকে টেনে সভাস্থলে নিয়ে এল।

দুঃশাসন চুল ধরে টানায় দ্রৌপদীর চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। শরীর থেকে বস্ত্র খুলে গিয়েছিল। তিনি লজ্জায় লাল হয়ে ধীরে ধীরে বললেন—'ওরে দুরাত্মা ! এই সভায় শাস্ত্রজ্ঞাতা, কর্মনিপুণ, ইন্দ্রের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত আমার গুরুজনরা রয়েছেন। এঁদের সামনে এই অবস্থায় আমি কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকব ? ওরে দুরাচারী ! আমাকে টেনো না, নগ্ন কোরো না। এই নীচ কাজ করতে একটু তো চিন্তা করো। দেখ, যদি ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও তোমাকে সাহায্য করেন, তাহলেও পাণ্ডবদের হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে না। ধর্মরাজ তাঁর ধর্মে অটল, তিনি সূক্ষ্ম ধর্মের মর্ম জানেন। আমি তাঁর মধ্যে শুধু গুণই দেখতে পাই, দোষ কদাপি নয়। হায় ! ভরত বংশকে ধিক্ ! এই কুপুত্রেরা ক্ষত্রিয়ত্ব নাশ করে দিচ্ছে। এই সভায় উপস্থিত কৌরবগণ নিজ চোখে কুলের মর্যাদা নষ্ট হতে দেখছেন। দ্রোণ, ভীষ্ম এবং বিদুরের আত্মবল কোথায় গেল ? বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনরা এই অধর্ম কেন সহ্য করছেন ?' ক্রুদ্ধ পাণ্ডবদের দিকে কটাক্ষ করে দ্রৌপদী এই কথা বললেন, তাঁর শরীরে ক্রোধাগ্নি যেন লেলিহান শিখার মতো জ্বলছিল। সেই সময় পাণ্ডবদের যে দুঃখ হয়েছিল, তা সমস্ত রাজ্য, ধর্ম এবং ধন-রত্ন অপহৃত হলেও হয় না। পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে দুঃশাসন আরও জোরে দ্রৌপদীর চুল টানতে টানতে 'এই দাসী, দাসী' বলে অট্টহাসি করে উঠলেন। কর্ণ খুশি হয়ে দুঃশাসনের কথা সমর্থন করলেন এবং শকুনি তাঁকে প্রশংসা করলেন। এই তিনজন ব্যতীত সভাস্থ সকলেই এই নিষ্ঠুর কর্মে মর্মাহত হলেন।

দ্রৌপদী বললেন—'এই কপটাচারী পাপাত্মারা ধূর্তভাবে ধর্মরাজকে জুয়া খেলতে রাজি করিয়েছে এবং কপটভাবে তাঁকে এবং তাঁর সর্বস্ব জিতে নিয়েছে। তিনি প্রথমে ভাইদের, তারপর নিজে পণে হেরে গিয়ে তারপর আমাকে বাজি রেখেছেন। আমি জানতে চাই যে, আমাকে পণ রাখার অধিকার ধর্মানুসারে ওঁর ছিল কি না। এই সভায় অনেক কুরুবংশীয় মহাত্মা আছেন, তাঁরা চিন্তা করে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।'

পাণ্ডবদের দুঃখ এবং দ্রৌপদীর কাতর আবেদন শুনে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন বিকর্ণ বললেন—'সভাসদগণ ! আমাদের সকলের ঠিকমতো বিচার বিবেচনা করে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। এতে ত্রুটি হলে আমাদের নরকগামী হতে হবে। পিতামহ ভীষ্ম, পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং মহামতি বিদুর এই বিষয়ে পরামর্শ করে কেন উত্তর দিচ্ছেন না ? আচার্য দ্রোণ ও আচার্য কৃপ কেন চুপ করে আছেন ? এইসব রাজারা আসক্তি-দ্বেষ পরিত্যাগ করে এই প্রশ্নের বিচার করছেন না, কেন ? আপনারা ভেবে-চিন্তে পতিব্রতা রমণী দ্রৌপদীর প্রশ্নের পৃথকভাবে উত্তর দিন।'

বিকর্ণ বারংবার এই আবেদন করলেও কেউ কোনো উত্তর দিলেন না। তখন বিকর্ণ হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'কৌরবগণ ! সভাসদরা উত্তর দিন বা না দিন, এই ব্যাপারে আমি যা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করি, তা না বলে থাকতে পারছি না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা রাজাদের চারটি

ব্যসনকে অত্যন্ত খারাপ বলে জানিয়েছেন, সেগুলি হল শিকার, মদ, জুয়া এবং নারী-সঙ্গে আসক্তি। এতে আসক্ত হলে মানুষের পতন হয়। এখানে জুয়াড়ীদের আহ্বানে রাজা যুধিষ্ঠির এসে জুয়ায় আসক্তিবশত দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছিলেন। দ্রৌপদী শুধুমাত্র যুধিষ্ঠিরের পত্নী নন, পাঁচভাইয়ের তাঁর ওপর সমান অধিকার। এটিও মনে রাখতে হবে যে, যুধিষ্ঠির নিজেকে হারানোর পরে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। তাই আমার বিচারে যুধিষ্ঠিরের কোনো অধিকার ছিল না দ্রৌপদীকে বাজি রাখার। দ্বিতীয়ত উনি স্বেচ্ছায় নয়, শকুনির প্ররোচনাতেই দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছিলেন। এইসব কথা চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে, দ্রৌপদী জুয়াতে হারেননি।' বিকর্ণের কথা শুনে সকল সভাসদ তাঁর প্রশংসা এবং শকুনির নিন্দা করতে লাগল। চারদিকে কোলাহল শুরু হল। সকলে শান্ত হলে কর্ণ ক্রোধভরে বিকর্ণের হাত ধরে বলতে লাগলেন—'বিকর্ণ! তুমি কুলাঙ্গারের মতো কথা বলছ কেন ? মনে হচ্ছে তুমি অরণি থেকে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় নিজ বংশের সর্বনাশ করতে চাও ? দ্রৌপদী বারবার প্রশ্ন করলেও সভাসদগণ কেউই উত্তর দেননি। তার অর্থ যে সকলেই এঁকে ধর্মানুসারে সঠিক বলে মনে করেন। তুমি শিশুর মতো ধৈর্য হারিয়ে বিজ্ঞের মতো কথা বলছ কেন ? তুমি একে দুর্যোধনের থেকে ছোট আর দ্বিতীয়ত ধর্ম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তোমার এই তুচ্ছ বুদ্ধির কী গুরুত্ব আছে ? যুধিষ্ঠির যখন তার সর্বস্বই পণ রেখে হেরে গেছে, তখন দ্রৌপদী কীভাবে জেতে ? দ্রৌপদীকে পণ রাখায় কি পাণ্ডবদের সকলের সম্মতি ছিল না ? তুমি যদি মনে কর যে, রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে সভায় আনা উচিত হয়নি, তাহলে তার উত্তরও শোন, দেবতারা নারীদের জন্য একপতিরই বিধান করেছেন। পাঁচপতির স্ত্রী হওয়ায় দ্রৌপদী নিঃসন্দেহে বেশ্যা। তাই আমার মনে হয় একে এক বস্ত্রে অথবা বস্ত্রহীনা করেও সভায় নিয়ে আসা কোনো অনুচিত কাজ নয়। অতএব পাণ্ডব, তাদের পত্নী দ্রৌপদী এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি আমরা জিতে নিয়েছি।' তারপর কর্ণ দুঃশাসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'দুঃশাসন ! বিকর্ণ বালক হয়ে গুরুজনদের মতো কথা বলছে। তাতে কান না দিয়ে তুমি দ্রৌপদী এবং পাণ্ডবদের বিবস্ত্র করো।' কর্ণের কথা শুনেই পাণ্ডবগণ তাঁদের উত্তরীয় খুলে রাখলেন এবং দুঃশাসন সবলে দ্রৌপদীর কাপড় খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাপড় টানতে গেলেন, দ্রৌপদী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে ডেকে প্রার্থনা করতে লাগলেন—'হে গোবিন্দ ! হে দ্বারকাবাসী ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রেমঘন ! হে গোপীজনবল্লভ ! হে সর্বশক্তিমান্ প্রভো ! কৌরবরা আমাকে অপমানিত করছে, আপনি কি একথা জানেন না ? হে নাথ, হে রমানাথ ! হে ব্রজনাথ ! হে আর্তিনাশন জনার্দন ! আমি কৌরবরূপী সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন ! হে কৃষ্ণ ! আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ মহাযোগী ! আপনি সর্বস্বরূপ এবং সকলের জীবনদাতা, গোবিন্দ ! আমি কৌরবদের মধ্যে বড় সংকটে পড়েছি। আপনার শরণাগত। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'[১]

দ্রৌপদী ত্রিভুবনপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তন্ময় হয়ে স্মরণ করে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সেই আর্ত ক্রন্দন শ্রীকৃষ্ণ শুনতে পেলেন, তাঁর হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হয়ে গেল। ভক্তবৎসল প্রভু প্রেমপরবশ হয়ে দ্বারকায় শয়ন, ভোজন এমনকী স্বপত্নীকে ভুলে অতিশীঘ্রই দ্রৌপদীর কাছে পৌঁছলেন। তখন দ্রৌপদী নিজেকে রক্ষার জন্য 'হে কৃষ্ণ ! হে বিষ্ণো ! হে হরে !' এইভাবে ছট্‌ফট্ করে ডাকছিলেন। ধর্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষ্যে সেখানে এসে দিব্য-বস্ত্রে দ্রৌপদীকে সুরক্ষিত করলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করার জন্য যতই বস্ত্র ধরে আকর্ষণ করতে থাকেন, ততই বস্ত্র বাড়তে থাকে। এইভাবে সেখানে বস্ত্রের পাহাড় জমে উঠল। ধর্মের মহিমা

---

[১]গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়॥
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথর্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥ (৬৮।৪১-৪৩)

কী অদ্ভুত ! শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও অনির্বচনীয়। চতুর্দিকে হই হই পড়ে গেল। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে সকলেই দুঃশাসনকে ধিক্কার ও দ্রৌপদীর প্রশংসা করতে লাগল।

সেই সময় ভীমের ঠোঁট দুটি ক্রোধে কাঁপছিল। তিনি সেই পূর্ণ সভা গৃহে বজ্রমুষ্টি করে মেঘস্বরে গর্জন করে শপথ করলেন—'দেশ-দেশান্তরের নৃপতিগণ ! অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন, এরকম কথা কেউ হয়তো কখনো বলেনি, পরেও আর কখনো বলবে না। আমি যা বলছি, তা যদি না করি, তাহলে পূর্ব-পুরুষদের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হবে। আমি শপথ করে বলছি যে, আমি রণভূমিতে বলপূর্বক ভরতকুলকলঙ্ক পাপী দুরাত্মা দুঃশাসনের বুকের তাজা রক্ত পান করব।' ভীমের ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনে সকলের দেহ মন শিহরিত হয়ে উঠল। সকল সভাসদ ভীমের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল। এতক্ষণ বস্ত্র আকর্ষণ করতে করতে দুঃশাসন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বস্ত্রের পাহাড় জমে উঠল আর দুঃশাসন নিজের অক্ষমতায় লজ্জায় মাথা নীচু করে বসে পড়লেন। চারদিকে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। দুঃশাসনকে সকলে ধিক্কার দিতে লাগল। সকলে বলতে লাগল 'কৌরবরা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিল না কেন ? এটি অত্যন্ত লজ্জার কথা।' তখন মহাত্মা বিদুর হাত তুলে সকলকে শান্ত করে বললেন—'সভাসদবৃন্দ ! দ্রৌপদী আপনাদের প্রশ্ন করে অনাথের মতো কাঁদছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউই তার উত্তর দিতে পারলেন না। এ অধর্ম। আর্ত মানুষ দুঃখাগ্নিতে পুড়েই সুবিচারের আশা করে। সভাসদদের উচিত সত্য এবং ধর্মের আশ্রয় নিয়ে তাকে শান্তি দেওয়া। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সত্য অনুসারে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির মীমাংসা অতি অবশ্যই করা কর্তব্য। বিকর্ণ তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন। এবার আপনারাও আসক্তি-দ্বেষ মুক্ত হয়ে দ্রৌপদীর প্রশ্নের সমুচিত জবাব দিন। যে ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি সভায় গিয়ে কারো প্রশ্নের উত্তর দেন না, তাঁর অর্ধ মিথ্যা বলার পাপ হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, তার সম্বন্ধে আর কী বলব ! এই বিষয়ে আমি আপনাদের একটি কাহিনী শোনাচ্ছি।

একবার দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা উভয়েই একটি কন্যাকে পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে 'আমি শ্রেষ্ঠ', 'আমি শ্রেষ্ঠ' বলে প্রতিজ্ঞা করে উভয়ে প্রাণের ওপর পণ রাখে। এই বিবাদের বিচারের ভার তারা প্রহ্লাদকে দেয়। তাঁর কাছে গিয়ে উভয়ে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি ঠিক করে বিচার করুন আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?' প্রহ্লাদ খুব দ্বিধায় পড়ে গেলেন। একদিকে তাঁর পুত্রের জীবন অন্য দিকে ধর্ম ! কিছু স্থির করতে না পেরে প্রহ্লাদ মহর্ষি কশ্যপের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাভাগ ! আপনি দেবতা, অসুর এবং ব্রাহ্মণদের ধর্ম বিষয়ে পূর্ণরূপে অবগত। আমি খুবই ধর্ম-সংকটে পড়েছি। আপনি কৃপা করে বলুন যে, কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিলে বা জেনে শুনেও ভিন্ন উত্তর দিলে কী গতি হয়।' মহর্ষি কশ্যপ বললেন—'যে ব্যক্তি জেনেশুনে আসক্তি-দ্বেষ বা ভয়ের জন্য ঠিকমতো উত্তর দেয় না, অথবা যে সাক্ষী সাক্ষ্যপ্রদানে শিথিলতা করে বা ঠিকমতো বলে না, সে বরুণের সহস্র পাশে বদ্ধ হয়। প্রত্যেক বছরে তার পাশের এক একটি গ্রন্থি খোলে। তাই যার সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, তার সত্য কথাই বলা উচিত। যে সভায় অধর্মের দ্বারা ধর্মকে দাবিয়ে রাখা হয় এবং সেখানকার সভাসদ সেই অধর্মকে দূর করে না, সেক্ষেত্রে সেই সভার সভাসদই পাপভাগী হয়। যে সভায় নিন্দিত ব্যক্তিকে নিন্দা করা হয় না, সেখানে সভাপতি সেই অধর্মের অর্ধেক, সভাকারীরা এক-চতুর্থাংশ এবং অন্যান্য সভাসদরাও পাপের এক-চতুর্থাংশের ভাগীদার হয়। যেখানে নিন্দিত ব্যক্তির নিন্দা হয়, সেখানে সভাপতি এবং সদস্যগণ পাপমুক্ত হন আর সমস্ত পাপ শুধু পাপীতেই বর্তায়। প্রহ্লাদ ! যে ব্যক্তি সজ্ঞানে প্রশ্নের উত্তর ধর্মের প্রতিকূলে দেয়, তার পূর্বের এবং পরের সাতপুরুষ এবং শ্রৌত-স্মার্ত ইত্যাদি সমস্ত শুভকর্ম নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গীদের কাছে প্রতারিত হলে মানুষ মনে অত্যন্ত ব্যথা পায়। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, তাকে তার থেকেও বেশি দুঃখ ভোগ করতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখে, শুনে এবং ধারণা করেও সাক্ষ্য দেওয়া যায়। এতে সত্যবাদী সাক্ষীর ধর্ম ও অর্থ নষ্ট হয় না। সভাসদগণ ! মহাত্মা কশ্যপের কথা শুনে প্রহ্লাদ তাঁর পুত্রকে বললেন—'পুত্র বিরোচন ! সুধন্বার পিতা অঙ্গিরা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা তোমার মাতার থেকে শ্রেষ্ঠা এবং সুধন্বা তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই এখন থেকে সুধন্বা তোমার প্রভু ! সে ইচ্ছা করলে তোমার প্রাণ নিতেও পারে অথবা প্রাণভিক্ষা দিতে পারে।' প্রহ্লাদের সত্যবাদিতায় প্রসন্ন হয়ে সুধন্বা বললেন—'প্রহ্লাদ ! আপনি পুত্রস্নেহে বিবশ না হয়ে ধর্মে অটল আছেন। তাই আপনার পুত্রকে আমি আশীর্বাদ করছি, সে একশত বছর বেঁচে থাকবে।' ধর্মে অটল

থাকাতেই প্রহ্লাদ তাঁর পুত্রকে মৃত্যু থেকে এবং নিজেকে অধর্ম থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। সভাসদগণ ! আপনারা আপনাদের ধর্ম এবং সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে দ্রৌপদীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।'

মহাত্মা বিদুরের কথা শুনেও সভাসদগণ কোনো উত্তর দিলেন না। কর্ণ বললেন—'ভাই দুঃশাসন ! এই দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে নিয়ে যাও।' কর্ণের নির্দেশ পেয়েই দুঃশাসন সেই পূর্ণ সভাকক্ষে দ্রৌপদীকে টানতে লাগলেন। দ্রৌপদী লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আগে আমাকে যখন মহলে বায়ু স্পর্শ করত, তখন পাণ্ডবরা তা সহ্য করতে পারতেন না। আজ এই দুরাত্মা সকলের উপস্থিতিতে সভামাঝে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখেও পাণ্ডবরা শান্তভাবে বসে তা সহ্য করছেন। আমি কৌরবদের কন্যাসম পুত্রবধূ, কিন্তু তাঁরা আমার এই কষ্ট দেখেও প্রতিকার করছেন না। এ হল অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। এর থেকে বেশি দুঃখের আর কী হতে পারে যে আমাকে আজ এই সভায় টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাজাদের ধর্ম আজ কোথায় গেল ? ধর্মপরায়ণা নারীকে এইভাবে সভায় এনে কৌরবরা তাঁদের সনাতনধর্ম নষ্ট করেছেন। আমি পাণ্ডবদের সহধর্মিণী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং শ্রীকৃষ্ণের স্নেহধন্যা। হায় ! আমি জানি না কেন আমার এই দুর্দশা করা হচ্ছে। কৌরবগণ ! আমি ধর্মরাজের পত্নী এবং ক্ষত্রিয়াণী, আমাকে তোমরা দাসী করো বা অদাসী, যা বলবে করব। কিন্তু এই দুঃশাসন কৌরবদের কীর্তিতে কালিমা লেপন করে আমার অন্তরে যে বেদনা দিয়েছে, তা আমি সহ্য করতে পারছি না। আপনারা আমাকে জয় করেছেন কি না, তা স্পষ্ট করে বলুন, দুর্যোধন আমি তা-ই করব।'

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'কল্যাণী ! ধর্মের গতি বড় সূক্ষ্ম। যশস্বী বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানও তার রহস্য ভুল করেন। যে ধর্ম সবথেকে বলবান এবং সর্বোপরি, অধর্মের উত্থানে তা পরাভূত হয়। তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গভীর এবং গৌরবপূর্ণ। কেউই নিশ্চিতভাবে এটি স্থির করতে পারে না। এই সময় কৌরবরা লোভ এবং মোহের বশ হয়ে রয়েছে। এটিই কুরুকুল ধ্বংস হবার আগাম সূচনা দিচ্ছে। তুমি যে কুলের বধূ, সেই কুলের লোকরা অনেক বড় দুঃখ সহ্য করেও ধর্মপথ থেকে সরে যায়নি। তাই এই দুর্দশায় পড়েও তোমার ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখা এই কুলেরই অনুরূপ। ধর্মের মর্মজ্ঞ দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ এখনও মাথা হেঁট করে নির্জীবভাবে বসে আছেন। আমার মনে হয় ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যে উত্তর দেবেন, তাকেই প্রমাণ বলে মানা উচিত। তুমি জিতেছ কিনা, উনিই তার উত্তর দেবেন, তাকেই প্রমাণ বলে মানা উচিত।'

সভাস্থ সকলেই দুর্যোধনের ভয়ে দ্রৌপদীর দুর্দশা দেখে এবং তাঁর করুণ ক্রন্দন শুনেও উচিত-অনুচিত কিছুই বলতে পারলেন না। দুর্যোধন ঈষৎ হাস্যে দ্রৌপদীকে বললেন—'ওরে দ্রুপদ-কন্যা ! তোমার এই প্রশ্ন তোমার উদার-স্বভাব পতি ভীম, অর্জুন, সহদেব এবং নকুলের প্রতি করো। এরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না কেন ? এরা যদি আজ এখানে সবার সামনে বলে দেয় যে, যুধিষ্ঠিরের তোমার ওপর কোনো অধিকার নেই এবং তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে, তাহলে আমি এখনই তোমাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করে দেব।'

ভীম তাঁর চন্দনচর্চিত দিব্যবাহু তুলে বললেন—'সভাসদগণ ! উদার শিরোমণি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যদি কুলের শীর্ষকুলপতি এবং আমাদের সর্বস্ব না হতেন, তাহলে কি আমরা এই অত্যাচার সহ্য করতাম ! ইনি আমাদের পুণ্য, তপস্যা এবং জীবনের প্রভু। ইনি যদি নিজেকে পরাজিত মনে করেন, তাহলে আমরাও যে পরাজিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি আমি প্রভু হতাম তাহলে এই দুরাত্মা দুঃশাসন কি দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে, মাটিতে ফেলে, পদাঘাত করে এখনও জীবিত থাকত ? আমার এই লৌহদণ্ডের ন্যায় লম্বা বাহু, যার দ্বারা ইন্দ্রকেও পিষে ফেলা যায়, তা দিয়ে পিষে মারতাম। কিন্তু আমরা ধর্মরজ্জুতে আবদ্ধ, অর্জুন আমাকে বাধা দিয়েছে। ধর্মরাজের গৌরবের জন্যও আমি এই সংকটে কিছু করতে পারিনি। ধর্মরাজ যদি একবার সংকেত দ্বারাও আমাকে আদেশ দিতেন, তাহলে আমি ওই ক্ষুদ্র জন্তুকে একমুহূর্তে পিষে মেরে ফেলতাম।' ভীমের প্রজ্বলিত ক্রোধাগ্নি দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর বললেন—'ভীম ! ক্ষমা করো ! তোমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। তোমার দ্বারা সব কিছুই হওয়া সম্ভব।' সেই সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রায় অচেতন অবস্থা। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্‌ ! ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার অধীন। তাহলে তুমিই দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কি মনে কর যে দ্রৌপদীকে আমি পাশা খেলায় পণ হিসেবে জয়লাভ করিনি ?' দুরাত্মা দুর্যোধন

এই বলে কর্ণের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং ভীমকে লজ্জা দেবার জন্য বাম জঙ্ঘা দেখাতে লাগলেন। ভীমের চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি চিৎকার করে সভা কাঁপিয়ে বললেন—'দুর্যোধন, শোন, আমি যদি মহাযুদ্ধে নিজ গদার আঘাতে তোর ওই জঙ্ঘা ভেঙে না দিই, তবে আমি আমার পূর্বপুরুষের ন্যায় সদ্গতি লাভ করব না।' সেইসময় ক্রোধান্বিত ভীমের রোমকূপ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বার হচ্ছিল।

বিদুর বললেন—'রাজাগণ! দেখো, ভীম এখন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। আজকের এই ঘটনা অবশ্যই ভরতবংশের অনর্থের মূল কারণ হবে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ! তোমাদের এই জুয়াখেলা অন্যায়। সেইজন্যই তোমরা এই পরিপূর্ণ সভাতে এক নারীকে নিয়ে অন্যায় বিবাদ করছ। তোমরা তোমাদের উৎকৃষ্টতার সবই বিসর্জন দিয়েছ, তোমাদের সব কাজই কুকর্মযুক্ত। সভাতে ধর্ম উলঙ্ঘন করলে সমস্ত সভারই দোষ হয়। ধর্ম নিয়ে একটু চিন্তা করো। যুধিষ্ঠির নিজেকে হেরে যাওয়ার আগে যদি দ্রৌপদীকে পণ রাখতেন, তাহলে অবশ্যই দ্রৌপদী দুর্যোধনের হত। কিন্তু আগে তিনি নিজেকে হারানোয় দ্রৌপদীকে পণ রাখার তাঁর কোনো অধিকার ছিল না। 'দ্রৌপদীকে আমরা জিতে নিয়েছি'—এ তোমার শুধু স্বপ্ন। শকুনির কথায় ধর্মনাশ কোরো না।' এইপ্রকার প্রশ্নোত্তর যখন চলছে, সেইসময়

ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞশালায় বহু গর্দভ একত্রিত হয়ে ডাকতে লাগল এবং সেই সঙ্গে বহু কাক, শকুন প্রভৃতি ভয়ংকর শব্দে কোলাহল করে উড়তে লাগল। এই ভীষণ কোলাহলে গান্ধারী ভয় পেয়ে গেলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্য, 'স্বস্তি', 'স্বস্তি' বলতে লাগলেন। বিদুর এবং গান্ধারী ভয় পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ঘটনাটি অবগত করালেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন—'ওরে দুর্বিনীত, তোর জেদে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। আরে দুর্বুদ্ধি! তুই কুরুকুলের পুত্রবধূ এবং পাণ্ডবদের রাজরানিকে সভায় নিয়ে এসে কথা বলছিস?' তারপর তিনি একটু ভেবে নিয়ে দ্রৌপদীকে বোঝাতে লাগলেন—'মা, তুমি পরম পতিব্রতা এবং আমার পুত্রবধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমার যা ইচ্ছা আমার কাছে চেয়ে নাও।' দ্রৌপদী বললেন—'রাজন্! আপনি যদি আমাকে কিছু দিতে চান, তাহলে আমার ইচ্ছা ধর্মাত্মা সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করুন, যাতে আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে কেউ অজ্ঞানতাবশত দাসপুত্র বলতে না পারে।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'কল্যাণী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তুমি আরও বর চাও, কারণ তুমি কেবল মাত্র একটি বর পাওয়ার যোগ্য নও।' দ্রৌপদী তখন বললেন—'আমার দ্বিতীয় বর হল—রথ এবং ধনুকসহ ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেবও দাসত্ব থেকে যেন মুক্তিলাভ করে।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সৌভাগ্যবতী বধূ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু এতেও তোমার সঠিক সম্মান হয়নি, তুমি আরও বর চাও।' দ্রৌপদী বললেন—'মহারাজ! অধিক লোভে ধর্মনাশ হয়। তৃতীয় বর প্রার্থনা করার আমার আর ইচ্ছা নেই, আমি তার অধিকারিণীও নই। শাস্ত্র অনুসারে বৈশ্যের এক, ক্ষত্রিয় নারীর দুই, ক্ষত্রিয়ের তিন এবং ব্রাহ্মণদের একশত বর চাওয়ার অধিকার আছে। এখন আমার পতিগণ দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন, এবারে তাঁরা সৎকর্ম দ্বারা সব কিছু প্রাপ্ত করবেন।' দ্রৌপদীর সুবুদ্ধিতে কর্ণ তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজেন্দ্র! আমি আমাদের শত্রুদের এইখানে অথবা এখান থেকে বেরোলেই হত্যা করব।' সেইসময় ক্রোধে ভীমের সারা অঙ্গ দিয়ে আগুন ঝরছিল। ভ্রূ কুঁচকে মুখমণ্ডল ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। যুধিষ্ঠির ভীমকে শান্ত করলেন। তারপর তাঁরা জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। তাঁরা বললেন— 'মহারাজ! আপনি বলুন এখন আমরা কী করব, আপনি আমাদের প্রভু! আমরা চিরদিনই আপনার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে চাই।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির! তোমার কল্যাণ হোক। আনন্দে বাস করো। তোমার ধনসম্পদ ও রাজ্য তুমি ফেরত নাও এবং রাজ্যপালন করো, বৃদ্ধের এই হল আদেশ। আমি তোমার হিত ও মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলছি। তুমি

বুদ্ধিমান, ধর্মজ্ঞ, বিনম্র এবং বৃদ্ধদের সেবাকারী, বুদ্ধি ও ক্ষমার সংমিশ্রণ। তুমি ক্ষমা করো, উত্তম ব্যক্তি কারো প্রতি শত্রুতা রাখে না। দোষ না দেখে গুণের দিকেই দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং কারো সঙ্গেই বিরোধ করে না। সংব্যক্তিদের দৃষ্টি শুধু সংকর্মের দিকেই থাকে। কেউ শত্রুতা করলেও তারা তা মনে রাখে না। শত্রুরও উপকার করে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করে না। নীচ ব্যক্তিরা সাধারণ কথাবার্তায় কটুকথা বলে এবং মধ্যম ব্যক্তিরা কটুবাক্য শুনে কটুবাক্য বলে। কিন্তু উত্তম ব্যক্তিরা কোনো পরিস্থিতিতেই কঠোর বচন প্রয়োগ করেন না। সং ব্যক্তিরা কোনো সময়েই মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তাঁদের দেখে সকলেই প্রসন্ন হন। এই সময় তুমিও অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছ। অতএব পুত্র ! তুমি তোমার এই জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের এবং মাতা গান্ধারীর জন্য দুর্যোধনের দুর্ব্যবহার ভুলে যাও। তোমার বৃদ্ধ অন্ধ জ্যেষ্ঠতাতকে দেখ, আমি আগেই এই পাশা খেলতে নিষেধ করেছিলাম। তারপর ভাবলাম এতে ভায়েদের মেলামেশা ও পরস্পরের শক্তির প্রকাশ করার সুযোগ হবে তাই অনুমতি দিয়েছিলাম। তোমার ন্যায় শাসক ও বিদুরের ন্যায় মন্ত্রী পেয়ে কুরুবংশ ধন্য হয়েছে। তোমার মধ্যে ধর্ম, অর্জুনের মধ্যে ধৈর্য, ভীমের মধ্যে পরাক্রম এবং নকুল-সহদেবের মধ্যে বিশুদ্ধ গুরু-সেবার ভাব আছে। ধর্মরাজ ! তোমার কল্যাণ হোক। এখন তুমি তোমার রাজ্যে যাও।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিনয় ও শিষ্টাচারের সঙ্গে প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে নিজ ভাই-বন্ধুদের এবং ইষ্ট-মিত্রের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে রওনা হলেন।

---o---

দ্বিতীয়বার কপট-দ্যূতের আয়োজন এবং পাণ্ডবদের বনগমন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ বৈশম্পায়ন ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন পাণ্ডবদের সকল সম্পদ এবং রত্নরাশি নিয়ে চলে যাবার অনুমতি দিলেন, তখন দুর্যোধনদের কী দশা হল ?

বৈশম্পায়ন বললেন—ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ধন-সম্পত্তি নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন শুনেই দুঃশাসন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যোধনের কাছে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'দাদা ! বৃদ্ধ রাজা আমাদের বহু কৌশলে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ নষ্ট করে ফেললেন। সমস্ত সম্পদই এখন শত্রুর হাতে ফিরে গেল। কিছু করণীয় থাকলে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করো।' এই শুনেই দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সকলে একসঙ্গে মিলে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'রাজন্ ! এখন যদি আমরা পাণ্ডবদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সাহায্যে রাজাদের প্রসন্ন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতাম, তাহলে আমাদের কী ক্ষতি হত ? দেখুন দংশনে উদ্যত ক্রোধপূর্ণ সাপকে গলায় ঝুলিয়ে কে বাঁচতে পারে ? এখন পাণ্ডবরাও ক্রুদ্ধ সাপেরই মতো। তারা যখন রথে করে সুসজ্জিত হয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করবে, তখন আমাদের কাউকে ওরা ছাড়বে না। এখন ওরা সেনা সংগ্রহের জন্য রওনা হল। আমরা একবার ওদের যে বিপদে ফেলেছি, তাতে ওরা আমাদের ক্ষমা করবে না। দ্রৌপদী যে লাঞ্ছনা পেয়েছে, তার জন্য ওরা কাউকে ক্ষমা করবে না। তাই আমরা বনবাসকে পণ রেখে পাণ্ডবদের সঙ্গে আবার জুয়া খেলব। তাতে ওরা আমাদের অধীন থাকবে। খেলায় যারাই হেরে যাক, ওরা অথবা আমরা, দ্বাদশ বৎসর মৃগচর্ম পরিধান করে বনে বাস করবে এবং ত্রয়োদশ বর্ষে কোনো নগরে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকবে, যাতে কেউ না খুঁজে পায়। এই সময়ে যদি জানতে পারা যায় যে, এরা পাণ্ডব বা কৌরব তাহলে আরও দ্বাদশ বৎসর বনবাস করতে হবে। এই শর্তে আপনি আবার পাশাখেলার নির্দেশ দিন। এখন এছাড়া অন্য সহজ পথ নেই। পাশা খেলার ব্যাপারে মাতুল শকুনি খুবই চতুর। পাণ্ডবরা যদি এই শর্ত মেনে নেয়, তাহলে এরই মধ্যে আমরা অনেক রাজাকে সম্পদ দ্বারা বশীভূত করে দুর্জয় সেনা সংগ্রহ করে ফেলব এবং যুদ্ধে পাণ্ডবদের হারাতে সক্ষম হব। অতএব আপনি আমাদের এই পরামর্শ মেনে নিন।'

ধৃতরাষ্ট্র এই মতকে স্বীকৃতি দিলেন। তিনি বললেন—'পুত্র ! যদি এমন হয় যে, পাণ্ডবরা বহুদূরে চলে গেছে, তাহলে দূত পাঠিয়ে দ্রুত ডেকে আনো। তারা এলে এই

শর্তেই আবার খেলো।' ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে দ্রোণাচার্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য, বিদুর, অশ্বত্থামা, যুযুৎসু, ভূরিশ্রবা, পিতামহ ভীষ্ম, বিকর্ণ—সকলেই একসুরে বলে উঠলেন 'আর পাশা খেলো না। শান্তি বজায় রাখো।' কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সকল দূরদর্শী উপকারী বন্ধুর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে পাণ্ডবদের পাশা খেলতে আহ্বান করলেন। এই সব দেখেশুনে ধর্মপরায়ণা গান্ধারী অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হলেন। তিনি তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'স্বামী ! দুর্যোধন জন্মেই গর্দভের মতো শব্দ করেছিল। তাই পরম জ্ঞানী বিদুর তখনই তাকে পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন। আমার সেই কথা স্মরণ করে মনে হচ্ছে যে, এ কুরুবংশ ধ্বংস না করে ছাড়বে না। আর্যপুত্র ! আপনি নিজ দোষে সকলকে বিপদ সাগরে নিমজ্জিত করবেন না। এই জেদী মূর্খের সকল কথায় সম্মতি দেবেন না। বংশ নষ্ট করবেন না। তুষের আগুন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। পাণ্ডবরা শান্তিপ্রিয় এবং শত্রুতার বিরোধী। তাদের ক্রুদ্ধ করা ঠিক নয়। যদিও আপনি সব কথাই জানেন, তবুও আপনাকে এসব স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে কেন ? দুষ্ট গ্রহ কবলিত ব্যক্তির চিত্তে শাস্ত্র উপদেশের ভালোমন্দ কোনো প্রভাবই পড়ে না। কিন্তু আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানী হয়েও বালকদের মতো কথা বলছেন, তা খুবই অনুচিত। এখন আপনি আপনার পুত্রতুল্য পাণ্ডবদের বশে রাখুন। দুঃখ পেয়ে এঁরা যেন আপনার ওপর বীতশ্রদ্ধ না হয়ে ওঠে। কুলকলঙ্ক দুর্যোধনকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। আমি সেই সময় মাতৃস্নেহে বিদুরের কথা মেনে নিইনি, এসব তারই ফল। শান্তি, ধর্ম অবলম্বন করে এবং মন্ত্রীদের পরামর্শে আপনার বিচারশক্তির সঠিক প্রয়োগ করুন। ভুল করবেন না। বিচার বিবেচনা না করে কাজ করলে তা দুঃখদায়ক হয়। রাজ্যলক্ষ্মী ক্রূরের হাতে পড়লে তারই সর্বনাশ করে দেয়। ধার্মিক, নিষ্ঠাবান এবং রাজ্যপালনে সক্ষম ব্যক্তির কাছেই রাজ্যলক্ষ্মী পুরুষানুক্রমে অবস্থান করে।' গান্ধারীর কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'প্রিয়ে ! যদি কুলনাশ হওয়ার হয় তাহলে হতে দাও। আমি তা রোধ করতে সক্ষম নই। এখন দুর্যোধন আর দুঃশাসন যা চায়, তাই হবে। পাণ্ডবদের ফিরে আসতে দাও। আমার ছেলেরা ওদের সঙ্গে পাশা খেলবে।'

জনমেজয় ! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে প্রতিহারী পাণ্ডবদের কাছে গেল। ততক্ষণে তাঁরা বহুদূর চলে গিয়েছিলেন। প্রতিহারী বলল—'রাজন্ ! আবার পাশা খেলার আয়োজন হচ্ছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন

আপনারা ফিরে আসুন, আবার খেলা হবে।' ধর্মরাজ বললেন—'সকলেই দৈবের অধীন, সেই অনুসারে শুভ-অশুভ ফল ভুগতে হয়। কেউ কারো বশ নয়। চলো, আবার যদি পাশা খেলতে হয় তো, তাই হবে। আমি জানি এর ফলে বংশ নাশ হবে। কিন্তু আমি আমার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ কী করে উল্লঙ্ঘন করব !' তিনি ভাইদের নিয়ে আবার ফিরে এলেন। 'শকুনি প্রবঞ্চক' জেনেও তিনি তাঁর সঙ্গে পাশা খেলতে প্রস্তুত হলেন। ধর্মরাজের এই পরিস্থিতি দেখে তাঁর মিত্ররা খুব দুঃখ পেলেন।

শকুনি ধর্মরাজকে সম্বোধন করে বললেন—'রাজন্ ! আমাদের বৃদ্ধ মহারাজ আপনার ধনসম্পত্তি আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় আমরা খুব খুশি হয়েছি। এখন আমরা আর একটি অন্য পণ রেখে খেলতে চাই। আমরা যদি আপনার কাছে খেলায় হারি, তাহলে মৃগচর্ম পরিধান করে দ্বাদশ বছর বনে বাস করব এবং ত্রয়োদশতম বছরে কোনো নগরে অজ্ঞাতভাবে বসবাস করব। সেইসময় কেউ চিনে ফেললে আরও দ্বাদশ বছর বনে বাস করতে হবে। আর যদি আমরা আপনাদের হারিয়ে দিই তাহলে আপনাদের মৃগচর্ম ধারণ করে দ্রৌপদীর সঙ্গে দ্বাদশ বছর বনে এবং ত্রয়োদশতম বছরে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। অজ্ঞাতবাসের সময় কেউ চিনে ফেললে আবার দ্বাদশ বছর

বনবাস করতে হবে। এইভাবে ত্রয়োদশ বছর পূর্ণ হলে আপনারা বা আমরা নিয়মমতো নিজ রাজ্য ফেরত পাবো। এই শর্তে আমরা আবার পাশা খেলব।' শকুনির কথা শুনে সভাসদরা বিষণ্ণ হলেন। তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে হাত তুলে বলতে লাগলেন—'অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র, এই কাজে আসন্ন বিপদকে বুঝতে পারুক কিংবা না পারুক, তাঁর মিত্রদের উচিত তাঁকে সময়মতো সতর্ক করা, নাহলে তাঁরা ধিকৃত হবেন।' সভাসদদের কথা যুধিষ্ঠিরও শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন এবারে কী সাংঘাতিক পরিণাম হতে চলেছে। তবুও তিনি এই ভেবে পাশা খেলতে রাজি হলেন যে, কৌরবদের বিনাশের সময় আগত। শকুনি তাঁর স্বীকৃতি পেয়েই পাশা ফেললেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'নাও, এই বাজি আমি জিতে নিয়েছি।'

খেলায় হেরে পাণ্ডবরা কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণ করে বন-গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁদের এই অবস্থায় দেখে দুঃশাসন বলতে লাগলেন—'ধন্য, ধন্য ! এবার দুর্যোধনের শাসন শুরু হল। রাজা দ্রুপদ তো খুব বুদ্ধিমান, তিনি কী করে মৃগচর্মধারী পাণ্ডবদের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা তো নপুংসক ! দ্রুপদ কন্যা ! এখন পাণ্ডবরা মৃগচর্ম পরে দরিদ্রের মতো বনে বাস করবে। তুমি এখন আর কী করে এদের সঙ্গে বসবাস করবে ? এবার কোনো পছন্দসই পাত্রকে বিয়ে করে নাও।' দুঃশাসন বলতেই লাগলেন, তখন ভীম ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন—'ওরে ক্রূর ! তুই তোর বাহুবলে আমাদের জয় করিসনি। ছলনা বিদ্যার বলে জিতে আকাশকুসুম দেখছিস ? এইসব কথা পাপীই বলে থাকে। তুই এই কটুবাক্যের দ্বারা যত পারিস আমার মর্মস্থলে আঘাত করে নে, আমি রণভূমিতে তোর মর্মস্থানে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে আজকের কথা মনে করিয়ে দেব। আজকে যারা ক্রোধ বা লোভের বশে তোদের পক্ষপাতিত্ব করছে, তোদের রক্ষক হয়ে রয়েছে, তাদেরও আমি সবান্ধবে যমপুরীতে পাঠিয়ে দেব।'

তখন ভীম মৃগচর্ম ধারণ করে দাঁড়িয়েছিলেন। ধর্মরক্ষার জন্যই তাঁরা এই সময় শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হননি। ভীমের কথা শুনে দুঃশাসন সেই পরিপূর্ণ সভাকক্ষে 'এই বলদ ! বলদ !' বলে নির্লজ্জের মতো নাচতে লাগলেন। ভীম বললেন—'ওরে দুরাত্মা ! কুবাক্য বলতে তোর লজ্জা করে না ? ছলনা করে সম্পত্তি লাভ করে আস্ফালন করে যাচ্ছিস। এই বৃকোদর ভীম যদি কুন্তীর গর্ভে জন্ম নিয়ে থাকে, তাহলে রণভূমিতে তোর বুক চিরে রক্তপান করবে। যদি তা না হয় তাহলে যেন আমার পুণ্যলোক প্রাপ্তি না হয়।'

পাণ্ডবরা রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলেন, ভীম সিংহের ন্যায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। দুর্যোধন তাঁকে রাগাবার জন্য ঠিক সেই ভাবেই তাঁদের পিছন পিছন চলতে লাগলেন। ভীম পিছন ফিরে তাঁকে দেখে বললেন—'মূর্খ ! এই সব লজ্জাজনক ঘটনার এখানেই সমাপ্তি হবে না। আমি তোর পারিষদদের সঙ্গে তোকে বধ করে শীঘ্রই তোর এই হাসির জবাব দেব।' ভীম নিজেকে শান্ত করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যেতে যেতে বললেন—'আমি দুর্যোধনকে, অর্জুন কর্ণকে এবং সহদেব শকুনিকে বধ করবে। আমি এই সভায় আবার শপথ করে বলছি, জগদীশ্বর নিশ্চয়ই আমার এই শপথ পূর্ণ করবেন। গদার আঘাতে আমি দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করে তার মাথায় পা রাখব আর দুঃশাসনের বুকের গরম রক্ত পান করব।' অর্জুনও বলে উঠলেন—'ভাই ভীম ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা যে, সে সংগ্রামে কর্ণ এবং তার সমস্ত সাথীকে সংহার করবে। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসা সমস্ত মূর্খদের আমি যমরাজের কাছে পাঠাব। ভাই ! হিমালয় যদি নিজ স্থান থেকে সরে যায়, সূর্যে অন্ধকার নেমে আসে, চন্দ্র জ্বলন্ত আগুনের গোলা হয়ে ওঠে ; তবুও আমার বাক্য মিথ্যা হবে না। চতুর্দশ বর্ষে যদি দুর্যোধন আমাদের রাজ্য ভালোভাবে ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে আমার কথা অবশ্যই সত্য হবে।' সহদেব বললেন—'আরে গান্ধারের কুলকলঙ্ক ! যাকে তুই পাশা ভাবছিস সেগুলিই হবে তোর জন্য তীক্ষ্ণ বাণ। আমি তোর এবং তোর আত্মীয়দের নিজ হাতে নাশ করব। শর্ত শুধু এই যে, রণভূমিতে ক্ষত্রিয়ের মতো সাহস করে থাকিস, যেন লুকিয়ে পড়িস না।'

পাণ্ডবরা এইভাবে নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞা করতে করতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'জ্যেষ্ঠতাত ! আমি ভরতবংশের বয়োবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিদুর, দুর্যোধনদের সব ভাই, যুযুৎসু, সঞ্জয়, অন্যান্য নরপতিগণ এবং সভাসদগণের অনুমতি নিয়ে বনবাসের জন্য রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে যেন আপনাদের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়।' সেইসময় সভাস্থ সকলেই লজ্জায় মাথা নীচু করে মনে মনে পাণ্ডবদের কল্যাণ চাইছিলেন। কেউ

কোনো কথা বলতে পারলেন না। বিদুর বললেন—'পাণ্ডব ! আর্যা কুন্তী রাজকুমারী, বৃদ্ধা হয়েছেন, কোমল শরীর। তাঁর পক্ষে বনবাসের ধকল সহ্য করা কঠিন। তাই তিনি সসম্মানে আমার গৃহে থাকুন। আমি এই কথা জানিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমরা সর্বদা সর্বত্র সুস্থ ও প্রসন্নভাবে থাক।' যুধিষ্ঠির বললেন—'মহাত্মা ! আমরা আপনার আদেশ শিরোধার্য করছি। আপনি আমাদের খুল্লতাত, পিতৃতুল্য। আমরা সর্বদাই আপনার অনুগত।' মহাত্মা বিদুর বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তুমি ধর্মজ্ঞ, অর্জুন বিজয়শীল, ভীম শত্রুনাশক, নকুল ধন-সংগ্রহকুশল এবং সহদেব শত্রুদের বশকারী। ঋষি ধৌম্য বেদজ্ঞ, পতিব্রতা দ্রৌপদী ধর্মশীলা এবং সংসার পরিচালনায় নিপুণ। তোমরা সকলেই প্রীতি সহকারে বাস কর। শত্রুও তোমাদের চিত্তে ভেদ-ভাব সৃষ্টি করতে পারে না। তুমি অত্যন্ত নির্মল এবং সন্তুষ্ট হৃদয়। জগতের সকলেই তোমাকে চায় এবং তোমার দর্শন লাভের জন্য আশা করে থাকে। মেরুসাবর্ণি হিমালয়ে, ব্যাসদেব বারণাবতে, পরশুরাম ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে এবং স্বয়ং মহাদেব দৃষদ্বতী নদীতীরে তোমাকে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। অঞ্জন পর্বতে অসিত মহর্ষির কাছ থেকে এবং কল্মাষী নদীর ধারে ভৃগুমুনির নিকট তুমি জ্ঞানলাভ করেছ। দেবর্ষি নারদ সর্বদা তোমার দেখাশোনা করেন আর ধৌম্যঋষি তো তোমার পুরোহিত আছেনই। দেখো, বিষম পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সময় যেন এইসব ঋষিদের উপদেশ বিস্মরণ হয়ো না। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! তুমি পুরুরবার থেকেও বুদ্ধিমান। কোনো রাজাই শক্তিতে তোমার সমকক্ষ নয়। শত্রুদের পরাজিত করায় তুমি বরুণের সমান। ধর্মাচরণে তুমি ঋষিদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তুমি জলের মতো নির্মল এবং নিজ প্রাণের বিনিময়েও অপরের মঙ্গল করে থাক। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি পৃথিবী হতে ক্ষমা, সূর্যমণ্ডল হতে তেজ, বায়ু হতে বল এবং সমস্ত প্রাণী হতে আত্মধন লাভ করো। তোমার শরীর সুস্থ এবং চিত্ত যেন প্রসন্ন থাকে। কোনো কাজ করার আগে ঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে নেবে। তুমি কখনো পাপ করেছ বলে আমার মনে হয় না। তাই তুমি অবশ্যই কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসবে। এবার তোমরা গমন করো। তোমাদের কল্যাণ হোক।'

রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরের আশীর্বাদ শিরোধার্য করে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকে ও মাতা কুন্তীকে প্রণাম করে বনবাসে যাবার অনুমতি নিলেন। দুঃখাতুরা দ্রৌপদী তাঁর শ্বশ্রূমাতা কুন্তী এবং অন্য মহিষীদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে এলে অন্তঃপুর শোকাচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাতা কুন্তী শোকাকুল কণ্ঠে বললেন—'মা ! তুমি নারীদের ধর্ম জানো। এই ঘোর সংকটে দুঃখ কোরো না। তুমি শীল ও

সদাচারসম্পন্না। তাই পতিদের প্রতি তোমার কর্তব্য সম্পর্কে তোমাকে শেখাবার কিছু নেই। তুমি পরম সাধ্বী, গুণবতী এবং দুই কুলের ভূষণ। নির্দোষ দ্রৌপদী ! তুমি যে কৌরবদের অভিশাপ দিয়ে ওদের ভস্ম করনি, এ তাদের সৌভাগ্য এবং তোমার সৌজন্য। তোমার পথ নিষ্কণ্টক হোক, তুমি চিরায়ুষ্মতী হও। কুলীন নারীগণ আকস্মিক দুঃখে দিশেহারা হন না। পতিব্রত-ধর্ম তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবে এবং সর্বপ্রকারে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমাকে একটি কথা বলার আছে। বনে থাকার সময় তুমি আমার প্রিয় পুত্র সহদেবের উপর বিশেষ নজর রেখ, সে যেন কষ্ট না পায়।' মাতা কুন্তী পাণ্ডবদের বললেন—'পুত্র ! তোমরা ধর্মপরায়ণ, সদাচারী, ভক্ত, পাপরহিত এবং দেবতাদের পূজারী। কী করে তোমাদের ওপর এই সংকট এল ? এ নিশ্চয়ই প্রারব্ধেরই ফল। তোমরা তো এমন কোনো অপরাধ করোনি। এ আমারও ভাগ্যের দোষ। কারণ তোমরা আমার গর্ভ থেকেই জন্মেছ। এইজন্যই সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের ওপর এই দুঃখ ও সংকট নেমে এল। হায় কৃষ্ণ ! হায় দ্বারকাধীশ ! হায় প্রভু ! তুমি এই ভীষণ দুর্দশা থেকে আমায় এবং আমার মহান পুত্রদের কেন রক্ষা করছ না ? তুমি তো অনাদি অনন্ত। যে ব্যক্তি নিত্য-নিরন্তর তোমার ধ্যান করে, তুমি তাকে রক্ষা কর—তোমার সম্পর্কে এই প্রসিদ্ধি এখন মিথ্যা হল কেন ? আমার পুত্রগণ ধার্মিক, যশস্বী এবং পরাক্রমশালী। তাদের

ওপর এই কষ্ট উচিত নয়। ভগবান! ওদের দয়া করো। হায়, নীতি ও ব্যবহার কুশল পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য কৃপ ও দ্রোণ ইত্যাদি কুরুকুলের বীরদের উপস্থিতিতে এই বিপত্তি কী করে ঘটল ? পুত্র সহদেব, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, পুত্র, ফিরে এসো।'

মাতা কুন্তী শোকে অধীর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর করুণ-ক্রন্দনে বিষণ্ণ হয়ে পাণ্ডবরা তাঁকে প্রণাম করে বনের দিকে রওনা হলেন। মহাত্মা বিদুর কুন্তীকে দৈবের কথা বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও আর্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে নিজ ভবনে তাঁকে নিয়ে গেলেন। কৌরবকুলের মহিলাগণ দ্যূত সভায় দ্রৌপদীকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অত্যাচারের জন্য দুর্যোধনদের নিন্দা করতে লাগলেন এবং মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

পাণ্ডবদের বনগমনের পরে কৌরবদের অবস্থা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের অন্যায়ের কথা উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবতে লাগলেন। একমুহূর্তের জন্যও তিনি শান্তি পেতেন না। অশান্ত হয়ে তিনি দূত মারফৎ বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। বিদুর এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'বিদুর ! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, পুরোহিত ধৌম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী—তাঁরা সব কীভাবে বনে গেলেন, এখন তাদের অবস্থা কী ? সেইসব বলো, আমি শুনতে চাই।'

বিদুর বললেন—'মহারাজ ! এত স্পষ্টই প্রতিভাত যে আপনার পুত্ররা কপট পাশাতে ধর্মরাজের রাজ্য ও বৈভব কেড়ে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও বিচারশীল ধর্মরাজের বুদ্ধি ধর্মে অবিচলিত ছিল। কপটভাবে রাজ্যচ্যুত হলেও তিনি আপনার পুত্রদের ওপর ভ্রাতৃভাবই রাখেন। তিনি তাঁর ক্রোধপূর্ণ চক্ষু বন্ধ রেখেছিলেন, যাতে তাঁর নেত্রের অগ্নিতে কৌরবরা ভস্ম হয়ে না যায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাই পথ চলার সময়ও নিজ মুখ বস্ত্র দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। ভীমের নিজের বাহুবলের ওপর বড় অভিমান। সে কাউকে নিজের সমকক্ষ মনে করে না। তাই বনগমনের সময় সে শত্রুদের নিজের বাহুদ্বয় প্রসারিত করে দেখাচ্ছিল যে, সময় এলে সে তার বাহুর জোর প্রয়োগ করবে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ধর্মরাজের পিছনে ধূলা উড়িয়ে যাচ্ছিল, তাতে সে জানাচ্ছিল যে, যুদ্ধের সময় সে শত্রুদের ওপর এমনই বাণ বর্ষণ করবে। এইসময় ধূলাও যেমন পুঞ্জীভূতভাবে উড়ছিল, তেমন করেই অর্জুনেরও বাণ শত্রুদের উপর বর্ষিত হবে। সহদেব মুখে ধূলা-ময়লা মেখেছিলেন, যেন তাঁর মুখ কেউ না দেখে, এই তাঁর অভিপ্রায়। নকুল তো সারা দেহ ধূলায় ধূসরিত করেছিলেন, যাতে তাঁর সুন্দর রূপে পথে কোনো নারী মুগ্ধ না হয়। রজস্বলা দ্রৌপদী, একবস্ত্র পরিধান করে, আলুলায়িত কেশে, ক্রন্দন করতে করতে যাচ্ছিলেন। তিনি যেতে যেতে বলছিলেন—'যাঁদের জন্য আমাদের এই দুর্দশা, আজ থেকে চোদ্দো বছর পর তাঁদের নারীরাও স্বজন হারাবার শোকে এমনি করেই হস্তিনাপুরে প্রবেশ করবেন।' সর্বাগ্রে পুরোহিত ধৌম্য চলছিলেন। তিনি নৈঋত কোণের দিকে কুশাগ্রের মুখ রেখে যমদেবতা সম্বন্ধীয় সামবেদগান করতে করতে যাচ্ছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় হল যে, রণভূমিতে কৌরবরা নিহত হলে তাঁদের গুরু-পুরোহিত এইরূপ মন্ত্রপাঠ করবেন।

পাণ্ডবদের বনগমনে শোকাতুর হয়ে সকল নাগরিক বিলাপ করে বলছিলেন, 'হায়, হায় ! আমাদের প্রিয় সম্রাট এই ভাবে বনে যাচ্ছেন। কুরুকুলের বয়োবৃদ্ধগণকে ধিক এই সময়ে বিবশ থাকার জন্য। তাঁরা লোভবশত ধর্মাত্মা পাণ্ডবদের দেশ থেকে বার করে দিলেন। আমরা এঁদের বিহনে অনাথ হলাম। এই অন্যায় কাজের জন্য কৌরবদের ওপর আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই।' প্রজারা এইভাবে আচরণ করছিল, ওদিকে পাণ্ডবরা চলে যেতেই আকাশে বিনামেঘে বজ্রপাত হল। পৃথিবী কেঁপে উঠল। অমাবস্যা ছাড়াই সূর্যগ্রহণ দেখা গেল। নগরের দক্ষিণ দিকে উল্কাপাত

হল। শকুন, কাক প্রভৃতি মাংসাশী পাখিরা দেবালয়, কেল্লা ইত্যাদির ওপর মাংস এবং হাড় ফেলতে লাগল। এই উৎপাতের ফল হচ্ছে ভরতবংশের নাশ। এসবই আপনার দুর্মতির ফল।' যখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এইসব বলছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ অনেক ঋষিকে সঙ্গে করে সেই স্থানে এলেন এবং এক ভয়ংকর কথা বলে চলে গেলেন যে, 'দুর্যোধনের কুকর্মের ফলস্বরূপ আজ হতে চোদ্দ বছর পর ভীম ও অর্জুনের হাতে কুরুবংশ বিনাশ প্রাপ্ত হবে।'

তখন দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি দ্রোণাচার্যকে তাদের প্রধান আশ্রয় ভেবে পাণ্ডবদের সমস্ত রাজ্য তাঁকে সমর্পণ করলেন। দ্রোণাচার্য বললেন—'ভরতবংশীয়গণ ! পাণ্ডবরা দেবতাদের পুত্র। তাঁদের কেউ মারতে পারবে না। সব ব্রাহ্মণই এই কথা বলেন। তা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা আমার শরণ নিয়েছেন, তাই এঁদের সাহায্যকারী নৃপতিদের সঙ্গে আমিও নিজ শক্তি অনুসারে কৌরবদের পূর্ণ সহযোগিতা করব। শরণাগতকে আমি পরিত্যাগ করতে পারব না। আমার ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে এই কাজ করতে হবে। কী আর করব, দৈবই সর্বাপেক্ষা বলবান। কৌরবগণ ! পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে তোমাদের কাজ শেষ হয়নি। তোমাদের নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তোমাদের রাজ্য স্থায়ী নয়। এ চার দিনের আলো। দুই ঘণ্টার খেলা, এতে গর্বিত হয়ো না। বড় বড় যজ্ঞ করো, ব্রাহ্মণদের দান করো। যা পার ভোগ করে নাও। চতুর্দশ বর্ষে তোমাদের সংকটে পড়তে হবে।'

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! গুরুদেবের কথা ঠিক। তুমি পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনো। যদি ফিরে না আসে তাহলে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র, রথ এবং সেবাকারী সঙ্গে দাও। এমন ব্যবস্থা কর, যেন বনেও আমার পুত্র পাণ্ডবরা সুখে থাকে।' এই বলে তিনি নির্জন স্থানে গিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তাঁর চিত্ত বিহ্বল হল। তখন সঞ্জয় তাঁকে বললেন—'মহারাজ ! আপনি পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত করে বনবাসী করেছেন, তাঁদের ধন-দৌলত, রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন। এখন কেন শোক করছেন ?' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করে কি কারো সুখলাভ হয় ? তারা যুদ্ধকুশল, বলবান এবং মহারথী।'

সঞ্জয় কিছু গম্ভীর হয়ে বললেন—'মহারাজ ! আপনার কুল যে নাশ হবে তা তো নিশ্চিত, নিরীহ প্রজারাও বাঁচবে না। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং মহাত্মা বিদুর আপনার পুত্র দুর্যোধনকে অনেক বারণ করেছিলেন, তবুও তিনি পাণ্ডবদের প্রিয় পত্নী ধর্মপরায়ণা দ্রৌপদীকে সভায় এনে অপমানিত করেছেন। বিনাশকাল নিকট হলে বুদ্ধি মলিন হয়। অন্যায়কেও ন্যায় মনে হয়। সেই ব্যাপার হৃদয়ে এমন স্থান নেয় যে, অনর্থকে স্বার্থ এবং স্বার্থকে অনর্থ বোধ হয় এবং নিজেকে বিনাশ করেই ক্ষান্ত হয়। কালদণ্ড মাথায় আঘাত করে বিনাশ করে না বরং তার এমনই ক্ষমতা যে বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো বলে দেখাতে থাকে। আপনার পুত্ররা অযোনিসম্ভূতা, পতিব্রতা, অগ্নিবেদী হতে উৎপন্ন সুন্দরী দ্রৌপদীকে পূর্ণ সভায় অসম্মান করে যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করেছেন। এরূপ নিন্দনীয় কাজ দুষ্ট দুর্যোধন ব্যতীত কেউ করতে পারে না।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয়, আমারও তাই মনে হয়। দ্রৌপদীর আর্ত দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে, আমার পুত্ররা তো নগণ্য। ধর্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভায় অপমানিত হতে দেখে ভরতবংশের নারীরা গান্ধারীর কাছে গিয়ে করুণ ক্রন্দন করেছিলেন। ব্রাহ্মণরাও আমাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সন্ধ্যাপূজা না করে লোকদের সঙ্গে সেই কথাই বলে ক্ষোভ করতেন। সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণের সময় ঝড় উঠেছিল, বজ্রপাত হয়েছিল, উল্কাপাতও হয়েছিল। অমাবস্যা ছাড়াই সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। প্রজারা আতঙ্কিত হয়েছিল। রথশালাতেও আগুন লেগেছিল। মন্দিরে ধ্বজা ভেঙে পড়েছিল। যজ্ঞশালায় শিয়াল প্রবেশ করেছিল, গাধা ডাকতে আরম্ভ করেছিল। চারিদিকে অলক্ষণ দেখে ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক প্রমুখ সভামণ্ডপ থেকে চলে গিয়েছিলেন। বিদুরের ইচ্ছায় আমি দ্রৌপদীকে তাঁর মনোমত বর দিয়ে পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার অনুমতি দিয়েছিলাম। তখন বিদুর বলেছিলেন দ্রৌপদীকে অপমান করার ফলে ভরতবংশ নাশ হবে। দ্রৌপদী দৈব উৎপন্ন অনুপম লক্ষ্মী। তিনি পাণ্ডবদের অনুগামিনী। এই মহা অপমান ও ক্লেশ পাণ্ডব, যদুবংশ ও পাঞ্চাল সহ্য করবে না ; কারণ এঁদের সহায়ক ও রক্ষক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বিদুর অনেকভাবে বুঝিয়ে কল্যাণের জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছিলেন। বিদুরের কথা ধর্মানুকূল তো ছিলই, অর্থের দৃষ্টিতেও কম লাভের ছিল না। কিন্তু আমি অন্ধ পুত্রস্নেহের জন্য তাঁর কথা উপেক্ষা করেছি।'

সভাপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

বনপর্ব

পাণ্ডবদের বনগমন এবং তাঁদের প্রতি প্রজাদের ভালোবাসা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মহর্ষি ! দুরাত্মা দুর্যোধন, দুঃশাসনরা তাঁদের মন্ত্রীদের সাহায্যে কপট দ্যূতে পাণ্ডবদের পরাজিত করেছিলেন। এমনকি তাঁরা অনেক কুকথাও বলেছিলেন যার ফলে শত্রুতার চরম বৃদ্ধি হয়েছিল। তারপর আমার পূর্বপুরুষগণ এই বিপদে কেমন করে সময় অতিবাহিত করলেন, তাঁদের সঙ্গে কারা বনে গিয়েছিলেন ? তাঁরা সেখানে কীভাবে থাকতেন, কী খেতেন, দ্বাদশ বৎসর কীভাবে কাটালেন ? পরম সৌভাগ্যবতী দ্রৌপদী কী করে এই বনবাসের দুঃখ সহ্য করলেন ? আপনি সবিস্তারে এইসব জানিয়ে আমার উৎকণ্ঠা প্রশমন করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ দুরাত্মা দুর্যোধনদের দুর্ব্যবহারে ক্ষোভিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁদের রানি দ্রৌপদীকে নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সহ হস্তিনাপুর থেকে রওনা হলেন। তাঁরা হস্তিনাপুরের বর্ধমানপুরের সম্মুখস্থ দ্বার অতিক্রম করে উত্তর দিকে চললেন। ইন্দ্রসেন ও আরও চোদ্দজন সেবাকারী তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে দ্রুতগামী রথে তাঁদের অনুসরণ করলেন। হস্তিনাপুরের নাগরিকরা এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। লোকেরা ব্যাকুল হয়ে নিঃশঙ্কে পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ কুরু বয়োজ্যেষ্ঠগণের নিন্দা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল—'দুরাত্মা দুর্যোধন শকুনির সাহায্যে রাজশাসন করতে চায়। তার

রাজ্যে আমরা, আমাদের বংশ, প্রাচীন সদাচার এবং গৃহ-সম্পত্তি যে সুরক্ষিত থাকবে—তার কোনো আশা নেই। রাজা যদি পাপী হয় এবং তার সাহায্যকারীও যদি অধার্মিক হয় তাহলে কুল-মর্যাদা আচার, ধর্ম-অর্থ কী করে থাকবে ! আর এগুলি না থাকলে কীসের আশায় মানুষ জীবন ধারণ করবে ? দুর্যোধন তার গুরুজনদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেছে, লোভের বশবর্তী হয়ে বংশ-মর্যাদা এবং আত্মীয় স্বজনকে

ত্যাগ করেছে। এমন অর্থলোলুপ, অহংকারী এবং ক্রূর ব্যক্তির শাসনে এই পৃথিবীর সর্বনাশ সুনিশ্চিত। চলো, যেখানে আমাদের প্রিয় পাণ্ডবগণ যাচ্ছেন, আমরাও সেখানে যাই। এঁরা দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, যশস্বী এবং ধর্মনিষ্ঠ।

হস্তিনাপুরের লোকজন এইভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেখান থেকে রওনা হয়ে পাণ্ডবদের কাছে এসে বিনীতভাবে হাত জোড় করে বললেন—'পাণ্ডবগণ! আপনাদের কল্যাণ হোক। আমাদের হস্তিনাপুরে দুঃখ ভোগ করার জন্য রেখে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ? আপনারা

যেখানে যাবেন, আমরাও সেখানে যাব। আমরা যখন থেকে জানতে পেরেছি যে, দুর্যোধনরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে কপট-দ্যূতে হারিয়ে আপনাদের বনবাসী করেছে, তখন থেকে আমরা খুব দুঃশ্চিন্তায় আছি। আমাদের এইভাবে ছেড়ে যাওয়া আপনাদের উচিত নয়। আমরা আপনাদের সেবক এবং হিতৈষী। দুরাত্মা দুর্যোধনের কুশাসনে আমাদের যেন সর্বনাশ না হয়। আপনারা তো জানেন দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করলে কী কী ক্ষতি হয় আর সৎব্যক্তির সঙ্গে বাস করলে কী লাভ হয় ? সুগন্ধ পুষ্পের সঙ্গে থাকলে যেমন জল-তিল এবং স্থান সুগন্ধিত হয়, তেমনই মানুষও ভালো-মন্দ সঙ্গ অনুসারে ভালো-মন্দ হয়ে ওঠে। সৎপুরুষের সঙ্গে ধর্মভাব বৃদ্ধি পায় আর দুষ্টের সঙ্গে মোহ। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত জ্ঞানী, বৃদ্ধ, দয়ালু, শান্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং তপস্বী ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করা। কুলীন, বিদ্বান এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সেবা এবং তাঁদের সাহচর্য শাস্ত্রাদির স্বাধ্যায়ের থেকেও শ্রেষ্ঠ। পাপী ব্যক্তিদের দর্শন, স্পর্শ, তাদের সঙ্গে বার্তালাপে ধর্ম এবং সদাচার নষ্ট হয়। উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হয়। নীচ পুরুষের সাহচর্যে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। সৎপুরুষের সঙ্গ করলে উন্নতি লাভ হয়। হে পাণ্ডবগণ! জগতের শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ মানুষের অভ্যুদয় এবং কল্যাণের জন্য যে গুণাদির প্রয়োজনের কথা বলেছেন, লোক-ব্যবহারে যে বেদোক্ত আচরণের প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছেন, সে সবই আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাই আপনাদের মতো সৎব্যক্তিদের সঙ্গে আমরা থাকতে চাই, তাতেই আমাদের কল্যাণ।'

প্রজাদের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার পূজনীয় এবং আদরণীয় ব্রাহ্মণ ও অন্য প্রজাগণ! বাস্তবে আমাদের কোনো গুণ নেই, আপনারা স্নেহ ও দয়ার বশবর্তী হয়ে আমাদের গুণ দেখছেন এবং বর্ণনা করছেন। এ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আমি আমার ভাইদের সঙ্গে আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনারা দয়া করে ও স্নেহবশত আমাদের এই কথা মেনে নিন। এখন হস্তিনাপুরে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর, আমাদের মাতা কুন্তী, গান্ধারী এবং সকল আত্মীয়-বন্ধু বসবাস করছেন। আমাদের জন্য যেমন আপনাদের দুঃখ হচ্ছে, তেমনই ওঁদের মনেও তীব্র শোক ও বেদনা অনুভূত হচ্ছে। আপনারা আমাদের প্রসন্নতার জন্যই ওখানে ফিরে যান এবং তাঁদের সঙ্গে থাকুন! আপনারা বহু দূর চলে এসেছেন, আর আসবেন না। আমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন আপনাদের রাজ্যে আছেন, তাঁদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করবেন। তাঁদের রক্ষা করাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনারা যদি তাই করেন, তাহলে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করব এবং তাতে আমারই সম্মান করা হয়েছে বলে মনে করব।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন তাঁর প্রজাদের এই কথা বললেন, তখন সকলেই অত্যন্ত আর্তভাবে 'হায়! হায়!' করে উঠল। পাণ্ডবদের গুণ-স্বভাব ইত্যাদি স্মরণ করে তাঁদের আকুলতার সীমা রইল না এবং ইচ্ছা না থাকলেও পাণ্ডবদের অনুরোধে তাঁরা সেখান থেকে ফিরে গেলেন। পুরবাসীগণ ফিরে গেলে পাণ্ডবরা রথে করে গঙ্গাতীরে প্রমাণ নামক এক বড় বটগাছের কাছে এলেন। তখন সন্ধ্যা

হবার উপক্রম। তাঁরা সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে শুধুমাত্র জলপান করেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সেইসময় বহু ব্রাহ্মণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাণ্ডবদের কাছে এলেন, এঁদের মধ্যে অনেক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের মণ্ডলীতে থেকে পাণ্ডবগণ বিবিধ শাস্ত্র চর্চা করে রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কথোপকথন এবং মহাত্মা শৌনকের উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাত্রি অতিবাহিত হল। পাণ্ডবরা নিত্যকর্মে প্রবৃত্ত হলেন। যখন বনে যাওয়ার সময় হল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন—'মহাত্মাগণ ! আমাদের রাজ্য, লক্ষ্মী এবং সর্বস্ব শত্রুরা হস্তগত করেছে। এখন আমাদের ফল-মূল-কন্দ ইত্যাদি খেয়ে বনে বাস করতে হবে, সেখানে নানা বিপদ ও বিঘ্ন আছে। আপনাদের সেখানে বড় কষ্ট হবে। অতএব আপনারা এখন সস্থানে গমন করুন।' ব্রাহ্মণরা বললেন—'রাজন্ ! প্রীতিবশত আমরা আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। আমাদের আপনার কাছে কৃপা করে থাকতে দিন। ধর্মরাজ ! আমাদের শয়ন-ভোজন ইত্যাদির জন্য আপনাকে একটুও চিন্তা করতে হবে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেব এবং আপনার সঙ্গে বনেই থাকব। সেখানে আমরা আনন্দে ইষ্টদেবতার ধ্যান করব, জপ করব, পূজা করব ; তাতে আপনাদের ভালো হবে, আমাদের মনও প্রফুল্ল থাকবে। সেখানে নানা সুন্দর কাহিনী শুনিয়ে সুখে বনে বিচরণ করব।' ধর্মরাজ বললেন—'মহাত্মাগণ ! আপনাদের কথা ঠিকই, আমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসি ; কিন্তু এখন আমার অর্থবল নেই ; আমি নিরুপায় কিন্তু আমি কী করে সহ্য করব যে, আপনারা নিজেরাই নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করছেন ! হায় ! আমাদের জন্য আপনাদের কত কষ্ট হবে।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন এইভাবে শোক প্রকাশ করে মাটিতে বসে পড়লেন, তখন আত্মজ্ঞানী শৌনক তাঁকে বললেন—'রাজন্ ! অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রত্যহ শত শত শোক এবং ভয়ের কারণ এসে উপস্থিত হয়, জ্ঞানীদের কাছে নয়। আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এইভাবে কর্মবন্ধনে বাঁধা পড়েন না, তাঁরা সর্বদা মুক্ত থাকেন। আপনার চিত্তবৃত্তি যম, নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা পরিপুষ্ট। শ্রুতি ও স্মৃতির জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন। আপনার মতো অটলবুদ্ধি যাঁর, তিনি সম্পত্তি নাশে, অন্ন-বস্ত্রের অনটনে কিংবা ভয়ানক বিপত্তিতেও বিচলিত হন না। কোনো শারীরিক বা মানসিক দুঃখ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। মহাত্মা জনক জগৎকে শারীরিক ও মানসিক দুঃখে কাতর দেখে শান্তির জন্য এই কথা বলেছিলেন। আপনি তাঁর উপদেশ শুনুন—মানুষের দুঃখের চারটি কারণ হল—রোগ, দুঃখদায়ক বস্তুর স্পর্শ, অধিক পরিশ্রম এবং অভিলষিত বস্তু না পাওয়া। এর জন্য মনে চিন্তা হয় এবং মানসিক দুঃখই শারীরিক কষ্টের রূপ ধারণ করে। গরম লোহা যদি কলসির জলে ফেলা হয়, তাহলে সেই জলও গরম হয়ে যায়। তেমনই মানসিক পীড়ায় শরীরও ব্যথিত হয়। যেমন শীতল জলে অগ্নি শান্ত হয়, তেমন জ্ঞানের সাহায্যে মনকে শান্ত করা উচিত। মনের দুঃখ দূর হলেই শরীরের দুঃখও দূর হয়। মনের দুঃখ হওয়ার কারণ স্নেহ। স্নেহই মানুষকে বিষয়ে আবদ্ধ করে এবং নানাপ্রকার দুঃখভোগ করায়। স্নেহের জন্যই দুঃখ, ভয়, শোক ইত্যাদি অনুভূত হয়। স্নেহের জন্যই বিষয়ের অস্তিত্ব অনুভব হয় এবং তাতে অনুরাগ জন্মায়। বিষয় চিন্তা এবং অনুরাগের থেকেও স্নেহের প্রভাব বেশি। যেমন কোটরের আগুন সমস্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলে, তেমনই অল্প ঈর্ষাও ধর্ম ও অর্থের সর্বনাশ করে। বিষয় না থাকায় যে নিজেকে ত্যাগী বলে, সে বাস্তবিক ত্যাগী নয়। বাস্তবিক ত্যাগী সে, যে বিষয় পেয়েও সেগুলির অবগুণ লক্ষ্য করে এবং তার থেকে দূরে থাকে। সংসার বিমুখ ব্যক্তি দ্বেষরহিত হন। তাই তিনি কখনো কর্মবন্ধনে বাঁধা পড়েন না। জগতে বন্ধু-বান্ধব থাকা ও অর্থ সংগ্রহ করা উচিত কিন্তু তাতে আসক্তি রাখা উচিত নয়। বিবেক-বিচারের সাহায্যে স্নেহ পরিত্যাগ করতে হয়। পদ্ম পাতায় যেমন জল স্থায়ী হয় না, তেমনই বিবেকবান, ঈশ্বর

লাভে ইচ্ছুক এবং আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তে স্নেহ চিরস্থায়ী হয় না। বিষয় দর্শনে রমণীয় বুদ্ধি হয়, তখন তাতে ভালোবাসা জন্মায়, তা প্রাপ্ত করার ইচ্ছা জাগে। পাওয়া গেলে লালসা জন্মায় এবং আরও পাওয়ার ইচ্ছা থাকে। এই তৃষ্ণাই সমস্ত পাপের মূল, উদ্বেগের জননী, অধর্মে পূর্ণ এবং ভয়ংকর। মূর্খ একে ত্যাগ করতে পারে না। বৃদ্ধ হলেও এর বৃদ্ধত্ব আসে না। এই রোগ শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এটি ত্যাগ করতে পারলে সত্যকার সুখ পাওয়া যায়। আগুন যেমন লোহার মধ্যে প্রবেশ করে তাকেও পুড়িয়ে দেয়, তেমনই প্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ করে এই তৃষ্ণা তাকেও নাশ করে, নিজে কখনো মিটে যায় না। ইন্ধন যেমন নিজেই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়, লোভী ব্যক্তিও তেমনই লোভেই নষ্ট হয়ে যায়। প্রাণীদের ওপর যেমন মৃত্যুভয় সবসময় চেপে বসে থাকে ধনী ব্যক্তিদেরও তেমনই রাজা, জল, অগ্নি, চোর এবং কুটুম্বভয় সর্বদা ঘিরে থাকে। যেমন মাংসকে আকাশে পাখি, ভূমিতে হিংস্র প্রাণী এবং জলে কুমীর খেয়ে নেয়, তেমনই ধনী ব্যক্তিদের ধনও অপর লোকেই ভোগ করে থাকে। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের ধনও অনর্থের মূল, মূর্খের তো কথাই নেই। তারা অর্থের দ্বারা প্রাপ্য কর্মের ফলে উৎসুক হয়ে থাকে এবং নিজ কল্যাণ সাধনে বিমুখ হয়ে যায়। ধন সর্বপ্রকার লোভ, মোহ, কৃপণতা, অহংকার, ভয় ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করায়। ধন অর্জন করতে, রক্ষা করতে এবং খরচ করতেও অনেক উদ্বেগ সহ্য করতে হয়। ধনের জন্য একে অন্যের প্রাণহরণ করে। কারো কাছে অনেক অর্থ জমা হওয়া, শত্রু জড়ো হওয়ার মতোই উদ্বেগজনক। তাকে ত্যাগ করাও কঠিন হয়ে ওঠে। অর্থ চিন্তাদ্বারা মানুষ নিজেকেই নষ্ট করে। সেইজন্য অজ্ঞানী সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকে এবং জ্ঞানী থাকে সর্বদাই সন্তুষ্ট। অর্থ পিপাসা কখনো মেটে না, সেই দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই পরম সুখ। সত্যকার সন্তোষই পরম শান্তি। ধর্মরাজ ! জীবন, যৌবন, সৌন্দর্য, রত্নরাশি, ঐশ্বর্য এবং প্রিয়বস্তু ও বন্ধু সমাগম—এ সবই অনিত্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসব কখনো চায় না। তাই মানুষের উচিত হল এইসবের সংগ্রহ থেকে বিরত থাকা এবং এগুলি ছেড়ে দেওয়াতে যে কষ্ট, তা প্রসন্নভাবে মেনে নেওয়া। আজ পর্যন্ত জগতে এমন কোনো ব্যক্তি দেখা যায়নি, যিনি ধন সংগ্রহ করে সুখী হয়েছেন। তাই ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা সেইসব মানুষের প্রশংসা করেন, যারা ভাগ্য বশে প্রাপ্ত বস্তুতেই সন্তুষ্ট। ধর্মাচরণ করার জন্যও ধন উপার্জন করার থেকে না করাই ভালো। ধর্মরাজ ! সুতরাং আপনি কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করবেন না। যদি আপনি নিজ ধর্মে অটল থাকতে চান তাহলে ধনের ইচ্ছা ত্যাগ করুন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ব্রাহ্মণগণ ! আমি নিজে উপভোগ করব বলে ধন আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি শুধু আপনাদের পালন পোষণ করতে চাই। আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ধনলোভ নেই। মহাত্মন্ ! আমি পাণ্ডুবংশীয় গৃহস্থ, আমি কী করে আমার অনুগামীদের পালন-পোষণ না করে থাকব ? গৃহস্থ ব্যক্তির আহারে সকল প্রাণীই ভাগীদার। গৃহস্থের ধর্ম হল সন্ন্যাসীর জন্য খাদ্য রন্ধন করা, কারণ তাঁরা নিজেরা রন্ধন করেন না। সৎব্যক্তির গৃহে তৃণের আসন, বসার স্থান, পানীয় জল এবং মিষ্ট বাক্যের কখনো অভাব থাকে না। দুঃখীকে শয়নের শয্যা, ক্লান্ত ব্যক্তিকে বসার স্থান, তৃষ্ণার জল এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্য অবশ্যই দেওয়া উচিত। সনাতন ধর্ম হল যে নিকটে আসবে তাকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখবে। তার প্রতি আন্তরিকভাবে সদ্ভাব পোষণ করবে। মধুর বাক্যে বসার আসন দেবে। অতিথিকে আসতে দেখলে স্বাগত জানিয়ে আপ্যায়ন করবে। যে গৃহস্থ সন্ধ্যাপূজা, গো-অতিথি, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র এবং সেবকদের আপ্যায়ন করে না, তাকে এরা নষ্ট করে দেয়। গৃহস্থ দেবতা ও পিতৃগণের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করবে, তাঁদের অর্পণ না করে ব্যবহার করা উচিত নয়। কুকুর, চণ্ডাল এবং পাখিদের জন্যও কিছু খাদ্য দেওয়া উচিত। এগুলি বলিবৈশ্বদেব কর্ম করে এবং অন্যকে খাইয়ে যে খাওয়া তা অমৃত ভোজন। অতিথিকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা, আন্তরিকভাবে তার মঙ্গলকামনা করা, সত্য ও মিষ্টবাক্য বলা, নিজ হাতে তার সেবা করা এবং যাবার সময় তার অনুগমন করা, এগুলিকে বলা হয় পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞ। কোনো অজানা ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে এলে তাকে সাদরে খেতে দেওয়া উচিত। এ হল মহাপুণ্য কাজ। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে বাস করে এইরূপ ব্যবহার করে ; সে নিজ ধর্ম পালন করে। আমার ন্যায় গৃহস্থকে আপনি এছাড়া ভিন্ন ধর্ম উপদেশ দিচ্ছেন কেন ?'

শৌনক বললেন—সত্যই এই জগতের গতি বিপরীত। আপনার ন্যায় সৎ ব্যক্তি অপরকে না খাইয়ে নিজে খেতে

দ্বিধা বোধ করেন আর দুষ্টরা নিজের পেট ভর্তি করার জন্য অন্যের খাবারও কেড়ে নেয়। ইন্দ্রিয় বড় বলবান, মানুষ সেই ফাঁদে পড়ে এমনই মূঢ় হয়ে যায় যে, তার সুপথ-কুপথের জ্ঞান থাকে না। যখন ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগ সাধিত হয়, তখন অন্তরের সংস্কার মনে জেগে ওঠে। মন ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত যে বিষয়টির সম্মুখীন হয় তাই ভোগ করার জন্য উৎসুক হয়ে সেটি হস্তগত করার চেষ্টা করে। সংকল্প-দ্বারা কামনা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়াদির আকর্ষণ যথাবৎ বজায় থাকে। এই দুটিতে মানুষ বিবশ হয়ে রূপের লোভে পতঙ্গের ন্যায় কামনার আগুনে গিয়ে পড়ে। সে তখন নিজ বাসনা অনুসারে রসনেন্দ্রিয় এবং জননেন্দ্রিয়ের ভোগে এত ব্যস্ত হয়ে যায় যে, তখন তার আর নিজেকে স্মরণ থাকে না। অজ্ঞানতার জন্য কামনা, কামনাপূর্তি হলে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার জন্য নানাপ্রকারের উচিত-অনুচিত কর্ম হতে থাকে। পরে সেই কর্ম অনুসারে বহু যোনিতে জন্মগ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত জলচর-স্থলচর এবং নভশ্চর প্রাণীরূপে জন্ম নিতে হয়। বিষয়াসক্ত বুদ্ধিহীন প্রাণীদেরই এই গতি হয়। এবারে যারা নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করে এই জগতের জন্মচক্র থেকে মুক্ত হতে চায়, সেই বুদ্ধিমানদের কথা শুনুন ! কর্ম করো এবং কর্ম পরিত্যাগ করো, এই দুটি কথাই বেদের আদেশ। তাই কর্মের আচরণকারীকে বেদের নির্দেশ মেনেই কর্ম করতে হবে এবং কর্মকে ত্যাগ করাও বেদের নির্দেশ মনে করে তা ত্যাগ করতে হবে। কর্ম করা এবং না করা—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আগ্রহ নিজ বুদ্ধির অহংকারে করা উচিত নয়। ধর্মের আটটি পথ—যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং নির্লোভতা। এর প্রথম চারটি কর্মরূপ এবং শেষ চারটি মনোভাবরূপ। এগুলিও কর্তব্য-বুদ্ধিতে অহংকার পরিত্যাগ করে করা উচিত। যারা গতে বিজয়লাভ করতে চায়, তাদের ঠিকভাবে এই নিয়ম পালন করা উচিত, যথা—শুদ্ধ সংকল্প, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, ব্রহ্মচর্য, অহিংসাদি ব্রত, গুরুদেবের সেবা, ভোজন শুদ্ধি, কর্মফল পরিত্যাগ এবং চিত্তনিরোধ। এই নিয়ম পালনের দ্বারাই বড় বড় দেবতাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধর্মরাজ ! আপনিও এই নিয়ম ও তপস্যার দ্বারা ওইরূপ সিদ্ধিলাভ করুন, যাতে ব্রাহ্মণদের ভরণ-পোষণের শক্তি লাভ হয়।

পুরোহিত ধৌম্যের হিতোপদেশ অনুসারে যুধিষ্ঠিরের সূর্য উপাসনা ও অক্ষয়পাত্র প্রাপ্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাত্মা শৌনকের এই উপদেশ শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যের কাছে গেলেন এবং ভাইদের সামনে তাঁকে বললেন—'ঠাকুর ! বহু বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমাদের সঙ্গে বনে যাচ্ছেন। তাঁদের পালন-পোষণ করার আমার কোনো সামর্থ্য নেই, তাই আমি খুব চিন্তিত। আমি তাঁদের পালন-পোষণ করতেও সক্ষম নই আর তাঁদের ছেড়ে দিতেও পারছি না। এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত, আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে পুরোহিত ধৌম্য কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে এই বিষয়ে চিন্তা করলেন, তারপর ধর্মরাজকে সম্বোধন করে বললেন—'ধর্মরাজ ! সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন সকল প্রাণী ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়েছিল, তখন ভগবান সূর্য দয়াপরবশ হয়ে পিতার ন্যায় তাঁর কিরণ-রশ্মি দ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করে পুনরায় দক্ষিণায়নের সময় তাতে প্রবেশ করেন। এইভাবে তিনি অন্ন-উৎপাদনের যোগ্য ভূমি প্রস্তুত করলে চন্দ্র তাতে বীজবপন করেন এবং তারই ফলে অন্নের উৎপত্তি হয়। সেই অন্নের সাহায্যেই প্রাণীদের ক্ষুধা নিরসন হয়। ধর্মরাজ ! এই কথা বলার তাৎপর্য হল, সূর্যের কৃপায় অন্ন উৎপন্ন হয়। সূর্যই সকল প্রাণীকে রক্ষা করেন, তিনিই সবার পিতা। অতএব তুমি ভগবান সূর্যের শরণ গ্রহণ করো এবং তাঁর কৃপাপ্রসাদে ব্রাহ্মণদের পালন করো।'

পুরোহিত ধৌম্য ধর্মরাজকে সূর্যের আরাধনা পদ্ধতি জানিয়ে বললেন—'আমি তোমাকে সূর্যের একশত আট নাম বলছি। সাবধানে শোনো—সূর্য, অর্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথ্বী-জল-তেজ-বায়ু-আকাশ স্বরূপ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, ইন্দ্র, বিবস্বান,

দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐন্ধন অগ্নি, তেজস্পতি, ধর্মধ্বজ, বেদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কল, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, শাশ্বত পুরুষ, যোগী, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্বলোকনমস্কৃত, স্রষ্টা, সংবর্তক বহ্নি, সর্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, সর্বতোমুখ, শয়, বিশাল, বরদ, সর্বধাতুনিষেচিতা, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারক, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, অদিতিপুত্র, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, মাতা-পিতা-পিতামহ স্বরূপ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, মৈত্রেয় এবং করুণান্বিত। ধর্মরাজ ! অমিত তেজস্বী এবং কীর্তন যোগ্য ভগবান সূর্যের এই হল একশত আটটি নাম। স্বয়ং ব্রহ্মা এর বর্ণনা করেছেন। এই নামগুলি উচ্চারণ করে ভগবান সূর্যকে এইভাবে নমস্কার করতে হয়—সমস্ত দেবতা, পিতৃলোক এবং যক্ষ যাঁর সেবা করেন, অসুর, রাক্ষস ও সিদ্ধ যাঁর বর্ণনা করেন, তপ্ত সোনা এবং অগ্নির ন্যায় যাঁর কান্তি, সেই ভগবান ভাস্করকে আমি আমাদের হিতের জন্য প্রণাম করি। যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় একাগ্রচিত্তে এটি পাঠ করে, তার স্ত্রী-পুত্র, ধনরত্নরাশি পূর্ব-জন্মস্মরণ, ধৈর্য এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিলাভ হয়। যে ব্যক্তি পবিত্র হয়ে শুদ্ধ ও একাগ্রচিত্তে মনে মনে ভগবান সূর্যের এই স্তব পাঠ করে, সে সমস্ত শোকাদি মুক্ত হয়ে অভীষ্ট বস্তু লাভ করে।'

পুরোহিত ধৌম্যের কথা শুনে সংযমী এবং দৃঢ়ব্রতী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শাস্ত্রোক্ত বস্তু দ্বারা ভগবান সূর্যের তপস্যা এবং আরাধনা করলেন। তিনি স্নান করে ভগবান সূর্যের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে আচমন, প্রাণায়ামাদি করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'সূর্যদেব ! আপনি সমস্ত জগতের নেত্র, সকল প্রাণীর আত্মা। আপনিই সমস্ত প্রাণীর মূল কারণ এবং কর্মনিষ্ঠদের সদাচার। সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠার উপাসকরা শেষকালে আপনাকেই লাভ করে। আপনি মোক্ষের দ্বার এবং মুমুক্ষুদের পরম আশ্রয়। আপনিই সমস্ত লোককে ধারণ করেন, প্রকাশিত করেন, পবিত্র করেন এবং স্বার্থ ব্যতীতই পালন করেন। আজ পর্যন্ত বড় বড় ঋষিরা আপনার পূজা করেছেন এবং এখনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা তাঁদের শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা আপনার পূজা করেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, গুহ্যক এবং পন্নগ আপনার কাছে বর পাবার ইচ্ছায় আপনার দিব্য রথ অনুসরণ করেন। তেত্রিশজন দেবতা, বিশ্বদেব প্রমুখ দেবতাগণ, উপেন্দ্র, মহেন্দ্রও আপনার আরাধনা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন। বিদ্যাধর কল্পবৃক্ষের পুষ্পদ্বারা আপনার পূজা করে নিজ মনোরথ সফল করেন। গুহ্যক, পিতৃগণ, দেবতা, মানুষ সকলেই আপনার পূজা করে গৌরবান্বিত হন। অষ্টবসু, ঊনপঞ্চাশ মরুদ্গণ, একাদশ রুদ্র, সাধ্য গণ এবং বালখিল্য প্রমুখ সকলেই আপনাকে আরাধনা করেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত লোকে এমন কোনো প্রাণী নেই, যে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বহু শক্তি বিরাজমান, কিন্তু আপনার প্রভাব ও কান্তির সঙ্গে কেউই তুলনীয় নয়। জ্যোতির্ময় সমস্ত পদার্থই আপনার অন্তর্গত। আপনি সকল জ্যোতির প্রভু। সত্য, সত্ত্ব এবং সমস্ত সাত্ত্বিকভাব আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত। ভগবান বিষ্ণু যে চক্রের সাহায্যে অসুরদের অহংকার চূর্ণ করেন তা আপনারই অংশ হতে নির্মিত। আপনি গ্রীষ্মকালে আপনার কিরণের সাহায্যে সমস্ত ওষধি, রস এবং প্রাণীদের তেজ আকর্ষণ করেন এবং বর্ষাকালে আবার সে সব ফিরিয়ে দেন ; বর্ষা ঋতুতে আপনার কিরণমালা তপ্ত করে, জ্বালা দেয় এবং গর্জন করে। সেগুলিই বিদ্যুৎ হয়ে চমকায় এবং বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে। ঠাণ্ডায় কম্পমান ব্যক্তিদের অগ্নিদ্বারা, বস্ত্রদ্বারা বা কম্বলের সাহায্যে তেমন সুখলাভ হয় না, যেমন সুখ আপনার কিরণ দিয়ে থাকে। আপনি আপনার আলোর রশ্মিতে তেরোদ্বীপ সম্বলিত এই পৃথিবীকে প্রকাশিত করেন। কারো সহায়তা ছাড়াই আপনি ত্রিলোকের হিতে ব্যাপৃত থাকেন। আপনি প্রকাশিত না হলে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হয়ে থাকে ফলে ধর্ম-অর্থ ও কাম সম্বন্ধীয় কোনো কর্মেই কারো প্রবৃত্তি হয় না। ব্রাহ্মণাদি দ্বি-জাতি সংস্কার, যজ্ঞ, মন্ত্র, তপস্যা এবং বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম আপনার কৃপাতেই হয়ে থাকে। ব্রহ্মার একদিন এক হাজার যুগ হয়।

তার আদি-অন্তের বিধাতা আপনিই। মনু, মনুপুত্র, জগৎ, মনুষ্য, মন্বন্তর এবং ব্রহ্মার সমর্থকগণের প্রভুও আপনি। প্রলয়ের সময় আপনার ক্রোধেই সংবর্তক অগ্নি প্রকটিত হয় এবং ত্রিলোক ভস্ম করে আপনাতেই স্থিত হয়। আপনার কিরণ থেকেই নানা রংয়ের ঐরাবত ইত্যাদি মেঘ ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং প্রলয় করে থাকে। আপনিই বারোটি রূপে দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রলয়ের সময় সমুদ্রের জল আপনি কিরণের সাহায্যে শুষ্ক করেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, অগ্নি, সূক্ষ্মমন, প্রভু, শাশ্বত ব্রহ্ম এসবই আপনার নাম। আপনিই হংস, সবিতা, ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি, বিবস্বান, মিহির, পূষা, মিত্র এবং ধর্ম। আপনিই সহস্ররশ্মি, আদিত্য, তপন, গোপতি, মার্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য, শরণ্য এবং দিনকর। আপনাকেই দিবাকর, সপ্তসপ্তি, ধামকেশী, বিরোচন, আশুগামী, তমোঘ্ন এবং হরিতাশ্ব বলা হয়। যে ব্যক্তি সপ্তমী অথবা ষষ্ঠীর দিন প্রসন্ন হয়ে ভক্তির সঙ্গে আপনার পূজা করেন এবং অহংকার করেন না, তাঁর লক্ষ্মী লাভ হয়। যিনি অনন্য চিত্তে আপনার পূজা এবং নমস্কার করেন, তাঁর আধি, ব্যাধি এবং বিপদ কোনো কষ্ট দেয় না। আপনার ভক্ত সমস্ত রোগরহিত, পাপমুক্ত, সুখী এবং চিরজীবি হয়ে থাকেন। হে অন্নপতে, আমি শ্রদ্ধাসহকারে সকলকে অন্নদান এবং আতিথ্য করতে চাই। আমি অন্ন কামনা করি। আপনি কৃপা করে আমার মনের বাসনা পূর্ণ করুন। আপনার চরণের আশ্রিত মাঠর, অরুণ, দণ্ড, প্রভৃতি সকল অনুচরগণকে—যাঁরা বজ্র, বিদ্যুৎ আদির প্রবর্তক, আমি প্রণাম করি। ক্ষুভা, মৈত্রী ও অন্যান্য ভূতমাতাদেরও প্রণাম করছি। আপনি এই শরণাগতকে রক্ষা করুন।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন ভুবনভাস্কর ভগবান অংশুমালীকে এইভাবে স্তব করলেন তখন তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁর অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান শ্রীবিগ্রহে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক। আমি দ্বাদশ বৎসর ধরে তোমাকে অন্নদান করব। এই তাম্রনির্মিত পাত্র তোমায় দিলাম। তোমার রান্নাঘরে যা কিছু ফল, মূল, পঞ্চব্যঞ্জনাদি ভোজনসামগ্রী তৈরি হবে, দ্রৌপদী আহার না করা পর্যন্ত প্রতিদিন এই পাত্র পূর্ণ থাকবে। আজ থেকে চতুর্দশ বর্ষে তুমি তোমার রাজ্য ফিরে পাবে।' এই বলে ভগবান সূর্যদেব অন্তর্হিত হলেন।

যে ব্যক্তি সংযম এবং একাগ্রতার সঙ্গে মনের কোনো

বাসনা পূরণের জন্য এই স্তোত্রপাঠ করে, ভগবান সূর্য তার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। যে বারবার এটি ধারণ ও শ্রবণ করে, তার ইচ্ছানুসারে পুত্র, ধন, বিদ্যা ইত্যাদি লাভ হয়। নারী-পুরুষ যে কেউই এটি দিনে রাতে দুবার পাঠ করলে অতিঘোর সংকট থেকেও মুক্তিলাভ করে। এই স্তব ব্রহ্মার থেকে ইন্দ্র, ইন্দ্রের থেকে নারদ, নারদের থেকে ধৌম্য এবং ধৌম্যের থেকে যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এর সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই স্তোত্র পাঠ করলে যুদ্ধে বিজয়লাভ এবং ধনলাভ হয়, সমস্ত পাপ দূর হয়ে অন্তিমকালে সূর্যলোক প্রাপ্তি হয়।

জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে ভগবান সূর্যের কাছ থেকে বরলাভ করেন। তারপর জল থেকে উঠে পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণাম জানালেন এবং ভাইদের আলিঙ্গন করলেন। পরে সূর্যের দেওয়া পাত্রটি দ্রৌপদীকে দিলেন। রান্না তৈরি হলে, সামান্য রান্নাকরা অন্ন সেই পাত্রে রাখলে, পাত্রের প্রভাবে সেই অন্ন সমাগত সকলের পরিপূর্ণ আহার যোগাত। তার দ্বারাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পরে ভাইদের খাওয়াতেন, শেষে তিনি নিজে পরমতৃপ্তি ভরে অমৃতের ন্যায় অন্ন গ্রহণ করতেন। তাঁর পরে দ্রৌপদীর খাওয়া হলে

খাদ্য সমাপ্ত হত। যুধিষ্ঠির ভগবান সূর্যের কাছে অক্ষয় পাত্র লাভ করে এইভাবে ব্রাহ্মণদের অভিলাষ পূর্ণ করতেন। কিছুদিন পরে তাঁরা সকলে মিলে কাম্যক বনে রওনা হলেন।

—— o ——

ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হওয়ায় পাণ্ডবদের কাছে বিদুরের গমন এবং পুনরায় ফিরে আসা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবরা বনে যাওয়ার পর প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাব এবং অন্তর্দাহ শুরু হল। তিনি পরম জ্ঞানসম্পন্ন ধর্মাত্মা বিদুরকে ডেকে বললেন—'ভাই বিদুর ! তোমার বুদ্ধি মহাত্মা শুক্রাচার্যের ন্যায় শুদ্ধ, তুমি সূক্ষ্মতম এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকে জানো। কৌরব এবং পাণ্ডব তোমাকে সম্মান করে এবং তোমারও উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি আছে। তুমি এমন কোনো উপায় বলো যাতে উভয়েরই হিত সাধিত হয়। পাণ্ডবরা চলে যাওয়ার পর আমার এখন কী করা উচিত ? প্রজারা কী করলে আমাদের সম্মান করবে ? পাণ্ডবরাও যাতে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, তেমন কোনো উপায় তুমি বলো।'

বিদুর বললেন—'রাজন্ ! অর্থ, ধর্ম এবং কাম— এই তিনের ফল ধর্ম দ্বারাই লাভ হয়। এটি রাজ্যপালনেরও মূল ধর্ম। আপনি ধর্ম পালনে অনড় থেকে পাণ্ডবদের এবং আপনার পুত্রদের রক্ষা করুন। আপনার পুত্ররা শকুনির পরামর্শে পূর্ণ সভায় ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে, সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতে পরাজিত করে তাদের সর্বস্ব কৌশলে অপহরণ করেছে। এ মস্ত বড় অধর্ম। আমার দৃষ্টিতে এটি নিবারণের একটি মাত্র উপায় আছে, যা করলে আপনার পুত্ররা পাপ ও কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সেই উপায় হল পাণ্ডবদের যা কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা ওদের ফিরিয়ে দেওয়া। রাজার পরম ধর্ম হল নিজের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, অন্যের কিছুতে লোভ না করা। আমি যে উপায় বললাম, তাতে আপনার লাঞ্ছনা দূর হবে, ভাই ভাইয়ে বিবাদ হবে না এবং অধর্মও হবে না। আপনার কাছে এই কাজটিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন যে, আপনি পাণ্ডবদের সন্তুষ্ট করুন এবং শকুনিকে তিরস্কার করুন। আপনার পুত্রদের যদি একটুও সৌভাগ্যের অবশিষ্ট থাকে তাহলে অতি শীঘ্রই এই কাজ করা উচিত। মোহবশত যদি আপনি এরূপ না করেন, তাহলে সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস

হয়ে যাবে। আপনার পুত্র দুর্যোধন যদি খুশি মনে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়, তাহলে ঠিক আছে, নাহলে পরিবার এবং প্রজাদের সুখের জন্য তাকে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন। যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে কারো প্রতি রাগ-দ্বেষ নেই, তাই তিনিই ধর্ম অনুসারে পৃথিবী শাসন করার যোগ্য। আমরা যদি মিলে মিশে থাকতে পারি, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত রাজাই আমাদের অনুগত হয়ে সেবা করার জন্য উপস্থিত থাকবেন। দুঃশাসন পরিপূর্ণ সভায় ভীম এবং দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুক। আপনি সান্ত্বনা দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসান। আর কী বলব, আপনি এইটুকু করলে সব কৃতকৃত্য হয়ে যাবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! এ তুমি কী বলছ ? তুমি পাণ্ডবদের ভালো চাইছ আর আমার পুত্রদের কথা ভাবছ না। তোমার কথা আমার ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি বার বার পাণ্ডবদের পক্ষেই কথা বলছ। ওদের জন্য আমি

আমার পুত্রদের কী করে ত্যাগ করব ? বিদুর ! আমি তোমাকে এত সম্মান করি আর সেই তুমি আমার পুত্রদের অহিত চাইছ ? আমার আর তোমাকে কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি এখানে থাকতে পারো অথবা চলে যাও।' এই বলে ধৃতরাষ্ট্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্দরমহলে চলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই দশা দেখে বিদুর বললেন—'কৌরবকুলের ধ্বংস এবার অবশ্যম্ভাবী।' এই বলে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হলেন।

বিদুরের মনে তো এমনিই পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা সর্বদা থাকত, আজ ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে তা পূর্ণ করার অবকাশ পেয়ে তিনি একটি রথে করে কাম্যক বনের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর রথের দ্রুতগামী ঘোড়াগুলি অতি সত্বর তাঁকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল। সেই সময় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণাদি, দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সমভিব্যাহারে বসে ছিলেন। তাঁরা দেখলেন বিদুর তাঁদের কাছে আসছেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে

বললেন—'ভাই, জানি না মহাত্মা বিদুর এবারে এখানে এসে আমাদের কী বলবেন।' পাণ্ডবরা উঠে বিদুরকে স্বাগত জানালেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করলেন। বিদুরও সকলের সঙ্গে দেখা করলেন। বিশ্রামের পর পাণ্ডবরা তাঁকে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারের কথা বললেন। কুশল প্রশ্ন শেষ হলে বিদুর বললেন—'ধর্মরাজ ! আমি তোমাকে একটি বড় কাজের কথা বলছি। শত্রু দুঃখ দিলেও যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে এবং উন্নতির সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ শক্তি এবং জনবল সংগ্রহ করতে থাকে, সেই পৃথিবীর রাজা হয়। যে ব্যক্তি নিজেদের ভাইদের আলাদা করে দেয় না, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে, আপদ-বিপদ মিলেমিশে সহ্য করে এবং প্রতিরোধও করে পরিণামে সে লাভবান হয়। তাই ভাইদের কখনো আলাদা করে দিতে নেই। ভাইদের সঙ্গে সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে আলোচনা করা উচিত এবং এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে তাঁদের মনে কোনো সন্দেহ জাগে। যা নিজে খাবে, তা ভাইদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া উচিত। নিজে আরাম করার আগে ভাইদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে। যে এরূপ ব্যবহার করে তার ভালো হয়।' যুধিষ্ঠির বললেন—'খুল্লতাত ! আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে আপনার উপদেশ অনুসারে কাজ করব আর আপনি আমাদের অবস্থা এবং পরিস্থিতি অনুসারে যা ঠিক বলে মনে করেন, তা বলুন ; আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব।'

জনমেজয় ! এদিকে বিদুর হস্তিনাপুর ছেড়ে পাণ্ডবদের কাছে চলে যাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের মনে বড় অনুতাপ হল। তিনি বিদুরের প্রভাব, নীতিজ্ঞান এবং সন্ধি-বিগ্রহের কুশলতার কথা স্মরণ করে ভাবতে লাগলেন যে 'এখন উনি পাণ্ডবদের হয়ে ওদেরই শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন।' ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হয়ে সভার মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরলে তিনি উঠে সঞ্জয়কে বললেন—'সঞ্জয় ! আমার প্রিয় ভাই বিদুর পরম হিতৈষী এবং সাক্ষাৎ ধর্মের মূর্তি। সে না থাকায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। আমি ক্রোধবশে আমার নিরপরাধ ভাইকে বহিষ্কার করে দিয়েছি। তুমি শীঘ্র যাও, গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসো। বিদুর ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করো।'

ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে সঞ্জয় কাম্যক বনের দিকে যাত্রা করলেন। কাম্যক বনে পৌঁছে সঞ্জয় দেখলেন ধর্মরাজ মৃগচর্ম পরে ভাই, বিদুর এবং সহস্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। সঞ্জয় তাঁদের প্রণাম করলে সবাই তাঁকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন। বিশ্রাম এবং কুশল প্রশ্নাদির পরে সঞ্জয় তাঁর আসার কারণ ব্যক্ত করে বললেন—'মহাত্মা বিদুর ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ করেছেন। আপনি হস্তিনাপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রাণরক্ষা

করুন।' মহাত্মা বিদুর সঞ্জয়ের কথায় পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন—'আমার প্রিয় ভাই! তোমার কোনো অপরাধ নেই। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে তুমি ভালোভাবে ফিরে এসেছ। ওখানে তোমার কী আমার কথা মনে ছিল! তুমি যাওয়ায় আমার ঘুম হয়নি। আমি যে রূঢ় ব্যবহার করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।' বিদুর বললেন—'আপনি আমার বড় এবং পূজনীয়। আপনার কথায় আমি কিছু মনে করিনি, তাতে ক্ষমা করার কী আছে? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। আমার কাছে আপনার পুত্ররা এবং পাণ্ডবরা একই। পাণ্ডবদের অসহায় দেখে স্বভাবতই ওদের সাহায্য করার কথা আমার মনে হয়েছে। আমার মনে কৌরবদের প্রতি কোনো দ্বেষভাব নেই।' এইভাবে একে অপরকে প্রসন্ন করে সুখে বাস করতে লাগলেন।

—o—

দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি, ব্যাসদেবের আগমন এবং মৈত্রেয়র অভিশাপ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! দুরাত্মা দুর্যোধন যখন খবর পেলেন যে, বিদুর পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে এসেছেন, তখন তিনি খুব দুঃখিত হলেন। তিনি মাতুল শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনকে ডেকে বললেন—'পাণ্ডবদের হিতৈষী এবং আমাদের পিতার অন্তরঙ্গ মন্ত্রী বিদুর বন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি এবার পিতাকে এমন কিছু বোঝাবেন যাতে পিতা আবার ওদের ডেকে আনবেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের যুক্তি করতে হবে, যাতে আমার কার্যসিদ্ধ হয়।' দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝে কর্ণ বললেন—'আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রথে করে চলো বনে যাই, সেখানে গিয়ে পাণ্ডবদের হত্যা করি। এইভাবে ওদের মৃত্যু হলে লোকে কিছু জানতে পারবে না এবং আমাদের বিবাদও চিরকালের জন্য সমাপ্ত হবে। বর্তমানে পাণ্ডবরা যুদ্ধে অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে, উপরন্তু তারা শোকগ্রস্ত এবং অসহায়। তার মধ্যেই ওদের ওপর চড়াও হয়ে ওদের হারিয়ে দেওয়া উচিত।' কর্ণের এই কথা সকলে এক বাক্যে মেনে নিল এবং সকলে ক্রোধভরে রথে করে পাণ্ডবদের বধ করার জন্য বনের দিকে রওনা হল।

মহর্ষি ব্যাস অত্যন্ত শুদ্ধ হৃদয়ের মানুষ। তাঁর সামর্থ্য অনির্বচনীয়। কৌরবরা যখন পাণ্ডবদের অনিষ্ট করার জন্য রওনা হয়, সেইসময় মহর্ষি ব্যাস সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে কৌরবদের কুবুদ্ধি জেনে গেলেন এবং স্পষ্টভাষায় কৌরবদের এমন কাজ না করতে আদেশ দিলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—'ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাদের ভালোর জন্য বলছি। দুর্যোধন কপটতা করে পাশা খেলে পাণ্ডবদের পরাজিত করে তাদের বনে পাঠিয়েছে, এই ব্যাপার আমার একটুও ভালো লাগেনি। পাণ্ডবরা নিশ্চয়ই তেরো বছর পরে কৌরবদের দেওয়া কষ্টের কথা স্মরণ করে উগ্ররূপ ধারণ করে যুদ্ধ করে তোমার পুত্রদের ধ্বংস করবে। এ কেমন কথা যে, দুরাত্মা দুর্যোধন রাজ্যলোভে পাণ্ডবদের বধ করতে চায়! তুমি তোমার পুত্রদের এই কাজে বাধা দাও, তারা গৃহেই চুপচাপ থাকুক। ওরা যদি পাণ্ডবদের বধ করার চেষ্টা করে তাহলে নিজেদেরই প্রাণ সংশয় হবে। তুমি যদি পুত্রদের এই ঈর্ষা-দ্বেষ প্রশমনের জন্য চেষ্টা না করো, তাহলে বড়ই অন্যায় হবে। আমার মত হল যে, দুর্যোধন একাই বনে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকুক। পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকলে তার হিংসাভাব দূর হয়ে প্রীতিভাব জাগরূক হবে। কিন্তু তা খুব

কঠিন কাজ, কেননা জন্মগত স্বভাব পরিবর্তন করা সহজ নয়। তুমি যদি কুরুবংশ রক্ষা করতে চাও এবং দুর্যোধনের মঙ্গল চাও তাহলে দুর্যোধন যেন তাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে নেয়।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'হে পরমজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ! আপনি যা বলছেন, আমারও তাই মত, সকলেই তা জানেন। আপনি কৌরবদের ভালোর জন্য যে কথা বলছেন, বিদুর, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যও সেই কথা বলছেন। আপনি যদি আমার ওপর অনুগ্রহ করে থাকেন, কুরুবংশীয়দের দয়া করেন, তাহলে আমার দুষ্ট পুত্র দুর্যোধনকেও এই শিক্ষা দিন।' ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! কিছুক্ষণ পরে মহর্ষি মৈত্রেয় এখানে আসবেন। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেছেন, এবার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তিনিও তোমার পুত্রকে মিলেমিশে থাকার উপদেশই দেবেন। তবে আমি একটা কথা জানিয়ে রাখছি যে, তিনি যা বলবেন তা কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই করা উচিত। তাঁর নির্দেশ যদি অমান্য করা হয় তাহলে তিনি ক্রোধে শাপ দিয়ে থাকেন।' এই বলে মহর্ষি বেদব্যাস সেখান থেকে রওনা হয়ে গেলেন।

মহর্ষি মৈত্রেয় পদার্পণ করতেই ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের নিয়ে তাঁর আদর-আপ্যায়নে ব্যাপৃত হলেন। তাঁর বিশ্রাম শেষ হলে ধৃতরাষ্ট্র বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু ! আপনি কুরুজাঙ্গাল দেশ থেকে এখানে ভালোভাবে এসেছেন তো ? পঞ্চ পাণ্ডবরা আশাকরি কুশলে আছে ? তারা তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে ইচ্ছুক কি না ? আপনি কৃপা করে বলুন কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে চিরকালের মতো ভাব-ভালোবাসা হবে তো ?' মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—'রাজন্ ! আমি তীর্থযাত্রা করতে করতে কুরুজাঙ্গাল দেশে গিয়েছিলাম। সেখানে কাম্যক বনে দৈবাৎ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁরা আজকাল জটা এবং মৃগছাল ধারণ করে তপোবনে বাস করছেন। তাঁদের দর্শন লাভের জন্য বড় বড় মুনি-ঋষিরা আসেন। ধৃতরাষ্ট্র ! আমি সেখানে শুনে এসেছি তোমার পুত্ররা মূর্খতাবশত পাশা খেলে তাদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছে। তোমাদের পক্ষে এ বড়ই ক্ষতির কারণ হবে। ওখান থেকেই তোমাদের কাছে এলাম, কারণ আমি তোমাদের স্নেহ করি এবং ভালোবাসি। রাজন্ ! তুমি এবং ভীষ্ম জীবিত থাকতে তোমার পুত্ররা একে অপরের সঙ্গে বিরোধ করে মারামারি করবে,তা কখনো উচিত নয়। তুমি সবার মধ্যমণি এবং সকলকে বাধা দিতে বা দণ্ড দিতে সক্ষম, তাহলে এই ভীষণ অন্যায়কে কেন সহ্য করছ ? তোমার সভায়, তোমার উপস্থিতিতে যে অন্যায় আচরণ হল তাতে মুনি-ঋষিদের মধ্যে তোমার মাথা হেঁট হয়েছে। এখনও সময় আছে সামলে নেবার।' তারপর তিনি দুর্যোধনদের দিকে ফিরে বললেন—'পুত্র দুর্যোধন ! আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি, তুমি একটু ভেবে চিন্তে দেখ। পাণ্ডবদের, কুরুবংশীয়দের, সমস্ত প্রজাদের এবং তোমাদেরও মঙ্গল এতেই যে, তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। তাঁরা সকলেই বীর, যোদ্ধা, বলবান, দৃঢ়চিত্ত এবং নররত্নস্বরূপ। তাঁরা অত্যন্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ, আত্মাভিমানী এবং রাক্ষসদের শত্রু। তাঁরা ইচ্ছা করলে যেমন খুশি রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁদের হাতে অনেক বড় বড় রাক্ষস মারা পড়বে এবং এঁরা হিড়িম্ব, বক, কিমীর ইত্যাদি রাক্ষসদেরও মেরে ফেলেছেন। যে রাতে ওঁরা এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিমীরের মতো বলশালী রাক্ষসকে ভীম কথা বলতে বলতেই মেরে ফেলেছেন। তুমি তো জানোই দিগ্বিজয়ের সময় ভীম দশ হাজার হাতির সমান বলশালী জরাসন্ধকে বধ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আত্মীয়। দ্রুপদের পুত্র ওঁদের শ্যালক। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে পাল্লা দেবার এখন কেউ নেই। সুতরাং তোমাদের এখন ওদের সঙ্গে সন্ধি করে নেওয়া উচিত। তুমি আমার কথা মেনে নাও। ক্রোধের বশে অনর্থ কোরো না।'

মহর্ষি মৈত্রেয় যখন এইসব বলছিলেন তখন দুর্যোধন

মৃদু হাস্য মুখে এক পায়ে মাটি খুঁটছিলেন আর অন্য পায়ের ওপর হাত দিয়ে তাল দিচ্ছিলেন। দুর্যোধনের এই ঔদ্ধত্য দেখে মৈত্রেয় তাকে অভিশাপ দেবার কথা ভাবলেন। কে বা কার বশ ! এ বিধাতারই ইচ্ছা। তিনি জলস্পর্শ করে দুর্যোধনকে অভিশাপ দিলেন—'মূর্খ দুর্যোধন ! তুমি আমাকে অপমান করছ এবং আমার কথা শুনছ না, এবার তুমি তোমার অহংকারের ফল ভোগ করো। তোমার এই মনোভাবের জন্য কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হবে, তাতে গদার আঘাতে ভীম তোমার উরুভঙ্গ করবে।' মহর্ষি মৈত্রেয়ের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর চরণে পড়ে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'প্রভু ! কৃপা করুন, এই শাপ যেন দুর্যোধনকে স্পর্শ না করে।' মহর্ষি বললেন—'রাজন্ ! তোমার পুত্র যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়, তাহলে এই শাপ লাগবে না, নাহলে অবশ্যই লাগবে।' এই বলে মহর্ষি মৈত্রেয় সেখান থেকে চলে গেলেন। দুর্যোধনও কির্মীর বধ সম্বন্ধে ভীমের পরাক্রমের কথা শুনে উদাস হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

—o—

কির্মীর বধের কাহিনী

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মৈত্রেয় মুনি চলে গেলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বিদুর ! ভীমের সঙ্গে কির্মীর রাক্ষসের কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল ? তুমি আমাকে কির্মীর বধের কাহিনী শোনাও।' বিদুর বললেন—'রাজন্ ! পাণ্ডবদের সব কাজই অলৌকিক। আমার সেটি বারবার শোনার অবকাশ হয়। রাজন্ ! পাণ্ডবরা যখন পাশায় পরাজিত হয়ে বনবাসের জন্য হস্তিনাপুর থেকে রওনা হয়, তখন তিন দিন ধরে তারা এক নাগাড়ে চলেছিল। যে পথ দিয়ে তারা কাম্যক বনে প্রবেশ করতে চাইছিল, নিঝুম রাত্রে সেই রাস্তা আটকে রাক্ষস কির্মীর হাতে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দুটি

লাল, লম্বা বাহু এবং ভয়ংকর দাঁত, মাথায় লম্বা চুল। সে কখনো নানা রূপ ধারণ করছিল, কখনো মেঘের মতো গর্জন করছিল। তার সেই গর্জন শুনে বনের সমস্ত পশু পক্ষী ভয়ে ডেকে উঠেছিল, ঝড় উঠেছিল, ধুলায় সমস্ত আকাশ ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। দ্রৌপদী তাকে দেখেই ভয়ে যেন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। তার এই কাণ্ড দেখে পুরোহিত ধৌম্য রক্ষোঘ্ন মন্ত্রপাঠ করে তার রাক্ষসী মায়া নাশ করে দেন। সেই সময় রাক্ষস কির্মীর ভয়াবহ বেশ ধারণ করে পাণ্ডবদের সামনে এসে দাঁড়াল। পাণ্ডবদের পরিচয় জেনে কির্মীর বলল— 'আমি বকাসুরের ভাই আর হিড়িম্বের মিত্র। এই ভীমই ওদের বধ করেছে, আজ খুব ভালো সুযোগ এসেছে, আমি এখনই ওকে বধ করব।' তখন ভীম এক বিশাল গাছ উপড়ে নিয়ে তার পাতাগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ়ভাবে কোমরের কাপড় বেঁধে গাছটি তুলে রাক্ষসের মাথায় মারলেন। কিন্তু এতে রাক্ষসের কিছুই হল না। রাক্ষস তাঁর ওপর এক জ্বলন্ত কাঠ ফেলল, ভীম সেটি পায়ে চেপে নিজেকে রক্ষা করলেন। তারপর দুজনের মধ্যে ভয়ংকর বৃক্ষযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, যার ফলে আশপাশের বহু বৃক্ষ নষ্ট হয়ে গেল। ভীম হাতির মতো লম্ফ দিয়ে রাক্ষসকে হাতে করে ধরলেও, সে এক ঝটকায় হাত থেকে বেরিয়ে এসে ভীমকে ধরল। বলবান ভীম তখন তাকে মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে কোমর চেপে ধরে গলা টিপে ধরলেন। তখন তার শরীর শিথিল হয়ে চোখ বেরিয়ে এলো। কির্মীর রাক্ষস এইভাবে বধ হলে পাণ্ডবরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সকলেই ভীমের প্রশংসা করতে লাগল এবং তারপরে কাম্যক বনে প্রবেশ করল। মহাত্মা বিদুরের কাছে কির্মীর বধের কাহিনী শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিষণ্ণ বদনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

—o—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্যদের কাম্যক বনে আগমন, পাণ্ডবদের সঙ্গে আলোচনা এবং তাঁদের প্রত্যাবর্তন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যখন ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক ইত্যাদি বংশের যাদবগণ, পাঞ্চালের ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিদেশের ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় দেশের আত্মীয়স্বজনরা এই সংবাদ পেলেন যে, পাণ্ডবগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে রাজধানী থেকে চলে গিয়ে কাম্যক বনে বাস করছেন তখন তাঁরা কৌরবদের ওপর বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের নিন্দা করতে লাগলেন এবং নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করতে পাণ্ডবদের কাছে গেলেন। সকল ক্ষত্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের নেতা করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নমস্কার করে বিষণ্ণভাবে বললেন—'হে রাজন্যবর্গ ! এখন এটি নিশ্চিত হল যে, পৃথিবী দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের রক্তপান করবে। সনাতন ধর্ম হল এই যে, যে ব্যক্তি কাউকে ঠকিয়ে সুখ- ভোগ করে, তাকে মেরে ফেলা উচিত। এখন আমরা একত্রিত হয়ে কৌরব এবং তাদের সাহায্যকারীদের যুদ্ধে বধ করব এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করব।'

অর্জুন দেখলেন, 'পাণ্ডবগণ অপমান হওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর কালরূপ প্রকটিত করতে চান।' তখন তিনি লোকমহেশ্বর সনাতন পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করার জন্য স্তুতি করতে লাগলেন। অর্জুন বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্যামী আত্মা। সমস্ত জগৎ আপনার থেকেই প্রকটিত হয়ে অন্তকালে আপনাতেই সমাহিত হয়। সকল তপস্যার অন্তিম গতিও আপনিই। আপনি নিত্য যজ্ঞস্বরূপ, আপনি অহংকারী, ভৌমাসুরকে বধ করে মণির কুণ্ডলগুলি ইন্দ্রকে উপহার দিয়েছেন এবং ইন্দ্রত্বও প্রদান করেছেন। আপনিই জগৎ উদ্ধারের জন্য মনুষ্যাবতার গ্রহণ করেছেন। আপনিই নারায়ণ ও হরি রূপে প্রকটিত। আপনি ব্রহ্মা, সোম, সূর্য, ধর্ম, ধাতা, যমরাজ, অগ্নি, বায়ু, কুবের, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী এবং দিকস্বরূপ। পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ং অজ এবং চরাচর জগতের স্রষ্টা। আপনিই অদিতির গর্ভে বামন বিষ্ণুরূপে অবতার হয়েছিলেন। সেই সময় আপনি মাত্র তিন পদে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল জয় করেছিলেন। সর্বস্বরূপ ! আপনি সূর্যে তাঁর জ্যোতিরূপে থেকে তাঁকে প্রকাশ করছেন। আপনি সহস্র অবতার রূপ ধারণ করে ধর্মবিরোধী অসুরদের সংহার করেছেন। আপনি সর্ব ঐশ্বর্যময়ী দ্বারকানগরীকে আপন করে লীলা বিস্তার করেছেন এবং শেষে তাকে সমুদ্রে সমাহিত করবেন। আপনি সর্বতোভাবে স্বাধীন। তা সত্ত্বেও হে মধুসূদন ! আপনার মধ্যে ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ, অসত্য এবং ক্রূরতা নেই। কুটিলতা তো থাকতেই পারে না। হে অচ্যুত ! সকল মুনি-ঋষি আপনাকে তাঁদের হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান দিব্য জ্যোতিরূপে জেনে আপনার শরণ গ্রহণ করেন এবং মোক্ষ লাভের ইচ্ছা করেন। প্রলয়ের সময় আপনি স্বাধীনভাবে সমস্ত প্রাণীদের নিজ স্বরূপে লীন করে নেন এবং সৃষ্টির সময় সমস্ত জগৎরূপে প্রকটিত হন। ব্রহ্মা এবং শংকর উভয়েই আপনার থেকে প্রকটিত হয়েছেন। আপনি বাল্যলীলার সময় বলরামের সঙ্গে যেসব অলৌকিক কার্য ঘটিয়েছেন, তা আজ পর্যন্ত কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না।'

শ্রীকৃষ্ণের আত্মা অর্জুন তাঁকে এইভাবে স্তুতি করে চুপ করলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন ! তুমি একমাত্র আমার এবং আমি একমাত্র তোমারই। যা আমার, তা তোমার এবং যা তোমার, তা আমার। যে তোমাকে হিংসা করে, সে আমাকে হিংসা করে এবং যে তোমাকে ভালোবাসে, সে আমার প্রিয়। তুমি নর, আমি নারায়ণ। আমরা ঠিক সময়েই অবতারত্ব নিয়েছি। তুমি আমার অভিন্ন আর আমিও তোমার অভিন্ন। আমাদের দুজনের স্বরূপও একই।' যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলছিলেন, তখন পাণ্ডবদের রাজরানি দ্রৌপদী শরণাগত-বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে আসছিলেন।

দ্রৌপদী বললেন—'মধুসূদন ! আমি অসিত এবং দেবল মুনির মুখ থেকে শুনেছি যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনি একাই কারো সাহায্য ছাড়া সমস্ত লোক সৃষ্টি করেছেন। পরশুরাম আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি অপরাজিত বিষ্ণু। আপনি যজমান, যজ্ঞ এবং যজনীয়। পুরুষোত্তম ! সকল ঋষিই বলে থাকেন যে, আপনি ক্ষমার মূর্তি। আপনি পঞ্চভূতস্বরূপ এবং এর দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার যজ্ঞস্বরূপও,

ঋষি কাশ্যপ আমাকে এই কথা বলেছেন। নারদ ঋষি আমাকে জানিয়েছেন আপনি সকল দেবতার প্রভু, সর্বপ্রকার কল্যাণের আধার, সৃষ্টিকর্তা এবং মহেশ্বর বালক যেমন তার খেলার সামগ্রী নিয়ে খেলা করে, তেমন আপনিও ব্রহ্মা, ইন্দ্র-মহেশ্বর আদি দেবতার সঙ্গে বারবার খেলা করেন। স্বর্গ আপনার মস্তকে, পৃথিবী আপনার পদতলে এবং সমস্ত লোক আপনার উদরে ব্যাপ্ত। আপনি সনাতন পুরুষ। বেদাভ্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, অতিথি সেবক গৃহস্থ, শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত বানপ্রস্থ আশ্রমবাসী এবং আত্মদর্শী সন্ন্যাসীদের হৃদয়ে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে স্ফুরিত হওয়া পুরুষ আপনিই। রণভূমিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা পুণ্যাত্মা রাজর্ষি এবং সমস্ত ধার্মিকদের পরম গতিও আপনি। আপনি সবার প্রভু, বিভু, সর্বাত্মা। আপনার শক্তিতেই সকলে কর্ম করতে সক্ষম হয়। লোক, লোকপাল, তারামণ্ডল, দশদিক, আকাশ, চাঁদ এবং সূর্য—সবই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণীদের মৃত্যু, দেবতাদের অমরত্ব এবং জগতের সকল কর্মই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। আপনি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, তাই আপনার কাছেই আমি উজাড় করে আমার দুঃখ নিবেদন করছি। শ্রীকৃষ্ণ ! আমি পাণ্ডবদের পত্নী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং আপনার সখী। আমার মতো ভাগ্যবতী নারীকে কৌরবদের পূর্ণ সভাস্থলে টেনে আনা হয়েছিল, একী লজ্জার কথা ! কৌরবরা কপটতা করে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, বীর পাণ্ডবদের দাসে পরিণত করে রাজন্য পরিবেষ্টিত পূর্ণ সভাগৃহে আমার ন্যায় রজস্বলা একবস্ত্রা নারীকে চুল ধরে টেনেছে। মধুসূদন ! আমি জানি অর্জুন, ভীম ও আপনি ছাড়া গাণ্ডীব ধনুতে কেউই গুণ পরাতে পারেন না। তবুও ভীম এবং অর্জুন আমাকে রক্ষা করতে পারেননি। ধিক তাঁদের এই বল-পৌরুষকে। এঁরা থাকতে দুর্যোধন এক মুহূর্তও কীভাবে বেঁচে থাকে ! এই সেই দুর্যোধন, যে সবলচিত্ত পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ভীমকে বিষপ্রদান করে মারতে চেয়েছিল। ভীমসেনের আয়ু ছিল, তাই বিষ হজম করে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন, সে কথা আলাদা। ভীম যখন প্রমাণকোটি বটবৃক্ষের নীচে শায়িত ছিলেন, তখন দুর্যোধন তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। তিনি অবশ্য দড়ি ছিঁড়ে সাঁতার কেটে উঠে এসেছিলেন। তাঁকে সর্পাঘাতে মেরে ফেলারও চেষ্টা করা হয়েছিল। এঁদের মা যখন পুত্রদের নিয়ে বারণাবতে ছিলেন, তখন আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এমন নীচ কর্ম কোন ব্যক্তি করে ? শ্রীকৃষ্ণ ! আমার ন্যায় সতীর চুল ধরে দুঃশাসন পরিপূর্ণ সভায় টেনে এনেছিল আর পাণ্ডবরা শুধু চেয়ে দেখছিলেন।' দ্রৌপদীর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলল। তিনি মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। একটু পরে নিজেকে একটু সামলে ভরাট গলায় ক্রোধভরে আবার বলতে লাগলেন।

'শ্রীকৃষ্ণ ! চারটি কারণের জন্য তোমার সর্বদা আমাকে রক্ষা করা উচিত। প্রথমত তুমি আমার আত্মীয়, দ্বিতীয়ত অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন হওয়ায় আমি গৌরবশালিনী। তৃতীয়ত তোমার চরণের আশ্রিতা এবং চতুর্থত তোমার ওপর আমার পূর্ণ অধিকার আছে এবং তুমি আমাকে রক্ষা

করতে সক্ষম।' শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সভায় বীরদের সামনে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করে বললেন—'কল্যাণী ! তুমি যাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, তাদের স্ত্রীরাও এমনি করে কাঁদবে। কিছু দিনের মধ্যেই অর্জুনের বাণে সেই দুরাত্মারা রক্তে প্লাবিত হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকবে। আমি সেই কাজই করব, যা পাণ্ডবদের পক্ষে অনুকূল হবে। দুঃখ কোরো না। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি রাজরানি হবে। যদি আকাশ দুটুকরো হয়ে যায়, হিমালয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, পৃথিবী ধ্বংস হয়, সমুদ্র শুকিয়ে যায়, তবুও দ্রৌপদী ! আমার কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।' দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে

আড়চোখে অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন বললেন—'প্রিয়ে ! তুমি কেঁদো না, শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, তেমনই ঘটবে। এর অন্যথা হবে না।' ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'ভগ্নী ! আমি দ্রোণকে, শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মকে, ভীম দুর্যোধনকে এবং অর্জুন কর্ণকে বধ করবে। আমরা যখন বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য পেয়েছি, তখন স্বয়ং ইন্দ্রও আমাদের পরাজিত করতে পারবেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তো নগণ্য।'

সকলে এবার শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরে তাকালেন। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! আমি সেইসময় দ্বারকাতে থাকলে আপনাদের এত বিপদে পড়তে হত না। যদি কুরুবংশীয়রা আমাকে দ্যূত সভায় আমন্ত্রণ নাও করতেন, তবুও আমি ওখানে উপস্থিত হয়ে পাশা খেলার কুফলাদি বুঝিয়ে খেলা বন্ধ করে দিতাম। আমি পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য এবং বাহ্লীকের সামনে ধৃতরাষ্ট্রকে বলতাম, 'রাজন্ ! আপনি পুত্রদের পাশা খেলতে দেবেন না !' পাশার জন্য রাজা নলকে কত বিপদে পড়তে হয়েছে, আমি তা ওঁকে শোনাতাম। ধর্মরাজ ! সেই পাশার জন্যই আপনি রাজ্যচ্যুত হয়েছেন। পাশায় অসময়েই ধন-সম্পত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই খেলাতে তীব্র আকর্ষণ জন্মায় তার ফলে এই খেলা থেকে বিরত হওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে। মহিলাদের সঙ্গে হাস্য কৌতুক, পাশাখেলা, শিকারের নেশা এবং মদ্যপান—মানুষের জীবনে দুঃখ আনতে পারে। এইগুলির দ্বারা মানুষ শ্রীভ্রষ্ট হয়। এই চারটির মধ্যেও পাশা খেলা সবথেকে খারাপ। পাশা দ্বারা একদিনে সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ খারাপ স্বভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ধর্ম, অর্থ ইত্যাদি ভোগ না করেই নাশ হয় এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনও এর জন্য খারাপ ব্যবহার করে। আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পাশার আরও নানা দোষের কথা বলতাম। যদি তিনি আমার কথা মেনে নিতেন, তাহলে কুরুবংশের মঙ্গল হোত এবং ধর্মরক্ষা হোত। তিনি আমার এই হিতৈষীপূর্ণ কথা না শুনলে, নিজেই আমি দণ্ডদান করতাম। তাঁর স্তাবক সভাসদরা যদি অন্যায়বশত তাঁর পক্ষ নিতেন তাহলে আমি তাদের প্রাণদণ্ড দিতাম। সেইসময় আমি দ্বারকায় না থাকাতেই আপনি পাশা খেলে বিপত্তি ডেকে এনেছেন, তাই আজ আপনাদের এই বিপদ।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সেই সময় দ্বারকায় না থেকে কোথায় ছিলে, কী কাজ করছিলে ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ ! সেইসময় আমি শাল্বর এবং তার বিশালাকার বিমান সৌভকে ধ্বংস করার জন্য দ্বারকার বাইরে গিয়েছিলাম। যখন আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আমার অগ্রপূজা করা হয়েছিল এবং শিশুপালের ঔদ্ধত্যের জন্য আমি তাকে পরিপূর্ণ সভার মধ্যে চক্রের সাহায্যে মেরেছিলাম, তখন আমি তো সেখানে ছিলাম আর ওদিকে শিশুপালের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শাল্ব দ্বারকাতে চড়াও হয়েছিল। সে তার সপ্তধাতু নির্মিত সৌভ বিমানে করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দ্বারকার কুমারদের বধ করতে থাকে। বাগান, মহল সব ভেঙে নষ্ট করে দিতে থাকে। সে লোকদের জিজ্ঞাসা করতে থাকে 'যাদবাধম মূর্খ কৃষ্ণ কোথায় ? আমি সেই অহংকারীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করব। সে যেখানেই থাক, আমি সেখানে যাব। আমি এই অস্ত্রের শপথ করে বলছি, কৃষ্ণকে হত্যা না করে আমি ফিরব না।' শাল্ব আরও বলেছে যে, 'বিশ্বাসঘাতক কৃষ্ণ আমার বন্ধু শিশুপালকে বধ করেছে, তাই আজ আমি তাকে যমালয়ে পাঠাব।' ধর্মরাজ ! শাল্ব অনেক কটু কথা বলে দ্বারকায় অনেক অশান্তির সৃষ্টি করেছে এবং সৌভ বিমানে বসে আমার প্রতীক্ষায় ছিল। আমি যখন দ্বারকায় ফিরে ওখানকার দুর্দশা দেখলাম, তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম এবং তার অপকর্মের কথা চিন্তা করে স্থির করলাম যে, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াই উচিত। অতএব দ্বারকা থেকে বেরিয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রের মধ্যে এক ভয়ানক দ্বীপে তাকে তার বিমানসহ দেখতে পেলাম। তখন আমি পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলাম। আমাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। শেষে শাল্বসহ সমস্ত দানবদের হত্যা করে আমি ধরাশায়ী করলাম। আমার দ্বারকায় না থাকার এটিই হল কারণ। আমি যখন দ্বারকাতে ফিরে এলাম তখন জানতে পারলাম যে হস্তিনাপুরে কপটদ্যূতে আপনাদের সব কিছু ওরা জিতে নিয়েছে। আমি তখনই রওনা হয়েছি এবং হস্তিনাপুর হয়ে এখানে আসছি।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সবিস্তারে শাল্ব-বধের কাহিনী শোনালেন এবং দ্বারকা যাবার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন, ভীম শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে আদর করলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আলিঙ্গন করলেন, নকুল-সহদেব তাঁকে প্রণাম করলেন, পুরোহিত ধৌম্য তাঁকে সম্মান জানালেন। দ্রৌপদী অশ্রুসজল নয়নে তাঁকে

বিদায় জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথে সুভদ্রা এবং অভিমন্যুকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সান্ত্বনা দিয়ে দ্বারকায় রওনা হলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর পুত্রকে নিয়ে নিজ দেশে প্রস্থান করলেন। শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু তাঁর ভগ্নী করেণুমতীকে (নকুলের স্ত্রীকে) নিয়ে তাঁর নগরী শুক্তিমতীর দিকে যাত্রা করলেন। সব রাজা মহারাজা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবরা প্রজাদের অনেকবার করে দেশে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু তাঁরা ফিরলেন না। সেই দৃশ্য ছিল বড়ই অনুপম। সকলে ফিরে গেলে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন করে তাঁদের কাছে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন এবং সেবকদের রথ প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন।

পাণ্ডবদের দ্বৈতবনে বাস, মার্কণ্ডেয় মুনি এবং দাল্‌ভ্যবকের উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পরিজনরা তাঁদের নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করার পর প্রজাপতির মতো তেজস্বী পাণ্ডবগণ বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা ব্রাহ্মণদের স্বর্ণমোহর, উত্তম বস্ত্র এবং গোধন দান করে রথে চড়ে অন্য বনে প্রস্থান করলেন। ইন্দ্রসেন সমস্ত দাস-দাসী, বস্ত্র-আভূষণ নিয়ে সৈন্যসহ দ্বারকার দিকে রওনা হলেন। সেই সময় অভিজাত নাগরিকগণ এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। দলে দলে প্রজাগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন দেখে পাণ্ডবরা দাঁড়িয়ে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলতে লাগলেন। সেই সময় রাজা ও প্রজা উভয়ের ব্যবহার ছিল পিতা-পুত্রের মতো। সমস্ত প্রজা বলতে লাগলেন—'হায় প্রভু ! হায় ধর্মরাজ ! আমাদের অনাথ করে কেন যাচ্ছেন ? আপনি কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং আমাদের প্রভু। আপনি এই দেশ এবং আমাদের মতো নাগরিকদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন ? পিতা কি কখনো তাঁর সন্তানকে এইভাবে অনাথ করেন ? ক্রূরবুদ্ধি দুর্যোধন, শকুনি এবং কর্ণ, যাঁরা আপনাদের মতো ধর্মাত্মা পুরুষদের কপটদ্যূতে হারিয়ে সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের ধিক্। আপনি নিজের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে ময়দানব নির্মিত সুন্দর সভাগৃহ পরিত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছেন ?' প্রজাদের কথা শুনে মহাপরাক্রমশালী অর্জুন সমস্ত প্রজাদের উদ্দেশ্যে উচ্চৈস্বরে বললেন—'উপস্থিত নাগরিকবৃন্দ ! ধর্মরাজ বনবাসকাল সম্পূর্ণ করে ওই দিব্য সভাগৃহ এবং শত্রুদের কীর্তি অধিগ্রহণ করবেন। আপনারা ধর্ম অনুসারে প্রত্যেকে সৎ ব্যক্তির সেবা করে তাঁদের প্রসন্ন রাখবেন, যাতে পরবর্তীকালে আমাদের সাহায্য হয়।' অর্জুনের কথা শুনে সকলেই তা মেনে নিলেন। তাঁরা যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ মেনে বিষণ্ণবদনে যে যার গৃহে ফিরে গেলেন।

প্রজারা ফিরে গেলে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের বললেন—'আমাদের দ্বাদশ বৎসর নির্জন বনে থাকতে হবে। সুতরাং এই জঙ্গলে এমন স্থান আমাদের খুঁজে নিতে হবে যে স্থান ফলে-ফুলে রমণীয়, নির্জন, সুখদায়ক এবং মুনি-ঋষিদের আশ্রমের পাশেই অবস্থিত।' অর্জুন ধর্মরাজকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন, তিনি বললেন—'আপনি অনেক বড় বড় মুনি-ঋষির সেবা করেছেন। ইহজগতের কোনো কিছুই আপনার অজ্ঞাত নয়। তাই আপনার যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বসবাস করা উচিত। ভ্রাতা, এবার আমরা যে বনে যাচ্ছি, তা হল দ্বৈতবন। সেখানে এক পবিত্র সরোবর আছে। তাছাড়া সেই স্থানটি ফুল-ফলে সুন্দর ও রমণীয়। সেই স্থান পক্ষীরবে পরিপূর্ণ। আমার তো সেই স্থান বড়ই সুখদায়ক মনে হয়, এখন আপনার অনুমতি চাই।' যুধিষ্ঠির বললেন—'অর্জুন ! আমারও তাই ইচ্ছা, চলো, আমরা দ্বৈতবনে

যাই।' যাওয়া স্থির হলে অগ্নিহোত্রী, সন্ন্যাসী, স্বাধ্যায়শীল ভিক্ষুক, বানপ্রস্থী, তপস্বী, ব্রতী, মহাত্মা ব্রাহ্মণ-গণের সঙ্গে ধর্মাত্মা পাণ্ডবরা দ্বৈতবনে প্রবেশ করলেন। সেখানকার ধর্মাত্মা, তপস্বী এবং পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন আশ্রমবাসীরা ধর্মরাজের কাছে এলেন। ধর্মরাজ সকলকে যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করলেন। তারপর সকলে পুষ্পশোভিত কদম্ববৃক্ষের নীচে এসে বসলেন। ভীম, দ্রৌপদী, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং তাঁদের সহকারীরা সকলেই রথ থেকে নেমে সেখানে গিয়ে বসলেন। ধর্মরাজ সমস্ত অতিথিকে, মুনি-ঋষি ও ব্রাহ্মণদের ফল-মূল দিয়ে তৃপ্ত করলেন। সমস্ত প্রকার পূজা-অর্চনা এবং হোম যজ্ঞাদি সবই পুরোহিত ধৌম্যের দ্বারা সম্পন্ন হত। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ছেড়ে দ্বৈতবনে বাস করতে লাগলেন।

সেই সময় পরম তেজস্বী মহামুনি মার্কণ্ডেয় আশ্রমে এলেন। মহান যুধিষ্ঠির, দেবতা, ঋষি এবং মানুষের পূজনীয় মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে শাস্ত্রানুসারে স্বাগত ও আপ্যায়ন করলেন। মার্কণ্ডেয় বনবাসী পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকে দেখে মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মান্যবর! অন্য সব তপস্বী আমাদের এই দুর্দশা দেখে দুঃখে হতবাক হয়ে যান, আপনি আমাদের দেখে হাসছেন কেন? কী আপনার অভিপ্রায়?' মহাত্মা মার্কণ্ডেয় বললেন—'তোমাদের এই দশা দেখে আমি খুশি হয়ে হাসিনি। আমার কোনো কিছু নিয়ে অহংকার নেই। তোমাদের দশা দেখে আমার সত্যনিষ্ঠ দশরথনন্দন ভগবান রামচন্দ্রের স্মৃতি মনে ভেসে উঠল। তিনি পিতার আদেশে ধনুক হাতে করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন। তাঁকে আমি ঋষ্যমূক পর্বতে দেখেছি। ভগবান রাম ইন্দ্রের থেকেও শক্তিমান, যমকেও দণ্ড দেবার শক্তি ধরেন, তিনি মহামনস্বী এবং নির্দোষ। তা সত্ত্বেও তিনি পিতার আদেশে বনবাস স্বীকার করে নিজ ধর্মপালন করেছিলেন। যদিও কেউই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠত না, তা সত্ত্বেও তিনি রাজোচিত ভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের 'আমি খুব বলবান'—মনে করে অধর্ম করা উচিত নয়। ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা নাভাগ, ভগীরথ আদি রাজা সত্যের বলেই পৃথিবী শাসন করেছিলেন। ধর্মরাজ! এখন জগতে তোমার যশ ও তেজ দেদীপ্যমান। ধার্মিকতা, সত্যনিষ্ঠা, সদ্ব্যবহারে জগতে তোমার স্থান সবার উঁচুতে। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে বনবাসের তপস্যা সম্পূর্ণ করে কৌরবদের কাছ থেকে তোমার রাজলক্ষ্মী যে নিয়ে নেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' এই কথা বলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় পুরোহিত ধৌম্য এবং পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে উত্তরের পথে রওনা হলেন।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন থেকে দ্বৈতবনে এসে থাকতে আরম্ভ করলেন তখন থেকে সেই বিশাল বন ব্রাহ্মণদের আগমনে ভরে উঠল। সেই বনে এবং সরোবরের আশপাশে এত বেদধ্বনি হত, যাতে সেটি ব্রহ্মলোকের মতো মনে হত। সেই ধ্বনি যে শুনত, তারই হৃদয়ে তা ধ্বনিত হত। একদিন দাল্‌ভবক মুনি সন্ধ্যার সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্! দেখো, এখন দ্বৈতবনের চতুর্দিকের আশ্রমে তপস্বী ব্রাহ্মণদের অগ্নি প্রজ্বলিত। ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য এবং অত্রি-গোত্রের উত্তম তপস্বী ব্রাহ্মণগণ এই পবিত্রবনে একত্রিত হয়েছেন এবং তোমার জন্য সুখ-সুবিধা সহ নিজ নিজ ধর্মপালন করছেন। আমি তোমাদের একটা কথা বলছি, সতর্ক হয়ে শোন। যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা মিলেমিশে কাজ করে, তখন তাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। তখন তারা অগ্নি ও পবনের ন্যায় শত্রুদের ভস্ম করে দেয়। ব্রাহ্মণদের আশ্রয় না নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করলেও কেউ ইহলোক বা পরলোকে শ্রেয় প্রাপ্ত করতে পারে না। ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে দক্ষ নির্লোভী ব্রাহ্মণের সাহায্যে রাজা তাঁর শত্রুদের নাশ করতে পারেন। রাজা বলি ব্রাহ্মণদের সাহায্যেই উন্নতি করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা এক অনুপম দৃষ্টি এবং ক্ষত্রিয় এক অনুপম বল; এরা দুজনে যখন একত্রে থাকে তখন জগতে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাই বিদ্বান ক্ষত্রিয়দের উচিত যে, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণদের সেবা করে তাঁদের থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করা। যুধিষ্ঠির! সর্বদাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে থাক, তাই তুমি যশস্বী হয়েছ।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্নতার সঙ্গে দাল্‌ভাবক মুনির উপদেশ মেনে নিলেন। মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পরশুরাম, পৃথুশ্রবা, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, হারীত, অগ্নিবেশ্য প্রমুখ অনেক ব্রতধারী ব্রাহ্মণ দাল্‌ভাবক্ এবং যুধিষ্ঠিরকে সম্মান জানালেন।

—o—

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীর কথোপকথন, ক্ষমার প্রশংসা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একদিন সন্ধ্যার সময় বনবাসী পাণ্ডবরা কিছু দুঃখিত চিত্তে দ্রৌপদীর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। কথায় কথায় দ্রৌপদী বললেন—'দুর্যোধন সত্যিই বড় ক্রূর এবং দুরাত্মা। আমাদের দুঃখী দেখে তার একটুও কষ্ট হয়নি। হায় ! আমাদের মৃগচর্ম পরিয়ে বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে পাঠিয়ে ওর একটুও কষ্ট হয়নি। তার হৃদয় নিশ্চয়ই পাথরের তৈরি। এক তো কপটদ্যূতে আমাদের হারিয়েছে, তারপরে আপনার মতো সরল এবং ধর্মাত্মা ব্যক্তিকে পূর্ণ সভাস্থলে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করে এখন বন্ধুদের সঙ্গে মজা করছে। আমি যখন দেখি যে, আপনারা সুন্দর পালঙ্কের শয্যা ছেড়ে কুশের বিছানায় শয্যাগ্রহণ করেন, তখন আমার হাতির দাঁতের সিংহাসনের কথা মনে পড়ে আর কান্না পায়। বড় বড় নৃপতিরা আপনাকে ঘিরে থাকতেন, আপনারা চন্দনচর্চিত হয়ে থাকতেন। এখন আপনারা একা একা জঙ্গলে রুগ্ন, নোংরাভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি কী করে শান্তি পাব ! আপনার মহলে প্রত্যহ হাজার হাজার ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো হত আর আজ আমরা ফলমূল খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি। প্রিয় স্বামী, ভীমকে বনবাসী এবং দুঃখী দেখে আপনার চিত্তে ক্রোধ আসছে না ? ভীম একাই রণভূমিতে সমস্ত কৌরবদের নিহত করতে সক্ষম। কিন্তু আপনাকে চুপ করে থাকতে দেখে মন খারাপ করে বসেছিলেন। দুই বাহু সমন্বিত হয়েও অর্জুন হাজার হস্ত সম্বলিত কার্তবীর্য অর্জুনের সমান বলশালী। তাঁর অস্ত্র-কৌশলে চমকিত হয়েই বড় বড় রাজারা আপনার চরণে প্রণাম করে আপনার যজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। সেই দেবতা ও দানবদের পূজনীয় পুরুষসিংহ আজ বনবাসী হয়ে রয়েছেন। আপনার চিত্তে ক্রোধের উদয় হয় না ? শ্যামল বর্ণ, বিশাল দেহ, হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে বীরত্বের দেবতা, সেই নকুল ও সহদেবকে বনবাসী দেখে আপনি কেন চুপ করে আছেন ? রাজা দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং পাণ্ডবদের পতিব্রতা পত্নী আমি আজ বনে পথভ্রান্তের মতো ঘুরে মরছি। ধন্য আপনার সহ্যের শক্তি ! আপনার মধ্যে ক্রোধ নেই। যার মধ্যে ক্রোধ এবং তেজ নেই, সে কেমন ক্ষত্রিয় ? যে ঠিক সময়ে তার তেজ দেখায় না, তাকে সকল প্রাণীই অপমান করে। শত্রুদের সঙ্গে ক্ষমা নয়, শৌর্যপূর্ণ ব্যবহারই করা উচিত।'

দ্রৌপদী আবার বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! পূর্বে রাজা বলি তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'পিতামহ ! ক্ষমা উত্তম, না ক্রোধ ? আপনি আমাকে ঠিক মতো বুঝিয়ে দিন।' প্রহ্লাদ বলেছিলেন—'পরিস্থিতি বিশেষে ক্ষমা এবং ক্রোধ দুইয়েরই সমান প্রয়োজন। সবসময় ক্রোধ করাও উচিত নয়, ক্ষমা করাও নয়। যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা করে থাকেন, তাকে তার পুত্র, দাস, সেবক এবং উদাসীন ব্যক্তিরাও কটুকথা বলে অপমান করতে থাকেন, অবজ্ঞা করেন। ধূর্ত ব্যক্তিরা ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে দমন করে তার স্ত্রীকেও আত্মসাৎ করতে চায়। নারীরাও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং পতিব্রতা ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া যে ব্যক্তি কখনো ক্ষমা করে না, সব সময় ক্রোধ করে, ক্রোধের জন্য বিনা বিচারে সকলকে দণ্ড দেয়, সে মিত্রদের বিরোধী এবং আত্মীয়স্বজনের শত্রু হয়ে ওঠে। সর্বদিক থেকে অপমানিত হওয়ায় তার ধনহানি হয় এবং ধিক্কার লাভ হয়। তার মনে তখন সন্তাপ, ঈর্ষা এবং দ্বেষভাব বাড়তে থাকে। এর জন্য তার শত্রুবৃদ্ধি হয়। সে ক্রোধভরে অন্যায়পূর্বক কাউকে দণ্ড দিলে তাকে ঐশ্বর্য, স্বজন এবং নিজের প্রাণও হারাতে হয়। যে সবসময় ক্রোধ ও অহংকার করে, তাকে লোকে ভয় পায়, তার ভালো করতে কুণ্ঠিত হয় এবং তার কোনো দোষ দেখলে সকলকে বলে বেড়ায়। তাই সবসময় উগ্র ব্যবহারও করতে নেই আবার সরল ব্যবহারও করতে নেই। সময়ানুসারে উগ্র বা সরল ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যক্তি সময় অনুসারে সরল ও উগ্র ব্যবহার করেন, তিনি ইহলোকে শুধু নয় পরলোকেও সুখভোগ করেন।' এবার আমি আপনাকে ক্ষমা কখন করবেন, তা বলছি। যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে আপনার কোনো উপকার করে থাকে, তারপর তার দ্বারা কোনো বড় অপরাধ সংঘটিত হয় তবে আগের উপকারের কথা মনে রেখে তাকে ক্ষমা করে দিতে হয়। কোনো ব্যক্তি যদি মূর্খতাবশত অপরাধ করে ফেলে, তাহলে তাকেও ক্ষমা করা উচিত। কারণ সকলেই সব কাজে পারদর্শী হয় না। অন্যদিকে যে লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করে এবং বলে 'আমি না জেনে করে ফেলেছি' সেই ব্যক্তিকে সামান্য অপরাধেও পুরো সাজা দেওয়া উচিত। কুটিল ব্যক্তিদের

কখনো ক্ষমা করতে নেই। প্রথম বারের অপরাধ সকলেরই ক্ষমা করা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়বার হলে অবশ্যই দণ্ড দিতে হয়। মৃদুতার দ্বারা উগ্র ও কোমল উভয় প্রকারের লোককেই বশ করা যায়। মৃদু স্বভাব ব্যক্তির পক্ষে কোনো কিছুই অসাধ্য নয়। তাই মৃদুতাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সুতরাং দেশ, কাল, সামর্থ্য এবং দুর্বলতার ওপর পুরোপুরি বিচার করে মৃদুতা এবং উগ্রতার ব্যবহার করা উচিত। কখনো কখনো ভয়েও ক্ষমা করতে হয়। কেউ এর অন্যথা করলে ক্রোধপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়।' দ্রৌপদী আরও বললেন—'রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পরপর অপরাধ করে যাচ্ছে, তাদের লোভও অসীম। আমার মনে হয় এখন ওদের ওপর ক্রোধ প্রকাশের সময় হয়েছে। আপনি ওদের আর ক্ষমা না করে, সাজা দিন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'প্রিয়ে ! ক্রোধের বশ না হয়ে, ক্রোধকে নিজের বশে রাখা উচিত। যে ব্যক্তি ক্রোধ জয় করেছে, সে কল্যাণভাজন হয়। ক্রোধের জন্য মানুষের বিনাশ হয়, তা প্রত্যক্ষ। আমি কী করে ক্রোধের বশ হয়ে অবনতির হেতু হব ? ক্রুদ্ধ ব্যক্তি পাপ করে, গুরুজনকে মারে, মহৎ ব্যক্তি এবং কল্যাণকারক বস্তুকেও তিরস্কার করে, ফলে সে বিপদে পড়ে। ক্রোধী ব্যক্তি বুঝতে পারে না তার কী করা উচিত আর কী নয়। যা মনে আসে বলে যায়। সে যোগ্য ব্যক্তিকে অসম্মান করে আর অযোগ্য ব্যক্তির সম্মান করে, পরে ক্রোধের বশে আত্মহত্যা করে সে নরকে গমন করে। ক্রোধ হল দোষের আবাস। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের উন্নতি, পারলৌকিক সুখ এবং মুক্তিলাভ করার জন্য ক্রোধ জয় করে। ক্রোধের অগুণতি দোষ। তাই এই সব ভেবে চিন্তে আমার চিত্তে ক্রোধের উদয় হয় না। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ওপরেও রাগ করে না, ক্ষমা করে, সে নিজে এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করে। সে দুজনেরই রোগ মুক্তিকারী চিকিৎসক। মিথ্যা বলার থেকে সত্য বলা কল্যাণকর। ক্রূরতার থেকে কোমলতাই উত্তম। ক্রোধের থেকে ক্ষমার স্থান উচ্চে। দুর্যোধন যদি আমাকে হত্যাও করে তাহলেও আমি নানা দোষ পরিপূর্ণ এবং মহান্ ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত ক্রোধকে আপন করে নেব না। যিনি নিজ ক্রোধকে জ্ঞানদৃষ্টিতে শান্ত করে নেন, তাঁকেই তেজস্বী বলে জানবে। ক্রোধী ব্যক্তি যখন নিজ কর্তব্য ভুলে যায়, তখন তার কর্তব্য এবং মর্যাদার জ্ঞান থাকে না। সেই ব্যক্তি অবধ্য প্রাণীদেরও মেরে ফেলে, গুরুজনদের মর্মভেদী বাক্য বলে ; তাই, যদি নিজের মধ্যে ক্ষমতা (তেজ) থাকে, তবে নিজ ক্রোধকেই বশীভূত করতে হয়। কাজ করার কৌশল, শত্রুদের পরাজিত করার চিন্তা, বিজয় লাভের শক্তি এবং স্ফূর্তিই হল তেজস্বীদের গুণ। ক্রোধী ব্যক্তিদের এই গুণ থাকে না। ক্রোধ ত্যাগ করলে তবেই এটি লাভ করা যায়। ক্রোধ রজোগুণের পরিণাম হওয়ায় মানুষের মৃত্যুর কারণ। তাই ক্রোধ পরিত্যাগ করে শান্ত হতে হয়। নিজ ধর্ম থেকে একবার সরে যাওয়াও শ্রেয়, কিন্তু ক্রোধ করা কখনোই ভালো নয়। আমি মূর্খদের কথা বলছি না, বুদ্ধিমান মানুষ কখনো ক্ষমাকে পরিত্যাগ করে না। মানুষের মধ্যে যদি ক্ষমাশীলতা না থাকে তাহলে সকলেই একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে মরবে। একজন দুঃখী অন্যজনকে দুঃখ দেবে, দণ্ডদানকারী গুরুজনদেরও মারতে উদ্যত হবে, তাহলে তো কোনো ধর্মই থাকবে না, প্রাণীও নাশ হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় কী হবে ? গালাগালের পরিবর্তে গালি, মারের বদলে মার, অপমানের প্রতিশোধ অপমানে। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে শেষ করে দেবে। কোনো মর্যাদা, কোনো সুব্যবস্থা, কোনো সৌহার্দ থাকবে না। যে ব্যক্তি গালি দিলেও, মারলেও ক্ষমা করে, নিজ ক্রোধকে বশীভূত করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বিদ্বান। ক্রোধী ব্যক্তি মূর্খ হয়, নরকগামী হয়। মহাত্মা কাশ্যপ এই সম্পর্কে ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমাসাধনের কথা বলেছেন— ক্ষমা ধর্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ, ক্ষমা স্বাধ্যায়। যে ব্যক্তি ক্ষমার এই সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ জানেন, তিনি সব কিছু ক্ষমা করতে পারেন। ক্ষমা ব্রহ্ম, ক্ষমা সত্য, ক্ষমাই ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপ, ক্ষমা পবিত্রতা, ক্ষমাই এই জগৎকে ধারণ করে আছে। যাজ্ঞিকরা যজ্ঞ করে যে লোক প্রাপ্ত হন, ক্ষমাশীল ব্যক্তিরা তার থেকেও উত্তম লোক লাভ করেন। বেদজ্ঞরা, তপস্বীরা এবং কর্মনিষ্ঠেরা অন্যান্য লোক পেয়ে থাকেন আর ক্ষমাশীলরা ব্রহ্মলোকের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন। ক্ষমা হল তেজস্বীদের তেজ, তপস্বীদের ব্রহ্ম এবং সত্যবাদীদের সত্য। ক্ষমাই লোকোপকার, ক্ষমাই শান্তি। সেই ক্ষমাকে আমি কীভাবে ত্যাগ করব ? জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বদা ক্ষমা করা উচিত। কোনো ব্যক্তি যখন সব কিছু ক্ষমা করে দেয়, তখন সে স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যায়। ক্ষমাশীলের জন্য ইহলোক ও পরলোক উভয়ই রয়েছে, ইহলোকে সম্মান এবং পরলোকে শুভগতি। যারা ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে দমিত রাখে, তারাই পরমগতি প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা কাশ্যপ এইভাবে

ক্ষমার মহিমা জানিয়েছেন ; এই সব শুনে তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করে ক্ষমা অবলম্বন করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য ধৌম্য, মন্ত্রী বিদুর, কৃপাচার্য, সঞ্জয় এবং মহাত্মা বেদব্যাসও ক্ষমারই প্রশংসা করে থাকেন। ক্ষমা এবং দয়াই জ্ঞানীদের সদাচার, এটিই সনাতন ধর্ম। আমি সত্যের সঙ্গে ক্ষমা এবং দয়া পালন করব।'

যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীর কথোপকথন, নিষ্কামধর্মের প্রশংসা ও দ্রৌপদীকে উৎসাহিত করা

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দ্রৌপদী বললেন—'ধর্মরাজ ! ইহজগতে ধর্মাচরণ, দয়াভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার এবং লোক নিন্দার ভয়ে ভীত থাকলে রাজলক্ষ্মী লাভ করা যায় না। আপনার এবং আপনার ভাইদের মধ্যে প্রজাপালনের সমস্তগুণই বিদ্যমান। আপনারা দুঃখভোগ করার যোগ্য নন। তা সত্ত্বেও আপনাদের এই কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। আপনার ভাইরা রাজ্য শাসনের সময় ধর্মে অবিচল তো ছিলেনই, এই দীন হীন দশাতেও সেই ধর্মেই অবিচল আছেন। আপনারা ধর্মকে নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু সকলেই অবগত যে, আপনার রাজ্য এবং জীবন ধর্মের জন্য। আমি এটিও নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনি ধর্মের জন্য ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং আমাকেও ত্যাগ করতে পারেন। আমি গুরুজনদের কাছে শুনেছি যে, যদি কেউ নিজের ধর্মরক্ষা করে তবে সে নিজের রক্ষকের রক্ষা করে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে সে আপনাকে রক্ষা করছে না। ছায়া যেমন মানুষের পিছন পিছন যায়, তেমনই আপনার বুদ্ধি সর্বদা ধর্মের পিছনে চলে। আপনি যখন সমস্ত পৃথিবীর চক্রবর্তী সম্রাট হয়েছিলেন, তখনও কোনো ছোট রাজাকে অসম্মান করেননি, বড়দের তো কথাই নেই। আপনার মধ্যে সম্রাটভাবের অহংকার একেবারেই ছিল না। আপনার মহলে দেবতাদের জন্য 'স্বাহা' এবং পিতৃগণের জন্য 'স্বধা' সবসময় ধ্বনিত হত । সেইসময় এবং এখনও অতিথি ব্রাহ্মণের সেবা করা হয়ে থাকে। আপনি সাধু-সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং তাঁদের তৃপ্ত করেছেন। সেই সময় আপনার কাছে এমন কোনো জিনিস ছিল না, যা ব্রাহ্মণদের না দেওয়া যায়। কিন্তু এখন আপনার এখানে পঞ্চ দোষ লাঘবের জন্য কেবল আহুতি যজ্ঞ করা হয় এবং তারপর অতিথি এবং প্রাণীদের আহার করিয়ে বাকি অন্নের দ্বারা নিজেদের জীবন-নির্বাহ করা হয়। আপনার বুদ্ধি এমন বিপরীত হয়ে গেল যে, আপনি রাজ্য, ধন-সম্পদ, ভাই এমন কী আমাকেও পাশাতে হারিয়ে বসলেন। আপনার এই দুর্দশা দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হয়, আমি যেন বেহুঁশ হয়ে যাই। মানুষ ঈশ্বরের অধীন, তার কোনোই স্বাধীনতা নেই। ঈশ্বরই প্রাণীদের পূর্বজন্মের কর্মবীজ অনুসারে তাদের সুখ-দুঃখ ও প্রিয়-অপ্রিয় বস্তুর ব্যবস্থা করে থাকেন। কাঠের পুতুল যেমন সূত্রধরের ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, তেমনই সমস্ত প্রাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জগতে কর্মভোগ করে। ঈশ্বর সবার ভিতরে এবং বাইরে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজমান, তিনি সকলকে প্রেরণা দান করেন এবং সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। সূত্রে গাঁথা মণি, বল্‌গাযুক্ত বলদ এবং জলাশয়ে পতিত বৃক্ষ যেমন পরাধীন হয় তেমনই জীবও ঈশ্বরের অধীন। মৃত্তিকা নির্মিত কলস যেমন মধ্যবর্তী সময়ে এবং অন্তকালেও মৃত্তিকারই থাকে তেমনই জীবও আদি-মধ্য এবং অন্তকালে ঈশ্বরের অধীন। জীবের কোনো ব্যাপারেই সঠিক জ্ঞান থাকে না, তাই সে সুখ পেতে বা দুঃখ দূর করতে অক্ষম, সে ঈশ্বরের প্রেরণাতেই স্বর্গ বা নরকে যেতে পারে। ছোট ছোট তৃণ যেমন বায়ুর অধীন হয়, সকল প্রাণীও তেমন ঈশ্বরের অধীন। শিশুরা যেমন খেলতে খেলতে খেলা ছেড়ে চলে যায়, প্রভুও তেমনই জগতে সংযোগ-বিয়োগের খেলা খেলেন। রাজন্‌ ! আমার মনে হয় ঈশ্বর প্রাণীদের সঙ্গে মাতা পিতার মতো ব্যবহার করেন না। সাধারণ ব্যক্তি যেমন ক্রোধের সঙ্গে ক্রূর ব্যবহার করে, তিনিও তেমনই করে থাকেন। আমি যখন দেখি যে, আপনার মতো সদাচারসম্পন্ন সুশীল আর্য ব্যক্তি ভালো-ভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারেন না, চিন্তায় বিহ্বল হয়ে থাকেন, আর অনার্য ব্যক্তিরা সুখ-সুবিধা ভোগ করে, তখন আমার মনে কষ্ট হয়। আপনার এই বিপদ এবং দুর্যোধনের সম্পত্তি দেখে আমি ঈশ্বরের নিন্দা করছি, কারণ তিনি বিষম

দৃষ্টিতে বিচার করেন। কর্মের ফল যদি একমাত্র কর্তার প্রাপ্য হয়, তাহলে এই বিষমতার ফল ঈশ্বর অবশ্যই পাবেন। যদি কর্মের ফল কর্তা ভোগ না করে তাহলে তো উন্নতির কারণই হল কেবল লৌকিক বল ; নির্বল ব্যক্তিদের জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'প্রিয়ে ! আমি তোমার মধুর, সুন্দর এবং বিস্ময়কারী কথা শুনেছি ; তুমি এখন নাস্তিকের মতো কথা বলছ। প্রিয়ে ! কর্মফল পাবার আশায় আমি কর্ম করি না। দান করা ধর্ম বলে আমি দান করি। যজ্ঞ কর্তব্য মনে করে যজ্ঞ করি, ফলের দৃষ্টিতে নয়। ফল পাওয়া যাক বা না যাক, মানুষের নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। আমি তাই আমার কর্তব্য পালন করি। সুন্দরী ! আমি ধর্মফলের জন্য ধর্ম করি না। ধর্মপালন করি, কারণ বেদের তাই নির্দেশ এবং সাধু ব্যক্তিরা তা পালন করেছেন। আমি স্বভাবতই আমার মনকে ধর্মে নিযুক্ত করেছি। কোনো ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে ধর্ম পালনের সঙ্গে দেনা-পাওনা নিয়ে তুলনা করা অনুচিত। যে ধর্মের বিনিময়ে কিছু আশা করে, সে ধর্মের ফল পায় না। যে ধর্মপালন করে নাস্তিকের মতো তাতে সন্দেহ পোষণ করে, সে ব্যক্তি পাপী। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে তোমাকে বলছি যে, ধর্মের ওপর কখনো সন্দেহ কোরো না। ধর্মের ওপর সন্দেহ করলে অধোগামী হতে হয়। যে দুর্বল চিত্ত ব্যক্তি ধর্মে এবং ঋষিদের বাক্যে সন্দেহ করে, সে মোক্ষ থেকে দূরে থাকে, বেদজ্ঞ, ধর্মাত্মা এবং কুলীন ব্যক্তিগণই হল জ্ঞানবৃদ্ধ। সেই পাপী ব্যক্তি তো চোরের ন্যায়, যে মূর্খতাবশত শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করে ধর্মের ওপর সন্দেহ করে। প্রিয়ে ! কিছুদিন আগেই তুমি মার্কণ্ডেয় মুনিকে দেখেছ, যিনি পরম তপস্বী এবং ধর্মপ্রভাবেই চিরজীবি। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ, লোমশ, শুক্র প্রমুখ সকল ঋষি ধর্মপালন দ্বারাই জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন। তুমি জানো, এঁরা দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন এবং শাপ-বর দিতে সক্ষম এবং দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে। তাঁরা নিজেদের এই অলৌকিক শক্তির সাহায্যে বেদ ও ধর্মের সার অনুভব করেছেন। এঁরা ধর্মের মহিমা বর্ণনা করে থাকেন। রানি ! তুমি তোমার মূঢ় মনের দ্বারা ঈশ্বর ও ধর্মের জন্য আক্ষেপ কোরো না এবং কোনো সন্দেহও কোরো না। ধর্মের ওপর সন্দেহকারী ব্যক্তি স্বয়ং মূর্খ হয় এবং বড় বড় চিন্তাশীল এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিদেরও পাগল বলে মনে করে। সেই অহংকারীরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে এবং ইন্দ্রিয় সুখদায়ক লৌকিক বস্তুতেই মজে থাকে। লোকোত্তর বস্তু সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই থাকে না। যারা ধর্মে সন্দেহ করে, তাদের ইহলোকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই এবং তারা চাইলেও লৌকিক ও পারলৌকিক কোনো উন্নতি করতে পারে না। সকল যুক্তি-প্রমাণ অস্বীকার করে তারা বেদ ও শাস্ত্রের নিন্দা করতে থাকে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে কামনা-পূর্তি করা। ফলে তারা ঘোর নরকে পতিত হয়। যারা দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে নিঃশঙ্কে ধর্মপালন করে, তারা অনন্ত সুখ লাভ করে। যারা ঋষিবাক্য মানে না, ধর্মপালন করে না, শাস্ত্রাদি বাক্য মানে না, তাদের এক জন্মে নয়, বহু জন্মেও শান্তি লাভ হয় না। সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী ঋষিরা সনাতন ধর্মের বর্ণনা করেছেন এবং সৎ ব্যক্তিরা তা আচরণ করেছেন। এতে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? সমুদ্র পার করার জন্য যেমন জাহাজই অবলম্বন, তেমনই পারলৌকিক সুখলাভের জন্য ধর্মই আশ্রয়। সুন্দরী ! ধর্মাত্মাদের আচরিত ধর্মপালন যদি নিষ্ফল হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত জগৎ ঘোর অন্ধকারে ডুবে যাবে। যদি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান এবং সরলতা নিষ্ফল হয়ে যায়, তাহলে কেউ ধন লাভ করবে না, মোক্ষ লাভ করবে না, বিদ্বান হবে না, সকলেই পশুর ন্যায় হয়ে যাবে। যদি তাই হবে, তাহলে সৎ ব্যক্তিরা কেন ধর্মাচরণ করবেন ? সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই তবে প্রতারণা। বড় বড় ঋষি গন্ধর্ব দেবতারা সামর্থশালী হয়েও কেন ধর্মাচরণ করেন ? তাঁরা মনে করেন ঈশ্বর ধর্মের ফল অবশ্যই দেন। ধর্ম এবং অধর্ম কোনোটিই নিষ্ফল হয় না। বিদ্যা এবং তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তোমাকে যে বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করে ধর্মে শ্রদ্ধা রাখতে বলছি, তা নয়। তোমার নিজের অনুভবও তো ধর্মেরই মহিমা প্রচার করছে। তুমি কি জানো না যে, তোমার এবং তোমার ভাইয়ের উৎপত্তি যজ্ঞরূপ ধর্মাচরণ থেকেই হয়েছে। তোমার জন্ম-বৃত্তান্তই এই কথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে, ধর্মের ফল

অবশ্যই পাওয়া যায়। ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিহীন ব্যক্তি অনেক কিছু পেয়েও সন্তুষ্ট হয় না। পাপ ও পুণ্যের ফল প্রাপ্তি তথা কর্মের কারণ—এ সবেরই মূলে আছে বিদ্যা ও অবিদ্যা। দেবতাগণ এটির রহস্য গুপ্ত রেখেছেন। সাধারণ মানুষ এ সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না। যে সকল তত্ত্ববেত্তাগণ এটির রহস্য বোঝেন তাঁরা ফলের আশায় কর্ম করেন না বরং জ্ঞানপূর্বক তা বুঝে সেটির অনুষ্ঠান করেন। বাস্তবে এটির রহস্য দেবতাদেরও অজ্ঞাত। তবুও বিরাগী, স্বল্পাহারী, জিতেন্দ্রিয় ও তপস্বী ব্যক্তিগণ শুদ্ধ চিত্তে ধ্যান করে পূর্বোক্ত কর্মের স্বরূপ অবগত হন। ধর্মাচরণ করলেও যদি ফলপ্রাপ্তি না হয় তাহলেও তাতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরও উদ্যোগ করে যজ্ঞ করা উচিত। ঈর্ষা ত্যাগ করে দান করা উচিত। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন যে, কর্মের ফল অবশ্য পাওয়া যায় এবং ধর্ম সনাতন—মহর্ষি কাশ্যপ এই ব্যাপারে সাক্ষী। ধর্মের সম্পর্কে তোমার এই সন্দেহ কুয়াশার মতো অপসারিত হোক। সবই ঠিক, এরূপ ভেবে তুমি নাস্তিকতা ত্যাগ করো এবং ধর্ম ও ঈশ্বরের ওপর আক্ষেপ রেখো না। এটি বুঝতে চেষ্টা করো ও এদের প্রণাম জানাও। তোমার মনে যেন কখনো এরূপ বিপরীত কথা না আসে। যাঁর কৃপায় মানুষ মরেও অমরত্ব লাভ করে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মার কখনো অপমান করা উচিত নয়।'

দ্রৌপদী বললেন—ধর্মরাজ ! আমি ধর্ম বা ঈশ্বরের অবমাননা করছি না। আমি এখন বিপদ্গ্রস্ত, তাই প্রলাপ বলছি। আমি এখনও এই নিয়ে বলব। জ্ঞানী ব্যক্তিদের অতি অবশ্যই কর্ম করা উচিত, কারণ কর্মবিহীন হয়ে জড় পদার্থই বাঁচতে পারে, চেতন প্রাণী নয়। পূর্বজন্মের কথা ভাবলেই সব প্রমাণিত হয়, কারণ গো-বৎস জন্মেই মাতৃ দুগ্ধ পেয়ে থাকে, রোদের থেকে রক্ষা পেতে ছায়াতে গিয়ে বসে। এগুলি তার পূর্বজন্মের সংস্কারেই করে থাকে। সকল প্রাণীই তার উন্নতি বোঝে এবং প্রত্যক্ষরূপে নিজ কর্মের ফলভোগ করে। তাই আপনি কর্ম করুন, ধৈর্য হারাবেন না। আপনি কর্মের কবচে সুরক্ষিত হয়ে সুখী হোন। হাজারো লোকের মধ্যেও কোনো একজনও কর্ম করার যুক্তি ঠিকমতো জানে কি না এতে সন্দেহ আছে। যদি হিমালয় পাহাড় থেকে অল্প অল্পও কাঁকর-পাথর সরানো হয় এবং সেটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে স্বল্পকালেই সেটি ক্ষীণ হয়ে যায়। অতএব ধনরক্ষা এবং বৃদ্ধি করার জন্য কর্ম করার প্রয়োজন আছে। প্রজারা কর্ম না করলে সব উজাড় হয়ে যায়। তাদের কর্ম নিষ্ফল হলে, উন্নতি রুদ্ধ হয়। কর্মকে নিষ্ফল মনে করলেও কর্ম করতে হয়, কারণ কর্ম না করলে জীবন চলে না। যারা ভাগ্যের ওপর ভরসা করে হাতের ওপর হাত রেখে বসে থাকে, তারা পূর্বজন্মের কর্ম স্বীকার করে না। তাদের মূর্খ বলে জানতে হবে। যারা কাজ না করে আলস্যে জীবন কাটায় তারা মাটির তালের মতো জলে পড়ে গলে যায়। যারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ করে না, তারা চিরকাল বাঁচতে পারে না। যারা ফল পাব কি না এই চিন্তায় থেকে কাজ করে তারা কর্মের কোনো ফল পায় না। যারা নিঃসন্দেহে থাকে, তারাই ফল পায়। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত থাকেন এবং ফলের সম্পর্কে চিন্তা করেন না। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। কৃষক জমি চাষ করে বীজ বপন করে সন্তোষের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে। তারপরে তাকে জলসিঞ্চন করে অঙ্কুরিত করার কাজ মেঘ সম্পাদন করে। মেঘ যদি অনুগ্রহ না করে তাহলে কৃষকের কোনো অপরাধ নেই। কৃষক তখন ভাবে যে সকলে যা করেছে, আমিও তাই করেছি। এখন বর্ষা হোক বা না হোক আমি নির্দোষ। তেমনই ধৈর্যশীল ব্যক্তির, তাঁর বুদ্ধি অনুযায়ী দেশ, কাল, শক্তি ও উপায় ঠিকমতো চিন্তা করে কাজ করা উচিত। আমি একথা পিতৃগৃহে বৃহস্পতি-নীতির মর্মজ্ঞের কাছে শুনেছি। আপনি চিন্তা করে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ করুন।

—o—

যুধিষ্ঠির ও ভীমের কর্তব্য নিয়ে আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রৌপদীর কথা শুনে ভীমের মনে ক্রোধ জেগে উঠল। তিনি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন—'দাদা ! আপনি সৎপুরুষোচিত ধর্মানুকূল রাজার কর্তব্য পালন করুন। আমরা যদি ধর্ম, অর্থ ও কামে বঞ্চিত হয়ে এই তপোবনে পড়ে থাকি তাহলে আমাদের কী লাভ হবে ? দুর্যোধন ধর্ম, সরলতা অথবা বল- পৌরুষের সাহায্যে আমাদের রাজ্য জয় করেনি। কপট-দ্যূতে সে আমাদের প্রতারণা করেছে। আমরা তাদের যতই ক্ষমা করেছি, ততই সে আমাদের অক্ষম ভেবে দুঃখ দিয়ে চলেছে। এর থেকে ভালো ছিল কোনোপ্রকার ইতস্তত না করে যুদ্ধ করা। নিষ্কপট হয়ে যুদ্ধ করে আমরা যদি মারাও যাই, তাও ভালো, তাতে আমাদের অমরলোক প্রাপ্তি হবে। আর যদি আমরা ওদের পরাজিত করে পৃথিবীর রাজা হই, তাহলেও আমাদের কল্যাণ হবে। আমরা ধর্মে স্থিত আছি, আমরা চাই আমাদের যশ অক্ষুণ্ণ থাক এবং কৌরবদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিই। তাহলে এখন প্রয়োজন আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করা। মানুষের শুধুমাত্র ধর্ম বা শুধু অর্থ বা শুধু কাম নিয়ে কালযাপন করা উচিত নয়। এই তিনটিই এমনভাবে করা উচিত, যাতে এগুলির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য না হয়। এই বিষয়ে শাস্ত্রাদিতে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, দিবসের প্রথম ভাগে ধর্মাচরণ, দ্বিতীয় ভাগে ধনোপার্জন এবং সায়ংকালে কাম উপভোগ করা উচিত। আমরা সকলেই ভালোভাবে জানি যে, আপনি নিরন্তর ধর্মাচরণে ব্যাপৃত থাকেন। তা সত্ত্বেও সকলে আপনাকে বেদমন্ত্রের সাহায্যে কর্ম করার পরামর্শ দেন। দান, যজ্ঞ, সৎপুরুষের সেবা, বেদ অধ্যয়ন ও সরলতা এগুলি মুখ্য ধর্ম। কিন্তু মহারাজ ! মানুষের অন্য সবকিছু থাকলেও অর্থ না থাকলে ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। জগতের আধার ধর্ম এবং ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো বস্তু নেই। কিন্তু সেই ধর্মাচরণ অর্থের দ্বারাই হয়। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা উৎসাহহীন হয়ে বসে থাকলে ধন পাওয়া যায় না। ধর্ম আচরণ করলেই তা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করেও তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ। তাই আপনাকে পরাক্রম দ্বারাই সেই ধন-প্রাপ্তির উদ্যোগ করতে হবে। আপনি আপনার ক্ষত্রিয় ধর্ম স্বীকার করে আমাকে এবং অর্জুনকে নিয়োগ করে শত্রু সংহার করুন। শত্রুদের পরাজিত করে আপনি যে ফল পাবেন তা কখনই নিন্দনীয় হবে না। প্রজাপালনই আপনার সনাতন ধর্ম। আপনি যদি ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাহলে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন। মানুষের নিজ ধর্ম উল্লঙ্ঘন করা জগতে ভালো বলে পরিগণিত হয় না। আপনি এই শৈথিল্য পরিত্যাগ করুন। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দৃঢ়তা এবং বীরত্ব স্বীকার করে ধর্মের পালন করুন। অর্জুনের মতো ধনুর্ধারী আর কেউ আছে কি ? ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমার মতো গদাযুদ্ধবিশারদ আর কে আছে ? বলশালী ব্যক্তি নিজের বলের ওপর ভরসা করেই যুদ্ধ করে, সৈন্যসংখ্যা দ্বারা নয়। আপনি বলের সাহায্য নিন। মৌমাছি যদিও ক্ষুদ্র প্রাণী, তবুও তারা একত্রে মধু হরণকারীর প্রাণনাশ করে দেয়। তেমনই বলহীন ব্যক্তিরাও একত্রিত হয়ে বলশালী শত্রুর জীবন নাশ করতে পারে। সূর্য যেমন কিরণের সাহায্যে পৃথিবীর রস গ্রহণ করে বৃষ্টি দ্বারা প্রজাপালন করে, তেমনই আপনিও দুর্যোধনের কাছ থেকে রাজ্য জয় করে প্রজাপালন করুন। আমাদের পিতা-পিতামহ শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রজাপালন করেছিলেন, প্রজাপালন আমাদের সনাতন ধর্ম। একজন ক্ষত্রিয় যুদ্ধে সৎভাবে বিজয় লাভ করে অথবা প্রাণদান করে যে লোক প্রাপ্ত হয়, তপস্যার দ্বারাও তা লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণ এবং কুরুবংশীয়গণ একত্রিত হয়ে আনন্দিত চিত্তে আপনার সত্যরক্ষার কথা আলোচনা করছেন। আপনি লোভ, মোহ, ভয়, কাম ইত্যাদিতে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। আপনি রাজাদের বিনাশজনিত পাপের জন্য যদি ভয় পান, তবে তাও অমূলক। কারণ রাজা রাজ্য জয় করার জন্য যে পাপ করেন, তা তাঁরা বড় বড় যজ্ঞ করে দান-দক্ষিণা দ্বারা ক্ষয় করে দেন। আপনিও ব্রাহ্মণদের সহস্রগাভী এবং গোধন দান করে পাপমুক্ত হবেন। এখন আপনি শীঘ্রই শত্রুকে আক্রমণ করুন। আজই শুভ দিন। ব্রাহ্মণ দিয়ে স্বস্তিবাচন করিয়ে আপনার অস্ত্রকুশল শূরবীর ভাইদের সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুর আক্রমণ করুন। সৃঞ্জয় বংশের রাজা, কেকয়বংশের রাজা এবং বৃষ্ণিকুলভূষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যেও কি আমরা যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারব না ? আমরা আমাদের অনুগত লোকজন এবং শক্তির সাহায্যে শত্রুর হাত থেকে রাজ্য কেন নিয়ে নেব না ?'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—ভাই ভীম ! মানুষ উদ্যোগী, অভিমানী ও বীর হয়েও নিজ মনকে বশীভূত করতে পারে না। আমি তোমার কথাকে অসম্মান করছি না। কিন্তু আমি মনে করি এমন হওয়াই আমার ভাগ্যে ছিল। যখন আমরা জুয়া খেলার জন্য দ্যূতসভায় এলাম, সেই সময় দুর্যোধন ভরতবংশীয় রাজাদের সামনে এই আধিপত্য প্রকাশ করে বলেছিল, 'যুধিষ্ঠির ! যদি তুমি জুয়াতে হেরে যাও, তাহলে ভাইদের সঙ্গে তোমাকে বারো বছর বনে বাস করতে হবে এবং তেরতম বছরে অজ্ঞাত স্থানে বাস করতে হবে। সেই সময় কৌরবদের কোনো দূত যদি তোমাদের খুঁজে পায় তাহলে আরও বারো বছর বনে এবং পুনরায় তেরতম বছরে গুপ্ত বাস করতে হবে। আর যদি আমরা হেরে যাই, আমরা সব ভাই সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে একই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করব।' ভীম ! আমি দুর্যোধনের কথা মেনে নিয়েছিলাম এবং তেমনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তুমি এবং অর্জুন দুজনেই এই ঘটনা জানো। তারপরে সেই অধর্মময় জুয়া খেলা হয়েছিল, আমরা হেরে গিয়ে নিয়ম অনুসারে বনবাস করছি। মহাত্মা সৎ ব্যক্তিদের সামনে একবার প্রতিজ্ঞা করে আবার রাজ্যের জন্য কে তা ভঙ্গ করবে ? এক কুলীন ব্যক্তি যদি রাজ্য লোভে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তা পেয়েও যায় তবে তা মরণের অধিক দুঃখদায়ক। আমি কুরুবংশীয় বীরদের সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তার থেকে সরতে পারি না। কৃষক যেমন বীজ বপন করে তা পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে, তেমনই তোমারও উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। সময় না হলে কিছুই হবে না। ভীম ! আমার প্রতিজ্ঞা শোন, আমি দেবত্ব প্রাপ্তি এবং ইহলোকে জীবিত থাকার চেয়েও ধর্মকে বেশি ভালোবাসি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে রাজ্য, পুত্র, কীর্তি, ধন—এই সব মিলেও সত্যধর্মের ষোলো আনার এক আনার সমানও হতে পারে না।

ভীম বললেন—দাদা ! পাত্রের কাজল যেমন সামান্য পরিমাণে নিত্য ব্যবহারেও একদিন শেষ হয়ে যায় তেমনি মানুষের আয়ু দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এখন কি সময়ের জন্য বসে থাকলে চলে ? যে ব্যক্তি জানে যে তার আয়ু দীর্ঘ, অনন্ত সময় আছে এবং ভূত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ দেখতে পায়, সে-ই শুধু সময়ের প্রতীক্ষা করতে পারে। মৃত্যু শিয়রে অপেক্ষমান, তা আসার আগেই আমাদের রাজ্যলাভের উপায় করে নেওয়া উচিত। আপনি সম্মানিত বংশের বুদ্ধিমান, পরাক্রমী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। আপনি কেন ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট পুত্রদের ক্ষমা করছেন ? এইরূপ অহেতুক বিলম্বের কারণ কী ? আপনি আমাদের বনে লুকিয়ে রাখতে চান, যেন ঘাস দিয়ে হিমালয় পর্বতকে লুকিয়ে রাখার মতো। আপনি একজন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি। সূর্য যেমন আকাশে লুকিয়ে বিচরণ করতে পারে না, তেমনই আপনিও কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারেন না। অর্জুন, নকুল এবং সহদেবও কীভাবে একসঙ্গে লুকিয়ে থাকবে ? রাজরানি দ্রৌপদী কী করে লুকিয়ে থাকতে পারে ? আমাকেও বালক-বৃদ্ধ সকলেই চেনে, আমি কী করে একবছর গুপ্তভাবে থাকব ! আমরা আজ পর্যন্ত তের-মাস বনে থাকলাম। বেদের নির্দেশানুসারে আপনি এটিকেই তের বছর করে গুণে নিন। বছরের প্রতিনিধি হল মাস, অতএব তের মাসেই তের বছরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা সম্ভব। দাদা ! আপনি শত্রুবিনাশের জন্য দৃঢ় নিশ্চিত হন, ক্ষত্রিয়দের কাছে যুদ্ধের থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই। অতএব আপনি যুদ্ধ করতে সম্মতি দিন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর যুধিষ্ঠির বললেন—বীর ভীমসেন ! তোমার দৃষ্টি শুধু অর্থের ওপর, তাই তোমার কথাও ঠিক। কিন্তু আমি অন্য কথা বলছি। সাহস দিয়েই শুধু কোনো কাজ করা উচিত নয়। যারা এরূপ কাজ করে তাদের দুঃখভোগ করতে হয়। যে কোনো কাজ করতে হলে ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে যুক্তি এবং উপায়ের সাহায্যে করা উচিত। তাহলে দৈবও অনুকূল হন। তখন সিদ্ধিলাভে আর কোনো বাধা থাকে না। বল এবং দর্পে উৎসাহিত হয়ে বালকসুলভ চপলতায় তুমি যে কাজ করতে বলছ, সেই সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। ভূরিশ্রবা, শল্য, জরাসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং ধৃতরাষ্ট্রের শস্ত্রবিদ কুশল পুত্রগণ আমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত আছে। আগে আমরা যেসব রাজাদের পরাজিত করেছিলাম এখন তাঁরা ওদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দুর্যোধন ও কৌরবসেনার সব বীরদের, সেনাপতিদের এবং মন্ত্রীদের এবং তাঁদের পরিবারবর্গকেও উত্তম বস্ত্র এবং ভোগ-সামগ্রী দিয়ে স্বপক্ষে করে নিয়েছেন। এঁরা প্রাণ থাকা পর্যন্ত দুর্যোধনের পক্ষে লড়াই করবেন, এ আমার স্থির বিশ্বাস। যদিও পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আমাদের দুই পক্ষের ওপরই সমদৃষ্টি রাখেন, তা সত্ত্বেও তাঁরা যেহেতু ওঁদের রাজ্যে থাকেন এবং অন্নগ্রহণ করেন, তাই দুর্যোধনের জন্যই ওঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করবেন।

তাঁরা সকলেই অস্ত্রকুশল এবং বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি। আমার বিশ্বাস যে সমস্ত দেবতা সহ ইন্দ্রও ওঁদের সামনে যুদ্ধে জয়ী হতে পারবেন না। কর্ণের বীরত্ব, উৎসাহ এবং তেজস্বিতা অপূর্ব। তাঁর দেহ অভেদ্য কবচে আচ্ছাদিত। তাঁকে পরাজিত না করে তুমি দুর্যোধনকে বধ করতে পারবে না।

যখন যুধিষ্ঠির এবং ভীম এইরূপ কথাবার্তা বলছিলেন সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেখানে পদার্পণ করলেন।

—— o ——

যুধিষ্ঠিরকে বেদব্যাসের উপদেশ, প্রতিস্মৃতি বিদ্যাপ্রাপ্ত করে অর্জুনের তপোবন যাত্রা এবং ইন্দ্রের পরীক্ষা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবরা এগিয়ে গিয়ে বেদব্যাসকে স্বাগত জানালেন ও আসনে বসিয়ে বিধিসম্মতভাবে তাঁকে পূজা করলেন। বেদব্যাস ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—প্রিয় যুধিষ্ঠির ! আমি তোমার মনের কথা জানি। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। তোমার মনে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং দুর্যোধন ইত্যাদির যে ভয় আছে, আমি শাস্ত্ররীতির সাহায্যে তা দূর করব। তুমি আমার উপদেশ মেনে চলো, তোমার মনের সমস্ত আশঙ্কা দূর হবে। এই বলে তিনি যুধিষ্ঠিরকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার শরণাগত শিষ্য, তাই আমি তোমাকে মূর্তিমান সিদ্ধির সমান প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যা দান করছি। তুমি এই বিদ্যা অর্জুনকে শিখিয়ে দাও, এই বলে বলীয়ান হয়ে সে তোমাদের শত্রুর কাছ থেকে রাজ্য উদ্ধার করবে। অর্জুন তপস্যা এবং পরাক্রমের সাহায্যে দেবদর্শনের যোগ্যতা সম্পন্ন ; সে নারায়ণের সহচর মহাতপস্বী ঋষি নর। তাকে কেউ হারাতে পারবে না, সে অচ্যুতস্বরূপ। সুতরাং তুমি অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য ভগবান শংকর, দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এবং ধর্মরাজের কাছে পাঠাও। সে ওঁদের কাছ থেকে অস্ত্র প্রাপ্ত করে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠবে। এখন তোমাদের কোনো দূর বনে গিয়ে বাস করতে হবে। কেননা তপস্বীদের চিরকাল একস্থানে থাকা দুঃখদায়ক হয়। এই কথা বলে ভগবান বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দান করে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভগবান ব্যাসের উপদেশানুসারে মন্ত্র জপ ও মনন করতে লাগলেন। এতে তাঁর মন অত্যন্ত প্রসন্ন হল। তাঁরা এবার দ্বৈতবন থেকে রওনা হয়ে সরস্বতীতীরে কাম্যক বনে এলেন। বেদজ্ঞ এবং তপস্বী ব্রাহ্মণরাও তাঁদের অনুসরণ করে সেখানে এলেন। সেইস্থানে থেকে তাঁরা মন্ত্রী এবং সেবকদের সঙ্গে নিয়ে পিতৃপুরুষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সেবা করতে লাগলেন। ব্যাসদেবের উপদেশ অনুসারে ধর্মরাজ একদিন অর্জুনকে একান্তে ডেকে বললেন—অর্জুন ! ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রমুখ মহারথীরা অস্ত্রশস্ত্রে অত্যন্ত কুশল। দুর্যোধন বিভিন্ন ভাবে তাঁদের বশীভূত করেছে। আমাদের শুধু তুমিই ভরসা। আমি তোমাকে এক গুপ্তবিদ্যা জানাচ্ছি, ভগবান বেদব্যাস আমাকে এই বিদ্যা দান করেছেন। তুমি খুব সাবধানে এই মন্ত্র আমার কাছে শিখে নাও এবং এটি প্রয়োগ করে সময়মতো দেবতাদের কৃপা লাভ করো। এর জন্য তুমি কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করবে এবং ধনুক-বাণ-কবচ ও খড়্গ নিয়ে সাধকের ন্যায় উত্তরাঞ্চলে প্রস্থান করো। সেখানে তুমি কঠোর তপস্যা দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে লীন করে দেবতাদের কৃপা লাভ করো। বৃত্রাসুরের থেকে ভীত হয়ে দেবতারা তাঁদের সমস্ত অস্ত্র ইন্দ্রকে সমর্পণ করেছেন। তাই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ইন্দ্রের কাছেই আছে। তুমি ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করো, তিনি প্রসন্ন হলে তোমাকে সব অস্ত্র দেবেন। তুমি আজই মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে ইন্দ্রদেবকে দর্শনের নিমিত্ত রওনা হয়ে যাও। ধর্মরাজ সংযমশীল অর্জুনকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রতপালন করিয়ে গুপ্ত মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন এবং ইন্দ্রকীল যাবার নির্দেশ দিলেন। অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক, অক্ষয় তূণীর এবং কবচে সুসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হলেন।

সেইসময় দ্রৌপদী অর্জুনের কাছে এসে বললেন—'হে বীর ! পাপী দুর্যোধন পূর্ণ সভাকক্ষে আমাকে অনেক অনুচিত কটু বাক্য বলেছে। আমি যদিও তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি তবু তোমার বিরহ-ব্যথা তার থেকেও অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের সুখ দুঃখের

তুমিই একমাত্র সহায়। আমাদের জীবন-যাপন, রাজ্য এবং ঐশ্বর্য লাভ তোমার পুরুষার্থের ওপরই নির্ভর। তাই আমি তোমাকে যাওয়ায় উৎসাহ দিচ্ছি এবং ঈশ্বর এবং সমস্ত দেব দেবীর কাছে তোমার কল্যাণ ও সাফল্য প্রার্থনা করছি।'

অর্জুন ভাইদের এবং পুরোহিত ধৌম্যকে ডান দিকে রেখে গাণ্ডীব ধনুক হাতে নিয়ে উত্তরাপথে যাত্রা করলেন। পরম পরাক্রমী অর্জুন যখন ইন্দ্রকে দর্শন করার বিদ্যাপ্রাপ্ত হয়ে পথ চলছিলেন, তখন সকল প্রাণী তাঁর রাস্তা ছেড়ে সরে যাচ্ছিলেন। অর্জুন এত দ্রুতগতিতে যাচ্ছিলেন যে, একদিনেই তিনি পবিত্র এবং দেবসেবিত হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর তিনি গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে অত্যন্ত সাবধানে রাত-দিন পথ চলতে চলতে ইন্দ্রকীলে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—'দাঁড়াও।' এদিক সেদিক তাকিয়ে অর্জুন দেখলেন একজন তপস্বী বৃক্ষছায়ায় বসে আছেন। তপস্বীর দেহ কৃশ হলেও, তাতে ব্রহ্মতেজ চমকিত হচ্ছিল। সেই জটাধারী তপস্বীকে দেখে অর্জুন দাঁড়িয়ে রইলেন। তপস্বী বললেন—'ধনুক-বাণ-কবচ ও তলোয়ার ধারণকারী তুমি কে ? এখানে কী প্রয়োজনে এসেছ ? এখানে অস্ত্র-শস্ত্রের কোনো কাজ নেই। শান্ত স্বভাব তপস্বীরা এখানে থাকেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় না, সুতরাং তুমি তোমার ধনুর্বাণ ফেলে দাও।' তপস্বী মৃদুহাস্যে এই কথা বললেও অর্জুন তাঁর মত পরিবর্তন করলেন না। তিনি স্থির করেছিলেন যে অস্ত্র-ত্যাগ করবেন না। অর্জুনকে অবিচল থাকতে দেখে তপস্বী মৃদুহাস্যে বললেন—'অর্জুন ! আমি ইন্দ্র ! তোমার যা ইচ্ছা, আমার কাছে চেয়ে নাও।' অর্জুন দুই হাত জোড় করে ইন্দ্রকে প্রণাম করলেন এবং বললেন—'হে দেবরাজ ! আমি আপনার কাছে সমগ্র অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করতে চাই। আপনি আমাকে এই বর দিন।' ইন্দ্র বললেন—'তুমি এখন অস্ত্রবিদ্যা শিখে কী করবে ? মনোমত ঐশ্বর্য চেয়ে নাও।' অর্জুন বললেন—'আমি লোভ, কাম, দেবত্ব, সুখ অথবা ঐশ্বর্যের লোভে আমার ভাইদের বনে ছেড়ে দিতে পারি না। আমি অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করে আমার ভাইদের কাছে ফিরে যেতে চাই।' ইন্দ্র অর্জুনকে বুঝিয়ে বললেন—'হে মহাবীর ! ভগবান শংকরের সঙ্গে তোমার যখন সাক্ষাৎ হবে তখন আমি তোমাকে আমার সমস্ত দিব্য-অস্ত্র প্রদান করব। তুমি তাঁর সাক্ষাৎলাভের জন্য সাধনা করো। তাঁর দর্শনলাভে সিদ্ধ হলে তুমি স্বর্গে আমার কাছে আসবে।' এই বলে ইন্দ্র অন্তর্ধান করলেন।

—o—

অর্জুনের তপস্যা, শংকরের সঙ্গে যুদ্ধ, পাশুপতাস্ত্র এবং দিব্যাস্ত্র লাভ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'পূজাবর ! মনস্বী অর্জুন কী প্রকারে দিব্য অস্ত্র লাভ করলেন ? আমি বিস্তারিতভাবে সেই কথা শুনতে আগ্রহী।'

বৈশম্পায়ন বললেন—'জনমেজয় ! মহারথী এবং দৃঢ়ব্রতী অর্জুন হিমালয় লঙ্ঘন করে এক বৃহৎ কণ্টকপূর্ণ জঙ্গলে পৌঁছলেন। অপূর্ব তার শোভা, সেই শোভা দেখে অর্জুন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কুশবস্ত্র, দণ্ড, মৃগচর্ম ও কমণ্ডলু ধারণ করে একনিষ্ঠ চিত্তে তপস্যা করতে লাগলেন। প্রথম মাসে তিনি তিন দিন অন্তর গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতা খেয়ে থাকতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয় দিন অন্তর এবং তৃতীয় মাসে পনেরো দিন অন্তর পাতা খেতেন। চতুর্থ মাসে হাত তুলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু বায়ু সেবন করে থাকতেন। প্রত্যহ স্নান করার জন্য তাঁর জটা উজ্জ্বল হলুদবর্ণ ধারণ করেছিল।'

বড় বড় মুনি-ঋষিরা ভগবান শংকরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন—'ভগবান ! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যায় রত। তার একনিষ্ঠ তপস্যায় সমস্ত মুনি-ঋষিরা চমৎকৃত। অর্জুনের তপস্যার তেজে চতুর্দিক ধূম্রবর্ণ ধারণ করেছে।' ভগবান শংকর এই শুনে তাঁদের বললেন—'আমি আজ অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ করব।' ঋষিরা চলে গেলে ভগবান শংকর সোনার মতো ভীলমূর্তি ধারণ করে, সুন্দর ধনুক, সর্পাকৃতি বাণ নিয়ে পার্বতীকে সঙ্গে করে অর্জুনের কাছে এলেন। বহু ভূত-প্রেতও ভীলমূর্তি ধারণ করে তাঁদের সঙ্গে এল। ভীলবেশধারী ভগবান শংকর অর্জুনের কাছে এসে দেখলেন যে, মূক দানব জঙ্গলী শূকরের রূপ ধারণ করে

তপস্বী অর্জুনকে হত্যার চেষ্টা করছে, অর্জুনও শূকরটিকে দেখেছিলেন। অর্জুন গাণ্ডীবে সর্পাকৃত বাণ লাগিয়ে ধনুকে টংকার দিয়ে বললেন—'দুষ্ট ! তুমি আমার মতো নিরপরাধকে মারতে চাও। আমি তোমাকে প্রথমেই যমের দুয়ারে পাঠাচ্ছি।' যেই তিনি বাণ ছুঁড়তে গেলেন, ভীলবেশী শিব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন— 'আমি আগেই একে মারব বলে স্থির করেছি, তুমি একে মেরো না।' অর্জুন ভীলের কথায় কর্ণপাত না করে শূকরের ওপর বাণ ছুঁড়লেন। শিবও তৎক্ষণাৎ তাঁর বজ্র বাণ চালালেন। দুটি বাণই মূক দানবের দেহের ওপর ধাক্কা খেল, ভয়ংকর আওয়াজ হল। তারপর অসংখ্য বাণের আঘাতে শূকরটি ভয়ংকর দানবের রূপে প্রকটিত হয়ে মারা গেল। অর্জুন তখন ভীলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'তুমি কে'? এইসব লোক নিয়ে নির্জন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? এই শূকর আমাকে বধ করতে এসেছিল, আমি তাই আগেই ওকে বধ করার সিদ্ধান্ত করি। তুমি কেন একে হত্যা করতে চেয়ে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করলে ? আমি তোমাকেও যুদ্ধে পরাস্ত করব।' ভীল বলল—'আমি তোমার আগে এই শূকরকে মেরেছি। তোমার থেকে আগেই আমি একে মারব ঠিক করে ছিলাম। এ আমার নিশানা ছিল, আমিই একে বধ করেছি। একটু অপেক্ষা করো, আমি বাণ চালাচ্ছি, শক্তি থাকে তো সামলাও। তা না হলে তুমিই আমার ওপর আঘাত হানো।' ভীলের কথা শুনে অর্জুন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন, তিনি ভীলের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

অর্জুনের বাণ যখনই ভীলের কাছে যাচ্ছিল, তিনি তা ধরে ফেলছিলেন। ভীলবেশী ভগবান শংকর হেসে বলতে লাগলেন—'নির্বোধ ! মার, খুব মার ; একটুও থামিস না।' অর্জুন বাণের বন্যা বওয়ালেন। দুদিক থেকে বাণযুদ্ধ শুরু হল। বাণগুলি ভীলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করল না দেখে অর্জুন খুব আশ্চর্য হলেন। অর্জুন বাণ ছুঁড়লেই ভীল সেটি হাতে ধরে নেন। অর্জুনের বাণ শেষ হয়ে গেল। অর্জুন তখন ধনুকের কোণা দিয়ে তাঁকে মারতে গেলে ভীল সেটি কেড়ে নিলেন। তরবারি দিয়ে মারতে গেলে সেটি দুটুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পাথর এবং গাছ তুলে মারতে গেলে ভীল তা আগেই কেড়ে নেন। অর্জুন তখন তাঁকে ঘুসি মারতে গেলেন। ভীলও তখন তাঁকে ঘুসি মারলে অর্জুন মূর্ছিত হলেন। তখন ভীল অর্জুনের দুই হাত দুমড়ে মুচড়ে দিলেন। অর্জুন আর নড়া-চড়া করতে পারলেন না, তাঁর দম

বন্ধ হয়ে আসছিল, রক্তে মাখামাখি হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে অর্জুনের জ্ঞান ফিরল। তিনি মাটির এক বেদী তৈরি করে ভগবান শংকরের মূর্তি স্থাপন করে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে পূজা করতে লাগলেন। অর্জুন দেখতে পেলেন তিনি যে ফুল মহাদেবের মাথায় দিচ্ছেন, তা গিয়ে ভীলের মাথায় পড়ছে। এই দেখে অর্জুন বুঝতে পারলেন যে, ভীল আসলে কে, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে ভীলের চরণে প্রণাম জানালেন। ভগবান শংকর প্রসন্ন হয়ে আশ্চর্যান্বিত, আহত অর্জুনকে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন—'অর্জুন ! তোমার অনুপম কর্মে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মতো শূরবীর ক্ষত্রিয় আর দ্বিতীয় নেই। তোমার তেজ ও বল আমারই মতো। আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি আমার স্বরূপ দর্শন করো। তুমি সনাতন ঋষি, তোমাকে আমি দিব্য জ্ঞান প্রদান করছি। এর প্রভাবে তুমি শত্রুদের এবং দেবতাদেরও পরাজিত করতে সক্ষম হবে। আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে এমন এক অস্ত্র দিচ্ছি, যা কেউ নিবারণ করতে পারবে না। তুমি মুহূর্তের মধ্যে আমার এই অস্ত্র ধারণ করতে পারবে।' তারপর অর্জুন ভগবতী পার্বতী এবং ভগবান শংকরের দর্শন লাভ করলেন। তিনি নতজানু হয়ে পরম প্রার্থিত শংকরের চরণ স্পর্শ করলেন।

অর্জুন ভগবান শংকরকে প্রসন্ন করার জন্য তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'প্রভো ! আপনি দেবাদিদেব মহাদেব,

আপনি জগতের মঙ্গলকারী ও নীলকণ্ঠী, জটাধারী। আপনি কারণ সমূহেরও কারণ, ত্রিনেত্র এবং ব্যাপ্তি স্বরূপ, দেবতাদের আশ্রয় এবং জগতের মূল কারণ। আপনাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। আপনিই শিব, আপনিই বিষ্ণু। আমি আপনার চরণে প্রণাম করি। আপনি দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংসক ও হরিহর স্বরূপ। আপনি সর্বস্বরূপ, ভক্তবৎসল, পিনাকপাণি। আপনি সূর্যস্বরূপ, শুদ্ধমূর্তি এবং সৃষ্টির বিধাতা। আমি আপনার চরণে প্রণাম করি। আপনিই সর্বভূতমহেশ্বর, সর্বেশ্বর, কল্যাণকারী, পরমকারণ, স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমায় ক্ষমা করুন। আপনার দর্শনের আশায় আমি এই পর্বতে এসেছি। আমি অজ্ঞানবশত আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস করেছি। দয়া করে আমার অপরাধ নেবেন না। আমি আপনার শরণাগত, আমাকে ক্ষমা করুন।' অর্জুনের স্তুতি শুনে ভগবান শংকর হেসে অর্জুনের হাত ধরে বললেন—'ক্ষমা করলাম' ; তারপর ভগবান অর্জুনকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন।

ভগবান শংকর বললেন—'অর্জুন ! তুমি নারায়ণের নিত্যসহচর নর। পুরুষোত্তম বিষ্ণু এবং তোমার পরম তেজের আধারেই জগৎ টিকে আছে। ইন্দ্রের অভিষেকের সময় তুমি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনুক দিয়ে দানব নাশ করেছিলে। আজ আমি মায়ার সাহায্যে ভীলরূপ ধারণ করে তোমারই উপযুক্ত গাণ্ডীব ধনুক এবং অক্ষয় তূণীর কেড়ে নিয়েছি। তুমি এবার সেগুলি নিয়ে নাও। তোমার শরীরও নীরোগ ও সুস্থ হবে। আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তোমার ইচ্ছা মতো বর চেয়ে নাও।' অর্জুন বললেন—'ভগবান ! আপনি আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হয়ে বরপ্রদান করতে চান তাহলে আমাকে আপনার পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন। এই ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রলয়ের সময় জগৎ নাশ করে। সেই অস্ত্রের সাহায্যে আমি আগামী যুদ্ধে সকলকে যাতে পরাজিত করতে পারি, সেই আশীর্বাদ করুন। এই অস্ত্রের সাহায্যে রণভূমিতে আমি দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব এবং সর্পকুল ভস্ম করে দেব। আমি জানি মন্ত্রপূত করে নিক্ষেপ করলে এই পাশুপত অস্ত্র থেকে হাজার হাজার ত্রিশূল, ভয়ংকর গদা এবং সর্পাকৃতি বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আমি এই পাশুপত অস্ত্রের সাহায্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং দুর্মুখ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করব।' ভগবান

শংকর বললেন—'বীর অর্জুন ! আমি তোমাকে প্রিয় পাশুপত অস্ত্র দিচ্ছি। কারণ তুমি এর ধারণ, প্রয়োগ এবং উপসংহারের অধিকারী। ইন্দ্র, যমরাজ, কুবের, বরুণ এবং বায়ুও এই অস্ত্র ধারণ, প্রয়োগ ও উপসংহারে সক্ষম নয়। তাহলে মানুষের আর কী কথা ! আমি তোমাকে এই অস্ত্র দিলেও তুমি সহসা এটি কারো ওপর প্রয়োগ কোরো না। অল্পশক্তি মানুষের ওপর এটি প্রয়োগ করলে এটি সমস্ত জগৎ ধ্বংস করে ফেলবে। যদি সংকল্প, বাক্য, ধনুক অথবা দৃষ্টি দ্বারা—কোনোভাবে শত্রুর ওপর এটি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এটি তাকে নাশ করে ফেলে।'

অর্জুন স্নান করে পবিত্র হয়ে ভগবান শংকরের কাছে এসে বললেন 'এবার আমাকে পাশুপত অস্ত্র শিক্ষা দিন।' মহাদেব অর্জুনকে তার প্রয়োগ থেকে উপসংহার পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব, রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। মূর্তিমান কালের মতো পাশুপত অস্ত্র অর্জুনের কাছে এল এবং অর্জুন তা গ্রহণ করলেন। সেইসময় পর্বত, বন, সমুদ্র, নগর, গ্রাম এবং খনি সহ সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত হল। ভগবান শংকর অর্জুনকে স্বর্গে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ভগবান শংকরকে প্রণাম করে হাতজোড় করে দাঁড়ালে, ভগবান

তাঁকে নিজ হাতে গাণ্ডীব ধনুক দিয়ে আকাশমার্গে অন্তর্ধান হলেন।

তখনকার অর্জুনের মানসিক অবস্থার বর্ণনা হয় না। তিনি ভাবছিলেন 'আজ ভগবান শংকরের দর্শন লাভ হয়েছে, তিনি আমার দেহে তাঁর হাত স্নেহভরে বুলিয়ে দিয়েছেন। আমি ধন্য, আজ আমার মনোস্কামনা পূর্ণ হয়েছে।' অর্জুন যখন এইসব ভাবছিলেন, তখন তাঁর সামনে বৈদুর্যমণির ন্যায় কান্তিমান জলচর বেষ্টিত হয়ে জলাধীপ বরুণ, স্বর্ণের ন্যায় বঙ্কিমান ধনাধীপ কুবের, সূর্যপুত্র যমরাজ এবং বহু গুহ্যক-গন্ধর্ব ইত্যাদি মন্দারচলের তেজস্বীগণ এলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ঐরাবতের পিঠে করে দেবগণের সঙ্গে মন্দারচলে এলেন। সকল দেবতা এলে ধার্মিক যমরাজ মধুর স্বরে বললেন—'অর্জুন ! দেখো, সব লোকপাল তোমার কাছে এসেছেন। এখন তুমি আমাদের দর্শন লাভের যোগ্য হয়েছ, দিব্যদৃষ্টি গ্রহণ করো, আমাদের দর্শন করো। তুমি সনাতন ঋষি নর, মনুষ্যরূপে অবতার গ্রহণ করেছ। এখন তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থেকে পৃথিবীর ভার লাঘব করো। আমি তোমাকে আমার এই দণ্ড দিচ্ছি একে কেউ নিবারণ করতে পারে না।' অর্জুন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সেই দণ্ড গ্রহণ করলেন। তার মন্ত্র, পূজার বিধি-নিয়ম এবং প্রয়োগ ও উপসংহারের নিয়ম শিখে নিলেন। বরুণ বললেন—'অর্জুন ! আমার দিকে তাকাও, আমি জলাধীপ বরুণ ! আমার বারুণ পাশ যুদ্ধে কখনো নিস্ফল হয় না। তুমি এটি গ্রহণ করে এর প্রয়োগ বিধি শিখে নাও। তারকাসুরের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে আমি এই পাশের সাহায্যে হাজার হাজার দৈত্যকে বন্দী করেছিলাম। তুমি এর সাহায্যে যাকে ইচ্ছা বন্দী করতে পারো।'

অর্জুন পাশ স্বীকার করে নিলে ধনাধীপ কুবের বললেন—'অর্জুন ! তুমি ভগবানের নর-রূপ। প্রথম কল্পে তুমি আমার সঙ্গে খুব পরিশ্রম করেছিলে। অতএব তুমি আমার কাছ থেকে অন্তর্ধান নামক এই অনুপম অস্ত্র গ্রহণ করো। বল-পরাক্রম এবং তেজপ্রদানকারী এই অস্ত্র আমার অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান শংকর ত্রিপুরাসুরকে নাশ করার সময় এর প্রয়োগ করে অসুরকে ভস্ম করেছিলেন। এটি তোমার জন্যই, তুমি এটিকে গ্রহণ করো।' অর্জুন সেটি গ্রহণ করলে দেবরাজ ইন্দ্র মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন—'প্রিয় অর্জুন ! তুমি ভগবানের নর-রূপ। তুমি পরম সিদ্ধি এবং দেবতাদের পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছ। তোমাকে দেবতাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে এবং স্বর্গেও যেতে হবে। তুমি তার জন্য প্রস্তুত হও। সারথি মাতলি তোমার জন্য রথ নিয়ে আসবে। তখন আমি তোমাকে দিব্য অস্ত্রও দেব।' এইভাবে সমস্ত লোকপালগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হয়ে অর্জুনকে দর্শন ও বরপ্রদান করেন। অর্জুন প্রসন্নচিত্তে সকলের স্তুতি এবং ফল-ফুল দ্বারা পূজা করলেন। দেবতারা নিজ নিজ ধামে প্রস্থান করলেন।

---o---

স্বর্গে অর্জুনের অস্ত্র এবং নৃত্য-শিক্ষা, উর্বশীর প্রতি মাতৃভাব, ইন্দ্র কর্তৃক লোমশ ঋষিকে পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দেবতারা চলে গেলে অর্জুন সেইস্থানেই ইন্দ্রের রথের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্রের সারথি মাতলি দিব্যরথ নিয়ে উপস্থিত হলেন। রথের উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেল, মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চারিদিকে ভীষণ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রথটি তলোয়ার, শক্তি, গদা, তেজঃপূর্ণ বাণ, বজ্র, তোপ, বায়ুবেগে গুলি নিক্ষেপ করার যন্ত্র ইত্যাদি নানা অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। দশ হাজার বায়ুগামী ঘোড়ায় সেটি সংযুক্ত ছিল। সেইসময় দিব্যরথের চমকে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। স্বর্ণদণ্ডে শ্যামবর্ণের বৈজয়ন্তী ধ্বজা হাওয়ায় উড়ছিল। সারথি মাতলি অর্জুনের কাছে এসে

প্রণাম করে বললেন—'ইন্দ্রনন্দন ! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আপনি তাঁর প্রিয় রথে করে তাঁর কাছে চলুন।' সারথির কথায় অর্জুন প্রসন্ন হয়ে গঙ্গাস্নান করলেন এবং শাস্ত্রীয় রীতিতে পিতৃপুরুষ, দেবতা-ঋষিদের পূজার্চনা সমাপ্ত করলেন। তারপর মন্দরাচলের অনুমতি নিয়ে সকলের সঙ্গে দিব্যরথে আরোহণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই রথ মন্দারচল থেকে উঠে সেখানকার মুনি-ঋষিদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। অর্জুন দেখলেন সেখানে সূর্য-চন্দ্র বা অগ্নির প্রকাশ নেই। হাজার হাজার বিমান সেখানে অদ্ভুতভাবে চমকিত হচ্ছে। সেগুলি তাদের নিজস্ব পুণ্যকান্তিতে চমকিত হচ্ছে আর পৃথিবীতে সেগুলি নক্ষত্রের রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। অর্জুন মাতলিকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, মাতলি বললেন—'বীরবর ! পৃথিবী থেকে যেগুলি আপনারা তারারূপে দেখছেন, সেগুলি পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের বাসস্থান।' রথ ততক্ষণে সিদ্ধ ব্যক্তিদের স্থান পেরিয়ে গিয়েছে। তারপরে রাজর্ষিদের পুন্যস্থান এল, তারপরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী দৃষ্টিগোচর হল।

স্বর্গের শোভা, সুগন্ধ, দিব্যতা, দৃশ্য সবই অতি উত্তম। বড় বড় পুণ্যাত্মা পুরুষ এই লোক প্রাপ্ত হন, যিনি তপস্যা করেননি, সন্ধ্যাহ্নিক করেননি, যুদ্ধে পিঠ প্রদর্শন করেছেন, তিনি এই লোক দর্শন করতে পারেন না। যাঁরা যজ্ঞ করেন না, ব্রত করেন না, বেদমন্ত্র জানেন না, তীর্থস্নান করেন না, যজ্ঞ এবং দান থেকে দূরে থাকেন, যজ্ঞে বিঘ্নস্থাপন করেন, ক্ষুদ্র, মদ্যপায়ী, গুরুস্ত্রীগামী, মাংসভোজী এবং দুরাত্মা, তাঁরা কোনোভাবেই স্বর্গ দর্শন করতে সক্ষম হন না। অমরাবতীতে সহস্র বিমান দেবতাদের ইচ্ছানুযায়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বহু বিমান বিভিন্ন দিকে যাতায়াত করছিল। অপ্সরা এবং গন্ধর্বগণ অর্জুনকে স্বর্গে দেখে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করল। দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রসন্ন হয়ে উদারচরিত্র অর্জুনের পূজায় রত হলেন। অর্জুন সেখানে সাধ্য দেবতা, বিশ্বদেবা, পবন, অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, বসু, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, তুম্বুরু, নারদ এবং হাহা-হুহু ইত্যাদি গন্ধর্বদের দর্শন করলেন। তাঁরা অর্জুনকে স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ক্রমশ এগিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাৎ হল। রথ থেকে নেমে অর্জুন মাথা নত করে ইন্দ্রকে প্রণাম

করলেন। ইন্দ্র তাঁকে স্নেহভরে নিজের পাশে দিব্য আসনে বসালেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সংগীতবিদ্যা ও সামগানের কুশল গায়ক তুম্বুরু ইত্যাদি গন্ধর্বগণ মনোহর গাথা গান করতে লাগলেন। হৃদয় ও বুদ্ধি হরণকারী ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্বাচিত্তি, স্বয়ংপ্রভা, উর্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, সহজন্যা, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা, মধুস্বরা আদি অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে দেবতা এবং গন্ধর্বগণ উত্তম অর্ঘ্য দিয়ে অর্জুনের সেবা ও সৎকার করলেন। তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন। তারপর অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গেলেন। তিনি ইন্দ্রভবনে থেকে অস্ত্রাদির প্রয়োগ ও উপসংহার শিক্ষা করতে লাগলেন। তিনি ইন্দ্রের প্রিয় শত্রুঘাতী বজ্রের ব্যবহারও শিখলেন। তিনি প্রয়োজন মতো মেঘে আচ্ছাদিত করা, মেঘগর্জনা এবং বিদ্যুৎ চমকিত করাও অভ্যাস করলেন। সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের জ্ঞান লাভ করার পর অর্জুন তাঁর বনবাসী ভাইদের স্মরণ করে মর্ত্যে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ইন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তিনি আরও পাঁচবছর স্বর্গে কাটালেন।

একদিন উপযুক্ত সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্রবিদ অর্জুনকে

বললেন—'প্রিয়ে অর্জুন ! এবার তুমি চিত্রসেন নামক

গন্ধর্বের কাছ থেকে নাচগান শিখে নাও এবং মর্তো যেসব বাদ্য নেই সেগুলিরও বাজানো শিখে নাও।' ইন্দ্র চিত্রসেনের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা করালে অর্জুন চিত্রসেনের সঙ্গে মিলে নাচ-গান-বাজনা শিখতে লাগলেন। অর্জুন অচিরেই এইসব বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। এত শিল্পচর্চায় নিমগ্ন থাকলেও যখনই অর্জুনের ভাইদের কথা মনে পড়ত, তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। একদিন ইন্দ্র দেখলেন অর্জুন নির্নিমেষ নয়নে উর্বশীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি চিত্রসেনকে একান্তে ডেকে বললেন—'তুমি উর্বশী অপ্সরার কাছে গিয়ে আমার কথা বলো, সে যেন অর্জুনের কাছে যায়।' চিত্রসেন পরমা সুন্দরী অপ্সরা উর্বশীর কাছে গিয়ে বললেন—'আমি দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে তোমার কাছে এসেছি। তুমি তাঁর এই আদেশ পালন করো। মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন সৌন্দর্য, স্বভাব, রূপ, ব্রত, জিতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদি স্বাভাবিক গুণে দেবতা এবং মনুষ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলবান এবং প্রতিভাসম্পন্ন, বিদ্যা, তেজ, প্রতাপ, ক্ষমা, মাৎসর্যহীনতা, বেদ-বেদাঙ্গ-জ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রনিপুণ। আট প্রকার গুরুসেবা এবং আটগুণসম্পন্ন বুদ্ধিতেও পারঙ্গম। তিনি নিজে ব্রহ্মচারী ও উৎসাহী তো বটেই, তাঁর মাতৃকুল এবং পিতৃকুলও অত্যন্ত শুদ্ধ। তিনি তরুণ বয়স্ক। ইন্দ্র যেমন স্বর্গরক্ষা করেন, ইনিও তেমন কারো সাহায্য ব্যতীতই পৃথিবী রক্ষা করতে সক্ষম। তিনি অন্যের প্রশংসা করেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্যাও স্থূলকথার মতো অনুধাবন করতে পারেন। তিনি মিষ্ট বাক্য বলেন এবং বন্ধুদের আপ্যায়নে নিপুণ। সত্যপ্রেমী, নিরহংকার, প্রেমপাত্র এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তাঁর সেবকদের প্রিয়ভাবে দেখেন এবং গুণে ইন্দ্রের সমকক্ষ। তুমি নিশ্চয়ই অর্জুনের গুণকাহিনী শুনেছ। তিনি যেন তোমার সেবায় সুখলাভ করেন, তাঁর জন্য তোমার আমার কথা মেনে নেওয়া উচিত।' উর্বশী চিত্রসেনের আদর-আপ্যায়ন করে বললেন—'গন্ধর্বরাজ ! তুমি অর্জুনের যেসব গুণের কথা বর্ণনা করলে, আমি তা আগেই শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আমি অর্জুনকে ভালোবাসি এবং আগেই তাঁকে নির্বাচন করেছি। এখন দেবরাজের নির্দেশ এবং তোমার কথায় তাঁর প্রতি আকর্ষণ আমার আরও বেড়ে গেল, আমি অর্জুনের সেবা করব। তুমি নিশ্চিন্তে গমন কর।'

চিত্রসেন চলে যাওয়ার পর অর্জুনের সেবা করার জন্য উর্বশী সানন্দে সুগন্ধিজলে স্নান করলেন। তিনি তো সুন্দরী ছিলেনই, তারপর তিনি নানা বস্ত্রালঙ্কারে সুন্দরভাবে সজ্জিত হলেন। তারপর মৃদুহাস্যে হাওয়ার গতিতে পলকের মধ্যে অর্জুনের কাছে এসে পৌঁছলেন। দ্বারপাল অর্জুনকে তাঁর আগমন সংবাদ দিলেন, উর্বশী অর্জুনের মহলে এলেন। অর্জুন মনে মনে নানাকথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চোখবন্ধ করে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁকে গুরুজনের মতো আদর-আপ্যায়ন করে বললেন—'দেবী ! আমি তোমাকে নমস্কার জানাই, আমি তোমার সেবক, আদেশ করো।' উর্বশী হতচকিত হলেন। তিনি বললেন—'দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে গন্ধর্ব চিত্রসেন আমার কাছে এসে আপনার নানাগুণের বর্ণনা করেন এবং আমাকে আপনার কাছে আসার জন্য বলেন। আপনার পিতা ইন্দ্র এবং গন্ধর্ব চিত্রসেনের নির্দেশে আমি আপনার সেবা করতে এসেছি। শুধু নির্দেশেই নয়, যখন থেকে আমি আপনার গুণের কথা শুনেছি তখন থেকেই আমি আপনার গুণগ্রাহী হয়েছি। আমি কামনায় জর্জরিত, বহুদিন থেকে আমি আপনার সঙ্গ কামনা করছি। আপনি আমাকে স্বীকার করুন।' উর্বশীর কথা শুনে অর্জুন লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেলেন। তিনি হাত দিয়ে কান বন্ধ করে বললেন—'হায় ! হায় ! একথা যেন আমার কানে প্রবেশ

না করে। দেবী ! তুমি নিঃসন্দেহে আমার গুরুপত্নীর সমান। দেবসভায় আমি যে তোমায় অপলকে দেখেছিলাম, তা কোনো কু-দৃষ্টিতে নয়। আমি ভাবছিলাম যে, তুমিই পুরুবংশের আনন্দময়ী মাতা, তোমাকে চিনতে পেরেই আমার চোখ আনন্দে উছলে উঠেছিল। তাই আমি তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম। দেবী ! আমার সম্পর্কে আর কোনো কথা ভাবা উচিত নয়। তুমি আমার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠা, আমার পূর্বপুরুষের জননী।' উর্বশী বললেন—'বীর ! অপ্সরাদের কারো সঙ্গে বিবাহ হয় না। আমরা স্বাধীন, অতএব আমাকে গুরুজন ভাবা আপনার উচিত নয়। আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন, এই কামপীড়িতাকে পরিত্যাগ করবেন না। আমি কাম-জ্বরে জর্জরিত, আপনি আমার দুঃখ দূর করুন।' অর্জুন বললেন—'দেবী ! আমি তোমাকে সত্যকথাই বলছি। দিক-বিদিকের দেবতারা আমার কথা শুনুন, যেমন কুন্তী, মাদ্রী এবং ইন্দ্রপত্নী শচী আমার মা, তেমনই তুমিও পুরুবংশের জননী হওয়ায় আমার পূজনীয়া মাতা। আমি তোমার চরণে মস্তক নত করে প্রণাম করছি।

তুমি মাতার ন্যায় পূজনীয়া এবং আমি তোমার পুত্রের মতো রক্ষণীয়।'

অর্জুনের কথা শুনে উর্বশী ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। তিনি তাঁর সুন্দর ভ্রূ বাঁকিয়ে অর্জুনকে অভিশাপ দিলেন—'অর্জুন ! আমি তোমার পিতা ইন্দ্রের নির্দেশে কামাতুর হয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কামনা পূরণ করছ না। সুতরাং তোমাকে স্ত্রীলোকের মধ্যে নর্তক হয়ে থাকতে হবে এবং সম্মানরহিত হয়ে নপুংসক নামে প্রসিদ্ধ হবে।' তখন ক্রোধে উর্বশীর ঠোঁট কাঁপছিল, দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল। তিনি নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। অর্জুন তাড়াতাড়ি চিত্রসেনের কাছে গিয়ে উর্বশীর সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন। চিত্রসেন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। ইন্দ্র তখন অর্জুনকে কাছে ডেকে অনেক কিছু বোঝালেন এবং একটু হেসে বললেন—'প্রিয় অর্জুন ! তোমার মতো পুত্র পেয়ে কুন্তী সত্যিই পুত্রবতী হয়েছেন। তুমি তোমার ধৈর্যের দ্বারা ঋষিদেরও পরাজিত করেছ। উর্বশী তোমাকে যে শাপ দিয়েছে, তাতে তোমার মঙ্গল হবে। যখন তোমরা ত্রয়োদশতম বর্ষে অজ্ঞাতবাস করবে, সেই সময় তুমি একবছর নপুংসক হয়ে অজ্ঞাতভাবে থেকে এই শাপ ভোগ করবে। তারপরে তুমি তোমার পুরুষত্ব প্রাপ্ত হবে।' অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁর চিন্তা দূর হল। তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে স্বর্গের সুখ ভোগ করতে থাকলেন। জনমেজয় ! অর্জুনের চরিত্র এমনই পবিত্র—যে ব্যক্তি এটি প্রতিদিন শ্রবণ করে তার মনে আর পাপ-বাসনা জাগে না।

এই সময় মহর্ষি লোমশ স্বর্গে এলেন। তিনি দেখলেন অর্জুন ইন্দ্রের অর্ধেক আসনে বসে আছেন। তিনিও অন্য একটি আসনে উপবেশন করে ভাবতে লাগলেন—'অর্জুন কী করে এই আসন লাভ করল ? সে এমন কী পুণ্যকাজ করেছে, কোন দেশ জয় করেছে যে সর্বদেববন্দিত ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হয়েছে ?' দেবরাজ ইন্দ্র লোমশ মুনির মনের কথা জেনে ফেললেন। তিনি বললেন—'ব্রহ্মর্ষি ! আপনার মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছে, আমি তার উত্তর দিচ্ছি। অর্জুন শুধু মানুষ নয়, সে মনুষ্যরূপধারী দেবতা। সে মনুষ্যরূপে অবতার গ্রহণ করেছে। সে হল সনাতন নর ঋষি। এখন সে পৃথিবীতে অবতার হয়ে রয়েছে। মহর্ষি নর এবং নারায়ণ কার্যবশত পবিত্র পৃথিবীতে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। নিবাতকবচ নামে একটি দৈত্য মদোন্মত্ত হয়ে আমার অনিষ্ট করছিল। সে বর পেয়ে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর কালিয়দহে সর্পদের নিধন করেছিলেন, তিনি যে দৃষ্টিমাত্রেই নিবাত-কবচ দৈত্যকে সানুচর নাশ করতে পারতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মহান তেজঃপুঞ্জ, এত ছোট কাজের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা ঠিক হবে না। তাঁর ক্রোধ যদি একবার জেগে ওঠে, তাহলে সমস্ত জগৎকে তা

ভস্মীভূত করে দিতে পারে। এই কাজের জন্য অর্জুন একাই যথেষ্ট। সে নিবাতকবচকে বধ করে তবে পৃথিবীতে যাবে। হে ব্রহ্মর্ষি ! আপনি পৃথিবীতে গিয়ে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলবেন যে তাঁরা যেন অর্জুনের জন্য একটুও চিন্তা না করেন। আর বলবেন যে, 'অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় এখন বহু শক্তির অধিকারী। তিনি স্বর্গীয় নৃত্য-গীত এবং বাদ্যেও কুশলী হয়ে উঠেছেন। আপনারা সব ভাই মিলে পবিত্র তীর্থে যাত্রা করুন। তীর্থযাত্রায় মন-প্রাণ প্রফুল্ল থাকবে আর আপনারা পবিত্রভাবে রাজভোগ করবেন। ব্রহ্মর্ষি ! আপনি বড় তপস্বী এবং সমর্থ, সুতরাং পৃথিবীতে বিচরণকালে পাণ্ডবদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।' ইন্দ্রের কথা শুনে লোমশ মুনি কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কাছে এলেন।

অর্জুনের স্বর্গে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবদের অবস্থান এবং বৃহদশ্বের আগমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অর্জুনের স্বর্গে বাস করার সংবাদ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভগবান ব্যাসের কাছে পেলেন। ব্যাসদেব চলে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন—

'সঞ্জয় ! আমি অর্জুনের খবর বিস্তারিতভাবে জেনেছি। তুমি কি এই খবর জান ? আমার পুত্র দুর্যোধন অল্পবুদ্ধি। তাই সে খারাপ কাজ এবং বিষয় ভোগে ব্যাপৃত থাকে। সে নিজের দুর্বুদ্ধির জন্য রাজ্যনাশ করবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধর্মাত্মা। তিনি সাধারণ কথাবার্তাতেও সত্যনিষ্ঠ। তাঁর পক্ষে অর্জুনের মতো বীর যোদ্ধা আছে। তিনি অবশ্যই ত্রিলোকের রাজ্যলাভ করবেন। অর্জুন যখন তার মহাশক্তিসম্পন্ন বাণের দ্বারা যুদ্ধ করবে, তখন কে আর তার সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবে ?' সঞ্জয় বললেন—'মহারাজ ! আপনি দুর্যোধন সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সবই সত্য। আমি শুনেছি অর্জুন যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম দেখিয়ে ভগবান শংকরকে প্রসন্ন করেছেন। অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং ভীলের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে প্রসন্ন হয়ে মহাদেব অর্জুনকে দিব্য অস্ত্র প্রদান করেছেন। অর্জুনের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে সব লোকপাল এসে অর্জুনকে দর্শন দিয়েছেন এবং দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করেছেন। অর্জুন ছাড়া এমন ভাগ্যশালী আর কে আছেন ? অর্জুনের বল অপার, শক্তি অপরিমিত।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! আমার পুত্ররা পাণ্ডবদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। পাণ্ডবদের শক্তি বেড়েই চলেছে। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের সাহায্য করার জন্য যদুবংশের যোদ্ধাদের উৎসাহিত করবেন, তখন কৌরবপক্ষের রথী মহারথীরাও তাঁদের পরাস্ত করতে পারবে না। আমাদের কৌরবপক্ষে এমন কোনো রাজা নেই যে অর্জুনের ধনুকের টংকার অথবা ভীমের গদার বেগ সহ্য করতে পারে ! আমি দুর্যোধনের কথায় আমাদের হিতৈষী ব্যক্তিদের হিত বাক্যে কান দিইনি। মনে হচ্ছে এখন আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে হবে।' সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! আপনি অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু স্নেহবশত আপনি আপনার পুত্রদের বারণ করেননি, উপেক্ষা করেছেন। তার ভয়ংকর কুফল এবার আপনি বুঝতে পারবেন। যখন পাণ্ডবরা কপটতার দ্বারা পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে কাম্যক-বনে গিয়েছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গিয়ে তাঁদের আশ্বাস

দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় প্রমুখ সেখানে পাণ্ডবদের যা বলেছিলেন, তা দূত মারফত শুনে আমি আপনার কাছে নিবেদন করেছিলাম। যখন ওরা সকলে আমাদের আক্রমণ করবে তখন কে তাদের সম্মুখীন হবে ?'

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! মহাত্মা অর্জুন যখন অস্ত্র লাভের জন্য ইন্দ্রলোকে চলে গেলেন, পাণ্ডবরা তখন কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! তখন পাণ্ডবরা কাম্যক বনে বাস করছিলেন। তাঁরা রাজ্য হারিয়ে এবং অর্জুনের বিয়োগ ব্যথায় দুঃখে কাল কাটাচ্ছিলেন। একদিন পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। ভীম রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'দাদা ! অর্জুনের ওপরই আমাদের সব ভার, সেই আমাদের প্রাণের আধার। সে এখন আপনার নির্দেশে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করতে গেছে। অর্জুনের যদি কোনো অনিষ্ট হয় তাহলে রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং আমরা জীবিত থাকব না। অর্জুনের বাহুবলের জন্যই শত্রুরা আমাদের সমীহ করে, পৃথিবী আমাদের বশীভূত। আমাদের বাহুতে শক্তি আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সহায়ক ও রক্ষক। কৌরবদের পিষে মারার জন্য আমার বার বার ক্রোধ জন্মায়। কিন্তু আপনার জন্য আমাকে সেই ক্রোধ দমন করতে হয়। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে কর্ণসহ সকল শত্রুকে নিহত করে বাহুবলের দ্বারা সমস্ত পৃথিবী জয় করে রাজ্য ভোগ করব। দাদা ! দুর্যোধন সমস্ত পৃথিবীকে নিজের বশ করার পূর্বেই ওকে এবং ওর সাহায্যকারীদের বধ করা উচিত। শাস্ত্রে তো বলাই আছে যে, কপট ব্যক্তিকে কপটতার দ্বারা মারা উচিত। সুতরাং আপনি অনুমতি দিলে আমি দুর্বার গতিতে দুর্যোধনকে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দিতে পারি।' ভীমের কথা শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে শান্ত করতে আলিঙ্গন করে বললেন—'আমার বলশালী ভাই ! তেরো বছর পূর্ণ হতে দাও। তারপরে তুমি আর অর্জুন মিলে দুর্যোধনকে নাশ করো। আমি অসত্য বলি না, কারণ আমাতে অসত্য নেই। ভীম ! তুমি যখন কপটতা ছাড়াই দুর্যোধন ও তার সাহায্যকারীদের বধ করতে সক্ষম, তখন কপটতার প্রয়োজন কী ?' ধর্মরাজ যখন ভীমকে এইভাবে বোঝাচ্ছেন, তখন মহর্ষি বৃহদশ্বকে তাঁদের আশ্রমে আসতে দেখা গেল।

—o—

নল-দময়ন্তীর কথা, দময়ন্তীর স্বয়ংবর ও বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহর্ষি বৃহদশ্বকে আসতে দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এগিয়ে গিয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং আসনে বসালেন। বিশ্রাম গ্রহণের পরে যুধিষ্ঠির তাঁদের সব বৃত্তান্ত মহর্ষিকে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন—'মহর্ষি ! কৌরবরা কপটভাবে আমাদের ডেকে এনে ছলনা করে পাশাতে হারিয়ে আমাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের প্রাণপ্রিয়া দ্রৌপদীকে টেনে এনে পূর্ণ সভাকক্ষে অপমান করেছে। শেষকালে আমাদের মৃগচর্ম পরিয়ে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে। মহর্ষি ! আপনিই বলুন পৃথিবীতে আমার মতো দুর্ভাগা রাজা আর কে আছে ? আমার মতো দুঃখী আর কাউকে আপনি দেখেছেন কিংবা তার সম্বন্ধে শুনেছেন ?'

মহর্ষি বৃহদশ্ব বললেন—'ধর্মরাজ ! আপনার একথা ঠিক নয় যে, আপনার মতো দুঃখী কোনো রাজা হয়নি। কেননা আমি আপনার থেকেও মন্দভাগ্য এবং দুঃখী রাজার কাহিনী জানি। আপনি শুনতে চাইলে আমি শোনাব।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শোনার আগ্রহ দেখালে মহর্ষি বৃহদশ্ব বলতে আরম্ভ করলেন—'ধর্মরাজ ! নিষাধ দেশে বীরসেনের পুত্র নল নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গুণবান, পরম সুন্দর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদজ্ঞ, ব্রাহ্মণভক্ত এবং সকলের প্রিয়। তাঁর বহু সেনা ছিল, তিনি নিজেও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি বীর, যোদ্ধা এবং প্রবল পরাক্রমী ছিলেন। তাঁর একটু পাশা খেলার শখ ছিল। সেইসময় বিদর্ভ দেশে ভীমক নামে এক রাজা ছিলেন, তিনিও নলের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি দমন ঋষিকে প্রসন্ন করে চারটি সন্তান লাভ করেছিলেন—তিন পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদের নাম ছিল দম, দান্ত এবং দমন, কন্যার নাম দময়ন্তী। দময়ন্তী লক্ষ্মীর মতো রূপ-গুণ সম্পন্না ছিলেন। দেবতা এবং যক্ষের মধ্যেও এরকম সুন্দরী কন্যা দেখা যেত না। সেই সময় যত লোক বিদর্ভ থেকে নিষাধ দেশে আসতেন, নলের

কাছে দময়ন্তীর রূপ-গুণের বর্ণনা করতেন। নিষাধ দেশ থেকে যাঁরা বিদর্ভে যেতেন, তাঁরাও দময়ন্তীর কাছে রাজা নলের রূপ-গুণ ও পবিত্র চরিত্রের বর্ণনা করতেন। এর ফলে উভয়ের মনে উভয়ের প্রতি অনুরাগ অংকুরিত হল।

একদিন রাজা নল তাঁর মহল সংলগ্ন উদ্যানে কয়েকটি

হাঁস দেখে, একটি হাঁসকে ধরে ফেললেন। হাঁসটি বলল—'মহারাজ ! আমাকে ছেড়ে দিন, আমরা দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার গুণের এমন প্রশংসা করব যে, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বামীরূপে মেনে নেবেন।' নল হাঁসটিকে ছেড়ে দিলেন। হাঁসগুলি উড়ে বিদর্ভ দেশে গেল। দময়ন্তী হাঁসদের দেখে খুব খুশি হলেন এবং হাঁসদের ধরার জন্য পিছন পিছন দৌড়তে লাগলেন। দময়ন্তী যে হাঁসটির পিছনে দৌড়চ্ছিলেন, সে বলে উঠল—'ওহে দময়ন্তী ! নিষাধ দেশে নল নামে এক রাজা আছেন। তিনি অশ্বিনীকুমারের মতো সুন্দর, তাঁর ন্যায় সুন্দর পুরুষ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। যেন মূর্তিমান কামদেব। তুমি তার পত্নী হলে তোমার জন্ম এবং রূপ দুই-ই সফল হবে। আমরা দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, সর্প এবং রাক্ষসদের মধ্যে ঘুরে দেখেছি, নলের মতো সুন্দর পুরুষ আর কোথাও নেই। তুমি যেমন নারীদের মধ্যে রত্নসমা, নল তেমনই পুরুষদের মধ্যে ভূষণ। তোমাদের দুজনের মিলন বড়ই সুন্দর হবে।' দময়ন্তী বললেন—'হংস ! তুমি নলকেও এই কথা বোলো।' হাঁস

নিষাধ দেশে গিয়ে নলকে দময়ন্তীর খবর জানাল।

দময়ন্তী হংসের মুখে রাজা নলের কীর্তি শুনে তাঁর প্রেমে পড়লেন এবং তাঁর প্রেম এত প্রবল হল যে, তিনি দিন-রাত তাঁর কথাই ভাবতে লাগলেন। গাত্রবর্ণ কালো এবং শরীর কৃশ হয়ে গেল। সখীরা তাঁর মনোভাব দেখে বিদর্ভরাজকে জানাল, 'আপনার কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।' রাজা ভীমক কন্যাকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়লেন, পরে স্থির করলেন যে, 'আমার কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে, তার জন্য স্বয়ংবর সভা করা উচিত।' তিনি সব রাজাকে স্বয়ংবরের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন এবং জানালেন যে রাজারা যেন দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। দেশ-বিদেশের রাজারা হাতি, ঘোড়া, রথের ধ্বনিতে পৃথিবী মুখরিত করে নানা সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বিদর্ভে আসতে লাগলেন। ভীমক সকলের আদর-আপ্যায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন।

দেবর্ষি নারদ এবং পর্বতের মাধ্যমে দেবতারাও দময়ন্তীর স্বয়ংবরের সংবাদ পেয়েছিলেন। ইন্দ্র প্রমুখ লোকপালগণ তাঁদের বাহনসহ বিদর্ভের দিকে রওনা হলেন। রাজা নলের হৃদয় আগে থেকেই দময়ন্তীর প্রতি আসক্ত ছিল। তিনিও দময়ন্তীর স্বয়ংবরে উপস্থিত থাকার জন্য রওনা হলেন। দেবতারা স্বর্গ থেকে আসার সময় দেখলেন কামদেবের

ন্যায় রূপবান নল দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন। নলের সূর্যের ন্যায় কান্তি এবং লোকোত্তর রূপে দেবতারাও চমকিত হলেন। তাঁরা নলকে চিনতে পারলেন। তাঁরা তাঁদের বিমান দাঁড় করিয়ে, নীচে নেমে বললেন— 'রাজেন্দ্র নল ! আপনি অত্যন্ত সত্যব্রতী। আপনি আমাদের সাহায্য করার জন্য দূত হয়ে যান।' নল সত্য করে বললেন—'যাব'। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা কে ? আমাকে দূত করে আপনারা কী করতে চান ?' ইন্দ্র বললেন—'আমরা দেবতা। আমি ইন্দ্র, এরা অগ্নি, বরুণ এবং যম। আমরা দময়ন্তীর জন্য এখানে এসেছি। আপনি আমাদের দূত হয়ে দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বলুন যে, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি এবং যমদেবতা এখানে তোমাকে বিবাহ করতে চান। এঁদের মধ্যে যে কোনো একজনকে তুমি পতিরূপে স্বীকার করো।' নল দুই হাত জোড় করে বললেন—'দেবরাজ ! ওখানে আপনাদের এবং আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য একই। সুতরাং আপনাদের আমাকে দূত করে পাঠানো উচিত নয়। যে ব্যক্তি কোনো নারীকে নিজের পত্নীরূপে পেতে চায়, সে কীভাবে গিয়ে তাকে এইকথা বলবে ? আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।' দেবতারা বললেন—'নল, তুমি আগে সত্য করে বলেছ যে, তুমি আমাদের কাজ করবে, এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরো না। অবিলম্বে ওখানে চলে যাও।' নল বললেন—'রাজপ্রাসাদে সর্বক্ষণ পাহারা থাকে, আমি কী করে যাব ?' ইন্দ্র বললেন—'আমার বরে, তুমি যেতে পারবে।' ইন্দ্রের নির্দেশে নল বিনা বাধায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে দময়ন্তীকে দেখলেন। দময়ন্তী এবং তাঁর সখীরাও নলকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা এই অনুপম সুন্দর ব্যক্তিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না।

দময়ন্তী নিজেকে সামলে নিয়ে নলকে বললেন—'বীরবর ! তুমি দেখতে অতি সুন্দর এবং নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে। তোমার পরিচয় কী বলো। তুমি এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছ, দ্বারপালরা কি তোমাকে দেখতে পায়নি ? তাদের একটু ভুল হলে আমার পিতা তাদের অত্যন্ত কড়া শাস্তি দিয়ে থাকেন।' নল বললেন—'কল্যাণী ! আমি নল ! লোকপালদের দূত হয়ে এখানে এসেছি। সুন্দরী ! ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম—এই চারজন দেবতা তোমাকে বিবাহ করতে চান। তুমি এঁদের মধ্যে কোনো একজনকে স্বামীরূপে বরণ করো। এই কথা জানাতে আমি তোমার কাছে এসেছি। সেই দেবতাদের প্রভাবেই এই প্রাসাদে প্রবেশ করার সময় কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। দেবতাদের সংবাদ তোমাকে দিলাম, এখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।' দময়ন্তী অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ দেবতাদের প্রণাম করে মৃদু হাস্য করে বললেন—'রাজেন্দ্র ! আপনি প্রেমপূর্বক আমাকে অবলোকন করে আদেশ করুন আমি আপনার কী সেবা করব ? হে প্রভু ! আমি আমার সর্বস্ব আপনাকে সমর্পণ করেছি। আপনি আমার প্রেমে বিশ্বাস রাখুন। যেদিন থেকে আমি হাঁসদের মুখে আপনার কথা শুনেছি, সেদিন থেকেই আমি আপনার জন্য ব্যাকুল। আপনার জন্যই স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়েছে। যদি আপনি আপনার এই দাসীর প্রার্থনা অস্বীকার করেন, তাহলে আমি বিষপান করে, আগুনে পুড়ে অথবা জলে ডুবে বা গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যাব।' রাজা নল বললেন—'বড় বড় লোকপাল যখন তোমার প্রণয়-প্রার্থী, তখন তুমি আমার মতো মানুষকে কেন চাইছ ? আমি তো সেইসব ঐশ্বর্যশালী দেবতাদের চরণের রেণু তুল্যও নই। তুমি ওঁদেরই বরণ করো। দেবতাদের অপ্রিয় হলে মানুষের মৃত্যু হয়। তুমি আমাকে রক্ষা করো, ওঁদের বরণ করে নাও।' নলের কথা শুনে দময়ন্তী ভয় পেলেন। তাঁর দুচোখে জল এল, তিনি বলতে লাগলেন—'আমি সব দেবতাকে প্রণাম করে আপনাকেই পতিরূপে বরণ করছি, আমি সত্য শপথ করছি।' সেই সময় দময়ন্তীর শরীর কাঁপছিল, তিনি হাতজোড় করেছিলেন।

রাজা নল বললেন—'ঠিক আছে, তবে তুমি তাই করো। কিন্তু আমি যে এখানে ওঁদের দূত হয়ে খবর দিতে এসেছিলাম, এখন যদি আমার স্বার্থ সিদ্ধ করি তাহলে সেটি অন্যায় হবে। যদি ধর্ম-বিরুদ্ধ না হয় তবেই আমি তা করতে পারি। তোমারও তাই করা উচিত।' দময়ন্তী আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—'নরেশ্বর ! তার এক নির্দোষ উপায় আছে। সেই অনুযায়ী কাজ করলে আপনার কোনো দোষ হবে না। আপনি লোকপালদের সঙ্গে স্বয়ংবর সভায় আসবেন, সকলের সামনে আমি আপনাকে বরণ করে নেব। তখন আপনার আর কোনো দোষ থাকবে না।' রাজা নল তখন

দেবতাদের কাছে এলেন। দেবতারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—'আপনাদের নির্দেশে আমি দময়ন্তীর মহলে গিয়েছিলাম। দ্বারে বৃদ্ধ দ্বারপাল পাহারায় ছিল, কিন্তু আপনাদের প্রভাবে সে আমাকে দেখতে পায়নি, শুধু দময়ন্তী এবং তাঁর সখীরাই আমাকে দেখতে পেয়েছিল। আমি দময়ন্তীর কাছে আপনাদের বর্ণনা করেছি, কিন্তু তিনি আপনাদের পরিবর্তে আমাকেই বরণ করতে চান। তিনি বলেছেন—আপনার সঙ্গে সব দেবতা স্বয়ংবরে এলেও, আমি আপনাকেই বরণ করব। এতে আপনার কোনো দোষ হবে না। আমি আপনাদের সব বললাম, এখন সব কিছু আপনাদেরই হাতে।'

রাজা ভীমক শুভমুহূর্ত দেখে স্বয়ংবর সভা ডেকেছিলেন এবং রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সব রাজা ঠিক সময়ে রাজসভায় এসে নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করলেন। সভা পূর্ণ হয়ে গেল। সকলে আসন গ্রহণ করলে সুন্দরী দময়ন্তী তাঁর অঙ্গকান্তিতে রাজাদের বিমোহিত করে রঙ্গমণ্ডপে এলেন। রাজাদের পরিচয় দেওয়া হতে লাগল। দময়ন্তী এক-একজনকে দেখে এগিয়ে যেতে লাগলেন। একস্থানে নলেরই মতন পাঁচজন রাজা একত্রে বসেছিলেন। দময়ন্তী ভাবতে লাগলেন এদের মধ্যে আসল নল কে ? তিনি যাকেই ভালো করে পরীক্ষা করেন, তাকেই আসল বলে মনে হয়। এই পাঁচ জনের মধ্যে আসল নল কে খুঁজে বার করার কোনো উপায় তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর বড় দুঃখ হল। শেষে তিনি স্থির করলেন দেবতাদেরই শরণ নেওয়া উচিত। তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করে স্তুতি করতে লাগলেন—'হে দেবগণ ! হংসের মুখে নলের বর্ণনা শুনে আমি তাঁকে পতিরূপে বরণ করেছি। আমি কায়মনোবাক্যে আর কাউকে পতিরূপে মেনে নিতে পারবো না। বিধাতা নিষাধেশ্বর নলকেই আমার পতিরূপে পাঠিয়েছেন এবং আমিও নলের আরাধনা করে তাঁকে পাওয়ার ব্রত আরম্ভ করেছি। আমার এই সত্য শপথের প্রভাবেই দেবগণ আমাকে আমার পতিকে চিনিয়ে দিন। ঐশ্বর্যশালী লোকপালগণ ! আপনারা আপনাদের রূপ প্রকটিত করুন, যাতে আমি পুণ্যশ্লোক নলকে চিনতে পারি।' দেবতারা দময়ন্তীর এই আর্ত বিলাপ শুনে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত, সত্যকার ভালোবাসা, আত্মশুদ্ধি, বুদ্ধি, ভক্তি এবং নলপরায়ণতা দেখে তাঁকে এমন শক্তি দিলেন যাতে তিনি দেবতা ও মানুষের পার্থক্য বুঝতে পারেন। দময়ন্তী দেখলেন দেবতাদের শরীরে ঘাম হয়নি, চোখের পলক পড়ছে না, শরীর নির্মল এবং স্থির কিন্তু মাটিতে তাদের দেহ স্পর্শ করেনি। এদিকে নলের দেহের ছায়া পড়েছে, দেহে কিছু ময়লা পড়েছে, ঘাম হচ্ছে, চোখের পলক পড়ছে এবং

তিনি মাটি স্পর্শ করে বসে আছেন। দময়ন্তী এই লক্ষণ দ্বারা দেবতা এবং পুণ্যশ্লোক নলের পার্থক্য চিনে ফেললেন। তখন তিনি নলকে বরণ করলেন, এবং লজ্জা পেয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে নলের গলায় বরমালা পরালেন। দেবতা ও মহর্ষিগণ 'সাধু'-'সাধু' বলে উঠলেন। সভায় উপস্থিত অন্য রাজাদের মধ্যে বিষাদ ধ্বনি শোনা গেল।

রাজা নল আনন্দপূর্বক দময়ন্তীকে অভিনন্দিত করে বললেন—'কল্যাণী ! দেবতারা তোমার সামনে থাকা সত্ত্বেও তুমি যে আমাকে বরণ করেছ তার জন্য তুমি আমাকে প্রেম-পরায়ণ পতি বলে জেনো। আমি তোমার কথা মেনে চলব এবং যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে ভালোবাসব—একথা আমি সত্য শপথ করে বলছি।' দুজনে একে অন্যকে অভিনন্দন জানিয়ে ইন্দ্রাদি দেবতাদের শরণ গ্রহণ করলেন। দেবতারাও প্রসন্ন হলেন। ইন্দ্র বললেন—'নল ! যজ্ঞে তুমি আমার দর্শন লাভ করবে এবং তোমার উত্তম গতি লাভ হবে।' অগ্নি

বললেন—'তুমি যেখানেই আমাকে স্মরণ করবে, সেখানেই আমি প্রকটিত হব এবং তুমি আমার মতো প্রকাশময় লোক লাভ করবে।' যমরাজ বললেন—'তোমার রন্ধন করা খাদ্য অত্যন্ত উত্তম হবে এবং তুমি ধর্মে দৃঢ় থাকবে।' বরুণ বললেন—'তুমি যেখানেই চাইবে, সেখানেই জল পাবে। তোমার মালা সুগন্ধে পরিপূর্ণ থাকবে।' এইভাবে প্রত্যেক দেবতা দুটি করে বরদান করে নিজ নিজ লোকে চলে গেলেন। নিমন্ত্রিত রাজারাও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ভীমক প্রসন্ন হয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে নল ও দময়ন্তীর বিবাহ দিলেন। রাজা নল কিছুদিন বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুরমে থাকলেন। তারপরে ভীমকের অনুমতি নিয়ে পত্নী দময়ন্তীকে সঙ্গে করে নিজ রাজধানীতে ফিরে এসে ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করতে লাগলেন। তাঁর রাজা নাম সার্থক হয়ে উঠল। তিনি অশ্বমেধ এবং আরও নানা যজ্ঞ করলেন। সময়মতো দময়ন্তীর গর্ভে ইন্দ্রসেন নামক এক পুত্র এবং ইন্দ্রসেনা নামক এক কন্যার জন্ম হল।

কলিযুগের কুপ্রভাব, পাশাতে নলের পরাজয় এবং নগর হতে নির্বাসন

মহর্ষি বৃহদশ্ব বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা থেকে যখন ইন্দ্রাদি প্রমুখ লোকপালগণ নিজ নিজ লোকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথে তাঁদের সঙ্গে কলি ও দ্বাপর যুগের সাক্ষাৎ হল । ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'কী কলিযুগ ! কোথায় যাচ্ছ ?' কলিযুগ বলল—'আমি দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় তাকে বিবাহ করার জন্য যাচ্ছি।' ইন্দ্র স্মিত হাস্যে বললেন—'আরে, সে বিয়ে তো কবেই হয়ে গেছে, দময়ন্তী রাজা নলকে বরণ করে নিয়েছে, আমরা শুধু তাকিয়েই থাকলাম।' কলিযুগ ক্রোধভরে বলল—'ওঃ, তবে তো খুব খারাপ হয়েছে, দেবতাদের উপেক্ষা করে মানুষকে বরণ করেছে, তার জন্য তাকে দণ্ড দিতে হবে।' দেবতারা বললেন—'দময়ন্তী আমাদের অনুমতি নিয়েই নলকে বরণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে নল একজন সর্বগুণসম্পন্ন এবং যোগ্য ব্যক্তি । সে ধর্মজ্ঞ এবং সদাচারী। নল ইতিহাস-পুরাণের সঙ্গে বেদাদি অধ্যয়ন করেছে। সে ধর্মানুসারে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের তৃপ্ত করে, কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না, সত্য নিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তার বুদ্ধি, ধৈর্য, জ্ঞান, তপস্যা, পবিত্রতা, শম-দম এসবই লোকপালদের মতো। তাঁকে শাপ দেওয়া নরকের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ারই সমান।' এই বলে দেবতারা চলে গেলেন।

তখন কলিযুগ দ্বাপরকে বলল—'ভাই ! আমি আমার ক্রোধ শান্ত করতে পারছি না। তাই আমি নলের দেহে আশ্রয় নেব। তাকে রাজ্যচ্যুত করব, তাহলে সে আর দময়ন্তীর সঙ্গে থাকতে পারবে না। সুতরাং তুমি পাশার মধ্যে প্রবেশ করে আমাকে সাহায্য করবে।' দ্বাপর তাতে রাজি হল। দ্বাপর এবং কলি নলের রাজধানীতে এসে বাস করতে লাগল। বারো বছর ধরে তারা নলের কোনো খুঁত ধরার জন্য অপেক্ষা করে রইল। একদিন রাজা নল বাইরের কাজ সমাপ্ত করে পা না ধুয়ে সন্ধ্যাকালে বিনা আচমনেই সন্ধ্যা-বন্দনা করতে বসলেন। তাঁর এই অপবিত্র অবস্থা দেখে কলিযুগ তাঁর শরীরে প্রবেশ করল। সেই সঙ্গে কলি অন্য আরও একটি রূপ ধারণ করে পুষ্করের কাছে গিয়ে বলল—'তুমি নলের সঙ্গে পাশা খেলো এবং আমার সাহায্যে রাজা নলকে পাশাতে হারিয়ে নিষাধদেশের রাজ

লাভ করো।' পুষ্কর তার কথা মেনে নিয়ে নলের কাছে গেল। দ্বাপরও পাশার রূপ ধারণ করে তার সঙ্গে চলল। পুষ্কর যখন বার বার রাজা নলের সঙ্গে পাশা খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করছিল, তখন রাজা নল দময়ন্তীর সামনে এই বারংবার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি পাশা খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সময় নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেছিল, তাই রাজা নল পাশাখেলায় সোনা, রূপা, রথ ইত্যাদি যা কিছু ছিল বাজী রেখে হারতে লাগলেন। প্রজা এবং মন্ত্রীগণ ব্যাকুল হয়ে রাজা নলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাশাখেলা বন্ধ করাতে চাইলেন এবং প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের অভিপ্রায় জেনে দ্বারপাল রানি দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বলল—'আপনি মহারাজের কাছে গিয়ে বলুন। আপনি ধর্ম এবং অর্থের তত্ত্ব জানেন। প্রজারা আপনাদের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।' দময়ন্তী নিজেও দুঃখে দুর্বল এবং হতচেতন হয়েছিলেন। তিনি চোখে জল নিয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে মহারাজকে বললেন—'স্বামী ! নগরের রাজভক্ত প্রজা এবং মন্ত্রিগণ আপনার সাক্ষাতের আশায় রাজদ্বারে উপস্থিত। আপনি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।' কিন্তু কলির আবেশে নল তার কোনো উত্তর দিলেন না। মন্ত্রিগণ এবং প্রজারা শোকগ্রস্ত হয়ে ফিরে গেলেন। পুষ্কর এবং নল কয়েকমাস ধরে পাশা খেলতে লাগলেন এবং রাজা নল

বারবার হারতে লাগলেন। রাজা নল খেলার সময় যে পাশা ফেলতেন, তা সবই তাঁর প্রতিকূল হত। সমস্ত ধনসম্পত্তি তিনি পাশাতে হেরে গেলেন। দময়ন্তী যখন এই কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি বৃহৎসেনা নামক ধাত্রীর দ্বারা রাজা নলের সারথি বার্ষ্ণেয়কে ডাকিয়ে এনে বললেন—'সারথি ! তুমি রাজার প্রিয়পাত্র ! রাজা যে অত্যন্ত সংকটে পড়েছেন, একথা তোমার কাছে গোপন নেই। অতএব তুমি রথে করে আমার দুই সন্তানকে নিয়ে কুণ্ডিন নগরে যাও। ঘোড়া ও রথ সেখানেই থাকবে, ইচ্ছা হলে তুমিও সেখানে থাকতে পারো, নাহলে অন্য কোনো স্থানে চলে যেও।' সারথি দময়ন্তীর কথানুযায়ী মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজপুত্র এবং রাজকন্যাকে কুণ্ডিনপুরে পৌঁছে, ঘোড়া ও রথ সেখানেই রেখে দিল। তারপর সেখান থেকে পদব্রজে সে অযোধ্যায় পৌঁছে সেখানে ঋতুপর্ণ রাজার নিকট সারথির কাজ করতে লাগল।

বার্ষ্ণেয় চলে যাওয়ার পর পুষ্কর পাশা খেলায় রাজা নলের রাজ্য ও ধন জয় করে নিয়ে হেসে বলল—'কী আর পাশা খেলবে ? কিন্তু তোমার তো বাজী রাখার মতো আর কিছুই নেই। তবে তুমি যদি দময়ন্তীকে বাজী রাখতে চাও তাহলে খেলতে পারো।' নলের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। তিনি পুষ্করকে কিছু বললেন না। তিনি নিজ বসনভূষণ সব খুলে এক বস্ত্রে নগর থেকে বার হলেন। দময়ন্তীও এক বস্ত্রে পতির অনুগমন করলেন। নলের আত্মীয় এবং মিত্ররা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। নল এবং দময়ন্তী তিন রাত নগরের বাইরে বাস করলেন। পুষ্কর নগরে জানিয়ে রাখলেন যে, কেউ নলকে কোনোপ্রকার সহানুভূতি দেখালে, তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। ভয়ে প্রজারা কেউই তাদের প্রিয় রাজা নলের কোনোপ্রকার আদর-আপ্যায়ন করতে পারল না। রাজা নল তিন দিন তিন রাত শুধু জল খেয়ে রইলেন। চতুর্থদিন তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বোধ করায় সেখান থেকে এগিয়ে কিছু ফলমূল খেলেন।

রাজা নল একদিন দেখলেন তাঁর কাছে অনেকগুলো পাখি বসে আছে। তাদের পাখা সোনার মতো চমক দিচ্ছে। নল ভাবলেন এই পাখাগুলি থেকে কিছু সোনা পাওয়া যাবে। এই ভেবে তিনি পাখি ধরার জন্য তাঁর পরনের কাপড়টি খুলে পাখির ওপর ফেলে দিলেন, পাখিগুলি সেই কাপড় নিয়ে উড়ে গেল। নল তখন মলিন বদনে উলঙ্গ হয়ে

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাখিগুলি বলল—'ওহে দুর্বুদ্ধি! তুমি নগর থেকে এক বস্ত্রে পথে বেরিয়েছিলে, তাই দেখে আমাদের বড় দুঃখ হয়েছিল। নাও, এখন আমরা তোমার পরিধেয় বস্ত্রটিও নিয়ে গেলাম। আমরা পক্ষি নই, পাশা।' নল দময়ন্তীকে পাশার কথা বললেন।

তারপরে নল বললেন—'প্রিয়ে! তুমি দেখছ, এখানে অনেকগুলি পথ আছে। একটি যাচ্ছে অবন্তীর দিকে, অন্যটি ঋক্ষবান পর্বত হয়ে দক্ষিণ দেশে। সামনে বিন্ধ্যাচল পর্বত। এই পয়োষ্ণী নদী সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে। এগুলি মহর্ষিদের আশ্রম। সামনের রাস্তা বিদর্ভ দেশে যাচ্ছে। এটি কোশল দেশের পথ।' রাজা নল এইভাবে দুঃখ শোকে দময়ন্তীকে নানা পথ ও আশ্রমের কথা বলতে লাগলেন। দময়ন্তীর চোখ জলে ভরে গেল। তিনি আবেগমন্ত্রিত কণ্ঠে বললেন—'স্বামী! আপনি কী ভাবছেন? আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। আপনার রাজ্য চলে গেছে, ধন সম্পদ গেছে, শরীরে বস্ত্র নেই, ক্লান্ত-বিষণ্ণ, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, আপনাকে এই অবস্থায় নির্জন বনে ছেড়ে আমি একা কোথাও যেতে পারি? আমি আপনার সঙ্গে থেকে আপনার দুঃখ দূর করব। দুঃখের সময় পত্নীই তার স্বামীর সান্ত্বনা। পত্নী ধৈর্য দিয়ে তার স্বামীর দুঃখ কম করে। বৈদ্যরাও একথা স্বীকার করে।' নল বললেন—'প্রিয়ে! তোমার কথা ঠিক। পত্নী মিত্র, পত্নী ঔষধ। কিন্তু আমি তো তোমাকে ত্যাগ করতে চাই না। তুমি কেন এমন সন্দেহ করছ?' দময়ন্তী বললেন—'আপনি আমাকে ত্যাগ করতে চান না, তাহলে কেন বিদর্ভ দেশের পথ চেনাচ্ছেন? আমি নিশ্চিত জানি যে, আপনি আমাকে ত্যাগ করতে পারেন না। তবুও এখন আপনার মন বিপরীত হয়ে গেছে। তাই আমার এইরকম ভয় হচ্ছে। আপনি পথ চেনাতে আমার তাই মনে দুঃখ হচ্ছে। আপনি যদি আমাকে আমার পিতা বা কোনো আত্মীয় গৃহে পাঠাতে চান, তাহলে ঠিক আছে, চলুন, আমরা দুজন একসঙ্গে যাই। আমার পিতা আপনাকে আপ্যায়ন করবেন। আপনি সেখানে সুখেই থাকবেন।' নল বললেন—'তোমার পিতা রাজা আর আমিও রাজা ছিলাম। এখন এই সংকটের সময় আমি তাঁর কাছে যাব না।' রাজা নল দময়ন্তীকে বোঝাতে লাগলেন। তারপর একটি বস্ত্রই দুজনে পরিধান করে এদিক ওদিকে ঘুরতে লাগলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে তাঁরা দুজনে একটি ধর্মশালায় উঠলেন।

—o—

নলের দময়ন্তীকে ত্যাগ করা, দময়ন্তীর সংকট থেকে রক্ষা, দিব্য ঋষিদের দর্শন লাভ এবং রাজা সুবাহুর মহলে বাস

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির! সেই রাজা নলের দেহে একটুকরো বস্ত্রও ছিল না। শোওয়ার জন্য কোনো শয্যাদ্রব্য ছিল না। শরীর ধুলায় ধূসরিত ছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তো বলারই নয়। রাজা নল মেঝেতেই শুয়ে পড়লেন। রাজরানি দময়ন্তীর জীবনেও কখনো এমন দুঃখদায়ক পরিস্থিতি আসেনি, তিনিও সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। দময়ন্তী ঘুমিয়ে পড়লে রাজা নলের নিদ্রাভঙ্গ হল। আসলে দুঃখ এবং শোকের আধিক্যে তিনি ভালো করে ঘুমোতেও পারছিলেন না। চোখ খুললেই তাঁর রাজ্য চলে যাওয়া, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হওয়া, পাখির বস্ত্র নিয়ে উড়ে যাওয়া একে একে তাঁর চোখে ভেসে উঠল। তিনি ভাবলেন 'দময়ন্তী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তার জন্যই সে এত দুঃখভোগ

করছে। আমি যদি একে ছেড়ে চলে যাই, তাহলে দময়ন্তী তার পিতৃরাজ্যে চলে যাবে। আমার সঙ্গে থাকলে তো ওকে শুধু দুঃখভোগই করতে হবে। আমি যদি একে ছেড়ে চলে যাই তাহলে সম্ভবত ও সুখ পাবে।' এইসব ভেবে রাজা নল স্থির করলেন যে, দময়ন্তীকে ছেড়ে যাওয়াই ভালো। দময়ন্তী পতিব্রতা নারী, কেউই এঁর সতীত্ব নষ্ট করতে পারবে না। তারপর তিনি ভাবলেন 'একটি মাত্র বস্ত্র দময়ন্তীর দেহে, আমি তো উলঙ্গ। অর্ধেক বস্ত্র ছিঁড়ে নিতে হবে আমার পরার জন্য, কিন্তু ছিঁড়ব কেমন করে ? যদি দময়ন্তী জেগে যায় !' তিনি ধর্মশালায় এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি এক খাপবিহীন তলোয়ারের ওপর পড়ল। রাজা নল সেটিকে তুলে আস্তে করে দময়ন্তীর বস্ত্র থেকে অর্ধেক

কেটে তাঁর উলঙ্গ দেহ ঢেকে নিলেন। দময়ন্তী গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন। রাজা নল তাঁকে রেখে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে মন শান্ত হলে তিনি আবার ধর্মশালায় ফিরে এলেন এবং দময়ন্তীকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। তিনি ভাবছিলেন যে 'আমার প্রাণ প্রিয়া অন্তঃপুরে পর্দার মধ্যে থাকতেন, তাঁকে কেউ দেখতেই পেত না। আজ সে অনাথের মতো অর্ধেক বস্ত্র পরিধান করে মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমাকে না পেয়ে বেচারী একাকী বনে কীভাবে থাকবে ! প্রিয়ে তুমি ধর্মাত্মা ; তাই আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার এবং পবন দেবগণ তোমায় রক্ষা করুন।' নলের হৃদয় তখন দুঃখে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, তিনি দোটানায় পড়ে বারংবার ধর্মশালার ভেতরে যাচ্ছিলেন আর বাইরে আসছিলেন। দেহে কলি প্রবেশ করায় তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে বনের মধ্যে একলা ফেলে চলে গেলেন।

ঘুম ভাঙলে দময়ন্তী দেখলেন, নল সেখানে নেই। তিনি চিন্তান্বিত হয়ে ডাকতে লাগলেন—'মহারাজ ! স্বামী ! আমার সর্বস্ব ! আপনি কোথায় ! আমার ভয় করছে, আপনি কোথায় গেলেন ? ঠিক আছে, আর তামাশা করবেন না। আমাকে কেন ভয় দেখাচ্ছেন ? শিগগির দেখা দিন। আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি ! এই নাও দেখে ফেলেছি। বৃক্ষলতার পাশে চুপ করে লুকিয়ে আছেন কেন ? আমি দুঃখে পড়ে এত বিলাপ করছি আর আপনি এসে আমাকে একটুও সান্ত্বনা দিচ্ছেন না ? স্বামী আমার আর কোনো দুঃখ নেই, শুধু আপনার জন্যই চিন্তা হয় যে, আপনি এই ঘোর জঙ্গলে একা কেমন করে থাকবেন ? হে নাথ ! আপনার মতো নির্মলচরিত্র ব্যক্তির যে এই দশা করেছে, সে আপনার থেকেও অধিক দুর্দশাপ্রাপ্ত হয়ে নিরন্তর দুঃখী জীবন কাটাবে।' এইভাবে বিলাপ করতে করতে দময়ন্তী রাজা নলকে খুঁজতে লাগলেন। উন্মত্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক অজগরের কাছে এসে পৌঁছলেন, শোকবিহ্বল থাকায় তিনি অজগরটিকে

দেখতেও পেলেন না। ফলে অজগর দময়ন্তীকে গ্রাস করতে লাগল। তখনও দময়ন্তী নলের জন্য চিন্তা করছিলেন যে, তিনি না থাকলে নল একা কী করবেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগলেন—'স্বামী ! আমাকে অনাথের মতো অজগর গ্রাস করছে, আপনি আমাকে বাঁচাতে আসছেন না কেন ?' দময়ন্তীর ক্রন্দনভরা আওয়াজ এক ব্যাধ শুনতে পেল। সে দৌড়ে সেখানে এসে দেখল দময়ন্তীকে অজগর গ্রাস করছে, সে তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে অজগরের মুখ চিরে ফেলল। দময়ন্তীকে উদ্ধার করে নিয়ে ব্যাধ তাঁকে স্নান করিয়ে আশ্বস্ত করল এবং খাবার দিল। দময়ন্তী একটু শান্ত হলে ব্যাধ জিজ্ঞাসা করল—'সুন্দরী ! তুমি কে ? কোন উদ্দেশ্যে এই জঙ্গলে এসেছ ?' দময়ন্তী ব্যাধকে তাঁর দুঃখের কাহিনী বললেন। দময়ন্তীর সৌন্দর্য, শিষ্ট ব্যবহার দেখে ব্যাধ কামমোহিত হয়ে গেল। সে মিষ্টবাক্যে দময়ন্তীকে বশীভূত করার চেষ্টা করতে লাগল। দময়ন্তী দুরাত্মা ব্যাধের মনোভাব জেনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। দময়ন্তী ব্যাধকে বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু যখন সে কিছুতেই বাধা মানল না, তখন দময়ন্তী তাকে শাপ দিলেন—'আমি যদি নিষাধনরেশ ছাড়া আর কোনো পুরুষকে মনে মনে চিন্তা না করে থাকি, তাহলে এই ক্ষুদ্র ব্যাধ এক্ষুণি মারা যাবে।' দময়ন্তীর মুখ থেকে কথাগুলি বার হওয়ামাত্র ব্যাধের প্রাণ পাখি উড়ে

গেল, সে সেখানেই মরে পড়ে রইল।

ব্যাধ মারা যাওয়ার পর দময়ন্তী রাজা নলকে খুঁজতে খুঁজতে এক নির্জন ও ভয়ংকর বনে গিয়ে পৌঁছলেন। বহু পর্বত, নদী-নদ, জঙ্গল, হিংস্র পশু-পক্ষী, পিশাচ দেখতে দেখতে বিরহে উন্মাদের ন্যায় রাজা নলের খবর জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি উত্তর দিকে এগোতে লাগলেন। এইভাবে তিন দিন, তিন রাত কেটে যাবার পর দময়ন্তী দেখলেন সামনেই অতি সুন্দর বৃহৎ এক তপোবন। সেই আশ্রমে বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং অত্রির ন্যায় মিতভোজী, সংযমী, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় এবং তপস্বী ঋষিরা বাস করেন। এঁরা বৃক্ষের ছাল বা মৃগচর্ম পরিধান করেন। দময়ন্তী কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন। তিনি আশ্রমে গিয়ে বিনীতভাবে তপস্বীদের প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। ঋষিরা তাঁকে 'স্বাগত' বলে আপ্যায়ন করলেন এবং বললেন 'বোসো। আমরা তোমার জন্য কী করতে পারি ?' দময়ন্তী বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনাদের তপস্যায় অগ্নি, ধর্ম সুরক্ষিত এবং পশু-পক্ষী সব কুশল তো ? আপনাদের ধর্মাচরণে কোনো বিঘ্ন হয়নি তো ?' ঋষিরা বললেন— 'কল্যাণী ! আমরা সর্বপ্রকারে কুশলে আছি। তুমি কে ? কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ ? তোমাকে দেখে আমরা বড় আশ্চর্য হচ্ছি। তুমি কি বন, পর্বত, নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ?' দময়ন্তী বললেন—'মহাত্মাগণ ! আমি কোনো দেবী বা দেবতা নই, এক মানবী মাত্র। আমি বিদর্ভরাজ ভীমকের কন্যা। বুদ্ধিমান, যশস্বী এবং বীর-বিজয়ী নিষাধরাজ নল আমার পতি। কপটদ্যূতে পারদর্শী দুরাত্মা ব্যক্তিরা আমার ধর্মাত্মা স্বামীকে পাশাখেলায় প্ররোচিত করে তাঁর রাজ্য এবং ধনসম্পত্তি সমস্তই ছিনিয়ে নিয়েছে, আমি তাঁর পত্নী দময়ন্তী। তিনি এখন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। আমি সেই রণকুশল, শস্ত্রবিদ, মহাত্মা পতিদেবকে বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাঁকে যদি শীঘ্র খুঁজে না পাই, তাহলে আমি জীবিত থাকব না। তাঁকে না পেলে আমার এ জীবন নিষ্ফল। বিয়োগ ব্যথা আর কতদিন সহ্য করব ?' তপস্বীরা বললেন—'কল্যাণী ! আমরা আমাদের তপঃশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তুমি ভবিষ্যতে খুব সুখী হবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই রাজা নলের দর্শন পাবে। ধর্মাত্মা নিষাধরাজ কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে সম্পদশালী হয়ে নিষাধরাজ্যে রাজত্ব করবেন। তাঁর শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হবে, বন্ধু-বান্ধবরা সুখী হবে এবং আত্মীয় কুটুম্বরা তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দিত হবেন।' এই কথা বলে তাঁরা নিজ নিজ আশ্রম সহ

অন্তর্হিত হলেন। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে দময়ন্তী বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—'আরে ! আমি কি স্বপ্ন দেখলাম ? এ কী হল, এই তপস্বীগণ, আশ্রম, পুণ্যসলিলা নদী, ফল-ফুল সমন্বিত বৃক্ষ লতা কোথায় গেল ?' দময়ন্তী বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।

সেখান থেকে বিলাপ করতে করতে দময়ন্তী এক অশোক গাছের নিকট পৌঁছলেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু পড়ছিল। তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সেই অশোক গাছকে বললেন—'হে শোকরহিত অশোক ! তুমি আমার শোক দূর করো। তুমি কি কোথাও শোকরহিত রাজা নলকে দেখেছ ? অশোক ! তুমি তোমার শোকনাশক নাম সার্থক করো।' দময়ন্তী অশোক গাছকে প্রদক্ষিণ করে এগিয়ে চললেন। সেই ভয়ংকর বনে নানা বৃক্ষ, গুহা, পর্বতশিখর এবং নদীর আশে পাশে পতিকে খুঁজতে খুঁজতে দময়ন্তী বহু দূর চলে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন বহু হাতি, ঘোড়া-রথ সমভিব্যাহারে একদল ব্যবসায়ী কোথাও যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের যিনি প্রধান, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে দময়ন্তী জানতে পারলেন যে, তাঁরা চেদিদেশে রাজা সুবাহুর রাজ্যে যাচ্ছে। দময়ন্তীও তাঁদের সঙ্গে চললেন। তাঁর মনে পতিদর্শনের আগ্রহ বেড়েই যাচ্ছিল। কয়েকদিন চলার পর তাঁরা এক ভয়ংকর বনে এসে পৌঁছলেন। সেখানে এক বৃহৎ সুন্দর সরোবর ছিল। বহু পথ চলার ফলে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই তাঁরা সেখানেই শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু দৈব যে প্রতিকূল ! রাত্রিবেলা বুনো হাতির দল এসে ব্যবসায়ীদের পালিত হাতিদের ওপর হামলা করল এবং
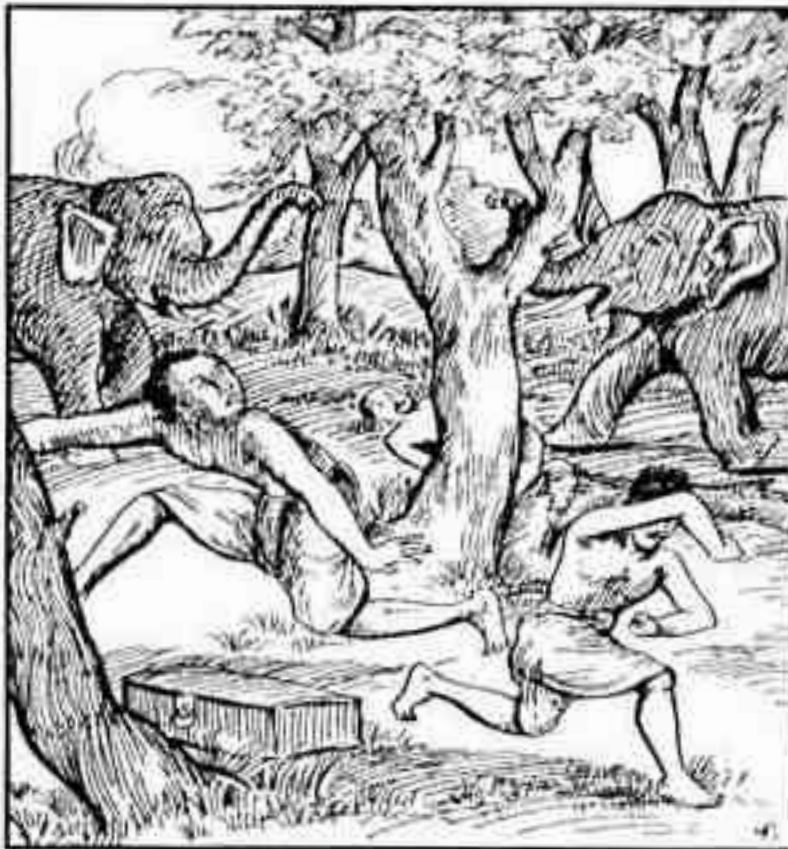
তাদের ছোটাছুটিতে ব্যবসায়ীদের সমস্ত জিনিস তছনছ হয়ে গেল। কোলাহল শুনে দময়ন্তীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি এই মহাসংহার দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি কখনো এমন দৃশ্য দেখেননি। ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে কিছু দূরে কয়েকজন সংযমী বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা ওই মহাসংহার থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে অর্ধবস্ত্রে শরীর আবৃত করে চলতে লাগলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি চেদিরাজা সুবাহুর রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছলেন।

দময়ন্তী যখন রাজধানীর রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নগরবাসীরা তাঁকে দেখে মনে করল যে, এ কোনো পাগলী। ছোট ছোট বালকরা তাঁর পিছনে জুটে গেল। দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছলেন। সেইসময় রাজমাতা জানালার সামনে বসেছিলেন। তিনি একদল বালক পরিবৃত দময়ন্তীকে দেখে তাঁর দাসীকে বললেন—'আরে, দেখ তো ওই স্ত্রীলোকটিকে বড় দুঃখী বলে মনে হচ্ছে, বোধহয় কোনো আশ্রয় খুঁজছে। ছেলেগুলো ওকে জ্বালাতন করছে। তুমি যাও, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। মেয়েটি এত সুন্দরী যে আমার মহল আলো করে দেবে।' দাসী নির্দেশ পালন করল। দময়ন্তী রাজমহলে এলেন। রাজমাতা তাঁর সুন্দর দেহ দেখে বললেন—'তোমাকে দেখে তো দুঃখী বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমার শরীর এত তেজস্বী কী করে হল ? বল, তুমি কে ? কার পত্নী ? এই অসহায় অবস্থাতেও কেন ভয় পাচ্ছ না !' দময়ন্তী বললেন—'আমি এক পতিব্রতা নারী। আমি কুলীন কিন্তু দাসীর কাজ করি, অন্তঃপুরে থাকি। যে কোনো স্থানেই থাকতে পারি, ফল-মূল খেয়ে দিন কাটাতে পারি। আমার পতিদেব অত্যন্ত গুণী এবং আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, তিনি আমার কোনো অপরাধ ছাড়াই রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি রাত-দিন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে খুঁজছি আর দুঃখের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি।' এই কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে এলো, তিনি কাঁদতে লাগলেন। দময়ন্তীর দুঃখে ভরা কাহিনী শুনে রাজমাতার হৃদয় দুঃখে ভরে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন—'কল্যাণী, তোমার জন্য আমার স্বাভাবিক ভাবেই দুঃখ হচ্ছে। তুমি আমার কাছে থাক, তোমার স্বামীকে খুঁজে দেবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। যদি তিনি আসেন, তাহলে তুমি তাঁর সঙ্গে এখানেই সাক্ষাৎ

কোরো।' দময়ন্তী বললেন—'মা ! আমি একটি শর্তে আপনার এখানে থাকতে পারি। আমি কখনো উচ্ছিষ্ট খাব না, কারো পা ধোওয়াব না, কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলব না। যদি কোনো পুরুষ আমার সঙ্গে কু-ব্যবহার করে, তাহলে তাঁকে দণ্ড দিতে হবে। দণ্ড দেওয়ার পরেও যদি সে পুনঃ পুনঃ তা করে তাহলে তাকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে। আমি আমার পতিকে খোঁজার জন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা বলব। আপনি যদি আমার এই শর্ত মেনে নেন, তাহলে আমি এখানে থাকতে পারি, নচেৎ নয়।' রাজমাতা দময়ন্তীর শর্ত শুনে প্রসন্ন হয়ে বললেন—'তাই হবে।' তারপর তিনি তাঁর কন্যা সুনন্দাকে ডেকে বললেন—'মা, দেখো এই দাসীকে দেবী বলে জানবে। এ তোমারই মতো, একে তোমার সখী বলে জানবে। রাজপ্রাসাদে বেশে এর সঙ্গে আনন্দে থাক।' সুনন্দা প্রসন্নতার সঙ্গে দময়ন্তীকে নিজ মহলে নিয়ে গেলেন। দময়ন্তী ইচ্ছানুসারে তাঁর নিয়ম পালন করে মহলে থাকতে লাগলেন।

—— ০ ——

নলের রূপ পরিবর্তন, ঋতুপর্ণের সারথি হওয়া, ভীমকের নল-দময়ন্তীকে অনুসন্ধান করা এবং দময়ন্তীকে খুজে পাওয়া

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির ! রাজা নল যখন দময়ন্তীকে ঘুমন্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে গেলেন, তখন দাবাগ্নি লেগেছিল। নল কিছুটা থমকে দাঁড়ালেন, তাঁর কানে একটা আওয়াজ এল—' রাজা নল ! শীঘ্র দৌড়ে এসো, আমাকে বাঁচাও।' নল বললেন—'ভয় পেয়ো না।' তিনি দৌড়ে সেই দাবানলের মধ্যে ঢুকে গেলেন এবং দেখলেন নাগরাজ কর্কোটক কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছেন। তিনি হাতজোড় করে নলকে বললেন—'রাজন্ ! আমি কর্কোটক নামক সর্প। আমি তেজস্বী ঋষি নারদকে ঠকিয়েছিলাম, তিনি শাপ দিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ না রাজা নল তোমাকে উদ্ধার করেন, ততক্ষণ তুমি এখানে পড়ে থাকবে। তিনি ওঠালে তোমার অভিশাপ দূর হয়ে তুমি মুক্ত হবে। তাঁর শাপের জন্যই আমি আগুনে কিছু করতে পারিনি। তুমি আমাকে শাপ থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাকে তোমার হিতের কথা বলব। আর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব। আমার ওজনে ভয় পেয়ো না, আমি এখনই হাল্কা হয়ে যাব।' এই বলে তিনি আঙুল প্রমাণ হয়ে গেলেন। নল তাঁকে তুলে নিয়ে দাবানল থেকে বেরিয়ে এলেন। কর্কোটক বললেন—'রাজন্ ! তুমি আমাকে এখন মাটিতে ফেলো না, কয়েক পা গুনে গুনে চলো।' রাজা নল গুনে গুনে যেমনই 'দশ' বললেন, অমনি কর্কোটক নাগ তাঁকে দংশন করলেন। তাঁর নিয়ম ছিল কেউ 'দশ' বললেই, তাকে 'ডস' অর্থাৎ দংশন করবে, নাহলে নয়। কর্কোটকের দংশনে নলের আগের রূপ পরিবর্তিত হল এবং কর্কোটক আগের রূপ ফিরে পেলেন। আশ্চর্যচকিত নলকে তিনি বললেন—'রাজন্ ! তোমাকে যাতে কেউ চিনতে না পারে, তাই আমি তোমার রূপ বদল করে দিয়েছি। কলি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, এখন আমার বিষে তোমার শরীরে সে খুবই কষ্টে থাকবে। তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। এখন তোমার হিংস্র পশু-পক্ষী, শত্রু, ব্রহ্মবেত্তা কারো থেকেই কোনো ভয় নেই। এবার থেকে তোমার ওপর কোনো বিষের প্রভাব পড়বে না। যুদ্ধে সর্বদা তোমার জয় হবে। এখন থেকে তোমার নাম হবে বাহুক, তুমি দ্যূতকুশল রাজা ঋতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যাতে যাও। তাঁকে অশ্ব বিদ্যা শেখালে তিনি
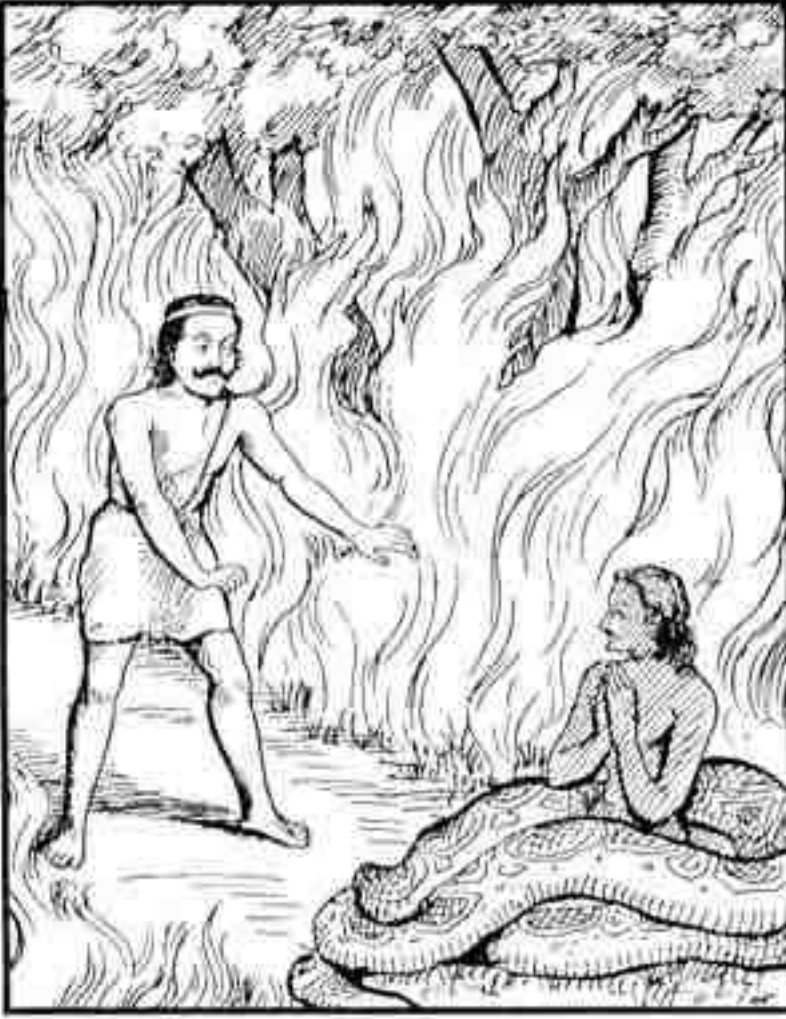
তোমাকে পাশার রহস্য বলবেন এবং তোমার বন্ধু হয়ে যাবেন। পাশার রহস্য জানলেই তুমি তোমার পত্নী-পুত্র-কন্যা-রাজ্য সব পেয়ে যাবে। যখন তুমি নিজ রূপ ধারণ করতে চাইবে, আমাকে স্মরণ কোরো এবং আমার দেওয়া বস্ত্র পরিধান করে নিও।' এই বলে কর্কোটক নাগ রাজা নলকে দিব্যবস্ত্র প্রদান করে অন্তর্ধান করলেন।

রাজা নল সেখান থেকে রওনা হয়ে দশম দিনে রাজা ঋতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় পৌঁছলেন। সেখানে তিনি রাজদরবারে গিয়ে নিবেদন করলেন—'আমার নাম বাহুক। আমি ঘোড়া চালাতে এবং তাদের নানাপ্রকার কসরৎ শেখানোর কাজ করি। ঘোটক-বিদ্যায় আমার মতো নিপুণ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। অর্থ সম্পর্কিত এবং অন্যান্য গুরুতর সমস্যা আমি ভালোভাবে সমাধান করতে পারি, রন্ধনকার্যেও আমি অত্যন্ত নিপুণ। হস্তকৌশলের যে কোনো কাজ এবং অন্য কঠিন কাজও সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করব। আপনি আমার জীবিকা স্থির করে আমাকে আপনার কাছে রাখুন।' রাজা ঋতুপর্ণ বললেন—'বাহুক, তুমি এসেছ, ভালো হয়েছে। এ সব কাজই তোমার দায়িত্বে থাকবে। আমি দ্রুতগামী ঘোড়া পছন্দ করি। সুতরাং তুমি এমন কাজ করো যাতে আমার ঘোড়া দ্রুতগামী হয়। আমি তোমাকে আমার অশ্বশালার অধ্যক্ষ করে দিলাম, প্রত্যেক মাসে তুমি দশ হাজার স্বর্ণমোহর পাবে। তাছাড়াও বার্ষ্ণেয় (রাজা নলের পুরানো সারথি) এবং জীবল সবসময় তোমার কাছে থাকবে। তুমি আনন্দিত হয়ে আমার দরবারে থাক।' রাজা ঋতুপর্ণের কাছে অভ্যর্থনা পেয়ে রাজা নল বাহুকের রূপে বার্ষ্ণেয় এবং জীবলের সঙ্গে অযোধ্যায় বাস করতে লাগলেন। রাজা নল প্রতি রাতে দময়ন্তীকে স্মরণ করে বলতেন 'হায় হায়, তপস্বিনী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত বিষণ্ণ হয়ে এই মূর্খকে (আমাকে) হয়তো স্মরণ করছে, না জানি কোথায় বিশ্রাম নিচ্ছে ? কী জানি সে তার জীবন নির্বাহের জন্য কোথায় কী কাজ করছে ?' তিনি এইসব নানা কথা ভাবতেন এবং রাজা ঋতুপর্ণের কাছে একমনভাবে থাকতেন, যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

বিদর্ভরাজ ভীমক যখন সংবাদ পেলেন যে, তাঁর জামাতা নল রাজ্যচ্যুত হয়ে তাঁর কন্যাকে নিয়ে বনে চলে গেছেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের ডাকালেন এবং তাঁদের বহু ধন-সম্পদ দিয়ে বললেন—'আপনারা পৃথিবীর সর্বত্র গিয়ে নল-দময়ন্তীর অনুসন্ধান করুন এবং তাঁদের খুঁজে আনুন। যে ব্রাহ্মণ এই কাজ করতে পারবেন, তাঁকে এক সহস্র গো-ধন এবং জমিদারী দেওয়া হবে। যদি আপনারা তাঁকে আনতে না পারেন শুধু খবরটি আনেন তাহলেও দশ হাজার গো-ধন দেওয়া হবে।' ব্রাহ্মণরা খুশি মনে নলদময়ন্তীকে খুঁজতে বেরোলেন।

সুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ নল-দময়ন্তীকে খোঁজার জন্য চেদিরাজের রাজধানীতে গেলেন। তিনি একদিন রাজপ্রাসাদে দময়ন্তীকে দেখে ফেললেন। সেই সময় রাজার

মহলে পুণ্যাহ দেখেই চিনে ফেললেন যে 'ইনিই ভীমক-নন্দিনী। আমি আগে এঁকে যেমন দেখেছিলাম, এখনও তেমনই আছেন। আমার যাত্রা সফল হল।' সুদেব দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বললেন—'বিদর্ভ নন্দিনী ! আমি তোমার ভাইয়ের মিত্র সুদেব ব্রাহ্মণ, রাজা ভীমকের নির্দেশে তোমাকে খুঁজতে আমি এইখানে এসেছি। তোমার মাতা পিতা, ভাই সানন্দ এবং তোমার দুই সন্তানও বিদর্ভে আছে, তারা সকলেই ভালো আছে। তোমার বিরহে সব আত্মীয়-কুটুম্ব প্রাণহীন হয়ে আছে এবং তোমাকে খোঁজার জন্য শত শত ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে ঘুরছেন।' দময়ন্তী ব্রাহ্মণকে চিনতে পারলেন। তিনি ক্রমশ সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। সুনন্দা দময়ন্তীকে কথা বলতে বলতে কাঁদতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে তাঁর মাকে সব জানালেন। রাজমাতা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ ! ইনি কার পত্নী, কার কন্যা ? বাড়ির লোকদের থেকে ইনি কী করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন ? আপনি এঁকে কী করে চিনলেন ?' সুদেব নল-দময়ন্তীর সম্পূর্ণ ঘটনা জানালেন এবং বললেন

যেমন ছাই চাপা আগুন উষ্ণতার প্রভাবে জানা যায়, তেমনই এই দেবীর সুন্দর রূপ এবং ললাট দেখে আমি চিনেছি। সুনন্দা নিজ হাতে দময়ন্তীর কপাল ধুয়ে দিলেন, তাতে তাঁর ভ্রূযুগলের মাঝখানে চাঁদের মতো লাল চিহ্ন প্রকটিত হল। ললাটের সেই লাল তিল দেখে সুনন্দা এবং রাজমাতা দুজনেই কেঁদে উঠলেন। তাঁরা বহুক্ষণ দময়ন্তীকে বুকে ধরে রাখলেন। রাজমাতা বললেন—'দময়ন্তী ! আমি এই তিলটি দেখে চিনতে পারলাম, তুমি আমার ভগ্নীর কন্যা। তোমার মা আমার নিজের বোন। আমরা দুজন দশার্ণ দেশের রাজা সুদামার কন্যা। তোমার জন্ম হয়েছিল আমার পিতৃগৃহে, আমি তখনই তোমাকে দেখেছি। তোমার পিতার ঘরের মতো, এই বাড়িও তোমার, এই সম্পত্তি যেমন আমার, তেমনই তোমারও।' দময়ন্তী খুব খুশি হলেন। তিনি তাঁর মাসীমাকে প্রণাম করে বললেন—'মা ! তুমি আমাকে চেনোনি তাতে কী হয়েছে, আমি তো এখানে তোমার মেয়ের মতোই ছিলাম। তুমি আমার সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছ, রক্ষা করেছ। আমি এখানে আরও থাকতে পারতাম, কিন্তু আমার ছোট দুটি সন্তান বাবার কাছে আছে, তারা হয়তো পিতার বিরহে কাতর। তুমি আমাকে বিদর্ভে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও।' রাজমাতা খুব খুশি হলেন। তিনি পুত্রকে বলে বস্ত্র অলংকার ও সৈন্যসহ দময়ন্তীর

যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। বিদর্ভে দময়ন্তীর অত্যন্ত আদর ও অভ্যর্থনা হল। তিনি মা-বাবা, ভাই ও সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। রাজা ভীমক কন্যাকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হলেন। তিনি সুদেবকে এক হাজার গোধন ও জমিদারী দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন।

নলের অনুসন্ধান, ঋতুপর্ণের বিদর্ভযাত্রা, কলিযুগের নিষ্ক্রান্ত হওয়া

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির ! পিতৃগৃহে একদিন বিশ্রামের পর দময়ন্তী তাঁর মাকে বললেন—'মা ! আপনাকে সত্য করে বলছি, আপনি যদি আমাকে জীবিত রাখতে চান, তাহলে আমার পতিদেবকে খুঁজে বার করুন।' রানি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁর পতি রাজা ভীমককে বললেন—'স্বামী ! দময়ন্তী তার পতির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল, সে লজ্জাত্যাগ করে আমাকে তার স্বামীর অনুসন্ধান করতে বলেছে।' রাজা তাঁর আশ্রিত ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে আনালেন এবং নলকে খোঁজার জন্য তাঁদের নিযুক্ত করলেন। ব্রাহ্মণরা দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বললেন—'আমরা রাজা নলকে খোঁজার জন্য যাচ্ছি।' দময়ন্তী ব্রাহ্মণদের বললেন—'আপনারা যে দেশে যাবেন, সেখানে লোকদের সমবেত করে বলবেন—'হে দময়ন্তীর ছলনাকারী তুমি তাঁর শাড়ির অর্ধেক ছিঁড়ে নিয়ে এবং ওই দাসীকে বনে নিদ্রিত অবস্থায় ফেলে রেখে কোথায় গেছ ? তোমার সেই দাসী এখনও সেই অবস্থায় অর্ধেক শাড়ি পরে তোমার আসার অপেক্ষায় পথ দেখছে এবং তোমার বিরহ ব্যথায় দুঃখে সময় কাটাচ্ছে।' তাঁর কাছে আমার দুর্দশার বর্ণনা করবেন এবং এমন কথা বলবেন, যাতে তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে কৃপা করেন। আমার কথা শুনে যদি কোনো উত্তর দেন, তাহলে তিনি কে, কোথায় থাকেন এই সব খবর জেনে নেবেন এবং মনে করে আমাকে জানাবেন। মনে

রাখবেন, আপনারা আমার নির্দেশেই এইসব কথা বলছেন, তা যেন উনি বুঝতে না পারেন।' ব্রাহ্মণরা দময়ন্তীর নির্দেশানুসারে রাজা নলকে খুঁজতে বেরোলেন।

বহুদিন ধরে অনুসন্ধান চালাবার পরে পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজপ্রাসাদে এসে দময়ন্তীকে জানাল—'রাজকুমারী, আমি আপনার নির্দেশানুসারে রাজা নলের অনুসন্ধান করতে অযোধ্যায় পৌঁছাই। সেইখানেই রাজা ঋতুপর্ণের সভায় সবার সামনে আপনার কথা আবৃত্তি করি। কিন্তু সেখানে কেউ কোনো উত্তর দেয়নি। ওখান থেকে যখন রওনা হই তখন বাহুক নামক সারথি আমাকে একান্তে ডেকে কিছু জানায়। 'দেবী ! সেই সারথি রাজা ঋতুপর্ণের ঘোড়াদের শিক্ষা দেয়, উত্তম রান্না করে, কিন্তু তার হাত দুটি ছোট এবং সে দেখতে কুৎসিত।' সে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জানায় যে, কুলীন নারীরা ভয়ানক কষ্ট পেলেও নিজ মর্যাদা রক্ষা করে এবং সতীত্বের জোরে স্বর্গে যায়। পতি ত্যাগ করলেও, তাঁরা কুপিত হন না, নিজ সদাচার রক্ষা করেন। ত্যাগকারী ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হওয়ায় দুঃখ-শোকে চেতনাহীন হয়েছিল, সুতরাং তার ওপর রাগ করা উচিত নয়। একথা সত্য যে, সেই সময় তাঁর পত্নীকে ঠিকমতো যত্ন করেনি, কিন্তু তখন সে রাজলক্ষীচ্যুত, ক্ষুধাতুর, দুঃখী এবং দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। অতএব এই বিরূপ অবস্থায় তার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। সে প্রাণরক্ষার জন্য কোনো একটি অবলম্বনের উপায় করছিল সেইসময় একটি পাখি তার বস্ত্র নিয়ে উড়ে যায়। তার অন্তরে অসহ্য বেদনা ছিল।' রাজকুমারী বাহুকের কথাগুলি আমি আপনাকে শোনাতে এসেছি। আপনি যা ঠিক মনে করেন, করুন। ইচ্ছা হলে মহারাজকেও বলতে পারেন।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে দময়ন্তীর চোখ জলে ভরে গেল, তিনি মাকে একান্তে ডেকে বললেন—'মা, আপনি পিতাকে একথা বলবেন না। আমি সুদেব ব্রাহ্মণকে এই কাজে নিযুক্ত করছি। সুদেব যেমন শুভ মুহূর্তে আমাকে
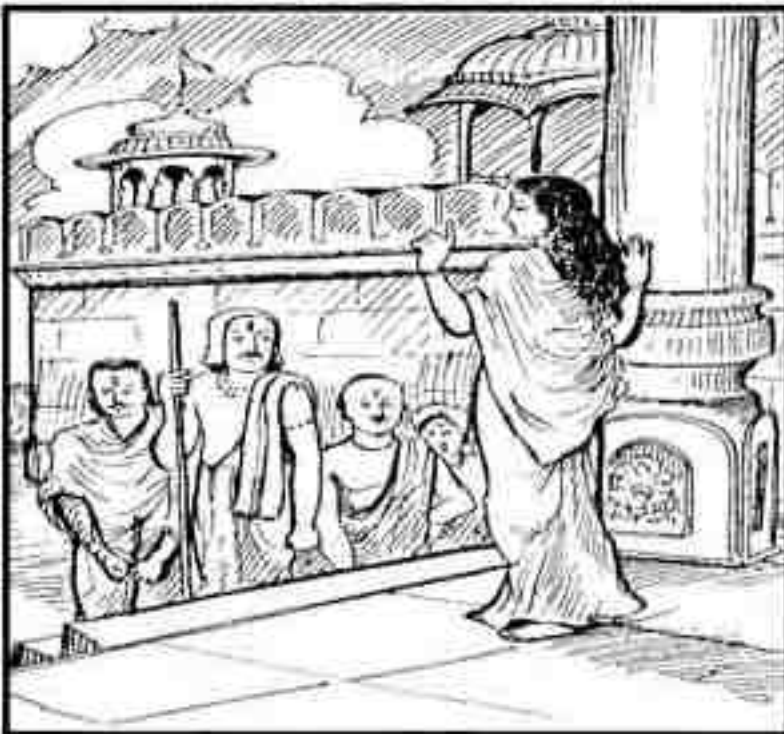
এইখানে নিয়ে এসেছিল, তেমনই ও শুভসময় দেখে অযোধ্যায় যাবে এবং আমার পতিকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় করবে।' তারপর দময়ন্তী পর্ণাদকে যথোচিত আদর ও আপ্যায়ন করে বিদায় দিয়ে সুদেবকে ডাকালেন।

সুদেব এলে তাঁকে বললেন—'ব্রাহ্মণদেবতা! আপনি অতি শীঘ্র অযোধ্যা নগরীতে গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে বলুন যে দময়ন্তী পুনর্বার স্বয়ংবর সভায় স্বেচ্ছানুসারে পতি নির্বাচন করতে চান। বড় বড় রাজা এবং রাজপুত্ররা যাচ্ছেন। কালই স্বয়ংবর তিথি। আপনি যদি যেতে চান তাহলে যেতে পারেন। নল বেঁচে আছেন কি না তার কোনো খবর নেই, তাই সূর্যোদয়ের সময় তিনি দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন।' দময়ন্তীর কথা শুনে সুদেব অযোধ্যায় গেলেন এবং রাজা ঋতুপর্ণকে সব কথা বললেন।

রাজা ঋতুপর্ণ সুদেব ব্রাহ্মণের কথা শুনে বাহুককে ডাকালেন এবং মিষ্টস্বরে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে 'বাহুক! কাল দময়ন্তীর স্বয়ংবর। আমি একদিনের মধ্যে বিদর্ভ দেশে পৌঁছতে চাই। তুমি যদি মনে করো তাড়াতাড়ি পৌঁছানো সম্ভব, তাহলেই আমি যাব।' রাজা ঋতুপর্ণের কথা শুনে নলের হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল। তিনি মনে মনে ভাবলেন—'দময়ন্তী দুঃখে হতচেতন হয়েই নিশ্চয়ই এই কথা বলেছে। হয়তো তাই করতে চায়। কিন্তু না, না, ও আমাকে পাওয়ার জন্যই এইরকম উপায় করেছে। দময়ন্তী পতিব্রতা, তপস্বিনী এবং দীন। আমি দুর্বুদ্ধিবশত ওকে ত্যাগ করে বড় নিষ্ঠুর কাজ করেছি। অপরাধ আমারই, সে কখনো এমন কাজ করতে পারে না। যাহোক, সত্য কী আর অসত্যই বা কী—তা ওখানে গেলেই জানা যাবে। ঋতুপর্ণের ইচ্ছা পূর্ণ করায় আমারও স্বার্থ আছে।' বাহুক হাত জোড় করে বললেন—'আমি আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করব, প্রতিজ্ঞা করছি।' বাহুক অশ্বশালায় গিয়ে শ্রেষ্ঠ ঘোড়াগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন। রাজা নল ভালো জাতের চারটি দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে রথে জুতলেন এবং রাজা ঋতুপর্ণকে নিয়ে রথে চড়লেন।

আকাশচারী পাখি যেমন আকাশে ওড়ে, তেমনই বাহুকের রথও অল্পসময়ের মধ্যে নদী, পাহাড়, বন পার হয়ে গেল। এক স্থানে রাজা ঋতুপর্ণের উত্তরীয় নীচে পড়ে গেল, তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'রথ থামাও, বার্ষ্ণেয়কে পাঠাও উত্তরীয় নিয়ে আসতে।' নল বললেন—'আপনার বস্ত্র যেখানে পড়েছে, আমরা সেখান থেকে এক যোজন চলে এসেছি, এখন আর ওটা পাওয়া যাবে না।' এই কথা বলার সময় রথ একটি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ঋতুপর্ণ বললেন—'বাহুক! আমার অঙ্ক-শাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখ, সামনের বৃক্ষে যত ফল আর পাতা দেখছ, তার থেকে

জমিতে পতিত ফল ও পাতা একশত গুণ বেশি। এই গাছের দুটি শাখা ও ছোট ডালে পাঁচকোটি পাতা এবং দুহাজার পাঁচানব্বইটি ফল আছে। তুমি ইচ্ছা হলে গুণে নাও।' বাহুক রথ দাঁড় করিয়ে বললেন—'আমি এই গাছটি কেটে এর ফল ও পাতা ঠিক করে গুণে স্থির করব।' বাহুক গুণে দেখলেন, রাজা যা বলেছেন ঠিক ততগুলিই ফল ও পাতা আছে। তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'আপনার বিদ্যা তো অদ্ভুত, দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দিন।' ঋতুপর্ণ বললেন—'গণিত-বিদ্যার মতোই পাশার বশীকরণ বিদ্যাতেও আমি এইরকমই পারদর্শী।' বাহুক বললেন—'আপনি আমাকে যদি এই বিদ্যাও শিখিয়ে দেন, তাহলে আমি আপনাকে অশ্ব-বিদ্যা শিখিয়ে দেব।' ঋতুপর্ণের বিদর্ভ দেশে পৌঁছানোর খুব তাড়া ছিল আর অশ্ববিদ্যা শেখারও লোভ ছিল। তাই তিনি রাজা নলকে পাশাখেলার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে বললেন—'তুমি আমাকে পরে অশ্ববিদ্যা শিখিয়ে দিও। আমি এটি তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম।'

রাজা নল যখনই পাশাখেলার বিদ্যা শিখলেন, তখনই কলিযুগ কর্কোটক নাগের তীক্ষ্ণ বিষ বমন করতে করতে শরীর থেকে বেরিয়ে গেল। কলি তাঁর শরীর থেকে বার হয়ে গেলে নলের খুব ক্রোধ হল, তিনি তাকে অভিশাপ দিতে গেলেন। কলিযুগ দুই হাত জোড় করে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল—'আপনি শান্ত হোন, ক্রোধ সংবরণ করুন, আমি আপনাকে যশস্বী করে দেব। আপনি যখন দময়ন্তীকে ত্যাগ করেন, তিনি সেই সময়ই আমাকে শাপ দেন। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কর্কোটক নাগের বিষে জ্বলে আপনার শরীরে ছিলাম। আমি আপনার শরণাগত, আমার প্রার্থনা শুনুন, আমাকে শাপ দেবেন না। যে আপনার পবিত্র চরিত্র পাঠ করবে, তার আমরা থেকে ভয় থাকবে না।' রাজা নল ক্রোধ সংবরণ করলেন। কলিযুগ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বহেড়া গাছের মধ্যে ঢুকে গেল। কলিযুগ এবং নল ছাড়া একথা আর কেউ জানতে পারলেন না, বহেড়া গাছ ঠুঁটো হয়ে রইল।

কলি রাজা নলকে ছেড়ে দিলেও তাঁর রূপ পরিবর্তন হল না। তিনি দ্রুত রথ চালিয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই বিদর্ভ দেশে পৌঁছলেন। রাজা ভীমকের কাছে সংবাদ পাঠানো হল। তিনি ঋতুপর্ণকে স্বাগত জানালেন। ঋতুপর্ণের রথের ঝংকারে দশদিক গুঞ্জরিত হল। কুণ্ডিননগর থেকে রাজা নলের যে ঘোড়াগুলি তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে এসেছিল, সেই ঘোড়াগুলি রথের আওয়াজে উল্লসিত হয়ে উঠল। দময়ন্তীরও এই রথের আওয়াজ পরিচিত মনে হল। দময়ন্তী ভাবতে লাগলেন 'এই রথের আওয়াজ আমার চিত্তে আনন্দের লহরী তুলেছে, নিশ্চয়ই আমার পতিদেব এটি চালাচ্ছেন। আজ যদি তিনি না আসেন, তাহলে আমি জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেব। আমি কখনো তাঁকে হাসি-ঠাট্টা করে মিথ্যা কথা বলেছি, তাঁর কোনো অপকার করেছি অথবা প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করেছি, এরকম মনে হয় না। উনি শক্তিশালী, ক্ষমাশীল, বীর, দাতা এবং একপত্নীব্রত। ওঁর বিরহে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।' দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের ছাদে গিয়ে রথের আগমন এবং তার থেকে রথী ও সারথিদের অবরোহণ দেখতে লাগলেন।

রাজা নলকে দময়ন্তীর পরীক্ষা, চিনে নেওয়া, মিলন, রাজ্যপ্রাপ্তি এবং কাহিনীর উপসংহার

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির ! বিদর্ভরাজ ভীমক অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করলেন। ঋতুপর্ণের থাকার উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। রাজা ঋতুপর্ণ কুণ্ডিনপুরে স্বয়ংবর সভার কোনো ব্যবস্থাই দেখতে পেলেন না। ভীমক জানতেনই না যে রাজা ঋতুপর্ণ তাঁর কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন। তিনি কুশল সংবাদের পর জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ?' রাজা ঋতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনো আয়োজন না দেখে, সেই কথা চেপে গেলেন, বললেন—'আমি আপনাকে দেখতে আর প্রণাম করতে এসেছি।' ভীমক ভাবলেন একশত যোজন দূর থেকে কেউ শুধু প্রণাম করতে বা দেখতে আসে না। যাহোক, সে কথা পরে ঠিকই জানা যাবে। বাহুক এবং বার্ষ্ণেয় অশ্বশালায় থেকে ঘোড়াদের দেখাশোনা করতে লাগলেন।

দময়ন্তী আকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন 'রথের আওয়াজ তো আমার পতিদেবের রথেরই মতো, কিন্তু তাঁকে তো কোথাও দেখছি না। বার্ষ্ণেয় ওঁর কাছে থেকে রথবিদ্যা শিখেছে তাই হয়ত মনে হচ্ছে এই রথ তাঁর। হয়তো

ঋতুপর্ণও এই বিদ্যা জানেন।' তিনি দাসীকে ডেকে বললেন—'কেশিনী ! তুমি গিয়ে খোঁজ নাও ওই কুরূপ ব্যক্তিটি কে ? হয়তো উনিই আমার স্বামী। আমি ব্রাহ্মণকে যে কথা বলে পাঠিয়েছিলাম, সেই কথাই ওঁকে গিয়ে বলো, আর তিনি কী উত্তর দেন শুনে আমাকে এসে বলো।' কেশিনী অশ্বশালায় গিয়ে বাহুকের সঙ্গে কথা বলল।

কেশিনী জিজ্ঞাসা করল—'বাহুক, রাজা নল কোথায় ? তুমি কি জান ? তোমার সঙ্গী বার্ষ্ণেয় কি জানে ?' বাহুক বলল—'কেশিনী ! বার্ষ্ণেয় রাজা নলের সন্তানদের এখানে রেখে গিয়েছিল। নলের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এই সময় নলের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি লুকিয়ে থাকেন। তাঁকে স্বয়ং তিনি চিনতে পারেন অথবা তাঁর পত্নী দময়ন্তী। কারণ তিনি তাঁর গুপ্ত চিহ্ন কারো সামনে প্রকাশ করেন না। কেশিনী ! রাজা নল বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে ত্যাগ করেছিলেন, দময়ন্তীর তাঁর ওপর রাগ করা উচিত নয়। যখন তিনি আহারের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন পাখি তাঁর বস্ত্র নিয়ে উড়ে যায়। তাঁর হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়েছিল। তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি সঠিক ব্যবহার করেননি, সেকথা ঠিক, তবুও তাঁর দুরবস্থার কথা চিন্তা করে দময়ন্তীর রাগ করা উচিত নয়।' এই কথা বলতে বলতে রাজা নলের হৃদয় দুঃখে ভেঙে পড়ল, তাঁর কণ্ঠরোধ হল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেশিনী দময়ন্তীর কাছে এসে আনুপূর্বিক সমস্ত সবিস্তারে জানাল।

তখন দময়ন্তীর ধারণা আরও দৃঢ় হল যে, ইনিই রাজা নল। তিনি তখন দাসীকে ডেকে বললেন—'কেশিনী, তুমি আবার বাহুকের কাছে যাও এবং সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি কী করেন দেখ, আগুন চাইলে দেবে না, জল চাইলে দেরী করে দেবে, তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমাকে এসে বলবে।' কেশিনী আবার বাহুকের কাছে গেল এবং তাঁর দেবতা ও মানুষের মতো সুন্দর ব্যবহার দেখে ফিরে এসে দময়ন্তীকে বলল—'রাজকুমারী ! বাহুক তো জল-স্থল-অগ্নি সবই জয় করে নিয়েছে। আমি এখনও পর্যন্ত কখনো এমন ব্যক্তি দেখিনি। তাঁর সামনে যদি নীচু দরজা পড়ত, তিনি সেখানে এলেই দরজা আপনিই উঁচু হয়ে যেত, তাঁকে সেখানে মাথা নত করতে হত না। সামান্য ছিদ্রসম গোলকও তাকে প্রবেশ করবার জায়গা দিয়ে গুহার মতো বড় হয়ে যায়। তাঁর খাওয়ার জলের যে কলসটি ঘরে দেওয়া আছে, তা কখনো খালি হয় না, তিনি সেদিকে তাকালে তা আপনিই জলে ভরে যায়। তিনি খড় তুলে সূর্যের দিকে করলেই, সেটিতে আগুন ধরে যায়। তাছাড়া অগ্নির স্পর্শে তাঁর হাত পোড়েও না। তাঁর ইচ্ছানুসারে জল বয়ে যায়। তিনি যখন হাতে ফুল ধরেন, সেই ফুল ম্লান হয় না বরং আরও প্রস্ফুটিত হয়ে সুগন্ধ ছড়ায়। এইসব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। তাই তাড়াতাড়ি আপনার কাছে চলে এসেছি।' দময়ন্তী বাহুকের কাজ ও কর্মপ্রচেষ্টার কথা শুনে নিশ্চিত হলেন যে, ইনি অবশ্যই তাঁর পতি। তিনি কেশিনীর সঙ্গে তাঁর দুই সন্তানকে নলের কাছে পাঠালেন। বাহুক ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে চিনতে পেরে

তাদের কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি সন্তানদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, তাঁর মুখে পিতার স্নেহভাব প্রকটিত হল। কিছুক্ষণ পরে তিনি সন্তানদের দাসী কেশিনীর কাছে দিয়ে বললেন—'এই শিশুদুটি আমার দুই সন্তানের মতো, তাই এদের দেখে আমার কান্না এসেছিল। কেশিনী ! তুমি বারংবার আমার কাছে আসছ, না জানি লোকে কী ভাবছে। তোমার এখানে আমার কাছে বারবার আসা ঠিক নয়। তুমি যাও।' কেশিনী শিশু দুটিকে নিয়ে ফিরে গেল এবং দময়ন্তীকে সব কথা জানাল।

দময়ন্তী তারপর কেশিনীকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—'মা, আমি রাজা নল মনে করে বাহুককে বারবার পরীক্ষা করেছি। এখন আমার শুধু তাঁর রূপের ব্যাপারেই একটু সন্দেহ রয়েছে। আমি নিজে এখন তাঁকে পরীক্ষা করতে চাই। সুতরাং আপনি বাহুককে আমার মহলে আসার অনুমতি প্রদান করুন, অথবা আমাকে ওর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আপনি ইচ্ছা করলে এই কথা বাবাকে বলতেও পারেন এবং নাও বলতে পারেন।' রানি তাঁর স্বামী ভীমকের অনুমতি নিয়ে বাহুককে রানিমহলে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। বাহুককে ডেকে আনা হল। দময়ন্তীকে দেখেই নলের হৃদয় শোক ও দুঃখে ভরে উঠল। তিনি চোখের জলে প্লাবিত হলেন। বাহুকের আকুলতা দেখে দময়ন্তীও শোকগ্রস্ত হলেন। সেইসময় দময়ন্তী গৈরিক বসন পরেছিলেন, চুলেও জটা ধরেছিল, শরীরে ময়লা পড়েছিল। দময়ন্তী বললেন—'বাহুক ! এক ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর নিদ্রিত পত্নীকে বনের মধ্যে ফেলে চলে গিয়েছিলেন, তুমি কি তাঁকে দেখেছ ? সেই সময় সেই নারী ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত এবং নিদ্রায় অচেতন ছিল ; এরূপ নিরপরাধা পত্নীকে পুণ্য শ্লোক নিষাধরাজ ব্যতীত আর কে নির্জন বনে ফেলে আসতে পারেন ! আমি সারাজীবন জেনেশুনে তাঁর কাছে কোনো অন্যায় করিনি, তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় ছেড়ে চলে গেলেন।' বলতে বলতে দময়ন্তী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। দময়ন্তীর সেই বিশাল সুন্দর চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখে নল আর থাকতে পারলেন না। তিনি বলতে লাগলেন—'প্রিয়ে, আমি জেনে শুনে রাজ্য নষ্ট করিনি এবং তোমাকেও ত্যাগ করিনি। এ কলিযুগের কাজ। আমি জানি, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়েছে, তুমি রাত দিন আমার কথাই চিন্তা করছ। কলি আমার দেহের মধ্যে তোমার শাপের জন্যই কষ্ট পাচ্ছিল। আমি নিজ চেষ্টায় এবং তপস্যাবলে তাকে জয় করেছি, অবশেষে আমাদের দুঃখের সময় শেষ হয়েছে। কলি এখন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমি তোমার জন্যই এখানে এসেছি। এখন তুমি বলো তুমি আমার মতো প্রেমিক, অনুরাগী স্বামীকে ছেড়ে যেভাবে দ্বিতীয় বিবাহ করতে যাচ্ছ অন্য কোনো স্ত্রী কি তা করতে পারত ? তোমার স্বয়ংবরের কথা শুনেই তো রাজা ঋতুপর্ণ অত্যন্ত দ্রুত এখানে চলে এলেন।' দময়ন্তী এই কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

দময়ন্তী হাত জোড় করে বললেন—'আর্যপুত্র ! আমাকে দোষী করা উচিত নয়। আপনি তো জানেন যে, আপনার সামনে প্রকটিত দেবতাদের গলায় মালা না দিয়ে আমি আপনাকে বরণ করেছিলাম। আমি আপনাকে খোঁজার জন্য বহু ব্রাহ্মণকে নানাদিকে পাঠিয়েছি। তাঁরা আমার বলা কথা বলতে বলতে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পর্ণাদ নামক ব্রাহ্মণ অযোধ্যাপুরীতে আপনার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি আপনাকে আমার বলা কথাগুলি শুনিয়েছিলেন এবং আপনি তার যথোচিত উত্তর দিয়েছিলেন। সেই খবর শুনে আপনাকে এখানে আনাবার জন্যই আমি এই উপায় ঠিক করেছিলাম। আমি জানি আপনি ছাড়া কেউ নেই, যে একদিনের মধ্যে ঘোড়ায় করে

শত যোজন পথ পার হতে পারে। আমি আপনার চরণস্পর্শ করে সত্য সত্য বলছি যে, আমি মনে মনেও কখনো পরপুরুষের কথা চিন্তা করিনি। আমি যদি মনে মনেও কখনো পাপকর্ম করে থাকি তাহলে নিরন্তর বিচরনশীল বায়ুদেব, ভগবান সূর্য এবং মনের দেবতা চন্দ্র আমাকে যেন নাশ করেন। এই তিন দেবতা ভূমণ্ডলে বিরচণ করেন, তাঁরা সত্য কথা বলুন এবং আমি যদি পাপিয়সী হই, তাহলে যেন ত্যাগ করেন।' তখন বায়ু অন্তরীক্ষে অবস্থিত হয়ে বললেন—'রাজন্‌! আমি সত্য বলছি দময়ন্তী কোনো পাপ করেননি। ইনি তিন বৎসর ধরে তাঁর উজ্জ্বল শীলব্রত রক্ষা করেছেন। আমরা এঁর রক্ষকরূপে ছিলাম এঁর পবিত্রতার সাক্ষী। ইনি স্বয়ংবরের ঘোষণা করেছিলেন তোমার খোঁজ পাবার জন্যই। প্রকৃতপক্ষে দময়ন্তী তোমার উপযুক্ত স্ত্রী এবং তুমিও এঁর যোগ্য স্বামী। কোনো চিন্তা না করে এঁকে গ্রহণ করো।' পবন দেবতা যখন এইকথা বলছিলেন, তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং দেবতাদের দুন্দুভি ধ্বনিত হল। শীতল, সুগন্ধ বায়ু মন্দ-মন্দ প্রবাহিত হল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে নলের সন্দেহ দূর হল, তিনি নাগরাজ কর্কোটক প্রদত্ত বসন গায়ে দিয়ে তাঁকে স্মরণ করলেন। তাঁর শরীর তৎক্ষণাৎ পূর্বরূপ ধারন করল। দময়ন্তী নলের পূর্বেকার রূপ দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। রাজা নলও গভীর প্রেমে দময়ন্তীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। দুই সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নানা মিষ্টবাক্য বলতে লাগলেন। সারা রাত এইভাবে কেটে গেল।

পরদিন ভোরে দময়ন্তী এবং রাজা নল স্নান করে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে রাজা ভীমকের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীমক আনন্দের সঙ্গে তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং আশ্বাস দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, নগরবাসী আনন্দে উৎসব করতে লাগল। দেবগণের মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠানো হল। রাজা ঋতুপর্ণ যখন জানতে পারলেন যে, বাহুক আসলে রাজা নল, তিনি এখানে এসে তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইল না, তিনি নলের কাছে গিয়ে ক্ষমা

চাইলেন। রাজা নল তাঁর সুব্যবহারে প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে সাদর-অভ্যর্থনা জানালেন। রাজা নল ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা শিখিয়ে দিলেন। রাজা অন্য সারথি নিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

এক মাস রাজা নল কুণ্ডিনগরে থাকলেন, তারপর শ্বশুর ভীমকের অনুমতি নিয়ে সঙ্গে বেশ কিছু লোক-লস্কর নিয়ে নিষাধ দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাজা ভীমক একটি শ্বেতবর্ণের রথ, ষোলটি হাতি, পঞ্চাশটি ঘোড়া এবং ছয়শত পদাতিক সৈন্য নলের সঙ্গে দিলেন। নিজ নগরে প্রবেশ করে রাজা নল পুষ্করের সঙ্গে দেখা করে বললেন—'তুমি হয় আবার আমার সঙ্গে কপট পাশা খেলো নয়তো ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হও।' পুষ্কর হেসে বললেন—'ভালো কথা! তুমি বাজী ধরার জন্য আরও অর্থ সংগ্রহ করেছ? এসো, এবার তোমার সব ধন এবং দময়ন্তীকেও জিতে নেব।' রাজা নল বললেন—'আরে, এসো পাশা খেল, অত কথা বলছ কেন? হেরে গেলে তোমার কী দশা হবে জানো?' খেলা হতে লাগল, রাজা নল প্রথম বাজীতেই পুষ্করের রাজ্য, রত্নভাণ্ডার এবং প্রাণও জিতে নিলেন। তিনি পুষ্করকে বললেন—'সমস্ত রাজ্য আমার হয়ে গেছে, তুমি আর চোখ তুলে দময়ন্তীর দিকে তাকাবে না। তুমি এখন দময়ন্তীর সেবক। আরে মূঢ়!

আগের বারেও তুমি আমাকে হারাতে পারনি। সে ছিল কলির কর্ম, তুমি তা জানো না। আমি কলির দোষ তোমার ঘাড়ে চাপাতে চাই না। তুমি সুখে জীবন কাটাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার সব জিনিস এবং রাজ্যের ভাগও তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার ওপর আমার ভালোবাসা আগের মতোই আছে, তুমি আমার ভাই। আমি কখনো তোমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখব না, তুমি একশত বছর বেঁচে থাক।' রাজা নল এই কথা বলে পুষ্করকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আলিঙ্গন করে যাবার অনুমতি দিলেন। পুষ্কর

হাত জোড় করে রাজা নলকে প্রণাম করে বললেন—'জগতে আপনার কীর্তি অক্ষয় হোক এবং আপনি দশ হাজার বছর সুখে জীবিত থাকুন। আপনি আমার অন্নদাতা ও প্রাণদাতা।' পুষ্কর অত্যন্ত সম্মান ও আদরের সঙ্গে এক মাস রাজা নলের নগরে থাকলেন। তারপর সেনা, সেবক এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে নিজ নগরে চলে গেলেন। রাজা নল পুষ্করকে তাঁর নগরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন। সমস্ত নাগরিক, সাধারণ প্রজা এবং মন্ত্রীগণ রাজা নলকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন। তাঁরা আনন্দিত হয়ে হাত জোড় করে রাজা নলকে বললেন—'রাজেন্দ্র ! আজ আমরা মনোবেদনা থেকে মুক্তি পেলাম। দেবতারা যেমন ইন্দ্রের সেবা করেন, তেমনই আমরা সকলে আপনার সেবা করতে এসেছি।'

ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব হতে লাগল। চারিদিকে শান্তি বিরাজ করতে লাগল। রাজা নল সেনা পাঠিয়ে দিলেন দময়ন্তীকে আনার জন্য। রাজা ভীমক বহু বস্ত্র-অলংকার সহ কন্যাকে নলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, দময়ন্তী দুই সন্তানকে নিয়ে নিষাধরাজ্যে ফিরে এলেন। রাজা নল অত্যন্ত আনন্দে কাল কাটাতে লাগলেন। তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ধর্মনীতি অনুসারে প্রজা-পালন করতে লাগলেন। অনেক বড়-বড় যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের আরাধনা করলেন।

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির ! তুমিও অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্য ও আত্মীয়স্বজনকে ফিরে পাবে। রাজা নল পাশা খেলে ভয়ানক দুঃখ ডেকে এনেছিলেন। তিনি এককভাবে সব দুঃখ ভোগ করেছিলেন ; কিন্তু তোমার সঙ্গে তোমার ভাইরা আছেন, দ্রৌপদী এবং অনেক বিদ্বান ও সদাচারী ব্রাহ্মণ রয়েছেন। এই অবস্থায় তোমার দুঃখ করার কোনো কারণই নেই। জগতে সকলের অবস্থা সর্বদা একপ্রকার থাকে না। সেই কথা ভেবে নিজের অবস্থার পতনের জন্য চিন্তা করা উচিত নয়। নাগরাজ কর্কোটক, দময়ন্তী, নল এবং ঋতুপর্ণের এই কথা শোনালে এবং শুনলে কলির পাপ নাশ হয় এবং দুঃখী মানুষ সান্ত্বনা লাভ করে।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পরে মহর্ষি বৃহদশ্বের অনুপ্রেরণায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে তিনি তাঁকে পাশাখেলার বশীকরণ বিদ্যা এবং অশ্ববিদ্যা শিখিয়ে স্নান করতে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মুনি-ঋষিদের সঙ্গে অর্জুনের তপস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

— ০ —

দেবর্ষি নারদের তীর্থযাত্রার মহিমা বর্ণনা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! আমার পিতামহ অর্জুনের বিরহে আমার অপর পাণ্ডব পিতামহগণ কাম্যক বনে কীভাবে দিন যাপন করছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অর্জুন তপস্যা করার জন্য চলে যাবার পর অন্য পাণ্ডব ভাইরা অর্জুনের বিরহে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁরা দুঃখ ও শোকে মগ্ন হয়ে থাকতেন। সেইসময় পরম তেজস্বী দেবর্ষি নারদ তাঁদের কাছে এলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রবিধিমতে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন।
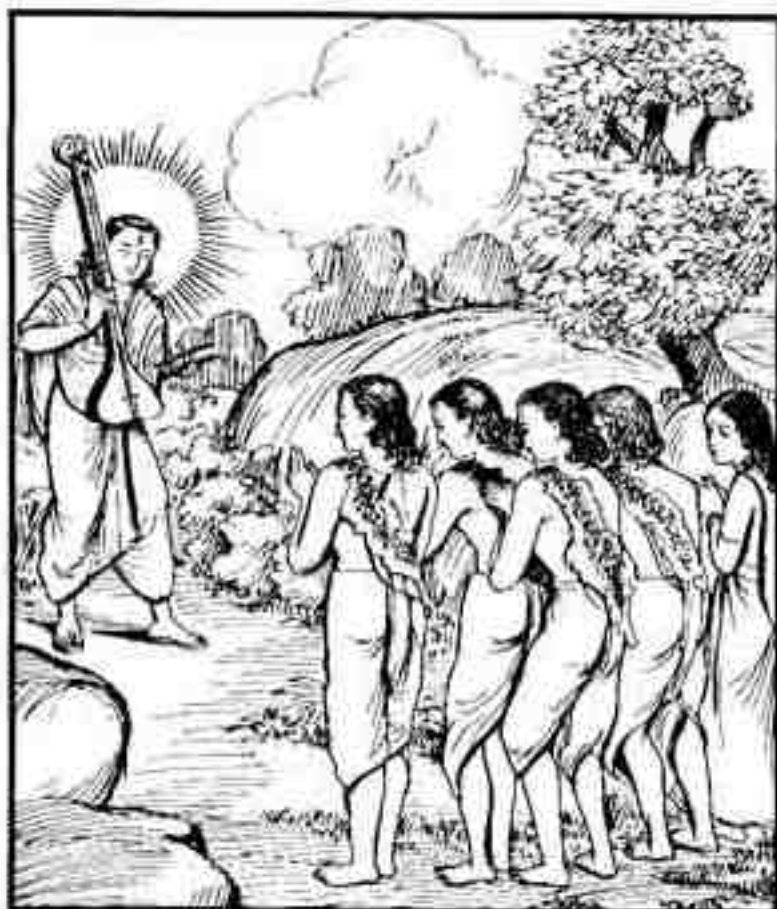
দেবর্ষি নারদ তাঁদের কুশল বার্তা নিলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন—'যুধিষ্ঠির ! এখন তোমরা কী চাও ? আমি তোমাদের জন্য কী করতে পারি ?' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর চরণে প্রণাম করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'মহারাজ ! সকলেই আপনাকে পূজা করে। আপনি আমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, তাতেই আমরা অনুভব করছি যে আপনার কৃপায় আমাদের সমস্ত কার্য সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনি কৃপা করে আমাদের একটা কথা বলুন, যাঁরা পৃথিবীতে তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁরা কী ফল লাভ করেন ?' নারদ বললেন—'রাজন্ ! মন দিয়ে শোন ! একবার তোমার পিতামহ হরিদ্বারে ঋষি, দেবতা এবং পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য কোনো এক অনুষ্ঠান করছিলেন। সেখানে একদিন পুলস্ত্য মুনি এলেন। ভীষ্ম তাঁর সেবা-পূজা করে এই প্রশ্নই করেন, যা তুমি এখন আমাকে করছ। তার উত্তরে পুলস্ত্য মুনি যা বলেছিলেন, তাই তোমাকে বলছি।'

পুলস্ত্য মুনি বলেছিলেন—ভীষ্ম ! তীর্থস্থানে প্রায়শই বড় বড় ঋষি-মুনি বাস করেন। সেই তীর্থাদি ভ্রমণে যে ফল পাওয়া যায়, আমি তাই তোমাকে বলছি। যাঁর হাত দান নেওয়ায় অথবা কুকর্ম করায় অপবিত্র হয়নি, যাঁর পা নিয়মমাফিক পৃথিবীতে পড়ে অর্থাৎ জীব-জন্তুকে পায়ে না পিষে যিনি অন্যের সুখের জন্য চলেন, যাঁর মন কারো অনিষ্ট চিন্তা করে না, যাঁর বিদ্যা মারণ-উচাটনে যুক্ত নয় এবং বিবাদে লিপ্ত নয়, যাঁর তপস্যা অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং জগতের কল্যাণের জন্য, যাঁর কৃতি এবং কীর্তি নিষ্কলঙ্ক, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রে বর্ণনা অনুযায়ী তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি কোনোপ্রকার দানগ্রহণ করেন না, যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, অহংকার করেন না, দম্ভ ও কামনারহিত, অল্পভোজী, ইন্দ্রিয়কে বশে রাখেন, সমস্ত পাপ থেকে দূরে থাকেন, যিনি কখনো কারো ওপর ক্রোধ করেন না, স্বভাবতই সত্য পালন করেন, দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ নিয়মাদি পালন করেন ; সমস্ত প্রাণীর সুখ দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করেন, তিনি শাস্ত্রোক্ত তীর্থফল প্রাপ্ত হন। তীর্থদর্শনের দ্বারা নির্ধন ব্যক্তিও বড় বড় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হতে পারেন।

মর্ত্যে ভগবানের পুষ্কর তীর্থ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ; সেখানে কোটি তীর্থ বিরাজমান। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা সর্বদাই সেখানে থাকেন। বড় বড় দেবতা, দৈত্য এবং ব্রহ্মর্ষিগণ তপস্যা করে ওইখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। যে উদারচিত্ত ব্যক্তি মনে মনেও পুষ্কর তীর্থ স্মরণ করেন, তাঁর পাপ নাশ হয় এবং স্বর্গলাভ হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা অত্যন্ত আনন্দে পুষ্করে বাস করেন। এই তীর্থে যিনি স্নান করেন এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষকেও সন্তুষ্ট করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের দশগুণ ফল লাভ করেন। যিনি পুষ্করারণ্য তীর্থে একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সুখলাভ করেন। মানুষ নিজে শাক-সবজি, কন্দমূল ইত্যাদি যা যা বস্তুর দ্বারা জীবন-ধারণ করে, সেই বস্তুর দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে, কাউকে ঈর্ষা করবে না। যে ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পরম পবিত্র পুষ্কর তীর্থে স্নান করেন, তাঁর আর জন্ম হয় না। কার্তিক মাসে পুষ্করতীর্থে বাস করলে অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে দুই হাত জোড় করে পুষ্কর তীর্থকে স্মরণ করেন, তাঁর সমস্ত তীর্থের পুণ্য স্নানের ফল লাভ হয়। নারী বা পুরুষ সারাজীবনে যত পাপ করেন, পুষ্করতীর্থে স্নান করা মাত্র তা দূরীভূত হয়। দেবতাদের মধ্যে যেমন ভগবান বিষ্ণু প্রধান, তেমনই তীর্থাদির মধ্যে পুষ্কররাজ প্রধান।

এইভাবে অন্যান্য তীর্থাদির বর্ণনা করতে করতে পুলস্ত্য বলেছিলেন—রাজন্! তীর্থরাজ প্রয়াগের মহিমা সকলেই বর্ণনা করেন। সেখানে অবশ্যই যাওয়া উচিত। সেখানে ব্রহ্মাদি দেবতা, দিক্‌গণ, দিক্‌পাল, লোকপাল, সাধ্যপিতৃ, সনৎকুমার আদি পরমঋষি, অঙ্গিরাদি নির্মল ব্রহ্মর্ষি, নাগ, সুপর্ণ, সিদ্ধ, নদী, সমুদ্র, গন্ধর্ব এবং অপ্সরা ইত্যাদি সকলেই থাকেন। ব্রহ্মার সঙ্গে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুও সেখানে বাস করেন। প্রয়াগ ক্ষেত্রে অগ্নির তিনটি কুণ্ড আছে। তার মধ্যে দিয়ে শ্রীগঙ্গা প্রবাহিত। তীর্থ শিরোমণি সূর্যকন্যা যমুনাও প্রবাহিত। এইখানেই লোকপাবনী যমুনার সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গম হয়েছে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগকে পৃথিবীর জঙ্ঘা মনে করা হয়। প্রয়াগ পৃথিবীর জননেন্দ্রিয়। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান (ঝুসী), কম্বল এবং অশ্বতর নাগ, ভোগবতী তীর্থ—এগুলি প্রজাপতি বেদী। বেদ ও যজ্ঞ এতে মূর্তিমান হয়ে বিরাজ করে। বড় বড় তপস্বী ঋষি প্রজাপতির উপাসনা করেন এবং চক্রবর্তী রাজা যজ্ঞাদির সাহায্যে দেবতাদের পূজা করেন। এইজন্য এই স্থান পরম পবিত্র। ঋষিরা বলেন প্রয়াগ সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রয়াগ যাত্রা করলে, তার নাম সংকীর্তন করলে এবং প্রয়াগের মৃত্তিকা স্পর্শ করলে মানুষের সমস্ত পাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি জগদ্‌বিখ্যাত গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করেন, তিনি রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। এটি দেবতাদের যজ্ঞভূমি। এখানে অল্প দান করলেই অনেক বড় দানের ফল পাওয়া যায়। যদিও বেদে এবং লোক ব্যবহারে আত্মহত্যাকে খুবই খারাপ বলা হয়েছে, কিন্তু প্রয়াগে মৃত্যু সম্বন্ধে সে কথা চিন্তা করা উচিত নয়। প্রয়াগে সর্বদা ষাট কোটি দশ হাজার তীর্থের সান্নিধ্য থাকে। চারপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়নের এবং সত্যভাষণের সে পুণ্য, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান করলে তা লাভ হয়। বাসুকি নাগের ভোগবতী তীর্থে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত হংসপ্রপতন তীর্থ এবং গঙ্গাদশাশ্বমেধিক তীর্থও ওই স্থানেই। তাছাড়া, দেবনদী গঙ্গা যেখানেই থাক, সেখানেই স্নান করলে কুরুক্ষেত্র-যাত্রার ফল পাওয়া যায়। গঙ্গাস্নানে কনখলের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, প্রয়াগ তার থেকেও অধিক।

যে ব্যক্তি বহু পাপ করেছে, সে যদি একবার গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহলে তার সারা পাপ এমন ভাবে দূরীভূত হয় যেমন আগুন শুকনো কাঠকে ভস্মীভূত করে। সত্যযুগে সব তীর্থই পুণ্যদায়ক। ত্রেতাতে পুষ্কর এবং দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের বিশেষ মহিমা। কলিযুগে একমাত্র গঙ্গার মহিমাই সর্বশ্রেষ্ঠ। পুষ্করে তপস্যা, মহালয় তীর্থে দান, মলয়াচলে শরীর দাহ করা এবং ভৃগুতুঙ্গ ক্ষেত্রে অনশন করা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং মগধ দেশে স্নানমাত্রেই সাত পুরুষ মুক্ত হয়ে যায়। গঙ্গা নামোচ্চারণ মাত্রে পাপ ধুয়ে যায়, দর্শনমাত্রে কল্যাণদান করে, স্নান ও পানে সাতপুরুষ পবিত্র হয়ে যায়। মানুষের অস্থি যতক্ষণ গঙ্গাজলে থাকে, ততক্ষণ তার স্বর্গের সম্মান লাভ হয়। যে ব্যক্তি তীর্থ এবং পুণ্যক্ষেত্রাদিতে বাস করে, সে পুণ্য উপার্জন করে স্বর্গের অধিকারী হয়। ব্রহ্মা একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে গঙ্গাসম তীর্থ আর নেই, ভগবানের থেকে বড় কোনো দেবতা নেই এবং ব্রাহ্মণের থেকে বড় কোনো প্রাণী নেই। যেখানে গঙ্গা আছে সেই দেশই পবিত্র, সেটিই

তপোভূমি। গঙ্গাতীরই সিদ্ধিক্ষেত্র।

ভীষ্ম ! আমি যে তীর্থযাত্রার বর্ণনা করলাম, তা সত্য ; এই কথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সদ্পুরুষ, পুত্র, মিত্র, শিষ্য এবং সেবকদের গোপনীয় নিধিরূপে কানে কানে বলা উচিত। এই মাহাত্ম্য বর্ণনা করলে এবং শ্রবণ করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এর দ্বারা শুদ্ধি, বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। চার বর্ণের লোকের ইচ্ছাপূর্ণ হয়। আমি যেসব তীর্থের বর্ণনা করেছি, সেখানে যাওয়া সম্ভব না হলে মানসিক যাত্রা করতে হয়। ভীষ্ম ! তুমি শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ইন্দ্রিয় শুদ্ধ রেখে তীর্থ যাত্রা করো এবং পুণ্যবৃদ্ধি করো। শাস্ত্রদর্শী সদ্ব্যক্তিরাই সেই তীর্থাদি প্রাপ্ত হতে পারে। অনিয়মকারী, অসংযমী, অপবিত্র এবং চোর ব্যক্তি এই সকল তীর্থের মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। তুমি সদাচারী, ধর্মজ্ঞ, তোমার ধর্মপালনে সকলেই তৃপ্ত। তুমি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ঋষিদের তীর্থ স্নান করিয়েছ। তোমার শ্রেষ্ঠ লোক এবং মহাকীর্তি লাভ হবে।

ধর্মরাজ ! ভীষ্ম পিতামহকে এই কথা বলে পুলস্ত্যমুনি অন্তর্হিত হলেন। পিতামহ ভীষ্ম তীর্থযাত্রা করলেন। এইভাবে যিনি তীর্থ পরিক্রমা করেন, তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তুমি একা না গিয়ে এই ঋষিদেরও তীর্থে নিয়ে যাবে, তাই তুমি আটগুণ ফল লাভ করবে। বহু তীর্থ রাক্ষসরা বন্ধ করে রেখেছে, সেখানে শুধু তোমরাই যেতে পারো। তীর্থগুলিতে বাল্মীকি, কশ্যপ দত্তাত্রেয়, কুণ্ডজঠর, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ মুনি, উদ্দালক, শৌনক, ব্যাস, শুকদেব, দুর্বাসা, জাবালী প্রমুখ মহা তপস্বী ঋষিগণ তোমার প্রতীক্ষা করছেন। তুমি এঁদের সঙ্গে নিয়ে তীর্থে যাও। পরম তেজস্বী লোমশ মুনিও আসবেন, তাঁকেও নিয়ে যাও, আমিও যাব। তুমি যযাতি ও পুরূরবার মতো যশস্বী, ধর্মাত্মা ! রাজা ভগীরথ এবং লোকাভিরাম রামের ন্যায় রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মনু, ইক্ষ্বাকু, পুরু, পৃথু ও ইন্দ্রের ন্যায় যশস্বী। তুমি শত্রু পরাজিত করে প্রজাপালন করো এবং ধর্মানুসারে সাম্রাজ্য করে কার্তবীর্য অর্জুনের ন্যায় কীর্তিমান হও। যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে নারদ অন্তর্ধান করলেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তীর্থ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

——o——

ধৌম্যের তীর্থাদির বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদের কাছে তীর্থের মাহাত্ম্য শুনে ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের মত জেনে পুরোহিত ধৌম্যের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবান ! আমার তৃতীয় ভ্রাতা অর্জুন বড় ধীর, বীর এবং পরাক্রমী। আমি আমার উদ্যোগী, সাহসী, শক্তিমান অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করার জন্য বনে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি মনে করি অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নর-নারায়ণ রূপ অবতার। ভগবান বেদব্যাসও এই কথা বলে থাকেন। এঁদের দুজনের মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, জ্ঞান, কীর্তি, লক্ষ্মী, বৈরাগ্য এবং ধর্ম—এই ছয়টি ঐশ্বর্য নিত্য অবস্থান করে, তাই তাঁদের ভগবান বলা হয়। স্বয়ং দেবর্ষি নারদও এই কথা বলে তাঁদের প্রশংসা করেন। অর্জুনের শক্তি এবং অধিকার জেনেই আমি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে তাকে অস্ত্রবিদ্যা শেখার জন্য পাঠিয়েছি। কৌরবদের কথা মনে এলেই সর্বপ্রথম পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের নাম মনে আসে। অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যও দুর্জয়। দুর্যোধন প্রথম থেকেই এই মহারথীদের নিজের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সত্য বদ্ধ করে রেখেছে। সূতপুত্র কর্ণও মহারথী এবং দিব্য অস্ত্রাদির প্রয়োগ জানে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে ধনঞ্জয় ইন্দ্রের কাছ থেকে অস্ত্র শিক্ষা করে ফিরে এসে একাই সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করবে। অর্জুন ছাড়া আমাদের আর কেউ সাহায্যকারী নেই। আমরা অর্জুনের পথ চেয়ে এখানে বাস করছি। তার শৌর্য ও সামর্থ্যের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। আমরা সকলেই তার জন্য উদ্বিগ্ন আছি। আপনি দয়া করে এমন এক পবিত্র, রমণীয় স্থানের কথা বলুন, যেখানে অন্ন, ফল, ফুল পর্যাপ্ত পাওয়া যাবে এবং যেখানে পুণ্যাত্মা সৎব্যক্তিরা বসবাস করেন। আমরা সেখানে গিয়ে বসবাস করব এবং অর্জুনের প্রতীক্ষা করব।'

পুরোহিত ধৌম্য বললেন—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে পবিত্র আশ্রম, তীর্থ এবং পর্বতাদির বর্ণনা শোনাচ্ছি। তা শুনে দ্রৌপদীর এবং তোমাদের বিষণ্ণতা দূর হবে। তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ করলে পুণ্য হয়, তারপর যদি সেই তীর্থে যাত্রা করা হয় তাহলে পুণ্য শতগুণ বৃদ্ধি পায়। এখন

আমি আমার স্মৃতি থেকে পূর্বদিকের রাজর্ষি সেবিত তীর্থগুলি বর্ণনা করছি। নৈমিষারণ্য তীর্থের নাম তো তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। সেখানে দেবতাদের পৃথক পৃথক বহু তীর্থ আছে। সেই তীর্থ পরম পবিত্র, পুণ্যপ্রদ এবং রমণীয় গোমতী নদীতীরে অবস্থিত। এ হল দেবতাদের যজ্ঞভূমি এবং বড় বড় দেবর্ষি সেখানে বিরাজ করেন। গয়ার সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, মানুষের বহু পুত্র হলে ভালো, কারণ তাদের মধ্যে একজনও যদি গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অথবা নীল বৃষোৎসর্গ করে তাহলে তার পূর্বতন এবং অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। গয়া ক্ষেত্রে পরম পবিত্র ফল্গু নদী প্রবাহিতা এবং গয়াশীর নামক তীর্থস্থান আছে আর আছে অক্ষয়বট নামে মহাবটবৃক্ষ, এইস্থানে পিণ্ডদান করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। বিশ্বামিত্রের তপস্যার স্থান কৌশিকী নদী, যেস্থানে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন তাও পূর্বদিকেই। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বিশাল ধারাও পূর্বদিকেই প্রবাহিত। তার তীরে রাজা ভগীরথ অনেক বড় বড় যজ্ঞ করেছিলেন। গঙ্গা ও যমুনার জগদ্বিখ্যাত সঙ্গম প্রয়াগ, যা পরম পবিত্র এবং পুণ্য স্থান। বড় বড় ঋষি এখানে বাস করেন। সর্বাত্মা ব্রহ্মা এইস্থানে অনেক যাগ-যজ্ঞ করেছেন। তাই এর নাম প্রয়াগ। অগস্ত্য মুনির সুন্দর আশ্রম এবং বড় বড় তপস্বী পরিপূর্ণ তপোবনও পূর্বদিকেই অবস্থিত। কালঞ্জর পর্বতের ওপর হিরণ্যবিন্দু আশ্রম অবস্থিত। অগস্ত্য পর্বত অত্যন্ত রমণীয়, পবিত্র এবং কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত স্থান। পরশুরামের তপস্যাক্ষেত্র মহেন্দ্র পর্বত, যেখানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন, তাও ওদিকেই, সেখানে বাহুদা এবং নন্দা নামক নদী আছে।

দক্ষিণ দিকে গোদাবরী নামে এক পবিত্র নদী প্রবাহিত। সেই নদীর জল মঙ্গলময় এবং তপস্বীগণ দ্বারা পূজিত। এর তীরে বড় বড় ঋষিদের আশ্রম। বেণা এবং ভাগীরথী নদীর জলও অত্যন্ত পবিত্র। সেইদিকেই রাজা নৃগের পয়োষ্ণী নদী, এই নদীর জল কোনো ভাবে শরীরে স্পর্শ করলে সারাজীবনের পাপ দূর হয়ে যায়। একদিকে গঙ্গা এবং অন্য সব নদী আর অন্য দিকে পয়োষ্ণী নদীকে রাখলে, পয়োষ্ণীই সব থেকে বড় পবিত্র নদী, এই হল আমার অভিমত। দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত পাণ্ড্যতীর্থে অগস্ত্যতীর্থ, বরুণতীর্থ এবং কুমারীতীর্থও অবস্থিত। তাম্রপর্ণী নদী, গোকর্ণ আশ্রম, অগস্ত্য আশ্রমও অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ ও রমণীয়।

সৌরাষ্ট্র দেশে অত্যন্ত মহিমাময় আশ্রম, দেবমন্দির, নদী এবং সরোবর আছে। সৌরাষ্ট্র দেশে প্রভাস তীর্থ জগদ্বিখ্যাত। পিণ্ডারক তীর্থ এবং উজ্জয়ন্ত পর্বতও ওখানে। পুরাণ-পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৌরাষ্ট্র দেশেই দ্বারকাতে বাস করেন। তিনি সনাতন ধর্মের মূর্তিমান স্বরূপ—বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মাগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এ কথাই বলে থাকেন। কমলনেত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পবিত্রদের মধ্যে পবিত্র, পুণ্যের মধ্যেও পুণ্য, মঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল এবং দেবতাদের মধ্যে দেবতা। ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম—তিনিই সব। তাঁর স্বরূপ অচিন্ত্য এবং অনির্বচনীয়। এই প্রভুই দ্বারকাতে বাস করেন। পশ্চিম দিকে আনর্ত দেশের অন্তর্গত বহু পবিত্র এবং পুণ্যপ্রদ দেবমন্দির এবং তীর্থ আছে। এখানেই পুণ্যসলিলা নদী নর্মদা, এর গতি পশ্চিম দিকে। তার তীরে বড় সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ, উপবন এবং জঙ্গল আছে। তিন লোকের পবিত্র তীর্থ, দেবমন্দির, নদী, বন, পর্বত, ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি-মহর্ষি, সিদ্ধ-চারণ এবং বহু পুণ্যাত্মা দেবতা এখানে নর্মদার পবিত্র জলে স্নান করার জন্য প্রত্যহ আসেন। নর্মদার তীরেই বিশ্রবা মুনির আশ্রম, সেখানে কুবেরের জন্ম হয়েছিল। বৈদুর্য শিখর পর্বতও নর্মদা তীরে অবস্থিত। ওইদিকে কেতুমালা, মেধ্যা নদী এবং গঙ্গাদ্বার—এই তিন তীর্থ অবস্থিত। সৈন্ধবারণ্য নামক পবিত্র অরণ্যে অনেক তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করেন। ব্রহ্মার পুণ্যদায়ক সরোবর পুষ্করও এখানেই অবস্থিত। এটি কর্মমার্গ ত্যাগ করে জ্ঞানমার্গে আরোহণকারী ঋষিদের পবিত্র আশ্রম। এঁদের সম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন যে, যেসব মননশীল ব্যক্তি মনে মনে পুষ্কর তীর্থ যাওয়ার অভিলাষ করেন, তাঁদের সমস্ত পাপনাশ হয় এবং অন্তকালে স্বর্গলাভ হয়।

উত্তর দিকে পরম পবিত্র সরস্বতী নদীর তীরে বহু তীর্থ আছে। এই উত্তরদিকেই যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থল। প্লক্ষাবতরণ নামের মঙ্গলময় তীর্থে যজ্ঞ করে যদি সরস্বতী নদীতে অবভৃথস্নান করা হয়, তাহলে স্বর্গলাভ হয়। অগ্নি শির তীর্থও ওইখানেই। সরস্বতী নদীর তীরে বালখিল্য ঋষিরা যজ্ঞ করেছিলেন। সৎ ব্যক্তিরা তার মহিমা বর্ণনা করেন। দৃষদ্বতী নদী, ন্যগ্রোধ, পাঞ্চাল্য, দাল্‌ভ্য ঘোষ এবং দালভ্য নামক আশ্রমও ওখানেই। উত্তরের পর্বতগুলির মধ্যে থেকে গঙ্গা প্রবাহিত, সেই স্থানটিকে বলা হয় গঙ্গাদ্বার, সেখানে অনেক স্বনামধন্য ব্রহ্মর্ষি বসবাস করেন। কনখল সনৎ কুমারের নিবাসস্থান। পুরু পর্বতও

সেইখানে, ভৃগুমুনির তপস্যার স্থান ভৃগুতুঙ্গ মহাপর্বতও এখানেই অবস্থিত।

ভগবান নারায়ণ সর্বজ্ঞ, সর্ব ব্যাপক, সর্বশক্তিমান এবং পুরুষোত্তম। তাঁর কীর্তি সর্বদা মঙ্গলময়। বদরিকাশ্রমের কাছে তাঁর বিশালা নামে নগরী। এই নগরী তিন লোকে পরম পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। বদরিকাশ্রমের কাছে পূর্বে ঠাণ্ডা ও গরমজলের গঙ্গাধারা প্রবাহিত ছিল। তাতে স্বর্ণবালি ঝলমল করত। বড় বড় ঋষি, মুনি, দেব দেবী ভগবান নারায়ণকে প্রণাম করতে সেই আশ্রমে যেতেন। স্বয়ং পরমাত্মার নিবাসস্থল হওয়ায় সেই তীর্থে জগতের সমস্ত তীর্থ ও দেব-মন্দিরের বাসস্থান। এই পুণ্য ক্ষেত্র, তীর্থ এবং তপোবন পরমব্রহ্মস্বরূপ। কারণ দেবাদিদেব নিখিললোক মহেশ্বর পরমেশ্বর স্বয়ং এই আশ্রমে বসবাস করেন। পরমাত্মার পরম স্বরূপ যিনি চিনে নেন, তাঁর কখনো কোনোপ্রকার শোক হয় না। ভগবানের নিবাসস্থল বিশালাতে বড় বড় সিদ্ধ, তপস্বী এবং দেবর্ষিগণ বসবাস করেন। এই বদরিকাশ্রম তীর্থ অন্যান্য তীর্থের থেকে পরম পবিত্র। ধর্মরাজ ! তুমি উত্তম ব্রাহ্মণ এবং ভাইদের নিয়ে তীর্থ যাত্রা করো। তোমার মনের দুঃখ দূর হবে এবং অভিলাষ পূর্ণ হবে। পুরোহিত ধৌম্য যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ আলোচনা করছিলেন, সেইসময় পরম তেজস্বী লোমশ মুনি দর্শন দিলেন।

লোমশ মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের সংবাদ পাণ্ডবদের প্রদান, ব্যাস ও অন্যান্যদের আগমন এবং পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রা আরম্ভ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ, ব্রাহ্মণ, সেবক সকলেই লোমশ মুনির অভ্যর্থনা করতে হাজির হলেন। সেবা ও আপ্যায়নের পরে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী ?' লোমশ মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মধুর স্বরে বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! আমি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। এর মধ্যে আমি একবার ইন্দ্রলোকে গিয়েছিলাম, সেখানে আমি দেখলাম দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের অর্ধাংশে তোমার ভাই অর্জুন উপবেশন করে আছে। আমি দেখে খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম। দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন—'দেবর্ষি ! তুমি পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে অর্জুনের কুশল সমাচার জানাও'। সেইজন্য আমি তোমাদের কাছে এসেছি। আমি তোমাদের মঙ্গলের কথা বলছি, তোমরা সকলে সাবধানে শোন। তোমাদের অনুমতি নিয়ে অর্জুন যে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করতে গিয়েছিল, তা সে শিবের কাছ থেকে পেয়ে গেছে। ভগবান শংকর অমৃতের কাছ থেকে এই দিব্য অস্ত্র লাভ করেছিলেন, সেটিই অর্জুনকে দিয়েছেন। তার প্রয়োগ এবং প্রত্যাহারও অর্জুন শিখে নিয়েছে। এর দ্বারা যদি নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত অর্জুন জেনে নিয়েছে। এই অস্ত্রে ভস্মীভূত হওয়া বন-উপবন অর্জুন আবার ফলে-ফুলে ভরিয়ে তুলতে সক্ষম। এই অস্ত্র নিবারণ করার কোনো উপায় নেই। মহাপরাক্রমশালী অর্জুন দিব্য

অস্ত্রের সঙ্গে যম, কুবের, বরুণ এবং ইন্দ্রের কাছ থেকেও দিব্য অস্ত্রশস্ত্রাদি লাভ করেছে। বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেন গন্ধর্বের কাছ থেকে অর্জুন সামগান, নৃত্য-গীত-বাদ্য ইত্যাদিও ভালোভাবে শিক্ষা করেছে। গান্ধর্ববেদ শিক্ষা-গ্রহণের পরে অর্জুন এখন অমরাবতীপুরীতে আনন্দে বাস করছে। ইন্দ্র তোমার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে বলেছে, 'যুধিষ্ঠির ! তোমার ভাই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হয়েছে, ওর

এখন এখানে নিবাতকবচ নামক অসুরকে বধ করতে হবে। এই কাজ এত কঠিন যে অনেক বড় বড় দেবতাও করতে সক্ষম হয়নি। অসুর বধ করেই অর্জুন তোমার কাছে চলে যাবে। তুমি তোমার অন্য ভাইদের সঙ্গে তপস্যা করে আত্মবল অর্জন করো। তপস্যার থেকে বড় কিছু নেই। তপস্যার দ্বারাই মানুষ মোক্ষ ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। আমি কর্ণ ও অর্জুন দুজনকেই জানি। আমি জানি তোমার মনে কর্ণের ভয় রয়েছে, কিন্তু আমি স্পষ্ট করে তোমায় জানাচ্ছি যে, কর্ণ শৌর্য-বীর্যে অর্জুনের ষোল আনার এক আনাও নয়। তোমার মনে তীর্থযাত্রার যে সংকল্প রয়েছে, লোমশ মুনি তা পূর্ণ করার জন্য তোমাকে সাহায্য করবেন।' ইন্দ্রের সংবাদ জানিয়ে লোমশ বললেন—যুধিষ্ঠির ! তখন অর্জুন আমাকে বলল—'তপোধন ! আপনি ধর্মজ্ঞ এবং তপস্বী ; আপনার কাছে রাজধর্ম বা মনুষ্যধর্ম কিছুই অগোচরে নেই। আপনি আমার ভাইকে এমন উপদেশ দেবেন, যাতে তিনি ধর্মের পুঁজি একত্রিত করেন। আপনি এঁদের তীর্থযাত্রার সহায়ক হয়ে পুণ্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করুন।' সুতরাং ইন্দ্র এবং অর্জুনের প্রেরণায় আমি তোমাদের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করব। আমি আগে আরও দুবার তীর্থযাত্রা করেছি, এই নিয়ে তৃতীয়বার যাত্রা হবে। যুধিষ্ঠির তুমি স্বভাবতই ধার্মিক ; ধর্মজ্ঞ এবং সত্যনিষ্ঠ। তীর্থযাত্রার প্রভাবে তুমি সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তিলাভ করবে। রাজা ভগীরথ, গয় এবং যযাতি যেমন জগতে যশস্বী এবং বিজয়ী হয়েছেন, তুমিও তাই হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—মহর্ষি ! আপনার কথায় আমি অত্যন্ত সুখী হলাম। আপনাকে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। দেবরাজ ইন্দ্র যাঁকে স্মরণ করেন, তাঁর থেকে বেশি ভাগ্যবান আর কে হতে পারে ! যে ব্যক্তি আপনার মতো সৎব্যক্তির সংস্পর্শ লাভ করেছে, যার অর্জুনের মতো ভাই আছে, যার ওপর ইন্দ্রের কৃপা বর্ষিত হয়, সে যে ভাগ্যবান হবে তাতে সন্দেহ কীসের ? দেবরাজ ইন্দ্র আপনার মারফৎ আমাকে যে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তা আমি আগেই আচার্য ধৌম্যের কথা অনুসারে চিন্তা করেছিলাম। এখন আপনি যখন আদেশ দিচ্ছেন, তখন আপনার সঙ্গেই আমরা তীর্থযাত্রা করব। আমি তাই স্থির করেছি, আপনি আদেশ করুন।

তিন রাত কাম্যক বনে বাস করার পর যুধিষ্ঠির তীর্থে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই সময় বনবাসী ব্রাহ্মণগণ

এসে তাঁকে বললেন—'মহারাজ ! আপনি লোমশ মুনির সঙ্গে ভাইদের নিয়ে তীর্থে যাচ্ছেন, আমাদেরও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, কেননা আপনি না নিয়ে গেলে আমরা যেতে পারি না। হিংস্র পশু-পাখির জন্য এবং দুর্গম জঙ্গল পথে যেতে হয় বলে সাধারণ মানুষ প্রায়শই তীর্থে যেতে পারে না। আপনার পরাক্রমশালী ভ্রাতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা সহজেই তীর্থযাত্রা করতে পারব। আপনার তো ব্রাহ্মণদের ওপর স্বাভাবিকভাবে প্রীতি আছে, তাই আমরা আপনাদের সঙ্গে প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্র আদি পর্বত এবং গঙ্গা আদি নদী এবং অক্ষয় বট ইত্যাদি বৃক্ষ দর্শন করে কৃতার্থ হব।' বনবাসী ব্রাহ্মণরা এইরূপ প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললে, তাঁর চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল, তিনি বললেন, 'খুব ভালো, আপনারাও চলুন।' ধর্মরাজ যখন লোমশ মুনি এবং আচার্য ধৌম্যের সম্মতি অনুসারে ভ্রাতাদের এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে তীর্থযাত্রা স্থির করেন, তখন ভগবান বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ এবং পর্বত মুনি কাম্যক বনে এলেন। যুধিষ্ঠির সবাইকে শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে পূজা করলেন। তাঁরা বললেন—শারীরিক শুদ্ধি এবং মানসিক শুদ্ধি, দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। মনের শুদ্ধিই পূর্ণ শুদ্ধি। সুতরাং তোমরা এখন কারো প্রতি দ্বেষবুদ্ধি না রেখে মিত্রবুদ্ধি রাখো। এতে তোমাদের

মানসিক শুদ্ধি হবে। তারপর তীর্থযাত্রা করো। ঋষিদের কথা শুনে পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাঁরা তাই করবেন। দিব্যমানব এবং মুনিরা স্বস্তিবাচন করলেন। পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী সব মুনিঋষিদের প্রণাম করলেন। অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার পর পুণ্য নক্ষত্রে পুরোহিত ধৌম্য এবং বনবাসী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁরা তীর্থযাত্রা শুরু করলেন। তখন সকলে হাতে লাঠি নিয়েছেন, পুরাতন বস্ত্র বা মৃগচর্ম পরিহিত, মস্তকে জটা, শরীর অভেদ্য কবচে ঢাকা, হাতে অস্ত্র, কোমরে তরোয়াল, কাঁধে বাণভর্তি তূণীর এবং ইন্দ্রসেন ইত্যাদি সেবক পিছনে পিছনে চলেছেন।

———o———

নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ ও গয়াযাত্রা এবং অগস্ত্য আশ্রমে মহর্ষি লোমশের অগস্ত্য-লোপামুদ্রার কথা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! বীর পাণ্ডবগণ তাঁদের সাথীদের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে নৈমিষারণ্যে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা গোমতী নদীতে স্নান করে বহু ধন রত্ন এবং গাভী দান করলেন। তারপর দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং ব্রাহ্মণদের তৃপ্ত করে তাঁরা কন্যাতীর্থ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ, কালকোটি এবং বিষপ্রস্থ পর্বতে বাস করে বাহুদা নদীতে স্নান করলেন। সেখান থেকে তাঁরা দেবতাদের যজ্ঞভূমি প্রয়াগে পৌঁছলেন। প্রয়াগে স্নান করে তাঁরা ব্রাহ্মণদের বহু ধন দান করলেন। তারপর তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদীতে গেলেন। এখানে বহু তপস্বী বাস করতেন। সেখানে পাণ্ডবগণ তপস্যা করলেন এবং ব্রাহ্মণদের বনের ফল-মূল-কন্দ দ্বারা তৃপ্ত করে গয়াতে উপস্থিত হলেন। এখানে গয়াশির নামক পর্বত এবং বেতবন পরিবেষ্টিত অতি রমণীয় মহানদী নামে এক নদী আছে। সেখানে ঋষিজন সেবিত পবিত্র শিখর সমন্বিত ধরণীধর নামক পর্বত অবস্থিত। সেই পর্বতের ওপর ব্রহ্মসর নামক এক অতি পবিত্র তীর্থ আছে, যেখানে সনাতন ধর্মরাজ স্বয়ং বাস করেন। ভগবান অগস্ত্যও সেখানে সূর্যপুত্র যমরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। পিনাকধারী মহাদেবও এই তীর্থে নিত্য নিবাস করেন। এই দেশে হাজার হাজার তপস্বী ব্রাহ্মণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করলেন। এই বিপ্রপ্রবর বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞাতা এবং বিদ্যা ও তপস্যায় পারঙ্গম ছিলেন। তাঁরা সভা করে শাস্ত্রচর্চাও করলেন।

সেই সভায় শমঠ নামে এক বিদ্বান এবং সংযমী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি অমূর্তরয়ার পুত্র রাজর্ষি গয়ের চরিত্র শোনালেন। তিনি বললেন—মহারাজ গয় এখানে অনেক পুণ্য কর্ম করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞে পক্বান্ন এবং দক্ষিণার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। অন্নের পর্বত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ঘৃতের নালা এবং দধির নদী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। উত্তম ব্যঞ্জনের সারি লেগে গিয়েছিল। রন্ধনকারীদের প্রতিদিন মুক্ত হস্তে দান করা হত। যেমন বালিকণা, আকাশের তারা এবং বর্ষার বারিধারা কেউ গুণতে পারে না, তেমনই গয়ের যজ্ঞে প্রদত্ত দক্ষিণাও গণনা করা সম্ভব হত না। কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির ! এই সরোবরের সন্নিকটেই রাজর্ষি গয়ের অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এইভাবে গয়াশিরক্ষেত্রে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করে, ব্রাহ্মণদের বহু দক্ষিণা দিয়ে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অগস্ত্য আশ্রমে এলেন। সেখানে লোমশ ঋষি তাঁকে বললেন—কুরুনন্দন ! একবার ভগবান অগস্ত্য একটি গর্তে তাঁর পিতৃপুরুষদের মাথা নীচু করে ঝুলতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

'আপনারা কেন এইভাবে মাথা নীচু করে ঝুলে আছেন ?' সেই বেদবাদী মুনিরা উত্তর দিলেন—'আমরা তোমার পিতৃপুরুষ, পুত্র হওয়ার আশায় আমরা এইভাবে মাথা ঝুলিয়ে আছি। পুত্র, অগস্ত্য ! তোমার যদি একটি পুত্র হয়, তাহলে এই নরক থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব। তুমিও সদ্গতি লাভ করবে।' অগস্ত্য অত্যন্ত তেজস্বী এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পিতৃপুরুষদের বললেন—'পিতৃগণ ! আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব।'

পিতৃপুরুষগণকে কথা দিয়ে ভগবান অগস্ত্য চিন্তা করলেন যে, বংশধারা যাতে উচ্ছেদ না হয় তার জন্য বিবাহ করা প্রয়োজন। কিন্তু কোনো নারীই তাঁর অনুরূপ বলে মনে হচ্ছিল না। তিনি তখন বিদর্ভ দেশের রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! পুত্র উৎপাদনের জন্য আমার বিবাহ করা প্রয়োজন। আপনার কন্যা লোপামুদ্রাকে আপনার কাছ থেকে পেতে চাই। আমার সঙ্গে আপনি তাঁর বিবাহ দিন।'

অগস্ত্য মুনির কথা শুনে রাজার অত্যন্ত চিন্তা হল, তিনি অস্বীকার করতেও পারলেন না আবার কন্যা দেবার কথাও ভাবতে পারলেন না। তিনি মহারানির কাছে গিয়ে সব জানিয়ে বললেন—'প্রিয়ে ! মহর্ষি অগস্ত্য অত্যন্ত তেজস্বী। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলে আমরা ভস্ম হয়ে যাব। বলো, এখন তোমার কী মত ?' রাজা-রানিকে দুঃখে কাতর দেখে রাজকন্যা লোপামুদ্রা এসে বলল, 'পিতা ! আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমাকে অগস্ত্য মুনির হাতে সমর্পণ করুন। তাতে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে।'

কন্যার কথা শুনে রাজা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গে লোপামুদ্রার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত্নীকে বললেন—'দেবী ! তুমি এই বহু মূল্য বস্ত্রালংকার ত্যাগ করো।' লোপামুদ্রা তখনই তাঁর বস্ত্র অলংকার খুলে চীর ও বৃক্ষছাল ও মৃগচর্ম ধারণ করে পতির ন্যায় ব্রত ও নিয়ম পালন করতে লাগলেন। তারপর ভগবান অগস্ত্য হরিদ্বার ক্ষেত্রে এসে অনুগত পত্নীকে নিয়ে ঘোর তপস্যায় রত হলেন। লোপামুদ্রা অত্যন্ত প্রেম ও তৎপরতা সহ পতির সেবা করতেন, ভগবান অগস্ত্যও তাঁর পত্নীর সঙ্গে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করতেন।

রাজন্ ! এইভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন ঋষি অগস্ত্য ঋতুস্নান থেকে নিবৃত্ত হওয়া লোপামুদ্রাকে দেখলেন। তপঃ প্রভাবে লোপামুদ্রার দেহের কান্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর সেবা, পবিত্রতা, সংযম, কান্তি এবং রূপমাধুরী তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সমাগমের জন্য আবাহন করলেন। লোপামুদ্রা তখন সংকুচিত হয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'মুনিবর ! পতি যে সন্তানের জন্যই পত্নীকে স্বীকার করেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার প্রতি আপনার যে প্রীতি, তাকেও সার্থক করা উচিত। আমার ইচ্ছা যে, আমি পিতার মহলে যেরূপ সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে থাকতাম, এখানেও তেমন করেই থাকি এবং তখনই আপনার সঙ্গে আমার সমাগম হবে। আপনিও সেইরূপ বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হোন। এই কষায়বস্ত্র পরিহিত হয়ে আমি সমাগমে লিপ্ত হব না। এই বস্ত্র তপস্যার জন্য তৈরি হয়েছে, একে অন্য কোনো প্রকারে ব্যবহার করা উচিত নয়।' অগস্ত্য বললেন—'লোপামুদ্রা, তোমার পিতৃগৃহে যে অর্থ আছে, তা তোমার কাছেও নেই, আমার কাছেও নেই। তাহলে কীকরে বসন ভূষণ পরা সম্ভব ?' লোপামুদ্রা বললেন—'তপোধন ! ইহলোকে যত অর্থ-সম্পদ আছে, আপনার তপঃ প্রভাবে তা আপনি এক মুহূর্তেই প্রাপ্ত করতে পারেন।' অগস্ত্য মুনি বললেন—'প্রিয়ে ! তুমি যা বলছ, তা ঠিকই, কিন্তু এরূপ করা তপস্বীদের ধর্ম নয়। তুমি এমন কিছু বলো যাতে আমার তপস্যা ক্ষয় না হয়।' লোপামুদ্রা বললেন—'ভগবান ! আমি আপনার তপস্যা নষ্ট করতে চাই না। অতএব আপনি তা রক্ষা করেই আমার কামনা পূর্ণ করুন।' অগস্ত্য তখন বললেন—'সুভদ্রে ! তুমি যদি মনে মনে ঐশ্বর্য ভোগ করবে স্থির করে থাক, তাহলে তুমি এখানে থেকেই তোমার ইচ্ছানুসারে ধর্ম আচরণ করো, আমি তোমার জন্য ধন আহরণে লোকালয়ে যাচ্ছি।'

লোপামুদ্রাকে এই কথা বলে মহর্ষি অগস্ত্য অর্থ আনতে মহারাজ শ্রুতর্বার কাছে গেলেন। তাঁর আসার সংবাদ পেয়ে মহারাজ শ্রুতর্বা তাঁকে আহ্বান করতে মন্ত্রীদের নিয়ে রাজ্যের সীমানায় এলেন এবং তাঁকে সসম্মানে নগরে নিয়ে গিয়ে যথাবিহিত পূজা-অর্চনা করলেন। পরে হাত জোড় করে বিনীতভাবে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। অগস্ত্য মুনি বললেন, 'রাজন্ ! আমি অর্থ পাবার আশায় এখানে এসেছি। অতএব অন্যকে কষ্ট না দিয়ে আপনি যে ধন আহরণ করেছেন, তার থেকে কিছু আমাকে প্রদান করুন।'

ঋষি অগস্ত্যের কথা শুনে রাজা তাঁর সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব তাঁর কাছে এনে দিলেন এবং বললেন এর থেকে আপনি যা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন, তা নিয়ে নিন। অগস্ত্য দেখলেন সেই হিসাবে যত্র আয় তত্র ব্যয় দেখানো আছে, তিনি ভাবলেন যে, এর থেকে সামান্য কিছু নিলেও এদের অসুবিধা হবে। তাই তিনি সেখান থেকে কিছুই নিলেন না। তারপর ঋষি অগস্ত্য শ্রুতর্বাকে সঙ্গে করে ব্রধ্নশ্বরের কাছে গেলেন। তিনিও রাজ্যের প্রান্ত থেকে এঁদের দুজনকে আহ্বান করে নিজ প্রাসাদে নিয়ে গেলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অগস্ত্য মুনি বললেন—'রাজন্ ! আমরা দুজনে আপনার কাছ থেকে কিছু অর্থ পাবার আশায় এসেছি, আপনি অন্যকে কষ্ট না দিয়ে যে অর্থ আহরণ করেছেন, তার থেকে যথাসম্ভব আমাকে দিন।' অগস্ত্যের কথা শুনে রাজা তাঁকে আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে বললেন—'এর মধ্যে যা উদ্বৃত্ত আছে তা আপনি নিয়ে নিন।' সমদৃষ্টি সম্পন্ন অগস্ত্য দেখলেন এর থেকে কিছু অর্থ নিলে এখানকার লোকেরা অসুবিধায় থাকবে। তাই তিনি এখান থেকেও অর্থ নেওয়ার সংকল্প ত্যাগ করলেন। তারপর তিনজনে মিলে পুরুকুৎসের পুত্র মহা ধনবান রাজা ত্রসদস্যুর কাছে গেলেন। ইক্ষ্বাকু কুলভূষণ মহারাজ ত্রসদস্যুও তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এখানেও আয় ব্যয়ের হিসাব দেখে তাঁরা কোনো ধন নিলেন না।

তখন সব রাজারা একসঙ্গে আলোচনা করে বললেন, 'মুনিবর ! এখন জগতে ইল্বল নামে এক মহাধনবান দৈত্য আছে।' তাঁরা সকলে মিলে ইল্বলের কাছে গেলেন। ইল্বল ঋষি অগস্ত্য আসছেন জেনে মন্ত্রীদের নিয়ে রাজ্যসীমানা থেকে তাঁদের আহ্বান করে নিয়ে এলেন। তারপর আদর আপ্যায়নের পরে হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা এখানে কৃপা করে কেন এসেছেন ; বলুন, আমি আপনাদের কী সেবা করতে পারি ?' অগস্ত্য মৃদুহাস্যে বললেন—'অসুররাজ ! আমি আপনাকে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ধনকুবের বলে জানি। আমার সঙ্গে যে রাজারা এসেছেন, এঁরা তত ধনী নন ; কিন্তু আমার অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং অন্যকে কষ্ট না দিয়ে আপনার যে ন্যায়সম্মত অর্থ আছে, তার থেকে যথাশক্তি আমাকে প্রদান করুন।' এই কথা শুনে ইল্বল মুনিকে প্রণাম করে বললেন—'মুনিবর ! আমি আপনাকে কত ধন দিতে চাই, আপনি যদি আমার এই মনোভাব বলতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে ধন দিয়ে দেব।' অগস্ত্য বললেন—'অসুররাজ ! তুমি প্রত্যেক রাজাকে দশহাজার গোধন এবং ততই স্বর্ণমুদ্রা এবং আমাকে তার দ্বিগুণ গোধন ও স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি স্বর্ণ রথ এবং মনের মতো বেগবান দুটি ঘোড়া প্রদানের ইচ্ছা করেছ। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ এই সামনের রথটি সোনারই।' এই কথা শুনে দৈত্য তাঁকে বহু ধন-বস্ত্র দিলেন। সেই রথে বিরাব এবং সুরাব নামে দুটি অশ্ব জুতে অতি শীঘ্র সমস্ত সম্পদ এবং রাজাদের নিয়ে সেটি অগস্ত্যমুনিকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এল। তারপর ঋষি অগস্ত্যের অনুমতি নিয়ে রাজারা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অগস্ত্য মুনি তাঁর পত্নী লোপামুদ্রার সমস্ত কামনা পূর্ণ করলেন।

তখন লোপামুদ্রা বললেন—'মুনিবর ! আপনি আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ করেছেন। আপনি এখন আমার গর্ভে এক পরাক্রমশালী পুত্র উৎপন্ন করুন।' অগস্ত্য বললেন—'সুন্দরী ! আমি তোমার সদাচারে সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই

তোমার সন্তানের ব্যাপারে আমার যা চিন্তা, তা বলছি শোন। বলো, তোমার সহস্র পুত্র চাই, না সহস্র পুত্রের সমান শতপুত্র চাই, অথবা শত পুত্র সম দশ পুত্র চাই ? অথবা সহস্রব্যক্তিকে পরাস্ত করার মতো শুধু একটি পুত্র চাই ?' লোপামুদ্রা বললেন, 'তপোধন ! আমি সহস্রব্যক্তিকে পরাস্ত করার মতো একটি পুত্রই শুধু চাই। বহু অযোগ্য পুত্রের থেকে একটি মাত্র যোগ্য সর্বগুণ সম্পন্ন পুত্রই কাম্য।'

মুনিবর তাতে সম্মত হয়ে ঋতুকাল এলে সহধর্মিণীর সঙ্গে সমাগম করলেন। গর্ভাধান হলে তিনি বনে চলে গেলেন। তিনি বনে যাওয়ার পর সাত বছর ধরে সেই সন্তান গর্ভেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। সাত বছর সমাপ্ত হলে লোপামুদ্রার গর্ভ হতে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তেজস্বী পুত্র জন্মাল, যার নাম দৃঢ়স্যু। সে পরম তপস্বী এবং সমস্ত বেদ এবং উপনিষদ কণ্ঠস্থ করেছিল। তার জন্ম হলে ঋষি অগস্ত্যের পিতৃপুরুষ তাঁদের অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হলেন। তখন থেকে পৃথিবীতে এই স্থান 'অগস্ত্যাশ্রম' নামে প্রসিদ্ধ। রাজন্ ! এই আশ্রম বহু রমণীয় গুণ সম্পন্ন। দেখুন, এর নিকট দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত। বড় বড় দেবতা এবং গন্ধর্বগণ এর পূজা করেন। এই ভৃগুতীর্থ ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ। ভগবান শ্রীরাম ভৃগুনন্দন পরশুরামের তেজ হরণ করেছিলেন। এই তীর্থে স্নান করে পরশুরাম তা পুনঃ প্রাপ্ত করেন। এখন দুর্যোধনও আপনার তেজ হরণ করেছেন, সুতরাং আপনিও এই তীর্থে স্নান করে সেই তেজ প্রাপ্ত করুন।

পরশুরামের তেজহীন হওয়া এবং তা পুনরায় ফিরে পাওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি লোমশের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভাইদের এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে সেই তীর্থে স্নান করে পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। এই তীর্থে স্নান করায় তাঁদের তেজস্বী দেহ আরও কান্তিমান প্রতীত হতে লাগল এবং শত্রুদের কাছে দুর্জয় হয়ে উঠল। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তারপর মহর্ষি লোমশকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান ! কৃপা করে বলুন পরশুরামের দেহের তেজ কেন ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল এবং কীভাবে তিনি তা ফিরে পেলেন।'

লোমশ মুনি বললেন—মহারাজ ! আমি আপনাকে ভগবান শ্রীরাম এবং মতিমান্ পরশুরামের কাহিনী শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন। মহাত্মা দশরথের গৃহে পুত্ররূপে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত রামাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দশরথনন্দন রাম বাল্যকালেই নানা অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। তাঁর সুযশ শুনে মহাপরাক্রমী পরশুরাম অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তাঁর ক্ষত্রিয় সংহারকারী দিব্য ধনুক নিয়ে রামের পরাক্রম পরীক্ষা করে দেখার জন্য অযোধ্যা নগরীতে এলেন। দশরথ তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে রামের নেতৃত্বে লোক পাঠালেন রাজ্যের সীমানা থেকে তাঁকে আহ্বান করে আনার জন্য। শ্রীরামের প্রসন্নবদন এবং অস্ত্রসজ্জিত মূর্তি দেখে পরশুরাম বললেন, 'রাজকুমার ! আমার এই ধনুক কালের ন্যায় করাল, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে এতে গুণ চড়াও।' শ্রীরাম পরশুরামের হাত থেকে সেই দিব্য ধনুক নিয়ে অনায়াসে তাতে গুণ চড়ালেন। তারপর স্মিত হেসে তাতে টংকার দিলেন। সেই শব্দে সমস্ত প্রাণী এত ভীত সন্ত্রস্ত হল, যেন তাদের মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। তারপর তিনি পরশুরামকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! এই নিন, আপনার ধনুকে গুণ চড়িয়েছি, আর কী সেবা করব ?' পরশুরাম তখন তাঁকে একটি বাণ দিয়ে বললেন—'এটি ধনুকে রেখে কান পর্যন্ত টেনে দেখাও।'

একথা শুনে শ্রীরাম বললেন—'ভৃগুনন্দন ! আপনাকে খুব অহংকারী মনে হচ্ছে। আমি আপনার কথা শুনেও না শোনার ভান করছি। আপনি আপনার পিতামহ ঋচীকের কৃপায় ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করে এই তেজ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাই বোধহয় আপনি আমাকে অপমান করছেন। আমি আপনাকে দিব্য নেত্র প্রদান করছি, তার সাহায্যে আপনি আমার স্বরূপ অবলোকন করুন।' ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম দিব্য চক্ষুর দ্বারা ভগবান শ্রীরামের শরীরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, পিতৃপুরুষ, অগ্নি, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ, নদী, তীর্থ, বালখিল্যাদি ব্রহ্মভূত সনাতন মুনিবর, দেবর্ষি এবং সম্পূর্ণ সমুদ্র ও পর্বতগুলিকে দেখতে পেলেন। তাছাড়াও তিনি শ্রীরামের মধ্যে উপনিষদাদি সহ বেদ, বষট্কার এবং যাগ-যজ্ঞাদি-সহ সজীব সামশ্রুতি এবং ধনুর্বেদ ও মেঘ-বর্ষা-বিদ্যুৎও দেখতে পেলেন। তারপর ভগবান শ্রীরাম সেই বাণ ছুঁড়লে

বড় বড় আগুনের গোলার সঙ্গে বজ্রপাত হতে লাগল ; সমস্ত ভূমণ্ডল ধুলো এবং মেঘে ছেয়ে গেল। পৃথিবী কাঁপতে লাগল এবং সর্বত্র ভয়ংকর আওয়াজ হতে লাগল। শ্রীরামের হস্তনিক্ষিপ্ত সেই বাণ পরশুরামকেও ব্যাকুল করে তুলল এবং পরশুরামের তেজ হরণ করে পুনরায় শ্রীরামের কাছে ফিরে এল। যখন পরশুরামের চেতনা ফিরে এল, তখন যেন তাঁর প্রাণসঞ্চার হল এবং তিনি ভগবান বিষ্ণুর অংশরূপ শ্রীরামকে প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীরামের অনুমতি নিয়ে শ্রান্ত এবং লজ্জিত হয়ে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এইভাবে এক বছর কেটে যাওয়ার পর যখন তাঁর পিতৃব্যগণ দেখলেন যে, পরশুরাম তেজহীন অবস্থায় রয়েছেন, তাঁর সমস্ত অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে এবং তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রয়েছেন, তখন তাঁরা বললেন—'বৎস ! তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর প্রতি যে আচরণ করেছ, তা ঠিক নয়। ইনি ত্রিলোকে সর্বদা পূজনীয় এবং শ্রেষ্ঠ। এখন তুমি বধূসরকৃতা নামক পুণ্য নদীতে স্নান কর। সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু দীপ্তোদ নামক তীর্থে ঘোর তপস্যা করেছিলেন। এতে স্নান করলে তোমার দেহ পুনরায় তেজঃপূর্ণ হবে।'

পিতৃপুরুষের কথায় পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করলেন, ফলে তাঁর অপহৃত তেজ পুনঃপ্রাপ্ত হল। মহারাজ ! পরমপরাক্রমশালী পরশুরাম এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যুদ্ধে আহ্বান করে তাঁর তেজ হারিয়েছিলেন, এই তীর্থে স্নান করে তা পুনরায় ফিরে পান।

—o—

বৃত্রবধ এবং অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণ করার কাহিনী

যুধিষ্ঠির বললেন—বিপ্রবর ! আমি মহামতি ঋষি অগস্ত্যের অদ্ভুত কর্মকাণ্ডগুলি সবিস্তারে শুনতে চাই।

মহর্ষি লোমশ বললেন—রাজন্ ! আমি পরম তেজস্বী ঋষি অগস্ত্যের অত্যন্ত দিব্য, অদ্ভুত এবং অলৌকিক কাহিনী শোনাচ্ছি ; তুমি মন দিয়ে শোন। সত্যযুগে কালকেয় নামে ভয়ংকর রণবীর দৈত্যগণ বাস করত। তারা বৃত্রাসুরের অধীনে থেকে নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ইন্দ্রাদি সকল দেবতাকে আক্রমণ করল। সকল দেবতা একত্রে বৃত্রাসুর বধের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দেখে বললেন—'দেবগণ ! তোমরা যা করতে চাও, তা আমার অজানা নেই। আমি তোমাদের বৃত্রাসুরকে বধের উপায় জানাচ্ছি। পৃথিবীতে দধীচি নামে এক উদার হৃদয় মহর্ষি আছেন। তোমরা সকলে গিয়ে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করো। তিনি প্রসন্ন হয়ে যখন তোমাদের বর দিতে চাইবেন, তখন তাঁকে বলবে যে, 'মুনিবর ! ত্রিলোকের হিতের জন্য আপনি আপনার অস্থি আমাদের প্রদান করুন।' তখন তিনি দেহত্যাগ করে তোমাদের নিজ অস্থি প্রদান করবেন। তাঁর অস্থি দিয়ে তোমরা ছয় দন্তবিশিষ্ট এক ভয়ংকর সুদৃঢ় বজ্র তৈরি করবে। সেই বজ্রের সাহায্যেই ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করতে সক্ষম হবে। আমি তোমাদের সব জানিয়ে দিলাম। এখন শীঘ্র উদ্যোগী হও।'

ব্রহ্মার এই কথায় সব দেবতা তাঁর অনুমতি নিয়ে সরস্বতী নদীর অপর পারে দধীচি ঋষির আশ্রমে এলেন। আশ্রমটি নানাপ্রকার বৃক্ষ লতায় সুশোভিত। সূর্যের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি দধীচিকে দর্শন করে দেবতারা তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপরে শ্রীব্রহ্মার কথা অনুসারে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করলেন। ঋষি দধীচি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'দেবগণ, তোমাদের যাতে মঙ্গল হয়, আমি তাই করব ; তোমাদের

জন্য আমি এই শরীরও সমর্পণ করতে পারি।' তখন দেবতারা তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলে মন ও ইন্দ্রিয়বশকারী মহর্ষি দধীচি প্রাণত্যাগ করলেন। দেবতারা ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহের অস্থি সংগ্রহ করলেন এবং বিশ্বকর্মাকে ডেকে এনে তাঁদের প্রয়োজনের কথা জানালেন ; বিশ্বকর্মা সেই অস্থি দিয়ে এক ভয়ংকর বজ্র তৈরি করলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—'দেবরাজ ! এই বজ্রের সাহায্যে আপনি দেবতাদের শত্রু উগ্রকর্মা বৃত্রাসুরকে ভস্মীভূত করুন।'

বিশ্বকর্মার কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র নিয়ে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে করে পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে বৃত্রাসুরের ওপর আক্রমণ করলেন। তখন পর্বত শিখরের ন্যায় বিশালকায় কালকেয় দৈত্যরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বৃত্রাসুরকে চতুর্দিক থেকে রক্ষা করছিল। দেবতা ও ঋষিদের তেজে সমৃদ্ধ ইন্দ্রের পরাক্রম দেখে বৃত্রাসুর ক্রোধে সিংহনাদ করল। তার সেই হুংকারে পৃথিবী, আকাশ, পর্বত এবং দশদিক কেঁপে উঠল। ইন্দ্রও সেই হুংকারের জবাবে বৃত্রাসুরের ওপর ভীষণ বজ্র ছুঁড়ে মারলেন। সেই বজ্রের আঘাতে মহাদৈত্য বৃত্রাসুর প্রাণহীন হয়ে এমনভাবে পৃথিবীতে এসে পড়ল, যেমনভাবে পূর্বকালে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাত থেকে মন্দারপর্বত পড়েছিল।

বৃত্রাসুর বধ হলে সকল দেবতা এবং মহর্ষি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সকলে ইন্দ্রের স্তুতি করতে লাগলেন। তারপরে দেবতারা বৃত্রাসুরের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত সমস্ত দৈত্যদের বধ করতে শুরু করলেন। তখন দৈত্যরা তাঁদের ভয়ে মৎস্য-হাঙর পরিপূর্ণ সমুদ্রজলের মধ্যে আত্মগোপন করে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ত্রিলোক ধ্বংসের উপায় ভাবতে লাগল। চিন্তা করতে করতে তারা এক ভয়ংকর উপায় ঠিক করল। তারা ভেবে দেখল যে, সমস্ত লোকই তপস্যার প্রভাবে রক্ষা পায়, সুতরাং তারা সর্বপ্রথম তপস্যারই ক্ষতি করবে। পৃথিবীতে যত তপস্বী, ধর্মাত্মা এবং জ্ঞাননিষ্ঠ মানুষ আছেন, অতি শীঘ্র তাঁদের বধ করতে হবে। তাঁদের বধ করলেই জগৎ স্বতই নষ্ট হয়ে যাবে।

এরূপ স্থির করে তারা সমুদ্রের মধ্যে থেকেই ত্রিলোক নাশ করতে তৎপর হয়ে উঠল। তারা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে নিত্য রাত্রে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে আশ-পাশের আশ্রম এবং তীর্থাদিতে থাকা মুনিদের প্রাণ হরণ করত আর সারাদিন সমুদ্রে লুকিয়ে থাকত। তাদের অত্যাচার এত বেড়ে গেল যে সমস্ত পৃথিবীতে চতুর্দিক মৃত মুনি ঋষিদের অস্থিতে ভরে উঠল।

রাজন্ ! এইভাবে যখন জগতে সংহারলীলা চলতে লাগল এবং যাগ-যজ্ঞ নষ্ট হয়ে গেল তখন দেবতারা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে শরণাগত বৎসল শ্রীমৎ নারায়ণের শরণাগত হলেন। দেবতারা বৈকুণ্ঠনাথ অপরাজেয় ভগবান মধুসূদনের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর স্তুতি করে বললেন—'প্রভু ! আপনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার কর্তা ; আপনিই এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। হে কমলনয়ন ! পূর্বে পৃথিবী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন আপনিই তাকে বরাহরূপে উদ্ধার করেছিলেন। পুরুষোত্তম ! আপনিই নৃসিংহরূপ ধারণ করে মহাবলী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। কোনো দেহধারীর পক্ষেই মহাদৈত্য বলির সংহার করা সম্ভব ছিল না, তাকেও আপনি বামনরূপে পরাভূত করেছেন। মহাধনুর্ধর জম্ভ অত্যন্ত ক্রূর এবং যজ্ঞ ধ্বংসকারী ছিল, সেই ক্রূর দানবকেও আপনি নিহত করেছেন। আপনার এইরূপ অগণিত পরাক্রমের ঘটনা আছে। হে মধুসূদন ! এই দুর্দিনে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। অতএব হে দেবদেবেশ্বর ! ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই মহাভয় থেকে আপনি সমস্ত লোক, দেবতা এবং ইন্দ্রকে রক্ষা করুন। এখন জগতে মহাভয় উপস্থিত হয়েছে ; আমরা জানি না রাত্রে কে এসে ব্রাহ্মণদের হত্যা করে। ব্রাহ্মণরা নাশ হলে পৃথিবী নাশ হবে আর পৃথিবী নাশ হলে স্বর্গও থাকবে না। জগৎপতে ! এখন কৃপাপূর্বক আপনি রক্ষা করলে তবেই এই জগৎ সংসার

রক্ষা পাবে।'

দেবতাদের প্রার্থনা শুনে ভগবান বিষ্ণু বললেন—'হে দেবগণ ! আমি প্রজাদের ক্ষতির কারণ সম্পূর্ণভাবে জানি। কালকেয় নামে এক প্রসিদ্ধ দৈত্যের দল আছে। তারা বৃত্রাসুরের আশ্রয় নিয়ে সমস্ত জগৎকে পীড়িত করছে। সারাদিন হাঙর, কুমীর অধ্যুষিত সমুদ্রে লুকিয়ে থাকে আর রাত্রে জগৎ উচ্ছেদ করার জন্য বাইরে এসে ব্রাহ্মণদের বধ করে। সমুদ্রের ভিতরে থাকার জন্য তোমরা ওই দৈত্যদের বধ করতে পারবে না, তাই তোমাদের সমুদ্র শুষ্ক করার উপায় খুঁজতে হবে। একমাত্র মহর্ষি অগস্ত্য ছাড়া আর কেউ সমুদ্র শুষ্ক করতে সক্ষম নন এবং সমুদ্র শুষ্ক না হলে দৈত্য বধও সম্ভব নয়। অতএব তোমরা কোনোভাবে ঋষি অগস্ত্যের কাছে গিয়ে এই কাজের কথা বলো।'

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কথা শুনে দেবতারা ব্রহ্মার নির্দেশে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন মিত্রাবরুণের পুত্র পরম তেজস্বী তপোমূর্তি মহাত্মা অগস্ত্য ঋষিদের মধ্যে উপবিষ্ট। দেবতারা সকলে তাঁর কাছে গেলেন। তাঁরা ঋষি অগস্ত্যর সমস্ত অলৌকিক কর্মের গুণগান করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'পূর্বে রাজা নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করে যখন লোকদের বিরক্ত করতে আরম্ভ করে তখন আপনিই জগৎ কণ্টক রাজা নহুষকে দেবলোকের ঐশ্বর্য থেকে বিতাড়িত করেন। পর্বতরাজ বিন্ধ্যাচল সূর্যের ওপর কুপিত হয়ে অনেক উঁচু হয়েছিল, যাতে সূর্য দক্ষিণাবর্তে যেতে না পারে। ফলে জগতের দক্ষিণাংশে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল এবং প্রজারা ব্যাধি ও মৃত্যুতে জর্জরিত হয়েছিল। সেই সময় আপনার শরণ গ্রহণ করায় শান্তিলাভ হয়। আপনি সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ করেন ; আমরাও দীনভাবে আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আমার সেই কাহিনী বিস্তারিত শুনতে ইচ্ছা করছে যে, বিন্ধ্যাচল কেন অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল।

মহর্ষি লোমশ বললেন—সূর্য উদয় এবং অস্ত হওয়ার সময় পর্বতরাজ সুবর্ণগিরি সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করতেন। তাই দেখে বিন্ধ্যাচল বলল, 'সূর্যদেব ! তুমি যেভাবে প্রতিদিন সুমেরুর পরিক্রমা কর, তেমনই আমাকেও করবে।' তাতে সূর্য বললেন—'আমি নিজ ইচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমার পথ

নির্দিষ্ট করেছেন।' হে পরন্তপ ! সূর্যের কথায় বিন্ধ্য ক্রোধে জ্বলে উঠল, তাই সূর্য ও চন্দ্রের গতিপথ বন্ধ করতে অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন সব দেবতারা মিলে পর্বতরাজ বিন্ধ্যের কাছে এসে তাকে নানাভাবে বাধা দিতে লাগলেন, কিন্তু বিন্ধ্য তাঁদের কোনো কথা শুনল না। তখন তাঁরা সকলে পরম তপস্বী ধর্মাত্মা এবং অদ্ভুত পরাক্রমী ঋষি অগস্ত্যের কাছে এলেন এবং তাঁকে তাঁদের প্রয়োজনের কথা জানালেন। তাঁরা বললেন—'ভগবান ! ক্রোধের বশীভূত হয়ে এই পর্বতরাজ বিন্ধ্যাচল সূর্য এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। মহর্ষি ! আপনি ব্যতীত আর কেউই তাকে বাধাদান করতে সক্ষম নয়। এখন আপনি এর বিহিত করুন।'

দেবতাদের প্রার্থনা শুনে ঋষি অগস্ত্য পত্নীসহ বিন্ধ্যাচলের কাছে এসে তাকে বললেন—'পর্বত প্রবর ! আমি কোনো কাজে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করছি, তাই আমাকে ওদিকে যাওয়ার পথ দাও। যতদিন আমি ওদিক থেকে ফিরে না আসি, ততদিন তুমি আমার প্রতীক্ষা করবে,তারপর ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধিলাভ কর।' বিন্ধ্যাচলকে এইভাবে রেখে অগস্ত্যমুনি দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন এবং

আজ পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে ফেরেননি। এর ফলে অগস্ত্য ঋষির প্রভাবে বিন্ধ্যাচলের বৃদ্ধিলাভ বন্ধ হয়েছিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির, তোমার জিজ্ঞাসায় আমি এই বিন্ধ্যপ্রসঙ্গ তোমায় শোনালাম। এখন দেবতারা যেভাবে অগস্ত্যঋষির কাছে বর পেয়ে কালকেয়দের সংহার করেছিল, তা শোন।

দেবতাদের প্রার্থনা শুনে অগস্ত্যমুনি বললেন, 'আপনারা এখানে কেন এসেছেন এবং আমার কাছে কী বর চান ?' দেবতারা বললেন—'মহাত্মা ! আমাদের ইচ্ছা যে আপনি মহাসাগরকে পান করে ফেলুন। আপনি যদি তা করেন তাহলে আমরা দেবদ্রোহী কালকেয়দের সপরিবারে বধ করতে পারব।' দেবতাদের কথা শুনে মুনিবর অগস্ত্য বললেন—'ঠিক আছে, আমি আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব এবং জগতের দুঃখ দূর করব।'

তারপর সেই তপঃসিদ্ধ ঋষি দেবতাদের সঙ্গে সমুদ্রের তীরে এসে সেইখানে একত্রিত সমস্ত দেবতা এবং ঋষিদের বললেন, 'আমি জগতের মঙ্গলের জন্য সমুদ্র পান করছি' বলে তিনি ধীরে ধীরে সমুদ্রকে জলশূন্য করে দিলেন। দেবতারা তখন প্রবল পরাক্রমে তাঁদের দিব্য অস্ত্রাদির সাহায্যে কালকেয়দের সংহার করতে লাগলেন। দেবতাদের এইভাবে গর্জনসহ আক্রমণে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং এই প্রহারের বেগ তাদের অসহ্য হয়ে উঠল। দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ তারাও ভয়ানক যুদ্ধ করল। কিন্তু তারা পবিত্র মুনিদের তপঃপ্রভাবে আগে থেকেই অর্ধমৃত হয়েছিল, তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও তারা দেবতাদের হাতে বিনষ্ট হল, যারা কোনোপ্রকারে বেঁচে

গেল তারা পাতালে গিয়ে আশ্রয় নিল।

দানবরা এইভাবে ধ্বংস হয়ে গেলে দেবতারা মুনি অগস্ত্যের নানাপ্রকার স্তুতি করে বললেন 'এবার আপনি পান করা জল পুনরায় সমুদ্রতে ফিরিয়ে দিন।' তখন ঋষি অগস্ত্য বললেন, 'সেই জল হজম হয়ে গেছে, আপনারা সমুদ্র ভর্তি করার জন্য অন্য কোনো উপায় ভাবুন।' মহর্ষির কথায় দেবতারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তখন তাঁরা ঋষি অগস্ত্যকে প্রণাম করে ব্রহ্মার কাছে এলেন। তাঁরা ব্রহ্মার কাছে হাতজোড় করে প্রার্থনা জানালেন সমুদ্র জলপূর্ণ করে দেবার জন্য। ব্রহ্মা বললেন—'দেবগণ ! এখন তোমরা যে যার স্থানে ফিরে যাও। আজ থেকে বহুবছর পরে রাজা ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করবেন, তাতে সমুদ্র আবার জলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।' ভগবান ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা তাঁদের যে যার স্থানে চলে গেলেন।

———o———

সগর পুত্রদের মৃত্যু এবং গঙ্গাবতরণ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্! সমুদ্র জলপূর্ণ হতে ভগীরথের পূর্বপুরুষেরা কীভাবে উপলক্ষ হলেন, ভগীরথ কী করে সমুদ্রকে জলপূর্ণ করলেন—সেই কাহিনী সবিস্তারে শুনতে চাই।

মহর্ষি লোমশ বললেন—রাজন্! ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত রূপবান, বলবান, প্রতাপশালী এবং পরাক্রমী ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী বৈদর্ভী এবং শৈব্যা। স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কৈলাসপর্বতে গিয়ে যোগাভ্যাসের সাহায্যে অত্যন্ত কঠিন তপস্যায় রত হলেন। কিছুকাল তপস্যা করার পর তিনি ত্রিপুরনাশক ত্রিনয়ন ভগবান শংকরের দর্শনলাভ করলেন। তিনি দুই রানিকে নিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করলেন।

শ্রীমহাদেব প্রসন্ন হয়ে রাজা-রানিদের বললেন—'রাজন্! তুমি যে বর প্রার্থনা করেছ, তার প্রভাবে তোমার এক রানির গর্ভে অত্যন্ত অহংকারী এবং শূরবীর ষাট হাজার পুত্র জন্ম নেবে। কিন্তু তারা একসঙ্গে সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হবে; আর দ্বিতীয় রানির গর্ভে বংশরক্ষাকারী একটিই মাত্র বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।' এই বলে ভগবান রুদ্র তখনই অন্তর্হিত হলেন। রাজা সগর আনন্দিত মনে রানিদের নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। সময়মত বৈদর্ভী এবং শৈব্যা গর্ভধারণ করলেন। কালক্রমে বৈদর্ভীর গর্ভ থেকে এক বিশাল লাউ এবং শৈব্যার গর্ভ থেকে সুন্দর দেবশিশু জন্মগ্রহণ করে। রাজা সেই লাউটিকে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে, তখনই এক গম্ভীর স্বরে আকাশবাণী হল, 'রাজন্! একাজ অনুচিত, এভাবে পুত্রকে পরিত্যাগ করা অধর্ম। লাউটির বীজ বার করে অল্প গরম করে ঘৃত ভর্তি কলসে পৃথক ভাবে রেখে দাও; এর থেকে তুমি ষাট হাজার পুত্র লাভ করবে।'

দৈববাণী শুনে রাজা সেই মতো কাজ করলেন। তিনি লাউয়ের এক-একটি বীজ একটি একটি ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন এবং প্রত্যেকটি কলস দেখাশোনার জন্য একজন করে দাসী নিযুক্ত করে দিলেন। বেশ কিছুকাল পর ভগবান শংকরের কৃপায় তার থেকে অতুলনীয় তেজস্বী ষাট হাজার পুত্র জন্ম নিল। তারা অত্যন্ত ভয়ংকর প্রকৃতির এবং ক্রূর ছিল, তারা আকাশে উড়ে যেতে পারত। সংখ্যায় বহু হওয়ায় তারা বিভিন্ন দেবতা ও লোকসমূহকে গ্রাহ্যই করত না।

এইভাবে বেশ কয়েক বছর পার হওয়ার পর রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষা নিলেন। তাঁর প্রেরিত যজ্ঞের ঘোড়া পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল; রাজার পুত্রগণ তার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। ঘুরতে ঘুরতে সেই ঘোড়া জলশূন্য শুষ্ক সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছাল, সেই দৃশ্য ছিল অতীব ভয়ংকর। রাজকুমারগণ যদিও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়াটির দেখাশোনা করছিল, তবু সমুদ্রতীরে পৌঁছেই সেই ঘোড়াটি অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক খোঁজার পরেও যখন ঘোড়াটি পাওয়া গেল না তখন তারা বুঝতে পারল যে, ঘোড়াটি কেউ চুরি করে নিয়েছে, তারা তখন রাজা সগরের কাছে গিয়ে সব বৃত্তান্ত জানাল এবং বলল—'পিতা! আমরা সমুদ্র-নদী-পর্বত-গুহা-দ্বীপ সমস্ত স্থানে খুঁজেছি, কিন্তু ঘোড়াটিকে বা যে সেটি চুরি করেছে, কাউকেই খুঁজে পাইনি।' পুত্রদের কথা শুনে রাজা সগর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নির্দেশ দিলেন— 'যাও, ঘোড়ার অনুসন্ধান করো, যজ্ঞের অশ্ব না নিয়ে ফিরবে না।'

পিতার নির্দেশে সগরপুত্ররা সারা পৃথিবী জুড়ে অনুসন্ধান করতে লাগল। শেষে তারা পৃথিবীর এক স্থানে একটু ফাটল দেখতে পেল। সেই ফাটলের মধ্যে তারা এক

ছিদ্রও দেখতে পেল। তারা তখন কোদাল এবং অন্য যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে মাটি কাটতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে মাটি কোপালেও তারা ঘোড়ার সন্ধান পেল না। তাতে তারা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং ঈশান কোণ ধরে পাতাল পর্যন্ত মাটি কেটে ফেলল। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেল যে, তাদের ঘোড়াটি বিচরণ করছে আর তার কাছেই অতুলনীয় তেজ সম্পন্ন মহাত্মা কপিল বসে রয়েছেন। ঘোড়া দেখে তারা আনন্দে রোমাঞ্চিত হলেও ভগবান কপিলের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অপমান করে তারা ঘোড়া ধরতে গেল। সেই অপমানে মহাতেজস্বী কপিল অত্যন্ত কুপিত হলেন। তিনি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে তাদের দিকে

দৃষ্টিপাত করলে সেই মন্দবুদ্ধি সগরপুত্ররা ভস্ম হয়ে গেল। তাদের ভস্মীভূত হতে দেখে দেবর্ষি নারদ সগর রাজার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। দেবর্ষি নারদের কথায় মুহূর্তের জন্য রাজা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই তাঁর মহাদেবের কথা স্মরণ হল। তিনি তখন অসমঞ্জসের পুত্র এবং তাঁর নাতি অংশুমানকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আমার অতুলনীয় তেজস্বী ষাট হাজার পুত্র আমারই জন্য মহর্ষি কপিলের তেজে ভস্মীভূত হয়ে গেছে এবং আমি ধর্মরক্ষা ও প্রজাদের হিতার্থে তোমার পিতাকেও পরিত্যাগ করেছি।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তপোধন মহর্ষি লোমশ ! রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সগর তাঁর পুত্রকে কেন ত্যাগ করেছিলেন ?

মহর্ষি লোমশ বললেন—'রাজন্ ! শৈব্যার গর্ভে সগর রাজার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অসমঞ্জস নামে বিখ্যাত। নগরবাসীদের নিরীহ ছোট ছোট ছেলেদের ঘাড় ধরে নদীতে ফেলে দিতেন। চিৎকার-কান্নাকাটি করলেও কেউ রক্ষা পেত না।' এতে নগরবাসীরা ভয় ও দুঃখে ব্যাকুল হয়ে একদিন রাজা সগরের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বলল—'মহারাজ ! আপনিই শত্রুর আক্রমণজনিত সংকট থেকে আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ। সুতরাং বিষম পরিস্থিতিতে যে ঘোর সংকট উপস্থিত হয়েছে, তার থেকে আমাদের রক্ষা করুন।' পুরবাসীদের কথা শুনে মহারাজ সগর মুহূর্তকাল বিষণ্ণ হয়ে রইলেন। তারপর মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—'আমার মঙ্গলকারী একটি কাজ আপনাকে করতে হবে—এই মুহূর্তে আমার পুত্র অসমঞ্জসকে নগরের বাইরে বার করে দিন।' রাজার নির্দেশানুসারে মন্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ তাই করল। মহাত্মা সগর এইভাবে পুরবাসীদের হিতার্থে তাঁর পুত্রকে বার করে দিলেন।

সগর রাজা অংশুমানকে বললেন—'পুত্র ! তোমার পিতাকে আমি নগর থেকে বার করে দিয়েছি, আমার অন্য পুত্ররা ভস্ম হয়ে গেছে, যজ্ঞের ঘোড়াও পাওয়া যাচ্ছে না ; আমার মনে তাই বড় দুঃখ হচ্ছে। তুমি কোনোপ্রকারে ঘোড়া খুঁজে নিয়ে এসো, যাতে আমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে স্বর্গে যেতে পারি।' সগরের কথায় দুঃখিত চিত্তে অংশুমান সেইখানে এলেন, যেখানে মাটি খুঁড়ে সমুদ্রে যাওয়ার রাস্তা করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি যজ্ঞের ঘোড়া এবং মহাত্মা কপিলকে দেখতে পেলেন। তেজপূর্ণ ঋষি কপিলকে দর্শন করে তিনি তাঁকে প্রণাম করে সেখানে তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। অংশুমানের কথা শুনে মহর্ষি কপিল অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'বৎস ! আমি তোমাকে বর প্রদান করতে চাই, তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও।' অংশুমান প্রথম বরে যজ্ঞের অশ্ব চাইলেন, তারপর দ্বিতীয় বরে তাঁর পিতৃপুরুষদের পবিত্র করার জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন মহাতেজস্বী মুনি কপিল বললেন—'হে

অনঘ ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি যে বর প্রার্থনা করেছ, আমি তার সবই তোমায় দিচ্ছি। তোমার মধ্যে ক্ষমা, ধর্ম এবং সত্য বিদ্যমান। তোমার দ্বারা সগরের জীবন সফল হবে এবং তোমার পিতা পুত্রবান বলে পরিগণিত হবে। তোমার প্রভাবেই সগরপুত্ররা স্বর্গলাভ করবে এবং তোমার পৌত্র ভগীরথ সগরপুত্রদের উদ্ধার করার জন্য মহাদেবকে প্রসন্ন করে স্বর্গলোক থেকে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করবে, তুমি এই যজ্ঞের অশ্ব প্রসন্ন মনে নিয়ে যাও।'

কপিল মুনির কথা শুনে অংশুমান ঘোড়া নিয়ে রাজা সগরের যজ্ঞশালায় এলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। রাজা সগর অংশুমানকে আশীর্বাদ করলেন এবং যখন জানতে পারলেন যে, যজ্ঞের অশ্ব এসে গেছে, তখন তিনি পুত্রশোক ত্যাগ করে অংশুমানকে আদর করে যজ্ঞশালায় নিয়ে এলেন যজ্ঞপূর্ণ করতে। তারপরে বহু বছর তিনি তাঁর প্রজাদের পুত্রবৎ পালন করে, পৌত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করে স্বর্গগমন করলেন। মহাত্মা অংশুমানও পিতামহের ন্যায় আসমুদ্রভূমণ্ডল পালন করেন। তাঁর দিলীপ নামে এক ধর্মাত্মা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে দিলীপকে রাজ্য সমর্পণ করে অংশুমানও স্বর্গে চলে যান। দিলীপ তাঁর পিতৃপুরুষের বিনাশের কারণ জানতে পেরে অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হলেন এবং উদ্ধারের উপায় ভাবতে লাগলেন। তিনি গঙ্গা আনয়নের জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সফল হলেন না। তাঁর পুত্র ভগীরথ ছিলেন পরম ঐশ্বর্যশালী এবং ধর্মপরায়ণ। তাঁর হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে দিলীপ বনে চলে গেলেন এবং তপস্যার প্রভাবে কালক্রমে স্বর্গবাসী হলেন।

মহারাজ ! রাজা ভগীরথ মহা ধনুর্ধর, রাজ চক্রবর্তী এবং মহারথী ছিলেন, তাঁকে দর্শন করলেই সকলের মন ও নয়ন শীতল হত। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, ঋষি কপিলের কোপে তাঁর পূর্বপুরুষগণ ভস্ম হয়ে গেছেন এবং তাঁরা স্বর্গলাভ করতে পারেননি, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁর রাজ্য মন্ত্রীদের হাতে সমর্পণ করে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে গেলেন। সেখানে তিনি এক হাজার বছর ধরে শুধু ফল-মূল ও জলপান করে দেবতাদের ঘোর তপস্যা করলেন। একহাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে মহানদী গঙ্গা তাঁকে দর্শন দান করে বললেন—'রাজন্ ! তুমি আমার কাছে কী চাও ? বলো আমি তোমাকে কী দিতে পারি ? তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।' গঙ্গাদেবীর কথায় রাজা বললেন—'হে বরদায়িনী ! আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ সগরের ষাটহাজার পুত্র যজ্ঞের ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে ভগবান কপিলের তেজে ভস্ম হয়ে যমালয়ে গমন করেছেন। হে মহানদী ! আপনি যতক্ষণ আপনার জলে ওঁদের অভিষিক্ত না করছেন, ততক্ষণ তাঁরা সদ্গতি লাভ করবেন না। সেই সগরপুত্রদের উদ্ধারের জন্যই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।'

লোমশ মুনি বললেন—রাজা ভগীরথের কথা শুনে বিশ্ববন্দনীয়া গঙ্গাদেবী তাঁকে বললেন—'রাজন্ ! আমি

তোমার কথা রাখব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি যখন আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতিত হব, তখন আমার বেগ অসহ্য হবে। ত্রিলোকে এমন কেউ নেই, যে আমাকে ধারণ করতে সক্ষম। একমাত্র দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ ভগবান শংকর আমাকে ধারণ করতে সমর্থ। হে মহাবাহো ! তুমি তপস্যার দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করো। আমি যখন পৃথিবীতে নামব, তখন তিনিই আমাকে তাঁর মস্তকে ধারণ করবেন। তোমার পূর্বপুরুষদের হিতার্থে তিনি অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন।'

এই কথা শুনে মহারাজ ভগীরথ কৈলাসে গিয়ে তীব্র তপস্যা করে মহাদেবকে প্রসন্ন করে তাঁর কাছ থেকে পিতৃপুরুষদের স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গাদেবীকে ধারণ করার বর প্রার্থনা করলেন। ভগীরথকে বরপ্রদান করে ভগবান শংকর হিমালয়ে এলেন এবং ভগীরথকে বললেন—'মহাবাহো ! পর্বত-পুত্রী গঙ্গার কাছে গিয়ে অবতরণের জন্য প্রার্থনা করো, স্বর্গ থেকে পতিত হলে আমি তাকে ধারণ করে নেব।' একথা শুনে মহারাজ ভগীরথ একান্ত মনে গঙ্গাদেবীর ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি স্মরণ করা মাত্রই পবিত্র সলিলা গঙ্গা মহাদেবকে দণ্ডায়মান দেখে আকাশ থেকে নামতে লাগলেন। তাঁকে নামতে দেখে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব, নাগ এবং যক্ষ তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সেখানে উপস্থিত হলেন। মহাদেবের মাথায় গঙ্গা এমনভাবে অবতরিত হলেন যেন মনে হল একগুচ্ছ স্বচ্ছ মুক্তার মালা। ভগবান শংকর তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধারণ করলেন। তখন গঙ্গাদেবী ভগীরথকে বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার জন্যই পৃথিবীতে এসেছি, এখন বলো, আমি কোন পথ দিয়ে যাব ?' তাই শুনে রাজা যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের শরীর ভস্ম হয়েছিল তাঁকে সেখানে নিয়ে এলেন। গঙ্গার জলে সমুদ্র পুনরায় ভরে গেল। রাজা ভগীরথ তাঁকে কন্যা বলে মেনে নিলেন। তারপর সফল মনোরথ হয়ে তিনি গঙ্গাজলে তাঁর পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলেন। এইভাবে গঙ্গা যেভাবে সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করার জন্য পৃথিবীতে পদার্পণ করেন, তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত তোমাকে শোনালাম।'

ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির একে একে নন্দা এবং অপরনন্দা নামক নদীতে গেলেন, এই নদীগুলি সর্বপ্রকার পাপ ও ভয় নাশ করে। হেমকূট পর্বতে গিয়ে তাঁরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। সেই স্থানে নিরন্তর বায়ু প্রবাহমান এবং নিত্য বর্ষা বিরাজমান। সেখানে বেদাধ্যয়ন শ্রুতিগোচর হলেও কোনো স্বাধ্যায়কারীকে দেখা যেত না।

লোমশ মুনি তখন বললেন—'কুরুবর ! নন্দা নদীতে স্নান করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত হয়ে যায়, সুতরাং আপনি ভাইদের নিয়ে এখানে স্নান করুন।'

তাঁর কথায় যুধিষ্ঠির ভাই এবং সঙ্গীদের নিয়ে নন্দানদীতে স্নান করলেন, পরে শীতল জলসম্পন্ন অত্যন্ত রমণীয় এবং পবিত্র কৌশিকী নদীতে গেলেন। লোমশ মুনি বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! এ হল পরম পবিত্র দেবনদী কৌশিকী। এর তীরে বিশ্বামিত্রের রমণীয় আশ্রম দেখা যাচ্ছে। এখানেই মহাত্মা কাশ্যপের (বিভাণ্ডকের) আশ্রম, একে পুণ্যাশ্রম বলা হয়। মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বিখ্যাত তপস্বী এবং সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন। একবার অনাবৃষ্টি হওয়ায় তিনি তপঃ প্রভাবে বর্ষা আনিয়েছিলেন। এই পরম তপস্বী বিভাণ্ডক মৃগীর গর্ভ হতে জন্ম নিয়েছেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! মানুষের পশুর সঙ্গে যৌন সংসর্গ তো শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদা—উভয় দৃষ্টিতেই বিরুদ্ধ, তাহলে পরমতপস্বী কাশ্যপনন্দন ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীর গর্ভ থেকে কীভাবে জন্ম নিলেন ? আর অনাবৃষ্টি হওয়ায় ওই বালকের ভয়ে বৃত্রাসুর বধকারী ইন্দ্র কীভাবে বারিপাত ঘটালেন ?'

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডক অত্যন্ত সাধুস্বভাব এবং প্রজাপতির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। তাঁর বীর্য অমোঘ ছিল এবং তপস্যার প্রভাবে অন্তঃকরণও শুদ্ধ ছিল। একবার তিনি এক সরোবরে স্নান করতে গেছেন। সেখানে উর্বশী অপ্সরাকে দেখে জলের মধ্যেই তাঁর বীর্য স্খলিত হয়। সেইসময় এক পিপাসার্ত হরিণ জল পান করতে এসে জলের সঙ্গে বীর্যও পান করে নেয়। তাতে সে গর্ভধারণ করে। বাস্তবে সে ছিল এক দেবকন্যা। কোনো কারণে ব্রহ্মা তাঁকে শাপ দিয়ে বলেছিলেন—'তুমি মৃগ হয়ে জন্ম নিয়ে এক মুনিপুত্রের জন্ম দেবে, তাহলে এই

অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।' বিধির বিধান অটল, তাই মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ ওই মৃগীর পুত্ররূপে জন্মান। তিনি অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ ছিলেন এবং বনেই থাকতেন। তাঁর মাথায় একটি

শৃঙ্গ ছিল, যার জন্য তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁর পিতা ব্যতীত আর কোনো মানুষ দেখেননি। তাই তাঁর মন সর্বদাই ব্রহ্মচর্যে অটল ছিল।'

সেইসময় অঙ্গদেশে মহারাজ দশরথের মিত্র রাজা লোমপাদ রাজত্ব করতেন। এরূপ শোনা যায় যে, তিনি কোনো এক ব্রাহ্মণকে কিছু দেবার অঙ্গীকার করে পরে তাকে নিরাশ করেন। তাই ব্রাহ্মণরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। তাই তাঁর রাজ্যে বর্ষা হত না এবং প্রজারা বৃষ্টির জন্য হাহাকার করত। তখন তিনি তপস্বী এবং মনস্বী ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভূদেবগণ ! বৃষ্টি কী করে হবে, তার কোনো উপায় বলুন।' তাঁরা সকলে যে যার মত প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে এক মুনিশ্রেষ্ঠ বললেন—'রাজন্ ! ব্রাহ্মণরা আপনার ওপর কুপিত হয়েছেন, আপনি তার প্রায়শ্চিত্ত করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক মুনিকুমার আছেন, তিনি বনে থাকেন, অত্যন্ত শুদ্ধ ও সরল। নারীজাতির সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই, তাঁকে আপনি এখানে আমন্ত্রণ করুন। তিনি এলেই এখানে বৃষ্টি হবে।' এই কথা শুনে রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে তাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করালেন। তাঁরা প্রসন্ন হলে তিনি মন্ত্রীদের ডেকে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসার বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান বারবণিতাদের ডাকালেন এবং তাঁদের বললেন— 'তোমরা কোনোভাবে মোহ উৎপন্ন করে এবং তোমাদের প্রতি বিশ্বাস এনে মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আমার রাজ্যে নিয়ে এসো।' তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা বারবণিতা বলল—'রাজন্ ! আমি তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার চেষ্টা করব, কিন্তু আমার যেসব ভোগ্য সামগ্রীর প্রয়োজন, আপনি তা দেবার ব্যবস্থা করুন।'

রাজার আদেশ পেয়ে বৃদ্ধা কৌশলে নৌকার ভিতর একটি আশ্রম তৈরি করাল, আশ্রমটি নানা প্রকার ফল এবং ফুল দিয়ে বৃক্ষের মতো করে সাজাল। সেই নৌকাশ্রম অতি সুন্দর এবং লোভনীয় ছিল। সেটি বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমের কিছু দূরে বেঁধে গুপ্তচর দিয়ে খবর নিল যে, মুনিবর কখন আশ্রম ছেড়ে বাইরে যান। তারপর বিভাণ্ডক মুনির-অনুপস্থিতির সুযোগে বারবণিতা নিজ কন্যাকে সব কিছু শিখিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাছে পাঠান। সেই বারবণিতা আশ্রমে গিয়ে তপোনিষ্ঠ মুনিকুমারকে দর্শন করে বলল— 'মুনিবর ! এখানে সব তপস্বীরা আনন্দে আছে তো ? আপনি কুশলে আছেন তো ? আপনার বেদাধ্যয়ন ঠিকমতো হচ্ছে তো ?'

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—'আপনার দেহকান্তি আপনার সাক্ষাৎ তেজঃপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশমান হচ্ছে ; আমার মনে হচ্ছে আপনি কোনো পূজনীয় মহানুভব। আমি আপনাকে পা ধোওয়ার জল দিচ্ছি এবং আমার ধর্ম অনুসারে আপনাকে কিছু ফলপ্রদান করছি। আপনি এই মৃগচর্মে বসুন, আপনার আশ্রম কোথায়, আপনি কী নামে প্রসিদ্ধ ?'

বারবণিতা বলল—'কাশ্যপনন্দন ! আমার আশ্রম এখান থেকে তিন যোজন দূরে পর্বতের ওপারে। আমার নিয়ম হল যে, আমি কারো প্রণাম নিই না এবং কারো প্রদত্ত পাদ্য স্পর্শ করি না। আমি আপনার প্রণম্য নই, আপনিই

আমার বন্দনীয়।'

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—'এখানে নানাপ্রকার পাকা ফল রয়েছে, আপনি আপনার রুচি অনুসারে এখান থেকে ফল গ্রহণ করুন।'

মহর্ষি লোমশ বললেন—'রাজন্ ! বারবণিতা মেয়েটি সেই ফলগুলি নিল না, উপরন্তু ঋষিকুমারকে নিজের থেকে অত্যন্ত রসাল, স্বাদু, রুচিবর্ধক খাদ্য পদার্থ দিল। তাছাড়া সুগন্ধী মালা, বিচিত্র জমকালো বস্ত্র এবং সুস্বাদু শরবতও দিল। সেইগুলি পেয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁর হাসি মজা করতে প্রবৃত্তি হল। এইভাবে তাঁর মনে বিকার অংকুরিত হতে দেখে সেই বারবণিতা তাঁকে নানাভাবে প্রলোভিত করতে লাগল। কয়েকবার বারবণিতা তাঁকে আলিঙ্গন করল এবং কটাক্ষপাত করে অগ্নিহোত্রের বাহানা করে সেখান থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আশ্রমে কাশ্যপনন্দন বিভাণ্ডক মুনি এলেন। তিনি এসে দেখলেন ঋষ্যশৃঙ্গ একলা একমনে বসে আছেন, তাঁর মানসিক স্থিতি একেবারে বিপরীত। তিনি ওপরদিকে তাকিয়ে বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন। তাঁর এই দশা দেখে ঋষি বললেন—'পুত্র ! আজ সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের জন্য তুমি সমিধ ঠিক করে রাখোনি, আজ কি তুমি অগ্নিহোত্র থেকে নিবৃত্ত হয়েছ ? আজ তোমাকে তো অন্য দিনের মতো প্রসন্ন দেখাচ্ছে না ? তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকাতর, জ্ঞানহীন ও দীন বলে মনে হচ্ছে। আজ কেউ এখানে এসেছিল ?'

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—'পিতা ! এই আশ্রমে এক জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিল। তার গাত্রবর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, কমলের ন্যায় বিশাল নয়ন, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও রূপবান। তার মাথায় লম্বা কালো সুগন্ধিত জটা, তাতে সুন্দর মালা দিয়ে সাজানো। আকাশের বিদ্যুতের মতো তার গলায় সোনার হার চমক দিচ্ছে। গলার নীচে দুটি সুন্দর মনোহর মাংসপিণ্ড। তার চলার সময় সুন্দর আওয়াজ হয়, হাতে আমার মতো রুদ্রাক্ষের মালার স্থানে স্বর্ণমণ্ডিত গহনা। তার কথা শুনে আমার হৃদয়ে আনন্দের লহর উঠতে লাগল। কোকিলের মতো তার অতি সুরেলা কণ্ঠস্বর, তা শুনলে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। সেই মুনিকুমার যেন এক দেবপুত্র। তাকে দেখে তার প্রতি আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি ও আসক্তি জন্ম নিয়েছে। সে আমাকে নতুন নতুন ফল এনে দিয়েছে। এখানে যেসব ফল আছে সেগুলির কোনো ফলই ওর ফলের মতো সুস্বাদু এবং রসাল নয়। সেই রূপবান মুনিকুমার আমাকে অত্যন্ত স্বাদু জল পান করতে দিয়েছিল, সেই জল পান করতেই আমার আনন্দ অনুভূত হচ্ছে, পৃথিবী যেন ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে। এই যে বিচিত্র সুগন্ধ পুষ্প এখানে পড়ে রয়েছে, এটি তার বস্ত্র থেকেই পড়েছে। তপস্যাদীপ্ত মুনিকুমার এখন তার আশ্রমে চলে গেছে। সে চলে যেতে আমি হতজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, আমার দেহে জ্বালা বোধ হচ্ছিল। আমার মনে ইচ্ছা হচ্ছে এখনই তার কাছে যাই এবং সর্বদা তাকে আমার সঙ্গে রাখি।'

বিভাণ্ডক বললেন—'পুত্র ! ওরা রাক্ষস ; ওরা এরূপ বিচিত্র এবং দর্শনীয় রূপেই বিচরণ করে। ওরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী আর সুন্দর সুন্দর রূপ ধারণ করে তপস্যায় বিঘ্ন প্রদানের উদ্দেশ্যে বিচরণ করে থাকে। যেসব জিতেন্দ্রিয় মুনি উত্তম লোকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁরা এদের মায়াতে দৃষ্টিপাত করেন না। এরা অত্যন্ত পাপী, তপস্বীদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটিয়েই এরা সুখ পায়। তপস্বীদের ওদের দিকে তাকিয়ে দেখাও উচিত নয়। পুত্র ! তুমি যে স্বাদু পানীয় পান করেছ, তা দুষ্টলোকরা পান করে এবং তারাই রং বেরং-এর মালা পরে। এ সব জিনিস মুনিদের জন্য নয়।'

'ওরা রাক্ষস' বলে বিভাণ্ডক মুনি পুত্রকে আটকালেন আর নিজে সেই বারবণিতাকে খুঁজতে লাগলেন। তিনদিন ধরে খুঁজেও তাকে না পেয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন।

তারপর শ্রৌত বিধি অনুসারে বিভাণ্ডক মুনি যখন আবার ফল আহরণে গেলেন তখন সেই বারবণিতা ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করার জন্য আবার এলো। তাকে দেখেই ঋষ্যশৃঙ্গ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি দৌড়ে তার কাছে এসে বললেন, 'শোনো, পিতা আসার আগেই আমরা তোমার আশ্রমে চলে যাব।' হে রাজন্ ! এইভাবে যুক্তিকরে বিভাণ্ডক মুনির একমাত্র পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে তারা নৌকাতে তুলে নিলো। তারপর নৌকা চালিয়ে মুনিপুত্রকে নানাপ্রকার আনন্দে ব্যস্ত রেখে অঙ্গরাজ লোমপাদের কাছে নিয়ে এলো। অঙ্গরাজ তাঁকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। তার মধ্যেই তিনি দেখলেন বৃষ্টি শুরু হয়ে সর্বত্র জলে ভরে উঠেছে। এইভাবে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় রাজা লোমপাদ তাঁর কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন।

এদিকে বিভাণ্ডক মুনি ফল-ফুল নিয়ে আশ্রমে এসে পুত্রকে না দেখতে পেয়ে অনেক খুঁজলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভাবলেন নিশ্চয়ই অঙ্গরাজই এই ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু। তখন তিনি অঙ্গাধিপতি এবং তাঁর সমস্ত রাজ্য পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছায় চম্পাপুরীর দিকে রওনা হলেন। পথ চলতে চলতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি এক গো সম্পদশালী ঘোষ বাড়িতে এলেন। গোয়ালারা তাঁকে রাজার মতো আদর-আপ্যায়ন করল। বিভাণ্ডক ঋষি সেখানে এক রাত বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। গোয়ালারা তাঁকে এত অভ্যর্থনা জানানোয় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কার প্রজা ?' তখন সকল

গোয়ালা জানাল যে, এসবই তাঁর পুত্রের সম্পত্তি। স্থানে স্থানে এইরূপ অভ্যর্থনা পেয়ে এবং মধুর বাক্য শুনে তাঁর

উগ্র ক্রোধ শান্ত হয়ে গেল। তখন তিনি প্রসন্ন চিত্তে অঙ্গরাজের কাছে এলেন। নরশ্রেষ্ঠ লোমপাদ তাঁকে বিধিসম্মত ভাবে পূজা-অর্চনা করলেন। তিনি দেখলেন স্বর্গলোকে যেমন ইন্দ্র বিরাজ করেন, তাঁর পুত্রও এখানে সেইভাবে বিদ্যমান। সেইসঙ্গে তিনি বিদ্যুতের মতো জ্যোতিপূর্ণ পুত্রবধূ শান্তাকে দেখলেন। পুত্র বহু গ্রাম ও সম্পত্তি পেয়েছে দেখে এবং শান্তাকে দেখে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল। তারপর লোমপাদ যা অন্তর থেকে চাইছিলেন তাই করলেন। পুত্রকে বললেন—'তোমার যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, তখন রাজার অনুমতি নিয়ে বনে চলে আসবে।'

ঋষ্যশৃঙ্গও পিতার নির্দেশ পালন করে যথাসময়ে পিতার আশ্রমে ফিরে এলেন। শান্তাও সর্বপ্রকারে পতির অনুকূল আচরণ করতেন। তিনিও বনে বাস করে পতির সেবা করতে লাগলেন। যেভাবে সৌভাগ্যবতী অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে, লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে এবং দময়ন্তী নলকে সেবা করতেন, শান্তাও অত্যন্ত প্রীতি সহকারে তাঁর বনবাসী

পতির সেবা করতেন। এই পবিত্র কীর্তিশালী আশ্রম সেই ঋষ্যশৃঙ্গেরই। এরই জন্য এর নিকটবর্তী সরোবরের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সরোবরে স্নান করে তুমি কৃতকৃত্য ও শুদ্ধ হও, তারপর অন্য তীর্থে যাবে।'

পরশুরামের উৎপত্তি ও তাঁর চরিত্র বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সেই সরোবরে স্নান করে মহারাজ যুধিষ্ঠির কৌশিকী নদীর তীর থেকে একে একে সকল তীর্থস্থানে গেলেন ; এরপর তিনি সমুদ্রতীরে পৌঁছে গঙ্গার সঙ্গমস্থলে পাঁচশ নদীর সম্মিলিত ধারায় স্নান করলেন। তারপর সমুদ্রতীর ধরে ভ্রাতাদের সঙ্গে কলিঙ্গদেশে এসে পৌঁছলেন। সেখানে লোমশমুনি বললেন—'কুন্তীনন্দন ! এ হল কলিঙ্গ দেশ, এখানেই বৈতরণী নদী আছে। এখানে দেবতাদের সাহায্যে স্বয়ং যমরাজ যজ্ঞ করেছিলেন।'

তারপর ভাগ্যবান পাণ্ডবরা দ্রৌপদীসহ বৈতরণী নদীতে পিতৃতর্পণ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন—'মহর্ষি লোমশ ! এই নদীতে আচমন করে আমি তপস্যা প্রভাবে পার্থিব বিষয় থেকে মুক্ত হলাম। আপনার কৃপায় আমার সমস্ত লোক দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। দেখুন, আমি বাণপ্রস্থী মহাত্মাদের বেদপাঠ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' তখন লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! চুপ করে যান ! আপনি এই ধ্বনি ত্রিশ হাজার যোজন দূর থেকে শুনতে পাচ্ছেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র পর্বতে গেলেন এবং সেখানে একরাত বাস করলেন। সেখানকার তপস্বীরা তাঁদের খুব আপ্যায়ন করলেন। লোমশমুনি, ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং কশ্যপবংশীয় ঋষিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে পরশুরামের শিষ্য বীরবর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান পরশুরাম তপস্বীদের কখন দর্শন দেন ? তাঁদের সঙ্গে আমিও তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষী।' অকৃতব্রণ বললেন—'মহর্ষি পরশুরাম সকলের মনের কথা জানেন। আপনার আসার খবর তিনি নিশ্চয়ই জেনে গেছেন। আপনার ওপর তাঁর স্নেহ আছে, অতএব তিনি শীঘ্রই আপনাকে দর্শন দিতে এসে পড়বেন। তপস্বীগণ চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে তাঁর দর্শন পেয়ে থাকেন। কাল চতুর্দশী, তখন আপনিও তাঁর দর্শন পাবেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি জমদগ্নিনন্দন মহাবলী পরশুরামের শিষ্য। তিনি এর আগে যে সব বীরত্বপূর্ণ কর্ম করেছেন, তা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং যেভাবে এবং যে নিমিত্তে তিনি যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের পরাস্ত করেছিলেন, আমাকে সব বিস্তারিত বলুন।'

অকৃতব্রণ বললেন—'রাজন্ ! আমি ভৃগুবংশ জাত জমদগ্নিনন্দন দেবতুল্য ভগবান পরশুরামের চরিত্র শোনাচ্ছি। এই কাহিনী বড় সুন্দর ও মহান। তিনি হৈহয়বংশের যে কার্তবীর্য অর্জুনকে বধ করেছিলেন, তাঁর এক সহস্র বাহু ছিল। শ্রীদত্তাত্রেয়ের কৃপায় তাঁর একটি স্বর্ণ বিমান প্রাপ্ত হয়েছিল এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীর ওপর তাঁর প্রভুত্ব ছিল। তাঁর রথের গতি রোধ করা কারো সাধ্য ছিল না। সেই রথ এবং বরের কৃপায় তিনি শক্তিশালী দেবতা, যক্ষ এবং ঋষি—সকলকেই পরাজিত করতেন। তাঁর ভয়ে সর্বত্র সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত।

'সেইসময় কান্যকুব্জ (কনৌজ) নগরে গাধি নামে এক বলবান রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন, সেখানে তাঁর এক অত্যন্ত রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, নাম সত্যবতী। ভৃগুনন্দন ঋচীক তাঁকে বিবাহ করার জন্য রাজার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেন। রাজা গাধি ঋচীক মুনির সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ দেন। বিবাহ সম্পন্ন হলে মহর্ষি ভৃগু এসে পুত্র এবং তার পত্নীকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি পুত্রবধূকে বললেন, 'সৌভাগ্যবতী বধূ ! তুমি বর প্রার্থনা করো, তোমার যা

প্রার্থনা, আমি তাই দেব।' বধূ তার শ্বশুরকে প্রসন্ন দেখে নিজের এবং মায়ের জন্য পুত্র কামনা করল। তখন ভৃগু বললেন—'তুমি এবং তোমার মাতা ঋতুস্নানের পর পুত্র কামনায় পৃথক পৃথক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করবে। মা অশ্বত্থগাছকে এবং তুমি ডুমুরগাছকে আলিঙ্গন করবে। তাছাড়া আমি সমস্ত জগৎ ঘুরে তোমার এবং তোমার মায়ের জন্য যত্ন করে এই দুটি চরু তৈরি করে এনেছি, তোমরা সাবধানে এটি খেয়ে নাও।' এই বলে মুনি অন্তর্হিত হলেন। কিন্তু মাতা ও কন্যা চরু ভক্ষণ এবং বৃক্ষ আলিঙ্গনে উলটো পালটা করে ফেললেন।

বহু দিন কেটে যাওয়ার পরে ভগবান ভৃগু আবার এলেন এবং দিব্য দৃষ্টিতে সব কিছু জেনে ফেললেন। তিনি তাঁর পুত্রবধূ সত্যবতীকে বললেন, 'মা ! চরু এবং বৃক্ষে উলটো-পাল্টা করে তোমার মা তোমাকে প্রতারণা করেছেন। তুমি যে চরু খেয়েছ এবং যে বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেছ, তার প্রভাবে তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করবে এবং তোমার মাতার গর্ভে যে পুত্র হবে, সে ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণের মতো আচারসম্পন্ন হবে। সে অত্যন্ত তেজস্বী এবং মহাপুরুষদের পথ অনুসরণকারী হবে। তখন সত্যবতী বারংবার প্রার্থনা করে তাঁর শ্বশুরকে প্রসন্ন করলেন এবং বললেন যে তাঁর পুত্র যেন এমন না হয়, পৌত্র হোক তাতে ক্ষতি নেই। মহর্ষি ভৃগু 'তাই হবে' বলে পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন। যথাসময়ে তাঁর গর্ভে জমদগ্নি মুনির জন্ম হল, তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও পরাক্রমী ছিলেন।

মহাতেজস্বী জমদগ্নি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করে নিয়মানুসারে স্বাধ্যায় করে সমস্ত বেদ কণ্ঠস্থ করলেন। তারপর রাজা প্রসেনজিতের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করার জন্য অনুমতি চাইলেন, রাজা তাঁর কন্যার সঙ্গে জমদগ্নির বিবাহ দিলেন। রেণুকার ব্যবহার সর্বপ্রকারে তাঁর পতিদেবের অনুকূল ছিল। তাঁর সঙ্গে আশ্রমে থেকে তিনি তপস্যা করতে লাগলেন। ক্রমশ তাঁদের চারটি পুত্র জন্মাল। তারপর পঞ্চম পুত্র পরশুরাম জন্মালেন। ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও তিনি গুণাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদিন যখন সব পুত্র ফল আহরণে গেছেন, ব্রতশীলা রেণুকা তখন স্নান করতে গেছেন। স্নান করে আশ্রমে ফেরার সময় তিনি দৈবক্রমে রাজা চিত্ররথের জলক্রীড়া দেখে ফেলেন। সম্পত্তিবান রাজার জলবিহার দেখে রেণুকার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল। সেই মানসিক বিকারে দীন, হতচেতন এবং ত্রস্ত হয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। মহাতেজস্বী জমদগ্নি সবই জানতে পারলেন এবং রেণুকাকে অধীর ও ব্রহ্ম তেজঃচ্যুত দেখে ধিক্কার দিলেন। এর মধ্যে তাঁর পুত্ররা রুমন্বান, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু ফিরে এলেন। মুনি তাঁর পুত্রদের ডেকে এক এক করে বললেন, 'তোমরা তোমাদের মাকে হত্যা করো।' কিন্তু

তারা মোহান্ধ হয়ে হতচকিত হয়ে রইল, কোনো কথাই বলতে পারল না। তখন মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের শাপ দিলেন, যাতে তাঁদের বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে তাঁরা পশুপক্ষীর ন্যায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেলেন। এরপর শত্রু সংহারকারী পরশুরাম এলেন, জমদগ্নি মুনি তাঁকে বললেন—'পুত্র ! তোমার এই পাপিষ্ঠা মাতাকে এখনই হত্যা করো এবং তার জন্য মনে কোনো দুঃখ রেখো না।' এই কথা শুনে পরশুরাম অস্ত্র দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মায়ের মাথা কেটে ফেললেন।

রাজন্ ! এতে জমদগ্নির কোপ শান্ত হয়ে গেল এবং

তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'পুত্র! তুমি আমার কথায় এমন কাজ করেছ, যা করা অত্যন্ত কঠিন ; এখন তুমি বর প্রার্থনা করো।' তখন তিনি বললেন—'পিতা! আমার মা জীবিত হয়ে উঠুন, তাঁকে আমি যে হত্যা করেছি, এটি যেন তাঁর স্মরণে না থাকে, তাঁর মানসিক পাপ যেন দূর হয়ে যায়, আমার চার ভাই সুস্থ হয়ে উঠুক, যুদ্ধে আমার সামনে যেন কেউ দাঁড়াতে না পারে এবং আমি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হই।' পরমতপস্বী জমদগ্নি বরপ্রদান করে তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ করলেন।

একবার জমদগ্নির সব পুত্ররা বাইরে গেছেন ; সেইসময় অনূপ দেশের রাজা কার্তবীর্য অর্জুন সেখানে এলেন। তিনি আশ্রমে এলে মুনিপত্নী রেণুকা তাঁকে আপ্যায়ন করলেন। কার্তবীর্য অর্জুন যুদ্ধের অহংকারে উন্মত্ত ছিলেন। তিনি অতিথি সৎকারের কোনো পরোয়া না করে আশ্রমের হোমধেনুটি ডাকতে থাকলেও তার গো-বৎসটি হরণ করলেন এবং সেখানকার গাছপালা ভেঙে নষ্ট করলেন।
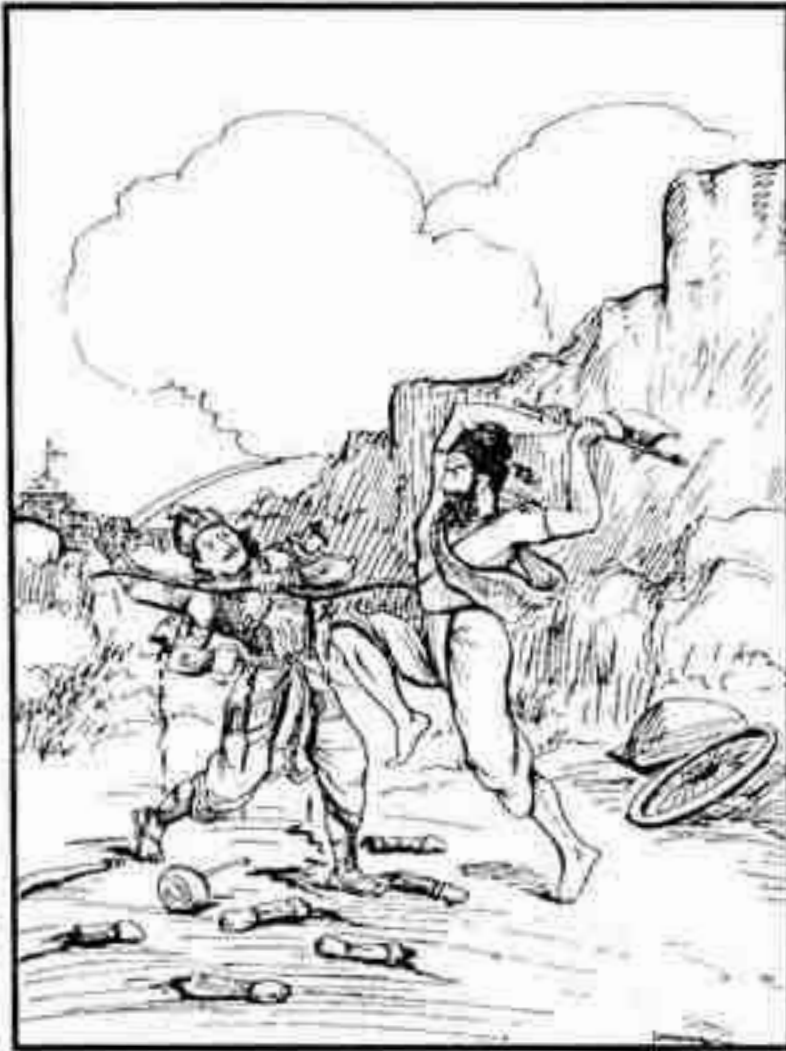
পরশুরাম আশ্রমে এলে স্বয়ং জমদগ্নি তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। তিনি আশ্রমের ধেনুটিকেও কাঁদতে দেখলেন। এতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এবং কালের বশীভূত সহস্রার্জুনের কাছে গেলেন। শত্রুদমনে পরশুরাম তাঁর সুন্দর ধনুক নিয়ে তার সঙ্গে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাণের দ্বারা তার হাজার হাত কেটে ফেললেন এবং তাকে পরাস্ত করে যমালয়ে পাঠালেন। এতে সহস্রার্জুনের পুত্ররা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং তারা একদিন পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নির আশ্রমের ওপর আক্রমণ করল।

পরম তেজস্বী মহর্ষি জমদগ্নি তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, যুদ্ধাদি বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। তাই তারা সহজেই জমদগ্নিকে হত্যা করল। মৃত্যুর সময় তিনি অনাথের ন্যায় 'হে রাম! হে রাম!' বলে ডাকতে লাগলেন। তাঁকে হত্যা করে সহস্রার্জুনের পুত্ররা চলে গেলে পরশুরাম সমিধ নিয়ে আশ্রমে এলেন। তিনি তাঁর পিতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে দেখে অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে কাঁদতে লাগলেন। দুঃখে শোকে কিছুক্ষণ বিলাপ করার পর তিনি তাঁর পিতার অগ্নি-সংস্কার করে সমস্ত প্রেতকর্ম সমাপ্ত করলেন। তারপর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল তিনি নাশ করবেন।'

মহাবলী ভৃগুনন্দন ক্রোধের আবেশে সাক্ষাৎ কালরূপ ধারণ করলেন এবং একাই কার্তবীর্যের পুত্রদের হত্যা

করলেন। সেই সময় যেসব ক্ষত্রিয় তাঁদের পক্ষ নিল, তাদের সকলেরই মৃত্যু হল পরশুরামের হাতে। ভগবান পরশুরাম এইভাবে একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করে তাঁদের রক্তে সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রের পাঁচটি সরোবর পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এই সময় মহর্ষি ঋচীক প্রকটিত হয়ে তাঁকে এই ভয়ংকর কর্ম থেকে বিরত করলেন। তখন তিনি ক্ষত্রিয় বধ করা বন্ধ করে সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করলেন। সমগ্র ভূমণ্ডল ব্রাহ্মণদের দান করে মহর্ষি পরশুরাম এই মহেন্দ্র পর্বতে এসে বাস করতে লাগলেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! চতুর্দশীর দিন মহামনা পরশুরাম তাঁর নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং ভ্রাতা সহ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন। ধর্মরাজ তাঁর ভাইদের নিয়ে পরশুরামের পূজা করলেন এবং সেখানে যে সব ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁদেরও দান দক্ষিণা দিয়ে সৎকার করলেন। পরশুরামের নির্দেশে সেই রাত্রে মহেন্দ্র পর্বতে থেকে পরদিন তাঁরা দক্ষিণের দিকে রওনা হলেন।

———o———

প্রভাসক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সঙ্গে যাদবদের সাক্ষাৎ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমুদ্রতীরের সমস্ত তীর্থ দর্শন করতে করতে এগিয়ে চললেন। তিনি সর্বপ্রকার সদাচার পালন করতেন। ভাইদের নিয়ে সব তীর্থেই স্নান করতেন। তাঁরা এক সমুদ্রগামিনী প্রশস্তা নদীতটে পৌঁছলেন। সেখানে স্নান-তর্পণ করে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের ধনদান করলেন। তারপর তাঁরা গোদাবরী নদী তীরে এলেন এবং স্নানাদি করে পবিত্র হয়ে দ্রাবিড় দেশের সমুদ্রতীরবর্তী পবিত্র অগস্ত্যতীর্থ ও নারীতীর্থ দর্শন করলেন। তারপর তাঁরা শূর্পারক ক্ষেত্রে গেলেন। সেখানে সমুদ্র পার হয়ে তাঁরা এক প্রসিদ্ধ বনে এলেন। সেখানে ধনুর্ধর শ্রেষ্ঠ পরশুরামের বেদী দর্শন করেন। এর কাছাকাছি বহু তপস্বীর বাস ছিল এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এই বেদীকে পূজ্য বলে মানতেন। তারপর তাঁরা বসু, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, শিব, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, পিতৃগণ, রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধ এবং অন্যান্য দেবতাদের পরম পবিত্র মন্দির এবং মনোহর স্থান দর্শন করলেন। সেইসব তীর্থে উপবাস ও স্নান করে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের বহুমূল্য রত্ন-বস্ত্র দান করে শূর্পারক ক্ষেত্রে ফিরে এলেন। সেখান থেকে ভ্রাতাদের সঙ্গে অন্য তীর্থাদি ঘুরে সুপ্রসিদ্ধ প্রভাসক্ষেত্রে এলেন। সেখানে স্নান ও তর্পণ করে তাঁরা দেবতা ও পূর্বপুরুষদের তৃপ্ত করলেন। পরে বারোদিন শুধু জল ও বায়ু পান করে চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে তপস্যা করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন জানতে পারলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভাসক্ষেত্রে উগ্র তপস্যায় রত হয়েছেন, তখন তাঁরা পরিকর সহ তাঁদের কাছে এলেন। তাঁরা দেখলেন, পাণ্ডবরা ধূলায় ধূসরিত হয়ে ভূমিশয্যা নিয়ে রয়েছেন এবং রাজকন্যা, রাজবধূ দ্রৌপদী কষ্ট ভোগ করছেন। তাই দেখে তাঁরা খুব দুঃখ পেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুদুঃখ ভোগ করলেও তাঁর ধৈর্যে শৈথিল্য দেখা দেয়নি। তিনি বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর দ্বারা সম্মানিত হয়ে যাদবরাও তাঁদের যথোচিত আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে চারদিকে ঘিরে বসেন, সেইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে বসলেন।

তখন শ্রীবলদেব কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! দেখো, ধর্মরাজ মস্তকে জটাধারণ করে এবং

বল্কলে অঙ্গ আবরিত করে বনে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করছেন আর পাপাত্মা দুর্যোধন রাজা হয়ে পৃথিবী শাসন করছে। হায় ! পৃথিবী তো এর জন্য স্থির হয়ে যাচ্ছে না ! এর দ্বারা অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা মনে করবে যে, ধর্মাচরণ করার থেকে পাপাচারই শ্রেষ্ঠ। ইনি সাক্ষাৎ ধর্মপুত্র, ধর্মই এঁর আধার, ইনি কখনো সত্যকে লঙ্ঘন করেন না এবং নিরন্তর দান করে থাকেন। তাঁর রাজ্য এবং সুখ যতই নষ্ট হোক না কেন, তিনি কখনো ধর্মত্যাগ করতে পারবেন না। পাপী ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নির্দোষ ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছেন। তিনি পরলোকে পিতৃপুরুষের কাছে গিয়ে কী করে জানাবেন যে, এঁদের সঙ্গে তিনি সঠিক ব্যবহার করেছেন ? তিনি এখনও ভাবছেন না যে 'আমি কেন পৃথিবীতে অন্ধ হয়ে এসেছি এবং ওদের রাজ্যচ্যুত করায় এরপর আমার কী গতি হবে !' এই পাণ্ডবদের তিনি কী করে মুখ দেখাবেন ? মহাবাহু ভীমের তো শত্রুসৈন্য ধ্বংস করার জন্য অস্ত্রেরও প্রয়োজন নেই। তার হুংকারেই তো সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। দেখো, ভীম যখন দিগ্বিজয়ের জন্য পূর্বদিকে গিয়েছিল, তখন সে একাই সমস্ত রাজাদের অনুচর সহ পরাজিত করে কুশলেই নিজ নগরে ফিরে এসেছিল, কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু আজ সেই ভীম ছেঁড়া-পুরাতন বস্ত্র পরে দুঃখভোগ করছে। এই হাসামুখ বীর সহদেবকে দেখো। ইনি দক্ষিণদেশের একজোট হওয়া সমস্ত রাজাকে দক্ষিণের সমুদ্র তীরে পরাস্ত করেছিলেন। আজ ইনিও তপস্বীবেশ ধারণ করেছেন। পরম পতিব্রতা দ্রৌপদী সকল সুখভোগের যোগ্যা। মহারথী দ্রুপদের সমৃদ্ধশালী যজ্ঞের বেদী থেকে এঁর জন্ম ; তিনি কী করে এই বনবাসের দুঃখ সইছেন ? দুর্যোধন কপটদ্যূতে ধর্মরাজকে হারিয়ে তাঁর ভাই, স্ত্রী এবং অনুচরদের রাজ্যচ্যুত করেছেন, তাঁর এই বাড়বৃদ্ধি দেখে নদী পর্বত সমন্বিতা বসুন্ধরা দুঃখিত নয় কেন ?'

সাত্যকি বললেন—'বলরাম ! এখন বৃথা অনুতাপ করার সময় নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির যদিও কিছু বলছেন না, তবুও আমাদের যা কর্তব্য, তা আমাদের করা উচিত। অপর কেউ রক্ষাকারী হলে লোকে তার ওপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এখানে আমি, আপনি, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং শাম্ব কেন চুপচাপ বসে আছি ? আমরা তো ত্রিলোক রক্ষা করতে সক্ষম, তাহলে আমাদের উপস্থিতিতে পাণ্ডবরা দ্রৌপদী এবং ভাইদের সঙ্গে বনে বাস করবেন—এ কী করে সম্ভব ? আজই যাদব সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কুচকাওয়াজ করে দুর্যোধনকে পরাজিত করে ভাইদের সঙ্গে তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিক। বলরাম ! আপনি তো একাই আপনার ক্রোধে এই পৃথিবী ধ্বংস করতে সক্ষম। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, সেইরকম আপনিও দুর্যোধনকে তার সঙ্গীসহ বধ করুন। আমিও আমার তীক্ষ্ণজ্বালার সাপের বিষের মতো বাণের সাহায্যে তার মস্তক ছিন্নভিন্ন করে দেব আর তলোয়ারের সাহায্যে কেটে টুকরো টুকরো করে দেব। তারপর সমস্ত কৌরব অনুচরদের বধ করব। প্রদ্যুম্ন যখন প্রধান কৌরব বীরদের সংহার করবেন সেইসময় তাঁর ছোঁড়া তীক্ষ্ণ তীরে আঘাত কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং বিকর্ণও সহ্য করতে পারবেন না। অভিমন্যুর বীরত্বও আমি খুব জানি, তিনি রণভূমিতে প্রদ্যুম্নেরই সমকক্ষ। শাম্বও তাঁর বাহুবলে রথ ও সারথি নিয়ে দুঃশাসনকে বধ করতে সক্ষম। জাম্ববতীনন্দন অত্যন্ত পরাক্রমী, কেউই তাঁর বল সইতে পারেন না আর শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কী বলব ? তিনি যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সুদর্শন চক্র ধারণ করেন, তখন তিনি অপরাজেয়।

দেবলোক ও এই পৃথিবীতে কোন্ কাজ তাঁর কাছে কঠিন ? এখন অনিরুদ্ধ, গদ, উল্মুক, বাহু, ভানু, নীথ এবং রণবীরকুমার নিশঠ ও রণযোদ্ধা সারণ এবং চারুদেষ্ণ—সকলেরই তাদের কুলোচিত পুরুষার্থ দেখানো উচিত। বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক বংশের প্রধান যোদ্ধাগণ এবং সাত্বৎ ও শূরকুলের সেনারা একত্রিত হয়ে রণভূমিতে কৌরবদের বধ করে যশপ্রাপ্ত করতে পারে। তাহলে যতদিন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশায় হারজনিত নিয়ম পালন করবে, ততদিন অভিমন্যুর হাতে রাজ্যের শাসনভার থাকবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সাত্যকি ! তুমি নিঃসন্দেহে ঠিকই বলছ, আমরা তোমার কথা মেনে নিচ্ছি ; কিন্তু কুরুরাজ নিজে না জিতে রাজ্য গ্রহণ করতে চাইবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কোনো ইচ্ছা, ভয় বা লোভের বশে স্বধর্ম ত্যাগ করতে পারেন না। তেমনই ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীও কাম, লোভ বা ভয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করবেন না। ভীম ও অর্জুন অতিরথ, পৃথিবীতে তাঁদের সমকক্ষ এমন কোনো বীর নেই যে তাঁদের সম্মুখীন হতে পারে। মাদ্রীপুত্র নকুল, সহদেবও কিছু কম নয়। এঁদের সাহায্যেই এঁরা পৃথিবী শাসন করতে সক্ষম। যখন মহাত্মা পাঞ্চালরাজ, কেকয়নরেশ, চেদীরাজ এবং হয় একত্রিত হয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন শত্রুদের কোনো চিহ্নই থাকবে না।'

সব শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'মাধব ! আপনি যা বলছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বভাব ঠিকমতো জানেন, তাঁর স্বরূপও আমি যথার্থভাবে জানি। সাত্যকি ! তুমি নিশ্চিত জান, শ্রীকৃষ্ণ যখন পরাক্রম দেখানোর উপযুক্ত সময় মনে করবেন, তখনই তুমি এবং শ্রীকেশব দুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারবে। এখন আপনারা সব যাদব বীররা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। আপনারা যে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ ধর্ম পালন করুন। আমরা আবার আপনাদের সকলকে সুস্থ শরীরে একত্রে দেখব আশা করি।

তখন সব যাদব বীররা বড়দের প্রণাম ও ছোটদের আশীর্বাদ করে নিজেদের ভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবরা পুনরায় তীর্থযাত্রায় রওনা হলেন। শ্রীকৃষ্ণরা চলে যাওয়ার পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাই, অনুচর ও মহর্ষি লোমশের সঙ্গে পরমপবিত্র পয়োষ্ণী নদীর তীরে এলেন। এই নদীর তীরে অমূর্তরয়ার পুত্র রাজা গয় সাতটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ইন্দ্রকে তৃপ্ত করেছিলেন।

——o——

রাজকুমারী সুকন্যা ও মহর্ষি চ্যবন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পয়োষ্ণীতে স্নান করার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির বৈদূর্য পর্বত এবং নর্মদা নদীর দিকে গেলেন। ভগবান লোমশ তাঁদের সমস্ত তীর্থ ও দেবস্থানের কাহিনী শোনালেন। ধর্মরাজ ভাইদের সঙ্গে উৎসাহপূর্বক সব তীর্থ দর্শন করলেন এবং সহস্র ব্রাহ্মণকে ধনরত্ন দান করলেন।

লোমশ মুনি তারপর আর একটি স্থান দেখিয়ে বললেন—'রাজন্ ! এই হল মহারাজ শর্যাতির যজ্ঞস্থান, এখানে কৌশিক মুনি অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে সোমপান করেছিলেন। এই স্থানেই মহাতপস্বী চ্যবন মুনি ইন্দ্রের ওপর কুপিত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁকে স্তম্ভিত করেছিলেন। এখানেই তিনি রাজকুমারী সুকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাতপস্বী চ্যবন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কেন ? তিনি ইন্দ্রকে কেন স্তব্ধ করেছিলেন ? অশ্বিনীকুমারদের তিনি সোমপানের অধিকারী করলেন কেমন করে ? মুনিবর ! কৃপা করে আপনি আমাকে সব বলুন।'

লোমশ মুনি বললেন—'মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে এক মুনিবর অত্যন্ত তেজস্বী পুত্র ছিল। তিনি এই সরোবরের তীরে তপস্যায় ব্যাপৃত হলেন। চ্যবন মুনি বহুদিন ধরে বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল থেকে এক স্থানে বীরাসনে বসে রইলেন। অনেকদিন কেটে যাওয়ায় তাঁর শরীর ধীরে ধীরে তৃণ ও লতাগুল্মে ঢেকে গেলে তার ওপর পিঁপড়ে বাসা তৈরি করল। ফলে ঋষিকে একটি মাটির ঢিপির মতো দেখাচ্ছিল। এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন রাজা শর্যাতি সেই সরোবরে এলেন, সঙ্গে এলেন চার সহস্র সুন্দরী নারী এবং এক সুন্দর ভ্রূসমন্বিত কন্যা, সুকন্যা। দিব্য বসন ভূষণ পরিহিতা কন্যা তার সখীদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চ্যবন মুনির ঢিপির কাছে এসে

পৌঁছাল। সুকন্যা সেই ঢিপির ছিদ্রের মধ্যে চ্যবনঋষির জ্বলজ্বলে চোখ দুটি দেখতে পেলেন। এতে তিনি কৌতূহলী হয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ায় দুটি কাঁটা সেই জ্বলজ্বলে বস্তুতে ফুটিয়ে দিলেন। চোখ দুটি বিদ্ধ হওয়ায় চ্যবন মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্যাতির সৈন্যদের মল-মূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করে দিলেন। এতে সৈন্যরা অত্যন্ত কষ্ট পেতে লাগল। তাদের দুর্দশা দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'এখানে নিরন্তর তপস্যারত বয়োবৃদ্ধ মহাত্মা চ্যবন থাকেন, তিনি স্বভাবত অত্যন্ত ক্রোধী। তাঁকে জেনে অথবা না জেনে কেউ কী কোনো ক্ষতি করেছে ? যে এই কাজ করেছে, সে যেন অবিলম্বে তা বলে দেয়।'

সুকন্যা এই কথা শুনে বললেন—'আমি বেড়াতে

বেড়াতে একটি ঢিপির কাছে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে উজ্জ্বল কোনো জিনিস দেখা যাচ্ছিল। আমি তাকে জোনাকি মনে করে কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়েছি।' একথা শুনে শর্যাতি তৎক্ষণাৎ সেই ঢিপির কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তপোবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে দেখে হাত জোড় করে সেনাদের ক্লেশমুক্ত করার জন্য প্রার্থনা জানালেন এবং বললেন—'মুনিবর ! অজ্ঞতাবশত এই বালিকা যে অপরাধ করে ফেলেছে, কৃপা করে আপনি তা ক্ষমা করুন।' ভৃগু-নন্দন মহর্ষি চ্যবন রাজাকে বললেন—'এই অহংকারী কন্যা আমাকে অপমান করার জন্যই আমার চোখ ফুটো করেছে। আমি তাকে পেলেই ক্ষমা করতে পারি।'

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! এই কথা শুনে রাজা শর্যাতি কোনো দ্বিধা না করেই তার কন্যাকে মহাত্মা চ্যবনের হাতে সমর্পণ করলেন। কন্যাকে পেয়ে চ্যবন মুনি প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর কৃপায় সৈন্যরা ক্লেশমুক্ত হয়ে রাজার সঙ্গে নগরে ফিরে গেল। সতী সুকন্যাও তপস্যা ও নিয়ম পালন করে প্রীতিসহকারে তপস্বী স্বামীর সেবায় নিযুক্ত রইলেন।'

সুকন্যা একদিন স্নান করে আশ্রমে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইসময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে দেখতে পান। সুকন্যা সাক্ষাৎ দেবরাজের কন্যার ন্যায় সুন্দরী ছিলেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'সুন্দরী ! তুমি কার কন্যা, কার পত্নী, এই বনে কী করছ ?'

তাঁদের কথায় সলজ্জভাবে সুকন্যা বললেন—'আমি মহারাজ শর্যাতির কন্যা এবং মহর্ষি চ্যবনের ভার্যা।'

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন—'আমরা দেবতাদের বৈদ্য, তোমার পতিকে যুবক এবং রূপবান করে দিতে পারি। তুমি তোমার পতিকে গিয়ে এই কথা জানাও।'

তাঁদের কথা শুনে সুকন্যা চ্যবন মুনিকে গিয়ে এই কথা জানালেন। মুনি তাতে সম্মত হলেন এবং অশ্বিনী-কুমারদের সেইরূপ করতে অনুমতি দিলেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তাঁকে সরোবরে নামতে বললেন। মহর্ষি চ্যবন রূপবান হওয়ার জন্য উৎসুক ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ
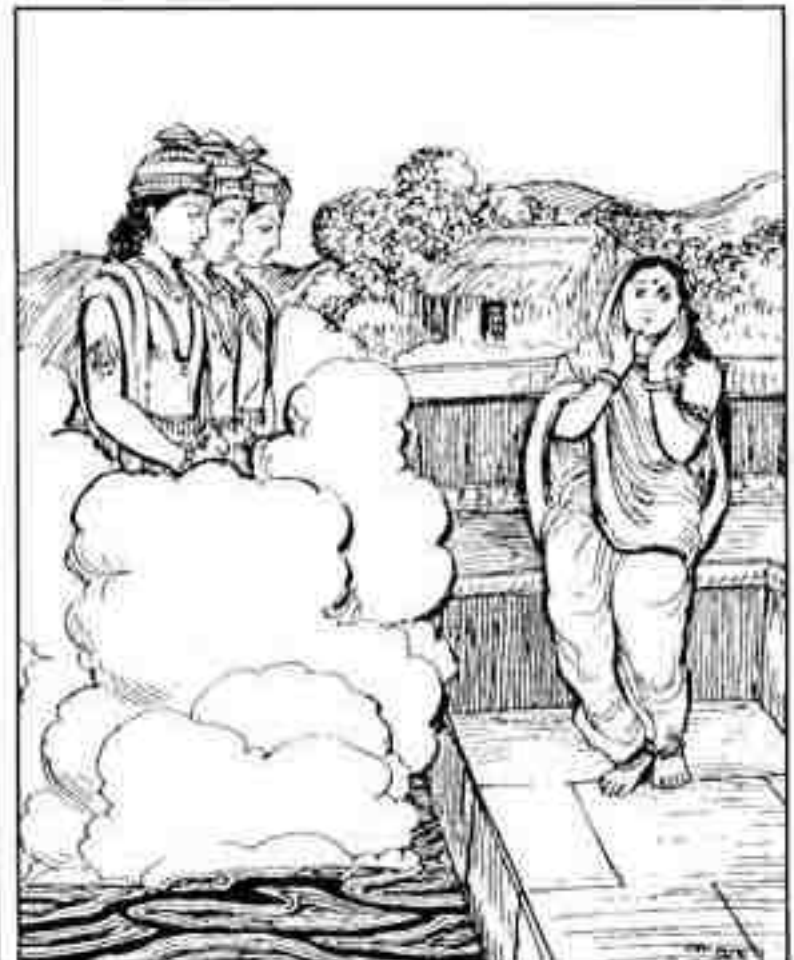
জলে নামলেন। তাঁর সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও ডুব দিলেন। এক মুহূর্ত পরে তিনজনেই জল থেকে বাইরে এলেন। তিনজনই দিব্যরূপধরী, একই প্রকার চেহারার যুবক পুরুষ। তাঁদের তিনজনকে দেখেই চিত্তে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। সেই তিনজনে বলল, 'সুন্দরী ! তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নাও।' তিনজনই সমান রূপবান। সুকন্যা একবার বিভ্রান্ত হলেন কিন্তু মন ও বুদ্ধিকে স্থির করে তিনি তাঁর পতিকে চিনতে পারলেন এবং তাঁকেই বরণ করলেন। এইভাবে নিজ পত্নী ও মনের মতো রূপযৌবন পেয়ে মহর্ষি চ্যবন খুব খুশি হলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বললেন— 'আমি বৃদ্ধ ছিলাম, তোমরাই আমাকে এই রূপ ও যৌবন দিয়েছ। প্রত্যুপকারে আমি তোমাদের সোমপানের অধিকারী করব।' একথা শুনে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রসন্ন হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন এবং চ্যবন ঋষি তাঁর পত্নীর সঙ্গে সেই আশ্রমে দেবতার ন্যায় বিহার করতে লাগলেন।'

'রাজা শর্যাতি যখন শুনলেন যে, চ্যবন মুনি যৌবন প্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আশ্রমে এলেন। তিনি দেখলেন সুকন্যা এবং চ্যবন ঋষি দেবদম্পতির মতো বিরাজমান। রাজা-রানি এতে এত খুশি হলেন, যেন তাঁরা সারা পৃথিবী জয় করেছেন। চ্যবন মুনি রাজাকে বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনাকে দিয়ে যজ্ঞ করাব, আপনি সমস্ত যজ্ঞ সামগ্রী সংগ্রহ করুন।' রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। যজ্ঞের জন্য শুভ দিন উপস্থিত হলে রাজা শর্যাতি এক সুন্দর যজ্ঞমণ্ডপ তৈরি করিয়ে দিলেন। সেই মণ্ডপে ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবন রাজার যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। সেই যজ্ঞে এক নতুন ঘটনা ঘটল, তা শুনুন। চ্যবন মুনি যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞে ভাগ দিলেন, তখন ইন্দ্র বাধাপ্রদান করে বললেন—'আমার বিচারে দুজন অশ্বিনীকুমারই যজ্ঞে ভাগ নেওয়ার অধিকারী নয়।' চ্যবন মুনি বললেন—'এই দুই কুমার অত্যন্ত উৎসাহী, উদার হৃদয়, রূপবান এবং ধনবান। তোমার অথবা অন্য দেবতাদের মতো এঁরা কেন সোমপানের অধিকার পাবেন না ?' ইন্দ্র বললেন—'এঁরা চিকিৎসক এবং ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করে পৃথিবীতেও বিচরণ করেন। অতএব এঁরা কী করে সোমপানের অধিকারী হবেন।'

'যখন চ্যবন ঋষি দেখলেন যে, দেবরাজ বারংবার ওই কথার ওপরই জোর দিচ্ছেন, তখন তিনি তাঁকে উপেক্ষা করে অশ্বিনীকুমারদের জন্য উত্তম সোমরস গ্রহণ করলেন। তাঁকে এই ভাবে আগ্রহপূর্বক সোমরস নিতে দেখে ইন্দ্র বললেন—'তুমি যদি এইভাবে আমাদের জন্য প্রস্তুত সোমরস অশ্বিনীকুমারদের প্রদান কর, তাহলে আমি তোমার ওপর আমার ভয়ংকর বজ্র ছুঁড়ে মারব।' তিনি একথা বললেও চ্যবন মুনি মৃদুহাস্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য সোমরস আহরণ করলেন। তখন ইন্দ্র তাঁর ওপর বজ্র ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখনই চ্যবন তাঁর হাত দুটি অচল করে দিলেন এবং তপোবলের সাহায্যে অগ্নিকুণ্ড থেকে 'মদ' নামক এক ভয়ংকর রাক্ষসকে উৎপন্ন করলেন, যে ভীষণ গর্জন করে ত্রিভুবনকে ত্রস্ত করে

ইন্দ্রকে আত্মসাৎ করার জন্য তাঁর দিকে ছুটলেন। ইন্দ্র এতে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বললেন—'আজ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপানের অধিকারী হল, এখন আপনি আমাকে কৃপা করুন, আপনি যা চাইবেন, তাই হবে।' ইন্দ্র এই কথা বলায় মহাত্মা চ্যবনের ক্রোধ শান্ত হল এবং তখনই তিনি ইন্দ্রকে মুক্ত করে দিলেন। রাজন্ ! এই সুন্দর দ্বিজসংঘুষ্ট নামক সরোবরটি চ্যবন মুনির। তুমি তোমার ভাইদের নিয়ে এই সরোবরে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করো। এখানে ভগবান শংকরের মন্ত্র জপ করলে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে। এখানে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধির সমান

কাল বাস করে, এই তীর্থে যে স্নান করে, কলিযুগ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তার সব পাপ নাশ হয়। এতে স্নান করো। এর পরে একটি পর্বত আছে, আর্চীক পর্বত। সেখানে বহু মনীষী ও মহর্ষি বাস করেন। সেখানে নানা দেবস্থান আছে, এটি চন্দ্রতীর্থ। সেখানে বালখিল্য নামের তেজস্বী ও বায়ুভোজী বাণপ্রস্থ আশ্রমবাসীগণ থাকেন। এখানে তিনটি শিখর ও তিনটি ঝরনা আছে, সেগুলি অত্যন্ত পবিত্র। তুমি এগুলিকে প্রদক্ষিণ করে, স্নান করো। এর কাছেই যমুনা নদী প্রবাহিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এখানে তপস্যা করেছেন। নকুল, সহদেব, ভীম, দ্রৌপদী এবং আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে যাব। এইস্থানে মহাধনুর্ধর রাজা মান্ধাতাও যজ্ঞ করেছিলেন।

রাজা মান্ধাতার জন্মবৃত্তান্ত

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মন্ ! রাজা যুবনাশ্বের পুত্র নৃপশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা ত্রিলোকে বিখ্যাত। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।'

মহর্ষি লোমশ বললেন—'রাজা যুবনাশ্ব ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মেছিলেন। তিনি এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করে আরও বহু যজ্ঞ করে প্রভূত দক্ষিণা দান করেন। পরে মন্ত্রীর ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে মনোনিগ্রহ করে নিরন্তর বনেই বাস করতে লাগলেন। একবার মহর্ষি ভৃগু পুত্রসন্তান প্রাপ্তির আশায় যুবনাশ্বকে দিয়ে যজ্ঞ করান। রাত্রিবেলা উপবাসে থাকা রাজার জল পিপাসা পেয়েছিল। তিনি আশ্রমের ভিতরে গিয়ে জল চান। কিন্তু সকলেই রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে এত গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন যে, কেউই তাঁর আওয়াজ শুনতে পাননি। মহর্ষি মন্ত্রপূত জলভর্তি একটি কলসী রেখেছিলেন। রাজা সেই কলসী দেখেই জল পান করে তৃষ্ণা মিটিয়ে কলসী সেখানেই রেখে দিলেন।'

'কিছুক্ষণ পরে তপোধন ভৃগুপুত্র সহ সকলেই উঠলেন এবং দেখলেন কলসের জল খালি। তখন সকলে আলোচনা করতে লাগলেন যে, এটি কার কাজ। যুবনাশ্ব তখন সত্য কথাই বললেন যে 'আমি করেছি।' ভৃগুপুত্র তাই শুনে বললেন—'রাজন্ ! এই কাজটা ঠিক হয়নি। তোমার যাতে এক বলবান ও পরাক্রমশালী পুত্র হয়, তাই আমি এই জল মন্ত্রপূত করে রেখেছিলাম। এখন যা হয়ে গেছে তা ফেরানো যাবে না। অবশ্য যা ঘটেছে তা দৈবের প্রেরণাতেই হয়েছে। তুমি পিপাসার্ত হয়ে মন্ত্রপূত জল পান করেছ, অতএব তোমাকেই এক পুত্র প্রসব করতে হবে।'

'এই বলে মুনিরা যে যার স্থানে চলে গেলেন। একশত বছর পরে রাজার বাম দিকের উদর ভেদ করে সূর্যের ন্যায়

এক তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করল। কিন্তু এরূপ ঘটনাতেও রাজার মৃত্যু হল না, এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার। সেই বালককে দেখার জন্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে এলেন। দেবতাগণ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কিং ধাস্যতি' বালক কী পান করবে ? তাতে ইন্দ্র তার মুখে তর্জনী ঢুকিয়ে বললেন, 'মাং ধাতা' (আমার আঙুল পান করবে)। তাইতে দেবতারা তার নাম রাখলেন 'মান্ধাতা'। তারপর তিনি ধ্যান করতেই ধনুর্বেদ সহ সম্পূর্ণ বেদ এবং দিব্য অস্ত্র তাঁর কাছে উপস্থিত হল ; সঙ্গে এলো আজগব নামক ধনুক, শিং এর তৈরি বাণ এবং অভেদ্য কবচ। তারপর স্বয়ং ইন্দ্র তার রাজ্যাভিষেক করলেন।

'রাজা মান্ধাতা সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। এই পরম পবিত্র কুরুক্ষেত্রে তাঁর যজ্ঞ করার স্থান। তুমি তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলে, আমি সেই মহত্বপূর্ণ বৃত্তান্ত জানালাম। রাজন্ ! প্রথম প্রজাপতি এই ক্ষেত্রে এক হাজার বছরে সম্পূর্ণ হয় এরূপ 'ইষ্টীকৃত' যজ্ঞ করেছিলেন। এখানে নাভাগের পুত্র রাজা অম্বরীষ যমুনাতীরে যজ্ঞকারীদের দশপদ্ম গাভী দান করেছিলেন এবং নানা যজ্ঞ ও তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই দেশ নহুষের পুত্র পুণ্যকর্মা রাজা যযাতির। রাজা যযাতি এখানে বহু যজ্ঞ করেছিলেন। এখানেই মহারাজ ভরত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ঘোড়া ছেড়েছিলেন ; রাজা মরুৎও সংবর্তমুনির অধ্যক্ষতায় এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। রাজন্ ! যে ব্যক্তি এই তীর্থে আচমন করে, তার সমস্ত লোক দর্শন ও সর্বপাপ মুক্ত হয়। তুমি এখানে আচমন করো।'

'মহর্ষি লোমশের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং ভ্রাতাগণ সকলেই স্নান করলেন। সেই সময় মহর্ষিরা স্বস্তিবাচন করছিলেন। স্নানের পর তিনি লোমশ মুনিকে বললেন—'হে সত্যপরাক্রমী মুনিবর ! এই তপের প্রভাবে আমি সর্বলোকের দর্শন দেখতে পাচ্ছি। আমি এখান থেকেই শ্বেত ঘোড়ায় অর্জুনকে দেখতে পাচ্ছি।' লোমশ মুনি বললেন—'মহাবাহো ! তোমার কথা ঠিক, মহর্ষিরা এইভাবে স্বর্গদর্শন করেন। এই পরম পবিত্র সরস্বতী নদী, এখানে স্নান করলে পুরুষ সর্ব পাপ মুক্ত হয়। এখানে চারদিকে পাঁচক্রোশ জুড়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদী। এখানেই মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র, যা কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত।'

—— o ——

অন্য তীর্থাদির বর্ণনা এবং রাজা উশীনরের কথা

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! এ হল বিনাশন তীর্থ, সরস্বতী নদী এখানে অদৃশ্য হয়ে যান। এটি নিষাদ দেশের দ্বার। নিষাদরা যাতে তাঁকে দেখতে না পায়, তাই সরস্বতী নদী এখানে অন্তঃসলিলা। এরপরে চমসোদ্ভেদ নামক স্থান, সেখানে সরস্বতী পুনরায় প্রবাহমানা হন এবং এখানেই সমুদ্রে মিলিত হওয়ার জন্য সব নদী একত্রিত হয়। এটি সিন্ধু নদীর খুব বড় তীর্থ, এখানেই অগস্ত্য মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় লোপামুদ্রা তাঁকে পতি রূপে বরণ করেন। এখানে বিষ্ণুপদ নামক পবিত্র তীর্থ আর ওই হল বিপাশা নামক পবিত্র নদী। হে শত্রুদমন ! এই হল সর্ব পবিত্র কাশ্মীর মণ্ডল, এখানে অনেক মহর্ষি বাস করেন, তুমি ভ্রাতাদের নিয়ে তাঁদের দর্শন করো। এখান থেকেই মানসসরোবরের দ্বার দেখা যাচ্ছে। এই তীর্থে এক অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার আছে। এক যুগ অতিক্রান্ত হলে এখানে দেবী পার্বতী এবং পার্ষদগণের ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণকারী মহাদেবের সাক্ষাৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধালু যাজকগণ পরিবারের হিতার্থে এই সরোবরে চৈত্রমাসে স্নান করে মহাদেবের পূজা করেন।'

'সামনে উজ্জানক তীর্থ, এর কাছেই কুশবান সরোবর। এতে কুশেশয় নামক কমল উৎপন্ন হয়। পাণ্ডুনন্দন ! এবার তোমরা ভৃগুতুঙ্গ পর্বত দেখতে পাবে। আগে সর্বপাপহারি বিতস্তা নদীর দর্শন করো। এটি যমুনার দিক থেকে আসা জলা ও উপজলা নদী। এর তীরে যজ্ঞ করে রাজা উশীনর ইন্দ্রের থেকে বড় হয়েছিলেন। রাজন্ ! একবার ইন্দ্র এবং অগ্নি তাঁকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। ইন্দ্র বাজের রূপ আর অগ্নি পায়রার রূপ ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তারা রাজা উশীনরের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন। বাজের ভয়ে পায়রা প্রাণরক্ষার জন্য রাজার কোলে আশ্রয় নেয়। তখন বাজ বলল—'রাজন্ ! সমস্ত রাজারা আপনাকে ধর্মাত্মা বলে থাকে। তাহলে আপনি কেন এই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করছেন ? আমি ক্ষুধায় কাতর আর এই পায়রাটি আমার। আপনি ধর্মের লোভে একে রক্ষা করবেন না।' রাজা বললেন—'হে মহাপক্ষী ! এই পক্ষী তোমার ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য আমার শরণ নিয়েছে। সে অভয় পাবার

জন্য আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। আমি যদি একে তোমার আহার্য হওয়া থেকে রক্ষা করি তবে সেটি কী তোমার কাছে ধর্মযুক্ত বলে মনে হয় না ? দেখ, এ ভয়ে কেমন কাঁপছে, প্রাণরক্ষার জন্যই সে আমার কাছে এসেছে। এই অবস্থায় একে ত্যাগ করা অত্যন্ত অন্যায়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, যে জগন্মাতা গাভী হত্যা করে এবং যে শরণাগতকে ত্যাগ করে—এই তিনজনের সমান পাপ হয়।' বাজ বলল—'সমস্ত প্রাণীই আহারের ফলে সৃষ্টি হয়। আহারেই তাদের বৃদ্ধি, আহারই তাদের জীবন। যে সকল পার্থিব ধন পরিত্যাগ করা কষ্টকর মনে হয়, তা না পেলেও মানুষ অনেক দিন জীবিত থাকতে সক্ষম ; কিন্তু আহার বিনা কেউই বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না। আজ আপনি আমাকে আহার থেকে বঞ্চিত করলেন, তাই আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না। আর আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী-পুত্রও মারা যাবে। আপনি এই একটি পায়রাকে বাঁচাতে গিয়ে কয়েকটি প্রাণের ঘাতক হয়ে যাবেন। যে ধর্ম অন্য ধর্মের বাধাস্বরূপ, তা ধর্ম নয়। তাকে কুধর্মই বলে, ধর্ম তাকেই বলে, যা অন্য কোনো ধর্মের পরিপন্থী হয় না। যেখানে দুটি ধর্মের মধ্যে বিরোধ থাকে, সেখানে অবস্থার গুরুত্ব বিচার করে, যাতে প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেই ধর্মের আচরণ করা উচিত। সুতরাং রাজন্ ! আপনিও ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে লঘু-গুরুর দিকে দৃষ্টি রেখে যাতে ধর্মের প্রকৃত পালন হয় সেই আচরণ করুন।'

তখন রাজা বললেন—'পক্ষিপ্রবর ! আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। আপনি কি সাক্ষাৎ পক্ষীরাজ গরুড় ? আপনি যে ধর্মের মর্ম সম্যকভাবে জানেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি যে কথা বলছেন তা অতি বিচিত্র এবং ধর্মসম্মত। আমি এও লক্ষ্য করছি যে, এমন কোনো ব্যাপার নেই, যা আপনি জানেন না। কিন্তু শরণার্থীকে পরিত্যাগ করাকে আপনি কী করে ভালো বলেন ? পক্ষীবর ! আপনার এই সমস্ত চেষ্টাই খাদ্যের জন্য বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে তো এর অধিক খাদ্য দেওয়া সম্ভব। আমি আপনাকে শিবি প্রদেশের সমৃদ্ধশালী রাজ্য প্রদান করছি, গ্রহণ করুন। এছাড়াও আপনি আর যা কিছু চান, তা-ও আমি দিতে পারি। এই শরণার্থী পক্ষীকে ত্যাগ করতে পারব না। হে পক্ষীশ্রেষ্ঠ ! কোন কাজ করলে আপনি একে ছেড়ে দেবেন, তা বলুন ! আমি তাই করব, কিন্তু এই পায়রাটিকে আমি দেব না।'

বাজ বলল—'নৃপবর ! আপনার যদি এই পায়রার ওপর এতই স্নেহ থাকে তাহলে এর সমান ওজনের মাংস ওজন করে দিন, তাতেই আমার তৃপ্তি হবে।'

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! তখন পরম ধর্মজ্ঞ উশীনর নিজের শরীরের মাংস কেটে ওজন করতে আরম্ভ
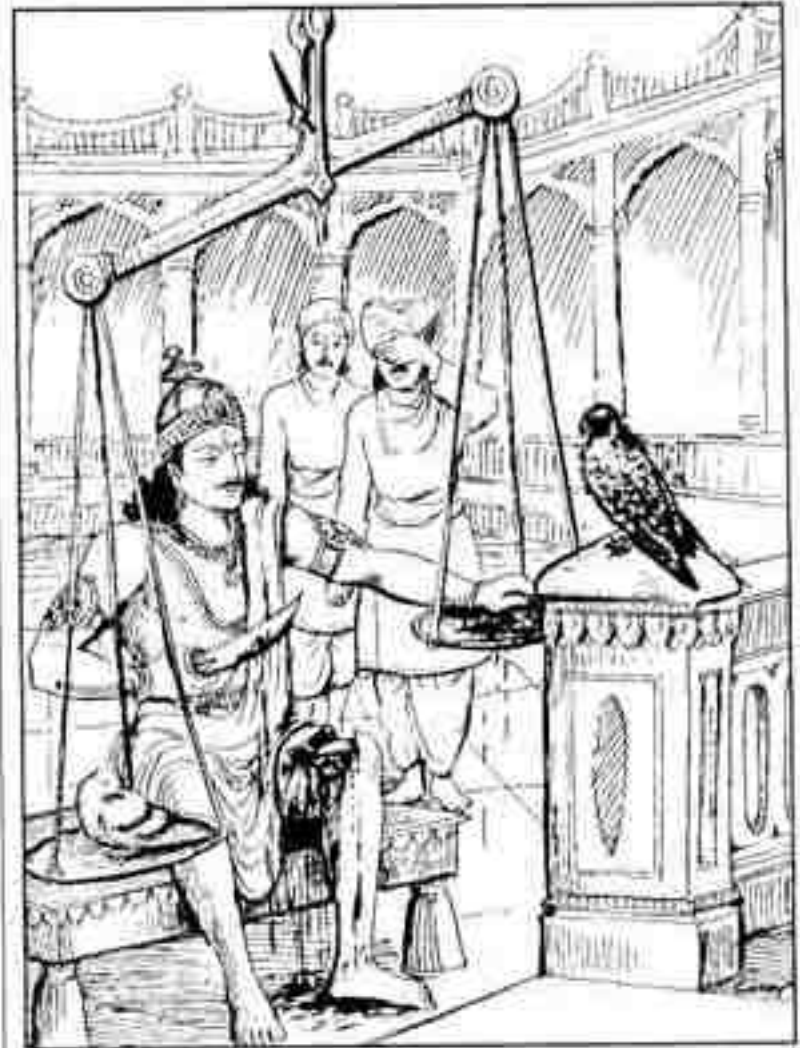
করলেন। অন্য পাল্লায় রাখা পায়রাটি তার থেকেও ভারী হয়ে গেল। তখন তিনি আরও মাংস গায়ের থেকে কেটে দিলেন। এভাবে বেশ কয়েকবার মাংস কেটে দিলেও যখন তা পায়রার সমান ওজনের হল না, তখন তিনি নিজেই সেই ওজন-যন্ত্রে চেপে বসলেন। তাই দেখে বাজ বলল—'হে ধর্মজ্ঞ ! আমি ইন্দ্র আর ইনি অগ্নিদেব ; আমরা আপনার ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্যই আপনার যজ্ঞশালায় এসেছি। রাজন্ ! যতদিন পৃথিবীতে লোকে আপনাকে স্মরণ করবে, ততদিন আপনার যশ অক্ষয় থাকবে এবং আপনি পুণ্যলোক ভোগ করবেন।' রাজাকে এই কথা বলে তাঁরা দুজনে দেবলোকে চলে গেলেন। মহারাজ ! এই পবিত্র আশ্রম সেই মহানুভব রাজা উশীনরের। এ অত্যন্ত পবিত্র এবং পাপনাশকারী। আপনি আমার সাথে এটির দর্শন করুন।'

—— o ——

অষ্টাবক্রের জন্ম এবং শাস্ত্রার্থের বৃত্তান্ত

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্‌ ! উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতুকে এই পৃথিবীতে মন্ত্রশাস্ত্রে পারঙ্গম বলে মনে করা হয়। সদা বসন্ত বিরাজমান ফল-ফুলে সমন্বিত আশ্রমটি তাঁরই। আপনি এটি দর্শন করুন। এই আশ্রমে শ্বেতকেতু দেবী সরস্বতীকে সাক্ষাৎ মানবীরূপে দর্শন করেছিলেন।'

লোমশ মুনিবর বললেন—'উদ্দালক মুনির কহোড় নামে এক প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁর গুরুদেবকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ভরে সেবা করতেন। এতে প্রসন্ন হয়ে তিনি তাঁকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই বেদ অধ্যয়ন করিয়েছিলেন এবং তাঁর কন্যা সুজাতার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে সুজাতা গর্ভবতী হলেন, গর্ভস্থ সেই সন্তানটি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিল। একদিন কহোড় বেদপাঠ করছিলেন, তখন সে গর্ভের ভিতর থেকেই জানাল—'পিতা, আপনি সারা-রাত ধরে বেদপাঠ করছেন, কিন্তু তা ঠিকমতো হচ্ছে না।'

শিষ্যদের মধ্যে এইভাবে ভুল ধরায় পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই উদরস্থ সন্তানকে অভিশাপ দিলেন যে, তুমি গর্ভস্থ অবস্থাতেই এইরূপ অপ্রিয় কথা বলছ, এর জন্য তোমার অঙ্গের আট জায়গায় বক্রতা থাকবে। অষ্টাবক্র যখন গর্ভে বাড়তে লাগলেন তখন সুজাতা খুব পীড়িতা হলেন, তিনি তাঁর ধনহীন পতিকে একান্তে ডেকে কিছু ধন নিয়ে আসার জন্য প্রার্থনা করলেন। কহোড় রাজা জনকের কাছে ধনের জন্য গেলেন। কিন্তু সেখানে 'বন্দী' নামক শাস্ত্রার্থে প্রবীণ বিদ্বান তাঁকে পরাজিত করল এবং শাস্ত্রার্থের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল। উদ্দালক এই সংবাদ পেয়ে সুজাতার কাছে গিয়ে সব বললেন এবং জানালেন যে, 'তুমি অষ্টাবক্রকে এই বিষয়ে কিছু জানিও না।' তাই জন্মের পরেও অষ্টাবক্র এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। তিনি উদ্দালককেই তাঁর পিতা বলে মনে করতেন এবং তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে নিজের ভাই বলে জানতেন।

অষ্টাবক্র যখন বারো বছর বয়সের বালক তখন একদিন যখন তিনি উদ্দালকের কোলে বসে ছিলেন, তখন শ্বেতকেতু সেখানে এসে তাঁকে কোল থেকে টেনে বলল 'এ তোমার পিতার কোল নয়।' শ্বেতকেতুর এই কটূক্তিতে তাঁর মনে অত্যন্ত আঘাত লাগল। তিনি গৃহে গিয়ে মাকে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, আমার পিতা কোথায় গেছেন ?' সুজাতা এতে খুব ভয় পেয়ে শাপের ভয়ে সব কথা বলে দিলেন। সব কথা শুনে তিনি রাত্রে শ্বেতকেতুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, 'আমরা দুজনে রাজা জনকের যজ্ঞে যাব। শুনেছি, সেই যজ্ঞ অত্যন্ত বিচিত্র, আমরা সেখানে বড় বড় শাস্ত্রার্থ শুনব।' এই পরামর্শ করে মামা-ভাগিনেয় দুজনে রাজা জনকের রাজবীরযজ্ঞের জন্য রওনা হলেন।

যজ্ঞশালার দ্বার দিয়ে তাঁরা যখন ভিতরে ঢুকছিলেন তখন দ্বারপাল তাঁদের বলল, 'আপনাদের প্রণাম। আমি আজ্ঞাপালনকারী মাত্র, রাজার আদেশে আমি আপনাদের যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। এই যজ্ঞশালায় বালকদের প্রবেশের অনুমতি নেই, এখানে শুধু বৃদ্ধ ও বিদ্বান ব্রাহ্মণই প্রবেশ করতে পারবেন।'

অষ্টাবক্র বললেন—'দ্বারপাল ! মানুষ অধিক বৎসর বয়স হলে, চুল সাদা হলে, অর্থের দ্বারা বা অধিক কুটুম্বের দ্বারা বড় বলে মানা হয় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনিই বড়

যিনি বেদের প্রবক্তা। ঋষিরা তো এই নিয়মই জানিয়েছেন। আমি রাজসভায় বন্দী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তুমি আমাদের হয়ে রাজাকে খবর দাও। আজ তুমি বিদ্বানদের সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রার্থ করতে দেখবে আর বাদ-প্রতিবাদে বন্দীদের পরাস্ত করেছি দেখতে পাবে।'

দ্বারপাল বলল—'আচ্ছা, আমি কোনোভাবে আপনাদের সভায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনাদের বিদ্বানের যোগ্য কাজ করে দেখাতে হবে।' এই বলে দ্বারপাল তাঁদের রাজার কাছে নিয়ে গেল। অষ্টাবক্র সেখানে গিয়ে বললেন—'রাজন্! আপনি জনক বংশের প্রধান ব্যক্তি এবং চক্রবর্তী রাজা। আমি শুনেছি, আপনার এখানে 'বন্দী' নামের একজন বিদ্বান আছেন। তিনি ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রার্থে পরাস্ত করে দেন এবং আপনার অনুচররা পরাজিত ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণদের মুখে এই কথা শুনে আমি অদ্বৈত ব্রহ্ম বিষয়ে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রার্থ আলোচনা করতে এসেছি। বন্দী কোথায় আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

রাজা বললেন—'অনেক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ বন্দীর প্রভাব দেখেছেন। তুমি তাঁর শক্তি না জেনেই তাঁকে জিতে নেবার আশা করছ। আগে অনেক ব্রাহ্মণ এসেছেন ; কিন্তু সূর্যের কাছে যেমন নক্ষত্রসমূহ হতপ্রভ হয়ে পড়ে, তেমনই তাঁরাও এঁর কাছে হতপ্রভ হয়ে পড়েন।' তখন অষ্টাবক্র বললেন—'আমার মতো কোনো বিজ্ঞের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, তাই তিনি সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে কথা বলছেন। এবার আমার কাছে পরাজিত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা অচল গাড়ির মতো মূক হয়ে থাকবেন।'

তখন রাজা অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন—'যে ব্যক্তি ত্রিশ অবয়ব, দ্বাদশ অংশ, চব্বিশ পর্ব এবং তিন শত ষাট আরা সম্পন্ন পদার্থ জানে, সে খুব বড় বিদ্বান।' এই কথা শুনে অষ্টাবক্র বললেন—'যার মধ্যে পক্ষরূপ চব্বিশ পর্ব, ঋতুরূপ ছয় নাভি, মাস রূপ দ্বাদশ অংশ এবং দিন রূপ তিনশত ষাট আরা থাকে, সেই নিরন্তর ঘুরতে থাকা সংবৎসর রূপ কালচক্র আপনাকে রক্ষা করুক।'

যথার্থ উত্তর শুনে রাজা এবার প্রশ্ন করলেন—'ঘুমানোর সময়ে কে চোখ বন্ধ করে না ? জন্মের পরও

কার গতি থাকে না ? কার হৃদয় নেই ? কে বেগে বৃদ্ধি পায় ?' অষ্টাবক্র উত্তর দিলেন মাছ ঘুমানোর সময় চোখ বন্ধ করে না, ডিম জন্ম নিলেও তার গতি থাকে না, পাথরের হৃদয় নেই এবং নদী বেগের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। তাই শুনে রাজা বললেন, 'আপনি দেবতার মতোই প্রভাবশালী। আপনাকে আমার মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, আপনি বালকও নন, আপনাকে বিজ্ঞই মনে করি। বিচার-বিবাদে আপনার সমকক্ষ কেউই নেই। তাই আপনাকে আমি মণ্ডপে যাবার অনুমতি দিচ্ছি, সেখানেই বন্দী আছে।'

অষ্টাবক্র তখন বন্দীর দিকে ফিরে বললেন—'নিজেকে অতিবন্দী[1] বলে মনে করো বন্দী ! তুমি পরাজিত ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে দেবে, এই নিয়ম করেছ। কিন্তু আমার সামনে তোমার মুখে কথা ফুটবে না। প্রলয়কালীন অগ্নির কাছে যেমন নদীর প্রবাহ শুকিয়ে যায়, তেমনই আমার সামনে তোমার তর্ক করার শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এবার তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও এবং আমিও তোমার কথার উত্তর দেব।'

রাজন্ ! পরিপূর্ণ সভায় অষ্টাবক্র ক্রোধভরে গর্জন করে তাকে আহ্বান করলে বন্দী বলল—'অষ্টাবক্র ! এক অগ্নিই নানাপ্রকারে প্রকাশিত হয়, এক সূর্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, শত্রু নাশকারী দেবরাজ ইন্দ্রই একমাত্র বীর এবং আমিও তোমার কথা উত্তর দেব।'

রাজন্ ! পরিপূর্ণ সভায় অষ্টাবক্র ক্রোধভরে গর্জন করে তাকে আহ্বান করলে বন্দী বলল—'অষ্টাবক্র ! এক অগ্নিই নানাপ্রকারে প্রকাশিত হয়, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করে, শত্রু নাশকারী দেবরাজ ইন্দ্রই একমাত্র বীর এবং পিতৃপুরুষের ঈশ্বর যমরাজও একজনই।'

অষ্টাবক্র—ইন্দ্র ও অগ্নি—এই দুই দেবতা, নারদ ও পর্বত—দেবর্ষি ও এই দুজন। অশ্বিনীকুমারও দুজন, রথের চাকাও দুটি হয় এবং বিধাতা পতি ও পত্নী উভয়ে উভয়ের সহচররূপেই দুজনকে সৃষ্টি করেছেন।

বন্দী—সমস্ত প্রজা কর্মবশত তিনপ্রকারে জন্মগ্রহণ করে ; সমস্ত কর্মের প্রতিপাদন বেদই করে, অধ্বর্যুজনও প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং—এই তিনটি সময়েই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় ; কর্মানুসারে প্রাপ্ত হওয়া ভোগাদির জন্য স্বর্গ, মর্ত্য ও নরক—এই তিনটি লোক আছে এবং বেদে কর্মজনিত জ্যোতিও তিন প্রকারের।

অষ্টাবক্র—ব্রাহ্মণদের জন্য আশ্রম চারপ্রকার, বর্ণও চার যজ্ঞাদি দ্বারা নিজেদের নির্বাহ করে থাকে। চারটিই প্রধান দিক, ওঁকারের অকার, উকার, মকার এবং অর্ধমাত্রা—এই চারটিই বর্ণ এবং পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা এবং বৈখরী ভেদে বাণীও চার প্রকারের বলে কথিত আছে।

বন্দী—যজ্ঞের অগ্নি পাঁচপ্রকারের (গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহ্বনীয়, সভ্য এবং আবসথ্য), পংক্তি ছন্দও পঞ্চপদবিশিষ্ট, যজ্ঞও পাঁচপ্রকারের (অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও সোম), পাঁচ ইন্দ্রিয়, বেদে পঞ্চ শিখাবিশিষ্ট অপ্সরাও পাঁচজন এবং জগতে পবিত্র নদও পাঁচটিই প্রসিদ্ধ।

অষ্টাবক্র—কত লোকে বলে থাকেন যে, অগ্নির

[1] শাস্ত্রার্থ বিজয়ী

আধান করার সময় ছয়টি গাভী দক্ষিণা দেওয়া উচিত ; কালচক্রে ঋতু ছয় প্রকার, মন-সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও ছয়টি, ছয় কৃত্তিকা এবং সমস্ত বেদে সাধস্ক যজ্ঞও ছয়টিই বলা হয়েছে।

বন্দী—গ্রাম্য পশু সাত, বন্য পশুও সাতটিই। যজ্ঞ পূর্ণকারী ছন্দ সাত, ঋষিও সাতজন, মান দেওয়ার প্রকার সাত এবং বীণার তারও সাতটিই প্রসিদ্ধ।

অষ্টাবক্র—অনেক বস্তু ওজন করার পাল্লার গুণ আট হয়ে থাকে। সিংশনাশকারী শরভের চরণও আট হয়ে থাকে, দেবতাদের মধ্যে বসু নামক দেবতারাও আটজন বলে শুনেছি এবং সমস্ত যজ্ঞেই যজ্ঞস্তম্ভ ভুজপ্রকৃতি হয়ে থাকে।

বন্দী—পিতৃযজ্ঞে সমিধ ত্যাগ করার মন্ত্র নয় বলে কথিত আছে, জগতে প্রকৃতির নয়টি ভাগ করা হয়েছে, বৃহতী ছন্দের অক্ষরও নয়টি এবং যার থেকে নানাপ্রকার সংখ্যা উৎপন্ন হয়, সেই এক থেকে নয় পর্যন্তই অঙ্ক হয়।

অষ্টাবক্র—জগতে দশদিক, সহস্রের সংখ্যাতেও একশতককে দশবার গণনা করতে হয়, গর্ভবতী নারী দশ মাস গর্ভধারণ করেন, তত্ত্ব উপদেশকারীও দশজন এবং পূজনীয় ব্যক্তিও দশ।

বন্দী—পশুদের শরীরে একাদশবিকার সম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদি এগারোটি হয়ে থাকে, যজ্ঞের স্তম্ভ এগারোটি হয়, প্রাণীদের এগারোরকম বিকার হয় এবং দেবতাদের মধ্যে রুদ্রও এগারোজন বলা হয়।

অষ্টাবক্র—এক বছরে বারো মাস থাকে, জগতী ছন্দে বারো অক্ষরের চরণ, প্রাকৃত যজ্ঞ বারোদিনের হয় এবং মহাত্মারা বলেন আদিত্যও বারো।

বন্দী—তিথিগুলির মধ্যে ত্রয়োদশীকে উত্তম তিথি বলা হয় এবং পৃথিবীও তেরোদ্বীপে সমন্বিত।[1]

বন্দী এই পর্যন্ত অর্ধেক শ্লোক বলে চুপ করে গেলে অষ্টাবক্র বাকী অর্ধেক শ্লোক সম্পূর্ণ করে বললেন—'অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য—এই তিন দেবতা তেরো দিনের যজ্ঞে ব্যাপক এবং বেদেও তেরোটি আদি অক্ষর বিশিষ্ট অতিছন্দ কথিত আছে।'[2] এই শুনেই বন্দী মুখ নীচু করল এবং অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেল। এদিকে অষ্টাবক্রর মুখে শাস্ত্রীয় কথনের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে সভার ব্রাহ্মণরা হর্ষধ্বনি করতে করতে অষ্টাবক্রের কাছে এসে তাঁকে সম্মান জানাতে লাগলেন।

অষ্টাবক্র বললেন—রাজন্ ! এই 'বন্দী' বহু বিদ্বান ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রার্থে পরাজিত করে জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। এখন এরও শীঘ্রই সেই গতি হওয়া উচিত।

বন্দী বললেন—'মহারাজ ! আমি জলাধীশ বরুণের পুত্র। আমার পিতাও আপনার মতো দ্বাদশ বর্ষে পূর্ণ হওয়ার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন। সেইজন্যই আমি জলে ডুবিয়ে দেওয়ায় ছলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বরুণলোকে পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা সব এখনই ফিরে আসবেন। অষ্টাবক্র মুনি আমার পূজনীয়, এঁর কৃপায় জলে ডুবে আমিও আমার পিতা বরুণদেবের সঙ্গে শীঘ্র মিলনের সৌভাগ্য লাভ করব।'

রাজাকে বন্দীর কথার জালে আবদ্ধ হয়ে দেরী করতে দেখে অষ্টাবক্র বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! আমি কয়েকবার বলেছি, তবুও আপনি মদমত্ত হাতির মতো কিছুই শুনছেন না, হয় আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, নাহলে আপনি এর মনোহর কথায় সব ভুলে গেছেন।'

জনক বললেন—'দেব ! আমি আপনার দিব্য বাণী শুনছি, আপনি সাক্ষাৎ দিব্য পুরুষ। আপনি শাস্ত্রার্থে বন্দীকে পরাস্ত করেছেন। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে এর দণ্ডের ব্যবস্থা করছি।'

বন্দী বললেন—'রাজন্ ! বরুণের পুত্র হওয়ায় আমার জলে ডোবার ভয় নেই। এই অষ্টাবক্র বহুদিন আগে ডুবে যাওয়া তার পিতা কহোড়কে এখনই দেখতে পাবে।'

লোমশ মুনি বললেন—'সভায় যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল তখন সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া সমস্ত ব্রাহ্মণ বরুণদেব দ্বারা সম্মানিত হয়ে জল থেকে উঠে জনক রাজার সভায়

[1]ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ।

[2]ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী ত্রয়োদশাদীন্যতিছন্দাংসি চাহুঃ।

এসে পৌঁছলেন। তখন কহোড় বললেন—'মানুষ এরূপ কাজের জন্যই পুত্র কামনা করে। আমি যে কাজ করতে পারিনি, তা আমার পুত্র করে দেখিয়েছে। রাজন্! কোনো কোনো সময়ে দুর্বল ব্যক্তির বলবান এবং মূর্খেরও বিদ্বানপুত্র জন্ম নেয়।' তারপর বন্দীও রাজা জনকের অনুমতি নিয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। তারপর ব্রাহ্মণরা অষ্টাবক্রের পূজা করলেন, অষ্টাবক্রও তাঁর পিতার পূজা করলেন। তারপর তাঁর মামা শ্বেতকেতুর সঙ্গে আশ্রমে ফিরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে কহোড় অষ্টাবক্রকে বললেন—'তুমি এই সমঙ্গা নদীতে নামো।' অষ্টাবক্র যেমনই নদীতে ডুব দিলেন তখনই তাঁর সমস্ত শরীর সোজা হয়ে গেল। তাঁর স্পর্শে নদীও পবিত্র হয়ে গেল। যে ব্যক্তি এই নদীতে স্নান করে, সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। রাজন্! তুমিও তোমার ভ্রাতাগণ এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে এই নদীতে স্নান ও আচমন করো।'

—o—

পাণ্ডবদের গন্ধমাদন যাত্রা

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্! এই যে মধুবিলা নদী দেখা যাচ্ছে, এরই অপর নাম সমঙ্গা। এ হল কর্দমিল ক্ষেত্র। এখানে রাজা ভরতের অভিষেক হয়েছিল। বৃত্রাসুরকে বধ করার পর শচীপতি ইন্দ্র যখন রাজ্যলক্ষ্মীচ্যুত হয়েছিলেন, তখন এই সমঙ্গা নদীতে স্নান করেই তাঁর পাপমুক্তি হয়। মৈনাক পর্বতের মধ্যভাগে এই হল বিনশন তীর্থ। এদিকে কন্‌খল নামক পর্বতমালা; এটি ঋষিদের প্রিয় স্থান। এর কাছেই মহানদী গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। পূর্বকালে এইখানে ভগবান সনৎকুমার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রাজন্! এখানে স্নান করলে তুমি সর্বপাপ মুক্ত হবে। এর পরে পুণ্য নামে এক সরোবর ও ভৃগুতুঙ্গ নামে পর্বত দেখতে পাবে। সেখানে তুমি উষ্ণগঙ্গা তীর্থে তোমার মন্ত্রীদের নিয়ে স্নান করবে। দেখো, স্থূলশিরা মুনির সুন্দর আশ্রম দেখা যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে মন থেকে অহংকার ও ক্রোধ ত্যাগ করবে। এদিকে রৈভ্য ঋষির সুন্দর সুশোভিত আশ্রম। এখানকার বৃক্ষ সর্বদা ফলে ফুলে ভরে থাকে। এখানে বাস করলে তুমি সর্বপাপ হতে মুক্ত হবে।

রাজন্! তুমি উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেত এবং কাল নামক পর্বতসমূহ লঙ্ঘন করে এসেছ। এখানে ভাগীরথী সপ্তধারায় প্রবাহিত, এ অত্যন্ত নির্মল এবং পবিত্র স্থান। এখানে সর্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, এখন এই স্থান মানুষে দেখতে পায় না। তুমি ধৈর্য ধরে এখানে সমাধিতে বসো, তাহলে এই তীর্থগুলি দর্শন করতে পারবে। এবার আমরা মন্দরাচল পর্বতে যাব। সেখানে মণিভদ্র নামক যক্ষ এবং যক্ষরাজ কুবের থাকেন। রাজন্! এই পর্বতে অষ্টাশি হাজার গন্ধর্ব ও কিন্নর এবং তার চতুর্গুণ যক্ষ নানাপ্রকার শস্ত্র নিয়ে যক্ষরাজ মণিভদ্রের সেবার জন্য উপস্থিত থাকে। তারা নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে, গতিতে তারা সাক্ষাৎ বায়ুর সমকক্ষ। বলবান যক্ষ এবং রাক্ষস দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় এই পর্বত অত্যন্ত দুর্গম, তুমি এখানে সাবধানে থেক। আমাদের এখানে কুবেরের সঙ্গী মৈত্র নামক ভয়ানক রাক্ষসের সম্মুখীন হতে হবে। রাজন্! কৈলাস পর্বত ছয় যোজন উচ্চ। এর ওপরই বদরিকাশ্রম তীর্থ, যেখানে দেবতারা আসেন। অতঃপর তুমি আমার তপস্যা ও ভীমের

বলে সুরক্ষিত হয়ে এই তীর্থে স্নান করো। 'দেবী গঙ্গে! কাঞ্চনময় পর্বত থেকে নেমে আসা আপনার কলকলধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি এই নরেন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করুন।' গঙ্গাদেবীর কাছে এইভাবে প্রার্থনা করে লোমশ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন—'ভাইসব! মহর্ষি লোমশ এই স্থানকে খুবই ভয়ানক মনে করেন। অতএব তোমরা দ্রৌপদীকে সাবধানে রক্ষা করবে, কোনো বিপদ যেন না হয়। এখানে মন, বাণী এবং শরীরে খুব পবিত্রভাবে থাকবে। ভীম! মুনিবর কৈলাস সম্পর্কে যা বলেছেন, তা তুমিও শুনেছ। এখন চিন্তা কর দ্রৌপদীকে নিয়ে কীভাবে অগ্রসর হবে! তা নাহলে সহদেব, এক কাজ করো। ভগবান ধৌম্য, পাচকরা, পুরবাসীগণ, রথ, ঘোড়া, পরিচারকরা এবং আমি, নকুল এবং ভগবান লোমশদেব—আমরা তিনজন অল্পাহার করে নিয়ম মেনে এই পর্বতে উঠব। আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা সাবধানে হরিদ্বারে থাক এবং দ্রৌপদীর ভালোভাবে দেখাশোনা করো।'

ভীম বললেন—'রাজন্! এই পর্বত রাক্ষসে পরিপূর্ণ আর দুর্গম ও অসমতল। সৌভাগ্যবতী দ্রৌপদীও আপনাকে ছাড়া ফিরতে চান না। সহদেবও সেইমতো আপনার পশ্চাতেই থাকতে চান। আমি ওর মনের কথা খুব জানি, ও কখনো ফিরে আসবে না। তাছাড়া সকলেই অর্জুনকে দেখার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে, তাই সকলেই আপনার সঙ্গেই যাবে। যদি গুহ্যকন্দরের জন্য পর্বতে রথে যাত্রা করা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা পদব্রজেই যাব। আপনি চিন্তা করবেন না। যেসব স্থানে দ্রৌপদী পদব্রজে যেতে পারবেন না, সেসব স্থানে আমি তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে যাব। মাদ্রীপুত্র নকুল এবং সহদেবও অল্পবয়স্ক তরুণ, দুর্গম স্থানে ওরা যদি চলতে সক্ষম না হয়, তাহলে ওদেরও আমি পার করে দেব।'

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'তুমি যশস্বিনী পাঞ্চালী এবং নকুল, সহদেবকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার যে সাহস দেখাচ্ছ, তা অত্যন্ত আনন্দের কথা। অন্য কারো কাছে এরূপ আশা করা যায় না। ভাই, তোমার কল্যাণ হোক আর তোমার বল, ধর্ম এবং সুযশ বৃদ্ধিলাভ করুক।' তখন দ্রৌপদীও হেসে বললেন—'রাজন্! আমি আপনার সঙ্গেই যাব, আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না।'

লোমশ ঋষি বললেন—'কুন্তীনন্দন! এই গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যার প্রভাবেই আরোহণ করা সম্ভব, তাই আমাদের সকলেরই তপস্যা করা উচিত। তপস্যার সাহায্যেই আমরা সকলে অর্জুনকে দেখতে পাব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে যেতে রাজা সুবাহুর বিস্তৃত রাজ্য নজরে পড়ল। সেখানে হাতি ঘোড়ার ভিড় লেগেছিল এবং বহু কিরাত, পুলিন্দ জাতির লোকের বাস ছিল। পুলিন্দ দেশের রাজা যখন জানতে পারলেন যে, পাণ্ডবরা তাঁদের দেশে এসেছেন তখন তিনি অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁদের আহ্বান জানালেন। পাণ্ডবরা তাঁর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে সেদিন সেখানে থাকলেন। পরদিন সূর্যোদয় হলে তাঁরা বরফের পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ইন্দ্রসেন প্রমুখ সেবক, পাচক এবং দ্রৌপদীর সমস্ত জিনিসপত্র পুলিন্দরাজের কাছে রেখে তাঁরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললেন।

যুধিষ্ঠির আবার বলতে লাগলেন—'ভীম! অর্জুনকে

দেখার জন্যই পাঁচবছর ধরে তোমাদের সবাইকে নিয়ে সুরম্য তীর্থ, বন এবং সরোবরগুলিতে বিচরণ করছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই সত্যসন্ধ, শূরবীর ধনঞ্জয়কে না দেখতে পাওয়ায় আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। অর্জুনের গুণের কথা আর কী বলব! যদি অতি হীন মানুষও তাকে অপমান করে তাহলেও অর্জুন তাকে ক্ষমা করে দেয়। সাধারণ ও সরল ব্যক্তিদের সে সুখ ও শান্তি প্রদান করে ও অভয় দেয়। যদি কেউ ছলনা বা কপটতার দ্বারা তার সঙ্গে সংঘাত করে তাহলে, সে ইন্দ্র হলেও ওর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। শরণাগত হলে, তার শত্রুর ওপরও অর্জুন উদার ভাব পোষণ করে। আমাদের সকলের সে-ই একমাত্র ভরসা। অর্জুন শত্রু দমনকারী, সর্বপ্রকার রত্নজয়কারী এবং সকলকে সুখপ্রদানকারী। তারই বাহুবলে আমাদের ত্রিলোকের বিখ্যাত সভাগৃহ প্রাপ্ত হয়েছিল। তাকে দেখার জন্যই আমরা এই গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করেছি। কোনো ক্রূর, লোভী এবং অশান্ত চিত্ত ব্যক্তি এখানে যাত্রা করতে পারে না। অসংযমী ব্যক্তিদের নানারকম দংশক প্রাণী, বাঘ, সাপ ইত্যাদি কষ্ট দেয়, সংযমী ব্যক্তিদের কাছে তারা আসে না। সুতরাং আমাদের সংযত-চিত্ত ও মিতাহারী হয়ে এই পর্বতে আরোহণ করতে হবে।'

লোমশ মুনি বললেন—'হে সৌম্য! এখান দিয়ে শীতল ও পবিত্র অলকানন্দা নদী বহমানা। বদরিকাশ্রম থেকেই এর উৎপত্তি। দেবর্ষিগণ এই জল ব্যবহার করেন। আকাশচারী বালখিল্য এবং গন্ধর্বও এর তীরে আসেন। মরিচী, পুলহ, ভৃগু এবং অঙ্গিরা প্রমুখ মুনি এখানে শুদ্ধস্বরে সামগান করেন। গঙ্গাদ্বারে ভগবান শংকর এই নদীর জলই তাঁর জটায় ধারণ করেছিলেন। তোমরা সকলে বিশুদ্ধ ভাবে এই ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাম করো।'

মহামুনি লোমশের কথা শুনে পাণ্ডবরা অলকানন্দার কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর আনন্দিত মনে ঋষিদের সঙ্গে রওনা হলেন।

লোমশ মুনি বললেন—'সামনে যে কৈলাস পর্বতের শিখরের ন্যায় শ্বেতবর্ণের পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে, সেগুলি নরকাসুরের অস্থি। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের হিতার্থে এই স্থানে ভগবান বিষ্ণু ওই দৈত্যকে বধ করেছিলেন। সেই দৈত্য দশ হাজার বর্ষ তপস্যা করে ইন্দ্রের আসন নিয়ে নিতে চেয়েছিল। নিজ তপোবল ও বাহুবলের জন্য সে দেবতাদের অপরাজেয় ছিল, তাই সে সর্বদা দেবতাদের বিরক্ত করত। ইন্দ্র তাইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মনে মনে ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতে থাকেন। ভগবান প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিলে

সকল দেবতা ও ঋষিরা তাঁকে স্তুতি করে সমস্ত কষ্ট জানালেন। তখন ভগবান বললেন—'দেবরাজ! তুমি নরকাসুরকে ভয় পাও, তা আমি জানি এবং একথাও জানি যে, তার তপস্যার প্রভাবে সে তোমার স্থান নিয়ে নিতে চায়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে যতই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করুক, আমি তাকে শীঘ্রই বধ করব।' দেবরাজকে এই কথা বলে তিনি এক চপেটাঘাতে তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে সেই আঘাতে পর্বতের মতো পৃথিবীর ওপর এসে পড়ল। ভগবানের দ্বারা বধ হওয়া সেই দৈত্যের স্তূপীকৃত অস্থিই সামনে দেখা যাচ্ছে।

এছাড়াও ভগবান শ্রীবিষ্ণু আর একটি কর্মের জন্য প্রসিদ্ধ। সত্যযুগে আদিদেব শ্রীনারায়ণ যমের কার্য করতেন। সেই সময় মৃত্যু না থাকায় সকল প্রাণী অত্যন্ত বৃদ্ধিলাভ করেছিল। তাদের ভারে আক্রান্ত পৃথিবী জলের মধ্যে শত যোজন ঢুকে গিয়েছিল, সে তখন শ্রীনারায়ণের কাছে গিয়ে বলল—'ভগবান! আপনার কৃপায় আমি

বহুদিন স্থির হয়েছিলাম ; কিন্তু এখন বোঝা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, তাই আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আপনিই আমার এই ভার কম করতে সক্ষম। আমি আপনার শরণাগত ; আপনি আমাকে কৃপা করুন।'

পৃথিবীর কথা শুনে শ্রীভগবান বললেন—'পৃথিবী ! তুমি ভারবহন করে পীড়িত, সে কথা ঠিক, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি এবার এমন উপায় অবলম্বন করব, যাতে তুমি ভারমুক্ত হয়ে যাও।' এই বলে তিনি পৃথিবীকে বিদায় দিয়ে নিজে একশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহমূর্তি ধারণ করলেন। তারপর পৃথিবীকে তার ওপর ধারণ করে একশত যোজন নীচে থেকে তাকে জলের বাইরে বার করে আনলেন।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং লোমশ মুনির নির্ধারিত পথে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন।

——o——

বদরিকাশ্রম যাত্রা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পাণ্ডবরা যখন গন্ধমাদন পর্বতে উঠলেন, তখন সেখানে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। বায়ুর বেগে ধুলো এবং পাতা উড়ছিল। সেই ধুলো আকাশ বাতাস চতুর্দিক আচ্ছাদিত করে ফেলল। সেই ধুলোর অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে বা কারও কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বায়ুবেগ কম হলে ধুলো ওড়া বন্ধ হল এবং মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল এবং বজ্রপাতের মতো মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ঝড় কমে এলো, বাতাস শান্ত হল, মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যদেব উঁকি দিলেন।

এই অবস্থায় পাণ্ডবরা প্রায় এক ক্রোশ রাস্তা গেছেন এমন সময় পাঞ্চাল রাজকুমারী দ্রৌপদী এই ঝড়-বাদলে পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন। তিনি এই কঠোর পরিশ্রম সহ্য

করতে পারলেন না। পদব্রজে যেতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই তিনি আর চলতে পারলেন না। ধর্মরাজ তাঁকে নিজ ক্রোড়ে নিয়ে ভীমকে বললেন—'ভ্রাতা ভীম ! এবার তো বহু উঁচু নীচ পর্বত আসবে। বরফ থাকায় সেগুলি পেরোনো কঠিন হবে। সুকুমারী দ্রৌপদী তার ওপর দিয়ে কী করে যাবেন ?' তখন ভীম বললেন—'রাজন্ ! আপনি চিন্তা করবেন না, আমি নিজে আপনাকে, দ্রৌপদীকে এবং নকুল, সহদেবকে নিয়ে যাব। তাছাড়া হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচও আমার মতোই বলশালী, সে আকাশপথেও যেতে সক্ষম। আপনার আদেশ পেলে সে আমাদের সকলকে নিয়ে যাবে।'

এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'তাহলে ভীম ! তুমি ঘটোৎকচকে স্মরণ করো।' তাঁর নির্দেশ পেয়ে ভীম তাঁর রাক্ষসপুত্রকে স্মরণ করলেন, স্মরণ করতেই ঘটোৎকচ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি হাত জোড় করে পাণ্ডবদের এবং ব্রাহ্মণদের নমস্কার জানালেন। উপস্থিত সকলেও তাঁকে স্বাগত জানালেন। তারপর এই ভীষণ বীর ঘটোৎকচ হাত জোড় করে ভীমকে বললেন—'আপনি আমাকে স্মরণ করায় আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছি। বলুন কী আদেশ ?'

ভীম তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—'পুত্র ! তোমার মা দ্রৌপদী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন, তুমি এঁকে তোমার কাঁধে তুলে নাও। আস্তে আস্তে হাঁটবে, যেন এঁর কষ্ট না হয়।'

ঘটোৎকচ বললেন—'আমি একাই ধর্মরাজ, ধৌম্য, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেব—সবাইকে নিয়ে যেতে পারি ; আমার সঙ্গে বহু শূরবীর আছে যারা ইচ্ছামতো রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আপনাদেরও নিয়ে

যাবে।' এই বলে বীর ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে কাঁধে করে পাণ্ডবদের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলেন। অন্য রাক্ষসরা পাণ্ডবদের নিয়ে চলল। অতুলনীয় তেজস্বী ভগবান লোমশ

তাঁর নিজ তপস্যা বলে আকাশপথে চললেন। তখন তাঁকে সূর্যের ন্যায় মনে হচ্ছিল। ঘটোৎকচের নির্দেশে অন্য রাক্ষসরাও ব্রাহ্মণদের কাঁধে করে নিয়ে চলল। এইভাবে সকলে সুরম্য বন উপবন দেখতে দেখতে বদরিকাশ্রমের দিকে রওনা হলেন। রাক্ষসরা অত্যন্ত দ্রুতগামী হয়। তাই, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা তাদের বহুদূরে নিয়ে এলো। পথে যাওয়ার সময় তাঁরা ম্লেচ্ছ অধ্যুষিত দেশ, রত্নের খনি, নানাপ্রকার ধাতু সম্পন্ন পর্বতের তরাই অঞ্চলও দেখলেন। সেইসব দেশে নানা বিদ্যাধর, কিন্নর, গন্ধর্ব এবং কিম্পুরুষ বিচরণ করছিল এবং এখানে ওখানে বহু বানর, ময়ূর, চমরী গাই, মৃগ, শূকর, মহিষ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছিল। পথে নানা নদীও দেখা গেল।

এইভাবে উত্তরে কুরুদেশকে লঙ্ঘন করে তাঁরা নানা আশ্চর্যময় কৈলাস পর্বত দেখতে পেলেন। তাঁরা শ্রীনর-নারায়ণের আশ্রম দর্শন করলেন। আশ্রমটি দিব্য বৃক্ষে সুশোভিত, সর্বদা ফল-ফুলে পরিপূর্ণ। সেখানে তাঁর সুগোল শাখাবিশিষ্ট মনোহর বদরী দর্শন করলেন। এর ছায়া অত্যন্ত শীতল এবং ঘন, এর পাতাগুলি চকচকে এবং কোমল। এতে মিষ্টি ফল ধরে ছিল। বদরীর কাছে পৌঁছে সকলে রাক্ষসদের কাঁধ থেকে নেমে আশ্রমে শ্রীনর-নারায়ণ দর্শনে গেলেন। আশ্রমের ভিতর অন্ধকার ছিল না, কিন্তু বৃক্ষের পাতার ছায়াতে তার মধ্যে সূর্য কিরণও প্রবেশ করেনি। এই আশ্রমে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণতা কোনো কিছুই বাধা সৃষ্টি করে না এবং এখানে প্রবেশ করলেই শোক স্বতই দূর হয়ে যায়। এখানে মহর্ষিরা উপস্থিত থাকেন এবং ঋক্-সাম-যজুরূপা ব্রাহ্মী, লক্ষ্মী বিরাজমানা। যারা ধর্মপালনে অপারগ, তাদের তো এখানে প্রবেশই হতে পারে না। মহর্ষি ও সংযতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু যতিগণ, যাঁদের তেজ সূর্য ও অগ্নির ন্যায় এবং অন্তরের মল তপস্যায় দগ্ধ হয়ে গেছে, তাঁরাই এখানে বাস করতে পারেন। তাছাড়া ব্রাহ্মী-স্থিতি প্রাপ্ত নানা ব্রহ্মজ্ঞ মহানুভবও বাস করেন।

জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সঙ্গে মহর্ষিদের কাছে গেলেন। তাঁরা সকলেই দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন। তাঁরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের আশ্রমে আসতে দেখে প্রসন্ন হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ জানাতে এগিয়ে এলেন। তাঁদের তপস্যার তেজ অগ্নির মতো এবং তাঁরা নিরন্তর স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁরা বিধিপূর্বক যুধিষ্ঠিরদের আদর ও আপ্যায়ন করলেন এবং জল-ফুল-ফল-মূল প্রদান করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের আপ্যায়ন স্বীকার করলেন। ভীম এবং বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম ব্রাহ্মণরাও সেই মনোরম আশ্রমে এলেন। সেই আশ্রম সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরীর ন্যায় মনে হচ্ছিল। সেখানকার সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখে তাঁরা পরম পবিত্র ভাগীরথী তীরে এলেন, এখানে তা সীতা নামে বিখ্যাত। তাতে স্নানাদি করে পবিত্র হয়ে, দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দে আশ্রমে থাকতে লাগলেন।

—o—

ভীমসেনের শ্রীহনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় পাণ্ডবরা সেখানে ছয় রাত কাটালেন। এর মধ্যে দৈবযোগে ঈশান কোণ থেকে বাতাসে একটি সহস্রদল পদ্ম উড়ে এলো। সেটি অত্যন্ত দিব্য এবং সূর্যের ন্যায়, তার গন্ধ অতুলনীয় ছিল। মাটিতে পড়তেই দ্রৌপদীর দৃষ্টি তার ওপর পড়ল, তিনি সেই সুগন্ধি পদ্মটির কাছে এলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভীমকে বললেন—'আর্য !

আমি এই কমলটি ধর্মরাজকে উপহার দেব। আপনার যদি আমার ওপর ভালোবাসা থাকে, তাহলে আমার জন্য এই রূপ ফুল আরও নিয়ে আসুন। আমি কাম্যকবনে আমাদের আশ্রমে নিয়ে যেতে চাই।'

ভীমসেনকে এই কথা বলে দ্রৌপদী তখনই সেই ফুলটি নিয়ে ধর্মরাজের কাছে গেলেন। রাজমহিষী দ্রৌপদীর মনের ইচ্ছা বুঝে মহাবলী ভীম তাঁকে উপহার দেবার ইচ্ছায়, যেদিক থেকে ফুলটি উড়ে এসেছিল, সেইদিকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গমন করলেন। রাস্তার বিপদ দূর করার জন্য তিনি সুবর্ণ মণ্ডিত ধনুক ও বাণ সঙ্গে নিয়ে মত্ত হাতির ন্যায় চলতে থাকলেন। পথে যাবার সময় মেঘে মেঘে ধাক্কা লেগে যেমন ভয়ংকর ধ্বনি শোনা যায়, ভীমও তেমনই গর্জন করে চলতে লাগলেন। সেই শব্দে চকিত হয়ে বাঘেরা তাদের গুহা ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। বুনো জীব-জন্তুও যেখানে সেখানে লুকিয়ে পড়ল, পাখিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে পালাল। ভীমসেনের গর্জনে সমস্ত দিক কেঁপে উঠল। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি গন্ধমাদনের চূড়ায় কয়েক যোজন বিস্তৃত এক কদলী বাগিচা দেখতে পেলেন। মহাবলী ভীম নৃসিংহের ন্যায় গর্জন করে একলম্ফে তার ভিতর প্রবেশ করলেন।

সেই কদলী বনে মহাবীর হনুমান বাস করতেন। তিনি ভ্রাতা ভীমের সেই দিকে আসার খবর পেয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন ভীমসেনের এদিক দিয়ে স্বর্গে যাওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে পথে কেউ তাঁকে অপমান করতে পারেন অথবা শাপ দিতে পারেন। এই ভেবে ভীমসেনকে রক্ষা করার জন্য তিনি কদলী বন দিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। শুয়ে শুয়ে যখন তাঁর তন্দ্রা আসছিল তখন তিনি হাই তুলে লেজ আছড়াতে লাগলেন, সেই প্রতিধ্বনি অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। সেই আওয়াজে মহা পর্বতও কেঁপে উঠছিল, সেই আওয়াজ শুনে ভীমের রোমাঞ্চ হল। তিনি তার কারণ খুঁজতে সেই কদলীবনে ঢুকে ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখতে পেলেন যে, এক বৃহৎ শিলার ওপর বানর রাজ হনুমান শয়ন করে আছে। তার জিভ এবং মুখ লাল, পাতলা ঠোঁট, কানের রংও লাল, উন্মুক্ত মুখে বড় বড় তীক্ষ্ণ দাঁত, শক্ত চোয়াল। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, তাঁর মুখ যেন কিরণযুক্ত চাঁদের মতো মনে হচ্ছিল। তাঁর অঙ্গকান্তি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, হলুদ চক্ষু খুলে এদিক ওদিক দেখছিলেন। তিনি স্থূল শরীর দিয়ে স্বর্গের পথ রোধ করে হিমালয়ের ন্যায় অবস্থান করছিলেন।

ওই মহাবনে হনুমানকে একা শয়ন করে থাকতে দেখে ভীম নির্ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে ভয়ানক সিংহনাদ করে উঠলেন। ভীমের গর্জনে বনের সব জীবজন্তু ভয়ে কাঁপতে

লাগল। মহাবলী হনুমান অল্প একটু চোখ খুলে উপেক্ষা সহকারে ভীমকে দেখে মৃদুহাস্যে বললেন—'আরে! আমি

অসুস্থ, এখানে একটু শুয়েছিলাম, আমাকে জাগালে কেন ? তুমি বুদ্ধিমান মানুষ, জীবের ওপর তোমার দয়া হওয়া উচিত। কেন তোমার কায়মনোবাক্য দূষিতকারী ক্রূর কর্মে প্রবৃত্তি হচ্ছে ? মনে হচ্ছে তুমি কখনো বিদ্বানদের সেবা করনি। তুমি কে বলো তো, এই বনে কেন এসেছ ? এখানে কোনো মানুষ থাকে না, তুমি এদিকে কোথায় যাবে ? এদিকের পাহাড় তো যাওয়ার অযোগ্য, এতে কেউই আরোহণ করতে পারে না। তুমি এখানে বসে ফল-মূল খেয়ে একটু বিশ্রাম কর আর আমার কথা যদি ভালো মনে হয় তাহলে এখান থেকে ফিরে যাও। অকারণে ওপরে উঠে কেন প্রাণ সংকট করছ ?'

তাই শুনে ভীম বলল—'বানররাজ ! আপনি কে ? কেন এই বানর মূর্তি ধারণ করেছেন ? আমি চন্দ্রবংশের অন্তর্গত কুরুবংশে জাত। মাতা কুন্তীর গর্ভে জন্মেছি, মহারাজ পাণ্ডু আমার পিতা। লোকে আমাকে পবনপুত্রও বলে থাকে, আমার নাম ভীমসেন।'

শ্রীহনুমান বললেন—'আমি তো বানর, তুমি যে এই পথ দিয়ে যেতে চাও, আমি তা হতে দেব না। ভালো হয় যদি তুমি এখান থেকেই ফিরে যাও, নাহলে মারা পড়বে।' ভীম বললেন 'আমি মরি বা বাঁচি তাতে আপনার কী ? আপনি একটু সরে গিয়ে আমার পথ দিন।' হনুমান বললেন—'আমি অসুখে জর্জরিত, তোমার যদি যেতেই হয়, আমাকে ডিঙিয়ে যাও।' ভীম বললেন—'জ্ঞানগম্য নির্গুণ পরমাত্মা সকল প্রাণীর দেহে ব্যাপ্তভাবে অবস্থান করছেন। তাই আমি তাঁকে ডিঙিয়ে অপমান করতে পারব না। শাস্ত্রের দ্বারা যদি আমার শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞান না হত, তাহলে শুধু আপনাকে কেন, এই পর্বতকে সেইভাবে ডিঙিয়ে যেতে পারতাম, যেভাবে শ্রীহনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন।' শ্রীহনুমান বললেন—'এই হনুমান আবার কে, যে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিল ? তার বিষয়ে তুমি কিছু জানলে, বলো।' ভীম বললেন—'সেই বানর প্রবর আমার ভ্রাতা। তিনি বল, বুদ্ধি, উৎসাহ সম্পন্ন এবং অত্যন্ত গুণবান এবং রামায়ণে তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত। তিনি শ্রীরামের ভার্যা শ্রীমতী সীতা দেবীকে খোঁজবার জন্য এক লম্ফে একশত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন। আমিও বল-পরাক্রম এবং তেজে তাঁরই সমকক্ষ। সুতরাং তুমি সরে যাও, আমাকে পথ দাও। যদি আমার নির্দেশ মেনে না নাও, তাহলে তোমাকে আমি যমপুরীতে পাঠাব।' তখন শ্রীহনুমান বললেন—'হে অনঘ ! রাগ কোরো না, অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ায় আমার ওঠবার শক্তি নেই। তুমি আমার লেজটি সরিয়ে চলে যাও।'

এই কথা শুনে ভীম অবজ্ঞাপূর্বক হেসে বাঁ হাত দিয়ে হনুমানের লেজ ওঠাতে গেলেন, কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র সরাতে পারলেন না। তারপর তিনি দুহাত দিয়ে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলেন। তখন তিনি লজ্জায় মাথা নত করলেন এবং দুহাত জোড় করে প্রণাম করে তাঁকে বললেন—'বানররাজ ! আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন। আমি যে কটুবাক্য বলেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার পরিচয় জানতে চাই, আপনি কৃপা করে বলুন এইরূপ বানরের রূপ ধারণকারী আপনি কে ? কোনো সিদ্ধ, দেবতা, গন্ধর্ব অথবা গুহ্যক ? যদি এটি গোপনীয় না হয় এবং আমার শোনবার উপযুক্ত হয় তাহলে

আমি আপনার শরণাগত হয়ে শিষ্যভাবে জিজ্ঞাসা করছি, কৃপা করে বলুন।' তখন শ্রীহনুমান বললেন—'কমলনয়ন ভীম ! আমি বানররাজ কেশরীর দ্বারা জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ু হতে উৎপন্ন হনুমান নামের বানর। অগ্নির যেমন বায়ুর সঙ্গে মিত্রতা, তেমনি আমার সঙ্গে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব ছিল। কোনো একটি কারণে বালী তাঁর ভাই সুগ্রীবকে বহিষ্কার করেছিলেন। তাই বহুদিন তিনি আমার সঙ্গে ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করছিলেন। সেইসময় মানবরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু দশরথ-নন্দন শ্রীরাম পৃথিবীতে বিচরণ করছিলেন। পিতার আদেশ পালন করার জন্য শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী শ্রীরাম তাঁর ভার্যা সীতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে আসেন। যখন তাঁরা অরণ্যে বাস করছিলেন, তখন সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠকে মায়াদ্বারা মুগ্ধ করে রত্নখচিত সুবর্ণময় মৃগের রূপ ধারণ করে মারীচ রাক্ষসের ছলনায় রাক্ষসরাজ রাবণ প্ররোচনা করে তাঁর ভার্যা সীতাকে অপহরণ করেন। পত্নী অপহৃত হলে তাকে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীরাম ঋষ্যমূক পর্বতে এলে সেখানে তাঁর সঙ্গে বানররাজ সুগ্রীবের সাক্ষাৎ হয়। তারপর তাঁদের বন্ধুত্ব হয় এবং শ্রীরাম বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা রূপে অভিষিক্ত করেন। নিজ রাজ্য লাভ করে সুগ্রীব সীতাদেবীর অনুসন্ধানের জন্য এক লক্ষ কোটি বানর নিযুক্ত করেন। তাদের সঙ্গে আমিও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করি। গৃধ্ররাজ সম্পাতি আমাদের জানায় যে, রাবণরাজই সীতাকে নিয়ে গেছেন। তাই পুণ্যকর্মা ভগবান শ্রীরামের কার্যোদ্ধারের জন্য আমি সেই শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করি। হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্র নিজ পরাক্রমে পার হয়ে আমি রাবণের লংকাপুরীতে জনক-নন্দিনীর খোঁজ পাই। পরে অট্টালিকা, প্রাকার, গোপুর সজ্জিত লংকানগরীতে আগুন লাগিয়ে রাম নাম করতে করতে ফিরে আসি। আমার কথা শুনে শ্রীরাম অতি শীঘ্র বানরদের নিয়ে সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করে লংকায় পৌঁছান। সেখানে ভীষণ যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস এবং জগৎ ত্রাসকারী রাবণকে বধ করে রাবণের ভাই, আশ্রিতদের কৃপাকারী, পরম ধার্মিক বিভীষণকে লংকা-রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তারপর পত্নী সীতাদেবীকে নিয়ে অযোধ্যা নগরীতে ফিরে আসেন। সেখানে যখন তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়, তখন আমি তাঁর কাছে বর চাই যে, 'হে শত্রুদমন ! যতদিন এই পৃথিবীতে আপনার পবিত্র কাহিনী থাকবে, আমি যেন ততদিন জীবিত থাকি।' তাতে তিনি বলেছিলেন—'তাই হবে।' ভীম ! সীতাদেবীর কৃপায় এখানে আমি ইচ্ছানুসারে দিব্য-বস্তু পেয়ে থাকি। শ্রীরাম একাদশ সহস্র বছর রাজত্ব করে, তারপর নিজ ধামে ফিরে গেছেন। হে অনঘ ! এই স্থানে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ তাঁর কাহিনী শুনিয়ে আমাকে আনন্দপ্রদান করে। এখানে দেবতারা থাকেন। মানুষের জন্য এ স্থান অগম্য, তাই আমি তোমাকে বাধা দিয়েছি। এখানে হয়তো তোমাকে কেউ অপমান করত অথবা শাপ দিত ; কারণ এ পথ শুধু দেবতাদেরই, মানুষদের নয়। তুমি যেখানে যাবার জন্য এসেছ, সেই সরোবর এখানেই অবস্থিত।'

শ্রীহনুমানের কথায় মহাবাহু ভীম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং প্রীতিভরে ভ্রাতা বানররাজ শ্রীহনুমানকে প্রণাম করে মিষ্ট ভাষায় বললেন—'আজ আমার মতো সৌভাগ্যবান কেউ নেই, কারণ আজ আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দর্শন পেয়েছি। আপনি অত্যন্ত কৃপা করেছেন। আপনার দর্শন পেয়ে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আমার একটি ইচ্ছা আছে, তা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। বীরবর ! সমুদ্র লঙ্ঘন করার সময় আপনি যে অনুপম রূপ ধারণ করেছিলেন আমি তা দেখতে চাই। এতে আমি আনন্দ লাভ করব এবং আপনার কথায় আমার বিশ্বাসও হবে।'

ভীমসেনের কথায় পরম তেজস্বী হনুমান হেসে বললেন—'ভাই, তুমি বা অন্য কোনো পুরুষ আমার সেইরূপ দেখতে সক্ষম নয়। সেই সময় যে পরিবেশ ছিল, তা আজ নেই। সত্যযুগের সময় একরকম ছিল, আর ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের সময় অন্যরকম। কাল নিত্য ক্ষয়কারী, এখন আমার আর সেই রূপ নেই। পৃথিবী, নদী, বৃক্ষ, পর্বত, সিদ্ধ, দেবতা এবং মহর্ষি—এসবই কালকে অনুসরণ করে। প্রত্যেক যুগ অনুসারে এইসবের দেহ, বল এবং প্রভাবে ন্যূনাধিকতা হতে থাকে। অতএব তুমি সেই রূপ দেখার আগ্রহ পরিত্যাগ করো। আমার মধ্যেও যুগ অনুযায়ীই বল-বিক্রম থাকে, কারণ কালকে অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

ভীমসেন বললেন—'আপনি আমাকে যুগের সংখ্যা

এবং প্রত্যেক যুগের আচার, ধর্ম ও কামের রহস্য, কর্মফলের স্বরূপ এবং উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বলুন।'

শ্রীহনুমান বললেন—'ভ্রাতা ! সর্বপ্রথম হল কৃতযুগ, এতে সনাতন ধর্ম পূর্ণ বিদ্যমান থাকে এবং কারো কোনো কর্তব্যের অবশেষ থাকে না। সেই সময় ধর্মের একটুও ক্ষতি হয় না এবং পিতার জীবিতকালে পুত্রের মৃত্যু হয় না। কালক্রমে তাতে আর প্রাধান্য থাকে না। কৃতযুগে আধি-ব্যাধি থাকে না এবং ইন্দ্রিয় দৌর্বল্যও হয় না। সেই সময় কেউ কাউকে নিন্দা করে না, দুঃখে কারোকে কাঁদতে হয় না এবং কারো মধ্যে অহংকার, কপটতা থাকে না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, আলস্য, দ্বেষ, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা এবং হিংসা প্রভৃতির নাম-গন্ধও সে যুগে ছিল না। সেই সময় যোগীদের পরম আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের আত্মা, শ্রীনারায়ণ হন শুক্ল বর্ণের। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—সকল বর্ণের ব্যক্তিরাই শম-দম লক্ষণ সম্পন্ন এবং প্রজারা নিজ নিজ কর্মে তৎপর হন। এক পরমাত্মাই সকলের আশ্রয়, আচার-বিচার এবং জ্ঞানও সকলের একই প্রকারের। সকলের ধর্ম পৃথক পৃথক হলেও, তাঁরা বেদকেই মানতেন ও এক ধর্মেরই অনুসরণকারী ছিলেন। চার আশ্রমের কর্মগুলি নিষ্কামভাবে পালন করে পরম গতি প্রাপ্ত করতেন। এইরূপ যখন আত্মতত্ত্বপ্রাপ্তিকারী ধর্ম বিদ্যমান থাকে, তখন তাকে কৃতযুগ বলে বুঝতে হবে। সেই সময় চার বর্ণের ধর্ম চারপাদে সম্পন্ন থাকত। এ হল সত্ত্বঃ, রজ, তম—তিনগুণ রহিত কৃতযুগের বর্ণনা। এবার ত্রেতাযুগের স্বরূপ শোনো। এই সময় লোকেদের যজ্ঞে প্রবৃত্তি হত। ধর্মের একপাদ নষ্ট হয়ে ভগবান রক্তবর্ণ ধারণ করতেন। লোকের সত্যে প্রবৃত্তি থাকত এবং তাঁদের নিজ নিজ সংকল্প এবং ভাব অনুসারে কর্ম ও দানের ফল প্রাপ্তি হত। তাঁরা নিজেদের ধর্ম লঙ্ঘন করতেন না এবং ধর্ম, তপস্যা ও দানাদিতে তৎপর থাকতেন। ত্রেতাযুগে মানুষ এইভাবে নিজ ধর্মে রত থেকে ক্রিয়াশীল ছিলেন। এরপর দ্বাপরে দুই পদ ধর্ম অবশিষ্ট থাকে। ভগবান বিষ্ণু পীত বর্ণ ধারণ করেন এবং বেদ চার ভাগে বিভক্ত হয়। সেই সময় কিছু ব্যক্তি চার বেদ পাঠ করতেন, কেউ তিন, কেউ দুই আবার কেউ এক ভাগ বেদপাঠ করেই স্বাধ্যায় করতেন। কিছু ব্যক্তি বেদপাঠ করতেনই না। এইভাবে শাস্ত্র ছিন্নভিন্ন হওয়ায় কর্মও ভিন্ন হয়ে যায়। প্রজারা তপস্যা ও দান এই দুই ধর্মে প্রবৃত্ত হয়ে রাজসিক হয়ে ওঠে। সেই সময় বেদের যথাযথ জ্ঞান না থাকায় বেদের অনেক ভাগ হয়ে যায় এবং সত্ত্বগুণ হ্রাস পাওয়ায় সত্যে প্রায়শ কারোরই স্থিতি থাকে না। সত্য থেকে চ্যুত হওয়ায় সেই সময় ব্যাধি এবং কামনা-বাসনাও খুব বেড়ে যায়। নানাপ্রকার দৈবী উপদ্রবও হতে থাকে। তাতে পীড়িত হয়ে লোকে তপস্যায় রত হয়, এর মধ্যে অনেকে আবার ভোগ ও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। এইভাবে দ্বাপর-যুগে অধর্মের জন্য প্রজার শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। তারপর কলিযুগে ধর্ম কেবল একপাদে অবস্থিত থাকে। এই তমোগুণী যুগ আসাতে ভগবান শ্যামবর্ণ ধারণ করেন, বৈদিক আচার নষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্ম, যজ্ঞ, ক্রিয়া হ্রাস পেতে থাকে। এই সময়ে ঈতি, ব্যাধি, তন্দ্রা এবং ক্রোধাদি দোষ ও নানাপ্রকারের উপদ্রব, মানসিক চিন্তা, ক্ষুধা—এইসব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে যুগের পরিবর্তনে ধর্মেও পরিবর্তন হতে থাকে, ধর্মে পরিবর্তন হওয়ায় মানুষের স্থিতিও পরিবর্তিত হতে থাকে। লোকের স্থিতি যখন অবনমিত হয়, তখন তার প্রবর্তক ভাবগুলিও ক্ষয় হতে থাকে। এবার শীঘ্রই কলিযুগ আসবে। তাই তোমার যে পূর্বরূপ দেখার কৌতূহল হয়েছিল, তা উচিত নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃথা কোনো ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এইভাবে তুমি আমার কাছে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, তা আমি তোমাকে সব জানালাম ; এবার তুমি প্রসন্ন মনে যেতে পার।'

ভীম বললেন—'আমি আপনার পূর্বের সেই রূপ না দেখে যেতে পারছি না। যদি আপনার আমার ওপর কৃপা থাকে, তাহলে সেইরূপ অবশ্যই দেখান।'

ভীম এই কথা বলায় শ্রীহনুমান হেসে নিজের সেই রূপ দেখালেন, যে রূপ তিনি সমুদ্র লঙ্ঘনের সময় ধারণ করেছিলেন। নিজের ভাইকে খুশি করার জন্য তিনি তাঁর দেহ বর্ধিত করে বিশাল আকার ধারণ করলেন। তখন তাঁর অতুলনীয় বিশাল চেহারায় অন্যান্য বৃক্ষসহ কদলী বাগিচাও আচ্ছাদিত হয়ে গেল। কুরুশ্রেষ্ঠ ভীমসেন তাঁর ভাইয়ের সেই বিশাল দেহ দেখে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হলেন। শ্রীহনুমানের সেই বিশাল দেহ তেজে সূর্যের সমান এবং

সুবর্ণ পর্বতের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁর বিশালতার

বর্ণনা কী করে করা যায় ? মনে হয় যেন দেদীপ্যমান আকাশ, তাঁকে দেখেই ভীম চোখ বন্ধ করলেন। বিন্ধ্যাচলের মতো সেই বিচিত্র, ভয়ানক দেহ দেখে ভীম রোমাঞ্চিত হয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'হে সমর্থ শ্রীহনুমান ! আমি আপনার দেহের মহাবিস্তার দর্শন করেছি, এবার আপনি তা সংকুচিত করুন। আপনি সাক্ষাৎ উদীয়মান সূর্যের ন্যায় এবং মৈনাক পর্বতের মতো অপরিমিত ও দুর্ধর্ষ। আমি আপনার দিকে তাকাতে পারছি না। হে বীর ! আমি তো অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনি কাছে থাকতে শ্রীরামকে কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল। লংকাকে তো সমস্ত যোদ্ধাসহ আপনিই সহজে ধ্বংস করতে পারতেন। পবন-নন্দন ! এমন কোনো বস্তু নেই যা আপনার অলভ্য ; রাবণ তাঁর সমস্ত যোদ্ধাসহ যুদ্ধ করলেও আপনার সমকক্ষ হতে পারতেন না।'

ভীমের কথায় কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান গম্ভীর ও মধুর স্বরে বললেন—'ভরত ! তুমি ঠিকই বলেছ ; সেই অধম রাক্ষস আমার সামনে দাঁড়াতেই পারত না। কিন্তু সারা পৃথিবীকে জ্বালাতন করা এই রাবণকে যদি আমি বধ করতাম, তাহলে শ্রীরামের এই কীর্তি হত না, তাই আমি তা করিনি। বীরবর শ্রীরঘুনাথ সেই রাক্ষসাধমকে বধ করে সীতাদেবীকে নিয়ে অযোধ্যানগরীতে ফিরে এলেন। তাঁর সুযশ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। বুদ্ধিমান ভীম ! এবার তুমি যাও। দেখো, এই সামনের পথটি সৌগন্ধিক বনে যাচ্ছে। সেখানে যক্ষ ও রাক্ষস সুরক্ষিত কুবেরের বাগান পাবে। তুমি নিজেই যেন তাড়াতাড়ি করে ফুল তুলতে যেয়ো না। মানুষদের, বিশেষ করে দেবতাদের মান্য করা উচিত। তাই, তুমি বেশি সাহস দেখাবে না, নিজ ধর্ম পালন করবে। নিজ ধর্মে অবস্থান করে তুমি শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞান আহরণ করো এবং সেইমতো ব্যবহার করো। কারণ ধর্মজ্ঞান না থাকলে এবং বড়দের সেবা না করলে বৃহস্পতির মতো হয়েও তুমি ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব জানতে সক্ষম হবে না। কোনো সময় অধর্ম ধর্ম হয়ে যায় আবার ধর্ম অধর্ম হয়ে ওঠে। সুতরাং ধর্ম এবং অধর্মের পৃথক পৃথক জ্ঞান হওয়া উচিত। বুদ্ধিহীন লোকেরা এতে মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ধর্ম আচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম বেদ প্রতিষ্ঠিত, বেদের থেকে যজ্ঞের প্রবৃত্তি হয় এবং যজ্ঞে দেবতাগণ অবস্থান করেন। দেবতাদের আচার-আচরণ বেদাচারের বিধানে কথিত যজ্ঞে অবস্থিত এবং মানুষের আধার বৃহস্পতি ও শুক্র কথিত নীতি। তাই ব্রাহ্মণরা বেদপাঠের দ্বারা, বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা এবং ক্ষত্রিয়গণ শাসননীতির দ্বারা তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করেন। এই তিনটির ঠিকমতো প্রয়োগ হলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। এই তিনটি বৃত্তির সম্যক প্রবৃত্তি হলে এর দ্বারা প্রজা ধর্মকে প্রাদুর্ভূত করে। দ্বিজাতিদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রধান ধর্ম হল আত্মজ্ঞান তথা—যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান—এই তিনটি সাধারণ ধর্ম। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম প্রজাপালন, বৈশ্যের পশুপালন আর এই তিনবর্ণের সেবা হল শূদ্রের মুখ্য ধর্ম। তাদের ভিক্ষা, হোম অথবা ব্রতের অধিকার নেই, তাদের তো ব্রাহ্মণদের গৃহে অবস্থান করে তাদের সেবা করা উচিত। কুন্তী-নন্দন ! তোমার নিজধর্ম হল ক্ষত্রিয়ধর্ম, তার প্রধান কাজ প্রজাপালন, তুমি বিনয় এবং ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক তা পালন কর। যে রাজা বৃদ্ধ, সাধু, বুদ্ধিমান এবং বিদ্বানদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসন কার্য পরিচালনা করে, সে-ই রাজদণ্ড ধারণ করতে সক্ষম, দুরাচারী রাজাদের পরিণামে অপদস্থ হতে হয়। রাজা যখন প্রজার নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উচিত রীতিতে করেন, তখনই লোকেদের মর্যাদার সুব্যবস্থা হয়। অতএব রাজার তাঁর রাজ্যে ও দুর্গে নিজ শত্রু ও মিত্রের সেনার অবস্থান, বৃদ্ধি ও হ্রাস দূতের

দ্বারা সর্বদা খোঁজ রাখা উচিত। সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ—এই চারটি উপায়। দূত, বুদ্ধি, গুপ্ত বিচার, পরাক্রম, নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং দক্ষতা—এই সব গুণই রাজাদের কার্য সিদ্ধ করে। রাজার সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এবং উপেক্ষা—এই পাঁচটির এক সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে প্রয়োগ দ্বারা নিজের কাজ সিদ্ধ করা উচিত। হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! সমস্ত নীতি এবং দূতের মূল হল গুপ্ত বিচার ; তাই যে শুভ বিচারের দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয়, তা ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। স্ত্রীলোক, মূর্খ, বালক, লোভী এবং নীচ ব্যক্তির সঙ্গে অথবা যার মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ দেখা যায়, তার সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ করবে না। পরামর্শ করবে বিদ্বানের সঙ্গে, যাঁর সামর্থ্য আছে, তাঁকে দিয়ে কাজ করাবে ; যিনি হিতৈষী, তাঁকে দিয়ে ন্যায়ের কাজ করাবে। সব কাজ থেকে মূর্খদের দূরে রাখবে। রাজা ধর্মকার্যে ধার্মিকদের, অর্থকার্যে বিদ্বানদের এবং নারীদের মধ্যে কাজ করবার জন্য নপুংসকদের নিযুক্ত করবে আর কঠোর কাজে ক্রূর প্রকৃতির লোক নিযুক্ত করবে। কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে নিজের এবং শত্রু পক্ষের সম্মতি জানবে এবং শত্রুপক্ষের বলাবল সম্পর্কে অবহিত হবে। বুদ্ধির দ্বারা যাকে ভালো মতো পরীক্ষা করেছ, সেই সাধু ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবে এবং মর্যাদাহীন অশিষ্ট ব্যক্তিদের দমন করবে। এইভাবে হে ভীম ! আমি তোমাকে কঠোর রাজধর্মের উপদেশ দিলাম। এর মর্ম বোঝা অত্যন্ত কঠিন। তুমি নিজ ধর্মের বিভাগ অনুসারে বিনয়পূর্বক তা পালন কর। ব্রাহ্মণ যেমন তপ, ধর্ম এবং দম ও যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা উত্তম লোক প্রাপ্ত হন, বৈশ্য দান ও আতিথ্যরূপ ধর্মের দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হন, সেইরূপ যিনি দণ্ডকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন, কাম ও দ্বেষরহিত, লোভহীন, ক্রোধহীন, এইরূপ ক্ষত্রিয়রা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে স্বর্গলোকে গমন করেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর নিজ ইচ্ছায় বর্ধিত করা শরীরকে সংকুচিত করে বানররাজ শ্রীহনুমান দুই হাত দিয়ে ভীমকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাতে ভীমের সমস্ত ক্লান্তি তৎক্ষণাৎ দূর হল এবং সমস্তই অনুকূলরূপে দেখা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল যে, তিনি মস্ত বলবান, তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তারপর হনুমান অশ্রুপূর্ণ চোখে গদগদ কণ্ঠে ভীমকে বললেন—'ভাই ! এবার তুমি যাও, কখনো

কোথাও বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ করবে। আর আমি যে এইস্থানে থাকি তা কাউকে বলবে না। এখানে এবার কুবের ভবন থেকে প্রেরিত দেবাঙ্গনা এবং অপ্সরাদের আসার সময় হয়েছে। তোমার মানব-দেহের স্পর্শে আমার জগৎ-সংসারের আনন্দবর্ধনকারী ভগবান শ্রীরামের কথা স্মরণ হচ্ছে। আমাকে দর্শন করার কিছু ফল তোমারও পাওয়া উচিত। তুমি আমার ভাই হওয়ার সুবাদে কোনো বর প্রার্থনা করো। তুমি যদি চাও যে, আমি হস্তিনাপুরে গিয়ে অপদার্থ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বধ করি, তাহলে তা আমি করতে পারি। অথবা তুমি যদি চাও পাথরের আঘাতে তাদের নগর ধ্বংস করে দিই, অথবা এখনই দুর্যোধনকে বেঁধে তোমার কাছে নিয়ে আসি। মহাবাহো ! তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব।'

শ্রীহনুমানের কথায় ভীম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং বললেন—'বানররাজ ! আপনার মঙ্গল হোক ; আমার সমস্ত কাজই আপনি করে দিয়েছেন, এখন এগুলি যে পূর্ণ হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি চাই আপনার এই কৃপাদৃষ্টি যেন বজায় থাকে। আপনি আমাদের রক্ষক, এখন পাণ্ডবরা সনাথ হল। আপনার প্রতাপের সাহায্যেই আমরা

সব শত্রুকে পরাস্ত করব।'

ভীমসেনের কথায় হনুমান বললেন—'ভাই এবং সুহৃদ হওয়ার সুবাদে আমি তোমার প্রিয় কাজ করব। যখন তুমি তোমার শক্তি ও বাণের দ্বারা শত্রুসেনার মধ্যে ঢুকে সিংহনাদ করবে, তখন আমি আমার শক্তি দিয়ে তোমার গর্জন তীব্র করে দেব এবং অর্জুনের ধ্বজার ওপর বসে এমন ভয়ংকর গর্জন করব যে, শত্রুরা আতঙ্কিত হয়ে যাবে এবং তোমরা সহজেই তাদের বধ করতে পারবে।' এই কথা বলে শ্রীহনুমান ভীমসেনকে পথ দেখালেন এবং সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন।

———o———

সৌগন্ধিক বনে যক্ষ-রাক্ষসদের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরাদির সেই স্থানে আগমন, পরে সকলের প্রত্যাবর্তন

বৈশম্পায়ন বললেন—কপিবর শ্রীহনুমান অন্তর্হিত হলে মহাবলী ভীম তাঁর নির্দেশিত পথে গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করতে লাগলেন। পথে তিনি শ্রীহনুমানের বিশাল দেহ, অলৌকিক শোভা, দশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামের মাহাত্ম্য ও তাঁর প্রভাবের কথা চিন্তা করতে করতে যাচ্ছিলেন। সৌগন্ধিক বনে যাবার সময় তিনি পথের রমণীয় বন ও উপবন দেখলেন এবং বহুরকম পুষ্পিত বৃক্ষে সুশোভিত বিভিন্ন সরোবর এবং নদ-নদী দেখতে পেলেন।

এইভাবে এগিয়ে গিয়ে তিনি কৈলাস পর্বতের নিকটে কুবেরের রাজভবনের কাছে একটি সরোবরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি প্রাণভরে সেই সরোবরের নির্মল জল পান করলেন। মহাত্মা কুবের এই সরোবরে জলক্রীড়া করেন। তার আশেপাশে দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং ঋষিগণ বাস করেন। সেই সরোবর এবং সৌগন্ধিক বনকে দেখে ভীম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। মহারাজ কুবেরের হাজার হাজার ক্রুদ্ধ রাক্ষস নানাপ্রকার শস্ত্র ও পরিধেয় সুসজ্জিত হয়ে এই স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণ করত। তারা মহাবাহু ভীমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কৃপা করে বলুন, আপনি কে ? আপনার বেশভূষা মুনিদের মতো হলেও, হাতে অস্ত্র রয়েছে বলুন, আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন ?'

ভীম বললেন—'হে রাক্ষসগণ! আমি ভীমসেন, আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা, মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। আমরা বর্তমানে বিশালায় অবস্থান করছি। এখান থেকে একটি সুন্দর সৌগন্ধিক পুষ্প উড়ে গিয়ে আমাদের থাকবার স্থানে পড়েছে। তাই দেখে পত্নী দ্রৌপদীর সেইরকম আরও ফুল নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তাই আমি এখানে এসেছি।'

রাক্ষসরা বলল—'পুরুষপ্রবর ! এইস্থান কুবেরের অত্যন্ত প্রিয় ক্রীড়াস্থল। মরণধর্মী মানুষ এখানে আসতে পারে না। দেবর্ষি, যক্ষ এবং দেবতারাও যক্ষরাজার অনুমতি নিয়েই এখানে জলপান বা জলবিহার করতে পারেন। আপনি তার অসম্মান করে কীভাবে বলপ্রয়োগে কমল নিতে চাইছেন, আর এরকম অধর্ম করেও আপনি বলছেন যে, আপনি ধর্মরাজের ভাই ! আপনি মহারাজের অনুমতি নিয়ে আসুন, তাহলে জলপান করতে পারবেন এবং কমলও নিতে পারবেন ; নাহলে আপনি কমলের দিকে ফিরে তাকাতেও পারবেন না।'

ভীম বললেন—'হে রাক্ষসগণ ! রাজারা ভিক্ষে চায় না, সেটাই হল ক্ষত্রিয়-ধর্ম। আমি কোনোভাবেই ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এই সুরম্য সরোবর পাহাড়ী ঝরনার দ্বারা সৃষ্ট। এতে সকলেরই কুবেরের মতোই সমান অধিকার। এই সর্বসাধারণ জিনিসের জন্য কে আবার কার কাছে চাইতে যাবে ?'

ভীম এই বলে তাদের অগ্রাহ্য করে সরোবরে স্নান করতে নামলেন। সব রাক্ষস তখন তাঁকে বাধা দিতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভীম তাঁর যমদণ্ডের মতো সুবর্ণমণ্ডিত ভারী গদা তুলে—'দাঁড়াও ! দাঁড়াও' বলে আক্রমণ করলেন। তাতে রাক্ষসদের রাগ আরও বেড়ে গেল, তারা চারদিক থেকে ঘিরে তাঁর ওপর বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি দিয়ে

আক্রমণ করল। মহাত্মা ভীম তাদের সব প্রচেষ্টা বিফল করে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র খণ্ড-বিখণ্ড করে সরোবরের ধারে বহু বীরের প্রাণনাশ করলেন। ভীমসেনের আক্রমণে আহত ও হতচেতন হয়ে কিছু রাক্ষস রণাঙ্গন থেকে বিমানে করে কৈলাসপর্বতের চূড়ার ওপর চলে গেল। তারা যক্ষরাজ কুবেরের কাছে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভীমসেনের বল ও পরাক্রমের বর্ণনা দিল। এদিকে ভীম সুগন্ধি রমণীয় কমল চয়ন করতে লাগলেন।

রাক্ষসদের কথা শুনে কুবের হেসে বললেন—'আমি এ খবর জানি ; ভীম দ্রৌপদীর জন্য যত খুশি ফুল নিয়ে যাক।' তখন রাক্ষসরা শান্ত হয়ে ভীমসেনের কাছে এল।

এদিকে বদরিকাশ্রমে ভীমসেনের যুদ্ধের খবর দিতে অত্যন্ত বেগবান, তীক্ষ্ণ এবং ধূলিময় বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, বারংবার গর্জনধ্বনি সহ উল্কাপাত হতে লাগল, তাই দেখে সবার হৃদয়ে ভয় উৎপন্ন হল। ধুলায় সূর্যের তেজ কমে গেল, পৃথিবী কম্পমান হল, আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে গেল, পশু-পক্ষী কোলাহল করতে লাগল, চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। এসব ছাড়াও সেখানে আরও নানা উৎপাত দেখা গেল। এই অদ্ভুত অবস্থা দেখে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বললেন—'পাঞ্চালী, ভীম কোথায় ? মনে হচ্ছে সে ভয়ংকর কিছু একটা করে বসেছে, নয়তো করতে চলেছে ; কারণ এই অকস্মাৎ উৎপাত কোনো মহাযুদ্ধের ইঙ্গিত করছে।'

দ্রৌপদী বললেন—'রাজন্ ! বাতাসে উড়ে একটি সুগন্ধি কমল এখানে এসেছিল, সেটি আমি প্রেমভরে ভীমসেনকে উপহার দিয়ে বলেছিলাম যে, যদি আপনি এমন ফুল আরও পান তাহলে তা শীঘ্র নিয়ে আসুন।

মহাবাহু ভীম আমার প্রিয় কাজ করার জন্য সেই কমলের খোঁজে পূর্বোত্তর দিকে গেছেন।'

দ্রৌপদী এই কথা জানালে মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেবকে বললেন—'ভীম যেদিকে গেছেন, আমাদের সকলকে সেইদিকে যেতে হবে। রাক্ষসরা তো ব্রাহ্মণদের নিয়ে যাবে আর পুত্র ঘটোৎকচ ! তুমি দ্রৌপদীকে নিয়ে চলো। দেখো, ভীম ব্রহ্মবাদী সিদ্ধ মুনিবদের প্রতি যেন কোনো অপরাধ না করে বসে, তার আগেই যদি আমরা তার সাহায্যে সেখানে পৌঁছে যাই তাহলে খুব ভালো হয়।'

তখন ঘটোৎকচ ইত্যাদি সব রাক্ষসরা 'যে আজ্ঞা' বলে পাণ্ডব এবং ব্রাহ্মণদের তুলে মহর্ষি লোমশের সঙ্গে প্রসন্ন চিত্তে রওনা হলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যস্থান কুবেরের সরোবর চিনতেন। তাঁরা অতি শীঘ্র গিয়ে এক সুন্দর বনে কমলগন্ধে সুবাসিত এক মনোহর সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরের তীরে পরম তেজস্বী ভীমসেনকে দেখতে পেলেন, তার আশে পাশে বহু মৃত যক্ষের দেহও দেখতে পেলেন। ভীমকে দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে বারংবার আলিঙ্গন করতে লাগলেন এবং মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—'কুন্তীনন্দন ! এ তুমি কী করেছ ? এর দ্বারা তুমি দেবতাদেরও অপ্রিয় হয়েছ। যদি তুমি আমার ভালো চাও, তাহলে এমন কাজ আর কোরো না।' ভীমকে বুঝিয়ে তিনি সুগন্ধি কমল নিয়ে দেবতাদের মতো সেই সরোবরে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। এর মধ্যে সেই বাগানের রক্ষক বিশালকায় যক্ষ-রাক্ষস এসে হাজির হল। তারা ধর্মরাজ, নকুল-সহদেব, মহর্ষি লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দেখে মাথা নত করে বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম জানাল। কুবের পাণ্ডবদের আসার খবর পেলেন। তারপর তাঁরা অর্জুনের আসার অপেক্ষায় সেই গন্ধমাদন পর্বতে কিছুদিন বাস করলেন।

সেখানে থাকার সময় একদিন দ্রৌপদী, ভ্রাতাগণ এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনার কালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'যেখানে আগে দেবতা ও মুনিঋষিরা নিবাস করতেন এবং তেমনই নানা পবিত্র ও কল্যাণকর তীর্থ এবং মনমোহনকর বন, উপবন আমরা দর্শন করেছি। সেই সঙ্গে নানা আশ্রমে বহু শুভ আলোচনা শুনেছি, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তীর্থস্নান করেছি, পুষ্পাদি ও ফল-মূল দিয়ে দেবতা এবং পিতৃপুরুষের তর্পণ করেছি। মহর্ষি লোমশ আমাদের এইভাবে ক্রমশ সমস্ত তীর্থস্থান দর্শন করিয়েছেন। এখন এই সিদ্ধসেবিত কুবেরের মন্দিরে আমরা কী করে প্রবেশ করব ?'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন এই কথা বলছিলেন সেই সময় তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন—'এখান থেকে তোমরা আর এগোতে পারবে না, এই পথ অত্যন্ত দুর্গম ; তাই কুবেরের আশ্রম অতিক্রম না করে তোমরা যে রাস্তায় এসেছ সেই পথ ধরে শ্রীনর-নারায়ণের স্থান বদরিকাশ্রমে ফিরে যাও। সেখান থেকে তোমরা সিদ্ধ ও চারণ সেবিত বৃষপর্বার আশ্রমে যাবে, সেটি অত্যন্ত রমণীয় এবং সিদ্ধচারণ সেবিত। তারপরে সেগুলি পেরিয়ে তোমরা আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে থাকবে। সেখান থেকে এগিয়ে গেলে তোমরা কুবেরের মন্দিরের দর্শন পাবে।' তখনই সেখানে দিব্য সুগন্ধি পবিত্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল এবং পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হল। সেই আশ্চর্য দৈববাণী শুনে রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি ধৌম্যের নির্দেশানুসারে সেখান থেকে শ্রীনর-নারায়ণের আশ্রমে ফিরে এলেন।

——o——

জটাসুর-বধ

দৈবযোগে এক রাক্ষস একবার ধর্মরাজের কাছে এসে বলল 'আমি সমস্ত শাস্ত্রবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্রবিদ্যা কুশল ব্রাহ্মণ।' এই বলে সে পাণ্ডবদের ধনুক, তূণীর এবং দ্রৌপদীকে হরণ করার সুযোগের অপেক্ষায় তাঁদের কাছে থাকতে লাগল। এই রাক্ষসের নাম জটাসুর। একদিন ভীম বনে গেছেন আর মহর্ষি লোমশ প্রমুখ ঋষি স্নানে গেছেন। সেইসময় জটাসুর ভীষণরূপ ধারণ করে তিন পাণ্ডব, দ্রৌপদী এবং সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে পালাতে লাগল। এঁদের

মধ্যে সহদেব কোনোমতে তার হাত ছাড়িয়ে, রাক্ষসের হাত থেকে নিজের কৌশিকী নামক তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে, যেদিকে ভীমসেন গেছেন, সেই দিকে ফিরে চিৎকার করতে লাগলেন।

তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, যাঁকে রাক্ষস নিয়ে যাচ্ছিল, বললেন—'ওরে মূর্খ ! এইভাবে চুরি করলে যে তোর ধর্ম নাশ হবে, সেকথা তুই চিন্তা করছিস না ! তোর সমস্ত ধর্মাধর্ম ভেবেই কাজ করা উচিত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের গুরু, ব্রাহ্মণ, মিত্র এবং বিশ্বাসকারীদের এবং যাঁর অন্ন খাওয়া হয়েছে আর যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়। তুই আমাদের এখানে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সুখে বাস করছিলি। ওরে দুর্বুদ্ধি ! আমাদের অন্ন গ্রহণ করে তুই কী করে আমাদের হরণ করছিস ? এতে তোর আচার-ব্যবহার, আয়ু এবং বুদ্ধি—সবই নিষ্ফল হয়ে গেল। এখন তুই বৃথাই মরতে চাইছিস। ওরে রাক্ষস ! আজ যে তুই এই মানবীকে স্পর্শ করেছিস তা তোর কাছে বিষপানের সমান।'

এই বলে যুধিষ্ঠির নিজে ভারী হয়ে গেলেন, তাঁর ভারে রাক্ষসের গতি মন্থর হয়ে গেল। ধর্মরাজ তখন নকুল ও দ্রৌপদীকে বললেন—'তোমরা এই মূঢ় রাক্ষসকে ভয় পেয়ো না। আমি এর গতি হ্রাস করে দিয়েছি। একটু দূরেই মহাবাহু ভীম আছে, সে নিশ্চয়ই এদিকেই আসছে তারপর দেখো এর আর কোনো চিহ্ন থাকবে না।' সহদেব সেই মূঢ়বুদ্ধি রাক্ষসকে দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! দেশ ও কাল এমনই যে আমাকে এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আমি যদি একে মেরে ফেলি তাহলে বিজয়ী হব আর যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমি সদ্গতি লাভ করব।' তারপর তিনি রাক্ষসকে আহ্বান করে বললেন—'ওরে ও রাক্ষস ! একটু দাঁড়া, হয় তুই আমাকে বধ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে যা, নাহলে আমার হাতে বধ হয়ে যমালয়ে যা।'

মাদ্রীকুমার সহদেব যখন এই কথা বলছিলেন, ঠিক সেইসময়ই অকস্মাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রের মতো গদাধারী ভীম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে, রাক্ষস তাঁর ভ্রাতাদের এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং রাক্ষসকে বললেন—'ওরে পাপী ! আমি আগেই তোকে শাস্ত্র-পরীক্ষা করার সময় চিনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তুই ব্রাহ্মণ বেশধারী হয়েছিলি, তাই তোকে মারতে পারিনি। কাউকে রাক্ষস বলে চিনতে পারলেও অপরাধ না করলে তাকে বধ করা উচিত নয়। যে বিনা অপরাধে হত্যা করে, সে নরকে গমন করে। আজ মনে হচ্ছে তোর মৃত্যু সমাগত, তাই এই কুবুদ্ধি তোর মাথায় এসেছে। অবশ্য অদ্ভুতকর্মা কালই তোকে কৃষ্ণাকে অপহরণ করার বুদ্ধি দিয়েছে। এখন তুই যেখানে যেতে চাস, সেখানে যেতে পারবি না ; তোকে বক আর হিড়িম্বের পথে যেতে হবে।'

ভীমসেনের কথায় কালের প্রেরণায় রাক্ষস ভয় পেয়ে

গেল এবং সবাইকে ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল। ক্রোধে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, সে ভীমকে বলল, 'ওরে পাপী ! তুই যে যে রাক্ষসদের যুদ্ধে বধ করেছিস, আমি তাদের নাম শুনেছি, আজ তোরই রক্তে আমি তাদের তর্পণ করব।' তারপর তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধ হতে লাগল। দুই মাদ্রীকুমারও ক্রোধভরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীম হেসে তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন—'আমি একাই এর পক্ষে যথেষ্ট, তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের যুদ্ধ দেখো।' তারপর দুজনে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। যেমন দেবতা ও দানব একে অন্যের বাড়-বাড়ন্ত সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধে রত হন, তেমনই ভীম ও জটাসুর একে অন্যকে আঘাত করতে লাগলেন। যেমন পূর্বে স্ত্রীর ইচ্ছায় বালী ও সুগ্রীবের সংগ্রাম হয়েছিল, তেমনই এই দুজনের মধ্যেও বৃক্ষযুদ্ধ হতে লাগল। এতে ওখানকার বহু গাছ নষ্ট হল। তারপর তারা বজ্রের মতো পাথর দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। শেষে একে অপরকে ঘুঁসি মারতে লাগল। তখন ভীম জটাসুরের ঘাড়ে দারুণ জোরে এক ঘুসি মারলেন, ঘুসির আঘাতে রাক্ষসটি শিথিল হয়ে পড়ল। তাকে অবসন্ন দেখে ভীম তাকে তুলে আছাড় মেরে তার সমস্ত দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। তারপর কনুইয়ের আঘাতে তার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন।

রাক্ষসকে বধ করে ভীম যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। মরুদ্‌গণ যেমন ইন্দ্রের স্তুতি করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণরাও তখন ভীমের প্রশংসা করতে লাগলেন।

—o—

পাণ্ডবদের বৃষপর্বা এবং আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! জটাসুর মারা যাওয়ার পর যুধিষ্ঠির আবার শ্রীনর-নারায়ণের আশ্রমে এসে থাকতে লাগলেন। এই সময় তাঁদের অর্জুনের কথা স্মরণ হল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীসহ সকল ভ্রাতাদের ডেকে বললেন—'অর্জুন আমাকে বলেছিল যে, সে পাঁচবছর স্বর্গে অস্ত্রবিদ্যা শিখে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তাই সে যখন অস্ত্রবিদ্যা শিখে ফিরে আসবে, সেই সময় তার আদর-আপ্যায়নের জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা প্রয়োজন।' এই কথা বলতে বলতে তিনি ব্রাহ্মণগণ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। তিনি কখনো পদব্রজে যেতেন আবার কখনো রাক্ষসগণ তাঁকে পিঠে করে নিয়ে যেত। পথে তাঁরা কৈলাসপর্বত, মৈনাক পর্বত এবং গন্ধমাদনের নিম্নভাগ শ্বেতগিরি এবং পাহাড়ের ওপরের অনেক বিশুদ্ধ নদী দেখতে দেখতে সপ্তম দিনে হিমালয়ের পবিত্র পৃষ্ঠে পৌঁছলেন। এখানে তাঁরা রাজর্ষি বৃষপর্বার পবিত্র আশ্রম দেখলেন। এটি নানা পুষ্পিত বৃক্ষে সুশোভিত। পাণ্ডবরা সেখানে পৌঁছে পরমধার্মিক রাজর্ষিকে প্রণাম করলেন। রাজর্ষির আপ্যায়নে তাঁরা সেখানে সাত রাত অতিবাহিত করলেন। অষ্টম দিনে তাঁরা রওনা হবার জন্য বৃষপর্বার অনুমতি চাইলেন। পাণ্ডবদের কাছে যেসব জিনিস ছিল সেসব এবং যজ্ঞপাত্র, রত্ন-বস্ত্র সবই তাঁর আশ্রমে রেখে গেলেন। রাজর্ষি বৃষপর্বা ভূত-ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং ধর্মজ্ঞ

ছিলেন। রওনা হওয়ার সময় তিনি পাণ্ডবদের পুত্রের ন্যায় উপদেশ দিলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবরা উত্তরদিকে রওনা হলেন।

সেখান থেকে সত্যপরাক্রমী যুধিষ্ঠির পদব্রজে রওনা হলেন, সেই প্রান্তর নানা প্রকার মৃগে পরিপূর্ণ। পথে পর্বতের ওপর ছোট ছোট কুঞ্জবনে রাত কাটিয়ে চতুর্থ দিনে তাঁরা শ্বেতপর্বতে এলেন। শ্বেতাচল বিশাল শ্বেতবর্ণের পাহাড়, এতে জলের আধিক্য আছে এবং এটি মণি, স্বর্ণ ও রৌপ্য শিলায় পরিপূর্ণ। পথে ধৌম্য, দ্রৌপদী, পাণ্ডব এবং মহর্ষি লোমশ একসঙ্গে চলতেন, তাঁরা কেউই পরিশ্রান্ত হতেন না। ক্রমশ তাঁরা মাল্যবান পর্বতে এসে হাজির হলেন। তার ওপরে উঠে তাঁরা কিম্পুরুষ, সিদ্ধ এবং চারণ সেবিত গন্ধমাদন দর্শন করলেন, গন্ধমাদন দর্শনে তাঁরা রোমাঞ্চিত হলেন। তারপর তাঁরা মন ও চক্ষু সার্থককারী পরম পবিত্র গন্ধমাদন বনে প্রবেশ করলেন। সেইসময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে প্রেমভরে বললেন—'ভীম ! এই গন্ধমাদন জঙ্গল কী অপূর্ব শোভাময় ! এই মনোহর বনে নানা দিব্য বৃক্ষ ও পত্র-পুষ্প-ফল সুশোভিত নানাপ্রকার লতা আছে। এদিকে দেখো, পরম পবিত্র গঙ্গা নদী, কত হংস এতে ক্রীড়া করছে। এর তীরে ঋষি এবং কিন্নররা বাস করেন। হে কুন্তীনন্দন ভীম ! নানাপ্রকার ধাতু, নদী, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মনোরম বন, নানা আকারের সর্প এবং বহু শিখর সমন্বিত এই পর্বতরাজের দিকে দৃষ্টিপাত করো।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! শূরবীর পাণ্ডবরা তাঁদের লক্ষ্য স্থানে পৌঁছে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সেই পর্বতরাজকে দেখে দেখে তাঁদের আর তৃপ্তি হচ্ছিল না। তাঁরা ফল-ফুল বৃক্ষাদি সুশোভিত রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রম দেখলেন, তিনি খুবই বড় তপস্বী। তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশ, শরীরের শিরা দেখা যাচ্ছিল, তিনি সমস্ত ধর্মে পারঙ্গম ছিলেন। পাণ্ডবরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ধর্মজ্ঞ আর্ষ্টিষেণ দিব্য দৃষ্টিতে তাঁদের চিনতে পেরে বসবার জন্য বললেন।

পাণ্ডবরা আসন গ্রহণ করলে মহাতপা আর্ষ্টিষেণ কৌরব শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! তোমার মন তো কখনো অসত্যে যায় না, তুমি

সবসময় ধর্মে অবিচল থাক তো ? তোমার পিতা-মাতার সেবাতে কোনো ঘাটতি তো হয় না ? তোমরা সকল গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের আপ্যায়ন কর তো ? পাপকর্মে কখনো তোমার প্রবৃত্তি হয় না তো ? তুমি উপকারীর উপকার করো এবং অপকারীর অপকার ভুলে যাও তো ? তোমার শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার কোনো অহংকার নেই

তো ? তোমার কাছে সাধুব্যক্তিরা যথাযোগ্য সম্মান পেয়ে প্রসন্ন থাকেন তো ? বনে থেকেও তুমি ধর্ম অনুসারে চলো তো ? তোমার ব্যবহারে পুরোহিত ধৌম্য কখনো কষ্ট পাননি তো ? দান, ধর্ম, তপ, শৌচ, আর্জব এবং তিতিক্ষার আচরণ কালে তুমি তোমার পিতা-পিতামহের শীলতা অনুসরণ কর তো ? রাজর্ষি নির্দেশিত পথ অনুসরণ কর তো ? যখন বংশে পুত্র বা নাতি জন্ম নেয় তখন পিতৃলোকে পিতা-পিতামহ হাসেন আবার কাঁদেনও, কারণ তাঁরা ভাবতে থাকেন যে, কী জানি আমাদের এর কুকর্মের জন্য দুঃখভোগ করতে হবে নাকি সুকর্মের জন্য সুখভোগ হবে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, অগ্নি, গুরু এবং আত্মার পূজা করে, সে ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই জয় করে নেয়।'

মহারাজ যুধিষ্ঠির তার উত্তরে বললেন—'মুনিবর ! আপনি ধর্মের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। আমিও যথাশক্তি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী বিধিমত এটি পালন করি।'

আর্ষ্টিষেণ বললেন—'পূর্ণিমা এবং প্রতিপদের সন্ধিকালে এই পর্বতে শুধু জল ও হাওয়া সেবনকারী মুনিগণ আকাশ পথ দিয়ে আসেন। সেই সময় এখানে ভেরী, পণব, শঙ্খ এবং মৃদঙ্গের শব্দ শোনা যায়। তোমাদের এখান থেকেই তা শোনা উচিত, ওখানে যাবার কথা চিন্তা করো না। এখান থেকে আর এগোনো সম্ভব নয়, কারণ সেখানে দেবতাদের বিহারভূমি, মানুষ সেখানে যেতে পারে না। শুধু পরমসিদ্ধ ও দেবর্ষিগণই তাকে অতিক্রম করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি চাপল্যবশত যাবার চেষ্টা করলে সমস্ত পার্বত্যজীব অসন্তুষ্ট হয় এবং রাক্ষসগণ লৌহশলাকা দিয়ে তাকে বধ করে। কৈলাস শিখরেই দেবতা, দানব, সিদ্ধ এবং কুবেরদের উদ্যান। যতক্ষণ অর্জুন না আসে ততক্ষণ তোমরা এখানে অপেক্ষা করো।'

অতুলনীয় তেজস্বী মুনি আর্ষ্টিষেণের হিতকর কথা শুনে পাণ্ডবরা তাঁর নির্দেশানুসারে কাজ করতে লাগলেন। তাঁরা হিমালয়ে থেকে মহর্ষি লোমশের কাছে নানা উপদেশ শুনতে লাগলেন। এইভাবে ওই স্থানে থাকার সময় তাঁদের বনবাসের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল। ঘটোৎকচ আগেই রাক্ষসদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি আবার আসবেন। সেই আশ্রমে তাঁরা কয়েকমাস থাকলেন এবং বহু অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। একদিন হাওয়ার বেগে হিমালয়ের শিখর থেকে নানাপ্রকার সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল উড়ে এলো। পাণ্ডবরা দ্রৌপদী ও বন্ধুবান্ধবসহ সেখানে পঞ্চ-রংয়ের ফুল দেখলেন।

---o---

ভীম কর্তৃক যক্ষ-রাক্ষস বধ এবং কুবের দ্বারা শান্তিস্থাপন

ভীম একদিন ওই পর্বতে একান্তে প্রসন্ন মনে বসেছিলেন। তখন দ্রৌপদী তাঁকে বললেন—'মহাবাহো ! সমস্ত রাক্ষস যদি আপনার ভয় পেয়ে এই পর্বত থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে কেমন হয় ? তাহলে আপনার সুহৃদেরা ভয়শূন্য হয়ে এই পর্বতের বিচিত্র পুষ্পাবলিমণ্ডিত মঙ্গলময় শিখরগুলি উপভোগ করতে পারবে। আর্যপুত্র, আমি অনেক দিন ধরেই এই কথা চিন্তা করছি।'

দ্রৌপদীর কথা শুনে ভীম সুবর্ণমণ্ডিত ধনুক, তরোয়াল, তূণীর এবং গদা নিয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে গন্ধমাদন পর্বতে উঠতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে দ্রৌপদী যারপর নাই আনন্দিত হলেন। পবনপুত্র ভীমের মনে গ্লানি, ভয়, কাপুরুষতা, প্রতিহিংসার কোনো চিহ্নই ছিল না। সেই পর্বতের শিখরে উঠে তিনি কুবেরের প্রাসাদ দেখতে পেলেন, সেটি স্বর্ণ ও স্ফটিক দিয়ে সুশোভিত ছিল। তার চতুর্দিক সোনার প্রাকার দিয়ে ঘেরা, তাতে নানা রত্ন ঝলমল

করছে। প্রাসাদের আশে পাশে সুন্দর সুশোভিত বাগিচা। রাক্ষসরাজ কুবেরের সেই সুন্দর প্রাসাদ দেখে ভীম তাঁর শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারী শঙ্খ বাদন করলেন এবং ধনুকের ছিলার ভয়ানক শব্দে সমস্ত প্রাণীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললেন। সেই শব্দে যক্ষ-রাক্ষস ও গন্ধর্বদের গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল। তারা তখনই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ভীমের দিকে দৌড়ে এল। ভীমের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হল। ভীমের অস্ত্রের আঘাতে যক্ষ ও রাক্ষসদের অস্ত্র-শস্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং তাদের শরীরও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই ভাবে আহত হয়ে তারা খুব ভয় পেয়ে অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে চিৎকার করে পালিয়ে যেতে লাগল। সেখানে কুবেরের বন্ধু মণিমান নামে এক রাক্ষস থাকত। সে যক্ষ-রাক্ষসদের পালাতে দেখে হেসে বলল—'আরে, তোমাদের এত লোককে একজন মানুষ পরাজিত করে দিয়েছে। তোমরা কুবেরের কাছে গিয়ে কী বলবে'?'

এই কথা বলে সেই রাক্ষস শক্তি, ত্রিশূল এবং গদা নিয়ে ভীমকে আক্রমণ করল। ভীমও মদমত্ত হাতির মতো তাকে আসতে দেখে বৎসদন্ত নামক তিনটি কঠোর বাণের সাহায্যে তাকে আঘাত করল, তাতে মণিমান অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তার ভারী গদা নিয়ে ভীমের ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু ভীম গদাযুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন ; তিনি মণিমানের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন। তখন রাক্ষসটি স্বর্ণ মণ্ডিত এক ইস্পাতের তীর ছুঁড়ল। সেটি ভীমের ডান হাতে আঘাত করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সেই শক্তির আঘাতে অতুলনীয় পরাক্রমী ভীমের চোখ রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি তাঁর সুবর্ণমণ্ডিত গদা ওপরে তুলে ঘুরিয়ে মণিমানের ওপর ভীষণ গর্জন করে আঘাত করলেন। সেই গদা বায়ুবেগে সেই রাক্ষসকে বধ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। মণিমানকে মারা যেতে দেখে যে সব রাক্ষস তখনও বেঁচে ছিল, তারা চিৎকার করে পূর্বদিকে পালিয়ে গেল।

সেইসময় পর্বতের গুহা থেকে অস্ত্র-শস্ত্রের ভয়ানক শব্দ শুনে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ধৌম্য, দ্রৌপদী, ব্রাহ্মণ এবং অন্য সকলে ভীমকে না দেখতে পেয়ে বিমর্ষ হলেন। তাঁরা দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণ মুনির কাছে রেখে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে একসঙ্গে পর্বতে উঠলেন। পর্বতে আরোহণ করে তাঁরা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন একস্থানে ভীম দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর দ্বারা হত বহু রাক্ষস মাটিতে পড়ে রয়েছে। ভীমকে দেখে সব ভাইরা

তাঁকে আলিঙ্গন করে সেখানেই বসে পড়লেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুবেরের প্রাসাদ এবং মৃত রাক্ষসদের দেখে বললেন—'ভাই ভীম ! তুমি সাহস অথবা মোহবশত যে পাপকাজ করেছ, তা তোমার শোভা পায় না। তুমি এখন

তপস্বীদের মতো জীবন কাটাচ্ছ, অতএব তোমার এরূপ সংহার করা উচিত নয়। দেখো, তুমি যদি আমায় প্রসন্ন দেখতে চাও, তাহলে এই কাজ আর কখনো করবে না।'

ইতিমধ্যে ভীমের আক্রমণের হাত থেকে যেসব রাক্ষস রক্ষা পেয়েছিল, তারা দ্রুত কুবেরের কাছে এসে আর্তস্বরে বলতে লাগল, 'যক্ষরাজ! আজ যুদ্ধভূমিতে একজন মানুষ

'ক্রোধবশ' বংশের সকল রাক্ষসদের হত্যা করেছে, তারা সকলেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা কয়েকজন কোনোপ্রকারে পালিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনার মিত্র মণিমানও মারা গেছে। একজন ব্যক্তিই এই কাণ্ড করেছে। এখন যা ভালো মনে হয়, তাই করুন।' এই খবর শুনে যক্ষ ও রাক্ষসদের প্রভু কুবের অত্যন্ত কুপিত হলেন, তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'এসব কী করে হল?' তারপর ভীমই আবার এইসব করেছেন শুনে তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন—'আমার পর্বতের ন্যায় উচ্চ রথ সাজাও।' রথ প্রস্তুত হলে রাজরাজেশ্বর মহারাজ কুবের তাতে উঠলেন। তিনি গন্ধমাদনে পৌঁছালে যক্ষ-রাক্ষস পরিবৃত প্রিয়দর্শন কুবেরকে দেখে পাণ্ডবদের রোমাঞ্চ হল। মহারাজ পাণ্ডুর ধনুর্বাণধারী মহারথী পুত্রদের দেখে কুবেরও অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁদের দ্বারা দেবতাদের একটি কাজ করাতে চাইছিলেন, তাই তাঁদের দেখে খুশি হলেন। কুবেরের যে সকল সেবক পিছনে ছিল, তারা পাখির মতো সোজা পর্বত শিখরে এসে পৌঁছাল এবং যক্ষরাজ কুবেরকে পাণ্ডবদের ওপর প্রসন্ন দেখে তাদের সকল মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল।

ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব কুবেরকে প্রণাম করে নিজেদের অপরাধী বলে স্বীকার করলেন এবং সকলে যক্ষরাজের চারপাশে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। তখন ভীমের হাতে পাশ, খড়্গ, ধনুক ছিল, তিনি কুবেরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে কুবের ধর্মরাজকে বললেন—'রাজন্! আপনি সর্বদাই সমস্ত প্রাণীর হিতে রত থাকেন—সকলেই একথা জানে। আপনি ভাইদের নিয়ে নিঃসংশয়ে এই পর্বতে থাকুন। আপনি ভীমের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। রাক্ষসরা তাদের আয়ুকাল ফুরোতেই মারা গেছে, আপনার ভ্রাতা এতে নিমিত্তমাত্র হয়েছেন। রাজন্! একবার কুশস্থলী নামের জায়গায় দেবতাদের এক মন্ত্রণা হয়েছিল, সেখানে আমিও গিয়েছিলাম। সেইসময় আমি নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত ভয়ংকর তিন শত যক্ষ নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। পথে অগস্ত্য মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। তিনি যমুনাতীরে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। সেই সময় আমার মিত্র রাক্ষসরাজ মণিমানও আমার সঙ্গে ছিল। সে মূর্খতা, অজ্ঞতা, গর্ব এবং মোহের অধীন হয়ে ওপর থেকে মহর্ষির গায়ে থুতু ফেলেছিল। তখন মুনিবর কুপিত হয়ে আমাকে বলেছিলেন—'কুবের! দেখো, তোমার সখা আমাকে অপমান করেছে, তাই সে তার সৈন্য-সামন্ত সহ মাত্র একজন মানুষের হাতে মারা যাবে। তোমারও এই সেনাদের জন্য দুঃখ পেতে হবে, কিন্তু পরে সেই মানুষের সঙ্গে দেখা হলে তোমার দুঃখ দূর হবে।' মহর্ষি শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য

আমাকে এই শাপ দিয়েছিলেন। আপনার ভ্রাতা আজ আমাকে সেই শাপ থেকে মুক্ত করেছে। রাজন্ ! লৌকিক ব্যবহারে ধৈর্য, কুশলতা, দেশ, কাল এবং পরাক্রম—এই পাঁচটির অত্যন্ত প্রয়োজন। সত্যযুগে লোকে ধৈর্যশীল এবং নিজ কর্মে কুশল ও পরাক্রমশালী ছিল। যে ক্ষত্রিয় ব্যক্তি ধৈর্যশীল, দেশ-কাল সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন এবং সর্বপ্রকার ধর্মবিধিনিপুণ হয় সে বহুকাল দেশ শাসন করে। যে ব্যক্তি এভাবে তার কর্তব্য পালন করে, সে যশ প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর সদ্গতি লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধে মত্ত হয়ে নিজের পতনের দিকে দৃষ্টি রাখে না এবং যার মন-বুদ্ধি পাপেই নিমজ্জিত, সে শুধু পাপকেই অনুসরণ করে। কর্মের বিভাগ না জানায় তার ইহলোকে ও পরলোকে পতন হয়। ভীমও ধর্ম জানে না, সে অহংকারী এবং তার বুদ্ধিও বালকের মতো অপরিণত। সে অসহিষ্ণু এবং কোনো কিছুতে ভয়ও পায় না। সুতরাং আপনি একে নিয়ে আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গিয়ে বোঝান। এই কৃষ্ণপক্ষটি আপনি ওখানেই অতিবাহিত করুন। আমার নির্দেশে অলকাপুরীর সমস্ত যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর এবং পর্বতবাসীগণ আপনাদের দেখাশুনা করবে। ভীম সাহস করে এখানে এসেছে, আপনি ওকে বুঝিয়ে এই সব কাজ করতে বারণ করুন। এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন ব্যবহারে নিপুণ এবং সর্বপ্রকার ধর্মমর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত। সেইজন্য পৃথিবীতে যতপ্রকার স্বর্গীয় বিভূতি আছে, তা সবই সে প্রাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া তার মধ্যে দম, দান, বল, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৈর্য এবং তেজ—এই সব গুণও বিদ্যমান।'

কুবেরের কথা শুনে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ভীমও শক্তি, গদা, ধনুকে সজ্জিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। শরণাগতবৎসল কুবের ভীমকে বললেন—

'তুমি শত্রুদের মানভঙ্গকারী এবং সুহৃদ্গণের সুখবৃদ্ধিকারী হও।' তারপর ধর্মরাজকে বললেন, 'অর্জুন এখন অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ হয়ে উঠেছে, দেবরাজ ইন্দ্র তাকে গৃহে যাবার অনুমতি দিয়েছেন ; তাই সে শীঘ্রই এখানে আসবে।' কুবের উত্তম কর্মকারী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়ে নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। ভীমের হাতে যেসব রাক্ষস মারা গিয়েছিল, কুবেরের নির্দেশে তাদের শব পাহাড়ের নীচে ফেলে দেওয়া হল। অগস্ত্যঋষির মণিমানকে প্রদান করা শাপ এইভাবে ভীমের হাতে তাদের মৃত্যুতে শেষ হল। পাণ্ডবরা সেই রাত কুবের ভবনে অতিবাহিত করলেন।

—— ০ ——

যুধিষ্ঠিরকে ধৌম্যের নানা দর্শনীয় স্থান দেখানো এবং অর্জুনের গন্ধমাদনে ফিরে আসা

বৈশম্পায়ন বললেন—শত্রুদমন জনমেজয় ! সূর্যোদয় হলে মুনিবর ধৌম্য আহ্নিক শেষ করে রাজর্ষি আষ্টিষেণের সঙ্গে পাণ্ডবদের কাছে গেলেন। পাণ্ডবগণ তাঁদের প্রণাম করলেন এবং অন্য ব্রাহ্মণদেরও হাত জোড় করে অভিবাদন
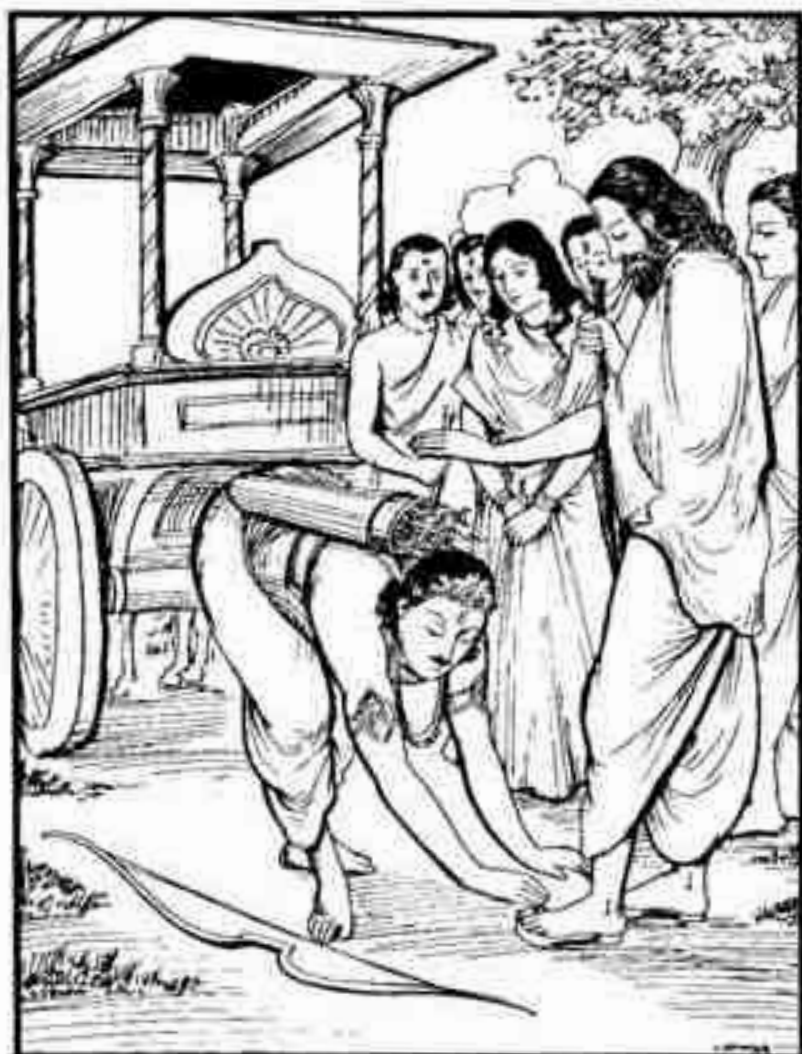
জানালেন। ধৌম্য ধর্মরাজের হাত ধরে পূর্ব দিক দেখিয়ে বললেন—'এই যে আসমুদ্র বিস্তৃত পর্বত দেখতে পাচ্ছেন, এর নাম মন্দরাচল। এর শোভা দেখুন। পর্বতমালা এবং সবুজ বনবীথিতে এই দিক কী রমণীয় দেখাচ্ছে ! এই দিক ইন্দ্র ও কুবেরের নিবাসস্থল বলে কথিত। সর্বধর্মজ্ঞ, মুনিগণ, প্রজাগণ, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেবগণ এই দিকে উদিত হওয়া সূর্যের পূজা করেন। সমস্ত প্রাণীর প্রভু পরমধর্মজ্ঞ যমরাজ দক্ষিণ দিকে নিবাস করেন। মৃত প্রাণীদের এটিই গন্তব্য স্থান। এই পবিত্র এবং অদ্ভুত দর্শন সংযমনী পুরী, প্রেতরাজ যমের বাসস্থান। এটিও অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। পশ্চিম দিকে যে পর্বত দেখা যাচ্ছে, তাকে বলা হয় অস্তাচল। মহারাজ বরুণ এই পর্বত ও মহাসমুদ্রে থেকে সকল প্রাণীকে রক্ষা করেন। সামনে উত্তর দিক আলোকিত করে পরম প্রতাপী মেরুপর্বত দণ্ডায়মান। শুধু ব্রহ্মবেত্তাগণই এর ওপরে যেতে পারেন। এর ওপরেই ব্রহ্মার সভা, তিনি এর ওপরেই স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করে বাস করেন। এই পর্বতের ওপরই বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণের উদয়-অস্ত হতে থাকে। আপনি মেরুপর্বতের এই পবিত্র শিখর দর্শন করুন। অনাদি-নিধন শ্রীনারায়ণের স্থান এরও পরে এবং সেটি দেদীপ্যমান, সর্বতেজোময় এবং পরম পবিত্র, দেবতারাও সেটি দর্শন করতে পারেন না। অগ্নি এবং সূর্য এই স্থানকে প্রকাশিত করতে পারেন না। তিনি স্বয়ং নিজ প্রকাশেই প্রকাশিত। তাঁর দর্শন দেবতা ও দানবদেরও দুর্লভ। সেই স্থানে অচিন্ত্য মূর্তি শ্রীহরি বিরাজমান। যিনি মহা তপস্বী এবং শুভকর্ম দ্বারা পবিত্র চিত্ত হয়েছেন, সেই অজ্ঞান ও মোহরহিত যোগসিদ্ধ মহাত্মা যতিজনই ভক্তির সাহায্যে তাঁর কাছে যেতে সক্ষম। সেখানে গেলে তাঁরা এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন না। রাজন্ ! এই পরমেশ্বরের স্থান ধ্রুব, অক্ষয় এবং অবিনাশী ; আপনি প্রণাম করুন। দেখুন, সূর্য, চন্দ্র এবং তারাগণ নিজ নিজ মর্যাদা রক্ষা করে সর্বদা এই পর্বতরাজ মেরুকেই প্রদক্ষিণ করে থাকে। এর পরিক্রমাকালে নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র পর্ব সন্ধির সময় মাসের বিভাগ করে এবং মহাতেজস্বী সূর্য বর্ষা, বায়ু এবং সুখের সাহায্যে প্রাণীদের পোষণ করে। হে ভরত ! ভগবান সূর্যই সমস্ত জীবের আয়ু ও কর্মের বিভাগ করে দিন, রাত, কলা, কাষ্ঠা ইত্যাদি কালের অবয়ব সৃষ্টি করে থাকেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর উত্তম ব্রত পালনকারী পাণ্ডবগণ সেই পর্বতের ওপরেই বসবাস করতে লাগলেন।

অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে ইন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি পাঁচ বছর ইন্দ্রের ভবনে থেকে অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু, ইন্দ্র, পশুপতি, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, প্রজাপতি যম, ধাতা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং কুবেরাদি দেবতাদের অস্ত্র প্রাপ্ত করেন। তারপর ইন্দ্র তাঁকে গৃহে যাবার অনুমতি দেন। তখন অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে আনন্দিত চিত্তে গন্ধমাদন পর্বতে ফিরে যান।

—o—

অর্জুনের প্রবাসের কথা, কিরাতের প্রসঙ্গ এবং লোকপালদের থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা

বৈশম্পায়ন বললেন—মহাবীর অর্জুন ইন্দ্রের রথে করে অকস্মাৎ একদিন পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রথ থেকে নেমে প্রথমেই পুরোহিত ধৌম্য এবং পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনকে প্রণাম করলেন। তারপর নকুল ও সহদেব তাঁকে অভিবাদন করলেন। তারপর কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি বিনীতভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। অতুলনীয় প্রভাবশালী অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাণ্ডবরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অর্জুনও এঁদের দেখা পেয়ে খুব খুশি হলেন এবং তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করতে লাগলেন। পাণ্ডবরা ইন্দ্রের রথ পরিক্রমা করলেন এবং সারথি মাতলিকে ইন্দ্রের মতোই আপ্যায়ন করলেন। তাঁর কাছে দেবতাদের সবরকম কুশল সংবাদ নিলেন। মাতলিও পিতা যেমন পুত্রকে উপদেশ দেয়, সেইমতো পাণ্ডবদের উপদেশ দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে সেই অলৌকিক রথে করে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন।

মাতলি ফিরে গেলে অর্জুন দেবরাজ প্রদত্ত অত্যন্ত সুন্দর বহুমূল্য অলংকার দ্রৌপদীকে প্রদান করলেন। তারপর সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পাণ্ডব এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবেশন করে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। তিনি বললেন—'আমি এইভাবে ইন্দ্র, বায়ু এবং সাক্ষাৎ শ্রীমহাদেবের থেকে অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছি, আমার ব্যবহারে ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট ছিলেন।' শুদ্ধকর্মা অর্জুন সংক্ষেপে তাঁর স্বর্গে প্রবাসকালের নানা কাহিনী শোনালেন। তারপর রাত্রে আনন্দের সঙ্গে নকুল, সহদেবের সঙ্গে শয়ন করলেন। রাত্রি প্রভাত হলে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্মরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

সেইসময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সুবর্ণমণ্ডিত রথে করে সেই পর্বতে এলেন। পাণ্ডবরা তাঁকে দেখে তাঁর কাছে এসে বিনীতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানালেন। পরম তেজস্বী অর্জুনও দেবরাজকে প্রণাম করে তাঁর সেবকের মতো তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। উদার চিত্ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হলেন ইন্দ্র আসাতে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে বললেন—'পাণ্ডুপুত্র ! তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক তুমিই এই
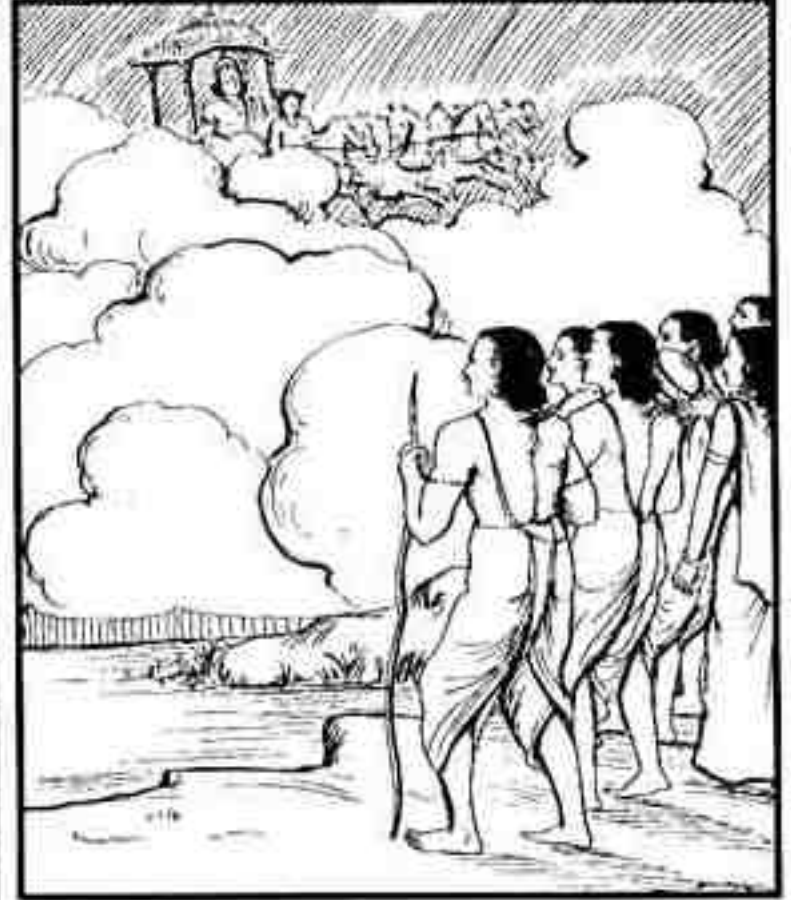
পৃথিবী শাসন করবে। এবার তোমরা কাম্যক বনে ফিরে যাও। অর্জুন অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে আমার সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়, এখন এই ত্রিলোকে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারবে না।' কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে গেলেন।

ইন্দ্র চলে গেলে ধর্মরাজ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভাই ! তুমি ইন্দ্রের দর্শন পেলে কী করে ? ভগবান শংকরের সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ হল ? সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা কীভাবে আয়ত্ত করলে ? শ্রীমহাদেবের আরাধনা কেমন করে করলে ?' ভগবান ইন্দ্র বলেছিলেন যে 'অর্জুন আমার প্রিয় কাজ করেছে', তুমি তাঁর কী প্রিয় কাজ করেছ ? সেইসব ঘটনা সবিস্তারে আমায় বলো।'

তাই শুনে অর্জুন বললেন—'মহারাজ ! আমার যেভাবে ইন্দ্র ও ভগবানের সাক্ষাৎ হয়েছে, তা শুনুন। আপনি আমাকে যে বিদ্যা প্রদান করেছিলেন, তার সাহায্যে আপনার নির্দেশে আমি তপস্যা করার জন্য বনে গিয়েছিলাম। কাম্যক বন থেকে রওনা হয়ে আমি ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু সেখানে

আমি মাত্র একটি রাতই ছিলাম। তারপর আমি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে থাকি। হিমালয়ে একমাস শুধু কন্দ ও ফল আহার করেছিলাম, দ্বিতীয় মাসে শুধু জল এবং তৃতীয় মাস নিরাহারে ছিলাম। চতুর্থ মাসে আমি হাত ওপরে করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এতদ্ সত্ত্বেও বিচিত্র ব্যাপার হল যে, এতে আমার প্রাণত্যাগ হয়নি। পঞ্চম মাসে একদিন কাটার পরে এক শূকর এদিক ওদিক ঘুরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তার পিছন পিছন কিরাতবেশী এক ব্যক্তি আসে। তার হাতে ধনুর্বাণ ও তলোয়ার। তার পিছনে কয়েকজন নারীও ছিল। আমি তখন ধনুকে বাণ লাগিয়ে সেই শূকরটিকে মেরে দিলাম। তখনই সেই বিশালকৃতি ভীলও তার বিরাট ধনুক থেকে বাণ ছুঁড়ল, তাতে আমার মন একটু কেঁপে উঠেছিল। রাজন্ ! তারপর সে বলল—'এই শূকরটিকে আমি প্রথমে লক্ষ্য করেছি, তুমি শিকারের নিয়ম না মেনে তাকে কেন বধ করলে ? ঠিক আছে, এবার তুমি সাবধান হও, আমি এই ধারালো বাণ দিয়ে এখনই তোমার গর্ব চূর্ণ করে দেব।' এই বলে সেই বিরাটকায় ভীল পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আমাকে বাণ দিয়ে ঢেকে ফেলল, আমিও বাণ দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত করে দিলাম। সেই সময় তার শত-সহস্রমূর্তি প্রকটিত হতে থাকল, আমি তাদের সকলের ওপরই বাণ ছুঁড়তে লাগলাম। পরে সে সব মূর্তি সংহত হয়ে একরূপে প্রকটিত হলে আমি তাকেও বাণ দ্বারা বিদ্ধ করি। এত বাণবর্ষা করাতেও যখন সে পরাজিত হল না, তখন আমি বায়ব্যাস্ত্র ছুঁড়লাম। কিন্তু তাতেও সে নিহত হল না, বায়ব্যাস্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। তারপর আমি ক্রমশ তার ওপর স্থূণাকর্ণ, বারুণাস্ত্র, শরবর্ষাস্ত্র, শালভাস্ত্র এবং অশ্মবর্ষাস্ত্রও নিক্ষেপ করি, কিন্তু ভীল সে সবই ব্যর্থ করে। সব অস্ত্র ব্যর্থ হলে আমি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করি, তাতে প্রজ্বলিত বাণের আগুনে সমস্ত আচ্ছাদিত হয়েছিল। কিন্তু সেই মহাতেজস্বী ভীল সেই অগ্নি এক মুহূর্তে নির্বাপিত করে দিল। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। তখন আমি ধনুক এবং দুই অক্ষয় তূণীর নিয়ে তাকে মারি, কিন্তু তাও কোনো কাজে এলো না। এইভাবে যখন সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হল তখন আমরা দুজন বাহুযুদ্ধে রত হলাম। বহু চেষ্টা করেও আমি তার সমকক্ষ হতে পারলাম না, বরং হতচেতন হয়ে আমি মাটির ওপর পড়ে গেলাম। তখন সে হাসতে হাসতে সেই স্ত্রীলোকগুলির সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

এই সব লীলার পর দেবাদিদেব মহাদেব কিরাতবেশ পরিত্যাগ করে নিজ দিব্যরূপে প্রকটিত হলেন। তাঁর কণ্ঠে সর্প, হাতে পিণাক ধনুক এবং সঙ্গে দেবী পার্বতী। আমি পূর্বের মতোই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কাছে এসে বললেন 'আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি।' তারপর আমার ধনুক ও তূণীর ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—'হে বীর ! এগুলি গ্রহণ করো। আমি তোমার ওপর প্রসন্ন ; তুমি বলো তোমার জন্য কী করব ? তোমার মনে যা আছে, বলো। অমরত্ব বাদ দিয়ে তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ করব।' আমার মনে অস্ত্রের ভাবনাই ছিল, তাই আমি হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করে বললাম—'ভগবান ! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার মনে দেবতাদের দিব্য অস্ত্র পাবার এবং তার প্রয়োগ বিদ্যা জানার ইচ্ছা আছে এই বরই আমার অভীষ্ট।' ভগবান ত্রিলোচন তখন বললেন—'আচ্ছা, আমি এই বরই তোমায় দিচ্ছি। শীঘ্রই তুমি আমার পাশুপতাস্ত্র প্রাপ্ত হবে।' তারপর তিনি তাঁর পাশুপত অস্ত্র আমাকে দিলেন এবং বললেন—'তুমি এই অস্ত্র কখনো মানুষের ওপর প্রয়োগ করবে না, কারণ এটি অল্পবীর্য প্রাণীদের ওপর ছুঁড়লে, ত্রিলোক ভস্ম হয়ে যাবে। অতএব তুমি যখন অত্যন্ত পীড়িত হবে, তখনই এটি প্রয়োগ করবে। অথবা শত্রু নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে রোধ করতে চাইলে, এর প্রয়োগ করবে।' এইভাবে ভগবান শংকর প্রসন্ন হলে সমস্ত অস্ত্ররোধকারী এবং নিজে কোনো কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ার যে দিব্য অস্ত্র তা মূর্তিমান হয়ে আমার কাছে এলো। তারপর ভগবানের নির্দেশে আমি সেখানে বসলাম এবং তিনি সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন।

মহারাজ ! দেবাদিদেব শ্রীমহাদেবের কৃপায় আমি সেই রাত্রি আনন্দে অতিবাহিত করি। পরের দিন যখন দিন শেষ হচ্ছিল তখন সেই হিমালয়ের নীচে দিব্য, তাজা, সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল ; চতুর্দিকে দিব্য বাদ্য ধ্বনিত হতে লাগল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতি শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে শ্রেষ্ঠ ঘোড়ায় টানা এক অত্যন্ত সুসজ্জিত রথে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী সেখানে পদার্পণ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক দেবতা এলেন। তারই মধ্যে আমি মহাঐশ্বর্যময় শ্রীকুবেরকে দেখতে পেলাম। তারপর আমি দেখলাম দক্ষিণ দিকে যমরাজ বিরাজমান, পূর্বদিকে ইন্দ্র অবস্থিত এবং পশ্চিমে মহারাজ বরুণ। রাজন্ ! তাঁরা আমাকে ধৈর্য ধরতে বললেন—'সব্যসাচী ! এখানে আমরা সব লোকপাল

উপস্থিত। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যই তুমি দেবাদিদেবের দর্শন পেয়েছ। তুমি আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র গ্রহণ করো।' রাজন্! আমি তখন সকলকে অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত মহান্ অস্ত্র গ্রহণ করলাম। অস্ত্র নেওয়ার পর তাঁরা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং তাঁরাও নিজ নিজ ধামে চলে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর তেজোময় রথে উঠে আমাকে বললেন—'অর্জুন, তোমাকে স্বর্গে আসতে হবে। তুমি অনেক বার তীর্থে স্নান করেছ এবং কঠোর তপস্যাও করেছ। অতএব তোমাকে আসতে হবে। আমার নির্দেশে মাতলি তোমাকে স্বর্গে পৌঁছে দেবে।'

আমি তখন ইন্দ্রকে বললাম—'হে দেব! আপনি আমাকে কৃপা করুন, আমি অস্ত্রবিদ্যা শেখার জন্য আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই।' ইন্দ্র বললেন—'ভারত! তুমি আমার লোকে অবস্থান করে বায়ু, অগ্নি, বসু, বরুণ এবং মরুদ্গণ প্রমুখ সকলের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করো। এইভাবে সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, বিষ্ণু এবং নির্ঋতি এবং আমার থেকেও অস্ত্র জ্ঞান লাভ করো।' আমাকে এই কথা বলে ইন্দ্র সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।'

—o—

স্বর্গলোকে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির আলোচনা

অর্জুন বললেন—'রাজন্! তারপর দিব্য ঘোড়াযুক্ত ইন্দ্রের দিব্য এবং মায়াময় রথ নিয়ে মাতলি আমার কাছে এসে বললেন, 'দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।' তাই শুনে আমি পর্বতরাজ হিমালয়কে প্রদক্ষিণ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে রথে আরোহণ করি। তারপর অশ্বচালনায় দক্ষ মাতলি সেই মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মাতলি যখন লক্ষ্য করলেন যে, রথ চললেও আমি স্থির হয়ে বসে আছি তখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন—'আমি আজ এক বিচিত্র

ব্যাপার দেখছি। ঘোড়া যখন রথ টানে তখন আমি দেবরাজকেও নড়তে দেখেছি, কিন্তু তুমি একেবারে স্থির হয়ে বসে আছ, তোমার এই নিষ্ঠা আমার কাছে ইন্দ্রের থেকেও বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে।' কথা বলতে বলতে মাতলি রথ আকাশের ওপরে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে দেবতাদের ভবন এবং বিমান দেখাতে লাগলেন। আরও কিছু এগিয়ে তিনি আমাকে দেবতাদের নন্দন বন এবং উপবন দেখালেন। তারপর ইন্দ্রের অমরাবতী দৃষ্টিগোচর হল। সেখানে সূর্যতাপ নেই এবং শীত, তাপ এবং শ্রমও নেই। সেখানে বার্ধক্যের কষ্ট নেই, কোথাও শোক, দৈন্য, ব্যাধি দেখা যায় না। সেখানকার অধিবাসীরা বিমানে বসে আকাশে বিচরণ করছিলেন। এইভাবে দেখতে দেখতে যখন আমি আরও এগোলাম তখন আমি বসু, রুদ্র, সাধ্য, পবন, আদিত্য এবং অশ্বিনীকুমারদের দর্শন পেলাম। আমি তাঁদের প্রণাম করলাম, তাঁরা আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন— 'তুমি বল, বীর্য, যশ, তেজ, অস্ত্র এবং যুদ্ধে বিজয় লাভ করো।'

তারপর আমি দেবতা ও গন্ধর্ব পূজিত অমরাবতী পুরীতে প্রবেশ করলাম এবং দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। ইন্দ্র আমাকে বসবার জন্য তাঁর অর্ধেক আসন ছেড়ে দিলেন। আমি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার সময় দেবতা ও গন্ধর্বের সঙ্গে বাস করতে থাকি। ওখানে থাকার সময় বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়।
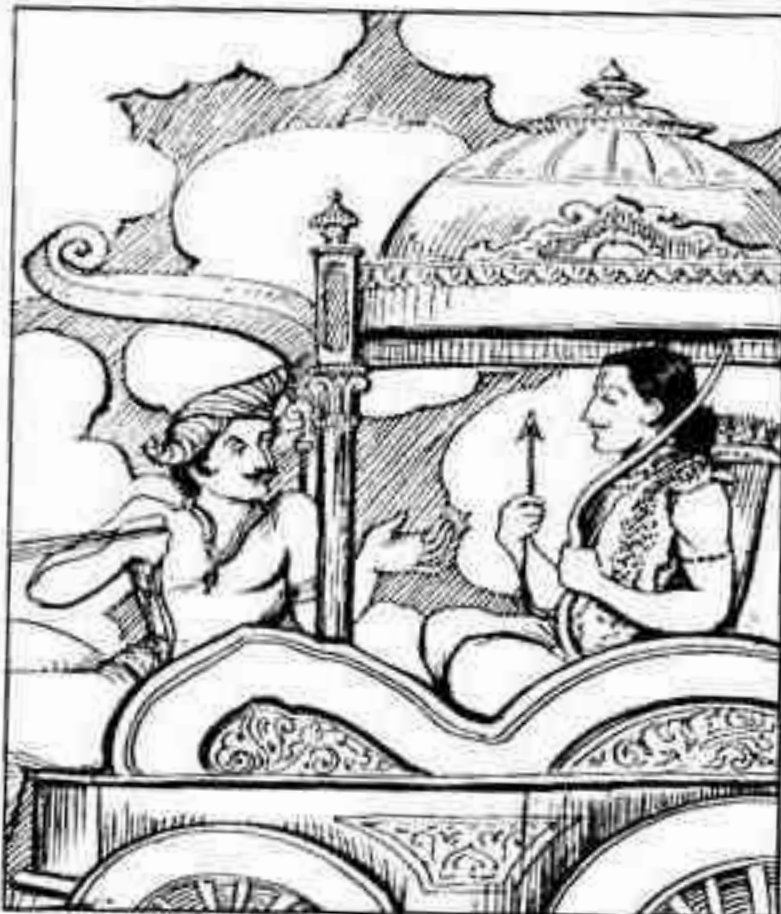
সে আমাকে সম্পূর্ণ গান্ধর্ব শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করে। ইন্দ্রভবনে থেকে আমি নানা প্রকার গীত ও বাদ্য শ্রবণ করি এবং অপ্সরাদের নৃত্য করতে দেখি। কিন্তু এগুলি অসার ভেবে আমি অস্ত্রশিক্ষাতেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করি। আমার এইভাব দেখে দেবরাজ ইন্দ্র আমার ওপর প্রসন্ন ছিলেন এবং আমিও স্বর্গে আনন্দে সময় কাটিয়েছি। আমার ওপর সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, অস্ত্রবিদ্যাতে আমি বেশ নিপুণতা অর্জন করেছি। ইন্দ্র একদিন আমাকে বললেন—'বৎস ! তোমাকে এখন আর দেবতারাও যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে না, মর্ত্যবাসীদের কথা আর কী বলব ? তুমি যুদ্ধে অতুলনীয়, অজেয় এবং অনুপম হবে। এমন কোনো বীর নেই যে যুদ্ধে তোমার সম্মুখীন হতে পারে। তুমি সর্বদা সতর্ক, কুশলী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণসেবী এবং শূরবীর। তুমি পনেরোটি অস্ত্রে সিদ্ধ হয়েছ এবং তার প্রয়োগ, উপসংহার, আবৃত্তি, প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রতিঘাত—এই পাঁচটি বিধিও ভালোভাবে জানো। অতএব হে শত্রুদমন ! এখন তোমার গুরুদক্ষিণা প্রদানের সময় এসেছে। নিবাতকবচ নামক দানব আমার শত্রু, সে সমুদ্রের মধ্যে দুর্গম স্থানে বাস করে। তার রূপ, বল, প্রভাব অসীম। তুমি তাকে বধ কর। তাহলেই তোমার গুরুদক্ষিণা প্রদান করা হবে।' ইন্দ্র এই কথা বলে আমাকে তাঁর অত্যন্ত প্রভাসম্পন্ন দিব্য রথ প্রদান করলেন। মাতলি ছিলেন তাঁর সারথি এবং তিনিও আমার মাথায় একটি উজ্জ্বল মুকুট পরালেন। এক অভেদ্য, সুন্দর কবচ পরিয়ে আমার গাণ্ডীব ধনুকে জ্যা পরালেন। সর্বপ্রকার যুদ্ধসামগ্রীতে সুসজ্জিত হয়ে আমি সেই রথে করে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রওনা হলাম। রথের ঘর্ঘর আওয়াজে দেবরাজ ইন্দ্র ভেবে সকলে আমার কাছে এলেন। সেখানে আমাকে দেখে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—'অর্জুন ! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' আমি তাঁদের সব জানিয়ে বললাম—'আমি নিবাতকবচকে বধ করতে যাচ্ছি, আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি সফল হই।' তাঁরা প্রসন্ন হয়ে আমাকে বললেন—'এই রথে করে ইন্দ্র শম্বর, নমুচি, বল, বৃত্র এবং নরক

ইত্যাদি সহস্রাধিক দৈত্য জয় করেছেন ; অতএব হে কুন্তী-নন্দন ! এর সাহায্যে তুমিও নিবাতকবচকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে।'

অর্জুনের নিবাতকবচদের সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণনা

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! পথে যেতে যেতেও স্থানে স্থানে মহর্ষিগণ আমার প্রশংসা করছিলেন। শেষে আমি সেই ভয়াবহ অর্ণবে সমুদ্রের কাছে পৌঁছে দেখলাম যে, পর্বতের ন্যায় উঁচু উঁচু ঢেউ উঠছে, কখনো তা তীরে আসছে আবার কখনো দুটো একসঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে। হাজার হাজার মাছ, কচ্ছপ, তিমি এবং কুমীর সেই জলের মধ্যে খেলা করছে। সেই মহাসাগরের পাশেই দানব বহুল তাদের নগর দেখতে পেলাম। সেখানে পৌঁছে মাতলি রথ সেই নগরের দিকে চালিত করল। রথের শব্দে দানবরা ভয়ে কম্পিত হল। আমিও তখন খুশি হয়ে ধীরে ধীরে আমার দেবদত্ত শঙ্খ বাজাতে লাগলাম। সেই ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সেই আওয়াজে অনেক বড় বড় জীব-জন্তু ভয় পেয়ে এদিক ওদিক লুকিয়ে পড়ল। বহু অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাজার হাজার নিবাতকবচ দৈত্য নগরের বাইরে বেরিয়ে

এল। তারা নানাপ্রকার ভীষণ আওয়াজ করে বাজনা বাজাতে লাগল। নিবাতকবচদের সঙ্গে আমার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে সেখানে অনেক মুনি, ঋষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ হাজির হলেন। আমার বিজয়লাভের জন্য তাঁরা মধুর স্বরে আমার প্রশংসা করতে লাগলেন।

দানবরা আমার ওপর গদা, শক্তি, শূল বৃষ্টি করতে লাগল, সেগুলি আমার রথের ওপর পড়তে লাগল। আমি বহু দানবকে ধরাশায়ী করলাম, ছোট ছোট অস্ত্রের সাহায্যে আমি হাজার হাজার অসুর বধ করলাম। এদিকে ঘোড়া এবং রথের চাকার আঘাতেও অনেক রাক্ষস মারা পড়ল, অনেকে পালিয়ে গেল। কিছু নিবাতকবচ সাহস করে বাণ বৃষ্টি করে আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল। তখন আমি ব্রহ্মাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করে হাজার হাজার বাণ ছুঁড়ে তাদের নির্মূল করে দিলাম। সেই দৈত্যদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ থেকে এমন রক্ত প্রবাহ বাহিত হল যেন বর্ষাঋতুতে পর্বতের চূড়া থেকে জলধারা বইছে।

রাজন্ ! তারপর সবদিক থেকে বড় বড় পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারা আমাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ করে তুলেছিল, তখন আমি ইন্দ্রাস্ত্রের সাহায্যে বজ্রের ন্যায় বেগবান বাণ ছুঁড়ে তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলাম। এতে তারা পাথর ছোঁড়া বন্ধ করে বিশাল জলপ্রবাহ সৃষ্টি করল। ইন্দ্র আমাকে বিশোষণ নামের এক দীপ্তিশালী দিব্যাস্ত্র দিয়েছিলেন। সেটি প্রয়োগ করায় সমস্ত জল শুষ্ক হয়ে যায়। তারপর দানবরা মায়া দ্বারা অগ্নি ও বায়ু নিক্ষেপ করতে থাকে। আমি তৎক্ষণাৎ বরুণাস্ত্রের সাহায্যে অগ্নি নির্বাপিত করি এবং শৈলাস্ত্রের সাহায্যে বায়ু রোধ করি। এতে একে একে সমস্ত দানব অদৃশ্য হয়ে যায় এবং অন্তর্ধানী মায়াতে আমি প্রত্যক্ষ না থেকেও আমার ওপর অস্ত্র চালাতে থাকে, আমিও অদৃশ্যাস্ত্রের সাহায্যে তার মোকাবিলা করি, গাণ্ডীব ধনুক থেকে ছোঁড়া বাণ দিয়ে তাদের মাথা কেটে ফেলি। যখন এইভাবে আমি তাদের সংহার করতে থাকি তখন তারা মায়া সংহত করে নগরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। দৈত্যরা চলে যাওয়ার পর দেখলাম সেখানে হাজার হাজার দানব মরে পড়ে আছে। এত লাশ পড়েছিল যে ঘোড়ার পা রাখার জায়গা ছিল না, তাই ঘোড়া জমি থেকে আকাশে উঠে পড়ল। কিন্তু নিবাতকবচরা অদৃশ্যরূপে আবার পাথর বৃষ্টি করে আকাশ ঢেকে ফেলল। এতে ঘোড়ার গতি রুদ্ধ হওয়ায় আমি বড় বিরক্ত হলাম। তখন আমাকে মাতলি বললেন—'অর্জুন, বিরক্ত হয়ো না, বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করো।' মাতলির কথা শুনে আমি দেবরাজের প্রিয় অস্ত্র বজ্র নিক্ষেপ করলাম। তারপর এক নির্জন স্থানে বসে গাণ্ডীবকে অভিমন্ত্রিত করে আমি লৌহ নির্মিত বজ্রসম তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করি। সেই বজ্রতুল্য বাণগুলির বেগে আহত হয়ে সেই পর্বতের ন্যায় বিশালাকায় দৈত্য একে অপরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়তে লাগল। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, ভীষণ সংগ্রাম হওয়া সত্ত্বেও রথ, মাতলি অথবা ঘোড়াগুলির কোনো প্রকার ক্ষতি হয়নি।

মাতলি তখন হেসে আমাকে বললেন—'অর্জুন ! মনে হচ্ছে তোমার মতো পরাক্রম তো কোনো দেবতারও নেই।' নিবাতকবচ দৈত্যরা সব মারা গেলে নগরে তাদের পত্নীদের কান্না শোনা যেতে লাগল। আমি মাতলিকে নিয়ে নগরে গেলাম। রথের আওয়াজ শুনে তারা ভয় পেয়ে দলে দলে পালিয়ে যেতে লাগল। সেই নগর অমরাবতীর চেয়েও সুন্দর। সেই সুন্দর নগর দেখে আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এত সুন্দর নগরে দেবতারা বাস করেন না কেন ? আমার তো একে ইন্দ্রপুরীর থেকেও সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।' মাতলি বললেন—'এই নগর আগে আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রেরই ছিল, তারপর নিবাতকবচ দৈত্যরা দেবতাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। কথিত আছে, পূর্বকালে মহাতপস্যা করে দানবরা ভগবান ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে নিজেদের থাকার এই স্থান এবং যুদ্ধে দেবতাদের সঙ্গে জয়ী হওয়ার পর বর প্রার্থনা করে। ইন্দ্র তখন ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা জানান যে 'ভগবান ! আমাদের হিতের জন্য আপনিই এদের সংহার করুন।' তখন ব্রহ্মা বলেন—'ইন্দ্র ! বিধাতার বিধান হল অন্য দেহ দ্বারা তুমিই এর নাশ করবে।' তাই এদের বধ করার জন্য ইন্দ্র তোমাকেই তাঁর অস্ত্র দিয়েছেন। তুমি যে অসুরদের সংহার করেছ, দেবতারা তাঁদের মারতে সক্ষম নন কারণ তুমি ইন্দ্রের অংশ বিশেষ, তাই এ কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে।'

এইভাবে দানবদের বধ করে সেই নগরে শান্তি স্থাপন করে আমি মাতলির সঙ্গে আবার দেবলোকে ফিরে গেলাম।'

—— ০ ——

অর্জুনের সঙ্গে কালিকেয় এবং পৌলোমোর যুদ্ধ এবং স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা

অর্জুন বললেন—'ফেরার সময় পথে আমি এক দিব্য নগরী দেখতে পেলাম। সেই নগরী অত্যন্ত বিস্তৃত এবং অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন। সেটিকে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। এতেও দৈত্যরা বাস করত। সেই বিচিত্র নগরী দেখে আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করলাম 'এই বিচিত্র মনোরম স্থানটি কার ?' মাতলি বললেন—'পুলোমা এবং কালিকা নামে দুই দানবী ছিল। তারা সহস্র দিব্য বছর ধরে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিল। তপস্যার শেষে ব্রহ্মা যখন প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বর প্রার্থনা করতে বললেন, তারা বলল আমাদের পুত্ররা যেন কোনো কষ্ট না পায়, দেবতা, রাক্ষস বা নাগ—কেউ যেন তাদের মারতে না পারে এবং তাদের থাকার জন্য এক অতি রমণীয়, প্রকাশশীল এবং আকাশচারী নগর প্রয়োজন। তখন ব্রহ্মা কালিকার পুত্রদের জন্য সর্বভাবে সুসজ্জিত, দেবতাদের অজেয়, সর্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগে পূর্ণ রোগ-শোক রহিত এই নগর তৈরি করেন। একে মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ, অসুর বা রাক্ষস—কেউই জয় করে নিতে পারে না। এই নগরী আকাশে বিচরণ করে। এতে কালিকা এবং পুলমার পুত্ররাই থাকে। তারা সর্বপ্রকার উদ্বেগ ও চিন্তার থেকে দূরে থেকে অত্যন্ত আনন্দে এখানে বাস করে। কোনো দেবতাই এদের পরাজিত করতে পারে না। ব্রহ্মা এদের মৃত্যু মানুষের ওপরই ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং তুমি বজ্রদ্বারা এই দুর্জয় মহাবলী দৈত্যদের শেষ করে দাও।'

আমি খুশি হয়ে মাতলিকে বললাম—'আপনি আমাকে এখনই ওই নগরীতে নিয়ে চলুন। যে দুষ্টরা দেবরাজের সঙ্গে বিদ্রোহ করে, তাদের আমি এখনই ছারখার করে দেব।' মাতলি তৎক্ষণাৎ আমাকে সেই সুবর্ণময় নগরীর কাছে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখেই দৈত্যরা কবচ পরে, রথে চড়ে আমাকে আক্রমণ করল এবং ক্রোধান্বিত হয়ে নানা অস্ত্র প্রয়োগ করল। আমি আমার অস্ত্রবিদ্যার সাহায্যে তাদের অস্ত্রবর্ষণ রোধ করলাম এবং সকলকে মায়াজালে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলাম, যার ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। তাদের এই অবস্থাতেই আমি বাণ ছুঁড়ে তাদের অনেকের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলাম। এই অবস্থায় তারা আবার নগরে ঢুকে পড়ল এবং মায়ার সাহায্যে নগরীকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন দিব্যাস্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শরদ্বারা আমি দৈত্যসহ সেই নগরীকে ঘিরে ফেললাম। আমার নিক্ষিপ্ত লৌহবাণের আঘাতে সেই দৈত্যনগরী পৃথিবীর বুকে এসে পড়ল।

তখন তারা যুদ্ধ করার জন্য ষাটহাজার রথীসহ চারদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করল। আমি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাদের সব নষ্ট করে দিলাম। একটু পরেই আবার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আর একদল আক্রমণ করল। তখন আমি দেখলাম যে, সাধারণ অস্ত্রের দ্বারা এদের পরাস্ত করা কঠিন, তাই ধীরে ধীরে দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এই দৈত্যরা অত্যন্ত কুশলী যোদ্ধা, তারা আমার দিব্যাস্ত্রও কেটে ফেলতে লাগল। আমি তখন দেবাদিদেব মহাদেবের শরণ নিয়ে 'সর্বপ্রাণীর কল্যাণ হোক' বলে তাঁর প্রসিদ্ধ পাশুপতাস্ত্র গাণ্ডীবে চড়ালাম। তারপর মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে দৈত্যদের বধ করার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। তার প্রচণ্ড আঘাতে দৈত্যরা ধ্বংস হয়ে গেল। রাজন্ ! এইভাবে একমুহূর্তে আমি তাদের শেষ করলাম।

সেই দিব্যাভরণভূষিত দৈত্যদের দিব্যাস্ত্রের প্রভাবে নাশ হতে দেখে মাতলি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাত জোড় করে আমাকে বললেন—'এই আকাশচারী নগর দেবতা ও দৈত্য সবার পক্ষেই অজেয় ছিল, স্বয়ং দেবরাজও এদের পরাজিত করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু বীর ! তুমি তোমার পরাক্রম ও তপোবলে আজ এদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছ।' সেই আকাশচারী নগর ধ্বংস হওয়ায় এবং দানবদের মৃত্যু হওয়ায় তাদের পত্নীরা চিৎকার করতে করতে নগরের বাইরে এলো। তারা শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগল এবং ক্রমশ নগরটি গন্ধর্ব নগরের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমি খুব তৃপ্ত হলাম। তারপর সারথি আমাকে রণভূমি থেকে ইন্দ্রের রাজভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে মাতলি হিরণ্য নগরের পতন, দানবী মায়ার নাশ এবং রণদুর্মদ নিবাতকবচ বধ ইত্যাদি বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শোনালেন। সব শুনে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং মধুর স্বরে বললেন, 'পার্থ ! তুমি দেবতা এবং অসুরদের থেকেও বড় কাজ করেছ। আমার

শত্রুদের বধ করে তুমি গুরুদক্ষিণাও দিয়েছ। এখন দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, গন্ধর্ব, পক্ষী ও নাগ—সবার কাছেই তুমি যুদ্ধে অজেয় হয়েছ। সুতরাং তোমার বাহুবলে জয়লাভ করে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পৃথিবীতে নিষ্কণ্টকভাবে বহুদিন রাজত্ব করবেন।' তুমি যে সকল দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছ, তাতে ভূমণ্ডলে কোনো যোদ্ধা তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। পুত্র ! তুমি যখন রণভূমিতে যাবে তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি বা অন্য কেউই তোমার যুদ্ধকলার সমকক্ষ হতে পারবে না।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র আমার শরীর রক্ষাকারী এই দিব্য অভেদ্য কবচ ও স্বর্ণহার প্রদান করেন, সঙ্গে এই দেবদত্ত নামক শঙ্খ দিয়েছেন, যার আওয়াজ অত্যন্ত তীব্র। তিনি নিজ হাতে এই দিব্য কিরীটি আমার মস্তকে পরিয়ে দিয়েছেন, বহু সুন্দর বসন-ভূষণ তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন। ইন্দ্রের দ্বারা সম্মানিত হয়ে গন্ধর্বকুমারদের সঙ্গে আমি অত্যন্ত আনন্দে সেখানে ছিলাম। সেখানে পাঁচবছর অতিক্রান্ত হলে ইন্দ্র একদিন আমাকে বললেন—'অর্জুন, এবার তোমার ফিরে যাওয়ার সময় উপস্থিত। তোমার ভ্রাতারা তোমাকে স্মরণ করছে।' তাই আমি সেখান থেকে এই গন্ধমাদন পর্বতে এসে ভ্রাতাদের সঙ্গে আপনার দর্শন পেলাম।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধনঞ্জয় ! এ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে আরাধনা দ্বারা প্রসন্ন করে এইসব দিব্যাস্ত্র লাভ করেছ। দেবী পার্বতী ও ভগবান শংকরকে তুমি প্রত্যক্ষ করেছ এবং তোমার যুদ্ধকলায় তাঁকে সন্তুষ্ট করেছ—এ তো বড় আনন্দের কথা। তুমি লোকপালদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছ এবং কুশলপূর্বক ফিরে এসেছ, এতে আমি খুবই সুখী হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি সমগ্র পৃথিবী জিতে নিয়েছি এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পরাস্ত করেছি। অর্জুন ! আমাকে সেই দিব্যাস্ত্রগুলি দেখাও, যা দিয়ে তুমি নিবাতকবচদের বধ করেছ।'

যুধিষ্ঠিরের কথায় অর্জুন দেবগণ প্রদত্ত দিব্যাস্ত্র দেখাতে গেলেন। প্রথমে তিনি স্নান করে শুদ্ধ হলেন এবং অঙ্গে কান্তিমান দিব্য কবচ ধারণ করলেন। এক হাতে গাণ্ডীব অন্যহাতে দেবদত্ত শঙ্খ নিলেন। এইরূপ বেশে সুশোভিত হয়ে মহাবাহু অর্জুন দিব্যাস্ত্র দেখাতে লাগলেন। যখন সেই অস্ত্র প্রদর্শনী শুরু হল, পৃথিবী কেঁপে উঠল, নদী ও সমুদ্রে তুফান উঠল, পৃথিবী ফাটতে লাগল, বায়ু রুদ্ধ হল এবং সূর্যের কান্তি কমে গেল, আগুন নিভে গেল।

তখন সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, মহর্ষি, দেবর্ষি ও স্বর্গবাসী

দেবতারা এসে উপস্থিত হলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এবং ভগবান শংকরও সেখানে পদার্পণ করলেন। দেবতারা একমত হয়ে নারদকে অর্জুনের কাছে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন—'অর্জুন, দাঁড়াও ! এখন দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ কোরো না। কোনো লক্ষ্য বিনা এর প্রয়োগ উচিত নয়। কোনো শত্রু লক্ষ্য হলেও, যতক্ষণ সে আঘাত না করে, ততক্ষণ তার ওপরও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত নয়। এর ব্যর্থ প্রয়োগ করলে মহা অনর্থ হবে। তুমি যদি নিয়মানুসারে একে রক্ষা করো তাহলে এটি শক্তিশালী ও রক্ষাকারী হবে। ব্যর্থ প্রয়োগে এ ত্রিলোক নাশ করবে। আর কখনো এ কাজ কোরো না। যুধিষ্ঠির ! তুমিও এখন এসব দেখার ইচ্ছা ত্যাগ করো ; যুদ্ধে শত্রু সংহারের সময় অর্জুন যখন এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করবে, তখন তুমি এগুলি প্রত্যক্ষ করবে।'

নারদ যখন এইভাবে অর্জুনকে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে নিষেধ করলেন, তখন সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য প্রাণী, যারা যেখান থেকে এসেছিল, সবাই ফিরে গেল এবং পাণ্ডবরাও দ্রৌপদীকে নিয়ে আনন্দে বনে থাকতে লাগলেন।

—o—

গন্ধমাদন পর্বত থেকে পাণ্ডবদের অন্যত্র গমন এবং দ্বৈতবনে প্রবেশ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—হে মুনিবর বৈশম্পায়ন! মহারথী বীর অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা লাভ করে ইন্দ্রভবন থেকে ফিরে এলেন, তারপরে পাণ্ডবরা কী করলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন—অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিখে ইন্দ্রের ন্যায় মহাপরাক্রমী বীর হয়ে উঠলেন। সকল পাণ্ডব একসঙ্গে সেই বনে থেকে রমণীয় গন্ধমাদন পর্বতে বিচরণ করতে লাগলেন। সেই পর্বতে অতি সুন্দর একটি ভবন এবং নানা রমণীয় বৃক্ষাদি ছিল। কিরীটধারী অর্জুন হাতে ধনুক নিয়ে সেখানে ভ্রমণ করতেন এবং অস্ত্র সঞ্চালন অভ্যাস করতেন। কুবেরের অনুগ্রহে পাণ্ডবরা সেখানে থাকার সুন্দর বাসস্থান পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে তাঁরা সেখানে চার বছর কাটালেন কিন্তু তাঁদের কাছে এই সময়কাল মাত্র একটি রাত বলে মনে হচ্ছিল। এইভাবে দশবছর অতিক্রান্ত হল।

তখন একদিন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে একান্তে বসে কোমলস্বরে নিজেদের হিতের কথা বললেন—'কুরুরাজ! আমরা চাই যে, আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য হোক; আমরা আপনার প্রিয় কাজ করতে চাই। আমাদের বনবাসের একাদশ বছর চলছে। আপনার আদেশ শিরোধার্য করে, কষ্টের কথা না ভেবে আমরা নির্ভয়ে বনে বিচরণ করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে ওই দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দুর্যোধনকে বিস্মিত করে আমরা অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশতম বর্ষও অতিবাহিত করব। অজ্ঞাতবাস কাটিয়ে আমরা ওই নরাধমকে সংহার করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—ধর্ম ও তত্ত্বে অভিজ্ঞ মহাত্মা যুধিষ্ঠির যখন তাঁর ভ্রাতাদের কথা ভালোভাবে জেনে নিলেন, তখন তাঁরা কুবেরের নিবাসস্থল প্রদক্ষিণ করে, সেখানকার সমস্ত যক্ষ-রাক্ষসদের কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সব ভ্রাতা এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে যে পথে এসেছিলেন, সেই পথে ফিরে চললেন। পথে যেখানে পর্বত বা ঝরনা আসত, ঘটোৎকচ সকলকে একসঙ্গে কাঁধে করে সেগুলি পার করে দিত। মহর্ষি লোমশ পাণ্ডবদের সেখান থেকে যেতে দেখে স্নেহশীল পিতা যেমন তাঁর পুত্রদের উপদেশ দেন, তেমনই সবাইকে সুন্দর উপদেশ দিলেন এবং স্বয়ং মনে মনে খুশি হয়ে দেবতাদের নিবাসস্থানে ফিরে গেলেন। রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণও তাঁদের সবাইকে নানা উপদেশ দিলেন। তারপর সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পবিত্র তীর্থ, মনোহর তপোবন এবং বড় বড় সরোবর দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। তাঁরা কখনো রমণীয় বনের মধ্যে, কখনো নদীর তীরে, কখনো পর্বতের ছোট-বড় গুহায় রাত কাটাতেন। এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা রাজা বৃষপর্বার অতি মনোরম আশ্রমে পৌঁছলেন। বৃষপর্বা তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। পাণ্ডবদের ক্লান্তি দূর হলে তাঁরা কেমন ভাবে গন্ধমাদন পর্বতে ছিলেন, সেইসব সমাচার সবিস্তারে জানালেন।

বৃষপর্বার আশ্রমে দেবতা এবং মহর্ষিগণ এসে বাস করতেন, ফলে সেই আশ্রম অত্যন্ত পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। পাণ্ডবরাও সেখানে একরাত্রি থেকে পরদিন সকালে বদরিকাশ্রম তীর্থ বিশালা নগরীতে এলেন। ভগবান নর-নারায়ণের ক্ষেত্রে তাঁরা একমাস অত্যন্ত আনন্দে কাটালেন। তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, সেখান দিয়ে কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যের দিকে রওনা হলেন। চীন, তুষার, দরদ, কুলিন্দ দেশ, যেখানে মণিরত্নের খনি আছে, সেগুলি পেরিয়ে হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশ পার হয়ে তাঁরা রাজা সুবাহুর নগরে এলেন।

রাজা সুবাহু যখন শুনলেন যে, তাঁর রাজ্যে পাণ্ডবরা পদার্পণ করেছেন, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নগরের বাইরে থেকে তাঁদের স্বাগত জানিয়ে আহ্বান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে সম্মান জানালেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁরা রাজা সুবাহুর রাজ্যে একরাত কাটালেন। পরদিন সকালে ঘটোৎকচকে তাঁর অনুচর সহিত বিদায় জানালেন এবং সুবাহু প্রদত্ত রথ ও সারথি সমভিব্যাহারে পর্বতের

ওপর যমুনানদীর উৎস স্থানে পৌঁছলেন। বীর পাণ্ডবরা সেই পর্বতের ওপর বিশাখযূপ নামক বনে বাস করলেন।

সেখানে বসবাসকালে একদিন ভীম পর্বতের কন্দরে এক মহাবলী অজগরের কাছে গিয়ে পড়লেন, সে ছিল অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং মৃত্যুর ন্যায় ভয়ংকর। তাকে দেখে ভীম ভীত হলেন, তাঁর অন্তরাত্মা বিষাদে ভরে গেল। সেই অজগর ভীমের শরীর জড়িয়ে ধরল। ভীম ভয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। সেইসময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরই সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের ন্যায় তার রক্ষাকারী হন। তিনি সেই সাপের কবল থেকে ভীমকে রক্ষা করেন।

সেই সময় পাণ্ডবদের একাদশ বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বাদশ বর্ষ শুরু হচ্ছিল। তাই তাঁরা কোনো অন্য বনে ভ্রমণ করার জন্য চৈত্ররথের ন্যায় সুন্দর বন থেকে বার হয়ে এসে মরুভূমির কাছে সরস্বতী নদীর তীরে দ্বৈতবনে পৌঁছলেন। সেখানে দ্বৈত নামে এক অতি সুন্দর সরোবর ছিল।

—— ০ ——

ভীমের সর্প কবলিত হওয়া এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক মহাসর্পের প্রশ্নের উত্তর প্রদান

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! ভীম তো দশ হাজার হাতির সমান বলীয়ান এবং ভয়ানক পরাক্রমী ছিলেন, তিনি কেন অজগরকে এত ভয় পেলেন ? যিনি কুবেরকেও যুদ্ধে আহ্বান করেন, সেই শত্রুহন্তা ভীমকে আপনি সর্পের ভয়ে ভীত বলছেন ? এ তো অতি আশ্চর্য ব্যাপার, আমার সব ঘটনা জানার জন্য খুব উৎকণ্ঠা হচ্ছে, আপনি কৃপা করে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যখন পাণ্ডবরা মহর্ষি বৃষপর্বার আশ্রমে এসে সেখানকার নানাপ্রকার আশ্চর্যজনক ঘটনাযুক্ত বনে বাস করেন, এটি তখনকার কথা। একদিন ভীম বনের শোভা দেখার জন্য আশ্রমের বাইরে যান। তখন তাঁর কোমরে তলোয়ার ও হাতে ধনুক ছিল। ভীম পথে যেতে যেতে এক বিশালকায় অজগর দেখতে পান, সে এক পর্বত কন্দরে পড়েছিল। তার পর্বতের ন্যায় বিশাল দেহে সমস্ত গুহা বন্ধ হয়েছিল, তাকে দেখলেই শরীর ভয়ে শিহরিত হয়। তার গাত্রবর্ণ হলুদ, মুখ পর্বত গুহার ন্যায় বিশাল, তাতে চারটি লম্বা লম্বা দাঁত। তার লাল চোখ দিয়ে যেন আগুন বৃষ্টি হচ্ছে। সে বারবার জিভ বার করে মুখ চাটছিল। সেই অজগর কালের ন্যায় বিকট এবং সকল প্রাণীর ভীতি উদ্রেককারী। তার নিঃশ্বাসে যে শব্দ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সে যেন সব প্রাণীকে তাই দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করছিল।

ভীমকে হঠাৎ নিজের কাছে পেয়ে সেই মহাসর্প অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং সবলে ভীমের দুই বাহু সমেত শরীরকে জড়িয়ে ধরল। শাপের প্রভাবে অজগর ভীমকে স্পর্শ করতেই তাঁর চেতনা লুপ্ত হল। যদিও তাঁর হাতে দশ হাজার হাতির বল, তবুও সাপের কবলে পড়ে তিনি কাবু হয়ে পড়লেন এবং মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করতে লাগলেন ; কিন্তু অজগর এমনভাবে ধরেছে যে তিনি নড়তেও পারলেন না। ভীমের জিজ্ঞাসার উত্তরে অজগর তার পূর্বজন্মের

পরিচয় দিল এবং শাপ ও বরপ্রদানের কথাও জানাল। ভীম বহু অনুনয় বিনয় করলেও সাপের কবল থেকে মুক্তি পেলেন না।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির নানা অমঙ্গলসূচক ঘটনায় ভয় পেলেন। তাঁদের আশ্রমের দক্ষিণ বনে ভীষণ আগুন লাগে এবং তাতে ভয় পেয়ে শৃগালী অমঙ্গলসূচক স্বরে চিৎকার করতে থাকে। ভীষণ বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে এবং তার সঙ্গে বালি ও কাঁকর বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বাঁ হাত কম্পিত হতে লাগল। এই সব দুর্লক্ষণ দেখে বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির বুঝে গেলেন যে, তাঁদের কোনো মহাভয় উপস্থিত হয়েছে।

তিনি দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভীম কোথায় ?' দ্রৌপদী বললেন—'তিনি তো অনেকক্ষণ বনে গেছেন !' তাই শুনে যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধৌম্য ঋষিকে নিয়ে ভীমের অনুসন্ধানে বেরোলেন। অর্জুনকে দ্রৌপদীর রক্ষার কার্য সমর্পণ করলেন এবং নকুল-সহদেবকে ব্রাহ্মণদের সেবায় নিযুক্ত করলেন। ভীমের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি বনে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি পর্বতের দুর্গম প্রদেশে গিয়ে দেখলেন এক বিশাল অজগর ভীমকে জড়িয়ে ধরেছে এবং ভীম নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছেন।

তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে ধর্মরাজ বললেন—'ভীম ! বীরমাতা কুন্তীর পুত্র হয়ে তুমি এই বিপদে কী করে পড়লে ? এই পর্বতকায় অজগর কে ?'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজকে দেখে ভীম কী করে সাপের কবলে পড়লেন এবং নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলেন ইত্যাদি সব জানালেন এবং পরে বললেন—'ভ্রাতা ! এই মহাবলী সাপ আমাকে খাওয়ার জন্য ধরে রেখেছে।'

যুধিষ্ঠির সর্পকে বললেন—'আয়ুষ্মন্ ! তুমি আমার এই অনন্ত পরাক্রমী ভাইকে ছেড়ে দাও। তোমার ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য আমি তোমাকে অন্য আহার দেব।'

সর্প বলল—'এই রাজকুমার আমার কাছে এসে স্বয়ং আহার হয়েছে। তুমি এখান থেকে চলে যাও, এখানে থাকলে ভালো হবে না, যদি থাক তাহলে কাল তুমিও আমার আহার হবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সর্পরাজ ! তুমি কী কোনো দেবতা, না দৈত্য নাকি সত্যই সর্প ? সত্য বলো, তোমাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করছে ! ভুজঙ্গম্ ! ঠিক করে বলো, এমন কোনো বস্তু কী আছে যা পেয়ে অথবা জেনে তুমি প্রসন্ন হবে ? কী পেলে তুমি ভীমকে ছেড়ে দেবে ?'

সর্প বলল—'পূর্ব জন্মে আমি তোমার পূর্বপুরুষ নহুষ নামক রাজা ছিলাম। চন্দ্রের পঞ্চম বংশধর, যিনি আয়ু নামের রাজা ছিলেন, আমি তাঁরই পুত্র। আমি অনেক যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় করেছিলাম এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করেছিলাম। এই সব সৎকর্মের দ্বারা এবং নিজ পরাক্রমেও আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য লাভ করেছিলাম, সেইসব ঐশ্বর্য পেয়ে আমার অহংকার বৃদ্ধি হয়। আমি মদোন্মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের অপমান করেছিলাম, তাতে কুপিত হয়ে মহর্ষি অগস্ত্য আমার এই অবস্থা করেন। তাঁর কৃপাতেই আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি লুপ্ত হয়নি। ঋষির শাপেই দিনের ষষ্ঠ ভাগে তোমার ভাইকে আমি খাদ্যরূপে পেয়েছি ; সুতরাং আমি একে ছাড়ব না এবং এর পরিবর্তে অন্য কোনো খাদ্যও নেব না। তবে একটা কথা, যদি তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের এখনই উত্তর দাও, তাহলে তোমার ভাইকে অবশ্যই ছেড়ে দেব।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সর্প ! তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করো। যদি সম্ভব হয়, তাহলে তোমার প্রসন্নতার জন্য আমি অবশ্যই সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

সর্প প্রশ্ন করল—'রাজা যুধিষ্ঠির ! বলো, ব্রাহ্মণ

কে ? আর জানবার যোগ্য তত্ত্ব কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'নাগরাজ, শোনো। যাঁর মধ্যে সত্য, দান, ক্ষমা, সুশীলতা, কোমলতা, তপস্যা, দয়া—এই সব সদ্‌গুণ দেখা যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ, স্মৃতির এই হল সিদ্ধান্ত। আর জানার যোগ্য তত্ত্ব সেই পরব্রহ্মই, যিনি সুখ-দুঃখের অতীত এবং যেখানে গেলে বা যাঁ জানলে মানুষ শোক পার হয়ে যায়।'

সর্প বলল—'যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্ম ও সত্য চার বর্ণের জন্য হিতকর তথা প্রমাণভূত এবং বেদে কথিত সত্য, দান, ক্রোধ এবং ক্রূরতা না থাকা, অহিংসা, দয়া ইত্যাদি সদ্‌গুণ তো শূদ্রদের মধ্যেও দেখা যায় ; তাহলে তোমার মতে এদেরও ব্রাহ্মণ বলা যেতে পারে। তাছাড়াও, তুমি যে দুঃখ ও শোকের অতীত জানার যোগ্য পদ বলেছ, তাতেও আমার আপত্তি আছে। আমার বিচারে সুখ ও দুঃখ রহিত কোনো অন্য পদ নেই-ই।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যদি শূদ্রের মধ্যে সত্য ইত্যাদি উপরিউক্ত লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে তা না থাকে, তাহলে সেই শূদ্র শূদ্র নয় এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। হে সর্প ! যার মধ্যে সত্য আদি লক্ষণ থাকে, তাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে জানবে, যার মধ্যে এগুলির অভাব তাকে 'শূদ্র' বলা উচিত। আর তুমি যে বললে সুখ-দুঃখ রহিত অন্য কোনো পদ নেই, তোমার এই মতও ঠিক। প্রকৃতপক্ষে যা অপ্রাপ্ত এবং কর্মদ্বারাই প্রাপ্ত হয়, এরকম পদ যাই হোক না কেন, সুখ-দুঃখ শূন্য নয়। কিন্তু যেমন শীতল জলে উষ্ণতা থাকে না এবং উষ্ণ স্বভাব অগ্নিতে জলের শীতলতা থাকে না, কারণ এদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, তেমনই যা জানার যোগ্য পদ, যাতে অজ্ঞানের আবরণ দূরীভূত হয়ে নিজেকে অভিন্ন ভাবা হয়, তার কখনো কোথাও প্রকৃত সুখ-দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক হয় না।'

সর্প বলল—'রাজন্ ! তুমি যদি আচরণের সাহায্যেই ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করো, তাহলে জাতি অনুসারে যদি কর্ম না করা হয় তাহলে তো সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার মতে মানুষের জাতির পরীক্ষা করা খুবই কঠিন। কারণ এখন বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ হচ্ছে। সকলেই বিভিন্ন জাতির নারী থেকে সন্তান উৎপাদন করছে। চলন-বলন, মৈথুনে প্রবৃত্তি, জন্ম-মৃত্যু-সব মানুষের মধ্যে একই প্রকারের দেখা যায়। এই সব বিষয়ে আর্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়। 'যে যজামহে' এই শ্রুতিবাক্য জাতির নিশ্চিত নির্ধারণ না হওয়ার কারণেই 'যে আমরা যজ্ঞ করি'—সাধারণভাবে এরূপ নির্দেশ প্রদান করে। এতে 'যে' (যে) এই সর্বনামের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কোনো বিশেষণ প্রযুক্ত হয়নি। তাই যিনি তত্ত্বদর্শী বিদ্বান, তিনি শীল (সদাচার)কেই প্রাধান্য দেন। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন নাড়ী কর্তনের আগে তার জাতকর্ম-সংস্কার করা হয়। তখন মাকে সাবিত্রী ও পিতাকে আচার্য বলা হয়। যতক্ষণ শিশুর সংস্কার সাধন করে তাকে বেদের স্বাধ্যায় না করানো হয়, ততক্ষণ সে শূদ্রের সমান। জাতিবিষয়ক সন্দেহ হওয়ায় স্বায়ম্ভুব মনু এই নির্দেশ দিয়েছেন। বৈদিক সংস্কারের পরে বেদাধ্যয়ন করলেও যদি তার মধ্যে শীল ও সদাচার না পাওয়া যায়, তাহলে তার মধ্যে বর্ণসংকরতা প্রবল এরূপ স্থির করা হয়েছে। যার মধ্যে সংস্কারের সঙ্গে শীল ও সদাচারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে আমি আগেই ব্রাহ্মণ বলে জানিয়েছি।'

সর্প বলল—'যুধিষ্ঠির ! জ্ঞাতব্য সব কিছুই তুমি জান ; তুমি আমার প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছ, তা আমি ভালোভাবে শুনেছি। আমি আর এখন তোমার ভ্রাতা ভীমকে কীভাবে গলাধঃকরণ করব ?'

যুধিষ্ঠির এবং সর্পের প্রশ্নোত্তর, নহুষের সর্পজন্মের ইতিহাস, ভীমের রক্ষা পাওয়া এবং নহুষের স্বর্গগমন

সর্পের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যুধিষ্ঠির সর্পকে প্রশ্ন করলেন—'সর্পরাজ ! তুমি সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ ; বলো, কোন্ কর্ম আচরণের দ্বারা সর্বোত্তম গতি লাভ করা যায় ?'

সর্প বলল—'ভারত ! এই বিষয়ে আমার অভিমত হল সৎপাত্রে দান করলে, সত্য ও প্রিয় বাক্য বললে এবং অহিংসাধর্মে তৎপর থাকলে মানুষের উত্তম গতি লাভ হয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দান ও সত্যের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? অহিংসা ও প্রিয়ভাষণ—এর মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশি এবং কার কম?'

সর্প বলল—'রাজন্! দান, সত্য, অহিংসা এবং প্রিয়ভাষণ এগুলির গুরুত্ব বা লঘুত্ব কাজের মহত্ত্ব অনুসারে দেখা হয়। কোনো দানের দ্বারা সত্যের গুরুত্ব বেড়ে যায়, কোনো সত্য ভাষণ থেকে দান বড় হয়ে ওঠে। এইরূপই কোথাও প্রিয় বাক্য বলার চেয়ে অহিংসা অধিক গৌরবময় আবার কোথাও অহিংসার থেকে প্রিয়ভাষণের গুরুত্ব বেশি। এইরূপ এর গুরুত্ব-লঘুত্ব পরিস্থিতি অনুসারে হয়।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মৃত্যুকালে মানুষ তার দেহ পৃথিবীতেই ফেলে যায় তাহলে বিনা দেহে সে কী করে স্বর্গে যায় এবং কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল কী করে ভোগ করে?'

সর্প বলল—'রাজন্! নিজ নিজ কর্ম অনুসারে জীবের তিনপ্রকার গতি হয়—স্বর্গলোক প্রাপ্তি, মনুষ্য যোনিতে জন্ম এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে জন্ম।[১] এই তিন প্রকারেরই গতি হয়। এদের মধ্যে যে সব জীব মনুষ্য প্রজাতিতে জন্ম নেয়, সে যদি আলস্য ও প্রমাদ ত্যাগ করে অহিংসা পালন করে দানাদি শুভকর্ম করে, তাহলে পুণ্যের আধিক্যে তার স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। এর বিপরীত হলে মনুষ্য অথবা পশু-পক্ষী হয়ে জন্মাতে হয়। কিন্তু পশু-পক্ষী জন্মে কিছু বিশেষত্ব আছে; তা হল কাম- ক্রোধ-লোভ-হিংসায় রত থেকে যে জীব মানবত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়—মানুষ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তারই তির্যগ প্রজাতিতে জন্ম হয়। তারপর সৎকর্মের আচরণ করার জন্য মনুষ্য জন্মের ফলে তার তির্যগযোনি থেকে উদ্ধার লাভ হয়। তারপর জগতের ভোগে বীতরাগ হলে তার মুক্তি হয়।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'সর্প! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এর আধার কী, এগুলি যথার্থভাবে বর্ণনা করো। সব বিষয়কে তুমি একসঙ্গে কেন গ্রহণ করো না, এর রহস্যও বুঝিয়ে বলো।'

সর্প বলল—'রাজন্! যাকে লোক আত্মা বলে, তা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীররূপী আধার স্বীকার করায় বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তঃকরণে যুক্ত হয় এবং সেই আধারস্থ আত্মাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানাপ্রকার ভোগ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন—সেগুলিই এই ভোগসাধনের করণ। হে ধর্মরাজ! বিষয়াদির আধারভূত যে সব ইন্দ্রিয়, তাতে স্থিত মনের সাহায্যে এই জীবাত্মা বাহ্যবৃত্তি দ্বারা ক্রমশ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উপভোগ করে। বিষয়াদি উপভোগের সময় বুদ্ধির দ্বারা মন কোনো একটিই বিষয়ে সংযুক্ত হয়; তাই একসঙ্গে তার দ্বারা নানাবিষয় গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যাকে আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যুক্ত হলে 'ভোক্তা' বলে থাকি, সেটিই আত্মা বা অনাত্মার চিন্তায় ব্যাপৃত উত্তম-অধম বুদ্ধিকে রূপাদি বিষয়ের দিকে প্রেরণ করে। বুদ্ধির উত্তরকালেও বিদ্বান ব্যক্তিদের এক অনুভূতি হয়, যেখানে বুদ্ধির লয় ও উদয় স্পষ্ট জানা যায়। সেই জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ এবং সেটিই সবকিছুর আধার। রাজন্! এই হল ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে প্রকাশিত করার বিধি।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'হে সর্প! আমাকে মন ও বুদ্ধির সঠিক লক্ষণ বলো। অধ্যাত্মশাস্ত্রের জ্ঞানীদের এটি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

সর্প বলল—'বুদ্ধিকে আশ্রিত বলে বুঝতে হবে। তাই সে নিজের অধিষ্ঠানভূত আত্মার কামনা করতে থাকে; অন্যথায় আধার বিনা তার অস্তিত্ব নেই। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, মন তো আগেই উৎপন্ন হয়ে যায়। বুদ্ধি নিজে বাসনা সম্পন্ন নয়, মনকেই বাসনা সম্পন্ন বলে মনে করা হয়। মন ও বুদ্ধিতে এতটাই পার্থক্য। তুমিও এই বিষয়ে অবগত। এতে তোমার কী মত?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'হে বুদ্ধিমান! তোমার বুদ্ধি অতি উত্তম। যা কিছু জ্ঞাতব্য, তুমি সবই জান; তাহলে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ? তোমার এই দুর্গতি দেখে আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে। তুমি অনেক বড় বড় ভালো কাজ করেছ, স্বর্গবাস করেছ এবং সর্বজ্ঞ তো তুমি আছই, তাহলে কীসে মোহগ্রস্ত হয়ে তুমি ব্রাহ্মণদের অপমান করে বসলে?'

সর্প বলল—'রাজন্! এই ধন ও সম্পত্তি বড় বড় বুদ্ধিমান ও শূরবীর মানুষদেরও মোহগ্রস্ত করে। আমার মনে হয় সুখ ও বিলাসে জীবন-যাপনে রত সকল ব্যক্তিই মোহগ্রস্ত হয়। সেইজন্যই আমিও ঐশ্বর্যের মোহে মদোন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এই মোহের জন্য যখন আমার অধঃপতন হয়েছিল, তখন আমার চেতনা হল, সেজন্য আমিও তোমাকে সচেতন করছি। মহারাজ! আজ তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা

[১] এগুলিই ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি, মধ্যগতি এবং অধোগতি নামে প্রসিদ্ধ।

বলায় আমার সেই কষ্টদায়ক অভিশাপ নিবৃত্ত হয়েছে। এখন আমি তোমাকে আমার পতনের ইতিহাস বলছি।

পূর্বে আমি যখন স্বর্গের রাজা ছিলাম দিব্য বিমানে চড়ে আকাশে বিচরণ করতাম, তখন অহংকারবশত আমি কাউকে গ্রাহ্য করতাম না। ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগ আদি যারা ত্রিলোকে বাস করত, সকলেই আমাকে করপ্রদান করত। রাজন্! সেই সময় আমার দৃষ্টিতে এত শক্তি ছিল যে যার দিকে আমি তাকাতাম, তারই তেজ হরণ করতাম। আমার অন্যায় এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, এক হাজার ব্রহ্মর্ষি আমার পাল্কী বহন করতেন। এই অত্যাচারে আমি রাজ্যলক্ষ্মী থেকে ভ্রষ্ট হই। মুনিবর অগস্ত্য যখন পালকী বহন করছিলেন, আমি তাঁকে লাথি মারি। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—'ওরে ও মূর্খ, তুই নীচে পড়ে যা।' তিনি একথা বলতেই আমার রাজচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল, আমি সেই সুন্দর বিমান থেকে নীচে পড়ে গেলাম। তখন আমার মনে হল যে আমি সাপ হয়ে নীচের দিকে মুখ করে পড়ছি। আমি তখন অগস্ত্য মুনির কাছে প্রার্থনা জানালাম—'ভগবান! আমি ভুলবশত বিবেকশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য এই ভয়ংকর অপরাধ করে ফেলেছি, আপনি ক্ষমা করুন আর কৃপা করে এই শাপের অন্ত করে দিন।'

আমাকে নীচে পড়ে যেতে দেখে তাঁর হৃদয় দয়ার্দ্র হয়ে যায় এবং তিনি বললেন, 'রাজন্, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে এই শাপ থেকে মুক্ত করবেন। যখন তোমার এই অহংকার ও ঘোর পাপের ফল ক্ষীণ হয়ে যাবে, তখন তুমি আবার তোমার পুণ্যের ফল ফিরে পাবে।'

আমি তখন তাঁর তপস্যার মহাবল দেখে আশ্চর্য হলাম। মহারাজ! তোমার ভাই মহাবলী ভীমকে গ্রহণ করো। আমি একে আঘাত করিনি। তোমাদের কল্যাণ হোক, এবার আমাকে বিদায় দাও ; আমি পুনরায় স্বর্গলোকে যাব।'

এই বলে রাজা নহুষ অজগর দেহ ত্যাগ করে দিব্য দেহ ধারণ করে স্বর্গলোকে পুনরায় গমন করলেন। ধর্মাত্মা

যুধিষ্ঠির ও ভ্রাতা ভীম এবং ধৌম্য মুনিকে সঙ্গে করে আশ্রমে ফিরে এলেন। সেখানে ব্রাহ্মণদের যুধিষ্ঠির এই সব ঘটনা জানালেন।

কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডবরা যখন সরস্বতী নদীর তীরে বাস করছিলেন, সেই সময় সেখানে কার্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠান চলছিল। সেই অবকাশে পাণ্ডবগণ বড় বড় তপস্বীর সঙ্গে সরস্বতী তীর্থে পুণ্য কর্ম করলেন এবং কৃষ্ণ পক্ষ আরম্ভ হতেই তাঁরা ধৌম্য মুনিকে নিয়ে সারথি এবং সেবক সহ কাম্যক বনের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছলে মুনিরা তাঁদের স্বাগত জানালেন এবং তাঁরা দ্রৌপদীসহ সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

একদিন অর্জুনের প্রিয় মিত্র এক ব্রাহ্মণ খবর নিয়ে এলেন 'মহাবাহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই এখানে পদার্পণ করবেন। ভগবান জেনেছেন যে আপনারা এই বনে এসেছেন। তিনি সর্বদাই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎসুক হয়ে থাকেন এবং আপনাদের কল্যাণের কথা ভাবেন। আর একটি শুভ সংবাদ হল যে স্বাধ্যায় এবং তপস্যারত কল্পান্তজীবী মহাতপস্বী মহাত্মা মার্কণ্ডেয় শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।'

সেই ব্রাহ্মণ যখন এই সব কথা বলছেন তখনই দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে রথে করে

সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা রথ থেকে নেমে আনন্দিত চিত্তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং মহাবলী ভীমকে প্রণাম করে

পুরোহিত ধৌম্যের পূজা করলেন। তারপর নকুল ও সহদেব তাঁদের প্রণাম করলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করে দ্রৌপদীকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহধর্মিণী সত্যভামাও দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করলেন।

সেই সব শিষ্টাচার সমাপ্ত হলে পাণ্ডবরা দ্রৌপদী ও ধৌম্যমুনির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামাকে আন্তরিক আপ্যায়ন করলেন এবং তারপর সকলে একত্রে বসলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! রাজ্য প্রাপ্তির থেকেও ধর্মপালন শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়, ধর্মপ্রাপ্তির জন্যই শাস্ত্র তপস্যার উপদেশ দেয়। তুমি সত্যভাষণ এবং সরল ব্যবহারের দ্বারা ধর্মপালন করে ইহলোক ও পরলোকে বিজয় লাভ করেছ। কোনো কামনার জন্য নয়, তুমি নিষ্কামভাবে শুভকর্মের আচরণ করে থাক। কোনো কিছুর লোভেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করো না। সেইজন্যই তোমাকে ধর্মরাজ বলা হয়। তোমার মধ্যে দান, সত্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা, ধৈর্য—সবই বিদ্যমান। রাজ্য, ধন ও ভোগাদি প্রাপ্ত হয়েও তুমি এই সদ্গুণে সদা অবিচল। সুতরাং তোমার সমস্ত ইচ্ছাই যে পূর্ণ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন—'যাজ্ঞসেনি ! তোমার পুত্র অত্যন্ত সুশীল, ধনুর্বেদ শিক্ষায় তার খুব অনুরাগ। সে তার মিত্রদের সঙ্গে থেকে সর্বদাই সৎ ব্যক্তিদের আচরণ অনুকরণ করে। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন যেমন অনিরুদ্ধ ও অভিমন্যুকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয়, তোমার পুত্রও তেমনই প্রতিবিন্ধ্য প্রমুখ পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে।'

দ্রৌপদীকে এইভাবে তাঁর পুত্রদের কুশল-সংবাদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আবার ধর্মরাজকে বললেন—'রাজন্‌ ! দশার্হ, কুকুর এবং অন্ধক বংশের বীররা সর্বদা তোমার নির্দেশ পালন করবে এবং তুমি যা বলবে, ওরা তাই করবে। তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলেই দশার্হ বংশীয় যোদ্ধা তোমার শত্রুসেনাদের সংহার করবে। তারপর তুমি শোকরহিত হয়ে নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করবে।'

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির যখন কথাবার্তা বলছিলেন, তখন হাজার বছর আয়ুসম্পন্ন তপোবৃদ্ধ মহাত্মা মার্কণ্ডেয় তাঁদের দর্শন দিলেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় অজর-অমর। তিনি রূপবান এবং উদারগুণসম্পন্ন ; অত্যন্ত বৃদ্ধ হলেও তাঁকে দেখতে পঁচিশ বছরের যুবকের মতো। তিনি পদার্পণ করলে ভগবান
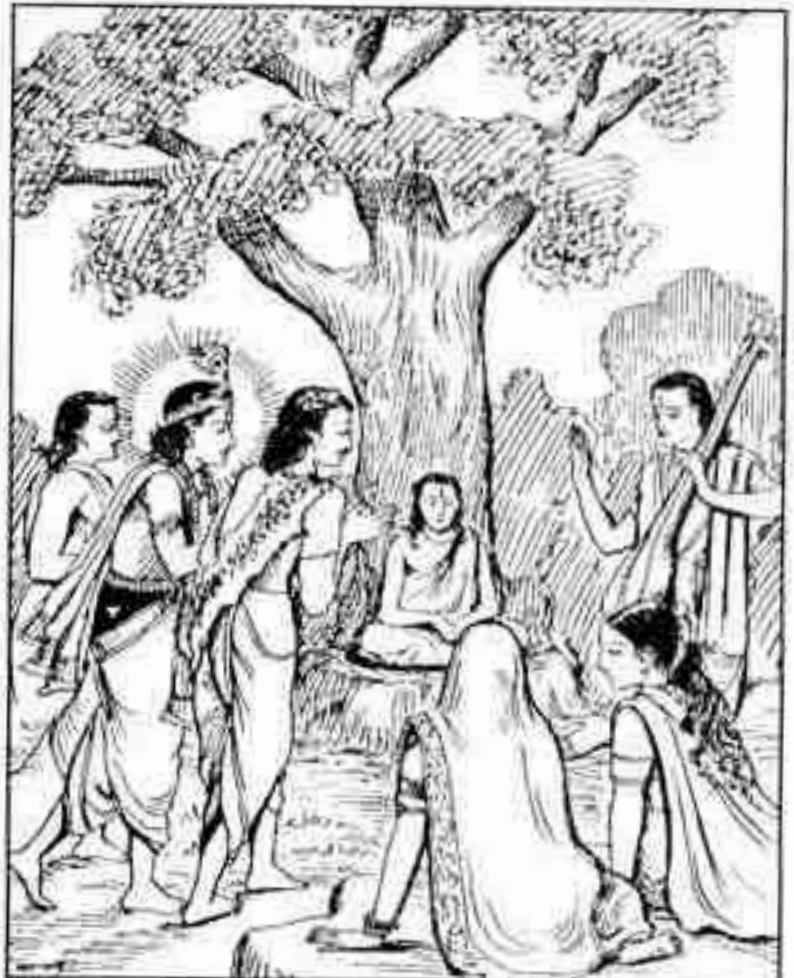
শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ এবং বনবাসী ব্রাহ্মণরা তাঁর পূজা করে তাঁকে সসম্মানে বসালেন। পাণ্ডবদের আতিথ্য স্বীকার করে মহর্ষি আসনে উপবেশন করলেন। সেইসময় দেবর্ষি নারদও সেখানে এসে পৌঁছলেন, পাণ্ডবরা তাঁকেও যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। তারপর যুধিষ্ঠির কথাপ্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রশ্ন করলেন—'হে মুনিবর ! আপনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, দেবতা-দৈত্য-ঋষি-মহাত্মা এবং রাজর্ষি-সবার চরিত্র আপনি জানেন। তাই আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। ধর্মপালন করেও যখন আমি নিজে সুখ থেকে বঞ্চিত হই আর দুরাচারে ব্যাপৃত দুর্যোধনাদিকে সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যশালী হতে দেখি তখন আমার মনে প্রায়শই প্রশ্ন আসে যে পুরুষ যেসব শুভ-অশুভ কর্মের আচরণ করে, তার ফল তারা কীভাবে ভোগ করে এবং ঈশ্বর কীভাবে কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন ? মানুষ কী কারণে সুখ বা দুঃখ পায় ?'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজন্ ! তুমি একেবারে বাস্তব প্রশ্ন করেছ। এখানে জ্ঞাতব্য যা কিছু আছে, সেসব তুমি জান ; লোকমর্যাদা রক্ষার জন্যই তুমি আমাকে এসব জিজ্ঞাসা করছ। সুতরাং মানুষ ইহলোক বা পরলোকে যেমন করে সুখ-দুঃখ ভোগ করে সেই বিষয়ে বলছি, মন দিয়ে শোন। সর্বপ্রথম প্রজাপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তিনি জীবদের জন্য নির্মল ও বিশুদ্ধ শরীর গঠন করেন, সেই সঙ্গে শুদ্ধ ধর্মজ্ঞান উৎপন্নকারী উত্তম শাস্ত্র রচনা করেন। সেইসময় সকলেই উত্তম ব্রত পালন করত, তাদের সংকল্প কখনো ব্যর্থ হত না। তারা সদাই সত্যভাষণ করত। সব মানুষই ব্রহ্মভূত, পুণ্যাত্মা এবং দীর্ঘায়ু হত। সকলেই স্বচ্ছন্দে আকাশে বিচরণ করে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত এবং পুনরায় নিজ ধামে ফিরে আসত। তারা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী মারা যেত অথবা জীবিত থাকত। তাদের কোনো বাধা বা দুঃখ ছিল না এবং কোনো ভয়ও ছিল না। তারা উপদ্রব রহিত, পূর্ণকাম, সর্বধর্ম প্রত্যক্ষকারী, জিতেন্দ্রিয় এবং রাগ দ্বেষরহিত ছিল।

'তারপর কালের গতিতে মানুষের আকাশে বিচরণ বন্ধ হয়ে গেল, তারা পৃথিবীতেই বিচরণ করতে লাগল, কাম-ক্রোধ তাদের ওপর অধিকার কায়েম করল। তারা ছল-কপটের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল এবং লোভ ও মোহের বশীভূত হল। তাই শরীরের ওপর তাদের আর কোনো অধিকার থাকল না। নানাপ্রকার জন্ম নিয়ে তারা জন্ম-মরণের ক্লেশ ভোগ করতে লাগল। তাদের কামনা, সংকল্প এবং জ্ঞান—সবই নিষ্ফল হয়ে গেল। স্মরণশক্তি ক্ষীণ হল। একে অপরের ওপর সন্দেহ করে একে অন্যকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। এইভাবে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে পাপীরা তাদের কর্ম অনুসারে আয়ু ক্ষীণ করে ফেলে। হে কুন্তীনন্দন ! ইহজগতে মৃত্যুর পর জীবের গতি তার কর্ম অনুসারেই হয়ে থাকে। যমরাজের নির্দিষ্ট পাপ-পুণ্যকর্মের ফল জীব দূর করতে সক্ষম নয়। কোনো প্রাণী ইহলোকে সুখ পায় পরলোকে দুঃখ, কেউ পরলোকে সুখ পায়, ইহলোকে দুঃখ। কাউকে দুই লোকেই দুঃখ পেতে হয়, কেউবা দুই লোকেই সুখ পায়। যার অনেক অর্থ আছে, সে নিজ দেহকে নানাভাবে সাজিয়ে নিত্য আনন্দ লাভ করে। নিজ দেহ-সুখে আসক্ত সেই সব মানুষেরা কেবল ইহলোকেই সুখ পায় না, পরলোকে সুখভোগ করে। যারা ধর্ম আচরণ করে এবং ধর্মপূর্বক ধন উপার্জন করে সময়মত বিবাহ করে, যাগ-যজ্ঞ দ্বারা সেই ধনের সদ্‌ব্যবহার করে, তাদের কাছে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সুখের স্থান। কিন্তু যেসব মূর্খ ব্যক্তি বিদ্যা, তপস্যা ও দান না করে বিষয়সুখে মত্ত থাকে তাদের জন্য ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখ নেই। রাজা যুধিষ্ঠির ! তোমরা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমী এবং সত্যবাদী। দেবতাদের কার্য সিদ্ধ করার জন্যই তোমাদের সব ভাইয়ের জন্ম। তোমরা তপস্যা এবং সদাচারে সর্বদাই তৎপর এবং শূরবীর। ইহ জগতে বড় বড় মহত্বপূর্ণ কাজ করে তোমরা দেবতা ও ঋষিদের সন্তুষ্ট করবে এবং অন্তকালে উত্তম লোকে গমন করবে। তোমাদের এই বর্তমানের কষ্টে তোমরা কোনোরূপ দুঃখ কোরো না। এই দুঃখ তোমাদের ভবিষ্যতে সুখের কারণ হবে।'

——o——

উত্তম ব্রাহ্মণদের মহত্ত্ব

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডুপুত্ররা তারপর মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে বললেন—'মুনিবর ! আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মহিমা শুনতে চাই, কৃপা করে তার বর্ণনা করুন।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়দের এক রাজকুমার, তাঁর নাম পরপুরঞ্জয়, যে অতি সুন্দর এবং বংশের মর্যাদাবৃদ্ধিকারী, একদিন বনে শিকারে গিয়েছিলেন। তৃণগুল্ম আচ্ছাদিত বনে বিচরণকালে রাজকুমার এক মুনিকে দেখতে পেলেন। যিনি কৃষ্ণ মৃগচর্ম পরিধান করে বসেছিলেন। তিনি তাঁকে কৃষ্ণ মৃগ মনে করে তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করলেন। মুনিকে হত্যা করেছেন জানতে পেরে রাজকুমার অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তিনি হৈহয়বংশের ক্ষত্রিয়দের কাছে গিয়ে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিলেন। খবর পেয়ে তাঁরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং মুনি কার পুত্র তার খোঁজ করতে কশ্যপ নন্দন অরিষ্টনেমির আশ্রমে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা অরিষ্টনেমিকে প্রণাম করলেন, মুনি তাঁদের মধুপর্ক দিয়ে অতিথি সৎকার করলেন। তাতে তাঁরা বললেন—'মুনিবর ! আমরা আমাদের দুষ্কর্মের জন্য আপনার আতিথ্য পাওয়ার যোগ্য নই। আমরা এক ব্রাহ্মণকে বধ করেছি।'

ব্রহ্মর্ষি অরিষ্টনেমি বললেন—'আপনাদের দ্বারা কীভাবে ব্রাহ্মণ বধ হয়েছে ? ওই মৃত ব্রাহ্মণ কোথায় ?' তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে ক্ষত্রিয়রা মুনিবধের সমস্ত সংবাদ জানালেন এবং তাঁকে সেখানে নিয়ে এলেন যেখানে মুনির মৃতদেহ পড়ে ছিল ; কিন্তু তাঁরা সেখানে সেই দেহ পেলেন না।

তখন মুনি অরিষ্টনেমি পুরপুরঞ্জয়কে বললেন—'পুরপুরঞ্জয় ! এদিকে দেখ, এই সেই ব্রাহ্মণ যাকে তোমরা হত্যা করেছিলে, এ আমারই পুত্র, তপোবল যুক্ত।' মুনিকুমারকে জীবিত দেখে তাঁরা সকলে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'এ তো বড় আশ্চর্যের কথা, এই মৃত মুনি এখানে কী করে এলেন। ইনি কী করে জীবন ফিরে পেলেন ? এ কী তপস্যার ফল, যাতে ইনি পুনর্জীবিত হলেন ? বিপ্রবর, আমরা এর রহস্য জানতে চাই।'
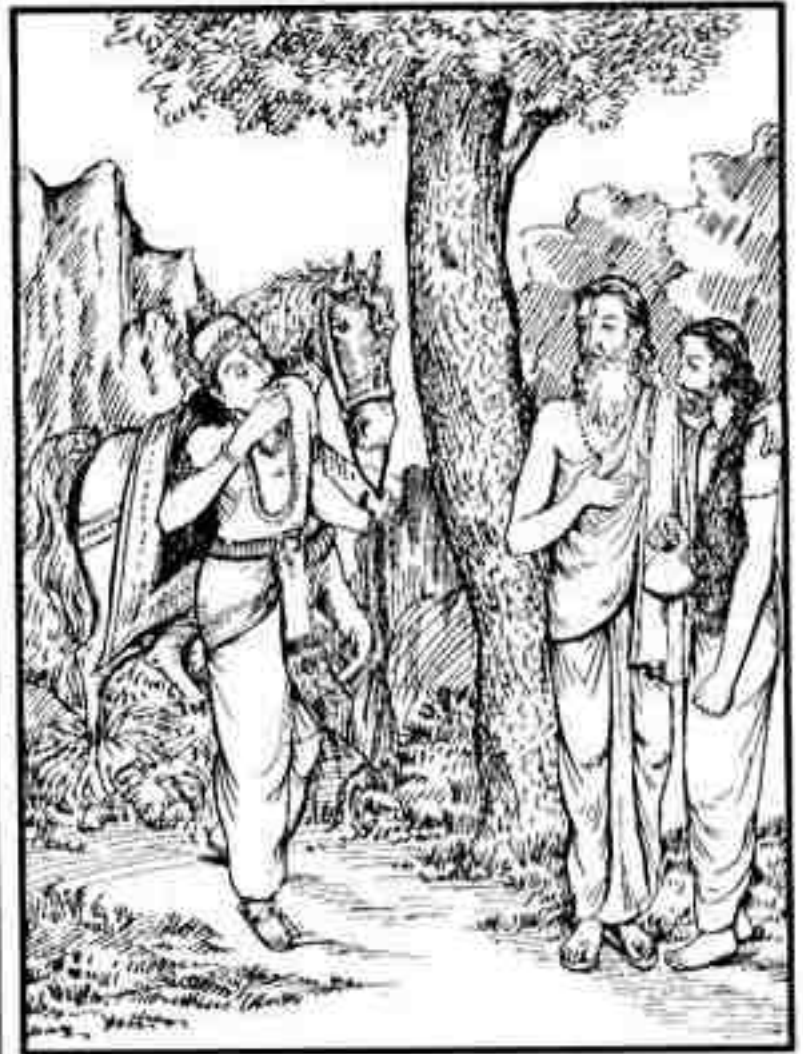
ব্রহ্মর্ষি তাঁদের বললেন—'রাজাগণ ! মৃত্যু আমাদের ওপর তার প্রভাব ফেলতে পারে না। তার কারণ আমি আপনাদের বলছি। আমরা সর্বদা সত্য কথা বলি এবং সর্বদা নিজ ধর্ম পালন করি। তাই আমাদের মৃত্যুভয় নেই। আমরা ব্রাহ্মণদের কুশলতা এবং তাঁদের শুভকর্মেরই চর্চা করি ; তাদের দোষ নিয়ে আলোচনা করি না। অতিথিদের আমরা অন্ন ও জলের দ্বারা তৃপ্ত করি ; আমরা যাদের পালন করি, তাদের পূর্ণ ভোজন করাই এবং যা উদ্বৃত্ত হয় পরে তাই গ্রহণ করি। আমরা সর্বদা শম, দম, ক্ষমা, তীর্থসেবন এবং দানে তৎপর থাকি ; পবিত্র স্থানে বাস করি। এইসব কারণেও আমাদের মৃত্যুভয় নেই। আমি আপনাদের সব সংক্ষেপে জানালাম। এবার আপনারা যেতে পারেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে আপনাদের আর কোনো ভয় নেই।'

তাই শুনে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়রা 'তাই হবে' বলে মহর্ষি অরিষ্টনেমিকে সম্মান ও পূজা করে প্রসন্ন মনে নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

—০—

তার্ক্ষ্য-সরস্বতী সংবাদ

মার্কণ্ডেয়মুনি বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! মুনিবর তার্ক্ষ্য একবার দেবী সরস্বতীকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে দেবী যা বলেছিলেন, তা তোমাকে বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোন।'

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞেস করলেন—'ভদ্রে ! এই জগতে মানুষের মঙ্গলকারী বস্তু কী ? কীরূপ আচরণ করলে মানুষ ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয় না ? দেবী ! তুমি তার বর্ণনা করো, আমি তোমার নির্দেশ পালন করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমার উপদেশ গ্রহণ করলে আমি ধর্মচ্যুত হব না।'

দেবী সরস্বতী বললেন—'যে ব্যক্তি অকর্তব্য পরিত্যাগ করে পবিত্র ভাবে নিত্য স্বাধ্যায়—প্রণবমন্ত্র জপ করে এবং অর্চি ইত্যাদি পথে প্রাপ্তব্য সগুণ ব্রহ্মকে জেনে যায়, সেই দেবলোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং দেবতাদের সঙ্গে তার মিত্রভাব হয়। দানকারী ব্যক্তিও উত্তমলোক প্রাপ্ত হয়। বস্ত্র-দানকারী চন্দ্রলোকে যায়, স্বর্ণ প্রদানকারী দেবতা হয়। যে ব্যক্তি উত্তম দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করে, সে গাভীর গাত্রে যত রোম আছে, ততবছর পুণ্যভোগ করে। যে ব্যক্তি বস্ত্র, দ্রব্য, দক্ষিণা সহ কপিলা গাভী প্রদান করে, সেই গাভী কামধেনুরূপে এসে তার সমস্ত মনোস্কামনা পূর্ণ করে। গোদানকারী ব্যক্তি তার অধঃস্তন সাতপুরুষকে নরক থেকে রক্ষা করে। কাম-ক্রোধ ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছন্ন পতিত ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ নরকে পতিত মানুষকে এই গোদান রক্ষা করে। ব্রাহ্ম বিবাহ রীতিতে কন্যাদানকারী, ব্রাহ্মণকে জমি দানকারী এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে অন্য বস্তু প্রদানকারী ব্যক্তি ইন্দ্রলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি সদাচারী হয়ে নিয়মপূর্বক সাত বছর ধরে প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করে, সে তার পুণ্যকর্মের দ্বারা উপরোক্ত সাতপুরুষ এবং অধঃস্তন সাত পুরুষকে উদ্ধার করে।'

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞেস করলেন—'দেবী ! অগ্নিহোত্রের প্রাচীন নিয়ম কী ?'

দেবী সরস্বতী বললেন—'অপবিত্র অবস্থায় এবং হাত-পা না ধুয়ে হোম করা উচিত নয়। যে বেদপাঠ এবং তার অর্থ জানে না, অর্থ জেনেও যে ব্যক্তি সেরূপ আচরণ করে না, সে অগ্নিহোত্রের অধিকারী নয়। দেবগণ জানতে ইচ্ছুক যে মানুষ কী মনোভাব নিয়ে হোম করছে। তাঁরা পবিত্রতা চান, তাই তাঁরা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পূজা গ্রহণ করেন না। যারা বেদ

জানে না সেই অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিদের দেবতাদের জন্য হবিষ্য প্রদানের কাজে নিয়োগ করা উচিত নয় ; কারণ তাদের করা যজ্ঞ ব্যর্থ হয়ে যায়। অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিদের বেদে অপরিচিত বলা হয়েছে। মানুষ যেমন অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া অন্ন গ্রহণ করে না, তেমনই অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি প্রদত্ত পূজা দেবতা গ্রহণ করেন না ; সুতরাং তার অগ্নিহোত্র করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি ধনাভিমান রহিত হয়ে সত্যব্রতপালন করে প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞের শেষে ভোজন করেন, তিনি পবিত্র সুগন্ধ ভরা পুণ্যলোকে গিয়ে পরম সত্য পরমাত্মাকে দর্শন করেন।'

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! আমার বিচারে তুমি পরমাত্মস্বরূপে প্রবেশকারী ক্ষেত্রজ্ঞভূতা প্রজ্ঞা (ব্রহ্মবিদ্যা) এবং কর্মফল প্রকাশকারী উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি কে, আমি তাই জানতে চাই।'

দেবী সরস্বতী বললেন—'আমি পরাপর বিদ্যারূপা সরস্বতী। তোমার সংশয় দূর করার জন্যই আমি আবির্ভূতা হয়েছি। আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে আমার স্থিতি ; যেখানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকে সেখানেই আমি প্রকটিত হই।

তুমি সমীপস্থ বলে আমি তোমাকে এইসব তাত্ত্বিক বিষয় যথাবৎ বর্ণনা করলাম।'

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! মুনিগণ যাকে পরম-কল্যাণ স্বরূপ বলে মনে করে ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ করেন এবং যে পরম মোক্ষস্বরূপে ধীর ব্যক্তিরা প্রবেশ করেন, সেই শোকরহিত পরম মোক্ষপদের বর্ণনা করো। কারণ যে পরম মোক্ষপদ সাংখ্যযোগী ও কর্মযোগী জানেন, সেই সনাতন মোক্ষতত্ত্ব আমি জানি না।'

দেবী সরস্বতী বললেন—'স্বাধ্যায়রূপ যোগে রত এবং তপকেই পরম ধনরূপে যে সকল যোগী মান্য করেন, তাঁরা ব্রত, পুণ্য ও যোগের দ্বারা যে পরমপদ লাভ করে শোকরহিত হয়ে মুক্ত হন, সেটিই হল পরাৎপর সনাতন ব্রহ্ম। বেদবেত্তাগণ সেই পরমপদ লাভ করেন। সেই পরমব্রহ্মে ব্রহ্মাণ্ডরূপী এক বিশাল বৃক্ষ আছে তা ভোগস্থানরূপী অনন্ত শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং শব্দাদি বিষয়রূপ পবিত্র সুগন্ধ-সম্পন্ন। সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষের মূল হল অবিদ্যা। অবিদ্যারূপী মূল থেকে ভোগবাসনাময়ী নিরন্তর প্রবহমানা অনন্ত নদী উৎপন্ন হয়। এই নদীগুলি উপর থেকে দেখলে রমণীয়, পবিত্র সুগন্ধ সম্পন্ন, মধুর ন্যায় মিষ্ট ও জলের ন্যায় তৃপ্তি প্রদানকারী বিষয়াদিতে বহমানা ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ফল দিতে অসমর্থ, বহু ছিদ্রসম্পন্ন, মাংসের ন্যায় অপবিত্র, শুকনো পাতার মতো সারশূন্য। ক্ষীরের ন্যায় রুচিকর মনে হলেও তা চিত্তে মলিনতা উৎপন্ন করে। বালি কণার ন্যায় পরস্পরে বিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষশাখাগুলিতে অবস্থানকারী। হে মুনি ! ইন্দ্র, অগ্নি ও পবনাদি দেবগণ মরুদ্‌গণের সঙ্গে যে ব্রহ্মকে লাভ করার জন্য যজ্ঞ দ্বারা যাকে পূজা করেন, তাই হল আমার পরমপদ।'

বৈবস্বত মনুর চরিত্র এবং মহামৎস্যের উপাখ্যান

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে অনুরোধ করলেন—'আপনি আমাদের বৈবস্বত মনুর চরিত্র বলুন।'

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—'রাজন্ ! বিবস্বান্ (সূর্য)-এর এক প্রতাপশালী পুত্র ছিলেন, যিনি প্রজাপতির ন্যায় কান্তিমান এবং একজন মহান ঋষি। বদরিকাশ্রমে গিয়ে তিনি দশ হাজার বছর ধরে একপায়ে দাঁড়িয়ে, দুই হাত তুলে তীব্র তপস্যা করেছিলেন। একদিন মনু গিরিণী নদীর তীরে যখন তপস্যা করছিলেন, তাঁর কাছে এক মৎস্য এসে বলল—'মহাত্মন্ ! আমি এক ক্ষুদ্র মৎস্য, এখানে আমি সর্বদা বৃহৎ মৎস্যদের ভয়ে থাকি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'

বৈবস্বত মনুর এই মৎস্যের কথায় দয়া হল। তিনি তাকে নিয়ে একটি মাটির কলসে রেখে দিলেন। তাঁর সেই মৎস্যের ওপর পুত্রভাব এসেছিল। মনুর যত্নে সেই মৎস্য কলসের মধ্যে হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল। কিছুদিনের মধ্যেই সে অনেক বড় হয়ে গেল, কলসে থাকা কঠিন হয়ে উঠল।

একদিন সে মনুকে দেখে বলল—'মহারাজ ! আপনি আমাকে এবার এর থেকে ভালো অন্য কোনো জায়গা দিন।' তখন মনু তাকে সেখান থেকে বার করে এক বৃহৎ পুষ্করিণীতে রেখে দিলেন। সেই পুষ্করিণী দুই যোজন লম্বা,

এক যোজন চওড়া। সেখানেও সেই মৎস্য বহু বছর ধরে বৃদ্ধি পেতে লাগল, সে এত বেড়ে গেল যে তার বিশাল

শরীর সেই পুষ্করিণীতেও ধরে না। একদিন সে আবার মনুকে বলল—'ভগবান ! এবার আপনি আমাকে সমুদ্রের রানি গঙ্গাজলে দিয়ে দিন, সেখানে আমি আরামে থাকব। অথবা আপনি যা ভালো বোঝেন, সেখানেই আমাকে পৌঁছে দিন।'

মৎস্যের কথায় মনু তাঁকে গঙ্গাজলে ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল সে সেখান থেকে আরও বেড়ে গেল। একদিন সে মনুকে দেখে বলল—'ভগবান ! এখন আমি এত বৃদ্ধি পেয়েছি যে গঙ্গাতেও নড়াচড়া করতে পারি না। আপনি দয়া করে আমাকে সমুদ্রে নিয়ে চলুন।' তখন মনু তাঁকে গঙ্গা থেকে তুলে সমুদ্রের জলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেন। সমুদ্রে ফেলার পর সেই মৎস্য হেসে মনুকে বলল—'তুমি আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করেছ। এখন পরিস্থিতি অনুসারে যা করণীয় তা মন দিয়ে বলছি, শোন। কিছুক্ষণ পরেই ভয়ানক প্রলয় উপস্থিত হবে। সমগ্র জগৎ নিমজ্জিত হবার উপক্রম হবে, সুতরাং একটি সুদৃঢ় নৌকা তৈরি কর এবং সেটিতে মজবুত দড়ি বাঁধ এবং সপ্তর্ষিদের নিয়ে তাতে আরোহণ কর। সর্বপ্রকার অন্ন এবং ঔষধির বীজ পৃথকভাবে সংগ্রহ করে সেগুলি নৌকায় সুরক্ষিত রাখো এবং নৌকায় বসে আমার প্রতীক্ষা করো। সময় মতো আমি শৃঙ্গযুক্ত মহামৎস্য-রূপে হাজির হব, তাতে তুমি আমাকে চিনে নিও। এখন আমি যাচ্ছি।'

সেই মৎস্যের কথা অনুযায়ী মনু সর্বপ্রকার বীজ নিয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন এবং উত্তাল তরঙ্গে সমুদ্রে দোল খেতে লাগলেন। তিনি সেই মহামৎস্যকে স্মরণ করলেন, তাঁকে চিন্তিত দেখে শৃঙ্গধারী মহামৎস্য নৌকার কাছে এলো। মনু তাঁর দড়ির ফাঁস মৎস্যের শৃঙ্গে বাঁধলেন। মৎস্য তখন অত্যন্ত বেগে নৌকাকে টানতে লাগল। নৌকার ওপরে সকলে বসেছিল, সমুদ্রে তখন বড় বড় ঢেউ উঠছিল এবং প্রলয়কালীন হাওয়ার বেগে নৌকা টল্‌মল করছিল। সেই সময় কোনো দিক্ বা স্থলভূমি দেখা যাচ্ছিল না। আকাশ ও পৃথিবী সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। শুধু মনু, সপ্তর্ষি আর মৎস্য—এদেরই দেখা যাচ্ছিল। এইভাবে সেই মৎস্য বহুবর্ষ ধরে সেই নৌকাকে সাবধানে টানতে লাগল।

তারপর সে নৌকাকে টেনে হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ার কাছে নিয়ে গেল এবং নৌকায় উপবিষ্ট ঋষিদের ডেকে

বলল—'হিমালয়ের শিখরে এই নৌকা বেঁধে দাও, দেরী করো না।' তাই শুনে ঋষিরা তাড়াতাড়ি সেই হিমালয়ের শিখরে নৌকা বেঁধে ফেললেন। আজও হিমালয়ের সেই শিখর 'নৌকাবন্ধন' নামে বিখ্যাত। তারপর মহামৎস্য তাঁদের মঙ্গলের জন্য বলল—'আমি ভগবান প্রজাপতি, আমার অতীত অন্য কোনো কিছুই নেই। আমি মৎস্যরূপ ধারণ করে তোমাদের এই মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছি। এখন মনুর কর্তব্য হল দেবতা, অসুর, মানুষ ও সমস্ত প্রজার, সব লোকের এবং সমস্ত চরাচর প্রাণীর সৃষ্টি করা। জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ইনি তপস্যাদ্বারা প্রাপ্ত হবেন এবং আমার কৃপায় প্রজাসৃষ্টির সময় মোহগ্রস্ত হবেন না।'

মহামৎস্য এই বলে অন্তর্ধান হয়ে গেল। তারপর যখন মনুর সৃষ্টির ইচ্ছা প্রবল হল তখন তিনি ভীষণ তপস্যা করে শক্তি লাভ করলেন এবং প্রজা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। সর্বপ্রথমে তিনি কল্পের সমান প্রজা উৎপন্ন করলেন। হে যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে সেই প্রাচীন মৎস্য উপাখ্যানের বর্ণনা করলাম।'

—o—

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং সহস্রযুগের অন্তে ভাবী প্রলয়ের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—মৎস্যোপাখ্যান শোনার পর যুধিষ্ঠির আবার মুনিবর মার্কণ্ডেয়কে বললেন—'হে মহামুনি ! আপনি হাজার হাজার যুগের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া অনেক মহাপ্রলয় দেখেছেন। এই জগতে আপনার মতো দীর্ঘায়ু ব্যক্তি আর কেউ নেই। ভগবান নারায়ণের পার্ষদদের মধ্যে আপনি বিখ্যাত, পরলোকে সর্বত্র আপনার মহিমা গীত হয়। আপনি ব্রহ্ম উপলব্ধির স্থানভূত হৃদয়কমল কর্ণিকাকে যোগকলায় উদ্‌ঘাটন করে বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে বিশ্বরচয়িতা ভগবানের অনেক বার সাক্ষাৎলাভ করেছেন। তাই প্রত্যেককে বধ করে যে মৃত্যু এবং সকলের শরীর ক্ষীণ করে যে বৃদ্ধাবস্থা তা আপনাকে স্পর্শ করে না। মহাপ্রলয়ের সময় যখন সূর্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ইত্যাদি কোনো কিছুরই কোনো চিহ্নের অবশেষ থাকে না, সমস্ত চরাচর জলমগ্ন হয়ে যায়, স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, অসুর, সর্প আদি ধ্বংস হয়ে যায়, সেই সময় পদ্মপত্রে শায়িত সর্বভূতেশ্বর ব্রহ্মার কাছে থেকে কেবলমাত্র আপনিই তাঁর উপাসনা করেন। বিপ্রবর ! সমস্ত পূর্বকালীন ইতিহাস আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, বহুবার অনুভবও করেছেন। সমস্ত জগতে এমন কোনো বস্তু নেই, যা আপনার অজ্ঞাত। সুতরাং আমি আপনার থেকে সমস্ত জগতের মূল কথা শুনতে চাই।'

মুনিবর মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজন্ ! আমি স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমাদের নিকটে উপবিষ্ট এই যে পীতাম্বরধারী জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই এই জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী, ইনিই সমস্ত ভূতের অন্তর্যামী এবং সেগুলির সৃষ্টিকর্তা। ইনি পরম পবিত্র, অচিন্ত্য এবং আশ্চর্যময় তত্ত্ব। ইনি সকলের কর্তা, এঁর কোনো কর্তা নেই। পুরুষার্থ প্রাপ্তিতেও ইনিই কারণ। অন্তর্যামীরূপে ইনি সকলকে জানেন, বেদও এঁকে জানে না। সমস্ত জগতের প্রলয় হওয়ার পরে এই আদিভূত পরমেশ্বর থেকেই সম্পূর্ণ আশ্চর্যময় জগত ইন্দ্রজালের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয়।

চার হাজার দিব্য বর্ষে এক সত্যযুগ হয়, চার শত বর্ষ তাঁর সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের হয়। এইরূপ মোট আটচল্লিশ শত দিব্য বর্ষ সময়কাল হল সত্যযুগের। তিন হাজার দিব্য বর্ষে ত্রেতাযুগ হয়ে থাকে, এবং তিন-তিনশত দিব্য বর্ষ তার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের হয়ে থাকে। এইভাবে এই যুগ ছত্রিশশত দিব্য বর্ষের হয়। দ্বাপরের দুহাজার দিব্য বর্ষ এবং দুই শত দিব্য বর্ষ তার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের। অতএব সব মিলিয়ে দ্বাপরের কাল হল চব্বিশশত দিব্য বর্ষ। এই ভাবে বারো হাজার দিব্য বর্ষে এক চতুর্যুগী হয়। এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। সমস্ত জগত ব্রহ্মার এক দিন পর্যন্ত অবস্থান করে, দিন সমাপ্ত হয়ে রাত্রির আগমনে এটি লোপ হয়। তাকেই বলা বিশ্বপ্রলয়।

সত্য যুগের সমাপ্তিতে যখন কিছুসময় অবশেষ থাকে, সেই সময় কলিযুগের অন্তিম ভাগে প্রায় সকল মানুষই মিথ্যাবাদি হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের কর্ম করে, শূদ্র বৈশ্যের ন্যায় ধন সংগ্রহে ব্যাপৃত হয় অথবা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করে। ব্রাহ্মণ যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দণ্ড, মৃগচর্ম ইত্যাদি পরিত্যাগ করে ভক্ষ্য-অভক্ষ্য বিচার ছেড়ে সব কিছু ভক্ষণ করতে আরম্ভ করে এবং জপ থেকে দূরে সরে যায় এবং শূদ্র গায়ত্রী জপ করতে থাকে।

মানুষের আচার-ব্যবহার যখন এইরূপ বিপরীত হয়ে যায় তখন প্রলয়ের পূর্বরূপ আরম্ভ হয়ে যায়। পৃথিবীতে ম্লেচ্ছদের রাজত্ব শুরু হয়। মহাপাপী এবং মিথ্যাবাদি, আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন এবং আভীর জাতির লোকরা রাজা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য বর্ণের কর্ম করতে থাকে। সকলেরই আয়ু, বল, বীর্য ও পরাক্রম কম হতে থাকে। মানুষ খর্বকায়, কদাকার হতে থাকে, তাদের বাক্যে সত্যের অংশ খুব কম থাকে। সেইসময় নারীরাও খর্বকায় ও বহুসন্তান উৎপন্নকারী হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে শীল ও সদাচার থাকে না। গ্রামে গ্রামে অন্ন বিক্রয় হয়, ব্রাহ্মণ ধর্মগ্রন্থ বিক্রয় করে, স্ত্রীলোকে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে, গাভীর দুগ্ধ কমতে থাকে, বৃক্ষাদিতে ফলফুল কম হয়। বৃক্ষাদিতে সুন্দর পাখির পরিবর্তে কাক-চিল বাসা বাঁধে।

ব্রাহ্মণরা লোভের বশবর্তী হয়ে পাপাচারী রাজাদের থেকেও দক্ষিণা গ্রহণ করে, মিথ্যা ধর্মভাব দেখায়, ভিক্ষার ছুতোয় চারদিকে চুরি করে বেড়ায়। গৃহস্থরা নানাপ্রকার করের বৃদ্ধির ফলে নিরুপায় হয়ে অন্যায়ভাবে ধন আহরণ করে। ব্রাহ্মণ মুনির ভেক ধারণ করে বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, মদ্যপান করে এবং পরস্ত্রীর সঙ্গে

ব্যভিচার করে। শরীরে যাতে রক্ত-মাংস বৃদ্ধি পায় সেরূপ দুর্বল কর্মই করে, দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা ব্রত বা তপস্যার কথা ভাবে না। এই সময় সময়মতো বৃষ্টি হয় না এবং বীজও ভালোমতো বপন করা যায় না। ক্রেতাকে ওজনে কম দিয়ে, সঠিক ওজনের দাম নেয়। ব্যবসায়ীরা কপটাচারী হয়। রাজন্ ! কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস করে গচ্ছিত বস্তু কারো কাছে রাখলে পাপী নির্লজ্জ ব্যক্তি সেই ধন আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে।

স্ত্রীলোকরা পতিকে ছলনা করে নীচলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করে। বীরপুরুষদের পত্নীরাও তাদের স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে যখন সহস্র যুগ পূর্ণ হয়ে আসে তখন বহুবছর ধরে বৃষ্টি বন্ধ হতে থাকে, তার ফলে দুর্বল প্রাণীরা ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে মারা যায়। তার পরে সূর্যের তাপ খুব বৃদ্ধি পায় ; সূর্য তখন নদী ও সমুদ্রের জলও শুষ্ক করে দেয়। সেইসময় তৃণ, কাষ্ঠ অথবা অন্য যে কোনো পদার্থ দেখা যায় সবই ভস্মের রূপ ধারণ করে। তারপরে সংবর্তক নামের প্রলয়কালীন অগ্নি বায়ুর সাহায্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবী ভেদ করে সেই অগ্নি রসাতল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তার ফলে দেবতা, দানব এবং যক্ষরা মহাভয় পান। সেই অগ্নি নাগলোককে ভস্ম করে পৃথিবীর নীচে যা কিছু থাকে, মুহূর্তের মধ্যে তা নষ্ট করে দেয়। তারপর এই অশুভ বায়ু এবং অগ্নি দেবতা-অসুর-গন্ধর্ব-যক্ষ-সর্প-রাক্ষস ইত্যাদি সহ সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করে ফেলে।

তারপর আকাশে মেঘের ঘনঘোর ঘটা দেখা যায়, ভীষণ গর্জন করে বিদ্যুৎ ঝলক দেয় এবং এমন বৃষ্টি শুরু হয় যে সেই ভয়ানক অগ্নিও নিভে যায়। বারো বছর ধরে সেই মেঘ বর্ষণ করে। তাতে সমুদ্র সীমা ছাড়ায়, পাথরে ফাটল ধরে এবং পৃথিবী জলমগ্ন হয়। তারপর হাওয়ার বেগে সেই মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হয়। তারপরে ব্রহ্মা সেই প্রচণ্ড পবনকে পান করে একার্ণবের জলে শয়ন করেন। সেইসময় দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস এবং চরাচরের সমস্ত প্রাণী নাশ হয়ে যায়। শুধুমাত্র আমিই সেই একার্ণবের তরঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই।'

—o—

মার্কণ্ডেয় মুনির বালমুকুন্দ দর্শন এবং তাঁর মহিমা বর্ণন

মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজা যুধিষ্ঠির ! কোনো এক সময়ের কথা, আমি যখন একার্ণবের জলে সতর্কতা সহকারে বহুক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে বহুদূর গিয়ে দেখলাম, বিশ্রাম নেওয়ারও কোনো স্থান নেই। তখন সেই জলরাশিতে আমি এক সুন্দর বিশাল বটবৃক্ষ দেখলাম। তার বিস্তৃত শাখায় এক নয়নাভিরাম শ্যামসুন্দর বালক উপবিষ্ট ছিল। পদ্মের মতো তার সুন্দর কোমল মুখ, বিশাল নেত্র। রাজন্, তাকে দেখে আমি খুব অবাক হলাম, ভাবতে লাগলাম সমস্ত পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে গেছে, তাহলে এই বালক কোথা থেকে এলো ? অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—আমি তিন কালই জানি। তা সত্ত্বেও আমি আমার তপোবলের সাহায্যে ভালোভাবে ধ্যান করেও সেই বালককে চিনতে পারলাম না। সেই বালক, যার গাত্রবর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় শ্যামসুন্দর এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস শোভায়মান, তখন আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে বললেন—'মার্কণ্ডেয় ! আমি জানি তুমি খুব পরিশ্রান্ত, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। সুতরাং হে মুনিবর, তোমাকে কৃপা করে আমি এই নিবাস দিচ্ছি।'

বালক এই কথা বলায় আমার দীর্ঘ জীবন এবং মনুষ্য শরীরের ওপর বড় খেদ জন্মাল। এর মধ্যে বালকটি মুখব্যাদান করল এবং দৈবযোগে অবশ হয়ে আমি তার মধ্যে প্রবেশ করে তার উদরে ঢুকে পড়লাম। সেখানে সমস্ত রাজ্য ও নগরে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী দেখতে পেলাম। আমি সেখানে গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, নর্মদা, কাবেরী ইত্যাদি নদীগুলি দেখলাম এবং রত্ন ও জলজন্তুপূর্ণ সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্রে শোভমান আকাশ ও পৃথিবীর নানা-বন-উপবনও দেখলাম। সেখানে আমি বর্ণাশ্রম-ধর্মও যথারীতি পালন হতে দেখেছি। ব্রাহ্মণরা যজন-যাজন করছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজা সকল বর্ণের প্রজাদের মনোরঞ্জন করছিলেন—সকলকে সুখী ও প্রসন্ন করছিলেন, বৈশ্যরা চাষ-বাস ও ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং শূদ্ররা তিনজাতির সেবায় ব্যাপৃত। তারপর সেই মহাত্মার উদরের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে এগিয়ে গেলে হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, শ্বেতগিরি, গন্ধমাদন, মন্দরাচল, নীলগিরি, মেরু, বিন্ধ্যাচল, মলয়, পারিয়াত্র ইত্যাদি যত পর্বত আছে, সব আমি দেখতে পেলাম। এদিক-ওদিক বিচরণকালে আমি ইন্দ্রাদি দেবতা, রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব, যক্ষ, ঋষি এবং দৈত্য-দানব

সমূহকে দেখলাম। কত আর বলব, এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখা যায়, সেই বালকের উদরে আমি সবই দেখতে পেলাম। আমি প্রত্যেকদিন ফলাহার করে ঘুরে বেড়াতাম। এইভাবে একশত বছর আমি বিচরণ করলাম, কিন্তু কখনো তাঁর শরীরের অন্ত দেখতে পেলাম না। শেষে আমি কায়মনোবাক্যে সেই বরদায়ক দিব্য বালকেরই শরণ গ্রহণ করি। তখন তিনি সহসা মুখ খোলেন আর আমি বায়ুর ন্যায় বেগে তাঁর মুখের বাইরে এসে পড়ি। দেখলাম, সেই অমিত তেজস্বী বালক আগের মতোই জগৎ চরাচরকে নিজ উদরে নিয়ে সেই বটবৃক্ষের শাখায় শায়িত আছেন। আমাকে দেখে মহাকান্তিসম্পন্ন পীতাম্বরধারী বালক প্রসন্ন হাস্যে আমাকে বললেন—'মার্কণ্ডেয় ! তুমি আমার শরীরে বিশ্রাম করেছ তো ? তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে ?'

সেই অতুলনীয় তেজস্বী বালকের অসীম প্রভাব দেখে আমি তাঁর রক্তবর্ণ পদতলে কোমল অঙ্গুলী সুশোভিত দুই সুন্দর চরণে মস্তক ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। তারপর বিনয়াবনত হয়ে কাছে গিয়ে সর্বভূতাত্মআত্মা কমলনয়ন ভগবানকে দর্শন করে তাঁকে বললাম, 'ভগবান ! আমি আপনার শরীরে প্রবেশ করে সমস্ত জগৎ চরাচর দর্শন করেছি। প্রভু, আপনি এই বিরাট বিশ্বকে উদরে ধারণ করে বালক বেশ ধরে কেন বিরাজ করছেন ? সমগ্র জগৎ আপনার উদরে অবস্থিত কেন ? কতদিন আপনি এইরূপে

এখানে থাকবেন ?'

আমার প্রার্থনা শুনে বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব পরমেশ্বর আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'বিপ্রবর ! দেবতারাও আমার স্বরূপ ঠিকমতো জানেন না ; তোমার প্রতি প্রেমে আমি তোমাকে জানাচ্ছি, কীভাবে আমি এই জগৎ সৃষ্টি করেছি। তুমি পিতৃভক্ত এবং মহান ব্রহ্মচর্য পালন করেছ, এতদ্‌ব্যতীত তুমি আমার শরণাগত। তাই তুমি আমার স্বরূপ দর্শন করেছ। পূর্বকালে আমি জলের নাম রেখেছিলাম 'নারা', সেই 'নারা' হল আমার 'অয়ন' বা বাসস্থান, তাই আমি 'নারায়ণ' নামে খ্যাত। আমি সকলের উৎপত্তির কারণ, সনাতন এবং অবিনাশী। সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহারকর্তা আমিই এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কুবের, শিব, সোম, প্রজাপতি কশ্যপ, ধাতা, বিধাতা এবং যজ্ঞও আমিই।

অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী চরণ, চন্দ্র ও সূর্য নেত্র, দ্যুলোক আমার মস্তক, আকাশ এবং দশদিক আমার কান। আমার ঘর্ম থেকে জল উৎপন্ন হয়েছে। বায়ু আমার মনে অবস্থিত। পূর্বকালে পৃথিবী যখন জলে মগ্ন হয়েছিল, আমিই বরাহরূপ ধারণ করে তাকে জল থেকে বার করে আনি। ব্রাহ্মণ আমার মুখ, ক্ষত্রিয় আমার দুই বাহু, বৈশ্য ঊরু এবং শূদ্র হল চরণ। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চার বেদ আমা হতে প্রকটিত হয় এবং আমাতেই লীন হয়ে যায়। শান্তির ইচ্ছায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমকারী যতি ও ব্রাহ্মণগণ সর্বদা আমারই ধ্যান ও উপাসনা করে থাকেন। আকাশের নক্ষত্রসমূহ আমার রোমকূপ। সমুদ্র এবং চতুর্দিক আমার বস্ত্র, শয্যা এবং নিবাসমন্দির।

মার্কণ্ডেয় ! সত্য, দান, তপ ও অহিংসা—ধর্মের এই আচরণ দ্বারা মানুষের কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। দ্বিজগণ সম্যকভাবে বেদাদির স্বাধ্যায় এবং নানাপ্রকার যজ্ঞ করে শান্ত চিত্ত এবং ক্রোধশূন্য হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। পাপী, লোভী, কৃপণ, অনার্য এবং অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনো আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের উত্থান হয়, তখনই আমি অবতার রূপ ধারণ করি। হিংসাকারী দৈত্য এবং উগ্র স্বভাব রাক্ষসকুল জগতে উৎপন্ন হয়ে যখন অত্যাচার করতে থাকে আর দেবতারাও তাদের বধ করতে সক্ষম হন না, তখন আমি পুণ্যবানদের গৃহে জন্ম নিয়ে অবতার হয়ে এসে সব অত্যাচারীদের সংহার করি। দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস ইত্যাদি প্রাণী এবং স্থাবর বিষয়াদিও আমি নিজ মায়াদ্বারা সৃষ্টি করি

এবং মায়াদ্বারাই সংহার করি। জগৎ-সৃষ্টির সময় আমি অচিন্ত্য স্বরূপ ধারণ করি এবং মর্যাদা স্থাপন ও রক্ষার জন্য মানব শরীরে অবতার গ্রহণ করি। সত্যযুগে আমার বর্ণ ছিল শ্বেত, ত্রেতায় হলুদ, দ্বাপরে লাল এবং কলিতে কৃষ্ণ। কলিতে ধর্মের এক ভাগ বাকী থাকে আর অধর্মের তিনভাগ। জগতের বিনাশকালে মহাকালরূপে আমি একাই স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত ত্রিলোককে ধ্বংস করে দিই।

আমি স্বয়ম্ভু, সর্বব্যাপক, অনন্ত, ইন্দ্রিয়াদির প্রভু এবং মহাপরাক্রমী। সমস্ত ভূতাদির সংহারকারী এবং সকলকে উদ্যোগশীলরূপে সৃষ্টিকারী নিরাকার যে কালচক্র, আমিই তার সঞ্চালক। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই আমার স্বরূপ। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই আমি অবস্থিত, কিন্তু কেউই আমাকে জানে না। আমি শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণকারী বিশ্বাত্মা নারায়ণ। সহস্র যুগের শেষে যে প্রলয় হয়, সেইসময়ে সমস্ত প্রাণীকে মোহিত করে আমি জলে শয়ন করি। যদিও আমি বালক নই, তা সত্ত্বেও যতক্ষণ ব্রহ্মা নিদ্রিত থাকেন, আমি বালকরূপ ধারণ করে থাকি। বিপ্রবর ! আমি তোমাকে আমার স্বরূপ সম্বন্ধে জানালাম, যা জানা দেবতা ও অসুরদের পক্ষেও অসম্ভব। যতক্ষণ ব্রহ্মা না জাগরিত হন, তুমি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্বক সুখে বিচরণ করো। ব্রহ্মা জাগরিত হলে আমি তাঁতে একীভূত হয়ে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এবং অন্যান্য চরাচর বিষয়ও সৃষ্টি করব।'

যুধিষ্ঠির ! এই বলে সেই পরম অদ্ভুত ভগবান বালমুকুন্দ অন্তর্হিত হলেন। আমি এইভাবে সহস্রযুগের শেষে সেই আশ্চর্যজনক প্রলয়লীলা প্রত্যক্ষ করি। সেই সময় যে পরমাত্মাকে আমি দর্শন করি, তিনি তোমারই আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর বরে আমার স্মরণশক্তি কখনো ক্ষীণ হয় না, দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়েছি এবং মৃত্যু আমার বশে থাকে। বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে পুরাণ পুরুষ পরমাত্মাই। তাঁর স্বরূপ অচিন্ত্য, তা সত্ত্বেও আমাদের সামনে লীলাময়রূপে প্রত্যক্ষ। ইনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও সংহারকারী সনাতন পুরুষ, এঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। এই গোবিন্দই প্রজাপতিদেরও পতি। এঁকে এখানে দেখে আমার সেই ঘটনার স্মৃতি মনে হল। পাণ্ডবগণ ! এই মাধবই সকলের পিতা-মাতা, তোমরা এঁর শরণ গ্রহণ করো, তিনিই সকলকে শরণ দেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—মার্কণ্ডেয় মুনির কথায় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। ভগবানও সস্নেহে তাঁদের আশীর্বাদ দিলেন।

—o—

কলিধর্ম এবং কল্কি-অবতার

যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়র কথা শুনে পুনরায় তাঁকে বললেন—'ভার্গব ! আপনার কাছ থেকে আমি উৎপত্তি এবং প্রলয়ের আশ্চর্যময় কাহিনী শুনলাম। এখন আমার কলিযুগের বিষয়ে জানতে কৌতূহল হচ্ছে। কলিতে যখন সমস্ত ধর্মের উচ্ছেদ হয়ে যাবে, তারপর কী হবে ? কলিযুগে মানুষের পরাক্রম কেমন হবে ? তাদের আহার বিহারের স্বরূপ কী হবে, লোকের আয়ু কেমন হবে, পোশাক-আশাক কেমন হবে ? কলিযুগ কোন সীমায় পৌঁছলে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে ? মুনিবর, এই সব বিস্তারিতভাবে বলুন ; আপনার বাচন-ভঙ্গী অত্যন্ত সুন্দর।'

যুধিষ্ঠির এই কথা বলায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের আবার বলতে আরম্ভ করলেন—'রাজন্ ! কলিকালে জগতের ভবিষ্যৎ কেমন হবে সেই বিষয়ে আমি যেমন শুনেছি ও অনুভব করেছি, তা তোমাদের বলছি ; মন দিয়ে শোন। সত্য যুগে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাতে ছল, কপট অথবা দম্ভ থাকে না। সেই সময় ধর্মরূপী গাভীর চারটি চরণই বিদ্যমান থাকে। ত্রেতাযুগে আংশিকভাবে অধর্ম এক পা নিয়ে নেয় ; তার ফলে ধর্মের এক পা ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন তিন পায়েই সে স্থিত হয়। দ্বাপরে ধর্ম অর্ধেক ক্ষয়ে যায় অর্থাৎ অর্ধেকে অধর্ম মিশে যায়। তারপর তমোময় কলিযুগ এলে তিন দিক থেকে এই জগতের ওপর অধর্মের আক্রমণ হয় এবং এক চতুর্থাংশে ধর্ম টিকে থাকে। সত্যযুগের পর যেমন যেমন অন্য যুগের আগমন হয় তেমনই মানুষের আয়ু, বল, বুদ্ধি, বীর্য এবং তেজ হ্রাস পেতে থাকে। যুধিষ্ঠির ! কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সব জাতির লোকই অন্তরে ছল কপটতা রেখে ধর্ম আচরণ করবে। মানুষ ধর্মের জাল ফেলে অন্যকে অধর্মে জড়াবে। নিজেকে পণ্ডিত ভেবে

লোকেরা সত্যের গলা টিপে ধরবে। সত্যের হানি হওয়ায় তাদের আয়ু হ্রাস পাবে। আয়ু হ্রাস হওয়ায় তারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। বিদ্যাহীন ব্যক্তি লোভের বশীভূত হবে। লোভ ও ক্রোধের বশীভূত হওয়ায় মূঢ় ব্যক্তি কামনায় আসক্ত হবে। তাতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে এবং একে অপরের প্রাণনাশের চেষ্টাও করতে থাকবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—নিজেদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করে বর্ণসংকর ঘটাবে। তখন জাতি বিভাগ করা কঠিন হয়ে পড়বে। তারা সকলেই তপস্যা ও সত্য পরিত্যাগ করে শূদ্রের সমান হয়ে যাবে।

কলিযুগের শেষে জগতের দশা এরকমই হবে। উত্তম বস্ত্র পরিত্যাগ করে লোকেরা নিকৃষ্ট মানের বস্ত্র পরিধান করবে, উত্তম খাবার ছেড়ে নিকৃষ্ট খাবার খাবে। সেই সময় পুরুষরা শুধু স্ত্রীলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। লোকে মাছ-মাংস খাবে, ভেড়া-ছাগলের দুধ খাবে, গোরু দেখতে পাওয়া যাবে না। লোকেরা পরস্পর মারামারি করবে, ঠকাবে। কেউই ভগবানের নাম করবে না, সকলেই নাস্তিক এবং চোর হয়ে উঠবে। পশুর অভাবে চাষ-বাস বন্ধ হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণরা ব্রত-নিয়ম পালন করবে না, বেদ, ধর্মগ্রন্থের নিন্দা করবে, শুকনো তর্কাতর্কিতে মেতে হোম-যজ্ঞ সব পরিত্যাগ করবে। গাভী এবং ছোট্ট বাছুরের কাঁধে জোয়াল রেখে লোকেরা জমি চাষ করবে। তারা 'অহং-ব্রহ্মাস্মি' বলে বাজে তর্ক করবে। কেউ এদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না। সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছ ব্যবহারে মেতে উঠবে ; সৎকর্ম ও যজ্ঞাদির কথা কেউ ভাববে না। জগৎ আনন্দ ও উৎসবহীন হয়ে উঠবে। লোকে দীন-দরিদ্র ও অসহায় বিধবার ধন অপহরণ করবে। ক্ষত্রিয়রা অহংকার ও অভিমানে মত্ত হবে, প্রজা রক্ষা না করে শুধু তাদের অর্থ আদায় করে নেবার জন্য ব্যস্ত থাকবে। রাজারা শুধু প্রজাদের দণ্ড দিতেই উৎসুক থাকবে। লোকে নির্দয় ভাবে সজ্জন ব্যক্তিদের আক্রমণ করে তার অর্থ ও স্ত্রীদের বলপূর্বক ভোগ করবে। নারীদের করুণ-ক্রন্দনেও তাদের দয়া আসবে না। কেউ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করবে না এবং কেউ কন্যাদানও করবে না। নারীপুরুষ কলিযুগে নিজেরাই স্বয়ংবর করবে। মূর্খ ও লোভী রাজন্যবর্গ বিভিন্ন উপায়ে অপরের ধন অপহরণ করবে। বাড়ির লোকেরাই অর্থ-সম্পদ চুরি করতে আরম্ভ করবে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বলে আর কিছু থাকবে না। সব এক হয়ে যাবে। ভক্ষ্য-অভক্ষ্য পরিত্যাগ করে সকলে একই প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করবে। নারী-পুরুষ সকলেই স্বেচ্ছাচারী হবে ; একে অন্যের কার্য পদ্ধতি সহ্য করতে পারবে না।

শ্রাদ্ধ-তর্পণ উঠে যাবে। কেউ কারো উপদেশ শুনবে না, কেউ কারো গুরুও হবে না। সকলে অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে থাকবে। মানুষের আয়ু সর্বাধিক ষোলো বছর হবে। পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকেই কন্যা গর্ভবতী হবে। পতি তাঁর স্ত্রীতে এবং স্ত্রী তাঁর পতিতে সন্তুষ্ট থাকবেন না, উভয়েই পরপুরুষ ও পরনারীতে আসক্ত হবেন।

ব্যবসায়ে ক্রয়-বিক্রয়কালে লোভবশত একে অপরকে ঠকাবে। সবাই স্বভাবত ক্রূর হবে। বৃক্ষ ও গাছপালা কেটে ফেলবে, তার জন্য কেউই দুঃখ বোধ করবে না। প্রত্যেকেই সন্দেহগ্রস্ত হবে। ব্রাহ্মণ হত্যা করে তার অর্থভোগ করবে, শূদ্রের দ্বারা পীড়িত হয়ে ব্রাহ্মণ হাহাকার করবে। অত্যাচারে বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণগণ নদীর তীরে অথবা পাহাড়ে আশ্রয় নেবে। দুষ্ট প্রকৃতির রাজার জন্য করভারে সাধারণ লোক পীড়িত থাকবে। শূদ্র ধর্মের উপদেশ দেবে এবং ব্রাহ্মণ তাদের সেবা করবে, তাদের উপদেশকে প্রামাণিক বলবে। সকল লোকের ব্যবহার কপটতায় পূর্ণ হবে। লোকেরা দেওয়ালে অঙ্কিত হাড়ের প্রতিকৃতির পূজা করবে। শূদ্র দ্বিজাতির সেবা করবে না। মহর্ষিদের আশ্রম, ব্রাহ্মণের ঘর, দেবস্থান, ধর্মসভা প্রভৃতিতে হাড়ের মতো অশুদ্ধ বস্তু ব্যবহৃত হবে। লোকে দেবমূর্তির পূজা করবে না, শূদ্র ব্রাহ্মণদের সেবা করবে না, কোথাও দেবমন্দির থাকবে না। এগুলি সবই যুগ অন্তের নিদর্শন যখন অধিকাংশ মানুষ ধর্মহীন, মাংসভোজী, মদ্যপায়ী হবে, তখনই যুগের অন্ত হবে। তখন অকালে বৃষ্টি হবে, শিষ্য গুরুর অপমান করবে, তাঁর অপকার করবে। আচার্য ধনহীন হবেন, শিষ্যের কাছে অসম্মান সহ্য করবেন। অর্থের মাধ্যমেই পরিবারের এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে।

যুগ অন্ত হলে সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সমস্ত দিক জ্বলে উঠবে। নক্ষত্র ও গ্রহাদির বিপরীত গতি হবে, প্রচণ্ড ঝড় হবে যাতে লোকে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে। মহাভয় উদ্রেককারী উল্কাপাত হবে। এক সূর্যের সঙ্গে আরও ছয়টি সূর্য উদিত হয়ে তাপপ্রদান করবে। ভয়ানক শব্দে বজ্রপাত হতে থাকবে। চারদিকে আগুন জ্বলে উঠবে।

অসময়ে বর্ষা হবে। চাষ করলেও অন্ন উৎপন্ন হবে না। উদয়-অস্তের সময় মনে হবে সূর্যকে রাহু গ্রাস করেছে। নারীরা কঠোর স্বভাবসম্পন্না, কটুভাষিণী হবে, পতির নির্দেশ পালন করবে না। পুত্র মাতা-পিতার হত্যাকারী হবে। পত্নীপুত্র একত্রিত হয়ে পতিকে বধ করবে। অমাবস্যা ব্যতীতই সূর্যগ্রহণ হবে। পথিকরা ক্লান্ত হলেও কোথাও খাদ্য-জল-আশ্রয় পাবে না। পশু-পক্ষী এই যুগ শেষের সময় কর্কশ ভাষায় ডাকবে। মানুষ, মিত্র, কুটুম্ব ও সম্বন্ধিদের পরিত্যাগ করবে। স্বদেশ পরিত্যাগ করে প্রবাসে আশ্রয় নেবে। যুগান্তে জগতের এই অবস্থা হবে এবং তখন এই পৃথিবীর সংহার হবে।

তারপরে কালান্তর হলে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে। ক্রমশ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ শক্তিশালী হবে। লোক অভ্যুদয়ের জন্য পুনরায় দৈবের আনুকূল্য লাভ করবে। সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি যখন একই রাশিতে পুষ্য নক্ষত্রে একত্রিত হবে, তখন সত্যযুগ শুরু হবে। সময়মত বর্ষা হবে, গ্রহ অনুকূল হবে, সকলের মঙ্গল হবে এবং আরোগ্য বিস্তার লাভ করবে।

সেইসময় কালের প্রেরণায় শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের গৃহে এক বালক জন্ম নেবে, তার নাম হবে কল্কী বিষ্ণুযশা। সেই বালক অত্যন্ত বলশালী, বুদ্ধিমান এবং পরাক্রমী হবে। মনে চিন্তা করলেই সে ইচ্ছানুসারে বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র, যোদ্ধা পেয়ে যাবে। সে ব্রাহ্মণ সেনা নিয়ে জগতের সর্বত্র ম্লেচ্ছদের বধ করবে। সেই সব দুষ্ট বধ করে সত্যযুগের প্রবর্তক হবে। ধর্মানুসারে বিজয়ী হয়ে সে রাজ-চক্রবর্তী হবে এবং সমস্ত জগৎকে আনন্দ প্রদান করবে।'

—o—

যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র ধর্ম উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা যুধিষ্ঠির তারপর পুনরায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মুনিবর ! প্রজাপালনের সময় আমার কোন্ ধর্ম পালন করা উচিত ? আমার আচার-আচরণ কেমন হবে, যাতে আমি স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়ে যাই ?'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজন্ ! তুমি সকল প্রাণীকে দয়া করবে, সকলের হিতসাধনে রত থাকবে। কারো গুণের মধ্যে দোষ দেখবে না, সর্বদা সত্যভাষণ করবে, সবার প্রতি বিনয়ী ও কোমল থাকবে। ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবে, প্রজারক্ষায় তৎপর থাকবে। ধর্ম আচরণ করবে, অধর্ম ত্যাগ করবে। দেবতা ও পিতৃপুরুষের পূজা করবে। যদি অসতর্কভাবে কারো মনে আঘাত দিয়ে দাও, তাকে ভালোমত দান দক্ষিণা দিয়ে মার্জনা চেয়ে সন্তুষ্ট করবে। আমি সকলের প্রভু, এই অহংকার কখনো মনে আসতে দেবে না, নিজেকে সর্বদা সেবক বলে ভাববে।

তাত যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে যে ধর্মের কথা জানালাম, ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা তা বর্তমানে পালন করে থাকেন এবং ভবিষ্যতেও এর পালন আবশ্যক। তুমি তো সবই জানো ; কারণ এই পৃথিবীতে ভূত-ভবিষ্যৎ এমন কিছুই নেই যা তোমার অজ্ঞাত। তুমি প্রসিদ্ধ কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছ ; আমি তোমাকে যা সব বললাম, তা তুমি কায়-মনো-বাক্যে পালন করবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দ্বিজবর ! আপনি যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমার অত্যন্ত মধুর ও প্রিয় বলে মনে হয়েছে। আমি সযত্নে তা পালন করব। প্রভো ! লোভ ও ভয় থেকে ধর্মত্যাগ হয়ে থাকে ; আমার মনে লোভ এবং ভয় কোনোটাই নেই। আমার কারো প্রতি হিংসা বা ঈর্ষাও নেই। তাই আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন, আমি তার সবই পালন করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণসহ সমস্ত পাণ্ডব এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত ঋষি-মহর্ষিগণ বুদ্ধিমান মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র মুখে ধর্মোপদেশ শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

—o—

ইন্দ্র ও বক মুনির উপাখ্যান

তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে নিবেদন করলেন—'মুনিবর ! শোনা যায় বক এবং দাল্‌ভ্য—এই দুই মহাত্মা চিরজীবি এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে এঁদের বন্ধুত্ব আছে। আমি বক এবং ইন্দ্রের সমাগমের বৃত্তান্ত শুনতে চাই। আপনি যথাসাধ্য তার বর্ণনা করুন।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'কোনো একসময় দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ইন্দ্র বিজয়ী হয়েছিলেন এবং তিনি ত্রিলোকের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে বর্ষা ঠিকমতো হওয়ায় শস্যের ফলন ভালো ছিল। প্রজাদের কোনো রোগ হত না, সকলেই নিজ ধর্মে স্থিত ছিল। সকলেই আনন্দে দিন অতিবাহিত করত।

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রজাদের দেখার জন্য ঐরাবতে করে বার হলেন। তিনি পূর্বদিকে সমুদ্রের নিকটে এক সুন্দর, সুখদায়ক বৃক্ষসংবলিত স্থানে আকাশ থেকে নীচে নামলেন। সেখানে এক অত্যন্ত সুন্দর আশ্রম ছিল, সেখানে বহু মৃগ ও পক্ষী দেখা যাচ্ছিল। সেই রমনীয় আশ্রমে ইন্দ্র বকমুনির দর্শন পেলেন। বকও দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখে

অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে বসার আসন দিয়ে পাদ্য-অর্ঘ, ফল-মূল দিয়ে তাঁর পূজা করে আতিথ্য সৎকার করলেন। তারপর ইন্দ্র বক মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মন্ ! আপনার বয়স এক লক্ষ বছর হয়েছে। আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলুন, বেশি দিন জীবিত থাকলে কী কী দুঃখ দেখতে হয় ?'

বক বললেন—'অপ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকতে হয়, প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তাদের দুঃখ সহ্য করে জীবন কাটাতে হয়, কখনো কখনো দুষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গ করতে হয়, চিরজীবি ব্যক্তিদের পক্ষে এর থেকে বড় দুঃখ আর কি হবে ? নিজের স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যু দেখতে হয়, ভাই-বন্ধু-মিত্রের বিয়োগ ব্যথা সহ্য করতে হয়। জীবন কাটাবার জন্য পরাধীন হয়ে থাকতে হয়, অনেকে অপমান করে, এর থেকে বেশি দুঃখ আর কি হতে পারে ?'

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! এবার বলুন, চিরজীবি মানুষ সুখী কিসে ?'

বক বললেন—'যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রমে উপার্জন করে নিজ ঘরে কেবল শাক-ভাতে সন্তুষ্ট, কারো অধীন নয়, সেই সুখী। অপরের কাছে দৈন্য না দেখিয়ে, নিজ গৃহে ফল-মূল ও শাক ভক্ষণ শ্রেয়, কিন্তু অন্যের গৃহে অপমান সহ্য করে প্রতিদিন উত্তম খাদ্য গ্রহণ করা ভালো নয়। সৎ ব্যক্তিদের একরূপই চিন্তা। যে অন্যের কাছে খাদ্য গ্রহণ করে সে কুকুরের মতো অপমানিত হয়। সেই দুরাত্মা ব্যক্তির ওইরূপ খাদ্যে ধিক্কার। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সর্বদা অতিথি, প্রাণীদের এবং পিতৃপুরুষকে অর্পণ করে শেষে অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করে। তার থেকে বেশি সুখ আর কি হতে পারে ? এই যজ্ঞ শেষ অন্ন থেকে পবিত্র এবং মধুর আর কোনো খাদ্য নেই। যে ব্যক্তি নিজে অতিথিদের তৃপ্ত করে স্বয়ং শেষে ভোজন করে, তার অন্নের যত গ্রাস অতিথি ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, তত হাজার গাভীদানের পুণ্য সেই দাতা প্রাপ্ত হন। তাঁর যুবাবস্থাতে করা সমস্ত পাপ, নষ্ট হয়ে যায়।'

দেবরাজ ইন্দ্র এবং বক মুনির মধ্যে এইভাবে বহুক্ষণ উত্তম আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। তারপর মুনির অনুমতি নিয়ে ইন্দ্র স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

——০——

ক্ষত্রিয় রাজাদের মহত্ত্ব—সুহোত্র, শিবি এবং যযাতির প্রশংসা

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর পাণ্ডবরা মার্কণ্ডেয় মুনিকে বললেন—'মুনিবর ! আপনি ব্রাহ্মণদের মহিমা শোনালেন, এবার ক্ষত্রিয়দের মহত্ত্ব শুনতে চাই।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'তাহলে শোনো ! আমি ক্ষত্রিয়দের মহত্ত্ব শোনাচ্ছি। কুরুবংশীয় রাজাদের মধ্যে সুহোত্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মহর্ষিদের কাছে সৎসঙ্গে গেলেন। ফেরবার সময় তিনি রাস্তায় উশীনর পুত্র রাজা শিবিকে রথে করে আসতে দেখলেন। কাছে এলে একে অপরকে অবস্থা অনুসারে সম্মান জানালেন ; কিন্তু গুণে তাঁরা দুজনেই সমান মনে করে কেউ কাউকে পথ ছাড়লেন না। এর মধ্যে দেবর্ষি নারদ সেখানে এলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কী ব্যাপার, তোমরা দুজনে একে অপরের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?' তাঁরা

বললেন—'পথ দেওয়া হয় যিনি বড়, তাঁকে। আমরা দুজনেই সমান, তাহলে কে কাকে পথ দেবে ?' সেই কথা শুনে নারদ তিনটি শ্লোক বললেন, তার সারাংশ হল—'কৌরব ! নিজের প্রতি কোমল ব্যবহারকারীর প্রতি ক্রূর ব্যক্তিও কোমল হয়ে ওঠে। ক্রূরতা দেখায় সে ক্রূরেরই প্রতি। কিন্তু সাধু ব্যক্তি দুষ্ট লোকের সঙ্গেও সাধু ব্যবহার করে ; তাহলে সে সজ্জনের সঙ্গে কেন সাধু ব্যবহার করবে না ? নিজের ওপর করা একটি উপকারের বদলে মানুষ তার শতগুণ ফিরিয়ে দিতে পারে। দেবতাদের মধ্যেও এই উপকারের মনোভাব থাকবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। উশীনর কুমার রাজা শিবির ব্যবহার তোমার থেকে ভালো। নীচ প্রকৃতির মানুষকে দান দিয়ে বশ কর, মিথ্যাকে সত্যভাষণ দিয়ে জয় কর, ক্রূরকে ক্ষমা দিয়ে, দুষ্টকে ভালব্যবহার দিয়ে নিজ বশে আনো। সুতরাং তোমরা দুজনেই উদার হও ; এবার তোমাদের মধ্যে যে বেশি উদার সে পথ ছেড়ে দাও।' এই বলে নারদ ঋষি মৌন হলেন। এই কথা শুনে কুরুবংশীয় রাজা সুহোত্র শিবিকে নিজের ডান দিকে করে তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে গেলেন। মহর্ষি নারদ এইভাবে রাজা শিবির মহত্ত্ব নিজ মুখে বললেন।

এবার অন্য এক ক্ষত্রিয় রাজার মহত্ত্ব শোনো—নহুষের পুত্র রাজা যযাতি যখন সিংহাসনে ছিলেন, সেইসময় এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য ভিক্ষা চাইতে তাঁর কাছে এসে বললেন—'রাজন্ ! আমি গুরুকে দক্ষিণা দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই ভিক্ষা চাইছি। জগতের অধিকাংশ মানুষ ভিক্ষুকদের দ্বেষ করে, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আমার অভিষ্ট বস্তু দিতে পারবেন ?'

রাজা বললেন—'আমি দান দিয়ে তার ব্যাখ্যা করি না, যে বস্তু দানের যোগ্য, তা দান করে আমি মুখ উজ্জ্বল করি। আমি তোমাকে এক সহস্র রক্তবর্ণ গাভী প্রদান করছি, কারণ ন্যায্যত প্রার্থনাকারী ব্রাহ্মণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। প্রার্থনাকারীর ওপর আমার ক্রোধ হয় না এবং কোনো কিছু দান করে আমি অনুতাপ করি না।'

এই বলে রাজা তাঁকে এক সহস্র গাভী দিলেন এবং ব্রাহ্মণ সেই দান স্বীকার করলেন।

রাজা শিবির চরিত্র

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—যুধিষ্ঠির ! দেবতারা কোনো এক সময়ে ঠিক করলেন যে, পৃথিবীতে গিয়ে তাঁরা উশীনরের পুত্র রাজা শিবির সাধুত্ব পরীক্ষা করবেন। অগ্নি তখন পায়রার রূপ ধারণ করলেন এবং ইন্দ্র বাজ পক্ষীর রূপ ধরে মাংস খাওয়ার জন্য পায়রার পিছনে পিছনে ধাওয়া করলেন। রাজা শিবি তাঁর দিব্য সিংহাসনে বসেছিলেন, পায়রা গিয়ে তাঁর কোলে পড়ল। রাজার পুরোহিত তাই

দেখে বললেন—'রাজন্ ! পায়রাটি বাজপাখীর ভয়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে আপনার শরণ গ্রহণ করেছে।'

পায়রাও বলল—'মহারাজ ! বাজ আমাকে তাড়া করেছে, তাতে ভয় পেয়ে আমি প্রাণরক্ষার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমি প্রকৃতপক্ষে পায়রা নই, ঋষি ; এক শরীর থেকে আমি অন্য শরীর পরিবর্তন করেছি। প্রাণরক্ষা করার জন্য এখন আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে ব্রহ্মচারী বলে জানবেন ; বেদের স্বাধ্যায় করে আমি শরীর দুর্বল করেছি, আমি তপস্বী এবং জিতেন্দ্রিয়। আচার্যের বিপক্ষে কখনো কোনো কথা বলি না। আমি সর্বতোভাবে নিষ্পাপ এবং নিরপরাধ, আমাকে বাজের কুক্ষিগত হতে দেবেন না।'

তখন বাজ বলল—'রাজন্ ! আপনি এই পায়রাটির জন্য আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাবেন না।'

রাজা বলতে লাগলেন—'এই বাজ ও পায়রা যেমন শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা বলছে ; কেউ কি তেমন কোনো পক্ষীর মুখে শুনেছে ? আমি কী করে এদের প্রকৃত স্বরূপ জেনে এদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারি ?

'যে ব্যক্তি তার শরণে আসা ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণীকে তার শত্রুর হাতে তুলে দেয়, তার দেশে সময়মত সুবৃষ্টি হয় না, তার বপন করা বীজে গাছ হয় না এবং সংকট সময়ে কেউ তাকে রক্ষা করে না। তার সন্তানের অকালমৃত্যু হয় এবং পিতৃপুরুষদের পিতৃলোকে স্থান হয় না। সে স্বর্গে গেলেও সেখান থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা তাকে বজ্র দ্বারা প্রহার করেন। অতএব প্রাণত্যাগ করলেও আমি শরণাগত এই পায়রাকে ত্যাগ করব না। বাজ ! তুমি বৃথা চেষ্টা কোরো না, এই পায়রাকে আমি কোনোমতেই দিতে পারব না। এই পায়রা ব্যতীত অন্য যা কিছু তোমার প্রিয়, আমাকে বল ; আমি তা পূর্ণ করব।'

বাজ বলল—'রাজন্ ! আপনার দক্ষিণ জঙ্ঘা থেকে এই পায়রার সম ওজনে মাংস কেটে মেপে আমাকে অর্পণ করুন, তাহলে এই পায়রাটির প্রাণরক্ষা হতে পারে।'

রাজা তখন তাঁর দক্ষিণ জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে তুলাদণ্ডে রাখলেন, কিন্তু তা পায়রার ওজনের সমান হল না। আরও মাংস কেটে দিলেন, তাতেও পায়রাই ভারী হল। এই ভাবে তিনি ক্রমশ তাঁর সর্বঅঙ্গের মাংস কেটে কেটে তুলাদণ্ডে চাপালেন, তবুও পায়রা ভারী হয়ে থাকল। তখন রাজা শিবি নিজেই তুলাদণ্ডে চাপলেন। এইসব করতে তাঁর মনে একটুও কষ্ট হয়নি। তাই দেখে বাজ বলে উঠল—'পায়রা রক্ষা পেয়ে গেছে !' বলে সে অন্তর্ধান করল।

রাজা শিবি তখন পায়রাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পায়রা ! ওই বাজপাখীটি কে ?' পায়রা বলল—'বাজপাখী সাক্ষাৎ ইন্দ্র আর আমি অগ্নি। রাজন্ ! আমরা দুজনে আপনার সততা পরীক্ষা করার জন্য এখানে

এসেছিলাম। আপনি আমার পরিবর্তে নিজের মাংস যে কেটে দিয়েছেন, আমি এখনই আপনার ক্ষতস্থান সারিয়ে দিচ্ছি। সেই স্থানের চামড়া সুন্দর হয়ে যাবে। আপনার জঙ্ঘার এই চিহ্নের ধার থেকে এক যশস্বী পুত্র জন্ম নেবে, যার নাম হবে কপোতরোমা।'

অগ্নিদেব এই কথা বলে চলে গেলেন। রাজা শিবির কাছে কেউ কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি তখনই সেটা দিয়ে দিতেন। একবার রাজার মন্ত্রীরা জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কী করে এরূপ সাহস করেন ? অদেয় বস্তুও দান করতে উদ্যত হন, আপনি কী যশলোভের জন্য এরূপ কাজ করেন ?'

রাজা বললেন—'না, আমি যশকামনায় বা ঐশ্বর্যের জন্য দান করি না, ভোগের অভিলাষেও নয়। ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা এই পথ অনুসরণ করেন, তাই আমারও এটিই কর্তব্য—এই মনে করে আমি সব কাজ করি। সৎ ব্যক্তিরা যে পথ দিয়ে চলেন, সেই পথই উত্তম পথ সেকথা ভেবেই আমি উত্তম পথের আশ্রয় গ্রহণ করি।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—মহারাজ শিবির এই মহত্ত্ব আমি জানি, আমি তাই তোমাদের কাছে সেটি যথাসাধ্য বর্ণনা করলাম।

—o—

দানের জন্য উত্তম পাত্রের বিচার এবং দানের মহিমা

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! মানুষ কোন অবস্থায় দান করলে ইন্দ্রলোকে গিয়ে সুখভোগ করে ? দান ইত্যাদি শুভকর্মের ভোগ সে কীভাবে প্রাপ্ত হয় ?'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—(১) যে ব্যক্তি অপুত্রক, (২) যে ব্যক্তি ধার্মিক জীবন যাপন করে না, (৩) যে অন্যের গৃহে সর্বদা ভোজন করে, (৪) যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যই খাদ্য প্রস্তুত করে, দেবতা বা অতিথিকে অর্পণ করে না—এই চারপ্রকার মানুষের জন্ম বৃথা। যে ব্যক্তি বাণপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম থেকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এসেছে, তার প্রদত্ত দান এবং অন্যায়ভাবে উপার্জন করা ধন দানও বৃথা হয়। এরূপ পতিত ব্যক্তি, চোর, ব্রাহ্মণ, মিথ্যাবাদী গুরু, পাপী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদ বিক্রয়কারী, শূদ্র দ্বারা যজ্ঞকারী, আচারহীন ব্রাহ্মণ, শূদ্রানীর পতি এবং নারীদের প্রদত্ত দানও ব্যর্থ হয়। এইসব দানের কোনো ফল হয় না। তাই সর্ব অবস্থায় সর্বপ্রকারের দান উত্তম ব্রাহ্মণদেরই দেওয়া উচিত।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে মুনিবর ! ব্রাহ্মণ কোন বিশেষ ধর্ম পালন করলে, তিনি নিজেও উদ্ধার হন আবার অন্যদেরও উদ্ধারে সমর্থ হন ?

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ব্রাহ্মণ জপ, মন্ত্র, পাঠ, হোম, স্বাধ্যায় এবং বেদ-অধ্যয়নের সাহায্যে বেদময়ী নৌকা নির্মাণ করেন, যার সাহায্যে তিনি অন্যদের সঙ্গে নিজেও উদ্ধার প্রাপ্ত হন। যিনি ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেন, তাঁর ওপর সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হন। শ্রাদ্ধাদিতে যত্ন করে উত্তম ব্রাহ্মণদেরই ভোজন করানো উচিত। যার দেহবর্ণ ঘৃণা উদ্রেক করে, যার নখ অপরিষ্কার, যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত, প্রতারক, পিতার জীবিতাবস্থায় মায়ের ব্যভিচারে জন্ম অথবা বিধবা মাতার গর্ভে জন্ম, যে ব্যক্তি পিঠে তীর ধনুক নিয়ে ক্ষত্রিয়বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে—এরূপ ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধকার্যে সযত্নে পরিহার করবে। কারণ তাদের ভোজন করালে শ্রাদ্ধ নিন্দিত হয়ে যায় এবং তা যজমানকে এমন ফলদান করে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু হে রাজন্ ! অন্ধ, বধির, বোবা ইত্যাদি যাদের শাস্ত্রে বর্জিত বলা হয়েছে, তাদের বেদপারঙ্গম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করতে পারো।

যুধিষ্ঠির ! আমি এবার তোমাকে জানাচ্ছি, কাদের দান করা উচিত। যে ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গম এবং দাতাকে বিপদে উদ্ধার করার শক্তি রাখে, এরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। অতিথিকে ভোজন করালে অত্যন্ত পুণ্য হয়। অতিথি ভোজন করালে অগ্নিদেব যত সন্তুষ্ট হন, তত সন্তুষ্ট তিনি হবিষ্য করলে বা ফুল-চন্দনে পূজা করলেও হন না। অতএব তোমার সর্বদা অতিথিকে ভোজন করানোর চেষ্টা থাকা উচিত। যে ব্যক্তি দূর থেকে আসা ব্যক্তিকে পা ধোওয়ার জল, রাত্রে আলো, খাবার অন্ন এবং থাকার স্থান দেয়, যমরাজ কখনো তার কাছে অসময়ে আসেন না। কপিলা গাভী দান করলে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণকে সুসজ্জিত গাভী দান করা উচিত। দান গ্রহিতা ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় হবে, নিত্য সন্ধ্যাহ্নিক করবে। দরিদ্রের

জন্য যাকে নিত্য স্ত্রী-পুত্রের অপমান সইতে হয় এবং যার থেকে কোনো উপকার পাওয়ার নেই এমন লোককেই গাভী দান করা উচিত, ধনীদের নয়। আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, একটি গাভী একজন ব্রাহ্মণকেই দেওয়া উচিত, বহুজনকে নয়। কারণ সকলে মিলে সেই গাভী বিক্রি করে দিলে দাতার পাপ হয়। যিনি চাষের যোগ্য বলশালী বলদ ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি দুঃখ ও ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করেন। যিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন, তিনি তাঁর বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ লাভ করেন। অন্নদান সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ। কোনো ক্লান্ত-দুর্বল, ধূলি ধূসরিত পথিক যদি এসে অন্ন পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তাকে যে ব্যক্তি খাদ্যের সন্ধান দেয়, সে-ও অন্নদানের পুণ্যলাভ করে। তাই যুধিষ্ঠির ! অন্য দানের চেয়ে অন্ন দানের প্রতি বিশেষ নজর দেবে। কারণ ইহজগতে অন্নদানের থেকে পুণ্য আর কোনো দানে নেই। যিনি নিজ শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণকে উত্তম অন্নদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হন। বেদে অন্নকে প্রজাপতি বলা হয়, প্রজাপতিকে সংবৎসর মানা হয়। সংবৎসর যজ্ঞরূপ এবং যজ্ঞে সকলের স্থিতি। যজ্ঞ থেকেই সমস্ত চরাচর প্রাণী উৎপন্ন হয়। অন্নই সর্বপদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি জলের জন্য পুষ্করিণী খনন করায় বা কুয়ো তৈরি করে বা অপরের থাকার জন্য ধর্মশালা তৈরি করে, অন্ন দান করে, মিষ্ট বাক্য বলে, তাকে যমের দ্বারস্থ হতে হয় না।

—o—

যমলোকের পথ এবং সেখানে ইহলোকে দানের ফল

বৈশম্পায়ন বললেন—যমরাজের নাম শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা অত্যন্ত কৌতূহলী হলেন, তাঁরা মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন—'মুনিবর ! আপনি বলুন মনুষ্যলোক থেকে যমলোক কতদূর, সেটি কেমন, কত বড়, কী করলে মানুষ তার থেকে রক্ষা পেতে পারে।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ধর্মাত্মা শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! তুমি অত্যন্ত গূঢ় প্রশ্ন করেছ, এ অত্যন্ত পবিত্র, ধর্মসম্মত এবং ঋষিদেরও অভিপ্রেত। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। মনুষ্যলোক এবং যমলোকের মধ্যে দূরত্ব হল ছিয়াশী হাজার যোজন। শূন্য আকাশ হল এর পথ, তা অত্যন্ত ভয়ানক এবং দুর্গম। সেই পথে কোনো বৃক্ষ ছায়া নেই, জল নেই, বিশ্রাম করার স্থান নেই। যমরাজের নির্দেশে তাঁর দূত এখানে আসে এবং মর্ত্যলোকের সকল জীবকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। যারা ইহলোকে ব্রাহ্মণদের ঘোড়া ইত্যাদি বাহন দান করে, তারা এই পথ বাহনের সাহায্যে অতিক্রম করে। ছত্রদানকারী ছত্রের সাহায্য লাভ করে, তাতে সে রৌদ্রে কষ্ট পায় না। অন্নদানকারী ক্ষুধায় কষ্ট পায় না, যে অন্নদান করে না সে ক্ষুধায় কাতর হয়। বস্ত্র দানকারী বস্ত্র পরিধানের সুযোগ পায়। ভূমিদানকারী সর্বকামনাতৃপ্ত হয়ে আনন্দে যাত্রা করে। গৃহদানকারী দিব্য বিমানে করে আরামে যাত্রা করে। জলদানকারী পিপাসায় কষ্ট পায় না। দীপদানকারী অন্ধকারে আলোর সাহায্য পায়। গোদানকারী সর্বপাপমুক্ত হয়ে সুখে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি মাসাধিককাল উপবাসব্রত পালন করে, সে হংসযুক্ত বিমানে যাত্রা করে। ছয়রাত উপবাসকারী ময়ূর বিমানে যায় এবং ত্রিরাত্রি উপবাসকারী অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয়। জলদানের প্রভাব অত্যন্ত অলৌকিক, প্রেতলোকে জল অত্যন্ত সুখপ্রদানকারী হয়। মারা গেলে যাদের জলদান করা হয়, সেই পুণ্যাত্মাদের জন্য যমলোকের পথে পুষ্পোদকা নামে নদী আছে, তারা সেই নদীর মধুর শীতল জল পান করে। পাপী জীবদের নিকট এই জলই দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজের মতো হয়ে যায়। এই নদী এইভাবে সকল কামনা পূর্ণ করে।

অতএব হে রাজন্ ! তোমারও এই ব্রাহ্মণদের বিধিমতো পূজা করা উচিত। যে অন্নদাতা সন্ধান করে ভোজনের আশায় গৃহে আসে, সেই অতিথির, ব্রাহ্মণের তুমি বিধিমতো সৎকার করো। এরূপ অতিথি বা ব্রাহ্মণ যার গৃহে যায়, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা তার সঙ্গে সেখানে যান। সেখানে অতিথি যদি সম্মান পান, তাহলে তাঁরাও প্রসন্ন হন আর যদি সম্মান না পান তাহলে দেবতারাও নিরাশ হয়ে ফিরে যান। অতএব হে রাজন্ ! তুমি অতিথির বিধিমতো সৎকার করতে থাক। এখন বলো, আর কী শুনতে চাও ?

—o—

দান, পবিত্রতা, তপ ও মোক্ষ-বিচার

যুধিষ্ঠির বললেন—মুনিবর, আপনি ধর্মজ্ঞ, তাই আপনার কাছ থেকে বারংবার ধর্মের কথা শুনতে ইচ্ছা করে।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! এখন আমি তোমাকে ধর্ম সম্পর্কে অন্য কথা জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানালে অগ্নি, আসন প্রদান করলে ইন্দ্র, পদ প্রক্ষালন করলে পিতৃপুরুষ এবং ভোজনের অন্ন দিলে ব্রহ্মা তৃপ্ত হন। সদ্যজাত বৎস সহ গাভী প্রদান করলে পৃথিবী দানের সমান পুণ্য হয়।

যে দ্বিজ মৌনভাবে ভোজন করেন তিনি নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম। যিনি মদ্যপান করেন না, জগতে যাঁর নিন্দা হয় না, যিনি বৈদিক সংহিতা সুললিতভাবে পাঠ করেন, তিনি অপরকেও উদ্ধার করতে সমর্থ হন। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণই হব্য (যজ্ঞ বলি), কব্য (পিতৃবলি) দানের উত্তম পাত্র। প্রজ্বলিত অগ্নিতে যেমন যজ্ঞ সফল হয়, তেমনই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দেওয়া দান সার্থক হয়ে থাকে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আমি সেই পবিত্রতার কথা জানতে চাই, যা পালন করলে ব্রাহ্মণ সর্বদা শুদ্ধ থাকে।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—পবিত্রতা তিন প্রকারের—বাক্য, কর্ম ও জলের। যে ব্যক্তি এই তিন পবিত্রতায় যুক্ত, সেই স্বর্গের অধিকারী, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ করেন, গায়ত্রীর কৃপায় তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। তিনি সম্পূর্ণ পৃথিবী দান গ্রহণ করলেও প্রতিগ্রহ দোষ তাঁকে স্পর্শ করে না। গায়ত্রী জপকারী ব্রাহ্মণের গ্রহ যদি বিপরীত হয়, তাহলেও তা শান্ত হয়ে তাঁকে সুখী করে এবং কেউই তাঁকে বিপদে ফেলতে পারে না। ব্রাহ্মণ সর্বাবস্থায় সম্মানের যোগ্য। তিনি বেদ পড়ে থাকুন বা না থাকুন, সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন হোন বা না হোন, তাঁকে অপমান করা উচিত নয়—ছাই চাপা আগুনে যেমন পা দেওয়া ঠিক নয়। যেখানে সদাচারী, জ্ঞানী এবং তপস্বী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করেন, সেই স্থানই নগর। গোশালা হোক অথবা জঙ্গল—যেখানে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকেন, সেই স্থানকে তীর্থ বলা হয়। পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বেদমন্ত্র অথবা ভগবৎ-নাম কীর্তন এবং সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা—বিদ্বান ব্যক্তিরা এইসব কার্যকে উত্তম বলে থাকেন। সজ্জন ব্যক্তি সৎসঙ্গে কথিত পবিত্র সুন্দর বাণীরূপ জলের সাহায্যেই নিজ আত্মাকে পবিত্র বলে মনে করেন। যিনি কায়মনোবাক্যে এবং বুদ্ধিতে কখনো পাপ করেন না, তিনিই মহাত্মা তপস্বী ; শুধু শরীর শুষ্ক করলেই তপস্বী হয় না। যে ব্যক্তি ব্রত-উপবাসের সাহায্যে মুনিবৃত্তিতে থাকে কিন্তু নিজ আত্মীয় পরিজনের ওপর একটুও দয়াভাব রাখে না, সে কখনো নিষ্পাপ হতে পারে না। তার এই নির্দয় ভাব সমস্ত তপস্যা নাশ করে দেয়, শুধু আহার-ত্যাগ করলেই তপস্যা হয় না। যিনি নিরন্তর গৃহে বাস করে পবিত্রভাবে থাকেন এবং সর্বপ্রাণীর ওপর দয়াভাব রাখেন, তাঁকেই মুনি বলে বুঝতে হবে ; তিনি সর্ব পাপ মুক্ত হয়ে যান।

রাজন্ ! শাস্ত্রে যার উল্লেখ নেই, এরূপ কর্ম মন থেকে কল্পনা করে লোকে শিলা ইত্যাদির ওপর আসন গ্রহণ করেন। তপস্যার নামে পাপ নষ্ট করার জন্য এইসব করা হয় ; কিন্তু এর দ্বারা শুধু শরীরকেই কষ্ট দেওয়া হয়, আর কিছু লাভ হয় না। যার হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভাবশূন্য, অগ্নিও তার পাপকর্ম ভস্ম করতে পারে না। দয়া এবং কায়মনো-বাক্যের শুদ্ধিতেই শুদ্ধ বৈরাগ্য এবং এতে মোক্ষলাভ হয় ; শুধু ফল খেয়ে ও হাওয়া খেয়ে থাকলে অথবা মস্তক মুণ্ডন করলে, জটা রাখলে, গৃহত্যাগ করলে, পঞ্চাগ্নি সেবন করলে, জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে, কিংবা মাটিতে বা খোলা আকাশের নীচে বাস করলেই মোক্ষলাভ হয় না। জ্ঞান অথবা নিষ্কাম কর্মদ্বারাই জরা-মৃত্যু ইত্যাদি জাগতিক ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ হয় এবং উত্তম-পদ প্রাপ্তি হয়। অগ্নিদগ্ধ বীজে যেমন বৃক্ষ হয় না, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সমস্ত অবিদ্যাজনিত ক্লেশ দগ্ধ হয়ে গেলে পুনরায় তাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

একটি বা অর্ধেক শ্লোকেই যদি হৃদদেশে বিরাজমান আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়, তাহলে মানুষের সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়। কোনো ব্যক্তি 'তৎ' এই দুই অক্ষর দ্বারাই আত্মাকে জেনে যায় আবার কিছু লোক মন্ত্রপদযুক্ত হাজার হাজার উপনিষদের বাক্য দ্বারা আত্মতত্ত্বকে বোঝে। যেমনই হোক, আত্মতত্ত্বের সুদৃঢ় বোধই মোক্ষ। যার হৃদয়ে সংশয়, আত্মার প্রতি অবিশ্বাস, তার লোকও নেই, পরলোকও নেই এবং সে কখনো সুখ পায় না। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এই কথাই বলেছেন, তাই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে নিশ্চয়াত্মক বোধই মোক্ষের স্বরূপ। যদি তুমি এক অবিনাশী এবং সর্বব্যাপক আত্মাকে যুক্তির

সাহায্যে জানতে চাও তাহলে কথা তর্ক ছেড়ে শ্রুতি এবং স্মৃতির আশ্রয় নাও। তাতে আত্মবোধকারী নানা উত্তম যুক্তি উপলব্ধ হবে। যে শুষ্ক তর্কের আশ্রয় নেয়, সাধন বৈপরীত্যের জন্য তার আত্মার সিদ্ধি হয় না। সুতরাং আত্মাকে বেদের সাহায্যেই জানা উচিত ; কারণ আত্মা বেদস্বরূপ, বেদই তার শরীর। বেদের দ্বারাই তত্ত্ববোধ হয়। আত্মাতেই বেদের উপসংহার বা লয় হয়। আত্মা নিজ উপলব্ধিতে স্বয়ংই সমর্থ নয়, সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারাই তার অনুভব হয়। সুতরাং মানুষের ইন্দ্রিয়াদির নির্মলতার সাহায্যে বিষয় ভোগাদি ত্যাগ করা উচিত। ইন্দ্রিয় নিরোধের দ্বারা যে অনশন, তা দিব্য হয়। তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, দানের সাহায্যে ভোগপ্রাপ্তি হয়, তীর্থস্নান করলে পাপ নষ্ট হয় ; মোক্ষলাভ হয় জ্ঞানের দ্বারা—একপ উপলব্ধি থাকা উচিত।

ধুন্ধুমারের কথা—উত্তঙ্ক মুনির তপস্যা এবং তাঁকে বিষ্ণুর বরদান

মহারাজ যুধিষ্ঠির তারপর মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আমরা শুনেছি যে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা কুবলাশ্ব অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। পরে তিনি 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর এই নাম পরিবর্তনের কারণ কী ? আমরা তা ঠিকমতো জানতে চাই।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজা ধুন্ধুমারের ধার্মিক উপাখ্যান আমি শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শোনো। বহু পূর্বে উত্তঙ্ক নামে এক প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন। মরুদেশের (মারবাড়ের) সুন্দর প্রদেশে তাঁর আশ্রম ছিল। মহর্ষি উত্তঙ্ক ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার জন্য বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ভগবান প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন। তাঁকে দর্শন করে মুনি পূর্ণকাম হয়ে বিনয়ের সঙ্গে স্তোত্রপাঠ করে ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন।

উত্তঙ্ক বললেন—ভগবান ! আপনার থেকেই দেবতা, অসুর এবং মানুষ উৎপন্ন হয়েছে। আপনিই এই চরাচরের প্রাণীদের জন্ম দিয়েছেন। বেদবেত্তা ব্রহ্মা, বেদ এবং জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়, সবই আপনার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। দেবাদিদেব ! আকাশ আপনার মস্তক, সূর্য ও চন্দ্র নেত্র, বায়ু নিঃশ্বাস এবং অগ্নি আপনার তেজ। সর্বদিক আপনার বাহু, মহাসাগর উদর, পর্বত উরু এবং অন্তরীক্ষ জঙ্ঘা। পৃথিবী আপনার চরণ এবং বৃক্ষাদি আপনার রোম। ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, বরুণ, দেবতা, অসুর, নাগ—এঁরা সকলেই নতমস্তকে নানা স্তুতি করেন এবং হাত জোড় করে আপনাকে প্রণাম করেন। ভুবনেশ্বর ! আপনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত আছেন। বড় বড় যোগী এবং মহর্ষিগণ আপনারই স্তুতি করে থাকেন।

উত্তঙ্কের স্তুতি শুনে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—উত্তঙ্ক, আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা করো।

উত্তঙ্ক বললেন—প্রভো ! সমস্ত জগৎসৃষ্টিকারী দিব্য সনাতন পুরুষ ভগবান নারায়ণের দর্শন আমি পেয়েছি, আমার কাছে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বর।

ভগবান বিষ্ণু বললেন—হে মুনি ! তুমি লোভে চঞ্চল নও, আমাতে তোমার অনন্য ভক্তি ; তাই আমি তোমার ওপর বিশেষ প্রসন্ন হয়েছি। আমার কাছ থেকে কোনো বর তোমার অবশ্যই নেওয়া উচিত।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ভগবান বিষ্ণু যখন এইভাবে বারংবার বললেন তখন উত্তঙ্ক হাতজোড় করে বর চাইলেন—হে কমলনয়ন ! আপনি যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং আমাকে বর দিতে চান তাহলে এমন কৃপা করুন যাতে আমার বুদ্ধি সর্বদা শম-দম, সত্যভাষণ এবং ধর্মেই ব্যাপৃত থাকে এবং আপনার

ভজনের অনুরাগ যেন আমার কখনো দূর না হয়।

ভগবান বললেন—মুনিবর ! তুমি যা চেয়েছ, তা সব পূর্ণ হবে। তাছাড়াও তোমার হৃদয়ে সেই যোগবিদ্যারও প্রকাশ হবে, যার দ্বারা তুমি দেবতা এবং এই ত্রিলোকের অনেক বড় কাজ সিদ্ধ করবে। ধুন্ধু নামের এক বিশাল অসুর ত্রিলোক বিনাশ করার জন্য ভীষণ তপস্যা করবে। সেই অসুর যার হাতে নিহত হবে, আমি তার নাম তোমাকে বলছি ; শোনো। ইক্ষ্বাকুবংশে এক বলবান এবং বিজয়ী রাজা হবে, তার নাম হবে বৃহদশ্ব। তার এক পুত্র 'কুবলাশ্ব' নামে প্রসিদ্ধ হবে। সে আমার যোগবলের সাহায্যে তোমার নির্দেশে ধুন্ধুকে বিনাশ করবে ; তখন সে এই জগতে 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত হবে।

মহর্ষি উত্তঙ্ককে এই কথা বলে ভগবান অন্তর্ধান করলেন।

—o—

উত্তঙ্ক মুনির রাজা বৃহদশ্বকে ধুন্ধু বধের জন্য অনুরোধ

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—সূর্য বংশের রাজা ইক্ষ্বাকু পরলোকবাসী হলে তাঁর পুত্র শশাদ রাজা হলেন। তাঁর রাজধানী ছিল অযোধ্যায়। শশাদের পুত্র ককুৎস্থ, ককুৎস্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর বিশ্বগশ্ব, তাঁর অদ্রি, অদ্রির যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র হলেন শ্রাব ; শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্ত যিনি শ্রাবস্তী নামের নগরী তৈরি করেছিলেন। শ্রাবস্তের পুত্রের নাম বৃহদশ্ব এবং বৃহদশ্বের পুত্র হলেন কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বও তাঁর পিতার থেকে অনেক বেশি গুণবান ছিলেন। তিনি রাজা হওয়ার উপযুক্ত হলে তাঁর পিতা তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করে স্বয়ং তপস্যা করতে বনে যেতে উদ্যত হলেন।
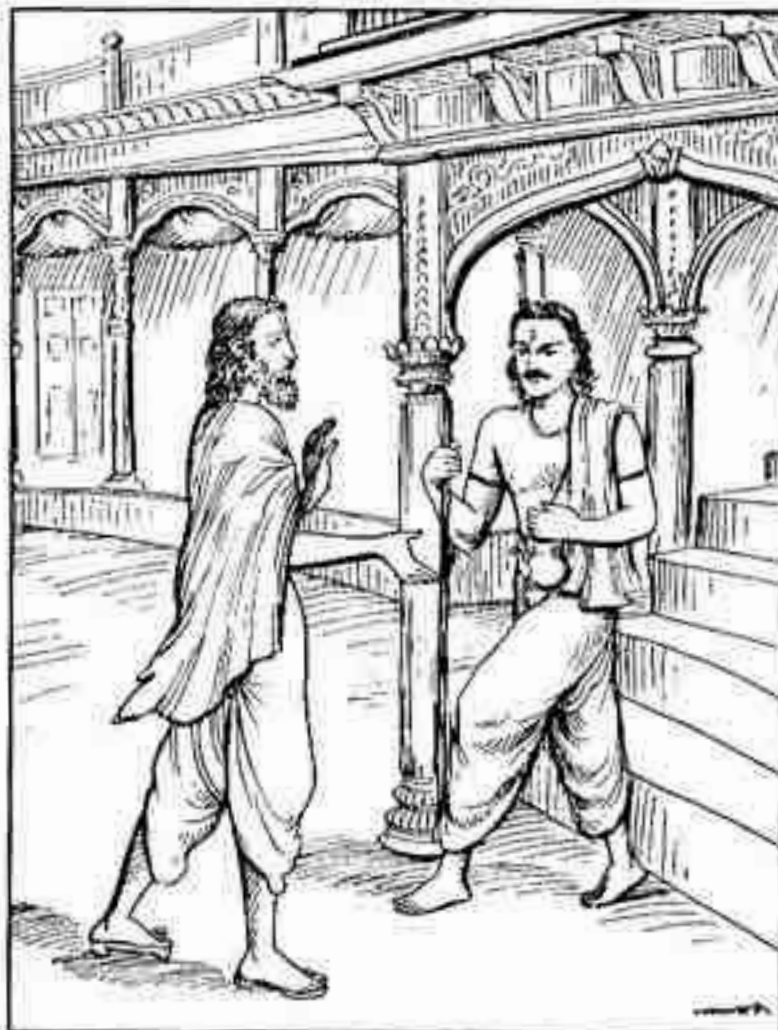
মহর্ষি উত্তঙ্ক যখন শুনলেন যে বৃহদশ্ব বনে যেতে উদ্যত তখন তিনি তাঁর রাজধানীতে এলেন এবং রাজাকে বাধা দিয়ে বলেন—রাজন্ ! আমরা আপনার প্রজা, আপনার কর্তব্য প্রজাদের রক্ষা করা। আপনি প্রথমে আপনার এই প্রধান কর্তব্য পালন করুন। আপনার কৃপাতেই সমস্ত প্রজা এবং পৃথিবীর উদ্বেগ দূর হবে। এখানে থেকে প্রজারক্ষা করায় যা পুণ্য, বনে গিয়ে তপস্যা করলে তেমন পুণ্য হয় না। সুতরাং আপনার এরকম চিন্তা করা উচিত নয়। আপনি না থাকলে আমরা নির্বিঘ্নে তপস্যা করতে পারব না। মরুদেশে আমার আশ্রমের কাছেই এক বালির সমুদ্র আছে, তার নাম উজ্জালক সাগর। সেটি লম্বা চওড়ায় কয়েক যোজন। সেখানে এক খুব বলবান দানব থাকে, তার নাম ধুন্ধু। সে মধুকৈটভের পুত্র। পৃথিবীর ভিতরে সে লুকিয়ে থাকে। সেই মহাক্রূর দৈত্য সারা বছরে বালির ভেতরে লুকিয়ে থেকে একবার মাত্র শ্বাস নেয়। যখন সে নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন পর্বত ও বনের সঙ্গে পৃথিবীও দুলতে থাকে। তার নিঃশ্বাসের ঝড়ে বালি এত দূরে ওঠে যে সূর্যও ঢেকে যায়, সাতদিন তার রেশ থাকে। মহারাজ ! এইসব উৎপাতের জন্য আশ্রমে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং হে রাজন্ ! মানুষের কল্যাণ করার জন্য আপনি ওই দৈত্যকে বধ করুন।

রাজা বৃহদশ্ব হাত জোড় করে বললেন—হে মুনিবর ! আপনি যে উদ্দেশে এখানে পদার্পণ করেছেন, তা নিষ্ফল হবে না। আমার পুত্র কুবলাশ্ব এই পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর, ধৈর্যশীল এবং ক্ষিপ্র। আপনার অভীষ্ট কার্য ও অবশ্যই পূর্ণ করবে। তার বীর পুত্ররাও যুদ্ধে তার সঙ্গী হবে। আপনি আমাকে অব্যাহতি দিন, কারণ আমি শস্ত্র-ত্যাগ করেছি, যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়েছি।

উত্তঙ্ক বললেন—'ঠিক আছে।' তখন রাজা বৃহদশ্ব উত্তঙ্ক মুনির নির্দেশ পেয়ে তাঁর অভীষ্ট কাজ পূরণ করার জন্য পুত্র কুবলাশ্বকে আদেশ দিলেন এবং নিজে তপোবনে চলে গেলেন।

—o—

ধুন্ধু বধ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! এরূপ মহাবলী দৈত্যের কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি। কে সেই দৈত্য ? তার সম্পর্কে কিছু বলুন।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—মহারাজ ! মধুকৈটভের পুত্র হল ধুন্ধু। একসময় সে এক পায়ে বহুদিন দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিল। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর চাইতে বলেন। তখন সে বলে আমি এই বর চাই যেন দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সর্প—এদের কারো হাতে আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা বললেন—ঠিক আছে, তাই হবে। তাঁর স্বীকৃতি পেয়ে ধুন্ধু তাঁকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে গেল।

তখন থেকে সে উত্তঙ্কমুনির আশ্রমের কাছে তার নিঃশ্বাসের আগুনে চতুর্দিক জ্বালিয়ে সেই বালিতে বাস করতে লাগল। রাজা বৃহদশ্বের বনগমনের পর তাঁর পুত্র কুবলাশ্ব উত্তঙ্কমুনির সঙ্গে সৈন্যসহ তাঁর আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। তাঁর পুত্রই ছিল একুশ হাজার। উত্তঙ্কের অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য রাজা কুবলাশ্বকে নিজের তেজ প্রদান করলেন। কুবলাশ্ব যেমনই যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন, আকাশে দৈববাণী শোনা গেল 'রাজা কুবলাশ্ব নিজে অবধ্য থেকে ধুন্ধুকে বধ করে ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হবেন।' দেবতারা তাঁর চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং দেবতাদের দুন্দুভি আপনিই বেজে উঠল, ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল, পৃথিবীর ধুলো শান্ত করার জন্য ইন্দ্র মৃদু বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

ভগবান বিষ্ণুর তেজে বলীয়ান রাজা শীঘ্রই সমুদ্রের তীরে পৌঁছলেন এবং পুত্রদের দিয়ে চতুর্দিকে বালি তুলতে লাগলেন। সাতদিন বালি তোলার পর মহাবলশালী ধুন্ধুকে দেখা গেল। বালির ভিতর তার বিকট শরীর লুক্কায়িত ছিল, প্রকটিত হয়ে সে নিজ তেজে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। ধুন্ধু প্রলয়কালের অগ্নির মতো পশ্চিম দিক ঘিরে শায়িত ছিল। কুবলাশ্বের পুত্ররা তাকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরে তীক্ষ্ণ বাণ, গদা, মুষল, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল। তাদের প্রহারে সেই বলশালী দৈত্য ক্রোধে জ্বলে উঠে তাদের অস্ত্রগুলি আত্মসাৎ করতে লাগল। তারপর সে মুখ দিয়ে সংবর্তক অগ্নির মতো আগুনের শিখা বার করে এক মুহূর্তেই সব রাজকুমারদের ভস্ম করে ফেলল, যেমন বহুকাল আগে মহাত্মা কপিল সগর পুত্রদের দগ্ধ করেছিলেন।

সমস্ত রাজকুমার ধুন্ধুর ক্রোধাগ্নিতে পুড়ে মারা গেলে সেই মহাকায় দৈত্য দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণের মতো সাবধানে জেগে রইল, তখন মহাতেজস্বী রাজা কুবলাশ্ব তার দিকে এগোলেন। তাঁর শরীর থেকে জলের বৃষ্টি হচ্ছিল, ফলে ধুন্ধুর মুখ নিঃসৃত আগুন নিভে গেল। এইভাবে রাজা কুবলাশ্ব যোগবলে সেই অগ্নি নির্বাপিত করলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে সমস্ত জগতের ভয় দূর করার জন্য সেই দৈত্যকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলেন। ধুন্ধুকে বধ করার জন্য তিনি 'ধুন্ধুমার' নামে প্রসিদ্ধ হলেন। এই যুদ্ধে কুবলাশ্বের মাত্র তিন পুত্র বেঁচে গিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব এবং চন্দ্রাশ্ব। এই তিনজন থেকেই ইক্ষ্বাকুবংশের পরম্পরা এগিয়ে চলে।

—o—

পতিব্রতা স্ত্রী এবং কৌশিক ব্রাহ্মণের কথা

ধুন্ধুমারের কাহিনী শোনার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে বললেন—মহর্ষিবর ! আমি এখন পতিব্রতা নারীদের সূক্ষ্ম ধর্ম এবং তাঁদের মাহাত্ম্যের কথা শুনতে চাই। মাতা পিতা আদি গুরুজনদের সেবাকারী বালক ও পাতিব্রত্য পালনকারী নারীরা—সকলের আদরণীয় হয়। নারীরা সদাচার পালন করে এবং পতিকে দেবতা মনে করে সম্মানভাবে তাঁর সেবা করে, তা কোনো সহজ কাজ নয়। সেইরূপ, মাতা পিতার সেবারও অনেক মহিমা। নারীরা অল্পবয়সে মাতা-পিতার এবং বিবাহের পরে পতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে সেবা করে, নারী ধর্ম অত্যন্ত কঠিন, এর থেকে কঠিন আর কোনো ধর্ম আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই মুনিবর ! আপনি আমাকে পাতিব্রত্য মাহাত্ম্যের কথা বলুন।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! সতী নারীরা পতির সেবা করে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় এবং মাতা পিতার সেবার দ্বারা তাঁদের প্রসন্নকারী পুত্রও ইহ জগতে সুযশ এবং সনাতনধর্মের বিস্তার করে অন্তকালে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে আমি পরে জানাব। প্রথমে পাতিব্রত্যের মহত্ত্ব এবং ধর্মের বর্ণনা করছি, মন দিয়ে শোনো।

অনেকদিন আগে কৌশিক নামে এক অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিল। সে বেদ, বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ অধ্যয়ন করেছিল। একদিন ব্রাহ্মণ একটি গাছের নীচে বসে বেদপাঠ করছিল, সেইসময় গাছের ওপর এক বক বসেছিল, সে ব্রাহ্মণের ওপর বিষ্ঠা ত্যাগ করল। ব্রাহ্মণ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে বকের অনিষ্ট চিন্তা করে তার দিকে তাকাল, বেচারী বক গাছ থেকে পড়ে মরে গেল। মৃত বককে দেখে ব্রাহ্মণের মনে দয়ার উদ্রেক হল, সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হল। দুঃখে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'ওঃ ! ক্রোধের বশীভূত হয়ে আজ আমি কী অন্যায় কাজ করে ফেললাম।'

বারবার এইভাবে দুঃখ প্রকাশ করে ব্রাহ্মণ গ্রামে গেল ভিক্ষা করতে। গ্রামে যারা শুদ্ধ ও পবিত্র আচার যুক্ত, তাদের কাছে ভিক্ষা করতে করতে এমন এক গৃহে গিয়ে পৌঁছাল, যেখানে সে আগেও ভিক্ষা করেছিল। দরজায় গিয়ে সে বলল—'কিছু ভিক্ষা দাও।' ভিতর থেকে এক নারী বলল—'দাঁড়াও বাবা !এখনই আনছি।' সেই নারী গৃহের
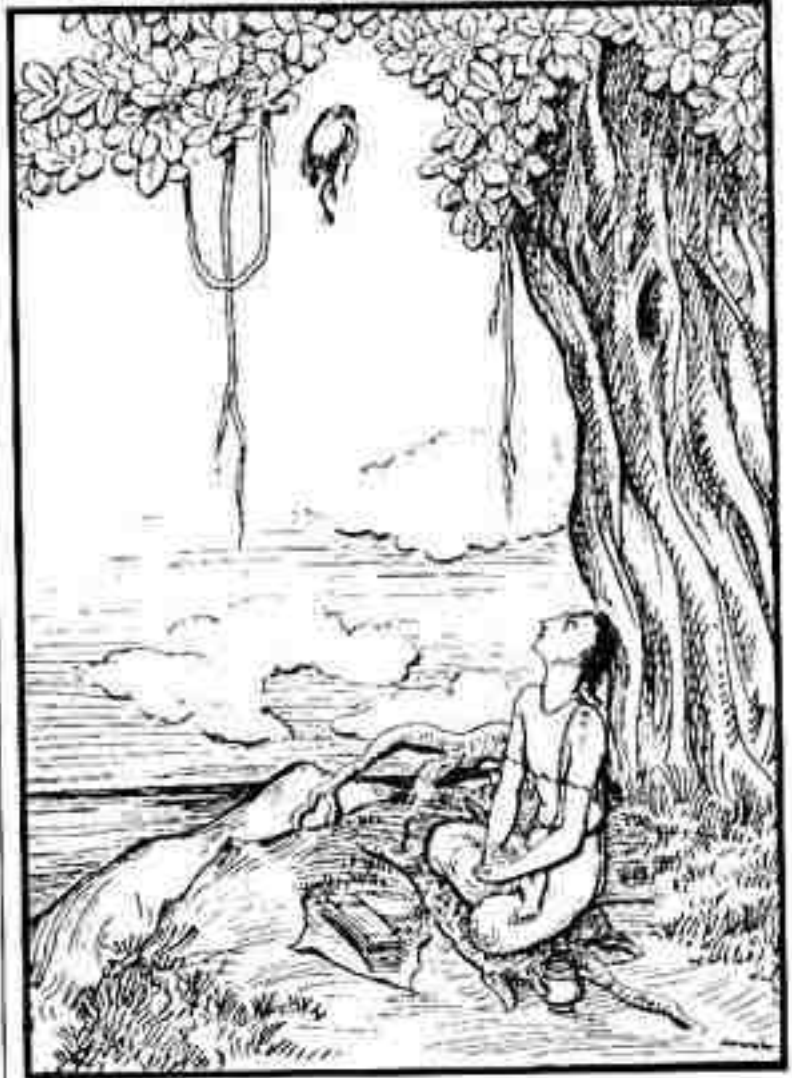
ময়লা বাসন পরিষ্কার করছিল। যেমনই তার বাসন ধোওয়া শেষ হল, তখনই তার স্বামী গৃহে ফিরে এলো, সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। স্বামীকে দেখে তার আর বাইরে অপেক্ষারত ব্রাহ্মণের কথা মনে রইল না, সে স্বামীর সেবায় ব্যস্ত হয়ে গেল। জল এনে স্বামীর হাত-পা ধুয়ে আসন এনে বসতে দিল। থালায় করে খাদ্যবস্তু সাজিয়ে এনে স্বামীকে খেতে দিল।

যুধিষ্ঠির ! সেই নারী প্রত্যহ স্বামীকে ভোজন করিয়ে তার উচ্ছিষ্টকে প্রসাদ মনে করে আনন্দে ভোজন করত, স্বামীকেই দেবতা বলে মনে করত এবং স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করত। কখনো মনে মনে অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করত না। নিজের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, ভাবনা, চিন্তা স্বামীর চরণে সঁপে দিয়ে সে অনন্যভাবে স্বামীর সেবাতেই ব্যাপৃত থাকত। তার জীবনের অঙ্গ ছিল সদাচার পালন, তার শরীর ও হৃদয় দুই-ই শুদ্ধ ছিল। সেই নারী গৃহকাজে কুশল ছিল, আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের মঙ্গল কামনা করত এবং স্বামীর মঙ্গলের দিকে সর্বদাই নজর রাখত। দেবতাদের পূজা, অতিথি সৎকার, সেবকদের ভরণ পোষণ

এবং শাশুড়ী শ্বশুরের সেবা—এইসব কাজে কখনো অসাবধান হয়নি। নিজ মন এবং ইন্দ্রিয়সম্পূর্ণ তার বশীভূত ছিল।

পতির সেবা করতে করতে সেই নারীর বাইরে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ল। পতির সেবার তাৎক্ষণিক কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে সংকোচের সঙ্গে ভিক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে গেল। ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখে সে বলল—'দেবী ! তোমার যখন এতই কাজ তখন 'দাঁড়াও বাবা' বলে আমাকে আটকালে

কেন ? আমাকে যেতে দিলে না কেন ?' ব্রাহ্মণের রাগ দেখে সেই সতী নারী অত্যন্ত শান্তস্বরে বলল—'পণ্ডিত বাবা ! ক্ষমা করো ; আমার সব থেকে বড় দেবতা আমার স্বামী, তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে ফিরেছেন, তাকে ফেলে কেমন করে আসব ? তাঁর সেবা কাজেই ব্যস্ত ছিলাম।'

ব্রাহ্মণ বলল—কী বলছ, ব্রাহ্মণ বড় নয় ! স্বামীই সব থেকে বড় ? গার্হস্থ্য-ধর্মে থেকেও তুমি ব্রাহ্মণদের অপমান করছ ? ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের কাছে মাথা নত করেন, মানুষের কথা আর কী বলব। তুমি কী ব্রাহ্মণদের জান না ? বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে কখনো শোননি ? আরে, ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, সে ইচ্ছা করলে এই পৃথিবীকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলতে পারে।

সতী নারী বলল—তপস্বী বাবা ! রাগ কোরো না, আমি সেই বক পাখি নই। লাল চোখ করে আমাকে দেখছ কেন ? রাগ করে তুমি আমার কী ক্ষতি করবে ? আমি ব্রাহ্মণদের অপমান করি না। তারা তো দেবতা তুল্য। আমি অপরাধ করেছি, তাই ক্ষমা চাইছি। ব্রাহ্মণের তেজের সঙ্গে আমি অপরিচিত নই, তাদের মহাসৌভাগ্যের কথা আমি জানি। ব্রাহ্মণের ক্রোধের ফলেই সমুদ্রের জল পানযোগ্য নেই। তিনি এক মহাতপস্বী এবং শুদ্ধান্তঃকরণ মুনিই ছিলেন, যার ক্রোধাগ্নিতে আজও দণ্ডকারণ্য জ্বলছে। ব্রাহ্মণদের প্রতারণা এবং হত্যার জন্য বাতাপি রাক্ষস অগস্ত্যের পেটে গিয়ে হজম হয়ে গিয়েছিল। মহাত্মা ব্রাহ্মণদের প্রভাব যে অনেক বড় তা আমার শোনা আছে। মহাত্মাদের ক্রোধ এবং আশীর্বাদ উভয়ই মহান। এখন আমার দ্বারা আপনার যে অসম্মান হয়েছে, তা ক্ষমা করুন। পতিসেবায় যে ধর্ম পালন হয়, তা-ই আমার বেশি পছন্দের। দেবতাদের মধ্যেও আমার স্বামীই আমার সব থেকে বড় দেবতা। আমার দ্বারা এই পাতিব্রত্যধর্মেরই সাধারণভাবে পালন করা হয়। এই ধর্ম পালনের যে ফল, তাও আপনি প্রত্যক্ষ করুন। আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে বকপাখিকে দগ্ধ করেছিলেন, সে কথা আমি জেনে গিয়েছিলাম। বাবা ! মানুষের মধ্যেই এক বড় শত্রু তার নিজের সঙ্গে শত্রুতা করে ; তার নাম ক্রোধ। যে ক্রোধ এবং মোহকে জয় করেছে, যে সর্বদা সত্যভাষণ করে, গুরুজনদের সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট রাখে, কেউ মারলেও তাকে মারে না, যে নিজ ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে পবিত্রভাবে ধর্ম ও স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকে, যে কাম জয় করেছে, দেবতাদের মতে সে-ই ব্রাহ্মণ। যে ধর্মজ্ঞ এবং মনস্বী পুরুষের সমস্ত জগতের প্রতি আত্মভাব থাকে এবং সকল ধর্মের ওপর অনুরাগ থাকে, যে যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ইত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করে নিজ শক্তি অনুসারে দানও করে থাকে, ব্রহ্মচর্যকালে যে সর্বদা বেদ অধ্যয়ন করে, যার নিত্য স্বাধ্যায়ে কখনো ভুল হয় না, দেবতারা তাকেই ব্রাহ্মণ বলে মানেন। ব্রাহ্মণদের পক্ষে যা কল্যাণকর ধর্ম, তাই তাদের সমক্ষে বর্ণনা করা উচিত। সেজন্য আমি অপলকে এত কথা বলছি। ব্রাহ্মণরা সত্যবাদী হয়, তাদের মন কখনো অসত্যে যায় না। স্বাধ্যায়, দম, আর্জব (সরলতা) ও সত্যভাষণ, ব্রাহ্মণদের এগুলিই

পরমধর্ম। যদিও ধর্মের স্বরূপ বোঝা কিছু কঠিন, তবুও তা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, ধর্মের বিষয়ে বেদই প্রমাণ, বেদ থেকেই ধর্মজ্ঞান হয়। তবুও ধর্মের স্বরূপ খুবই সূক্ষ্ম। বেদপাঠ করলেই যে তার প্রকৃত রূপ প্রকটিত হবে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। আমার তো মনে হয় যে আপনার এখনও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয়নি। ব্রাহ্মণদেব ! 'পরম ধর্ম কী ?' আপনি যদি তা জানতে চান তাহলে মিথিলাপুরীতে গিয়ে মাতা-পিতার ভক্ত, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনাকে ধর্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দেবে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন ; এখন আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। আমি যদি কোনো অন্যায় কথা বলে থাকি ক্ষমা করবেন, কারণ নারীদের সকলেই দয়া করে থাকেন।

ব্রাহ্মণ বলল—দেবী ! তোমার কল্যাণ হোক ; আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। আমার ক্রোধ দূরীভূত হয়েছে। তুমি আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছ, আমার কাছে তা সতর্ক বার্তা। এর দ্বারা আমার কল্যাণ হবে। তোমার মঙ্গল হোক ; আমি এখন মিথিলা যাব এবং নিজ কার্য সফল করব।

কৌশিক ব্রাহ্মণের মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধের নিকট উপদেশ গ্রহণ

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—সেই পতিব্রতা রমণীর কথা শুনে কৌশিক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হল। নিজের ক্রোধের কথা স্মরণ করে সে অপরাধীর মতো নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। তারপর ধর্মের সূক্ষ্ম গতির কথা চিন্তা করে সে মনে মনে ঠিক করল যে, তার এই সতীর কথায় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখা উচিত এবং অবশ্যই মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধর্ম সম্বন্ধীয় কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

এইসব চিন্তা করে সে কৌতূহলবশত মিথিলাপুরীর দিকে রওনা হল। পথে অনেক জঙ্গল, গ্রাম, নগর পার হতে হল। ক্রমশ সে রাজা জনকের সুরক্ষিত মিথিলাপুরীতে এসে পৌঁছাল। সেই নগর অত্যন্ত শোভাময় ছিল, ধার্মিক মানুষরা সেখানে বাস করত এবং নানাস্থানে যজ্ঞ এবং ধর্মসম্বন্ধীয় নানা অনুষ্ঠান হচ্ছিল।

কৌশিক নগরে পৌঁছে সবদিক ঘুরে ঘুরে ধর্মব্যাধের অনুসন্ধান করছিল। এক জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ব্রাহ্মণরা তাকে ঠিকানা জানিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে কৌশিক দেখল ধর্মব্যাধ কসাইখানায় মাংস বিক্রয় করছে। ব্রাহ্মণ গিয়ে একান্তে বসল। ব্যাধ জেনে গেছে যে কোনো এক ব্রাহ্মণ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাই সে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণের কাছে এসে বলল—ভগবান ! আপনার চরণে প্রণাম। আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমিই সেই ব্যাধ, যাকে খুঁজতে আপনি এত দূরে কষ্ট করে এসেছেন। আপনার মঙ্গল হোক, আদেশ করুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি। আমি জানি আপনি কেমন করে এখানে এসেছেন, সেই পতিব্রতা নারীই আপনাকে মিথিলাতে পাঠিয়েছেন।

ব্যাধের কথা শুনে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং ভাবতে লাগল এবার আর একটি আশ্চর্যজনক জিনিস দেখলাম। ব্যাধ বলল—এই স্থান আপনার উপযুক্ত নয় ; যদি কিছু মনে না করেন, চলুন আমরা দুজন গৃহে যাই।

ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হয়ে বলল—ঠিক আছে, তাই চলো। তারপর প্রথমে ব্রাহ্মণ এবং তারপর ব্যাধ চলল। গৃহে পৌঁছে ধর্মব্যাধ ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে বসার আসন দিল। তাতে বসে ব্রাহ্মণ ব্যাধকে বলল—'বাবা, মাংস বিক্রয়ের কাজ তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার এই ভীষণ কর্মে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ব্যাধ বলল—বিপ্রবর ! একাজ আমি নিজ ইচ্ছায় করিনি। এই ব্যবসা আমার বংশে পিতা-পিতামহের সময় থেকে চলে আসছে। আমি নিজে এমন কোনো কাজ করি না যা ধর্ম-বিরুদ্ধ। সাবধানতার সঙ্গে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা করি, সত্য কথা বলি, কারো নিন্দা করি না। যথাসাধ্য দান করি এবং দেবতা, অতিথি ও সেবকদের ভোজন করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি।

শূদ্রের কর্তব্য হল সেবা ; বৈশ্যের কর্ম চাষ-আবাদ করা, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য যুদ্ধ করা। ব্রাহ্মণের পালন যোগ্য কর্তব্য ও ধর্ম হল ব্রহ্মচর্যপালন, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং রাজার কর্তব্য হল সত্যভাষণ, নিজ নিজ ধর্ম ও কর্তব্যপালনরত প্রজাদের ধর্মপূর্বক পালন করা এবং যারা ধর্মচ্যুত হবে, তাদের পুনরায় ধর্মে স্থাপন করা। ব্রহ্মন্ ! রাজা জনকের এই রাজ্যে এমন কেউ নেই যে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করে। চার বর্ণের লোক নিজ নিজ ধর্ম পালন করে। রাজা জনক দুরাচারীদের, ধর্ম বিরুদ্ধাচরণকারীদের, নিজ পুত্র হলেও, কঠোর শাস্তি দেন। (সুতরাং আপনি এখানে কোনো মিথিলাবাসীর মধ্যে অধর্মের আশংকা করবেন না।)

আমি নিজে জীবহত্যা করি না। অন্যের বধ করা শূকর এবং মহিষের মাংস বিক্রয় করি। আমি নিজে কখনো মাংস ভক্ষণ করি না। শুধু ঋতুকালেই স্ত্রী-সংসর্গ করি। সর্বদাই দিনে উপবাস করি আর রাত্রে ভোজন করি। কিছু লোকে আমার প্রশংসা করে, কিছু লোক নিন্দা করে, কিন্তু আমি সকলকেই সদ্‌ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখি।

দ্বন্দ্বসহ্য করা, ধর্মে দৃঢ় থাকা, সকল প্রাণীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান করা—এইসব মানবোচিত গুণ ত্যাগ ব্যতীত আসে না। ব্যর্থ বিবাদ পরিত্যাগ করে অন্যের ভালো করা উচিত। কোনো কামনার বশবর্তী হয়ে বা দ্বেষবশত ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষোৎফুল্ল হওয়া উচিত নয়। নিজ মনের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো কাজ হলে দুঃখিত হবে না ; আর্থিক সংকট এলে ভয় পাবে না এবং কোনো অবস্থাতেই ধর্মত্যাগ করবে না। যদি ভ্রমক্রমে একবার ধর্ম বিপরীত কাজ হয়ে যায়, তা যেন দ্বিতীয়বার না হয়। যে কাজ অন্যের এবং নিজের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে হয়, সেই কাজ করা উচিত। বদ্ আচরণকারীর প্রতিও কখনো খারাপ ব্যবহার করবে না, নিজে সাধু ব্যবহার কখনো পরিত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি অন্যের খারাপ করতে চায়, সে পাপী নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে থাকা ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের কর্মকে অধর্ম বলে হাসি ঠাট্টা করে, সে ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাপী ব্যক্তি হাপরের মতো ফুলে ওঠে গর্ব করে। প্রকৃতপক্ষে তার পুরুষার্থ বলে কিছু থাকে না।

যে ব্যক্তি পাপকাজ করে ফেলে সত্যই অনুতপ্ত হয়, সে ওই পাপ থেকে মুক্তি পায় ; আর 'কখনো এমন কাজ করব না' বলে প্রতিজ্ঞা করে পাপ কর্ম থেকে বিরত হলে ভবিষ্যতেও পাপ থেকে রক্ষা পায়। লোভই পাপের মূল, লোভী ব্যক্তিরাই পাপ চিন্তা করে। পাপী পুরুষ ওপর থেকে ধর্মের জাল বিছায়। যেমন কোনো খাদ (গর্ত) শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তেমনই এরা ধর্মের নামে পাপ কর্ম করে। এরা ইন্দ্রিয় সংযম, বাহ্য পবিত্রতা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় কথাবার্তার উপদেশ করলেও ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের ন্যায় শিষ্টাচার সম্পন্ন হয় না।

——০——

শিষ্টাচারের বর্ণনা

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ধর্মব্যাধের উপরিউক্ত উপদেশ শুনে ব্রাহ্মণ কৌশিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'নরশ্রেষ্ঠ ! সজ্জন ব্যক্তিদের আচরণ সম্বন্ধে আমি কীভাবে জানব ? তুমি আমাকে যথার্থ রীতিতে শিষ্টাচারের কথা বুঝিয়ে বলো।'

ব্যাধ বলল—ব্রাহ্মণ ! যজ্ঞ, তপ, দান, বেদের স্বাধ্যায় এবং সত্যভাষণ—শিষ্ট পুরুষদের ব্যবহারে এই পাঁচটি ব্যাপার সর্বদা থাকে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ এবং মত্তভাব—এই দুর্গুণগুলি জিতে নেয়, কখনো এগুলির বশীভূত হয় না, তাকেই শিষ্ট (উত্তম) বলা হয় এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাকেই সম্মান করে থাকেন। তারা সর্বদাই যজ্ঞে এবং স্বাধ্যায়-কর্মে নিযুক্ত থাকেন। কখনো খুশিমতো আচরণ করেন না। সর্বদা সদাচার পালন করা শিষ্ট ব্যক্তিদের আর একটি লক্ষণ। শিষ্টাচারী ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুর সেবা, ক্রোধহীনতা, সত্যভাষণ এবং দান—এই চারটি গুণ অবশ্যই থাকে। বেদের সার সত্য, সত্যের সার ইন্দ্রিয় সংযম এবং ইন্দ্রিয়সংযমের সার ত্যাগ। শিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই ত্যাগ সর্বদা বিদ্যমান। শিষ্ট পুরুষ সর্বদা নিয়মিত জীবন নির্বাহ করে, ধর্মপথে চলে এবং গুরুর নির্দেশ পালন করে থাকে।

সুতরাং হে প্রিয় ! তুমি ধর্মমর্যাদা ভঙ্গকারী নাস্তিক, পাপী এবং নির্দয় ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সর্বদা ধার্মিক ব্যক্তিদের সেবা করো। এই শরীর এক নদীর মতো, পাঁচ ইন্দ্রিয় জলের মতো আর কাম ও লোভ এর মধ্যে কুমীরের মতো বসবাস করে। জন্ম-মৃত্যুর দুর্গম প্রদেশে এই নদী বহমান। তুমি ধৈর্যের নৌকায় বসে এই দুর্গম স্থানের ক্লেশগুলি পার হয়ে যাও। শ্বেতবস্ত্রের ওপর যেমন যেকোনো রং খুব সুন্দর দেখায় তেমনই শিষ্টাচার পালনকারী ব্যক্তির ক্রমশ সঞ্চিত কর্ম এবং জ্ঞানরূপ মহাধর্ম সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। অহিংসা ও সত্য—এর দ্বারাই সমস্ত জীবের কল্যাণ হয়। অহিংসা সবথেকে বড় ধর্ম, কিন্তু সত্যেই এর প্রতিষ্ঠা। সত্যের আধারেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমস্ত কাজ আরম্ভ হয়, তাই সত্য গৌরবের বস্তু। ন্যায় সম্বলিত কর্মের পালনকেই ধর্ম বলা হয়। এর বিপরীত যে অনাচার, শিষ্ট ব্যক্তিরা তাকেই অধর্ম বলে থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ বা নিন্দা করে না, যার মধ্যে অহংকার ও ঈর্ষাভাব নেই, যে নিজ মনকে বশে রাখে এবং সরল স্বভাব সম্পন্ন হয়, তাকেই শিষ্টাচারী বলা হয়। তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। অন্যের পক্ষে যা পালন করা কঠিন সেরূপ সদাচারগুলিও সে সহজেই পালন করতে পারে। নিজ সৎকর্মের জন্যই সে সর্বত্র সম্মানিত হয়। তার দ্বারা কখনোই হিংসাদি ভয়ানক কর্ম হয় না। পুরাকাল থেকে সদাচার চলে আসছে, এটিই সনাতন ধর্ম কেউ এটি দূর করতে পারে না। সর্বপ্রধান ধর্ম তাকেই বলে যা বেদ প্রতিপাদন করে ; দ্বিতীয় স্তরের ধর্মগুলির বর্ণনা ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় স্তরের ধর্ম হল শিষ্ট ব্যক্তির আচরণ। ধর্মের এই তিনটিই লক্ষণ। বিদ্যায় পারঙ্গম হওয়া, তীর্থে স্নান করা এবং ক্ষমা, সত্য, কোমলতা এবং পবিত্রতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ শিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণেই দেখা যায়। যে সকলের প্রতি দয়াভাব পোষণ করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, কখনো কঠোর বাক্য বলে না, তাকেই সাধু বা শিষ্ট ব্যক্তি বলা হয়। যার শুভ-অশুভ কর্মের পরিণামের জ্ঞান থাকে, যে ন্যায়যুক্ত, সদ্‌গুণসম্পন্ন, সমস্ত জগতের হিতৈষী এবং সর্বদা সুপথে চলে, সেই সজ্জন ব্যক্তিই শিষ্ট। তাঁর দান করার স্বভাব থাকে। সকল বস্তুই সে সকলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে উপভোগ করে। দীন-দুঃখীর ওপর তার সর্বদা দয়া থাকে। স্ত্রী এবং অনুচরদের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্যও সজ্জন ব্যক্তি সদাই তৎপর থাকে এবং নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের অর্থ প্রদান করে। সে সর্বদা সৎপুরুষদের সঙ্গ করে। অহিংসা-সত্য-ক্রূরতার অভাব, কোমলতা, অহংকার, ত্যাগ, লজ্জা, ক্ষমা, শম, দম, বুদ্ধি, ধৈর্য, জীবে দয়া, কামনা ও হিংসাভাব না থাকা—এগুলি শিষ্ট ব্যক্তিদের গুণ। এর মধ্যেও তিনটির প্রাধান্য আছে—কারও সঙ্গে শত্রুতা না করা, দানে রত থাকা এবং সত্যভাষণ। শান্ত থাকা, সন্তুষ্টি-ভাব এবং মিষ্ট বাক্য—এগুলিও সৎপুরুষের গুণ। এরূপ ব্যক্তি মহাভয় হতে মুক্ত হয়ে যায়। হে ব্রাহ্মণ ! আমি যেমন জেনেছি ও শুনেছি, সেইমতো শিষ্ট আচারের বর্ণনা তোমাকে করলাম।

—o—

ধর্মের সূক্ষ্ম গতি এবং ফলভোগে জীবের পরাধীনতা

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ধর্মব্যাধ কৌশিক ব্রাহ্মণকে বলল, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন ধর্মের ব্যাপারে বেদই প্রমাণ। সেকথা একেবারে যথার্থ ; তবুও ধর্মের গতি অতীব সূক্ষ্ম, তার নানা ভেদ, নানা শাখা। বেদে সত্যকে ধর্ম এবং অসত্যকে অধর্ম বলা হয় ; কিন্তু যদি কারো প্রাণ সংকট উপস্থিত হয় এবং অসত্য ভাষণের সাহায্যে তার প্রাণরক্ষা হয়, তবে সেইসময় অসত্য বাক্যই ধর্ম হয়ে ওঠে। ওইস্থানে অসত্যের দ্বারাই সত্যের কাজ হয়। ওই সময় সত্যকথা বললে তাতে অসত্যের ফল লাভ হয়। এর আসল কথা হল যাতে পরিণামে প্রাণীদের হিত হয়, তা বাহ্যত অসত্য মনে হলেও, বাস্তবে সত্য। অপরপক্ষে যাতে কারো অহিত হয়, অপরের প্রাণ সংকট উপস্থিত হয়, তা সত্য বলে প্রতিভাত হলেও বাস্তবে তা অসত্য এবং অধর্ম। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। মানুষ যে শুভ-অশুভ কর্ম করে, তার ফল তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। মন্দকর্মের ফল হিসাবে যখন তার প্রতিকূল দশা প্রাপ্ত হয়, দুঃখ ভোগ করতে হয়, তখন সে দেবতার নিন্দা করে, ঈশ্বরকে দোষ দেয়, কিন্তু অজ্ঞতাবশত সে নিজ কর্মগুলির দিকে দৃষ্টি দেয় না। মূর্খ, কপট, অস্থির চিত্ত ব্যক্তি সর্বদাই সুখ-দুঃখের চক্রে আবর্তিত হয়। তার বুদ্ধি, শিক্ষা এবং পুরুষার্থ—কিছুই তাকে সেই চক্র থেকে রক্ষা করতে পারে না। পুরুষার্থের ফলে যদি পরাধীনতা না থাকত, তাহলে যার যা খুশি সে তাই করত। কিন্তু দেখা যায় যে বড় বড় সংযমী, কার্যকুশল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিও কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও তার ইচ্ছানুযায়ী ফল মেলে না। অন্য ব্যক্তি যে সকলকে হিংসা করে এবং সর্বদা লোকেদের ঠকিয়ে বেড়ায়, সে ফুর্তিতে জীবন কাটায়। কেউ বিনা চেষ্টাতেই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়, আবার কেউ সারাদিন খেটেও খেতে পায় না। কত মানুষ বহু কষ্ট সহ্য করে, দেবতাদির পূজা করে পুত্র সন্তান লাভ করে, কিন্তু সে বড় হয়ে কুলে কলঙ্ক লেপন করে। আবার এমন দেখা যায় যে, পিতৃ অর্জিত ধন-ধান্য ও প্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্যেই কারোর জন্মলাভ হয়। আবার মানুষ যে রোগ-ভোগ করে, সেসব তার কর্মেরই ফল ; পশু-বন্দীকারীরা যেমন বাচ্চা হরিণকে বন্দী করে যাতনা দেয়, তেমনই কর্মফল অনুসারে অনেকেই বিভিন্ন রোগে কষ্ট পায়। ভোগ সমাপ্ত হলে চিকিৎসার মাধ্যমে চিকিৎসকের দ্বারা যেমন রোগীর অসুখ নিবারণ হয় তদনুরূপ সেই ধৃত পশুও যাতনা প্রদানকারীর হাত থেকে রক্ষা পায়। সাধারণত দেখা যায়, যার ভাণ্ডারে খাদ্য বস্ত্র মজুত থাকে, সে অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায়, অন্যদিকে যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যবান, অন্নের অভাবে সে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' করতে থাকে, অতিকষ্টে সে আহার সংগ্রহ করে। এইভাবে লোকে শোক ও মোহে ডুবে থাকে। কর্মের ভীষণ প্রবাহে পড়ে মানুষ নিরন্তর আধি-ব্যাধিরূপ তরঙ্গের আঘাত সহ্য করে। জীব যদি ফল ভোগেতে স্বাধীন হত, তাহলে কেউ বৃদ্ধও হত না, মৃত্যুমুখেও পতিত হত না, সকলেই ইচ্ছামতো কামনা পূর্ণ করত। দেখা যায় পৃথিবীতে সকলেই বড় হতে চায় এবং তারজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু তা হয় না। বহু মানুষই এক লগ্ন ও নক্ষত্রে জন্মায়, কিন্তু পৃথক পৃথক কর্মফল হওয়ায় তাদের ফল প্রাপ্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। এমনকী নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুতেও সকলের সমান অধিকার থাকে না। শ্রুতি অনুসারে জীবাত্মা সনাতন এবং সকল প্রাণীর শরীর বিনাশশীল। অস্ত্রাঘাতে শরীর নাশ হলেও অবিনাশী জীব মরে না ; সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থেকে পুনরায় অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

—০—

জীবাত্মার নিত্যতা এবং পুণ্য-পাপ কর্মের শুভাশুভ পরিণাম

কৌশিক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করল—হে ধর্মব্যাধ ! জীব সনাতন কীকরে, এই বিষয়ে আমি সঠিকভাবে জানতে চাই।

ধর্মব্যাধ বলল—দেহ নাশ হলে জীবনের অস্তিত্ব নাশপ্রাপ্ত হয় না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে বলে জীব মারা যায়, সে কথা ঠিক নয়। জীব এই দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যায়। শরীরের পাঁচতত্ত্ব পৃথকভাবে পাঁচভূতে মিশে গেলে তাকেই নাশ বলা হয়। ইহজগতে মানুষের কৃতকর্ম অন্য কেউ ভোগ করে না ; যে যা কর্ম করে, তাকেই তার ফলভোগ করতে হয়। কৃত কর্মের কখনো নাশ হয় না। পবিত্র আত্মার ব্যক্তি পুণ্য কর্ম করে এবং নীচ ব্যক্তি পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্মই মানুষকে অনুসরণ করে এবং কর্মানুসারে তার ভিন্ন জন্ম লাভ হয়।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করল—জীব অপর যোনিতে কেমন করে জন্ম নেয় ? পাপ ও পুণ্যের সঙ্গে তার কীরূপ সম্পর্ক এবং তার কেমন করে পাপ ও পুণ্য যোনির (ভিন্ন-জন্মের) প্রাপ্তি ঘটে ?

ধর্মব্যাধ বলল—জীব কর্মবীজ সংগ্রহ করে কীভাবে শুভ কর্ম অনুসারে উত্তম যোনি ও পাপকর্ম অনুসারে অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। শুধুমাত্র শুভকর্মের সংযোগে জীব দেবত্বলাভ করে, শুভাশুভ উভয়ের মিশ্রণে মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হয়। মোহে পতিতকারী তামস কর্মের আচরণের দ্বারা পশু-পক্ষীরূপে জন্ম নিতে থাকে। নিজের পাপের জন্যই তাকে বারংবার জগতের ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ জীব হাজার প্রকার তির্যক যোনি এবং নরকে আবর্তিত হতে থাকে। মৃত্যুর পর পাপকর্মের ফলে দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং সেই দুঃখ ভোগ করার জন্যই জীবকে নীচ যোনিতে জন্ম নিতে হয়। সেখানে সে আবার নতুন করে বহু পাপ কাজ করে বসে, ফলে কুপথ্য খাওয়া রোগীর মতো তাকে আবার নানা কষ্ট ভোগ করতে হয়। এইভাবে যদিও যে নিত্য দুঃখভোগ করতে থাকে, তবু সে নিজেকে দুঃখী বলে মনে করে না, দুঃখকেই সুখ ভেবে থাকে। যতক্ষণ কর্মভোগ সম্পূর্ণ না হয় এবং সে নতুন করে কর্ম করতে থাকে, ততক্ষণ কষ্ট সহ্য করে জীবকে এই জগৎ সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

বন্ধনকারক কর্মের ভোগ পূর্ণ হলে এবং সৎকর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেলে তখন মানুষ তপ ও যোগ আরম্ভ করে। তখন পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ তার উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। সেখানে গেলে তার আর শোক-দুঃখ থাকে না। মানুষের পাপ কর্ম করা উচিত নয়, পাপকর্ম ত্যাগ করতে হয়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংস্কারসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় পবিত্র এবং মনকে বশে রাখতে সক্ষম, সে উত্তম লোকেই সুখলাভ করে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৎব্যক্তির মতো ধর্ম পালন করা কর্তব্য। জগতে যাতে কেউ কষ্ট না পায়, তেমন জীবিকা অবলম্বন করা উচিত। নিজ ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করবে, যেন কর্ম সংকর (মিশ্রণ) না হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্মেই আনন্দ খুঁজে পান, তাতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ধর্ম থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারাই ধর্মের মূল সিঞ্চন করেন। এইরূপে যে ধর্মাত্মা, তার চিত্ত স্বচ্ছ এবং প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ধর্মাত্মা ব্যক্তি রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শ—এগুলি থেকে বিষয় সুখ প্রাপ্ত হয় এবং প্রভুত্ব লাভ করে। এসব তার ধর্মেরই ফল বলে মানা হয়। ধর্মের ফলরূপে জাগতিক সুখলাভ করে যে সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ করে না, জ্ঞানদৃষ্টিবশত সে ব্যক্তি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। বিবেক-বিচার সম্পন্ন ব্যক্তি রাগ- দ্বেষাদি দোষে যুক্ত হয় না। তার পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ হলেও সে ধর্ম ত্যাগ করে না। সমস্ত জগৎকে বিনাশশীল জেনে সে সবকিছুই পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে, তারপর প্রারব্ধের জন্য অপেক্ষা না করে সে মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। এইভাবে বৈরাগ্য লাভ করে সে পাপকর্ম পরিত্যাগ করে এবং ধার্মিক হয়ে শেষে মোক্ষ লাভ করে। জীবের কল্যাণের সাধন হল তপ আর তপের মূল হল শম ও দম—মন ও ইন্দ্রিয়াদির ওপর বিজয়লাভ করা। সেই তপের দ্বারাই মানুষ তার বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে। ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যভাষণ এবং শম-দম—এই সবের সাহায্যে মানুষ পরমপদ (মোক্ষ) লাভ করে।

—o—

ইন্দ্রিয়াদির অসংযমে ক্ষতি এবং সংযমে লাভ

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করল—ধর্মাত্মন্ ! ইন্দ্রিয় কী কী, কীভাবে তার নিগ্রহ করা উচিত ? নিগ্রহের ফল কী এবং এই ফল কীভাবে প্রাপ্ত করা হয় ?

ধর্মব্যাধ বলল—ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কোন কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করার জন্য সর্ব প্রথম মানুষের মন প্রবৃত্ত হয়—সেটি জানার পর সেটির ওপর মনের রাগ বা দ্বেষ জন্মায়। যার প্রতি অনুরাগ জন্মায়, তার জন্য মানুষ প্রচেষ্টা করে, সেটি পাওয়ার জন্য বড় বড় কাজ আরম্ভ করে এবং তা প্রাপ্ত হলে নিজ অভীষ্ট বিষয় বারংবার সেবন করে। অধিক ব্যবহারে তাতে অনুরাগ জন্মায়, তার জন্য অন্যের প্রতি দ্বেষ ভাব জন্মায় ; তখন লোভ ও মোহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোভে আক্রান্ত ও রাগ-দ্বেষ পীড়িত ব্যক্তির বুদ্ধি ধর্মপথে যায় না। সে যে ধর্ম করে, তা হল এক বাহানা, তার মধ্যে তার স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। সুদের দ্বারা ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি আসলে অর্থ চায় এবং ধর্মের আড়ালে যখন অর্থ লাভ হতে থাকে, তখন সে তাতেই মোহমুগ্ধ হয়ে যায় ; তখন সেই ধন দ্বারা তার মনে পাপ-বাসনা জাগ্রত হয়। যখন তার বন্ধু এবং বিদ্বান ব্যক্তিরা তাকে সেই কর্মে বাধা প্রদান করে তখন সে তার উত্তরে নানা অশাস্ত্রীয় কথা বলে তাদের বাধা দেয়। রাগরূপী দোষের জন্য তিনপ্রকার অধর্ম তার দ্বারা সংঘটিত হয়—(১) সে মনে মনে পাপচিন্তা করে, (২) পাপকথা বলতে থাকে (৩) পাপ ক্রিয়া করতে থাকে। অধর্মে ব্যাপৃত হওয়ায় তার ভালো গুণ সব নষ্ট হয়ে যায়। নিজের মতো পাপস্বভাব সম্পন্ন লোকেদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেই পাপের কারণে সে ইহলোকে দুঃখ তো পায়ই, পরলোকেও তাকে দুর্গতি ভোগ করতে হয়। একে পাপাত্মা হওয়ার চক্র বলা যায়।

ধর্ম প্রাপ্তি হয় কীভাবে এখন সেই কথা শোনো। যে ব্যক্তি কিসে সুখ আর কিসে দুঃখ এই বিষয়ে কুশলী, সে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে বিষয় সম্পর্কীয় দোষগুলি আগেই বুঝে যায়। তাই সে সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ করতে থাকে, সাধু সঙ্গ করায় তার বুদ্ধি ধর্মে প্রবৃত্ত হয়।

বিপ্রবর ! পঞ্চভূতে তৈরি এই সমস্ত জগৎ চরাচর ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মের থেকে উৎকৃষ্ট কোনো পদ নেই। পঞ্চভূত হল—আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এগুলি ক্রমশ এর বিশেষ গুণ। পাঁচ গুণের অতিরিক্ত ষষ্ঠ তত্ত্ব হল চেতনা, একেই মন বলা হয়। সপ্তম তত্ত্ব বুদ্ধি আর অষ্টম তত্ত্ব অহংকার। এতদ্ব্যতীত পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, জীবাত্মা এবং সত্ত্ব, রজ, তম—এই সব মিলে সতেরোটি তত্ত্বের এই সমূহকে অব্যক্ত (মূল প্রকৃতির কার্য) বলা হয়। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং মন ও বুদ্ধির যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিষয়, তা সম্মিলিত করলে এই সমূহকে চব্বিশ তত্ত্ব বলা হয় ; এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই-ই ভোগ্যরূপ।

পৃথিবীর পাঁচটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এর মধ্যে গন্ধ ছাড়া বাকী চার গুণ জলেরও আছে। তেজের তিন গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। বায়ুর দুটি গুণ শব্দ ও স্পর্শ আর আকাশের একটাই গুণ, তা হল শব্দ। এই পাঁচভূত একে অপরকে ছাড়া থাকে না, একই ভাব প্রাপ্ত হয়েই স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়। যখন জগতের প্রাণী তীব্র সংকল্পের দ্বারা অন্য দেহ ভাবনা করে, তখন কালের অধীন হয়ে সে অন্য দেহে প্রবেশ করে। পূর্বদেহের স্মৃতি বিস্মরণ হওয়াকেই মৃত্যু বলা হয়। এইভাবে ক্রমশ আবির্ভাব ও তিরোভাব হতে থাকে। দেহের প্রতিটি অঙ্গে যে রক্ত ইত্যাদি ধাতু থাকে তা পঞ্চভূতেরই পরিণাম। সারা জগৎ এতে পরিব্যাপ্ত। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যার সংসর্গ হয়, তা ব্যক্ত ; কিন্তু যে বিষয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, শুধু অনুমানের দ্বারা জানা যায়, তাকে অব্যক্ত বলে জানতে হবে।

নিজ নিজ বিষয়সমূহ অতিক্রম না করে শব্দাদি বিষয়াদির গ্রহণকারী এই ইন্দ্রিয়কে যখন আত্মা তার বশ করে, তখন সে তপস্যা করে—ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করে। এর ফলে আত্মদৃষ্টি লাভ করায় সে সমস্ত লোকে নিজেকে ব্যাপ্ত এবং নিজের মধ্যে সমস্ত জগৎকে স্থিত দেখে। এইরূপ পরাৎপর ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির যতক্ষণ প্রারব্ধ থাকে, ততক্ষণ সমস্ত প্রাণীকে দেখতে থাকে। সর্ব অবস্থায় সমস্ত প্রাণীকে আত্মরূপে অবলোকনকারী এই ব্রহ্মভূত জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো কোনো অশুভ কর্মে লিপ্ত হন না। যে মায়াময় ক্লেশ অতিক্রম করে, সেই যোগীর লোকবৃত্তির প্রকাশকারী জ্ঞানমার্গের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা বেদযুক্ত জীবকে আদি অন্ত রহিত, স্বয়ম্ভু অবিকারী, অনুপম এবং নিরাকার বলেছেন।

হে বিপ্র ! তপস্যাই সব কিছুর মূল এবং ইন্দ্রিয় সংযম করলেই তপস্যা হয়। স্বর্গ-নরক বলে যা আছে, তা সবই ইন্দ্রিয়গত। মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করাই হল যোগ। ইন্দ্রিয়কালকে বশে না রাখাই হল নরকের হেতু। ইন্দ্রিয়াদি রিপুর তাড়নায় তার ইচ্ছানুযায়ী চলাতেই সমস্ত প্রকার দোষ

সংঘটিত হয় এবং ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করলেই সিদ্ধিলাভ হয়। নিজ দেহে বিদ্যমান মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের ওপর যে ব্যক্তি অধিকার কায়েম করেছে, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আর পাপে লিপ্ত হয় না এবং কোনো অনর্থও তার দ্বারা সম্ভব হয় না। শরীর হল মানুষের রথ, আত্মা তার সারথি এবং ইন্দ্রিয় সমূহ হল ঘোড়া। কুশল সারথি যেমন ঘোড়াকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে সুখে যাত্রা করে, তেমনই সাবধানী ব্যক্তি নিজ ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে সুখে জীবনযাত্রা পূর্ণ করে। যে ব্যক্তি দেহরূপ রথে মন এবং ইন্দ্রিয়রূপ ছটি বলবান ঘোড়াকে ঠিকমতো চালিত করে, সেই উত্তম সারথি। পথে ধাবিত ঘোড়ার ন্যায় বিষয়ে বিচরণকারী এই ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করার জন্য ধৈর্য সহকারে চেষ্টা করা উচিত, যারা ধৈর্য সহকারে চেষ্টা করে, তারা অবশ্যই ফললাভ করে। বিষয়ের অভিমুখী ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি মনকেও লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে, পতন হয়, যেমন সমুদ্রে চালিত নৌকাকে বায়ু পথভ্রষ্ট করে নিমজ্জিত করে। অজ্ঞান ব্যক্তি মোহবশত এই ছয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখের চিন্তা করে এবং তাতেই সিদ্ধিলাভ হয় বলে মনে করে। কিন্তু বীতরাগ পুরুষ, যিনি এগুলির দোষ অনুসন্ধান করেন, তিনি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে ধ্যানের দ্বারা আনন্দ লাভ করেন।

———o———

তিন গুণের স্বরূপ এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—তারপর কৌশিক ব্রাহ্মণ ধর্মব্যাধকে বললেন—'আমি এবার সত্ত্বঃ, রজ, তম—এই তিনটি গুণের স্বরূপ জানতে চাই। আমাকে এগুলি যথাবৎ বর্ণনা কর।'

ধর্মব্যাধ বলল—আমি তোমাকে তিনটি গুণের পৃথক স্বরূপগুলি জানাচ্ছি, শোনো। তিনটি গুণের মধ্যে যেটি তমোগুণ, তা মোহ উদ্রেককারী, রজোগুণে কর্মে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সত্ত্বগুণ বিশেষ জ্ঞান প্রকাশক, তাই একে সর্বাপেক্ষা উত্তম বলা হয়। যার মধ্যে অজ্ঞানতা বেশি, মোহগ্রস্ত এবং অচেতনভাবে দিন রাত ঘুমিয়ে থাকে, যার ইন্দ্রিয় বশে নেই, অবিবেচক, ক্রোধী এবং আলস্যপ্রিয়—সে তমোগুণ সম্পন্ন বলে জানবে। যে শুধু প্রবৃত্তি সম্পর্কীয় কথা বলে, বিচারশীল, অন্যের দোষ দেখে না, সদাই কর্মব্যস্ত থাকে, যার মধ্যে বিনয়ের অভাব থাকে, অহংকারী, সে রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি। যার মধ্যে জ্ঞান বেশি, যিনি ধীর এবং অক্রিয়, অন্যের মধ্যে দোষ দেখেন না, জিতেন্দ্রিয়, অক্রোধী, তাঁকে বলে সাত্ত্বিক পুরুষ।

মানুষের অল্পাহারী হওয়া উচিত এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ রাখা কর্তব্য। সন্ধ্যা ও প্রভাতকালে মন আত্মচিন্তায় (ঈশ্বর চিন্তায়) মগ্ন রাখবে। যে ব্যক্তি এইভাবে সর্বদা নিজ হৃদয়ে আত্ম-সাক্ষাৎকারের অভ্যাস করে, সে নিজের মনের মধ্যে নিরাকার আত্মাকে দর্শন (বোধ) করে মুক্ত হয়ে যায়। সর্বভাবে ক্রোধ এবং লোভ পরিত্যাগ করা উচিত। জগতে এই হল তপস্যা এবং ভবসাগর থেকে পার হওয়ার সেতু। ক্রোধ হতে তপস্যাকে, দ্বেষ থেকে ধর্মকে, মান-অপমান থেকে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। সব থেকে বড় ধর্ম হল দয়া। প্রধান বল ক্ষমা, উত্তম ব্রত হল সত্য এবং আত্মজ্ঞানই সবথেকে বড় জ্ঞান। সত্যকথা বলা হল সদা কল্যাণময়ী, সত্যেই জ্ঞানের স্থিতি। প্রাণীদের যাতে কল্যাণ হয়, তাকেই সত্য বলে। যার কর্ম কামনাদ্বারা আবদ্ধ নয়, যে নিজের সব কিছু ত্যাগ রূপ অগ্নিতে অর্পণ করেছে, সে-ই বুদ্ধিমান এবং ত্যাগী। কোনো প্রাণীতে হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রভাব রাখবে। দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়ে কারোর প্রতি শত্রুভাব পোষণ করবে না। সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, কামনা ও লোভ ত্যাগ করবে—এগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানের সাধন। সর্বপ্রকার সংগ্রহ পরিত্যাগ করে পরলোক ও ইহলোকের ভোগের প্রতি সুদৃঢ় বৈরাগ্য ধারণ করে বুদ্ধির সাহায্যে মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করবে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যার মনের ওপর অধিকার আছে, যে অজিত পদ জয়ের ইচ্ছা রাখে, নিত্য তপস্যারত সেই মুনির আসক্তি উদ্রেককারী ভোগের থেকে দূরে (অনাসক্ত) থাকা উচিত। গুণাদিও যেখানে অগুণরূপ হয়, যা বিষয়াদি থেকে আসক্তি বর্জিত ও একমাত্র নিত্যসিদ্ধস্বরূপ এবং একমাত্র অজ্ঞান ভিন্ন যাঁর উপলব্ধিতে অন্য কোনো বাধা নেই—অজ্ঞান দূরীভূত হলে স্বতই অভিন্নরূপে যা প্রকাশিত হয়, তাই হল ব্রহ্মপদ, তাই অসীম আনন্দ। যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ের ইচ্ছাই ত্যাগ করে আসক্তিশূন্য হয়ে যায়, সেই ব্রহ্মকে লাভ করে। বিপ্রবর ! এ বিষয়ে আমি যেমন শুনেছি ও জেনেছি, তা সবই তোমাকে শোনালাম।

———o———

ধর্মব্যাধের মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—যুধিষ্ঠির ! ধর্মব্যাধ যখন এইভাবে মোক্ষসাধক ধর্মের বর্ণনা করলেন তখন কৌশিক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'তুমি আমাকে সবই ন্যায়যুক্ত কথা বলেছ। আমার মনে হচ্ছে ধর্ম সম্বন্ধে এমন কোনো বিষয় নেই, যা তোমার অজ্ঞাত।'

ধর্মব্যাধ বললেন—'হে ব্রাহ্মণদেবতা ! আমার ধর্মপালনের প্রত্যক্ষ প্রভাবও আপনি এবার দেখবেন যার জন্য আমি এই সিদ্ধিলাভ করেছি। গৃহের ভিতর পদার্পণ করে আপনি আমার পিতা-মাতাকে দর্শন করুন।'

ব্যাধের অনুরোধে ব্রাহ্মণ তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করল। সেখানে সে এক অতি সুন্দর চার কক্ষ বিশিষ্ট শ্বেত বর্ণের ভবন দেখল। সেই গৃহের শোভায় মন মুগ্ধ হয়। যেন দেবতাদের নিবাসস্থান ! দেবতাদের সুন্দর মূর্তিদ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত। একদিকে শোবার জন্য পালঙ্কে বিছানা পাতা, অন্যদিকে বসার জন্য আসন রাখা ছিল। সেই গৃহ ধূপ ও কেশর ইত্যাদির মিষ্ট সুগন্ধে সুরভিত ছিল। ব্রাহ্মণ দেখলেন ধর্মব্যাধের পিতামাতা আহার সমাপ্ত করে প্রসন্ন চিত্তে এক সুন্দর আসনে বসে আছেন। তাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরে আছেন এবং পুষ্প-চন্দন দিয়ে তাঁদের পূজা করা হয়েছে।

পিতা-মাতাকে দেখেই ধর্মব্যাধ তাঁদের চরণে মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ পিতা-মাতা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন—'বাবা ! ওঠো, ওঠো ; তুমি ধর্মকে জান, ধর্মই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবে। আমরা তোমার সেবায়, তোমার শুদ্ধ ভাবে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি উত্তম গতি, তপ, জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করেছ। তুমি সৎপুত্র, নিত্য নিয়মিত আমাদের সেবা ও পূজা করেছ। আমাদের দেবতা বলে ভেবেছ। ব্রাহ্মণের মতো শম-দম পালন করেছ। আমার পিতার পিতামহ এবং প্রপিতামহগণ এবং আমরাও তোমার সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন। তুমি কায়মনোবাক্যে কখনো আমাদের সেবায় বিরত হও না। এখনও তোমার মধ্যে আমাদের সেবা ব্যতীত আর কোনো চিন্তা নেই। পরশুরাম যেভাবে তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করেছিলেন তার থেকেও ভালোভাবে তুমি আমাদের সেবা করেছ।'

ব্যাধ তখন মাতা-পিতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ দেবতার পরিচয় করাল। তাঁরা ব্রাহ্মণকে আদর-আপ্যায়ন করলেন। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা দুজনে এই গৃহে পুত্র-পরিবার সহ কুশলে আছেন তো ? আপনারা সুস্থ আছেন তো ?' তাঁরা বললেন—'হ্যাঁ ব্রাহ্মণদেবতা ! আমাদের গৃহে পরিবার-পরিজন সহ আমরা কুশলে আছি। আপনি আপনার কথা বলুন, আপনি এখানে ভালোভাবে এসেছেন তো ? পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো ?' ব্রাহ্মণ বললেন—'হ্যাঁ, আমি ভালোভাবেই এসেছি ; পথে কোনো কষ্ট হয়নি।'

তারপর ব্যাধ তাঁর মাতা-পিতার দিকে তাকিয়ে কৌশিক ব্রাহ্মণকে বলল—'ভগবান ! মাতা-পিতাই আমার প্রধান দেবতা, দেবতাদের জন্য যা করা উচিত, তা আমি এঁদের জন্য করি। এঁদের সেবা কাজে আমার কোনো আলস্য নেই। জগতে যেমন ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি (প্রকার) দেবতা পূজনীয়, তেমনই এই বৃদ্ধ পিতা-মাতা আমার পূজনীয়। দ্বিজগণ যেমন দেবতাদের নানাপ্রকার উপহার সমর্পণ করেন, আমিও এঁদের জন্য তাই করি। ব্রহ্মান্ ! মাতা-পিতাই আমার শ্রেষ্ঠ দেবতা। আমি ফল-ফুল-রত্নাদিতে এঁদেরই সন্তুষ্ট করে থাকি। বিদ্বানেরা যাঁকে অগ্নি বলেন, এঁরাও আমার কাছে সেরূপ অগ্নিস্বরূপ। আমার মাতা-

পিতাই আমার কাছে চতুর্বেদ ও যজ্ঞসমূহ। এঁদের জন্য আমি আমার প্রাণও সমর্পণ করতে পারি। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমি নিত্য এঁদের সেবা করি। আমি নিজেই এঁদের স্নান করাই এবং স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করে খাওয়াই। আমি জানি এঁরা কী ভালোবাসেন আর কী পছন্দ করেন না। তাই এঁদের পছন্দের জিনিস নিয়ে আসি। যা এঁরা পছন্দ করেন না, তা আনি না। আলস্য পরিত্যাগ করে এইভাবে আমি সর্বদা এঁদের সেবায় ব্যাপৃত থাকি।'
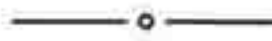
ধর্মব্যাধ কর্তৃক মাতা-পিতার সেবার জন্য উপদেশ লাভ করে কৌশিকের গৃহে প্রত্যাবর্তন

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ধর্মাত্মা ব্যাধ ব্রাহ্মণকে এইভাবে তাঁর মাতা-পিতাকে দর্শন করিয়ে বললেন—'ব্রাহ্মণ ! মাতা-পিতার সেবাই আমার তপস্যা, এই তপস্যার প্রভাব দেখুন। এর প্রভাবে আমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছি। যার ফলে আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এক পতিব্রতা স্ত্রীর কথায় এখানে এসেছেন। যে সাধ্বী নারী আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনি তাঁর পাতিব্রত্যের প্রভাবে এই সমস্তই জানেন। আমি এবার আপনার মঙ্গলের জন্য কিছু বলতে চাই, শুনুন। আপনি বেদ-স্বাধ্যায়ের জন্য পিতা-মাতার আদেশ না নিয়েই গৃহত্যাগ করেছেন, এতে তাঁদের অত্যন্ত অপমান করা হয়েছে এবং আপনারও এই কাজ উচিত হয়নি। আপনার শোকে আপনার দুই বৃদ্ধ মাতা-পিতা অন্ধ হয়ে গেছেন ; আপনি ফিরে গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন। তাতে আপনার ধর্ম নষ্ট হবে না। আপনি তপস্বী মহাত্মা এবং ধর্মানুরাগী। কিন্তু মাতা-পিতার সেবা বিনা সবই ব্যর্থ। আপনি সত্বর গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি। আমি এর থেকে বড় কোনো ধর্ম বুঝি না।'

ব্রাহ্মণ বলল—'ধর্মাত্মা ! আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমি এখানে এসে তোমার সৎসঙ্গ লাভ করেছি। তোমার ন্যায় ধর্মতত্ত্ব জানা লোক ইহজগতে দুর্লভ। সহস্র মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিরল যিনি ধর্মতত্ত্ব জানেন এবং তাঁর দর্শন পাওয়া খুবই দুর্লভ। তোমার কল্যাণ হোক, তোমার সত্যপালনে আজ আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। স্বর্গভ্রষ্ট যযাতিকে যেমন তাঁর দৌহিত্ররা রক্ষা করেছিলেন, তোমার ন্যায় সাধু ব্যক্তি আজ আমাকে নরক থেকে উদ্ধার করেছে। এখন থেকে আমি তোমার কথানুযায়ী মাতা-পিতার সেবা করব। যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়, সে ধর্ম-অধর্ম ঠিক করতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, এই সনাতন ধর্ম, যার তত্ত্ব বোঝা কঠিন, তা শূদ্র জাতির মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান। আমি তোমাকে শূদ্র বলে মনে করি না। কোনো প্রবল প্রারব্ধবশত তোমার শূদ্রকুলে জন্ম হয়েছে।'

ব্রাহ্মণের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্যাধ জানাল—'পূর্ব-জন্মে আমি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ছিলাম ; সঙ্গদোষে আমি এমন কিছু কর্ম করেছি, যার ফলে আমি ঋষির দ্বারা শাপগ্রস্ত হই। সেই শাপের জন্যই আমি শূদ্রকুলে ব্যাধ হয়ে জন্মলাভ করেছি।'

ব্রাহ্মণ বলল—'শূদ্র হলেও আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলেই মনে করি। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়েও পাপী, গর্বিত এবং অসৎ পথে বিচরণ করে, সে শূদ্রেরই সমান। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি শূদ্র হয়েও শম, দম, সত্য এবং ধর্ম সর্বদা পালন করে, তাকে আমি ব্রাহ্মণ বলেই মনে করি। কারণ মানুষ সদাচারের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। তুমি জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, তুমি ধর্মতত্ত্ব জান এবং জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত রয়েছ, তাই কৃতার্থ। এখন আমি ফিরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইছি। তোমার কল্যাণ হোক এবং ধর্ম সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বলল—'ব্রাহ্মণের কথা শুনে ধর্মাত্মা ব্যাধ হাত জোড় করে বিদায় জানালেন। ব্রাহ্মণ ধর্মব্যাধকে প্রদক্ষিণ করে ওখান থেকে রওনা হলেন। গৃহে ফিরে তিনি মাতা-পিতার পূর্ণভাবে সেবা করলেন এবং বৃদ্ধ মাতা-পিতা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। যুধিষ্ঠির ! তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে, সেইমত আমি তোমাকে পতিব্রতা স্ত্রী এবং ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব শোনালাম এবং ধর্মব্যাধের মাতা-পিতার সেবার কথাও শোনালাম।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর ! ধর্মের বিষয়ে আপনি আমাকে অত্যন্ত অদ্ভুত এবং সুন্দর উপাখ্যান শোনালেন।

এই কথা শুনে এত সুখ পেয়েছি, যাতে মনে হল এক পলকে সময় চলে গেল। আপনার কাছে ধর্মের কথা শুনতে শুনতে আমার তৃপ্তিতে মন ভরে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আরও শুনি।'

——০——

কার্তিকের জন্ম এবং তাঁর দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণের উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভার্গবশ্রেষ্ঠ ! স্বামী কার্তিকের জন্ম কীভাবে হয়েছিল এবং তিনি কেমন করে অগ্নিপুত্র হলেন, সেইসব কথা আমাকে যথাবৎ কৃপা করে বলুন।

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—কুরুনন্দন ! আমি তোমাকে স্বামী কার্তিকের জন্ম বৃত্তান্ত শোনাচ্ছি। পূর্বকালে দেবতা এবং অসুর নিজেদের মধ্যে প্রায়ই সংগ্রামে রত থাকতেন। ভয়ংকর রূপধারণকারী অসুররা দেবতাদের সর্বদাই পরাজিত করত। ইন্দ্র যখন বারবার তাঁর সেনাদের নাশ হতে দেখলেন, তখন তিনি মানস পর্বতে গিয়ে এক শ্রেষ্ঠ সেনাপতি কী করে লাভ করা যায় তার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন। সেইসময় তিনি এক নারীর করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলেন। সে বারংবার চেঁচিয়ে বলছিল—'কোনো পুরুষ আছ, আমাকে রক্ষা করো !' ইন্দ্র তার আর্তনাদ শুনে বললেন—'ভয় পেয়ো না, এখানে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।' এই বলে সেখানে পৌঁছে দেখলেন হাতে গদা নিয়ে কেশী দৈত্য সেই নারীটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্র সেই নারীর হাত ধরে বললেন—'ওরে নীচ কুকর্মকারী ! তুই কী করে এই নারীটিকে হরণ করতে চাস ? মনে রাখিস, আমি বজ্রধারী ইন্দ্র। তুই এখনই একে ছেড়ে দে।' তখন কেশী বলল—'আরে ইন্দ্র !, একে আমি বরণ করে নিয়েছি। তুই একে ছেড়ে দে তাহলেই তুই বেঁচে নিজপুরীতে ফিরতে পারবি।'

এই বলে কেশী তার গদা ইন্দ্রের ওপরে ছুঁড়ে দিল। ইন্দ্র বজ্রের সাহায্যে তাকে মধ্যপথে কেটে ফেললেন। কেশী তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের ওপর এক বিশাল পাথর ছুঁড়ল। পাথর আসতে দেখে ইন্দ্র সেটিও টুকরো টুকরো করে দিলেন। সেই টুকরো পড়ার সময় তাতে কেশী আঘাত পেল। কেশী সেই আঘাতে ভয় পেয়ে নারীটিকে ফেলে পালিয়ে গেল। কেশী চলে গেলে ইন্দ্র সেই নারীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ? কার কন্যা ? এখানে তোমার কী কাজ ?'

কন্যা উত্তর দিল—'ইন্দ্র ! আমি প্রজাপতির কন্যা, আমার নাম দেবসেনা। দৈত্যসেনা আমার বোন, কেশী তাকে নিয়ে গেছে। আমরা দুই বোন প্রজাপতির অনুমতি নিয়ে একসঙ্গে খেলার জন্য এই মানসপর্বতে আসতাম ; কেশী দৈত্য প্রতিদিন তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলত, দৈত্যসেনার তার সঙ্গে প্রণয় ছিল, কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করতাম না। তাই দৈত্যসেনাকে কেশী নিয়ে গেলেও, আপনার পরাক্রমে আমি রক্ষা পেয়েছি। এখন আপনি যে পরাক্রমী বীরকে ঠিক করবেন, আমি তাকেই আমার পতি বলে বরণ করব।' ইন্দ্র বললেন—'আমার মা দক্ষকন্যা অদিতি, সুতরাং তুমি আমার মাসতুতো বোন। এখন বলো তোমার পতির কীরকম বিক্রম তুমি চাও।' কন্যা উত্তর দিল—'যিনি দেবতা, দানব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং দুষ্ট দৈত্যদের পরাজিত করবেন, মহা পরাক্রমশালী, অত্যন্ত বলবান এবং যিনি আপনার সঙ্গে মিলে সমস্ত প্রাণীর ওপর বিজয়লাভ করবেন, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং কীর্তি

বৃদ্ধিকারী ব্যক্তিকেই আমি পতি হিসাবে চাই।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! সেই কন্যার কথা শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভাবলেন যে এই মেয়ে যেমন চায় তেমন কোনো পাত্র দেখা যাচ্ছে না। তখন তিনি কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মলোকে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'ভগবান ! আপনি এই কন্যার জন্য কোনো

সদ্‌গুণ সম্পন্ন শূরবীর পাত্রের সন্ধান দিন।' ব্রহ্মা বললেন—'এরজন্য তুমি যেমন ভেবেছ, আমিও তেমনই ভেবেছি। অগ্নির সাহায্যে এক মহাপরাক্রমী বালক জন্ম নেবে, সেই হবে এই কন্যার পতি এবং তোমার সেনাধ্যক্ষের কাজও সেই করবে।'

ব্রহ্মার কথা শুনে ইন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বশিষ্ঠ প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি যেখানে ছিলেন, সেখানে গেলেন। সেইসময় এই মহর্ষিগণ যে যজ্ঞ করেছিলেন, দেবতারা এসে তার থেকে নিজেদের ভাগ গ্রহণ করতেন। ঋষিরা আবাহন করায় অগ্নিদেবও সেখানে এলেন এবং ঋষিদের মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক প্রদত্ত বলি গ্রহণ করে বিভিন্ন দেবতাদের দিতে লাগলেন। সেইসময় ঋষিপত্নীদের রূপে অগ্নিদেব মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেও সংযত হতে পারলেন না। কিন্তু সেই কামাগ্নি শান্ত করার কোনো উপায় করতে পারলেন না, কারণ ঋষিপত্নীরা ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা ও শুদ্ধচারিণী। অগ্নিদেব অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে নিরাশচিত্তে দেহত্যাগ করা স্থির করে বনে চলে গেলেন।

অগ্নিপত্নী স্বাহা যখন জানতে পারলেন যে অগ্নি ঋষিপত্নীদের রূপে মোহিত হয়ে বনগমন করেছেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, তিনি ঋষিপত্নীদের রূপ ধারণ করে তাঁকে নিজের প্রতি আসক্ত করবেন। তাতে অগ্নির তাঁর ওপর প্রেমবৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর কামনাও তৃপ্ত হবে। এই কথা ভেবে স্বাহা প্রথমে মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী রূপ-গুণশীলবতী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবের কাছে গিয়ে বললেন—'অগ্নিদেব ! আমি কামাগ্নিতে জ্বলে যাচ্ছি, তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করো। তুমি তা না করলে আমার প্রাণ বাঁচবে না। আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী শিবা।' অগ্নি তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তার সঙ্গে সমাগম করলেন। স্বাহা তাঁর বীর্য হাতে নিয়ে একটি স্বর্ণকুণ্ডে রাখলেন। এইভাবে স্বাহা সপ্তঋষির প্রত্যেকের পত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নির কামবাসনা পূর্ণ করলেন। কিন্তু অরুন্ধতীর তপস্যা এবং শক্তির প্রভাবে তাঁর রূপ ধারণ করতে সক্ষম হলেন না। এইভাবে স্বাহা প্রতিপদের দিন ছয়বার অগ্নির বীর্য সেই সুবর্ণকুণ্ডে রাখলেন। সেই বীর্য থেকে এক ঋষিপূজ্য বালক জন্মগ্রহণ করলেন। স্খলিত বীর্য থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁর নাম হল 'স্কন্দ'। তাঁর ছয়টি মাথা, বারোটি কান, বারোটি চক্ষু, বারোটি হাত এবং একটি গ্রীবা ও একটি পেট ছিল। তিনি দ্বিতীয়াতে অভিব্যক্ত হয়ে তৃতীয়াতে শিশুরূপ হলেন, চতুর্থীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হন। উদীয়মান সূর্য যেমন অরুণবর্ণ মেঘে সুশোভিত থাকে, তেমনই এই বালককেও মনে হত অরুণবর্ণ মেঘে ঢাকা। ত্রিপুরবিনাশক মহাদেব দৈত্য সংহারকারী যে বিশাল রোমাঞ্চকারী ধনুক রেখেছিলেন, স্কন্দ সেই বিশাল ধনুক তুলে নিয়ে ভীষণ সিংহনাদ করে ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীকে হতচেতন করে দিলেন। তাঁর সেই মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জনে বহু প্রাণী ভূমিতলে পতিত হল। সেইসময় যেসব প্রাণী তাঁর শরণ গ্রহণ করেছিল, তাদের তাঁর পার্ষদ বলা হয়। তাদের সকলকে মহাবাহু স্বামী কার্তিক সান্ত্বনা প্রদান করেন।

তারপর তিনি শ্বেতপর্বতে উঠে হিমালয়ের পুত্র ক্রৌঞ্চপর্বতকে বাণবিদ্ধ করেন। সেই ছিদ্রপথে এখনও হংস এবং গৃধ্রপক্ষী মেরুপর্বতের ওপর দিয়ে গমন করে থাকে। কার্তিকের বাণে বিদ্ধ হয়ে ক্রৌঞ্চপর্বত আর্তনাদ করতে

করতে পড়ে গেল। তাকে পড়তে দেখে অন্যান্য পর্বতও তীব্র চিৎকার করতে লাগল। পর্বতদের সেই আর্ত তীব্র চিৎকার শুনেও মহাবলী কার্তিক বিচলিত হননি। তিনি এক শক্তিশালী আয়ুধ হাতে নিয়ে সিংহনাদ করতে লাগলেন। তিনি সেই শক্তিশালী আয়ুধ ছুঁড়ে শ্বেতগিরির এক বিশাল শিখর ভেঙে ফেললেন। তাঁর আঘাতে বিদীর্ণ সেই শ্বেতপর্বত ভীত হয়ে অন্যান্য পাহাড়ের সঙ্গে পৃথিবী ত্যাগ করে আকাশে উড়ে গেল। পৃথিবীও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ায় তাতে যেখানে-সেখানে ফাটল ধরতে লাগল, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে কার্তিকের কাছে গেলে পৃথিবী আবার বলশালী হয়ে উঠল। পর্বতরাও তাঁর চরণে মস্তক অবনত করে আবার পৃথিবীতে ফিরে এল। তারপর থেকে প্রতি শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর দিন লোকে তাঁর পূজা করতে থাকল।

এদিকে সপ্তর্ষিরা যখন এই মহাতেজস্বী পুত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত শুনলেন, তখন অরুন্ধতী ব্যতীত অন্য সকল ঋষি-পত্নীদেরই তাদের স্বামী-ঋষিরা পরিত্যাগ করলেন। স্বাহা বারবার সপ্তঋষিদের বলতে লাগলেন যে 'এ আমারই পুত্র, আপনারা যা মনে করছেন, তা নয়।' অগ্নিদেব যখন কামাতুর হয়ে বনগমন করেছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র গোপনে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন, তাই তিনি সবই জানেন। তিনিও সপ্তর্ষিদের জানালেন যে তাঁদের স্ত্রীদের কোনোই অপরাধ নেই। কিন্তু সবকিছু সম্পূর্ণভাবে শুনেও তাঁরা পত্নীদের আর গ্রহণ করলেন না।

দেবতারা স্কন্দের বল ও পরাক্রমের কথা শুনে ইন্দ্রের কাছে এসে বললেন, 'দেবরাজ ! স্কন্দের বল অসহ্য, আপনি শীঘ্র ওকে হত্যা করুন। যদি ওকে হত্যা না করেন, তাহলে সেই একদিন দেবতাদের রাজা হয়ে বসবে।' ইন্দ্রের যদিও তাঁর বলের সম্বন্ধে ধারণা ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি ঐরাবতে চড়ে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে স্কন্দকে আক্রমণ করলেন। স্কন্দের কাছে এসে ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতা ভীষণ সিংহনাদ করলেন। সেই শব্দ শুনে কার্তিকও সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জন করলেন। সেই মহাগর্জনে দেবতাদের সেনাদল হতচেতন হয়ে পড়ল এবং তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। দেবতারা তাঁকে বধ করতে এসেছেন দেখে কার্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মুখ দিয়ে জ্বলন্ত অগ্নির হল্কা ছাড়তে লাগলেন। সেই আগুনের হল্কা ভীতসন্ত্রস্ত দেবতাদের দগ্ধ করতে লাগল। এতে দেবতাদের মস্তক, শরীর, অস্ত্র-শস্ত্র এবং বাহনও দগ্ধ হয়ে ছিন্নভিন্ন তারার মতো মনে হতে লাগল। এইভাবে দগ্ধ হয়ে তাঁরা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে অগ্নিপুত্র স্কন্দের শরণ গ্রহণ করলেন। ফলে দেবতারা কার্তিকের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

দেবতারা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করলে ইন্দ্র স্কন্দের ওপর বজ্র নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্রের আঘাতে কার্তিকের দক্ষিণ অঙ্গ আহত হয়, এবং সেই অঙ্গ থেকে আর একজন পুরুষ প্রকটিত হয়। সেই পুরুষ যুবাবস্থা প্রাপ্ত এবং স্বর্ণ কবচ, শক্তি এবং দিব্যকুণ্ডল পরিহিত। স্কন্দের শরীরে বজ্র প্রবেশ হওয়াতে এই পুরুষ উৎপন্ন হওয়ায়, তিনি 'বিশাখ' নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রলয়াগ্নির মতো তেজস্বী আর একজন পুরুষকে উৎপন্ন হতে দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হলেন, তিনি হাতজোড় করে তখন স্কন্দেরই শরণাপন্ন হলেন। স্কন্দ তখন সেনাসহ ইন্দ্রকে অভয়দান করলেন। দেবতারা তখন প্রসন্ন হয়ে বাদ্যধ্বনি করতে লাগলেন।

তখন ঋষিরা তাঁকে বললেন—'দেবশ্রেষ্ঠ ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি সমস্ত জগতের মঙ্গল করো। তুমি মাত্র ছয়দিন পূর্বে উৎপন্ন হয়েছ ; এর মধ্যেই তুমি সমস্ত পৃথিবীকে নিজ বশে এনেছ এবং তাদের অভয়প্রদান করেছ। সুতরাং তুমি এবার ইন্দ্র হয়ে তিনলোককে নির্ভয় করো।' স্বামী কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মুনিগণ ! ইন্দ্র ত্রিলোকের কী কাজ করেন এবং কীভাবে দেবতাদের রক্ষা করেন ?' ঋষিরা বললেন—'ইন্দ্র সমস্ত প্রাণীকে

বল, তেজ ও সুখপ্রদান করেন এবং প্রসন্ন হয়ে সর্বপ্রকার ইচ্ছা পূরণ করেন। তিনি দুরাচারীকে সংহার করেন এবং সদাচারীকে রক্ষা করেন। সকল প্রাণীর প্রত্যেক কাজে তাঁর অনুশাসন মানা হয়। সূর্য না থাকলে তিনিই সূর্য হন, চন্দ্রের অভাবে তিনি চন্দ্র হয়ে থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন কারণে তিনি অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, জল হয়ে যান। এসব কাজই ইন্দ্রকে করতে হয়, কেননা ইন্দ্রের মধ্যে অত্যন্ত শক্তি আছে। বীরবর ! তুমিও অত্যন্ত বলবান, অতএব তুমিই আমাদের ইন্দ্র হও।' তখন ইন্দ্রও বললেন—'মহাবাহো ! তুমি ইন্দ্র হয়ে আমাদের সকলকে সুখী করো। তুমিই প্রকৃতপক্ষে এই পদের যোগ্য, অতএব আজই তোমার অভিষেক হোক।' স্কন্দ বললেন—'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ত্রিলোক শাসন করুন। আমি আপনার সেবক, আমার ইন্দ্রপদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।' ইন্দ্র বললেন—'বীর ! অদ্ভুত তোমার শক্তি, তোমার পরাক্রমে চমকিত হয়ে প্রাণী সব আমাকে হীনভাবে দেখবে। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। এইরূপ মতভেদ থাকলে তোমার আমার মধ্যে লড়াই চলতেই থাকবে। আমার ধারণা তাতে তোমারই জয় হবে। সুতরাং তুমি ইন্দ্র হও, এ নিয়ে আর চিন্তা-ভাবনা করো না।' স্কন্দ বললেন—'ত্রিলোকে আপনি আমারও রাজা ; বলুন আমি আপনার কোন নির্দেশ পালন করব ?' ইন্দ্র বললেন—'ঠিক আছে, তোমার কথায় আমিই ইন্দ্র হয়ে থাকলাম ; কিন্তু সত্যি যদি তুমি আমার আদেশ মানতে চাও, তাহলে শোনো, তুমি দেবসেনাপতির পদে অভিষিক্ত হও।' স্কন্দ বললেন—'ঠিক আছে ; দানবদের বিনাশ, দেবতাদের অর্থসিদ্ধি এবং গো-ব্রাহ্মণদের হিতার্থে আপনি প্রসন্নতা সহকারে আমাকে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—স্কন্দের ইচ্ছায় ইন্দ্র তাঁকে সমস্ত দেবতাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। মহর্ষিদের দ্বারা পূজিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত হয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার ওপর সোনার ছাতা লাগানো হয়েছিল। সেইসময় পার্বতীসহ ভগবান শংকর সেখানে এলেন। তাঁরা এসে বিশ্বকর্মা নির্মিত একটি মালা তাঁর গলায় পরালেন। অগ্নিদেব প্রদত্ত লাল রংয়ের ধ্বজা সর্বদা তাঁর রথে শোভা পেত। যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রচেষ্টা, প্রভা, শান্তি এবং বল ও দেবতাদের জয়বৃদ্ধিকারী শক্তি সেই তিনি স্বয়ং তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর শরীরে জন্মের সঙ্গে উৎপন্ন হওয়া কবচে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধের সময় তা স্বয়ংই প্রকটিত হত। শক্তি, ধর্ম, বল, তেজ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রহ্মণ্যতা, অসম্মোহ, ভক্তের রক্ষা, শত্রু সংহার এবং জগৎ রক্ষা—এইসব গুণ স্কন্দের মধ্যে জন্মগত ছিল। তাই সমস্ত দেবতাই তাঁকে সেনাপতিপদে বরণ করলেন।

তারপর কার্তিকের কাছে সহস্র সহস্র দেবসেনা উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল 'আপনিই আমাদের প্রভু।' তখন স্কন্দ তা মেনে নিলেন এবং তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে সকলকে আশ্বস্ত করলেন। ইন্দ্রের তখন কেশী দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দেবসেনার কথা স্মরণ হল, তিনি ভাবলেন যে, 'এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে ব্রহ্মা এঁকেই দেবসেনার পতি হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন।' তখন তিনি দেবসেনাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করে তাকে স্কন্দের কাছে এনে বললেন—'দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনার জন্মের পূর্বেই ব্রহ্মা এঁকে আপনার পত্নীরূপে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ; অতএব আপনি বিধিপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করে এর পাণিগ্রহণ করুন।' স্কন্দ দেবসেনার পাণিগ্রহণ করলেন। মন্ত্রবেত্তা

বৃহস্পতি হোম-যজ্ঞ সহকারে বিবাহ সুসম্পন্ন করালেন। দেবসেনা কার্তিকের পাটরানি হলেন। তাঁকেই ব্রাহ্মণরা ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহু, সদ্বৃত্তি এবং অপরাজিতা নামে অভিহিত করেন।

—o—

শ্রীকার্তিকের কয়েকটি উদার কর্মের কথা

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্! কার্তিককে শ্রীসম্পন্ন এবং দেবসেনাপতি হতে দেখে সপ্তঋষির ছয়জন পত্নী তাঁর কাছে এলেন। তাঁরা সকলেই ধার্মিক ও ব্রতশীলা ছিলেন, তা সত্ত্বেও ঋষিরা তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা দেবসেনার পতি কার্তিকের কাছে গিয়ে বললেন—'পুত্র! আমাদের দেবতুল্য পতিগণ অকারণে আমাদের ত্যাগ করেছেন, তাই আমরা পুণ্যলোক চ্যুত হয়ে রয়েছি। তাঁদের কেউ বুঝিয়েছে যে, আমাদের থেকেই তোমার জন্ম হয়েছে। তুমি আমাদের সত্যকাহিনী শুনে আমাদের রক্ষা করো। তোমার কৃপায় আমাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হতে পারে। তাছাড়া তোমাকে আমরা পুত্ররূপেও চাই।' স্কন্দ বললেন—'হে নির্দোষ দেবীগণ! আপনারা আমার মাতা,

আমি আপনাদের পুত্র। এছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা যদি আপনাদের থাকে, তাও পূর্ণ হবে।'

কার্তিক যখন মাতাদের এইসব প্রিয় কথা বলছিলেন তখন স্বাহা তাঁকে বললেন—'তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র, আমি চাই তুমি আমার এক দুর্লভ প্রিয় কাজ করো।' স্কন্দ বললেন—কী তোমার ইচ্ছা?' স্বাহা বললেন—'আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয় কন্যা। শিশুকাল থেকেই আমি অগ্নিদেবের অনুরক্ত, কিন্তু অগ্নি সঠিকভাবে আমার প্রেমকে জানেন না। আমি সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকতে চাই।' স্কন্দ বললেন—'ব্রাহ্মণরা যাগ-যজ্ঞতে যেসব পদার্থ মন্ত্রদ্বারা শুদ্ধ করবেন, তাঁরা 'স্বাহা' বলেই তা অগ্নিতে প্রদান করবেন। কল্যাণী! এইভাবে অগ্নিদেব সর্বদাই আপনার সঙ্গে থাকবেন।'

এইকথা বলে স্কন্দ স্বাহাকে পূজা করলেন, স্বাহা তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং অগ্নির সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্কন্দের পূজা করলেন। ব্রহ্মা তারপর স্কন্দকে বললেন—'তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরারি শ্রীমহাদেবের কাছে যাও, কারণ সমস্ত জগতের হিতার্থে ভগবান রুদ্র অগ্নিতে ও উমা স্বাহাতে প্রবেশ করে তোমাকে উৎপন্ন করেছেন।' ব্রহ্মার কথা শুনে কার্তিক 'তথাস্তু' বলে মহাদেবের কাছে চলে গেলেন।

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ইন্দ্র যখন অগ্নিকুমার কার্তিককে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, তখন ভগবান শংকর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পার্বতীর সঙ্গে সূর্যসম কান্তিসম্পন্ন এক রথে চড়ে ভদ্রবটে গেলেন। সেইসময় গুহ্যকের সঙ্গে পুষ্পক বিমানে করে শ্রীকুবের তাঁদের আগে আগে চলতেন। ইন্দ্র ঐরাবতে করে দেবতাদের সঙ্গে তাঁর পিছন পিছন যেতেন। তাঁদের দক্ষিণ দিকে বসু এবং রুদ্র সহ বহু সুনামধন্য দেবসেনানী ছিলেন। যমরাজও মৃত্যুর সঙ্গে তাঁদের অনুগমন করছিলেন। যমরাজের পশ্চাতে ভগবান শংকরের তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত বিজয় নামের ত্রিশূল চলত। তার পিছনে নানাপ্রকার জলচরবেষ্টিত হয়ে জলাধীশ বরুণ চলছিলেন। চন্দ্র তখন মহাদেবের মাথায় শ্বেতছত্র ধরেছিলেন। বায়ু এবং অগ্নি চামর নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের পিছনে রাজর্ষিদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র স্তুতি করতে করতে যাচ্ছিলেন।

মহাদেব অত্যন্ত উদারভাবে তখন কার্তিককে বললেন—'তুমি সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে ব্যূহ রক্ষা করবে।' স্কন্দ বললেন—'ভগবান! আমি অবশ্য তা রক্ষা করব। এছাড়া আর কোনো কাজ থাকলে বলুন।' শ্রীমহাদেব বললেন—'পুত্র! কর্তব্যে রত থাকাকালেও তুমি আমার সঙ্গে মাঝেমধ্যে সাক্ষাৎ করবে। আমার দর্শনলাভে ও ভক্তির দ্বারা তোমার পরম কল্যাণ হবে।' এই বলে তিনি

কার্তিককে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। তিনি প্রস্থান করতেই অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হল। সমস্ত দেবতা তাতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নক্ষত্রসহ আকাশ জ্বলতে লাগল, জগৎ মুগ্ধ হয়ে গেল, পৃথিবী টালমাটাল হতে লাগল, জগৎ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। তার মধ্যে পর্বত ও মেঘের ন্যায় নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ভয়ানক সেনাবাহিনী দেখা গেল। তারা অত্যন্ত ভয়ংকর এবং অসংখ্য ছিল। সেই ভীষণ বাহিনী সহসা ভগবান শংকর এবং সমস্ত দেবতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে লাগল। সেই ভয়ংকর অস্ত্রযুদ্ধে আহত হয়ে একটু পরেই দেবসেনারা সংগ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল।

দানবদের আঘাতে আহত সেনাদের পালাতে দেখে ইন্দ্র তাদের সাহস দেবার জন্য বললেন—'বীরগণ ! ভয় পরিত্যাগ করো, অস্ত্র হাতে নাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। একটু ধৈর্য ধরো, তোমাদের দুঃখ দূর হবে। এই ভয়ানক, দুষ্ট দানবদের পরাস্ত করো। এসো, আমরা সকলে মিলে ওদের আক্রমণ করি।' ইন্দ্রের কথা শুনে দেবতারা ধৈর্য ধরে ইন্দ্রের সঙ্গে এসে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সমস্ত দেবতা, মহাবলী মরুৎ, সাধ্য এবং বসুগণও যুদ্ধে যোগদান করলেন। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে দৈত্যদের শরীর রক্তে লাল হয়ে গেল। তাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে রণভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এইভাবে দেবতারা দানবসেনাদের আহত করে দিলেন। এর মধ্যে মহিষ নামের এক দৈত্য বিশাল পর্বত নিয়ে দেবতাদের দিকে ধাবিত হল, তাকে দেখে দেবতারা পালাতে লাগলেন। কিন্তু সে তাঁদের পিছনে গিয়ে দেবতাদের ওপর সেই বিশাল পাহাড় ছুঁড়ে মারল। সেই আঘাতে দশ হাজার সৈন্য ধরাশায়ী হল। তারপর মহিষাসুর অন্য দানবদের নিয়ে দেবতাদের ওপর আক্রমণ হানল। তাকে আসতে দেখে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতা পালাতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ মহিষাসুর তখন অতি বেগে গিয়ে ভগবান রুদ্রের রথের রশি ধরে

ফেলল। তাই দেখে শ্রীমহাদেব মহিষাসুর বধের সংকল্প করে কালরূপ শ্রীকার্তিককে স্মরণ করলেন। কান্তিমান কার্তিক তৎক্ষণাৎ রণভূমিতে উপস্থিত হলেন। তিনি ক্রোধে সূর্যের ন্যায় অগ্নিগর্ভ হয়েছিলেন। তিনি লালবস্ত্র পরিধান করেছিলেন, গলায় রক্তবর্ণের মালা, ঘোড়ার রংও লাল। তিনি স্বর্ণকবচ ধারণ করেছিলেন এবং অগ্নির ন্যায় সুন্দর কান্তিসম্পন্ন রথে আরোহণ করেছিলেন। তাঁকে দেখেই দৈত্যসেনারা রণভূমি পরিত্যাগ করে পালাতে লাগল।

মহাবলী কার্তিক মহিষাসুরকে বধ করার জন্য এক প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সেটি গিয়ে তার বিশাল মস্তক কেটে ফেলল এবং মহিষাসুর প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মহিষাসুরের পর্বতসমান মস্তক গিয়ে উত্তর কুরুদেশের ষোলো যোজন বিস্তৃত পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। শক্তি বার বার নিক্ষেপ করে কার্তিক বহু দৈত্য সংহার করলেও তা পুনরায় কার্তিকের হাতেই ফিরে আসত। এইভাবে কার্তিক সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করলেন। সূর্য যেমন অন্ধকারকে, অগ্নি যেমন বৃক্ষকে এবং বায়ু যেমন মেঘকে নাশ করে, তেমনই কার্তিক সমস্ত শত্রুকে নাশ করলেন।

তারপর তিনি ভগবান শংকরকে প্রণাম করলেন এবং দেবতাদের পূজা করলেন। তাঁকে তখন কিরণজালমণ্ডিত সূর্যের মতো দীপ্ত বলে মনে হচ্ছিল। ইন্দ্র তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—'কার্তিক ! এই মহিষাসুর ব্রহ্মার কাছে বরপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাই সমস্ত দেবতাই এর কাছে তৃণের মতো, তাকে আজ আপনি বধ করলেন। এর ফলে আপনি আজ দেবতাদের এক ভয়ানক কণ্টক দূর করলেন। এতদ্ব্যতীত আপনি আরও অন্য বহু দৈত্য বধ করেছেন, যারা এর আগে বহু ক্লেশ দিয়েছে। দেব, আপনি ভগবান শংকরের মতোই সংগ্রামে অজেয় হবেন আর আপনার এই প্রথম যুদ্ধপরাক্রম প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। ত্রিলোকে আপনার অক্ষয় কীর্তি ছড়িয়ে পড়বে এবং হে মহাবাহো, সকল দেবতাই আপনার অধীনে থাকবেন।' এই কথা বলে ইন্দ্র ভগবান শিবের অনুমতি নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে করে রওনা হলেন। মহাদেব তখন অন্য সব দেবতাদের বললেন 'তোমরা কার্তিককে আমার মতোই মান্য করবে।' তারপর তিনি ভদ্রবটে চলে গেলেন এবং দেবতারাও যে যার নিজ স্থানে চলে গেলেন। অগ্নিকুমার কার্তিক একদিনেই সমস্ত দানব সংহার করে ত্রিলোক জয় করে নিলেন। মহর্ষিরা তাঁকে সাধ্যমতো পূজা করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন—দ্বিজবর ! ভগবান কার্তিকের ত্রিলোকে বিখ্যাত যে সব নাম আছে, আমি তা জানতে চাই।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—শুনুন ! আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষমর্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশুশীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নকপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয় ও প্রিয়কৃৎ—কার্তিকেয়র এইগুলি দিব্য নাম। যে এটি পাঠ করে সে নিঃসন্দেহে স্বর্গ, কীর্তি ও ধনলাভ করে।

দ্রৌপদীর নিজ দৈনন্দিন আচার-আচরণের বিবরণ সত্যভামাকে জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডবগণ এবং ব্রাহ্মণরা একসময় আশ্রমে উপবেশন করেছিলেন। প্রিয়বাদিনী দ্রৌপদী এবং সত্যভামাও একস্থানে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। অনেক দিন পর তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁরা দুজনে কুরুকুল ও যদুকুলের সম্পর্কে নানা আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী মহারানি সত্যভামা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগ্নী ! তোমার পতি পাণ্ডবরা লোকপালের ন্যায় বীর ও সুদৃঢ় দেহসম্পন্ন ; এঁরা কখনো তোমার ওপর ক্রুদ্ধ হন না, সর্বদা তোমার ওপর প্রসন্ন থাকেন—তুমি কীভাবে তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চল ? প্রিয়ে, আমি দেখেছি পাণ্ডবরা সর্বদাই তোমার বশে থাকেন এবং তোমার ভালোর দিকেই চেয়ে থাকেন, এর রহস্য আমাকে বলো ! পাঞ্চালী ! তুমি আমাকে সেইরকম কোনো ব্রত, তপ, মন্ত্র, ওষধি, বিদ্যা অথবা যৌবনের প্রভাব বা জপ হোক বা জড়ী-বুটির কথা বলো, যা সৌভাগ্য বৃদ্ধিকারী এবং শ্যামসুন্দরকে সর্বদাই আমার অধীন করতে সক্ষম।'

তখন পতিপরায়ণা সৌভাগ্যবতী দ্রৌপদী তাঁকে বললেন—'সত্যভামা ! তুমি তো আমার কাছে দুরাচারিণী নারীদের আচরণের কথা জানতে চাইছ ! আমি সেই দুষ্ট আচরণকারী স্ত্রীলোকদের কথা কেমন করে জানব ? তাদের ব্যাপারে তোমারও কোনো জিজ্ঞাসা থাকা উচিত নয়। কারণ তুমি শ্রীকৃষ্ণের পাটরানি এবং বুদ্ধিমতী নারী। পতি যখন জানতে পারেন যে, তাঁর পত্নী তাঁকে বশ করার জন্য

মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে তখন তিনি পত্নীর থেকে বহুদূরে সরে যান। এরূপ উদ্বিগ্ন-চিত্ত হলে স্বামীর হৃদয়ে শান্তি আসবে কীভাবে ? আর যে শান্ত নয়, সে সুখলাভ করবে কীভাবে ? সুতরাং তন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে পত্নী কখনো তার পতিকে বশ করতে পারে না। তাছাড়া এতে অনেক ক্ষতি হয়। লোকেরা সেইসব যন্ত্র-মন্ত্রের নামে এমন সব পদার্থ দিয়ে থাকে যাতে ভীষণ অসুখ হতে পারে, শত্রুরা এর ছলে বিষও দিয়ে দিতে পারে। এর ফলে পতি নানাপ্রকার শারীরিক মানসিক রোগের শিকার হয়। সাধ্বী নারীর কখনো এইরূপ অপ্রিয় কাজ করা উচিত নয়।

'যশস্বিনী সত্যভামা ! আমি মহাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করে থাকি তা বিশদভাবে জানাচ্ছি, শোনো। আমি অহংকার এবং কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করে অত্যন্ত সতর্কভাবে সমস্ত পাণ্ডবদের, তাঁদের অন্যান্য স্ত্রীদের সেবা করি। আমি ঈর্ষা পরিহার করে নিজের মনকে বশে রেখে শুধুমাত্র সেবার মনোভাবে পতিদের পছন্দমতো কাজ করি। কখনো অহংকার করি না। কটুবাক্য বলি না, কোনো অসভ্যতাকে স্থান দিই না, অপ্রিয় কথায় কান দিই না, মন্দ স্থানে যাই না, কোনো কু-অভিপ্রায় নিয়ে চলি না। পতিদের মনোভাব বুঝে সেভাবে চলি। দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, যুবক, ধনী, রূপবান—যেমনই পুরুষ হোক, আমার মন পাণ্ডবগণ ব্যতীত আর কোনো দিকে যায় না। পতিদের আহার না হলে আমি ভোজন গ্রহণ করি না, তাঁদের স্নান না হলে স্নান করি না এবং তাঁরা না বসলে উপবেশন করি না। যখন তাঁরা গৃহে আসেন, আমি উঠে তাঁদের আসন এবং জল দিয়ে আপ্যায়ন করি। ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে রাখি এবং তাঁদের মনোমত আহার প্রস্তুত করি এবং সময়মতো তা পরিবেশন করি। সর্বদা সাবধান থাকি। প্রয়োজনে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখি। কথাবার্তায় কখনো কাউকে অপমান করি না, দুষ্ট নারীর সংসর্গ করি না এবং সর্বদা পতির সেবায় তৎপর থেকে আলস্য থেকে দূরে থাকি। আমি দরজাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি না এবং আবর্জনাময়স্থানে যাই না। সদা সত্যভাষণ করি এবং পতিসেবায় তৎপর থাকি। পতিরা ছাড়া একা থাকা আমার পছন্দ নয়। পতিরা কোনো কাজে বাইরে গেলে পুষ্প ও চন্দন পরিত্যাগ করে নিয়ম ও ব্রতপালন করে থাকি। আমার স্বামীরা যা পছন্দ করেন না আমিও তা পরিহার করি। পত্নীদের জন্য শাস্ত্রে যেসব করণীয় কর্তব্য আছে, আমি তার সবই পালন করি। নিজেকে যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করি এবং সর্বদা সাবধানে থেকে পতিদের প্রিয় কাজে তৎপর থাকি।

'আমার শ্বশ্রূমাতা কুটুম্বের প্রতি পালনীয় যেসব ধর্ম বলেছেন, আমি সেগুলি সব পালন করি। ভিক্ষা প্রদান করা, পূজা, শ্রাদ্ধ, উৎসবে নানা আহার তৈরি করা, সম্মানীয়দের সম্মান জানানো এবং যেসব ধর্ম আমার পক্ষে বিহিত, আমি সতর্কতার সঙ্গে সেইসব আচরণ করি। আমি বিনয় এবং নিয়মাদি সবসময় পালন করি। আমার পতিরাও মৃদুভাষী, সরল স্বভাব, সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যধর্মপালন করে থাকেন। আমি সর্বদাই সতর্ক থেকে তাঁদের সেবায় তৎপর থাকি। আমার বিচারে নারীদের পতির অধীনেই থাকা উচিত, তিনিই তাদের ইষ্টদেব এবং আশ্রয়, তাই পতির অপ্রিয় কোনো নারী হবেন কেন ? আমি কখনো পতিদের কাছে স্পর্ধা দেখাই না, তাঁদের থেকে ভালো বেশভূষা করি না এবং শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে কখনো বাদ-বিবাদ করি না এবং সর্বদা সংযম পালন করি। সুভগে ! আমি প্রত্যহ স্বামীদের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠি এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবায় ব্যাপৃত থাকি। এতেই আমার পতিরা বশে থাকেন। বীরমাতা, সত্যবাদিনী, আর্যা কুন্তীকে আমি সর্বদা খাদ্য-বস্ত্র-জল

ইত্যাদি দিয়ে সেবা করি। বস্ত্র, অলংকার এবং আহারাদিতে কখনো আমার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য রাখি না। আগে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহলে প্রত্যহ আটহাজার ব্রাহ্মণ সুবর্ণ পাত্রে আহার করতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অষ্টআশি হাজার গৃহস্থ স্নাতকদের ভরণ-পোষণ করতেন, তাঁর দশহাজার পরিচারক ছিল। তাঁরা রত্নালংকারে সুসজ্জিত থাকত। আমি সকলের নাম, রূপ, আহার, বস্ত্রাদির খবর রাখতাম এবং কে কী কাজ করত তারও হিসাব রাখতাম। মতিমান কুন্তীনন্দনের দশ হাজার দাস-দাসী হস্তে ভোজনপাত্র নিয়ে দিন রাত অতিথিদের সেবায় ব্যস্ত থাকত। ইন্দ্রপ্রস্থে যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যপালন করতেন, তখন একলাখ ঘোড়া এবং এক লাখ হাতি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। তার সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতা আমিই করতাম। তাদের প্রয়োজনের কথা জেনে সেইমতো ব্যবস্থা নিতাম। অন্তঃপুরের দাস-দাসী এবং পরিবার পরিজনের কাজের দেখাশোনা আমিই করতাম।

'যশস্বিনী সত্যভামা ! মহারাজের আয়-ব্যয় এবং জমা-খরচের হিসাব আমিই রাখতাম। পাণ্ডবরা আত্মীয় কুটুম্বের সমস্ত ভার আমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে পূজা-পাঠ এবং অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। আমি সমস্ত সুখ-বিশ্রাম পরিত্যাগ করে সব কাজ করতাম। আমার ধর্মাত্মা পতিদের যে বিপুল রত্নভাণ্ডার ছিল, তা আমিই একমাত্র জানতাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে দিন-রাত পাণ্ডবদের সেবায় ব্যাপৃত থাকতাম, তাই দিন ও রাতের কোনো ভেদাভেদ আমার ছিল না। আমি সর্বদা সবার আগে নিদ্রা থেকে জেগে উঠতাম এবং সকলের শেষে ঘুমোতে যেতাম। পতিদের বশ করার এর থেকে ভালো কোনো উপায় আমার জানা নেই। দুষ্টা নারীদের মতো আচার-ব্যবহার আমি কখনো করি না এবং আমার তা ভালোও লাগে না।'

দ্রৌপদীর এই ধর্মপূর্ণ কথা শুনে সত্যভামা তাঁকে সম্মান জানিয়ে বললেন, 'পাঞ্চালী ! আমার একটি প্রার্থনা আছে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। সখীরা তো হাসি-তামাশা করেও এমন কথা বলে থাকে।'

সত্যভামাকে দ্রৌপদীর উপদেশ এবং সত্যভামার বিদায় গ্রহণ

দ্রৌপদী বললেন—'সত্যভামা ! স্বামীর হৃদয় বশ করার নির্দোষ পথ তোমায় জানালাম। তুমি যদি এই পথ অনুসরণ কর, তাহলে স্বামীর মন স্বতই তোমার দিকে আকর্ষিত হবে। স্ত্রীদের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে পতির ন্যায় আর কোনো দেবতা নেই। তিনি প্রসন্ন হলে নারী সর্বপ্রকার সুখলাভ করতে সক্ষম আর তিনি অসন্তুষ্ট হলে সব সুখ মাটিতে মিশে যায়। হে সাধ্বী ! সুখের দ্বারা কখনো সুখ লাভ করা যায় না, দুঃখই সুখপ্রাপ্তির সাধন। অতএব তুমি সৌহার্দ, প্রেম, পরিচর্যা, কার্যকুশলতা এবং পুষ্প-চন্দন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করো এবং তিনি যাতে তোমার প্রিয়পাত্র হন, সেইরূপ কাজ করো। পতির ফিরে আসার সংবাদ পেলে তুমি অঙ্গনে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ভিতরে এলে আসন এবং পা ধোওয়ার জল দিয়ে আপ্যায়ন করবে। তিনি যদি দাসীকে কোনো কাজের জন্য আদেশ দেন, তুমি নিজে উঠে সেই কাজ করবে। শ্রীকৃষ্ণের যেন মনে হয় তুমিই তাঁকে সর্বভাবে কামনা করো। তোমার পতি যদি এমন কোনো কথা তোমাকে বলেন, যা গুপ্ত রাখার প্রয়োজন নেই, তবুও তুমি তা কাউকে বলবে না। যিনি পতিদেবের প্রিয়, বন্ধু এবং হিতৈষী, তাঁকে নানাভাবে খাদ্য ইত্যাদিতে সন্তুষ্ট রাখ এবং যিনি তাঁর শত্রু, তাঁর থেকে দূরে থাকবে। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব তোমার পুত্র হলেও, তাদের সঙ্গে একান্তে থেকো না। যেসব নারীরা কুলীন, সতী এবং দোষবর্জিত, তাঁদের সঙ্গেই তোমার ভালোবাসা হওয়া উচিত। ক্রূর, কলহপ্রিয়া, ভোজনপটু, চোর, দুষ্টা এবং চঞ্চল স্বভাবসম্পন্না নারীদের থেকে দূরে থাকবে। এইভাবে তুমি তোমার পতির সেবা করো। এরফলে তোমার যশ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাবে। অন্তকালে স্বর্গলাভ করবে এবং দুরাচারিণীরা পরাজিত হবে।'

সেইসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মার্কণ্ডেয় মুনির সঙ্গে এবং মহাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা করছিলেন। তিনি দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার জন্য রথে উঠতে গিয়ে সত্যভামাকে ডাকলেন। সত্যভামা তখন দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে নানা স্নেহপূর্ণ প্রিয় কথা বললেন। তিনি

বললেন, 'কৃষ্ণা ! তুমি চিন্তা কোরো না, ব্যাকুল হয়ো না। রাতভর জেগে থেকো না। তোমার দেবতুল্য পতিরা আবার নিজ রাজ্য ফিরে পাবেন। তোমার মতো শীলসম্পন্না, সম্মানীয়া নারী বেশিদিন দুঃখভোগ করতে পারে না। আমি মুনি ঋষিদের কাছে শুনেছি যে, তুমি নিশ্চয়ই নিষ্কণ্টক হয়ে পতিদের সঙ্গে রাজ্যভোগ করবে। তুমি দেখবে অতি শীঘ্রই দুর্যোধনকে বধ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির পৃথিবী জয় করবেন। তোমার দুঃখ দেখেও যারা তোমার অপ্রিয় কাজ করেছে, জেনে রাখো তারা সকলেই নরকভোগ করবে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব থেকে যে তোমার প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামক পাঁচপুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তারা সকলেই শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ বীর। তারা অভিমন্যুর মতোই অত্যন্ত আনন্দে দ্বারকায় রয়েছে। সুভদ্রা তোমার মতোই স্নেহে তাদের দেখাশোনা করেন। তিনি কোনোপ্রকার ভেদভাব না করে সকলকেই আদর-যত্নে রাখেন। প্রদ্যুম্নের মাতা রুক্মিণীও তাদের সব আবদার পূর্ণ করেন, শ্রীশ্যামসুন্দরও নিজ পুত্রদের মতোই তাদের ভালোবাসেন। আমার শ্বশুর তাদের খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির দেখাশোনা করেন এবং শ্রীবলরাম প্রমুখ সব অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশী যাদব তাদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন। প্রদ্যুম্ন এবং তোমার পুত্রদের প্রতি তাঁদের একই প্রকার স্নেহ ভালোবাসা।' এইরূপ নানা প্রিয়, সত্য, আনন্দদায়ক, অনুকূল কথা বলে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রথে চড়তে উদ্যত হলেন। দ্রৌপদীকে পরিক্রমা করে তিনি রথে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন এবং রথে করে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

কৌরবদের ঘোষযাত্রা এবং গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—এইভাবে বনে বসবাস করে শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, বাদল সহ্য করায় নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদের শরীর নিশ্চয়ই খুব কৃশ হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় তাঁরা দ্বৈতবনের পবিত্র সরোবরে এসে কী করলেন, আমাকে সেই কথা বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সেই রমণীয় সরোবরে এসে পাণ্ডবরা তাঁদের হিতৈষীদের নিজ নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিলেন, তারপর সেখানে কুটির নির্মাণ করে আশপাশের রমণীয় বন, পর্বত এবং নদীতীরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ যখন বনে বাস করছিলেন, তখন তাঁদের কাছে অনেক বেদাধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ আসতেন এবং পাণ্ডবরা যথাসাধ্য তাঁদের সেবা করতেন। সেইসময় এক ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন, তিনি কথাবার্তায় অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে সেই ব্রাহ্মণ কৌরবদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। বৃদ্ধ কুরুরাজ তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করে আগ্রহ সহকারে পাণ্ডবদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন—'যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই অত্যন্ত কষ্টে আছেন, গরমে এবং ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁরা সকলেই খুব কৃশ হয়ে গেছেন। দ্রৌপদী রাজবধূ হয়েও অনাথার মতো সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করছেন।'

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন রাজপুত্র এবং রাজা হয়েও তাঁরা এরূপ কষ্টে রয়েছেন, তখন তাঁর হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হল, তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে অপরাধী
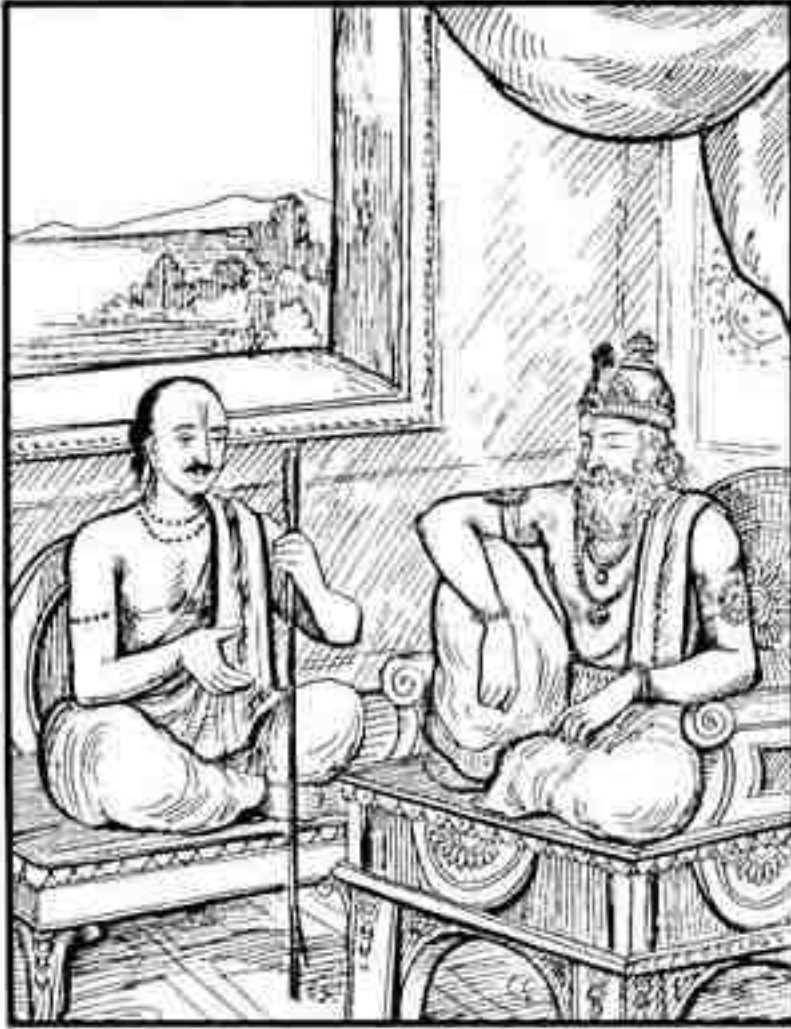
করবে না, অর্জুনও তাঁকেই অনুসরণ করবে। কিন্তু এই বনবাসের কষ্টে ভীমের কোপ তো তেমন করেই বেড়ে চলবে, যেমন করে হাওয়াতে আগুন বেড়ে ওঠে। সেই ক্রোধানলে সে আমার পুত্রদের জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করবে। জানি না, এই দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনের বুদ্ধি কোথায় গিয়েছিল। তারা জুয়া খেলে যে রাজ্য জয় করেছে, যাকে মধুর মতো মিষ্ট বলে ভাবছে, তাতে যে কী সর্বনাশ হবে, তা তারা ভাবছে না। দেখো! শকুনি কপট জুয়া খেলে ভালো করেনি, তা সত্ত্বেও পাণ্ডবরা এত ভালো যে তখনই তাকে বধ করেনি। কিন্তু আমিও আমার কুপুত্রের মোহে অন্ধ হয়ে এমন কাজ করে ফেললাম, যাতে তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত হল। সব্যসাচী অর্জুন অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, তার গাণ্ডীব ধনুক অত্যন্ত বেগসম্পন্ন। তাছাড়া সে আরও বহু দিব্যাস্ত্র লাভ করেছে। আমাদের এখানে এমন কে আছে যে ওদের সেই তেজ সহ্য করতে সক্ষম!'

ধৃতরাষ্ট্রের এই বিলাপ শকুনি শুনলেন এবং কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গিয়ে একান্তে সব কথা জানালেন। এইসব কথা শুনে অল্পবুদ্ধি দুর্যোধনও বিমর্ষ হয়ে গেলেন। শকুনি আর কর্ণ তখন তাঁকে বললেন—'ভরত-নন্দন! তুমি তোমার পরাক্রমেই পাণ্ডবদের এখান থেকে দূর করেছ। তুমি একাই ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য ভোগের মতো পৃথিবীর এই রাজ্য ভোগ করো। দেখো, তোমার বাহুবলে আজ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—চারদিকের নৃপতিরাই তোমাকে কর-প্রদান করেন। যে রাজলক্ষ্মী পূর্বে পাণ্ডবদের প্রতি ছিল, তা আজ তুমি ও তোমার ভাইরা লাভ করেছ। রাজন্! শুনেছি পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে এক সরোবরের তীরে কিছু ব্রাহ্মণ সহ বসবাস করেন। তাই আমাদের ইচ্ছা তোমরা অত্যন্ত সাজ-সজ্জা সহকারে সেইখানে যাও এবং সূর্য যেমন তাঁর তাপে পৃথিবীকে তপ্ত করেন, সেইভাবে তোমাদের তেজে পাণ্ডবদের সন্তপ্ত করো। তোমার মহিষীরাও যেন বহুমূল্য রত্নালংকারে সুসজ্জিত হয়ে তোমাদের সঙ্গে ভ্রমণে যান এবং মৃগচর্ম এবং বল্কলধারিণী কৃষ্ণাকে দেখে তৃপ্ত হন ও নিজ ঐশ্বর্যের দ্বারা কৃষ্ণাকে ক্রোধতপ্ত করে দেন।'

জনমেজয়! দুর্যোধনকে এইসব কথা বলে কর্ণ ও শকুনি চুপ করলেন। রাজা দুর্যোধন তখন বললেন—'কর্ণ! তুমি যা বলছ আমারও তা মনে হয়েছে, পাণ্ডবদের বল্কল ও মৃগচর্ম পরিহিত দেখে আমাদের যত আনন্দ হবে, সারা পৃথিবীর রাজ্য পেলেও তত আনন্দ হবে না। এর থেকে বেশি প্রসন্নতা আমার আর কীসে হবে যদি দ্রৌপদীকে গেরুয়া বস্ত্র পরে থাকতে দেখি! কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না কী

ছলে আমি দ্বৈতবনে যাব এবং মহারাজ আমাকে অনুমতি দেবেন কি না ! তুমি মাতুল শকুনি এবং দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে এমন এক উপায় বার কর যাতে আমি দ্বৈতবনে যেতে পারি।'

তখন সকলে 'ঠিক আছে' বলে যে যার স্থানে চলে গেলেন। রাত্রি শেষে আবার সকলে দুর্যোধনের কাছে এলেন। কর্ণ হেসে দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! দ্বৈতবনে যাওয়ার আমি এক উপায় বার করেছি, শুনুন ! আপনার গোরুর পাল এখন দ্বৈতবনেই রয়েছে এবং তারা আপনারই প্রতীক্ষা করছে। সুতরাং ঘোষযাত্রার কথা বলে আমরা সেখানে যাব।' শকুনি এই কথা শুনে হেসে বললেন—'দ্বৈতবন যাওয়ার এই উপায় আমারও খুব উপযুক্ত মনে হয়েছে। মহারাজ এই কথায় আমাদের নিশ্চয়ই যাওয়ার অনুমতি দেবেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্যও বলবেন। গোরক্ষকেরা সেখানে তোমার প্রতীক্ষা করছে, অতএব ঘোষযাত্রার ছলে আমরা সেখানে নিশ্চয়ই যেতে পারি।'

জনমেজয় ! এইরূপ পরামর্শ করে তাঁরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। সকলে ধৃতরাষ্ট্রের কুশল সংবাদ নিলেন, ধৃতরাষ্ট্রও সুখ-সুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা আগে থেকেই সমঙ্গ নামক একজন গোপকে বুঝিয়ে ঠিক করে এনেছিলেন। সে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলল—'মহারাজ ! আপনার গো-ধন এখন রাজধানীর কাছেই এসেছে।' তখন কর্ণ এবং শকুনি বললেন—'মহারাজ, এখন আপনার গোধন অত্যন্ত রমণীয় স্থানে রয়েছে। এখনই গাভী এবং গোবৎস গণনা করা এবং তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার উপযুক্ত সময়। আপনি দুর্যোধনকে ওখানে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।' এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বৎস ! গোধন দেখাশোনা করাতে আমার কোনো আপত্তি নেই ; কিন্তু আমি শুনেছি নরশার্দুল পাণ্ডবরা এখন ওদিকেই আশপাশে কোথাও বাস করছে। সেইজন্য আমি তোমাদের ওদিকে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। কারণ তোমরা ওদের কপটভাবে জুয়াতে হারিয়েছ এবং ওরা বনে গিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করছে। কর্ণ ! ওরা বনে থেকে তপস্যা করছে এবং এখন ওরা সর্বপ্রকার শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তোমরা অহংকারে মত্ত হয়ে আছ, তাই ওদের অসম্মান করে ছাড়বে ; তাহলে ওরাও ওদের তপস্যার বলের প্রভাবে অবশ্যই তোমাদের ভস্ম করে ফেলবে। শুধু তাই নয়, অনেক অস্ত্রশস্ত্রও আছে। সুতরাং ওরা ক্রোধান্বিত হলে তোমাদের আর রক্ষা নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে তোমরা যদি কোনোপ্রকারে ওদের পরাজিত করো, তাহলেও তোমাদের নীচতাই প্রকাশ পাবে। আমি তো ওদের পরাজিত করা তোমাদের অসম্ভব বলেই মনে করি। দেখো, যখন অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভ করেনি, তখনই সে পৃথিবী জয় করেছিল ; এখন দিব্যাস্ত্র লাভ করে তোমাদের ধ্বংস করা ওদের পক্ষে এমন কী বড় কাজ ? তাই আমার মনে হয় ওখানে তোমাদের না যাওয়াই উচিত। গোধন গণনা করার জন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে পাঠানো যেতে পারে।' তখন শকুনি বললেন—'রাজন্ ! আমরা শুধু গোধনের সংখ্যা নির্ণয় করতে চাইছি। পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। তাই আমাদের দ্বারা কোনোপ্রকার অশালীন আচরণের সম্ভাবনা নেই। পাণ্ডবরা যেখানে বাস করছে, আমরা সেদিকে যাব না।'

শকুনির কথায় ইচ্ছা না থাকলেও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীসহ দুর্যোধনকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। তাঁর আদেশ পেয়ে রাজা দুর্যোধন বিশাল সৈন্য নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে দুঃশাসন, শকুনি, আরো কয়েকজন ভাই এবং তাঁদের স্ত্রীরাও অনুগামী হলেন। এঁরা ছাড়াও আট হাজার রথ, ত্রিশ হাজার হাতি, হাজার হাজার পদাতিক এবং নয় হাজার ঘোড়সওয়ারও ছিল। অস্ত্রশস্ত্র ও

জিনিসপত্র বহন করার জন্য বহু গাড়ি, বাহন, বেনে ও বন্দীও তাঁদের সঙ্গে চলল। এঁরা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝেই এক এক স্থানে শিবির ফেলে রাত কাটাতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গীরাও নিজ নিজ স্থান নির্বাচন করে শিবির স্থাপন করত। এইভাবে ক্রমশ তাঁরা ঘোষদের কাছে পৌঁছে রমণীয়, সজল, সুন্দর স্থান দেখে শিবির স্থাপন করলেন, তাঁদের সঙ্গীরাও আশেপাশে স্থান নির্বাচন করে বসলো।

সকলের ঠিকমতো শিবির স্থাপন হয়ে গেলে দুর্যোধন তাঁর অসংখ্য গোধন নিরীক্ষণ করে তাদের গণনা করে, পৃথক পৃথক নম্বর দিয়ে আলাদা করে নিলেন। তারপর তিন বছরের গোবৎসগুলিকে পৃথক করে তাদের চিহ্নিত করে রাখলেন। এইভাবে সমস্ত গাভী ও গোবৎস্য পৃথকভাবে চিহ্নিত করে তাঁরা মহানন্দে বনে বিচরণ করতে লাগলেন এবং ক্রমশ দ্বৈতবনে এসে পৌঁছলেন। সেই সময় তাঁদের সাজসজ্জা-বেশভূষায় অহংকারের মাত্রা খুবই বেশি হয়েছিল। অতি নিকটে সেই সরোবরের তীরেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি কুটির তৈরি করে বাস করছিলেন। তিনি সেই দিন মহারানি দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে দিব্য বিধিতে রাজর্ষি নামের এক যজ্ঞ করছিলেন। দুর্যোধন তাঁর হাজার হাজার সেবককে আদেশ দিলেন সেখানে অতি সত্বর এক ক্রীড়াভবন নির্মাণ করার জন্য। সেবকেরা রাজাজ্ঞায় ক্রীড়াভবন নির্মাণ করার জন্য দ্বৈতবনের সরোবরে গেলে গন্ধর্বরা তাদের বনে প্রবেশ করতে বাধাপ্রদান করেন। কারণ দুর্যোধনেরা আসার আগেই সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন জলক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁর সেবক, দেবতা এবং অপ্সরাদের নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁরাই সরোবরের পাশে অবস্থান করছিলেন।

দুর্যোধনের লোকেরা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুর্যোধনের কাছে ফিরে এল। তাদের কথা শুনে দুর্যোধন তাঁর সেনাদের গন্ধর্বদের সেখান থেকে বার করার আদেশ দিয়ে পাঠালেন। তারা গিয়ে গন্ধর্বদের বলল 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র মহাবলী মহারাজ দুর্যোধন এখানে জলবিহার করতে আসছেন, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।' সেনাদের কথায় গন্ধর্বরা হাসতে হাসতে বললেন—'তোমাদের রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত অল্পবুদ্ধি বলে মনে হচ্ছে, তার কোনো হুঁশ নেই, তাই আমাদের ওপর হুকুম দিচ্ছে, যেন আমরা তার প্রজা ! তোমরাও নিঃসন্দেহে হতভাগা, মৃত্যুমুখে যেতে চাও। তোমরা তোমাদের রাজার কাছে ফিরে যাও, নাহলে এখনই তোমাদের যমের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

সব যোদ্ধারা একত্রিত হয়ে দুর্যোধনের কাছে এসে গন্ধর্বদের কথা জানাল। দুর্যোধন এই কথা শুনে ক্রোধে অগ্নিগর্ভ হয়ে সেনাপতিদের আদেশ দিলেন যে, 'আমার অপমানকারী পাপীদের শাস্তি দাও। ওখানে যদি দেবতাদের সঙ্গে স্বয়ং ইন্দ্রও এসে থাকেন তবে তোমরা তা গ্রাহ্য করবে না, সকলকেই আঘাত করবে।' দুর্যোধনের আদেশ পেয়েই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কয়েক সহস্র যোদ্ধা নিয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে জোর করে বনে প্রবেশ করল।

গন্ধর্বরা তাদের প্রভু চিত্রসেনকে গিয়ে সমস্ত বিবরণ জানাল। তখন তিনি তাদের বললেন—'যাও, এই নীচ কৌরবদের উচিত শাস্তি দাও।' গন্ধর্বরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবার কৌরবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের অস্ত্র নিয়ে আসতে দেখে কৌরবরা এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল। তখন দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের আরো কয়েকজন পুত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কর্ণ সবার আগে চললেন। দুই পক্ষে ভীষণ রোমাঞ্চকর যুদ্ধ শুরু হল। কৌরবদের বাণের আঘাতে গন্ধর্বদের মনোবল ক্ষীণ হয়ে গেল। গন্ধর্বদের ভীত হতে দেখে চিত্রসেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি কৌরবদের বধ করার জন্য মায়া অস্ত্র বার করলেন। চিত্রসেনের মায়াতে কৌরবরা হতচকিত হয়ে পড়ল। সেইসময় এক একজন কৌরবকে দশজন করে গন্ধর্ব বীর ঘিরে ধরেছিল। তাদের আঘাতে আহত হয়ে তারা রণভূমি থেকে পালাতে লাগল। কৌরব সেনা এইভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শুধু কর্ণই নিজস্থানে অচল থেকে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি আহত হলেও গন্ধর্বদের কাছে তাঁরা পশ্চাৎ প্রদর্শন করলেন না। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন গন্ধর্বরা হাজারে হাজারে একত্রিত হয়ে কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁরা কর্ণের রথ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলেন। কর্ণ তখন ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে নেমে প্রাণরক্ষার জন্য বিকর্ণের রথে চড়লেন।

অগত্যা দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য রণভূমি থেকে পালাতে লাগল। দুর্যোধনের অন্য ভাইরা রণভূমি পরিত্যাগ করলেও দুর্যোধন রণভূমি ত্যাগ করলেন না। তিনি যখন দেখলেন চিত্রসেনের সমস্ত সৈন্য তাঁর দিকেই আসছে, তিনি বাণের দ্বারা তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গন্ধর্বরা তার কোনোপ্রকার পরোয়া না করে চারদিক থেকে তাঁকে

ঘিরে ধরল। তারা বাণের আঘাতে দুর্যোধনের রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, দুর্যোধন রথ থেকে পড়ে যেতেই চিত্রসেন তাঁকে

জীবিত উদ্ধার করে বন্দী করলেন। গন্ধর্বরা তারপর দুঃশাসনকেও ধরে আনল। কিছু গন্ধর্ব রাজমহিষীদের ধরে নিয়ে এল। দুর্যোধনের যেসব সৈন্য আগেই পালিয়েছিল, তারা গিয়ে পাণ্ডবদের শরণ গ্রহণ করল। দুর্যোধনের মন্ত্রীরা করুণভাবে ধর্মরাজকে বলল—'মহারাজ ! আমাদের প্রিয়দর্শী মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রকুমার দুর্যোধনকে গন্ধর্বরা বন্দী করেছে। তারা দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, দুর্জয় এবং সমস্ত রানিদেরও বন্দী করেছে। আপনি সত্বর ওদের রক্ষা করুন।'

দুর্যোধনের প্রবীণ মন্ত্রীদের এইভাবে দীন ও দুঃখীর মতো যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখে ভীম বললেন—'আমরা বহু চেষ্টা করে অস্ত্রশস্ত্র হাতি ঘোড়া নিয়ে যে কাজসম্পন্ন করতাম, আজ গন্ধর্বরা তা করে দিয়েছে। আমরা শুনেছি যারা দুর্বল ব্যক্তিদের ঈর্ষা করে, অন্য লোকই তাদের শায়েস্তা করে দেয়। গন্ধর্বরা আমাদের তাই প্রত্যক্ষ দেখাল। এই সময় আমরা বনবাসে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সহ্য করে এবং তপস্যা দ্বারা ক্লিষ্ট। অন্যদিকে দুর্যোধনরা অনুকূল অবস্থা পেয়ে আনন্দে আমাদের দুর্গতি দেখতে এসেছে। আসলে কৌরবরা অত্যন্ত কুটিল'—ভীম এইরূপ বলতে থাকলে ধর্মরাজ বললেন—'ভাই ভীম ! এখন কঠিন বাক্য বলার সময় নয়। দেখো, এঁরা অত্যন্ত ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ত্রাণের আশায় আমাদের কাছে এসেছেন, এইসময় কেন এমন কথা বলছ ? আত্মীয়-কুটুম্বে বাদ বিবাদ হয়েই থাকে, কখনো শত্রুতাও হয় ; কিন্তু যখন বাইরের শত্রু আক্রমণ করে তখন সেই অপমান কারো সহ্য করা উচিত নয়। ভীম ! গন্ধর্বরা বলপূর্বক দুর্যোধনদের ধরে নিয়ে গেছে, আমাদের কুলবধূরা এখন অপরের অধীনে। প্রকান্তরে এটি আমাদের বংশেরই অপমান। সুতরাং হে শূরবীর ! যাও শরণাগতকে রক্ষা করতে এবং কুলের লজ্জা রক্ষা করতে অস্ত্রধারণ করো ! দেরী কোরো না, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলে গিয়ে ওদের উদ্ধার করে আনো। দেখো, কৌরবদের স্বর্ণনির্মিত রথে অস্ত্রশস্ত্র আছে, তোমরা তাইতে আহরণ করে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওদের মুক্ত করে সাবধানে নিয়ে এসো। প্রত্যেক রাজাই তাঁর শরণাগতকে যথাসাধ্য রক্ষা করে থাকেন, তুমি তো মহাবলী ভীম ! এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে যে আজ দুর্যোধন তোমার বাহুবলের অপেক্ষায় নিজের জীবন আশা করছে। বীর, আমি নিজেও তোমাদের সঙ্গে যেতাম, কিন্তু আমি যজ্ঞ আরম্ভ করেছি, আমার এখন অন্য কিছু ভাবতে নেই। দেখো, গন্ধর্বরাজকে বোঝালে তিনি যদি না বোঝেন, তাহলে একটু পরাক্রম দেখিয়ে যুদ্ধ করেও ওদের পরাজিত করে দুর্যোধনদের মুক্ত করে আনবে।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন,

'যদি বোঝালে গন্ধর্ব চিত্রসেন কৌরবদের মুক্ত করতে রাজি না হন, তাহলে পৃথিবী আজ গন্ধর্বরাজের রক্তপান করবে।' সত্যবাদী অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে কৌরবরা প্রাণের আশ্বাস পেল।

—— o ——

গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের দুর্যোধনদের মুক্ত করে আনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীমাদি সকলেই হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যুদ্ধের জন্য উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তুত হলেন। তারপর তাঁরা অভেদ্য কবচ এবং দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গন্ধর্বদের আক্রমণ করলেন। বিজয়োন্মত্ত গন্ধর্বরা যখন দেখলেন যে, লোকপালের মতো চার পাণ্ডব রথে করে রণভূমিতে এসেছেন, তখন তাঁরা ব্যূহরচনা করে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন।

অর্জুন গন্ধর্বদের মিষ্টস্বরে বোঝালেন—'তোমরা আমার ভ্রাতা রাজা দুর্যোধনকে মুক্ত করে দাও।' গন্ধর্বরা বললেন—'আমরা একমাত্র গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ছাড়া আর কারো নির্দেশ মানি না। তিনি যেমন আদেশ করেন, আমরা সেইমতো কাজ করে থাকি।' গন্ধর্বদের কথা শুনে কুন্তী-নন্দন অর্জুন বললেন—'অপরের স্ত্রীদের ধরে আনা এবং মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করা—এরূপ নিন্দনীয় কাজ গন্ধর্বরাজের পক্ষে শোভনীয় নয়। তোমরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ মেনে মহাপরাক্রমশালী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের ছেড়ে দাও। আর যদি শান্তিপূর্ণভাবে এঁদের ছেড়ে না দাও, তাহলে আমি আমার পরাক্রমে এঁদের মুক্ত করব।' এই কথাও যখন গন্ধর্বরা মানলেন না তখন অর্জুন তাঁদের ওপর তীক্ষ্ণবাণ প্রয়োগ করতে লাগলেন, গন্ধর্বরাও বাণবর্ষা শুরু করলেন। অর্জুন আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা হাজার হাজার গন্ধর্বকে যমালয়ে পাঠালেন। মহাবলী ভীমও তীক্ষ্ণ তীরের দ্বারা বহু গন্ধর্বকে হত্যা করলেন। মাদ্রীপুত্র নকুল এবং সহদেবও সংগ্রাম-ভূমিতে এসে বহু শত্রুদের ঘিরে ফেলে হত্যা করতে লাগলেন। মহারথী পাণ্ডবরা যখন গন্ধর্বদের এইরূপ দিব্য অস্ত্রের সাহায্যে বধ করতে থাকলেন সেইসময় গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছিলেন। কুন্তীপুত্র অর্জুন তাঁদের আকাশে উড়তে দেখে বাণের দ্বারা এমন বিস্তৃত এক জাল রচনা করলেন, যার ফলে চারদিক দিয়ে তাঁদের যাত্রাপথ রুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁরা সেই জালে এমনভাবে আবদ্ধ হলেন যেমন খাঁচায় পাখি বন্ধ করে রাখা হয়। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর গদা, শক্তি, তোমর ইত্যাদি নানা অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। মহাবীর অর্জুনও তাঁদের ওপর স্থূলাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় এবং সৌম্য ইত্যাদি অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। বাণের জালে তাঁরা কোথাও যেতে না পেরে অস্ত্রের আঘাতে আহত হতে থাকলেন।

চিত্রসেন যখন দেখলেন অর্জুনের বাণের আঘাতে গন্ধর্বরা ত্রাহি রবে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি একটি গদা হাতে করে সেই দিকে গেলেন। অর্জুন বাণের সাহায্যে সেই লৌহ গদাকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন চিত্রসেন মায়াদ্বারা অদৃশ্য হয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন তাতে ক্রোধান্বিত হয়ে আকাশচারী দিব্যাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করতে লাগলেন। বিপক্ষ অন্তর্ধানে থাকলেও এই অস্ত্র শব্দ অনুসরণ করে তাদের আঘাত করে। অর্জুনের অস্ত্রে জর্জরিত হয়ে চিত্রসেন প্রকটিত হয়ে বললেন—'অর্জুন !

দেখো এই যুদ্ধে তোমার সামনে তোমারই সখা চিত্রসেন উপস্থিত।' অর্জুন সখাকে অস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত হতে দেখে দিব্যাস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন। পাণ্ডবরা এসব দেখে খুশি হলেন এবং রথে উপবিষ্ট ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, চিত্রসেনের কুশল সংবাদ নিতে লাগলেন।

মহাধনুর্ধর অর্জুন তখন মৃদুহাস্যে চিত্রসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বীরবর ! কৌরবদের তুমি কী উদ্দেশ্যে পরাজিত করেছ ? দুর্যোধনদের তাদের স্ত্রীসহ কেন বন্দী করে রেখেছ ?' চিত্রসেন বললেন—'বীর ধনঞ্জয় ! দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গেই দুরাত্মা দুর্যোধন ও পাপী কর্ণের অভিপ্রায় জানতে পেরেছিলেন। তারা ভেবেছিল এখন পাণ্ডবরা বনে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনাথের ন্যায় বহু কষ্টে আছে আর নিজেরা খুব আনন্দে আছে, তাই তোমাদের দেখতে এবং দুর্দশাগ্রস্ত যশস্বিনী দ্রৌপদীকে বিদ্রূপ করার জন্য এখানে এসেছিল। তাদের এই নীচ মনোবৃত্তি জানতে পেরে ইন্দ্র আমাকে বললেন—যাও দুর্যোধনকে তার মন্ত্রী এবং ভ্রাতাসহ এখানে বেঁধে নিয়ে এসো। কিন্তু অর্জুনকে তার ভ্রাতাসহ রক্ষা করবে, কারণ সে তোমার প্রিয় সখা এবং (সংগীত বিদ্যার) শিষ্য। দেবরাজের কথায় আমি সত্বর এখানে এসে দুষ্টকে বন্দী করেছি। এখন আমি ইন্দ্রের নির্দেশানুসারে এই দুরাত্মাকে নিয়ে দেবলোকে যাচ্ছি।' অর্জুন বললেন—'চিত্রসেন ! তুমি যদি আমার প্রিয়কাজ করতে চাও তাহলে ধর্মরাজের আদেশে আমার ভাই দুর্যোধনকে মুক্ত করে দাও।'

চিত্রসেন বললেন—'অর্জুন, এই দুর্যোধন বড়ই পাপী আর অহংকারী, একে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এ ধর্মরাজকে এবং কৃষ্ণাকে ছলনা করেছে। ধর্মরাজকে ও যে এখন কী করতে চেয়েছিল, তার ঠিক নেই। চলো, ধর্মরাজকে সব বলে আসি ; তারপর তাঁর যা ইচ্ছা হবে, তেমনই করা যাবে।'

তখন সকলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে তাঁকে সব ঘটনা জানালেন। অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন গন্ধর্বদের কথা শুনে তাঁদের প্রশংসা করলেন এবং সমস্ত কৌরবদের মুক্ত করার জন্য বললেন। তিনি গন্ধর্বদের বললেন—'আপনারা বলবান এবং শক্তিশালী, অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনারা আমার ভ্রাতা-বন্ধু ও মন্ত্রীগণসহ দুর্যোধনকে বধ করেননি। আমার ওপর আপনাদের অত্যন্ত দয়া।' তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অপ্সরাসহ চিত্রসেনাদি গন্ধর্বগণ প্রসন্নচিত্তে
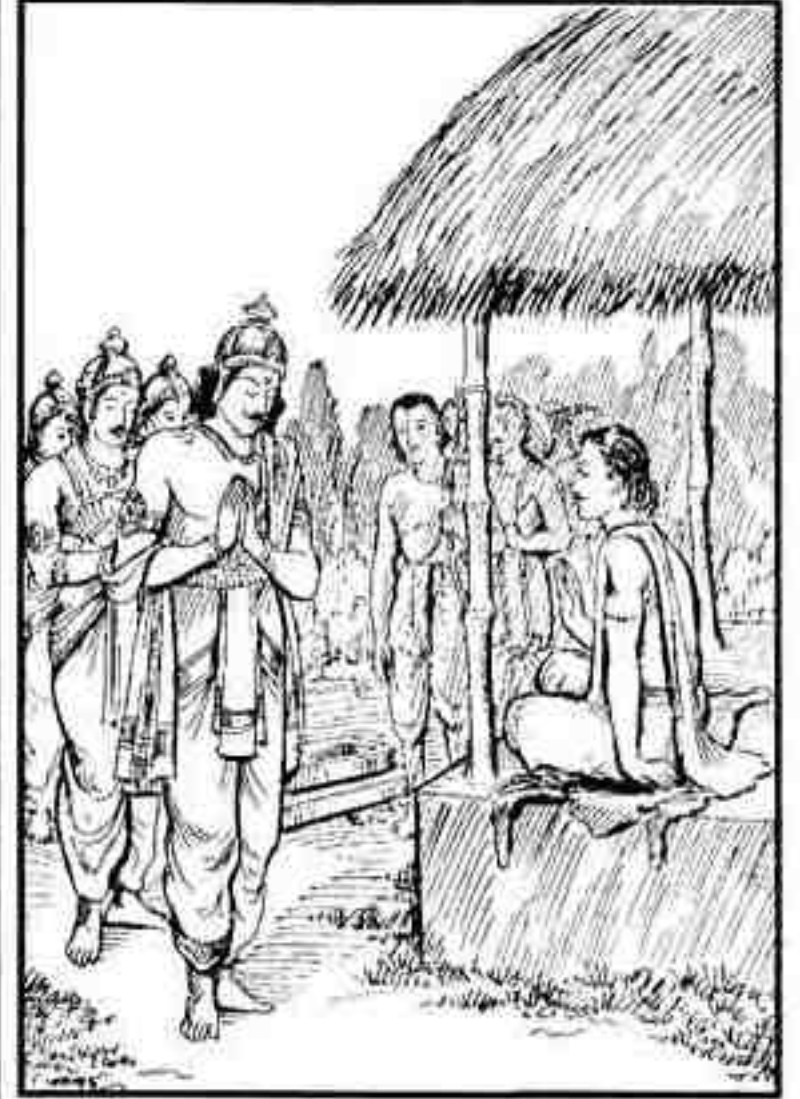
স্বর্গে চলে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে কৌরবদের হাতে নিহত গন্ধর্বদের জীবন দান করলেন। স্বজন এবং রাজমহিষীদের গন্ধর্বদের থেকে মুক্ত করে পাণ্ডবরাও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কৌরবরাও স্ত্রী-পুত্র সহ পাণ্ডবদের অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করল।

ভ্রাতাসহ বন্ধনমুক্ত দুর্যোধনকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত মধুর স্বরে বললেন—'ভাই, আর কখনো এমন দুঃসাহসের কাজ কোরো না, দেখো দুঃসাহসী লোকেরা কখনো সুখ পায় না। তুমি এবার সকলকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাও। এই ঘটনার জন্য মনে কোনো দুঃখ রেখ না।' দুর্যোধন ধর্মরাজকে প্রণাম করে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। সেই সময় তিনি এত বিষণ্ণ হয়েছিলেন যেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে দুঃখে-ক্ষোভে তাঁর হৃদয় ফেটে যাচ্ছিল।

——০——

দুর্যোধনের অনুতাপ এবং প্রাণ-ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! লজ্জায় দুর্যোধনের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল এবং শোকেও নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় তিনি কীভাবে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন, আমাকে তা বিস্তারিতভাবে জানান।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠির যখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে বিদায় জানালেন, তখন তিনি লজ্জায় মুখ নীচু করে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। পথে এক শ্যামল সরোবরের তীরে তাঁরা বিশ্রাম করলেন। কর্ণ সেখানে তাঁর কাছে এসে বললেন—'রাজন্ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনার জীবন রক্ষা পেয়েছে এবং

আমরা পুনরায় মিলিত হতে পেরেছি। আপনার সামনেই গন্ধর্বরা আমাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করে আটকে রেখেছিল যে আমি তাদের বাণে আহত সৈন্যদের সামলাতে পারছিলাম না। শেষে আর না পেরে ওখান থেকে পালাতে হল। সেই অতিমানবিক যুদ্ধে আপনি রানি ও সৈন্যসহ ভালোভাবে ফিরে এসেছেন কোনোরকম আহত হননি দেখে আমি খুব বিস্মিত বোধ করছি। আপনি ভ্রাতাদের নিয়ে যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশ করলেন—জগতে অন্য কোনো পুরুষ এইরূপ করতে সক্ষম নয়।'

কর্ণের এই কথায় রাজা দুর্যোধন আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—'রাধেয় ! তুমি প্রকৃত কথা জানো না, তাই আমি তোমার কথার দোষ ধরছি না। তুমি মনে করছ যে আমি আমার পরাক্রমে গন্ধর্বদের হারিয়েছি। প্রকৃত ব্যাপার হল, আমার এবং আমার ভাইদের সঙ্গে গন্ধর্বদের বহুক্ষণ যুদ্ধ হয়েছিল। দুপক্ষেই বহু হতাহত হয়। কিন্তু ওরা যখন মায়ার আড়ালে যুদ্ধ করতে লাগল তখন আমরা আর ওদের সম্মুখীন হতে পারলাম না। শেষে আমরা পরাজিত হলাম এবং গন্ধর্বরা আমাদের সেবক, মন্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী সহ সকলকেই বন্দী করে ফেলল। তারপর তারা আমাদের আকাশপথে নিয়ে চললো। সেই সময় কয়েকজন মন্ত্রী এবং সৈন্য পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে আমাদের অবস্থার কথা জানাল। তখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের বুঝিয়ে আমাদের উদ্ধারের নির্দেশ দিলেন। পাণ্ডবরা সেখানে এলেন এবং গন্ধর্বদের হারাবার শক্তি থাকলেও তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু গন্ধর্বরা আমাদের ছেড়ে দিতে রাজি হল না। তখন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁদের দিকে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। গন্ধর্বরা রণভূমি ছেড়ে তখন আমাদের আকাশপথে নিয়ে যেতে লাগল। আমি দেখলাম অর্জুন সমস্ত দিক বাণের জালে ঘিরে দিব্য অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করছে। অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে গন্ধর্বরা আহত হতে থাকলে অর্জুনের মিত্র চিত্রসেন প্রকটিত হলেন। দুজনে তখন কুশলবার্তা বিনিময় করলেন। কর্ণ ! তারপর শত্রুদমন অর্জুন হেসে বললেন— 'বীরবর ! আপনি আমার ভাইদের ছেড়ে দিন। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকতে এদের এরূপ অপমান হওয়া উচিত নয়।' মহাত্মা অর্জুনের কথায় গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন বললেন যে আমরা পাণ্ডবদের তাদের স্ত্রীসহ কী দুর্দশায় আছে তাই দেখতে গেছি। চিত্রসেন যখন এই কথা বলছিলেন আমার লজ্জায় মনে হচ্ছিল যে যদি পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হয় তবে আমি তার মধ্যে মিশে যাই। তারপর পাণ্ডবদের সঙ্গে গন্ধর্বরা যুধিষ্ঠিরের কাছে আমাদের সেই বন্দী অবস্থায় দাঁড় করিয়ে সেই নীচ চিন্তার কথা জানাল। স্ত্রীদের সামনে এইভাবে দীন ও বন্দীরূপে আমাকে যুধিষ্ঠিরের সামনে হাজির করানো হয়েছিল, বলো, এর থেকে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে ? যাঁকে আমি সর্বদা অনাদর করেছি, যাঁকে সর্বদা শত্রু ভেবে রেখেছি। তিনিই আমার ন্যায় মন্দবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে জীবনদান করলেন। হে বীর ! এর থেকে ওই মহাসংগ্রামে যদি আমি মারা পড়তাম,

তাহলে অনেক ভালো হত। এইভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ ? গন্ধর্বরা যদি আমায় বধ করত, তাহলে জগতে আমার যশ হত আর ইন্দ্রলোকে অক্ষয় পুণ্যলাভ করতাম। এখন আমি যা ঠিক করেছি, শোনো। আমি এইখানেই অন্ন-জল ত্যাগ করে অনাহারে প্রাণ বিসর্জন করব। তুমি দুঃশাসনের সঙ্গে আমার ভাইদের নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে যাও। আমি সেখানে গিয়ে মহারাজকে কী বলব ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা এবং যত প্রবীণ বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণরা আমাকে কী বলবেন, আর আমি কী উত্তর দেব ? এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।'

দুর্যোধন তখন অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ছিলেন। পুনরায় তিনি দুঃশাসনকে বললেন—'ভাই, শোনো, আমি তোমাকে রাজ্য সমর্পণ করছি। তা স্বীকার করে তুমি রাজা হও এবং কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগ করো।' দুর্যোধনের কথায় দুঃশাসনের কণ্ঠ দুঃখে রুদ্ধ হয়ে এল। তিনি দুর্যোধনের চরণে মাথা রেখে বললেন—'মহারাজ, তা হয় না। যদি পৃথিবী বিদীর্ণ হয়, সূর্য তার তাপ এবং চন্দ্র তার শৈত্য পরিত্যাগ করে, হিমালয় তার স্থান ত্যাগ করে এবং অগ্নি তার উষ্ণতা পরিত্যাগ করে ; তাহলেও আমি আপনাকে ছাড়া পৃথিবী শাসন বা ভোগ করব না। আপনি প্রসন্ন হন।' এই বলে তিনি দুর্যোধনের চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন। দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে দুঃখিত হতে দেখে কর্ণও অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন—'আপনারা দুজনে না বুঝে সাধারণ মানুষের মতো কেন শোক করছেন ? শোকগ্রস্তদের শোক তো কখনো দূর হয় না। অতএব ধৈর্য ধারণ করুন, এইভাবে শোক করে শত্রুদের হর্ষোৎপাদন করবেন না। পাণ্ডবরা যে গন্ধর্বের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করেছে তাতে তারা তাদেরই কর্তব্যপালন করেছে। রাজ্যে যারা বাস করে, তাদের সর্বদাই রাজার প্রিয়কাজ করা উচিত। কাজেই তেমন কিছু হয়ে থাকলে তাতে আপনাদের শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। দেখুন, আপনার প্রায়োপবেশনের কথা শুনে আপনার সব ভায়েরাই শোকমগ্ন হয়ে রয়েছে। অতএব এই সংকল্প ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান এবং শোকসন্তপ্ত ভায়েদের সান্ত্বনা দিন। ধৈর্য ধরুন। আপনি যদি আমার কথা মেনে না নেন, তাহলে আমিও এখানে আপনার সেবায় রত থাকব। আপনি না থাকলে আমিও জীবিত থাকবো না।'

তখন সুবলপুত্র শকুনিও দুর্যোধনকে বুঝিয়ে বললেন—'রাজন্ ! কর্ণ ঠিক কথা বলেছে। তুমি তা শুনেছ। আমি যে সমৃদ্ধিশালী রাজলক্ষ্মী পাণ্ডবদের থেকে ছিনিয়ে তোমাকে দিয়েছি, মোহবশত তাকে তুমি হারাতে চাইছ কেন ? তুমি আজ মূর্খতাবশত প্রাণত্যাগ করতে চাইছ ! আমার মনে হয় তুমি কখনো বয়োবৃদ্ধদের সেবা করনি, তাই এমন বিপরীত কথা ভাবছ। যা ঘটেছে তা তো আনন্দের কথা আর এজন্য তোমার পাণ্ডবদের উপকার করা উচিত, তা না করে তুমি শোক করছ ? তুমি বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করো এবং পাণ্ডবরা যে উপকার করেছে, তা স্মরণ করে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও। তাতে তুমি যশ ও ধর্মলাভ করবে। আমার কথা শুনে তাই করো, তাতে তোমাকে কৃতজ্ঞ বলে মনে হবে। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করে তাদের পৈতৃক রাজ্য সমর্পণ করো। এতে তুমি সুখ পাবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধনকে এইভাবে
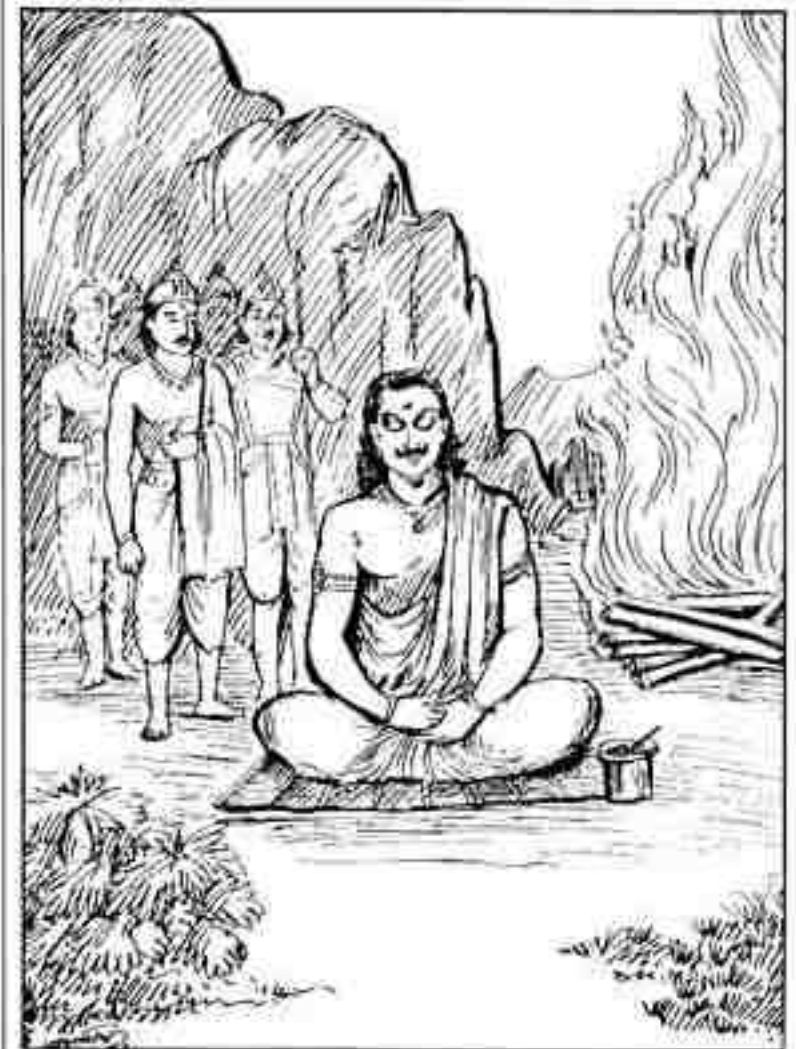
তাঁর সুহৃদ্, ভাই, মন্ত্রী এবং বন্ধু-বান্ধবরা বহুভাবে বোঝালেন ; কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে সরলেন না। তিনি কুশ ও বল্কল ধারণ করে স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় বাক্ সংযম করে উপবাস ও নিয়মাদি পালন করতে লাগলেন।

—— o ——

দুর্যোধনের প্রাণ-ত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ

দুর্যোধনকে প্রায়োপবেশন করতে দেখে দেবতাদের কাছে পরাজিত হওয়া পাতালবাসী দৈত্য এবং দানবরা আলোচনা করল যে, যদি এইভাবে দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করে, তাহলে আমাদের পক্ষ দুর্বল হয়ে যাবে। তাই তারা তাঁকে নিজের পক্ষে আনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্র বর্ণিত অথর্ব বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা ঔপনিষদ কর্মকাণ্ড শুরু করল। বেদকর্ম সমাপ্ত হলে কৃত্যা নামক এক অদ্ভুত রাক্ষসী যজ্ঞকুণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে বলল—'বলুন, আমাকে কী করতে হবে ?' দৈত্যরা প্রসন্ন হয়ে বলল—'প্রায়োপবেশনে উদ্যত দুর্যোধনকে এখানে নিয়ে এসো।' তখন সেই রাক্ষসী 'যথা হুকুম' বলে চলে গেল এবং পরক্ষণেই দুর্যোধনকে নিয়ে রসাতলে পৌঁছে দিল। দুর্যোধনকে দেখে দানবরা অত্যন্ত

প্রসন্ন হল এবং বলল—'ভরতকুলদীপ মহারাজ দুর্যোধন ! আপনার কাছে সর্বদাই বড় বড় শূরবীর এবং মহাত্মা হাজির থাকেন, তাহলে আপনি কেন প্রায়োপবেশনের কথা চিন্তা করছেন ? যে আত্মহত্যা করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং লোকে তার নিন্দা করে। আপনার এই সিদ্ধান্ত ধর্ম, অর্থ ও সুখনাশকারী, এই সিদ্ধান্ত আপনি পরিত্যাগ করুন। আপনি কেন দুঃখ করছেন, আপনার আর কোনোরূপ চিন্তা নেই। আপনাকে সাহায্য করার জন্য বহু দানববীর পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। অন্য কয়েকজন দৈত্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাদির দেহে প্রবেশ করবেন, যার ফলে তাঁরা দয়া ও স্নেহ বিসর্জন দিয়ে আপনার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তাছাড়াও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে জাত বহু দৈত্য ও দানব আপনার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে পূর্ণ পরাক্রমে আপনাকে সহযোগিতা করবে। মহারথী কর্ণও অর্জুন এবং অন্য সব বীরদের পরাস্ত করবে। এই কাজের জন্য আমরা সংশপ্তক নামধারী সহস্র সহস্র দৈত্য এবং রাক্ষসদের নিযুক্ত করেছি। তারা বীর অর্জুনের পরাক্রম নষ্ট করে দেবে। আপনি দুঃখ করবেন না, এই পৃথিবী এখন আপনার শত্রুবর্জিত বলেই মনে করুন। নিশ্চিন্ত হয়ে আপনি পৃথিবী ভোগ করুন। দেবতারা যেমন পাণ্ডবদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তেমনই আপনি সর্বদাই আমাদের আশ্রয়দাতা।' দুর্যোধনকে এইসব কথা বলে তারা বলল—'এবার আপনি রাজধানীতে ফিরে যান এবং শত্রুদের পরাজিত করুন।'

দৈত্যরা তাঁকে বিদায় জানালে সেই কৃত্যা রাক্ষসী দুর্যোধনকে আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হল। কৃত্যা চলে গেলে দুর্যোধনের চেতনা ফিরে এলো এবং তিনি এই ঘটনাকে স্বপ্ন বলে মনে করলেন। পরদিন প্রভাতে কর্ণ মৃদুহাস্যে বললেন—'মহারাজ ! কেউই মরে গিয়ে শত্রুদের জয় করতে পারে না। যে জীবিত থাকে, সেই সুখের দিন দেখার আশা করতে পারে। আপনি কেন এমন ভাবে রয়েছেন, এমন কী হয়েছে যাতে শোকগ্রস্ত হচ্ছেন ?' নিজ পরাক্রমে একবার শত্রুদের সন্তপ্ত করে এখন কেন মরতে চান ? অর্জুনের পরাক্রমে আপনি ভয় পাননি তো ? তা যদি হয়ে থাকে আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে আমি ওকে যুদ্ধে বধ করব। আমি অস্ত্র ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশবর্ষ সমাপ্ত হলেই আমি ওকে আপনার অধীন করে দেব।' কর্ণর কথায় এবং দুঃশাসনের বহু অনুনয় বিনয়ে আর দৈত্যদের কথা স্মরণ করে দুর্যোধন প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করলেন।

তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে হস্তিনাপুর যাওয়ার জন্য রথ, হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিকযুক্ত তাঁর চতুরঙ্গ সেনা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। সেই বিশাল বাহিনী সুসজ্জিত হয়ে গঙ্গার প্রবাহের মতো চলতে লাগল। এইভাবে তাঁরা সকলে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

কর্ণের দিগ্বিজয় এবং দুর্যোধনের বৈষ্ণব-যজ্ঞ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! কৃপা করে বলুন, যে সময় মহামনা পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করছিলেন, তখন মহাধনুর্ধর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র, সূতপুত্র কর্ণ, মহাবলী শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে কী করছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধন ফিরে এলে পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে বললেন—'বৎস ! তোমরা যখন

দ্বৈতবনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলে, তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তোমাদের ওখানে যাওয়া আমার ভালো মনে হচ্ছে না, কিন্তু তুমি কর্ণপাত করলে না। সেখানে শত্রুদের হাতে তোমাকে বন্দী হতে হল এবং ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবরা তোমাদের মুক্ত করল ; এতে তোমার লজ্জা হয় না ? সেই সময় তোমার সমস্ত সৈন্য এবং এই সূতপুত্র কর্ণও ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেইসময় তুমি মহাত্মা পাণ্ডব আর দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ উভয়ের পরাক্রম নিশ্চয়ই দেখেছ। এই কর্ণ ধনুর্বেদ, শৌর্য, বীর্য, এবং ধর্মে পাণ্ডবদের এক চতুর্থাংশও নয়। তাই এই কুলবৃদ্ধির জন্য আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই ভালো বলে মনে করি।'

ভীষ্মের এইসব কথা শুনে দুর্যোধন হেসে শকুনির সঙ্গে চলে গেলেন। তাঁকে যেতে দেখে কর্ণ ও দুঃশাসন তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁর সব কথা না শুনেই ওঁদের চলে যেতে দেখে ভীষ্মও নিজ গৃহে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন আবার সেখানে ফিরে এসে তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন যে 'আমাদের ভালো কিসে হবে এবং আমাদের এখন কী করা উচিত ?' তখন কর্ণ বললেন—'রাজন্ ! শুনুন , আমি আপনাকে একটা কথা বলি। ভীষ্ম সর্বদাই আমাদের নিন্দা করেন এবং পাণ্ডবদের প্রশংসা করেন। আপনাকে দ্বেষ করায় তাঁর প্রতি আমারও বিদ্বেষ জন্মেছে। আপনার কাছেও উনি আমার নামে নানাপ্রকার নিন্দা করে থাকেন। আমি ভীষ্মের কথা তাই সহ্য করতে পারি না। আপনি আমাকে সেবক ও সৈন্য দিয়ে পৃথিবী জয় করার নির্দেশ দিন, আপনার অবশ্যই জয় হবে। আমি অস্ত্রের শপথ করে বলছি।'

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন অত্যন্ত প্রীতিভরে বললেন—'বীর কর্ণ ! তুমি সর্বদাই আমার হিতের জন্য প্রস্তুত থাকো। তুমি যদি নিশ্চিতরূপে জানো যে আমি আমার সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করব, তাহলে তুমি প্রস্তুত হও। তাহলে আমিও শান্তি পাব।' দুর্যোধনের কথায় কর্ণ দিগ্বিজয় যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। তারপর শুভ মুহূর্ত দেখে স্নান করে শুভ নক্ষত্র ও তিথিতে তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণরা তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন, রথের ঘর্ঘর আওয়াজে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠল।

হস্তিনাপুর থেকে বিশাল সৈন্যদল নিয়ে এসে মহাধনুর্ধর কর্ণ রাজা দ্রুপদের রাজধানী ঘিরে ভীষণ যুদ্ধ করে বীর

দ্রুপদকে তাঁর বশে আনলেন। তাঁর কাছ থেকে কর বাবদ বহু সেনা, রূপা এবং রত্নাদি আদায় করলেন। তারপর যেসব রাজা দ্রুপদের অধীনে ছিলেন, তাঁদেরও পরাজিত করে তাঁদের থেকে কর আদায় করলেন। সেখান থেকে তিনি উত্তর দিকে রওনা হয়ে সেদিকের সব রাজাকে হারিয়ে দিলেন। মহারাজ ভগদত্তকে পরাজিত করে তিনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হিমালয় পর্যন্ত চলে গেলেন। এইভাবে সেখানকার সব রাজাদের পরাজিত করে তিনি নেপালের রাজাকেও পরাস্ত করেন। তারপর সেখান থেকে এসে তিনি পূর্বদিকে আক্রমণ করেন। সেইদিকে তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড, আবশীর, যোধ্য, অহিক্ষত্র প্রভৃতি রাজ্য জয় করে তাদের নিজের বশে করেন। তারপর তিনি বৎসভূমি জয় করেন এবং কেবলা, মৃত্তিকাবতী, মোহনপত্তন, ত্রিপুরী এবং কোসলা ইত্যাদি নগরীও নিজ অধীনে আনেন। এদের সকলকে পরাস্ত করে এবং কর আদায় করে কর্ণ এবার দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। সেদিকেও তিনি অনেক মহারথীদের পরাস্ত করলেন। রুক্মির সঙ্গে কর্ণের ভয়ানক যুদ্ধ হল, শেষে তাঁকেও কর্ণের ইচ্ছানুসারে করপ্রদান করতে হল। তারপর তিনি গেলেন পাণ্ড্য এবং শ্রীশৈলের দিকে। সেখানে কেরল, নীল এবং বেণুদারিসুত প্রমুখ সব রাজাদের পরাজিত করে, কর আদায় করে তারপর শিশুপালের পুত্রকে পরাস্ত করেন। তার আশেপাশের রাজাদেরও মহাবীর কর্ণ নিজ অধীন করেন। এরপরে তিনি অবন্তি দেশের রাজা এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের নিজপক্ষে এনে পশ্চিম দিক জয় করতে আরম্ভ করেন। পশ্চিম দিকে গিয়ে তিনি যবন এবং বর্বর রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করেন। এইভাবে তিনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকে সমস্ত পৃথিবী জয় করে নিলেন।

এইভাবে সমগ্র পৃথিবী নিজ বশে এনে যখন ধনুর্ধর বীর কর্ণ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন, তখন রাজা দুর্যোধন তাঁর সব ভাই, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বন্ধু-বান্ধবসহ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে যথাযোগ্য সমাদর জানালেন ও আনন্দের সঙ্গে তাঁর দিগ্বিজয়ের কথা ঘোষণা করলেন। তারপর কর্ণকে বললেন, 'কর্ণ ! তোমার মঙ্গল হোক। তোমার মধ্যে আমি এমন শক্তির সন্ধান পেয়েছি যা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ বা বাহ্লিকের মধ্যে পাইনি। সকল পাণ্ডব এবং অন্যান্য রাজারা তোমার ষোড়শ অংশের একাংশও নন। আমি পাণ্ডবদের বিশাল

রাজসূয় যজ্ঞ দেখেছি ; আমার ইচ্ছা সেইরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করার, তুমি তা পূর্ণ করো।' দুর্যোধনের কথায় কর্ণ বললেন—'রাজন্ ! এখন সকল নৃপতিই আপনার অধীন। আপনি যাজককে ডেকে যজ্ঞ করার জন্য প্রস্তুত হোন।'

দুর্যোধন তাঁর পুরোহিতকে ডেকে বললেন—'দ্বিজ-বর ! আপনি শাস্ত্রসম্মতভাবে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করার ব্যবস্থা করুন। এই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে আমি প্রচুর দক্ষিণা দেব।' তাতে পুরোহিত বললেন—'রাজন্ ! যুধিষ্ঠির জীবিত থাকতে আপনি এই যজ্ঞ করতে পারবেন না। কিন্তু অন্য আর একটি যজ্ঞ আছে, যা করতে কারো কোনো বাধা নেই। আপনি বিধিসম্মতভাবে তাই করুন। একে বলা হয় বৈষ্ণব যজ্ঞ, এই যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞেরই সমান। এই যজ্ঞ আমারও অত্যন্ত প্রিয়, এতে আপনার মঙ্গল হবে এবং বাধা বিঘ্ন ছাড়াই সেটি সম্পন্ন হবে।'

ঋত্বিকের এই কথায় রাজা দুর্যোধন কর্মচারীদের যথাযোগ্য নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর নির্দেশানুসারে যজ্ঞের সমস্ত ব্যবস্থা করা হল। মহামতি বিদুর এবং মন্ত্রীরা দুর্যোধনকে জানালেন—'রাজন্ ! যজ্ঞের সমস্ত জিনিসপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সুবর্ণ নির্মিত সভাকক্ষ তৈরি করা হয়েছে, যজ্ঞের নির্দিষ্ট তিথিও সমাগতপ্রায়।' দুর্যোধন তখন যজ্ঞ আরম্ভ করার নির্দেশ দিলেন। যজ্ঞকার্য শুরু হল,

দুর্যোধন শাস্ত্রানুসারে বিধিসম্মতভাবে যজ্ঞের দীক্ষা নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি এবং গান্ধারী— সকলেই দুর্যোধনের কাজে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ব্রাহ্মণ ও রাজাদের আমন্ত্রণ জানাতে শীঘ্রগামী দূত পাঠান হল। দুঃশাসন একদল দূত দ্বৈতবনে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন—'তোমরা শীঘ্র দ্বৈতবনে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের বিধিসম্মতভাবে যজ্ঞের জন্য নিমন্ত্রণ করে এস।' তাঁরা পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন—'মহারাজ ! নৃপতিশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন নিজ পরাক্রমে বহুধন প্রাপ্ত হয়ে এক মহাযজ্ঞ শুরু করেছেন। বহু রাজা এবং ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন। মহামনা কুরুরাজ আমাদের আপনাদের সেবায় পাঠিয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রকুমার মহারাজ

দুর্যোধন আপনাদের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেছেন। আপনারা কৃপা করে এই যজ্ঞে উপস্থিত থাকবেন।'

দূতদের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন— 'পূর্বপুরুষদের যশবৃদ্ধিকারী রাজা দুর্যোধন মহাযজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করছেন—এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরাও তাতে যোগদান করতে ইচ্ছা করি ; কিন্তু এখন তা হওয়া সম্ভব নয়, আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসের নিয়ম পালন করতে হবে।' ধর্মরাজের কথা শুনে ভীম বললেন—'তোমরা দুর্যোধনকে গিয়ে বল যে ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে যুদ্ধযজ্ঞে প্রজ্বলিত অস্ত্রের আগুনে যখন তোমাকে হোম করা হবে, তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেখানে আসবেন।' ভীম ব্যতীত আর কেউ কোনো কথা বললেন না। দূতরা হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা দুর্যোধনকে জানাল।

বহুদেশ থেকে রাজা ও ব্রাহ্মণগণ হস্তিনাপুরে আসতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর দুর্যোধনের নির্দেশে সকল বর্ণের ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সমাদর করলেন এবং তাঁদের মনোমতো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, নানা বস্ত্র-আভরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। রাজা দুর্যোধন সকলের জন্যই শাস্ত্রানুযায়ী নিবাসগৃহ তৈরি করালেন এবং রাজা ও ব্রাহ্মণদের বহু ধনরত্ন দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর তিনি কর্ণ ও ভ্রাতাগণ সহ শকুনিকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! দুর্যোধনদের বন্ধন থেকে মুক্ত করার পর মহাবলী পাণ্ডবরা সেই বনে কী করলেন, কৃপা করে আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্‌ ! কিছুদিন সেই বনে বাস করে ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে সেখান থেকে রওনা হলেন। ইন্দ্রসেনাদি সেবকরাও তাঁদের সঙ্গ নিলেন। তারপর যে পথে শুদ্ধ অন্ন এবং সুপেয় জল ছিল সেইদিক দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ তাঁরা কাম্যকবনের পবিত্র আশ্রমে পৌঁছলেন।

———o———

মহর্ষি ব্যাসদেবের যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে আগমন এবং তাঁকে তপ ও দানের মহত্ত্বের উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এইভাবে মহাত্মা পাণ্ডবগণ একাদশ বৎসর অনেক কষ্টে বনবাসে কাটালেন। তাঁরা সুখভোগের যোগ্য হয়েও মহাদুঃখ সহ্য করে ফলমূল খেয়ে থাকতেন। সকলেই মহাপুরুষ ছিলেন, তাই তাঁরা এই ভেবে হতাশ হতেন না যে 'এখন আমাদের কষ্টের সময়, ধৈর্য সহকারে একে সহ্য করা উচিত।' রাজা যুধিষ্ঠির ভাবতেন, 'আমার জন্যই আমার ভাইদের এই মহাদুঃখ, কষ্ট সহ্য করতে হল, আমার অপরাধেই তারা বনবাসে পড়ে রয়েছে।' কাঁটার মতোই ভাইদের এই দুঃখ-কষ্ট তাঁর বুকে বিঁধতো, তিনি সারারাত শান্তিতে ঘুমোতে পারতেন না। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীও স্বামী যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে সমস্ত কষ্ট ধৈর্য ধরে সহ্য করতেন। দুঃখের চিহ্ন চোখেমুখে ফুটে উঠতে দিতেন না। উৎসাহ ও চেষ্টার দ্বারা তাঁদের শরীরের ভাবই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

একদিন সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সেখানে এলেন। তাঁকে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির এগিয়ে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সসম্মানে আসন দিয়ে তাঁকে বসালেন ও ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন এবং তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় নিকটেই উপবেশন করলেন। পৌত্রদের বনবাসের কষ্টে দুর্বল শরীর এবং জঙ্গলের ফল-মূল খেয়ে জীবন নির্বাহ করতে দেখে ব্যাসদেব অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—'মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! জগতে তপস্যা ব্যতীত (কষ্ট না করে) কেউই প্রকৃত সুখলাভ করে না। তপস্যার থেকে বড় কোনো সাধন নেই। তপস্যার দ্বারাই মহৎপদ (ব্রহ্ম) লাভ হয়। তপস্যার মহত্ত্ব আর কী বলব ! তুমি শুধু এটুকু জেনে রাখো যে, এমন কোনো বস্তু নেই যা তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায় না। সত্য, সরলতা, ক্রোধহীনতা, দেবতা ও অতিথিদের নিবেদন করে অন্নগ্রহণ করা, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশে রাখা, অপরের দোষ না দেখা, কোনো প্রাণীকে হিংসা না করা, অন্তর-বাহিরে পবিত্রতা বজায় রাখা—এইসব সদ্‌গুণ মানুষকে পবিত্র করে, এর সাহায্যে মঙ্গল হয়। যেসব ব্যক্তি এই ধর্মপালন না করে অধর্মে রুচি রাখে, তাদের পশু-পক্ষী ইত্যাদি তির্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেই সকল যোনিতে তারা কখনো সুখ পায় না। ইহলোকে যেসব কর্ম করা হয়, পরলোকে তার ফল ভোগ করতে হয়। তাই তপস্যা ও যম-নিয়মাদির পালন করা উচিত। রাজন্ ! কোনো ব্রাহ্মণ অথবা অতিথি এলে প্রসন্নভাবে নিজ সাধ্য অনুযায়ী তাকে দান করে পূজা করবে এবং মনে কোনোপ্রকার দ্বেষভাবকে স্থান দেবে না।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মহামুনি ! দান ও তপস্যার মধ্যে অধিক ফল কিসে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি কঠিন ?'

ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! দানের থেকে কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। অর্থের প্রতি লোকের বিশেষ আকর্ষণ থাকে এবং অর্থ পাওয়াও অত্যন্ত কষ্টকর। উৎসাহী ব্যক্তি ধনের লোভে নিজ প্রিয় প্রাণের মায়াত্যাগ করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এবং সমুদ্রে রত্নের খোঁজ করে। কেউ চাষ-বাস করে, কেউ গোপালন করে। কেউ আবার ধনলোভে অপরের দাসত্বও স্বীকার করে নেয়। এরূপ কষ্ট সহ্য করে উপার্জন করা ধন ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। তাই দানের থেকে দুষ্কর কোনো কর্ম নেই, আমি তাই দানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। সেই ধন যদি ন্যায়ত উপার্জন করা

হয় এবং উত্তম দেশ, কাল, পাত্র বিচার করে দান করা হয় তাহলে তার মহত্ত্ব অনেক বেড়ে যায়। অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত ধন দান করলে, তা কর্তাকে মহাভয় হতে রক্ষা করে না। যুধিষ্ঠির ! ঠিক সময় মতো যদি শুদ্ধভাবে সৎপাত্রে সামান্যও দান করা হয়, তাহলে পরলোকে তার অনন্ত ফল লাভ হয়। এই বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটি উদাহরণ দেন যে মুদ্গল ঋষি এক দ্রোণ (প্রায় সাড়ে পনের সের) ধান দান করে মহান ফল লাভ করেছিলেন।

—o—

মুদ্গল ঋষির কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! মহাত্মা মুদ্গল এক দ্রোণ ধান কী করে কীভাবে দান করলেন এবং কাকে দান করলেন আমাকে সব বলুন।'

ব্যাসদেব বললেন—রাজন্ ! কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে এক ঋষি বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সদা সত্য কথা বলতেন, কারো নিন্দা করতেন না। তাঁর ব্রত ছিল অতিথিসেবা, তিনি অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ মহাত্মা ছিলেন। শীল এবং উদ্বৃত্ত বৃত্তির দ্বারাই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পনেরো দিনে এক দ্রোণ ধান জমাতেন। তার দ্বারা তিনি 'ইষ্টীকৃত' নামক যজ্ঞ করতেন এবং পঞ্চদশতম দিন প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে দর্শ-পৌর্ণমাস যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞে দেবতা ও অতিথিদের সেবার পর যে অন্ন উদ্বৃত্ত হত তার দ্বারা সপরিবারে জীবন নির্বাহ করতেন। তাঁর সংসারে স্ত্রী, পুত্র—এই তিনজন ছিলেন। তিনজনই এক পক্ষে একদিনই আহার করতেন। মহারাজ ! তার প্রভাব এমনই ছিল যে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ সহ তাঁর যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করতেন। এইরূপ মুনিবৃত্তিতে অবস্থান করে প্রসন্ন চিত্তে অতিথিদের অন্নদান করা—এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কারো প্রতি দ্বেষ ভাব না রেখে অত্যন্ত শুদ্ধভাবে তিনি দান করতেন। তাই তাঁর এক দ্রোণ অন্ন পনের দিনের মধ্যে কখনো শেষ হত না, বেড়েই চলত ; বহু ব্রাহ্মণ এবং বিদ্বান ভোজন করলেও, তা কখনো কম পড়ত না।

মুনির এই ব্রতের খ্যাতি বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন তাঁর এই কীর্তি দুর্বাসামুনির কানে গেল। তিনি ছিন্ন ভিন্ন পোশাক পরে পাগলের মতো এলোমেলো চুলে কটুকথা বলতে বলতে সেখানে এলেন। এসেই বললেন—'হে বিপ্রবর ! আপনার জানা উচিত যে আমি এখানে খেতেই এসেছি।' মুদ্গল বললেন—'আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' তারপর পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমন করার জন্য পূজার দ্রব্য দিলেন। তারপর তিনি তাঁর ক্ষুধার্ত অতিথিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে খাদ্য পরিবেশন করলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়া খাবার অত্যন্ত সরস হয়, মুনি ক্ষুধার্তই ছিলেন, সব খেয়ে ফেললেন। মুদ্গল তাঁকে খাদ্য দিতে লাগলেন আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা গলাধঃকরণ করতে থাকলেন। শেষে ওঠবার
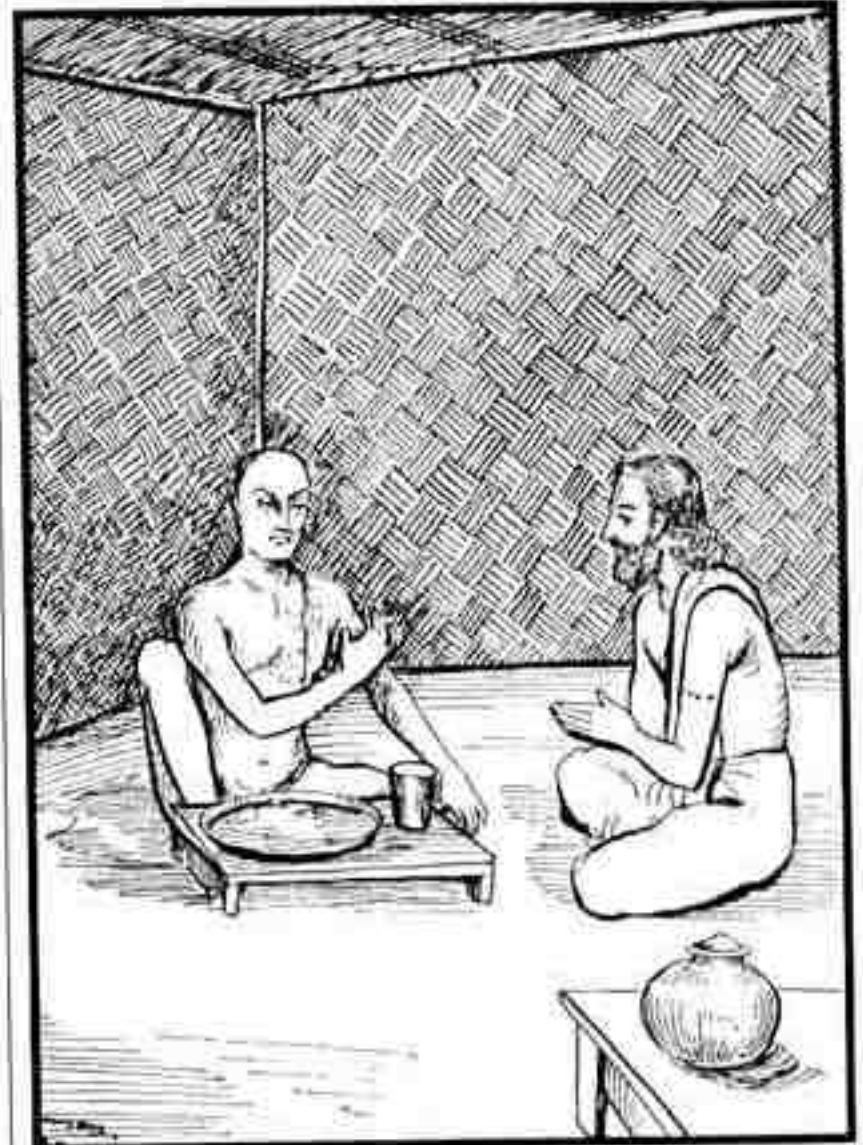
সময় যেটুকু অন্ন বেঁচেছিল, তা শরীরে মেখে নিয়ে, যেদিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকেই চলে গেলেন। এরপরে দ্বিতীয় যজ্ঞের দিনও এলেন এবং আহার করে চলে গেলেন। মুদ্গল মুনিকে সপরিবারে ক্ষুধার্তই থাকতে হল। তিনি আবার অন্ন সংগ্রহ করতে লাগলেন। স্ত্রী এবং পুত্রও তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। ক্ষুধার জন্য তাঁদের মনে কোনোপ্রকার বিকার বা খেদ ছিল না। ক্রোধ, ঈর্ষা বা

অসম্মানের ভাবও আসেনি। তাঁরা একই রকম শান্ত ছিলেন। পরের যজ্ঞদিনে দুর্বাসা মুনি আবার উপস্থিত হলেন। এইভাবে তিনি ছয়বার প্রত্যেক যজ্ঞে হাজির হলেন। কিন্তু মুদ্গল মুনির মনে কোনোপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়নি। প্রত্যেকবারই তাঁর চিত্ত শান্ত ও নির্মল ছিল।

দুর্বাসা মুনি তা লক্ষ্য করে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি মুদ্গল মুনিকে বললেন—'মুনি! ইহজগতে তোমার সমান দাতা আর কেউ নেই। ঈর্ষা তো তোমাকে ছুঁতেই পারে না। বড় বড় ধার্মিক ব্যক্তিকেও ক্ষুধা কাবু করে দেয় এবং ধৈর্য হরণ করে। জিভকে রসনা বলা হয়, সে সর্বদা রস আস্বাদন করে এবং মানুষের চিত্তকে রূপের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। আহারের দ্বারাই প্রাণ রক্ষা পায়। মন এত চঞ্চল যে তাকে বশে রাখাই কঠিন বলে মনে হয়। মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাকেই নিশ্চিতরূপে তপস্যা বলা হয়। এইসব ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে অত্যন্ত পরিশ্রমে প্রাপ্ত ধন শুদ্ধ চিত্তে দান করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তুমি এসবই সিদ্ধ করেছ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, আমার ওপর তোমার অনুগ্রহ মেনে নিচ্ছি। ইন্দ্রিয়জয়, ধৈর্য, দান, শম, দম, দয়া, সত্য ও ধর্ম—এ সবই তোমার মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তুমি শুভকর্মের দ্বারা সমস্ত লোক জয় করেছ, পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছ। দেবতারাও তোমার মহিমা গান করে সর্বত্র ঘোষণা করছেন।'

দুর্বাসা মুনি যখন এই কথা বলছেন তখন এক বিমানে করে দেবতার দূত সেখানে এসে পৌঁছালেন। সেই বিমান দিব্য হংস এবং সারস যুক্ত ছিল এবং তার থেকে দিব্য সুগন্ধ নিঃসৃত হচ্ছিল। সেই মনোরম বিমানটি মনের ইঙ্গিতে চালিত হত। দেবদূত মহর্ষি মুদ্গলকে বললেন—'মুনিবর! এই বিমান আপনি শুভকর্মের দ্বারা লাভ করেছেন। আপনি এতে বসুন। আপনি সিদ্ধ হয়েছেন।' দেবদূতের কথা শুনে মহর্ষি তাঁকে বললেন—'দেবদূত! সৎ পুরুষরা সাত পা একসঙ্গে চললেই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, সেই সূত্রে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করছি; যা সত্য এবং হিতকর আমাকে তা বলুন। আপনার কথা শুনে তারপর কর্তব্য স্থির করব। প্রশ্ন হল—স্বর্গে কী সুখ এবং কী দোষ?'

দেবদূত বললেন—'মহর্ষি মুদ্গল! আপনার বুদ্ধি অত্যন্ত উত্তম। অন্যান্য ব্যক্তিরা যে স্বর্গ সুখকে অতি উত্তম সুখ বলে মনে করে, তা আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত; তা

সত্ত্বেও আপনি না জানার ভান করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করছেন—জিজ্ঞাসা করছেন তা কেমন? আপনার আদেশানুসারে আপনাকে তা জানাচ্ছি। স্বর্গ এখান থেকে অনেক ওপরের লোক, তাকে 'স্বর্লোক'ও বলা হয়। অত্যন্ত উত্তম পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয়, সেখানে বসবাসকারীগণ সর্বদা বিমানে বিচরণ করে। যারা তপ, দান বা মহাযজ্ঞ করেনি অথবা যারা মিথ্যাবাদী বা নাস্তিক, তারা এই লোকে প্রবেশ করতে পারে না। যারা ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, শম-দমসম্পন্ন এবং দ্বেষ রহিত ও দানধর্ম পালন করেছেন, তাঁরাই এই লোকে গমন করেন, এতদ্ব্যতীত যাঁরা শূরবীর, যাঁদের বীরত্ব যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁরাও স্বর্গলোকের অধিকারী। সেখানে দেবতা, সাধ্য, বিশ্বদেব, মহর্ষি যাম, ধাম, গন্ধর্ব এবং অপ্সরা—এঁদের সকলের পৃথক পৃথক অনেক লোক আছে, সেগুলি অত্যন্ত কান্তিমান, ইচ্ছানুযায়ী প্রাপ্তকারী ভোগসম্পন্ন এবং তেজঃপূর্ণ। স্বর্গে তেত্রিশ হাজার যোজন ব্যাপ্ত এক উচ্চ পর্বত বিদ্যমান, যার নাম সুমেরু পর্বত। সেটি সুবর্ণ মণ্ডিত, এর ওপরে দেবগণের নন্দনবন ইত্যাদি নানা সুন্দর উদ্যান আছে, সেগুলি পুণ্যাত্মাদের বিহার স্থান। সেখানে কারো ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাগে না, মন কখনো বিমর্ষ হয় না, শীত গ্রীষ্মের কষ্ট নেই এবং কোনোপ্রকার ভয়ও থাকে না।

সেখানে এমন কোনো বস্তু নেই, যা দেখে ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুন্দর সুগন্ধিত মৃদু শীতল বাতাস বইতে থাকে, মন ও প্রাণ স্নিগ্ধ করা মিষ্ট শব্দ শোনা যায়। সেখানে শোক নেই, কারো বিলাপ শোনা যায় না, বৃদ্ধত্ব আসে না এবং শরীরে ক্লান্তি অনুভূত হয় না। স্বর্গবাসীদের শরীরে তেজস তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে। তাঁরা পুণ্যকর্মের দ্বারাই সেই শরীর প্রাপ্ত হন, মাতা পিতার দ্বারা নয়। তাঁদের দেহে ঘর্ম হয় না, দেহ থেকে দুর্গন্ধ যুক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয় না, মল-মূত্র থাকে না। কোনো জিনিস ময়লা হয় না, ফুল কখনো শুষ্ক হয় না। এই যে বিমান দেখছেন, এরূপ বিমান ওখানে সকলের আছে। তাঁরা কারোকে হিংসা করেন না, বিদ্বেষভাবও রাখেন না। সকলে অত্যন্ত সুখে জীবন যাপন করেন।

এই দেবলোকের ওপরেও অনেক দিব্য লোক আছে। সব থেকে ওপরে ব্রহ্মলোক। নিজ নিজ শুভ কর্মের ফলে সেখানে মুনি ঋষিরা গমন করেন। ঋভু নামক এক দেবতা সেখানে থাকেন, যাঁকে দেবতারাও পূজা করেন। এই লোক স্বপ্রকাশ, তেজস্বী এবং সর্বপ্রকার কামনা পূরণকারী। কোনো ঐশ্বর্যের জন্য তাঁদের মনে ঈর্ষার উদয় হয় না। যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতির উপর তাঁদের জীবন নির্ভর করে না। তাঁদের অমৃত পান করারও প্রয়োজন হয় না। তাঁদের দেহ দিব্য জ্যোতির্ময়, তা কোনো বিশেষ আকারসম্পন্ন নয়। তাঁরা সুখস্বরূপ, তাই তাঁদের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা হয় না। তাঁরা দেবতাদেরও দেবতা এবং সনাতন। মহাপ্রলয়ের সময়ও তাঁদের বিনাশ হয় না, সুতরাং তাঁদের জরা-মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকে না। হর্ষ-প্রীতি, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, কিছুই তাঁদের থাকে না। স্বর্গের দেবতাগণও এই স্থিতি লাভ করতে চান। এ হল পরাসিদ্ধির অবস্থা, যা সকলের সুলভ নয়। ভোগ আকাঙ্ক্ষাকারী এই সিদ্ধিলাভ করতে কখনো সক্ষম নয়।

এই যে তেত্রিশ (কোটি) প্রকারের দেবতা আছেন, উত্তম আচরণ দ্বারা এবং বিধি পূর্বক দান করলে মহাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁদের লোক প্রাপ্ত হন। আপনি আপনার দানের প্রভাবে এই সুখদ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, তপস্যার তেজে দেদীপ্যমান হয়ে আপনি তা উপভোগ করুন। হে বিপ্র ! একেই বলে স্বর্গসুখ। এ পর্যন্ত আমি স্বর্গের সুখের কথা বললাম, এখন দোষের কথা শুনুন। স্বর্গে আপনার পূর্বকৃত কর্মের ফলই ভোগ করতে পারবেন, নতুন কোনো কর্ম করা যায় না। মূল পুঁজি ভাঙিয়েই সেখানকার ভোগ লাভ করা যায়। আমার মনে হয় এটিই ওখানকার সব থেকে বড় দোষ এবং একদিন না একদিন সেখান থেকে পতন হবেই। সুখদায়ক ঐশ্বর্য উপভোগ করে নিম্নস্থানে পতিত প্রাণীদের যে বেদনা এবং অসন্তোষ হয়, তা বর্ণনা করা কঠিন। স্বর্গ থেকে পতনের সূচনা হয় তাদের গলার মালা শুকোতে আরম্ভ করলে। তাই দেখেই তাদের মনে ভয় ঢুকে যায় যে এবার পতিত হলাম। তাদের ওপর রজোগুণের প্রভাব পড়ে। পতিত হওয়ার সময় তাদের বুদ্ধি, চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যতলোক আছে, সবার মধ্যেই এই ভয় বজায় থাকে।'

মুদ্গল বললেন—'আপনি তো স্বর্গের মহাদোষের কথা বললেন। তাছাড়া যে নির্দোষ লোক আছে, তার কথা বলুন।'

দেবদূত বললেন—'ব্রহ্ম লোকেরও ওপরে বিষ্ণুর পরম ধাম। সেই ধাম শুদ্ধ সনাতন এবং জ্যোতির্ময়। একে পরব্রহ্মপদও বলা হয়। বিষয়ী ব্যক্তিরা সেখানে যেতেই পারে না। দম্ভ, লোভ, ক্রোধ, মোহ এবং দ্রোহযুক্ত ব্যক্তিরাও সেখানে পৌঁছতে পারে না। সেখানে কেবল মমতা ও অহংকার বর্জিত, দ্বন্দ্বের অতীত, জিতেন্দ্রিয় এবং ধ্যানযোগে ব্যাপৃত মহাত্মা ব্যক্তিই যেতে সক্ষম। মুদ্গল ! আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সব কথাই আপনাকে জানালাম। কৃপা করে এবার তাড়াতাড়ি চলুন, দেরী করবেন না।'

ব্যাসদেব বললেন—দেবদূতের কথা শুনে মুদ্গল ঋষি সেইসব চিন্তা করে বললেন—'দেবদূত ! আপনাকে প্রণাম, আপনি ফিরে যান। স্বর্গের অনেক দোষ ; আমার সেই স্বর্গসুখে দরকার নেই। পতনের পরে স্বর্গবাসীদের অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপ হয়। তাই আমি স্বর্গে যেতে চাই না। যেখানে গেলে দুঃখ কষ্টের মূল দূর হয়, আমি শুধু সেই স্থানেরই অনুসন্ধান করব।' এই বলে ধর্মাত্মা মুনি দেবদূতকে বিদায় জানালেন এবং পূর্ববৎ শিলোঞ্ছ বৃত্তিতে থেকে ভালোভাবে শমপালন করতে লাগলেন। তাঁর কাছে নিন্দা ও স্তুতি, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ—সব এক হয়ে গিয়েছিল। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের আশ্রয় নিয়ে নিত্য ধ্যানযোগ-পরায়ণ হয়ে থাকতেন। ধ্যান থেকে বৈরাগ্যের শক্তি পেয়ে তিনি উত্তম বোধ লাভ করলেন, যার সাহায্যে তিনি মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করলেন। তাই হে যুধিষ্ঠির ! তোমারও শোক করা উচিত নয়। মানুষের সুখের পরে দুঃখ

এবং দুঃখের পরে সুখ আসতে থাকে। ত্রয়োদশ বৎসর পরে তোমরা পিতা-পিতামহের রাজ্য অবশ্যই ফিরে পাবে। এখন মন থেকে চিন্তা দূর করো।

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে পুনরায় তপস্যা করার জন্য তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন।

——o——

দুর্যোধনের দুর্বাসা মুনির অতিথি সৎকার ও বরদান লাভ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—হে বৈশম্পায়ন ! মহাত্মা পাণ্ডবরা যে সময় বন থেকে মুনি-ঋষিদের অনুপম আলোচনা শুনে আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলেন সেইসময় দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির কথায় চালিত পাপাচারী দুরাত্মা দুর্যোধনরা তাঁদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন—ভগবান ! আমাকে সেই কথা বলুন !

বৈশম্পায়ন বললেন—মহারাজ ! দুর্যোধন যখন শুনতে পেলেন যে পাণ্ডবরা বনে সেইরূপ আনন্দেই আছেন, যেমন আনন্দে তাঁরা নগরে থাকতেন, তখন তিনি তাদের খারাপ কিছু করার চিন্তা করলেন। ছল কপটে বিজ্ঞ কর্ণ এবং দুঃশাসন একত্রিত হয়ে পাণ্ডবদের ক্ষতি করার জন্য নানা উপায় ভাবতে লাগলেন। অত্যন্ত ক্রোধী দুর্বাসাকে সেখানে আসতে দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভাইদের নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন এবং নম্রতার সঙ্গে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। অত্যন্ত বিধিসম্মতভাবে তাঁর পূজা করলেন এবং দাসের মতো দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর সেবা করলেন। দুর্বাসা ঋষি কিছুদিন সেখানে থেকে গেলেন। দুর্যোধন আলস্য ত্যাগ করে রাত-দিন তাঁর সেবা করতেন, ভক্তিভাবের জন্য নয়, তাঁর শাপের ভয়েই তিনি সেবা করতেন। মুনির স্বভাবও ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। কখনো বলতেন—'আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, রাজন্ ! শীঘ্র খাদ্য প্রস্তুত করাও।' এই বলে স্নান করতে চলে যেতেন এবং অনেক দেরী করে ফিরতেন, এসে বলতেন—'আজ আর খাব না, ক্ষিদে নেই।' বলে চলে যেতেন। তিনি বারংবার এরূপ ব্যবহার করলেও দুর্যোধনের কোনো বিকার হত না বা রাগও প্রকাশ করতেন না। দুর্বাসা মুনি এতে প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমি তোমাকে বর দিতে চাই, যা ইচ্ছা চেয়ে নাও।'

দুর্বাসার কথা শুনে দুর্যোধনের মনে হল তিনি যেন নবজন্ম লাভ করেছেন। মুনি সন্তুষ্ট হলে তাঁর কাছ থেকে কী বর চাওয়া হবে—কর্ণ, দুঃশাসন এঁদের সঙ্গে তিনি আগেই শলা পরামর্শ করে রেখেছিলেন। মুনি যখন বর চাইতে বললেন, তখন দুর্যোধন প্রসন্ন হয়ে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! যুধিষ্ঠির আমাদের কুলে সর্বজ্যেষ্ঠ, তিনি এখন ভ্রাতাদের সঙ্গে বনে বাস করছেন। তিনি অত্যন্ত গুণবান এবং সুশীল। আপনি যেমন সশিষ্য আমাদের অতিথি হয়েছেন, তেমনই তাঁরও আতিথ্য গ্রহণ করুন। আপনার যদি আমার ওপর বিশেষ কৃপা থাকে তবে আমার আর একটি প্রার্থনা মনে রাখবেন। রাজকুমারী দ্রৌপদী যখন তাঁর সব অতিথি ব্রাহ্মণ এবং পতিদের আহারের পর নিজে আহার করে বিশ্রাম করবেন, আপনি সেইসময় ওখানে পদার্পণ করবেন।'

'তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকায় আমি তাই করব'—বলে দুর্বাসা মুনি চলে গেলেন। দুর্যোধন মনে মনে ভাবলেন 'এবার আমি জিতে গেছি।' তিনি আনন্দের সঙ্গে কর্ণের করমর্দন করলেন। কর্ণও বললেন—'এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা ; এবার কাজ হাসিল হবে। রাজন্ ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হল, তোমার শত্রু দুঃখের মহাসাগরে ডুবে যাবে—এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় !'

——o——

যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে দুর্বাসার আতিথ্যগ্রহণ, ভগবান কর্তৃক পাণ্ডবদের রক্ষা

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর দুর্বাসা মুনি খবর পেলেন যে যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদী আহারের পর বিশ্রাম করছেন, তখন তিনি দশ হাজার শিষ্য সমভিব্যাহারে বনে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অতিথিদের আসতে দেখে ভ্রাতাদের নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের স্বাগত জানালেন। প্রণাম করে তাঁদের আসনে বসালেন। তারপর বিধিমতো পূজা করে তাঁদের নিমন্ত্রণ জানালেন, বললেন—'ভগবান আপনি স্নানাদি পূজা নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে শীঘ্র
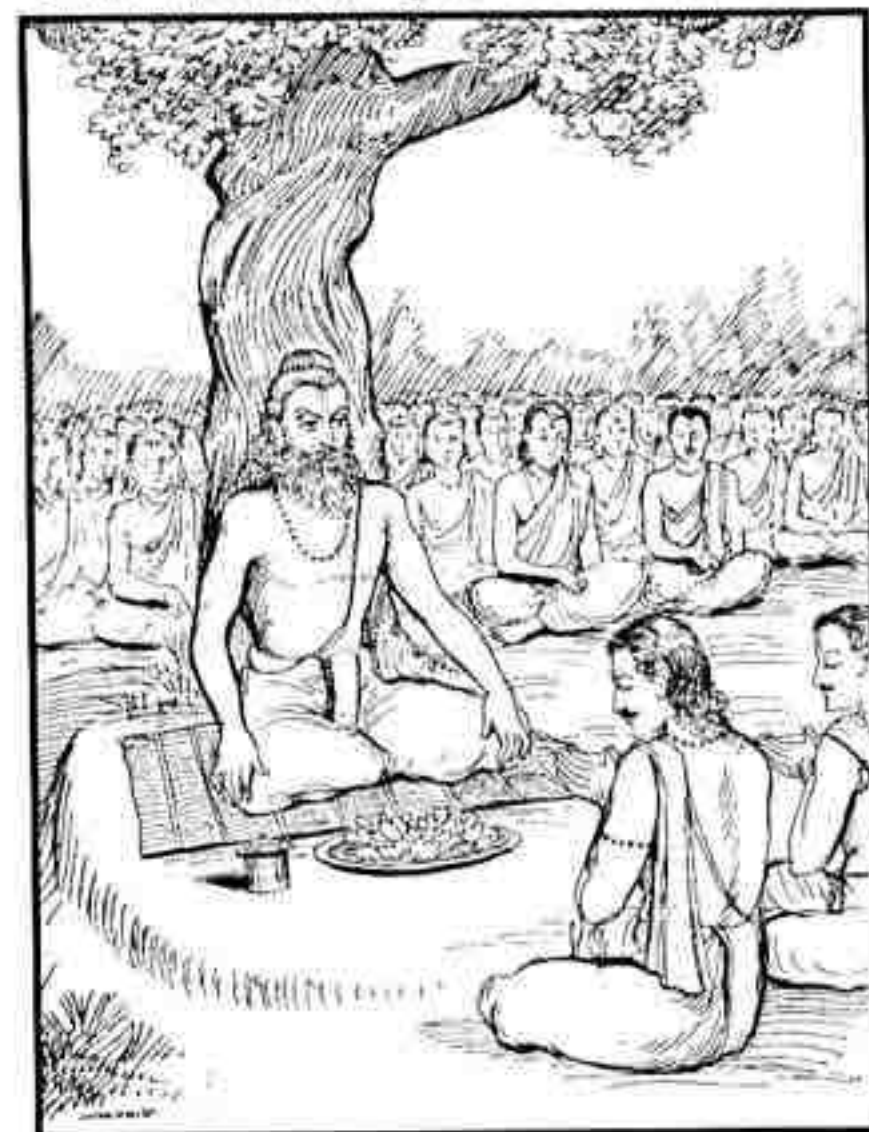
এসে আহার করুন।' মুনি শিষ্য পরিবৃত হয়ে স্নানে গেলেন। তিনি একবারও ভাবলেন না যে এইসময় এত জন শিষ্যসহ এঁরা কীভাবে আমাদের আহারের ব্যবস্থা করবেন। তাঁরা স্নান করে ধ্যানে বসলেন।

এদিকে দ্রৌপদীর তাঁদের খাদ্যের জন্য অত্যন্ত চিন্তা হল। তিনি অনেক ভাবলেন, কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ করার কোনো উপায়ই তাঁর মনে এলো না। তখন তিনি মনে মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগলেন—'হে কৃষ্ণ ! হে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ! দেবকীনন্দন ! হে অবিনাশী বাসুদেব ! তোমার চরণে পতিত দুঃখীদের দুঃখহরণকারী হে জগদীশ্বর ! তুমিই সমস্ত জগতের আত্মা। এই বিশ্ব সৃষ্টি করা বা নাশ করা তোমার হাতেরই খেলা। প্রভো ! তুমি অবিনাশী, শরণাগতকে রক্ষাকারী গোপাল ! তুমিই সমস্ত প্রজার রক্ষক পরাৎপর পরমেশ্বর ; চিত্ত বৃত্তি এবং চিদ্‌বৃত্তি সমূহের প্রেরকও তুমিই, তোমাকে আমি প্রণাম করি। সবাকার বরণীয় বরদাতা অনন্ত ! এসো, তুমি ছাড়া যাকে রক্ষা করার কেউ নেই, সেই অসহায় ভক্তকে রক্ষা করো। পুরাণপুরুষ, প্রাণ এবং মনের বৃত্তি তোমার নিকটে পৌঁছায় না। সবার সাক্ষী পরমাত্মা ! আমি তোমার শরণাগত। হে শরণাগতবৎসল ! কৃপা করে আমাকে রক্ষা করো। নীল কমলদলের ন্যায় শ্যামসুন্দর ! কমলপুষ্পের মধ্যভাগের মতো কিঞ্চিৎ লাল নেত্র সম্পন্ন ! কৌস্তভমণিবিভূষিত এবং পীতাম্বর ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সমস্ত প্রাণীর আদি ও অন্ত, তুমিই পরম আশ্রয়। তুমি পরাৎপর, জ্যোতির্ময়, সর্বব্যাপক এবং সর্বাত্মা। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তোমাকেই এই জগতের পরম কারণ (বীজ) এবং সমস্ত সম্পদের অধিষ্ঠাতা বলেছেন। দেবেশ ! তুমি যদি আমার রক্ষক হও, তাহলে যত বিপদই আমার হোক না কেন তবুও আমার কোনো ভয় নেই। পূর্বে সভার মধ্যে দুঃশাসনের হাত থেকে তুমি আমাকে যেভাবে বাঁচিয়েছিলে, এই বর্তমান সংকট থেকে সেইভাবে তুমি আমাকে উদ্ধার করো।'[১]

দ্রৌপদী যখন এইভাবে ভক্তবৎসল ভগবানের স্তুতি

---

[১]কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দনাব্যয়॥

বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্তিবিনাশন। বিশ্বাত্মন্ বিশ্বজনক বিশ্বহর্তঃ প্রভোহব্যয়ঃ॥
প্রপন্নপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর। আকূতীনাং চ চিত্তীনাং প্রবর্তক নতাস্মি তে॥
বরেণ্য বরদানন্ত অগতীনাং গতির্ভব। পুরাণপুরুষ প্রাণমনোবৃত্ত্যাদ্যগোচর॥
সর্বাধ্যক্ষ পরাধ্যক্ষ ত্বামহং শরণং গতা। পাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল॥
নীলোৎপলদলশ্যাম পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ। পীতাম্বরপরীধান লসৎকৌস্তুভভূষণ॥
ত্বমাদিরন্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্। পরাৎপরতরং জ্যোতির্বিশ্বাত্মা সর্বতোমুখঃ॥
ত্বামেবাহুঃ পরং বীজং নিধানং সর্বসম্পদাম্। ত্বয়া নাথেন দেবেশ সর্বাপদ্‌ভ্যো ভয়ং ন হি॥
দুঃশাসনাদহং পূর্বং সভায়াং মোচিতা যথা। তথৈব সংকটাদস্মান্মামুদ্ধর্তুমিহার্হসি॥ (মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।৮-১৬)

করলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, দ্রৌপদী সংকটে পড়েছেন। সেই অচিন্ত্যগতি পরমেশ্বর শীঘ্রই সেখানে এসে পৌঁছলেন। ভগবানকে আসতে দেখে দ্রৌপদীর আনন্দের সীমা থাকল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে দুর্বাসা মুনি আসার সমস্ত সমাচার জানালেন। ভগবান বললেন, 'কৃষ্ণা ! এখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ; শীঘ্র আমাকে কিছু খেতে দাও, তারপর অন্য কাজ !'

তাঁর কথা শুনে দ্রৌপদী অত্যন্ত লজ্জা পেলেন, বললেন—'ভগবান ! সূর্যদেবের প্রদত্ত দিব্যপাত্র থেকে ততক্ষণই খাদ্য পাওয়া যায়, যতক্ষণ আমি খাদ্যগ্রহণ না করছি। আজ আমি আহার গ্রহণ করে ফেলেছি, সুতরাং এখন কিছুই নেই। কোথা থেকে আনব ?'

ভগবান বললেন, 'দ্রৌপদী ! আমি ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে কষ্ট পাচ্ছি, আর তোমার হাসি পাচ্ছে। এখন হাসির সময় নয়, শীঘ্র গিয়ে সেই পাত্র এনে আমাকে দেখাও।'

ভগবান দ্রৌপদীর কাছে তাড়াতাড়ি করে পাত্র চাইলেন। পাত্র এলে দেখলেন যে তার একস্থানে একটুকরো শাক লেগে আছে, তিনি সেটি তুলে মুখে দিয়ে বললেন—'এই

শাকের দ্বারা সমস্ত জগতের আত্মা যজ্ঞভোক্তা পরমেশ্বর তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট হোন।' তারপর সহদেবকে বললেন—'যাও, এবার শীঘ্র গিয়ে মুনিদের খাবার জন্য ডেকে আনো।' তাঁর নির্দেশে সহদেব দুর্বাসা এবং তাঁর শিষ্যরা, যাঁরা নদীতে স্নানাহ্নিক করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের ডাকতে গেলেন।
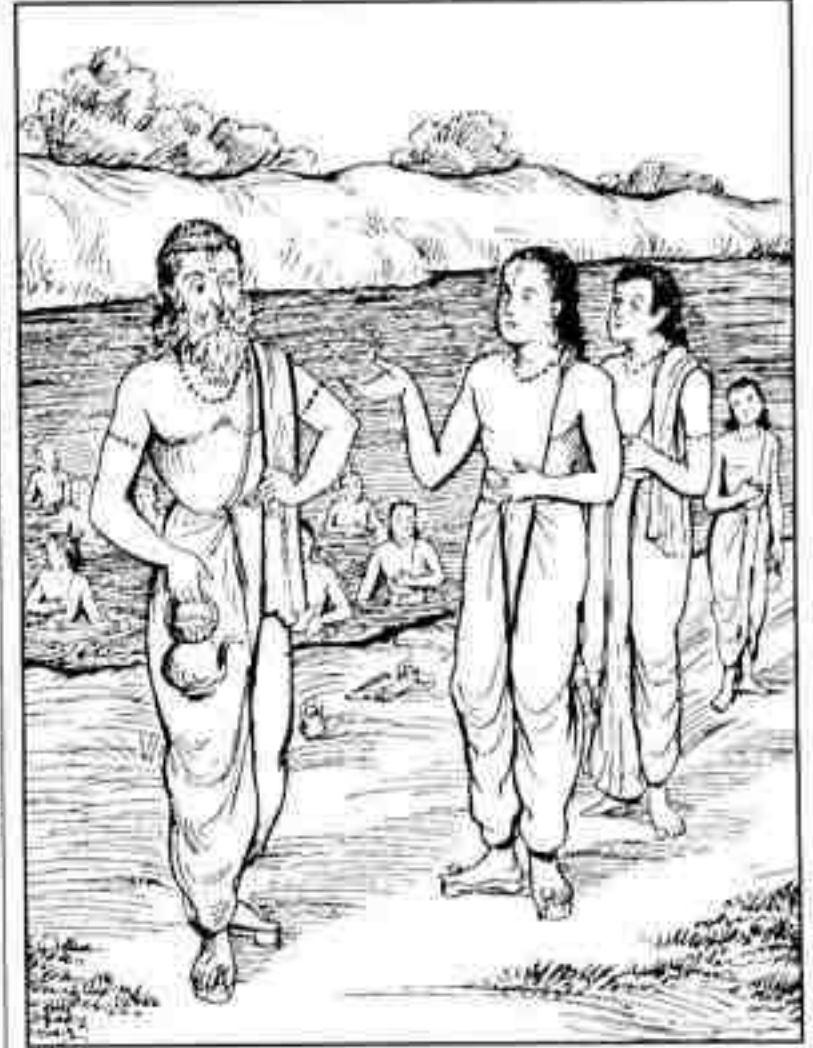
মুনিরা নদীর জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিকের অন্তিম মন্ত্রটি উচ্চারণ করছিলেন। তাঁরা হঠাৎ অনুভব করলেন যে খাওয়ার পর যে উদর পূরণ হয়ে তৃপ্তি হয়, সেই তৃপ্তি অনুভূত হচ্ছে, বারংবার ঢেঁকুর উঠছে। স্নান করে উঠে তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। একই অবস্থা সকলের। সকলে তখন দুর্বাসাকে বললেন—'ব্রহ্মর্ষি ! রাজাকে খাদ্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়ে আমরা স্নান করতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন এমন পেট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে গলা পর্যন্ত খাবার খাওয়া হয়েছে। কী করে খাদ্যগ্রহণ করব ? যে খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা বৃথা হবে। এখন আমরা কী করব ?'

দুর্বাসা মুনি বললেন—'সত্যই, বৃথা খাদ্যপ্রস্তুত করিয়ে আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে মহা অপরাধ করেছি। রাজা অম্বরীষের প্রভাব আমি এখনও ভুলে যাইনি, সেই ভয়ানক ঘটনা মনে রেখে ভগবানের ভক্তদের আমি সর্বদাই ভয় পাই। পাণ্ডবরা সকলেই মহাত্মা ব্যক্তি। তাঁরা ধার্মিক,

শূরবীর, বিদ্বান, ব্রতধারী, তপস্বী, সদাচারসম্পন্ন এবং নিত্য ভগবান বাসুদেবের ভজনা করেন। আগুন যেমন তুলোর বস্তা পুড়িয়ে ফেলে, তেমনই পাণ্ডবগণও ক্রুদ্ধ হলে আমাদের ভস্ম করে দিতে পারেন। তাই হে শিষ্যগণ ! পাণ্ডবদের কিছু না জানিয়েই আমরা এখান থেকে শীঘ্র চলে যাই চলো, তাতেই মঙ্গল।'

গুরুদেব দুর্বাসা মুনির কথা শুনে পাণ্ডবগণের ভয়ে কেউ আর এক পলও বিলম্ব না করে যেদিকে পারলেন রওনা হয়ে গেলেন। সহদেব নদীতে এসে কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি চারদিকে অন্য ঘাটগুলিতে খুঁজতে লাগলেন। সেখানকার অন্য ঋষিরা তাঁদের চলে যাওয়ার কথা সহদেবকে জানালেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানালেন। এতদ্‌সত্ত্বেও জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডবগণ তাঁদের ফিরে আসার জন্য অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে রইলেন। তাঁরা মনে করছিলেন যে 'মুনি অর্ধরাত্রে হঠাৎ করে এসে আমাদের পরীক্ষা নেবেন, দৈববশে আমাদের ওপর এই বিশাল সংকট এসে পড়েছে, কীভাবে এর থেকে আমরা রক্ষা পাব ?' তাঁরা বারবার এইসব চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ভীষণ ক্রোধসম্পন্ন দুর্বাসা মুনির থেকে আপনাদের অত্যন্ত ভয়ানক এক বিপদ আসতে পারে জেনে দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন ; তাই আমি সত্বর এখানে চলে এসেছি। আপনাদের এখন দুর্বাসাকে আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনি শিষ্যদের নিয়ে আপনাদের তেজে ভয় পেয়ে চলে গেছেন। যাঁরা সর্বদা ধর্মে তৎপর থাকে, তাঁরা দুঃখে পতিত হন না। এখন আপনাদের কাছে আমি বিদায় চাইছি, আমাকে অনুমতি দিন। আপনাদের কল্যাণ হোক।'

ভগবানের কথা শুনে দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবদের আশঙ্কা দূর হল। তাঁরা বললেন—'গোবিন্দ ! তোমাকে আমাদের রক্ষাকর্তারূপে পেয়ে আমরা অনেক বড় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। মহাসাগরে ডুবন্ত লোক যেমন জাহাজের দেখা পায়, তেমনই তুমি আমাদের সহায়ক হয়ে এসেছ। এমনি করেই তুমি ভক্তদেরও কল্যাণ করো।'

তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে ফিরে গেলেন এবং পাণ্ডবরাও দ্রৌপদীকে নিয়ে এক বন থেকে অপর বনে প্রসন্নতার সঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন।

—— ০ ——

জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ

বৈশম্পায়ন বললেন—কোনো এক সময়ের কথা, পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে একা আশ্রমে রেখে পুরোহিত ধৌম্যের নির্দেশে ব্রাহ্মণদের আহারের ব্যবস্থা করার জন্যে বনে চলে গিয়েছিলেন। সেই সময় সিন্ধুদেশের রাজা, বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র জয়দ্রথ, বিবাহের উদ্দেশ্যে শাল্বদেশে যাচ্ছিলেন। তিনি বহুমূল্য রাজসিক সাজপোশাকে সজ্জিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আরও অনেক রাজন্যবর্গ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি কাম্যক বনে এলেন। সেই নির্জন বনে আশ্রমের দ্বারে পাণ্ডবদের প্রিয় পত্নী দ্রৌপদী দাঁড়িয়েছিলেন, জয়দ্রথের দৃষ্টি তাঁর ওপরে পড়ল। দ্রৌপদী অনুপম সুন্দরী ছিলেন। তাঁর শ্যাম শরীর এক দিব্য তেজে পরিপূর্ণ ছিল। আশ্রমের নিকটস্থ বন তাঁর দেহ-কান্তিতে উজ্জ্বল হয়েছিল। জয়দ্রথের সঙ্গীরা সেই অনিন্দ্য সুন্দরীকে দেখে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন, তাঁরা ভাবলেন—এ কী কোন অপ্সরা না দেবকন্যা অথবা দেবতাসৃষ্ট কোনো মায়া ?

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই সুন্দরীকে দেখে চমকিত হলেন, তাঁর মনে কুচিন্তার উদয় হল, তিনি কামমোহিত হলেন। তাঁর সঙ্গী রাজা কোটিকাস্যকে তিনি বললেন—'কোটিক, তুমি গিয়ে অনুসন্ধান করো এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কার পত্নী, নাকি তিনি মানব পত্নী নন ! যদি একে পেয়ে যাই, তাহলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন থাকবে না। জিজ্ঞাসা করো ইনি কার, কোথা থেকে এসেছেন এবং এই কণ্টকপূর্ণ জঙ্গলে কেন এসেছেন ? উনি কী আমার সেবা করবেন ? ওঁকে পেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।'

সিন্ধুরাজের কথায় কোটিকাস্য রথ থেকে নেমে শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, তেমনই দ্রৌপদীর কাছে বললেন—'সুন্দরী ! কদম্বের ডাল ধরে এই আশ্রমে একলা দাঁড়িয়ে তুমি কে ? এই ভীষণ জঙ্গলে তোমার ভয় করছে না ? তুমি কি কোনো দেবতা, যক্ষ বা দানবের পত্নী ? অথবা কোনো শ্রেষ্ঠ অপ্সরা বা নাগকন্যা ? যমরাজ,

চন্দ্র, বরুণ বা কুবের—এদের কারো তুমি পত্নী নও তো ? ধাতা, বিধাতা, সবিতা, বিষ্ণু বা ইন্দ্র—কোন ধাম থেকে এসেছ বলো।'

'আমি রাজা সুরথের পুত্র, লোকে আমাকে কোটিকাস্য বলে। সৌবীর দেশের দ্বাদশ রাজকুমার হাতে ধ্বজা নিয়ে যাঁর রথ অনুসরণ করেন, ছয় হাজার রথী, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক সেনা সর্বদা যাঁকে অনুসরণ করেন, সেই সৌবীর-নরেশ (সিন্ধুদেশের) রাজা জয়দ্রথ ওইপাশে দণ্ডায়মান ; তুমি হয়তো তাঁর নাম শুনেছ। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন রাজা এসেছেন। আমরা আমাদের পরিচয় জানালাম, কিন্তু তোমার বিষয়ে কিছুই জানি না। এবার বলো, তুমি কার পত্নী এবং কার কন্যা ?'

কোটিকাস্যের প্রশ্ন শুনে দ্রৌপদী ধীরে ধীরে তার দিকে তাকালেন, তারপর কদম্বের ডালটি ছেড়ে গায়ের রেশমী চাদর জড়িয়ে দৃষ্টি নীচু করে বললেন—'রাজকুমার ! আমি আমার বুদ্ধিতে ভেবে দেখলাম যে আমার ন্যায় কোনো নারীর তোমার সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু এখানে এখন এমন কেউ নেই যে তোমার কথার জবাব দিতে পারে ; তাই কথা বলতে হচ্ছে। আমি একজন পাতিব্রত্য পালনকারী নারী, তা-ও আমি এখানে এখন একা ; এই বনে আমি একা তোমার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব ? কিন্তু আমি আগে থেকেই জানি যে তুমি রাজা সুরথের পুত্র, কোটিকাস্য, তাই তোমাকে আমার বিখ্যাত বংশের পরিচয় প্রদান করছি। আমি রাজা দ্রুপদের কন্যা, আমার নাম কৃষ্ণা। পাঁচ পাণ্ডবের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাসকারী ; তাঁদের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। তোমরা এখন এখানে বাহন থেকে নেমে এসো, পাণ্ডবদের আতিথ্য স্বীকার করে পরে নিজেদের অভীষ্ট স্থানে চলে যেও। তাঁদের আসার সময় হয়েছে। ধর্মরাজ অতিথিসেবা করতে ভালোবাসেন ; তোমাদের দেখে প্রসন্ন হবেন।'

দ্রৌপদী এই কথা বলে পর্ণকুটিরে ঢুকে গেলেন। তিনি তাঁদের বিশ্বাস করে অতিথি সৎকারে ব্যাপৃত হলেন। কোটিকাস্য রাজাদের কাছে গিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছে, তা জানালেন। তাঁর কথা শুনে দুষ্ট জয়দ্রথ বললেন—'আমি নিজে গিয়ে দ্রৌপদীকে দেখি।' তিনি তাঁর ছয় ভ্রাতাকে সঙ্গে করে মেষ যেমন সিংহের গুহায় প্রবেশ করে, তেমন করে পাণ্ডবদের আশ্রমে এসে বললেন—'সুন্দরী ! তুমি ভালো আছো তো ? তোমার স্বামীরা সুস্থ আছেন এবং যাঁদের তুমি কুশল-কামনা করো, তাঁরা সব কুশলে আছেন তো ?'

দ্রৌপদী বললেন—'রাজকুমার ! তুমি নিজে কুশলে আছো তো ? তোমার রাজ্য, সম্পদ এবং সেনারা কুশলে আছে তো ? আমার পতিগণ কুরুবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবরা কুশলে আছেন। রাজন্ ! পা ধোওয়ার জল ও আসন গ্রহণ করো। তোমাদের সকলের আহারের ব্যবস্থা করি।'

জয়দ্রথ বললেন—'আমি কুশলে আছি। আহারের জন্য তুমি যা দেবে, আমরা সে সবই পেয়ে গেছি। এখন তোমাকে বলছি যে পাণ্ডবদের আর কোনো ধন-সম্পদ নেই, তাদের রাজ্যচ্যুত করা হয়েছে। এখন তাদের সেবা করা বৃথা। তুমি যে এত ভক্তি করে ওদের সেবা করো, তার ফল শুধুই কষ্টভোগ। তুমি পাণ্ডবদের ছেড়ে আমার পত্নী হয়ে সুখভোগ করো। আমার সঙ্গেই সমস্ত সিন্ধু এবং সৌবীর দেশের রাজ্য তুমি লাভ করবে আর রানি হবে।'

জয়দ্রথের কথা শুনে দ্রৌপদীর হৃদয় কেঁপে উঠল, ক্রোধে তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি পিছনে সরে গেলেন। তাঁর কথায় অপমান করে দ্রৌপদী অনেক কড়াকথা বললেন—'খবরদার ! আর কখনো এমন কথা মুখে আনবে না, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আমার পতিগণ

মহা যশস্বী, সর্বদা ধর্মে অবস্থান করেন, যুদ্ধে যক্ষ ও রাক্ষসদের সম্মুখীন হতে পারেন। এইরূপ মহারথী বীরদের সম্পর্কে এমন কুকথা বলতে তোমার লজ্জা করে না ? আরে মূর্খ ! বাঁশ, কলা এবং নরকুল—ফলপ্রদান করে নিজেকে নাশ করে, তেমনই তুইও নিজের মৃত্যুর জন্য আমাকে অপহরণ করতে চাস।'

জয়দ্রথ বললেন—'কৃষ্ণা ! আমি সব জানি। আমি ভালোভাবে জানি তোমার পতি রাজপুত্র পাণ্ডবরা কেমন ! এখন তাদের বিভীষিকা দেখিয়ে আমাকে ভয় পাওয়াতে পারবে না। তোমার সামনে এখন মাত্র দুটি পথই আছে, হয় সোজা গিয়ে রথে ওঠো অথবা পাণ্ডবরা যুদ্ধে গেলে সৌবীররাজ জয়দ্রথের কাছে হাতজোড় করে কৃপা ভিক্ষা করবে।'

দ্রৌপদী বললেন—'আমার বল ও শক্তি এবং আমার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ; কিন্তু সৌবীররাজের দৃষ্টিতে আমাকে দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। । জোর জুলুম করলেও আমি জয়দ্রথের কাছে কখনো দীনবাক্য বলতে পারব না। দেবরাজ ইন্দ্র এসেও দ্রৌপদীকে নিয়ে যেতে পারবেন না, বেচারী মানুষের কী ক্ষমতা ! অর্জুন যখন শত্রুপক্ষের বীরদের সংহার করেন তখন মহাবল শত্রুর হৃদয়ও কেঁপে ওঠে। তিনি আমার জন্য তোমার সেনাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে, আগুন যেমন তৃণকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তেমনভাবে তোমাদেরও ভস্ম করে দেবেন। যখন তুমি গাণ্ডীব ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বাণগুলিকে ছুটে আসতে দেখবে এবং অর্জুনের ওপর তোমার দৃষ্টি পড়বে, তখন তুমি তোমার কুকর্মের কথা স্মরণ করে নিজ বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে থাকবে। ওরে নীচ ! ভীম যখন হাতে গদা নিয়ে ছুটে আসবেন, নকুল-সহদেবও ক্রোধজনিত বিষ উগরে দিয়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তখন তোমার খুবই অনুতাপ হবে। আমি যদি মনে মনেও কখনো আমার পতিদের উল্লঙ্ঘন করে না থাকি, যদি আমার অখণ্ড পাতিব্রত্য সুরক্ষিত থাকে তাহলে সেই সত্যের প্রভাবে আমি দেখব যে পাণ্ডবরা তোমাকে হারিয়ে জমিতে টেনে ঘষটে নিয়ে আসবেন। আমি জানি তুমি অত্যন্ত নৃশংস, আমাকে সবলে টেনে নিয়ে যাবে ; তাতে কিছু আসে যায় না। আমার পতি কুরুবংশীয় বীরদের আমি শীঘ্রই লাভ করব এবং তাঁদের সঙ্গে পুনরায় এই কাম্যক বনে এসে থাকব।'

তারপর দ্রৌপদী দেখলেন জয়দ্রথের লোকরা তাঁকে ধরতে আসছে। তখন তিনি ধমক দিয়ে বললেন—'খবরদার ! কেউ আমার গায়ে হাত দেবে না !' তারপর ভয় পেয়ে তিনি পুরোহিত ধৌম্যকে ডাকলেন। ইতিমধ্যে জয়দ্রথ এগিয়ে এসে দ্রৌপদীর শাড়ির আঁচল ধরলেন। দ্রৌপদী তাঁকে জোরে ধাক্কা মারলেন, তাতে জয়দ্রথ শিকড় কাটা গাছের মতো মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লেন। তারপর উঠে সবেগে দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টানতে লাগলেন। দ্রৌপদী বারংবার ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন, অগত্যা ধৌম্য মুনির চরণে প্রণাম জানিয়ে যেমন তেমন ভাবে রথে উঠলেন।

ধৌম্য বললেন—'জয়দ্রথ ! ক্ষত্রিয়দের প্রাচীন ধর্মের কথা স্মরণ কর। মহারথী পাণ্ডব বীরদের পরাস্ত না করে এঁকে নিয়ে যাওয়ার তোমার কোনো অধিকার নেই। পাপী ! ধার্মিক পাণ্ডবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তুমি এই নীচ কর্মের ফল পাবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

ধৌম্য এই বলে দ্রৌপদীকে যে সেনারা নিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনুগমন করে পদব্রজে যেতে লাগলেন।

——o——

পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রৌপদীকে রক্ষা এবং জয়দ্রথের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডবরা যখন বন থেকে আশ্রমে ফিরে আসছিলেন তখন এক শৃগাল উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে ডাকতে তাঁদের বামপার্শ্ব দিয়ে চলে গেল। এই অশুভ লক্ষণ দেখে রাজা যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে বললেন—'শৃগালটি আমাদের বামভাগ দিয়ে যেভাবে ডেকে চলে গেল, এতে স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে পাপাচারী কৌরবরা এখানে এসে কোনো ভীষণ উপদ্রব করেছে।' এই কথা বলতে বলতে তাঁরা আশ্রমে এসে দেখলেন যে তাঁদের পত্নী দ্রৌপদীর দাসী ক্রন্দন করছে। দাসী ধাত্রেয়িকাকে এইভাবে দেখে সারথি ইন্দ্রসেন রথ থেকে নেমে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলল—'তুমি এমন করে মাটিতে পড়ে কাঁদছ কেন ? তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে

কেন ? সেই নির্দয় পাপী কৌরবরা রাজকুমারী দ্রৌপদীকে কোনো কষ্ট দিয়ে যায়নি তো ?'

দাসী বলল—'ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী পাঁচ পাণ্ডবকে অপমান করে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। দেখো, এখনও তাদের রথের দাগ এবং পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রাজকুমারীকে এখনও বেশি দূরে নিয়ে যায়নি ; শীঘ্র রথে করে যাও, জয়দ্রথকে অনুসরণ কর। এখন তোমাদের বেশি দেরী করা উচিত নয়।'

পাণ্ডবরা বারংবার ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলেন এবং ধনুকে টংকার তুলে রথে করে রওনা হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পরই তাঁরা জয়দ্রথের ফৌজের ঘোড়ার পায়ের ধুলো উড়তে দেখতে পেলেন। তাঁরা পদাতিক সৈন্যের মধ্যে তাঁদের পুরোহিত ধৌম্যকে দেখলেন, যিনি তখনও ভীমের নাম করে ডাকছিলেন। পাণ্ডবরা ধৌম্যকে আশ্বস্ত করে বললেন 'এখন আপনি নির্ভয়ে চলুন।' তারপর তাঁরা যখন দেখলেন জয়দ্রথের সঙ্গে একই রথে দ্রৌপদীও রয়েছেন, তখন তাঁরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তারপর ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব— সকলে জয়দ্রথকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। পাণ্ডবদের আসতে দেখে শত্রুদের ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। পদাতিক সেনারা এত ভয় পেল যে তারা হাত জোড় করতে লাগল। পাণ্ডবরা তাদের কিছু করলেন না, কিন্তু বাকী যারা ছিল, তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। বর্ষার মতো নিক্ষিপ্ত বাণে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁর সঙ্গী রাজাদের তখন উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগলেন—'আপনারা সকলে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, শত্রুদের বধ করুন।' তারপর মহা কোলাহল শুরু হয়ে গেল। শিবি, সৌবীর এবং সিন্ধু দেশের সৈনিক মহা-বলবান ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীম-অর্জুনের বীরত্ব দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল। ভীমের ওপর অস্ত্রের আঘাত করলেও তিনি বিচলিত হলেন না। তিনি জয়দ্রথের সেনার অগ্রভাগের এক হাতি এবং কিছু পদাতিক সৈন্য বধ করলেন। অর্জুন পাঁচশত মহারথীকে সংহার করলেন। যুধিষ্ঠির একশত যোদ্ধাকে মারলেন। নকুল, সহদেবও তরবারি হাতে শত্রুদের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন।

ত্রিগর্ত দেশের রাজা ইতিমধ্যেই ধনুক হাতে তাঁর রথ থেকে নেমে গদার প্রহারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রথের চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন। তাঁকে কাছে আসতে দেখে রাজা যুধিষ্ঠির অর্ধচন্দ্রাকার বাণের সাহায্যে তাঁকে বধ করলেন। নিজের রথে ঘোড়া না থাকায় তখন যুধিষ্ঠির তাঁর সারথি ইন্দ্রসেনকে নিয়ে সহদেবের বিশাল রথে গিয়ে উঠলেন।

কোটিকাস্য ভীমের দিকে এগিয়ে গেলে ভীম ক্ষুরের আঘাতে তাঁর সারথির মাথা কেটে নিলেন, সারথিহীন রথের ঘোড়া এদিক ওদিক পালাতে লাগল। কোটিকাস্যকে পালাতে দেখে ভীম প্রাস নামক অস্ত্রে তাঁকে বধ করলেন। অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সৌবীর দেশের বারোজন রাজার অস্ত্র ও মাথা কেটে দিলেন। তিনি শিবি এবং ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের ও ত্রিগর্ত এবং সিন্ধুদেশের নৃপতিদেরও বধ করেন।

এতসব বীর নিহত হওয়ায় জয়দ্রথ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে প্রাণের ভয়ে বনের দিকে পালালেন। ধর্মরাজ দেখলেন ধৌম্যকে নিয়ে দ্রৌপদী আসছেন, তিনি তখন তাঁকে সহদেবের রথে তুলে নিলেন।

যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'শত্রুদের প্রধান প্রধান বীর হত হয়েছে, অনেকে পালিয়ে গেছে। আপনি নকুল, সহদেব এবং মহাত্মা ধৌম্যকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান এবং দ্রৌপদীকে শান্ত করুন। আমি ওই মূর্খ জয়দ্রথকে জীবিত ছাড়ব না, তা সে পাতালেই যাক অথবা

ইন্দ্র তার সাহায্য করতে আসুন না কেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মহাবাহু ভীম ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যদিও অত্যন্ত পাপাচারী ব্যক্তি, তবুও তুমি আমাদের বোন দুঃশলা এবং যশস্বিনী গান্ধারীর কথা মনে রেখে তার প্রাণনাশ কোরো না।'

রাজা যুধিষ্ঠির তারপর দ্রৌপদীকে নিয়ে পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে আশ্রমে এলেন। সেখানে মার্কণ্ডেয় মুনি এবং অনেক ঋষি ও ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীর জন্য দুঃখ করছিলেন। তাঁরা যখন ধর্মরাজকে পত্নীসহ ফিরে আসতে দেখলেন এবং তাঁদের কাছে সিন্ধু ও সৌবীর দেশের বীরদের পরাজয়ের কথা শুনলেন, তখন সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের সঙ্গে বাইরে বসলেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেবের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

এদিকে ভীম ও অর্জুন খবর পেলেন জয়দ্রথ এক ক্রোশ দূরে পালিয়ে গেছে, তখন তাঁরা নিজেরাই ঘোড়ার রাশ ধরে অত্যন্ত বেগে চলতে লাগলেন। অর্জুন এই সময় এক অদ্ভুত পরাক্রম দেখালেন। যদিও জয়দ্রথ দুমাইল দূরে ছিলেন, তা সত্ত্বেও অর্জুন তাঁর অভিমন্ত্রিত করা বাণ চালিয়ে জয়দ্রথের ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। ঘোড়াগুলি মারা যেতে জয়দ্রথ অত্যন্ত দিশাহারা হলেন, তিনি অর্জুনের পরাক্রমে ভীত হয়ে বনের মধ্যে পালাতে লাগলেন। অর্জুন যখন দেখলেন জয়দ্রথ প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন তখন অর্জুন চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—'রাজকুমার ! ফিরে এসো ; তোমার পালানো উচিত নয়, তুমি কোন সাহসের ওপর নির্ভর করে অন্যের স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলে ? আরে, নিজের সৈন্যদের শত্রুর কবলে ফেলে কী করে পালাচ্ছ ?'

অর্জুনের কথা শুনেও সিন্ধুরাজ ফিরলেন না। তখন মহাবলী ভীম সবেগে ধাবিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও !' অর্জুনের তখন জয়দ্রথের ওপর করুণা হল, তিনি বললেন—'দাদা ! ওকে প্রাণে মেরো না।'

ভীমের হাতে জয়দ্রথের হেনস্থা, বন্দী হওয়া এবং যুধিষ্ঠিরের দয়ায় মুক্ত হয়ে তপস্যা দ্বারা বর প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীম এবং অর্জুন—দুই ভাইকে তাঁকে বধ করতে আসতে দেখে জয়দ্রথ অত্যন্ত ভয় পেয়ে প্রাণ বাঁচাবার আশায় অত্যন্ত বেগে দৌড়তে লাগলেন। তাঁকে পালাতে দেখে ভীম রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরলেন। তারপর ক্রুদ্ধ ভীম তাঁকে তুলে মাটিতে আছাড় মারলেন এবং খুব প্রহার করলেন। জয়দ্রথ আর্তস্বরে চেঁচাতে থাকলে ভীম তাঁকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসলেন। পীড়ন সহ্য করতে না পেরে জয়দ্রথ অচেতন হয়ে গেলেন, তবুও ভীমের ক্রোধ শান্ত হল না। তখন অর্জুন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—'দুঃশলার বৈধব্যের কথা চিন্তা করে মহারাজ যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার কথা চিন্তা করুন।'

ভীম বললেন—'এই নীচ পাপী দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়েছে, সুতরাং আমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া তার উচিত নয়। কিন্তু কী করব ? রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই দয়ালু হয়ে থাকেন এবং তুমিও না বুঝে আমার কাজে বাধাপ্রদান করছ।'

এই বলে ভীম তাঁর চুলগুলি অর্ধচন্দ্রাকার বাণের সাহায্যে পাঁচভাগ করে কেটে পাঁচটি টিকি রেখে তাকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন—'ওরে মূঢ় ! যদি বেঁচে থাকতে চাস তো শোন। রাজাদের সভায় সর্বদা নিজেকে দাস বলে জানাবি, এই শর্ত মেনে নিলে তোকে জীবনদান করতে পারি।'

জয়দ্রথ তা স্বীকার করে নিলেন। তিনি ধুলায় ধূসরিত হয়ে অচেতনপ্রায় হয়ে ছিলেন এবং ওঠার চেষ্টা করছিলেন। ভীম তাই দেখে তাঁকে বেঁধে নিজের রথে তুলে নিলেন। তারপর অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন। ভীম জয়দ্রথকে সেই অবস্থাতে যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্পণ করলেন। ধর্মরাজ হেসে বললেন—'এবার একে ছেড়ে দাও।' ভীম বললেন—'দ্রৌপদীর নিকটেও একে ঘোষণা করতে হবে যে এই পাপাচারী এখন পাণ্ডবদের দাস হয়ে গেছে।' তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে ভীমকে বললেন—'আপনি এর চুল কেটে পাঁচটি টিকি রেখে দিয়েছেন এবং এ এখন মহারাজের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে ; সুতরাং এবারে একে ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

জয়দ্রথকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি বিহ্বলভাবে যুধিষ্ঠির

ও উপস্থিত সমস্ত মুনিদের প্রণাম জানালেন। দয়ালু রাজা তাঁকে বললেন—'যাও, তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হল ; আর কখনো এমন কাজ কোরো না। তুমি নিজেও নীচ, তোমার সঙ্গীরাও নীচ। তুমি পরস্ত্রী হরণ করেছিলে। তোমাকে ধিক্। তুমি ছাড়া আর কে আছে এমন নীচ কাজ করবে ! জয়দ্রথ ! যাও, আর কখনো এমন পাপ কাজ

কোরো না ; নিজের রথ, ঘোড়া, সৈন্য—সব কিছু নিয়ে চলে যাও।'

যুধিষ্ঠিরের কথায় জয়দ্রথ অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি মুখ নীচু করে চুপচাপ চলে গেলেন। পাণ্ডবদের কাছে পরাজিত ও অপমানিত হয়ে তিনি ভীষণ দুঃখিত হয়ে নিজ রাজ্যে না গিয়ে হরিদ্বার চলে গেলেন। সেখানে তিনি ভগবান শংকরের কঠিন তপস্যা করলেন। মহাদেব তাঁর তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি প্রকটিত হয়ে পূজা স্বীকার করে তাঁকে বর চাইতে বললেন। জয়দ্রথ বললেন—'আমি যেন যুদ্ধে রথসহ পাঁচ পাণ্ডবকে হারিয়ে দিতে পারি, এই বর দিন।' ভগবান শংকর বললেন—'তা হবার নয়। পাণ্ডবদের যুদ্ধে কেউ হারাতে পারবে না, বধ

করতেও পারবে না। শুধুমাত্র একদিন তুমি অর্জুন ছাড়া বাকী চার পাণ্ডবকে যুদ্ধে পিছু হটাতে সক্ষম হবে। অর্জুনের ওপর তোমার কোনো জোর এইজন্য চলবে না, কারণ সে দেবতাদের প্রভু নরের অবতার, যিনি বদ্রীকাশ্রমে ভগবান নারায়ণের সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। বিশ্বে কেউই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না, তিনি দেবতাদেরও অজেয়। আমি তাঁকে পাশুপত নামক দিব্যাস্ত্র প্রদান করেছি, অন্য কোনো অস্ত্র যার তুল্য নয়। তেমনই অর্জুন অন্য দেবতাদের কাছ থেকেও বজ্র ইত্যাদি মহা অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করেছেন। ভগবান বিষ্ণুও দুষ্টের নাশ এবং ধর্মরক্ষার জন্য এখন যদুবংশে জন্ম নিয়েছেন। তাঁকেই সকলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন। তিনি অনাদি, অনন্ত, অজ পরমেশ্বরই বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও অঙ্গে সুন্দর পীতবাস ধারণ করে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের রূপে সর্বদা অর্জুনকে রক্ষা করে থাকেন। তাই অর্জুনকে দেবতারাও পরাস্ত করতে পারেন না ; তাহলে মানুষের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁকে পরাজিত করতে সক্ষম।' এই বলে পার্বতীসহ ভগবান শংকর সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। অল্পবুদ্ধি রাজা জয়দ্রথ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবরা সেই কাম্যক বনেই থাকতে লাগলেন।

—o—

শ্রীরাম ও অন্যান্যদের জন্ম, কুবের এবং রাবণাদির উৎপত্তি, তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—হে বৈশম্পায়ন ! দ্রৌপদী এইভাবে অপহৃত হওয়ার পর মানুষের মধ্যে ইন্দ্রসম পরাক্রমশালী পাণ্ডবরা এত কষ্ট করার পরে কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! আমি যা বলছিলাম, জয়দ্রথকে হারিয়ে তার কাছ থেকে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মুনিদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। মহর্ষিরা পাণ্ডবদের এই সংকটের জন্য বারংবার দুঃখপ্রকাশ করছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষিকে লক্ষ্য করে যুধিষ্ঠির বললেন—'ভগবান ! আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—সবই জানেন। দেবর্ষিদের মধ্যেও আপনি বিখ্যাত। আপনাকে আমি আমার মনের এক প্রশ্নের কথা জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে তার নিরসন করুন। সৌভাগ্যশালিনী দ্রুপদকুমারী যজ্ঞবেদী থেকে প্রকটিত হয়েছেন, তাঁকে গর্ভবাসের কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ হওয়ারও গৌরব তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি কখনো কোনো পাপ বা নিন্দিত কর্ম করেননি। ইনি ধর্মের তত্ত্ব জানেন এবং তা পালন করেন। সেই নারীকে পাপী জয়দ্রথ অপহরণ করেছিল এবং সেই অপমানও আমাদের দেখতে হল। আত্মীয়-স্বজনের থেকে দূর জঙ্গলে বাস করে আমরা নানাবিধ কষ্ট সহ্য করছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি—'আমাদের মতো হতভাগ্য পুরুষ আপনি ইহজগতে দেখেছেন কি ?'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজন্ ! শ্রীরামকেও বনবাস এবং স্ত্রীবিয়োগের মহাদুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ মায়াজাল ছড়িয়ে আশ্রম থেকে শ্রীরামের পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করেছিলেন। জটায়ু তাঁকে বাধা দিতে যাওয়ায় রাবণ তাঁকে বধ করেন। তারপরে শ্রীরাম সুগ্রীবের সাহায্যে সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে বধ করে সীতাদেবীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! পুণ্যকর্মা শ্রীরামের কথা ও চরিত্র আমি বিস্তারিতভাবে শুনতে চাই ; সুতরাং শ্রীরাম কোন বংশে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর বল ও পরাক্রম কেমন ছিল। আমি আরও জানতে ইচ্ছা করি রাবণ কার পুত্র ছিলেন এবং শ্রীরামের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল কেন ?'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ইক্ষ্বাকু বংশে অজ নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র দশরথ, যিনি অত্যন্ত পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন এবং স্বাধ্যায়শীল ছিলেন। দশরথের চার পুত্র হয়—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এঁরা চারজনেই ছিলেন ধর্ম ও তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানী। কৌশল্যা ছিলেন রামের মা, ভরতের মা ছিলেন কৈকেয়ী আর সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন। বিদেহ দেশের রাজা জনকের কন্যা হলেন সীতা, বিধাতা তাঁকে শ্রীরামের জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। আমি তোমাকে রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত জানালাম।

এবার রাবণের জন্মবৃত্তান্ত শোনো। সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকারী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ছিলেন রাবণের পিতামহ। পুলস্ত্য ছিলেন তাঁর পরম প্রিয় মানস পুত্র। পুলস্ত্যের পত্নীর নাম গৌ, তাঁর বৈশ্রবণ (কুবের) নামে এক পুত্র ছিল। সে পিতাকে ছেড়ে পিতামহের সেবা করত, তাতে পুলস্ত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যোগবলে অন্য দেহে প্রকটিত হন। এইভাবে অর্ধ শরীর থেকে রূপান্তরিত হওয়ায় পুলস্ত্য বিশ্রবা নামে বিখ্যাত হন। তিনি সর্বদাই বৈশ্রবণের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকতেন, কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে অমরত্বের বর প্রদান করেন, ধনের প্রভু এবং লোকপাল নিযুক্ত করেন, মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপন করান এবং নলকুবের নামক এক পুত্র প্রদান করেন। তিনি রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কাকে কুবেরের রাজধানী করে, সেখানে ইচ্ছানুযায়ী বিচরণের জন্য পুষ্পক নামে এক বিমান অর্পণ করেন। এছাড়া তিনি কুবেরকে যক্ষদের প্রভু করে 'রাজরাজ' উপাধিও প্রদান করেন।

পুলস্ত্যের অর্ধদেহ থেকে 'বিশ্রবা' নামে যে মুনি প্রকটিত হয়েছিল, সে কুবেরকে কুপিত দৃষ্টিতে দেখত। রাক্ষসদের প্রভু কুবের জানতেন যে তাঁর পিতা তাঁর ওপর প্রসন্ন নয়, তাই তিনি তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতেন। তিনি তিনজন রাক্ষস কন্যাকে তাঁর পিতার সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁরা অত্যন্ত সুন্দরী ও নৃত্যগীত পটিয়সী ছিলেন। তিনজন কন্যাই নিজের ভালো চাইতেন, তাই একে অপরের থেকে দূরত্ব রেখে মহাত্মা বিশ্রবাকে সন্তুষ্ট রাখার

চেষ্টা করতেন ; তাঁদের নাম ছিল—পুষ্পোৎকটা, রাকা এবং মালিনী। মুনি তাঁদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেককে লোকপালের ন্যায় পরাক্রমশালী পুত্র হওয়ার বরপ্রদান করেন। পুষ্পোৎকটার দুই পুত্র জন্মায়—রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ। পৃথিবীতে তাঁদের ন্যায় বলশালী কেউ ছিল না। মালিনীর এক পুত্র জন্মায়—বিভীষণ। রাকার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম নেয়, খর হল পুত্র আর শূর্পণখা কন্যার নাম। এঁদের মধ্যে বিভীষণ সব থেকে সুন্দর, ভাগ্যবান, ধর্মরক্ষক এবং সৎকর্মকুশল ছিলেন। সর্বজ্যেষ্ঠ রাবণ, তাঁর দশটি মুখ ছিল, উৎসাহ, বল এবং পরাক্রমে তিনি মহান ছিলেন। কুম্ভকর্ণ শারীরিক বলে সবার ওপরে ছিলেন। তিনি মায়াবী এবং রণদক্ষ ছিলেন আর ভীষণ দর্শন ছিল তাঁর চেহারা। খর ছিলেন ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পরাক্রমশালী ; তিনি মাংসাশী এবং ব্রাহ্মণ দ্বেষী ছিলেন। শূর্পণখার আকৃতিও বড় ভয়ানক ছিল, তিনি সর্বদা মুনিদের তপস্যায় বিঘ্ন প্রদান করতেন।

মহাসমৃদ্ধিযুক্ত হয়ে কুবের একদিন পিতার সঙ্গে উপবেশন করেছিলেন ; রাবণ প্রমুখ তাঁর বৈভব দেখে ঈর্ষান্বিত হন। তখন তাঁরা তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরা ঘোর তপস্যা আরম্ভ করেন। রাবণ এক পায়ে দণ্ডায়মান হয়ে পঞ্চাগ্নিতে তাপিত হয়ে বায়ু ভক্ষণ করে একাগ্র চিত্তে এক হাজার বছর ধরে তপস্যা করতে থাকেন। কুম্ভকর্ণও আহার সংযম করেন। তিনি ভূমিশয্যা নিয়ে কঠোর নিয়ম পালন করতেন। বিভীষণ একটি মাত্র শুষ্ক গাছের পাতা খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। তিনি উপবাস করতে ভালোবাসতেন এবং সর্বদা জপ করতেন। খর এবং শূর্পণখা—এঁরা দুজন তপস্যা নিরত ভাইদের প্রসন্ন চিত্তে সেবা করতেন।

এক হাজার বৎসর পূর্ণ হলে রাবণ তাঁর মস্তক কেটে আগুনে আহুতি দেন। তাঁর এই অদ্ভুত কর্মে ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তিনি স্বয়ং এসে তাঁকে তপস্যায় বিরত করেন এবং সকলকে বরদানের কথা বলেন—'পুত্রগণ ! আমি তোমাদের সকলের ওপর প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা করো এবং তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হও। অমরত্ব ছাড়া যা খুশি প্রার্থনা করো, আমি তা পূর্ণ করব।' তারপর রাবণকে লক্ষ্য করে বললেন—'তুমি মহত্বপূর্ণ পদলাভের আশায় তোমার যে মস্তকগুলি আহুতি দিয়েছ, তা সব পূর্বের মতোই তোমার দেহে অবস্থান করবে। তুমি ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণ করতে সক্ষম হবে এবং যুদ্ধে বিজয়ী হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

রাবণ বললেন—'গন্ধর্ব, দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর এবং ভূতগণের কাছে আমি যেন কখনো পরাজিত না হই।'

ব্রহ্মা বললেন—'তুমি যাঁদের নাম করেছ, এঁদের মধ্যে কারো হতে তোমার কোনো ভয় নেই। কেবল মানুষের থেকে ভয় হতে পারে।'

ব্রহ্মার কথায় রাবণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তিনি ভাবলেন—'আরে, মানুষ আমার কী করবে, আমি তো তাদের ভক্ষণ করে থাকি।' তারপর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর চাইতে বললেন। তাঁর বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়েছিল, তাই তিনি অধিক সময় নিদ্রার জন্য বর প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা তাঁকে 'তথাস্তু' বলে বিভীষণের কাছে এসে বললেন—'পুত্র আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, তুমিও বর চাও।'

বিভীষণ বললেন—'ভগবান ! অনেক বড় সংকট-কালেও যেন আমার মনে পাপ চিন্তা না আসে এবং শিক্ষা ছাড়াই যেন আমার হৃদয়ে 'ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ বিধি' স্বতই স্ফুরিত হয়।'

ব্রহ্মা বললেন—'রাক্ষসী গর্ভে জন্ম নিলেও তোমার মন অধর্মে যায়নি, তাই তোমাকে 'অমর হওয়ার' বরও প্রদান করছি।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—এইভাবে বরলাভ করে রাবণ

সর্বপ্রথম লঙ্কার ওপর আক্রমণ করলেন এবং কুবেরকে

পরাজিত করে লঙ্কা থেকে বার করে দিলেন। কুবের লঙ্কা ত্যাগ করে গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং কিন্নরদের সঙ্গে গন্ধমাদন পাহাড়ে এসে বাস করতে লাগলেন। রাবণ তাঁর পুষ্পক বিমানটিও কেড়ে নিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে কুবের তাঁকে শাপ দিলেন যে 'এই বিমানে তুমি কখনো চড়তে পারবে না ; যিনি তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করবেন, তাঁকেই এই বিমান বহন করবে। আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর তুমিই আমার অপমান করলে ! এর ফলে তুমি অতি শীঘ্রই নাশপ্রাপ্ত হবে।'

বিভীষণ ধর্মাত্মা ছিলেন, তিনি সৎপুরুষদের অনুকরণীয় ধর্মকে আশ্রয় করে সর্বদা কুবেরকে অনুসরণ করতেন। কুবের তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে যক্ষ ও রাক্ষসদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এদিকে মনুষ্যখাদক রাক্ষস এবং মহাবলশালী পিশাচগণ মন্ত্রণা করে রাবণকে তাঁদের রাজা নিযুক্ত করেছিলেন। দশানন অত্যন্ত বলশালী ছিলেন ; তিনি দৈত্য ও দেবতাদের আক্রমণ করে তাঁদের যত ধনরত্ন ছিল, সব অপহরণ করেছিলেন। সমস্ত জগৎকে রোদন করানোর জন্য তাঁর 'রাবণ' নাম সার্থক হয়েছিল। দেবতাদেরও তিনি সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতেন।

—o—

দেবতাদের ভালুক ও বানররূপে জন্মগ্রহণ করা

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—তারপর রাবণের কাছ থেকে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ অগ্নিদেবকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার শরণ নিলেন। অগ্নি বললেন—'ভগবান ! আপনি বিশ্রবার পুত্র রাবণকে বরপ্রদান করে তাঁকে যে অবধ্য করেছেন, সে এখন জগতের সমস্ত প্রজাকুলকে কষ্ট দিচ্ছে ; তার হাত থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

ব্রহ্মা বললেন—'হে অগ্নিদেব ! দেবতা বা অসুর তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে না। তার জন্য যা প্রয়োজন, তা আমি করেছি ; এবার শীঘ্রই তার দমন হবে। আমি চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণুকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনাতে জগতে অবতাররূপ গ্রহণ করেছেন। তিনিই রাবণকে দমন করবেন। তারপর ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন— 'ইন্দ্র ! তুমিও সব দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীতে বানররূপে জন্মগ্রহণ করো এবং ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণকারী বলবান পুত্র উৎপন্ন করো।' তারপর তিনি দুন্দুভি নামধারী গন্ধর্বীকে বললেন—'তুমিও দেবকার্য সিদ্ধির জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করো।'

ব্রহ্মার আদেশ শুনে দুন্দুভি মন্থরা নামে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণও অবতীর্ণ হয়ে ভালুক ও বানর-স্ত্রীদের গর্ভে পুত্র উৎপন্ন করেন। এইসব ভালুক ও বানররা যশ ও বলে তাদের দেবতা-পিতারই সমকক্ষ ছিলেন। তাঁরা পর্বতের চূড়া ভেঙে ফেলতেন। শাল ও তালবৃক্ষ এবং পাথরের বড় বড় টুকরোই ছিল তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র। তাঁদের শরীর ছিল বজ্রের ন্যায় অভেদ্য এবং সুদৃঢ়। তাঁরা সকলেই ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী, বলবান এবং যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। ব্রহ্মা এইসব ব্যবস্থা করে মন্থরাকে দিয়ে যে কাজ করাবার, তা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

—o—

রামের বনবাস, খর-দূষণ রাক্ষসদের বধ এবং রাবণের মারীচের কাছে গমন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আপনি শ্রীরামের সব ভাইদের জন্মকথা তো শোনালেন, আমি এখন তাঁর বনবাসের কারণ শুনতে চাই। দশরথপুত্র রাম এবং লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী সীতাকে কেন বনবাসে যেতে হয়েছিল ?

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—পুত্র জন্মগ্রহণ করায় রাজা দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর তেজস্বী পুত্ররা ক্রমশ বড় হতে লাগলেন। উপনয়নের পরে তাঁরা বিধিমত ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে বেদ এবং ধনুর্বেদ সম্পর্কে বিদ্বান হয়ে উঠলেন। যথাসময়ে তাঁদের বিবাহ হলে রাজা দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। চার পুত্রের মধ্যে রাম জ্যেষ্ঠ ; তিনি তাঁর মনোহর রূপ এবং সুন্দর স্বভাবে প্রজাকুলের প্রীতি উৎপাদন করতেন।

রাজা দশরথ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি ভাবলেন—'এখন আমার বয়স হয়েছে, অতএব রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করা উচিত।' এই ব্যাপারে তিনি তাঁর মন্ত্রী এবং ধর্মজ্ঞ পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সকলেই রাজা দশরথের সময়োচিত প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

শ্রীরামের সুন্দর চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল, হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ বাহু, দেবতার ন্যায় সুন্দর চলন, বিশাল বক্ষ, মাথায় একরাশ কুঞ্চিত কালো কেশ, দেহের দিব্যকান্তি যেন বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হচ্ছে। যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম ইন্দ্রের থেকে কম ছিল না। তাঁর নয়নাভিরাম রূপ শত্রুর মনও মুগ্ধ করে তুলত। তিনি সর্ব ধর্মবেত্তা এবং বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান ছিলেন। সমস্ত প্রজাই তাঁর অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, দুষ্টের দমনকারী, ধর্মাত্মা, সাধুদের রক্ষক, ধৈর্যবান, দুর্ধর্ষ, বিজয়ী এবং অজেয় ছিলেন। এমন গুণবান এবং মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী পুত্রকে দেখে রাজা দশরথ অত্যন্ত আনন্দে থাকতেন।

শ্রীরামের গুণাবলী স্মরণ করে রাজা দশরথ পুরোহিতকে ডেকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আজ রাত্রে অত্যন্ত পবিত্র পুষ্য নক্ষত্র যোগ হবে। আপনি রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করে রামকে খবর পাঠান।' রাজার এই কথা মন্থরাও শুনলেন। তিনি সময়মতো কৈকেয়ীর কাছে গিয়ে বললেন—'রানি ! আজ রাজা তোমার দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা করেছেন। কৌশল্যার ভাগ্য খুবই ভালো, তাঁর পুত্রেরই রাজ্যাভিষেক

হচ্ছে। তোমার আর তেমন ভাগ্য কোথায় ? তোমার পুত্র রাজ্যের অধিকারী নয়।'

মন্থরার কথা শুনে পরম সুন্দরী কৈকেয়ী রাজা দশরথের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করে মধুর হাস্যে প্রেম নিবেদন করে বললেন—'রাজন্ ! আপনি অত্যন্ত সত্যবাদী, আপনি আমাকে এক সময় বর দেবেন বলেছিলেন, তা এখন দিন।' রাজা বললেন—'বল, এখন দিচ্ছি ; তোমার যা ইচ্ছা হয় চেয়ে নাও।' কৈকেয়ী রাজাকে সত্যবদ্ধ করে বললেন—'আপনি রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য যে আয়োজন করেছেন, তাতে ভরতের অভিষেক করানো হোক আর রাম বনে গমন করুন।' কৈকেয়ীর অপ্রিয় বাক্যে রাজা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, তিনি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়লেন। রাম যখন জানতে পারলেন যে পিতা কৈকেয়ীকে বর দিয়ে তাঁর বনবাস স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন তিনি পিতার সত্য রক্ষার জন্য নিজেই বনে চলে গেলেন। লক্ষ্মণও ধনুর্বাণ নিয়ে ভ্রাতার অনুগমন করলেন, সীতাও পতির সঙ্গে

গেলেন। রাম বনবাসে গেলে দশরথ মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন।

কৈকেয়ী এরপর ভরতকে তাঁর মাতুলালয় থেকে আনিয়ে বললেন—'পুত্র! রাজা স্বর্গগমন করেছেন, রাম-লক্ষ্মণ বনে গেছেন। এখন এই বিশাল সাম্রাজ্য তুমি নিষ্কণ্টক হয়ে ভোগ করো।' ভরত অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। মাতার কথা শুনে তিনি বললেন—'কুলঘাতিনী! ধনলোভে তুমি অত্যন্ত হীন কাজ করেছ। পতিকে হত্যা করেছ এবং এই বংশের সর্বনাশ করেছ। আমার মাথায় কলঙ্ক লেপন করেছ।' এই বলে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত প্রজাকে জানালেন যে এই ষড়যন্ত্রে তাঁর কোনো হাত ছিল না। তারপর তিনি শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনার জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী এবং শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে বশিষ্ঠ, বামদেব ও বহু ব্রাহ্মণ এবং হাজার হাজার নগরবাসী চললেন। ভরত চিত্রকূট পর্বতে রাম ও লক্ষ্মণকে তপস্বীবেশে বসবাস করতে দেখলেন। তিনি বহু অনুনয়-বিনয় করলেও রাম অযোধ্যায় ফিরতে রাজি হলেন না। পিতৃসত্য পালনে তিনি বদ্ধপরিকর—একথা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে ভরতকে ফেরত পাঠালেন। তখন ভরত অযোধ্যায় না ফিরে নন্দীগ্রামে গিয়ে ভগবান শ্রীরামের পাদুকা সামনে রেখে রাজ্যশাসন করতে থাকেন।
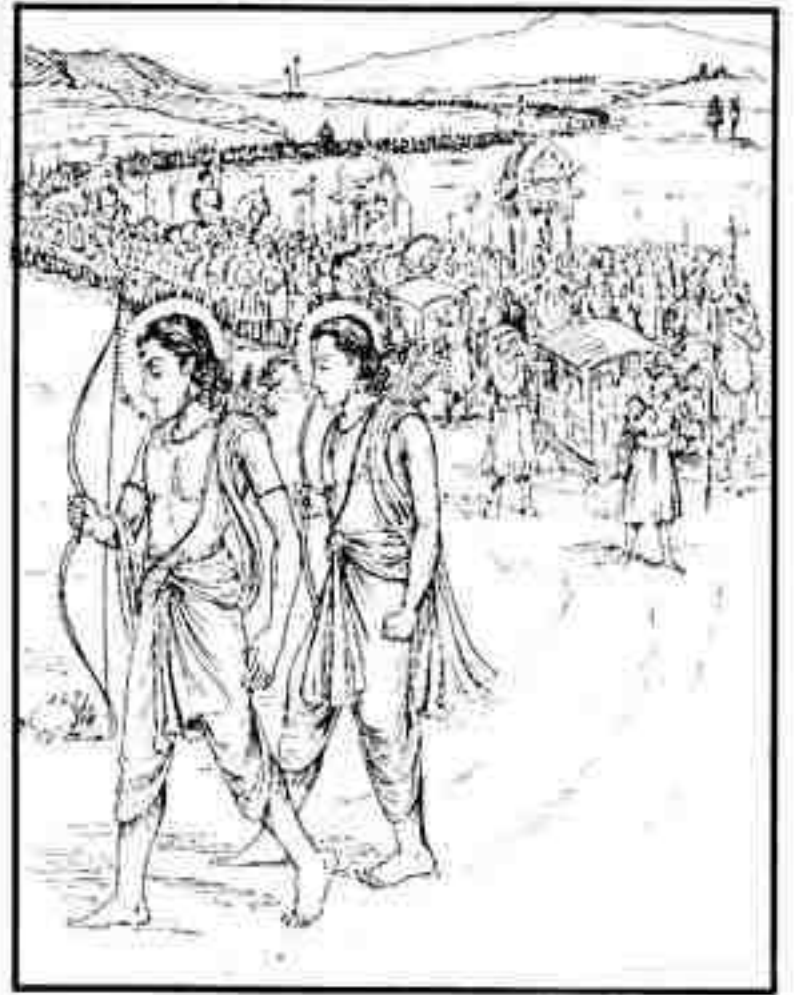
রাম দেখলেন, এখানে থাকলে নগরবাসীরা বারবার তাঁকে দর্শন করতে আসবেন। তাই তিনি শরভঙ্গ মুনির আশ্রমের কাছে ভীষণ জঙ্গলে চলে গেলেন। শরভঙ্গকে আপ্যায়ন করে তিনি গোদাবরী নদীর তীরে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে লাগলেন। তার কাছেই জনস্থান নামে আর একটি বন ছিল, সেখানে 'খর' নামক একজন রাক্ষস বাস করত। শূর্পণখার জন্য তার সঙ্গে রামের শত্রুতা হয়। শ্রীরাম সেখানকার তপস্বীদের রক্ষার জন্য চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করেন। মহাবলবান খর ও দূষণকে বধ করে তিনি সেই

স্থানটিকে নির্ভয় ধর্মারণ্য তৈরি করেন। শূর্পণখার নাক ও ঠোঁট কাটার জন্য বিবাদের সূত্রপাত হয়। জনস্থানের সমস্ত রাক্ষস নিহত হলে শূর্পণখা লঙ্কায় গমন করে এবং ভ্রাতা রাবণকে তার দুঃখের কাহিনী শোনায়। নিজ ভগ্নীর এই করুণ দশা দেখে রাবণ ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠলেন এবং সিংহাসন থেকে উঠে পড়লেন। তিনি শূর্পণখাকে নিয়ে নির্জনে গিয়ে বললেন, 'কল্যাণী ! তুমি বলো, কে আমাকে ভয় না পেয়ে, আমাকে অপমানিত করে তোমার এই দশা করেছে ? তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের দ্বারা কে হত হতে চায় ? সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে কোন সাহসী মৃত্যুর অপেক্ষা করছে ?' কথাগুলি বলার সময় রাবণের নাক-মুখ-চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছিল।

শূর্পণখা রামের পরাক্রম, খর-দূষণ-সহ সমস্ত রাক্ষসের সংহার কাহিনী সবিস্তারে রাবণকে জানাল। রাবণ ভগ্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে, কর্তব্য ঠিক করে নগর রক্ষার ব্যবস্থা করে আকাশপথে চললেন। তিনি গভীর মহাসমুদ্র পার হয়ে গোকর্ণ-তীর্থে পৌঁছলেন। সেখানে রাবণ তাঁর ভূতপূর্ব মন্ত্রী মারীচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সে শ্রীরামের ভয়ে সেখানে লুকিয়ে তপস্যা করছিল।

—o—

মৃগের বেশধারী মারীচ-বধ এবং সীতা-হরণ

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাবণকে আসতে দেখে মারীচ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল এবং ফল-মূলাদি সহকারে তাঁকে আপ্যায়ন করল। কুশল সংবাদের পর মারীচ জিজ্ঞাসা করল—'রাক্ষসরাজ ! আপনার এমন কী প্রয়োজন হল যার জন্য আপনি এতদূরে কষ্ট করে এলেন। কোনো কঠিনতম কাজ থাকলেও আমাকে আপনি নিঃসঙ্কোচে জানান এবং মনে করুন, সেই কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে।'

রাবণ ক্রোধ ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, তিনি সমস্ত ঘটনা মারীচকে জানালেন। মারীচ শুনে বললেন—'রাক্ষসরাজ ! শ্রীরামের মোকাবিলায় আপনার কোনো লাভ হবে না। আমি তাঁর পরাক্রম জানি, জগতে এমন কেউ নেই যে তাঁর বাণের তেজ সহ্য করতে পারে। সেই মহাপুরুষের জন্যই আমি আজ সন্ন্যাসী হয়েছি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে যাওয়া মৃত্যু-মুখে যাওয়ার সামিল। কোন দুরাত্মা আপনাকে এই পরামর্শ দিয়েছে ?'

তাঁর কথায় রাবণ ক্রোধে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সগর্জনে বললেন—'মারীচ! তুমি যদি আমার কথা না শোনো তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে তোমাকে এখনই মৃত্যুমুখে যেতে হবে।'

মারীচ তখন মনে মনে ভাবল—'যদি মৃত্যু নিশ্চিত হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠ পুরুষের হাতে মৃত্যুবরণই শ্রেয়।' তখন সে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা বলুন, আমাকে কী করতে হবে?' রাবণ বললেন—'তুমি এক সুন্দর মৃগরূপ ধারণ করো, যার শৃঙ্গ এবং শরীরের রোমগুলি রত্নময় ও স্বর্ণখচিত বলে মনে হয়। তারপর সীতা দেখতে পান এমন স্থানে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করবে, যাতে তিনি তোমাকে ধরার জন্য রামকে পাঠান। তিনি তোমাকে ধরতে চলে গেলে সীতাকে বশ করা সহজ হবে। আমি তাঁকে হরণ করব আর রাম তাঁর প্রিয় পত্নীর বিয়োগ ব্যথায় প্রাণবিসর্জন দেবেন। তোমাকে শুধু এটুকুই করতে হবে।'

রাবণের কথা শুনে মারীচ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রাবণের সঙ্গে সঙ্গে গেল। শ্রীরামের আশ্রমের কাছে পৌঁছে দুজনে পরামর্শ করে কাজ শুরু করে দিলেন। মৃগরূপধারী মারীচ এমন স্থানে গিয়ে দাঁড়াল যাতে সীতা তাকে ভালোভাবে দেখতে পান। বিধির বিধান প্রবল ; তারই প্রেরণায় সীতা

রামকে সেই মৃগটি ধরে আনতে অনুরোধ করলেন। সীতার অনুরোধে শ্রীরাম ধনুর্বাণ হাতে লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার জন্য রেখে সেই মৃগকে ধরতে গেলেন। শ্রীরামকে তার পিছনে আসতে দেখে মারীচ কখনো দেখা দিয়ে কখনো লুক্কায়িতভাবে তাঁকে বহুদূরে নিয়ে গেল। শ্রীরাম জানতে পারলেন যে এ এক মায়াবী প্রাণী, তখন তিনি লক্ষ্যভেদী বাণ ছুঁড়লেন। বাণ গায়ে লাগতেই মারীচ রামের মত গলা নকল করে 'হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!' বলে আর্তনাদ করতে লাগল। সেই করুণ আর্তনাদ শুনে সীতা সেই দিকে দৌড়তে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাই দেখে বললেন—'মাতা! ভয় পাবেন না ; পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে ভগবান রামকে বধ করতে পারে। এখনই শ্রীরাম এখানে এসে পৌঁছবেন।'

লক্ষ্মণের কথায় সীতা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। যদিও সীতা সাধ্বী এবং পতিব্রতা ছিলেন, সদাচারই ছিল তাঁর ভূষণ ; তা সত্ত্বেও স্ত্রী সুলভ স্বভাববশত তিনি লক্ষ্মণকে অত্যন্ত কঠোর বাক্য বলতে লাগলেন। লক্ষ্মণ ভগবান রামের অত্যন্ত প্রিয় এবং সদাচারী ছিলেন। সীতার মর্মভেদী বাক্যে তিনি দুই হাতে কান বন্ধ করে শ্রীরাম যে পথে গেছেন, সেই পথ অনুসরণ করলেন। হাতে ধনুক বাণ নিয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ চিহ্ন ধরে যেতে লাগলেন।

সেই অবকাশে সাধ্বী সীতাকে হরণ করার জন্য রাবণ সন্ন্যাসী বেশে আশ্রমে হাজির হলেন। সন্ন্যাসীকে আশ্রমে আসতে দেখে ধার্মিক সীতা তাঁর আহারের জন্য ফল-মূলাদি এনে তাঁকে আহার করতে অনুরোধ করলেন। রাবণ বললেন—'সীতা! আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, আমার নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সমুদ্রপারে রমণীয় লঙ্কাপুরী আমার রাজধানী। সুন্দরী, তুমি এই তপস্বী রামকে পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে লঙ্কায় এস, সেখানে আমার পত্নী হয়ে থাকবে। অনেক সুন্দরী নারী তোমার সেবা করবে, তুমি তাদের রানি হয়ে থাকবে।'

রাবণের কথা শুনে সীতা দুই হাতে তাঁর কান চেপে ধরে বললেন 'এমন কথা বলবেন না। আকাশ যদি তারা শূন্য

হয়ে পড়ে, পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং অগ্নি তার উষ্ণতা পরিত্যাগ করে, তাহলেও আমি কখনো শ্রীরামকে পরিত্যাগ করব না।' এই বলে তিনি যেই আশ্রমে প্রবেশ করতে গেলেন, রাবণ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধরে ফেললেন এবং কঠোর স্বরে তাঁকে ধমক দিতে লাগলেন। কোমল হৃদয়া সীতা অচেতন হয়ে গেলেন, তখন রাবণ তাঁর কেশ ধরে সবলে আকাশপথে নিয়ে চললেন। সীতা 'রাম' নাম ধরে কাঁদতে লাগলেন। সেইসময় পর্বত গুহায় বাসকারী গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতাকে দেখতে পেলেন।

—o—

জটায়ু বধ এবং কবন্ধ উদ্ধার

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—রাজন্! গৃধ্ররাজ জটায়ু ছিলেন অরুণের পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। রাজা দশরথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাই তিনি সীতাকে পুত্রবধূর ন্যায় মনে করতেন। তাঁকে রাবণের হাতে বন্দী দেখে জটায়ুর ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি ছিলেন মহাবীর, রাবণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে তিনি বললেন—'নিশাচর ! তুমি জনকনন্দিনী সীতাকে এখনই ছেড়ে দাও। যদি আমার পুত্রবধূকে ছেড়ে না দাও, তাহলে তোমাকে জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হবে।'

এই বলে জটায়ু রাবণকে ঠোক্‌রাতে আরম্ভ করলেন, নখ, চঞ্চু ও পক্ষ দ্বারা আঘাত করে রাবণের সারা দেহ জর্জরিত করে তুললেন, রক্তের ধারা বইতে লাগল। শ্রীরামের হিতাকাঙ্ক্ষী জটায়ুকে এইভাবে আঘাত করতে দেখে রাবণ হাতে তরবারি নিয়ে জটায়ুর দুটি পক্ষই কেটে ফেললেন। জটায়ুকে পরাস্ত করে রাক্ষস রাবণ সীতাকে নিয়ে পুনরায় আকাশপথে চললেন। সীতা যেখানে যেখানে মুনির আশ্রম দেখতেন, নদী, পুষ্করিণী বা জীবিত প্রাণী দেখতে পাচ্ছিলেন, সেখানেই তিনি তাঁর গায়ের গহনা ফেলে দিচ্ছিলেন। কিছুদূরে গিয়ে এক পর্বত শিখরে তিনি পাঁচজন বিশালদেহ বানর দেখলেন, তিনি সেখানেও নিজ অঙ্গের বহুমূল্য বস্ত্র ফেলে দিলেন। রাবণ পাখির মতো

আকাশে তাঁর বিমানে করে যাচ্ছিলেন এবং অতি শীঘ্রই সীতাকে নিয়ে বিশ্বকর্মা নির্মিত মনোহরপুরী লঙ্কায় গিয়ে পৌঁছলেন।

সীতাকে রাবণ নিয়ে চলে গেলেন, এদিকে শ্রীরাম কপট

মৃগকে বধ করে ফিরছিলেন, পথে লক্ষ্মণের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন—'লক্ষ্মণ ! রাক্ষস পরিপূর্ণ এই ভয়ানক জঙ্গলে জানকীকে একা রেখে তুমি এখানে কী করছ ?' লক্ষ্মণ সীতার সব কথা রামকে জানালেন। শ্রীরাম সব শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তাঁরা সত্বর আশ্রমের কাছে এসে দেখলেন পর্বতের ন্যায় বিশাল এক গৃধ্র সেখানে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দুই ভাই তাঁর কাছে গেলে সেই গৃধ্র বললেন—'আপনাদের কল্যাণ হোক। আমি রাজা দশরথের প্রিয় মিত্র গৃধ্ররাজ জটায়ু।' তাঁর কথা শুনে রাম-লক্ষ্মণ ভাবতে লাগলেন—'ইনি কে ? আমাদের পিতার নাম বলে পরিচয় দিচ্ছেন !' কাছে গিয়ে তাঁরা দেখলেন জটায়ুর দুটি পক্ষই খণ্ডিত। গৃধ্র জানালেন 'সীতাকে মুক্ত করার জন্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে

তার হাতে আমার এই অবস্থা হয়েছে।' রাম জিজ্ঞাসা করলেন রাবণ কোন দিকে গেছেন। গৃধ্র ইশারায় দক্ষিণ দিকে মাথা হেলিয়েই প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর সংকেত বুঝে ভগবান শ্রীরাম পিতার বন্ধু হওয়ায় তাঁকে সম্মান জানিয়ে বিধিমতো তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

তারপর আশ্রমে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সব শূন্য পড়ে আছে, সীতা কোথাও নেই। সীতা হরণ সত্যই হয়েছে জেনে দুই ভাই অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁরা দুঃখ শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, তারপর দুজনে দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে যাত্রা করলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা মৃগদলকে পালাতে দেখলেন, কিছুদূরে গিয়ে তাঁরা এক ভয়ানক কবন্ধ দেখতে পেলেন, মেঘের মতো কালো আর পর্বতের ন্যায় বিশাল তার দেহ। সেই রাক্ষস হঠাৎ এসে লক্ষ্মণের হাত ধরে তাঁকে মুখের কাছে টেনে নিল। লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তখন ভগবান রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'হে নরশ্রেষ্ঠ ! দুঃখ কোরো না, আমি থাকতে এ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি এর বাম হস্ত কাটছি, তুমি দক্ষিণ হস্ত কেটে নাও।' এই বলে শ্রীরাম তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে তার হাত কেটে ফেললেন ; লক্ষ্মণও নিজের খড়্গের সাহায্যে তার অপর হাত কেটে দিলেন। তাতে কবন্ধ প্রাণত্যাগ করল। তার দেহ থেকে সূর্যের ন্যায় এক উজ্জ্বল দিব্য পুরুষ বেরিয়ে আকাশে স্থিত হলেন। শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ?' সে উত্তর

দিল—'ভগবান ! আমি বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণের শাপে রাক্ষসজন্ম লাভ করেছিলাম। আজ আপনার স্পর্শে শাপমুক্ত হলাম। এখন সীতার সংবাদ শুনুন—লঙ্কার রাজা

রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন। এখান থেকে কিছু দূরে ঋষ্যমূক পর্বত, তার কাছে 'পম্পা' সরোবর। সেখানে সুগ্রীব তাঁর চার মন্ত্রীর সঙ্গে বাস করছেন। তিনি বানররাজ বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনি আপনার সংকটের কথা জানান ; তাঁর শীল ও স্বভাব অত্যন্ত মধুর, তিনি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি শুধু একথাই বলতে পারি যে জানকীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবেই।'

কথাগুলি বলে সেই পরম কান্তিমান দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত হলেন, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁর কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

—o—

সুগ্রীবের সঙ্গে ভগবান শ্রীরামের বন্ধুত্ব ও বালী বধ

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—সীতাহরণের দুঃখে ব্যাকুল শ্রীরাম তারপর পম্পা সরোবরের কাছে এলেন। সেখানে স্নান করে তিনি পিতৃ-তর্পণ করলেন। তারপর দুভাই ঋষ্যমূক পর্বতে উঠলেন। সেই পর্বত শিখরে পাঁচটি বানর বসেছিল। সুগ্রীব তাঁদের আসতে দেখে সুদক্ষ মন্ত্রী হনুমানকে তাঁদের কাছে পাঠালেন। হনুমানের সঙ্গে কথা বলে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুজনে সুগ্রীবের কাছে এলেন। শ্রীরাম সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাঁকে নিজের কথা জানালেন। তাঁর কথা শুনে বানররা তাঁকে সেই দিব্য বস্ত্র দেখাল, যা সীতা রাবণের সঙ্গে যাওয়ার সময় আকাশ থেকে নীচে ফেলেছিলেন। সেটি দেখে রাম নিশ্চিত হলেন যে রাবণ সত্যই সীতাকে হরণ করেছেন। শ্রীরাম সুগ্রীবকে ভূমণ্ডলের সমস্ত বানরদের রাজারূপে অভিষিক্ত করেন। সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধে তিনি বালী বধ করবেন। সুগ্রীবও তখন সীতাকে খুঁজে আনার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এইভাবে প্রতিজ্ঞা করে দুজনে দুজনের বিশ্বাসভাজন হন। তারপর সকলে যুদ্ধ করতে কিষ্কিন্ধ্যায় রওনা হন। সেখানে গিয়ে সুগ্রীব ভীষণ গর্জন করে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই গর্জন শুনে বালী যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন তাঁর স্ত্রী তারা তাঁকে বাধাপ্রদান করেন বলেন—'স্বামী ! সুগ্রীব আজ যেরূপ সিংহনাদ করছে, তাতে মনে হয় এখন তার বল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ; কোনো বলবান সাহায্যকারী সে পেয়েছে। সুতরাং আপনি গৃহের বাইরে যাবেন না।' বালী বললেন—'তুমি কেবল প্রাণীদের আওয়াজেই তাদের সব কিছু জেনে যাও ; ভেবে বলো তো, সুগ্রীব কার সাহায্য লাভ করেছে ?' তারা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—'রাজা দশরথের পুত্র মহাবলী রামের পত্নী সীতাকে কেউ হরণ করেছে, তাঁর অনুসন্ধানের জন্য তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন। দুজনে একে অপরের শত্রুকে শত্রু ও মিত্রকে মিত্র মেনে নিয়েছেন। শ্রীরাম ধনুর্ধর বীর, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও যুদ্ধে অপরাজেয় বীর। তাছাড়াও সুগ্রীবের মৈন্দ, দ্বিবিধ, হনুমান ও জাম্ববান—এই চারজন বুদ্ধিমান, বলবান মন্ত্রী আছেন। সুতরাং এইসময় শ্রীরামের সাহায্য নেওয়ায় সুগ্রীব তোমাকে পরাজিত ও হত্যা করতে সক্ষম।'
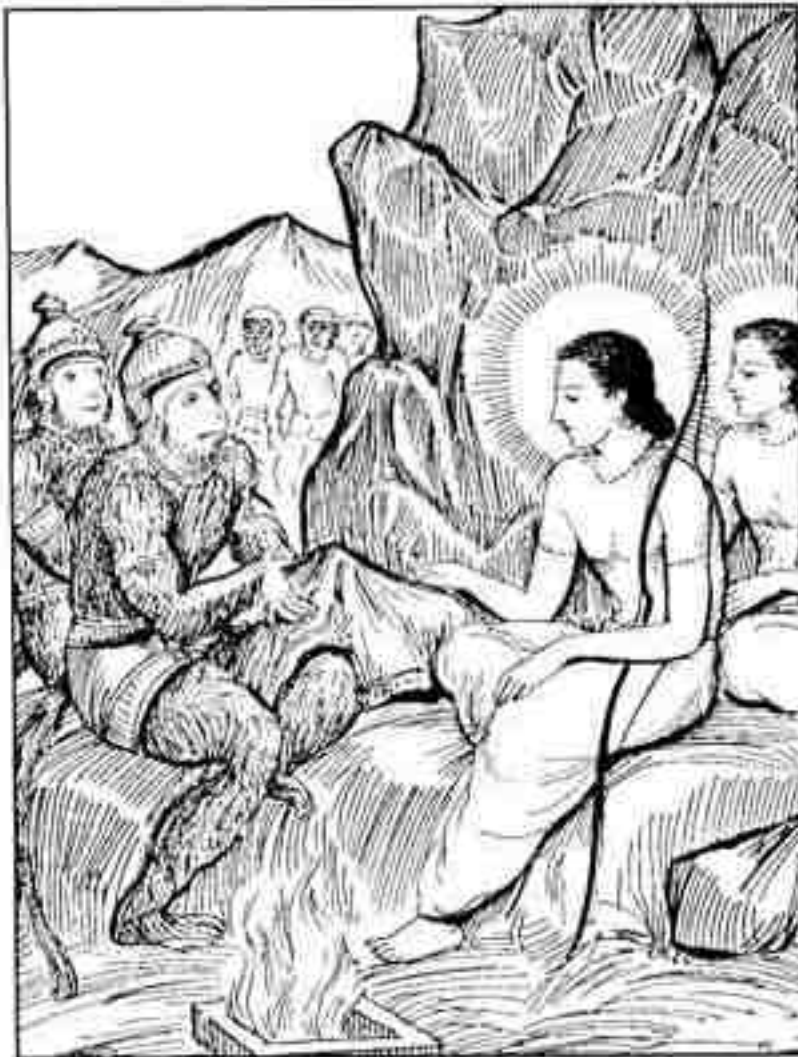
তারা হিতার্থে অনেক কিছু বললেও বালী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে কিষ্কিন্ধ্যা গুহার দ্বার দিয়ে বার হয়ে এলেন। সুগ্রীব মাল্যবান পর্বতের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, বালী তাঁর কাছে এসে বললেন—'আরে ! অনেকবার যুদ্ধে হারিয়েও ভাই বলে তোকে জীবিত ছেড়ে দিয়েছি,

আজ কি মরার জন্য এসেছিস্ ?'

তাঁর কথা শুনে সুগ্রীব ভগবান রামকে লক্ষ্য করে বালীকে শুনিয়ে বললেন—'ভাই ! তুমি আমার রাজ্য, স্ত্রী সবই কেড়ে নিয়েছ ; আমি এখন আর কেন বেঁচে থাকব, এই ভেবেই মরতে এসেছি।' এইসব বলতে বলতে দুজনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সেই যুদ্ধে গাছের ডাল, তালবৃক্ষ এবং বড় বড় পাথরের খণ্ড, এই ছিল তাদের হাতিয়ার। দুই ভাইয়ে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল, দুজনের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। কে বালী আর কে সুগ্রীব তা চেনা যাচ্ছিল না। হনুমান তাঁকে চেনাবার জন্য সুগ্রীবের গলায় এক মালা পরিয়ে দিলেন। চিহ্নের সাহায্যে সুগ্রীবকে চিনে শ্রীরাম তাঁর ধনুক থেকে বালীকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন। সেই বাণ বালীর শরীরে আঘাত করতেই তিনি সামনে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণসহ রামকে দেখে, এই কার্যের নিন্দা করে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বালীর মৃত্যু হলে সুগ্রীব তারাকে গ্রহণ করলেন এবং কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হলেন। তখন বর্ষাকাল। সুতরাং মাল্যবান পর্বতে শ্রীরাম বর্ষার চার মাস অবস্থান করলেন। সেইসময় সুগ্রীব তাঁদের খুব আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন।

—o—

ত্রিজটার স্বপ্ন, রাবণের প্রলোভন এবং সীতার সতীত্ব

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—কামনার বশীভূত হয়ে রাবণ সীতাকে লঙ্কায় এনে এক সুরম্য ভবনে রাখলেন। সেই ভবনটি নন্দনবনের ন্যায় মনোহর উদ্যানের মধ্যে অশোকবনের নিকট নির্মিত। সীতা তপস্বিনি বেশে সেখানে থাকতেন এবং তপস্যা ও উপবাসে দিন কাটাতেন। সর্বদা শ্রীরামের চিন্তা করে করে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। রাবণ সীতার দেখাশোনার জন্য কয়েকজন রাক্ষসীকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাদের আকৃতি বড় ভয়ানক। সর্বদা ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তারা সীতাকে সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দিত। অনেক সময় তারা বিকট স্বরে সীতাকে ধমক দিয়ে নিজেরা বলাবলি করত—'এসো, আমরা সকলে একে টুকরো টুকরো করে কেটে খাই।' তাঁদের কথা শুনে সীতা একদিন তাদের ডেকে বললেন—'ভগ্নী ! তোমরা আমাকে সবাই এখনই খেয়ে ফেল, এই জীবনের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমি আমার স্বামী কমললোচন রামকে ছাড়া বাঁচতে চাই না। অনাহারে থেকে আমি শরীর কৃশ করে ফেলব, তাঁকে ছাড়া আর কোনো পুরুষের সেবা করতে পারব না, একথা তোমরা সত্য বলে জেনো।'

সীতার কথা শুনে সেই ভয়ংকর রাক্ষসীরা রাবণকে সব কথা জানাতে গেল। তারা চলে গেলে ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী, যে ধর্মজ্ঞ এবং প্রিয়বাক্যশীল ছিল, সীতাকে বলল—'সখী ! তোমাকে একটা কথা বলি, আমাকে বিশ্বাস করো আর মন থেকে ভয় দূর করো। এখানে এক শ্রেষ্ঠ রাক্ষস থাকে, নাম অবিন্ধ্য। সে বৃদ্ধ হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সর্বদা শ্রীরামের হিত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। সে তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছে, তোমার স্বামী শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ নিরাপদে আছেন। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করে তোমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। রাবণকেও তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ নলকুবের তাকে যে অভিশাপ দিয়েছেন, তাতেই তুমি সুরক্ষিত থাকবে। রাবণ একবার নলকুবেরের স্ত্রী

রম্ভাকে স্পর্শ করেছিল, সেই থেকেই তিনি শাপগ্রস্ত। এখন এই কামলোলুপ রাক্ষস কোনো পরস্ত্রীকে বলাৎকার করতে পারবে না। তোমার স্বামী শ্রীরাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্রই এখানে আসবেন। সুগ্রীব তাঁদের রক্ষায় নিযুক্ত। আমিও অনিষ্টের সূচনাকারী এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি, যাতে রাবণের বিনাশকাল সন্নিকট। স্বপ্নে আমি রাবণ ও কুম্ভকর্ণের নানা দুর্দশা দেখেছি, শুধু বিভীষণই শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে শ্বেতচন্দনে চর্চিত হয়ে শ্বেতপর্বতের ওপর দণ্ডায়মান। বিভীষণের চারজন মন্ত্রীকেও তাঁর সঙ্গে একই প্রকার পরিধানে সজ্জিত অবস্থায় দেখা গেল। এঁরা সেই আসন্ন মহাভয় থেকে মুক্ত থাকবেন। স্বপ্নে আমি দেখেছি ভগবান শ্রীরামের বাণে সসাগরা পৃথিবী ঢেকে আছে ; তোমার পতির যশ যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সীতা, তুমি শীঘ্রই তোমার পতি ও দেবরের সঙ্গে মিলিত হবে।'

ত্রিজটার কথা শুনে সীতার মনে আশার সঞ্চার হল যে, তিনি পুনরায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। ত্রিজটার কথা শেষ হওয়ামাত্রই অন্য সব রাক্ষসীরা এসে তাঁকে ঘিরে বসল। সীতাদেবী একটি পাথরের ওপর বসে রামকে স্মরণ করে কাঁদছিলেন। কামপীড়িত রাবণ সেইসময় সেখানে এলেন, সীতা তাঁকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হলেন। রাবণ বললেন—'সীতা ! তুমি আজ পর্যন্ত তোমার পতির ওপর যে অনুগ্রহ করেছ, তা যথেষ্ট ; এবার আমাকে কৃপা করো। আমি আমার সব রানির থেকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তোমাকে পাটরানি করে রাখব। দেবতা, গন্ধর্ব, দানব, দৈত্য—এদের কন্যারা সকলেই আমার স্ত্রীরূপে বিদ্যমান। চোদ্দ কোটি পিশাচ, আটাশ কোটি রাক্ষস, এদের তিনগুণ যক্ষ এখানে আমার আদেশ পালন করে। অপ্সরাগণ আমার ভাই কুবেরের মতো আমার সেবাতেও উপস্থিত থাকে। আমার এখানে ইন্দ্রের ন্যায় দিব্য ভোগ প্রাপ্ত হয়। আমার কাছে থাকলে তোমার বনবাসের দুঃখ দূর হবে। সুতরাং হে সুন্দরী ! তুমি মন্দোদরীর মতো আমার পত্নী হও।'

রাবণের কথায় সীতা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তাঁর অশ্রু অনর্গল প্রবাহিত হতে লাগল। তৃণের ন্যায় কম্পিত হয়ে সীতা বললেন—'রাক্ষসরাজ এ কথা তুমি অনেকবার আমাকে বলেছ, আমি এতে কষ্ট পেলেও আমার মতো অভাগিনীকে এসব কথা শুনতেই হবে। তুমি আমার থেকে মন সরিয়ে নাও, আমি অন্যের স্ত্রী, পতিব্রতা ; তুমি কিছুতেই আমাকে পাবে না।' এই বলে সীতা তাঁর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। সীতার সোজা উত্তর শুনে রাবণ সেখান থেকে চলে গেলেন। সীতা রাক্ষসী পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানেই বসে রইলেন।
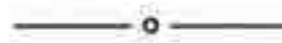
সীতার অনুসন্ধানে বানরদের গমন এবং হনুমান কর্তৃক শ্রীরামকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মাল্যবান পর্বতে বাস করছিলেন ; সুগ্রীব তাঁদের রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছিলেন। ভগবান রাম একদিন লক্ষ্মণকে বললেন—'সুমিত্রানন্দন ! কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে একবার দেখ সুগ্রীব কী করছে, আমার মনে হয় সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করতে জানে না, নিজ অল্পবুদ্ধির বশে সে উপকারীকে অবহেলা করছে। সে যদি সীতা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা না করে বিষয় ভোগেই আসক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে তুমি বালীর কাছে পৌঁছে দাও। সে যদি আমাদের জন্য কোনো উদ্যোগ নিয়ে থাকে, তাহলে তাকে সঙ্গে করে অবিলম্বে এখানে ফিরে আসবে।'

ভগবান শ্রীরামের কথা শুনেই বীর লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করলেন। নগরদ্বার দিয়ে তিনি রাজবাটীতে পৌঁছলেন। বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণ রুষ্ট হয়েছেন জেনে অত্যন্ত বিনীতভাবে স্ত্রী সহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। আদর-আপ্যায়নের পর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হয়ে শ্রীরামের নির্দেশ জানালেন। সব শুনে সুগ্রীব হাত জোড় করে বললেন—'লক্ষ্মণ ! আমি নির্বুদ্ধি নই এবং কৃতঘ্ন বা নির্দয়ও নই। সীতাদেবীর অনুসন্ধানের জন্য আমি যে-চেষ্টা করেছি, তা আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। দশদিকে সুশিক্ষিত বানরদের পাঠানো হয়েছে ; তাদের প্রত্যাবর্তনের সময়ও নির্দিষ্ট করা আছে। কেউই একমাসের বেশি সময় নিতে পারবে না। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন এই পৃথিবীর প্রতিটি পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, গ্রাম, নগর ও ঘরে

ঘরে সীতাদেবীর অনুসন্ধান করে। পাঁচরাত্রের মধ্যেই তাদের ফিরে আসার সময়কাল পূর্ণ হবে, তারপরে আপনি শ্রীরামের প্রিয় সংবাদ শুনতে পাবেন।'

সুগ্রীবের কথা শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করে সুগ্রীবের প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি তাঁকে সঙ্গে করে শ্রীরামের কাছে এসে সব কিছু জানালেন। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হতে না হতেই সব দিক থেকে অনুসন্ধান করে কয়েক হাজার বানর এসে পড়ল। শুধু দক্ষিণ দিক থেকে বানর এলো না। উপস্থিত বানররা জানাল বহু চেষ্টা করেও তারা রাবণ বা সীতার কোনো খোঁজ পায়নি। আরও দুমাস পার হওয়ার পর কিছু বানর এসে জানাল—'বানররাজ ! রাজা বালী এবং আপনি যে মধুবনকে আজ অবধি রক্ষা করে এসেছেন, সেটি আজ ধ্বংস হতে বসেছে। আপনি যাদের দক্ষিণ দিকে পাঠিয়েছিলেন, সেই পবন নন্দন হনুমান, বালিকুমার অঙ্গদ এবং আরও কয়েকজন বানরে সেটি ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে।'

তাদের ধৃষ্টতার সংবাদে সুগ্রীব বুঝতে পারলেন যে তারা কাজ পূর্ণ করে এসেছে। কারণ এমন কাজ সেইসব ভৃত্যরাই করতে পারে যারা প্রভুর কার্য ভালোভাবে সিদ্ধ করে আসতে পারে। এই ভেবে বুদ্ধিমান সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। শ্রীরামও অনুমান করলেন যে ওই বানররা নিশ্চয়ই সীতাদেবীর দর্শন পেয়েছে।

হনুমান প্রভৃতি বানররা মধুবনে বিশ্রামের পর সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে এলেন। হনুমানের হাব-ভাব এবং মুখের প্রসন্নতা দেখে শ্রীরাম বুঝলেন যে, হনুমানই সীতাকে দর্শন করেছে। হনুমানাদি অন্য বানররা এসে শ্রীরাম, সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণকে প্রণাম করলেন। তারপর রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমান বললেন—'শ্রীরাম ! আমি আপনাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ জানাচ্ছি। আমি জানকী মায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথমে

আমরা সকলে এখান থেকে গিয়ে পর্বত, বন, গুহাতে খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে এক বিশাল গুহা নজরে আসে, সেটি বহু যোজন বিস্তৃত ; ভিতরে বহুদূর পর্যন্ত অন্ধকার, ঘন জঙ্গল ও হিংস্র প্রাণীতে পরিপূর্ণ। বহুদূর যাওয়ার পর সূর্যের আলো দেখা গেল। সেখানে অপূর্ব সুন্দর এক ভবন ছিল, সেটি ময়দানবের বলে বিদিত। তাতে প্রভাবতী নামে একজন তপস্বিনী তপস্যা করছিলেন। তিনি নানা সুস্বাদু আনাদের ভোজন করতে দেন, যা খেয়ে আমাদের ক্লান্তি দূর হয়। শরীরে নতুন বল আসে। তাঁর কথামতো আমরা গুহার বাইরে আসতেই

সমুদ্র দেখতে পেলাম। সামনেই সহ্য, মলয় এবং দর্দুর পর্বতও অবস্থিত ছিল। আমরা সকলে মলয় পর্বতে উঠলাম। সেখান থেকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় বিষাদ মগ্ন হল, ভয়ংকর জলজন্তু পরিবৃত শত শত যোজন বিস্তৃত এই মহাসাগর কেমন করে পার হব ভেবে অত্যন্ত চিন্তা হল। শেষে অনশনে প্রাণত্যাগ করব বলে আমরা সকলে সেখানে বসে পড়লাম। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা প্রসঙ্গে জটায়ুর কথা উঠল। সেই কথা শুনে পর্বতের ন্যায় বিশালাকায় এক ঘোররূপধারী ভয়ংকর পাখি আমাদের সামনে হাজির হয়, দেখে মনে হচ্ছিল যেন আর এক গরুড়পক্ষী। তিনি আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমরা কোন জটায়ুর কথা বলছ ? আমি সম্পাতি, তার বড় ভাই। বহুদিন আমি তাকে দেখিনি, তার সম্পর্কে কিছু জানলে আমাকে বলো।' আমরা তখন তাঁকে জটায়ুর মৃত্যু এবং আপনার সংকটের কথা জানালাম। এই অপ্রিয় সংবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—'রাম কে ? সীতাকে কেমন করে হরণ করা হয় ? জটায়ুর মৃত্যু কেমন করে হল ?' তখন আমরা আপনার পরিচয়, সীতাহরণ, জটায়ুর মৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ, আমাদের অনশনের কারণ—সমস্ত বিস্তারিতভাবে জানাই। সব শুনে তিনি আমাদের অনশন করতে বারণ করেন ও বলেন—'রাবণকে আমি চিনি, তার মহাপুরী লঙ্কাও আমি দেখেছি। বিদেহকুমারী সীতা ওখানেই আছেন ; তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

তাঁর কথা শুনে আমরা সমুদ্র পারে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করতে থাকি। কেউই যখন সাহস করল না, তখন আমি আমার পিতা বায়ুর স্বরূপে প্রবেশ করে শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র পার হই। সমুদ্রের মধ্যে এক রাক্ষসী ছিল, যাওয়ার সময় তাকেও হত্যা করেছি। লঙ্কায় পৌঁছে রাবণের অন্তঃপুরে আমি সীতাদেবীকে দর্শন করেছি। তিনি আপনার দর্শনের আশায় তপস্যা ও উপবাসে রত। তাঁর কাছে গিয়ে আমি একান্তে বললাম—'দেবী ! আমি শ্রীরামের দূত এক বানর, আপনার দর্শনের আশায় আকাশপথে এসেছি। শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ দুজনেই কুশলে আছেন। বানররাজ সুগ্রীব তাঁদের রক্ষা করছেন, তাঁরা সকলেই আপনার কুশল সংবাদের জন্য ব্যগ্র। কিছুদিনের মধ্যেই বানর সেনাসহ আপনার স্বামী এখানে পদার্পণ করবেন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি রাক্ষস নই।' সীতাদেবী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—'অবিন্ধ্যে-এর কথা অনুযায়ী আমার মনে হয় তুমি 'হনুমান'। সে আমাকে তোমাদের মতো মন্ত্রী ও সুগ্রীবের পরিচয় দিয়েছে। মহাবাহু, তুমি এবার রামের কাছে যাও।' এই বলে তিনি একটি মণি আমাকে দিয়েছেন এবং বিশ্বাস করাবার জন্য একটি কথা বলেছেন, আপনি যখন চিত্রকূট পর্বতে ছিলেন, তখন আপনি একটি কাকের ওপর একটি শরবিহীন তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এটিই হল সেই কথার প্রধান বিষয়। তারপর সীতার খবর হৃদয়ে ধারণ করে আমি লঙ্কায় আগুন লাগাই এবং আপনার সেবার উদ্দেশ্যে চলে আসি।' সমস্ত সংবাদ শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে শ্রীরাম হনুমানের খুব প্রশংসা করলেন।

—o—

বানর সেনা সংগঠন, সেতু-বন্ধন, বিভীষণের অভিষেক এবং লঙ্কায় সৈন্য প্রবেশ

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—সুগ্রীবের নির্দেশে তখন সেখানে বড় বড় বানর বীররা একত্রিত হতে লাগল। সর্বপ্রথম বালীর শ্বশুর সুষেণ শ্রীরামের সেবায় উপস্থিত হলেন ; তাঁর সঙ্গে শত কোটি বেগবান বানর সৈন্য ছিল। মহাবলবান গজ গবয়ও সেই রূপ সেনা সঙ্গে নিয়ে এলেন। গন্ধমাদন পর্বত নিবাসী বানররাজাও তাঁর সঙ্গে শত কোটি বানর সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। গবাক্ষের সঙ্গে ছয় হাজার কোটি বানরসেনা ছিল। মহাবলী পনসের সঙ্গে বাহান্ন কোটি সৈন্য এল। অত্যন্ত পরাক্রমশালী দধিমুখও তেজস্বী বানরের বিশাল সৈন্যদল নিয়ে এলেন। জাম্ববানের সঙ্গেও পৌরুষসম্পন্ন শত কোটি সৈন্য এলো। এছাড়াও বহু বানর সেনার দল শ্রীরামের সাহায্যের জন্য একত্রিত হল। বানরদের সেই বিশাল সৈন্য সমাবেশ মহাসমুদ্রের ন্যায় দেখাল। সুগ্রীবের নির্দেশে মাল্যবান পর্বতের পাশেই সকলে শিবির স্থাপন করল।

সমস্ত সেনা একত্রিত হলে শ্রীরাম একদিন শুভ তিথি,

শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত দেখে সুগ্রীব সহ রওনা হলেন। সৈন্যদল ব্যূহ আকারে অবস্থিত ছিল, ব্যূহের অগ্রভাগ পবননন্দন হনুমান এবং পশ্চাৎভাগ শ্রীলক্ষ্মণ রক্ষা করছিলেন। এছাড়াও নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ, দ্বিবিদও সৈন্যদের রক্ষা করছিলেন। সেই সুরক্ষিত সৈন্যদল শ্রীরামের কার্য সিদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হল। পথে নানাস্থানে শিবির স্থাপন করতে করতে তারা সমুদ্রের তীরে পৌঁছে সেখানেই শিবির স্থাপন করল।

রাম তখন প্রধান প্রধান বানর সহ সুগ্রীবকে ডেকে বললেন—'আমাদের সৈন্যদল বিশাল এবং সামনে অগাধ মহাসমুদ্র, যা পার হওয়া কঠিন ; আপনারা এটি পার হওয়ার কোনো উপায় বলুন। এত সৈন্য পার করার জন্য আমাদের কোনো নৌকাও নেই। ব্যবসায়ীদের জাহাজে করে পার হওয়া সম্ভব, কিন্তু আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদের ক্ষতি করব কীভাবে ? আমাদের সেনারা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, এদের ঠিক মতো রক্ষা না করলে শত্রু এদের নাশ করতে পারে। আমার মনে হয় সমুদ্রের আরাধনা, উপবাসপূর্বক ধরনা দিলে, তিনিই কোনো উপায় জানাবেন। উপাসনা করলেও যদি ইনি রাস্তা না দেখান, তাহলে অগ্নি-বাণের সাহায্যে এঁকে শুষ্ক করে দেব।'

এই বলে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে সমুদ্রের ধারে বসলেন। নদ ও নদীর প্রভু সমুদ্র তখন জলচরসহ শ্রীরামকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে মধুর বাক্যে বললেন—'কৌশল্যানন্দন ! আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি ?' শ্রীরাম বললেন—'হে মহাসাগর ! আমি আমার সেনাদের জন্য পথ চাই, যাতে লঙ্কায় গিয়ে রাবণ বধ করতে পারি। আপনি যদি আমার অনুরোধে পথ না দেন, তাহলে অভিমন্ত্রিত অগ্নিবাণের সাহায্যে আপনাকে আমি শুষ্ক করে দেব।'

শ্রীরামের কথায় সমুদ্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন—তিনি হাত জোড় করে বললেন—'ভগবান ! আমি আপনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই না এবং আপনার কাজে বাধা দেওয়ারও আমার কোনো ইচ্ছা নেই। আগে আমার কথা শুনুন, তারপর যা ভালো মনে হয় করুন। আপনার নির্দেশে যদি পথ করে দিই, তাহলে অন্য জনও ধনুর্বাণ হাতে আমাকে রাস্তা দিতে আদেশ করবে। আপনার সেনার মধ্যে নল নামক একজন বানর আছে, সে বিশ্বকর্মার পুত্র। তার নির্মাণকার্যের খুব ভালো জ্ঞান আছে। সে নিজে তৃণ, কাঠ, পাথর যা কিছু জলে ফেলবে আমি সেগুলি জলে ভাসিয়ে রাখব। এইভাবে আপনার জন্য এক সেতু তৈরি হয়ে যাবে।'

সমুদ্র এই কথা বলে অন্তর্ধান করলেন। শ্রীরাম তখন অনশন ত্যাগ করে নলকে ডেকে বললেন—'নল ! তুমি সমুদ্রের ওপর একটি সেতু নির্মাণ করো। আমি জানতে পেরেছি তুমি এই ধরনের কাজে দক্ষ।' এই ভাবে শ্রীরাম নলকে দিয়ে সেতু নির্মাণ করালেন, সেই সেতু লম্বায় চারশত ক্রোশ এবং প্রস্থে চল্লিশ ক্রোশ। এখনও এই সেতু 'নলসেতু' নামে প্রসিদ্ধ।

তারপর শ্রীরামের কাছে রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই পরম ধর্মাত্মা বিভীষণ এলেন। তাঁর সঙ্গে চারজন মন্ত্রীও ছিলেন। ভগবান রাম অত্যন্ত উদার হৃদয় ছিলেন, তিনি বিভীষণকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন। সুগ্রীব আশংকা করছিলেন যে এ হয়ত শত্রুর কোনো গুপ্তচর ! কিন্তু শ্রীরাম
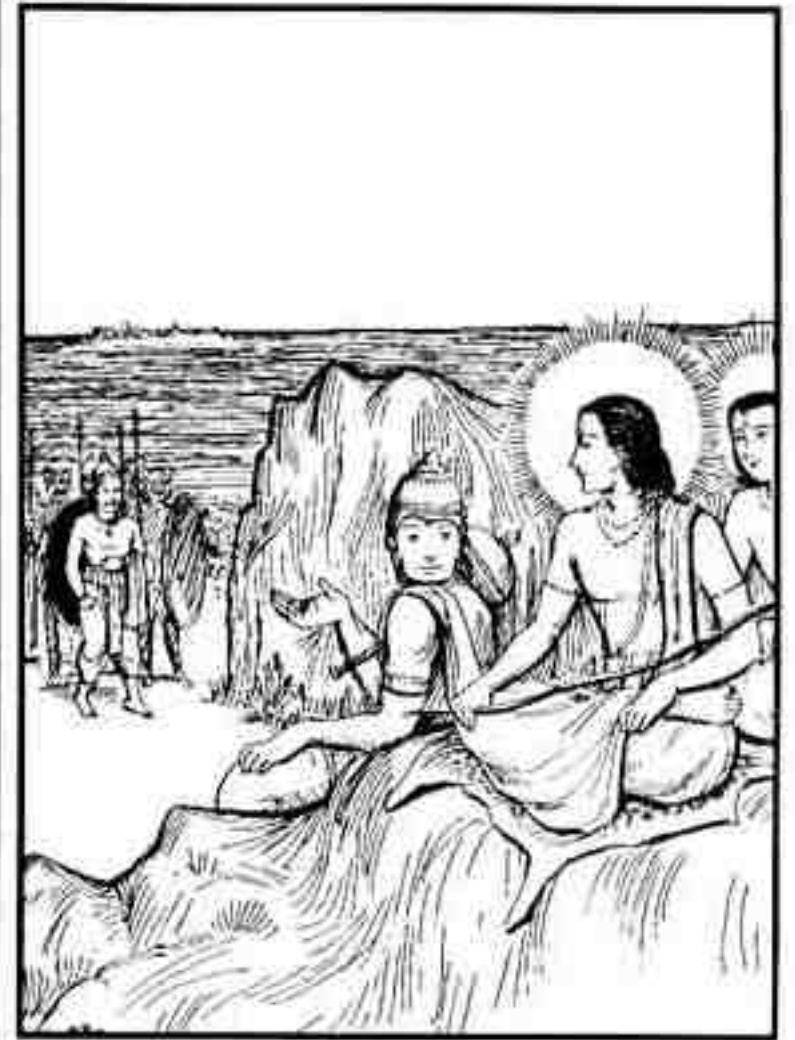
তাঁর হাবভাব, আচরণ এবং মনোভাব পরীক্ষা করে তাঁকে সৎ এবং শুদ্ধমনের জানতে পেরে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন এবং সেই মুহূর্তে তিনি বিভীষণকে রাক্ষসদের রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে

তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিলেন এবং তাঁকে নিজের মন্ত্রণাদাতা নিযুক্ত করলেন। তারপর বিভীষণের সম্মতি নিয়ে সকলে মিলে সেতুর রাস্তা ধরে রওনা হলেন এবং একমাসে সমুদ্রের অন্যপারে এসে পৌঁছলেন। লঙ্কার সীমানায় এসে তাঁরা সৈন্য শিবির স্থাপন করলেন। বানর সৈন্যগণ সেখানকার অনেক বাগান-বাড়ি তছনছ করে দিলেন। রাবণের দুজন মন্ত্রী শুক ও সারণ বানরের বেশে শ্রীরামের সৈন্যদলে মিশে গেল। বিভীষণ সেই দুজনকে চিনে ধরে ফেললেন। তারপর তাদের রামের সৈন্যবল দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন। লঙ্কার উপবনে সৈন্যদল অবস্থিত হলে ভগবান রাম বুদ্ধিমান অঙ্গদকে দূত হিসাবে রাবণের কাছে পাঠালেন।

—o—

রাবণের কাছে রামের দূত রূপে অঙ্গদকে প্রেরণ এবং রাক্ষস ও বানরদের সংগ্রাম

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—লঙ্কার যে বনে অন্ন এবং জলের কোনো অসুবিধা ছিল না, ফল এবং মূলও প্রচুর মাত্রায় ছিল ; সেখানে সৈন্য শিবির স্থাপন করা হয়েছিল, শ্রীরাম সবদিক দিয়ে তাদের রক্ষা করতেন। এদিকে রাবণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। লঙ্কার প্রাকার ও নগরদ্বার অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল ; তাই সাধারণভাবে কোনো আক্রমণকারীর নগরীর মধ্যে যাওয়া অসম্ভব ছিল। নগরের চারদিকে বিস্তৃত এবং গভীর পরিখা ছিল, যা জল পরিপূর্ণ থাকত এবং সেখানে কুমীর প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী বিচরণ করত। নগরের বিশাল ফটকগুলির পাশে লুকিয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য বুরুজ ছিল এবং পাহারা দেওয়ার জন্য প্রাচীরের ওপর চলার পথ ছিল।

একদিন অঙ্গদ দূত হয়ে লঙ্কায় গেলেন। নগর দ্বারে গিয়ে তিনি রাবণকে সংবাদ পাঠালেন এবং নির্ভয়ে পুরীতে প্রবেশ করলেন। হাজার হাজার রাক্ষসের মধ্যে অঙ্গদ মধ্যাহ্ন গগনে সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। রাবণের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—'রাক্ষসরাজ ! কোশল দেশের রাজা শ্রীরাম আপনাকে জানাবার জন্য যে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তা শুনুন এবং সেই মতো কার্য করুন ; যে ব্যক্তি নিজ মনকে বশে না রেখে অন্যায় কর্ম করে, সেইরূপ রাজার অধীনে থেকে দেশ ও নগর নষ্ট হয়ে যায়। সীতাকে বলপূর্বক অপহরণ করে আপনি একাই অপরাধ করেছেন, কিন্তু তার জন্য দণ্ড পেতে হবে আপনার নিরপরাধ প্রজাদের, আপনার সঙ্গে এদেরও বিনাশ হবে। আপনি বল ও অহংকারে উন্মত্ত হয়ে বনবাসী ঋষিদের হত্যা করেছেন, দেবতাদের অপমান করেছেন, রাজর্ষি এবং রোদনাকুল অবলাদেরও প্রাণ হরণ করেছেন। এখন এই সব অত্যাচারের ফল ভোগ করতে প্রস্তুত হন। আমি আপনাকে সপরিষদ হত্যা করব ; সাহস থাকে তো যুদ্ধে পৌরুষ দেখান। নিশাচর ! আমি মনুষ্য দেহধারী হলেও আমার ধনুকের শক্তি দেখবেন। জনকনন্দিনী সীতাকে ছেড়ে দিন, অন্যথায় আমার হাত থেকে কখনো আপনার রেহাই নেই। আমি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে পৃথিবী রাক্ষসশূন্য করে দেব।'
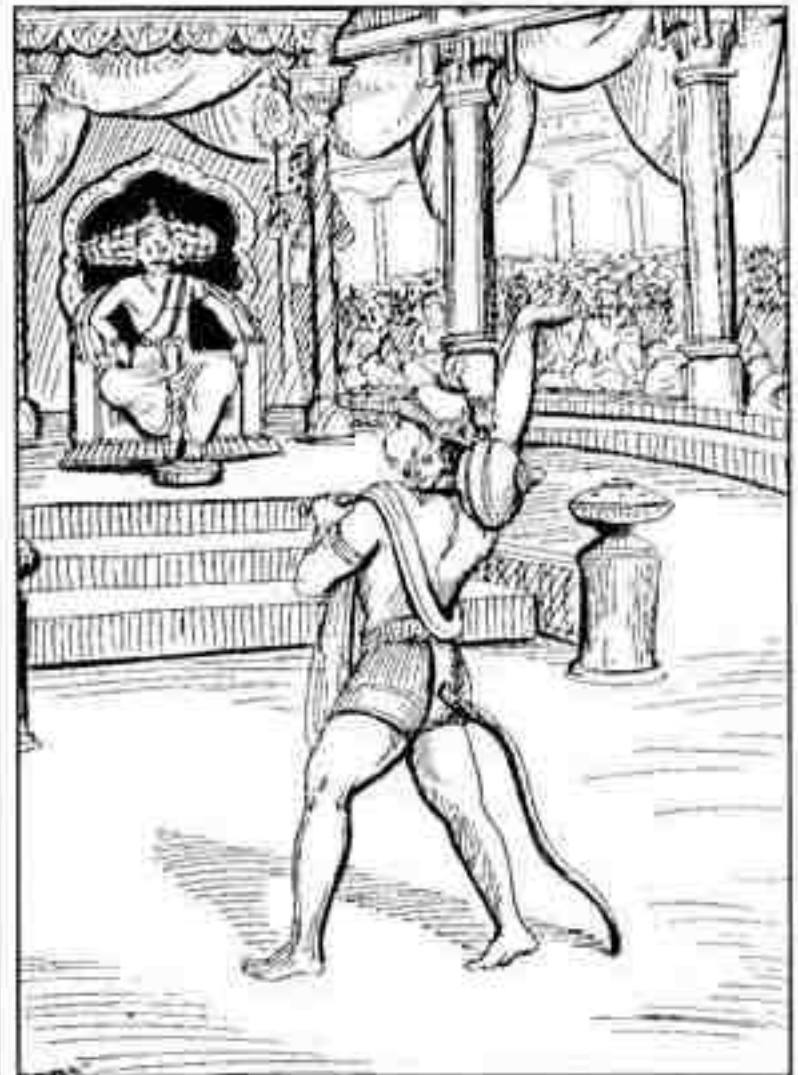
শ্রীরামের দূতের মুখে এরূপ কঠোর বাক্য রাবণ সহ্য

করতে পারলেন না, তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তাঁর ইশারায় চারজন রাক্ষস উঠে যেভাবে পাখি সিংহকে ধরে, সেইভাবে অঙ্গদকে চারদিক দিয়ে ধরে ফেলল। অঙ্গদ সেই চারজনকে নিয়েই একলাফে মহলের ছাতে গিয়ে উঠলেন। সেই লম্ফ প্রদানের সময় চার রাক্ষস ছিটকে নীচে পড়ে গেল আর তাদের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। অঙ্গদ মহলের শিখরে উঠে গেলেন এবং সেখান থেকে লাফিয়ে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করে নিজ সেনাদলের কাছে চলে এলেন। শ্রীরামের কাছে এসে তিনি সমস্ত ঘটনা জানালেন। শ্রীরাম অঙ্গদের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন, তারপর তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন।

তারপর ভগবান রাম বায়ুর ন্যায় বেগসম্পন্ন বানরদের এক সেনাদলকে দিয়ে লঙ্কার ওপর আক্রমণ হানলেন এবং নগর প্রাচীরের চারটি দরজা ভেঙে ফেললেন। নগরের দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ করা কঠিন ছিল, কিন্তু লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও জাম্ববানকে সঙ্গে করে সেটিও ধুলায় মিশিয়ে দিলেন। তারপর যুদ্ধকুশল কয়েক কোটি বানর সৈন্য নিয়ে লঙ্কাপুরীতে ঢুকলেন। সেইসময় তাঁর সঙ্গে তিন কোটি ভালুক সেনাও ছিল। রাবণও আক্রমণ প্রতিহত করতে রাক্ষস বীরদের যুদ্ধে পাঠালেন। আদেশ পেয়ে ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম ভয়ংকর রাক্ষসের দল এসে পৌঁছাল এবং অস্ত্রের বর্ষণে বানরদের সেখান থেকে হটিয়ে নিজেদের মহাপরাক্রমের পরিচয় দিতে লাগল। বানররাও রাক্ষসদের বধ করতে লাগল, অন্যদিকে রামও বাণের দ্বারা তাদের সংহার করতে শুরু করলেন। লক্ষ্মণ অন্যদিকে তাঁর বাণের সাহায্যে কেল্লার মধ্যে রাক্ষসদের প্রাণ বধ করতে লাগলেন।

রাবণ সব শুনে বিষাদমগ্ন হয়ে পিশাচ এবং রাক্ষসদের ভয়াল সেনা সহ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। তিনি শুক্রাচার্যের মতো যুদ্ধশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। শুক্রের কথামত, তিনি সৈন্যব্যূহ সৃষ্টি করলেন এবং বানর বধ করতে শুরু করলেন। শ্রীরাম রাবণের সৈন্যব্যূহ দেখে বৃহস্পতির রীতি অনুসারে নিজ সৈন্য ব্যূহ তৈরি করলেন। তারপর রাবণের সঙ্গে ভগবান রামের, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের, বিরূপাক্ষের সঙ্গে সুগ্রীবের, নিখর্বটের সঙ্গে তারের, তুণ্ডের সঙ্গে নলের এবং পটুশের সঙ্গে পনসের যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রতিপক্ষের যাকে নিজের সমকক্ষ মনে হল তাঁরই সঙ্গে বানর-ভালুকসৈন্য যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। এমন ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল হল যে দেবাসুরের সংগ্রামও তার কাছে হীনপ্রভ হয়ে পড়ল।

—o—

প্রহস্ত, ধূম্রাক্ষ এবং কুম্ভকর্ণ বধ

মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—ভয়ানক পরাক্রমী বীর প্রহস্ত সহসা রণক্ষেত্রে বিভীষণের কাছে এসে চিৎকার করে তাঁকে গদা দিয়ে আঘাত করে। বিভীষণও একটি মহাশক্তি নিয়ে সেটি অভিমন্ত্রিত করে প্রহস্তের মস্তকে মারলেন। সেই শক্তি বজ্রের ন্যায় বেগবান ছিল ; তার আঘাতে প্রহস্তের মাথা কেটে গেল এবং প্রহস্ত ঝড়ে নিপাতিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হল। তাকে বধ হতে দেখে ধূম্রাক্ষ নামের রাক্ষস তীব্র বেগে ছুটে এল। তার বাণের আঘাতে বানররা এদিক ওদিক পালাতে লাগল। তাই দেখে পবন-নন্দন হনুমান তাকে তার রথ, ঘোড়া এবং সারথিসহ বধ করলেন। তাকে মরতে দেখে বানররা একটু আশ্বস্ত হল এবং অন্যান্য রাক্ষসদের বিনাশ করতে লাগল। তাদের ভয়ংকর আঘাতে রাক্ষসরা হতাশ হয়ে লঙ্কা-পুরীতে ঢুকে পড়ল এবং রাবণকে যুদ্ধের বিস্তারিত খবর

জানাল।

তাদের কাছে সেনাসহ প্রহস্ত এবং ধূম্রাক্ষ বধের বৃত্তান্ত শুনে রাবণ অত্যন্ত শোকাতুর হলেন। তারপর সিংহাসন থেকে উঠে বললেন—'এখন কুম্ভকর্ণের পরাক্রম দেখাবার সময় হয়েছে।' এই বলে তিনি উচ্চনাদে নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি করলেন এবং বহু চেষ্টা করে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙালেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণকে রাবণ বললেন—'ভাই কুম্ভকর্ণ! তুমি জানো না, আমাদের ভীষণ সংকট উপস্থিত হয়েছে, আমি রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করে এনেছি, তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য রাম সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করে এখানে উপস্থিত হয়েছে ; তার সঙ্গে বানরদের এক বিশাল সৈন্যদলও এসেছে। ওরা আমাদের প্রহস্ত, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি আত্মীয়দের বধ করেছে এবং অনেক রাক্ষসও সংহার করেছে। তুমি ছাড়া এমন আর কোনো বীর নেই, যে ওকে হত্যা করতে পারে। তুমি বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধে গমন করো। রাম-

লক্ষ্মণাদি শত্রুদের সংহার করো।'

রাবণের নির্দেশে কুম্ভকর্ণ নিজ সৈন্য নিয়ে লঙ্কাপুরীর বাইরে এসে বিশাল সৈন্যের সমাবেশ দেখলেন। তারা তখন বিজয়োল্লাসে মগ্ন ছিল। কুম্ভকর্ণ তখন ভগবান রামের দর্শনেচ্ছায় এদিক ওদিক তাকাতে ধনুর্ধারী লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। ইত্যবসরে বানররা তাঁকে দেখে চারদিক দিয়ে ঘিরে বড় বড় গাছ উপড়ে মারতে শুরু করল। কিছু বানর অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে লাগল। কুম্ভকর্ণ এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসতে হাসতে বানরদের তুলে খেতে আরম্ভ করল। বল, চণ্ডবল, বজ্রবাহু নামক বানর তার মুখের গ্রাস হয়ে গেল। কুম্ভকর্ণের এই ভয়ানক কর্ম দেখে বানররা ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। তাদের চিৎকারে সুগ্রীব শীঘ্রই সেখানে এলেন এবং একটি শালগাছ উপড়ে কুম্ভকর্ণের মাথায় আঘাত করলেন। সেই শালগাছ টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের বিন্দুমাত্রও আঘাত লাগল না। তবে এবারে তিনি একটু সতর্ক হয়ে গেলেন। তারপর তিনি বিকট গর্জন করে

সুগ্রীবকে মুঠোয় ধরে নিয়ে চললেন। লক্ষ্মণ অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। সুগ্রীবকে নিয়ে যেতে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁকে লক্ষ্য করে এক শক্তিশালী বাণ ছুঁড়লেন। সেই বাণ কুম্ভকর্ণের কবচ ভেদ করে শরীরকে ছিন্ন করে রক্তরঞ্জিত হয়ে মাটিতে পড়ল। শরীরে ছিদ্র হওয়ায় তিনি সুগ্রীবকে ছেড়ে এক বিরাট পাথর খণ্ড নিয়ে লক্ষ্মণের ওপর আক্রমণ করলেন। লক্ষ্মণও সত্বর দুই তীক্ষ্ণবাণের আঘাতে তাঁর দুই হাত কেটে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভকর্ণের হাত

চারটি হয়ে গেল। তখন তিনি চার হাতে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সুমিত্রানন্দন আবারও তাঁর চার হাত কেটে ফেললেন। তখন কুম্ভকর্ণ তাঁর দেহকে বিশাল বড় করে ফেললেন ; তাতে বহু হস্ত, বহু পদ এবং বহু মস্তক দেখা গেল। তখন লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাঁর দেহ চিরে দিলেন। প্রলয় ঝড়ে যেমন বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়, তেমনই সেই দিব্যাস্ত্রে আহত হয়ে মহাবলী কুম্ভকর্ণ পৃথিবীতে পড়লেন। কুম্ভকর্ণকে প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়তে দেখে রাক্ষসরা ভয়ে পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে বানরের তুলনায় রাক্ষস অধিক সংখ্যায় বধ হল।

রাম-লক্ষ্মণের মূর্ছা এবং ইন্দ্রজিৎ বধ

মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—রাবণ তখন তাঁর বীরপুত্র ইন্দ্রজিতকে বললেন—'পুত্র ! তুমি শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী বীর, যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাজিত করে তুমি তোমার উজ্জ্বল কীর্তি বিস্তারিত করেছ ; সুতরাং তুমি যুদ্ধে যাও এবং রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বধ করো।'

ইন্দ্রজিৎ 'তাই হোক' বলে পিতার আদেশ স্বীকার করে কবচ ধারণ করে রথে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তিনি নিজ নাম ঘোষণা করে লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। লক্ষ্মণও ধনুর্বাণ নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে এলেন এবং সিংহ যেমন তার হুংকারে মৃগদের ভীত সন্ত্রস্ত করে, তেমনই নিজ টংকার ধ্বনিতে রাক্ষসদের ভীত করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ উভয়েই দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ জানতেন। দুজনেই একে অপরকে হারাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ; তাই দুজনেই মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। এর মধ্যে বালিকুমার অঙ্গদ একটি গাছ উপড়ে ইন্দ্রজিতের মাথায় আঘাত করলেন। আঘাত পেয়েও তিনি বিচলিত হলেন না। অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের খুব কাছে চলে এসেছিলেন, তখন ইন্দ্রজিৎ তাঁর বাম পাঁজরে গদা দিয়ে জোরে মারলেন। কিন্তু অঙ্গদও অত্যন্ত বলবান ছিলেন, তাই এই প্রহারে তিনি একেবারেই বিচলিত হলেন না। ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি আবার এক শালবৃক্ষ তুলে ইন্দ্রজিতের ওপর আঘাত হানলেন, তাতে তাঁর রথ ভেঙে ঘোড়া ও সারথি মারা গেল। রথ ভেঙে যেতে ইন্দ্রজিৎ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে মায়ার বলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তাঁকে অন্তর্ধান হতে দেখে রাম সেখানে এসে সেনাদের রক্ষা করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে রাম ও লক্ষ্মণের সমস্ত শরীর হাজার হাজার বাণে ঢেকে দিলেন। বানররা তাঁকে দেখতে না পেয়ে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড নিয়ে আকাশ-পথে তাঁকে খুঁজতে লাগল। ইন্দ্রজিৎ লুকায়িতভাবে বানরদের এবং রাম ও লক্ষ্মণের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। দুই ভ্রাতার সারা গায়ে বাণবিদ্ধ হলে তাঁরা মাটিতে পড়ে গেলেন।

এরমধ্যে বিভীষণ সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি প্রজ্ঞাস্ত্রের সাহায্যে তাঁদের মূর্ছা দূর করলেন এবং সুগ্রীব বিশল্যা নামে ওষধি মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে তাঁদের দেহে লেপন করলেন। তার প্রভাবে সহজেই তাঁদের শরীরের বাণ অপসারিত হয়ে গিয়ে সব ক্ষত সেরে গেল। এর ফলে তাঁদের চেতনা ফিরে এল এবং আলস্য ও ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেল। ভগবান রামকে সুস্থ হতে দেখে বিভীষণ হাত জোড় করে বললেন—'মহারাজ আপনার সেবার জন্য শ্বেতগিরি থেকে একজন গুহ্যক এসেছে, কুবেরের আদেশে সে এই দিব্য জল নিয়ে এসেছে। এই পবিত্র জলে

আপনি চক্ষু ধৌত করলে মায়ার সাহায্যে লুক্কায়িত প্রাণীদের দেখতে পাবেন এবং যাকে এই জল দেবেন, সে-ও ওইসব প্রাণীদের দেখতে পাবে।'

ভগবান শ্রীরাম সেই পবিত্র জল নিয়ে তাঁর দুই চক্ষু ধৌত করলেন। পরে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিধ এবং নীলও চক্ষু ধৌত করলেন। প্রায় সব বানর নেতাই এই জল নিয়ে নিজের নিজের চক্ষু ধৌত করেন। বিভীষণের কথা অনুসারেই তৎক্ষণাৎ সেই জলের প্রভাব দেখা গেল। মুহূর্তের মধ্যেই অগোচর সবকিছুই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে সেদিন যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তা জানাতে তিনি রাবণের কাছে যান ; সেখান থেকে এসে পুনরায় তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখনই লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে তাঁর ওপর আক্রমণ চালান। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে মর্মভেদী বাণের সাহায্যে বিদ্ধ করেন। লক্ষ্মণ তখন অগ্নির ন্যায় দহনকারী বাণে ইন্দ্রজিতকে আঘাত করেন। সেই বাণে আহত হয়ে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে বিষধর সাপের ন্যায় আটটি বাণ দিয়ে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন। তখন লক্ষ্মণ অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণ মুখসম্পন্ন তিনটি বাণ দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করেন। এই বাণগুলি ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করামাত্রই তাঁর দেহ প্রাণশূন্য হয়ে ধরাশায়ী হল।

—— o ——

রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণ বধ এবং রাম-সীতার মিলন

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হলে রাবণ রত্নখচিত স্বর্ণ রথে করে লঙ্কাপুরী থেকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল নানা অস্ত্রে সজ্জিত ভয়ংকর রাক্ষসের দল। তারা বানর সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শ্রীরামের দিকে এগিয়ে চলল। রাবণকে ক্রোধান্বিত হয়ে শ্রীরামের দিকে আসতে দেখে সেনাসহ মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনুমান এবং জাম্ববান তাঁদের চার দিক থেকে ঘিরে ধরল। সেই বানর বীরদের বৃক্ষের আঘাতে রাবণের সৈন্যরা মৃতপ্রায় হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। মায়াবী রাবণ যখন দেখলেন শত্রু তাঁর সেনাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন তিনি মায়াজাল বিস্তার করলেন। তাঁর দেহ থেকে নানা দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত শত শত হাজার সৈন্য বার হতে থাকল। কিন্তু ভগবান রাম তাঁর দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে তাদের সকলকে বধ করলেন। তখন রাবণ অন্য মায়া বিস্তার করলেন। তিনি রাম ও লক্ষ্মণের রূপই ধারণ করে রাম-লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হলেন। রাক্ষসরাজের মায়া দেখে লক্ষ্মণ এতটুকু বিস্মিত হলেন না, তিনি শ্রীরামকে বললেন—'ভগবান ! আপনারই আকৃতি বিশিষ্ট এই পাপী রাক্ষসকে হত্যা করুন।' শ্রীরাম 'রামরূপী' রাবণ ও বহু রাক্ষসকে ধরাশায়ী করলেন।

এই সময় ইন্দ্রের সারথি মাতলি নীলবর্ণের ঘোড়া সমন্বিত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী রথ নিয়ে রণাঙ্গনে শ্রীরামের কাছে এসে বললেন—'রঘুনাথ ! নীলঘোড়া সমন্বিত এটি ইন্দ্রের জৈত্র নামক শ্রেষ্ঠ রথ। এই রথে করে ইন্দ্র রণভূমিতে বহু দৈত্য ও দানব বধ করেছেন। পুরুষসিংহ ! আপনি আমার সারথ্যে এই রথে চড়ে শীঘ্র রাবণকে বধ করুন, বিলম্ব করবেন না।' শ্রীরঘুনাথ প্রসন্ন হয়ে সেই রথে উঠলেন। রাবণকে আক্রমণ করতেই সব রাক্ষস হাহাকার করে উঠল এবং আকাশে দেবতারা দুন্দুভি বাজিয়ে

সিংহনাদ করতে লাগলেন। এইভাবে রাম ও রাবণের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধের আর কোনো তুলনা পাওয়া অসম্ভব। রাবণ রামের ওপর বজ্রের ন্যায় অত্যন্ত কঠিন এক ত্রিশূল ছুঁড়লেন। রাম তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণবাণ দিয়ে সেটি কেটে ফেললেন। তাঁর এই দুষ্কর কাজ দেখে রাবণ ভীত হলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে হাজার-হাজার তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। তাঁর সেনাদলও তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রের বন্যা বইয়ে দিল। রাবণের এই ভীষণ মায়াতে হতবুদ্ধি হয়ে বানররা চারদিকে পালাতে শুরু করল। তখন শ্রীরাম তাঁর গাণ্ডীব থেকে একটি বাণ ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে রাবণের উদ্দেশ্যে মারলেন। রাম যেই বাণটি ছুঁড়লেন তখনই সেই রাক্ষস রথ, ঘোড়া এবং সারথিসহ ভয়ানক অগ্নি পরিবৃত হয়ে জ্বলতে লাগল। পুণ্যকর্মা ভগবান শ্রীরামের হাতে এইভাবে রাবণকে বধ হতে দেখে গন্ধর্ব এবং দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

রাজন্ ! দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণকারী নীচ রাক্ষস রাবণকে বধ করে রাম-লক্ষ্মণ এবং তাঁদের সুহৃদরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দেবতা এবং ঋষিগণ জয়ধ্বনি করে মহাবাহু রামকে আশীর্বাদ জানিয়ে অভিনন্দিত করলেন। সকল দেবতা কমলনয়ন রামের স্তুতি করলেন, গন্ধর্বরা পুষ্পবৃষ্টি করে, কীর্তিগান করে তাঁর পূজা করলেন। তারপর ভগবান শ্রীরাম লঙ্কার রাজপদে বিভীষণকে অভিষিক্ত করলেন। অবিন্ধ্য নামক বুদ্ধিমান ও বয়োবৃদ্ধ

মন্ত্রী সীতাদেবীকে নিয়ে বিভীষণের সঙ্গে শ্রীরামের কাছে এলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন—'মহাত্মা ! সর্বগুণসম্পন্না, পতিপরায়ণা, শুদ্ধাচারী দেবী জানকীকে গ্রহণ করুন।' সুন্দরী সীতাদেবী একটি পালকিতে বসে ছিলেন, তিনি শোকে অত্যন্ত কৃশ হয়েছিলেন, তাঁর শরীরে ময়লা এবং চুলে জটা পড়েছিল। তাঁকে দেখে শ্রীরাম বললেন—'জনকনন্দিনী ! আমার যা কর্তব্য ছিল, তা আমি করেছি ; এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ পুরুষ অন্য পুরুষের স্পর্শ করা স্ত্রীকে এক মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করতে পারে না।' শ্রীরামের এরূপ কঠোর বাক্য শুনে সুকুমারী সীতা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কর্তিত কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সমস্ত বানর ও লক্ষ্মণ এই কথা শুনে প্রাণহীনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলেন।

তখন জগৎ সৃষ্টিকারী দেবাদিদেব ব্রহ্মা বিমানে করে সেখানে পদার্পণ করলেন। তাঁর সঙ্গেই ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু,

যম, বরুণ, কুবের এবং সপ্তর্ষিরাও দর্শন দিলেন, দিব্য মূর্তি ধারণ করে রাজা দশরথও এক হংসবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বিমানে সেখানে এলেন। সেই সময় দেবতা ও গন্ধর্বদের ভিড়ে সারা আকাশ শরৎকালীন নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগল। যশস্বিনী জানকী তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশাল বক্ষ শ্রীরামকে বললেন—'রাজপুত্র ! স্ত্রী ও পুরুষের অবস্থান আপনি ভালোভাবেই জানেন, তাই আপনাকে কোনো দোষ দেব না। কিন্তু আপনি আমার কথা শুনুন। নিরন্তর গতিশীল বায়ু সকল প্রাণীর ভিতর বিদ্যমান, আমি যদি কোনো পাপ করে থাকি তাহলে সে যেন আমার প্রাণ হরণ করে। বীরবর ! যদি আমি স্বপ্নেও আপনি ব্যতীত আর কারো কথা চিন্তা না করে থাকি, তাহলে এই দেবতারা উত্তর দিন, উত্তরে সন্তুষ্ট হলে আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।' তখন বায়ু বললেন—'হে রাম ! আমি নিরন্তর গতিশীল বায়ু। সীতা সত্যই নিষ্কলঙ্ক। তুমি তোমার পত্নীকে গ্রহন করো।' অগ্নি বললেন—'রঘুনন্দন ! আমি প্রাণীদের শরীরের মধ্যে অবস্থান করি, তাই আমি তাদের অনেক গুপ্ত কথা জানি ; আমি সত্যই বলছি মৈথিলীর কোনোই অপরাধ নেই।' বরুণ বললেন—'রাঘব ! সমস্ত ভূতাদির রস আমা হতেই উৎপন্ন হয়, আমি নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছি তুমি মিথিলেশ কুমারীকে গ্রহণ করো।' ব্রহ্মা বললেন—'রঘুবীর ! তুমি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, দানব এবং মহর্ষিগণের শত্রু রাবণকে বধ করেছ ; আমার বরের প্রভাবে সে সমস্ত জীবের পক্ষে অবধ্য ছিল। কোনো কারণবশত কিছুকাল এই পাপীর পাপ উপেক্ষা করেছিলাম। এই দুষ্টকে বধ করার জন্যই সীতা হরণ হয়েছিল। নলকুবেরের শাপের সাহায্যে আমিই জানকীকে রক্ষা করেছি। রাবণ আগেই এই অভিশাপ পেয়েছিল যে 'যদি তুমি কোনো পরস্ত্রীর শ্লীলতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভঙ্গ করো, তাহলে তোমার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।' তাই হে রাম ! তুমি কোনো আশংকা না করে সীতাকে গ্রহণ করো। তুমি দেবতাদের জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় কাজ করেছ।' দশরথ বললেন, 'বৎস ! আমি তোমার পিতা দশরথ, তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি ; তোমার কল্যাণ হোক। আমি তোমাকে আদেশ করছি যে তুমি এবার অযোধ্যায় রাজত্ব করো।' তখন শ্রীরাম বললেন—'মহারাজ ! যদি আপনি আমার পিতা হন, তাহলে আপনাকে প্রণাম করি। আপনার আদেশে এবার আমি সুরম্যনগরী অযোধ্যায় যাব।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! শ্রীরাম তখন সকল দেবতাকে প্রণাম করে বন্ধুবর্গের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে সীতাদেবীকে পরম আনন্দে গ্রহণ করলেন। তারপর শত্রুসূদন শ্রীরামচন্দ্র অবিন্ধ্যকে অভীষ্ট বরপ্রদান করলেন এবং ত্রিজটা রাক্ষসীকে ধন ও মান দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন। এরপর ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—'কৌশল্যানন্দন ! প্রার্থনা কর, আজ তোমাকে আমি কী বর দেব ?' তখন শ্রীরাম বললেন—'আমার যেন সদা ধর্মে মতি থাকে, শত্রুর কাছে কখনো পরাজিত না হই এবং রাক্ষসদের হাতে যেসব বানর হত হয়েছে, তারা যেন পুনর্জীবন লাভ করে।' শ্রীব্রহ্মা তখন 'তথাস্তু' বলতেই সব বানর জীবিত হল। তখন সৌভাগ্যবতী সীতাদেবীও শ্রীহনুমানকে বর দিলেন, 'পুত্র ! যতদিন রামের কীর্তি থাকবে, ততদিন তোমার জীবন থাকবে এবং আমার কৃপায় তুমি সর্বদাই দিব্য ভোগ প্রাপ্ত হবে।' তারপর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

—o—

শ্রীরামের অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন এবং রাজ্যাভিষেক

বিভীষণের দ্বারা সম্মানিত হয়ে শ্রীরাম লঙ্কার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন, তারপরে সুগ্রীব ইত্যাদি মুখ্য বানর নেতাদের সঙ্গে আকাশগামী পুষ্পক বিমানে সমুদ্র পার হলেন। সমুদ্রের এপারে এসে তিনি প্রথমে যেখানে তাঁর প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে থাকতেন, সেখানে বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি সকলকে রত্নাদি উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। সকলে প্রস্থান করলে শ্রীরাম সীতাদেবী, ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণের সঙ্গে পুষ্পক বিমানে কিষ্কিন্ধ্যাপুরী রওনা হলেন। কিষ্কিন্ধ্যাতে পৌঁছে তিনি মহাপরাক্রমী বীর অঙ্গদকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলেন।
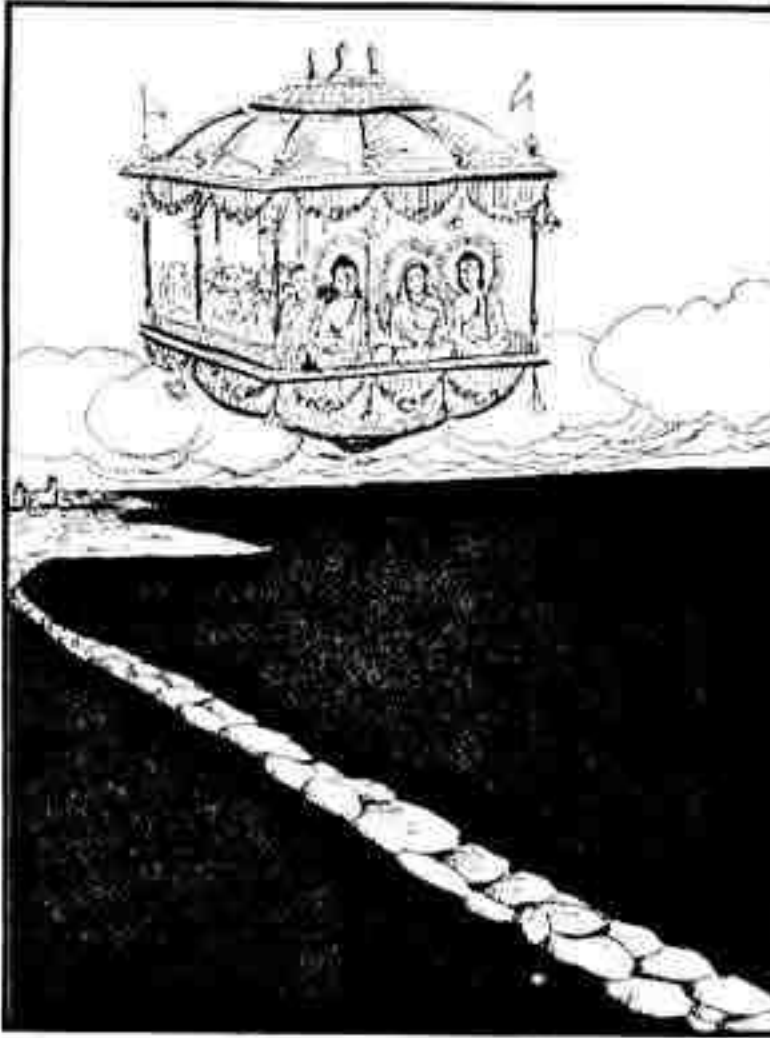
এরপর সকলকে নিয়ে যে পথে এসেছিলেন, সেই পথে নিজ রাজধানীতে ফিরে চললেন। অযোধ্যার কাছে পৌঁছে তিনি শ্রীহনুমানকে দূত করে পাঠালেন ভ্রাতা ভরতের কাছে। ভরতের আচরণে তাঁর মনোভাব বুঝে হনুমান তাঁকে শ্রীরামের পুনরাগমনের প্রিয় সংবাদ জানিয়ে ফিরে এলে সকলে নন্দীগ্রামে প্রবেশ করলেন। শ্রীরাম দেখলেন ভরত চীরবস্ত্র পরিধান করে আছেন, তাঁর দেহ তপস্বীর ন্যায় এবং তিনি শ্রীরামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে নীচে আসনে বসে আছেন। ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম পরাক্রমশালী রঘুনাথ ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। জানকীদেবীকে দেখে ভরত ও শত্রুঘ্ন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর ভরত আন্তরিক আনন্দে ভগবান রামকে তাঁর রাজ্য সমর্পণ করলেন। এরপর বিষ্ণুদেবযুক্ত শ্রবণ নক্ষত্রের পুণ্য দিবস উপস্থিত হলে বশিষ্ঠ ও বামদেব উভয়ে শুভ শিরোমণি ভগবান শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক করলেন।

অভিষেক কার্য সম্পন্ন হলে শ্রীরাম কপিরাজ সুগ্রীব এবং পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণকে রাজ্যে ফেরার অনুমতি প্রদান করলেন। রাম তাঁদের নানাভাবে আদর ও আপ্যায়ন করেন। তাতে এঁরাও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়কালে বিয়োগব্যথায় তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। ভগবান রাম পুষ্পক বিমানটি কুবেরকে প্রত্যর্পণ করে দেবর্ষিদের সাহায্যে গোমতী নদীর তীরে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন, যাতে প্রার্থনাকারীদের জন্য সব সময় ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখা ছিল।

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! পূর্বকালে অতুলনীয় পরাক্রমশালী বীর শ্রীরাম এইরূপ বনবাসের ভয়ংকর কষ্ট ভোগ করেছিলেন। পুরুষসিংহ! তুমি ক্ষত্রিয়, দুঃখ কোরো না। তুমি তোমার বাহুবলের ওপর নির্ভর করে প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী পথে দৃষ্ট রয়েছ। এতে তোমার বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই। এরূপ সংকটপূর্ণ জীবন ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ও অসুরদেরও ভোগ করতে হয়েছে। যেভাবে ইন্দ্র মরুতদের সাহায্যে বৃত্রাসুরকে নাশ করেছিলেন, তেমনই তুমি এই দেবতুল্য ধনুর্ধর ভ্রাতাদের সাহায্যে সমস্ত শত্রুকে যুদ্ধে পরাস্ত করবে। শ্রীরাম তো একাই সেই ভয়ংকর পরাক্রমশালী রাবণকে যুদ্ধে বধ করে জানকীদেবীকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর সাহায্যকারী শুধু বানর ও ভালুকই ছিল। এইসব কথা তুমি ভেবে দেখ।

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—এইভাবে মতিমান ঋষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য এবং মনোবল বাড়িয়ে দিলেন।

—০—

সাবিত্রী চরিত্র—সাবিত্রীর জন্ম ও বিবাহ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! দ্রৌপদীর জন্য আমার যেরূপ দুঃখ হয়, সেরূপ আমার নিজের জন্যও হয় না, এমনকী রাজ্য চলে যাওয়ার জন্যও হয় না। দ্রৌপদী যেমন পতিব্রতা নারী, এরূপ কোনো ভাগ্যবতী নারী আপনি কখনো দেখেছেন বা তাঁর সম্বন্ধে শুনেছেন কী ?

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! রাজকন্যা সাবিত্রী যেমনভাবে কুল-কামিনীদের পরম সৌভাগ্যরূপ পাতিব্রত্যের সুযশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, শোন। মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসেবী রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল, চতুর, পুরবাসী ও দেশবাসীর প্রিয়, সমস্ত প্রাণীর হিতে তৎপর এবং ক্ষমাশীল ছিলেন। সেই নিয়মনিষ্ঠ রাজার ধর্মশীলা জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে এক কমলনয়না কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাজা প্রসন্ন মনে তাঁর জাতকর্মাদি সুসম্পন্ন করান। সাবিত্রীদেবীকে যজ্ঞে আহ্বান করায় সাবিত্রী দেবীই প্রসন্ন হয়ে এই কন্যা প্রদান করেন, তাই ব্রাহ্মণরা এবং রাজা তাঁর নাম 'সাবিত্রী' রাখেন।

মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় কন্যা ক্রমশ বড় হতে লাগলেন এবং যৌবনে প্রবেশ করলেন। যৌবনপ্রাপ্তা কন্যাকে দেখে মহারাজ অশ্বপতি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি সাবিত্রীকে বললেন, 'কন্যা ! তুমি এখন বিবাহযোগ্যা হয়েছ, তুমি

স্বয়ংই কোনো যোগ্য পাত্রের সন্ধান করো। ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে, বিবাহযোগ্যা কন্যাকে যে পিতা কন্যাদান করেন না, তিনি নিন্দনীয় হন। ঋতুকালে যে পতি স্ত্রী সমাগম করেন না, সেই পতি নিন্দার পাত্র হয়ে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুর পর যে পুত্র বিধবা মাতাকে পালন করেন না, তিনিও নিন্দনীয় হন। অতএব তুমি শীঘ্রই পতি অন্বেষণ করো এবং এমন কাজ করো যাতে আমি দেবতাদের কাছে অপরাধী না হই।' কন্যাকে এই কথা বলে তিনি বৃদ্ধমন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন সাবিত্রীকে অনুসরণ করেন।

তপস্বিনী সাবিত্রী সংকোচের সঙ্গে পিতার আদেশ মেনে নিলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে স্বর্ণরথে বৃদ্ধমন্ত্রীদের সঙ্গে পতি অন্বেষণে রওনা হলেন। তিনি রাজর্ষিদের তপোবনে গেলেন, সেখানে রাজর্ষিদের চরণবন্দনা করে ক্রমশ নানা উপবন পার হতে লাগলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত তীর্থে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ধন-রত্ন দান করতে করতে এগোতে লাগলেন।

রাজন্ ! একদিন মদ্ররাজ অশ্বপতি তাঁর সভায় বসে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। সাবিত্রীদেবী সেইসময় মন্ত্রীগণসহ তীর্থভ্রমণ করে পিতার কাছে এলেন। সেখানে নারদকে উপস্থিত দেখে তিনি উভয়কেই প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! আপনার কন্যা কোথায় গিয়েছিলেন, কোথা থেকে আসছেন ? ইনি যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন, এঁর বিবাহ দিচ্ছেন না কেন ?' অশ্বপতি বললেন—'আমি সেইজন্যই একে পাঠিয়েছিলাম এবং আজই ও ফিরে এসেছে। আপনি একে জিজ্ঞাসা করুন, ও কাকে পছন্দ করেছে ?' তারপর অশ্বপতি সাবিত্রীকে বললেন, 'তুমি তোমার কথা বলো।' সাবিত্রী তাঁর নির্দেশ মেনে বললেন—'শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক বিখ্যাত ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন, পরে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং পুত্র বাল্যাবস্থায় থাকার সুযোগে তাঁর পূর্বশত্রু এক প্রতিবেশী রাজা তাঁর রাজ্য দখল করেন। রাজা তখন তাঁর বালক পুত্র ও ভার্যাকে নিয়ে বনে চলে যান এবং ব্রত ও তপস্যা করে দিন কাটাতে থাকেন। তাঁদের পুত্র সত্যবান বনে থেকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই আমার যোগ্য আর আমি মনে

মনে তাঁকেই পতিরূপে বরণ করেছি।'

তাই শুনে নারদ বললেন—'রাজন্ ! অত্যন্ত চিন্তার কথা, সাবিত্রীর পক্ষে বড় ভুল হয়েছে, সে না জেনেই সত্যবানকে গুণবান মনে করে তাঁকে বরণ করেছে। এই কুমার সত্যবানের পিতা সত্যভাষী এবং মাতাও সত্যভাষণ করেন, তাই ব্রাহ্মণরা তাঁর নাম রেখেছেন 'সত্যবান'।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতার প্রিয় পুত্র রাজকুমার সত্যবান এখন তেজস্বী, বুদ্ধিমান, ক্ষমাবান এবং শূরবীর হয়ে উঠেছেন তো ?'

দেবর্ষি নারদ বললেন—'দ্যুমৎসেনের বীর পুত্র সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির মতো বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের ন্যায় বীর, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল, রন্তিদেবের মতো দাতা, উশীনরের পুত্র শিবির মতো ব্রহ্মণ্য এবং সত্যবাদী, যযাতির মতো উদার, চন্দ্রের মতো প্রিয়দর্শন এবং অশ্বিনীকুমারদের মতো রূপবান। তিনি জিতেন্দ্রিয়, মৃদু স্বভাব, শূরবীর, বন্ধুস্বভাবপন্ন, ঈর্ষাহীন, লজ্জাশীল এবং তেজস্বী। তপস্যা ও শীলে নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে থাকেন যে তাঁর মধ্যে সারল্য সর্বদা বিরাজ করে।'

অশ্বপতি বললেন—'ভগবান ! আপনি তো তাঁকে সর্বগুণসম্পন্ন বলে জানাচ্ছেন, তাঁর মধ্যে যদি কোনো দোষ থাকে তবে সেটাও আমাকে নির্দ্বিধায় বলুন।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—'তাঁর মধ্যে একটিই মাত্র দোষ আছে, তাতেই তাঁর সমস্ত গুণ অবদমিত হয়ে আছে এবং কোনোভাবেই তা রোধ করা যাবে না। এছাড়া তাঁর মধ্যে আর কোনো দোষ নেই— সেই দোষ হল যে আজ থেকে ঠিক একবছর পরে সত্যবানের আয়ু শেষ হয়ে যাবে এবং সে দেহত্যাগ করবে।'

রাজা তখন সাবিত্রীকে ডেকে বললেন—'সাবিত্রী ! এখানে এস। তুমি আবার যাও এবং অন্য কোনো বরের সন্ধান করো। দেবর্ষি নারদ আমাকে বলেছেন সত্যবান অল্পায়ু, সে একবছর পরেই দেহত্যাগ করবে।'

সাবিত্রী বললেন—'পিতা ! কাঠ বা পাথরের টুকরো একবারই পৃথক হয়, কন্যাকে একবারই দান করা যায় এবং 'আমি দান করলাম' এই সংকল্প একবারই করা যায়। এখন আমি যাকে বরণ করেছি তিনি দীর্ঘায়ু হন অথবা স্বল্পায়ু, গুণবান হন অথবা গুণহীন—তিনিই আমার পতি হবেন। অন্য কোনো পুরুষকে আমি বরণ করতে পারব না। প্রথমে মনে মনে স্থির করে তারপর তা বলা হয় এবং তদনুরূপ কর্ম সম্পাদিত হয়। সুতরাং আমার কাছে মনই পরম সত্যি।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—'রাজন্ ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। তাই একে কোনোভাবেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। সত্যবানের যে সব গুণ আছে, তা অন্য কোনো পুরুষের নেই। তাই আমারও মনে হয়, এই ঈশ্বরের ইচ্ছা, আপনি ওঁকেই কন্যাদান করুন।'

রাজা বললেন—'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, এ সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না, আপনি আমার গুরুদেব। সুতরাং আমি তাই করব।'

কন্যাদানের বিষয়ে নারদের আদেশ শিরোধার্য করে রাজা অশ্বপতি বিবাহের আয়োজন করলেন এবং গুরুজন ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের ডেকে শুভদিনে কন্যাকে নিয়ে রওনা হলেন। রাজা অশ্বপতি সেই পবিত্র-বনে ব্রাহ্মণসহ দ্যুমৎসেনের আশ্রমে পদব্রজে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দেখলেন সেই নেত্রহীন রাজা এক শালবৃক্ষের নীচে কুশাসনে বসে আছেন। রাজা অশ্বসেন রাজর্ষি দ্যুমৎসেনকে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন এবং বিনীতভাবে নিজের পরিচয় দিলেন। ধর্মজ্ঞ রাজর্ষি অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে অশ্বপতিকে সমাদর জানালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—'বলুন, কী কারণে আপনি কৃপা করে এখানে পদার্পণ করেছেন ?' তখন রাজা অশ্বপতি বললেন—

'রাজর্ষি ! সাবিত্রী নামে আমার এক রূপবতী কন্যা আছে। একে ধর্ম অনুসারে আপনার পুত্রবধূরূপে স্বীকার করুন।'

দ্যুমৎসেন বললেন—'আমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছি, এখন এই বনে বাস করে সংযম সহকারে তপস্বী জীবন যাপন করছি। আপনার কন্যা এই কষ্ট সহ্য করতে পারবে না ; সে এখানে কেমন করে থাকবে ?'

অশ্বপতি বললেন—'রাজন্ ! সুখ এবং দুঃখ তো আসে আর যায়, আমি এবং আমার কন্যা একথা জানি। আমাকে আপনার একথা বলা উচিত নয়, আমি তো সব স্থির করেই এখানে এসেছি।'

দ্যুমৎসেন বললেন—'রাজন্ ! আমার আগেই এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাজ্যচ্যুত হওয়ায় সে চিন্তা পরিত্যাগ করেছি। এখন যদি আমার আগের ইচ্ছা স্বয়ংই পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তাই হোক। আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি।'

তারপরে আশ্রমে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণকে ডেকে দুই রাজা শাস্ত্রসম্মতভাবে বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করালেন। বিবাহের পর রাজা অশ্বপতি আনন্দিত মনে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সর্বগুণসম্পন্না ভার্যা পেয়ে সত্যবান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, সাবিত্রীও নিজ মনোমত স্বামী লাভ করে আনন্দিত হলেন। পিতা ফিরে গেলে সাবিত্রী তাঁর গায়ের সমস্ত গহনা খুলে গেরুয়া বসন ধারণ করলেন। তাঁর সেবা, গুণ, বিনয়, সংযম এবং সকলের মনের মতো কাজ করায় সকলেই তাঁর ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আন্তরিক সেবার দ্বারা এবং দেবতা জ্ঞানে সম্মান ও বাক্য সংযমের সাহায্যে শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রসন্ন করলেন। এই প্রকার মধুরবাক্য, কার্যকুশলতা, শান্তি ও একান্ত সেবার সাহায্যে পতিকেও সন্তুষ্ট করলেন।

—o—

সাবিত্রী দ্বারা সত্যবানের জীবন লাভ

কিছুদিন কেটে যাবার পর সত্যবানের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এল। সাবিত্রীর মনে দেবর্ষি নারদের কথা সদা জাগরূক ছিল, তিনি একটি একটি করে দিন গুণছিলেন। যখন মৃত্যুর আর চারদিন মাত্র বাকি, তখন সাবিত্রী তিন দিনের ব্রত পালন করলেন এবং দিনরাত স্থির হয়ে বসে রইলেন। আগামীকাল পতিদেবের প্রাণ বিয়োগের দিন, সেই চিন্তায় সাবিত্রী বিনিদ্র রজনী কাটালেন। পরের দিন সূর্য উদিত হতে তিনি তাঁর আহ্নিক-কৃত্যাদি সমাপ্ত করলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শাশুড়ী-শ্বশুর এবং তপোবনে অবস্থিত সকলকে প্রণাম করলেন, তাঁরা সকলেই সাবিত্রীকে অবৈধব্যসূচক আশীর্বাদ করলেন সাবিত্রীও 'তাই হোক' বলে ধ্যানযোগে সেই আশীর্বাণী গ্রহণ করলেন। সত্যবান কুড়ুল নিয়ে বনে কাষ্ঠ আহরণে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সাবিত্রী তখন তাঁকে বললেন, 'আপনি একা যাবেন না, আজ আমিও আপনার সঙ্গে যাব।' সত্যবান বললেন—'প্রিয়ে ! তুমি আগে কখনো বনে যাওনি, বনের পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং তুমি উপবাস করে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছ। এখন এই কঠিন পথে কী করে হাঁটবে ?' সাবিত্রী বললেন—'উপবাসের জন্য আমার কোনো দুর্বলতা বা ক্লান্তি নেই, আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল। আপনি দয়া করে যেতে বারণ

করবেন না।' সত্যবান বললেন—'তোমার যদি যাওয়াতে উৎসাহ থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে চল, কিন্তু আগে তুমি মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে এস।'

সাবিত্রী তখন শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে বললেন—'আমার স্বামী ফলাদি আহরণ করতে বনে যাচ্ছেন। আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আজ তাঁর সঙ্গে যেতে চাই।' দ্যুমৎসেন বললেন—'যখন থেকে তোমার পিতা কন্যাদান করেছেন, তখন থেকে আমার মনে হয় না তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ। সুতরাং আজ তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করা উচিত। আচ্ছা, মা ! তুমি যাও, পথে সত্যবানের কুশলাদিতে নিমগ্ন থেকো।'

শাশুড়ী-শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে যশস্বিনী সাবিত্রী তাঁর পতির সঙ্গে রওনা হলেন। বাইরে থেকে তাঁকে হাস্যময়ী দেখালেও হৃদয়ে তাঁর মর্মবেদনার আগুন প্রজ্বলিত ছিল। প্রথমে সত্যবান ফল তুলে একটি ঝুড়িতে রাখলেন, তারপর কাঠ কাটতে লাগলেন। কাঠ কাঠতে কাটতে পরিশ্রমবশত তাঁর গা ঘেমে উঠল এবং তাঁর মাথাব্যথা করতে লাগল। শ্রমে ক্লান্ত হয়ে তিনি সাবিত্রীর কাছে গিয়ে বললেন—'প্রিয়ে ! কাঠ কাটার পরিশ্রমে আমার মাথা ব্যথা করছে, সমস্ত অঙ্গে একপ্রকার জ্বালা হচ্ছে ; মনে হচ্ছে শরীর অসুস্থ হয়েছে, মাথায় যেন লোহা দিয়ে ছিদ্র করা হচ্ছে। কল্যাণী ! আমি একটু শুতে চাই, আর আমার বসে থাকার শক্তি নেই।'

তাঁর কথা শুনে সাবিত্রী সত্যবানের কাছে এসে তাঁর মাথা কোলে নিয়ে মাটিতে বসলেন। তখন তিনি নারদের কথা স্মরণ করে সেই মুহূর্ত, ক্ষণ ও দিনের হিসাব করতে লাগলেন। এরমধ্যে সেখানে এক পুরুষকে দেখা গেল। তিনি রক্তবর্ণের পোশাক পরিহিত, মাথায় মুকুট এবং সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। তাঁর দেহ শ্যামল, সুন্দর, চক্ষু রক্তবর্ণ, হাতে পাশ, তাঁকে দেখতে অত্যন্ত ভয়ংকর। তিনি সত্যবানের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে সাবিত্রী তাঁর স্বামীর মাথা ধীরে ধীরে মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল, অত্যন্ত আর্ত হয়ে হাত জোড় করে তাঁকে বললেন—'আমি জানি আপনি কোনো দেবতা, কারণ আপনার দেহ মানুষের মতো নয়। আপনি বলুন আপনি কে এবং কী চান ?'

তখন সেই পুরুষ বললেন—'সাবিত্রী ! তুমি পতিব্রতা এবং তপস্বিনী, তাই তোমাকে বলছি, আমি যমরাজ ! তোমার পতি রাজকুমার সত্যবানের আয়ু সমাপ্ত হয়ে গেছে, এখন আমি এঁকে পাশবদ্ধ করে নিয়ে যাব, তাই আমি এসেছি।'

সাবিত্রী বললেন—'আমি তো শুনেছি যে মানুষকে নিতে আপনার দূত আসে। এখানে আপনি স্বয়ং কেন পদার্পণ করেছেন ?'

যমরাজ বললেন—'সত্যবান ধর্মাত্মা, রূপবান এবং গুণের সাগর। এঁকে দূত দ্বারা নেওয়া যায় না। তাই আমি স্বয়ং এসেছি।'

তারপর যমরাজ সবলে সত্যবানের শরীর থেকে পাশবদ্ধ করা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ এক জীবকে বার করলেন। সেটি নিয়ে তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। দুঃখাতুর সাবিত্রীও তাঁর পিছন পিছন চললেন। তাঁকে দেখে যমরাজ বললেন— 'তুমি ফিরে যাও এবং এঁর ঊর্ধ্বদৈহিক সংস্কার করো, তুমি পতিসেবার ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গেছ। পতির পশ্চাতে তোমার যতটা আসবার ছিল, তুমি তা এসেছ।'

সাবিত্রী বললেন—'আমার স্বামীকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে অথবা যেখানে ইনি নিজে যাবেন, সেখানে আমারও যাওয়া উচিত, এই হল সনাতন ধর্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিপ্রেম, ব্রতাচরণ এবং আপনার কৃপায় আমার গতি কোথাও রুদ্ধ হবার নয়।'

যমরাজ বললেন—'সাবিত্রী ! তোমার স্বর, অক্ষর, ব্যঞ্জন এবং যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য কোনো বর প্রার্থনা করো। আমি তোমাকে যে কোনো বর দিতে প্রস্তুত।'

সাবিত্রী বললেন—'আমার শ্বশুর রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বনে বাস করছেন, তাঁর চোখও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনার কৃপায়

যেন তিনি চক্ষুলাভ করেন, বলশালী হন এবং অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়ে ওঠেন।'

যমরাজ বললেন—'সাধ্বী সাবিত্রী! তোমাকে আমি বর দিচ্ছি, তুমি যা চাও, তেমনই হবে। এতদূর এসে তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ। এবার তুমি ফিরে যাও, নাহলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

সাবিত্রী বললেন—'পতির কাছে থাকলে আমার শ্রম কিসের ? যেখানে আমার প্রাণনাথ থাকবেন, সেখানেই আমার আশ্রম। দেবেশ্বর! আপনি যেখানে আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই আমার স্থান হওয়া উচিত। সৎপুরুষের একবারের সমাগমও অত্যন্ত অভীষ্টকারী হয়। তার থেকেও বেশি হল যদি তাঁর প্রতি প্রীতি জাগে। সাধুপুরুষদের সঙ্গ কখনও বিফল হয় না ; সুতরাং সর্বদা সৎপুরুষদের সঙ্গেই থাকা উচিত।'

যমরাজ বললেন—'সাবিত্রী তুমি যে হিতকথা বলেছ, তা আমার খুবই প্রিয় বলে মনে হয়েছে। এতে বিদ্বান ব্যক্তিদেরও বুদ্ধি বিকশিত হবে। সুতরাং সত্যবানের জীবন ব্যতীত তুমি অন্য কোনো বর প্রার্থনা কর।'

সাবিত্রী বললেন—'আমার মতিমান শ্বশুরের যে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা উনি ফিরে পান এবং তিনি নিজধর্ম যেন ত্যাগ না করেন—এই আমার দ্বিতীয় বর আপনার কাছে চাইছি।'

যমরাজ বললেন—'রাজা দ্যুমৎসেন শীঘ্রই তার রাজ্য স্বতই লাভ করবেন এবং তিনি কখনো ধর্মত্যাগ করবেন না। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, এবার ফিরে যাও, বৃথা শ্রম করো না।'

সাবিত্রী বললেন—'হে দেব! এই সব প্রজাকুলকে আপনি নিয়মমত সঞ্চালন করেন এবং নিয়মের দ্বারাই তাদের অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন ; তাই আপনি 'যম' নামে বিখ্যাত। অতএব আমি যা বলছি শুনুন। সৎপুরুষের ধর্ম হল মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা সকল প্রাণীর প্রতি অদ্রোহ রাখা, কৃপা করা ও দান করা। এইভাবে প্রায় সকলেই— সব মানুষ নিজ শক্তি অনুসারে কোমল ব্যবহার করে। কিন্তু যিনি সৎপুরুষ, তিনি তাঁর কাছে আসা শত্রুর প্রতিও দয়াভাব দেখান।'

যমরাজ বললেন—'কল্যাণী! তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির যেমন জল পেলে আনন্দ হয় তেমনই তোমার কথা আমার ভালো লাগছে। সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য যেন কোনো বর তুমি চেয়ে নাও।'

সাবিত্রী বললেন—'আমার পিতা রাজা অশ্বপতি পুত্রহীন ; আমি তৃতীয় বর চাইছি যে তাঁর যেন কুলবৃদ্ধিকারী শতপুত্রের জন্ম হয়।'

যমরাজ বললেন—'রাজপুত্রী ! তোমার পিতার কুলবৃদ্ধিকারী শতপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, এবার তুমি ফিরে যাও ; বহুদূর চলে এসেছ।'

সাবিত্রী বললেন—'পতির সান্নিধ্যবশত একে দূর বলে মনে হচ্ছে না। আমার মন তো বহু দূরের কথা ভাবছে। অতএব দয়া করে এবারে আমার কথা শুনুন। আপনি বিবস্বানের (সূর্যের) প্রতাপশালী পুত্র, পণ্ডিতরা তাই আপনাকে 'বৈবস্বত' বলে। আপনি শত্রুমিত্রের পার্থক্য ছেড়ে সকলের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করেন। তাই সব প্রজা ধর্মের আচরণ করে এবং আপনাকে 'ধর্মরাজ' বলা হয়। তাছাড়াও মানুষ সৎপুরুষদের যেমন বিশ্বাস করে, তেমন নিজের লোককেও করে না। তাই তারা সব থেকে বেশি সৎপুরুষকেই ভালোবাসতে চায় এবং সুহৃদতার জন্যই এই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকে ; সুতরাং সকলে সাধু-সন্তদের বিশ্বাস করে তাদের সুহৃদতার আধিক্যের কারণে।'

যমরাজ বললেন—'সুন্দরী ! তুমি যে কথা বলছ, তেমন কথা তুমি ছাড়া আর কারো কাছে শুনিনি। আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া চতুর্থ যে কোনো বর চেয়ে নিয়ে ফিরে যাও।'

সাবিত্রী বললেন—'সত্যবানের দ্বারা কুলবৃদ্ধিকারী অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রমশালী আমার একশতটি পুত্র হোক—এই বর আমি চাই।'

যমরাজ বললেন—'হে অবলা ! তোমার বল ও পরাক্রমশালী একশত পুত্র হবে, যাদের দ্বারা তুমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করবে। রাজপুত্রী ! এবার তুমি ফিরে যাও। তুমি বহু পথ চলে এসেছ, ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

সাবিত্রী বললেন—'সৎপুরুষদের বৃত্তি সর্বদা ধর্মেই স্থিত হয়। কখনো তার অন্যথা হয় না। সৎপুরুষদের সঙ্গে সৎপুরুষদের যে সমাগম হয়, তা কখনো নিষ্ফল হয় না। সৎপুরুষ সত্যের প্রভাবে সূর্যকেও নিকটে ডেকে নেন। তিনি তাঁর তপঃপ্রভাবে পৃথিবী ধারণ করেন। সাধুপুরুষই ভূত ও ভবিষ্যতের আধার, তাঁর সঙ্গে থাকলে কখনো বিষাদ হয় না। এই সনাতন সদাচার সৎপুরুষ দ্বারা সেবিত—তাই জেনে সৎপুরুষ পরোপকার করেন এবং প্রত্যুপকারের আশা করেন না।'

যমরাজ বললেন—'হে পতিব্রতা রমণী ! তুমি যেমন গম্ভীর অর্থবহ এবং প্রিয় ধর্মানুকুল কথা আমায় শোনাচ্ছ ; তেমনই তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এবার তুমি আমার কাছে এক অনুপম বর চেয়ে নাও।'

সাবিত্রী বললেন—'হে যমরাজ ! আপনি আমাকে পুত্রলাভের যে বর দিয়েছেন, দাম্পত্য ধর্ম ব্যতীত তা পূর্ণ হবার নয়। সুতরাং আমি এবার বর চাইছি যেন সত্যবান জীবিত হয়। এতে আপনার বাক্যই সত্য হবে, কারণ পতি বিনা আমি মৃত্যুমুখেই রয়েছি। পতি ব্যতিরেকে আমি

কোনো সুখ পেতে চাই না, তাঁকে বিনা আমি স্বর্গও কামনা করি না। পতি না থাকলে লক্ষ্মীদেবী এলেও তাঁকে আমার প্রয়োজন নেই এবং পতি বিনা আমি জীবিত থাকতেও চাই না। আপনিই আমাকে শত পুত্রলাভের বর দিয়েছেন, তবুও আপনি আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন ! সুতরাং আমি এখন যে বর চাইছি যে সত্যবান জীবিত হোক, এতে আপনার দেওয়া বরই সত্য হবে।'

এই কথা শুনে সূর্যপুত্র যম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে 'তবে তাই হোক' বলে সত্যবানের বন্ধন খুলে দিলেন। তারপর তিনি সাবিত্রীকে বললেন—'হে কুলনন্দিনী কল্যাণী ! আমি তোমার পতিকে মুক্তি দিলাম, এখন থেকে ইনি সর্বতোভাবে নীরোগ হবেন, চারশত বছর জীবিত থাকবেন এবং ধর্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করে পৃথিবীতে যশস্বী হবেন। এঁর ঔরসে তোমার গর্ভে শত পুত্র জন্ম নেবে।' সাবিত্রীকে এই বর দিয়ে তাঁদের গৃহে ফিরিয়ে সত্যনিষ্ঠ যমরাজ নিজ লোকে চলে গেলেন।

যমরাজ চলে গেলে সাবিত্রী নিজ পতির জীবন ফিরে পেয়ে সেইখানে এলেন যেখানে তাঁর পতির শব পড়েছিল। তিনি বসে তাঁর মাথা ক্রোড়ে নিতেই কিছুক্ষণ পরে সত্যবানের চেতনা ফিরে এল, তিনি বারংবার সাবিত্রীকে আনন্দচিত্তে দেখতে লাগলেন এবং কথা বলতে লাগলেন, যেন বহুদিন প্রবাসে থেকে ফিরেছেন। তিনি বললেন—'আমি বহুক্ষণ ঘুমিয়ে রয়েছি, জাগাওনি কেন ? কালো রংয়ের ব্যক্তিটি কে ছিল, যে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ?' সাবিত্রী বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি অনেকক্ষণ আমার ক্রোড়ে শুয়ে আছেন। ওই শ্যামবর্ণ পুরুষ প্রজানিয়ন্ত্রণকারী দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান যম। এখন তিনি তাঁর লোকে ফিরে গিয়েছেন। দেখুন, সূর্যাস্ত হয়েছে, রাত্রি গভীর হচ্ছে। কাল আপনাকে সব ঘটনা জানাব। এখন চলুন, মাতা-পিতাকে দর্শন করুন।'

সত্যবান বললেন—'ঠিক আছে, চলো। দেখেছ এখন আমার আর কোনো পীড়া নেই, সারা শরীর সুস্থ হয়ে গেছে। আমি শীঘ্রই মাতা-পিতাকে দর্শন করতে চাই। প্রিয়ে ! আমি কখনো দেরী করে আশ্রমে যাই না। সন্ধ্যার

পর আমার মাতা আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করেন। দিনের বেলাও আশ্রমের বাইরে গেলে মাতা-পিতা আমার চিন্তায় ডুবে থাকেন এবং দেরী হলে আশ্রমবাসীদের খুঁজতে পাঠান। অতএব হে কল্যাণী ! এখন আমার মাতা-পিতার জন্য অত্যন্ত চিন্তা হচ্ছে। তাঁরা এখন আমার জন্য কত চিন্তা করছেন ! যতক্ষণ আমার মাতা-পিতা জীবিত থাকবেন, ততক্ষণ আমি জীবন ধারণ করব।'

পতির কথায় সাবিত্রী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সত্যবানকে তুলে নিজের বাম স্কন্ধে তাঁর হাত রেখে, ডান হাত দিয়ে তাঁর কোমর ধরে চললেন। সত্যবান বললেন, 'আরে ! এই পথে যাতায়াতের অভ্যাস থাকায় এই পথ আমার পরিচিত আর এখন চাঁদনী রাত হওয়ায় বৃক্ষের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। কাল যে পথে ফল তুলেছিলাম, সেখানে এসে গেছি। এবার চিন্তা না করে সোজা চলো। আমি এখন যথেষ্ট সুস্থ ও সবল। মাতা-পিতাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছি।' এই বলে তাঁরা তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললেন।

——o——

দ্যুমৎসেন এবং শৈব্যার চিন্তা, সত্যবান এবং সাবিত্রীর আশ্রমে ফেরা, দ্যুমৎসেনের রাজ্য ফিরে পাওয়া

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! ইত্যবসরে রাজা দ্যুমৎসেন দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং তিনি সব দেখতে পেতে লাগলেন। পুত্র ফিরে না আসায় তিনি এবং তাঁর পত্নী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে সব আশ্রমে ঘুরে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। তখন সমস্ত আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলে তাঁদের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেখানে বৃদ্ধ আশ্রমবাসীরা তাঁকে নানা কাহিনী বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে সুবর্চা নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বললেন—'সত্যবানের স্ত্রী তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম, সদাচারী ও গুরুজন মান্যকারী ; অতএব সত্যবান নিশ্চয়ই জীবিত আছেন।' অপর এক ব্রাহ্মণ গৌতম বললেন—'আমি বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেছি এবং বহু তপস্যা করেছি। যুবক অবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরু ও অগ্নিকে তৃপ্ত করেছি। সেই তপস্যার প্রভাবে আমি অপরের মনের কথা জানতে পারি। অতএব আমার কথা সত্য বলে জেনো যে সত্যবান অবশ্যই জীবিত আছেন।' সমস্ত ঋষি বলতে লাগলেন যে সত্যবানের স্ত্রী সাবিত্রীর মধ্যে অবৈধব্যসূচক সমস্ত শুভলক্ষণ বিদ্যমান। সুতরাং সত্যবান জীবিত আছেন। দাল্‌ভ্য বললেন—'দেখুন আপনি দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন এবং সাবিত্রী ব্রতের উদ্‌যাপন না করেই সত্যবানের সঙ্গে গেছেন, অতএব সত্যবান নিশ্চয়ই জীবিত।'

সত্যবক্তা ঋষিগণ দ্যুমৎসেনকে এইভাবে বোঝালে তিনি একটু শান্ত হলেন। কিছুক্ষণ পরেই সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রী আশ্রমে এলেন। তাঁদের দেখে ব্রাহ্মণরা বললেন—'রাজন্ ! দেখ তুমি তোমার পুত্রও পেয়ে গেছ আর চক্ষুও লাভ করেছ।' তারপর সত্যবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সত্যবান ! তুমি স্ত্রীকে নিয়ে আগেই কেন

ফিরে এলে না ? কী বাধা পড়েছিল ? রাজকুমার ! আজ তুমি তোমার মাতা-পিতা ও আমাদের সকলকে অত্যন্ত চিন্তায় ফেলেছিলে, আমরা তো জানি না তোমার কী হয়েছিল, আমাদের সব বলো।'

সত্যবান বললেন—'আমি পিতার আদেশ নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেই জঙ্গলে কাঠ কাটার সময় আমার মাথাব্যথা শুরু হয়, সেইজন্য আমি বহুক্ষণ শুয়েছিলাম। এতবেশিক্ষণ আমি কোনোদিন ঘুমোইনি। আপনারা চিন্তা করবেন না, সেইজন্যই আমার আসতে এত বিলম্ব হয়েছে, আর কোনো কারণ নেই।'

গৌতম বললেন—'সত্যবান ! তোমার পিতা দ্যুমৎসেন আজ অকস্মাৎ দৃষ্টি লাভ করেছেন। তুমি প্রকৃত কারণ জানো না, সাবিত্রী সব বলতে পারবেন। সাবিত্রী ! তোমাকে আজ আমার সাক্ষাৎ সাবিত্রী (ব্রহ্মাণী দেবী) বলে মনে হচ্ছে। তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জ্ঞান আছে। তুমি নিশ্চয়ই এর কারণ জান। যদি গোপনীয় না হয়, আমাদের সব বলো।'

সাবিত্রী বললেন—'আপনি যা ভাবছেন, তেমনই হয়েছে, আপনার ভাবনা মিথ্যা নয়। আমার কোনো কথা আপনাদের কাছে গোপনীয় নয়। সুতরাং যা সত্য, আমি তাই বলছি ; শুনুন। দেবর্ষি নারদ আমাকে বলে দিয়েছিলেন কবে আমার পতির মৃত্যু হবে। আজই সেই দিন, তাই আমি ওঁকে একা বনের মধ্যে যেতে দিইনি। ইনি যখন বনের মধ্যে ঘুমিয়েছিলেন তখন যমরাজ এসে এঁকে বেঁধে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি সত্যবাক্যের দ্বারা সেই দেবশ্রেষ্ঠর স্তুতি করি। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে পাঁচটি বর দেন। তার প্রথম দুটি ছিল—শ্বশুর মহাশয়ের চক্ষু এবং রাজ্যলাভ হোক। দ্বিতীয় দুটি বর ছিল—আমার পুত্রহীন পিতা শতপুত্র লাভ করুন এবং আমিও যেন শত পুত্র লাভ করি এবং পঞ্চম বর অনুসারে আমার পতির চারশত বৎসর আয়ু লাভ হয়। পতিদেবের জীবন প্রাপ্তির জন্যই আমি এই ব্রত রেখেছিলাম। আমি সবই বিস্তারিতভাবে আপনাদের জানালাম।'

ঋষিগণ বললেন—'সাধ্বী ! তুমি সুশীলা, ব্রতশীলা এবং পবিত্র গুণ সম্পন্না। তুমি উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করেছ। রাজা দ্যুমৎসেনের পরিবার আজ অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যেত, তুমি আজ তাঁদের রক্ষা করেছ।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! সেখানকার সমস্ত ঋষিরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন এবং রাজা ও রাজকুমারের অনুমতি নিয়ে যে যাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। পরের দিন শাল্বদেশের সমস্ত রাজকর্মচারী সেখানে এসে রাজা দ্যুমৎসেনকে বলল—'ওখানে যে রাজা ছিলেন, সেখানে তাঁর মন্ত্রীই তাঁকে হত্যা করেছেন, তাঁর আত্মীয় স্বজনকেও জীবিত রাখেননি। তাঁর সমস্ত সৈন্য পালিয়ে গেছে এবং সমস্ত প্রজাকুল একমত হয়ে স্থির করেছে যে আপনি অন্ধ হলেও আমাদের রাজা। রাজন্ ! তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই আমাদের এইখানে পাঠিয়েছে। আমরা আপনার জন্য রথ এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য নিয়ে এসেছি। আপনার মঙ্গল হোক। এখন কৃপা করে ফিরে

চলুন। নগরে আপনার জয় ঘোষিত হয়েছে। আপনি আপনার পূর্বপুরুষের রাজ্যভার গ্রহণ করুন।'

তাঁরা রাজা দ্যুমৎসেনকে সুস্থ এবং চক্ষুষ্মান দেখে বিস্ময়াপন্ন হলেন। রাজা আশ্রমস্থিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের অভিবাদন করে, তাঁদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে নিজ রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। সেখানে রাজপুরোহিত অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দ্যুমৎসেনের রাজ্যাভিষেক করালেন এবং তাঁর পুত্র সত্যবানকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলেন। এরপরে যথা সময়ে সাবিত্রীর শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা কখনো যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতেন না এবং

যশবৃদ্ধিকারী শূরবীর ছিলেন। সাবিত্রীর পিতা মদ্ররাজ অশ্বপতির পত্নী মালবীর গর্ভেও সেইরূপ শূরবীর শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সাবিত্রী এইভাবে নিজেকে এবং পিতৃকুল ও শ্বশ্রূকুল—উভয়কে সংকট থেকে উদ্ধার করেন। সাবিত্রীর ন্যায় শীলবতী, কুলকামিনী, কল্যাণী দ্রৌপদীও আপনাদের উদ্ধার করবেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ঋষি মার্কণ্ডেয়র কথায় মহারাজ যুধিষ্ঠির শোক ও সন্তাপ মুক্ত হয়ে কাম্যকবনে বসবাস করতে লাগলেন। যে ব্যক্তি এই পরম পবিত্র সাবিত্রী চরিত্র শ্রদ্ধাসহকারে শুনবেন, তিনি সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় সুখী হবেন এবং কখনো দুঃখ ভোগ করবেন না।

কর্ণকে ব্রাহ্মণ বেশধারী সূর্যদেবের সাবধান বাণী

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! মহর্ষি লোমশ ইন্দ্রের আজ্ঞা অনুযায়ী পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছিলেন—'তোমার মনে যে আশংকা হয়ে রয়েছে এবং যা তুমি কারো সামনে আলোচনাও করো না, তাও আমি অর্জুন স্বর্গে এলে দূর করে দেব।' অতএব হে বৈশম্পায়ন ! কর্ণের থেকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এমন কী আশংকা ছিল, যা নিয়ে তিনি কারো সঙ্গে আলোচনা করতেন না ?

বৈশম্পায়ন বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা জনমেজয় ! তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, তাই তোমাকে জানাচ্ছি, সাবধানে আমার কথা শোন। পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে ত্রয়োদশ বৎসর শুরু হলে পাণ্ডবদের হিতৈষী ইন্দ্র কর্ণের কাছ থেকে তাঁর কবচ ও কুণ্ডল চেয়ে নেবার জন্য তৈরি হলেন। সূর্য যখন ইন্দ্রের মনোভাব জানতে পারলেন তখন তিনি কর্ণের কাছে এলেন। ব্রাহ্মণসেবক ও সত্যবাদী বীর কর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে সুন্দর শয্যাবিশিষ্ট খাটে শুয়েছিলেন। সূর্যদেব পুত্রস্নেহবশত দয়ার্দ্র চিত্তে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের বেশে স্বপ্নাবস্থায় কর্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—'সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ মহাবাহু কর্ণ ! আমি স্নেহবশত তোমার পরম হিতের কথা বলছি, মন দিয়ে শোন। দেখো, পাণ্ডবদের হিতার্থে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপে তোমার কাছে কবচ ও কুণ্ডল নিতে আসবেন। তিনি তোমার স্বভাব জানেন এবং সমস্ত জগতও তোমার এই নিয়ম সম্পর্কে অবহিত আছে যে কোনো সৎ ব্যক্তি প্রার্থনা করলে তুমি তার অভীষ্ট বস্তু প্রদান করো এবং নিজে কখনো কারো কাছে কিছু চাও না। কিন্তু তুমি যদি তোমার সহজাত এই কবচ ও কুণ্ডল দান করো, তাহলে

তোমার আয়ু ক্ষীণ হয়ে তোমার ওপর মৃত্যুর অধিকার বর্তাবে। তুমি জেনে রাখো, যতক্ষণ তোমার কাছে এই কবচ ও কুণ্ডল থাকবে, কোনো শত্রু তোমাকে যুদ্ধে বধ করতে পারবে না। এই রত্নখচিত কবচ-কুণ্ডল অমৃত হতে উৎপন্ন হয়েছে ; অতএব তোমার যদি জীবন প্রিয় হয়, তাহলে অবশ্যই এটি রক্ষা করবে।'

কর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! আপনি আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। দয়া করে বলুন ব্রাহ্মণবেশে আপনি কে ?'

ব্রাহ্মণ বললেন—'হে পুত্র ! আমি সূর্য, স্নেহবশত

তোমাকে এই উপদেশ দিলাম। আমার কথা শুনে এইরূপই করো, এতে তোমার বিশেষ কল্যাণ হবে।'

কর্ণ বললেন—'ভগবান ভাস্কর স্বয়ংই যখন আমার হিতার্থে উপদেশ দিচ্ছেন, তখন আমার পরম কল্যাণ তো নিশ্চিত। কিন্তু আপনি কৃপা করে আমার প্রার্থনা শুনুন। আপনি বরদাতা দেবতা, আপনাকে প্রসন্ন রেখে আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে যদি আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তাহলে এই ব্রত থেকে আমাকে বিচ্যুত করবেন না। সূর্যদেব ! জগতের সকলেই আমার এই ব্রতর কথা জানেন যে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ চাইলে প্রাণ পর্যন্ত দান করতে পারি। দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যদি পাণ্ডবদের হিতার্থে ব্রাহ্মণের বেশে আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসেন আমি অবশ্যই তাঁকে আমার দিব্য কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করব। এর ফলে ত্রিলোকে আমার যে নাম আছে তা কালিমালিপ্ত হবে না। আমার মতো লোকের যশই রক্ষা করা উচিত, প্রাণ নয়। জগতে যশস্বী হয়েই মরা উচিত।'

সূর্য বললেন—'কর্ণ ! তুমি দেবতাদের গুপ্ত কথা জানতে পারবে না। তাই এতে যে রহস্য আছে, তা আমি তোমাকে জানাতে চাই না ; সময় এলে তুমি নিজেই সব জেনে যাবে। কিন্তু আমি তোমাকে আবার বলছি যে চাইলেও তুমি ইন্দ্রকে তোমার কবচ-কুণ্ডল দেবে না ; কারণ এই কুণ্ডল তোমার সঙ্গে থাকলে অর্জুন এবং তাঁর সখা স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন না। তাই তুমি যদি অর্জুনকে যুদ্ধে হারাতে চাও, তাহলে এই দিব্য কবচ-কুণ্ডল ইন্দ্রকে কখনো দেবে না।'

কর্ণ বললেন—'সূর্যদেব আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি, তাতো আপনি জানেন আর আপনি এও জানেন যে আমার অদেয় কিছুই নেই। ভগবান ! আপনার প্রতি আমার যে অনুরাগ তেমন আমার স্ত্রী-পুত্র-নিজ শরীর অথবা সুহৃদের ওপরও নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মহানুভব পুরুষও তাঁর ভক্তদের প্রতি প্রীতি রাখেন। সুতরাং আপনি যা বলছেন, তার জন্য আপনাকে প্রণাম জানাই এবং আপনাকে প্রসন্ন করে আমি আপনার কাছে বারবার এই প্রার্থনা করি যে আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমার ব্রতপালনে সাফল্যর আশীর্বাদ করুন, ইন্দ্র আমার কাছে চাইলে প্রাণও যেন তাকে দান করতে পারি।'

সূর্য বললেন—'বেশ, তুমি যদি এই দিব্য কবচ-কুণ্ডল তাঁকে প্রদান করে দাও তাহলে তোমার বিজয়লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো যে, 'দেবরাজ ! আপনি আমাকে আমার শত্রুদের সংহারকারী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন, তাহলেই আমি আপনাকে আমার কবচ ও কুণ্ডল দেব।' মহাবাহো ইন্দ্রের এই শক্তি অত্যন্ত প্রবল। যতক্ষণ না তা শত্রুকে সম্পূর্ণ সংহার করে, ততক্ষণ সে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না।'

সূর্য এই কথাগুলি বলে অন্তর্হিত হলেন। পরদিন জপ সমাপ্ত হলে কর্ণ এইসব কথা সূর্যদেবকে জানালেন। সব শুনে সূর্যদেব হেসে বললেন—'এ কোনো স্বপ্ন নয়, সত্য ঘটনা।' কর্ণও তখন সেই কথাগুলি সত্য মেনে নিয়ে শক্তি পাওয়ার ইচ্ছায় ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কর্ণের জন্মকথা—কুন্তীর ব্রাহ্মণ-সেবা এবং বরপ্রাপ্তি

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! সূর্যদেব যে গোপনীয় কথা কর্ণকে বলেননি, সেটি কী ? আর কর্ণের কাছে যে কবচ ও কুণ্ডল ছিল, তা কেমন ছিল, তিনি কোথা থেকে তা পেয়েছিলেন ? তপোধন ! আমি সব শুনতে চাই, কৃপা করে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে সূর্যদেবের সেই গুহ্য কথা শোনাচ্ছি, তার সঙ্গে এও জানাচ্ছি যে এই কবচ কুণ্ডল কেমন ছিল। পুরাতন দিনের কথা, একবার রাজা কুন্তীভোজের কাছে এক মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। অত্যন্ত দীর্ঘ চেহারা, দাড়ি-গোঁফ-জটা সমন্বিত দর্শনীয় ভব্যমূর্তি, হাতে তাঁর দণ্ড। তেজঃপূর্ণ দেহ, মিষ্ট বচনধারী এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। কিন্তু আপনি বা আপনার সেবকরা আমার কাছে কোনো অপরাধ করবেন না। যদি তাতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি এখানে থাকব এবং ইচ্ছানুযায়ী যাতায়াত করব।'

রাজা কুন্তীভোজ তাঁকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বললেন—

'মহামতি ! পৃথা নামে আমার এক কন্যা আছে। সে অত্যন্ত সুশীলা, সদাচারিণী, সংযমধারিণী এবং ভক্তিমতী। সেই আপনার সেবা-যত্ন-পূজা করবে। তার সদাচারে আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন।' রাজা এই কথা বলে বিধিমতো ব্রাহ্মণের সৎকার করলেন এবং বিশালনয়না পৃথাকে ডেকে বললেন—'কন্যা ! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমাদের কাছে থাকতে চান, আমি তোমার ভরসায় এঁর কথা মেনে নিয়েছি। দেখো কোনোপ্রকারে যেন আমার কথা মিথ্যা হয়ে না যায়। ইনি যা চাইবেন, প্রশ্ন না করে তাই তাঁকে দিয়ে দেবে। ব্রাহ্মণ পরম তেজরূপ এবং পরমতপঃস্বরূপ হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণরা নমস্কার করলে তবেই সূর্য উদিত হন। কন্যা ! এই ব্রাহ্মণদেবতার পরিচর্যার ভার আমি এখন তোমাকে সমর্পণ করছি। তুমি ঠিকমতো তাঁর সেবা করবে। আমি জানি তুমি শিশুকাল থেকে ব্রাহ্মণ, গুরুজন, বন্ধু, সেবক, মিত্র-বন্ধু, মাতা ও আমার প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করে এসেছ। এই নগরে বা অন্তঃপুরে এমন কেউ নেই যে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তুমি বৃষ্ণিবংশে জন্ম নেওয়া শূরসেনের প্রিয়কন্যা। রাজা শূরসেন তোমাকে শিশুকালেই আমার কাছে দত্তক রূপে দিয়েছেন। তুমি বসুদেবের ভগ্নী এবং আমার সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজা শূরসেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর প্রথম সন্তান আমাকে দেবেন। সেই অনুসারেই আজ তুমি আমার কন্যা। অতএব মা ! তুমি দর্প, দম্ভ, অভিমান পরিত্যাগ করে এই বরদায়ক ব্রাহ্মণের সেবা করো। তোমার অবশ্যই কল্যাণ হবে।'

তখন কুন্তী বললেন—'রাজন্ ! আপনার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এই ব্রাহ্মণ দেবতার সেবা করব। ব্রাহ্মণদের পূজা করাই তো আমার প্রিয় কাজ। এতে আপনার প্রিয় এবং আমার কল্যাণ হবে। ইনি যখনই আসুন, আমি কখনোই এঁকে কুপিত হওয়ার অবকাশ দেব না। রাজন্ ! এতে আমার লাভ এই যে আপনার আদেশে ব্রাহ্মণের সেবা করায় কল্যাণ হবে।'

কুন্তীর কথা শুনে রাজা কুন্তীভোজ তাঁকে বারংবার আদর করে উৎসাহ দিয়ে সমস্ত কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। রাজা বললেন—'কল্যাণী ! নিঃশঙ্ক হয়ে তোমার এই কাজ করা উচিত।' এই কথা বলে রাজা কুন্তীভোজ ব্রাহ্মণের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করলেন এবং তাঁকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আমার এই কন্যা অত্যন্ত অল্প বয়সী এবং সুখে প্রতিপালিত। যদি এর দ্বারা কোনো অপরাধ হয়ে যায়, তাহলে আপনি কিছু মনে করবেন না। ব্রাহ্মণরা তো বৃদ্ধ, বালক এবং তপস্বীদের অপরাধে ক্রুদ্ধ হন না।' ব্রাহ্মণ বললেন—'ঠিক আছে।' রাজা তখন তাঁকে শ্বেত প্রাসাদে নিয়ে রাখলেন। রাজকন্যা পৃথা আলস্য পরিত্যাগ করে তাঁর পরিচর্যায় নিরত হলেন। তাঁর আচরণ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি শুদ্ধভাবে সেবা করে তপস্বী ব্রাহ্মণের মন পূর্ণভাবে প্রসন্ন করলেন। বিরক্তিকর, অপ্রিয় কথা শুনলেও পৃথা কখনো তাঁর অপ্রিয় কাজ করেননি। ব্রাহ্মণের ব্যবহার অত্যন্ত উল্টো-পাল্টা ছিল, কখনো অসময়ে আসতেন, কখনো আসতেনই না, কখনো এমন খাবার চাইতেন, যা পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু পৃথা অত্যন্ত যত্নে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতেন। তিনি শিষ্যা, পুত্রী এবং ভগ্নীর ন্যায় তাঁর সেবায় তৎপর থাকতেন। তাঁর স্বভাবে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, পৃথার কল্যাণের জন্য আশীর্বাদ করলেন।

রাজন্ ! কুন্তীভোজ প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় পৃথাকে জিজ্ঞাসা করতেন—'মা ! ব্রাহ্মণদেবতা তোমার সেবায় প্রসন্ন তো ?' যশস্বিনী পৃথা তাঁকে জানাতেন যে ব্রাহ্মণ খুবই প্রসন্ন। সেই শুনে উদারচিত্ত কুন্তীভোজ অত্যন্ত প্রসন্ন হতেন। এইভাবে এক বৎসর অতিক্রান্ত হলেও ব্রাহ্মণ পৃথার কোনো ত্রুটি দেখতে পেলেন না। ব্রাহ্মণ দেবতা

তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—'কল্যাণী ! তোমার সেবায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি আমার কাছে এমন বর প্রার্থনা কর যা ইহলোকে মানুষের পক্ষে দুর্লভ।' তখন কুন্তী বললেন—'বিপ্রবর ! আপনি শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ। আপনি এবং পিতা আমার ওপর প্রসন্ন। তাতেই আমার কাজ সফল হয়েছে, আর আমার কোনো বরের প্রয়োজনীয়তা নেই।'
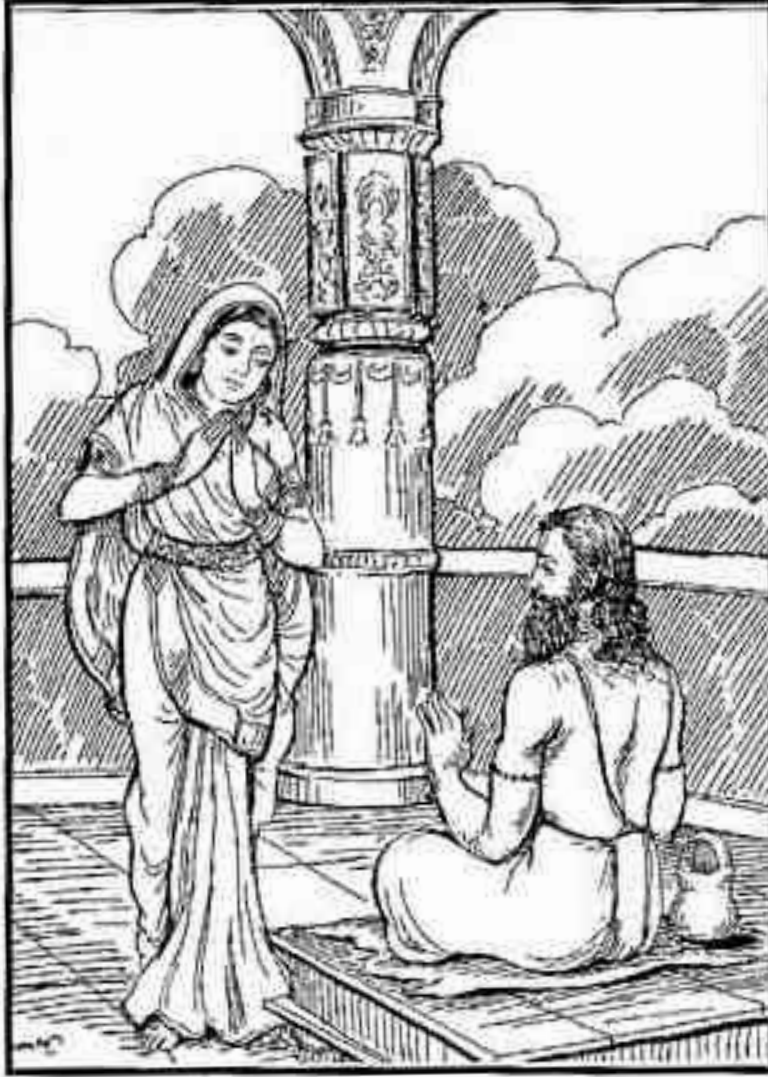
ব্রাহ্মণ বললেন—'ভদ্রে ! তুমি যদি কোনো বর নিতে না চাও, তাহলে দেবতাদের আবাহন করার জন্য আমার থেকে এই মন্ত্র গ্রহণ করো। এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আবাহন করবে, তিনিই তোমার অধীন হবেন। তাঁর ইচ্ছা থাক বা না থাক, এই মন্ত্রের প্রভাবে তিনি শান্তভাবে তোমার সামনে উপস্থিত হবেন।'

ব্রাহ্মণ দেবতা এই কথা বলায় অনিন্দিতা পৃথা শাপের ভয়ে দ্বিতীয়বার না বলতে পারলেন না। তখন তিনি তাকে অথর্ব বেদ শিরোভাগে উদ্ধৃত মন্ত্র উপদেশ দিলেন। পৃথাকে মন্ত্রপ্রদান করে তিনি রাজা কুন্তীভোজকে বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার কাছে অত্যন্ত সুখে দিন কাটিয়েছি। তোমার কন্যা আমাকে সর্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রেখেছিল। এবার আমি যাচ্ছি।' বলে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

সূর্য কর্তৃক কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম এবং অধিরথের গৃহে তাঁর পালন ও বিদ্যাধ্যয়ন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ব্রাহ্মণদেবতা চলে গেলে পৃথা মন্ত্রের গুণাগুণ চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, 'মহাত্মা আমাকে কী মন্ত্র দিয়েছেন, তার শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' একদিন তিনি প্রাসাদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিলেন, সেই সময় তিনি হঠাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে, কবচকুণ্ডলধারী সূর্যনারায়ণকে দর্শন করেন। তখন তাঁর ব্রাহ্মণ প্রদত্ত মন্ত্রের পরীক্ষা করতে কৌতূহল হয়। তিনি বিধিমতো আচমন ও প্রাণায়াম করে সূর্যদেবকে আবাহন করেন। সূর্যদেব তখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর দেহ পিঙ্গলবর্ণ, লম্বিত বাহু, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা, মুখে মৃদুহাসি, হাতে বাজুবন্দ, মাথায় মুকুট, তেজোদ্দীপ্ত শরীর। তিনি যোগশক্তির সাহায্যে দুই রূপ ধারণ করে একটির দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করতে থাকলেন, দ্বিতীয়টির সাহায্যে পৃথার কাছে এলেন। তিনি মধুর বাক্যে কুন্তীকে বললেন—

'ভদ্রে ! তোমার মন্ত্র শক্তির বলে আমি তোমার অধীন হয়েছি ; এখন বলো কী করব ? তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।'

কুন্তী বললেন—'ভগবান ! আপনি যেখান থেকে এসেছেন, সেখানেই ফিরে যান ; আমি কৌতূহলবশত আপনাকে আবাহন করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

সূর্য বললেন—'তন্বী ! তুমি আমাকে ফিরে যেতে বললে আমি চলে যাব, কিন্তু দেবতাকে আহ্বান করে কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ না করে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া অন্যায়। সুন্দরী ! তোমার ইচ্ছা ছিল যে, সূর্যের দ্বারা তোমার এক পুত্র হবে, সে জগতে পরাক্রমী বীর হবে, কবচ-কুণ্ডল ধারণ করে থাকবে। সুতরাং তুমি তোমার দেহ আমাকে সমর্পণ করো ; তাহলে তোমার ইচ্ছানুযায়ী পুত্র লাভ করবে।'

কুন্তী বললেন—'হে প্রভু ! আপনি আপনার বিমানে করে প্রস্থান করুন। আমি এখনো কুমারী, অতএব এই ধরনের অপরাধ ঘটালে তা খুবই কলঙ্কজনক হবে। আমার মাতা-পিতা এবং গুরুজনই বিধিমত এই দেহ কন্যাদান রূপে দান করার অধিকারী। আমি এই ধর্মের লোপ হতে দেব না। জগতে নারীজাতির সদাচারকেই লোকে-মর্যাদা দেয়। অনাচার থেকে দেহকে রক্ষা করলে তবেই সেই সদাচার রক্ষা পায়। আমি অজ্ঞতাবশত মন্ত্রটি পরীক্ষার জন্য আপনাকে আবাহন করেছিলাম। হে প্রভু ! অবুঝ মনে করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

সূর্যদেব বললেন—'কুন্তী ! যেহেতু তুমি অবোধ কন্যা, কাজেই আমি তোমাকে শিষ্ট কথায় বলছি। অন্য কোনো নারীকে আমি এভাবে অনুনয় বিনয় করি না। তুমি আমাকে দেহ দান করো, এতে তুমি ইচ্ছানুযায়ী পুত্র লাভ করবে।'

কুন্তী বললেন—'হে দেব ! আমার মাতা-পিতা এবং অন্য গুরুজনরা জীবিত। তাঁরা থাকতে এই সনাতন বিধি লোপ পাওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রবিধির প্রতিকূলে যদি আপনার সঙ্গে আমার সমাগম হয় তবে আমার জন্য জগতে এই কুলের কীর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি যদি একে ধর্ম বলে মানেন, তাহলে আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি। কিন্তু আপনাকে আত্মদান করেও আমি সতীই থাকব ; কারণ আপনার ওপরেই জগতের প্রাণীদের ধর্ম, যশ, কীর্তি ও আয়ু নির্ভর করছে।'

সূর্য বললেন—'সুন্দরী ! এই কাজ করলে তোমার আচরণ অধর্মময় বলে মানা হবে না। লোকের হিতের দৃষ্টিতে আমিও কেন অধর্ম আচরণ করব ?'

কুন্তী বললেন—'ভগবান ! যদি তাই হয় এবং আমা হতে আপনার যে পুত্র জন্মাবে, সে জন্ম থেকেই উত্তম কবচ ও কুণ্ডল ধারণ করে থাকে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমার সমাগম হতে পারে। কিন্তু সেই বালক পরাক্রম, রূপ, সত্ত্ব, ওজঃ এবং ধর্মসম্পন্ন হওয়া চাই।'

সূর্য বললেন—'রাজকন্যা ! আমার মা অদিতি আমাকে যে কবচ-কুণ্ডল দিয়েছেন, সেটিই আমি এই বালককে দেব।'

কুন্তী বললেন—'হে সূর্যদেব ! আপনি যা বলছেন, যদি সেইরূপ পুত্র আমার হয় তাহলে আমি সানন্দে আপনার সঙ্গে সহবাস করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান ভাস্কর তখন নিজ তেজে তাঁকে মোহমুগ্ধ করে যোগশক্তির দ্বারা কুন্তীর গর্ভ সঞ্চার করলেন, যার ফলে কুন্তীর কন্যাত্ব অটুট থাকল। মাঘ শুক্ল প্রতিপদের দিন পৃথার গর্ভ সঞ্চারিত হল। তাঁর অন্তঃপুরস্থিত এক ধাত্রী ব্যতীত কেউই এ খবর জানলেন না। যথাসময়ে সুন্দরী পৃথা এক দেব সমান কান্তিমান পুত্রের জন্ম দিলেন, সূর্যদেবের কৃপায় তাঁর কন্যাত্ব বজায় রইল। বালক তার পিতার ন্যায় অঙ্গে কবচ ও কুণ্ডল পরিহিত ছিলেন। পৃথা ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বেতের ঝাঁপি এনে তাতে ভালোকরে কাপড় বিছিয়ে নবজাত শিশুকে তার মধ্যে শুইয়ে ওপরে ঢাকনা দিয়ে অশ্বনদীতে

ভাসিয়ে দিলেন। সেই ঝাঁপিটি জলে ভাসিয়ে তিনি কেঁদেকেঁদে বলতে লাগলেন—'পুত্র! নভশ্চর, স্থলচর, জলচর জীব এবং দিব্য প্রাণীরা সকলে তোমার মঙ্গল করুন, তোমার পথ মঙ্গলময় হোক। শত্রু যেন তোমার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। জলাধিপতি বরুণ তোমার রক্ষা করুন, আকাশে সর্বত্রগামী পবন তোমার রক্ষক হোক, তোমার পিতা সূর্যদেব তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। তোমাকে যেখানেই দেখি সেখানেই তোমাকে কবচ-কুণ্ডলের সাহায্যে আমি চিনে নেব।' পৃথা ব্যাকুলভাবে বিলাপ করতে করতে ধাত্রীর সঙ্গে মহলে ফিরে এলেন।

সেই ঝাঁপিটি ভাসতে ভাসতে অশ্বনদী থেকে চর্মণ্বতী (চম্বল) নদীতে গেল এবং শেষে যমুনা নদীতে গিয়ে পড়ল। তারপর সেটি গঙ্গায় পড়ে অধিরথ সূত যেখানে থাকতেন সেই চম্পাপুরীর কাছে এলো। সেইসময় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মিত্র অধিরথ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে এসেছিলেন। রাজন্! অধিরথের পত্নী রাধা অনুপম সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। পুত্রলাভের জন্য তাঁরা অনেক পূজা-যজ্ঞ করেছিলেন। সেদিন দৈবযোগে তাঁদের দৃষ্টি সেই ঝাঁপির ওপরে পড়ল। ঝাঁপিটি গঙ্গার ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে এসে লেগেছিল, কৌতূহলবশত রাধা সেটি অধিরথকে দিয়ে

তুলে নিয়ে আনলেন। ঝাঁপিটির ঢাকা খুলে তাঁরা দেখলেন তরুণ সূর্যের ন্যায় এক সুন্দর শিশু সেখানে শায়িত। তার সঙ্গে সোনার কবচ কুণ্ডল। মুখ উজ্জ্বল কান্তিতে দীপ্তমান।

সেই শিশুকে দেখে অধিরথ এবং রাধা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। অধিরথ শিশুটিকে ক্রোড়ে নিয়ে পত্নীকে বললেন—'প্রিয়ে, আমি জন্মাবধি এরূপ সুন্দর বালক দেখিনি। আমার মনে হয় কোনো দেবশিশু আমাদের কাছে এসেছে। আমি অপুত্রক ছিলাম, তাই দেবতারা কৃপা করে আমাকে এই পুত্র দিয়েছেন।' এই কথা বলে তিনি সেই শিশুকে রাধার হাতে দিলেন। রাধা সেই দিব্যরূপ কমলের ন্যায় শোভাসম্পন্ন শিশুকে বিধিসম্মতভাবে গ্রহণ করে পালন করতে লাগলেন। এইভাবে সেই পরাক্রমী বালক বড় হতে লাগল। এরপর অধিরথের নিজেরও পুত্র জন্মাল। বালকের বসুবর্ম (স্বর্ণ কবচ) এবং স্বর্ণকুণ্ডল দেখে ব্রাহ্মণরা তাঁর নাম রাখলেন 'বসুষেণ'। সেই পুত্র ক্রমশ সুতপুত্র এবং 'বসুষেণ' বা 'বৃষ' নামে বিখ্যাত হন। দিব্যকবচধারী হওয়ায় পৃথাও দূত মারফৎ জেনে যান যে তাঁর পুত্র অঙ্গদেশে এক সূতের গৃহে পালিত হচ্ছেন। সেই বালক বয়োপ্রাপ্ত হলে অধিরথ শিক্ষার জন্য তাঁকে হস্তিনাপুর পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে লাগলেন। সেখানে দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল। তিনি দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের কাছে চার প্রকারের অস্ত্র সঞ্চালন শিখলেন এবং মহাধনুর্ধর হিসাবে জগতে পরিচিত হলেন। তিনি দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য সর্বদা পাণ্ডবদের অনিষ্ট করতে তৎপর থাকতেন এবং সর্বদা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন।

রাজন্! সূর্যদেবের এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে গোপনীয় যে, সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি সূতপরিবারে পালিত হয়েছিলেন। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দেখে যুধিষ্ঠির মনে করতেন তিনি যুদ্ধে অজেয়, তাতে যুধিষ্ঠির চিন্তিত থাকতেন। মহারাজ! কর্ণ মধ্যাহ্নে স্নান করে জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের স্তুতি করতেন। সেই সময় ব্রাহ্মণরা ধনলাভের আশায় তাঁর কাছে আসতেন; সেই সময় কর্ণের কাছে এমন কিছু ছিল না যা ব্রাহ্মণদেরকে অদেয়।

—o—

ইন্দ্রকে কবচ-কুণ্ডল প্রদান এবং কর্ণের অমোঘ শক্তি লাভ

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র একদিন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে কর্ণের কাছে এসে বললেন 'ভিক্ষাং দেহি'। কর্ণ বললেন, 'আসুন, আপনাকে স্বাগত। বলুন, আমি আপনার কী উপকারে লাগতে পারি ? কী সেবা করতে পারি ?'

ব্রাহ্মণ বললেন—'আপনি যদি বাস্তবিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাহলে আপনার জন্মজাত এই কবচ ও কুণ্ডল আমাকে দিন। এগুলি নেওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী, আমার আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।'

কর্ণ বললেন—'বিপ্রবর ! আমার সঙ্গে জাত এই কবচ ও কুণ্ডল অমৃতময়। এরজন্য ত্রিলোকে আমাকে কেউ বধ করতে পারে না। আমি তাই একে আমার থেকে বিচ্যুত করতে চাই না। আপনি আমার কাছ থেকে বিস্তৃত শত্রুহীন রাজ্য নিয়ে নিন, এই কবচ ও কুণ্ডল আপনাকে দিলে আমি শত্রুদের শিকার হয়ে যাব।'

এই কথা শুনেও ইন্দ্র যখন অন্য কোনো বর চাইলেন না তখন কর্ণ হেসে বললেন—'দেবরাজ ! আমি আপনাকে আগেই চিনেছি। কিন্তু আমি আপনাকে কিছু দিলে তার পরিবর্তে আমি যদি কিছু না পাই, সেটা কি ঠিক ? আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ ; আমাকেও আপনার কিছু দেওয়া উচিত। আপনি বহু জীবের প্রভু এবংতাদের সৃষ্টিকারী। দেবেশ্বর ! আমি আপনাকে যদি কবচ ও কুণ্ডল দিয়ে দিই তাহলে আমি শত্রুদের বধ্য হয়ে উঠব, আপনারও কীর্তিনাশ হবে। অতএব পরিবর্তে কিছু দিয়ে আপনি এই দিব্য কবচ কুণ্ডল নিয়ে যান ; নাহলে আমি এটি দিতে পারি না।'

ইন্দ্র বললেন—'আমি যে তোমার কাছে আসব, সে কথা সূর্য জানতেন ; নিঃসন্দেহে তিনি তোমাকে এইসব জানিয়ে দিয়েছেন। ঠিক আছে, তুমি যা চাও, তাই হবে। বজ্র ছাড়া আমার কাছ থেকে অন্য কোনো জিনিস চেয়ে নাও।'

কর্ণ বললেন—'ইন্দ্রদেব ! এই কবচ ও কুণ্ডলের পরিবর্তে আমাকে আপনার অমোঘ শক্তি প্রদান করুন, যা সংগ্রামে বহু শত্রু সংহার করবে।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে ইন্দ্র বললেন—'তুমি তোমার জন্মজাত কবচ-কুণ্ডলের পরিবর্তে আমার কাছ থেকে অমোঘ শক্তির অধিকারী হও। কিন্তু একটি শর্ত আছে। এই শক্তি তোমার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে, যে তোমাকে সংগ্রামে পরাস্ত করতে চলেছে, এমন একজন মাত্র প্রবল শত্রুকে নিশ্চিত বধ করে আমার কাছেই ফিরে আসবে।'

কর্ণ বললেন—'দেবরাজ ! আমিও কেবল তেমনই একজন শত্রুকেই বধ করতে চাই, যে ঘনঘোর সংগ্রামে আমাকে প্রবলভাবে হেনস্থা করছে, যার থেকে আমার ভয় উৎপন্ন হয়েছে।'

ইন্দ্র বললেন—'তুমি যুদ্ধে এক প্রবল শত্রুকে মারতে চাও তো, কিন্তু যাকে তুমি বধ করতে চাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে রক্ষা করেন, তাঁকে বেদজ্ঞ পুরুষ অজিত ও নারায়ণ বলা হয়।'

কর্ণ বললেন—'ভগবান, সে যাই হোক ; আপনি আমাকে এক পুরুষ ঘাতিনী অমোঘ শক্তি দিন, যার দ্বারা আমি সন্তপ্তকারী শত্রুকে বধ করতে পারি।'

ইন্দ্র বললেন—'আরও একটি কথা ! যদি অন্য অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এবং প্রাণ সংকট উপস্থিত না হলেও তুমি প্রমাদবশত এই শক্তি নিক্ষেপ করো তাহলে এ তোমারই প্রাণনাশ করবে।'

কর্ণ বললেন—'ইন্দ্র ! প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হচ্ছি যে, এই শক্তি অত্যন্ত ভয়ানক সংকট উপস্থিত হলেই নিক্ষেপ করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তখন সেই প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণ করে কর্ণ এক তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা নিজ অঙ্গ থেকে কবচ ও কুণ্ডল কেটে তুলতে লাগলেন। তাঁকে হাসিমুখে

অস্ত্রের দ্বারা নিজ অঙ্গ কেটে কবচ-কুণ্ডল তুলতে দেখে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। এইভাবে নিজ অঙ্গ ও কর্ণ ছেদন করে কবচ-কুণ্ডল প্রদান করায় তিনি 'কর্ণ' নামে পরিচিত হলেন। রক্ত প্লাবিত দেহে তিনি সেই শোণিত-সিক্ত কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন।

কর্ণকে এইভাবে প্রতারিত করে, জগতে তাঁকে যশস্বী করে ইন্দ্র নিশ্চিত হলেন যে পাণ্ডবদের কাজ সিদ্ধ হয়েছে। তখন তিনি প্রসন্ন মনে দেবলোকে চলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কর্ণের এই খবর জেনে অত্যন্ত আতঙ্কিত হলেন। এদিকে বনবাসী পাণ্ডবরা কর্ণের এই সংবাদ জেনে প্রসন্ন হলেন।

——o——

ব্রাহ্মণের অরণি উদ্ধারের জন্য পাণ্ডবদের মৃগকে অনুসরণ এবং ভীম ও তিন ভ্রাতার এক সরোবরে অচেতন হয়ে পড়া

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! দ্রৌপদীকে জয়দ্রথ হরণ করায় পাণ্ডবরা তো অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। ফিরে পাওয়ার পর তাঁরা কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—দ্রৌপদীকে জয়দ্রথ এইভাবে হরণ করায় রাজা যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন চিত্তে কাম্যকবন ছেড়ে ভ্রাতাদের নিয়ে পুনরায় দ্বৈতবনেই ফিরে এলেন। সেই বনে প্রচুর ফল-মূল ও রমণীয় বৃক্ষের সমাবেশ ছিল। সেখানে তাঁরা মিতাহারী হয়ে ফলাহার করে দ্রৌপদীকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন।

একদিন সেই বনে এক ব্রাহ্মণের অরণি কাষ্ঠে এক হরিণ তার শৃঙ্গ ঘষতে থাকে, দৈবাৎ সেটি তার শৃঙ্গে আটকে যায়। হরিণটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল, সে সেই মন্থন কাষ্ঠ সহ লাফাতে লাফাতে অন্য আশ্রমে চলে গেল। তাই দেখে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র রক্ষার জন্য কাষ্ঠ না পেয়ে হতচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি পাণ্ডবদের কাছে এলেন। তিনি ভ্রাতা-সহ উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন—'রাজন্ ! আমি অরণি সহ মন্থন কাষ্ঠ এক বৃক্ষে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। এক হরিণ তাতে তার শৃঙ্গ ঘষতে গেলে, সেটি তার শৃঙ্গে আটকে যায়। বিশাল হরিণটি সেটি নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনারা তার পায়ের চিহ্ন দেখে সেই মন্থন কাষ্ঠটি খুঁজে এনে দিন, যাতে আমার অগ্নিহোত্র রক্ষা পায়।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির দুঃখিত হলেন এবং ভাইদের নিয়ে ধনুক হাতে হরিণ খুঁজতে গেলেন। ভাইরা সকলেই তাকে মারবার খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা সফল হলেন না এবং হরিণটিও তাঁদের চোখের আড়ালে চলে গেল। তাকে দেখতে না পেয়ে পাণ্ডবরা
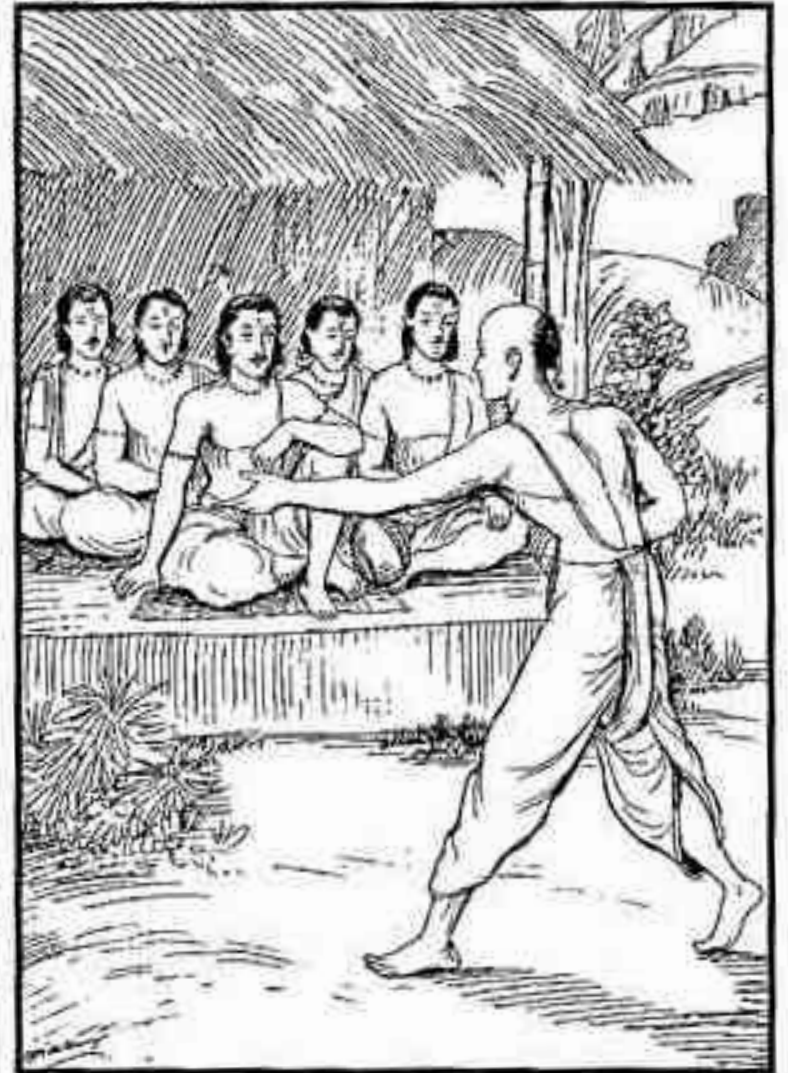
দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা গভীর জঙ্গলে এক বটবৃক্ষের কাছে পৌঁছলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তাঁরা সেই বৃক্ষের ছায়ায় বসলেন। তখন ধর্মরাজ নকুলকে বললেন—'নকুল ! তোমার ভ্রাতারা সবাই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। এখানে কাছেই কোথাও জল আছে কিনা দেখো তো ?' নকুল 'ঠিক আছে' বলে গাছে উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন—'রাজন্ ! জলের কাছে যেসব বৃক্ষ হয়, তেমন বহু বৃক্ষ আমি দেখতে পাচ্ছি এবং সারস পাখির

ডাকও শুনতে পাচ্ছি। তাই কাছেই নিশ্চয়ই জল আছে।' সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির তখন বললেন—'সৌম্য ! তুমি শীঘ্র যাও, আমাদের জন্য জল নিয়ে এসো।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশে নকুল 'আচ্ছা' বলে খুব তাড়াতাড়ি সেই জলাশয়ের কাছে পৌঁছলেন। সারস বেষ্টিত নির্মল জলাশয় দেখে নকুল যেই জল পানের জন্য ঝুঁকলেন তখনই এক দৈববাণী শুনতে পেলেন—'প্রিয় নকুল ! জলপানের চেষ্টা কোরো না। আমার একটি নিয়ম আছে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপরে জলপান করবে এবং নিয়ে যাবে।' কিন্তু নকুলের অত্যন্ত তৃষ্ণা পেয়েছিল। তিনি সেই বাণীর আদেশ গ্রাহ্য না করেই শীতল জল পান করলে তক্ষুণি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

নকুলের বিলম্ব দেখে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বীর সহদেবকে বললেন, 'সহদেব তোমার ভ্রাতা নকুল অনেকক্ষণ গেছে। অতএব তুমি গিয়ে তার খোঁজ করো এবং জলও নিয়ে এসো।' সহদেব 'ঠিক আছে' বলে জলের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়ে সহদেব দেখলেন নকুল মৃতাবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। ভাইয়ের জন্য তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হল, এদিকে পিপাসাতেও কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই তিনি জলের দিকে এগোলেন। তখন সেই দৈববাণী আবার শোনা গেল—'প্রিয় সহদেব ! জলপানের চেষ্টা কোরো না। আমার একটি নিয়ম আছে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপর জলপান করবে এবং নিয়ে যাবে।' সহদেব অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিলেন। তিনিও সেই বাণী গ্রাহ্য করলেন না। যখনই তিনি সেই শীতল জলপান করলেন, তাঁরও নকুলের গতি প্রাপ্তি হল।

ধর্মরাজ এবার অর্জুনকে বললেন—'শত্রুদমন অর্জুন ! তোমার ভাই নকুল-সহদেব অনেকক্ষণ আগে গেছে। তুমি তাদের অন্বেষণ করো এবং জলও আনো। ভাই ! আমরা বিপন্ন, তুমিই একমাত্র উপায়।' অর্জুন তখন ধনুর্বাণ ও তলোয়ার নিয়ে সরোবরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর দুভাই মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। পার্থ অত্যন্ত শোকার্ত চিত্তে বনের মধ্যে সব দিকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রাণীরই সাক্ষাৎ পেলেন না। জলপিপাসা পাওয়ায় তিনি তখন জলে দিকে গেলেন। সেইসময় তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন—'কুন্তীনন্দন ! তুমি জলের দিকে কেন যাচ্ছ ? তুমি জোর করে এই জল পান করতে পারবে না। যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তাহলে জল পান করতে পারবে এবং নিয়েও যেতে পারবে।' এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অর্জুন বললেন—'সাহস থাকলে সামনে এস, তারপর আমার বাণে বিদ্ধ হলে আর এমন কথা বলার সাহস করবে না।' এই কথা বলে অর্জুন শব্দভেদের কৌশল দেখিয়ে সমস্ত দিক অভিমন্ত্রিত বাণের দ্বারা ব্যাপ্ত করে দিলেন। তখন যক্ষ বললেন—'অর্জুন ! এই বৃথা চেষ্টায় কী লাভ ? আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তুমি জলপান করতে পার। উত্তর না দিয়ে জলপান করলেই মারা পড়বে।' যক্ষের কথা গ্রাহ্য না করে সব্যসাচী অর্জুন জলপান করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে গেলেন।

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তারপর ভীমকে বললেন—'ভরত-নন্দন ! নকুল, সহদেব এবং অর্জুন অনেকক্ষণ জল আনতে গিয়েছে, এখনও তারা কেউ ফিরে এলো না। তুমি যাও, দেখো কেন ওদের এত দেরী, আসার সময় জল আনবে।' ভীম 'ঠিক আছে' বলে সেই স্থানে গেলেন, যেখানে তাঁর সব ভায়েরা মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। তাঁদের এই অবস্থায় দেখে ভীম অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এদিকে পিপাসাতে তিনিও অত্যন্ত কাতর ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, 'এ কোনো যক্ষ বা রাক্ষসের কাজ, আজ আমার তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, অতএব আগে জলপান করে নিই।' এই ভেবে তিনি পিপাসার্ত হয়ে জলপান করতে গেলেন। এর মধ্যে যক্ষ বলে উঠলেন—'ভীম ! সাহস কোরো না, আমার একটি নিয়ম আছে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান করতেও পারবে এবং জল নিয়ে যেতেও পারবে।' তেজস্বী যক্ষ এই কথা বললেও ভীম তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলপান করলেন এবং তাঁরও একই দুর্দশা হল।

—o—

যক্ষ-যুধিষ্ঠির কথোপকথন

বৈশম্পায়ন বললেন—মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমের বিলম্ব দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তাঁর হৃদয় নানা চিন্তায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হল এবং নিজেই যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। জলাশয়ের তীরে পৌঁছে তিনি দেখলেন তাঁর চারভাই সেখানে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁদের অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। শোকসমুদ্রে ডুবে তিনি ভাবতে লাগলেন, 'এই বীরদের কে মারল ? এদের দেহে তো কোনো অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই এবং এখানে পদচিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। যে আমার ভাইদের মেরেছে, সে অবশ্যই বিশেষ কেউ হবে। ঠিক আছে, আগে আমি একাগ্র হয়ে এর কারণ নির্ধারণ করি অথবা জলপান করলে আমি নিজেই তা জানতে পারব। এমনও হতে পারে যে কূটবুদ্ধি শকুনির সাহায্যে দুর্যোধন আমাদের অগোচরে এই সরোবরে বিষ মিশ্রিত করে রেখেছে। কিন্তু এই জলকে বিষাক্ত বলে মনে হচ্ছে না, কারণ মারা গেলেও আমার ভ্রাতাদের শরীরে কোনো বিকার দেখা যাচ্ছে না এবং এদের গাত্রবর্ণও স্বাভাবিক আছে। এরা প্রত্যেকেই দেবতাদের ন্যায় মহাবলী। একমাত্র যমরাজ ছাড়া আর কে এঁদের সম্মুখীন হতে সাহস করেন ?'

এইসব ভেবে তিনি জলে নামার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঠিক তখনই তিনি সেই দৈববাণী শুনতে পেলেন। তিনি বললেন—'আমি এক বক, আমিই তোমার ভাইদের মেরেছি। তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও, তাহলে তুমিও এদের দশা প্রাপ্ত হবে। হে পুত্র ! সাহস কোরো না, আমার একটি নিয়ম আছে। আগে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপর জল পান করো এবং নিয়ে যাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'এ তো কোনো পাখির কাজ হতে পারে না। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে আপনি রুদ্র, বসু অথবা মরুৎ ইত্যাদি দেবতাদের মধ্যে কে ?'

যক্ষ বললেন—'আমি কোন জলচর পক্ষী নই, আমি যক্ষ। তোমার এই মহাতেজস্বী ভাইদের আমিই মেরেছি।'

যক্ষের এই অমঙ্গলময় কঠোর বাক্য শুনে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর পাশে গেলেন। তিনি দেখলেন বিকট চক্ষুবিশিষ্ট বিশালকায় এক যক্ষ বৃক্ষের উপরে উপবিষ্ট আছে। সেই যক্ষ দুর্ধর্ষ, তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘকায়, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং পর্বতের মতো বিশাল ; সেই গম্ভীর স্বরে তাঁকে আহ্বান

করছে। তারপর সে যুধিষ্ঠিরকে বলল—'রাজন্ ! তোমার ভাইদের আমি বারংবার বাধা দিয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও তারা মূর্খতাবশত জল নিতে চেয়েছিল ; তাই আমি এদের মেরে ফেলেছি। তোমার প্রাণ যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে এখানে জলপান কোরো না। এই স্থানটি আমার অধিকারে। আমার নিয়ম হল, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপরে জল পান কর এবং নিয়ে যাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি আপনার অধিকৃত জিনিস নিতে চাই না। আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন। কোনো সৎ ব্যক্তি নিজের প্রশংসা করেন না। আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে তার উত্তর দেব।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'সূর্য কার দ্বারা উদিত হয় ? তাঁর চার দিকে কারা চলেন ? কে তাঁকে অস্তে পাঠায় ? আর তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সূর্য ব্রহ্ম দ্বারা উদিত হন। তাঁর চারদিকে দেবতারা চলেন। ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায় এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'মানুষ কিসের দ্বারা বেদাধ্যেতা হয় ? কিসের দ্বারা মহৎ পদ লাভ হয় ? কিসের সাহায্যে

তারা ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয় ? এবং কী করে বুদ্ধিমান হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'শ্রুতির দ্বারা মানুষ বেদাধ্যেতা হয়। তপস্যার দ্বারা মহৎপদ প্রাপ্ত হয়। ধৃতির দ্বারা ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবার দ্বারা বুদ্ধিমান হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ব্রাহ্মণদের দেবত্ব কী ? তাদের মধ্যে সৎপুরুষের ন্যায় ধর্ম কী ? মনুষ্যত্ব কী ? অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'বেদের স্বাধ্যায়ই ব্রাহ্মণদের দেবত্ব, তপস্যাই সৎ পুরুষদের ধর্ম, মৃত্যুই মানুষ ভাব এবং নিন্দা করাই হল অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—ক্ষত্রিয়দের দেবত্ব কী ? তাদের মধ্যে সৎপুরুষের ন্যায় ধর্ম কী ? মনুষ্যত্ব কী ? এবং তাদের অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরন কী ?

যুধিষ্ঠির বললেন—অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শিতা ক্ষত্রিয়দের দেবত্ব, যজ্ঞ করা হল তাঁদের সৎপুরুষের ন্যায় ধর্ম, ভয় হল মানবিক ভাব এবং দীনকে রক্ষা না করা হল অসৎ ব্যক্তির আচরণ।

যক্ষ প্রশ্ন করল—'যজ্ঞীয় সাম বস্তুটি কী ? যজ্ঞীয় যজুঃ কী ? কোন বস্তুটি যজ্ঞকে বরণ করে ? এবং কাকে যজ্ঞ অতিক্রম করে না ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—'প্রাণই যজ্ঞীয় সাম, মন যজ্ঞীয় যজুঃ, একমাত্র ঋক্ই যজ্ঞ অতিক্রম করে না।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'দেবতর্পণকারীদের কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ ? পিতৃপুরুষদের তর্পণকারীদের জন্য কী শ্রেষ্ঠ ? প্রতিষ্ঠা যারা চায় তাদের নিকট কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ ? সন্তান আকাঙ্ক্ষাকারীদের নিকট শ্রেষ্ঠ কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দেবতর্পণকারীদের পক্ষে বর্ষাই শ্রেষ্ঠ, পিতৃতর্পণকারীদের জন্য ধন-ধান্য সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা যারা চায় তাদের কাছে গোধন শ্রেষ্ঠ এবং সন্তান আকাঙ্ক্ষাকারীদের কাছে পুত্রই শ্রেষ্ঠ।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'এমন কোন ব্যক্তি আছে যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুভব করে, শ্বাস গ্রহণ করে, বুদ্ধিমান, সম্মানিত এবং সকল প্রাণীগণের নিকট মাননীয় হয়েও প্রকৃতপক্ষে জীবিত নয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, সেবক, মাতা-পিতা ও আত্মা—এই পাঁচকে পোষণ করে না, সে শ্বাস-প্রশ্বাসকারী হলেও জীবিত নয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'পৃথিবীর থেকে ভারী কী ? আকাশের থেকে উঁচু কী ? বায়ুর থেকে বেগে কী চলে ? এবং তৃণের থেকে সংখ্যায় অধিক কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মাতা পৃথিবীর থেকে ভারী অর্থাৎ বেশি, পিতা আকাশের থেকেও উঁচু, মন বায়ুর থেকেও বেগে চলে এবং চিন্তা তৃণের থেকেও অধিক।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ঘুমোলে কার পলক বন্ধ হয় না ? জন্মালেও নিশ্চেষ্ট থাকে কে ? কার হৃদয় নেই ? বেগের সাহায্যে কে বৃদ্ধি পায় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মাছ ঘুমোলেও পলক বন্ধ করে না। ডিম উৎপন্ন হয়েও নিশ্চেষ্ট থাকে। পাথরের হৃদয় নেই, নদী বেগের সাহায্যে বৃদ্ধি পায়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'বিদেশে গমনকারীর মিত্র কে ? গৃহে বাসকারীর মিত্র কে ? রোগীর মিত্র কে ? মৃত্যুর নিকট পৌঁছান ব্যক্তির মিত্র কে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঙ্গের যাত্রীই বিদেশ গমনকারীর মিত্র। গৃহবাসকারীর মিত্র তার স্ত্রী, বৈদ্য রোগীর মিত্র এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই হল তার মিত্র।'

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন—'সমস্ত প্রাণীর অতিথি কে ? সনাতন ধর্ম কী ? অমৃত কী এবং এই সমস্ত জগৎ কী ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—'অগ্নি সমস্ত প্রাণীর অতিথি ; অবিনাশী নিত্যধর্মই সনাতন ধর্ম, গোরুর দুধ অমৃত এবং বায়ু হল সমস্ত জগৎ।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'কে একাকী বিচরণ করে ? একবার উৎপন্ন হয়ে কে পুনর্বার উৎপন্ন হয় ? শীতের উপশম কী ? মহান্ ক্ষেত্র কোনটি ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সূর্য একাকী বিচরণ করেন। চন্দ্র একবার জন্ম নিয়ে পুনরায় জন্ম নেয়, শীতের প্রতিকার অগ্নি এবং পৃথিবী হল সর্বাপেক্ষা মহাক্ষেত্র।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ধর্মের প্রধান স্থান কী ? যশের প্রধান স্থান কী ? স্বর্গের প্রধান স্থান কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধর্মের মুখ্য স্থান দক্ষতা, যশের মুখ্য স্থান দান, স্বর্গের মুখ্য স্থান সত্য এবং সুখের প্রধান স্থান শীল।'

যক্ষ প্রশ্ন করলেন—'মানুষের আত্মা কী ? তার দৈবকৃত সখা কে ? জীবনের সহায়ক কে এবং তার পরম আশ্রয় কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'পুত্র মানুষের আত্মা। স্ত্রী তার দৈবকৃত সখা। মেঘ তার জীবনের সহায়ক এবং দানই হল

পরম আশ্রয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'যিনি ধন্যবাদের পাত্র তাঁর উত্তম গুণ কী ? ধনের মধ্যে উত্তম ধন কী ? লাভের মধ্যে প্রধান লাভ কী এবং সুখের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ সুখ ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধন্যবাদের যোগ্য ব্যক্তিদের দক্ষতাই উত্তম গুণ, ধনাদির মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান উত্তম, লাভের মধ্যে আরোগ্যই প্রধান এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই প্রধান সুখ।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কী ? নিত্য ফলদায়ক ধর্ম কী ? কাকে বশে রাখলে শোক হয় না ? কার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করলে তা নষ্ট হয় না ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল দয়া, বেদোক্ত ধর্ম নিত্য ফলদায়ক। মনকে বশে রাখলে শোক হয় না এবং সৎব্যক্তির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করলে তা নষ্ট হয় না।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'কোন বস্তু ত্যাগ করলে মানুষ প্রিয় হয় ? কী ত্যাগ করে দিলে মানুষ শোক করে না ? কী ত্যাগ করলে মানুষ অর্থবান হয় এবং কী ত্যাগ করলে সে সুখী হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মান ত্যাগ করলে মানুষ প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক হয় না। কাম ত্যাগ করলে অর্থবান হয় এবং লোভ ত্যাগ করলে সুখী হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ব্রাহ্মণকে কেন দান করা হয় ? নট ও নটীদের কেন দান করা হয় ? সেবকদের দান করার প্রয়োজন কী ? এবং রাজাকে কেন দান দেওয়া হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ব্রাহ্মণকে ধর্মের জন্য দান করা হয়, নট ও নটীদের যশের জন্য দান বা পুরস্কৃত করা হয়, সেবকদের পালন-পোষণের জন্য দান (বেতন) দিতে হয়। রাজাকে ভয় হতে রক্ষার জন্য দান (কর) দেওয়া হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'জগৎ কোন বস্তু দিয়ে আচ্ছাদিত ? কীসের জন্য এটি প্রকাশিত হয় না ? মানুষ কীসের জন্য মিত্রকে ত্যাগ করে ? এবং কোন্ কারণে স্বর্গগমন হয় না ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—'জগৎ অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত, তমোগুণের কারণে তা প্রকাশিত হয় না। লোভের জন্য মানুষ মিত্রকে পরিত্যাগ করে এবং আসক্তির জন্য স্বর্গে গমন করে না।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'পুরুষকে কোন অবস্থায় মৃত বলা হয় ? কোন অবস্থায় রাষ্ট্রকে মৃত বলা হয় ? শ্রাদ্ধ কী করে মৃত হয়, এবং যজ্ঞ কীভাবে মৃত হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দরিদ্র ব্যক্তি মৃততুল্য, রাজা বিহনে রাষ্ট্র মৃততুল্য হয়ে থাকে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত শ্রাদ্ধ মৃত, বিনা দক্ষিণায় যজ্ঞ মৃত।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'দিশা (দিক) কী ? জল কী ? অন্ন কী ? বিষ কী ? এবং শ্রাদ্ধের সময় কী, তা বলো।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সৎ ব্যক্তিই দিশা (দিক)[১]। আকাশ জল, গাভী অন্ন[২], প্রার্থনা (কামনা) বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের সময়[৩]।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ক্ষমা কী ? লজ্জা কাকে বলে ? তপের লক্ষণ কী ? এবং দম কাকে বলে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দ্বন্দ্ব সহ্য করাই ক্ষমা, করার মতো কাজ থেকে দূরে থাকাই লজ্জা, নিজ ধর্মে স্থিত থাকাই তপ এবং মনকে দমন করাকেই দম বলা হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'রাজন্ ! জ্ঞান কাকে বলে ? শম কী ? দয়া কার নাম এবং সরলতা কাকে বলা হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'প্রকৃত বস্তুকে সঠিকভাবে জানাই হল জ্ঞান, চিত্তের শান্তি হল শম, সকলের জন্য সুখের ইচ্ছা থাকা দয়া এবং সমচিত্ত হওয়াই সরলতা।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'মানুষের দুর্জয় শত্রু কে ? অনন্ত ব্যাধি কী ? সাধু বলে কাকে গণ্য করা হবে এবং অসাধু কাকে বলা হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ক্রোধ দুর্জয় শত্রু। লোভ অনন্ত ব্যাধি ; যে সকল প্রাণীর হিত করে থাকে সে সাধু এবং নির্দয় পুরুষকে অসাধু বলা হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'রাজন্ ! মোহ কাকে বলে ? মান কাকে বলে ? আলস্য কাকে বলে এবং শোক কাকে বলে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধর্মমূঢ়তাই মোহ, আত্মাভিমানই মান, ধর্মপালন না করা হল আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ঋষিগণ স্থৈর্য কাকে বলেন ? ধৈর্য

[১] কারণ সৎ ব্যক্তিই ভগবদ্প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করেন।

[২] কারণ গাভী থেকেই দুধ-ঘি ইত্যাদি হব্য হয়, সেই হবন দ্বারাই বর্ষা হয় এবং বর্ষা থেকেই অন্নের উৎপত্তি হয়।

[৩] অর্থাৎ যখন উত্তম ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় তখনই শ্রাদ্ধ করা উচিত।

কাকে বলে, স্নান কাকে বলে এবং দান কিসের নাম ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'নিজ ধর্মে স্থির থাকাই স্থৈর্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ধৈর্য, মানসিক কলুষ ত্যাগ করা হল স্নান এবং প্রাণীদের রক্ষা করাকে বলা হয় দান।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'কোন ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে বুঝতে হবে ? নাস্তিক কাকে বলে ? মূর্খ কে ? কাম কাকে বলে ? এবং মৎসর কাকে বলা হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা হয়, মূর্খকে নাস্তিক বলা হয় আর নাস্তিক ব্যক্তি মূর্খ হয়, যা জন্ম-মৃত্যু চক্রে নিক্ষেপ করে সেই বাসনাকে কাম বলা হয় এবং হৃদয়ের সন্তাপকে বলা হয় মৎসর।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'অহংকার কাকে বলে ? দম্ভ কাকে বলে ? পরমদৈব কাকে বলা হয় ? পৈশুন্য কার নাম ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'অহংকার হল মহা অজ্ঞান, নিজেকে অযথা বড় ধর্মাত্মা বলে জাহির করা হল দম্ভ। দানের ফলকে দৈব বলে এবং অপরের দোষ অন্যকে বলা হল পৈশুন্য।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ধর্ম, অর্থ ও কাম—এগুলি পরস্পর বিরোধী। এই নিত্য বিরুদ্ধগুলি কী করে একস্থানে সংযুক্ত হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যখন ধর্ম ও ভার্যা পরস্পর বশবর্তী হয় তখন ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনের সংযুক্তি হওয়া সম্ভব।'[১]

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! অক্ষয় নরক কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে ডেকে তাকে ভিক্ষা না দেয়, সে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং পিতৃধর্মে মিথ্যাবুদ্ধি রাখে, সে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'রাজন্ ! কুল, আচার, স্বাধ্যায় এবং শাস্ত্রশ্রবণ—এগুলির মধ্যে কার সাহায্যে ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয়, ঠিক করে তা আমাকে জানাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'প্রিয় যক্ষ শোনো ! কুল, স্বাধ্যায় এবং শাস্ত্রশ্রবণ—এগুলির কোনোটিই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয় ; আচার ও আচরণই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। সুতরাং যত্ন পূর্বক সদাচার রক্ষা করা উচিত। ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত ; কারণ যার সদাচার অক্ষুণ্ণ থাকে, তারই ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে। যার সদাচার নষ্ট হয়ে গেছে, সে স্বয়ং নাশ হয়ে যায়। যে পড়ে, যে পড়ায় এবং যে শাস্ত্রবিচার করে—তারা সব বিলাসী এবং মূর্খ ; সেই পণ্ডিত, যে নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে। চারবেদ পাঠ করার পরেও যদি কেউ দুষ্ট আচরণ সম্পন্ন হয়, তাহলে সে শূদ্রেরও অধম। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'মধুর বাক্য যারা বলে তারা কী পায় ? যারা ভেবে চিন্তে কাজ করে তারা কী পায় ? যে অনেক বন্ধু তৈরি করে, তার কী লাভ হয় ? যে ব্যক্তি ধর্মনিষ্ঠ, সে কী পায় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যারা মধুর বাক্য বলে, তারা সকলের প্রিয় হয়। যারা ভেবে-চিন্তে কাজ করে তারা বেশি সাফল্য লাভ করে ; যে ব্যক্তি অনেক বন্ধু তৈরি করে, সে সুখে দিন কাটায় এবং যে ধর্মনিষ্ঠ, সে সদ্‌গতি লাভ করে।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'সুখী কে ? আশ্চর্য কী ? পথ কী ? বার্তা কী ? আমার এই চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যার কোনো ঋণ নেই, যে ব্যক্তি প্রবাসী নয়, যে দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগেও নিজ গৃহে শাক-ভাত রান্না করে খেতে পারে—সেই সুখী। প্রাণী নিত্য যমের দ্বারে যাচ্ছে ; কিন্তু যে বেঁচে থাকে, সে সর্বদা বেঁচে থাকার আশা করে এর থেকে বেশি আশ্চর্যের আর কি হতে পারে ! তর্কের কোনো স্থিতি নেই, শ্রুতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়, কোনো একজন ঋষির বচন শিরোধার্য বলে মানা যায় না, ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ় ; সুতরাং যে পথে মহাপুরুষ গমন করেন, তাই হল প্রকৃত পথ। এই মহামোহরূপ কড়াইতে কালরূপ ভগবান সমস্ত প্রাণীকে মাস ও ঋতুরূপ হাতা দিয়ে সূর্যরূপ অগ্নি এবং রাত ও দিনরূপ ইন্ধন দিয়ে রান্না করছেন—এটাই বার্তা।'

যক্ষ বলল—'তুমি আমার সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছ। এবার তুমি পুরুষের ব্যাখ্যা করো এবং বল সবথেকে ধনী কে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যে ব্যক্তির পুণ্যকর্মের কীর্তির

---

[১]অর্থাৎ পত্নী ধর্মানুবর্তিনী যদি হয় তাহলে এই তিনের সংযোগ হওয়া সম্ভব ; কারণ পত্নী কামের সাধন, সে যদি অগ্নিহোত্র এবং দানাদির বিরোধ না করে তাহলে সেগুলির যথাযথ অনুষ্ঠান হলে তার অর্থ—তিনটিই একসঙ্গে সম্পাদন করা সম্ভব।

আওয়াজ স্বর্গ ও ভূমি স্পর্শ করে, পুরুষ সেই পর্যন্ত থাকেন। যাঁর কাছে প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ—সব সমান, তিনিই সব থেকে ধনী ব্যক্তি।'

যক্ষ বলল—'রাজন্ ! সব থেকে ধনী ব্যক্তির ব্যাখ্যা তুমি ঠিকমতোই করেছ। তাই তোমার ভাইদের মধ্যে তুমি একজনকে চেয়ে নাও, সে জীবিত হতে পারে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যক্ষ ! এই শ্যামবর্ণ, অরুণনয়ন, শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ, সুবিশাল বক্ষ সমন্বিত মহাবাহু নকুল যেন জীবিত হয়।'

যক্ষ বলল—'রাজন্ ! যার দশ হাজার হাতির মতো দেহের বল, সেই ভীমকে ছেড়ে তুমি নকুলকে কেন বাঁচাতে চাও ? অথবা যার বাহুবলের ওপর সমস্ত পাণ্ডবরা ভরসা করে আছে, সেই অর্জুনকে ছেড়ে তুমি নকুলকে কেন বাঁচিয়ে তুলতে চাও ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যদি ধর্মনাশ করা হয়, তাহলে সেই নষ্ট ধর্ম কর্তাকেও নাশ করে আর যদি ধর্মরক্ষা করা হয়, তবে তা কর্তাকেও রক্ষা করে। তাই আমি ধর্মত্যাগ করি না, যাতে ধর্ম আমাকেই না নাশ করে দেয়। আমার বিচার হল সবার প্রতি সমানভাব রাখাই পরম ধর্ম। লোকে জানে যে রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা। আমার পিতার দুই পত্নী—কুন্তী এবং মাদ্রী, এঁরা দুজনেই যাতে পুত্রবতী থাকেন, সেটাই আমার বিচার। আমার কাছে কুন্তী ও মাদ্রী—দুজনেই সমান—কোনোই পার্থক্য নেই। আমি দুজনের প্রতি সমান আচরণ করতে চাই তাই আমি চাই নকুলই জীবিত হোক।'

যক্ষ বলল—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি অর্থ এবং কাজের থেকেও সমত্বকে বেশি সম্মান করেছ, সুতরাং তোমার সব ভাই-ই জীবিত হোক।'

—o—

পাণ্ডবদের জীবন ফিরে পাওয়া, যুধিষ্ঠিরের বরলাভ এবং অজ্ঞাতবাসের জন্য ব্রাহ্মণদের কাছে বিদায় গ্রহণ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যক্ষ বলামাত্রই মৃত পাণ্ডবরা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব মিটে গেল।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু ! দেবশ্রেষ্ঠ আপনি কে ? আপনি যে যক্ষ, আমার তা মনে হচ্ছে না। আপনি বসুগণ, রুদ্রগণ এবং মরুতগণের মধ্যে কেউ নয় তো, অথবা স্বয়ং ইন্দ্র ? আমার ভ্রাতারা শত-শত, হাজার-হাজার বীরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিপুণ। এমন কোনো যোদ্ধা আমি দেখিনি, যাঁরা আমার ভ্রাতাদের রণভূমিতে পরাজিত করেছেন। এখন জীবিত হলেও মনে হচ্ছে তাঁরা সুখনিদ্রায় ছিলেন, তাঁদের এত সুস্থ দেখাচ্ছে ; সুতরাং আপনি আমাদের কোনো সুহৃদ বা পিতা হবেন !'

যক্ষ বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার পিতা ধর্মরাজ, তোমাকে দেখার জন্যই এখানে এসেছি। যশ, সত্য, দম, শৌচ, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা, দান, তপ এবং ব্রহ্মচর্য—এগুলি আমার দেহ এবং অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ এবং অমৎসর—এগুলিকে তুমি আমার পথ বলে জানবে। তুমি সর্বদাই আমার প্রিয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তোমার শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এবং সমাধান—এই পাঁচটি সাধনে প্রীতি আছে এবং তুমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-মোহ, জরা-মৃত্যু এই ছটি দোষও জয় করে নিয়েছ। এর প্রথম দুই দোষ জন্ম থেকেই থাকে, মধ্যের দুটি দোষ তরুণাবস্থাতে আসে আর অন্তিম দোষ দুটি শেষজীবনে আসে। তোমার মঙ্গল হোক, আমি ধর্ম, তোমার ব্যবহার জানার জন্যই এখানে এসেছিলাম। হে নিষ্পাপ রাজন্ ! তোমার সমদৃষ্টির জন্য আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি অভীষ্ট বর চেয়ে নাও ; যে আমার ভক্ত, তার কখনো দুর্গতি হয় না।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ভগবান ! প্রথম বরে আমার প্রার্থনা, যে ব্রাহ্মণের অরণিসহ মন্থনকাষ্ঠ মৃগ নিয়ে গেছে, তার অগ্নিহোত্র যেন রক্ষা হয়।'

যক্ষ বলল—'রাজন্ ! ওই ব্রাহ্মণের অরণিসহ মন্থন কাষ্ঠ আমি তোমার পরীক্ষার জন্যই মৃগরূপে হরণ করেছিলাম, সেটি আমি তোমায় দিচ্ছি। তুমি অন্য বর চেয়ে নাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'আমরা দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করেছি, এবার ত্রয়োদশ বৎসর আগত প্রায় ; সুতরাং এমন বর দিন যাতে কেউ আমাদের চিনতে না পারে।'

ভগবান ধর্ম এই কথা শুনে বললেন—'আমি তোমাকে এই বর দিলাম যে, যদি তুমি পৃথিবীতে নিজ

রূপেই বিচরণ কর, তাহলেও কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে যেমন চাইবে, সে তেমনই রূপধারণ করতে সক্ষম হবে। এছাড়া তুমি তৃতীয় বরও চেয়ে নাও। রাজন্ ! তুমি আমার পুত্র এবং বিদুরও আমার অংশ থেকে জন্ম নিয়েছে ; তাই আমার কাছে তোমরা দুজনেই সমান।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ভগবান ! আপনি সনাতন দেবাদিদেব। আজ সাক্ষাৎ আপনার দর্শন লাভ হল, এর চেয়ে দুর্লভ আর কী লাভ হতে পারে! তবুও আপনি আমাকে যে বর দেবেন, আমি তা শিরোধার্য করব। আমাকে এমন বর দিন যেন আমি লোভ, মোহ ও ক্রোধ জয় করতে পারি এবং

দান, তপ ও সত্যে আমার যেন সর্বদা মতি থাকে।'

ধর্মরাজ বললেন—'পাণ্ডুপুত্র ! তুমি স্বভাবতই এই গুণে সমৃদ্ধ, পরবর্তীকালেও তোমার ইচ্ছা অনুসারে এইসব ধর্ম তোমার মধ্যে বজায় থাকবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—এই কথা বলে ধর্ম অন্তর্ধান করলেন এবং পাণ্ডবরা সকলে আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমে এসে তাঁরা ব্রাহ্মণকে তাঁর অরণি ফিরিয়ে দিলেন।

যাঁরা এই শ্রেষ্ঠ আখ্যানকে স্মরণে রাখবেন তাঁদের মন অধর্মে, সুহৃদদ্রোহে, পরের ধন অপহরণে, পরস্ত্রীগমনে এবং কৃপণতাতে কখনো প্রবৃত্ত হবে না।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ধর্মরাজের নির্দেশে সত্যপরাক্রমী পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশ বছরটি অজ্ঞাতভাবে কাটিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই নিয়ম ব্রত পালন করতেন। একদিন তাঁরা যখন বনবাসী মুনিদের সঙ্গে বসে ছিলেন, তখন অজ্ঞাতবাসের অনুমতি নেওয়ার জন্য তাঁরা হাতজোড় করে বললেন—'এই দ্বাদশ বৎসর আমরা নানা কঠিন পরিস্থিতিতে বনে বাস করেছি। এবার ত্রয়োদশতম বৎসর আগত, আমাদের এবার অজ্ঞাত থাকতে হবে, আমাদের অনুমতি দিন। দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন এবং পুরবাসীদের জানিয়েছেন যে, আমাদের কেউ আশ্রয় দিলে তাদের কঠিন শাস্তি হবে। অতএব আমাদের অন্য দেশে যেতে হবে। আপনারা প্রসন্ন হয়ে আমাদের অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।'

তখন সকল মুনি ঋষিরা তাঁদের আশীর্বাদ করে পুনরায় মিলিত হওয়ার আশা রেখে, নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। তখন ধৌম্যের সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডব দ্রৌপদীসহ রওনা হলেন। প্রায় এক ক্রোশ পথ এসে তাঁরা অজ্ঞাতবাস শুরু করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন।

—o—

বনপর্ব সমাপ্ত

—o—

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

বিরাটপর্ব

বিরাটনগরে কে কী কাজ করবেন, সেই নিয়ে পাণ্ডবদের আলোচনা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মণ ! আমার প্রপিতামহগণ দুর্যোধনের ভয়ে কষ্ট সহ্য করে বিরাটনগরে কীভাবে অজ্ঞাতবাসের সময় পূর্ণ করলেন ? নিদারুণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে দ্রৌপদী কীভাবে সেখানে গোপনভাবে থাকলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তোমার প্রপিতামহগণ কীভাবে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, বলছি শোন। যক্ষের কাছ থেকে বর পাওয়ার পর ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির একদিন তাঁর ভ্রাতাদের ডেকে বললেন—'রাজ্যচ্যুত হয়ে আমরা দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করেছি ; এবার ত্রয়োদশতম বৎসর শুরু হচ্ছে, এখন আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গুপ্তভাবে থাকতে হবে। অর্জুন ! তুমি তোমার পছন্দমতো কোনো সুন্দর বাসস্থানের কথা বলো, যেখানে আমরা এক বৎসর একসঙ্গে এমনভাবে থাকতে পারি যাতে শত্রুরা তার খবর জানতে না পারে।'

অর্জুন বললেন—'মহারাজ ! ধর্মরাজ প্রদত্ত বরের প্রভাবে আমাদের কেউই চিনতে পারবে না, এতে কোনো সন্দেহই নেই। সুতরাং আমরা স্বচ্ছন্দে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারি। তবুও গুপ্তভাবে থাকা যায় এমন নিবাসযোগ্য কয়েকটি রমণীয় দেশের নাম আমি আপনাকে বলছি। কুরুদেশের আশেপাশে অনেক সুরম্য দেশ আছে, যেগুলি শস্যপূর্ণ ; সেগুলি হল পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মলল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী। এর মধ্যে যে কোনো একটি দেশকে আপনি পছন্দ করতে পারেন, সেখানে আমরা এক বৎসর থাকব।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'তোমার বর্ণিত দেশগুলির মধ্যে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট অত্যন্ত বলবান এবং পাণ্ডুবংশের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা আছে ; তিনি অত্যন্ত উদার, ধর্মাত্মা এবং অভিজ্ঞ। অতএব আমরা এই এক বৎসর বিরাটনগরেই বসবাস করব এবং রাজার কিছু কাজ করব।'

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! আপনি তার রাজ্যে কীভাবে থাকবেন ? বিরাটনগরে কোন কাজে আপনার মন লাগবে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি পাশা খেলা জানি এবং পছন্দও করি ; অতএব 'কঙ্ক' নামে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর সভার সভাসদ হব। আমার কাজ হবে—পাশা খেলে রাজা, মন্ত্রী এবং রাজার আত্মীয়দের মনোরঞ্জন করা। ভীম ! তুমি বলো, তুমি বিরাট রাজার ওখানে কী কাজ করে আনন্দে থাকতে পারবে ?'

ভীম বললেন—'আমি রান্নায় পারদর্শী, সুতরাং আমি 'বল্লব' নামের পাচক হয়ে রাজ দরবারে উপস্থিত হব।'

যুধিষ্ঠির—'অর্জুন ! তুমি কী কাজ করবে ?'

অর্জুন—'আমি হাতে শাঁখের চুড়ি পরে, মাথায় বেণী ঝোলাব এবং নিজেকে 'নপুংসক' ঘোষণা করে 'বৃহন্নলা' নামে পরিচিত হব। আমার কাজ হবে—রাজা বিরাটের অন্তঃপুরে নারীদের সংগীত ও নৃত্যকলা শিক্ষাপ্রদান। তার সঙ্গে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রও শেখাব। আমি নর্তকীরূপে নিজেকে লুকিয়ে রাখব।'

যুধিষ্ঠির—'ভাই নকুল ! এবার তোমার কথা বলো, রাজা বিরাটের রাজ্যে তুমি কী কাজ করতে সক্ষম হবে ?'

নকুল—'আমি অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী, ঘোড়াকে পরিচালনা করা, লালনপালন, তার রোগের চিকিৎসা—এই সব কাজে আমি বিশেষ পারদর্শী ; সুতরাং বিরাট রাজসভায় গিয়ে আমার 'গ্রন্থিক' নাম জানাব এবং তাঁর অশ্বরক্ষক হয়ে থাকব।'

এবার যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভাই ! রাজার কাছে গিয়ে তুমি তোমার কী পরিচয় দেবে এবং নিজেকে গুপ্ত রাখার জন্য কী কাজ করবে ?'

সহদেব—'আমি বিরাটরাজার গোধন রক্ষা করব। গোরু যতই রাগী ও উদ্ধত হোক, আমি সেগুলিকে বশ করতে দক্ষ। গাভীদোহনে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণে আমি পারদর্শী। গোরুর লক্ষণ এবং চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্যক জ্ঞান আছে। আমি শুভলক্ষণযুক্ত বৃষও চিনতে পারি, যার মূত্রের আঘ্রাণে বন্ধ্যা স্ত্রীও সন্তানলাভ করতে পারে। আমার নাম হবে 'তন্ত্রিপাল'। আমাকে কেউ চিনতেও পারবে না।'

রাজা যুধিষ্ঠির তখন দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'এই দ্রুপদকুমারী আমাদের প্রাণের অধিক প্রিয় ; তিনি সেখানে কী কাজ করবেন ?'

দ্রৌপদী বললেন—'মহারাজ ! আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। যেসব নারীরা অন্যের গৃহে বাসপূর্বক সেবা করে জীবন ধারণ করে, তাদের সৈরন্ধ্রী বলা হয় ; অতএব আমি 'সৈরন্ধ্রী' বলে নিজের পরিচয় দেব। কেশ পরিচর্যার কাজ আমি ভালোমতো জানি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব আমি দ্রৌপদীর দাসী ছিলাম। এইভাবে আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখব, বিরাট রাজার রানি সুদেষ্ণাও আমাকে রক্ষা করবেন। সুতরাং আমার সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

—०—

যুধিষ্ঠিরকে ধৌম্য কর্তৃক রাজার কাছে থাকার নিয়মাদি শিক্ষা

বৈশম্পায়ন বললেন—দ্রৌপদী এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'বিধাতার ইচ্ছা অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসে তোমরা যা করবে, তা আমাকে বলেছ ; আমিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যা উচিত কর্তব্য মনে করেছি, তা তোমাদের জানালাম। পুরোহিত ধৌম্য এখন সেবক এবং পাচকাদিসহ রাজা দ্রুপদের গৃহে থেকে আমাদের অগ্নিহোত্র রক্ষা করবেন। ইন্দ্রসেন ইত্যাদি সারথি এবং সেবকরা খালি রথ নিয়ে দ্বারকাতে চলে যাবে। অন্য সমস্ত নারী, দাসী ইত্যাদি যাঁরা আছেন, সকলে পাঞ্চাল রাজ্যে ফিরে যাবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে যে, তাঁরা পাণ্ডবদের কোনো খবর জানেন না, পাণ্ডবরা তাঁদের দ্বৈতবনে রেখে কোথায় চলে গেছেন।'

এইভাবে সব কিছু ঠিক করে পাণ্ডবরা ধৌম্য মুনির কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ধৌম্য তাঁদের বললেন—

'হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, সেবক, বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অগ্নি ইত্যাদি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা নিয়েছ, তা অতি উত্তম। এখন আমি তোমাদের জানাতে চাই যে, রাজগৃহে থাকলে কেমন ব্যবহার করা উচিত। রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমে দ্বারপালের অনুমতি নিতে হয়। রাজাদের ওপর কখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে না। নিজের জন্য এমন আসন বেছে নেবে যাতে অন্য কেউ না বসার থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনো রাজার পত্নীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা উচিত নয়। সেইরূপ যারা অন্তঃপুরে আসা-যাওয়া করে, তাদের সঙ্গে অথবা রাজা যার প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন বা যারা রাজার সঙ্গে শত্রুতা করে, তাদের সঙ্গেও মিত্রতা করা উচিত নয়। অতি ক্ষুদ্র কাজও রাজাকে জানিয়ে করা উচিত, তাতে কখনো বিপদে পড়তে হয় না। রাজাকে অগ্নি ও দেবতার ন্যায় মান্য করে প্রতিদিন যত্নপূর্বক তাঁর পরিচর্যা করা উচিত। যে তাঁর সঙ্গে কপট আচরণ করে, তার বিনাশ হয়। রাজা যেসব কাজের জন্য আদেশ দেন, সেগুলিই পালন করবে ; বেপরোয়াভাব, অহংকার, ক্রোধ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে। প্রিয় এবং হিতকারী বাক্য বলবে। প্রিয়ের থেকেও হিতকারী বাক্যের গুরুত্ব বেশি। সমস্ত ব্যাপারে এবং সর্বকথায় রাজার অনুকূল থাকবে। যা রাজার পছন্দ নয়, তা কখনো করবে না। তাঁর শত্রুর সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না এবং কখনো কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না। এরূপ ব্যবহারকারী ব্যক্তিই রাজার কাছে থাকতে পারে। বিদ্বান ব্যক্তিরা রাজার ডান বা বামভাগে বসবেন, অস্ত্রধারী, যিনি পাহারা দেবেন, তাঁর পিছনে থাকা উচিত। রাজা যদি কোনো অপ্রিয় কথা বলেন, অন্যের নিকট তা প্রকাশ করবে না। 'আমি শূরবীর', 'আমি বুদ্ধিমান' এমন অহংকার দেখাবে না। সর্বদা রাজার প্রিয় কাজ করবে। নিজ দুই হাত, ঠোঁট বা হাঁটু বৃথা সঞ্চালন করবে না। বেশি কথা বলবে না। কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করা হলে, তাতে যোগ দেবে না। পাগলের মতো কখনো উচ্চহাস্য করবে না। যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর প্রাপ্তিতে আনন্দে আত্মহারা না হয়, অপমানিত হলে দুঃখিত হয় না এবং নিজ কাজে সর্বদা সতর্ক থাকে, সেই রাজার কাছে টিকে থাকে। কোনো মন্ত্রী যদি আগে রাজার কৃপাপাত্র থাকে, পরে অকারণে তাকে দণ্ড পেতে হয়, তা সত্ত্বেও যদি সে রাজার সমালোচনা না করে, তাহলে সে পুনরায় সব কিছু ফেরত পায়। নিজের লাভের কথা ভেবে রাজার সম্বন্ধে অপরের সঙ্গে কথা বলা ঠিক নয় ; যুদ্ধের সময়ে রাজাকে সর্বপ্রকারে রাজোচিত শক্তিতে বিশিষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি সর্বদা উৎসাহ দেয়, বুদ্ধি-বলযুক্ত, শূরবীর, সত্যবাদী, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয় এবং ছায়ার ন্যায় রাজাকে অনুসরণ করে, সেই রাজগৃহে থাকার উপযুক্ত। যখন অন্য ব্যক্তিকে কোনো কাজে পাঠানো হয়, তখন যে ব্যক্তি উঠে 'আমাকে কী আদেশ করেন' বলে এগিয়ে আসে, সেই রাজগৃহে থাকার উপযুক্ত। রাজার মতো বেশভূষা করবে না, তাঁর অতি নিকটে থাকবে না এবং তাঁর মনের বিপরীত পরামর্শ দেবে না। এরূপ করলেই রাজার প্রিয় হতে পারবে। রাজা কোনো কাজে নিযুক্ত করলে, তার জন্য অন্যের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করবে না। কারণ উৎকোচ গ্রহণকারী ব্যক্তির কুকর্ম জানাজানি হয়ে একদিন তাকে ধরা পড়তেই হয় এবং ফলরূপে কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। পাণ্ডবগণ ! এইভাবে যত্নপূর্বক নিজ মনকে বশে রেখে ভালোভাবে ত্রয়োদশতম বর্ষ পূর্ণ করো ; তারপর নিজ রাজ্যে এসে স্বচ্ছন্দে বসবাস করবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ব্রহ্মণ ! আপনি আমাদের অনেক ভালো শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের মাতা কুন্তী এবং মহাবুদ্ধিমান বিদুর ছাড়া এমন কেউ নেই যে আমাদের এরূপ উপদেশ দিতে সক্ষম। এখন আমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে, এখান থেকে চলে যাবার ও বিজয়ী হওয়ার জন্য যে কর্তব্য করা প্রয়োজন, আপনি তা পূর্ণ করুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা যুধিষ্ঠিরের কথায় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ধৌম্য যাত্রাকালে যা কিছু শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য ছিল, তা বিধিমতো পালন করলেন। পাণ্ডবদের অগ্নিহোত্র সামগ্রী অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাঁদের সমৃদ্ধি ও বিজয়ের জন্য বেদমন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞ করলেন। পাণ্ডবরা তারপর অগ্নি, ব্রাহ্মণ এবং তপস্বীদের প্রদক্ষিণ করে দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে অজ্ঞাতবাসের জন্য রওনা হলেন। তাঁরা চলে গেলে পুরোহিত ধৌম্য যজ্ঞের সেই অগ্নি নিয়ে পাঞ্চাল রাজ্যে চলে গেলেন। ইন্দ্রসেন প্রমুখ সেবকরা রথ ও ঘোড়াসহ দ্বারকায় চলে গেল।

— ০ —

পাণ্ডবদের মৎস্য রাজ্যে গমন, শমীবৃক্ষের ওপর অস্ত্র সংরক্ষণ এবং যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদীর ক্রমান্বয়ে রাজমহলে পৌঁছানো

বৈশম্পায়ন বললেন—মহাপরাক্রমী পাণ্ডবরা তারপর যমুনার কাছে পৌঁছে তার দক্ষিণ তট ধরে চলতে লাগলেন। তাঁরা পদব্রজেই যাচ্ছিলেন। তাঁরা কখনো পর্বতগুহা, কখনো জঙ্গলে যাত্রা বিরতি করছিলেন। ক্রমশ তাঁরা দশার্ণর উত্তর এবং পাঞ্চালের দক্ষিণে যকৃল্লোম এবং শূরসেন দেশগুলির মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে লাগলেন। তাঁদের হাতে ধনুক এবং কোমরে তলোয়ার ছিল। দেহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল, চুল-দাড়ি বেড়ে গিয়েছিল। ক্রমশ বনপথ পার হয়ে তাঁরা মৎস্যদেশে বিরাটের রাজধানীর কাছে পৌঁছলেন। যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! নগরে প্রবেশ করার আগে ঠিক করতে হবে যে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কোথায় রাখবে। তোমার গাণ্ডীব অত্যন্ত বড়, জগতে এটি প্রসিদ্ধ ; সুতরাং আমরা যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নগরে প্রবেশ করি, তাহলে সকলেই যে আমাদের চিনে ফেলবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুসারে আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করতে হবে।'

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! শ্মশানের কাছে একটি বিশাল শমীবৃক্ষ দেখা যাচ্ছে ; তার শাখাগুলি অতি নিবিড়, কারো পক্ষে ওই বৃক্ষে ওঠা খুবই কঠিন। এখানে এখন কোনো লোকও দেখা যাচ্ছে না, যে আমাদের অস্ত্র রাখার জায়গা দেখে নেবে। এই বৃক্ষটি বসতি থেকে খুবই দূরে ঘন-জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এবং হিংস্র জন্তু ও সর্পাদি পরিবেষ্টিত। অতএব আমরা এই বৃক্ষের ওপরেই অস্ত্রশস্ত্র রেখে নগরে প্রবেশ করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—ধর্মরাজকে এই কথা বলে অর্জুন সেইখানে অস্ত্র রাখার উদ্যোগ করলেন। তাঁরা ধনুক, তীর, তলোয়ার, গাণ্ডীব সব একসঙ্গে বাঁধলেন। যুধিষ্ঠির নকুলকে বললেন—'বীর ! তুমি বৃক্ষে উঠে এগুলি রেখে দাও।' তাঁর নির্দেশ পেয়ে নকুল গাছের ওপর উঠে, গাছের এক কোটরে, যাতে বৃষ্টির জল না পড়ে, এমন জায়গায় সব অস্ত্রগুলি মজবুত দড়ি দিয়ে শাখার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। তারপর তাঁরা একটি মৃতদেহ এনে সেই গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ভয়ে কেউ কাছে না আসে। সব ঠিকমতো ব্যবস্থা করে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের নিজেদের এক একটি গুপ্ত নাম রাখলেন ; তা হল যথাক্রমে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন এবং জয়দ্বল। তারপরে তাঁরা অজ্ঞাতবাসের জন্য বিরাটনগরে প্রবেশ
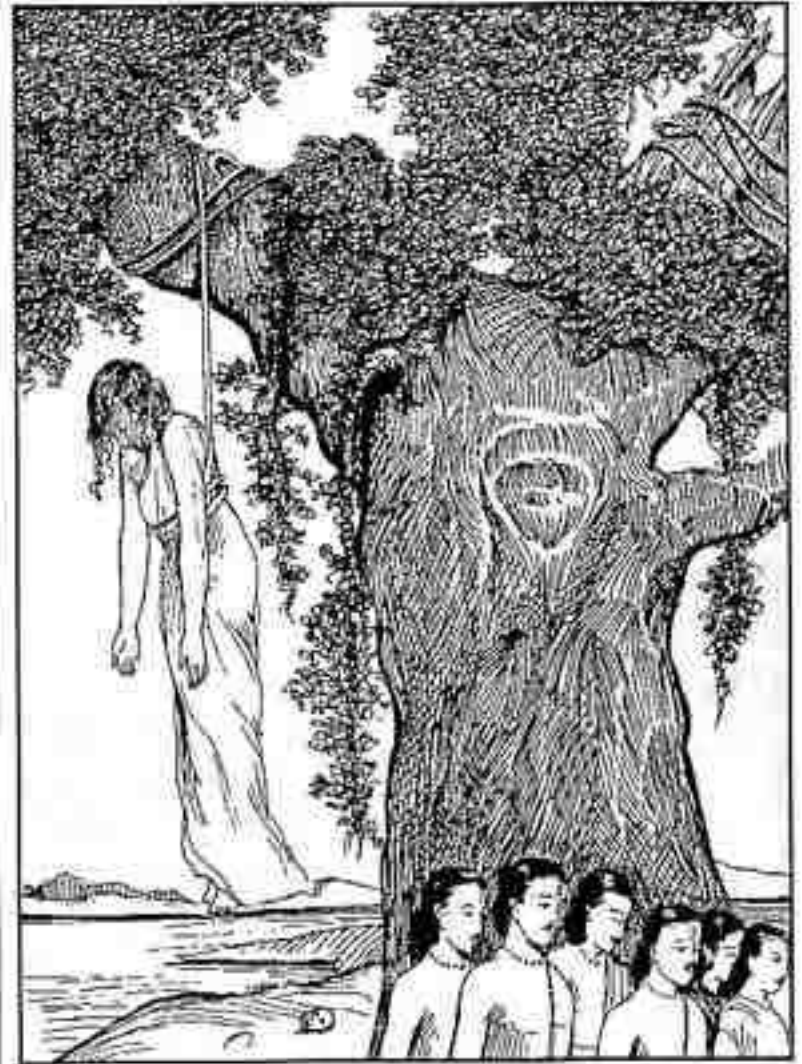
করলেন।

নগরে প্রবেশ কালে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাসহ দেবী ত্রিভুবনেশ্বরী দুর্গার স্তব করলেন, দেবী প্রসন্ন হয়ে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁদের বিজয় ও রাজ্যপ্রাপ্তি বর দিয়ে বললেন

'বিরাটনগরে তোমাদের কেউ চিনতে পারবে না।'

তারপর তাঁরা বিরাট রাজের সভায় গেলেন। রাজা রাজসভাতে বসেছিলেন। সর্বপ্রথম যুধিষ্ঠির সেখানে পৌঁছলেন, তিনি সঙ্গে পাশা নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি রাজাকে নিবেদন করলেন, 'সম্রাট ! আমি

একজন ব্রাহ্মণ ! আমার সব অপহরণ হয়ে গেছে, আমি তাই জীবিকা উপার্জনের আশায় আপনার কাছে এসেছি। আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ করে আপনার কাছে থাকতে ইচ্ছা করি।'

রাজা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর প্রার্থনা মেনে নিলেন। তারপরে প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রাহ্মণ ! আমি জানতে ইচ্ছুক যে আপনি কোন রাজার রাজ্য থেকে কষ্ট করে এখানে এসেছেন, আপনার নাম ও গোত্র কী ? আপনি কোন বিদ্যা জানেন ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজন্ ! ব্যাঘ্রপদ গোত্রে আমার জন্ম, নাম কঙ্ক। আগে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে থাকতাম। পাশা খেলায় আমার বিশেষ জ্ঞান আছে।'

বিরাট বললেন—'কঙ্ক ! আমি আপনাকে আমার বন্ধু করে নিলাম ; আমি যেমনভাবে থাকব, আপনিও তেমন থাকবেন। খাদ্য-বস্ত্রের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। বহির্রাজ্য, রাজকোষ ও সৈন্য এবং অন্যান্য সম্পদ ইত্যাদির দেখাশোনার সব ভার আপনাকে দিলাম। আপনার জন্য রাজদ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে এবং আপনার কাছে কোনো কিছু গোপন থাকবে না। জীবিকার জন্য কেউ আপনার কাছে প্রার্থনা জানালে, তা আপনি সর্বদা আমাকে জানাবেন। আমি তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করব। আমাকে কোনো কিছু জানাতে আপনি ভয় বা সংকোচ করবেন না।'

রাজার সঙ্গে এইসব কথাবার্তার পর যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সেখানে সুখে থাকতে লাগলেন ; তাঁর গুপ্তকথা প্রকাশিত হল না।

তারপর সিংহের মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভীম রাজদরবারে হাজির হলেন। তাঁর হাতে চামচ, হাতা, ছুরি। তাঁর বেশভূষা পাচকের মতো হলেও, শরীর থেকে এক দিব্যকান্তি প্রস্ফুটিত হচ্ছিল। তিনি এসে বললেন—'রাজন্ ! আমার নাম বল্লব ! আমি রান্নার কাজ জানি, উত্তম রান্না করতে পারি। আপনি রান্নার কাজে আমাকে নিযুক্ত করুন।'

বিরাট বললেন—'বল্লব ! তোমাকে পাচক বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমাকে তো ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী এবং পরাক্রমী বলে মনে হচ্ছে !'

ভীম বললেন—'মহারাজ ! বিশ্বাস করুন, আমি

পাচক, আপনার সেবা করতে এসেছি। রাজা যুধিষ্ঠিরও আমার প্রস্তুত করা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও আপনি যা বললেন, আমি পরাক্রমশালীও, আমার ন্যায় বলশালী কেউ নেই। আমি সিংহ এবং হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনাকে প্রসন্ন করব।'

বিরাট বললেন—'ঠিক আছে! তুমি যখন রান্নার কাজে পারদর্শী বলছ, তখন সেই কাজই করো। যদিও আমার মনে হয় এ কাজ তোমার যোগ্য নয় তোমার আগ্রহ দেখেই আমি তা মেনে নিলাম। তুমি আমার পাকশালার প্রধান হবে। যারা আগে থেকে ওখানে কাজ করছে, আমি তোমাকে তাদের প্রভু হিসাবে নিযুক্ত করছি।'

এইভাবে রাজা বিরাটের পাকশালায় ভীমসেন প্রধান পাচক হলেন। তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। তিনি ক্রমশ রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রীর ন্যায় বেশভূষা করে দুঃখিনীর মতো নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বিরাট রাজার রানি সুদেষ্ণা তাঁর মহলের বাতায়ন দিয়ে নগরের শোভা দেখছিলেন। তাঁর দৃষ্টি দ্রৌপদীর ওপর পড়ে, অনাথার ন্যায় বস্ত্র পরিহিত সুন্দরী রমণী দেখে রানি তাঁকে ডেকে আনালেন। গৃহে এনে

জিজ্ঞাসা করলেন—'কল্যাণী ! তুমি কে ? কী করতে চাও ?' দ্রৌপদী বললেন—'মহারানি ! আমি যোগ্য কোনো কাজ চাই ; যিনি আমাকে নিযুক্ত করবেন, আমি তাঁর কাজ করব।' সুদেষ্ণা বললেন—'সুকুমারী ! তোমার ন্যায় রূপবতী নারীরা সৈরন্ধ্রী হয় না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বহু দাস-দাসীর সেবার যোগ্যা। তোমার এত সুন্দর রূপ, লক্ষ্মী বলে মনে হচ্ছে। সত্য করে বলো, তুমি কে ? যক্ষ বা দেবতা নয় তো ? অথবা কোনো অপ্সরা, দেবকন্যা, নাগকন্যা, চন্দ্রপত্নী রোহিণী বা ইন্দ্রাণী ? অথবা ব্রহ্মা বা প্রজাপতির পত্নীদের মধ্যে কেউ ?'

দ্রৌপদী বললেন—'রানি ! আমি সত্যই বলছি—আমি দেবতা বা গন্ধর্বী নই—সেবিকা সৈরন্ধ্রী। আমি কেশপরিচর্যাতে পারদর্শিনী, অঙ্গরাগ করতে জানি। নানা পুষ্প সমাহারে সুন্দর মালা গাঁথতে জানি। এর আগে আমি মহারানি দ্রৌপদীর সেবা করতাম এবং খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া কিছুই গ্রহণ করতাম না।'

রানি সুদেষ্ণা বললেন—'যদি রাজা তোমাকে দেখে মোহগ্রস্ত না হন, তবে আমি তোমাকে মাথায় করে রাখতে পারি। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, রাজা দেখেই তোমাকে চাইবেন।'

দ্রৌপদী বললেন—'মহারানি ! রাজা বিরাট অথবা কোনো পরপুরুষই আমাকে পেতে পারেন না। পাঁচ তরুণ গন্ধর্ব আমার স্বামী, যাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। যিনি উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে দেন না, আমাকে দিয়ে পা ধোওয়ান না, আমার গন্ধর্ব পতিরা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু যদি কেউ আমাকে সাধারণ নারী মনে করে আমার ওপর বলপ্রয়োগ করতে চান, তাঁকে সেই রাতেই প্রাণত্যাগ করতে হয় ; আমার পতিরা তাঁকে বধ করেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তিই আমাকে সদাচার থেকে বিচ্যুত করতে পারেন না।'

সুদেষ্ণা বললেন—'নন্দিনী ! এমন ব্যাপার হলে আমি তোমাকে আমার মহলে রাখব। তোমাকে কারো পা ধুয়ে দিতে হবে না অথবা উচ্ছিষ্ট ছুঁতে হবে না।'

বিরাট রাজার রানি তাঁকে যখন এইভাবে আশ্বস্ত করলেন, তখন পতিব্রতা ধর্মপালনকারী সতী দ্রৌপদী সেখানে থেকে গেলেন ; তাঁকেও কেউ চিনতে পারল না।

—০—

সহদেব, অর্জুন ও নকুলের রাজা বিরাটের ভবনে প্রবেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর একদিন সহদেব গোয়ালার বেশ ধারণ করে তেমনই ভাষা বলতে বলতে রাজা বিরাটের গোশালার কাছে এলেন। সেই তেজস্বী ব্যক্তিকে ডেকে রাজা স্বয়ং তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'তুমি কার লোক, কোথা থেকে এসেছ ? কী কাজ করতে চাও, ঠিক করে বলো।' সহদেব বললেন— 'আমি জাতিতে বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি ; আগে আমি পাণ্ডবদের গো-রক্ষকের কাজ করতাম, কিন্তু এখন জানিনা তাঁরা কোথায় গেছেন। কাজ না করলে জীবিকা

নির্বাহ হবে কীভাবে ? পাণ্ডব ব্যতীত আপনি ছাড়া আর কোনো রাজা আমার পছন্দ নয়, যার কাছে আমি কাজ করতে পারি।'

রাজা বিরাট বললেন—'তুমি কী কাজ করতে পার, কোন শর্তে এখানে কাজ করতে চাও ? এই কাজের জন্য কত বেতন চাও ?'

সহদেব বললেন—'আমি তো বলেছি যে, আমি পাণ্ডবদের গো-রক্ষক ছিলাম। সেখানে আমাকে সবাই 'তন্ত্রিপাল' বলত। চল্লিশ ক্রোশের মধ্যে যত গোরু ছিল, তাদের সমস্ত সংখ্যা আমার স্মরণে থাকত। যে উপায়ে গো-ধন বৃদ্ধি পায়, তাদের কোনো রোগ-ব্যাধি না হয়— আমি সেসব দেখতাম। এছাড়া উত্তম লক্ষণযুক্ত বলদ আমি চিনি, যার মূত্রের ঘ্রাণের দ্বারা বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চার হয়।'

বিরাট বললেন—'আমার কাছে একই গাত্রবর্ণের এক লাখ পশু আছে, তাদের মধ্যে সবগুণের সংমিশ্রণ আছে। আজ থেকে সেই পশুদের এবং তার রক্ষকদের তোমার হাতে সমর্পণ করছি। আমার পশুগুলি এখন থেকে তোমার অধিকারে থাকবে।'

এইভাবে রাজার সঙ্গে পরিচয় করে সহদেব সেখানে সুখে থাকতে লাগলেন, কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। রাজা তাঁর ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা করে দিলেন।

কিছুদিন পর এক অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ দেখা গেল, যিনি নারীদের ন্যায় সুন্দর বস্ত্র-অলংকার পরেছিলেন। তাঁর চলন ছিল হাতির ন্যায় ধীর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। ইনি হলেন বীর অর্জুন। রাজা বিরাটের সভায় পৌঁছে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন—'মহারাজ ! আমি নপুংসক ! আমার নাম বৃহন্নলা, আমি নাচ-গান ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারি। নৃত্য ও সংগীত কলায় আমি পারদর্শী। আপনি উত্তরাকে এই কলা শিক্ষা প্রদানের জন্য আমাকে নিযুক্ত করুন।'

বিরাট বললেন—'বৃহন্নলা ! তোমার ন্যায় ব্যক্তির এই কাজ আমার উচিত বলে মনে হচ্ছে না। তবুও আমি তোমার প্রার্থনা স্বীকার করছি। তুমি আমার কন্যা উত্তরা এবং রাজপরিবারের অন্যান্য কন্যাদের নৃত্যকলা শিক্ষা দেবে।'

এই বলে মৎস্যনরেশ বৃহন্নলার সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের পরীক্ষা নিলেন। তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, এঁকে অন্তঃপুরে রাখা উচিত কিনা। যুবতী কন্যাদের পাঠিয়ে অর্জুনের নপুংসকত্ব যাচাই করালেন। সর্বভাবে যখন অর্জুনের নপুংসকত্ব প্রমাণিত হল তখন তাঁকে অন্তঃপুরে থাকার অনুমতি প্রদান করা হল। সেখানে থেকে অর্জুন উত্তরা এবং তাঁর সখীদের গান-বাজনা ও নৃত্য শিক্ষা দিতে লাগলেন ; ক্রমে তিনি অন্তঃপুরে সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। কপটরূপে তিনি কন্যাদের সঙ্গে থাকলেও নিজের মনকে সর্বদা বশে রাখতেন। তাই বাইরে বা অন্দরমহলে কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি।

তারপরে নকুল অশ্বপালকের বেশ ধারণ করে রাজা বিরাটের কাছে উপস্থিত হলেন এবং রাজভবনের কাছে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে ঘোড়া দেখতে লাগলেন। তারপরে রাজার দরবারে এসে বললেন—'মহারাজ ! আপনার কল্যাণ হোক। আমি অশ্বদের শিক্ষাপ্রদানে নিপুণ, অনেক বড় বড় রাজার কাছে সম্মান পেয়েছি, আমার ইচ্ছা আপনার কাছে থেকে আপনার ঘোড়াদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ করি।'

বিরাট বললেন—'আমি তোমাকে থাকার ঘর এবং অনেক অর্থ দেব। তুমি আমার এখানে থেকে ঘোড়াদের শিক্ষা ও পরিচর্যার কাজ করতে পার। কিন্তু আগে বলো অশ্বসম্বন্ধীয় কোন্ কলায় তোমার বিশেষ জ্ঞান আছে, এবং তোমার পরিচয় প্রদান করো।'

নকুল বললেন—'মহারাজ ! আমি ঘোড়ার জাতি ও স্বভাব চিনতে পারি। তাদের শিক্ষা দিয়ে কর্মপোযোগী করতে পারি। দুষ্ট ঘোড়াকে শিষ্ট করার উপায় আমি জানি। এছাড়াও ঘোড়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার পূর্ণ জ্ঞান আছে।
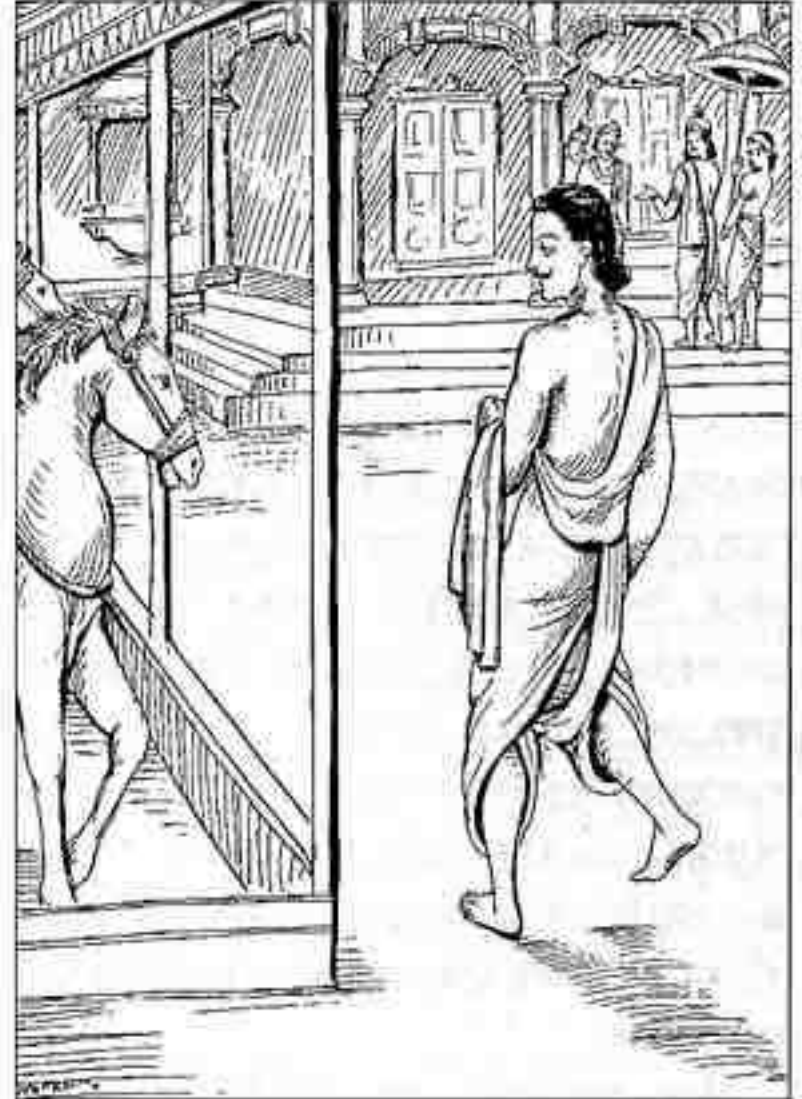
আমার কাছে ঘোড়া কখনো নির্দেশ অমান্য করে না। আমি আগে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে কাজ করতাম। সেখানে তাঁরা আমাকে গ্রন্থিক বলে ডাকতেন।'

বিরাট বললেন—'আমার এখানে যত ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার আছে, তাদের সকলকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। পুরাতন সারথিরাও তোমার অধীনে থাকবে। তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে আজ আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, যেমন খুশি হতাম রাজা যুধিষ্ঠিরের দর্শন পেলে।'

রাজা বিরাটের কাছে এইভাবে সম্মানিত হয়ে নকুল সেখানে থাকতে লাগলেন। নগরে বেড়াবার সময়ও এই সুন্দর যুবককে কেউ চিনতে পারত না। যাঁদের দর্শনমাত্রে পাপ নাশ হয়, সেই আসমুদ্রহিমাচল পৃথিবীর প্রভু পাণ্ডবরা এইভাবে তাঁদের প্রতিজ্ঞা অনুসারে অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ করতে লাগলেন।

—০—

ভীমের হাতে জীমূত নামক মল্ল বধ

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মণ ! পাণ্ডবরা বিরাটনগরে লুকিয়ে থেকে কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজণ ! পাণ্ডবরা বিরাটনগরে লুকিয়ে থেকে রাজা বিরাটকে প্রসন্ন রেখে যেসব কাজ করলেন, তা শোনো। পাণ্ডবদের সর্বদাই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের থেকে ধরা পড়ার আশঙ্কা থেকে গিয়েছিল। সেইজন্য তাঁরা সর্বদাই দ্রৌপদীসহ সতর্কভাবে থাকতেন, যেন মাতৃগর্ভে বাস করছেন। এই ভাবে তিনমাস কেটে গিয়ে চতুর্থমাস আরম্ভ হল। সেই সময় মৎস্যদেশে অত্যন্ত মহাসমরোহে ব্রহ্মমহোৎসব শুরু হল। সব দিক থেকে সমস্ত মল্লবীরেরা সেখানে আসতে লাগল, রাজা তাদের বিশেষভাবে সম্মান জানালেন। সিংহের মতো তাদের কাঁধ, গ্রীবা এবং কোমর, গৌরবর্ণ দেহ। রাজার মল্লের আখড়াতে তারা বহুবার বিজয় লাভ করেছিল।

এইসব মল্লবীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল জীমূত। সে মল্লভূমিতে নেমে একে একে সবাইকে ডাকলেও, তার গর্জন এবং কসরৎ দেখে কেউই তার কাছে যুদ্ধের জন্য যেতে সাহস করল না। সব মল্লবীর উৎসাহহীন হয়ে পড়লে মৎস্যনরেশ তাঁর পাচক বল্লবকে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে আহ্বান করলেন। রাজার সম্মান রক্ষার্থে বল্লব নামধারী ভীম সিংহের ন্যায় বীরপদে রণভূমিতে প্রবেশ করলেন। তাঁকে প্রস্তুত হতে দেখে জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল। ভীমসেন প্রস্তুত হয়ে বৃত্রাসুরের ন্যায় পরাক্রমশালী জীমূতকে মল্লে আহ্বান করলেন। দুজনেই ভীষণ পরাক্রমী এবং হাতির ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট। দুজনে ঘোর গর্জনে কুস্তি আরম্ভ করলেন। পরস্পরের আঘাতে ভীষণ শব্দ হতে লাগল। কখনো একজন অপরকে মাটিতে ফেলে দেন, তখন অপরজন নীচে থেকেই পায়ের আঘাতে তাঁকে দূরে নিক্ষেপ করেন। দুজনই দুজনকে বলপূর্বক হারাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। বাহুবল, প্রাণবল এবং দেহবলের দ্বারাই সেই বীরদের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল, কেউই কোনো অস্ত্র নেননি।

তারপর সিংহ যেমন হাতিকে ধরে, সেইভাবে ভীম জীমূতকে দুই বাহু ধরে মাথার ওপরে তুলে ঘোরাতে আরম্ভ করলেন, তাঁর এই পরাক্রম দেখে সমস্ত মল্লবীর, মৎস্য দেশের জনতা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হল। ভীম তাকে বহুবার
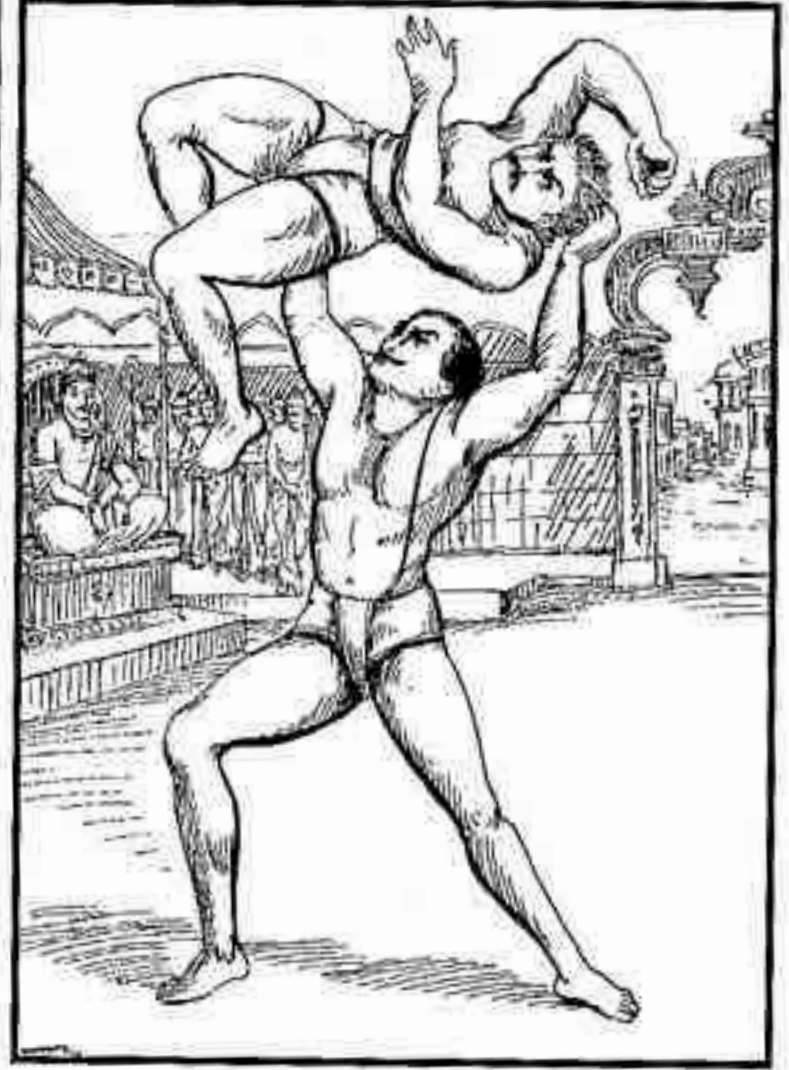
ঘোরালেন যাতে সে অচেতন হয়ে যায়, তারপর তাকে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। ভীমের হাতে সেই জগৎপ্রসিদ্ধ মল্লবীর জীমূত মারা পড়ায় রাজা বিরাট অত্যন্ত খুশি হলেন।

সেই মল্লভূমিতে ভীম আরও অনেক মল্লবীরকে মেরে রাজা বিরাটের স্নেহভাজন হলেন। অর্জুনও তাঁর নৃত্য-গীত বিদ্যার দ্বারা অন্তঃপুরের নারীদের ও রাজাকে প্রসন্ন করেছিলেন। নকুলও এইভাবে তাঁর শিক্ষার সাহায্যে ঘোড়ার নানাপ্রকার শিক্ষাকর্ম দেখাতেন এবং সহদেবের গোধন রক্ষা ও বৃদ্ধি করার প্রয়াস দেখে মৎস্য নরেশ বিরাট অত্যন্ত প্রসন্ন থাকতেন। এইভাবে সকল পাণ্ডবই বিরাট রাজের কাছে থেকে তাঁদের কাজ সম্পাদন করতেন।

—o—

কীচকের দ্রৌপদীর প্রতি আসক্তি এবং দ্রৌপদীকে অপমান

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইভাবে পাণ্ডবদের মৎস্যনরেশের রাজধানীতে দশমাস কেটে গেল। যজ্ঞসেনী দ্রৌপদী, যিনি স্বয়ং রানির মতো সেবা পাবার যোগ্য, তিনি রানি সুদেষ্ণার সেবা করে বড় কষ্টে দিন যাপন করছিলেন। একদিন রাজা বিরাটের সেনাপতি কীচকের দৃষ্টি দ্রৌপদীর ওপর পড়ল, যিনি রাজমহলে দেবকন্যার ন্যায় প্রতীত হচ্ছিলেন। কীচক ছিলেন মৎস্যনরেশের শ্যালক। তিনি সৈরন্ধ্রীকে দেখেই কামমোহিত হলেন। তিনি তাঁর ভগ্নী রানি সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে হেসে বললেন—'সুদেষ্ণা ! এই

সুন্দরী, যে তাঁর রূপে আমাকে উন্মত্ত করেছে, আগে তো তাঁকে কখনো এই মহলে দেখিনি ! ইনি কে ? কার স্ত্রী ? কোথা থেকে আসছেন ? ইনি আমার হৃদয় হরণ করেছেন, এখন ওঁকে না পেলে আমি হৃদয়ে শান্তিলাভ করব না। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, ইনি তোমার কাছে দাসীর কাজ করছেন, এই কাজ এঁর যোগ্য নয়। আমি এঁকে আমার সর্বস্বের অধিকারিণী করতে চাই।'

রানি সুদেষ্ণাকে এইসব কথা বলে কীচক রাজবধূ দ্রৌপদীর কাছে এসে বললেন—'কল্যাণী ! তুমি কে ? কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ ? তোমার এই সুন্দর রূপ দিব্য দেহ এবং সৌকুমার্য জগতে সব থেকে বড় সম্পদ। তোমার উজ্জ্বল মুখ এবং কমনীয় কান্তি চন্দ্রকেও লজ্জিত করছে। তোমার ন্যায় মনোহারিণী নারী আমি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে দেখিনি। তুমি কমলবন বিহারিণী দেবী লক্ষ্মী নয় তো ? এই স্থান তোমার উপযুক্ত নয়। আমি তোমাকে পৃথিবীর সর্বোত্তম সুখ প্রদান করতে চাই, তুমি তা স্বীকার করো। নচেৎ তোমার এই রূপ ও সৌন্দর্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরী ! যদি তুমি অনুমতি দাও তাহলে আমি আমার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করব অথবা তোমার দাসী করে রাখব, আমি নিজেও তোমার সেবক হয়ে তোমার অধীন থাকব।'

দ্রৌপদী বললেন—'আমি পরস্ত্রী, আমাকে এমন কথা বলা উচিত নয়। জগতের সকল প্রাণীই তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, তুমিও তাই করো। অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। সৎপুরুষদের নিয়ম হল, তাঁরা অনুচিত কর্ম সর্বদা ত্যাগ করেন।'

সৈরন্ধ্রীর কথা শুনে কীচক বললেন—'সুন্দরী ! তুমি আমার প্রার্থনা এইভাবে ফিরিয়ে দিও না, তোমার জন্য আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি ; আমাকে অস্বীকার করলে তুমি অনুতাপ করবে। এই সম্পূর্ণ রাজ্য আমার শাসনাধীন, শারীরিক বলেও কেউ আমার সমকক্ষ নয়। আমি সমস্ত রাজ্য তোমাকে সমর্পণ করব। তুমি আমার পাটরানি হয়ে আমার সঙ্গে সর্বোত্তম সুখ ভোগ করো।'

সৈরন্ধ্রী বললেন—'সূতপুত্র ! তুমি এইভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে জীবন হারিয়ো না। মনে রেখো আমার পাঁচ গন্ধর্ব পতি বড় ভয়ানক, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। সুতরাং এই কুৎসিত চিন্তা দূর করো, নাহলে আমার স্বামীরা ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে বধ করবেন। কেন নিজের সর্বনাশ করতে চাও ? কীচক ! আমার ওপর কুদৃষ্টি দিয়ে তুমি আকাশ, পাতাল বা সমুদ্রের তলাতেও যদি লুকিয়ে থাক তবুও আমার দেবতুল্য পতিদের কাছ থেকে তুমি জীবিত ফিরতে পারবে না। কোনো রোগী যেমন কষ্ট পেয়ে মৃত্যুকে ডাকে, তেমনই তুমিও কালরাত্রির মতো কেন আমাকে প্রার্থনা করছ ?'

রাজকুমারী দ্রৌপদী কীচককে ফিরিয়ে দিলে তিনি কামসন্তপ্ত হয়ে সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বললেন—'ভগ্নী ! এমন কোনো উপায় করো যাতে সৈরন্ধ্রী আমাকে স্বীকার করে। তা যদি না হয় আমি তাহলে প্রাণত্যাগ করব।' কীচকের এইরূপ বিলাপ শুনে রানি বললেন—'ভাই ! আমি সৈরন্ধ্রীকে একান্তে তোমার কাছে পাঠাব, তুমি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাবে।' ভগ্নীর কথা মেনে নিয়ে কীচক চলে গেলেন। এক উৎসবের দিনে কীচক তাঁর গৃহে নানা খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করেন এবং সুদেষ্ণাকে সেখানে আমন্ত্রণ করেন। সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীকে ডেকে বললেন কীচকের গৃহ থেকে কিছু পানীয় তাঁর জন্য নিয়ে আসতে।

সৈরন্ধ্রী বললেন—'রানি ! আমি ওঁর ঘরে যাব না। আপনি তো জানেন, তিনি কেমন, আমি এখানে ব্যাভিচারিণী হয়ে থাকব না। আমি এখানে থাকার সময়ই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণে আছে। তাহলে আমাকে কেন পাঠাচ্ছেন ? মূর্খ কীচক কামপীড়িত হয়ে রয়েছে, আমাকে দেখলেই তিনি অপমান করবেন। আপনার কাছে তো অনেক দাস-দাসী আছে, তাদের মধ্যে কাউকে পাঠিয়ে দিন। আমি অপমানের ভয়ে সেখানে যেতে চাই না।'

সুদেষ্ণা বললেন—'আমি তোমাকে এখান থেকে পাঠাচ্ছি, সুতরাং সে কখনো তোমাকে অপমান করবে না।'

এই বলে তিনি তাঁর হাতে সোনার ঢাকনিসহ একটি স্বর্ণপাত্র দিলেন। দ্রৌপদী সেটি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কীচকের গৃহে চললেন। তিনি তাঁর সতীত্ব রক্ষার জন্য মনে মনে সূর্যকে ডাকতে লাগলেন। সূর্য তাঁকে রক্ষার জন্য গুপ্তভাবে এক রাক্ষসকে পাঠিয়ে দিলেন, যে সর্বভাবে তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগল।

দ্রৌপদী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হরিণীর ন্যায় কম্পিত কলেবরে সেখানে গেলেন। তাঁকে দেখে কীচক আনন্দে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'সুন্দরী, স্বাগত ! আমার আজকের রাত্রি প্রভাত অত্যন্ত মঙ্গলময় হবে। আমার রানি, তুমি আমার গৃহে এসেছ, এবার আমার প্রিয় কাজ করো।' দ্রৌপদী বললেন—'আমাকে রানি সুদেষ্ণা এখানে পাঠিয়েছেন তোমার কাছ থেকে পানীয় নেওয়ার জন্য, তিনি অত্যন্ত পিপাসার্ত।' কীচক বললেন—'কল্যাণী ! তিনি যা চেয়েছেন অন্য দাসী তা নিয়ে যাবে।' এই বলে তিনি দ্রৌপদীর দক্ষিণ হাত ধরলেন। দ্রৌপদী বললেন—'পাপী ! আমি যদি আজ পর্যন্ত মনে মনেও কখনো পতির বিরুদ্ধাচরণ না করে থাকি, তাহলে সেই সত্যের প্রভাবে দেখব যে, তুমি শত্রুর হাতে পরাজিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছ।'

এইভাবে কীচককে অপমান করতে করতে দ্রৌপদী পিছু হটছিলেন এবং কীচকও এগিয়ে আসছিলেন। তিনি তাঁকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই কীচক তাঁর শাড়ির আঁচল ধরে ফেললেন, তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বশ করতে চেষ্টা করছিলেন। দ্রৌপদী খুব জোরে কীচককে এক ধাক্কা মারতেই কীচক কাটা গাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন।

সেই অবসরে দ্রৌপদী কম্পিত কলেবরে রাজসভায় চলে এলেন। কীচকও উঠে তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর চুল ধরলেন। তারপর রাজার সামনেই তাঁকে মাটিতে ফেলে লাথি মারলেন। এর মধ্যে সূর্যদেব দ্বারা নিযুক্ত রাক্ষস কীচককে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, কীচক নিশ্চেষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে রইলেন।

সেইসময় রাজসভায় যুধিষ্ঠির এবং ভীম উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা দুজনে দ্রৌপদীর এই অপমান প্রত্যক্ষ করলেন। এই অন্যায় তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না, তাঁরা অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। ভীম দুরাত্মা কীচককে বধ করার ইচ্ছায় ক্রোধে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলেন। তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন যুধিষ্ঠির গুপ্ত রহস্য প্রকটিত হওয়ার ভয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে বাধা দিলেন।

দ্রৌপদী মৎস্যরাজের সভাদ্বারে এসে বললেন—'আমার পতিরা সমস্ত জগত ধ্বংস করার শক্তি রাখেন, কিন্তু তাঁরা ধর্মপাশে বাঁধা আছেন। আমি তাঁদের সম্মানিত ধর্মপত্নী, তা সত্ত্বেও একজন সূতপুত্র আমাকে পদাঘাত করেছে। হায় ! যাঁরা শরণার্থীদের সাহায্য করেন, আজ তাঁরা এই জগতে অজ্ঞাতভাবে রয়েছেন, আমার সেই মহারথী বীর

পতিরা কোথায় ? অত্যন্ত বলবান এবং তেজস্বী হয়েও তাঁরা তাঁদের প্রিয়তমা পত্নীকে এক সূতের দ্বারা অপমানিত হতে দেখেও কাপুরুষের মতো বরদাস্ত করছেন কী করে ? এখানকার রাজা বিরাটও ধর্মদূষণকারী। এক নিরপরাধা নারীকে তিনি তাঁর সামনে মার খেতে দেখেও সহ্য করছেন। ইনি রাজা হয়েও রাজোচিত ন্যায় করছেন না। মৎস্যরাজ ! আপনার এই চোরের মতো ধর্ম রাজসভাতে শোভা পায় না। আপনার কাছে এসেও কীচকের হাতে যে ব্যবহার আমি পেয়েছি, তা কখনো উচিত নয়। সভাসদরা এর বিচার করুন। কীচক নিজে তো পাপীই, এই মৎস্যনরেশেরও ধর্মজ্ঞান নেই। এই সভাসদরাও ধর্মকে জানে না, তাই তো এরা এরূপ অধার্মিক রাজার সেবা করছে।'

দ্রৌপদী এইভাবে ক্রন্দন করে বিরাটরাজাকে সব জানালেন। সভাসদরা তাঁকে কলহের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁদেরও সব বৃত্তান্ত জানালেন। সব সভাসদরাই তখন তাঁর সৎ সাহসের প্রশংসা করে কীচককে ধিক্কার জানিয়ে বলল—'যিনি এই সাধ্বীর পতি, তিনি জীবনে অনেক ভালো কিছু পেয়েছেন। মানুষের মধ্যে এরূপ স্ত্রী-রত্ন পাওয়া কঠিন। ইনি মানবী নন, দেবী বলেই আমরা মনে করি।'

সভাসদরা যখন দ্রৌপদীর প্রশংসা করছিল তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—'সৈরন্ধ্রী ! তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, রানি সুদেষ্ণার মহলে যাও। তোমার গন্ধর্ব পতির এখন অবকাশ নেই সেজন্য আসতে পারছেন না। তিনি অবশ্যই এসে যে তোমাকে এই কষ্ট দিয়েছে তার সমুচিত ব্যবস্থা করবেন।'

দ্রৌপদী চলে গেলেন, তাঁর চোখ লাল, খোলা চুল। তাঁকে কাঁদতে দেখে রানি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কল্যাণী, তোমাকে কে মেরেছে ? কাঁদছ কেন ? কে এমন অপ্রিয় কাজ করেছে ?' দ্রৌপদী বললেন—'আজ রাজদরবারে রাজার সামনেই কীচক আমাকে মেরেছে।' সুদেষ্ণা বললেন—'সুন্দরী ! কীচক কামোন্মত্ত হয়ে বারংবার তোমাকে অপমান করছে। তুমি যদি বল আমি আজই ওকে মৃত্যুদণ্ড দিই।' দ্রৌপদী বললেন—'ও যাঁদের কাছে অপরাধ করেছে, তাঁরাই ওকে বধ করবেন। এবারে সে অবশ্যই যমলোকে যাত্রা করবে।'

—o—

দ্রৌপদী এবং ভীমসেনের গোপন আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—সেনাপতি কীচক যখন দ্রৌপদীকে পদাঘাত করেছিলেন, তখন থেকেই যশস্বিনী রাজকুমারী দ্রৌপদী তাঁকে বধ করার কথা চিন্তা করছিলেন। সেই কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি ভীমের কথা স্মরণ করে রাত্রে শয্যাত্যাগ করে তাঁর ভবনে গেলেন। সেই সময় অপমানে তিনি অত্যন্ত কাতর ছিলেন। পাকশালায় প্রবেশ করে তিনি বললেন—'ভীমসেন! ওঠো, ওঠো, আমার শত্রু মহাপাপী সেনাপতি আমাকে পদাঘাত করে এখনও জীবিত রয়েছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এইখানে কেমন করে নিদ্রারত?'

দ্রৌপদীর ডাকে ভীম পালঙ্কের ওপর উঠে বসে তাঁকে বললেন—'প্রিয়ে! এমন কী প্রয়োজন হল, যার জন্য তুমি

উতলা হয়ে আমার কাছে চলে এসেছ? তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, তুমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে রয়েছ, কী হল? সব কথা খুলে বলো।'

দ্রৌপদী বললেন—'আমার দুঃখ কি তুমি জানো না? সেইদিনের কথা কি ভুলে গেছ যেদিন প্রাতিকামী আমাকে 'দাসী' বলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল? সেই অপমানের আগুনে আমি সর্বদা জ্বলে যাচ্ছি। জগতে আমার মতো এমন কোনো রাজকন্যা আছে যে, এত দুঃখভোগ করেও বেঁচে আছে? বনবাসের সময় যে দুরাত্মা জয়দ্রথ আমাকে স্পর্শ করেছিল, তা আমার কাছে অসম্মানজনক ছিল, তাও আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। এবার আবার এখানে বিরাট রাজার সামনে কীচক আমাকে অপমান করেছে। এইভাবে বারংবার অপমান সহ্য করে কোনো নারী জীবনধারণ করতে পারে? এরূপে নানাভাবে অপমানিত হচ্ছি আর তুমি এসবের কথা একবারও ভাবছ না! এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ? এখানে কীচক নামে এক সেনাপতি আছে, যে রাজা বিরাটের শ্যালক, সে অত্যন্ত পাপী। প্রতিদিন সে আমাকে তার স্ত্রী হওয়ার জন্য বলে। রোজ একই কথা শুনতে শুনতে আমার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জীবিকার জন্য অন্য রাজার সেবা করতে দেখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। পাকশালায় রান্না করার পর যখন তুমি বিরাটের জন্য খাবার নিয়ে উপস্থিত হও, তখন আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করি। তরুণ বীর অর্জুন, যে একাই দেবতা ও মানুষকে পরাজিত করতে সক্ষম, ধর্মে, বীরত্বে, সত্যবাদিতায় সকলের আদর্শস্বরূপ, সে নারীর বেশে বিরাটের অন্তঃপুরে নৃত্য-গীত শেখাচ্ছে, তাঁর জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা হচ্ছে। সহদেবকে যখন গোয়ালার বেশে গোশালাতে দেখি, আমার রক্ত হিম হয়ে যায়। আমার মনে পড়ে, বনে আসার সময় মাতা কুন্তী আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—'পাঞ্চালী! সহদেব আমার অত্যন্ত প্রিয়, মধুরভাষী, ধর্মাত্মা এবং সব ভাইয়ের প্রিয়; কিন্তু বড়ই লাজুক, তুমি নিজ হাতে একে খাবার খাওয়াবে, যেন বনে গিয়ে ও কোনো কষ্ট না পায়, এই বলে তিনি সহদেবকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আজ সেই সহদেব রাতদিন গোসেবাতে ব্যস্ত, রাত্রে সেই গোশালার একপ্রান্তে শুয়ে থাকে। এইসব দুঃখ দেখে আমি কী করে বেঁচে থাকব? গ্রহের ফের! অপূর্ব সুন্দর চেহারা, অস্ত্র-বিদ্যা এবং মেধাসম্পন্ন নকুল—আজ রাজা বিরাটের অশ্বশালায় অশ্বসেবায় নিযুক্ত। এগুলি দেখে আমি কি সুখে থাকতে পারি? রাজা যুধিষ্ঠিরের জুয়ার নেশার জন্য আজ আমাকে সৈরিন্ধ্রীর বেশে রানি সুদেষ্ণার সেবা করতে হচ্ছে। পাণ্ডবদের মহারানি এবং দ্রুপদ রাজকুমারী হয়েও আজ আমার এই দশা। আমার এই ক্লেশে কৌরব, পাণ্ডব এবং পাঞ্চালবংশেরও কত অপমান হচ্ছে। একদিন আসমুদ্রের

রাজত্ব যাদের অধীন ছিল, আজ তাদের রানি দ্রৌপদী সুদেষ্ণার সেবা করছে। দুঃখ আরও এইজন্য যে, আগে মাতা কুন্তী ব্যতীত কারো জন্য আমি চন্দন ঘষার কাজ করিনি। আজ রাজার জন্য চন্দন ঘষতে হয়, দেখো, আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে, আগে এমন ছিল না।'

দ্রৌপদী এই বলে ভীমসেনকে তাঁর হাত দেখালেন, তারপর বললেন—'না জানি দেবতাদের কাছে আমি কী অপরাধ করেছি! আমার মৃত্যুও কেন আসে না !' ভীম তাঁর কোমল হাতটি ধরে দেখলেন, সত্যি তাঁর হাতে কালো কালো দাগ পড়েছে। ভীম অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন—'কৃষ্ণা ! আমার বাহুবলকে ধিক্কার দিই। গাণ্ডীব ধনুকধারী অর্জুনকেও ধিক্কার জানাই। আমি সেই দিনই সভায় বিরাটের সর্বনাশ করতাম অথবা ঐশ্বর্য মদমত্ত কীচকের মাথা গুঁড়িয়ে ফেলতাম ; কিন্তু ধর্মরাজ বাধা প্রদান করায় আমি তা করতে পারিনি। ওইভাবে রাজ্যচ্যুত হওয়ার পরেও যে আমি কৌরবদের বধ করিনি, দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনের মাথা কেটে নিইনি—তার জন্য আজও আমার শরীর ক্রোধে জ্বলে যায়। সেই ভুল আজও আমার হৃদয়ে কাঁটার মতো বেঁধে। সুন্দরী ! তুমি তোমার ধর্মত্যাগ কোরো না, তুমি বুদ্ধিমতী, ক্রোধ দমন করো। পূর্বকালেও অনেক নারী তাদের পতির সঙ্গে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন। ভৃগুবংশীয় চ্যবনমুনি যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর দেহে উইপোকার বাসা হয়েছিল। তাঁর পত্নী রাজকুমারী সুকন্যা, তাঁর অত্যন্ত সেবা করেন। রাজা জনকের কন্যা সীতার কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ ; তিনি ভয়ানক জঙ্গলে শ্রীরামের সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। একদিন রাক্ষস অপহরণ করে তাঁকে লঙ্কায় নিয়ে যায় এবং সেখানে তাঁকে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। তবুও তিনি শ্রীরামের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অবশেষে শ্রীরাম তাঁকে উদ্ধার করেন। লোপামুদ্রাও এইভাবে জাগতিক সুখ পরিত্যাগ করে অগস্ত্য মুনিকে অনুগমন করেন। সাবিত্রী তাঁর পতি সত্যবানকে অনুসরণ করে যমলোকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এইসব রূপবতী পতিব্রতা নারীদের মহত্ত্ব যেমন বলা হয়, তুমিও তাঁদেরই মতো ; তোমার মধ্যেও সমস্ত সদ্‌গুণ বর্তমান। কল্যাণী, আর বেশি দিন তোমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে না, আর মাত্র দেড়মাস বাকি একবৎসর পূর্ণ হতে। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হলেই তুমি রাজরানি হবে।'

দ্রৌপদী বললেন—"স্বামী ! অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, তাই আমার চোখে জল এসেছে। এখন যে কাজ করতে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হও। পাপী কীচক সর্বদা আমার পিছনে আসে। একদিন আমি ওকে বলেছি—'কীচক ! কামমোহিত হয়ে মৃত্যুকে ডেকে আনছ, আমি পাঁচ গন্ধর্বের রানি, তাঁরা অত্যন্ত বীর এবং সাহসী। তাঁরা তোমাকে অবশ্যই প্রাণদণ্ড দেবেন।' আমার কথা শুনে সেই দুষ্ট বলল—'সৈরন্ধ্রী, আমি গন্ধর্বদের একটুও ভয় পাই না। যুদ্ধে এক লাখ গন্ধর্ব এলেও আমি তাদের বধ করব। তুমি আমাকে স্বীকার করো।'

তারপর কীচক রানি সুদেষ্ণার সঙ্গে পরামর্শ করে। সুদেষ্ণা ভ্রাতার প্রতি স্নেহবশত আমাকে বলে—'কল্যাণী ! তুমি কীচকের গৃহ থেকে আমার জন্য পানীয় নিয়ে এসো।' আমি গেলে, সে আমাকে তার কথা মেনে নেওয়ার জন্য বলে। কিন্তু আমি যখন তার কথা অগ্রাহ্য করি, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সতীত্ব নাশ করার চেষ্টা করে। সেই দুষ্টের মনোভাব বুঝতে পেরে আমি রাজার শরণ নিতে দৌড়ে তাঁর কাছে যাই। সেখানে পৌঁছেও সে আমাকে রাজার সামনেই মাটিতে ফেলে লাথি মারে। কীচক রাজার সেনাপতি, তাই রাজারানি দুজনেই তার কথা শোনেন। প্রজারা যতই কাঁদুক, দুঃখ করুক, সে তাদের ধন লুট করে নেয়। সদাচার এবং ধর্মপথে সে কখনো চলে না। আমার প্রতি তার ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ, আমাকে দেখলেই সে কুপ্রস্তাব করবে। সুতরাং আমি আজ প্রাণত্যাগ করব। বনবাসের সময় পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি তুমি চুপ করে থাক, তাহলে আমাকে হারাতে হবে। ক্ষত্রিয়ের সব থেকে বড় ধর্ম শত্রুনাশ করা। কিন্তু ধর্মরাজ এবং তোমার সামনে কীচক আমাকে পদাঘাত করে আর তোমরা চুপ করে থাক। তুমি জটাসুরের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছ, জয়দ্রথের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে এনেছ। এবার এই পাপীকে বধ করো। যদি সে কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে আমি বিষপান করব। ভীমসেন ! এই কীচকের হাতে যাওয়ার থেকে আমি তোমার সামনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয় বলে মনে করি।"

দ্রৌপদী এই কথা বলে ভীমের বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। ভীম তাঁকে হৃদয়ে ধরে আশ্বাস দিলেন এবং তাঁর চোখের জল মুছিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন— 'কল্যাণী ! তুমি যেমন বলবে, তাই করব ; আজই কীচককে তার বন্ধুসহ বধ করব। তুমি নিজের দুঃখ

ও শোক দূর করো, কাল সন্ধ্যায় তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সংকেত দাও। রাজা বিরাট যে নতুন নৃত্যশালা নির্মাণ করেছেন, তাতে দিবসকালে নৃত্যগীত শিক্ষা হয়, রাত্রে সেটি ফাঁকা থাকে। সেখানে খাট-বিছানা সবই আছে। তুমি এমন করো যাতে সে ওখানে আসে, আমি সেখানেই তাকে যমপুরীতে পাঠাব।'

এইসব কথাবার্তা বলে দুজনে বাকি রাত অত্যন্ত দুঃখে কাটালেন, উগ্র সংকল্প মনে মনেই রাখলেন। সকাল হতেই কীচক পুনরায় রাজমহলে এসে দ্রৌপদীকে বললেন—'সৈরন্ধ্রী ! সভায় রাজার সামনে তোমাকে যে লাথি মেরেছিলাম, তার প্রভাব দেখেছ ? এখন তুমি আমার মতো বীরের হাতে পড়েছ, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। বিরাট তো শুধু নামেই মৎস্যদেশের রাজা, সেনাপতি হওয়ায় আমি এখানকার প্রভু। তাই ভালোয় ভালোয় আমাকে স্বীকার করে নাও, তাতেই তোমার মঙ্গল।'

দ্রৌপদী বললেন—'কীচক ! যদি তাই হয়, তাহলে আমার এক শর্ত আছে। আমাদের দুজনের মিলনের কথা তোমার কোনো ভাই বা বন্ধু যেন জানতে না পারে।'

কীচক বললেন—'সুন্দরী, তুমি যা বলছ তাই করব।'

দ্রৌপদী বললেন—'রাজা যে নৃত্যশালা তৈরি করেছেন, সেটি রাত্রে খালি থাকে ; অন্ধকার হলে তুমি ওইখানে চলে আসবে।'

কীচকের সঙ্গে কথা বলতে দ্রৌপদীর অত্যন্ত ঘৃণা হচ্ছিল। কীচক তাঁর কথায় আনন্দে মত্ত হয়ে গৃহে ফিরে গেলেন, তিনি জানতেও পারলেন না যে, সৈরন্ধ্রীরূপে মৃত্যু তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে।

পাকশালায় গিয়ে দ্রৌপদী ভীমসেনকে জানালেন—'পরন্তপ ! তোমার কথা অনুযায়ী আমি কীচককে নৃত্যশালায় যেতে বলেছি। সে রাত্রে ওখানে আসবে, আজই তুমি তাকে অবশ্যই বধ করবে।' ভীম বললেন—'আমি ধর্ম, সত্য এবং ভাইদের নামে শপথ করে বলছি, ইন্দ্র যেভাবে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, আমিও সেইভাবে কীচককে বধ করব। মৎস্যদেশের লোকজন তাকে সাহায্য করতে এলে, তাদেরও বধ করব ; তারপর দুর্যোধনকে বধ করে পৃথিবীর অধিপতি হব।'

দ্রৌপদী বললেন—'স্বামী ! আমার জন্য তুমি সত্য পরিত্যাগ করো না ; তুমি অজ্ঞাত থেকেই কীচককে বধ করো।'

ভীমসেন বললেন—'তুমি যা বলছ, তাই করব ; আজ কীচককে সবান্ধবে বধ করব।'

—o—

কীচক এবং তার ভাইদের প্রাণসংহার এবং সৈরন্ধ্রীকে রাজার সন্দেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর ভীমসেন রাত্রে নৃত্যশালায় গিয়ে লুকিয়ে রইলেন এবং সিংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষা করে, সেইভাবে কীচকের জন্য প্রতীক্ষায় রইলেন। পাঞ্চালীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় কীচকও মনের মতো সাজসজ্জা করে নৃত্যশালায় এলেন। সেইসময় নৃত্যশালা অন্ধকার ছিল, পরাক্রমী বীর ভীম আগে থেকেই সেখানে এক শয্যায় শুয়ে ছিলেন। দুর্মতি কীচক সেখানে পৌঁছে তাঁকে দ্রৌপদী মনে করে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে উদ্যত হলেন। দ্রৌপদীকে অপমান করায় ভীম তখন কীচকের ওপর ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়েছিলেন। কামমোহিত কীচক তাঁর কাছে পৌঁছে হর্ষে উন্মত্তচিত্ত হয়ে হেসে বললেন—'সৈরন্ধ্রী, আমি নানাভাবে যত ধন সঞ্চিত করেছি, সেসব তোমাকে উপহার দিচ্ছি। এছাড়া ধন-রত্নাদি ও দাস-দাসী পরিবৃত আমার যে রমণীয়, সুশোভিত ভবন আছে, তাও আমি তোমাকে সমর্পণ করছি। আমার

অন্তঃপুরের নারীরাও আজ আমার বেশভূষার এবং আমার রূপের প্রশংসা করেছে।'

ভীম বললেন—'আপনি যে দর্শনীয়—এ বড় আনন্দের কথা, কিন্তু আপনি এরূপ স্পর্শ আগে কখনো পাননি।'

এই বলে মহাবাহু ভীম সহসা উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন—'ওরে পাপী ! তুই পর্বতের ন্যায় বিশাল দেহসম্পন্ন ; কিন্তু সিংহ যেমন বিশাল গজরাজকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনই আজ আমি তোকে মাটিতে ফেলে পিষব, তোর ভগ্নী এইসব দেখবে। তুই এই পৃথিবী ত্যাগ করে গেলে সৈরন্ধ্রী বিনা বাধায় বিচরণ করতে পারবে আর ওর পতিরাও নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।' তারপর মহাবলী ভীম তার চুল টেনে ধরলেন। কীচকও অত্যন্ত বলবান ছিলেন, তিনি তাঁর চুল ছাড়িয়ে অত্যন্ত তেজে ভীমের দুই হাত ধরলেন। তারপর ক্রুদ্ধ দুই পুরুষসিংহ পরস্পর বাহুযুদ্ধে রত হলেন। দুজনেই বড় বীর ছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন গাছগুলি উৎপাটিত হয়, ভীম তেমনই কীচককে ধাক্কা দিয়ে নৃত্যশালাতে ঘোরাতে লাগলেন। মহাবলী কীচকও তাঁর হাঁটুর আঘাতে ভীমকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুজনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। শেষে ভীম তাঁর চুলের মুঠি ধরে নিজের হাতের মধ্যে এমন চেপে ধরলেন, যেন পশুকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। কীচক সেই বন্ধন মুক্ত করার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু ভীম তাঁকে দুই হাতে ধরে মাটিতে আছাড় মারতে লাগলেন। তারপর মাটিতে ফেলে দুই হাঁটু দিয়ে তাঁর পিঠে চেপে বসলেন। কীচকের দুই চোখ বেরিয়ে এল, তখন ভীম তাঁর হাতের চাপে কীচককে অবলীলাক্রমে মেরে ফেললেন।

কীচককে বধ করে ভীমসেন তার হাত পা ভেঙে শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর দ্রৌপদীকে ডেকে বললেন—'দ্রৌপদী ! এদিকে এসে, দেখো, এই দুষ্ট কীটের কী অবস্থা করেছি !' তারপর সেই মৃতদেহকে পদাঘাত করে বললেন—'যে তোমার ওপর কুদৃষ্টি দেবে, তার এমনই দশা হবে।' তারপর ক্রোধ শান্ত হলে তিনি পাকশালাতে ফিরে গেলেন।

কীচক বধ হওয়াতে দ্রৌপদী অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তাঁর সব দুঃখ দূর হল। তারপর তিনি নৃত্যশালার সংরক্ষককে বললেন—'দেখো, এখানে কীচকের দেহ পড়ে রয়েছে, আমার গন্ধর্ব পতিগণ তার এই অবস্থা করেছে।' দ্রৌপদীর কথা শুনে সব চৌকিদার মশাল নিয়ে ছুটে এল এবং কীচককে রক্তাপ্লুত ও মৃত অবস্থায় দেখল। তাঁর সেই মৃত চেহারা দেখে সকলেই বিস্মিত ও ব্যথিত হল।

কীচকের সকল ভাই-বন্ধু সেখানে এসে তাঁর এই অবস্থা দেখে শোক করতে লাগল, কীচকের দশা দেখে
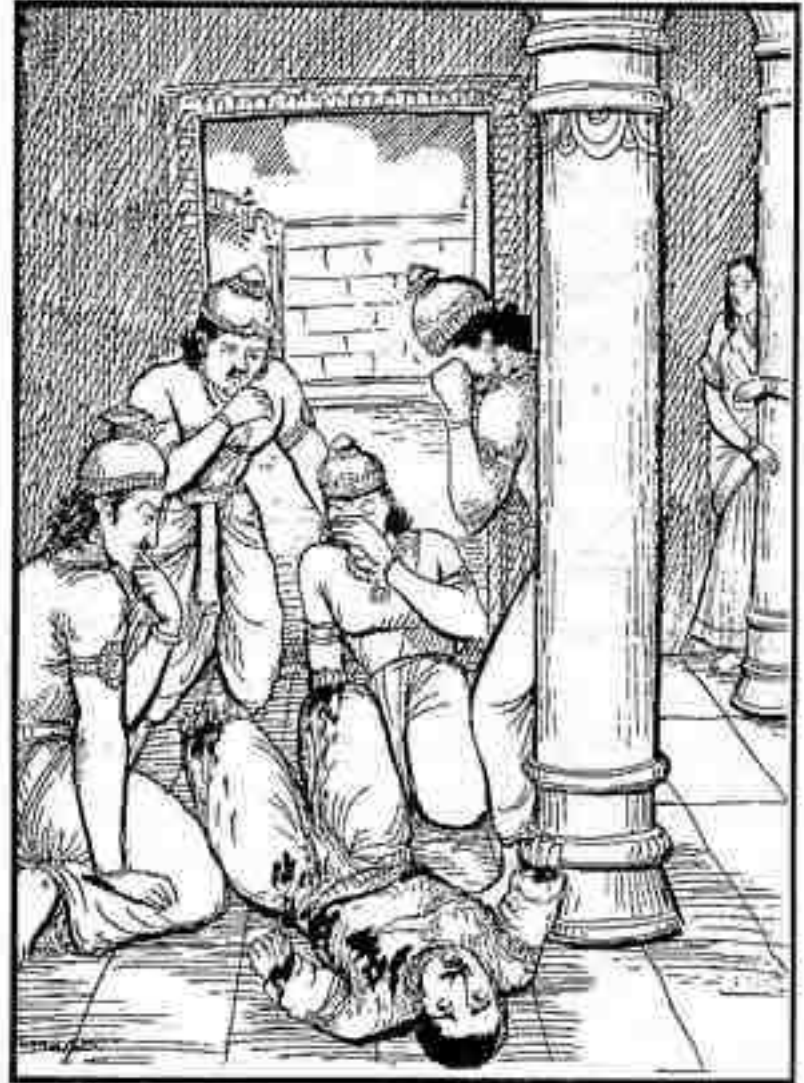
সকলেই ভয়ে কাঁপতে লাগল, তাঁর সারা অঙ্গ শরীরের মধ্যে ঢোকানো থাকায় সেটি কচ্ছপের আকার ধারণ করেছিল। কীচকের বন্ধু এবং আত্মীয়রা তাঁর দাহ-সংস্কারের জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তাদের দৃষ্টি দ্রৌপদীর ওপর পড়ল। কীচকের ভাইরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল—'এই দুষ্টা নারীকে এখনই মেরে ফেলা উচিত, ওর জন্যই কীচক মারা গেছে। একে কীচকের সঙ্গেই দাহ করা হোক, তাতে মৃত কীচকের আত্মা শান্তি পাবে।' তারা তখন রাজা বিরাটের কাছে গিয়ে বলল—'কীচকের মৃত্যু সৈরন্ধ্রীর জন্যই হয়েছে, তাই আমরা কীচকের সঙ্গেই ওকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই, আপনি অনুমতি দিন।' রাজা বিরাট সূতপুত্রদের পরাক্রম দেখে কীচকের সঙ্গে সৈরন্ধ্রীকে পোড়াবার অনুমতি দিলেন।

কীচকের ভাইরা ভীতচকিত কমলনয়নী কৃষ্ণাকে ধরে

কীচকের শববাহী শকটে তুলে বেঁধে দিল। তারপর সকলে শ্মশানের দিকে রওনা হল। সনাথা কৃষ্ণা সূতপুত্রদের কবলে পড়ে অনাথের ন্যায় সাহায্যের জন্য ক্রন্দন করে বিলাপ করতে লাগলেন—'জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল আমার আওয়াজ শোনো, সূতপুত্রেরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। যে বেগবান গন্ধর্বদের ধনুকের ভীষণ টংকার সংগ্রামভূমিতে বজ্রের মতো শোনায় এবং যাদের রথের প্রচণ্ড ঘর্ঘর আওয়াজ, তারা আমার এই ডাক শোনো, সূতপুত্ররা আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে।'

কৃষ্ণার সেই আর্ত আওয়াজ এবং বিলাপ শুনে ভীম কোনো চিন্তা না করেই শয্যা থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন—'সৈরন্ধ্রী ! তোমার কথা আমি শুনতে পেয়েছি। তোমার আর এখন সূতপুত্রদের কাছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' এই বলে তিনি দ্রুত শ্মশানের দিকে রওনা হলেন। তিনি সূতপুত্রদের আগেই শ্মশানে পৌঁছলেন। চিতার কাছে এক বিরাট লম্বা গাছ ছিল তার ওপরের কিছু মোটা ডাল শুকনো হয়েছিল। ভীম সেই মোটা ডাল ভেঙে কাঁধে নিয়ে দণ্ডপাণি যমরাজের মতো সূতপুত্রদের দিকে চললেন।

ভীমসেনকে সিংহের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের দিকে আসতে দেখে কীচকের ভাই-বন্ধুরা ভয় ও বিষাদে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল—'ওই দেখ, বলবান গন্ধর্ব একটা গাছ উঠিয়ে নিয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে আমাদের দিকে আসছে ; শীঘ্রই সৈরন্ধ্রীকে ছেড়ে দাও। ওর জন্যই এই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।' তারা তখন সৈরন্ধ্রীকে ফেলে নগরের দিকে পালাতে লাগল। তাদের পালাতে দেখে পবননন্দন ভীমসেন, ইন্দ্র যেমনভাবে দানবদের বধ করেন, সেইভাবে বৃক্ষের আঘাতে কীচকের একশত পাঁচ ভাইকে যমের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি পাঞ্চালীকে বন্ধন মুক্ত করে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর চক্ষু দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছিল। বীর ভীমসেন বললেন—'কৃষ্ণা ! যারা তোমাকে জ্বালাতন করবে, তারা এমনভাবেই মারা পড়বে। এবার তুমি নগরে ফিরে যাও, আর কোনো ভয় নেই। আমি অন্য পথ ধরে বিরাটরাজের পাকশালাতে যাব।'

নগরবাসীরা এই কাণ্ড দেখে রাজা বিরাটকে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল যে, গন্ধর্বরা সূতপুত্রদের বধ করেছে, সৈরন্ধ্রী সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে রাজভবনের দিকে গেছেন। তাদের কথা শুনে রাজা বিরাট বললেন—'আপনারা সূতপুত্রদের অন্ত্যেষ্টি করুন। সুগন্ধিত পুষ্প-চন্দন ও রত্নাদির দ্বারা সব ভ্রাতাসহ কীচককে একই চিতায় প্রজ্বলিত করা হোক।' তারপর কীচক বধে ভীত হয়ে রাজা মহারানি সুদেষ্ণাকে গিয়ে বললেন—'সৈরন্ধ্রী এখানে এলে আমার হয়ে তাকে বলে দিও যে, সে যেন যেখানে খুশি চলে যায়, তার মঙ্গল হোক, এখানে থাকার দরকার নেই। আমি গন্ধর্বদের বলে ভীত হয়েছি।'

রাজন্ ! মনস্বিনী দ্রৌপদী যখন সিংহের ভয়ে হরিণীর ন্যায় স্নান করে সিক্ত বসনে নগরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে দেখে নগরবাসীরা গন্ধর্বদের ভয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যেতে লাগল, কেউ বা চোখ বন্ধ করে নিল। পথে নৃত্যশালায় তাঁর সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাৎ হল। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—'সৈরন্ধ্রী ! তুমি পাপীদের হাত থেকে কীভাবে ছাড়া পেলে ? ওরা কীভাবে মারা পড়ল, সব আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।' সৈরন্ধ্রী বললেন—'বৃহন্নলা ! তোমার আর তাতে কাজ কী ? তুমি তো মজা করে এই অন্তঃপুরে থাক। আজকাল সৈরন্ধ্রীর যে দুঃসময় চলছে, তাতে তোমার কী ? তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?' বৃহন্নলা বললেন—'কল্যাণী ! এই নপুংসক হয়ে বৃহন্নলাও যে কী মহাদুঃখ সহ্য করছে, তুমি কি তা বোঝ না ? আমরা সকলে একসঙ্গে থাকি, তোমার দুঃখে আমরা কি দুঃখিত হব না ?'

তারপরে অন্যান্য সেবিকাদের সঙ্গে দ্রৌপদী রাজভবনে গিয়ে সুদেষ্ণার কাছে দাঁড়ালেন। সুদেষ্ণা তখন বিরাটের কথা অনুযায়ী তাঁকে বললেন—'ভদ্রে ! মহারাজের গন্ধর্বদের থেকে খুবই ভয় হচ্ছে। জগতে তোমার ন্যায় রূপবতী তরুণী দেখা যায় না, পুরুষরা স্বভাবতই রূপমুগ্ধ। তোমার গন্ধর্ব স্বামীরাও অত্যন্ত ক্রোধী। অতএব তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারো।' সৈরন্ধ্রী বললেন—'মহারাজ যেন তেরো দিনের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন। তারপর গন্ধর্বরা নিজে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন এবং আপনাদেরও মঙ্গল করবেন। তাঁদের সাহায্যে মহারাজ এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অবশ্যই অনেক উপকার হবে।'

—o—

কৌরব সভায় পাণ্ডবদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে আলোচনা এবং বিরাটনগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভ্রাতাসহ কীচক অকস্মাৎ বধ হয়েছে শুনে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হল এবং সেই নগর ও অন্যান্য রাষ্ট্রেও সকলে আলোচনা করতে লাগল যে, 'মহাবলী কীচক তাঁর শৌর্যের জন্য বিরাট রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, তিনি বহু শত্রু বধ করেছিলেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত দুষ্ট ও পরস্ত্রীগামী পাপাচারী ছিলেন, তাই তাঁকে গন্ধর্বরা হত্যা করেছে।' মহারাজ ! শত্রুনিপাতকারী বীর কীচকের বিষয়ে দেশ-বিদেশে এইরূপ আলোচনা হতে লাগল।

সেইসময় পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের খোঁজ করার জন্য দুর্যোধন যে বহু সংখ্যায় গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন, তারা বহু দেশ, রাষ্ট্র ঘুরে হস্তিনাপুরে ফিরে এল। তারা রাজসভায় কুরুরাজ দুর্যোধনের কাছে এল, যেখানে মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ এবং দুর্যোধনের ভাইরা উপস্থিত ছিলেন। তারা সেখানে এসে বলল—'রাজন্ ! পাণ্ডবদের অনুসন্ধানের জন্য আমরা বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁরা কোথায় গেলেন আমরা তার খোঁজ পাইনি। আমরা পর্বতে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, গ্রামে, নগরে অনুসন্ধান চালিয়েছি। আমাদের মনে হয় তাঁরা আর বেঁচে নেই। আমরা অবশ্য খবর নিয়ে জেনেছি যে, ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারথিগণ পাণ্ডবদের ছাড়াই দ্বারকাপুরীতে ফিরে গেছে এবং সেখানেই আছে, পাণ্ডবরা সেখানে যাননি। তবে অন্য এক সুসমাচার আছে, রাজা বিরাটের মহাপরাক্রমশালী সেনাপতি কীচক, যিনি মহাপরাক্রমে ত্রিগর্তদেশকে পরাজিত করেছিলেন, তাঁকে তাঁর ভ্রাতাগণসহ গন্ধর্বরা গুপ্তভাবে হত্যা করেছে।'

দূতদের কথা শুনে দুর্যোধন বহুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর সভাসদদের ডেকে বললেন—'পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশবর্ষ শেষ হতে আর অল্পদিন বাকী। তা সমাপ্ত হলে পাণ্ডবরা মদমত্ত হাতি এবং বিষধর সর্পের ন্যায় কৌরবদের আক্রমণ করবে। তারা সকলেই সময়ের হিসাব করে কোথাও লুকিয়ে আছে। এমন কোনো উপায় বার করতে হবে যাতে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বাইরে এসে আবার বনে যেতে পারে। অতএব শীঘ্র তাদের খোঁজ করো, যাতে আমাদের রাজ্য চিরকালের জন্য বাধাবিপত্তিমুক্ত হতে পারে।'

তাই শুনে কর্ণ বললেন—'ভরতনন্দন ! শীঘ্র কুশলী গুপ্তচর পাঠান। তারা গুপ্তভাবে নানা জনাকীর্ণ দেশে যাবে এবং সুরম্য সভা, মহাত্মাদের আশ্রম, তীর্থাদি, গুহা এবং নগরবাসীদের বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করে ওঁদের অনুসন্ধান করবে।'

দুঃশাসন বললেন—'রাজন্ ! যে সব দূতের ওপর আপনার বিশেষ আস্থা আছে, তাদের পাঠান। কর্ণের কথা আমার ঠিক বলে মনে হয়।'

তত্ত্বদর্শী, পরমপরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য তখন বললেন—'পাণ্ডবরা শূরবীর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্মরাজের নির্দেশে কাজ করে। এরূপ মহাপুরুষগণের নাশও হয় না এবং তাঁরা কারো দ্বারা অসম্মানিতও হন না। এঁদের মধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত, গুণবান, সত্যবান, নীতিবান, পবিত্রাত্মা এবং তেজস্বী। তাঁকে চোখে দেখলেও কেউ চিনতে পারবে না। অতএব এই কথা স্মরণ রেখে আমাদের ব্রাহ্মণ, সেবক, সিদ্ধপুরুষদের, যাঁরা ওঁদের চেনেন, তাঁদের মধ্যে থেকে গুপ্তচর বেছে নিতে হবে।'

তারপর ভরতবংশের পিতামহ, দেশ-কাল জ্ঞাতা, ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম কৌরবদের হিতার্থে বললেন—'ভরতনন্দন ! পাণ্ডবদের ব্যাপারে আমার যা ধারণা, তা আমি বলছি। নীতিমান ব্যক্তিদের নীতি দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা নষ্ট করতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের যে নীতি, তাকে আমার মতো ব্যক্তিরা কখনো নিন্দা করতে পারে না। তাকে সুনীতিই বলা উচিত, দুর্নীতি বলা ঠিক নয়। রাজা যুধিষ্ঠির যে নগর বা রাষ্ট্রে থাকবেন, সেখানকার জনতাও দানশীল, প্রিয়বাদিনী, জিতেন্দ্রিয় এবং লজ্জাশীল হবেন। যেখানে তাঁরা থাকবেন সেখানকার লোক সংযমী, হৃষ্টপুষ্ট, পবিত্র এবং কার্যকুশল হবেন, তাঁরা ঈর্ষাপূর্ণ, অভিমানী, অহংকারী এবং দোষদর্শী হবেন না। সেখানে সর্বসময় বেদধ্বনি হবে এবং বড় বড় যজ্ঞাদি হবে। মেঘ ঠিকমতো বৃষ্টি দেবে, রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ ও ভয়শূন্য হবে। মলয়বায়ু প্রবাহিত হবে, পাষণ্ডশূন্য রাজ্য হবে, কোনো প্রভাবের ভীতি থাকবে না। গো-ধনের আধিক্য থাকবে। গোদুগ্ধ, ঘৃত, দই খুবই সরস ও পুষ্টিদায়ক হবে। রাজা যুধিষ্ঠির খুবই ধর্মনিষ্ঠ। তাঁর মধ্যে সত্য, ধৈর্য, দান, শান্তি, ক্ষমা, লজ্জা, শ্রী, কীর্তি, তেজ, দয়ালুভাব ও সারল্য সর্বদাই বিরাজ করে। সাধারণ লোকের কী কথা, বিচক্ষণ ব্রাহ্মণও তাঁকে চিনতে পারবেন না। সুতরাং যে স্থানে এইসব লক্ষণ দেখা যাবে, সেইস্থানেই মতিমান পাণ্ডবরা গুপ্তভাবে বসবাস করছেন, জানবে। তোমরা সেই সব জায়গাতে অনুসন্ধান করো, আমি এছাড়া আর কিছু বলতে চাই না। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করো তবে যা ভালো বলে মনে হয় করো।'

তারপর মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র কৃপ বললেন—'বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম পাণ্ডবদের বিষয়ে যা বলেছেন, তা যুক্তিযুক্ত এবং সময়ানুসার। এতে ধর্ম, অর্থ দুইই নিহিত এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই বিষয়ে আমার বক্তব্য শোন। তোমরা গুপ্তচরের সাহায্যে পাণ্ডবদের গতি ও স্থিতির খোঁজ নাও আর এইসময় যা হিতকারিণী, তার আশ্রয় নাও। স্মরণ রেখো যে, অজ্ঞাতবাসের কাল সমাপ্ত হলেই মহাবলী পাণ্ডবদের উৎসাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তারা অতুল পরাক্রমী। সুতরাং এখন তোমাদের সেনা, কোষাগার এবং নীতি সাবধানে রক্ষা করা প্রয়োজন। যাতে তারা ফিরে এলে আমরা সসম্মানে সন্ধি করতে পারি। তোমার সৈন্যদের পরীক্ষা করা উচিত যে, তারা তোমার ওপর সন্তুষ্ট কি না। সেই অনুসারেই আমাদের সন্ধি বা যুদ্ধ করতে হবে। সেনারা সন্তুষ্ট থাকলে, তারা যুদ্ধে জয় লাভের চেষ্টা করে, অসন্তুষ্ট থাকলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তারা সন্ধি করে নেয়। নীতি হল—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও কর গ্রহণ। এতে শত্রুকে আক্রমণের দ্বারা, দুর্বলকে বলের সাহায্যে, মিত্রকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে এবং সেনাদিকে মিষ্টভাষণ ও সুবেতন দিয়ে বশ করতে হয়। তুমি যদি এইভাবে রাজকোষ ও সেনাদের ঠিক রাখ তাহলে সফল হবে।

এরপর ত্রিগর্তদেশের রাজা মহাবলী সুশর্মা কর্ণের দিকে তাকিয়ে দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন ! মৎস্যদেশের শাল্ববংশীয় রাজা বারংবার আমাদের ওপর আক্রমণ করে থাকেন। মৎস্যরাজের সেনাপতি মহাবলী সূতপুত্র কীচক বন্ধুবান্ধবসহ আমাকে নানাভাবে জ্বালাতন করেছে। কীচক

অত্যন্ত বলবান, ক্রূর, দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিল, তার পরাক্রম জগদ্বিখ্যাত। আমরা সেসময় কিছু করতে পারিনি। এখন সেই পাপীকে গন্ধর্বরা বধ করেছে, তার মৃত্যুতে বিরাটরাজ বলহীন ও নিরুৎসাহ হয়েছেন। তাই যদি আপনাদের ঠিক মনে হয় তাহলে এসময় ওই দেশ আক্রমণ করা উচিত বলে মনে হয়। সেই দেশ জয় করে যে সব ধন, রত্ন, নগর, গ্রাম পাওয়া যাবে, আমরা নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নেব।'

ত্রিগর্তরাজের কথা শুনে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—'রাজা সুশর্মা বড় ভালো কথা বলেছেন। এ অত্যন্ত সময়ানুসার কাজের কথা। আপনি যেমন বলেন, সেইভাবে সেনা সাজিয়ে আমরা শীঘ্রই ওদের আক্রমণ করি।' ত্রিগর্তরাজ ও কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন দুঃশাসনকে নির্দেশ দিলেন, 'ভাই, তুমি সবার সঙ্গে পরামর্শ করে আক্রমণের প্রস্তুতি করো। প্রথমে সুশর্মা আক্রমণ করবেন, দ্বিতীয় দিন আমরা যাব। এরা গোয়ালাদের থেকে গোধন ছিনিয়ে নেবে। তারপর আমরাও সেনাদের দুভাগে ভাগ করে রাজা বিরাটের এক লাখ গোধন অধিকার করব।'

—o—
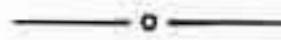
বিরাট ও সুশর্মার যুদ্ধ এবং ভীমসেনের হাতে সুশর্মার পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! সুশর্মা তাঁর পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ত্রিগর্তদেশের সমস্ত রথী-মহারথীদের নিয়ে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে বিরাট রাজার গোধন অপহরণের জন্য অগ্নিকোণ থেকে আক্রমণ করলেন। আর দ্বিতীয় দিন সমস্ত কৌরব মিলে অন্য দিক থেকে আক্রমণ করে বিরাটের হাজার হাজার গোধন অধিকার করে নিল। এইসময় পাণ্ডবদের ত্রয়োদশতম বর্ষের অজ্ঞাতবাসকাল সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সুশর্মাও অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে বিরাটের বহু গোধন দখল করল। তাই দেখে রাজার প্রধান গোপ রথে করে নগরে এসে রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে জানাল—'মহারাজ! ত্রিগর্তদেশের যোদ্ধারা আমাদের পরাস্ত করে আপনার এক লাখ গাভী নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনি শীঘ্র ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন, নাহলে ওরা বহুদূরে চলে যাবে।' তাই শুনেই মৎস্যরাজ সব বীরদের একত্রিত করলেন। রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক সর্বপ্রকার রথী-মহারথী যুদ্ধসাজে সেজে নগরের বাইরে গেলেন।

সব সেনা প্রস্তুত হলে রাজা বিরাট তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতানীককে বললেন—'আমার মনে হয় কঙ্ক, বল্লব, তন্তিপাল এবং গ্রন্থিক, এরাও বড় বীর এবং যুদ্ধ করতে সক্ষম। এঁদেরও সুশোভিত রথ ও কবচ দেওয়া হোক।' তাই শুনে শতানীক পাণ্ডবদের জন্যও রথ তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। পাণ্ডবরাও সুবর্ণ মণ্ডিত রথে করে রাজা বিরাটের সঙ্গে চললেন। তাঁদের সঙ্গে আট হাজার রথী, এক হাজার হাতি, ষাট হাজার ঘোড়সওয়ার চলল। তারা গোরুর পদচিহ্ন দেখে চলতে লাগল। নগরের বাইরে তারা ব্যূহরচনা করে চলছিল এবং সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই ত্রিগর্তের সেনাকে ধরে ফেলল। দুই পক্ষে ভয়ংকর রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেখতে দেখতে রণভূমি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মস্তক ও দেহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। শতানীক একশত এবং বিশালাক্ষ চারশত ত্রিগর্ত বীরকে ধরাশায়ী করলেন। রাজা বিরাট পাঁচশত রথী, আটশত ঘোড়সওয়ার এবং পাঁচ মহারথীকে বধ করলেন। তারপর তিনি রথযুদ্ধ করতে করতে ক্রমশ স্বর্ণরথে উপবিষ্ট সুশর্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি দশবাণ সুশর্মাকে এবং পাঁচবাণ চারটি ঘোড়াকে মারলেন। সুশর্মা অত্যন্ত চতুর বীর ছিলেন, তিনি মৎস্যরাজের সমস্ত সৈন্যকে নিজের প্রবল পরাক্রমে দমন করলেন এবং রাজা বিরাটকে ধরতে দৌড়লেন। তিনি বিরাটের রথের ঘোড়াগুলি এবং সারথিকে বধ করে বিরাটকে জীবিত তাঁর রথে তুলে নিলেন এবং রথ চালিয়ে রওনা হলেন।

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তাই দেখে ভীমসেনকে বললেন—'মহাবাহো! ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা মহারাজ বিরাটকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি শীঘ্র তাঁকে ছাড়িয়ে আনো, তিনি যেন শত্রুর ফাঁদে না পড়ে যান।' ভীমসেন বললেন—'মহারাজ! আপনার আদেশে আমি এখনই যাচ্ছি। সামনের গাছের ডালগুলি খুব সুন্দর, গদার মতো। এগুলি তুলে আমি শত্রুকে আঘাত করব।' যুধিষ্ঠির বললেন—'ভীম! এমন সাহসের কাজ কোরো না। তুমি যদি অতি মানুষের মতো এরূপ কাজ কর, তাহলে সকলেই তোমাকে ভীম বলে চিনে ফেলবে। সুতরাং তুমি কোনো মনুষ্যোচিত

অস্ত্র ধারণ করো।'

ধর্মরাজের কথায় ভীম অতি শীঘ্র তাঁর ধনুক তুলে বর্ষার জলধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তাই দেখে ভ্রাতাসহ সুশর্মা ফিরে এসে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

ভীম তখন গদা হাতে বিরাটের সামনেই হাজার হাজার রথী, মহারথী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিকদের সংহার করতে লাগলেন। এই ভীষণ যুদ্ধ দেখে রণোন্মত্ত সুশর্মার সমস্ত অহংকার ধূলিসাৎ হল, তিনি সেনা-সংহার দেখে বলতে লাগলেন—'হায় ! যে সবসময় ধনুর্বাণ হাতে শত্রু সংহার করত, আমার সেই ভাই মারা পড়েছে।' তিনি ভীমের ওপর বাণ ছুঁড়তে আরম্ভ করলে পাণ্ডবরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ত্রিগর্তের রাজাকে আক্রমণ করলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব সকলেই বহু সৈন্য সংহার করলেন।

শেষকালে ভীমসেন সুশর্মার কাছে এসে তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাঁর ঘোড়া এবং অঙ্গরক্ষকদের বধ করলেন এবং সারথিকে রথ থেকে ফেলে দিলেন। বিরাট রাজা বৃদ্ধ হলেও রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে গদা হাতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রথহীন হওয়ায় সুশর্মা পালাতে লাগলেন। ভীম চেঁচিয়ে বললেন—'রাজকুমার পালিয়ো না ! যুদ্ধে পিঠ দেখানো তোমার উচিত নয়। এই বীরত্ব নিয়ে তুমি গোরু নিয়ে যেতে চাইছিলে ?' এই বলে ভীম সুশর্মাকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে দৌড়লেন। তিনি সুশর্মার চুল ধরে তাঁকে ওপরে তুলে মাটিতে আছাড় মারলেন। সুশর্মা চিৎকার করতে থাকলে ভীম তাঁর পিঠের ওপর চেপে বসে ঘুঁষি মারতে লাগলেন, সুশর্মা অচেতন হয়ে পড়লেন। মহারথী সুশর্মাকে ধরে নিয়ে গেলে ত্রিগর্তের সমস্ত সেনা ভীত হয়ে পালাতে লাগল। মহারথী পাণ্ডবরা তখন সমস্ত গোধন নিয়ে ফিরে এলেন এবং সুশর্মাকে পরাস্ত করে তার সমস্ত ধন ছিনিয়ে নিলেন।

ভীমসেনের পায়ের নীচে পড়ে সুশর্মা প্রাণরক্ষার তাগিদে ছটফট করছিলেন। তাঁর শরীর ধূলায় ধূসরিত, অর্ধচেতন অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন। ভীম তাঁকে বেঁধে রথে তুলে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে দেখে হেসে বললেন—'ভাই ! এই নরাধমকে ছেড়ে

দাও।' ভীমসেন সুশর্মাকে বললেন—'ওরে মূঢ় ! যদি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে বিদ্বান এবং রাজাদের সভায় গিয়ে তোমাকে বলতে হবে যে 'আমি দাস' তবেই তোমার জীবন দান করব।' তখন ধর্মরাজ স্নেহ সহকারে বললেন—'ভাই ! আমার কথা শোনো, এই পাপী সুশর্মাকে মুক্ত করে দাও। এ তো মহারাজ বিরাটের দাস হয়েই গেছে।' তারপর

ত্রিগর্ত রাজকে বললেন—'যাও, তুমি এখন আর দাস নয়, আর কখনো এমন সাহস কোরো না।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে সুশর্মা লজ্জায় মুখ নিচু করে বিরাট রাজের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দেশে চলে গেলেন। মৎস্যরাজ বিরাট প্রসন্ন হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন 'আসুন, আপনাকে এই সিংহাসনে অভিষিক্ত করি। এখন আপনিই এই মৎস্যদেশের রাজা। তাছাড়া আপনি যদি কোনো দুর্লভ জিনিস পেতে চান, তাহলে আমি তা-ও দিতে প্রস্তুত।'

তখন যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজকে বললেন—'মহারাজ ! আপনার বাক্য অত্যন্ত মধুর। আপনি অত্যন্ত দয়ালু, ভগবান যেন সর্বদা আপনাকে আনন্দে রাখেন। রাজন্, শীঘ্রই দূতদের নগরে পাঠান, তারা সকলকে গিয়ে আপনার বিজয় সমাচার ঘোষণা করুক।' তখন রাজা দূতদের নির্দেশ দিলে তারা রাজার আদেশ শিরোধার্য করে আনন্দ সহকারে একরাত্রের মধ্যে বহু রাস্তা পার হয়ে ভোরবেলা নগরে পৌঁছে রাজার বিজয় ঘোষণা করল।

—o—

কৌরবদের আক্রমণ, বৃহন্নলাকে সারথি করে উত্তরের যুদ্ধ যাত্রা এবং কৌরব সৈন্য দেখে ভয়ে পলায়ন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মৎস্যরাজ বিরাট যখন গোধন ফিরিয়ে আনতে ত্রিগর্তসেনার দিকে গেলেন তখন দুর্যোধন সুযোগ বুঝে মন্ত্রীদের নিয়ে বিরাটনগর আক্রমণ করলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, দুঃশল প্রমুখ বহু মহারথী সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সকলে বিরাটরাজার ষাট হাজার গো-ধন রথের দ্বারা ঘিরে নিয়ে চললেন। গোয়ালারা এই মহারথীদের হাতে মার খেয়ে আর্তনাদ শুরু করলে, তাদের সর্দার কোনোমতে একটি রথে করে নগরে এসে রাজমহলে ঢুকে গেল। সেখানে তার সঙ্গে বিরাটরাজার পুত্র ভূমিঞ্জয় (উত্তর)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। গোপরাজ তাঁকে

সব জানিয়ে বলল—'রাজকুমার ! কৌরবরা আমাদের ষাট হাজার গোধন নিয়ে যাচ্ছে। রাজা আপনার ওপরেই সব ভার দিয়েছেন। সভায় আপনার প্রশংসা করে তিনি বললেন যে, 'আমার এই কুলদীপক পুত্র আমারই মতো বীর।' অতএব আপনি সত্বর গিয়ে গো-ধন রক্ষা করুন।'

রাজকুমার অন্তঃপুরে নারীমহলে ছিলেন, তিনি গোপের কথা শুনে অহংকার করে বলে উঠলেন—'যেদিকে গোধন নিয়ে যাচ্ছে, আমি অবশ্যই সেখানে যাব। আমার অস্ত্রশস্ত্র খুবই মজবুত। কিন্তু মুশকিল হল যে, এমন একজনও সারথি এখন নেই যে রথ চালনায় নিপুণ। তুমি শীঘ্র গিয়ে এক কুশল সারথির অনুসন্ধান করো। তারপর ইন্দ্র যেমন দানবদের ভীত সন্ত্রস্ত করেন, আমিও সেইভাবে দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ ও অশ্বত্থামা—এই সকল মহাধনুর্ধরদের এক লহমায় উড়িয়ে দিয়ে গোধন ফেরত আনব। যুদ্ধে আমার পরাক্রম দেখে তাঁরা বলবেন যে, এ সাক্ষাৎ পৃথাপুত্র অর্জুন নয় তো ?'

রাজপুত্র বারংবার নারীদের মধ্যে বসে অর্জুনের কথা বলছিলেন শুনে দ্রৌপদী আর থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন—'ওই যে হাতির মতো বিশালকায় সুন্দর যুবক বৃহন্নলা নামে খ্যাত, ও আগে অর্জুনের সারথি ছিল। ওকে যদি সারথিরূপে নেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কৌরবদের পরাজিত করে গোধন ফিরিয়ে আনতে পারবেন।' সৈরন্ধ্রীর কথা শুনে উত্তর তাঁর ভগ্নী উত্তরাকে ডেকে বললেন—'ভগ্নী ! তুমি তাড়াতাড়ি বৃহন্নলাকে ডেকে আন।' ভাইয়ের কথায় উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গেলেন, তাঁকে দেখে বৃহন্নলা বললেন—

'বলো রাজকুমারী। এখানে কেন এসেছ ?' রাজকুমারী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'বৃহন্নলা ! কৌরবরা আমাদের রাজ্যের গোধন অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমার ভাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। তুমি আমার ভাইয়ের রথের সারথি হও এবং কৌরবরা বহু দূর চলে যাওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে যাও।' রাজকুমারী উত্তরার কথায় অর্জুন রাজকুমার উত্তরের কাছে চললেন। তাঁকে আসতে দেখে রাজকুমার বলে উঠলেন—'বৃহন্নলা ! আমি যখন গোধন ফিরিয়ে আনার জন্য কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তখন তুমি আমার ঘোড়াগুলিকে ঠিকমতো বশে রেখো। আমি শুনেছি যে, তুমি নাকি আগে অর্জুনের রথের সারথি ছিলে এবং তোমার জন্যই পাণ্ডবপ্রবর অর্জুন সমস্ত জগৎ জয় করেছিলেন।' তারপর উত্তর কবচ ধারণ করে রথে সিংহধ্বজ লাগিয়ে, বহুমূল্য ধনুক এবং তীক্ষ্ণ বাণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। সেইসময়ে বৃহন্নলাকে উত্তরা এবং সখীগণ বলল—'বৃহন্নলা তুমি যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণাদি কৌরবদের হারিয়ে আমাদের পুতুলের জন্য রং-বেরং-এর বস্ত্র নিয়ে আসবে।' অর্জুন তখন হেসে বললেন—'এই রাজকুমার যদি তাঁদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয় তাহলে আমি অতি অবশ্য তাঁদের দিব্য সুন্দর বস্ত্র নিয়ে আসব।'

রাজকুমার উত্তর রাজধানীর বাইরে এসে অর্জুনকে বললেন—'যেদিকে কৌরবরা গেছেন, তুমি সেই দিকে রথ নিয়ে চলো। কৌরবরা যে এখানে জয়লাভের আশায় একত্রিত হয়েছে, আমি তাদের সকলকে হারিয়ে, গোধন নিয়ে শীঘ্র ফিরে আসব।' পাণ্ডুনন্দন অর্জুন উত্তরের উত্তম ঘোড়াগুলির লাগাম আলগা করে দিলেন। তখন ঘোড়াগুলি যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর উত্তর এবং অর্জুন মহাবলী কৌরবদের সেনা দেখতে পেলেন, বিশাল সেই বাহিনী হাতি, ঘোড়া এবং রথ সমন্বিত ছিল। কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং অশ্বত্থামা সেই গোধন রক্ষা করছিলেন। তাঁদের দেখে উত্তর ভয়ে কম্পিত হলেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে অর্জুনকে বললেন—'আমার এত ক্ষমতা নেই যে, এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করি, দেখো আমার সমস্ত রোম কণ্টকাকার ধারণ করেছে। এদের মধ্যে অগণিত বীর দেখছি, দেবতারাও এদের সম্মুখীন হতে ভয় পাবেন। আমি তো বালক, তেমন করে অস্ত্রাভ্যাস করিনি। আমি একা কী করে এদের সম্মুখীন হব ? অতএব বৃহন্নলা, ফিরে চলো।'

বৃহন্নলা বললেন—'রাজকুমার ! তুমি অন্তঃপুরে নিজের পুরুষার্থের খুব অহংকার করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছ, তবে এখন কেন যুদ্ধে পিছপা হচ্ছো ? তুমি যদি যুদ্ধে এদের পরাস্ত না করে ফিরে যাও, তাহলে রাজধানীর সবাই তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে। সৈরন্ধ্রী আমাকে তোমার সারথি করে পাঠিয়েছে, তাই গোধন ব্যতীত আমিও নগরে ফিরে যাব না।'

উত্তর বললেন—'বৃহন্নলা, কৌরবরা মৎস্যরাজের গোধন নিয়ে যায় তো যাক, অন্তঃপুরে নারীপুরুষে আমাকে বিদ্রূপ করুক, কিন্তু যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

রাজকুমার উত্তর এই বলে রথ থেকে নেমে মান-মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে অস্ত্র ফেলে পালালেন। বৃহন্নলা বললেন—'শূরবীরদের দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়, তাঁদের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুই শ্রেয়, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা উচিত নয়।' অর্জুন এই বলে রথ থেকে নেমে দৌড়ে উত্তরকে ধরলেন। উত্তর কাপুরুষের মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'বৃহন্নলা ! তুমি শীঘ্র রথ ফেরাও, বেঁচে থাকলে অনেক সুদিনের দেখা পাওয়া যাবে।'

উত্তর এইভাবে অনুনয়-বিনয় করলেও অর্জুন হাসতে
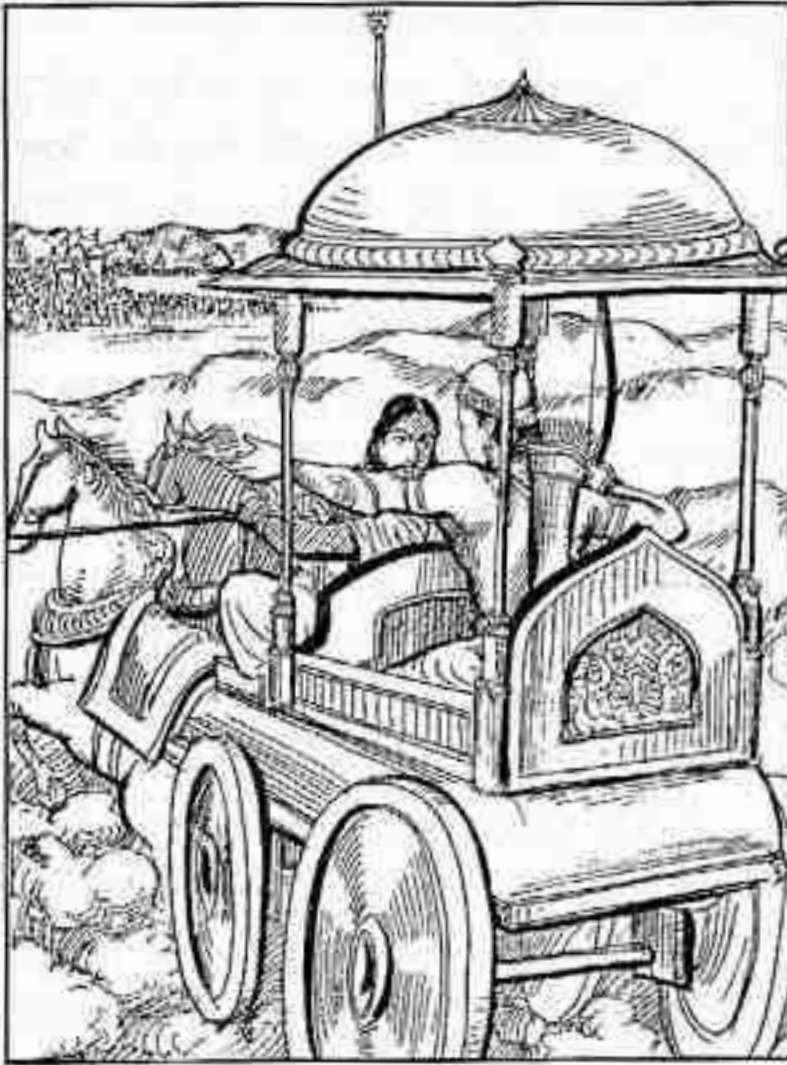
হাসতে তাকে রথের কাছে নিয়ে এসে বললেন—'রাজকুমার ! যদি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার তোমার সাহস না থাকে, তাহলে তুমি ঘোড়া সামলাও, আমি যুদ্ধ করছি। ভয় পেয়ো না, আমি আমার বাহুবলে তোমায় রক্ষা করব। ভয় পাচ্ছ কেন, তুমি তো ক্ষত্রিয় বালক। শত্রুদের সম্মুখীন হতে ভয় কীসের ? দেখ, আমি এই দুর্জয় সেনার মধ্যে ঢুকে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমাদের গোধন ছাড়িয়ে আনব। তুমি আমার সারথির কাজ করো।' এই বলে অর্জুন যুদ্ধে ভীত রাজকুমার উত্তরকে বুঝিয়ে রথের ওপরে বসালেন।

—o—

শমীবৃক্ষের কাছে গিয়ে অর্জুনের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে উত্তরকে নিজ পরিচয় প্রদান এবং কৌরবসেনাদের দিকে যাত্রা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ প্রধান প্রধান কৌরব মহারথীরা যখন নপুংসক বেশধারী ওই পুরুষকে রাজকুমার উত্তরের সঙ্গে শমীবৃক্ষের দিকে যেতে দেখলেন, তখন তাঁরা তাঁকে অর্জুন মনে করে ভীত হলেন। শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য পিতামহ ভীষ্মকে বললেন—'গঙ্গাপুত্র ! এই নারীবেশধারী ব্যক্তিকে ইন্দ্রপুত্র অর্জুন বলে মনে হচ্ছে। সে অবশ্যই আমাদের পরাজিত করে গোধন ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এই সৈন্যদলে ওর সম্মুখীন হবার মতো কোনো যোদ্ধা নেই। শুনেছি, হিমালয়ে তপস্যা করার সময় অর্জুন কিরাতবেশী মহাদেবকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন।' তখন কর্ণ বললেন—'আচার্য ! আপনি সর্বদা অর্জুনের গুণগান করে আমাদের নিন্দা করেন, কিন্তু অর্জুন আমার এবং দুর্যোধনের ষোলো অংশের এক অংশও নয়।' দুর্যোধন বললেন—'আরে কর্ণ ! এ যদি অর্জুন হয়, তাহলে আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে ; কারণ ওকে চিনে ফেলায় এবার পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসর বনে যেতে হবে। আর যদি অন্য কোনো ব্যক্তি নপুংসকের বেশে আসে তাহলে আমি তীক্ষ্ণ বাণে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলব।'

রাজন্ ! অর্জুন এদিকে শমীবৃক্ষের কাছে রথ নিয়ে

গেলেন এবং উত্তরকে বললেন—'রাজকুমার ! তুমি শীঘ্র

এই বৃক্ষ থেকে আমার ধনুক পেড়ে আন, তোমার ধনুক আমার বাহুবল সহ্য করতে পারবে না। এই বৃক্ষে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র রাখা আছে।' এই কথা শুনে রাজকুমার উত্তর রথ থেকে নেমে বৃক্ষের ওপর উঠলেন। অর্জুন রথ থেকেই নির্দেশ দিলেন, 'তাড়াতাড়ি নামিয়ে আন, দেরি কোরো না, ওর ওপরের কাপড় তাড়াতাড়ি খুলে ফেলো।' উত্তর পাণ্ডবদের অত্যুত্তম ধনুকগুলি নিয়ে নেমে এলেন এবং কাপড়গুলি খুলে অর্জুনের সামনে রাখলেন। গাণ্ডীব ছাড়া উত্তর আরও চারটি ধনুক দেখলেন, সেই তেজস্বী ধনুকগুলিতে সূর্যের আলো পড়ায় দিব্যকান্তি ছড়িয়ে পড়ল। উত্তর সেই বিশাল ধনুকগুলি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'এগুলি কার ?'

অর্জুন বললেন—'রাজকুমার ! এটি অর্জুনের সুপ্রসিদ্ধ গাণ্ডীব, যুদ্ধ ক্ষেত্রে এটি ক্ষণকালের মধ্যেই শত্রু সৈন্য নাশ করে। ত্রিলোকে এটি সুপ্রসিদ্ধ এবং সকল অস্ত্রের মধ্যে এটি সব থেকে শ্রেষ্ঠ। এটি দিয়েই এক লাখ অস্ত্রের মোকাবিলা করা যায়। অর্জুন এর সাহায্যেই যুদ্ধে দেবতা ও মানুষদের পরাস্ত করেছেন। প্রথমে এটি এক হাজার বছর ব্রহ্মার কাছে ছিল, তারপর পাঁচশত তিন বছর প্রজাপতির কাছে ছিল। তারপর পঁচাশি বছর ইন্দ্র একে ধারণ করেছিলেন। তারপর পাঁচশত বছর চন্দ্র এবং একশত বছর বরুণ একে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এখন সাড়ে বত্রিশ বছর ধরে এই পরম দিব্য ধনুকটি অর্জুনের কাছে আছে, সে এটি বরুণের কাছ থেকে পেয়েছে। অপর যে স্বর্ণমণ্ডিত দেবতা ও মনুষ্য পূজিত ধনুক রয়েছে, সেটি ভীমসেনের। শত্রুদমন ভীম এর সাহায্যে সমস্ত পূর্ব দিক জিতে নিয়েছিলেন। তৃতীয় এই ইন্দ্রগোপ চিহ্নিত মনোহর ধনুকটি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। চতুর্থ ধনুক, যেটির স্বর্ণবর্ণ সূর্যের আলোয় চমকিত হচ্ছে, সেটি নকুলের আর অন্য যেটিতে চিত্রবিচিত্র করা আছে, সেই পঞ্চমটি মাদ্রীনন্দন সহদেবের ধনুক।'

উত্তর বললেন—'বৃহন্নলা ! যেসব পরাক্রমী মহাত্মাদের সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র এখানে রয়েছে সেই পৃথাপুত্র অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব এঁরা সব কোথায় আছেন ? তাঁরা সকলেই তো অত্যন্ত মহানুভব এবং শত্রুসংহারকারী। ওঁরা যখন জুয়ায় হেরে রাজ্যচ্যুত হলেন, তাঁর পরে তাঁদের সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায়নি। নারীরত্ন-স্বরূপা পাঞ্চালকুমারী দ্রৌপদী বা কোথায় গেলেন ?'

অর্জুন বললেন—'আমিই পৃথাপুত্র অর্জুন, প্রধান সভাসদ কঙ্ক-যুধিষ্ঠির, তোমার পিতার ভোজন প্রস্তুতকারী বল্লব-ভীমসেন, অশ্বশিক্ষক গ্রন্থিক-নকুল, গোপালক-তন্ত্রিপাল সহদেব এবং যাঁর জন্য কীচক বধ হয়েছে, সেই হল সৈরন্ধ্রী-দ্রৌপদী।'

উত্তর বললেন—'আমি অর্জুনের দশটি নাম শুনেছি, তুমি যদি সেই নামের কারণ বলে দিতে পার তবে তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি।'

অর্জুন বললেন—'আমি সমস্ত দেশ জয় করে ধনের অধিপতি হয়েছিলাম, তাই আমার এক নাম 'ধনঞ্জয়'। আমি যখন যুদ্ধে যাই, তখন যুদ্ধোন্মত্ত শত্রুদের পরাজিত না করে ফিরি না, তাই আমার নাম 'বিজয়'। যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমার রথে সুন্দর সজ্জাবিশিষ্ট শ্বেত অশ্ব লাগানো হয়, তাই আমি 'শ্বেতবাহন'। আমি উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে হিমালয়ের ওপরে জন্ম নিয়েছিলাম, তাই আমাকে 'ফাল্গুনী' বলে থাকে। আগে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমার মাথায় সূর্যের ন্যায় তেজস্বী কিরীট পরিয়েছিলেন তাই আমি 'কিরীটি'। যুদ্ধের সময় আমি কোনো বীভৎস (ভয়ানক) কর্ম করি না, তাই দেবতা ও মানুষের মধ্যে 'বীভৎসু' নামে পরিচিত। গাণ্ডীব চালনায় আমার দুই হাত

সমানভাবে কুশল তাই আমি 'সব্যসাচী' নামে প্রসিদ্ধ। আসমুদ্র পৃথিবীতে আমার ন্যায় শুদ্ধবর্ণ দুর্লভ, তাছাড়া আমি শুদ্ধ কর্ম করি, তাই লোকে আমাকে 'অর্জুন' বলে। আমি দুর্লভ, দুর্জয়, দমনকারী এবং ইন্দ্রের পুত্র,তাই দেবতা ও মানুষের মধ্যে 'জিষ্ণু' নামে বিখ্যাত। পিতা আমার দশম নাম 'কৃষ্ণ' রেখেছিলেন, কারণ আমি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের এবং প্রিয় বালক হওয়ায় চিত্ত আকর্ষণকারী ছিলাম।'

সব শুনে বিরাটপুত্র অর্জুনকে প্রণাম করলেন এবং বললেন—'আমি ভূমিঞ্জয় নামক রাজকুমার, অপর নাম উত্তর। আজ আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আমি পৃথাপুত্র অর্জুনের দর্শন পেলাম। আপনাকে চিনতে না পারার জন্য যে সব অন্যায় কথা বলেছি, তার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি এই রথে উঠুন, আমি সারথি হয়ে যেখানে আপনি নিয়ে যেতে বলবেন, সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাব।'

অর্জুন বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি ; তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, যুদ্ধে আমি তোমার সব শত্রুকে পরাস্ত করব। তুমি শান্তভাবে থেকে যুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে আমি কী ভীষণ সংগ্রাম করি, তা দেখ। আমি যদি গাণ্ডীব ধনুক নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হই, তাহলে শত্রুর সৈন্যরা আমাকে কোনোভাবেই পরাস্ত করতে পারবে না। এখন তোমার অমূলক ভয় দূর হওয়া উচিত।'

উত্তর বলল—'আমি আর এখন এদের ভয় পাচ্ছি না ; কারণ আমি ভালোভাবেই জানি যে, আপনি যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সম্মুখীন হতে সক্ষম। এখন আপনার সহায়তা পেয়েছি তাই যুদ্ধে দেবতাদেরও সম্মুখীন হতে পারি। আমার ভয় দূর হয়েছে, এখন বলুন কী করব ? পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি পিতার কাছে সারথির কাজ শিখেছি। আমি আপনার রথের ঘোড়া ঠিকমতো চালাতে পারব।'

অর্জুন তখন শুদ্ধভাবে রথের ওপর পূর্বমুখে বসে একাগ্রচিত্তে সমস্ত অস্ত্রকে স্মরণ করলেন। তাঁরা প্রকটিত হয়ে হাতজোড় করে বললেন—'পাণ্ডুকুমার ! আমরা সব উপস্থিত হয়েছি।' অর্জুন বললেন—'তোমরা আমার মনে নিবাস করো।' এইভাবে অস্ত্রগুলি গ্রহণ করায় অর্জুনের চেহারা প্রসন্নভাব ধারণ করল, তিনি গাণ্ডীব ধারণ করে তাতে টংকার তুললেন। তখন উত্তর বললেন—'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! আপনি একাকী বহু মহারথীর সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করবেন—তাই ভেবে আমি একটু ভয় পাচ্ছি।' তাই শুনে অর্জুন সশব্দে হেসে উঠলেন এবং বললেন—'বীর, ভয় পেয়ো না। বলো তো কৌরবদের ঘোষযাত্রার সময় যখন আমি মহাবলী গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম, তখন কে আমায় সাহায্য করেছিল ? দেবরাজের জন্য নিবাতকবচ এবং পৌলোম দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কে আমার সঙ্গী ছিল ? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যখন আমাকে বহু রাজার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তখন কে আমাকে সাহায্য করেছিল ? আমি গুরুদেব দ্রোণাচার্য, ইন্দ্র, কুবের, যমরাজ, বরুণ, অগ্নিদেব, কৃপাচার্য, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান শংকর—এঁদের সবার আশীর্বাদ লাভ করেছি। তাহলে এদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে পারব না। তুমি মন থেকে ভয় দূর করে শীঘ্র রথ নিয়ে চলো।'

উত্তরকে এইভাবে নিজ সারথি করে পাণ্ডবপ্রবর অর্জুন শমীবৃক্ষকে পরিক্রমা করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অগ্নিদেব প্রদত্ত রথের ধ্যান করলেন। ধ্যান করতেই আকাশ থেকে ধ্বজা-পতাকা সুশোভিত এক দিব্যরথ নেমে এল। অর্জুন বানর ধ্বজ বিশিষ্ট সেই রথ প্রদক্ষিণ করে রথে উঠে ধনুর্বাণ নিয়ে উত্তর দিকে রওনা হলেন। অর্জুন তাঁর মহাশঙ্খ বাজালেন, সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শুনে শত্রুরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হল। রাজকুমার উত্তরও অত্যন্ত ভয় পেয়ে রথের ভিতরে ঢুকে বসলেন। অর্জুন তখন রাশ ধরে ঘোড়া থামালেন এবং উত্তরকে আলিঙ্গন দ্বারা আশ্বস্ত করে

বললেন—'রাজপুত্র ! ভয় পেয়ো না ! তুমি তো ক্ষত্রিয় ; তাহলে শত্রুদের দেখে ভয় পাও কেন ?'

উত্তর বললেন—'আমি অনেক শঙ্খ এবং ভেরীর আওয়াজ শুনেছি এবং অনেকবার যুদ্ধস্থলে সৈন্য এবং হাতি ঘোড়ার চিৎকারও শুনেছি। কিন্তু শঙ্খের এমন আওয়াজ আগে কখনো শুনিনি। তাই এই শঙ্খের আওয়াজ, ধনুকের টংকার, ধ্বজায় অবস্থিত অমানবী প্রাণীর হুংকার এবং রথের ঘর্ঘর শব্দে আমার মন আতঙ্কে ভরে উঠেছে।'

অর্জুন উত্তরকে বললেন—'এবার তুমি ঠিকভাবে পা দিয়ে শক্ত করে ধরে বসে রথ সামলাও, আমি আবার শঙ্খ বাজাব।' তারপর অর্জুন এত জোরে শঙ্খ বাজালেন যেন সেই আওয়াজে পর্বত, গুহা এবং দিঙ্দিক বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেই আওয়াজে ভয় পেয়ে উত্তর আবার রথের মধ্যে ঢুকে বসলেন। অর্জুন আবার উত্তরকে ধৈর্য ধরতে বললেন।

অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার বিষয়ে কৌরব মহারথীদের মধ্যে বিবাদ

এই ভয়ংকর শব্দ শুনে দ্রোণাচার্য কৌরব সেনাদের বললেন—'মেঘগর্জনের ন্যায় এই যে ভীষণ রথের ঘর্ঘর আওয়াজ, যাতে পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে—এ আওয়াজ অর্জুন ছাড়া আর কারো নয় বলে আমার মনে হচ্ছে। দেখ, আমাদের অস্ত্রগুলি অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে, ঘোড়াগুলি যেন ভয় পেয়েছে, অগ্নিহোত্রের অগ্নিও যেন প্রকাশহীন হয়ে পড়েছে। এতে মনে হচ্ছে যুদ্ধের পরিণাম আমাদের পক্ষে ভালো হবে না। যোদ্ধাদের মুখও নিস্তেজ এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সুতরাং আমাদের উচিত এখন গোধনকে হস্তিনাপুরের দিকে পাঠিয়ে ব্যূহরচনা করে দাঁড়ানো।'

রাজা দুর্যোধন তখন ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্যকে বললেন—'আমি এবং কর্ণ একথা আপনাদের কয়েকবার বলেছি এখন আবার বলছি, পাণ্ডবদের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে, জুয়াতে হারলে ওরা দ্বাদশ বছর বনে থাকবে এবং একবছর কোনো নগরে বা বনে অজ্ঞাতবাস করবে। এখনো ওদের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হয়নি, অতএব অর্জুন যদি আমাদের সামনে আসে তাহলে পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসর বনে থাকতে হবে। পিতামহ ভীষ্ম একথা ঠিক করে বলতে পারবেন। তাছাড়া ওই রথে করে মৎস্যরাজ বিরাট আসুন অথবা অর্জুন, আমাদের সবার সঙ্গেই লড়তে হবে। আমরা তাই ঠিক করেই এসেছি। তাহলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা মহারথীরা এরূপ নিরুৎসাহ হয়ে রয়েছেন কেন ? মনে হচ্ছে সকলেই ভয় পেয়ে গেছেন। কিন্তু এই সময় আমাদের পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই, তাই আপনারা সকলে উৎসাহিত হোন। যদি দেবরাজ ইন্দ্র এবং স্বয়ং যমরাজও যুদ্ধ করে গোধন ছিনিয়ে নেন তাহলে এখানে এমন কে আছে যে প্রাণ নিয়ে হস্তিনাপুর ফিরে যেতে চাইবে ?'

দুর্যোধনের কথা শুনে কর্ণ বললেন—'আপনারা আচার্য দ্রোণকে সেনার পিছনে রেখে যুদ্ধনীতি ঠিক করুন, কেননা অর্জুনকে আসতে দেখে উনি তার প্রশংসা করতে শুরু করেছেন। এতে আমাদের সেনার ওপর কী প্রভাব পড়বে ? অতএব আমাদের এমন পন্থা গ্রহণ করা উচিত, যাতে আমাদের সেনাদের মধ্যে কোনো মতভেদ না হয়। এরা অর্জুনের ঘোড়ার রব শুনলে হতচকিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। এখন আমরা ভিন্ন দেশে এক ভয়ানক জঙ্গলে রয়েছি। একে গরমের সময়, তার ওপর শত্রুরা পিছনে নিঃশ্বাস ফেলছে ; এমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত যাতে সেনারা উৎসাহিত হয়, ভয় না পায়। আচার্যরা তো দয়ালু, বুদ্ধিমান এবং হিংসার বিরুদ্ধ নীতিধারণকারী হয়ে থাকেন। সংকটকালে এঁদের পরামর্শ নিতে নেই। পণ্ডিতরা শোভা পান মনোরম মহলে, সভাগৃহে এবং সুন্দর বাগিচায় যেখানে তাঁরা নানাপ্রকার তত্ত্ব কথা শোনাতে পারেন। সুতরাং শত্রুর প্রশংসাকারী এই পণ্ডিতদের পিছনে রেখে এমন নীতির আশ্রয় নাও যাতে শত্রু নাশ হয়। গোধন মধ্যবর্তী স্থানে রাখ, তার চারপাশে ব্যূহরচনা করে রক্ষক নিযুক্ত করে রণক্ষেত্র সামনে রাখ, যাতে আমরা নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করতে পারি। আমি আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সেই অনুযায়ী আজকের যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করে দুর্যোধনের অক্ষয় ঋণ শোধ করে দেব।'

কর্ণের কথা শুনে কৃপাচার্য বললেন—'কর্ণ ! যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত সর্বদাই অত্যন্ত কড়া। তুমি কাজের বিষয়ে চিন্তা করো না এবং তার পরিণামও ভেবে দেখো না। বিচার করলে দেখা যায় যে, আমরা অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখীন

যুদ্ধে সক্ষম নই। সে একাই চিত্রসেন গন্ধর্বের সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমস্ত কৌরবদের রক্ষা করেছে এবং একাই অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছে। কিরাতবেশী ভগবান শংকর ওর সামনে এলে অর্জুন একাই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। নিবাতকবচ এবং কালকেয় দানবদের দেবতারাও অবদমন করতে পারেননি, কিন্তু অর্জুন একাই তাদের বধ করেছে। অর্জুন একাই বহু রাজাকে অধীন করেছে ; এখন কর্ণ আপনি বলুন, আপনি এমন কোনো কাজ করে দেখিয়েছেন কি ? ইন্দ্রেরও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই ; আপনি যে ওর সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে যে, আপনার মাথার ঠিক নেই। আপনার মাথার চিকিৎসা করা উচিত। ঠিক আছে, দ্রোণ, দুর্যোধন, ভীষ্ম, আপনি, অশ্বত্থামা এবং আমি—সবাই মিলে অর্জুনের সম্মুখীন হব ; একা তার সম্মুখীন হওয়ার সাহস করবেন না।'

তারপর অশ্বত্থামা বললেন—'এখনও পর্যন্ত আমরা গোধন নিয়ে যেতে পারিনি এমনকী মৎস্যরাজ্যের সীমানাও পেরোতে পারিনি, হস্তিনাপুরও এখন বহুদূর ; তাহলে কর্ণ তুমি এতো বড় বড় কথা বলছ কেন ? দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রূর এবং নির্লজ্জ ; তা না হলে পাশা খেলায় ছলনা করে রাজ্য জয় করে কোনো ক্ষত্রিয় সন্তুষ্ট হয় ? অতএব যেভাবে তোমরা জুয়া খেলে, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানী জিতে নিয়েছিলে এবং দ্রৌপদীকে জোর করে সভাস্থলে এনেছিলে, সেইভাবে এখন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আরে ! কাল, পবন, মৃত্যু এবং দাবানল যখন কুপিত হয়, তারাও কিছু অবশেষ রেখে যায়, কিন্তু অর্জুন কুপিত হলে কিছুই অবশেষ থাকবে না। তাই যেভাবে তোমরা শকুনির পরামর্শে জুয়া খেলেছিলে, এখন তাঁর পরামর্শেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আর যে যুদ্ধে যেতে চায় যাক, আমি যাব না। গোধন নিতে যদি মৎস্যরাজ বিরাট নিজে আসেন, তবে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই যুদ্ধ করব।'

তখন পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যের বিচারই ঠিক। কর্ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে উতলা হয়ে রয়েছে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই আচার্য দ্রোণের দোষ ধরা উচিত নয়। অর্জুন যদি আমাদের সামনে আসে, তাহলে নিজেদের মধ্যে বিরোধের কোনো অবকাশই নেই। আচার্য কৃপ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে এই সময় ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেনাসম্বন্ধীয় যত দুর্বলতার কথা বলেছেন, তাতে সব থেকে বড় সেনার মধ্যে মতভেদ।'

দুর্যোধন বললেন—'আচার্যগণ ! আমাদের ক্ষমা করুন এবং এখন শান্তি বজায় রাখুন। এখন গুরুদেবের চিত্তে যদি কোনো পার্থক্য না এসে থাকে, তাহলেই আমাদের পক্ষে এগোনো সম্ভব হবে।'

তখন কর্ণ, ভীষ্ম ও কৃপাচার্যের সঙ্গে দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দ্রোণাচার্য তখন শান্ত হয়ে বললেন—'শান্তনুনন্দন যা বলেছেন, তাতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। এবার যুদ্ধের নীতি নির্ধারণ করো। দুর্যোধনের সন্দেহ আছে পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে, কিন্তু তা পূর্ণ না হলে অর্জুন কখনো আমাদের সামনে আসত না। দুর্যোধন এ নিয়ে কয়েকবার সন্দেহ প্রকাশ করেছে। অতএব ভীষ্ম এই বিষয়টি কৃপা করে ঠিক মতো নির্ণয় করুন।'

তখন পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, দিন, পক্ষ, মাস, নক্ষত্র, গ্রহ, ঋতু এবং সংবৎসর—এই সব মিলে এক কালচক্র তৈরি হয়। এটি কলাকাষ্ঠাদির বিভাগে আবর্তিত হয়। এতে সূর্য ও চন্দ্র নক্ষত্রদের লঙ্ঘন করে যায় এবং কাল কিছু বৃদ্ধি পায়। এর জন্য প্রত্যেক পাঁচ বছরে দুমাস বৃদ্ধি পায়। তাই আমার বিচার হল যে,

পাণ্ডবদের এখন ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ করে আরও পাঁচ মাস এবং বারো দিন সময় বেশি হয়ে গেছে। পাণ্ডবরা যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিল, তারা তা ঠিকভাবে পালন করেছে। অর্জুন এখন ঠিকভাবে নিশ্চিত হয়েই আমাদের সামনে এসেছে। ওরা সকলেই মহাত্মা এবং ধর্ম ও অর্থের মর্মজ্ঞ। যুধিষ্ঠির যাঁদের পথপ্রদর্শক, ধর্মের বিষয়ে তারা কী করে ভুল করবে ? পাণ্ডবরা নির্লোভ, তারা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম করেছে ; সুতরাং তারা কোনো নীতিবিরুদ্ধ উপায়ে রাজ্যগ্রহণ করতে চাইবে না। বনবাসের সময়ও তারা তাদের পরাক্রম বলে রাজ্য নিতে সক্ষম ছিল। কিন্তু ধর্মপাশে আবদ্ধ থাকায় তারা ক্ষত্রিয়ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। সুতরাং যে অর্জুনকে মিথ্যাচারী বলবে, তাকেই অপদস্থ হতে হবে। পাণ্ডবরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে, কিন্তু অসত্য কাজ কখনো করবে না। সেই সঙ্গে তাদের শৌর্যও আছে, সময় এলে তারা তাদের নিজের জিনিস, বজ্রধর ইন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত হলেও ছাড়বে না। অতএব রাজন্ ! এখন অর্জুন কাছে এসে পড়েছে, যুদ্ধোচিত বা ধর্মোচিত কোনো কাজ শীঘ্র করো।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতামহ ! আমি পাণ্ডবদের রাজ্য কখনোই দেব না ; সুতরাং এখন যুদ্ধের জন্য যা করা উচিত, তাই শীঘ্র করুন।'

ভীষ্ম বললেন—'এ বিষয়ে আমার কথা শোনো। তুমি এক চতুর্থাংশ সেনা নিয়ে হস্তিনাপুর চলে যাও। দ্বিতীয় চতুর্থাংশ গোধন নিয়ে যাক। বাকী অর্ধেক সৈন্য নিয়ে আমরা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। অর্জুন যুদ্ধ করতে আসছে, অতএব আমি, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য ওর সঙ্গে যুদ্ধ করব। তারপরে যদি রাজা বিরাট বা স্বয়ং ইন্দ্রও আসেন, তাহলে তটের দ্বারা যেমন সমুদ্রকে রোধ করা হয় তেমনই আমি তাকে রোধ করব।'

মহাত্মা ভীষ্মের কথা সকলেরই মনোমতো হল। কৌরবরাজ দুর্যোধন সেইমতোই কাজ করলেন। ভীষ্ম প্রথমেই দুর্যোধন ও গোধনকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর প্রধান প্রধান সেনানীদের নিয়ে ব্যূহরচনা করলেন। তিনি বললেন—'দ্রোণ ! আপনি মধ্যভাগে থাকুন, অশ্বত্থামা বামভাগে, কৃপাচার্য সেনাদের দক্ষিণ ভাগে পার্শ্ব রক্ষা করুন। কর্ণ কবচধারণ করে সেনাদলের সম্মুখে থাকবে আর আমি সমস্ত সেনার পিছনে থেকে তাদের রক্ষা করব।'

—o—

অর্জুনের দুর্যোধনের সম্মুখীন হওয়া, বিকর্ণ ও কর্ণকে পরাজিত করা এবং উত্তরকে কৌরব বীরদের পরিচয় দেওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—কৌরব সেনাদের ব্যূহরচনা হতে না হতেই অর্জুনের রথ ঘর্ঘর শব্দে আকাশ কম্পিত করে সেখানে এসে পড়ল। দ্রোণাচার্য তাই দেখে বললেন—'বীরগণ ! ওই দেখ, দূর থেকেই অর্জুনের ধ্বজার অগ্রভাগ দেখা যাচ্ছে। ওই রথের তুমুল ঘর্ঘর শব্দ এবং রথের ধ্বজায় উপবিষ্ট হনুমান ভয়াবহ শব্দে চতুর্দিক কম্পিত করছে। সেই উত্তম রথে উপবিষ্ট মহারথী অর্জুন বজ্রের ন্যায় গাণ্ডীব ধনুকে টংকার ধ্বনি তুলছে। দেখ ! দুটি বাণ একসঙ্গে আমার পদতলে পড়ল এবং দুটি বাণ আমার কান স্পর্শ করে চলে গেল। অর্জুন অনেক অতিমানবিক কর্ম করে বনবাস থেকে ফিরেছে, তাই এইগুলি দিয়ে সে আমাকে প্রণাম জানাচ্ছে এবং কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করছে। আমাদের প্রিয় অর্জুনকে বহুদিন পরে দেখতে পেলাম।'

এদিকে অর্জুন বললেন—'সারথি ! তুমি রথটি কৌরবসেনাদের কাছাকাছি নিয়ে চলো, যাতে আমি দেখতে পাই কুরুকুলাধম দুর্যোধন কোথায় রয়েছে !'

অর্জুন সমস্ত সেনার মধ্যে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু দুর্যোধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তিনি বললেন, 'মনে হয় দুর্যোধন দক্ষিণদিকের পথ ধরে প্রাণ বাঁচাবার জন্য গোধন নিয়ে পালিয়ে গেছে ! ঠিক আছে এখন এইসব সৈন্যদের ছেড়ে ওদিকে চলো যেদিকে দুর্যোধন গেছে।' অর্জুনের নির্দেশে উত্তর, যেদিকে দুর্যোধন গেছেন, সেইদিকে রথ চালালেন। দুর্যোধনের কাছে পৌঁছে অর্জুন নিজের নাম বলে তাঁর সৈন্যের ওপর বৃষ্টির মতো বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই বাণে সমগ্র আকাশ ঢেকে গেল। অর্জুনের শঙ্খধ্বনি, রথের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ, গাণ্ডীবের টংকারধ্বনি এবং ধ্বজায় বিরাজমান দিব্য প্রাণীর

শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠল এবং গাভীর দল পুচ্ছ উঠিয়ে আওয়াজ করে দক্ষিণ দিকে পালাতে লাগল।

বৈশম্পায়ন বললেন—ধনুর্ধারী শ্রেষ্ঠ অর্জুন শত্রু-সৈন্যকে অবদমিত করে অতি সহজেই গোধন জয় করে নিলেন। তারপরে যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধনের দিকে এগোলেন। কৌরব বীররা দেখলেন গোরুর দল তীব্র গতিতে বিরাটনগরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং অর্জুন দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগোচ্ছেন, তখন তাঁরা অতি শীঘ্র সেই দিকে এলেন। কৌরব সেনাদের দেখে অর্জুন বিরাট রাজপুত্র উত্তরকে বললেন—'রাজকুমার ! দুর্যোধনের সহায়তা পেয়ে আজকাল কর্ণ বড় অহংকারী হয়ে উঠেছে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সে উতলা হয়ে রয়েছে ; সুতরাং আগে কর্ণের দিকে রথ অগ্রসর করো।'

উত্তর অর্জুনের রথ যুদ্ধভূমির মধ্যস্থলে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যেই চিত্রসেন, সংগ্রামজিৎ প্রমুখ মহারথী বীররা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। যুদ্ধ শুরু হলে অর্জুন এঁদের রথগুলি দাবানলের মতো ভস্ম করে দিলেন। এই ভয়ংকর সংগ্রাম দেখে কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বিকর্ণ রথে করে সেখানে উপস্থিত হলেন। এসেই তিনি বিপাঠ নামক বাণ বর্ষণ শুরু করলেন। অর্জুন তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন এবং
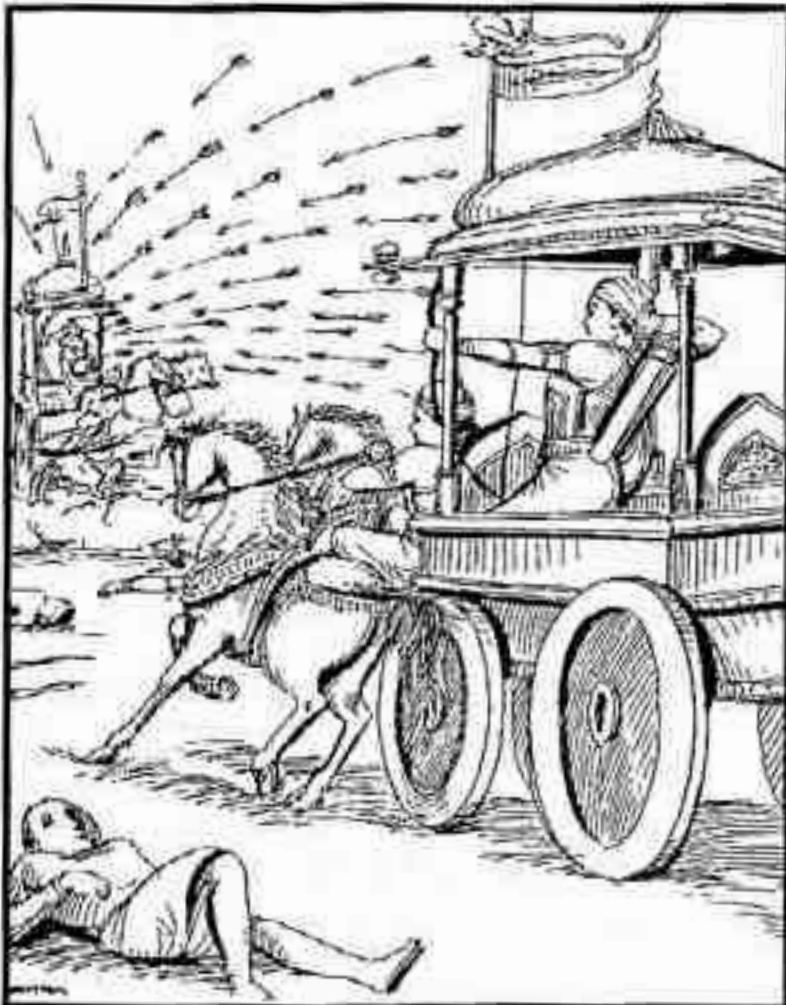
রথের ধ্বজা টুকরো টুকরো করে দিলেন। বিকর্ণ পালিয়ে গেলেন, কিন্তু 'শত্রুন্তপ' নামক রাজা সামনে এসে অর্জুনের হাতে মারা পড়লেন। তারপর প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, তেমনই অর্জুনের বাণে কৌরব সেনার বীররা উৎপাটিত হয়ে পড়তে লাগলেন। বহু বীরের প্রাণ গেল। ইন্দ্রসম পরাক্রমী বীরও এই যুদ্ধে অর্জুনের কাছে পরাস্ত হলেন। তিনি শত্রুসংহার করতে করতে রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন। এর মধ্যে কর্ণের ভাই সংগ্রামজিৎ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। অর্জুন তাঁর রথের লাল ঘোড়াগুলিকে মেরে একবাণেই তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। ভাই মারা গেলে কর্ণ নিজ পরাক্রম দেখাতে অর্জুনের দিকে ছুটে এলেন এবং বারোটি বাণের সাহায্যে অর্জুনকে আঘাত করলেন, তাঁর ঘোড়াকে বিদ্ধ করলেন এবং রাজকুমার উত্তরের হাতেও আঘাত করলেন। তাই দেখে অর্জুনও গরুড় যেমন সাপের দিকে ধেয়ে যায় তেমন করে কর্ণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুজন বীরই ধনুর্ধরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবলী এবং শত্রুর আঘাত সহনকারী। এঁদের দুজনের যুদ্ধ দেখার জন্য সকল কৌরব বীর যে যেখানে ছিলেন দাঁড়িয়ে গেলেন।

অপরাধী কর্ণকে সামনে পেয়ে অর্জুন ক্রোধান্বিত হয়ে এত বাণ ছুঁড়লেন যে, কর্ণ রথ, সারথি ও অশ্বসহ লুকোতে বাধ্য হল। তারপরে অর্জুন অন্যান্য কৌরব যোদ্ধাদেরও রথ ও হাতিসহ ধ্বংস করলেন। ভীষ্ম এবং অন্যান্য সকলেই অর্জুনের বাণে ঢাকা পড়ে গেলেন। সেনাদের মধ্যে হাহাকার রব উঠল। ইতিমধ্যে কর্ণ অর্জুনের সমস্ত বাণ প্রতিহত করলেন এবং ক্রোধভরে তাঁর চারটি ঘোড়া এবং সারথিকে বিদ্ধ করলেন। তিনি রথের ধ্বজা কেটে অর্জুনকেও আঘাত করলেন। কর্ণের বাণে আহত হয়ে অর্জুন সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন এবং পুনরায় কর্ণকে বাণদ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বজ্রের ন্যায় তেজস্বী বাণে কর্ণের হাত, জানু, মস্তক, ললাট, কণ্ঠ ইত্যাদি অঙ্গ বিদ্ধ করলেন। কর্ণের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, তিনি খুবই আহত হলেন। তখন হাতি যেমন একটি হাতির কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তেমনই কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন।

কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে দুর্যোধন ও অন্যান্য বীর নিজ নিজ সেনার সঙ্গে ধীরে ধীরে অর্জুনের দিকে এগোতে লাগলেন। অর্জুন তখন মৃদুহাস্যে দিব্য অস্ত্রদ্বারা কৌরব সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করলেন। সেই সময়

কৌরব সেনাদলে এমন কেউ ছিল না যার দেহে অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাত-চিহ্ন ছিল না। প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অর্জুন শত্রুদের ভস্ম করে দিচ্ছিলেন ; সেই সময় তাঁর তেজস্বীরূপের দিকে কেউ তাকাতেও সাহস করছিল না। অর্জুনের রথকে একবারই নিকটে আসতে দেখা যেত, দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ মিলত না। কারণ তার আগেই অর্জুন তাকে পরলোক পাঠিয়ে দিতেন। সমস্ত কৌরব সৈন্যের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল—এক অর্জুনই পারেন শত্রুপক্ষকে এইভাবে ছত্রভঙ্গ করতে, আর কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো তুলনা হয় না। তিনি দ্রোণাচার্য, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ভীষ্ম, দুর্যোধন সকলকেই তাঁর বাণের দ্বারা আহত করেছিলেন। কর্ণি নামক বাণের দ্বারা কর্ণের কান ছেদন করে তার অশ্ব ও সারথিকে নিহত করেন। তাই দেখে সকল কৌরব সৈন্য চতুর্দিকে পলায়ন করল।

বিরাটকুমার উত্তর তখন অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বিজয় ! এখন আপনি কোন দিকে যাবেন ? আদেশ করুন, আমি সেই দিকেই রথ নিয়ে যাব।' অর্জুন বললেন—'উত্তর ! যে রথের ঘোড়া লাল বর্ণের, যার ওপরে নীল পতাকা উড্ডীয়মান, সে রথে কল্যাণকারী বেশে যে ব্যাঘ্রচর্মধারী মহাপুরুষকে দেখা যাচ্ছে, তিনিই কৃপাচার্য এবং পাশে তাঁরই সেনা। তুমি আমাকে ওই সেনার নিকটে নিয়ে চলো। আর দেখ যাঁর ধ্বজায় স্বর্ণময় কমণ্ডলু চিহ্ন, তিনি হলেন সমস্ত শস্ত্রধারীদের শ্রেষ্ঠ আচার্য দ্রোণ। তুমি রথ নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করো। তিনি যদি আমাকে আঘাত করেন, তাহলেই আমি তাঁর ওপর অস্ত্রাঘাত করব, তাতে তিনি কুপিত হবেন না। তাঁর থেকে একটু দূরে, যাঁর ধ্বজায় 'ধনুক' চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, তিনি হলেন আচার্য দ্রোণের পুত্র মহারথী অশ্বত্থামা। আর অন্য যে রথটিতে সেনার মধ্যে সুবর্ণ কবচ ধারণ করে আছে, যার ধ্বজায় সুবর্ণময় হাতি চিহ্ন, সেটি হল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র রাজা দুর্যোধনের। যার ধ্বজার অগ্রভাগে হাতির সুন্দর শুঁড় দেখা যাচ্ছে, সে হল কর্ণ, তা তো তুমি আগেই জেনে গেছ। যাঁর সুন্দর রথের ওপর সুবর্ণময় পাঁচমণ্ডলসম্পন্ন নীল রঙের পতাকা উড্ডীয়মান, যাঁর ধনুক বিশাল এবং যিনি মহাপরাক্রমশালী, যাঁর সুন্দর রথে সূর্য ও নক্ষত্র চিহ্ন যুক্ত অনেক ধ্বজা, মস্তকে সোনার টুপি এবং তার ওপর শ্বেতছত্র শোভা পাচ্ছে, যা আমার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে—ইনি আমাদের সকলের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। এঁর কাছে সব থেকে পরে যেতে হবে ; কারণ ইনি আমার কাজে বিঘ্ন ঘটাবেন না।'

অর্জুনের কথা শুনে উত্তর সতর্ক হয়ে যেখানে কৃপাচার্যের রথ দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দিকে অর্জুনের রথ নিয়ে গেলেন।

—o—

আচার্য কৃপ এবং দ্রোণের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—বিরাটকুমার রথ নিয়ে কৃপাচার্যকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তারপর তাঁর সামনে রথটি স্থাপন করলেন। অর্জুন তখন তাঁর নাম বলে পরিচয় জানালেন এবং জোরে দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। সেই আওয়াজে মনে হল পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মহারথী কৃপাচার্যও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শঙ্খ বাজালে তার আওয়াজ ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হল। তারপর তিনি ধনুক হাতে অর্জুনের ওপর দশ হাজার বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং ভীষণ গর্জন করতে লাগলেন। অর্জুন তখন তাঁর ভল্ল নামক তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে কৃপাচার্যের ধনুক এবং কবচ টুকরো টুকরো করে দিলেন। কিন্তু তাঁর শরীরে কোনো আঘাত করলেন না। কৃপাচার্য আর একটি ধনুক নিলে তিনি সেটিও কেটে ফেললেন। এইভাবে অর্জুন কৃপাচার্যের কয়েকটি ধনুক কেটে ফেললে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে প্রজ্বলিত বজ্রের ন্যায় এক শক্তি অর্জুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন। উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত শক্তি তাঁর দিকে আসতে দেখে অর্জুন দশবাণ দিয়ে সেটি প্রতিহত করলেন। তারপর তিনি বাণের আঘাতে রথের চারটি ঘোড়াকে নিহত করলেন এবং রথের রশি কেটে দিলেন। অপর একবাণে সারথির মাথা কেটে ফেললেন। ধনুক, রথ, ঘোড়া এবং সারথি সব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃপাচার্য হাতে গদা নিয়ে নেমে এসে অর্জুনের ওপরে সেটি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন বাণের দ্বারা গদাকে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিলেন। এবারে কৃপাচার্যের সঙ্গী সৈন্যরা চারদিক থেকে কুন্তীনন্দনকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে

লাগল। তাই দেখে বিরাটকুমার রথকে বামদিকে ঘুরিয়ে 'যমক' নামক মণ্ডল তৈরি করে শত্রুর গতি রুদ্ধ করলেন। তখন কৃপাচার্যের সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে অর্জুনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

কৃপাচার্যকে রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে লাল ঘোড়াবিশিষ্ট রথে করে দ্রোণাচার্য অর্জুনকে ধনুর্বাণ হাতে আক্রমণ করলেন। দুজনেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, ধৈর্যশালী এবং মহাবলবান। দুজনেই পরাজয় কাকে বলে জানেন না। দুই গুরু শিষ্যের সম্মুখ যুদ্ধ দেখে ভরত বংশীয় বিশাল সেনা ভীত কম্পিত হয়ে পড়েছিল। মহারথী অর্জুন তাঁর রথ দ্রোণাচার্যের রথের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করে বললেন—'যুদ্ধে সদা বিজয়ী হে গুরুদেব ! আমরা আজকাল বনে বিচরণ করে থাকি, এবার শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই ; আপনি আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। আমি ঠিক করেছি, যতক্ষণ আপনি আমাদের ওপর অস্ত্রনিক্ষেপ না করছেন, আমিও অস্ত্র নিক্ষেপ করব না ; সুতরাং আপনি আগে অস্ত্র ধরুন।'

আচার্য দ্রোণ তখন অর্জুনকে লক্ষ্য করে একুশটি বাণ নিক্ষেপ করলেন ; সেই বাণগুলি লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই অর্জুন তা কেটে ফেললেন। তারপর দ্রোণ তাঁর অস্ত্রকৌশলে হাজার হাজার বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, অর্জুনের শ্বেতবর্ণের ঘোড়াগুলিও আহত হল। এইভাবে উভয়েই সমানভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুজনেই তেজস্বী ও পরাক্রমশালী বীর। দুজনেরই বেগ ছিল বায়ুর মতো তীব্র এবং দুজনেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে জানতেন। সুতরাং তাঁদের দুজনের যুদ্ধ দেখে উপস্থিত রাজারা মোহিত হলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—'অর্জুন ব্যতীত আর কে আছেন যে যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হতে পারেন ? ক্ষত্রিয়ের ধর্মও কী কঠিন, যার জন্য অর্জুনকেও নিজ গুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে!' দ্রোণাচার্য ঐন্দ্র, বায়ব্য এবং আগ্নেয় ইত্যাদি যে সব অস্ত্র অর্জুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন সে সবই তাঁর দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে নষ্ট করে দিলেন। আকাশচারী দেবতারা আচার্য দ্রোণের প্রশংসা করে বললেন, 'সমস্ত দৈত্য ও দেবতাদের জয় করেছেন যে প্রবল প্রতাপশালী অর্জুন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে দ্রোণাচার্য অত্যন্ত দুষ্কর কাজ করেছেন।'

অর্জুন যুদ্ধ কলা অতি উত্তমভাবে শিক্ষা করেছিলেন, তাঁর নিশানা কখনো ভুল হত না, বাণ চালনায় তিনি খুবই ক্ষিপ্রগতি ছিলেন এবং তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণ বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করত। এইসব দেখে আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। গাণ্ডীব ধনুক উঠিয়ে অর্জুন যখন দুই হাতে গুণ টানলেন তখন বাণের বর্ষায় আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল এবং যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা আশ্চর্য হয়ে ধন্য ধন্য করল। এইভাবে আচার্য দ্রোণের রথ যখন বাণের বর্ষায় ঢেকে গেল, তখন তাঁর সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল। দ্রোণাচার্যের রথের ধ্বজা কেটে গিয়েছিল, তাঁর শরীরও বাণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ; দ্রোণ একটু সুযোগ পেয়েই তাঁর দ্রুতগামী ঘোড়ায় করে রণভূমির গণ্ডি অতিক্রম করলেন।

——o——

অর্জুনের সঙ্গে অশ্বত্থামা ও কর্ণের যুদ্ধ এবং তাদের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—এরপর অশ্বত্থামা অর্জুনের ওপর আক্রমণ করলেন। মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, তেমনই অশ্বত্থামার ধনুক থেকে বাণবর্ষণ হতে লাগল। তার বেগ বায়ুর মতো প্রচণ্ড হলেও অর্জুন তাকে প্রতিহত করে নিজ বাণের সাহায্যে অশ্বত্থামার ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করে দিলেন। মহাবলী অশ্বত্থামাও অর্জুনের এতটুকু অসতর্কতার অবকাশে একটি বাণের সাহায্যে তাঁর ধনুকের ছিলা কেটে দিলেন। অশ্বত্থামার এই কাজ দেখে দেবতাদের সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ ও কৃপাচার্য তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর অশ্বত্থামা তাঁর শ্রেষ্ঠ ধনুক দিয়ে অর্জুনের দেহ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। তারপর দুজনে রোমাঞ্চকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। দুজনেই মহা শূরবীর, দুজনেই দুজনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুনের কাছে ছিল দিব্য তূণীর, যাতে কখনো বাণের অভাব হত না ; তাই তিনি যুদ্ধে পর্বতের ন্যায় অচল থাকতেন। এদিকে অশ্বত্থামা এত বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন যে, তাঁর বাণ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর থেকে অর্জুন যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন। তাই দেখে কর্ণ তাঁর ধনুকে টংকার তুললেন, সেই শব্দে অর্জুন তাকিয়ে কর্ণকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে অর্জুন ক্রোধান্বিত হয়ে কর্ণকে বধ করার ইচ্ছায় তাঁর দিকে রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি অশ্বত্থামাকে ছেড়ে সহসা কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'কর্ণ ! তুমি যে সভার মধ্যে অহংকার করে বলতে যে, যুদ্ধে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই, সেই কথা প্রমাণ করার আজ সময় এসেছে। আমার সঙ্গে যুদ্ধ না করেই যে তুমি এতদিন বড় বড় কথা বলে এসেছ, আজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি তা প্রমাণ করো। মনে আছে, সভার মধ্যে দ্রৌপদীকে দুষ্ট লোকেরা যখন কষ্ট দিচ্ছিল, তখন তুমি মজা দেখছিলে ? আজ সেই অন্যায়ের ফলভোগ করো। তখন আমি ধর্মবন্ধনে বাঁধা থাকায় সব কিছু সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলাম, আজ সেই ক্রোধের ফল এই যুদ্ধে আমার বিজয়ের রূপে তুমি দেখ।'

কর্ণ বললেন—'অর্জুন ! তুমি যা বলছ, তা করে দেখাও। অনেক বড় বড় কথা বলছ ; কিন্তু তুমি যে কাজ করেছ, তা কারো কাছে গোপন নেই। আগে তুমি যা সহ্য করেছ, তোমার অক্ষমতাই তার কারণ। আজ যদি তোমার পরাক্রম দেখি, তবে তা স্বীকার করব। আমার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা নতুন বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আজ তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার পরাক্রমও দেখ।'

অর্জুন বললেন—'রাধাপুত্র ! কিছুক্ষণ আগেই তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে ; তাই তোমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, শুধু তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মারা গেছে। তুমি ছাড়া এমন কে আছে যে ভাইকে মরতে দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তারপরে আবার এসে এমন বড় বড় কথা বলে ?'

এই বলে অর্জুন কর্ণের কবচ ছিন্নভিন্ন করার জন্য বাণ ছুঁড়লেন। কর্ণও বাণ ছুঁড়ে তা প্রতিরোধ করতে লাগলেন। অর্জুন বারংবার বাণ দিয়ে কর্ণের ঘোড়াগুলি বিদ্ধ করলেন, তাঁর হাতের ঢাল কেটে ফেললেন, রথের রশি কেটে ফেললেন। তখন কর্ণ তূণীর থেকে তীর উঠিয়ে অর্জুনের হাতে বিদ্ধ করলেন। অর্জুন কর্ণের ধনুক কেটে ফেললেন। ধনুক কেটে যেতে কর্ণ শক্তিপ্রয়োগ করলেন, কিন্তু সেটি আঘাত করার আগেই অর্জুন তাকে কেটে ফেললেন। তাই দেখে কর্ণের অনুগামী যোদ্ধারা একযোগে অর্জুনকে
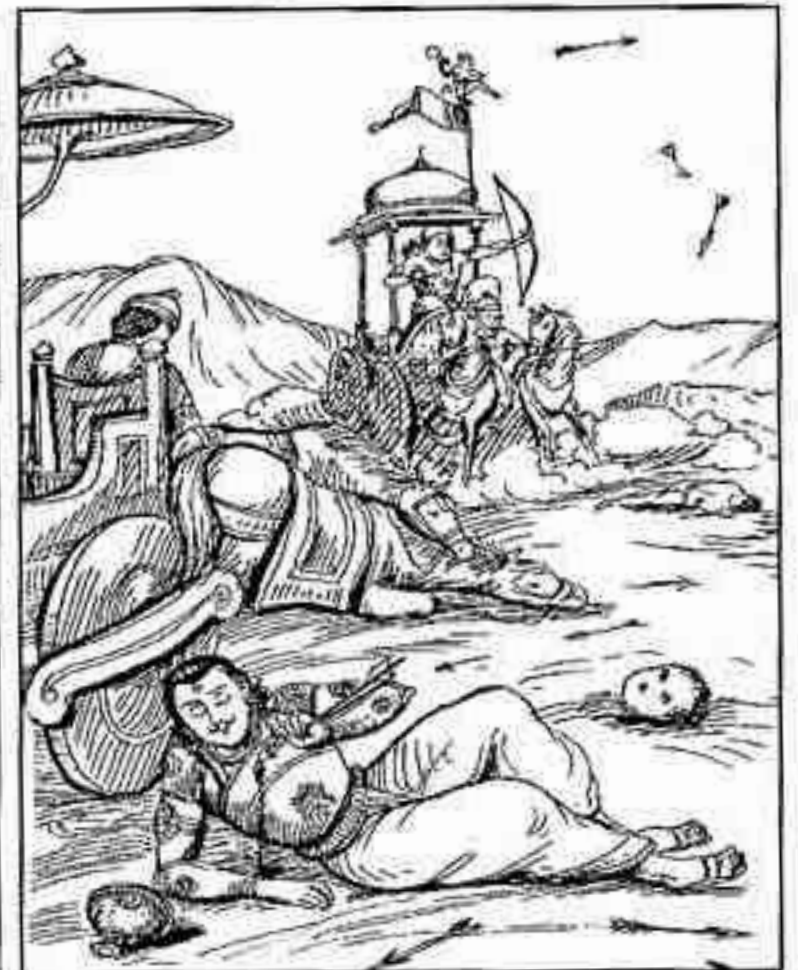
আক্রমণ করল। অর্জুনের গাণ্ডীব থেকে নিক্ষিপ্ত বাণে তারা সকলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। অর্জুন তারপর কর্ণের রথের ঘোড়াগুলি বধ করলেন। এরপর অর্জুন এক তেজস্বী বাণ কর্ণের দিকে নিক্ষেপ করলেন, সেই বাণ কর্ণের কবচ ভেদ করে তাঁর বুকে আঘাত করল। কর্ণ অচেতন হয়ে পড়লেন, পরে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে উত্তর দিকে পালিয়ে গেলেন। মহারথী অর্জুন এবং উত্তর উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগলেন।

—o—

অর্জুন ও ভীষ্মের যুদ্ধ এবং ভীষ্মের মূর্ছা যাওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—কর্ণকে পরাজিত করার পর অর্জুন উত্তরকে বললেন—'যেখানে রথের ধ্বজায় স্বর্ণময় তারকা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, আমাকে সেই সেনাদের কাছে নিয়ে চলো। সেখানে আমার পিতামহ, যাঁকে দেবতার ন্যায় দেখতে, রথে বিরাজমান রয়েছেন এবং তিনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান।' উত্তরের দেহও বাণের আঘাতে আহত হয়েছিল। তাই অর্জুনকে তিনি বললেন—'বীরবর ! আমি আর আপনার ঘোড়াগুলি বশে রাখতে পারছি না। আমার প্রাণ সংশয় হয়েছে, আমি একটু ভয় পেয়েছি। আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে আমি এত বড় বড় যোদ্ধার সমাবেশ দেখিনি। আপনার সঙ্গে এঁদের যুদ্ধ দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। এইসব অস্ত্রশস্ত্রের ঢক্কা-নিনাদ শুনে শুনে আমি বধির হয়ে যাচ্ছি, স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন আমার আর চাবুক ও রথের রশি ধরার শক্তি নেই।'

অর্জুন বললেন—'নরশ্রেষ্ঠ ! ভয় পেয়ো না, ধৈর্য ধরো ; তুমিও যুদ্ধে বড় অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়েছ। তুমি রাজার পুত্র, শত্রু দমনকারী মৎস্যনরেশের বিখ্যাত বংশে তোমার জন্ম। তাই এই সময়ে তোমার নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। রাজপুত্র ! ঠিকভাবে ধৈর্য ধরে বস এবং ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করো। চলো, এবার ভীষ্মের সেনার সামনে যাই আর দেখ আমি কীভাবে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করি। আজ দেখবে সমস্ত সৈন্য কেমন চক্রের ন্যায় ঘোরে। আমি এখন তোমায় বাণ চালানো এবং অন্যান্য অস্ত্র সঞ্চালনও শেখাবো। আমি মুষ্ঠি দৃঢ় করা ইন্দ্রের কাছ থেকে, হাতির ন্যায় তেজ ব্রহ্মার কাছ থেকে এবং সংকটের সময় বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করার কৌশল প্রজাপতির কাছে শিখেছি। এইভাবে রুদ্রের কাছে রুদ্রাস্ত্র, বরুণের কাছে বারুণাস্ত্র, অগ্নির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বায়ুদেবতার কাছে বায়ব্যাস্ত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং তুমি ভয় পেয়ো না, আমি একাই কৌরবরূপী বন উজাড় করে দেব।'

অর্জুন যখন এইভাবে উত্তরকে শান্ত করলেন, তখন উত্তর তাঁর রথ ভীষ্মদ্বারা সুরক্ষিত সেনার কাছে নিয়ে গেলেন। কৌরবদের পরাস্ত করার ইচ্ছায় অর্জুনকে তাঁর দিকে আসতে দেখে ভীষণ পরাক্রমশালী ভীষ্ম ধৈর্য সহকারে তাঁর গতিরোধ করলেন। অর্জুন বাণের আঘাতে ভীষ্মের রথের ধ্বজা কেটে ফেলে দিলেন। এই সময় মহাবলী দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ এবং বিবিংশতি এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। দুঃশাসন এক বাণে উত্তরকে বিদ্ধ করলেন এবং অপর বাণে অর্জুনের বুক বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে দুঃশাসনের সুবর্ণমণ্ডিত ধনুক কেটে দিলেন এবং তাঁকে পাঁচটি বাণ মারলেন। সেই বাণের আঘাতে দুঃশাসন অত্যন্ত পীড়িত হলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। এরপর বিকর্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন তাঁর কপালে একটি বাণ মারতেই তিনি আহত হয়ে রথ থেকে পড়ে গেলেন। তারপর দুঃসহ ও বিবিংশতি ভাইদের

প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একযোগে এসে অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুন একটুও বিচলিত হলেন না, তিনি দুটি তীক্ষ্ণ বাণে দুজনকে একসঙ্গে বিদ্ধ করলেন এবং ঘোড়াগুলিও বধ করলেন। তাঁদের সহচররা যখন দেখল যে, তাঁদের ঘোড়া মারা গেছে এবং দুঃসহ ও বিবিংশতি রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে আছেন, তখন তারা তাদের অন্য রথে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে গেল। অর্জুন রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

জনমেজয় ! ধনঞ্জয়ের এরূপ পরাক্রম দেখে দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা এবং মহারথী কৃপাচার্য ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বধ করার জন্য ধনুকে টংকার দিতে দিতে পুনরায় অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তাঁরা একযোগে অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁদের দিব্যাস্ত্র সব দিক আচ্ছন্ন করায় অর্জুনের দেহের এমন কোনো অংশ বাকী ছিল না, যেখানে বাণ বিদ্ধ হয়নি। সেই অবস্থাতে তিনি মৃদুহাস্যে গাণ্ডীবে ঐন্দ্র-অস্ত্র সন্ধান করে বাণের বর্ষায় কৌরবদের আচ্ছন্ন করে দিলেন। রণভূমিতে উপস্থিত হাতি ও রথের সওয়ার সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সমস্ত সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, সমস্ত যোদ্ধা জীবন রক্ষার জন্য প্রাণভয়ে পালাতে লাগল।

তাই দেখে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বর্ণখচিত ধনুক এবং মর্মভেদী বাণ নিয়ে এসে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তিনি অর্জুনের ধ্বজায় আটটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। তাঁর ধ্বজায় স্থিত বানর এবং তার অগ্রেস্থিত ভূতাদিও আহত হল। অর্জুন তখন এক বিশাল ভল্লের সাহায্যে ছত্র কেটে ফেললেন, সেটি মাটিতে পড়ে গেল। সেইসঙ্গে তিনি তাঁর ধ্বজায় বাণ দ্বারা আঘাত হানলেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর ঘোড়াগুলি, পার্শ্বরক্ষক এবং সারথিকেও আহত করলেন। পিতামহ ভীষ্ম আর সহ্য করতে না পেরে অর্জুনের ওপর দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। উত্তরে অর্জুনও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। দুই মহাবলী বীরের মধ্যে এইসময় বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ভয়ংকর রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হতে লাগল। কৌরবরা প্রশংসা করে বলতে লাগল—'ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যে যুদ্ধ শুরু করেছেন, তা অত্যন্ত দুষ্কর কাজ। অর্জুন বলবান, তরুণ, রণকৌশলী এবং ক্ষিপ্রতাসম্পন্ন ; যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম এবং দ্রোণ ছাড়া আর কে তাঁর বেগ সহ্য করতে পারবেন ? অর্জুন এবং ভীষ্ম দুই মহাপুরুষই এই যুদ্ধে প্রজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, বারুণ, কৌবের, যাম্য এবং বায়ব্য ইত্যাদি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করছেন।'

অর্জুন এবং ভীষ্ম সকল অস্ত্রেই কুশল ছিলেন। প্রথমে এঁরা দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে যুদ্ধ করলেন। তারপর বাণ দিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন। অর্জুন ভীষ্মের স্বর্ণময় ধনুক কেটে ফেললেন। মহারথী ভীষ্ম তখনই অন্য একটি ধনুক নিয়ে তাতে ছিলা পরালেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর বাণে অর্জুনের বামভাগ বিদ্ধ করলেন। অর্জুন তখন হেসে তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে

ভীষ্মের ধনুক টুকরো করে দিলেন। তারপর দশটি বাণে তাঁর বুকে আঘাত করলেন। ভীষ্ম এতে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে রথের দণ্ড ধরে বহুক্ষণ বসে রইলেন। ভীষ্মকে অচেতন দেখে সারথি তার কর্তব্য মনে করে তাঁকে রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধভূমির বাইরে নিয়ে গেলেন।

———০———

দুর্যোধনের পরাজয়, কৌরব সেনার মোহগ্রস্ত হয়ে কুরুদেশে প্রত্যাবর্তন

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীষ্ম যখন সংগ্রামভূমি ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন, তখন দুর্যোধন তাঁর রথের পতাকা উড়িয়ে হাতে ধনুক নিয়ে গর্জন করতে করতে ধনঞ্জয়ের ওপর আক্রমণ করলেন। তিনি অর্জুনের ললাট লক্ষ্য করে বাণ ছুড়লেন ; অর্জুনের ললাট ঘেঁষে সেই বাণ বেরিয়ে গেল আর গরম রক্তের ধারা তাঁর ললাট থেকে গড়িয়ে পড়ল। অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিষাগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে দুর্যোধনকে আঘাত করতে শুরু করলেন। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। অর্জুনের একটি বাণে দুর্যোধনের বুকে আঘাত লাগায় দুর্যোধন আহত হয়ে পড়লেন। অর্জুন তারপর সমস্ত প্রধান সেনানীদের মেরে রণক্ষেত্র থেকে ফেরত পাঠালেন। যোদ্ধাদের পালাতে দেখে দুর্যোধনও তাঁর

রথ ঘুরিয়ে পালাতে লাগলেন। অর্জুন দেখলেন দুর্যোধন আহত হয়ে রক্তবমন করতে করতে অত্যন্ত বেগে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন ; তখন তিনি দুর্যোধনকে আহ্বান করে বললেন—'ধৃতরাষ্ট্রনন্দন ! যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাচ্ছ কেন ? এতে তোমার বিশাল কীর্তিনাশ হবে। তোমার বিজয়ের বাদ্য আগে যেমন বাজত, আর তা বাজবে না। তুমি যে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছ, আজ তাঁরই আদেশ পালনকারী ভ্রাতা যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, তোমার মুখটা একবার দেখাও। বীর দুর্যোধন, রাজার কর্তব্য স্মরণ করো। এখন তোমার সামনে পিছনে কেউ আর রক্ষাকারী নেই, অতএব পালাও, পালিয়ে পাণ্ডবদের হাত থেকে তোমার প্রিয় প্রাণকে রক্ষা করো।'

মহাত্মা অর্জুন এইভাবে যুদ্ধে আহ্বান করায় আহত মত্ত হাতীর ন্যায় দুর্যোধন ফিরে এলেন। ক্ষত-বিক্ষত শরীর কোনোমতে সামলে নিয়ে তাঁকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরতে দেখে উত্তর দিক থেকে কর্ণ দুর্যোধনের রক্ষার জন্য এলেন। পশ্চিম দিক থেকে ভীষ্মও তাঁর ধনুক উঁচিয়ে এগিয়ে এলেন। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বিবিংশতি ও দুঃশাসনও অস্ত্রাদি নিয়ে সত্বর চলে এলেন। দিব্য অস্ত্র ধারণ করে এই সব যোদ্ধারা অর্জুনকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন আর বৃষ্টির ন্যায় বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর অস্ত্র দিয়ে এঁদের অস্ত্র নিবারণ করলেন এবং কৌরবদের লক্ষ্য করে সম্মোহন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, যা নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তারপর অর্জুন দুই হাতে শঙ্খ তুলে ভয়ংকর শব্দে উচ্চৈঃস্বরে সেটি বাজালেন। শঙ্খের সেই গম্ভীর ধ্বনিতে দিক-বিদিক, আকাশ-বাতাস, পৃথিবী কেঁপে উঠল। অর্জুনের শঙ্খের আওয়াজে কৌরব বীররা অচেতন হয়ে পড়লেন, তাঁদের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র পড়ে গেল—তাঁরা শান্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন।

তাঁদের অচেতন হতে দেখে অর্জুনের উত্তরার কথা স্মরণ হল, তিনি তখন উত্তরকে বললেন—'রাজকুমার ! এঁদের চেতনা ফিরে আসার আগেই, তুমি এই সেনাদের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের শ্বেতবস্ত্র, কর্ণের হলুদ বস্ত্র, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্র নিয়ে এসো। আমার মনে হয় পিতামহ ভীষ্ম সচেতন আছেন, কারণ তিনি সম্মোহনাস্ত্র নিবারণ করতে জানেন। তাই তাঁর ঘোড়াগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাবে, কেননা যিনি অচেতন হননি, তাঁর থেকে সাবধানে থাকা উচিত।'

অর্জুনের কথায় রাজকুমার উত্তর ঘোড়ার রশি ছেড়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে মহারথীদের বস্ত্র নিয়ে ফিরে আবার রথে এসে বসলেন। তারপর রথ চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে এলেন। অর্জুনকে চলে যেতে দেখে ভীষ্ম তাঁর দিকে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। অর্জুনও তাঁর ঘোড়াদের দশবাণে বিদ্ধ করলেন। পরে তাঁর সারথিরও প্রাণনাশ করলেন। তারপর অর্জুন যুদ্ধভূমি থেকে বাইরে চলে এলেন। তখন তাঁকে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

পরে সমস্ত কৌরব ক্রমশ চেতনা ফিরে পেল। দুর্যোধন যখন দেখলেন অর্জুন যুদ্ধভূমির বাইরে একা দাঁড়িয়ে তখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! ও আপনার হাত থেকে রক্ষা পেল কী করে ? এখনই ওকে শেষ করুন, যেন পালাতে না পারে।' ভীষ্ম হেসে বললেন—'কুরুরাজ ! যখন তুমি অস্ত্র ছেড়ে অচেতন হয়ে এখানে পড়েছিলে, তখন তোমার বুদ্ধি কোথায় ছিল ? পরাক্রম কোথায় গিয়েছিল ? অর্জুন কখনো নির্দয় ব্যবহার করতে পারে না, তার মন কখনো পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় না ; ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও সে কখনো নিজ ধর্ম ত্যাগ করবে না। সেইজন্যই অর্জুন এই যুদ্ধে আমাদের বধ করেনি। এখন চলো, শীঘ্র কুরুদেশে ফিরে যাই। অর্জুনও গোধন জিতে নিয়ে ফিরে যাবে। মোহবশত নিজ স্বার্থ নষ্ট কোরো না ; সকলেরই নিজের হিতের জন্য কাজ করা উচিত।'

পিতামহের হিতকর কথা শুনে দুর্যোধন দেখলেন এই যুদ্ধে আর কোনো আশা নেই। তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। ভীষ্মের কথা অন্য যোদ্ধাদেরও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল। যুদ্ধ করলে অর্জুনরূপী অগ্নি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তাই সকলে দুর্যোধনকে রক্ষা করার জন্য ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন।

কৌরব বীরদের ফিরে যেতে দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁর পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকে মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং অন্যান্য কুরুবংশীয় পূজ্য ব্যক্তিদের বাণের দ্বারা বিচিত্র রীতিতে প্রণাম জানালেন। তারপর এক বাণে দুর্যোধনের রত্নখচিত মুকুটটি দু-টুকরো করে দিলেন। এরপর তিনি গাণ্ডীবে টংকার দিয়ে, দেবদত্ত শঙ্খ বাজিয়ে শত্রুর হৃদয় কম্পিত করে দিলেন। সেইসময় তাঁর রথের সুবর্ণমালামণ্ডিত ধ্বজা সমস্ত শত্রুকে পদানত করে বিজয়োল্লাসে সুশোভিত হচ্ছিল। কৌরবরা ফিরে গেলে অর্জুন প্রসন্ন হয়ে বললেন—'রাজকুমার ! এবার ঘোড়াদের ফেরাও। তোমাদের গোধন আমরা জয় করেছি, শত্রু চলে গেছে ; অতএব আনন্দ সহকারে নগরে ফিরে চলো।'

অর্জুনের সঙ্গে কৌরবদের এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর পরাক্রম স্মরণ করতে করতে নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন।

———০———

উত্তরের নগরে প্রবেশ এবং সম্বর্ধিত হওয়া, রাজা বিরাট কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের অপমান এবং পরে ক্ষমা প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বললেন—এইরূপ উত্তমদৃষ্টিসম্পন্ন অর্জুন কৌরবদের যুদ্ধে পরাস্ত করে বিরাটরাজার বিশাল গোধন ফিরিয়ে আনলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা যখন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চলে গেলেন, তখন কৌরবদের বহু সৈনিক যারা এদিক-ওদিকে লুকিয়ে ছিল, তারা ভয়ে ভয়ে অর্জুনের কাছে এল। তারা ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত। বিদেশ বিভুঁই হওয়ায় তাদের কষ্ট আরও বেড়ে গিয়েছিল। তারা অর্জুনকে প্রণাম করে বলল, 'কুন্তীনন্দন ! আমরা আপনার আদেশ পালন করব।'

অর্জুন বললেন—'তোমাদের কল্যাণ হোক ! ভয় পেয়ো না, নিজ রাজ্যে ফিরে যাও। যারা বিপদগ্রস্ত আমি তাদের মারি না। তোমরা বিশ্বাস রাখ।'

অভয়বাণী শুনে তারা সকলে আয়ু, কীর্তি ও যশপ্রদান-রূপ আশীর্বাদে অর্জুনকে প্রসন্ন করলেন। তারপর অর্জুন উত্তরকে আলিঙ্গন করে বললেন—'পুত্র ! তুমি তো জেনে গেছ যে, তোমার পিতার কাছে পাণ্ডবরা বসবাস করছে ; কিন্তু নগরে প্রবেশ করে তুমি পাণ্ডবদের প্রশংসা করবে না, তাহলে তোমার পিতা ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন।' উত্তর বললেন—'সব্যসাচী ! যতদিন পর্যন্ত আপনি এটি প্রকাশ করতে নিজে আমাকে না বলবেন, ততদিন আমি পিতাকে এই বিষয়ে কিছুই বলব না।'

তারপর অর্জুন আবার সেই শ্মশানের কাছে এসে সেই শমীবৃক্ষের কাছে দাঁড়ালেন। তখন রথের ধ্বজার ওপর স্থিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বিশালকায় বানর শক্তিরূপে আকাশে চলে গেল। এইভাবে সমস্ত মায়া বিলীন হয়ে গেল। তারপর রথের ওপর সিংহ চিহ্নিত রাজা বিরাটের ধ্বজা লাগালেন এবং অর্জুনের সমস্ত অস্ত্র গাণ্ডীবসহ পুনরায় শমীবৃক্ষের ডালে বেঁধে রাখলেন। এবার অর্জুন সারথি হয়ে রথের রশি ধরে বসলেন এবং উত্তর আনন্দ সহকারে নগরের দিকে চললেন। অর্জুন আবার মাথায় বেণী বেঁধে বৃহন্নলা সেজে চললেন। পথে তিনি উত্তরকে বললেন—'রাজকুমার ! এখন গোয়ালাদের নির্দেশ দাও তারা যেন শীঘ্র নগরে গিয়ে এই আনন্দ সংবাদ জানায় এবং তোমার বিজয়ের কথা ঘোষণা করে।'

অর্জুনের কথা মেনে উত্তর তখনই দূতদের আদেশ

দিলেন—'তোমরা নগরে পৌঁছে খবর দাও যে, শত্রু পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে, আমরা বিজয়ী হয়েছি এবং গোধন জিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।'

জনমেজয় ! সেনাপতি রাজা বিরাটও দক্ষিণ দিক থেকে গোধন জিতে চার পাণ্ডবকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। তিনি যুদ্ধে ত্রিগর্তের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি যখন গোধন নিয়ে পাণ্ডবগণ-সহ পদার্পণ করলেন, তখন তাঁর বিজয়শ্রী অপরূপ শোভা ধারণ করেছিল। রাজসভায় এসে তিনি সিংহাসন সুশোভিত করলেন, তাঁকে দেখে তাঁর আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সকলে পাণ্ডবদের সঙ্গে রাজার সেবা করতে লাগল। রাজা বিরাট জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজকুমার উত্তর কোথায় ?' তার উত্তরে রানিমহলের নারী ও কন্যারা জানাল 'মহারাজ ! আপনি যুদ্ধে যাওয়ার পর কৌরবরা এখানে এসে গো-ধন হরণ করে নিয়ে যেতে থাকে। তখন কুমার উত্তর ক্রোধান্বিত হয়ে অত্যন্ত সাহস দেখিয়ে একাই তাদের পরাস্ত করতে গেছে। সঙ্গে বৃহন্নলা তার সারথিরূপে

গেছেন। কৌরব সেনাতে ভীষ্ম, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা—এই ছয় মহারথী এসেছেন।'

বিরাট যখন শুনলেন যে, তাঁর পুত্র একাই বৃহন্নলাকে সারথি করে মাত্র একটি রথ নিয়ে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে বললেন—'আমার যে সব যোদ্ধা ত্রিগর্তের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়নি তারা যেন শীঘ্র বহু সৈন্য নিয়ে উত্তরের রক্ষার জন্য চলে যায়।' সৈন্যদের যাওয়ার আদেশ দিয়ে তিনি পুনরায় মন্ত্রীদের বললেন—'আগে শীঘ্র খবর নাও রাজকুমার জীবিত আছে কি না। যার সারথি এক নপুংসক, তার এতক্ষণ জীবিত থাকার সম্ভাবনা নেই।'

রাজা বিরাটকে দুঃখিত ও চিন্তিত দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হেসে বললেন—'রাজন্ ! বৃহন্নলা যদি সারথিরূপে গিয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বাস করুন আপনার পুত্র সমস্ত রাজাদের, কৌরব এবং দেবতা, অসুর, সিদ্ধ এবং যক্ষদেরও যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে।' এর মধ্যে উত্তরের প্রেরিত দূত বিরাট নগরে এসে পৌঁছাল এবং উত্তর রাজকুমারের বিজয় সংবাদ জানাল। সেই খবর শুনে মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বললেন—'মহারাজ ! উত্তর সমস্ত গোধন জিতে এবং কৌরবদের পরাজিত করে তাঁর সারথিসহ কুশলে ফিরে আসছেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, গোধন ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং কৌরবরাও পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই ; বৃহন্নলা যার সারথি, তার বিজয় নিশ্চিত।'

পুত্রের বিজয়ী হওয়ার সংবাদে রাজার আনন্দের কোনো সীমা ছিল না। তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হল। দূতদের পুরস্কার দিয়ে তিনি মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন, 'সড়কের দুধারে বিজয় পতাকা উত্তোলন করা হোক। ফুল এবং নানা উপচারে দেবতার পূজা করা হোক। সমস্ত রাজপুত্র, যোদ্ধা এবং বাদ্যবাজিয়েদের আমার পুত্রকে স্বাগত জানাতে যেতে বলা হোক এবং একজন ব্যক্তি হাতির ওপর বসে ঘণ্টা বাজিয়ে নগরবাসীকে এই আনন্দ সংবাদ শোনাতে থাকুক।'

রাজার নির্দেশ শুনে সকল নগরবাসী, নর-নারী, সূত-মাগধী মাঙ্গলিক উপচার নিয়ে গীত-বাদ্য সহযোগে বিরাটকুমার উত্তরকে স্বাগত জানাতে গেলেন। তাঁরা সকলে চলে গেলে রাজা বিরাট প্রসন্ন হয়ে বললেন—'সৈরন্ধ্রী, যাও পাশা নিয়ে এসো। কঙ্ক ! এবার পাশা খেলা আরম্ভ করা যাক।' একথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি শুনেছি হর্ষান্বিত চতুর খেলোয়াড়ের সঙ্গে পাশা খেলা উচিত নয়। আপনি এখন আনন্দ মগ্ন হয়ে রয়েছেন ; তাই আপনার সঙ্গে খেলতে সাহস হচ্ছে না। আপনি কেন পাশা খেলেন ? এতে নানা দোষ আছে। আপনি যুধিষ্ঠিরের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন ; তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য এবং ভাইদেরও কপট পাশাতে হারিয়েছেন। তাই আমি এই খেলা পছন্দ করি না। তবুও যদি আপনার বিশেষ ইচ্ছা হয়, তবে খেলব।'

খেলা আরম্ভ হল। খেলতে খেলতে বিরাট রাজা

বললেন—'দেখ, আজ আমার পুত্র প্রসিদ্ধ কৌরবদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে।' যুধিষ্ঠির বললেন—'বৃহন্নলা যার সারথি, সে কেন যুদ্ধে জিতবে না ?' তার কথা শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'অধম ব্রাহ্মণ ! তুই একটা নপুংসকের সঙ্গে আমার পুত্রের তুলনা করছিস ? মিত্র হওয়ায় আমি তোর এই অপরাধ ক্ষমা করছি ; কিন্তু যদি বেঁচে থাকতে চাস, তাহলে এই ধরনের কথা আর বলবি না।' রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজন্ ! যেখানে দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃপাচার্য এবং দুর্যোধনাদি মহারথীরা যুদ্ধ করতে এসেছেন, সেখানে

বৃহন্নলা ব্যতীত আর কে তাঁদের সম্মুখীন হতে পারে! তার মতো বাহুবল আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের হয়নি, পরেও আর হবে না। যে দেবতা, মানুষ এবং অসুরের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করেছে, সেই বীরের সাহায্য পেয়ে উত্তর কেন জয়লাভ করবে না!' বিরাট বললেন—'বহুবার বলা সত্ত্বেও তোর কথা বন্ধ হল না! সত্যই শাস্তিপ্রদানকারী না থাকলে মানুষ ধর্ম-আচরণ করতে পারে না।' এই বলে রাজা ক্রোধে অধীর হয়ে পাশা তুলে কঙ্কের মুখে মারলেন। তারপর ধমক দিয়ে বললেন—'আর কখনো এমন করবি না।'

পাশা খুব জোরে লেগেছিল, যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই যুধিষ্ঠির তা হাত দিয়ে ধরে নিলেন এবং পাশে দাঁড়ানো দ্রৌপদীর দিকে তাকালেন। দ্রৌপদী স্বামীর ইচ্ছা বুঝতে

পেরে একটি জলপূর্ণ সোনার বাটি নিয়ে এলেন এবং তাতে সব রক্ত ধরে নিলেন।

রাজকুমার উত্তর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। বিরাটনগরের নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং পার্শ্ববর্তী সকল দেশের লোক তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিল—সকলেই তাঁর জয়ধ্বনি করল। উত্তর রাজভবনের দ্বারে পৌঁছে পিতাকে সংবাদ পাঠালেন। দ্বারপাল দরবারে গিয়ে বিরাট রাজাকে বলল—'মহারাজ! বৃহন্নলার সঙ্গে রাজকুমার উত্তর সিংহদ্বারে অপেক্ষমান।' শুভ সংবাদ শুনে রাজা অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি দ্বারপালকে বললেন—'উভয়কেই সভায় নিয়ে এস। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে খুবই উৎসুক।' যুধিষ্ঠির বললেন 'প্রথমে শুধু উত্তরকে এখানে আনো, বৃহন্নলাকে নয়; কারণ সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যে আমার দেহে যুদ্ধ বিনা অন্য কারণে রক্তপাত ঘটাবে, সে তার প্রাণবধ করবে। আমার মুখে রক্ত দেখে ও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠবে এবং তখন বিরাটকে তাঁর সৈন্য, মন্ত্রীসহ সকলকে বধ করবে।'

তারপর উত্তরই প্রথম সভাভবনে প্রবেশ করলেন। এসেই প্রথমে পিতাকে পরে কঙ্ককে প্রণাম করলেন। তিনি দেখলেন কঙ্কের নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কঙ্ক একান্তে মাটির ওপর বসে আছেন আর সৈরিন্ধ্রী তাঁর সেবা করছেন। রাজকুমার অত্যন্ত উতলা হয়ে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্! এঁকে কে মেরেছে, কে এই পাপ কাজ করেছে?' বিরাট বললেন—'আমিই একে মেরেছি, এ অতি কুটিল; এঁকে যে সম্মান করা হয়, এ তার যোগ্য নয়। যখন আমি তোমার প্রশংসা করি তখনই এ ওই নপুংসকের প্রশংসা করে।' উত্তর বললেন—'মহারাজ! আপনি খুব অন্যায় করেছেন; এঁকে শীঘ্র প্রসন্ন করুন; নাহলে ব্রাহ্মণের কোপে আপনি সমূলে নাশ হবেন।'

পুত্রের কথা শুনে রাজা বিরাট কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রাজাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজন্! আমি চিরকালের জন্য ক্ষমাব্রত ধারণ করেছি, আমার ক্রোধ হয়ই না। আমার নাকের রক্ত যদি মাটিতে পড়ত, তাহলে আপনি যে রাজ্যসহ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হতেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই; তাই আমি মাটিতে রক্ত পড়তে দিইনি।'

যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত বন্ধ হলে বৃহন্নলা সভাগৃহে এসে বিরাট এবং কঙ্ককে প্রণাম করলেন। রাজা বিরাট অর্জুনের সামনেই উত্তরের প্রশংসা করতে লাগলেন—'কৈকেয়ীনন্দন, তোমার জন্য আমি আজ প্রকৃত পুত্রবান হয়েছি। পুত্র! যে কর্ণ একসঙ্গে এক হাজার নিশানা বিদ্ধ করতে কখনো ব্যর্থ হন না, তাঁর সঙ্গে; ইহ জগতে যে ভীষ্মের সম্মুখীন হওয়ার কেউ নেই, তাঁর সঙ্গে; কৌরবদের আচার্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং যোদ্ধাদের হৃদয়

কম্পিতকারী কৃপাচার্যের সঙ্গে তুমি কী করে যুদ্ধ করলে ? দুর্যোধনের সঙ্গে কীভাবে সংগ্রাম করলে ? আমাকে বিস্তারিত সব জানাও।'

উত্তর বললেন—'মহারাজ ! এ আমার বিজয় নয়। এই সব কাজ একজন দেবকুমার করেছেন। আমি ভয়ে পালিয়ে আসছিলাম, কিন্তু সেই দেবপুত্র আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেই রথে বসে গোধন জিতে আনেন এবং কৌরবদের পরাজিত করেন। তিনিই কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কর্ণ এবং দুর্যোধন—এই ছয় মহারথীকে মহাযুদ্ধে পরাজিত করে রণভূমি থেকে অপসারণ করেন। তিনি সেই সেনাদের হারিয়ে হাসতে হাসতে তাদের বস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে আসেন।'

বিরাট বললেন—'সেই বীর মহাবাহু দেবপুত্র কোথায় ? আমি তাঁর দর্শন পেতে চাই।' উত্তর বললেন—'তিনি সেখানেই অন্তর্ধান করেছেন। কাল-পরশুর মধ্যে এসে দর্শন দেবেন।'

উত্তরের এই সংকেত অর্জুনের সম্বন্ধেই ছিল। তিনি নপুংসক বেশে থাকায় বিরাট তাঁকে চিনতে পারেননি। তাঁর নির্দেশে বৃহন্নলা সেইসব রঙীন বস্ত্র, যা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনা হয়েছিল, সব রাজকুমারী উত্তরাকে দিয়ে দিলেন। সেই বহুমূল্য রঙীন বস্ত্রাদি পেয়ে উত্তরা অত্যন্ত খুশি হলেন।

এরপর অর্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের পরিচয় প্রদানের ব্যাপারে উত্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে তদনুরূপ করতে মনস্থ করলেন।

——o——

পাণ্ডবদের পরিচয় প্রদান এবং অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ প্রস্তাব

বৈশম্পায়ন বললেন—উত্তরের ফিরে আসার তৃতীয় দিনে মহারথী পঞ্চপাণ্ডব স্নানান্তে শ্বেতবস্ত্র এবং রাজোচিত অলংকার ধারণ করে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে সভাভবনে প্রবেশ করলেন। সভায় পৌঁছে তাঁরা রাজার আসনে উপবেশন করলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজকার্য দেখার জন্য স্বয়ং রাজা বিরাট সভাগৃহে পদার্পণ করলেন। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পাণ্ডবদের রাজাসনে উপবিষ্ট দেখে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তারপর নিজে কিছুক্ষণ চিন্তা করে কঙ্ককে বললেন—'তুমি পাশা খেলতে এসেছ, সভায় পাশা খেলার জন্য আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছি। আজ এইভাবে সাজসজ্জা করে সিংহাসনে বসেছ কেন ?'

রাজা পরিহাসের ভঙ্গীতে কথাগুলি বলছিলেন। তাই শুনে অর্জুন সহাস্যে বললেন—'রাজন্ ! আপনার সিংহাসনের তো কথাই নেই, ইনি ইন্দ্রের সিংহাসনেরও অর্ধেক অধিকারী। ইনি ব্রাহ্মণদের রক্ষক, শাস্ত্রাদিতে বিজ্ঞ, ত্যাগী, যজ্ঞকারী এবং দৃঢ়তা সহকারে নিজ ব্রত পালন করেন। ইনি মূর্তিমান ধর্ম, পরাক্রমী পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জগতে সব থেকে বুদ্ধিমান এবং তপস্যার আশ্রয়। যেসব অস্ত্র সমস্ত দেবতা, অসুর, মানুষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর এবং নাগরা জানে না, সেই সবের সম্পর্কে ইনি অভিজ্ঞ। ইনি দীর্ঘদর্শী, মহাতেজস্বী এবং তাঁর দেশবাসী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, বীর, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান ও জিতেন্দ্রিয়। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে ইনি ইন্দ্র ও কুবেরের সমকক্ষ। ইনি হলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, কৌরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উদীয়মান সূর্যের স্নিগ্ধ প্রভার ন্যায় এঁর কীর্তি সমগ্র বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ। কুরুদেশে দশ হাজার বলবান হাতি এবং উত্তম ঘোড়াযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত রথ এঁকে অনুসরণ করত। দেবতারা যেমন কুবেরের উপাসনা করেন, তেমনই সমস্ত রাজা এবং

কৌরবরা এঁর উপাসনা করত। এঁর কাছে প্রত্যহ অষ্টআশী হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু মানুষদের রক্ষা করতেন, প্রজাদের পুত্রসম দেখতেন। রাজন্! এরূপ উত্তম গুণসম্পন্ন হয়েও ইনি কি আপনার আসনে বসার অধিকারী নন ?'

বিরাট বললেন—'ইনি যদি কুরুবংশী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির হন তাহলে এঁর ভ্রাতা অর্জুন ও মহাবলী ভীম কে ? নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীরা কোথায় ? ওঁরা পাশা খেলায় হেরে যাওয়ার পর ওঁদের কোথাওই কোনো খবর পাওয়া যায়নি।'

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! বল্লব নামক এই যে আপনার পাচক, এই হল ভয়ংকর পরাক্রমশালী ভীম। কীচক হত্যাকারী গন্ধর্বও এই বল্লব। যে আপনার ঘোড়ার দেখাশোনা করে, সে নকুল। আর সহদেব আপনার গোধন রক্ষা করে। এই দুই মহারথী মাদ্রীপুত্র। এই যে সুন্দরী, সৈরন্ধ্রীরূপে এখানে আছেন, ইনিই দ্রৌপদী ; এঁর জন্যই কীচক বধ হয়েছে। আমি হলাম অর্জুন, আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন!'

অর্জুনের কথা শেষ হলে কুমার উত্তরও তাঁদের পরিচয় দিলেন এবং অর্জুনের পরাক্রম বলতে আরম্ভ করলেন। 'পিতা ! ইনিই যুদ্ধে গোধন জিতে নিয়ে এসেছেন, ইনিই কৌরবদের পরাজিত করেছেন। এঁর শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনিতে আমি বধির হয়ে গিয়েছিলাম।'

সব শুনে রাজা বিরাট বললেন—'উত্তর ! এখন আমরা পাণ্ডবদের প্রসন্ন করার শুভ সময় পেয়েছি। তুমি রাজি থাকলে আমি অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন করি।' উত্তর বললেন—'পাণ্ডবরা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, পূজনীয় এবং সম্মানীয়। আপনি অবশ্যই এঁদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন করুন।' বিরাট বললেন—'আমিও যুদ্ধে শত্রুর ফাঁদে পড়েছিলাম, তখন ভীমসেনই আমাকে উদ্ধার করে গোধন উদ্ধার করে আনেন। আমি না জেনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যা কিছু অনুচিত কথা বলেছি, তার জন্য ধর্মাত্মা পাণ্ডুপুত্র আমাকে ক্ষমা করুন।' ক্ষমা প্রার্থনা করে রাজা বিরাট সন্তোষ লাভ করলেন এবং পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের রাজ্য ও অর্থকোষ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করলেন। তারপর পাণ্ডবদের দর্শন পাওয়ায় নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালেন। সকলকে আলিঙ্গন করলেন এবং প্রসন্ন চিত্তে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, আপনারা কুশলে বন থেকে ফিরে এসেছেন। অজ্ঞাত-বাসের কাল যে আপনাদের সম্পূর্ণ হয়েছে, তাও অতি আনন্দের কথা। আমার সর্বস্ব আপনার, নিঃসংকোচে এসব স্বীকার করুন। অর্জুন আমার কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করুন, তিনি সর্বতোভাবে তার স্বামী হওয়ার যোগ্য।'

বিরাটের কথা শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন তখন মৎস্যরাজকে বললেন—'রাজন্! একবৎসর কাল আমি উত্তরাকে সন্তান স্নেহে শিক্ষাদান করেছি। আমি আপনার কন্যাকে আমার পুত্রবধূরূপে স্বীকার করছি। মৎস্য এবং ভরতবংশের এই সম্পর্ক সর্বতোভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত।'

অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—অর্জুনের কথা শুনে রাজা বিরাট বললেন—'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! আমি আমার কন্যাকে আপনার হাতে সমর্পণ করছি, আপনি কেন তাকে পত্নীরূপে স্বীকার করছেন না ?' অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! আমি বহুদিন আপনার রানিমহলে বাস করেছি, আপনার কন্যাকে আমি কন্যারূপেই দেখে এসেছি। সেও আমাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করেছে, বিশ্বাস করেছে। আমি নৃত্য করতাম, সংগীতেরও সমঝদার ; তাই সে আমাকে খুবই ভালোবাসে কিন্তু গুরু বলে মান্য করে। উত্তরা যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে, তাই আপনাদের কারো মনে যাতে অনুচিত সন্দেহ না হয়, তাই উত্তরাকে আমি আমার পুত্রবধূরূপে বরণ করছি। এমতো করলে আমি শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূতরূপে খ্যাতি লাভ করব এবং আপনার কন্যার চরিত্রও শুদ্ধ বলে সবাই মেনে নেবে। আমি নিন্দা এবং মিথ্যা কলঙ্ককে ভয় পাই, সেইজন্য উত্তরাকে পুত্রবধূরূপেই বরণ করতে চাই। আমার পুত্র দেবকুমারের মতো, সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়, তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। ওর নাম অভিমন্যু, সে সর্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং আপনার কন্যার পতি হওয়ার সর্বতোভাবে যোগ্য।'

রাজা বিরাট বললেন—'যুধিষ্ঠির ! আপনি কৌরবশ্রেষ্ঠ

কুন্তীপুত্র। ধর্মাধর্মের এরূপ বিচার আপনারই যোগ্য। আপনি সর্বদা ধর্মে তৎপর ও জ্ঞানী। তাহলে এরপর যা কিছু কর্তব্য, তা আপনি পূর্ণ করুন। অর্জুন যখন আমার বৈবাহিক হচ্ছেন, তখন আমার আর কোন্ কামনা অপূর্ণ থাকে ?'

বিরাটের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির দুজনের কথা অনুমোদন করলেন। রাজা বিরাট এবং যুধিষ্ঠির নিজ নিজ মিত্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত প্রেরণ করলেন। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই পাণ্ডবরা বিরাটের উপপ্লব্য নামক স্থানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। অভিমন্যু, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য দশার্হ বংশীয়োদের আসার জন্য আমন্ত্রণ করা হল। কাশীরাজ এবং শৈব্য এক এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রসন্নতাপূর্বক পদার্পণ করলেন। রাজা দ্রুপদও এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে সেখানে এলেন। রাজা বিরাট তাঁদের যথোচিত আদর ও সম্মান জানিয়ে উত্তম স্থানে রাখলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, কৃতবর্মা, সাত্যকি, অক্রূর এবং শাম্ব প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ অভিমন্যু, সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। যেসব সারথি এক বৎসর যাবৎ দ্বারকায় বাস করছিলেন, সেই ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারথিও রথসহ সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দশ হাজার হাতি, দশ হাজার ঘোড়া, এক কোটি রথ এবং দশ কোটি পদাতিক সৈন্য ছিল। বৃষ্ণি, অন্ধক এবং ভোজবংশেরও অনেক বলবান রাজকুমার এলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহু দাস-দাসী, নানাপ্রকার বস্ত্র-অলংকার যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিলেন।

রাজা বিরাটের গৃহে শঙ্খ, ভেরী এবং গোমুখ ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য বাজতে লাগল। অন্তঃপুরের সুন্দরী নারীরা নানা বস্ত্রালংকারে সেজে রানি সুদেষ্ণাসহ মহারানি দ্রৌপদীর কাছে এলেন। তাঁরা সকলে রাজকুমারী উত্তরাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। অর্জুন সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর
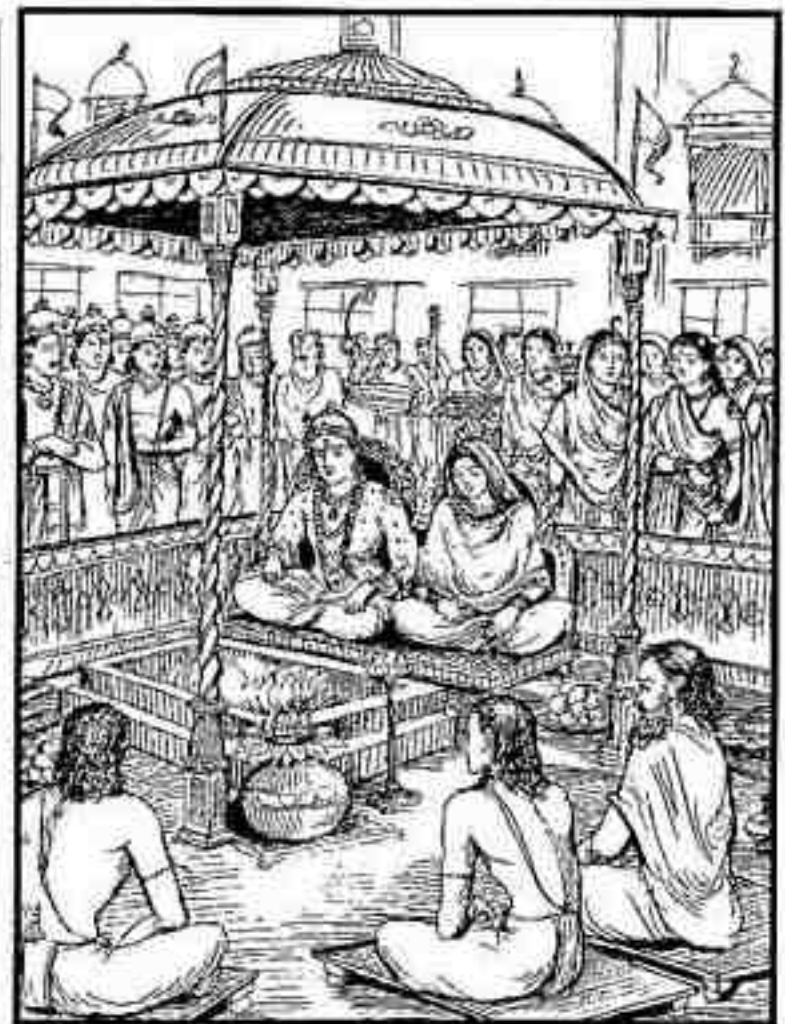
জন্য সুন্দরী বিরাটকুমারী উত্তরাকে মনোনীত করেছিলেন। অন্যান্য সব পাণ্ডব ভ্রাতারাও তাঁর এই মনোনয়ন স্বীকার করেছিলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে অভিমন্যু এবং উত্তরার বিবাহ পর্ব সমাপ্ত হল। বিবাহের সময় রাজা বিরাট প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিধিসম্মতভাবে হোম করে ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন করলেন। বিবাহে তিনি কন্যার সঙ্গে সাত হাজার দ্রুতগামী ঘোড়া, দুই শত মদমত্ত হাতি এবং নিজেকেও পাণ্ডবদের সেবায় সমর্পণ করলেন।

বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হলে যুধিষ্ঠির ভগবান কৃষ্ণের কাছ হতে প্রাপ্ত উপহার থেকে ব্রাহ্মণদের অনেক কিছু দান করলেন। এই মহোৎসবে মৎস্য নগরী নানা ফুল ও পতাকায় অপূর্বরূপ ধারণ করেছিল।

বিরাটপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

উদ্যোগপর্ব

বিরাটনগরে পাণ্ডবপক্ষীয় রাজাদের পরামর্শ, সৈন্যসংগ্রহের উদ্যোগ এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে রাজা দ্রুপদের দূত প্রেরণ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবরা অভিমন্যুর বিবাহ সম্পন্ন হলে তাঁদের সুহৃদ যাদবদের সঙ্গ লাভ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন প্রভাতে বিরাটের সভায় পৌঁছলেন। সর্বপ্রথম সকল রাজার সম্মানীয় রাজা বিরাট এবং দ্রুপদ আসন গ্রহণ করলেন। তারপর পিতা বসুদেবকে নিয়ে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করলেন, সাত্যকি ও বলরাম বসলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির রাজা বিরাটের নিকটে বসলেন। এঁদের পশ্চাতে বসলেন দ্রুপদরাজার পুত্ররা এবং ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব। বিরাটপুত্রদের সঙ্গে অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর সব পুত্ররা স্বর্ণখচিত মনোহর সিংহাসনে আসন গ্রহণ করলেন।

সকলে উপবেশন করলে পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।
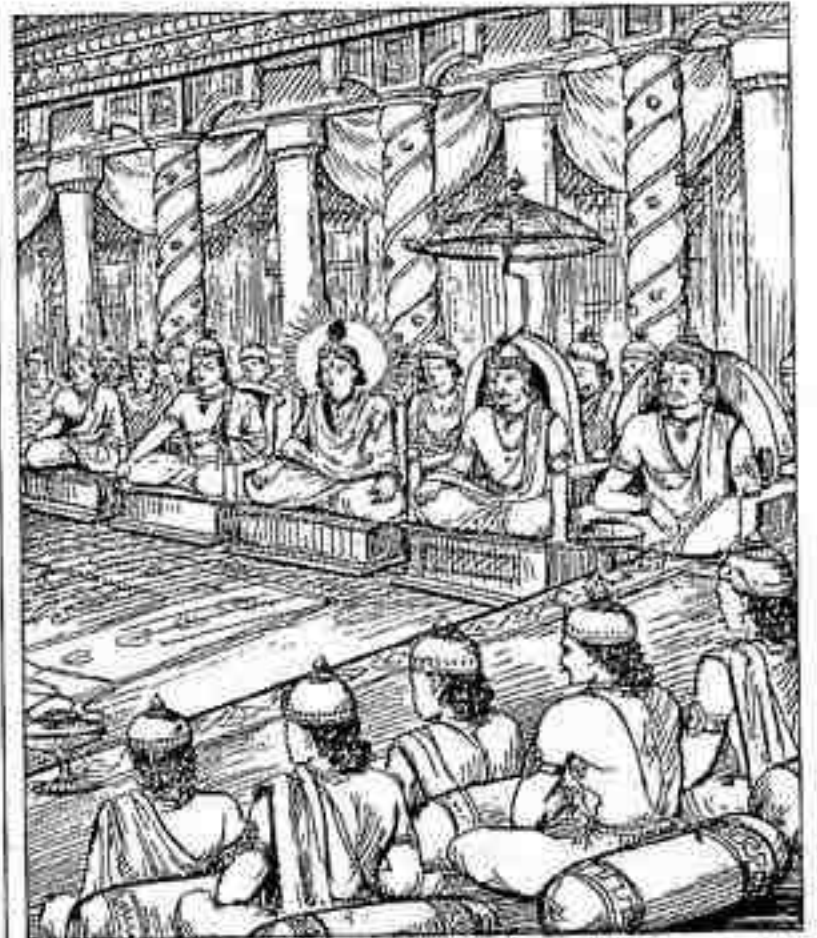
শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনার জন্য সকলে তাঁর দিকে তাকালেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সুবলপুত্র শকুনি যেভাবে কপটদ্যূতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে রাজ্যের অধিগ্রহণ এবং বনবাসের নিয়ম করে দিয়েছিল, সে সবই আপনারা জানেন। পাণ্ডবরা সেই সময় নিজেদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে সক্ষম ছিলেন ; কিন্তু তাঁরা সত্যনিষ্ঠ, তাই তাঁরা এই ত্রয়োদশ বর্ষ ধরে কঠোর নিয়ম পালন করেছেন। এখন আপনারা একটি এমন উপায় ভেবে বার করুন, যা কৌরব ও পাণ্ডবদের জন্য ধর্মানুকূল এবং সুখকর হয়, কারণ অধর্মের সাহায্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবতাদের রাজ্যও নিতে চান না। ধর্ম, অর্থযুক্ত হলে একটিমাত্র গ্রামের আধিপত্য মেনে নিতেও তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের জন্য ইনি অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছেন, তবুও তিনি সর্বদা তাদের মঙ্গলকামনাই করে থাকেন। এখন এই পুরুষপ্রবর সেই রাজ্যই ফিরে পেতে চান, যা তিনি নিজ বাহুবলে রাজাদের পরাস্ত করে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আপনাদের কাছে এটিও অজানা নেই যে, এঁরা যখন বালক ছিলেন, তখন থেকেই ক্রূরস্বভাব কৌরবরা এঁদের ক্ষতিতে মগ্ন ছিল এবং তাঁদের রাজ্য নিয়ে নেবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করেছিল। এখন তাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞতা এবং এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে আপনারা কিছু ঠিক করুন। এঁরা সর্বদা সত্যে স্থির থাকেন এবং প্রতিজ্ঞা ঠিকমতো পালন করেছেন। অতএব এখন যদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ আবার কোনো অন্যায় করেন, তাহলে এঁরা ওঁদের বধ করবেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অন্যায় কার্যে সুহৃদবর্গও যুদ্ধে আমাদের পক্ষে যোগ দেবেন। কিন্তু এখনও আমরা জানি না দুর্যোধন কী করবেন এবং অপরপক্ষের নির্ণয় না জেনে আমরা কোনো কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারি না। সেইজন্য তাঁদের বোঝাতে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য প্রদানের জন্য এদিক থেকে কোনো ধর্মাত্মা, পবিত্রচিত্ত, কুলীন, সতর্ক এবং সমর্থ ব্যক্তির দূত হয়ে যাওয়া উচিত।'

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ অত্যন্ত ধর্মার্থপূর্ণ, মধুর এবং পক্ষপাতশূন্য ছিল। বলরাম তার অত্যন্ত প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—'আপনারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ও অর্থযুক্ত ভাষণ শুনলেন। তা ধর্মরাজের পক্ষে যেমন হিতকর তেমন কুরুরাজ দুর্যোধনের কাছেও হিতকর। বীর কুন্তীপুত্রগণ অর্ধেক রাজ্য কৌরবদের দিয়ে বাকী অর্ধেক পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে চান। সুতরাং দুর্যোধন যদি অর্ধেক রাজ্য প্রদান করে তাহলে সে আনন্দে থাকতে পারে। অতএব দুর্যোধনের সিদ্ধান্ত জানার জন্য এবং যুধিষ্ঠিরের দাবি জানানোর জন্য কোনো দূত পাঠিয়ে কৌরব-পাণ্ডবদের বিসংবাদ যদি মেটানো যায়, তাহলে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হব। যখন কেউ দূত হয়ে সেখানে সভায় উপস্থিত হবেন তখন যেন সেই সভায় কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপাচার্য, শকুনি, কর্ণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা এবং সব বয়োবৃদ্ধ ও বিদ্বান পুরবাসীও উপস্থিত থাকেন। দূতকে তাদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের কার্য যাতে সিদ্ধ হয় সেইরূপ কথা বলতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কৌরবদের অসন্তুষ্ট করা উচিত হবে না। তাঁরা সবল হয়েই এঁদের ধন জয় করে নিয়েছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের পাশাতে আসক্তি ছিল, তাই যুধিষ্ঠির-প্রিয় দ্যূত ক্রীড়ার আশ্রয় নেওয়াতেই তাঁরা পাণ্ডবদের রাজ্য হরণ করেছিলেন। শকুনি যদি এঁদের পাশাখেলায় হারিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে অপরাধী বলা যায় না।'

বলরামের কথা শুনে সাত্যকি উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং বলরামের ভাষণের নিন্দা করে বললেন—'মানুষের হৃদয় যেমন, তার কথাও তেমনই
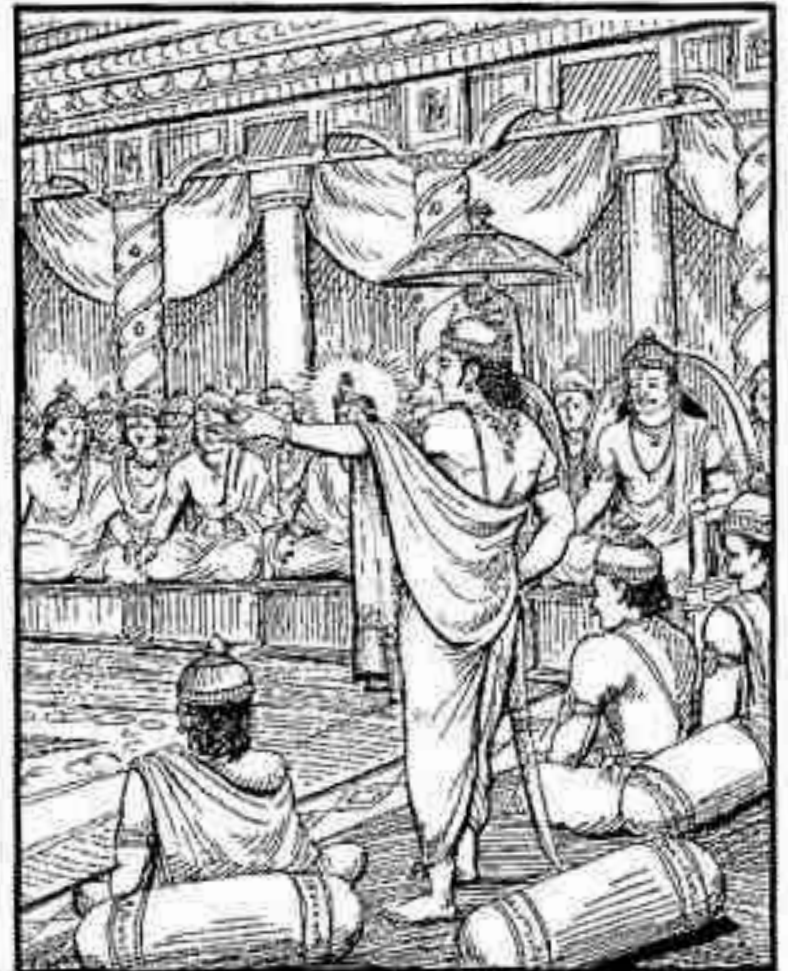
হয়ে থাকে। আপনারও যেমন হৃদয়, তেমন কথাই আপনি বলেছেন। জগতে শূরবীরও থাকে আর কাপুরুষও থাকে। একথা ঠিক যে, ধর্মরাজ পাশা খেলায় দক্ষ নয়, শকুনি এই ক্রিয়ায় পারঙ্গম। কিন্তু ধর্মরাজের পাশা খেলায় প্রীতি ছিল না। এই পরিস্থিতিতে যদি শকুনি তাঁকে আমন্ত্রণ করে জিতে থাকে তাহলে সেই জয়কে কি ধর্মানুকূল বলা যায় ? আরে, কৌরবরা ধর্মরাজকে এনে তো কপটতাপূর্বক হারিয়ে দিয়েছিল ; তাহলে তাদের ভালো হবে কী করে ? মহারাজ যুধিষ্ঠির বনবাসের কাল পূর্ণ করে এখন স্বতন্ত্র এবং তাঁর পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী। এই অবস্থায় তিনি ওঁদের কাছে ভিক্ষা চাইবেন তা কী করে সম্ভব ? ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর— এরা সকলেই নানাভাবে বুঝিয়েছেন ; কিন্তু দুর্যোধনাদি পাণ্ডবদের পৈতৃক সম্পত্তি সমর্পণ করতেই চান না। এখন আমি রণভূমিতে আমার তীক্ষ্ণবাণের সাহায্যে ওদের শিক্ষা দিয়ে দেব এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের পদতলে তাদের এনে ফেলব। যদি তারা আগেই নত হতে রাজি না হয়, তাহলে তাদের মন্ত্রীসহ যমরাজের কাছে পাঠিয়ে দেব। এমন কে আছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে গাণ্ডীবধারী অর্জুন, চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ, দুর্ধর্ষ ভীম, ধনুর্ধর নকুল-সহদেব, বীরবর বিরাট এবং দ্রুপদ ও আমার বেগ সহ্য করতে সক্ষম ! ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদের পাঁচপুত্র, ধনুর্ধর অভিমন্যু এবং কাল ও সূর্যের মতো পরাক্রমশালী গদ, প্রদ্যুম্ন—এঁদের অস্ত্রাঘাত সহ্য করার ক্ষমতা কার আছে ? আমরা শকুনির সঙ্গে দুর্যোধন ও কর্ণকে বধ করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক করব। আততায়ী শত্রুদের বধ করলে কখনো কোনো দোষ হয় না। শত্রুদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া অধর্ম এবং অপযশের কারণ হয়। অতএব আপনারা সতর্কভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই ইচ্ছা পূরণ করুন যেন ধৃতরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় পাণ্ডবদের রাজ্যের অংশ প্রদান করেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। হয় তিনি এইভাবে রাজ্য লাভ করবেন, নচেৎ সমস্ত কৌরব যুদ্ধে নিহত হবে।'

এই শুনে রাজা দ্রুপদ বললেন—'মহাবাহো ! দুর্যোধন শর্ত অনুযায়ী রাজ্য সমর্পণ করবে না। পুত্রের প্রতি মোহবশত ধৃতরাষ্ট্রও তাকেই সমর্থন করবেন, ভীষ্ম-দ্রোণ দীনতাবশত ও কর্ণ, শকুনি মূর্খতাবশত একই কথা বলবেন। শ্রীবলরামের কথাও আমার বুদ্ধিতে ঠিক বলে মনে হয়নি, তবুও যারা শান্তি চায়, তাদের এইরূপই করা উচিত। দুর্যোধনকে কোনোমতেই মিষ্টবাক্য বলা উচিত নয়। আমার মনে হয় সে মিষ্ট বাক্যে ভোলার পাত্র নয়। দুষ্ট লোকরা মৃদুভাষী ব্যক্তিদের শক্তিহীন বলে মনে করে ; যেখানে নরমভাব দেখে, সেখানেই নিজের কাজ হাসিল করার পথ খোঁজে। আমরা দূত পাঠালেও, সঙ্গে সঙ্গে অন্য উদ্যোগও নিতে থাকব। আমাদের মিত্র-বন্ধুদের কাছে দূত পাঠাতে হবে, যাতে তাঁরা আমাদের জন্য প্রয়োজনে সৈন্য-সহ প্রস্তুত থাকেন। শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন; কেকয়রাজ— এঁদের সকলের কাছে শীঘ্রই দূত পাঠানো উচিত। দুর্যোধনও নিশ্চয়ই এইসব রাজাদের কাছে দূত পাঠাবেন এবং এঁরা প্রথমে যাঁর আমন্ত্রণ পাবেন, তাঁকেই অঙ্গীকার করবেন। সুতরাং এই রাজাদের কাছে যাতে আমাদের আমন্ত্রণ আগেই পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার তো মনে হয় আমাদের এখন অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের পুরোহিত অত্যন্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ, এঁকে আপনাদের সংবাদ দিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রেরণ করুন। দুর্যোধন, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও দ্রোণাচার্য—এঁদেরকে যদি পৃথকভাবে কিছু বলার থাকে, দূতকে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহারাজ দ্রুপদ ঠিক কথাই বলেছেন। এঁর পরামর্শ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাজ সিদ্ধ করবে। আমাদের সঠিক নীতি নির্ধারণ করে কাজ করা উচিত। সুতরাং আমাদের প্রথমে মহারাজ দ্রুপদের কথামতো কাজ করা উচিত। যে ব্যক্তি বিপরীত আচরণ করে, সে মহামূর্খ। বয়স এবং জ্ঞানের দৃষ্টিতে রাজা দ্রুপদই সবথেকে প্রবীণ, আমরা সকলে তাঁর শিষ্যের মতো। অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এরূপ সন্দেশই পাঠান, যাতে পাণ্ডবদের কার্যসিদ্ধ হয়। রাজা দ্রুপদ যে সংবাদ পাঠাবেন, আমরা সকলে তা অবশ্যই মান্য করব। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র যদি ন্যায়সংগতভাবে সন্ধি করেন তাহলে কৌরব-পাণ্ডবদের আর ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। কিন্তু যদি অহংকারবশত দুর্যোধন সন্ধি করতে না চায়, তাহলে গাণ্ডীবধারী অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে দুর্যোধনকে তার পরামর্শদাতা আত্মীয়-স্বজনসহ নিশ্চিহ্ন হতে হবে।'

তারপর রাজা বিরাট শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু ও আত্মীয়সহ দ্বারকায় চলে গেলেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচভাই এবং রাজা বিরাট যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে লাগলেন। রাজা বিরাট, দ্রুপদ এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা সব রাজাদের কাছে পাণ্ডবদের সাহায্য করার জন্য সংবাদ পাঠালেন। সব নৃপতি

কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদের এবং বিরাট ও দ্রুপদের আমন্ত্রণ পেয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে চারদিক ছিল মুখরিত।

রাজা দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে বললেন—'পুরোহিত! ভূতাদির মধ্যে প্রাণধারী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধির দ্বারা যারা কাজ করে তারা শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, দ্বিজের মধ্যে বিদ্বানের স্থান ঊর্ধ্বে, বিদ্বানের মধ্যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এবং সিদ্ধান্ত জ্ঞানীর মধ্যে ব্রহ্মবেত্তা শ্রেষ্ঠ। আমার বিচারে আপনি সিদ্ধান্ত বেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনার কুলও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, বয়স এবং শাস্ত্রজ্ঞানের দৃষ্টিতেও আপনি প্রাজ্ঞ। আপনার বুদ্ধি শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতির ন্যায়। আপনি তো জানেন যে, কৌরবরা পাণ্ডবদের ঠকিয়েছিল, শকুনি কপটদ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে বোকা বানিয়েছিল, অতএব তারা নিজেরা কিছুতেই রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। আপনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁকে ধর্মযুক্ত কথা বলে তাঁদের হৃদয় পরিবর্তন নিশ্চয়ই করতে পারবেন। আপনি ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ প্রমুখের মধ্যে মতভেদ জাগাতে সক্ষম। এইভাবে তাঁদের মন্ত্রীদের মধ্যে যখন মতভেদ হবে এবং যোদ্ধারা তাঁদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করবেন তখন কৌরবরা তাদের একমতে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সেই অবকাশে পাণ্ডবগণ সৈন্য সংগ্রহ এবং অর্থ সঞ্চয় করে নেবেন। আপনি সেখানে বেশিদিন থাকার চেষ্টা করবেন। কেননা আপনি থাকাকালীন ওঁরা সৈন্য সংগ্রহের কাজ করতে পারবেন না। এমনও হতে পারে যে আপনার সঙ্গতপূর্ণ ধর্মানুকূল কথা ধৃতরাষ্ট্র মেনে নেবেন। আপনি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, তাই আমার বিশ্বাস যে, তাঁদের সঙ্গে ধর্মানুকূল ব্যবহার করে, কুলধর্মের আলোচনা করে আপনি তাঁদের হৃদয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং আপনি যুধিষ্ঠিরের কার্যসিদ্ধির জন্য পুষ্যা নক্ষত্রে বিজয় মুহূর্তে রওনা হোন।'

দ্রুপদ পুরোহিতকে এইভাবে বলায় সেই সদাচারসম্পন্ন এবং অর্থনীতিবিশারদ পুরোহিত পাণ্ডবদের হিতার্থে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

—o—

অর্জুন ও দুর্যোধনের শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ এবং তাঁর দুই পক্ষকে সাহায্য করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! পুরোহিতকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে পাণ্ডবরা নানাস্থানে রাজাদের কাছে দূত পাঠাতে লাগলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করার জন্য কুন্তীনন্দন অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্যোধনও তাঁর গুপ্তচরদের সাহায্যে পাণ্ডবদের সমস্ত প্রয়াসের খবর পাচ্ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বিরাটনগর থেকে দ্বারকায় গেছেন, তিনিও কয়েকজন সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্বারকায় পৌঁছলেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনও সেই দিনই দ্বারকায় পৌঁছলেন। তাঁরা দুজনে সেখানে পৌঁছে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাচ্ছেন। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শয়নকক্ষে গিয়ে পালঙ্কের মাথার দিকে একটি উত্তম সিংহাসনে উপবেশন করলেন। অর্জুন তাঁর পিছনেই শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বিনীতভাবে হাতজোড় করে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘুম ভেঙে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই অর্জুনকে দেখতে পেলেন। তারপর তিনি দুজনকেই আদর-আপ্যায়ন করে তাঁদের

আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুর্যোধন সহাস্যে বললেন—'পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের যে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে, তাতে আপনাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। আপনার অর্জুনের সঙ্গেও যেমন বন্ধুত্ব আছে, তেমনই আমাদের সঙ্গেও একই রকম সম্পর্ক ; আজ আমিই প্রথম এসেছি। সৎ ব্যক্তিরা তাকেই অগ্রাধিকার দেয়, যে প্রথমে আসে ; অতএব আপনারও সৎব্যক্তির আচরণ অনুসরণ করা উচিত।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আপনি যে আগে এসেছেন, এতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু আমি প্রথমে অর্জুনকে দেখেছি। আপনি প্রথমে এসেছেন আর আমি প্রথমে অর্জুনকে দেখেছি—তাই আমি দুজনকেই সাহায্য করব। আমার কাছে এক অক্ষৌহিণী গোপ আছে, এরা আমারই মতো বলিষ্ঠ এবং রণে পারদর্শী, তাদের নাম নারায়ণ। একদিকে এই দুর্জয় নারায়ণী সেনা থাকবে, অন্যদিকে আমি নিজে থাকব ; কিন্তু আমি যুদ্ধও করব না এবং কোনো অস্ত্রও ধারণ করব না। অর্জুন ! ধর্মানুসারে প্রথমে তোমারই বেছে নেওয়ার অধিকার ; কেননা তুমি ছোট। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে তোমার যেটি নেবার ইচ্ছা হয়, তুমি সেটি নিয়ে নাও।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন তাঁকে নেওয়ার ইচ্ছাই প্রকাশ করলেন। অর্জুন যখন স্বেচ্ছায় মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ শত্রুদমন শ্রীনারায়ণকে তাদের পক্ষে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন দুর্যোধন তাঁর সমস্ত গোপ সেনাকে নিজের পক্ষে নিলেন। তারপর তিনি মহাবলী বলরামের কাছে গেলেন এবং তাঁকে সমস্ত সংবাদ জানালেন। বলরাম বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এক মুহূর্ত থাকতে পারি না ; তাই ওর মনোভাব বুঝে আমি স্থির করেছি যে আমি অর্জুনকেও সাহায্য করব না এবং তোমার সঙ্গেও থাকব না।'

বলরাম একথা বলে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন। দুর্যোধন নারায়ণী সেনা নিয়ে মনে করলেন তিনি খুব জিতে গেছেন এবং যুদ্ধে নিজের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। তারপর তিনি কৃতবর্মার কাছে এলে তিনি তাঁকে এক অক্ষৌহিণী সেনা দিলেন। সেই সমস্ত সৈন্য নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে দুর্যোধন রওনা হলেন।

দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের মহল থেকে যাবার পর ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অর্জুন ! আমি তো যুদ্ধ করব না, তাহলে তুমি কী মনে করে আমাকে নিলে ?' অর্জুন বললেন—'প্রভু ! আমার মনে সর্বদাই ইচ্ছা ছিল আপনাকে সারথি করার, আপনি দয়া করে তা পূর্ণ করুন।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'তোমার কামনা পূর্ণ হবে, আমি তোমার সারথি হব।' তাঁর কথায় অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য দাশার্হ বংশীয় প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন।

—o—

শল্যের আপ্যায়ন এবং তাঁর দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠির—উভয়কেই সাহায্যের আশ্বাস

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দূতের কাছে পাণ্ডবদের সংবাদ পেয়ে রাজা শল্য বিশাল সেনাবাহিনী এবং নিজ মহারথী পুত্রকে নিয়ে পাণ্ডবদের সহায়তার জন্য রওনা হলেন। তাঁর সৈন্যদল এত বড় ছিল যে তাদের শিবির পড়ত দুই ক্রোশ ধরে। তিনি এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন এবং তাঁর সৈন্যের মধ্যে হাজার হাজার ক্ষত্রিয় বীর সেনাপতি ছিল। এই বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি বিশ্রাম করতে করতে ধীর লয়ে পাণ্ডবদের কাছে চললেন।

দুর্যোধন যখন মহারথী শল্যকে পাণ্ডবদের সাহায্য করতে আসার কথা শুনলেন, তখন তিনি নিজে গিয়ে তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। রাজা শল্যের আপ্যায়নের জন্য তিনি শিল্পী দ্বারা পথের রমণীয় প্রদেশে সুন্দর সুন্দর রত্ন মণ্ডিত সভা ভবন তৈরি করালেন, তাতে নানাপ্রকার ক্রীড়াসামগ্রী রাখলেন। শল্য যখন সেই স্থানে এলেন, দুর্যোধনের মন্ত্রীরা তাঁকে দেবতার ন্যায় সাদর সম্ভাষণ

জানালেন। একের পর অপর স্থানে পৌঁছলে, সেখানেও অনুরূপ সভাভবনে নানা অলৌকিক বিষয় উপভোগ করলেন। শল্য প্রসন্ন হয়ে একজন সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন—'যুধিষ্ঠিরের কোন শিল্পীরা এই সভাগৃহ নির্মাণ করেছেন ? তাঁদের এখানে নিয়ে এসো, তাঁদের কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমি তাঁদের পুরস্কার দেব। যুধিষ্ঠিরেরও এই বিষয়ে আমাকে সমর্থন করা উচিত।'

সেবকরা সতর্ক হল এবং দুর্যোধনকে সব জানাল। দুর্যোধন যখন বুঝলেন যে শল্য এখন অত্যন্ত প্রসন্ন, নিজের প্রাণও দিতে পারেন, তখন দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। মদ্ররাজ শল্য দুর্যোধনকে দেখে এবং সমস্ত ব্যবস্থা তাঁরই করা জেনে প্রসন্ন হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন—'আপনার যা ইচ্ছা হয় আমার কাছে চেয়ে নিন।' দুর্যোধন বললেন—'মহানুভব ! আপনার কথা সত্য হোক, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে বর দেবেন। আমার ইচ্ছা আপনি আমার সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর প্রধান হোন।' শল্য বললেন—'আমি আপনার কথা মেনে নিলাম। বলুন ! আপনার জন্য আর কী করব ?' দুর্যোধনও তখন তাঁকে বললেন—'আপনি আমার কাজ তো পূর্ণ করে দিয়েছেন।'

তারপর শল্য বললেন—'দুর্যোধন ! আপনি রাজধানী ফিরে যান, আমি এবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি শীঘ্রই আপনার কাছে ফিরে আসব।' দুর্যোধন বললেন—'রাজন্ ! যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শীঘ্রই ফিরে আসুন। আমি তো এখন আপনারই অধীন ; আমাকে বর প্রদানের কথা স্মরণ রাখবেন।' তারপর দুজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন এবং দুর্যোধন শল্যের অনুমতি নিয়ে নিজ নগরে ফিরে গেলেন। শল্য দুর্যোধনের সব কথা জানাবার জন্য যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। বিরাট নগরের উপপ্লব্য প্রদেশে পৌঁছে তাঁরা পাণ্ডবদের শিবিরে এলেন। সেখানে তাঁদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, পাণ্ডবরা তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে স্বাগত জানালেন। মদ্ররাজ তাঁদের কুশল প্রশ্ন করে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করলেন এবং ভীম-অর্জুন ও তাঁর ভাগিনেয় নকুল-সহদেবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আসন গ্রহণ করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কুরুশ্রেষ্ঠ, তোমার সব কুশল তো ? অত্যন্ত আনন্দের কথা যে তোমাদের বনবাসের কাল সমাপ্ত হয়েছে। তুমি দ্রৌপদী

ও ভাইদের সঙ্গে বনে থেকে অত্যন্ত দুষ্কর কাজ করেছ। তার থেকেও কঠিন অজ্ঞাতবাসের কালও তোমরা ভালোভাবে পার করেছ, সত্যি, রাজ্যচ্যুত হয়ে তো তোমাদের দুঃখভোগ করতেই হয়েছে, সুখ কোথায় ? রাজন্ ! ক্ষমা, দম, সত্য, অহিংসা এবং অদ্ভুত সম্পত্তি এসব তোমার মধ্যে স্বভাবতই বিদ্যমান। তুমি অত্যন্ত মৃদুস্বভাব, উদার, ব্রাহ্মণসেবক, দানশীল এবং ধর্মনিষ্ঠ। তোমরা এই মহাদুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছ দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।'

তারপর রাজা শল্য দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর যেসব কথাবার্তা হয়েছিল এবং যেভাবে দুর্যোধন তাঁকে সেবা যত্ন করেছেন এবং তার পরিবর্তে শল্য যে তাঁকে বর দিয়েছেন সমস্ত যুধিষ্ঠিরকে জানালেন। তাই শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'মহারাজ ! আপনি যে প্রসন্ন হয়ে দুর্যোধনকে সাহায্য করার কথা দিয়েছেন, খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু আমিও আপনাকে একটি কাজ সমর্পণ করতে চাই। রাজন্ ! আপনি যুদ্ধে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমী। যখন কর্ণ আর অর্জুন রথে করে দুজনে যুদ্ধ করবে, তখন আপনি যে কর্ণের সারথি হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি যদি আমাদের মঙ্গল চান, তাহলে সেই সময় অর্জুনকে রক্ষা করবেন এবং আমাদের জয়ের জন্য কর্ণের উৎসাহ নষ্ট করতে থাকবেন।'

শল্য বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তোমার মঙ্গল হোক ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্যই কর্ণের সারথি হব, কারণ সে আমাকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ মনে করে। সেই-সময় আমি অবশ্যই কর্ণকে কটু ও অপ্রিয় বাক্য বলব। তাতে তার গর্ব ও তেজ নষ্ট হবে এবং তখন তাকে বধ করা সহজ হবে। রাজন্ ! দ্রৌপদীও পাশাখেলার সময় অনেক দুঃখ সহ্য করেছে। সূতপুত্র কর্ণ তোমাকে অনেক কটুবাক্য বলেছে। কিন্তু তুমি তার জন্য মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না। বড় বড় মহাপুরুষকেও দুঃখভোগ করতে হয়। স্মরণ করো ইন্দ্রকেও ইন্দ্রাণীসহ মহাদুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল।'

—o—

ত্রিশিরা এবং বৃত্রাসুরের বধের বিবরণ এবং ইন্দ্রের অপমানিত হয়ে জলে লুকিয়ে থাকা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীকে কেন ভীষণ দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল, তা জানতে আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

শল্য বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! শোনো, তোমাকে আমি এক পুরাতন ইতিহাস শোনাচ্ছি। দেবশ্রেষ্ঠ ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। ইন্দ্রের প্রতি ঈর্ষাবশত তিনি একটি তিন মস্তক বিশিষ্ট পুত্রের জন্ম দেন। সেই বালক একটি মুখে বেদপাঠ করত, দ্বিতীয়টির দ্বারা সুধাপান করত এবং তৃতীয় মুখটির দ্বারা সমস্ত দিকগুলি এমনভাবে দেখত যেন সব আত্মসাৎ করে নেবে। সে অত্যন্ত তপস্বী, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম ও তপস্যায় তৎপর ছিল। তার তপস্যা অত্যন্ত তীব্র এবং দুষ্কর ছিল। সেই অতুলনীয় তেজস্বী বালকের তপোবল দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের মনে বড় ভয় হল। তিনি ভাবলেন এই বালক তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র না হয়ে

ওঠে। কীভাবে একে তপস্যা থেকে সরিয়ে ভোগাসক্ত করা যায়, এইসব অনেক ভাবনা চিন্তা করে তিনি তার তপস্যা নষ্ট করার জন্য অপ্সরাদের নির্দেশ দিলেন।

ইন্দ্রের নির্দেশে অপ্সরারা ত্রিশিরার কাছে এসে তাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাতে লাগলেন। কিন্তু ত্রিশিরা তাঁর

ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো শান্ত থাকলেন। বহু চেষ্টা করার পর অপ্সরাগণ ইন্দ্রের কাছে ফিরে গিয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগলেন—'মহারাজ ! ত্রিশিরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, একে ধৈর্যচ্যুত করা সম্ভব নয়। এখন অন্য কিছু করতে চাইলে করুন।' ইন্দ্র অপ্সরাদের সসম্মানে বিদায় করলেন। তারপর ভাবলেন—'ত্রিশিরার ওপর আজ আমি বজ্র নিক্ষেপ করব, যাতে সে শীঘ্রই নাশ হয়।' এরূপ স্থির করে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিশিরার ওপর ভয়ংকর বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বজ্রের আঘাতে ত্রিশিরা বিশাল পর্বত শিখরের মতো মাটিতে মৃত হয়ে পড়ে গেলেন। ইন্দ্র তখন প্রসন্ন হয়ে নির্ভয়ে স্বর্গলোকে গেলেন।

প্রজাপতি ত্বষ্টা যখন জানতে পারলেন যে ইন্দ্র তাঁর পুত্রকে বধ করেছেন, তিনি তখন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন—'আমার পুত্র ক্ষমাশীল এবং শম-দম-সম্পন্ন ছিল, সে তপস্যায় নিরত ছিল। বিনা অপরাধে ইন্দ্র তাকে হত্যা করেছেন। আমি এবার ইন্দ্রকে বধ করার জন্য বৃত্রাসুরকে উৎপন্ন করব, লোকে আমার পরাক্রম এবং তপোবল দেখুক।' এইরূপ চিন্তা করে মহা যশস্বী এবং তপস্বী ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হয়ে জলে আচমন করে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুরকে উৎপন্ন করে তাকে বললেন—'ইন্দ্রশত্রু ! আমার তপস্যার প্রভাবে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।' অমনি সূর্য আর অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বৃত্রাসুর তখনই বৃদ্ধিলাভ করে আকাশ ছুঁতে লাগল এবং বলল—'বলুন আমি কী করব ?' ত্বষ্টা বললেন—'ইন্দ্রকে বধ করো।' তখন সে

স্বর্গে গেল। সেখানে ইন্দ্র এবং বৃত্রের প্রচণ্ড সংগ্রাম হল। শেষকালে বীর বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে ধরে আত্মসাৎ করে ফেলল। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে উদ্ধার করার জন্য বৃত্রাসুরের দেহে এমন অনুভূতির সৃষ্টি করলেন, যাতে সে মুখগহ্বর উন্মুক্ত করে। বৃত্র যেই হাই তুলল দেবরাজ ইন্দ্র দেহ সংকুচিত করে তার মুখ বিবর দিয়ে বাইরে এলেন। দেবতারা তাঁকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর আবার ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ শুরু হল। ত্বষ্টার তেজ এবং বল পেয়ে বীর বৃত্রাসুর অত্যন্ত প্রবলভাবে যুদ্ধ করতে থাকলে ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন।

ইন্দ্র চলে যেতে দেবতারা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং

ত্বষ্টার ভয় পেয়ে ইন্দ্র ও মুনিগণের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন যে কী করা উচিত ! ইন্দ্র বললেন—'দেবগণ ! বৃত্রাসুর সমস্ত জগৎ অধিকার করে নিয়েছে। আমাদের কাছে এমন কোনো অস্ত্র নেই, যা দিয়ে ওকে বধ করতে পারি। সুতরাং আমার মনে হয় যে আমরা সকলে ভগবান বিষ্ণুর ধামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে এই দুষ্ট বধের উপায় ঠিক করি।'

ইন্দ্রের কথায় সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ শরণাগতবৎসল ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হলেন এবং তাঁকে বললেন—'পূর্বকালে আপনি আপনার তিন পদ দিয়ে তিন লোক মেপেছিলেন। আপনি সমস্ত দেবতার প্রভু, সমস্ত জগৎ আপনাতেই পরিব্যাপ্ত, আপনি দেব-দেবেশ্বর। সমস্ত লোক আপনাকে স্মরণ করেন। এখন সমস্ত জগতে বৃত্রাসুর পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ; অতএব হে অসুরনিকন্দন ! আপনি ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতাদের আশ্রয় দিন।' ভগবান বিষ্ণু বললেন—'আমি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গল করব। তাই আমি এমন উপায় বলছি, যাতে এর অন্ত হয়। সমস্ত দেবতা, ঋষি এবং গন্ধর্ব সকলে মিলে তোমরা বিশ্বরূপধারী বৃত্রাসুরের কাছে যাও এবং তার প্রতি সামনীতি প্রয়োগ করো। এতে তোমরা ওকে পরাজিত করতে পারবে। দেবতাগণ ! এইভাবে আমার এবং ইন্দ্রের প্রভাবে তোমাদের জয়লাভ হবে। আমি অদৃশ্যরূপে দেবরাজের অস্ত্রবজ্রের মধ্যে প্রবেশ করব।'

ভগবান বিষ্ণুর কথায় সব দেবতা এবং ঋষি ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বৃত্রাসুরের কাছে গিয়ে বললেন—'দুর্জয় বীর ! সমস্ত জগৎ তোমার তেজে পরিব্যাপ্ত, তা সত্ত্বেও তুমি ইন্দ্রকে পরাজিত করতে পারোনি। তোমাদের দুজনের যুদ্ধে বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ; এর ফলে দেবতা, অসুর, মানুষ—সকল প্রজাই খুব কষ্ট পাচ্ছে। অতএব এখন চিরকালের মতো তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও।' মহর্ষিদের কথা শুনে পরম তেজস্বী বৃত্রাসুর বলল—'আপনারা তপস্বী, আমার মাননীয়। কিন্তু আমি যা বলছি, তা যদি পূর্ণ করা হয়, তাহলে আপনারা যা বলছেন, আমি তা করতে রাজি আছি। আমাকে ইন্দ্র অথবা দেবতাগণ কোনো শুষ্ক বা সিক্ত বস্তুর দ্বারা, পাথর অথবা কাঠের দ্বারা, অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা এবং দিন বা রাত্রে মারতে পারবেন না এই শর্তে আমি ইন্দ্রের সঙ্গে সর্বদার জন্য সন্ধি করতে রাজি আছি।' ঋষিরা বললেন—'ঠিক আছে, তাই হবে।' এইভাবে সন্ধি হওয়াতে বৃত্রাসুর অত্যন্ত প্রসন্ন হল। দেবরাজ ইন্দ্র যদিও প্রসন্নভাব দেখালেন তবুও তিনি সর্বদাই বৃত্রাসুরকে বধ করার সুযোগ খুঁজতে থাকলেন।

ইন্দ্র একদিন সন্ধ্যার সময় বৃত্রাসুরকে সমুদ্রতটে বিচরণ করতে দেখলেন। তখন তিনি বৃত্রাসুরকে তাঁর প্রদত্ত

বরগুলি নিয়ে চিন্তা করছিলেন—'এখন সন্ধ্যার সময়, না দিন না রাত্রি ; আমার শত্রু বৃত্রাসুরকে অবশ্যই বধ করতে হবে। যদি আজ একে ছলনা করে বধ করতে না পারি,

তাহলে আমার মঙ্গল হবে না।' এই ভেবে ইন্দ্র যেমনই ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন, তখনই তিনি দেখতে পেলেন সমুদ্রের ওপর পর্বতের ন্যায় উঁচু ঢেউ উঠছে। তিনি ভাবতে লাগলেন— 'এটি শুষ্ক নয়, সিক্ত নয় এবং কোনো অস্ত্রও নয়। সুতরাং আমি যদি এটি বৃত্রাসুরের ওপর ফেলি, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই তার বিনাশ হবে।' এইভেবে তিনি তাড়াতাড়ি নিজ বজ্রটিকে ফেনার সঙ্গে বৃত্রাসুরের ওপর ফেললেন। ভগবান বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ সেই ফেনায় প্রবেশ করে বৃত্রাসুরকে বধ করলেন। বৃত্রাসুর বধ হতেই সমস্ত প্রজা প্রসন্ন হল এবং দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ও ঋষি—সকলে ইন্দ্রের স্তুতি করতে লাগলেন।

ইন্দ্র, দেবতাদের ত্রাসের কারণ মহাবলী বৃত্রাসুরকে বধ করলেও, এর আগে ত্রিশিরাকে বধ করায় তাঁর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের কারণে এবং এখন অসত্য ব্যবহারের জন্য তিরস্কৃত হওয়ায়, মনে মনে অত্যন্ত দুঃখবোধ করতে লাগলেন। এই পাপের জন্য তিনি সংজ্ঞাহীন ও অচেতনবৎ হয়ে জগৎ সীমার প্রান্তে জলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে ব্রহ্মহত্যা-জনিত দুঃখে পীড়িত হয়ে স্বর্গত্যাগ করে চলে গেলে সমস্ত পৃথিবীর গাছপালা ও জঙ্গল শুকিয়ে গেল। নদীর ধারা শুকিয়ে গেল এবং সরোবরও জলহীন হয়ে পড়ল। অনাবৃষ্টির জন্য সমস্ত প্রাণী ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং দেবতা ও ঋষিগণ ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। রাজা না থাকায় সমস্ত জগৎ উপদ্রবে ভরে গেল। দেবতারাও ভয় পেয়ে ভাবলেন, এখন আমাদের দেবতা কে ? কেননা কোনো দেবতাই রাজ্যের ভার সামলাতে রাজি ছিলেন না।

——o——

নহুষের ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রাণীর ওপর আসক্ত হওয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রের শুদ্ধ হওয়া

রাজা শল্য বললেন—যুধিষ্ঠির ! সমস্ত দেবতা ও ঋষি তখন বললেন—'রাজা নহুষ বর্তমানে অত্যন্ত প্রতাপশালী, তাঁকেই দেবতাদের রাজপদে অভিষিক্ত করো। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, যশস্বী এবং ধার্মিক।' এইরূপ পরামর্শ করে তাঁরা রাজা নহুষের কাছে গিয়ে বললেন—'আপনি আমাদের রাজা হন।' নহুষ বললেন—'আমি অত্যন্ত দুর্বল, আপনাদের রক্ষা করার শক্তি আমার নেই।' ঋষি এবং দেবতাগণ বললেন—'রাজন্ ! দেবতা, দানব, যক্ষ, ঋষি, রাক্ষস, পিতৃগণ, গন্ধর্ব এবং ভূতগণ—এরা আপনার সামনে হাজির থাকবে। আপনি এদের দেখে এঁদের থেকে তেজ সংগ্রহ করেই বলবান হয়ে যাবেন। আপনি ধর্মকে অগ্রে রেখে সমস্ত জগতের প্রভু হন এবং স্বর্গলোকে বাস করে ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাদের রক্ষা করুন।' একথা বলে তাঁরা স্বর্গলোকে রাজা নহুষের রাজ্যাভিষেক করলেন। রাজা নহুষ এইভাবে সমস্ত জগতের প্রভু হলেন।

এই দুর্লভ বর এবং স্বর্গরাজ্য লাভ করে রাজা নহুষ—যিনি পূর্বে নিরন্তর ধর্মপরায়ণ ছিলেন ক্রমশ ভোগী হয়ে উঠলেন। তিনি দেবউদ্যান, নন্দনবন, কৈলাস, হিমালয় পর্বতের শিখর সমূহে নানাপ্রকার ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে রইলেন। তাতে তাঁর মন দূষিত হয়ে গেল। একদিন যখন তিনি ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি দেবরাজের সাধ্বী স্ত্রী

ইন্দ্রাণীর ওপর পড়ল। তাঁকে দেখে দুষ্ট নহুষ তাঁর সভাসদদের বলতে লাগলেন—'আমি দেবতাদের রাজা এবং সমস্ত লোকের প্রভু। তাহলে ইন্দ্রের মহিষী দেবী ইন্দ্রাণী আমার সেবার জন্য কেন উপস্থিত হচ্ছেন না ? আজ শীঘ্র শচীদেবীকে আমার মহলে নিয়ে আসতে হবে।'

নহুষের কথা শুনে দেবী ইন্দ্রাণী অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি বৃহস্পতিকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার শরণাগত, নহুষের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি অনেকবার আমাকে অখণ্ড সৌভাগ্যবতী হওয়ার, একজনের পত্নী হওয়ার এবং পতিব্রতা হওয়ার আশীর্বাদ করেছেন, অতএব আপনি আপনার বাক্যের সত্য রক্ষা করুন।' তখন বৃহস্পতি ভীত ব্যাকুল ইন্দ্রাণীকে বললেন—'দেবী ! আমি তোমাকে যা বলেছি, তা অবশ্যই সত্য হবে। তুমি নহুষকে ভয় পেয়ো না। আমি সত্য বলছি, শীঘ্রই তোমাকে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত করে দেব।' এদিকে নহুষ যখন জানতে পারলেন যে, ইন্দ্রাণী বৃহস্পতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁকে ক্রুদ্ধ দেখে দেবতা এবং ঋষিগণ বললেন—'দেবরাজ ! ক্রোধ পরিহার করুন, আপনার মতো সৎ ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হন না। ইন্দ্রাণী পরস্ত্রী, অতএব তাঁকে ক্ষমা করুন এবং পরস্ত্রী-গমনজনিত পাপ হতে নিজেকে দূরে রাখুন। আপনি দেবতাদের রাজা, প্রজাদের ধর্মপূর্বক পালন করা আপনার কর্তব্য। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

ঋষিগণ নহুষকে অনেক ভাবে বোঝালেন, কিন্তু কামাসক্ত হওয়ায় তিনি তাঁদের কোনো কথাই শুনলেন না। তখন তাঁরা ভগবান বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন—'দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ ! আমরা শুনেছি ইন্দ্রাণী আপনার আশ্রয়ে আছেন এবং আপনি তাঁকে অভয়প্রদান করেছেন। কিন্তু আমরা দেবতা ও ঋষিগণ আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে আপনি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হাতে সমর্পণ করুন।' দেবতা এবং ঋষিদের কথা শুনে দেবী ইন্দ্রাণীর চোখ জলে ভরে গেল। তিনি দীনভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আমি নহুষকে পতিরূপে বরণ করতে চাই না ; আমি আপনার শরণাগত, আপনি এই মহাভয় থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' বৃহস্পতি বললেন—'ইন্দ্রাণী ! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমি কখনো শরণাগতকে ত্যাগ করি না।

অনিন্দিতা ! তুমি ধর্মজ্ঞ এবং সত্যশীলা, সুতরাং আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।' তারপর দেবতাদের বললেন—'আমি ধর্মবিধি জানি, ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করেছি এবং আমার সত্যে নিষ্ঠা আছে ; এতদ্ব্যতীত আমি ব্রাহ্মণ। সুতরাং আমি কখনো অকর্তব্যের আচরণ করতে পারি না। আপনারা যান, আমি এমন কাজ করতে পারব না। এই বিষয়ে ভগবান ব্রহ্মা যা বলেছেন, তা শুনুন—

'যে ব্যক্তি ভীত হয়ে শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুর হাতে অর্পণ করে, তার রোপণ করা বীজ সময় মতো ফল দেয় না, তার জমিতে সময়মতো বৃষ্টি হয় না। কেউ আক্রমণ করলে, তাকে রক্ষা করার কেউ থাকে না। এরূপ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি যে অন্ন (ভোগ) লাভ করে, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তার চৈতন্যশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, স্বর্গ থেকে পতন হয় এবং দেবতারাও তার সমর্পিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। তার সন্তান অকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তার পিতৃপুরুষরা নরক বাস করে এবং ইন্দ্র ও দেবতারা তার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন[১]।'

'এইরূপ শ্রীব্রহ্মার বাক্য অনুসারে শরণাগতের ত্যাগ

---

[১]ন তস্য বীজং রোহতি রোহকালে ন তস্য বর্ষং বর্ষতি বর্ষাকালে। ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি শত্রবে ন স ত্রাতারং লভতে ত্রাণমিচ্ছন্।।
মোঘমন্নং বিন্দতি চাপ্যচেতাঃ স্বর্গাল্লোকাদ্ ভ্রশ্যতি নষ্টচেষ্টঃ। ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি যো বৈ ন তস্য হব্যং প্রতিগৃহ্ণন্তি দেবাঃ।।
প্রমীয়তে চাস্য প্রজা হ্যকালে সদা বিবাসং পিতরোঽস্য কুর্বতে। ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি শত্রবে সেন্দ্রা দেবাঃ প্রহরন্ত্যস্য বজ্রম্।।

করলে যে অধর্ম হয় তা জেনে আমি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হাতে সমর্পণ করতে পারি না। আপনারা এমন কোনো পথ নির্ণয় করুন, যাতে এঁর এবং আমার দুজনেরই মঙ্গল হয়।'

দেবতারা তখন ইন্দ্রাণীকে বললেন—'দেবী ! সমস্ত পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গম এক আপনার আধারেই স্থিত। আপনি পতিব্রতা এবং সত্যনিষ্ঠ। একবার নহুষের কাছে চলুন, আপনাকে কামনা করলে ওই পাপী শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হবে এবং দেবরাজ শক্র নাশ করে পুনরায় তাঁর ঐশ্বর্য লাভ করবেন।' নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য দেবতাদের কথামতো ইন্দ্রাণী সসংকোচে নহুষের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে দেবরাজ নহুষ বললেন—'শুচিস্মিতে ! আমি ত্রিলোকের প্রভু ! অতএব হে সুন্দরী ! তুমি আমাকে পতিরূপে বরণ করো।' নহুষের কথা শুনে পতিব্রতা ইন্দ্রাণী ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি হাতজোড় করে ব্রহ্মাকে নমস্কার করে দেবরাজ নহুষকে বললেন—'সুরেশ্বর ! আমি আপনার কাছে কিছু সময় চাইছি। আমি এখনও জানিনা ইন্দ্র কোথায় গেছেন এবং ফিরে আসবেন কি না। তাঁর ঠিকমতো অনুসন্ধানের পরেও যদি সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে আমি আপনার সেবায় ব্যাপৃত হবো।' নহুষ বললেন—'সুন্দরী, তুমি যা বলছ, তাই হবে। শক্রর অনুসন্ধান করো। তুমি তোমার কথা স্মরণ রাখবে।'

নহুষের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ইন্দ্রাণী বৃহস্পতির গৃহে গেলেন। ইন্দ্রাণীর কথায় অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতা একত্রিত হয়ে ইন্দ্রের সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা দেবাদিদেব ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাকুল হয়ে বললেন—'দেবেশ্বর ! আপনি জগতের প্রভু এবং আমাদের আশ্রয়, পূর্বপুরুষ। সমস্ত প্রাণীর রক্ষার জন্যই আপনি বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। ভগবান ! আপনার তেজে বৃত্রাসুর বিনাশপ্রাপ্ত হলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপের পাতক হন। আপনি তা হতে মুক্তি পাবার উপায় বলুন।' দেবতাদের কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু বললেন—'ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করে আমার পূজা করুক। আমি তাকে

ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। এর ফলে সে সর্বভয় হতে মুক্ত হয়ে পুনরায় দেবতাদের রাজা হবে এবং দুষ্টবুদ্ধি নহুষ নিজ কুকর্মের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'

ভগবান বিষ্ণুর এই সত্য, শুভ এবং অমৃতময় বচন শুনে দেবতারা ঋষি এবং উপাধ্যায়দের সঙ্গে ইন্দ্র যেখানে ভীতব্যাকুল হয়ে লুকিয়ে ছিলেন সেখানে গেলেন। সেইখানে ইন্দ্রের শুদ্ধির জন্য ব্রহ্মহত্যানিবৃত্তিকারী অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ শুরু হল। যজ্ঞকারীগণ ব্রহ্মহত্যাকে বিভক্ত করে তা বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পৃথিবী এবং নারীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। ফলে ইন্দ্র নিষ্পাপ ও নিঃশঙ্ক হলেন। কিন্তু তিনি নিজ স্থান অধিকার করতে এসে দেখলেন নহুষ দেবতাদের বরের প্রভাবে দুঃসহ হয়ে রয়েছে এবং নিজ দৃষ্টির প্রভাবে সে সমস্ত প্রাণীর শক্তিনাশ করে দেয়। তাই দেখে ইন্দ্র ভয়ে কম্পিত হয়ে সেখান থেকে ফিরে গেলেন এবং অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষায় অদৃশ্যভাবে বিচরণ করতে লাগলেন।

—০—

ইন্দ্র কথিত যুক্তির দ্বারা নহুষের পতন এবং ইন্দ্রের পুনরায় দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া

যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্র চলে গেলে ইন্দ্রাণী পুনরায় শোকসাগরে নিমগ্ন হলেন। তিনি দুঃখিত হয়ে 'হায় ইন্দ্র !' বলে বিলাপ করে বলতে লাগলেন—'আমি যদি দান করে থাকি, যজ্ঞ করে থাকি, গুরুজনদের সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করে থাকি, যদি আমি সত্যনিষ্ঠ হই এবং আমার পাতিব্রত্য ধর্ম অবিচল থাকে তাহলে আমাকে যেন কখনো অন্য পুরুষের দিকে তাকাতে না হয়। আমি উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাত্রী রাত্রিদেবীকে প্রণাম জানাই, তিনি যেন আমার মনোরথ পূর্ণ করেন।' একবার তিনি একাগ্রচিত্তে রাত্রিদেবী উপশ্রুতির উপাসনা করে প্রার্থনা জানালেন যে, যে স্থানে দেবরাজ আছেন, তিনি যেন সেই স্থান দেখিয়ে দেন।

ইন্দ্রাণীর প্রার্থনা শুনে উপশ্রুতি দেবী মূর্তিমতি হয়ে আবির্ভূতা হলেন। তাঁকে দেখে ইন্দ্রাণী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পূজা করে বললেন—'দেবী ! আপনি কে ? আপনার পরিচয় জানতে আমি খুবই আগ্রহী।' উপশ্রুতি বললেন—'দেবী ! আমি উপশ্রুতি। তোমার সত্যের প্রভাবে আমি তোমাকে দর্শন দিতে এসেছি। তুমি পতিব্রতা, যম-নিয়মাদি যুক্ত, আমি তোমাকে ইন্দ্রের কাছে নিয়ে যাব। শীঘ্র তুমি আমার সঙ্গে এসো, দেবরাজের দর্শন লাভ করবে।' তারপর

উপশ্রুতি দেবীর পিছন পিছন ইন্দ্রাণী দেবতাদের বন, নানা পর্বত, হিমালয় লঙ্ঘন করে এক দিব্য সরোবরে পৌঁছলেন। সেই সরোবরে এক বিশাল সুন্দর কমল ছিল। সেটি এক উচ্চ নালবিশিষ্ট গৌরবর্ণ মহাকমল দিয়ে বেষ্টন করা ছিল। উপশ্রুতি সেই নাল ছিঁড়ে তার মধ্যে ইন্দ্রাণী সহ প্রবেশ করলেন, সেখানেই তাঁরা ইন্দ্রকে খুঁজে পেলেন। ইন্দ্রাণী পূর্বকর্ম স্মরণ করে ইন্দ্রের স্তুতি করলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! তুমি কী করে এখানে এলে, কী করে আমার খোঁজ পেলে ?' ইন্দ্রাণী তাঁকে নহুষের সব কথা বলে নিজের সঙ্গে যেতে বললেন এবং নহুষকে বিনাশ করার জন্য প্রার্থনা করলেন।

ইন্দ্রাণীর কথা শুনে ইন্দ্র বললেন—'দেবী ! এখন নহুষের বলবৃদ্ধি পেয়েছে, ঋষিরা তাঁর বল অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব এখন পরাক্রম দেখাবার সময় নয়। আমি তোমাকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি, তুমি সেই অনুসারে কাজ করো। তুমি একান্তে নহুষের কাছে গিয়ে বলো সে যেন ঋষিদের দ্বারা পাল্কীবাহিত হয়ে তোমার কাছে আসে, তাহলেই তুমি প্রসন্ন হয়ে তার অধীন হবে।' দেবরাজের কথায় শচী 'যে আজ্ঞে' বলে নহুষের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে নহুষ সহাস্যে বললেন—'সুন্দরী ! বলো, তোমার কী সেবা করব ? আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।' ইন্দ্রাণী বললেন—'জগৎপতে ! আমি আপনার কাছে যে সময় চেয়েছিলাম, তা পূর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি, তা আপনি চিন্তা করে দেখুন। আপনি যদি আমার সেই প্রণয়বাক্য পূর্ণ করেন, তাহলে আমি অবশ্যই আপনার অধীন হব। আমার ইচ্ছা ঋষিরা যেন আপনাকে পাল্কীতে বসিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসেন।'

নহুষ বললেন—'সুন্দরী ! তুমি তো এক অপূর্ব কথা বলেছ, এরকম বাহনে কেউ বোধহয় চড়েনি। এ আমার খুব মনোমত হয়েছে, আমাকে তোমার অধীন বলে মনে করো। এখন সপ্তর্ষি এবং মহর্ষিরা আমার পাল্কী বহন করবেন।' এই বলে রাজা নহুষ ইন্দ্রাণীকে বিদায় জানালেন এবং অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে ঋষিগণ দ্বারা পাল্কী বহন করাতে লাগলেন।

শচী তখন বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন—'নহুষ আমাকে যে সময় দিয়েছিলেন, তার সামান্যই অবশেষ আছে। এবার আপনি শীঘ্র ইন্দ্রের অনুসন্ধান করুন। আমি আপনার ভক্ত, আমায় কৃপা করুন।' বৃহস্পতি বললেন—'ঠিক আছে তুমি দুষ্ট বুদ্ধি নহুষকে ভয় পেয়ো না। নরাধম ঋষিদের দিয়ে পাল্কী বহন করায়, ধর্মের কোনো স্থানই তার নেই। মনে করো এবারই তার শেষ। সে এখানে আর থাকতে পারবে না। ভয় পেয়ো না, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।' তারপর মহাতেজস্বী বৃহস্পতি অগ্নি প্রজ্বলিত করে উত্তমরূপে যজ্ঞ করলেন এবং অগ্নিকে ইন্দ্রের

অনুসন্ধান করতে বললেন। তাঁর আদেশে অগ্নি নানাস্থানে খুঁজতে খুঁজতে সেই সরোবরে গিয়ে পৌঁছলেন যেখানে ইন্দ্র লুকিয়ে ছিলেন। তিনি সেই কমলনালের তন্তুতে ইন্দ্রকে দেখে বৃহস্পতিকে জানালেন যে, ইন্দ্র অণুমাত্ররূপ ধারণ করে কমলনালের তন্তুতে লুকিয়ে আছেন। তাঁর কথা শুনে বৃহস্পতি সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্বদের নিয়ে সেখানে এলেন এবং ইন্দ্রের প্রাচীন কর্মসমূহের উল্লেখ করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। তখন ক্রমশ ইন্দ্রের তেজ বাড়তে লাগল এবং তিনি পূর্বরূপ ধারণ করে শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি তখন বৃহস্পতিকে বললেন—'বলুন, আপনার কী কাজ বাকি আছে ? মহাদৈত্য বিশ্বরূপ এবং বিশালকায় বৃত্রাসুর উভয়েরই অন্ত হয়েছে।' বৃহস্পতি বললেন—'দেবরাজ, নহুষ নামে এক মানবরাজা দেবতা ও ঋষিদের তেজে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁদের অধিপতি হয়েছে। সে আমাদের ভীষণ জ্বালাতন করছে। তুমি তাকে বধ করো।'

'বৃহস্পতি যখন ইন্দ্রকে এই কথা বলছিলেন, তখন কুবের, যম, চন্দ্র এবং বরুণও সেখানে এলেন এবং সকলে মিলে নহুষের বধের উপায় ভাবতে লাগলেন। এর-মধ্যে পরম তপস্বী ঋষি অগস্ত্যও সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি ইন্দ্রকে অভিনন্দন করে বললেন—'আনন্দের কথা যে বিশ্বরূপ এবং বৃত্রাসুরকে বধ করা হয়েছে। আজ নহুষও দেবরাজপদ হতে ভ্রষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।' ইন্দ্র অগস্ত্যমুনিকে যথারীতি আপ্যায়ন করলেন, তিনি আসন গ্রহণ করলে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! আমি জানতে চাই পাপবুদ্ধি নহুষের পতন হল কীভাবে ?' মহর্ষি অগস্ত্য বললেন—'দুষ্টচিত্ত নহুষের যার জন্য স্বর্গ হতে পতন হয়েছে, তা বলছি শোনো। মহাভাগ দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি পাপাত্মা নহুষের পাল্কীবহন করেছিলেন। সেইসময় ঋষিদের সঙ্গে তার বিবাদ হয় এবং অধর্মে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় সে আমার মস্তকে পদাঘাত করে, তাতে তার তেজ ও কান্তি নষ্ট হয়ে যায়। আমি তাকে বলি—রাজন্ ! তুমি প্রাচীন মহর্ষিদের আচার-আচরণ নিয়ে দোষারোপ করছ, ব্রহ্মার ন্যায় তেজস্বী ঋষিদের দিয়ে

পাল্কী বহন করাচ্ছ এবং আমার মস্তকে পদাঘাত করেছ, অতএব তুমি পুণ্যহীন হয়ে পৃথিবীতে পতিত হও। এখন তুমি দশ হাজার বছর ধরে অজগরের রূপধারণ করে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াবে। এইসময় অতিক্রান্ত হলে আবার স্বর্গলাভ করবে। এইভাবে আমার শাপে সে ইন্দ্রপদচ্যুত হয়েছে। এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে সব লোক পালন করো।'

'তখন দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে অগ্নি, বৃহস্পতি, যম, বরুণ, কুবের সমস্ত দেবতা গন্ধর্ব এবং অপ্সরাসহ দেবলোকে গেলেন। সেখানে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে থেকে আনন্দে সব লোক পালন করতে লাগলেন। ইত্যবসরে ভগবান অঙ্গিরা সেখানে পদার্পণ করলেন। ভগবান অঙ্গিরা অথর্ববেদের মন্ত্রদ্বারা দেবরাজের পূজা করলেন। ইন্দ্র এতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিলেন, 'আপনি অথর্ববেদ গান করেছেন, তাই এই বেদে আপনি অথর্বাঙ্গিরা নামে বিখ্যাত হবেন এবং যজ্ঞের ভাগও প্রাপ্ত হবেন।' এইভাবে অথর্বাঙ্গিরা ঋষিকে আপ্যায়ন করে ইন্দ্র তাঁকে বিদায় জানালেন। তারপর তিনি সমস্ত দেবতা এবং তপোধন ঋষিদের আদর আপ্যায়ন করে ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করতে লাগলেন।'

শল্যের বিদায় গ্রহণ এবং কৌরব ও পাণ্ডবদের সৈন্যসংগ্রহের বর্ণনা

মহারাজ শল্য বললেন—'যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্রকে এইভাবে সপত্নীক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল এবং শত্রুকে বধ করার জন্য অজ্ঞাতবাসও করতে হয়েছিল। সুতরাং তোমাকে যদি দ্রৌপদী এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে বনে কষ্ট সহ্য করতে হয় তার জন্য তুমি অসন্তুষ্ট হয়ো না। বৃত্রাসুরকে বধ করে যেমন ইন্দ্র রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন তেমনই তুমিও রাজ্য ফিরে পাবে। ঋষি অগস্ত্যের অভিশাপে যেমন নহুষের পতন হয়েছিল, তেমনই তোমার শত্রু কর্ণ এবং দুর্যোধনাদিরও বিনাশ হবে।'

রাজা শল্য এইভাবে সান্ত্বনা দেওয়ায় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর বিধিমতো আপ্যায়ন করলেন। তারপর মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় নিয়ে সেনাসহ দুর্যোধনের কাছে চলে এলেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর যাদব মহারথী সাত্যকি বিশাল এক চতুরঙ্গিণী সৈন্য নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। তাঁর সৈন্যদল বিভিন্ন দেশের বীরগণের দ্বারা সুশোভিত ছিল। নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে তারা সুসজ্জিত ছিল। তারপর এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এলেন, এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এলেন জরাসন্ধের পুত্র জয়ৎসেন এবং পাণ্ড্যরাজও সমুদ্রতীরবর্তী নানা যোদ্ধাকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সেবায় উপস্থিত হলেন। এইভাবে বিভিন্ন দেশের সৈন্য সমাগম হওয়ায় পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যদল অত্যন্ত আকর্ষক, ভব্য এবং শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠল। মহারাজ দ্রুপদের সেনা ও তাঁর মহারথী পুত্র এবং দেশ-বিদেশ থেকে আসা শূরবীরদের সমাবেশে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের সেনাদলে বহু পার্বত্য রাজা ছিলেন। তাঁরাও পাণ্ডবদের শিবিরে যোগদান করলেন।
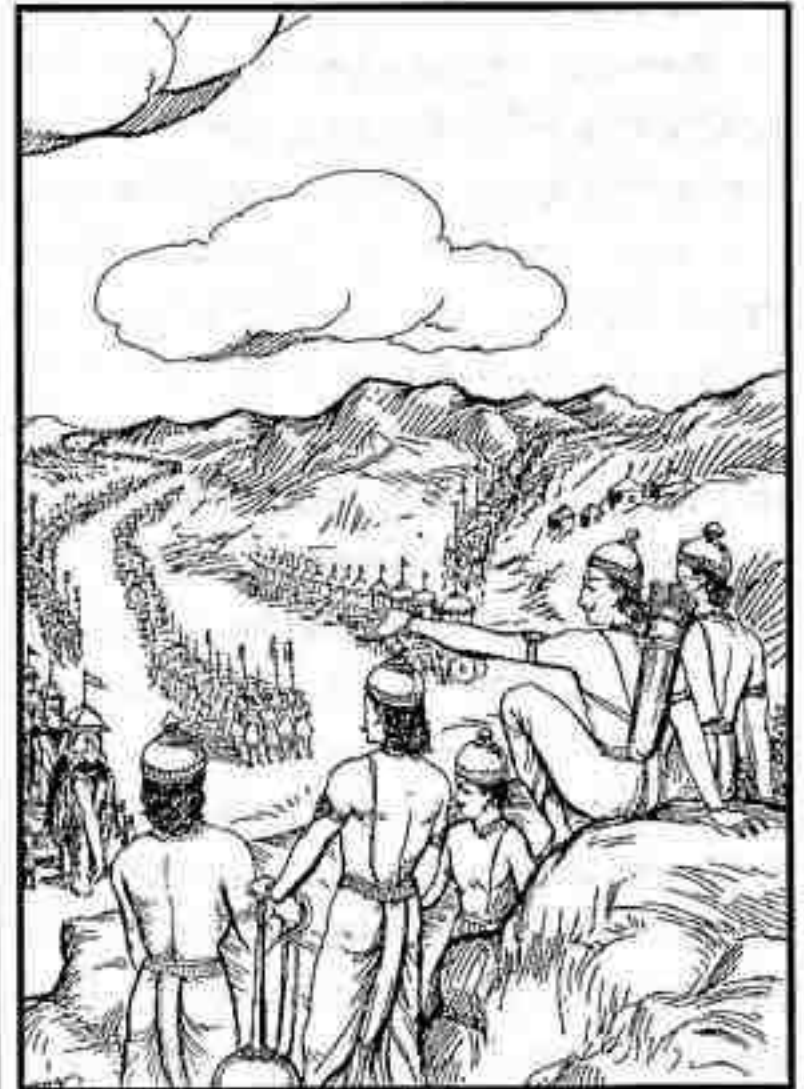
এইভাবে নানাস্থান থেকে আগত সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য মহাত্মা পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করল। কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসুক এই বিশাল বাহিনী দেখে পাণ্ডবরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

এদিকে রাজা ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে কৌরবদের উৎসাহ বর্ধন করলেন, তাঁর সৈন্যদলে চীন, কিরাত দেশের বীরগণ ছিল। রাজা দুর্যোধনের পক্ষে আরও কয়েক দেশের রাজা এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য দিয়ে এলেন। কৃতবর্মা, ভোজ, অন্ধক এবং কুকুরবংশীয় যাদব বীরদের সঙ্গে অক্ষৌহিণী সৈন্য দিয়ে দুর্যোধনের সমীপে উপস্থিত হলেন। সিন্ধু সৌবীর দেশের জয়দ্রথ প্রমুখ রাজাদের সঙ্গেও কয়েক অক্ষৌহিণী সেনা এল। কম্বোজ দেশের রাজা সুদক্ষিণ শক এবং যবন বীরদের সঙ্গে এলেন, তাঁর সঙ্গেও এক অক্ষৌহিণী সেনা ছিল। মাহিষ্মতী পুরীর রাজা নীল দক্ষিণ দেশের মহাবলী বীরদের সঙ্গে এলেন। অবন্তী দেশের রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ এক-এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে দুর্যোধনের সেবায় উপস্থিত হলেন। কেকয় দেশের রাজারা ছিলেন পাঁচভাই। তাঁরাও এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এসে কুরুরাজকে প্রসন্ন করলেন। এছাড়াও এদিক সেদিক থেকে অন্যান্য রাজারা আরো তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে এলেন। দুর্যোধনের পক্ষে এইভাবে সর্বমোট একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্রিত হল। তাঁরা সব নানাপ্রকার ধ্বজা-পতাকায় সুশোভিত হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। পঞ্চনদ, কুরুজাঙ্গল, রোহিতবন, মারবাড়, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাতট, বারণ, বটধান এবং যমুনাতটের পার্বত্য প্রদেশ—এই সমস্ত ধন-ধান্যপূর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্র কৌরব সেনায় ভরে গিয়েছিল। মহারাজ দ্রুপদ তাঁর যে পুরোহিতকে দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, তিনি এইসব একত্রিত কৌরব সৈন্য দেখলেন।

—o—

দ্রুপদের পুরোহিতের সঙ্গে ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রের মত বিনিময়

বৈশম্পায়ন বললেন—দ্রুপদের পুরোহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর তাঁকে সাদর আপ্যায়ন করলেন। পুরোহিত প্রথমে নিজ পক্ষের কুশল-সমাচার জানালেন, পরে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি সমস্ত সেনাপতিদের সমক্ষে বলতে লাগলেন—'একথা সকলেই জানেন যে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ে একই পিতার পুত্র ; তাই পিতার সিংহাসনে দুজনেরই সমান অধিকার। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তাঁদের পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হলেও পাণ্ডুর পুত্ররা তা পাননি—তার কারণ কী ? কৌরবরা বহুবার নানা উপায়ে পাণ্ডবদের বধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আয়ু ছিল, তাই তাঁদের যমলোকে পাঠাতে পারেননি। এত কষ্ট সহ্য করেও তাঁরা নিজ শক্তিতে রাজ্যের বৃদ্ধি করেছিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ শকুনির সঙ্গে মিলিত হয়ে ছলনা দ্বারা পাণ্ডবদের সমস্ত রাজ্য অধিকার করে নিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তা অনুমোদন করেছেন এবং পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশবর্ষ ধরে অসহায় হয়ে বনে বাস করেছেন। সমস্ত অপরাধ ভুলে তাঁরা এখনও কৌরবদের সঙ্গে সবকিছু মিটিয়ে নিতে চান। সুতরাং দুই পক্ষের কথা মনে রেখে হিতৈষীগণের উচিত দুর্যোধনকে বোঝানো। পাণ্ডবরা বীর হলেও কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না। তাঁদের ইচ্ছা এই যে, যুদ্ধে প্রাণীবধ না করে যদি তাঁরা তাঁদের অংশ পেয়ে যান, সেটাই মঙ্গল। দুর্যোধন যে লাভের কথা মনে রেখে যুদ্ধ করতে চাইছেন, তা কখনোই সফল হবে না। পাণ্ডবরাও কম শক্তিশালী নন। যুধিষ্ঠিরের কাছে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে। এতদ্ব্যতীত পুরুষসিংহ সাত্যকি, ভীম, নকুল এবং সহদেব—এঁরা একাই হাজার অক্ষৌহিণী সেনার সমান। অর্জুন একাই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে জয় করতে সক্ষম। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণও তাই । পাণ্ডব সৈন্যদলে প্রাবল্য, অর্জুনের পরাক্রম এবং শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা দেখে কোন ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস করবেন ? সুতরাং ধর্ম এবং সময়ের কথা ভেবে আপনারা পাণ্ডবদের যে অংশ প্রাপ্য, তা শীঘ্র প্রদান করুন। এই উপযুক্ত সময় যেন বৃথা না চলে যায়, তা স্মরণে রাখবেন।'

পুরোহিতের বক্তব্য শুনে মহাবুদ্ধিমান ভীষ্ম তাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করে এক সময়োচিত কথা বললেন—'ব্রহ্মন্ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে সকল পাণ্ডব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কুশলে আছেন। শুনে সুখী হলাম যে তাঁরা অন্যান্য রাজাদের কাছে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা ধর্মে তৎপর রয়েছেন জেনেও আনন্দলাভ করলাম। পাঁচ ভ্রাতা যে যুদ্ধের চিন্তা ছেড়ে ভ্রাতা-বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধি করতে

চান, একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। মহারথী কিরীটধারী অর্জুন প্রকৃতই বলবান এবং অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ; ওর সঙ্গে যুদ্ধে সম্মুখীন হওয়ার সাহস কার আছে ? সাক্ষাৎ ইন্দ্রেরও এত ক্ষমতা নেই, অতএব অন্য ধনুর্ধরদের আর কীকথা ? আমার বিশ্বাস অর্জুনই ত্রিলোকে একমাত্র বীর !'

ভীষ্ম যখন এই কথা বলছিলেন তখন কর্ণ ক্রোধান্বিত হয়ে ধৃষ্টতাপূর্বক তাঁর কথার মাঝখানে বলতে লাগলেন—

'ব্রহ্মন্ ! অর্জুনের পরাক্রমের কথা কারো অজানা নয়, বারবার তা উল্লেখ করে কী লাভ ? এসব পূর্বের কথা। শকুনি দুর্যোধনের হয়ে যুধিষ্ঠিরকে পাশাতে হারিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁরা একটি শর্ত মেনে বনে গিয়েছিলেন। সেই শর্ত পূরণ না করেই তাঁরা মৎস্য এবং পাঞ্চাল দেশের ভরসায় মূর্খের মতো পৈতৃক সম্পত্তি নিতে চাইছেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের ভয়ে রাজ্যের এক চতুর্থাংশও দেবেন না। যদি তাঁরা পিতৃপুরুষের রাজ্য নিতে চান, তাহলে প্রতিজ্ঞা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁদের পুনরায় বনে যেতে হবে। তারা যদি ধর্মত্যাগ করে যুদ্ধ করতেই অবতীর্ণ হয়, তবে এই কৌরব বীরদের কাছে এলে আমার কথা ভালোমতোই মনে পড়বে।'

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'রাধাপুত্র ! মুখে বলার দরকার কী ? একবার অর্জুনের পরাক্রমের কথা স্মরণ কর, যখন বিরাটনগরের যুদ্ধে সে একাই ছয় মহারথীকে পরাস্ত করেছিল। তোমার পরাক্রম সেই সময়েই দেখা গেছে, বহুবার তুমি তার সামনে থেকে পরাজয় বরণ করে ফিরেছিলে। আমরা যদি এই ব্রাহ্মণের কথা অনুযায়ী কাজ না করি তাহলে অবশ্যই এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের হাতে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

ভীষ্মের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সম্মান জানালেন এবং ভীষ্মকে প্রসন্ন করার জন্য কর্ণকে ধমক দিয়ে বললেন—'ভীষ্ম যা বললেন, তাতে আমাদের এবং পাণ্ডবদের উভয়েরই মঙ্গল। এতে জগতেরও কল্যাণ। ব্রাহ্মণদেবতা ! আমি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে পাঠাবো। আপনি সত্বর ফিরে যান।' এই বলে ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতকে সাদর আপ্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করে পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

—o—

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে সভায় ডেকে বললেন—'সঞ্জয় ! সকলে বলছে পাণ্ডবরা উপপ্লব্য নামক স্থানে বসবাস করছেন। তুমি সেখানে গিয়ে তাঁদের খবর নাও। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সম্মান করে বলবে— 'অত্যন্ত আনন্দের কথা যে আপনারা এখন নিজ স্থানে ফিরে এসেছেন।' তাঁদের কুশল সংবাদ নেবে এবং আমাদের কুশল সংবাদ তাঁদের জানাবে। তাঁরা কদাপি বনবাসের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবুও তাঁরা আমাদের ওপর ক্রোধপ্রকাশ করেননি। প্রকৃতই তাঁরা অত্যন্ত নিষ্কপট এবং সজ্জনের উপকারকারী। সঞ্জয় ! আমি কখনো পাণ্ডবদের অধর্ম করতে দেখিনি। এঁরা নিজ পরাক্রমে লক্ষ্মীলাভ করেও সমস্তই আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সর্বদাই ওদের দোষ দেখতাম ; কিন্তু কখনোই ওদের মধ্যে একটিও দোষ খুঁজে পাইনি, যাতে তাঁদের নিন্দা করতে পারা যায়। তাঁরা অসময়ে বন্ধুদের অর্থপ্রদান করে সাহায্য করে থাকেন।

প্রবাসে গিয়েও তাঁদের আচার-ব্যবহারে কোনো পার্থক্য হয়নি। তাঁরা সকলকেই যথোচিত আদর আপ্যায়ন করেন। আজমীঢ় বংশীয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দুর্যোধন এবং কর্ণ ব্যতীত এদের কোনো শত্রুই নেই। সুখ এবং প্রিয়জন বিচ্ছিন্ন এই পাণ্ডবদের ক্রোধকে এই দুজনেই বাড়িয়ে থাকে। মূর্খ দুর্যোধন পাণ্ডবদের জীবিতকালেই তাদের অংশ অপহরণ করে নিতে চায়। যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, সাত্যকি, নকুল, সহদেব এবং সমস্ত সৃঞ্জয়বংশীয় বীর রয়েছেন, তাঁদের রাজ্যের অংশ যুদ্ধ করার আগেই দিয়ে দেওয়া মঙ্গলের হবে। গাণ্ডীবধারী অর্জুন একাই রথে বসে সমস্ত পৃথিবীকে নিজ অধিকারে আনতে সক্ষম। তেমনই বিজয়ী এবং দুর্ধর্ষ বীর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণও ত্রিলোকের প্রভু এবং পাণ্ডবদের সখা। ভীমের ন্যায় গদাধারী এবং হাতীতে চড়ে যুদ্ধ করায় কেউই সমকক্ষ নয়। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করলে সে আমার পুত্রদের পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও তাঁকে পরাস্ত করতে পারেন না। মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেবও শুদ্ধচিত্ত এবং বলবান। দুটি বাজ যেমন পক্ষীকুলকে নষ্ট করে, এঁরা দুভাই তেমনই শত্রুদের জীবিত রাখবে না। পাণ্ডবপক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত বড় যোদ্ধা। মৎস্য নরেশ বিরাটও পুত্রসহ পাণ্ডবদের সহায়ক, তিনি যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত বড় ভক্ত। পাঞ্চালদেশের রাজাও বহুবীর নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যে এসেছেন। সাত্যকি তো এঁদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আছেনই।

'কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা, লজ্জাশীল এবং বলবান। কারও প্রতি তাঁর শত্রুভাব নেই। দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে কপটতা করেছে। ক্রোধান্বিত হয়ে যুধিষ্ঠির আমার ছেলেদের ভস্ম না করে দেয়। আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধকে যত ভয় পাই তত শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবে পাই না ; কারণ

যুধিষ্ঠির একজন বড় তপস্বী এবং নিয়ম অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। সুতরাং তিনি যা সংকল্প করেন, তা পূর্ণ অবশ্যই হয়। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি রাখেন, তাঁকে আত্মার সমান দেখেন। কৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্বান এবং সদা পাণ্ডবদের হিতসাধনে তৎপর। তিনি সন্ধির কথা বললে যুধিষ্ঠির তা অবশ্যই মেনে নেবেন। সঞ্জয় ! তুমি আমার হয়ে এঁদের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করবে এবং রাজাদের মধ্যে যথোচিত কথাবার্তা বলবে। ভরতবংশের যাতে মঙ্গল হয়, পরস্পর ক্রোধ এবং মনোমালিন্য বৃদ্ধি না পায় এবং যুদ্ধের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়—সেইভাবে আলোচনা করবে।'

উপপ্লব্য নগরে সঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সঞ্জয় পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপপ্লব্য নগরে গেলেন। সেখানে তিনি প্রথমে কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন, তারপর প্রসন্ন বদনে বললেন—'রাজন্ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আজ আপনাদের সকলকে কুশলে দেখা গেল। অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলে কুশলে আছেন তো ? সত্যব্রতধারিণী বীরপত্নী রাজকুমারী দ্রৌপদী প্রসন্ন আছেন তো ?'

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! তোমাকে স্বাগত জানাই, তোমার সাক্ষাৎ লাভ করে আমরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি ভ্রাতৃগণসহ কুশলে আছি। আমাদের পিতামহ

ভীষ্ম কুশলে আছেন তো, আমাদের ওপর তাঁর স্নেহ পূর্বের মতো বজায় আছে তো ? পুত্রগণসহ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মহারাজ বহ্লীক কুশলে আছেন তো ? সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, রাজা শল্য, সপুত্র দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্য—এই সকল প্রধান ধনুর্ধরও ভালো আছেন তো ? ভরতবংশের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী, মাতাগণ এঁদের কোনো কষ্ট নেই তো ? যাঁরা রন্ধনকার্য করেন, গৃহকাজ করেন তাঁরা, তাঁদের পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভাগিনেয় সকলে স্বচ্ছন্দভাবে আছেন তো ? রাজা দুর্যোধন পূর্বের মতোই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করেন তো ? আমি তাঁদের যে বৃত্তি প্রদান করেছিলাম, তা তিনি ফিরিয়ে নেননি তো ? কৌরব প্রজাগণ কখনো একত্রিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনকে আমাকে রাজ্যভাগ দেওয়ার কথা বলেন কী ? রাজ্যে ডাকাত ও লুটেরা দেখে কখনো কি তাঁদের অর্জুনের কথা মনে পড়ে ? কেননা অর্জুন একই সঙ্গে একষট্টিটি বাণ চালাতে সক্ষম, ভীমও যখন গদা হাতে করেন, শত্রু ভয়ে কম্পিত হয়। তাঁরা কি সেই পরাক্রমশালী ভীমকে স্মরণ করেন ? মহাবলী এবং অতুল পরাক্রমশালী নকুল ও সহদেবকে তাঁরা ভুলে যাননি তো ? মন্দবুদ্ধি দুর্যোধনাদি যখন দুর্বুদ্ধিবশত ঘোষ যাত্রার জন্য বনে গিয়ে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শত্রুদের হাতে বন্দী হন, সেইসময় ভীম ও অর্জুনই তাঁদের রক্ষা করেন—একথা তাঁর স্মরণে আছে কি না ? সঞ্জয় ! আমার তো মনে হয় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত, শুধুমাত্র একবারের উপকারের দ্বারা দুর্যোধনের মতি ফেরানো যাবে না।'

সঞ্জয় বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা সকলেই সানন্দে আছেন। দুর্যোধন তো শত্রুদেরও দান করেন, সুতরাং ব্রাহ্মণদের বৃত্তি তিনি কেন ফিরিয়ে নেবেন ? ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে বারণ করেন। তাঁরা আপনাদের প্রতি যে ব্যবহার করেন, তা শুনে তিনি মনে মনে কষ্ট পান। কেননা তিনি আগত ব্রাহ্মণদের কাছে শুনে থাকেন যে 'মিত্রদ্রোহ সব থেকে বড় পাপ'। যুদ্ধের কথা হলে ধৃতরাষ্ট্র বীরাগ্রণী অর্জুন, গদাধারী ভীম এবং রণধীর নকুল—সহদেবের কথা সর্বদা চিন্তা করেন। অজাতশত্রু ! এখন আপনিই এমন কোনো পথ প্রদর্শন করুন যাতে কৌরব, পাণ্ডব এবং সৃঞ্জয় বংশের সকলে সুখে থাকে। এখানে যে রাজারা উপস্থিত, তাঁদের সংবাদ দিন। আপনার পুত্র ও মন্ত্রীদেরও সঙ্গে রাখুন। তারপর আপনার জেষ্ঠতাত যে বার্তা পাঠিয়েছেন, তা শুনুন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং রাজা বিরাট উপস্থিত ; পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সবাই আছেন। এখন ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদ বলুন।'

সঞ্জয় বললেন—'রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তি চান, যুদ্ধ নয়। তিনি অত্যন্ত উতলা হয়ে রথ প্রস্তুত করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় ভাই, পুত্র এবং কুটুম্বসহ রাজা যুধিষ্ঠিরও এই কথা অনুমোদন করবেন। এতে পাণ্ডবদের মঙ্গল হবে। কুন্তী পুত্রগণ ! আপনারা দিব্য শরীর, নম্রতা, সারল্য ও সব ধর্ম এবং উত্তমগুণসম্পন্ন, আপনাদের জন্মও উত্তম বংশে। আপনারা অত্যন্ত দয়ালু, দানশীল এবং স্বভাবতই শীলবান ও কর্মের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত। আপনাদের হৃদয় সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ, তাই আপনাদের দ্বারা কোনো অমর্যাদাকর কাজ হওয়া অসম্ভব। পরিষ্কার সাদা কাপড়ে কোনো দাগ পড়লে তা যেমন স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, তেমনি আপনাদের মধ্যে কোনো দোষ থাকলে তা গোপন থাকত না। যে কর্মের দ্বারা সকলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, যা সর্বপ্রকারের পাপের জন্মদাতা এবং পরিণামে যা নরকগামী করে, এমন ভাবে

যুদ্ধের মতো ঘোর কর্মে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রবৃত্ত হতে চায় ? সেখানে জয়-পরাজয় দুই-ই সমান। কুন্তীর পুত্ররা কীকরে অধম ব্যক্তিদের ন্যায় এরূপ কর্ম করতে উদ্যত হতে পারে, যারা ধর্ম বা অর্থ কোনোটিই প্রদান করে না। এখানে ভগবান বাসুদেব আছেন, বয়োবৃদ্ধ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ আছেন ; এঁদের আমি প্রণাম করে প্রসন্ন করতে চাই। আমি হাত জোড় করে আপনাদের শরণ নিচ্ছি ; আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে যাতে কৌরব এবং সৃঞ্জয়বংশের কল্যাণ হয়, তাই করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন আমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই ফেরাবেন না। আমি তো মনে করি, চাইলে অর্জুন প্রাণও দিতে পারেন। এইসব ভেবেই আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, সন্ধিই শান্তির সর্বোত্তম উপায়। পিতামহ ভীষ্ম এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও এই অভিমত।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি এমন কী শুনেছ, যাতে আমার যুদ্ধের ইচ্ছা আছে জেনে ভীত হচ্ছ ? যুদ্ধ করার থেকে না করাই ভালো। সন্ধির প্রস্তাব পেলে কে যুদ্ধ করতে চাইবে ? আমি মনে করি বিনা যুদ্ধে যদি সামান্য লাভ হয়, তাকেই যথেষ্ট বলে মেনে নেওয়া উচিত। সঞ্জয় ! তুমি জানো বনে আমরা কত কষ্ট সহ্য করেছি। তা সত্ত্বেও তোমার কথায় আমরা কৌরবদের অপরাধ ক্ষমা করতে পারি। কৌরবরা আমাদের সঙ্গে আগে যে ব্যবহার করেছে এবং পাশা খেলার পরে আমরা ওদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করেছি, তা তোমার অজানা নেই। এখনও সব কিছু তেমনই হতে পারে। তোমার কথা অনুযায়ী আমরা শান্তি অবলম্বন করব। কিন্তু তা তখনই সম্ভব, যখন ইন্দ্রপ্রস্থ আমার রাজ্য থাকবে এবং দুর্যোধন এই কথা মেনে ওই রাজ্য আমাদের ফেরত দেবে।'

সঞ্জয় বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! আপনার প্রতিটি কাজ ধর্মযুক্ত—একথা লোকপ্রসিদ্ধ এবং তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই জীবন অনিত্য হলেও কীর্তি দ্বারা মহাযশ প্রাপ্তি হতে পারে—এই কথা ভেবে আপনি আপনার কীর্তিনাশ করবেন না। হে অজাতশত্রু ! যদি কৌরবরা যুদ্ধবিনা আপনাদের রাজ্যভাগ দিতে না চায় তাহলে আমি যুদ্ধ করে সমস্ত রাজ্য পাওয়ার বদলে অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশীয় রাজাদের রাজ্যে ভিক্ষা করেও জীবন নির্বাহ করা ভালো বলে মনে করি। মানুষের জীবন খুবই অল্প সময়ের, তা সর্বদাই ক্ষয়িষ্ণু, দুঃখময় ও চঞ্চল। অতএব হে পাণ্ডব ! এই জীবন সংহার আপনার যশের অনুকূল নয়। আপনি যুদ্ধরূপ পাপে প্রবৃত্ত হবেন না। ইহজগতে ধনের তৃষ্ণা বন্ধন প্রদানকারী, তাতে আবদ্ধ হলে ধর্মে বাধা আসে। যিনি ধর্মের অঙ্গীকার করেন, তিনি জ্ঞানী। ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অর্থসিদ্ধির দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে যায়। যারা ব্রহ্মচর্য এবং ধর্মাচরণ পরিত্যাগ করে অধর্মে প্রবৃত্ত হয় আর যারা মূর্খতাবশত পরলোকে অবিশ্বাস করে, সেই সব অজ্ঞানী মৃত্যুর পর অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে। পরলোকে গমন করলেও নিজের কৃত পুণ্যপাপরূপী কর্মগুলি নষ্ট হয় না। প্রথমে পাপ-পুণ্য মানুষের অনুগমন করে তারপর মানুষকেই তার পিছনে চলতে হয়। শরীর থাকতেই যে কোনো সৎকর্ম করা সম্ভব, মৃত্যুর পর আর কিছুই করা সম্ভব নয়। আপনি পরলোকে সুখ পাওয়ার মতো অনেক পুণ্য কর্ম করেছেন, সৎপুরুষরা যার প্রশংসা করে থাকেন। এরপর যদি আপনাদের আবার যুদ্ধরূপ পাপকর্ম করতে হয়—তার থেকে চিরকালের মতো আপনারা বনে বাস করুন—তাই ভালো। বনবাসে দুঃখ হলেও, ধর্ম আছে। কুন্তীনন্দন ! আপনার বুদ্ধি কখনো অধর্মে নিযুক্ত হয় না ; আপনি ক্রোধবশতও যে কখনো পাপকর্ম করেছেন তা বলা যায় না। তাহলে বলুন, কীজন্য আপনি আপনার বিবেচনা বিরুদ্ধ কাজ করতে চাইছেন ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! সর্ব কর্মের মধ্যে ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ, তোমার একথা ঠিক। কিন্তু আমি যা করতে চলেছি, তা ধর্ম না অধর্ম—প্রথমে তার বিচার করো, তারপর আমার নিন্দা করবে। কোথাও অধর্মই ধর্মের বেশ ধারণ করে, কোথাও সম্পূর্ণ ধর্মই অধর্মরূপে প্রতীত হয় আবার কোথাও ধর্ম নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে। বিদ্বান ব্যক্তিরা নিজ বুদ্ধির দ্বারা তার পরীক্ষা করেন। এক বর্ণের কাছে যা ধর্ম, অপর বর্ণের কাছে তা অধর্ম। এইভাবে যদিও ধর্ম ও অধর্ম নিত্যই বিরাজমান, আপৎকালে তার একটু-আধটু পরিবর্তন হয়ে থাকে। যে ধর্ম যার কাছে প্রধান বলা হয়, তাই তার কাছে প্রমাণভূত। অন্যের দ্বারা আপৎকালেই তা ব্যবহৃত হতে পারে। জীবিকার্জন সর্বতোভাবে নষ্ট হলে যে বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করলে জীবন রক্ষা এবং সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হতে পারে, তারই আশ্রয় নেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি আপৎকাল না হলেও সেই সময়ের ধর্মপালন করে এবং যে ব্যক্তি আপৎগ্রস্ত হয়েও সেই অনুযায়ী জীবিকানির্বাহ করে না তারা উভয়েই নিন্দার পাত্র। জীবিকার মুখ্য সাধন না হলেও ব্রাহ্মণরা যাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, তাই বিধাতা অন্য বর্ণের বৃত্তি থেকে জীবিকা চালিয়ে ব্রাহ্মণদের জন্য

প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী তুমি যদি আমাকে বিপরীত আচরণ করতে দেখো, তাহলে অবশ্যই নিন্দা করবে। মনীষী ব্যক্তিরা সত্ত্বাদি বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে সৎব্যক্তিদের কাছে ভিক্ষাগ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, শাস্ত্রে তাঁদের ক্ষেত্রে এইরূপ বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণ নন, ব্রহ্মবিদ্যায় যাঁর নিষ্ঠা নেই, তাঁদের জন্য নিজ ধর্ম পালনই উত্তম বলে মানা হয়। আমার পিতৃ-পিতামহ এবং তাঁদেরও পূর্বপুরুষরা যে পথ মেনে এসেছেন এবং যজ্ঞের জন্য তাঁরা যা যা কর্ম করেছেন, আমিও সেই পথ এবং কর্ম মানি, তার বেশি নয়। অতএব আমি নাস্তিক নই। সঞ্জয় ! ইহজগতে যত ধন আছে, দেবতা, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মলোকেও যে বৈভব আছে তা আমি যদি পাই, তাও আমি সেগুলি অধর্ম দ্বারা নিতে চাই না। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন, ইনি সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, কুশল, নীতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণভক্ত এবং মনীষী। তিনি বলবান রাজাদের এবং ভোজবংশকে শাসন করেন। আমি যদি সন্ধি পরিত্যাগ করে অথবা যুদ্ধ করে নিজ ধর্মভ্রষ্ট হয়ে নিন্দাপাত্র হই, তাহলে ভগবান বাসুদেব এই বিষয়ে তাঁর বিবেচনা জানান, কারণ তিনি এই দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি প্রত্যেক কর্মের পরিণাম জানেন, এঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। ইনি আমাদের সবথেকে প্রিয়, আমরা কখনো এঁর কথা অমান্য করতে পারি না।'

—o—

সঞ্জয়ের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সঞ্জয় ! আমি যেমন পাণ্ডবদের বিনাশ থেকে রক্ষা করতে চাই, তাঁদের ঐশ্বর্য ফিরে পেতে এবং প্রিয়কাজ করতে চাই, সেইরূপ বহুপুত্র-সম্পন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি সমৃদ্ধিও কামনা করি। আমার একমাত্র ইচ্ছা যে দুপক্ষই শান্ত থাক। রাজা যুধিষ্ঠিরও শান্তিপ্রিয়, একথা শুনেছি এবং পাণ্ডবদের সামনে তা স্বীকারও করছি। কিন্তু সঞ্জয় ! শান্তি হওয়া কঠিন বলে মনে হয় ; ধৃতরাষ্ট্র যখন তাঁর পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লোভের বশে এঁদের রাজ্য দখল করে নিতে চান, তাহলে বিবাদ বৃদ্ধি পাবে না কেন ? তুমি জান যে আমার দ্বারা অথবা যুধিষ্ঠিরের দ্বারা ধর্মলোপ পেতে পারে না ; তাহলে উৎসাহের সঙ্গে নিজ ধর্মপালনকারী যুধিষ্ঠিরের ধর্মলোপের আশঙ্কা তোমার কেন হচ্ছে ? ইনি তো প্রথম থেকেই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কুটুম্বদের সঙ্গে আছেন ; নিজের রাজ্য ভাগ প্রাপ্ত করার যে প্রয়াস ইনি করেছেন, তাকে তুমি ধর্মলোপ বলছ কেন ? গার্হস্থ্যজীবনেও তো এর বিধান আছে ; ব্রাহ্মণরাই এইসব ত্যাগ করে বনবাসের কথা ভাবেন। কেউ হয়তো গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে কর্মযোগের দ্বারা পারলৌকিক সিদ্ধি হওয়া মানেন, কেউ কর্ম ত্যাগ করে জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধি প্রতিপাদন করেন ; কিন্তু খাওয়া-দাওয়া না করলে ক্ষুধা দূর হয় না। তাই ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানীর জন্যেও গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা নেওয়ার বিধান আছে। এই জ্ঞানযোগের বিধিরও কর্মের সঙ্গেই

বিধান করা আছে ; জ্ঞানপূর্বক যে কর্ম করা হয় তা ছিন্ন হয়ে যায়, বন্ধনকারক হয় না। এরমধ্যে কর্মত্যাগ করে যাঁরা শুধু সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাঁরা দুর্বল ; তাঁদের কথার কোনো মূল্য নেই। সঞ্জয় ! তুমি তো সব ধর্মের কথাই জানো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের ধর্মও তোমার

অজ্ঞাত নয়। এরূপ জ্ঞানবান হয়েও তুমি কৌরবদের জন্য কেন হঠকারী কাজ করছ ? রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদা স্বাধ্যায় করেন, ইনি অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞও করেছেন। ইনি ধনুক, কবচ, হাতি, ঘোড়া, রথ এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি সম্পন্ন। পাণ্ডবরা স্বধর্ম অনুসারে কর্তব্যপালন করে থাকেন এবং ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে যদি দৈববশত মৃত্যুও প্রাপ্ত হন তবে সেই মৃত্যুকেও উত্তম বলে মানা হবে। তুমি যদি মনে করো সব কিছু ছেড়ে শান্তিধারণ করাই ধর্মপালন তাহলে বল যুদ্ধ করলে রাজার ধর্মপালন করা হয়, না যুদ্ধ ছেড়ে পৃষ্ঠ পদর্শন করলে হয় ? এই বিষয়ে তোমার মতামত আমি জানতে চাই। ধর্ম অনুসারে যে রাজ্য ভাগ পাণ্ডবদের পাওয়া উচিত, ধৃতরাষ্ট্র তা অধিকার করে নিতে চান, তাঁর পুত্ররাও তাঁকে মদদ দিচ্ছেন। প্রকৃত সনাতন রাজধর্মের কথা কেউ ভেবে দেখছে না ! লুটেরা ধন অপহরণ করে এবং ডাকাতে বলপূর্বক ধন ছিনিয়ে নেয়—উভয়েই নিন্দার পাত্র। সঞ্জয় ! তুমিই বলো দুর্যোধনের সঙ্গে এদের পার্থক্য কোথায় ? দুর্যোধন যে ক্রোধের বশীভূত হয়ে রয়েছে, সে ছলনাপূর্বক রাজ্য অপহরণ করেছে, লোভের জন্য তাকে ধর্ম বলে মনে করে এবং রাজ্য দখল করতে চায়। কিন্তু পাণ্ডবদের রাজ্য তারা গচ্ছিত হিসাবে রেখেছিল, কৌরবরা তা কী করে নিজেদের অধিকারে রাখতে পারে ? দুর্যোধন যাঁদের যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত করেছেন, সেই মূর্খ রাজারা অহংকারবশত মৃত্যু ফাঁদে এসে পড়েছে। সঞ্জয় ! পরিপূর্ণ সভাগৃহে কৌরবরা যে পাপকর্ম করেছিল, সেইকথা স্মরণ কর। পাণ্ডবদের প্রিয় পত্নী সুশীলা দ্রৌপদী রজস্বলা অবস্থায় আনীত হয়েছিলেন ; তখন ভীষ্ম প্রমুখ প্রধান প্রধান কৌরব পুরুষগণও তা উপেক্ষা করেছিলেন। সেইসময় যদি সকলেই দুঃশাসনের এই মন্দ কাজ বন্ধ করতেন তাহলে আমাদের প্রিয় কাজ হত এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদেরও মঙ্গল হত। সভায় বহু রাজা একত্রিত ছিলেন, কিন্তু দীনতাবশত কেউই সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেননি। শুধু বিদুর নিজের ধর্ম মেনে মূর্খ দুর্যোধনকে বারণ করেছিলেন। সঞ্জয় ! ধর্ম না জেনেই তুমি এই সভায় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম উপদেশ দিতে চাও ? দ্রৌপদী সেই সভায় গিয়ে এক অসম্ভব কাজ করেছিলেন, যা তাঁর স্বামীদের সংকট থেকে রক্ষা করেছিল। তাঁকে সেখানে বহু অপমান সহ্য করতে হয়েছে। সভায় তিনি তাঁর শ্বশুরদের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও সূতপুত্র কর্ণ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'যাজ্ঞসেনী ! তোর আর কোনো উপায় নেই, দাসী হয়ে দুর্যোধনের মহলে যা, তোর পতি তোকে পাশাখেলায় হারিয়েছে ; এখন অন্য পতির সন্ধান কর।' যখন পাণ্ডবরা বনে যাওয়ার জন্য মৃগচর্ম ধারণ করেছিল, সেইসময় দুঃশাসন অত্যন্ত কটুভাষায় বলে ওঠে—'এই সব নপুংসকেরা এবার শেষ হয়ে গেল, চিরকালের জন্য এরা নরকের গর্তে পতিত হল।' সঞ্জয় ! কী আর বলব, পাশা খেলায় সময় যত নিন্দনীয় ও অবমাননাকর বাক্য বলা হয়েছিল, সেগুলি সবই তুমি জানো ; তা সত্ত্বেও এই নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনর্বার ঠিক করার জন্য আমি নিজে হস্তিনাপুরে যেতে চাই। পাণ্ডবদের স্বার্থ নষ্ট না করে যদি কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করা সম্ভব হয় তাহলে আমি এই কাজ খুবই পুণ্যের এবং অত্যন্ত অভ্যুদয়কারী বলে মনে করব আর কৌরবরাও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। কৌরবগণ লতাগাছের তুল্য আর পাণ্ডবগণ হলেন বৃক্ষের শাখার ন্যায়। বৃক্ষ-শাখার সাহায্য না পেলে লতা বাড়তে পারে না। পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করতেও প্রস্তুত এবং যুদ্ধ করতেও। এখন ধৃতরাষ্ট্র যা ভালো মনে করেন, তাই করুন। পাণ্ডবরা ধর্ম আচরণকারী ; এঁরা শক্তিশালী বীর হয়েও সন্ধি করতে উদ্যত। তুমি এসব কথা ধৃতরাষ্ট্রকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবে।'

—○—

যুধিষ্ঠিরের সম্ভাষণ, সঞ্জয়ের বিদায় গ্রহণ

সঞ্জয় বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি অনুমতি দিন আমি বিদায় গ্রহণ করি। আমি আবেগবশত যা বলেছি, তাতে আপনি কষ্ট পাননি তো ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! এবার তুমি যেতে পার, তোমার কল্যাণ হোক। আমাকে কষ্ট দেওয়ার কথা তুমি কখনো চিন্তাই করতে পার না। সমস্ত কৌরব এবং আমরা পাণ্ডবরা জানি যে তোমার অন্তর শুদ্ধ এবং তুমি কারো পক্ষপাতী হয়ে মধ্যস্থতা করো না। তুমি বিশ্বাসী এবং

তোমার কথা কল্যাণকারী, তুমি শীলবান এবং সন্তোষকারী, তাই তুমি আমার প্রিয়। তোমার বুদ্ধি কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। কটু কথা বললেও তোমার কখনো ক্রোধের উদ্রেক হয় না। সঞ্জয় ! তুমি আমার প্রিয় এবং বিদুরের মতো দূত হয়ে এসেছ, তুমি অর্জুনেরও প্রিয় সখা। হস্তিনাপুরে গিয়ে তুমি স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং বনবাসী তপস্বী এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আমার প্রণাম জানাবে। বাকী যাঁরা আছেন, তাঁদের কুশল সমাচার জানাবে। আচার্য দ্রোণকে আমার প্রণাম জানাবে, অশ্বত্থামাকে কুশল প্রশ্ন করবে এবং কৃপাচার্যের গৃহে গিয়ে আমার হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করবে। যাঁর মধ্যে শৌর্য, তপস্যা, বুদ্ধি, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, সত্ত্ব এবং ধৈর্য ইত্যাদি সৎগুণ বিদ্যমান, সেই ভীষ্মের চরণে আমার হয়ে প্রণাম জানাবে। ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে আমার কুশল জানাবে। দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং কর্ণ ইত্যাদিদের কুশল সংবাদ দেবে। দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যে বশাতি, শাল্বক, কেকয়, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত এবং পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ও পার্বত্য প্রান্তের রাজাদের একত্রিত করেছে, তাঁদের মধ্যে যারা ক্রূরতা বর্জিত, সুশীল এবং সদাচারী তাঁদের সকলের কুশল সংবাদ নেবে।'

'তাত সঞ্জয় ! বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন, দীর্ঘদর্শী বিদুর আমাদের প্রিয়, গুরু, স্বামী, পিতা, মাতা, মিত্র এবং মন্ত্রী ; আমাদের হয়ে তাঁর কুশল সংবাদ নেবে। কুরুকুলের যেসব সর্বগুণসম্পন্ন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন, তাঁদের আমাদের প্রণাম জানাবে এবং আমার ভাইদের স্ত্রীদের কুশল জিজ্ঞাসা করবে। এইসব সুন্দর কীর্তিযুক্ত এবং প্রশংসনীয় আচরণ সম্পন্না নারীরা সুরক্ষিত থেকে সতর্কতা-পূর্বক গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করছেন তো ? তাঁদের জিজ্ঞাসা করবে—দেবী, তোমরা সকলে শ্বশুর-শাশুড়িদের সঙ্গে কল্যাণময় কোমল ব্যবহার করো তো ? তোমাদের পতি যাতে প্রসন্ন থাকেন, সেইরূপ ব্যবহার তাঁদের সঙ্গে করো তো ?'

'সেবকদের জিজ্ঞাসা করবে—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র পূর্বতন সদাচার পালন করে তো ? তোমাদের সর্বপ্রকার সুখসুবিধা দেয় তো ? দুর্যোধনকে বলবে—'আমি কিছু ব্রাহ্মণদের জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম, কিন্তু দুঃখের কথা হল যে তোমার কর্মচারীরা তাঁদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না। আমি তাঁদের পূর্ববৎ বৃত্তিযুক্ত দেখতে চাই। এইভাবে রাজার কাছে যত অতিথি-অভ্যাগত পদার্পণ করেছেন এবং নানাদিক থেকে যত দূত এসেছেন, তাঁদের সকলের কুশল বার্তা নেবে এবং আমাদের কুশল বার্তা তাঁদের জানাবে। যদিও দুর্যোধন যেসব যোদ্ধা সংগ্রহ করেছেন, তেমন আর পৃথিবীতে নেই, তবু ধর্মই নিত্য। শত্রুনাশ করার জন্য আমার তো এক 'ধর্মই' মহাবলবান অস্ত্র। সঞ্জয় ! দুর্যোধনকে তুমি একথাও জানিয়ো যে—তুমি যে মনে করছ যে কৌরবরা নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করবে, তা হওয়ার উপায় নেই। আমরা চুপচাপ থেকে তোমাকে এই প্রিয়কাজ করতে দেব না। হে বীর, হয় তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আমাদের প্রত্যর্পণ করো, নাহলে যুদ্ধ করো।'

'সঞ্জয় ! সজ্জন-অসজ্জন, বালক-বৃদ্ধ, নির্বল ও বলবান—সকলেই বিধাতার বশে থাকে। আমার সৈন্যবল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তুমি সকলকেই আমার সঠিক স্থিতি জানাবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আমার হয়ে কুশল প্রশ্ন করে তাঁকে জানাবে—'আপনার পরাক্রমেই পাণ্ডব সুখে জীবন নির্বাহ করছে। এরা যখন অল্পবয়স্ক ছিল, তখন আপনার কৃপাতেই রাজ্যলাভ করেছিল। একবার রাজ্য দিয়ে এখন তা নষ্ট হতে দেখে আপনি উপেক্ষা করবেন না।' সঞ্জয়, আর বলবে যে 'তাত ! এই রাজ্য একজনের জন্য পর্যাপ্ত নয়, আমরা সকলে একসঙ্গে থেকে জীবন অতিবাহিত করব, তা হলে আপনাকে কখনো শত্রুর বশীভূত হতে হবে না।'

পিতামহ ভীষ্মকেও আমার নাম করে প্রণাম জানিয়ে বলবে—'পিতামহ ! এই শান্তনুর বংশ মর্যাদা একবার নেমে গিয়েছিল, আপনিই এর পুনরুদ্ধার করেছেন। এবার আপনি আপনার বুদ্ধিতে এমন কোনো উপায় স্থির করুন যাতে আপনার পৌত্ররা পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয়।' মন্ত্রী বিদুরকেও বলবে—'সৌম্য ! আপনি যুদ্ধ না হওয়ার পরামর্শ দিন ; আপনি তো সর্বদাই যুধিষ্ঠিরের মঙ্গল চেয়ে থাকেন।'

'তারপর দুর্যোধনকেও বারংবার অনুনয়-বিনয় করে বলবে—তুমি কৌরব নাশের কারণ হয়ো না। অত্যন্ত বলবান হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, একথা সকল কৌরবই জানেন। তোমার অনুমতিক্রমে দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরে তাকে অপমান করেছে, এই অপরাধের তো আমরা হিসাবই রাখিনি। কিন্তু এবার আমরা আমাদের উচিত ভাগ নেব। তুমি অপরের ধনের লোভ করো না। এতেই পরস্পরে শান্তি স্থাপিত

হবে। আমরা শান্তি চাই, তুমি রাজ্যের এক ভাগ আমাদের দিয়ে দাও। দুর্যোধন ! অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং পঞ্চম যে কোনো গ্রাম দিয়ে দাও, যাতে এই যুদ্ধ বন্ধ হয়। আমাদের পাঁচভাইকে পাঁচটি মাত্র গ্রাম দাও, যাতে শান্তি বজায় থাকে।' সঞ্জয় ! আমি শান্তি বজায় রাখতে এবং যুদ্ধ করতেও সক্ষম। ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। আমি প্রয়োজনে কোমলও হতে পারি আবার কঠোরও হতে পারি।'

—o—

ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সঞ্জয়ের সাক্ষাৎ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে সঞ্জয় বিদায় গ্রহণ করলেন। হস্তিনাপুরে গিয়ে তিনি শীঘ্রই অন্তঃপুরে গিয়ে দ্বারপালকে বললেন—'প্রহরী ! তুমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আমার আসার সংবাদ দাও, তাঁর সঙ্গে আমার অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন আছে।' দ্বারপাল গিয়ে বলল—'রাজন্ ! প্রণাম ! সঞ্জয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছেন, তিনি পাণ্ডবদের কাছ থেকে এসেছেন। বলুন, তাঁর জন্য কী আদেশ আছে ?'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয়কে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে এসো ; তার সঙ্গে দেখা করতে তো সময়ের কোনো বাধা নেই, তাহলে সে বাইরে কেন ?'

রাজার নির্দেশে সঞ্জয় তাঁর মহলে প্রবেশ করে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন—'রাজন্ ! আমি সঞ্জয় আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করে এসেছি। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আপনাকে প্রণাম জানিয়ে আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন। তিনি প্রসন্নতার সঙ্গে আপনার পুত্রদের সংবাদ জানতে চেয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি আপনার পুত্র, নাতি, মিত্র, মন্ত্রী এবং আশ্রিতদের নিয়ে আনন্দে আছেন তো ?'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'তাত সঞ্জয় ! ধর্মরাজ তাঁর মন্ত্রী, পুত্র এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে কুশলে আছে তো ?'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! যুধিষ্ঠির তাঁর মন্ত্রীসহ কুশলে আছেন। এখন তিনি তাঁর রাজ্যের ন্যায্য ভাগ চান। তাঁরা বিশুদ্ধভাবে ধর্ম ও অর্থ নীতিজ্ঞ, মনস্বী, বিদ্বান এবং শীলবান। কিন্তু আপনি আপনার কর্মের দিকে একটু নজর দিন। ধর্ম ও অর্থ যুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের থেকে আপনার ব্যবহার একেবারে বিপরীত। তার ফলে ইহলোকে আপনার অত্যন্ত নিন্দা হয়েছে, এই পাপ পরলোকে আপনাকে রেহাই দেবে না। আপনি আপনার পুত্রদের বশীভূত হয়ে পাণ্ডবদের বাদ দিয়েই সমস্ত রাজ্য নিজের অধীনস্থ করে নিতে চাইছেন। রাজন্ ! আপনার দ্বারা পৃথিবীতে অনেক পাপ ছড়িয়ে পড়বে ; একাজ আপনার উপযুক্ত নয়। বুদ্ধিহীন, কুবংশজাত, ক্রূর, দীর্ঘকাল ধরে বৈরীভাবসম্পন্ন, শস্ত্রবিদ্যায় অনিপুণ, পরাক্রমহীন এবং অভদ্র ব্যক্তিদের উপর ঘোর বিপদ নেমে আসে। যারা সৎকুলে জন্ম নেয়, বলবান, যশস্বী, বিদ্বান এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁরা প্রারব্ধ অনুযায়ী সম্পত্তি লাভ করেন।'

'আপনার মন্ত্রীরা যে সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত থেকে নিত্য একত্রিত হয়ে বৈঠক করেন ; তাঁরা পাণ্ডবদের রাজ্য না দেবার জন্য যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছেন সেটিই হল কৌরবদের বিনাশের কারণ। যদি নিজেদের পাপের জন্য কৌরবরা অসময়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার সমস্ত অপরাধ আপনার ওপর ন্যস্ত করে যুধিষ্ঠির এঁদের বিনাশ করতে চাইবেন। তখন জগতে আপনার অত্যন্ত নিন্দা হবে। রাজন্ ! এই জগতে প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা এসব মানুষ প্রাপ্ত হতেই থাকে। কিন্তু নিন্দা তার হয়, যে অপরাধ করে আর প্রশংসা তার হয় যার ব্যবহার উত্তম। ভরতবংশে বিরোধ বাড়াবার জন্য আমি আপনারই নিন্দা করছি। এই বিরোধের জন্য প্রজাগণের অবশ্যই সর্বনাশ হবে। সমস্ত জগতে এইরূপ পুত্রের অধীন হতে আমি একমাত্র আপনাকেই দেখেছি। আপনি এমন সব লোক সংগ্রহ করেছেন যারা বিশ্বাসের যোগ্য নয়, এরা বিশ্বাসী পাত্রকেই দণ্ডদান করেছে। এই দুর্বলতার জন্যই আপনি আপনার রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। এখন রথে করে আসার জন্য আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ; যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি একটু বিশ্রাম করতে যাই। প্রাতঃকালে সমস্ত কৌরব যখন সভায় একত্রিত হবেন, তখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের কথা শোনাব।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সূতপুত্র ! আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। সকালে সভায় তোমার মুখে যুধিষ্ঠিরের সমাচার সকলে শুনবে।'

—o—

ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের নীতির উপদেশ প্রদান (বিদুর নীতি)

প্রথম অধ্যায়

সঞ্জয় বিদায় গ্রহণ করলে মহাবুদ্ধিমান রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্বারপালকে বললেন—'আমি বিদুরের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাঁকে শীঘ্রই এখানে ডেকে নিয়ে এসো।' ধৃতরাষ্ট্র প্রেরিত দূত বিদুরকে গিয়ে বলল—'মহামতি! আমাদের প্রভু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।' তার কথা শুনে বিদুর রাজমহলে এসে দ্বারপালকে বললেন—'দ্বারপাল! ধৃতরাষ্ট্রকে আমার আসার খবর দাও।' দ্বারপাল গিয়ে বলল—'মহারাজ! আপনার নির্দেশে মহামতি বিদুর এসেছেন, তিনি আপনার চরণ দর্শন করতে চান, আমাকে আদেশ করুন, তাঁকে কী বলব?' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'মহাবুদ্ধিমান দূরদর্শী বিদুরকে এখানে নিয়ে এসো। বিদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কোনো সময়ই আমার অসময় নয়।' দ্বারপাল বিদুরের কাছে গিয়ে বলল—'মহামতি বিদুর! আপনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন। মহারাজ আমাকে বলেছেন যে তাঁর আপনার সঙ্গে দেখা করার কোনো সময় অসময় নেই।'॥ ১-৬ ॥

বৈশম্পায়ন বললেন—বিদুর অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের মহলে গিয়ে চিন্তান্বিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে হাতজোড় করে বললেন—'মহাপ্রাজ্ঞ! আমি বিদুর, আপনার নির্দেশে এখানে এসেছি। আদেশ করুন, আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছি।'॥ ৭-৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর! সঞ্জয় এসেছিল, আমাকে ভালো-মন্দ নানা কথা বলে গেছে। কাল সভায় সে যুধিষ্ঠিরের কথা বলবে। কুরুবীর যুধিষ্ঠিরের সকল সংবাদ জানতে না পারায় আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তাতেই আমি এতক্ষণ জেগে রয়েছি। আমার পক্ষে যা কল্যাণকর বলে মনে করো, তা বলো, কেননা তুমি অর্থ ও ধর্মজ্ঞান নিপুণ। যখন থেকে সঞ্জয় পাণ্ডবদের ওখান থেকে ফিরে এসেছে, তখন থেকে আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না। সকল অঙ্গ বিকল হয়ে রয়েছে। কাল সে যে কী বলবে, সেই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে আছি'॥ ৯-১২ ॥

বিদুর বললেন—'সহায় সম্বলহীন দুর্বল মানুষের যদি শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে বিরোধ হয় তাহলে সেরূপ ব্যক্তির, কামাসক্ত পুরুষের এবং চোরের রাতজাগা অসুখ হয়। নরেন্দ্র, আপনারও এইরূপ কোনো মহাদোষ হয়নি তো? পরধনের লোভে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন না তো?'॥ ১৩-১৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'আমি তোমার ধর্মযুক্ত ও কল্যাণময়ী সুন্দর কথা শুনতে চাই, কারণ এই রাজর্ষিবংশে একমাত্র তুমিই বিদ্বানদের মধ্যেও মাননীয়।'॥ ১৫ ॥

বিদুর বললেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! শ্রেষ্ঠ লক্ষণযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের প্রভু হওয়ার উপযুক্ত। তিনি আপনার আদেশ পালনকারী ছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁকে বনে পাঠিয়েছেন। আপনি ধর্মাত্মা এবং ধর্মকে জানলেও চক্ষুষ্মান না হওয়ায় তাঁকে চিনতে পারেননি, তাই তাঁর প্রতি প্রতিকূল আচরণ করেছেন এবং তাঁর রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দিতেও আপনার আপত্তি রয়েছে। যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ক্রূরতার অভাব, দয়া, ধর্ম, সত্য ও পরাক্রম আছে, তিনি আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। এইসব সদ্গুণের জন্য তিনি ভেবে চিন্তে বহু ক্লেশ সহ্য করছেন। আপনি দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ বা দুঃশাসনের মতো অযোগ্য ব্যক্তিদের ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে কী করে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি চান? নিজ অবস্থা

স্বরূপের জ্ঞান, উদ্যোগ, দুঃখ সহ্য করার শক্তি এবং ধর্মে স্থিরতা যে মানুষকে পুরুষার্থচ্যুত করতে না পারে, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। যিনি ভালো কাজ করেন এবং মন্দকাজ থেকে দূরে থাকেন এবং আস্তিক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, এসকল সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই পণ্ডিত নামের যোগ্য। ক্রোধ, হর্ষ, গর্ব, লজ্জা, অসহিষ্ণুতা এবং নিজেকে পূজনীয় বলে ভাবা এইসব ভাব যাকে পুরুষার্থ থেকে ভ্রষ্ট করতে না পারে, তাকেই পণ্ডিত বলা হয়। অন্য লোক যার কর্তব্য, পরামর্শ এবং আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি জানতে পারে না, কাজ সম্পূর্ণ হলে তবেই জানতে পারে, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। শীত-গ্রীষ্ম, ভয়-ভালোবাসা, অর্থ বা দারিদ্র্য এইসব যাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। যাঁর লৌকিক বুদ্ধি ধর্ম এবং অর্থই অনুসরণ করে এবং যিনি ভোগ পরিত্যাগ করে পুরুষার্থকেই বরণ করেন, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ শক্তি অনুসারে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন ও কাজ করেন এবং কোনো বস্তুকেই তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করেন না। কোনো কথা ধৈর্য ধরে শোনা কিন্তু শীঘ্রই সেটির তাৎপর্য বুঝে নেওয়া, বুঝে নিয়ে কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা পুরুষার্থে প্রবৃত্ত হওয়া কামনাদ্বারা নয়, জিজ্ঞাসিত না হয়ে অন্যের ব্যাপারে বৃথা কথা না বলা এগুলি পণ্ডিতদের লক্ষণ। পণ্ডিতদের মতো বুদ্ধিধারী ব্যক্তি দুর্লভ বস্তু কামনা করেন না, হারিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং বিপদে পড়লে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যান না। যিনি প্রথমে সিদ্ধান্ত স্থির করে তারপর কাজ আরম্ভ করেন এবং মধ্যপথে থেমে যান না, বৃথা সময় ব্যয় করেন না, চিত্তকে বশে রাখেন, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। ভরতকুলভূষণ ! পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ কর্মে রুচি রাখেন, উন্নতির জন্য কাজ করেন এবং উপকারী ব্যক্তির দোষ ধরেন না। যিনি সম্মানিত হলে আনন্দে অধীর হন না, অসম্মানিত হয়ে দুঃখিত হন না, গঙ্গার কুণ্ডের ন্যায় যাঁর চিত্তে ক্ষোভ হয় না, তাঁকেই পণ্ডিত বলে। যিনি সমস্ত ভৌতিক পদার্থের যথার্থ স্বরূপ অবগত, সমস্ত কাজ করার নিয়ম জানেন এবং জটিল পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। যাঁর বাণী মাঝ পথে থেমে যায় না, আলোচনায় যিনি দক্ষ, তর্কে নিপুণ এবং প্রভাবশালী, যিনি গ্রন্থের তাৎপর্য সম্পর্কে শীঘ্রই অবহিত হন তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। যাঁর বিদ্যা বুদ্ধিকে অনুসরণ করে এবং বুদ্ধি বিদ্যার, যিনি শিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনিই 'পণ্ডিত' নামের যোগ্য। যারা না পড়েই গর্ব করে, দরিদ্র হয়েও বড় বড় কথা বলে এবং কাজ না করেই ধনী হওয়ার কথা ভাবে, পণ্ডিতরা তাদেরই মূর্খ বলেন। নিজের কর্তব্য ত্যাগ করে যে অপরের কর্তব্য পালন করে এবং বন্ধুর প্রতিও শত্রুর ন্যায় আচরণ করে তাকে মূর্খ বলা হয়। যে অনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সঙ্গ কামনা করে এবং আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে এবং যে নিজের থেকে বলবান ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা করে, তাকে মূঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলা হয়। যে শত্রুকে মিত্র মনে করে এবং মিত্রকে হিংসা করে তাকে কষ্ট দেয়, সর্বদা খারাপ কাজ করতে থাকে তাকে 'মূঢ় চিত্ত সম্পন্ন' বলা হয়। এরূপ মানুষ না ডাকতেই ভিতরে আসে, জিজ্ঞাসা না করলেও অনেক কথা বলে এবং অবিশ্বাসী মানুষকে বিশ্বাস করে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে নিজ কাম বৃথাই বাড়িয়ে তোলে, সকলকে সন্দেহ করে এবং শীঘ্র হওয়ার কাজে বিলম্ব ঘটায়, সে মূঢ়। যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করে না এবং যার সুহৃদ্ মিত্র নেই, তাকে 'মূঢ় চিত্তসম্পন্ন' বলা হয়। নিজ ব্যবহার দোষণীয় হলেও যে অপরের দোষে আক্ষেপ করে এবং নিজে অক্ষম হয়েও বৃথা ক্রোধ করে, সে মহামূর্খ। যে নিজের সামর্থ্য না বুঝে কিছু না করেই ধর্ম ও অর্থের প্রতিকূল এবং না পাওয়ার যোগ্য জিনিস পেতে চায়, তাকে জগতে 'মূঢ়বুদ্ধি' বলা হয়। রাজন্ ! যে অনধিকারীকে উপদেশ দেয়, যে শূন্যের উপাসনা করে এবং যে কৃপণের আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে মূঢ়চিত্ত বলা হয়। যিনি বহু ধন, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য পেয়েও উচ্ছ্বসিত হন না, তাঁকে পণ্ডিত বলা হয়। যিনি তাঁর দ্বারা ভরণ পোষণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের না দিয়ে একাই উত্তম আহার করেন এবং উত্তম বস্ত্র পরিধান করেন, তাঁর থেকে বেশি ক্রূর আর কে হবে ? একজন মানুষ পাপ করে আর বহু লোকে তার থেকে মজা করে, মজা করা ব্যক্তিরা পার পেয়ে যায়, কিন্তু পাপ করে যে, সে-ই দোষের ভাগী হয়। কোনো ধনুর্ধরের নিক্ষিপ্ত তীর কারোকে আঘাত করুক বা না করুক, বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধি রাজাসহ সমস্ত রাষ্ট্রকে বিনাশ করতে পারে। এক

(বুদ্ধি) থেকে দুই (কর্তব্য-অকর্তব্য) স্থির করে তিন (শত্রু-মিত্র-উদাসীন)কে বশীভূত করে চার-এর (সাম-দান-দণ্ড-ভেদ) সাহায্যে। পাঁচ (ইন্দ্রিয়) কে জিতে নিয়ে ছয় (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বিধাভাব, সমাশ্রয়রূপ) গুণাদি জেনে এবং সাত (নারী, জুয়া, মৃগয়া, মদ্য, কঠোর বচন, শাস্তির কঠোরতা এবং অন্যায়রূপে অর্থ উপার্জন) কে পরিত্যাগ করে সুখী হয়ে যান। বিষ একজনকেই (পানকারীকে) বধ করে, শস্ত্র দ্বারা একজনই বধ হয়, কিন্তু মন্ত্র স্ফুরিত হলে রাষ্ট্র এবং প্রজার সঙ্গে রাজাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। একা স্বাদু খাদ্য ভোজন করা উচিত নয়, একা কোনো বিষয় স্থির করা উচিত নয়, একা পথ চলা ঠিক নয় এবং বহুলোক নিদ্রিত থাকলে সেখানে জেগে থাকা উচিত নয়॥ ১৬-৫১ ॥

রাজন্! সমুদ্রপারে যাওয়ার জন্য নৌকাই যেমন একমাত্র উপায়, তেমনই স্বর্গে যাওয়ার জন্য সত্যই একমাত্র সোপান, দ্বিতীয় নেই। কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারছেন না। ক্ষমাশীল পুরুষদের মধ্যে একটি দোষই আরোপিত হয়, দ্বিতীয়র সম্ভাবনা নেই, সেই দোষ হল যে ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে লোকে অসমর্থ বলে মনে করে। কিন্তু ক্ষমাশীল ব্যক্তির পক্ষে সেটি দোষ নয়, কারণ ক্ষমা খুব বড় শক্তি। ক্ষমা অক্ষম ব্যক্তির গুণ এবং সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ। জগতে ক্ষমা বশীকরণরূপ। ক্ষমার দ্বারা কি না সিদ্ধ করা যায়। যার হাতে শান্তিরূপ তলোয়ার থাকে, দুষ্ট ব্যক্তি তার কী করবে? তৃণ শূন্য স্থানে আগুন স্বতই নিভে যায়। ক্ষমাহীন ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকে দোষের ভাগী করে নেয়। কেবল ধর্মই পরম কল্যাণকারক, একমাত্র ক্ষমাই শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বিদ্যাই একমাত্র পরম সন্তোষ প্রদানকারী এবং একমাত্র অহিংসাই সুখপ্রদান করতে পারে। জলে বাসকারী ভেককে যেমন সাপ গিলে নেয় তেমনই শত্রুকে প্রতিরোধ না করা রাজাকে এবং পরিভ্রমণ না করা ব্রাহ্মণকে এই পৃথিবী বিনষ্ট করে। যাঁরা কঠোর বাক্য বলেন না এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান করেন না তাঁরা ইহলোকে বিশেষ সম্মান পান। অপর নারী দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে যে নারী কামনা করে এবং অপরের দ্বারা পূজিত পুরুষকে যে ব্যক্তি সম্মান করে, তাঁরা অপরের প্রতি বিশ্বাস ভাবাপন্ন হয়ে থাকে। যে নির্ধন হয়েও বহুমূল্য বস্ত্র আকাঙ্ক্ষা করে এবং অক্ষম হয়েও ক্রোধ করে এরা দুজনেই নিজ দেহ শুষ্ককারী কাঁটার ন্যায়। অকর্মণ্য গৃহস্থ এবং প্রপঞ্চে ব্যাপৃত সন্ন্যাসী—এই দুজনই তাদের বিপরীত কর্মের শোভা পায় না। শক্তিশালী হয়েও ক্ষমাপ্রদানকারী ব্যক্তি এবং নির্ধন হয়েও দানশীল ব্যক্তি—এই দুজনই স্বর্গেরও উর্ধ্বে স্থান পায়। ন্যায়পূর্বক উপার্জিত ধনের দুভাবে অপব্যবহার হতে পারে—অপাত্রে দান এবং সৎপাত্রে দান না করা। যে ব্যক্তি ধনী হয়েও দান করে না এবং দরিদ্র হয়েও যে কষ্ট সহ্য করতে পারে না এই দুই প্রকারের মানুষকে গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিতে হয়। পুরুষশ্রেষ্ঠ! দুই প্রকারের মানুষ সূর্যমণ্ডল ভেদ করে উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়—যোগযুক্ত সন্ন্যাসী এবং সংগ্রামে মৃত যোদ্ধা। ভরতশ্রেষ্ঠ! বেদবেত্তা বিদ্বানরা জানেন যে মানুষের কার্যসিদ্ধির জন্য তিন প্রকার উপায় শোনা যায়—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। পুরুষও তিন প্রকারের হয় উত্তম, মধ্যম এবং অধম, এদের যথাযোগ্য তিন প্রকারের কর্মে লাগানো উচিত। রাজন্! তিনজনকে ধনের অধিকারী মানা হয় না—স্ত্রী, পুত্র এবং দাস। এরা যা কিছু উপার্জন করে, তা তারই হয় যার অধীনে এরা থাকে। অপরের ধন হরণ, পরস্ত্রীগমন এবং সুহৃদ মিত্রকে পরিত্যাগ—এই তিনদোষই বিনাশের কারণ হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ—আত্মনাশকারী নরকের এই তিনটি দ্বার, এগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রের জন্ম একত্রে এই তিনটি লাভ করা এবং অপরদিকে শত্রুর নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করা, উভয়ই সমকক্ষ। ভক্ত, সেবক এবং আমি আপনার শরণাগত, এরূপ যে বলে—এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে সংকট এলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন, দীর্ঘসূত্রী, ব্যস্ত-সমস্ত এবং স্তুতিকারী লোকের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করা উচিত নয়—এই চার প্রকারের লোক রাজার পক্ষে ত্যাগের যোগ্য বলা হয়। আপনার মতো গৃহস্থ ধর্মে স্থিত লক্ষ্মীবান ব্যক্তির গৃহে চার প্রকারের মানুষ সর্বদা থাকা উচিত—নিজ আত্মীয়ের মধ্যে বৃদ্ধ, উচ্চকুলজাত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি, ধনহীন মিত্র, সন্তানহীনা ভগ্নী। মহারাজ! ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বৃহস্পতি যে চারটি তৎকালীন ফলপ্রদানকারী বলে জানিয়েছিলেন, সেগুলি আমার কাছে শুনুন—দেবতাদের সংকল্প, বুদ্ধিমানের প্রভাব, বিদ্বানের নম্রতা এবং

পাপীদের বিনাশ। চারটি কর্ম ভয় দূর করে, কিন্তু ঠিকভাবে সম্পাদিত না হলে যা ভয়প্রদান করে, সেগুলি হলো সম্মানের সঙ্গে অগ্নিহোত্র, সম্মানের সঙ্গে মৌন পালন, সম্মানের সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং সম্মানের সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান। ভরতশ্রেষ্ঠ ! পিতা-মাতা-অগ্নি-আত্মা-গুরু—মানুষের এই পাঁচ অগ্নিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেবা করা উচিত। দেবতা, পিতৃপুরুষ, মানুষ, সন্ন্যাসী এবং অতিথি—এই পাঁচজনকে পূজা করেন যে ব্যক্তি, তিনি শুদ্ধ যশ প্রাপ্ত হন। রাজন্ ! আপনি যেখানে যাবেন, সেখানেই মিত্র, শত্রু, উদাসীন, আশ্রয় প্রদানকারী ও আশ্রয় গ্রহণকারী—এই পাঁচজন আপনার সান্নিধ্যে আসবে। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি একটি ইন্দ্রিয় দোষযুক্ত হয়, তাহলে তার বুদ্ধি এমনভাবে নির্গত হয় যেমন জলাধারের ছিদ্র থেকে জল নির্গত হয় ॥ ৫২-৮২ ॥

উন্নতিকামী ব্যক্তিদের নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা (যে কাজ শীঘ্র করা যায় তাতে অধিক সময় ব্যয় করা) এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা উচিত। উপদেশ প্রদান করেন না যে আচার্য, মন্ত্রোচ্চারণ করেন না যে পুরোহিত, রক্ষা করতে অক্ষম রাজা, কটুবাক্য বলে যে পত্নী, গ্রামে থাকার ইচ্ছা সম্পন্ন গোয়ালা এবং বনে বাস করার ইচ্ছাসম্পন্ন নাপিত— এদের তেমনভাবে পরিত্যাগ করা উচিত, যেমনভাবে সমুদ্রে মানুষ ভাঙা নৌকা পরিত্যাগ করে। মানুষের কখনো সত্য, দান, কর্মণ্যতা, অনসূয়া (লোকের দোষ না খোঁজা), ক্ষমা এবং ধৈর্য—এই ছয়গুণ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অর্থোপার্জন, নীরোগ থাকা, স্ত্রীর অনুকূল এবং প্রিয়বাদিনী থাকা, আজ্ঞা-পালনকারী এবং অর্থোপার্জনকারী বিদ্যার জ্ঞান—এই ছয়টি জিনিস পৃথিবীতে সুখদায়ক হয়ে থাকে। মনে নিত্যবাসকারী ছয় শত্রু —কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যকে বশে রাখেন যিনি, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হন না এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির এই ষড়রিপুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নিম্নলিখিত ছয় প্রকারের মানুষ ছয় প্রকার ব্যক্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এর অতিরিক্ত কোনো পথ নেই। চোর অসতর্ক ব্যক্তি হতে, বৈদ্য রোগী হতে, দুশ্চরিত্রা নারী কামী পুরুষ দ্বারা, পুরোহিত যজমান দ্বারা, রাজা কলহপ্রিয় লোকদ্বারা এবং বিদ্বান ব্যক্তি মূর্খের দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করে। সতর্ক না থাকলে ছটি জিনিস নষ্ট হয়ে যায়—গাভী, সেবা, খেত, পত্নী, বিদ্যা এবং শূদ্রের সঙ্গে মেলামেশা। এই ছয়জন সর্বদা নিজ পূর্ব উপকারীকে অনাদর করে—শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিষ্য আচার্যের, বিবাহিত পুত্র মায়ের, কামবাসনা দূর হলে মানুষ তার পত্নীর, কৃতকার্য ব্যক্তি তার সাহায্যকারীর, নদীর দুর্গম ধার পার করার পর সেই ব্যক্তির নৌকার এবং অসুস্থ ব্যক্তির অসুখ সেরে যাবার পর চিকিৎসকের। নীরোগ থাকা, অঋণী থাকা, প্রবাসী না হওয়া, ভালোলোকের সঙ্গে মেলামেশা, নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ এবং নির্ভয়ে থাকা—এই ছয়টি দ্বারা মানুষ সুখী হয়। ঈর্ষাকারী, ঘৃণাকারী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধী, সদাশঙ্কিত এবং অপরের রোজগারে জীবিকা নির্বাহকারী—এই ছয়টি কারণে মানুষ সর্বদা দুঃখী থাকে। নারীতে আসক্তি, জুয়া, শিকার, মদ্যপান, কঠোর বাক্য, কঠিন শাস্তি প্রদান এবং অর্থের অপচয়—এই সাতটি দুঃখদায়ক দোষ রাজার সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। এর দ্বারা প্রতাপশালী রাজাও প্রায়শই বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৮৪-৯৭ ॥

বিনাশ হওয়ার পূর্বে মানুষের আটটি চিহ্ন দেখা যায়—প্রথম সে ব্রাহ্মণদের দ্বেষ করে, তারপরে তাদের বিরোধের পাত্র হয়, ব্রাহ্মণের ধন আত্মসাৎ করে নেয়, তাঁকে মারতে চায়, ব্রাহ্মণের নিন্দাতে আনন্দ পায়, তাঁদের প্রশংসা শুনতে চায় না, যাগ-যজ্ঞতে তাঁকে আমন্ত্রণ করে না এবং তিনি কিছু চাইলে নানা দোষ খুঁজতে থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই সব দোষ ভেবেচিন্তে ত্যাগ করা উচিত। ভারত ! মিত্র সমাগম, অধিক ধন প্রাপ্তি, পুত্রের আলিঙ্গন, মৈথুনে প্রবৃত্তি, সময়ে প্রিয় বাক্য বলা, নিজ শ্রেণীর লোকের মধ্যে উন্নতি, অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তি এবং জনসমাজে সম্মান—এই আটটি আনন্দের মুখ্য হেতু এবং এগুলি লৌকিক সুখেরও সাধন। বুদ্ধি, কৌলিন্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, অধিক কথা না বলা, সামর্থ্য অনুসারে দান এবং কৃতজ্ঞতা—এই আটটি গুণ পুরুষের খ্যাতি বৃদ্ধি করে। যে বিদ্বান ব্যক্তি (চোখ, কান ইত্যাদি) নয় দ্বার সম্পন্ন, তিন (বাত, পিত্ত, কফরূপী) স্তম্ভ-সম্পন্ন, পাঁচ (জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ) সাক্ষীরূপ, আত্মার নিবাসস্থল এই শরীররূপ গৃহকে জানেন, তিনি খুব বড় জ্ঞানী॥ ৯৮-১০৫ ॥

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! দশ প্রকারের লোক ধর্ম জানেন না,

তাদের নাম শুনুন। নেশায় মত্ত, অসতর্ক, উন্মাদ, ক্লান্ত, ক্রোধী, ক্ষুধার্ত, চপল, লোভী, ভীত এবং কামুক। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তিরা যেন এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করেন। এই বিষয়ে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ সুধন্বা ও তাঁর পুত্রকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। যে রাজা কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করেন, সুপাত্রে ধন দান করেন, বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, কর্তব্য কর্ম শীঘ্র সম্পাদন করেন, তাঁকে সকলেই আদর্শ বলে মনে করেন। যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জাগাতে পারেন, যার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তাকেই দণ্ড দেন, যিনি দণ্ড প্রদানের ন্যূনাধিক মাত্রা এবং ক্ষমার ব্যবহার জানেন, সেই রাজার সেবায় সকল প্রজা এগিয়ে আসেন। যিনি কোনো দুর্বলকে অপমান করেন না, সর্বদা সতর্ক থেকে শত্রুর সঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করেন, বলবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না এবং সময়মতো পরাক্রম দেখান, তিনিই ধীর। যে মহাপুরুষ বিপদে পড়লে দুঃখী হন না, বরং সাবধানতার সঙ্গে নানা উদ্যোগের আশ্রয় নেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে দুঃখ সহ্য করেন, তাঁর শত্রু তো পরাজিত হবেই। যে ব্যক্তি নিরর্থক বিদেশ বাস করেন না, পাপীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন না, পরস্ত্রী গমন করেন না, দম্ভ, চুরি এবং মদ্যপান করেন না, তিনি সর্বদা সুখী থাকেন। যিনি ক্রোধ বা উতলা হয়ে ধর্ম, অর্থ এবং কামে লিপ্ত হন না, জিজ্ঞাসা করলেও প্রকৃত কথা বলেন না, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য কারও সঙ্গে ঝগড়া করেন না, সম্মান না পেলে ক্রুদ্ধ হন না, বিবেক ত্যাগ করেন না, অন্যের দোষ ধরেন না, সকলের প্রতি দয়াশীল, নিজের ক্ষমতা চিন্তা করে তবেই অপরের দায়িত্ব স্বীকার করেন, বাড়িয়ে কথা বলেন না এবং বাদ-বিসংবাদ সহ্য করেন—তিনি সর্বত্রই প্রশংসিত হন। যে ব্যক্তি উগ্রবেশ ধারণ করেন না, অপরের কাছে নিজের পরাক্রমের অহংকার করেন না, ক্রোধান্বিত হলেও কটু বাক্য বলেন না, তাঁকে সকলেই ভালোবাসে। যিনি শান্ত হয়ে যাওয়া শত্রুকে প্রজ্বলিত করেন না, গর্ব করেন না, দীনতা দেখান না এবং 'আমি বিপদে পড়েছি' বলে অন্যায় কাজ করেন না, সেই উত্তম আচরণধারী মানুষকে আর্যগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানেন। যিনি নিজ সুখে প্রসন্ন হন না, অপরের দুঃখে আনন্দিত হন না এবং দান করে অনুতাপ করেন না, তাঁকে সজ্জনরা সদাচারী ব্যক্তি বলেন। যে ব্যক্তি দেশাচার, লোকাচার এবং জাতির ধর্ম জানতে আগ্রহী, তাঁর উত্তম-অধমের বিবেক জ্ঞান হয়। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই শ্রেষ্ঠ সমাজে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য, পাপকর্ম, রাজদ্রোহ, চুকলি, অনেকের সঙ্গে শত্রুভাব, উন্মত্ত পাগল এবং দুর্জন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদ পরিত্যাগ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি দান, হোম, দেবপূজা, মাঙ্গলিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত এবং নানা লৌকিক আচার পালন করেন, দেবতারা তাঁর অভিলাষ সিদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি তাঁর সমগোত্রীয়ের সঙ্গে বিবাহ, মিত্রতা, ব্যবহার এবং আলাপ আলোচনা করেন, হীন ব্যক্তির সঙ্গে নয় এবং গুণবান ব্যক্তিদের সর্বদা সম্মান করেন, সেই বিদ্বান ব্যক্তির নীতি শ্রেষ্ঠ। যিনি আশ্রিতদের দিয়ে নিজে সামান্য আহার করেন, বেশি কাজ করেন এবং অল্প নিদ্রা যান, ধন চাইলে মিত্র না হলেও যিনি সাহায্য করেন সেই মনস্বী ব্যক্তিকে কোনো অনর্থ স্পর্শ করে না। যাঁর নিজ ইচ্ছানুকুল এবং অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধের কাজ অপরে বিন্দুমাত্র জানতে পারে না, মন্ত্র গুপ্ত থাকায় এবং অভীষ্ট কার্য ঠিকমতো সম্পাদিত হওয়ায় তাঁর কাজ একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি সকলকে শান্তিপ্রদান করতে তৎপর, সত্যবাদী, কোমল, অপরকে সম্মানপ্রদানকারী এবং পবিত্র চিন্তা সম্পন্ন, তিনি সুন্দর খনি হতে নির্গত শ্রেষ্ঠ রত্নের ন্যায় নিজ জাতির মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ হন। যিনি অত্যন্ত লজ্জাশীল, তাঁকে সব লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। তিনি তাঁর অনন্ত তেজ, শুদ্ধ হৃদয় এবং একাগ্রতার জন্য সূর্যের ন্যায় কান্তিমান হয়ে শোভা পান। অম্বিকানন্দন ! শাপগ্রস্ত রাজা পাণ্ডুর যে পাঁচ পুত্র বনে জন্মেছেন, তাঁরা ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী, তাঁদের আপনিই শিশুকালে পালন করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন ; তাঁরাও আপনার আদেশ পালন করে এসেছেন। তাত ! তাঁদের ন্যায়সংগত রাজ্য ভাগ দিয়ে আপনি পুত্রসহ আনন্দ করুন। নরেন্দ্র ! এই করলে আপনি দেবতা ও মানুষের সমালোচনার বিষয় হবেন না॥ ১০৬-১২৮ ॥

———o———

বিদুর-নীতি
(দ্বিতীয় অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! আমি চিন্তায় জ্বলে এখনও বেঁচে আছি ; আমার কী কর্তব্য, তাই বলো ; কারণ তুমি ধর্ম ও অর্থজ্ঞানে নিপুণ। উদার চিত্ত বিদুর ! তুমি তোমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে আমাকে সঠিক উপদেশ দাও। যুধিষ্ঠিরের কাছে যা হিতকর এবং দুর্যোধনের পক্ষেও যা কল্যাণকর, তা আমাকে বলো। হে বিদ্বান ! আমার মনে অনিষ্ট আশঙ্কা হচ্ছে। আমি সর্বত্র অনিষ্টের ছায়া দেখতে পাচ্ছি ; তাই ব্যাকুল হয়ে তোমাকে অনুরোধ করছি—অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কী চান—আমাকে তা ঠিক করে বলো।। ১-৩ ।।

বিদুর বললেন—মানুষের উচিত, সে যার পরাজয় চায় না, সে জিজ্ঞাসা না করলেও তার পক্ষে কল্যাণকর বা অনিষ্টকর—যাই হোক, তাকে জানিয়ে দেওয়া। তাই রাজন্ ! যাতে সমস্ত কৌরবদের মঙ্গল হয়, সেই কথাই আপনাকে বলব। আমি যে কল্যাণকর এবং ধর্মযুক্ত কথা বলব, আপনি তা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন—ভারত ! অসৎ উপায় (জুয়া ইত্যাদি) দ্বারা যে কপট কার্য সিদ্ধ হয়, তাকে আপনি অনুমোদন দেবেন না। অনুরূপভাবে সৎ উপায়ে সাবধানের সঙ্গে কোনো কর্ম করলে তা যদি সফল না-হয় তাহলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তির তা নিয়ে মনে কোনো গ্লানি রাখা উচিত নয়। কোনো কাজ করার আগে তার প্রয়োজন জেনে নিতে হয়। খুব ভেবেচিন্তে কোনো কাজ করা উচিত, হঠকারী হয়ে কোনো কাজ করা উচিত নয়। ধৈর্যশীল মানুষের উচিত কোনো কাজ করার আগে সেই কাজের প্রয়োজন, পরিণাম এবং নিজের উন্নতির কথা ভেবে তারপর কাজটা করা। যে রাজা তাঁর অবস্থিতি, লাভ, ক্ষতি, সম্পদ, দেশ, দণ্ড ইত্যাদির মাত্রা জানেন, তাঁর রাজত্ব স্থায়ী হয়। উপরোক্ত বিষয়ে যাঁর সঠিক জ্ঞান আছে এবং ধর্ম ও অর্থনীতিতে যিনি পারঙ্গম তিনিই রাজ্য লাভ করেন। 'এখন তো রাজা হয়েই গেছি'—এই ভেবে অনুচিত ব্যবহার করা উচিত নয়। উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পত্তি নষ্ট করে, যেমন নষ্ট হয় সুন্দর রূপ বৃদ্ধ অবস্থাতে। মাছ পরিণাম না ভেবে লোহার বঁড়শিকে গেলে ভালো খাদ্যের সন্ধানে। সুতরাং যে নিজের উন্নতি চায় সেই ব্যক্তির তেমন বস্তুই গ্রহণ করা উচিত যা গ্রহণযোগ্য এবং হিতকারক। যে বৃক্ষ থেকে অপক্ব ফল পাড়ে, সে যে শুধু ফলের রস পায় না তাই নয়, গাছের বীজটিও নষ্ট করে। কিন্তু যে সময়ের পাকা ফল গ্রহণ করে, সে সেই ফলের স্বাদ তো পায়ই উপরন্তু সেই বীজটি হতে পুনরায় গাছ জন্ম নেয়। ভ্রমর যেমন ফুলকে কষ্ট না দিয়ে মধু আস্বাদন করে, তেমনই রাজারও উচিত প্রজাকে কষ্ট না দিয়ে অর্থ আহরণ করা। মালী বাগান থেকে একটি একটি করে ফুল সংগ্রহ করে কিন্তু গাছের শিকড় কাটে না। তেমনই রাজারও উচিত প্রজাবর্গকে সুরক্ষিত রেখেই কর আদায় করা। কীসে আখেরে লাভ হবে, কী করলে ক্ষতি হবে, এইসব ভালোভাবে চিন্তা করে মানুষের কর্ম করা উচিত। এমন কিছু কর্ম আছে, যার কোনো ফলই হয় না, অতএব তার জন্য করার উদ্যমও ব্যর্থ হয়। যার প্রসন্নতা কোনো কাজে আসে না এবং ক্রোধও ব্যর্থ হয়, তাকে প্রজারা রাজা হিসাবে চায় না, যেমন কোনো নারী নপুংসককে স্বামী হিসাবে চায় না। যার মূল (সাধন) ছোট আর ফল মহান ; বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা শীঘ্রই আরম্ভ করে দেয়, সেই কাজে বিঘ্ন আসতে দেয় না। যে রাজার দৃষ্টিতেই স্নেহবর্ষণ হয়, তিনি কথা না বললেও প্রজারা তাঁর অনুরক্ত হয়। রাজা অধিক সম্পদশালী হলেও বড় দানী হওয়া উচিত নয়। বড় দানী হলেও তার সর্বদা গাম্ভীর্য রক্ষা করতে হবে। রাজা দুর্বল হলেও নিজেকে শক্তিশালী বলে প্রচার করতে হবে। এরূপ করলে সে বিনষ্ট হবে না। যে রাজা চক্ষু, মন, বাক্য ও কর্ম —এই চারটির সাহায্যে প্রজাপ্রসন্ন করেন, প্রজা তাতেই প্রসন্ন থাকে। হরিণ যেমন ব্যাধকে ভয় পায়, তেমনই যাঁর দ্বারা সব প্রাণী ভীত হয়ে থাকে, তিনি যদি আসমুদ্র পৃথিবীরও রাজা হন তাহলে তাঁকে প্রজারা গ্রহণ করে না। পিতা পিতামহের রাজ্য লাভ করে অন্যায় কর্মকারী রাজা তাকে সেইভাবেই নষ্ট করেন যেমনভাবে প্রবল হাওয়া মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করে। পরম্পরা দ্বারা প্রাপ্ত রাজধর্ম আচরণকারী রাজার দ্বারা ধন-ধান্যে পূর্ণ হয়ে উন্নতি ও ঐশ্বর্যের শিখরে উঠে যায়। যে রাজা ধর্মত্যাগ করে অধর্ম করে তার রাজ্য আগুনের ওপর স্থিত চর্ম দ্রব্যের ন্যায় সংকুচিত হয়ে যায়।

অন্য রাষ্ট্র বিনাশের জন্য যে চেষ্টা, তা নিজ রাজ্য রক্ষা ও উন্নতির জন্য করা উচিত। ধর্ম দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করে ধর্মের দ্বারা তা রক্ষা করা উচিত। কারণ ধর্মমূলক রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করে রাজা তাকে ছাড়েন না, তিনিও রাজাকে পরিত্যাগ করেন না। যারা অকারণে কথা বলে, অনর্গল অসংলগ্ন কথা বলে যায় কিংবা পাগল—তাদের কথার মধ্যেও খনির পাথরের ভিতর থেকে সোনার মতো সারকথা গ্রহণ করবে। উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী যেমন এক একটি কণা খুঁটে নেয়, তেমনই ধৈর্যশীল ব্যক্তির এখান সেখান থেকে ভাবপূর্ণ কথা ও সৎকর্ম ইত্যাদি সংগ্রহ করা উচিত। গোরু গন্ধের সাহায্যে, ব্রাহ্মণরা বেদের সাহায্যে, রাজা গুপ্তচরের সাহায্যে এবং সর্বসাধারণের চোখের দ্বারা দেখে থাকেন। যে গোরু অনেক চেষ্টার ফলে দুধ দেয় তাকে কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু যে গোরুটিকে সহজেই দোহন করা যায় তাকে কষ্ট পেতে হয় না। যে ধাতু তপ্ত না করলেই বেঁকে যায়, তাকে কেউ অগ্নিতে তপ্ত করে না। যে কাঠ আপনিই বেঁকে আছে, তাকে কেউ বাঁকাতে চেষ্টা করে না। এই দৃষ্টান্ত মেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বলবানের সামনে নীচু হয়ে থাকা উচিত। যে বলবানের সামনে নীচু হয়, সে যেন ইন্দ্রদেবকে প্রণাম করছে মনে হয়। পশুদের রক্ষক বা প্রভু হল মেঘ, রাজার সহায়ক মন্ত্রী, নারীদের বন্ধু ও রক্ষক স্বামী এবং ব্রাহ্মণদের বন্ধু হল বেদ। সত্য দ্বারা ধর্মরক্ষা হয়, যোগের দ্বারা বিদ্যা সুরক্ষিত থাকে, পরিচ্ছন্নতার দ্বারা রূপ রক্ষা পায় এবং সদাচার দ্বারা কুলরক্ষা পায়। ওজন করে সুরক্ষিত রাখলে শস্য রক্ষা পায়, ছোটাছুটি করালে অশ্বকুল সুস্থ থাকে, প্রতিনিয়ত দেখাশোনা করলে গোবংশ রক্ষা পায় এবং নোংরা বস্ত্রাদির পরিধানে নারী রক্ষা পায়। সদাচার পালন না করলে শুধুমাত্র উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করলেই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না। নিম্ন বংশে জন্মালেও সদাচারের পালন তাকে শ্রেষ্ঠ করে তুলবে। যে ব্যক্তি অপরের ধন, রূপ, পরাক্রম, কৌলিন্য, সুখ, সৌভাগ্য ও সম্মানে হিংসা করে তার কপালে দুঃখ আছে। না করার যোগ্য কাজ করলে, করার উপযুক্ত কাজে ভুল করলে এবং কার্য সিদ্ধ হওয়ার আগেই গোপন কথা প্রকটিত হলে সতর্ক থাকতে হয়। যাতে নেশা বাড়ে সেই বস্তু পান করা উচিত নয়। বিদ্যার (অহংকার) মদ, অর্থের (অহংকার) মদ এবং উচ্চকুলের (অহংকার) মদ ভয়ংকর জিনিস। অহংকারী ব্যক্তিদের কাছে এগুলি মদ হলেও সজ্জন ব্যক্তিদের কাছে এগুলি দমের সাধন। কখনো কোনো কাজে সজ্জন দ্বারা প্রার্থিত হলেও দুষ্ট ব্যক্তি নিজেকে দুষ্ট বলে জানলেও নিজেকে সজ্জনের মতো জাহির করে। মনস্বী ব্যক্তিকে সাধু ব্যক্তি সাহায্য করেন, সাধু ব্যক্তিরও সহায়ক সাধুই হন, দুষ্টদেরও সাহায্য করেন সাধু, কিন্তু দুষ্টরা সাধুর সহায়ক হয় না। পুরুষের শীল (আচরণ)-ই প্রধান, যার সেটি নষ্ট হয়ে যায়, ইহজগতে তার জীবন, ধন এবং বন্ধুদ্বারাও কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ভরতশ্রেষ্ঠ ! ধনোন্মত্ত মানুষের আহারে মাংসের, মধ্যম শ্রেণীর মধ্যে ভোজনে গোরস এবং দরিদ্রদের মধ্যে ভোজনে তেলের প্রাধান্য থাকে। দরিদ্র ব্যক্তিদের সর্বদাই স্বাদু আহার ; কারণ ক্ষুধাই স্বাদের জননী। ধনীদের কাছে তা সর্বদাই দুর্লভ। রাজন্ ! পৃথিবীতে ধনীদের প্রায়শই আহার করার শক্তি থাকে না। কিন্তু দরিদ্ররা কাঠও হজম করে ফেলে। অধম পুরুষরা জীবিকা না হওয়ার ভয় পায়, মধ্যম শ্রেণীর মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় এবং উত্তম পুরুষরা অপমানকে মহা ভয় পায়। পান করা নেশা হলেও ঐশ্বর্যের নেশা সব থেকে খারাপ ; কারণ ঐশ্বর্যের অহংকারে মত্ত মানুষ ভ্রষ্ট না হয়ে ঠিকপথে ফেরে না॥ ৪-৫৪ ॥

যে ব্যক্তিকে জীব বশীভূতকারী পাঁচ ইন্দ্রিয় জয় করে নিয়েছে, তার বিপদ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বর্ধিত হয়। ইন্দ্রিয়াদিসহ মনকে জয় না করেই যিনি মন্ত্রীদের জয় করতে চান এবং মন্ত্রীদের নিজ অধীন না করেই যিনি শত্রুকে জয় করতে চান, সেই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে সকলেই পরিত্যাগ করে। যিনি প্রথমে ইন্দ্রিয়সহ মনকেও শত্রু মনে করে জয় করেন, তারপরে যদি তিনি মন্ত্রী বা শত্রুদের জয় করতে চান তাহলে তিনি অনায়াসে সফল হন। ইন্দ্রিয় এবং মনকে জয় করেন যিনি, অপরাধীদের দণ্ড প্রদান করেন যিনি এবং ভেবে চিন্তে কাজ করেন যে ধৈর্যশীল পুরুষ লক্ষ্মী তাঁর সহায়ক হন। রাজন্ ! মানুষের শরীর হল রথ, বুদ্ধি তার সারথি এবং ইন্দ্রিয়গুলি তার ঘোড়া। এরূপ চিন্তা করে সাবধানে থাকা চতুর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বশে আনা ঘোড়া

দ্বারা চালিত হয়ে সুখে যাত্রা করেন। শিক্ষা না পাওয়া ঘোড়া যেমন মূর্খ সারথিকে রাস্তায় ফেলে মেরে দেয়, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি বশে না হলে সেই ব্যক্তি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত না থাকায় মূর্খ ব্যক্তি অর্থকে অনর্থ এবং অনর্থকে অর্থ মনে করে অতি বড় দুঃখকেও সুখ বলে মনে করে। যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় সে শীঘ্রই ঐশ্বর্য, প্রাণ, ধন এবং স্ত্রীকে খুইয়ে ফেলে। যে অধিক ধনের অধিপতি হয়েও ইন্দ্রিয়কে বশে রাখে না, সে ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে নিজেই নিজের আত্মাকে জানার চেষ্টা করা উচিত, কারণ আত্মাই বন্ধু এবং আত্মাই নিজের শত্রু। যিনি স্বয়ং আত্মাকে জয় করেছেন, আত্মাই তাঁর বন্ধু। রাজন্! সূক্ষ্ম ছিদ্রসম্পন্ন জালে আবদ্ধ বড় বড় মাছ যেমন জাল কেটে ফেলে, তেমনই কাম ও ক্রোধ সম্মিলিতভাবে জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে দেয়। যিনি ইহজগতে ধর্ম ও অর্থের বিচার করে বিজয় সাধনের সামগ্রী সংগ্রহ করেন, তিনি সেই সামগ্রীতে যুক্ত হওয়ায় সদা সুখ ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকেন। যিনি চিত্তের বিকারভূত পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ নিজের শত্রুকে জয় না করে অন্য শত্রুদের পরাস্ত করতে চান, শত্রুরা তাঁকে পরাজিত করে। ইন্দ্রিয়াদির ওপর অধিকার না থাকায় বড় বড় সাধু-মহাত্মা এবং রাজারাও ভোগ বিলাসে আবদ্ধ থাকেন। দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ না করে তার সঙ্গে মিলে মিশে থাকলে নিরপরাধ সৎ ব্যক্তিও সমান দণ্ড পান, শুকনো কাঠের সঙ্গে থাকলে ভেজা কাঠও যেমন পুড়ে যায়। তাই দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কখনো মেলামেশা করবেন না। যে ব্যক্তি পাঁচ বিষয় এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মোহবশত বশ না-করে, তাকে বিপদ গ্রাস করে। গুণাদিতে দোষ না দেখা উচিত, সরলতা, পবিত্রতা, সন্তোষ, প্রিয় বাক্য বলা, ইন্দ্রিয়দমন, সত্যভাষণ এবং স্থৈর্য—দুরাত্মা ব্যক্তির এই গুণগুলি থাকে না। আত্মজ্ঞান, অশান্তচিত্ত না হওয়া, সহনশীলতা, ধর্মপরায়ণতা, বাক্য পালন এবং দান করা—দুরাত্মাদের এই সকল গুণ থাকে না। মূর্খ ব্যক্তি বিদ্বানদের গালিগালাজ ও নিন্দা দ্বারা কষ্ট দেয়। গালি যে দেয় সে পাপের ভাগী হয় এবং ক্ষমাকারী পাপ হতে মুক্ত হয়। দুষ্ট ব্যক্তির বল হচ্ছে হিংসা, রাজার বল শাস্তিপ্রদান, নারীদের বল সেবা এবং গুণবানদের বল ক্ষমা। রাজন্! বাক্‌সংযম পূর্ণভাবে করা কঠিন বলা হয়; কিন্তু বিশেষ অর্থ যুক্ত ও মনোমোহন বাক্যও বেশি বলা যায় না। রাজন্! মধুরবাক্য নানাপ্রকার কল্যাণ করে থাকে কিন্তু সেই কথাগুলিই কটুভাবে বললে মহা অনর্থের কারণ হয়ে ওঠে। বাণবিদ্ধ পশু এবং কুঠার দিয়ে কাটা বনও পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়, কিন্তু কটু বাক্য বলা ঘা কখনো সারে না। বাণের কাঁটা বের করে শরীর সারানো সম্ভব কিন্তু কটুবাক্যরূপ কাঁটা মন হতে বার করা যায় না কারণ তা হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে থাকে। বচনরূপ বাণ মুখ থেকে নির্গত হয়ে অন্যের মর্মে এমন আঘাত করে যে আহত ব্যক্তি রাতদিন সেই দুঃখবোধ নিয়ে সন্তপ্ত হতে থাকে। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্যের ওপর এরূপ ব্যবহার করা উচিত নয়। দেবতারা যাকে পরাজিত করতে চান, তাঁরা তার বুদ্ধি আগে থেকেই হরণ করেন; তাতে সেই ব্যক্তির নীচ কর্মের দিকে অধিক দৃষ্টি থাকে। বিনাশকাল হলে বুদ্ধি মলিন হয়; তখন অন্যায়কেও ন্যায় বলে প্রতীত হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্রদেরও বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে; পাণ্ডবদের সঙ্গে আপনার বিরোধের জন্য আপনি আপনার পুত্রদের কুমতলব জানতে পারছেন না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! যিনি রাজলক্ষণযুক্ত হওয়ায় ত্রিভুবনের রাজা হতে সক্ষম, আপনার আদেশপালনকারী সেই যুধিষ্ঠির এই সমগ্র পৃথিবীর শাসক হওয়ার যোগ্য। তিনি ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব জানেন, তেজ ও বুদ্ধিযুক্ত, পূর্ণ সৌভাগ্যশালী এবং আপনার সকল পুত্রের থেকে সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। রাজেন্দ্র! ধর্মধারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দয়া, সৌম্য-ভাব এবং আপনার প্রতি সৌজন্যবশত কষ্ট সহ্য করছেন॥ ৫৫-৮৬॥

—o—

বিদুর-নীতি
(তৃতীয় অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বুদ্ধিমান ! তুমি আরও ধর্ম অর্থযুক্ত কথা শোনাও। এতে আমার পূর্ণ তৃপ্তি হয়নি। এইসব বিষয়ে তুমি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করছ॥ ১ ॥

বিদুর বললেন—সর্ব তীর্থে স্নান এবং সকলের সঙ্গে নম্র ব্যবহার—এই দুটিই সমান ; কিংবা বলা যায় কোমল ব্যবহারের বিশেষ মহত্ত্ব আছে। বিভো ! আপনি আপনার পুত্র কৌরব এবং পাণ্ডব—উভয়ের প্রতিই সমানভাবে নম্র ব্যবহার করুন। তাতে আপনি ইহলোকে মহা যশ প্রাপ্ত হবেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যাবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ইহলোকে যতদিন মানুষের পুণ্যগাথা কীর্তন করা হয় ততদিন সে স্বর্গলোকেও সম্মান পায়। এই ব্যাপারে সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়, যাতে 'কেশিনী'কে পাওয়ার জন্য সুধন্বা ও বিরোচনের বিবাদের উল্লেখ রয়েছে। রাজন্ ! কোনো এক সময়ের কথা, কেশিনী নামে এক সুন্দরী কন্যা শ্রেষ্ঠ পতি বরণের ইচ্ছায় স্বয়ংবর সভায় এসেছিলেন। তখন দৈত্যকুমার বিরোচন তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় সেখানে উপস্থিত হন। সেই সময় কেশিনীর সঙ্গে দৈত্যরাজের এইরূপ কথাবার্তা হয়॥ ২-৭ ॥

কেশিনী বললেন—বিরোচন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না দৈত্য ? যদি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে আমি কেন সুধন্বাকে বিবাহ করব না ? ॥ ৮ ॥

বিরোচন বললেন—কেশিনী ! আমরা প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত জগৎ আমাদেরই। আমাদের কাছে দেবতা আর ব্রাহ্মণ কী বস্তু ? ॥ ৯ ॥

কেশিনী বললেন—বিরোচন ! আমরা দুজন এখানে অপেক্ষা করি, কাল প্রাতে সুধন্বা এখানে আসবেন, তারপর আমি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখব॥ ১০ ॥

বিরোচন বললেন—কল্যাণী ! তুমি যা বলছ, তাই করব। কেশিনী ! কাল প্রাতে তুমি আমাকে ও সুধন্বাকে একত্রে উপস্থিত দেখতে পাবে ॥ ১১ ॥

বিদুর বললেন— রাজন্ ! তারপর রাত্রি প্রভাত হলে সুধন্বা প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও কেশিনীর নিকটে এলেন। ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে কেশিনী উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে আসন এবং পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন॥ ১২-১৩ ॥

সুধন্বা বললেন—প্রহ্লাদনন্দন ! আমি তোমার এই সুবর্ণ সিংহাসনটি শুধু ছুঁয়ে দেখব, তোমার সঙ্গে এর ওপর বসা সম্ভব নয় ; কারণ তাহলে আমরা সমকক্ষ হয়ে যাব॥ ১৪ ॥

বিরোচন বললেন—সুধন্বন্ ! তোমার বসার পক্ষে কাঠ পিঁড়ি, চাটাই বা কুশাসনই উপযুক্ত। তুমি আমার সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য নও॥ ১৫ ॥

সুধন্বা বললেন— পিতা ও পুত্র এক সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন ; দুজন ব্রাহ্মণ, দুজন ক্ষত্রিয়, দুই বৃদ্ধ, দুজন বৈশ্য এবং দুজন শূদ্রও একসঙ্গে বসতে পারেন। কিন্তু অন্য কোনো দুজন ব্যক্তি পরস্পর একসঙ্গে বসতে পারেন না। তোমার পিতা প্রহ্লাদ নীচে বসেই আমার সেবা করতেন। তুমি এখনও বালক, সুখে পালিত ; তাই তোমার এই সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই॥ ১৬-১৭ ॥

বিরোচন বললেন—সুধন্বন ! আমাদের অসুরদের কাছে যা সোনা, গাভী, ঘোড়া ইত্যাদি সম্পত্তি আছে, সেগুলি আমি বাজী রাখছি, চলো আমরা দুজনে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ॥ ১৮ ॥

সুধন্বা বললেন—বিরোচন ! স্বর্ণ, গাভী এবং ঘোড়া

তোমারই থাক। আমাদের দুজনের প্রাণ বাজী রেখে যিনি এসবে অভিজ্ঞ, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো॥ ১৯ ॥

বিরোচন বললেন—ঠিক আছে, প্রাণ বাজী রেখে আমরা কার কাছে যাব ? আমি তো দেবতাদের কাছেও যেতে পারি না এবং মানুষদেরও বিচারক নিযুক্ত করতে পারি না॥ ২০ ॥

সুধন্বা বললেন—প্রাণ বাজী রেখে আমরা দুজন তোমার পিতার কাছে যাব। (আমার বিশ্বাস) প্রহ্লাদ নিজের পুত্রের জন্যও মিথ্যা বলবেন না॥ ২১ ॥

বিদুর বললেন— এইভাবে প্রাণের বাজী রেখে উভয়ে উত্তেজিত হয়ে যেখানে প্রহ্লাদ ছিলেন, সেখানে গেলেন॥ ২২ ॥

প্রহ্লাদ (মনে মনে) বললেন—যাদের কখনো একসঙ্গে দেখা যায়নি, তারা দুজনে, সুধন্বা আর বিরোচনকে আজ সাপের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে একসঙ্গে আসতে দেখা যাচ্ছে। (তারপর বিরোচনকে বললেন) বিরোচন ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমার কি সুধন্বার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে ? নাহলে একসঙ্গে আসছ কী করে ? আগে তো তোমাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি॥ ২৩-২৪ ॥

বিরোচন বললেন—পিতা ! সুধন্বার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি। আমরা দুজন প্রাণ বাজী রেখে এসেছি। আমি আপনার নিকট একটি প্রশ্নের সত্য উত্তর জানতে চাইছি। আমার প্রশ্নের অসত্য উত্তর দেবেন না॥ ২৫ ॥

প্রহ্লাদ বললেন— সেবকগণ ! সুধন্বার জন্য জল এবং মধুপর্ক নিয়ে এসো। (তারপর সুধন্বাকে বললেন।) ব্রহ্মন্ ! আপনি আমার পূজনীয় অতিথি, আমি আপনার জন্য সাদা গাভী প্রস্তুত করে রেখেছি॥ ২৬ ॥

সুধন্বা বললেন—প্রহ্লাদ ! জল আর মধুপর্ক আমি পথেই পেয়েছি। তুমি আমার প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দাও—ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না বিরোচন ? ॥ ২৭ ॥

প্রহ্লাদ বললেন — ব্রহ্মণ ! আমার একটিই পুত্র আর এদিকে আপনি নিজে উপস্থিত ; আপনাদের বিবাদে আমার মতো মানুষ কী করে স্থির সিদ্ধান্ত নেবে ? ॥ ২৮ ॥

সুধন্বা বললেন—মতিমন্ ! তোমার যে গো-ধন এবং প্রিয় সম্পত্তি আছে সে সব তোমার নিজের পুত্র বিরোচনকে দিয়ে দাও ; কিন্তু আমাদের দুজনের বিবাদে তোমাকে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদ বললেন— সুধন্বন্ ! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি— যে ব্যক্তি সত্য বাক্য বলে না অথবা অসৎ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, সেই অসৎ বক্তার কী হয় ? ॥ ৩০ ॥

সুধন্বা বললেন— সতীনসম্পন্না নারী, জুয়াতে হেরে যাওয়া জুয়াড়ী এবং ভার বয়ে ব্যথিত দেহী মানুষের রাত্রে যে অবস্থা হয়, বিপরীত ন্যায় প্রদানকারী বক্তারও তাই হয়। যে মিথ্যা বিচার করে, সেই রাজা নগরে বন্দী হয়ে বাইরের দরজায় ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে বহু শত্রুর সম্মুখীন হয়। মিথ্যা বলার অপরাধে যদি পশু মারা যায় তাহলে তার পরবর্তী পাঁচ পুরুষ, গাভী মারা গেলে দশ পুরুষ, অশ্ব মারা গেলে একশ পুরুষ এবং মানুষ মারা গেলে পরবর্তী এক হাজার পুরুষদের নরকবাস করতে হয়। স্বর্ণের জন্য মিথ্যা বলে যে সে ভূত ভবিষ্যতের সমস্ত কুলকে নরকে পতিত করে দেয়। পৃথিবী এবং নারীর জন্য যে মিথ্যা বলে সে নিজের সর্বনাশ করে বসে, অতএব তুমি স্ত্রীর জন্য কখনো মিথ্যা বলবে না॥ ৩১-৩৪ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—বিরোচন ! সুধন্বার পিতা অঙ্গিরা আমা হতে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বা তোমা হতে শ্রেষ্ঠ, এঁর মাতাও তোমার মাতার থেকে শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং আজ তুমি সুধন্বার কাছে পরাজিত হয়েছ। বিরোচন ! সুধন্বা এখন তোমার প্রভু। সুধন্বন্ ! যদি এখন বিরোচনকে আমাকে দিয়ে দেন, আমি ওকে চাই॥ ৩৫-৩৬ ॥

সুধন্বা বললেন — প্রহ্লাদ ! তুমি ধর্ম স্বীকার করেছ, স্বার্থবশত মিথ্যা কথা বলনি ; তাই তোমার পুত্রকে তোমাকে দিয়ে দিলাম। প্রহ্লাদ ! তোমার পুত্র বিরোচনকে আমি তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। কিন্তু এবার কুমারী কেশিনীর কাছে গিয়ে আমার পা ধুইয়ে দেবে॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিদুর বললেন—তাই রাজেন্দ্র ! আপনি পৃথিবীর

সাম্রাজ্যের জন্যও মিথ্যা বলবেন না। পুত্রের স্বার্থের জন্য অসত্য বলে পুত্র এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে বিনাশের মুখে পা দেবেন না। দেবতারা রাখালের মতো লাঠি হাতে পাহারা দেন না, তাঁরা যাকে রক্ষা করতে চান, তাকে উত্তম বুদ্ধি দিয়ে পাঠান। মানুষ যখনই কল্যাণমুখী হয়, তখনই তার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হতে থাকে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কপট ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের পাপ, বেদও দূর করতে সক্ষম হয় না। ডানা গজালে পাখি যেমন নীড় ছেড়ে উড়ে যায় তেমনই বেদও অন্তকালে পাপী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। মদ্যপান, বিবাদ, সকলের সঙ্গে শত্রুতা, পতি-পত্নীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা, আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে ভেদাভেদ করা, রাজার সঙ্গে দ্বেষ, স্ত্রী-পুরুষে বিবাদ এবং কু-মার্গে গমন—এগুলি ত্যাজ্য বলা হয়েছে। হস্তরেখাবিদ্, চুরি করে ব্যবসায়ী হওয়া, জুয়াড়ী, বৈদ্য, শত্রু, মিত্র এবং চারণ—এই সাত ব্যক্তিকে কখনো সাক্ষী করবে না। সম্মানের সঙ্গে অগ্নিহোত্র, সম্মানের সঙ্গে মৌন পালন, সম্মানের সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং সম্মানের সঙ্গে যজ্ঞ অনুষ্ঠান—এই চারকর্ম ভয় দূর করে। কিন্তু এগুলি ঠিকভাবে সম্পাদন না করলে ভয়প্রদানকারী হয়। গৃহে অগ্নিপ্রদানকারী, বিষপ্রদানকারী, জারজ সন্তানের উপার্জনে জীবিকা নির্বাহকারী, মদ্যবিক্রেতা, অস্ত্র প্রস্তুত কারক, কলহকারী, মিত্রদ্রোহী, ব্যভিচারী, গর্ভপাতকারী, গুরুপত্নীগামী, ব্রাহ্মণ হয়েও মদ্যপানকারী, তীক্ষ্ণ স্বভাবসম্পন্ন, কাকের মতো কর্কশবাক্য বলা, নাস্তিক, বেদ নিন্দাকারী, ঘুষখোর, পতিত, ক্রূর এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শরণাগতকে রক্ষা না করে যে হিংসা করে তারা সকলেই ব্রহ্মহত্যার ন্যায় পাপের পাতক হয়। আগুনে সোনা চেনা যায়, সদাচারের দ্বারা সৎ ব্যক্তির, ব্যবহার দ্বারা সাধুর, ভয়ে শূরবীরের, অর্থ কষ্টে ধৈর্যশীলের এবং কঠিন বিপদে শত্রু-মিত্রের পরীক্ষা হয়। বৃদ্ধত্ব সুন্দর রূপকে, আশা ধৈর্যকে, মৃত্যু প্রাণকে, দোষ দেখার স্বভাব ধর্মাচরণকে, ক্রোধ লক্ষ্মীকে, নীচ ব্যক্তির সেবা সৎ স্বভাবকে, কাম লজ্জাকে এবং অভিমান সর্বস্ব নষ্ট করে দেয়। শুভ কর্মের দ্বারা লক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়, বাক্য নৈপুণ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, চাতুর্যে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং সংযমে সুরক্ষিত থাকে। আটটি গুণ পুরুষের শোভা বৃদ্ধি করে—বুদ্ধি, কৌলিন্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, বাজে কথা না বলা, যথাশক্তি দান এবং কৃতজ্ঞতা। তাত! একটি এমন গুণ আছে যা এইসব মহত্ত্বপূর্ণ গুণগুলির ওপর হঠাৎ অধিকার কায়েম করে বসে। রাজা যখন কোনো ব্যক্তিকে সম্মান জানান, তখন সেই একটি গুণই (রাজসম্মান) সমস্ত গুণের ওপর শোভা পায়। রাজন্! ইহলোকের এই আটটি গুণ স্বর্গলোক দর্শন করায়; এর মধ্যে চারটি সৎ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে এবং অপর চারটি সৎব্যক্তি স্বয়ং অনুসরণ করে থাকেন। যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন এবং তপ—এই চারটি সৎব্যক্তিকে অনুগমন করে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য, সারল্য এবং কোমলতা—এই চারটি স্বয়ং সৎ ব্যক্তি অনুসরণ করেন। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা, দয়া এবং লোভহীন হওয়া—ধর্মের এই আটটি পথ। এর মধ্যে প্রথম চারটি দম্ভের জন্যও অনুষ্ঠান করা যায়; কিন্তু বাকি চারটি যারা মহাত্মা নয়, তাদের মধ্যে থাকতেই পারে না। যে সভায় বৃদ্ধ ও প্রাচীন ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন না, তা সভাই নয়। যিনি ধর্মকথা বলেন না, তাঁরা বৃদ্ধ নন; যাতে সত্য নেই, তা ধর্ম নয় এবং যা কপটতাপূর্ণ, তা সত্য নয়। সত্য, বিনয়ের ভাব, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, কৌলিন্য, শীল, ধন, শৌর্য এবং সুন্দর কথা বলা—এই দশটি স্বর্গের সাধন। পাপকীর্তি-সম্পন্ন মানুষ পাপাচরণ করে পাপরূপ ফলই লাভ এবং পুণ্যকর্মা ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে পুণ্যফলই উপভোগ করেন। তাই প্রশংসনীয় ব্রত আচরণকারী ব্যক্তির পাপকাজ করা উচিত নয়; কারণ বারংবার পাপ কাজ করলে তা বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। তেমনই বারংবার পুণ্য করলে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। যাঁর বুদ্ধি বাড়ে তিনি সর্বদা পুণ্য কাজ করে থাকেন। পুণ্যকর্মা ব্যক্তি পুণ্যলোকেই গমন করেন। তাই মানুষের উচিত সর্বদা একাগ্রচিত্তে পুণ্য কর্ম করা। দোষদর্শী, মর্মে আঘাতকারী, নির্দয়, শত্রুতাকারী এবং শঠ ব্যক্তি পাপাচরণ করে সত্বরই মহাকষ্ট প্রাপ্ত হয়। দোষদৃষ্টিরহিত, শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির থেকে সদ্বুদ্ধি লাভ করেন, তিনিই পণ্ডিত; কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ধর্ম, অর্থ লাভ করে অনায়াসে নিজ উন্নতি করতে সক্ষম হন। সারাদিন কাজ করেন, যাতে রাতে সুখে কাটাতে পারেন এবং আট মাস কাজ করেন যাতে বৎসরের বাকি চার মাস সুখে কাটাতে পারেন। জীবনের প্রথম দিকে অর্থ উপার্জন করবে যাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে জীবন অতিবাহিত হয় এবং আজীবন এমন কাজ করবে যাতে মৃত্যুর পরেও শান্তি থাকে। ভালোভাবে হজম হলে সজ্জন ব্যক্তি সেই অন্নের, নিষ্কলঙ্কভাবে যৌবন অতিবাহিত করলে সেই পত্নীর, যুদ্ধ জয়ী বীরের এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত তপস্বীর প্রশংসা করেন।

অধর্মের দ্বারা অর্জিত অর্থের দ্বারা যে দোষ চাপা দেওয়া হয়, তা চাপা তো পড়েই না, তার থেকেও ভিন্ন নতুন দোষ প্রকটিত হয়ে পড়ে। মন ও ইন্দ্রিয়বশকারী শিষ্যের গুরুই তাঁর শাসক, দুষ্টের শাসক রাজা এবং যারা গোপনে পাপ করে তাদের শাসক সূর্যপুত্র যমরাজ। ঋষি, নদী, মহাত্মাদের কুল এবং নারীদের দুশ্চরিত্রের মূল জানা যায় না। রাজন্ ! ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধাকারী, দাতা, কুটুম্বদের প্রতি কোমল ব্যবহারকারী এবং শীলবান রাজা বহুদিন পৃথিবী পালন করেন। শূর, বিদ্বান এবং সেবাধর্মজ্ঞাতা—এই তিন ব্যক্তি পৃথিবী থেকে স্বর্ণময় পুষ্প সঞ্চয় করেন। ভারত ! বুদ্ধিদ্বারা বিচার করা কর্ম শ্রেষ্ঠ, বাহুবলে করা কার্য মধ্যম শ্রেণীর, জঙ্ঘার দ্বারা কর্ম অধম এবং ভারবহনের কর্ম মহা অধম হয়ে থাকে। রাজন্ ! আপনি দুর্যোধন, শকুনি, মূর্খ দুঃশাসন এবং কর্ণের ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে উন্নতির আশা করেন কী করে ? ভরতশ্রেষ্ঠ ! পাণ্ডবরা উত্তম গুণসম্পন্ন এবং আপনার প্রতি পিতার মতো ব্যবহার করেন ; আপনিও তাদের প্রতি পুত্রভাব বজায় রেখে আচরণ করুন॥ ৩৯-৭৭ ॥

—o—

বিদুর নীতি
(চতুর্থ অধ্যায়)

বিদুর বললেন—এই বিষয়ে দত্তাত্রেয় এবং সাধ্য দেবতাদের কথোপকথন রূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়, একথা আমার শোনা। প্রাচীন কালের কথা, উত্তম ব্রত সম্পন্ন মহাবুদ্ধিমান মহর্ষি দত্তাত্রেয় পরমহংস রূপে বিচরণশীল ছিলেন ; সেইসময় সাধ্য দেবতাগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—॥ ১-২ ॥

সাধ্য বললেন—মহর্ষি ! আমরা সাধ্য দেবতা ; আপনাকে শুধুমাত্র দেখে আপনার বিষয়ে কিছু অনুমান করতে পারছি না। আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞানী, ধৈর্যশীল এবং বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে ; আপনি আমাদের বিদ্বত্বপূর্ণ কিছু উদার বাণী কৃপা করে শোনান॥ ৩ ॥

পরমহংস বললেন—দেবগণ ! আমি শুনেছি যে ধৈর্য-ধারণ, মনো-নিগ্রহ, সত্য ধর্ম পালনই কর্তব্য ; পুরুষের এর সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি উন্মোচন করে প্রিয় এবং অপ্রিয়কে নিজের আত্মার সমান বলে জানা উচিত। অপরে কুকথা বললেও তাকে গালি দেওয়া উচিত নয়। ক্ষমাকারীর অবরুদ্ধ ক্রোধই গালিপ্রদানকারীর ক্ষতি করে এবং তার পুণ্য হরণ করে। অপরকে গালি দেবে না এবং তাকে অসম্মানও করবে না, মিত্রের সঙ্গে দ্রোহ এবং নীচব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করবে না, সদাচারশূন্য ও অহংকারী হবে না, রুক্ষ এবং ক্রোধযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ করবে। যাঁর বাক্য কঠোর এবং স্বভাব রুক্ষ, যে মর্মে আঘাত করে বাক্-বাণে মানুষকে দুঃখ দেয়, বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মহা দরিদ্র এবং নিজ বাক্যে দারিদ্র্য বয়ে বেড়ায়। রুক্ষ ও কঠোর বাক্য মানুষের মর্মস্থান, হৃদয় এবং প্রাণকে দগ্ধ করে ; তাই ধর্মানুরাগী ব্যক্তি জ্বালাপ্রদানকারী রুক্ষ, কঠোর বাক্য সততই পরিত্যাগ করেন। যদি কেউ বিদ্বান ব্যক্তিকে অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় দগ্ধকারী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করে, তবে সেই বিদ্বান পুরুষ অত্যন্ত আহত হয়েও মনে

করেন যে এর দ্বারা তাঁর পুণ্য পুষ্ট হচ্ছে। বস্ত্র যেমন যে রঙে রঙ করা হয় সেই রঙই ধারণ করে তেমনই যদি কোনো ব্যক্তি সজ্জন, অসজ্জন, তপস্বী অথবা চোরের সেবা করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর সেই রঙই প্রভাব বিস্তার করে। যে ব্যক্তি কারো প্রতি খারাপ বাক্য বলেন না, অন্যকেও বলান না, মার খেয়েও পরিবর্তে নিজে মারেন না এবং অপরকেও দিয়েও মার দেওয়ান না দেবতারাও তাঁর আগমনের অপেক্ষায় থাকেন। কথা বলার চেয়ে না বলাই উত্তম বলা হয় ; কিন্তু সত্য কথার অন্য বিশেষত্ব আছে, মৌন থাকার চেয়ে তাতে দ্বিগুণ লাভ হয়। সেই সত্য যদি প্রিয় হয়, তবে তা তিনগুণ বিশেষত্ব এবং তা যদি ধর্মসম্মতভাবে বলা হয় তবে তা চতুর্গুণ বিশেষত্ব লাভ করে। মানুষ যেমন লোকেদের সঙ্গে বাস করে, যেমন লোকেদের সেবা করে এবং যেমন হতে চায়, সে তেমনই হয়ে যায়। যে যে বিষয় থেকে মনকে সরানো হয়, সেইসব থেকে মুক্তি হয়ে যায়। এইভাবে সর্বদিক থেকে যদি নিবৃত্ত হওয়া যায় তাহলে মানুষ কখনো লেশমাত্র দুঃখ পায় না। যিনি নিজে কখনো কারোর দ্বারা বিজিত হন না, অপরকে জেতার ইচ্ছা রাখেন না, কারো সঙ্গে শত্রুতা করেন না, কাউকে দুঃখ বা আঘাত দিতে চান না, নিন্দা ও প্রশংসাতে যিনি সমভাবে থাকেন, তিনি হর্ষ- শোকের অতীত হয়ে যান। যিনি সকলের কল্যাণ কামনা করেন, কারো অকল্যাণের কথা মনেও আনেন না, যিনি সত্যবাদী, কোমল এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁকে উত্তম পুরুষ বলা হয়। যিনি মিথ্যা সান্ত্বনা দেন না, দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে দিয়ে ফেলেন, অপরের দোষ সম্বন্ধে অবহিত, তিনি মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ। দেখুন, দুঃশাসনকে গন্ধর্বরা মেরেছিল, অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, (সেই সময় পাণ্ডবরা ওদের রক্ষা করেছিল) ; তা সত্ত্বেও সেই কৃতঘ্ন ক্রোধের বশীভূত হয়ে পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে পিছন হটেনি। এই দুরাত্মা কারোরই মিত্র নয়। অধম পুরুষেরই এরূপ চিত্তবৃত্তি হয়। যে নিজের ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় অপরের দ্বারা ভালো হলেও তাকে বিশ্বাস করে না, মিত্রকে দূরে রাখে, সে অবশ্যই অধম পুরুষ। যে নিজের উন্নতি চায়, তার অবশ্যই উত্তম পুরুষের সেবা করা উচিত। প্রয়োজন হলে মধ্যম পুরুষেরও সেবা করা যেতে পারে, কিন্তু অধম পুরুষের কখনো নয়। মানুষ দুষ্ট পুরুষের বলের দ্বারা, নিরন্তর চেষ্টা দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা এবং পুরুষার্থের দ্বারা যতই অর্থ লাভ করুন, কিন্তু এগুলির দ্বারা উত্তম কুলীন ব্যক্তির সম্মান এবং সদাচার কখনো লাভ করতে পারেন না॥ ৪-২১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! ধর্ম এবং অর্থের নিত্যজ্ঞাতা এবং বহুশ্রুত দেবতারাও উত্তম কুলে জন্ম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, উত্তম কুল কাকে বলে ? ॥ ২২ ॥

বিদুর বললেন — যাতে তপ, ইন্দ্রিয় সংযম, বেদের স্বাধ্যায়, যজ্ঞ,পবিত্র বিবাহ, সদা অন্নদান এবং সদাচার— এই সাতগুণ বর্তমান, তাকে উত্তম কুল বলা হয়। যাঁর সদাচার শিথিল হয় না, যিনি নিজ দোষে পিতা মাতাকে কষ্ট দেন না, প্রসন্ন চিত্তে ধর্ম আচরণ করেন এবং অসত্য পরিত্যাগ করে নিজ কুলের বিশেষ কীর্তি রাখতে চান, তাঁর কুলই উত্তম। যজ্ঞ না করলে, নিন্দনীয় কুলে বিবাহ করলে, বেদ পরিত্যাগ ও ধর্ম উল্লঙ্ঘন করলে উত্তম কুলও অধম হয়ে যায়। ভারত ! দেবতাদের ধন নাশ, ব্রাহ্মণদের ধন অপহরণ, ব্রাহ্মণদের মর্যাদা লঙ্ঘন করলেও উত্তম কুল অধম হয়ে যায়। ভারত ! ব্রাহ্মণদের অসম্মান এবং নিন্দাতে এবং গচ্ছিত বস্ত্র অপহরণ করলে উত্তম কুলও নিন্দনীয় হয়ে যায়। জনবল, গো-পশু ও ধনসম্পত্তি সম্পন্ন হয়েও যে কুল সদাচারহীন হয়, তা উত্তম কুলের গণনার মধ্যে থাকে না। অল্পসম্পদ-বিশিষ্ট কুলও যদি সদাচারসম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে ভালো কুলের মধ্যে গণনা করা হয় এবং তা মহাযশপ্রাপ্ত করে। যত্নপূর্বক সদাচার রক্ষা করা উচিত, ধন তো আসে এবং যায়। ধন ক্ষীণ হলেও সদাচারী মানুষকে ক্ষীণ বলে মনে করা হয় না কিন্তু যে ব্যক্তি সদাচার ভ্রষ্ট হয়েছে, তাকে নষ্ট বলে মনে করা উচিত। যে কুল সদাচারহীন, তা যতই ধন-সম্পদ সম্পন্ন হোক, উন্নতি করতে পারে না। আমাদের কুলে যেন কেউ শত্রুতাকারী না থাকে, অন্যের ধন অপহরণকারী রাজা বা মন্ত্রী না থাকে এবং মিত্রদ্রোহী, কপট মিথ্যাবাদী না থাকে। এইরূপ মাতা-পিতা এবং দেবতা-অতিথির আহারের পূর্বে কেউ যেন আহারও না করে। আমাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, ব্রাহ্মণকে হিংসা করে এবং পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান বা তর্পণ করে না, সে যেন আমাদের সভায় না আসে। তৃণাসন, মাটি, জল ও মিষ্ট বাক্য—সজ্জনের গৃহে এই চারটি জিনিসের কখনো অভাব হয় না। রাজন্ ! পুণ্যকর্মকারী ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের গৃহে এই তৃণাদি বস্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎকারের জন্য দেওয়া হয়। নৃপবর ! ছোট রথ

ভারবহন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু অন্য কাঠ বৃহৎ হলেও ভারবহনে অক্ষম হয়ে থাকে। তেমনই উত্তম কুলে উৎপন্ন উৎসাহী ব্যক্তি ভার বহন করতে সক্ষম, অন্য ব্যক্তিরা তা পারে না। যার কোপে ভীত হতে হয় এবং শঙ্কিত চিত্তে সেবা করতে হয়, সে মিত্র নয়। মিত্র তাকেই বলে, যার ওপর পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা যায় ; অপরেরা তো শুধু সঙ্গী। আগে থেকে কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও যে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে, সেই বন্ধু, সেই মিত্র, সেই আশ্রয়। যার চিত্ত চঞ্চল, যে বৃদ্ধদের সেবা করে না, সেই চঞ্চলমতি মানুষের স্থায়ী বন্ধু হয় না। হংস যেমন শুষ্ক সরোবরের পাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে, ভিতরে প্রবেশ করে না, তেমনই যার চিত্ত চঞ্চল, যে অজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের দাস, তার অর্থ প্রাপ্তি হয় না। দুষ্ট ব্যক্তির স্বভাব মেঘের ন্যায় চঞ্চল, সে সহসা ক্রোধান্বিত হয় আবার অকারণে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। যে মিত্রের দ্বারা সম্মানিত হয়ে, তার সাহায্যে কৃতকার্য হয়েও তার বন্ধু হয় না, সেই কৃতঘ্নের মৃত্যুর পর মাংসভোজী জন্তুও তার মাংস খায় না। অর্থ থাক বা না থাক, বন্ধুকে আপ্যায়ন করতেই হয়। বন্ধুর কাছ থেকে কিছু যাচ্ঞা করার মনোভাব রাখবে না এবং তাদের ভালো-মন্দের পরীক্ষা করবে না। দুঃখে রূপ নষ্ট হয়, বল নষ্ট হয় এবং জ্ঞান নষ্ট হয়, দুঃখে মানুষ রোগগ্রস্ত হয়। শোক করলে অভীষ্ট লাভ করা যায় না, এতে শুধু শরীরের কষ্ট হয় এবং শত্রু আনন্দিত হয়। অতএব আপনি শোক করবেন না। মানুষ বারংবার মরে এবং জন্ম নেয়, বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং লাভ করে। বারংবার অপরের কাছ থেকে যাচ্ঞা করলে, অপরে তার কাছে যাচ্ঞা করে। সে অপরের জন্য শোক করে, অপরে তার জন্য শোক করে। সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-বিনাশ, লাভ-ক্ষতি এবং জীবন-মরণ—এইসব বারবার আসে যায় ; তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তির তার জন্য হর্ষ বা শোক করা উচিত নয়। ছয়টি ইন্দ্রিয় অত্যন্ত চঞ্চল ; যে ইন্দ্রিয় যে বিষয়ের প্রতি গভীরতরভাবে আসক্ত হতে থাকে বুদ্ধি ততই ক্ষীণ হতে থাকে, যেমন ছিদ্রযুক্ত কলস থেকে জল নির্গত হতে থাকে ॥ ২৩-৪৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন— তুষের আগুনের মতো সূক্ষ্ম ধর্মে আবদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমি কপট ব্যবহার করেছি ; সুতরাং সে যুদ্ধের দ্বারা আমার পুত্রদের বিনাশ করবে। মহামতি ! আমার মন সর্বদা ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ; তাই যা উদ্বেগশূন্য এবং শান্তিপ্রদ, তা আমাকে বলো॥ ৪৯-৫০ ॥

বিদুর বললেন—নিষ্পাপ নরেশ ! বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং লোভ পরিত্যাগ ব্যতীত আপনার জন্য আর কোনো শান্তির উপায় দেখি না। মানুষ তার ভয় বুদ্ধির সাহায্যে দূর করে। তপস্যা দ্বারা মহানপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, গুরু শুশ্রূষা দ্বারা জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা শান্তিলাভ হয়। মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ দানের পুণ্যের আশ্রয় নেন না, বেদের পুণ্যেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন না ; নিষ্কামভাবে রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে তাঁরা ইহলোকে বিচরণ করেন। সম্যক্, অধ্যয়ন, ন্যায়োচিত যুদ্ধ, পুণ্যকর্ম এবং ভালোভাবে করা তপস্যার শেষে সুখ বৃদ্ধি হয়। রাজন্ ! যারা নিজেদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে চলে, তারা সুন্দর বিছানায় শয়ন করলেও সুখে নিদ্রা যেতে পারে না ; সুন্দরী নারীর কাছে থাকলে অথবা চাটুকারীগণ স্তুতি করলেও তারা প্রসন্ন হয় না। যারা নিজেদের মধ্যে ভেদভাব রাখে, তারা কখনো ধর্ম আচরণ করে না, সুখও পায় না। তারা গৌরব প্রাপ্ত হয় না এবং শান্তির বার্তাও সহ্য করতে পারে না। হিতের কথাও তাদের ভালো লাগে না, যোগ-ক্ষেমের সিদ্ধিও তারা পায় না ; রাজন্ ! ভেদাভেদ রাখে যেসব পুরুষ, বিনাশ ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই। গোরুতে দুধ, ব্রাহ্মণে তপ এবং যুবতী স্ত্রীর মধ্যে চপলতার ন্যায় জ্ঞাতি-পরিবারের দ্বারা ভয়েরও কারণ থাকতে পারে। নিত্য জলসেচন করে যে লতাকে বড় করা হয়, তা অনেকদিন নানা ঝড় বাদল সহ্য করতে পারে ; সৎপুরুষদের বিষয়েও একথা ঠিক। তাঁরা দুর্বল হলেও সামূহিক শক্তির দ্বারা বলবান হয়ে ওঠেন। ভরত-শ্রেষ্ঠ ! জ্বলন্ত কাঠ পৃথকভাবে থাকলে অগ্নি উদ্‌গীরণ করে, কিন্তু একসঙ্গে থাকলেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এইরূপই আত্মীয়-বন্ধু পৃথক হলে দুঃখ বাড়ে আর একত্রে থাকলে সুখী হয়। ধৃতরাষ্ট্র ! যারা ব্রাহ্মণ, নারী, আত্মীয়-কুটুম্ব এবং গাভীর ওপর বীরত্ব দেখায়, তারা চারাগাছের ফলের মতো মাটিতে পড়ে যায়। গাছ যদি একা দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তা যতই বলবান, দৃঢ়মূল এবং বৃহৎ হোক ঝড়ের দাপটে একমুহূর্তে শাখা-প্রশাখাসহ ধরাশায়ী হয়। কিন্তু যদি বহু গাছ একসঙ্গে থাকে তাহলে অনেক বড় ঝড়ও তাদের ধরাশায়ী করতে পারে না। এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন মানুষও একা হয়ে গেলে শত্রু তাকে নিজের অধীনে পেয়ে যায়। কিন্তু পরস্পর একসঙ্গে থাকলে, একে অন্যের সাহায্য পেলে, কোনো শত্রু তার সামনে আসতে পারে না। ব্রাহ্মণ, গাভী, কুটুম্ব, বালক, নারী, অন্নদাতা এবং শরণাগত—এরা অবধ্য। রাজন্ ! আপনার কল্যাণ

হোক, মানুষের অর্থ এবং আরোগ্য ছাড়া আর কোনো গুণ নেই, কারণ রোগী মৃত ব্যক্তিরই মতো। যা রোগ ছাড়াই উৎপন্ন হয়, তা পাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। কঠোর, তীক্ষ্ণ, গরম, যা সৎ ব্যক্তিরা সহ্য করেন আর দুর্জনেরা সম্বরণ করতে পারেন না— আপনি সেই ক্রোধ সম্বরণ করে শান্ত হন। পীড়িত ব্যক্তি মধুর ফলের স্বাদ বোঝে না, বিষয়েও তার কিছু সার মেলে না। রোগী সর্বদাই দুঃখিত হয়ে থাকে ; সে ধন সম্পর্কের ভোগ এবং সুখ কোনোটিই অনুভব করে না। রাজন্! আগে দ্রৌপদীকে পাশাতে জিতে নেওয়ার পর আমি বলেছিলাম, 'আপনি দ্যুত ক্রীড়ায় আসক্ত দুর্যোধনকে বাধাপ্রদান করুন, বিদ্বানরা এই প্রবঞ্চনা করতে বারণ করেছেন ; কিন্তু আপনি আমার বারণ শোনেননি। তাকে শক্তি বলা যায় না, যা মৃদুস্বভাবের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়। সূক্ষ্মধর্ম সত্বরই সেবন করা উচিত। ক্রূরভাবে উপার্জন করা অর্থ নশ্বর হয় ; যদি স্বাভাবিকভাবে উপার্জন করা অর্থ হয় তবে তা পুত্র-পৌত্র পর্যন্ত স্থির থাকে। রাজন্ ! আপনার পুত্র পাণ্ডবদের রক্ষা করুক আর পাণ্ডুপুত্রগণ আপনার পুত্রদের রক্ষা করবে। সকল কৌরব একে অপরের শত্রুকে শত্রু এবং মিত্রকে মিত্র বলে জানবে। সকলের যেন একই কর্তব্য হয়, সকলেই সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী হয়ে যেন জীবন কাটায়। আজমীঢ় কুলনন্দন ! আপনিই এখন কৌরবদের আধারস্তম্ভ, কুরুবংশ আপনারই অধীন। তাত ! কুন্তীর পুত্ররা এখনও অল্পবয়স্ক এবং বনবাসে বহু কষ্ট পেয়েছে ; এখন আপনি আপনার যশরক্ষা করে পাণ্ডবদের পালন করুন। কুরুরাজ ! পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নিন ; যাতে শত্রুরা আপনার ছিদ্রান্বেষণ করতে না পারে। হে নরেশ ! পাণ্ডবরা সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এখন আপনি দুর্যোধনকে শাসন করুন॥ ৫১-৭৪ ॥

বিদুর নীতি

(পঞ্চম অধ্যায়)

বিদুর বললেন—রাজেন্দ্র ! বিচিত্রবীর্যনন্দন ! স্বয়ম্ভুব মনু বলেছেন নিম্নলিখিত সতেরো প্রকারের পুরুষকে যমরাজের দূত পাশ হাতে করে নরকে নিয়ে যায়—আকাশে মুষ্টি দ্বারা প্রহার করা ; বর্ষার ইন্দ্রধনু যাকে অবনত করা যায় না, তাকে অবনত করার চেষ্টা ; যে সূর্যকিরণ ছোঁয়া যায় না, তাকে ধরার চেষ্টা ; শাসন করার অযোগ্য ব্যক্তিকে শাসনের চেষ্টা ; মর্যাদা লঙ্ঘন করে যে সন্তুষ্ট থাকে ; শত্রুর সেবা করে ; নারীদের রক্ষায় নিযুক্ত থেকে জীবিকা-নির্বাহ করে ; ভিক্ষা চাওয়ার অযোগ্য ব্যক্তির কাছে ভিক্ষা চায় এবং আত্মপ্রশংসা করে ; উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেও নীচকর্ম করে ; দুর্বল হয়েও বলবানের সঙ্গে শত্রুতা করে ; শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করে ; না চাওয়ার বস্তু চায়, শ্বশুর হয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করে এবং পুত্রবধূর সাহায্যে সংকট মুক্ত হয়ে পুনরায় তার কাছে প্রতিষ্ঠা চায় ; পরস্ত্রীতে সমাগম করে ; প্রয়োজনের বেশি পত্নী-নিন্দা করে ; কারো কাছে কিছু পেয়েও 'মনে নেই' বলে তাকে লুকিয়ে রাখতে চায় ; কেউ কিছু চাইলে সেটি দিয়ে তার জন্য অহংকার করা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। যে ব্যক্তি যেমন ব্যবহার করে, তার সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত—এটি হল নীতি। কপট আচরণকারীর সঙ্গে কপট ব্যবহার করা এবং ভালো আচরণকারীর সঙ্গে সাধু ব্যবহারই করা উচিত। বৃদ্ধাবস্থা রূপের, আশা ধৈর্যের, মৃত্যু প্রাণের, হিংসা ধর্মাচরণের, কাম লজ্জার, নীচ ব্যক্তির সেবা সদাচারের, ক্রোধ লক্ষ্মীর এবং অভিমান সর্বস্ব নাশ করে দেয়॥ ১-৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সকল বেদেই যখন বলা হয়েছে মানুষের আয়ু শতবর্ষ তাহলে কী কারণে মানুষ পূর্ণ আয়ু পায় না ? ॥ ৯ ॥

বিদুর বললেন—রাজন্ ! আপনার কল্যাণ হোক। অত্যন্ত অভিমান, বেশি কথা বলা, ত্যাগের অভাব, ক্রোধ, নিজের ভরণ পোষণেই ব্যস্ত থাকা এবং মিত্রদ্রোহ— এই ছয়টি তীক্ষ্ণ তরবারি দেহধারীর আয়ু নষ্ট করে দেয়। এগুলিই মানুষকে বধ করে, মৃত্যু নয়। ভারত ! যে ব্যক্তি তার ওপর বিশ্বাসকারী ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে সমাগম করে, গুরুস্ত্রীগামী হয়, ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, মদ্যপান করে, বয়স্ক ব্যক্তিকে হুকুম করে, অপরের জীবিকা নষ্ট

করে, ব্রাহ্মণদের সেবাকাজের জন্য পাঠায়, শরণাগতের অনিষ্ট করে—তারা সকলেই ব্রহ্মহত্যার ন্যায় পাপ করে। বেদের নির্দেশ হল এদের সঙ্গ করলে প্রায়শ্চিত্ত করা। বয়স্ক ব্যক্তির নির্দেশপালনকারী, নীতিজ্ঞ, দাতা, যজ্ঞশেষ অন্নগ্রহণকারী, হিংসারহিত, অনর্থ কার্য থেকে দূরে থাকা, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী এবং কোমল স্বভাবসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তি স্বর্গগামী হন। রাজন্ ! সর্বদা প্রিয়বাক্য বলা মানুষ সহজেই পাওয়া যায় ; কিন্তু অপ্রিয় এবং হিতবাক্য বলা ব্যক্তি এবং শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ। যিনি ধর্মের আশ্রয় নিয়ে এবং রাজার প্রিয় লাগুক বা না লাগুক এই চিন্তা পরিত্যাগ করে অপ্রিয় হলেও হিতবাক্য বলেন, তাঁর থেকেই সত্যকার সহায়তা পান। কুলরক্ষার জন্য একজন ব্যক্তিকে, গ্রাম রক্ষার জন্য একটি কুলকে, দেশরক্ষার জন্য একটি গ্রামকে এবং আত্মার কল্যাণের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পরিত্যাগ করা উচিত। বিপদের জন্য ধনরক্ষা করা উচিত, ধনের দ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করা উচিত এবং স্ত্রী এবং ধন উভয়ের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত। আগেকার দিনে পাশা খেলায় মানুষদের মধ্যে শত্রুতার উৎপন্ন হত ; সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি তামাশা করেও জুয়া খেলবেন না। রাজন্ ! আমি পাশা খেলা শুরু হওয়ার আগেও বলেছিলাম এসব ঠিক নয় ; কিন্তু রোগীদের যেমন ওষুধ এবং পথ্য ভালো লাগে না, তেমনই আমার কথাও আপনার ভালো লাগেনি। নরেন্দ্র ! আপনি আপনার কাকের ন্যায় পুত্রদের দ্বারা বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট ময়ূরের মতো পাণ্ডবদের পরাজিত করার চেষ্টা করছেন, সিংহকে ছেড়ে শিয়ালকে রক্ষা করছেন ; পরে এরজন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। তাত ! যে প্রভু তাঁর হিতে রত নিজের সেবকের ওপর কখনো ক্রোধ করেন না, তাঁর ভৃত্যগণ তাঁকে বিশ্বাস করেন এবং বিপদের সময়ও পরিত্যাগ করে না। সেবকদের জীবিকা বন্ধ করে অপরের রাজ্য এবং ধন অপহরণের চেষ্টা করা উচিত নয় ; কারণ জীবিকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কার্যরত প্রিয় মন্ত্রীরাও বিরোধী হয়ে, রাজাকে পরিত্যাগ করে। আগে কর্তব্য, আয়-ব্যয় এবং উচিত বেতন ইত্যাদি ঠিক করে তারপর সুযোগ্য সাহায্যকারী সংগ্রহ করা উচিত কারণ কঠিনতম কাজও সাহায্যকারীর দ্বারা সম্ভব হয়। যে সেবক প্রভুর অভিপ্রায় বুঝে আলস্য পরিত্যাগ করে সমস্ত কার্য পূর্ণ করে, হিতবাক্য বলে, স্বামীভক্ত, সজ্জন এবং রাজার শক্তি জানে, তাকে নিজের মতন ভেবে কৃপা করা উচিত। যে সেবক প্রভু নির্দেশ দিলেও, তা পালন করে না ; নিজের বুদ্ধি নিয়ে অহংকারী ; অপ্রিয় বাক্য বলা সেই ভৃত্যকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করা উচিত। অহংকারবর্জিত, নির্ভীক, শীঘ্র কাজ পূর্ণ করে, দয়ালু, শুদ্ধ হৃদয়, অন্যের বাক্যে কর্ণপাত না করা, নীরোগ এবং উদার বক্তা—এই আটটি-গুণ যুক্ত মানুষকে 'দূত' করার যোগ্য বলা হয়েছে। সতর্ক ব্যক্তির সন্ধ্যাবেলা কখনো বিশ্বাসযোগ্য শত্রুর গৃহে যাওয়া উচিত নয়, রাতে চৌরাস্তায় গোপনে দাঁড়ানো উচিত নয় এবং রাজা যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে চান তাকে প্রাপ্ত করার চেষ্টা না করা উচিত। দুষ্ট মন্ত্রণাকারীর সঙ্গে রাজা যখন বহু লোকের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসেন, তখন তাঁর কোনো কথা খণ্ডন করা উচিত নয় ; 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না' এরকমও বলা উচিত নয় বরং কোনো যুক্তিসংগত বাহানা করে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। অত্যন্ত দয়ালু রাজা, ব্যাভিচারিণী স্ত্রী, রাজকর্মচারী, পুত্র, ভাই, অল্পবয়স্ক পুত্রের বিধবা মা, সৈনিক এবং যার অধিকার নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক না রাখাই উচিত। নিম্নোক্ত আটটি গুণ পুরুষের শোভাবৃদ্ধি করে বুদ্ধি, কৌলিন্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পরাক্রম, বেশি কথা না বলার স্বভাব, যথাশক্তি দান এবং কৃতজ্ঞতা। তাত ! একটি গুণ এমন আছে যা এইসব মহত্ত্বপূর্ণ গুণগুলিকে হঠাৎ অধিকার করে নেয়। রাজা যখন কোনো মানুষকে সম্মান জানান, তখন এইগুণ (রাজসম্মান) উপরিউক্ত সমস্ত গুণের থেকে বড় হয়ে শোভা পায়। নিত্য স্নান করে যে তার বল, রূপ, মধুর স্বর, উজ্জ্বল বর্ণ, কোমলতা, সুগন্ধ, পবিত্রতা, শোভা, সৌকুমার্য এবং সুন্দরী নারী—এই দশপ্রকার লাভ হয়। অল্প আহার-কারীদের নিম্নলিখিত ছয়টি গুণ লাভ হয়—আরোগ্য, আয়ু, বল এবং সুখলাভ তো হয়ই, তার সন্তান সুন্দর হয় এবং 'এ অধিক আহার করে' এই বলে লোকে তাকে কটাক্ষ করতে পারে না। অকর্মণ্য, অধিক ভোজনকারী, সবার সঙ্গে শত্রুতাকারী, অধিক মায়াবী, ক্রূর, দেশ-কাল সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কুশ্রীবেশ পরিধানকারী মানুষকে কখনো গৃহে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। ভীষণ দুঃখী হলেও কৃপণ, গালি দেওয়া স্বভাব, মূর্খ,

জঙ্গলবাসী, ধূর্ত, নীচসেবী, নির্দয়ী, শত্রুতাকারী এবং অকৃতজ্ঞের কাছ থেকে কখনো সহায়তা চাওয়া উচিত নয়। ক্লেশকারী কর্ম করে যে, যে অত্যন্ত প্রমাদী, সদা মিথ্যা বলে, অস্থির ভক্তিসম্পন্ন, স্নেহবর্জিত, নিজেকে চতুর বলে মনে করে—এই ছয় প্রকারের অধম ব্যক্তির সেবা করা উচিত নয়। ধন সহায়কের অপেক্ষায় থাকে এবং সহায়ক ধনের অপেক্ষায় থাকে, এই দুটি একে অপরের আশ্রিত, পরস্পরের সহায়তা ছাড়া এদের সিদ্ধি হয় না। পুত্রের জন্ম দিয়ে তাকে ঋণভার থেকে মুক্ত করে তার কোনো প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হয় ; পরে কন্যাদের যোগ্য পাত্রে বিবাহ দিয়ে মৌন বৃত্তি ধারণ করে বনে বাস করা উচিত। যা সকল প্রাণীর হিতকর এবং নিজের জন্যও সুখদ, সেই কাজ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করা উচিত, সমস্ত সিদ্ধির এই মূলমন্ত্র। যার মধ্যে বৃদ্ধি পাবার শক্তি, প্রভাব, তেজ, পরাক্রম, উদ্যোগ এবং স্থির সিদ্ধান্ত থাকে, তার নিজের জীবিকা নাশের ভয় থাকে না। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করায় যে দোষ রয়েছে, তাতে দৃষ্টি দিন। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও কষ্ট হবে। এতদ্ব্যতীত পুত্রদের মধ্যে শত্রুতা, নিত্য উদ্বেগপূর্ণ জীবন, কীর্তিনাশ এবং শত্রুদের আনন্দ বৃদ্ধি হবে। আকাশে উদিত বাঁকাভাবের ধূমকেতু যেমন সমস্ত জগতে অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করে, তেমনই ভীষ্ম, আপনার এবং দ্রোণাচার্য ও রাজা যুধিষ্ঠিরের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধ এই জগৎকে সংহার করতে পারে। আপনার শত পুত্র, কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব—এঁরা সম্মিলিতভাবে আসমুদ্র ধরিত্রীর শাসন করতে সক্ষম। রাজন্ ! আপনার পুত্ররা জঙ্গলের ন্যায় এবং পাণ্ডবরা তাতে বসবাসকারী ব্যাঘ্রের ন্যায়। আপনি ব্যাঘ্র সহ সমস্ত বনকে নষ্ট করবেন না এবং বন থেকে বাঘকেও তাড়িয়ে দেবেন না। বাঘ না থাকলে বন রক্ষা পায় না এবং বন ছাড়াও বাঘ থাকে না। কারণ বাঘ বনরক্ষা করে এবং বন বাঘকে। যার মন পাপে লিপ্ত, সে অন্যের দোষের খবর রাখতে যতটা ইচ্ছা করে, অপরের কল্যাণময় গুণ জানার তেমন ইচ্ছা করে না। যে অর্থের পূর্ণ সিদ্ধি চায়, তার প্রথমে ধর্মাচরণই করা উচিত। স্বর্গ থেকে যেমন অমৃত দূর হয় না, তেমনই ধর্ম থেকে অর্থও পৃথক হয় না। যার বুদ্ধি পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎ কর্মে সংলগ্ন হয়েছে, সে জগতের সমস্ত প্রকৃতি ও বিকৃতি জেনে গেছে। যে ব্যক্তি সময় মতো ধর্ম, অর্থ ও কাম সেবন করে, সে ইহলোকে এবং পরলোকেও ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হয়। রাজন্ ! যে ব্যক্তি হর্ষ ও ক্রোধের বেগ প্রশমন করে এবং বিপদে ধৈর্যচ্যুত হয় না, সে-ই রাজলক্ষ্মীর অধিকার লাভ করে । রাজন্ ! আপনার কল্যাণ হোক, মানুষের পাঁচ প্রকারের বল থাকে ; সেগুলি হল বাহুবল যাকে বলা হয়, তা হল কনিষ্ঠ বল ; দ্বিতীয় বল হল মন্ত্রী পাওয়া ; মনীষীগণ ধনলাভকে বলেন তৃতীয় বল ; এবং রাজন্ ! পিতা, পিতামহ থেকে প্রাপ্ত স্বাভাবিক বল (আত্মীয় বল) তাকে বলা হয় 'অভিজাত' নামক চতুর্থ বল ! ভারত ! যার দ্বারা এই সব বল সংগ্রহ হয়, সব বলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বল হল 'বুদ্ধিবল '। যে খুব ক্ষতি করতে পারে, তার সঙ্গে শত্রুতা করে এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় যে 'আমি তার থেকে দূরে আছি (ও আমার কিছু করতে পারবে না)। এমন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, যিনি নারী, রাজা, সাপ, পঠিত বস্তু, সামর্থ্যবান শত্রু, ভোগ এবং আয়ুর ওপর বিশ্বাস করতে পারেন ? যার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, তার পক্ষে কোনো বৈদ্য, ওষুধ, হোম, মন্ত্র, মাঙ্গলিক কার্য, বেদাদি প্রয়োগ এবং অতিশয় উত্তম জড়ি-বুটি কিছুই কার্যকারী হয় না। ভারত ! মানুষের সাপ, অগ্নি, সিংহ এবং নিজ কুলে উৎপন্ন ব্যক্তির অনাদর করা উচিত নয় ; কারণ এগুলি অত্যন্ত তেজস্বী হয়। জগতে অগ্নি এক মহা তেজ, তা শক্তিরূপে কাঠে লুকিয়ে থাকে ; কিন্তু যত-ক্ষণ তা অন্য কেউ প্রজ্বলিত না করে, ততক্ষণ তা কাঠকে জ্বালায় না। সেই অগ্নিকে যদি প্রজ্বলিত করা হয় তাহলে তা কাঠসহ সমস্ত জঙ্গলকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। এইরূপ নিজ কুলে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পাণ্ডব ক্ষমা ভাবযুক্ত এবং বিকারশূন্য হয়ে কাঠে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় শান্তভাবে অবস্থান করছেন। আপনি আপনার পুত্র সহ লতার ন্যায় এবং পাণ্ডবরা মহাশালবৃক্ষ স্বরূপ ; মহাবৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। রাজন্ ! অম্বিকানন্দন ! আপনার পুত্রদের বন এবং পাণ্ডবদের তার মধ্যে স্থিত সিংহ বলে জানবেন। তাত ! সিংহশূন্য হলে বন নষ্ট হয়ে যায় এবং বন না থাকলে সিংহও বিনষ্ট হয়॥ ১০-৬৪ ॥

—০—

বিদুর নীতি
(ষষ্ঠ অধ্যায়)

বিদুর বললেন—যখন কোনো মাননীয় বৃদ্ধ কোনো নবযুবকের কাছে আসেন, তখন তাঁর প্রাণ ওপর দিকে উঠতে থাকে ; তারপর সে যখন বৃদ্ধকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম জানায়, তখন সে তা পুনরায় প্রকৃত অবস্থান ফিরে পায়। ধৈর্যশীল ব্যক্তির উচিত যখন কোনো সাধু ব্যক্তি অতিথিরূপে আসেন, তখন তাঁকে প্রথমে আসন দিয়ে, জল এনে তাঁর পা ধুয়ে দেবে, তারপরে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে নিজের কথা বলবে এবং পরে আবশ্যক হলে তাঁকে ভোজন করাবে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ যার গৃহে দাতার লোভ, ভয় বা কৃপণতার জন্য জল, মধুপর্ক ইত্যাদি গ্রহণ করেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই গৃহস্থের জীবন ব্যর্থ বলে জানান। বৈদ্য, ব্রহ্মচর্য ভ্রষ্ট, চোর, ক্রুর, মাতাল, গর্ভপাতকারী, সৈনিক এবং বেদবিক্রেতা—যদিও এরা পা ধোয়ারও যোগ্য নয়, তবু এরা যদি অতিথিরূপে আসে তাহলে সম্মানের যোগ্য হয়। নুন, রান্না করা অন্ন, দই, দুধ, মধু, তেল, ঘি, তিল, মাংস, ফল, মূল, শাক, লালকাপড়, সর্বপ্রকার সুগন্ধী ও গুড়—এইসব বস্তু বিক্রি করার উপযোগী নয়। যিনি ক্রোধ করেন না, মাটি-পাথর ও সোনাকে একই প্রকার দেখেন, শোকহীন, সন্ধি-বিগ্রহ বর্জিত, নিন্দা-প্রশংসারহিত, প্রিয়-অপ্রিয় ত্যাগী এবং উদাসীন—তিনিই ভিক্ষুক (সন্ন্যাসী)। যিনি জঙ্গলের ফল-মূল শাকাদি খেয়ে জীবন ধারণ করেন, মনকে বশে রাখেন, অগ্নিহোত্র করেন এবং বনে বাস করেও অতিথিসেবায় রত থাকেন, সেই পুণ্যাত্মাকে (বাণপ্রস্থী) শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির হাত অনেক প্রসারিত হয়, তাঁকে বিরক্ত করলে তিনি সেই প্রসারিত হাতে প্রতিশোধ নেন। যে বিশ্বাসনীয় নয়, তাকে তো বিশ্বাস করাই উচিত নয়। কিন্তু যে বিশ্বাসপাত্র, তাকেও বেশি বিশ্বাস করা উচিত নয়। বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি মোহভঙ্গ হলে বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হয়। মানুষের উচিত ঈর্ষারহিত, নারীদের রক্ষাকারী, ধনসম্পত্তি ন্যায়পূর্বক বিভাজনকারী, স্বচ্ছ প্রিয়বাদী এবং নারীদের কাছে মিষ্টভাষী হওয়া—কিন্তু কখনো এগুলির বশীভূত হওয়া উচিত নয়। নারীদের গৃহলক্ষ্মী বলা হয় ; তারের অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী, পূজার যোগ্য, পবিত্র এবং গৃহের শোভা বলা হয় ; সুতরাং এঁদের বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। অন্তঃপুর রক্ষার কাজ পিতাকে সমর্পণ করতে হয়, মাতার হাতে রন্ধনশালার ভার, গাভীর সেবা নিজের মতো কোনো বিশ্বাসী পাত্রের ওপর এবং কৃষিকাজ নিজেই করা উচিত। সেবকের দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করা এবং পুত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ সেবা করা উচিত। জল থেকে অগ্নি, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় এবং পাথর থেকে লোহা উৎপন্ন হয়। এর তেজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হলেও নিজ উৎপত্তিস্থানে শান্ত হয়ে যায়। উত্তম কুলজাত, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, ক্ষমাশীল এবং বিকারশূন্য সাধু ব্যক্তি সর্বদা তুষের অগ্নির ন্যায় শান্তভাবে অবস্থিত থাকেন। যে রাজার মন্ত্রণা তাঁর বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সভাসদরাও জানেন না, সবদিকে দৃষ্টিরক্ষাকারী সেই রাজা বহুকাল ঐশ্বর্য উপভোগ করেন। ধর্ম, কাম এবং অর্থসম্পর্কীয় কাজ করার আগে বলা উচিত নয়, করেই দেখাতে হয়। এরূপ করলে নিজের মন্ত্রণা প্রকটিত হয় না। পর্বত শিখরে গিয়ে অথবা রাজমহলের একান্ত স্থানে গিয়ে বা জঙ্গলে নির্জন স্থানে গিয়ে মন্ত্রণা করা উচিত। ভারত ! যে মিত্র নয়, মিত্র হলেও পণ্ডিত নয়, পণ্ডিত হলেও যার মন বশে নেই, সে গুপ্ত মন্ত্রণা জানার অধিকারী নয়। ভালোভাবে পরীক্ষা না করে রাজা কাউকে মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন না। কারণ ধনপ্রাপ্তি এবং মন্ত্রণা রক্ষার ভার মন্ত্রীর ওপরেই থাকে। যাঁর ধর্ম, অর্থ এবং কামবিষয়ক সব কাজ পূর্ণ হওয়ার পরই সভাসদরা জানতে পারেন, সেই রাজা সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নিজ মন্ত্রণা গোপনকারী সেই রাজা নিঃসন্দেহে সাফল্য অর্জন করেন। যে মূঢ়তাবশত নিন্দনীয় কর্ম করে, সেই কর্মের প্রতিকূল প্রভাবে তার জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান সুখদায়ক হয় কিন্তু তা না করলে অনুতাপের কারণ হয়। যেমন বেদ না পাঠ করলে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের অধিকারী হয় না, তেমনই সন্ধি বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধভাব এবং সমাশ্রয় নামের ছয়টি গুণ না জানলে কেউ গুপ্তমন্ত্রণা শোনার অধিকারী হয় না। রাজন্ ! যিনি সন্ধি-বিগ্রহ ইত্যাদি দুটি গুণে অভিজ্ঞ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, যিনি স্থিতি-বৃদ্ধি ও হ্রাস জানেন এবং যার স্বভাবের প্রশংসা সকলেই করে থাকেন, পৃথিবী সেই রাজার অধীন হয়। যাঁর হর্ষ ও ক্রোধ বৃথা যায় না, প্রয়োজনীয় কাজ যিনি নিজেই দেখাশোনা করেন এবং অর্থ

বিষয়েও যিনি নিজে খোঁজ রাখেন, পৃথিবী তাঁকে অপর্যাপ্ত ধন সম্পদ প্রদান করে। ভূপতির 'রাজা' নামে এবং রাজোচিত 'ছত্র' ধারণে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেবকদেরও অর্থ প্রদান করতে হয়, শুধু একা ভোগ করতে নেই। ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ জানে, পতি তার স্ত্রীকে জানে, মন্ত্রীকে জানে রাজা এবং রাজাকে রাজাই জানে। নিজ বশে আসা বধযোগ্য শত্রুকে কখনো ছেড়ে দিতে নেই। যদি অধিক সামর্থ্য না থাকে, তাহলে নম্র হয়ে সময় কাটানো উচিত এবং শক্তি সংগ্রহ করে তাকে বধ করা উচিত ; কারণ শত্রুকে না মারলে শীঘ্রই তার থেকে ভয় উপস্থিত হয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা, বৃদ্ধ এবং রোগীর ওপর হওয়া ক্রোধকে সযত্নে পরিহার করা উচিত। মূর্খরা নিরর্থক বিবাদ করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের তা ত্যাগ করা উচিত। এতে তাঁর যশ বৃদ্ধি পায় এবং অনর্থের সম্মুখীন হতে হয় না। যিনি প্রসন্ন হলেও কোনো লাভ হয় না এবং ক্রোধও ব্যর্থ হয়, সেইরূপ রাজাকে কোনো প্রজা চায় না। যেমন নপুংসককে নারী কামনা করে না। বুদ্ধির দ্বারা ধনলাভ হয় এবং মূর্খতাই দরিদ্রতার কারণ—এমন কোনো নিয়ম নেই। জগৎ চক্র সম্পর্কে বিদ্বান পুরুষই অবহিত থাকেন, অন্যেরা নয়। ভারত ! মূর্খ ব্যক্তিরা বিদ্যা, শীল অবস্থা, বুদ্ধি, ধন ও কুলে মাননীয় ব্যক্তিদের সর্বদা অসম্মান করে থাকে। যার চরিত্র নিন্দনীয়, যে মূর্খ, গুণসমূহে দোষ দেখে, অধার্মিক, কুকথা বলে, ক্রোধী, তার শীঘ্রই বিপদ উপস্থিত হয়। লোককে প্রতারণা না করা, দান করা, নিজের কথায় অটল থাকা, হিতবাক্য বলা—সকল লোকই এর দ্বারা আপন হয়ে ওঠে। কাউকে প্রতারণা না করা, চতুর, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং সরল রাজা ধনসম্পদ নিঃশেষ হলেও সাহায্যকারীর সহায়তা পেয়ে যান। ধৈর্য, মনোনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সংযম, পবিত্রতা, দয়া, কোমল বাক্য এবং মিত্রদ্রোহ না করা উচিত—এই সাতটি রক্ষা করলে লক্ষ্মীবৃদ্ধি পায়। রাজন্ ! যে ব্যক্তি তাঁর আশ্রিতদের মধ্যে অর্থ ঠিকমতো বিতরণ করেন না এবং যিনি দুষ্ট, কৃতঘ্ন, নির্লজ্জ—এইরূপ রাজাকে ত্যাগ করা উচিত। যিনি নিজে দোষী হয়েও নির্দোষ আত্মীয়দের কুপিত করেন, তিনি সর্প যুক্ত গৃহে থাকা মানুষের ন্যায় রাত্রে সুখে নিদ্রা যেতে পারেন না। ভারত ! যার ওপর দোষ আরোপ করলে যোগ ও ক্ষেত্রে বাধা আসে, সেই ব্যক্তিকে দেবতার মতো সর্বদা প্রসন্ন রাখা উচিত। যে ব্যক্তি ধন এবং স্ত্রী প্রমাদী, পতিত এবং নীচ পুরুষদের হাতে সমর্পণ করেন, তাঁরা সংশয়ে পতিত হন। রাজন্ ! যেস্থানে স্ত্রী, জুয়াড়ী এবং বালকের হাতে শাসনভার থাকে, সেখানকার লোক নদীতে পাথরের নৌকায় আরোহণ করার মতো বিপদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। যারা যতটা প্রয়োজন, ততটুকু কাজেই ব্যাপৃত থাকে, অধিক কাজে হাত দেয় না, তাঁদের পণ্ডিত বলে মনে করা হয় ; কারণ বেশি কাজে হাত দেওয়া সংঘর্ষের কারণ হয়। জুয়াড়ী ব্যক্তি যার প্রশংসা করে, চারণ যার গুণ গায়, বারবণিতারা যাকে নিয়ে অহংকার করে, সে ব্যক্তি বেঁচে থেকেও মৃতের সমান। ভারত ! আপনি সেই মহা ধনুর্ধর এবং অত্যন্ত তেজস্বী পাণ্ডবদের ছেড়ে এই মহাঐশ্বর্যের ভার যে দুর্যোধনের ওপর রেখেছেন ; এর ফলে আপনি অতি শীঘ্রই সেই ঐশ্বর্য মদ-মত্ত মূঢ় দুর্যোধনকে ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য থেকে রাজা বলির ন্যায় রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে পতিত হতে দেখবেন॥ ১-৪৭ ॥

বিদুর নীতি

(সপ্তম অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া ও নষ্ট করা, কোনো কিছুতেই মানুষ স্বাধীন নয়। ব্রহ্মা সুতোয় বাঁধা পুতুলের ন্যায় এদের প্রারব্ধের অধীন করে রেখেছেন ; অতএব তুমি বলো, আমি ধৈর্য ধরে শুনছি॥ ১ ॥

বিদুর বললেন—ভারত ! সময়ের প্রতিকূলে বৃহস্পতিও যদি কিছু বলেন তবে তাঁকেও অপমানিত হতে হয় এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। জগতে কোনো ব্যক্তি দান করলে প্রিয় হয়, অপর কেউ প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রিয় হয় আবার কেউ মন্ত্র বা ঔষধের বলে প্রিয় হয়। কিন্তু যে যথার্থভাবে প্রিয়, সে সর্বদাই প্রিয় হয়ে থাকে। যার প্রতি দ্বেষ হয় তাকে সাধু, বিদ্বান বা বুদ্ধিমান বলেও মনে হয় না। প্রিয়তমের সকল কাজই শুভ এবং দুরাত্মার সব কাজই

পাপময় মনে হয়। রাজন্! দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করতেই আমি বলেছিলাম যে, 'শুধু এই একটি পুত্রকে আপনি পরিত্যাগ করুন। একে ত্যাগ করলে শত পুত্র শ্রীবৃদ্ধিশালী হবে এবং ত্যাগ না করলে শতপুত্র বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যা বৃদ্ধি হলে ভবিষ্যতে বিনাশের কারণ হয়, তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। যা পরবর্তীকালে শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়, তাকেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। যে ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হয়, তা আসলে ক্ষয় নয়। কিন্তু সেই লাভকে ক্ষয় মনে করা উচিত, যা পেলে বহু ক্ষতি হয়। ধৃতরাষ্ট্র ! কিছু মানুষ গুণের জন্য ধনী হন আর কিছু অর্থের কারণে। যিনি ধনের দ্বারা ধনী হয়েও গুণের কাঙাল, তাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবেন॥ ২-৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তুমি যা বলছ, তার পরিণাম হিতকর ; বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা অনুমোদন করেন। এও সত্য যে যেদিকে ধর্ম থাকে, সেই পক্ষেরই জয় হয়, তা সত্ত্বেও আমি আমার পুত্রকে পরিত্যাগ করতে পারব না॥ ৯ ॥

বিদুর বললেন—যিনি অধিক গুণসম্পন্ন এবং বিনয়ী, তিনি প্রাণীদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হতে দেখলে উপেক্ষা করতে পারেন না। যে ব্যক্তি অন্যের নিন্দায় মুখর, অপরকে দুঃখ দিতে এবং বিভেদ সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট, যার দর্শন দোষযুক্ত (অশুভ) এবং যার সঙ্গে থাকলে ভীষণ বিপদ হতে পারে, সেই ব্যক্তির অর্থ গ্রহণ করলেও মহাদোষ এবং তাকে অর্থ দিলেও ভীষণ ভয়ের সম্ভাবনা থাকে। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করা যার স্বভাব, যারা কামাসক্ত, নির্লজ্জ, শঠ এবং পাপী, তাদের সঙ্গে রাখা উচিত নয়। এদের নিন্দিত বলে মানা হয়। উপরিউক্ত দোষ ব্যতীত আর যে সব মহাদোষ আছে, সেই দোষযুক্ত ব্যক্তিদেরও ত্যাগ করা উচিত। সৌহার্দভাব নিবৃত্ত হলে নীচ ব্যক্তির ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়, তার ফলে সৌহার্দের দ্বারা যে ফল ও সুখ পাওয়া যায় তাও নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই নীচ ব্যক্তি নিন্দা করার চেষ্টা করে এবং অল্প অপরাধেই বিনাশের চেষ্টা করে। সে একটুও শান্তি পায় না। বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা করে সেই নীচ, ক্রূর এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। যিনি তাঁর আত্মীয়, দরিদ্র, দীন এবং রোগীদের অনুগ্রহ করেন তিনি পুত্র ও ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে অশেষ সুখ লাভ করেন। রাজেন্দ্র ! যাঁরা নিজের ভালো চান, তাঁদের নিজ-জাতির সমৃদ্ধি করা উচিত। তাই আপনার ভালোভাবে নিজের কুলবৃদ্ধি করা উচিত। রাজন্! যে নিজ কুটুম্বদের সৎকার করে, সে কল্যাণভাগী হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ ! নিজ আত্মীয় কুটুম্ব গুণহীন হলেও তাদের রক্ষা করা উচিত। তাহলে যারা আপনার কৃপাপ্রার্থী এবং গুণবান্, তাদের আর কথাই কী ? রাজন্! আপনি সমর্থ, বীর পাণ্ডবদের ওপর কৃপা করুন এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম প্রদান করুন। নরেশ্বর ! এরূপ করলে আপনি এই জগতে যশ লাভ করবেন। রাজন্! আপনি গুরুজন, সুতরাং আপনার পুত্রদের শাসন করা উচিত। ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমার আপনাকে হিতের কথা বলা উচিত। আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বলে জানবেন। রাজন্! যারা নিজের ভালো চায়, তাদের কখনো নিজের জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয় ; তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে সুখভোগ করা উচিত। জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে একত্রে আহার, কথাবার্তা ও ভালো ব্যবহার করা কর্তব্য ; তাঁদের সঙ্গে কখনো বিরোধ করা উচিত নয়। জগতে জ্ঞাতি ভাইরা বাঁচাতেও পারে আবার বিনাশও করতে পারে। রাজেন্দ্র ! আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে সুব্যবহার করুন। রাজন্! তাঁদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আপনি শত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবেন। বিষযুক্ত বাণ হাতে নেওয়া ব্যাধের কাছে গেলে মৃগ যে কষ্ট পায়, তেমনই কোনো ব্যক্তি তার ধনী আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে যে কষ্ট পায় সেই পাপের ভাগী ধনী আত্মীয়ই হয়ে থাকে। নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি পাণ্ডবরা অথবা আপনার পুত্ররা মারা গেছে শুনলে পরে অনুতাপ করবেন ; অতএব এই কথা আগেই চিন্তা করে নিন (এই জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই)। যে কর্ম করলে পরে অনুতাপ করতে হয়, তা আগে থেকেই পরিহার করতে হয়। শুক্রাচার্য ব্যতীত এমন কেউ নেই যিনি নীতি লঙ্ঘন করেন না ; সুতরাং যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, এখন বাকি কর্তব্যের বিচার আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির ওপরই নির্ভর করছে। নরেশ্বর ! দুর্যোধন আগে পাণ্ডবদের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছে, এখন এই বংশের প্রবীণ ব্যক্তি হওয়ায় আপনি তা সংশোধন করুন। নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে অভিষেক করেন তাহলে জগতে আপনার যে কলঙ্ক আছে তা মিটে যাবে এবং আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত হবেন। যে ব্যক্তি ধীর পুরুষের কথায় পরিণাম চিন্তা করে সেগুলি কাজে পরিণত করে, সে চিরকাল যশের ভাগী হয়ে থাকে। বিদ্বান ব্যক্তির উপদিষ্ট জ্ঞানও ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি তার দ্বারা কর্তব্য

জ্ঞান না হয় অথবা সেটি কাজে পরিণত করা না হয়। যে বিদ্বান পাপরূপ ফলপ্রদানকারী কর্ম করেন না, তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্বকৃত পাপের কথা না ভেবে, সেগুলিই পুনরায় অনুসরণ করে, সেই বুদ্ধিহীন ব্যক্তি নরকে পতিত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নোক্ত ছটি বিষয়কে যথার্থভাবে জেনে এবং সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে এগুলিকে সযত্নে পরিহার করবে—নেশা, অতিনিদ্রা, প্রয়োজনীয় জিনিস না জানা, নিজ চোখ-মুখ ইত্যাদির বিকার, দুষ্ট মন্ত্রীদের এবং মূর্খ দূতের ওপর বিশ্বাস। রাজন্! যাঁরা এগুলি থেকে সর্বদা দূরে থাকেন তাঁরা ধর্ম, অর্থ ও কামে ব্যাপৃত থেকে শত্রুদেরও বশীভূত রাখেন। বৃহস্পতির ন্যায় ব্যক্তিও শাস্ত্রজ্ঞান অথবা বৃদ্ধের সেবা না করে ধর্ম ও অর্থের জ্ঞানলাভ করতে পারেন না। সমুদ্রে পতিত বস্তু নষ্ট হয়ে যায়, যে শোনে না—তাকে বলা কথাও তদনুরূপ নষ্ট হয়ে যায়। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞানও ছাই-এ প্রদত্ত আহুতির ন্যায় ব্যর্থ হয়ে যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভেবে চিন্তে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করা উচিত। পরে অন্যের কাছ থেকে শুনে এবং নিজে দেখে ভালোভাবে চিন্তা করে বিদ্বানগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। বিনয়ভাব অপযশ নাশ করে, পরাক্রম অনর্থ দূর করে, ক্ষমা ক্রোধনাশ করে এবং সদাচার কুলক্ষণের বিনাশ করে। রাজন্! নানাপ্রকারের ভোগ্যসামগ্রী, মাতা, ঘর, স্বাগত-সংকারের কায়দা এবং আহার ও বস্ত্রাদির দ্বারা কুলের পরীক্ষা করা উচিত। দেহাভিমান রহিত ব্যক্তির কাছেও যদি ন্যায়যুক্ত পদার্থ স্বত উপস্থিত হয়, তাহলে তিনি তার বিরোধ করেন না, তাহলে কামাসক্ত মানুষের কথা আর বলার কী আছে ? যিনি বিদ্বানদের সেবায় রত, বৈদ্য, ধার্মিক, দেখতে সুন্দর, বহু বন্ধু-বান্ধব যুক্ত এবং মধুরভাষী, সেই সুহৃদকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। অধম কুলে জন্ম হোক বা উত্তম কুলে—যিনি ধর্মকে লঙ্ঘন করেন না, ধর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, কোমল স্বভাবসম্পন্ন সলজ্জ, তিনি বহু কুলীনের থেকেও উঁচো। যে দুটি মানুষের হৃদয়, গুপ্ত রহস্য এবং বুদ্ধি মিলে যায়, তাদের মিত্রতা কখনো নষ্ট হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হল দুর্বুদ্ধি এবং বিচারশক্তিহীন ব্যক্তিদের তৃণ আচ্ছাদিত কূপের মতো পরিত্যাগ করা, কারণ তাদের সঙ্গে মিত্রতা করলে তা স্থায়ী হয় না। বিদ্বান ব্যক্তিদের অহংকারী, মূর্খ, ক্রোধী, বেপরোয়া এবং ধর্মহীন ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা না করা উচিত। মিত্রের হওয়া উচিত কৃতজ্ঞ, ধার্মিক, সত্যবাদী, উদার, দৃঢ় অনুরাগী, জিতেন্দ্রিয়, মর্যাদাব্যঞ্জক এবং বন্ধুত্ব ত্যাগ না করা। ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে রুদ্ধ করা মৃত্যুর থেকেও কঠিন আবার এগুলি যেমন তেমনভাবে ব্যবহার করলে দেবতারাও বিনাশপ্রাপ্ত হন। বিদ্বানরা বলেন সমস্ত প্রাণীর প্রতি কোমল ব্যবহার, গুণে দোষ না দেখা, ক্ষমা, ধৈর্য এবং মিত্রদের অপমান না করা—এই সবগুণ আয়ুবৃদ্ধিকারী। যিনি অন্যায়ভাবে নষ্ট হওয়া অর্থ স্থিরবুদ্ধিযুক্ত হয়ে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন, তাঁর আচরণ বীরপুরুষোচিত। যিনি অনাগত দুঃখ রোধ করার উপায় জানেন, কর্তব্য পালনে স্থির, অটল এবং অতীতে সম্পাদিত কর্তব্য-কর্মের বাকি কাজ সম্পর্কে অবহিত, সেই ব্যক্তি কখনো অর্থহীন হন না। মানুষ কায়-মনোবাক্যে যা নিরন্তর চিন্তা করেন, সেই কাজ তাঁকে স্বতই আকর্ষণ করে। তাই সর্বদা কল্যানময় কাজই করা উচিত। মাঙ্গলিক পদার্থ স্পর্শ, চিত্তবৃত্তির নিরোধ, শাস্ত্র অভ্যাস, উদ্যোগশীলতা, সরলতা এবং সৎপুরুষদের বারংবার দর্শন —এগুলি কল্যাণকর। উদ্যোগে লেগে থাকা, ধন লাভ এবং কল্যাণের মূল। অতএব যিনি উদ্যম ত্যাগ করেন না, তিনি শেষে জয়ী হয়ে সুখে কালাতিপাত করেন। তাত! সমর্থ পুরুষের পক্ষে সর্বত্র এবং সর্বসময় ক্ষমার ন্যায় হিতকর এবং শ্রীসম্পন্নকারী আর কিছুই নেই। যে শক্তিহীন, সে তো সকলকেই ক্ষমা করবে কিন্তু যে শক্তিমান তারও উচিত ধর্মের দৃষ্টিতে সকলকে ক্ষমা করা। যার কাছে অর্থ ও অনর্থ দুই-ই সমান, তার কাছে ক্ষমা হিতকারক, যে সুখভোগ করলে মানুষ ধর্ম ও অর্থ থেকে ভ্রষ্ট হয় না, তা ভোগ করা উচিত, কিন্তু আসক্তি এবং অন্যায়ভাবে নয়। যে ব্যক্তি দুঃখ পীড়িত, প্রমাদী, নাস্তিক, অলস, অজিতেন্দ্রিয় এবং উৎসাহরহিত তার কাছে লক্ষ্মীবাস করেন না। দুষ্ট বুদ্ধি লোক সরল এবং সারল্যের জন্য লজ্জাশীল মানুষকে অক্ষম মনে করে অপমান করে। অতি শ্রেষ্ঠ, অতি দানী, অত্যন্ত বড় যোদ্ধা, অত্যধিক ব্রত-নিয়মপালনকারী, অতি অহংকারী মানুষের কাছে লক্ষ্মী ভয়ে আসেন না। রাজলক্ষ্মী অতিগুণবানের কাছেও থাকেন না এবং অতি নির্গুণের কাছেও যান না। রাজলক্ষ্মী বহুগুণীরও ইচ্ছা করেন না আবার একেবারে গুণহীনেরও অনুরক্ত হন না। উন্মত্ত গোরুর ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ স্থানেই ইনি স্থির হয়ে বাস করেন। বেদের ফল হল অগ্নিহোত্র করা,

শাস্ত্রাধ্যায়নের ফল সুশীলতা এবং সদাচার, স্ত্রীর ফল রতি - সুখ এবং পুত্রলাভ, ধনের ফল দান এবং উপভোগ। যে অধর্মে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পরলোকে সুখ পাবার আশায় কর্মাদি করে, সে মৃত্যুর পর সেই ফললাভ করে না ; কারণ সেই অর্থ অনর্থ দ্বারা প্রাপ্ত। ভয়ানক জঙ্গলে, দুর্গম পথে, কঠিন বিপদের সময়, আঘাতের জন্য অস্ত্র উদ্যত হলেও মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি তাতে ভয় পায় না। উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, সতর্কতা, ধৈর্য, স্মৃতি এবং ভাবনা-চিন্তা করে কাজ আরম্ভ করা—এগুলিই উন্নতির মূলমন্ত্র বলে জানবে। তপস্বীদের বল তপস্যা, বেদবিদ্‌দের বল বেদ, অসাধুদের বল হিংসা এবং গুণবানদের বল ক্ষমা। জল, মূল, ফল, দুধ, ঘি, ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপূর্তি, গুরুবাক্য এবং ঔষধ— এই আটটি ব্রতের নাশক হয়। যা নিজের প্রতিকূল মনে হয়, তা অন্যের প্রতিও করা উচিত নয়। সংক্ষেপে এটিই হল ধর্মের স্বরূপ। এর বিপরীত অর্থাৎ যার দ্বারা কামনা-বাসনার উদ্রেক হয় তা হল অধর্ম। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় করবে, অসাধুকে সৎ ব্যবহার দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দানের দ্বারা মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করবে। নারী, ধূর্ত, অলস, ভীতু, ক্রোধী, অহংকারী পুরুষ, চোর, কৃতঘ্ন এবং নাস্তিককে বিশ্বাস করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি নিত্য গুরুজনকে প্রণাম করে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবায় ব্যাপৃত থাকে, তার কীর্তি, আয়ু, যশ এবং বল বৃদ্ধি পায়। যে ধন অত্যন্ত কষ্টে, ধর্ম লঙ্ঘন করলে অথবা শত্রুর কাছে মস্তক অবনত করলে পাওয়া যায়, তাতে মন দেওয়া উচিত নয়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি, সন্তান জন্ম না দিতে পারা নারী প্রসঙ্গ, ক্ষুধার্ত প্রজা এবং রাজাবিহীন রাষ্ট্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। অত্যধিক চলা-ফেরা দেহধারীগণের পক্ষে দুঃখময় বৃদ্ধাবস্থার মতো, ক্রমাগত বারিপাত হল পর্বতের বৃদ্ধাবস্থা, সম্ভোগশূন্য অবস্থা হল স্ত্রীর পক্ষে বৃদ্ধাবস্থা এবং শরবিদ্ধ তীরের ন্যায় দুর্বাক্য হল মনের বৃদ্ধাবস্থা। অভ্যাস না করা হল বেদের কলুষ, ব্রাহ্মণোচিত নিয়মাদি পালন না করা ব্রাহ্মণদের কলুষ, বাহ্লীক দেশ পৃথিবীর কলুষ এবং মিথ্যা বাক্য হল পুরুষদের কলুষ। ক্রীড়া এবং হাস্য-পরিহাস পতিব্রতা স্ত্রীর কলুষ এবং স্বামী ছাড়া একাকী বাস নারী মাত্রেরই কলুষ। সোনার কলুষ রূপা, রূপার কলুষ রঙ্গধাতু, রঙ্গধাতুর কলুষ সীসা, সীসার কলুষ হল কলুষই। শুয়ে নিদ্রা জয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। কামোপভোগের দ্বারা নারীকে জয় করার চেষ্টা করবে না, কাঠ ফেলে আগুনকে জয় করার চেষ্টা করবে না এবং বেশি মদ্যপান করে মদ্যপান ছাড়ার চেষ্টা করবে না। যার মিত্র ধন-দানের দ্বারা বশীভূত, শত্রু যুদ্ধে পরাজিত এবং নারীরা ভরণ পোষণের সাহায্যে বশীভূত হয়েছে, তার জীবন সফল। যার কাছে হাজার আছে, সে-ও জীবিত আছে, যার কাছে পাঁচশত আছে সেও জীবিত আছে ; সুতরাং মহারাজ ! আপনি অধিক লোভ আকাঙ্ক্ষা করুন, এর দ্বারাও জীবন বিপন্ন হবে। পৃথিবীতে যত অর্থ, সোনা-হীরে, গবাদি পশু এবং নারীকুল রয়েছে—মিলিতভাবে একজনকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি এগুলিতে মোহগ্রস্ত হন না। রাজন্! আমি আবার বলছি, আপনার যদি পাণ্ডব ও কৌরবদের প্রতি এক প্রকারেরই মনোভাব থাকে তাহলে কৌরব-পাণ্ডব সব পুত্রদের প্রতি সম ব্যবহার করুন॥ ১০-৮৫ ॥

—o—

বিদুর নীতি

(অষ্টম অধ্যায়)

বিদুর বললেন—যে সৎ ব্যক্তি সম্মান পেয়েও আসক্তিরহিত হয়ে নিজ শক্তি অনুযায়ী সাধনে লগ্ন থাকে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সত্বর সুখপ্রাপ্ত হন ; কিন্তু সাধুরা যার ওপর প্রসন্ন হন, তিনি সদা সুখী থাকেন। যিনি অধর্ম হতে উপার্জিত ধনরাশি পরিত্যাগ করেন, তিনি সাপ যেমন খোলস পরিত্যাগ করে নতুন দেহলাভ করে, তেমন তিনিও দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখে বাস করেন। মিথ্যা কথা বলে উন্নতি করা, রাজার কাছে মিথ্যা কথা লাগানো, গুরুর কাছে মিথ্যা আগ্রহ দেখানো—এই তিনটি কাজ ব্রহ্মহত্যার সমকক্ষ। গুণাদিতে দোষ দর্শন করা মৃত্যুর সমান, কঠোর বাক্য বলা এবং নিন্দা করা লক্ষ্মীবধের সমান। বিদ্যার তিনটি শত্রু— শোনার ইচ্ছা না থাকা, উতলা হওয়া এবং আত্ম-প্রশংসা। আলস্য, দম্ভ, মোহ, চাঞ্চল্য, দলবাজি, উদ্দামতা, অহংকার এবং লোভ— বিদ্যার্থীদের পক্ষে এই সাতটিকে

গুরুতর দোষ বলে মানা হয়। বিদ্যার্জনকারীদের জন্যে সুখ নেই। সুখ চাইলে বিদ্যাকে ছাড়তে হয় আর বিদ্যা চাইলে সুখত্যাগ করতে হয়। আগুন ইন্ধনের দ্বারা, সমুদ্র নদীর দ্বারা, মৃত্যু সমস্ত প্রাণীর দ্বারা, কুলটা নারী পুরুষের দ্বারা কখনো তৃপ্ত হয় না। আশা ধৈর্যের, ক্রোধ লক্ষ্মীর, কৃপণতা যশের খ্যাতি, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পশুকুলকে নষ্ট করে দেয়। একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত রাষ্ট্রকে বিনাশ করতে পারে। ছাগল, কাঁসার বাসন, রূপা, মধু, পাখি, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ আত্মীয় এবং বিপদগ্রস্ত কুলীন ব্যক্তি —এরা যেন আপনার গৃহে থাকে। ভারত ! মনু বলেছেন দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, সেবার জন্য ছাগল, বৃষভ, চন্দন, বীণা, তর্পণ, মধু, ঘি, লোহা, তাম্রপাত্র, শঙ্খ, শালগ্রাম এবং গোরোচনা— এই সব বস্তু গৃহে রাখা উচিত। তাত ! আমি আপনাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যজনক কথা বলছি—কামনার জন্য, ভয়ে, লোভে কিংবা জীবনের জন্যও কখনো ধর্মত্যাগ করবেন না। ধর্ম নিত্য, সুখ-দুঃখ অনিত্য ; জীব নিত্য কিন্তু এর কারণ (অবিদ্যা) অনিত্য। আপনি মন্ত্রীদের পরিত্যাগ করে নিত্যে স্থিত হন এবং সন্তোষ লাভ করুন। কারণ সন্তোষই বড় লাভ। ধন-ধান্যপূর্ণ এই পৃথিবী শাসন করে শেষে সমস্ত রাজ্য ও বিপুল ভোগ এখানেই পরিত্যাগ করে যমরাজের কাছে যাওয়া বড় বড় বলবান এবং মহানুভব রাজাদের দিকে দেখুন। রাজন্ ! যে পুত্রকে বহু কষ্টে পালন- পোষণ করা হয়, তারও মৃত্যু হলে তাকে ঘর থেকে সত্বরই বার করে দেওয়া হয়। প্রথমে তার জন্য যতই কান্নাকাটি হোক, পরে সাধারণ বস্তুর মতোই তাকে চিতায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মৃত মানুষের অর্থ অন্য লোকেরা ভোগ করে। দেহটি পশু-পক্ষী ভক্ষণ করে কিংবা আগুনে ভস্মীভূত হয়। মৃত মানুষের আত্মা তার পাপ-পুণ্যসহ পরলোক গমন করে। তাত ! ফল-ফুলবিহীন গাছ যেমন পাখিরাও ত্যাগ করে, তেমনই মৃত ব্যক্তিকে তার আত্মীয়, সুহৃদ এবং আপনজনরাও পরিত্যাগ করে। মানুষের কৃত শুভ-অশুভ কর্মই তার পরলোকের সঙ্গী হয়। তাই মানুষের উচিত জীবিতকালে যত্নপূর্বক পুণ্য সঞ্চয় করা। ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বত্র অজ্ঞানরূপ মহা অন্ধকার প্রসারিত রয়েছে ; সেগুলি ইন্দ্রিয়কে মোহগ্রস্ত করে রাখে। রাজন্ ! আপনি এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হোন, যাতে এইসব আপনাকে স্পর্শ করতে না পারে। আমার কথা যদি আপনি ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে ইহলোকে আপনি মহাযশ লাভ করবেন এবং ইহলোকে ও পরলোকে আপনার কোনো ভয় থাকবে না। ভারত ! জীবাত্মা এক নদী। এতে পুণ্যতীর্থ আছে, সত্য স্বরূপ পরমাত্মা থেকে এর উদ্ভব, ধৈর্য হল এর তীর, এতে দয়ার ঢেউ ওঠে, পুণ্যকর্মকারী মানুষ এতে স্নান করে পবিত্র হয়। কারণ লোভরহিত আত্মা সর্বদাই পবিত্র। কাম-ক্রোধরূপ কুমীর ভর্তি, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের জলে পূর্ণ এই সংসার নদীর জন্ম-মৃত্যুরূপ দুর্গম প্রবাহকে ধৈর্যের নৌকা দিয়ে পার করুন। যে ব্যক্তি বুদ্ধি, ধর্ম, বিদ্যা এবং অবস্থায় শ্রেষ্ঠ নিজ বন্ধুকে আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করে তাকে কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করে, সে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। কামবেগ এবং ক্ষুধা ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হয়। এইভাবে হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ, মন ও বাক্যকে সৎকর্ম দ্বারা রক্ষা করা উচিত। যিনি প্রতিদিন স্নান-সন্ধ্যা-তর্পণাদি করেন, নিত্য স্বাধ্যায় করেন, দরিদ্রকে অন্নদান করেন, সত্যকথা বলেন এবং গুরুসেবা করেন, সেই ব্রাহ্মণ কখনো ব্রহ্মলোক ভ্রষ্ট হন না। বেদপাঠী, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানকারী নানাপ্রকার যজ্ঞকারী, গো-ব্রাহ্মণদের হিতার্থে সংগ্রামে মৃত্যুবরণকারী ক্ষত্রিয় শস্ত্র দ্বারা পবিত্র হওয়ায় ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন। যদি বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং আশ্রিতদের সময়-অসময়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে এবং যজ্ঞের পবিত্র অগ্নির ধূম গ্রহণ করে তাহলে মৃত্যুর পর সে স্বর্গলোকে দিব্য সুখ ভোগ করে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে ক্রমানুসারে সেবা করে তাদের সন্তুষ্ট রাখে, তাহলে সে ব্যথারহিত হয়ে পাপমুক্ত হয়ে দেহত্যাগের পর স্বর্গসুখ ভোগ করে। মহারাজ ! আপনাকে আমি চার বর্ণের ধর্মের কথা জানালাম ; এগুলি বলার কারণ শুনুন, আপনার জন্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ধর্ম থেকে চ্যুত হচ্ছেন, সুতরাং আপনি তাঁকে পুনরায় রাজধর্মে নিযুক্ত করুন॥ ১-২৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তুমি প্রতিদিন আমাকে যা উপদেশ দাও, তা অত্যন্ত শাস্ত্রসম্মত এবং সময়োচিত। সৌম্য ! তুমি আমাকে যা বলছ, আমারও তাই মনে হয়। আমি যদিও যুধিষ্ঠিরের জন্য সর্বদা ওইরূপই চিন্তা করে থাকি, কিন্তু দুর্যোধন এলেই আমার বুদ্ধি অন্যরকম হয়ে যায়। প্রারব্ধ পালটে নেবার শক্তি কোনো প্রাণীরই নেই। আমি প্রারব্ধকেই অটল বলে মনে করি, তার কাছে পুরুষার্থও ব্যর্থ॥ ৩০-৩২ ॥

—০—

সনৎ সুজাত ঋষির আগমন

(সনৎ সুজাতীয়—প্রথম অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তোমার যদি আর কিছু বলা বাকি থাকে তা হলে বলো ; আমার শুনতে খুব আগ্রহ হচ্ছে। কারণ তোমার বলার ভঙ্গী অপূর্ব॥ ১ ॥

বিদুর বললেন—ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র ! 'সনৎসুজাত' নামে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাপুত্র একজন প্রাচীন সনাতন ঋষি আছেন। তিনি একবার বলেছিলেন—'মৃত্যু বলে কিছু নেই।' মহারাজ তিনি সমস্ত বুদ্ধিমানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আপনার হৃদয়ে স্থিত ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন॥ ২-৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তুমি কি সেই তত্ত্ব জানো না, যা এখন তুমি সনাতন ঋষির দ্বারা আমাকে শোনাবে ? তোমার বুদ্ধি যদি কাজ করে, তাহলে তুমিই আমাকে উপদেশ দাও॥ ৪ ॥

বিদুর বললেন—রাজন্ ! আমি শূদ্রা নারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছি ; সুতরাং এর থেকে বেশি উপদেশ দেবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু কুমার সনৎসুজাতের বুদ্ধি সনাতন ব্রহ্ম বিষয় গোচরকারী, আমি তা জানি। ব্রাহ্মণ বংশে যাদের জন্ম, তারা গোপনীয় তত্ত্ব প্রতিপাদন করলেও নিন্দার পাত্র হন না। সেইজন্যই আমি আপনাকে সনৎসুজাতের নাম বলেছি॥ ৫-৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! সেই প্রাচীন সনাতন ঋষি এখন কোথায় আমাকে জানাও। তিনি এখানে কীভাবে আসবেন ? ॥ ৭ ॥

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর বিদুর উত্তম ব্রতধারী সেই সনাতন ঋষিকে স্মরণ করলেন। তিনিও বিদুর স্মরণ করেছেন জেনে সেখানে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য, মধু-পর্কাদির দ্বারা স্বাগত জানালেন। পরে তিনি যখন সুখাসনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন বিদুর তাঁকে বললেন—'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! ধৃতরাষ্ট্রের মনে কিছু সংশয়াদির উদয় হয়েছে, যার সমাধান করা আমার উচিত নয়। আপনিই তা নিবারণের যোগ্য। যা শুনে এই নরেশ সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি পান এবং লাভ-ক্ষতি, প্রিয়-অপ্রিয়, জরা-মৃত্যু, ভয়-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অহংকার-ঐশ্বর্য, চিন্তা-আলস্য, কাম-ক্রোধ এবং উন্নতি-অবনতি—এইসব দ্বন্দ্ব এঁকে কষ্ট দিতে না পারে॥ ৮-১২ ॥

—o—

সনৎ সুজাতের ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নাদির উত্তর

(সনৎ সুজাতীয়—দ্বিতীয় অধ্যায়)

বৈশম্পায়ন বললেন—তখন বুদ্ধিমান এবং মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা অনুমোদন করে তাঁর বুদ্ধি পরমাত্মার বিষয়ে নিবেশ করার জন্য একান্তে সনৎসুজাত মুনিকে প্রশ্ন করলেন॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—প্রভু সনৎসুজাত ! আমি শুনেছি যে আপনার সিদ্ধান্ত হল যে 'মৃত্যু বলে কিছু নেই'। আর এও শুনেছি যে দেবতা ও অসুররা মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এই দুটির মধ্যে কোনটি ঠিক ? ॥ ২ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! তুমি যে প্রশ্ন করেছ তার দুটি পক্ষ। মৃত্যু আছে এবং তা কর্ম দ্বারা দূর হয়—একপক্ষ ; এবং 'মৃত্যু বলে কিছু নেই' এটি হল দ্বিতীয় পক্ষ। এটি প্রকৃতপক্ষে কী, তা তোমাকে বলছি ; মন দিয়ে শোনো, আমার কথায় সন্দেহ কোরো না। ক্ষত্রিয় ! এই প্রশ্নের দুটি

ভাগই সত্য বলে জেনো। কিছু বিদ্বান ব্যক্তি মোহবশত মৃত্যুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হল যে প্রমাদই মৃত্যু আর অপ্রমাদ অমৃত। প্রমাদবশতই আসুরী সম্পদযুক্ত মানুষ মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয় এবং অপ্রমাদের সাহায্যে দৈবী সম্পদ বিশিষ্ট মহাত্মা পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠেন। মৃত্যু যে ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রাণীদের খেয়ে ফেলে না একথা নিশ্চিত, কারণ মৃত্যুর রূপ চক্ষুগোচর নয়। কিছু লোকে আমার বলায় ভুল করে 'যম' কে মৃত্যু বলে এবং হৃদয় দিয়ে দৃঢ়তা সহকারে পালন করা ব্রহ্মচর্যকেই অমৃত বলে মনে করে। যম দেবতা পিতৃলোকে রাজ্য-শাসন করেন। তিনি পুণ্যকর্মকারীদের কাছে সুখদায়ক এবং পাপীদের পক্ষে ভয়ংকর। যমের নির্দেশেই ক্রোধ, প্রমাদ এবং লোভরূপ মৃত্যু মানুষের বিনাশে প্রবৃত্ত হয়। অহংকার-বশীভূত হয়ে বিপরীত পথে চলা কোনো মানুষই আত্মার সাক্ষাৎ পায় না। মানুষ মোহবশত অহংকারের অধীন হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। মৃত্যুর পর তার মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ সঙ্গে যায়। শরীর থেকে প্রাণরূপী ইন্দ্রিয় বিয়োগ হওয়াকেই মৃত্যু বা 'মরণ' বলা হয়। প্রারব্ধকর্মের উদয় হলে কর্মের ফলে যারা আসক্তি রাখে তারা স্বর্গ লোকে গমন করে, তাই তারা মৃত্যুকে পার করতে পারে না। দেহাভিমানী জীব পরমাত্মাসাক্ষাৎকারের উপায় না জানায় ভোগবাসনায় নানাপ্রকারের প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। এইরূপ যারা বিষয়ে আসক্ত তারা অবশ্যই ইন্দ্রিয়াদি সুখভোগে মোহগ্রস্ত থাকে। এই মিথ্যা বিষয়ে যারা আসক্তি রাখে তাদের সেইদিকে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। মিথ্যা ভোগে আসক্ত হওয়ায় যার অন্তরের জ্ঞানশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, সে মনে মনে সেই বিষয় আস্বাদন করতে থাকে। প্রথমত বিষয় চিন্তাই মানুষের সর্বনাশ করে। ক্রমে এই বিষয়-চিন্তা, কাম-ক্রোধের সাহায্যে বিবেকহীন মানুষদের মৃত্যুমুখে পৌঁছে দেয়। কিন্তু যারা স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা ধৈর্যসহকারে মৃত্যু পার হয়ে যায়। সুতরাং যারা মৃত্যুকে জয় করতে চায়, তাদের বিষয়ের সম্যক বিচার করে কামনাগুলি উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তাকে নষ্ট করে দেওয়া উচিত। এইভাবে যারা বিষয় কামনা দূর করে দেয়, তারা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কামনা অনুসরণকারী মানুষ কামনার দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কামই সমস্ত প্রাণীদের মোহের কারণ হওয়ায়, তমোগুণ ও অজ্ঞানরূপ এবং নরকের সমান দুঃখদায়ী। মত্ত ব্যক্তি যেমন পথ চলতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে, কামনাসক্ত ব্যক্তিও ভোগকেই সুখ মনে করে সেইরূপ পাপগর্তে পতিত হয়। যার চিত্তবৃত্তি কামনাতে মোহগ্রস্ত হয়নি, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে ইহলোকে তৃণ-নির্মিত ব্যাঘ্রের ন্যায় মৃত্যু কিছুই করতে পারে না। তাই রাজন্! কামের অস্তিত্ব নষ্ট করার জন্য বিষয়ভোগের চিন্তা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা উচিত। রাজন্! তোমার শরীরের মধ্যে যে অন্তরাত্মা বাস করেন, মোহের বশীভূত হয়ে সেটিই ক্রোধ, লোভ এবং মৃত্যুরূপ হয়ে ওঠে। মোহ থেকে উৎপন্ন মৃত্যুকে জেনে যে ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সে ইহলোকে মৃত্যুকে ভয় পায় না। তার কাছে মৃত্যু সেইভাবেই পরাজিত হয়, যেভাবে মৃত্যুর অধিকারে আসা মরণশীল মানুষ এই গতি প্রাপ্ত হয়॥ ৩-১৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—দ্বিজাতিদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের) জন্য যজ্ঞের দ্বারা যে পবিত্রতম, সনাতন এবং শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, বেদ এখানে তাকেই পরম পুরুষার্থ বলে জানিয়েছেন। যে বিদ্বান এগুলি জানেন, তাঁরা উত্তম কর্মের আশ্রয় কেন নেন না? ॥ ১৭ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্! অজ্ঞান ব্যক্তিরাই এইসব ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করে এবং বেদকর্মের নানা প্রয়োজনের কথাও বলে থাকে। কিন্তু যাঁরা নিষ্কাম পুরুষ, তাঁরা জ্ঞানমার্গের সাহায্যে অন্য সমস্ত পথ জেনে পরমাত্মস্বরূপ হয়ে একমাত্র পরমাত্মাকেই লাভ করেন॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদ্বান! যদি সেই পরমাত্মাই ক্রমশ এই সমস্ত জগৎরূপে প্রকটিত হন তাহলে সেই অজ, পুরাতন পুরুষকে কে শাসন করবে? তাঁর এইরূপে আসার কী প্রয়োজন এবং কী সুখ তিনি পান—আমাকে এগুলি ঠিকমতো বুঝিয়ে বলুন॥ ১৯ ॥

সনৎসুজাত বললেন—তোমার প্রশ্নে যে নানা বিকল্প রয়েছে, সেই অনুসারে ভেদ প্রাপ্তি হয় এবং সেটি স্বীকার করলে মহাদোষ হয়; কারণ অনাদি মায়ার সম্পর্কে জীবদের নিত্যপ্রবাহ চলতে থাকে—এটি মেনে নিলে এই পরমাত্মার মহত্ব নষ্ট হয় না এবং তাঁর মায়ার সংস্পর্শে জীব পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হতে থাকে। এই যে দৃশ্যমান জগৎ, সেটি হল পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরমাত্মা নিত্য। তিনি বিকার অর্থাৎ মায়ার সংস্পর্শে এই বিশ্বকে উৎপন্ন করেন। মায়া হল সেই পরমাশক্তির শক্তি—এরূপ মানা হয়। আর এই অর্থের প্রতিপাদনে বেদই প্রমাণ॥ ২০-২১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ইহজগতে কিছুলোক ধর্মাচরণ করে না এবং কিছু লোক ধর্মাচরণ করে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি, ধর্ম পাপের দ্বারা নষ্ট হয়, না ধর্মই পাপকে নষ্ট করে ?॥ ২২ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! ধর্ম এবং পাপ—দুইয়ের দুপ্রকার ফল হয় এবং দুটিই আলাদা-আলাদভাবে ভোগ করতে হয়। পরমাত্মাতে স্থিতি হলে বিদ্বান ব্যক্তি সেই নিত্য তত্ত্ব জ্ঞানের সাহায্যে নিজ পূর্বকৃত পাপ এবং পুণ্য—উভয়ই চিরকালের মতো বিনাশ করেন। যদি এরূপ স্থিতিলাভ না হয় তাহলে দেহাভিমানী ব্যক্তি কখনো পুণ্যফল লাভ করে আবার কখনো পূর্ব অর্জিত পাপের ফলভোগ করে। এইরূপ পুণ্য ও পাপের যে স্বর্গ-নরকরূপ দুই অস্থির ফল আছে, তা ভোগ করে সে ইহজগতে জন্ম নিয়ে পুনরায় তদনুসারে কর্মে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু কর্মের তত্ত্ব জানা নিষ্কাম ব্যক্তি ধর্মরূপ কর্মের সাহায্যে নিজ পূর্বকৃত পাপের এখানেই বিনাশ করেন। তাই ধর্ম অত্যন্ত বলবান। সুতরাং ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি সময়ানুসারে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন॥ ২৩-২৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদ্বান ! পুণ্যকর্মকারী দ্বিজাতিরা নিজ নিজ ধর্মের ফলস্বরূপ যে সনাতন লোক প্রাপ্ত হন বলে বলা হয়েছে, ক্রমানুসারে তা আমাকে জানান এবং এছাড়াও যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মোক্ষসুখ আছে, তা-ও নিরূপণ করুন। আমি এখন সকাম কর্মের কথা জানতে ইচ্ছুক নই॥ ২৬ ॥

সনৎসুজাত বললেন— বলবান ব্যক্তি যেমন বলবৃদ্ধির নিমিত্ত অপরের সঙ্গে স্পর্ধা করেন, তেমনই যিনি নিষ্কামভাবে নিয়মাদি পালনের দ্বারা অপরের থেকে বড় হওয়ার চেষ্টা করেন, সেই ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে নিজ তেজ প্রকটিত করেন। যাঁর বর্ণাশ্রমে স্পৃহা থাকে, তাঁর জন্য সেই জ্ঞানের সাধন বিহিত। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যদি সকামভাবে তা অনুষ্ঠিত করে, তাহলে সে মৃত্যুর পর দেবতাদের নিবাসস্থান স্বর্গে গমন করে। ব্রাহ্মণের সম্যক আচারের বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ প্রশংসা করেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমের অহংকার থাকায় যে ব্যক্তি বহির্মুখী, তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। যে নিষ্কামভাবে শ্রোতধর্ম পালন করে অন্তর্মুখী হয়েছে, তাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে জানতে হবে। বর্ষাঋতুতে যেমন তৃণসমূহ বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ যেখানে ব্রহ্মবেত্তা সন্ন্যাসীর যোগ্য অন্ন-জল ইত্যাদির আধিক্য থাকে, সেই দেশে বাস করে জীবন-নির্বাহ করা উচিত। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দ্বারা কষ্ট না করাই উচিত। কিন্তু যেখানে নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশিত না করলে ভয় ও অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়, সেখানে থেকেও যে নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করে না, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে কারো আত্মপ্রশংসা শুনে ঈর্ষা করে না, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে উপভোগ করে না, তার অন্ন স্বীকার করতে সৎপুরুষদেরও সম্মতি থাকে। কুকুর যেমন নিজের বমন করা খাদ্য পুনরায় ভক্ষণ করে তেমনই যারা নিজেদের পরাক্রম বা পাণ্ডিত্য দেখিয়ে জীবিকা-নির্বাহ করে তারা কুকুরের মতোই বমন ভক্ষণকারী। এদের সর্বদাই অবনতি হয়। যিনি আত্মীয়দের সঙ্গে থেকেও সর্বদা নিজের সাধনকে তাঁদের থেকে গুপ্ত রাখার চেষ্টা করেন, সেই ব্রাহ্মণদেরই বিদ্বান পুরুষ, ব্রাহ্মণ বলে মনে করেন। উপরিউক্ত রূপে জীবন যাপন করা ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মের প্রকাশ প্রাপ্ত হন, তিনিও তাঁর ব্রহ্মভাবকে অবলোকন করেন। এইরূপ যে ভেদবিহীন, চিহ্নরহিত, অবিচল, শুদ্ধ এবং দ্বৈতরহিত আত্মা, তাঁর স্বরূপ যাঁরা জানেন সেই ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তিরা তাঁকে হনন করেন না। যাঁরা আত্মাকে এর বিপরীত মনে করেন সেই আত্মা অপহরণকারীরা সর্বপ্রকার পাপ করে থাকে। যে কর্তব্য পালনে ক্লান্ত হয় না, দান গ্রহণ করে না, সম্মানিত এবং শান্ত ও শিষ্ট হয়েও তা প্রদর্শন করে না—সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং বেদবেত্তা। যে লৌকিক ধনের দৃষ্টিতে নির্ধন হয়েও দৈবী সম্পদ এবং যজ্ঞ উপাসনাসম্পন্ন, সে দুর্ধর্ষ এবং নির্ভয়, তাঁকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মূর্তি বলে জানতে হবে। কেউ যদি ইহলোকে অভীষ্ট সিদ্ধিকারী সমস্ত দেবতাদের জেনে যান, তা হলেও তিনি ব্রহ্মবেত্তার সমকক্ষ হতে পারেন না। কেননা তিনি তো অভীষ্ট ফললাভের জন্যই সচেষ্ট রয়েছেন। যিনি অন্যের কাছে সম্মানিত হয়েও অহংকার করেন না এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের দেখে ঈর্ষা করেন না, তিনিই প্রকৃত সম্মানিত ব্যক্তি। এই জগতে যারা অধর্মে নিপুণ, ছল-কপটে চতুর এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের অপমানকারী মূঢ় ব্যক্তি, তারা কখনো সম্মানীয় ব্যক্তিদের সম্মান করে না। একথা নিশ্চিত যে মান এবং মৌন সর্বদা একসঙ্গে থাকে না ; কারণ মানের দ্বারা ইহজগতে সুখ পাওয়া যায় এবং মৌনদ্বারা পরলোকে। জ্ঞানীরা একথা জানেন। ঐশ্বর্যাদিকে জগতে সুখের একটি মুখ্য আধার বলে মানা হয়েছে, কিন্তু লুণ্ঠনকারীদের মতো এটিও পরলোকের কল্যাণমার্গে বিঘ্ন প্রদানকারী। রাজন্ ! প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানময়ী লক্ষ্মী সর্বতোভাবেই দুর্লভ। সন্ত পুরুষ সেই ব্রহ্মসুখের

অনেক উপায় জানিয়েছেন, যা মোহকে জাগ্রত করে না এবং যা অত্যন্ত কষ্টে ধারণ করা হয়। সেগুলি হল—সত্য, সরলতা, লজ্জা, দম, শৌচ এবং বিদ্যা॥ ২৭-৪৬ ॥

—o—

ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী মৌন, তপ ইত্যাদির লক্ষণ এবং গুণ-দোষ নিরূপণ
(সনৎ সুজাতীয়—তৃতীয় অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদ্বান ! মৌন কাকে বলে ? বাক্ সংযম এবং পরমাত্মার স্বরূপ এই দুটির মধ্যে মৌন কোনটি ? আপনি মৌনভাবের বর্ণনা করুন। বিদ্বান ব্যক্তিরা কি মৌনের দ্বারা মৌনরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হতে পারে ? হে মুনি ! জগতে লোকে কীভাবে মৌন আচরণ করে ? ॥ ১ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন ! যেখানে মনের সঙ্গে বাক্যরূপ বেদ পৌঁছতে পারে না, সেই পরমাত্মাকেই মৌন বলা হয় ; তাই সেটিই মৌনস্বরূপ। বৈদিক এবং লৌকিক শব্দাবলীর যেখান থেকে উদ্ভব হয়েছে, সেই পরমেশ্বরকে তন্ময়ভাবে ধ্যান করলে তিনি প্রকাশিত হন॥ ২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—যে ঋক্ বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ জানে এবং পাপ করে সে পাপে লিপ্ত হয় কী না ? ॥ ৩ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি না ; ঋক্, সাম অথবা যজুর্বেদ—কোনো পাপাচারী অজ্ঞান ব্যক্তিকে তার পাপকর্ম হতে রক্ষা করে না। যে কপটতাপূর্বক ধর্ম আচরণ করে, সেই মিথ্যাচারীকে বেদ পাপ হতে উদ্ধার করে না। পাখির পাখা হলে সে যেমন বাসা ছেড়ে উড়ে যায়, তেমনি অন্তকালে বেদও তাকে পরিত্যাগ করে॥ ৪-৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদ্বান ! ধর্ম ব্যতীত বেদ যদি রক্ষা করতে সক্ষম না হয় তাহলে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণের পবিত্র হওয়ার কথা[১] কেন চিরকাল ধরে চলে আসছে ? ॥ ৬ ॥

সনৎসুজাত বললেন—মহানুভাব ! পরমাত্মার নাম এবং স্বরূপেরই বিশেষরূপে এই জগতে প্রতীতি হয়। বেদ এই কথা (**'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে'** ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা) বিশেষ ভাবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এর স্বরূপ এই বিশ্বের থেকে বিশিষ্ট বলা হয়েছে। তার প্রাপ্তির জন্যই বেদে (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ইত্যাদি) তপ এবং (জ্যোতিষ্টম ইত্যাদি) যজ্ঞের প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই তপ এবং যজ্ঞাদির দ্বারা ওইসকল শ্রোত্রিয় বিদ্বান পুরুষ পুণ্য প্রাপ্ত করেন। তারপর সেই পুণ্য দ্বারা পাপ নষ্ট হলে জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা তিনি নিজ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বিদ্বান ব্যক্তি এইভাবে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে লাভ করেন। না হলে ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ ফলের ইচ্ছা রাখায় সে ইহলোকে করা সমস্ত কর্মগুলি সঙ্গে নিয়ে পরলোকে ফল ভোগ করে এবং ভোগ সমাপ্ত হলে পুনরায় এই সংসার-চক্রে ফিরে আসে। ইহলোকে তপস্যা করা হয় এবং পরলোকে তার ফল ভোগ করা হয় (সকলের জন্যই এই সাধারণ নিয়ম)। কিন্তু অবশ্য পালন করার উপযুক্ত তপস্যায় স্থিত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ এই লোকেই তাঁর জ্ঞানরূপ ফল (জীবৎকালেই) প্রাপ্ত হন॥ ৭-১০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—মুনিবর ! একই তপে কখনো বৃদ্ধি কখনো ক্ষতি কীভাবে হয় ? আপনি এমনভাবে বলুন যাতে আমি ভালোভাবে বুঝতে পারি॥ ১১ ॥

সনৎসুজাত বললেন—যা কোনো কামনা বা পাপরূপ দোষে যুক্ত নয়, তাকে বিশুদ্ধ তপ বলা হয়। সেই তপই শুধুমাত্র ঋদ্ধ এবং সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। (কিন্তু যখন সেই তপে কামনা বা পাপরূপ দোষের সংসর্গ ঘটে, তখন তার হানি হতে থাকে।) রাজন্ ! তুমি আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করছ, সেগুলি সবই তপস্যামূলক—তপ থেকেই প্রাপ্তি হয় ; বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ এই তপ থেকেই পরম অমৃত (মোক্ষ) লাভ করেন॥ ১২-১৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে মহাভাগ ! আমি দোষরহিত তপস্যার কথা শুনেছি ; এবার তপস্যার যে দোষ থাকে, তার কথা বলুন, যাতে আমি এই সনাতন গোপনীয় তত্ত্ব

[১] 'ঋগ্‌যজুঃসামভিঃ পূতো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।' (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ দ্বারা পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হন) ইত্যাদি বচন দ্বারা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের পবিত্র এবং নিষ্পাপ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

জানতে পারি।। ১৪ ।।

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! তপস্যার ক্রোধ ইত্যাদি বারোটি দোষ থাকে এবং তেরো প্রকারের ক্রূর মানুষ হয়ে থাকে। পিতৃপুরুষ এবং ব্রাহ্মণদের ধর্মাদি বারোটি গুণ শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অসন্তোষ, নির্দয়ভাব, পরদোষ-দর্শন, অভিমান, শোক, স্পৃহা, হিংসা, ঈর্ষা ও নিন্দা—মানুষের এই বারোটি দোষ সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। নরশ্রেষ্ঠ ! ব্যাধ যেমন মৃগকে শিকারের জন্য তার পিছনে ধাবমান হয়, তেমনই এই সব এক একটি দোষ মানুষের স্বভাবে ছিদ্র পথে তার ওপর আক্রমণ চালায়। নিজের সম্বন্ধে অহংকারী, লোলুপ, নিরন্তর ক্রোধযুক্ত, চঞ্চল, গর্বিত এবং আশ্রিতকে রক্ষা করে না—এই ছয় প্রকারের মানুষ পাপী। এরূপ ব্যক্তি মহা সংকটে পড়লেও নির্ভয় হয়ে এই সব পাপ কর্মের আচরণ করে। সর্বদা সম্ভোগে আকাঙ্ক্ষিত, বিষম ব্যবহারকারী, অত্যন্ত মানী, দান করে অনুতপ্ত, অত্যন্ত কৃপণ, অর্থ ও কামের প্রশংসাকারী, স্ত্রীদোষযুক্ত—এই সাত এবং আগের ছয়, সর্বমোট তেরো প্রকারের মানুষকে নৃশংস বর্গ (ক্রূর-সম্প্রদায়) বলা হয়। ধর্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপ, মৎসরতার অভাব, লজ্জা, সহনশীলতা, কারো দোষ না দেখা, যজ্ঞ করা, দান দেওয়া, ধৈর্য এবং শাস্ত্রজ্ঞান—এই বারোটি হল ব্রাহ্মণদের ব্রত। যে এই বারোটি ব্রতের (গুণের) ওপর নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখে, সে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে নিজ অধীন করতে পারে। এর মধ্যে তিন, দুই অথবা একটি গুণেও যে যুক্ত, তার কাছে সর্বপ্রকারের ধন থাকে—তাই বুঝতে হবে। দম, ত্যাগ এবং আত্মকল্যাণে প্রমাদ করা উচিত নয়—এই তিনেই অমৃত বাস করে। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি বলেন এই গুণগুলি সত্যস্বরূপ পরমাত্মামুখী করে অর্থাৎ এগুলি পরমাত্মপ্রাপ্তি করায়। দম অষ্টাদশ গুণসম্পন্ন (নিম্নলিখিত আঠারোটি দোষ পরিত্যাগ করাকেই আঠারোটি গুণ বলে জানতে হবে)। কর্তব্য-অকর্তব্যে বিপরীত ধারণা, অসত্যভাষণ, গুণাদিতে দোষদৃষ্টি, স্ত্রীবিষয়ক কামনা, সর্বদা অর্থোপার্জনে ব্যাপৃত থাকা, ভোগেচ্ছা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পরচর্চা, ঈর্ষা, হিংসা, সন্তাপ, চিন্তা, কর্তব্য বিস্মৃতি, বাজে কথা বলা এবং নিজেকে বড় বলে ভাবা—যারা এইসব দোষমুক্ত, তাদের সৎপুরুষ বা জিতেন্দ্রিয় বলা হয়।। ১৫-২৫ ।।

অহংকারের আঠারোটি দোষ ; আগে যে দমের বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকেই অহংকারের দোষ বলা হয় (পরে এর পৃথক দোষের কথাও জানানো হবে।) ত্যাগ ছয় প্রকারের এবং তা অতিশয় উত্তম ; কিন্তু এগুলির তৃতীয়টি অর্থাৎ কামত্যাগ করা অত্যন্তই কঠিন, এটি পালন করলে মানুষ নানা দুঃখ থেকে অবশ্যই মুক্তিলাভ করে। কামত্যাগের দ্বারা সব কিছু জয় করা সম্ভব। রাজেন্দ্র ! সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়প্রকার ত্যাগ হল—লক্ষ্মীলাভ করে হর্ষোৎফুল্ল না হওয়া, প্রথম ত্যাগ। হোম-যজ্ঞ এবং জলের কুয়া বা পুষ্করিণী তৈরি করা, তাতে অর্থব্যয় করা দ্বিতীয় ত্যাগ, সর্বদা বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে কাম ত্যাগ করা—তৃতীয় ত্যাগ, এরূপ ত্যাগীকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলা হয়, তাই এই তৃতীয় ত্যাগটি খুবই বিশিষ্ট এরূপ ত্যাগীকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপই বলা হয়। পদার্থত্যাগে যে নিষ্কামভাব আসে, স্বেচ্ছায় তা উপভোগ করলে আসে না। অধিক ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করলেও নিষ্কামভাব সিদ্ধ হয় না এবং কামনাপূর্তির জন্য তা উপভোগ করলেও কামত্যাগ হয় না। কর্ম সিদ্ধ না হলেও তার জন্য দুঃখ করা উচিত নয়, সেই দুঃখে গ্লানি যেন না থাকে। এইসব গুণযুক্ত ব্যক্তি সম্পদশালী হলেও ত্যাগী। কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটলেও কখনো ব্যথিত হওয়া উচিত নয়—এ হল চতুর্থ ত্যাগ। নিজ অভীষ্ট পদার্থ—স্ত্রী-পুত্রাদি কখনো কামনা করবে না—এটি পঞ্চম ত্যাগ। সুযোগ্য লোক এলে তাকে দান করবেন—এটি ষষ্ঠ ত্যাগ। এইসবে কল্যাণ হয়। এই ত্যাগের গুণে মানুষ অপ্রমাদী হয়। অপ্রমাদেরও আটগুণ—সত্য, ধ্যান, সমাধি, তর্ক, বৈরাগ্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। ত্যাগ এবং অপ্রমাদ—এই আটটি গুণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এইভাবে অহংকারের যে আঠারোটি দোষের কথা বলা হয়েছে, তা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। প্রমাদের আট দোষও ত্যাগ করা উচিত। ভারত ! পাঁচটি-ইন্দ্রিয় এবং মন —এরা নিজ নিজ বিষয়ে ভোগবুদ্ধিতে যে প্রবৃত্ত হয়—তার ছয়টি প্রমাদ বিষয়ক দোষ আর দুটি দোষ হল অতীত চিন্তা এবং ভবিষ্যতের আশা। এই আটটি দোষ থেকে মুক্ত পুরুষ সুখী হয়। রাজেন্দ্র ! তুমি সত্যস্বরূপ হও, সত্যেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। এই দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ ইত্যাদি গুণও সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তি করায়, সত্যেই অমৃতের প্রতিষ্ঠা। দোষাদি নিবৃত্ত করে তপ ও ব্রত আচরণ করা উচিত। এই নিয়মগুলি হল বিধাতা সৃষ্ট। শ্রেষ্ঠপুরুষদের ব্রত হল সত্য। মানুষের উপরিউক্ত দোষরহিত এবং গুণযুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ ব্যক্তির তপই বিশুদ্ধ এবং সমৃদ্ধ হয়। রাজন্ ! আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে জানালাম।

এই জপ জন্ম-মৃত্যু ও বৃদ্ধাবস্থার কষ্ট দূর করে, পাপহারী ও পবিত্র॥ ২৬-৪০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে মুনিবর ! পঞ্চবেদে কিছু ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে করা হয়েছে (তাদের পঞ্চবেদী বলা হয়)। অন্যদের চতুর্বেদী, ত্রিবেদী বলা হয়। এই রূপ কিছু লোককে দ্বিবেদী, একবেদী ও অনৃচ[1] বলা হয় । এদের মধ্যে কাকে ব্রাহ্মণ বলে জানব ? ॥ ৪১-৪২ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! একটি বেদকে যথার্থভাবে না জানার ফলেই অনেক বেদ সৃষ্ট হয়েছে। সেই সত্যস্বরূপ বেদের সারতত্ত্ব পরমাত্মাতে যিনি স্থিত হন তিনিই ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য। এইরূপ বেদের তত্ত্ব না জেনেও কিছু লোক 'আমি বিদ্বান' বলে মনে করে এবং দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞাদি কর্মের লৌকিক এবং পারলৌকিক ফলের লোভে প্রবৃত্ত হয়। বাস্তবে যে সত্যস্বরূপ পরমাত্মা থেকে চ্যুত হয়েছে, তারই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগে। তারপর সত্যরূপ বেদের প্রামাণ্য স্থির করেই তিনি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন। কারো যজ্ঞ মন দ্বারা, কারো বাক্যের সাহায্যে এবং কারো যজ্ঞ ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। পুরুষ সংকল্প করতে থাকে তাই সে নিজ সংকল্প অনুসারে প্রাপ্ত লোকে অধিষ্ঠান করে। কিন্তু যতক্ষণ সংকল্প সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ দীক্ষিত ব্রত আচরণ অর্থাৎ যজ্ঞাদি করা কর্তব্য। এই 'দীক্ষিত' শব্দটি 'দীক্ষ ব্রতাদেশে' ধাতুতে তৈরি। সৎপুরুষের জন্য সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই সবথেকে বড়। কারণ (পরমাত্মার) জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ এবং তপের ফল পরোক্ষ (তাই জ্ঞানের আশ্রয়ই নেওয়া উচিত)। অনেক পড়াশোনা করেন যেসব ব্রাহ্মণ তাঁদের বহুপাঠী বলে জানতে হয়। তাই ক্ষত্রিয় ! বাক্যচাতুরীতে দক্ষ হলেই কাউকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করবে না। যিনি সত্যস্বরূপ পরমাত্মা থেকে কখনো পৃথক হন না, তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে জানবে। রাজন্, অথবা মুনি এবং মহর্ষিগণ পূর্বকালে যার ভজন করেছেন, তাকেই ছন্দ (বেদ) বলে। কিন্তু সমস্ত বেদপাঠ করার পরও যিনি বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য পরমাত্মতত্ত্ব জানেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষে বেদবিদ্ নন। নরশ্রেষ্ঠ ! ছন্দ (বেদ) সেই পরমাত্মার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে স্থিত (অর্থাৎ স্বতঃ প্রমাণিত)। তাই বেদ অধ্যয়ন করেই বেদবেত্তা আর্যগণ বেদ্যরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব লাভ করেছেন। রাজন্ ! বাস্তবে বেদতত্ত্ববিদ কেউ নেই অথবা মনে কর কোনো বিরল ব্যক্তিই তার রহস্য জানতে পারে। যে শুধু বেদের বাক্য জানে সে বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য সেই পরমাত্মাকে জানে না। কিন্তু যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই বেদ্‌বিদ পরমাত্মাকে জানেন। জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ মন প্রভৃতি হল অচেতন। এদের কেউই জ্ঞাতা নন। অতএব মন প্রভৃতির দ্বারা আত্মা বা অনাত্মা—কাউকেও জানা যায় না। যে আত্মাকে জানতে পারে, সে অনাত্মাকেও জানে। যে শুধু অনাত্মাকে জানে, সে সত্যআত্মাকে জানে না। যে (বেদ্য) পুরুষ বেদকে জানে, সে বেদ্য (জগৎ ইত্যাদি)ও জানে ; কিন্তু সেই জ্ঞাতাকে বেদপাঠীও জানে না, বেদও জানে না। তবুও বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ সেই আত্মতত্ত্বকে বেদের দ্বারাই জানতে পারেন। শাখাচন্দ্র ন্যায়ের মতো সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে জানার জন্য বেদের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। আমি তাকেই ব্রাহ্মণ মনে করি যিনি পরমাত্মতত্ত্ব জানেন এবং বেদের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন ; যাঁর নিজের সন্দেহ দূর হয়েছে এবং তিনি অন্যের সংশয়ও মেটাতে সক্ষম। এই আত্মাকে অনুসন্ধান করার জন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই, কোনো দিকেই তাঁকে খুঁজতে হয় না। কোনো অনাত্ম-পদার্থে আত্মার অনুসন্ধান করা উচিত নয়। বেদবাক্যে না খুঁজে শুধু তপের সাহায্যেই তাঁর সাক্ষাৎকার করা উচিত। সর্বপ্রকার চেষ্টা ছেড়ে পরমাত্মার উপাসনা করা কর্তব্য, মনের দ্বারাও চেষ্টা করা উচিত নয়। রাজন্ ! তুমিও তোমার হৃদয়োস্থিত সেই পরমাত্মার উপাসনা করো। মৌন অথবা বনে বাস করলেই মুনি হওয়া যায় না। যিনি আত্মার স্বরূপ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি। সমস্ত অর্থ প্রকট করার জন্যই জ্ঞানীদের বৈয়াকরণ বলা হয়। সমস্ত অর্থ মূলভূত ব্রহ্ম হতেই প্রকটিত, তাই তিনি মুখ্য বৈয়াকরণ। বিদ্বান পুরুষও ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মস্বরূপ লাভে সমর্থ) হওয়ায় এবং ব্রহ্মের যথার্থ তাৎপর্য ব্যাকৃত (ব্যক্ত) করতে সমর্থ হওয়ায় তিনিও বৈয়াকরন। যিনি সমস্ত লোক প্রত্যক্ষ দেখেন, তাঁকে সর্বলোকের দ্রষ্টামাত্র বলা হয় (সর্বজ্ঞ নয়)। কিন্তু যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। রাজন্ ! পূর্বোক্ত ধর্মাদিতে স্থিত হলে ও বেদাদি বিধিবৎ অধ্যয়ন করলেও মানুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে এই কথা আমি বুদ্ধির সাহায্যে স্থির করে তোমাকে জানাচ্ছি॥ ৪৩-৬৩ ॥

—o—

[1]যারা ঋক্ বেদাদি অধ্যয়ন করেনি, তাদের অনৃচ বলা হয়।

ব্রহ্মচর্য এবং ব্রহ্মের নিরূপণ
(সনৎ সুজাতীয়—চতুর্থ অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে মুনিবর ! আপনি যে সর্বোত্তম এবং সর্বরূপা ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় বিদ্যার উপদেশ দিলেন, তাতে বিষয় ভোগের কোনো আলোচনা নেই। আমি বলছি যে আপনি এই পরম দুর্লভ বিষয় পুনরায় ব্যাখ্যা করুন॥ ১ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! তুমি আমাকে প্রশ্ন করার সময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছ, এরূপ ভাব থাকলে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধির দ্বারা মন লয় হলে সমস্ত বৃত্তি নিরোধকারী যে স্থিতি হয় তাকেই বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যা এবং ব্রহ্মচর্য পালন করলেই তা উপলব্ধ হয়॥ ২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—যা কর্মদ্বারা আরম্ভ হয় না এবং কাজের সময়ও যা এই আত্মাতেই থাকে, সেই অনন্ত ব্রহ্মে সম্পর্ক রাখা এই সনাতন বিদ্যাকে যদি আপনি ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলেন, তাহলে আমার মতো লোক ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় অমৃতত্ব (মোক্ষ) কেমন করে লাভ করতে সক্ষম ? ॥ ৩ ॥

সনৎসুজাত বললেন—আমি এবার অব্যক্ত ব্রহ্মে সম্পর্কযুক্ত সেই পুরাতন বিদ্যার বর্ণনা করব, যা মানুষ সদবুদ্ধি এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা লাভ করে। যা লাভ করে বিদ্বান ব্যক্তিরা এই মৃত্যুশীল শরীর চিরকালের মতো ত্যাগ করে এবং যে বুদ্ধি গুরুজনের মধ্যে নিত্য বিদ্যমান॥ ৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ব্রহ্মন্ ! এই ব্রহ্মবিদ্যা যদি ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই সহজে জানা যায়, তাহলে আমাকে প্রথমে বলুন যে ব্রহ্মচর্য পালন হয় কীভাবে ? ॥ ৫ ॥

সনৎসুজাত বললেন—যাঁরা আচার্যের আশ্রমে বাস করেন, সেবার দ্বারা তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁরা সেখানেই শাস্ত্রকার হয়ে যান এবং দেহত্যাগের পর পরম যোগরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। ইহজগতে বাস করে যিনি সমস্ত কামনা জয় করেন এবং ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করার জন্য নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব সহ্য করেন, তিনি সত্ত্বগুণে স্থিত হয়ে দেহ থেকে আত্মাকে (বিবেকের সাহায্যে) পৃথক করে নেন। ভারত ! যদিও মাতা ও পিতা —এঁরা দুজনেই শরীরের জন্ম দেন, তবুও আচার্যের উপদেশে যে জন্মলাভ হয়, তা পরম পবিত্র এবং অজর, অমর। যিনি পরমার্থ তত্ত্বের উপদেশে সত্যকে প্রকটিত করে অমরত্ব প্রদান করত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ রক্ষা করেন, সেই আচার্যকে পিতা মাতা বলেই জানা উচিত এবং তাঁর কৃত উপকারের কথা স্মরণে রেখে কখনো তাঁর বিরোধিতা করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারী শিষ্যের প্রত্যহ গুরুকে প্রণাম করা উচিত। অন্তর বাহিরে পবিত্র হয়ে প্রমাদ ত্যাগ করে স্বাধ্যায়ে মন নিয়োজিত করা, অহং-অভিমান না রাখা এবং মনে ক্রোধ না রাখা উচিত। ব্রহ্মচর্যের এটিই হল প্রথম চরণ। যিনি শিষ্যবৃত্তির ক্রমানুসারে জীবন নির্বাহ করে পবিত্র হয়ে বিদ্যালাভ করেন, এই নিয়ম তাঁর পক্ষেও ব্রহ্মচর্যের প্রথম পাদ বলা হয়। নিজ প্রাণ ও অর্থের দ্বারা মন, বাক্য এবং কর্ম দ্বারা আচার্যকে খুশি করা—এটি হল দ্বিতীয় পাদ। গুরুর প্রতি শিষ্যের যেমন সম্মানপূর্ণ ব্যবহার হবে, তেমনই গুরুপত্নী এবং তাঁর পুত্রদের সঙ্গেও হওয়া উচিত। এটিও ব্রহ্মচর্যের দ্বিতীয় পাদ। আচার্য যে উপকার করেছেন, তা স্মরণে রেখে এবং তাতে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, তার বিচার করে মনে মনে প্রসন্ন হয়ে শিষ্য তাঁর প্রতি যেন এইভাব রাখেন, 'ইনি আমাকে অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় তুলে দিয়েছেন' — ব্রহ্মচর্যের এটি হল তৃতীয় পাদ। আচার্যের উপকারের দাম না দিয়ে অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট না করে বিদ্বান শিষ্য যেন অন্যত্র না যান। (দক্ষিণা দিয়ে অথবা সেবা করে) মনে কখনো এমন চিন্তা যেন না আসে যে 'আমি গুরুর উপকার করছি', মুখ থেকে যেন এমন কথা কখনো না নির্গত হয়। ব্রহ্মচর্যের এই হল চতুর্থ পাদ। ব্রহ্মচারী শিষ্য প্রথমে গুরুর নিকট শিক্ষা ও সদাচারের এক চরণ লাভ করে, পরে উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে দ্বিতীয় পাদের জ্ঞান হয়। তারপরে বহুদিন মনন করলে তৃতীয় পাদের জ্ঞান লাভ হয়। পরে শাস্ত্রের দ্বারা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করলে চতুর্থ পাদ জানতে পারে। এইরূপ ব্রহ্মচর্য পালনে প্রবৃত্ত হয়ে যা কিছু ধন লাভ করা যায়, তা আচার্যকে সমর্পণ করা উচিত। এরূপ করলে শিষ্য সৎ ব্যক্তিদের নানাগুণসম্পন্ন বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এরূপ বৃত্তি থাকলে শিষ্য ইহজগতে সর্বপ্রকার উন্নতি প্রাপ্ত হয়। সে বহুপুত্র ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশে-বিদেশে তার ওপর সুখের বর্ষা হয় এবং বহু লোক তার কাছে ব্রহ্মচর্য-পালনের জন্য আসে। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারাই দেবতারা

দেবত্ব লাভ করেছেন এবং মহাসৌভাগ্যশালী ঋষিগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। এর প্রভাবেই গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ দিব্য রূপ লাভ করেছেন। এই ব্রহ্মচর্যের প্রতাপেই সূর্যদেব সকল লোককে প্রকাশিত করতে সক্ষম হন। ব্রহ্মচর্য মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করে—এই জেনে ঋষি-দেবতারাও ব্রহ্মচর্য পালন করেন। রাজন্! যে এই ব্রহ্মচর্য পালন করে, সেই ব্রহ্মচারী যম-নিয়ম ও তপ আচরণ করে নিজের সম্পূর্ণ দেহকে পবিত্র করে তোলে। বিদ্বান ব্যক্তিরা এর দ্বারা আত্মবল প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুকে জয় করেন। রাজন্! সকাম ব্যক্তি নিজ পুণ্যকর্মের দ্বারা বিনাশশীল লোক প্রাপ্ত হয় কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, সেই বিদ্বান এই জ্ঞানের দ্বারা সর্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। মোক্ষের জন্য জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনো পথ নেই॥ ৬-২৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—এখানে বিদ্বান ব্যক্তিরা সত্যস্বরূপ পরমাত্মার যে অমৃত এবং অবিনাশী পরমপদ সাক্ষাৎ করেন, তার রূপ কেমন? সেই রূপ কী শ্বেত শুভ্র, রক্তবর্ণ, না কাজল কালো অথবা সোনার মতো হলুদ বর্ণের বলে মনে হয়? ॥ ২৫ ॥

সনৎসুজাত বললেন—এগুলি যদিও শ্বেত, লাল, কালো, লৌহ সদৃশ সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান এবং নানারূপে প্রতীত হয়, তবুও ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ পৃথিবীতেও নেই, আকাশেও নয় সেই রূপ সমুদ্রের জল ও নক্ষত্রে নেই, বিদ্যুৎ বা মেঘেরও আশ্রিত নয়। তেমনই বায়ু, দেবগণ, চন্দ্র এবং সূর্যেও দেখা যায় না। রাজন্! ঋক্ বেদের ঋচাতে, যর্জুবেদের মন্ত্রে, অর্থববেদের সূক্তে এবং সামবেদেও তা দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রহ্মের সেই স্বরূপের কেউ সাক্ষাৎ পায় না, তা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত। মহাপ্রলয়ে সবকিছুর অন্তকারী কালও এতেই লীন হয়। এটি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর এবং মহৎ থেকে মহত্তর। তিনিই সবকিছুর আধার, অমৃত, লোক, যশ এবং তিনিই ব্রহ্ম। সমস্ত ভূত তাঁর থেকেই প্রকটিত এবং তাঁতেই লীন হয়ে যায়। বিদ্বানগণ বলেন—কার্যরূপ জগৎ বাণীর বিকারমাত্র। কিন্তু এই সম্পূর্ণ জগৎ যাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই নিত্যকারণ স্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন। এই ব্রহ্ম রোগ, শোক এবং পাপরহিত এবং তাঁর মহান যশ সর্বত্র প্রসারিত॥ ২৬-৩১॥

—o—

যোগপ্রধান ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন

(সনৎ সুজাতীয়—পঞ্চম অধ্যায়)

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্! শোক, ক্রোধ, লোভ, মোহ, কাম, মান, অধিক নিদ্রা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, কাপুরুষতা, গুণাদিতে দোষদর্শন এবং নিন্দা করা—এই বারোটি মহাদোষ মানুষের প্রাণনাশক। রাজেন্দ্র! মানুষ একে একে সব দোষ গ্রহণ করে এবং তার সংস্পর্শে মূঢ়বুদ্ধি মানুষ পাপকাজ করতে থাকে। লোলুপ, ক্রূর, কঠোরভাষী, কৃপণ, ক্রোধী এবং নিজ প্রশংসাকারী—এই ছয়প্রকারের মানুষ ক্রূর কর্মকারী হয়। এরা পেলেও ভালো ব্যবহার করে না। সম্ভোগকারী, বিষম ব্যবহারকারী, অত্যন্ত অহংকারী, স্বল্প দান করে অধিক বর্ণনাকারী, কৃপণ, দুর্বল হয়েও শক্তির অহংকার প্রদর্শনকারী এবং নারীবিদ্বেষকারী—এই সাত প্রকারের মানুষকে পাপী এবং ক্রূর বলা হয়েছে। ধর্ম, সত্য, তপ, ইন্দ্রিয় সংযম, ঈর্ষা না করা, লজ্জা সহনশীলতা, কারো দোষ না দেখা, দান, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য এবং ক্ষমা—ব্রাহ্মণদের এই হল বারোটি মহাব্রত। যিনি এই বারোটি ব্রত হতে কখনো চ্যুত হন না, তিনি সমস্ত পৃথিবী শাসন করতে সক্ষম। এরমধ্যে তিন, দুই বা একগুণেও যাঁরা যুক্ত—তাঁদেরও কোনো বস্তুতে মমত্ববোধ থাকে না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগ এবং অপ্রমাদ—এতেই অমৃতের স্থিতি হয়। ব্রহ্মই যাঁর প্রধান লক্ষ্য, সেই বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের এগুলিই মুখ্য সাধন। সত্য হোক অথবা মিথ্যা, অপরের নিন্দা করা ব্রাহ্মণদের শোভা পায় না। যারা অপরের নিন্দা করে তারা অবশ্যই নরকগমন করে। অহংকার বা দম্ভের আঠেরোটি দোষ, যা প্রথমে উল্লেখ করলেও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি—লোকবিরুদ্ধ কাজ করা, শাস্ত্রের প্রতিকূল আচরণ করা, গুণীদের ওপর দোষারোপ, অসত্যভাষণ, কাম, ক্রোধ, পরাধীনতা, অপরের দোষ দেখা, পরনিন্দা অর্থের অপব্যবহার, কলহ, হিংসা, প্রাণীদের কষ্ট দেওয়া,

ঈর্ষা, হর্ষ, বেশি কথা বলা ও বিবেক-শূন্যভাব। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তিদের অহংকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয় ; কারণ সংব্যক্তিরা সর্বদাই এর নিন্দা করে থাকেন। সৌহার্দ বা মিত্রতার ছয়টি গুণ অবশ্যই জেনে রাখা উচিত। সুহৃদের ভালো হলে তাতে হর্ষোৎফুল্ল হওয়া, খারাপ কিছু হলে মনে কষ্ট অনুভব করা—এই দুটি গুণ। তৃতীয় গুণ হল, নিজের যা সঞ্চিত ধন থাকে মিত্র চাইলে তা দিয়ে দিতে হয়। মিত্রের জন্য অযাচ্য বস্তুও অবশ্যই প্রদানযোগ্য হয়। তাছাড়াও সুহৃদ চাইলে তার হিতের জন্য শুদ্ধভাবে নিজ প্রিয় পুত্র, অর্থসম্পদ এবং পত্নীকেও দিয়ে দেওয়া যায়। মিত্রকে অর্থপ্রদান করে প্রত্যুপকার পাবার কামনা না করা—এ হল চতুর্থ গুণ। নিজ পরিশ্রমে অর্জিত ধন উপভোগ করা উচিত (মিত্রের উপার্জন অবলম্বন করে নয়)—এটি পঞ্চম গুণ। মিত্রের ভালো করার জন্য নিজের ভালোর পরোয়া না করা —এটি ষষ্ঠ গুণ। যে ধনী গৃহস্থ এইরূপ গুণবান, ত্যাগী ও সাত্ত্বিক হয়, সে তার পাঁচ ইন্দ্রিয় থেকে পাঁচটি বিষয়কে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। যিনি বৈরাগ্যের অভাব থাকায় সত্ত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, এরূপ মানুষের দিব্যলোক প্রাপ্তির সংকল্পে সঞ্চিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ তপস্যা সমৃদ্ধ হলেও, তা কেবল উর্ধ্বলোক প্রাপ্তির কারণ হয়, মুক্তির নয়। কারণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মবোধ না হওয়ায় তাদের দ্বারা সকাম যজ্ঞের বৃদ্ধি ঘটে। কারো যজ্ঞ মনের দ্বারা, কারো বাক্যের দ্বারা আবার কারো যজ্ঞ ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। সংকল্পসিদ্ধ অর্থাৎ সকামপুরুষ থেকে সংকল্পরহিত অর্থাৎ নিষ্কাম পুরুষের অবস্থান উচ্চে। কিন্তু ব্রহ্মবেত্তার অবস্থান তারও উর্ধ্বে। তাছাড়া আর একটি কথা, এই মহত্ত্বপূর্ণ শাস্ত্র যশরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করায়, এটি শিষ্যদের অবশ্যই পাঠ করানো উচিত। পরমাত্মা হতে ভিন্ন এই সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চ বাক্যের বিকারমাত্র—বিদ্বানরা এই কথা বলে থাকেন। এই যোগশাস্ত্রে পরমাত্মাবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যে এটি জেনে যায়, সে অমরত্ব লাভ করে। রাজন্ ! কেবল সকাম পুণ্যকর্মের দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জয় করা যায় না। অথবা যাগযজ্ঞ করেও অজ্ঞানী পুরুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে না এবং মৃত্যুকালেও সে শান্তি পায় না। সর্বপ্রকার কর্ম প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে একান্তে উপাসনা করা, মনে মনেও কোনো কাজ না করা এবং স্তুতিতে খুশি ও নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হওয়া উচিত। রাজন্ ! উপরিউক্ত সাধন করলে মানুষ এখানেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করে তাতে অবস্থিত হন। বিদ্বান ! বেদাদি বিচার করে আমি যা জেনেছি, তাই তোমাকে জানালাম॥ ১-২১ ॥

—o—
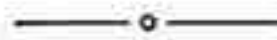
পরমাত্মার স্বরূপ এবং যোগিগণের দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার (সনৎ সুজাতীয়—ষষ্ঠ অধ্যায়)

সনৎসুজাত বললেন—ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ, মহান, জ্যোতির্ময়, দেদীপ্যমান এবং বিশাল যশরূপ ; সর্বদেবতা তাঁরই উপাসনা করেন। তাঁর প্রকাশেই সূর্য প্রকাশিত হন, সেই সনাতন ভগবানকে যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম থেকে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয় এবং তার থেকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই শুদ্ধ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মই সূর্য আদি সমস্ত জ্যোতির মধ্যে স্থিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন ; তিনি অপরের দ্বারা প্রকাশিত না হয়ে স্বয়ংই সকলের প্রকাশক, যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানেরই সাক্ষাৎ করেন। পরমাত্মা থেকে প্রকৃতি উৎপন্ন হয়েছে, প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব প্রকটিত, তার মধ্যে আকাশে সূর্য ও চন্দ্র— এই দুটি দেবতা আশ্রিত। জগৎ উৎপন্নকারী ব্রহ্মের যে স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, তা সর্বদা সতর্ক থেকে এই দুই দেবতা ও পৃথিবী এবং আকাশকে ধারণ করে। যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎ করেন। উক্ত দুই দেবতাকে, পৃথিবী এবং আকাশ, সর্বদিক এবং এই বিশ্বকে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই ধারণ করেন। তাঁর থেকেই দিক্‌গুলি প্রকটিত হয়, তাঁর থেকে নদী প্রবাহিত হয়, তাঁর থেকেই বড় বড় সমুদ্র প্রকটিত হয়। যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎ করেন। নিজে বিনাশশীল হলেও যাঁর কর্ম নষ্ট হয় না, সেই দেহরূপী রথে মনরূপ চক্রে সংযুক্ত ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়া, বুদ্ধিমান-দিব্য-অজর (নিত্য নবীন) জীবাত্মাকে যে পরমাত্মার দিকে নিয়ে যায়, সেই সনাতন ভগবানের যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। সেই পরমাত্মার সঙ্গে কারো

স্বরূপ তুলনীয় নয়। তাঁকে কেউ জাগতিক চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না। যিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে বুদ্ধি, মন ও হৃদয় দিয়ে জেনে যান, তিনি অমর হয়ে যান ; যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎকার করেন। দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ বিষয় যাঁর মধ্যে থাকে, অবিদ্যা নামক নদীর বিষয়রূপ মধুর জল ব্যবহারকারীরা ইহজগতে ভয়ংকর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, যে সনাতন পরমাত্মা এই দুর্গতি থেকে মুক্ত করেন, যোগিগণ তাঁর সাক্ষাৎ করেন। মধুমক্ষিকা যেমন অর্ধমাস-ব্যাপী মধুসংগ্রহ করে বাকি অর্ধমাস তা সেবন করে, তেমন সংসারী জীব পূর্বজন্মের সঞ্চিত ফল ইহজন্মে সেবন করে। পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীর জন্যই তার কর্মানুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন ; যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎ করেন, যাঁর বিষয়রূপ পাতাগুলি স্বর্ণের ন্যায় মনোরম। সেই জগৎ সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে আরূঢ় হয়ে জীব কর্মরূপ পাখাধারণ করে নিজ বাসনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতিতে জন্ম নেয় ; কিন্তু যাঁর জ্ঞান লাভ করে জীবগণ মুক্তিলাভ করেন, যোগিগণ সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন। পূর্ণ পরমেশ্বর থেকেই পূর্ণ-চরাচর প্রাণী উৎপন্ন হয়, পূর্ণ থেকেই এই সব পূর্ণ প্রাণী কাজ করে, তারপর সেই পূর্ণ ব্রহ্মেই তা মিলিত হয় এবং শেষে একমাত্র পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ; যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। পূর্ণ ব্রহ্ম থেকেই বায়ুর উৎপত্তি এবং তাতেই স্থিতি। ব্রহ্ম থেকেই অগ্নি এবং সোমের উৎপত্তি এবং তার থেকেই প্রাণের বিস্তার। আমি আর পৃথকভাবে নাম বলতে অসমর্থ ; শুধু জেনে রেখো সব কিছু সেই পরমাত্মা হতেই প্রকটিত। যোগিগণ সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। অপানকে প্রাণ নিজের মধ্যে লীন করে নেয়, প্রাণকে চন্দ্র, চন্দ্রকে সূর্য এবং সূর্যকে পরমাত্মা তাঁর মধ্যে লীন করেন, যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। এই সংসার সাগরের উপরে উত্থিত হংসরূপ পরমাত্মা নিজের একটি অংশকে ওপরে তোলেননি ; যদি সেই অংশটিও ওপরে উঠিয়ে নেন, তাহলে সকলের মোক্ষ ও বন্ধন, চিরকালের মতো দূর হবে। যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। হৃদ্দেশে স্থিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তর্যামী পরমাত্মা লিঙ্গশরীর ধারণ করে জীবাত্মারূপে সর্বদা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন। সকলের শাসক, স্তবনীয়, সর্বসমর্থ, সকলের আদিকারণ এবং সর্বত্র বিরাজমান সেই পরমাত্মাকে মূঢ় ব্যক্তিরা দেখতে পায় না ; কিন্তু যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ পান। কোনো ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন হোক অথবা সাধনহীন, সকল মানুষের মধ্যেই সমানরূপে এই ব্রহ্ম পরিলক্ষিত হন। তিনি বদ্ধ ও মুক্ত সবার মধ্যেই সমভাবে অবস্থিত। পার্থক্য শুধু এই যে, যিনি মুক্ত পুরুষ তিনি আনন্দের মূলস্রোত পরমাত্মাকে লাভ করেন। সেই সনাতন ভগবানকেই যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। বিদ্বান ব্যক্তিরা ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা ইহলোক এবং পরলোক—উভয়কেই ব্যাপ্ত করে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে তাঁরা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম না করলেও তাঁদের পূর্ণ বলেই জানতে হয়। রাজন্ ! এই ব্রহ্মবিদ্যা যেন তোমার মধ্যে লঘুত্ব প্রাপ্ত না হয় ; এর দ্বারা তুমি সেই প্রজ্ঞা লাভ করো যা ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা লাভ করেন। সেই প্রজ্ঞার দ্বারাই যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। এইভাবেই পরমাত্মাভাব লাভ করা মহাত্মা ব্যক্তি অগ্নিকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন। যিনি সেই পূর্ণ পরমেশ্বরকে জানতে পারেন, তিনি কৃতকৃত্য হয়ে যান। যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই পরমাত্মার স্বরূপ দেখা যায় না ; যাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত শুদ্ধ, তিনিই তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম। যিনি সকলের হিতৈষী এবং মনকে বশে রাখেন, যাঁর মনে কখনো দুঃখ হয় না—এইভাবে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি মুক্ত হয়ে যান। সেই সনাতন পরমাত্মাকে যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। সাপ যেমন নিজেকে গর্তে লুকিয়ে রাখে, দাম্ভিক ব্যক্তিরা তেমনই তাদের শিক্ষা ও ব্যবহারের দ্বারা তাদের পাপ লুকিয়ে রাখে। মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের ওপর বিশ্বাস করে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং যাঁরা যথার্থ পথ অর্থাৎ পরমাত্মার দিকে যেতে চান, তাঁদেরও সেই দাম্ভিক ব্যক্তিরা ভয় দেখিয়ে মোহগ্রস্ত করার চেষ্টা করে ; কিন্তু যোগিগণ ভগবৎকৃপায় তাদের ফাঁদে না পড়ে সেই সনাতন পরমাত্মাকেই সাক্ষাৎ করে থাকেন। রাজন্ ! আমি কখনো কারো অসম্মানের পাত্র হই না। আমার মৃত্যুও হয় না জন্মও হয় না, তাহলে মোক্ষ হবে কী প্রকারে (কারণ আমি নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম)। সত্য এবং অসত্য সবই আমাস্থিত সনাতন ব্রহ্মে অবস্থিত। আমিই একমাত্র সৎ ও অসতের উৎপত্তির স্থান। আমার স্বরূপভূত সেই সনাতন পরমাত্মাকেই যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। পরমাত্মার সাধু কর্মের সঙ্গেও

সম্পর্ক নেই, অসাধু কর্মের সঙ্গেও নয়। এই বিষমভাব দেহাভিমানী মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ব্রহ্মের স্বরূপ সর্বত্রই সমান বলে জানতে হবে। এইভাবে জ্ঞানযোগে যুক্ত হয়ে সেই আনন্দময় ব্রহ্মকেই লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মাকেই সাক্ষাৎ করেন। এই সকল ব্রহ্মবেত্তা পুরুষদের হৃদয় নিন্দাবাক্যে সন্তপ্ত হয় না। 'আমি স্বাধ্যায় করিনি, অগ্নিহোত্র করিনি' এইসব ব্যাপারও তাঁদের মনকে ক্লিষ্ট করে না। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদের অতি সত্বর স্থির বুদ্ধি প্রদান করে। সেই বুদ্ধিদ্বারা তাঁরা যা লাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মাকে যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন॥ ১-২৪ ॥

এইভাবে যিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিরন্তর পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সেইরূপ দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে নানা বিষয়াসক্ত মানুষের জন্য কেন শোক করবেন ? সর্বত্র জল পরিপূর্ণ স্থানে বাস করে যেমন কেউ জলের জন্য অন্যত্র যায় না, তেমনই আত্মজ্ঞানীর জন্য বেদাদির কোনো প্রয়োজন নেই। সেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তর্যামী পরমাত্মা সবার হৃদয়ে স্থিত কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তিনি অজ, চরাচরব্যাপ্ত স্বরূপ এবং সর্বদা অবস্থিত। যিনি তাঁকে জেনে যান, সেই বিদ্বান পরমানন্দে নিমগ্ন হন॥ ২৫-২৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র! আমিই সবার মাতা ও পিতা, আমিই পুত্র এবং সকলের আত্মাও আমি। যা আছে তা আমি আর যা নেই তা-ও আমিই। ভারত! আমি তোমার পিতামহ, পিতা এবং পুত্রও। তোমরা সকলে আমার আত্মাতেই অবস্থিত ; তবুও তুমি আমার নয়, আমিও তোমার নয় (কারণ আত্মা একই)। আত্মাই আমার স্থান, আত্মাই আমার জন্ম (উদ্গম)। আমি সবেতে ওতপ্রোত ও নিত্যনূতনভাবে অবস্থিত। আমি জন্মরহিত, চরাচরস্বরূপ সর্বক্ষণেই সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন। আমাকে জেনে বিদ্বান ব্যক্তিগণ পরম প্রসন্নতা লাভ করেন। পরমাত্মা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং বিশুদ্ধ মন সম্পন্ন, তিনিই সকল প্রাণীতে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান। সম্পূর্ণ প্রাণীতে হৃদয়কমলে অবস্থিত সেই পরম পিতাকে বিদ্বান ব্যক্তিরাই জানেন॥ ২৮-৩১ ॥

——০——

কৌরব সভায় এসে সঞ্জয়ের দুর্যোধনকে অর্জুনের সংবাদ জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! এইভাবে ভগবান সনৎ-সুজাত এবং বুদ্ধিমান বিদুরের সঙ্গে কথোপকথন করতে ধৃতরাষ্ট্রের সারারাত কেটে গেল। প্রাতঃকালে দেশ-দেশান্তরের রাজারা এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর এবং মহারাজ যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে ও দুঃশাসন, চিত্রসেন, শকুনি, দুর্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলূক আর বিবিংশতি কুরুরাজ দুর্যোধনের সঙ্গে সভায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা সকলেই সঞ্জয়ের মুখ থেকে পাণ্ডবদের ধর্মার্থযুক্ত কথা শোনার জন্য উৎসুক ছিলেন। সভায় এসে সকলেই নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে আসনে উপবেশন করলেন। এর মধ্যে দ্বারপাল জানাল যে, সঞ্জয় সভাদ্বারে উপস্থিত। সঞ্জয় সত্বর রথ থেকে নেমে সভায় এসে বলতে লাগলেন, 'কৌরবগণ ! আমি পাণ্ডবদের কাছ থেকে আসছি। তাঁরা আপনাদের সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! আমি জানতে চাই ওখানে রাজাদের মধ্যে দুষ্টদের বিনাশকারী অর্জুন কী বললেন ?
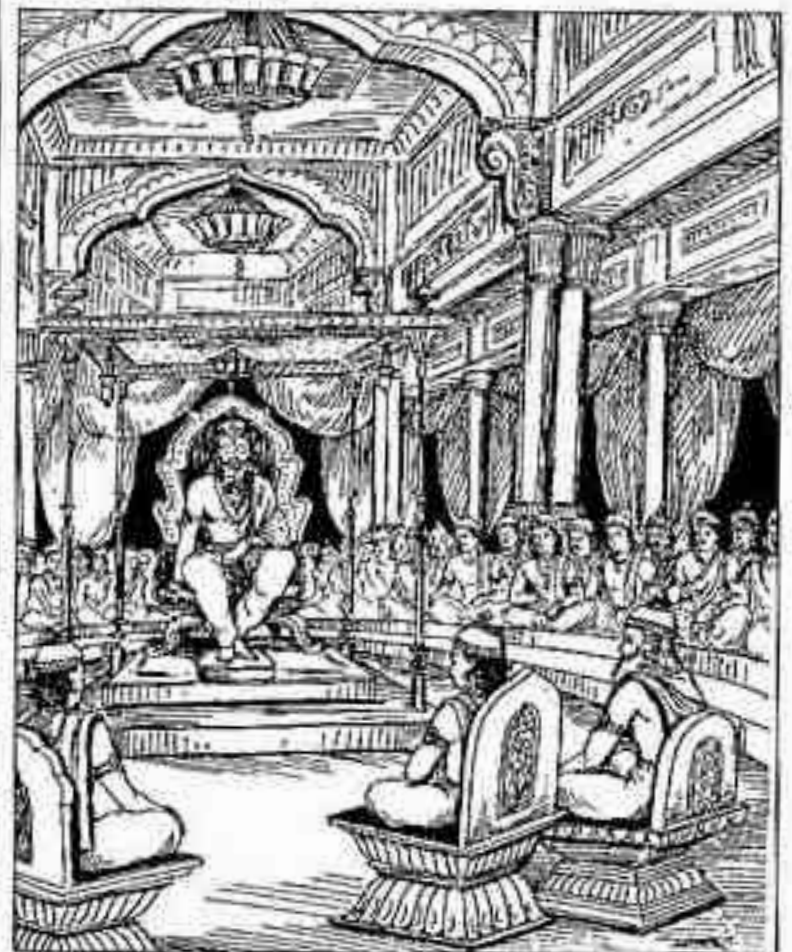
সঞ্জয় বললেন—রাজন্! সেখানে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মতিক্রমে মহাত্মা অর্জুন যা বলেছেন, কুরুরাজ দুর্যোধন তা শুনুন। তিনি বলেছেন যে 'যে কালের মুখে পতিত, অল্পবুদ্ধি, মহামূঢ় সূতপুত্র সর্বদাই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্পর্ধা দেখায় সেই কটুভাষী দুরাত্মা কর্ণ এবং যেসব রাজা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁদের শুনিয়ে তুমি আমার খবর এমন ভাবে দেবে যাতে মন্ত্রিগণসহ রাজা দুর্যোধনও সব শুনতে পান।' গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসুক বলে মনে হল। তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন—দুর্যোধন যদি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে রাজি না থাকেন, তাহলে জানবেন অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা এমন কোনো পাপকর্ম করেছে, যার ফলভোগ করতে তাদের বাকি আছে। দুর্যোধন যদি মনে করে থাকে যে, কৌরবরা ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং স্ব-ইচ্ছাতেই পৃথিবী এবং আকাশ ভস্ম করতে সমর্থ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তাহলে ঠিক আছে ; এতে পাণ্ডবদের মনোবাসনাই পূর্ণ হবে। পাণ্ডবদের হিতের জন্য আপনার সন্ধি করার কোনো প্রয়োজন নেই, যুদ্ধ হতে দেওয়াই উচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠির নম্রতা, সরলতা, তপ, দম, ধর্মরক্ষা এবং বল এই সব গুণে সম্পন্ন। তিনি বহুদিন ধরে বহু প্রকার কষ্ট সহ্য করলেও, সত্যকথাই বলেন এবং আপনাদের কপট ব্যবহার সহ্য করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যখন বহু বৎসর কষ্ট সহ্য করার পর একত্রিত হয়ে নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করবেন, তখন দুর্যোধনকে অনুতাপ করতে হবে। দুর্যোধন যখন রথে আরোহণ করে ভীমকে গদাহস্তে সবেগে আসতে দেখবেন, তখন তাঁর এই যুদ্ধ করার জন্য অনুতাপ করতে হবে। যেমন তৃণের কুটিরসমূহ একটিমাত্র আগুনের স্ফুলিঙ্গে ভস্মে পরিণত হয়, তেমনই নিজের বিশাল বাহিনীকে পাণ্ডবদের ক্রোধাগ্নিতে নিঃশেষ হতে দেখে দুর্যোধন যুদ্ধ করার জন্য নিশ্চয়ই অনুতাপ করবে। পরাক্রমী যোদ্ধা নকুল যখন যুদ্ধে শত্রুর মস্তকের পাহাড় তৈরি করবে, লজ্জাশীল সত্যবাদী ধর্মাচরণকারী সহদেব যখন শত্রু সংহার করতে করতে শকুনিকে আক্রমণ করবে এবং দুর্যোধন যখন দ্রৌপদীর

মহাধনুর্ধর ও রথযুদ্ধবিশারদ পুত্রদের কৌরবদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত দেখবে, তখন নিশ্চয়ই সে তার অতীত কর্মের কথা ভেবে দিশেহারা হবে। অভিমন্যু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলশালী ; যখন সে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাণবর্ষণ করে শত্রু সংহার করবে, দুর্যোধন তখন এই

যুদ্ধবীজ রোপণ করার জন্য অবশ্যই অনুতপ্ত হবে। যখন মহারথী বিরাট এবং দ্রুপদ নিজ নিজ সেনা নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন, তখন দুর্যোধনকে অনুতাপ করতেই হবে। কৌরবদের শিরোমণি ভীষ্ম যখন শিখণ্ডীর হাতে মারা পড়বেন তখন আমি সত্য বলছি যে, দুর্যোধনরা বাঁচার আর কোনো পথই খুঁজে পাবে না, তুমি এতে সন্দেহ প্রকাশ করো না। অতুল তেজস্বী সেনানায়ক ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন তাঁর বাণে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের আহত করে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করবেন তখন দুর্যোধন যুদ্ধ শুরু করার জন্য অনুতপ্ত হবে। সোমক বংশের শ্রেষ্ঠ মহাবলী যে সৈন্য দলের নেতা, তার বেগ শত্রু সহ্য করতে পারে না। তুমি দুর্যোধনকে গিয়ে বলবে রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করতে। কারণ আমরা শিনির পৌত্র, অদ্বিতীয় রথী মহাবলী সাত্যকিকে সহায়ক পেয়েছি। দুর্যোধন যখন রথে গাণ্ডীব ধনুক, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর দিব্য শঙ্খ, দুটি অক্ষয় তূণীর, দেবদত্ত শঙ্খসহ আমাকে দেখবে তখন তার যুদ্ধ করার জন্য অনুতাপ হবে। যুদ্ধ করার জন্য আমরা যখন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় কৌরবদের ভস্ম করতে থাকব তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত হবেন। দুর্যোধনের সমস্ত অহংকার ধূলিসাৎ হবে এবং ভাই, সেনা, সেবকসহ রাজা ভ্রষ্ট হয়ে কম্পিত হৃদয়ে

অনুতাপ করবে। আমি বজ্রধর ইন্দ্রের কাছে এই বর পেয়েছি যে, শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধে আমার সহায়ক হবেন।

একদিন আমি সকালে জপ-ধ্যান সমাপনে বসেছিলাম, তখন এক ব্রাহ্মণ এসে আমাকে বলেন—'অর্জুন! তোমাকে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তুমি কী চাও ? উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ায় বসে বজ্র হাতে ইন্দ্র তোমার শত্রুদের বধ করতে করতে প্রথমে যাবেন, না, সুন্দর ঘোড়াযুক্ত দিব্য রথে করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার রক্ষাকর্তা হয়ে পিছনে যাবেন ?' তখন আমি বজ্রপাণি ইন্দ্রের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণকেই যুদ্ধে সহায়করূপে বরণ করি। মনে হয় এ দেবতাদেরই বিধান। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ না করলেও, তিনি মনে মনে কারো জয় চাইলে তিনি অবশ্যই শত্রুদের পরাস্ত করবেন ; তা যদি দেবতা বা ইন্দ্র হন তাহলেও, মানুষের তো কথাই নেই। শ্রীকৃষ্ণই আকাশচারী সৌভায়নের প্রভু ভয়ংকর মায়াবী রাজা শাল্বর সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং সৌভের দরজাতেই শাল্ব নিক্ষিপ্ত শতঘ্নী হাত দিয়ে ধরে নিয়েছিলেন—যার বেগ কোনো মানুষই সহ্য করতে পারে না। আমি রাজ্যলাভের আশায় পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং বীর কৃপাচার্যকে প্রণাম করে যুদ্ধ করব। আমি মনে করি, যে সকল পাপাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তাদের নিধন ধর্মতঃ নিশ্চিত। আমি তোমাকে স্পষ্ট জানাচ্ছি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে রক্ষা পাবেন, যুদ্ধ হলে কেউ বাঁচবে না। আমি যুদ্ধে কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের বধ করে কৌরবদের রাজ্য নিশ্চয়ই জয় করে নেবো। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যেমন শত্রু সংহারে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত, তেমনই অদৃষ্ট জ্ঞাতা শ্রীকৃষ্ণেরও এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমিও যুদ্ধের পরিণাম তেমনই দেখতে পাচ্ছি। আমার যোগদৃষ্টিও ভবিষ্যৎ দর্শন করতে ভুল করে না। আমি স্পষ্ট দেখছি যে, যুদ্ধ হলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ জীবিত থাকবে না। গ্রীষ্মকালে দাবাগ্নি যেমন গহন বনকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, সেইরূপ আমিও বিভিন্ন অস্ত্র-বিদ্যা—স্থূলাকর্ণ, পশুপতাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ইন্দ্রাস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ করে শত্রুপক্ষের একজনকেও জীবিত রাখবো না। সঞ্জয়! তুমি ওঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দেবে যে, এইরূপ করলেই আমরা শান্তি পাব। সুতরাং পিতামহ ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও মহামতি বিদুর যা বলবেন, ওদের তাই করা উচিত। সেরূপ করলেই কৌরবরা জীবিত থাকতে পারবে।

—o—

কর্ণ, ভীষ্ম এবং দ্রোণের সম্মতি এবং সঞ্জয় কর্তৃক পাণ্ডবপক্ষের বীরদের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—ভরতনন্দন ! সেই সময় কৌরব সভায় সমস্ত রাজারা উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জয়ের ভাষণ সমাপ্ত হলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন—' কোনো এক সময় বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন এবং সকলে ব্রহ্মাকে বেষ্টন করে বসেছিলেন। সেইসময় দুজন প্রচীন ঋষি নিজেদের তেজে সকলের চিত্ত এবং তেজ হরণ করে সকলকে লঙ্ঘন করে চলে গেলেন। বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এঁরা দুজন কে ?

এঁরা আপনার উপাসনা না করেই চলে গেলেন ?' ব্রহ্মা বললেন—'এঁরা প্রবল পরাক্রমী নর-নারায়ণ ঋষি, যাঁরা তাঁদের তেজে পৃথিবী এবং স্বর্গকে প্রকাশিত করেন। এঁরা তাঁদের কর্মের দ্বারা সমগ্র লোকের আনন্দ বর্ধন করেছেন। এঁরা পরস্পর অভিন্ন হয়েও অসুর বিনাশ করার জন্য দুটি দেহ ধারণ করেছেন। এঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং শত্রুসন্তপ্তকারী। সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব এঁদের পূজা করেন।' শুনেছি এই যুদ্ধে যে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ একত্রিত হয়েছেন, তাঁরা দুজনই সেই নর-নারায়ণ নামের প্রচীন দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ হলেন নারায়ণ আর অর্জুন নর। প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ ও নর এঁরা দুজনেই দুই রূপে অভিন্ন প্রকাশ। দুর্যোধন ! যখন তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণকে নানা অস্ত্রে সজ্জিত গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সঙ্গে একই রথে দেখবে, তখন তোমার আমার কথা স্মরণ হবে। তুমি যদি আমার কথায় গুরুত্ব না দাও, তাহলে জেনো যে কৌরবদের অন্তকাল উপস্থিত হয়েছে এবং তোমার বুদ্ধি, ধর্ম ও অর্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার তো তিনজনের পরামর্শই উপযুক্ত বলে মনে হয়—এক সূতপুত্র অধম জাতি কর্ণের, দুই সুবলপুত্র শকুনির এবং তৃতীয় তোমার অল্পবুদ্ধি ভাই দুঃশাসনের।'

তখন কর্ণ বলে উঠলেন—'পিতামহ ! আপনি যা বলছেন, তা আপনার মতো বয়োবৃদ্ধের মুখে মানায় না। আমি ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থিত এবং কখনো আমার ধর্ম পরিত্যাগ করি না। আমি এমন কী দুষ্কর্ম করেছি, যার জন্য আপনি আমার নিন্দা করছেন ? আমি দুর্যোধনের কখনো কোনো অনিষ্ট করি না এবং আমি একাই সমস্ত পাণ্ডবদের যুদ্ধে বিনাশ করব।'

কর্ণের কথা শুনে পিতামহ ভীষ্ম রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন—'কর্ণ যে সর্বদাই বলে থাকে যে সে

পাণ্ডবদের বধ করবে, কিন্তু সে তো পাণ্ডবদের যোলো

অংশের এক অংশও নয়। তোমার দুষ্ট পুত্ররা যে অনিষ্ট ফল ভোগ করতে যাচ্ছে, তাতে এই দুষ্টবুদ্ধি সূতপুত্রের অবদান কম নয়। তোমার অল্পবুদ্ধি পুত্র দুর্যোধনও এর বলে বলীয়ান হয়েই পাণ্ডবদের অপমান করেছে। পাণ্ডবরা একত্রে অথবা পৃথকভাবে যেসব অসাধ্য কর্ম সাধন করেছে, এই সূতপুত্র তেমন কী পরাক্রম দেখিয়েছে ? বিরাট নগরে অর্জুন এর সামনেই যখন এর প্রিয় ভাইকে বধ করে তখন সে কী করতে পেরেছিল ? যখন অর্জুন একাই সমস্ত কৌরবদের আক্রমণ করে এবং একে পরাজিত করে এর বস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল, তখন সে কোথায় ছিল ? ঘোষযাত্রার সময় গন্ধর্বরা যখন তোমার পুত্রকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, কর্ণ তখন কোথায় ছিল ? এখন সে নানাকথা বলছে। সেখানে কিন্তু এই ভীম অর্জুন আর নকুল-সহদেবই গন্ধর্বদের পরাস্ত করেছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ ! কর্ণ বড়ই বাক্যবাগীশ, এর সব কথাই এই প্রকার অতিরঞ্জিত। এ ধর্ম ও অর্থ দুইই নষ্ট করে দেবে।'

ভীষ্মের কথা শুনে মহামনা আচার্য দ্রোণ তাঁর প্রশংসা করে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—রাজন্ ! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যা বলছেন, তেমনই করুন। যারা অর্থ ও কামের দাস, তাদের কথা শোনা উচিত নয়। আমি তো মনে করি যুদ্ধ না করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই ভালো। অর্জুন যা বলেছে এবং সঞ্জয় যে সংবাদ আপনাকে শুনিয়েছে, আমি তার সবই বুঝেছি। অর্জুনের ন্যায় ধনুর্ধর ত্রিলোকে নেই।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় কর্ণপাত না করে সঞ্জয়ের কাছে পাণ্ডবদের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! আমাদের এই বিশাল সেনার খবর শুনে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কী বলেছে ? যুদ্ধের জন্য তারা কীরূপ প্রস্তুত হয়েছে এবং তার আদেশ পাওয়ার জন্য কারা অপেক্ষা করছে ?'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল—উভয় পক্ষের সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের নির্দেশের অপেক্ষায় এবং তিনিও সকলকে সময়মতো নির্দেশ দিচ্ছেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য এইসব দেশের রাজারা সকলেই তাঁকে সম্মান করেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! তুমি বলো পাণ্ডবরা কাদের সহায়তায় আমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায় ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! পাণ্ডবদের পক্ষে যারা যোগদান করেছেন, তাঁদের নাম শুনুন। বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, হিড়িম্ব রাক্ষসও ওদের পক্ষে। ভীম তাঁর শক্তির জন্য বিখ্যাত, বারণাবত নগরে তিনিই পাণ্ডবদের দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। ভীম গন্ধমাদন পর্বতে ক্রোধবশ নামক রাক্ষসকে বধ করেছেন, তাঁর গায়ে দশহাজার হাতির বল। সেই মহাবলী ভীম যুদ্ধকালে অন্যান্য পাণ্ডবদের সঙ্গে আক্রমণ করবেন। অর্জুনের পরাক্রমের কথা আর কী বলব ! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একা অর্জুনই অগ্নির তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ দেবাদিদেব ত্রিশূলপাণি ভগবান শংকরকে যুদ্ধ দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন। এছাড়া ধনুর্ধর অর্জুনই সমস্ত লোকপালকে জয় করেছিলেন। সেই অর্জুনকে সঙ্গে নিয়েই পাণ্ডবরা আপনাদের আক্রমণ করবে। ম্লেচ্ছ অধ্যুষিত পশ্চিম দিক জয় করেছে যে নকুল, তিনিও এঁদের সঙ্গে থাকবেন এবং কাশী, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গ দেশ জয়ী সহদেবও তাঁদের সহায়ক হবেন। পিতামহ ভীষ্মকে বধের নিমিত্ত যিনি পুরুষরূপে জন্ম নিয়েছেন, সেই শিখণ্ডীও ধনুক হাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে রয়েছেন। কেকয়দেশের পঞ্চ ভ্রাতা বড়ই পরাক্রমশালী ও বীর, তাঁরাও সুসজ্জিত হয়ে আপনাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত। সাত্যকি অত্যন্ত বেগে অস্ত্রচালনা করেন। তাঁর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে। মহারথী কাশীরাজ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে পাণ্ডবদলে যোগ দিয়েছেন। যিনি বীরত্বে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ এবং সংযমে যুধিষ্ঠিরের সমান, সেই অভিমন্যুও ওঁদের সঙ্গে থেকে আপনাদের ওপর আক্রমণ হানবেন। শিশুপালের পুত্র এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব এবং জয়ৎসেন—এঁরা রথযুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রমী, এঁরাও পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। মহাতেজস্বী দ্রুপদ বহু সেনা দিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়েছেন। এইরূপ পূর্ব ও উত্তরদিকের আরও বহু রাজা পাণ্ডবপক্ষে আছেন, যাঁদের সাহায্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

—০—

পাণ্ডবপক্ষের বীরদের প্রশংসা করে ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! তুমি যাঁদের কথা উল্লেখ করলে, এঁরা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা। তা সত্ত্বেও একদিকে এঁদের সকলকে একসঙ্গে দেখ আর অন্যদিকে একা ভীমকে। অন্য সব জীব যেমন সিংহকে ভয় পায়, তেমনই আমি ভীমের ভয়ে সারারাত দুশ্চিন্তায় জেগে থাকি। কুন্তীপুত্র ভীম অত্যন্ত অসহিষ্ণু, ভীষণ প্রতিশোধ পরায়ণ, উন্মত্ত, বঙ্কিম দৃষ্টিধারী, গর্জনশীল, মহা বেগশালী, উৎসাহী, বিশাল বাহু এবং বলবান। সে যুদ্ধ করে অবশ্যই আমার অল্পবলী পুত্রদের মেরে ফেলবে। তার কথা স্মরণে এলেই আমার হৃদয় কম্পিত হয়। বাল্যাবস্থাতেও যখন আমার পুত্ররা ওর সঙ্গে খেলাধুলা করতে করতে যুদ্ধ করত, তখন ভীম ওদের হাতির মতো পিষে দিত। ও যখন ক্রুদ্ধ হয়ে

রণভূমিতে অবতীর্ণ হবে তখন গদা দ্বারা রথ, হাতি, মানুষ এবং ঘোড়া—সব কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। যুদ্ধক্ষেত্রে গদা হাতে এসে সে সব সৈন্য হটিয়ে প্রলয়নৃত্য করতে থাকবে। দেখো ! মগধের রাজা মহাবলী জরাসন্ধ সমস্ত পৃথিবীকে বশে এনে শোক সন্তপ্ত করে রেখেছিল ; কিন্তু ভীম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার অন্তঃপুরে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে। ভীমের বল শুধু আমি নয়— ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্যও ভালোমতো জানেন। আমার তাদের জন্যই দুঃখ হচ্ছে, যারা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ব্যগ্র। বিদুর প্রথমেই যে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন, আজ তাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন কৌরবদের যে বিপদ আসছে, তার প্রধান কারণ পাশা খেলা বলেই মনে হয়। আমি বড়ই মন্দমতি। হায় ! ঐশ্বর্যের লোভেই আমি এই মহাপাপ করেছি। সঞ্জয় ! আমি কী করব ? কেমন করে বাঁচব ? কোথায় যাব ? এই মন্দমতি কৌরবরা তো কালের অধীন হয়ে বিনাশের দিকেই যাচ্ছে। হায় ! শতপুত্রের মৃত্যুর পর যখন আমাকে অসহায় হয়ে তাদের পত্নীদের করুণ ক্রন্দন শুনতে হবে, তখন মৃত্যুও আমাকে গ্রাস করতে কুণ্ঠিত হবে। বায়ুর সাহায্যে যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি ঘাস-খড়ের গাদাকে ভস্মে পরিণত করে, তেমনই অর্জুনের সহায়তায় ভীম আমার সব পুত্রদের বধ করবে।

দেখো, আমি আজ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরকে একটিও মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি ; এছাড়া অর্জুনের মতো বীর ওর পক্ষে, সুতরাং সে তো ত্রিলোক জয় করতে সক্ষম। সারাক্ষণ ভেবেও আমি এমন কোনো যোদ্ধা দেখছি না যে রথযুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারে। বীরবর দ্রোণাচার্য এবং কর্ণ তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগোলেও তাঁরা যে অর্জুনকে পরাজিত করতে পারবেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং আমাদের জেতার কোনো আশা নেই। অর্জুন সমস্ত দেবতাদেরও জয় করেছে। কোথাও পরাজিত হয়েছে বলে আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি। কারণ স্বভাব ও আচরণে যিনি ওর সমকক্ষ, সেই শ্রীকৃষ্ণই ওর সারথি। সে যখন রণভূমিতে রোষভরে তীক্ষবাণের সাহায্যে যুদ্ধ করবে তখন বিধাতা সৃষ্ট সর্বসংহারক কালের ন্যায় তাকে পরাজিত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন রাজপ্রাসাদে বসে আমি নিরন্তর কৌরবদের পরাজিত হওয়ার এবং বিনাশের সংবাদ শুনব। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ সর্বদিক থেকে ভরতবংশের ওপর বিনাশকারী বলে সিদ্ধ হবে।

সঞ্জয় ! পাণ্ডবরা যেমন বিজয়লাভের জন্য উৎসুক, তেমনই তাঁদের পক্ষে যোগ দেওয়া সৈন্য-সামন্তগণও পাণ্ডবদের বিজয়লাভের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্গ্রীব। তুমি শত্রুপক্ষের পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য এবং মগধ দেশের রাজাদের নাম আমাকে বলেছ। জগৎস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র ইন্দ্রের সঙ্গে একত্র হয়ে ত্রিলোক বশীভূত করতে পারেন !

তিনিও পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত করেছেন। সাত্যকিও অর্জুনের থেকে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছে ; সে-ও যুদ্ধে বাণবর্ষা করবে। মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নও অত্যন্ত বীর, শস্ত্রজ্ঞ, তিনিও ওদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। আমার সবসময় যুধিষ্ঠিরের কোপ এবং অর্জুনের পরাক্রম ও নকুল-সহদেব আর ভীমের থেকে ভয় হয়। যুধিষ্ঠির সর্বগুণসম্পন্ন এবং জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। কোন মূঢ় পতঙ্গের মতো তাতে পুড়তে যাবে ? সুতরাং কৌরবগণ ! আমার কথা শোন। আমি মনে করি ওদের সঙ্গে যুদ্ধ না করাই ভালো। যুদ্ধ করলে অবশ্যই এই কুলের বিনাশ ঘটবে। এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত এবং তাতেই আমি শান্তিলাভ করব। তোমরা যদি যুদ্ধ না করা ঠিক করো তাহলে আমি সন্ধির জন্য চেষ্টা করব।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও দেখতে পাচ্ছি যে, গাণ্ডীব ধনুক দ্বারাই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হবে। দেখুন, এই কুরুজাঙ্গল তো পৈতৃক রাজ্য এবং অবশেষে সবই পাণ্ডবদের জয় করা রাজ্য আপনারা পেয়েছেন। পাণ্ডবরা তাঁদের বাহুবলে এইসব রাজ্য জয় করে আপনাদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা মনে করেন এগুলি আপনারাই জিতে লাভ করেছেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন যখন আপনার পুত্রদের বন্দী করেছিলেন, তখন অর্জুনই তাঁদের মুক্ত করে আনেন। বাণ চালানোতে অর্জুন শ্রেষ্ঠ, ধনুকের মধ্যে গাণ্ডীব শ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ এবং ধ্বজাগুলির মধ্যে বানর চিহ্নিত ধ্বজা সর্বশ্রেষ্ঠ। এগুলি সবই অর্জুনের কাছে আছে। সুতরাং যুদ্ধ হলে অর্জুন কালচক্রের ন্যায় আমাদের সকলের বিনাশ করবে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনি নিশ্চিতভাবে জানবেন—ভীম ও অর্জুন যার সহায়ক, সমস্ত পৃথিবী তারই অধীন।

—o—

দুর্যোধনের বক্তব্য এবং সঞ্জয় কর্তৃক অর্জুনের রথের বর্ণনা

সমস্ত কথা শুনে দুর্যোধন বললেন—'মহারাজ ! ভয় পাবেন না। আমাদের জন্য চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং শত্রুদের সংগ্রামে পরাস্ত করতে সক্ষম। যখন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে কিছুদূরে বনবাসী পাণ্ডবদের কাছে বিশাল সৈন্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন এবং কেকয়রাজ, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাণ্ডবদের মিত্র অন্যান্য মহারথী একত্রিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই আপনার ও কৌরবদের অত্যন্ত নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা আত্মীয়সহ আপনাকে বিনাশ করার জন্য প্রস্তুত এবং পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা বলছিলেন। এই কথা আমার কানে আসতেই আত্মীয় বিনাশের আশংকায় আমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে সে কথা জানাই। সেইসময় আমার মনে হচ্ছিল যে, পাণ্ডবরাই এবার রাজসিংহাসনে আসীন হবে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে 'শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের উৎখাত করে যুধিষ্ঠিরকেই কৌরবদের একচ্ছত্র রাজা করতে চান। এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত বলুন—তাদের কাছে মাথা নত করব ? ভয়ে পালিয়ে যাব ? না কী প্রাণের মায়া ছেড়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব ? যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করলে আমাদের অবশ্যই পরাজয় হবে ; কেননা সব রাজাই তাঁদের পক্ষে। দেশের প্রজাগণও আমাদের প্রতি

প্রসন্ন নয়। মিত্ররাও রুষ্ট হয়ে আছেন এবং সমস্ত রাজা ও আত্মীয় স্বজন আমাদের নানা কথা শোনাচ্ছেন।

আমার কথা শুনে দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য এবং

অশ্বত্থামা বলেছিলেন—'রাজন্ ! ভয় পেয়ো না। আমরা যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হব, শত্রু আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। আমরা প্রত্যেকে একাই সমস্ত রাজাদের হারাতে সক্ষম। ওদের আসতে দাও, আমরা তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে ওদের সমস্ত গর্ব ভেঙে দেব।' সেই সময় মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্যরাও এরূপই ঠিক করেছিলেন। আগে সমগ্র পৃথিবী আমাদের শত্রুদেরই অধীন ছিল, কিন্তু সব এখন আমাদেরই অধীনে। এছাড়া এখানে যেসব রাজা একত্রিত হয়েছেন, এঁরাও আমাদের সুখদুঃখকে নিজেদের বলেই মনে করেন। প্রয়োজন হলে এঁরা আমাদের জন্য আগুনেও প্রবেশ করতে পারেন এবং সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে পারেন বলে জানবেন। আপনি শত্রুদের সম্পর্কে নানা কথা শুনে দুঃখিত হয়ে বিলাপ করছেন এবং উন্মাদ প্রায় হয়েছেন দেখে এইসব রাজা মজা পাচ্ছেন। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে পাণ্ডবদের সমকক্ষ বলে মনে করেন। অতএব আপনি যে ভয়ে ভীত হচ্ছেন, তা দূর করুন।

মহারাজ ! যুধিষ্ঠিরও এবার আমার প্রভাবে এত ভীত হয়েছে যে নগরের পরিবর্তে পাঁচটি গ্রাম মাত্র ভিক্ষা চাইছে। আপনি যে কুন্তীপুত্র ভীমকে অত্যন্ত বলবান বলে মনে করেন, তাও আপনার ভ্রান্ত ধারণা। আপনি আমার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে জানেন না। পৃথিবীতে গদাযুদ্ধে আমার সমকক্ষ কেউ নেই, আগেও ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না। রণভূমিতে যখন ভীমের ওপর আমার গদাঘাত হবে তখন সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মরে মাটিতে পড়বে। অতএব এই মহাযুদ্ধে আপনি ভীমকে ভয় পাবেন না। বিষণ্ণ হবেন না, ওকে আমি অবশ্যই বধ করব। তাছাড়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগ্জ্যোতিষনগরের রাজা, শল্য এবং জয়দ্রথ—এইসকল বীররা প্রত্যেকেই পাণ্ডবদের বধ করতে সক্ষম। এঁরা যখন একত্রে ওঁদের আক্রমণ করবেন, তখন এক মুহূর্তেই ওদের সকলকে যমের দ্বারে পৌঁছে দেবে। গঙ্গাদেবীর পুত্র ব্রহ্মর্ষিকল্প পিতামহ ভীষ্মের পরাক্রম দেবতারাও সহ্য করতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত এই পৃথিবীতে তাঁকে বধ করারও কেউ নেই ; কারণ তাঁর পিতা শান্তনু প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বীর ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাও অস্ত্রে পারঙ্গম, আচার্য কৃপকেও কেউ বধ করতে পারবেন না। এইসব মহারথীগণ দেবতার ন্যায় বলশালী। অর্জুন এঁদের কারো দিকেই মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পাবে না। কর্ণকেও আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যেরই সমকক্ষ বলে মনে করি। সংশপ্তক ক্ষত্রিয়রাও তেমনই পরাক্রমশালী। তাঁরা অর্জুনকে বধ করতে নিজেদের পর্যাপ্ত বলে মনে করেন। তাই অর্জুন বধের জন্য আমি তাঁদেরই নিযুক্ত করেছি। রাজন্ ! আপনি মিথ্যাই পাণ্ডবদের ভয় পাচ্ছেন। আপনিই বলুন, ভীম মারা পড়লে ওদের মধ্যে কে আছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ? যদি কাউকে মনে হয়, তাহলে বলুন। শত্রু সেনার মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—এই সাতজন বীরই প্রধান বল। কিন্তু আমাদের পক্ষে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা, শল্য, অবন্তীরাজ বিন্দ-অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুঃসহ, শ্রুতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ—এইসব বড় বড় বীর এবং একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্রিত হয়েছে। শত্রুপক্ষে আমাদের থেকে কম—মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে। তাহলে আমরা কী করে পরাজিত হব ? সুতরাং আপনি আমার সেনাদের সক্ষমতা এবং পাণ্ডব সেনাদের দুর্বলতা বুঝে আর ভয় পাবেন না।'

এই কথা বলে রাজা দুর্যোধন সময় মতো সব কিছু জানার জন্য সঞ্জয়কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! তুমি তো পাণ্ডবদের খুব প্রশংসা করছ। বলো তো অর্জুনের রথে কেমন ঘোড়া আর কেমন ধ্বজা আছে ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ওই রথের ধ্বজায় দেবতারা মায়ার সাহায্যে নানাপ্রকার ছোটবড়, দিব্য-বহুমূল্য মূর্তি
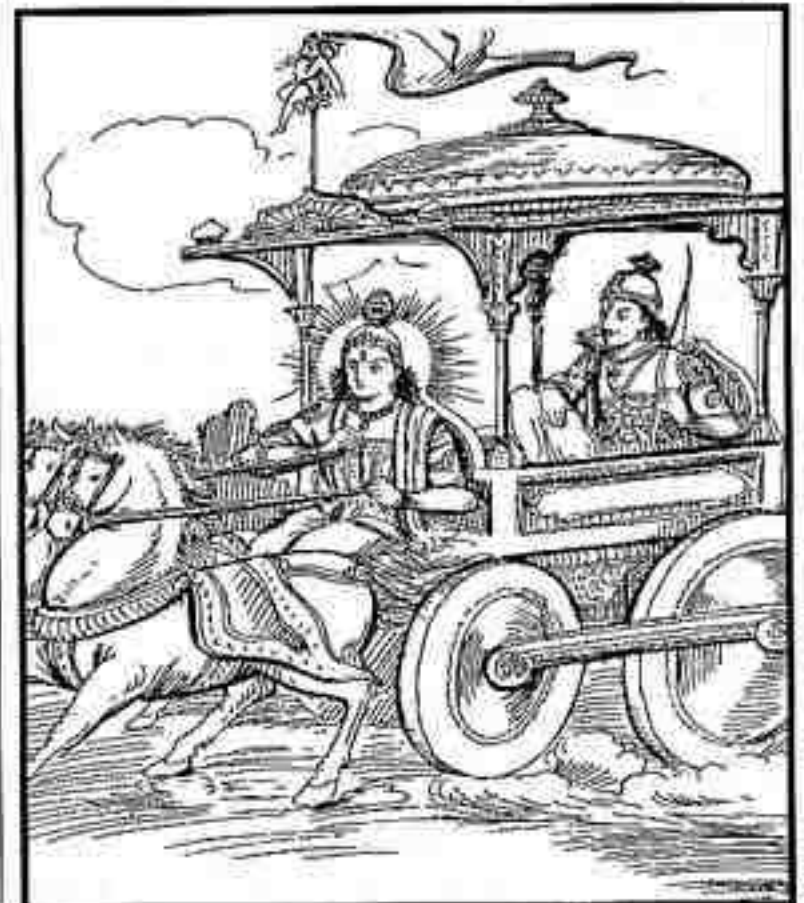
তৈরি করেছেন। পবননন্দন হনুমান তার ওপর নিজ মূর্তি স্থাপন করেছেন এবং সেই ধ্বজা সব দিকে এক যোজন অবধি প্রসারিত। বিধাতার এমনই মায়া যে বৃক্ষাদির জন্যও তার গতি কখনো রুদ্ধ হয় না। অর্জুনের রথে চিত্ররথ গন্ধর্ব প্রদত্ত বায়ুর ন্যায় বেগসম্পন্ন শ্বেতবর্ণের উত্তম ঘোড়া সংযুক্ত করা হয়েছে। তাদের গতি পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, কোনো স্থানেই বাধা পায় না এবং সেই ঘোড়াগুলির মধ্যে যদি কোনো একটি মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহলে বরের প্রভাবে সেই স্থানে নতুন ঘোড়া উৎপন্ন হয়ে সেই একশত সংখ্যা কখনো কমে না।

———০———

সঞ্জয়ের কাছে পাণ্ডবপক্ষের বীরদের বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন, দুর্যোধনের ক্ষোভ প্রকাশ এবং সঞ্জয়ের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানানো

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! যুধিষ্ঠিরের প্রসন্নতার জন্য যারা পাণ্ডবপক্ষে আমার পুত্রের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেই সৈন্যদলের শক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা দাও।

সঞ্জয় বললেন—আমি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের প্রধান শ্রীকৃষ্ণ এবং চেকিতান ও সাত্যকিকে ওখানে দেখেছি। এই দুই প্রসিদ্ধ মহারথী প্রত্যেকে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এবং পাঞ্চালনরেশ দ্রুপদ তাঁর দশপুত্র সত্যজিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এসেছেন। মহারাজ বিরাটও শঙ্খ এবং উত্তর নামক তাঁর পুত্র এবং সূর্যদত্ত ও মদিরাক্ষ প্রমুখ বীরদের সঙ্গে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এসেছেন। এছাড়া কেকয় দেশের পাঁচ সহোদর রাজাও এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে পাণ্ডবদের পক্ষে সমবেত হয়েছেন। আমি ওখানে শুধু এঁদেরই দেখে এসেছি, যাঁরা পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন।

রাজন্ ! সংগ্রামের জন্য শিখণ্ডীকে ভীষ্মের জন্য রাখা হয়েছে। তার পৃষ্ঠপোষকরূপে মৎস্য দেশীয় বীরদের সঙ্গে রাজা বিরাট থাকবেন। মদ্ররাজ শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুরক্ষিত রাখবে। দুর্যোধনের একশত ভ্রাতা ও পুত্রগণের দিকে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের ভাগে নজরে রাখবেন রাজা ভীমসেন। কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ভার অর্জুনের ওপর সমর্পণ করা হয়েছে। এছাড়াও যে রাজাদের সঙ্গে অন্য কারো যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাঁদেরও অর্জুন নিজে আক্রমণের পরিকল্পনা রেখেছেন। কেকয় দেশের যে মহাধনুর্ধর পাঁচ সহোদর রাজপুত্র আছেন, তাঁরা আমাদের পক্ষের কেকয় বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। দুর্যোধন ও দুঃশাসনের সব পুত্র এবং রাজা বৃহদ্বল সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর বিরুদ্ধে রাখা হয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নর নেতৃত্বে দ্রৌপদীর পুত্রগণ আচার্য দ্রোণের সম্মুখীন হবেন। সোমদত্তের সঙ্গে চেকিতানের রথযুদ্ধ হবে এবং ভোজবংশের কৃতবর্মার সঙ্গে সাত্যকি যুদ্ধ করবেন। মাদ্রীপুত্র সহদেব স্বয়ং আপনার শ্যালক শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান এবং নকুল উলূক, কৈতব্য এবং সারস্বতদের সঙ্গে যুদ্ধ করা স্থির করেছেন। এঁরা ব্যতীত আরও যেসব যোদ্ধা আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবেন পাণ্ডবরা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যোদ্ধা নিযুক্ত করেছেন।

রাজন্ ! আমি নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছিলাম, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বললেন—তুমি শীঘ্র এখান থেকে যাও এবং গিয়ে দুর্যোধনের পক্ষের বীরদের, বাহ্লীক, কুরু এবং প্রতীপের বংশধরদের, কৃপাচার্য, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, রাজা দুর্যোধন ও পিতামহ ভীষ্মকে সত্বর জানাও যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, নাহলে দেবতাদ্বারা সুরক্ষিত অর্জুন তোমাদের বধ করবে। তোমরা শীঘ্রই ধর্মরাজকে তাঁর রাজ্য সমর্পণ করো, তিনি পৃথিবীতে সুপ্রসিদ্ধ বীর, তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমী বীর যোদ্ধা এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। গাণ্ডীবধারী অর্জুনের রথ দেবতারা রক্ষা করেন, কোনো মানুষের পক্ষে তাঁকে হারানো সম্ভব নয় ; অতএব যুদ্ধের জন্য মন স্থির কোরো না।

একথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—দুর্যোধন ! তুমি যুদ্ধের চিন্তা ত্যাগ করো। মহাপুরুষগণ কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ

করাকে ভালো বলেন না। অতএব পুত্র ! তুমি পাণ্ডবদের যথোচিত অংশ দিয়ে দাও, তোমার ও তোমার পারিষদবর্গের জন্য অর্ধ রাজ্যই যথেষ্ট। দেখো, আমিও যুদ্ধে সম্মত নই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, সোমদত্ত, শল্য এবং কৃপাচার্যও যুদ্ধে রাজি নন। এ ছাড়া সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় এবং ভূরিশ্রবাও যুদ্ধের পক্ষে নেই। আমার মনে হয় তুমিও নিজ ইচ্ছায় যুদ্ধ করছ না ; পাপাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনিই তোমাকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে।

তখন দুর্যোধন বললেন—পিতা ! আমি আপনার, দ্রোণের, ভীষ্মের, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, কাম্বোজ নরেশ, কৃপ, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, ভূরিশ্রবা বা অন্যসব যোদ্ধার সাহায্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত হইনি। আমি, কর্ণ এবং দুঃশাসন—এই তিনজনেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিনাশ করব। হয় পাণ্ডবদের বধ করে আমি রাজা হব, নাহলে পাণ্ডবরাই আমাদের বধ করে রাজ্য ভোগ করবে। আমি ধন, জীবন ও রাজ্য সবকিছু ছাড়তে পারি ; কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সূচাগ্রে যেটুকু মাটি ধরে, সেটুকুও আমি ওদের দিতে পারব না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বন্ধুগণ ! তোমাদের—কৌরবদের জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। দুর্যোধনকে আমি ত্যাগ করেছি ; কিন্তু যারা এই মূর্খকে অনুসরণ করবে তারা অবশ্যই যমালয়ে যাবে। পাণ্ডবদের আঘাতে কৌরবসেনা যখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের আমার কথা স্মরণ হবে।' তারপর সঞ্জয়কে বললেন—'সঞ্জয় ! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন তোমাকে যা বলেছেন, আমাকে সব বলো ; আমার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে যেভাবে দেখেছি এবং তাঁরা যা বলেছেন, তা সবই আপনাকে জানাচ্ছি। মহারাজ ! আপনার বার্তা জানাবার জন্য আমি অত্যন্ত সতর্কভাবে করজোড়ে তাঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। সেইস্থানে অভিমন্যু বা নকুল-সহদেবও যেতে পারেন না। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণ দুটি অর্জুনের ক্রোড়ে রেখে বসেছিলেন। অর্জুন আমাকে বসার জন্য একটি স্বর্ণ আসন দিলে আমি সেটি হাতে নিয়ে মাটিতেই উপবিষ্ট হলাম। দুই মহাপুরুষকে একত্রে দেখে আমি ভীত হয়ে ভাবতে লাগলাম যে অল্প বুদ্ধি দুর্যোধন কর্ণের কথায় এই বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের ন্যায় বীরদের স্বরূপ চিনতে পারেননি। তখনই আমি দৃঢ়নিশ্চিত হলাম যে এঁরা দুজন যাঁর আদেশে থাকেন, সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমাকে তাঁরা আহারাদি দ্বারা তৃপ্ত করেন। তারপর ভালোভাবে বসে আমি ওঁদের আপনার বার্তা জানালাম। তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে উত্তর দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসে মৃদু কঠিন বাক্যে বলতে লাগলেন—'সঞ্জয় ! বুদ্ধিমান ধৃতরাষ্ট্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকে তুমি আমাদের হয়ে এই সংবাদ জানাবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের আমাদের প্রণাম জানাবে এবং কনিষ্ঠদের কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁদের বলবে ' তোমাদের মাথার ওপর এক মহা সংকট উপস্থিত হয়েছে ; সুতরাং তোমরা নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করো, ব্রাহ্মণদের দান করো এবং স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে কিছুদিন আনন্দ ভোগ করে নাও।' দেখো, দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণের সময় তিনি যে ' হে গোবিন্দ' বলে আমাকে ডেকেছিলেন, সেই ঋণ আমার ওপর বৃদ্ধি পেয়েছে ; সেই ঋণ এক মুহূর্তও আমি ভুলতে পারছি না। আরে, যার সঙ্গে আমি থাকি, সেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কে চাইবে ? আমার তো দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং নাগেদের মধ্যে এমন কেউ নজরে আসেনি যে রণভূমিতে অর্জুনের সম্মুখীন হওয়ার সাহস রাখে। তার পর্যাপ্ত প্রমাণ হল,

বিরাটনগরে অর্জুন একাই সমস্ত কৌরবদের মধ্যে হাহাকার ফেলে দিয়েছিল, যাতে তারা পালিয়ে বাঁচে। বল-বীর্য-তেজ-কাজের তৎপরতা, অবিষাদ ও ধৈর্য—এই সমস্ত গুণ অর্জুন ব্যতীত আর কারো মধ্যে দেখা যায় না।' অর্জুনকে উৎসাহ প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় গুরুগম্ভীর স্বরে এই কথাগুলি বললেন।

—o—

কর্ণের বক্তব্য, ভীষ্মের কর্ণকে অবমাননা, কর্ণের প্রতিজ্ঞা, বিদুরের বক্তব্য এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনকে বোঝানো

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কর্ণ তখন দুর্যোধনকে উৎসাহ দিতে বললেন—গুরু পরশুরামের কাছে আমি যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছি, তা এখনও আমার কাছে আছে। সুতরাং আমি অর্জুনকে পরাজিত করতে ভালোভাবেই সক্ষম, তাকে পরাস্ত করার ভার আমার। শুধু তাই নয়, আমি পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য এবং পুত্র পৌত্রাদিসহ অন্য পাণ্ডবদের বধ করে যোদ্ধাদের প্রাপ্ত যে লোক তা প্রাপ্ত করব। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং অন্য রাজারাও সকলে আপনার সঙ্গেই থাকুন ; পাণ্ডবদের আমি আমার প্রধান সেনাদের সাহায্যেই বিনাশ করব। এ আমার দায়িত্ব।'

কর্ণ এইসব বললে ভীষ্ম বলতে লাগলেন—'কর্ণ ! তোমার বুদ্ধি কালবশে নষ্ট হয়ে গেছে, তুমি কী এত বড় বড় কথা বলছ ? মনে রেখো, কৌরবদের আগেই তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সুতরাং তুমি নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করো। আরে ! খাণ্ডবদহনের সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন যা করেছে, তা শুনে তোমার কাণ্ডজ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। বাণাসুর এবং ভৌমাসুরকে বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করেন। এই ভয়ানক সংগ্রামে তিনি তোমার মতো বীরদের অনায়াসে বিনাশ করবেন।'

তাঁর কথা শুনে কর্ণ বললেন—'পিতামহ যা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে তেমনই—বরং তার চেয়েও বেশি। কিন্তু তিনি আমার সম্পর্কে যে কঠিন কথা বললেন, তার পরিণামও তিনি শুনে রাখুন। আমি আমার অস্ত্রত্যাগ করছি। আজ থেকে পিতামহ রণভূমি বা রাজসভাতে আমাকে আর দেখতে পাবেন না। আপনার দিন শেষ হলে তারপর পৃথিবীর রাজারা আমার প্রভাব দেখতে পাবেন।' এই কথা বলে মহাধনুর্ধর কর্ণ সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

পিতামহ ভীষ্ম তখন হেসে রাজা দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! কর্ণ তো সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তাহলে সে যে

রাজাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করল যে প্রত্যহ সহস্র বীর সংহার করবে, তা সে কেমন করে পূর্ণ করবে ? এর ধর্ম ও তপস্যা তখনই নষ্ট হয়ে গেছে, যখন সে ভগবান পরশুরামের কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণের পরিচয় দিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছে।'

ভীষ্ম যখন এইকথা বলছিলেন এবং কর্ণ অস্ত্রত্যাগ করে সভা ত্যাগ করলেন তখন অল্পবুদ্ধি দুর্যোধন বলতে লাগলেন—'পিতামহ ! পাণ্ডবরা এবং আমরা অস্ত্রবিদ্যা, অস্ত্র-সঞ্চালনের বেগ এবং যুদ্ধে সমান আর উভয়েই মানুষ ; তা সত্ত্বেও আপনার কেন মনে হচ্ছে যে পাণ্ডবরাই বিজয় লাভ করবে ? আমি, আপনি-দ্রোণাচার্য-কৃপাচার্য-বাহ্লীক বা অন্য রাজাদের ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে মনস্থির করিনি, পাঁচ পাণ্ডবকে আমি, কর্ণ আর ভাই

দুঃশাসনই তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা শেষ করে দেব।'

তখন মহাত্মা বিদুর বললেন—'বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা দমকেই কল্যাণের সাধন বলে জানিয়েছেন। যে ব্যক্তি দম, দান, তপ, জ্ঞান এবং স্বাধ্যায়ের অনুসরণ করে থাকেন, তিনি দান, ক্ষমা এবং মোক্ষ যথাবৎ প্রাপ্ত হন। দম তেজ বৃদ্ধি করে, দম পবিত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। যাঁর পাপ এইভাবে নিবৃত্ত হয়ে তেজ বৃদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তি পরমপদ প্রাপ্ত হন। রাজন্! যে ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধৈর্য, মৃদুভাব, লজ্জা, অচঞ্চলতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ এবং শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণ থাকে, তাদের দমযুক্ত বলা হয়। দমনশীল ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, নিদ্রা, বাক্য বিস্তার ; মান, ঈর্ষা এবং শোক—এগুলিকে নিজেদের কাছে আসতে দেন না। কুটিলতা এবং শঠতা বর্জিত হওয়া এবং শুদ্ধভাবে থাকা—ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের লক্ষণ। যে ব্যক্তি লোভবর্জিত, ভোগাদি বিমুখ এবং সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, তাকে বলে দমশীল ব্যক্তি। সদাচারসম্পন্ন, সুশীল, প্রশান্তচিত্ত, আত্মবিদ্ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহলোকে সম্মানলাভ করে মৃত্যুর পর সদগতি পায়।

তাত! আমরা পূর্বপুরুষের মুখে শুনেছি যে একদিন এক ব্যাধ পাখি ধরার উদ্দেশ্যে জাল পেতেছিল। সেই জালে একসঙ্গে থাকা দুটি পাখি ধরা পড়ে যায়। দুটি পাখি জালটি নিয়ে উড়ে চলতে লাগল। ব্যাধটি মন খারাপ করে তাদের পিছন পিছন দৌড়তে লাগল। এক মুনি সেই ব্যাধকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে ব্যাধ ! তুমি ওই পাখিদের পিছন পিছন ছুটছ কেন ?' ব্যাধ বলল—'এই দুটি পাখির খুব ভাব, তাই আমার জালটি দুজনে নিয়ে পালাচ্ছে। যখন ওদের মধ্যে ঝগড়া হবে তখনই আমি ওদের ধরে ফেলব।' কিছুক্ষণ পরে দুটি পাখির মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল, তারা দুটিতে লড়াই করতে করতে মাটিতে

এসে পড়ল। তখনই ব্যাধ চুপচাপ গিয়ে তাদের ধরে ফেলল। এইরূপ যখন দুজন আত্মীয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বাধে তখনই তারা শত্রুর কবলে পড়ে। ভালোবাসার কাজ হল একসঙ্গে বসে আহার করা, মিষ্ট কথা বলা, একে অপরের সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করা এবং মিলেমিশে থাকা, শত্রুতা না করা। যে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সময়মত গুরুজনদের আশ্রয় গ্রহণ করে সে সিংহদ্বারা সুরক্ষিত বনে বাস করে।

একবার কিছু ভীল এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আমরা গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলাম। আমরা সেখানে মধুভর্তি একটি মৌচাক দেখতে পেলাম। বহু বিষধর সর্প সেটি রক্ষা করছিল। সেই মধু বহুগুণযুক্ত ছিল। কোনো ব্যক্তি তা পান

করলে অমর হয়ে যায়, অন্ধ পান করলে দৃষ্টি ফিরে পাবে এবং বৃদ্ধ যৌবন প্রাপ্ত হবে। আমরা কবিরাজের কাছে একথা জেনেছি। ভীলেরা সেটি পাওয়ার লোভে গুহায় ঢুকে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। আপনার পুত্র দুর্যোধন তেমনই একাই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করতে চায়। মোহবশত সে মধু তো দেখেছে, কিন্তু নিজের বিনাশের রাস্তা দেখতে পায়নি। মনে রাখবেন, অগ্নি যেমন সব কিছু জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে তেমনই দ্রুপদ, বিরাট এবং ক্রুদ্ধ অর্জুন—এই যুদ্ধে কাউকে ছেড়ে দেবে না। তাই রাজন্ ! আপনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আপনার ক্রোড়ে স্থান দিন, নচেৎ এই দুই পক্ষের যুদ্ধে কে যে জিতবে—তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।'

বিদুরের বক্তব্য সমাপ্ত হলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র দুর্যোধন ! আমি তোমায় যা বলছি, মন দিয়ে শোন। তুমি অজ্ঞ পথিকের ন্যায় কুপথকে সুপথ বলে মনে করছ। তাই তুমি পঞ্চপাণ্ডবকে পরাস্ত করার কথা ভাবছ। কিন্তু মনে রেখো, ওদের পরাজিত করার চিন্তা করা নিজের প্রাণকেই সংকটে ফেলা। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে তাঁর দেহ, গৃহ, স্ত্রী, পরিবার ও রাজ্য এবং অপরদিকে অর্জুনকে রাখেন। অর্জুনের জন্য তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। যেখানে অর্জুন, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ থাকেন ; আর যে সৈন্যদলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, পৃথিবীর কাছে সেই শক্তি অজেয় হয়ে যায়। দুর্যোধন ! তুমি সৎ ব্যক্তি এবং তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদের কথানুসারে চলো এবং বয়োবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের কথায় মন দাও। আমিও কৌরবদের হিতের কথাই চিন্তা করছি। তোমার আমার কথাও শোনা উচিত এবং দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ এবং মহারাজ বাহ্লীকের কথায়ও মন দেওয়া উচিত। ভরতশ্রেষ্ঠ ! এঁরা সকলে ধর্মজ্ঞ এবং কৌরব ও পাণ্ডবদের ওপর সমান স্নেহশীল। অতএব তুমি পাণ্ডবদের সহোদর ভাই মনে করে অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দাও।'

———०———

বেদব্যাস এবং গান্ধারীর উপস্থিতিতে সঞ্জয়ের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শোনানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধনকে এই কথা বলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে আবার বললেন—'সঞ্জয় ! এবার যা বাকি আছে, তাও বলো। শ্রীকৃষ্ণের পর অর্জুন তোমাকে কী বলল ? তা শোনার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে।'

সঞ্জয় বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে কুন্তীপুত্র অর্জুন তাঁর সামনেই বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি পিতামহ ভীষ্ম, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, রাজা বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং ওখানে সমবেত সমস্ত রাজাদের আমার যথাযোগ্য সম্মান জানাবে এবং আমার হয়ে তাদের কুশল খবর নেবে এবং পাপাত্মা দুর্যোধন, তাঁর মন্ত্রী সকলকে শ্রীকৃষ্ণের সমাধানযুক্ত বার্তা জানিয়ে আমার হয়ে শুধু এটাই বলবে যে মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজের যে ন্যায্য ভাগ চাইছেন, তা যদি তুমি প্রত্যর্পণ না করো, তাহলে আমি আমার তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তোমার ঘোড়া, হাতি এবং পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে তোমাকেও যমালয়ে পাঠাবো।' মহারাজ ! তারপর আমি অর্জুনের কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁদের সংবাদ আপনাকে জানাবার জন্য সত্বর এখানে চলে এসেছি।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই কথাতে দুর্যোধন কোনোপ্রকার গুরুত্ব দিলেন না। সকলেই চুপ করে রইলেন। তারপর সেখানে অন্য যেসব রাজারা এসেছিলেন, তাঁরা উঠে যে যার নিজ স্থানে চলে গেলেন। সেই অবকাশে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! তোমার তো উভয় পক্ষের বলাবল সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাছাড়াও তুমি ধর্ম ও অর্থের রহস্য ভালোই জানো আর কোনো কিছুর পরিণাম তোমার অজানা নয়। সুতরাং তুমি ঠিক করে বলো যে এদের দুই পক্ষের মধ্যে কে সবল আর কে দুর্বল।'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! আমি কোনো কথাই আপনাকে একান্তে বলতে চাই না, এর ফলে আপনার অন্তরে বিদ্বেষ উৎপন্ন হবে। অতএব আপনি মহাতপস্বী ভগবান ব্যাসদেব এবং মহারানি গান্ধারীকে ডেকে নিন। তাঁদের দুজনের উপস্থিতিতে আমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কিত মাহাত্ম্য শোনাব।'

সঞ্জয়ের কথায় গান্ধারী এবং ব্যাসদেবকে সেখানে

আসার জন্য অনুরোধ করা হল। বিদুরও তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে এলেন। মহামুনি ব্যাসদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের মনোভাব জেনে বললেন—'সঞ্জয় ! ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে প্রশ্ন করছে, তার নির্দেশানুসারে তুমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বিষয়ে যা জানো সব ঠিকমতো বলো।'

সঞ্জয় বললেন—'অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনেই অত্যন্ত সম্মানিত ধনুর্ধর। শ্রীকৃষ্ণের চক্রের ভিতরের ভাগ পাঁচ হাত বিস্তৃত এবং তিনি এটি ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ করতে পারেন। নরকাসুর, শম্বর, কংস এবং শিশুপাল—এঁরা সব খুবই বড় বীর ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এঁদের খেলাচ্ছলেই বধ করেন। যদি একদিকে সমস্ত জগৎ আর অন্যদিকে একা শ্রীকৃষ্ণকে রাখা যায়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই অধিক হবে। তিনি ইচ্ছামাত্রই সমস্ত জগৎকে ভস্মীভূত করে ফেলতে পারেন। যেখানে সত্য, ধর্ম, লজ্জা এবং সরলতা বাস করে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই থাকেন আর যেখানে শ্রীকৃষ্ণের নিবাস সেখানে বিজয় থাকে। এই সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম জনার্দন খেলাচ্ছলেই পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গলোককে প্রেরিত করছেন। এখন তিনি সকলকে নিজ মায়ায় মোহিত করে পাণ্ডবদের নিমিত্ত করে আপনার অধর্মনিষ্ঠ মূঢ় পুত্রদের ভস্মীভূত করতে চান। শ্রীকেশবই নিজ চিৎশক্তির দ্বারা অহর্নিশ কালচক্র, জগৎচক্র এবং যুগচক্রকে চালিত করছেন। আমি সত্য বলছি—ইনিই একমাত্র কাল, মৃত্যু এবং সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের প্রভু এবং নিজ মায়াদ্বারা এই পৃথিবীকে মোহগ্রস্ত করে রাখেন। যাঁরা তাঁর শরণ গ্রহণ করেন তাঁরা মোহগ্রস্ত হন না।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত জগতের অধীশ্বর—তা তুমি কেমন করে জানলে আর আমি কেন জানি না ? এর রহস্য আমাকে বলো।'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! আপনার এ বিষয়ে জ্ঞান নেই আর আমার জ্ঞানদৃষ্টি কখনো মন্দ হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন, সে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবরূপ কখনো জানতে পারে না। আমি আমার জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশকারী অনাদি মধুসূদন ভগবানকে জানি।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! ভগবান কৃষ্ণে যে তোমার সর্বদাভক্তি থাকে, তার স্বরূপ কী ?'

সঞ্জয় বললেন—'মহারাজ ! আপনার কল্যাণ হোক, শুনুন। আমি কখনো কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করি না, কোনো ব্যর্থ ধর্মের আচরণ করি না, ধ্যানযোগের দ্বারা আমার দেহ-মন শুদ্ধ হয়েছে ; সুতরাং শাস্ত্রবাক্য দ্বারা আমার শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান হয়েছে।'

এসব শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন—'পুত্র দুর্যোধন ! সঞ্জয় আমাদের হিতকারী এবং বিশ্বাসের পাত্র ; সুতরাং তুমিও হৃষিকেশ, জনার্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করো।'

দুর্যোধন বললেন—'দেবকীনন্দন ভগবান কৃষ্ণ যতই ত্রিলোক সংহার করে থাকুন, তিনি যখন নিজেকে অর্জুনের সখা বলে ঘোষণা করেছেন, আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করব না।'

ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারীকে বললেন—'গান্ধারী ! তোমার এই দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন এবং অহংকারী পুত্র ঈর্ষাবশত সৎব্যক্তির পরামর্শ না শুনে অধোগতির দিকে যাচ্ছে।'

গান্ধারী বললেন—'দুর্যোধন ! তুমি অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি ও মূর্খ। আরে, তুমি ঐশ্বর্যের লোভে পড়ে নিজের গুরুজনদের নির্দেশ লঙ্ঘন করছ ! মনে হয় তুমি এবার তোমার ঐশ্বর্য, জীবন, পিতা, মাতা—সবার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। যখন ভীম তোমার প্রাণ বধ করতে আসবে, তখন তোমার পিতার কথা স্মরণ হবে।'

তখন মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন—'ধৃতরাষ্ট্র ! তুমি আমার কথা শোন। তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সঞ্জয় তোমার এমনই

দূত, যে তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। পুরাণ পুরুষ শ্রীহৃষীকেশের স্বরূপ সম্বন্ধে ওর সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে ; সুতরাং তুমি যদি ওর কথা শোন, তাহলে এ তোমাকে জন্ম-মরণের মহাভয় থেকে মুক্ত করবে। যারা কামনায় অন্ধ, তারা অন্ধের পিছনে লেগে অন্ধের মতো নিজ নিজ কর্ম অনুসারে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। মুক্তির পথ সব থেকে আলাদা, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই সেই পথ অনুসরণ করে। সেই পথ অনুসরণ করে মহাপুরুষগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন এবং তাঁদের কোথাও কোনো আসক্তি থাকে না।'

ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! তুমি আমাকে এমন কোনো নির্ভয় পথের কথা জানাও, যা অনুসরণ করলে আমি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারি এবং পরমপদ প্রাপ্ত হই।'

সঞ্জয় বললেন—'কোনো অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শ্রীহৃষীকেশকে লাভ করতে পারেন না। এছাড়া তাঁকে লাভ করার আর কোনো উপায় নেই। ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত উগ্র, এদের জয় করতে হলে সতর্ক হয়ে ভোগাদি পরিত্যাগ করতে হয়। প্রমাদ এবং হিংসা থেকে দূরে থাকা—এগুলি নিঃসন্দেহে জ্ঞানের প্রধান কারণ। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের অধীনে রাখাকেই বিদ্বানরা জ্ঞান বলে অভিহিত করেন। বাস্তবে এটি জ্ঞান এবং এটিই হল উপায়, যার দ্বারা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেই পরমপদ লাভ করতে পারেন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি আর একবার শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করো, যাতে তাঁর নাম এবং কর্মরহস্য জেনে আমি তাকে লাভ করতে পারি।'

সঞ্জয় বললেন—'আমি শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি নামের ব্যুৎপত্তি (তাৎপর্য) শুনেছি। তার মধ্যে যতটা আমার স্মরণে আছে, শোনাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রমাণের বিষয় নন। সমস্ত প্রাণীকে নিজ মায়াদ্বারা আবৃত করে থাকায় এবং দেবতাদের জন্মস্থান হওয়ায় তিনি 'বাসুদেব' ; ব্যাপক এবং মহান হওয়ায় তিনি 'বিষ্ণু' ; মৌন, ধ্যান এবং যোগের সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি 'মাধব', মধুদৈত্যকে বধ করায় এবং সর্বতত্ত্বময় হওয়ায় তিনি 'মধুসূদন'। 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ অস্তিত্ব এবং 'ণ' আনন্দের বাচক ; এই দুটি ভাবে যুক্ত হওয়ায় যদুকুলে অবতীর্ণ শ্রীবিষ্ণুকে 'কৃষ্ণ' বলা হয়। হৃদয়রূপ পুণ্ডরীক (শ্বেতকমল)ই তাঁর নিত্য আলয় এবং অবিনাশী পরমস্থান, তাই তাঁকে বলা হয় 'পুণ্ডরীকাক্ষ' এবং দুষ্টের দমন করায় তাঁকে 'জনার্দন' বলা হয়, কারণ তিনি কখনো সত্ত্বগুণ থেকে চ্যুত হন না এবং সত্ত্বও কখনো তাঁর থেকে কমে না, তাই তিনি শাশ্বত। আর্ষ ও উপনিষদে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি আর্ষভ, বেদই তাঁর নেত্র, তাই তিনি 'বৃষভেক্ষণ'। তিনি কোনো প্রাণী থেকেই উৎপন্ন নন, তাই 'অজ'। 'উদর'—ইন্দ্রিয়াদির আপনি স্বয়ং প্রকাশক এবং 'দাম' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকে দমন করায় আপনি 'দামোদর'। বৃত্তিসুখ ও স্বরূপসুখকে 'হৃষিক' বলে, তাঁদের ঈশ হওয়ায় তিনি 'হৃষীকেশ'। নিজ বাহু দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ ধারণ করায় তিনি 'মহাবাহু'। তাঁর কখনো অধঃ (নীচু) হলেও স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত, তাই 'অধোক্ষজ' এবং নরদের (জীবদের) অয়ন (আশ্রয়) হওয়ায় তিনি 'নারায়ণ'। যিনি সবেতে পূর্ণ এবং সকলের আশ্রয় তাঁকে 'পুরুষ' বলা হয় ; তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তিনি 'পুরুষোত্তম'। তিনি সৎ ও অসৎ—সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান এবং সর্বদা তাঁদের জানেন, তাই তিনি 'সর্ব'। শ্রীকৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য তাঁতে প্রতিষ্ঠিত, তাই 'সত্য'ও তাঁর নাম। তিনি বিক্রমণ (বামনাবতার কালে নিজ ক্রমে বিশ্বকে ব্যাপ্তকারী) হওয়ায় 'বিষ্ণু', জয় করায় তিনি 'জিষ্ণু', নিত্য বলে 'অনন্ত' এবং গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা হওয়ায় 'গোবিন্দ'। তিনি নিজ অস্তিত্বের বেগে অসত্যকে সত্যে প্রতিভাত করে সমস্ত প্রজাকে মোহিত করেন। নিরন্তর ধর্মে স্থিত মধুসূদনের স্বরূপ এমনই। সেই অচ্যুত ভগবান কৌরবদের বিনাশ থেকে বাঁচাতে এখানে পদার্পণ করবেন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! যারা নিজ চক্ষে ভগবানের তেজোময়রূপ দেখেন সেই ব্যক্তিদের ভাগ্যে আমার লোভ হচ্ছে। আমি আদি-মধ্য ও অন্তরহিত, অনন্তকীর্তি ও ব্রহ্মাদি হতে শ্রেষ্ঠ পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি। যিনি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্তা, যিনি দেবতা, অসুর, নাগ ও রাক্ষসাদির উৎপত্তিকারী এবং রাজা ও বিদ্বানদের প্রধান, সেই ইন্দ্রানুজ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি।'

—o—

কৌরবদের সভায় দূত হয়ে যাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

বৈশম্পায়ন বললেন—সঞ্জয় নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর রাজা যুধিষ্ঠির যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন— 'মিত্রবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ! আমি, আপনি ছাড়া এমন কাউকে দেখছি না, যে আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আপনার জন্যই আমি নির্ভয় হয়েছি এবং দুর্যোধনের কাছে রাজ্য ফিরে চাইছি।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনার সেবায় উপস্থিত। আপনি যা কিছু বলতে চান, বলুন। আপনি যা বলবেন, আমি সব পূর্ণ করব।'

যুধিষ্ঠির বললেন— 'রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্ররা যা করতে চান তা আপনি শুনেছেন। সঞ্জয় আমাদের যা বলেছেন, সেসব ওঁদেরই মত। কারণ দূত তার প্রভুর কথাই বলে, সে অন্য কথা বললে প্রাণদণ্ডের যোগ্য হয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বড় লোভ, তাই তিনি আমাদের ও কৌরবদের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন না হয়ে আমাদের রাজ্য না দিয়েই সন্ধি করতে চান। আমি তো এই ভেবেই তাঁর নির্দেশে দ্বাদশ বৎসর বনে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করলাম যে, তিনি তাঁর বাক্য রক্ষা করবেন। কিন্তু এখন তাঁকে লোভী বলে মনে হচ্ছে। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই করছেন না এবং নিজে মূর্খ পুত্রদের মোহে অন্ধ হওয়ায় তাদের নির্দেশেই চলছেন। জনার্দন ! একটু ভাবুন যে এর থেকে বেশি দুঃখ আর কী হতে পারে যে আমরা আমাদের মায়ের সেবা করতে পারছি না এবং পারছি না আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ করতে। কাশীরাজ, চেদিরাজ, পাঞ্চাল-নরেশ, মৎস্যরাজ এবং আপনি আমাদের সহায়ক হলেও আমি শুধু পাঁচটি গ্রামই চেয়েছি। আমি বলেছি অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং পঞ্চম অন্য যে কোনো গ্রাম তাঁরা আমাদের সমর্পণ করুন। যাতে আমরা পাঁচভাই একত্রে থাকতে পারি এবং ভরতবংশ বিনাশপ্রাপ্ত না হয়। কিন্তু দুষ্ট দুর্যোধন এতেও রাজি নয়, সে সবকিছুর ওপরই নিজ অধিকার রাখতে চায়। লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়, বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে লজ্জা থাকে না, সেই সঙ্গে ধর্ম চলে যায় এবং ধর্ম বিদায় নিলে শ্রীও বিদায় নেয়। শ্রীহীন পুরুষের থেকে স্বজন, সুহৃদ এবং ব্রাহ্মণরা দূরে থাকেন, পুষ্প-ফলহীন বৃক্ষে যেমন পক্ষী থাকে না। নির্ধন অবস্থা বড়ই দুঃখময়। কেউ কেউ এই অবস্থায় পড়লে মৃত্যুকামনা করে। যারা জন্ম থেকেই নির্ধন তারা এত কষ্ট পায় না, কষ্ট পায় তারা, যারা লক্ষ্মীলাভ করার পরে নির্ধন হয়ে যায়।

মাধব ! এই ব্যাপারে আমার প্রথম চিন্তা হল যে আমরা কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করে শান্তিপূর্বক সমানভাবে এই রাজ্যলক্ষ্মীকে উপভোগ করি ; যদি তা না হয়, তবে শেষে এই করতে হবে যে ওদের যুদ্ধে বধ করে এই সারা রাজ্য আমাদের অধীনে করতে হবে। যুদ্ধে তো সর্বদা বিবাদই থাকে এবং প্রাণ সংকটগ্রস্ত হয়। আমি নীতির আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধই করব। কারণ আমি রাজ্য ছাড়তেও চাই না এবং কুলনাশ হোক তা-ও চাই না। আমরা সাম-দান-দণ্ড- ভেদ —সমস্ত উপায়েই নিজ কাজ সিদ্ধ করতে চাই ; কিন্তু যদি সামান্য ক্ষতি স্বীকার করেও সন্ধি হয়, তাহলে সেটিই সবথেকে বড় কথা। সন্ধি না হলে, যুদ্ধ হবেই, তখন বীরত্ব দেখাতেই হবে। শান্তিতে কাজ না হলে কটুত্ব অবশ্যই আসে। পণ্ডিতরা এর উদাহরণ কুকুরের বিবাদেই দিয়েছেন। কুকুর প্রথমে লেজ নাড়ে, পরে একে অন্যের দোষ দেখে, তারপর গর্জন শুরু করে, তারপর দাঁত দেখিয়ে চিৎকার করতে থাকে, তারপরে তারা লড়াই শুরু করে। এদের মধ্যে যে বলবান সে অন্যের মাংস খায়। মানুষের মধ্যেও এর থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

শ্রীকৃষ্ণ ! আমি জানতে চাই যে এরূপ অবস্থা হলে আপনি কী করা উচিত বলে মনে করেন। এমন কী উপায় আছে, যাতে আমরা অর্থ ও ধর্ম থেকে বঞ্চিত না হই ! পুরুষোত্তম ! এই সংকটের সময় আপনি ছাড়া কে আমাদের পরামর্শ দেবে ? আপনার মতো প্রিয় এবং হিতৈষী এবং সমস্ত কর্মের পরিণাম জানা এমন আর কে আছেন ?'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আমি উভয়পক্ষের হিতার্থে কৌরব সভায় যাব এবং সেখানে আপনার লাভের পথে কোনো বাধা দান না করে যদি সন্ধি করা সম্ভব হয়, তাহলে মনে করব আমার দ্বারা কোনো একটি পুণ্যকার্য সম্ভব হয়েছে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যে সেখানে যাবেন, তাতে আমার সম্মতি নেই ; কারণ বহু যুক্তিপূর্ণ কথা বললেও দুর্যোধন তা মেনে নেবেন না। এখন ওখানে দুর্যোধনের অধীন সমস্ত রাজাও একত্রিত আছেন, তাই সেখানে তাদের মধ্যে আপনার যাওয়া আমার ভালো মনে হচ্ছে না। মাধব ! আপনার কষ্ট হলে অর্থ, সুখ ও দেবত্ব এবং সমস্ত দেবগণের উপর আধিপত্য হলেও আমরা প্রসন্ন হতে পারব না।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহারাজ ! দুর্যোধন যে কত পাপী তা আমি জানি ! কিন্তু আমরা যদি নিজে থেকে সমস্ত কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিই, তাহলে কেউই আমাদের দোষী বলতে পারবে না। আমার বিপদের কথা ভাবছেন ? সিংহের সামনে যেমন অন্য কোনো বন্য প্রাণী টিকতে পারে না, তেমনই আমি যদি ক্রুদ্ধ হই, তাহলে কোনো রাজাই আমার সম্মুখীন হতে পারবে না। সুতরাং ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে কোনো প্রকারেই নিরর্থক নয়। কাজ সফল হতেও পারে, তা যদি না হয় তাহলেও অন্ততপক্ষে নিন্দার হাত থেকে রক্ষা হবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন— 'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যদি তাই উচিত মনে করেন তাহলে আপনি প্রসন্ন মনে কৌরবদের কাছে গমন করুন। আশা করি, আপনাকে কার্য সফল করে কুশলে ফিরতে দেখব। আপনি ওখানে গিয়ে কৌরবদের শান্ত করুন, যাতে আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি। আপনি আমাদেরও জানেন, কৌরবদেরও জানেন ; সুতরাং আমাদের উভয় পক্ষের হিত কীসে তা আপনি ভালোই জানেন। আলাপ আলোচনাতেও আপনি দক্ষ। অতএব যাতে আমাদের মঙ্গল হয় আপনি তাই করুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! আমি সঞ্জয় ও আপনার উভয়ের কথা শুনেছি এবং আপনাদের এবং কৌরবদের আন্তরিক ইচ্ছাও জানি। আপনার বুদ্ধি ধর্মের আশ্রিত আর ওদের মনোভাব কপটতায় পরিপূর্ণ। যা বিনা যুদ্ধে পাওয়া যায়, আপনি সেটিই ভালো বলে মনে করেন। কিন্তু মহারাজ ! ক্ষত্রিয়ের এটি স্বাভাবিক কর্ম নয়। আশ্রমবাসীরা বলে থাকেন ক্ষত্রিয়দের ভিক্ষা করা উচিত নয়। বিধাতা তাঁদের জন্য একেই সনাতন ধর্ম বলেছেন যে ক্ষত্রিয়রা হয় সংগ্রামে জয়লাভ করবেন নতুবা যুদ্ধে মৃত্যুলাভ করবেন। ক্ষত্রিয়দের তাই হল স্বধর্ম, দীনতা তাদের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। রাজন্ ! দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করলে ক্ষত্রিয়ের জীবিকা চলে না। অতএব আপনিও পরাক্রমপূর্বক শত্রুদমন করুন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা অত্যন্ত লোভী। বহুদিন ধরে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে সুব্যবহার করে দুর্যোধন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, এতে তার শক্তি অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই সে যে আপনার সঙ্গে সন্ধি করবে, তা মনে হয় না। তাছাড়া ভীষ্ম, কৃপাচার্য প্রমুখের জন্যও সে নিজেকে শক্তিশালী মনে করছে। সুতরাং আপনি যতক্ষণ ওর সঙ্গে নরমভাবে কথা বলবেন, ও আপনার রাজ্য দখল করার চেষ্টাই করবে। রাজন্ ! এরূপ কুটিল স্বভাব ব্যক্তির সঙ্গে সন্ধি করার চেষ্টা করবেন না ; শুধু আপনারই নয়, দুর্যোধন তো সকলেরই বধ্য।

যখন পাশাখেলা হয়েছিল এবং দুঃশাসন ক্রন্দনরতা অসহায় দ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণ করে রাজসভায় টেনে আনে, তখন দুর্যোধন বারংবার ভীষ্ম ও দ্রোণের সামনে তাঁকে গাভী বলে ডাকছিল। সেইসময় আপনি আপনার মহাপরাক্রমশালী ভাইদের বাধা দিয়েছিলেন। ধর্মপাশে বাঁধা থাকায় তখন তাঁরা এর কোনো প্রতিকার করতে পারেননি। কিন্তু দুষ্ট এবং অধম ব্যক্তিকে বধ করাই উচিত। অতএব আপনি কোনো চিন্তা না করে ওকে বধ করুন। তবে আপনি যে পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতামহ ভীষ্মের প্রতি বিনয়ভাব প্রদর্শন করেন, তা আপনার যোগ্য কাজ। আমি কৌরবসভায় গিয়ে সমস্ত রাজাদের সামনে আপনার গুণাবলী প্রকাশ করব এবং দুর্যোধনের দোষগুলি জানাব। ধর্ম ও অর্থের অনুকূল কথাও আমি বলব। শান্তির কথা বললেও আপনার অপযশ হবে না। সব রাজাই ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরবদেরই নিন্দা করবেন। আমি কৌরবদের কাছে গিয়ে এমন ভাবে সন্ধির কথা বলব যাতে আপনার স্বার্থ

সাধনে কোনো ত্রুটি না থাকে, তা ছাড়া আমি ওদের গতিবিধিও জেনে নেব। আমার তো মনে হয় শত্রুদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবেই ; আমি সেইরকম লক্ষণই দেখছি। অতএব আপনারা সব বীররা একত্র হয়ে শস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, রথ, হাতি এবং ঘোড়া প্রস্তুত করুন। তাছাড়া যুদ্ধোপযোগী সমস্ত সামগ্রীও একত্রিত করুন। এটা জেনে রাখুন যতক্ষণ দুর্যোধন জীবিত থাকবে, ও কোনোভাবেই আপনাদের কিছু দেবে না।'

—o—

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকির কথাবার্তা

ভীমসেন বললেন—মধুসূদন ! আপনি কৌরবদের এমন কথা বলবেন যাতে তাঁরা সন্ধি করতে প্রস্তুত হয়ে যান ; ওঁদের যুদ্ধের কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করবেন না। দুর্যোধন অত্যন্ত অসহনশীল, ক্রোধী, অদূরদর্শী, নিষ্ঠুর, নিন্দুক এবং হিংসুটে। সে মরে গেলেও নিজ জেদ ছাড়বে না। গ্রীষ্মকালে দাবানল হলে যেমন সমস্ত বন ভস্মীভূত হয়, তেমনই দুর্যোধনের ক্রোধে একদিন সমস্ত ভরতবংশ ভস্ম হয়ে যাবে। কেশব ! কলি, মুদাবর্ত, জনমেজয়, বহুল, বসু, অজাবিন্দু, রুষর্দ্ধিক, অর্কজ, ধৌতমূলক, হয়গ্রীব, বরযু, বাহু, পুরূরবা, সহজ, বৃষধবজ, ধারণ, বিগাহন এবং শম—এই আঠারোজন রাজা এইভাবেই নিজেদের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুদের সংহার করেছিলেন। এখন কুরুবংশীয়দের সংহারের সময় এসেছে। তাই কালগতি চক্রে এই কুলাঙ্গার পাপাত্মা দুর্যোধনের জন্ম হয়েছে। সুতরাং আপনি মিষ্ট ও কোমল বাক্যে ওদের ধর্ম ও অর্থযুক্ত হিতের কথা বলবেন, দেখবেন সেই কথা যেন তাদের মনোমত হয়। আমরা সকলেই দুর্যোধনের বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে রাজি আছি, যাতে ভরতবংশের বিনাশ না হয়। আপনি কৌরব সভায় গিয়ে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ এবং অন্যান্য সভাসদদের বলবেন যে, তাঁরা যেন এমন কিছু করেন যাতে আমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে ভালোবাসা থাকে এবং দুর্যোধন শান্ত হয়।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভীমসেনের কাছে কেউ কখনো নম্রভাষা শোনেনি। সুতরাং তাঁর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ হেসে ফেললেন, তারপর ভীমসেনকে উত্তেজিত করার জন্য বললেন, 'ভীমসেন ! তুমি তো অতীতে সর্বদাই এই ক্রূর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বধ করার জন্য যুদ্ধ করতেই প্রস্তুত ছিলে। তাছাড়া তুমি তোমার ভাইদের সামনে গদা তুলে প্রতিজ্ঞাও করেছ যে তুমি যুদ্ধভূমিতে গদা দিয়ে দ্বেষদূষিত দুর্যোধনকে বধ করবে। কিন্তু এখন দেখছি যে যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলে যেমন যুদ্ধ উন্মুখ বীরদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে
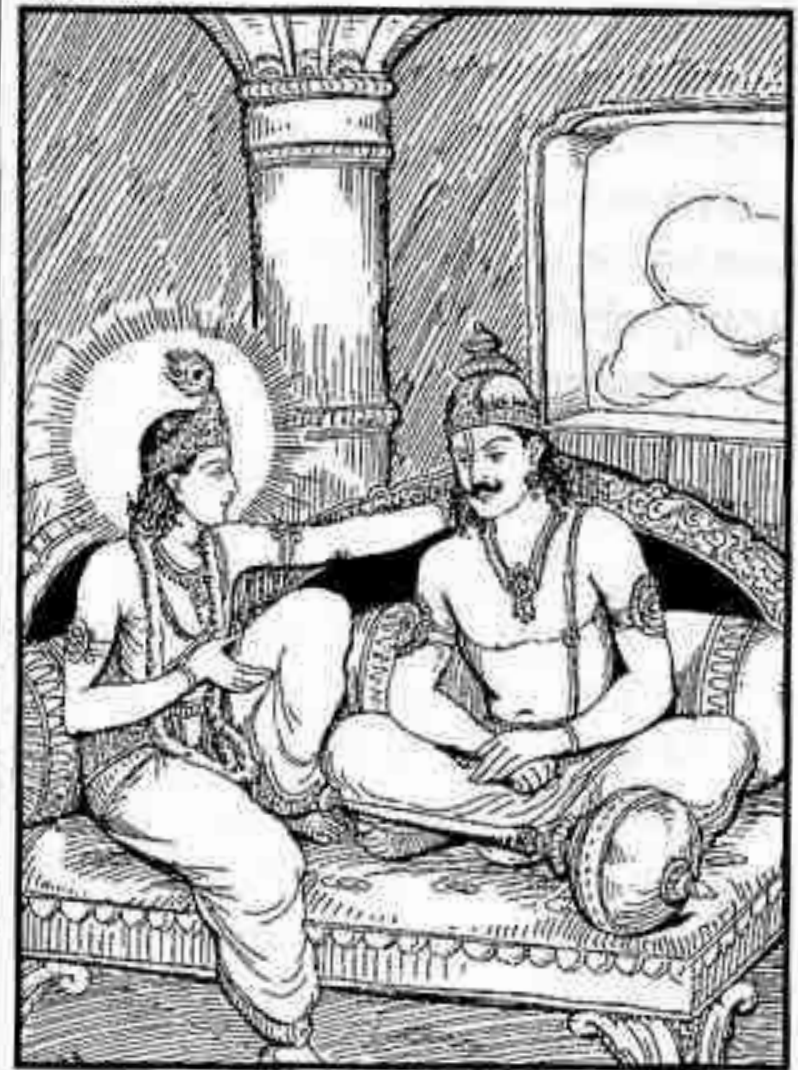
তেমনই তুমি যুদ্ধে ভয় পাচ্ছ। এ তো অত্যন্ত দুঃখের কথা। এই সময় তুমি নপুংসকদের মতো কথা বলছ ! হে ভরতনন্দন ! তুমি তোমার কুল, জন্ম এবং কর্মের ওপর দৃষ্টি রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। কোনো কিছুর জন্য বৃথা দুঃখ কোরো না, নিজ ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে সজাগ থাকো। তোমার মনে যে এইসময় বন্ধুবধের জন্য গ্লানি উৎপন্ন হয়েছে, তা তোমার যোগ্য নয় ; কারণ ক্ষত্রিয়রা যা পুরুষার্থ দ্বারা লাভ করে না, তা তারা কাজে লাগায় না।'

ভীমসেন বললেন—'বাসুদেব ! আমি অন্য কিছু বলতে চাইছিলাম, আপনি অন্য কথা বুঝেছেন। আমার বল এবং পুরুষার্থ অন্য কোনো পুরুষের পরাক্রমের থেকে কম নয়।

নিজ মুখে নিজের গর্ব করা—সৎপুরুষদের পক্ষে উচিত নয়। কিন্তু আপনি আমার পুরুষার্থের নিন্দা করেছেন, তাই আমাকে নিজের বলের কথা বর্ণনা করতে হবে। লৌহদণ্ডের ন্যায় শক্ত মোটা আমার এই হাত দুটিকে দেখুন। এর কবলে পড়ে বেঁচে ফিরে যাবে—এমন কাউকে দেখি না। আমি যাকে আক্রমণ করব, ইন্দ্রেরও সাধ্য নেই তাকে রক্ষা করার। আমি যখন পরাক্রমশালী রাজাদের পরাস্ত করে আমাদের অধীন করেছিলাম, আপনি কী সেসব ভুলে গেছেন ? যদি সমস্ত পৃথিবী আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবুও আমি ভয় পাই না। আমি সৌহার্দের জন্যই শান্তির কথা বলেছি ; আমি দয়াপরবশ হয়ে সব কষ্ট সহ্য করতে চাই এবং তাই ভরতবংশের বিনাশ হোক, তা আমি চাই না।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ভীমসেন ! আমি তোমার মনের ভাব জানার জন্যই ভালোবেসে এসব কথা বললাম, নিজের বুদ্ধি বা ক্রোধ দেখাতে একথা বলিনি। আমি তোমার প্রভাব এবং পরাক্রম ভালোমতোই জানি, তোমাকে আমি অসম্মান করতেই পারি না। কাল আমি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তোমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সন্ধির চেষ্টা করব। তিনি যদি সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেন, তাহলে আমার যশ হবে, আপনাদের কাজ হবে এবং ওঁদেরও খুব উপকার হবে। আর যদি অহংকারবশত ওঁরা আমার কথা মেনে না নেন, তাহলে ভয়ংকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হবে। ভীমসেন ! এই যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব তোমাকে অথবা অর্জুনকেই বহন করতে হবে, অন্য সকলে তোমাদের নির্দেশ পালন করবে। যুদ্ধ হলে আমি অর্জুনের রথের সারথি হব, অর্জুনেরও তাই ইচ্ছা। এতে তুমি যেন ভেবো না যে আমি যুদ্ধ করতে চাই না। তাই তুমি যখন কাপুরুষের মতো কথা বলছিলে, তখন তোমার চিন্তার ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। সেইজন্য আমি ওইসব কথা বলে তোমার তেজ বৃদ্ধি করে দিয়েছি।'

অর্জুন তখন বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ, যা বলার ছিল, মহারাজ যুধিষ্ঠির সেসব বলে দিয়েছেন। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, লোভ এবং মোহের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করা সহজ হবে না বলে আপনার মনে হচ্ছে। কিন্তু কোনো কাজ ঠিকমতো করলে তা অনেক সময় সফলও হয়। অতএব আপনি এমন কিছু করুন, যাতে সন্ধি হয়। আপনি যা ভাবছেন, আমরা তা-ই সমর্থন করি। কিন্তু যিনি ধর্মরাজের ঐশ্বর্য দেখে সহ্য করতে পারেননি এবং কপটদ্যূতে কুটিল উপায়ে তাঁর রাজ্য সম্পদ হরণ করেছেন, সেই দুরাত্মা দুর্যোধন কী তাঁর পুত্র- পৌত্র, বন্ধু-বান্ধব-সহ মৃত্যুমুখে প্রেরণের যোগ্য নয় ? ওই পাপী সভার মধ্যে যেভাবে দ্রৌপদীকে অসম্মানিত করে কষ্ট দিয়েছিল, তাতো আপনি জানেন। আমরা তাও সহ্য করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে সেই দুর্যোধন এখন পাণ্ডবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। ঊষর জমিতে বীজ বপন করে কেউ কি অংকুরিত হবার আশা করেন ? সুতরাং আপনি যা ভালো মনে করেন এবং পাণ্ডবদের যাতে মঙ্গল হয়, সেই কাজ করুন এবং আমরা কী করব তাও বলুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহাবাহো অর্জুন ! তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমি যাতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মঙ্গল হয়, সেই কাজই করব। কিন্তু প্রারব্ধ বদল করা আমার কাজ নয়। দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্ম ও লোক উভয়ই জলাঞ্জলি দিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। এরূপ কর্ম করেও সে অনুতপ্ত নয়। অপর পক্ষে তার পরামর্শদাতারা শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসন তার সেই পাপবুদ্ধিকে আরও বৃদ্ধি করে তুলছে। সুতরাং অর্ধেক রাজ্য দিয়ে তারা শান্ত হবে না। সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেই তারা শান্ত হবে। অর্জুন ! তোমার তো দুর্যোধনের মন ও আমার চিন্তাধারা জানা আছে। তাহলে আমার থেকে কেন ভয় পাচ্ছ ? পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য দেবতারা অবতীর্ণ হয়েছেন— তাঁদের দিব্য বিধানও তুমি জানো। তাহলে বলো ওদের সঙ্গে সন্ধি হবে কীভাবে ? তবুও আমাকে সর্বপ্রকারে ধর্মরাজের নির্দেশ তো পালন করতেই হবে।'

তখন নকুল বললেন—'মাধব ! ধর্মরাজ আপনাকে অনেক কিছু বলেছেন, আপনি সেসব শুনেছেন। ভীমসেনও সন্ধির কথা বলে পরে তাঁর বাহুবলের বর্ণনা দিয়েছেন। এইভাবে অর্জুনও যা বলেছেন, তা আপনি শুনেছেন এবং আপনার মতামতও ব্যক্ত করেছেন। অতএব হে পুরুষোত্তম ! এইসব কথা ছেড়ে আপনি শত্রুদের মতামত জেনে যা করা উচিত, তাই করবেন। শ্রীকৃষ্ণ ! আমাদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের সময় যে চিন্তাধারা ছিল, এখন তার থেকে চিন্তাধারা পৃথক। বনে থাকাকালীন আমাদের রাজ্য পাওয়ার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল না, যা এখন হয়েছে। আপনি কৌরব সভায় গিয়ে আগে সন্ধির কথাই বলবেন, পরে যুদ্ধের ভয় দেখাবেন এবং এমনভাবে কথা বলবেন যাতে অল্পবুদ্ধি দুর্যোধন মনে ব্যথা

না পায়। আপনি চিন্তা করে দেখুন, এমন কোনো ব্যক্তি আছেন, যিনি রণভূমিতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, সহদেব, আপনি, বলরাম, সাত্যকি, বিরাট, উত্তর, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু ও আমার সামনে দাঁড়াতে পারেন ? আপনার কথায় বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বাহ্লীক একথা বুঝতে পারবেন যে কীসে কৌরবদের মঙ্গল ! তাহলে তাঁরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং পরামর্শদাতাসহ দুর্যোধনকে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

তারপর সহদেব বললেন—'মহারাজ সনাতন ধর্মের কথাই বলেছেন, কিন্তু আপনি দেখবেন, যাতে যুদ্ধ হয়। কৌরবরা সন্ধি করতে চাইলেও আপনি যুদ্ধ করার জন্যই পথ প্রশস্ত করবেন। শ্রীকৃষ্ণ ! সভাস্থলে দ্রৌপদীর যে দুর্গতি করা হয়েছিল, তাই দেখে আমার দুর্যোধনের ওপর যে ক্রোধ জন্মেছে, তা ওর প্রাণ না নিলে শান্ত হবে না।'

সাত্যকি বললেন— 'মহাবাহো ! মহামতি সহদেব ঠিক বলেছেন। এঁর এবং আমার ক্রোধ শান্ত হবে দুর্যোধনের বিনাশ হলে তবেই। বীরবর সহদেব যা বলেছেন প্রকৃতপক্ষে সব যোদ্ধাদেরই সেই মত।'

সাত্যকির কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সমস্ত যোদ্ধা ভয়ংকর সিংহনাদ করে উঠলেন। সেই যুদ্ধে উৎসুক বীররা 'সাধু, সাধু' বলে সাত্যকিকে হর্ষিত করে সর্বভাবে তাঁর মতকে সমর্থন করলেন।

—o—

ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর কথাবার্তা এবং হস্তিনাপুরে গমন

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম ও অর্থযুক্ত কথা শুনে এবং ভীমসেনকে শান্ত দেখে দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা সহদেব ও সাত্যকির প্রশংসা করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'ধর্মজ্ঞ মধুসূদন ! দুর্যোধন যেভাবে ক্রূরতার আশ্রয় নিয়ে পাণ্ডবদের রাজসুখ থেকে বঞ্চিত করেছে, তাতো আপনি জানেন এবং সঞ্জয়কে রাজা ধৃতরাষ্ট্র একান্তে তাঁর যে মতামত জানিয়েছেন, তাও আপনার অজানা নয়। অতএব দুর্যোধন যদি রাজ্যভাগ দিয়েও আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চান, তাহলে আপনি কখনো তা মেনে নেবেন না। এই সৃঞ্জয় বীরদের সঙ্গে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের রণোন্মত্ত সেনাদের ভালোভাবেই নাশ করতে পারবেন। সাম বা দানের দ্বারা কৌরবদের সঙ্গে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার কোনো আশা নেই, তাই আপনিও ওদের প্রতি কোনো দুর্বলতা দেখাবেন না ; কারণ যার নিজ জীবিকা রক্ষার তাগিদ থাকে, তার সাম বা দানের দ্বারা বশে না আসা শত্রুদের প্রতি দণ্ডই প্রয়োগ করা উচিত। অতএব অচ্যুত ! আপনারও পাণ্ডব এবং সৃঞ্জয় বীরদের নিয়ে ওদের সত্বর কঠোর দণ্ড দেওয়া উচিত।

জনার্দন ! শাস্ত্রের মত হল অবধ্যকে বধ করলে যে পাপ হয় বধ্যকে বধ না করলেও সেই পাপ হয়। সুতরাং আপনিও পাণ্ডব, যাদব এবং সৃঞ্জয় বীরদের নিয়ে এমন কাজ করুন, যাতে এই দোষ আপনাকে স্পর্শ না করে। বলুন তো পৃথিবীতে আমার ন্যায় কোন নারী আছেন ? আমি মহারাজ দ্রুপদের যজ্ঞবেদী থেকে উদ্ভূত অযোনিজ কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী, আপনার প্রিয় সখী, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ এবং ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী পাঁচ পাণ্ডবের পত্নী পাটরানি। এইরূপ সম্মানিতা হওয়া সত্ত্বেও আমাকে চুল ধরে টেনে সভায় নিয়ে আসা হয়, সেও পাণ্ডবদের উপস্থিতিতে এবং আপনি জীবিত থাকাকালীনই আমাকে এইভাবে অপমানিত করা হয়েছে। হায় ! পাণ্ডব, যাদব এবং পাঞ্চাল বীররা জীবিত থাকতেই আমাকে এই পাপীদের সভায় দাসীর মতো আনা হয়েছিল। কিন্তু আমাকে ওই অবস্থায় দেখেও পাণ্ডবরা কোনো প্রতিকারের চেষ্টা বা আমাকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই করেননি। তাই আমি বলছি যে, দুর্যোধন যদি এক মুহূর্তও জীবিত থাকে তাহলে অর্জুনের ধনুর্ধারিতা এবং ভীমসেনের বাহুবলকে ধিক্কার জানাই। সুতরাং আপনি যদি আমাকে কৃপাপাত্রী বলে মনে করেন এবং আমার প্রতি যদি দয়াদৃষ্টি থাকে তাহলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করুন।'

তারপর দ্রৌপদী তাঁর ঘন লম্বা কালো চুল বাঁহাতে ধরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকে বললেন—কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার ইচ্ছা শত্রুপক্ষের

সঙ্গে সন্ধি করা ; কিন্তু আপনার সর্বপ্রচেষ্টার মধ্যে স্মরণ রাখবেন দুঃশাসন দ্বারা আকর্ষিত আমার এই চুলগুলিকে। ভীম ও অর্জুন যদি কাপুরুষের মতো সন্ধির জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন, তাহলে আমার বৃদ্ধ পিতা তাঁর পুত্রের সাহায্যে কৌরবদের বধ করবেন এবং অভিমন্যুর সঙ্গে আমার পাঁচপুত্রও তাতে যোগদান করবে। দুঃশাসনের হাতগুলি কেটে ধূলি ধূসরিত হতে না দেখলে আমি শান্ত হব না। সেই জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোধকে আমি তেরো বছর ধরে অন্তরে প্রজ্বলিত করে রেখেছি। আজ ভীমসেনের বাক্যবাণে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে। এখন এঁরা ধর্ম দেখাতে চান !

এই কথা বলতে বলতে দ্রৌপদীর কণ্ঠরোধ হল, তাঁর চক্ষু জলে পূর্ণ হল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তিনি কাঁদতে লাগলেন।

তখন বিশালবাহু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলে বললেন—'কৃষ্ণে ! তুমি অতি শীঘ্রই কৌরব নারীদের ক্রন্দন করতে দেখবে। আজ যাঁদের ওপর তোমার ক্রোধ, সেই শত্রুদের আত্মীয়-স্বজন, সেনাদি নষ্ট প্রাপ্ত হলে তাঁদের স্ত্রীরাও এমন ভাবেই কাঁদবে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম, অর্জুন এবং নকুল-সহদেবের সঙ্গে আমিও সেই কাজ করব। কালের বশে যদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্র আমার কথা না শোনে তাহলে তাঁরা যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে কুকুর ও শৃগালের খাদ্য হবেন। তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, হিমালয় যদি স্থানচ্যুত হয়, পৃথিবী শতধা বিভক্ত হয়, নক্ষত্রখচিত আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে — তবু আমার বাক্য কখনো মিথ্যা হবে না। কৃষ্ণে ! চোখের জল সংবরণ করো,

আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে তুমি শীঘ্রই শত্রুদের বধ করে তোমার পতিদের শ্রীসম্পন্নরূপে দেখবে।'

অর্জুন বললেন—শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি এখন সমস্ত কুরুবংশীয়দেরই অত্যন্ত সুহৃদ। আপনি উভয় পক্ষেরই আত্মীয় এবং প্রিয়। সুতরাং পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের বিবাদ মিটিয়ে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করতে সক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সেখানে আমি ধর্ম অনুকূল কথাই বলব এবং যাতে আমাদের ও কৌরবদের মঙ্গল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব। এবার আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হচ্ছি।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ শরৎ ঋতুর শেষে, হেমন্তের প্রাক্কালে, কার্তিক মাসে রেবতী নক্ষত্রে, মৈত্র মুহূর্তে যাত্রা করলেন। যাত্রার আগে তিনি সাত্যকিকে বললেন, 'তুমি আমার রথে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনুক-শক্তি

ইত্যাদি সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দাও।' তাঁর সেবকরা শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামের ঘোড়াগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রথে জুড়ে দিলেন এবং রথের ধ্বজে পক্ষীরাজ গরুড়কে শোভিত করালেন। শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করলেন, সাত্যকি তাঁর সঙ্গী হলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন।

ভগবান যাত্রা শুরু করলে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সপুত্র বিরাটরাজ, কেকয়রাজ তাঁকে এগিয়ে দিতে চললেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্বগুণসম্পন্ন শ্রীশ্যামসুন্দরকে আলিঙ্গন করে বললেন—'গোবিন্দ! আমাদের অবলা মাতা, যিনি আমাদের শিশুকাল থেকে পালন- পোষণ করে বড় করেছেন, যিনি নিরন্তর উপবাস ও তপে ব্যাপৃত থেকে আমাদের কুশলের জন্য প্রার্থনা করেন, যাঁর দেবতা ও অতিথি সৎকারে অত্যন্ত অনুরাগ, আপনি তাঁর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করবেন। তাঁকে সবসময় আমাদের বিরহ কষ্ট দেয়। আপনি আমার হয়ে তাঁকে প্রণাম করবেন। শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ! কখনো কি এমন সময় আসবে যখন আমার দুঃখিনী মাতাকে একটু সুখ দিতে পারব ? এতদ্ব্যতীত রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সোমদত্ত এবং অন্যান্য ভরতবংশীয়দের আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানাবেন এবং প্রধানমন্ত্রী অগাধবুদ্ধি ধর্মজ্ঞ বিদুরকে আমার হয়ে প্রণাম জানাবেন।' এই বলে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা করে তাঁর আদেশ নিয়ে ফিরে গেলেন।

পথে যেতে যেতে অর্জুন বললেন—'গোবিন্দ ! আগে মন্ত্রণার সময় আমাদের অর্ধ রাজ্য দেওয়ার কথা হয়েছিল—সব রাজারা তা জানেন। দুর্যোধন যদি তাতে রাজি থাকে, তাহলে তো খুবই ভালো কথা ; সে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা লাভ করবে। তাতে যদি সে রাজি না থাকে, তাহলে আমি তার সমস্ত ক্ষত্রিয়বীরকে বিনাশ করব।' অর্জুনের কথা শুনে ভীম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন। তাতে ভীত হয়ে বড় বড় ধনুর্ধররাও কেঁপে উঠল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়ে, আলিঙ্গন করে ফিরে গেলেন। ক্রমশ সব রাজা ফিরে গেলে

শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হস্তিনাপুরের দিকে চললেন।

পথের দুধারে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন অনেক মহর্ষি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা সকলে ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান, তাঁদের দেখে শ্রীকৃষ্ণ সত্বর রথ থেকে নেমে তাঁদের প্রণাম করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বললেন, 'আপনারা সকলে কুশল তো ? ঠিক মতো ধর্মপালন হচ্ছে তো ? এখন আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, আমি আপনাদের কী সেবা করতে পারি ? আপনারা কিজন্য এখানে পদার্পণ করেছেন ?'

শ্রীপরশুরাম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন—'যদুপতে ! এইসব দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষিরা প্রাচীন কালের বহু দেবতা এবং অসুরদের দেখেছেন। এই সময় হস্তিনাপুরে একত্রিত হয়েছেন যে সব ক্ষত্রিয় রাজা ও সভাসদ, তাঁদের এবং আপনাকে দর্শন করার জন্য এঁরা সেখানে যাচ্ছেন। এই সমারোহ অবশ্যই অত্যন্ত দর্শনীয়। কৌরব সভায় আপনি যে ধর্ম ও অর্থ সমন্বিত ভাষণ দেবেন, আমরা তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। সেই সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ এবং মহামতি বিদুরের ন্যায় মহাপুরুষ এবং আপনিও উপস্থিত থাকবেন। আমরা সকলে আপনাদের দিব্য ভাষণ শুনতে চাই। সেই ভাষণ অবশ্যই অত্যন্ত হিতকর এবং
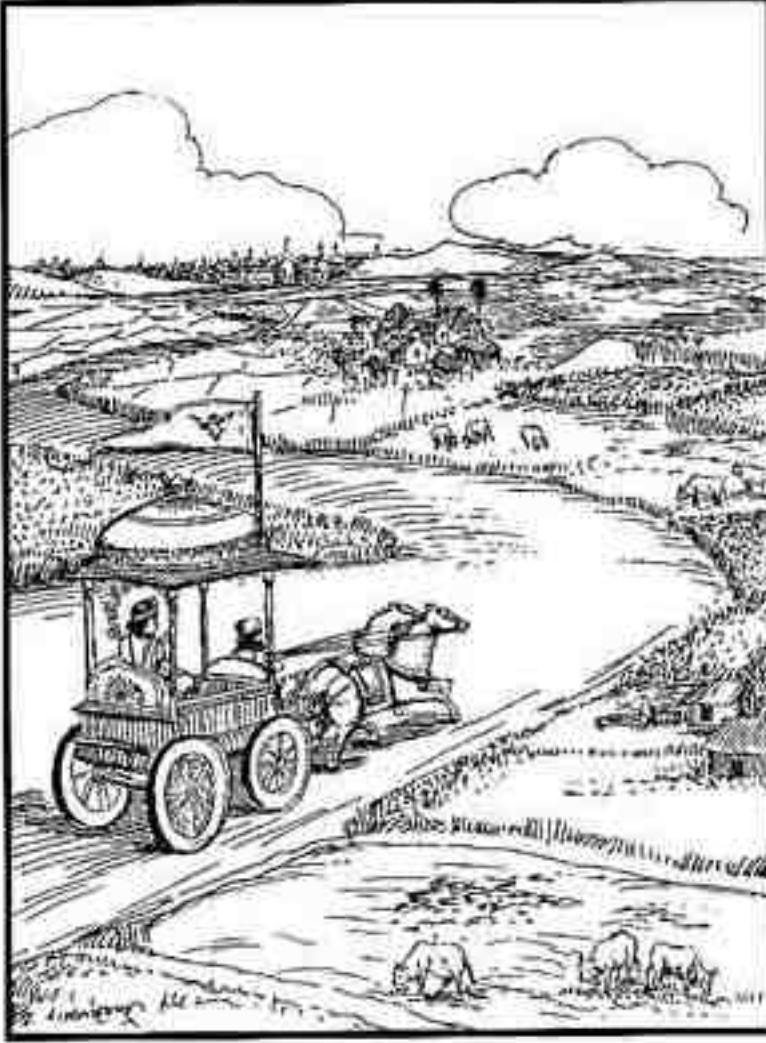
যথার্থ হবে। বীরবর ! আপনি অগ্রসর হোন, আমরা সভাতেই আপনাকে দর্শন করব।'

রাজন্‌! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে দশ মহারথী, এক হাজার পদাতিক, এক হাজার ঘোড়সওয়ার, বহু আকার সামগ্রী এবং কয়েকশত সেবক ছিল। তাঁর যাওয়ার সময় যেসব শুভ ও অশুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, সেসব বর্ণনা করছি। সেই সময় বিনা মেঘে ভয়ংকর গর্জন করে বাজ পড়েছিল এবং বৃষ্টিপাতও হচ্ছিল। পূর্বগামিনী ছয়টি নদীও সমুদ্রের বিপরীতগামী হয়েছিল। সর্ব দিকেই এমন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল যে কিছুই ঠিক ছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেইদিকে অত্যন্ত সুখদায়ক হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিল এবং শুভলক্ষণও দেখা যাচ্ছিল। পথে নানাস্থানে ব্রাহ্মণরা তাঁকে মধুপর্ক ইত্যাদি দ্বারা স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন ও মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা তাঁর পূজা আরতি করছিলেন। পথের নানাস্থানে অনেক পশু-পক্ষী, নগর-গ্রাম পার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শালিযবন নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানকার অধিবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আদর ও আপ্যায়ন করলেন। পরে সন্ধ্যার সময় যখন অস্তমান সূর্যের কিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন তিনি বৃকস্থল নামক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি রথ থেকে নেমে স্নানাদি নিত্যকর্ম সমাপন করলেন এবং সন্ধ্যাবন্দনা করলেন। দারুক ঘোড়াগুলিকে রথ থেকে খুলে বিশ্রাম দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত অধিবাসীদের বললেন—'আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের কাজে যাচ্ছি, আজকের রাত্রি এখানেই অবস্থান করব।' তাঁর কথা শুনে গ্রামবাসীরা সেখানে রাত্রিযাপনের এবং খাওয়া-দাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা করে ফেলল। তারপর সেই গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণরা এসে আশীর্বাদ ও মাঙ্গলিক বাণী বলে তাঁদের বিধিমতো অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর ভগবান ব্রাহ্মণদের সুস্বাদু আহারে পরিতৃপ্ত করে নিজেও আহার করলেন এবং সকলের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেখানে রাত্রিযাপন করলেন।

———०———

হস্তিনাপুরে শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি এবং কৌরবদের সভায় পরামর্শ

বৈশম্পায়ন বললেন—এদিকে দূতমুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন জানতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আসছেন, তখন আনন্দে তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয়, বিদুর, দুর্যোধন এবং মন্ত্রীদের বললেন—'শুনছি, পাণ্ডবদের কাজে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। তিনি সর্বপ্রকারে আমাদের মাননীয় এবং পূজনীয়। সমস্ত লোকব্যবহারের একমাত্র তিনিই অধিষ্ঠিতা, কারণ তিনি সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর ; তাঁর মধ্যে শৌর্য, বীর্য, প্রজ্ঞা, ওজ ইত্যাদি সমস্ত গুণ বিদ্যমান। তিনি সনাতন ধর্মরূপ, তাই সর্বভাবে তিনি সম্মানের যোগ্য। তাঁকে অভ্যর্থনা করাতেই সুখ, অসৎকার করা হলে তিনি দুঃখের নিমিত্ত হয়ে ওঠেন। তিনি যদি আমাদের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হন, তাহলে আমাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। দুর্যোধন ! তুমি আজ থেকেই তাঁর স্বাগত অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নাও, পথিমধ্যে আবশ্যক সামগ্রী সম্পন্ন বিশ্রামস্থান নির্মাণ করাও। তুমি এমন কাজ করবে, যাতে শ্রীকৃষ্ণ তোমার ওপর প্রসন্ন হন। পিতামহ ! এই বিষয়ে আপনার কী মত ?'

ভীষ্ম এবং অন্যান্য সভাসদ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্যের প্রশংসা করে বললেন—'আপনার সিদ্ধান্ত একেবারে ঠিক।' তখন তাঁদের সকলের জন্য দুর্যোধন পথের স্থানে স্থানে সুন্দর বিশ্রামস্থান নির্মাণ করাতে শুরু করলেন। তিনি দেবগণের ন্যায় অভ্যর্থনার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই নানা রত্নে সজ্জিত বিশ্রামস্থলের দিকে তাকালেনই না।

দুর্যোধনের কাছে সব কিছু প্রস্তুতির খবর পেয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন—'বিদুর ! শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্য থেকে এদিকেই আসছেন। আজ তিনি বৃকস্থলে বিশ্রাম নিয়েছেন। কাল প্রাতে তিনি এখানে আসবেন। তিনি অত্যন্ত উদারচিত্ত, পরাক্রমী এবং মহাবলী। যাদবদের বিস্তৃত রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন তিনিই করে থাকেন। তিনি ত্রিলোকের পিতা, ব্রহ্মারও পিতা। অতএব আমাদের নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলেরই তাঁকে সাক্ষাৎ সূর্যের ন্যায় দর্শন করা উচিত। সব দিকে বড় বড় ধ্বজা এবং পতাকা দিয়ে সাজাও, তাঁর আসার পথ পরিষ্কার করে সুগন্ধি জল ছিটিয়ে রাখো। দুঃশাসনের ভবন দুর্যোধনের মহলের থেকে উত্তম। তাকে পরিষ্কার করে সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করে রাখো। ওই ভবনটিতে সুন্দর সুন্দর বৃহৎ কক্ষ আছে এবং আরামের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে। আমার এবং দুর্যোধনের মহলে যেসব সুন্দর জিনিস আছে, সেগুলিও ওখানে সাজিয়ে দাও, তার মধ্যে যেগুলি শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত, সেগুলি তাঁকে উপহার দিও।'

বিদুর বললেন—'রাজন্ ! ত্রিলোকে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত, প্রতিষ্ঠিত এবং মাননীয় ব্যক্তি। আপনি যা বলছেন, তা শাস্ত্র এবং উত্তম যুক্তির ওপর নির্ভর করেই। এতেই জানা যায় আপনি স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি বয়োবৃদ্ধ, কিন্তু একটি কথা আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে অর্থ অথবা অন্য কিছুর দ্বারা চেষ্টা করলেও আপনি শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের থেকে পৃথক করতে সক্ষম হবেন না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আমি জানি এবং পাণ্ডবদের ওপর তাঁর যে কী সুদৃঢ় অনুরাগ, তাও আমি জানি। অর্জুন তাঁর প্রাণের ন্যায় প্রিয়, তাকে তিনি কখনোই ত্যাগ করবেন না। তিনি জলপূর্ণ কলস, পা ধোওয়ার জল এবং কুশলপ্রশ্ন করা ব্যতীত আর কোনো কিছুতেই আকৃষ্ট হবেন না। তবে তিনি অতিথি সৎকারের যোগ্য সম্মানীয় ব্যক্তি, তাঁকে অবশ্যই সাদর অভ্যর্থনা জানানো উচিত। শ্রীকৃষ্ণ উভয়পক্ষেরই হিতার্থে যে কাজ নিয়ে আসছেন, আপনি অবশ্যই তা পূর্ণ করবেন। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে আপনাদের সন্ধি করাতে ইচ্ছুক। আপনি তাঁর ইচ্ছা মেনে নিন। মহারাজ ! আপনি পাণ্ডবদের পিতা, তাঁরা আপনার পুত্র ; আপনি বৃদ্ধ, এঁরা আপনার কাছে বালক সমান। ওঁরা আপনার সঙ্গে পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, আপনিও ওঁদের সঙ্গে পিতার মতো ব্যবহার করুন।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! বিদুর একেবারে ঠিক কথা বলেছেন। পাণ্ডবদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অনুরাগ, তাঁকে ওদিক থেকে এদিকে আনা যাবে না। সুতরাং আপনি তাঁর অভ্যর্থনায় যে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করতে চান, তাঁকে কখনো ওসব দেওয়া উচিত নয়।'

দুর্যোধনের কথা শুনে পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে একবার যা স্থির করেন, তাকে কেউ কোনোভাবে বদলাতে পারে না। তাই তিনি যা বলেন

নিঃসংশয় হয়ে তাই করা উচিত। তুমি শ্রীকৃষ্ণ সচিবের সাহায্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে শীঘ্রই সন্ধিস্থাপন করো। ধর্মপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই কথাই বলবেন যা ধর্ম ও অর্থের অনুকূল। সুতরাং তোমার এবং তোমার সহযোগীদের তাঁর সঙ্গে প্রিয়বাক্য বলা উচিত।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতামহ ! ইহজীবনে আমি বেঁচে থেকে এই রাজ্য পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করব—এ আমার চিন্তার বাইরে। আমি যে মহৎ কাজ করব বলে ঠিক করেছি, তা হল এই যে পাণ্ডবদের পক্ষপাতিত্ব করা কৃষ্ণকে বন্দী করে রাখব। তাঁকে বন্দী করলেই সমস্ত যাদবকুল, সারা জগৎ এবং পাণ্ডবরা আমার অধীন হবে। তিনি কাল প্রাতঃকালেই আসছেন। আপনারা আমাকে এখন সেই পরামর্শ দিন, যাতে কৃষ্ণ একথা জানতে না পারে এবং কোনো ক্ষতিও না হয়।'

শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে দুর্যোধনের এই ভয়ংকর মনোভাব জেনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর মন্ত্রীরা অত্যন্ত আঘাত পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন—'পুত্র ! তুমি এমন চিন্তা ত্যাগ করো, এ সনাতন ধর্ম বিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে এখানে আসছেন, তা ছাড়াও তিনি আমাদের আত্মীয় এবং সুহৃদ। তিনি কৌরবদের কোনো ক্ষতি করেননি। তাহলে তাঁকে বন্দী করার কথা ভাবছ কেন ?'

ভীষ্ম বললেন—'ধৃতরাষ্ট্র ! তোমার এই পুত্রকে মৃত্যু ঘিরে ধরেছে বলে মনে হয়। এর সুহৃদরা একে হিতবাক্য বললেও, সে অনর্থকেই ডেকে আনছে। এই পাপী তো

কুপথে গেছে তুমিও হিতৈষীদের কথা না শুনে এর ইশারাতেই চলেছ। তুমি জানো না, এই দুর্বুদ্ধি যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এক মুহূর্তে নিজের পরামর্শদাতাসহ বিনাশ হবে। এ তো ধর্মকে ত্যাগ করেছে, হৃদয়ও অত্যন্ত কঠোর। আমি এর অর্থহীন প্রলাপ শুনতে পারছি না।'

এই কথা বলে পিতামহ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

হস্তিনাপুরে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণের ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও কুন্তীর নিকট গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—এদিকে বৃকস্থলে প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হলে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকর্ম সমাপন করে ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। তাঁর যাত্রা শুরু হলে যে সব গ্রামবাসী তাঁর সঙ্গে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর নির্দেশে ফিরে গেলেন। নগরের নিকটস্থ স্থানে দুর্যোধন ব্যতীত সব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ সুসজ্জিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বহু নগরবাসী পায়ে হেঁটে অথবা গোরু বা ঘোড়ার গাড়ি করে সেখানে এসেছিলেন। পথেই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং তাঁরা একত্রে নগরে প্রবেশ করলেন। সমস্ত নগরী শ্রীকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে সাজানো হয়েছিল। নানা বহুমূল্য জিনিস দিয়ে পথ সাজানো হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পথে ভিড় করেছিল। সকলেই পথিমধ্যে তাঁকে নতমস্তকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সেই জনতার ভিড় পেরিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করলেন। এই মহল অন্য সব মহলের থেকে সুশোভিত ছিল, এতে তিনটি দ্বার, তিনটি দ্বার পেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এলেন। তিনি এসে

পৌঁছতেই ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ সকল সভাসদ দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম ও বন্দনা করলেন, তারপর ক্রমশ সমস্ত রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মর্যাদা অনুসারে সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সেখানে এক স্বর্ণ সিংহাসন রাখা হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় তিনি সেখানে উপবেশন করলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও তাঁকে বিধিমতো আদর-অভ্যর্থনা করলেন।

কিছু পরে তিনি কুরুরাজের অনুমতি নিয়ে বিদুর ভবনে এলেন। বিদুর সমস্ত মাঙ্গলিক বস্তুর দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা করে, গৃহে এনে তাঁর পূজা করলেন, তারপর বললেন— 'কমলনয়ন ! আজ অপানার দর্শন পেয়ে আমি যেমন আনন্দিত হয়েছি, তা আমি প্রকাশ করতে অপরাগ, আপনি সমস্ত দেহধরীর অন্তরাত্মা।' অতিথিসৎকারের পর ধর্মজ্ঞ বিদুর ভগবানের কাছে পাণ্ডবদের কুশল জানতে চাইলেন। বিদুর ছিলেন পাণ্ডবদের প্রিয় এবং তিনি ধর্ম ও অর্থে তৎপর। ক্রোধ কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি। শ্রীকৃষ্ণ তাই পাণ্ডবরা যা করবেন স্থির করেছেন, সে সব বিদুরকে সবিস্তারে জানালেন।

তারপর দ্বিপ্রহরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমা কুন্তীর কাছে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে কুন্তী তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে পুত্রদের স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। অতিথি সৎকারের পর শ্রীশ্যামসুন্দর উপবেশন করলে কুন্তী গদগদকণ্ঠে বললেন— 'মাধব ! আমার পুত্ররা বালক বয়স থেকেই গুরুজনদের সেবা করে। তাদের নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা ছিল। সকলেই তাদের সম্মান করত আর ওরাও সবার প্রতি সমান মনোভাব বজায় রাখত। কৌরবরা কপটপূর্বক তাদের রাজ্যচ্যুত করেছে এবং তাদের নির্জন বনে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তারা হর্ষশোক জয়ী ব্রাহ্মণদের সেবা পরায়ণ এবং সর্বদা সত্যভাষী। তাই ওরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাজ্য ও ভোগের থেকে মুখ ফিরিয়ে, আমাকে ক্রন্দনরতা অবস্থায় ফেলে বনে চলে গেছে। পুত্র ! ওরা বনে যাবার সময় আমার হৃদয়ও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, আমি হৃদয়হীনা হয়ে গিয়েছি। যে অত্যন্ত লজ্জাশীল, সত্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, দয়াশীল, সদাচারসম্পন্ন, ধর্মজ্ঞ, সর্বগুণসম্পন্ন, ত্রিলোকের রাজা হওয়ার উপযুক্ত, সেই কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এখন কেমন আছে ? যার দেহে দশ হাজার হাতির বল, বায়ুর ন্যায় বেগবান, ভাইদের প্রিয় কাজ করার জন্য যে তাদের অত্যন্ত প্রিয়, যে কীচক, ক্রোধাবশ, হিড়িম্ব এবং

বক প্রভৃতি রাক্ষসদের কথায় কথায় বধ করে, পরাক্রমে ইন্দ্র এবং ক্রোধে মহাদেবের সমান, সেই মহাবলী ভীমের এখন কী অবস্থা ? যে তেজে সূর্য, মন সংযমে মহর্ষি, ক্ষমায় পৃথিবী এবং পরাক্রমে ইন্দ্রসম, সকল প্রাণীকে পরাজিত করে কিন্তু নিজে কখনো কারো দ্বারা পরাজিত হয় না, সেই তোমার ভাই এবং সখা অর্জুন এখন কেমন আছে ? সহদেব অত্যন্ত দয়ালু, লজ্জাশীল, অস্ত্র-শস্ত্রে পারঙ্গম, মৃদু স্বভাব, ধর্মজ্ঞ এবং আমার বড় প্রিয়। ধর্ম-অর্থে কুশল এবং ভাইদের সেবায় সদা তৎপর, তার সদাচারের জন্য সব ভাই তার প্রশংসা করে, সেই সহদেব এখন কোথায়, কেমন আছে ? নকুলও অত্যন্ত সুকুমার, শূরবীর এবং দর্শনীয় যুবক, ভাইদের সে প্রাণ, নানা যুদ্ধে কুশল এবং অত্যন্ত বড় ধনুর্ধর ও পরাক্রমী। সে কুশলে আছে তো ? আমার পুত্রবধূ দ্রৌপদী, সর্বগুণসম্পন্না, পরম রূপবতী, উচ্চকুলের কন্যা, আমার সব পুত্রদের থেকে বেশি প্রিয়। সে সত্যবাদিনী এবং নিজপুত্রদেরও ছেড়ে বনবাসে গিয়ে পতিদের সেবা করছে। এখন সে কেমন আছে ?

কৃষ্ণ ! আমি কখনো কৌরব ও পাণ্ডবদের পৃথক দৃষ্টিতে দেখিনি। সেই সত্যের প্রভাবে এখন আমি শত্রুনাশ হলে পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমাকে রাজ্যসুখ উপভোগ করতে দেখব। হে পরন্তপ ! অর্জুনের জন্মের সময় আকাশবাণী হয়েছিল যে, 'তোমার এই পুত্র সমস্ত পৃথিবী জয় করবে, এর যশ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, মহাযুদ্ধে কৌরবদের বধ করে তাদের রাজ্যলাভ করবে এবং নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে।' আমি সব থেকে মহান নারায়ণ স্বরূপ ধর্মকেই নমস্কার করি। তিনিই সমস্ত জগতের বিধাতা এবং তিনিই সমস্ত প্রজাকে ধারণ করেন। ধর্ম যদি সত্য হয় তুমি এই কাজ পূর্ণ করবে, যা দৈববাণীতে আমি শুনেছি।

মাধব ! তুমি ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে বলবে, ' তোমার ধর্মের অত্যন্ত হানি হচ্ছে ; তুমি একে বৃথা নষ্ট হতে দিও না।' কৃষ্ণ ! যে নারী অন্যের আশ্রিতা হয়ে জীবন নির্বাহ করে, তাকে ধিক্। দীনভাবে প্রাপ্ত জীবিকার থেকে মৃত্যুও শ্রেয়। তুমি অর্জুন ও পরাক্রমী ভীমকে বলবে যে 'ক্ষত্রিয়ানি যে জন্য পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, তার সময় সমাগত। এই উপযুক্ত সময়ে যদি তুমি যুদ্ধ না করো, তাহলে তা বৃথাই যাবে। তুমি সর্বলোকে সম্মানিত, এরূপ অবস্থায় তুমি যদি কোনো নিন্দনীয় কাজ করো, তাহলে আমি তোমার মুখদর্শন করব না। সময় এলে নিজের প্রাণের ওপরও মায়া করবে না।' মাদ্রীর পুত্ররা নকুল ও সহদেব সর্বদা ক্ষাত্রধর্মে অটল থাকে, তাদের বলবে যে 'প্রাণপণ করেও নিজ পরাক্রম প্রাপ্ত সম্পদ ভোগ করলেই সুখ লাভ করা যায়।'

'শত্রুরা রাজ্য নিয়ে নিয়েছে-তা কোনো দুঃখের ব্যাপার নয় ; পাশাতে পরাজয় হওয়াও কোনো দুঃখের কারণ নয়, আমার পুত্রদের বনে থাকতে হয়েছে তাতেও আমি দুঃখিত নই। কিন্তু আমার যুবতী পুত্রবধূ, যে সেদিন একবস্ত্রে ছিল, তাকে টেনে পরিপূর্ণ সভায় নিয়ে গিয়ে কঠোর ভাষায় অপমান করা হয়েছিল—এর থেকে অধিক দুঃখ আমার আর কী হতে পারে! তখন দ্রৌপদী রজস্বলা ছিল। তার বীর পতিরা সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাকে অনাথার ন্যায় ক্রন্দন করতে হয়েছে। পুরুষোত্তম ! আমি পুত্রবতী, এরা ছাড়াও তুমি বলরাম এবং প্রদ্যুম্ন আমার আশ্রয়। তা সত্ত্বেও আমি এই দুঃখ ভোগ করছি। হায় ! দুর্ধর্ষ ভীম এবং যুদ্ধে অপরাজেয় অর্জুন থাকতেও আমার এই দুর্দশা।'

কুন্তী পুত্রদের দুঃখে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। তাঁর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—'পিসিমা ! তোমার মত সৌভাগ্যবতী নারী আর কে আছেন ! তুমি রাজা শূরসেনের কন্যা এবং মহারাজ অজমীঢ়ের বংশে তোমার বিবাহ হয়েছে। তুমি সর্বপ্রকার শুভগুণ সম্পন্ন, তোমার স্বামীও তোমাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তুমি বীরমাতা এবং বীরপত্নী। তোমার মতো নারীই সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করতে পারে। পাণ্ডবরা নিদ্রা-জাগরণ, ক্রোধ-হর্ষ, ক্ষুধা-পিপাসা, শীত-গ্রীষ্ম সবকিছু জয় করে বীরোচিত আনন্দ উপভোগ করছেন। তাঁরা এবং দ্রৌপদী তোমাকে প্রণাম জানিয়েছেন এবং তাঁদের কুশল জানিয়ে তোমার কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছেন। তুমি শীঘ্রই পাণ্ডবদের নীরোগ ও সফল মনোরথ হতে দেখবে। তাঁদের সমস্ত শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হবে এবং তাঁরা সমস্ত জগতে আধিপত্য লাভ করে রাজলক্ষ্মীর দ্বারা সুশোভিত হবেন।'

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে কুন্তীকে সান্ত্বনা দিলে কুন্তীর অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হল । তিনি বললেন—'কৃষ্ণ ! পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর এবং তাদের জন্য যা তুমি করতে চাও, তাই করো। ওদের যেন ধর্মলোপ না হয় এবং কপটতার আশ্রয় না নিতে হয়। আমি তোমাদের সত্য ও কুলের প্রভাব ভালো করেই জানি। তুমি তোমার বন্ধুদের কাজ করার সময় যে বুদ্ধি ও পরাক্রমের পরিচয় দাও,

তা-ও আমার অজানা নয়। আমাদের বংশে তুমি মূর্তিমান ধর্ম, সত্য এবং তপ। তুমি সকলের রক্ষাকারী, পরব্রহ্ম এবং তোমাতেই সমস্ত প্রপঞ্চ অধিষ্ঠিত। তুমি যা বলছ, তোমার দ্বারা সেসবই সত্য হবে।'

তারপর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর অনুমতি নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে দুর্যোধনের মহলে চলে গেলেন।

—— o ——

রাজা দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিদুরের নিকট আহার গ্রহণ এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছতেই দুর্যোধন মন্ত্রীসহ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণ সব রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান জানালেন এবং তারপর এক বিস্তৃত স্বর্ণ পালঙ্কে উপবেশন করলেন। আদর-অভ্যর্থনার পর দুর্যোধন তাঁকে আহারের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন,

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সে আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন না। তখন দুর্যোধন প্রথমে মধুর পরে ক্রমশ শঠতাপূর্ণ বাক্যে বলতে লাগলেন—'জনার্দন ! আমি আপনাকে যে উত্তম খাদ্য-পানীয় এবং বস্ত্র-শয্যা প্রদান করতে চাই, তা আপনি অস্বীকার করছেন কেন ? আপনি উভয় পক্ষকেই সাহায্য করেছেন এবং দুপক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। এতদ্ব্যতীত আপনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয় এবং প্রিয়। ধর্ম ও অর্থের রহস্য আপনি ভালোভাবেই জানেন। অতএব এর কারণ কী আমি তা জানতে চাই।'

দুর্যোধনের কথা শুনে মহামনা মধুসূদন তাঁর দীর্ঘবাহু তুলে মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বললেন—'রাজন্ ! নিয়ম হল দূত তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে তবেই আহারাদি গ্রহণ করেন। সুতরাং আমার কাজ শেষ হলে তবেই আপনি আমাকে ও আমার মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানাবেন। আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থ, কাপট্য অথবা লোভের বশবর্তী হয়ে ধর্মকে কোনোভাবে পরিত্যাগ করতে পারি না। আহার এক প্রেমবশত করা হয় অথবা বিপদে পড়লে করা হয়। আপনার তো আমার ওপর প্রেম নেই এবং আমি বিপদগ্রস্তও নই। পাণ্ডবরা আপনার ভাই, তাঁরা সর্বদা তাঁদের স্নেহভাজনদের অনুকূল কার্য করেন, তাঁদের মধ্যে সমস্ত সদ্গুণ বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও বিনা কারণে আপনি জন্ম থেকেই ওদের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন। তাঁদের দ্বেষ করা উচিত নয়। তাঁরা সর্বদা ধর্মে স্থিত। তাঁদের প্রতি যাঁর দ্বেষ থাকে, সে তো আমাকেও দ্বেষ করে। যারা তাঁর অনুকূল, তারা আমারও অনুকূল। ধর্মাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি একই, তা জেনে রাখুন। যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশ এবং মূর্খতাবশত গুণবানদের সঙ্গে বিরোধ ও দ্বেষ করে, তাকে অধম বলা হয়। আপনার সমস্ত খাদ্য দুষ্ট পুরুষদ্বারা যুক্ত, তাই এগুলি খাওয়ার যোগ্য নয়। আমি স্থির করেছি যে আমি বিদুরের গৃহে অন্নগ্রহণ করব।'

দুর্যোধনকে এই কথাগুলি বলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহল থেকে বেরিয়ে বিদুরের গৃহে এলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বিদুরের গৃহেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক এবং অন্যান্য কয়েকজন কুরুবংশীয় ব্যক্তি এলেন। তাঁরা বললেন—'বার্ষ্ণেয় ! আমরা আপনাকে উত্তমরূপে সজ্জিত কয়েকটি ভবন দিচ্ছি, আপনি সেখানে বিশ্রাম করুন।' শ্রীমধুসূদন তাঁদের বললেন—'আপনারা আসুন, আপনারা

সর্বপ্রকারে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন।' কৌরবরা বিদায় গ্রহণ করলে বিদুর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। তারপর তিনি তাঁকে উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য-পানীয়

আহার করতে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সেই খাদ্য ও পানীয় ব্রাহ্মণদের সমর্পণ করলেন, তারপর নিজ অনুচরদের সঙ্গে বসে ভোজন করলেন।

আহারের পর ভগবান যখন বিশ্রাম করছিলেন, সেই রাত্রে বিদুর বললেন—'আপনি যে এখানে এসেছেন, এটা ঠিক হয়নি। অল্পবুদ্ধি দুর্যোধন ধর্ম ও অর্থ দুই-ই পরিত্যাগ করেছে। সে অত্যন্ত ক্রোধী এবং গুরুজনদের আদেশ অমান্যকারী ; ধর্মশাস্ত্র কিছুই বোঝে না, শুধু হঠকারী করে। ওকে সুপথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সমস্ত বিষয়ের কীট-স্বরূপ, নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, মিত্রদের সঙ্গে বিবাদ করে, সকলকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে, কৃতঘ্ন এবং বুদ্ধিহীন। এছাড়াও তার মধ্যে আরও অনেক দোষ আছে। আপনি তাকে হিতের কথা বললে, সে ক্রোধবশত তা শুনবেই না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং জয়দ্রথের সাহায্যে সে রাজ্য দখল করে নেওয়ার বিশ্বাস রাখে, তাই সে সন্ধির কথা চিন্তাও করে না। তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল যে কর্ণ একাই সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করবে। তাই সে সন্ধি করতে চায় না। আপনি সন্ধির জন্য চেষ্টা করছেন ; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, পাণ্ডবদের কোনো ভাগ তারা কখনো দেবে না। তাদের সিদ্ধান্ত যখন এটাই, তখন তাদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা। মধুসূদন ! যেখানে ভালো বা মন্দ দুপক্ষের কথাই একভাবে শোনা যায়, সেখানে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কিছু বলা উচিত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ ! যে সব রাজারা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেছিল, তারা সকলে আপনার ভয়ে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছে। এরা দুর্যোধনের সঙ্গে এক হয়ে নিজেদের প্রাণপণ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। সুতরাং আমার ইচ্ছা নয়, আপনি সেখানে যান। যদিও দেবতারাও আপনার সামনে দাঁড়াতে পারেন না এবং আমি আপনার বল, বুদ্ধি, প্রভাব ভালোমতই জানি, তা সত্ত্বেও আপনার প্রতি প্রেম ও সৌহার্দবশত এই কথা বলছি। হে কমলনয়ন ! আপনার দর্শন লাভে আমি যে প্রসন্নতা লাভ করেছি, তা আর কী বলব ? আপনি সকল দেহধারীর অন্তরাত্মা, আপনি সবই জানেন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বিদুর ! অতিশয় বুদ্ধিমানের যেরূপ বলা উচিত এবং আমার ন্যায় প্রেম-পাত্রকে আপনার যা বলা উচিত, আপনার মুখ থেকে যেরূপ ধর্ম-অর্থযুক্ত সত্য বাক্য বের হওয়া উচিত, তেমন কথাই মাতা-পিতার সমান আপনি স্নেহবশে আমাকে বলেছেন। আমি দুর্যোধনের ধৃষ্টতা এবং ক্ষত্রিয় বীরদের শত্রুতার কথা জেনেই এখানে এসেছি। মানুষের কর্তব্য হল ধর্মত কাজ করা। যথাসম্ভব চেষ্টা করেও যদি সে তা পূর্ণ করতে না পারে তাহলেও সে যে পুণ্যলাভ করবে এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। দুর্যোধন এবং তার মন্ত্রীসমূহের আমার শুভ, হিতকারী এবং ধর্ম-অর্থের অনুকূল কথা মানা উচিত। আমি নিষ্কপটভাবে কৌরব, পাণ্ডব এবং পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দের হিতের চেষ্টা করব। এইভাবে হিতের চেষ্টা করলেও যদি দুর্যোধন আমাকে সন্দেহ করে, তাহলেও আমি প্রসন্ন থাকব এবং আমার কর্তব্য থেকে অঋণী হয়ে থাকব। কোনো অধার্মিক মূঢ় ব্যক্তি যাতে না বলতে পারে যে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি করাতে পারতেন, কিন্তু তিনি ক্রোধবশে কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেননি।'

তাই আমি সন্ধির জন্য এখানে এসেছি। দুর্যোধন যদি আমার ধর্ম ও অর্থের অনুকূল হিতবাক্য না শোনে, তাহলে সে তার কর্মফল ভোগ করবে।'

তারপর যদুকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ পালঙ্কে শয়ন করলেন। মহাত্মা বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণের আলাপ-আলোচনায় সেই রাত্রি কেটে গেল।

—— o ——

শ্রীকৃষ্ণের কৌরব সভায় এসে সমবেত সকলকে পাণ্ডবদের কথা জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ স্নান, জপ ও অগ্নিহোত্রাদি সমাপন করে সূর্য পূজা করলেন, তারপর বস্ত্র-ভূষণ ধারণ করলেন। সেইসময় রাজা দুর্যোধন সুবল-পুত্র শকুনিকে নিয়ে সেই স্থানে এলেন। দুর্যোধন বললেন—'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মাদি সহ সকল কৌরব মহানুভব সভায় উপস্থিত হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তখন সারথি এসে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করল এবং তাঁর উত্তম ঘোড়া যুক্ত শুভ্র রথটি নিয়ে এল। শ্রীযদুনাথ রথে আরোহণ করলেন। সব কৌরববীররা তাঁকে নিয়ে রওনা হলেন। ভগবানের সঙ্গে সেই রথে ধর্মজ্ঞ বিদুরও আরোহণ করলেন। দুর্যোধন ও শকুনি অন্য রথে তাঁদের অনুসরণ করলেন। ভগবানের রথ রাজসভায় পৌঁছলে, তাঁরা রথ থেকে নেমে সভার মধ্যে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদুর ও সাত্যকির সঙ্গে সভায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর কান্তিতে সমস্ত কৌরবরা ম্লান হয়ে পড়েছিল। তাঁদের আগে দুর্যোধন এবং কর্ণ, পিছনে কৃতবর্মা এবং বৃষ্ণিবংশীয় বীররা প্রবেশ করলেন। সভায় পৌঁছলে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ সভাস্থ সকলেই
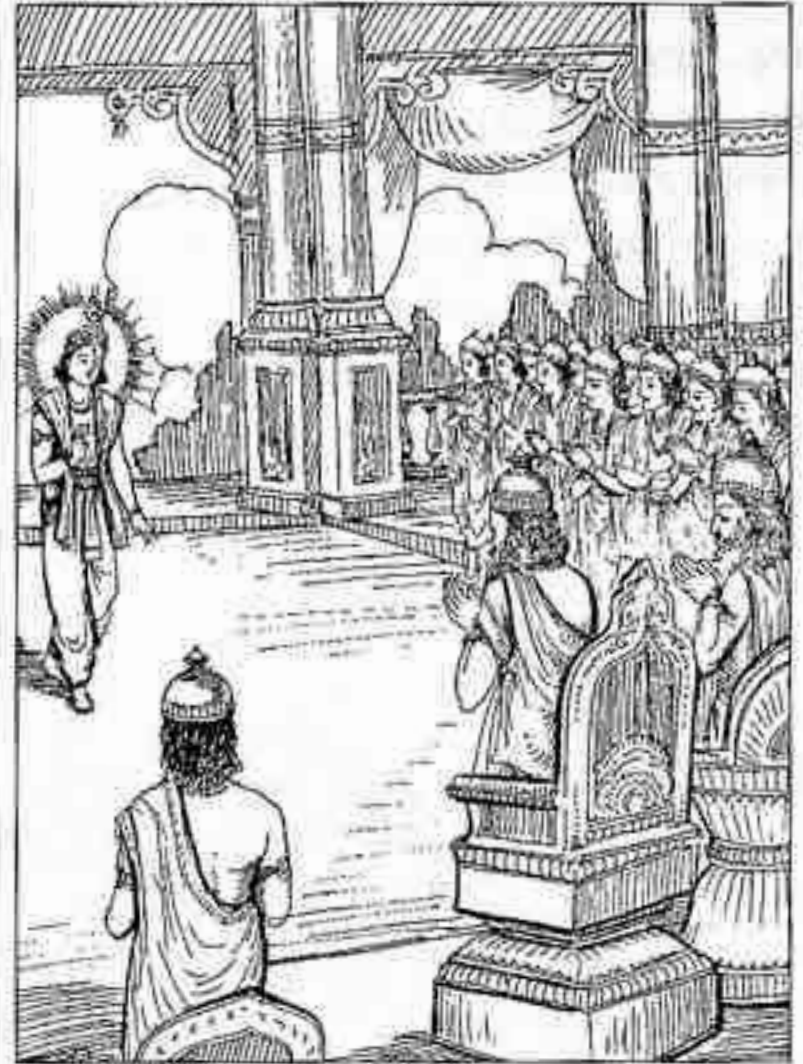
দণ্ডায়মান হলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাজসভায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সর্বতোভদ্র নামে এক স্বর্ণময় সিংহাসন স্থাপিত ছিল। তাতে উপবেশন করে শ্রীশ্যামসুন্দর হাসিমুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন এবং সমস্ত কৌরব ও রাজারা সভায় উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করলেন।

সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ সভার মধ্যেই অন্তরীক্ষে নারদ প্রমুখ

ঋষিদের উপস্থিত থাকতে দেখলেন। তখন তিনি শান্তভাবে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে বললেন — 'এই সভা দেখার জন্য ঋষিরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের আসন প্রদান করে সম্মানের সঙ্গে সকলকে অভ্যর্থনা করুন। তাঁরা না বসলে এখানে কারও আসন গ্রহণ করা উচিত নয়। এই শুদ্ধচিত্ত মুনিদের পূজা করুন।' মুনিদের সভার দ্বারে আসতে দেখে ভীষ্ম সত্বর সেবকদের আসন আনার জন্য আদেশ দিলেন। তারা শীঘ্রই আসন নিয়ে এল। ঋষিরা যখন আসনে উপবেশন করে পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি গ্রহণ করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য রাজারা আসন গ্রহণ করলেন। মহামতি বিদুর শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনের পাশে এক মণিময় আসনে শ্বেত মৃগচর্মের ওপরে বসেছিলেন। রাজারা শ্রীকৃষ্ণকে বহুদিন পরে দেখলেন, তাই অমৃত পান করতে করতে যেমন কখনো তৃপ্তির শেষ হয় না, তেমনই তাঁদের শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আশা মিটছিল না। সভার সকলের মনই তাঁতে আকৃষ্ট হয়ে ছিল, তাই কেউই কোনো কথা বলতে পারছিলেন না।

সব রাজাই যখন মৌন হয়ে বসে রইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন—'রাজন্ ! আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হল যাতে ক্ষত্রিয় বীরদের বিনাশ না হয় এবং কৌরব ও পাণ্ডব

সন্ধি করে নেন। রাজাদের মধ্যে এই সময় কুরুবংশকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। এঁদের মধ্যে শাস্ত্র ও সদাচারের সম্যক সম্মান আছে এবং আরও নানাগুণে এঁরা ভূষিত। অন্য রাজবংশের তুলনায় কুরুবংশীদের মধ্যে দয়া, কৃপা, ক্ষমা, করুণা, মৃদুতা, সরলতা, সত্য—এইসব গুণগুলি বিশেষভাবে দেখা যায়। এইরূপ নানাগুণে গৌরবান্বিত বংশে আপনার জন্য কোনো অনুচিত কর্ম যেন না হয়। কৌরবদের মধ্যে যদি গুপ্ত বা প্রকটরূপে কোনো অসৎ ব্যবহার হয়, তাতে বাধাপ্রদান করা আপনারই কর্তব্য। দুর্যোধন প্রমুখ আপনার পুত্রগণ ধর্ম ও অর্থের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্রূর ব্যক্তিদের ন্যায় আচরণ করছে। নিজের আপন ভাইদের সঙ্গে এঁদের অশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আচরণ এবং হৃদয়ে লোভ জন্মানোয় এঁরা ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। আপনি তো এসবই জানেন। এক ভীষণ বিপদ কৌরবদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, আপনি যদি তাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি যদি আপনার কুলরক্ষা করতে চান তাহলে এখনও তা নিবারণ করা সম্ভব। এখন শান্তিরক্ষার ভার আপনার ও আমার ওপরে রয়েছে। আমার মনে হয় দুপক্ষের মধ্যে সন্ধি করানো এখনও অসম্ভব নয়। আপনি আপনার পুত্রদের শান্ত রাখুন, আমিও পাণ্ডবদের সংযত করব। আপনার পুত্রদের আপনার নির্দেশ পালন করা উচিত, তাহলে এঁদের মঙ্গল হবে। মহারাজ ! আপনি পাণ্ডবদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে ধর্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান করুন। এরূপ রক্ষক আপনি চেষ্টা করলেও পাবেন না। ভরতশ্রেষ্ঠ ! যাদের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি এবং যুযুৎসুর মতো বীর থাকেন, কোন বুদ্ধিহীন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস করবে ! কৌরব এবং পাণ্ডব একত্রে মিলিত হলে আপনি সমস্ত জগতের আধিপত্য লাভ করবেন এবং শত্রুরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। যেসব রাজা আপনার সমকক্ষ বা আপনার থেকে ক্ষমতাশালী, তারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবে। তাহলে আপনি আপনার পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভাই এবং সুহৃদরা সর্বপ্রকার সুরক্ষিত থেকে সুখে জীবন কাটাতে পারবেন। মহারাজ ! যুদ্ধের পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক, জীবন হানিকর। এইভাবে দুপক্ষের বিনাশে আপনি কোন্ ধর্ম দেখতে পাচ্ছেন ? সুতরাং আপনি এদের রক্ষা করুন এবং এমন

করুন যাতে আপনার প্রজারা বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। আপনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করলে সকলেই রক্ষা পায়।

মহারাজ ! পাণ্ডবরা আপনাদের প্রণাম জানিয়ে আপনার প্রসন্নতা চেয়েছেন এবং বলেছেন যে 'আমরা আপনার নির্দেশেই এতদিন সকলে মিলে অনেক দুঃখ ভোগ করেছি। আমরা বারো বছর বনবাসে এবং ত্রয়োদশতম বর্ষে অজ্ঞাতবাসে কাটিয়েছি। বনবাসে যাওয়ার সময় আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা ফিরে এলে আপনি আমাদের মাথার ওপর পিতার ন্যায় থাকবেন। আমরা আমাদের শর্ত পূর্ণ করেছি ; এবার আপনিও সেইমতো ব্যবহার করুন। আমাদের এবার নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দিন। আপনি ধর্ম ও অর্থের স্বরূপ জানেন, সুতরাং আপনার আমাদের রক্ষা করা উচিত। গুরুর প্রতি শিষ্য যেমন ব্যবহার করে, আপনার সঙ্গেও আমরা সেই ব্যবহারই করি। অতএব আপনিও আমাদের সঙ্গে গুরুর ন্যায় আচরণ করুন। আমরা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকি, তাহলে আপনি আমাদের সঠিক পথে নিয়ে আসুন এবং আপনি নিজেও সঠিক পথে অবস্থান করুন।' এতদ্ব্যতীত আপনার ওই পুত্ররা এই সভাসদদের উদ্দেশ্যেও বলেছেন যে, যেখানে ধর্মজ্ঞ সভাসদ থাকেন, সেখানে কোনো অনুচিত কাজ হতেই পারে না। যদি সভাসদদের সামনে অধর্মের দ্বারা ধর্মের এবং অসত্যের দ্বারা সত্যের বিনাশ হয়, তাহলে সভাসদরাও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। এখন পাণ্ডবরা ধর্মের ওপর নির্ভর করে চুপ করে আছেন। তাঁরা ধর্ম অনুযায়ী সত্য ও ন্যায়যুক্ত কথা বলেছেন। রাজন্ ! আপনি পাণ্ডবদের রাজ্য তাদের সমর্পণ করুন—এছাড়া আপনাকে আর কিছু বলার নেই। এই সভায় যেসব রাজা বসে আছেন, তাঁদের যদি কিছু বলার থাকে তো বলুন। ধর্ম অর্থের বিচার করে যদি সত্য কথা বলার হয়, তাহলে বলছি যে এই ক্ষত্রিয়দের আপনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন। ভরতশ্রেষ্ঠ ! শান্তি বজায় রাখুন, ক্রোধের বশ হবেন না, পাণ্ডবদের তাদের পিতার রাজ্য সমর্পণ করুন। তাহলে আপনি আপনার পুত্রদের সঙ্গে আনন্দে রাজ্যভোগ করতে পারবেন। রাজন্ ! এখন আপনি অর্থকে অনর্থ এবং অনর্থকে অর্থ মনে করছেন। আপনার পুত্ররা লোভের বশবর্তী হয়ে আছে, তাদের আপনি বশে রাখুন। পাণ্ডবরা আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত এবং যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত। এই দুয়ের মধ্যে যেটি আপনার হিতের বলে মনে হয়, সেটিই বেছে নিন।'

—o—

ঋষি পরশুরাম এবং মহর্ষি কণ্ব কর্তৃক সন্ধির জন্য অনুরোধ এবং দুর্যোধনের ঔদ্ধত্য

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইসব কথা শুনে সভাসদদের রোমাঞ্চ হল এবং তাঁরা চমকিত হলেন। তাঁরা মনে মনে নানাপ্রকার বিচার-বিবেচনা করতে লাগলেন, কোনো কথা বলতে পারলেন না। সব রাজাদের এইভাবে মৌন বসে থাকতে দেখে, সভায় উপস্থিত মহর্ষি পরশুরাম বলতে লাগলেন, 'রাজন্ ! তুমি সমস্ত সন্দেহ ত্যাগ করে আমার এক সত্য কথা শোনো। তা যদি তোমার ভালো লাগে, সেই অনুসারে কাজ করো। পুরাকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক সার্বভৌম রাজা ছিলেন। সেই মহারথী সম্রাট প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করতেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রদের মধ্যে এমন কি কেউ শস্ত্রধারী আছেন যিনি যুদ্ধে আমার সমকক্ষ অথবা আমার থেকে বড় !' এই কথা বলে রাজা গর্বে উন্মত্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতেন। রাজার অহংকার দেখে কয়েকজন তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন—এই পৃথিবীতে

দুজন সদ্ব্যক্তি আছেন, যাঁরা সংগ্রামে অনেক ব্যক্তিকে পরাস্ত করেছেন। তুমি কখনো তাঁদের সমকক্ষ হতে পারবে না। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'সেই বীরপুরুষরা এখন কোথায় ? কোথায় জন্মেছেন ? তাঁরা কী করেন ?' ব্রাহ্মণরা বললেন—'তাঁরা নর এবং নারায়ণ নামক দুজন তপস্বী, এখন তাঁরা এই পৃথিবীতেই আছেন ; তুমি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতের ওপর ঘোর তপস্যা করছেন।'

রাজা এই কথা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তখনই বিশাল সৈন্য সাজিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে তাঁদের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি দুজন মুনিকে দেখতে পেলেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তাঁরা এতই কৃশ হয়েছিলেন যে তাঁদের শরীরের শিরাগুলি দেখা যাচ্ছিল। রাজা তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের চরণস্পর্শ করে কুশল প্রশ্ন

করলেন। মুনিরাও ফল-মূল-জল-আসন দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে জিজ্ঞাসা করলেন—'বলুন, আমরা আপনাদের জন্য কী করতে পারি ?' রাজা প্রথমেই তাঁদের সব জানিয়ে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি। এ আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা, তাই এটি মেনে নিয়ে আপনারা আমার আতিথ্য করুন।' নর-নারায়ণ বললেন—'রাজন্ ! এই আশ্রমে ক্রোধ- লোভ ইত্যাদি দোষ থাকতে পারে না ; এখানে যুদ্ধের কোনো পরিবেশ নেই, তাহলে এখানে অস্ত্র-শস্ত্র অথবা কুটিল ব্যক্তি কী করে থাকবে ? পৃথিবীতে বহু ক্ষত্রিয় আছেন, তুমি অন্যত্র গিয়ে যুদ্ধের জন্য চেষ্টা করো।' নর-নারায়ণ বারবার রাজাকে বোঝালেও তাঁর যুদ্ধ লিপ্সা শান্ত হল না, তিনি যুদ্ধের জন্য পীড়াপিড়ি করতে লাগলেন।

তখন ভগবান একমুঠি তৃণ নিয়ে বললেন—'আচ্ছা, তোমার যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহলে অস্ত্র ধারণ করো, নিজ সেনাদের প্রস্তুত করো।' একথা শুনে রাজা দম্ভোদ্ভব এবং তাঁর সৈনিকরা তাঁদের ওপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। ভগবান নর একটি তৃণকে অমোঘ অস্ত্রে পরিণত করে নিক্ষেপ করলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার দেখা গেল যে সমস্ত বীরের চোখ-কান-নাক তৃণে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। সমস্ত আকাশ এইভাবে শ্বেত তৃণে ভর্তি হয়ে গেছে দেখে রাজা দম্ভোদ্ভ তাঁর চরণে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন—'আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।' তখন শরণাগতবৎসল নর শরণাপন্ন রাজাকে বললেন—'রাজন্ ! তুমি ব্রাহ্মণদের সেবা করো এবং ধর্ম আচরণ করো ; এরূপ কাজ আর কখনো কোরো না। তুমি বুদ্ধির আশ্রয় নাও, লোভ পরিত্যাগ করো। অহংকারশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, মৃদু এবং শান্ত হয়ে প্রজাপালন করো। ভবিষ্যতে আর কখনো কারো অপমান করবে না।'

তারপর রাজা দম্ভোদ্ভব মুনীশ্বরের চরণে প্রণাম করে নিজ নগরে ফিরে এলেন এবং ধর্মানুকূল ব্যবহার করতে লাগলেন। সেইসময় নর এই এক ভীষণ কাজ করেছিলেন। সেই নরই অর্জুন। সুতরাং তার গাণ্ডীবে বাণ সংযোজন করার পূর্বে, তুমি অহংকার পরিত্যাগ করে তার শরণ গ্রহণ করো। যিনি সমস্ত জগতের নির্মাতা, সকলের প্রভু এবং সর্বকর্মের সাক্ষী, সেই নারায়ণ অর্জুনের সখা। তাই যুদ্ধে তাদের পরাক্রম সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে। অর্জুনের মধ্যে অগণিত গুণ আছে আর কৃষ্ণের তো তার থেকেও অনেক বেশি। কুন্তীপুত্র অর্জুনের গুণের পরিচয় তুমি তো কয়েক বারই পেয়েছো। নর এবং নারায়ণ এখন অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ। এঁদের দুজনকে সমস্ত পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বীর বলে জানবে। আমার কথা যদি তোমার ঠিক মনে হয় এবং বাক্যে তোমার যদি কোনো সন্দেহ না থাকে, তাহলে তুমি সদ্বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও।

পরশুরামের কথা শুনে মহর্ষি কণ্বও দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন— লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং নর-নারায়ণ—এঁরা অক্ষয় এবং অবিনাশী। অদিতির পুত্রদের মধ্যে শুধু বিষ্ণুই সনাতন, অজেয়, অবিনাশী, নিত্য এবং সকলের ঈশ্বর। তিনি ছাড়া চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, গ্রহ এবং নক্ষত্র—এগুলি সবই বিনাশের সময় এলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জগতে যখন প্রলয় হয় তখন এইসব জিনিসই নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনরায় সৃষ্টির সময় উৎপন্ন হয়। এইসব ভেবে তোমার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত। এর ফলে কৌরব এবং পাণ্ডব একত্রে পৃথিবীর প্রজাপালন করবে। দুর্যোধন ! মনে কোরো না তুমিই শ্রেষ্ঠ বীর। জগতে এক বলবানের চেয়ে আরও অধিক বলবান অন্য ব্যক্তি দেখা যায়। সত্যকার যোদ্ধার কাছে সৈন্যবল কোনো কাজে লাগে না। পাণ্ডবরা সমস্ত দেবতার ন্যায় বীর ও পরাক্রমী। এঁরা বায়ু, ইন্দ্র, ধর্ম এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পুত্র, সেই দেবতাদের দিকে তো তুমি তাকিয়ে দেখতেই পারবে না। অতএব বিরোধ ত্যাগ করে সন্ধি করে নাও। এই তীর্থস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তোমার নিজ কুলরক্ষার চেষ্টা করা উচিত। মহাতপস্বী দেবর্ষি নারদ এখানে উপস্থিত আছেন, ইনি শ্রীভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষভাবে জানেন এবং সেই চক্র-গদাধারী শ্রীবিষ্ণুই এখানে শ্রীকৃষ্ণরূপে বিদ্যমান।

মহর্ষি কণ্বের কথা শুনে দুর্যোধন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি কুটিলতর হল, কর্ণের দিকে তাকিয়ে তিনি তাচ্ছিল্য ভরে হেসে উঠলেন। দুরাত্মা দুর্যোধন কণ্বের কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং তাল ঠুকে বলতে লাগলেন— 'মহর্ষি ! যা হবার এবং আমার যা হবে,ঈশ্বর আমাকে সেইভাবেই সৃষ্টি করেছেন, আমার আচরণও সেইরূপই। আপনার কথায় আর কী হবে ?'

দুর্যোধনকে বোঝাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রচেষ্টা এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভগবান বেদব্যাস, ভীষ্ম এবং নারদও দুর্যোধনকে নানাভাবে বোঝালেন। তখন নারদ তাঁকে যা বললেন, তা শুনুন। তিনি বললেন— 'জগতে সহৃদয় শ্রোতা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ পাওয়াও কঠিন ; কারণ ঘোর সংকটে যখন আত্মীয়-স্বজনরাও পরিত্যাগ করে চলে যায়, সেখানে একমাত্র সত্যকার বন্ধুই সঙ্গে থাকেন। অতএব কুরুনন্দন ! তোমার হিতৈষীদের কথায় মনোযোগ দেওয়া উচিত। তোমার এরূপ হঠকারী হওয়া উচিত নয়। কারণ হঠকারিতার পরিণাম দুঃখদায়ক হয়।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'ভগবান ! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও তাই চাই, কিন্তু তা করতে পারছি না।'

তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন—কেশব ! আপনি যা বলেছেন, তা সর্বভাবে সুখপ্রদ এবং সদ্গতি-দায়ক, ধর্মানুকূল এবং ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু আমি স্বাধীন নই। মন্দমতি দুর্যোধন আমার মনোমত আচরণ করে না এবং শাস্ত্র অনুসরণও করে না। আপনি ওকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করুন। সে গান্ধারী, বুদ্ধিমান বিদুর এবং ভীষ্ম প্রমুখ আমাদের আরও যেসব হিতৈষী আছেন, তাঁদের শুভ উপদেশেও কর্ণপাত করে না। এবার আপনি নিজেই এই পাপী, ক্রূর এবং দুরাত্মা দুর্যোধনকে বোঝান। ও যদি আপনার কথা মেনে নেয়, তাহলে আপনার দ্বারা আপনার সুহৃদদের অত্যন্ত উপকার হবে।'

তখন সমস্ত ধর্ম ও অর্থের জ্ঞাতা শ্রীকৃষ্ণ মধুর স্বরে দুর্যোধনকে বলতে আরম্ভ করলেন— 'কুরুনন্দন ! আমার কথা শোন, এতে তোমার এবং তোমার পরিবারের সকলেই সুখী হবে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তাই তোমার এই শুভ কাজ অবশ্যই করা উচিত। তুমি যা করতে চাইছ, যারা নীচকুলে জন্ম নেয় এবং দুষ্টব্যক্তি, ক্রূর এবং নির্লজ্জ তেমন কাজ তারাই করে। এই ব্যাপারে তোমার জেদ অতি ভয়ংকর, অধর্মরূপী এবং প্রাণসংশয়কারী। এর দ্বারা অনিষ্টই হয়। এর কোনো প্রয়োজন নেই এবং তা সফলও হবে না। এই অনর্থ পরিত্যাগ করলে তুমি তোমার ভাই-বন্ধু, সেবক এবং পরিবারের সকলের হিত সাধনে সক্ষম হবে এবং তুমি যে অধর্ম এবং অপযশের কাজ করতে চাইছ, তার থেকে মুক্ত হবে। দেখো, পাণ্ডবরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, শূরবীর, উৎসাহী, আত্মজ্ঞ এবং বহুশ্রুত। তুমি ওদের সঙ্গে সন্ধি করো। এতেই

তোমার মঙ্গল এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিদুর, কৃপাচার্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি এবং তোমার অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুও তাই চান। সন্ধি করলেই সমস্ত জগতের শান্তি। তোমার মধ্যে লজ্জা, শাস্ত্রজ্ঞান এবং অক্রূরতা ইত্যাদি গুণ বিদ্যমান। সুতরাং তোমার পিতা-মাতার নির্দেশ মেনে চলা উচিত। পিতা যা শিক্ষা দেন, তা সকলেই হিতকর বলে জানেন। মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন তার পিতামাতার শিক্ষা স্মরণে আসে। তোমার পিতা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিত মনে করেন। সুতরাং তোমার এবং তোমার মন্ত্রণাদাতাদেরও তা ভালো লাগা উচিত। যে ব্যক্তি মোহবশে হিতবাক্য শোনে না, সেই দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তির কোনো কাজই পূর্ণ হয় না এবং অনুতাপ করলেও তা ফিরে আসে না। কিন্তু যে হিতবাক্য শুনে নিজের জেদ পরিত্যাগ করে এবং সেই মতো আচরণ করে, সে সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি উত্তম পরামর্শদাতাকে পরিত্যাগ করে নীচ ব্যক্তির সঙ্গ করে, সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয় এবং তার থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না।

'ভ্রাতা ! তুমি জন্ম থেকেই তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে কপট ব্যবহার করেছ ; তা সত্ত্বেও যশস্বী পাণ্ডবরা তোমাদের প্রতি সদ্ভাব বজায় রেখেছে। তোমারও তাদের প্রতি তেমনই ব্যবহার করা উচিত। তারা তোমার আপন ভাই, তাদের প্রতি দ্বেষ থাকা উচিত নয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এমন কাজ করেন যাতে অর্থ, ধর্ম ও কাম প্রাপ্ত হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটি পৃথক পৃথক। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ধর্মের অনুকূলে থাকেন, মধ্যম ব্যক্তি অর্থের প্রাধান্য মানেন, মূর্খ ব্যক্তিরা কলহের হেতু হয়ে কামের বশীভূত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে লোভবশত ধর্ম পরিত্যাগ করে, সে দূষিত উপায়ে অর্থ ও কামপ্রাপ্তির বাসনায় বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অর্থ ও কামের জন্য উৎসুক, তার প্রথমে ধর্মের আচরণই করা উচিত। বিদ্বানরা ধর্মকেই ত্রিবর্গপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ বলে জানিয়েছেন। যে ব্যক্তি তার সঙ্গে সুব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সে নিজের মৃত্যুফাঁদ নিজেই তৈরি করে। যার বুদ্ধি লোভের দ্বারা দূষিত নয়, তার মন কল্যাণ সাধনে মগ্ন থাকে। এরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পাণ্ডবদের কেন, জগতের সাধারণ ব্যক্তিদেরও অসম্মান করে না। কিন্তু ক্রোধী ব্যক্তিরা নিজেদের হিতাহিত বোঝে না। বেদ ও ধর্মগ্রন্থে যে সব প্রমাণ প্রসিদ্ধ, তার থেকেও সে পতিত হয়। সুতরাং দুর্জনদের পরিবর্তে তুমি যদি পাণ্ডবদের সঙ্গ করো তবে তোমার কল্যাণই হবে। তুমি যে পাণ্ডবদের থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদের ভরসায় নিজেকে রক্ষা করতে চাও, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনির হাতে সব ঐশ্বর্য সমর্পণ করে পৃথিবী জয়ে আশা রাখ ; স্মরণ রেখো—এরা তোমাকে জ্ঞান, ধর্ম বা অর্থ প্রাপ্তি করাতে পারবে না। পাণ্ডবদের পরাক্রমের সমকক্ষ এরা নয়। তোমার সঙ্গে থেকেও এইসব রাজারা পাণ্ডবদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তোমার কাছে যেসব সৈন্য একত্রিত হয়েছে, তারা চোখ তুলে ভীমসেনের ক্রুদ্ধরূপের দিকে তাকাতে সাহস করবে না। এই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা,অশ্বত্থামা এবং জয়দ্রথ — সকলে একত্র হয়েও অর্জুনের সঙ্গে পেরে উঠবে না। অর্জুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করা সমস্ত দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং মানব—কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তুমি যুদ্ধ করতে চেয়ো না। তুমি এঁদের মধ্যে এমন এক রাজাকে দেখাও যিনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থভাবে ঘরে ফিরতে পারেন। প্রমাণরূপে বিরাটনগরে একা অর্জুনের অনেক মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার যে অদ্ভুত ঘটনা, তাই যথেষ্ট। মূঢ়, যে সংগ্রামে সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছেন, সেই অজেয় বিজয়ী বীর অর্জুনকে তুমি পরাস্ত করার আশা রাখো ? আর আমি যখন তার সঙ্গে আছি, তখন সাক্ষাৎ ইন্দ্র অথবা অন্য কেউই কি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে সাহস পাবে ? যে ব্যক্তি অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করার শক্তি রাখে সে তো নিজ হাতে পৃথিবী তুলে ধরতে পারে, ক্রোধানলে সমস্ত প্রজাকে ভস্মীভূত করে ফেলতে পারে এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করতে পারে। তুমি একটু তোমার পুত্র মিত্র ভ্রাতা, আত্মীয়দের দিকে তাকাও, তোমার জন্য যেন তাদের বিনাশ না হয়। কৌরব বংশ বাঁচিয়ে রাখ, এই বংশের পরাভব কোরো না, 'কুলঘাতী' হয়ো না, নিজ কীর্তি কলঙ্কিত করো না। মহারথী পাণ্ডবরা তোমাকেই যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করবে এবং তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকেই রাজারূপে মেনে নেবে। যে রাজলক্ষ্মী তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁকে অসম্মান কোরো না এবং পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান করে মহান ঐশ্বর্য লাভ করো। তুমি যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও এবং হিতৈষীদের কথা মেনে নাও, তাহলে চিরকাল তোমার মিত্রদের সঙ্গে আনন্দে সুখভোগ করবে।

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ শুনে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন—'তাত ! আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যে কথা বোঝালেন, তার তাৎপর্য হল যে তুমি এখনও সন্ধির কথা মেনে নাও এবং অসহিষ্ণুভাব পরিত্যাগ করো। তুমি যদি মহামান্য শ্রীকৃষ্ণের কথা না শোন, তাহলে কখনো তোমার মঙ্গল হবে না এবং সুখী হতে পারবে না। শ্রীকেশব ধর্ম ও অর্থের অনুকূল কথাই বলেছেন, তুমি তা স্বীকার করো, প্রজাদের বৃথা সংহার কোরো না। তুমি যদি তা না করো, তাহলে তোমার মন্ত্রী, পুত্র এবং বন্ধু-বান্ধবদের জীবনের মায়া কাটাতে হবে। ভরতনন্দন ! শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের নীতিযুক্ত কথা লঙ্ঘন করে তুমি কুলঘ্ন, কুমতি, কুপুরুষ এবং কুমার্গগামী বলে পরিচিত হয়ো না এবং পিতা-মাতাকে শোকসাগরে ভাসিয়ো না।'

তখন দ্রোণাচার্য বললেন—'রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীষ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয়, অর্থনিষ্ঠ এবং বহুশ্রুত। তাঁরা তোমার হিতের কথাই বলেছেন, তুমি তাঁদের কথা মেনে নাও এবং মোহবশত শ্রীকৃষ্ণের অসম্মান কোরো না। যারা তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছে, তাদের দ্বারা তোমার কোনো কাজ হবে না, এরা যুদ্ধের দায় অপরের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। তুমি তোমার প্রজা, পুত্র, বন্ধু-বান্ধবদের প্রাণ সংকটে ফেলো না। এ কথা নিশ্চয়ই জেনো যে, যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন থাকবে, তাদের কেউ হারাতে পারবে না। তুমি যদি তোমার হিতৈষীদের কথা না শোন, তবে পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। পরশুরাম অর্জুনের বিষয়ে যা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে তার থেকেও বড় আর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তো দেবতাদেরও অপরাজেয়। কিন্তু রাজন্ ! তোমাকে সুখ ও হিতের কথা বলে কী হবে ? যাইহোক তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলা হয়েছে ; এখন তোমার যা ইচ্ছা, তাই করো। আমি তোমাকে আর কিছু বলতে চাই না।'

তার মধ্যে বিদুর বলে উঠলেন—'দুর্যোধন ! তোমার জন্য আমার কোনো চিন্তা হচ্ছে না, তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই আমার দুঃখ হচ্ছে, যারা তোমার মতো দুষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তির সঙ্গ করার ফলে একদিন সমস্ত পরামর্শদাতা ও সুহৃদের মৃত্যুতে আহত পক্ষীর ন্যায় অসহায় হয়ে পড়বে।'

শেষকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলতে লাগলেন—'দুর্যোধন ! মহাত্মা কৃষ্ণের কথা সর্ব প্রকারে কল্যাণকারী। তুমি তাঁর কথায় মন দাও এবং সেই অনুসারে কাজ করো। পুণ্যকর্মা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে আমরা সমস্ত অভীষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত করতে সক্ষম। তুমি এঁর সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে যাও আর যাতে সমস্ত ভরতবংশীয়ের মঙ্গল হয়, তাই করো। আমার মনে হয় এখনই সন্ধির উপযুক্ত সময়, তুমি এই সুযোগ হাতছাড়া করো না। শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির কথা বলছেন এবং তোমার হিতের কথা বলছেন। এখন যদি তুমি ওঁর কথা না শোনো, তাহলে তোমার পতন কিছুতেই রোধ করা সম্ভবপর হবে না।'

—o—
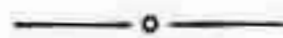
দুর্যোধন ও শ্রীকৃষ্ণের বিবাদ, দুর্যোধনের সভাকক্ষ ত্যাগ, ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীকে ডেকে আনা এবং গান্ধারীর দুর্যোধনকে বোঝানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এই অপ্রিয় কথা শুনে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'কেশব ! আপনার ভালোকরে ভেবে কথা বলা উচিত। আপনি পাণ্ডবদের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে নানা উল্টোপাল্টা কথা বলে আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন। আপনি কী বলাবল চিন্তা করেই সর্বদা আমার নিন্দা করেন ? আমি দেখছি যে আপনি, বিদুর, আমার পিতা ও পিতামহ সর্বদা আমার ওপরেই সমস্ত দোষ নাস্ত করেন। আমি খুব ভেবেও আমার ছোট-বড় কোনো দোষ খুঁজে পাইনি। পাণ্ডবরা নিজেরাই শখ করে পাশা খেলতে এসেছিল ; তাতে মাতুল শকুনি ওদের হারিয়ে রাজ্য জয় করেছে, তাতেই ওদের বনে যেতে হয়েছে। বলুন, এতে আমার দোষ কোথায় ? ওরা অযথা শত্রুতা করে আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করছে ? আমি জানি পাণ্ডবদের আমাদের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি নেই, তা সত্ত্বেও তারা কেন আমাদের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করছে ? আমরা ওদের ভয়ানক কর্ম দেখে অথবা

আপনাদের কথা শুনে ভীত হওয়ার মানুষ নই। আমরা এইভাবে ইন্দ্রের সামনেও মাথা নত করব না। কৃষ্ণ! আমরা তো এমন কোনো ক্ষত্রিয় দেখছি না, যারা যুদ্ধে আমাদের হারাতে পারে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণকে তো দেবতারাও যুদ্ধে হারাতে সক্ষম নন ; সেখানে পাণ্ডবদের আর কী কথা ? স্বধর্ম পালন করে যদি আমরা যুদ্ধে হতও হই, আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। ক্ষত্রিয়ের এটিই প্রধান ধর্ম। যুদ্ধে যদি আমরা বীরগতি প্রাপ্ত হই, তাহলে কোনো অনুতাপই থাকবে না। কারণ পুরুষের ধর্মই হল উদ্যোগ করা। তাতে মানুষ যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহলেও তার মাথা নত করা উচিত নয়। আমার মতো বীরপুরুষ শুধু ধর্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করে, আর কাউকে মানে না। ক্ষত্রিয়ের সেটাই ধর্ম বলে আমার মত। পিতা পাশায় জেতার পর আমাকে রাজ্যের যে ভাগ দিয়েছেন, আমি জীবিত থাকতে তা কেউ নিতে পারবে না। বাল্যাবস্থায় আমার যখন জ্ঞান হয়নি তখন পাণ্ডবরা রাজ্য পেয়েছিল, এখন আর ওরা তা পাবে না। কেশব! যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ সূঁচের অগ্রভাগে যে মাটি ওঠে, তা-ও আমি দেব না।'

দুর্যোধনের এই সব কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। কিছুক্ষণ ভেবে পরে তিনি বললেন—'দুর্যোধন! তোমার যদি বীরশয্যা লাভ করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তোমার মন্ত্রণাকারীদের সঙ্গে কিছুদিন অপেক্ষা করো। তুমি অবশ্যই তা লাভ করবে এবং তোমার কামনা পূর্ণ হবে। কিন্তু স্মরণ রেখো, মর্মান্তিক প্রজা হত্যা হবে। তুমি যে মনে করছ যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে তুমি কোনো দুর্ব্যবহার করনি, এখানে উপস্থিত রাজারাই তার বিচার করবেন। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যে ঈর্ষাপীড়িত হয়েই তুমি এবং শকুনি পাশা খেলার বদ্‌মতলব করেছিলে। পাশা খেলায় সদ্‌ব্যক্তিরও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। যে অসৎ ব্যক্তিরা পাশায় প্রবৃত্ত হয়, তাদের শুধু কলহ ও ক্লেশই বৃদ্ধি পায়। আর তুমি যে দ্রৌপদীকে সভায় এনে সবার সামনে যে সব অসভ্য আচরণ করেছিলে, নিজ ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে কেউ কি তেমন অনুচিত ব্যবহার করতে পারে ? সদাচারী, নির্লোভ, সর্বদা ধর্ম আচরণকারী ভাইদের সঙ্গে কেউ কি তোমার মতো দুর্ব্যবহার করতে পারে ? সেই সময় কর্ণ, দুঃশাসন এবং তুমি ক্রূর এবং নীচ ব্যক্তির ন্যায় বহু কটু বাক্য বলেছ। তুমি বারণাবতে মাতা কুন্তীর সঙ্গে অল্পবয়সী পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিলে। সেইসময় পাণ্ডবদের বহু কষ্ট সহ্য করে মাতা কুন্তীকে নিয়ে একচক্রা নগরীতে ভিক্ষা দ্বারা জীবন কাটাতে হয়েছিল। তাছাড়া বিষপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা উপায়ে তুমি ওদের বধ করার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু তোমার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। পাণ্ডবদের প্রতি সবসময়ই তোমার কুবুদ্ধি এবং কপট আচরণ ছিল। তবে কী করে বলা যায় যে পাণ্ডবদের প্রতি তোমার কোনো অপরাধ নেই ! তুমি যদি পাণ্ডবদের তাদের পৈতৃক রাজ্যের ভাগ না দাও, তাহলে পাপাত্মা ! স্মরণ রেখো, ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হয়ে ওদের হাতে তোমার মৃত্যু অবধারিত। তুমি কুটিল ব্যক্তির মতো পাণ্ডবদের প্রতি না করার যোগ্য বহু কাজ করেছ, আজও তুমি বিপরীত কাজ করে চলেছ। তোমার পিতা-মাতা-পিতামহ-আচার্য এবং বিদুর বারংবার সন্ধির কথা বললেও, তুমি তাতে রাজি নও। হিতৈষীদের কথা না মেনে নিলে, তুমি কখনো সুখ পাবে না। তুমি যে কাজ করতে চাও তা অধর্ম এবং অপযশের কারণ।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, তার মধ্যেই দুঃশাসন দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! আপনি যদি নিজ ইচ্ছায় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না করেন, তাহলে মনে হচ্ছে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আমাদের পিতা আপনাকে, আমাকে ও কর্ণকে বেঁধে পাণ্ডবদের কাছে সমর্পণ করবেন।' ভাইয়ের এই কথা শুনে দুর্যোধনের ক্রোধ আরও বর্ধিত হল, তিনি সাপের মতো ফুঁসে উঠে বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, কৃপ, সোমদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং শ্রীকৃষ্ণ—সকলকে অপমান করে সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। তাঁকে যেতে দেখে তাঁর ভাই, মন্ত্রী এবং অনুগত রাজারা সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। পিতামহ ভীষ্ম বললেন— 'রাজকুমার দুর্যোধন বড়ই দুষ্ট চিত্ত, সে সর্বদা অসদ্ উপায়েরই আশ্রয় নেয়, মিথ্যা অহংকার, ক্রোধ ও লোভই তাকে অবদমিত করেছে। শ্রীকৃষ্ণ ! আমার মনে হয় ক্ষত্রিয়দের অন্তিম সময় এসে গেছে। তাই দুর্যোধন তার কুমন্ত্রণাকারীদের কথা অনুসরণ করছে।'

ভীষ্মের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'কৌরবকুলের বয়োবৃদ্ধের সব থেকে বড় ভুল হল যে তাঁরা বলপূর্বক উন্মত্ত দুর্যোধনকে বন্দী করে রাখছেন না। এই ব্যাপারে আমার যেটা সম্পূর্ণভাবে হিতের কথা মনে হয়, তা আমি বলে দিচ্ছি। আপনাদের যদি তা অনুকূল এবং ঠিক বলে মনে হয়, তা হলে তা করবেন। ভোজরাজ উগ্রসেনের পুত্র

কংস অত্যন্ত দুরাচারী ও দুর্বুদ্ধি ছিল। সে পিতার জীবিতকালেই তাঁর রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল। শেষে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। সুতরাং আপনারাও দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের নিকট সমর্পণ করুন। কুল রক্ষার জন্য একজন ব্যক্তিকে, গ্রাম রক্ষার জন্য একটি কুলকে, দেশ রক্ষার জন্য একটি গ্রামকে এবং নিজেকে রক্ষার জন্য সমস্ত পৃথিবীকেই পরিত্যাগ করা উচিত। সুতরাং আপনারাও দুর্যোধনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নিন। তাতে এইভাবে ক্ষত্রিয়কুলের নাশ হবে না।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন—'ভ্রাতা ! তুমি পরম বুদ্ধিমতী গান্ধারীর কাছে গিয়ে তাঁকে এখানে ডেকে আনো। আমি তাঁর সঙ্গে দুরাত্মা দুর্যোধনকে বোঝাবো।' মহাত্মা বিদুর গিয়ে দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে সভাকক্ষে নিয়ে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে

বললেন—'গান্ধারী ! তোমার দুষ্ট পুত্র আমার কথা শুনতে চায় না। সে অসৎ ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত শিষ্টাচার পরিত্যাগ করেছে। হিতৈষীদের কথা না শুনে তার পাপী, দুষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে সে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছে।'

পতির কথা শুনে যশস্বিনী গান্ধারী বললেন—'রাজন্ ! আপনি পুত্রের মোহে আবদ্ধ হয়ে আছেন এর জন্য আপনিই দায়ী। দুর্যোধন অত্যন্ত পাপী জেনেও আপনি তাকে সায় দিচ্ছেন। কাম, ক্রোধ ও লোভের কবলে দুর্যোধন পড়ে রয়েছে। এখন বল প্রয়োগ করেও আপনি তাকে সেই পথ থেকে সরাতে পারবেন না। আপনি কিছু না জেনে বুঝেই আপনার এই মূর্খ, দুরাত্মা, কুসঙ্গী, লোভী পুত্রকে রাজ্যের ভার অর্পণ করেছেন। এখন তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আপনার ঘরে যে বিরোধ রয়েছে, তা কেন উপেক্ষা করছেন ? এই ভাবে আত্মীয়ের মধ্যে বিরোধিতা থাকলে, শত্রুরাও মজা পাবে। যদি সাম বা ভেদের সাহায্যে বিপদ দূর করা যায়, তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বজনের জন্য দণ্ড প্রয়োগে ইতস্তত করেন না।'

তারপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কথায় মহাত্মা বিদুর পুনরায় দুর্যোধনকে সভায় ডেকে আনলেন। দুর্যোধনের চোখ রাগে রক্তবর্ণ হয়েছিল এবং তিনি সাপের মতো ফুঁসছিলেন। মাতা ডেকেছেন কেন—তা শোনার জন্য তিনি রাজসভাতে এলেন। মাতা গান্ধারী দুর্যোধনকে তিরস্কার করে সন্ধি করার জন্য বললেন—'পুত্র দুর্যোধন ! আমার কথা শোন। এতে তোমার এবং তোমার সন্তানের মঙ্গল হবে এবং ভবিষ্যতে তোমার সুখ হবে। তোমার পিতা, আমার, দ্রোণাচার্য প্রমুখ সকলেরই তোমার দ্বারা অনেক সেবা প্রাপ্ত হবে। পুত্র ! রাজ্য লাভ করা, তা রক্ষা করা এবং ভোগ করা—তোমার কর্ম নয়। যিনি জিতেন্দ্রিয় হন, তিনিই রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম। কাম ও ক্রোধ মানুষকে অর্থচ্যুত করে দেয়। উন্মত্ত ঘোড়া যেমন পথেই মূর্খ সারথিকে বধ করে, তেমনই ইন্দ্রিয়কে বশে না রাখলে, মানুষ তাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে নিজ মনকে জিতে নেয় সে নিজের শত্রু ও মন্ত্রীকেও জিতে নেয়। তেমনই যে ইন্দ্রিয়কে বশে রাখে, মন্ত্রীদের ওপর যার অধিকার থাকে, অপরাধীদের যে শাস্তি দেয় এবং সব কাজ ভালো করে ভেবে করে, লক্ষ্মী চিরকাল তার কাছে বাঁধা থাকেন। পুত্র ! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে কেউ হারাতে পারে না। সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও,তিনি প্রসন্ন থাকলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। যুদ্ধে কোনো কল্যাণ নেই। তাতে ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ কী করে হবে ? যুদ্ধে যে বিজয় হবেই—একথাও বলা যায় না ; অতএব যুদ্ধ করতে চেয়ো না। তুমি যদি রাজ্য ভোগ করতে চাও তাহলে ন্যায়োচিত ভাগ দিয়ে

দাও। ওদের যে তেরো বছর বনবাসে থাকতে হল, সে-ও খুবই অন্যায় হয়েছে। এবার সন্ধি করে ভুল সংশোধন করো। তুমি যে পাণ্ডবদের ভাগ দখল করতে চাও, তোমার সে শক্তি নেই, কর্ণ বা দুঃশাসনও তা পারবে না। তোমার যে মনে হচ্ছে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ মহারথীগণ পূর্ণ শক্তিতে তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন—তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ এঁদের দৃষ্টিতে তোমাদের এবং পাণ্ডবদের স্থান সমান। এই রাজ্যে অন্নগ্রহণ করার জন্য তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যুধিষ্ঠিরের দিকে বাঁকা চোখে তাকাবেন না। পুত্র ! জগতে লোভের দ্বারা কোনো সম্পত্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং তুমি লোভ পরিত্যাগ করে, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও।'

—o—

দুর্যোধনের কুমন্ত্রণা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন এবং কৌরব সভা থেকে প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বললেন—মাতার এই নীতিযুক্ত কথা দুর্যোধন কানেই তুললেন না, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রীদের কাছে চলে এলেন। তারপর দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসন—চারজনে মিলে পরামর্শ করলেন, 'দেখো এই কৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মের সঙ্গে মিলে আমাদের বন্দী করতে চান ; অতএব আমরাই ওকে আগে বলপ্রয়োগ করে বন্দী করে ফেলি। কৃষ্ণ বন্দী হয়েছে শুনেই পাণ্ডবদের সমস্ত উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আর ওরা

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।'

সাত্যকি ইশারার দ্বারাই অপরের মনের কথা জেনে ফেলতেন। তিনি শীঘ্রই তাদের মনোভাব বুঝে গেলেন এবং সভার বাইরে এসে কৃতবর্মাকে বললেন—'সত্বর সেনা সমাবেশ করো, আর যতক্ষণ আমি এই কুমন্ত্রণার কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানাচ্ছি, তুমি কবচ ধারণ করে সভাভবনের দ্বারে অবস্থান করো।' তারপর তিনি সভায় প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণকে এই কুচক্রের কথা জানালেন। তারপর তিনি হেসে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে বলতে লাগলেন—'সদ্ব্যক্তির দৃষ্টিতে দূতকে বন্দী করা ধর্ম, অর্থ ও কামের বিরুদ্ধ, কিন্তু মূর্খ তাই করার কথা ভাবছে। তার মনোবাসনা কখনো পূর্ণ হবে না। সে বড়ই ক্ষুদ্রচিত্ত, সে জানে না কৃষ্ণকে বন্দী করা বালকের আগুন দিয়ে কাপড় ধরার মতো বিপজ্জনক।'

সাত্যকির কথা শুনে দূরদর্শী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন —'রাজন্ ! মনে হচ্ছে আপনার সকল পুত্রকেই মৃত্যু ঘিরে ধরেছে ; তাই তারা না করার যোগ্য এবং অপযশ প্রাপ্তি করার মতো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। দেখুন, এরা একসঙ্গে মিলে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করে এখন বলপ্রয়োগে বন্দী করার কথা ভাবছে। কিন্তু এরা জানে না আগুনের কাছে গেলে যেমন পতঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেই ওদের সাধ মিটবে।'

তখন শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'রাজন্ ! এরা যদি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বন্দী করার সাহস করে, তাহলে আপনি অনুমতি করুন আর দেখুন ওরা আমাকে বন্দী করে, না আমি ওদের বেঁধে রাখি ! আমি যদি এখন ওকে এবং ওর অনুচরদের বেঁধে পাণ্ডবদের কাছে সমর্পণ করি, তাহলে তা নিশ্চয়ই অন্যায় কাজ হবে না ! রাজন্ ! আমি আপনার সব

পুত্রদেরই অনুমতি দিচ্ছি ; ওরা যেন দুর্যোধনের ইচ্ছামত কাজ করার সাহস দেখায় !'

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুরকে বললেন— 'তুমি শীঘ্র গিয়ে পাপী দুর্যোধনকে এইখানে নিয়ে এসো, আশা করি এবার আমি তাকে ঠিক পথে আনতে পারব।' বিদুর তখনই দুর্যোধন আসতে না চাইলেও তাকে সভায় ফিরিয়ে আনলেন, তাঁর সঙ্গীসাথী এবং ভাইরাও সঙ্গে এলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন—'কুটিল দুর্যোধন ! তুমি তোমার পাপী সঙ্গীদের নিয়ে পাপকর্ম করতে একেবারে নীচে নেমে গেছ ? মনে রেখো, তোমার মতো মূঢ় এবং কুলকলঙ্ককারী ব্যক্তি যা কিছু করতে চায়, তা কখনো পূর্ণ হয় না ; এতে সদ্ব্যক্তিরা তোমার নিন্দা করবে। তুমি নাকি তোমার পাপী সঙ্গীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করে রাখতে চাও ? এঁকে তো ইন্দ্রসহ কোনো দেবতাই পরাস্ত করতে পারেননি। তোমার এই দুঃসাহস এমনই যেন কোনো শিশুর চাঁদ ধরতে চাওয়া। মনে হচ্ছে শ্রীকেশবের প্রভাব সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। আরে, হাওয়াকে যেমন হাত দিয়ে ধরা যায় না, পৃথিবীকে মাথার ওপর তোলা যায় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণকে কেউ বলপ্রয়োগ করে বাঁধতে পারে না।'

তারপর মহাত্মা বিদুর বললেন—দুর্যোধন ! তুমি আমার কথা শোন। শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার কথা নরকাসুরও ভেবেছিল ; কিন্তু সমস্ত দানবদের সঙ্গে নিয়েও সে তা করতে পারেনি। তুমি কী করে নিজের বলবুদ্ধির সাহায্যে এঁকে ধরবার সাহস করছ ? ইনি বাল্যাবস্থাতেই পূতনা ও বকাসুরকে বধ করেছেন, গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেছিলেন। অরিষ্টাসুর, ধেনুকাসুর, চাণূর, কেশী এবং কংসকে ধূলিসাৎ করেছেন। তাছাড়াও তিনি জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, বাণাসুর এবং আরও অনেক রাজাকে পরাস্ত করেছেন। সাক্ষাৎ বরুণ, অগ্নি এবং ইন্দ্রও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। ইনি তাঁর অন্যান্য অবতাররূপে মধু-কৈটভ এবং হয়গ্রীব ইত্যাদি নানা দৈত্যকে বিনাশ করেছেন। ইনি সমস্ত প্রবৃত্তির প্রেরক, কিন্তু নিজে কারো প্রেরণায় কোনো কাজ করেন না। ইনিই সব পুরুষার্থের কারণ। ইনি সব কাজই অনায়াসে করতে সক্ষম। তুমি এঁর প্রভাব জানো না। তুমি যদি এঁকে অপমান করার সাহস করো, তাহলে তোমারও তেমনই দশা হবে, কোনো চিহ্ন থাকবে না, যেমন আগুনে পড়ে পতঙ্গের চিহ্নও নষ্ট হয়ে যায়।

বিদুরের বক্তব্য শেষ হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'দুর্যোধন ! তুমি যে অজ্ঞানতাবশত মনে করছ যে আমি একা, আমাকে বলপ্রয়োগে বন্দী করবে, তাহলে স্মরণে রেখো যে সমস্ত পাণ্ডব এবং বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় যাদবও এখানে আছেন। শুধু তাই নয়, আদিত্য, রুদ্র, বসু এবং সকল মহর্ষিগণও এখানে উপস্থিত রয়েছেন।' এই কথা বলে শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ অট্টহাস্য করলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর

সর্ব অঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সব দেবতাকে দেখা গেল। তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থলে রুদ্র, হাত দুটিতে লোকপাল এবং মুখে অগ্নিদেবকে দেখা গেল। আদিত্য, সাধ্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র-সহ মরুদ্‌গণ, বিশ্বদেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস—এ সবই তাঁর দেহে অভিন্ন হয়ে রয়েছেন। তাঁর দুই হাতে বলভদ্র এবং অর্জুন প্রকটিত হলেন। ধনুর্ধারী অর্জুন তাঁর দক্ষিণ হাতে এবং হলধর বলরাম তাঁর বাম হাতে বিরাজমান ছিলেন। ভীম, যুধিষ্ঠির এবং নকুল-সহদেব তাঁর পৃষ্ঠভাগে ছিলেন আর প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণ অস্ত্র-শস্ত্র সহ তাঁর সম্মুখে ছিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণের বহু বাহু দৃষ্টিগোচর হল, সেই বাহুগুলিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, ধনুক, হল এবং খড়্গ ধরা ছিল। তাঁর চক্ষু, নাসিকা এবং

কর্ণরন্ধ্রে ভীষণ আগুনের শিখা এবং রোমকূপ থেকে সূর্যের কিরণের মতো জ্যোতি দেখা যাচ্ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ংকর রূপ দেখে সমস্ত রাজা ভীত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন। শুধু দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় এবং ঋষিগণই তা দর্শন করতে সক্ষম হলেন। কারণ ভগবান তাঁদের দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। সভাগৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত কাজ দেখে দেবতারা দুন্দুভি বাজাতে লাগালেন এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'কমলনয়ন ! সমস্ত জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী আপনি, আপনি আমাদের কৃপা করুন। আমার প্রার্থনা, আপনি এখন আমাকে দিব্যদৃষ্টি দিন ; আমি শুধু আপনাকেই দর্শন করতে চাই, আর কাউকে দেখার আমার বাসনা নেই।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'কুরুনন্দন, অদৃশ্যরূপে আপনার দুটি নেত্র হোক।' সভায় উপস্থিত রাজা ও ঋষিগণ যখন দেখলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চক্ষুষ্মান হয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন। তখন পৃথিবী টলমল করে উঠল, সমুদ্র উত্তাল হল এবং রাজারা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর ভগবান তাঁর দিব্য, চিত্র-বিচিত্র অদ্ভুত রূপ সংবরণ করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদের অনুমতি নিয়ে সাত্যকি ও কৃতবর্মাকে সঙ্গে নিয়ে সভাভবন ত্যাগ করলেন। তিনি প্রস্থান করতেই নারদ ও অন্য ঋষিগণ অন্তর্ধান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে যেতে দেখে রাজাদের সঙ্গে সমস্ত কৌরবও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন না। দারুক তাঁর রথ নিয়ে উপস্থিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাতে উঠলেন, মহারথী কৃতবর্মাও তাতে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যাত্রা শুরু করছেন তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'জনার্দন ! পুত্রের ওপর আমার অধিকার কতটুকু কাজ করে—তা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। আমি চাই কোনোভাবে কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে মিল হয়ে যাক, তার জন্য চেষ্টাও করেছি। আপনি এখন আমাকে কোনো সন্দেহ করবেন না।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, বিদুর, কৃপাচার্য এবং বাহ্লীককে বললেন—'এখন কৌরব সভায় যা কিছু হয়েছে তা সবই আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন কীভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন তাও আপনাদের সামনেই ঘটেছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই ব্যাপারে কিছু করতে অক্ষম বলে জানাচ্ছেন। সুতরাং আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে যাচ্ছি।' শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে যাত্রা শুরু করলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং যুযুৎসু প্রমুখ কৌরব বীর কিছুদূর পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে তাঁর পিসিমা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

—o—

কুন্তীর বিদুলার কথা বলে পাণ্ডবদের সংবাদ প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের সেখান হতে বিদায় গ্রহণ করে পাণ্ডবদের কাছে আসা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভগবান কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে গিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করলেন এবং কৌরব সভার বিবরণ সংক্ষেপে জানালেন। তিনি বললেন—'পিসিমা ! আমি এবং ঋষিগণ নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু দুর্যোধন কোনো কথাই শোনেনি। আমি এখন আপনার কাছে বিদায় চাইছি, কারণ আমাকে শীঘ্রই পাণ্ডবদের কাছে যেতে হবে। বলুন, ওদের কাছে আপনার কথা কী বলব ?'

কুন্তী বললেন—'কেশব ! আমার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলবে তোমার ধর্ম পৃথিবী পালন করা, একাজে বড়ই ক্ষতি হচ্ছে। পুত্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর হস্ত থেকে ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তাদের বাহুবলেই জীবিকা-নির্বাহ করতে হবে। পূর্বকালে কুবের রাজা মুচকুন্দকে সমগ্র পৃথিবী অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু মুচকুন্দ তা স্বীকার করেননি। তিনি যখন নিজ বাহুবলে রাজ্য লাভ করেন, তখন ক্ষাত্রধর্মের আশ্রয় নিয়ে তিনি যথাবৎ পৃথিবী পালন করেন। রাজা দ্বারা সুরক্ষিত থেকে প্রজা যে ধর্মকর্ম করে, তার চতুর্থাংশ রাজা প্রাপ্ত হন। রাজা ধর্মাচরণ করলে দেবলোক প্রাপ্ত হন, অধর্ম করলে নরক গমন হয়। তিনি যদি দণ্ডনীতি ঠিকমতো প্রয়োগ করেন, তাহলে চার বর্ণের লোক অধর্ম করতে বাধা পেয়ে ধর্মে প্রবৃত্ত হয়। বাস্তবে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—

এই চার যুগের কারণ হলেন রাজন্যবর্গ। এখন তুমি যে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছ তা তোমার পিতা পাণ্ডু, আমি অথবা তোমার পিতামহ কখনো চাইনি। আমি সর্বদা তোমার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শৌর্য, প্রজ্ঞা, সন্তানোৎপত্তি, মহত্ত্ব, বল এবং তেজস্বীতারই কামনা করেছি। ধর্মাত্মা ব্যক্তির কর্তব্য হল যে রাজ্যলাভ করে কাউকে দানের দ্বারা, কাউকে বলের সাহায্যে এবং কাউকে মিষ্ট ভাষায় বশীভূত করা। ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন করে, বৈশ্য ধনসংগ্রহ করে এবং শূদ্র এদের সকলের সেবা করে। তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ এবং কৃষিকাজও উচিত নয়। তুমি ক্ষত্রিয়, প্রজাদের রক্ষক ; বাহুবলই তোমার জীবন-সাধন। মহাবাহো ! তোমার যে পৈতৃক অংশ শত্রুরা দখল করেছে, সাম-দান-দণ্ড-ভেদ বা নীতির সাহায্যে তোমার সেটি উদ্ধার করা উচিত। এর থেকে দুঃখের আর কী হতে পারে যে তোমার ন্যায় পুত্র থাকতেও আমাকে অন্যের গৃহে থাকতে হয়। সুতরাং ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে তুমি যুদ্ধ করো।

'কৃষ্ণ ! এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাচ্ছি। এতে বিদুলা এবং তাঁর পুত্রের সংবাদ বলা হয়েছে। বিদুলা ক্ষত্রিয়াণী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত যশস্বিনী, তেজস্বিনী, সংযমী, দীর্ঘদর্শিনী এবং কুলীন বংশীয়া নারী ছিলেন। রাজসভায় তাঁর খুব খ্যাতি ছিল, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল অগাধ। একবার তাঁর পুত্র সিন্ধুরাজার কাছে পরাস্ত হয়ে অত্যন্ত দীন হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রকে তিরস্কার করে বললেন— আরে, অপ্রিয়দর্শী ! তুমি আমার পুত্র নও। তুমি শত্রুর আনন্দবর্ধনকারী, তোমার মধ্যে একটুও আত্মাভিমান নেই। তাই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তুমি ধর্তব্য নও। তোমার বুদ্ধি এবং অবয়বও নপুংসকের ন্যায়। প্রাণ থাকতেও তুমি নিরাশ হয়ে রয়েছ। যদি নিজের কল্যাণ চাও, তাহলে যুদ্ধের প্রস্তুতি করো, আত্মার অনাদর কোরো না এবং মনকে সুস্থ করে ভীতি ত্যাগ করো। কাপুরুষ ! উঠে দাঁড়াও, হার স্বীকার করে নিস্তেজ হয়ে থেকো না। এইভাবে নিজের মান বিসর্জন দিয়ে কেন শত্রুদের আনন্দ প্রদান করছ ! এতে তোমার সুহৃদদের দুঃখ বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণ গেলেও পরাক্রম ছাড়া উচিত নয়। বাজপাখি যেমন নিঃশঙ্ক হয়ে আকাশে ওড়ে, তুমিও তেমনই নির্ভয় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে

বিচরণ করো। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বাজপড়া মৃত মানুষ। তুমি শুধু উঠে দাঁড়াও ; শত্রুর কাছে হেরে গিয়ে পড়ে থেকো না। তুমি সাম, দান ও ভেদরূপ মধ্যম, অধম ও নীচ উপায়ের আশ্রয় নিয়ো না। দণ্ডই সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই আশ্রয় নিয়েই শত্রুর সামনে রুখে দাঁড়াও। বীরপুরুষরা রণভূমিতে গিয়ে উচ্চ কোটির মনুষ্যোচিত পরাক্রম দেখিয়ে নিজ ধর্ম থেকে ঋণ পরিশোধ করে। বিদ্বান ব্যক্তি ফল পাওয়া যাক বা না যাক তার জন্য চিন্তা করে না, সে নিরন্তর পুরুষার্থ সাধ্য কর্ম করতে থাকে। তার নিজের জন্য অর্থের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। তুমি হয় নিজ পুরুষার্থ বৃদ্ধি করে জয় লাভ করো, নচেৎ বীরগতি প্রাপ্ত হও। ধর্মকে পিঠ দেখিয়ে এইভাবে কেন বেঁচে আছ ? আরে নপুংসক ! এইভাবে সমস্ত কর্ম এবং সুখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তোমার যে রাজ্য ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেছে ; তোমার কীসের জন্য বেঁচে থাকা ?'

দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা, ধনসংগ্রহের প্রসঙ্গ হলে যে ব্যক্তির সুনাম করা হয় না, সে তার মাতার বিষ্ঠা স্বরূপ। সত্যকার ব্যক্তি তাঁকেই বলা হয় যিনি তাঁর বিদ্যা, তপ, ঐশ্বর্য এবং পরাক্রমে সকলকে স্তব্ধ করে রাখেন। তোমার ভিক্ষাবৃত্তি করা উচিত নয়, তা অকীর্তিকর, দুঃখদায়ক এবং

কাপুরুষের কাজ। সঞ্জয় ! মনে হয় পুত্ররূপে আমি কলিযুগকে জন্ম দিয়েছি। তোমার মধ্যে একটুও স্বাভিমান, উৎসাহ বা পুরুষার্থ নেই। কোনো নারীই যেন এরূপ কুপুত্রের জন্ম না দেয়। যে ব্যক্তি নিজের হৃদয় লোহার মতো দৃঢ় করে রাজ্য ও ধনাদি সংগ্রহ করে এবং শত্রুর সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, তাকেই পুরুষ বলা হয়। যে ব্যক্তি নারীর মতো কোনোপ্রকারে জীবিকা-নির্বাহ করে, তাকে 'পুরুষ' বলা বৃথা। যদি শূরবীর, তেজস্বী,বলীয়ান এবং সিংহের ন্যায় পরাক্রমী রাজা বীরগতি প্রাপ্ত হন, তাহলেও তাঁর রাজ্যের প্রজারা প্রসন্ন হয়। সকল প্রাণীর খাদ্যই যেমন মেঘ থেকে হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনের জীবিকা তোমার ওপরই নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

'যাও, কোনো পার্বত্য কেল্লাতে গিয়ে বাস করো এবং শত্রুদের বিপদ আসার প্রতীক্ষা করো। মানুষ তো অজর-অমর নয়। পুত্র ! তোমার নাম সঞ্জয়, কিন্তু তোমার মধ্যে তেমন কোনো গুণ দেখতে পাচ্ছি না, তুমি যুদ্ধে জয় লাভ করে নিজ নাম সার্থক করো। তুমি যখন শিশু ছিলে তখন এক বুদ্ধিমান ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ তোমাকে দেখে বলেছিলেন যে 'এই বালক এক বার ভীষণ বিপদে পড়ে তারপর উন্নতি করবে।' সেই কথা স্মরণ করে আমার তোমার বিজয় সম্পর্কে পূর্ণ আশা আছে, তাই তোমাকে এইসব বলছি। শম্বর মুনির বক্তব্য ছিল—যেখানে আজ আহার নেই, কালকের জন্যও কোনো ব্যবস্থা নেই—এরূপ চিন্তা থাকে, তার চেয়ে খারাপ অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। তুমি যখন দেখবে তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় না থাকলে কাজ করার দাস, সেবক, আচার্য, ঋত্বিক, পুরোহিত সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে, তখন তোমার বেঁচে থাকার আর কী দরকার ? আগে কখনো আমি এবং আমার পতি কোনো ব্রাহ্মণকে 'না' বলতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হত। আমরা সর্বদা অপরকে আশ্রয় প্রদান করেছি, অন্যের নির্দেশ শোনার অভ্যাস আমার নেই। আমাকে যদি অন্যের আশ্রয়ে জীবন কাটাতে হয়, তাহলে আমি প্রাণত্যাগ করব। তোমার যদি জীবনের মায়া না থাকে তাহলে তোমার সব শত্রুই পরাস্ত হবে। তুমি যুবক এবং বিদ্যা, কুল ও রূপে সম্পন্ন। তোমার মতো যশস্বী এবং জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যদি এরূপ বিপরীত আচরণ করে এবং নিজ কর্তব্য পালন না করে, তাহলে আমি তাকে মৃত্যু বলেই মনে করি। আমি যদি তোমাকে শত্রুদের সঙ্গে মিষ্টবাক্য বলতে শুনি এবং তাদের অনুসরণ করতে দেখি, তাহলে আমার হৃদয় কী করে শান্তি পাবে ? এই কুলে এমন কেউ জন্মায়নি যে তার শত্রুর পিছনে পিছনে ঘোরে। শত্রুর সেবক হয়ে বেঁচে থাকা তোমার কখনোই উচিত নয়। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিয়েছে এবং যার ক্ষাত্রধর্মের জ্ঞান থাকে, সে কখনো ভয়ে বা জীবিকা নির্বাহের জন্য কারোও কাছে নত হবে না। সেই মহান বীর মত্ত হাতির ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করে এবং ধর্মরক্ষার নিমিত্ত শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের কাছেই নত হয়।'

পুত্র বলতে লাগলেন—'মাতা ! তুমি বীরদের ন্যায় বুদ্ধিশালী, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর এবং ক্রোধী। তোমার হৃদয় যেন লৌহ-নির্মিত। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম অত্যন্ত কঠিন, যার জন্য তুমি আমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করছ। আমি তোমার একমাত্র পুত্র, তাও তুমি আমাকে এমনভাবে বলছ ? আমাকে যদি তুমি দেখতে না পাও, তাহলে এই পৃথিবী, অলংকার, ভোগ-বিলাস ভরা জীবনে তুমি কী সুখ পাবে ? তোমার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র আমি তো সংগ্রামে নিহত হব।'

মাতা বললেন—'সঞ্জয় ! বুদ্ধিমানরা ধর্ম ও অর্থকে লক্ষ্য রেখেই উপযুক্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। সেইজন্যই আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছি। এখন তোমার কাজ করে দেখানোর সময় এসেছে। এইসময় যদি তোমার পরাক্রম না দেখাও এবং নিজ শরীর ও শত্রুর ওপর শক্ত না হও তাহলে তোমার অত্যন্ত অসম্মান হবে। যখন অসম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তখন আমি যদি তোমাকে কিছু না বলি, তাহলে লোকে আমার অপযশ করবে। সুতরাং তুমি এই নিন্দিত এবং মূর্খসেবিত পথ পরিত্যাগ করো। প্রজারা যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সে তো বড়ই অজ্ঞান। আমার তখনই তোমাকে প্রিয় বলে মনে হবে, যখন তোমার আচরণ সৎ ব্যক্তির ন্যায় হবে। যে ব্যক্তি অবিনয়ী, শত্রুকে আক্রমণ করতে ভয় পায়, দুষ্ট এবং দুর্বুদ্ধিশালী পুত্র- পৌত্র পেয়েও নিজেকে সুখী বলে মনে করে, তার সন্তান লাভ ব্যর্থ। যে নিজ কর্তব্যকর্ম করে না, অপর দিকে নিন্দনীয় আচরণ করে সেই অধম ব্যক্তি ইহলোকেও সুখ পায় না, পরলোকেও নয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ এবং বিজয়প্রাপ্ত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যুদ্ধে বিজয় অথবা মৃত্যুপ্রাপ্ত হলে ক্ষত্রিয়

ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত করে। শত্রুকে বশীভূত করে ক্ষত্রিয় যে সুখ অনুভব করে, তা ইন্দ্রভবন বা স্বর্গেও পাওয়া যায় না।'

পুত্র বললেন—'মাতা ! সে কথা ঠিক, কিন্তু তোমার নিজপুত্রকে এমনভাবে বলা উচিত নয়। পুত্রের প্রতি তোমার দয়াদৃষ্টি রাখা উচিত।'

মাতা বললেন—'পুত্র ! তুমি যেমন আমাকে আমার কর্তব্য জানাচ্ছ, তেমনই আমি তোমাকে তোমার কর্তব্য জানাচ্ছি। যখন তুমি সিন্ধুদেশের সমস্ত যোদ্ধাদের বধ করবে, তখন আমি তোমার প্রশংসা করব। আমি তোমার বীরত্বে প্রাপ্ত বিজয়লাভই দেখতে চাই।'

পুত্র বললেন—'মাতা ! আমার অর্থও নেই, আর কোনো সাহায্যকারীও নেই ; তাহলে আমি কী করে বিজয়লাভ করব ? এই ভয়ানক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আমি নিজেই রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করেছি, যেমন পাপী ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করে। যদি এই পরিস্থিতিতে তুমি কোনো উপায় দেখতে পাও তবে আমাকে বলো ; তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।'

মাতা বললেন—'পুত্র ! যদি প্রথমেই তোমার কাছে অর্থ না থাকে, তার জন্য দুঃখ কোরো না। ধনসম্পত্তি আগে না হয়ে পরে হয় এবং পরে হয়েও আবার নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জেদের বশে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা কোরো না। বুদ্ধিমান পুরুষদের ধর্মানুসারে অর্থ উপার্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। কর্মফলের সঙ্গে সর্বদা অনিত্যতা লেগে থাকে। কখনো তার ফল পাওয়া যায়, কখনো পাওয়া যায় না। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কর্ম করেই যান। যে কর্ম করে না, সে তো কখনোই ফল পায় না। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের স্থির বিশ্বাস নিয়ে যে 'আমার অভীষ্ট কর্ম সফল হবেই' বলে অগ্রসর হওয়া উচিত, সাবধানে, ঐশ্বর্য প্রাপ্তির কাজে লেগে থাকা উচিত। কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় পুরুষের মাঙ্গলিক কর্ম করা উচিত। ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের পূজা করা উচিত, এই কাজ করলে রাজার উন্নতি হয়। যারা লোভী, শত্রু দ্বারা অবদমিত এবং অপমানিত, তাকে ঈর্ষা করে—তাদের তুমি নিজের পক্ষে আন। তাতে তুমি অনেক শত্রুনাশ করতে পারবে। তাদের বেতন দাও, প্রভাতে উঠে সকলের সঙ্গে প্রিয় কথা বলো। তাতে তারা অবশ্যই তোমার প্রিয় কাজ করবে। শত্রু যখন জেনে যায় যে আমার প্রতিপক্ষ প্রাণপণে যুদ্ধ করবে, তখন তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে।'

কোনো বিপদ এলে রাজার ভয় পাওয়া উচিত নয়। ভয় পেলেও তা প্রকাশ করা উচিত নয়। রাজাকে ভীত দেখলে প্রজা, সেনা, মন্ত্রী সকলেই ভয় পেয়ে তাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করবে। এদের মধ্যে কেউ শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, কেউ দূরে সরে যাবে আবার অন্য কেউ, যে আগে অপমানিত হয়েছিল, রাজ্য দখল করার চেষ্টা করবে। সেইসময় শুধু প্রকৃত বন্ধুরাই সঙ্গে থাকে ; কিন্তু হিতৈষী হলেও শক্তিহীন হওয়ায় এরাও কিছুই করতে পারে না।

আমি তোমার পুরুষার্থ ও বুদ্ধিবল জানাতে এবং তোমার উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য এই আশ্বাস দিয়েছি। তোমার যদি মনে হয় যে আমি ঠিক কথাই বলেছি, তাহলে মনকে স্থির করে বিজয়লাভের জন্য উঠে দাঁড়াও। আমার কাছে বহু ধন-সম্পদ আছে, যা আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি তোমাকে সেগুলি সমর্পণ করছি। সঞ্জয় ! এখন তোমার অনেক সুহৃদ আছে, যারা সুখ-দুঃখ সহনকারী এবং যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না।'

রাজা সঞ্জয় ছিলেন অত্যন্ত হীন প্রকৃতির মানুষ । কিন্তু মায়ের কথা শুনে তাঁর মোহ নষ্ট হয়ে গেল। তিনি মাকে বললেন—'আমার এই রাজ্য শত্রুরূপ জলে নিমজ্জিত ; এবার আমাকে তা উদ্ধার করতে হবে, নাহলে আমি রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করব। আমি কত সৌভাগ্যবান যে তোমার মতো মা আমি লাভ করেছি। আমার আর কীসের চিন্তা ? আমি সবসময় তোমার উপদেশ শুনতে চাই তাই কথার মাঝে চুপ করে থাকি। তোমার অমৃতসম বাক্য শোনা খুবই ভাগ্যের কথা। এবার আমি শত্রু দমন করে জয়লাভ করার জন্য প্রস্তুত। শত্রু জয়ই আমার তৃপ্তি এনে দেবে।'

কুন্তী বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! মাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো মাতার আজ্ঞানুসারে সঞ্জয় সব কাজ করলেন। এই কাহিনী অত্যন্ত উৎসাহবর্ধক এবং তেজবৃদ্ধিকারী। কোনো রাজা যখন শত্রু পীড়িত হয়ে কষ্টে পড়বে, তখন তার মন্ত্রী যেন এই প্রসঙ্গ তাকে শোনায়। এই কাহিনী শুনলে গর্ভবতী নারী বীর পুত্র উৎপন্ন করে। যদি কোনো ক্ষত্রিয় নারী এটি শোনেন তাহলে তাঁর গর্ভে বিদ্যাশূর, তপঃশূর, দানশূর, তেজস্বী, বলবান, ধৈর্যবান, অজেয়, বিজয়ী, দুষ্টদমনকারী, সাধুদের রক্ষক, ধর্মাত্মা এবং শূরবীর পুত্র উৎপন্ন হয়।'

'কেশব ! তুমি অর্জুনকে জানিও যে 'তোমার জন্মের সময় আমি আকাশবাণী শুনেছিলাম যে এই পুত্র ইন্দ্রের সমান হবে। ভীমকে সঙ্গে নিয়ে সে যুদ্ধস্থলে সমস্ত

কৌরবদের পরাস্ত করবে, শত্রুসৈন্যকে ভীত করে তুলবে। সমস্ত পৃথিবীকে নিজেদের অধীন করবে এবং স্বর্গলোক পর্যন্ত এই যশ ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত কৌরবকে যুদ্ধে পরাজিত করে অর্জুন নিজ হারানো পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করবে এবং পঞ্চভ্রাতা মিলে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে। কৃষ্ণ ! আমার মনের ইচ্ছাও তাই যে দৈববাণীতে আমি যেমন শুনেছি, তেমনই যেন হয় ; যদি ধর্ম সত্য হয়, তাহলে তেমনই হবে। তুমি অর্জুন ও ভীমকে বলবে, 'ক্ষত্রিয়াণী যে জন্য সন্তানের জন্ম দেয়, তার উপযুক্ত সময় এসেছে। দ্রৌপদীকে বলবে 'তুমি উচ্চবংশে উৎপন্ন হয়েছ, তুমি যে আমার সব পুত্রের সঙ্গে ধর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করেছ—তা তোমারই যোগ্য কাজ।' নকুল ও সহদেবকে বলবে যে 'তোমরা প্রাণপণে পূর্ণ শৌর্য প্রদর্শন করে ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো।'

'কৃষ্ণ ! রাজ্য হারানোতে অথবা কপট পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে পুত্ররা বনবাসে যাওয়াতে আমার তত দুঃখ হয়নি ; কিন্তু আমার যুবতী পুত্রবধূ সভায় ক্রন্দন করতে করতে দুর্যোধনের যে কুব্যবহার সহ্য করেছে, তাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ভীম ও অর্জুনের পক্ষে এটি অত্যন্ত অপমানজনক ঘটনা ! তুমি ওদের একথা স্মরণ করিয়ে দেবে। দ্রৌপদী, পাণ্ডব এবং তাদের পুত্রদের আমার হয়ে কুশল সংবাদ এবং আশীর্বাদ জানিয়ো। এবার তুমি অগ্রসর হও, আমার পুত্রদের সহায় থেকো। তোমার যাত্রা যেন নির্বিঘ্ন হয়।'

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পিসিমা কুন্তীকে প্রণাম করলেন এবং প্রদক্ষিণ করে বাইরে এলেন। বাইরে ভীষ্ম প্রমুখ প্রধান কৌরবদের বিদায় করে এবং কর্ণকে রথে তুলে দিয়ে সাত্যকির সঙ্গে রওনা হলেন। ভগবান চলে গেলে কৌরবরা নিজেদের মধ্যে নানা অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক কথা বলতে লাগলেন। নগরের বাইরে এসে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে কয়েকটি গোপনীয় কথা বললেন। তারপর কর্ণের কাছে বিদায় নিয়ে রথ চালিয়ে দিলেন। তিনি এতো শীঘ্র রথ চালালেন যে অতি অল্প সময়েই উপপ্লব্য এসে পৌঁছে গেলেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের আলোচনা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও কর্ণের গুপ্ত পরামর্শ

বৈশম্পায়ন বললেন—কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পুত্রদের যে আদেশ পাঠিয়েছেন,তা শুনে মহারথী ভীষ্ম এবং দ্রোণ রাজা দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে যে অর্থ আর ধর্মের অনুকূল কথা বলেছেন তা অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ এবং মর্মদায়ক, তা কি তুমি শুনেছ ? এবার পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাই করবে। তারা নিজ রাজ্য না নিয়ে ছাড়বে না। সুতরাং তুমি তোমার মা-বাবা এবং হিতৈষীদের কথা জেনে নাও। এখন সন্ধি অথবা যুদ্ধ—এর একটি তোমার উপর নির্ভর করছে। এখন যদি আমাদের কথা তোমার ভালো না লাগে, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের ভীষণ সিংহনাদ এবং গাণ্ডীবের টংকার শুনে অবশ্যই একথা স্মরণ করবে।'

দুর্যোধন একথা শুনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিনি মুখ নীচু করলেন, ভ্রূ কুঁচকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁকে বিষণ্ণ দেখে ভীষ্ম এবং দ্রোণ নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন—'যুধিষ্ঠির সর্বদা আমাদের সেবায় তৎপর থাকে, কখনো কাউকে ঈর্ষা করে না, ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং সত্যবাদী। তার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, এর থেকে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে।' দ্রোণাচার্য বললেন—'আমার পুত্র অশ্বত্থামার থেকেও অর্জুন আমার বেশি প্রিয়, তার সঙ্গেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এই ক্ষাত্রবৃত্তিকে ধিক্। দুর্যোধন ! তোমাকে তোমার পিতামহ ভীষ্ম, আমি, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেই বোঝাতে গিয়ে হার মেনেছি। কিন্তু তুমি কোনো হিতের কথাই শুনছ না। দেখো, আমরা অনেক দান, যজ্ঞ এবং স্বাধ্যায় করেছি ; ব্রাহ্মণদেরও দান ধ্যানের দ্বারা তৃপ্ত করেছি, আয়ুও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের যেসব কাজ করার ছিল, তা করে নিয়েছি। পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করে তোমাকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে। তোমার সুখ, রাজ্য, মিত্র, অর্থ—সবই শেষ হয়ে যাবে। অতএব

সেই বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চিন্তা ছেড়ে তুমি সন্ধি করে নাও। এতেই কুরুকুলের মঙ্গল। তোমার পুত্র, মন্ত্রী এবং সৈন্যদের পরাজয়ের সম্মুখীন কোরো না।'

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে রথে তুলে নিয়ে হস্তিনাপুরের বাইরে এসে তীক্ষ্ণ, মৃদু এবং ধর্মযুক্ত বাক্যে বললেন—

'কর্ণ ! তুমি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের খুব সেবা করেছ এবং তাঁদের কাছে অনেক পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে জেনেছ ; কিন্তু আমি তোমাকে একটি অত্যন্ত গোপনীয় কথা জানাচ্ছি। তুমি কুন্তীর কন্যাবস্থায় তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ। তাই ধর্মানুসারে তুমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সুতরাং শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে তুমিই রাজ্যের অধিকারী। তুমি আমার সঙ্গে চলো, পাণ্ডবরা যখন জানবে তুমি যুধিষ্ঠিরের পূর্বে জাত কুন্তীরই পুত্র, তখন পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং অভিমন্যু তোমার পদধূলি নেবে। পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করা সব রাজারা, রাজপুত্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সমস্ত যাদবও তোমার চরণবন্দনা করবে। আমার মনে হয় ধৌম্যমুনি আজই তোমার জন্য হোম করবেন এবং চতুর্বেদ জ্ঞাতা ব্রাহ্মণরা তোমার অভিষেক করবেন। আমরাও সকলে মিলিতভাবে তোমার রাজ্যাভিষেক করব। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হবেন এবং শ্বেত চামর হাতে তোমার পিছনে থাকবেন। ভীম তোমার মস্তকে শ্বেতছত্র নিয়ে দাঁড়াবেন, অর্জুন তোমার রথ চালাবেন। অভিমন্যু সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবে এবং নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, পাঞ্চাল রাজকুমার এবং মহারথী শিখণ্ডী তোমার পিছনে থাকবেন। আমিও তোমার পিছনে থাকব। তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে রাজ্যভোগ করো এবং জপ, হোম এবং নানা মঙ্গলকৃত্য করতে থাকো।'

কর্ণ বললেন—'কেশব ! আপনি বন্ধুত্ব, স্নেহ এবং প্রীতির বশে আমার মঙ্গলকামনায় যা কিছু বলেছেন, তা সবই যথার্থ। আপনি যা বলছেন তা সবই আমি জানি, ধর্মানুসারে আমি পাণ্ডুরই পুত্র। মাতা কুন্তী কন্যাবস্থায় সূর্যদেবের দ্বারা আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং জন্মের পরেই ত্যাগ করেন। অধিরথ সূত তখন আমাকে দেখতে পান এবং গৃহে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত স্নেহভরে তাঁর পত্নী রাধার ক্রোড়ে আমাকে সমর্পণ করেন। তিনি আমার সব কিছু সহ্য করে, মল-মূত্র পরিষ্কার করে মাতৃস্নেহে বড় করেছেন। সুতরাং ধর্মশাস্ত্র জেনে আমি কীভাবে তাঁর পিণ্ডলোপ করব ? তেমনই অধিরথ সূতও আমাকে পুত্র বলে জানেন, আমি তাঁকে সর্বদা পিতা বলেই জানি। তিনি আমার জাতকর্ম সংস্কার করিয়েছেন, ব্রাহ্মণের দ্বারা বসুষেণ নাম রেখেছেন। যুবাবস্থা প্রাপ্ত হলে সূতজাতির নারীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন, তার থেকে আমার পুত্র এবং পৌত্রাদিও জন্মেছে। অতএব এখন যদি আমাকে প্রভূত অর্থ-সম্পদ সমস্ত পৃথিবীও দেওয়া হয় কিংবা ভয়ও দেখানো হয়, তবুও আমি এই সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারব না। দুর্যোধনও আমার জন্যই যুদ্ধ করতে সাহস করেছে এবং অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথে সে আমাকেই নির্দিষ্ট করে রেখেছে। এখন আমি মৃত্যু, বন্ধন, ভয় বা লোভ কোনো কারণেই দুর্যোধনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। এইসময় অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ না হলে আমার ও অর্জুন, দুজনেরই অপযশ হবে।

কিন্তু মধুসূদন ! এখন আমরা একটি শর্ত করি, আমাদের দুজনের গোপনীয় কথা আমাদের মধ্যেই থাক। কারণ ধর্মাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির যদি এই বিষয় জানতে পারেন যে আমি কুন্তীর প্রথম পুত্র, তাহলে তিনি রাজ্য গ্রহণ করবেন না আর আমি এই বিশাল রাজ্য পেলে, তা দুর্যোধনকেই প্রদান করব। কিন্তু আমার প্রকৃত ইচ্ছা হল যে

যাদের নেতা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন, সেই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সর্বদা রাজ্যশাসন করুন। আমি দুর্যোধনের খুশির জন্য পাণ্ডবদের প্রতি যে কটুবাক্য বলেছি, সেই কুকর্মের জন্য আমার অত্যন্ত অনুতাপ হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যখন আমাকে অর্জুনের হাতে বধ হতে দেখবেন, যখন ভীষণ গর্জন করে ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করবে, যখন পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্মকে বধ করবেন, মহাবলী ভীম দুর্যোধনকে বধ করবেন, তখনই রাজা দুর্যোধনের এই রণ যজ্ঞ সমাপ্ত হবে। কেশব ! কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। সমস্ত বৈভবশালী ক্ষত্রিয়সমাজ সেখানেই স্বর্গলাভ করবে, আপনি তাঁদের এই অনুগ্রহ করুন। ক্ষত্রিয়ের অর্থ হল সংগ্রামে জয় লাভ অথবা পরাক্রম দেখিয়ে মৃত্যুলাভ করা। সুতরাং আপনি আমাদের এই কথা গোপনে রেখেই অর্জুনকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠাবেন।'

কর্ণের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ হেসে তাঁকে বলতে লাগলেন —'কর্ণ ! তুমি কি তাহলে এই রাজ্য প্রাপ্ত করতে চাও না ? আমার প্রদত্ত পৃথিবীর শাসনভার নিতে চাও না ? পাণ্ডবরাই যে জয়ী হবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঠিক আছে, তাহলে তুমি গিয়ে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য এবং ভীষ্মকে বলবে যে এই মাসই উত্তম সময়। এখন ফসলের অভাব নেই, কীট-পতঙ্গ কম আছে, মাটি শুষ্ক হয়েছে, জলে স্বাদ এসেছে এবং শীত বা গ্রীষ্ম কিছুরই আধিক্য নেই। আজ থেকে সপ্তম দিনে অমাবস্যা, সেই দিনই যুদ্ধ আরম্ভ করো। ওখানে যেসব রাজা একত্রিত হয়েছেন, তাঁদের এই সংবাদ জানিয়ে দিও। তোমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা হলে, আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুর্যোধনের অধীনে যেসব রাজা বা রাজপুত্র আছেন, তাঁরা যুদ্ধে মৃত হয়ে উত্তমগতি লাভ করবেন।'

কর্ণ তখন শ্রীকৃষ্ণকে আপ্যায়ন করে বললেন— 'মহাবাহো ! আপনি জেনেশুনে আমাকে কেন মোহগ্রস্ত করছেন ? এখন তো পৃথিবীর সংহারের সময় হয়েছে। শকুনি, আমি, দুঃশাসন ও দুর্যোধন তো নিমিত্তমাত্র। দুর্যোধনের অধীনে যত রাজা আছেন, সকলেই শাস্ত্রাগ্নিতে ভস্ম হয়ে যমলোকে যাবেন ! এখন চারিদিকে অলক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাই দেখে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। এতে স্পষ্টভাবে দুর্যোধনের পরাজয় এবং যুধিষ্ঠিরের বিজয় লাভ সুনিশ্চিত মনে হচ্ছে। পাণ্ডবদের হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি বাহনগুলিকে প্রসন্ন দেখাচ্ছে আর মৃগ তাঁদের দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে—এগুলি সবই বিজয়ের লক্ষণ। কৌরবদের বামদিক দিয়ে মৃগ গেছে—এতেই তাদের পরাজয় সূচিত হয়েছে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'কর্ণ ! এই পৃথিবী নিঃসন্দেহে বিনাশের সম্মুখীন হয়েছে, তাই আমার কথা তোমার হৃদয় স্পর্শ করেনি। বিনাশকাল নিকটবর্তী হলে অন্যায়কে ন্যায় বলে মনে হয়।'

কর্ণ বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! এই মহাযুদ্ধে যদি বেঁচে থাকি, তবেই আবার আপনার দর্শন পাব। অন্যথায় স্বর্গে তো আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবেই। এবার যুদ্ধে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।'

এই বলে কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তাঁর রথ থেকে নেমে, নিজ সুবর্ণ মণ্ডিত রথে উঠে হস্তিনাপুর নগরীতে ফিরে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত্যকিকে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পাণ্ডবদের দিকে রওনা হলেন।

———o———

কুন্তীর কর্ণের সমীপে গমন এবং কর্ণ কর্তৃক অর্জুন ব্যতীত অন্য পুত্রদের না বধ করার অঙ্গীকার

বৈশম্পায়ন বললেন— শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে চলে যাওয়ার পর বিদুর বিষণ্ণ মনে কুন্তীর কাছে গিয়ে বললেন, 'দেবী ! আপনি জানেন আমি সর্বদাই যুদ্ধের বিরোধী। আমি অনেক ভাবে বোঝালেও দুর্যোধন আমার কথা শোনেনি। এখন শ্রীকৃষ্ণও সন্ধির চেষ্টা করে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন। তিনি এবার পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবেন। কৌরবদের দুর্নীতির জন্য সব বীর বিনাশপ্রাপ্ত হবে, সেই কথা ভেবে আমার রাতের নিদ্রা চলে গেছে।'

বিদুরের কথা শুনে কুন্তী চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এই অর্থ-সম্পদ ধিক্, হায় ! এরজন্যই আত্মীয় স্বজন বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এই যুদ্ধে আমাদের সুহৃদরাও পরাজিত

হবে, এইসব ভেবে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ প্রমুখ দুর্যোধনের পক্ষেই থাকবেন, তাই তো আমার ভয় আরো বেড়ে যাচ্ছে। আচার্য দ্রোণ হয়তো তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করবেন না, পিতামহও যে পাণ্ডবদের স্নেহ করেন না, তা নয়। শুধু কর্ণই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সে মোহবশত দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনকে অনুসরণ করে সর্বক্ষণ পাণ্ডবদের হিংসা করে। সে ভয়ানক কিছু একটা করার জন্য পণ করেছে। আজ আমি কর্ণকে পাণ্ডবদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করব এবং তাকে তার জন্মবৃত্তান্ত জানাব।

এইভেবে কুন্তী গঙ্গাতীরে কর্ণের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর সত্যনিষ্ঠ পুত্রের বেদপাঠ শুনতে পেলেন। কর্ণ পূর্বমুখ হয়ে হাতদুটি উপরে তুলে মন্ত্রপাঠ করছিলেন। তপস্বিনী কুন্তী তাঁর জপ সমাপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় পিছনে প্রতীক্ষা করছিলেন। সূর্যতাপ যখন পিঠের দিকে এলো তখন জপ শেষ করে কর্ণ পিছন ফিরে কুন্তীকে দেখতে পেলেন। কুন্তীকে দেখে তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করে শ্রদ্ধা সহকারে বললেন—'আমি অধিরথ পুত্র কর্ণ, আপনাকে প্রণাম জানাই। আমার মাতার নাম রাধা। আপনি এখানে কেন এসেছেন ? বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?'

কুন্তী বললেন—'কর্ণ ! তুমি রাধার পুত্র নও, কুন্তীর সন্তান। অধিরথও তোমার পিতা নয়। তুমি সূতকুলে জন্ম নাওনি। পুত্র, এই বিষয়ে আমি যা বলছি শোন। আমি যখন রাজা কুন্তীভোজের ভবনে ছিলাম, তখন আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছি। তুমি আমার কুমারী অবস্থায় উৎপন্ন সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান। স্বয়ং সূর্যনারায়ণের দ্বারা তোমার জন্ম। জন্মের সময় তুমি কবচ-কুণ্ডল ধারণ করেছিলে এবং দেহ দিব্য ও তেজস্বী ছিল। পুত্র ! তুমি নিজ ভ্রাতাদের চিনতে না পারায় মোহবশত যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পক্ষে যোগ দিয়েছ, এ তোমার যোগ্য কাজ নয়। মনুষ্যধর্ম অনুসারে পিতা মাতা যাতে প্রসন্ন থাকেন, তাই ধর্মের ফল। অর্জুন প্রথমে রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করেছিল, পাপী কৌরবরা সেই লক্ষ্মী লোভবশত ছিনিয়ে নিয়েছে। এবার তুমি সেগুলি জয় করে ভোগ করো। তোমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হতে দেখলে, পাপী দুর্যোধন তোমার সম্মুখে মাথা নত করবে। কৃষ্ণ ও বলরামের যেমন একতা, কর্ণ ও অর্জুনেরও তেমন একতা হোক। এইভাবে তোমরা দুজন যখন মিলে যাবে তখন জগতে তোমাদের অসাধ্য আর কী থাকবে ? তুমি সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; নিজেকে 'সূতপুত্র' বোলো না, তুমি কুন্তীর পরাক্রমশালী পুত্র।'

সেইসময় কর্ণ সূর্যমণ্ডল থেকে আগত এক আওয়াজ শুনতে পেলেন। তা পিতার কণ্ঠস্বরের মতোই স্নেহপূর্ণ। তিনি শুনতে পেলেন—'কর্ণ ! কুন্তী সত্যই বলেছেন, তুমি মাতার কথা মেনে নাও। তাহলে তোমার সর্বপ্রকারে মঙ্গল হবে।'

কর্ণের ধৈর্য ছিল অপরিসীম। মাতা কুন্তী দেবী এবং পিতা সূর্যনারায়ণ স্বয়ং এইরূপ বললেও তাঁর বুদ্ধি বিচলিত হয়নি। তিনি বললেন—'ক্ষত্রিয় মাতা ! আপনার এই নির্দেশ মেনে নেওয়া হলে সেটি আমার ধর্মনাশ করার সমতুল্য হবে। মাতা ! আপনি আমাকে ত্যাগ করে আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছেন। এতে আমার সমস্ত যশ এবং কীর্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ক্ষত্রিয় জাতিতে জন্মগ্রহণ করলেও আপনার জন্যই আমার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংস্কার হয়নি। এর থেকে বেশি অহিত আর কোনো শত্রু করতে পারে ? আপনি আগে কখনো আমার প্রতি মাতার দায়িত্ব পালন করেননি, এখন নিজের কার্য সাধনের জন্য আমাকে বোঝাতে এসেছেন ! এতদিন পর্যন্ত আমাকে কেউ

পাণ্ডবদের ভ্রাতারূপে চিনতে পারেননি, যুদ্ধের সময় সেটা জানা গেল ? এখন যদি আমি পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করি তাহলে ক্ষত্রিয়রা আমাকে কী বলবে ? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণই আমাকে সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য প্রদান করেছে, এখন আমি কীভাবে তাদের উপকার অস্বীকার করব ? এবার দুর্যোধনের এই আশ্রিতের মৃত্যুর সময় হয়েছে। অতএব নিজের প্রাণের মায়া না করে এখন আমার ওদের ঋণশোধ করার সময় এসেছে। যাদের পালন-পোষণ করা হয়, প্রয়োজনের সময় তারা নিজেদের কাজ ঠিকমতো করে কৃতার্থ হয় ; চঞ্চল হৃদয় পাপীরাই সেই উপকার ভুলে কর্তব্য পরিত্যাগ করে। তারা রাজার কাছে অপরাধী হয়ে থাকে। আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্য নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আপনার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আপনার কাছে আমি মিথ্যা কথা বলব না, আমাকে সৎব্যক্তির ন্যায় দয়া ও সদাচার রক্ষা করতে হবে। কিন্তু মাতা ! আপনার এই চেষ্টা বিফল হবে না। যদিও আমি আপনার সব পুত্রদেরই বধ করতে সক্ষম, তা সত্ত্বেও আমি অর্জুন ব্যতীত আর কারো—যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব—এদের কোনো ক্ষতি করব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদলে আমি শুধু অর্জুনের সঙ্গেই যুদ্ধ করব। তাকে বধ করলেই আমার সংগ্রাম করার ফল ও সুযশ লাভ হবে। অতএব যে কোনো উপায়েই আপনার পাঁচপুত্র থাকবে। অর্জুন না থাকলে কর্ণকে নিয়ে পাঁচপুত্র থাকবে, আমার মৃত্যু হলে অর্জুন সহ পাঁচটি পুত্র থাকবে।'

তখন কুন্তী অপরিসীম ধৈর্যশালী কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন—'কর্ণ বিধাতা অত্যন্ত বলবান। মনে হয় তুমি যা বলছ, তাই হবে। কৌরবরা এবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু পুত্র ! তুমি চার পুত্রের জন্য যে অভয় বাক্য প্রদান করেছ, তা স্মরণ রেখো।' তারপর কুন্তীদেবী তাঁকে কুশলে থাকার আশীর্বাদ করলেন। কর্ণ বললেন 'তথাস্তু'। পরে দুজন নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন।

—o—

শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাজা যুধিষ্ঠিরের কৌরবসভার সংবাদ শ্রবণ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! হস্তিনাপুর থেকে উপপ্লব্যতে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, তা পাণ্ডবদের জানালেন। তিনি বললেন—'হস্তিনাপুরে গিয়ে আমি কৌরবসভাতে দুর্যোধনকে সত্য, মঙ্গলকারক এবং দুপক্ষেরই কল্যাণকারী কথা বলেছি। কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন কিছুই মানতে চাইল না।'

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! দুর্যোধন যখন কুপথ ছাড়তে রাজি হল না, তখন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ তাকে কী বললেন ? তাছাড়া আচার্য দ্রোণ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মাতা গান্ধারী, ধর্মজ্ঞ বিদুর এবং সভায় উপস্থিত অন্যান্য রাজারা কী উপদেশ দিলেন, আমাকে সব বলুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! কৌরব সভায় রাজা দুর্যোধনকে যা বলা হয়েছে তা শুনুন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করলে দুর্যোধন হেসে ওঠে। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম বললেন—'দুর্যোধন ! এই বংশের কল্যাণের জন্য আমি যা বলি, মন দিয়ে শোন। তুমি বিবাদ কোরো না, অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের প্রদান করো। আমি জীবিত থাকতে এখানে কে রাজত্ব করতে পারবে ? তুমি আমার কথার অন্যথা কোরো না। আমি সর্বদাই সকলের মঙ্গল কামনা করি। পুত্র ! আমার

কাছে পাণ্ডবদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আর তোমার পিতা-মাতা এবং বিদুরেরও এই মত। তোমার বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শোনা উচিত। আমার কথার অবহেলা কোরো না। আমাদের কথা যদি শোনো, তাহলে তুমি নিজেকে এবং সমস্ত পৃথিবীকে বিনাশের হাত থেকে বাঁচাবে।'

'পিতামহ ভীষ্মের পর আচার্য দ্রোণ দুর্যোধনকে বললেন —'দুর্যোধন ! মহারাজ শান্তনু ও ভীষ্ম যেভাবে এই কুলকে রক্ষা করতেন, তেমনভাবে মহাত্মা পাণ্ডুও তাঁর কুলরক্ষায় তৎপর ছিলেন। যদিও ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না তা সত্ত্বেও তিনি এঁদেরই রাজ্য সমর্পণ করেছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে দুই পত্নীকে নিয়ে বনে গিয়ে বাস করেছিলেন। বিদুরও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে দাসের ন্যায় তাঁর সেবা করতেন। বিদুর রাজকোষ দেখাশোনা, দান ধ্যান করা, সেবকদের দেখাশোনা করা এবং সকলের পালন-পোষণে ব্যস্ত থাকতেন এবং মহাতেজস্বী ভীষ্ম রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক তথা রাজস্বের দিকটি দেখাশোনা করতেন। সেই কুলে জন্ম নিয়ে তুমি বিভেদের চেষ্টা করছ। ভাইদের সঙ্গে সন্ধি করে তুমি এই রাজ্যভোগ করো। আমি কোনো প্রকার ভয় বা স্বার্থবশত একথা বলছি না। আমি ভীষ্মের প্রদত্ত জিনিসই নিতে চাই, তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না। তুমি নিশ্চয়ই জানো, যেখানে ভীষ্ম থাকেন, সেখানেই দ্রোণ ! সুতরাং তুমি পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দিয়ে দাও। আমি যেমন তোমাদের গুরু, তেমন পাণ্ডবদের গুরু। আমার কাছে তোমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু জয় সে পক্ষেরই হবে যেখানে ধর্ম থাকে।'

'তারপরে বিদুর পিতামহ ভীষ্মের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ভীষ্ম ! আমি যা নিবেদন করছি, তা একটু শুনুন ! এই কুরুবংশ একপ্রকার বিনষ্ট হয়েই গিয়েছিল। আপনি এর সম্মান পুনরুদ্ধার করেছেন। এখন আপনি দুর্যোধনের বুদ্ধিতে চলছেন। কিন্তু তার মাথার লোভ চেপে বসেছে। সে অত্যন্ত কৃতঘ্ন এবং অনার্য মানুষ। দেখুন, সে তার ধর্ম ও অর্থ বিচারকারী পিতার নির্দেশও অমান্য করছে। এই দুর্যোধনের জন্য কৌরব বংশ নাশ হবে। মহারাজ ! আপনি কৃপা করে এমন কিছু করুন যাতে এই বংশের বিনাশ না হয়। কুলনাশ হতে দেখে উপেক্ষা করবেন না। মনে হচ্ছে কুরুবংশ বিনাশের সময় নিকটবর্তী হওয়াতেই আপনার বুদ্ধিও এমন হয়েছে। আপনি হয় আমাকে ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে বনে চলুন, নাহলে এই ক্রুরবুদ্ধি দুরাত্মা দুর্যোধনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের দ্বারা এই রাজ্যের সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন।' এই কথা বলে বিদুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৌন হয়ে রইলেন।

'তখন গান্ধারী স্বজন নাশের আশংকায় ক্রোধান্বিত হয়ে কতগুলি ধর্ম ও অর্থযুক্ত কথা বলতে লাগলেন— 'দুর্যোধন ! তুমি অত্যন্ত পাপবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ক্রুর-কর্মকারী। আরে ! এই রাজ্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা ভোগ করে এসেছেন, এই আমাদের কুলধর্ম। কিন্তু এবার তুমি অন্যায় কর্ম করে এই কৌরব রাজ্য ধ্বংস করে দেবে। এখনও এই রাজ্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর ছোট ভাই বিদুর বিদ্যমান, তাহলে মোহবশত তুমি একে কীভাবে দখল করতে চাইছ ? পিতামহ ভীষ্মের সামনে তো এঁরা দুজন এখনও পরাধীনই। মহাত্মা ভীষ্ম ধর্মজ্ঞ, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য রাজ্য গ্রহণ করেননি। এই রাজ্য তো প্রকৃতপক্ষে মহারাজ পাণ্ডুরই, অতএব এই রাজ্যের অধিকার তাঁর পুত্রদেরই, অন্য কারো নয়। তাই কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্ম যা বলছেন, কোনোরকম দ্বিধা না করে সেটি আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। এখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতামহ ভীষ্মের নির্দেশে যুধিষ্ঠিরই এই কুরুবংশের পৈতৃক রাজ্য পালন করুন।'

গান্ধারীর এইরূপ কথা শুনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন —'পুত্র ! পিতার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র সম্মান থেকে থাকে তাহলে আমি যা বলছি, তা মন দিয়ে শোনো এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করো। কুরুবংশের পূর্বসূরি নহুষের পুত্র যযাতি প্রথমে রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচপুত্র হয়। এঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন যদু এবং সর্বকনিষ্ঠ পুরু। পুরু রাজা যযাতির আজ্ঞাপালনকারী পুত্র ছিলেন, তিনি পিতার এক বিশেষ কার্য সম্পন্ন করেন। তাই সর্বকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও যযাতি তাঁকেই রাজসিংহাসন প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অহংকারী বলে সে রাজ্যলাভ করে না, কনিষ্ঠপুত্র গুরুজনের সেবা দ্বারা সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। আমার প্রপিতামহ মহারাজ প্রতীপও এইরূপ সর্ব ধর্মজ্ঞ এবং ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর দেবতার ন্যায় যশস্বী তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবাপি এবং তাঁর কনিষ্ঠ বাহ্লীক আর সর্বকনিষ্ঠ হলেন আমার পিতামহ শান্তনু। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি যদিও উদার, ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ ও

প্রজাদের প্রেমপাত্র ছিলেন, কিন্তু চর্মরোগ থাকায় তাঁকে রাজসিংহাসনের যোগ্য বলে মনে করা হয়নি। বাহ্লীক পৈতৃক রাজ্য ছেড়ে তাঁর মাতুলের রাজ্যে প্রতিপালিত হতে থাকেন। তাই পিতার মৃত্যুর পর বাহ্লীকের অনুমতিক্রমে শান্তনু রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এইভাবে পাণ্ডুও আমাকে এই রাজ্য সমর্পণ করেন। আমি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হলেও নেত্রহীন হওয়ার জন্য রাজসিংহাসনের অযোগ্য বলে পাণ্ডুই রাজা হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর এই রাজ্য এখন তাঁর পুত্রদেরই। আমি রাজ্যের ভাগীদার নই, তুমি রাজপুত্রও নও, রাজ্যের প্রভুও নয়, তাহলে অন্যের অধিকার কেন হরণ করতে চাও ? যুধিষ্ঠিরের মধ্যে রাজার উপযুক্ত ক্ষমা, তিতিক্ষা, দম, সারল্য, সত্যনিষ্ঠা, শাস্ত্রজ্ঞান, অপ্রমাদ, জীবে দয়া এবং সদুপদেশ প্রদানের ক্ষমতা—এই সমস্ত গুণই বিদ্যমান। সুতরাং তুমি মোহ পরিত্যাগ করে অর্ধরাজ্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করো এবং অর্ধেক তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহের জন্য রাখো।'

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে এইভাবে বুঝিয়ে বললেও মন্দমতি দুর্যোধন তা গ্রাহ্যই করলেন না। উপরন্তু তাঁদের কথা অসম্মান করে, ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে সেখান থেকে চলে গেলেন। তাঁকে পশ্চাদনুসরণ করলেন সেইসব রাজারা, যাঁদের মৃত্যু নিকটবর্তী। সেইসব রাজাদের দুর্যোধন নির্দেশ দিলেন, 'আজ পুষ্যা নক্ষত্র, অতএব আজই সকলে কুরুক্ষেত্রের জন্য রওনা হও।' তখন তাঁরা ভীষ্মকে সেনাপতি করে অত্যন্ত আশা নিয়ে কুরুক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন। যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে সৌহার্দ বজায় থাকে, তাই আমি প্রথমে সামনীতি প্রয়োগ করেছিলাম, কিন্তু তারা যখন তা মানল না,

তখন ভেদনীতি প্রয়োগ করি। আমি সব রাজাকে তাদের অসামর্থ্যের কথা জানিয়েছি, দুর্যোধনের মুখ বন্ধ করেছি এবং শকুনি ও কর্ণকে ভয়ও দেখিয়েছি। কুরুবংশে যাতে মতবিরোধ না হয়, তাই সামনীতির সঙ্গে দানের কথাও বলেছি। আমি দুর্যোধনকে বলেছি যে সমস্ত রাজ্য তোমাদের থাক, তুমি শুধু পাঁচটি গ্রাম প্রত্যর্পণ করো ; কেননা তোমাদের পিতার পাণ্ডবদের পালন করা উচিত। একথা শুনেও সেই দুরাত্মা আপনাকে ভাগ দিতে স্বীকার করেনি। এখন ওইসব পাপীদের জন্য আমার তো দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত বলে মনে হয় ; কোনোভাবেই তাকে আর বোঝানো সম্ভব নয়। দুর্যোধন সমস্ত বিনাশের কারণ, মৃত্যু তার শিয়রে অপেক্ষা করছে।

—o—

পাণ্ডবসেনার সেনাপতি নির্বাচন এবং কুরুক্ষেত্রে গিয়ে শিবির স্থাপন

বৈশম্পায়ন বললেন— শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তাঁর ভাইদের বললেন ' কৌরব সভায় যা হয়েছে, তা সবই তোমরা শুনেছ এবং শ্রীকৃষ্ণও যা বললেন, তাও নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করেছ। সুতরাং এখন সব সৈন্যদের সুসংগঠিত করো। আমাদের যুদ্ধে এই সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্রিত হয়েছে, এঁদের সাত সেনাধ্যক্ষ হলেন—দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান এবং ভীমসেন। এই বীররা সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করবেন। এঁরা সকলেই লজ্জাশীল, নীতিমান এবং যুদ্ধকুশল। কিন্তু সহদেব, তুমি বলো—এই সাতজনেরও

নেতা কে হবেন, যিনি রণভূমিতে ভীষ্মরূপ অগ্নির সম্মুখীন হবেন ?'

সহদেব বললেন—'আমার বিচারে মহারাজ বিরাটই এই পদের যোগ্য।' তখন নকুল বললেন—'আমি বয়স, শাস্ত্রজ্ঞান, কৌলিন্য এবং ধর্মের দৃষ্টিতে মহারাজ দ্রুপদকেই এই পদের যোগ্য বলে মনে করি।' মাদ্রীকুমারদের বলা শেষ হলে অর্জুন বললেন—'আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি হওয়ার যোগ্য বলে মনে করি। ইনি ধনুক, কবচ এবং তলোয়ার সম্পন্ন হয়েই অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রকটিত হয়েছেন। তিনি ছাড়া এমন কোনো বীর আমি দেখছি না, যিনি মহাব্রতী ভীষ্মের সামনে দাঁড়াতে পারেন।' ভীমসেন বললেন—'দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীর জন্ম ভীষ্মকে বধ করার জন্যই, তাই আমার বিচারে তিনিই প্রধান সেনাপতি হওয়ার যোগ্য।'

তাই শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'ভ্রাতাগণ ! ধর্মমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের সার-অসার এবং প্রতিপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত। সুতরাং ইনি যাঁকে বলবেন, তাঁকেই সেনাপতি করা হোক। তা তিনি অস্ত্রকুশল হোন বা না হোন, বৃদ্ধ হোন অথবা যুবক। একমাত্র কৃষ্ণই আমাদের জয় বা পরাজয়ের মূল কারণ। আমাদের প্রাণ, রাজ্য, ভাব-অভাব এবং সুখ-দুঃখ এঁর ওপরই নির্ভরশীল। ইনিই সকলের প্রভু-স্বামী এবং এঁর অধীনেই সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে কমলনয়ন ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'মহারাজ ! আপনার সৈন্যদলের নেতৃত্বের জন্য যেসব বীরেদের নাম জানানো হয়েছে, তাঁরা সকলকেই এই পদের যোগ্য বলে আমি মনে করি। এঁরা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমশালী যোদ্ধা এবং আপনার শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম। কিন্তু আমার মনে হয় ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি করা উচিত হবে।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তাঁরা হর্ষধ্বনি করলেন। সৈনিকরা রওনা হবার জন্য তোড়-জোড় শুরু করে দিল, সর্বদিকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল। হাতি-ঘোড়া-রথের এবং সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের ভীষণ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। সৈন্যদলের অগ্রবর্তী হয়ে ভীম, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য পাঞ্চালবীর রওনা হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির রণহস্তি, খাদ্যসামগ্রী, তাঁবুর সরঞ্জাম, পাল্কী, রথ, অস্ত্র চিকিৎসক, বাদক প্রমুখ নিয়ে রওনা হলেন। ধর্মরাজকে রওনা করিয়ে পাঞ্চাল কুমারী দ্রৌপদী অন্য মহিলাদের এবং দাসদাসীদের নিয়ে উপপ্লব্য শিবিরে ফিরে এলেন। পাণ্ডবরা পাহারাদারের দ্বারা তাঁদের ধন-সম্পদ এবং নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করে ব্রাহ্মণদের গোধন ও স্বর্ণ দান করে বিশাল বাহিনী নিয়ে মণিখচিত রথে আরোহণ করে কুরুক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের স্তুতি করতে করতে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। কেকয় দেশের পাঁচ রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজের পুত্র অভিভূ, শ্রেণিমান, বসুদনা এবং শিখণ্ডী—এইসব বীররাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র, কবচ এবং বসনভূষণে সজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। সেনার পশ্চাদ্ ভাগে রাজা বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সুধর্মা, কুন্তিভোজ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ছিলেন। অনাধৃষ্টি, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং সাত্যকি—এঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কাছাকাছি যাচ্ছিলেন। ব্যূহরচনা রীতিতে রওনা হয়ে তাঁরা কুরুক্ষেত্রে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে একদিকে সমস্ত পাণ্ডব এবং অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খধ্বনি করলেন। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্যের বজ্রসম ধ্বনি শুনে সমস্ত সৈন্যরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হল। শঙ্খ এবং সমস্ত বাদ্যধ্বনি ও সৈন্যদের কোলাহল মিলে সমস্ত আকাশ, পৃথিবী এবং সমুদ্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

রাজা যুধিষ্ঠির এসে এক বিশাল সমতল ভূমি, যেখানে ঘাস ও জ্বালানী পর্যাপ্ত ছিল, সেখানে সৈন্য শিবির স্থাপন করলেন। এই স্থান শ্মশান, ঋষি-আশ্রম, তীর্থভূমি ও দেব-মন্দির থেকে দূরে এক পবিত্র ও রমণীয় ভূমি। পাণ্ডবদের যেরূপ শিবির স্থাপিত হল, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক অন্যান্য রাজাদের জন্যও সেরূপ শিবির তৈরি করালেন। সেই সব শিবিরে ভোজ্য-পেয় ও জ্বালানী প্রচুর পরিমাণে রাখা ছিল। সেইসব শিবির নির্মাণের জন্য বহু শিল্পীকে সবেতনে নিয়োগ করা হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রতিটি শিবিরে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য-পানীয়, ঘাস-খড়, অগ্নি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে রেখে দিয়েছিলেন। সেখানে যোদ্ধাদের সঙ্গে বহু রণমত্ত হাতি পর্বতের ন্যায় রক্ষিত ছিল। পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে আসার খবর শুনে তাঁদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখতে উৎসুক রাজারা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে এলেন।

—o—

কৌরব পক্ষের সৈন্য সংগঠন এবং দুর্যোধনের পিতামহ ভীষ্মকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ

জনমেজয় বললেন—মুনিবর ! দুর্যোধন যখন জানতে পারলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্যসহ কুরুক্ষেত্রে এসেছেন, তখন তিনি কী করলেন ? কৌরব ও পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্রে কী করেছিলেন, আমি তা বিস্তারিত ভাবে শুনতে চাই।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলে রাজা দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে বললেন, 'কৃষ্ণ তাঁর উদ্দেশ্যে অসফল হয়ে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেছেন, তিনি নিশ্চয়ই ক্রোধান্বিত হয়ে ওদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধই চেয়েছিলেন, ভীম ও অর্জুন তাঁর মতেই চলেন। যুধিষ্ঠিরও ভীমসেনের মতই জানেন। এছাড়া আমি আগে ওদের অসম্মান করেছি। বিরাট এবং দ্রুপদের সঙ্গেও আমার শত্রুতা আছে, এঁরা দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের ইশারাতে চলেন। অতএব এই যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ংকর এবং রোমাঞ্চকারী হবে। সুতরাং সাবধানে যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত করতে হবে। কুরুক্ষেত্রে অনেক শিবির স্থাপন করো, যার মধ্যে অনেক ফাঁকা স্থান থাকবে, সেখানে জল ও কাঠের সুবিধা থাকবে। এমনভাবে পথ রাখবে, যাতে আসা-যাওয়ার পথ শত্রু বন্ধ করতে না পারে। নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সেখানে রাখ এবং নানা ধ্বজা-পতাকা লাগিয়ে দাও। আর দেরী না করে আজই ঘোষণা কর যে, আগামীকাল সৈন্য রওনা হবে।' তাঁরা তিনজনে 'যে আজ্ঞা' বলে পরদিন উৎসাহের সঙ্গে রাজাদের থাকার জন্য শিবির স্থাপন করলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে রাজা দুর্যোধন তাঁর এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য বিভাগ করলেন। তিনি পদাতিক, হাতি, রথ ও ঘোড়সওয়ার সৈন্যের মধ্যে উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীদের পৃথক করে তাদের যথাস্থানে নিযুক্ত করলেন। এই সব বীর অনুকর্ষ (রথ সারানোর জন্য নীচে বাঁধা কাঠ), তূণীর, বরূথ (রথ ঢাকার ব্যাঘ্রচর্ম), উপাসঙ্গ (হাতি বা ঘোড়া তুলতে পারে এরূপ তূণীর), শক্তি, নিষঙ্গ (পদাতিক সৈন্যের অস্ত্র), ঋষ্টি (লৌহদণ্ড), ধ্বজা, পতাকা, ধনুর্বাণ, দড়ি, পাশ, কচগ্রহ ক্ষেপ (চুল ধরে মাটিতে ফেলার যন্ত্র), তেল, গুড়, বালি, বিষধর সাপের কলস, তৈলনিষিক্ত রেশমী বস্ত্র, ঘি এবং অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী ছিল। সব রথে চারটি করে ঘোড়া এবং শত শত বাণ রাখা ছিল, তাতে একজন করে সারথি এবং দুজন করে চক্ররক্ষক ছিল। তারা সকলেই উত্তম রথচালক ও অশ্ববিদ্যা কুশল ছিল। রথের মতো হাতিও সাজানো হয়েছিল। তার ওপর সাতব্যক্তি বসতে পারত। তার মধ্যে দুজন অঙ্কুশ হাতে মাহুতের কাজ করত, দুজন ধনুর্ধর যোদ্ধা, দুজন খড়্গধারী, একজন শক্তি ও একজন ত্রিশূলধারী ছিল। এইভাবে সুসজ্জিত লক্ষ লক্ষ হাতি, ঘোড়া ও সহস্র সহস্র পদাধিক সৈন্য সেনাদের সঙ্গে রওনা হল।

রাজা দুর্যোধন তারপরে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বিশেষ বুদ্ধিমান, শূরবীর ব্যক্তিদের সেনাপতিপদে নিযুক্ত করলেন। তিনি কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, শল্য, জয়দ্রথ, কর্ণ, সুদক্ষিণ, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও বাহ্লীক—এই এগারো বীরকে এক এক অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক করলেন। তারপর সব রাজাদের নিয়ে পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন—'পিতৃব্য ! যত বড়ই সেনা হোক, তাদের যদি কোনো পরিচালক না থাকে, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তারা পিপীলিকার ন্যায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শোনা যায় একবার হৈহয় বীরদের ওপর ব্রাহ্মণরা আক্রমণ করেছিল, সেই সময় বৈশ্য এবং শূদ্ররাও তাদের সঙ্গে ছিল।

এইভাবে একদিকে তিনবর্ণের মানুষ, অন্যদিকে হৈহয় ক্ষত্রিয়রা ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনবর্ণের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তাদের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়গণ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে। ব্রাহ্মণরা তখন ক্ষত্রিয়দের বিজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলে ধর্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ তার কারন জানিয়ে বলে 'আমরা যুদ্ধের সময় একজন পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তির নির্দেশ মেনে যুদ্ধ করি আর তোমরা সকলে পৃথকভাবে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যুদ্ধ করছিলে।' তখন ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে থেকে এক যুদ্ধনীতি কৌশল যোদ্ধাকে তাদের সেনাপতি করে এবং ক্ষত্রিয়দের পরাস্ত করে। এইভাবে যে যুদ্ধ সঞ্চালনে কৌশলী, হিতকারী, নিষ্কপট, শূরবীরকে নিজেদের সেনাপতি করে, সেই যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করে। আপনি শুক্রাচার্যের ন্যায় নীতিকুশল এবং আমার পরম হিতৈষী,

কালও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং ধর্মে আপনার অবিচল স্থিতি। অতএব আপনিই আমাদের সেনাধ্যক্ষ হবেন। কার্তিক যেমন দেবতাদের অগ্রে থাকেন, তেমনই আপনিও আমাদের অগ্রবর্তী থাকবেন।'

ভীষ্ম বললেন—'মহাবাহো! তুমি ঠিকই বলেছ, আমার কাছে তোমরাও যেমন, পাণ্ডবরাও তেমনই। সুতরাং আমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাদের মঙ্গলের কথা বলতে হবে এবং তোমাদের জন্য, আমি আগে যা বলেছিলাম, যুদ্ধও করতে হবে। আমি নিজের অস্ত্রশক্তির দ্বারা এক মুহূর্তেই দেবতা ও অসুর যুক্ত এই সমগ্র জগৎকে মনুষ্যহীন করে ফেলতে পারি। কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রদের আমি বধ করতে পারি না। তবুও আমি প্রত্যহ ওদের পক্ষের দশ হাজার যোদ্ধা সংহার করব। তোমার সেনাপতিত্ব আমি একশর্তে স্বীকার করতে পারি, কর্ণ অথবা আমি যে কোনো একজন যুদ্ধ করব, কারণ সূতপুত্র সর্বদাই আমার বিরোধিতা করে।'

কর্ণ বললেন—'রাজন্! গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না। তাঁর মৃত্যুর পরই অর্জুনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে।'

এইভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মকে শাস্ত্রীয় রীতিতে সেনাপতিপদে বরণ করলেন। রাজাজ্ঞায় বাদ্যকারেরা শত শত শঙ্খ ও ভেরী বাজাতে লাগল। ভীষ্মের সেনাপতি পদে অভিষেকের সময় নানা দুর্লক্ষণ দেখা গেল। ভীষ্মকে সেনাপতি করে দুর্যোধন বহু গোধন এবং মোহর দক্ষিণা দিয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করালেন। তারপর তাঁদের জয়যুক্ত আশীর্বাদ বাণীতে উৎসাহিত হয়ে ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে দুর্যোধন সমস্ত রাজা ও ভাইদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কর্ণের সঙ্গে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে এক সমতল ভূমিতে সেনাদের শিবির স্থাপন করলেন। সেই শিবির দূর থেকে হস্তিনাপুর বলেই প্রতিভাত হত।

—o—

বলরামের পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তীর্থে গমন করা

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—বৈশম্পায়ন! গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে সেনাপতি পদে বরণ করা হয়েছে শুনে মহাবাহো যুধিষ্ঠির কী বললেন? ভীম, অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ তার কী উত্তর দিলেন?

বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন—আপৎ ধর্মে কুশল মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সব ভাইদের এবং শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে বললেন, 'তোমরা খুব সাবধানে থাকবে। তোমাদের সর্ব প্রথম পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এখন তোমরা আমাদের সাতজন সেনা নায়ক নিযুক্ত করো।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্! এই সময়ে যা বলা উচিত, আপনি সেই কথাই বলেছেন। আপনার কথা আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে। আপনি অবশ্যই প্রথমে আপনার সেনানায়ক নিয়োগ করুন।'

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী এবং মগধরাজ সহদেবকে ডেকে তাঁদের শাস্ত্রীয় রীতিতে সেনানায়ক পদে অভিষিক্ত করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে এঁদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। সেনাধ্যক্ষের অধ্যক্ষ হলেন অর্জুন এবং অর্জুনেরও উপদেষ্টা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ঘোর সংহাররূপ যুদ্ধ নিকটস্থ জেনে ভগবান বলরাম, অক্রূর, গদ, শাম্ব, উদ্ধব,

প্রদ্যুম্ন এবং চারুদেষ্ণ প্রমুখ প্রধান কুরুবংশের বীরদের সঙ্গে করে শিবিরে এলেন। তাঁদের দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম এবং অন্যান্য সব রাজা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা সকলে বলভদ্রকে স্বাগত জানালেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রেমপূর্বক তাঁর হাত ধরলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি ও যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আসীন হলে সকলেই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন—'এবার এক ভয়ংকর নরসংহার হবে। একে আমি অনিবার্য দৈবলীলা বলেই মনে করি, একে রোধ করা সম্ভব নয়। আমার আকাঙ্ক্ষা যে আমি যেন আমার সুহৃদ সকলকে এই যুদ্ধের শেষে সুস্থ দেখতে পাই। এখানে যেসব রাজা যুদ্ধে একত্রিত হয়েছেন তাঁদের মৃত্যুকাল এসেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষ্ণকে আমি বারংবার বলেছি যে, ভাই! তোমার আত্মীয়দের সঙ্গে একই প্রকার ব্যবহার করো ; কারণ আমাদের কাছে যেমন পাণ্ডব, তেমনই রাজা দুর্যোধন। কিন্তু ও অর্জুনকে দেখলে, তার ওপরেই ভালোবাসা পড়ে যায়। রাজন্ ! আমার নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে পাণ্ডবরাই জিতবেন, শ্রীকৃষ্ণের

প্রতিজ্ঞাও সেইরূপই। আমি তো শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এই লোকেদের দিকে দৃষ্টি দিতেই পারি না ; তাই সে যা করে, আমি তারই অনুসরণ করি। ভীম এবং দুর্যোধন—এই দুই বীর আমার শিষ্য এবং গদাযুদ্ধে কুশল। সুতরাং এদের দুজনের ওপরই আমার স্নেহ সমান। তাই আমি সরস্বতীর তীরের তীর্থগুলিতে যাত্রা করব, কারণ আমি উদাসীনের মতো কুরুবংশের বিনাশ দেখতে পারব না।' এই কথা বলে বলরাম পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তীর্থযাত্রায় রওনা হলেন।

—o—

রুক্মীর সাহায্য করতে আসা, কিন্তু পাণ্ডব এবং কৌরব— উভয়েরই তাঁর সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করা

বৈশম্পায়ন বললেন— জনমেজয় ! সেই সময় রাজা ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে এলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য সূর্যের ন্যায় তেজোদীপ্ত ধ্বজা নিয়ে পাণ্ডবদের শিবিরে প্রবেশ করলেন।

তিনি পাণ্ডবদের পরিচিত ছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে স্বাগত জানালেন। রুক্মী সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও অভিবাদন করলেন। তারপর সব বীরদের সামনে অর্জুনকে

বললেন, 'অর্জুন! তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য এসেছি। আমি যুদ্ধে তোমাদের এমন সাহায্য করব যে শত্রু তা সহ্য করতে পারবে না। জগতে আমার ন্যায় পরাক্রমশালী বীর আর নেই। তুমি যুদ্ধে আমাকে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলবে, আমি তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দেব। দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, কর্ণ—যে যেমনই বীর হোক না কেন, সকলে একত্র হলেও আমি সকলকে বধ করে তোমাকেই পৃথিবীর ভার সমর্পণ করব।'

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্মরাজের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে হেসে বললেন—'আমি কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তার ওপর মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ আমার সহায়ক এবং গাণ্ডীব ধনুক আমার হস্তগত। তাহলে কী করে বলি যে আমি ভয় পেয়েছি। বীরবর! যখন কৌরবদের ঘোষযাত্রার সময় আমি গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমাকে সাহায্য করেছিল? বিরাটনগরে অনেক কৌরব সৈন্যের সঙ্গে একাই যুদ্ধ করতে হয়েছে তখন কে সাহায্য করতে এসেছিল? আমি যুদ্ধের জনাই ভগবান শংকর, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেছি। অতএব 'আমি যুদ্ধে ভয় পাই' এমন অপযশের কথা সাক্ষাৎ ইন্দ্রও বলতে পারেন না। তাই মহাবাহো! আমার কোনো কিছুর ভয় নেই এবং কোনো সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই। তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে যেখানে যেতে চাও যেতে পারো আর থাকতে চাইলে আনন্দ সহকারে থাকো।'

তখন রুক্মী তার সমুদ্রের ন্যায় বিশাল বাহিনী নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন এবং সেখানেও আগের মতো কথা বললেন। দুর্যোধনের নিজের বীরত্বের অহংকার ছিল, তাই তিনিও রুক্মীর সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন। এইভাবে বলরাম ও রুক্মী যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন।

দুপক্ষের সৈন্য সমাবেশ হয়ে গেলে এবং তাঁদের ব্যূহরচনাও ঠিক হয়ে গেলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয়! তুমি আমাকে বলো কৌরব ও পাণ্ডবদের সেনা শিবির স্থাপিত হলে তারপর সেখানে কী হল? আমার মনে হয় ভাগ্যই বলবান, পুরুষার্থ দ্বারা কিছু হয় না। আমি বুদ্ধিদ্বারা দোষগুলি বুঝতে পারি, কিন্তু দুর্যোধন এলেই সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সুতরাং যা হবার, তা হবেই।'

—o—

উলূক দ্বারা দুর্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবগণকে কটু কথা শোনানো

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবরা হিরণ্যবতী নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন এবং কৌরবরাও অন্য একটি স্থানে শাস্ত্রবিধি মেনে শিবির স্থাপন করেন। রাজা দুর্যোধন উৎসাহের সঙ্গে তাঁর সেনাদের স্থান নির্ধারণ করলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে সমস্ত রাজাদের অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের সঙ্গে গোপনীয় পরামর্শ করে উলূককে ডেকে বললেন—'উলূক! তুমি পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে

শ্রীকৃষ্ণের সামনে তাদের বলবে, যার জন্য আমরা কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা করেছি সেই যুদ্ধের সময় আগত। অর্জুন ! তুমি কৃষ্ণ ও ভাইদের সঙ্গে টিৎকার করে যে কথা বলেছিলে, তা সে কৌরব সভাতে বলেছে। এখন তার প্রত্যুত্তরের সময় এসেছে। রাজন্! তোমাকে বড় ধার্মিক বলা হয়। এখন তুমি অধর্মে নিযুক্ত কেন ? একে তো বিড়াল-তপস্বী বলা হয়। একবার নারদ আমার পিতাকে এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বলেছিলেন, তা বলছি শোন। একবার একটি বিড়াল শক্তিহীন হয়ে গঙ্গাতীরে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে সব প্রাণীকে বিশ্বাস করাবার জন্য বলতে লাগল 'আমি ধর্মাচরণ করছি'। বহুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর পাখিদের তার ওপর বিশ্বাস জন্মাল এবং তারা বিড়ালকে সম্মান দেখাতে লাগল। বিড়াল ভাবল আমার তপস্যা সফল হয়েছে। অনেকদিন পর সেখানে এক ইঁদুর এল, সে বিড়াল তপস্বীকে দেখে ভাবল, 'আমাদের অনেক শত্রু, সুতরাং এই বিড়াল আমাদের রক্ষাকর্তা হয়ে আমাদের মধ্যে যেসব বৃদ্ধ ও শিশু আছে, তাদের রক্ষা করুক।' তখন সব ইঁদুর এসে বিড়ালকে বলল— 'আপনি আমাদের আশ্রয় এবং পরম সুহৃদ্। তাই আমরা আপনার শরণে এসেছি। আপনি সর্বদা ধর্মে তৎপর। সুতরাং বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রক্ষা করেন, আপনিও সেইমত আমাদের রক্ষা করুন।'

ইঁদুরের কথায় তাদের ভক্ষণকারী বিড়াল বলল—'আমি তপস্যা করব আবার তোমাদের সকলকে রক্ষাও করব—আমি দুটি কাজ একসঙ্গে করার কোনো উপায় দেখছি না। তবুও তোমাদের মঙ্গলার্থে তোমাদের কথা আমার অবশ্যই মেনে নেওয়া উচিত। কঠোর নিয়ম পালন করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, নিজের চলা ফেরার শক্তি নেই। সুতরাং আজ থেকে তোমরা আমাকে প্রতিদিন নদীতীরে পৌঁছে দিও।'
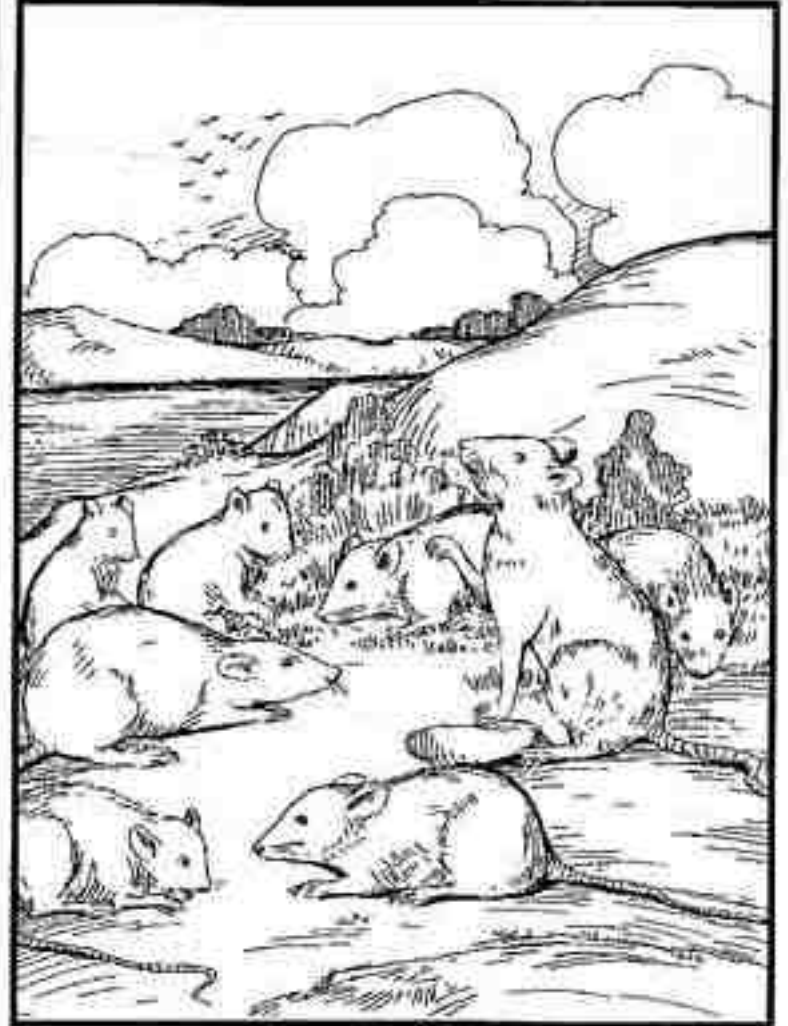
ইঁদুরেরা 'ঠিক আছে' বলে তা মেনে নিল এবং সমস্ত বালক-বৃদ্ধ ইঁদুরকে তার কাছে সমর্পণ করল।

তারপর সেই বিড়াল ইঁদুর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেল। এদিকে ইঁদুরের সংখ্যা প্রত্যহ কমে যেতে লাগল। তখন সকলে বলতে লাগল, 'কী ব্যাপার ? বিড়াল ক্রমশ মোটা হচ্ছে আর আমাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এর কী কারণ ?' তখন কৌলিক নামে এক অতি বৃদ্ধ ইঁদুর বলল —'বিড়াল ধর্মের কোনো পরোয়া করে না। সে সং সেজে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা বাড়িয়েছে। যে প্রাণী শুধু ফল-মূল খায়, তার বিষ্ঠাতে লোম দেখা যায় না। এতো মোটা হচ্ছে আর আমাদের সংখ্যা কমছে, সাত আটদিন ধরে ডিণ্ডিক ইঁদুরকেও দেখা যাচ্ছে না।' কৌলিকের কথা শুনে সব ইঁদুর পালিয়ে গেল এবং বিড়াল তার দুষ্ট মুখ নিয়ে চলে গেল।

দুষ্টাত্মা ! তুমিও এইরূপ বিড়ালব্রত ধারণ করেছ। ইঁদুরদের মধ্যে বিড়াল যেমন ধর্মাচরণের সাজ নিয়েছিল, তেমনই তুমি আত্মীয় স্বজনের কাছে ধর্মাচারী সেজে রয়েছ। তোমার কথা একপ্রকার, কর্ম অন্যপ্রকার। তুমি জগৎকে ঠকাবার জন্যই বেদাভ্যাস এবং শান্তির সং সেজে রয়েছ। এই সাজ ছেড়ে ক্ষাত্রধর্মের আশ্রয় নাও। তোমার মাতা বহু বৎসর ধরে দুঃখ ভোগ করছেন। তাঁর অশ্রুমোচন করে যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত করে সম্মান লাভ করো। তোমরা আমাদের কাছে পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলে। কিন্তু আমরা তোমাদের কুপিত করতে চাইনি, তাই তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিনি। তোমার জন্যই আমি দুরাত্মা বিদুরকে ত্যাগ করেছি। আমি তোমাদের লাক্ষা ভবনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলাম—সেকথা স্মরণ করে একবার পুরুষ হয়ে ওঠো। জাতি ও শক্তিতে তুমি আমার সমকক্ষ, তা সত্ত্বেও কৃষ্ণের ভরসায় রয়েছ কেন ?

উলূক ! তারপর ওখানেই কৃষ্ণকে বলবে যে তুমি নিজের এবং পাণ্ডবদের রক্ষা করার জন্য এবার আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তুমি মায়াদ্বারা সভায় যে রূপধারণ করেছিলে, তেমনই রূপ ধারণ করে অর্জুনের সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করো। ইন্দ্রজাল, মায়া এবং কপটতা ভীতিপ্রদ, কিন্তু যারা রণাঙ্গণে শস্ত্র ধারণ করে থাকে, তাদের এসব কিছু করতে পারে না। আমরাও ইচ্ছা করলে আকাশে উড়তে পারি, পাতালে প্রবেশ করতে পারি, ইন্দ্রলোকে যেতে পারি। কিন্তু তার দ্বারা নিজের স্বার্থও সিদ্ধ হবে না এবং প্রতিপক্ষকেও ভয় দেখানো যাবে না। আর তুমি যে বলেছিলে 'রণভূমিতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে পাণ্ডবদের তাদের রাজ্য সমর্পণ করব', তোমার সেই সমাচারও সঞ্জয় আমাকে জানিয়েছে। এখন তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমরাও তোমার বীরত্ব দেখব। জগতে হঠাৎই তোমার বড় যশ ছড়িয়েছে, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি যে তোমাকে যারা মাথায় তুলেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে নপুংসক। তুমি কংসের একজন সেবক মাত্র। আমার মতো রাজা-মহারাজের তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসাই উচিত নয়।

বহুভোজী, অজ্ঞ, মূর্খ ভীমসেনকে বোলো যে, 'তুমি কৌরব সভায় আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাকে মিথ্যা হতে দিও না। যদি শক্তি থাকে, তাহলে দুঃশাসনের রক্ত পান কোরো। তুমি যে বলেছ 'আমি রণভূমিতে একসঙ্গে সব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে মেরে ফেলব, এখন তার সময় এসেছে। আর নকুলকে বোলো ভালো করে যুদ্ধ করতে। আমরা তোমার বীরত্ব দেখব। এখন তুমি যুধিষ্ঠিরের অনুরাগ, আমার প্রতি দ্বেষ এবং দ্রৌপদীর ক্লেশের কথা স্মরণ করো। তেমনই সমস্ত রাজাদের সামনে সহদেবকে বলবে যে তোমাকে যে দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে, তা স্মরণ করে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করো।

বিরাট ও দ্রুপদকে আমার হয়ে বলবে ' তোমরা সবাই একত্রে এসো আমাকে বধ করবে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলবে, দ্রোণাচার্যের সামনে তুমি যখন আসবে তখন তুমি বুঝতে পারবে তোমার মঙ্গল কীসে। এবার তুমি তোমার সুহৃদদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসো। তারপর শিখণ্ডীকে বলবে, মহাবাহু ভীষ্ম তোমাকে নারী মনে করে বধ করবেন না, তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করো।'

দুর্যোধন তারপর উচ্চহাস্য করে উলূককে বলতে লাগলেন—'তুমি কৃষ্ণের সামনেই আর একবার অর্জুনকে বলবে যে তুমি আমাকে পরাজিত করে পৃথিবীর রাজা হও, নাহলে আমার হাতে মৃত্যুবরণ করে পৃথিবীতে শয্যাগ্রহণ করতে হবে। ক্ষত্রিয়াণী যার জন্য পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, সেই কাজের সময় সমাগত। এখন তুমি রণভূমিতে বল, বীর্য, শৌর্য, অস্ত্রলাঘব এবং পৌরুষ দেখিয়ে তোমার ক্রোধ ঠাণ্ডা করো। আমরা তোমাদের পাশাতে হারিয়েছি, তোমাদের সামনেই আমরা দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে নিয়ে এসেছি, আমরাই দ্বাদশ বৎসরের জন্য তোমাদের গৃহচ্যুত করে বনে পাঠিয়েছি এবং এক বৎসর বিরাট রাজার গৃহে দাসত্ব করতে বাধ্য করেছি। এই সব দুঃখের কথা স্মরণ করে একবার পুরুষ হয়ে ওঠো এবং কৃষ্ণকে সঙ্গী করে রণভূমিতে এসো। তুমি অনেক বড় বড় কথা বলেছ, এখন বৃথা বাক্যব্যয় না করে পৌরুষ দেখাও। ভালো কথা, তুমি পিতামহ ভীষ্ম, দুর্ধর্ষ কর্ণ, মহাবলী শল্য এবং আচার্য দ্রোণকে যুদ্ধে পরাজিত না করে কীভাবে রাজ্যলাভ করতে চাইছ ? আরে, পৃথিবীতে এমন কোন জীব আছে, যাকে ভীষ্ম এবং দ্রোণ মারবার সংকল্প করেন আর তবুও সে বেঁচে থাকে ? আমি জানি যে শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহায়ক এবং তোমার কাছে গাণ্ডীব ধনুক আছে— আর তোমার ন্যায় কোনো যোদ্ধা নেই, তাও আমি জানি। এতো সব জেনেও আমি তোমার রাজ্য নিয়ে নিয়েছি। গত তেরো বছর ধরে তোমরা বিলাপ করেছ আর আমরা রাজ্য ভোগ করেছি। এরপরেও বন্ধু-বান্ধব সহকারে আমরাই রাজ্য ভোগ করব।

অর্জুন ! যখন দাসত্বের পণে আমি তোমাকে পাশাতে জিতেছিলাম, তখন তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল ? ভীমের শক্তির কী হয়েছিল ? সেই সময় কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) অনুগ্রহ না হলে গদাধারী ভীম এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনেরও দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। আমরাই পৌরুষের দ্বারা ভীমসেনকে বিরাটনগরে রাঁধুনি হয়ে আর অর্জুনকে মাথায় বেণী বেঁধে নপুংসক হয়ে এক বছর কাটাতে বাধ্য করেছি। আমি তোমার অথবা কৃষ্ণের ভয়ে রাজ্য প্রত্যর্পণ করব না। এবার তুমি আর কৃষ্ণ মিলে যুদ্ধ করো দেখি। আমার অমোঘ বাণ যখন ছাড়ব, তখন হাজার হাজার কৃষ্ণ আর শত শত অর্জুন দশ দিকে পালাতে থাকবে। তোমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন সকলেই যুদ্ধে মারা পড়বে। তখন তোমরা অত্যন্ত শোকান্বিত হবে আর পুণ্যহীন ব্যক্তি যেমন স্বর্গপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করে, তেমনই তোমাদের পৃথিবী লাভের আশাও পরিত্যক্ত হবে। অতএব তুমি ক্ষান্ত হও।'

উলুকের দুর্যোধনের সংবাদ পাণ্ডবদের শোনানো এবং আবার পাণ্ডবদের সংবাদ নিয়ে দুর্যোধনের কাছে ফিরে আসা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! দুর্যোধনের সংবাদ নিয়ে উলুক পাণ্ডবদের শিবিরে এসে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন—'আপনি তো দূতের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত, তাই আমাকে যেমন বলা হয়েছে, তেমনইভাবেই আমি দুর্যোধনের বক্তব্য শোনাতে এসেছি, আপনি আমার ওপর কুপিত হবেন না।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'উলুক ! তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তুমি বিনা দ্বিধায় অদূরদর্শী দুর্যোধনের বক্তব্য শোনাও।'

উলুক বললেন—'রাজন্ ! মহামান্য রাজা দুর্যোধন সমস্ত কৌরবদের সামনে আপনাকে যা বলেছেন, তা শুনুন ! তিনি বলেছেন—'পাণ্ডব ! তুমি রাজ্যহরণ, বনবাস এবং দ্রৌপদীকে উৎপীড়নের কথা স্মরণ করে একটু পৌরুষ দেখাও। ভীমসেন তার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও পণ করেছিল যে 'আমি দুঃশাসনের রক্তপান করব, তাহলে ক্ষমতা থাকলে পান করুক।' অস্ত্রশস্ত্রে মন্ত্রের সাহায্যে দেবতাদের আবাহন করা হয়েছে, কুরুক্ষেত্রের ময়দানও যুদ্ধের উপযুক্ত হয়েছে, রাস্তাও প্রস্তুত। সুতরাং তোমরা কৃষ্ণকে সঙ্গে করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসো। তুমি পিতামহ ভীষ্ম, দুর্ধর্ষ কর্ণ, মহাবলী শল্য এবং আচার্য দ্রোণকে যুদ্ধে পরাস্ত না করে কী করে রাজ্য নিতে চাইছ ? পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী আছে, যাকে ভীষ্ম এবং দ্রোণ বধ করবার সংকল্প করলে এবং তাঁদের অস্ত্রের আঘাত সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে পারে।'

মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে উলুক অর্জুনের দিকে ফিরে বললেন—'অর্জুন ! মহারাজ দুর্যোধন আপনাকে বলেছেন—'তুমি বৃথা বাক্যব্যয় করো কেন,

এসব ছেড়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হও। এখন যুদ্ধ দ্বারাই কাজ হতে পারে, বৃথা বাক্যে নয়। আমি জানি যে কৃষ্ণ তোমার সহায়ক এবং তোমার গাণ্ডীব ধনুক আছে এবং

তোমার সমকক্ষ কোনো যোদ্ধা নেই, তাও আমার জানা আছে। এসব জেনেও আমি তোমাদের রাজ্য দখল করেছি। বিগত তেরো বছর ধরে তোমরা বিলাপ করেছ আর আমরা রাজ্য ভোগ করেছি। ভবিষ্যতেও তোমাদের ও তোমাদের উত্তরসূরীদের বধ করে আমরাই রাজ্যশাসন করব। দ্যূতক্রীড়ার সময় তোমরা যখন দাসত্বে আবদ্ধ ছিলে তখন দ্রৌপদীর সাহায্য ব্যতীত গদাধারী ভীমসেন এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন, তোমরা কিছুই করতে পারোনি। আমার পরিকল্পনায় বিরাটনগরে নপুংসক বেশে নৃত্যগীতের সাহায্যে অর্জুনকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল। আমি তোমার বা কৃষ্ণের ভয়ে রাজ্য সমর্পণ করব না। এবার তুমি ও কৃষ্ণ দুজনে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমার অমোঘ বাণে শতশত কৃষ্ণ ও অর্জুন দশদিকে ছুটে পালাবে। এইভাবে যখন তোমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে হত হবে, তখন তোমাদের সম্বিত ফিরবে এবং পুণ্যহীন ব্যক্তি যেমন স্বর্গের আশা পরিত্যাগ করে, তেমনই তোমার পৃথিবীর রাজ্যপ্রাপ্তির আশা ভঙ্গ হবে। অতএব তুমি শান্ত হও।'

পাণ্ডবরা আগেই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। উলূকের কথা শুনে তাঁরা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরের দিকে দেখতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে উলূককে বললেন— 'উলূক ! তুমি সত্বর দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বলো যে তার কথা আমরা সকলে শুনেছি এবং তিনি যা চান, তাই হবে।'

ভীম কৌরবদের ইশারা এবং মনোভাব বুঝে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে উলূককে বললেন — 'মূর্খ ! দুর্যোধন তোমাকে যা বলেছে তা আমরা শুনলাম। এবার আমি যা বলি তা শোনো ! তুমি সব ক্ষত্রিয়, সূতপুত্র কর্ণ এবং তোমার পিতা দুরাত্মা শকুনির সামনে দুর্যোধনকে বলবে, 'ওরে দুরাত্মা ! আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সত্য রক্ষার জন্য সর্বদাই তোমার অন্যায় সহ্য করে এসেছি। মনে হচ্ছে, আমাদের সেই ব্যবহারে তোমার হৃদয়ে কোনো প্রভাবই পড়েনি। ধর্মরাজ তাঁর কুলের কল্যাণার্থেই বিরোধের মীমাংসা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই তিনি কৌরবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তোমার শিয়রে শমন নৃত্য করছে, তাই তুমি ওঁর কথা গ্রাহ্য করনি। ঠিক আছে, অবশ্যই তোমার সঙ্গে আমাদের রণভূমিতে সাক্ষাৎ হবে। আমি তো তোমাকে তোমার ভাইদের সঙ্গে যেভাবে বধ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি তাই করব। সমুদ্র যদি শুষ্ক হয়ে যায়, পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, তবুও আমার কথার অন্যথা হবে না। ওরে দুর্বুদ্ধি ! সাক্ষাৎ যম, কুবের, রুদ্র তোমার সহায়তা করলেও পাণ্ডবরা নিজেদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে দুঃশাসনের রক্তপান করব। ভীষ্মকে সামনে রেখেও যদি তারা যুদ্ধ করতে আসে, তাহলেও তাকে তৎক্ষণাৎ যমালয়ে পাঠিয়ে দেব। ক্ষত্রিয়ের সভায় আমি যে কথা বলেছি, তা সবই পালিত হবে—আমি আত্মার শপথ করে বলছি।

ভীমসেনের কথা শুনে সহদেবও ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন—'উলূক ! আমার কথা শোনো। তুমি তোমার পিতাকে গিয়ে বলবে যে, 'যদি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের তুমি শ্যালক না হতে, তাহলে আমাদের ভাই-ভাইতে এই বিরোধ উৎপন্ন হত না। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের বংশ এবং অন্য সব লোকেদের বিনাশের জন্যই জন্ম নিয়েছ। তুমি সাক্ষাৎ কালের মূর্তি, নিজ কুলের উচ্ছেদকারী এবং পাপী। উলূক ! স্মরণ রেখো, এই যুদ্ধে আমি প্রথমে তোমাকে বধ করব তারপর তোমার পিতার প্রাণ নেব।'

ভীম এবং সহদেবের কথা শুনে অর্জুন মৃদুহাস্যে ভীমসেনকে বললেন—'ভ্রাতা ! আপনার সঙ্গে যাঁদের শত্রুতা, আপনি জেনে রাখুন যে তারা জগতে কেউই বেঁচে থাকবে না। উলূককে আপনার কটুবাক্য বলা উচিত নয়। দূত বেচারী কী অপরাধ করেছে, তাকে তো যেমন বলা হয়েছে, সে তেমনই বলে যাবে।' ভীমসেনকে এই কথা বলে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ তাঁর শ্যালকদের বললেন — 'আপনারা পাপী দুর্যোধনের কথা শুনেছেন তো ? এতে বিশেষভাবে আমার ও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা হয়েছে। এর কথা শুনে আপনারা, আমাদের হিতৈষীরা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছেন, তবে আপনারা অনুমতি দিলে এবারে আমি উলূককে এর উত্তর দিতে পারি। কিন্তু আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গাণ্ডীব ধনুক দিয়ে এই বৃথা বাক্যের জবাব দেব।' অর্জুনের কথা শুনে সব রাজারা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল কৌরবদের যথাযোগ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা নিবেদন করে দুর্যোধনকে জানাবার জন্য উলূককে বললেন—'উলূক ! তুমি গিয়ে অভিমানী কুলকলঙ্ক দুর্যোধনকে বলো— তোমার বুদ্ধি পাপগ্রস্ত। তুমি আমাদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছ, কিন্তু তুমি তো ক্ষত্রিয়, সুতরাং আমাদের মাননীয় ভীষ্ম এবং কর্ণ, দ্রোণদের সামনে রেখে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে

না। তুমি তোমার নিজের এবং সৈন্যদের পরাক্রমের ওপর নির্ভর করেই পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে। সম্পূর্ণভাবে ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজই করবে। যে ব্যক্তি অপরের পরাক্রমের আশ্রয় নিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, যার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, তাকে নপুংসক বলা হয়।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'উলূক ! দুর্যোধনকে এরপরে তুমি আমার সংবাদ জানিয়ে বলবে, 'কালই তুমি রণভূমিতে এসে তোমার পৌরুষ দেখাও। তুমি যে মনে করছ কৃষ্ণ যুদ্ধ করবে না ; কারণ পাণ্ডবরা তাকে অর্জুনের রথের সারথি হতে বলেছে—তাতে কি তোমার আমাকে ভয় হচ্ছে না ? স্মরণ রেখো, যুদ্ধের শেষে তোমাদের কেউই বেঁচে থাকবে না ; আগুন যেমন ঘাস-খড় জ্বালিয়ে দেয় তেমনই রণক্ষেত্রে আমি সব ভস্ম করে দেব। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে আমি যুদ্ধের সময় অর্জুনের সারথি হয়েই থাকব। যুদ্ধে তুমি যেখানেই থাকো, সামনে অর্জুনের রথই দেখতে পাবে। তুমি যে মনে করছ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, জেনো রাখো, ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করবেই। তুমি বৃথাই নিজের জয়ের কথা ভাবছ। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমাকে একটুও গ্রাহ্য করেন না।'

তখন মহাযশস্বী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে উলূককে বলতে লাগলেন—'যে ব্যক্তি নিজের পরাক্রমে শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাকেই পুরুষ বলা হয়। যাও, দুর্যোধনকে গিয়ে বলো যে অর্জুন তোমার আহ্বান মেনে নিয়েছে, আজকের রাত্রি প্রভাত হলেই যুদ্ধ হবে। তোমার সামনে আমি প্রথমেই কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে সংহার করব। তোমার অধার্মিক ভাই দুঃশাসনকে ভীম ক্রোধভরে যে কথা বলেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই তা সত্য হবে। দুর্যোধন ! অভিমান, দর্প, ক্রোধ, কটুত্ব, নিষ্ঠুরতা, অহংকার, ক্রূরতা, তীক্ষ্ণতা, ধর্মবিদ্বেষ, গুরুজনের আদেশ না মানা এবং অধর্মের পথে চলার পরিণাম খুব শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের যুদ্ধস্থলে হত হওয়া মাত্রই তুমি তোমার জীবন, রাজ্য ও পুত্রদের আশা ছেড়ে দেবে। তুমি যখন তোমার ভাই ও পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ পাবে আর ভীম তোমাকে বধ করতে উদ্যত হবে, তখন তোমার নিজের কুকর্মের কথা স্মরণ হবে। আমি তোমাকে বলছি, এ সবই সত্য হবে।'

তারপর যুধিষ্ঠির আবার বললেন—'ভ্রাতা উলূক ! তুমি দুর্যোধনকে গিয়ে বলবে যে আমি কীট-পতঙ্গকেও কষ্ট দিতে চাই না, তাহলে নিজের আত্মীয়-স্বজন-নাশের ইচ্ছা কেন করব ? তাই আমি বসবাসের জন্য মাত্র পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মন লোভে আচ্ছন্ন, তাই তুমি বৃথাই বাক্যব্যয় করছ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের হিত কথাও শোনোনি। এখন আর বেশি কথায় কাজ কী, তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রণাঙ্গণে চলে এসো।'

তখন ভীম বললেন—'উলূক ! দুর্যোধন অত্যন্ত খল, পাপী, শঠ, ক্রূর, কুটিল এবং দুরাচারী। তুমি আমার হয়ে ওকে বলবে যে সভামধ্যে আমি যে পণ করেছি, সত্য-শপথ করে বলেছি, তা অবশ্যই সত্য করব। আমি রণভূমিতে দুঃশাসনকে মেরে তার রক্তপান করব, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করব এবং তার ভাইদের বিনাশ করব। জেনে রেখো আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সাক্ষাৎ যম। আরও একটি কথা শোন—ভ্রাতাসহ দুর্যোধনকে বধ করে আমি ধর্মরাজের সামনে তার মস্তকে পা রাখব।'

নকুল তখন বললেন—'উলূক ! তুমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনকে বলবে যে আমরা তার সব কথাই ভালোমত শুনেছি। তুমি আমাদের যা করতে বলছ, আমরা তাই করব।' সহদেব বললেন—'দুর্যোধন ! তোমার যা আশা, তা সবই ব্যর্থ হবে এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তোমার জন্য শোক করতে হবে।' তারপর শিখণ্ডী বললেন—'বিধাতা আমাকে নিঃসন্দেহে পিতামহ ভীষ্মকে বধ করার জন্যই উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং আমি সব ধনুর্ধরকে ধরাশায়ী করে দেব।' তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'আমার হয়ে তুমি দুর্যোধনকে বলবে, আমি দ্রোণাচার্যকে তাঁর সঙ্গী-সাথী সহ বধ করব।' শেষে মহারাজ যুধিষ্ঠির করুণাপরবশ হয়ে বললেন—'আমি কোনোভাবেই আমার আত্মীয়-স্বজনদের বধ করতে চাই না। তোমার জন্যই এই দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হয়েছে, আর উলূক ! এখন তুমি ইচ্ছা হলে এখানে থাকতেও পারো অথবা ফিরে যেতেও পারো, কারণ আমরাও তোমার আত্মীয়।'

উলূক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে রাজা দুর্যোধনের কাছে এলেন এবং অর্জুনের সন্দেশ আনুপূর্বিক শুনিয়ে দিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পৌরুষের বর্ণনা করে নকুল, বিরাট, দ্রুপদ, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সব

কথাই যথাযথভাবে জানালেন। উলূকের কথা শুনে রাজা দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনিকে বললেন 'সমস্ত রাজা এবং আমাদের পক্ষের সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে দাও কাল সূর্যোদয়ের আগেই যেন সব সেনাপতি প্রস্তুত থাকেন।' তখন কর্ণের নির্দেশে দূতরা সমস্ত সেনা এবং রাজাদের দুর্যোধনের আদেশ জানাল।

এদিকে উলূকের কথা শুনে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে তাঁর চতুরঙ্গিণী সেনা রওনা করিয়ে দিলেন। মহারথী ভীম এবং অর্জুন সব দিক দিয়ে তাঁদের রক্ষা করে চলতে লাগলেন। সর্বাগ্রে মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন। তিনি যে বীরের যেমন ক্ষমতা এবং যোগ্যতা তাকে তেমনই উপযুক্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। অর্জুনকে কর্ণের সঙ্গে, ভীমসেনকে দুর্যোধনের সঙ্গে, ধৃষ্টকেতুকে শল্যের সঙ্গে, উত্তমৌজাকে কৃপাচার্যের সঙ্গে, নকুলকে অশ্বত্থামার সঙ্গে, শৈব্যকে কৃতবর্মার সঙ্গে, সাত্যকিকে জয়দ্রথের সঙ্গে এবং শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করলেন। সেইভাবেই সহদেবকে শকুনির সঙ্গে, চেকিতানকে শল্যের সঙ্গে, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রকে ত্রিগর্ত বীরদের সঙ্গে এবং অভিমন্যুকে বৃষসেন এবং অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। কারণ তিনি অভিমন্যুকে যুদ্ধে অর্জুনের থেকেও অধিক শক্তিশালী বলে মনে করতেন। এইভাবে সমস্ত যোদ্ধাদের বিভক্ত করে তিনি নিজের বিপক্ষে দ্রোণাচার্যকে রাখলেন এবং তারপর পাণ্ডবদের বিজয়লাভের জন্য রণাঙ্গনে সুসজ্জিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

ভীষ্মের কাছে দুর্যোধনের তাঁর সৈন্যের রথী ও মহারথীদের বিবরণ শোনা

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! অর্জুন যখন রণভূমিতে ভীষ্মকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন তখন আমার মূর্খ পুত্র দুর্যোধন কী করল ? আমার তো মনে হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী হয়ে অর্জুন সংগ্রামে আমার পিতৃব্য ভীষ্মকে বধ করবে। তাছাড়া মহাপরাক্রমী ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হয়ে কী করলেন ?'

সঞ্জয় বলতে লাগলেন—'মহারাজ ! সেনাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হয়ে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্যোধনের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্য বললেন—আমি শক্তিপাণি ভগবান স্বামিকার্তিককে নমস্কার করে আজ তোমার সেনাপতি পদ গ্রহণ করছি। আমি সৈন্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থা এবং নানাপ্রকার ব্যূহরচনায় কুশল এবং দেবতা, গন্ধর্ব এবং মানুষ—তিনপ্রকার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনায় অভিজ্ঞ। এখন তুমি সর্বপ্রকার চিন্তা পরিত্যাগ করো। আমি শাস্ত্রানুসারে তোমার সৈন্যদের যথোচিত সুরক্ষিত রেখে নিষ্কপটভাবে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতামহ ! আমি দেবতা বা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও ভয় পাই না। উপরন্তু আপনি যখন সেনাপতি এবং পুরুষসিংহ আচার্য দ্রোণ আমাদের রক্ষার জন্য উপস্থিত, তখন আর বলার কী আছে ? আপনি আমাদের এবং বিপক্ষীয়দের সমস্ত রথী ও মহারথীদের ভালো মতোই জানেন। তাই আমি এবং উপস্থিত রাজন্যবর্গ আপনার কাছে তাঁদের পূর্ণ বিবরণ শুনতে আগ্রহী।'

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'রাজন্ ! তোমার সৈন্যদলে

যেসব রথী ও মহারথী আছেন, তাঁদের বিবরণ শোনো। তোমার পক্ষে কোটি কোটি রথী আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁদের নাম শোনো। সর্বপ্রথম দুঃশাসন প্রমুখ একশত ভ্রাতার সঙ্গে তুমিও একজন বড় রথী। তুমি সর্ব অস্ত্র কুশল এবং গদা, প্রাস ও ঢাল-তলোয়ারে বিশেষ পারঙ্গম। আমি তোমার প্রধান সেনাপতি। আমার কোনো কিছুই তোমার অজানা নয় ; নিজের মুখে নিজ গুণগান করা উচিত নয়। শস্ত্রধারির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃত তাঁর ভাগিনেয় নকুল ও সহদেব ছাড়া অন্য সব পাণ্ডবদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবেন। রথযূথ-পতিদের অধিপতি ভূরিশ্রবাও শত্রুসৈন্য ভীষণভাবে সংহার করবেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুজন রথীর সমকক্ষ। ইনি প্রাণ পণ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ একজন রথীর সমান। মাহিষ্মতী পুরীর রাজা নীলকেও রথী বলা যায়। আগে থেকেই সহদেবের সঙ্গে এঁর শত্রুতা আছে। তাই তিনি তোমার জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। অবন্তীর রাজা বিন্দ এবং অনুবিন্দ কুশল রথী বলে পরিচিত, এঁরা দুজনেই যুদ্ধে উৎসাহী, তাই তাঁরা শত্রুসেনার মধ্যে খেলার মতো শত্রুসংহার করবেন। আমার বিবেচনায় ত্রিগর্ত দেশের পাঁচ ভাইও খুব বড় রথী, এঁদের মধ্যে সত্যরথ প্রধান। তোমার পুত্র লক্ষ্মণ এবং দুঃশাসনের পুত্ররা—এরা যদিও তরুণ এবং সুকুমার, তবুও আমি তাদের বড় রথী বলেই মনে করি। রাজা দণ্ডধারও একজন রথী, তিনি তাঁর বিপক্ষের সৈন্যদের দেখে নেবেন। আমার বিবেচনায় বৃহদ্বল এবং কৌসল্যও ভালো রথী। কৃপাচার্য তো রথযূথপতিদের অধ্যক্ষ আছেনই। তিনি তাঁর প্রাণের মায়া ত্যাগ করে শত্রুসংহার করবেন। ইনি সাক্ষাৎ কার্তিক স্বামীর ন্যায় অজেয়।

তোমার মাতুল শকুনিও একজন রথী। তিনিই পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা বাধিয়েছেন, সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে ওদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করবেন। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা মহারথী, কিন্তু তাঁর নিজের প্রাণ অত্যন্ত প্রিয়। যদি তাঁর মধ্যে মধ্যে এই দোষ না থাকত, তাহলে তাঁর মতো যোদ্ধা দুই পক্ষে আর কেউই ছিল না। এঁর পিতা দ্রোণ বৃদ্ধ হলেও যুবকদের থেকেও ক্ষিপ্র। তিনি যে রণাঙ্গণে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন—এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি অর্জুনের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল, তাই তিনি তাঁর আচার্য হওয়ার সুবাদে তাকে কখনো নিহত করবেন না ; কেননা তিনি অর্জুনকে নিজ পুত্র অপেক্ষা বেশি স্নেহ করেন। নাহলে সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ একত্রিত হয়ে তাঁর সম্মুখীন হলে, তিনি একাই তাঁর দিব্য অস্ত্রের সাহায্যে সব কিছু ছিন্ন-ভিন্ন করতে পারেন। ইনি ছাড়া মহারাজ পৌরবকেও আমি মহারথী বলে মনে করি। ইনি পাঞ্চাল বীরদের বধ করবেন। রাজপুত্র বৃহদ্বলও একজন সত্যকার রথী। সে কালের মতো তোমার শত্রুদের সামনে বিচরণ করবে। আমার বিবেচনায় মধুবংশী রাজা জরাসন্ধও রথী। নিজ সৈন্যসহ সেও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করবে। মহারাজ বাহ্লীক তো মহারথী, তাঁকে এই যুদ্ধে আমি সাক্ষাৎ যম বলে মনে করি। তিনি একবার যুদ্ধে এলে আর পিছন ফেরেন না। সেনাপতি সত্যবানও একজন মহারথী। তাঁর দ্বারা আশ্চর্যজনক কর্ম সম্পাদিত হবে। রাক্ষসরাজ অলম্বুষ তো একজন মহারথীই, ইনি সমস্ত রাক্ষস সৈন্যের মধ্যে সর্বোত্তম রথী এবং মায়াবী ও প্রতাপশালী। তিনি হাতির পিঠে থেকে যুদ্ধ করায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রথযুদ্ধেও কুশলী। ইনি ছাড়াও গান্ধারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অচল এবং বৃষক—এই দুই ভাইও শ্রেষ্ঠ রথী। এরাও দুজনে মিলে অজস্র শত্রু সংহার করবে।

কর্ণ, যে তোমার প্রিয় মিত্র এবং পরামর্শদাতা ; তোমাকে সর্বদাই পাণ্ডবদের সঙ্গে বিবাদ করার জন্য উত্তেজিত করে, অত্যন্ত অভিমানী, বাক্যবাগীশ এবং নীচপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। সে রথীও নয় মহারথীও নয়। আমি মনে করি সে অর্ধরথী, সে যদি একবারও অর্জুনের সামনে পড়ে, তাহলে আর জীবিত ফিরবে না।'

তখন দ্রোণাচার্য বলতে লাগলেন—'ভীষ্ম ! আপনি তো একেবারে ঠিক কথা বলেন, আপনার কথা কখনো মিথ্যা হয় না। আমরাও প্রতিটি যুদ্ধে তাকে গর্ব ভরে এগিয়ে আবার সেখান থেকে পালিয়ে আসতে দেখেছি। এর বুদ্ধি স্থির নয়, তাই আমিও তাকে অর্ধরথী বলেই মনে করি।'

ভীষ্ম ও দ্রোণের কথা শুনে কর্ণের দৃষ্টি বাঁকা হল, তিনি ক্রোধ ভরে বলে উঠলেন—'পিতামহ ! আমার কোনো অপরাধ না থাকলেও আপনারা দ্বেষবশত এভাবে কথায় কথায় আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। আমি রাজা দুর্যোধনের জন্যই আপনাদের সব কিছু সহ্য করি। আপনি যদি আমাকে অর্ধরথী মনে করেন, তাহলে সমস্ত জগৎও তাই মনে করবে, কেননা তারা জানে যে ভীষ্ম কখনো মিথ্যা বলেন না। কিন্তু হে কুরুনন্দন ! বয়োজ্যেষ্ঠ হলে, চুল পেকে গেলে অথবা ধন বা আত্মীয়স্বজন বেশি হলেই

কোনো ক্ষত্রিয়কে মহারথী বলা যায় না। বলের জন্যই ক্ষত্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। সেইরূপ ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্রের জ্ঞানে, বৈশ্য অধিক ধনসম্পত্তিতে এবং শূদ্রের অধিক আয়ু হলে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। আপনি পক্ষপাতিত্বে পূর্ণ হয়ে আছেন, তাই মোহবশত নিজের পছন্দ অনুযায়ী রথী-মহারথীদের বিভাগ করছেন। মহারাজ দুর্যোধন ! আপনি ঠিকমতো বিচার করুন। ভীষ্ম পিতামহের মনোভাব অত্যন্ত দূষিত এবং ইনি আপনার অহিতকারী, অতএব আপনি এঁকে ত্যাগ করুন। কোথায় রথী মহারথীদের বিচার আর কোথায় এই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ভীষ্ম ! এঁর কী সেই বুদ্ধি থাকতে পারে ! আমি একাই সমস্ত পাণ্ডবদের পরাস্ত করব। ভীষ্মের আয়ু শেষ হয়েছে। তাই কালের প্রেরণায় এঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। ইনি যুদ্ধ, সংপরামর্শ ও জয়-পরাজয় সম্বন্ধে আর কী জানবেন ! শাস্ত্র বৃদ্ধের কথায় মন দিতে বলেছে, অতি বৃদ্ধের কথায় নয়। কারণ তারা বালকের মতো হয়ে যায়। যদিও আমি একাই পাণ্ডবদের বিনাশ করব, কিন্তু সেনাপতি থাকায় যশ ইনিই লাভ করবেন ! সুতরাং যতদিন ইনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন আমি যুদ্ধ করব না। এঁর মৃত্যুর পর আমি সমস্ত মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখিয়ে দেব।'

ভীষ্ম বললেন—'সূতপুত্র ! আমি তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাই না, তাই তুমি এখনও জীবিত আছো। আমি বৃদ্ধ হলে কী হয়, তুমি তো এখনও শিশুই। তবুও আমি তোমার যুদ্ধের জন্য ইচ্ছা এবং জীবনের আশা শেষ করছি না। জামদগ্নিনন্দন পরশুরামও অনেক অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে আমার কিছু করতে পারেননি, তুমি আমার কী করবে ? আরে কুলকলঙ্ক ! যদিও বুদ্ধিমান মানুষরা নিজের মুখে নিজের পৌরুষের অহংকার করে না, কিন্তু তোমার কথার জন্যই আমাকে এসব বলতে হচ্ছে। দেখ, যখন কাশীরাজের রাজসভায় স্বয়ংবর সভা হয়েছিল, তখন সেখানে আমি একত্রিত সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে কাশীরাজের কন্যাদের হরণ করেছিলাম। সেইসময় হাজার হাজার রাজাদের আমি একাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করেছিলাম।'

এই বিবাদ দেখে রাজা দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে বললেন—'পিতামহ ! আপনি আমাকে দেখুন, আপনার ওপর অত্যন্ত বড় এক দায়িত্ব এসে পড়েছে। এখন আপনি একমাত্র আমার হিতের দিকেই নজর দিন। আমার বিবেচনায় আপনারা দুজনেই আমার খুব উপকার করতে পারেন। আমি এখন শত্রু সেনামধ্যে যেসব রথী-মহারথী আছেন, তাঁদের বিবরণ শুনতে চাই। শত্রুদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে আমি জানতে চাই ; কারণ আজকের রাত্রি প্রভাত হলেই যুদ্ধ শুরু হবে।'

—o—

পাণ্ডবপক্ষের রথী-মহারথীদের শক্তি বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার পক্ষের রথী, মহারথী এবং অর্ধরথীর কথা জানালাম ; এখন তোমার যদি পাণ্ডবপক্ষের রথীদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থাকে তাহলে শোন। প্রথমত, রাজা যুধিষ্ঠিরও একজন ভালো রথী, ভীম আটজন রথীর সমান, বাণ ও গদাযুদ্ধে তার সমকক্ষ কেউ নেই। তার গায়ে দশহাজার হাতির বল এবং সে অত্যন্ত মানী এবং তেজস্বী। মাদ্রীর পুত্র নকুল-সহদেবও ভালো রথী। এই সকল পাণ্ডব বাল্যকাল থেকেই তোমাদের থেকে দ্রুত ছুটতে, লক্ষ্যভেদে পারঙ্গম। এরা রণভূমিতে আমাদের সৈন্য ধ্বংস করবে, তুমি এদের সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। অর্জুন তো সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের ছত্রছায়ায় রয়েছে। দুই পক্ষের সেনানীর মধ্যে অর্জুনের মতো রথী আর কেউ নেই। শুধু এখনই নয়, অতীতেও আমি এমন রথীর কথা শুনিনি। সে ক্রুদ্ধ হলে তোমার সমস্ত সৈন্য বিনাশ করবে। অর্জুনের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা এক আমার আছে আর আছে দ্রোণাচার্যের। আমরা দুজন ছাড়া উভয় সেনাতে তৃতীয় আর কোনো বীর নেই যে তার সামনে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আমরা দুজনও বৃদ্ধ হয়েছি, অর্জুন এখন যুবক এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধকুশল।

এরা ছাড়া দ্রৌপদীর পাঁচ মহারথী পুত্র আছে। বিরাটের পুত্র উত্তরকেও আমি একজন রথী বলে মনে করি। মহাবাহু অভিমন্যুও রথযূথপতিদের যূথের অধ্যক্ষ, সেও যুদ্ধে স্বয়ং অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সমান। বৃষ্ণিবংশী বীরদের মধ্যে পরম শূরবীর সাত্যকিও যূথপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে অত্যন্ত অসহনশীল এবং নির্ভয়। উত্তমৌজাকেও আমি ভালো রথী বলে মনে করি এবং আমার বিবেচনায় যুধামন্যুও উত্তম

রথী। বিরাট এবং দ্রুপদ বৃদ্ধ হলেও যুদ্ধে অজেয় ; আমি এঁদের অত্যন্ত পরাক্রমী এবং মহারথী বলে মনে করি। দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডীও ওদের সেনার মধ্যে এক প্রধান রথী। দ্রোণাচার্যের শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত সেনার অধ্যক্ষ। তাকেও আমি মহারথী বলে মনে করি। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা অর্ধরথী ; বালক বয়স হওয়ায় সে এখনও পূর্ণ রথী হয়ে ওঠেনি। শিশুপালের পুত্র চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অত্যন্ত বড় বীর এবং ধনুর্ধর। সে পাণ্ডবদের আত্মীয় এবং মহারথী। এছাড়া ক্ষত্রদেব, জয়ন্ত, অমিতৌজা, সত্যজিৎ, অজ এবং ভোজও হলেন পাণ্ডব পক্ষের মহাপরাক্রমী, মহারথী।

কেকয় দেশের পাঁচ সহোদর রাজকুমার অত্যন্ত দৃঢ়পরাক্রমী, নানাশাস্ত্রবিদ্ এবং উচ্চকোটির রথী। কৌশিক, সুকুমার, নীল, সূর্যদত্ত, শঙ্খ এবং মদিরাশ্ব—এরা সকলেই বড় রথী এবং যুদ্ধকলায় পারঙ্গম। মহারাজ বার্দ্ধক্ষেমিকে আমি মহারথী বলে মনে করি। রাজা চিত্রায়ুধও রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অর্জুনের ভক্ত। চেকিতান, সত্যধৃতি, ব্যাঘ্রদত্ত, চন্দ্রসেন—এঁরাও পাণ্ডব পক্ষের বড় রথী। সেনাবিন্দু বা ক্রোধহন্তা নামে যে বীর আছে, সে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সমানই বলবান। তাকেও একজন উত্তম রথী বলে মেনে নেওয়া উচিত। কাশীরাজ শস্ত্র নিক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষ এবং শত্রুবিনাশকারী, তিনি একজন রথীরই সমকক্ষ। দ্রুপদের যুবক পুত্র সত্যজিৎ আটজন রথীর সমান। তাকে ধৃষ্টদ্যুম্নের মতোই মহারথী বলা যায়। রাজা পাণ্ড্যও পাণ্ডবসৈন্যদলে একজন মহারথী। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমী এবং মহাধনুর্ধর। ইনি ছাড়া শ্রেণিমান এবং রাজা বসুদানকেও আমি মহারথী বলে মনে করি।

পাণ্ডবদের পক্ষে রোচমানও একজন মহারথী। পুরুজিৎ কুন্তীভোজ মস্ত বড় বড় ধনুর্ধর এবং মহাবলী, ইনি ভীমসেনের মামা, আমার বিবেচনায় তিনি মহারথী। ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ, রাক্ষসরাজ এবং অত্যন্ত মায়াবী। আমি তাকে রথযূথপতিদের অধিপতি বলেই মনে করি। রাজন্! আমি তোমাকে পাণ্ডবদের প্রধান প্রধান রথী, মহারথী ও অর্ধরথীর কথা জানালাম। আমি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন অথবা অন্য রাজাদের মধ্যে যাকে যেখানেই দেখতে পাব, সেখানেই তাকে আটকাবার চেষ্টা করব। কিন্তু যদি দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী আমার সামনে এসে যুদ্ধ করে, তাহলে আমি তাকে মারব না ; কারণ আমি রাজাদের সামনে আজন্ম ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিজ্ঞা করেছি। অতএব কোনো নারী অথবা যে আগে নারী ছিল, সেই ব্যক্তিকে আমি কখনো বধ করব না। তুমি হয়ত শুনেছ যে শিখণ্ডী আগের জন্মে নারী ছিল। এই জন্মেও সে কন্যারূপেই জন্ম নিয়েছিল, পরবর্তীকালে সে পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না। সে ছাড়া আর যেসব রাজা আমার সম্মুখীন হবে, তাদের সকলকে বধ করব, কিন্তু কুন্তীপুত্রদের প্রাণ হরণ করব না।'

—o—

ভীষ্ম কর্তৃক শিখণ্ডীর পূর্বজন্মের বর্ণনা, অম্বা-হরণ এবং শাল্ব দ্বারা অম্বার তিরস্কার

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! শিখণ্ডী যদি রণক্ষেত্রে বাণের দ্বারা আপনাকে আক্রমণ করে, তাহলেও আপনি তাকে বধ করবেন না কেন ?'

ভীষ্ম বললেন—'দুর্যোধন ! শিখণ্ডীকে রণভূমিতে আমার সামনে দেখলেও কেন ওকে মারব না, তার কারণ শোনো। আমার জগৎ বিখ্যাত পিতা স্বর্গবাসী হলে আমি প্রতিজ্ঞা পালন করে চিত্রাঙ্গদকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করি। তারও মৃত্যু হলে আমি মাতা সত্যবতীর পরামর্শে বিচিত্রবীর্যকে রাজা করি। বিচিত্রবীর্যের বয়স কম হওয়ায় রাজকার্যে তার আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হলে তার অনুরূপ কোনো কুলীন কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার কথা আমার মনে হল। তখন আমি শুনলাম যে কাশীরাজের অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামের তিনটি অনুপম রূপবতী কন্যার স্বয়ংবর সভা হবে। স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমি একা রথে করে কাশীরাজের রাজধানী গেলাম। সেখানে নিয়ম করা হয়েছিল, যে ওখানে সবথেকে পরাক্রমী হবে, তার সঙ্গেই কন্যাদের বিবাহ দেওয়া হবে। আমি যখন এই কথা শুনলাম, তখন তিনটি কন্যাকেই রথে তুলে ওখানকার সমবেত সমস্ত রাজাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'মহারাজ

শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছে, ক্ষমতা থাকলে আপনারা সকলে মিলে এঁদের মুক্ত করুন।'

তখন সমস্ত রাজা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে একত্রে আমার ওপর আক্রমণ হানল এবং তাদের সারথিদের রথ প্রস্তুত রাখার আদেশ দিল। তারা রথে চড়ে চারদিক দিয়ে আমাকে ঘিরে ধরল আর আমিও বাণ বর্ষণ করে তাদের ঢেকে দিলাম। আমি এক একটি বাণের সাহায্যে তাদের হাতি, ঘোড়া এবং সারথীদের ধরাশায়ী করে দিয়েছিলাম। আমার বাণ চালানোর দক্ষতা দেখে তারা মুখ ফিরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। আমি এইভাবে সব রাজাদের পরাজিত করে তিন কন্যাকে নিয়ে মাতা সত্যবতীর কাছে সমর্পণ করলাম। সমস্ত ঘটনা শুনে মাতা সত্যবতী আনন্দিত হয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি যে সব রাজাকে পরাস্ত করেছ, তা অতি আনন্দের কথা।' তারপর যখন তাঁর নির্দেশে বিবাহের প্রস্তুতি হতে লাগল তখন কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলল—'ভীষ্ম ! আপনি সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গম এবং ধর্মের রহস্য জানেন। অতএব আপনি আমার ধর্মানুকূল কথা শুনে যা করা উচিত মনে করেন, তাই করুন। আগে আমি মনে মনে রাজা শাল্বকে বরণ করেছি এবং তিনিও পিতার কাছে প্রকাশ না করে গোপনে আমাকে পত্নীরূপে স্বীকার করেছেন। আমার মন এইভাবে অন্যত্র বাঁধা পড়েছে, তাহলে কুরুবংশীয় হয়ে রাজধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে আপনি কেন আমাকে আপনার গৃহে রাখতে চান ? সবকিছু চিন্তা-ভাবনা করে, যা করা উচিত, তাই করুন।'

আমি তখন মাতা সত্যবতী, মন্ত্রীগণ, ঋত্বিক এবং পুরোহিতদের অনুমতি নিয়ে অম্বাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। অম্বা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং ধাত্রিদের সঙ্গে করে রাজা শাল্বের নগরে চলে গেলেন। শাল্বের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—'মহাবাহো ! আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছি।' একথা শুনে শাল্ব হেসে বললেন—'সুন্দরী ! তোমার সম্পর্ক আগে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে হয়েছে, তাই এখন আর আমি তোমাকে পত্নীরূপে স্বীকার করতে পারি না। এখন তুমি ভীষ্মের কাছেই যাও। ভীষ্ম তোমাকে বলপূর্বক হরণ করেছিল, তাই আমি তোমাকে গ্রহণ করতে চাই না। আমি অন্যদের ধর্মোপদেশ দিই এবং আমার সব ব্যাপারই জানা আছে। অন্যের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হওয়ার পরে আমি তোমাকে কীভাবে রাখতে পারি। সুতরাং তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারো।

অম্বা বললেন—'শত্রুদমন ! ভীষ্ম আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় আমি ক্রন্দন করছিলাম। তিনি বলপূর্বক সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। শাল্বরাজ ! আমি আপনার দাসী, নিরপরাধ। আপনি আমাকে স্বীকার করুন। নিজ দাসীকে ত্যাগ করা ধর্মশাস্ত্রে ভালো বলা হয় না। আমি ভীষ্মের অনুমতি নিয়ে সত্বরই এখানে এসেছি। ভীষ্ম নিজের জন্য আমাকে আনেননি, তিনি ভ্রাতার জন্যই এই কাজ করেছেন। আমার দুই বোন অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ তাঁর ছোট ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে হয়েছে। আমি আপনি ব্যতীত কাউকেই মনে স্থান দিইনি, আমি এখনও কুমারীই আছি। তাই নিজে উপস্থিত হয়ে আপনার কৃপা চাইছি।'

অম্বা এইভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন, কিন্তু শাল্ব তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন না। অম্বার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল, তিনি গদ্গদ কণ্ঠে বললেন—'রাজন্ ! আপনি আমাকে ত্যাগ করছেন, ভালো কথা। কিন্তু যদি সত্য অটল হয়, তাহলে আমি যেখানেই যাব, সাধুজন আমার রক্ষা করবেন।' এইভাবে তিনি করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন, শাল্ব তাঁকে ত্যাগ করলেন। তিনি নগরের বাইরে এসে ভাবলেন 'পৃথিবীতে আমার মতো দুঃখিনী কেউ নেই, কুটুম্বদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে গেছি, শাল্ব অপমান করেছে, হস্তিনাপুরেও যেতে পারব না। দোষ আমারই। যখন ভীষ্ম যুদ্ধ করছিলেন, তখনই আমার শাল্বর কাছে যাওয়া উচিত ছিল, আজ তারই ফল পাচ্ছি। এই সমস্ত বিপদ আজ ভীষ্মের জন্যই এসেছে। সুতরাং তপস্যা করে বা যুদ্ধের দ্বারা এর প্রতিশোধ নেওয়া প্রয়োজন।'

—o—

অম্বার তপস্বীদের আশ্রমে আগমন, পরশুরাম কর্তৃক ভীষ্মকে বোঝানো এবং তিনি স্বীকার না করায় উভয়ের যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্রে আগমন

ভীষ্ম বললেন—'এইরূপ স্থির করে অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে এলেন। তিনি সেই রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করলেন এবং ঋষিদের নিজের সব বৃত্তান্ত জানালেন। ঋষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন যে এখন এর কী করা যায়। কেউ বললেন যে 'এঁকে পিতৃগৃহে পৌঁছে দাও', কেউ আমাকে বোঝাতে লাগলেন, কেউ বললেন শাল্বর কাছে গিয়ে একে বিবাহ করতে আদেশ দেওয়া হোক, কেউ আবার তাতে আপত্তি জানালেন। তারপর সকল তপস্বী অম্বাকে বললেন—তোমার পক্ষে পিতার কাছে থাকাই সব থেকে ভালো। নারীদের পতি অথবা পিতা—এই দুটিই আশ্রয়।

অম্বা বললেন—মুনিগণ! আমি আর কাশীপুরীতে আমার পিতৃগৃহে ফিরে যেতে পারি না। এতে আমাকে অবশ্যই আমার আত্মীয়-স্বজনের অপমান সহ্য করতে হবে। এখন আমি তপস্যা করব, যাতে পরজন্মে আমার আর এরূপ দুর্ভাগ্য না হয়।

ভীষ্ম বলতে লাগলেন—ব্রাহ্মণরা যখন এই কন্যাকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন সেখানে পরম তপস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহন এলেন। তপস্বীরা তাঁকে স্বাগত জানিয়ে আসন ও জল ইত্যাদির দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। তিনি আসন গ্রহণ করলে মুনিরা তাঁর সামনেই আবার অম্বার কথা বলতে লাগলেন। অম্বা ও কাশীরাজের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাজর্ষি হোত্রবাহন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ ছিলেন। তিনি তাঁকে কাছে ডেকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে চাইলেন। অম্বা সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানালেন। রাজর্ষি তাতে দুঃখিত হয়ে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে তাঁকে বললেন— 'কন্যা! আমি তোমার মাতামহ, তুমি পিতৃগৃহে যেয়ো না। আমি বলছি তুমি জামদগ্নিনন্দন পরশুরামের কাছে যাও। তিনি তোমার এই শোক ও সন্তাপ অবশ্যই দূর করবেন। তিনি সর্বদা মহেন্দ্র পর্বতের ওপর বাস করেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তুমি আমার হয়ে তাঁকে সব কথা বলবে। আমার নাম বললে তিনি তোমার ইচ্ছাপূর্ণ করবেন। বৎস! পরশুরাম আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র এবং স্নেহশীল সখা।'

রাজর্ষি হোত্রবাহন যখন অম্বার সঙ্গে এইসব কথা বলছিলেন, তখন পরশুরামের প্রিয় সেবক অকৃতব্রণ সেখানে এলেন। মুনিরা সকলে তাঁর সাদর আপ্যায়ন করলেন, অকৃতব্রণও সকলকে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। সকলে সেখানে উপবেশন করলে মহাত্মা হোত্রবাহন তাঁকে মুনিবর পরশুরামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। অকৃতব্রণ বললেন—পরশুরাম আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কাল এখানে আসছেন। পরদিন প্রভাতেই শিষ্য পরিবৃত হয়ে ভগবান পরশুরাম সেখানে পদার্পণ করলেন। তিনি ব্রহ্মতেজে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন। তাঁর মস্তকে জটা এবং শরীরে চীরবস্ত্র শোভা পাচ্ছিল। হাতে ধনুক, খড়্গ এবং পরশু ছিল। তাঁকে দেখেই সব তপস্বী, রাজা হোত্রবাহন এবং অম্বা হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা পরশুরামকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং সকলে উপবেশন করলেন। রাজা হোত্রবাহন এবং পরশুরাম তাঁদের অতীতের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। কথায় কথায় রাজা বললেন—পরশুরাম! এ কাশীরাজের কন্যা আমার দৌহিত্রী, এর একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে, আপনি শুনুন!

পরশুরাম তখন অম্বাকে বললেন—'কন্যা! তোমার কী প্রয়োজন, বলো।' তখন অম্বা যা ঘটেছিল, তা সব জানালেন। তখন পরশুরাম বললেন, 'আমি তোমাকে আবার ভীষ্মের কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি যা বলব, ভীষ্ম তাই করবে। যদি সে আমার কথা মেনে না নেয়, তাহলে মন্ত্রীসহ তাকে আমি ভস্ম করে ফেলব।' অম্বা বললেন—আপনি যা উচিত বলে মনে করেন, তাই করুন। আমার এই সংকটের মূলে ব্রহ্মচারী ভীষ্মই। তিনি বলপূর্বক আমাকে হরণ করেছেন। সুতরাং আপনি তাঁকে শেষ করে দিন।

অম্বার কথায় পরশুরাম তাঁকে এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন এবং সরস্বতীর তীরে আশ্রয় নিলেন। তৃতীয় দিন তাঁরা আমার কাছে খবর পাঠালেন যে, 'আমি তোমার কাছে এক বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি, তুমি

আমার এই প্রিয় কাজ করে দাও।' আমাদের রাজ্যে পরশুরামের পদার্পণের কথা শুনে আমি সত্বর অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমার সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক, পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁর আপ্যায়ানের জন্য আমি একটি গাভীও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রতাপশালী পরশুরাম আমার পূজা স্বীকার করে আমাকে বললেন—'ভীষ্ম ! তোমার যখন নিজের বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না, তখন তুমি কেন এই কাশীরাজ কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলে এবং কেন তাকে আবার ত্যাগ করেছ ? দেখো, তোমার স্পর্শে এ এখন নারীধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তাই রাজা শাল্ব একে স্বীকার করেননি। সুতরাং অগ্নি সাক্ষী করে এখন তুমি একে গ্রহণ করো।'

তখন আমি তাঁকে বললাম—'প্রভু ! এখন আমি কোনোমতেই এর সঙ্গে আমার ভ্রাতার বিবাহ দিতে পারি না ; কারণ এ নিজেই আমাকে বলেছে যে সে শাল্বের প্রণয়াসক্ত। তারপর সে আমার অনুমতি নিয়েই শাল্বের কাছে গিয়েছিল। আমি ভয়, নিন্দা, অর্থলোভ অথবা কোনো কামনাতেই নিজ ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচলিত হতে পারি না।' আমার কথা শুনে পরশুরামের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বারংবার বলতে লাগলেন, 'তুমি যদি আমার আদেশ পালন না করো, তাহলে তোমার মন্ত্রীসহ আমি তোমাকে বিনাশ করব।' আমিও বারংবার তাঁকে বিনীতভাবে প্রার্থনা জানালাম, কিন্তু তাঁর ক্রোধ শান্ত হল না। আমি তখন তাঁর চরণে মাথা রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—ভগবান ! আপনি কেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছেন ? বাল্যাবস্থায় আপনিই আমাকে নানাপ্রকার ধনুর্বিদ্যা শিখিয়েছেন এবং আমি আপনার শিষ্য। পরশুরাম ক্রোধে চক্ষু লাল করে বললেন—'ভীষ্ম ! তুমি আমাকে গুরু বলে স্বীকার কর, অথচ আমার প্রসন্নতার জন্য কাশীরাজের কন্যাকে গ্রহণ করছ না ! দেখো, তা না হলে তুমি শান্তি পাবে।'

আমি তাঁকে বললাম—'ব্রহ্মর্ষি ! আপনি বৃথা শ্রম করছেন। এতো হতেই পারে না। আমি পূর্বেই একে ত্যাগ করেছি। যে নারীর অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম আছে, তাকে কেউ কখনো নিজ গৃহে রাখতে পারে ? আমি ইন্দ্রের ভয়েও ধর্ম ত্যাগ করব না। আপনি এতে প্রসন্ন হন বা না হন ; আপনি যা চান, তা করতে পারেন। আপনি আমার গুরু, তাই আমি যথোচিত সম্মানে আপনাকে আপ্যায়ন করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করতে জানেন না। অতএব আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। আমি যুদ্ধে গুরুকে, ব্রাহ্মণকে বিশেষত তপোবৃদ্ধদের বধ করি না। তাই আপনার কথা সহ্য করছিলাম। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ঠিক করা আছে যে, যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণকে—যখন সে স্পর্ধাভরে যুদ্ধ করছে এবং রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়নি, তাকে বধ করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। আমিও ক্ষত্রিয় এবং ক্ষাত্রধর্মেই স্থিত। সুতরাং আপনি খুশি মনে আমার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। আপনি যে বহুদিন ধরে গর্ব করতেন যে 'আমিএকাই পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দের হারিয়েছি।' তাহলে শুনুন, সেই সময় ভীষ্ম বা ভীষ্মের ন্যায় কোনো ক্ষত্রিয় জন্মায়নি। এই তেজস্বী বীর পরে জন্মগ্রহণ করেছে। আপনি ঘাস-খড়ের সঙ্গেই বীরত্ব দেখিয়েছেন। যে আপনার যুদ্ধাভিমান এবং যুদ্ধলিপ্সাকে ভালোভাবে মেটাতে পারবে, সেই ভীষ্ম তো এখন জন্মেছে।'

পরশুরাম তখন হেসে আমাকে বললেন—ভীষ্ম ! তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, এ বড় আনন্দের কথা। আচ্ছা চলো আমি কুরুক্ষেত্রে যাচ্ছি, তুমিও এসো। সেখানে শত শত বাণে বিদ্ধ করে আমি তোমাকে ধরাশায়ী করব। তোমার মাতা গঙ্গাদেবীও তোমার সেই দীন দশা দেখবেন। পূর্ণ রণ সজ্জায় রথ ইত্যাদি সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রী নিয়ে চলো।' আমি তখন পরশুরামকে প্রণাম করে বললাম—'যথা আজ্ঞা'।

পরশুরাম তারপর কুরুক্ষেত্রে চলে গেলে আমি হস্তিনাপুরে এসে সব কথা মাতা সত্যবতীকে জানালাম। মাতা আমাকে আশীর্বাদ করলে আমি ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুণ্যাহবাচন এবং স্বস্তিবাচন করিয়ে হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রের দিকে রওনা হলাম। সেই সময় ব্রাহ্মণরা 'জয় হোক', 'জয় হোক' বলে আমাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে আমরা দুজনেই যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে লাগলাম। আমি পরশুরামের সামনে আমার শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাজালাম। তখন ব্রাহ্মণ, বনবাসী, তপস্বী এবং ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা সেই দিব্য যুদ্ধ দেখতে এলেন। মাঝে মাঝে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল, দিব্য বাদ্য ধ্বনি ও মেঘগর্জন হতে লাগল। ঋষি পরশুরামের সঙ্গে যেসব তপস্বী এসেছিলেন, তাঁরাও দর্শক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। সেই সময়

সমস্ত প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী মা গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে আমার কাছে এসে বললেন—'বৎস ! এ তুমি কী করছ ? আমি এখনই পরশুরামের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, ভীষ্ম আপনার শিষ্য, তার সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করবেন না। তুমি পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করার স্পর্ধা কোরো না। তুমি কী জানোনা ইনি ক্ষত্রিয় নাশকারী এবং সাক্ষাৎ শ্রীমহাদেবের সমান শক্তিশালী—তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছ ?' আমি তখন করজোড়ে তাঁকে প্রণাম করে পরশুরামের সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল, সব জানালাম। সেই সঙ্গে অম্বার কাহিনীও তাঁকে জানালাম।

মাতা গঙ্গাদেবী পরশুরামের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন— 'মুনে ! আপনি আপনার শিষ্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না।' পরশুরাম বললেন— 'আপনি ভীষ্মকেই অবদমন করুন। সে আমার কথা শুনতে চাইছে না, তাই আমি যুদ্ধ করতে এসেছি।' পুত্রস্নেহবশে মাতা গঙ্গা আবার আমার কাছে এলেন, কিন্তু আমি তাঁর কথা স্বীকার করিনি। ইতিমধ্যে মহাতপস্বী পরশুরাম রণভূমিতে উপস্থিত হয়ে আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন।'

ভীষ্ম এবং পরশুরামের যুদ্ধ এবং তার সমাপ্তি

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! আমি তখন রণক্ষেত্রে পরশুরামকে বললাম, 'মুনে ! আপনি মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন, অতএব আমি রথে করে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলে রথে উঠে, বর্ম ধারণ করে যুদ্ধ করুন।' পরশুরাম মৃদু হাস্যে বললেন—'ভীষ্ম ! এই পৃথিবীর মাটিই আমার রথ আর বেদ হল ঘোড়া। বায়ু সারথি এবং বেদমাতা গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী আমার বর্ম। তাঁদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আমি যুদ্ধ করব।' এই কথা বলে ভীষণ বাণবৃষ্টি দ্বারা পরশুরাম চতুর্দিক থেকে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলেন। তখন আমি দেখলাম, তিনি রথে আরোহণ করে আছেন। তিনি সেই রথ মন থেকেই প্রকটিত করছিলেন। সেই রথ অতি বিচিত্র এবং নগরীর ন্যায় বিশাল। তাতে সর্বপ্রকার উত্তম অস্ত্র ছিল এবং তা দিব্য অশ্বে সঞ্চালিত হচ্ছিল। তাঁর শরীরে সূর্য-চন্দ্র চিহ্নিত বর্ম শোভা পাচ্ছিল এবং পিঠে ধনুক বাঁধা ছিল। তাঁর শিষ্য ও সখা অকৃতব্রণ সারথির কাজ করছিলেন। এরমধ্যে তিনি আমার ওপর তিনটি বাণ ছুঁড়লেন। তখন আমি ঘোড়া থামিয়ে, ধনুক রেখে, রথ থেকে নেমে পদব্রজে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে বললাম—'মুনিবর ! আপনি আমার গুরু, এখন আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ; সুতরাং আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যাতে আমি বিজয়লাভ করি।' তখন পরশুরাম বললেন—'কুরুশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি সাফল্য চায়, তার এরূপই করা উচিত। নিজের থেকে বড় তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে, এটিই ধর্মসম্মত পদ্ধতি। তুমি যদি এইভাবে না আসতে, তবে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। তুমি এখন সাবধানে যুদ্ধ করো। আমি তোমাকে জয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দেব না, কারণ আমি এখানে তোমাকে পরাস্ত করতে এসেছি। যাও, যুদ্ধ করো, তোমার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।'

তখন আমি তাঁকে পুনরায় প্রণাম করে সত্বর ফিরে এসে রথে উঠে শঙ্খ বাজালাম। তারপর আমরা দুজনে একে অপরকে পরাস্ত করার বাসনায় অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করতে লাগলাম। সেই যুদ্ধে পরশুরাম আমার ওপর একশত উনসত্তর বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। আমি তখন ভল্লের ন্যায় এক তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে সেগুলির ধার কেটে দিলাম এবং শত বাণ দিয়ে তাঁর শরীর বিদ্ধ করলাম। তিনি আহত হয়ে প্রায় অচেতন হয়ে গেলেন। এতে আমার হৃদয় খুবই ব্যথিত হল, ধৈর্য ধারণ করে আমি বললাম, 'যুদ্ধ এবং ক্ষাত্রধর্মে ধিক্।' তারপর আমি তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করিনি। দিন সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় সূর্যদেব অস্তাচলে গেলে আমাদের যুদ্ধ বন্ধ হল।

পরের দিন সূর্যোদয় হলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রতাপশালী পরশুরাম আমার ওপর দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। আমি আমার সাধারণ অস্ত্র দ্বারাই তাকে বাধা দিলাম। তারপর আমি পরশুরামের ওপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলাম, তিনি গুহ্যকাস্ত্র দ্বারা তাকে কেটে দিলেন। এরপর আমি অভিমন্ত্রিত করে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলাম, ভগবান পরশুরাম বারুণাস্ত্র দ্বারা বাধা দিলেন। এইভাবে আমি পরশুরামের দিব্য অস্ত্রকে বাধা দিতে থাকলাম আর শত্রুদমন পরশুরাম আমার দিব্যাস্ত্র বিফল

করতে লাগলেন। তারপর তিনি ক্রোধভরে আমার বুকে বাণ নিক্ষেপ করলেন ; আমি রথের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাকে অচেতন দেখে সারথি সত্বর রথ বাইরে নিয়ে গেল। চেতনা ফিরে এলে আমি সব জানতে পেরে সারথিকে বললাম—'সারথি ! আমি প্রস্তুত, আমাকে পরশুরামের কাছে নিয়ে চলো।' সারথি শীঘ্রই রওনা হয়ে আমাকে নিয়ে পরশুরামের সামনে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছেই আমি তাঁকে বধ করার জন্য কালের ন্যায় এক করাল বাণ ছুঁড়লাম। তার ভয়ানক আঘাতে পরশুরাম অচেতন হয়ে রণভূমিতে পড়ে গেলেন। তাতে সব লোক ভয় পেয়ে হাহাকার করে উঠল।

মূর্ছাভঙ্গ হলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ধনুকে বাণ সংযোগ করে অত্যন্ত বিহ্বলভাবে বললেন—'ভীষ্ম ! দাঁড়াও, আমি এখনই তোমাকে নাশ করব।' ধনুক থেকে ছোঁড়া সেই বাণ আমার দক্ষিণ স্কন্ধে আঘাত করে। সেই আঘাতে আমি ঝড়ের দাপটে বৃক্ষের ন্যায় বিকল হয়ে গেলাম। তারপর আমিও অত্যন্ত তেজে বাণ বর্ষণ করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেই বাণ অন্তরীক্ষেই থেকে গেল। এইভাবে পরশুরাম এবং আমার বাণ এমনভাবে আকাশ ঢেকে দিল যে, সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসাই বন্ধ হয়ে গেল। বায়ুর গতি রুদ্ধ হল। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে যত বাণ নিক্ষেপ করেন, আমি সর্পের ন্যায় বাণ দ্বারা তা মাটিতে ফেলতে থাকি। এইভাবে পরের দিনও ভীষণ যুদ্ধ হল। পরশুরাম অত্যন্ত বড় যোদ্ধা এবং দিব্যাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি প্রত্যহ আমার ওপর দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতেন। কিন্তু আমি প্রাণপণে সেগুলির প্রতিশেধক অস্ত্র দ্বারা তাঁর দিব্যাস্ত্র নষ্ট করে দিতাম। এইভাবে তাঁর বহু দিব্যাস্ত্র নষ্ট হওয়ায় তিনিও প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে তেইশ দিন অবিরাম যুদ্ধ হতে লাগল। প্রত্যহ প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হত আর সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হত।

সেই রাত্রে আমি ব্রাহ্মণ, পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের প্রণাম করে একান্তে শয্যায় শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম যে, 'পরশুরামের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বহু দিন হল আরম্ভ হয়েছে। উনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, আমি সম্ভবত তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে পারব না। যদি তাঁকে জয় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আজ রাত্রে দেবতারা প্রসন্ন হয়ে আমাকে দর্শন দিন।' এইরূপ প্রার্থনা করে আমি ডান পাশ ফিরে শুলাম। স্বপ্নে আমাকে আটজন ব্রাহ্মণ দর্শন দিয়ে বললেন —'ভীষ্ম ! উঠে দাঁড়াও, ভয় পেয়ো না ; তোমার কোনো ভয় নেই। আমরা তোমাকে রক্ষা করব, কারণ তুমি আমাদেরই শরীর। পরশুরাম কোনোভাবেই তোমাকে হারাতে পারবেন না। এই নাও প্রস্বাপ নামক অস্ত্র, এর দেবতা প্রজাপতি। তুমি নিজেই এর প্রয়োগ জেনে যাবে, কারণ পূর্বজন্মে তুমি এর সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলে। পরশুরাম অথবা এই পৃথিবীতে অন্য কেউ এ সম্পর্কে জানে না। তুমি এটি স্মরণ করে নিক্ষেপ করো, স্মরণ করলেই এটি তোমার কাছে এসে যাবে। এর দ্বারা পরশুরামের মৃত্যু হবে না, অতএব তোমার কোনো পাপও হবে না। এই অস্ত্রাঘাতে তিনি অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। এইভাবে তাঁকে পরাস্ত করে তুমি পুনরায় তাঁকে সম্বোধনাস্ত্র দ্বারা জাগরিত করবে। প্রভাতে উঠে তুমি এইভাবে কাজ করো। মৃত ও নিদ্রিত উভয় মানুষকেই আমরা সমান বলে মনে করি। পরশুরামের কখনোই মৃত্যু হতে পারে না। অতএব তাঁর ঘুমিয়ে পড়াই মৃত্যুর মতো।' এই বলে সেই আটজন ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হলেন। আটজন ব্রাহ্মণই সমান রূপবান এবং অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে আমি জেগে উঠলাম এবং স্বপ্নের কথা মনে পড়ায় মন অত্যন্ত প্রসন্ন হল। কিছুক্ষণ পরেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল, তাতে সকলেই ভীত কম্পিত হল। বাণের সাহায্যে পরশুরাম আমাকে ঢেকে দিলে আমিও বাণের সাহায্যে তা আটকাতে লাগলাম। তারপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে কালের সমান এক করাল বাণ নিক্ষেপ করলেন, সেটি সর্পের ন্যায় এসে আমার বুকে বিদ্ধ হল। আমি রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। চেতনা ফিরে এলে আমি বজ্রের ন্যায় জ্বলন্ত শক্তি নিক্ষেপ করলাম, সেটি বিপ্রবরের বুকে আঘাত করাতে তিনি বেদনায় কাঁপতে লাগলেন। সতর্ক হয়ে তিনি আমার ওপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, সেটি ব্যর্থ করতে আমিও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। সেটি প্রজ্বলিত হয়ে প্রলয়কালের মতো রূপ ধারণ করলে, দুটি ব্রহ্মাস্ত্র মাঝপথেই উভয়কে আঘাত করল, তাতে আকাশে বিশাল তেজ প্রকটিত হল। সেই তেজে সকল প্রাণী বিহ্বল হয়ে উঠল এবং সন্তপ্ত হয়ে ঋষি-মুনি, দেবতা-গন্ধর্ব সকলেই অত্যন্ত পীড়া অনুভব করতে লাগলেন, পৃথিবী কেঁপে উঠল। আকাশে যেন আগুন লেগে গেল, দশদিক ধোঁয়ায় ভরে উঠল এবং দেবতা, অসুর ও রাক্ষস হাহাকার করে উঠল। তখনই আমার প্রস্বাপাস্ত্র নিক্ষেপ করার কথা মনে হল, সংকল্প করতেই তা

আমার মনে প্রকটিত হল।

তাকে নিক্ষেপ করার জন্য উদ্যত হতেই অত্যন্ত কোলাহল শুরু হল ; দেবর্ষি নারদ আমাকে বললেন, 'কুরুনন্দন ! আকাশে উপস্থিত দেবতারা তোমাকে বাধা দিচ্ছেন, বলছেন যে তুমি এই প্রস্বাপাস্ত্র প্রয়োগ কোরো না। পরশুরাম তপস্বী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ এবং তিনি তোমার গুরু ; কোনোভাবেই তাঁকে তোমার অসম্মান করা উচিত নয়।' তখনই আমি আকাশে সেই আটজন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলাম। তাঁরা মৃদুহাস্যে আমাকে ধীর স্বরে বললেন — 'ভরতশ্রেষ্ঠ ! দেবর্ষি নারদ যা বলছেন, তাই করো। তাঁর কথা জগতের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকারী।' তখন আমি সেই মহা অস্ত্রকে ধনুক থেকে নামিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রকটিত করলাম।

আমি প্রস্বাপাস্ত্র সংবরণ করায় পরশুরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠলেন—'আমার বুদ্ধি ভ্রম হয়েছিল, ভীষ্ম আমাকে পরাস্ত করে দিয়েছে।' তখনই তাঁর পিতা জমদগ্নি এবং মাননীয় পিতামহকে দেখা গেল। তাঁরা বলতে লাগলেন—'পুত্র ! আর কখনো এমন সাহস কোরো না। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম। ব্রাহ্মণদের পরম ধন হল স্বাধ্যায় এবং ব্রতচর্যা। ভীষ্মের সঙ্গে যে এতো যুদ্ধ করেছ, তাই যথেষ্ট। বেশি সাহস করলে তোমাকে ছোট হতে হবে। সুতরাং তুমি এবার রণভূমি ত্যাগ করো, ধনুর্বাণ ত্যাগ করে ঘোর তপস্যা করো। দেখো, এখন দেবতারাই ভীষ্মকে নিষেধ করেছেন।' তারপর তাঁরা আমাকেও বললেন—'পরশুরাম তোমার গুরু, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করা তোমার উচিত নয়।'

পূর্বপুরুষদের কথা শুনে পরশুরাম বললেন—'আমার নিয়ম হল, যুদ্ধ থেকে পিছু হটি না। আগেও কখনো আমি যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি। তবে যদি ভীষ্মের ইচ্ছা হয়, তাহলে সে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে পারে।' দুর্যোধন ! তখন তাঁরা ঋচীকাদি মুনিগণ নারদকে সঙ্গে করে আমার কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন — 'পুত্র ! তুমি ব্রাহ্মণ পরশুরামের মান রাখো এবং যুদ্ধ বন্ধ করো।' তখন আমি ক্ষাত্রধর্মের কথা বিবেচনা করে তাঁদের বললাম— 'মুনিগণ ! আমার নিয়ম হল পিঠে বাণ সহ্য করে কখনো যুদ্ধের থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেওয়া। আমার স্থির সিদ্ধান্ত হল যে লোভের দ্বারা, কৃপণতার দ্বারা, ভয়ের দ্বারা বা অর্থের লোভে আমি কখনো সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব না।'

তখন দেবর্ষি নারদ ও অন্য মুনিগণ এবং মাতা ভাগিরথীও রণভূমিতে বিরাজ করছিলেন। আমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন তাঁরা সকলে পরশুরামকে বললেন—'ভৃগুনন্দন ! ব্রাহ্মণের হৃদয় এমন বিনয়শূন্য হওয়া উচিত নয়। অতএব এবার তুমি শান্ত হও। যুদ্ধ বন্ধ করো। ভীষ্মের তোমার হাতে বধ হওয়া উচিত নয় এবং তোমারও ভীষ্মের হাতে বধ হওয়া ঠিক হবে না।' এই কথা বলে তাঁরা পরশুরামের থেকে অস্ত্র নিয়ে রেখে দিলেন। এরমধ্যে সেই আটজন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ দর্শন দিলেন। তাঁরা আমাকে প্রেমপূর্বক বললেন— 'মহাবাহো ! তুমি পরশুরামের কাছে যাও এবং জগতের মঙ্গল করো।' আমি দেখলাম পরশুরাম যুদ্ধ থেকে সরে গেছেন তখন আমিও লোক কল্যাণের জন্য পিতৃপুরুষের কথা মেনে নিলাম। পরশুরাম অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি হেসে অত্যন্ত প্রীতি সহকারে আমাকে বললেন—'ভীষ্ম ! ইহলোকে তোমার ন্যায় আর কোনো ক্ষত্রিয় নেই। তুমি এই যুদ্ধে আমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছ। এবার তুমি যাও।'

—o—

ভীষ্মকে বধ করার জন্য অম্বার তপস্যা

ভীষ্ম বললেন—দুর্যোধন ! তখন আমার সম্মুখেই পরশুরাম সেই কন্যাকে ডেকে সমস্ত মহাত্মাদের সামনে অত্যন্ত দীন স্বরে বললেন, 'ভদ্রে ! এর সঙ্গে আমি পূর্ণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেছি। তুমি দেখেছ আমার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে প্রচেষ্টা করেছি। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। তাছাড়া বলো, আমি তোমার আর কী করতে পারি ? আমার বিবেচনায় এখন তুমি ভীষ্মের শরণ নাও। এছাড়া তোমার আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না। ভীষ্ম আমাকে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে পরাস্ত করেছে।'

তখন সেই কন্যা বললেন—'প্রভু ! আপনি ঠিকই

বলেছেন। আপনি আপনার শক্তি ও উৎসাহ দ্বারা আমাকে সাহায্যে কার্পণ্য করেননি, কিন্তু যুদ্ধে ভীষ্মের পরাজয় হয়নি। তা সত্ত্বেও আমি কোনোভাবেই ভীষ্মের কাছে যাব না। এখন আমি এমন স্থানে যাব, যেখানে থাকলে আমি নিজেই ভীষ্মকে যুদ্ধে সংহার করতে পারব।'

এই কথা বলে সেই কন্যা আমার বিনাশের জন্য তপস্যা করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। পরশুরাম আমার সঙ্গে কথা বলে মুনিদের সঙ্গে মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন, আমিও রথে করে হস্তিনাপুরে ফিরে এলাম। সেখানে আমি সব কথা মাতা সত্যবতীকে জানালাম ; মাতা আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আমি সেই কন্যার সংবাদ জানার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর নিযুক্ত করি, তারা প্রত্যহ সতর্কতার সঙ্গে আমাকে তার আচার-আচরণ, ব্যবহার সম্পর্কে জানাত।

কুরুক্ষেত্রে গিয়ে সেই কন্যা যমুনাতীরের এক আশ্রমে থেকে অলৌকিক তপস্যায় রত হয়। ছয়মাস শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণ করে বৃক্ষের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক বৎসর যমুনার জলে নিরাহারে অবস্থান করে। তারপরে এক বৎসর গাছের যে পাতা আপনি ঝরে যায়, তাই খেয়ে পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে তপস্যা করে। এইভাবে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করে সে আকাশ ও জগৎকে সন্তপ্ত করে তুলল। তারপরে অষ্টম এবং দশম মাসে সে শুধুমাত্র জলপান করে কাটাতে লাগল। এরপর তীর্থ ভ্রমণের আশায় ঘুরতে ঘুরতে বৎসদেশে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে তপস্যার প্রভাবে তার অর্ধদেহ অম্বা নামক নদীতে পরিণত হল এবং অর্ধদেহ বৎসদেশের রাজকন্যা হয়ে জন্ম নিল।

সেই জন্মেও তাকে তপস্যায় আগ্রহী দেখে সমস্ত তপস্বী তাকে বাধাপ্রদান করে বললেন— 'তুমি কী করতে চাও ? সেই কন্যা তপোবৃদ্ধ ঋষিদের জানালো, 'ভীষ্ম আমাকে অসম্মান করেছেন এবং আমাকে পতিব্রতাধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করেছেন। তাই কোনো দিব্যলোক লাভের জন্য নয়, ভীষ্মকে বধ করার জন্যই তীব্র তপস্যার সংকল্প করেছি। ভীষ্মের মৃত্যু হলেই আমার শান্তি হবে, এই আমার সিদ্ধান্ত। আমি ভীষ্মের আচরণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তপস্যা করছি, সুতরাং আপনারা আমাকে বাধা দেবেন না।' তখন উমাপতি ভগবান শংকর সেই মহর্ষিদের মধ্যে এসে তপস্বিনীকে দর্শন দিয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। কন্যা আমাকে পরাজিত করার বর প্রার্থনা করে। তখন মহাদেব বলেন— তুমি ভীষ্মের বিনাশ করতে সক্ষম হবে। তখন কন্যা তাঁকে বললো—'আমি তো নারী, তাই আমার হৃদয়, শৌর্যহীন ; তাহলে ভীষ্মকে আমি কী করে পরাজিত করতে পারব ? আপনি কৃপা করুন যাতে আমি সংগ্রামে শান্তনু-নন্দন ভীষ্মকে বধ করতে সক্ষম হই। ভগবান শংকর বললেন—আমার কথা মিথ্যা হবে না, তুমি অবশ্যই ভীষ্মকে বধ করবে, পুরুষত্ব লাভ করবে এবং পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলেও এই কথা স্মরণে থাকবে। তুমি দ্রুপদের গৃহে জন্মলাভ করে এক মহাবীর, মহারথী হবে। আমি যা বলছি, তাই হবে। তুমি কন্যা রূপে জন্ম নিলেও, কিছুদিন পরে পুরুষ হয়ে যাবে।' এই কথা বলে ভগবান শংকর অন্তর্হিত হলেন। সেই কন্যা এক চিতা প্রস্তুত করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে এবং 'আমি ভীষ্মবধের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রবেশ করছি' বলে তাতে প্রবেশ করে আত্ম-বিসর্জন করে।

---o---

শিখণ্ডীর পুরুষত্ব প্রাপ্তির বৃত্তান্ত

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! কৃপা করে বলুন শিখণ্ডী কন্যা হয়েও পুরুষ হলেন কী করে ?'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মহারাজ দ্রুপদের রানির কোনো পুত্র ছিল না। দ্রুপদ সন্তানপ্রাপ্তির জন্য তপস্যা করে ভগবান শিবকে প্রসন্ন করেছিলেন। মহাদেব বলেছিলেন 'তোমার এমন এক পুত্র উৎপন্ন হবে, যে প্রথমে নারী হলেও পরে পুরুষ হয়ে যাবে। তুমি এবার তোমার তপস্যা বন্ধ করো ; আমি যা বলেছি, তার অন্যথা হবে না।' রাজা তখন নগরে গিয়ে রানিকে তাঁর তপস্যা এবং শ্রীমহাদেবের বরের কথা জানালেন। ঋতুকাল এলে রানি গর্ভধারণ করলেন এবং যথাসময়ে এক রূপবতী কন্যার জন্ম দিলেন, কিন্তু নগরবাসীকে জানানো হল যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। রাজা তার পুত্রের মতোই সমস্ত সংস্কার করালেন । সেই নগরে দ্রুপদ ব্যতীত আর কেউই এই সংবাদ জানতেন না।

মহাদেবের কথায় তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল., তাই তিনি কন্যার পরিচয় লুকিয়ে পুত্র বলে জনসমক্ষে জানিয়েছিলেন। তিনি শিখণ্ডী নামে পরিচিত ছিলেন। একমাত্র আমিই দেবর্ষি নারদের আশ্বাস, দেবতাদের বচন এবং তপস্যার কারণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম।

রাজন্ ! রাজা দ্রুপদ তাঁর কন্যাকে লেখা-পড়া এবং শিল্পকলা ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যা শেখাতে লাগলেন। বাণবিদ্যা শেখার জন্য শিখণ্ডী দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রানি একদিন বললেন—মহারাজ ! মহাদেবের কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। তাই আমি বলি যে এর কোনো কন্যার সঙ্গে বিধিপূর্বক বিবাহ দিয়ে দিন, মহাদেবের কথা যে সত্য হবেই এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।' তাঁরা দুজনে সেইমত স্থির করে দশার্ণ দেশের রাজকন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ স্থির করলেন। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মা তাঁর কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর শিখণ্ডী কাম্পিল্যনগরে এসে বাস করতে লাগলেন। বিবাহের পর হিরণ্যবর্মার কন্যা জানতে পারলেন শিখণ্ডী পুরুষ নন, নারী। তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁর ধাত্রী ও সখীদের সব জানালেন। এই সংবাদে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রাজাকে সংবাদ পাঠালেন। এই সংবাদে রাজা হিরণ্যবর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুপদের কাছে দূত পাঠালেন।

দূত রাজা দ্রুপদের কাছে এসে তাঁকে একান্তে ডেকে বললেন—'রাজন্ ! আপনি দশার্ণরাজকে ঠকিয়েছেন, তাই তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছেন যে আপনি আপনার কন্যার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে তাঁকে অপমান করেছেন। সুতরাং আপনি এখন তার ফলভোগ করার জন্য প্রস্তুত হন। এবারে তিনি মন্ত্রী ও আত্মীয় স্বজন সহ আপনাকে বিনাশ করবেন।'

রাজন্ ! দূতের কথা শুনে দ্রুপদ অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন, তিনি 'তা নয়' বলে দূতের মাধ্যমে তাঁর বৈবাহিককে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু হিরণ্যবর্মা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে শিখণ্ডী নারীই। তাই তিনি পাঞ্চাল দেশ আক্রমণ করার জন্য শীঘ্রই রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গী রাজারাও ঠিক করেছিলেন যে, 'শিখণ্ডী যদি নারী হয়, তাহলে আমরা পাঞ্চালরাজকে বন্দী করে অন্য রাজাকে সিংহাসনে বসাব এবং দ্রুপদ ও শিখণ্ডীকে আমাদের নগরে এনে বধ করব।'

দশার্ণরাজের কাছে দূত পাঠিয়ে রাজা দ্রুপদ শোকাকুল চিত্তে রানিকে গিয়ে বললেন—'এই কন্যার বিষয়ে আমরা অত্যন্ত মূর্খতার কাজ করেছি, এখন আমরা কী করব ? শিখণ্ডীর ব্যাপারে সকলেরই সন্দেহ যে সে নারী, তাই দশার্ণরাজও ভাবছেন যে আমরা তাঁকে ঠকিয়েছি। সেইজন্যই তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে আমাদের বিনাশের জন্য আসছেন। এখন তুমি বল কী করলে আমাদের মঙ্গল হয়, আমি তাই করব।

তখন রানি বললেন— সৎ ব্যক্তিরা সম্পত্তিশালীদের থেকেও দেবতার পূজা করা শ্রেয়স্কর বলে মনে করেন। তাহলে যিনি দুঃখের সমুদ্রে ডুবছেন, তাঁর আর অন্য কথা কী ? অতএব আপনি দেবতার আরাধনা করার জন্য ব্রাহ্মণদের পূজা করুন আর সংকল্প করুন যাতে দশার্ণরাজ যুদ্ধ না করেই ফিরে যান। তাহলে দেবতাদের অনুগ্রহে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেবতার কৃপা এবং মানুষের চেষ্টা দুই যখন মিলে যায় তখন কাজ সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়। কিন্তু এর মধ্যে যদি বিরোধ থাকে তাহলে তাতে সাফল্য পাওয়া যায় না। সুতরাং মন্ত্রীদের সাহায্যে নগর সুরক্ষিত করে দেবতাদের পূজা করুন।

মাতা পিতাকে এইভাবে শোকাকুল হয়ে কথা বলতে দেখে শিখণ্ডী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'এঁরা দুজন আমার জন্যই দুঃখী হয়েছেন।' তখন তিনি প্রাণত্যাগ করতে স্থির করলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এক নির্জন বনে গেলেন। স্থূণাকর্ণ নামে এক সমৃদ্ধিশালী যক্ষ এই বন রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, সেখানে তাঁর একটি ভবনও ছিল। শিখণ্ডী সেই বনে গেলেন। তিনি বহুক্ষণ অনাহারে থেকে শরীরকে শুষ্ক করে ফেললেন। স্থূণাকর্ণ একদিন তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কন্যা ! তুমি কী জন্য এইসব করছ ? তুমি আমাকে বলো, আমি তোমার কাজ করে দেব।' শিখণ্ডী বারবার বলতে লাগলেন—'আপনাকে দিয়ে সে কাজ হবে না।' কিন্তু যক্ষ বলতে লাগলেন— 'আমি অতি শীঘ্র তোমার কাজ করে দেব, আমি কুবেরের অনুচর, তোমাকে বর দিতেই এসেছি। তোমার যা বলার আছে, আমাকে বলো ; তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।' শিখণ্ডী তখন তাঁর সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত জানালেন এবং স্থূণাকর্ণকে বললেন —'আপনি আমার দুঃখ দূর করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই এমন কিছু করুন যাতে আপনার কৃপাতে আমি একজন সুন্দর পুরুষ হয়ে যাই। দশার্ণরাজ আমার নগরীতে পৌঁছবার আগেই আপনি আমাকে এই

কৃপা করুন।'

যক্ষ বললেন—'তোমার এই কাজ সম্ভব, কিন্তু একটি শর্ত আছে। আমি কিছু সময়ের জন্য তোমাকে আমার পুরুষত্ব দান করব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি তা আবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। ততদিন আমি তোমার নারীত্ব ধারণ করব।'

শিখণ্ডী বললেন—'ঠিক আছে, আমি আপনার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেব ; কিছুদিনের জন্যই আপনি আমার নারীত্ব গ্রহণ করুন। রাজা হিরণ্যবর্মা দশার্ণদেশে ফিরে গেলেই, আমি আবার কন্যা হয়ে যাব, আপনি পুরুষ হয়ে যাবেন।'

দুজনে এইভাবে প্রতিজ্ঞা করে নিজেদের মধ্যে শরীর বদল করলেন। এইভাবে পুরুষত্ব লাভ করে শিখণ্ডী অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং পাঞ্চালনগরে তাঁর পিতার কাছে ফিরে এলেন। পিতার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানালেন। দ্রুপদ সব শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজা দ্রুপদ এবং রানির ভগবান শংকরের কথা স্মরণ হল। দ্রুপদ দশার্ণরাজের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন—'আপনি নিজে আমার এখানে আসুন এবং দেখুন আমার পুত্র পুরুষ কি না। কেউ আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে।' রাজা দ্রুপদের বার্তা পেয়ে দশার্ণরাজ শিখণ্ডীকে পরীক্ষার জন্য কয়েকজন যুবতীকে পাঠালেন। তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জেনে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে হিরণ্যবর্মাকে জানালেন যে রাজকুমার শিখণ্ডী পুরুষই। রাজা হিরণ্যবর্মা প্রসন্নতার সঙ্গে দ্রুপদের রাজ্যে এলেন এবং বৈবাহিকের সঙ্গে কিছুদিন সেখানে কাটালেন। তিনি শিখণ্ডীকে হাতি, ঘোড়া, গোধন এবং বহু দাস-দাসী উপহার দিলেন। দ্রুপদও তাঁকে আদরআপ্যায়ন করলেন। এই ভাবে সন্দেহ দূরীভূত হওয়ায় তিনি প্রসন্ন মনে নিজ রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

এরমধ্যে যক্ষরাজ কুবের ঘুরতে ঘুরতে স্থূণাকর্ণের কাছে পৌঁছলেন। স্থূণাকর্ণের গৃহ সুন্দর পুষ্পে সুসজ্জিত ছিল। তাই দেখে যক্ষরাজ তাঁর অনুচরদের বললেন—এই সুসজ্জিত ভবন তো স্থূণাকর্ণের ; কিন্তু সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বার হচ্ছে না কেন ? যক্ষরা জানাল—'মহারাজ ! রাজা দ্রুপদের শিখণ্ডী নামে এক কন্যা আছে, কোনো কারণবশত স্থূণাকর্ণ তাকে তার পুরুষত্ব প্রদান করেছে এবং তার নারীত্ব নিজে গ্রহণ করেছে। সে স্ত্রীরূপে গৃহেই থাকে এবং লজ্জায় আপনার সেবায় উপস্থিত হয়নি। আপনি এখন যা ইচ্ছা হয় করুন।' তখন কুবের বললেন—'যাও তোমরা স্থূণাকর্ণকে আমার সামনে উপস্থিত করো, আমি তাকে শাস্তি দেব।' স্থূণাকর্ণকে ডেকে আনলে, তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কুবেরের কাছে এলেন। তখন কুবের তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন — 'এখন থেকে এই পাপী যক্ষ এইভাবে নারী হয়েই থাকবে।' তখন অন্য যক্ষরা তাঁর হয়ে প্রার্থনা জানালেন— 'মহারাজ ! আপনি এই শাপের কোনো সময় সীমা নির্দিষ্ট করুন।' তখন কুবের বললেন— 'ঠিক আছে, শিখণ্ডী যুদ্ধে মারা গেলে স্থূণাকর্ণ তার স্বরূপ ফিরে পাবে।' এই বলে ভগবান কুবের সমস্ত যক্ষকে নিয়ে অলকাপুরীতে ফিরে গেলেন।

প্রতিজ্ঞার সময় পূর্ণ হলে শিখণ্ডী স্থূণাকর্ণের কাছে গিয়ে বললেন—'প্রভু ! আমি ফিরে এসেছি।' স্থূণাকর্ণ শিখণ্ডীকে তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সময়মতো আসতে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে নিজের সমস্ত কথা জানালেন। তাঁর কথা শুনে শিখণ্ডী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিজ নগরে ফিরে এলেন। শিখণ্ডীর এইভাবে কার্য সিদ্ধি হয়েছে জেনে রাজা দ্রুপদ এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব খুব খুশি হলেন। তারপর দ্রুপদ তাঁকে ধনুর্বিদ্যা শেখার জন্য দ্রোণাচার্যের হাতে সমর্পণ করলেন। এই শিখণ্ডীই তোমাদের সঙ্গে চার অঙ্গ সহ ধনুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেছে। আমি যে নানাপ্রকার গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলাম, তারাই আমাকে এই সকল খবর সরবরাহ করেছে।

রাজন্ ! দ্রুপদের পুত্র মহারথী শিখণ্ডী এইভাবে পূর্বের নারীর অবস্থা থেকে পুরুষে পরিবর্তিত হয়েছে। সে যদি ধনুক হাতে আমার সম্মুখীন হয়, আমি তার দিকে তাকাব না এবং অস্ত্রও নিক্ষেপ করব না। ভীষ্ম কর্তৃক নারী হত্যা হলে সাধুব্যক্তিরা তার নিন্দা করবেন। তাই সে রণে উপস্থিত হলে আমি তাকে আঘাত করব না।

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীষ্মের কথা শুনে কুরুরাজ দুর্যোধন কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তাঁর মনে হল ভীষ্ম উপযুক্ত কথাই বলেছেন।

—০—

দুর্যোধনকে ভীষ্মাদির এবং যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের সামর্থ্যের বর্ণনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সেই রাত্রি প্রভাত হলে আপনার পুত্র দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এই যে অসংখ্য পদাতিক, হাতি, ঘোড়া এবং মহারথীপূর্ণ প্রবল বাহিনী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, আপনি কতদিনে এগুলি বিনাশ করতে পারেন ? অথবা আচার্য দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ এবং অশ্বত্থামার এদের নাশ করতে কত সময় লাগবে ? আমার তা জানার ইচ্ছা। কৃপা করে বলুন।'

ভীষ্ম বললেন—'রাজন্ ! তুমি যে শত্রুদের শক্তির কথা জানতে চাইছ, তা উচিত কাজই। যুদ্ধে আমার যে সর্বাধিক পরাক্রম, শস্ত্রবল এবং সামর্থ্য—তা শোনো। ধর্মযুদ্ধে নিয়ম হল সরল যোদ্ধাদের সঙ্গে সরলভাবে এবং মায়াযোদ্ধাকারীদের সঙ্গে মায়াপূর্বক যুদ্ধ করা। এই ভাবে যুদ্ধ করে আমি প্রতিদিন পাণ্ডবসেনার দশহাজার যোদ্ধা এবং একহাজার রথী সংহার করতে পারি। সুতরাং আমি যদি আমার মহাঅস্ত্র প্রয়োগ করি, তাহলে এক মাসের মধ্যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে পারি।'

দ্রোণাচার্য বললেন—'রাজন্ ! আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, তাহলেও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসের মধ্যে আমার শস্ত্রাগ্নির দ্বারা পাণ্ডবসেনাকে ভস্ম করে দিতে পারি। এই হল আমার সর্বাধিক সামর্থ্য।'

কৃপাচার্য দুই মাসে এবং অশ্বত্থামা দশ দিনে সমস্ত পাণ্ডবদের সংহার করতে পারেন বলে জানালেন। কিন্তু কর্ণ বললেন— 'আমি পাঁচ দিনেই সমস্ত সৈন্য শেষ করে দেব। কর্ণের কথা শুনে ভীষ্ম অট্টহাস্য করে বললেন—রাধাপুত্র ! যতক্ষণ রণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ সহ অর্জুন রথে করে না আসেন, ততক্ষণই তুমি এইরকম অহংকারপূর্ণ হয়ে থাকবে। তাঁদের সম্মুখীন হয়ে কী আর তুমি এইসব কথা ইচ্ছামতো বলতে পারবে ?'

কুন্তীনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সংবাদ শুনে নিজের ভাইদের ডেকে বললেন—'ভ্রাতাগণ ! কৌরব সৈন্যদের মধ্যে আমার যে গুপ্তচর আছে, তারা আমাকে আজ প্রভাতে এই সংবাদ জানিয়েছে যে, দুর্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আপনি পাণ্ডব সৈন্যদের কতদিনে সংহার করতে পারবেন ?' তাতে তিনি জানিয়েছেন, 'এক মাসে।' দ্রোণাচার্যও সেই সময়ের মধ্যেই নাশ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। কৃপাচার্য বলেছেন তাঁর দুমাস সময় লাগবে, অশ্বত্থামা বলেছেন তিনি দশ দিনে এই কাজ করতে সক্ষম। কর্ণকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পাঁচদিনেই সব বিনাশ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। অতএব অর্জুন ! আমিও এই বিষয়ে তোমার অভিমত জানতে চাই। তুমি কত সময়ে সব শত্রু সংহার করতে সক্ষম ?'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'আমার তো ইচ্ছা যে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে আমি একাই রথে করে একক্ষণেই দেবতাসহ ত্রিলোক ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান— সমস্ত জীবের প্রলয় ঘটিয়ে দিই। কিরাত বেশধারী ভগবান শংকরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি আমাকে যে অত্যন্ত প্রচণ্ড পাশুপতাস্ত্র প্রদান করেছিলেন, তা আমার কাছে আছে। ভগবান শংকর প্রলয়কালে সমস্ত জীবকে সংহার করার জন্যই এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন। এটি আমি ব্যতীত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ বা অশ্বত্থামা কেউই জানেন না ; কর্ণের তো কথাই নেই। তবুও এই দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ বধ করা উচিত নয়। আমি সম্মুখ যুদ্ধেই শত্রুদের পরাস্ত করব। এরূপে আপনার সাহায্যকারী অন্যান্য বীরগণও পুরুষের মধ্যে সিংহের সমান। এঁরা সকলেই দিব্য অস্ত্রের জ্ঞাতা এবং যুদ্ধের জন্য উৎসুক। কেউই এঁদের পরাজিত করতে পারবে না। এঁরা রণাঙ্গনে দেবসেনাদেরও সংহার করতে সক্ষম। শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, ঘটোৎকচ, তাঁর পুত্র অঞ্জনপর্বা, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং স্বয়ং আপনিও ত্রিলোক নাশ করতে সক্ষম। এতে সন্দেহ নেই যদি আপনি ক্রোধপূর্বক কারো দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে সে তখনই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

—o—

কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! কিছুক্ষণ পরেই প্রভাত হল। দুর্যোধনের নির্দেশে তাঁর পক্ষের রাজারা পাণ্ডবদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। স্নান করে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করে গলায় মালাধারণ করে যজ্ঞ করলেন, তারপর অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে স্বস্তিবাচন শুনতে শুনতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। প্রথমে অবন্তীদেশের রাজা বিন্দ, অনুবিন্দ, কেকয়দেশের রাজা এবং বাহ্লীক—এঁরা দ্রোণাচার্যের নেতৃত্বে রওনা হলেন। তারপর অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, গান্ধাররাজ শকুনি, দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব এবং উত্তরদিকের রাজা, পার্বত্য নৃপতিগণ ও শক, কিরাত, যবন, শিবি এবং বসাতি জাতির রাজারা নিজ নিজ সৈন্যসহ আর একটি দল তৈরি করে চললেন। তাঁদের পিছনে সেনাসহ কৃতবর্মা, ত্রিগর্তরাজ, ভ্রাতা পরিবৃত হয়ে দুর্যোধন, শল, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং কোসলরাজ বৃহদ্রথ—এঁরা সকলে যাত্রা করলেন। মহাবলী ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররা কবচ ধারণ করে কুরুক্ষেত্রের পিছনের অর্ধেক অংশে ঠিকমতো ব্যবস্থা করে দাঁড়ালেন। দুর্যোধন তাঁর শিবির এমনভাবে সুসজ্জিত করেছিলেন যে, দ্বিতীয় হস্তিনাপুর বলে মনে হচ্ছিল। সমস্ত রাজাদের জন্য শত শত হাজার হাজার শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। সেই সব শিবির পাঁচ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেইসব শিবিরে রাজারা নিজ নিজ শক্তি ও পদমর্যাদা অনুসারে বিভক্ত ছিলেন। রাজা দুর্যোধন যুদ্ধে আগত সমস্ত রাজা এবং সেনাদের জন্য উত্তম আহার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আগত ব্যবসায়ী এবং দর্শকদের জন্যও সুব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরদের রণভূমিতে রওনা হতে নির্দেশ দিলেন। তিনি রাজাদের হাতি, ঘোড়া, পদাতিক এবং বাহনদের সেবাকারী এবং কারিগরদের জন্য উত্তম খাদ্যসামগ্রী দেবার আদেশ দিলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে অভিমন্যু, বৃহৎ এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রকে রণাঙ্গনে পাঠালেন। অতঃপর ভীমসেন, সাত্যকি এবং অর্জুনকে অন্য সৈন্যদলের সঙ্গে যেতে নির্দেশ দিলেন। সেইসব উৎসাহী বীরদের হর্ষধ্বনি আকাশ মথিত করল। এঁদের পশ্চাতে রাজা বিরাট, রাজা দ্রুপদ এবং অন্য রাজাদের সঙ্গে স্বয়ং যুধিষ্ঠির রওনা হলেন। সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে যাত্রা করা সেই পাণ্ডব সৈন্যদলকে গঙ্গানদীর ন্যায় মন্দগতি স্রোত ধারার মতো প্রতিভাত হচ্ছিল।

কিছুদূর গিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সৈন্যদলকে দ্বিতীয়বার সংগঠন করলেন। তিনি দ্রৌপদীর পুত্রদের, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব এবং সমস্ত প্রভদ্রক বীরদের দশ হাজার ঘোড়সওয়ার, দুহাজার গজারোহী, দশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচশত রথীকে ভীমসেনের নেতৃত্বে প্রথম দল করে রওনা হবার নির্দেশ দিলেন। মধ্যবর্তী দলে বিরাট, জয়ৎসেন, পাঞ্চাল-রাজকুমার যুধামন্যু এবং উত্তমৌজাকে রাখলেন। তাদের পশ্চাতে মধ্যভাগেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন থাকলেন। তাঁদের অগ্রে এবং পশ্চাতে বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার, পাঁচ হাজার গজারোহী এবং বহু রথী, পদাতিক, ধনুক, খড়্গ, গদা এবং নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রাদি নিয়ে চলছিলেন। যে সৈন্যদলের মধ্যে যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেখানে বহু রাজা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিলেন। মহাবলী সাত্যকিও লক্ষ লক্ষ রথীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রদেব এবং ব্রহ্মদেব সেনাদের পিছন ভাগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত আরও বহু ব্যবসায়ী সামগ্রীপূর্ণ দোকান, হাতি-ঘোড়াসহ সৈন্যদলের সঙ্গে যাত্রা করেছিল। সেই সময় সেই রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বীর অত্যন্ত উৎসাহ ভরে ভেরী এবং শঙ্খ বাজিয়ে যাত্রা করছিলেন।

—o—

উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত

—o—

।। শ্রীগণেশায় নমঃ ।।

ভীষ্মপর্ব

শিবিরস্থাপন এবং যুদ্ধের নিয়মাদি নিরূপণ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

জনমেজয় বললেন—মুনে ! আমি শুনতে চাই যে কৌরব, পাণ্ডব, সোমক এবং নানা দেশ হতে আগত অন্যান্য রাজারা কীভাবে যুদ্ধ করলেন !

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! কৌরব, পাণ্ডব এবং সোমবংশীয় বীররা কুরুক্ষেত্রে যেভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, তা শুনুন। কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চক তীর্থের বাইরের প্রান্তরে হাজার হাজার শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে এত সৈন্য সমবেত হয়েছিল যে কুরুক্ষেত্র ছাড়া সমস্ত পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। শুধু বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকরা স্বগৃহে ছিল। সমস্ত যুবপুরুষ এবং ঘোড়া, রথ ও হাতি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে কুরুক্ষেত্রে সৈন্য এসেছিল এবং সমস্ত বর্ণ ও জাতির লোক সেখানে একত্রিত হয়েছিল। সকলে বহু যোজন ঘিরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেই পরিধির মধ্যে দেশ, নদী, পর্বত এবং বনভূমিও ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির সকলের আহারাদির উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন। যুদ্ধের সময় হলে তাঁদের পরিচিতির জন্য, তাঁরা যে পাণ্ডবপক্ষেরই যোদ্ধা, তা বোঝাতে সকলের নাম,বস্ত্র-ভূষণ এবং সংকেত নির্দিষ্ট করা হল।

দুর্যোধনও সমস্ত রাজাদের নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ব্যূহ রচনা করলেন। পাঞ্চালদেশীয় বীর দুর্যোধনকে দেখে আনন্দে উৎসাহিত হয়ে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজাতে লাগলেন। তারপর রথে বসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও

অর্জুন নিজ নিজ দিব্য শঙ্খ বাজালেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের সেই ভয়ংকর ধ্বনি শুনে কৌরব পক্ষের যোদ্ধাগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তারপর কৌরব, পাণ্ডব এবং সোমবংশীয় বীরগণ মিলিত হয়ে যুদ্ধের কয়েকটি নিয়ম ঠিক করলেন আর

যুদ্ধসম্পর্কীয় ধার্মিক নিয়মগুলি পালন করা সকলের পক্ষে অনিবার্য করে রাখলেন। সে নিয়মগুলি হল—প্রতিদিন যুদ্ধ সমাপ্ত হলে আমরা আগের মতোই নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করব। কেউ কারো সঙ্গে কোনো কপটতা করব না। বাক্‌যুদ্ধ হলে তা বাক্‌যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে চলে যাবে, তাকে আঘাত করা যাবে না। রথী রথীর সঙ্গে, হাতির সওয়ারী হাতির সঙ্গে, ঘোড়সওয়ার ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে এবং পদাতিক পদাতিকের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে। যে যার যোগ্য, যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা হবে, সে তার সঙ্গেই যুদ্ধ করবে। যার যেমন শক্তি ও উৎসাহ, সে সেই অনুসারেই যুদ্ধ করবে। বিপক্ষের যোদ্ধাকে যুদ্ধে আহ্বান করে আঘাত করতে হবে। যে আঘাতের সম্বন্ধে জানে না অথবা ভীতসন্ত্রস্ত, তাকে আঘাত করা চলবে না। যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তাকে আর অন্য কেউ আক্রমণ করবে না। যে শরণাগত হয়েছে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছে বা অস্ত্রশস্ত্র-কবচ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেছে, সেই অস্ত্র-শস্ত্রহীন ব্যক্তিকে যেন বধ করা না হয়। সূত, ভারবহনকারী, শস্ত্র সরবরাহকারী এবং রণবাদ্য বাদন-কারীদের ওপর যেন কোনোপ্রকার আঘাত করা না হয়। এইরূপ নিয়ম তৈরি করে সেই সমস্ত রাজারা এবং সেনারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

—o—

ব্যাসদেবের সঞ্জয়কে নিযুক্ত করা এবং অনিষ্টসূচক উৎপাতের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্‌ ! পূর্ব-পশ্চিম দিকে সামনা-সামনি দণ্ডায়মান দুপক্ষের সেনাদের দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান ব্যাসদেব একান্তে উপবিষ্ট রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—তোমার পুত্রদের এবং অন্যান্য রাজাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে ; এরা একে অপরকে সংহার করতে প্রস্তুত। তুমি যদি এদের সংগ্রাম দেখতে চাও, আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করতে পারি। তার দ্বারা তুমি এখান থেকেই ভালোভাবে যুদ্ধ দেখতে পাবে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ব্রহ্মর্ষিবর ! যুদ্ধে আমি আমার আত্মীয়-বধ দেখতে চাই না ; কিন্তু আপনার প্রভাবে যাতে যুদ্ধের খবর দ্রুত সম্পূর্ণভাবে জানতে পারি, সেই কৃপা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের তাৎক্ষণিক সংবাদ শুনতে চান জেনে ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টির বর প্রদান করলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—রাজন্‌ ! সঞ্জয় তোমাকে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ শোনাবে। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কিছুই এর কাছে গোপন থাকবে না। সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সর্বজ্ঞ হবে। সামনে হোক বা পরোক্ষে, দিনে অথবা রাত্রে কিংবা মনে মনে চিন্তা করা হোক, সে কথাও সঞ্জয় জেনে যাবে। অস্ত্র তার কিছুই করতে পারবে না, কিছুতেই শরীরে পরিশ্রম বোধ হবে না এবং রণক্ষেত্রে অবস্থান করলেও তার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি কৌরব এবং পাণ্ডবদের কীর্তি বৃদ্ধি করব, তুমি শোক কোর না। এ দৈবেরই বিধান, একে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধে যে পক্ষে ধর্ম থাকবে, সেই পক্ষই জয়ী হবে। মহারাজ ! এই সংগ্রামে বহু প্রাণহানি ঘটবে—সেরূপ অশুভ লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার সময় বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছে, সূর্যকে তিন রঙের মেঘ ঢেকে দিয়েছে, ওপর-নীচে সাদা-লাল মেঘ আর তার মধ্যস্থল কালো মেঘে ঢাকা। সূর্য-চন্দ্র এবং নক্ষত্রগুলি যেন জ্বলন্ত অগ্নির মতো প্রতিভাত হচ্ছে, দিন-রাতের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না। এসব লক্ষণই ভয় উদ্রেককারী। কার্তিক পূর্ণিমার চন্দ্র যখন প্রভাহীন হয়ে

অগ্নির রূপ ধারণ করে, তখন জানতে হবে যে বহু শূরবীর রাজা ও রাজকুমার প্রাণত্যাগ করে ভূমিশয্যা গ্রহণ করবে। প্রতিদিন শূকর এবং বিড়াল যুদ্ধ করছে আর তাদের ভীষণ গর্জন শোনা যাচ্ছে। দেবমূর্তিগুলি কম্পিত হচ্ছে, হর্ষিত হচ্ছে, রক্ত বমন করছে এবং সহসা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ পরম সাধ্বী অরুন্ধতীও বশিষ্ঠকে পশ্চাদবর্তী করেছেন। শনৈশ্চর রোহিণীকে কষ্ট দিচ্ছেন, চন্দ্রের মৃগচিহ্ন অদৃশ্যবৎ হয়ে রয়েছে, তা অত্যন্ত উৎপাদনকারী। গাভীগুলি গর্দভ, অশ্বা গোশাবক এবং কুকুরী শৃগালদের জন্ম দিচ্ছে। চতুর্দিকে ঝড় বয়ে চলেছে, ধূলিঝড় বন্ধ হচ্ছে না। বারংবার ভূমিকম্প হচ্ছে, রাহু সূর্যকে আক্রমণ করেছে, কেতু চিত্রার ওপর স্থির হয়ে আছে, ধূমকেতু পুষ্যানক্ষত্রে স্থিত। এই দুই মহাগ্রহ সৈন্যকুলের ঘোর অমঙ্গলকারী। মঙ্গল বক্রি হয়ে মঘা নক্ষত্রে স্থিত। বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং শুক্র পূর্বভাদ্রপদার ওপর স্থিত। পূর্বে চোদ্দ, পনেরো অথবা ষোলো দিন পরে অমাবস্যা হত ; কিন্তু তেরোদিনের মধ্যে কখনো অমাবস্যা হয়েছে বলে আমার স্মরণ নেই। এবার এক মাসের মধ্যে দুই পক্ষে ত্রয়োদশীতেই সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গেছে। এইরূপ বিনা পর্বে গ্রহণ হলে এই দুই গ্রহ অবশ্যই প্রজা সংহার করবে। পৃথিবী সহস্র রাজার রক্ত পান করবে। কৈলাস, মন্দরাচল এবং হিমালয়ের ন্যায় পর্বতে ভয়ানক শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে এবং পর্বত শিখরগুলি ভেঙে পড়ছে। মহাসাগরগুলি উদ্বেল হয়ে সীমা লঙ্ঘন করে পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে।

—o—

ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র কথোপকথন এবং সঞ্জয়ের ভূমির গুণাগুণ বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—ধৃতরাষ্ট্রকে এইসব বলে মহামুনি ব্যাসদেব কিছুক্ষণের জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন ; তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'রাজন্! কালই যে সমস্ত জগৎকে সংহার করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। অতএব তুমি তোমার আত্মীয়, কুটুম্ব, মিত্র ও কৌরবদের ক্রূর কর্মে বাধা প্রদান করো, তাদের ধর্মযুক্ত পথের উপদেশ দান করো ; নিজের বন্ধু-বান্ধবকে বধ করা অত্যন্ত নীচ কাজ, তা হতে দিও না। চুপ করে থেকে আমার অপ্রিয় কাজ কোরো না। বেদে, কাউকে বধ করা ভালো কাজ বলে না, এতে নিজেরও ভালো হয় না। কুলধর্ম নিজের শরীরের মতো—যে একে নাশ করে, কুলধর্মও তাকে নাশ করে। তুমি এই কুলধর্ম রক্ষা করতে পারতে, কিন্তু কাল প্রেরিত হয়ে বিপত্তিকালীন অধর্মে তুমি প্রবৃত্ত হয়েছ। রাজ্যরূপে তুমি মহা অনর্থ লাভ করেছিলে ; কারণ এই রাজা সমস্ত কুল ও বহু রাজার বিনাশের কারণ হয়েছে। যদিও তুমি বহুভাবে ধর্ম লোপ করেছ, তবুও আমার কথায় তুমি পুত্রদের ধর্মের পথ দেখাও। এমন রাজ্যে তোমার কী প্রয়োজন, যাতে পাপের ভাগী হতে হয় ! ধর্মরক্ষা করলে তুমি যশ, কীর্তি এবং স্বর্গলাভ করবে। এখন এমন কাজ করো, যাতে পাণ্ডবরা নিজেদের রাজ্য পায় এবং কৌরবরাও সুখ-শান্তি লাভ করে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—পিতা, সমস্ত জগৎ স্বার্থে মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, আমাকেও সাধারণ মানুষ বলেই জানবেন। আমিও অধর্ম করতে চাই না, কিন্তু কী করব ? আমার পুত্ররা আমার বশে নেই।

ব্যাসদেব বললেন—ঠিক আছে, তোমার যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করো, আমি তোমার সব সন্দেহ নিরসন করব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ভগবান ! যুদ্ধে বিজয়লাভকারীগণ যে শুভলক্ষণ দেখে থাকেন, আমি সেগুলি সম্পর্কে জানতে চাই।

ব্যাসদেব বললেন—যজ্ঞের অগ্নির জ্যোতি নির্মল হবে, তার শিখা ওপর দিকে উঠবে অথবা প্রদক্ষিণের মতো ঘুরবে, তার থেকে ধোঁয়া উদ্‌গীরণ হবে না, আহুতি প্রদান করলে পবিত্র গন্ধ ছড়াবে—এগুলি সবই ভাবী বিজয়ের লক্ষণ বলা হয়। ভারত ! যে পক্ষের যোদ্ধার মুখ হর্ষমণ্ডিত বাক্যভরা হয়, যারা ধৈর্যশীল, যাদের ধারণ করা মালা শুকিয়ে যায় না ; তারাই যুদ্ধরূপী মহাসাগর পার হয়ে যায়। সৈন্য কম হোক বা বেশি, তাদের উৎসাহপূর্ণ হর্ষই বিজয়ের প্রধান লক্ষণ বলা হয়। একে অন্যকে ভালোভাবে জানে, উৎসাহী, নারী বিষয়ে অনাসক্ত এবং দৃঢ়নিশ্চয়ী—এরূপ পঞ্চাশজন বীরও অনেক বড় সেনাদলের মোকাবিলা

করতে সক্ষম। যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না, এমন পাঁচ-সাতজন যোদ্ধাও বিজয় পেতে সাহায্য করে। সুতরাং সৈন্যবল অধিক হলেই যে বিজয়লাভ হবে, তেমন কোনো কথা নেই।

এই কথা বলে ভগবান বেদব্যাস চলে গেলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তা শুনে চিন্তামগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! এইসব যুদ্ধ-পারঙ্গম রাজারা পৃথিবীর ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির লোভে জীবনের মায়া ত্যাগ করে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা একে অন্যকে হত্যা করে, ভোগ-সুখের লোভে পরস্পরকে বধ করে যমলোকে বসবাস করেও ক্ষান্ত হয় না। তাতে আমার মনে হয় যে এই পৃথিবী বহু গুণসম্পন্ন, তাই এর জন্যই এত নরহত্যা হয়। সুতরাং তুমি আমাকে এই পৃথিবী সম্পর্কে কিছু বলো।'

সঞ্জয় বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে নমস্কার জানাই। আপনার আদেশ অনুসারে আমি পৃথিবীর গুণাগুণ বর্ণনা করছি ; শুনুন। এই পৃথিবীতে দুই প্রকারের প্রাণী আছে—চর এবং অচর। চর প্রাণী তিন প্রকার—অণ্ডজ, স্বেদজ এবং জরায়ুজ। তিন প্রকার প্রাণীর মধ্যে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ এবং জরায়ুজের মধ্যে মানুষ এবং পশু প্রধান। এদের মধ্যে কিছু গ্রামবাসী আর কিছু বনবাসী হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং বনবাসীদের মধ্যে সিংহ। অচর বা স্থাবরদের উদ্ভিজ্জও বলা হয়। এগুলির পাঁচটি জাতি—বৃক্ষ,

গুল্ম, লতা, বল্লী ও বাঁশ। এগুলি তৃণ জাতির অন্তর্গত।

এই সমস্ত জগৎ এই পৃথিবীতেই উৎপন্ন হয় এবং এখানেই নষ্ট হয়ে যায়। ভূমিই সমস্ত জীবের প্রতিষ্ঠা এবং সেই ভূমিই বেশিদিন স্থায়ী হয়। সেই ভূমির ওপর যার অধিকার, চরাচর জগৎ তারই বশে থাকে। তাই এই ভূমি বা পৃথিবীতে অত্যন্ত লোভ থাকায় সমস্ত রাজারাই একে অপরকে হত্যা করতে চায়।

—o—

যুদ্ধে পিতামহ ভীষ্মের পতনের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের বিষাদ এবং সঞ্জয় কর্তৃক কৌরবসেনা সংগঠনের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এক দিনের কথা, রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিলেন। সেই সময় সঞ্জয় রণভূমি থেকে ফিরে বিষাদগ্রস্ত হয়ে বললেন—'মহারাজ ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম জানাই। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধে আহত হয়ে রথচ্যুত হয়েছেন। যিনি সমস্ত যোদ্ধাদের শিরোমণি এবং ধনুর্ধরীদের আশ্রয় ও ভরসা, সেই পিতামহ আজ শর-শয্যায় শায়িত। যে মহারথী কাশীপুরীতে একটিমাত্র রথের সাহায্যে সেখানে একত্রিত সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন, যিনি নির্ভয়ে পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়েছিলেন, তিনি আজ শিখণ্ডীর হাতে আহত হয়েছেন। যিনি বীরত্বে ইন্দ্রের সমকক্ষ, স্থৈর্যে হিমালয় সদৃশ, গাম্ভীর্যে সমুদ্র সম এবং সহনশীলতায় পৃথিবীর সঙ্গে তুলনীয়, যিনি হাজার হাজার বাণবর্ষণ করে দশ দিনে কয়েক লক্ষ সৈন্য সংহার করেছেন, তিনি আজ ঝটিকা উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হয়েছেন। রাজন্ ! এসবই আপনার কুমন্ত্রণার ফল ; পিতামহ ভীষ্ম কখনোই এই দশার যোগ্য ছিলেন না।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! কৌরবশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রসম পরাক্রমী পিতৃবর ভীষ্ম শিখণ্ডীর হাতে কী করে আহত হলেন ? তাঁর সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি যখন রণক্ষেত্রে গেলেন, তখন তাঁর আগে-পিছে কারা ছিল ? তাঁর ধনুক বাণ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এবং রথও উত্তম ছিল।

তিনি তাঁর বাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বহু শত্রুর মস্তক ছেদ করতেন, তিনি কালাগ্নির ন্যায় দুর্ধর্ষ ছিলেন। তাঁকে যুদ্ধে উদ্যত দেখে পাণ্ডবদের বড় বড় সেনারাও কেঁপে উঠত। তিনি দশ দিন ক্রমাগত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করছিলেন। হায় ! দুষ্কর কার্য করার পর তিনি আজ সূর্যের ন্যায় অস্তমিত হলেন ! কৃপাচার্য এবং দ্রোণাচার্য তাঁর কাছেই ছিলেন, তবুও তাঁর পতন হল কী করে ? তাঁকে পাঞ্চালদেশীয় শিখণ্ডী কী করে ভূপাতিত করল ? আমাদের পক্ষের কোন কোন বীর দুর্যোধনের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিল ?

সঞ্জয় ! সত্যই আমার হৃদয় প্রস্তর নির্মিত, কঠোর ; তাই পিতৃসম ভীষ্মের মৃত্যুর সংবাদেও তা বিদীর্ণ হয়নি। ভীষ্মের সত্য, বুদ্ধি এবং নীতি ইত্যাদি সদ্‌গুণের কোনো সীমা ছিল না ; তিনি কী করে যুদ্ধে আহত হলেন ? সঞ্জয় ! বলো, পাণ্ডবদের সঙ্গে ভীষ্মের কীরকম যুদ্ধ হচ্ছিল ? হায় ! তাঁর পতনে আমার পুত্ররা সেনাপতিহীন সেনা এবং পুত্রহীনা নারীর ন্যায় অসহায় হয়ে পড়ল। আমাদের পিতা জগতে প্রসিদ্ধ ধর্মাত্মা ও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে আমাদের আর বেঁচে থাকার কী আশা থাকল ? নদীপারে ইচ্ছুক মানুষরা নৌকা ডুবতে দেখলে যেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আমার পুত্ররাও নিশ্চয়ই ভীষ্মের পতনে সেইরূপ শোকমগ্ন হয়েছে। আমি জানলাম যে ধৈর্য বা বল থাকলেও মৃত্যুর হাত থেকে কারো রক্ষা নেই। কাল অবশ্যই অত্যন্ত বলবান, সমস্ত জগতে কেউই তাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। আমি ভীষ্মের কাছেই কৌরবদের রক্ষা পাওয়ার আশা করেছিলাম। তাঁকে রণভূমিতে পতিত দেখে দুর্যোধন কী করল ? কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসন কী বলল ? ভীষ্ম ব্যতীত আর কোন কোন রাজার জয়-পরাজয় হয়েছে ? সঞ্জয় ! আমি দুর্যোধনের কৃত দুঃখদায়ক কর্মের কথা শুনতে চাই। সেই ভীষণ সংগ্রামে যা সব ঘটেছে, সে সবই আমাকে শোনাও। অল্পবুদ্ধি দুর্যোধনের মূর্খতার জন্য যে সব অন্যায় বা ন্যায়পূর্ণ ঘটনা ঘটেছে এবং বিজয়লাভের জন্য ভীষ্ম যেসব তেজস্বীতা পূর্ণ কর্ম করেছেন, তা আমাকে বলো। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কীরকম যুদ্ধ হচ্ছে তাও বলো। সব ঘটনা ক্রমানুসারে সবিস্তারে আমাকে শোনাও।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনার এই প্রশ্ন আপনারই যোগ্য ; কিন্তু সমস্ত দোষই আপনি দুর্যোধনের ওপর চাপাতে পারেন না। যে ব্যক্তি নিজ দুষ্কর্মের জন্য অশুভ ফল ভোগ করে, তার সেই পাপের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো উচিত নয়। বুদ্ধিমান পাণ্ডবরা দুর্যোধন তাঁদের প্রতি যে ছল-কপট ব্যবহার করেছিল, তা ভালোভাবেই জানতেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা আপনার মুখ চেয়ে মন্ত্রীসহ বনবাসে কালযাপন করে সব কিছু সহ্য করেছেন। যাঁর কৃপায় আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের জ্ঞান এবং আকাশে বিচরণ করার ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে, সেই পরাশরনন্দন ভগবান ব্যাসকে প্রণাম করে ভরতবংশীয়দের রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংগ্রামের কাহিনী আপনাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছি।

দুই পক্ষের সৈন্যদল যখন প্রস্তুত হয়ে ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান হল, তখন দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন—'দুঃশাসন ! ভীষ্ম পিতামহকে রক্ষা করার জন্য যে রথ নির্দিষ্ট আছে, তা প্রস্তুত করাও। এই যুদ্ধে ভীষ্মকে রক্ষার থেকে বড় আর কোনো দ্বিতীয় কর্ম আমাদের নেই। শুদ্ধ চিত্তসম্পন্ন পিতামহ আগেই বলে রেখেছেন যে, তিনি শিখণ্ডীকে বধ করবেন না, কারণ শিখণ্ডী স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই আমার মত হল শিখণ্ডীর হাত থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করার বিশেষ চেষ্টা করা। আমার সমস্ত সেনা শিখণ্ডীকে বধ করার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে। পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণের যেসব অস্ত্রকুশল বীর আছেন তাঁরাও পিতামহের রক্ষার জন্য থাকুন। দেখো, অর্জুনের রথের বামভাগ যুধামন্যু রক্ষা করছেন, দক্ষিণভাগে উত্তমৌজা। অর্জুনের এই দুজন রক্ষক আর অর্জুন নিজে শিখণ্ডীকে রক্ষা করছেন। সুতরাং তুমি এমন কাজ করো যাতে অর্জুন দ্বারা সুরক্ষিত এবং ভীষ্মের দ্বারা উপেক্ষিত শিখণ্ডী কিছুতেই পিতামহকে বধ করতে সক্ষম না হয়।

তারপর রাত্রি প্রভাত হলে সূর্যোদয়ে আপনার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবদের সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হল। দণ্ডায়মান যোদ্ধাদের হাতে ধনুক, ঋষ্টি, তলোয়ার, গদা, শক্তি এবং নানাপ্রকার অস্ত্র শোভা পাচ্ছিল। হাজার হাজার হাতি, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক ও রথী শত্রুদের যুদ্ধে বধ করার জন্য ব্যূহবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান ছিল। শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তীরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেকয়নরেশ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কলিঙ্গ নরেশ শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, বৃহদ্বল এবং কৃতবর্মা—এই দশজন বীর এক এক অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক। এঁরা ছাড়াও বহু মহারথী রাজা এবং রাজকুমার দুর্যোধনের অধীনে যুদ্ধে নিজ নিজ সৈন্যদলের সঙ্গে দণ্ডায়মান ছিলেন। এছাড়াও দুর্যোধনের এগারো অক্ষৌহিণী মহাসেনা ছিল। এরা সমস্ত সৈন্যের

অগ্রগামী ছিল ; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ছিলেন এদেরই অধিনায়ক। মহারাজ ! তিনি শ্বেতবর্ণের শিরস্ত্রাণ ও শ্বেতবর্ণের বর্ম পরিহিত ছিলেন, তাঁর রথের ঘোড়াও শ্বেতবর্ণের ছিল। তাঁর নিজ দেহের শ্বেত কান্তিতে তাঁকে চন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্ত দেখাচ্ছিল। তাঁকে দেখে মহাবীর ধনুর্ধারী সৃঞ্জয় বংশের বীর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাঞ্চালবীরগণও ভীতচমৎকৃত হলেন। এই এগারো অক্ষৌহিণী সেনা আপনাদের পক্ষে দণ্ডায়মান ছিল। রাজন্! কৌরবদলের এত বড় সৈন্য সংগঠন আমি এর আগে কখনো দেখিনি, শুনিনি।

ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য প্রত্যহ প্রভাতে উঠে মনে মনে এই কামনা করতেন যে 'পাণ্ডবদের জয় হোক' ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁরা দুজনেই আপনার জন্যই যুদ্ধ করছেন। সেই দিন পিতামহ ভীষ্ম সব রাজাকে ডেকে বললেন—'ক্ষত্রিয়-গণ ! আপনাদের স্বর্গে গমন করার এই যুদ্ধরূপ মহাদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, এর সাহায্যে আপনারা ইন্দ্রলোক এবং ব্রহ্মলোকে যেতে সক্ষম। এই আপনাদের সনাতন পথ, আপনাদের পূর্বপুরুষগণও এটি অনুসরণ করেছেন। রুগ্ন হয়ে গৃহে শায়িত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের কাছে অধর্ম বলে মনে করা হয়, যুদ্ধে মৃত্যুই সনাতন ধর্ম।'

ভীষ্মের কথা শুনে সব রাজাই নিজ নিজ উত্তম রথে আরোহণ করে সৈন্য শোভা বৃদ্ধি করে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। শুধু কর্ণ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে থেকে গেলেন। সমস্ত কৌরবসেনার সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম রথে আসীন হয়ে সূর্যের ন্যায় শোভাবৃদ্ধি করছিলেন, তাঁর রথের ধ্বজায় বিশাল তালবৃক্ষ এবং পাঁচটি তারাচিহ্ন শোভা পাচ্ছিল। আপনাদের পক্ষে যত মহা ধনুর্ধর রাজা ছিলেন তাঁরা সকলেই শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নির্দেশে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন। আচার্য দ্রোণের যে ধ্বজা উড়ছিল, তাতে স্বর্ণবেদী, কমণ্ডলু এবং ধনুক চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। কৃপাচার্য তাঁর বহুমূল্য রথে বৃষচিহ্নিত ধ্বজা দ্বারা শোভিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজন্ ! এইভাবে আপনার পুত্রের সৈন্যদের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যেন গঙ্গায় মিলিত যমুনার ন্যায় শোভাবর্ধন করছিল।

—o—

উভয় পক্ষের সৈন্যদলের ব্যূহ-রচনা

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! ভীষ্ম তো মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব এবং অসুর দ্বারা তৈরি ব্যূহরচনার কৌশল জানতেন। তিনি যখন আমাদের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার দ্বারা ব্যূহরচনা করেন, পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তখন তাঁর সামান্য সেনা দিয়ে কীভাবে ব্যূহরচনা করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনার সেনাদের সু-সজ্জিত ব্যূহ দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন—'তাত ! মহর্ষি বৃহস্পতির কথায় আমরা জেনেছি যে শত্রু অপেক্ষা যদি নিজ পক্ষের সৈন্য কম হয়, তাহলে তাদের পিছিয়ে কিছু দূরে রেখে যুদ্ধ করা উচিত আর যদি নিজেদের সৈন্য বেশি হয়, তবে ইচ্ছামতো সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধ করা উচিত। অল্প সৈন্য নিয়ে যদি অধিক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে তাদের সূচীমুখ নামক ব্যূহরচনা করা উচিত। আমাদের সৈন্যদল শত্রুপক্ষের সৈন্যের তুলনায় খুবই অল্প, সুতরাং তুমি উপযুক্ত ব্যূহরচনা করো।

একথা শুনে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ ! আমি আপনার জন্য বজ্র নামক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করছি ; এই ব্যূহ ইন্দ্রবর্ণিত দুর্জয় ব্যূহ। এর শক্তি বায়ুর ন্যায় প্রবল এবং শত্রুদের কাছে দুঃসহ। যোদ্ধাদের অগ্রগণ্য ভীমসেন এই ব্যূহে আমাদের সম্মুখে থেকে যুদ্ধ করবেন। তাঁকে দেখেই দুর্যোধন ও অন্যান্যরা এমনভাবে ভীত হবেন, যেমন সিংহকে দেখে ক্ষুদ্র মৃগ পালায়।

যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জানিয়ে ধনঞ্জয় ব্যূহরচনা করলেন। সেনাদের ব্যূহাকারে সাজিয়ে অর্জুন শীঘ্রই শত্রুদের দিকে এগোলেন। কৌরবদের এগিয়ে আসতে দেখে পাণ্ডবসেনাও জলপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব এবং ধৃষ্টকেতু—এঁরা সৈন্যদের অগ্রবর্তী হয়ে চললেন। এঁদের পশ্চাতে রাজা বিরাট তাঁর ভ্রাতা, পুত্র এবং এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তাঁদের রক্ষা করছিলেন। নকুল ও সহদেব ভীমসেনের উভয়দিকে থেকে তাঁর রথের দুপাশ রক্ষা করছিলেন। দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং অভিমন্যু এঁদের পৃষ্ঠভাগের রক্ষায় ছিলেন। এঁদের পিছনে যাচ্ছিলেন শিখণ্ডী, যিনি অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে ভীষ্মের

বিনাশ সাধনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। অর্জুনের পিছনে মহাবলী সাত্যকি ছিলেন এবং যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাঁদের চক্র রক্ষা করছিলেন। কৈকেয় ধৃষ্টকেতু এবং বলবান চেকিতানও অর্জুনের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন।

অর্জুন নির্মিত বজ্রব্যূহ সমস্ত ভীতি-আশঙ্কাশূন্য ছিল। তার মুখ সবদিকে প্রসারিত এবং দেখতে ছিল অতি ভয়ংকর। বীরদের ধনুক বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হচ্ছিল। স্বয়ং অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক হাতে তাঁদের রক্ষা করছিলেন। এঁদের ভরসাতেই পাণ্ডব আপনার সৈন্যের সম্মুখীন হয়েছে। পাণ্ডবদের সুরক্ষিত সেই ব্যূহ মানব-জগতের পক্ষে সর্বতোভাবে অজেয় হয়েছিল।

এরমধ্যে সূর্যোদয় হওয়ায় সমস্ত সৈনিক সন্ধ্যা-বন্দনা করতে শুরু করলেন। তখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকলেও মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছিল। তারপর প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল এবং ধুলায় সবদিক ভরে গেল। পূর্বদিকে উল্কাপাত শুরু হল। উদীয়মান সূর্যের সঙ্গে আঘাত খেয়ে উল্কাগুলি ভয়ানক শব্দ করে পৃথিবীতে নিপতিত হয়ে বিলীন হয়ে গেল।

সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর যখন সব সৈনিক প্রস্তুত হতে শুরু করল তখন সূর্যের আলো প্রায় নিভে গেল এবং পৃথিবী ভয়ানক শব্দ করে কম্পিত হতে লাগল। সব দিকে বজ্রপাত হতে লাগল। পাণ্ডবরা যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ভীমসেনকে সামনে রেখে আপনার পুত্রদের সামনে ব্যূহরচনা করে দাঁড়ালেন। গদাধারী ভীমকে ব্যূহের সামনে দেখে আমাদের যোদ্ধাদের মুখ মলিন হয়ে গেল।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! সূর্যোদয় হলে ভীষ্মের অধিনায়কত্বে আমার পক্ষের বীররা এবং ভীমসেনের সেনাপতিত্বে উপস্থিত পাণ্ডবপক্ষের সৈনিক-দের মধ্যে প্রথমে কারা যুদ্ধের জন্য হর্ষ প্রকটিত করে ?

সঞ্জয় বললেন—নরেন্দ্র ! দুপক্ষের সেনার অবস্থাই একরকম ছিল। দুপক্ষই যখন একে অপরের কাছে এল, দুপক্ষকেই প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। হাতি, ঘোড়া এবং রথ পরিপূর্ণ দুপক্ষের সেনাদের শোভা বিচিত্র সুন্দর হয়েছিল। কৌরবসেনারা পশ্চিমমুখী ছিল আর পাণ্ডবগণ পূর্বমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কৌরব সেনাদের দৈত্যরাজের সৈন্যের ন্যায় দেখাচ্ছিল আর পাণ্ডব সৈন্যদের পশ্চাদভাগ প্রশান্ত মলয় প্রবাহিত আর কৌরব সৈন্যদের পশ্চাতে হিংস্র পশুগুলি গর্জন করছিল।

ভারত ! আপনার সৈন্যব্যূহে এক লক্ষের বেশি হাতি ছিল, প্রত্যেকটি হাতির সঙ্গে শত শত রথ দণ্ডায়মান ছিল। এক একটি রথের সঙ্গে শত শত ঘোড়া ছিল, প্রত্যেকটি ঘোড়ার সঙ্গে দশজন করে ধনুর্ধর সৈনিক ছিল এবং এক একজন ধনুর্ধরের সঙ্গে দশজন ঢালধারী ছিল। ভীষ্ম এইভাবে আপনাদের সৈন্যব্যূহ রচনা করেছিলেন। তিনি প্রত্যহ ব্যূহ পরিবর্তন করতেন। কোনোদিন মানবব্যূহ রচনা করতেন, কোনোদিন দৈবব্যূহ আবার কোনোদিন গন্ধর্ব ব্যূহ বা কোনোদিন আসুর-ব্যূহ রচনা করতেন। আপনার সৈন্য ব্যূহ-মহারথী সৈনিকে পরিপূর্ণ ছিল। তাদের আওয়াজ সমুদ্রের গর্জনের ন্যায় ছিল। রাজন্ ! যদিও কৌরবসৈন্য ছিল অসংখ্য এবং ভয়ংকর, পাণ্ডব সৈন্য তেমন ছিল না, তবুও আমার বিশ্বাস যে, প্রকৃতপক্ষে সেই সেনাই দুর্ধর্ষ এবং বৃহৎ যাদের নেতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন।

—o—

যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনের আলোচনা, অর্জুন দ্বারা দুর্গাদেবীর স্তব এবং বরলাভ

সঞ্জয় বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! যখন ভীষ্ম নির্মিত অভেদ্য ব্যূহ দেখলেন তখন বিমর্ষ হয়ে অর্জুনকে বললেন—'ধনঞ্জয় ! পিতামহ ভীষ্ম যাঁদের সেনাপতি, সেই কৌরবদের সঙ্গে আমরা কীভাবে যুদ্ধ করব ? মহাতেজস্বী ভীষ্ম শাস্ত্রোক্ত বিধিতে যে ব্যূহ নির্মাণ করেছেন, সেই ব্যূহ ভেদ করা অসম্ভব। ভীষ্ম আমাদের এবং আমাদের সৈন্যদের সংকটে ফেলে দিয়েছেন, এই মহাব্যূহ থেকে আমরা কীভাবে রক্ষা পাব ?'

শত্রুদমন অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! যে যুক্তির সাহায্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও বুদ্ধি, গুণ এবং সংখ্যায় নিজের থেকে অধিক থাকলেও বিপক্ষের ওপর জয়লাভ করে, তা আমার কাছে শুনুন। অনেকদিন আগে দেবাসুর যুদ্ধের অবসরে ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতাদের বলেছিলেন—'দেবগণ ! জয়লাভের ইচ্ছাসম্পন্ন বীরগণ

কেবলমাত্র বল ও পরাক্রমে জয়লাভ করতে পারে না, বীরত্বের সঙ্গে সত্য, দয়া, ধর্ম এবং উদ্যমের দ্বারা তা লাভ করে। তাই ধর্ম-অধর্ম এবং লোভকে ভালোভাবে জেনে অহংকারবর্জিত হয়ে উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করো। যেখানে ধর্ম থাকে, সেখানেই জয়লাভ হয়।' রাজন্! তাই আপনিও জেনে রাখুন যে এই যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত। নারদ বলেন—'যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই বিজয়' শ্রীকৃষ্ণের একটি গুণ হল বিজয়, যা সর্বদা তাঁর অনুগমন করে। গোবিন্দের তেজ অনন্ত, তিনি সাক্ষাৎ সনাতন পুরুষ, তাই শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেই পক্ষেরই বিজয় হবে। রাজন্! আমি আপনার বিষাদের কোনো কারণ দেখছি না, কারণ বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণও আপনার বিজয় কামনা করছেন।'

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান তাঁর সেনাদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর রথ ইন্দ্রের রথের মতোই সুন্দর ছিল, তার ওপর যুদ্ধের সমস্ত সামগ্রী সজ্জিত ছিল। যুধিষ্ঠির রথে আরোহণ করলে তাঁর পুরোহিত 'শত্রুনাশ হোক'—বলে আশীর্বাদ করলেন এবং ব্রহ্মর্ষি ও শ্রোত্রিয় বিদ্বানগণ জপ, মন্ত্র এবং ঔষধির দ্বারা স্বস্তিবাচন করতে লাগলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও বস্ত্র, গাভী, ফল, ফুল এবং স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণদের দান করে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন। ভীমসেন আপনার পুত্রদের বধ করার জন্য ভয়ানক রূপ ধারণ করেছিলেন, তাঁকে দেখে আপনার যোদ্ধারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বললেন—নরশ্রেষ্ঠ! যিনি সৈন্যদের মধ্যভাগে সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়ে আমাদের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আছেন, তিনি কুরুকুলের ধ্বজা উত্তোলনকারী পিতামহ ভীষ্ম। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢেকে রাখে তেমনই এই সৈন্যদল মহানুভব ভীষ্মকে ঘিরে রেখেছে। তুমি প্রথমে এই সেনাদের বধ করে তবেই ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সেনাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে যুদ্ধের সময় আগত দেখে অর্জুনের হিতার্থে বললেন— 'মহাবাহো! যুদ্ধের প্রারম্ভে শত্রুদের পরাজিত করার জন্য তুমি পবিত্র হয়ে দুর্গাদেবীর স্তব করো।' ভগবান বাসুদেবের নির্দেশে অর্জুন রথ থেকে নেমে হাত জোড় করে দুর্গাদেবীর স্তুতি করতে লাগলেন—'মন্দারচল নিবাসিনী সিদ্ধদের সেনানেত্রী আর্যে! তোমাকে বারংবার প্রণাম। তুমিই কুমারী, কালী, কাপালী, কপিলা, কৃষ্ণ, পিঙ্গলা, ভদ্রকালী এবং মহাকালী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা; তোমাকে বারবার প্রণাম। দুষ্টের ওপর প্রচণ্ড কুপিত হওয়ার তোমাকে চণ্ডী বলা হয়, ভক্তদের সংকট থেকে তারণ করায় তারিণী বলা হয়। তোমার দেহের দিব্য বর্ণ অতি সুন্দর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। মহাভাগে! তুমি সৌম্য এবং সুন্দর রূপসম্পন্ন কাত্যায়নী আবার বিকট রূপধারিণী কালী। তুমি জয়া ও বিজয়া নামে বিখ্যাত। তোমার ধ্বজা ময়ূরপুচ্ছের, নানা অলংকার তোমার অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে। ত্রিশূল, খড়্গ ইত্যাদি অস্ত্র তুমি ধারণ করেছ। তুমি নন্দগোপের বংশে অবতার হয়ে এসেছিলে, তাই তুমি গোপেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী; গুণ ও প্রভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহিষাসুরকে বধ করে তুমি বড়ই প্রসন্ন হয়েছিলে। কুশিক গোত্রে অবতার হওয়ায় তুমি কৌশিকী নামেও প্রসিদ্ধ, তুমি পীতবস্ত্র ধারণকারিণী। শত্রুদের দেখে যখন অট্টহাস্য কর, তখন তোমার মুখ চক্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়। যুদ্ধ তোমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। উমা, শাকম্ভরী, শ্বেতা, কৃষ্ণা, কৈটভনাশিনী, হিরণ্যাক্ষী, বিরূপাক্ষী এবং সুধূম্রাক্ষী প্রমুখ নাম ধারণকারী দেবী! তোমাকে অজস্র বার নমস্কার। তুমি বেদের শ্রুতি, তোমার স্বরূপ অত্যন্ত পবিত্র; বেদ ও ব্রাহ্মণ তোমার প্রিয়।

তুমি জাতবেদা অগ্নির শক্তি ; জম্বু, কটক ও মন্দিরে তোমার নিত্য নিবাস। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা এবং দেহধারীদের মহানিদ্রা। ভগবতী ! তুমি কার্তিকের মাতা, দুর্গম স্থানে বাস করায় দুর্গা। স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, বেদমাতা সাবিত্রী ও বেদান্ত—এসব তোমারই নাম। মহাদেবী ! আমি বিশুদ্ধ হৃদয়ে তোমার স্তব করছি, তোমার কৃপায় এই রণাঙ্গনে আমার সর্বদা জয় হোক। মা ! তুমি ঘোর জঙ্গলে, ভয়পূর্ণ দুর্গম স্থানে, ভক্তের গৃহে এবং পাতালে নিত্য নিবাস করো। যুদ্ধে দানবদের পরাজিত করো। তুমি মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী এবং জননী। তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি এবং সূর্য-চন্দ্রের দীপ্তি বৃদ্ধিকারীও তুমি। তুমি ঐশ্বর্যবানদের বিভূতি। যুদ্ধভূমিতে সিদ্ধ ও চারণ তোমাকেই দর্শন করেন।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! অর্জুনের ভক্তি দেখে মনুষ্যলোকের প্রতি করুণামূর্তি দেবী দুর্গা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে আকাশে প্রকটিত হলেন এবং বললেন—'পাণ্ডু-নন্দন ! তুমি অল্পদিনেই শত্রুদের ওপর বিজয়লাভ করবে। তুমি সাক্ষাৎ নর, তোমার সাহায্যকারী নারায়ণ ; তোমাকে কেউ অবদমিত করতে পারবে না। শত্রুদের কথাই নেই, স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রের কাছেও তুমি অজেয়।'

বরদায়িনী দেবী দুর্গা এই কথা বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তর্হিত হলেন। বরদান লাভ করে অর্জুনের জয়লাভে আস্থা হল। তিনি রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন একই রথে আরোহণ করে নিজ নিজ দিব্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। রাজন্ ! যেখানে ধর্ম, সেখানেই দ্যুতি ও কান্তি ; যেখানে লজ্জা, সেখানেই লক্ষ্মী এবং সুবুদ্ধি। সেইরূপ যেখানে ধর্ম, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই জয়।

—o—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(অর্জুনবিষাদযোগ)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে সঞ্জয় ! ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ একত্রিত হয়ে কী করল ? ১

সঞ্জয় বললেন—সেই সময়ে রাজা দুর্যোধন ব্যূহাকারে সজ্জিত পাণ্ডব-সেনাদের দেখে, দ্রোণাচার্যের নিকটে এসে এই কথা বললেন। ২

হে আচার্য ! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূহাকারে রচিত পাণ্ডুপুত্রদের এই বিশাল সৈন্য সমাবেশ অবলোকন করুন। ৩

এই সেনার মধ্যে মহাধনুর্ধারী এবং যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ পরাক্রমশালী যোদ্ধা সাত্যকি, বিরাট, মহারথী রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বলশালী যুধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—এঁরা সকলেই মহারথী। ৪-৬

হে ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ ! আমাদের পক্ষেও যে সকল সেনাপ্রধান আছেন, আপনার অবগতির জন্য তাদের নাম আমি জানাচ্ছি। ৭

আপনি (দ্রোণাচার্য), পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য ছাড়াও অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা। ৮

এছাড়াও আমার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত এবং নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী সুসজ্জিত অনেক যোদ্ধা আছেন। তাঁরা সকলেই যুদ্ধ বিশারদ। ৯

পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত আমাদের ওই সেনা সর্বপ্রকারে অজেয় এবং ভীমের দ্বারা রক্ষিত পাণ্ডব সেনাদের জয় করা সহজ।১০

তাই সমস্ত বিভাগে নিজ নিজ ব্যূহস্থানে অবস্থান করে আপনারা সকলে সুনিশ্চিতভাবে পিতামহ ভীষ্মকে সবদিক থেকে রক্ষা করুন। ১১

কুরুকুলের অতি প্রতাপশালী বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তখন দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করতে সিংহবৎ পরাক্রমে উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করলেন। ১২

তারপর শঙ্খ, নাকাড়া, ঢোল, মৃদঙ্গ, রণশিঙ্গা ইত্যাদি বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল। সেই শব্দ ছিল গগন ভেদী ও লোমহর্ষক। ১৩

তারপর শ্বেত অশ্বসমন্বিত উত্তম রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খবাদন করলেন। ১৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোরকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন। ১৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ এবং নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজালেন। ১৬

হে রাজন্ ! মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অজেয় সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু—এঁরা সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। ১৭-১৮

সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে শব্দায়মান করে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করল। ১৯

হে রাজন্ ! এর পর কপিধ্বজ অর্জুন যুদ্ধোদ্যত ধৃতরাষ্ট্র-পরিজনদের অস্ত্রনিক্ষেপে প্রস্তুতাবস্থায় দেখে ধনুক উত্তোলন করে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন—হে অচ্যুত ! আমার রথটিকে উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন। ২০-২১

যতক্ষণ না যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত এই যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের ভালো করে দেখি যে এই মহারণে আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, ততক্ষণ রথটিকে ওইভাবে রাখুন। ২২

দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী যেসকল রাজন্যবর্গ যুদ্ধার্থে এখানে সমবেত হয়েছেন, সেই সকল যুদ্ধার্থীদের আমি দেখতে চাই। ২৩

সঞ্জয় বললেন–হে ধৃতরাষ্ট্র ! অর্জুন এইকথা বলায় শ্রীকৃষ্ণ দুই পক্ষের সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সামনে উত্তম রথটি স্থাপন করে বললেন, 'হে পার্থ ! যুদ্ধে সমবেত এই কৌরবদের দেখো।' ২৪-২৫

তখন পৃথাপুত্র অর্জুন উভয় সেনার মধ্যে অবস্থানকারী পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ,

পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ এবং সুহৃদ্‌গণকে দেখলেন। ২৬ এবং ২৭ শ্লোকের পূর্বার্ধ

উপস্থিত সেই সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের দেখে কুন্তীপুত্র অর্জুন খুবই করুণার্দ্র হয়ে বিষণ্ণ চিত্তে এই কথা বললেন। ২৭ শ্লোকের শেষার্ধ এবং ২৮-এর পূর্বার্ধ।

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যত এই যুদ্ধাভিলাষী স্বজনদের দেখে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শিথিল হয়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরে কম্পন ও রোমাঞ্চ হচ্ছে। ২৮ শ্লোকের শেষার্ধ এবং ২৯

গাণ্ডীবধনুক হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, সারা শরীরে জ্বালা বোধ হচ্ছে। মাথা ঘুরে যাচ্ছে, এই অবস্থায় আমার দাঁড়াবার শক্তি নেই। ৩০

হে কেশব ! আমি এই সব লক্ষণগুলিকে অশুভ মনে করছি এবং যুদ্ধে স্বজনদের হত্যা করায় আমি কোনো কল্যাণ দেখছি না। ৩১

হে কৃষ্ণ ! আমি জয় চাই না, রাজ্য ও সুখভোগও চাই না। হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্যের কী প্রয়োজন আর সুখভোগে ও জীবনধারণেই বা কী প্রয়োজন। ৩২

আমরা যাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখাদি কামনা করি, তাঁরাই অর্থ এবং প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত। ৩৩

আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুল-গণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালক এবং অন্যান্য আত্মীয়-গণও যুদ্ধে উপস্থিত। ৩৪

হে মধুসূদন ! আমাকে বধ করতে উদ্যত হলেও অথবা ত্রিলোকের রাজত্বের জন্যও আমি এদের বধ করতে চাই না, পৃথিবীর রাজত্ব তো নগণ্য। ৩৫

হে জনার্দন ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে আমাদের কী সুখ হবে ? এইসকল আত্মীয়দের বধ করলে তো আমাদের পাপই হবে। ৩৬

অতএব হে মাধব ! দুর্যোধনাদি ও তাদের বান্ধবগণকে বধ করা আমাদের উচিত নয় ; কেননা নিজ কুটুম্বদের হত্যা করে আমরা কীরূপে সুখী হব ? ৩৭

যদিও লোভে ভ্রষ্টচিত্ত হয়ে এঁরা কুলনাশ হতে উৎপন্ন দোষ এবং মিত্রদের সঙ্গে বিরোধে কোনো পাপ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু হে জনার্দন ! কুলনাশজনিত দোষ জেনেও আমরা কেন এই পাপ হতে নিরত হব না ? ৩৮-৩৯

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুলে পাপ ছড়িয়ে পড়ে। ৪০

হে কৃষ্ণ ! পাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। হে বার্ষ্ণেয় ! কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। ৪১

বর্ণসংকর উৎপন্ন হলে কুলঘাতকদের এবং কুলকে নরকে নিয়ে যায় এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ হতে বঞ্চিত হওয়ায়

পিতৃপুরুষগণও অধোগতি প্রাপ্ত হন। ৪২

এই বর্ণসংকরকারক দোষে কুলনাশকারীদের সনাতন কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। ৪৩

হে জনার্দন ! আমরা শুনেছি যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়, তারা চিরদিন নরকে বাস করে। ৪৪

হায় ! দুর্ভাগ্য ! আমরা বুদ্ধিমান হয়েও কী মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, রাজ্য ও সুখভোগের আশায় স্বজন বধ করতে উদ্যত হয়েছি। ৪৫

যদি আমাকে শস্ত্ররহিত ও প্রতিকারহীন অবস্থায় দেখে অস্ত্রসজ্জিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা বধও করে, তবে সেই মৃত্যুও আমার পক্ষে কল্যাণজনক হবে। ৪৬

সঞ্জয় বললেন— রণভূমিতে শোকে উদ্বিগ্ন-চিত্ত অর্জুন এই কথা বলেই ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে উপবেশন করলেন। ৪৭

—o—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(সাংখ্যযোগ)

সঞ্জয় বললেন—ওই প্রকার করুণার্দ্র এবং অশ্রুপূর্ণ আকুললোচন বিষণ্ণ অর্জুনকে তখন ভগবান এই কথা বললেন। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই অসময়ে এরূপ মোহ তোমার কোথা থেকে এল ? কেননা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই রকম আচরণ করেন না, এই মোহ স্বর্গ বা কীর্তি কোনোটিই প্রদান করে না। ২

সুতরাং হে অর্জুন ! পৌরুষহীনতার আশ্রয় নিও না, এ তোমার শোভা পায় না। হে পরন্তপ ! হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও। ৩

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! আমি কীভাবে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করব ? কারণ, হে অরিসূদন ! এঁরা উভয়েই আমার পূজনীয়। ৪

তাই এই মহানুভব গুরুজনদের হত্যা না করে আমি ইহলোকে ভিক্ষান্নে উদর পূরণও কল্যাণকর বলে মনে করি; কারণ গুরুজনদের বধ করে ইহলোকে যে অর্থ ও কামরূপ সুখ ভোগ করব তা তো তাঁদেরই রুধির লিপ্ত। ৫

যুদ্ধ করা বা না-করা—এর মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়, আর আমরা তাদের জয় করব, না তারা আমাদের জয় করবে, তাও আমরা জানি না, যাদের বধ করে আমরা বাঁচতেও চাই না, আমাদের আত্মীয় সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। ৬

এইজন্য কাপুরুষতারূপ দোষে অভিভূত-স্বভাব এবং ধর্ম বিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমার পক্ষে যা নিশ্চিত কল্যাণকর, তাই আমাকে বলুন, কারণ আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত। আমাকে শিক্ষা দিন। ৭

কারণ পৃথিবীর নিষ্কণ্টক, ধন-ধান্যসমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবগণের প্রভুত্ব লাভ করলেও আমি সেই উপায় দেখতে পাচ্ছি না যা আমার সন্তাপক শোক দূর করতে পারে। ৮

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! নিদ্রাজয়ী অর্জুন অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে 'আমি যুদ্ধ করব না' এই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে নীরব হলেন। ৯

হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র ! অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার
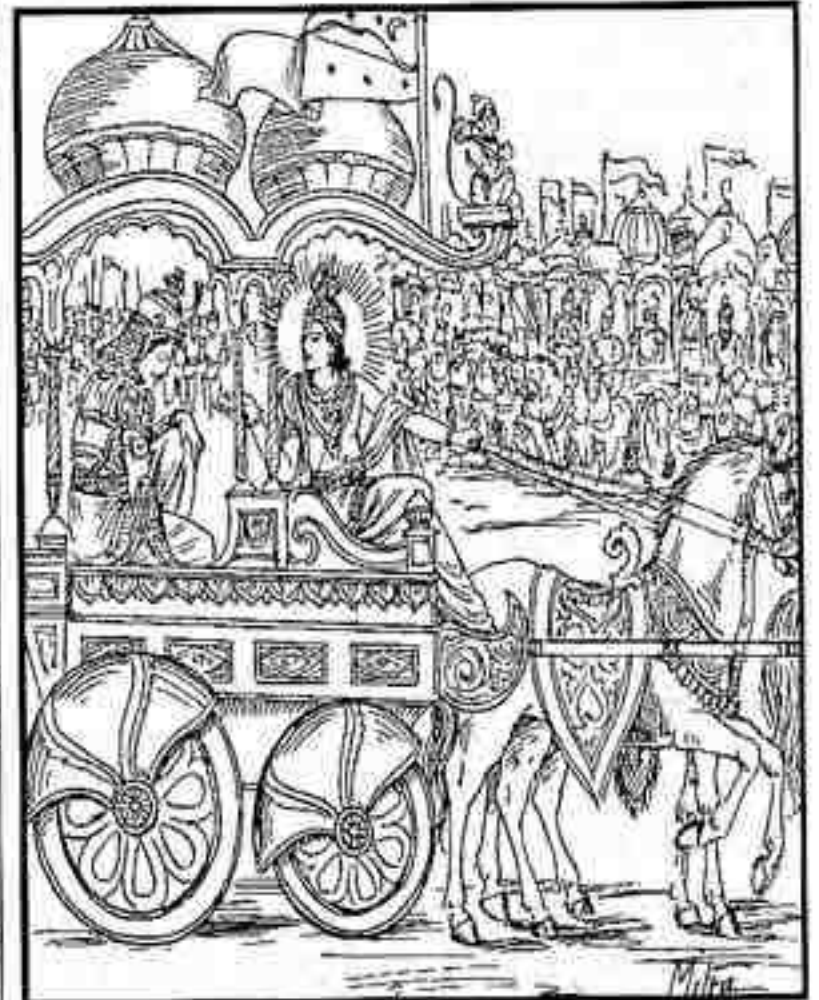
মধ্যে শোকমগ্ন অর্জুনকে স্মিতহাস্যে এই কথা বললেন। ১০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! যাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয় এমন মানুষদের জন্য তুমি শোক করছ, আবার পণ্ডিতের মতো কথাও বলছ। কিন্তু পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারো জন্য শোক করেন না। ১১

এমন নয় যে, আমি আগে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই রাজন্যবর্গ ছিল না এবং পরেও যে আমরা সকলে থাকব না, তা নয়। ১২

জীবাত্মার এই দেহে যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও ঘটে ; এই বিষয়ে ধীর ব্যক্তিগণ মোহগ্রস্ত হন না। ১৩

ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগহেতু উৎপন্ন শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখ প্রদানকারী দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অনিত্য ; সুতরাং হে ভারত ! তুমি এই সকল সহ্য করো। ১৪

কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সুখ-দুঃখ এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়জনিত সংযোগ যে ধীর ব্যক্তিকে বিচলিত করতে পারে না, তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হন। ১৫

অসৎ বস্তুর তো সত্তা (অস্তিত্ব) নেই এবং সৎ বস্তুর অভাব (অনস্তিত্ব) নেই, এইরূপে এই দুটিরই যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞানীগণের দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে। ১৬

তাঁকেই অবিনাশী জানবে যাঁর দ্বারা এই সমগ্র বস্তু-জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই অবিনাশীর বিনাশ করতে কেউ-ই সক্ষম নয়। ১৭

অবিনশ্বর, অপ্রমেয়, নিত্যস্বরূপ জীবাত্মার এই সকল শরীরকে বিনাশশীল বলা হয়েছে। তাই হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি যুদ্ধ করো। ১৮

যিনি এই আত্মাকে হত্যাকারী বলেন এবং যিনি এঁকে নিহত বলে মনে করেন তাঁরা উভয়েই (তত্ত্বটি) জানেন না ; কারণ এই আত্মা প্রকৃতপক্ষে কাকেও হত্যা করেন না এবং কারো দ্বারা হতও হন না। ১৯

এই আত্মার কখনো জন্ম বা মৃত্যু হয় না এবং আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তি সাপেক্ষ নয়, কারণ ইনি জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন ; শরীর বিনষ্ট হলেও ইনি বিনষ্ট হন না। ২০

হে পার্থ ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত এবং অব্যয় বলে জানেন, তিনি কীভাবে কাকে হত্যা করবেন বা করাবেন ? ২১

যেমন মানুষ পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই জীবাত্মা জীর্ণ-শরীর ত্যাগ করে নতুন নতুন শরীর গ্রহণ করে। ২২

শস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে পারে না, অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না, জল একে সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না। ২৩

কারণ এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য, এবং নিত্য, সর্বব্যাপ্ত, অচল, স্থির ও সনাতন। ২৪

এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত বলা হয়। তাই হে অর্জুন ! এই আত্মাকে উক্তপ্রকার জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৫

আর যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্য জন্মশীল এবং নিত্য মরণশীল বলে মনে কর, তবুও হে মহাবাহো ! তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৬

কারণ এইরূপ মনে করলেও যে জন্মায় তার মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতের জন্মও নিশ্চিত। এই বিচারেও তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৭

হে ভারত ! সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল, মৃত্যুর পরও অপ্রকট হয়ে যায়, কেবল মধ্যবর্তী সময়েই প্রকটিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিলাপ কেন ? ২৮

কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দেখেন, অন্য কেউ একে আশ্চর্যবৎ বর্ণনা করেন এবং অপর কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে শ্রবণ করেন আর কেউ কেউ তো শ্রবণ করেও এঁর সম্বন্ধে জানে না কারণ, আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়। ২৯

হে অর্জুন ! এই আত্মা সকলের দেহে সর্বদাই অবধ্য। এই কারণে কোনো প্রাণীর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। ৩০

এবং নিজ ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা বড় আর কোনো কল্যাণকর কর্তব্য নেই। ৩১

হে পার্থ ! স্বতঃপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ এইপ্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই প্রাপ্ত হন। ৩২

কিন্তু যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তা হলে স্বধর্ম ও কীর্তিচ্যুত হয়ে পাপভাগী হবে। ৩৩

এবং সকলেই তোমার এই দীর্ঘকালবাহী অকীর্তি নিয়ে আলোচনা করবে। মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই অকীর্তি মৃত্যু অপেক্ষাও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। ৩৪

আর যাদের দৃষ্টিতে তুমি খুবই সম্মানিত ছিলে তাদের চোখে হেয় হয়ে যাবে। এই মহারথীগণ মনে করবেন তুমি ভয়বশত যুদ্ধে বিরত হয়েছ। ৩৫

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক অকথ্য কথাও বলবে, এর থেকে বেশি দুঃখজনক আর কী হতে পারে। ৩৬

যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তাহলে স্বর্গ লাভ হবে আর যদি জয়লাভ কর, পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে। তাই হে অর্জুন ! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে দণ্ডায়মান হও। ৩৭

জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ; এইভাবে যুদ্ধ করলে তুমি পাপগ্রস্ত হবে না। ৩৮

হে পার্থ ! তোমার জন্য এই (সমত্ব বুদ্ধি) যোগের বিষয়ে বলা হল, এখন তুমি কর্মযোগের কথা শোন—এই বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে তুমি অনায়াসে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ৩৯

(নিষ্কাম) কর্মযোগে বিফলতা হয় না এবং বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না, উপরন্তু এই কর্মযোগরূপ ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হতে রক্ষা করে। ৪০

হে কুরুনন্দন ! এই কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী। ৪১

হে পার্থ ! যারা ভোগে আসক্তচিত্ত, কর্মফল-প্রশংসাকারী বেদবাক্যেই যাদের চিত্ত আকৃষ্ট, যাদের বুদ্ধিতে স্বর্গই পরমপ্রাপ্য বস্তু এবং যারা বলে থাকে স্বর্গ হতে বড় আর কিছুই নেই-এইরূপ বর্ণনাকারী অবিবেকীগণ যে পুষ্পিত শোভনীয় বাক্য বলে, যা জন্মরূপ কর্মফল প্রদান করে এবং ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য নানা ক্রিয়ার বর্ণনা করে—সেই বাক্য দ্বারা যাদের চিত্ত অপহৃত হয়ে ভোগ ও ঐশ্বর্যে অতি আসক্ত, তাদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হতে পারে না। ৪২-৪৪

হে অর্জুন ! বেদ পূর্বোক্ত ভাবে ত্রিগুণের কার্যরূপ সমস্ত ভোগ এবং তারই সাধনের প্রতিপাদক ; সুতরাং তুমি ওইসব ভোগ এবং তার সাধনে আসক্তিবর্জিত হও, হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্বরহিত ও নিত্যবস্তুতে (পরমাত্মাতে) স্থিত হও এবং যোগ ক্ষেমের আকাঙ্ক্ষাহীন ও আত্মপরায়ণ হও। ৪৫

সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলেও ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যে প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের বেদে ততটাই প্রয়োজন থাকে। ৪৬

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। তাই তুমি কর্ম-ফলের হেতু হয়ো না এবং কর্ম না করতে যেন তোমার কখনো আসক্তি না হয়। ৪৭

হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন ও যোগস্থ হয়ে সকল কর্ম করো। এই সমত্বকেই যোগ বলা হয়। ৪৮

এই সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা সকাম-কর্ম নিতান্তই নিকৃষ্ট। তাই, হে ধনঞ্জয় ! তুমি সমত্ববুদ্ধি-যোগের আশ্রয় নাও, কারণ যারা ফলের হেতু হয় তারা অত্যন্ত দীন। ৪৯

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ইহলোকেই পাপ এবং পুণ্য—দুই-ই পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ এগুলি হতে মুক্তিলাভ করেন। তাই তুমি সমত্বরূপ যোগের আশ্রয় নাও ; এই সমত্বরূপ যোগই হল কর্মের কৌশল অর্থাৎ কর্ম বন্ধন হতে মুক্ত হবার উপায়। ৫০

কারণ সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিকার পরমপদ লাভ করেন। ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কর্দম সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রুত এবং শ্রোতব্য ইহলোক এবং পরলোক সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে। ৫২

নানা কথার দ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাত্মায়

অটল ও স্থির হবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে তোমার নিত্য সংযোগ স্থাপিত হবে। ৫৩

অর্জুন বললেন, হে কেশব! সমাধিতে স্থিত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির লক্ষণ কী ? স্থিতধী ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন ? কীরূপে অবস্থান করেন ? কীভাবে চলেন ? ৫৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন! যখন যোগী মন থেকে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দেন এবং আত্মা কর্তৃক আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৫

দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৬

যিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে আসক্তিরহিত এবং শুভ ও অশুভ বস্তুর প্রাপ্তিতে প্রসন্ন বা দ্বেষ করেন না তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭

কচ্ছপ যেমন আপন অঙ্গসমূহ সংহরণ করে নেয়, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হতে ইন্দ্রিয়দের সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন, তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে জানবে। ৫৮

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়-উপভোগে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আসক্তি পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভে সর্বতোভাবে দূর হয়। ৫৯

হে অর্জুন! আসক্তি সর্বতোভাবে দূর না হলে চিত্ত আলোড়নকারী ইন্দ্রিয়সকল যত্নশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনকেও বলপূর্বক হরণ করে। ৬০

সাধকের উচিত ইন্দ্রিয়দের সংযত করে সমাহিত চিত্তে মৎপরায়ণ হয়ে অবস্থান করা, কারণ যার ইন্দ্রিয় বশীভূত, তারই বুদ্ধি স্থির হয়। ৬১

বিষয়চিন্তা করতে করতে মানুষের ওই বিষয়ে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি হতে কামনা উৎপন্ন হয় এবং কামনায় বাধা পড়লে ক্রোধের জন্ম হয়। ৬২

ক্রোধ হতে মূঢ়ভাব উৎপন্ন হয়, মূঢ়ভাব হতে স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধি নাশ হয় এবং বুদ্ধি নাশ হলে পতন হয়। ৬৩

কিন্তু যিনি অন্তঃকরণকে বশ করেছেন, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষবর্জিত বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে বিষয়সমূহে বিচরণ করেও অন্তঃকরণের প্রসন্নতা লাভ করেন। ৬৪

অন্তঃকরণে প্রসন্নতার ফলে তাঁর সমস্ত দুঃখ নাশ হয় এবং সেই প্রসন্নচিত্ত কর্মযোগীর বুদ্ধি অচিরে সকলদিক থেকে সংহরিত হয়ে পরমাত্মাতে স্থির হয়। ৬৫

যার মন এবং ইন্দ্রিয় নিজের বশে নেই তার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না এবং সেই অযুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভগবৎ চিন্তা জাগে না। আত্মচিন্তাবর্জিত মানুষের শান্তি অসম্ভব আর শান্তিরহিত মানুষের সুখ কোথায় ? ৬৬

কারণ জলের মধ্যে বিচরণশীল নৌকাকে যেমন বায়ু বিচলিত করে, তেমনি বিষয়ভোগে বিচরণকারী ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে মন যেটিতে আকর্ষিত হয় সেই ইন্দ্রিয়টিই অযুক্ত পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে। ৬৭

সেইজন্য, হে মহাবাহো! যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, তাঁরই প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে বলে জানবে। ৬৮

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যা রাত্রির সমান, নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী তাতে জাগ্রত থাকেন এবং বিনাশশীল জাগতিক সুখ প্রাপ্তির আশায় সমস্ত প্রাণী যাতে জাগরিত থাকে, পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী মুনির কাছে তা রাত্রির সমান। ৬৯

যেমন বিভিন্ন নদীর জল, পরিপূর্ণ অচল স্থির সমুদ্রকে বিচলিত না করেই বিলীন হয়ে যায় তেমনই সমস্ত বিষয়ভোগও যাঁর মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন না করে বিলীন হয়, তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন, কিন্তু যিনি ভোগ্যপদার্থ কামনা করেন, তাঁর পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব। ৭০

যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে মমত্বশূন্য ও অহং-বর্জিত এবং নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বরপ্রাপ্ত। ৭১

হে অর্জুন! এই হল ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের স্থিতি, এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি আর কখনো মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়ও যিনি এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। ৭২

—০—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(কর্মযোগ)

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব ! আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? ১

মিশ্রিত বাক্য দ্বারা আপনি আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্ত করছেন, অতএব একটি পথ আমাকে নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমি শ্রেয় লাভ করতে পারি। ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে নিষ্পাপ অর্জুন, ইহলোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা পূর্বেই বলেছি। তা হল সাংখ্যযোগীর নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে এবং কর্মযোগীর নিষ্ঠা কর্মযোগে। ৩

মানুষ কর্ম না করলে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধ হয় না এবং কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধি বা সাংখ্যনিষ্ঠা হয় না।৪

কেননা কেউই এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কারণ সকল মনুষ্যই প্রকৃতিজাত গুণে অবশ হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। ৫

যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়দের সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ে চিন্তা করে, তাকে মিথ্যাচারী বলে। ৬

কিন্তু হে অর্জুন ! যিনি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৭

তুমি শাস্ত্রনিহিত কর্তব্যকর্ম করো কারণ কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেয় এবং কর্ম না করলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না। ৮

যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমি আসক্তি শূন্য হয়ে শুধুমাত্র যজ্ঞার্থে কর্তব্যকর্ম করো। ৯

প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পারম্ভে যজ্ঞের সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা সমৃদ্ধ হও , এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুক। ১০

তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের সংবর্ধনা করো এবং দেবতাগণও তোমাদের উন্নত করুন। এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হও। ১১

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবতাগণ তোমাদের অভীষ্ট ভোগ্যসামগ্রী প্রদান করবেন। এইভাবে দেবতাদের প্রদত্ত

ভোগ্যবস্তু যে-ব্যক্তি দেবতাকে নিবেদন না করে স্বয়ং ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর। ১২

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের ভোক্তা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বপাপ হতে মুক্ত হন, আর যে-পাপাত্মাগণ নিজ শরীর পোষণের নিমিত্ত অন্নপাক করে তারা পাপ-ই ভক্ষণ করে। ১৩

সকল প্রাণী অন্ন হতে উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি বৃষ্টি হতে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ হতে এবং যজ্ঞের উৎপত্তি কর্ম হতে। কর্ম উৎপন্ন হয় বেদ হতে এবং বেদ অবিনাশী পরমাত্মা হতে উৎপন্ন বলে জানবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ব্যাপ্ত-স্বরূপ পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা সদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৪-১৫

হে পার্থ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইরূপে পরম্পরাগত সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন করে না অর্থাৎ নিজ কর্তব্য পালন করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত পাপীপুরুষ বৃথাই জীবনধারণ করে। ১৬

কিন্তু যিনি শুধু আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না। ১৭

সেই মহাপুরুষের ইহজগতে কোনো কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণীর সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎমাত্রও সম্পর্ক থাকে না। ১৮

অতএব তুমি আসক্তিরহিত হয়ে সর্বদা যথাযথভাবে কর্তব্য-কর্মের পালন করো। কারণ আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে। ১৯

জনক প্রমুখ জ্ঞানিগণও আসক্তিশূন্যভাবে কর্ম করে মোক্ষলাভ করেছিলেন। সেইজন্য লোকসংগ্রহের নিমিত্ত তোমার নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। ২০

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্য ব্যক্তিরাও তদনুরূপ অনুসরণ করে। তিনি যা কিছু প্রমাণ করে দেন, সকল মানুষ তারই অনুসরণ করে। ২১

হে পার্থ ! আমার ত্রিলোকে কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, তথাপি আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি, কর্মত্যাগ করি না। ২২

কারণ হে পার্থ ! আমি যদি সাবধান হয়ে কর্মে ব্যাপৃত না থাকি, তা হলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে, কারণ মানুষ সর্বভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করবে। ২৩

সেই হেতু আমি যদি কর্ম না করি তা হলে এই সব লোক উৎসন্নে যাবে এবং আমি বর্ণসংকর ঘটানোর হেতু হয়ে প্রজাগণের বিনাশের কারণ হব। ২৪

হে ভারত ! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ কর্ম করে, আসক্তিবর্জিত বিদ্বান ব্যক্তিও লোকসংগ্রহার্থে যেন সেরূপ কর্ম করেন। ২৫

পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত অবিচল জ্ঞানী ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্মে আসক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করাবেন না। বরং স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করে তাদের দ্বারাও সেইরূপ করাবেন। ২৬

বাস্তবে কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু যার অন্তঃকরণ অহংকারে মোহিত, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে 'আমি করি'। ২৭

কিন্তু হে মহাবাহো ! গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগের তত্ত্ব জানেন যে জ্ঞানযোগী, তিনি গুণই গুণেতে বর্তিত হচ্ছে, এরূপ জেনে আসক্ত হন না। ২৮

প্রকৃতির গুণে মোহগ্রস্ত মানুষ গুণ এবং কর্মে আসক্ত হয়ে থাকে, সেই অবুঝ অজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানী ব্যক্তির বিচলিত করা উচিত নয়। ২৯

ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, মমতাবর্জিত ও শোক-তাপরহিত হয়ে যুদ্ধ করো। ৩০

যাঁরা দোষদৃষ্টিরহিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার এই মতের সর্বদা অনুসরণ করেন, তাঁরা সমস্ত কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান। ৩১

কিন্তু যারা আমার উপর দোষারোপ করে আমার মতানুযায়ী চলে না, সেই মূর্খদের তুমি সর্বজ্ঞানী-মূঢ় এবং পরমার্থভ্রষ্ট বলে জানবে। ৩২

সকল প্রাণীই প্রকৃতির দ্বারা চালিত অর্থাৎ নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। জ্ঞানীও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করেন। তা হলে এক্ষেত্রে কারো হঠকারিতায় কী হবে ? ৩৩

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে রাগ এবং দ্বেষ গুপ্ত থাকে। মানুষের এই দুটির বশবর্তী হওয়া উচিত নয়, কারণ এই দুটিই মানুষের কল্যাণপথের বিঘ্নকারী মহাশত্রু। ৩৪

উত্তমরূপে আচরিত অন্য ধর্ম হতে গুণরহিত নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারক, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। ৩৫

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! তা হলে মানুষ স্বেচ্ছায় না করেও কেন বলপূর্বক কারও দ্বারা নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে ? ৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রজোগুণ হতে উৎপন্ন এই কাম অর্থাৎ কামনাই হল ক্রোধ, এটি মহা অশন (অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় অতৃপ্ত)—অর্থাৎ ভোগের দ্বারা কখনো তৃপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত পাপকারক, একেই তুমি মহা শত্রু বলে জানবে। ৩৭

ধূমের দ্বারা অগ্নি, ধুলোর দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ুর দ্বারা গর্ভ যেমন আবৃত থাকে, তেমনই কামনার দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। ৩৮

হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানীদের চিরশত্রু এই কাম অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয়। এই কামনার দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। ৩৯

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এইগুলিকে কামের বাসস্থান বলা হয়। এই কাম মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিকে অবলম্বন করে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে জীবাত্মাকে মোহিত করে। ৪০

সেইজন্য হে অর্জুন ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশকারী মহাপাপী কামকে অর্থাৎ কামনাকে সবলে বিনাশ করো। ৪১

স্থূলশরীর হতে ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রেষ্ঠ, বলবান এবং সূক্ষ্ম বলা হয় ; এই ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে যা অতিশয় শ্রেষ্ঠ তাই হল আত্মা। ৪২

এইভাবে বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, বলবান এবং অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জেনে এবং শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ করে হে মহাবাহো ! তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ করো। ৪৩

—— ০ ——

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(জ্ঞান-কর্মসন্ন্যাসযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম ; সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। ১

হে পরন্তপ অর্জুন ! এইভাবে পরম্পরাগতভাবে এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন ; কিন্তু তার পর এই যোগ দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী হতে যেন লুপ্ত হয়েছে। ২

তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা, সেইজন্য এই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম ; কারণ এটি অতি উত্তম রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়। ৩

অর্জুন বললেন—আপনার জন্ম তো এখন—এই যুগে হয়েছে আর সূর্যের জন্ম তো বহু পূর্বে অর্থাৎ কল্পের আদিতে হয়েছে। তবে আমি কী করে বুঝব যে, আপনিই

কল্পের আদিতে এই যোগের কথা সূর্যকে বলেছিলেন ? ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম হয়েছে ; সে সব তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। ৫

আমি জন্মরহিত, অবিনাশী স্বরূপ এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই। ৬

হে ভারত ! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ দেহ ধারণ করি। ৭

সাধুদিগের রক্ষার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

হে অর্জুন ! আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ নির্মল ও অলৌকিক—এইভাবে যে ব্যক্তি আমাকে তত্ত্বত জানেন, তিনি দেহত্যাগ করে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমাকেই লাভ করেন। ৯

যাঁদের আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ সর্বতোভাবে বর্জন হয়েছে, যাঁরা আমার প্রেমে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন—এরূপ বহু ভক্ত জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন। ১০

হে অর্জুন ! যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও তাকে সেইভাবেই ভজনা করি ; কারণ সকল মানুষই সর্বতোভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করেন। ১১

এই মনুষ্যলোকে কর্মফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত মানুষ দেবতাগণের পূজা করেন, কারণ কর্মজনিত সিদ্ধি তাঁরা শীঘ্রই লাভ করেন। ১২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয় গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুযায়ী আমি সৃষ্টি করেছি। সৃষ্টি-কর্মের কর্তা হলেও অবিনাশী, পরমেশ্বররূপ আমাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলে জানবে। ১৩

কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই, তাই কোনো কর্ম আমাকে বদ্ধ করতে পারে না—এইরূপে যিনি আমাকে তত্ত্বত জানেন, তিনিও কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। ১৪

পূর্বতন মুমুক্ষুগণও নিষ্কাম কর্ম করেছেন। এইজন্য তুমিও পূর্বসূরিদের সদা আচরিত কর্ম পালন করো। ১৫

কর্ম কী, অকর্ম কী ?—এর যাথার্থ্য নির্ণয় করতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও ভ্রান্ত হন। সেইজন্য এই কর্মতত্ত্ব আমি তোমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলছি যাতে তুমি অশুভ হতে অর্থাৎ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ১৬

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের স্বরূপ (তত্ত্ব) জানা উচিত, কারণ কর্মের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। ১৭

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, মানুষের মধ্যে তিনিই জ্ঞানী ও যোগযুক্ত এবং সর্ব-কর্মকারী। ১৮

যাঁর সমস্ত শাস্ত্রসম্মত কর্ম কামনা ও সংকল্পরহিত এবং যাঁর সমস্ত কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে, তাঁকে জ্ঞানিগণও পণ্ডিত বলেন। ১৯

যিনি সকল কর্ম ও তার ফলের আসক্তি সর্বতোভাবে বর্জনপূর্বক সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং পরমাত্মাতে নিত্য তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি উত্তমরূপে কর্ম করলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না। ২০

যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর স্ববশে এবং যিনি সকল প্রকার ভোগ্যসামগ্রী ত্যাগ করেছেন, সেইরূপ আশারহিত ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও কোনোরূপ পাপের ভাগী হন না। ২১

যিনি কোনো ইচ্ছা না রেখে যা পান তাতেই তুষ্ট, ঈর্ষাশূন্য, হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানসম্পন্ন—সেই যোগী কর্ম করলেও তাতে বদ্ধ হন না। ২২

যিনি সর্বতোভাবে আসক্তি বর্জন করেছেন, দেহাভিমান (অহংবোধ) ও মমত্বরহিত হয়েছেন এবং যাঁর চিত্ত নিরন্তর পরমাত্মার জ্ঞানে স্থিত, কেবলমাত্র যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যিনি কর্ম করেন তাঁর সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ফল প্রসব করে না। ২৩

যজ্ঞে অর্পণ, অর্থাৎ স্রুবাদিও (যার দ্বারা হবি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়) ব্রহ্ম এবং হোম করা দ্রব্যাদিও ব্রহ্ম তথা ব্রহ্মরূপ যজ্ঞকর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপে ক্রিয়াও ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মকর্মে স্থিত যোগীর প্রাপ্ত ফলও ব্রহ্ম। ২৪

অন্যান্য যোগিগণ দেবপূজারূপ যজ্ঞের যথাযথ অনুষ্ঠান করেন আবার অন্য কোনো যোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অগ্নিতে অভেদদর্শনরূপ যজ্ঞের দ্বারা আত্মরূপ যজ্ঞের আহুতি দেন। ২৫

অন্য যোগিগণ শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন এবং কেউ কেউ (যোগী) শব্দাদি সমস্ত বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। ২৬

অন্য যোগিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম এবং প্রাণের সকল কর্ম জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। ২৭

কোনো কোনো ব্যক্তি দ্রব্যযজ্ঞ করেন, কেউ আবার তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেউ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, অনেকে আবার অহিংসাদি তীক্ষ্ণ ব্রতধারী যত্নশীল
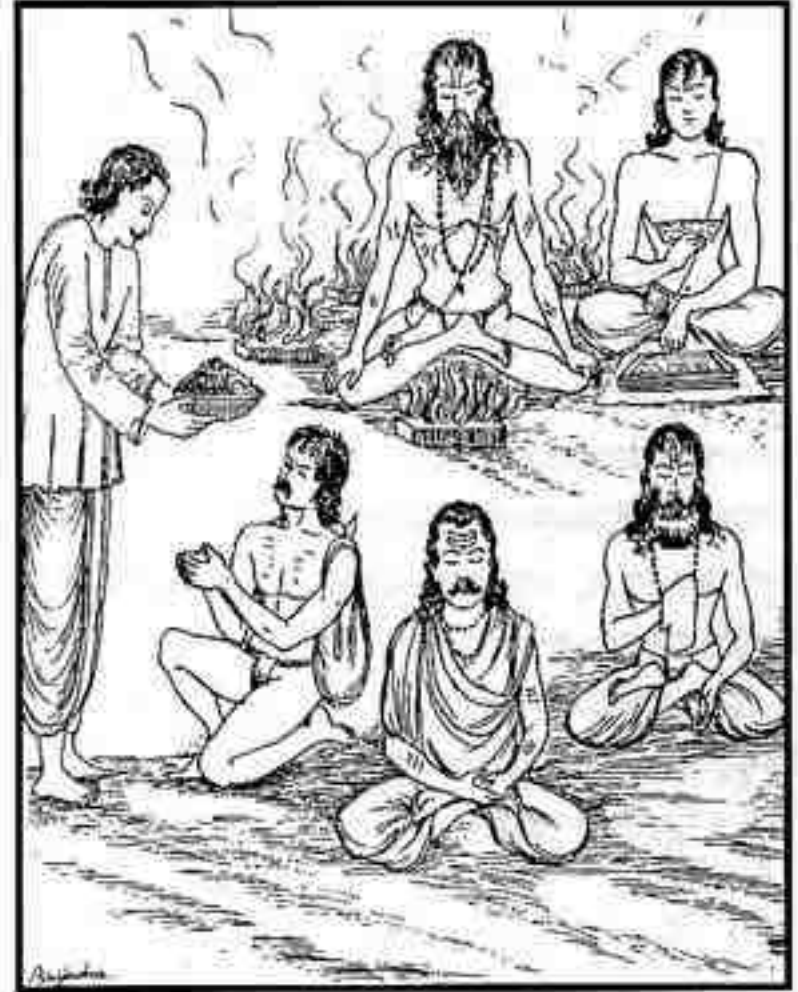
স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন। ২৮

আবার অন্যান্য যোগিগণ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন, সেইরূপ কেউ আবার প্রাণবায়ুতে অপানের আহুতি দেন। কেউ কেউ নিয়মিত আহারী যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়ে প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন। এই যোগিগণ যজ্ঞের দ্বারা পাপনাশকারী যজ্ঞসমূহের জ্ঞাতা হন। ২৯-৩০

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যজ্ঞাবশেষ অমৃত অনুভবকারী যোগিগণ সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। আর যাঁরা যজ্ঞ করেন না তাঁদের ইহলোক সুখদায়ক হয় না, পরলোক তো দূরের কথা ! ৩১

এইরূপ আরও বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এ সবই মন, ইন্দ্রিয়াদি ও কায়িক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে জানবে, এইরূপ তত্ত্বত জেনে এগুলির অনুষ্ঠান করলে তুমি কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ৩২

হে পরন্তপ অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্মের জ্ঞানেই সমাপ্তি হয়। ৩৩

সেই জ্ঞান তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের নিকটে গিয়ে জেনে নাও ; তাঁদের বিনয়পূর্বক প্রণাম ও সেবা করে কপটতা ত্যাগ করে সরলভাবে প্রশ্ন করলে সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ

দেবেন। ৩৪

হে অর্জুন ! যা জানলে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না। যে জ্ঞানের দ্বারা তুমি সমস্ত ভূতাদি নিঃশেষে প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারূপী আমাতে দেখতে সক্ষম হবে। ৩৫

যদি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও ; তা হলেও তুমি জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হবে। ৩৬

কারণ হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন তার ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তেমনই সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে। ৩৭

নিঃসন্দেহে এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী আর কিছুই নেই। দীর্ঘকাল প্রযত্ন দ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হলে স্বয়ংই স্বীয় সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ৩৮

জিতেন্দ্রিয়, সাধনপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করে সত্বর ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করেন। ৩৯

বিবেকহীন, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি পারমার্থিক পথ হতে অবশ্যই ভ্রষ্ট হন। এরূপ সংশয়াত্মার ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই এবং সুখও নেই। ৪০

হে ধনঞ্জয় ! যিনি কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেছেন এবং বিবেকের দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করেছেন এরূপ বশীভূত-চিত্ত ব্যক্তিকে কর্ম কখনো বন্ধ করতে পারে না। ৪১

অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞতাজনিত সংশয়কে বিবেকজ্ঞানরূপ তরবারির সাহায্যে ছেদন করে সমত্বরূপ যোগে স্থিত হও এবং যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। ৪২

—— ০ ——

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(কর্মসন্ন্যাসযোগ)

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! আপনি কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ—উভয়েরই প্রশংসা করছেন। অতএব এই দুটির মধ্যে যেটি আমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর, তা বলুন। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই কল্যাণকর ; কিন্তু কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ সহজ এবং শ্রেষ্ঠ। ২

হে অর্জুন ! যিনি কারো প্রতি দ্বেষ করেন না এবং কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই নিষ্কাম কর্মযোগীকে নিত্য-সন্ন্যাসী বলে জানবে। কারণ রাগ-দ্বেষ দ্বন্দ্বরহিত পুরুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হন। ৩

মূর্খ ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক ফল প্রদানকারী বলে থাকেন, পণ্ডিতরা তা বলেন না ; কারণ দুটির মধ্যে একটিতে সম্যকভাবে স্থিত হলে উভয়েরই ফলস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৪

জ্ঞানযোগী যে পরমধাম লাভ করেন, কর্মযোগীও সেই ধাম প্রাপ্ত হন। তাই যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে ফলরূপে অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ৫

কিন্তু হে অর্জুন ! কর্মযোগ ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের দ্বারা করা সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব ত্যাগ করা কঠিন এবং ভগবৎস্বরূপ মননকারী কর্মযোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে শীঘ্রই লাভ করেন। ৬

যাঁর মন বশীভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্বপ্রাণীর আত্মারূপ পরমাত্মাই যাঁর আত্মস্বরূপ, এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী কর্ম করলেও তাঁতে লিপ্ত হন না। ৭

তত্ত্বদর্শী সাংখ্যযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথোপকথন, মল-মূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ এবং নিমেষ ইত্যাদি কাজে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রবর্তিত ধারণা করেন এবং আমি কিছুই করি না তা নিশ্চিত জানেন। ৮-৯

যিনি সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন, তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না। ১০

নিষ্কাম কর্মযোগী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং শরীরের প্রতি মমত্ববুদ্ধিরহিত হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করেন। ১১

নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ শান্তি লাভ করেন আর সকাম ব্যক্তি কামনাবশত ফলে আসক্ত হয়ে বদ্ধ হন। ১২

বশীভূত অন্তঃকরণযুক্ত সাংখ্যযোগের আচরণকারী পুরুষ কর্ম না করে বা না করিয়ে নবদ্বারযুক্ত দেহে সমস্ত কর্ম মনে মনে ত্যাগ করে আনন্দে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হন। ১৩

কারণ পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল প্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না, প্রকৃতিগত স্বভাবই আবর্তিত হয়। ১৪

পরমাত্মা কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় মানুষ মোহগ্রস্ত হয়। ১৫

কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণের অজ্ঞান যাঁদের বিনষ্ট হয়েছে তাঁদের জ্ঞান সূর্যের ন্যায় সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। ১৬

যাঁদের মন তাঁতে নিবিষ্ট, যাঁদের বুদ্ধিও তাঁতে স্থিত এবং যাঁরা সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় নিরন্তর একইভাবে অবস্থান করেন, সেই তৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হন। ১৭

ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুকুর তথা চণ্ডালেও সমদর্শী হন। ১৮

যাঁদের মন সমভাবে অবস্থিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই সংসার জয় করেছেন ; কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ এবং সম, তাই তাঁরা সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন। ১৯

প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হলে উদ্বিগ্ন হন না ; স্থিরবুদ্ধি, সংশয়রহিত এইরূপ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিত্য স্থিত। ২০

বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত পুরুষ আত্মায় যে শাশ্বত আনন্দ আছে তা লাভ করেন, অতঃপর সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগে অভিন্নভাবে স্থিত পুরুষ অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন। ২১

ভোগ যদিও বিষয়ীলোকের নিকট সুখরূপে ভাসিত হয়, কিন্তু আসলে তা দুঃখেরই হেতু। এর আদি-অন্ত আছে অর্থাৎ এটি অনিত্য। সেইজন্য হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান বিবেকশীল ব্যক্তি তাতে রত হন না। ২২

যিনি দেহত্যাগ করার পূর্বে কাম-ক্রোধ হতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং সুখী। ২৩

যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, আত্মারাম এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত ; সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত সাংখ্যযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ২৪

যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, সমস্ত সংশয় জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন

হয়েছে, যিনি সর্বভূতহিতে রত, যাঁর সংযত চিত্ত নিশ্চলভাবে পরমাত্মাতে স্থিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ নির্বাণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৫

কাম-ক্রোধ হতে মুক্ত সংযতচিত্ত, ব্রহ্মদর্শী জ্ঞানী পুরুষের সর্বদিকেই শান্ত পরব্রহ্মই স্থিত আছেন। ২৬

বাহ্য বিষয়ভোগের চিন্তা না করে তাকে বাইরেই ত্যাগ করে, চোখের দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্থাপন করে, নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপানবায়ুকে সম করে এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সংযতপূর্বক ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধশূন্য হয়ে যে মোক্ষপরায়ণ মুনি সর্বদা বিরাজ করেন তিনি মুক্তই থাকেন। ২৭-২৮

আমার ভক্ত আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর (ঈশ্বরেরও ঈশ্বর) এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থরহিত দয়ালু ও প্রেমিক, এরূপ তত্ত্বত জেনে শান্তি লাভ করেন। ২৯

—— ০ ——

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(আত্মসংযমযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যিনি কর্মফলের আশ্রয় নিয়ে করণীয়-কর্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী আর যিনি কেবল যাগযজ্ঞাদি বৈদিক অগ্নি ত্যাগ করেছেন তিনি সন্ন্যাসী নন এবং শুধুই ক্রিয়াদি যিনি ত্যাগ করেছেন তিনি যোগী নন। ১

হে অর্জুন! যাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে কারণ সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউ যোগী হতে পারে না। ২

যোগ-আরোহণে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির পক্ষে যোগলাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম করাই হল কারণ এবং যোগারূঢ় হলে যোগারূঢ় পুরুষের যে সর্বসংকল্পের অভাব হয়, তাই হল তার কল্যাণের কারণ। ৩

যখন ইন্দ্রিয়াদি ভোগে আসক্ত হন না এবং কর্মেও আসক্ত হন না, তখন সেই সর্বসংকল্পত্যাগী পুরুষকে যোগারূঢ় বলা হয়। ৪

নিজের দ্বারাই নিজেকে সংসার হতে উদ্ধার করবে এবং নিজেকে কখনো অধোগতির পথে যেতে দেবে না; কারণ মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু আবার নিজেই নিজের শত্রু। ৫

যে জীবাত্মার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশীভূত হয়েছে, সেই জীবাত্মা নিজেই নিজের বন্ধু এবং যে জীবাত্মার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়সহ শরীর বশীভূত হয়নি, সে নিজেই নিজের শত্রু। ৬

শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে যাঁর চিত্ত পূর্ণরূপে শান্ত এরূপ স্বাধীন-চিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় সম্যকভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না। ৭

যাঁর অন্তঃকরণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকার-রহিত এবং জিতেন্দ্রিয়, যাঁর দৃষ্টিতে মৃত্তিকা, প্রস্তর এবং স্বর্ণ সমতুল্য, তিনিই যোগযুক্ত অর্থাৎ তাঁর ভগবৎপ্রাপ্তি হয়েছে বুঝতে হবে। ৮

সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধর্মাত্মা এবং পাপীদের উপর সমভাব যাঁরা রাখেন, তাঁরাই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। ৯

মন ও ইন্দ্রিয়সহ যিনি সংযতদেহ, আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং

সঞ্চয়বৃত্তিশূন্য, তিনি একাকী, নির্জন স্থানে থেকে নিরন্তর চিত্তকে পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত করবেন। ১০

পবিত্রস্থানে, যা অতি উঁচু বা অতি নিচু নয়, ক্রমশ কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্রাদি পেতে আসন স্থাপন করবেন। ১১

সেই আসনে বসে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করে মনকে একাগ্র করে, অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবেন। ১২

মেরুদণ্ড, মস্তক, গ্রীবাকে সমান ও নিশ্চলভাবে স্থির করে নিজ নাসিকার অগ্রভাগে চোখ রেখে, অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে। ১৩

ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত, ভয়রহিত ও প্রশান্তচিত্ত যোগী সতর্কতার সঙ্গে মনকে সংযম করে মদ্গতচিত্ত এবং মৎপরায়ণ হয়ে অবস্থান করবেন। ১৪

সংযতচিত্ত যোগী এইভাবে আত্মাকে নিরন্তর পরমেশ্বররূপ আমাতে চিত্ত সমাহিত করলে আমাতে স্থিতরূপ পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা শান্তি লাভ করেন। ১৫

হে অর্জুন! এই যোগ, যাঁরা অত্যধিক আহার করেন অথবা যাঁরা একান্ত অনাহারী, যাঁরা অতিশয় নিদ্রালু অথবা অত্যন্ত জাগরণশীল তাঁদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ১৬

দুঃখনাশক এই যোগ নিয়মিত আহার-বিহারকারী, কর্মে যথাযথ মনোনিবেশকারী এবং নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তিদের দ্বারা সিদ্ধ হয়ে থাকে। ১৭

চিত্ত যখন একান্তভাবে বশীভূত হয়ে পরমাত্মাতেই অবস্থান করে তখন ভোগে সম্পূর্ণভাবে আকাঙ্ক্ষাশূন্য পুরুষকে যোগযুক্ত বলা হয়। ১৮

বায়ুবিহীন স্থানে প্রদীপ যেমন চঞ্চল হয় না, সেইরূপ উপমা দেওয়া হয়েছে পরমাত্মার ধ্যানে সংযতচিত্ত যোগীর। ১৯

যোগের অভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত সেই অবস্থায় নিবৃত্ত হয় এবং এই অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে যোগী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় পরিতুষ্ট হন। ২০

ইন্দ্রিয়াদির অতীত, কেবল পরিশুদ্ধ সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণযোগ্য যে অনন্ত আনন্দ আছে, যোগী সেই অবস্থায় সেটি অনুভব করেন এবং সেই অবস্থায় স্থিত এই যোগী কোনোভাবেই পরমাত্মাস্বরূপ হতে আর বিচলিত হন না। ২১
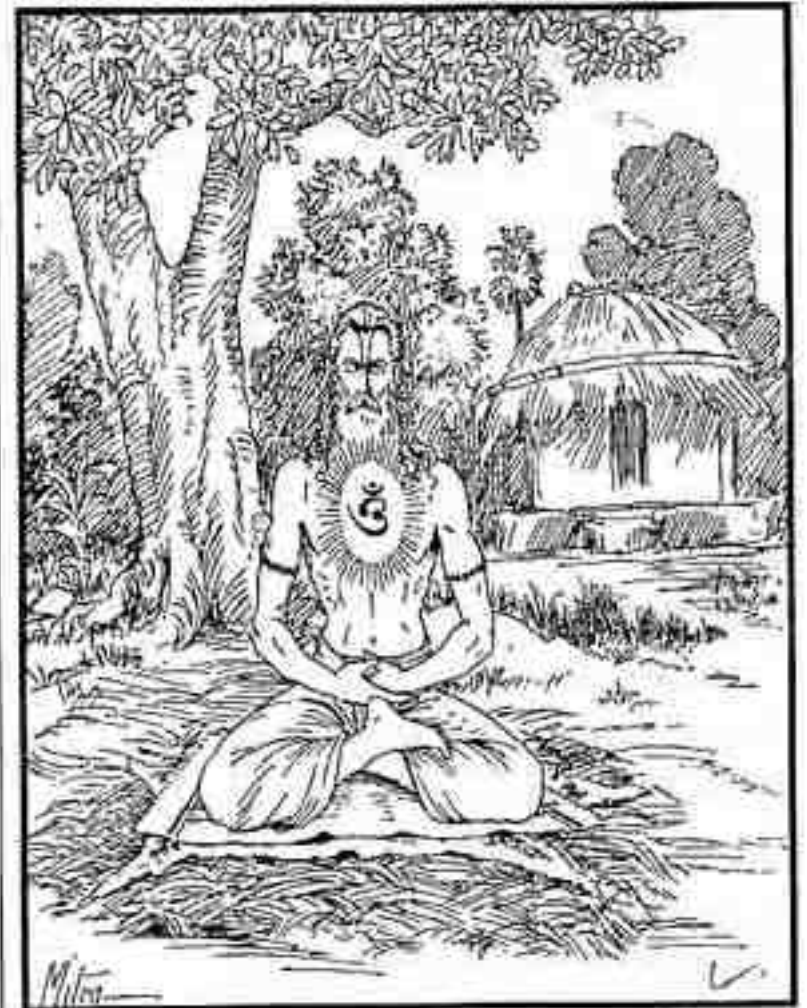
পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ যে-লাভ প্রাপ্ত হন, অন্য কিছুকে যোগী তা অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করেন না এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে মহাদুঃখেও বিচলিত হন না। ২২

যা দুঃখরূপ সংসারের সংযোগরহিত, তাকেই বলা হয় যোগ, এটি জানা চাই। এই যোগ অধৈর্য না হয়ে অর্থাৎ ধৈর্য

ও উৎসাহযুক্ত চিত্তে নিশ্চয়পূর্বক অভ্যাস করা উচিত। ২৩

সংকল্পজাত সমস্ত কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় হতে নিবৃত্ত করে। ২৪

ক্রমশ অভ্যাসপূর্বক নিবৃত্ত হবে এবং ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থাপন করে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তা করবে না। ২৫

এই অস্থির চঞ্চল মন যে-যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হতে প্রত্যাহার করে তাকে বারবার পরমাত্মাতেই স্থিত করবে। ২৬

কারণ যাঁর মন ভালোভাবে শান্ত,পাপরহিত এবং যিনি রজোগুণশূন্য এরূপ যোগী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরম আনন্দ লাভ করেন। ২৭

এইরূপ নিষ্পাপ যোগী এইভাবে নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করে অনায়াসে পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ২৮

সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনে একত্বভাবযুক্ত তথা সর্বত্র সমদর্শনকারী যোগী স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন। ২৯

যিনি সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে (বাসুদেবকে) দেখেন এবং সর্বভূতকে আমাতে দেখেন তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না। ৩০

যে-ব্যক্তি একত্বভাবে স্থিত হয়ে সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে (সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে) ভজনা করেন, সেই যোগী সর্বপ্রকার আচরণের মাধ্যমেও আমাতেই অবস্থান করেন। ৩১

হে অর্জুন ! যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! আপনি যে সমতারূপ যোগের কথা বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় আমি এর নিত্য স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। ৩৩

কারণ হে কৃষ্ণ ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, বিক্ষোভকারী, দৃঢ় ও শক্তিশালী। তাই একে বশে রাখা আমি বায়ুকে নিরুদ্ধ করার মতো দুষ্কর বলে মনে করি। ৩৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাবাহো ! মন নিঃসন্দেহে চঞ্চল এবং তাকে বশে রাখা দুষ্কর ; কিন্তু হে কুন্তীপুত্র অর্জুন ! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা একে বশ করা যায়। ৩৫

যাঁরা সংযতচিত্ত নয় তাঁদের দ্বারা এই যোগ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু যত্নশীল বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি সাধনার দ্বারা এই যোগ সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন—এই আমার মত।৩৬

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যিনি যোগে শ্রদ্ধা রাখেন, কিন্তু সংযতচিত্ত নন, সেইজন্য অন্তিম সময়ে (মৃত্যুকালে) যাঁর মন যোগ হতে বিচলিত হয়ে যায়, এরূপ সাধক যোগসিদ্ধ না হয়ে অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার না করে কীরূপ গতি প্রাপ্ত হন ? ৩৭

হে মহাবাহো ! তিনি কি ভগবৎপ্রাপ্তির পথে বিভ্রান্ত এবং নিরাশ্রয় হয়ে ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যান ? ৩৮

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় নিঃশেষে আপনিই দূর করতে সমর্থ ; কারণ আপনি ছাড়া অন্য কেউ এই সংশয় দূর করতে পারবে না। ৩৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! সেই ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নেই। কারণ হে বৎস ! কল্যাণকারীর কখনো অধোগতি হয় না। ৪০

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাগণের প্রাপ্যলোক অর্থাৎ স্বর্গাদি উচ্চলোকে বহুকাল বাস করে পুনরায় সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

অথবা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেইসকল লোকাদিতে না গিয়ে

জ্ঞানবান যোগীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্ম জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। ৪২

সেই দেহে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে মোক্ষপর বুদ্ধি লাভ করেন। তারপর হে কুরুনন্দন ! তার প্রভাবে পুনরায় পরমাত্মলাভের জন্য পূর্বাপেক্ষা তীব্রভাবে চেষ্টা করেন। ৪৩

তিনি (শ্রীসম্পন্ন সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী) যোগভ্রষ্ট হয়েও পূর্ব জন্মের অভ্যাসবশে ভগবানে আকৃষ্ট হন, তথা সমবুদ্ধিরূপ যোগের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদে-বর্ণিত সকাম কর্মের ফলকে অতিক্রম করেন। ৪৪

কিন্তু যত্নপূর্বক অভ্যাসকারী যোগী বিগত বহু জন্মের সংস্কারের প্রভাবে এই জন্মেই পাপরহিত হয়ে যান এবং তৎকালেই পরমগতি লাভ করেন। ৪৫

যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের হতেও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মানুষ্ঠানকারীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও। ৪৬

সকল যোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মদ্‌গতচিত্তে নিরন্তর আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী; এই আমার মত। ৪৭

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা আমাতে আসক্ত চিত্ত, মৎপরায়ণ এবং যোগযুক্ত হয়ে যেরূপে তুমি বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য গুণান্বিত সকলের আত্মরূপ আমাকে নিঃসংশয়ে জানতে পারবে, তা শোনো। ১

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এই তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বলছি যা জানলে ইহলোকে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না। ২

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজন আমাকে লাভ করবার জন্য যত্ন করেন এবং সেই যত্নকারীদের মধ্যে হয়তো কেউ আমাকে তত্ত্বত জানতে পারেন। ৩

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই হল আটভাগে বিভক্ত অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ এই আমার জড় প্রকৃতি, এবং হে মহাবাহো ! এছাড়া অন্য প্রকৃতি যার দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ধারণ করা আছে, তাকে আমার জীবরূপা পরা অর্থাৎ চেতন প্রকৃতি জানবে। ৪-৫

হে অর্জুন ! সর্বভূত এই উভয় প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন বলে জানবে এবং আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়রূপ অর্থাৎ সমগ্র জগতের মূলকারণ। ৬

হে ধনঞ্জয় ! আমা অপেক্ষা জগতের অন্য শ্রেষ্ঠ কারণ নেই। সুতায় যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই জগৎ আমাতে গ্রথিত রয়েছে। ৭

হে অর্জুন ! আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যের জ্যোতি, চারি বেদে ওঁ-কার, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্য মধ্যে পুরুষাকাররূপে বিরাজ করি। ৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ এবং সর্ব ভূতে জীবন এবং তপস্বীদের তপ। ৯

হে অর্জুন ! সকল ভূতের সনাতন বীজ আমাকেই জানবে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজও আমি। ১০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি বলবানদের কামরাগবর্জিত বল অর্থাৎ সামর্থ্য এবং সর্বভূতে ধর্ম শাস্ত্রের অনুকূল কাম। ১১

প্রাণিগণের যে-সকল ভাব সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ হতে উৎপন্ন হয়, তা সবই 'আমা হতে উৎপন্ন' বলে জানবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি সেইগুলিতে নেই এবং সেইগুলিও আমাতে নেই। ১২

গুণের কার্যরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক-ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগতের প্রাণী সমুদায় মোহিত হয়ে আছে ; তাই এই ত্রিগুণের অতীত অবিনাশী আমাকে তারা জানতে পারে না। ১৩

কারণ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অত্যন্ত দুস্তর কিন্তু যাঁরা কেবল আমাকেই নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁরাই এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হন। ১৪

মায়া-দ্বারা যাঁদের জ্ঞান অপহৃত, এরূপ আসুরী স্বভাবযুক্ত নরাধম, নীচ, কুকর্মকারী মূঢ়ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন না। ১৫

হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! অর্থার্থী, আর্ত জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ভক্তগণ আমার ভজনা করেন। ১৬

এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ (ভক্তিসম্পন্ন) জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়। ১৭

এঁরা সকলেই মহান, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ—এই আমার মত ; কারণ মদ্‌গত মনবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী ভক্ত সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমার মধ্যেই অবস্থান করেন। ১৮

বহু জন্মের পর এই শেষ জন্মে 'সবকিছুই বাসুদেব'—এইরূপ জেনে যিনি ভজনা করেন, সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। ১৯

বিভিন্ন ভোগাদির কামনায় যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে সেই সেই নিয়ম পালন করে অন্যান্য দেবতাদের ভজনা করে, অর্থাৎ উপাসনা করে। ২০

যেসব সকাম ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে-যে দেবতাকে অর্চনা করেন, সেই সেই ভক্তের শ্রদ্ধা আমি সেই সেই দেবতাতেই দৃঢ় করে দিই। ২১

সেই সকল সকাম ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার নিকট হতে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন। ২২

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনালব্ধ সেই ফল বিনাশশীল। দেবতাদের সেই পূজকগণ দেবতাদের প্রাপ্ত হন এবং আমার ভক্তগণ যে ভাবেই আমার ভজনা করুন,

অন্তিমে তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ২৩

বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট অবিনাশী পরম ভাব না জেনে মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাস্বরূপ আমাকে মনুষ্যের ন্যায় ব্যক্তিভাবসম্পন্ন বলে মনে করে। ২৪

নিজ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত বলে আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না, তাই এই সব মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মরহিত অবিনাশী পরমেশ্বর আমাকে জানতে পারে না অর্থাৎ আমাকে জন্ম-মরণশীল বলে মনে করে। ২৫

হে অর্জুন ! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের ভূতসমুদয়কে আমি জানি, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তিশূন্য ব্যক্তি আমাকে জানতে পারে না। ২৬

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! জগতে ইচ্ছা-দ্বেষ হতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ মোহ দ্বারা সমস্ত প্রাণী অজ্ঞান হয়ে আছে। নিতান্ত অজ্ঞানতায় প্রতিহত হচ্ছে।২৭

কিন্তু নিষ্কামভাবে শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণকারী যে-সকল পুরুষের পাপ নষ্ট হয়েছে, তাঁরা রাগ-দ্বেষজনিত দ্বন্দ্ব মোহ মুক্ত হয়ে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমাকে ভজনা করেন। ২৮

যাঁরা আমার শরণাগত হয়ে জরা-মরণ হতে মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করেন তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্ম অবগত হন। ২৯

যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সঙ্গে (সবার আত্মারূপে) আমাকে মৃত্যুকালেও জানেন, সেই সকল সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি আমাকে জানেন অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হন। ৩০

—o—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(অক্ষরব্রহ্মযোগ)

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম কী ? আধ্যাত্ম কী ? কর্ম কী ? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে ? ১

হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং তিনি কীভাবে অবস্থিত ? অন্তকালে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনাকে কীরূপে জ্ঞাত হন। ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পরম অক্ষর হল 'ব্রহ্ম', নিজ স্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মাকে বলা হয় 'অধ্যাত্ম' এবং ভূতগণের উদ্ভবরূপ সংযোগকারী যে ত্যাগ তাকে বলা হয় 'কর্ম'। ৩

উৎপত্তি ও বিনাশশীল সমস্ত বস্তুই অধিভূত ; হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈব এবং হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এই দেহে আমিই (বাসুদেব অন্তর্যামীরূপে) অধিযজ্ঞ। ৪

যিনি মৃত্যুকালে আমাকেই স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সংশয় নেই। ৫

হে কৌন্তেয় ! মানুষ মৃত্যুকালে যে-যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন সেই সেই ভাবই তিনি প্রাপ্ত হন ; কারণ তিনি সর্বদা সেই ভাবেই ভাবিত থাকেন। ৬

অতএব হে অর্জুন ! তুমি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধ করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে আমাকেই লাভ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ৭

হে পার্থ ! নিয়ম হল এই যে, পরমেশ্বরের ধ্যানে অভ্যাসরূপযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তে নিরন্তর চিন্তামগ্ন পুরুষ, পরম প্রকাশরূপ দিব্যপুরুষকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই লাভ করেন। ৮

যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, বিশ্ব-নিয়ন্তা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের ধারণ-পোষণকারী, অচিন্ত্য-স্বরূপ, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অবিদ্যার অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরকে স্মরণ করেন। ৯

সেই ভক্তিমান ব্যক্তি অন্তিমকালে যোগবলের দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে ধারণপূর্বক, একাগ্র মনে স্মরণ করে সেই দিব্য পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ১০

বেদার্থজ্ঞগণ যাঁকে অক্ষর পুরুষ বলে বর্ণনা করেন, নিঃস্পৃহ যোগিগণ যাঁকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারিগণ যাঁকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পরম-পদ প্রাপ্তির উপায় আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। ১১

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে, প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করে পরমাত্মারূপ যোগে স্থিত হয়ে যিনি 'ওঁ' এই এক অক্ষর ব্রহ্ম নাম উচ্চারণপূর্বক এবং তার অর্থস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আমাকে স্মরণ করতে

করতে দেহত্যাগ করেন তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ১২-১৩
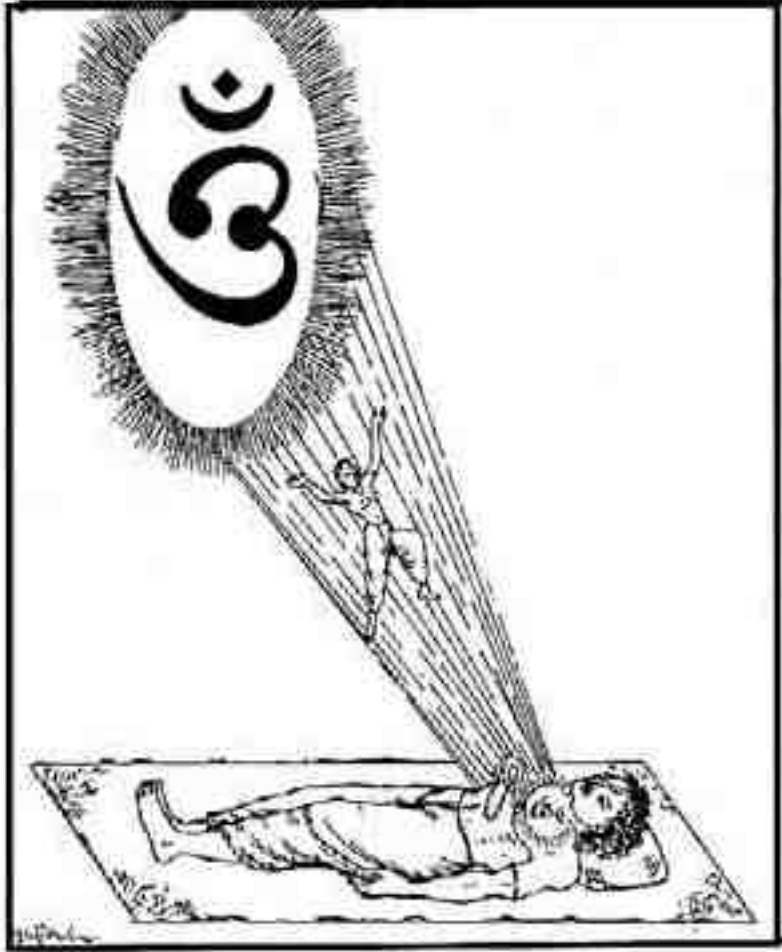
হে অর্জুন ! যিনি অনন্য চিত্তে আমাকে নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই নিত্য-নিরন্তর স্মরণশীল যোগীর নিকট আমি সহজলভ্য। ১৪

মুক্ত মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করে আর দুঃখালয়, ক্ষণভঙ্গুর সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫

হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না ; কারণ আমি কালাতীত এবং এই সমস্ত ব্রহ্মাদিলোক কালের অধীন হওয়ায় অনিত্য। ১৬

ব্রহ্মার একটি দিনকে যে মানুষ একহাজার চতুর্যুগের সময়কাল এবং রাত্রিকেও একহাজার চতুর্যুগের সময়কাল বলে তত্ত্বগতভাবে জানেন সেই যোগী কালকে তত্ত্বত জানেন। ১৭

সমস্ত চরাচর ভূতসমুদয় ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং তাঁর রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্তেই তার লয় হয়। ১৮

হে পার্থ ! প্রকৃতির অবশ সেই ভূতসমুদয় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় হয় এবং দিবাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয়। ১৯

সেই অব্যক্তের অতীত সম্পূর্ণ বিলক্ষণ যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, সেই পরম দিব্যপুরুষ সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও বিনষ্ট হন না। ২০

যা অব্যক্ত অক্ষর নামে কথিত, সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকে পরমগতি বলা হয় এবং যে সনাতন অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হলে মানুষকে আর ফিরে আসতে হয় না, তাই হল আমার পরম ধাম। ২১

হে পার্থ ! সর্বভূত যে-পরমাত্মার অন্তর্গত এবং যে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই সনাতন অব্যক্ত পরম পুরুষকে একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। ২২

হে অর্জুন ! যোগিগণ শরীরত্যাগ করে পুনরাগমনের গতি লাভ করেন এবং যে কালে শরীর ত্যাগ করে পুনরাগমনে গতি লাভ করেন না—সেই দুটি পথের কথা তোমাকে আমি জানাব। ২৩

যে-মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে ব্রহ্মবিদ যোগিগণ উপরিউক্ত দেবাদিগণের দ্বারা ক্রমশ উপনীত হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৪

যে-মার্গে ধূমের অধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি দেবতা এবং কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাসের অধিপতি

দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে সকাম কর্মযোগী উপরিউক্ত ক্রম অনুযায়ী চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে নিজ পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করে পুনরাগমন করেন। ২৫

কারণ জগতে এই দুটি পথ—শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযানকে সনাতন পথ বলা হয়, এর মধ্যে একটিতে পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ পরমগতি লাভ হয় এবং অপরটিতে পুনরাগমন করতে হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্তি হয়। ২৬

হে পার্থ ! উভয় পথের তত্ত্ব জানলে কোনো যোগী মোহগ্রস্ত হন না। সেই হেতু হে অর্জুন ! তুমি সর্বকালে সমবুদ্ধিরূপ যোগে যুক্ত হও অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্তির জন্যে নিরন্তর সাধনপরায়ণ হও। ২৭

যোগিগণ এই রহস্যের তত্ত্ব জেনে বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান ইত্যাদি করায় যে-পুণ্যফল বলা হয়েছে, সে সবই নিঃসন্দেহে অতিক্রম করেন এবং সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ২৮

—— ০ ——

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি দোষদৃষ্টিবর্জিত ভক্ত, তাই তোমাকে এই পরম গোপনীয় বিজ্ঞানসহ জ্ঞান পুনরায় ভালোভাবে বলছি, যা জানলে তুমি এই দুঃখরূপ সংসার হতে মুক্ত হবে। ১

এই ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত বিদ্যা এবং সর্বগোপনীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এটি অত্যন্ত পবিত্র, উৎকৃষ্ট, সাক্ষাৎফলপ্রদ, ধর্মযুক্ত, সহজসাধ্য এবং অবিনাশী। ২

হে পরন্তপ ! উপরিউক্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুময় সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে থাকে। ৩

নিরাকার পরমাত্মারূপ আমার দ্বারা এই সমগ্র জগৎ (জলের দ্বারা বরফের ন্যায়) পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং সমস্ত ভূত আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি সেগুলিতে স্থিত নই। ৪

ভূতগণ আমাতে অবস্থিত ; কিন্তু তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগশক্তি দর্শন করো যে, এই ভূতগণের ধারক ও পোষক তথা সৃষ্টিকারী হয়েও আমার স্বরূপে বাস্তবে এই ভূতগণ অবস্থিত নয়। ৫

যেমন আকাশে উৎপন্ন মহানবায়ু সর্বদা আকাশেই অবস্থান করে, তেমনই আমার সংকল্পজাত হওয়ায় সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিত বলে জানবে। ৬

হে অর্জুন ! কল্পের শেষে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে আমি পুনরায় তাদের সৃষ্টি করি। ৭

নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে স্বভাবের বশে বশীভূত এই ভূত সমুদয়কে আমি বারংবার তাদের কর্ম অনুযায়ী সৃষ্টি করি। ৮

হে ধনঞ্জয় ! অনাসক্ত এবং উদাসীন পুরুষের ন্যায় অবস্থান করায় সেই সকল কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। ৯

হে কৌন্তেয় ! আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা প্রকৃতি এই চরাচর সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করে। এই জন্যই জগৎ পরিবর্তিত হয়। ১০

আমার পরমভাবকে না জেনে মূঢ় লোকেরা মনুষ্য-দেহধারণকারী, সর্ব ভূতের মহেশ্বর আমাকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ নিজ যোগমায়া দ্বারা সংসারের উদ্ধারের নিমিত্ত মনুষ্যরূপে বিচরণশীল পরমেশ্বরকে (আমাকে) সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ১১

বৃথা-আশা, বিফলকর্ম ও নিষ্ফল জ্ঞান অবিবেকীগণ রাক্ষসী, আসুরী, এবং মোহিনী প্রকৃতি ধারণ করে থাকে। ১২

কিন্তু হে কুন্তীপুত্র ! দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত মহাত্মাগণ আমাকে সর্বভূতের সনাতন কারণ এবং অব্যয় অক্ষরস্বরূপ জেনে অনন্যচিত্তে নিরন্তর আমার ভজনা করেন। ১৩

দৃঢ়ব্রত ভক্তগণ নিত্য আমার নাম ও গুণকীর্তন করে আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং আমাকে বারংবার প্রণাম করে নিত্য সমাহিত হয়ে অনন্য ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করেন। ১৪

অন্য কেউ (জ্ঞানযোগী) জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মরূপে অভিন্নভাবে আমার উপাসনা করেন,

কেউ কেউ প্রভু-ভৃত্যভাবে, আবার কেউ কেউ বিশ্বমূর্তি ভগবান ভেবে বহু প্রকারে আরাধনা করেন। ১৫

ক্রতু আমি, আমিই যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমিই ঘৃত, অগ্নিও আমি এবং হোমাদি ক্রিয়াও আমি। ১৬

এই সমস্ত জগতের ধাতা অর্থাৎ ধারণকারী, কর্মের ফল প্রদানকারী, পিতা, মাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও ওঁকার এবং ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ আমি। ১৭

প্রাপ্তিযোগ্য পরম ধাম, ভর্তা, সকলের প্রভু, শুভাশুভ দ্রষ্টা, সকলের আশ্রয়স্থল, শরণগ্রহণের যোগ্য, প্রত্যুপকারের আশা না রেখে হিতকারী, উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু, স্থিতির আধার, নিধান এবং অবিনাশী কারণও আমিই।

আমিই সূর্যরূপে উত্তাপ বিকিরণ করি এবং জল আকর্ষণ করে বর্ষণ করি। হে অর্জুন! আমিই অমরত্ব ও মৃত্যু এবং সদসৎও আমিই। ১৯

ত্রিবেদের বিধান অনুযায়ী সকাম কর্মপরায়ণ, সোমরসপায়ী নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা করে স্বর্গ কামনা করেন ; তাঁরা তাদের পুণ্যের ফলরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে দিব্য দেবভোগ উপভোগ করেন। ২০

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে আসেন। এইরূপে স্বর্গের সাধন হিসাবে ত্রিবেদোক্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী, ভোগ-কামী ব্যক্তিগণ বারংবার ইহলোকে যাতায়াত করেন অর্থাৎ পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গে যান এবং পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। ২১

অনন্যচিত্তে যে-ভক্তগণ আমাকে সর্বদা নিষ্কামভাবে
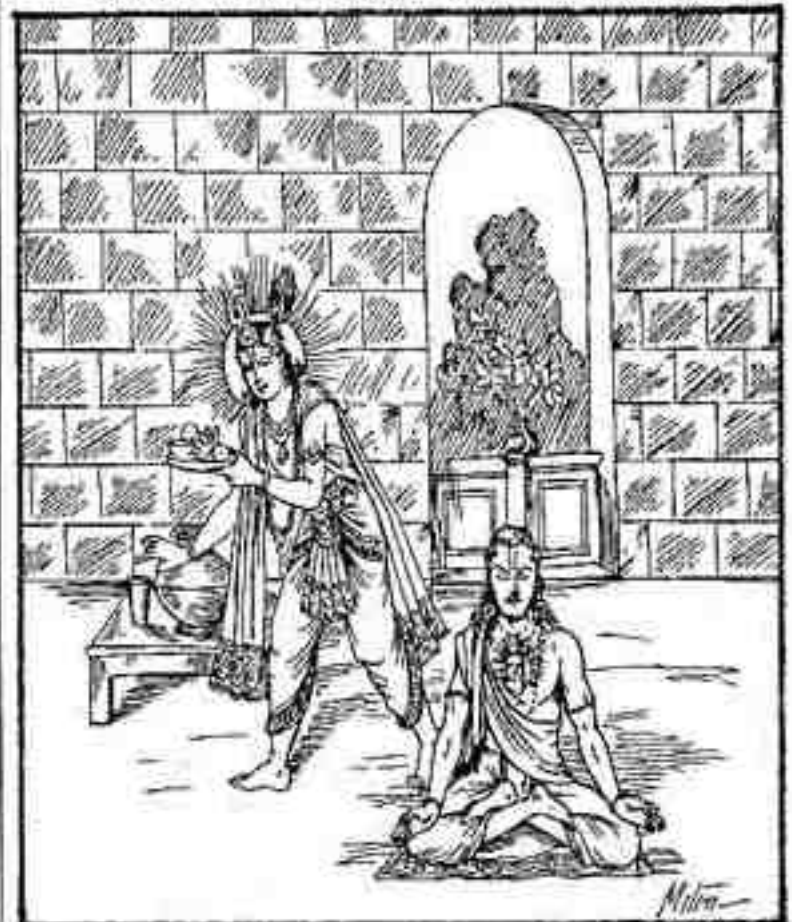
ভজনা করেন, সেই নিত্য-সমাহিত মুমুক্ষুগণের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি। ২২

হে অর্জুন ! শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যারা অন্য দেবতার পূজা করে, তারাও যদিও প্রকৃতপক্ষে আমাকেই পূজা করে কিন্তু তাদের সেই পূজা বিধিপূর্বক নয় অর্থাৎ তা অজ্ঞতা-প্রসূত। ২৩

কারণ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু ; কিন্তু তারা পরমেশ্বররূপী আমাকে তত্ত্বত জানে না, সেইজন্যই তাদের পতন হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। ২৪

দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন, পিতৃভক্তগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতোপাসকগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হন এবং আমার উপাসক আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাই আমার ভক্তের পুনর্জন্ম হয় না। ২৫

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিভাবে পত্র-পুষ্প-ফল-জল প্রভৃতি অর্পণ করেন, সেই শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি আমি সগুণরূপে প্রকট হয়ে প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ করি। ২৬

হে অর্জুন ! তুমি যা কর্ম কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, তা সবই আমাকে অর্পণ করো। ২৭
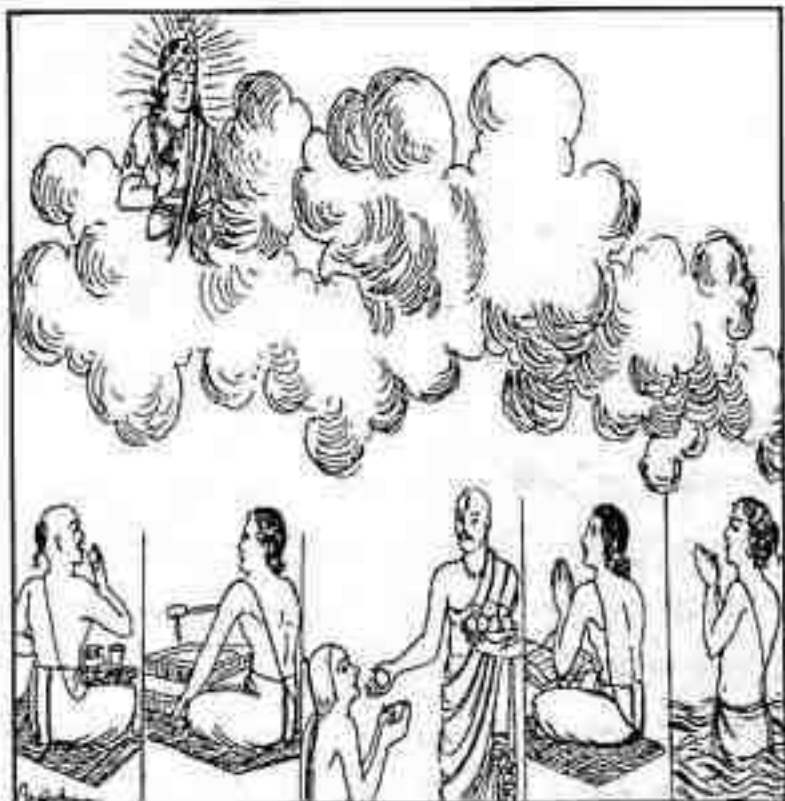
এইভাবে, আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে এবং এ হতে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ২৮

আমি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করি, আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই ; কিন্তু যাঁরা ভক্তিভাবে আমার উপাসনা করেন তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রকট হই। ২৯

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলে জানবে, কারণ তার সংকল্প অতি শুভ। ৩০

সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয় ! তুমি নিশ্চিত জানবে যে আমার ভক্ত কখনোই বিনষ্ট হয় না। ৩১

হে অর্জুন ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিসম্ভূত চণ্ডালাদি যে কেউই হোক না কেন, সে আমাকে আশ্রয় করে পরমগতি লাভ করে। ৩২

সুতরাং পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং ক্ষত্রিয়গণের আর কথা কী ? তাঁরা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করবেন। অতএব সুখহীন ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ ধারণ করে নিরন্তর আমাকেই ভজনা করো। ৩৩

তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভজনশীল হও, পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম করো। এইভাবে আত্মাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে মৎপরায়ণ হলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ৩৪

—০—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

(বিভূতিযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাবাহো ! তুমি পুনরায় আমার রহস্য ও প্রভাবযুক্ত উৎকৃষ্ট বাক্য শোনো, আমার প্রতি অতিশয় প্রীতিসম্পন্ন হওয়ায় তোমার হিতার্থে আমি এই কথা বলছি। ১

দেবতা বা মহর্ষি কেউই আমার উৎপত্তি জানেন না, কারণ আমি সর্বপ্রকারে দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি। ২

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে তত্ত্বত জানেন, মনুষ্য মধ্যে সেই জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব পাপ হতে মুক্ত হন। ৩

নিশ্চয় করবার শক্তি, যথার্থ জ্ঞান, অসম্মূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয় সংযত করা, মনের নিগ্রহ ও সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-প্রলয় এবং ভয়-অভয়, অহিংসা, সাম্য, সন্তোষ, তপ, দান, কীর্তি-অকীর্তি—প্রাণীদের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়। ৪-৫

ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, পুরাকালের সনকাদি চারজন, এবং স্বায়ম্ভুব প্রমুখ চতুর্দশ মনু—এঁরা সকলেই আমার ভাবসম্পন্ন এবং আমারই সংকল্পজাত। জগতের সমস্ত প্রজা এঁদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। ৬

যিনি আমার এই পরম ঐশ্বর্যরূপ বিভূতি এবং যোগশক্তি তত্ত্বত জানেন, তিনি অচল ভক্তিযোগে যুক্ত হন—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৭

আমি (বাসুদেবই) সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, আমার থেকেই সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত হয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ জেনে সর্বদা পরমেশ্বররূপ আমারই ভজনা করেন। ৮

নিরন্তর মদ্‌গতচিত্ত এবং মদ্‌গতপ্রাণ ভক্তগণ পরস্পর আমার কথা আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে আমার প্রভাবের কথার প্রচার এবং আমার গুণ-প্রভাবের কথা কীর্তনের দ্বারাই সন্তোষ লাভ করেন এবং আমার মধ্যেই নিরন্তর রমণ করেন। ৯

সর্বদা আমার ধ্যানে আসক্ত এবং প্রেমপূর্বক ভজনশীল ভক্তদের আমি সেই তত্ত্বজ্ঞান-রূপ যোগ প্রদান করি, যাতে তাঁরা আমাকেই লাভ করেন। ১০

হে অর্জুন ! সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশত আমি তাদের অন্তঃকরণে স্থিত হয়ে অজ্ঞানজনিত অন্ধকারকে

প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা নাশ করি। ১১

অর্জুন বললেন—আপনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং পরম পবিত্র, আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন জন্মরহিত, দিব্য-পুরুষ ও আদিদেব। দেবর্ষি নারদ এবং অসিত ও দেবল ঋষি এবং মহর্ষি ব্যাসও আপনাকে এইরূপেই বর্ণনা করেছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে তাই বলেছেন। ১২-১৩

হে কেশব ! আমাকে যা বলেছেন তা সবই আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান ! আপনার এই অভিব্যক্তি (অবতারত্ব) স্বরূপ দেবতা বা দানব কেউই জানে না। ১৪

হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবাদিদেব! হে জগৎপতি ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ংই নিজেকে জানেন। ১৫

আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা এই লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই সকল দিব্য বিভূতিগুলি সম্যকরূপে বর্ণনা করতে একমাত্র আপনিই সক্ষম। ১৬

হে যোগেশ্বর ! কীভাবে নিরন্তর চিন্তা করলে আমি আপনাকে জানতে পারব ? হে ভগবান ! আপনাকে আমি কী কী ভাবে চিন্তা করব ? ১৭

হে জনার্দন ! আপনার যোগশক্তি এবং বিভূতি বিস্তারিতভাবে আবার বলুন, কারণ আপনার অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, আমি আরও শুনতে ইচ্ছা করি। ১৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার যে দিব্য বিভূতি আছে তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কথা তোমাকে বলব, কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই। ১৯

হে অর্জুন ! আমিই সর্বভূতের হৃদয়স্থিত সকলের আত্মা
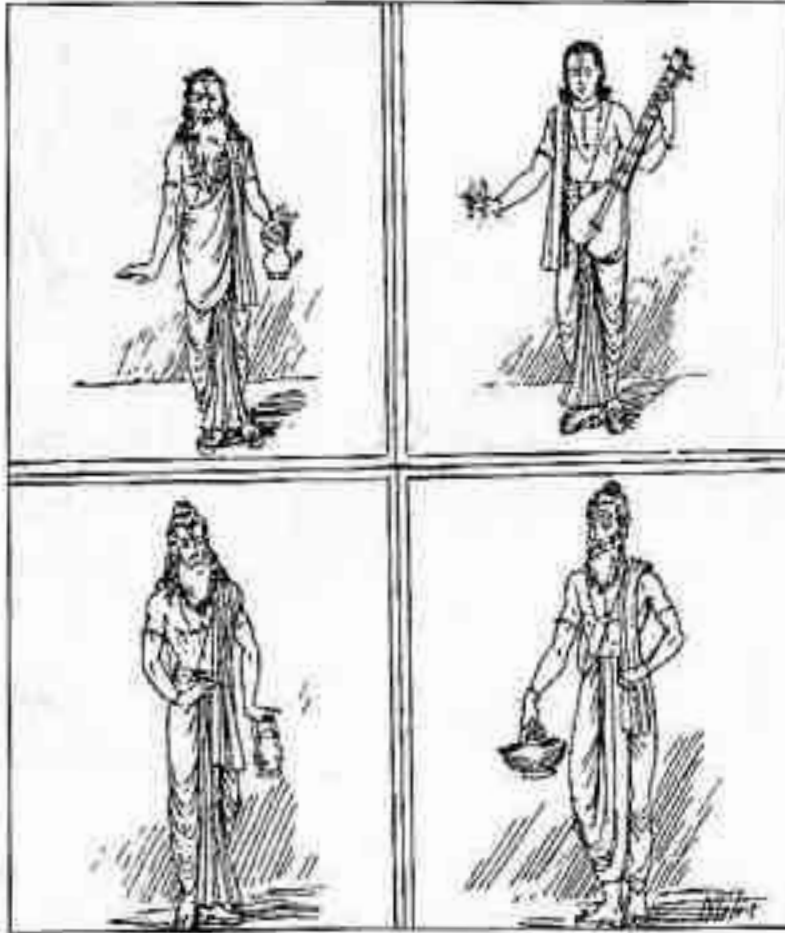
এবং সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তও আমিই। ২০

অদিতির দ্বাদশপুত্রের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিসমূহের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি চন্দ্রও আমি। ২১

চার বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে আমি মন এবং প্রাণীদেহে অভিব্যক্ত চেতনা অর্থাৎ জীবনশক্তিও আমি। ২২

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শংকর ; যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে আমি ধনাধিপতি কুবের ; অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে আমি মেরু পর্বত। ২৩

হে পার্থ ! পুরোহিতগণের মধ্যে আমি দেবগুরু বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি কার্তিক এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমিই সাগর। ২৪

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দের মধ্যে আমি এক অক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁ-কার। সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় পর্বত। ২৫

বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে আমি কপিলমুনি। ২৬

অশ্বসমূহের মধ্যে অমৃত মন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে নৃপতি বলে জানবে। ২৭

শস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুযায়ী সন্তান উৎপাদনের হেতু কাম আমিই এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকিও আমি। ২৮

আমি নাগগণের মধ্যে নাগরাজ অনন্ত এবং জলচর প্রাণীদের মধ্যে রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্যমা এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে আমি মৃত্যুরাজ যম।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীদের মধ্যে আমি সময় (বা কাল), পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। ৩০

পবিত্রকারীদের মধ্যে বায়ু এবং শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যকুলের মধ্যে আমি মকর (কুমির) এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

হে অর্জুন ! সমগ্র সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমিই। বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) এবং পরস্পর তর্ককারীদের মধ্যে আমি বাদ। ৩২

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অ-কার, সমাসসমূহের মধ্যে

আমি দ্বন্দ্বসমাস, আমি অক্ষয়কাল (কালেরও কাল মহাকাল) এবং সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট বিরাট স্বরূপ, সকলের ধারণপোষণকারীও আমিই। ৩৩

আমি সর্বসংহারকর্তা মৃত্যু এবং উদ্ভূতকারীদের উৎপত্তির কারণ এবং নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা। ৩৪
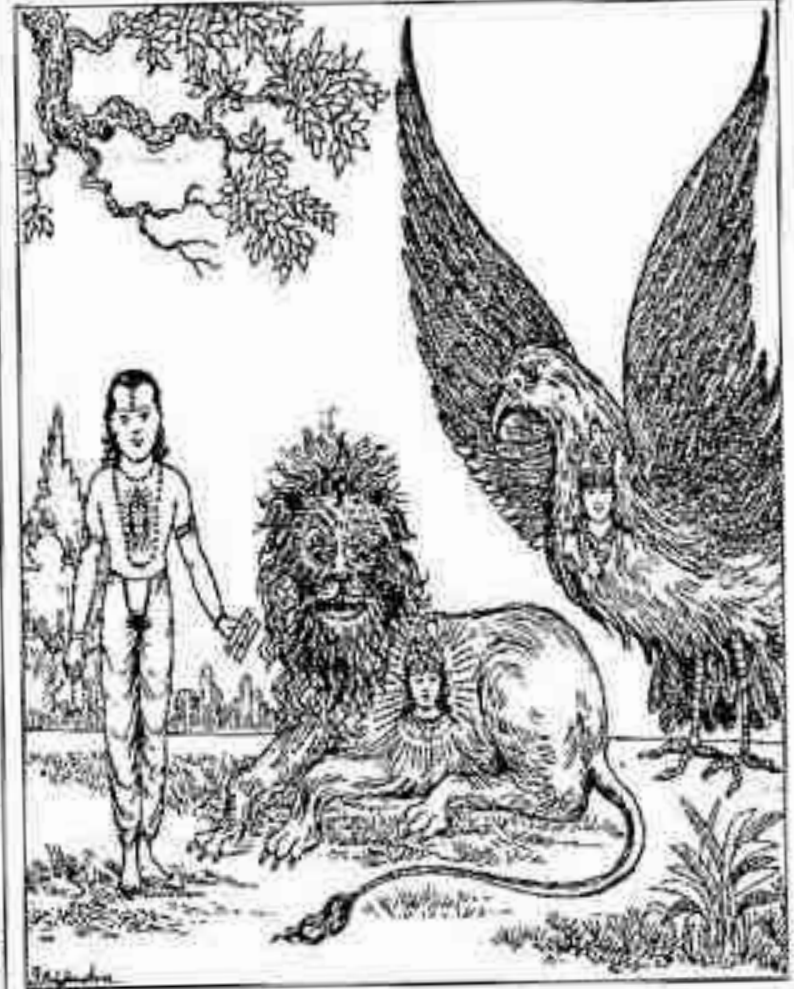
আমি গীতযোগ্য শ্রুতির মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্র, মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ষড়্‌-ঋতুর মধ্যে ঋতুরাজ বসন্ত। ৩৫

ছলনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়ারূপ ছল, তেজস্বীগণের তেজ, বিজয়ীগণের বিজয়, অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিদের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্বগুণও আমি। ৩৬

বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব অর্থাৎ তোমার সখা আমি, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমি, মুনিদের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য আমি। ৩৭

আমি শাসনকর্তাদের দণ্ড অর্থাৎ দমন করবার শক্তি। জয়লাভেচ্ছুদের নীতি, গোপনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীদের তত্ত্বজ্ঞান আমিই। ৩৮

হে অর্জুন ! সকল ভূতের উৎপত্তির কারণও আমি ; কারণ স্থাবর বা জঙ্গমে এমন কোনো প্রাণী-ই নেই যা আমাকে ছাড়া সম্ভাবান হতে পারে। ৩৯

হে পরন্তপ ! আমার দিব্যবিভূতির অন্ত নেই । আমি সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করলাম। ৪০

যা যা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন সেই সকলই আমার শক্তির অংশ হতে অভিব্যক্ত বলে জানবে। ৪১

অথবা, হে অর্জুন ! তোমার এত বিস্তারিত জানবার দরকারই বা কী ? আমি এই সমস্ত জগৎ নিজ যোগশক্তির একাংশে ধারণ করে আছি। ৪২

—o—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(বিশ্বরূপদর্শনযোগ)

অর্জুন বললেন—হে ভগবান, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আপনি যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মতত্ত্ব বললেন, তাতে আমার মোহ দূর হয়েছে। ১

কারণ হে কমললোচন ! আমি আপনার কাছে ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শুনেছি এবং আপনার অক্ষয় মাহাত্ম্যও জেনেছি। ২

হে পরমেশ্বর ! আপনি যে আত্মতত্ত্ব বলেছেন, তা যথার্থ ; কিন্তু হে পুরুষোত্তম ! আমি আপনার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য এবং তেজসমন্বিত ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা করি। ৩

হে প্রভু ! আমাকে যদি আপনার সেই বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য বলে মনে করেন, তা হলে হে যোগেশ্বর ! আমাকে আপনার অব্যয় জগদাত্মারূপ দেখান। ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! এবার তুমি আমার নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র দিব্যরূপ দর্শন করো। ৫

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি আমার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য (অদিতির পুত্র), অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঊনপঞ্চাশ মরুদ্গণকে দর্শন করো এবং পূর্বে যা কখনো দেখোনি এরূপ বহু আশ্চর্যময় রূপ দর্শন করো। ৬

হে অর্জুন ! আমার এই বিরাট শরীরের একস্থানে অবস্থিত চরাচরসহ সমগ্র জগৎ অবলোকন করো এবং আরও যা কিছু তোমার দেখবার ইচ্ছা তা-ও দেখো। ৭

কিন্তু তুমি নিজ চর্ম চক্ষুর দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ দেখতে সমর্থ নও ; সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, সেই চক্ষু দ্বারা তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগশক্তি দর্শন করো। ৮

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! মহাযোগেশ্বর এবং সর্বপাপনাশকারী ভগবান এই কথা বলে অর্জুনকে নিজের পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দিব্যরূপ দেখালেন। ৯

সেই বিশ্বরূপ অনেক মুখ ও বহু নেত্রযুক্ত, অসংখ্য অদ্ভুত আকৃতির, বহু দিব্যভূষণাদি পরিহিত এবং বহু দিব্য আয়ুধে সজ্জিত, দিব্য মাল্য এবং দিব্য বস্ত্রে ভূষিত, দিব্যগন্ধ অনুলিপ্ত, সর্বাশ্চর্যযুক্ত অনন্ত ও সর্বতোমুখ বিশিষ্ট—সেই বিশ্বরূপ পরমদেব পরমেশ্বরকে অর্জুন দর্শন করলেন। ১০-১১

সহস্র সূর্য একসঙ্গে আকাশে উদিত হলে যে জ্যোতি উৎপন্ন হয় সেই জ্যোতিও বিশ্বরূপের দিব্যজ্যোতির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র । ১২

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সেই সময় নানা ভাগে বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেবাদিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের একস্থানে অবস্থিত দেখলেন। ১৩

এর পর বিস্ময়াবিষ্ট এবং রোমাঞ্চিত অর্জুন বিশ্বরূপধারী ভগবানকে শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ নতমস্তকে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন। ১৪

অর্জুন বললেন—হে দেব ! আপনার শরীরে আমি সমস্ত দেবতাগণকে এবং চরাচর জগৎ, কমলাসনে অধিষ্ঠিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে, মহাদেবকে এবং সমস্ত ঋষি ও দিব্য সর্পগণকে দেখতে পাচ্ছি। ১৫

হে বিশ্বপতি ! আপনার বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ এবং বহু নেত্র বিশিষ্ট বিরাট রূপ দেখতে পাচ্ছি। হে বিশ্বরূপ ! আমি আপনার অন্ত, মধ্য এবং আদি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ১৬

আপনাকে আমি কিরীটি, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য এবং সর্বত্র অপ্রমেয়স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। ১৭

আপনি পরম ব্রহ্ম ও একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি জগতের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক, আপনিই অবিনাশী সনাতন পুরুষ, এই আমার মত। ১৮

আপনাকে আমি আদি, মধ্য ও অন্তহীনরূপে দেখছি, আপনি অনন্ত শক্তিসম্পন্নও, অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র, মুখ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এবং স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে আপনি সন্তপ্ত করছেন। ১৯

হে মহাত্মন্ ! স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং সর্বদিক আপনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আপনার এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে। ২০

দেবগণ আপনাতেই প্রবিষ্ট হচ্ছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে আপনার গুণগান করছেন এবং মহর্ষি ও সিদ্ধগণ জগতের 'কল্যাণ হোক' বলে প্রচুর স্তুতিবাক্যে আপনার স্তব করে চলেছেন। ২১

একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে আপনাকে দেখছেন। ২২

হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর এবং ভয়ানক দন্তযুক্ত বিকট রূপ দেখে সমস্ত লোক অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে এবং আমিও এখন অতিশয় ভয়ে ভীত। ২৩

কারণ হে বিষ্ণো ! আকাশস্পর্শকারী, তেজোময়, নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিস্ফারিত মুখমণ্ডল তথা জাজ্বল্যমান বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট আপনাকে দেখে আমি ভীত হয়ে পড়েছি এবং ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না। ২৪

বিকট দন্তদ্বারা বিকৃত এবং প্রলয়াগ্নিসম প্রজ্বলিত আপনার মুখ দেখে আমি দিশাহারা হচ্ছি, শান্তি পাচ্ছি না। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। ২৫

রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রের ওইসব পুত্রগণ এবং পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণসহ সকলেই আপনার দ্রংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে সবেগে প্রবেশ করছেন। কারো চূর্ণিত মস্তক খণ্ড আপনার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লেগে রয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। ২৬-২৭

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে যায় অর্থাৎ দ্রুতবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই এই বীরপুরুষগণও আপনার প্রজ্বলিত মুখে প্রবেশ করছেন। ২৮

যেমন পতঙ্গগণ অতি বেগে ধেয়ে এসে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এইসব লোকও মৃত্যুর জন্যই অতি বেগে ধাবমান হয়ে আপনার মুখে প্রবেশ করছেন। ২৯

আপনি সকল লোককে জ্বলন্ত মুখবিবরে গ্রাস করে সর্বদিকে লেহন করছেন। হে বিষ্ণু ! আপনার তীব্র প্রভা সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করে সন্তপ্ত করছে। ৩০

আপনি আমাকে বলুন, এই উগ্ররূপে আপনি কে ? হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি প্রসন্ন হোন। হে আদিপুরুষ আপনাকে আমি বিশেষভাবে জানতে চাই, কারণ আপনার কী প্রবৃত্তি তা আমি জানি না। ৩১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি লোকনাশকারক প্রবৃদ্ধ কাল। এখন এই লোক সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যদি যুদ্ধ না-ও করো, প্রতিপক্ষের যোদ্ধাগণ কেউই জীবিত থাকবে না অর্থাৎ এদের বিনাশ হবেই। ৩২

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উঠে দাঁড়াও ও যশ লাভ করো

এবং শত্রু জয় করে ধন-ধান্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ করো। এই যোদ্ধাদের আমি আগেই বধ করেছি। হে সব্যসাচী ! তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য সমস্ত যোদ্ধাদের আমি পূর্বেই নিধন করেছি, সেই মৃতদেরই তুমি বধ করো। ভয় কোরো না। তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুদের জয় করবে। অতএব যুদ্ধ করো। ৩৪

সঞ্জয় বললেন—কেশবের এই কথা শুনে মুকুটধারী অর্জুন কম্পিত দেহে হাত জোড় করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে পুনরায় প্রণাম করে গদ্‌গদ স্বরে বললেন। ৩৫

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ ! আপনার মাহাত্ম্য কীর্তনে সমস্ত জগৎ আনন্দিত ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাক্ষসরা নানাদিকে ধাবিত হচ্ছে ও সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছেন। এই সমস্ত খুবই যুক্তিযুক্ত। ৩৬

হে মহাত্মন্ ! ব্রহ্মারও আদি তথা সর্বোত্তম আপনাকে কেন সকলে প্রণাম করবে না ? হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! যা সৎ, যা অসৎ তাও আপনি এবং এই উভয়ের অতীত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম, তাও আপনি। ৩৭

আপনি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ, আপনি এই জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য, আপনি পরমধাম। হে অনন্তরূপ ! আপনিই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। ৩৮

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ; আপনি প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও পিতা। আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি। আপনাকে পুনরায় প্রণাম করি। আপনাকে বারবার প্রণাম করি। ৩৯

হে অনন্ত সামর্থ্যসম্পন্ন ! আপনাকে সম্মুখে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম ! সর্বদিক থেকেই প্রণাম। হে সর্বাত্মন্ ! অসীম পরাক্রমশালী আপনি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, অতএব আপনিই সর্বস্বরূপ। ৪০

আপনার এই জগদাকার রূপের মাহাত্ম্য না জেনে আপনাকে সখা মনে করে স্নেহবশত বা প্রমাদবশত আমি 'হে কৃষ্ণ !' 'হে যাদব !' 'হে সখে !'— এই বলে অবুঝের মতো সম্বোধন করেছি। হে অচ্যুত, উপহাসচ্ছলে আহার, বিহার, আসন এবং শয়নের সময় একাকী বা অন্য সখাদের সামনে আপনাকে যে অমর্যাদা করেছি, হে অপ্রমেয় ! সেইসব অপরাধের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ৪১-৪২

আপনি এই জগৎ চরাচরের পিতা, পূজ্য, গুরুরও গুরু। হে অনুপম প্রভাবশালী ! ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষ আর কেউ নেই, আপনার হতে শ্রেষ্ঠ আর কেইবা হতে পারে ? ৪৩

হে প্রভু ! সেইজন্য আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। হে দেব ! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন—তেমনই আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। ৪৪

যা পূর্বে কখনো দর্শন করিনি আপনার সেই বিশ্বরূপ অবলোকন করে আমি হর্ষান্বিত হচ্ছি, আবার মন ভয়ে ব্যথিত হচ্ছে। আমার অতিপ্রিয় আপনার সেই পূর্বরূপই আমাকে দেখান। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হোন। ৪৫

আমি পূর্বের মতো আপনার মুকুটধারী এবং গদা-চক্রধারী রূপ দর্শন করতে চাই। হে বিশ্বমূর্তি ! হে সহস্রবাহু ! এখন আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করুন। ৪৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় ঈশ্বরীয় যোগ প্রভাবে আমার তেজোময়, সকলের আদি এবং অসীম ও উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিয়েছি, যা তুমি ছাড়া আগে আর কেউ দেখেনি। ৪৭

হে অর্জুন ! ইহজগতে আমার এই বিশ্বরূপ বেদ পাঠ বা যজ্ঞের দ্বারা, দান বা ক্রিয়াদির দ্বারা অথবা কঠোর তপস্যার দ্বারাও কেউ দেখতে সক্ষম নয়। একমাত্র তুমিই তা দর্শন করলে। ৪৮

আমার এই ভয়ংকর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ভীত ও ব্যথিত হয়ো না, তোমার মূঢ়ভাবও যেন না হয় ; তুমি ভয় ত্যাগ করে প্রসন্নচিত্তে আমার সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজ রূপ পুনরায় দর্শন করো। ৪৯

সঞ্জয় বললেন—ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনরায় নিজের সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং তার পর শ্রীকৃষ্ণ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। ৫০

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! আপনার এই সৌম্য

মনুষ্যরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম এবং নিজের স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলাম। ৫১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি আমার যে চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেছ তার দর্শন পাওয়া বড়ই দুর্লভ। দেবতাগণও সর্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ৫২

আমার যে বিশ্বরূপের দর্শন তুমি করেছ তা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারাও সম্ভব নয়। ৫৩

হে পরন্তপ অর্জুন ! একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই এই প্রকার (ঈদৃশ) আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ রূপ মোক্ষ লাভ করতে ভক্তগণ সমর্থ হয়, অন্য উপায়ে নয়। ৫৪

হে অর্জুন ! যে-ব্যক্তি আমারই জন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম করেন, আমার শরণাগত হন, আমার ভক্ত হন, আসক্তিশূন্য হন এবং সমস্ত প্রাণীতে বৈরীভাবরহিত হন, সেই একনিষ্ঠ ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমাকেই লাভ করেন। ৫৫

—o—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(ভক্তিযোগ)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান, নিরন্তর ভজন-ধ্যানে নিযুক্ত থেকে যে সকল অনন্য-স্মরণ ভক্ত, সমাহিত চিত্তে আপনার উপাসনা করেন এবং অন্য যারা কেবল অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের উপাসনা করেন—এই উভয় উপাসকের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী ? ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমাতে মনোনিবেশ পূর্বক নিত্য-নিরন্তর ভজন-ধ্যানে নিযুক্ত থেকে যে ভক্তগণ অতি শ্রদ্ধাসহকারে সগুণ পরমেশ্বররূপী আমার উপাসনা করেন, তাঁরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। ২

কিন্তু যাঁরা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে মন-বুদ্ধির অতীত, সর্বব্যাপী অব্যক্ত স্বরূপ, সর্বদা একরস এবং নিত্য, অচল, নিরাকার, অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের নিরন্তর একাত্মভাবে ধ্যানযুক্ত হয়ে উপাসনা করেন, সকল প্রাণীর হিতে রত এবং সর্বত্র সমান ভাবসম্পন্ন তাঁরাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৩-৪

সেই সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মে নিবিষ্ট ব্যক্তিদের সাধনায় অধিক ক্লেশ হয় ; কারণ দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত বিষয়ক গতি প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় কষ্টকর। ৫

কিন্তু যে সকল মদ্‌গত ভক্ত সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে সগুণরূপে আমাকে একনিষ্ঠ ভক্তিযোগের দ্বারা নিরন্তর উপাসনা করেন। ৬

হে অর্জুন ! সেই সকল মদ্‌গতচিত্ত ভক্তকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হতে উদ্ধার করি। ৭

আমাতে মন সমাহিত করো, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করো। এরূপ করলে তুমি নিশ্চয়ই আমাতে স্থিতিলাভ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ৮

যদি তুমি মনকে আমাতে সমাহিত করতে না পার, তা হলে হে অর্জুন ! অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করতে চেষ্টা করো। ৯

যদি তুমি এই প্রকার অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে

শুধুমাত্র আমার জন্যই কর্ম করো। কারণ আমার জন্য কর্ম করলেও তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে (সিদ্ধিলাভ করবে)। ১০

আর যদি তুমি তাও করতে অসমর্থ হও, তবে মন-বুদ্ধি সংযমপূর্বক আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করো। ১১

মর্ম না জেনে শুধুমাত্র অভ্যাস করা হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞান হতে পরমেশ্বরের স্বরূপের ধ্যান শ্রেয় ; ধ্যান অপেক্ষা সর্বকর্মের ফল ত্যাগ শ্রেয় ; কারণ ত্যাগের দ্বারা তৎকালই পরম শান্তি লাভ হয়। ১২

যিনি সর্বভূতে অবিদ্বেষ, স্বার্থপরতারহিত, সর্বভূতে প্রেমভাবাপন্ন, হেতুরহিত, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার ; সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল অর্থাৎ অপরাধীকেও যিনি অভয় দান করেন, সদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিত চিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা আমার প্রতি দৃঢ়-নিশ্চয়যুক্ত, মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। ১৩-১৪

যিনি কাউকেও উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কারো দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১৫

যিনি নিঃস্পৃহ, অন্তরে-বাহিরে শুচিসম্পন্ন, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ভয় হতে মুক্ত এবং সকাম কর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয়। ১৬

যিনি ইষ্ট প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভ ও অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন তিনি আমার প্রিয়। ১৭

যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে সমবুদ্ধি, শীত ও উষ্ণে এবং সুখ ও দুঃখাদি দ্বন্দ্বে নির্বিকার ও আসক্তি-শূন্য। ১৮

যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধি, সংযতবাক্, জীবন-নির্বাহে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট এবং গৃহাদিতে মমতাশূন্য—এরূপ স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়। ১৯

কিন্তু যে সকল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মৎপরায়ণ হয়ে উক্তপ্রকার অমৃততুল্য ধর্ম ভক্তিপূর্বক অনুষ্ঠান করেন সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। ২০

—o—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই শরীরকে 'ক্ষেত্র' বলা হয় এবং যিনি এই শরীরকে জানেন, তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানিগণ তাঁকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করেন। ১

হে অর্জুন ! সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মা আমাকেই জানবে আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্পর্কে তত্ত্বগত জানা হল জ্ঞান—এই আমার মত। ২

সেই ক্ষেত্র কী এবং কেমন, তা কীরূপ বিকারবিশিষ্ট, কী কারণে এটি হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কেমন, তাঁর কীরূপ প্রভাব—এই সব সংক্ষেপে আমার কাছে শোনো। ৩

এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব ঋষিগণ নানাভাবে

বলেছেন ও বিবিধ বেদমন্ত্রাদির দ্বারাও এটি বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে এবং অসন্দিগ্ধভাবে যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্র পদসমূহ দ্বারাও এর বর্ণনা করা হয়েছে। ৪

পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি এবং মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। ৫

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, স্থূলদেহ, চেতনা ও ধৃতি—এইসকল বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হল। ৬

নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকা, অদাম্ভিকতা, কোনোভাবে কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া, ক্ষমা, মন ও বাক্যে সরলতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গুরু সেবা, বাহ্যান্তর শুদ্ধি, আত্মসংযম ও স্থৈর্য। ৭

ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকারের ভোগে অনাসক্তি, নিরহংকারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধি প্রভৃতিতে বারংবার দুঃখ ও দোষ দেখা। ৮

স্ত্রী-পুত্র-গৃহ ও ধনাদিতে অনাসক্তি, মমত্বশূন্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় অপ্রাপ্তিতে সর্বদা চিত্তের সমভাব। ৯

আমাতে অনন্য যোগসহ অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন ও পবিত্র স্থানে থাকার স্বভাব ও বিষয়াসক্ত লোকের প্রতি বিরাগ। ১০

অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থরূপে একমাত্র পরমেশ্বরকে সর্বত্র দর্শন—এইগুলি হল জ্ঞান এবং এর বিপরীতকে বলা হয় অজ্ঞান। ১১

যা জ্ঞাতব্য এবং যা জেনে মানুষ পরমানন্দ লাভ করে তা সবিশেষ তোমাকে বলব। সেই অনাদি পরমব্রহ্ম সৎও নয় আবার অসৎও নয়। ১২

তাঁর সর্বদিকে হস্ত ও পদ, চক্ষু ও মস্তক, মুখ ও কান। কারণ তিনি সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করে বিরাজিত আছেন। ১৩

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের জ্ঞাতা হয়েও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত এবং অনাসক্ত হয়েও সকলের ধারক ও পোষক, নির্গুণ হয়েও সমস্ত গুণের ভোক্তা। ১৪

তিনি চর, অচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে এবং স্থাবর ও জঙ্গম দেহসমূহে বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম বলে তিনি অবিজ্ঞেয়, অতি নিকটে এবং অত্যন্ত দূরেও তিনি। ১৫

এই পরমাত্মা অবিভক্তরূপে আকাশসদৃশ পরিপূর্ণ হয়েও চর-অচর সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হন। সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মাকে বিষ্ণুরূপে সকলের ধারক ও পোষক এবং রুদ্ররূপে সংহারকর্তা ও ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে। ১৬

সেই ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি এবং মায়ার অতিপর বলে কথিত হয়েছে। এই পরমাত্মা বোধস্বরূপ, জানার বিষয়, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৭

এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্ত এই তত্ত্ব জেনে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮

প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়কেই তুমি অনাদি বলে জানবে এবং রাগ-দ্বেষাদি বিকারসমূহ ও ত্রিগুণাত্মক সমস্ত পদার্থকে প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলে জানবে। ১৯

কার্য এবং কারণ উৎপন্ন করায় প্রকৃতিকেই হেতু বলা হয় এবং জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা অর্থাৎ ভোক্তৃত্বে হেতু বলা হয়। ২০

প্রকৃতিতে স্থিত হয়েই মানুষ প্রকৃতিজাত ত্রিগুণাত্মক পদার্থ ভোগ করে এবং এই গুণসমূহের সংসর্গের জন্যই এই জীবাত্মাকে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। ২১

এই দেহে অবস্থিত যে-আত্মা তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা। তিনি সাক্ষী হওয়ায় উপদ্রষ্টা, যথার্থ সম্মতি দেওয়ায় অনুমন্তা, সকলের ধারক ও পোষক হওয়ায় ভর্তা, জীবরূপে ভোক্তা, ব্রহ্মাদি সকলের স্বামী হওয়ায় মহেশ্বর এবং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন হওয়ায় পরমাত্মা বলে কথিত হন। ২২

যিনি পুরুষকে (ব্রহ্মকে) এবং গুণসহ প্রকৃতিকে তত্ত্বত পৃথকভাবে জানেন তিনি সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ২৩

সেই পরমাত্মাকে কেউ কেউ শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ধ্যানের সাহায্যে হৃদয়ে দর্শন করেন। অন্য কেউ কেউ জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং অপর কেউ কেউ কর্মযোগের দ্বারা সেই উপলব্ধি করেন। ২৪

আবার যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা এইভাবে আত্মাকে না জানতে পেরে পরের কাছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের কাছে শুনে সেই মতো উপাসনা করেন এবং এইরূপ শ্রবণপরায়ণ ব্যক্তিও মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর নিঃসংশয়ে অতিক্রম করেন। ২৫

হে অর্জুন ! স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা সবই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই উৎপন্ন বলে জানবে। ২৬

যিনি বিনাশশীল সমগ্র চরাচর ভূতসমূহের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিত দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৭

সেই সমদর্শী সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমেশ্বর দর্শন করেন বলে, তিনি নিজেই নিজেকে হিংসা (নাশ) করেন না, সেইজন্য তিনি পরমগতি লাভ করেন। ২৮

যিনি সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে এইরূপ দর্শন করেন এবং আত্মাকে অকর্তারূপে দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৯

যখন তিনি ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাবকে এক পরমাত্মাতেই অবস্থিত দেখেন এবং সেই পরমাত্মা হতেই সমস্ত প্রাণীর বিকাশ দর্শন করেন, তখন তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৩০

হে অর্জুন ! এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায়

অব্যয়, সেই হেতু শরীরসমূহে অবস্থিত থেকেও প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করেন না এবং লিপ্তও হন না। ৩১

যেমন আকাশ সর্বব্যাপী হয়েও অতি সূক্ষ্মতার জন্য কিছুতে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেহের সর্বত্র অবস্থান করলেও নির্গুণ হওয়ায় দৈহিক গুণাদিতে কখনো লিপ্ত হন না। ৩২

হে অর্জুন ! যেমন একমাত্র সূর্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করেন, তেমনই এক আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। ৩৩

এইপ্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য হতে মুক্তির উপায় যাঁরা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তত্ত্বত উপলব্ধি করেন, সেই মহাত্মাগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। ৩৪

———o———

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(গুণত্রয়বিভাগযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই উত্তম পরম জ্ঞানের কথা পুনরায় বলছি। এই তত্ত্ব জেনে মুনিগণ এই সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধিলাভ করেছেন। ১

এই জ্ঞান আশ্রয় করে আমার স্বরূপপ্রাপ্ত পুরুষ সৃষ্টিকালে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও উদ্বিগ্ন হন না। ২

হে অর্জুন ! আমার মহৎ-ব্রহ্মরূপ মূল প্রকৃতি সমস্ত ভূতের যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান এবং আমি সেই স্থানে চেতনরূপ গর্ভ স্থাপন করি। সেই জড় ও চেতনের

সংযোগেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। ৩

হে কৌন্তেয় ! নানাপ্রকারের যোনিসমূহে যে-সমস্ত মূর্তি অর্থাৎ দেহধারী প্রাণী উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাদের গর্ভধারণকারী মাতা এবং আমি বীজ বপনকারী পিতা। ৪

হে মহাবাহো ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এই তিনটি গুণ অবিনাশী জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে। ৫

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ায় প্রকাশশীল এবং বিকাররহিত, এতে আমি সুখী, আমি জ্ঞানী—এই অভিমানে জীবাত্মাকে বন্ধন করে। ৬

হে কৌন্তেয় ! রজোগুণ হল রাগাত্মক। এটি কামনা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন জানবে। এটি জীবাত্মাকে কর্ম এবং তার ফলের নিমিত্ত আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে। ৭

হে অর্জুন ! সকল দেহাভিমানীর মোহগ্রস্তকারক এই তমোগুণকে অজ্ঞান হতে উৎপন্ন বলে জানবে। তা জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে। ৮

হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণ সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে প্রমাদে আসক্ত করে। ৯

হে ভারত ! রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ প্রবল হয়, তেমনই সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ প্রবল হয়। ১০

যখন এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়েছে বুঝতে হবে। ১১

হে অর্জুন ! রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে লোভ, প্রবৃত্তি, স্বার্থবুদ্ধি, সকামকর্মে প্রবৃত্তি, অশান্তি এবং বিষয়ভোগের লালসা—এই সব উৎপন্ন হয়। ১২

হে অর্জুন ! তমোগুণের বৃদ্ধি হলে অন্তঃকরণে ও ইন্দ্রিয়ে অপ্রকাশ, কর্তব্য-কর্মে অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ বা ব্যর্থচেষ্টা, নিদ্রাদি এবং অন্তঃকরণের মোহিনী বৃত্তি—এই সব উৎপন্ন হয়। ১৩

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করলে উত্তম উপাসকদিগের সুখময় ব্রহ্ম লোকাদিতে গমন করেন। ১৪

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কর্মে আসক্ত মনুষ্যলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কীট, পশু ইত্যাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়। ১৫

সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হল অজ্ঞান। ১৬

সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হতে লোভ এবং তমোগুণ হতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৭

সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিদ্রা-প্রমাদ-আলস্যাদি তমোপ্রধান গুণে স্থিত তামসিক ব্যক্তিগণ অধোগতি অর্থাৎ কীট, পশু আদি নীচ যোনি বা নরকপ্রাপ্ত হয়। ১৮

যখন দ্রষ্টা তিনটি ভিন্ন অন্য কাউকে কর্তারূপে দেখেন না এবং তিনটি গুণের অতীত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ আমাকে পরমাত্মারূপে তত্ত্বত জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৯

দেহ উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন। ২০

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান, এই তিনটি গুণের অতীত ব্যক্তির কী লক্ষণ, তাঁর আচরণ কেমন ? হে প্রভু ! মানুষ কোন উপায়ে তিন গুণ অতিক্রম করতে পারে ? ২১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি ও তমোগুণের কার্য মোহ আবির্ভূত হলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং এই সকলের নিবৃত্তি হলে আকাঙ্ক্ষা করেন না। ২২

উদাসীন ব্যক্তি যেমন সাক্ষীর ন্যায় স্থিত হয়ে গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না এবং গুণই গুণেতে

প্রবর্তিত হচ্ছে এইরূপ জেনে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একীভাবে অবস্থান করেন এবং সেই অবস্থা থেকে কখনো বিচ্যুত হন না। ২৩

যিনি নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত, সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি, মাটি-পাথর ও স্বর্ণে সমভাব, প্রিয় ও অপ্রিয়ে সমজ্ঞান, নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাবাপন্ন। ২৪

যিনি মান-অপমানে সম, শত্রু ও মিত্রেও সম এবং সব কিছুর প্রারম্ভেই যিনি কর্তৃত্বভাববর্জিত, তাঁকেই গুণাতীত বলা হয়। ২৫

যে নিষ্কামকর্মী ঐকান্তিকী ভক্তির সঙ্গে আমাকে উপাসনা করেন, তিনিও ত্রিগুণাতীত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম লাভে সক্ষম হন। ২৬

কারণ অবিনাশী পরব্রহ্মের, সনাতন ধর্মের, অমৃতের ও অখণ্ড একরস সম্পন্ন আনন্দের আশ্রয় আমিই। ২৭

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
(পুরুষোত্তমযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আদিপুরুষ পরমেশ্বরই হলেন মূল এবং ব্রহ্মাই হলেন প্রধান শাখা—এরূপ যে সংসাররূপী অশ্বত্থগাছ তাকে অবিনাশী বলা হয় এবং বেদসমূহ এর পাতা। এই সংসাররূপী অশ্বত্থবৃক্ষকে যে-ব্যক্তি মূলসহ তত্ত্বত জানেন তিনিই বেদের প্রকৃত তাৎপর্যের জ্ঞাতা। ১

এই সংসারবৃক্ষের তিন গুণরূপী জলের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিষয় ভোগরূপ প্রবালবিশিষ্ট ; দেবতা, মনুষ্য ও তির্যকাদি যোনির শাখাগুলি নিম্নে ও ঊর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত এবং মনুষ্যলোকে কর্মানুযায়ী বন্ধনকারক অহংতা, মমত্ব ও বাসনারূপ মূল নিম্নে ও ঊর্ধ্বে সমস্ত লোক পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ২

এই সংসারবৃক্ষের সম্বন্ধে যেমন বলা হয় চিন্তা করলে তেমন উপলব্ধ হয় না, কারণ এর আদিও নেই, অন্তও নেই এবং যথাযথ স্থিতিও নেই। সেইজন্য এই অহং, মমতা এবং বাসনারূপ দৃঢ় মূলসম্পন্ন সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শাস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে। ৩

অতঃপর সর্বতোভাবে সেই পরম-পদরূপ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করা উচিত, যাঁকে প্রাপ্ত হলে জগতে আর ফিরে আসতে হয় না, এবং যে-পরমেশ্বর হতে এই অনাদি সংসারের প্রবৃত্তির বিস্তার হয়েছে আমি সেই আদিপুরুষ নারায়ণের শরণাগত হই। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে সেই পরমেশ্বরের মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত। ৪

যাঁদের মান এবং মোহ দূর হয়েছে যাঁরা আসক্তি জয় করেছেন, যাঁরা পরমাত্মা স্বরূপে নিত্য-স্থিত এবং যাঁদের কামনা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছে—সেইসকল সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বমুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন। ৫

যে পরমপদ প্রাপ্ত হলে মানুষ আর সংসারে ফিরে আসে না, সেই স্বয়ং প্রকাশ পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেউই প্রকাশ করতে পারে না, এই আমার পরমধাম। ৬

এই দেহে সনাতন জীবাত্মা আমারই অংশ এবং তা প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে মনসহ পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। ৭

বায়ু যেমন পুষ্পাদি হতে গন্ধ আহরণ করে নেয়,

তেমনই দেহাদির স্বামী জীবাত্মাও যে শরীরটি ত্যাগ করে মনসহ ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ করে নতুন অন্য দেহে প্রবেশ করে। ৮

দেহস্থিত জীবাত্মা কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকাকে আশ্রয় করে মনের সাহায্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চবিষয়কে উপভোগ করে।৯

শরীর ত্যাগের সময় অথবা শরীরে অবস্থান করে বিষয়ভোগকালীন বা গুণত্রয়ের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় এই জীবাত্মাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানতে পারে না। কেবল জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন বিবেকীগণই জানতে পারেন। ১০

যত্নশীল যোগিগণই নিজেদের হৃদয়ে অবস্থিত এই আত্মাকে তত্ত্বত জানতে পারেন ; কিন্তু যারা নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেনি, এরূপ অজ্ঞানিগণ যত্ন করলেও এই আত্মাকে জানতে পারে না। ১১

সূর্যে যে জ্যোতি আছে এবং যা সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, যা চন্দ্রে এবং অগ্নিতে বিদ্যমান—সেই জ্যোতি আমারই জানবে। ১২

আমি ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশ করে চরাচর সমস্ত ভূতকে ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে সকল ওষধি, বনস্পতিকে পুষ্ট করি। ১৩

আমিই উদরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি। ১৪

আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করি এবং আমা হতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন হয়। আমিই চার বেদের জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদান্তের কর্তা এবং বেদার্থবেত্তা। ১৫

এই জগতে অবিনাশী ও বিনাশী—এই দুই প্রকারের পুরুষ আছেন। এর মধ্যে সর্বভূতের শরীর বিনাশী এবং জীবাত্মা হল অবিনাশী। ১৬

এই দুই পুরুষ হতে অত্যন্ত ভিন্ন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হয়ে সকলের ধারণ ও পালন করেন। তাঁকেই অবিনাশী পরমেশ্বর ও পরমাত্মা বলা হয়। ১৭

কারণ আমি বিনাশী জড়-ক্ষেত্রের অতীত এবং অবিনাশী জীবাত্মার থেকেও উত্তম। সেইজন্য জগতে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত। ১৮

হে ভারত ! যিনি আমাকে এইরূপে তত্ত্বত পুরুষোত্তম বলে জানেন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বতোভাবে নিত্য-নিরন্তর বাসুদেব পরমেশ্বররূপ আমারই ভজনা করেন। ১৯

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! আমি এইরূপে তোমাকে অত্যন্ত রহস্যযুক্ত গোপনীয় শাস্ত্রের কথা বললাম। এই তত্ত্ব জেনে মানুষ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হয়। ২০

—০—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভয়শূন্যতা, অন্তঃকরণের পূর্ণ নির্মলতা, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানযোগে দৃঢ় নিরন্তর স্থিতি, সাত্ত্বিক দান, ইন্দ্রিয়াদি সংযম, ভগবান-দেবতা ও গুরুজনাদির পূজা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান, বেদ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ভগবানের নাম-গুণকীর্তন, স্বধর্ম পালনে কষ্ট সহ্য করা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিসহ অন্তঃকরণের সরলতা। ১

কায়মনোবাক্যে কাউকে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া, যথার্থ ও প্রিয় ভাষণ, স্বীয় অপরাধকারীর প্রতিও ক্রোধ না করা, সকল কর্মে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা, চিত্ত-চাঞ্চল্যের অভাব, পরনিন্দাবর্জন, সর্বভূতে অহেতুক দয়া, বিষয়সমূহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ হলেও আসক্ত না হওয়া, কোমলতা, লোক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা এবং ব্যর্থ চেষ্টার অভাব। ২

তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, শত্রুভাব-রাহিত্য এবং নিজের মধ্যে পূজ্যতার অনভিমান, হে ভারত এই সমস্ত দৈবী সম্পদযুক্ত পুরুষদের লক্ষণ। ৩

হে পার্থ ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এইগুলি হল আসুরী সম্পদশালী পুরুষদের লক্ষণ। ৪

দৈবী সম্পদ সংসার বন্ধন হতে মুক্তির হেতু এবং আসুরী সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব ! তুমি শোক কোরো না, কারণ তুমি দৈব সম্পদ নিয়ে জন্মেছ। ৫

হে পার্থ ! ইহলোকে দুইপ্রকারের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, এক দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন এবং অপরটি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন। এদের মধ্যে দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি, এবার আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট শোনো। ৬

আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুটিকেই জানে না। তাই তাদের বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধিও নেই, সদাচার নেই এবং সত্যভাষণও নেই। ৭

এই আসুরী প্রকৃতির মানুষরা বলে যে এই জগৎ আশ্রয়বিহীন, সত্য শূন্য এবং এটির কেউ কর্মফলদাতা নেই। শুধু কামবশত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এটি উৎপন্ন, এছাড়া আর কিছুই নেই। ৮

এইরূপ ভ্রান্ত বুদ্ধি বা ধারণা অবলম্বন করে বিকৃত স্বভাব এবং মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, অহিতকারী ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ৯

এইসব দুষ্পূরণীয় বাসনায় পূর্ণ, দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত মানুষরা অজ্ঞানতাবশত অশুচি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অশুভ-ব্রতযুক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০

মৃত্যুকাল পর্যন্ত এরা অসংখ্য চিন্তার আশ্রয় নিয়ে বিষয়ভোগে রত ও 'ইহাই সুখ' এরূপ মনে করে থাকে। ১১

অসংখ্য আশাপাশে (আশারূপ রজ্জুতে) আবদ্ধ এবং কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে বিষয়ভোগের জন্য অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহে রত থাকে। ১২

তারা ভাবতে থাকে যে আজ আমার এই ধন লাভ হলে ভবিষ্যতে আমার এই আশা পূরণ হবে। আমার এত ধন আছে, পরে আরও ধন লাভ হবে। ১৩

এই দুর্জয় শত্রুকে আমি নাশ করেছি, এবার অন্যান্যদেরও নাশ করব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী। আমি পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান এবং সুখী। ১৪

আমি অত্যন্ত ধনী এবং অনেক আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত, আমার মতো আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আমোদ করব। এইপ্রকার অজ্ঞ, মোহগ্রস্ত এবং নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ত মোহজাল সমাবৃত এবং বিষয়ভোগে অত্যধিক আসক্ত আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভয়ানক অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৫-১৬

নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে সেই অহংকারী ব্যক্তি ধন, মান ও গর্বের সঙ্গে অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করে। ১৭

অহংকার, বল, দর্প, কামনা ক্রোধপরায়ণ এবং অপরের নিন্দাকারী ব্যক্তি নিজের দেহে ও অপরের দেহে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে। ১৮

সেই দ্বেষপরায়ণ, পাপাচারী, ক্রূর, নরাধমদের আমি এই সংসারে বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। ১৯

হে অর্জুন ! এই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে জন্মে জন্মে আসুরী-জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে তা থেকেও
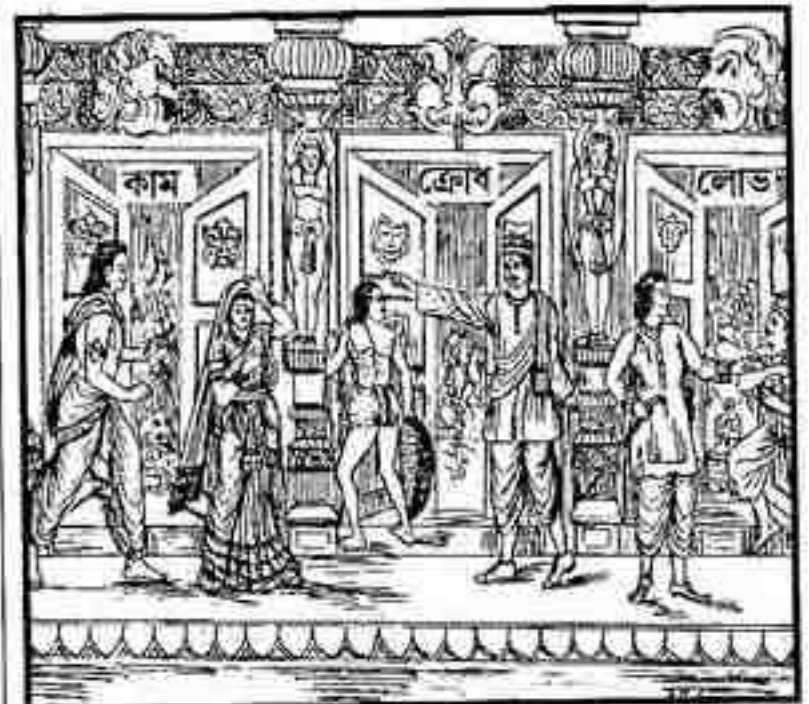
অত্যন্ত নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে পতিত হয়। ২০

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ এবং আত্মা হননকারী অর্থাৎ আত্মাকে অধোগামী করে। অতএব এই তিনটি বিষয় ত্যাগ করা উচিত। ২১

হে অর্জুন ! এই তিন নরকের দ্বার থেকে মুক্ত ব্যক্তি নিজ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। সেইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমাকে লাভ করেন। ২২

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে নিষিদ্ধ আচরণ করে, সে সিদ্ধি লাভ করে না, মোক্ষলাভ করে না এবং সুখও প্রাপ্ত হয় না। ২৩

কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব এই তত্ত্ব জেনে শাস্ত্রবিধিমতে তোমার কর্ম করা উচিত। ২৪

———o———

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

(শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ ! যাঁরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবতাগণের পূজা করেন, তাঁদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী ? ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এই শ্রদ্ধা জন্মান্তরকৃত ধর্মাদি সংস্কার হতে জাত হয়। মানুষের তিন প্রকার শ্রদ্ধা জন্মে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সেইগুলি তুমি আমার নিকট শোনো। ২

হে ভারত ! সকল মানুষের শ্রদ্ধা তাদের অন্তঃকরণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, অতএব যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেরূপই হন। ৩

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতের পূজা করেন। ৪

যে সব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিবর্জিত হয়ে শুধুমাত্র মনঃকল্পিত ঘোর তপস্যা করে এবং দম্ভ-অহংকারযুক্ত তথা কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমানে যুক্ত হয়। ৫
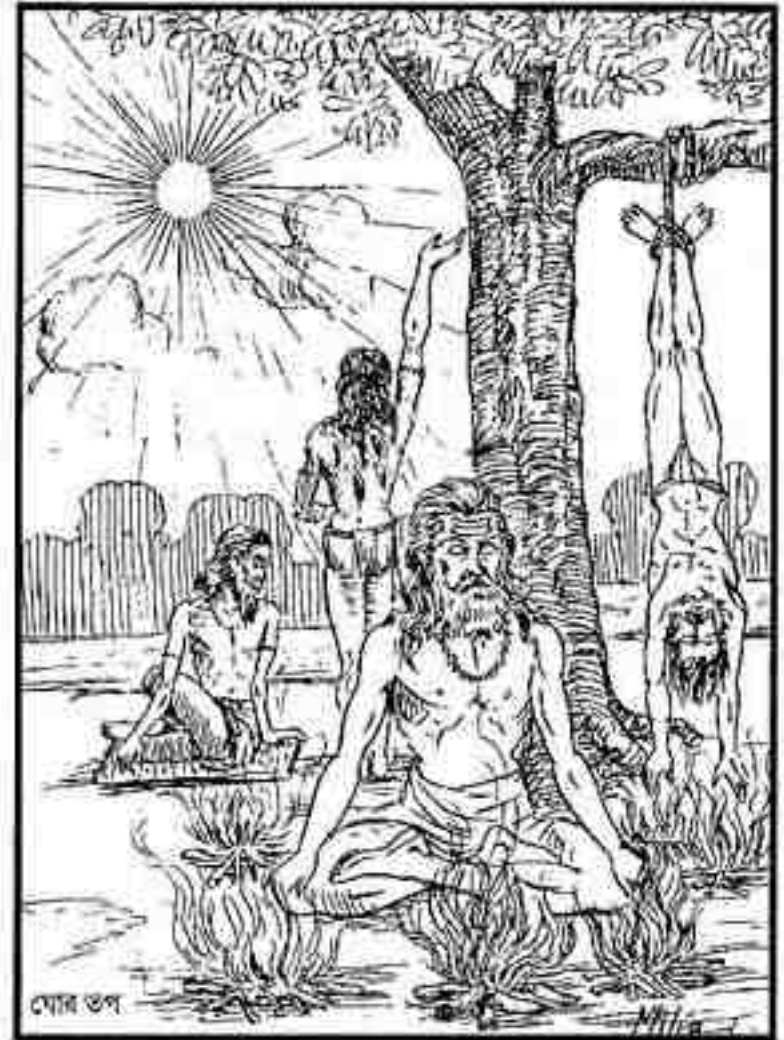
শরীরস্থ ভূতগণকে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মারূপ আমাকে ক্লিষ্ট করে, সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদের

তুমি আসুরী প্রকৃতির বলে জানবে। ৬

খাদ্যও সকলের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তিন প্রকার প্রিয় হয়। সেইরূপ যজ্ঞ-তপ এবং দানও তিন প্রকারের হয়। এইগুলির পার্থক্য শ্রবণ করো। ৭

আয়ু-বুদ্ধি-বল-আরোগ্য-সুখ ও প্রীতিবর্ধক, সরস-স্নিগ্ধ-পুষ্টিকর এবং মনোরম—এইসব আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। ৮

কটু-অম্ল-লবণাক্ত-অত্যন্ত গরম-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-প্রদাহ-কর এবং দুঃখ-চিন্তা-রোগ উৎপাদনকারী আহার রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। ৯

অর্ধপক্ব, রসহীন, দুর্গন্ধময়-বাসি-উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তির প্রিয় হয়। ১০

শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট যজ্ঞ করাই কর্তব্য—এতে নিশ্চয়যুক্ত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন পুরুষের দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয় তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

কিন্তু, হে অর্জুন ! শুধু দম্ভার্থে অথবা ফললাভের জন্য যে-যজ্ঞ করা হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে। ১২

যারা শাস্ত্রবিধিবর্জিত, অন্নদানশূন্য, মন্ত্রবিহীন, দক্ষিণাবিহীন এবং শ্রদ্ধারহিত, তাদের কৃত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়। ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পূজা,

পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা—এইগুলিকে শারীরিক তপস্যা বলা হয়। ১৪

যে-বাক্য অনুদ্বেগকর-প্রিয়-হিতকারক এবং যথার্থ ও বেদশাস্ত্রাদির পাঠ তথা ভগবদ্-নাম-জপাদিতে অভ্যাস তাকে বাচিক তপস্যা বলা হয়। ১৫

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, ভগবদ্‌চিন্তনের স্বভাব, মনের নিরোধ, অন্তঃকরণের পবিত্রতা—এইগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়। ১৬

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সমাহিত ব্যক্তিগণ পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে তপস্যা করেন তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। ১৭

সৎকার, মান ও পূজা পাবার আশায় দম্ভের সঙ্গে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে তা কদাচিৎ ফলপ্রদ হয়, সুতরাং তা অনিশ্চিত—সেই তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে। ১৮

দূরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে দেহেন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়ে অথবা অন্যের অনিষ্টের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক তপস্যা বলে। ১৯

দান করা কর্তব্য—এইভাবে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, সময়ে ও পাত্রে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ২০

কিন্তু যে-দান ক্লেশপূর্বক প্রত্যুপকারের আশায় অথবা ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে। ২১

সৎকাররহিত, অবজ্ঞাপূর্বক অযোগ্য পাত্রে অশুচি

স্থানে ও অশুভ সময়ে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলে। ২২

ওঁ, তৎ, সৎ—এই বাক্য দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম হয়েছে। এই ত্রিবিধ নির্দেশদ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞের কর্তা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের কারণ বেদ এবং যজ্ঞ রূপ ক্রিয়া নির্মিত হয়েছে। ২৩

সেই হেতু বেদবাদিগণ শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি কর্ম সর্বদা 'ওঁ' এই ব্রহ্মবাচক প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে আরম্ভ করেন। ২৪

'তৎ' এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে নানাবিধ যজ্ঞ-তপস্যা এবং দানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ২৫

হে পার্থ, সদ্‌ভাব ও সাধুভাব সম্পাদনার্থ 'সৎ' এই তৃতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং শুভ কর্মেও 'সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাতে যে-স্থিতি, তাকেও 'সৎ' বলা হয় এবং ভগবৎপ্রীতির জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকেও 'সৎ' নামে অভিহিত করা হয়। ২৭

হে অর্জুন ! হোম, দান, তপস্যা বা অন্য কোনো শুভ কর্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক করলে তাকে 'অসৎ' বলা হয় ; সেইজন্য সেগুলি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও ফলপ্রসূ হয় না। ২৮

—o—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

(মোক্ষসন্ন্যাসযোগ)

অর্জুন বললেন—হে মহাবাহো ! হে অন্তর্যামী ! হে বাসুদেব ! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পণ্ডিতগণের কেউ কেউ কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে জানেন, আবার অন্য কেউ বিচারশীল ব্যক্তি সর্ববিধ কর্মের ফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলে থাকেন। ২

কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি বলেন যে সমস্ত কর্মই দোষযুক্ত, অতএব সেগুলি ত্যাগ করা উচিত ; আবার অন্য কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। ৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! সন্ন্যাস এবং ত্যাগ, এই দুটির মধ্যে প্রথমে তুমি ত্যাগের বিষয়ে আমার অভিমত শোনো। ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়েছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ৪

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং এই সকল কর্ম করাই উচিত। কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী মনীষীগণের চিত্তশুদ্ধি-কারক। ৫

অতএব, হে পার্থ ! যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম এবং অন্যান্য সকল কর্তব্য-কর্ম, আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে অবশ্যই করা উচিত ; এই হল আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত। ৬

(নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্ম ত্যাগ করাই উচিত) কিন্তু অবশ্যকর্তব্য নিত্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, নিত্যকর্ম চিত্ত শুদ্ধিকর। মোহবশত এগুলি ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলা হয়। ৭

কর্মই দুঃখকর, মনে করে যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন, তিনি এই রাজস ত্যাগ করে ত্যাগের ফল মোক্ষ লাভ করতে পারেন না। ৮

হে অর্জুন ! শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ

বলে। ৯

যে-ব্যক্তি অশুভ কর্মে দ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হন না—সেই সত্ত্ব-গুণযুক্ত ব্যক্তিই সংশয়রহিত, বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত ত্যাগী। ১০

কারণ দেহাভিমানী মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয় ; তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকেই ত্যাগী বলা হয়। ১১

যাঁরা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন না, তাঁরা ভালো, মন্দ এবং ভালো-মন্দ মিশ্রিত—এইরূপ তিন প্রকারের ফল মৃত্যুর পরেও লাভ করেন। কিন্তু যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেছেন তাঁদের কোনো সময়েই কর্মফল হয় না। ১২

হে মহাবাহো ! সমস্ত কর্ম সম্পাদনের এই পাঁচটি হেতু কর্মবন্ধন হতে মুক্তির উপায়রূপে সাংখ্যশাস্ত্রে যেভাবে কথিত হয়েছে, সেগুলি তুমি আমার নিকট ভালোভাবে শোনো। ১৩

এই বিষয়ে অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান কর্তা, বিবিধ প্রকারের করণ এবং নানাবিধ চেষ্টা এবং অপর পঞ্চম কারণ হল দৈব। ১৪

মানুষ শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় যা-কিছু কর্ম করে এই পাঁচটি হল তার কারণ। ১৫

এতদ্‌সত্ত্বেও যে-ব্যক্তি অশুদ্ধবুদ্ধি হেতু ওই কর্ম সম্পাদনে শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকেই কর্তা বলে মনে করে, সেই মলিন বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক ঠিক বোঝে না। ১৬

যে-ব্যক্তির অন্তঃকরণে 'আমি কর্তা' এই ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি সাংসারিক পদার্থ এবং কর্মে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সকলকে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং পাপেও লিপ্ত হন না। ১৭

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই তিনটি একত্র হলে সকল কর্ম আরম্ভ হয় এবং কর্তা, করণ, ক্রিয়া এই তিনটিতে কর্ম সংগৃহীত হয়। ১৮

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ভেদে তিন প্রকারের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলিও তুমি যথাযথভাবে আমার কাছে শোনো। ১৯

যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে অবস্থিত এক অবিনাশী পরমাত্মাকে অবিভক্তরূপে দেখে, সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে। ২০

কিন্তু যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা-বিভক্ত সমস্ত ভূতে অবস্থিত নানা প্রকারের ভাবকে পৃথক পৃথক রূপে জানে, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলে জানবে। ২১

যে-জ্ঞান কোনো একটি দেহে পূর্ণরূপে আসক্ত, সেই যুক্তিবিহীন অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে জানবে। ২২

যে-কর্ম শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং কর্তৃত্বরহিত, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তির দ্বারা রাগ-দ্বেষবর্জিত হয়ে করা হয় তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়। ২৩

কিন্তু যে কর্ম বহু আয়াসসাধ্য এবং যা ভোগাকাঙ্ক্ষী অথবা অহংকারী পুরুষরা করে তাকে রাজস বলা হয়েছে। ২৪

ভবী শুভাশুভ ফল, ধনক্ষয়, শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও সামর্থ্যের বিচার না করে কেবল অবিবেকবশত যে কর্ম করা হয়, তাকে তামস কর্ম বলা হয়। ২৫

যে কর্তা সঙ্গহীন, অহংকারের কথা বলেন না, ধৈর্যশীল এবং উৎসাহী তথা কর্মে সফলতা বা বিফলতায় হর্ষ-শোকের বিচার হতে মুক্ত তাঁকে সাত্ত্বিক বলা হয়। ২৬

বাসনাকুলচিত্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী, পরপীড়ক, বাহ্যান্তর শৌচহীন, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে বিষাদযুক্ত—এইরূপ কর্তাকে রাজস কর্তা বলা হয়। ২৭

বিক্ষিপ্তচিত্ত, অত্যন্ত অসংস্কৃত বুদ্ধি, অনম্র, ধূর্ত, পরবৃত্তিনাশক, সদা বিষণ্ণ, অলস ও দীর্ঘসূত্রী কর্তাকে তামস কর্তা বলা হয়। ২৮

হে ধনঞ্জয় ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকারের ভেদ পৃথক পৃথক ভাবে বলছি শোনো। ২৯

হে পার্থ ! যে-বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ ঠিকমতো বুঝতে পারা যায়, তা হল সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। ৩০

হে পার্থ ! যে-বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম-অধর্ম এবং কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে যথাযথ বুঝতে পারা যায় না তা হল রাজসী বুদ্ধি। ৩১

হে পার্থ! যে-বুদ্ধি তমোগুণে সমাবৃত হয়ে অধর্মকে 'ধর্ম' মনে করে এবং সমস্ত বিষয়েই বিপরীত অর্থ করে, তা হল তামসী বুদ্ধি। ৩২

হে পার্থ ! যে অব্যভিচারিণী ধারণাশক্তিতে মানুষ ধ্যানযোগের দ্বারা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ধারণ করে, তাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে। ৩৩

কিন্তু, হে পৃথাপুত্র অর্জুন ! ফলাসক্ত মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা অত্যন্ত আসক্তিপূর্বক ধর্ম-অর্থ ও কামকে ধারণ করে, তাকে রাজসী ধৃতি বলে। ৩৪

হে পার্থ ! দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা নিদ্রা-ভয়-চিন্তা-দুঃখ এবং উন্মত্ততাকেও ত্যাগ করে না অর্থাৎ এইগুলিকে ধরে রাখে তাকে তামসী ধৃতি বলে। ৩৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তিন প্রকার সুখের বিষয় এইবার তুমি আমার নিকট শোনো। যে সুখে সাধক ভজন, ধ্যান এবং সেবাদির অভ্যাসের দ্বারা প্রীত ও পরিতৃপ্ত হন এবং পরিণামে দুঃখ হতে সম্যকরূপে মুক্ত হন—এইরূপ সুখ—যাকে আরম্ভে বিষতুল্য মনে হলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় ; সেইজন্য এই পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির নির্মলতা হতে উৎপন্ন সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়। ৩৬-৩৭।

যে-সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে হয়, যা প্রথমে ভোগকালে অমৃতবৎ মনে হলেও পরিণামে বিষতুল্য—সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়। ৩৮

যে-সুখ ভোগকালে এবং পরিণামে আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে—নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হতে জাত, সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয়। ৩৯

পৃথিবীতে বা স্বর্গে অথবা দেবতাদের মধ্যেও এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ রহিত। ৪০

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা শূদ্রদের কর্ম স্বভাবজাত গুণ-অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। ৪১

অন্তঃকরণের সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, ধর্মপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, অন্তর ও বাহিরকে শুচি রাখা, অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, কায়মনোবাক্যে সরল থাকা, বেদ, শাস্ত্র, ঈশ্বর এবং পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা রাখা, বেদাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন করা এবং পরমাত্মাতত্ত্ব অনুভব করা—এ সবই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা, দান করা এবং শাসনক্ষমতা—এই সবই ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত কর্ম। ৪৩

কৃষি, গোপালন, ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য ব্যবহার—এইগুলি বৈশ্যদের স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব বর্ণের সেবা করা শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম। ৪৪

নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্মে তৎপর ব্যক্তি ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। নিজ স্বাভাবিক কর্মে তৎপর ব্যক্তি কীরূপে কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন, আমার মুখে সেই বিধি শোনো। ৪৫

যে-পরমেশ্বর থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা অর্চনা করে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ৪৬

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম হতে গুণরহিত স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ ; কারণ স্বভাবকৃত নির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্মে মানুষের পাপ হয় না। ৪৭

অতএব, হে কুন্তীপুত্র ! দোষযুক্ত হলেও স্বভাবজ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সমস্ত কর্মই কোনো না কোনোভাবে দোষযুক্ত। ৪৮

সর্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সাংখ্যযোগের দ্বারা সেই পরম নৈষ্কর্মসিদ্ধি লাভ করেন। ৪৯

যা জ্ঞানযোগের পরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ, সেই নৈষ্কর্মসিদ্ধি লাভ করে মানুষ যেভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, হে কৌন্তেয় ! তুমি সংক্ষেপে তা আমার মুখে শোনো। ৫০

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, সাত্ত্বিক, মিতভোজী, শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করে একান্ত ও শুদ্ধস্থানে বসবাসকারী, সাত্ত্বিক ধৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে কায়মনোবাক্যে সংযমী, রাগ-দ্বেষ সর্বতোভাবে বর্জন-পূর্বক দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করে তথা অহংকার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ এবং পরিগ্রহ ত্যাগ করে নিরন্তর ধ্যানযোগে পরায়ণ, মমত্বশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নরূপে অবস্থান করতে সমর্থ হন। ৫১-৫৩

অতঃপর সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে একাত্মভাবে স্থিত প্রসন্নচিত্ত যোগী কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; এরূপ সর্বভূতে সমভাবযুক্ত যোগী আমার পরাভক্তি লাভ করেন। ৫৪

সেই পরাভক্তির দ্বারা তিনি পরমাত্মরূপী আমাকে, আমি কে এবং কতটা, তা ঠিক ঠিক তত্ত্বত জানতে পারেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে অচিরাৎ আমার মধ্যে প্রবেশ করেন। ৫৫

মৎপরায়ণ কর্মযোগী সকল কর্ম সর্বদা করতে থেকেও

আমার কৃপায় সনাতন অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৫৬

সমস্ত কর্ম মনে মনে আমাকে সমর্পণ করে সমবুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করে, মৎপরায়ণ হয়ে নিরন্তর আমাতে চিত্ত রাখো। ৫৭

উপরিউক্ত প্রকারে মদ্গত চিত্ত হয়ে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত সংকট অনায়াসে অতিক্রম করবে, আর যদি অহংকারবশত আমার কথা না শোনো, তবে বিনষ্ট হবে অর্থাৎ পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হবে। ৫৮

তুমি যে অহংকারবশত মনে করছ, তুমি যুদ্ধ করবে না, তোমার সেই সিদ্ধান্ত মিথ্যা ; কারণ তোমার স্বভাবই জোর করে তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে। ৫৯

হে কুন্তীপুত্র ! যে-কর্ম তুমি মোহবশত করতে চাইছ না, সেই কর্মই পূর্বকৃত স্বভাববশত কর্মে আবদ্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে করবে। ৬০

হে অর্জুন ! শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকল প্রাণীকে অন্তর্যামী পরমেশ্বর তাদের কর্ম-অনুসারে নিজ মায়ার দ্বারা চালিত করে সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত রয়েছেন। ৬১

হে ভরত ! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরেরই শরণাগত হও। তাঁর কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি এবং সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত হবে। ৬২

এইভাবে গুহ্য হতে অতি গুহ্য জ্ঞান আমি তোমাকে বললাম। এখন তুমি এই রহস্যময় জ্ঞানকে ভালোভাবে বিচার করে যেমন চাও, তেমন করো। ৬৩

সর্বাপেক্ষা গোপনীয় হতেও অতিশয় গোপনীয় আমার পরম রহস্যময় কথা আবার শোনো। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই এই পরম হিতকারক বাক্য তোমাকে পুনরায় বলব। ৬৪

হে অর্জুন ! তুমি আমার প্রতি মনযুক্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে এরূপ করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে ; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। ৬৫

সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্য কর্মের আশ্রয় আমাতে ত্যাগ করে তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বররূপ একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব, শোক কোরো না। ৬৬

এই গীতারূপ রহস্যময় উপদেশ কখনো তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, এবং শুনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বলবে না, আর যারা আমার প্রতি দোষদৃষ্টি রাখে তাদের তো কখনো বলবে না। ৬৭

যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তিপূর্বক এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট বলবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হবেন—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৬৮

মানুষের মধ্যে তাঁর অপেক্ষা প্রিয় কর্মকারী আমার আর কেউ নেই এবং পৃথিবীতে তাঁর অপেক্ষা শ্রেয় ভবিষ্যতে কেউ হবে না। ৬৯

এবং যে-ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মময় সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র পাঠ করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব—এই আমার মত। ৭০

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে এবং দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে উত্তম কর্মকারীদের শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন। ৭১

হে পার্থ ! তুমি কি এই গীতা শাস্ত্র একাগ্র মনে শুনেছ ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট

হয়েছে ? ৭২

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছি, এখন আমি নিঃসংশয় হয়েছি, অতএব আমি এখন আপনার আজ্ঞা পালন করব। ৭৩

সঞ্জয় বললেন—আমি এইভাবে ভগবান শ্রীবাসুদেব

এবং অর্জুনের এই অদ্ভুত, রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শুনেছি। ৭৪

বেদব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে এই পরম গুহ্য যোগের কথা স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বলছিলেন তখন আমি তা প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি। ৭৫

হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই রহস্যময়, কল্যাণকারী, অদ্ভুত কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি। ৭৬

হে রাজন্! শ্রীহরির সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমার চিত্তে মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি। ৭৭

হে রাজন্! যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে গাণ্ডীব ধনুর্ধারী অর্জুন সেইখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও অচল নীতি বিদ্যমান—এটাই আমার মত। ৭৮

—o—

রাজা যুধিষ্ঠিরের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং শল্যের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে যুদ্ধের জন্য অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! গীতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, তাই এটি ভালোভাবে স্বাধ্যায় করে বাস্তবায়িত করা উচিত। অন্য বহুশাস্ত্র সংগ্রহে কী লাভ? গীতায় সমস্ত শাস্ত্রের সমাবেশ হয়েছে, ভগবান সর্বদেবময়, গঙ্গায় সর্বতীর্থের বাস এবং মনুসকল দেবস্বরূপ। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ—গ-কারযুক্ত এই চার নাম হৃদয়ে স্থিত হলে আর এই জগতে জন্ম নিতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ভারতামৃতের সারভূত গীতা উপদেশ দান করেছেন।

সঞ্জয় বললেন—অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনুক ও বাণ ধারণ করতে দেখে মহারথীগণ সিংহনাদ করে উঠলেন। তখন পাণ্ডব, সোমক এবং তাঁদের অনুগামী রাজাগণ প্রসন্ন হয়ে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন এবং ভেরী, পেশী, ক্রকচ এবং সিঙ্গা অকস্মাৎ বেজে উঠে ভয়ানক গগনভেদী শব্দ সৃষ্টি করল।

দুপক্ষের সেনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর বর্ম এবং অস্ত্র রেখে রথ থেকে নেমে হাত জোড় করে দ্রুতগতিতে পূর্বদিকে, যেদিকে শত্রুসৈন্য দণ্ডায়মান ছিল, পিতামহ ভীষ্মের কাছে পদব্রজে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে এইভাবে যেতে দেখে অর্জুনও রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং সব ভাইরা একত্রে তাঁর পশ্চাদানুসরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য রাজারাও উৎসুক হয়ে তাঁদের অনুসরণ করলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কী চিন্তা করছেন? আমাদের ছেড়ে আপনি পদব্রজে শত্রুসৈন্য মধ্যে কেন যাচ্ছেন?' ভীমসেন বললেন—'রাজন্! শত্রুপক্ষের সৈন্যরা বর্মধারণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এই অবস্থায় আপনি আমাদের ছেড়ে, অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছেন?' নকুল বললেন—'মহারাজ! আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! আপনি এভাবে যাওয়ায় আমরা অত্যন্ত ভীত হচ্ছি। দয়া করে বলুন, আপনি কোথায় যেতে চান?' সহদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজন্! এই মহাভয়যুক্ত রণস্থলে এসে আমাদের পরিত্যাগ করে, শত্রুদের মধ্যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'
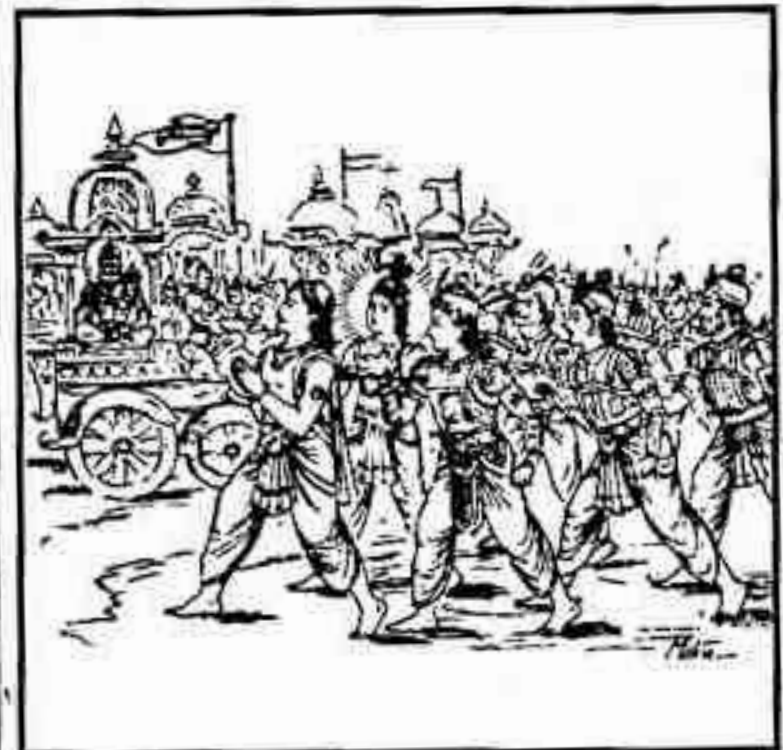
ভাইরা নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেও মহারাজ যুধিষ্ঠির কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি শান্তভাবে হেঁটেই চললেন। তখন চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যে বললেন—'আমি ওঁর অভিপ্রায় বুঝেছি। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য এই সব গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আমার অভিমত হল, যে ব্যক্তি তাঁর গুরুজনদের অনুমতি

না নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাকে তাঁরা স্পষ্টই অভিশাপ দিয়ে থাকেন আর যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে তাঁদের অভিবাদন করে, তাঁদের অনুমতি নিয়ে সংগ্রাম করে, সে অবশ্যই জয়লাভ করে।'

শ্রীকৃষ্ণ যখন এইসব কথা বলছিলেন তখন কৌরবদের সেনার মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল শুরু হল, কয়েকজন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দুর্যোধনের সৈনিকরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আসতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'আরে! এ কুলকলঙ্ক যুধিষ্ঠির! আরে, এর পিছনে অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেবের মতো বীর আছে! তবুও এ তো ভয় পেয়েছে।' এই বলে তারা কৌরবদের প্রশংসা করতে লাগল এবং খুশি মনে তাদের পতাকা উত্তোলন করতে আরম্ভ করল। যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে কৌরবগণ কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তিনি পিতামহ ভীষ্মকে কী বলবেন আর শ্রীকৃষ্ণ তথা ভীম ও অর্জুনও এখন কী করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ কাজে উভয় পক্ষের সেনারাই অত্যন্ত সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুসেনার মধ্য দিয়ে ভীষ্মের কাছে পৌঁছলেন এবং দুহাত দিয়ে তাঁর চরণ ধরে

বললেন—'অজেয় পিতামহ! আমি আপনাকে প্রণাম করি। আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন এবং সেই সঙ্গে কৃপা করে আশীর্বাদ দিন।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! তুমি যদি এখন আমার কাছে না আসতে, তাহলে আমি তোমাকে পরাজিত হওয়ার অভিশাপ দিতাম। কিন্তু এখন আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি যুদ্ধ করো, তোমার জয় হবে এবং এই যুদ্ধে তোমার সকল ইচ্ছাও পূর্ণ হবে। এছাড়াও তোমার যদি কোনো বর চাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে চেয়ে নাও ; কারণ তাহলে আর পরাজয় হবে না। রাজন্! মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—একথা সত্য এবং এই অর্থের দ্বারাই কৌরবরা আমাকে বেঁধে রেখেছে। সেজন্য আমি তোমাদের সঙ্গে নপুংসকের মতো ব্যবহার করছি। পুত্র! আমাকে তো কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করতেই হবে। এছাড়া তুমি অন্য যা বলতে চাও, বলতে পারো।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! আপনাকে কেউ পরাস্ত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আপনি যদি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, তহলে দয়া করে বলুন, আমরা যুদ্ধে কী করে আপনাকে পরাস্ত করব ?

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন! রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার সময় আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে—এমন কেউ আমার নজরে পড়ছে না। অন্য কারো কথা বাদ দাও—স্বয়ং ইন্দ্রেরও সেই শক্তি নেই। তাছাড়া আমার মৃত্যুরও কোনো সময় নিশ্চিত নেই। সুতরাং তুমি অন্য সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো।

মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কথা শিরোধার্য করে তাঁকে প্রণাম করে আচার্য দ্রোণের রথের দিকে চললেন। তিনি

আচার্যকে প্রণাম করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং নিজের মঙ্গলের জন্য বললেন, 'ভগবান ! আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ; আমি সেজন্য আপনার অনুমতি চাইছি, যাতে আমাদের কোনো পাপ না হয়। আপনি কৃপা করে বলুন আমরা কীভাবে শত্রুদের পরাস্ত করব।'

দ্রোণাচার্য বললেন—রাজন্ ! তুমি যদি যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বে আমার কাছে না আসতে তাহলে আমি তোমাকে পরাজিত হওয়ার অভিশাপ দিতাম। কিন্তু তোমার এই সম্মান প্রদানে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি যুদ্ধ করো, তোমার জয় হবে। আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। বলো, তুমি কী চাও ? এই অবস্থায় তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ব্যতীত তোমার অন্য যা ইচ্ছা, বলো ; কারণ মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—এই হল সত্য এবং এই অর্থের দ্বারাই কৌরবরা আমাদের বেঁধে রেখেছে। তাই আমি নপুংসকের ন্যায় তোমাকে বলছি যে তুমি তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ব্যতীত আমার কাছে আর অন্য কী চাও ? আমি কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তোমাদের বিজয় প্রার্থনা করি।

যুধিষ্ঠির বলেন—ব্রাহ্মণ্ ! আপনি কৌরবদের হয়েই যুদ্ধ করুন। আমি শুধু এই বর চাই যে আপনি আমার বিজয় প্রার্থনা করুন এবং আমাকে সৎপরামর্শ দিন।

দ্রোণাচার্য বললেন—রাজন্ ! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার পরামর্শদাতা, সুতরাং তোমার বিজয় নিশ্চিত। আমি তোমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিলাম। তুমি রণাঙ্গনে শত্রু সংহার করো। যেখানে ধর্মের অবস্থান, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, সেখানেই জয়ের অবস্থান। কুন্তীনন্দন ! এবার তুমি যুদ্ধ করতে যাও, আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে, জিজ্ঞাসা করো ; আমি তোমাকে আর কী পরামর্শ দেব ?

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—আচার্য ! আপনাকে প্রণাম করে আমি জানতে চাই, আপনাকে বধ করার কী উপায় !

দ্রোণাচার্য বললেন—রাজন্ ! যুদ্ধক্ষেত্রে রথারূঢ় হয়ে আমি যখন ক্রোধ ভরে বাণ বর্ষা করব, তখন আমাকে বধ করতে পারে—এমন কোনো শত্রু আমি দেখছি না। তবে,আমি যদি অস্ত্রত্যাগ করে হতচেতন হয়ে দণ্ডায়মান থাকি সেইসময় কোনো যোদ্ধা আমাকে বধ করতে সক্ষম হবে—আমি তোমাকে এই সত্য জানিয়ে দিলাম। তোমাকে আর একটি সত্য কথা বলি—যদি কোনো বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি আমাকে মর্মান্তিক কোনো কথা বলে, তাহলে আমি রণক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করব।

দ্রোণাচার্যের এই কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অনুমতি নিয়ে কৃপাচার্যের কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম ও

প্রদক্ষিণ করে বললেন—গুরুদেব ! আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ; আমি তাই আপনার অনুমতি চাইছি, যাতে আমার কোনো পাপ না হয়। তাছাড়া আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি শত্রুজয় করতে পারব।

কৃপাচার্য বললেন—রাজন্ ! যুদ্ধ প্রারম্ভের পূর্বে তুমি যদি আমার কাছে না আসতে তাহলে আমি তোমাকে শাপ দিতাম। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—একথা সত্য এবং এই অর্থের দ্বারাই কৌরবরা আমাকে বেঁধে রেখেছে ; তাই আমাকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে হবে, সেটাই আমি স্থির করেছি। তাই নপুংসকের ন্যায় বলতে হচ্ছে যে তোমার হয়ে যুদ্ধ করা ব্যতীত তোমার আর যা ইচ্ছা, বর প্রার্থনা করো।

যুধিষ্ঠির বললেন—আচার্য ! তাই আমি আপনাকে বলছি, শুনুন........।

এই কথা বলেই ধর্মরাজ ব্যথিত হয়ে অচেতনের মতো হয়ে পড়লেন, কোনো কথাই আর বলতে পারলেন না। তাঁর অভিপ্রায় বুঝে কৃপাচার্য বললেন—রাজন্ ! আমাকে কেউই বধ করতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা কোরো না ; তুমি

যুদ্ধ করো, তোমার জয় হবেই। এই সময় তুমি এখানে আসায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি প্রত্যহ প্রভাতে তোমার বিজয় কামনা করব।

কৃপাচার্যের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অনুমতি নিয়ে মদ্ররাজ শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে

নিজ মঙ্গলের জন্য তাঁকে বললেন—রাজন্ ! আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তাই আমি আপনার কাছে অনুমতি চাইছি, যাতে আমার কোনো পাপ না হয় এবং আপনার আদেশ হলে আমি শত্রু জয় করতে পারি।

শল্য বললেন—রাজন্ ! যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে তুমি যদি আমার কাছে না আসতে তাহলে আমি তোমাকে পরাজয়ের অভিশাপ দিতাম। এখন এসে তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ, তাই আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি, তুমি যুদ্ধ করো, তোমারই জয় হবে। তোমার কোনো অভিলাষ থাকলে আমাকে বলো। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—একথা সত্য এবং এই অর্থ দ্বারাই কৌরবরা আমাকে বেঁধে রেখেছে। তাই আমি নপুংসকের মতো জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ব্যতীত তুমি আর কী আমার কাছে চাও ? তুমি আমার ভাগিনেয়, তোমার যা ইচ্ছা, আমি তা পূর্ণ করব।

যুধিষ্ঠির বললেন—মাতুল ! সৈন্য সংগ্রহ করার সময় আমি আপনার কাছে যে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, তাই আমার বর প্রার্থনা। কর্ণের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ হবে, তখন আপনি তার তেজ হরণ করবেন।

শল্য বললেন—কুন্তীনন্দন ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। যাও নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধ করো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কথা রাখব।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! মদ্ররাজ শল্যের অনুমতি নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সঙ্গে সেই বিশাল বাহিনীর বাইরে এলেন। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমি শুনছি যে ভীষ্মের সঙ্গে দ্বেষবশত তুমি যুদ্ধ করবে না। যদি তাই হয় তাহলে যতদিন ভীষ্ম বধ না হচ্ছেন, ততদিন তুমি আমাদের পক্ষে এসো। ভীষ্ম বধ হলে যদি তোমার দুর্যোধনকে সাহায্য করা উচিত বলে মনে হয় তখন তুমি আবার আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

কর্ণ বললেন—কেশব ! আমি কখনো দুর্যোধনের অপ্রিয় কাজ করব না। আপনি আমাকে দুর্যোধনের প্রাণপ্রিয় হিতৈষী বলে জানবেন।

কর্ণের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে পাণ্ডবদের কাছে চলে এলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তারপর সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'যেসব বীর আমাদের সঙ্গে থাকতে চান, আমাদের সাহায্য করার জন্য আমি তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি।' এইকথা শুনে যুযুৎসু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ ! আপনি যদি আমার সেবা স্বীকার করেন, তাহলে আমি এই মহাযুদ্ধে আপনাদের পক্ষ নিয়ে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

যুধিষ্ঠির বললেন—যুযুৎসু ! এসো, এসো, আমরা সকলে মিলে তোমার মূর্খ ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। মহাবাহো ! আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করো। মনে হচ্ছে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশের ধারা তোমার দ্বারা রক্ষা হবে এবং তিনি তোমার পিণ্ডই প্রাপ্ত হবেন।

রাজন্ ! যুযুৎসু দুন্দুভির বাদ্যের সঙ্গে আপনার পুত্রদের পরিত্যাগ করে পাণ্ডব সেনায় যোগ দিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন ভাইদের সঙ্গে পুনরায় প্রসন্নতাপূর্বক বর্ম পরিধান

করলেন। সকলে নিজ নিজ রথে আরোহণ করলেন, দুন্দুভি বাজতে লাগল এবং যোদ্ধাগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। পাণ্ডবদের রথে আরোহণ করতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্য রাজাগণ হর্ষান্বিত হলেন। পাণ্ডবগণ সম্মানীয়দের মান প্রদর্শন করায় গৌরব লাভ করলেন, রাজারা তাই দেখে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁদের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পাণ্ডবদের সৌহার্দ, কৃপা এবং দয়ার কথা আলোচনা করতে লাগলেন।

———o———

যুদ্ধ আরম্ভ—উভয় পক্ষের বীরদের পরস্পর যুদ্ধ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! এইভাবে আমার পুত্র ও পাণ্ডব সেনাদের ব্যূহ রচনা হয়ে গেলে উভয়ের মধ্যে প্রথম কারা যুদ্ধ শুরু করে ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ভ্রাতাসহ আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীষ্মকে অগ্রগামী করে সেনাসহ এগোলেন। তেমনই ভীমসেনের নেতৃত্বে পাণ্ডবগণও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রসন্নতার সঙ্গে এগিয়ে এলেন। তারপর দুপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। পাণ্ডবরা আমাদের সেনার ওপর আক্রমণ করলে আমাদের সৈন্যও ওঁদের ওপর আক্রমণ চালাল। দুপক্ষে এত ভীষণ শব্দ হচ্ছিল যা শুনে রোমাঞ্চ হয়। মহাবাহু ভীম বৃষের মতো গর্জন করে উঠলেন। তাঁর সেই গর্জন শুনে আপনার সৈন্যদের হৃদয় কম্পিত হল। সিংহের গর্জন শুনে জঙ্গলের পশুরা যেমন মলমূত্র ত্যাগ করে, ভীমের গর্জন শুনে তেমনই আপনার পক্ষের হাতি, ঘোড়াগুলি মলমূত্র ত্যাগ করতে লাগল। ভীম বিকটরূপ ধারণ করে এগোতে লাগলেন। তাই দেখে আপনার পুত্ররা বাণের দ্বারা তাঁকে ঢেকে দিলেন, মেঘ যেমন করে সূর্যকে ঢেকে ফেলে। সেই সময় দুর্যোধন, দুর্মুখ, দুঃসহ, শল, দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ এবং সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা—এরা সব বড় বড় ধনুকে বিষধর সর্পের ন্যায় বাণ ছুঁড়ছিলেন। অপর দিকে দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণের সাহায্যে আপনার পুত্রদের আঘাত করতে করতে এগোচ্ছিলেন। এইভাবে ভীষণ টংকারের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ শুরু হল। দুপক্ষের কোনো বীরই পশ্চাদপসরণ করেনি।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁর কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ ধনুক নিয়ে অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং পরম তেজস্বী অর্জুনও তাঁর জগদ্বিখ্যাত গাণ্ডীব ধনুক নিয়ে ভীষ্মের ওপর আক্রমণ হানলেন। দুই কুরুবীর একে অপরকে মারার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্ম অর্জুনকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা

করলেন, কিন্তু অর্জুনের কিছুই ক্ষতি করতে পারলেন না। সাত্যকি কৃতবর্মাকে আক্রমণ করলেন, তাঁদের মধ্যে ভীষণ রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল। মহাধনুর্ধর কোশলরাজ বৃহদ্বলের সঙ্গে অভিমন্যু যুদ্ধে রত ছিলেন, তিনি অভিমন্যুর রথের ধ্বজা কেটে সারথিকে হত্যা করেন। অভিমন্যু তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নয়টি বাণ ছুঁড়ে বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করলেন এবং আরও দুটি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে রথের ধ্বজা এবং সারথি ও চক্ররক্ষককে হত্যা করলেন। ভীমসেনের সঙ্গে আপনার পুত্রের যুদ্ধ হচ্ছিল। দুই মহাবলী যোদ্ধা রণাঙ্গনে একে অপরের ওপর বাণ বর্ষণ করছিলেন। তাঁদের দেখে সকলে বিস্মিত হচ্ছিলেন। এদিকে দুঃশাসন মহাবলী নকুলের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং দুর্মুখ সহদেবের ওপর বাণ বর্ষণ করে তাঁকে আঘাত করছিলেন। সেইসময় সহদেব এক তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে দুর্মুখের সারথিকে হত্যা করেন। তারপর দুজনে একে অপরের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে থাকেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং শল্যের সম্মুখীন হলেন। মদ্ররাজ শল্য তাঁর ধনুক দুটুকরো করে দিলেন। ধর্মরাজ তৎক্ষণাৎ

অন্য একটি ধনুক নিয়ে শল্যকে বাণ দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হলেন। দ্রোণাচার্য কুপিত হয়ে তাঁর ধনুক তিন টুকরো করে দিলেন এবং কালদণ্ডের ন্যায় এক ভীষণ বাণ মারলেন, সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরে গিয়ে বিঁধল। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অপর একটি ধনুক তুলে নিয়ে একসঙ্গে চোদ্দটি বাণ নিক্ষেপ করে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করলেন। এভাবে দুই বীর তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। শঙ্খ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন এবং 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলে গর্জন করে উঠলেন। তিনি তাঁর ডান হাত কেটে ফেললেন। ভূরিশ্রবা শঙ্খের গলা ও কাঁধের মধ্যে হাড়ের ওপর আঘাত করলেন। সেই দুই রণোন্মত্তবীর ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন। রাজা বাহ্লীককে যুদ্ধে আসতে দেখে চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এগিয়ে এসে সিংহের ন্যায় গর্জন করে তাঁর ওপর বাণ বর্ষণ করলেন এবং দুজনে ক্রোধে গর্জন করতে করতে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। রাক্ষসরাজ অলম্বুষের সঙ্গে ঘটোৎকচের যুদ্ধ শুরু হল, ঘটোৎকচ নব্বইটি বাণ দিয়ে অলম্বুষকে আঘাত করলেন, অলম্বুষও ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। মহাবলী শিখণ্ডী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ওপর আক্রমণ চালালেন। অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণ তীরের সাহায্যে শিখণ্ডীকে অধৈর্য করে তুললেন। তারপর শিখণ্ডী এক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণপুত্রকে আঘাত করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এইভাবে এঁরা একে অপরকে বাণের সাহায্যে পীড়িত করতে লাগলেন।

সেনানায়ক বিরাট মহাবীর ভগদত্তর সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। মেঘ যেমন পর্বতে জলবর্ষণ করে, তেমনই বিরাট ভগদত্তের ওপর বাণবর্ষণ করে তাঁকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। আচার্য কৃপ কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের ওপর আক্রমণ করলেন। কেকয়রাজও কৃপাচার্যকে বাণে ঢেকে দিলেন। তাঁরা দুজনে একে অন্যের ঘোড়া ও ধনুক কেটে ফেললেন। রথহীন হয়ে তাঁরা দুজনেই খড়্গযুদ্ধ করার জন্য সামনাসামনি হলেন। সেইসময় তাঁদের দুজনের ঘোর সংগ্রাম হল। রাজা দ্রুপদ জয়দ্রথকে আক্রমণ করলেন, জয়দ্রথ তিনটি বাণে দ্রুপদকে আঘাত করলেন, দ্রুপদও জয়দ্রথকে বাণের দ্বারা আহত করলেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ সুতসোমকে আক্রমণ করেন, দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, দুজনের কেউই পশ্চাদাপসরণ করেননি। মহারথী চেকিতান সুশর্মাকে আক্রমণ করেন, সুশর্মা ভীষণ বাণবর্ষা করে তাঁর অগ্রগমন রোধ করেন। চেকিতানও ক্রোধান্বিত হয়ে বাণের দ্বারা সুশর্মাকে ঢেকে ফেললেন। শকুনি পরম পরাক্রমশালী প্রতিবিন্ধ্যকে আক্রমণ করেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরনন্দন প্রতিবিন্ধ্য তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে শকুনিকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা কাম্বোজ মহারথী সুদক্ষিণের প্রতি ধাবিত হন। সুদক্ষিণ তাঁকে বাণবিদ্ধ করলেও, তিনি যুদ্ধে পিছু হটেননি। তিনি ক্রোধভরে বহু বাণের দ্বারা সুদক্ষিণকে বিদীর্ণ করতে লাগলেন। অর্জুনের পুত্র ইরাবান শ্রুতায়ুর কাছে এসে তার ঘোড়াকে মেরে ফেললেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রুতায়ু তাঁর গদার সাহায্যে ইরাবানের ঘোড়াকে বধ করলেন। উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল!

মহারথী কুন্তীভোজের সঙ্গে অবন্তীরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দের যুদ্ধ শুরু হল। তাঁরা নিজ নিজ বিশাল বাহিনী নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন। অনুবিন্দ কুন্তীভোজকে গদা দ্বারা আঘাত করলে কুন্তীভোজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে বাণের দ্বারা আক্রমণ করেন। কুন্তীভোজের পুত্র বাণের দ্বারা আঘাত করলে বিন্দও তাঁকে বাণে বিদীর্ণ করে দিলেন। এইভাবে তাঁদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। কেকয়দেশের পাঁচ সহোদর রাজপুত্র গান্ধার দেশের পাঁচ রাজকুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে উভয় পক্ষের সেনারাও ছিল। আপনার পুত্র বীরবাহু রাজা বিরাটের পুত্র উত্তরের সঙ্গে সংগ্রামে রত হয়ে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করে দিলেন। উত্তর তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। চেদিরাজ উলূককে আক্রমণ করলেন, উলূকও তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তার মোকাবিলা করতে লাগলেন। এইভাবে দুপক্ষে ঘোর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

সেই সময় সমস্ত বীর এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে কেউ কাউকে চিনতে পারছিল না। হাতির সঙ্গে হাতি, রথীর সঙ্গে রথী, ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের যুদ্ধ হতে লাগল। দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ এবং চারণও সেখানে সেই দেবাসুরসম সংগ্রাম দেখতে লাগলেন। রাজন্‌! সেই সংগ্রামে লাখ লাখ পদাতিক মর্যাদা পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করছিল। সেখানে পিতা পুত্রকে পুত্রও পিতাকে আঘাত করে যুদ্ধ করছিল। এইরূপ ভাই ভায়ের, ভাগিনেয় মামার, মামা ভাগিনেয়র এবং মিত্র মিত্রকে গ্রাহ্য করছিল না। মনে হচ্ছিল তারা সব ভূতাবিষ্ট হয়ে যুদ্ধ করছে। সেই যুদ্ধ যখন মর্যাদাহীন ও ভয়ংকর হয়ে উঠল তখন ভীষ্মকে সামনে দেখে পাণ্ডব সেনা কম্পিত হয়ে উঠল।

অভিমন্যু, উত্তর এবং শ্বেতের সংগ্রাম এবং উত্তর ও শ্বেত বধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্‌! সেই ভয়ংকর দিনের প্রথম ভাগ অতিক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন বহু বীরদের সংহার হল, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধনের প্রেরণায় দুর্মুখ, কৃতবর্মা, কৃপ, শল্য এবং বিবিংশতি পিতামহ ভীষ্মের কাছে এলেন। এই পাঁচ মহারথী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলেন। তা দেখে অভিমন্যু ক্রোধাতুর হয়ে তাঁর রথে করে ভীষ্ম এবং পাঁচ মহারথীর সামনে এসে হাজির হলেন। তিনি একটি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে ভীষ্মের তালবৃক্ষ চিহ্নিত ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং সকলের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। তিনি কৃতবর্মাকে এক, শল্যকে পাঁচ এবং পিতামহকে নয়টি বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তারপর একটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা দুর্মুখের সারথির মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং অন্য আর এক বাণে কৃপাচার্যের ধনুক কেটে দিলেন। রণভূমিতে এইভাবে অভিমন্যু সকল বীরকে ত্রস্ত করে রাখলেন। তাঁর যুদ্ধের পারদর্শিতা দেখে দেবতারাও প্রসন্ন হলেন এবং ভীষ্মাদি মহারথীগণ তাঁকে অর্জুনেরই সমান বলে মনে করলেন। তখন কৃতবর্মা, কৃপ, শল্য ও অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু অভিমন্যু মৈনাক পর্বতের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না এবং কৌরব বীরগণ তাঁকে বেষ্টন করে রাখলেও সেই বীর মহারথী পাঁচ মহারথীর ওপর বাণ বর্ষা অব্যাহত রাখলেন। তাঁদের হাজার হাজার বাণকে আটকে দিয়ে ভীষ্মের ওপর বাণ বর্ষণ করতে করতে সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন।

রাজন্‌! মহাবলী ভীষ্ম তখন অত্যন্ত অদ্ভুত এক ভীষণ দিব্যাস্ত্র প্রকটিত করে তার দ্বারা অভিমন্যুর ওপর হাজার হাজার বাণ ছুঁড়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। তখন বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, ভীম, সাত্যকি এবং পাঁচ কেকয়বংশীয় রাজকুমার—পাণ্ডবপক্ষের এই দশ মহারথী অত্যন্ত দ্রুত অভিমন্যুর রক্ষার জন্য এগোলেন। তাঁরা যেই আক্রমণ করলেন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তখনই পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে তিন এবং সাত্যকিকে নয়টি বাণ দিয়ে আঘাত করলেন আর অপর এক বাণে ভীমসেনের রথের ধ্বজা কেটে ফেললেন। ভীমসেন তিন বাণে ভীষ্মের, এক বাণে কৃপাচার্যের এবং আট বাণে কৃতবর্মাকে আঘাত করলেন। রাজা বিরাটের পুত্র অত্যন্ত বেগে হাতিতে চড়ে শল্যের ওপর আক্রমণ করলেন। হাতিকে দ্রুত তাঁর রথের দিকে আসতে দেখে মহারাজ শল্য বাণের সাহায্যে তার গতিরোধ করলেন। হাতি তাতে ক্ষেপে উঠে রথের ওপর পা তুলে তার চারটি ঘোড়াকেই বধ করল। ঘোড়াগুলি মারা যেতে রথের ওপরে বসেই শল্য এক ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করলেন, তাইতে উত্তরের বর্ম ভেঙে গেল, তার হাতের অঙ্কুশ ও অস্ত্র পড়ে গেল এবং তিনি অচেতন হয়ে হাতি থেকে নীচে পড়ে গেলেন। তখন শল্য তরবারি নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে হাতির শুঁড় কেটে ফেললেন। হাতি প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে মারা গেল। রাজা শল্য তারপর কৃতবর্মার রথে আরোহণ করলেন।

বিরাটপুত্র শ্বেত যখন তাঁর ভাই উত্তরের মৃত্যু ও শল্যকে

কৃপবর্মার রথে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ বিশাল ধনুক নিয়ে দ্রুত শল্যকে বধ করার জন্য এগোলেন। তিনি শল্যের প্রতি বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। মদ্ররাজ শল্যকে মৃত্যুর মুখে পড়তে দেখে কৌরব পক্ষের সাত মহারথী শ্বেতকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল, মগধরাজ জয়ৎসেন, শল্যপুত্র রুক্মরথ, কম্বোজ নরেশ সুদক্ষিণ, বিন্দ, অনুবিন্দ এবং জয়দ্রথ—এই সাত বীর শ্বেতের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেনাপতি শ্বেত সাত বাণে তাঁদের সাতটি ধনুক কেটে ফেললেন। তখন সেই মহারথীগণ শক্তি তুলে ভীষণ গর্জন করে শ্বেতের ওপর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম শ্বেত সাতটি বাণের সাহায্যে সেগুলি প্রতিহত করলেন। তারপর তিনি এক ভীষণ বাণ রুক্মরথের ওপর নিক্ষেপ করলেন। তার ভীষণ আঘাতে রুক্মরথ অচেতন হয়ে রথের পিছনে পড়ে গেলেন। তাঁকে অচেতন দেখে সঙ্গে সঙ্গে সারথি তাঁকে নিয়ে রণভূমি থেকে চলে গেলেন। শ্বেতকুমার তারপর ছয় বাণ দিয়ে ছয় মহারথীর ধ্বজার অগ্রভাগ কেটে দিলেন এবং ঘোড়া ও সারথিদেরও আঘাত করলেন। তারপর তিনি বাণের দ্বারা তাঁদের আচ্ছাদিত করে শল্যের রথের দিকে এগোলেন। তার ফলে আপনার সৈন্যদলে মহা কোলাহল শুরু হল। সেনাপতি শ্বেতকে শল্যের দিকে যেতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীষ্মকে অগ্রগামী করে সমস্ত সৈন্যসহ শ্বেতের রথের সামনে এলেন এবং মৃত্যুমুখ থেকে শল্যকে রক্ষা করলেন। তারপর ঘোর রোমাঞ্চকর যুদ্ধ শুরু হল এবং পিতামহ ভীষ্ম—অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ এবং চেদি ও মৎস্যদেশের রাজাদের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! রাজকুমার শ্বেত শল্যের রথের সামনে পৌঁছলে কৌরব, পাণ্ডব এবং শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কী করলেন—আমাকে জানাও।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! সেই সময় লাখ লাখ ক্ষত্রিয় বীর রাজকুমার শ্বেতকে রক্ষা করছিলেন। তাঁরা পিতামহ ভীষ্মের রথকে বেষ্টন করে রেখেছিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল। ভীষ্মের দ্বারা নিহত হওয়ায় বহু রথ শূন্য হয়ে গেল, সেই সময় ভীষ্মের অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল। রাজকুমার শ্বেতও হাজার হাজার রথীকে নিহত করলেন। আমিও শ্বেতের ভয়ে রথ ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছি, তাই মহারাজকে দর্শন করতে পারলাম। এই ভীষণ ঝামেলার মধ্যে একমাত্র ভীষ্মই সুমেরু পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি তাঁর প্রাণের মায়া ত্যাগ করে নির্ভীকভাবে পাণ্ডবসেনা সংহার করছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শ্বেত অত্যন্ত দ্রুত কৌরব সেনা সংহার করছে, তখন তিনি সত্বর তাঁর সামনে এলেন। কিন্তু শ্বেত প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করে তাঁকে ঢেকে ফেললেন। ভীষ্মও বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় শ্বেত রক্ষা না করলে ভীষ্ম একদিনেই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যই ধ্বংস করে দিতেন। পাণ্ডবরা যখন দেখলেন ভীষ্ম মুখ ফিরিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। কিন্তু আপনার পুত্র দুর্যোধন বিষণ্ণ হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য রাজাদের নিয়ে সৈন্যসহ পাণ্ডবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর নির্দেশেই দুর্মুখ, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং শল্য ভীষ্মকে রক্ষা করছিলেন।

শ্বেত যখন দেখলেন যে দুর্যোধন এবং অন্য রাজারা মিলে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করছেন তখন তিনি ভীষ্মকে ছেড়ে কৌরব সেনা নিধন করতে লাগলেন। আপনার সেনাদের এইভাবে ছিন্নভিন্ন করে শ্বেত আবার ভীষ্মের সামনে এসে হাজির হলেন। তারপর দুজনে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় একে অপরের প্রাণ নেওয়ার জন্য যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। শ্বেত অট্টহাস্য করে নয়টি বাণের সাহায্যে ভীষ্মের ধনুক দশ টুকরো করে দিলেন এবং আর এক বাণে তাঁর ধ্বজা কেটে দিলেন। আপনার পুত্ররা মনে করলেন যে এবার শ্বেতের হাতে পড়ে ভীষ্ম নিহত হবেন, পাণ্ডবরা আনন্দে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন।

দুর্যোধন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সেনাদের আদেশ দিয়ে বললেন—'তোমরা সকলে সতর্ক হয়ে চারদিক থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করো, দেখো, উনি যেন আমাদের সামনেই শ্বেতের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত না হন।' রাজার আদেশ শুনে সব মহারথী অত্যন্ত শীঘ্র চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। বাহ্লীক, কৃতবর্মা, শল, শল্য, জলসন্ধ, বিকর্ণ, চিত্রসেন এবং বিবিংশতি—এই সব মহারথী সত্বর ভীষ্মকে চারদিক দিয়ে ঘিরে শ্বেতের ওপর ভয়ানক বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু মহা ধনুর্ধর শ্বেত তাঁর হস্তকৌশলের দ্বারা সমস্ত বাণ প্রতিহত করলেন। তারপর সিংহ যেমন হাতিদের পিছনে হটিয়ে দেয় তেমন করে শ্বেত সমস্ত বীরকে বাধাপ্রদান করে বাণের সাহায্যে ভীষ্মের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীষ্ম তখন অন্য ধনুকের

সাহায্যে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। সেনাপতি শ্বেত তখন ক্রুদ্ধ হয়ে লৌহ নির্মিত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীষ্মকে ব্যাকুল করে তুললেন। রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং আপনার সেনাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। শ্বেতের বাণে আহত হয়ে ভীষ্মকে পশ্চাদাপসরণ করতে দেখে অনেকেই মনে করলেন যে এবারে শ্বেতের হাতে ভীষ্ম বধ হবেন। ভীষ্ম যখন দেখলেন তাঁর রথের ধ্বজা কাটা পড়েছে এবং সেনারাও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চারটি বাণের সাহায্যে শ্বেতের চারটি ঘোড়া মেরে ফেললেন, দুটি বাণে তাঁর ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং একটির সাহায্যে সারথির মাথা কেটে ফেললেন। সূত এবং ঘোড়াগুলি মারা যাওয়াতে শ্বেত ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। শ্বেতকে রথহীন দেখে ভীষ্ম চারদিক থেকে তীক্ষ্ণবাণে তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন শ্বেত নিজের রথে ধনুকটি ফেলে কালদণ্ডের ন্যায় একটি শক্তি তুলে নিয়ে 'পৌরুষ ধারণ করে দাঁড়াও ; আমার পরাক্রম দেখো'—এই বলে ভীষ্মের ওপর সেই শক্তিটি নিক্ষেপ করলেন। সেই ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করতে দেখে

আপনার পুত্ররা হাহাকার করে উঠল। কিন্তু ভীষ্ম একটুও ভয় পেলেন না। তিনি আট-নটি বাণের সাহায্যে সেটি মধ্যপথেই দ্বিখণ্ডিত করলেন। তাই দেখে আপনার লোকেরা জয় জয়কার করে উঠল।

বিরাট পুত্র শ্বেত তখন ক্রোধের হাসি হেসে ভীষ্মকে বধ করার জন্য গদা নিয়ে সবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। ভীষ্ম দেখলেন শ্বেতকে থামানো অসম্ভব ; তাই তিনি তার হাত থেকে রক্ষা পেতে মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন। শ্বেত গদাটি ঘুরিয়ে রথের ওপর ছুঁড়লেন, গদার আঘাতে তাঁর রথ, সারথি, ধ্বজা এবং ঘোড়াগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ভীষ্মকে রথহীন দেখে শল্য ইত্যাদি অন্য রথীগণ রথ নিয়ে তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে এলেন। ভীষ্ম অন্য রথে আরোহণ করে স্মিত হাস্যে শ্বেতের দিকে এগোলেন। সেই সময় আকাশবাণী শোনা গেল—'মহাবাহো ভীষ্ম ! শীঘ্র একে বধ করার ব্যবস্থা করুন। বিশ্বকর্তা বিধাতা এই সময়েই তার বধের জন্য স্থির করে রেখেছেন।' আকাশবাণী শুনে ভীষ্ম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে বধ করা স্থির করলেন। শ্বেতকে রথহীন দেখে সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু এবং অভিমন্যু এক সঙ্গে তাঁদের রথ নিয়ে এগোলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শল্যসহ ভীষ্ম তাঁদের বাধা দিলেন। শ্বেত সেইসময় তরবারি বার করে ভীষ্মের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীম তৎক্ষণাৎ আর একটি ধনুক নিয়ে সত্বর শ্বেতের দিকে এগোলেন। সামনে এসে পড়ায় তিনি ভীমসেনকে ষাট, অভিমন্যুকে তিন, সাত্যকিকে একশত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে কুড়ি এবং কেকয়রাজকে পাঁচটি বাণের সাহায্যে প্রতিহত করলেন। তারপর সোজা শ্বেতের সামনে পৌঁছলেন এবং ধনুকে মৃত্যুসম এক বাণ যোজন করে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে সেটি নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শ্বেতের বর্মভেদ করে তার বুকে ঢুকে বিদ্যুৎ চমকের মতো মাটিতে প্রবেশ করল। এইভাবে রাজকুমার শ্বেতের প্রাণান্ত হল। তাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে পাণ্ডব এবং তাঁদের পক্ষের ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত শোকে অধীর হলেন, আপনার পুত্ররা এবং কৌরবরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। দুঃশাসন বাজনা বাজিয়ে নাচতে লাগলেন।

—০—

যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, কৃষ্ণের আশ্বাস এবং ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! সেনাপতি শ্বেত যুদ্ধে শত্রুহস্তে প্রাণ হারালে পাণ্ডবগণসহ মহাধনুর্ধর পাঞ্চাল-বীররা কী করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! স্থিরচিত্ত হয়ে শুনুন। সেই ভয়ংকর দিনের দ্বিপ্রহরে কৌরব ও পাণ্ডব সেনার মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হল। বিরাটের সেনাপতি শ্বেতকে মৃত এবং কৃতবর্মার সঙ্গে শল্যকে যুদ্ধে প্রস্তুত দেখে আহুতি দেওয়া অগ্নির ন্যায় রাজকুমার শঙ্খ ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন। সেই বলশালী বীর তাঁর বিশাল ধনুক নিয়ে মদ্ররাজ শল্যকে বধের ইচ্ছায় আক্রমণ করলেন। সেইসময় বহু রথ চারদিক থেকে শঙ্খকে রক্ষা করছিল। শঙ্খ বাণ বর্ষণ করতে করতে শল্যের কাছে পৌঁছলেন। মৃত্যুগ্রাসে পতিত শল্যকে রক্ষার জন্য আপনার সাত মহারথী—বৃহদ্বল, জয়ৎসেন, রুক্মরথ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ ও জয়দ্রথ তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে শঙ্খের ওপর বাণ বর্ষণ করছিলেন। সাতজনকে একসঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে সেনাপতি শঙ্খ ক্রুদ্ধ হয়ে ভল্ল নামক সাতটি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাঁদের সাতটি ধনুক কেটে সিংহনাদ করে উঠলেন। মহাবাহু ভীষ্ম তখন মেঘের ন্যায় গর্জন করে বিশাল ধনুক হাতে শঙ্খকে আক্রমণ করলেন। তাঁকে আসতে দেখে পাণ্ডবসেনা ভয়ে কম্পিত হল। এরমধ্যে শঙ্খকে ভীষ্মের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অর্জুন সেখানে এলেন ; তখন ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ শুরু হল।

এদিকে শল্য, গদা হস্তে তাঁর রথ থেকে নেমে শঙ্খের চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন। ঘোড়াগুলি না থাকায় শঙ্খও তরবারি হাতে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে অর্জুনের রথে আরোহণ করলেন। সেখানে যেতে তিনি একটু শান্তিলাভ করলেন। ভীষ্ম তখন পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় এবং প্রভদ্রক দেশীয় সেনাদের বাণের দ্বারা মেরে ফেলতে লাগলেন। তারপর তিনি অর্জুনের সামনে থেকে সরে গিয়ে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের ওপর আক্রমণ হানলেন। তিনি পাণ্ডবপক্ষের মহারথীদের আহ্বান করে করে বধ করতে লাগলেন। সমস্ত সেনা ভীত হয়ে উঠল, তাদের ব্যূহ ভঙ্গ হল। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকারে কিছু ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না, ভীষ্ম সবেগে এগিয়ে আসছিলেন—তাই দেখে পাণ্ডবরা তাঁদের সেনাকে সরিয়ে নিলেন।

প্রথম দিনের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবসেনা পিছু হটে গেল এবং ক্রুদ্ধ ভীষ্মের পরাক্রম দেখে দুর্যোধন আনন্দ প্রকাশ করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর সব ভ্রাতা ও রাজাদের সঙ্গে নিয়ে সত্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন এবং পরাজয়ের চিন্তায় দুঃখিত হয়ে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ, দেখছ, গ্রীষ্মের সময় শুষ্ক তৃণের রাশি যেমন পলকের মধ্যে ভস্মসাৎ হয়ে যায়, তেমনিই ভীষ্ম তাঁর ভয়ানক পরাক্রমের দ্বারা আমাদের সেনাকে ভস্মসাৎ করে দিচ্ছেন। ক্রোধান্বিত যম, বজ্রহস্তে ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ, গদাধারী কুবেরকে কদাচিৎ যুদ্ধে পরাস্ত করা সম্ভব হলেও মহা তেজস্বী ভীষ্মকে পরাজিত করা কখনোই সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমি বুদ্ধির দুর্বলতার জন্য ভীষ্মরূপী অগাধ জলে ডুবতে বসেছি। আমি এই রাজাদের ভীষ্মরূপ কালের মুখে যেতে দিতে চাই না। ভীষ্ম অত্যন্ত মহান, অস্ত্রবিদ, অগ্নিতে পতঙ্গ যেমন ভস্ম হয়, আমার সৈন্যরাও তেমনি ভীষ্মের কাছে গেলে ভস্ম হয়ে যাবে। কেশব ! এখন আমার জীবনের যে কটি দিন বাকি আছে, বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করব। কিন্তু এই আত্মীয়-পরিজনদের যুদ্ধে মরতে দেব না। ভীষ্ম প্রত্যহ আমাদের শ্রেষ্ঠ হাজার হাজার মহারথী ও যোদ্ধাদের সংহার করছেন। মাধব ! তুমি বলো, কী করলে আমাদের মঙ্গল হবে ?

এই কথা বলে যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ চোখ বন্ধ করে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শোকগ্রস্ত দেখে সমস্ত পাণ্ডবদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বললেন—'ভারত ! তোমার এরূপ শোক করা উচিত নয়। দেখো, তোমার ভ্রাতারা কত বড় শূরবীর এবং বিশ্ব বিখ্যাত ধনুর্ধর ! আমি এবং মহাযশস্বী সাত্যকি তোমার প্রিয়কাজ করতে সদা প্রস্তুত। রাজা বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য মহাবলী রাজারা তোমার কৃপাকাঙ্ক্ষী ও ভক্ত। মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার হিতচিন্তক এবং প্রিয় কার্য সম্পাদনকারী, ইনি সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আর শিখণ্ডী সাক্ষাৎ ভীষ্মের কালস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'ধৃষ্টদ্যুম্ন ! আমি যা বলি, মন দিয়ে শোনো। আশা করি, তুমি আমার কথার অন্যথা করবে না। তুমি আমাদের সেনাপতি, ভগবান বাসুদেব তোমাকে এই

সম্মান প্রদান করেছেন। পূর্বে কার্তিক যেমন দেবতাদের সেনাপতি হয়েছিলেন, তেমনই তুমিও এখন পাণ্ডবদের সেনানায়ক। পুরুষসিংহ ! নিজের পরাক্রম দেখিয়ে কৌরবদের সংহার করো। আমি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্র এবং সব প্রধান রাজা, সর্বশক্তি নিয়ে তোমাকে অনুসরণ করব।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে উপস্থিত সকলকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন—'কুন্তীনন্দন ! ভগবান শংকর আগে থেকেই আমাকে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর নিমিত্ত করে পাঠিয়েছেন। আজ আমি ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, শল্য এবং জয়দ্রথ—এই সব অহংকারী বীরদের সম্মুখীন হব।' শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন যুদ্ধের জন্য এইভাবে প্রস্তুত হলেন তখন রণোন্মত্ত পাণ্ডব বীররা জয়োল্লাস করে উঠলেন। তারপর যুধিষ্ঠির সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, 'দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের জন্য যে ক্রৌঞ্চারুণ নামক ব্যূহের উপদেশ দিয়েছিলেন, আমরা সেই ব্যূহ রচনা করব।'

পরদিন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে সমস্ত সেনার অগ্রবর্তী করে রাখলেন। রথে উপবিষ্ট অর্জুন তাঁর রত্নখচিত ধ্বজা এবং গাণ্ডীব ধনুকে এমন শোভা পাচ্ছিলেন, যেন সূর্যের কিরণে সুমেরুপর্বত। রাজা দ্রুপদ এক বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে সেই ক্রৌঞ্চব্যূহের শিরোভাগে অবস্থিত ছিলেন। কুন্তীভোজ এবং চেদিরাজ—এই দুজনকে চক্ষুর স্থানে রাখা হল। দাশার্ণক, প্রভদ্রক, অনূপক এবং কিরাতেরা গ্রীবার স্থানে ছিল। পটচ্চর, পৌণ্ড্র, পৌরবক এবং নিষাদগণসহ রাজা যুধিষ্ঠির তাদের পৃষ্ঠভাগে ছিলেন। তাঁর দুই পক্ষের স্থানে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন। দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, মহারথী সাত্যকি ও পিশাচ চোড ও পাণ্ড্য দেশের বীররা দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত এবং অগ্নিবেশ্য, হুণ্ড, মালব, শবর প্রমুখ নাকুলদেশীয় বীরদের সঙ্গে নকুল ও সহদেব বামপক্ষে অবস্থান করছিলেন। এই ব্যূহের দুই পক্ষে দশ হাজার, শিরোভাগে এক লাখ, পৃষ্ঠভাগে এক লক্ষ বিশ হাজার ও গ্রীবাতে এক লাখ সত্তর হাজার রথ সজ্জিত করা হয়েছিল। দুই পক্ষের সামনে পিছনে এবং অন্য পাশে পর্বত সমান উচ্চ গজরাজ শ্রেণী দণ্ডায়মান ছিল। বিরাট, কেকয়, কাশীরাজ এবং শৈব্য—তাঁরা ব্যূহের জঙ্ঘাস্থান রক্ষা করছিলেন। এইভাবে সেই মহাব্যূহ রচনা করে পাণ্ডব অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

—o—

দ্বিতীয় দিন—কৌরবদের ব্যূহরচনা এবং অর্জুন ও ভীষ্মের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধন যখন সেই দুর্ভেদ্য ক্রৌঞ্চব্যূহ অবলোকন করলেন এবং অর্জুনকে সেটি রক্ষা করতে দেখলেন, তখন তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে সেখানে উপস্থিত সমস্ত শূরবীরদের বললেন—বীরগণ ! আপনারা সকলেই নানা অস্ত্র সঞ্চালনে কুশলী এবং যুদ্ধকলায় প্রবীণ। আপনাদের প্রত্যেকেই যুদ্ধে একা পাণ্ডবদের বধ করতে সক্ষম ; তাহলে সব মহারথী যদি একসঙ্গে চেষ্টা করেন, তাহলে আর কীকথা ?

তাঁর এই কথায় ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আপনার সব পুত্ররা মিলে পাণ্ডবদের প্রতিহত করার জন্য এক মহাব্যূহ রচনা করলেন। ভীষ্ম বিশাল সৈন্য নিয়ে সর্বাগ্রে চললেন। তাঁর পিছনে কুন্তল, দশার্ণ, মগধ, বিদর্ভ, মেকল এবং কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি দেশের বীরদের সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রতাপশালী দ্রোণাচার্য চললেন। গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি, বসাতি বীরদের

সঙ্গে শকুনি দ্রোণাচার্যের রক্ষায় নিযুক্ত হলেন। তাঁদের পশ্চাতে সব ভাইদের সঙ্গে দুর্যোধন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অশ্বাতক, বিকর্ণ, অম্বষ্ঠ, কোমল, মালব প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা ছিলেন। এঁদের সকলের সঙ্গে তিনি শকুনির সেনাদের রক্ষা করছিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, শল, ভগদত্ত এবং বিন্দ ও অনুবিন্দ এই ব্যূহের বাম পার্শ্ব রক্ষা করছিলেন। সোমদত্তের পুত্র, সুশর্মা, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু—এঁরা দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করছিলেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা—এঁরা বিশাল সৈন্য নিয়ে ব্যূহের পৃষ্ঠের দিকে থাকলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেতুমান, বসুদান, কাশীরাজের পুত্র এবং অন্যান্য দেশের রাজারা।

রাজন্ ! তারপর আপনার পক্ষের সব যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন এবং আনন্দের সঙ্গে শঙ্খ বাজালেন ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। সৈনিকদের হর্ষধ্বনি শুনে কৌরব পিতামহ ভীষ্মও সিংহের ন্যায় গর্জন করে উচ্চনাদে শঙ্খ বাজালেন। পরে শত্রুরাও নানাপ্রকারের শঙ্খ, ভেরী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেবও নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন এবং কাশীরাজ, শৈব্য, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, পাঞ্চালদেশীয় বীর এবং দ্রৌপদীর পুত্ররাও শঙ্খ বাজালেন। তাঁদের শঙ্খের উচ্চধ্বনি পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত গুঞ্জিত হতে লাগল। এইভাবে কৌরব ও পাণ্ডব একে অপরকে আঘাত করার জন্য পরস্পর মুখোমুখী হলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—দুপক্ষের সেনারা ব্যূহরচনা করে দাঁড়ালে যোদ্ধারা কেমনভাবে একে অপরকে আঘাত করা শুরু করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—দুপক্ষের সেনা সমাবেশ এবং ব্যূহ যখন প্রস্তুত হয়ে গেল এবং নানা সুন্দর পতাকা উত্তোলিত হল, তখন দুর্যোধন তাঁর যোদ্ধাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। কৌরব বীরগণ জীবনের মায়া ত্যাগ করে পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন। তারপর দুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। রথের সঙ্গে রথ ও হাতির সঙ্গে হাতির যুদ্ধ চলল। হাতি ও ঘোড়াগুলি বাণবিদ্ধ হতে লাগল। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হলে পিতামহ ভীষ্ম তাঁর ধনুক নিয়ে অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীরদের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর আক্রমণে পাণ্ডবদের ব্যূহ ভেঙে গেল, সমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বহু ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার মারা পড়ল, রথীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

অর্জুন মহারথী ভীষ্মের পরাক্রম দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'জনার্দন ! পিতামহ ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চলুন। নচেৎ উনি আমাদের সমস্ত সৈন্যদের অবশ্যই নিধন করবেন। সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য আজ আমি ভীষ্মকে বধ করব।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সাধু ধনঞ্জয় ! সাবধান হও, আমি এখনই তোমাকে পিতামহের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভীষ্মের দিকে নিয়ে গেলেন। ভীষ্ম যখন দেখলেন অর্জুন তাঁর পক্ষের শূরবীরদের আঘাত করতে করতে দ্রুত এগিয়ে আসছেন তখন তিনি দ্রুত তাঁর সম্মুখীন হলেন। ভীষ্ম অর্জুনকে সত্তর, দ্রোণ পঁচিশ, কৃপাচার্য পঞ্চাশ, দুর্যোধন চৌষট্টি, শল্য, জয়দ্রথ নটি করে, শকুনি পাঁচটি বাণ মেরে সত্বর উত্তর দিলেন। এরমধ্যে সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং অভিমন্যু অর্জুনের সাহায্যের জন্য এলেন এবং তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখলেন।

ভীষ্ম তখন আশিটি বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। তাই দেখে কৌরব যোদ্ধারা হর্ষে কোলাহল করে উঠল। সেই মহারথী বীরদের হর্ষধ্বনি শুনে বীর অর্জুন তাদের মধ্যে প্রবেশ করে সেই মহারথীদের গাণ্ডীব ধনুকের প্রতাপ দেখাতে লাগলেন। দুর্যোধন তাঁর সেনাদের অর্জুনের দ্বারা আহত হতে দেখে ভীষ্মের কাছে গিয়ে বললেন—'তাত ! শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে বলবান অর্জুন আমার সেনাদের বধ করছে। আপনি এবং দ্রোণাচার্য বেঁচে থাকতেই আমাদের এই দশা ! কর্ণ সর্বদাই আমাদের মঙ্গল চায়, কিন্তু আপনারই জন্য সে অস্ত্র ত্যাগ করেছে ; তাই সে যুদ্ধে আসেনি। পিতামহ ! কৃপা করে ব্যবস্থা নিন, যাতে অর্জুনকে বধ করা যায় !'

দুর্যোধনের কথায় ভীষ্ম 'ক্ষত্রিয়ধর্মকে ধিক্কার' বলে অর্জুনের রথের দিকে অগ্রসর হলেন। অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, বিকর্ণ ভীষ্মের সঙ্গে গেলেন। ওদিকে পাণ্ডবরা অর্জুনকে বেষ্টন করেছিলেন। আবার যুদ্ধ শুরু হল। অর্জুন বাণের জাল বিস্তার করে ভীষ্মকে ঢেকে দিলেন । ভীষ্মও তাঁর বাণের সাহায্যে উপযুক্ত জবাব দিলেন। এইভাবে একে অপরের আঘাত বিফল করে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ

করতে লাগলেন। ভীষ্মের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ অর্জুনের বাণের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। সেইরূপ অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণও ভীষ্মের বাণে প্রতিহত হয়ে মাটিতে এসে পড়ল। উভয়েই ছিলেন বলবান এবং উভয়েই অজেয় বীর। দুজন একে অপরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সেই ভয়ংকর বাণবর্ষণের সময় কৌরব ভীষ্মকে এবং পাণ্ডব অর্জুনকে শুধুমাত্র তাদের ধ্বজার চিহ্ন দেখেই চিনতে সক্ষম ছিলেন। সেই দুই বীরের পরাক্রম দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। ধর্মে অবস্থিত ব্যক্তির কোনো কাজে যেমন কোনো ত্রুটি দেখা যায় না, তেমনি এঁদের দুজনের রণকৌশলে কোনো ভুল দেখা যায়নি। সেইসময় কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন তরবারি, বাণ এবং নানা অস্ত্রের দ্বারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছিল। এদিকে যখন প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছিল, তখন অন্যদিকে পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রোণাচার্যের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম হচ্ছিল।

—o—

ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রোণ ও ভীমসেন এবং কলিঙ্গের যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য এবং দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে কেমন যুদ্ধ হল, বর্ণনা করো।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেই ভীষণ সংগ্রামের বর্ণনা শান্ত হয়ে শুনুন। দ্রোণাচার্য প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্নও অনায়াসে নব্বইটি বাণে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করলেন। দ্রোণ পুনরায় বাণবর্ষা করে দ্রুপদকুমারকে ঢেকে দিলেন এবং তাঁর প্রাণনাশ করার জন্য দ্বিতীয় কালদণ্ডের মতো এক ভয়ংকর বাণ হাতে নিলেন। সেটি ধনুকে চড়াতে দেখে সমস্ত সৈন্য হাহাকার করে উঠল। মহারাজ ! সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পৌরুষ আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি সেই মৃত্যুসম ভয়ংকর বাণটি আসতেই প্রতিহত করে ফেললেন। তারপর দ্রোণের প্রাণবধের চেষ্টায় তিনি সবেগে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণাচার্য হাসতে হাসতে সেই শক্তি তিন টুকরো করে দিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঁচবাণে দ্রোণকে আঘাত করলেন। দ্রোণ দ্রুপদকুমারের ধনুক কেটে ফেললেন এবং সারথিকে মেরে রথ থেকে ফেলে দিলেন, তাঁর রথের চারটি ঘোড়াকেও মেরে ফেললেন। সারথি ও ঘোড়াগুলি মারা যেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদা নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং নিজ শৌর্য দেখাতে লাগলেন। তখন দ্রোণ এক অদ্ভুত কাজ করলেন ; ধৃষ্টদ্যুম্ন তখনও রথ থেকে সম্পূর্ণ নামেননি, তার আগেই দ্রোণ বাণের সাহায্যে তাঁর হাত থেকে গদা ফেলে দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল ও তরবারি নিয়ে তৎক্ষণাৎ দ্রোণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু বাণবর্ষণ করে দ্রোণ তাঁর আক্রমণ রোধ করলেন। গতি রুদ্ধ হলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তেজের সঙ্গে ঢাল দ্বারা বাণের গতিরোধ করতে লাগলেন। এরমধ্যে মহাবলী ভীমসেন হঠাৎ তাঁকে সাহায্য করতে সেখানে এলেন। তিনি এসেই দ্রোণাচার্যকে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে তৎক্ষণাৎ তাঁর রথে তুলে নিলেন। দুর্যোধনও দ্রোণের রক্ষার জন্য কলিঙ্গরাজ ভানুমানের সঙ্গে বিশালসেনা পাঠালেন। মহারাজ ! আপনার পুত্রের নির্দেশানুসারে কলিঙ্গের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীমসেনের ওপর আঘাত হানল। দ্রোণাচার্য বিরাট ও দ্রুপদের সামনে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠিরকে সাহায্য করতে চলে গিয়েছিলেন। তারপর ভীমসেন ও কলিঙ্গের মধ্যে ভয়ানক রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল।

ভীমসেন তাঁর বাহুবলের দ্বারা ধনুকে টংকার তুলে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কলিঙ্গরাজের এক পুত্র ছিল, শক্রদেব। তিনি বহুবাণের আঘাতে ভীমসেনের ঘোড়াগুলি মেরে ফেললেন। ভীমসেন রথহীন হয়ে গেলেন—তাই দেখে শক্রদেব জোর আঘাত হানলেন এবং বর্ষার মেঘের মতো বাণে তাঁকে ঢেকে দিলেন। ভীম তাঁর ওপর এক লৌহগদা নিক্ষেপ করলেন। সেই গদার আঘাতে তিনি সারথির সঙ্গে জমিতে লুটিয়ে পড়লেন। পুত্রকে মারা যেতে দেখে কলিঙ্গরাজ হাজার হাজার রথী ও সেনা নিয়ে ভীমকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। ভীমসেন গদা ফেলে দিয়ে ঢাল ও তরবারি হাতে নিলেন। তাই দেখে কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেনের প্রাণহরণের ইচ্ছায় তাঁর ওপর সাপের মতো বিষযুক্ত এক বাণ নিক্ষেপ করলেন। ভীম তাঁর তরবারি দিয়ে সেই তীক্ষ্ণ বাণকে দুটুকরো করে দিলেন এবং তাদের সেনাদের ভীত করার জন্য অত্যন্ত

জোরে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। কলিঙ্গরাজের ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি পাথর দিয়ে ঘষে অস্ত্রগুলি তীক্ষ্ণ করে তার চোদ্দটি অস্ত্র ভীমসেনের ওপর নিক্ষেপ করলেন। ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়ে সেগুলি টুকরো টুকরো করে ফেললেন এবং ভানুমানের ওপর আক্রমণ চালালেন। ভানুমান বাণবর্ষণ করে ভীমসেনকে ঢেকে ফেললেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করে উঠলেন। ভীমসেনও গর্জন করে উঠলেন। তাঁর বিকট গর্জন শুনে কলিঙ্গসেনা ভয় পেয়ে গেল, তারা বুঝে গেল যে ভীমসেন কোনো সাধারণ মানুষ নয়, দেবতা। ভীমসেন পুনরায় ভয়ংকর সিংহগর্জন করে হাতে তরবারি নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে ভানুমানের হাতির দাঁতদুটি ধরে তার মাথার ওপর চড়ে বসলেন। তাঁকে চড়তে দেখে ভানুমান শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন, কিন্তু ভীমসেন তাঁর তরবারি নিয়ে সেটি দুটুকরো করে ভানুমানের কোমরে তরবারির কোপ মেরে তাকে দুটুকরো করে

দিলেন। তারপর ভীম হাতিরও কাঁধে তরবারির আঘাত করলেন, কাঁধে আঘাত পেয়ে হাতি চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। ভীমও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে মাটিতে নামলেন। তারপর তিনি বড় বড় হাতিদের মারতে লাগলেন, হাতি-সওয়ারি সৈন্যের মধ্যে ঢুকে তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন তরবারির আঘাতে তিনি সকলের মাথা ও দেহ কেটে ফেলতে লাগলেন। ভীমসেন তখন একাই ক্রোধভরে যমরাজের ন্যায় সমস্ত শত্রু সংহার করছিলেন। রণভূমিতে তিনি কখনো মণ্ডলাকারে শত্রুবধ করছিলেন, কখনো ধাক্কা দিতে দিতে যাচ্ছিলেন, কখনো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিলেন, কখনো দৌড়ে গিয়ে কাউকে আঘাত করছিলেন। রথের ওপর লাফিয়ে উঠে রথীর মাথা কেটে ফেলছিলেন এবং তাদের রথের ধ্বজার সঙ্গে মাটিতে ফেলছিলেন। বহু যোদ্ধার পা কেটে ফেললেন, কত সৈন্যকে আছাড় দিয়ে মেরে ফেললেন। বহু যোদ্ধা তাঁর গর্জনে ভয়ে পালিয়ে গেল, বহু সৈন্য ভয়ে প্রাণত্যাগ করল।

এই ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও কলিঙ্গের এক বিশাল সৈন্যদল ভীমকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তাদের সামনে শ্রুতায়ুকে দণ্ডায়মান দেখে ভীম তাঁর দিকে এগোলেন। তাঁকে আসতে দেখে শ্রুতায়ু ভীমের বুকে নয়টি বাণ মারলেন। ভীমসেন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ইতিমধ্যেই সারথি অশোক ভীমসেনের জন্য এক সুন্দর রথ নিয়ে এলেন, ভীম তাতে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ কলিঙ্গবীর শ্রুতায়ুর ওপর আক্রমণ করলেন। শ্রুতায়ু ভীমসেনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হয়ে ভীম আহত সর্পের মতো গর্জন করে উঠলেন। তিনি ধনুক তুলে সাতটি লৌহবাণের দ্বারা শ্রুতায়ুকে বিদ্ধ করলেন, সেই সঙ্গে তাঁর রথের চাকার রক্ষায় নিযুক্ত সত্য ও সত্যদেবকে যমালয়ে পাঠালেন। পরে তিন বাণে কেতুমানকে বধ করলেন। তাতে কলিঙ্গবীর শ্রুতায়ু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং কয়েক হাজার সেনা নিয়ে ভীমসেনকে ঘিরে ফেললেন। তারপর চারদিক থেকে ভীমের ওপর নানাপ্রকার অস্ত্রদ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। ভীমসেন সেই সব অস্ত্র নিবারণ করে হাতে গদা নিয়ে কলিঙ্গ সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাত শত যোদ্ধা সংহার করলেন। মহারাজ ! সেই অবস্থায় তাঁকে দেখে আপনার পক্ষের সৈন্যরা বলতে লাগল সাক্ষাৎ কাল অবতীর্ণ হয়েছে।

তারপর ভীষ্ম তাঁর বাণে ভীমসেনের ঘোড়াগুলিকে মেরে ফেলেন। ভীম গদাহাতে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। এদিকে সাত্যকি ভীমসেনকে সাহায্য করার জন্য ভীষ্মের সারথিকে হত্যা করেন। সারথি পড়ে যেতেই ঘোড়াগুলি হাওয়ার বেগে ভীষ্মকে নিয়ে রণক্ষেত্রের বাইরে চলে গেল। ভীমসেন কলিঙ্গদের সংহার করে একাই সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও কৌরবসেনাদের কোনো বীরেরই তাঁর সম্মুখীন হওয়ার সাহস হল না। তার মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে এসে তাঁকে রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। সাত্যকি ভীমসেনের প্রশংসা করে বললেন—'অত্যন্ত

সৌভাগ্যের কথা যে আপনি কলিঙ্গরাজ ভানুমান, রাজকুমার কেতুমান, শক্রদেব এবং অন্য বহু কলিঙ্গ বীরদের সংহার করেছেন। কলিঙ্গ সেনাদের ব্যূহ বিশাল ছিল, তাতে অসংখ্য হাতি, ঘোড়া এবং রথ ছিল, বহু বীর তা রক্ষা করছিলেন। আপনি একাই বাহুবলের দ্বারা তাদের নাশ করেছেন। এই বলে সাত্যকি ভীমসেনকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে নিজ রথে তুলে পুনরায় কৌরব সৈন্য সংহার করতে আরম্ভ করলেন।

—o—

ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু এবং অর্জুনের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—সেইদিন পূর্বাহ্নের অর্ধেক পার হয়ে গেলে এবং বহু রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক ও ঘোড়সওয়ারের মৃত্যু হলে পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন একাই অশ্বত্থামা, শল্য এবং কৃপাচার্য—এই তিন মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি অশ্বত্থামার বিশ্ব বিখ্যাত ঘোড়াগুলিকে দশ বাণে মেরে ফেললেন। বাহনগুলির মৃত্যু হলে অশ্বত্থামা শল্যের রথে আরোহণ করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুও তীক্ষ্ণ বাণের বর্ষণ করে শীঘ্র সেখানে এলেন। তিনি শল্য, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামাকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। তখন অশ্বত্থামা, শল্য এবং কৃপাচার্যও তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা অভিমন্যুকে আঘাত করলেন।

মহারাজ ! তার মধ্যে আপনার পৌত্র কুমার লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে যুদ্ধ করতে দেখে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন, দুজনে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ক্রোধান্বিত লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে বহু বাণে বিদ্ধ করে পরাক্রম দেখালেন। অভিমন্যুও তখন ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের হস্তকৌশল দেখিয়ে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করলেন। লক্ষ্মণ এক বাণে অভিমন্যুর ধনুক দ্বিখণ্ডিত করলেন, তাই দেখে কৌরবপক্ষের বীররা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। অভিমন্যু তখন অন্য একটি সুদৃঢ় ধনুক হাতে নিলেন, আবার পরস্পরের মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ শুরু হল।

নিজ মহারথী পুত্রকে অভিমন্যুর বাণে পীড়িত দেখে দুর্যোধন তার সহায়তার জন্য এলেন। তাই দেখে অর্জুনও সত্বর পুত্রকে রক্ষার জন্য এলেন। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এঁরাও অর্জুনের সম্মুখীন হতে এগিয়ে এলেন। সেইসময় সকলে কোলাহল করে উঠল। অর্জুন এত বাণবর্ষণ করলেন যে চতুর্দিক ঢেকে অন্ধকার নেমে এল। এই ভয়ানক যুদ্ধে বহু রথ, রথী, হাতি, ঘোড়া মারা পড়ল। রথীরা রথ ছেড়ে পালাতে লাগল। মহারাজ ! আপনার সৈন্যদলে এমন যোদ্ধা দেখা যায়নি, যে বীর অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারে। যে কেউ তাঁর সামনে যায়, তখনই তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

আপনার বীর সৈন্যরা চতুর্দিকে পালাতে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। ভীষ্ম হেসে দ্রোণাচার্যকে বললেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে এই মহাবলী অর্জুন একাই সমস্ত সৈন্য সংহার করছে। দেখছ, আমাদের সব সৈন্য কেমন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছে ? ওদের ফিরিয়ে আনা মুশকিল। সূর্যেরও অস্তে যাবার সময় হয়েছে, এখন সৈন্যদের একত্র করে যুদ্ধ বন্ধ রাখাই উচিত বলে মনে হয়। আমাদের যোদ্ধারা ক্লান্ত ও ভীত, সুতরাং এখন আর উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না।' মহারাজ ! ভীষ্ম আচার্য দ্রোণকে এই কথা বলে আপনার সেনাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনলেন। সূর্যাস্ত হলে পাণ্ডবপক্ষের সেনারাও শিবিরে ফিরে গেল।

—o—

তৃতীয় দিন—দুপক্ষের সেনাদের ব্যূহ রচনা এবং ভয়ানক যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাত্রি প্রভাত হলে ভীষ্ম তাঁর সৈন্যদের রণক্ষেত্রে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সেনাদের নিয়ে গরুড় ব্যূহ রচনা করলেন এবং সেই ব্যূহের অগ্রভাগে তিনি স্বয়ং দণ্ডায়মান হলেন। দুই নেত্রস্থানে দ্রোণাচার্য ও কৃতবর্মা থাকলেন। শিরোভাগে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য দাঁড়ালেন, তাঁদের সঙ্গে ত্রৈগর্ত, কৈকেয় এবং বাটধানও ছিলেন। মদ্রক, সিন্ধুসৌবীর এবং পঞ্চনদ দেশীয় বীরদের সঙ্গে ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত এবং

জয়দ্রথ—এঁরা কণ্ঠস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাই এবং অনুচরদের নিয়ে দুর্যোধন পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত ছিলেন। কম্বোজ, শক এবং শূরসেন দেশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে বিন্দ, অনুবিন্দ প্রমুখ ব্যূহের পুচ্ছভাগে ছিলেন। মগধ এবং কলিঙ্গদেশের সেনা এবং দাসেরকগণ তাঁর দক্ষিণ পক্ষে এবং কারুষ, বিকুঞ্জ প্রমুখ যোদ্ধা বৃহদ্বলের সঙ্গে বামপক্ষে অবস্থিত ছিল।

অর্জুন কৌরব পক্ষের এই ব্যূহ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিয়ে নিজের সেনাদের অর্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ রচনা করলেন। ব্যূহের দক্ষিণ শিখরে ভীমসেন শোভা পাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বহু অস্ত্রে সজ্জিত বিভিন্ন দেশের রাজাগণ ছিলেন। ভীমসেনের পিছনে মহারথী বিরাট এবং দ্রুপদ দণ্ডায়মান। তাঁদের পরে নীল, নীলের পরে ধৃষ্টকেতু ছিলেন। ধৃষ্টকেতুর সঙ্গে চেদি, কাশী এবং করূষ প্রভৃতি দেশের সৈনিক ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক দেশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে সেনাদের মধ্যভাগে ছিলেন। হাতি সওয়ারিদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরও সেখানেই ছিলেন। তাঁর পরে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ছিলেন। পরে অভিমন্যু ও ইরাবান ছিলেন। তাঁদের পিছনে কেকয়বীরদের সঙ্গে ঘটোৎকচ ছিলেন। শেষভাগে ব্যূহের বামশিখরে অর্জুন অবস্থান করছিলেন, যাঁর রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। পাণ্ডবরা এইভাবে মহাব্যূহ রচনা করেছিলেন।

যুদ্ধ শুরু হল। রথের সঙ্গে রথী, হাতির সঙ্গে হাতির যুদ্ধ চলল। উভয়পক্ষের বীরদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম বেধে গেল। অর্জুন কৌরবপক্ষের রথীদের সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। কৌরববীররাও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা এমনভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে পাণ্ডব সৈন্য ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। তখন ভীমসেন, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আপনার সেনাদের এমনভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করলেন যেমন দেবতারা দানবদের করে থাকেন। এইভাবে উভয়পক্ষের যুদ্ধে এই পৃথিবী রক্তে মাখামাখি হয়ে বড় ভয়ংকর দেখাতে লাগল।

মহারাজ! সেই সময় দুর্যোধন এক হাজার রথী সৈন্য নিয়ে ঘটোৎকচের সামনে এলেন। পাণ্ডবরাও বিশাল সৈন্য নিয়ে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হলেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে সব রাজাদের ওপর চড়াও হলেন। তাঁকে আসতে দেখে রাজারা হাজার হাজার রথ নিয়ে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে নানা অস্ত্রাদির সাহায্যে আক্রমণ করলেন। অর্জুন তাঁর অস্ত্রের সাহায্যে সমস্ত অস্ত্র মাঝপথেই প্রতিহত করলেন। তাঁর এই অলৌকিক হস্তকৌশল দেখে দেব, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, সর্প এবং রাক্ষস—সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

অর্জুনের বাণে আহত হয়ে কৌরব সেনা বিষাদ এবং ভয়ে কম্পিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। তাদের পালাতে দেখে ভীষ্ম এবং দ্রোণ ক্রোধান্বিত হয়ে শত্রুদের বাধা দিলেন। দুর্যোধনকে দেখে কিছু যোদ্ধা ফিরতে লাগল। তাদের ফিরতে দেখে অন্য যোদ্ধারাও লজ্জিত হয়ে ফিরে এল। সকলে ফিরে এলে দুর্যোধন ভীষ্মকে গিয়ে

বললেন—পিতামহ! আমি যা বলি, কৃপা করে শুনুন। যতক্ষণ আপনি ও আচার্য দ্রোণ জীবিত আছেন, অশ্বত্থামা, সুহৃদবর্গ ও কৃপাচার্য উপস্থিত আছেন, ততক্ষণ আমাদের সৈন্য এইভাবে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসা আপনাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। আমি কখনো মনে করি না যে পাণ্ডবরা আপনাদের সমান যোদ্ধা। আপনি অবশ্যই ওদের ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, তাই আমাদের সৈন্য মারা যাচ্ছে আর আপনারা ক্ষমা করে যাচ্ছেন। যদি এই ব্যাপারই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে প্রথমেই বলা উচিত ছিল যে, 'আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে এবং সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করব না।' তখন আপনার, আচার্যের এবং কৃপাচার্যের কথা শুনে আমি কর্ণের সঙ্গে নিজের কর্তব্য বিচার করে নিতাম আর যদি আপনি এই যুদ্ধরূপ সংকটের সময় আমাকে ত্যাগ করার কথা ভেবে না থাকেন, তাহলে আপনাদের নিজ নিজ পরাক্রম অনুযায়ী যুদ্ধ করা উচিত।

দুর্যোধনের কথা শুনে ভীষ্ম সহাস্যে ক্রোধ কশায়িত নেত্রে বললেন—'রাজন্ ! একবার বা দুবার নয়, অনেকবার আমি তোমাকে এই সত্য ও হিতকর কথা বলেছি যে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে পারবে না। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি ; এই অবস্থায় যতটা করা সম্ভব, তার জন্য কোনো ত্রুটি রাখব না। তুমি দেখো, আজ আমি একাই পাণ্ডবদের সৈন্যসমেত পিছু হটিয়ে দেব।'

ভীষ্মের কথা শুনে আপনার পুত্ররা প্রসন্ন হয়ে ভেরী, শঙ্খ ইত্যাদি বাজাতে লাগলেন। তাঁদের ধ্বনি শুনে পাণ্ডবরাও শঙ্খ, ভেরী, ঢোলের আওয়াজ করে উঠলেন।

—— ০ ——

ভীষ্মের পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণের ভীষ্মকে বধ করতে উদ্যত হওয়া এবং অর্জুনের পৌরুষ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্যোধন নিজ পক্ষের ভয়াবহ সংহার দেখে চিন্তিত হয়ে যখন ভীষ্মের ক্রোধকে উজ্জীবিত করে দিলেন এবং তিনি ভয়ানক যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করলেন, তখন ভীষ্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে এবং পাঞ্চালবীররা ভীষ্মের সঙ্গে কেমন যুদ্ধ করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—সেদিনের প্রথমার্ধ পার হলে, সূর্য পশ্চিম দিশার দিকে অগ্রসর হলে বিজয়ী পাণ্ডবরা যখন বিজয়ের খুশি উপভোগ করছিলেন, সেই সময় পিতামহ ভীষ্ম দ্রুতগামী ঘোড়ায় রথ জুড়ে পাণ্ডব সেনাদের দিকে এগোলেন। তাঁর সঙ্গে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল এবং আপনার পুত্ররা চারদিক থেকে তাঁকে রক্ষা করছিলেন। সেইসময় আমাদের সঙ্গে পাণ্ডবদের রোমহর্ষণকারী সংগ্রাম আরম্ভ হল। হাজার হাজার যোদ্ধার মস্তক ও হাত কর্তিত হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল, রক্তের নদী প্রবাহিত হল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে যুদ্ধ হল, তেমন কখনো দেখা বা শোনা যায়নি। ভীষ্ম তাঁর ধনুকটি মণ্ডলাকারে ঘুরিয়ে বিষধর সাপের ন্যায় বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। রণভূমিতে তিনি এত দ্রুততার সঙ্গে বিচরণ করছিলেন যে পাণ্ডবরা এক ভীষ্মকে হাজার ভীষ্মরূপে দেখতে লাগলেন। যাঁরা তাঁকে পূর্বদিকেই দেখেছেন, তাঁরা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাতেই তাঁকে সেদিকে দেখতে পেল। একই সময়ে তাঁকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও দেখা গেল। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র তাঁকেই দেখা যেতে লাগল। পাণ্ডবরা কেউই তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, শুধু তাঁর ধনুক নিক্ষিপ্ত অসংখ্য বাণ দেখছিলেন। সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল। ভীষ্ম অতিমানব হয়ে বিচরণ করছিলেন। তাঁর কাছে হাজার হাজার রাজা এমনভাবে মারা পড়ছিল, যেমনভাবে অগ্নিতে পতঙ্গ মারা পড়ে। তাঁর একটি বাণও বৃথা যাচ্ছিল না।

অতুল পরাক্রমী ভীষ্মের অস্ত্রের আঘাতে যুধিষ্ঠিরের সেনা হাজার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তাঁর বাণে আহত হয়ে সৈন্যগণ কম্পিত হয়ে চতুর্দিকে পালাতে লাগল। এই যুদ্ধে পিতার হাতে পুত্র এবং পুত্রের হাতে পিতা ও মিত্রের হাতে মিত্রের নিধন হতে লাগল। পাণ্ডব সেনাদের এইভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথ থামিয়ে অর্জুনকে বললেন—'পার্থ ! যার জন্য তোমার অভিলাষ ছিল, সেই সময় উপস্থিত। এবার তীব্র আঘাত করো, নাহলে মোহগ্রস্ত হয়ে প্রাণ সংশয় ঘটাবে। এর আগে তুমি যে রাজাদের কাছে বলেছিলে 'দুর্যোধনের সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ যে কোনো বীরই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসুক, আমি তাদের সকলকে বধ করব', এবার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। অর্জুন ! দেখো তোমার সৈন্যরা কীভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আর রাজারা কালের ন্যায় ভীষ্মকে দেখে পালাচ্ছেন, যেমন জঙ্গলে সিংহের ভয়ে ছোট প্রাণীরা পালিয়ে যায়।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন বললেন—'হে কৃষ্ণ, আপনি ঘোড়াদের চালিয়ে এই সৈন্যসমূহের মধ্যে দিয়ে ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চলুন, আমি এখনই ওঁকে যুদ্ধে বধ করব।' মাধব তখন যেদিকে ভীষ্ম ছিলেন সেদিকে রথ ছুটিয়ে দিলেন। অর্জুনকে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতে দেখে যুধিষ্ঠিরের পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা ফিরে এল। অর্জুনকে আসতে দেখে ভীষ্ম সিংহনাদ করে বাণবর্ষণ শুরু করে দিলেন। অর্জুনের রথ, ঘোড়া, সারথি সেই বাণে ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, তিনি এতে এতটুকু বিচলিত হলেন না, রথ এগিয়ে নিয়ে চললেন। অর্জুন তাঁর দিব্য ধনুকে তিনটি বাণের সাহায্যে ভীষ্মের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অন্য

একটি ধনুক তুলে গুণ পরিয়ে নিলেন। কিন্তু বাণ নিক্ষেপ করার আগেই অর্জুন সেটিও দ্বিখণ্ডিত করলেন। অর্জুনের এই তৎপরতা দেখে ভীষ্ম তাঁর প্রশংসা করে বললেন, 'মহাবাহো ! খুব ভালো, এই মহাপরাক্রম তোমারই যোগ্য। বৎস ! আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, এসো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।' পার্থের প্রশংসা করে অন্য এক মহাধনুক তুলে তিনি অর্জুনের রথের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথ সঞ্চালনে অত্যন্ত কৌশল দেখাতে লাগলেন। তিনি রথ এমনভাবে মণ্ডলাকারে চালাতে লাগলেন, যাতে ভীষ্মের সমস্ত বাণই বিফল হয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে ভীষ্ম তীক্ষ্ণ বাণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য, শ্রুতায়ু, অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ এবং সুদক্ষিণ প্রমুখ বীর এবং প্রাচ্য, সৌবীর, বসাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবদেশীয় যোদ্ধা সত্বর অর্জুনের ওপর আক্রমণ হানলেন। তাঁরা হাজার হাজার ঘোড়া, পদাতিক, রথ এবং হাতি দিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ধরলেন। তাঁদের সেই অবস্থায় দেখে সাত্যকি সহসা সেখানে এলেন এবং অর্জুনের সহায়তা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের সেনাদের তিনি পুনরায় পলায়নোদ্যত দেখে বললেন—ক্ষত্রিয়গণ ! তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? এসব সৎপুরুষের ধর্ম নয়। বীরগণ ! নিজ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কোরো না, বীর ধর্ম পালন করো।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন পাণ্ডব সেনাদের প্রধান রাজারা রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, অর্জুন হেরে যাচ্ছেন এবং ভীষ্ম বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির প্রশংসা করে বললেন— 'শিনিবংশের বীর ! যারা পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের পালাতে দাও ; যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারাও চলে যাক। আমি এদের উপর নির্ভর করি না। তুমি দেখো, আমি এখনই ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে রথ থেকে মেরে মাটিতে ফেলছি। কৌরব সেনার একটি রথও আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আমি আমার সুদর্শন চক্র তুলে মহাব্রতী ভীষ্ম এবং দ্রোণের প্রাণ হরণ করব আর ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রদের বধ করে পাণ্ডবদের প্রসন্ন করব। কৌরবপক্ষের সমস্ত রাজাকে বধ করে আজ আমি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে বরণ করব।'

এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে হাতে সুদর্শন চক্র নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। সেই চক্র সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং তার প্রভাব বজ্রের ন্যায় অমোঘ। তার ধার ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবেগে ভীষ্মের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন, তাঁর পায়ের আঘাতে পৃথিবী কেঁপে উঠল। সিংহ যেমন মদমত্ত গজরাজের দিকে দৌড়ায়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই ভীষ্মের দিকে এগোলেন। তাঁর শ্যামদেহে পীত অম্বর হাওয়ায় এমনভাবে উড়ছিল যেন মেঘের ওপর বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছে। হাতে চক্র নিয়ে তিনি অত্যন্ত জোরে গর্জন করে উঠলেন। তাঁর ক্রোধ দেখে কৌরবদের সংহার ভেবে সমস্ত সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল। চক্র হাতে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যে প্রলয়কালের সংবর্তক অগ্নি সমস্ত জগতের সংহার করতে উদ্যত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকে চক্র হাতে আসতে দেখে ভীষ্ম বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। তিনি দুহাতে তাঁর মহান ধনুকে টংকার দিতে দিতে বললেন—'আসুন, আসুন দেবেশ্বর ! পরমেশ্বর ! আমি আপনাকে প্রণাম জানাই। হে চক্রধারী মাধব ! আপনি বলপূর্বক আমাকে মেরে এই রথ থেকে মাটিতে ফেলুন। আপনি জগতের স্বামী, সকলের শরণাগত প্রভু ; আজ আমি যদি আপনার হাতে নিহত হই, তাহলে ইহলোকে ও পরলোকে আমার কল্যাণ হবে। ভগবান ! আপনি নিজে আমাকে বধ করতে এসে ত্রিলোকে আমার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।'

ভগবানকে অগ্রসর হতে দেখে অর্জুনও রথ থেকে নেমে তাঁর পিছন পিছন এসে তাঁর দুটি হাত ধরলেন। ভগবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, অর্জুন ধরলেও তাঁর রাগ কমল না। ঝড়ে যেমন গাছকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। অর্জুন

তখন তাঁর হাত ছেড়ে পায়ে পড়লেন, খুব জোরে তাঁর পা-দুটি চেপে ধরলেন। সবেগে শ্রীকৃষ্ণ আরও দশ পা এগিয়ে গেলে অর্জুন কোনোক্রমে তাঁর গতিরোধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দাঁড়িয়ে পড়লেন তখন অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে বললেন—'কেশব ! আপনার ক্রোধ শান্ত করুন, আপনিই পাণ্ডবদের সহায়ক। আমি ভাই ও পুত্রদের শপথ করে বলছি, যুদ্ধে এতটুকুও শ্লথভাব দেখাব না, প্রতিজ্ঞা অনুসারেই যুদ্ধ করব।' অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর প্রিয় কাজ করার জন্য পুনরায় চক্র হাতে রথের উপর উঠে বসলেন। তিনি তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিতে চতুর্দিক আলোড়িত করলেন। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনুক থেকে চতুর্দিকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

ভূরিশ্রবা অর্জুনকে বাণ দ্বারা, দুর্যোধন তোমর, শল্য গদা এবং ভীষ্ম শক্তি দ্বারা প্রহার করলেন। অর্জুনও বাণের দ্বারা ভূরিশ্রবার বাণ প্রতিহত করলেন, ক্ষুর দিয়ে দুর্যোধনের তোমর খণ্ডন করলেন এবং বাণের সাহায্যে শল্যের গদা ও ভীষ্মের শক্তি টুকরো টুকরো করে দিলেন। তারপর তিনি দুহাতে গাণ্ডীব ধনুক টেনে আকাশে মাহেন্দ্র নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, সেই অস্ত্র অত্যন্ত অদ্ভুত ও ভয়ানক দর্শন ছিল। সেই দিব্য অস্ত্রের প্রভাবে অর্জুন সমস্ত কৌরব সেনার গতি রোধ করলেন। সেই অস্ত্র থেকে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত বাণবৃষ্টি হচ্ছিল এবং শত্রুদের রথ, ধ্বজা, ধনুক এবং হাত কেটে সেই বাণ রাজা, হাতি এবং ঘোড়ার শরীরে বিদ্ধ হচ্ছিল। সেই তীক্ষ্ণধার বাণের জালে অর্জুন চতুর্দিক ঢেকে দিয়েছিলেন আর গাণ্ডীব ধনুকের টংকারে শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রক্তের নদী প্রবাহিত হয়ে গেল। কৌরব সেনার বহু বিশিষ্ট বীর বধ হয়েছে দেখে চেদি, পাঞ্চাল, করূষ ও মৎস্য দেশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে সকল পাণ্ডব হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণও হর্ষধ্বনি করলেন।

ততক্ষণে সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। কৌরব বীরদের দেহ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। অর্জুনের অস্ত্রাঘাত সকলের কাছে অসহনীয় হয়েছে দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন ও বাহ্লীক প্রমুখ কৌরববীররা সেনাপতি-সহ শিবিরে ফিরে এলেন। অর্জুনও শত্রুদের পরাস্ত করে যশপ্রাপ্ত হয়ে ভ্রাতা ও রাজাদের সঙ্গে শিবিরে চলে এলেন। কৌরবরা শিবিরে ফেরার সময় পরস্পর বলতে লাগল—সাধু ! অর্জুন আজ খুব পরাক্রম দেখিয়েছেন, অন্য কেউ এত পরাক্রম দেখাতে পারে না। তিনি নিজ বাহুবলে অম্বষ্ঠপতি, শ্রুতায়ু, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য এবং ভীষ্মসহ অনেক যোদ্ধাকে পরাস্ত করেছেন।

সাংয়মণিপুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুত্রের বধ এবং ঘটোৎকচ ও ভগদত্তের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! রাত্রি প্রভাত হলে চতুর্থ দিনে ভীষ্ম ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে সব সেনার সঙ্গে শত্রুপক্ষের সামনে এলেন। দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, বাহ্লীক, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, জয়দ্রথ এবং অন্য রাজারাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ভীষ্ম অর্জুনের ওপরই আক্রমণ চালালেন, তাঁর সঙ্গে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শল্য, বিবিংশতি, দুর্যোধন, ভূরিশ্রবা সকলেই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাই দেখে সর্বশস্ত্রজ্ঞ অভিমন্যু সেখানে এলেন। তিনি সেই মহারথীদের অস্ত্র কেটে ফেললেন এবং রণাঙ্গনে শত্রুদের রক্তের নদী বইয়ে দিলেন। ভীষ্ম অভিমন্যুকে ছেড়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। কিরীটি মৃদুহাস্যে তাঁর গাণ্ডীব ধনুক নিক্ষিপ্ত বাণে ভীষ্মের অস্ত্র প্রতিরোধ করে অত্যন্ত বেগে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম তাঁর বাণে অর্জুনের অস্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন। এইভাবে উপস্থিত কৌরব ও সঞ্জয়বীররা ভীষ্ম ও অর্জুনের সেই অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলেন।

অভিমন্যুকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন এবং সাংয়মণির পুত্র ঘিরে ধরলেন। সেই পাঁচ বীরের সঙ্গে অভিমন্যু একা এমন যুদ্ধ করছিলেন যে মনে হচ্ছিল এক সিংহ শাবক পাঁচটি হাতির সঙ্গে লড়াই করছে। নিশানা ভেদ করার কৌশল, শৌর্য, পরাক্রম এবং বেগে কেউই বীর অভিমন্যুর সমকক্ষ ছিলেন না। রাজন্ ! আপনার পুত্ররা যখন দেখলেন সৈন্যরা অত্যন্ত বিপাকে,

তখন তাঁরা অভিমন্যুকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। কিন্তু তেজস্বী ও মহাবীর অভিমন্যু এক পাও পিছু হটলেন না। তিনি নির্ভয়ে কৌরব সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি বাণের সাহায্যে অশ্বত্থামা ও শল্যকে আহত করে আট বাণের সাহায্যে সাংযমণি পুত্রের ধ্বজা কেটে দিলেন। ভূরিশ্রবা নিক্ষিপ্ত সর্পের ন্যায় এক প্রচণ্ড শক্তি তাঁর দিকে আসতে দেখে অভিমন্যু এক তীক্ষ্ণ বাণে তা খণ্ডন করলেন। তখন শল্য অত্যন্ত বেগে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অভিমন্যু তা প্রতিহত করে তাঁর চারটি ঘোড়াকে মেরে ফেললেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমণি এবং শল—এঁরা কেউই অভিমন্যুর বাহুবলের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না।

তখন দুর্যোধনের নির্দেশে ত্রিগর্ত, মদ্র ও কেকয় দেশের পঁচিশ হাজার বীর অর্জুন ও অভিমন্যুকে ঘিরে ধরল। তাই দেখে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর সৈন্য নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মদ্র ও কেকয় দেশের বীরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি দশ বাণে দশ মদ্র দেশীর বীরকে, একটির দ্বারা কৃতবর্মার পৃষ্ঠরক্ষককে এবং এক বাণে কৌরব পুত্র দমনকে বধ করলেন। ইতিমধ্যে সাংযমণির পুত্র ত্রিশ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন কে ও দশ বাণে তাঁর সারথিকে আঘাত করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আঘাতে জর্জরিত হয়েও এক তীক্ষ্ণ বাণে সাংযমণিপুত্রের ধনুক কেটে দিলেন এবং বহু বাণ বিদ্ধ করে তাঁর ঘোড়া এবং সারথিদের হত্যা করলেন। সাংযমণিপুত্র রথ থেকে তরোয়াল হাতে নিয়ে লাফিয়ে নেমে অত্যন্ত বেগে পদব্রজে রথে উপবিষ্ট শত্রুদের কাছে পৌঁছলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে গদার আঘাতে তাঁর মস্তক চূর্ণ করে দিলেন। গদার আঘাতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর হাতের তরোয়াল ও ঢাল দূরে গিয়ে পড়ল।

সেই মহারথীর মৃত্যুতে আপনার সেনাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সাংযমণি তাঁর পুত্রকে মৃত দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে এগোলেন। তাঁরা রণাঙ্গনে দুজন সামনাসামনি হলেন এবং কৌরব ও পাণ্ডবরা সকলে তাঁদের যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। সাংযমনি ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন-কে তিনটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। অন্যদিক থেকে শল্যও তাঁকে আঘাত করলেন। শল্যের নয় বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত আঘাত পেলেন, তবুও তিনি বাণের আঘাতে মদ্ররাজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। কিছুক্ষণ দুই মহারথীর যুদ্ধ সমানভাবে চলতে লাগল, তার মধ্যে কেউই বেশি বা কম ছিলেন না। এরপর মহারাজ শল্য এক তীক্ষ্ণ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক কেটে তাঁকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন।

অভিমন্যু তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে মদ্ররাজের রথের দিকে সবেগে এগিয়ে গেলেন এবং তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তখন দুর্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, সত্যব্রত এবং পুরুমিত্র এঁরা সব এগিয়ে এলেন মদ্ররাজকে রক্ষা করতে। কিন্তু ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, অভিমন্যু এবং নকুল-সহদেব তাঁদের বাধা দিতে লাগলেন। তখন দুপক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। দশ মহারথীর এই যুদ্ধ দেখতে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের অন্য রথীগণ দর্শকের ন্যায় দাঁড়িয়ে গেলেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আঘাত করলেন এবং দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি এবং দুঃশাসন বহু বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে ব্যস্ত করে তুললেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও রণকৌশল দেখিয়ে তাঁদের বহু বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। অভিমন্যু তাঁর বাণের আঘাতে সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে বিদ্ধ করলেন। নকুল ও সহদেব তাঁদের মাতুল শল্যের ওপর তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। শল্যও তাঁর ভাগিনেয়ের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, নকুল ও সহদেব বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেলেও শল্য নিজ স্থান থেকে এতটুকুও সরলেন না।

ভীমসেন দুর্যোধনকে সামনে দেখে চূড়ান্ত প্রতিশোধের জন্য গদা তুলে এগোলেন। ভীমসেনকে গদা নিয়ে এগোতে দেখে আপনার সব পুত্র ভয়ে পালিয়ে গেল। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মগধরাজের দশহাজার গজারোহী সেনা নিয়ে ভীমসেনের ওপর আক্রমণ চালালেন। ভীমসেন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে গদা দ্বারা হাতিদের মারতে মারতে রণক্ষেত্রে ঘুরতে লাগলেন, সেইসময় ভীমের ভয়ংকর গর্জন শুনে হাতিগুলিও পালাতে লাগল। সেইসময় দ্রৌপদীর পুত্ররা, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন—পাণ্ডবপক্ষের এই সব বীররা ভীমসেনের পশ্চাতে থেকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা মগধের সেনাদের মস্তক চূর্ণ করতে লাগলেন। তাই দেখে মগধরাজ তাঁর বিশাল ঐরাবতকে অভিমন্যুর রথের দিকে এগিয়ে দিলেন। বীর অভিমন্যু একবাণেই ঐরাবতকে নিহত করে আর এক বাণে মগধরাজের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করলেন। ভীমসেনও সেই রণক্ষেত্রে একটি বার মাত্র আঘাত করেই হাতি বধ করতে লাগলেন, ক্রোধাতুর ভীমসেনের আঘাতে হাতিগুলি ভয়ে এদিক-ওদিক

পালাতে গিয়ে আপনার সেনাদেরই পদপিষ্ট করতে লাগল। সেই সময় ভীমসেনকে রণক্ষেত্রে গদা হস্তে দেখে মনে হচ্ছিল যে স্বয়ং শংকর মহাদেব রণাঙ্গনে নৃত্য করছেন।

তখন হাজার হাজার রথীসহ আপনার পুত্র নন্দক কুপিত হয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। তিনি ভীমের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন, অন্যদিকে দুর্যোধনও ভীমসেনকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। মহাবাহু ভীম তখন নিজরথে আরোহণ করে তাঁর সারথি বিশোককে বললেন—'দেখো, মহারথী ধৃতরাষ্ট্র পুত্র আমার প্রাণ নেওয়ার জন্য হাজির হয়েছে, আমি তোমার সামনেই একে বধ করব। সুতরাং তুমি সাবধানে ওর রথের সামনে আমার ঘোড়াদের নিয়ে চলো।' সারথিকে এই কথা বলে তিনি নন্দকের বুকে তিন বাণ মারলেন। দুর্যোধনও বহুবাণে ভীমকে আঘাত করলেন এবং তাঁর সারথিকে ঘায়েল করলেন। তারপর তিনটি বাণে ভীমের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীমসেন অন্য এক দিব্য ধনুকের দ্বারা দুর্যোধনের ধনুক কেটে ফেললেন। দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ একটি ধনুক নিয়ে ভয়ংকর বাণ দিয়ে ভীমসেনের বুকে আঘাত করলেন। সেই বাণের আঘাতে ভীমসেন আহত হয়ে রথের পিছনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

ভীমসেনকে মূর্ছিত হতে দেখে অভিমন্যু ও পাণ্ডবপক্ষের মহারথীগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, তাঁরা দুর্যোধনের মাথা লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। এরমধ্যে ভীমসেনের চেতনা ফিরে এল। তিনি দুর্যোধনকে বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর শল্যের দিকেও বাণ নিক্ষেপ করলেন। আহত হয়ে শল্য রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। তখন আপনার চোদ্দজন পুত্র সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট এবং সম ভীমকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের চোখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। তাঁরা একসঙ্গে বহু বাণ নিক্ষেপ করে ভীমসেনকে আহত করলেন। আপনার পুত্রদের তাঁর সামনে দেখে ভীম তাঁদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যেমন করে মেষের ওপর সিংহ আক্রমণ করে। তারপর তিনি এক তীক্ষ্ণ বাণে সেনাপতির মাথা কেটে ফেললেন, তিন বাণে জলসন্ধকে ঘায়েল করলেন, সুষেণকে যমদ্বারে পাঠালেন, উগ্রের মুকুট ভূষিত মস্তক কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং সত্তর বাণে বীরবাহুকে তার ঘোড়া ও সারথিসহ ধরাশায়ী করলেন। এইভাবে তিনি ভীম, ভীমরথ এবং সুলোচন ও সব সৈন্যকে একে একে যমালয়ে পাঠালেন। ভীমসেনের প্রবল পরাক্রম দেখে আপনার বাকি পুত্ররা ভয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেলেন।

ভীষ্ম তখন সব মহারথীদের বললেন—'দেখো, ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের মহারথী পুত্রদের বধ করছে, ওকে শিগগির ধরে ফেলো, দেরি কোরো না।' ভীষ্মের নির্দেশ পেয়ে কৌরবপক্ষের সমস্ত সৈনিক ক্রোধভরে মহাবলী ভীমসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভগদত্ত তাঁর মদোন্মত্ত হাতিতে চড়ে ভীমসেনের কাছে পৌঁছলেন। ভীমের কাছে পৌঁছেই তিনি বাণবর্ষণ করে ভীমকে ঢেকে ফেললেন। অভিমন্যু প্রমুখ বীর এসব দেখতে পারলেন না। তাঁরাও বাণবর্ষণ করে ভগদত্তের চারদিক ঢেকে দিলেন এবং তাঁর হাতিকে আহত করলেন। কিন্তু ভগদত্তের প্রেরণায় সেই হাতি মহারথীদের ওপর এমন বেগে দৌড়াল যেন কাল প্রেরিত যমরাজ। তাঁর সেই ভয়ংকর রূপ দেখে সব মহারথীর সাহস দমে গেল। সেইসময় ভগদত্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ভীমসেনের বুকে এক বাণ মারলেন। তাতে আহত হয়ে ভীমসেন হতচেতন হয়ে নিজের ধ্বজার দণ্ড ধরে বসে পড়লেন। তাই দেখে মহাপ্রতাপশালী ভগদত্ত অত্যন্ত জোরে সিংহনাদ করে উঠলেন।

ভীমসেনের অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। তারপর তিনি এমন মায়াজাল বিস্তার করলেন, যা দেখে আবাল-বৃদ্ধ ভীত কম্পিত হল। সে ভীষণ রূপ ধারণ করে মায়াদ্বারা রচিত ঐরাবতে চড়ে প্রকটিত হল। সে ভগদত্তকে হাতিসহ বধ করার প্রয়াসে তার দিকে নিজের হাতিকে ছেড়ে দিল। সেই চতুর্দন্ত গজরাজ ভগদত্তের হাতিকে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল, তাতে সেই হাতি অত্যন্ত কাতর হয়ে বজ্রপাতের

ন্যায় অত্যন্ত জোরে চীৎকার করে উঠল। সেই ভয়ংকর আওয়াজ শুনে ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ রাজা দুর্যোধনকে বললেন—'মহা ধনুর্ধর রাজা ভগদত্ত হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভীষণ বিপত্তিতে পড়েছেন। তাই পাণ্ডবদের হর্ষধ্বনি ও ভীত হাতির গর্জন শোনা যাচ্ছে! চলো, আমরা সকলে তাকে রক্ষা করি। শীঘ্র না গেলে তিনি এক্ষুণি মারা যাবেন। দেখো, ওখানে ভীষণ রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং বীরগণ শীঘ্র চলো, দেরি কোরো না।'

ভীষ্মের কথা শুনে সব বীররা একত্রে ভীষ্ম ও দ্রোণের নেতৃত্বে ভগদত্তের রক্ষার্থে চললেন। সেই সেনাদের দেখে প্রতাপশালী ঘটোৎকচ বজ্রের মতো গম্ভীর গর্জন করে উঠল। তার গর্জন শুনে ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে বললেন—'এই সময় আমার ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত হবে না ; কারণ এ অত্যন্ত বীর্যসম্পন্ন এবং অন্য বীররাও একে সহায়তা করছে। বজ্রধর ইন্দ্রও একে এখন পরাজিত করতে পারবে না। সুতরাং এখন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না ; আজ এখানেই যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষণা করা হোক। কাল আবার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ হবে।'

কৌরবরা ঘটোৎকচের ভয়ে ভীত ছিলেন। তাই ভীষ্মের কথায় আলোচনা করে তাঁরা যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা করলেন। সন্ধ্যা সমাগত ছিল। কৌরবরা পাণ্ডবদের কাছে পরাজিত

হওয়ায় লজ্জিত হয়ে শিবিরে ফিরলেন। পাণ্ডবরা ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে অগ্রগামী করে প্রসন্ন চিত্তে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সিংহনাদ করে শিবিরে এলেন ; অন্যদিকে ভাইদের মৃত্যু হওয়ায় রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত চিন্তিত ও শোকাকুল ছিলেন।

——○——

সঞ্জয় কর্তৃক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মুখ নিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! পাণ্ডবদের পরাক্রমের কথা শুনে আমার অত্যন্ত ভয় ও বিস্ময় বোধ হচ্ছে। সব দিকেই আমার পুত্রদের পরাজয় হচ্ছে—শুনে আমার অত্যন্ত চিন্তা হচ্ছে যে আমরা কী করে জয়লাভ করব ? বিদুরের কথা অবশ্যই আমার হৃদয় দগ্ধ করবে। ভীম অবশ্যই আমার পুত্রদের বধ করবে। এমন কোনো বীর আমি দেখছি না, যে যুদ্ধক্ষেত্রে ওদের পরাজিত করবে। সূত ! ঠিক করে বলো, পাণ্ডবরা এত শক্তি কোথায় পেল ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! আপনি সবিস্তারে শুনুন এবং শুনে স্থির করুন। এখন যা কিছু হচ্ছে, তা কোনো মন্ত্র বা মায়ার প্রভাবে নয়। আসলে মহাবলী পাণ্ডবরা সর্বদা ধর্মে তৎপর থাকেন এবং যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয় হয়ে থাকে। আপনার পুত্ররা দুষ্টচিত্ত, পাপপরায়ণ, নিষ্ঠুর এবং কুকর্মা ; তাই তাঁরা যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছেন। তাঁরা নীচ ব্যক্তির ন্যায় পাণ্ডবদের সঙ্গে অনেক ক্রূরকর্ম করেছেন। এবার তাঁদের সেই পাপকর্মের ভয়ংকর কুফল ভোগের সময় হয়েছে। সুতরাং পুত্রদের সঙ্গে আপনিও তার ফল ভোগ করুন। আপনার সুহৃদ বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আমি আপনাকে বারংবার বাধা প্রদান করেছি, কিন্তু আপনি আমাদের কথা শোনেননি। মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন ঔষধ ও পথ্য কার্যকারী হয় না, তেমনই আপনারও মঙ্গলের কথা ভালো লাগেনি। এখন আপনি যে পাণ্ডবদের বিজয়ের কারণ জানতে চাইছেন, এ বিষয়ে আমি যা জানি তা আপনাকে জানাচ্ছি। সেদিন ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত হতে

দেখে দুর্যোধন রাত্রে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন—পিতামহ ! আমি মনে করি আপনি, দ্রোণাচার্য, শল্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ এবং ভগদত্ত প্রমুখ মহারথী ত্রিলোকের সঙ্গে সংগ্রামে সক্ষম। কিন্তু আপনারা সকলে মিলেও পাণ্ডবদের পরাক্রমের সামনে দাঁড়াতে পারছেন না। তাই দেখে আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কৃপা করে বলুন, পাণ্ডবদের মধ্যে এমন কী শক্তি আছে যাতে ওরা আমাদের মাঝে মাঝেই হারিয়ে দিচ্ছে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! উদারধর্মী পাণ্ডবদের অবধ্যতার কারণ তোমাকে জানাচ্ছি, শোনো। ত্রিলোকে এমন কোনো পুরুষ কখনো হয়নি, হবেও না যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে সক্ষম। এই ব্যাপারে পবিত্র মুনিরা আমাকে এক ইতিহাস বলেছিলেন, আমি তোমাকে তা শোনাচ্ছি। পূর্বকালে গন্ধমাদন পর্বতে সমস্ত দেবতা ও মুনিগণ পিতামহ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় সকলের মধ্যে উপবিষ্ট ব্রহ্মা আকাশে এক তেজোময় বিমান দেখতে পেলেন। তখন তিনি ধ্যানে সব রহস্য জেনে প্রসন্ন চিত্তে পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মাকে দণ্ডায়মান হতে দেখে সব দেবতা এবং ঋষিও হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে লাগলেন। জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করে স্তুতি করতে লাগলেন—'প্রভু ! আপনি সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, আপনিই বিশ্বস্বরূপ এবং বিশ্বের প্রভু। বিশ্বের সর্বত্র আপনার অস্তিত্ব আছে। এই বিশ্ব আপনারই রচিত, সকলকেই আপনি আপনার বশে রাখেন। তাই আপনাকে বিশ্বেশ্বর ও বাসুদেব বলা হয়। আপনি যোগস্বরূপ দেবতা, আমি আপনার শরণাগত। বিশ্বরূপ মহাদেব ! আপনার জয় হোক ; লোকহিতে ব্যাপৃত মহাদেব ! আপনার জয় হোক। সর্বত্র ব্যাপ্ত পরমেশ্বর ! আপনার জয় হোক। হে যোগের আদি ও অন্ত ! আপনার জয় হোক। আপনার নাভি থেকে লোককমল উৎপন্ন হয়েছে, বিশাল আপনার নেত্র, আপনি লোকেশ্বরেরও ঈশ্বর ; আপনার জয় হোক। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রভু, আপনার জয় হোক। আপনার সৌম্যস্বরূপ, আমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আপনার পুত্র। আপনি অসংখ্য গুণের আধার এবং সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন, আপনার জয় হোক। শার্ঙ্গ-ধনুক ধারণকারী নারায়ণ ! আপনার মহিমার অন্ত পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, আপনার জয় হোক। আপনি সমস্ত কল্যাণময় গুণসম্পন্ন, বিশ্বমূর্তি ও নিরাময় ; আপনার জয় হোক। জগতের অভীষ্ট সাধনকারী মহাবাহু বিশ্বেশ্বর ! আপনার জয় হোক। আপনি মহান শেষ নাগ এবং মহাবরাহরূপ ধারণকারী, সকলের আদি কারণ, কিরণই আপনার কেশ। প্রভু ! আপনার জয় হোক, জয় হোক। আপনি আলোকের ধাম, দিকসমূহের প্রভু, বিশ্বের আধার, অপ্রমেয় এবং অবিনাশী। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সবই আপনার স্বরূপ, অসীম অনন্ত আপনার নিবাসস্থান। আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা, আপনার সকল কর্মই শুভ। আপনার সীমা নেই, আপনি স্বভাবত গম্ভীর এবং ভক্তদের কামনা পূরণকারী ; আপনার জয় হোক। ব্রহ্মণ ! আপনি অনন্ত বোধস্বরূপ, নিত্য এবং সমস্ত প্রাণীর উৎস। কোনো কিছুই আপনার অজানা নেই। আপনার বুদ্ধি পবিত্র, ধর্মজ্ঞাতা এবং বিজয় প্রদাতা। পূর্ণযোগস্বরূপ পরমাত্মন্ ! আপনার স্বরূপ গূঢ় হলেও স্পষ্ট। আজ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এবং যা হচ্ছে সবই আপনার রূপ। আপনি সমস্ত প্রাণীর আদি কারণ এবং লোকতত্ত্বের প্রভু। ভূত ভাবন ! আপনার জয় হোক। আপনি স্বয়ম্ভু, আপনার সৌভাগ্য মহান। আপনি এই কল্পের সংহারকারী এবং বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম। ধ্যান করলেই অন্তঃকরণে আপনি আবির্ভূত হন, আপনি জীবমাত্রেরই প্রিয়তম পরব্রহ্ম ; আপনার জয় হোক। আপনি স্বভাবত জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত থাকেন, আপনি সমস্ত কামনার প্রভু পরমেশ্বর। অমৃতের উৎপত্তি স্থান, সৎস্বরূপ, মুক্তাত্মা এবং বিজয় প্রদানকারী, আপনিই। আপনি প্রজাপতিদের পতি, পদ্মনাভ এবং মহাবলী। আত্মা এবং মহাভূতও আপনিই। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর ! আপনার জয় হোক। পৃথিবী দেবী আপনার চরণ, দশদিক আপনার বাহু, দ্যুলোক মস্তক। অহংকার আপনার মূর্তি, দেবতা শরীর এবং চন্দ্র ও সূর্য নেত্র। তপ এবং সত্য আপনার বল, ধর্ম ও কর্ম আপনার স্বরূপ। অগ্নি আপনার তেজ, বায়ু নিঃশ্বাস এবং জল হল ঘর্ম। অশ্বিনীকুমার আপনার কান, সরস্বতী দেবী আপনার জিহ্বা। বেদ আপনার সংস্কার নিষ্ঠা। এই জগৎ আপনার আধারেই অবস্থিত। যোগ-যোগীশ্বর। আমি আপনার সংখ্যাও জানি না, পরিমাণও নয়। আপনার তেজ, পরাক্রম ও বল সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। দেব, আমি শুধু আপনার ভজনাতেই ব্যস্ত থাকি। আপনার নিয়ম পালন করে আপনার শরণাগত হয়ে থাকি। হে বিষ্ণু !

সর্বদা পরমেশ্বর এবং মহেশ্বরকে পূজা করাই আমার কাজ। আপনার কৃপাতেই আমি পৃথিবীতে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী এবং কীট-পতঙ্গাদি সৃষ্টি করেছি। পদ্মনাভ ! বিশাললোচন ! দুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়, আপনিই জগতের গুরু। আপনার কৃপাদৃষ্টি হলেই সব দেবতা সর্বদা সুখী

থাকেন। দেব ! আপনার কৃপাতেই পৃথিবী নির্ভয়ে থাকে, তাই হে বিশাললোচন ! আপনি পুনরায় যদুবংশে অবতাররূপে এসে তাঁদের কীর্তি বৃদ্ধি করুন। হে প্রভু ! ধর্ম স্থাপন, দৈত্যবধ ও জগৎ রক্ষার জন্য আমার প্রার্থনা স্বীকার করুন। হে ভগবান বাসুদেব ! আপনার যে পরম গুহ্য স্বরূপ, আপনার কৃপাতেই আমরা তার কীর্তন করেছি।'

তখন দিব্যরূপ শ্রীভগবান অত্যন্ত মধুর ও গম্ভীর স্বরে বললেন—'বৎস ! আমি যোগ বলে তোমার ইচ্ছা জেনেছি ; তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।' এই কথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিরা এই দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তাঁরা কৌতূহলবশত ব্রহ্মার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! আপনি যাঁকে এত সুন্দর বাক্যে স্তুতি করলেন, তিনি কে ? আমরা তাঁর সম্বন্ধে জানতে চাই।' ভগবান ব্রহ্মা তখন মধুর স্বরে বললেন—'ইনি স্বয়ং পরব্রহ্ম, সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং পরমপদস্বরূপ। আমি জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলেছি আপনি যে দৈত্য-দানব-রাক্ষসদের বধ করেছিলেন, তারা এখন মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করেছে ; সুতরাং আপনি তাদের বিনাশের জন্য ধরণীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করুন।' তাই তিনি নর-নারায়ণ এই দুই রূপে মনুষ্য লোকে জন্ম নেবেন। মূঢ় মানুষ তাঁকে চিনতে পারবে না। ইনিই হলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেব এবং সমস্ত লোকের অধীশ্বর। তাঁকে মানুষ ভেবে, তাঁর অপমান করা উচিত নয়। তিনিই পরমগুহ্য, তিনিই পরমপদ, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই পরম যশ, অক্ষর, অব্যক্ত এবং সনাতন তেজ। তিনিই পরম পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। তিনিই পরম সুখ ও পরম সত্য। অতএব নিজ সুহৃদদের অভয়প্রদানকারী এই কিরীট-কৌস্তভধারী শ্রীহরিকে যিনি অসম্মান করবেন, তিনি ভয়ানক বিপদে পতিত হবেন।

ভীষ্ম বললেন—'দেবতা ও ঋষিদের এই কথা বলে ব্রহ্মা তাঁদের বিদায় জানালেন এবং নিজলোকে চলে গেলেন। একবার কয়েকজন পবিত্রাত্মা মুনি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন ; তাঁদের কাছ থেকেই আমি এই প্রাচীন প্রসঙ্গ শুনেছিলাম। এই কথা আমি জামদগ্নি-নন্দন পরশুরাম, মতিমান মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং শ্রীনারদের কাছেও শুনেছি। এইসব জেনেও শ্রীকৃষ্ণ কেন আমাদের কাছে পূজনীয় এবং বন্দনীয় হবেন না ! আমাদের অবশ্যই তাঁকে পূজা করা উচিত। আমি এবং অনেক বেদবেত্তা মুনি তোমাকে বারংবার শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বারণ করেছিলাম ; কিন্তু মোহবশত তুমি তাতে কর্ণপাত করোনি। আমি তোমাকে কোনো ক্রূরকর্মা রাক্ষস বলেই মনে করি ; কারণ তুমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে হিংসা করো। সাক্ষাৎ নর ও নারায়ণকে কোনো মানুষ কি হিংসা করতে পারে ? আমি তোমাকে সত্য বলছি—ইনি সনাতন, অবিনাশী, সর্বলোকময়, নিত্য, জগদীশ্বর, জগদ্ধর্তা এবং অবিকারী। ইনিই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, ইনিই জয় এবং ইনিই জয়ী হবেন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের রক্ষা করেন, তাই জয় তাদেরই হবে।'

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এই বাসুদেব পুত্রকে সমগ্র লোকে মহান বলা হয়। আমি এঁর উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ! বাসুদেবনন্দন নিঃসন্দেহে মহান। ইনি সকল দেবতারও দেবতা। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের থেকে বড় আর কেউ নেই। শ্রীমার্কণ্ডেয় এঁর বিষয়ে বড় অদ্ভুত কথা বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতময় এবং পুরুষোত্তম। স্বর্গের প্রারম্ভে ইনি সমস্ত দেবতা এবং ঋষিদের রচনা করেন এবং তিনি সবকিছুর উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। তিনি স্বয়ং ধর্মস্বরূপ ও ধর্মজ্ঞ, বরদায়ক, সমস্ত কামনাপূরণকারী। তিনিই কর্তা, কার্য, আদিদেব এবং স্বয়ংপ্রভু। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এঁরই কল্পনা এবং ইনিই সন্ধ্যা, দিক, আকাশ এবং নিয়মের স্রষ্টা। এই অবিনাশী প্রভু সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকারী। এই পরম তেজস্বী প্রভুকে শুধুমাত্র ধ্যানযোগেই জানা সম্ভব। এই শ্রীহরিই বরাহ, নৃসিংহ এবং ভগবান ত্রিবিক্রম। ইনি সমস্ত প্রাণীর মাতা-পিতা। এই শ্রীকমলনয়ন ভগবানের অধিক অন্য কোনো তত্ত্ব কখনো ছিল না এবং হবেও না। ইনি তাঁর শ্রীবদন থেকে ব্রাহ্মণদের, হস্ত থেকে ক্ষত্রিয়দের, জঙ্ঘা থেকে বৈশ্যদের এবং পদতল থেকে শূদ্রদের উৎপন্ন করেছেন। তিনিই সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন এঁকে পূজা করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। তিনি পরম তেজঃস্বরূপ এবং সমস্ত লোকের পরম পিতা। মুনিরা তাঁকে হৃষীকেশ বলেন। তিনিই সকলের সত্যকার আচার্য, পিতা এবং গুরু। ইনি যাঁর ওপর প্রসন্ন হন, তিনি সমস্ত অক্ষয়লোক জয় করেন। যে ব্যক্তি ভীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন এবং সর্বদা তাঁর স্তুতিপাঠ করেন, তিনি কুশলে থাকেন এবং সুখ লাভ করেন। তিনি কখনো মোহগ্রস্ত হন না। তাঁকে সম্পূর্ণ জগতের প্রকৃত প্রভু ও যোগেশ্বর জেনেই রাজা যুধিষ্ঠির এঁর শরণ নিয়েছেন।

রাজন্! পূর্বকালে ব্রহ্মর্ষি এবং দেবতারা এঁর যে ব্রহ্মময় স্তোত্র বলেছেন, আমি তা তোমাকে শোনাচ্ছি ; নারদ বলেছেন—আপনি সাধ্যগণ ও দেবতাদেরও দেবাদিদেব এবং সমস্ত জগতের পালনকারী, তাদের অন্তঃকরণের সাক্ষী। মার্কণ্ডেয় বলেছেন—আপনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং যজ্ঞাদির যজ্ঞ ও তপের তপ। ভৃগু বলেছেন—আপনি দেবতাদের দেবতা এবং ভগবান বিষ্ণুর যে প্রাচীন পরমরূপ, তাও আপনি। মহর্ষি দ্বৈপায়নের ভাষায়—আপনি বসুদের মধ্যে বাসুদেব, ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদানকারী এবং দেবতাদের পরমদেব। অঙ্গিরা বলেন—আপনি প্রথমে প্রজাপতিসর্গে দক্ষ ছিলেন এবং আপনিই সমগ্র লোক সৃষ্টিকারী। দেবলমুনি বলেন—অব্যক্ত আপনার শরীর থেকে হয়েছে, ব্যক্ত আপনার মনে স্থিত এবং সমস্ত দেবতাও আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। অসিত মুনির বক্তব্য—আপনার মস্তক দ্বারা স্বর্গলোক পরিব্যাপ্ত এবং বাহু হতে পৃথিবী, উদরে ত্রিলোক স্থিত। আপনি সনাতন পুরুষ। তপঃশুদ্ধ মহাত্মারা আপনাকে এমনই মনে করেন এবং আত্মতৃপ্ত ঋষিদের দৃষ্টিতেও আপনি সর্বোৎকৃষ্ট সত্য। মধুসূদন ! যিনি সমস্ত ধর্মে অগ্রগণ্য এবং সংগ্রামে পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই উদার হৃদয় রাজর্ষিদের আপনিই পরমাশ্রয়। যোগবেত্তাদের শ্রেষ্ঠ সনৎকুমারগণও এইভাবে শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের সর্বদা পূজা এবং স্তব করেন। রাজন্ ! আমি তোমাকে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানালাম, এবার তুমি প্রসন্নচিত্তে তাঁর ভজনা করো।'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! ভীষ্মের মুখে এই পবিত্র আখ্যান শুনে আপনার পুত্রের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের প্রতি অত্যন্ত সম্মানবোধ জন্মাল। পিতামহ তাঁদের বললেন — 'রাজন্ ! তোমরা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শুনেছ এবং নররূপ অর্জুনের স্বরূপও জেনেছ। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ যে এই নর-নারায়ণ ঋষি কী উদ্দেশ্যে অবতার গ্রহণ করেছেন। এঁরা যুদ্ধে অজেয় এবং অবধ্য আর পাণ্ডবরাও যুদ্ধে কারো দ্বারা বধ্য নয় ; কারণ এঁদের ওপর শ্রীকৃষ্ণেরও সুদৃঢ় অনুরাগ আছে।

তাই আমি বলি তোমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও। তাহলে তোমরা আনন্দে নিজ ভাইদের সঙ্গে রাজ্য ভোগ করবে। এই নর-নারায়ণকে অবজ্ঞা করলে তোমরা জীবিত থাকতে পারবে না।'

রাজন্ ! এই কথা বলে আপনার পিতৃব্য মৌন হলেন এবং দুর্যোধনকে বিদায় দিয়ে শয্যায় বিশ্রামের জন্য শায়িত হলেন। দুর্যোধন তাঁকে প্রণাম করে নিজ শিবিরে ফিরে এসে শুভ্র শয্যায় শয়ন করলেন।

ভীমসেন, অভিমন্যু এবং সাত্যকির শৌর্য এবং ভূরিশ্রবা কর্তৃক সাত্যকির দশ পুত্র বধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! রাত্রি প্রভাত হলে যখন সূর্যোদয় হল তখন দুপক্ষের সেনা যুদ্ধের জন্য সম্মুখীন হল। পাণ্ডব এবং কৌরব উভয় পক্ষই তাঁদের সেনাদের ব্যূহরচনা করে পরস্পর আক্রমণ শুরু করে দিল। ভীষ্ম মকরব্যূহ রচনা করলেন এবং সব দিক থেকে তা নিজেই রক্ষা করতে লাগলেন। পরে এক বিশাল সেনা নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁর সৈন্যদলের রথী, পদাতিক, গজারোহী এবং অশ্বারোহী নিজ নিজ স্থানে থেকে এক অপরের সাহায্যের জন্য চলতে লাগল। পাণ্ডবগণ তাঁকে এইভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে শ্যেন ব্যূহের মতো ব্যূহ নির্মাণ করলেন। তার চঞ্চুস্থানে ভীমসেন, নেত্রের স্থানে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী, মস্তক স্থানে সাত্যকি, গলদেশে অর্জুন, বামপক্ষে অক্ষৌহিণী সেনাসহ দ্রুপদ, দক্ষিণপক্ষে অক্ষৌহিণী নায়ক কেকয়রাজ ও পৃষ্ঠভাগে দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, অভিমন্যু, রাজা যুধিষ্ঠির এবং নকুল-সহদেব দণ্ডায়মান ছিলেন। ভীমসেন তখন মুখ্যস্থান থেকে মকরব্যূহতে ঢুকে ভীষ্মের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীষ্মও ভয়ানক বাণবর্ষণ করে পাণ্ডবদের ব্যূহবদ্ধ সেনাদের বিভ্রান্ত করতে লাগলেন। অর্জুন নিজ সেনাদের হতবুদ্ধি হতে দেখে শীঘ্রই সম্মুখভাগে এলেন এবং হাজার হাজার বাণবর্ষণ করে ভীষ্মকে আঘাত করতে লাগলেন। তিনি ভীষ্মকে বাণের দ্বারা প্রতিহত করে প্রসন্ন হয়ে সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এলেন।

রাজা দুর্যোধন তখন তাঁর ভাইদের সংহারের কথা স্মরণ করে আচার্য দ্রোণকে বললেন—'আচার্য ! আপনি সর্বদাই আমার হিত কামনা করেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমিও আপনার এবং পিতামহ ভীষ্মের ভরসায় দেবতাদেরও যুদ্ধে আহ্বান করার সাহস রাখি, তবে এই হীনপরাক্রমী পাণ্ডবদের আর কী কথা ? সুতরাং আপনি এমন যুদ্ধ করুন যাতে এই পাণ্ডবরা শীঘ্র বধ হয়।' দুর্যোধনের কথায় আচার্য দ্রোণ সাত্যকির সামনেই পাণ্ডবদের ব্যূহ ভেদ করতে লাগলেন। তখন সাত্যকি তাঁকে বাধাপ্রদান করলে দুজনের মধ্যে ভয়ংকর সংগ্রাম শুরু হল। আচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। ভীমসেন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকিকে রক্ষা করার জন্য আচার্যের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন দ্রোণ, ভীষ্ম এবং শল্য বাণের দ্বারা ভীমকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। তাই দেখে অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সকলের ওপর হাজার হাজার বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

দিন যত বাড়তে লাগল যুদ্ধ তত ভীষণরূপ ধারণ করল। কৌরব ও পাণ্ডব দুপক্ষের বহু বড় বড় বীর এগিয়ে এলেন, যুদ্ধের গগনভেদী শব্দ চারিদিক সন্ত্রস্ত করে তুলল। অর্জুন তাঁর ভাইদের এবং অন্য রাজাদের ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রিত দেখে তাঁদের রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং গাণ্ডীব ধনুকের শব্দ শুনে এবং বানর ধ্বজা দেখে আমাদের পক্ষের সেনাদের সাহস চলে গেল। অর্জুন যখন তাঁর ভয়ানক অস্ত্র নিয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন, তখন আমাদের সৈন্যদের পূর্ব-পশ্চিম জ্ঞান ছিল না। আপনার পুত্রদের সঙ্গে তারাও ভীত হয়ে ভীষ্মের আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকল। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রথী রথ থেকে, ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে, এমনকি পদাতিক সৈন্যও মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

ভীষ্ম নানা অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধাদের বিশাল বাহিনী নিয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। এইভাবে অবন্তী নরেশ কাশীরাজের সঙ্গে, ভীমসেন জয়দ্রথের সঙ্গে, যুধিষ্ঠির শল্যের সঙ্গে, বিকর্ণ সহদেবের সঙ্গে, চিত্রসেন শিখণ্ডীর সঙ্গে, মৎস্যরাজ বিরাট রাজার সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গীরা দুর্যোধন ও শকুনির সঙ্গে, দ্রুপদ, চেকিতান এবং সাত্যকি আচার্য দ্রোণ এবং অশ্বত্থামার সঙ্গে এবং কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে যুদ্ধ হতে হতে মধ্যাহ্ন হয়ে এল। সূর্যতাপে চারদিক জ্বলতে লাগল। ভীষ্ম সব সেনাদের নিয়ে ভীমসেনের অগ্রগমন প্রতিহত করলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে ভীমকে আঘাত করলেন। মহাবলী ভীম তাঁর ওপর এক অত্যন্ত বেগবান শক্তি নিক্ষেপ করলেন, ভীষ্ম নিজের বাণ দিয়ে সেটি দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং আর এক বাণে ভীমের ধনুক দু টুকরো করে দিলেন। সাত্যকি তখন সবেগে সেখানে এসে ভীষ্মের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম তখন এক ভীষণ বাণ দিয়ে সাত্যকির সারথিকে রথ থেকে ফেলে দিলেন। সারথি মারা যাওয়ায় ঘোড়াগুলি এদিক-ওদিক পালাতে লাগল, তার জন্য সেনাদের মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

ভীষ্ম এবার পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষের বীররা আপনার সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মহারথী বিরাট ভীষ্মের ওপর তিন বাণ ছুঁড়ে তিনটি ঘোড়াকে আঘাত করলেন। তখন ভীষ্ম দশ বাণে বিরাটকে বিদ্ধ করলেন। অশ্বত্থামা ছয় বাণে অর্জুনকে আঘাত করলে অর্জুন অশ্বত্থামার ধনুক কেটে ফেললেন। অশ্বত্থামা তখন অন্য ধনুক তুলে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করলেন। অর্জুন অত্যন্ত ভয়ংকর বাণ তুলে সবেগে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করলেন। সেই বাণ অশ্বত্থামার বর্ম ভেদ করে তাঁর রক্তক্ষরণ করতে লাগল। আহত হলেও অশ্বত্থামার মধ্যে তার জন্য কোনো বিকার দেখা গেল না। তিনি ভীষ্মের রক্ষার জন্য পূর্ববৎ স্থির থাকলেন।

দুর্যোধন এর মধ্যে দশ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করলেন, ভীমসেনও তীক্ষ্ণবাণে কুরুরাজের বুক বিদ্ধ করলেন। অভিমন্যু দশ বাণে চিত্রসেনকে এবং সাতবাণে পুরুমিত্রকে আঘাত করলেন, সত্যব্রত ভীষ্মকে সত্তর বাণে ঘায়েল করে রণাঙ্গনে নৃত্য করতে লাগলেন। তাই দেখে চিত্রসেন দশবাণে, পুরুমিত্র সাত বাণে, ভীষ্ম নয় বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। বীর অভিমন্যু আহত অবস্থাতেও চিত্রসেনের ধনুক দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন এবং তাঁর বর্মভেদ করে বুকে বাণবিদ্ধ করলেন। অভিমন্যুর পরাক্রম দেখে আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ তাঁর কাছে এসে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। সুভদ্রানন্দন তখন তাঁর চার ঘোড়া এবং সারথিকে বধ করে নিজ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁকে আক্রমণ করলেন। লক্ষ্মণ ক্রোধান্বিত হয়ে অভিমন্যুর রথে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। শক্তিকে আসতে দেখে অভিমন্যু তাকে তীক্ষ্ণ বাণে টুকরো টুকরো করে দিলেন। কৃপাচার্য তখন লক্ষ্মণকে নিজ রথে বসিয়ে রণক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

সংগ্রাম ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠল এবং আপনার পুত্র এবং পাণ্ডবরা জীবন বিপন্ন করে একে অপরকে আঘাত করতে লাগলেন। মহাবলী ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দিব্য অস্ত্রের দ্বারা পাণ্ডবসেনা বধ করতে লাগলেন। অন্যদিকে সাত্যকি রণোন্মত্ত হয়ে শত্রুদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁকে এগোতে দেখে দুর্যোধন তাঁকে প্রতিহত করতে দশ হাজার রথ পাঠালেন। সত্যপরাক্রমী সাত্যকি সেই সমস্ত ধনুর্ধর বীরদের দিব্য অস্ত্রের দ্বারা বধ করলেন। সেই অসাধারণ পরাক্রমের পর সাত্যকি ধনুক হাতে ভূরিশ্রবার সামনে এলেন। ভূরিশ্রবা যখন দেখলেন সাত্যকি তাঁদের সেনাদের বধ করছেন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিজ ধনুক হাতে তৎক্ষণাৎ বজ্রের ন্যায় কঠিন বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই বাণ ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু। সাত্যকির সঙ্গের যোদ্ধারা সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। সাত্যকির দশ মহারথী পুত্ররা ভূরিশ্রবার এই পরাক্রম দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর সামনে এসে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁদের নিক্ষিপ্ত বাণ যমদণ্ড এবং বজ্রের ন্যায় ভয়ংকর ছিল। কিন্তু মহারথী ভূরিশ্রবা তাতে এতটুকুও ভয় পেলেন না। বাণ তাঁর কাছে আসার আগেই তিনি সেগুলি প্রতিহত করে ফেলতে

লাগলেন। আমরা তার এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখলাম যে এই সংগ্রামে সে একাই নির্ভয়ে দশ মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। সেই দশ মহারথী বাণবৃষ্টি করতে করতে তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল এবং তাঁকে বধ করার চেষ্টা করতে লাগল। ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ধনুকগুলি কেটে ফেললেন। ধনুক কেটে ফেলার পর তিনি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁদের মস্তক কেটে ফেললেন।

সাত্যকি তাঁর মহাবলী পুত্রদের মৃত্যু দেখে গর্জন করে এসে ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দুই মহাবলী একে অন্যের রথের ওপর আঘাত করতে লাগলেন। উভয়েই উভয়ের রথের ঘোড়াগুলি মেরে ফেললেন এবং লাফিয়ে সামনে এসে হাতে তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধের জন্য দাঁড়ালেন। ভীমসেন এসে সাত্যকিকে নিজের রথে তুলে নিলেন, দুর্যোধনও এসে ভূরিশ্রবাকে রথে বসালেন।

এদিকে যখন এই যুদ্ধ চলছে, অন্য দিকে পাণ্ডবরা ক্রুদ্ধ হয়ে মহারথী ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। সন্ধ্যা হতে হতে অর্জুন পঁচিশ হাজার মহারথীকে হত্যা করলেন। এইসব মহারথী দুর্যোধনের নির্দেশে পার্থকে বধ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু অগ্নিতে গেলে যেমন পতঙ্গ জ্বলে মরে, সেইভাবে তাঁরা অর্জুনের কাছে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

সূর্য অস্তোমুখ হল, সমস্ত সেনা, ভীষ্মের রথের ঘোড়াগুলিও পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ভীষ্ম যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। সেনারা সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেল। সৃঞ্জয়ের সঙ্গে পাণ্ডব ও কৌরবও নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করলেন।

———o———
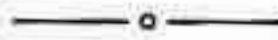
মকর ও ক্রৌঞ্চ-ব্যূহ নির্মাণ, ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! রাত্রি প্রভাত হলে, কৌরব ও পাণ্ডবদের বিশ্রাম শেষ হলে পুনরায় সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'মহাবাহো ! আজ তুমি শত্রুদের নাশ করার জন্য মকরব্যূহ রচনা করো।' তাঁর আদেশ পেয়ে মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত রথীদের ব্যূহের আকারে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন। রাজা দ্রুপদ ও অর্জুন ব্যূহের মস্তকের কাছে থাকলেন। নকুল-সহদেব দুটি নেত্রস্থানে থাকলেন। মহাবলী ভীম থাকলেন মুখের জায়গায়। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ঘটোৎকচ, সাত্যকি এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—এঁরা ব্যূহের কণ্ঠভাগে অবস্থিত হলেন। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেনাপতি বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন থাকলেন তার পৃষ্ঠভাগে। কেকয়দেশের পাঁচ রাজকুমার ব্যূহের বামভাগে ও ধৃষ্টকেতু, চেকিতান দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হয়ে ব্যূহ রক্ষা করছিলেন। কুন্তিভোজ ও শতানীক পায়ের স্থানে ছিলেন। সোমকের সঙ্গে শিখণ্ডী এবং ইরাবান সেই মকরের পুচ্ছভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন। এইভাবে ব্যূহ রচনা করে পাণ্ডবরা সূর্যোদয়ের পর বর্ম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং হাতি, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক যোদ্ধাসহ কৌরবদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজন্ ! পাণ্ডব সেনাদের ব্যূহ দেখে ভীষ্ম তার প্রতিরোধের জন্য বিশাল এক ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্মাণ করলেন। তার চঞ্চুস্থানে মহান ধনুর্ধর দ্রোণাচার্য সুশোভিত ছিলেন। অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য তার নেত্রস্থানে। কম্বোজ ও বাহ্লীকদের সঙ্গে কৃতবর্মা শিরোভাগে অবস্থান করছিলেন। শূরসেন এবং আরও অনেক রাজাদের সঙ্গে দুর্যোধন ছিলেন কণ্ঠস্থানে। মদ্র, সৌবীর এবং কেকয়দের সঙ্গে প্রাগ জ্যোতিষপুরের রাজা বক্ষস্থলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজ সৈন্য নিয়ে সুশর্মা ব্যূহের বামভাগে এবং তুষার, যবন ও শকদেশীয় যোদ্ধাদের দক্ষিণভাগে রাখা হয়েছিল। শ্রুতায়ু, শতায়ু এবং ভূরিশ্রবা—তাঁরা এই ব্যূহের জঙ্ঘাস্থানে ছিলেন।

এইভাবে ব্যূহ নির্মাণ হয়ে গেলে সূর্যোদয়ের পরে দুপক্ষের সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুন্তীনন্দন

ভীমসেন দ্রোণাচার্যের সেনার ওপর আক্রমণ করলেন। দ্রোণাচার্য তাঁকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে নয়টি লৌহবাণে ভীমের মর্মস্থলে আঘাত করলেন। তাঁর এই কঠোর আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ভীমসেন আচার্যের সারথিকে যমালয়ে পাঠালেন। সারথির মৃত্যু হলে দ্রোণাচার্য নিজেই ঘোড়ার রশি ধরলেন এবং আগুন যেমন সব পুড়িয়ে দেয়, তেমন করে পাণ্ডব সেনা ধ্বংস করতে লাগলেন। অন্যদিক থেকে ভীষ্মও সেনা বধ করতে লাগলেন। তাঁদের দুজনের আঘাতে সৃঞ্জয় এবং কেকয়বীর পালিয়ে গেলেন। ভীমসেন, অর্জুনও কৌরব সৈন্য সংহার করতে আরম্ভ করলেন, তাঁদের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কৌরব সেনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। দুই দলের ব্যূহ ভেঙে গেল এবং উভয় পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পর মিলে মিশে গেল।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! আমাদের সৈন্যের অনেক গুণ, বহু প্রকারের যোদ্ধা আছে এবং শাস্ত্রীরীতি মেনে তারা ব্যূহ নির্মাণ করেছে। আমাদের সৈনিক প্রসন্ন চিত্ত এবং আমাদের ইচ্ছানুসারেই যুদ্ধ করে ; তারা নম্র, তাদের কোনোপ্রকার দুর্ব্যসন নেই এবং সৈন্যদলে কোনো বৃদ্ধ বা বালক নেই। অতি স্থূল বা অত্যন্ত দুর্বল লোকও নেই, সকলেই নীরোগ এবং আনন্দের সঙ্গে কাজ করে। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত, শস্ত্রও তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। প্রায় সকলেই সব অস্ত্রে পারদর্শী। এদের রক্ষার ভার তাঁদের ওপর, যাঁদের পৃথিবীর লোক সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃতবর্মা, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও বাহ্লীক প্রমুখ মহাবীরদের দ্বারা আমাদের সেনা সুরক্ষিত ; তা সত্ত্বেও এদের যদি বিনাশ হতে থাকে, তাহলে আমাদের প্রারব্ধই তার কারণ। ইতিপূর্বে মানুষ বা প্রাচীন ঋষিরাও যুদ্ধের এত বড় আয়োজন কখনো দেখেনি। বিদুর প্রত্যহ আমাকে হিতের ও লাভের কথা বলতেন, কিন্তু মূর্খ দুর্যোধন সে কথা শোনেনি। বিদুর সর্বজ্ঞ, তিনি আজকের এই পরিণাম জানতে পেরেছিলেন, তাই তো বারণ করেছিলেন। অথবা কারোরই দোষ নেই, এমনই হওয়ার ছিল। বিধাতা প্রথমেই যেমন লিখেছেন, তেমনই হবে ; তাকে কেউ বদলাতে পারে না।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! আপনার অপরাধের জন্যই আপনাকে এই সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথমে যে পাশা খেলা হয়েছিল আর আজ যে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে—এই দুয়ের জন্য আপনিই দায়ী। ইহলোকে এবং পরলোকে মানুষের নিজের কর্মফল নিজেকেই ভুগতে হয়। আপনারও কর্মানুসারে উচিত ফলই প্রাপ্তি হয়েছে। এই মহাসংকট ধৈর্যসহকারে সহ্য করুন এবং যুদ্ধের বাকি বৃত্তান্ত সাবধানে শুনুন।

ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে আপনার মহাসেনার ব্যূহ ভেঙে দুর্যোধনের ভাইদের কাছে পৌঁছলেন। যদিও ভীষ্ম সেনাদের সবদিক থেকে রক্ষা করছিলেন, তা সত্ত্বেও দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুঃসহ, দুর্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্মা, দুষ্কর্ণ এবং কর্ণ প্রমুখ আপনার মহারথী পুত্রদের সেখানে দেখেই ভীম সেই মহাসেনার মধ্যে প্রবেশ করে হাতি, ঘোড়া এবং রথে উপবিষ্ট কৌরব সেনাদের প্রধান বীরদের বধ করলেন। কৌরবরা তাঁকে বন্দী করতে চেষ্টা করছিল, তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ভীমসেন বুঝতে পেরেছিলেন। তখন তিনি সেখানে আপনার যে পুত্ররা ছিলেন, তাদের বধ করার কথা ভাবলেন। তিনি গদা তুলে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁদের বধ করতে লাগলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সময় ভীমসেনের রথের কাছে এসে পৌঁছলেন। তিনি দেখলেন ভীমসেন রথে নেই শুধু ভীমের সারথি বিশোক সেখানে রয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তাঁর চেতনা লুপ্ত প্রায় হল, চোখে জল এসে গেল, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'বিশোক আমার প্রাণপ্রিয় ভীমসেন কোথায় ?'

বিশোক হাত জোড় করে বললেন—'আমাকে এইখানে রেখে তিনি এই সৈন্য সাগরে প্রবেশ করলেন। যাওয়ার সময় শুধু বলে গেলেন, 'সূত ! তুমি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। যারা আমাকে বধ করতে চায়, আমি এখনই তাদের বধ করব।'

তারপর ভীমসেনকে গদাহস্তে সেনাদের মধ্যে দৌড়তে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি বিশোককে বললেন—'মহাবলী ভীমসেন আমার সখা এবং তাঁর সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্বন্ধও রয়েছে। আমার তাঁর ওপর অত্যন্ত ভালোবাসা আছে, ওঁরও আমার ওপর ভালোবাসা আছে। তাই উনি যেখানে গেছেন, আমিও সেখানে যাচ্ছি।' এই বলে, ভীমসেন গদা দিয়ে হাতিদের বধ করে যে রাস্তা তৈরি করেছেন, সেই রাস্তা দিয়ে তিনিও সেনাদের

মধ্যে চলে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখলেন ঝড় যেমন করে গাছকে উপড়ে দেয়, ভীমসেন তেমন করে শত্রু সংহার করছেন, তাঁর গদার আঘাতে আহত হয়ে রথী, অশ্বারোহী, পদাতিক এবং হাতির সওয়ারি—সকলেই আর্তনাদ করছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর কাছে পৌঁছে তাঁকে নিজের রথে তুলে আলিঙ্গন করলেন।

আপনার পুত্ররা ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করতেন, শত্রুদের বাণে তিনি একটুও ব্যথিত হতেন না ; সব যোদ্ধাকে তিনি তাঁর বাণে বিদ্ধ করলেন। তারপরও আপনার পুত্রদের যুদ্ধ করতে দেখে মহারথী দ্রুপদকুমার 'প্রমোহনাস্ত্র' প্রয়োগ করলেন। তার প্রভাবে সমস্ত নরবীর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দ্রোণাচার্য

সেই খবর শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে এলেন। তিনি দেখলেন ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে বিচরণ করছেন। আপনার সব পুত্রই অচেতন হয়ে আছে। আচার্য তখন প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগ করে প্রমোহনাস্ত্র নিবারণ করলেন। তাতে সব বীর আবার প্রাণশক্তি ফিরে পেলেন এবং তাঁরা পুনরায় ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সৈন্যদের ডেকে বললেন—অভিমন্যু বারোজন মহারথী নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের কাছে যেন যায় এবং তাঁদের সংবাদ নেয়। ওঁদের জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে সমস্ত পরাক্রমশীল যোদ্ধা রওনা হলেন। তখন সময় দ্বিপ্রহর। ধৃষ্টকেতু, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং কেকয়দেশীয় বীর অভিমন্যুকে অগ্রণী করে বিশাল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁরা সূচীমুখ ব্যূহ তৈরি করে কৌরবসেনা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করলেন। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আগেই কৌরব সেনাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলেন, তাই তাঁরা আর এঁদের প্রতিহত করতে পারলেন না।

ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু প্রমুখ বীরদের তাঁদের দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং উৎসাহ ভরে আপনার সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। তার মধ্যে দ্রুপদ কুমার তাঁর গুরু দ্রোণাচার্যকে সেদিকে আসতে দেখলেন। তিনি তখন আপনার পুত্রদের বধ করার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে ভীমসেনকে কেকয়ের রথে উঠিয়ে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করলেন। তাঁকে নিজের দিকে আসতে দেখে আচার্য এক বাণে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন এবং চার বাণে তাঁর ঘোড়াগুলি ও সারথিকে যমালয়ে পাঠালেন। মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই রথ ত্যাগ করে অভিমন্যুর রথে উঠলেন। আচার্য দ্রোণের তীক্ষ্ণ বাণে পাণ্ডবসেনা ভয়ে কম্পিত হল। অন্য দিকে পিতামহ ভীষ্মও পাণ্ডবসেনা সংহার করছিলেন।

—o—

ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধ, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রদের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—তারপর সন্ধ্যা সমাগত হলে দুর্যোধন ভীমসেনকে বধ করার জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ করলেন। প্রধান শত্রুকে আসতে দেখে ভীমসেনের ক্রোধের সীমা থাকল না। তিনি দুর্যোধনকে বললেন—'আজ আমার সেই সুযোগ এসেছে, যার জন্য আমি বহু বৎসর অপেক্ষা করে আছি। যদি যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে না যাও, তাহলে অবশ্যই আমি আজ তোমাকে হত্যা করব। মাতা কুন্তীকে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, আমরা বনবাসে যে ক্লেশ সহ্য করেছি, দ্রৌপদীকে যে অপমান, দুঃখ পেতে হয়েছে, আজ তোমাকে
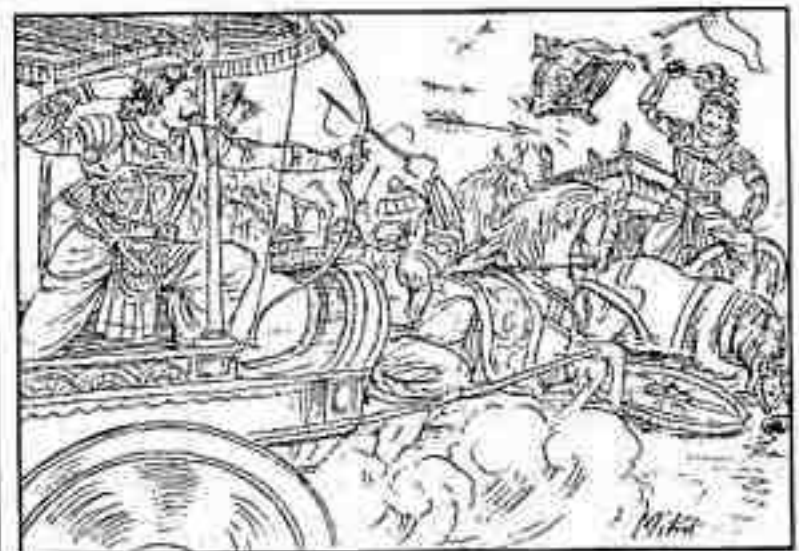
বধ করে তার প্রতিশোধ নেব।' এই বলে ভীমসেন ধনুক তুলে দুর্যোধনের ওপর জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ছাব্বিশটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। তারপর দুই বাণে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন, দুই বাণে সারথিকে বধ করলেন, চার বাণে ঘোড়াদের হত্যা করলেন, দুই বাণে ছত্র ও ছয় বাণে ধ্বজা কেটে দিলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কৃপাচার্য এসে দুর্যোধনকে তাঁর রথে তুলে নিলেন। ভীমসেন তাঁকে ভীষণভাবে আহত করেছিলেন, তাই তিনি রথের পিছনের অংশে বসে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। তারপর ভীমসেনকে পরাস্ত করার জন্য জয়দ্রথ কয়েক হাজার রথ এনে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও কেকয়দেশের রাজকুমার আপনার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গদ, চিত্রদর্শন, চারুচিত্র, সুচারু, নন্দক ও উপনন্দক—এই আট যশস্বী বীর অভিমন্যুর রথটি চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। অভিমন্যু তাই দেখে প্রত্যেককে পাঁচটি করে বাণ মারলেন। অভিমন্যুর এই পরাক্রম তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরাও তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অভিমন্যু এমন পরাক্রম দেখালেন যে শত্রুসৈন্য কেঁপে উঠল। মনে হল দেবাসুর-সংগ্রামে যেন বজ্রপাণি ইন্দ্র অসুর বধ করছেন। অভিমন্যু তারপর তীর দিয়ে বিকর্ণের রথের ধ্বজা কেটে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে হত্যা করলেন। তারপর তীক্ষ্ণ বাণে বিকর্ণর শরীরে আঘাত করলেন, সেই তীর বিকর্ণকে ভেদ করে পৃথিবীর মাটিতে গিয়ে পড়ল। বিকর্ণকে পড়ে যেতে দেখে অন্যান্য ভাইরা অভিমন্যুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দুর্মুখ সাত বাণে শ্রুতকর্মাকে বিদ্ধ করলেন, তাঁর ধ্বজা কেটে, ঘোড়া ও সারথিকে হত্যা করলেন। শ্রুতকর্মা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোড়াবিহীন রথে দাঁড়িয়ে দুর্মুখের ওপর প্রজ্বলন্ত উল্কার ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সেটি দুর্মুখের বর্ম ভেদ করে শরীর ছিদ্র করে মাটিতে পড়ল। এদিকে শ্রুতকর্মাকে রথবিহীন দেখে মহারথী সুতসোম তাঁকে নিজ রথে তুলে নিলেন। রাজন্! তারপর আপনার যশস্বী পুত্র জয়ৎসেনকে হত্যার ইচ্ছায় শ্রুতকীর্তি তাঁর কাছে এলেন। জয়ৎসেন মৃদুহাস্য করে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। ভাইয়ের ধনুক কেটে গেছে দেখে সিংহগর্জন করে শতানীক সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি তাঁর সুদৃঢ় ধনুক উঠিয়ে দশ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করলেন। জয়ৎসেনের কাছে তার ভাই দুষ্কর্ণও ছিলেন, তিনি নকুল পুত্র শতানীকের ধনুক কেটে ফেললেন। শতানীক অপর একটি ধনুক দিয়ে তাতে বাণ চড়িয়ে দুষ্কর্ণকে আঘাত করলেন। তারপর অন্য বাণে তাঁর ধনুক কেটে, দুই বাণে সারথি ও বারোটি বাণে ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। পরে ভল্ল নামক এক বাণে দুষ্কর্ণের বুকে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে দুষ্কর্ণ বিদ্যুতের আঘাত প্রাপ্ত গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দুষ্কর্ণকে আহত দেখে পাঁচ মহারথী শতানীককে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল এবং বাণের দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করে দিল। তাই দেখে পাঁচ কেকয় রাজকুমার ক্রুদ্ধ হয়ে শতানীককে রক্ষা করতে দ্রুত এগিয়ে এল। তাঁদের আক্রমণ করতে দেখে দুর্মুখ, দুর্জয়, দুর্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় প্রমুখ আপনার মহারথী পুত্ররা প্রতিশোধ নিতে এলেন। এইসব রাজারা সূর্যাস্ত হওয়ার প্রায় একঘন্টার পরেও ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন। হাজার হাজার রথী এবং অশ্বারোহীর মৃতদেহ ছড়িয়ে রইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তখন পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল সেনাদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। এইভাবে পাণ্ডব সেনা সংহার করে ভীষ্ম তাঁর যোদ্ধাদের ফেরত পাঠালেন, নিজেও তাঁর শিবিরে ফিরে গেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। তারপর সকলে আনন্দিত মনে শিবিরে চলে গেলেন।

—— ০ ——

ষষ্ঠ দিনে দ্বিপ্রহর অবধি যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সব যোদ্ধা তখন নিজ নিজ শিবিরে চলে এলেন। রাত্রে সকলে বিশ্রাম করে একে অন্যের খোঁজ নিলেন। পরদিন প্রভাতে সকলে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। আপনার পুত্র দুর্যোধন অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! আপনার সেনারা অত্যন্ত শক্তিমান।

এদের ব্যূহ রচনাও অত্যন্ত সাবধানে করা হয়। তা সত্ত্বেও পাণ্ডবপক্ষের মহারথীরা তাকে ভেদ করে আমাদের বীরদের বধ করে চলেছে। তারা আমাদের বীরদের ফাঁদে ফেলে অত্যন্ত যশলাভ করছে। তারা আমাদের বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় মকরব্যূহও ভেদ করছে এবং ভীমসেন তার ভেতরে প্রবেশ করে তার মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড বাণে আমাকে ঘায়েল করেছে। ভীমের সেই রোষপূর্ণ মূর্তি দেখে আমার চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হয়েছিল। এখনো আমি শান্ত হতে পারিনি। মহাত্মন্ ! আপনার সাহায্যে আমি যুদ্ধে জয় লাভ করে পাণ্ডবদের কাজ শেষ করে দিতে চাই।

দুর্যোধনের কথা শুনে মহাত্মা ভীষ্ম হেসে বললেন, 'রাজকুমার ! আমি অত্যধিক প্রচেষ্টার দ্বারা পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করব এবং ততধিক শক্তিতে পাণ্ডব সৈন্যের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করব। তোমার জন্য আমি, এই শত্রু সৈন্য তো কী, সমস্ত দেবতা ও দৈত্যদের বধ করতে পিছু

হটব না। আমি পূর্ণ শক্তি দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমার পছন্দমতো কাজ করব।'

পিতামহের কথা শুনে দুর্যোধন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। প্রাতঃকাল হতেই ভীষ্ম স্বয়ং ব্যূহ রচনা করলেন। তিনি নানা অস্ত্রে সজ্জিত মণ্ডলব্যূহের বিধিতে কৌরব সেনাবাহিনী সজ্জিত করলেন। তাতে প্রধান প্রধান বীর, গজারোহী, পদাতিক এবং রথীদের যথাস্থানে নিযুক্ত করলেন। ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে সৈন্যরা ব্যূহবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। যুদ্ধোৎসুক রাজাদের দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁরা ভীষ্মকেই যেন রক্ষা করছেন এবং ভীষ্ম তাঁদের রক্ষায় তৎপর। এই মণ্ডলব্যূহ অত্যন্ত দুর্ভেদ্য এবং একে পশ্চিমমুখী করে রাখা হয়েছিল।

সেই দুর্জয় মণ্ডলব্যূহ দেখে রাজা যুধিষ্ঠির নিজের সৈন্য দ্বারা বজ্রব্যূহ নির্মাণ করলেন। ব্যূহবদ্ধ হয়ে দুপক্ষের সেনা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য উতলা হয়ে সিংহনাদ করে ব্যূহ ভঙ্গ করার জন্য অগ্রসর হতে লাগল। দ্রোণাচার্য বিরাটের, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর এবং রাজা দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের সামনে এলেন। নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যের ওপর এবং অবন্তীনরেশ বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের ওপর আক্রমণ চালালেন। অন্য সব রাজা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীমসেন কৃতবর্মা, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণের অগ্রগমন প্রতিহত করলেন। অর্জুনের পুত্র আপনার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। প্রাগ্জ্যোতিষ নরেশ ভগদত্ত ঘটোৎকচকে আক্রমণ করলেন, রাক্ষস অলম্বুষ রণোন্মত্ত সাত্যকি এবং তাঁর সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ভূরিশ্রবা ধৃষ্টকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা শ্রুতায়ুর সঙ্গে, চেকিতান কৃপাচার্যের সঙ্গে এবং অপর বীরগণ পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

আপনার পক্ষের কয়েকজন রাজা নানাপ্রকার অস্ত্র নিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ধরলেন। অর্জুন তাঁদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। রাজারাও সকলে তাঁর দিকে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কাজ দেখে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব নাগরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। অর্জুন ক্রোধভরে তাঁদের দিকে ঐন্দ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন এবং বাণের সাহায্যে শত্রুপক্ষের সমস্ত বাণ প্রতিহত করলেন। অর্জুনের পরাক্রমে সকলে চমকিত হলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যত রাজা, অশ্বারোহী, গজারোহী এসেছিলেন, কেউই অক্ষত থাকলেন না। তখন তাঁরা সকলে ভীষ্মের শরণাগত হলেন। ভীষ্ম তখন অর্জুন সাগর থেকে তাঁদের পরিত্রাণ করতে জাহাজরূপে প্রতিভাত হলেন। তাঁদের পলায়নে আপনার সৈন্যরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিল।

ভীষ্ম তখন সবেগে অর্জুনের সম্মুখে এসে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য বাণের দ্বারা মৎস্যরাজ বিরাটকে ঘায়েল করলেন এবং তাঁর ধ্বজা এবং ধনুক কেটে ফেললেন। সেনানায়ক বিরাট তৎক্ষণাৎ অন্য একটি ধনুক নিয়ে তিন বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে আঘাত করলেন, চারটির দ্বারা ঘোড়াগুলি বধ করলেন এবং একটির দ্বারা ধ্বজা কেটে ফেললেন। পঞ্চম বাণে সারথিকে বধ করে অন্য আর এক বাণে ধনুক কেটে দিলেন। তাঁর এই কাজে দ্রোণাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি আট বাণে

বিরাটের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করলেন এবং সারথিকে বধ করলেন। বিরাট নিজের রথ থেকে লাফিয়ে তাঁর পুত্রের রথে আরোহণ করলেন। তখন দুই পিতা-পুত্র ভীষণ বাণবর্ষা করে আচার্যকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্য রাজকুমার শঙ্খের ওপর সর্পের ন্যায় এক বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শঙ্খের হৃদয় বিদ্ধ করল, তিনি রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। শঙ্খের হাতের ধনুক তাঁর পিতার কাছে গিয়ে পড়ল। পুত্রকে মৃত দেখে বিরাট ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন। তখন পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

শিখণ্ডী অশ্বত্থামার সামনে এসে তাঁর কপালের মধ্যস্থলে আঘাত করলেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামা বহু বাণবর্ষণ করে নিমেষের মধ্যে শিখণ্ডীর ধ্বজা, সারথি, ঘোড়া এবং

ধনুক কেটে ফেলে দিলেন। ঘোড়াগুলি বধ হওয়ায় তিনি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে বাঘের মতো গর্জন করে তাঁকে ধরলেন। রণাঙ্গনে তলোয়ার নিয়ে বিচরণশীল শিখণ্ডীকে অশ্বত্থামা আঘাত করার সুযোগই পেলেন না। তখন তিনি তাঁর ওপর হাজার হাজার বাণবর্ষণ করলেন। শিখণ্ডী তাঁর তলোয়ার দিয়ে সমস্ত বাণ কেটে ফেললেন। তখন অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর ঢাল ও তলোয়ার টুকরো টুকরো করে দিলেন। বহুবাণ দিয়ে শিখণ্ডীকে আঘাত করলেন, শিখণ্ডী তাড়াতাড়ি সাত্যকির রথে গিয়ে উঠলেন।

বীর সাত্যকি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে অলম্বুষ নামক রাক্ষসকে ঘায়েল করলেন। তখন অলম্বুষও অর্ধচন্দ্রাকার বাণে সাত্যকির ধনুক কেটে দিলেন এবং তাঁকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তারপর রাক্ষসী মায়াদ্বারা বাণের বর্ষা করে দিলেন। সেইসময় সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল, তিনি তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে আহত হলেও একটুও ভয় না পেয়ে, অর্জুনের কাছ থেকে পাওয়া ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসী মায়া তৎক্ষণাৎ ভস্ম করে দিলেন। তারপর বাণবর্ষণ করে অলম্বুষকে উৎপীড়িত করে তুললেন। সাত্যকির দ্বারা পীড়িত হয়ে রাক্ষস অলম্বুষ সেখান থেকে পালিয়ে গেল। সত্যপরাক্রমী সাত্যকি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে আপনার পুত্রদেরও প্রহার করলে, তাঁরাও ভীত হয়ে রণভূমি ত্যাগ করলেন।

দ্রুপদপুত্র মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন তাঁর তীক্ষ্ণবাণে আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। কিন্তু দুর্যোধন তাতে ভীত না হয়ে অত্যন্ত বেগে বাণ ছুঁড়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিত হয়ে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন, ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন এবং সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দুর্যোধনকেও আঘাত করলেন। ঘোড়া মারা যাওয়ায় দুর্যোধন রথ থেকে নেমে তলোয়ার হাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধেয়ে এলেন। এরমধ্যে শকুনি এসে তাঁকে রথে তুলে নিলেন।

এইভাবে দুর্যোধনকে পরাস্ত করে ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার সেনা সংহার করতে শুরু করলেন। সেইসময় মহারথী কৃতবর্মা ভীমসেনকে বাণে আচ্ছাদিত করলেন। ভীমসেন হেসে কৃতবর্মার ওপর বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন। তিনি তাঁর ঘোড়া, সারথি সব হত্যা করে ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং কৃতবর্মাকেও ঘায়েল করলেন। ঘোড়াগুলি মারা যাওয়ায় কৃতবর্মা দ্রুত গিয়ে আপনার শ্যালক বৃষকের রথে উঠলেন। তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় আপনার সেনা সংহার করতে লাগলেন।

মহারাজ ! এখনও দ্বিপ্রহর হয়নি। অবন্তীনরেশ বিন্দ এবং অনুবিন্দ ইরাবানকে আসতে দেখে তাঁর সামনে এলেন। তাঁদের মধ্যে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ শুরু হল। ইরাবান ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভাইকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তার পরিবর্তে তাঁরাও ইরাবানকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। ইরাবান তখন চারবাণে অনুবিন্দর চারটি ঘোড়াকে ধরাশায়ী করলেন এবং দুই তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর ধনুক ও ধ্বজা কেটে ফেললেন। অনুবিন্দ নিজের রথ ছেড়ে বিন্দের রথে চড়লেন। তারপর দুই ভাই একই রথে চড়ে ইরাবানের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ইরাবানও ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভাইয়ের ওপর বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁদের সারথিকে বধ করলেন। বিন্দ, অনুবিন্দের ঘোড়াগুলি ভীত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটতে লাগল। ইরাবান এইভাবে দুই বীরকে হারিয়ে নিজের পৌরুষ দেখিয়ে অত্যন্ত বেগে আপনার সেনা ধ্বংস করতে

লাগলেন।

সেইসময় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ রথে চড়ে ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি বাণের দ্বারা ভগদত্তকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। ভগদত্ত সমস্ত বাণ খণ্ডন করে অত্যন্ত বেগে ঘটোৎকচের মর্মস্থানে আঘাত করলেন। কিন্তু বহু আঘাত লাগলেও ঘটোৎকচ বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। তাতে কুপিত হয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করেন, ঘটোৎকচ তৎক্ষণাৎ সেগুলি কেটে ফেললেন এবং ভগদত্তকে সত্তর বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। ভগদত্ত তাঁর চারটি ঘোড়া বধ করলেন। তখন সেই অশ্বহীন রথের ওপর থেকেই ঘটোৎকচ সবেগে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ভগদত্ত সেটি তিন টুকরো করে দিলেন, সেটি মধ্যপথে মাটিতে পড়ে গেল। শক্তি ব্যর্থ হতে দেখে ঘটোৎকচ ভয় পেয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করলেন। ঘটোৎকচ তাঁর বল ও পরাক্রমে বিখ্যাত ছিলেন, রণক্ষেত্রে তাঁকে যমরাজ ও বরুণও সহসা হারাতে পারতেন না। রাজা ভগদত্ত এইভাবে ঘটোৎকচকে পরাজিত করে, হাতিতে চড়ে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগলেন।

এদিকে মহারাজ শল্য তাঁর ভগ্নীর দুই সন্তান নকুল-সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি বাণের দ্বারা দুজনের দেহ আচ্ছাদিত করে দিলেন। সহদেবও বাণবর্ষণ করে তাঁর বাণ প্রতিহত করলেন। সহদেবের পরাক্রম দেখে মদ্ররাজ শল্য অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, অন্যদিকে নকুল-সহদেবও তাঁদের শল্যের পরাক্রমে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহারথী শল্য চারবারে নকুলের চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন। নকুল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে রথ থেকে নেমে তাঁর ভাইয়ের রথে গিয়ে উঠলেন। তারপর দুই ভাই একই রথে বসে অত্যন্ত দ্রুত বাণের দ্বারা মদ্ররাজকে ঢেকে দিলেন। এরমধ্যে সহদেব ক্রুদ্ধ হয়ে মদ্ররাজের ওপর এক বাণ ছুঁড়লে, সেই
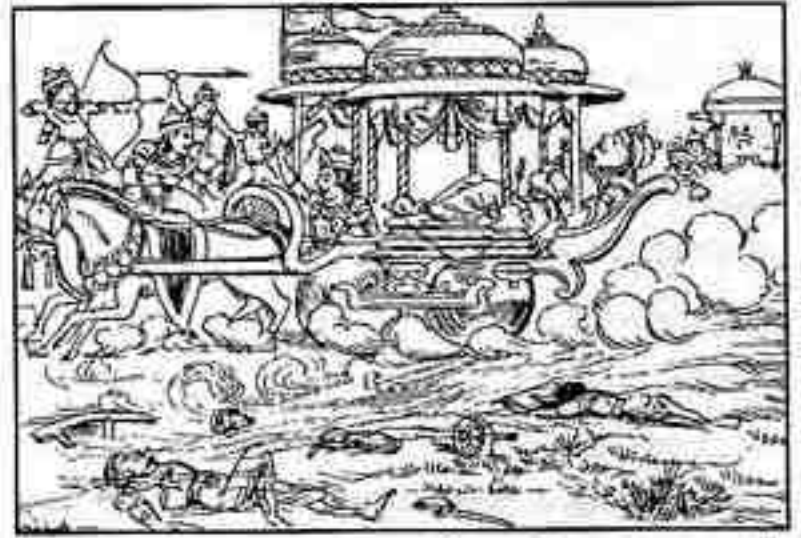
বাণ তাঁর দেহ ভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সেই আঘাতে ব্যাকুল হয়ে মদ্ররাজ রথের পিছনে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে সংজ্ঞাহীন দেখে সারথি তৎক্ষণাৎ রথ রণক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন। তা দেখে আপনার সৈন্যদলের বীররা বিমর্ষ হলেন। মহারথী নকুল ও সহদেব নিজ মাতুলকে পরাস্ত করে হর্ষধ্বনি ও শঙ্খনাদ করতে লাগলেন।

——o——

ষষ্ঠ দিনের দ্বি-প্রহরের শেষ ভাগের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সূর্যদেব যখন মধ্যগগনে এলেন তখন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে দেখে তাঁর দিকে ঘোড়া চালিয়ে এলেন এবং নয়টি বাণের দ্বারা তাঁকে আঘাত করলেন। শ্রুতায়ু সেই বাণ প্রতিহত করে যুধিষ্ঠিরকে সাতটি বাণ মারলেন। সেই বাণ তাঁর বর্ম ভেদ করে রক্তপাত ঘটাল। রাজা যুধিষ্ঠির তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ দেখে সকলের মনে হল যে তিনি এবার ত্রিলোক ভস্ম করে দেবেন। তাই দেখে দেবতা ও ঋষিরা সমস্ত জগতের জন্য স্বস্তিবাচন করতে লাগলেন। আপনার সৈন্যরা জীবনের আশা ত্যাগ করল। কিন্তু যশস্বী যুধিষ্ঠির ধৈর্যপূর্বক নিজের ক্রোধ সংবরণ করলেন এবং শ্রুতায়ুর ধনুক কেটে তাঁর দেহ বিদ্ধ করলেন। তারপর তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দেখে শ্রুতায়ু রথত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে পরাজিত করায় রাজা দুর্যোধনের সমস্ত সেনা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

অন্যদিকে চেকিতান মহারথী কৃপাচার্যকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তখন কৃপাচার্য সেই বাণগুলি প্রতিহত করে নিজে বাণ নিক্ষেপ করে চেকিতানকে ঘায়েল করলেন। তারপর তিনি চেকিতানের ধনুক কেটে, সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করলেন এবং তাঁর পার্শ্ব রক্ষককেও হত্যা করলেন। তখন চেকিতান রথ থেকে গদা হাতে লাফিয়ে

নেমে কৃপাচার্যের ঘোড়া ও সারথিকে বধ করলেন। কৃপাচার্য মাটিতে দাঁড়িয়েই তাঁর প্রতি ষোলোটি বাণ নিক্ষেপ করলেন, সেই বাণ চেকিতানকে বিদ্ধ করে মাটিয়ে গিয়ে পড়ল। তাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কৃপাচার্যের দিকে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন। কৃপাচার্য গদাটি আসতে দেখে বাণের সাহায্যে তা প্রতিহত করলেন। তখন চেকিতান হাতে তলোয়ার নিয়ে তাঁর সামনে এলেন। তখন আচার্যও তলোয়ার হাতে সবেগে তাঁকে আক্রমণ করলেন। তারপর দুই বীর একে অপরের ওপর তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে আক্রমণ চালালেন। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় দুজনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারমধ্যে সৌহার্দবশত করকর্ষ দ্রুত সেখানে এসে চেকিতানের এই অবস্থা দেখে তাঁকে নিজ রথে তুলে নিলেন। শকুনিও সবেগে সেখানে পৌঁছে কৃপাচার্যকে নিজ রথে করে নিয়ে গেলেন।

ধৃষ্টকেতু অসংখ্য বাণে ভূরিশ্রবাকে ঘায়েল করলেন। ভূরিশ্রবা তীক্ষ্ণ বাণে মহারথী ধৃষ্টকেতুর সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করলেন। মহামনা ধৃষ্টকেতু তখন নিজ রথ পরিত্যাগ করে শতানীকের রথে উঠলেন। সেই সময় চিত্রসেন, বিকর্ণ এবং দুর্মর্ষণ অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। অভিমন্যু আপনার সকল পুত্রদের রথচ্যুত করলেও ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে তাঁদের বধ করলেন না। তারপর সৈন্য-সহ পিতামহ ভীষ্মকে বালক অভিমন্যুর দিকে যেতে দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'হৃষীকেশ ! যেদিকে বহু রথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেদিকে আপনি ঘোড়া চালান।'

অর্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ যেদিকে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেই দিকে রথের ঘোড়া চালনা করলেন। অর্জুনকে আপনার বীরদের দিকে এগোতে দেখে সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেল। অর্জুন ভীষ্মের রক্ষাকারী রাজাদের কাছে পৌঁছে সুশর্মাকে ডেকে বললেন—'আমি জানি তুমি উত্তম যোদ্ধা এবং আমাদের পুরাতন শত্রু। আজ তোমার অনীতির ফল তুমি পাবে। আজ আমি তোমাকে তোমার পরলোকবাসী পিতামহের দর্শন করাব।' সুশর্মা অর্জুনের এই কঠোর বাক্য শুনে কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি বহু রাজার সঙ্গে এসে অর্জুনকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে শুরু করলেন। অর্জুন নিমেষের মধ্যে তাঁদের সকলের ধনুক কেটে ফেললেন এবং তাঁদের বিনাশ করার জন্য এক সঙ্গে সকলকে বাণবিদ্ধ করলেন। অর্জুনের আঘাতে সবাই রক্তে মাখামাখি হল, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে মস্তক মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, তাদের প্রাণ পাখি উড়ে গেল। পার্থের পরাক্রমে পরাভূত হয়ে তারা একসঙ্গে সকলে ধরাশায়ী হল।

সঙ্গী রাজাদের এইভাবে মারা যেতে দেখে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা অত্যন্ত দ্রুত বাকি জীবিত রাজাদের নিয়ে এগিয়ে এলেন। শিখণ্ডী যখন দেখলেন শত্রুরা অর্জুনকে আক্রমণ করেছে, তিনি তাঁকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার অস্ত্র নিয়ে তাঁর দিকে এগোলেন। অর্জুনও ত্রিগর্তরাজকে বহু রাজার সঙ্গে আসতে দেখে গাণ্ডীব ধনুকে তীক্ষ্ণ বাণ চড়িয়ে সকলকে বধ করলেন। তারপর দুর্যোধন ও জয়দ্রথের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি ভীষ্মের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও মদ্ররাজকে ছেড়ে ভীমসেন ও নকুল-সহদেবসহ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হাজির হলেন। ভীষ্ম কিন্তু সমস্ত পাণ্ডুপুত্রকে একসঙ্গে দেখেও ভীত হলেন না। সেই সময় শিখণ্ডী তো পিতামহকে বধ করার জন্য উদ্যত হলেন। তাঁকে অত্যন্ত দ্রুত আক্রমণ করতে দেখে রাজা শল্য তাঁর ভীষণ অস্ত্রে তাঁকে প্রতিহত করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে শিখণ্ডী দমলেন না। তিনি বরুণাস্ত্রের দ্বারা শল্যের সব অস্ত্র ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

ভীমসেন গদা নিয়ে পদব্রজে জয়দ্রথের দিকে এগোলেন। তাঁকে অতি দ্রুত আসতে দেখে জয়দ্রথ পাঁচশত তীক্ষ্ণ বাণ তাঁর দিকে নিক্ষেপ করলেন। ভীমসেন তাতে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সিন্ধুরাজের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করলেন। তাই দেখে আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমসেনকে আক্রমণ করতে গেলে ভীমসেনও গর্জন করে তার ওপর গদা নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। ভীমের সেই যমদণ্ডের ন্যায় গদা দেখে সব কৌরব সেনা তার আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আপনার পুত্রকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু গদা তাঁর দিকে আসতে দেখেও চিত্রসেন ভয় পেলেন না। তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে নেমে এক অন্য স্থানে চলে গেলেন। গদাটি চিত্রসেনের রথের ওপর পড়ে সারথি ও ঘোড়াসহ রথটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। চিত্রসেনকে রথবিহীন দেখে বিকর্ণ তাঁকে নিজ রথে তুলে নিলেন।

যুদ্ধ যখন ভীষণ আকার ধারণ করল, তখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সামনে এলেন। পাণ্ডবপক্ষের সব বীর কাঁপতে লাগলেন, তাঁরা মনে করলেন যে যুধিষ্ঠির মৃত্যুমুখে পড়তে যাচ্ছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেবকে নিয়ে ভীষ্মের

ওপর আক্রমণ করলেন। তাঁরা ভীষ্মের ওপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে ঢেকে ফেললেন। কিন্তু ভীষ্ম অর্ধপলের মধ্যেই তা প্রতিহত করে নিজ বাণে যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের ওপর নারাচ বাণ ছুঁড়লেন, কিন্তু পিতামহ মধ্যপথে তাকে খণ্ডন করে তাঁর ঘোড়া বধ করলেন। ধর্মপুত্র তৎক্ষণাৎ নকুলের রথে উঠলেন। ভীষ্ম সামনে এসে নকুল এবং সহদেবকেও বাণে ঢেকে ফেললেন। রাজা যুধিষ্ঠির তখন ভীষ্মবধের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর পক্ষের সব রাজা এবং সুহৃদদের ভীষ্মকে বধ করতে বললেন। রাজারা তাই শুনে ভীষ্মকে ঘিরে ধরলেন। সব দিক দিয়ে বেষ্টন করে রাখলেও ভীষ্ম তাঁর ধনুক দিয়ে বহু মহারথীকে ধরাশায়ী করতে লাগলেন।

এই ভয়ংকর যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে কোলাহল শুরু হল, দুপক্ষেরই ব্যূহ নষ্ট হয়ে গেল। তখন শিখণ্ডী দ্রুত পিতামহের সামনে এলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর পূর্বের নারীত্বের কথা ভেবে তাঁর দিকে মনোযোগ না দিয়ে সৃঞ্জয় বীরদের দিকে চললেন। ভীষ্মকে তাঁদের সামনে দেখে তাঁরা সহর্ষে সিংহনাদ করে উঠল এবং শঙ্খধ্বনি করতে লাগল। তখন সূর্য অস্তোন্মুখ, সেই সময় এমন ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছিল যে দুপক্ষের সৈন্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং মহারথী সাত্যকি নানা অস্ত্রবর্ষণ করে কৌরব সেনাদের পীড়িত করছিলেন। আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। তাদের আর্তনাদ শুনে অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্নের সামনে এলেন। তাঁরা দুজনে ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘোড়াগুলি হত্যা করে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পাঞ্চালকুমার তৎক্ষণাৎ নিজ রথ থেকে নেমে সাত্যকির রথে উঠলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন বিশাল সৈন্য নিয়ে ওই দুই রাজকুমারকে আক্রমণ করলেন। আপনার পুত্র দুর্যোধনও বিন্দ-অনুবিন্দকে ঘিরে রক্ষা করছিলেন।

সূর্যদেব ততক্ষণে অস্তে গিয়ে প্রভাহীন হয়েছেন। এদিকে যুদ্ধভূমিতে রক্তের নদী বয়ে চলেছে, সব দিকে রাক্ষস-পিশাচ এবং মাংসাহারী জীব বিচরণ করছে। অর্জুন তখন সুশর্মা প্রমুখ রাজাদের পরাস্ত করে শিবিরের দিকে রওনা হলেন। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনও সৈন্যসহ শিবিরে ফিরে এলেন। ওদিকে দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা প্রমুখ কৌরব বীরও নিজ নিজ সেনাসহ শিবিরে ফিরলেন। রাত্রি হলে সকলেই যে যার শিবিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। উভয় পক্ষের বীররাই নিজেদের বীরত্বের অহংকার করতে লাগলেন। সকলে স্নান করে ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করতে লাগলেন এবং পাহারা দেবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

—o—

সপ্তম দিনের যুদ্ধ এবং ধৃতরাষ্ট্রের আট পুত্র বধ

সঞ্জয় বললেন—রাত্রে সুখে বিশ্রাম করে সকাল হলে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের রাজারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুপক্ষের সৈন্য যখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন মহাসাগরের গম্ভীর ধ্বনির ন্যায় তাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। দুর্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য একত্রে অত্যন্ত যত্ন সহকারে কৌরব সেনার ব্যূহ নির্মাণ করলেন। সেই মহাব্যূহ সাগরের ন্যায় দেখাচ্ছিল, হাতি, ঘোড়া ও রথ তার তরঙ্গমালা। সমস্ত সেনার সম্মুখে ভীষ্ম যাচ্ছিলেন ; তাঁর সঙ্গে মালবা, দক্ষিণ ভারত এবং উজ্জয়িনীর যোদ্ধারা ছিল। তাঁদের পিছনে কুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক এবং মালবদেশীয় বীরদের সঙ্গে আচার্য দ্রোণ ছিলেন। দ্রোণের পিছনে মগধ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে রাজা ভগদত্ত এগোলেন। তাঁর পিছনে রাজা বৃহদ্বল, তাঁর সঙ্গে মেকল ও কুরুবিন্দ প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা ছিলেন। বৃহদ্বলের পিছনে ত্রিগর্তরাজ যাচ্ছিলেন, তাঁর পিছনে অশ্বত্থামা, তাঁদের পিছনে বাকি সৈন্যদের নিয়ে ভ্রাতাসহ দুর্যোধন এবং সর্বপশ্চাতে ছিলেন কৃপাচার্য।

মহারাজ ! আপনার যোদ্ধাদের সেই মহাব্যূহ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন শৃঙ্গাটক নামক ব্যূহ রচনা করলেন। সেই ব্যূহ দেখতে অত্যন্ত ভয়ানক এবং শত্রুব্যূহ ধ্বংসকারী ছিল। তার দুটি শৃঙ্গের স্থানে ভীমসেন ও সাত্যকি অবস্থান

করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কয়েক হাজার রথ, ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্য ছিল। তাঁদের দুজনের মাঝখানে অর্জুন, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ছিলেন। তারপরে অন্যান্য মহা ধনুর্ধর রাজা তাঁদের সৈন্য নিয়ে সেই ব্যূহ পূর্ণ করেন। তাঁদের পিছনে অভিমন্যু, মহারথী বিরাট, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং ঘটোৎকচ ছিলেন। এইভাবে ব্যূহ নির্মাণ করে পাণ্ডবগণও জয়লাভের আশায় দাঁড়ালেন। রণভেরী বাজল, শঙ্খধ্বনি হতে লাগল, তুমুল হট্টগোলে সমস্ত দিক গুঞ্জরিত হল। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পর নানা অস্ত্রে যুদ্ধ করে একে অপরকে যমালয়ে পাঠাতে লাগল। এর মধ্যে রথের প্রচণ্ড আওয়াজ ও ধনুকের টংকার তুলে সকলকে ভীত সন্ত্রস্ত করে ভীষ্ম সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ মহারথীগণ ভৈরবনাদ করে তাঁর দিকে দৌড়লেন। তখন দুই পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। পদাতিকের সঙ্গে পদাতিক, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়া, রথীর সঙ্গে রথী এবং হাতির সঙ্গে হাতির যুদ্ধ বেধে গেল।

তপ্ত সূর্যের দিকে তাকানো যেমন অসম্ভব, তেমনই ভীষ্ম যখন ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন তাঁর দিকে তাকানো পাণ্ডবদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ভীষ্ম সোমক, সৃঞ্জয় এবং পাঞ্চাল রাজাদের বাণের দ্বারা ভূমিতে ফেলে দিলেন। তাঁরাও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করে ভীষ্মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীষ্ম সত্বর সেই মহারথী বীরদের হাত, মাথা কেটে ফেললেন এবং রথীদের রথচ্যুত করলেন। ঘোড়সওয়ারের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন, পর্বতের ন্যায় গজরাজকে রণভূমিতে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। সেইসময় মহাবলী ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের অন্য কোনো বীরকে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে দেখা গেল না। কেবল তিনিই তাঁর ওপর সমানে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। ভীষ্ম ও ভীমসেনের মধ্যে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন সমস্ত সেনার মধ্যে ভয়ংকর কোলাহল শুরু হয়ে গেল, পাণ্ডবগণও প্রসন্ন হয়ে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

যখন এই নরসংহার হচ্ছিল, দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের একত্রিত করে ভীষ্মের রক্ষার জন্য সেখানে এলেন। এরমধ্যে ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে বধ করলেন। সারথি পড়ে যেতেই ঘোড়া রথ নিয়ে রণাঙ্গনের বাইরে চলে গেল। ভীমসেন রণভূমির সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি এক তীক্ষ্ণ বাণে আপনার পুত্র সুনাভের মাথা কেটে ফেললেন। তখন সেইখানে উপস্থিত সুনাভের সাত ভাই অত্যন্ত বিষণ্ণ ও কুপিত হয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। মহোদর, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, বিশালাক্ষ, পণ্ডিতক এবং অপরাজিত অসংখ্য বাণে মহাবলী ভীমকে আঘাত করতে লাগলেন। শত্রুদের আঘাত ভীম সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বাঁ-হাতে ধনুক ধরে এক তীক্ষ্ণ বাণে অপরাজিতের সুন্দর মাথাটি কেটে ফেললেন। দ্বিতীয় বাণে কুণ্ডধারকে যমালয়ে পাঠালেন। আর একটি বাণ পণ্ডিতকের ওপর নিক্ষেপ করলেন, সেটি তাঁর প্রাণ হরণ করে মাটিতে প্রবেশ করল। তারপরের তিনটি বাণ বিশালাক্ষের মাথা কেটে ফেলল, অন্য বাণ মহোদরের বুকে বিদ্ধ হলে তিনি প্রাণশূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর এক বাণে আদিত্যকেতুর ধ্বজা কেটে, অন্য একটি বাণে তাঁর মাথাও কেটে ফেললেন। ক্রোধান্বিত ভীম এরপর বহ্বাশীকেও যমলোকে পাঠালেন।

আপনার অন্যান্য পুত্ররা তখন রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গেলেন। তাঁদের মনে ভয় হল যে ভীমসেন সভার মধ্যে কৌরবদের বধ করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা আজই পূর্ণ করে ফেলবেন। ভ্রাতাদের মৃত্যুতে দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি সৈনিকদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে মিলে ভীমকে বধ করো। এইভাবে সহোদরদের মৃত্যু দেখে আপনার পুত্রদের বিদুরের কথা স্মরণ হল। তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'মহাত্মা বিদুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দিব্যদর্শী ব্যক্তি ; তিনি আমাদের হিতার্থে যা বলেছিলেন, তা সবই সত্য হচ্ছে।'

দুর্যোধন তারপর পিতামহ ভীষ্মের কাছে এলেন এবং অত্যন্ত দুঃখে তিনি ক্রন্দন করতে করতে বললেন—'আমার ভ্রাতারা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, ভীমসেন তাদের বধ করেছে এবং অন্য যোদ্ধাদেরও বধ করেছে। আপনি তাদের সম্মুখীন হয়েও আমাদের উপেক্ষা করছেন। দেখুন, আমার প্রারব্ধ (ভাগ্য) কত খারাপ। সত্যই আমি অত্যন্ত খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' দুর্যোধনের বাক্য কঠোর হলেও তা শুনে পিতামহ ভীষ্মের চোখ জলে ভরে এল। ভীষ্ম বললেন—'পুত্র ! আমি, আচার্য দ্রোণ, বিদুর এবং তোমার যশস্বিনী মাতা গান্ধারী তোমাকে এই পরিণামের কথা বলেছিলাম ; তুমি শোনোনি। আমি একথাও বলেছিলাম যে আমাকে এবং আচার্য দ্রোণকে যুদ্ধে সামিল কোরো না, তুমি সে কথাও রাখনি। এখন আমি তোমাকে

সত্য কথা জানাচ্ছি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে ভীম যাকেই সামনে দেখবে তাকেই বধ করবে। এই যুদ্ধের চরম ফল স্বর্গপ্রাপ্তি জেনে স্থির হয়ে যুদ্ধ করো। পাণ্ডবদের ইন্দ্রাদি দেবতা ও অসুরও পরাজিত করতে পারবে না।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! ভীমসেন একাই আমার বহুপুত্রকে বধ করেছে তাই দেখে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য কী করলেন ? তাত ! আমি, ভীষ্ম এবং বিদুর দুর্যোধনকে নিষেধ করেছিলাম, গান্ধারীও অনেক বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু সেই মূর্খ মোহবশত কারো কথা শোনেনি। আজ তারই ফল ভোগ করছে।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনিও তখন মহাত্মা বিদুরের কথা শোনেননি। হিতৈষীরা বারবার বলেছিলেন— 'আপনার পুত্রদের পাশা খেলতে নিষেধ করুন, পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করবেন না।' কিন্তু আপনি কিছুই শুনতে চাননি। মরণোন্মুখ ব্যক্তির যেমন ওষুধ ভালো লাগে না, তেমনই আপনারও সেসব কথা ভালো লাগেনি। তার জন্যই আজ কৌরবরা বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। আচ্ছা, এবার যুদ্ধের সংবাদ শুনুন। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। বহু প্রাণহানি হল। ধর্মরাজের নির্দেশে তাঁর সমস্ত সৈন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সমস্ত সোমক যোদ্ধাদের সঙ্গে রাজা দ্রুপদ এবং বিরাট, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু এবং কুন্তীভোজ এক সঙ্গে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, চেকিতান—এঁরা দুর্যোধন প্রেরিত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, চেকিতান—এঁরা দুর্যোধন প্রেরিত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অভিমন্যু, ঘটোৎকচ ও ভীমসেন কৌরবদের ওপর আক্রমণ করলেন। এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পাণ্ডবরা কৌরব সেনা সংহার করতে লাগলেন। কৌরবরাও এইভাবে তাদের শত্রুবিনাশ করতে লাগলেন।

দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে সোমক এবং সৃঞ্জয়দের আক্রমণ করলেন এবং তাঁদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। সৃঞ্জয়দের মধ্যে তখন হাহাকার পড়ে গেল। অন্যদিকে মহাবলী ভীমসেন কৌরবদের সংহার করতে লাগলেন। দুপক্ষের সৈন্য পরস্পরকে সংহার করতে লাগল। রক্তের নদী প্রবাহিত হল। ভীমসেন গজারোহীদের একে একে যমালয়ে পাঠাচ্ছিলেন। নকুল এবং সহদেব আপনার অশ্বারোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তাঁদের আঘাতে শত শত ঘোড়ার মৃতদেহে রণভূমিতে পাহাড় তৈরি হল। অর্জুনও বহু রাজাকে বধ করছিলেন। এদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা ক্রোধভরে যুদ্ধ করছিলেন এবং পাণ্ডব সেনা সংহার করছিলেন ; ওদিকে পাণ্ডবরাও কুপিত হয়ে আপনার পক্ষের সৈন্য সংহারে অব্যাহত ছিলেন।

—o—

শকুনির ভ্রাতাগণের ও ইরাবানের নিধন

সঞ্জয় বললেন—বড় বড় বীরদের বিনাশকারী সেই ভয়ংকর যুদ্ধ যখন চলছিল তখন শকুনি পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে বিশাল সেনা নিয়ে কৃতবর্মাও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন অর্জুনপুত্র ইরাবান। নাগকন্যার গর্ভে ইরাবানের জন্ম। তিনি অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। যখন শকুনি এবং গান্ধার দেশের অন্যান্য বীররা পাণ্ডবব্যূহ ভেদ করে তার মধ্যে প্রবেশ করল, তখন ইরাবান তাঁর যোদ্ধাদের ডেকে বললেন—'বীরগণ ! এমনভাবে যুদ্ধ করো, যেন আজই এই কৌরব যোদ্ধাগণ তাদের সাহায্যকারী ও বাহনসহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।' ইরাবানের সৈনিকরা তাতে সম্মত হয়ে কৌরবদের দুর্জয় সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বিনাশ করতে লাগল। সুবলপুত্র নিজ সৈন্যের বিনাশ সহ্য করতে না পেরে দ্রুতবেগে সেখানে এসে ইরাবানকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। ইরাবানের সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, রক্তে দেহ ভেসে গেল। ইরাবান একা ছিলেন, শত্রুপক্ষ চারদিক থেকে ঘিরে তাঁকে আঘাত করলেও তিনি ব্যথায় অধীর হলেন না। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সকলকে মূর্ছিত করে দিলেন। তারপর নিজ শরীরে বিদ্ধ অস্ত্রগুলি টেনে বার করে তার দ্বারাই সুবলপুত্রের ওপর আঘাত করলেন। পরে তিনি হাতে ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে সুবলপুত্রদের বধ করার জন্য পদব্রজে এগোলেন। এর মধ্যে অনেকের মূর্ছাভঙ্গ হয়েছিল, ইরাবানকে আসতে দেখে তারা ক্রোধে অধীর হয়ে ইরাবানের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়লেন, সেই সঙ্গে তাঁকে বন্দী করারও চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যেই তাঁরা কাছে এলেন, ইরাবান তলোয়ারের আঘাতে তাঁদের শরীর টুকরো টুকরো করে দিলেন। অস্ত্রশস্ত্র, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা পড়ায় তাঁরা প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে বৃষভ নামে একজন রাজকুমারই জীবিত থাকলেন।

সকলকে পড়ে যেতে দেখে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষ নামক রাক্ষসের কাছে গেলেন। সেই রাক্ষস অত্যন্ত মায়াবী ও ভয়ংকর ছিল, ভীমসেন বকাসুরকে বধ করায় সে ভীমসেনকে শত্রু মনে করত। দুর্যোধন তাকে বললেন—'বীরবর। দেখো, অর্জুনপুত্র ইরাবান অত্যন্ত বলবান এবং মায়াবী, একটা উপায় বার করো যাতে ও আমাদের সৈন্য ধ্বংস করতে না পারে। তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে যা চাও করতে পারো, মায়াস্ত্রেও তুমি পারদর্শী ; যে করে হোক ইরাবানকে তুমি বধ করো।'

সেই ভয়ংকর রাক্ষস 'ঠিক আছে' বলে সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে ইরাবানকে বধ করতে এল। ইরাবান তার গতিরোধ করলেন। তাঁকে আসতে দেখে রাক্ষস মায়া প্রয়োগ করল। সে মায়ার সাহায্যে দুহাজার ঘোড়সওয়ার উৎপন্ন করল, সেই ঘোড়সওয়ারগুলি সব রাক্ষস, তাদের হাতে শূল ও গদা। সেই মায়াবী রাক্ষসদের সঙ্গে ইরাবানের সৈনিকদের যুদ্ধ হতে লাগল এবং দুপক্ষের সৈন্যই তাতে হতাহত হতে লাগল।

সেনারা মারা যাওয়াতে দুই রণোন্মত্ত বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। একবার রাক্ষস ইরাবানকে আক্রমণ করে, অন্যবার ইরাবান রাক্ষসকে। কখনো রাক্ষস মায়াদ্বারা আকাশে উড়ে চলে, আবার ইরাবানও অন্তরীক্ষে থেকে তাকে বাণের আঘাত করতে থাকেন। মহারাজ ! বাণের আঘাতে আহত হলেও রাক্ষস পুনরায় নতুন রূপে প্রকটিত হচ্ছিল এবং যুবকের মতোই বলবান হয়ে উঠছিল। তাই তার যে যে অঙ্গ কাটছিল, তা পুনরায় উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছিল। ইরাবানও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ; তিনি তাকে বর্শা দিয়ে বারবার আঘাত করছিলেন। বর্শার আঘাতে অলম্বুষের শরীরে ছিদ্র হয়ে রক্ত পড়তে লাগল এবং সে চিৎকার করে উঠল। শত্রুর এই প্রবল প্রতাপ দেখে অলম্বুষের ক্রোধের সীমা রইল না। সে ভয়ানক রূপ ধারণ করে ইরাবানকে ধরার চেষ্টা করল। তার রাক্ষসী মায়া দেখে ইরাবানও মায়া প্রয়োগ করলেন। এইসময় ইরাবানের মাতৃকুলের এক নাগ বহু নাগসহ সেখানে এসে তাঁকে চারদিক থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগল। ইরাবান শেষনাগের ন্যায় বিরাটরূপ ধারণ করে বহু নাগের সঙ্গে সেই রাক্ষসকে ঢেকে ফেললেন। অলম্বুষ তখন গরুড়রূপ ধারণ করে সেই নাগগুলি খেতে আরম্ভ করল। সে ইরাবানের মাতৃকুলের সব নাগ খেয়ে ফেলল এবং তাঁকে মায়াদ্বারা মোহিত করে তলোয়ার বার করল। ইরাবানের সুন্দর ছিন্ন মস্তক মাটিতে পড়ল। অলম্বুষ এইভাবে অর্জুনকুমারকে বধ করায় কৌরবরা সকলে প্রসন্ন হলেন।

অর্জুন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃত্যু সংবাদ পাননি, তিনি ভীষ্মকে রক্ষাকারী রাজাদের সংহার করছিলেন, ভীষ্মও মর্মভেদী বাণের দ্বারা পাণ্ডব মহারথীদের কম্পিত করে তাদের প্রাণ বধ করছিলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সাত্যকি ভয়ানক যুদ্ধ করছিলেন। দ্রোণের পরাক্রম দেখে পাণ্ডবদের মনে ভয় উৎপন্ন হল, তাঁরা বলতে লাগলেন—একা দ্রোণাচার্যই সমস্ত সৈনিক বধ করার ক্ষমতা রাখেন ; আর এঁর সঙ্গে যখন পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ যোদ্ধা রয়েছেন, তখন আর বিজয় লাভের কী আশা ? সেই দারুণ সংগ্রামে দুপক্ষের সৈনিক অত্যন্ত কঠোরভাবে সংগ্রাম করছিল।

—— ০ ——

ঘটোৎকচের যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! ইরাবানকে মৃত দেখে পাণ্ডবরা সেই যুদ্ধে কী করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ইরাবান নিহত দেখে ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ বিকট চিৎকার করলেন। তাঁর সেই গর্জনে সমুদ্র, পর্বত, বনসহ সমগ্র পৃথিবী কেঁপে উঠল। সেই ভয়ংকর আওয়াজ শুনে আপনার সৈনিকরা থরথর করে কেঁপে উঠল, গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। ঘটোৎকচ ক্রোধে প্রলয়কালীন যমের মতো হয়ে উঠলেন। তাঁর আকৃতি ভয়ংকর হয়ে উঠল, তাঁর হাতে জ্বলন্ত ত্রিশূল, নানা অস্ত্রে সজ্জিত রাক্ষস সৈন্য নিয়ে তিনি এগিয়ে

চললেন। দুর্যোধন দেখলেন ঘটোৎকচ আসছেন এবং তাঁকে দেখে তাঁর সব সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি একটা ধনুক নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে ঘটোৎকচকে আক্রমণ করলেন। তাঁর পিছনে দশ হাজার গজারোহী সৈন্য নিয়ে বঙ্গভূমির রাজারা সাহায্য করতে চললেন। আপনার পুত্রকে গজারোহী সৈন্য নিয়ে আসতে দেখে ঘটোৎকচ অত্যন্ত কুপিত হলেন। তারপর রাক্ষসদের সঙ্গে দুর্যোধনের রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল। রাক্ষস নানা অস্ত্রের দ্বারা শত্রু সৈন্য সংহার করতে লাগল।

দুর্যোধনও প্রাণভয় পরিত্যাগ করে রাক্ষসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তাঁর হাতে প্রধান প্রধান রাক্ষস বিনাশ হতে লাগল। তিনি চার বাণে মহাবেগ, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব এবং প্রমাথী—এই চার রাক্ষসকে বধ করলেন। আপনার পুত্রের পরাক্রম দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং সবেগে দুর্যোধনের কাছে এসে চক্ষু রক্ত বর্ণ করে বলতে লাগলেন—'ওরে নৃশংস ! যাঁদের তুমি দীর্ঘকাল বনে বাস করিয়েছ, সেই মাতা-পিতার ঋণ থেকে আজ তোমাকে বধ করে আমি ঋণমুক্ত হব।' এই বলে ঘটোৎকচ দাঁতে দাঁত চেপে বিশাল ধনুক দ্বারা বাণবর্ষণ করে দুর্যোধনকে ঢেকে দিলেন। দুর্যোধনও বাণের সাহায্যে তাঁকে ঘায়েল করলেন। রাক্ষস তখন পর্বত বিদীর্ণকারী এক মহাশক্তি হাতে নিয়ে আপনার পুত্রকে আঘাত করতে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে বঙ্গভূমির রাজা তাড়াতাড়ি তাঁর হাতি সামনে এগিয়ে আনলেন। দুর্যোধনের রথ হাতির পিছনে চলে যাওয়ায় আঘাতের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচ হাতির ওপরই শক্তি নিক্ষেপ করলেন। শক্তির আঘাতে হাতিটি মারা গেল আর বঙ্গভূমির রাজা লাফিয়ে মাটিতে নেমে এলেন।

হাতি মৃত এবং সৈনিকেরা পলাতক—তাই দেখে দুর্যোধন খুব কষ্ট পেলেন ; কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা স্মরণে রেখে তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন না, পর্বতের ন্যায় নিজ স্থানে স্থির হয়ে রইলেন। তিনি রাক্ষসের ওপর কালাগ্নির ন্যায় এক বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু রাক্ষস তার থেকে রক্ষা পেয়ে পুনরায় গর্জন করে সেনাদের ভীত করতে লাগলেন। তার ভৈরবনাদ শুনে পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের সহায়তার জন্য অন্য মহারথীগণকে পাঠালেন। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য, ভূরিশ্রবা, শল্য, উজ্জয়িনীর রাজকুমার, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি এবং তাঁদের পশ্চাদগামী কয়েক হাজার রথী দুর্যোধনকে রক্ষার জন্য এলেন। ঘটোৎকচও মৈনাক পর্বতের ন্যায় নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ভাই-বন্ধু তাঁকে রক্ষা করছিলেন। তারপর উভয়দলে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ শুরু হল। ঘটোৎকচ অর্ধচন্দ্রাকার বাণে দ্রোণাচার্যের ধনুক কেটে ফেললেন, অন্য বাণে সোমদত্তের ধ্বজা খণ্ডিত করলেন, তিন বাণে বাহ্লীকের বক্ষ ভেদ করলেন। তারপর কৃপাচার্য ও চিত্রসেনকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। এক বাণে বিকর্ণের কাঁধে আঘাত করলেন, বিকর্ণ রক্তে ভেসে গিয়ে রথের পিছনে বসে পড়ল। ভূরিশ্রবাকে পনেরোটি বাণ মারল, সেই বাণ বর্ম ভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। তারপর সে অশ্বত্থামা এবং বিবিংশতির সারথিদের আঘাত করল। তারা ঘোড়ার রাশ ছেড়ে রথের মধ্যে পড়ে গেল। পরে সে জয়দ্রথের ধ্বজা ও ধনুক কেটে ফেলল। অবন্তীরাজের চারটি ঘোড়া বধ করল। তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে রাজকুমার বৃহদ্বলকে আঘাত করল এবং কয়েকটি বাণে রাজা শল্যকেও বিদ্ধ করল।

এইভাবে কৌরবপক্ষের সমস্ত বীরদের পরাজিত করে

সে দুর্যোধনের দিকে অগ্রসর হল। তাই দেখে কৌরব বীররাও দুর্যোধনকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এল। তারা চারদিকে বাণবর্ষণ করতে লাগল। ঘটোৎকচ গুরুতর আহত হলেন এবং গরুড়ের ন্যায় ভৈরব গর্জন করে আকাশে উড়ে গেলেন। তাঁর সেই গর্জন শুনে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বললেন—'ঘটোৎকচের প্রাণ সংকট হয়েছে, তুমি গিয়ে তাকে রক্ষা করো।' জ্যেষ্ঠর নির্দেশ শুনে ভীমসেন সিংহনাদে রাজাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে অতি দ্রুত এগোলেন। তাঁর পিছনে সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণীমান, বসুদান, কাশীরাজপুত্র অভিভূ, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রবর্মা এবং সৈন্যসহ অনূপদেশের রাজা নীল প্রমুখ মহারথীরাও চললেন। তাঁরা সকলে সেখানে পৌঁছে ঘটোৎকচকে রক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁদের আগমনের কোলাহলে এবং ভীমসেনের ভয়ে কৌরব সৈনিকরা বিষণ্ণ হল। তারা ঘটোৎকচকে ছেড়ে পিছনে চলে গেল। দুই পক্ষে মহাযুদ্ধ বেধে গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে কৌরবদের বেশির ভাগ সৈন্য পালিয়ে গেল। তাই দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত কুপিত হলেন এবং ভীমসেনের সম্মুখে গিয়ে এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর বুকে এক বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণে ভীমসেন আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ ক্ষিপ্ত হয়ে অভিমন্যু ও অন্য মহারথীদের সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দ্রোণাচার্য তখন কৌরব পক্ষের মহারথীদের বললেন—'বীরগণ ! রাজা দুর্যোধনের সংকট উপস্থিত, তোমরা শীঘ্র যাও তাঁকে রক্ষা করো।'

আচার্যের কথায় কৃপাচার্য, ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল এবং অবন্তীর রাজকুমার—এঁরা সকলে দুর্যোধনকে ঘিরে ধরলেন। দ্রোণাচার্য তাঁর মহান ধনুক থেকে বাণ নিক্ষেপ করে ভীমকে আচ্ছাদিত করলেন। ভীমও আচার্যের বাম দিকে বাণ মারতে লাগলেন। তার ভয়ংকর আঘাতে বয়োবৃদ্ধ আচার্য অচেতন হয়ে রথের পিছন দিকে লুটিয়ে পড়লেন। তাই দেখে দুর্যোধন ও অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমের দিকে ধাবিত হলেন। তাঁদের আসতে দেখে ভীমও হাতে কালদণ্ডের ন্যায় গদা দিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে তাঁদের দুজনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কৌরবরা মহারথী ভীমকে বধ করার জন্য তাঁর ওপর নানা অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। অভিমন্যু প্রমুখ পাণ্ডব মহারথীগণ তখন তাঁর রক্ষার জন্য প্রাণের মায়া ছেড়ে এগিয়ে এলেন। অনূপদেশের রাজা নীল, ভীমসেনের প্রিয় বন্ধু, তিনি অশ্বত্থামার ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শরীরে বিঁধে রক্তপাত হতে লাগল ; অশ্বত্থামা অত্যন্ত পীড়িত হলেন। অশ্বত্থামাও ক্রুদ্ধ হয়ে নীলের চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন, ধ্বজা কেটে দিলেন এবং ভল্ল নামক বাণে তাঁর বুক বিদ্ধ করে ফেললেন। তার ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নীল তাঁর রথের পিছনে গিয়ে বসলেন। তাঁর এই দশা দেখে ঘটোৎকচ তাঁর ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে অশ্বত্থামার ওপর আক্রমণ হানল। তাদের আসতে দেখে অশ্বত্থামাও এগিয়ে এলেন। বহু রাক্ষস ঘটোৎকচের আগে আগে আসছিল, অশ্বত্থামা তাদের সকলকে বধ করলেন। দ্রোণকুমারের বাণে রাক্ষসদের মরতে দেখে ঘটোৎকচ তাঁর ভয়ংকর মায়া প্রকট করল। অশ্বত্থামা তাতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা সেই মায়ায় ভীত হয়ে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করল। তারা মায়াবশে দেখল যে, সে নিজে ছাড়া অন্য সব যোদ্ধা অস্ত্রে আহত হয়ে রক্তের নদীতে ছটফট করছে। দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, শল্য, অশ্বত্থামা প্রমুখ মহাধনুর্ধর, প্রধান প্রধান কৌরব ও অন্যান্য রাজারাও নিহত হয়েছেন এবং হাজার হাজার গজারোহী ও অশ্বারোহী ধরাশায়ী হয়েছে। মায়াদ্বারা এই সব দেখে আপনার সৈন্যরা শিবিরের দিকে পালাতে লাগল। যদিও সেইসময় ভীষ্ম ও আমি (সঞ্জয়) চিৎকার করে ডাকছিলাম—'বীরগণ ! যুদ্ধ করো, পালিয়ো না, এসব রাক্ষসী মায়া, এতে বিশ্বাস কোরো না', কিন্তু তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করল না। শত্রুসৈন্যকে পালাতে দেখে বিজয়ী পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের সঙ্গে সিংহনাদ করতে লাগলেন। চারদিকে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। দুন্দুভি বেজে উঠল। এইসবের তুমুল আওয়াজে যুদ্ধক্ষেত্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। সূর্যাস্ত হতে না হতে দুরাত্মা ঘটোৎকচ আপনার সেনাদের চারদিক থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

—o—

দুর্যোধন ও ভীষ্মের আলোচনা এবং ভগদত্তের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—সেই মহাসংগ্রামে রাজা দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম করে ঘটোৎকচের জয় এবং নিজ সৈন্যের পরাজয়ের খবর জানালেন। তিনি বললেন 'পিতামহ ! পাণ্ডবরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য নিয়েছে, তেমনই আমরা আপনার ভরসায় শত্রুদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনানী আপনার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও ঘটোৎকচের সহায়তায় পাণ্ডবরা আমাদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছে। আমি এই অপমানের আগুনে জ্বলে মরছি তাই আপনার সাহায্যে সেই অধম রাক্ষসকে নিজে বধ করব। এই আমার আকাঙ্ক্ষা। আপনি কৃপা করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

তখন ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! রাজধর্ম স্মরণে রেখে তোমার সর্বদা যুধিষ্ঠির অথবা ভীম, অর্জুন, নকুল বা সহদেবের সঙ্গেই যুদ্ধ করা উচিত, কারণ রাজার সঙ্গেই রাজার যুদ্ধ করা উচিত। অন্য লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমরাই আছি। আমি, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, শল্য, ভূরিশ্রবা এবং বিকর্ণ, দুঃশাসন প্রমুখ তোমার ভ্রাতারা—আমরা সকলে তোমার জন্য ওই মহাবলী রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করব। নতুবা ওই দুষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী রাজা ভগদত্ত নিযুক্ত হবেন। একথা বলে ভীষ্ম রাজা ভগদত্তকে বললেন—মহারাজ ! আপনি গিয়ে ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে রাজা ভগদত্ত সিংহনাদ করে সবেগে শত্রুর দিকে চললেন। তাঁকে আসতে দেখে পাণ্ডবদের মহারথী ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্র, সত্যধৃতি, সহদেব, চেদিরাজ, বসুদান এবং দশার্ণরাজ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাঁর সামনে এলেন। ভগদত্তও সুন্দর হাতিতে চড়ে ওই সব মহারথীদের আক্রমণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে গেল। মহা ধনুর্ধর ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ করে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীমসেনও ক্রুদ্ধ হয়ে ভগদত্তের হাতি রক্ষাকারী একশতের অধিক বীরকে হত্যা করলেন। ভগদত্ত তাঁর গজরাজকে ভীমসেনের রথের দিকে চালিত করলেন। তাই দেখে পাণ্ডবদের কয়েকজন মহারথী তাঁকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভগদত্ত তাতে একটুও ভীত না হয়ে তাঁর হাতি এগিয়ে নিয়ে চললেন, অঙ্কুশের ইশারায় সেই মত্ত হাতি প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ভয়ংকর হয়ে উঠল। সে ক্রুদ্ধ হয়ে বহু রথ, রথী, অশ্বারোহী পদপিষ্ট করে মেরে ফেলল। হাজার হাজার পদাতিক তার পায়ের চাপে মারা গেল। তাই দেখে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ কুপিত হয়ে সেই হাতিকে বধ করার জন্য এক তীক্ষ্ণ ত্রিশূল চালালেন ; কিন্তু ভগদত্ত এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণে সেটি কেটে ফেললেন এবং অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত এক মহাশক্তি দ্বারা ঘটোৎকচের ওপর আঘাত করলেন। সেই মহাশক্তি আকাশে থাকাকালীনই ঘটোৎকচ লাফ দিয়ে সেটি হাতে ধরে দুহাঁটুর চাপে ভেঙে ফেললেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আকাশে স্থিত সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব এবং মুনিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। পাণ্ডবরা তাই দেখে তাঁকে বাহবা দিয়ে হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। ভগদত্ত তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তার ধনুক টেনে পাণ্ডব মহারথীদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন এবং ভীমসেন, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু ও কেকয়রাজকুমারদের বিদ্ধ করলেন। দ্বিতীয় বাণে ক্ষত্রদেবের ডান হাত কেটে ফেললেন, পাঁচ বাণে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে ঘায়েল করলেন এবং ভীমসেনের ঘোড়াগুলি বধ করলেন, ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং সারথিকেও যমালয়ে পাঠালেন। তারপর ভীমকে বিদ্ধ করলেন। ভীম আহত হয়ে কিছুক্ষণ রথের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়ে বসলেন। পরে গদা হাতে সবেগে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাঁকে গদাহস্তে আসতে দেখে কৌরব সৈন্য অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। এরমধ্যে অর্জুনও শত্রু সংহার করতে করতে সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং কৌরবদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় ভীমসেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে ইরাবানের মৃত্যুর সংবাদ জানালেন।

—o—

ইরাবানের মৃত্যুতে অর্জুনের শোক এবং ভীমসেন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুত্র-বধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! অর্জুন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—মহামতি বিদুরের এই কৌরব ও পাণ্ডবদের ভীষণ যুদ্ধের পরিণতি প্রথম থেকেই জানা ছিল। তাই তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বাধাপ্রদানও করেছিলেন। মধুসূদন! এই যুদ্ধে কৌরবদের হাতে আমাদের বহু বীর বধ হয়েছে এবং আমরাও কৌরবদের বহু বীর বিনাশ করেছি। এইসব মর্মান্তিক কাজ আমরা অর্থসম্পদের জন্য করছি। সেই সম্পদকে ধিক, যার জন্য এরূপ বন্ধু-বান্ধব বিনাশ হচ্ছে। এখানে একত্রিত নিজের ভাইদের বধ করে আমাদের কী লাভ হবে? হায়! আজ দুর্যোধনের অপরাধ এবং শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রণাতেই ক্ষত্রিয়রা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। মধুসূদন! আমার এই আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করা ভালো মনে হচ্ছে না, কিন্তু এই ক্ষত্রিয়রা মনে করবে যে আমি যুদ্ধ করতে অক্ষম। অতএব শীঘ্র ঘোড়া কৌরব সেনার দিকে চালান, বিলম্ব করার সময় নেই।

অর্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ হাওয়ার বেগে ঘোড়াগুলিকে নিয়ে এগোলেন। তাই দেখে আপনার সৈন্যদলে মহা সোরগোল শুরু হল। তখনি ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত এবং সুশর্মা অর্জুনের সামনে এলেন। কৃতবর্মা ও বাহ্লীক সাত্যকির সম্মুখীন হলেন, রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। অন্যান্য মহারথীরাও অন্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। ভীমসেন রণক্ষেত্রে আপনার পুত্রদের দেখলে ক্রোধে জ্বলে উঠতে থাকেন। এদিকে আপনার পুত্ররাও তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাতে তাঁর ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেল এবং তিনি এক তীক্ষ্ণ বাণে আপনার এক পুত্রকে হত্যা করলেন। আর একটি তীক্ষ্ণ বাণে কুণ্ডলীকে ধরাশায়ী করলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আপনার পুত্রদের ওপর তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীমসেনের ধনুক নিক্ষিপ্ত দুর্দান্ত বাণ আপনার মহারথী পুত্রদের রথ থেকে নীচে ফেলে দিতে লাগল। আপনার বীর পুত্রগণ—অনাবৃষ্টি, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু এবং কনকধ্বজ মাটিতে এমনভাবে ধরাশায়ী হয়েছিল, যেন বসন্ত ঋতুতে পুষ্পিত আম্রবৃক্ষ কেটে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আপনার অন্য পুত্ররা ভীমসেনকে কালের সমান মনে করে পলায়ন করল।

ভীমসেন যখন আপনার পুত্রদের বধ করতে ব্যাপৃত ছিলেন, সেইসময় দ্রোণাচার্য তাঁর ওপর চতুর্দিক থেকে বাণবর্ষণ করছিলেন। তখন ভীমসেন এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি দ্রোণাচার্যের বাণ প্রতিহত করতে করতেও আপনার পুত্রদের বধ করছিলেন। সেই সময় ভীষ্ম, ভগদত্ত ও কৃপাচার্য অর্জুনকে আটকালেন। কিন্তু অতিরথী অর্জুন তাঁর অস্ত্রে ওইসব অস্ত্রগুলিকে ব্যর্থ করে আপনার কয়েকজন সেনাপ্রধানকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন। অভিমন্যু রাজা অম্বষ্ঠকে রথহীন করে দিলেন। তিনি তখন লাফিয়ে রথ থেকে নেমে অভিমন্যুকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করলেন এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কৃতবর্মার রথে উঠে বসলেন। যুদ্ধকুশল অভিমন্যু প্রেরিত তলোয়ারকে আসতে দেখে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেটি প্রতিহত করলেন, সমস্ত সৈন্য তাই দেখে বাহবা দিয়ে উঠল। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য মহারথীও আপনার সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন এবং

আপনার সেনারাও পাণ্ডব সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। তারা অস্ত্র ছাড়াও চুল ধরে চড় ও ঘুঁসি মেরেও একে অন্যকে আঘাত করছিল। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকেও রেহাই দিচ্ছিল না। এই ঘোর যুদ্ধ চলতে চলতে বীররা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে কিছু ধরাশায়ী হল, কিছু পালিয়ে গেল। আস্তে আস্তে রাত্রি নেমে এল। তখন দুইপক্ষই তাদের সৈন্য নিয়ে ফিরে গেল এবং নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল।

—o—

দুর্যোধনের অনুরোধে ভীষ্মের পাণ্ডব সেনা সংহারের প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! শিবিরে পৌঁছে রাজা দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ নিজেরা আলোচনা করতে লাগলেন কীভাবে পাণ্ডবদের পরাস্ত করা যায়। রাজা দুর্যোধন

বললেন—দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, শল্য এবং ভূরিশ্রবা পাণ্ডবদের অগ্রগতি রোধ করতে পারছেন না। এর কারণ কী, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা তো এইভাবে পাণ্ডবদের বধ করতে পারছি না, কিন্তু তারা আমাদের সৈন্য ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। কর্ণ ! এতে আমার সৈন্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র খুবই কমে গেছে। এখন পাণ্ডব বীররা তো দেবতাদেরও অবধ্য হয়ে গেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমরা কী করে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করব ?

কর্ণ বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! চিন্তা করবেন না, আমি এই কাজ করে দেব ; এখন পিতামহ ভীষ্মের শীঘ্রই এই যুদ্ধ থেকে সরে যাওয়া উচিত। তিনি যদি যুদ্ধ থেকে সরে যান এবং অস্ত্রত্যাগ করেন, তাহলে আমি তাঁর সামনেই পাণ্ডবদের সমস্ত সোমক বীরসহ বিনাশ করব—এই আমি শপথ করে বলছি। ভীষ্ম সর্বদাই পাণ্ডবদের স্নেহ করেন এবং তাঁর পক্ষে এই মহারথীদের যুদ্ধে পরাস্ত করার ক্ষমতাও নেই। সুতরাং আপনি সত্বর ভীষ্মের শিবিরে যান এবং তাঁকে অস্ত্র-ত্যাগ করতে বলুন।

দুর্যোধন বললেন—শত্রুদমন। আমি এখনই ভীষ্মকে অনুরোধ জানিয়ে তোমার কাছে আসছি। পিতামহ যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালে তুমিই যুদ্ধ করবে।

তারপর দুর্যোধন তাঁর ভাইদের নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভীষ্মের কাছে গেলেন। ভীষ্মের শিবিরে গিয়ে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তিনি এক স্বর্ণ সিংহাসনে গিয়ে বসলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাত জোড় করে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন—'পিতামহ ! আপনার ভরসায় আমরা ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাকে পরাজিত করার সাহস রাখি, তখন এই পাণ্ডবদের আর কী কথা ? তাই আজ আপনার আমার ওপর কৃপা করা উচিত। আপনি পাণ্ডবদের এবং সোমকদের বধ করে আপনার বাক্যের সত্যরক্ষা করুন এবং যদি পাণ্ডবদের ওপর দয়া এবং আমার প্রতি দ্বেষ হওয়াতে অথবা আমার মন্দভাগ্যের জন্য আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করতে থাকেন, তাহলে কর্ণকে যুদ্ধ করার আদেশ দিন। সে অবশ্যই পাণ্ডবদের তাদের সুহৃদ ও বন্ধু-বান্ধবসহ পরাস্ত করবে।' এই কথা বলে দুর্যোধন মৌন হয়ে গেলেন।

মহামনা ভীষ্ম আপনার পুত্রের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে কোনো কথা বললেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তারপর তিনি দুর্যোধনকে বুঝিয়ে বললেন—

পুত্র দুর্যোধন ! তুমি এই প্রকার বাক্য বাণে আমাকে কেন বিদ্ধ করছ ? আমি আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে তোমার হিতের জন্য যুদ্ধ করছি। তোমার মঙ্গলার্থে আমি প্রাণ বিসর্জন করতেও রাজি আছি। দেখো,বীর অর্জুন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করে খাণ্ডববনে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিল—তার বীরত্বের এই প্রমাণ। গন্ধর্বরা যখন তোমাকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তখন সেই তোমাকে ছাড়িয়ে এনেছিল, তখন তোমার এই শূরবীর ভ্রাতাগণ এবং কর্ণ রণক্ষেত্রের থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এগুলো কি তার শক্তির পরিচয় নয় ? বিরাট নগরে সে একাই আমাদের সকলকে পরাস্ত করেছিল আর আমাকে ও দ্রোণাচার্যকে পরাস্ত করে যোদ্ধাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং নিজের পৌরুষ নিয়ে গর্বকারী কর্ণকেও পরাজিত করে উত্তরাকে তাদের বস্ত্র অর্পণ দিয়েছিল। এগুলিও তার বীরত্বের প্রমাণ । যার রক্ষক স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীকৃষ্ণ, সেই অর্জুনকে যুদ্ধে কে পরাস্ত করতে পারে ? শ্রীবসুদেবনন্দন অনন্ত শক্তির আধার, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কারী ; সকলের ঈশ্বর, দেবতাদেরও পূজনীয়, স্বয়ং সনাতন পরমাত্মা। নারদ ও মহর্ষিগণ তোমাকে কয়েকবার একথা বলেছেন। কিন্তু মোহবশত তুমি একথা বুঝতেই চাওনি। শিখণ্ডী ব্যতীত অন্য সব সোমক এবং পাঞ্চাল বীরদের আমি বধ করব। এবার হয় আমি ওদের হাতে মারা পড়ব অথবা ওদের বিনাশ করে আমি তোমাকে প্রসন্ন করব। এই শিখণ্ডী প্রথমে রাজা দ্রুপদের গৃহে স্ত্রীরূপে জন্মেছিল, পরে বরের প্রভাবে পুরুষরূপে পরিবর্তিত হয়। তাই আমার কাছে শিখণ্ডী নারীই। তাই সে আমার প্রাণ নিতে এলেও আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। এখন তুমি গিয়ে নিশ্চিন্তে শয়ন করো। কাল আমি ভীষণ সংগ্রাম করব। যতদিন পৃথিবী থাকবে, লোক ততদিন সেই সংগ্রামের কথা স্মরণে রাখবে।

রাজন্ ! ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন মস্তক অবনত করে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি নিজ শিবিরে এসে শয়ন করলেন। পরদিন প্রভাতে উঠে তিনি সব রাজাদের নির্দেশ দিলেন, 'আপনারা নিজ নিজ সৈন্য প্রস্তুত করুন, আজ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে সোমক বীরদের সংহার করবেন।' তারপর দুঃশাসনকে বললেন—'তুমি ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি রথ প্রস্তুত করো। আজ তোমার সমস্ত সেনানীদের তাঁকে রক্ষা করার জন্য আদেশ দাও। শিখণ্ডী, অরক্ষিত ভীষ্মকে যেন বধ করতে না পারে। আজ শকুনি, শল্য, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এবং বিবিংশতি যেন অত্যন্ত সাবধানে ভীষ্মকে রক্ষা করেন ; তিনি সুরক্ষিত থাকলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।' দুর্যোধনের কথা শুনে সমস্ত যোদ্ধারা বহু রথ নিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলো। ভীষ্মকে বহু রথ ঘিরে রয়েছে দেখে অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—তুমি আজ ভীষ্মের সামনে পুরুষসিংহ শিখণ্ডীকে রাখো। আমি তাঁকে রক্ষা করব।'

—o—

পাণ্ডবদের সঙ্গে ভীষ্মের ভয়ানক যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের চাবুক নিয়ে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হওয়া

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ভীষ্ম তখন বিশাল বাহিনী দিয়ে সর্বতোভদ্র নামক ব্যূহ তৈরি করলেন। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, শৈব্য, শকুনি, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ এবং আপনার সমস্ত পুত্ররা ভীষ্মের সঙ্গে সব সেনাদের সামনে দাঁড়ালেন। দ্রোণাচার্য, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং ভগদত্ত ব্যূহের ডান দিকে দাঁড়ালেন। অশ্বত্থামা, সোমদত্ত এবং দুই অবন্তীরাজকুমার তাঁদের বিশাল সৈন্যসহ অলম্বুষ ও শ্রুতায়ু সমস্ত ব্যূহবদ্ধ সৈন্যের পিছনে থাকলেন। আপনার পক্ষের সমস্ত বীর এইভাবে ব্যূহরচনার রীতিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

অন্যদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব—তাঁরা সমস্ত সৈন্যের ব্যূহের মুখভাগে দাঁড়ালেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, অর্জুন, ঘটোৎকচ, চেকিতান, কুন্তীভোজ, অভিমন্যু, দ্রুপদ, যুধামন্যু এবং কেকয় রাজকুমার—এই সকল বীররা কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ালেন। আপনার পক্ষের বীররা ভীষ্মকে সামনে রেখে পাণ্ডবদের দিকে এগোলেন। ভীমসেন ও অন্য পাণ্ডব যোদ্ধাও বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এলেন। দুই পক্ষে ভয়ানক

যুদ্ধ শুরু হল। ভীষণ শব্দে পৃথিবী কম্পিত হল। ধুলায় ধূসরিত হওয়ায় দ্বিপ্রহরের সূর্যও প্রভাহীন হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হল। শৃগাল চিৎকার করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে। কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল, আকাশ থেকে মুহুর্মুহু উল্কাপাত হচ্ছিল। সেই অশুভ মুহূর্তে হাতি, ঘোড়া ও সৈনিকদের কোলাহল বড় ভয়ংকর লাগছিল।

মহারথী অভিমন্যু সর্বপ্রথম দুর্যোধনের সেনার ওপর

আক্রমণ করলেন। তিনি যখন সেই অনন্ত সৈন্য সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, আপনার বড় বড় বীরও তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণে বহু ক্ষত্রিয় বীর যমালয়ে গমন করলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর বাণ বর্ষণ করে বহু রথ, রথী, ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার এবং হাতি ও তার আরোহীদের বিদীর্ণ করতে লাগলেন। অভিমন্যুর এই পরাক্রম দেখে রাজারা প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। সেইসময় তিনি কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল এবং জয়দ্রথকেও কৌশলে পরাস্ত করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রণভূমিতে বিচরণ করছিলেন। তাঁকে এইভাবে শত্রুদের সন্তপ্ত করতে দেখে ক্ষত্রিয়দের মনে হচ্ছিল যেন ইহলোকে দুজন অর্জুন প্রকটিত হয়েছেন। অভিমন্যু এইভাবে আপনার বিশাল বাহিনীর ভিত কাঁপিয়ে সমস্ত মহারথীদের হৃদয়ে ভয় ধরিয়ে দিলেন। তাঁর সুহৃদরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। অভিমন্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আপনার সেনারা আতুর হয়ে চিৎকার করতে লাগল।

আপনার সেনাদের ভয়ংকর আর্তনাদ শুনে রাজা দুর্যোধন রাক্ষস অলম্বুষকে বললেন—'মহাবাহো! বৃত্রাসুর যেভাবে সমস্ত দেবতা সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন, এই অর্জুনপুত্রও সেইভাবে আমার সেনাদের বিতাড়িত করছে। তুমি ব্যতীত এই সংগ্রামে তাকে প্রতিহত করার আর কেউ নেই। তুমি সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম। অতএব শীঘ্র গিয়ে তাকে শেষ করো। এখন ভীষ্ম-দ্রোণ প্রমুখ যোদ্ধা মিলে আমরা অর্জুনকে বধ করব।'

দুর্যোধনের কথায় মহাবলী রাক্ষসরাজ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জন করতে করতে অভিমন্যুর দিকে রওনা হল। তার ভীষণ গর্জনে পাণ্ডবসেনার মধ্যে কোলাহল পড়ে গেল। কয়েকজন যোদ্ধা ভয়ে প্রাণের আশাই ছেড়ে দিল। অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ ধনুর্বাণ নিয়ে তার সামনে এলেন। সেই রাক্ষস অভিমন্যুর কাছে এসে তাঁর সৈন্যদের তাড়িয়ে দিল এবং তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার প্রহারে বহু সৈন্যের বিনাশ হল। তারপর সেই রাক্ষস দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের দিকে এগোল। পাঁচ ভাই রাক্ষসকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে সবেগে তাকে আক্রমণ করলেন। প্রতিবিন্ধ্য তীক্ষ্ণবাণে তাঁকে আঘাত করলেন, বাণের আঘাতে তার বর্ম টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পাঁচ ভাই তাকে লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করায় সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে পেয়ে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবল পরাক্রমে তাঁদের ধনুক, বাণ ও ধ্বজা কেটে ফেলল। তারপর হাসতে হাসতে পাঁচ বাণ মেরে তাঁদের সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করল। এইভাবে রথহীন করে তাঁদের বধ করার জন্য সে সবেগে তাঁদের আক্রমণ করল। তাঁদের সংকট দেখে অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ তাঁদের দিকে এলেন। অভিমন্যু ও অলম্বুষের মধ্যে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। দুজনেই ক্রোধে একে অপরকে প্রলয়াগ্নির মতো জ্বলে উঠে আঘাত করতে লাগলেন।

অভিমন্যু প্রথমে তিনটি ও পরে পাঁচটি বাণের দ্বারা অলম্বুষকে বিদ্ধ করলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষ অভিমন্যুর বুকে নয়টি বাণ নিক্ষেপ করলেন, তারপর শত শত বাণে অভিমন্যুকে আক্রান্ত করে তুললেন। তখন কুপিত হয়ে অভিমন্যু তাঁর বুকে নয়টি বাণ মারলেন। সেই বাণ তার শরীর ভেদ করে মর্মস্থলে ঢুকল। আহত হয়ে সেই রাক্ষস রণক্ষেত্রে তার তামসী মায়া বিস্তার করল, সব যোদ্ধাদের চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। তারা তখন কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। সেই ভীষণ অন্ধকার দেখে অভিমন্যু ভাস্কর নামের এক প্রচণ্ড অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখন সব অন্ধকার দূর হল। অলম্বুষ আরও

কয়েক প্রকার মায়া প্রয়োগ করলে অভিমন্যু তা সবই নষ্ট করে দেন। মায়া নাশ হওয়ায় অভিমন্যুর আঘাতে পীড়িত হয়ে অলম্বুষ রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করল। মায়াযুদ্ধকারী রাক্ষসকে পরাস্ত করে অভিমন্যু কৌরব সেনাদের বধ করতে লাগলেন।

সেনাদের পলায়ন করতে দেখে ভীষ্ম এবং অনেক মহারথী সেই একাকী বালককে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন এবং চতুর্দিক থেকেই তাঁর ওপর ক্রমাগত বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বীর অভিমন্যু বল ও পরাক্রমে তাঁর পিতা অর্জুন ও মাতুল শ্রীকৃষ্ণের মতোই ছিলেন। তিনি রণভূমিতে তাঁদের দুজনের মতোই পরাক্রম দেখালেন। এরমধ্যে বীর অর্জুন তাঁর পুত্রকে রক্ষার জন্য আপনার সৈন্য সংহার করতে করতে ভীষ্মের কাছে পৌঁছলেন। আপনার পিতৃব্য ভীষ্মও রণক্ষেত্রে অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন আপনার পুত্র রথ, হাতি এবং ঘোড়ার দ্বারা ভীষ্মকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে রক্ষা করতে লাগলেন। পাণ্ডবরাও এইভাবে অর্জুনের আশে পাশে থেকে ভীষণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রথমে কৃপাচার্য অর্জুনকে পঁচিশটি বাণ মারলেন, সাত্যকি এগিয়ে এসে কৃপাচার্যকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করলেন, তারপর তিনি অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করলেন। অশ্বত্থামা তখন সাত্যকির ধনুক দুটুকরো করে তাঁকে বাণবিদ্ধ করলেন। সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক ধনুক এনে অশ্বত্থামার বুকে ও হাতে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তাতে আহত হয়ে অশ্বত্থামা মূর্ছিত হলেন এবং নিজ ধ্বজার সাহায্যে রথের পশ্চাদভাগে গিয়ে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে এলে অশ্বত্থামা কুপিত হয়ে সাত্যকিকে একটি নারাচ নিক্ষেপ করলেন। সেটি সাত্যকিকে আঘাত করে পৃথিবীতে ঢুকে গেল। অন্য এক বাণে তিনি তার ধ্বজা কেটে গর্জন করে উঠলেন। তারপর তিনি সাত্যকির ওপর প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। এই অবস্থাতেও অশ্বত্থামার সমস্ত বাণ প্রতিহত করে সাত্যকি তাঁর ওপর শতশত বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

মহাপ্রতাপশালী দ্রোণাচার্য পুত্রকে রক্ষা করার জন্য সাত্যকির সামনে এসে বাণের আঘাতে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন। সাত্যকি তখন অশ্বত্থামাকে ছেড়ে দ্রোণাচার্যকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। পরম সাহসী অর্জুনও তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্যকে আঘাত করলেন, তাঁকে বাণের দ্বারা ঢেকে ফেললেন। আচার্যের ক্রোধ তাতে বেড়ে গেল, তিনি অর্জুনকে বাণে বাণে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। দুর্যোধন সুশর্মাকে পাঠালেন আচার্যের সহায়তা করার জন্য। তাই ত্রিগর্তরাজ তাঁর ধনুকে তীক্ষ্ণ ফলাসম্পন্ন বাণে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুনও সিংহনাদ করে সুশর্মা এবং তাঁর পুত্রকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন, তাঁরা দুজনে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁর রথের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁদের বাণ নিজের বাণের দ্বারা প্রতিহত করলেন। তাঁর হাতের কৌশল দেখে দেবতা ও দানবও প্রসন্ন হলেন। অর্জুন তখন কুপিত হয়ে কৌরবসেনার অগ্রভাগে উপস্থিত ত্রিগর্ত বীরদের ওপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেটি আকাশে উঠে ঝড়ের সৃষ্টি করে বহু বৃক্ষ উপড়ে ফেলল এবং বহু বীর ধরাশায়ী হয়ে গেল। তখন দ্রোণাচার্য শৈলাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাতে বাতাস স্তব্ধ হয়ে চতুর্দিক পরিষ্কার হয়ে গেল। পাণ্ডুপুত্র অর্জুন এইভাবে ত্রিগর্ত-রথীদের নিরুৎসাহ করে তাঁদের পরাক্রমহীন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করলেন।

রাজন্ ! যুদ্ধ হতে হতে মধ্যাহ্ন হয়ে গেল, গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পাণ্ডবপক্ষের শত সহস্র সৈনিক সংহার করতে লাগলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট এবং দ্রুপদ ভীষ্মের সামনে এসে তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করে তিন বাণে বিরাটকে ঘায়েল করলেন এবং আর এক বাণ রাজা দ্রুপদের ওপর ছুঁড়লেন। ভীষ্মের হাতে আহত হয়ে এই ধনুর্ধর বীরগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। শিখণ্ডী পিতামহকে তীরবিদ্ধ করলেন। কিন্তু পিতামহ তাঁকে নারী মনে করে আক্রমণ করলেন না। তখন দ্রুপদ তাঁর বুক এবং হাত লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। দ্রুপদ, বিরাট এবং শিখণ্ডী—প্রত্যেকে পঁচিশ বাণে ভীষ্মকে আঘাত করলেন। ভীষ্ম তিন বাণে তিন বীরকে বিদ্ধ করলেন এবং এক বাণে দ্রুপদের ধনুক কেটে ফেললেন। তিনি তখনই অন্য ধনুক দিয়ে পাঁচ বাণে ভীষ্মকে এবং তিন বাণে তাঁর সারথিকে বিদ্ধ করলেন। দ্রুপদকে রক্ষা করার জন্য ভীমসেন, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, কেকয়দেশের পাঁচভাই, সাত্যকি, রাজা যুধিষ্ঠির এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের দিকে এগিয়ে এলেন। আপনার পক্ষের সব বীরও ভীষ্মের রক্ষার্থে পাণ্ডব সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুপক্ষের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল।

রথীর সঙ্গে রথী, পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে বিপক্ষকে যমরাজার গৃহে পাঠাতে লাগল।

অন্যদিকে অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সুশর্মার সঙ্গী রাজাদের যমালয়ে পাঠালেন। সুশর্মাও তাঁর তীক্ষ্ণবাণে অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে শতশত বাণ মারতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বাণ প্রতিহত করে সুশর্মার কয়েকজন বীরকে বধ করলেন। কল্পান্তকারী কালের ন্যায় অর্জুনের বাণে ভীত হয়ে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগলেন। তাঁরা কেউ ঘোড়া, কেউ হাতি আবার কেউ রথ ফেলে পালিয়ে গেলেন। সুশর্মা তাঁদের আটকাবার চেষ্টা করলেও, তাঁরা কেউ ফিরলেন না। সেনাদের এইভাবে পালিয়ে যেতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন ত্রিগর্তরাজকে রক্ষার জন্য সমস্ত সেনাসহ ভীষ্মকে অগ্রে রেখে অর্জুনের দিকে এগোলেন। পাণ্ডবরাও অর্জুনকে রক্ষার নিমিত্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ভীষ্মের দিকে চললেন।

ভীষ্ম তখন বাণের সাহায্যে পাণ্ডব সেনা সংহার করতে লাগলেন। অন্য দিকে সাত্যকি পাঁচ বাণে কৃতবর্মাকে বিদ্ধ করলেন এবং সহস্র বাণবর্ষণ করে যুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়ালেন। রাজা দ্রুপদ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করে, তাঁর সারথির ওপরও বাণ চালালেন। ভীমসেন তাঁর প্রপিতামহ বাহ্লীককে ঘায়েল করে সিংহনাদ করে উঠলেন। যদিও অভিমন্যুকে চিত্রসেন বহু বাণে আহত করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি সহস্র বাণবর্ষণ করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তিনি তিন বাণে চিত্রসেনকে অত্যন্ত আহত করে নয় বাণে তাঁর ঘোড়াগুলি মেরে সিংহনাদ করে উঠলেন।

অপরদিকে আচার্য দ্রোণ রাজা দ্রুপদকে শর বিদ্ধ করে তাঁর সারথিকে ঘায়েল করলেন। অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় দ্রুপদ রণক্ষেত্রের বাইরে চলে গেলেন। ভীমসেন সমস্ত সৈন্যের সামনেই রাজা বাহ্লীকের ঘোড়া, সারথি ও রথ নষ্ট করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের রথে আরোহণ করলেন। সাত্যকি বহু বাণের দ্বারা কৃতবর্মাকে প্রতিহত করে পিতামহ ভীষ্মের সামনে এলেন এবং তাঁর বিশাল ধনুক থেকে ষাটটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করলেন। তখন পিতামহ তাঁর ওপর এক লৌহ শক্তি নিক্ষেপ করলেন। কালের ন্যায় করাল সেই শক্তিকে আসতে দেখে সাত্যকি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে রোধ করলেন, সেই শক্তি সাত্যকির কাছে না এসে মাটিতে পড়ল। তখন সাত্যকি ভীষ্মের দিকে তাঁর শক্তি নিক্ষেপ করলেন। ভীষ্মও দুই তীক্ষ্ণ বাণে সেটি দ্বিখণ্ডিত করলেন, সেগুলি মাটিতে গিয়ে পড়ল। শক্তি কেটে ফেলে ভীষ্ম সাত্যকির ওপর নটি বাণবর্ষণ করলেন। তখন রথ, ঘোড়া ও গজসহ সমস্ত পাণ্ডব সাত্যকির রক্ষার্থে ভীষ্মকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

রাজা দুর্যোধন তাই দেখে দুঃশাসনকে বললেন—'বীরবর! পাণ্ডবরা পিতামহকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে, এখন তোমার তাঁকে রক্ষা করা উচিত।' দুর্যোধনের নির্দেশ শুনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে ভীষ্মকে ঘিরে দাঁড়ালেন। শকুনি এক লাখ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নকুল-সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে বাধা দিতে লাগলেন, দুর্যোধনও পাণ্ডবদের বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেব সেই অশ্বারোহীদের বাধা দেবার জন্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের মস্তক কেটে ফেলতে লাগলেন। তাদের মাথা এমনভাবে পড়তে লাগল যেন গাছের ফল ঝরে পড়ে যাচ্ছে। সেই মহাসমরে শত্রুদের পরাস্ত করে পাণ্ডবরা শঙ্খ ও ভেরী বাজাতে লাগলেন।

দুর্যোধন নিজ সেনাদের পরাজিত হতে দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিনি মদ্ররাজকে বললেন—'রাজন্! দেখুন, নকুল, সহদেব এবং জ্যেষ্ঠপাণ্ডুপুত্র আপনার সৈন্যদের হটিয়ে দিচ্ছেন ; আপনি ওঁদের বাধা দিতে চেষ্টা করুন। আপনার বল ও পরাক্রম সকলে সহ্য করতে পারে না।' দুর্যোধনের কথা শুনে মদ্ররাজ শল্য রথী সৈন্য সহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরের সামনে এলেন। তাঁর বিশাল বাহিনী একসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করল। ধর্মরাজ সেই সৈন্যপ্রবাহ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতিহত করলেন এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দশটি বাণ শল্যের ওপর নিক্ষেপ করলেন। নকুল-সহদেবও তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। মদ্ররাজ তাঁদের প্রত্যেককে তিনটি করে বাণ মারলেন। ষাট বাণে তিনি যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করলেন এবং দুটি করে বাণ তাঁর ভায়েদের ওপর ছুঁড়লেন। দুপক্ষে মহা কঠোর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

সূর্যদেব অস্তোন্মুখ হলেন। তাই পিতামহ ভীষ্ম ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণে পাণ্ডব ও তাঁদের সেনাদের আক্রমণ করলেন। তিনি বারো বাণে ভীমকে, সাত বাণে

সহদেবকে, নয় বাণে সাত্যকিকে, তিন বাণে নকুলকে এবং বারো বাণে যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করে সিংহনাদ করে উঠলেন। দ্রোণাচার্য পাঁচটি করে বাণ সাত্যকি ও ভীমসেনকে মারলেন এবং ভীম ও সাত্যকিও তাঁর ওপর তিনটি করে বাণ মারলেন।

তারপর পাণ্ডবরা আবার পিতামহকে ঘিরে ধরলেন। কিন্তু তাঁরা ঘিরে ধরলেও অজেয় ভীষ্ম আগুনের মতো তেজে শত্রুপক্ষকে পোড়াতে লাগলেন। তিনি বহু রথ, হাতি এবং ঘোড়া মনুষ্যহীন করে দিলেন। তাঁর বাজের আওয়াজের মতো গম্ভীর ধনুকের ছিলার টংকার শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল। ভীষ্মের ধনুক নিক্ষিপ্ত বাণ যোদ্ধার বর্মে না লেগে সোজা তাদের দেহ ভেদ করে চলে যেত। বেদি, কাশী ও করুষ দেশের চৌদ্দ হাজার মহারথী, যারা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত এবং কখনো পশ্চাদপসরণ করে না, তারা ভীষ্মের সম্মুখীন হয়ে হাতি ঘোড়া ও রথসহ বিনাশপ্রাপ্ত হল।

পাণ্ডবদের সৈন্যদল এই ভীষণ আঘাতে আর্তনাদ করতে লাগল। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ রথ থামিয়ে অর্জুনকে বললেন—'কুন্তীনন্দন! তুমি যার প্রতীক্ষায় ছিলে সেই সময় এবার এসেছে। এখন তুমি মোহগ্রস্ত না হয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করো। তুমি বিরাটনগরে একত্রিত রাজাদের সামনে সঞ্জয়কে বলেছিলে যে, 'আমার সঙ্গে যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ যেই ধৃতরাষ্ট্রের হয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের সবাইকেই আমি যুদ্ধে বধ করব।' এবার সেই কথা সত্য প্রমাণ করো। ক্ষাত্রধর্মের কথা ভেবে মুক্ত মনে যুদ্ধ করো। অর্জুন কিছু বিমনাভাবে বললেন—'আচ্ছা, যেদিকে পিতামহ আছেন, সেদিকে ঘোড়া নিয়ে চলুন। আমি আপনার আদেশ পালন করব, অজেয় ভীষ্মকে ধরাশায়ী করব।' শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনের রথের সাদা ঘোড়াগুলি ভীষ্মের দিকে চালালেন। অর্জুনকে ভীষ্মের সামনে আসতে দেখে যুধিষ্ঠিরের বিশাল বাহিনী ফিরে এল।

ভীষ্ম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাণ ছুঁড়ে অর্জুনের রথ ও ঘোড়াগুলি ঢেকে দিলেন। তাঁর সেই বাণবৃষ্টিতে সব কিছু ঢেকে গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভয় পেলেন না, তিনি বাণবিদ্ধ ঘোড়াদের চালাতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনুক তুলে বাণের দ্বারা ভীষ্মের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীষ্ম মুহূর্তের মধ্যে অন্য ধনুক নিলেন, অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে সেটিও কেটে ফেললেন। অর্জুনের এই ক্ষিপ্রতা দেখে ভীষ্ম তাঁকে প্রশংসা করে বললেন—'বাহ! মহাবাহু অর্জুন সাবাশ! কুন্তীর বীর পুত্র, সাবাশ!' এই বলে তিনি আর একটি ধনুক নিয়ে অর্জুনের ওপর বাণের ঝড় বইয়ে দিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ চক্রাকারে অত্যন্ত কৌশলে রথ চালিয়ে ভীষ্মের বাণ ব্যর্থ করতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধে অর্জুনের শৈথিল্য এবং ভীষ্মের পাণ্ডব বীরদের মুখ্য সেনাদের বধ হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সেটি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ঘোড়ার রাশ ছেড়ে লাফিয়ে রথ থেকে নেমে সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে চাবুক নিয়ে ভীষ্মের দিকে দৌড়লেন। তাঁর পদাঘাতে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। আপনার বীরদের হৃদয় তাতে ভয়ে কেঁপে উঠল, তাঁরা বলতে লাগলেন—'ভীষ্ম এবার বধ হবেন।'

শ্রীকৃষ্ণ রেশমের পীতবস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর নীলমণির ন্যায় শ্যাম শরীর, বিদ্যুৎলতা সুশোভিত শ্যামমেঘের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল। সিংহ যেমন হাতির ওপর লাফিয়ে পড়ে তেমনই ইনিও গর্জন করে অত্যন্ত বেগে ভীষ্মের দিকে দৌড়লেন। কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর দিকে আসতে দেখে পিতামহ তাঁর বিশাল ধনুক রেখে কোনোপ্রকার ভয়ভীত না হয়ে বললেন—'কমললোচন! আসুন দেব! আপনাকে নমস্কার! যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি এই যুদ্ধে আমাকে বধ করুন। যুদ্ধস্থলে আপনার হাতে মৃত্যু হলে আমার কল্যাণ হবে। গোবিন্দ! আজ আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে আসায় আমি ত্রিলোকে সম্মানিত হয়েছি। আপনি ইচ্ছামতো আমাকে আঘাত করুন, আমি আপনার দাস।' তখনই অর্জুন পিছন থেকে গিয়ে ভগবানকে বাহুবন্ধনে ধরে ফেললেন। তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত জোরে অর্জুনকে টেনে নিয়ে এগোতে লাগলেন। তখন অর্জুন তাঁর দুই পায়ে পড়ে অত্যন্ত বিনয়সহকারে মধুরভাবে বললেন—'মহাবাহো! আপনি ফিরে চলুন। আপনি যে আগে বলেছেন, আপনি যুদ্ধ করবেন না, তা মিথ্যা হতে দেবেন না। আপনি এ কাজ করলে লোকে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপরেই ছেড়ে দিন, আমি পিতামহকে বধ করব। আমি শস্ত্র, সত্য এবং পুণ্য শপথ করে বলছি।'

অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কোনো কথা না বলে ক্রোধভরেই রথে ফিরে এলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আবার বাণবর্ষণ করতে লাগলেন এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের প্রাণ সংহার করতে আরম্ভ করলেন। আগে যেমন আপনার

সেনা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল, এবার পাণ্ডবসেনার মধ্যে সেইরকম পলায়ন শুরু হল। পাণ্ডবপক্ষের শত সহস্র বীর মারা পড়ছিল। তারা এত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল যে, মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় ভীষ্মের দিকে তাকাতেও পারছিল না। পাণ্ডবরা হতবুদ্ধি হয়ে ভীষ্মের সেই অমানুষিক বীরত্ব দেখছিলেন। সেইসময় কাদায় আটকে পড়া গাভীর ন্যায় পাণ্ডবসেনা তাদের কোনো রক্ষাকর্তা দেখতে পাচ্ছিল না। সেইসময় সূর্য তাঁর কাজ শেষ করে অস্তাচলের দিকে গেলেন, সারাদিনের যুদ্ধ ক্লান্ত সৈনিকগণ যুদ্ধ বন্ধ করার কথা ভাবল।

——o——

পাণ্ডবদের ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর বধের উপায় জানা

সঞ্জয় বললেন—উভয় পক্ষের সেনারা তখনও যুদ্ধ করছিল, সূর্য অস্তাচলে গেলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যুদ্ধ বন্ধ হল। ভীষ্মের বাণের আঘাতে পাণ্ডবসেনা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে মহারথীদের সংহার করতে যাচ্ছিলেন, সোমক ক্ষত্রিয়গণ পরাজিত হয়ে নিরুৎসাহ হয়েছিলেন—এইসব দেখে রাজা যুধিষ্ঠির সেনাদের ফিরিয়ে নেবার কথা ভাবলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তারপর আপনার সেনারাও ফিরে গেল। ভীষ্মের বাণে আহত পাণ্ডবগণ তখন তাঁর পরাক্রমের কথা স্মরণ করে একটুও শান্তি পেল না। ভীষ্মও সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডবদের হারিয়ে কৌরবদের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে শিবিরে ফিরে গেলেন।

রাত্রির প্রথম প্রহরে পাণ্ডব, বৃষ্ণি এবং সৃঞ্জয়দের এক বৈঠক হল। সেখানে সকলে শান্তভাবে আলোচনা করলেন যে এখন কী করলে ভালো হয়। বহুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি মহাত্মা ভীষ্মের পরাক্রম

দেখছেন তো ? হাতি যেমন বনকে পদদলিত করে, তেমনই তিনিও আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন। জ্বলন্ত আগুনের মতো ভীষ্মের দিকে আমাদের তাকাতেও সাহস হচ্ছে না। ক্রোধান্বিত যমরাজ, বজ্রধারী ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ এবং গদাধারী কুবেরকেও যুদ্ধে জয় করা সম্ভব ; কিন্তু কুপিত ভীষ্মকে পরাজিত করা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে আমি শোকসমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। কৃষ্ণ ! এখন আমার ইচ্ছা বনে চলে যাওয়া। সেখানে গেলেই আমার কল্যাণ হবে। যুদ্ধ করার কোনোই আগ্রহ নেই ; কারণ ভীষ্ম নিরন্তর আমাদের সৈন্য সংহার করছেন। বাসুদেব ! আমাদের সৈন্য সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমার ভ্রাতারা বাণের আঘাতে কষ্ট পাচ্ছে ; ভ্রাতৃস্নেহের জনাই এরাও আমার সঙ্গে রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছে, বনে বনে ঘুরেছে, দ্রৌপদীও বহু ক্লেশ সহ্য করেছে। মধুসূদন ! আমি জীবনকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করি আর তা এই সময় দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমার ইচ্ছা, জীবনের যে কটা দিন বাকি আছে, তাতে ধর্ম আচরণ করব। কেশব ! আপনি যদি আমাদের কৃপাপাত্র বলে মনে করেন, তাহলে এমন কোনো উপায় বলুন যাতে আমাদের মঙ্গল হয় এবং ধর্মে বাধা না আসে।'

যুধিষ্ঠিরের করুণ বাক্য শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'ধর্মরাজ ! দুঃখ করবেন না। আপনার ভ্রাতারা মস্ত বড় বীর, দুর্জয় এবং শত্রুনাশকারী। অর্জুন ও ভীম বায়ু ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। নকুল-সহদেবও অত্যন্ত পরাক্রমশালী। আপনি যদি চান আমাকেও যুদ্ধে নিয়োগ করুন, আপনার জয়ের জন্য আমিও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি। আপনি বললে আমি কী না করতে পারি !

অর্জুনের যদি ইচ্ছা না থাকে, তাহলে আমিই ভীষ্মকে আহ্বান করে কৌরবদের পরাজিত করতে পারি। ভীষ্ম বধ হলেই যদি আপনার বিজয় হবে মনে করেন, তাহলে আমি একাই ওঁকে বধ করতে পারি। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, যিনি পাণ্ডবদের শত্রু, তিনি আমারও শত্রু। যা আপনার, তা আমার এবং যা আমার, তা আপনারও। আপনার ভাই অর্জুন আমার সখা, আত্মীয় এবং শিষ্য ; প্রয়োজন হলে তার জন্য আমি আমার প্রাণ দিতে পারি এবং অর্জুনও আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমরা 'একে অপরকে সংকট থেকে রক্ষা করব।' সুতরাং আপনি আদেশ করুন, আজ থেকে আমিও যুদ্ধ করব। অর্জুন উপপ্লব্য নগরে সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে 'আমি ভীষ্ম বধ করব', তা আমাকে সর্বভাবে পালন করতে হবে। যে কাজের জন্য অর্জুনের নির্দেশ আছে, তা আমার অবশ্যই পূর্ণ করা উচিত। ভীষ্মকে বধ করা এমন কী বড় ব্যাপার ? অর্জুনের কাছে এ অতি সহজ কাজ। রাজন্! অর্জুন প্রস্তুত থাকলে অসম্ভব কাজকেও সে সম্ভব করতে পারে। দৈত্য-দানবসহ সমস্ত দেবতাও যদি যুদ্ধ করতে আসেন, অর্জুন তাঁদেরও পরাজিত করতে সক্ষম ; ভীষ্মের আর কী কথা ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মাধব ! আপনি ঠিকই বলেছেন, কৌরবপক্ষের সমস্ত যোদ্ধা একত্র হয়েও আপনার সঙ্গে পারবে না। যাদের পক্ষে আপনার ন্যায় সহায়ক থাকেন, তাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে আর কী সন্দেহ ? গোবিন্দ ! আপনি যখন রক্ষা করতে প্রস্তুত তখন আমি ইন্দ্রাদি দেবতাকেও পরাস্ত করতে পারি। কিন্তু আমাদের গৌরব রক্ষার্থে আমি আপনার বাক্য মিথ্যা হতে দেব না। আপনি আপনার পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিনা যুদ্ধেই আমাদের সাহায্য করুন। ভীষ্মও আমাকে কথা দিয়েছেন যে 'আমি তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে পারব না, কিন্তু তোমাদের মঙ্গলের জন্য পরামর্শ দেব।' তিনি আমাকে রাজ্যও দিতে চান এবং সুপরামর্শও। সুতরাং আমরা সকলে আপনার সঙ্গে ভীষ্মের কাছে যাই এবং তাঁকেই তাঁর বধের উপায় জিজ্ঞাসা করি। তিনি অবশ্যই আমাদের মঙ্গলের কথা জানাবেন। যা বলবেন, সেই অনুযায়ী কাজ করব ; কারণ পিতার মৃত্যুর সময় যখন আমরা নাবালক ছিলাম, সেইসময় পিতামহই আমাদের পালন-পোষণ করে বড় করেছেন। মাধব ! ইনি আমাদের পিতার পিতা, প্রবীণ ; তবুও আমরা তাঁকে বধ করতে চাই। ধিক এই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিকে।'

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ ! আপনার কথা আমার গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। আপনার পিতামহ দেবব্রত অত্যন্ত পুণ্যাত্মা ! তিনি শুধু দৃষ্টির দ্বারাই সব ভস্ম করে দিতে পারেন। সুতরাং তাঁর বধের উপায় জানার জন্য অবশ্যই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত। আপনি জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই সঠিক উপায় বলবেন। উনি যেমন বলবেন, সেই অনুসারে আমরা যুদ্ধ করব।'

এইরূপ পরামর্শ করে পাণ্ডব ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের শিবিরে গেলেন। তখন তিনি তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম খুলে রেখেছিলেন। সেখানে পৌঁছে পাণ্ডবরা তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন এবং বললেন—'আমরা আপনার শরণাগত।' তখন ভীষ্ম তাঁদের দেখে বললেন—'বাসুদেব ! আমি আপনাকে স্বাগত জানাই। ধর্মরাজ, ধনঞ্জয়, ভীম, নকুল ও সহদেবকেও স্বাগত জানাই। আমি তোমাদের প্রসন্নতার জন্য কী করব বলো ? যত কঠিন কাজই হোক, আমাকে বলো, আমি তা সর্বতোভাবে পূর্ণ করার চেষ্টা করব।'

ভীষ্ম প্রসন্নতা সহকারে বারংবার এই কথা বলতে লাগলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির দীনভাবে বললেন—'প্রভু ! কীভাবে এই প্রজা সংহার বন্ধ করা যায় বলুন। আপনি নিজে আমাদের আপনার বধের উপায় বলুন। বীরবর ! এই যুদ্ধে আপনার পরাক্রম আমরা কীভাবে সহ্য করব ? আমরা তো আপনাকে কখনোই অসতর্ক দেখি না। আপনি যখন রথ, ঘোড়া, হাতি এবং মানুষদের সংহার করতে থাকেন, তখন কোন ব্যক্তি আপনাকে পরাস্ত করার সাহস করবে ? পিতামহ ! আমাদের বিশাল সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন বলুন ! কীভাবে আমরা আপনাকে হারাতে পারি ? কীভাবে নিজেদের রাজ্য লাভ করতে পারি ?'

তখন ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! আমি সত্য বলছি, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, তোমরা কোনোভাবেই জয়ী হতে পারবে না। আমি মারা গেলে তবেই তোমরা বিজয়ী হবে। সুতরাং তোমাদের যদি জয়ী হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে যত শীঘ্র পারো আমাকে বধ করো। আমার মৃত্যু হলে জেনো সকলেই পরাস্ত হবে ; তাই আগে আমাকেই বধ করার চেষ্টা করো।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! তাহলে আপনি তার উপায় জানান, যার দ্বারা আমরা আপনাকে পরাস্ত করতে পারি।

যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন আপনাকে অপরাজেয় মনে হয়। ইন্দ্র, বরুণ, যমকেও পরাজিত করা সম্ভব ; কিন্তু আপনাকে ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অসুরও পরাস্ত করতে পারবে না।

ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! তোমার কথা সত্য ; আমি যখন অস্ত্র ত্যাগ করব, সেই সময় তোমার মহারথী আমাকে বধ করতে সক্ষম হবে। যিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন, বর্ম ত্যাগ করবেন, ধ্বজা নীচু করবেন, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবেন, 'আমি আপনার শরণাগত' বলে ঘোষণা করবেন, নারী অথবা নারীর মতো নামসম্পন্ন, যিনি ব্যাকুল, যাঁর একটিই পুত্র অথবা যিনি লোকনিন্দিত—আমি এইরূপ লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। তোমার সৈন্যদলে যে শিখণ্ডী আছে, সে প্রথমে নারীরূপে জন্মেছিল, পরে পুরুষ হয়েছে —একথা তোমরাও জানো। বীর অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে যেন আমার ওপর বাণ নিক্ষেপ করে ; শিখণ্ডী আমার সামনে থাকলে, আমার হাতে ধনুক থাকলেও আমি আঘাত করব না। আমাকে বধ করার এই একটিমাত্র উপায়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অর্জুন আমাকে বারে বারে বিদ্ধ করুক। জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন ব্যতীত এমন কেউ নেই যে আমাকে বধ করতে পারে। তাই শিখণ্ডীর মতো কোনো ব্যক্তিকে সামনে রেখে অর্জুন আমাকে বধ করবে ; এরূপ করলে তোমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমি যা বলছি সেই মতো কাজ করো, তাহলেই ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে বধ করতে পারবে।

ভীষ্মের কাছে তাঁর মৃত্যুর উপায় জেনে পাণ্ডবরা তাঁকে প্রণাম করে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলেন। ভীষ্মের কথা স্মরণ করে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি সংকোচের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মাধব ! ভীষ্ম কুরু-বংশের প্রবীণ ব্যক্তি, আমাদের পিতামহ এবং গুরু ; এঁর সঙ্গে আমি কী করে যুদ্ধ করব ? শিশুবয়সে আমি এঁর ক্রোড়েই খেলা করেছি। ধুলা ধূসরিত হয়ে এঁকে কতবার ধুলায় ময়লা করে দিয়েছি। ইনি যদিও আমার পিতার পিতা, তা সত্ত্বেও আমি এঁকে ক্রোড়ে উঠে 'পিতা' বলেই ডাকতাম। তখন তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলতেন—'পুত্র ! আমি তোমার পিতার পিতা, তোমার পিতা নই।' যিনি এত আদরে, মমতায় আমাদের পালন করেছেন, তাঁকে আমি কী করে বধ করব ? ইনি যতই আমাদের সেনা বিনাশ করুন, আমাদের বিজয় হোক বা বিনাশ ; আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। কৃষ্ণ ! আপনার কী মত ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন ! তুমি আগেই ভীষ্মকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছ, তাহলে ক্ষত্রিয় ধর্মে থেকে এখন আর কী করে পশ্চাদপসরণ করতে পারো ? আমার মত হল ওঁকে বধ করো ; তা না হলে তোমার বিজয়লাভ অসম্ভব ! দেবতাদের কাছে একথা আগেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ভীষ্মের পরলোক-গমনের সময় সন্নিকট। নিয়তির বিধান পূর্ণ হবেই, তা কখনোই পাল্টায় না। আমার কথা শোনো—কেউ যদি তোমার থেকে বড় হয়, বৃদ্ধ হয় এবং বহুগুণসম্পন্ন হয় ; তা হলেও যদি সে আততায়ীরূপে বধ করতে আসে, তাহলে অতি অবশ্যই তাকে মেরে ফেলা উচিত। যুদ্ধ, প্রজা পালন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান—এগুলি ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম।

অর্জুন বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! এখন নিশ্চিতভাবে জেনে গেলাম যে শিখণ্ডীই ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবেন। কেননা তাঁকে দেখলেই ভীষ্ম অন্যদিকে ঘুরে যান। আমরা শিখণ্ডীকে সামনে রেখেই তাঁকে রণভূমিতে পরাস্ত করতে সক্ষম হব। আমি অন্য সব ধনুর্ধরীকে বাণের দ্বারা প্রতিহত করব। ভীষ্মের সহায়তার জন্য কাউকে আসতে দেব না। শিখণ্ডী ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।' এইরূপ স্থির করে পাণ্ডবরা প্রসন্ন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রাম করতে গেলেন।

—o—

দশম দিনের যুদ্ধ শুরু

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! শিখণ্ডী কীভাবে ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন এবং ভীষ্ম কেমন করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—সূর্যোদয় হলে, নানা বাদ্যযন্ত্র বাজতে লাগল, চারদিকে শঙ্খ ধ্বনি হতে লাগল। তখন পাণ্ডবরা শিখণ্ডীকে অগ্রে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। সৈন্যব্যূহ নির্মাণ হলে শিখণ্ডী সর্বাগ্রে অবস্থিত হলেন। ভীমসেন ও অর্জুন তাঁর রথরক্ষায় নিযুক্ত হলেন। পিছনের ভাগে

থাকলেন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র। তাঁদের পিছনে সাত্যকি ও চেকিতান। এই দুজনের পিছনে পাঞ্চাল দেশের যোদ্ধাদের নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন। তাঁর পিছনে নকুল-সহদেবসহ স্বয়ং যুধিষ্ঠির দণ্ডায়মান। তাঁদেরও পিছনে রাজা বিরাট ছিলেন তাঁর বিশাল সেনা নিয়ে। তাছাড়াও রাজা দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার এবং ধৃষ্টকেতু। এঁরা পাণ্ডবসেনার মধ্যভাগ রক্ষায় ছিলেন। এইভাবে সৈন্য ব্যূহ নির্মাণ করে পাণ্ডবরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে আপনার সেনাদের আক্রমণ করলেন।

কৌরবরাও এইভাবে ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডবদের দিকে অগ্রসর হলেন। আপনার পুত্রগণ পিছন থেকে তাঁকে রক্ষা করছিলেন। তাঁর পিছনে ছিলেন দ্রোণ ও অশ্বত্থামা। এঁদের পিছনে গজারোহী সৈন্যের সঙ্গে রাজা ভগদত্ত যাচ্ছিলেন। কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা ছিলেন তাঁর পিছনে। এঁদের পরে কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, বৃহদ্বল ও সুশর্মা প্রমুখ ধনুর্ধর ছিলেন। এঁরা আপনার সৈন্যের মধ্যভাগ রক্ষায় ছিলেন। ভীষ্ম প্রত্যহ নিজের ব্যূহ পরিবর্তন করতেন ; তিনি কখনো অসুর ও কখনো পিশাচের রীতিতে ব্যূহ নির্মাণ করতেন।

রাজন্ ! তারপর পাণ্ডব ও আপনার সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। দুপক্ষের যোদ্ধা একে অপরকে আঘাত করতে লাগল। অর্জুনরা শিখণ্ডীকে সামনে রেখে বাণবর্ষণ করতে করতে ভীষ্মের সামনে হাজির হলেন। মহারাজ ! আপনার সেনারা ভীমসেনের বাণে আহত হয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে পরলোক গমন করতে লাগল। নকুল, সহদেব এবং মহারথী সাত্যকি এঁরাও আপনার সৈন্য বিনাশ করতে লাগলেন। আপনার যোদ্ধারা পাণ্ডবদের উজ্জীবিত সৈন্য প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেন না। পাণ্ডব মহারথীগণ আপনার সেনাদের বধ করতে থাকলে তারা নানা দিকে পলায়ন করতে লাগল। তাদের কোনো রক্ষাকর্তা ছিল না।

ভীষ্ম শত্রুকর্তৃক এই সৈন্যসংহার সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়দের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি পাণ্ডবদের পাঁচ প্রধান মহারথীর অগ্রগমন রোধ করলেন এবং শত শত হাতি-ঘোড়া বধ করলেন। যুদ্ধের দশম দিন চলছিল। দাবানলের মতো ভীষ্ম শিখণ্ডীর সৈন্যকে ভস্মসাৎ করছিলেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের বুকে তিনটি বাণ মারলেন। সেই বাণে ভীষ্মের অত্যন্ত আঘাত লাগলেও তিনি শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে ইচ্ছুক না থাকায় হেসে তাঁকে বললেন—তোমার যেমন ইচ্ছা, আমাকে আঘাত করো বা না করো ; আমি তোমার সঙ্গে কোনোভাবেই যুদ্ধ করব না। বিধাতা

আমাকে নারীশরীর থেকে জন্ম দিয়েছেন, তোমারও সেই শরীর ; তাই আমি তোমাকে শিখণ্ডিনী বলে মনে করি।'

তাঁর কথায় শিখণ্ডী ক্রোধে অধীর হয়ে বললেন—'মহাবাহো ! আমি তোমার প্রভাব জানি, তা হলেও পাণ্ডবদের প্রিয় কাজ করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব। আমি শপথ করে বলছি, তোমাকে আমি অবশ্যই বধ করব। আমার কথা শুনে তোমার যা মনে হয়, তাই করো। তোমার যেমন ইচ্ছা, বাণ নিক্ষেপ করো বা না করো, আমি তোমাকে জীবিত থাকতে দেব না। অন্তিম সময়ে এই জগৎকে ভালো করে দেখে নাও।'

এই বলে শিখণ্ডী ভীষ্মকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও শিখণ্ডীর কথা শুনে, এই সুযোগ ভেবে তাঁকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'বীরবর ! তুমি ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমিও সবসময় তোমার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। যদি ভীষ্মকে বধ না করে আমরা ফিরে যাই, তাহলে লোকে আমাদের উপহাস করবে। সুতরাং চেষ্টা করে আজই পিতামহকে বধ করো, যাতে কেউ কিছু না বলে।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—শিখণ্ডী ভীষ্মের ওপরে কীভাবে আক্রমণ করলেন ? পাণ্ডবদের কোন কোন মহারথী তাঁকে রক্ষা করছিলেন এবং যুদ্ধের দশমদিনে ভীষ্ম পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ভীষ্ম প্রতিদিনের মতো এই দিনও যুদ্ধে শত্রু সংহার করছিলেন, প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করছিলেন। পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল

একত্র হয়েও তাঁর আক্রমণ সামলাতে পারলেন না। হাজার হাজার বাণবর্ষণ করে তিনি শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে দিলেন। এমন সময় সেখানে অর্জুন এসে পৌঁছলেন, তাঁকে দেখে কৌরব সৈন্য কেঁপে উঠল। অর্জুন জোরে জোরে ধনুকে টংকার তুলে সিংহনাদ করছিলেন এবং বাণবর্ষণ করতে করতে কালের মতো বিচরণ করছিলেন। সিংহের গর্জন শুনে যেমন হরিণ ভীত হয়ে পালায়, অর্জুনের সিংহনাদে ভীত হয়ে তেমনই আপনার সৈন্যরা পালাতে লাগল। দুর্যোধন তাই দেখে ব্যাকুল হয়ে ভীষ্মকে বললেন— 'পিতামহ ! এই পাণ্ডুনন্দন অর্জুন আমার সৈন্যদের ভস্ম করে দিচ্ছে। দেখুন, সব যোদ্ধাই এদিক-সেদিক পালাচ্ছে। ভীমের ভয়েও পালাচ্ছে। সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ঘটোৎকচ—এরা সকলেই আমার সৈন্য সংহার করছে। আপনি ছাড়া এদের সাহায্য করার আর কেউ নেই। আপনি এই আক্রান্তদের রক্ষা করুন।'

আপনার পুত্রের কথা শুনে ভীষ্ম মনে মনে ভেবে কিছু স্থির করলেন, তারপর তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন— 'দুর্যোধন ! আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে প্রতিদিন দশ হাজার মহাবলী ক্ষত্রিয় বধ করে তবে ফিরব। আজ পর্যন্ত আমি তা পালন করেছি। আজও আমি তা পূর্ণ করব। আজ হয় আমি মৃত্যু বরণ করে রণভূমিতে শয়ন করব, নাহলে পাণ্ডবদের পরাস্ত করব।'

ভীষ্ম এই কথা বলে পাণ্ডব সেনার কাছে পৌঁছে বাণের দ্বারা ক্ষত্রিয়দের বধ করতে লাগলেন। পাণ্ডবরা তাঁকে প্রতিহত করতেই ব্যস্ত থাকলেন, ভীষ্ম তাঁর অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়ে বহু সৈন্য সংহার করলেন। মোট দশ হাজার হাতি, দশ হাজার অশ্বারোহী এবং দুলাখ পদাতিক সৈন্য বিনাশ করে তিনি ধূম্রহীন অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান ছিলেন। পাণ্ডবরা তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছিল না।

পিতামহের সেই পরাক্রম দেখে অর্জুন শিখণ্ডীকে বললেন—'তুমি এবার ভীষ্মের সম্মুখীন হও, তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ; আমি সঙ্গে আছি, তাঁকে বাণে বিদ্ধ করে নীচে ফেলে দেব।' অর্জুনের কথায় শিখণ্ডী ভীষ্মের ওপর আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অভিমন্যুও আক্রমণ করলেন। তারপর বিরাট, দ্রুপদ, কুন্তীভোজ, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির এবং তাঁর সমস্ত সৈন্য ভীষ্মকে আক্রমণ করল। আপনার সৈন্যরাও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগোলেন। যার যেমন শক্তি, সে সেই অনুসারে প্রতিপক্ষ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হল। চিত্রসেন চেকিতানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃতবর্মা প্রতিহত করলেন, ভীমসেনকে ভূরিশ্রবা আটকালেন। বিকর্ণ নকুলের বিরুদ্ধে লড়লেন। সহদেবকে কৃপাচার্য প্রতিরোধ করলেন। এইভাবে ঘটোৎকচকে দুর্মুখ, সাত্যকিকে দুর্যোধন, অভিমন্যুকে সুদক্ষিণ, দ্রুপদকে অশ্বত্থামা, যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্য এবং শিখণ্ডী ও অর্জুনকে দুঃশাসন আটকালেন। এছাড়া আপনার অন্য যোদ্ধাগণও পাণ্ডব মহারথীদের ভীষ্মের কাছে এগোতে বাধা দিলেন।

এঁদের মধ্যে শুধু মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নই তাঁর বিপক্ষীয়কে পরাস্ত করে এগোলেন এবং চিৎকার করে সৈনিকদের বলতে লাগলেন—'বীরগণ ! তোমরা কী দেখছ ? পাণ্ডু-নন্দন অর্জুন ভীষ্মকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন, তোমরাও ওঁর সঙ্গে অগ্রসর হও। ভয় পেয়ো না, ভীষ্ম তোমাদের কিছুই করতে পারবেন না। ইন্দ্রও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠেন না, সেখানে ভীষ্মের আর কী কথা ?'

সেনাপতির কথা শুনে পাণ্ডব মহারথীগণ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভীষ্মের রথের দিকে এগোলেন। তাই দেখে দুঃশাসন নিজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পিতামহকে রক্ষা করার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তিনি তিন বাণে অর্জুনকে আঘাত করে শ্রীকৃষ্ণের ওপর কুড়িটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন দুঃশাসনের ওপর শত বাণ চালালেন, সেই বাণ তাঁর বর্মভেদ করে শরীরে বিঁধে গেল। দুঃশাসন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের কপাল লক্ষ্য করে বাণ মারলেন। অর্জুন তাঁর ধনুক কেটে দিয়ে তিন বাণে রথ ভেঙে দিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। দুঃশাসন অপর একটি ধনুক নিয়ে পঁচিশ বাণে অর্জুনের হাত ও বুকে আঘাত করলেন। অর্জুন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর বাণ দ্বারা দুঃশাসনকে আঘাত করতে লাগলেন। দুঃশাসন সেই সময় অদ্ভুত পরাক্রম দেখালেন। অর্জুনের বাণ তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই তিনি তা কেটে ফেলতে লাগলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুনকেও আহত করে দিলেন। তখন অর্জুন বাণগুলির শক্তি আরও তীক্ষ্ণ করে চালাতে লাগলেন। সেই বাণ দুঃশাসনের শরীরে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে ভীষ্মের রথের পিছনে লুকিয়ে পড়লেন। দুঃশাসন যখন অর্জুনরূপ মহা সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলেন, তখন ভীষ্মরূপ দ্বীপ তাঁকে আশ্রয় প্রদান করল।

—o—

দশম দিনের যুদ্ধের বৃত্তান্ত

সঞ্জয় বললেন—সাত্যকিকে ভীষ্মের দিকে যেতে দেখে অলম্বুষ রাক্ষস তাঁর গতিরোধ করলেন। সাত্যকি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নটি বাণ মারলেন। রাক্ষসও ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে নয়টি বাণের দ্বারা আহত করল। তখন সাত্যকির ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি রাক্ষসের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। রাক্ষসও সিংহনাদ করে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। রাজা ভগদত্তও তাঁর ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যকি তখন রাক্ষস অলম্বুষকে ছেড়ে ভগদত্তের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভগদত্ত সাত্যকির ধনুক কেটে দিলেন, সাত্যকি তখনই অন্য ধনুক নিয়ে তাঁকে আঘাত করতে থাকলেন। ভগদত্ত তাই দেখে এক ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করলেন, সাত্যকি বাণের আঘাতে তাকে টুকরো করে দিলেন।

মহারথী রাজা বিরাট এবং দ্রুপদ এর মধ্যে কৌরব সৈনিকদের পিছু হটিয়ে দিয়ে ভীষ্মের ওপর আক্রমণ হানলেন। অশ্বত্থামা এগিয়ে এসে তাঁদের দুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বিরাট ও দ্রুপদ এক যোগে দ্রোণকুমারকে আক্রমণ করলেন। অশ্বত্থামাও দুজনের ওপর বহু বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু দুই বয়োবৃদ্ধ অদ্ভুত পরাক্রম দেখালেন। অশ্বত্থামার ভয়ংকর বাণগুলি এঁরা প্রতিহত করতে লাগলেন। অন্যদিকে সহদেবের সঙ্গে কৃপাচার্য যুদ্ধে রত হয়েছিলেন। তিনি সহদেবকে সত্তরটি বাণ মারলেন। সহদেব তাঁর ধনুক কেটে তাঁকে নয় বাণে আঘাত করলেন। কৃপাচার্য অন্য ধনুক নিয়ে সহদেবের বুকে বাণদ্বারা আঘাত করলেন, সহদেবও তাঁকে আঘাত করলেন। এইভাবে দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল।

দ্রোণাচার্য তারপরে তাঁর মহাধনুক নিয়ে পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে ঢুকে তাঁদের সন্ত্রস্ত করতে লাগলেন। তিনি কিছু অশুভ লক্ষণ দেখে পুত্রকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আজ সেইদিন, যেদিন অর্জুন সমস্ত শক্তি দিয়ে ভীষ্মকে বধ করার চেষ্টা করবে ; কারণ আজ আমার বাণ উঠে পড়ছে, ধনুক হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, আমার মনে ক্রূরকর্ম করার ইচ্ছা জাগছে। চাঁদ ও সূর্যের চারিদিকে বলয় দেখা যাচ্ছে। এগুলি ক্ষত্রিয়দের ভয়ংকর বিনাশের সূচনাদায়ক। এতদ্ব্যতীত দুপক্ষ সেনার মধ্যেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং গাণ্ডীব ধনুকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাতে আমার মনে হচ্ছে অর্জুন আজ অবশ্যই সমস্ত যোদ্ধাকে পিছনে ফেলে ভীষ্মের কাছে পৌঁছে যাবে। ভীষ্ম ও অর্জুনের সংগ্রামের কথা ভাবলেই আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে এবং উৎসাহ কমে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অর্জুন ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগোচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্ম ও অর্জুনের সংগ্রাম এবং আমার অস্ত্র ত্যাগের উদ্যোগ—এই তিনটি ব্যাপারই প্রজাদের পক্ষে অমঙ্গলের সূচনাদায়ক। অর্জুন মনস্বী, বলবান, শূর, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধে পারঙ্গম, বহুদূর পর্যন্ত সঠিক নিশানাকারী এবং শুভাশুভ নিমিত্ত সম্বন্ধে বিজ্ঞ। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও এঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন না। পুত্র ! তুমি অর্জুনের রাস্তা ছেড়ে শীঘ্র ভীষ্মকে রক্ষার জন্য যাও। অর্জুনের তীক্ষ্ণবাণে রাজাদের বর্ম ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। ধ্বজা, পতাকা, অস্ত্রশস্ত্র টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। আমরা ভীষ্মের আশ্রয়ে থেকে জীবিকা নির্বাহ করি, তাঁর সংকট উপস্থিত, সুতরাং তুমি বিজয় ও যশ প্রাপ্তির জন্য যাও। ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপ এবং সদাচার প্রভৃতি গুণ শুধু যুধিষ্ঠিরের মধ্যেই দেখা যায় ; তাই তো তাঁর ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের মতো ভ্রাতা লাভ হয়েছে। ভগবান বাসুদেব তাঁর সহায়তায় এঁদের সনাথ করেছেন। দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের ওপর যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে, তা সমস্ত প্রজাকে দগ্ধ করে দিচ্ছে। দেখো, শ্রীকৃষ্ণের শরণে থাকা অর্জুন কৌরব সেনাদের মাঝখান দিয়ে এদিকেই আসছে। আমি যুধিষ্ঠিরের সামনে যাচ্ছি, যদিও তাঁর ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করা সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করার মতোই কঠিন ; কারণ তাঁর চারদিকে অতিরথী যোদ্ধাগণ দণ্ডায়মান। সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন এবং নকুল-সহদেব তাঁকে রক্ষা করছেন। ওই দেখো, অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জুনের ন্যায় সেনাদের অগ্রবর্তী হয়ে চলেছে। তুমি উত্তম অস্ত্র নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাও। কে না চায় তার প্রিয় সন্তান জীবিত থাকুক, তা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণে রেখে তোমাকে আমি পৃথক স্থানে পাঠাচ্ছি।'

সঞ্জয় বললেন—তখন ভগদত্ত, কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা, বিন্দ, অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, দুর্মর্ষণ এবং বিকর্ণ—এই দশজন যোদ্ধা ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ

করছিলেন। ভীমসেনের ওপর শল্য নয়, কৃতবর্মা তিন, কৃপাচার্য নয় এবং চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত দশটি করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। ভীমসেন এইসব মহারথীদের পৃথক ভাবে তাঁর বাণের দ্বারা ঘায়েল করলেন। তিনি শল্যকে সাত, কৃতবর্মাকে আটটি বাণ মেরে কৃপাচার্যের ধনুক দ্বিখণ্ডিত করলেন ; তারপর তাঁকে সাত বাণে আঘাত করলেন। তারপর বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিনটি করে, দুর্মর্ষণকে কুড়ি, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ এবং জয়দ্রথকে পাঁচ বাণ মারলেন। কৃপাচার্য অন্য একটি ধনুক দিয়ে ভীমসেনকে দশটি বাণ মারলেন। তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বহু বাণবর্ষণ করলেন। তারপর জয়দ্রথের সারথি ও ঘোড়াগুলিকে যমালয়ে পাঠালেন, দুই বাণে তার ধনুক কেটে ফেললেন। তখন তিনি রথ থেকে নেমে চিত্রসেনের রথে গিয়ে উঠলেন।

মহারথী ভগদত্ত তখন ভীমসেনের ওপর এক শক্তি প্রয়োগ করলেন, জয়দ্রথ পট্টিশ ও তোমর চালালেন, কৃপাচার্য শতঘ্নী প্রয়োগ করলেন এবং শল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। এছাড়া অন্য ধনুর্ধারী বীররাও তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন ভীম এক বাণে তোমর টুকরো টুকরো করে দিলেন, তিন বাণে পট্টিশকে টুকরো করে দিলেন,নয় বাণে শতঘ্নী কেটে ফেললেন, শল্যের বাণ এবং ভগদত্তের শক্তিও প্রতিহত করলেন। অন্য যোদ্ধাদের বাণও কেটে ফেললেন। সকলকে তিনটি করে বাণে ঘায়েল করলেন। এরমধ্যে অর্জুন এসে সেইখানে পৌঁছলেন। ভীম ও অর্জুনকে একত্রে দেখে আপনার যোদ্ধারা বিজয়ের আশা ত্যাগ করল। তখন দুর্যোধন সুশর্মাকে বললেন—'তুমি তোমার সেনা নিয়ে গিয়ে শীঘ্রই ভীম ও অর্জুনকে বধ করো।' তাই শুনে সুশর্মা হাজার হাজার রথী নিয়ে ভীম ও অর্জুনকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। তাই দেখে অর্জুন প্রথমে শল্যকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন, এবং সুশর্মা এবং কৃপাচার্যকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তারপর ভগদত্ত, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্মা, দুর্মর্ষণ, বিন্দ এবং অনুবিন্দ—এই মহারথীদের প্রত্যেককে পাঁচটি করে বাণ মারলেন। জয়দ্রথ চিত্রসেনের রথে অবস্থিত ছিলেন, তিনি অর্জুন এবং ভীমকে তাঁর বাণ দিয়ে আঘাত করলেন। শল্য এবং কৃপাচার্যও অর্জুনকে মর্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং চিত্রসেন প্রমুখ কৌরবরাও দুই পাণ্ডবকে পাঁচটি করে বাণে আঘাত করলেন। আহত হয়েও এই দুই পাণ্ডব ত্রিগর্তের সেনা সংহার করতে লাগলেন। সুশর্মা তখন নয় বাণে অর্জুনকে আহত করে অত্যন্ত জোরে সিংহনাদ করে উঠলেন। তাঁর সৈন্যদলের অন্যান্য রথীরাও এই দুই ভাইকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন ভীম ও অর্জুন শত শত বাণের আঘাতে শত্রুপক্ষের সৈন্যের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বাণে যোদ্ধাদের গতি রুদ্ধ করে মেরে ফেলতেন। তাঁর এই পরাক্রম অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। যদিও কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, বিন্দ ও অনুবিন্দ এঁরা সাহসের সঙ্গে ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তা সত্ত্বেও ভীম ও অর্জুনের ভয়ে কৌরবসেনারা পালাতে আরম্ভ করেছিল। তখন কৌরবসেনার রাজারা অর্জুনের ওপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু সে সবই অর্জুন নিজ বাণের দ্বারা প্রতিরোধ করে তাঁদের মৃত্যুমুখে পাঠালেন।

——o——

পিতামহ ভীষ্ম বধ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! শান্তনুকুমার ভীষ্ম এবং কৌরবরা পাণ্ডবদের সঙ্গে দশম দিনে কেমন যুদ্ধ করলেন, সেই মহাযুদ্ধের বিবরণ আমাকে বল।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! কৌরবদের সঙ্গে যখন ভীষ্ম ও পাঞ্চাল বীররা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন কেউই সঠিকভাবে বলতে পারছিলেন না যে এঁদের মধ্যে কে জিতবেন । সেই দশম দিনে বহু সৈন্য সংহার হয়েছিল। ভীষ্ম সেই সংগ্রামে হাজার হাজার বীরকে বধ করেছিলেন। ধর্মাত্মা ভীষ্ম দশদিন ধরে পাণ্ডবসেনাদের সন্তপ্ত করে এবার জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেলেন। তিনি যুদ্ধকালে প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় চিন্তা করলেন যে, 'এবার আর বেশি সৈন্য বধ করব না' এবং কাছে দাঁড়ানো যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আমি এই জীবনে বিতৃষ্ণ হয়েছি। এই সংগ্রামে বহুপ্রাণী সংহার করতে করতে সময় পার হয়ে গেছে। অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কাজ করতে চাও, তাহলে অর্জুন ও পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়বীরদের

নিয়ে আমাকে বধ করার চেষ্টা করো।'

ভীষ্মের ইচ্ছা বুঝে সত্যদর্শী যুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়বীরদের নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন এবং সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'এগিয়ে চলো, যুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আজ শত্রুদের পরাস্তকারী বীর অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ভীষ্মকে পরাস্ত করো। মহাধনুর্ধর সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেন অবশ্যই তোমাদের রক্ষা করবেন। হে সৃঞ্জয়-বীরগণ! আজ তোমরা ভীষ্মকে ভয় পেয়ো না, আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অবশ্যই তাঁকে পরাজিত করব।'

তখন সব যোদ্ধা যুদ্ধের আগ্রহে রণক্ষেত্রে এগিয়ে চলল এবং শিখণ্ডীও অর্জুনকে সামনে রেখে ভীষ্মকে ধরাশায়ী করার পূর্ণ প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। এদিকে আপনার পুত্রের নির্দেশে দেশ-দেশান্তরের রাজা, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা এবং নিজের সব ভ্রাতাদের সঙ্গে দুঃশাসন বহু সৈন্য নিয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। ভীষ্মকে সামনে রেখে এইভাবে আপনার অনেক বীর শিখণ্ডী ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। চেদি এবং পাঞ্চালবীরদের সঙ্গে অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন। এইভাবে সাত্যকি অশ্বত্থামার সঙ্গে, ধৃষ্টকেতু পৌরবের সঙ্গে, অভিমন্যু দুর্যোধন ও তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে, সেনাসহ বিরাট জয়দ্রথের সঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজা শল্যর সঙ্গে এবং ভীমসেন আপনার গজারোহী সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে রত হলেন। আপনার পুত্র এবং বহু রাজা অর্জুন ও শিখণ্ডীকে বধ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই ভয়ানক সংগ্রামে দুপক্ষের সৈন্যদের পদভারে পৃথিবী কাঁপতে লাগল এবং সবদিকে ভয়ানক আওয়াজ হতে লাগল। রথী, রথীদের সঙ্গে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সঙ্গে, গজারোহী গজারোহীর সঙ্গে, পদাতিক পদাতিকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। দুপক্ষই বিজয় পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল, তাই দুপক্ষই একে অপরকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য চেষ্টা করছিল।

রাজন্! মহাপরাক্রমী অভিমন্যু সেনাসহ আপনার পুত্র দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর বুকে নটি বাণ মারলেন। অভিমন্যু অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি এক ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করলেন। শক্তিটি আসতে দেখে আপনার পুত্র এক শক্তিশালী বাণে সেটি দুটুকরো করে দিলেন। তাই দেখে অভিমন্যু তাঁর বুক এবং হাত লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দুর্যোধন ও অভিমন্যু অত্যন্ত ভয়ংকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সব রাজারা তা দেখে তাঁদের বাহবা দিতে লাগলেন।

অশ্বত্থামা সাত্যকিকে নয়টি বাণ নিক্ষেপ করে আবার ত্রিশটি বাণে তাঁর বুক ও হাতে আঘাত করলেন। বাণবিদ্ধ হয়ে যশস্বী সাত্যকি অশ্বত্থামাকে তিনটি বাণ মারলেন। মহারথী পৌরব ধনুর্ধর ধৃষ্টকেতুকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং ধৃষ্টকেতু ত্রিশটি তীক্ষ্ণ বাণে পৌরবকে বিদ্ধ করলেন। তারপর দুজনই দুজনের ধনুক কেটে ফেললেন এবং একে অপরের ঘোড়াদের বধ করে দুজনেই রথহীন হয়ে তলোয়ার নিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুজনে গণ্ডারের চামড়ার ঢাল এবং তলোয়ার হাতে নিয়ে একে অপরকে আহ্বান করে সিংহনাদ করতে লাগলেন। পৌরব রোষান্বিত হয়ে ধৃষ্টকেতুর কপালে আঘাত করলেন এবং ধৃষ্টকেতুও তাঁর তীক্ষ্ণ তলোয়ার দিয়ে পৌরবের গলায় আঘাত করলেন। একে অপরের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সেইসময় আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব ধৃষ্টকেতুকে রথে তুলে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন।

অন্যদিকে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক কেটে তাঁকে পঞ্চাশ বাণে বিদ্ধ করলেন। শত্রুদমন ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনুক নিয়ে বাণের প্লাবন বইয়ে দিলেন। মহারথী দ্রোণ তাঁর বাণের দ্বারা সেগুলি কেটে ফেলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচটি বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে অধীর হয়ে তাঁর ওপর এক গদা নিক্ষেপ করলেন, দ্রোণাচার্য পঞ্চাশ বাণ মেরে তাকে মধ্যপথেই আটকে দিলেন। তাই দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন একটি শক্তি ছুঁড়লেন, দ্রোণাচার্য সেটি নয়বাণে কেটে ফেললেন। এইভাবে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল।

আর একদিকে অর্জুন ভীষ্মের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করতে লাগলেন। রাজা ভগদত্ত তখন তাঁর শিক্ষিত হাতিতে আরোহণ করে তাঁর সামনে এলেন। তিনি বাণবর্ষণ করে অর্জুনের গতিরোধ করলেন। অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণবাণে ভগদত্তের হাতিকে ঘায়েল করে শিখণ্ডীকে বললেন—'এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো ; ভীষ্মের কাছে পৌঁছে তাঁকে শেষ করে দাও।' তিনি শিখণ্ডীকে আগে নিয়ে সবেগে ভীষ্মের দিকে এগিয়ে চললেন। দুপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। আপনার যোদ্ধারা অত্যন্ত কোলাহল করে অর্জুনের দিকে ধাবিত হতে লাগল। কিন্তু অর্জুন তাদের চোখের পলকে শেষ করে দিলেন। শিখণ্ডী শীঘ্রই ভীষ্মের

সামনে এলেন এবং উৎসাহের সঙ্গে তাঁর প্রতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীষ্মও নানা দিব্য অস্ত্রদ্বারা বহু শত্রুবধ করতে লাগলেন। অর্জুনের মতো তিনিও বহু সোমক বীর বধ করলেন এবং পাণ্ডবদের অগ্রগতি রোধ করলেন। বহু রথ, হাতি ও ঘোড়ার আরোহীর মৃত্যু হল। ভীষ্মের একটি বাণও বৃথা যাচ্ছিল না। তাঁর আঘাতে চেদি, কাশী, করূষ দেশের চৌদ্দ হাজার বীর তাদের হাতি, ঘোড়া এবং রথসহ ধরাশায়ী হল। সোমকদের মধ্যে এমন একজনও মহারথী ছিলেন না যিনি ভীষ্মের সম্মুখীন হতে পারেন। তাই তাঁর সামনে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস কারোই হল না। শুধু বীরাগ্রগণ্য অর্জুন এবং অতুলনীয় তেজস্বী শিখণ্ডীই তাঁর সামনে দাঁড়াতে সাহস রাখলেন।

শিখণ্ডী ভীষ্মের সামনে এসে তাঁকে দশটি বাণ মেরে বুকে আঘাত করলেন। কিন্তু ভীষ্ম নারী বিবেচনা করে, তাঁর ওপর প্রত্যাঘাত করলেন না। কিন্তু শিখণ্ডী তা বুঝলেন না। অর্জুন তাঁকে বললেন—'বীর ! শীঘ্র এগিয়ে গিয়ে ভীষ্মকে বধ করো। তুমি মহারথী ভীষ্মকে শীঘ্র হত্যা করো। আমি সত্যই বলছি, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদলে এমন কোনো বীর নেই যে ভীষ্মের সম্মুখীন হতে সাহস করে।' অর্জুনের কথায় শিখণ্ডী তৎক্ষণাৎ নানাপ্রকার তীর দিয়ে ভীষ্মকে বিদ্ধ করলেন। ভীষ্ম সেই বাণ গ্রাহ্য না করে অর্জুনকে নিজ বাণের দ্বারা প্রতিহত করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি বাণের আঘাতে বহু পাণ্ডব সৈন্যকে পরলোকে পাঠালেন। পাণ্ডবরাও অপর দিক থেকে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

এইসময় আপনার পুত্র দুঃশাসনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল। তিনি একদিকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, অন্যদিকে পিতামহকে রক্ষা করছিলেন। এই সংগ্রামে তিনি বহু রথীকে রথহীন করে দিলেন এবং অনেক অশ্বারোহী, গজারোহী তাঁর তীক্ষ্ণবাণের আঘাতে ধরাশায়ী হল। শুধু তাই নয়, বহু হাতিও তাঁর আঘাতে পালাতে লাগল। সেই সময় দুঃশাসনের সামনে যেতে বা তাঁকে পরাস্ত করতে কোনো মহারথীই সাহস পেলেন না। শুধু অর্জুনই তাঁর সামনে আসতে সাহস করলেন। তিনি তাঁকে পরাস্ত করে তারপর ভীষ্মের ওপর আক্রমণ করলেন। শিখণ্ডী তাঁর বজ্রতুল্য বাণের দ্বারা ভীষ্মকে আক্রমণ করেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে পিতামহের কোনো কষ্টই মনে হচ্ছিল না। তিনি হাসিমুখে তা সহ্য করছিলেন। তখন আপনার পুত্র তাঁর সমস্ত যোদ্ধাদের ডেকে বললেন—'বীরগণ ! তোমরা চারদিক দিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করো। ভয় পেয়ো না, ভীষ্ম তোমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। সমস্ত দেবতা যদি একত্রে আসেন তবুও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবেন না, পাণ্ডবদের আর কী কথা ! সুতরাং অর্জুনকে আসতে দেখলে পিছু হটবে না, আমি নিজেও তার সম্মুখীন হবো। তোমরাও সাধ্যমতো আমার সহায়তা করো।'

আপনার পুত্রের সাহসের কথা শুনে সব যোদ্ধা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার মধ্যে বিদেহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, মালব, অবীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ এবং কেকয় দেশের রাজারা ছিলেন। তাঁরা সকলে একসঙ্গে অর্জুনের ওপর আক্রমণ করলেন। অর্জুন দিব্যবাণ স্মরণ করে ধনুকে সেই শরসন্ধান করলেন এবং অগ্নি যেমন পতঙ্গকে ভস্ম করে তেমনই সেই শর রাজাদের ভস্ম করতে লাগল। মহারাজ ! তখন অর্জুনের বাণে আহত হয়ে রথের সঙ্গে রথী, আরোহীসহ ঘোড়া ও হাতি সমূহের পতন হতে লাগল। সমস্ত পৃথিবী বাণে ছেয়ে গেল। আপনার সেনারা পালাতে লাগল। সৈন্যদের হটিয়ে দিয়ে অর্জুন দুঃশাসনের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন, তাঁর বাণ দুঃশাসনের গায়ে লেগে মাটিতে গিয়ে পড়ল। অর্জুন তাঁর ঘোড়া ও সারথিকে বধ করলেন। তারপর কুড়ি বাণে বিবিংশতির রথ ভেঙে দিলেন এবং পাঁচ বাণে তাঁকে আহত করলেন। তারপর কৃপাচার্য, বিকর্ণ এবং শল্যকে আঘাত করে তাঁদের রথহীন করলেন। সব মহারথী পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই অর্জুন এইসব যোদ্ধাদের পরাজিত করে ধূম্রহীন অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে বিরাজ করছিলেন। বাণবর্ষণ করে মহারথীদের হটিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব-কৌরবদের মধ্যে রক্তের নদী প্রবাহিত করলেন। ভীষ্ম তখন তাঁর দিব্য অস্ত্র নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তাই দেখে শিখণ্ডী তাঁকে আক্রমণ করলেন। শিখণ্ডীকে দেখেই ভীষ্ম তাঁর অগ্নির ন্যায় অস্ত্র সংবরণ করলেন। অর্জুন তখন পিতামহকে মূর্ছিত করে আপনার সেনা সংহার করতে লাগলেন।

তারপর শল্য, কৃপাচার্য, চিত্রসেন, দুঃশাসন এবং বিকর্ণ দেদীপ্যমান রথে করে পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন এবং তাঁদের সেনাদের বধ করতে লাগলেন। এই মহারথীদের হাতে আহত হয়ে সৈন্যসকল চারিদিকে

পালাতে লাগল। পিতামহ ভীষ্মও চেতনা ফিরে পেয়ে পাণ্ডবদের মর্মস্থলে আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুনও আপনার সেনার বহু হাতি ধরাশায়ী করলেন। তাঁর বাণের আঘাতে হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। সেই বীরবিনাশক যুদ্ধে অর্জুন ও ভীম উভয়েই তাঁদের পরাক্রম দেখাচ্ছিলেন। এর মধ্যে পাণ্ডবসেনাপতি মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে এসে তাঁর সৈনিকদের বললেন—'হে সোমকগণ ! তোমরা সৃঞ্জয়দের সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করো।' সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে সোমক এবং সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বাণবর্ষায় পীড়িত হয়েও ভীষ্মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাজন্ ! আপনার পিতা তাঁদের আঘাতে পীড়িত হয়েও সৃঞ্জয়দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। পূর্বে পরশুরাম তাঁকে যে শত্রুসংহারিণী অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, তা ব্যবহার করে ভীষ্ম শত্রুসংহার শুরু করলেন। তিনি প্রত্যহ পাণ্ডবদের দশ হাজার যোদ্ধা সংহার করতেন। এই দশম দিনেও তিনি একাই মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশের অসংখ্য হাতি ঘোড়া বধ করেন এবং তাদের সঙ্গে মহারথীদেরও যমালয়ে পাঠান। তারপর তিনি পাঁচ হাজার রথীকে সংহার করেন। তারপর চৌদ্দ হাজার পদাতিক, এক হাজার হাতি এবং দশ হাজার ঘোড়া বধ করেন। এইভাবে সমস্ত রাজাদের সৈন্য সংহার করে ভীষ্ম বিরাটের ভ্রাতা শতানীককে বধ করেন। এরপর আরও এক হাজার রাজাকে মৃত্যু গ্রাস করে। পাণ্ডবসেনার যে সব বীর অর্জুনের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরা ভীষ্মের সম্মুখীন হতেই যমলোকের অতিথি হয়ে গেলেন। ভীষ্ম এইভাবে পরাক্রম দেখিয়ে ধনুক হাতে উভয় সেনার মধ্যে দাঁড়ালেন। তখন কোনো রাজাই আর তাঁর দিকে তাকাতে সাহস করলেন না।

ভীষ্মের সেই পরাক্রম দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে বললেন—'অর্জুন ! দেখো, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুপক্ষের সেনার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ; এবার তুমি তাঁকে বধ করো, তাহলেই তোমার জয় হবে। ইনি যেখানে সৈন্য সংহার করছেন, সেখানে গিয়ে তুমি তাঁর গতিরোধ করো। তুমি ছাড়া এমন কোনো বীর নেই, যিনি ভীষ্মের আঘাত সহ্য করতে সক্ষম।' ভগবানের প্রেরণায় অর্জুন তখন এমন বাণবর্ষণ করলেন যে ভীষ্ম রথ, ধ্বজা এবং ঘোড়াসহ তাতে আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন। কিন্তু পিতামহ বাণবর্ষণ করে সব বাণই টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন শিখণ্ডী তাঁর উত্তম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অত্যন্ত বেগে ভীষ্মের দিকে গেলেন, সেই সময় অর্জুন তাঁকে রক্ষা করছিলেন। ভীষ্মের পিছনে যত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের সকলকে মেরে অর্জুন ভীষ্মকে আক্রমণ চালালেন। তাঁর সঙ্গে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রও ছিলেন। এঁরা সকলেই একসঙ্গে ভীষ্মের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাতে একটুও ভয় পেলেন না। তিনি যোদ্ধাদের বাণগুলি খণ্ডন করে পাণ্ডব সেনার মধ্যে প্রবেশ করে যেন খেলাচ্ছলে তাদের অস্ত্রশস্ত্র বিনাশ করতে লাগলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর নারীভাব স্মরণ করে, হেসে তাকে এড়িয়ে যেতেন, তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতেন না। তিনি যখন দ্রুপদ সেনার সাত মহারথীকে বধ করলেন, তখন রণভূমিতে মহাকোলাহল শুরু হল। ঠিক তখনই অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মের নিকট পৌঁছলেন।

শিখণ্ডীকে সামনে রেখে সকল পাণ্ডব ভীষ্মকে চারদিক দিয়ে ঘিরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শতঘ্নী, পরিঘ, ফরসা, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, বাণ, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত এবং ভূশুণ্ডী ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। সেই সময় ভীষ্ম ছিলেন একা এবং তাঁকে আঘাতকারী ছিলেন সংখ্যায় অনেক। ভীষ্মের বর্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাঁর মর্মস্থানে গভীর চোট লাগে, তা সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হলেন না। তিনি মুহূর্তের মধ্যে সেনাপংক্তি ভেঙে একবার বাইরে আসেন, পুনরায় সেনা মধ্যে প্রবেশ করেন। দ্রুপদ এবং ধৃষ্টকেতুকে কোনোরকম ভয় না পেয়ে তিনি পাণ্ডবসেনার মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীমসেন, সাত্যকি, অর্জুন, দ্রুপদ, বিরাট এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই ছয়জন মহারথীকে আঘাত করতে থাকেন। এই মহারথীরাও তাঁর বাণ নিবারণ করে দশ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। মহারথী শিখণ্ডী তাঁকে প্রবলভাবে আক্রমণ করলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাতে কোনো কষ্ট অনুভব করলেন না। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। কৌরবরা তাঁর ধনুক কেটে ফেলা সহ্য করতে পারলেন না। তখন আচার্য দ্রোণ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য এবং ভগদত্ত—এই সাত বীর ক্রোধে অধীর হয়ে ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করলেন এবং দিব্য অস্ত্র কৌশলে তাঁকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। সেই সময় রথের চারপাশে—'মারো, এখানে আনো, ধরো, টুকরো টুকরো করে দাও' —এইসব কথা শোনা যাচ্ছিল।

সেই কলরব শুনে পাণ্ডব মহারথীগণও অর্জুনের রক্ষার্থে এলেন। সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, ঘটোৎকচ এবং অভিমন্যু—এই সাতজন বীর তাঁদের ধনুক নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরবদের সামনে উপস্থিত হলেন। দুদলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। যেন দেবতা ও দানবের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। ভীষ্মের ধনুক দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় শিখণ্ডী তাঁকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন, অন্য দশ বাণে তাঁর সারথিকে বধ করলেন এবং রথের ধ্বজা কেটে ফেললেন। ভীষ্ম অন্য একটি ধনুক নিলে অর্জুন সেটিও দুটুকরো করে দিলেন। এইভাবে ভীষ্ম যতগুলি ধনুক নিলেন, অর্জুন সবগুলিই কেটে ফেললেন। বারংবার ধনুক কেটে যাওয়ায় ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং পর্বত বিদীর্ণকারী এক শক্তি অর্জুনের রথের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাই দেখে অর্জুন পাঁচ বাণে সেটি টুকরো টুকরো করে দিলেন।

এই শক্তিকে কেটে যেতে দেখে ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি রক্ষা না করতেন, তাহলে আমি একটি ধনুকেই সমস্ত পাণ্ডবদের বধ করতে পারতাম। এখন আমার সামনে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করার দুটি কারণ—প্রথমত, এরা পাণ্ডুর পুত্র হওয়ায় আমার পক্ষে অবধ্য ; দ্বিতীয়ত, আমার সামনে শিখণ্ডী উপস্থিত, যে প্রথমে এক নারী ছিল। আমার পিতা যখন মাতা সত্যবতীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দুটি বর দিয়েছিলেন যে, 'যখন তোমার ইচ্ছা হবে, তোমার তখনই মৃত্যু হবে। যুদ্ধে তোমাকে কেউ বধ করতে পারবে না।' এখন আমি স্বচ্ছন্দে মৃত্যু স্বীকার করে নিতে পারি, কারণ এখনই সঠিক সময় উপস্থিত হয়েছে।

ভীষ্মের সিদ্ধান্ত আকাশে অবস্থিত ঋষিগণ ও বসুদেবগণ জেনে গেলেন। তাঁরা ভীষ্মকে সম্বোধন করে বললেন—'বৎস ! তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। তাহলে তাই করো, যুদ্ধ থেকে চিত্ত বৃত্তি সরিয়ে নাও।' তাঁদের কথা শেষ হতেই মৃদু-মন্দ-শীতল বায়ু প্রবাহিত হল, দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল এবং ভীষ্মের ওপর পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল। ঋষিদের এই কথা অন্য কেউ শুনতে পেলেন না, শুধু ভীষ্ম শুনতে পেলেন এবং ব্যাসদেবের কৃপায় আমি শুনতে পেয়েছি। বসুদের কথা শুনে পিতামহ তাঁর ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ হলেও অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন না। শিখণ্ডী সেই সময় ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের ওপর নয়টি বাণ নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু ভীষ্ম একটুও বিচলিত হলেন না। তখন অর্জুন হেসে তাঁকে প্রথমে পঁচিশটি বাণ মারলেন তারপর ক্ষিপ্রতাসহ তাঁর সারা অঙ্গে এবং মর্মস্থানে একশত বাণ নিক্ষেপ করলেন। অন্য রাজারাও ভীষ্মের ওপর সহস্র সহস্র বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। ভীষ্মও তাঁর বাণের দ্বারা রাজাদের অস্ত্র নিবারণ করে তাঁদের বিদ্ধ করতে লাগলেন। তারপর অর্জুন পুনরায় ভীষ্মের ধনুক কেটে তাঁর রথের ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং দশবাণে তাঁর সারথিকে আহত করলেন। ভীষ্ম অন্য ধনুক তুলে নিলে অর্জুন সেটিও কেটে দিলেন। যতবার তিনি ধনুক তুলে ধরেন, অর্জুন ততবারই সেই ধনুক কেটে ফেলেন। এইভাবে অনেক ধনুক কেটে ফেলায় ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। তখন অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে পিতামহকে পুনরায় পঁচিশটি বাণ মারলেন। এতে আহত হয়ে পিতামহ দুঃশাসনকে বললেন—'দেখো, মহারথী অর্জুন আজ ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করেছে। বাণগুলি বর্ম ভেদ করে শরীরে ঢুকে গিয়েছে, এগুলি শিখণ্ডীর বাণ নয়। বজ্রের ন্যায় এই বাণ স্পর্শ করতেই দেহে বিদ্যুতের মতো চমক লাগে। ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর এবং বজ্রের ন্যায় দুর্গম্য ও মর্মস্থান বিদীর্ণকারী এই বাণ অর্জুন ব্যতীত আর কারো হতে পারে না।'

এই বলে ভীষ্ম এমনভাবে ক্রোধভরে পাণ্ডবদের দিকে তাকালেন, যেন ভস্ম করে দেবেন, তারপর অর্জুনের ওপর এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন সেটি তিন টুকরো করে দিলেন। ভীষ্ম তখন ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে রথ থেকে নামতে যাচ্ছিলেন, তার মধ্যেই অর্জুন বাণের আঘাতে তাঁর ঢাল শতখণ্ড করে দিলেন। তা দেখে সকলে বিস্মিত হল। অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীষ্মের সারা শরীর বিদ্ধ করলেন। তাঁর শরীরে দু আঙুল পরিমাণও জায়গা ছিল না যেখানে বাণ বিদ্ধ নেই। কৌরবদের চোখের সামনে এইভাবে আপনার পিতা সূর্যাস্তের সময় রথ থেকে পড়ে গেলেন, তাঁর মস্তক পূর্বদিকে ছিল। তাঁকে পড়তে দেখে দেবতা ও রাজারা হাহাকার করে উঠলেন। মহারাজ ! মহাত্মা ভীষ্মের সেই অবস্থা দেখে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ শোনা গেল। তাঁর সারা শরীরেই বাণ বিদ্ধ ছিল, তাই তাঁর দেহ বাণের ওপরেই রইল, মাটি স্পর্শ করল না। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের দেহে দিব্যভাবের

আবেশ হল। পড়ার সময় তিনি দেখলেন সূর্য এখন দক্ষিণায়নে, মৃত্যুর এটি উত্তম সময় নয়। তাই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন না, সজ্ঞানেই শায়িত রইলেন। তখন তিনি আকাশে এক দিব্য বাণী শুনলেন—'মহাত্মা ভীষ্ম তো সমস্ত শাস্ত্রবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তিনি এই দক্ষিণায়নকালে কেন মৃত্যুকে স্বীকার করলেন ?' তা শুনে ভীষ্ম বললেন —'আমি এখনও জীবিত।'

হিমালয়পুত্রী গঙ্গাদেবী যখন জানতে পারলেন যে ভীষ্ম ধরাশায়ী হয়েও উত্তরায়ণের দিকে তাকিয়ে প্রাণরক্ষা করছেন, তখন তিনি মহর্ষিদের হংসরূপে তাঁর কাছে পাঠালেন। তাঁরা শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছে এসে তাঁকে দর্শন ও প্রদক্ষিণ করলেন। পরে তাঁরা বলতে লাগলেন, 'ভীষ্ম তো মহাপুরুষ ! ইনি কেন দক্ষিণায়নে শরীর ত্যাগ করবেন ?' এই বলে তাঁরা প্রস্থানোদ্যত হলে ভীষ্ম বললেন—'হংসগণ ! আমি আপনাদের সত্য বলছি, দক্ষিণায়নে আমি শরীর ত্যাগ করব না। আমি প্রথম থেকেই নিশ্চিত করে রেখেছি যে, উত্তরায়ণ হলে তবেই আমি আমার ধামে যাত্রা করব। পিতার বরে মৃত্যু আমার অধীন ; সুতরাং নির্দিষ্ট সময়মতো প্রাণধারণে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

এই বলে তিনি পূর্ববৎ শরশয্যায় শায়িত রইলেন, হংসগণ প্রস্থান করলেন। কৌরবরা শোকে মূর্ছিতপ্রায় হয়েছিল। কৃপাচার্য এবং দুর্যোধন ভীষণভাবে ক্রন্দন করছিলেন। সকলের মধ্যে বিষাদ ছেয়ে গিয়েছিল, ইন্দ্রিয়াদি জড়বৎ হয়েছিল। কিছুলোক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। যুদ্ধে আর কারো মন ছিল না। কেউ আর পাণ্ডবদের আক্রমণ করতে পারছিল না, কোনো মহাগ্রহ যেন তাদের পা বেঁধে রেখেছিল। সকলেই তখন অনুমান করতে লাগল যে কৌরবদের বিনাশের আর বেশি দেরী নেই।

পাণ্ডবরা জয়ী হয়েছিলেন, তাই তাঁদের পক্ষে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। সৃঞ্জয় ও সোমক আনন্দে উদ্বেলিত হল। ভীমসেন সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। কিছু কৌরব সেনারা অচেতন হয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ ক্রন্দন করছিলেন। কেউ ক্ষত্রিয়ধর্মের নিন্দা করছিলেন, কেউ ভীষ্মের প্রশংসা করছিলেন। ভীষ্ম উপনিষদে বর্ণিত যোগধারণের আশ্রয় নিয়ে প্রণব জপ করতে করতে উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষা করে রইলেন।

—o—

সমস্ত রাজা এবং কর্ণের ভীষ্মের কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করা

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! ভীষ্ম মহাবলী এবং দেবতা-সম ছিলেন, তিনি তাঁর পিতার সত্য রক্ষার্থে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। রণভূমিতে তাঁর পতন হলে আমাদের যোদ্ধাদের কী গতি হবে ? ভীষ্ম যখন ধর্মবশত শিখণ্ডীকে বাণ নিক্ষেপে বিরত থাকা স্থির করলেন, তখনই আমি বুঝে গেছি যে এবার পাণ্ডবদের হাতে কৌরবরা পরাজিত হবে। হায় ! আমার কাছে এর থেকে বেশি দুঃখের আর কী আছে যে আজ আমি পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুর সংবাদ শুনছি। আমার হৃদয় বাস্তবিক বজ্র দিয়ে তৈরি, তাই আজ ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শুনেও তা শতধা বিভক্ত হয়নি। সঞ্জয় ! কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যখন পতিত হলেন, তারপর তিনি কী করলেন বলো।

সঞ্জয় বললেন—সন্ধ্যার সময় যখন ভীষ্ম ধরাশায়ী হলেন, তখন কৌরবরা অত্যন্ত দুঃখ পেল আর পাঞ্চাল দেশের যোদ্ধারা আনন্দ করতে লাগল। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন আপনার পুত্র দুঃশাসন অত্যন্ত দ্রুত দ্রোণাচার্যের সৈন্য মধ্যে গেলেন। তাঁকে আসতে দেখে কৌরব সেনারা ভাবতে লাগল, 'দেখা যাক, ইনি কী বলেন ?' তারা তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। দুঃশাসন দ্রোণকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। এই অপ্রিয় সংবাদ শুনেই দ্রোণাচার্য মূর্ছিত হয়ে গেলেন। কিছু পরে জ্ঞান ফিরতেই তিনি সৈন্যদের যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিলেন। কৌরব সৈন্যদের ফিরতে দেখে পাণ্ডবরাও দূত মারফৎ নিজ সেনাদের যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। সব সৈন্য ফিরে গেলে রাজারা নিজেদের বর্ম ও অস্ত্র নামিয়ে ভীষ্মের কাছে এলেন। কৌরব ও পাণ্ডব—উভয় পক্ষের সকলেই ভীষ্মের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। তখন ধর্মাত্মা ভীষ্ম তাঁর সামনে দণ্ডায়মান রাজাদের সম্বোধন করে

বললেন—'মহা সৌভাগ্যশালী মহারথীগণ ! আমি আপনাদের স্বাগত জানাই। দেবোপম বীরগণ ! এখন আপনাদের দর্শন লাভ করে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি।' সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে ভীষ্ম পুনরায় বললেন—'আমার মাথা নীচে ঝুলে আছে, আপনারা এরজন্য কোনো বালিশের ব্যবস্থা করুন।' তা শুনে রাজারা অত্যন্ত কোমল সুন্দর সুন্দর বালিশ নিয়ে এলেন, কিন্তু পিতামহের সেগুলি পছন্দ হল না। তিনি হেসে বললেন—'রাজাগণ ! এই বালিশ আমার শয্যার উপযুক্ত নয়।' তারপর তিনি অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'পুত্র ধনঞ্জয় ! আমার মাথা ঝুলে আছে, তার জন্য বিছানার অনুরূপ শীঘ্র এক বালিশের ব্যবস্থা করো। তুমি সমস্ত ধনুর্ধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। তোমার ক্ষত্রিয়ধর্মের জ্ঞান আছে এবং তোমার বুদ্ধি নির্মল ; সুতরাং তুমিই এই কাজ করতে সক্ষম।'

অর্জুন 'ঠিক আছে' বলে তাঁর নির্দেশ স্বীকার করে নিজ গাণ্ডীব ধনুক তুললেন এবং তাতে তিনটি বাণ অভিমন্ত্রিত করে নিক্ষেপ করলেন ও তার দ্বারা ভীষ্মের মস্তক উঁচু করে দিলেন। 'আমার অভিপ্রায় অর্জুন বুঝে গেছে'—এই ভেবে ভীষ্ম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই বীরোচিত বালিশ পেয়ে ভীষ্ম অর্জুনের প্রশংসা করে বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! তুমি এই শয্যার উপযুক্ত বালিশ দিয়েছ। যদি তা না করতে তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। মহাবাহো ! নিজ ধর্মে অবস্থিত ক্ষত্রিয়গণের রণভূমিতে এরূপ শয্যায় শয়ন করা উচিত।' অর্জুনকে এই কথা বলে ভীষ্ম অন্য রাজা এবং রাজকুমারদের বললেন—'আপনারা দেখুন, অর্জুন কী সুন্দর বালিশ দিয়েছে। এখন সূর্য যতদিন উত্তরায়ণে না আসে, আমি এই শয্যাতেই শায়িত থাকব। সেই সময় যারা আমার কাছে আসবে, তারা আমার পরলোক যাত্রা দেখতে সক্ষম হবে। আমার পাশের জমিতে খাল কেটে দেওয়া প্রয়োজন। বাণবিদ্ধ অবস্থাতেই আমি সূর্যের উপাসনা করব। হে রাজাগণ ! আমার অনুরোধ এই যে আপনারা এবার নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ত্যাগ করে যুদ্ধ বন্ধ করুন।'

তারপর শরীর থেকে বাণ বার করতে সক্ষম সুশিক্ষিত বৈদ্য চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ভীষ্মের চিকিৎসার জন্য এলেন। তাঁকে দেখে ভীষ্ম আপনার পুত্রকে বললেন—'দুর্যোধন ! এই চিকিৎসককে অর্থ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বিদায় দাও। এই অবস্থায় আমার বৈদ্যতে আর কী কাজ ? ক্ষত্রিয়ধর্মের যা সর্বোত্তম গতি, আমি তা লাভ করেছি ; শরশয্যায় শয়নের পরে চিকিৎসা করানো ধর্ম নয়। এই বাণের সঙ্গেই যেন আমার অন্তিম সংস্কার করানো হয়।'

পিতামহের কথা শুনে দুর্যোধন চিকিৎসককে অর্থাদি দ্বারা সম্মানিত করে বিদায় দিলেন। নানাদেশের রাজারা সেখানে একত্রিত ছিলেন, তাঁরা ভীষ্মের ধর্ম-নিষ্ঠা ও সাহস দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর কৌরব ও পাণ্ডবরা শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করে নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন।

মহারথী পাণ্ডবগণ নিজেদের শিবিরে প্রসন্নভাবে বসেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনারা জয়লাভ করছেন। ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে ভীষ্ম পরাস্ত হয়েছেন। এই মহারথী সম্পূর্ণ শাস্ত্র অনুগামী ছিলেন। তিনি তো মানুষের অবধ্য ছিলেনই, দেবতারাও এঁকে জয় করতে পারতেন না। কিন্তু আপনার তেজেই ইনি দগ্ধ হয়ে গেলেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'কৃষ্ণ ! এই বিজয় আপনারই কৃপার ফল। আপনি ভক্তের ভয় দূর করেন আর আমরা আপনারই শরণাগত। আপনি যাকে রক্ষা করেন, তার যদি বিজয় লাভ হয়, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমার বিশ্বাস,

যিনি সর্বভাবে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছে কোনো কিছুই আশ্চর্যের নয়।' তাঁর কথায় ভগবান হেসে বললেন—'মহারাজ ! আপনি আপনার অনুরূপ কথাই বলেছেন।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! রাত্রি প্রভাত হলে কৌরব ও পাণ্ডবরা পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। বীরশয্যায় শায়িত পিতামহকে প্রণাম করে সকলেই তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। বহু নারী ও কন্যা এসে তাঁর দেহে চন্দন, মালা ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন। দর্শকদের মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, বাদ্যকর, নট, নর্তক, শিল্পী ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে এসেছিল। কৌরব এবং পাণ্ডবরা অস্ত্রশস্ত্র-বর্ম সব রেখে পরস্পর প্রীতি সহকারে পিতামহের কাছে বসলেন।

বাণের আঘাতে তাঁর শরীর জ্বালা করছিল, ঘায়ের ক্ষতের কষ্টে তাঁর মূর্ছা আসছিল ; তিনি বড় কষ্টে রাজাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'জল চাই।' শুনেই ক্ষত্রিয় রাজারা উঠে চারদিক থেকে উত্তম আহার এবং শীতল পানীয় ভর্তি কলস এনে ভীষ্মকে অর্পণ করলেন। তাই দেখে ভীষ্ম বললেন—'এখন আমি কোনো মানবীয় ভোগ গ্রহণ করব না ; কারণ এখন আমি মনুষ্যলোক থেকে পৃথক হয়ে শরশয্যায় শায়িত আছি।' ভীষ্ম এই কথা বলে রাজাদের বুদ্ধির নিন্দা করে বললেন—'আমি একটু অর্জুনকে দেখতে চাই।'

তা শুনে অর্জুন তক্ষুণি তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে দুহাত জোড় করে বিনীত ভাবে বললেন—'পিতামহ ! আমার প্রতি কী আদেশ ?' অর্জুনকে সামনে দাঁড়াতে দেখে ভীষ্ম প্রসন্ন হয়ে বললেন—'পুত্র ! তোমার বাণের আঘাতে আমার শরীর জ্বালা করছে, মর্মস্থানে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। মুখ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। আমাকে জল দাও। তুমি সক্ষম, তুমিই আমাকে বিধিমতো জল পান করাতে পারো।'

অর্জুন 'ঠিক আছে' বলে পিতামহের নির্দেশ মেনে নিলেন এবং রথে বসে গাণ্ডীব ধনুকে গুণ চড়ালেন। সেই ধনুকের টংকারে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল, রাজারাও খুব ভয় পেলেন। অর্জুন রথে চড়ে পিতামহকে পরিক্রমা করলেন এবং একটি বাণ বার করে মন্ত্র পড়ে তাতে পার্জন্য অস্ত্রে সংযোজন করে ভীষ্মের পার্শ্বস্থিত জমিতে নিক্ষেপ করলেন। সেটি মাটিতে প্রোথিত হতেই দিব্য গন্ধযুক্ত

অমৃতের ন্যায় মধুর শীতল জলের নির্মল ধারা প্রবাহিত হল। তার দ্বারা দিব্য কর্মকারী পিতামহ ভীষ্মকে তৃপ্ত করলেন। অর্জুনের এই অলৌকিক কর্ম দেখে সেখানে উপস্থিত রাজাগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁরা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। সেইসময় চারদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির তুমুল ধ্বনি শোনা গেল। ভীষ্ম তৃপ্ত হয়ে সকলের সামনেই অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'মহাবাহো ! তোমার এই পরাক্রম কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। নারদ ঋষি আমাকে আগেই বলেছেন যে তুমি প্রাচীন ঋষি নর, ভগবান নারায়ণের সহায়তায় বড় বড় কাজ করবে, যা ইন্দ্রাদি দেবতাও করতে সাহস করেন না। তুমি এই ভূমণ্ডলে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমি, বিদুর, দ্রোণাচার্য, পরশুরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সঞ্জয় সকলেই বারংবার বলেছি ; কিন্তু দুর্যোধন কারো কথাই শোনেনি। তার বুদ্ধি বিপরীত হয়ে গেছে ; সে কারো কথাতেই বিশ্বাস করে না। সর্বদা শাস্ত্র প্রতিকূল কর্ম করে। যাক, এর ফল সে পাবে ; ভীমসেনের দ্বারা পরাজিত হয়ে সে চিরকালের জন্য রণভূমিতে শয্যা নেবে।'

ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তা দেখে পিতামহ বললেন—'রাজন্ ! ক্রোধ পরিত্যাগ করে আমার কথায় মন দাও। তুমি দেখলে তো অর্জুন কীভাবে শীতল, মধুর, সুগন্ধিত জলধারা প্রবাহিত করল ? এরূপ পরাক্রমশালী জগতে আর কেউ নেই। আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, প্রাজাপত্য, ধাতৃ, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র এবং বৈবস্বত প্রভৃতি অস্ত্রগুলি ইহজগতে একমাত্র অর্জুন বা শ্রীকৃষ্ণই জানেন। তৃতীয় কেউ এ সম্বন্ধে জানেন না। সুতরাং অর্জুনকে কোনোমতেই যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়, তার সকল কর্মই

অলৌকিক। তাই আমার মত হল, তুমি শীঘ্রই তার সঙ্গে সন্ধি করে নাও। যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হচ্ছেন, যতক্ষণ ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব তোমার সেনার সর্বনাশ না করছে, তার আগেই পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমাদের মিত্রতা হওয়া আমি মঙ্গল মনে করি। তাত ! আমার মৃত্যুর সঙ্গেই এই যুদ্ধ সমাপ্ত করে শান্ত হও। আমার কথা শোনো, এতেই তোমার ও তোমার কুলের কল্যাণ হবে। অর্জুন যে পরাক্রম দেখিয়েছে, তোমাকে সচেতন করার জন্য তা যথেষ্ট। এখন তোমাদের মধ্যে প্রেমভাব যেন বেড়ে ওঠে, বেঁচে যাওয়া রাজাদের জীবন রক্ষা হোক। পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান করো, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাক। পিতা-পুত্রের সঙ্গে, মামা-ভাগিনেয়র সঙ্গে এবং ভাই-ভাইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাক। যদি মোহবশত বা মূর্খতার জন্য তুমি আমার এই সময়োচিত কথায় মন না দাও, শেষে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে, তোমার সর্বনাশ হবে, নির্মম সত্য হলেও আমি এই কথা বলছি।'

বন্ধুভাবে এই কথা বলে ভীষ্ম চুপ করলেন। তিনি আবার তাঁর মন পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করলেন। মৃত্যুকালে মানুষ যেমন ঔষধ পান করা পছন্দ করে না, ঠিক সেই মতো দুর্যোধনেরও এই কথা পছন্দ হল না।

ভীষ্ম মৌনভাব অবলম্বন করলে সকল রাজা শিবিরে ফিরে গেলেন। কর্ণ সেইসময় ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে এলেন। ভীষ্মকে শরশয্যায়

দেখে তাঁর চোখ জলে ভরে এল। তিনি আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—মহাবাহো ভীষ্ম ! যাকে আপনি সর্বদা দ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই আমি রাধাপুত্র কর্ণ আপনার সেবায় উপস্থিত। তাঁর কথা শুনে ভীষ্ম চোখখুলে ধীরভাবে কর্ণের দিকে তাকালেন। তিনি প্রহরীদের সেখান থেকে সরিয়ে পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করে, সেইভাবে একহাতে কর্ণকে টেনে বুকে জড়িয়ে স্নেহস্বরে বললেন—'এসো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ! তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে মতবিরোধ করেছ। যদি তুমি আমার কাছে না আসতে তাহলে তোমার কোনোভাবেই মঙ্গল হত না। মহাবাহো ! তুমি রাধা নয়, কুন্তীর পুত্র ! তোমার পিতা অধিরথ নয়, তোমার পিতা সূর্য—একথা আমি ব্যাসদেব এবং নারদ ঋষির কাছে জেনেছি। এতে কোনো সন্দেহ রেখো না, একথা অতীব সত্য। পুত্র ! আমি সত্য বলছি ; তোমার প্রতি আমার কোনো দ্বেষ নেই, তুমি অকারণে পাণ্ডবদের ওপর আক্ষেপ করতে তাই তোমার দুঃসাহস দূর করার জন্যই আমি কঠোর বাক্য বলতাম। নীচ পুরুষদের সঙ্গ করায় তোমার বুদ্ধিও গুণবানদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয়েছে। সেইজনাই কৌরব সভায় আমি তোমাকে অনেক কটুবাক্য বলেছি। আমি জানতাম যুদ্ধে তোমার পরাক্রম শত্রুদের পক্ষে অসহ্য। তুমি ব্রাহ্মণদের ভক্ত, শূরবীর এবং দানে তোমার অতীব নিষ্ঠা। মানুষের মধ্যে তোমার তুল্য গুণবান আর নেই। বাণ নিক্ষেপে, অস্ত্র সন্ধানে, হাতের ক্ষিপ্রতায় এবং অস্ত্রবলে তুমি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ। তুমি ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ করে থাক, তেজ ও বলে তুমি দেবতার সমকক্ষ। যুদ্ধে তোমার পরাক্রম মানুষের চেয়ে বেশি। পূর্বে তোমার প্রতি আমার যে ক্রোধ ছিল, তা আমি দূর করে দিয়েছি। এখন আমি নিশ্চিত যে পুরুষার্থর দ্বারা দৈবের বিধান রদ করা যায় না। পাণ্ডবরা তোমার আপন ভাই ; যদি তুমি আমার প্রিয় কাজ করতে চাও, তাহলে ওদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও। আমার মৃত্যুর সঙ্গেই যেন এই শত্রুতা শেষ হয়ে যায় এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজা যেন আজ থেকে সুখী হয়।'

কর্ণ বললেন—'মহাবাহো ! আপনি যে বললেন আমি সূতপুত্র নই, কুন্তীর পুত্র—তা আমিও জানি। কিন্তু কুন্তী আমাকে ত্যাগ করেছেন এবং সূত আমার পালন-পোষণ করেছেন। আজ পর্যন্ত আমি দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করছি, তাকে অস্বীকার করার সাহস আমার নেই। বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবদের সহায়তার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেমনই আমিও দুর্যোধনের জন্য নিজ শরীর, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, যশ, সমস্ত দিয়ে দিয়েছি। যা অবশ্যম্ভাবী, তা রদ করা যায় না। পুরুষার্থের দ্বারা দৈবকে কে রোধ করতে পেরেছে ? আপনিও তো পৃথিবী নাশের সূচনার্থক অলক্ষণ

জেনেছিলেন, যা আপনি সভায় জানিয়েছিলেন। আমিও পাণ্ডব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানি, এঁরা মানুষের পক্ষে অজেয়। তা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস আমি যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজিত করব। এই শত্রুতা ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন এর থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন ; তাই আমি ধর্মে স্থির থেকে প্রসন্নভাবে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এখন আপনি অনুমতি দিন। আপনার অনুমতি নিয়েই যুদ্ধ করব, এই আমার ইচ্ছা। আজ পর্যন্ত চাপল্যবশত আমি আপনাকে যেসব কটুবাক্য বলেছি বা প্রতিকূল আচরণ করেছি, আপনি সেসব ক্ষমা করুন।'

ভীষ্ম বললেন—কর্ণ ! যদি এই দারুণ শত্রুতা মেটানো না যায়, তাহলে আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি দিচ্ছি। তুমি স্বর্গলাভের জন্যই যুদ্ধ করো। ক্রোধ ও ঈর্ষা ত্যাগ করে নিজ শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধে পরাক্রম দেখাও। সর্বদা সৎপুরুষের মতো আচরণ করো। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মদ্বারা প্রাপ্ত লোকে যাবে। অহংকার পরিত্যাগ করে বল ও পরাক্রমের ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করো। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুক্ত যুদ্ধের থেকে বড় অন্য কোনো কল্যাণের সাধন নেই। কর্ণ ! আমি শান্তির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে সফল হতে পারিনি। আমি তোমাকে সত্য কথা জানাচ্ছি।

রাজন্ ! ভীষ্মের কথা শুনে কর্ণ তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে রথে উঠে আপনার পুত্র দুর্যোধনের কাছে চলে গেলেন।

——o——

॥ ভীষ্মপর্ব সমাপ্ত ॥

——o——

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

দ্রোণপর্ব

দ্রোণাচার্যকে সেনাপতিপদে বরণ এবং কর্ণের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
ওঁ নমঃ পিতামহায়। ওঁ নমঃ প্রজাপতিভ্যঃ।
ওঁ নমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায়। ওঁ নমঃ সর্ববিঘ্নবিনায়কেভ্যঃ।

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! পিতামহ ভীষ্ম পাঞ্চাল রাজকুমার শিখণ্ডীর হাতে বধ হয়েছেন শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্র দুর্যোধন কী করলেন ? সেইসব প্রসঙ্গ আপনি আমাকে জানান।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তা ও শোকে নিমজ্জিত হলেন। তাঁর সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। এর মধ্যে শুদ্ধ চিত্ত সঞ্জয় তাঁর কাছে এলেন। তিনি কৌরব শিবির থেকে রাত্রের মধ্যেই হস্তিনাপুরে পৌঁছলেন। তাঁর কাছ থেকে ভীষ্মের পতনের বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র শোকমগ্ন হলেন। তিনি শোকাতুর হয়ে ক্রন্দন করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাত ! মহাত্মা ভীষ্মের জন্য শোকাতুর কৌরবরা কী করল ? বীর পাণ্ডবদের বিশাল এবং বিজয় বাহিনী ত্রিলোকে ভয় উৎপন্ন করতে সক্ষম। এখন দুর্যোধনের সৈন্যদলে এমন কে মহারথী আছে, যে এই অবস্থাতে এরূপ মহাভয় এলেও ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম !'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ভীষ্মের মৃত্যুর পর আপনার পুত্ররা কী করলেন, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাঁর

পতনের পর কৌরব ও পাণ্ডবগণ পৃথকভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরা ক্ষাত্রধর্মের নিন্দা করে মহাত্মা ভীষ্মকে

প্রণাম করলেন, পরে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নিজেদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তারপর পিতামহের নির্দেশে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁরা আবার যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাদ্যধ্বনির সঙ্গে আপনার পুত্ররা এবং পাণ্ডবরা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

রাজন্ ! আপনার পুত্র এবং আপনার অজ্ঞতার জন্য ভীষ্ম বধ হওয়ায়, কৌরব ও তাঁর পক্ষের রাজারা যেন মৃত্যুর সন্নিকট হলেন। ভীষ্মের বিয়োগে সকলেই অত্যন্ত কাতর ছিলেন। তাঁর অভাবে কৌরব সেনা অনাথপ্রায় হয়ে গেল। কোনো বিপদ এলে যেমন নিজ বন্ধুর কথা স্মরণ হয়, তেমনই কৌরববীরদের এবার কর্ণের কথা স্মরণ হল ; কারণ তিনি ভীষ্মের ন্যায় গুণবান, সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। কর্ণ দুই রথীর সমান বীর ছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম বলবান ও পরাক্রমী রথীদের গণনা করার সময় তাঁকে অর্ধরথী হিসাবে ধরেছিলেন। তাই দশদিন, যতদিন ভীষ্ম পিতামহ যুদ্ধ করেছিলেন, মহাযশস্বী কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পা রাখেননি। ভীষ্ম ধরাশায়ী হওয়ার পর আপনার পুত্ররা কর্ণকে আহ্বান করে বললেন—'কর্ণ ! এবার তোমার যুদ্ধ করার সময় হয়েছে।'

তখন মহারথী কর্ণ সমুদ্রে ডুবন্ত নৌকার মতো আপনার পুত্রের সেনাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সত্বর কৌরবদের কাছে এলেন। কৌরবদের কাছে এসে কর্ণ বলতে লাগলেন—'পিতামহ ভীষ্মের মধ্যে ধৈর্য, বুদ্ধি, পরাক্রম, সত্য, স্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত বীরোচিত গুণ বিরাজমান ছিল। তাঁর অনেক দিব্য অস্ত্রও ছিল, সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে নম্রতা, লজ্জা, মধুর বাক্য এবং সারল্যেরও কোনো অভাব ছিল না। তিনি অন্যের উপকার স্মরণে রাখতেন এবং বিপ্রবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর পতন হওয়াতে আমার মনে হচ্ছে যেন সব বীরই শেষ হয়ে গেছে।' এই কথা বলে, মহাপ্রতাপশালী ভীষ্মের নিধন এবং কৌরবদের পরাজয়ের কথা চিন্তা করে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চোখ জলে ভরে এল। কর্ণের কথা শুনে আপনার পুত্র এবং সৈনিকগণও শোকাকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন। তখন রথীশ্রেষ্ঠ কর্ণ অন্য সব মহারথীর উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য বললেন—'ভীষ্মের পতন হওয়ায় সৈনিকরা সেনাপতির অভাবে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে। শত্রুপক্ষ এদের নিরুৎসাহ এবং অনাথ করে দিয়েছে। আমি এখন এদের ভীষ্মের মতোই রক্ষা করব। আমি বুঝতে পারছি যে, এখন এই সমস্ত দায়িত্ব আমারই। আমি রণভূমিতে বিচরণ করে যুদ্ধে পরাজিত করে পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠাব এবং সমস্ত জগতে আমার মহাযশ প্রতিষ্ঠা করব নতুবা শত্রু হতে নিহত হয়ে রণক্ষেত্রে শয্যা নেব।' তারপর নিজ সারথিকে ডেকে বললেন—'সূত ! তুমি আমাকে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরাও এবং শীঘ্রই আমার রথ নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে এখানে নিয়ে এসো।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! এই বলে কর্ণ যুদ্ধসামগ্রী ও ধ্বজা-পতাকায় সজ্জিত এক সুন্দর রথে চড়ে

বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সর্বপ্রথম তিনি শরশয্যায় শায়িত অতুল তেজস্বী মহাত্মা ভীষ্মের কাছে গেলেন। ভীষ্মকে দেখে কর্ণ ব্যাকুল হয়ে রথ থেকে নেমে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি কর্ণ ! আপনার মঙ্গল হোক, আপনি আপনার পবিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখুন এবং আপনার মঙ্গলময় বাক্যে আমাকে আশীর্বাদ করুন। ধনসংগ্রহ, মন্ত্রণা, ব্যূহরচনা, অস্ত্র সঞ্চালনে আমি আপনার মতো কাউকে দেখতে পাই না। আপনি ব্যতীত আর কে অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারে ? বড় বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বলেন যে অর্জুনের কাছে অনেক দিব্য অস্ত্র আছে এবং সে নিবাতকবচ প্রমুখ অমানব এবং স্বয়ং মহাদেবের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে সে ভগবান শংকরের কাছ থেকে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের দুর্লভ বরও প্রাপ্ত হয়েছে। তবুও আপনার আদেশ পেলে আমি আজই আমার পরাক্রম দ্বারা তাকে বিনাশ করতে পারি।'

রাজন্‌! কর্ণের কথায় কুরুবৃদ্ধ পিতামহ প্রসন্ন হয়ে দেশ-কাল অনুসারে বললেন—'কর্ণ, তুমি শত্রুর মানমর্দনকারী এবং মিত্রের আনন্দবর্ধনকারী হও। ভগবান বিষ্ণু যেমন দেবতাদের আশ্রয়, তেমনই তুমি কৌরবদের আধার হও। দুর্যোধনকে বিজয়ী করার ইচ্ছাতেই তুমি তোমার বাহুবলের দ্বারা উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত এবং বাহ্লীক ইত্যাদি দেশের রাজাদের পরাস্ত করেছিলে। এতদ্‌ভিন্ন স্থানে স্থানে আরও অনেক বীরকে তুমি পরাজিত করেছ। পুত্র ! দুর্যোধন সমস্ত কৌরবদের কর্ণধার, তুমি তাঁকে সেইমতো ভরসা প্রদান করো। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি ; তুমি শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামে যাও। যুদ্ধে কৌরবদের পথ প্রদর্শক হও এবং দুর্যোধনকে বিজয়ী করো। দুর্যোধনের মতো তুমি আমার পৌত্রসম। ধর্মত আমি যেমন তার হিতৈষী, তেমনই তোমারও।'

ভীষ্মের কথা শুনে কর্ণ তাঁর চরণে প্রণাম করে সেনাদের কাছে গিয়ে তাদের উৎসাহিত করলেন। কর্ণকে সব সৈন্যের পুরোধা হয়ে আসতে দেখে দুর্যোধন ও সমস্ত কৌরব অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁরা করতালি দিয়ে, সিংহনাদ করে, লম্ফঝম্ফ করে এবং ধনুকে টংকার তুলে কর্ণকে স্বাগত জানালেন। তারপর দুর্যোধন তাঁকে বললেন—'কর্ণ ! এখন তুমি আমদের সেনাদের রক্ষক। তুমি এখন ঠিক করো কী করলে আমাদের মঙ্গল হবে।'

কর্ণ বললেন—'রাজন্‌ ! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বলুন ; কারণ রাজা স্বয়ং তাঁর কর্তব্য যেমন ঠিক করতে পারেন, অন্য কোনো ব্যক্তি তা পারে না। তাই আমি আপনার কথা শুনতে চাই।'

দুর্যোধন বললেন—'প্রথমে আয়ু, বল ও বিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্ম আমাদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি সব যোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে শত্রু সংহার করেছেন এবং দশ দিন ভীষণ যুদ্ধ করে আমাদের রক্ষা করেছেন। এখন তিনি স্বর্গপথের যাত্রী, সুতরাং তাঁর স্থানে তোমার বিচারে কাকে সেনাপতি করা উচিত ? সেনাপতিবিহীন হয়ে সেনারা এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। নাবিকবিহীন নৌকা এবং সারথিবিহীন রথ যেমন যেদিকে খুশি চলে যায়, তেমনই সেনাপতিবিহীন হলে সৈন্যরাও বিপথগামী হয়। সুতরাং আমার পক্ষের সব বীরদের দেখে তুমি ঠিক করো যে, ভীষ্মের পরে উপযুক্ত সেনাপতি কে হতে পারেন ?'

কর্ণ বললেন—'এখানে যেসব রাজারা উপস্থিত, তাঁরা সকলেই অত্যন্ত মহানুভব এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে এই পদের যোগ্য। তাঁরা সকলেই কুলীন, সুগঠিত দেহসম্পন্ন, যুদ্ধ কলাকুশলী ও বল-পরাক্রমী এবং বুদ্ধিসম্পন্ন। সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ এবং কেউ যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী নয়। কিন্তু সকলকে একইসঙ্গে সেনানায়ক করা যায় না। তাই যাঁর

মধ্যে সব থেকে বেশি গুণ আছে, তাঁকেই এই পদে নিযুক্ত করা উচিত। আমার বিচারে সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য দ্রোণকেই সেনাপতি করা উচিত ; কারণ তিনি সকল যোদ্ধার আচার্য এবং গুরু আর বয়োবৃদ্ধও। ইনি সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতির সমকক্ষ এবং এঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। সুতরাং তাঁর উপস্থিতিতে অন্য আর কে আমাদের সেনাপতি হবেন ? আপনার গুরুদেব সকল সেনানায়কের মধ্যে, সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে এবং সকল বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই দেবতারা যেমন স্বামী কার্তিককে নিজেদের সেনাধ্যক্ষ করেছিলেন, আপনিও তেমন এঁকেই আপনার সেনাপতি করুন।'

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন সেনাদের মধ্যে দণ্ডায়মান আচার্য দ্রোণের কাছে গিয়ে বললেন—'মুনিবর ! বর্ণ, কুল, বিদ্যা, ব্যুৎপত্তি, আয়ু, বুদ্ধি, পরাক্রম, যুদ্ধকৌশল,

অর্থজ্ঞান, নীতি, বিজয়, তপস্যা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সর্বগুণেই আপনি শ্রেষ্ঠতম। রাজাদের মধ্যে আপনার সমকক্ষ কোনো রক্ষক নেই। সুতরাং ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রক্ষা করেন, তেমনই আপনিও আমাদের রক্ষা করুন। আপনার নেতৃত্বেই আমরা শত্রুদের পরাজিত করতে চাই। অতএব কৃপা করে আপনি আমাদের সেনাপতি হোন। আপনি যদি আমাদের সেনাপতি হন, তাহলে আমরা অবশ্যই রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁর অনুগামী ও বন্ধুবান্ধবসহ পরাজিত করব।'

দুর্যোধন এই কথা বললে তাঁকে উৎসাহিত করতে সব রাজা দ্রোণাচার্যের নামে জয়ধ্বনি দিলেন।

তাঁরা সকলে দ্রোণাচার্যের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। তখন আচার্য দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! আমি ছয়অঙ্গবিশিষ্ট বেদ, মনু কথিত অর্থশাস্ত্র, ভগবান শংকর প্রদত্ত বাণবিদ্যা এবং কয়েক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র জানি। তুমি বিজয়ের ইচ্ছায় আমার যেসব গুণের কথা বলেছ, সেই সব দিয়ে আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমি কোনোভাবেই বধ করতে পারব না ; কারণ তার উৎপত্তি হয়েছে আমাকে বধের জন্যই।'

রাজন্ ! আচার্যের অনুমতি পেয়ে আপনার পুত্র দুর্যোধন তাঁকে শাস্ত্রমতে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন।

সেইসময় বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও শঙ্খধ্বনিতে সকলে হর্ষ প্রকাশ করল এবং পুণ্যাহবাচন, স্বস্তিবাচন, সূতদের স্তুতিগান এবং ব্রাহ্মণদের জয়জয়কার ধ্বনিতে আচার্যকে সম্মানিত করা হল। দ্রোণ সেনাপতি হওয়ায় সকলেই মনে করতে লাগল যে 'আমরা এবার পাণ্ডবদের পরাজিত করব।'

———০———

দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর প্রথম দিনের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেনাপতি পদ লাভ করে মহারথী দ্রোণ তাঁর সেনার ব্যূহরচনা করে আপনার পুত্রদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে চললেন। তাঁর ডান পাশে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কলিঙ্গরাজ এবং আপনার পুত্র বিকর্ণ, তাঁদের রক্ষণার্থে গান্ধারদেশের অশ্বারোহীসহ শকুনি পিছনে ছিলেন। বাম দিকে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি, দুঃশাসন প্রমুখ বীরগণ ছিলেন। তাঁদের রক্ষার ভার ছিল সুদক্ষিণ প্রমুখ কাম্বোজ বীরদের ওপর। তাঁদের সঙ্গেই শক ও যবন সৈন্যও যাচ্ছিল। মদ্র, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, শিবি, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব এবং পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দেশের সমস্ত যোদ্ধা আপনার পুত্রদের সঙ্গে দুর্যোধন ও কর্ণকে অনুগমন করছিল। তারা সকলেই নিজ নিজ সৈন্যের বল ও উৎসাহ বৃদ্ধি করছিল। যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ কর্ণ সেনাদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করতে করতে সবার আগে যাচ্ছিলেন। কর্ণকে দেখে এখন কেউ আর ভীষ্মের অভাব বোধ করছিলেন না। সকলের মুখে এককথা 'আজ কর্ণকে সামনে দেখে পাণ্ডবরা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াতেই পারবে না। আরে, কর্ণ তো দেবতাসহ স্বয়ং ইন্দ্রকেও জিতে নিতে পারবেন, এই বল-পরাক্রমহীন পাণ্ডবদের তো কথাই নেই। ভীষ্ম যদিও অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন, কিন্তু তিনি পাণ্ডবদের স্নেহবশত বাঁচিয়ে চলতেন। এখন কর্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে ওদের ছিন্নভিন্ন করে দেবেন।'

রাজন্! সমস্ত সৈন্য এইভাবে কর্ণের প্রশংসা করে তাঁকে সম্মান করে পথ চলছিল। রণক্ষেত্রে পৌঁছে আচার্য সেনাদের নিয়ে শকটব্যূহ তৈরি করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যদিকে ক্রৌঞ্চব্যূহ তৈরি করেছিলেন। সেই ব্যূহের মুখ্যস্থানে অর্জুনকে নিয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বানর চিহ্নিত ধ্বজাযুক্ত রথ নিয়ে বিরাজ করছিলেন। আপনার সেনার মুখ্যস্থানে ছিলেন কর্ণ। কর্ণ ও অর্জুন দুজনেই একে অপরকে হারাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দুজনেই দুজনের প্রাণ নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেই সময় মহারথী দ্রোণ এগিয়ে গেলেন এবং সৈন্যদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আপনার পুত্রকে বললেন—'রাজন্ ! তুমি মহাত্মা ভীষ্মের পরে আমাকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেছ, তাই আমি তোমাকে তার অনুরূপ ফলপ্রদান করতে চাই। বলো, আমি তোমার কী কাজ করব ? তোমার যা ইচ্ছা, সেই বরই চেয়ে নাও।'

তখন রাজা দুর্যোধন কর্ণ এবং দুঃশাসনদের সঙ্গে পরামর্শ করে আচার্যকে জানালেন 'আপনি যদি আমাকে বর দিতে চান, তাহলে মহারথী যুধিষ্ঠিরকে জয় করে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে আসুন।' আচার্য বললেন—'তুমি কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতেই ইচ্ছা কর, তাকে বধ করার জন্য তুমি বর চাওনি ; তাই তুমি ধন্য। কিন্তু দুর্যোধন ! তুমি তার মৃত্যু চাও না কেন ? পাণ্ডবদের হারিয়ে তারপর যুধিষ্ঠিরকেই রাজ্য সমর্পণ করে তুমি তোমার সৌহার্দ দেখাতে চাও না তো ? ধর্মরাজের ওপর তোমার ভালোবাসা আছে, তিনি অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান, তাঁর জন্ম সফল এবং তাঁর অজাতশত্রুতাও সত্য।'

রাজন্ ! আচার্যের কথায় আপনার পুত্রের হৃদয়ে সর্বদা যে ভাব সুপ্ত থাকে তা সহসা প্রকাশিত হল। তিনি প্রসন্ন হয়ে দ্রোণাচার্যকে বললেন—'আচার্যশ্রেষ্ঠ ! যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু হলে আমার বিজয় হবে না, কারণ আমরা যদি তাঁকে মেরে ফেলি, তাহলে বাকি পাণ্ডবরা আমাদের অবশ্যই বিনাশ করবে। দেবতারাও সকল পাণ্ডবদের ধ্বংস করতে পারবেন না ; তাই তাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে, সেই আমাদের শেষ করবে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে যদি নিজের বশে পাই, তাহলে তাঁকে আবার পাশাতে হারাব এবং তখন আবার তিনি ভ্রাতাসহ বনে চলে যাবেন। তাই আমি কোনো অবস্থাতেই ধর্মরাজকে বধ করতে চাই না।'

দ্রোণাচার্য অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন, তাই তিনি বর দেওয়ার সময় একটি শর্ত যোগ করলেন— 'বীর অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে, তাহলে যুধিষ্ঠির তোমার বশে এসে গেছে মনে করো। অর্জুনকে পরাস্ত করার সাহস ইন্দ্রসহ দেবতা ও অসুররাও করে না। তাই এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অর্জুন যে আমার শিষ্য এবং আমার থেকেই সে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে যুবক এবং পুণ্যশীল। আমার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে সে ইন্দ্র এবং রুদ্রের কাছ থেকেও অস্ত্র লাভ করেছে আর তোমার ওপর তার ক্রোধও আছে। তাই তার উপস্থিতিতে আমি এই কাজ করতে সক্ষম হব না। সুতরাং যেমন করে হোক, তুমি তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। অর্জুন চলে গেলেই ধর্মরাজ তোমার

হাতে ! অর্জুন দূরে গেলে ধর্মরাজ যদি একমুহূর্তও আমার সামনে দাঁড়ায়, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে তাকে বন্দী করব।'

রাজন্ ! দ্রোণাচার্য এইভাবে শর্তের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলেও আপনার মূর্খপুত্ররা যুধিষ্ঠির বন্দী হয়েছে বলেই মনে করলেন। দুর্যোধন জানতেন দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের ভালোবাসেন। তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা সত্য করার জন্য সমস্ত সেনার মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। সৈনিকরা যখন শুনল আচার্য দ্রোণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন তারা উল্লাসে সিংহনাদ করে উঠল। নিজেদের বিশ্বস্ত গুপ্তচর মারফৎ এই সংবাদ পেয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সব ভ্রাতা এবং অন্য রাজাদের ডাকলেন। তারপর অর্জুনকে বললেন—'পুরুষসিংহ ! আচার্য কী করতে চাইছেন, তা কি তুমি শুনেছ ? এখন এমনভাবে কাজ করো যাতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত সফল না হয়। তিনি একটি শর্তসহ প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং সেই শর্ত তোমাকে নিয়েই। সুতরাং তুমি আমার পাশে থেকেই যুদ্ধ করো, যাতে দ্রোণের সাহায্যে দুর্যোধনের ইচ্ছা পূর্ণ না হয়।'

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! আমি যেমন আচার্যকে বধ করতে চাই না, তেমনই আমি আপনার কাছ থেকেও দূরে যেতে চাই না। তাতে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে হয়, নক্ষত্রসহ আকাশ যদি ভেঙে পড়ে অথবা পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তবুও আমি জীবিত থাকতে স্বয়ং ইন্দ্রের সাহায্য পেলেও আচার্য আপনাকে বন্দী করতে পারবেন না। তাই যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আপনি আচার্যকে ভয় পাবেন না। আমি জোর করে বলছি, আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যতদূর মনে পড়ে, আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, কোথাও পরাজিত হইনি এবং প্রতিজ্ঞা করে কখনো তা ভঙ্গ করিনি।'

মহারাজ ! তারপর পাণ্ডবশিবিরে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি শোনা গেল ; পাণ্ডবরা সিংহনাদ করতে লাগলেন এবং তাঁদের ধনুকের টংকার আকাশে গুঞ্জিত হল। তাই দেখে আপনার সৈন্যরাও বাদ্যধ্বনি করতে লাগল। তারপর ব্যূহবদ্ধ উভয় সেনাদল ক্রমশ এগিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল। সৃঞ্জয়বীররা আচার্যের সৈন্য নষ্ট করার বহু চেষ্টা করলেও দ্রোণ তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকায় তা সম্ভব হল না। সেই মতো দুর্যোধনের মহারথী যোদ্ধাগণও অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডব সৈন্যদের কাবু করতে পারলেন না। দ্রোণাচার্যের নিক্ষিপ্ত বাণ পাণ্ডব সেনাদের সন্তপ্ত করে সর্বদিকে ঘুরছিল। সেই সময় কেউই আচার্যের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। এইভাবে তীক্ষ্ণবাণে পাণ্ডব সেনাদের মূর্ছিতপ্রায় করে আচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাদের বধ করতে লাগলেন। তাঁর নিক্ষিপ্তবাণে বহু রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক বিনাশপ্রাপ্ত হল। আচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে নানাদিকে বিচরণ করে সৈন্যদের ভীতি উৎপাদন করতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের নদী বইতে লাগল, শত শত

বীর যমরাজের গৃহে গমন করছিল এবং কাপুরুষরা তা দেখে ভীত হচ্ছিল।

যুধিষ্ঠির ও মহারথীগণ এবার সর্বদিকে আচার্য দ্রোণের ওপর চারদিক দিয়ে আক্রমণ চালালেন। কিন্তু আপনার পরাক্রমশালী বীররা তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে দাঁড়াল। রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। শকুনি সহদেবকে আক্রমণ করে তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সহদেবের রথ, সারথি ও ধ্বজা বিদ্ধ করলেন। তখন সহদেব ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনির রথের ধ্বজা এবং ধনুক কেটে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করে ষাট বাণে তাকে বিদ্ধ করলেন। শকুনি তখন গদা নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সহদেবের সারথিকে মেরে রথ থেকে ফেলে দিলেন। রথহীন হয়ে দুজনেই হাতে গদা নিয়ে পরস্পর আক্রমণ করতে লাগলেন।

দ্রোণাচার্য রাজা দ্রুপদকে দশ বাণ মারলেন। তিনিও বহুবাণে তার জবাব দিলেন। আচার্য তাঁকে আরও বেশি শর

নিক্ষেপ করলেন। ভীমসেন বিবিংশতিকে কুড়িটি বাণ মারলেন, কিন্তু বিবিংশতি তাতে ভীত হলেন না, তাই দেখে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হল। তারপর তিনি একে একে ভীমসেনের ঘোড়া, তাঁর রথের ধ্বজা এবং ধনুক কেটে ফেললেন। সব সেনাই তখন তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। ভীমসেন তাঁর শত্রুর পরাক্রম সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি তাঁর গদা দিয়ে বিবিংশতির সব ঘোড়া মেরে ফেললেন। অন্য দিকে শল্য হেসে তাঁর প্রিয় ভাগিনেয় নকুলকে বাণ বিদ্ধ করতে লাগলেন। প্রতাপশালী নকুল দেখতে দেখতে শল্যের ঘোড়া, ছত্র, ধ্বজা, সূত এবং ধনুক কেটে ফেলে তাঁর শঙ্খবাদ্য করলেন। ধৃষ্টকেতু কৃপাচার্যের নিক্ষিপ্ত বাণ কেটে ফেলে সত্তর বাণে তাঁকে বিদ্ধ করে তিন তীরে তাঁর ধ্বজা কেটে ফেললেন। কৃপাচার্য তখন ভয়ানক বাণবর্ষণ করে ধৃষ্টকেতুকে প্রতিহত করলেন এবং তাঁকে আহত করলেন। সাত্যকি তাঁর তীক্ষ্ণ তীরে কৃতবর্মার বুকে আঘাত করলেন এবং সত্তর বাণে তাঁকে আহত করলেন। কৃতবর্মা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁকে বাণ মারলেন, তাতে আহত হয়েও সাত্যকি পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন।

রাজা দ্রুপদ ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। ভগদত্ত রাজা দ্রুপদকে তাঁর সারথিসহ বিদ্ধ করলেন এবং তাঁর রথ ও ধ্বজাতেও বাণ মারলেন। তখন দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হয়ে ভগদত্তের বুকে বাণ মারলেন। অন্যদিকে ভূরিশ্রবা এবং শিখণ্ডীও ভীষণ যুদ্ধ করছিলেন। মহাবলী ভূরিশ্রবা বাণবর্ষণ করে শিখণ্ডীকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন। শিখণ্ডী তাইতে ক্রুদ্ধ হয়ে নব্বই বাণে ভূরিশ্রবাকে স্থানচ্যুত করলেন। ক্রূরকর্মা রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ দুজনেই বহু প্রকার মায়া জানতেন এবং অহংকারী হওয়ায় দুজনে একে অন্যকে পরাজিত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁরা সকলকে আশ্চর্য করে অন্তরালে থেকে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ওদিকে চেকিতান এবং অনুবিন্দ, অন্যদিকে ক্ষত্রদেব ও লক্ষ্মণ একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন।

এমন সময় পৌরব গর্জন করতে করতে অভিমন্যুর দিকে দৌড়াল। দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। পৌরব বহুবাণ মেরে অভিমন্যুকে ঢেকে দিল। অভিমন্যুও তাঁর ধ্বজা, ছত্র এবং ধনুক কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর সাত বাণে পৌরবকে এবং পাঁচ বাণে সারথি ও ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করলেন। তারপর তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে নেমে পৌরবের রথে উঠে তাঁর চুল ধরলেন ; পদাঘাতে সারথিকে রথ থেকে ফেলে তলোয়ার দিয়ে ধ্বজা কেটে ফেললেন। জয়দ্রথ পৌরবের এই দুর্দশা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে নিজের রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। জয়দ্রথকে আসতে দেখে অভিমন্যু পৌরবকে ছেড়ে বাজপাখির মতো বেগে রথ থেকে নেমে তাঁর সামনে এলেন। জয়দ্রথ অভিমন্যুর ওপর নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন ; কিন্তু সে সব অভিমন্যু তাঁর ঢাল দিয়ে প্রতিহত করে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেন। তাঁদের দুজনের ক্ষিপ্রতা দেখার মতো ছিল। তাঁদের অস্ত্র পরিচালনায় কোনো ফাঁক দেখা যাচ্ছিল না। দুজনেই নানা কৌশলে যুদ্ধ করছিলেন। এরমধ্যে অভিমন্যুর ঢালের আঘাতে জয়দ্রথের তলোয়ার ভেঙে গেল এবং জয়দ্রথ তক্ষুনি তাঁর রথে উঠে গেলেন। তখন অভিমন্যুও সেই অবকাশে রথে উঠে বসলেন।

অভিমন্যুকে রথে উঠতে দেখে কৌরব পক্ষের রাজারা তাঁকে ঘিরে ধরলেন। তখন তিনি জয়দ্রথকে ছেড়ে অন্য সব সেনার ওপর বাণ মারতে লাগলেন। তখন শল্য তাঁর ওপর অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। অভিমন্যু লম্ফ দিয়ে সেটিকে মধ্যপথে ধরে নিলেন এবং সেই শক্তিকে নিজ প্রচণ্ড বাহুবলে শল্যের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তি শল্যের সারথিকে বধ করে তাকে রথ থেকে ফেলে দিল। তাই দেখে রাজা বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কেকয় রাজকুমার, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র প্রশংসা করতে লাগলেন এবং অভিমন্যুকে উৎসাহিত করতে জোরে জোরে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

সারথিকে মৃত দেখে শল্য লোহার নির্মিত গদা তুলে ক্রোধে গর্জন করে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তাঁকে দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় অভিমন্যুর দিকে ধেয়ে আসতে দেখে ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাঁর ভারী গদা নিয়ে সামনে এলেন। ভীমসেনের সেই গদার আঘাত মদ্ররাজ শল্য ব্যতীত আর কারো সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না এবং মদ্ররাজের গদার বেগ সহন করা ভীমসেন ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিল না। দুই বীর গদা ঘুরিয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরতে লাগলেন। দুজনেই সমানভাবে যুদ্ধ করছিলেন, কেউ কাউকে হারাতে পারছিলেন না। এরমধ্যে ভীমসেনের আঘাতে শল্যের ভারী গদা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। উভয়ের পরস্পর গদাঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত

হতে লাগল। দুজনের বহুক্ষণ গদাযুদ্ধ হলেও কেউ কাউকে হারাতে পারছিলেন না। শেষে দুজনেই ক্লান্ত ও আহত হয়ে রণক্ষেত্রে পড়ে গেলেন। শল্য ব্যাকুল হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। কৃতবর্মা তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে রথে তুলে নিয়ে গেলেন। মহাবাহু ভীমসেনও কিছুক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে পুনরায় গদা হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজমান হলেন।

মদ্ররাজকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বাইরে যেতে দেখে আপনার পুত্র এবং তাঁর চতুরঙ্গিণী সেনা ভয়ে কেঁপে উঠল এবং বিজয়ী পাণ্ডবদের দ্বারা ঘায়েল হয়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। কৌরবদের হারিয়ে পাণ্ডবরা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বারংবার সিংহনাদ করতে লাগলেন এবং নানা বাদ্য ধ্বনি করতে লাগলেন। দ্রোণাচার্য যখন দেখলেন শত্রুর হাতে আহত হয়ে কৌরব সৈন্যদল ভীত হয়ে পড়েছে, তখন তিনি চীৎকার করে বললেন—'শূরবীরগণ ! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ো না।' তারপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডব সেনার মধ্যে প্রবেশ করে রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে দাঁড়ালেন। যুধিষ্ঠির তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণকে আঘাত হানলেন। আচার্য যুধিষ্ঠিরের ধনুক কেটে তাঁকেও তীব্র আক্রমণ করলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে চাইছিলেন ; তাই তাঁকে প্রতিহত করতে যেসব যোদ্ধা সামনে উপস্থিত হলেন তাঁদের সকলকেই আঘাত করে তিনি ক্ষুব্ধ করে তুললেন। তিনি বারো বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিনটি করে বাণে দ্রৌপদীর পুত্রদের, পাঁচ বাণে সাত্যকিকে এবং দশ বাণে মৎস্যরাজ বিরাটকে ঘায়েল করলেন। এর মধ্যে যুগন্ধর তাঁর গতি প্রতিহত করলেন। তখন আচার্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে আরও আঘাত করে এক ভল্লের আঘাতে যুগন্ধরকে রথ থেকে ফেলে দিলেন। তখন ধর্মরাজকে বাঁচাবার জন্য রাজা বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার, সাত্যকি, শিবি, ব্যাঘ্রদত্ত এবং সিংহসেন—এই সব বীররা বহুবাণ নিক্ষেপ করে আচার্যের পথরোধ করলেন। পাঞ্চালদেশীয় ব্যাঘ্রদত্ত পঞ্চাশ বাণ মেরে দ্রোণকে ঘায়েল করলেন। সিংহসেনও আচার্যকে বাণ বিদ্ধ করলেন এবং সব মহারথীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে হর্ষে অট্টহাস্য করে উঠলেন। দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে দুই বাণে এই দুই বীরের মস্তক কেটে ফেললেন এবং অন্য মহারথীদের বাণজালে আচ্ছাদিত করে মৃত্যুর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আচার্যের পরাক্রম দেখে কৌরব সৈনিকরা বলাবলি করতে লাগল—'ইনি এখনই যুধিষ্ঠিরকে ধরে আমাদের মহারাজের হাতে সমর্পণ করবেন।'

আপনার সৈন্যরা যখন এইসব আলোচনা করছিল, তখন অর্জুন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রথের আওয়াজে চতুর্দিক কাঁপিয়ে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের নদী বইয়ে দিলেন, চতুর্দিকে অস্থির পাহাড়, শব

পড়েছিল। অর্জুন তাঁর বাণের আঘাতে কৌরব বীরদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং বাণবর্ষণ করে শত্রুদের অচেতন করে তিনি সহসা দ্রোণাচার্যের সৈন্যের সামনে এলেন। ধনঞ্জয়ের বাণবর্ষণে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল—কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ; সব বাণময় হয়ে গেল।

এরমধ্যে সূর্য অস্তাচলে গেলে, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। শত্রু, মিত্র কাউকেই আর চেনা যাচ্ছিল না। তখন দ্রোণাচার্য এবং দুর্যোধন সেনাদের যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিলেন। অর্জুনও সৈন্যদের নিয়ে শিবিরের পথ ধরলেন। এইভাবে শত্রুদের বিষদাঁত ভেঙে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সমস্ত সেনার পিছনে পিছনে শিবিরে ফিরে এলেন। ঋষিরা যেমন সূর্যের স্তুতি করে থাকেন—পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়বীররা তেমনভাবে অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন।

—০—

অর্জুনকে বধ করার জন্য সংশপ্তক বীরদের প্রতিজ্ঞা এবং তাঁদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! দুই পক্ষের সৈন্যরা নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে পদ-মর্যাদা অনুসারে বিভক্ত হয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সেনারা ফিরে গেলে আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে সংকোচের সঙ্গে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমি আগেই বলেছি যে অর্জুনের উপস্থিতিতে দেবতারাও যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারবেন না। আজ যুদ্ধে তোমরা বহু চেষ্টা করলেও অর্জুন সেই ব্যাপার স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমি যা বলি, তাতে মনে সন্দেহ রেখো না। কৃষ্ণ এবং অর্জুন অজেয় বীর। কোনোভাবে যদি অর্জুনকে তুমি দূরে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা সম্ভব হবে। কোনো বীর যদি অর্জুনকে আহ্বান করে অন্যত্র নিয়ে যায়, তাহলে অর্জুন তাকে পরাস্ত না করে সেখান থেকে ফিরবে না। তারমধ্যে অর্জুন না থাকায় আমি ধৃষ্টদ্যুম্নের উপস্থিতিতেই সব সৈন্য হটিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে ফেলব। অর্জুনের অনুপস্থিতিতে আমাকে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির যদি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে না যায়, তাহলে ধরে নাও সে বন্দী হয়ে গেছে।'

আচার্যের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ এবং তাঁর ভ্রাতারা বললেন—'রাজন্! অর্জুন আমাদের সবসময় হেয় করেছে, সেই কথা স্মরণ করে আমরা দিন রাত ক্রোধে জ্বলছি। রাত্রে শান্তিতে ঘুমাতেও পারি না। সৌভাগ্যবশত যদি সে আমাদের সামনে এসে পড়ে তাহলে আমরা তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বধ করব। আমরা আপনার সামনে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ পৃথিবী হয় অর্জুনবিহীন হবে, নাহলে ত্রিগর্তবিহীন হবে—আমাদের এই কথার কোনো পরিবর্তন হবে না।' রাজন্! সত্যরথ, সত্যবর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু এবং সত্যকর্মা—এই পাঁচভাই এরূপ প্রতিজ্ঞা করে দশ হাজার রথ ও রথীসহ রওনা হলেন। তেমনই ত্রিশ হাজার রথী সৈন্যসহ মালব, মাবেল্লক, ললিত্থ ও মদ্রকবীরদের নিয়ে ভ্রাতাগণসহ ত্রিগর্তের প্রস্থলেশ্বর সুশর্মাও রণক্ষেত্রে রওনা হলেন। তারপর বিভিন্ন দেশের দশ হাজার শীর্ষস্থানীয় রথী শপথ করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা অগ্নি প্রজ্বলিত করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং অগ্নি সাক্ষী করেই দৃঢ়তা সহকারে প্রতিজ্ঞা করলেন। তাঁরা সকলকে শুনিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'আমরা যদি রণক্ষেত্রে অর্জুনকে বধ না করে তাঁর হাতে আহত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি, তাহলে ব্রতহীন, ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপ, গুরুপত্নী সংসর্গকারী, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণকারী, রাজঅন্ন হরণকারী, শরণাগতকে উপেক্ষাকারী, যাচককে প্রহারকারী, গৃহে অগ্নি সংযোগকারী, গো-ঘাতক, অপকারী, ব্রাহ্মণদ্রোহী, শ্রাদ্ধের দিন মিথুনকারী, আত্মপ্রবঞ্চক, গচ্ছিতের অর্থ অপহরণকারী, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী, নপুংসকের সঙ্গে যুদ্ধকারী, নীচব্যক্তির অনুসরণকারী, নাস্তিক, মাতা-পিতা ও অগ্নি ত্যাগকারী এবং নানাপ্রকার পাপকর্মকারী মানুষরা যে লোক প্রাপ্ত হয়, সেই লোক যেন আমরাও প্রাপ্ত হই, আর যদি আমরা সংগ্রামে অর্জুন-বধ রূপ দুষ্কর কর্ম করতে পারি, তবে নিঃসন্দেহে ইষ্টলোক প্রাপ্ত হই।' রাজন্ ! এই বলে তাঁরা যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে আহ্বান করে দক্ষিণের দিকে যাত্রা করলেন।

সেই বীরদের আহ্বান শুনে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ ! আমার নিয়ম হল যে, আমাকে কেউ যুদ্ধে আহ্বান করলে আমি পশ্চাদপদ হই না। আমাকে সংশপ্তক যোদ্ধারা যুদ্ধে আহ্বান করছে এবং ভ্রাতাসহ সুশর্মাও যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছে। সুতরাং আপনি আমাকে সেনাসহ এদের বিনাশ করার অনুমতি দিন, আমি এদের আস্ফালন সহ্য করতে পারছি না। আপনি বিশ্বাস করুন, এদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

যুধিষ্ঠির বললেন—ভ্রাতা ! দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা তো তুমি শুনেছই। এখন তুমি এমন উপায় করো যাতে তা পূর্ণ না হয়। দ্রোণাচার্য বলবান এবং শূরবীর। তিনি শস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম, যুদ্ধের কোনো পরিশ্রমই তাঁকে কাবু করে না। তিনি আমাকে বন্দী করার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তখন অর্জুন বললেন—রাজন্ ! এই সত্যজিৎ আজ আপনাকে রক্ষা করবে। এই পাঞ্চালরাজকুমার থাকতে আচার্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। এই পুরুষসিংহ যুদ্ধে নিহত হলে অন্য বীররা পাশে থাকলেও আপনি কখনো রণক্ষেত্রে অবস্থান করবেন না।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তাঁকে আলিঙ্গন করে, প্রীতিভরে তাঁর দিকে

তাকিয়ে তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন ত্রিগর্তের দিকে চললেন। অর্জুন অন্য দিকে চলে যাওয়ায় দুর্যোধনের সেনাদের অত্যন্ত আনন্দ হল এবং তারা উৎসাহের সঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার চেষ্টা করতে লাগল এবং বর্ষার জলস্ফীত নদীর ন্যায় সবেগে এগিয়ে গেল।

সংশপ্তকগণ একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের রথ চন্দ্রাকারে সাজিয়ে দাঁড়াল। অর্জুনকে সেইদিকে আসতে দেখে তারা উল্লসিত হয়ে কোলাহল করতে লাগল। সেই কোলাহল দিক-বিদিক ও আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের আনন্দ দেখে অর্জুন হেসে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'দেবকীনন্দন ! এই মরণাপন্ন ত্রিগর্তবন্ধুদের দেখুন, দুঃখের সময় আনন্দ করছে।' এই কথা বলে মহাবাহু অর্জুন ত্রিগর্তের ব্যূহবদ্ধ সেনাদের কাছে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেবদত্ত শঙ্খ বাজিয়ে তার গম্ভীর আওয়াজে সমস্ত দিক কাঁপিয়ে তুললেন। সেই শব্দে ভীত হয়ে সংশপ্তক সেনারা পাথরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের চেতনা ফিরে এলে, তারা একসঙ্গে অর্জুনের দিকে বাণ নিক্ষেপ করতে

লাগল। কিন্তু অর্জুন অনায়াসেই বাণের দ্বারা সেগুলি মধ্যপথেই প্রতিহত করলেন। তারা পুনরায় একযোগে বাণ নিক্ষেপ করলে অর্জুন তাদের বাণের দ্বারা আহত করলেন। তারা আরও পাঁচটি করে বাণ মারলে অর্জুন দুই দুই বাণে তার জবাব দিলেন।

সুবাহু তখন ত্রিশ বাণে অর্জুনের মুকুটে আঘাত করলেন, অর্জুন এক বাণে তার শিরস্ত্রাণ কেটে, বাণের দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। তখন সুশর্মা, সুরথ, সুধর্মা, সুধন্বা এবং সুবাহু দশটি করে বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। সেই বাণগুলিকে কেটে অর্জুন তাঁদের ধ্বজাগুলি খণ্ডিত করলেন। তারপর তিনি সুধন্বার ধনুক কেটে ফেলে তাঁর ঘোড়াগুলি বধ করলেন, তাঁর শিরস্ত্রাণ শোভিত মাথাটি কেটে দেহ থেকে পৃথক করে দিলেন। বীর সুধন্বা বধ হওয়ায় তাঁর অনুগামীরা ভীত হয়ে দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীর দিকে পালাতে লাগল। অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে ত্রিগর্তদের বিনাশ করছিলেন, তারা মৃগের ন্যায় ভয় পেয়ে যেখানে সেখানে অচেতন হয়ে পড়তে থাকল। ত্রিগর্তরাজ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মহারথীদের বললেন — 'শূরবীরগণ ! পালানো বন্ধ করো। ভয় পেয়ো না। সমস্ত সৈন্যের সামনে তোমরা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছ। এখন তোমরা দুর্যোধনের সেনার সামনে এই মুখ নিয়ে কী বলবে ? যুদ্ধে এমন কাজ করার পর, জগতে তোমাদের নিয়ে লোকে তামাসা করবে না ? সুতরাং ফিরে এসো, আমরা সকলে মিলে নিজেদের শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করি।' রাজার কথায় তারা হর্ষ প্রকাশ করে শঙ্খধ্বনি ও কোলাহল করতে লাগল। তারপর সংশপ্তক এবং নারায়ণসঞ্জ্ঞক গোপ বধ হলেও তারা পশ্চাদাপসরণ না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলো।

সংশপ্তকদের ফিরতে দেখে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে বললেন—'হৃষীকেশ ! ঘোড়াগুলি আবার সংশপ্তকদের দিকে নিয়ে চলুন। মনে হচ্ছে, দেহে প্রাণ থাকতে এরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যাবে না। আজ আপনি আমার অস্ত্রবল, ধনুক এবং হস্তকৌশল দেখুন। ভগবান শংকর যেমন প্রাণীসংহার করেন, আমিও আজ সেইভাবে এদের ধরাশায়ী করব।'

নারায়ণীসেনার বীররা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে চারদিক থেকে বাণজালে ঘিরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অদৃশ্য করে ফেলল। তাতে অর্জুনের ক্রোধাগ্নি বেড়ে উঠল। তিনি গাণ্ডীব ধনুক রেখে শঙ্খধ্বনি করলেন এবং তারপরে বিশ্বকর্মাস্ত্র ছুঁড়লেন। তাতে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের পৃথক পৃথক সহস্ররূপ প্রকটিত হল। নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীর অনেক রূপ দেখে নারায়ণী সেনা অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে একে অপরকে 'এ অর্জুন', 'এই কৃষ্ণ' বলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে

লাগল। সেই দিব্য অস্ত্রের মায়াতে পড়ে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেই মারা গেল। তাদের নিক্ষিপ্ত সহস্র বাণকে ভস্ম করে অর্জুনের অস্ত্র তাদের সকলকে যমলোকে নিয়ে গেল।

অর্জুন এবার হেসে তাঁর বাণ দিয়ে ললিথ, মালব, মাবেল্লক এবং ত্রিগর্ত বীরদের আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। কালের প্রেরণায় সেই ক্ষত্রিয় বীররাও অর্জুনকে নানা বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁদের সকলের বাণবর্ষণে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও রথ একেবারে ঢেকে গেল। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে করে সেই বীরগণ হর্ষের সঙ্গে বলতে লাগলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুন নিহত হয়েছে, তাঁরা ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ বাজিয়ে ভয়ানক সিংহনাদ করতে লাগলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ চেঁচিয়ে বললেন —'অর্জুন ! তুমি কোথায় ? আমি দেখতে পাচ্ছি না।' শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক বায়ব্যাস্ত্র ছুঁড়লেন। তাতে সমস্ত বাণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং বায়ুদেব সংশপ্তক বীরদের হাতি, ঘোড়া, রথসহ শুষ্ক পত্রের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। এইভাবে ব্যাকুল করে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে হাজার হাজার সংশপ্তকদের বধ করলেন। প্রলয়কালে যেমন ভগবান রুদ্রের সংহারলীলা সংঘটিত
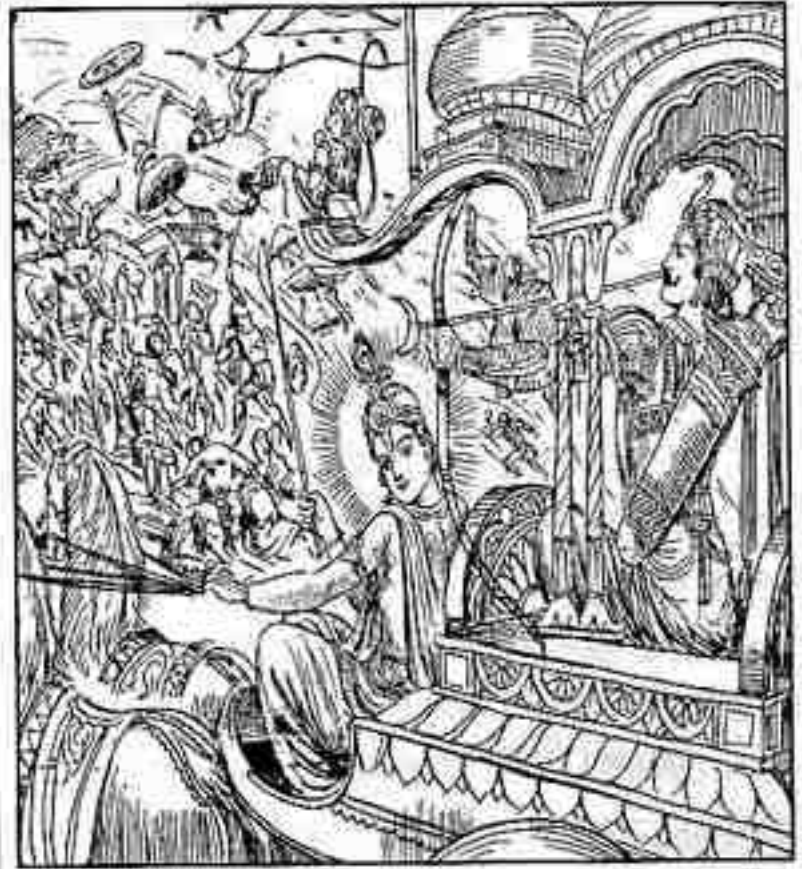
হয়, সেইরূপ অর্জুনও সেইসময় রণক্ষেত্রে অত্যন্ত বীভৎস এবং ভয়ানক কাণ্ড করছিলেন। অর্জুনের আঘাতে ব্যাকুল হয়ে ত্রিগর্তের হাতি, ঘোড়া, রথ তাঁদের দিকেই দৌড়ে যাচ্ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে যমের অতিথি হচ্ছিল। এইভাবে সমস্ত রণক্ষেত্র মৃত হাতি, ঘোড়া এবং মহারথীদের দেহে ভরে উঠল।

—o—

দ্রোণাচার্য কর্তৃক পাণ্ডবদের পরাজয় এবং বৃক, সত্যজিৎ, শতানীক বসুদান এবং ক্ষত্রদেব প্রমুখ বীর বধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সংশপ্তকদের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করতে চলে গেলে আচার্য দ্রোণ সৈন্য ব্যূহ রচনা করে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চললেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির আচার্যের সৈন্যদের গরুড়ব্যূহ দেখে তার মোকাবিলার জন্য মণ্ডলার্ধব্যূহ তৈরি করলেন। কৌরবদের গরুড়ব্যূহের মুখ্যস্থানে মহারথী দ্রোণ ছিলেন। মস্তক স্থানে ভ্রাতাগণসহ রাজা দুর্যোধন দাঁড়ালেন, চক্ষুস্থানে ছিলেন কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য। গ্রীবাস্থানে ভূতশর্মা, ক্ষেমশর্মা, করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, সিংহল, পূর্বদেশ, শূর, আভীর, দশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, হংসপথ, শূরসেন, দরদ, মদ্র এবং কেকয় প্রভৃতি দেশের বীর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাতি, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক সৈন্যরূপে দণ্ডায়মান ছিল। দক্ষিণদিকে অক্ষৌহিণী সেনাসহ ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লীক ছিলেন। বামদিকে অবন্তীনরেশ বিন্দ-অনুবিন্দ এবং কম্বোজনরেশ সুদক্ষিণ ছিলেন। তাঁদের পেছনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দাঁড়িয়ে ছিলেন। পৃষ্ঠভাগে কলিঙ্গ, অম্বষ্ঠ, মগধ, পৌণ্ড্র, মদ্র, গান্ধার, শকুন, পূর্বদেশ, পার্বত্য প্রদেশ, বসাতি প্রভৃতি দেশের বীররা ছিলেন। পুচ্ছস্থলে আপনার পুত্র এবং জাতি কুটুম্ব লোকেদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সৈন্য নিয়ে কর্ণ উপস্থিত ছিলেন, মধ্যে হৃদয়স্থলে জয়দ্রথ, সম্পাতি, ঋষভ, জয়, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ এবং নিষাধরাজ বিশাল সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এইরূপ পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথীসৈন্য আচার্য দ্রোণের নির্মিত গরুড়ব্যূহ ঋদ্ধে

উত্তাল সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছিল। ব্যূহের মধ্যভাগে হাতিতে উপবিষ্ট মহারাজ ভগদত্ত বালসূর্যের ন্যায় প্রতিভাত ছিলেন।

এই অজেয় এবং অতিমানুষিক ব্যূহ দেখে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'বীর ! তুমি এমন ব্যবস্থা করো, যাতে আমি দ্রোণাচার্যের হাতে বন্দী না হই।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—মহারাজ ! দ্রোণাচার্য যতই চেষ্টা করুন, তিনি আপনাকে বন্দী করতে পারবেন না। আমি আজ তাঁকে প্রতিরোধ করব। আমি জীবিত থাকতে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। দ্রোণাচার্য যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করতে পারবেন না।

মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলে বাণবর্ষা করে নিজেই দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। এই অশুভলক্ষণ[1] দেখে দ্রোণাচার্য একটু বিষণ্ণ হলেন। আপনার পুত্র দুর্মুখ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের গতিরোধ করলেন। দুই বীরে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। এঁরা যখন যুদ্ধ করছিলেন, তখন দ্রোণাচার্য তাঁর বাণে যুধিষ্ঠিরের সেনাদের ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিলেন। তাতে পাণ্ডবদের ব্যূহ কোনো কোনো স্থানে ভেঙে গেল এবং বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ হতে লাগল, কে আপন, কে পর বোঝা যাচ্ছিল না। এইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ যখন পূর্ণদ্যোমে চলছিল, ঠিক তখনই দ্রোণাচার্য সব বীরদের ছেড়ে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির আচার্যকে তাঁর সামনে আসতে দেখে নির্ভয়ে তাঁর সম্মুখীন হয়ে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় মহাবলী সত্যজিৎ তাঁকে রক্ষা করার জন্য আচার্যের দিকে এগোলেন। তিনি তাঁর অস্ত্রকৌশল দেখিয়ে এক তীক্ষ্ণ বাণে আচার্যকে আঘাত করলেন। পাঁচ বাণে তাঁর সারথিকে অচেতন করে দিলেন, দশ বাণে ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করে দশ দশ বাণে পার্শ্বচরদের বিদ্ধ করলেন। শেষে সত্যজিৎ আচার্যের ধ্বজাও কেটে ফেললেন। তখন আচার্য দ্রোণ দশটি মর্মভেদী বাণে তাঁকে ঘায়েল করে তাঁর ধনুক বাণ কেটে ফেললেন। সত্যজিৎ তৎক্ষণাৎ অন্য একটি বাণ নিয়ে আচার্যের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দ্রোণকে সত্যজিতের কব্জায় পড়তে দেখে পাঞ্চালদেশের বৃকও তাঁকে বহুবাণে আঘাত করলেন। পাণ্ডবরা তাই দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। বৃক এইসময় দ্রোণের বুকে ষাটটি বাণ মারলেন। আচার্য তখন সত্যজিৎ ও বৃকের ধনুক কেটে মাত্র ছয় বাণে বৃক, তার সারথি এবং ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। সত্যজিৎ আর একটি ধনুক নিয়ে দ্রোণাচার্যকে তাঁর সারথি এবং ঘোড়াগুলিসহ আহত করলেন আর তাঁর ধ্বজাও কেটে ফেললেন। সত্যজিতের আঘাতে আহত দ্রোণাচার্য সেটি সহ্য করতে না পেরে তাঁকে বধ করা জন্য বাণের বর্ষা শুরু করে দিলেন। তিনি তাঁর ঘোড়া, ধ্বজা, ধনুক, সারথি এবং পার্শ্বরক্ষকদের ওপর শত শত বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু সত্যজিৎ, বারংবার ধনুক দ্বিখণ্ডিত হলেও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যজিতের এই বীরত্ব দেখে আচার্য এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণে তাঁর মস্তক কেটে ফেললেন। পাঞ্চাল মহারথী নিধন হলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের ভয়ে অত্যন্ত বেগে ঘোড়া চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন।

আচার্যের সামনে এবার মৎস্যরাজ বিরাটের ছোটোভাই শতানীক এলেন। তিনি ছয় তীক্ষ্ণ বাণে সারথি ও ঘোড়াসহ দ্রোণকে বিদ্ধ করে জোরে গর্জন করে উঠলেন। পরে তিনি দ্রোণের ওপর আরও বাণ নিক্ষেপ করলেন। শতানীকের উৎসাহ দেখে আচার্য ক্ষিপ্রতা সহকারে এক ক্ষুরধার বাণ নিক্ষেপ করে তার কুণ্ডলশোভিত মস্তক কেটে ফেললেন। তা দেখে মৎস্য দেশের সব বীররা পালিয়ে গেল। মৎস্য বীরদের এইভাবে পরাজিত করে দ্রোণাচার্য চেদি, করূষ, কেকয়, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডব-বীরদেরও বার বার পরাজিত করলেন। অগ্নি যেমন বিশাল জঙ্গল জ্বালিয়ে দেয়, তেমনই ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্যও সেনাদের বিধ্বংস করছেন দেখে সৃঞ্জয় বীররা ভয়ে কেঁপে উঠল।

যুধিষ্ঠির যখন দেখলেন আচার্য আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন তখন তিনি চারদিক থেকে তাঁর ওপর পুনরায় আক্রমণ চালালেন। তারপর শিখণ্ডী, ক্ষত্রবর্মা, বসুদান, উত্তমৌজা, ক্ষত্রদেব, সাত্যকি, যুধামন্যু, যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেকিতান অসংখ্য বাণ মেরে তাঁকে আহত করতে লাগলেন। দ্রোণ তখন সর্বপ্রথম দৃঢ়সেনকে ধরাশায়ী করলেন। তারপর রাজা ক্ষেমকে ঘায়েল করলেন, তিনি নিহত হয়ে রথ থেকে পড়ে গেলেন। তারপর তিনি শিখণ্ডী ও উত্তমৌজাকে ঘায়েল করে এক ভল্ল বাণে বসুদানকে যমরাজের ঘরে পাঠালেন। ক্ষত্রবর্মা এবং সুদক্ষিণকে বাণের দ্বারা আহত করে ভল্লের সাহায্যে ক্ষত্রদেবকে রথের

[1]ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতেই দ্রোণ বধ হওয়ার ছিল, তাই শুরুতেই তাকে সামনে আসাকে দ্রোণাচার্য অশুভ লক্ষণ বলে মনে করলেন।

নীচে ফেলে দিলেন। বাণের আঘাতে যুধামন্যুকে ও সাত্যকিকে আহত করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সামনে চলে এলেন। তাই দেখে যুধিষ্ঠির তাঁর ঘোড়াগুলিকে নিয়ে সবেগে রণক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন, তখন আচার্যের সামনে এক পাঞ্চাল রাজকুমার এসে দাঁড়ালেন। আচার্য তৎক্ষণাৎ তাঁর ধনুক কেটে দিলেন। পরে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলির সঙ্গে তাঁকেও বধ করলেন। সেই রাজকুমারের মৃত্যু হলে চারদিক থেকে 'দ্রোণকে বধ করো', 'দ্রোণকে বধ করো', কোলাহল শোনা যেতে লাগল। কিন্তু দ্রোণাচার্য সেইসব ক্রোধোন্মত্ত পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয়, সৃঞ্জয়, পাণ্ডব বীরদের অত্যন্ত ভয় পাইয়ে দিলেন। তিনি কৌরব সেনাদ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বৃদ্ধক্ষেম এবং চিত্রসেনের পুত্র, সেনাবিন্দু এবং সুবর্চা—এই সমস্ত বীর এবং অন্যান্য রাজাদের পরাস্ত করলেন এবং আপনার পক্ষের অন্য যোদ্ধারাও সেই মহাসমরে পাণ্ডবদের বধ করতে লাগলেন।

—০—

দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করার জন্য কৌরব এবং পাণ্ডব বীরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কিছুক্ষণ পরেই পাণ্ডবদের সৈন্যদল ফিরে এসে দ্রোণকে ঘিরে ধরল, তাদের পদধূলিতে সমস্ত দিগন্ত আচ্ছাদিত হয়ে গেল। এই অন্ধকারে আমরা মনে মনে ভয় পেয়ে ভাবলাম আচার্য নিহত হয়েছেন। দুর্যোধন তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন 'যেমন করে পারো, পাণ্ডব সৈন্যদের প্রতিরোধ করো।' তখন আপনার পুত্র দুর্মর্ষণ ভীমসেনকে দেখে তাঁর প্রাণ নেওয়ার জন্য বাণবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর বাণে ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করে দিলেন, ভীমসেন তাঁকে বাণের দ্বারা ঘায়েল করলেন। দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। প্রভুর নির্দেশপেয়ে কৌরবপক্ষের সমস্ত শূরবীর যোদ্ধা নিজ প্রাণ ও রাজ্যের মায়া ত্যাগ করে শত্রুর সামনে হাজির হলেন। শূরবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্যকে বন্দী করার জন্য আসছিলেন, কৃতবর্মা তাঁকে আটকালেন। ক্ষত্রবর্মাও এগিয়ে আসছিলেন ; জয়দ্রথ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে প্রতিহত করলেন। ক্ষত্রবর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে জয়দ্রথের ধনুক ও ধ্বজা কেটে দিয়ে নারাচের দ্বারা তাঁর মর্মস্থানে আঘাত করলেন। জয়দ্রথ তখন অন্য বাণ দিয়ে ক্ষত্রবর্মার ওপর বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন।

মহারথী যুযুৎসুও দ্রোণাচার্যের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছিলেন, সুবাহু তাঁর গতিরোধ করেন। যুযুৎসু দুটি ক্ষুরের ন্যায় তীরে তাঁর দুটি হাত কেটে ফেলেন। মদ্ররাজ শল্য ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের পথরোধ করেন। ধর্মরাজ তাঁর ওপর বহু সংখ্যক মর্মভেদী বাণ ছোঁড়েন, কিন্তু মদ্রনরেশ তাঁকে চৌষট্টি বাণে আঘাত করে সিংহনাদ করে উঠলেন। যুধিষ্ঠির তখন দুটি বাণে তাঁর ধনুক ও ধ্বজা কেটে ফেললেন। রাজা দ্রুপদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে দ্রোণের দিকে আসছিলেন। রাজা বাহ্লীক ও তাঁর সেনারা বাণবর্ষণ করে তাঁদের গতিরোধ করেন। দুই বৃদ্ধ রাজা এবং তাঁর সেনাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। অবন্তীরাজ বিন্দ এবং অনুবিন্দ তাঁদের সেনা নিয়ে মৎস্যরাজ বিরাট এবং তাঁর সেনাদের আক্রমণ করলেন। দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাঁদের যুদ্ধ বড় ভয়ানক ছিল। মৎস্য বীরদের সঙ্গে কেকয় বীরদের ভীষণ যুদ্ধ হল, যাতে অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথী—সকলেই নির্ভয়ে যুদ্ধ করছিল।

এক দিকে নকুলের পুত্র শতানীক বাণবর্ষণ করতে করতে আচার্যের দিকে এগোচ্ছিলেন, ভূতকর্মা তাঁর গতিরোধ করেন। শতানীক তখন ক্ষুরধার তিন বাণের সাহায্যে ভূতকর্মার মস্তক ও বাহু কেটে ফেলেন। ভীমসেনের পুত্র সুতসোম বাণবর্ষণ করে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, বিবিংশতি তাঁর গতিরোধ করেন। কিন্তু সুতসোম সোজা লক্ষ্যভেদকারী বাণের সাহায্যে খুল্লতাতকে বিদ্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। সেই সময় ভীমরথ ছটি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে শাল্বকে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিসহ যমলোকে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রুতকর্মাও রথে চড়ে দ্রোণের দিকেই আসছিলেন, চিত্রসেনের পুত্র তাঁর রাস্তা আটকালেন। আপনার দুই পৌত্র একে অপরকে বধ করার ইচ্ছায় ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা দেখলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য দ্রোণের কাছে পৌঁছে গেছেন, তিনি তাঁদের

মাঝখানে এসে তাঁকে আটকালেন। তাঁকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবিন্ধ্য তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। দ্রৌপদীর সব পুত্ররাই তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে জর্জরিত করে তুললেন। অর্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্তিকে দ্রোণের দিকে যাওয়ার পথে দুঃশাসনের পুত্র পথ রোধ করলেন। তিনি পিতৃসম বীর ছিলেন ; তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে প্রতিপক্ষের ধনুক, ধ্বজা এবং সারথিকে বিদ্ধ করে দ্রোণাচার্যের সামনে গিয়ে পৌঁছলেন।

রাজন্ ! পটচ্চর রাক্ষস বধকারী সেই বীরকে দুই সেনাবাহিনীতেই বহু মান্য করা হত। তাকে লক্ষ্মণ আটকালেন। তিনি লক্ষ্মণের ধনুক ও ধ্বজা কেটে তাঁর ওপর বহু বাণবর্ষণ করেন। দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডীর গতিরোধ করেন মহামতি বিকর্ণ। শিখণ্ডী বাণের জাল বিস্তার করে তাঁকে প্রতিহত করেন। কিন্তু আপনার বীরপুত্র তখনই তা ছিন্নভিন্ন করেন। উত্তমৌজা আচার্যের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন, অঙ্গদ তাঁর গতিরোধ করেন। দুই পুরুষ সিংহের ভয়ানক যুদ্ধ দেখে সকল সেনা বাহবা দিতে থাকে। মহা ধনুর্ধর দুর্মুখ পুরুজিৎকে আচার্যের দিকে যাওয়ার পথ আটকান, পুরুজিৎ তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে বাণ মারেন। কর্ণ পাঁচজন কেকয় ভাইয়ের গতিরোধ করেন। তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কর্ণও কয়েকবার তাঁদের বাণজালে আচ্ছাদিত করে দিলেন। এইভাবে তাঁদের মধ্যে বাণবর্ষণ চলতে থাকায় ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা ও রথসহ সব কিছু চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল। আপনার তিন পুত্র দুর্জয়, বিজয় ও জয়নীল, কাশ্য ও জয়ৎসেনের গতিরোধ করলেন। এইভাবে ক্ষেমধূর্তি এবং বৃহৎ—এই দুই ভাই দ্রোণের দিকে এগিয়ে আসা সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করলেন। এই দুজনের সঙ্গে সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ হল। রাজা অম্বষ্ঠ একাই আচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। চেদিরাজ তাঁকে বাণের দ্বারা প্রতিহত করলেন। অম্বষ্ঠ তখন এক অস্থিভেদিনী শলাকার দ্বারা চেদিরাজকে আঘাত করলেন। বৃষ্ণিবংশের বৃদ্ধক্ষেমের পুত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আচার্য কৃপ বাণের দ্বারা তাঁর গতি রোধ করলেন। এঁরা দুজনেই নানাপ্রকার যুদ্ধ কৌশল জানতেন। সেসময় যাঁরা এঁদের যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা তাতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা দ্রোণের দিকে আসা রাজা মণিমানের সঙ্গে মোকাবিলা করলেন। মণিমান অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা সহকারে ভূরিশ্রবার ধনুক, ধ্বজা, সারথি এবং ছত্র কেটে ফেললেন। তখন ভূরিশ্রবা রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রুততার সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা এবং রথের সঙ্গে তাঁর গলা কেটে ফেললেন। তারপর তিনি রথে উঠে অন্য ধনুক নিয়ে নিজেই ঘোড়া চালিয়ে পাণ্ডব সৈন্য বধ করতে লাগলেন। এরূপ দুর্জয় বীর আসতে দেখে পাণ্ডবদের মহাবলী বৃষসেন বাণবর্ষণ করে তাঁদের গতিরোধ করলেন।

তখন দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করার জন্য ঘটোৎকচ গদা, তলোয়ার, লাঠি, লৌহদণ্ড, পাথর, ভুশুণ্ডী, বাণ, মুশল, মুদগর, চক্র, ফরসা, ধুলা, বায়ু, অগ্নি, জল, ভস্ম, তৃণ এবং বৃক্ষাদির সাহায্যে সেনাদের ঘায়েল করে এই দিকে এগিয়ে এলেন। রাক্ষসরাজ অলম্বুষ তাঁর ওপর নানাপ্রকার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন। দুই রাক্ষস বীরের মধ্যে ভয়ানক সংগ্রাম হতে লাগল।

এইভাবে আপনার ও পাণ্ডবদের সেনার রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক শত শত সৈনিক নিহত হল। এইসময় দ্রোণকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে যুদ্ধ হল, তা কেউ কখনো দেখেনি বা শোনেনি। রাজন্ ! বহু রণাঙ্গনে যুদ্ধ হচ্ছিল, কোথাও ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল, কোথাও বিচিত্র রকম যুদ্ধ হচ্ছিল।

ভগদত্তের বীরত্ব, অর্জুন দ্বারা সংশপ্তকদের বিনাশ ও ভগদত্ত বধ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! পাণ্ডবরা যখন যুদ্ধের জন্য ফিরে এলেন তখন আমার পুত্রদের সঙ্গে তাদের কেমন যুদ্ধ হল ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সকলে যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন গজারোহী সেনাদল নিয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধকুশল ভীম অল্পক্ষণেই সেই গজসেনার ব্যূহ ভেঙে দিলেন। তাঁর বাণে হাতিদের সমস্ত শক্তি গুঁড়িয়ে গেল, তারা মুখ ফিরিয়ে পালাতে

লাগল। সমস্ত সৈন্যদের ভীমসেন এইভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। তাই দেখে দুর্যোধনের ক্রোধ বেড়ে গেল, তিনি ভীমসেনের সামনে এসে তীক্ষ্ণবাণে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই ভীম বাণবর্ষণ করে তাঁকে ঘায়েল করলেন এবং অন্য দুটি বাণে দুর্যোধনের ধ্বজার বিচিত্র মণিময় হাতি এবং ধনুক কেটে দিলেন। দুর্যোধনকে বিপদে পড়তে দেখে অঙ্গদেশের রাজা হাতিতে চড়ে ভীমসেনের সামনে এলেন। তাঁর হাতিকে আসতে দেখে ভীমসেন বাণবর্ষণ করে তার মাথায় আঘাত হানলেন। সেই আঘাতে হাতি মাটিতে পড়ে গেল, হাতি পড়ে যেতে অঙ্গরাজও মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভীমসেন এক বাণে তাঁর মাথা উড়িয়ে দিলেন। তাই দেখে তাঁর সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর এক বিশালকায় ঐরাবতের বংশোদ্ভব গজরাজে চড়ে প্রাগ্জ্যোতিষ নরেশ ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। তাঁর হাতি ক্রুদ্ধ হয়ে সামনের দুই পা ও শুঁড় দিয়ে ভীমসেনের ঘোড়াগুলি এবং রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধ[১] জানতেন। তাই তিনি পালিয়ে না গিয়ে, দৌড়ে হাতির কাছে গিয়ে তার পেটের নীচে ঢুকে পেট চাপড়াতে লাগলেন। সেই গজরাজটির দশ হাজার হাতির সমান শক্তি ছিল এবং সেই ভীমসেনকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল, তাই সে অত্যন্ত বেগে কুমোরের চাকের মতো ঘুরতে লাগল। তখন ভীমসেন তার পেটের নীচে থেকে বেরিয়ে সামনে এলেন। হাতি তাঁকে শুঁড় দিয়ে ফেলে হাঁটু দিয়ে পিষতে শুরু করল। ভীমসেন তখন তার শুঁড়ের নীচে থেকে বার হয়ে শরীরের নীচে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে বেরিয়ে সবেগে সেখান থেকে দূরে চলে গেলেন। তাই দেখে সৈন্যদের মধ্যে কোলাহল শুরু হয়ে গেল, পাণ্ডবদের সৈন্যরা সেই হাতিকে অত্যন্ত ভয় পেয়ে যেখানে ভীমসেন দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইখানে চলে গেল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পাঞ্চালবীরদের সঙ্গে নিয়ে রাজা ভগদত্তকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে তাঁর ওপর হাজার হাজার বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভগদত্ত পাঞ্চালবীরদের সেই আঘাত তাঁর অঙ্কুশের সাহায্যে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর হাতির দ্বারাই পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বীরদের আহত করতে লাগলেন। ভগদত্তের অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল। তখন দশার্ণ দেশের রাজা হাতির পিঠে ভগদত্তের সামনে এলেন। দুই হাতির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। ভগদত্তের হাতি একটু পিছন হটে এমন জোরে ধাক্কা মারল যে দশার্ণরাজের হাতির হাড় ভেঙে গেল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন ভগদত্ত ক্ষুরধার অস্ত্রের সাহায্যে দশার্ণরাজকে বধ করলেন।

যুধিষ্ঠির বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভগদত্তকে ঘিরে

[১]হাতির পেটের এক বিশেষ স্থানে হাত দিয়ে আস্তে থাপ্পড় মারাকে বলা হয় 'অঞ্জলিবেধ'। হাতি এটি খুব পছন্দ করে এবং মাহুত তাকে ডাকলেও সে আর এগোয় না। এই কাজের দ্বারা ভীমসেন তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে যাওয়া ভগদত্তের হাতিকে নিজের বশ করে নিলেন।

ধরলেন। কিন্তু প্রাগজ্যোতিষনরেশ হাতিকে সাত্যকির রথের ওপর চালিয়ে দিলেন। হাতি তাঁর রথটি তুলে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সাত্যকি রথ থেকে নেমে পালিয়ে গেলেন। তখন কৃতীর পুত্র রুচিপর্বা ভগদত্তের সামনে এলেন। তিনি রথের ওপর থেকে কালের ন্যায় বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভগদত্ত এক বাণেই তাঁকে যমলোকে পাঠালেন। বীর রুচিপর্বার মৃত্যুর পর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্ররা, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং যুযুৎসু প্রমুখ যোদ্ধা ভগদত্তের হাতিকে উত্যক্ত করতে লাগলেন এবং তাকে শেষ করার জন্য তাঁরা হাতির ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু যখন মাহুত অঙ্কুশ এবং আঙুলের সাহায্যে তাকে উৎসাহিত করল, তখন সে শুঁড় উঁচিয়ে এবং চক্ষু ও কান স্থির রেখে শত্রুদের দিকে ছুটে চলল। সে যুযুৎসুর ঘোড়াগুলিকে পদদলিত করে সারথিকে মেরে ফেলল। যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ রথ থেকে নেমে পালিয়ে গেলেন।

তখন অভিমন্যু, যুযুৎসু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং ধৃষ্টকেতু বাণের আঘাতে তাঁকে ঘায়েল করলেন। শত্রুদের বাণে সে খুব আহত হল। মাহুত তাকে আবার এগিয়ে নিয়ে গেল। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সে শত্রুদের শুঁড়ে তুলে ডাইনে বামে ফেলতে লাগল। তাতে সব বীরই ভয় পেয়ে গেল। গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী সব রাজারাই ভয়ে পালাতে লাগলেন। তাদের কোলাহলের গর্জন শোনা যেতে লাগল। ভীষণ বায়ুর বেগে আকাশ ও সৈনিক সমস্ত ধুলায় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল।

ভগদত্ত এইরূপ যখন তাঁর পরাক্রম দেখাচ্ছিলেন তখন অর্জুন আকাশে ধুলার ঝড় এবং হাতির বৃংহতি রব শুনে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মধুসূদন ! মনে হচ্ছে প্রাগজ্যোতিষ নরেশ ভগদত্ত আজ হাতিতে চড়ে আক্রমণ করেছেন। এই বৃংহতি রব নিশ্চয়ই তাঁর হাতির ! আমার মনে হয় তিনি যুদ্ধে ইন্দ্রের থেকে কম পরাক্রমশালী নন। এঁকে গজারোহীদের মধ্যে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। আজ উনি একাই পাণ্ডবদের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করে দেবেন। আমরা দুজন ব্যতীত আর কেউই এঁর গতিরোধ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং শীঘ্র ওদিকে চলুন।'

অর্জুনের কথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রথ সেই দিকে নিয়ে চললেন যেদিকে ভগদত্ত পাণ্ডবসেনা সংহার করছিলেন। তাঁদের যেতে দেখে চৌদ্দ হাজার সংশপ্তক, দশ হাজার ত্রিগর্ত এবং চার হাজার নারায়ণী সৈন্য বীর পেছন থেকে তাঁকে ডাকতে লাগল। অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, তিনি ভাবতে লাগলেন 'আমি সংশপ্তকদের দিকে ফিরব না রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে যাব ? এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি বিশেষ হিতকর হবে ?' শেষে তিনি সংশপ্তকদের আগে বধ করারই সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একাই হাজার হাজার বীরদের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে সংশপ্তকদের দিকে ফিরে এলেন।

সংশপ্তক মহারথীরা এক সঙ্গে হাজার হাজার বাণ অর্জুনের দিকে ছুঁড়লেন। তাতে সব কিছু ঢেকে যাওয়ায় অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁদের ঘোড়া, রথ সব অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন অর্জুন মুহূর্তের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা সব নষ্ট করে দিলেন। তারপর তাঁর বাণের আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু ধ্বজা, ঘোড়া, সারথি, হাতি, মাহুত টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রইল। অস্ত্র ধরা বহু হাত এদিক ওদিক কেটে পড়ছিল। অর্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন—'পার্থ ! আজ তুমি যে পরাক্রম দেখিয়েছ, আমার বিচারে তা ইন্দ্র, যম এবং কুবেরের দ্বারা হওয়াও কঠিন। আমি নিজে শত শত, হাজার হাজার সংশপ্তক বীরদের একসঙ্গে পতন প্রত্যক্ষ করেছি।'

ওখানে যেসব সংশপ্তক বীর ছিল, তাদের অধিকাংশকে বধ করে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'এবার ভগদত্তের দিকে চলুন।' শ্রীমাধব তখন সবেগে ঘোড়াগুলি দ্রোণাচার্যের সেনার দিকে চালালেন। তা দেখে সুশর্মা তাঁর ভাইদের নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অচ্যুত ! দেখুন, এদিকে সুশর্মা তার ভাইদের নিয়ে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে আর অন্যদিকে উত্তর কোণে আমাদের সৈন্য সংহার হচ্ছে। আপনি বলুন, এরমধ্যে কোনটি করা আমার পক্ষে বিশেষ জরুরি ?' তাঁর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার দিকে রথ ঘোরালেন। অর্জুন তৎক্ষণাৎ সাত বাণে সুশর্মাকে বিদ্ধ করে তার ধনুক এবং ধ্বজা কেটে ফেললেন। তারপর ছয় বাণে তার ভাইকে সারথি ও ঘোড়াসহ যমলোকে পাঠালেন। সুশর্মা তখন অর্জুনের দিকে এক শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের দিকে তোমর নিক্ষেপ করেন। অর্জুন তিনটি বাণে শক্তি ও তোমর দুটিই কেটে ফেলে বাণের আঘাতে সুশর্মাকে অচেতন করে দ্রোণের দিকে ফিরে চললেন।

তিনি বাণবর্ষণ করে কৌরব সেনাদের আচ্ছাদিত করে ভগদত্তের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভগদত্ত মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ হাতির উপরে ছিলেন। তিনি অর্জুনের ওপর বাণ-বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন মধ্যপথে সব বাণ কেটে ফেললেন। ভগদত্ত তখন অর্জুনের বাণ প্রতিহত করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

অর্জুন তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন এবং অঙ্গরক্ষকদের মেরে ফেলে দিয়ে ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভগদত্ত অর্জুনের ওপর অস্ত্রপ্রয়োগ করলে অর্জুন অস্ত্রগুলি টুকরো করে দিলেন। তারপর অর্জুন ভগদত্তের হাতির বর্ম কেটে ফেললেন। ভগদত্ত তখন শ্রীকৃষ্ণের ওপর এক লৌহ শক্তি নিক্ষেপ করেন, অর্জুন সেটিও দুটুকরো করে ফেলেন এবং ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজা কেটে তাঁকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। ভগদত্ত তাতে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হয়ে ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের মাথায় বাণ দ্বারা আঘাত করলেন, তাতে অর্জুনের শিরস্ত্রাণটি বেঁকে গেল। সেটিকে ঠিক করতে করতে অর্জুন ভগদত্তকে বললেন—'রাজন্! তুমি প্রাণভরে এই জগৎকে দেখে নাও।' তাই শুনে ভগদত্ত ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অর্জুন ক্ষিপ্রতা সহকারে তাঁর ধনুক এবং তূণীর কেটে ফেলে বাহাত্তর বাণে তাঁর মর্মস্থান বিদ্ধ করলেন। তাতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ভগদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র আবাহন করে তার দ্বারা অঙ্কুশ অভিমন্ত্রিত করে সেটি অর্জুনের বুক লক্ষ্য করে চালালেন। ভগদত্তের সেই অস্ত্র ছিল সর্বনাশকারক, তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আড়াল করে সেটি নিজের বুকে গ্রহণ করলেন। অর্জুন এতে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'প্রভু! আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আপনি যুদ্ধ না করে সারথির কাজ করবেন ; কিন্তু আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করছেন না। আমি যদি বিপদে পড়তাম, অথবা অস্ত্রনিবারণে অসমর্থ হতাম, তাহলে আপনার এই কাজ করা উচিত ছিল। আপনি তো জানেন যে আমার হাতে যদি ধনুর্বাণ থাকে তাহলে দেবতা, অসুর, মানুষসহ সমস্ত জগৎ জয় করতে আমি সক্ষম।'

সেই কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রহস্যপূর্ণ কথা বললেন—'কুন্তীনন্দন ! শোনো, আমি তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলছি, যা পূর্বে ঘটেছিল। আমি চার প্রকার রূপ ধারণ করে সর্বদা সমস্ত জগৎ রক্ষায় তৎপর থাকি। নিজেই বহুরূপে বিভক্ত হয়ে জগতের হিত করি। ('নারায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ) আমার এক মূর্তি এই পৃথিবীতে থেকে তপস্যা করে, দ্বিতীয় মূর্তি জগতের শুভাশুভ কর্মের ওপর দৃষ্টি রাখে, তৃতীয় পৃথিবীতে এসে নানাপ্রকার কর্ম করে এবং চতুর্থ, যে হাজার বছর জলে শয়ন করে। আমার সেই চতুর্থ মূর্তি যখন হাজার বছর পর শয়ন থেকে উত্থিত হয়, তখন বর পাওয়ার উপযুক্ত ভক্তগণ এবং ঋষি-মহর্ষিগণকে উত্তম বর প্রদান করেন। একবার সেই সময়ে পৃথিবী দেবী আমার কাছে বর প্রার্থনা করেন যে 'আমার পুত্র (নরকাসুর) দেবতা ও অসুরদের অবধ্য হোক এবং তার কাছে যেন বৈষ্ণবাস্ত্র থাকে।' পৃথিবীর ইচ্ছা শুনে আমি তার পুত্রকে অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়ে বলেছিলাম—'পৃথিবী ! এই অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র নরকাসুরের রক্ষার জন্য তার কাছে থাকবে, এখন ওকে আর কেউ মারতে পারবে না।' পৃথিবীর মনোস্কামনা পূর্ণ হয় এবং তিনি 'তাই হবে' বলে চলে গেলেন। নরকাসুরও দুর্ধর্ষ হয়ে শত্রুদের সন্তপ্ত করতে থাকে। অর্জুন ! আমার সেই বৈষ্ণবাস্ত্র ভগদত্ত নরকাসুরের কাছ থেকে পেয়েছে। ইন্দ্র এবং রুদ্র প্রমুখ দেবতাসহ জগতে এমন কেউ নেই যে এর আঘাত সহ্য করতে পারে। তাই তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই আমি এই অস্ত্রের আঘাত সহ্য করে তাকে ব্যর্থ করেছি। ভগদত্তের কাছে আর এই অস্ত্র নেই, সুতরাং তুমি এখন এই অসুরকে বধ করো।'

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলায় অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করে ভগদত্তকে আচ্ছাদিত করলেন এবং হাতির কুম্ভস্থলের মধ্যে বাণ মারলেন। সেই বাণ পুচ্ছসমেত তার মাথায় ঢুকে গেল। তখন রাজা ভগদত্ত তাকে চালাতে চাইলেও সে আর না চলে আর্ত স্বরে চীৎকার করতে করতে প্রাণত্যাগ করল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বললেন—'পার্থ ! ভগদত্তের অনেক বয়স হয়েছে, এর মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। চক্ষু পলক খুলতে না পারার জন্য চোখ প্রায় বন্ধই থাকে ; এখন ইনি চোখ খোলা রাখার জন্য কাপড়ের পটি দিয়ে চোখের পলক কপালে বেঁধে রেখেছেন।'

ভগবানের কথায় অর্জুন বাণ নিক্ষেপ করে ভগদত্তের

কপালের কাপড়ের পটি কেটে দিলেন, সেটি কাটতেই ভগদত্তের চোখ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণ মেরে অর্জুন রাজা ভগদত্তের বক্ষ ভেদ করলেন। তাঁর হৃদয় ফেটে গেল, প্রাণপাখি উড়ে গেল, হাত থেকে ধনুক বাণ ছিটকে পড়ে গেল। প্রথমে তাঁর মাথা থেকে পাগড়ি খসে পড়ল, তারপর তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। অর্জুন এইভাবে যুদ্ধে ইন্দ্রসখা ভগদত্তকে বধ করলেন এবং কৌরব পক্ষের অন্যান্য যোদ্ধাদেরও সংহার করলেন।

বৃষক, অচল এবং নীল প্রমুখকে বধ ; শকুনি এবং কর্ণের পরাজয়

সঞ্জয় বললেন—ভগদত্তকে বধ করে অর্জুন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। অন্যদিক থেকে গান্ধাররাজ সুবলের দুই পুত্র বৃষক এবং অচল এসে যুদ্ধে অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। একজন অর্জুনের সামনে দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয়জন পিছনে, দুজনেই এক সঙ্গে অর্জুনকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুন তখন তীক্ষ্ণ বাণের

দ্বারা বৃষকের সারথি, ধনুক, ছত্র, ধ্বজা, রথ এবং ঘোড়ার ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন। তারপর নানাপ্রকার অস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ করে গান্ধার দেশের যোদ্ধাদের ব্যাকুল করে তুললেন। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পাঁচ শত গান্ধারবীরকে যমলোকে পাঠালেন।

বৃষকের রথের ঘোড়াগুলি মারা যাওয়ায় তিনি নিজ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁর ভাই অচলের রথে গিয়ে উঠলেন এবং অন্য একটি ধনুক হাতে নিলেন। তারপর দুভাই বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁরা দুজনে একই রথে বসে ছিলেন, সেই অবস্থায় অর্জুন দুভাইকে একসঙ্গে বধ করলেন। তাঁরা একই সঙ্গে রথ থেকে পড়ে গেলেন। রাজন্ ! নিজের দুই মাতুলকে মারা যেতে দেখে আপনার পুত্র ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভাইদের মৃত্যুমুখে পতিত দেখে মায়াবী শকুনি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে মোহমুগ্ধ করার জন্য মায়ার সৃষ্টি করলেন। সেই সময় সবদিক থেকে অর্জুনের ওপর লোহার গোলা, পাথর, শতঘ্নী, গদা, শক্তি ইত্যাদি নানা অস্ত্রবর্ষণ হতে লাগল। গাধা, উট, সিংহ, বাঘ, চিতা, বাঁদর, সাপ ইত্যাদি নানাপ্রকার জন্তু-জানোয়ার, রাক্ষস ও পাখিরা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুধার্ত হয়ে সবদিক থেকে অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অর্জুন দিব্য অস্ত্রের জ্ঞাতা ছিলেন, তিনি বাণবৃষ্টি করে সেই সব জীবদের প্রতিহত করতে লাগলেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে এই সব প্রাণী ভয়ানক চিৎকার করতে করতে বিনাশপ্রাপ্ত হল। এরমধ্যে অর্জুনের রথে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তারমধ্যে এক ক্রূর কথা শোনা গেল। অর্জুন 'জ্যোতিষ' নামক অত্যন্ত উত্তম অস্ত্র প্রয়োগ করে সেই ভয়ংকর অন্ধকার নাশ করলেন। অন্ধকার দূর হতেই সেখানে ভীষণ জলধারা প্রবাহিত হল। অর্জুন তখন

'আদিত্যাস্ত্র' প্রয়োগ করে জলপ্রবাহ শুষ্ক করে দিলেন। শকুনি এইভাবে অনেক মায়া রচনা করলেও অর্জুন অনায়াসে তাঁর অস্ত্রবলে সেসব নাশ করে দিলেন। সমস্ত মায়া যখন সম্পূর্ণভাবে নাশ হল এবং শকুনি অর্জুনের বাণে ভয়ানকভাবে আহত হলেন, তখন তিনি ভীত হয়ে রণভূমি ত্যাগ করলেন।

তারপর অর্জুন কৌরব সেনা ধ্বংস করতে লাগলেন। তিনি বাণবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে চললেন, কোনো ধনুর্ধর বীর তাঁকে আটকাতে পারলেন না। অর্জুনের আঘাতে আহত হয়ে আপনার সেনারা এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। সেই সময় হতবুদ্ধি হয়ে আপনার বহু সৈন্য নিজেদের পক্ষের যোদ্ধাদেরই বধ করে ফেলল। অর্জুন হাতি, ঘোড়া এবং মানুষের ওপর একবারই বাণ নিক্ষেপ করতেন, তাতেই আহত হয়ে তারা প্রাণত্যাগ করত। মৃত মানুষ, হাতি, ঘোড়ার দেহে রণক্ষেত্র পূর্ণ হয়ে গেল। সকল যোদ্ধাই বাণের আঘাতে ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগল। পিতা পুত্রের, পুত্র পিতার এবং বন্ধু বন্ধুর কথা চিন্তা না করে, একে অপরকে ছেড়ে চলে যেতে থাকল।

অন্যদিকে দ্রোণাচার্য তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে পাণ্ডবসেনাদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য যখন যোদ্ধাদের বাণের আঘাতে জর্জরিত করছিলেন সেই সময়েই সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এসে চারদিক দিয়ে দ্রোণকে ঘিরে ধরলেন। দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। অন্যদিকে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রাজা নীল তাঁর বাণে কৌরবসেনাদের ভস্ম করতে লাগলেন। তাঁকে এইভাবে সংহার করতে দেখে অশ্বত্থামা হেসে বললেন—'নীল! তুমি বাণাগ্নির সাহায্যে এই যোদ্ধাদের কেন ভস্ম করছ ? সাহস থাকে তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।' এই আস্ফালন শুনে নীল অশ্বত্থামাকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। অশ্বত্থামা তিন বাণে নীলের ধনুক, ধ্বজা এবং ছত্র কেটে দিলেন। তখন নীল হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে অশ্বত্থামার মাথা কাটতে গেলেন কিন্তু অশ্বত্থামা তার মধ্যেই এক ভল্লের আঘাতে নীলের কুণ্ডলসহ মস্তক দেহচ্যুত করে দিলেন। নীল মাটিতে পড়ে গেলেন, তাঁর মৃত্যুতে পাণ্ডবসেনারা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন।

এরমধ্যে অর্জুন বহু সংশপ্তকদের বধ করে দ্রোণাচার্য যেখানে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছিলেন সেখানে এসে কৌরব যোদ্ধাদের তাঁর বাণের আঘাতে উৎপীড়িত করতে লাগলেন। তাঁর বাণের আঘাতে বহু গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক মৃত্যুবরণ করল। বহু সৈন্য আহত হয়ে চীৎকার করতে লাগল। যারা আহত হয়ে পালাতে লাগল, যুদ্ধের নিয়ম মেনে অর্জুন তাদের বধ করলেন না। পালাতে পালাতে তারা 'হা কর্ণ!' 'হা কর্ণ!' বলে চীৎকার করছিল। সেই শরণার্থীদের ক্রন্দন শুনে—'বীরগণ ! ভয় পেয়ো না'—বলে কর্ণ অর্জুনের সম্মুখীন হতে এলেন। কর্ণ অস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি তখন আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলেন ; কিন্তু অর্জুন তা প্রতিহত করলেন। এইভাবে কর্ণও অর্জুনের তেজঃপূর্ণ বাণ নিজ অস্ত্রদ্বারা নিবারণ করে সিংহনাদ করে উঠলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম এবং সাত্যকি সেখানে পৌঁছে কর্ণের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কর্ণ তিন বাণে তিনজনের ধনুক কেটে ফেললেন। তখন তাঁরা কর্ণের ওপর শক্তি নিক্ষেপ করে সিংহের মতো গর্জন করলেন। কর্ণ তিন তিন বাণে সেই শক্তিগুলি টুকরো করে অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাতে অর্জুন সাত বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে তার ছোট ভাইকে বধ করলেন, তারপর তাঁর অন্য ভাই শত্রুঞ্জয়কেও ছয় বাণে পরপারে পাঠালেন। এরপর এক ভল্লের সাহায্যে বিপাটের মাথা কেটে তাকে রথচ্যুত করলেন। এরূপে কৌরবরা দেখতে দেখতেই কর্ণের সামনে তাঁর তিন ভাইকে অর্জুন একাই বধ করলেন।

তারপর ভীম তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তলোয়ার দিয়ে কর্ণপক্ষের পনেরোজন বীরকে হত্যা করে আবার রথে এসে বসলেন। অন্য ধনুক দিয়ে কর্ণ, তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বাণ বিদ্ধ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও ভীমের মতো রথ থেকে নেমে ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে চন্দ্রবর্মা এবং নিষাধ দেশের রাজা বৃহৎক্ষত্রকে হত্যা করে পুনরায় রথে এসে বসলেন। পরে আরেকটি ধনুক নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে কর্ণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকিও অন্য ধনুক তুলে কর্ণকে বাণবিদ্ধ করে গর্জন করতে লাগলেন। তারপর দুই বাণে কর্ণের ধনুক কেটে ফেললেন এবং তিন বাণ দিয়ে তাঁর হাত ও বুকে আঘাত করলেন।

কর্ণ যখন সাত্যকির আঘাতে নিমজ্জমান, তখন দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য এবং জয়দ্রথ এসে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন। তারপর আপনার সেনাবাহিনীর শত শত পদাতিক, রথী এবং গজারোহী যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করার

জন্য সবেগে সেখানে এসে পৌঁছলেন। অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অভিমন্যু, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করতে লাগলেন। সেইখানে ধনুর্ধরীদের বিনাশের জন্য ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। আপনার এবং পাণ্ডবপক্ষের বীররা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এদিকে সূর্য অস্তাচলে গেলেন। দুই পক্ষের ক্লান্ত, বিষণ্ণ এবং যুযুধান সেনাদল একে অপরকে দেখতে দেখতে শিবিরে ফিরে গেল।

চক্রব্যূহ-নির্মাণ এবং অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেদিন অমিতবিক্রম অর্জুন আমাদের সেনাকে পরাজিত করে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন এবং দ্রোণাচার্যের সংকল্পে বাধা দেন। দুর্যোধন শত্রুদের এই পরাক্রম দেখে বিষণ্ণ এবং কুপিত হলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি সব যোদ্ধার সামনেই বিনীত ও অভিমানমিশ্রিত কণ্ঠে দ্রোণাচার্যকে বললেন—'দ্বিজবর ! আমরা নিশ্চয়ই আপনার শত্রুপক্ষ, তাই কাল যুধিষ্ঠির আপনার সম্মুখে এলেও তাকে বন্দী করেননি। শত্রু আপনার সামনে এলে, আপনি যদি তাকে ধরতে চান, তাহলে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবরা এলেও আপনার থেকে তার রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে বরপ্রদান করলেও, তা পরে পূরণ করেননি।'

দুর্যোধনের কথায় আচার্য দ্রোণ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—

'রাজন্ ! তুমি এরূপ ভেবো না। আমি সর্বদাই তোমার প্রিয়কাজ করার চেষ্টা করি, কিন্তু কী করব ? অর্জুন যাকে রক্ষা করে, তাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস এবং জগতের কেউই জয় করতে পারে না। বিশ্ববিধাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যেখানে আছে, সেখানে শংকর ব্যতীত আর কারো শক্তিই কাজে আসে না। বৎস ! এখন তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি, এর কখনো অন্যথা হবে না। আজ পাণ্ডবপক্ষের কোনো এক শ্রেষ্ঠ মহারথী বধ করব। আজ এমন ব্যূহ তৈরি করব, যাকে দেবতারাও ভাঙতে পারবেন না। কিন্তু তুমি কোনোভাবে অর্জুনকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে নাও। যুদ্ধের এমন কোনো কলা নেই যা অর্জুনের অজ্ঞাত অথবা যা সে করতে অক্ষম। যুদ্ধের সমস্ত নৈপুণ্য সে আমার থেকে এবং অন্য সকলের কাছে জেনে নিয়েছে।'

দ্রোণের কথা শুনেই সংশপ্তকরা পুনর্বার অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে তাঁকে দক্ষিণের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সেইসময় অর্জুনের সঙ্গে তাদের এমন ভীষণ যুদ্ধ হল যে, যা আগে আর কখনো দেখা বা শোনা যায়নি। মহারাজ ! আচার্য দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করলেন ; এতে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী রাজাদের সম্মিলিত করে সেই ব্যূহের মধ্যস্থলে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী রাজকুমারদের দাঁড়

করালেন। রাজা দুর্যোধন ছিলেন তার মধ্যভাগে ; তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহারথী কর্ণ, কৃপাচার্য এবং দুঃশাসন। ব্যূহের অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য ও জয়দ্রথ দাঁড়ালেন ; জয়দ্রথের পাশে অশ্বত্থামার সঙ্গে আপনার ত্রিশজন পুত্রসহ শকুনি, শল্য এবং ভূরিশ্রবা দাঁড়ালেন। তারপর কৌরব এবং পাণ্ডব উভয়েই মৃত্যুকেই শেষ জেনে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন।

দ্রোণাচার্য দ্বারা সুরক্ষিত সেই দুর্ধর্ষ ব্যূহে ভীমসেনকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডবরা আক্রমণ করলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তীভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, ক্ষত্রবর্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিশুপালের পুত্র কেকয়রাজকুমার এবং হাজার হাজার সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয় এবং আরো বহু রণোন্মত্ত যোদ্ধা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় সহসা দ্রোণাচার্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের এগিয়ে আসতে দেখেও আচার্য দ্রোণ বিচলিত হলেন না, তিনি বাণবর্ষণ করে তাঁদের অগ্রগমন রোধ করলেন। সেইসময় আমরা দ্রোণের অদ্ভুত পরাক্রম দেখলাম, পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয় ক্ষত্রিয়রা একত্র হয়েও তাঁর সম্মুখীন হতে পারলেন না। দ্রোণাচার্যকে ক্রুদ্ধ হয়ে এগোতে দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। দ্রোণের সম্মুখীন হওয়া অন্যের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন মনে করে তিনি গুরুতর কাজের ভার অভিমন্যুর ওপর ন্যস্ত করলেন। অভিমন্যু তাঁর মাতুল শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা

অর্জুনের থেকে কম পরাক্রমশালী ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত তেজস্বী এবং শত্রুপক্ষের বীরদের সংহারকারী ছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—'পুত্র অভিমন্যু ! আমরা কেউই চক্রব্যূহ ভেদ করার উপায় জানি না। তুমি, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ অথবা প্রদ্যুম্নই একে ভঙ্গ করতে পারো। পঞ্চম আর কোনো ব্যক্তি এই কাজ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তুমি অস্ত্র নিয়ে শীঘ্রই দ্রোণের এই ব্যূহ ভেঙে ফেল, নাহলে অর্জুন আমাদের ওপর কুপিত হবে।'

অভিমন্যু বললেন—আচার্য দ্রোণের এই সেনা যদিও অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং ভয়ংকর, তবুও আমি আমার পিতৃবর্গের বিজয়ের জন্য এই ব্যূহে এখনই প্রবেশ করছি। পিতা এই ব্যূহে প্রবেশের কৌশল আমাকে বললেও বার হবার কথা জানাননি। এর ভিতরে আমি বিপদে পড়লে আর বার হতে পারব না।

যুধিষ্ঠির বললেন—বীরবর ! তুমি এই সৈন্য ভেদ করে আমাদের জন্য দ্বার তৈরি করো। তারপর তুমি যে পথে প্রবেশ করবে, আমরাও তোমার পিছনে পিছনে প্রবেশ করে সর্বভাবে তোমাকে রক্ষা করবো।

ভীম বললেন—আমি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং পাঞ্চাল, মৎস্য, প্রভদ্রক এবং কেকয় দেশের যোদ্ধা—আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে যাব। একবার তুমি যদি ব্যূহভঙ্গ করো, সেখানকার বড় বড় বীরদের বধ করে আমরা ব্যূহ ধ্বংস করে ফেলব।

অভিমন্যু বললেন—ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন দ্রোণের এই দুর্ধর্ষ সেনার মধ্যে প্রবেশ করছি। আজ এমন পরাক্রম দেখাব, যাতে আমার মাতুল বংশ ও পিতৃবংশ উভয়েই গর্বিত হবে। এতে আমার মাতুল ও পিতা—উভয়েই প্রসন্ন হবেন। আমি যদিও বালক, তা সত্ত্বেও জগতের সবাই দেখবে যে, আমি কী ভাবে আজ একাই শত্রুসেনাকে কালের গ্রাসে পাঠাই ! আমার জীবন থাকতে যদি কোনো শত্রু আমার সামনে বেঁচে ফিরে যায়, তাহলে আমি অর্জুনের পুত্র নই এবং মাতা সুভদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হয়নি।

যুধিষ্ঠির বললেন—সুভদ্রানন্দন ! তুমি দ্রোণাচার্যের দুর্ধর্ষ সৈন্য ব্যূহ ভঙ্গ করার উৎসাহ দেখাচ্ছ, সুতরাং এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলায় তোমার বলের যেন সর্বদা বৃদ্ধি হয় !

—০—
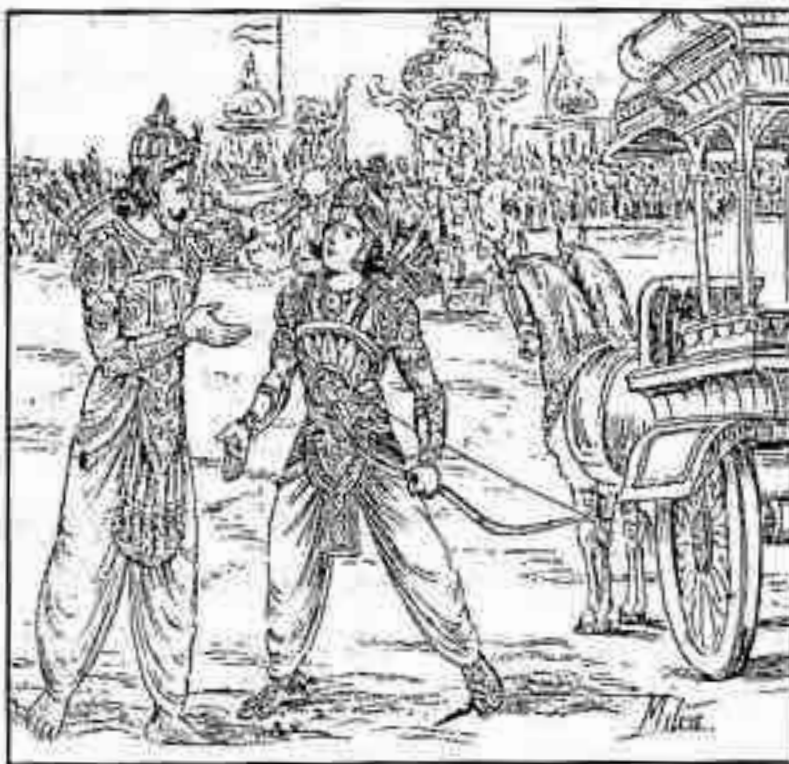
অভিমন্যুর ব্যূহ-প্রবেশ এবং পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অভিমন্যু সারথিকে দ্রোণের সেনার কাছে রথ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বারবার যাওয়ার নির্দেশ দিলেও সারথি তাঁকে বললেন—'আয়ুষ্মন্ ! পাণ্ডবরা আপনার ওপর কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি এই নিয়ে একটু চিন্তা করুন, তারপর যুদ্ধ করবেন। আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত বিদ্বান এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ। আপনি অতিশয় সুখ ও আরামে প্রতিপালিত, তাছাড়া আপনি যুদ্ধে তাঁর মতো নিপুণও নন।'

সারথির কথা শুনে অভিমন্যু হেসে বললেন—'সূত ! এই দ্রোণ অথবা ক্ষত্রিয় সমুদায় কে ? সাক্ষাৎ ইন্দ্র যদি দেবতাদের নিয়ে আসেন অথবা ভূতগণ নিয়ে সাক্ষাৎ শংকরও এসে পড়েন, তাহলে আমি তাঁদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি। এই ক্ষত্রিয়দের দেখে আমি আজ আশ্চর্য হচ্ছি না। এই সব শত্রুসৈন্য আমার ষোড়শাংসের এক অংশও নয়। অন্যের কথা ছেড়ে দাও, বিশ্ববিজয়ী মাতুল শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুনও যদি আমার বিপক্ষে দাঁড়ান, তাহলেও আমার ভয় হবে না।' সারথির কথা এইভাবে অবহেলা করে অভিমন্যু তাঁকে সত্বর দ্রোণের সেনার দিকে নিয়ে যেতে
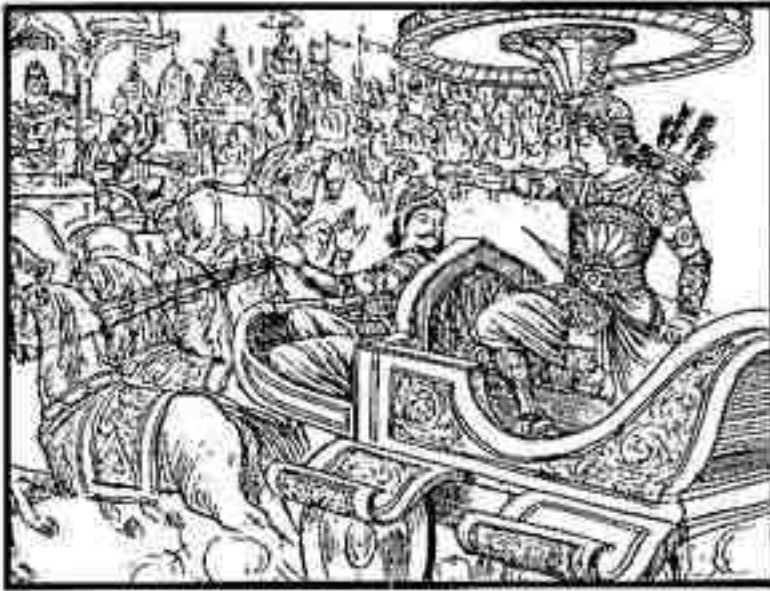
বললেন। সারথি একথায় প্রসন্ন না হলেও, ঘোড়াগুলি দ্রোণের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। পাণ্ডবগণও অভিমন্যুকে অনুসরণ করলেন। তাঁকে আসতে দেখে কৌরব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধা দ্রোণকে সম্মুখে রেখে দণ্ডায়মান হল।

অর্জুনের পুত্র অর্জুনের থেকেও পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের জন্য দ্রোণ প্রমুখ মহারথীদের সামনে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন হাতির পালের সামনে সিংহশিশু। অভিমন্যু ব্যূহের দিকে সবে মাত্র বিশ পা এগিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে কৌরব যোদ্ধারা তাঁর ওপর প্রহার করতে আরম্ভ করল। তখন দুই পক্ষের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। সেই ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যে অভিমন্যু দেখতে দেখতে দ্রোণের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সেখানে ঢুকতেই সমস্ত যোদ্ধা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বীর অভিমন্যু অস্ত্রচালনায় অত্যন্ত ক্ষিপ্র ছিলেন, যে কেউ তাঁর সামনে আসছিল, তাকেই তিনি তাঁর মর্মভেদী বাণে বিদ্ধ করছিলেন। বহু যোদ্ধা তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে ধরাশায়ী হল। মৃত মানুষের শরীরে রণক্ষেত্র ভরে উঠল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হাজার হাজার বীরকে অভিমন্যু মারলেন, কারো হাত কাটা গেল, কারো মাথা। তিনি একাই ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় অচিন্তনীয় পরাক্রম দেখালেন। রাজন্ ! সেই সময় আপনার পুত্রগণ এবং তাঁদের পক্ষের যোদ্ধা দশদিক দিয়ে পালাচ্ছিল। তাদের মুখ শুকিয়ে, গায়ের ঘর্ম বার হচ্ছিল। তারা জয়ের আশা পরিত্যাগ করে, বাঁচার পথ খুঁজছিল। মৃত পুত্র, পিতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় সকলকে পরিত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে সকলে ঘোড়া, হাতি ত্বরিৎ গতিতে চালিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালাচ্ছিল।

অমিত বিক্রমশালী অভিমন্যু তাঁর সেনাকে এইভাবে আক্রান্ত করছে দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সামনে এলেন। দ্রোণাচার্যের নির্দেশে সেখানে আরও বহু যোদ্ধা এসে পৌঁছল এবং দুর্যোধনকে চারদিক দিয়ে ঘিরে তাঁকে রক্ষা করতে লাগল। সেই সময় দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কর্ণ, কৃতবর্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, শল্য, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব এবং বৃষসেন—সকলেই সুভদ্রা-কুমারকে তীক্ষ্ণ বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। এইভাবে অভিমন্যুকে বাণে আচ্ছাদিত করে তাঁরা দুর্যোধনের প্রাণরক্ষা করলেন।

দুর্যোধনের এইভাবে তাঁর নাগালের বাইরে চলে যাওয়া অভিমন্যু সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ভয়ানক বাণবর্ষণ করে ঘোড়া এবং সারথিসহ সেই সব মহারথীদের আঘাত করে সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন। দ্রোণ প্রমুখ মহারথীগণ তার এই সিংহ গর্জন সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা রথের দ্বারা তাঁকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু সেই সব বাণ অভিমন্যু মধ্যপথেই দ্বিখণ্ডিত

করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁদের আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর অদ্ভুত পরাক্রম দেখা যাচ্ছিল, একপক্ষে একা অভিমন্যু ও অপরপক্ষে সম্মিলিত কৌরব যোদ্ধাগণ ভয়ংকর সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। কেউই যুদ্ধে বিমুখ

হচ্ছিলেন না। সেই ভয়ানক সংগ্রামে প্রথমে দুঃসহ অভিমন্যুকে নয়টি বাণ মারলেন, তারপর দুঃশাসন বারোটি, কৃপাচার্য তিনটি, দ্রোণ সতেরোটি, বিবিংশতি সত্তরটি, কৃতবর্মা সাতটি, বৃহদ্বল আটটি, অশ্বত্থামা সাতটি, ভূরিশ্রবা তিনটি, শল্য দুটি, শকুনি দুটি এবং রাজা দুর্যোধন তিনটি বাণদ্বারা আঘাত করলেন।

মহারাজ! সেইসময় প্রবল পরাক্রমশালী অভিমন্যু কুশলী নর্তকের ন্যায় ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক মহারথীকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর আপনার পুত্ররা একত্রে যখন তাকে আক্রমণ করতে শুরু করে, তখন অভিমন্যু ক্রোধে জ্বলে উঠে তাঁর অস্ত্রশিক্ষার মহাবল দেখাতে আরম্ভ করলেন। এর মধ্যে অশ্মক-নরেশের পুত্র অতি দ্রুত সেখানে এসে অভিমন্যুকে প্রতিহত করে তাঁকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। অভিমন্যু তখন হেসে দশ বাণ মেরে তাঁর ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা, ধনুক এবং তাঁর মাথা কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন।

অভিমন্যুর হাতে অশ্মকরাজকুমার নিহত হলে সমস্ত সৈন্য ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। তখন কর্ণ, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দন বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহ, দীর্ঘলোচন এবং দুর্যোধন—এঁরা সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। এইসব বড় বড় ধনুর্ধরীদের আঘাতে অভিমন্যু অত্যন্ত আহত হলেন, তখন তিনি বর্ম ও শরীর বিদ্ধকারী এক তীক্ষ্ণ বাণ কর্ণের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ কর্ণের বর্ম ভেদ করে তাঁর শরীর ছিদ্র করে পৃথিবীতে ঢুকে

গেল। সেই দুঃসহ আঘাতে কর্ণ অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে কেঁপে উঠলেন। অভিমন্যু এরপরে ক্রুদ্ধ হয়ে সুষেণ, দীর্ঘলোচন এবং কুণ্ডভেদীকেও মারলেন।

তখন কর্ণ পঁচিশ, অশ্বত্থামা কুড়ি এবং কৃতবর্মা সাত বাণ মেরে অভিমন্যুকে আহত করলেন, তাঁর সারা শরীরে ছিদ্র হয়ে গেল, তা সত্ত্বেও তিনি পাশধারী যমের ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন। শল্যকে তাঁর কাছে দাঁড়াতে দেখে অভিমন্যু বাণবর্ষা করে তাঁকে আচ্ছাদিত করলেন এবং সৈন্যদের ভয় দেখাতে ভীষণ গর্জন করলেন। তাঁর মর্মভেদী বাণে ঘায়েল হয়ে রাজা শল্য রথের পিছন ভাগে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। শল্যের এই অবস্থা দেখে দ্রোণের সামনেই সব সৈন্যরা পালিয়ে গেল। সেই সময় দেবতা, পিতৃপুরুষ, চারণ, সিদ্ধ, যক্ষ এবং মানুষ—সকলেই অভিমন্যুর যশোগান করে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

শল্যের এক ছোটভাই ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন অভিমন্যু তাঁর ভাই মদ্ররাজকে রণভূমিতে অচেতন করে দিয়েছেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এসে অভিমন্যুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। প্রথমেই তিনি দশ বাণে

অভিমন্যুর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করলেন এবং ভীষণ জোরে গর্জন করে উঠলেন। তখন অর্জুনকুমার বাণের আঘাতে তাঁর ঘোড়া, ছত্র, ধ্বজা, সারথি, চাকা, ধনুক, রথরক্ষক সমস্ত খণ্ড খণ্ড করে তাঁর হাত-পা-গলা এবং মাথা কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন। তখন তাঁর অনুচরগণ সব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিকবিদিকে পালাতে লাগল। অভিমন্যুর এই পরাক্রমে সকলে তাঁকে বাহবা দিতে লাগল। সেই সময় অভিমন্যুকে দেখা যাচ্ছিল যেন চারদিক দিয়ে শত্রুসংহার করে চলেছেন। তাঁর সেই অলৌকিক কর্ম দেখে সকলে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সেইসময় আপনার পুত্র দুঃশাসন ক্রোধে গর্জন করে সুভদ্রাকুমারকে আক্রমণ করলেন। তিনি আসতেই অভিমন্যু তাঁকে ছাব্বিশ বাণে আঘাত করলেন। তাঁরা দুজনেই রণকুশলী ছিলেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলাকার গতিতে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

দুঃশাসন ও কর্ণের পরাজয় এবং জয়দ্রথের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেইসময় অভিমন্যু হেসে বললেন—'দুর্মতো ! তুমি আমার পিতৃবর্গের রাজ্য হরণ করেছ, সেই কারণে এবং তোমার লোভ, অজ্ঞতা, দ্রোহ এবং দুঃসাহসের জন্য মহাত্মা পাণ্ডব তোমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন ; তাই তোমাকে আজ এইদিন দেখতে হল। আজ তুমি সেই ভয়ানক পাপের ফল ভোগ করবে। ক্রুদ্ধ মাতা দ্রৌপদী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী পিতা ভীমসেনের ইচ্ছা পূর্ণ করে আমি আজ তাঁদের ঋণ পরিশোধ করব। তুমি যদি রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যাও, তাহলে আমার হাতে জীবিত থাকবে না।' এই বলে অভিমন্যু তাঁর বুকে কালাগ্নি সম এক তেজস্বী বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ তাঁর বুকে লেগে গলার হার কেটে চলে গেল। তারপর তিনি আবার দুঃশাসনকে পঁচিশ বাণ মারলে দুঃশাসন দুঃসহ ব্যথায় অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। সারথি তৎক্ষণাৎ তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন। সেইসময় যুধিষ্ঠির ও অন্য পাণ্ডব, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয় রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীর অত্যন্ত আনন্দ সহকারে দ্রোণের সৈন্য ধ্বংস করার জন্য এগোলেন। পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। এদিকে কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন এবং তাঁকে অপমান করে তাঁর অনুচরদেরও বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। অভিমন্যুও তৎক্ষণাৎ তিয়াত্তরটি বাণ মেরে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। সেই সময় কেউই তাঁকে প্রতিহত করতে পারছিল না। তারপর কর্ণ তাঁর উত্তম অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করে বহু বাণ নিক্ষেপ করে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করলেন। কর্ণের আঘাতে আহত হয়েও সুভদ্রাকুমার শৈথিল্য দেখালেন না ; তিনি তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের ধনুক কেটে তাঁকে অত্যন্ত আহত করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর ছত্র, ধ্বজা, সারথি, ঘোড়াকেও ঘায়েল করলেন। কর্ণ তাঁকে বাণ মারলে অভিমন্যুও অবিচলভাবে তা সহ্য করে মুহূর্তের মধ্যে একই বাণে কর্ণের ধনুক, ধ্বজা কেটে মাটিতে ফেলে

দিলেন। কর্ণ সংকটের মধ্যে পড়ে যেতে তাঁর ছোট ভাই সুদৃঢ় ধনুক নিয়ে অভিমন্যুর সামনে এলেন। তিনি এসেই দশ বাণে অভিমন্যুর ছত্র, ধ্বজা, ঘোড়াসহ সারথিকে বিদ্ধ করলেন। তাই দেখে আপনার পুত্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। অভিমন্যু তখন হেসে একটি বাণেই তার মাথা কেটে ফেললেন।

রাজন্ ! ভাইকে মৃত দেখে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এদিকে অভিমন্যু কর্ণকে বিমুখ করে অন্য রাজাদের আক্রমণ করলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি হাতি, ঘোড়া, রথ এবং

পদাতিক সমন্বিত সেই বিশাল সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। কর্ণ তাঁর বাণে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ায় করে রণভূমি ত্যাগ করলেন। তখন ব্যূহভঙ্গ হল। সেইসময় জলধারার ন্যায় বাণের বর্ষণে আকাশ আচ্ছাদিত হওয়ায় কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ব্যতীত সেখানে আর কেউ থাকতে পারল না। অভিমন্যু বাণের দ্বারা শত্রুসেনা ধ্বংস করে ব্যূহের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। রথ, ঘোড়া, হাতি ও মানুষ বিনষ্ট হতে থাকল। রণক্ষেত্রে মৃতদেহের পাহাড় তৈরি হল। কৌরব যোদ্ধারা অভিমন্যুর বাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালাতে লাগল। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালানোর সময় তারা হতবুদ্ধি হয়ে নিজের পক্ষের সেনাদেরই মারতে লাগল। ব্যূহের মধ্যে তেজস্বী অভিমন্যুকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তৃণরাশির মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! অভিমন্যু যখন ব্যূহতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অন্য কোনো বীরও প্রবেশ করেছিলেন কি ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয় রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্য প্রমুখ যোদ্ধা ব্যূহাকারে সংগঠিত হয়ে অভিমন্যুকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সঙ্গে চললেন। তাঁদের আক্রমণ করতে দেখে আপনার সৈনিকরা পালাতে লাগল। তখন আপনার জামাতা জয়দ্রথ দিব্য অস্ত্রাদি প্রয়োগ করে পাণ্ডবদের সৈন্যসহ প্রতিহত করেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! আমার মনে হয় জয়দ্রথের ওপর এ এক বিশাল ভার প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল, সে একাই সেই ক্রোধান্বিত পাণ্ডবদের প্রতিহত করেছিল ! জয়দ্রথ এমন কী মহাতপস্যা করেছিল, যাতে সে পাণ্ডবদের প্রতিহত করতে সক্ষম হয় ?

সঞ্জয় বললেন—জয়দ্রথ বনে দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন, সেইসময় ভীমসেন তাঁকে পরাস্ত করেন। সেই অপমানে তিনি দুঃখিত হয়ে ভগবান শংকরের আরাধনা করে কঠোর তপস্যা করেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁকে দয়া করে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন—'জয়দ্রথ ! আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করো।' তখন তিনি প্রণাম করে বলেন—'আমি চাই যেন আমি একাই সমস্ত পাণ্ডবদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারি।' ভগবান বললেন—'সৌম্য, তুমি অর্জুন ব্যতীত বাকি চারজনকে

পরাজিত করতে পারবে।' 'আচ্ছা, তাই হোক'—বলতে বলতে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। সেই বরে এবং দিব্যাস্ত্রের বলেই জয়দ্রথ একাকী থাকলেও পাণ্ডবদের এগিয়ে আসা প্রতিহত করেন। তাঁর ধনুকের টংকার শুনলেই শত্রুপক্ষের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং আপনার সৈনিকরা হর্ষোৎফুল্ল হয়। সেইসময় সমস্ত দায়িত্ব জয়দ্রথের ওপর ন্যস্ত দেখে আপনার ক্ষত্রিয় বীররা কোলাহল করে যুধিষ্ঠিরের সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিমন্যু ব্যূহের যে অংশ ভেঙেছিলেন, জয়দ্রথ তা আবার সেনা দিয়ে ভরে দিলেন। তারপর তিনি সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাটকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করলেন। এইভাবে দ্রুপদ, শিখণ্ডী, কেকয় রাজকুমার, দ্রৌপদীর পুত্রদের এবং যুধিষ্ঠিরকে বহু বাণ দ্বারা আঘাত হানলেন। সেইসঙ্গে অন্য যোদ্ধাদেরও বাণবর্ষণ করে পিছু হটালেন। তাঁর এই কাজ অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির তখন হাসিমুখে এক বাণে তাঁর ধনুক কেটে দিলেন। পলক না ফেলতেই জয়দ্রথ অন্য ধনুক নিয়ে যুধিষ্ঠির এবং অন্য যোদ্ধাদের বাণ বিদ্ধ করলেন। তাঁর ক্ষিপ্রতা দেখে ভীম তিন বাণে তাঁর ধনুক, ধ্বজা ও ছত্র কেটে ফেললেন। জয়দ্রথ পুনরায় ধনুক দিয়ে তাতে গুণ লাগিয়ে ভীমের ধনুক, ধ্বজা এবং ঘোড়াগুলিকে সংহার করলেন। ঘোড়াগুলি বধ

হওয়ায় ভীম রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সাত্যকির রথে গিয়ে উঠলেন। জয়দ্রথের পরাক্রম দেখে আপনার সৈনিকরা প্রসন্ন হয়ে বাহবা দিতে লাগল। এরমধ্যে অভিমন্যু উত্তর দিকে যুদ্ধ করতে থাকা গজারোহীদের বধ করে পাণ্ডবদের জন্য পথ প্রস্তুত করেন, কিন্তু জয়দ্রথ তারও প্রতিরোধ করেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয় এবং পাণ্ডববীররা বহু

চেষ্টা করেও জয়দ্রথকে সরাতে সক্ষম হলেন না। আপনার শত্রুদের মধ্যে যে কেউই দ্রোণের ব্যূহভঙ্গ করার চেষ্টা করেন, বরদানের প্রভাবে তাকেই জয়দ্রথ প্রতিহত করতে থাকেন।

অভিমন্যুর দ্বারা কয়েকজন প্রধান প্রধান কৌরব বীরের সংহার

সঞ্জয় বললেন—তারপর দুর্ধর্ষ বীর অভিমন্যু সেই সেনার ভেতর প্রবেশ করে সকলকে হতচকিত করে দিলেন ; যেমন মস্ত বড় এক কুমীর সমুদ্রে সকলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে। আপনার প্রধান বীররা রথের দ্বারা অভিমন্যুকে ঘিরে ধরলেন ; তবুও তিনি বৃষসেনের সারথিকে বধ করে তার ধনুক কেটে ফেললেন। বলবান বৃষসেনও তাঁর বাণে অভিমন্যুর ঘোড়াগুলিকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। ঘোড়া রথসহ সেখান থেকে চলে গেল। বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সারথি রথ নিয়ে দূরে চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে শত্রুদমন করতে করতে অভিমন্যুকে পুনরায় আসতে দেখে বসাতী তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখীন হল এবং অভিমন্যুকে বাণের দ্বারা আঘাত করল। অভিমন্যু বসাতীকে একটি বাণ নিক্ষেপ

করলে, সে প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে আপনার সৈন্যদলের বড় বড় যোদ্ধারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বধ করার ইচ্ছায় ঘিরে ধরল। ভীষণ যুদ্ধ হল, অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হয়ে বসতীর ধনুক বাণ টুকরো টুকরো করে কুণ্ডল পরিহিত তাঁর মস্তকটি কেটে ফেললেন।

তারপর মদ্ররাজের বলবান পুত্র রুক্মরথ এসে ভীত কম্পিত সেনাদের আশ্বস্ত করে বললেন—'বীরগণ ! ভয় পেয়ো না, আমি থাকতে এই অভিমন্যু কিছুই করতে পারবে না। আমি জীবিতই একে বন্দী করব, এতে তোমরা মনে কোনো সন্দেহ রেখো না।' এই বলে তিনি অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হয়ে তার চতুর্দিকে বাণ নিক্ষেপ করে গর্জন করতে লাগলেন। অভিমন্যু তখন শীঘ্রই ধনুকসহ তাঁর দুহাত ও মাথা কেটে তাকে ধরাশায়ী করলেন।

রাজকুমারের কয়েকজন বন্ধু ছিলেন, তাঁরাও রণে দক্ষ। সকলে ধনুকে বাণ চড়িয়ে অভিমন্যুকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন, তাই দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত হর্ষান্বিত হলেন। তিনি ভাবলেন এবার অভিমন্যু যমালয়ে যাবে। কিন্তু অভিমন্যু তখন গন্ধর্বাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই অস্ত্র বাণ-বর্ষণ কালে কখনো এক, কখনো দুই আবার কখনো হাজার হাজার হয়ে দেখা যাচ্ছিল। অভিমন্যুর রথ সঞ্চালনের কৌশল এবং গন্ধর্বাস্ত্রের মায়া সেইসব রাজকুমারদের মোহমুগ্ধ করে তাঁদের শরীর টুকরো টুকরো করে ফেলল। এক অভিমন্যুর দ্বারা এত রাজপুত্র বধ হতে দেখে দুর্যোধন ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন। রথী, হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিকের মৃতদেহের স্তূপ দেখে তিনি অভিমন্যুর সামনে এলেন। দুজনের যুদ্ধ শুরু হলে ক্ষণকালের মধ্যেই বাণে আহত হয়ে দুর্যোধন রণভূমি ত্যাগ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সূত ! তুমি বলছ যে, একা অভিমন্যুর বহু যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ হল এবং তাতে সেই বিজয়ী হল—একথা সহসা বিশ্বাস হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে সুভদ্রাকুমারের এই পরাক্রম অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। কিন্তু যারা ধর্মের ওপর নির্ভর করে, তাদের কাছে এ কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নয়। সঞ্জয় ! দুর্যোধন যখন পালিয়ে গেল এবং শত শত রাজকুমার নিহত হল, তখন আমার পুত্ররা অভিমন্যুর জন্য কী উপায় ঠিক করল ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সেইসময় আপনার যোদ্ধাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। চোখ জলে ভরে গিয়েছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছিল এবং ঘাম ঝরছিল। তাদের যুদ্ধের উৎসাহ ছিল না, সকলেই পালাতে চাইছিল। মৃত ভাই, পিতা, বন্ধু, আত্মীয়কে ছেড়ে নিজের নিজের হাতি, ঘোড়া নিয়ে তারা তাড়াতাড়ি রণভূমির বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাদের এইরূপ হতোদ্যম হয়ে পালাতে দেখে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্মা এবং শকুনি—এঁরা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে অভিমন্যুর দিকে
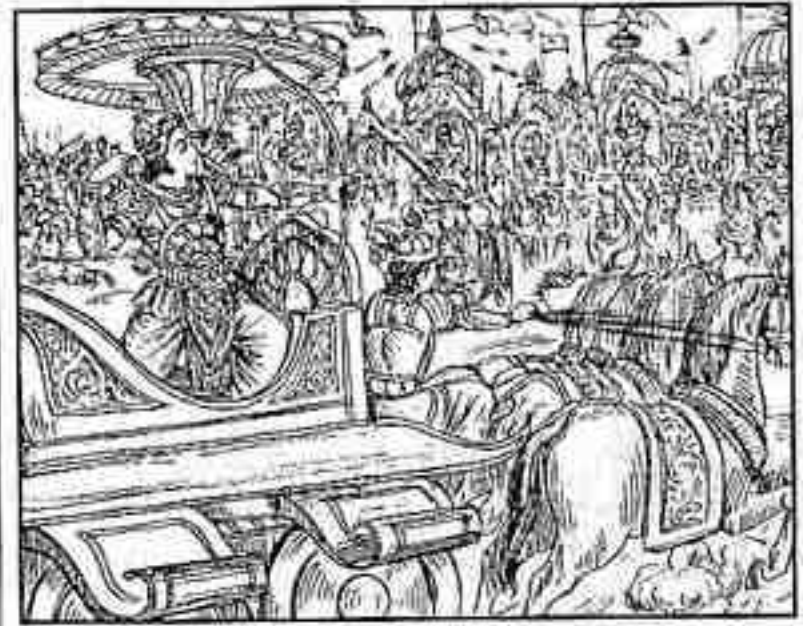
ছুটলেন। কিন্তু অভিমন্যু এঁদের পুনরায় রণে বিমুখ করলেন। শুধু লক্ষ্মণ সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। পুত্র স্নেহে দুর্যোধনও তাঁর কাছে ফিরে এলেন। দুর্যোধনের পেছনে অন্য মহারথীরাও এলেন। সকলে মিলে অভিমন্যুর ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু অভিমন্যু একাই সব মহারথীকে পরাস্ত করলেন, তারপর লক্ষ্মণের সামনে গিয়ে তাঁর বুকে এবং হাতে তীক্ষ্ণ বাণে তাকে আঘাত করলেন এবং তাঁকে বললেন—'ভাই ! এই পৃথিবীকে একবার ভালো করে দেখে নাও, কেননা এখনই তোমাকে পরলোকে যাত্রা করতে হবে। আজ তোমার বন্ধুবান্ধবের সামনে তোমাকে যমালয়ে পাঠাচ্ছি।' এই বলে মহাবাহু সুভদ্রাকুমার এক ভল্লের আঘাতে তার সেই সুন্দর নাসিকা, মনোহর ভ্রূ, কুঞ্চিত কেশ ও কুণ্ডলসহ মস্তক দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন।

কুমার লক্ষ্মণকে মৃত দেখে সকলে হাহাকার করে উঠল। নিজের প্রিয় পুত্রকে মৃত দেখে দুর্যোধনের ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি সব ক্ষত্রিয়দের ডেকে বললেন—'একে মেরে ফেলো।' তখন দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল এবং কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী অভিমন্যুকে চারদিকে ঘিরে ধরলেন। কিন্তু অর্জুনকুমার তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে ঘায়েল করে সবাইকে হটিয়ে দিয়ে সবেগে জয়দ্রথের সেনাদের

আক্রমণ করলেন। তাই দেখে কলিঙ্গ ও নিষাদ বীরদের সঙ্গে ক্রাথ পুত্র এসে গজ-সেনাদের সাহায্যে অভিমন্যুদের রাস্তা আটকালেন। তখন তাঁর সঙ্গে অভিমন্যুর প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। অভিমন্যু সেই গজ-সৈন্য সংহার করলেন। ক্রাথ অভিমন্যুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তার মধ্যে দ্রোণ প্রমুখ মহারথীগণ যাঁরা চলে গিয়েছিলেন ফিরে এলেন এবং ধনুকে টংকার তুলে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বাণে ওই সব মহারথীকে প্রতিহত করে ক্রাথপুত্রকে পীড়িত করলেন। তারপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করে তার ধনুক, বাণ, বাহু, মুকুট এবং মস্তকও কেটে

ফেললেন। সেই সঙ্গে তার ছাতা, ধ্বজা, সারথি এবং ঘোড়াগুলিকে রণাঙ্গনে শায়িত করলেন। ক্রাথের পতন হতেই অধিকাংশ যোদ্ধা বিমুখ হয়ে পালাতে লাগল।

তখন দ্রোণ প্রমুখ ছয়জন মহারথী পুনরায় অভিমন্যুকে ঘিরে ধরলেন। তাই দেখে অভিমন্যু দ্রোণ, বৃহদ্বল, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামাকে বহুবাণে বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনি কৌরবদের গৌরববৃদ্ধিকারী বীর বৃন্দারককে আপনার পুত্রদের সামনেই বধ করলেন। তখন অভিমন্যুর ওপরে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃতবর্মা, বৃহদ্বল এবং কৃপাচার্য বহু বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁরা সবদিক দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেও সুভদ্রাকুমার তাঁদের দশটি করে বাণ মেরে সকলকে আহত করলেন। তারপর কোশলরাজ অভিমন্যুর বুকে একটি বাণ মারলেন। অভিমন্যুও তাঁর ঘোড়া, ধ্বজা, ধনুক এবং সারথিকে ভূপতিত করলেন। রথচ্যুত হয়ে কোশল-নরেশ ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে অভিমন্যুর কুণ্ডলপরিহিত মস্তক ছেদন করার জন্য এলেন ; তার মধ্যেই অভিমন্যু তাঁর বুকে বাণ মারলেন। বাণ লাগতেই বুক বিদীর্ণ হয়ে কোশলরাজ রণভূমিতে পড়ে গেলেন। সেই সঙ্গে অভিমন্যু সেখানে উপস্থিত দশ হাজার মহাবলী রাজাকে বধ করলেন, যাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কটূক্তি করছিলেন। সুভদ্রানন্দন এইভাবে বাণবর্ষণ করে আপনার যোদ্ধাদের গতি রোধ করে রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

—o—

অভিমন্যু দ্বারা কৌরববীরদের সংহার এবং ছয় মহারথীর প্রচেষ্টায় অভিমন্যু বধ

সঞ্জয় বললেন—তারপর কর্ণ এবং অভিমন্যু দুজনে রক্তাপ্লুত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন কর্ণের ছজন মন্ত্রী সামনে এলেন, তাঁরা সকলেই বিচিত্র প্রকারে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু অভিমন্যু তাঁদের ঘোড়া এবং সারথিসহ বিনাশ করলেন এবং অন্য ধনুর্ধারীদেরও দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। এরপর তিনি মগধরাজের পুত্রকে ছয় বাণে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে ঘোড়া ও সারথিসহ অশ্বকেতুকেও বধ করলেন। তারপর মর্তিকাবতক দেশের রাজা ভোজকে ক্ষুরপ্র নামক বাণে মৃত্যুর পারে পাঠিয়ে সিংহনাদ করে উঠলেন। এরমধ্যে দুঃশাসনের পুত্র এসে চার বাণে চারটি ঘোড়া, একটিতে সারথি এবং দশ বাণ দিয়ে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করলেন। অভিমন্যুও তখন সাত বাণে দুঃশাসনের পুত্রকে আঘাত করে বললেন—আরে! তোমার পিতা তো কাপুরুষের মতো যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, এখন তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ ? সৌভাগ্যের কথা হল যে তুমি যুদ্ধ করতে জানো, কিন্তু আজ তোমাকে জীবিত ছাড়ব না। এই বলে তিনি দুঃশাসনের পুত্রের ওপর এক তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন, অশ্বত্থামা তিন বাণের সাহায্যে সেটি কেটে ফেললেন। তখন অভিমন্যু অশ্বত্থামার ধ্বজা কেটে তিন বাণে শল্যকে আঘাত করলেন। শল্যও তাঁর বুকে নটি বাণ মারলেন।

অভিমন্যু শল্যের ধ্বজা কেটে তাঁর পার্শ্বরক্ষক এবং সারথিকে মেরে ফেললেন, তারপর ছয় বাণে শল্যকে বিদ্ধ করলেন। শল্য তাঁর রথ ত্যাগ করে অন্য রথে গিয়ে উঠলেন। তারপর সুভদ্রানন্দন শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চা এবং সূর্যভাস—এই পাঁচ রাজাকে বধ করে শকুনিকে আঘাত করলেন। শকুনিও তিন বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করে দুর্যোধনকে বললেন—'দেখো, এ প্রথম থেকেই এক এক করে আমাদের বধ করে চলেছে, এবার আমরা সকলে মিলে একে বধ করব।'

তখন কর্ণ দ্রোণাচার্যকে বললেন—'অভিমন্যু প্রথম থেকেই আমাদের সকলকে পরাস্ত করে যাচ্ছে ; এখন একে বধ করার কোনো উপায় সত্বর আমাদের বলুন।' তখন মহাধনুর্ধর দ্রোণ সকলকে বললেন—'এই পাণ্ডবনন্দনের ক্ষিপ্রতা দেখ ! বাণ সন্ধান করে ছোঁড়ার সময়টুকুর মধ্যে এর রথের মধ্যে শুধু মণ্ডলাকার ধনুকটাই দেখা যায়, সে নিজে কোথায়, তা দেখা যায় না। সুভদ্রানন্দন আমাকে বাণবিদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, আমার প্রাণ যাবার উপক্রম ; তা সত্ত্বেও তার পরাক্রম দেখে আমার আনন্দই হচ্ছে। তার হস্তকৌশলে সমস্ত দিকে বাণবর্ষণ হচ্ছে। এখন অর্জুন আর তার মধ্যে আমি কোনো প্রভেদ দেখতে পাচ্ছি না।' তাঁর কথা শুনে কর্ণ ইতিমধ্যে অভিমন্যুর বাণে আহত হয়ে দ্রোণকে পুনরায় বললেন—'আচার্য, অভিমন্যু ভয়ংকরভাবে আঘাত করছে ! আমাকে সাহস করে দাঁড়াতে হবে ভেবে দাঁড়িয়ে আছি। এই তেজস্বী কুমারের তীক্ষ্ণ বাণ আমাকে অত্যন্ত আহত করছে।'

কর্ণের কথা শুনে আচার্য দ্রোণ হেসে ফেললেন, তারপর ধীরস্বরে বললেন—'একে তো এই তরুণ রাজকুমার নিজেই পরাক্রম দেখাচ্ছে, তাছাড়া এর বর্মও অভেদ্য। আমি এর পিতা অর্জুনকে যে বর্ম-ধারণ বিদ্যা শিখিয়েছিলাম, এ নিশ্চয়ই সেই বিদ্যা শিক্ষা করেছে। সুতরাং যদি এর ধনুক, বর্ম কাটা হয়, পার্শ্বরক্ষক ও সারথিকে বধ করা যায়, তাহলে কার্যোদ্ধার হওয়া সম্ভব। রাধানন্দন ! তুমি অত্যন্ত বড় ধনুর্ধর ; যদি সম্ভব হয়, তাই করো। যতক্ষণ ধনুক থাকবে, ততক্ষণ দেবতা এবং অসুরও একে পরাজিত করতে পারবে না।'

আচার্যের কথা শুনে কর্ণ বাণের দ্বারা অভিমন্যুর ধনুক কেটে ফেললেন। কৃতবর্মা তার ঘোড়াগুলি এবং কৃপাচার্য পার্শ্বরক্ষক ও সারথিকে হত্যা করলেন। তাকে ধনুক ও রথহীন দেখে অন্য মহারথীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর ওপর বাণনিক্ষেপ করতে লাগলেন। একদিকে ছয়জন মহারথী, অন্যদিকে অসহায় একা অভিমন্যু, সেই নির্দয় মহারথীরা একাকী বালকের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ধনুক খণ্ডিত, রথটিও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ; তবুও ক্ষাত্র-ধর্মের পালনার্থে বীর অভিমন্যু হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে নামলেন। নিজের লঘিমা শক্তির দ্বারা তিনি গরুড়ের ন্যায় লম্ফ দিচ্ছিলেন, তার মধ্যে দ্রোণাচার্য 'ক্ষরপ্র' নামক বাণে তাঁর তলোয়ার টুকরো টুকরো করে দিলেন এবং কর্ণ তাঁর ঢাল ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

এখন তাঁর হাতে তলোয়ারও রইল না, সমস্ত শরীর বাণে বিদ্ধ ছিল ; সেই অবস্থায় তিনি লম্ফ দিয়ে হাতে চক্র

নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্যের ওপর পড়লেন। সেইসময় তাঁকে চক্রধারী ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় দেখাচ্ছিল। তাঁকে দেখে রাজারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন এবং সকলে মিলে তাঁর চক্র টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন মহারথী অভিমন্যু এক বিশাল গদা হাতে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করলেন। জ্বলন্ত বজ্রের ন্যায় গদাকে আসতে দেখে অশ্বত্থামা রথ থেকে নেমে তিন পা পিছিয়ে গেলেন। গদার আঘাতে তাঁর ঘোড়া, পার্শ্বরক্ষক এবং সারথি মারা গেল। তারপরে অভিমন্যু সুবলের পুত্র কালিকেয় এবং তার অনুচর সাতাত্তরজন গান্ধারকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন। তারপর দশ বসাতীয় মহারথী এবং সাত কেকয়

মহারথীদের সংহার করে দশটি হাতিকে বধ করলেন। পরে দুঃশাসনকুমারের রথ এবং ঘোড়াগুলিকে গদা দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। দুঃশাসনের পুত্র এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গদা হস্তে অভিমন্যুর দিকে দৌড়লেন। দুজনে দুজনকে বধ করার আকাঙ্ক্ষায় আঘাত করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলেন। দুঃশাসন পুত্র প্রথমে উঠে দাঁড়ালেন এবং যেই

অভিমন্যু উঠতে যাবেন ঠিক তখনই তাঁর মাথায় গদা দিয়ে আঘাত করলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে বেচারা অভিমন্যু অচেতন হয়ে আবার পড়ে গেলেন। মহারাজ ! তারপর সেই নিরস্ত্র, অচেতন বালককে সমবেত মহারথীরা নির্মমভাবে হত্যা করল।

আকাশ থেকে পড়া চন্দ্রের ন্যায় সেই শূরবীরকে রণভূমিতে পড়তে দেখে অন্তরীক্ষে দণ্ডায়মান সকল প্রাণ হাহাকার করে উঠল। সকলে একসুরে বলে উঠল, 'দ্রোণ এবং কর্ণের মতো ছয় প্রধান মহারথী মিলে একাকী বালককে যেভাবে বধ করেছেন, আমরা তাকে ধর্ম বলে মনে করি না।' চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় কান্তিমান বালক অভিমন্যুকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে আপনার যোদ্ধাদের অত্যন্ত আনন্দ হল আর পাণ্ডবরা হৃদয়ে বড় আঘাত পেলেন। রাজন্ ! অভিমন্যু এখনও বালক, যৌবনে পদার্পণ করেনি। এই বীর নিহত হতেই যুধিষ্ঠিরের সামনেই সমস্ত পাণ্ডবসেনা পালিয়ে গেল। তাই দেখে যুধিষ্ঠির তাদের ডেকে বললেন—'বীরগণ ! যুদ্ধে মৃত্যু সন্নিকট হলেও অভিমন্যু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। তোমরাও তার মতো ধৈর্য ধরো, ভয় পেয়ো না। আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।' এই কথা বলে ধর্মরাজ তাঁর দুঃখভারাক্রান্ত সৈনিকদের শোক দূর করলেন। রাজন্ ! অভিমন্যু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি দশ হাজার রাজকুমার এবং মহারথী কৌশল্যকে বধ করে মারা গিয়েছিলেন। তিনি যে পুণ্যবানদের অক্ষয়লোক লাভ করেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ; সুতরাং তিনি শোকের যোগ্য নন।

মহারাজ ! আমরা এইভাবে পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠ বীরকে বধ করে এবং তাঁর বাণে পীড়িত ও রক্তাপ্লুত হয়ে শিবিরে ফিরে এলাম। আসার সময় দেখলাম শত্রুপক্ষও অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিষণ্ণ হয়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছে। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে রক্তের যে নদী প্রবাহিত করেছিল, তা বৈতরণীর ন্যায় ভয়ংকর এবং দুস্তর ছিল। রণভূমির মধ্যে প্রবাহিত সেই নদী জীবিত ও মৃত সকলকেই ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। রণস্থল ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল।

—০—

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ এবং ব্যাসদেব কর্তৃক মৃত্যুর উৎপত্তি বর্ণনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! মহাবীর অভিমন্যুর মৃত্যুর পর সমস্ত পাণ্ডবযোদ্ধা রথ ছেড়ে, বর্ম ও ধনুক নামিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের চারদিকে বসে মনে মনে অভিমন্যুকে স্মরণ করে তাঁর যুদ্ধের কথা ভাবছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা মনে করে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, 'যেমন গোরুর গোয়ালে সিংহের শাবক প্রবেশ করে তেমনই, যে শুধু আমার প্রিয়কাজ করার ইচ্ছায় দ্রোণের দুর্ভেদ্যগুহায় প্রবেশ করেছিল, যার সামনে এসে যুদ্ধ কুশল বড় বড় মহারথীও পালাতে পথ পাচ্ছিল না, যে আমাদের ভয়ানক শত্রু দুঃশাসনকে তার বাণে আহত করে রণক্ষেত্রের বাইরে পাঠিয়েছিল সেই বীর অভিমন্যু দ্রোণ সেনার মহাসাগর পার হয়েও দুঃশাসনকুমারের হাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হল। তার মৃত্যুর পর আমি অর্জুন অথবা সুভদ্রার কাছে কী করে মুখ দেখাব ? হায় ! সে বেচারি আর তার প্রিয় পুত্রকে দেখতে পাবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এই দুঃখদায়ক সংবাদ কী করে জানাব ? আমি কী নির্দয়, যে সুকুমার বালককে শয়ন, ভোজন এবং বসন-ভূষণ পরিধানে সযত্নে রাখা উচিত, তাকে আমি যুদ্ধে সর্বাগ্রে পাঠিয়েছিলাম। সেই তরুণ যোদ্ধা এখনও তেমনভাবে রণকুশল হয়ে ওঠেনি, তাহলে সে কুশলে ফিরে আসবে কী করে ? অর্জুন বুদ্ধিমান, নির্লোভ, ক্ষমাবান, রূপবান, বলবান, জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষাকারী, বীর এবং সত্য পরাক্রমী, যার কর্মের প্রশংসা দেবতারাও করেন, যে অভয় আকাঙ্ক্ষাকারী শত্রুদেরও অভয়প্রদান করে, তার বলবান পুত্রকে আমরা রক্ষা করতে পারলাম না। বল এবং পুরুষার্থে যার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই, সেই অর্জুনকুমারকে মৃত দেখে আমার বিজয়লাভে আর কোনো আনন্দ নেই ; তার বিহনে পৃথিবীর রাজত্ব, অমরত্ব অথবা দেবলোকের অধিকারেও আমার আর প্রয়োজন নেই।'

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির যখন বিলাপ করছিলেন, সেই সময় মহাত্মা বেদব্যাস সেখানে এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর ও স্বাগত জানালে, তিনি যখন আসন গ্রহণ করলেন তখন অভিমন্যুর শোকে সন্তপ্ত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন —'মুনিবর ! সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু যখন যুদ্ধ করছিল, তখন বহু অধর্মী মহারথী তাকে ঘিরে ধরে বধ করেছে। আমি ব্যূহতে ঢোকার জন্য তাকে পথ করে দিতে বলেছিলাম। সে

তাই করেছিল। অভিমন্যু ভিতরে প্রবেশ করল, আমরা তার পেছন পেছন ঢুকতে গেলে জয়দ্রথ আমাদের বাধা দেয়। যোদ্ধাদের নিজের সমকক্ষ বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত। কিন্তু শত্রুরা তার সঙ্গে অত্যন্ত অনুচিত ব্যবহার করেছে। সেজন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তাপ হচ্ছে। বারবার তারই চিন্তা হচ্ছে, একটুও শান্তি পাচ্ছি না।'

ব্যাসদেব বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান এবং সর্বশাস্ত্রবিদ্। তোমার মতো ব্যক্তির সংকটে পড়ে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। অভিমন্যু যুদ্ধে বহু বীরকে বধ করে অভিজ্ঞ মহারথীর ন্যায় পরাক্রম দেখিয়ে স্বর্গগমন করেছে। ভারত ! বিধাতার বিধানকে কেউই অমান্য করতে পারে না। মৃত্যু তো দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবদেরও প্রাণ হরণ করে ; তাহলে মানুষের তো কথাই নেই।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনে ! এই শূরবীর রাজকুমার শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। বলা হচ্ছে, সে মারা গেছে ; কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে 'মরে গেছে' কেন বলা হচ্ছে ? মৃত্যু কার হয়, কেন হয় ? এবং সে কীভাবে প্রজাসংহার করে ? কীভাবে জীবকে পরলোকে নিয়ে যায় ? আমাকে সব ভালো করে বলুন !'

ব্যাসদেব বললেন— রাজন্ ! জ্ঞানীব্যক্তিরা এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। তা শুনলে তুমি স্নেহবন্ধনের কারণ যে দুঃখ তা থেকে মুক্ত হবে। এই উপাখ্যান সমস্ত পাপনাশকারী, আয়ুবৃদ্ধিকারী, শোক-নাশক, অত্যন্ত মঙ্গলকারী এবং বেদাধ্যয়নের ন্যায় পবিত্র। আয়ুষ্মান পুত্র, রাজ্য এবং লক্ষ্মীকামনাকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্যদের প্রাতঃকালে এই আখ্যান শ্রবণ করা উচিত।

প্রাচীন কালের কথা। সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। শত্রুরা তাঁর ওপর আক্রমণ করে। রাজার এক পুত্র ছিল, নাম হরি। সে নারায়ণের মতো বলবান ছিল এবং যুদ্ধে ইন্দ্রের সমকক্ষ। সেই হরি যুদ্ধে দুষ্কর পরাক্রম দেখিয়ে শেষে শত্রুর হাতে নিহত হয়। তাতে রাজা অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন। তাঁর পুত্রশোকের সংবাদ পেয়ে দেবর্ষি নারদ এলেন। রাজা তাঁকে যথোচিত পূজা-অর্চনা করলেন। দেবর্ষি আসন গ্রহণ করলে তিনি বললেন—'প্রভু ! আমার পুত্র ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় কান্তিমান এবং মহাবলী ছিল। বহু শত্রু মিলে তাকে বধ করেছে, আমি সঠিকভাবে জানতে চাই 'এই মৃত্যু কী ? এর বল, বীর্য এবং পৌরুষ' কেমন ?'

রাজার কথা শুনে দেবর্ষি নারদ তাঁকে বললেন—রাজন্ ! আদিতে জগৎ সৃষ্টির সময় পিতামহ ব্রহ্মা যখন সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন তখন তার সংহার হতে না দেখে তিনি চিন্তাগ্রস্ত হলেন। চিন্তা করতে করতে যখন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না, তখন তাঁর ক্রোধ হল। তাঁর এই ক্রোধের ফলে আকাশে অগ্নি প্রকাশিত হল এবং তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভগবান ব্রহ্মা সেই অগ্নির দ্বারা পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত চরাচর জগৎকে দহন করতে আরম্ভ করলেন। তা

দেখে রুদ্রদেবতা ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করলেন। শংকর এলে প্রজার মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—'পুত্র ! তুমি নিজ ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়েছ এবং আমার কাছ থেকে অভীষ্ট বস্তু লাভের যোগ্য। বলো, তোমার কী কামনা পূর্ণ করব ?'

রুদ্র বললেন—'প্রভু ! আপনি নানাপ্রকার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা সকলেই আপনার ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের এই দশা দেখে আমার দয়া হচ্ছে। ভগবান ! এবার আপনি ওদের ওপর প্রসন্ন হোন।'

ব্রহ্মা বললেন—'পৃথিবী দেবী জগতের ভারে পীড়িত হচ্ছে, সেই আমাকে এই সংহারে প্রবৃত্ত করেছে। এই বিষয়ে বহু চিন্তা করেও যখন কোনো উপায় মনে এল না, তখন আমার অত্যন্ত ক্রোধ হল।'

রুদ্র বললেন—'প্রভু ! সংহার করার জন্য আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। প্রজার ওপর প্রসন্ন হন। আপনার ক্রোধে উৎপন্ন এই অগ্নি পর্বত, বৃক্ষ, নদী, তৃণ, জলাশয় ইত্যাদি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগৎকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এখন আপনার ক্রোধ যাতে শান্ত হয়—আমাকে সেই বর প্রদান করুন। প্রজার হিতের জন্য এমন কোনো উপায় ভাবুন, যাতে এই প্রাণীদের জীবন রক্ষা হয়।'

নারদ বললেন—শংকরের কথা শুনে ব্রহ্মা প্রজা কল্যাণের জন্য সেই অগ্নিকে পুনরায় নিজের মধ্যে লীন করে নিলেন। তাকে লীন করার সময় তাঁর সব ইন্দ্রিয় হতে এক নারী প্রকাশিত হল। তার রং ছিল কালো, লাল এবং হলুদ। তার জিহ্বা, মুখ এবং চক্ষুও লাল ছিল। ব্রহ্মা তাঁকে 'মৃত্যু' নামে ডাকলেন এবং বললেন 'আমি লোক সংহারের জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, তাতেই তোমার উৎপত্তি হয়েছে, সুতরাং তুমি আমার আদেশে এই সমস্ত চরাচর জগতকে নাশ করো। তোমার এতে কল্যাণ হবে।'

ব্রহ্মার কথায় সেই নারী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে যে জল পড়ছিল, ব্রহ্মা তা হাতে নিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। মৃত্যু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! আপনি আমাকে এইরূপ নারী কেন সৃষ্টি করলেন ? আমাকে জেনে শুনে এই অহিতকারক কঠোর কর্ম করতে হবে ? আমি পাপকে ভয় পাই। আমার দেওয়া দুঃখে লোক কাঁদবে ; সেই দুঃখী ব্যক্তিদের চোখের জলকে আমার খুব ভয় হচ্ছে, তাই আমি আপনার শরণ চাইছি। আমাকে বর দিন, আজ থেকে আমি ধেনুকাশ্রমে গিয়ে আপনার আরাধনা করে তীব্র তপস্যা করব। ক্রন্দন-

শীল, দুঃখী লোকের প্রাণ হরণ করা আমার দ্বারা হবে না। আমাকে এই পাপ থেকে রক্ষা করুন।'

ব্রহ্মা বললেন—'মৃত্যু ! প্রজা সংহারের জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাও, সব প্রজাকে বিনাশ করতে থাক। এতে চিন্তা করার কিছু নেই ; তাই হবে, এর কোনো পরিবর্তন হবে না। তুমি আমার আদেশ পালন করো। এতে তোমার কোনো অপযশ হবে না।'

ব্রহ্মার কথা অনুযায়ী সেই কন্যা প্রজা সংহারের প্রতিজ্ঞা না করেই তপ করার জন্য ধেনুকাশ্রমে চলে গেলেন। সেখান থেকে পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ এবং মলয়াচল প্রভৃতি তীর্থে গিয়ে স্বেচ্ছায় কঠোর নিয়মাদি পালন করে শরীর শীর্ণ করতে লাগলেন। তিনি অনন্যভাবে শুধু ব্রহ্মাতেই তাঁর সুদৃঢ় ভক্তি রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মাচরণে পিতমহকে প্রসন্ন করলেন।

ব্রহ্মা তখন প্রসন্ন মনে তাঁকে বললেন—'মৃত্যু ! বলো তো, কেন তুমি এই কঠোর তপস্যা করছ ?' মৃত্যু বললেন—'প্রভু ! আমি আপনার কাছে এই বর চাই, যেন আমাকে প্রজানাশ করতে না হয়। আমার অধর্মে বড় ভয়, তাই আমি তপস্যায় রত আছি। ভগবান ! আমার মতো ভীতসন্ত্রস্ত অবলাকে আপনি অভয়প্রদান করুন। আমি এক নিরপরাধ নারী, অত্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি ; আপনার কৃপা ভিক্ষা করছি, আমাকে শরণ প্রদান করুন।' ব্রহ্মা বললেন—'কল্যাণী ! এই প্রজাবর্গের বিনাশ করলে তোমার পাপ হবে না। আমার কথা কোনোভাবেই মিথ্যা হবে না। অতএব তুমি চার প্রকারের প্রজা নাশ করো, সনাতন ধর্ম তোমাকে পবিত্র করে রাখবে। লোকপাল, যম এবং নানাপ্রকার ব্যাধি তোমায় সাহায্য করবে। তাহলে দেবতারা এবং আমি—সকলেই তোমাকে বর প্রদান করব।'

তাঁর কথা শুনে মৃত্যু ব্রহ্মার শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করে বললেন—'প্রভু ! আমি ছাড়া যদি এ কাজ না হয়, তাহলে আপনার আদেশ শিরোধার্য। একটা কথা বলি, শুনুন ! লোভ, ক্রোধ, দোষদৃষ্টি, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ, নির্লজ্জতা এবং কটুবাক্য বলা—এই নানাপ্রকার দোষই যেন প্রাণীদের দেহ নাশ করে।'

ব্রহ্মা বললেন—'মৃত্যু ! তাই হবে ! তোমার চোখের জলের বিন্দু, যা আমি হাতে নিয়েছিলাম, তা ব্যাধি হয়ে গতায়ু প্রাণীদের বিনাশ করবে। তোমার পাপ হবে না, সুতরাং ভয় পেয়ো না ! তুমি কামনা ও ক্রোধ ত্যাগ করে সমস্ত জীবের প্রাণ হরণ করো। তাহলে তুমি অক্ষয় ধর্ম প্রাপ্ত করবে। যারা মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত, সেই জীবদের অধর্মই বধ করবে। অসত্যের দ্বারাই প্রাণী নিজেকে পাপপঙ্কে ডুবিয়ে ফেলে।'

নারদ বললেন—মৃত্যুনামধারিণী সেই নারী ব্রহ্মার উপদেশে, বিশেষত তাঁর শাপের ভয়ে 'ঠিক আছে' বলে তাঁর আদেশ মেনে নিলেন। তখন থেকে তিনি কাম ও ক্রোধ ত্যাগ করে অনাসক্তভাবে প্রাণীদের অন্তকাল এলে তাদের প্রাণ হরণ করেন। একেই প্রাণীদের মৃত্যু বলা হয়, তাতেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়েছে। রোগকেই ব্যাধি বলা হয়, যাতে জীব রুগ্ন হয়। জীবনের আয়ু ফুরিয়ে গেলে সকল প্রাণীরই মৃত্যু হয়। তাই রাজন্ ! তুমি বৃথা শোক করো না। মৃত্যুর পর সবপ্রাণীই পরলোকে যায় এবং সেখান থেকে ইন্দ্রিয়াদি এবং বৃত্তিগুলিসহ এখানে ফিরে আসে। দেবতারাও পরলোকে নিজ কর্মভোগ পূর্ণ করে এই মর্ত্যলোকে আবার জন্ম নেন। তাই তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়। সে বীরদের প্রাপ্তব্য রমণীয় লোকে গিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছে। ব্রহ্মা প্রজাদের সংহারের জন্যই স্বয়ং মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সময় এলে তিনি সকলকেই সংহার করেন। এই

জেনে ধৈর্যশীল ব্যক্তি মৃত প্রাণীদের জন্য শোক করেন না। সমস্ত জগৎ বিধাতার সৃষ্ট, তিনি ইচ্ছা অনুসারে তা সংহার করেন, সুতরাং তুমি তোমার মৃত পুত্রের শোক ত্যাগ করো।

ব্যাসদেব বললেন—নারদের এই অর্থযুক্ত কথা শুনে রাজা অকম্পন তাঁকে বললেন—'ভগবান ! আমার শোক দূর হয়েছে, আমি এখন প্রসন্ন হয়েছি। আপনার শ্রীমুখে এই ইতিহাস জেনে আমি কৃতার্থ হয়েছি, আপনাকে প্রণাম।' রাজার এরূপ সন্তোষজনক কথা শুনে দেবর্ষি নারদ তখনই নন্দনবনে চলে গেলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ! এই উপাখ্যান শুনলে এবং শোনালে পুণ্য, যশ, আয়ু, ধন, স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। মহারথী অভিমন্যু যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রু সংহার কালে মৃত্যুলাভ করেছে। সে চন্দ্রের নির্মল পুত্র আবার চন্দ্রেই লীন হয়েছে। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং প্রমাদ পরিত্যাগ করে শীঘ্রই ভ্রাতাসহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

—o—

ব্যাসদেব কর্তৃক সৃঞ্জয়পুত্র, মরুত, সুহোত্র, শিবি এবং রামের পরলোক গমনের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—মুনিবর ! প্রাচীন কালের পুণ্যাত্মা, সত্যবাদী এবং গৌরবশালী রাজর্ষিদের কর্মের বর্ণনা করে আপনার যথার্থ বাক্যে আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

ব্যাসদেব বললেন—পূর্বকালে শৈব্য নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম ছিল সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয় রাজা হলে দেবর্ষি নারদ ও পর্বত—এই দুই ঋষির সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়। কোনো এক সময়ে, এই দুই ঋষি রাজা সৃঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহে এলেন। রাজা তাঁদের শাস্ত্রোচিত সৎকার করলেন এবং তাঁরা সেখানে সুখে থাকতে লাগলেন।

সৃঞ্জয়ের পুত্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি নিজ সামর্থ্য অনুসারে ব্রাহ্মণদের ভক্তিভরে সেবা করলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ বেদ-বেদাঙ্গ জ্ঞাতা এবং তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে রত থাকতেন। রাজার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সেই ব্রাহ্মণগণ নারদকে বললেন—'ভগবান ! আপনি রাজা সৃঞ্জয়কে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একটি পুত্র প্রদান করুন।' নারদ 'তথাস্তু' বলে সৃঞ্জয়কে বললেন—'রাজর্ষি ! ব্রাহ্মণরা আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, তাঁরা আপনাকে পুত্র প্রদান করতে চান। আপনার কল্যাণ হোক, আপনি যেমন পুত্র চান, তার জন্য বর প্রার্থনা করুন।'

নারদ এই কথা বললে রাজা হাত জোড় করে বললেন—'ভগবান ! আমি এমন পুত্র চাই যে যশস্বী, তেজস্বী এবং শত্রুদমনকারী হবে এবং তার মল-মূত্র-থুতু এবং ঘর্মও সুবর্ণময় হবে।' রাজার তেমনই পুত্র জন্মাল। তার নাম হল সুবর্ণষ্ঠীবী। সেই বরে রাজার গৃহে নিরন্তর ধন বৃদ্ধি হতে লাগল। তিনি তাঁর মহল, প্রাচীর, কেল্লা, ব্রাহ্মণদের গৃহ, পালঙ্ক, বিছানা, রথ, বাসনপত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব স্বর্ণ নির্মিত করলেন। কিছুকাল পরে রাজগৃহে ডাকাত পড়ে এবং তারা রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে বলপূর্বক জঙ্গলে ধরে নিয়ে যায়। সুবর্ণলাভের উপায় তাদের জানা না থাকায় তারা মূর্খের মতো রাজকুমারকে বধ করে। পরে তার দেহ কেটে ফেলে, কিন্তু কোনো কিছুই পায় না। তার প্রাণ চলে গেলে ধন লাভের উপায়ও নষ্ট হয়ে গেল। মূর্খ ডাকাতরা সেই অনুপম রাজকুমারকে বধ করে, নিজেরাও খুনোখুনিতে শেষ হয়ে যায়। শেষকালে সেই পাপী ডাকাতরা অসম্ভাব্য নামক নরকে পতিত হয়।

রাজা মৃতপুত্রকে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে করুণস্বরে
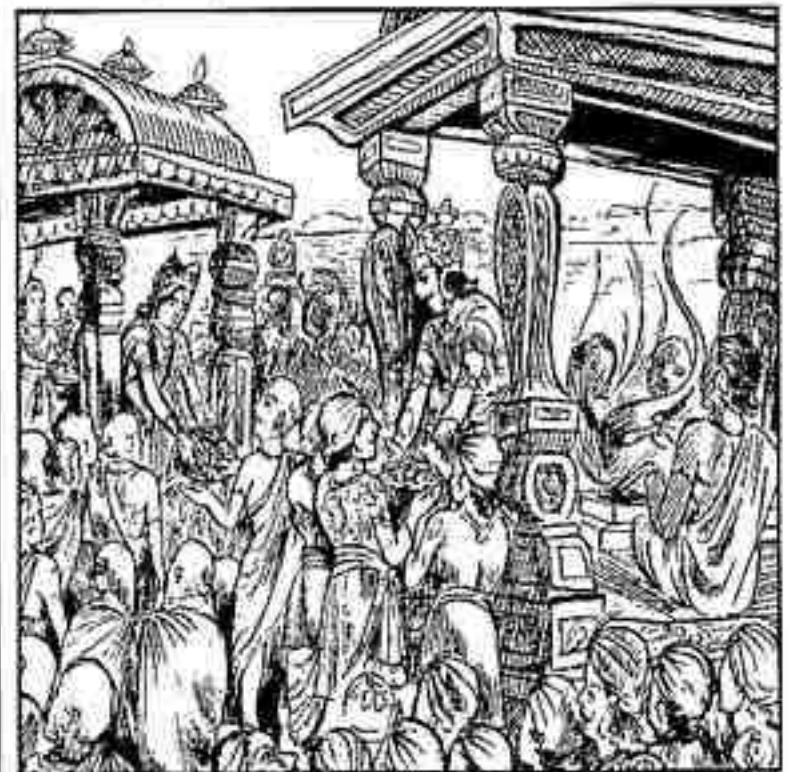
বিলাপ করতে থাকেন। সেই সংবাদ পেয়ে দেবর্ষি নারদ তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'সৃঞ্জয় ! নিজ অপূর্ণ কামনা নিয়ে তোমাকেও একদিন মরতে হবে, তাহলে অন্যের জন্য এত শোক কেন ? অন্যের কথা ছেড়ে দাও, অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুত্তও বাঁচেনি। বৃহস্পতির সঙ্গে অপ্রণয় হওয়ায় সংবর্ত রাজা মরুত্তের দ্বারা যজ্ঞ করিয়েছিলেন। ভগবান শংকর রাজর্ষি মরুত্তকে এক সুবর্ণ গিরিশিখর প্রদান করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞশালায় ইন্দ্রাদি দেবতা, বৃহস্পতি এবং সমস্ত প্রজাপতি বিরাজমান ছিলেন। যজ্ঞের সমস্ত জিনিস স্বর্ণ নির্মিত ছিল। তাঁর যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দুধ, দই, ঘি, মধু, রুচিকর ভোজ্য, ইচ্ছানুযায়ী বস্ত্র ও অলংকার প্রদান করা হত। মরুত্তের গৃহে মরুৎ(পবন)দেব খাদ্য পরিবেশন করতেন এবং বিশ্বদেব সভাসদ ছিলেন। তিনি দেবতা, ঋষি এবং পিতৃপুরুষদের হবিষ্য, শ্রাদ্ধ এবং স্বাধ্যায়ের সাহায্যে তৃপ্ত করেছিলেন। ইন্দ্রও তাঁর মঙ্গল চাইতেন। তাঁর রাজ্যে প্রজাদের রোগ-ব্যাধি হত না। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং শুভকর্মের দ্বারা অক্ষয় পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা মরুৎ তরুণাবস্থায় থেকে প্রজা, মন্ত্রী, ধর্মপত্নী, পুত্র এবং ভাইদের নিয়ে এক হাজার বছর ধরে রাজ্যশাসন করেছিলেন। সৃঞ্জয় ! এরূপ প্রতাপশালী রাজাও, যিনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বার্থেই বড় ছিলেন, তিনিও যদি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা না পান, তাহলে তোমারও পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।'

নারদ পুনরায় বললেন—'রাজা সুহোত্রেরও মৃত্যুর কথা শোনা গেছে। তিনি তাঁর সময়ের অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, দেবতারাও তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারতেন না। তিনি প্রজাপালন, ধর্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ—এগুলিকেই কল্যাণকর বলে মনে করতেন। ধর্মদ্বারা দেবতাদের আরাধনা করতেন, বাণের দ্বারা শত্রুর ওপর বিজয়লাভ করতেন এবং নিজ গুণে সমস্ত প্রজাদের প্রসন্ন রাখতেন। তিনি ম্লেচ্ছ এবং ডাকাতদের বিনাশ করে সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর প্রসন্নতার জন্য মেঘও বহুবর্ষ ধরে তাঁর রাজ্যে সুবর্ণ বর্ষণ করেছিল। সেখানে সুবর্ণরসের নদী প্রবাহিত ছিল। তাতে স্বর্ণকুমির ও স্বর্ণ মৎস্য বাস করত। মেঘ অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করত। রাজ্যে এক ক্রোশ লম্বা-চওড়া দিঘি ছিল, তাতে সুবর্ণময় কুমির ও কচ্ছপ থাকত। সেইসব দেখে রাজা আশ্চর্য হতেন। তিনি কুরুজাঙ্গাল দেশে যজ্ঞ করেছিলেন এবং তাঁর অপার সুবর্ণরাশি ব্রাহ্মণদের বিতরণ করেছিলেন। রাজা সুহোত্র এক হাজার অশ্বমেধ, একশত রাজসূয় এবং বহু দক্ষিণাসম্পন্ন নানা ক্ষত্রিয় যজ্ঞ এবং নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। সৃঞ্জয় ! এই সুহোত্রও তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁকেও রেহাই দেয়নি। এইসব ভেবে তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।'

নারদ আবার বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! যিনি সমস্ত পৃথিবীকে চর্মের ন্যায় বেষ্টন করেছিলেন, সেই উশীনরপুত্র রাজা শিবিও মারা গিয়েছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি দশকোটি আশরফি দান করেছিলেন, সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, পশু, ধান, মৃগ, গাভী, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি সহ বহু ভূখণ্ড ব্রাহ্মণদের প্রদান করেছিলেন। আকাশ থেকে পতিত জলধারা, আকাশে যত নক্ষত্র, গঙ্গার চরে যত বালুকণা, মেরুপর্বতে যত শিলাখণ্ড এবং সমুদ্রে যত রত্ন ও জলচর প্রাণী আছে, শিবির ব্রাহ্মণদের দান করা গাভীর সংখ্যাও প্রায় তেমনই। প্রজাপতিও শিবির ন্যায় মহাকার্যভারবহনকারী কোনো দ্বিতীয় মহাপুরুষ—অতীতে দেখা যায়নি, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও দুর্লভ। তিনি বহু যজ্ঞ করেছিলেন, যাতে প্রার্থীদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করা হত। সেই যজ্ঞে যজ্ঞস্তম্ভ,

আসন, গৃহ, প্রাচীর এবং দরজা—এ সবই সুবর্ণ নির্মিত হত। যজ্ঞের জন্য দুধ ও দইয়ের বড় বড় কুণ্ড ভরা থাকত। শুদ্ধ অন্নের পর্বত রাখা থাকত। সেখানে সকলের জন্য

ঘোষণা করা হত যে—'সজ্জনবৃন্দ স্নান করো এবং যার যেমন রুচি সেই অনুসারে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করো।' ভগবান শিব রাজা শিবির পুণ্যকর্মে প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছিলেন যে, 'রাজন্ ! সর্বদা দান করলেও তোমার ধনক্ষয় হবে না। তোমার শ্রদ্ধা, সুযশ এবং পুণ্য কর্ম অক্ষয় হবে। তোমার কথা অনুসারেই সকল প্রাণী তোমাকে ভালোবাসবে এবং অন্তকালে তোমার উত্তম লোক প্রাপ্তি হবে।'

উত্তম বর প্রাপ্ত হয়ে রাজা শিবি সময় হলে দিব্য লোকে গমন করলেন। তিনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকেও অধিক পুণ্যবান ছিলেন। ইনিই যখন মৃত্যু থেকে রক্ষা পাননি, তখন তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

সৃঞ্জয় ! যিনি প্রজাদের পুত্রের ন্যায় ভালোবাসতেন, সেই দশরথনন্দন রামও পরমধামে গমন করেছেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন এবং অসংখ্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পিতার আদেশে ধর্মপত্নী সীতা এবং ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে চোদ্দবছর বনবাস করেছিলেন। জনস্থানে থেকে তপস্বী মুনিদের রক্ষার জন্য তিনি চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করেন। সেখানে থাকাকালীন রাম ও লক্ষ্মণকে মায়ামুগ্ধ করে রাবণ নামক রাক্ষস তাঁর পত্নী সীতাকে হরণ করেন। রাবণ দেবতা ও দৈত্যদের অবধ্য ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের কণ্টকস্বরূপ ছিলেন। রাম রাবণকে সঙ্গীসাথীসহ বধ করেন। দেবতারা তাঁর স্তুতি করেন, সমস্ত জগতে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে। দেবতা ও ঋষিগণ তাঁর সেবায় ব্যাপৃত হন। তিনি বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করে সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দয়া করেন। ধর্মসহকারে প্রজাপালন করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুধা ও পিপাসা জয় করেছিলেন। সমস্ত দেহধারীর রোগ নষ্ট করেছিলেন। তিনি কল্যাণময়-গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং সর্বদা নিজ তেজে প্রকাশমান থাকতেন। রামের শাসন কালে এই পৃথিবীতে দেবতা, ঋষি এবং মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতেন। তখন সকলেই দীর্ঘায়ু হত। কোনো যুবক অকালে মারা যেত না। দেবতা এবং পিতৃপুরুষগণ প্রসন্ন হয়ে হব্যগ্রহণ করতেন। রামরাজ্যে বিষাক্ত প্রাণী ছিল না। সেই সময় লোকেরা অধার্মিক, লোভী বা মূর্খ হত না। সকলবর্ণের মানুষই শিষ্ট, বুদ্ধিমান এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করত।

জনস্থানে রাক্ষসরা পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের যে পূজা নষ্ট করেছিল, ভগবান শ্রীরাম রাক্ষসবধ করে তা পুনঃপ্রচলিত করেছিলেন। সেই সময় মানুষের বহু সন্তান জন্ম নিত এবং তারা প্রত্যেকেই দীর্ঘায়ু হত। বড়কে কখনো ছোটর শ্রাদ্ধ করতে হত না। ভগবান রামের শ্যামসুন্দর বর্ণ, তরুণ চেহারা এবং ঈষৎ অরুণ বর্ণ বিশাল

চক্ষু, আজানুলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ সকল জীবের মনোহরণ করত। তিনি এগারো হাজার বছর রাজ্যপালন করেন। সেই সময় লোকের মুখে শুধু রামেরই নাম থাকত। অন্তকালে তাঁর চার ভ্রাতার আট পুত্রের মাধ্যমে আটটি ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের স্থাপনা করে চারটি বর্ণের প্রজাসহ তিনি পরমধামে গমন করেন। সৃঞ্জয় ! তুমি ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ রামও যদি জীবিত থাকতে না পারেন, তবে তুমি কেন তোমার পুত্রের জন্য শোক করছ ?'

—o—

ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, যযাতি, অম্বরীষ এবং শশবিন্দুর মৃত্যুর দৃষ্টান্ত

নারদ পুনরায় বললেন—সৃঞ্জয় ! রাজা ভগীরথেরও মৃত্যুর কথা শোনা গেছে। তিনি যজ্ঞ করার সময় গঙ্গার দুধারে সোনার ইঁট দিয়ে ঘাট তৈরি করেছিলেন এবং স্বর্ণালংকার পরিহিত দশ লাখ কন্যা ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। তারা সকলেই চার ঘোড়াযুক্ত রথে বসেছিল। প্রত্যেক রথের পেছনে স্বর্ণহার পরিহিত একশত হাতি ছিল, প্রত্যেক হাতির পেছনে এক হাজার করে ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে শত শত গাভী, ছাগল ও মেষ অনুগামী ছিল।

এইভাবে তিনি বহু দক্ষিণা দিয়েছিলেন। গঙ্গা এত প্রাণী সমাবেশে ভয় পেয়ে 'আমায় রক্ষা করো' বলে ভগীরথের সাহায্য নেন। তার জন্য গঙ্গা ভগীরথের কন্যা হওয়ায়, তাঁর নাম হয় ভাগীরথী। গঙ্গাদেবী তাঁকে পিতা বলতেন। যে যে ব্রাহ্মণ যখনই কোনো অভীষ্ট বস্তু চেয়েছেন, জিতেন্দ্রিয় রাজা প্রসন্নতা সহকারে সেইসব বস্তু তৎক্ষণাৎ তাঁদের অর্পণ করেছেন। রাজা ভগীরথ ব্রাহ্মণদের কৃপায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সৃঞ্জয় ! ইনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বভাবে বড় ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি এখানে থাকতে পারলেন না, অন্যের আর কী কথা ! অতএব তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

ইলবিলোর পুত্র দিলীপও মারা গিয়েছেন, যাঁর শত যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ তত্ত্বজ্ঞানী এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যজ্ঞের সময় ধন-ধান্যসম্পন্ন এই সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়েছিলেন। রাজা দিলীপের যজ্ঞে স্বর্ণপথ নির্মাণ করা হয়েছিল। ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁকে ধর্মের সমকক্ষ মেনে তাঁর যজ্ঞে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর সুবর্ণময় সভাভবন সদা দেদীপ্যমান থাকত। সেখানে অন্নের পাহাড় এবং পেয় পদার্থের নদী বিরাজ করত। গন্ধর্বরাজ

বিশ্বাবসু সেখানে আনন্দে বীণা বাজাতেন। সকলেই সেই সত্যবাদী রাজাকে সম্মান করতেন। তাঁর একটি অদ্ভুত জিনিস ছিল, তিনি যুদ্ধ করার সময় জলে গেলেও, তাঁর রথের চাকা জলে ডুবত না। সেই সত্যবাদী, উদার রাজাকে যিনি দর্শন করতেন, তিনিও স্বর্গলোকের অধিকারী হতেন। দিলীপের ঘরে পাঁচ প্রকার আওয়াজ কখনো বন্ধ হত না—স্বাধ্যায়ের আওয়াজ, ধনুকের টংকার, অতিথির জন্য পান, ভোজন ও সাধুর জন্য ভিক্ষা গ্রহণের সুমধুর আহ্বান। সৃঞ্জয় ! এই রাজাও তোমাদের থেকে অনেক বড় ছিলেন, তিনি জীবিত থাকেননি। তাহলে তুমি কেন পুত্রের জন্য শোক করছ ?

যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতারও মৃত্যু হয়েছে। তিনি দেবতা, অসুর ও মানুষ— তিনলোকেরই বিজয়ী ছিলেন। কোনো এক সময়ের কথা, রাজা যুবনাশ্ব বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ঘোড়া অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল এবং তাঁরও পিপাসা পেয়েছিল। এর মধ্যে তিনি দূরে ধোঁয়া উঠতে দেখলেন, সেটি লক্ষ্য করে তিনি এক যজ্ঞমণ্ডপে

গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে একটি পাত্রে ঘৃতমিশ্রিত জল রাখা ছিল ; রাজা সেটি পান করেন। পেটে গিয়ে সেই মন্ত্রপূত জল বালকে পরিণত হয়। তারজন্য বৈদ্য শিরোমণি অশ্বিনীকুমারকে ডাকা হয়, তিনি গর্ভ থেকে সেই বালককে বার করেন। সেই বালক দেবতার ন্যায় তেজস্বী ছিল। তাকে পিতৃ ক্রোড়ে শায়িত দেখে দেবতারা বলাবলি করতে থাকেন, 'এ কার দুধ পান করবে ?' তাই শুনে ইন্দ্র বলে উঠলেন—'মাং ধাতা, আমার দুধ পান করবে।'

তখন ইন্দ্রের আঙুল থেকে ঘি এবং দুধের ধারা প্রবাহিত হল। ইন্দ্র যেহেতু দয়াপরবশ হয়ে 'মাং ধাতা' বলেছিলেন, তাই বালকের নাম হল মান্ধাতা। ইন্দ্রের হাত থেকে ঘি ও দুধ পান করে সে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বারো দিনেই সেই বালক বারো বৎসরের বালকের মতো হয়ে উঠল। রাজা হয়ে মান্ধাতা এক দিনেই সমস্ত পৃথিবী জয় করে নিলেন। তিনি ধর্মাত্মা, ধৈর্যবান, বীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, পুরু, বৃহদ্রথ, অসিত এবং নৃগকেও পরাজিত করেছিলেন। সূর্য যেখান থেকে উদিত হতেন এবং যেখানে অস্ত যেতেন, সে সব ক্ষেত্রই যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার রাজ্য বলা হত।

মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি শত যোজন বিস্তৃত মৎস্যদেশ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞে মধু ও দুধ প্রবাহিত নদী এবং চতুর্দিকে অন্নের পাহাড় ছিল। সেই নদীর ভেতর ঘৃতের কয়েকটি কুণ্ড ছিল। সেই রাজার যজ্ঞে দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, পক্ষী, ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে কেউই মূর্খ ছিল না। তিনি ধন-ধান্য পরিপূর্ণ আসমুদ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন এবং সময়মতো তিনিও ইহলোক থেকে গমন করেন। সমস্ত দিকে তাঁর সুযশ ছড়িয়ে তিনি পুণ্যবানদের লোকে পৌঁছে গেলেন। সৃঞ্জয় ! ইনিও তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনিও যখন মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পাননি, অন্যের আর কী কথা ! সুতরাং তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

নহুষনন্দন যযাতির মৃত্যুও শোনা গেছে। তিনি একশত রাজসূয়, একশত অশ্বমেধ, এক হাজার পুণ্ডরীক যজ্ঞ, একশত বাজপেয় যজ্ঞ, এক হাজার অতিরাত্র যজ্ঞ, চাতুর্মাস্য এবং অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি নানাপ্রকার যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে ব্রাহ্মণদের অনেক দক্ষিণা দিয়েছিলেন। পরম পবিত্র সরস্বতী নদী, সমুদ্র এবং পর্বতসহ অন্যান্য স্রোতস্বিনীগুলি যজ্ঞকারী যযাতিকে ঘৃত ও দুগ্ধ প্রদান করেছিলেন। নানাপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করে তিনি পৃথিবীকে চারভাগ করে সেগুলি ঋত্বিক, অধ্বর্যু, হোতা ও উদ্গাতা—এই চারপ্রকার ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পত্নীদ্বয় দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা উত্তম সন্তানের জন্ম দেন। যখন ভোগ করে তিনি শান্তিপ্রাপ্ত হলেন না, তখন তিনি নিম্নলিখিত গাথা রচনা করে ধর্মপত্নীকে নিয়ে বাণপ্রস্থে গমন করেন। গাথাটি হল—'এই পৃথিবীতে যত ধান্য, স্বর্ণ, পশু এবং নারী ইত্যাদি আছে, তা একটি মানুষকেও সন্তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত নয়—এই চিন্তা করে মনকে শান্ত করা উচিত।'

রাজা যযাতি এইভাবে ধৈর্যপূর্বক কামনা ত্যাগ করে নিজ পুত্র পুরুকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে বাণপ্রস্থে গমন করেন। সৃঞ্জয় ! ইনিও তোমার এবং তোমার পুত্রের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইনিও যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে তোমারও মৃতপুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

কথিত আছে, নাভাগের পুত্র অম্বরীষও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একাকী দশলাখ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কোনো এক সময়ের কথা, রাজার শত্রুগণ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। তারা সকলেই অস্ত্রকৌশলী ছিল এবং রাজার প্রতি অশুভ বাক্য প্রয়োগ করছিল। তখন রাজা অম্বরীষ তাঁর সামর্থ্য, অস্ত্রবল, হস্তকৌশল এবং যুদ্ধকুশলতার দ্বারা শত্রুদের ছত্র, ধ্বজা, আয়ুধ ও রথ টুকরো টুকরো করে দেন। তখন তারা প্রাণভিক্ষা করে প্রার্থনা করে যে 'আমরা আপনার শরণাগত' বলে কৃপা চায়। শত্রুদের বশীভূত করে সমস্ত পৃথিবী জয় করে তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে একশত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে উত্তম ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য লোকেরাও সর্বপ্রকার উত্তম অন্নভোজন করে অত্যন্ত তৃপ্ত হয় এবং রাজাও সকলকে ভালোভাবে আদর-আপ্যায়ন করেন। রাজা সেইসঙ্গে অধিক মাত্রায় দক্ষিণাও প্রদান করেন। মহর্ষিগণ তাঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে বলতেন যে, 'অসংখ্য দক্ষিণা প্রদানকারী রাজা অম্বরীষ যেমন যজ্ঞ করতেন, তেমন যজ্ঞ আগের কোনো রাজা করেননি এবং পরেও করবেন না।' সৃঞ্জয় ! ইনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনিও মৃত্যুর বশীভূত হয়েছিলেন, সুতরাং তোমার মৃতপুত্রের জন্য

শোক করা উচিত নয়।

শোনা যায়, রাজা শশবিন্দু, যিনি নানাপ্রকার যজ্ঞ করেছিলেন, তিনিও মৃত্যুর কবলিত হয়েছিলেন। তাঁর এক লাখ পত্নী ছিল, প্রত্যেকের গর্ভে এক হাজার করে সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। সব রাজকুমারই পরাক্রমী, বেদপারঙ্গম এবং উত্তম ধনুর্ধারী ছিলেন। সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা তাঁর পুত্রদের অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। প্রত্যেক রাজপুত্রের সঙ্গে সুবর্ণ ভূষিত একশতজন কন্যা, এক একটি কন্যার সঙ্গে একশত করে হাতি, প্রত্যেক হাতির সঙ্গে একশত করে রথ, প্রত্যেক রথের সঙ্গে একশত করে ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে হাজার হাজার গাভী এবং প্রত্যেক গাভীর সঙ্গে পঞ্চাশটি করে মেষ। এই অপার ধন রাজা শশবিন্দু তাঁর মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে ক্রোশব্যাপী অন্নের
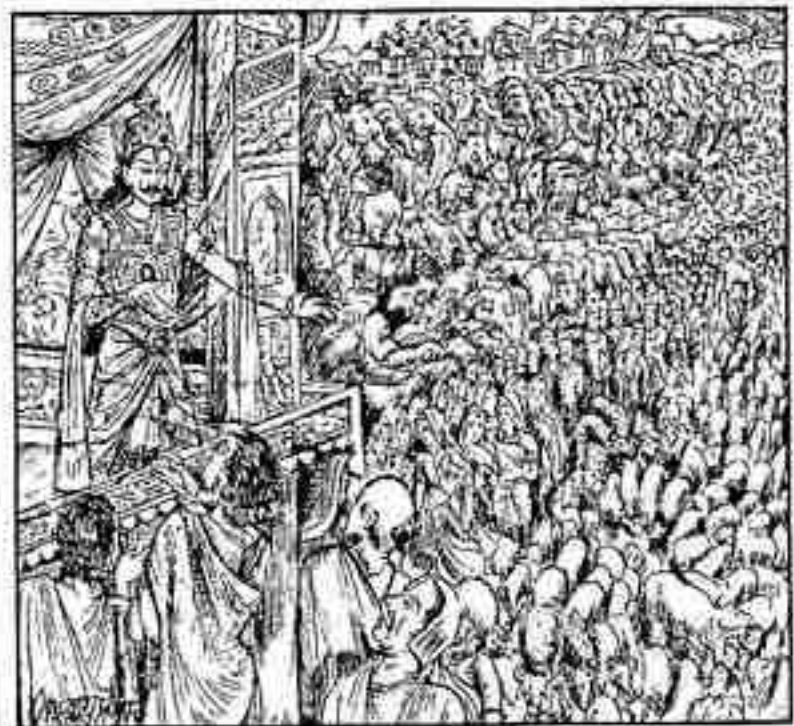
পাহাড় তৈরি হয়েছিল। রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তেরোটি অন্নের পর্বত উদ্বৃত্ত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবীতে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও নীরোগ ছিল। যেখানে কোনো বিঘ্ন নেই, সেখানে কোনো রোগ-বালাইও থাকে না। বহুকাল রাজ্য উপভোগ করে শেষে রাজা শশবিন্দু দিব্যলোক প্রাপ্ত হন। সৃঞ্জয় ! ইনিও তোমার ও তোমার পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; ইনিও যখন পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করেন, তখন তোমার নিজ পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

—o—

রাজা গয়, রন্তিদেব, ভরত ও পৃথুর কথা এবং যুধিষ্ঠিরের শোকনিবৃত্তি

মহর্ষি নারদ বললেন—রাজা অমূর্তরয়ের পুত্র গয়েরও মৃত্যুর কথা শোনা যায়। তিনি একশত বৎসর অগ্নিহোত্র করেছিলেন এবং প্রত্যহ হোমবিশিষ্ট অন্নই ভোজন করতেন। তাতে অগ্নিদেব প্রসন্ন হয়ে রাজাকে বর চাইতে বললে, রাজা গয় এই বর প্রার্থনা করেন—'আমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, ব্রত, নিয়ম এবং গুরুজনের কৃপায় বেদাদির জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে চাই। অন্যকে কষ্ট না দিয়ে নিজ ধর্ম অনুসারে অক্ষয় ধনলাভ করতে চাই। প্রতিদিন যেন ব্রাহ্মণদের দান করি এবং এই

কাজে যেন আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। নিজ বর্ণের কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, সেই নারী যেন পতিব্রতা হয় এবং তারই গর্ভে যেন আমার পুত্র হয়। অন্নদানে যেন আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মে যেন মন নিবিষ্ট থাকে। আমার ধর্মকার্যে যেন কখনো কোনো বিঘ্ন না আসে।'

অগ্নিদেব 'তাই হোক' বলে অন্তর্ধান করলেন। রাজা গয় তাঁর সমস্ত অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হলেন এবং ধর্মদ্বারাই শত্রুর ওপর বিজয়লাভ করলেন। একশত বৎসর ধরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্রহায়ণ, চাতুর্মাস্য ইত্যাদি নানাপ্রকার যজ্ঞ করেন/এবং প্রচুর দক্ষিণা দেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে একলাখ ষাট হাজার গোরু, দশহাজার ঘোড়া এবং একলাখ আশরফি দান করতেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে মণিময় স্বর্ণ-পৃথিবী তৈরি করে ব্রাহ্মণদের দান করেন। সমুদ্র, নদ, নদী, বন, দ্বীপ, নগর, রাষ্ট্র, আকাশ ও স্বর্গে যে নানা প্রাণী বাস করেন, তাঁরা সকলে তাঁর যজ্ঞে তৃপ্ত হয়ে বলে থাকেন—'রাজা গয়ের মতো যজ্ঞ আর কখনো হয়নি।' তিনি ছত্রিশ যোজন লম্বা এবং ত্রিশ যোজন চওড়া চব্বিশটি সুবর্ণমণ্ডিত বেদি নির্মাণ করেছিলেন। এটি পূর্ব থেকে ক্রমশ পশ্চিমে নির্মাণ করা হয়েছিল। বেদির ওপর হীরে-মুক্তো গাঁথা ছিল। সেগুলি বস্ত্রালংকারের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের দান করা হয়েছিল। যজ্ঞের শেষে অন্নের পাঁচিশটি পর্বত উদ্বৃত্ত হয়ে গিয়েছিল। কোথাও বস্ত্র, কোথাও অলংকারের রাশি জড়ো হয়েছিল। সেই যজ্ঞের প্রভাবে রাজা গয় ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

সেই পুণ্যকে অক্ষয় কীর্তি প্রদানকারী অক্ষয়বট এবং পবিত্র তীর্থ ব্রহ্মসরও তাঁর জন্য বিখ্যাত হল। সৃঞ্জয় ! এই রাজা গয় তোমার এবং তোমার পুত্রের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ; তা সত্ত্বেও তিনি যখন বেঁচে নেই, তখন তুমি পুত্রের জন্য শোক নিবারণ করো।

শুনেছি, সঙ্কৃতির পুত্র রন্তিদেবও জীবিত নেই। তাঁর কাছে দু লাখ পাচক কাজ করত, যারা গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণদের সুধার ন্যায় মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে পরিবেশন করত। রাজা রন্তিদেব প্রত্যেক পক্ষে সুবর্ণের সঙ্গে হাজার বলদ দান করতেন। একটি বলদের সঙ্গে একশত গাভী, সঙ্গে আটশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হত। তার সঙ্গে যজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীও থাকত। তিনি একশত বৎসর এই নিয়ম পালন করেছিলেন। তিনি ঋষিদের কমণ্ডলু, ঘড়া, বালতি, পিঁড়ি, শয্যা, আসন, মহল, গৃহ, বৃক্ষ এবং অন্ন-ধন প্রভৃতি দান করতেন। সমস্ত বস্তু স্বর্ণখচিত হত। রন্তিদেবের এই অলৌকিক সমৃদ্ধি দেখে পুণ্যবেত্তারা তাঁদের যশোগানে বলতেন—'আমরা কুবেরের গৃহেও রন্তিদেবের মতো ধনের পূর্ণ ভাণ্ডার দেখিনি, তাহলে মানুষের আর কথা কী ?' তাঁর সমস্ত সামগ্রীই সোনার ছিল। তিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের প্রায় সবই দান করে দিতেন। তাঁর প্রদত্ত হব্য-কব্য দেবতা ও পিতৃপুরুষ

প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মণদের সব কামনাই তাঁর কাছে পূর্ণ হত। সৃঞ্জয় ! ইনিও তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; এ হেন ব্যক্তিও যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

দুষ্মন্তের পুত্র ভরতও মৃত্যুলাভ করেছিলেন, তার কাহিনী শোনো। ভরত বনবাসকালে শিশু বয়সেই এমন পরাক্রম দেখিয়েছিলেন, যা অন্যের পক্ষে কঠিন। তিনি যখন শিশু ছিলেন, বড় বড় সিংহকে দমন করে বেঁধে ফেলতেন। তারপর টেনে নিয়ে যেতেন। অজগরের দাঁত ভেঙে দিতেন এবং পালাতে থাকা হাতির দাঁত ধরে নিজের বশে নিয়ে আসতেন। তিনি সব জীবকে এভাবে দমন করতেন দেখে ব্রাহ্মণরা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'সর্বদমন'।

রাজা ভরত যমুনাতীরে একশত, সরস্বতী কূলে তিনশত এবং গঙ্গাকিনারে চারশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তারপর পুনরায় তিনি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একশত রাজসূয় যজ্ঞ করেন, যাতে উত্তম দক্ষিণা প্রদান করা হয়। তারপর অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে দশলাখ বাজপেয় যজ্ঞ করেন। শকুন্তলানন্দন এই সব যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের বহুধন দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। সৃঞ্জয় ! ভরতও তোমার এবং তোমার পুত্রের থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ; তিনিও যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

মহর্ষিগণ রাজসূয় যজ্ঞে যাকে 'সম্রাট' পদে অভিষিক্ত করেছিলেন, সেই মহারাজ পৃথুও মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত যত্নে পৃথিবীকে চাষাবাদের যোগ্য করে প্রথিত (প্রসিদ্ধ) করেছিলেন, তাই তিনি 'পৃথু' নামে খ্যাত। এই পৃথিবী পৃথুর কাছে কামধেনু হয়ে উঠেছিল, চাষ না করেই এখানে ফসল ফলত। সমস্ত গাভী সেইসময় কামধেনুর সমান ছিল। পাতা থেকে মধু ঝরত। কুশগুলি সুবর্ণময় হত এবং তা সুখদ এবং কোমলও হত। তাই প্রজাগণ তার বস্ত্র পরিধান করত এবং তার ওপরেই শয়ন করত। বৃক্ষাদির ফল অমৃতের ন্যায় মধুর ও স্বাদু হোত। কেউ অভুক্ত থাকত না। সকলেই নীরোগ ছিল। সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হত এবং সকলেই নির্ভয়ে থাকত। লোকে নিজ নিজ রুচি অনুসারে বৃক্ষতলে বা গুহায় বাস করত। সেইসময় রাষ্ট্র বা নগরের বিভাজন ছিল না। সকলেই সুখী, সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন ছিল।

রাজা পৃথু সমুদ্র যাত্রা করলে জল থেমে যেত এবং পর্বত রাস্তা করে দিত। তাঁর রথের ধ্বজা কখনো ভাঙেনি। একবার তাঁর কাছে বনস্পতি, পর্বত, দেবতা, অসুর, মনুষ্য, সর্প, সপ্তর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং পিতৃপুরুষরা এসে বললেন—'মহারাজ ! আপনি আমাদের সম্রাট, আপনি আমাদের কষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের রাজা, রক্ষক ও পিতা। আপনি আমাদের অভীষ্ট বর প্রদান করুন, যাতে আমরা অনন্তকাল তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করতে পারি।' তাই শুনে রাজা বললেন—'তাই হবে।'

তারপর রাজা পৃথু নানাপ্রকার যজ্ঞ করলেন এবং সকল প্রাণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। পৃথিবীতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, সেই আকারের সুবর্ণ পদার্থ তৈরি করে রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞে সেগুলি ব্রাহ্মণদের দান করেন। তিনি ছেষট্টি হাজার সোনার হাতি তৈরি করে ব্রাহ্মণদের দান
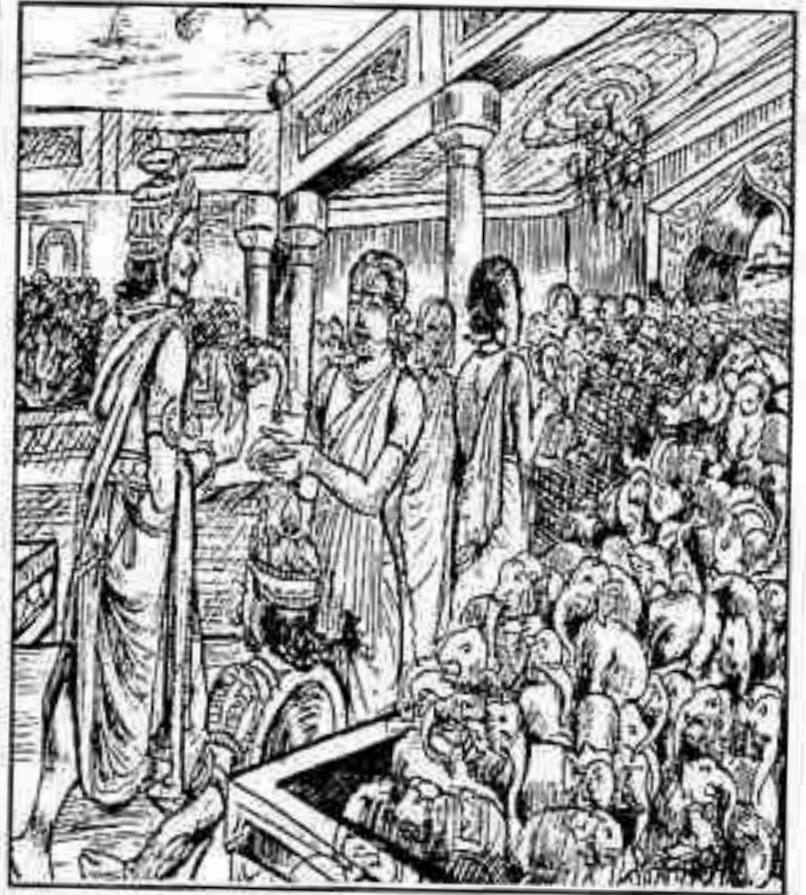
করেছিলেন। স্বর্ণ পৃথিবী নির্মাণ করে মণিমুক্তা ভূষিত করে দান করেছিলেন। সৃঞ্জয় ! ইনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ইনিও যখন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাননি, তখন তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

ব্যাসদেব বললেন—যুধিষ্ঠির ! এইসব রাজাদের উপাখ্যান শুনে সৃঞ্জয় কিছু বললেন না, মৌন হয়ে থাকলেন। তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে নারদ বললেন—'রাজন্ ! আমি যা বলেছি, তা শুনেছ । কিন্তু মর্মার্থ বুঝতে পেরেছ কি ? শূদ্রজাতির নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে যেমন ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্মই নষ্ট হয়ে যায়, আমার

এই সমস্ত কথা ব্যর্থ হয়ে যায়নি তো ?' তাঁর কথা শুনে সৃঞ্জয় হাত জোড় করে বললেন—'মুনিবর ! প্রাচীন রাজর্ষিদের এই উত্তম কাহিনী শুনে আমার সমস্ত শোক দূর হয়েছে। এখন আমার হৃদয়ে কোনো ব্যথা নেই। আপনি বলুন এখন আপনার কোন আদেশ পালন করব ।'

শ্রীনারদ বললেন—অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে তোমার শোক দূর হয়েছে ; এখন তোমার যা ইচ্ছা, আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও।

সৃঞ্জয় বললেন—আপনি আমার ওপর প্রসন্ন, এতেই আমি সন্তুষ্ট। যার ওপর আপনি প্রসন্ন, ইহ জগতে তার কাছে কোনো বস্তুই দুর্লভ নয়।

নারদ বললেন—ডাকাতরা তোমার পুত্রকে বৃথাই পশুর ন্যায় হত্যা করেছে। সে নরকে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে ; সুতরাং আমি তাকে নরক থেকে এনে তোমাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ব্যাসদেব বললেন—এই কথা বলতেই, সৃঞ্জয়ের সেই অদ্ভুত কান্তিমান পুত্র সেখানে উপস্থিত হল। তাকে দেখে রাজা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সৃঞ্জয়ের পুত্র নিজ ধর্ম পালন করে কৃতার্থ হয়নি, ভয়ে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই শ্রীনারদ তাকে পুনরায় জীবন দান করেন। কিন্তু অভিমন্যু কৃতার্থ এবং শূরবীর ছিলেন ; সে রণাঙ্গনে হাজার হাজার শত্রু বধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। যোগী, নিষ্কামভাবে যজ্ঞকারী এবং তপস্বী ব্যক্তি যে উত্তম গতি লাভ করেন, তোমার পুত্রও সেই অক্ষয় গতি লাভ করেছে। অভিমন্যু চন্দ্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, সেই বীর তার অমৃতময় কিরণে প্রকাশমান হয়ে রয়েছে ; তার জন্য শোক করা উচিত নয়। এইসব ভেবে তুমি ধৈর্য ধারণ করো। শোক করলে দুঃখ বেড়েই যায় ; তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির শোক পরিত্যাগ করে নিজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা উচিত। তুমি তো মৃত্যুর উৎপত্তি এবং তার অনুপম তপস্যার কথা শুনেছ। মৃত্যুর কাছে সব প্রাণীই সমান। ঐশ্বর্য চঞ্চল। সৃঞ্জয়ের পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কথায় তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই রাজা যুধিষ্ঠির ! তুমি এখন শোক ত্যাগ করো।

এই বলে ব্যাসদেব সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির প্রাচীন রাজাদের যজ্ঞ সম্পদের কথা শুনে মনে মনে তাঁদের প্রশংসা করে শোক পরিত্যাগ করলেন। তারপর 'অর্জুনকে কী বলব ?' ভেবে চিন্তান্বিত হলেন।

অর্জুনের বিষাদ এবং জয়দ্রথকে বধ করার প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সেই দিন সূর্যাস্তে প্রাণী সংহার বন্ধ হলে সমস্ত সৈনিক নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল। অর্জুনও তাঁর দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে সংশপ্তকদের বধ করে রথারূঢ় হয়ে শিবিরের দিকে চললেন। যেতে যেতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'কেশব ! জানি না আজ আমার হৃদয় কেন এত ব্যাকুল হচ্ছে, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোনো অনিষ্ট হয়েছে, আমি একথা ভুলতেই পারছি না। পৃথিবী এবং সমস্ত দিকের ভয়ংকর উৎপাতে আমার ভয় হচ্ছে। আমার পূজনীয় ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর মন্ত্রিসহ কুশলে আছেন তো ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—শোক কোরো না, মন্ত্রিসহ তোমার ভাইয়ের কল্যাণই হবে। এই অলক্ষণ অনুসারে অন্য কোনো অনিষ্ট হয়েছে বোধ হয়।

তারপর দুই বীর সন্ধ্যা উপাসনা করে রথে বসে যুদ্ধ সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে চললেন। শিবিরে পৌঁছে দেখলেন সেখানে সব নিরানন্দ ও শ্রীহীন হয়ে রয়েছে। তখন অর্জুন চিন্তিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন !

আজ শিবিরে মাঙ্গলিক বাদ্য বাজছে না, দুন্দুভির ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না। বীণা বা মঙ্গলগীত শোনা যাচ্ছে না। বন্দীগণ স্তুতিপাঠ করছে না। আমার সৈনিকরা আমাকে দেখে মুখ নীচু করে সরে যাচ্ছে। এদের ব্যাকুল দেখে আমার হৃদয়ের খটকা যাচ্ছে না। প্রতিদিনের মতো আজ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু তার ভাইদের সঙ্গে হাসতে হাসতে আমাকে স্বাগত জানাতে এলো না।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে তাঁরা দুজনে শিবিরে পৌঁছে দেখলেন যে পাণ্ডবরা অত্যন্ত ব্যাকুল এবং হতোদ্যম হয়ে রয়েছেন। ভাইদের এবং পুত্রদের এই অবস্থায় দেখে এবং সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে সেখানে না পেয়ে অর্জুন আশঙ্কা করলেন অভিমন্যু নিহত এবং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন —'আজ আপনাদের অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখছি, এদিকে অভিমন্যুকে দেখা যাচ্ছে না, আপনারা প্রসন্নভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না, কী হয়েছে ? আমি শুনেছি যে আচার্য দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন, আপনাদের মধ্যে অভিমন্যু ব্যতীত আর কেউই তা ভেদ করতে সক্ষম নয়। অভিমন্যুকেও আমি এখনও ওই ব্যূহ থেকে বার হবার উপায় বলিনি। আপনারা সেই বালককে চক্রব্যূহে পাঠাননিতো ? সুভদ্রানন্দন সেই ব্যূহ ভঙ্গ করে মারা পড়েনি তো ? সে সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রিয় এবং মাতা কুন্তী ও শ্রীকৃষ্ণের বড় আদরের ; বলুন এমন কে আছে, যে তাকে বধ করেছে ? হায় ! সে কেমন হাসিমুখে কথা বলত, সর্বদা বড়দের আদেশ পালন করত। শিশুবয়স থেকেই তার পরাক্রমের তুলনা ছিল না। কী সুন্দর প্রিয়ভাষী ছিল। ঈর্ষা, দ্বেষ তাকে ছুঁতে পারেনি। সে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। আজানুলম্বিত বাহু ও বিশাল কমল নয়ন ছিল তার। নিজের অনুচরদের ওপর তার খুব দয়া ছিল, কখনো নীচ ব্যক্তির সঙ্গ করত না। সে কৃতজ্ঞ, জ্ঞানী এবং অস্ত্রবিদ্যায় কুশল ছিল। যুদ্ধে কখনো পশ্চাদাপসরণ করত না। সে যুদ্ধকে অভিনন্দন জানাতো, শত্রু তাকে দেখলে ভীত হয়ে পড়ত। সে আত্মীয়দের প্রিয়কারী এবং পিতৃবর্গের বিজয়াকাঙ্ক্ষী ছিল। কখনো প্রথমে শত্রুকে আঘাত করত না এবং যুদ্ধে সর্বদা নির্ভীক থাকত। রথীদের গণনার সময় যাকে মহারথী বলে ধরা হয়েছিল, সেই বীর অভিমন্যুর মুখ না দেখে আমি কী করে শান্তি পাব ? আমার নিজের থেকে সুভদ্রার জন্য বেশি দুঃখ হচ্ছে, বেচারি পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকে প্রাণত্যাগ করবে। অভিমন্যুকে না দেখে সুভদ্রা এবং দ্রৌপদী আমাকে কী বলবে ? দুজনকে আমি কী জবাব দেব ? আমার হৃদয় সত্যই বজ্র-নির্মিত, তাই তো পুত্রবধূ উত্তরার বিলাপের কথা ভেবেও আমার হৃদয় হাজার টুকরো হয়ে যাচ্ছে না।'

অর্জুনকে পুত্রশোকে ব্যথিত এবং তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সামলাতে লাগলেন এবং বললেন—'মিত্র ! এত ব্যাকুল হয়ো না। যারা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, সেই সব শূরবীরদের এক দিন এই পথেই যেতে হয়। যুদ্ধেই যাদের জীবন চলে, বিশেষত সেই ক্ষত্রিয়দের এটিই পথ, শাস্ত্রজ্ঞরা তাদের জন্য এই গতিই নিশ্চিত করেছেন। সকল যোদ্ধাই চায় যে তাদের যেন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু হয়। অভিমন্যু বড় বড় বীর এবং মহাবলী রাজকুমারদের যুদ্ধে বধ করেছে, শত্রুর সামনে নির্ভয়ে থেকে বীরের বাঞ্ছনীয় মৃত্যুবরণ করেছে।/তোমাকে শোকাকুল দেখে তোমার ভাই ও বন্ধুরা অধিক দুঃখ পাচ্ছে। এদের তুমি সান্ত্বনা প্রদান করো। তুমি তো জানবার তত্ত্বগুলি জেনেছ ; তোমার শোক করা উচিত নয়।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বোঝালে অর্জুন তখন ভাইদের বললেন—'আমি শুরু থেকে অভিমন্যুর মৃত্যুর ঘটনা শুনতে চাই। আপনারা সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় কুশল, হাতে অস্ত্র নিয়ে সেখানেই ছিলেন। সেই সময় অভিমন্যু ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও মৃত্যু মুখে যেত না ; আপনারা থাকা সত্ত্বেও সে কীভাবে মারা গেল ? আমি যদি জানতাম যে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল আমার পুত্রকে রক্ষা করতে অসমর্থ, তাহলে আমি নিজে থেকে তাকে রক্ষা করতাম।'

এই বলে অর্জুন চুপ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেউই তাঁর দিকে তাকাতে বা কথা বলতে সাহস করলেন না। যুধিষ্ঠির বললেন—'মহাবাহো ! তুমি যখন সংশপ্তক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে, তখন দ্রোণাচার্য আমাকে বন্দী করার ভীষণ চেষ্টা করেন। তিনি রথী এবং সৈন্য নিয়ে ব্যূহ নির্মাণ করে বারংবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন আর আমরা ব্যূহাকারে সংগঠিত হয়ে তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ করে দিচ্ছিলাম। দ্রোণাচার্য তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে আমাদের আঘাত করছিলেন। সেই সময় ব্যূহ ভেদ করা দূরের কথা, আমরা তাঁর দিকে তাকাতেই পারছিলাম না। সেই পরিস্থিতিতে আমরা সকলে অভিমন্যুকে

বললাম—'পুত্র ! তুমি ব্যূহ ভেঙে দাও।' আমাদের কথাতেই সে এই অসহনীয় ভার বহন করতে রাজি হয় এবং তোমার শিক্ষানুসারে সে ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে চলে যায়। আমরাও তার প্রদর্শিত পথে যখন তার পেছনে যাচ্ছিলাম তখন জয়দ্রথ শংকরের বরদানের প্রভাবে আমাদের গতিরোধ করে। তারপর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী তাকে ঘিরে ধরে। তা সত্ত্বেও সেই বালক নিজ শক্তি অনুসারে তাদের পরাস্ত করার পূর্ণ প্রয়াস করে। কিন্তু এরা সকলে মিলে তাকে রথচ্যুত করে। যখন সে একা অসহায় হয়ে পড়ে, তখন দুঃশাসনের পুত্র সংকটাপন্ন অবস্থায় তাকে বধ করে। অভিমন্যু প্রথমে এক হাজার হাতি, ঘোড়া, রথী এবং পদাতিক বধ করেছে, তারপর আবার আটহাজার রথী এবং নয়শত হাতি সংহার করেছে, পরে দু হাজার রাজকুমার এবং আরও বহু অজ্ঞাত বীরদের বধ করে রাজা বৃহদ্বলকেও স্বর্গলোকে পাঠায়। তারপর সে স্বয়ং মারা যায় এবং এটিই আমাদের পক্ষে সবথেকে হৃদয় বিদারক কথা।'

ধর্মরাজের কথা শুনে অর্জুন 'হা পুত্র !' বলে করুণ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং শোকে কাতর হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সেই সময় সকলেই বিষাদমগ্ন হয়ে অর্জুনকে ঘিরে বসলেন এবং একে অপরের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে অর্জুনের চেতনা ফিরে এলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—'আমি আপনাদের সামনে

সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি যে, জয়দ্রথ যদি কৌরবদের পক্ষ ছেড়ে পালিয়ে না যায় অথবা আমাদের বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অথবা যুধিষ্ঠিরের শরণ গ্রহণ না করে, তাহলে কাল আমি ওকে অবশ্যই বধ করব। কৌরবদের প্রিয় কর্মকারী পাপী জয়দ্রথই এই বালকের বধের নিমিত্ত হয়েছিল, সুতরাং কাল তাকে নিশ্চয়ই মৃত্যুর হাতে তুলে দেব। যদি কাল তাকে বধ না করি, তাহলে মাতৃ-পিতৃ হত্যাকারী, গুরুস্ত্রীগামী, সাধু-নিন্দুক, অপরের কলঙ্ককারী, গচ্ছিতের বস্তু অপহরণকারী, বিশ্বাসঘাতক পুরুষের যে গতি হয়, আমারও তাই হবে। যারা বেদাধ্যয়নকারী উত্তম ব্রাহ্মণদের এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের, সাধুদের এবং গুরুজনদের অনাদর করে, ব্রাহ্মণ, গাভী ও অগ্নিকে পা দিয়ে স্পর্শ করে, জলাশয়ে মল-মূত্র-থুতু ত্যাগ করে তাদের যে গতি হয়, জয়দ্রথকে কাল বধ না করলে আমারও সেই গতি হবে। নগ্ন হয়ে স্নানকারী, অতিথিদের নিরাশকারী, সুদখোর, মিথ্যাবাদী, ঠগ, আত্মবঞ্চক, অপরের ওপর মিথ্যা দোষারোপকারী ও পরিবারকে না দিয়ে একাকী খাদ্য-গ্রহণকারী লোকদের যে দুর্গতি হয়, জয়দ্রথকে বধ না করলে আমারও সেই গতি হবে। যে শরণাগতকে ত্যাগ করে এবং সজ্জনদের পালনপোষণ করে না, উপকারীদের নিন্দা করে, সুযোগ্য ব্যক্তিকে দান না করে অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে, শূদ্র জাতির স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রক্ষাকারীকে শ্রাদ্ধান্ন ভক্ষণ করায়, মাতাল, মর্যাদা ভঙ্গকারী, কৃতঘ্ন, স্বামী নিন্দুক—সেই ব্যক্তির যে দুর্গতি হয়, জয়দ্রথকে বধ না করলে তা আমারও হবে। যারা বাম হাতে ভোজন করে, কোলে রেখে খায়, পলাশের পাতায় উপবেশন ও তেন্দুর গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজে, যে ধর্মত্যাগ করেছে, প্রাতঃকালে ঘুমায়, ব্রাহ্মণ হয়ে ঠাণ্ডাকে এবং ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধকে ভয় পায়, শাস্ত্রের নিন্দা করে, দিবা-কালে ঘুমায় অথবা মৈথুন করে, গৃহে আগুন লাগায়, অগ্নিহোত্র ও অতিথি সংকারে বিমুখ, তৃষ্ণার্ত গোরুকে জলপানে বাধা দেয়, মাসিককালে নারী-সঙ্গ করে, অর্থ নিয়ে কন্যা বিক্রয় করে, বহু লোকের যজমানী করে, ব্রাহ্মণ হয়ে দাসবৃত্তি করে এবং যে ব্রাহ্মণকে দানের সংকল্প করে লোভবশত বিমুখ করে—তাদের যে দুঃখদায়ক গতি হয়, জয়দ্রথকে বধ না করলে আমারও তাই হবে। উপরে যে সকল পাপীদের উল্লেখ করেছি এবং যাদের নামের উল্লেখ করিনি তাদের যে দুর্গতি হয় জয়দ্রথকে কালকে নিধন না করলে আমারও যেন সেই গতি হয়। এবার আমার অন্য

প্রতিজ্ঞাও শুনুন—যদি কাল সূর্যাস্তের আগে পাপী জয়দ্রথ বধ না হয়, তবে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব। দেবতা, অসুর, মানুষ, পক্ষী, নাগ, পিতৃ-পুরুষ, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি—এরা সকলে এবং এঁদের অতীত যা কিছু আছে সকলে মিলেও আমার শত্রুকে রক্ষা করতে পারবে না। জয়দ্রথ যদি পাতালে প্রবেশ করে অথবা অন্তরীক্ষে, দেবতাদের নগরে বা দৈত্যপুরীতে গিয়ে লুকোয় তাহলেও আমি শত শত বাণে অভিমন্যুর এই শত্রুর মস্তক দেহচ্যুত করবই।'

এই বলে অর্জুন ধনুকে টংকার দিলে, গাণ্ডীবের সেই ধ্বনি আকাশে গুঞ্জন তুলল। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করলেন এবং ক্রুদ্ধ অর্জুন খুব জোরে তাঁর দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শঙ্খধ্বনিতে আকাশ-পাতালসহ সমস্ত চরাচর কম্পিত হল। সেই সময় শিবিরে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল এবং পাণ্ডবরা সিংহনাদ করতে লাগলেন।

—o—

ভীত-সন্ত্রস্ত জয়দ্রথকে দ্রোণের আশ্বাস প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আলোচনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! দূতরা জয়দ্রথকে গিয়ে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা জানাল। শুনেই জয়দ্রথ ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেলেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে তিনি রাজাদের সভায় গেলেন, সেখানে তিনি প্রবল ভয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। অর্জুনকে ভয় পাওয়ায় তিনি বিলাপ করতে করতে বললেন—রাজাগণ ! পাণ্ডবদের হর্ষধ্বনি শুনে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। মরণাপন্ন মানুষের মতো আমার সারা অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। অর্জুন নিশ্চয়ই আমাকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছে তাই তো এই শোকের সময়ও তারা হর্ষান্বিত হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তো অর্জুনের প্রতিজ্ঞা দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, নাগ এবং রাক্ষসও অন্যথা করতে পারবে না। আপনাদের মঙ্গল হোক, আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি গিয়ে এমন স্থানে আশ্রয় নেব, যেখানে পাণ্ডবরা আমাকে দেখতে পাবে না।

জয়দ্রথকে এইভাবে ভয়ে ব্যাকুল হতে দেখে রাজা দুর্যোধন বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি এতো ভয় পেয়ো না।

যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরদের দ্বারা বেষ্টিত থাকলে তোমায় কে ধরতে পারবে ? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল, বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, কলিঙ্গরাজ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি—এঁরা সকলে এবং আরও বহু রাজা তাঁদের সৈন্য নিয়ে তোমাকে রক্ষার জন্য থাকবেন। তুমি চিন্তা দূর করো। সিন্ধুরাজ ! তুমি নিজেও শ্রেষ্ঠ মহারথী, শূরবীর, তাহলে পাণ্ডবদের ভয় পাচ্ছ কেন ? আমার সমস্ত সৈন্য তোমাকে রক্ষা করার জন্য সতর্ক থাকবে, তুমি ভয় ত্যাগ করো।'

রাজন্ ! আপনার পুত্র জয়দ্রথকে এইভাবে আশ্বাস দিলে, জয়দ্রথ তাঁর সঙ্গে রাত্রেই দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন। আচার্যকে প্রণাম করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! দূরের লক্ষ্য বিদ্ধ করতে, হাতের ক্ষিপ্রতায় এবং দৃঢ়ভাবে নিশানা করতে কে শ্রেষ্ঠ—আমি না অর্জুন ?'

দ্রোণাচার্য বললেন—'পুত্র ! যদিও তোমার ও অর্জুনের আমিই এক আচার্য, তবুও অভ্যাস এবং ক্লেশ সহ্য করায় অর্জুন তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও তোমার তাকে ভয় পাবার কিছু নেই ; কারণ আমি তোমার রক্ষক। আমি যাকে রক্ষা করি, তার ওপর দেবতাদেরও জোর চলে না। আমি এমন ব্যূহ রচনা করব, যাতে অর্জুন ঢুকতে পারবে না। সুতরাং ভয় পেয়ো না। উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তোমার ন্যায় বীরের মৃত্যুভয় থাকাই উচিত নয়। কারণ তপস্বীগণ তপস্যা করে যে লোক প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয়ধর্ম গ্রহণকারী বীর অনায়াসে তা লাভ করেন।'

এইরূপ আশ্বাস পেয়ে জয়দ্রথের ভয় দূর হল এবং তিনি যুদ্ধ করা স্থির করলেন। তখন আপনার সৈন্যদের মধ্যেও

হর্ষধ্বনি শোনা গেল।

অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ডেকে বললেন—'ধনঞ্জয় ! তুমি ভাইদের অনুমতি নাওনি আর আমার কাছেও পরামর্শ চাওনি, তা সত্ত্বেও সকলকে শুনিয়ে যে জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করেছ—এ

তোমার অত্যন্ত দুঃসাহস। এতে লোকে আমাদের তামাশা করবে। আমি কৌরবদের শিবিরে গুপ্তচর পাঠিয়েছিলাম, তারা এসে আমাকে সব সংবাদ জানিয়ে গেছে। তুমি যখন সিন্ধুরাজবধের প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তখন এখানে রণভেরী বেজেছিল এবং সিংহনাদও করা হয়েছিল। কৌরবরা সেই আওয়াজ শুনেছে, তারা তোমার প্রতিজ্ঞার কথা জেনেছে। তাতে দুর্যোধনের মন্ত্রীরা বিষণ্ণ ও ভীত হয়েছে। জয়দ্রথও অত্যন্ত ভয় পেয়ে রাজসভায় গিয়ে দুর্যোধনকে বলেছে—'রাজন্ ! অর্জুন আমাকেই তার পুত্রহন্তা বলে মনে করছে। তাই সে সকল সৈন্যদলের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছে, এ সব্যসাচীর প্রতিজ্ঞা, তা দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর নাগ কেউই অন্যথা করতে পারবে না। তোমার সৈন্যদলে আমি এমন কোনো ধনুর্ধারী দেখছি না যে এই মহাযুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে অর্জুনের অস্ত্র নিবারণ করতে সক্ষম। আমার বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অর্জুন দেবতা-সহ ত্রিলোকও বিনাশ করতে সক্ষম। তাই আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইছি। অথবা তুমি যদি মনে করো তাহলে অশ্বত্থামা ও দ্রোণাচার্যের দ্বারা আমাকে রক্ষা করার আশ্বাস দাও।' তখন দুর্যোধন স্বয়ং দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেন। জয়দ্রথের রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়ে গেছে, রথও প্রস্তুত। কাল যুদ্ধে কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, কৃপাচার্য এবং শল্য—এই ছয় মহারথী সামনে থাকবেন। দ্রোণাচার্য এমন ব্যূহ তৈরি করবেন, যার অর্ধেক শকটাকার, বাকি অর্ধেক কমলের ন্যায়। কমলব্যূহের মধ্যে কর্ণিকার মধ্যে সূচী ব্যূহের কাছে জয়দ্রথ থাকবে, অন্য সব বীররা চারদিক থেকে তাকে রক্ষা করবে, এইসব বীররা শারীরিক বল ও পরাক্রমে বলীয়ান। এককভাবে এদের শক্তির কথা চিন্তা করে দেখ। তারপর এরা একসঙ্গে হলে, তাদের জয় করা তত সহজ হবে না। আমাদের হিতের দিকে খেয়াল রেখে আমি রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী এবং হিতৈষীদের সঙ্গে পরামর্শ করব।'

অর্জুন বললেন—'মধুসূদন ! কৌরবদের যেসব মহারথীদের আপনি বলীয়ান বলে মনে করেন, তাদের আমি আমার অর্ধেক বলে মনে করি না। যদি সাধ্য, রুদ্র, বসু, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, বায়ু, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব, গরুড়, সমুদ্র, পৃথিবী, দিক্‌পাল, গ্রামবাসী, জঙ্গলী জীব ও সমস্ত চরাচরের প্রাণী তার রক্ষার্থে আসে তাহলেও আমি অস্ত্রের শপথ করে বলছি যে কাল আপনি জয়দ্রথকে আমার বাণে মৃত দেখবেন। আমি যে যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্রের কাছে ভয়ংকর অস্ত্র পেয়েছি, কাল তা সকলে দেখবেন। জয়দ্রথের রক্ষকগণ যে অস্ত্র চালাবেন আমি তা ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা কেটে ফেলব। কাল রাজাদের মস্তক কেটে মাটিতে বিছিয়ে দেব, আপনি আমার সহায় থাকুন। হৃষীকেশ, গাণ্ডীবের ন্যায় দিব্য ধনুক, যোদ্ধা আমি, আপনি সারথি—তবে কেন আমি জিতব না ? ভগবান ! আপনার কৃপায় যুদ্ধে আমার কী দুর্লভ ? আপনি তো জানেন শত্রু আমার পরাক্রম সহ্য করতে পারে না, তাহলে কেন আমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন ? ব্রাহ্মণের সত্য, সাধুর নম্রতা এবং যজ্ঞে লক্ষ্মী থাকা যেমন নিশ্চিত, তেমনই যেখানে নারায়ণ সেখানে বিজয়ও নিশ্চিত। কাল প্রভাতেই আমার রথ যেন প্রস্তুত থাকে, কারণ আমাদের ওপর এক ভয়ানক কাজের ভার এসে পড়েছে।'

———o———

শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস দান, সুভদ্রার বিলাপ এবং দারুকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বার্তালাপ

সঞ্জয় বললেন—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'ভগবান! এখন আপনি সুভদ্রা এবং উত্তরাকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। যেমন করে হোক, তাদের শোক দূর করুন।' শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে অর্জুনের শিবিরে গিয়ে পুত্রশোকাতুর দুঃখিনী ভগ্নীকে বোঝাতে লাগলেন। তিনি বললেন—ভগ্নী! তুমি এবং তোমার পুত্রবধূ উত্তরা তোমরা

শোক কোরো না। কালের প্রকোপে সকল প্রাণীরই একদিন এই দশা হয়। তোমার পুত্র উচ্চ বংশে জন্মেছিল, সে বীর, বীর এবং ক্ষত্রিয় ছিল এই মৃত্যু যদিও অকালে তবুও তার যোগ্য, সুতরাং শোক পরিত্যাগ করো। দেখো, বড় বড় সন্ত মহাপুরুষ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্রজ্ঞান এবং সদবুদ্ধির দ্বারা যে গতিপ্রাপ্ত করতে চান, তোমার পুত্র সেই গতিলাভ করেছে। তুমি বীরমাতা, বীরপত্নী, বীরকন্যা এবং বীরের ভগ্নী। কল্যাণী! তোমার পুত্র অত্যন্ত উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছে, তুমি তোমার পুত্রের জন্য শোক কোরো না। বালকের হত্যাকারী পাপী জয়দ্রথ যদি অমরাবতীতেও গিয়ে লুকায়, তাহলেও সে অর্জুনের হাত থেকে আজ রক্ষা পাবে না। কালই তুমি শুনতে পাবে যে জয়দ্রথের মস্তক কেটে সমন্তপঞ্চকের বাইরে গিয়ে পড়েছে।/শূরবীর অভিমন্যু ক্ষাত্রধর্ম পালন করে সৎপুরুষদের প্রাপ্য লোক লাভ করেছে—যা আমরা এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুল পেতে সর্বদাই আগ্রহী। ভগ্নী! চিন্তা ত্যাগ করে পুত্রবধূর ধৈর্য রক্ষা করো। অর্জুন যা প্রতিজ্ঞা করেছে, তা রক্ষা করবেই তা কেউ রোধ করতে পারবে না। তোমার স্বামী যা করতে চায়, তা কখনো নিষ্ফল হয় না। মানুষ, নাগ, পিশাচ, রাক্ষস, পক্ষী, দেবতা, অসুরও যদি সাহায্য করে তবুও কাল জয়দ্রথ জীবিত থাকবে না।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সুভদ্রার পুত্রশোক বৃদ্ধি পেল, তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—'হায় পুত্র! তোমার বিহনে আজ আমি মন্দভাগিনী হলাম। পুত্র! তুমি তো তোমার পিতার ন্যায় পরাক্রমী ছিলে, তাহলে যুদ্ধে কীভাবে নিহত হলে? হায়! তোমাকে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে রয়েছি। ভীমসেনের বলকে ধিক্, অর্জুনের ধনুর্ধারণ ও বৃষ্ণি পাঞ্চাল বীরদের পরাক্রমকেও ধিক্! কেকয়, চেদি, মৎস্য এবং সৃঞ্জয়দেরও বারংবার ধিক্কার জানাই। আজ সমস্ত পৃথিবী শূন্য এবং শ্রীহীন দেখাচ্ছে। আমার শোকাকুল চক্ষু অভিমন্যুকেই খুঁজছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। হায়! শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের অতিরথী পুত্র হয়েও তুমি রণভূমিতে পড়ে রয়েছ, আমি কী করে তোমাকে দেখতে পাব? পুত্র! তুমি কোথায়! এসো, আমার কোলে একবার বসো। তোমার মাতা তোমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। হায় বীর! আহা! এই জীবন জলের বুদ্বুদের ন্যায় বড়ই চঞ্চল। পুত্র! তুমি অসময়েই চলে গেলে। তোমার তরুণী পত্নী শোকমগ্না হয়ে রয়েছে, তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব? কালের গতি জানা বিদ্বানের পক্ষেও কঠিন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মতো অভিভাবক থাকতেও তুমি অনাথের ন্যায় নিহত হলে। বৎস! যজ্ঞ এবং দানকারী আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থে স্নানাদি করা, কৃতজ্ঞ, উদার, গুরুসেবক এবং সহস্র গোদানকারী যে গতি প্রাপ্ত হন, তাই যেন তোমার লাভ হয়। পতিব্রতা স্ত্রী, সদাচারী রাজা, দীনের ওপর দয়াদানকারী, যারা পরনিন্দা থেকে বিরত থাকে, ধর্মশীল, ব্রতী এবং অতিথি সৎকারকারী ব্যক্তিদের যে গতি

লাভ হয়, তুমিও তাই প্রাপ্ত হও। পুত্র! বিপদ ও সংকটের সময় যে ধৈর্যসহকারে নিজেকে সামলিয়ে রাখে, সর্বদা মাতা-পিতার সেবা করে, নিজ পত্নী দ্বারাই যে তৃপ্ত—তাদের যে গতি হয়, তোমার তাই হোক। যিনি মাৎসর্যরহিত হয়ে সমস্ত প্রাণীকে সান্ত্বনাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন, ক্ষমাভাব রাখেন, কাউকে দুঃখ দেন না, যিনি মদ্য, মাংস, মদ, দম্ভ, এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকেন, অপরকে কষ্ট দেন না, যিনি স্বভাবে বিনয়ী, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানানন্দে পূর্ণ এবং জিতেন্দ্রিয়, সেইসব সাধুদের যে গতি হয়, তা তোমারও হোক।'

এভাবে শোকাতুরা এবং দীনভাবে বিলাপ করতে থাকা সুভদ্রার কাছে দ্রৌপদী এবং উত্তরা এলেন। তখন তাঁর দুঃখের সীমা রইল না। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন এবং বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁদের দশা দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখ পেলেন এবং তাঁদের চেতনা আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের মুখে চোখে জল ছিটিয়ে তাঁদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন—'সুভদ্রে, পুত্রের জন্য আর শোক কোরো না। দ্রৌপদী, তুমি উত্তরাকে শান্ত করো। অভিমন্যু অত্যন্ত উত্তম গতি লাভ করেছে। আমি তো এই চাই যে আমাদের বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যশস্বী অভিমন্যুর গতিই লাভ করুক। তোমার মহারথী পুত্র একা যে কাজ করেছে, আমি এবং আমাদের সব সুহৃদ যেন তাই করে।'

সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং উত্তরাকে আশ্বাস দিয়ে ভগবান কৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনের কাছে গেলেন এবং হেসে বললেন—'অর্জুন! তোমার কল্যাণ হোক। এবার গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমিও যাচ্ছি।' তিনি অর্জুনের শিবিরে দ্বারপাল নিযুক্ত করলেন এবং কয়েকজন অস্ত্রধারী রক্ষককেও বহাল করলেন। তারপর দারুককে নিয়ে নিজ শিবিরে এসে নানা চিন্তা করতে করতে বিছানায় শয়ন করলেন। অর্ধেক রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল ; তিনি তখন অর্জুনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে দারুককে বললেন—'পুত্রশোকে অধীর হয়ে অর্জুন এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছে যে সে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে। কিন্তু দ্রোণের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা ব্যক্তিকে ইন্দ্রও মারতে পারেন না। সুতরাং কাল আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বেই জয়দ্রথকে বধ করে। দারুক! আমার কাছে স্ত্রী, মিত্র, ভাই, বন্ধু— কেউই কুন্তীনন্দন অর্জুনের চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। আমি এই জগতে অর্জুন বিনা এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। অর্জুনের জন্য আমি কর্ণ, দুর্যোধন প্রমুখ মহারথীদের ঘোড়া-হাতিসহ বধ করব। কাল সমস্ত জগৎ জেনে যাবে যে আমি অর্জুনের মিত্র। যে তাকে দ্বেষ

করে, সে আমাকেও করে। যে তার অনুকূল, আমিও তার অনুকূল। তুমি জেনে রাখো যে অর্জুন আমার অর্ধশরীর। প্রভাত হলেই আমার রথ প্রস্তুত করে দিও। তাতে সুদর্শন চক্র, গদা, দিব্য শক্তি এবং শার্ঙ্গ ধনুকের সঙ্গেই সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেখে দেবে। যখনই আমার পাঞ্চজন্যর ধ্বনি শুনবে, তৎক্ষণাৎ আমার কাছে রথ নিয়ে আসবে। আমি আশা করি অর্জুন যেসব বীরকে বধ করার চেষ্টা করবে, সেখানেই সে অবশ্য বিজয় লাভ করবে।'

দারুক বললেন—'পুরুষোত্তম! আপনি যাঁর সারথি, তাঁর বিজয় নিশ্চিত। তাঁর পরাজয় হতেই পারে না। অর্জুনের বিজয়লাভের জন্য আপনি আমাকে যা করার নির্দেশ দিচ্ছেন, যথাসময়ে তা আমি অবশ্যই প্রস্তুত করে রাখব।'

—o—

অর্জুনের স্বপ্ন, যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান এবং সকলের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গমন

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তার কথা জেনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। ভগবানকে

দেখেই অর্জুন উঠে তাঁকে বসার আসন দিয়ে নিজে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিদ্ধান্ত জেনে বললেন—'ধনঞ্জয় ! তোমার কীসের দুঃখ । বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত নয়, তাতে কাজের ক্ষতি হয়। কর্তব্য যা সামনে আসে, তা পূর্ণ করো। উদ্যোগহীন মানুষের শোকে শত্রুরা উল্লসিত হয়ে কাজে ভাগ বসায়।'

ভগবানের কথা শুনে অর্জুন বললেন—'কেশব ! আমি আমার পুত্রঘাতক জয়দ্রথকে আগামীকাল বধ করার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছি ; মনে হচ্ছে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য নিশ্চয়ই কৌরবরা জয়দ্রথকে সবথেকে পেছনে রাখবে, সকল মহারথী তাকে রক্ষা করবে। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে যারা এখনও জীবিত আছে, তারা সকলে ঘিরে থাকলে আমি কী করে জয়দ্রথকে দেখতে পাব ? যদি দেখতে না পাই, তাহলে প্রতিজ্ঞাপালন হবে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে আমার মতো মানুষ কীভাবে জীবন ধারণ করবে ? তাই আমার আশা নিরাশায় পরিণত হচ্ছে। তাছাড়া এখন দিন ছোট, সূর্যাস্তও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তাই আমি খুবই চিন্তায় রয়েছি।'

অর্জুনের শোকের কারণ শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পার্থ ! শংকরের কাছে 'পাশুপত' নামক এক দিব্য সনাতন অস্ত্র আছে, যার দ্বারা তিনি পূর্বে সমস্ত দৈত্য সংহার করেছিলেন। তোমার যদি সেই অস্ত্রজ্ঞান থাকে, তাহলে অবশ্যই তুমি কাল জয়দ্রথকে বধ করতে সক্ষম হবে। যদি সেই অস্ত্রজ্ঞান তোমার না থাকে, তাহলে মনে মনে ভগবান শংকরের ধ্যান করো, তাহলে তাঁর কৃপায় তুমি সেই মহান অস্ত্র লাভ করবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন আচমন করে মেঝেতে আসন পেতে উপবেশন করে একাগ্র চিত্তে ভগবান শংকরের ধ্যানে মগ্ন হলেন। ধ্যানাবস্থাতেই শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্তে অর্জুন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আকাশে উড়তে দেখলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ডান হাত ধরে বায়ুবেগে উড়ছিলেন। উত্তর দিকে এগিয়ে তাঁরা হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ এবং মণিময় পর্বত দেখতে পেলেন। সেখানে দিব্য জ্যোতির বিকীরণ হচ্ছিল এবং সিদ্ধ ও চারণগণ বিচরণ করছিলেন। পথের অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁরা এগিয়ে গিয়ে শ্বেত পর্বত দেখতে পেলেন। তার পাশেই কুবেরের বিচরণভূমি, সরোবরে কমল ফুটে আছে। কিছুদূরে অগাধ জলপূর্ণ স্রোতস্বিনী গঙ্গা ; তার তীরে ঋষিদের পবিত্র আশ্রম। তার পিছনেই মন্দার পর্বতের রমণীয় প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হল, যেখানে কিন্নর-কিন্নরীর মধুর সংগীত শোনা যায়। এইভাবে বহু দিব্য স্থান পার হয়ে তাঁরা এক পরম প্রকাশমান পর্বত দেখতে পেলেন। তার শিখরে ভগবান শংকর বিরাজমান ছিলেন, যিনি হাজার সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। তাঁর হাতে ত্রিশূল, মস্তকে জটাজুট, গৌরবর্ণ শরীরে বল্কল ও মৃগচর্ম। ভগবান ভূতনাথ পার্বতী দেবীর সঙ্গে বসে ছিলেন। তেজস্বী ভূতগণ তাঁদের সেবায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষি তাঁদের দিব্য স্তোত্রদ্বারা শিবের স্তুতিগান করছিলেন।

তাঁদের কাছে পৌঁছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন। নর ও নারায়ণ দুজনকে আসতে দেখে ভগবান শিব অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ভগবান শংকর হেসে বললেন—'বীরবর ! তোমাদের স্বাগত জানাই ; ওঠো, বিশ্রাম করো এবং বলো তোমাদের কী আকাঙ্ক্ষা ? তোমরা যে কাজের জন্য এসেছ, তা অবশ্যই পূর্ণ করব।'

ভগবান শিবের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'ভগবান !

আপনিই ভব, শর্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্তি, ঈশান প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ; আপনাকে বারংবার প্রণাম জানাই। আপনি ভক্তদের দয়া করেন, প্রভু ! আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

অর্জুন তারপর মনে মনে ভগবান শিব এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে শংকরকে বললেন—'ভগবান ! আমি দিব্যাস্ত্র প্রার্থনা করি।' তা শুনে ভগবান শংকর ঈষৎ হাসা করে বললেন—'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ! আমি তোমাদের দুজনকে স্বাগত জানাই। তোমাদের অভিলাষ বুঝেছি ; তোমরা যে জন্য এসেছ, তা আমি এখনই পূর্ণ করছি। কাছেই একটি অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে, সেখানেই আমি আমার দিব্য ধনুক ও বাণ রেখেছি ; সেখান থেকে ধনুক ও বাণ নিয়ে এসো।'

দুজন বীর 'ঠিক আছে' বলে শিবের পার্ষদদের সঙ্গে সেই সরোবরে গেলেন। সেখানে তাঁরা দুটি নাগ দেখতে পেলেন ; একটি সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন অপরটি সহস্র মস্তকধারী, তার মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনে সেই সরোবরের জলে আচমন করে নাগেদের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে শিবের শতরুদ্রিয় স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন। ভগবান শংকরের প্রভাবে এই দুই নাগ তাঁদের স্বরূপ ত্যাগ করে ধনুক-বাণে পরিণত হল। তা দেখে এঁরা দুজন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সেই দেদীপ্যমান ধনুক বাণ নিয়ে শংকরের কাছে এলেন। তাঁরা শংকরের কাছে এসে সেই অস্ত্রগুলি সমর্পণ করলেন। তখন ভগবান শংকরের পাঁজর থেকে এক ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব হল। তিনি বীরাসনে বসে ধনুক তুলে তাতে বিধিমতো বাণ চড়িয়ে আকর্ষণ করলেন। অর্জুন মনোযোগ সহকারে সব দেখলেন এবং ভগবান শিব যে মন্ত্রপাঠ

করলেন, তাও স্মরণ করে রাখলেন। তারপর সেই ব্রহ্মচারী ধনুর্বাণ পুনরায় সরোবরে ফেলে দিলেন। তারপর ভগবান শংকর প্রসন্ন হয়ে তাঁর পাশুপত নামক ভয়ানক অস্ত্র অর্জুনকে প্রদান করলেন। সেটি লাভ করে অর্জুনের

আনন্দের সীমা থাকল না। আনন্দে তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ হল। তিনি নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করতে লাগলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন শিবকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলেন (এসবই অর্জুন স্বপ্নে দেখেছিলেন)।

সঞ্জয় বললেন—এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও দারুক কথা বলতে বলতে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। অন্যদিকে রাজা যুধিষ্ঠিরেরও নিদ্রাভঙ্গ হল, তিনি উঠে স্নানাদি করতে গেলেন। সেখানে একশত আটজন যুবক স্নান করে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে জলভর্তি স্বর্ণকলস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুধিষ্ঠির আসনে
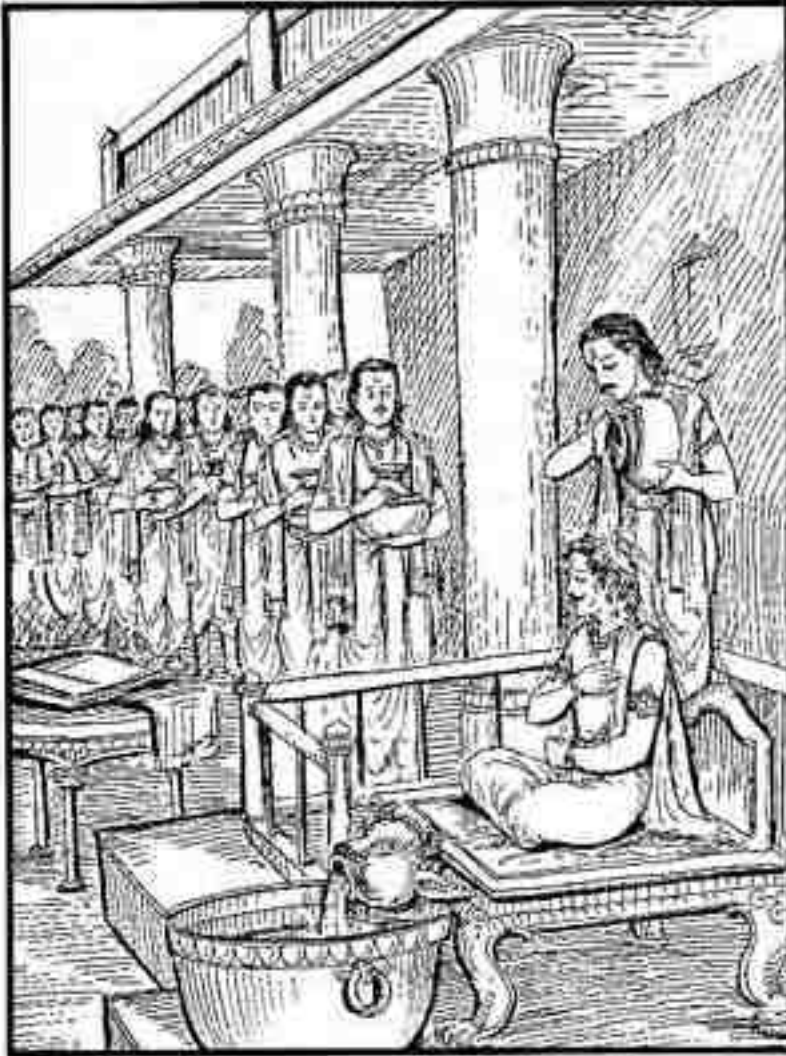
বসে সেই মন্ত্রপূত জলে স্নান করলেন, তারপর পূজা সমাপন করে উঠলে দ্বারপাল এসে জানাল—'মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন।' রাজা বললেন—'তাঁকে সম্মানপূর্বক নিয়ে এসো।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এক সুন্দর আসনে বসিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজা করলেন। তারপরে অন্য সকলের আসার সংবাদ পেলেন। রাজার নির্দেশে দ্বারপাল তাঁদের ভেতরে আনলেন। বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়রাজকুমার, যুযুৎসু, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সুবাহু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র—তাছাড়া অন্য আরো ক্ষত্রিয় মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেবায় উপস্থিত হয়ে উত্তম আসনে উপবেশন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি একই আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তখন সকলকে শুনিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'ভক্তবৎসল ! দেবতারা যেমন ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকেন, তেমনই আমরা আপনার শরণে থেকে যুদ্ধে বিজয়ী এবং তার পরবর্তী জীবনে সুখী হতে চাই। সর্বেশ্বর ! আমাদের সুখ ও প্রাণের রক্ষা—সবই আপনার অধীন। আপনি কৃপা

করুন, যেন আমাদের মন আপনাতেই নিবিষ্ট থাকে এবং অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সত্য হয়। এই সংকটময় মহাসাগর থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন। পুরুষোত্তম ! আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই। দেবর্ষি নারদ আপনাকে পুরাতন ঋষি নারায়ণ বলে জানিয়েছেন, আপনিই বরদায়ক বিষ্ণু ; আজ একথা সত্য করে দেখান।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন বলবান, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধে চতুর ও তেজস্বী ; তিনি অবশ্যই আপনার শত্রুদের সংহার করবেন। আমি চেষ্টা করব, যাতে অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসহ সেনাদের এমনভাবে ভস্মীভূত করে, যেমন অগ্নি ইন্ধনকে জ্বালায়। অভিমন্যুর হত্যাকারী পাপী জয়দ্রথকে অর্জুন বাণের দ্বারা এমন জায়গায় পাঠাবে,

যেখানে গেলে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না। ইন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত দেবতাও যদি তাকে রক্ষা করতে আসেন তবুও আজ তাকে প্রাণত্যাগ করে যমালয়ে যেতে হবে। রাজন্ ! অর্জুন আজ জয়দ্রথকে বধ করে তবেই আপনার নিকট উপস্থিত হবেন, সুতরাং শোক ও চিন্তা ত্যাগ করুন।'

এইসব কথাবার্তা যখন চলছিল তখন অর্জুন সকল রাজন্যবর্গকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি এসে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁকে দেখতেই যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর হেসে বললেন—'অর্জুন ! আজ তোমার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখের যেরূপ প্রসন্ন কান্তি দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধে তোমার বিজয় নিশ্চিত।' অর্জুন বললেন—'ভ্রাতা ! রাত্রে আমি কেশবের কৃপায় এক মহা আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি।' এই বলে অর্জুন তাঁর সব হিতৈষীকে আশ্বস্ত করার জন্য সমস্ত ঘটনা জানালেন, কীভাবে তিনি ভগবান শংকরকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন। এই কাহিনী শুনে সকলেই বিস্মিত হয়ে ভগবান শংকরকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—'এ তো অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।'

তারপর সকলে ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে, বর্ম ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হয়ে সত্বর যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। সকলেরই মনে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ ছিল। সাত্যকি, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে প্রসন্নতা সহকারে যুদ্ধের জন্য শিবিরের বাইরে এলেন। সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ একই রথে অর্জুনের শিবিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সারথির ন্যায় অর্জুনের রথ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধ সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করলেন। অর্জুন তাঁর দৈনন্দিন কর্ম সমাধা করে ধর্নুবাণ হাতে বাইরে এলেন এবং রথ পরিক্রমা করে তাতে উঠে বসলেন। তারপর সাত্যকি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামনে উঠে বসলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘোড়ার রাশ ধরলেন। অর্জুন এই দুজনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। সেই সময় যুদ্ধ জয়ের নানা শুভলক্ষণ দেখা গেল। কৌরব সেনার মধ্যে অলক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। শুভ লক্ষণ দেখে অর্জুন সাত্যকিকে বললেন—'যুযুধান ! আজ যে সব লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যে আজ যুদ্ধে আমার বিজয় সুনিশ্চিত। সুতরাং এখন আমি সেখানেই যাব, যেখানে জয়দ্রথ আমার পরাক্রমের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। এখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার ভার তোমার। এই জগতে এমন কোনো বীর নেই, যে তোমাকে পরাজিত করতে সক্ষম। তুমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ। তোমার এবং প্রদ্যুম্নের ওপরই আমার বিশেষ ভরসা। আমার চিন্তা পরিত্যাগ করে সর্বপ্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকেই রক্ষা করবে। যেখানে ভগবান বাসুদেব ও আমি আছি, সেখানে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই।' অর্জুনের কথা শুনে সাত্যকি 'যথা আজ্ঞা' বলে যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেইদিকে চলে গেলেন।

—o—

ধৃতরাষ্ট্রের বিষাদ এবং সঞ্জয়ের অভিযোগ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! অভিমন্যুর মৃত্যুর পর দুঃখ শোকে কাতর পাণ্ডবরা প্রভাত হলে কী করল ? আমার পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে কে কে যুদ্ধ করল ? অর্জুনের পরাক্রম জেনেও তার প্রতি দুর্যোধনেরা যে অপরাধ করল, তারপরেও তারা নির্ভয়ে থাকল কী করে ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সকল প্রাণীর প্রতি দয়াবশত কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি করানোর জন্য এখানে এসেছিলেন, তখন আমি মূর্খ দুর্যোধনকে বলেছিলাম—'পুত্র ! বাসুদেবের কথা অনুযায়ী সন্ধি করে নাও। তোমার সামনে উত্তম সুযোগ উপস্থিত, একে উপেক্ষা করো না। শ্রীকৃষ্ণ তোমার মঙ্গলের জনাই বলছেন, স্বয়ং নিজেই এসেছেন সন্ধি করার জন্য ; এঁর কথা মেনে না নিলে, যুদ্ধে তোমার বিজয় পাওয়া অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও অনুনয় করে অনেক কথা বলেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন তা শোনেনি। অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করায় আমাদের কথা তার ভালো লাগেনি। সেই দুর্বুদ্ধি কালের বশীভূত হয়েছিল, তা সে আমাকে অবহেলা করে শুধু কর্ণ ও দুঃশাসনের মতেই কাজ করেছে। পাশা খেলাতেও আমার কোনো মত ছিল না। বিদুর, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা,

পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দ্রোণ—এঁরাও পাশা খেলায় সম্মত ছিলেন না। আমার পুত্র যদি এঁদের সকলের পরামর্শ নিয়ে চলত, তাহলে জ্ঞাতি-ভাই, মিত্র, সুহৃদ—সকলের সঙ্গে চিরকাল সুখে জীবনযাপন করতে পারত। আমি আরও বলেছিলাম যে, পাণ্ডবরা সরল স্বভাব, মধুরভাষী, ভাই বন্ধুর হিতাকাঙ্ক্ষী, কুলীন, আদরণীয় এবং বুদ্ধিমান ; তাই তারা অবশ্যই সুখী হবে। ধর্মপালনকারী মানুষ সদা এবং সর্বত্র সুখলাভ করে মৃত্যুর পর তারা আনন্দ প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডবরা পৃথিবী ভোগের উপযুক্ত, তা প্রাপ্ত হওয়ার শক্তিও ওদের আছে। পাণ্ডবদের যেমন বলা হয়, তারা তেমনই করে। শল্য, সোমদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপ ও অন্যান্য বয়োবৃদ্ধগণ, যাঁরা তোমাদের হিতের কথা বলবেন, পাণ্ডবরা তা অবশ্যই মেনে নেবেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনোই ধর্মত্যাগ করতে পারেন না এবং পাণ্ডবরাও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী। আমিও যদি ধর্মযুক্ত কথা বলি, তাহলে তারা কখনো অমান্য করবে না ; কারণ পাণ্ডবরা ধর্মাত্মা।

সঞ্জয় ! আমি পুত্রদের কাছে এইরূপ কাতরভাবে অনেক কিছু বলেছি, কিন্তু মূর্খ আমার কথায় কান দেয়নি। যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সারথি ও অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমী যোদ্ধা থাকে, তাদের কখনো পরাজয় হতে পারে না। কিন্তু আমি অসহায়, দুর্যোধন আমার কোনো অনুনয়তেই মন দেয় না। আচ্ছা, এবার কী হল বলো ! দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি—এরা সকলে মিলে কী পরামর্শ করল ? মূর্খ দুর্যোধনের অন্যায় সংগ্রামে একত্রিত আমার সব পুত্ররা কী করল ? লোভী, অল্পবুদ্ধি, ক্রোধী, রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার ইচ্ছাসম্পন্ন, ক্রোধান্ধ দুর্যোধন ন্যায় বা অন্যায়ভাবে যেসব কাজ করেছে আমাকে বিস্তারিতভাবে বলো।'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, আপনাকে সম্পূর্ণভাবে জানাচ্ছি, স্থিরচিত্তে শুনুন। এই ব্যাপারে আপনার অন্যায়ও কিছু কম নয়। নদীর জল শুকিয়ে গেলে নৌকা ভাসানোর মতো আপনার এই দুঃখ ও অনুতাপ সবই বৃথা। অতএব দুঃখ করবেন না। যুদ্ধ আরম্ভের সময় যদি আপনি আপনার পুত্রকে বাধা দিতেন অথবা কৌরবদের আদেশ দিতেন যে তারা এই উদ্দণ্ড দুর্যোধনকে বন্দী করুক, অথবা পিতার কর্তব্য পালন করে পুত্রকে সৎপথে স্থাপন করা হত তাহলে আজ আর এই সংকট উপস্থিত হত না। আপনাকে এই জগতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয় ; তা সত্ত্বেও আপনি সনাতন ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনির কথায় রাজি হয়ে গেলেন। এখন যে আপনি এত অনুতাপ ও বিলাপ করছেন, তা সবই স্বার্থ ও লোভের জন্য হয়েছে। বিষমিশ্রিত মধুর ন্যায় এটি স্বাদে মিষ্ট মনে হলেও প্রাণঘাতী কটুত্ববিশিষ্ট। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন থেকে জেনেছেন যে আপনি রাজধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, তখন থেকে তিনি আর আপনার প্রতি সম্মান ভাব রাখেন না। আপনার পুত্ররা পাণ্ডবদের অপমান করেছে, আপনি তাদের বাধা দেননি। পুত্রদের রাজত্ব পাইয়ে দেবার লোভ সব থেকে বেশি আপনারই ছিল। তার ফলই এখন পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে আপনি তাদের পিতা পিতামহের রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন ; এখন পাণ্ডব যদি সমগ্র ধরিত্রীর রাজত্ব লাভ করে, তাহলে আপনি তা উপভোগ করুন। যুদ্ধের বিভীষিকা অপেক্ষা করছে আর আপনি দুর্যোধনাদির নিন্দা করে তাদের কটুবাক্য বলছেন। মহারাজ ! সে কথা এখন আর আপনার মুখে শোভা পায় না। সেসব কথা ভেবে এখন অনুশোচনা করে কোনো লাভ নেই। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের যে ভয়ংকর যুদ্ধ হচ্ছে, এবার তার সম্পূর্ণ বিবরণ শুনুন।

—o—

দ্রোণাচার্যের শকটব্যূহ রচনা এবং কয়েকজন বীরের সংহার করতে করতে অর্জুনের সেই ব্যূহে প্রবেশ

সঞ্জয় বললেন—রাত্রি অবসান হলে আচার্য দ্রোণ সব সৈন্যকে শকটব্যূহে দাঁড় করালেন। সেই সময় তিনি শঙ্খ বাজাতে বাজাতে এদিক-ওদিক বিচরণ করছিলেন। সমস্ত সেনা উৎসাহভরে ব্যূহের আকারে দাঁড়ালে আচার্য দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন—'তুমি, ভূরিশ্রবা, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন এবং কৃপাচার্য এক লাখ ঘোড়সওয়ার, ষাট হাজার রথী, চৌদ্দ হাজার গজারোহী এবং একুশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে আমাদের ছয়ক্রোশ পেছনে থাকো। ইন্দ্রাদি দেবতাও তোমার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। পাণ্ডবদের তো কথাই নেই, তুমি নিশ্চিন্তে সেখানে থাকো।'

দ্রোণাচার্য এইভাবে ভরসা দিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, গান্ধার মহারথী এবং ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে চললেন। এই দশ হাজার সিন্ধুদেশীয় ঘোড়া অত্যন্ত শিক্ষিত এবং শান্ত কিন্তু প্রয়োজনে তড়িৎ গতিতে চলে। তারপর আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেনার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দ্রোণাচার্য নির্মিত এই চক্র-শকটব্যূহ চব্বিশ ক্রোশ লম্বা এবং পেছনদিকে দশ ক্রোশ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তার পেছনে পদ্মগর্ভ নামক অভেদ্য ব্যূহ ছিল এবং সেই পদ্মগর্ভব্যূহে সূচীমুখ নামক একটি গুপ্তব্যূহ নির্মিত হয়েছিল। এইভাবে মহাব্যূহ রচনা করে আচার্য তার সামনে দাঁড়ালেন। সূচীব্যূহের মুখভাগে মহা ধনুর্ধর কৃতবর্মাকে রাখা হল, তাঁর পেছনে ছিলেন কম্বোজনরেশ এবং জলসন্ধ। তাঁদের পেছনে দুর্যোধন ও কর্ণ দণ্ডায়মান থাকলেন। শকটব্যূহের অগ্রভাগ রক্ষার জন্য একলাখ সৈন্য নিযুক্ত করা হল। এঁদের পেছনে সূচীব্যূহের পার্শ্বভাগে বিশাল সৈন্যসহ রাজা জয়দ্রথ দাঁড়িয়েছিলেন। দ্রোণাচার্য নির্মিত এই শকটব্যূহ দেখে রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

কৌরবসেনাদের ব্যূহরচনা হয়ে গেলে, ভেরী ও মৃদঙ্গের শব্দ এবং যোদ্ধাদের কোলাহল যখন শুরু হল, সেই রৌদ্র প্রভাতে তখন বীর অর্জুনকে দেখা গেল। নকুলের পুত্র শতানীক এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসেনাদের ব্যূহরচনা করলেন। তখন ক্রুদ্ধ কাল ও বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, প্রতিজ্ঞাপূর্ণকারী, নারায়ণের ন্যায় নরমূর্তি বীর অর্জুন তাঁর দিব্যরথে চড়ে গাণ্ডীব ধনুকে টংকার তুলে যুদ্ধভূমিতে পদার্পণ করলেন। তিনি তাঁদের সেনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন, তাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই দুই শঙ্খধ্বনিতে আপনার
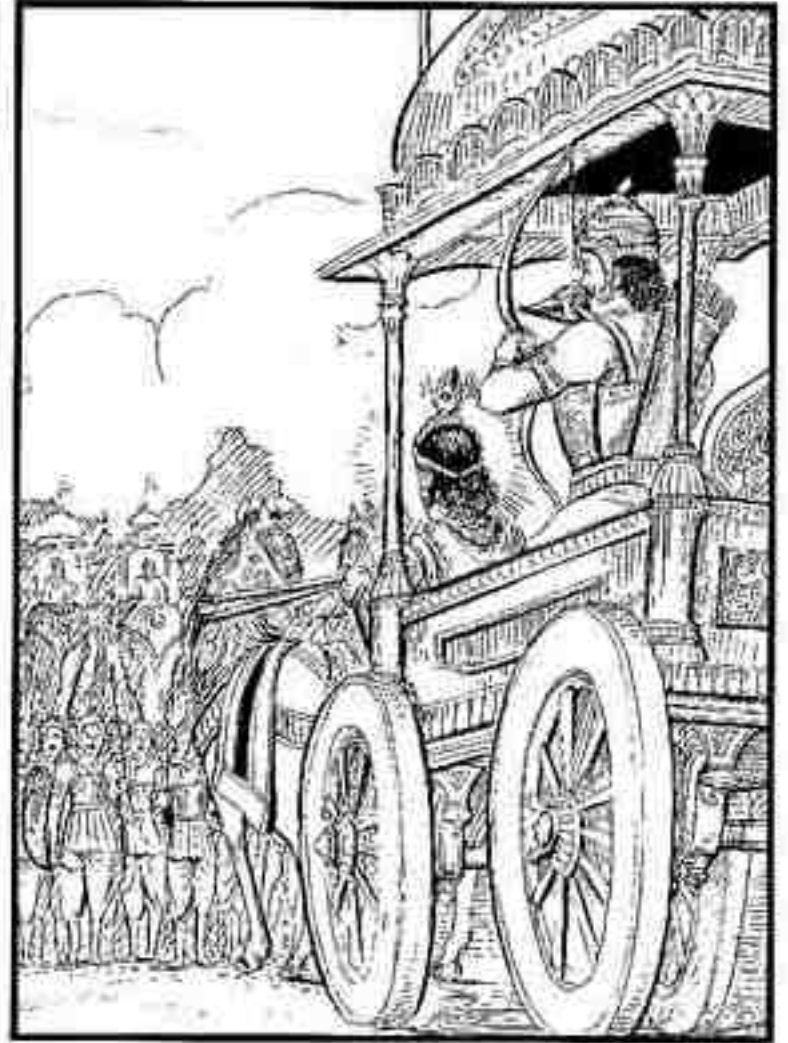
সৈনিকদের রোম ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠল, শরীর কাঁপতে লাগল এবং তারা অচেতন প্রায় হয়ে পড়ল। আপনার সমস্ত সৈন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য আপনার সৈন্যরা শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ বাজাতে লাগল।

অর্জুন হর্ষান্বিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'হৃষীকেশ ! আপনি ঘোড়াদের দুর্মর্ষণের দিকে নিয়ে চলুন। আমি তার হস্তিসৈন্য ভেদ করে শত্রুর দলে প্রবেশ করব।' সেকথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সেইদিকে রথ চালালেন। দুপক্ষে তুমুল সংগ্রাম বেধে গেল। আপনার পক্ষের সমস্ত রথী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। মহাবাহু অর্জুনও ক্রোধভরে বাণের দ্বারা তাঁদের মস্তকচ্যুত করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রণক্ষেত্র বীরদের মস্তকে ভরে উঠল। এছাড়া ঘোড়ার মাথা এবং হাতির শুঁড়ও সর্বত্র পড়ে

থাকতে দেখা গেল। আপনার সৈনিকরা চারিদিকে অর্জুনকেই দেখতে লাগল। তারা বারবার 'অর্জুন এখানে' 'অর্জুন ওই তো', 'অর্জুন ওখানে দাঁড়িয়ে' বলতে লাগল। ভ্রমক্রমে তারা নিজেরাই নিজেদের আঘাত করতে লাগল। কালের বশীভূত হয়ে তারা সর্বজগতেই অর্জুনকে দেখতে থাকল। রক্তাপ্লুত হয়ে কেউ মরণাপন্ন হয়ে গেল, কেউ গভীর ক্ষতের জন্য অচেতন হয়ে পড়ে রইল, আবার কেউ আহত হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল।

অর্জুন এইভাবে বাণের আঘাতে দুর্মর্ষণের গজসৈন্য সংহার করলেন। আপনার পুত্রের অবশিষ্ট সেনা তাই দেখে ভয়ে পালাতে লাগল। অর্জুনের ভয়ে তারা কেউ ফিরে তাকাচ্ছিল না। সব বীররাই রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেনাদের এইভাবে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে আপনার পুত্র দুঃশাসন বিশাল গজসেনা নিয়ে অর্জুনের সামনে এলেন এবং তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। সেইসময় দুঃশাসন ভয়ানক উগ্রমূর্তি ধারণ করেছিলেন। পুরুষসিংহ অর্জুন ভীষণ সিংহনাদ করে বাণের দ্বারা শত্রুর হস্তিসেনা বধ করতে লাগলেন। গাণ্ডীব ধনুক নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হয়ে হাতিগুলি ভয়ংকর চিৎকার করতে করতে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। তাদের ওপর যারা উপবিষ্ট ছিল, তাদের মস্তকও অর্জুন বাণের সাহায্যে

উড়িয়ে দিলেন। সেইসময় অর্জুনের ক্ষিপ্রতা দেখার মতো ছিল। তিনি কখন বাণ চড়ান, কখন ধনুকের ছিলা টানেন, কখন বাণ নিক্ষেপ করেন এবং কখন আবার তূণীর থেকে বাণ বার করেন—তা বোঝাই যায় না। অর্জুনের হাতে আহত হয়ে দুঃশাসন সেনাসহ পালিয়ে গেল এবং দ্রোণাচার্যের ব্যূহে গিয়ে আত্মরক্ষা করল।

মহারথী অর্জুন দুঃশাসনের সৈন্য সংহার করে জয়দ্রথের কাছে পৌঁছবার জন্য দ্রোণাচার্যের সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আচার্য ব্যূহের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। অর্জুন ব্যূহের সামনে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে হাত জোড় করে বললেন—'ব্রহ্মণ্ ! আপনি আমার জন্য কল্যাণ-কামনা করুন, আপনি আমার পিতার ন্যায়। অশ্বত্থামাকে রক্ষা করা যেমন আপনার কর্তব্য, তেমনই আমাকেও আপনার রক্ষা করা উচিত। আপনার কৃপায় আমি আজ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করতে চাই। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দিন।'

অর্জুনের কথা শুনে আচার্য মৃদুহাস্যে বললেন—'অর্জুন ! আমাকে পরাস্ত না করে তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না।' এইকথা বলতে বলতে তিনি তীক্ষ্ণবাণে অর্জুনের রথ, ঘোড়া, ধ্বজা, সারথি সব আচ্ছাদিত করে দিলেন। অর্জুনও তখন তাঁর বাণে আচার্যের বাণ প্রতিহত করে তাঁকে আক্রমণ করলেন। দ্রোণ তৎক্ষণাৎ অর্জুনের বাণ প্রতিহত করে অগ্নিসম জ্বলন্ত বাণে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। ধনঞ্জয় লক্ষ লক্ষ বাণ ছুঁড়ে আচার্যের সৈন্য সংহার করতে লাগলেন, তাঁর বাণে বহু যোদ্ধা, ঘোড়া, হাতি ধরাশায়ী হল। তখন দ্রোণ পাঁচ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে এবং তিয়াত্তর বাণে অর্জুনকে আঘাত করলেন। এবং তাঁর ধ্বজা ভেঙে দিলেন। তারপর একমুহূর্তের মধ্যে বাণবর্ষণ করে অর্জুনকে অদৃশ্য করে দিলেন।

দ্রোণ ও অর্জুনের যুদ্ধ এইভাবে বেড়ে চলেছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সেদিনে প্রধান কাজের কথা চিন্তা করে অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! আমাদের এইভাবে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আজ আমাদের অনেক বড় কাজ করার আছে। সুতরাং দ্রোণাচার্যকে ছেড়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' অর্জুন বললেন—'আপনার যেমন ইচ্ছা, তাই করুন।' অর্জুন আচার্যকে প্রদক্ষিণ করে বাণ ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেলেন। তখন দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন—'পার্থ ! তুমি কোথায় যাচ্ছ ? যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত না করে তুমি তো

কখনো পিছু হটতে না।' অর্জুন বললেন—'আপনি আমার শত্রু নন, গুরু। আমি আপনার শিষ্য, পুত্রের সমান। জগতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে যুদ্ধে আপনাকে পরাস্ত করতে পারে।' এই কথা বলতে বলতে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করার জন্য তাড়াতাড়ি কৌরব সেনার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তাঁর পিছনে তাঁর চক্ররক্ষক পাঞ্চাল রাজকুমার যুধামন্যু এবং উত্তমৌজাও সঙ্গে গেলেন।

জয়, কৃতবর্মা, কম্বোজনরেশ এবং শ্রুতায়ু তাঁকে এগোতে বাধা দিলেন। তাঁদের সঙ্গে অর্জুনের ভয়ানক সংগ্রাম হল। কৃতবর্মা অর্জুনকে দশটি বাণ মারলেন, অর্জুন তাঁকে শতাধিক বাণ মেরে অচেতন প্রায় করে দিলেন। তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর পঁচিশটি করে বাণ মারলেন। অর্জুন তাঁর বাণ প্রতিহত করে তিয়াত্তর বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। কৃতবর্মা তৎক্ষণাৎ অন্য একটি ধনুক নিয়ে অর্জুনের বুকে পাঁচটি বাণ মারলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'পার্থ! তুমি কৃতবর্মাকে দয়া কোরো না। এখন সম্পর্কের কথা চিন্তা না করে স্থির চিত্তে তাকে বধ করো।' তখন অর্জুন তাঁর বাণে কৃতবর্মাকে অচেতন করে কম্বোজ বীরদের সেনার দিকে এগিয়ে গেলেন।

অর্জুনকে এগোতে দেখে মহাপরাক্রমী রাজা শ্রুতায়ুধ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিশাল ধনুকসহ তাঁর সামনে এলেন। তিনি অর্জুনকে তিন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সত্তর বাণ মারলেন, আর একটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর ধ্বজায় আঘাত করলেন। অর্জুন শীঘ্রই তাঁর ধনুক এবং তূণীর টুকরো টুকরো করে দিলেন। তিনি তখন অন্য একটি ধনুক নিয়ে অর্জুনের বুকে এবং হাতে নটি বাণ মারলেন। তখন অর্জুন হাজার হাজার বাণে শ্রুতায়ুধকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন এবং তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। মহাবলী শ্রুতায়ুধ হাতে গদা নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে অর্জুনের দিকে দৌড়ে এলেন। ইনি বরুণের পুত্র, মহানদী পর্ণাশা এঁর মাতা, তিনি পুত্রের প্রতি স্নেহবশত বরুণকে বলেছিলেন, 'আমার পুত্র যেন জগতে শত্রুদের অবধ্য হয়।' তাতে বরুণ প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন, 'তোমাকে সেই বর দিলাম, সঙ্গে এই দিব্য অস্ত্রও দিচ্ছি। এরজন্যই তোমার পুত্র অবধ্য হবে। কিন্তু জগতে মানুষের অমর হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যার জন্ম হয়েছে, তার অবশ্যই মৃত্যু হবে।' এই বলে বরুণ শ্রুতায়ুধকে এক অভিমন্ত্রিত গদা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এই গদা এমন কারো ওপর প্রয়োগ কোরো না, যিনি যুদ্ধ করছেন না, তাহলে এটি তোমাকেই আঘাত করবে।' কিন্তু এইসময় শ্রুতায়ুধের মস্তকে কাল ভর করেছিল। তাই তিনি বরুণের কথা অমান্য করে শ্রীকৃষ্ণের ওপর গদার আঘাত হানলেন। ভগবান সেই গদা তাঁর বিশাল বক্ষে ধারণ করলেন আর সেটি বক্ষঃস্থল থেকে ফিরে শ্রুতায়ুধকে শেষ করে দিল। শ্রুতায়ুধ যুদ্ধে বিরত শ্রীকৃষ্ণের ওপর গদার আঘাত করায় সেটি ফিরে গিয়ে তাঁকেই আঘাত করে। বরুণের কথা অনুযায়ী শ্রুতায়ুধ মৃত্যুবরণ করলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন।

শ্রুতায়ুধকে মৃত দেখে কৌরবের সমস্ত সৈন্যের এবং তাদের সেনাপতিদের ভয়ে পা কাঁপতে লাগল। তখন কম্বোজনরেশের বীর পুত্র সুদক্ষিণ অর্জুনের সামনে এলেন। অর্জুন তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন, সেই তীর তাঁকে ঘায়েল করে মাটিতে ঢুকে গেল। সুদক্ষিণ তিন বাণে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করে পাঁচ বাণ অর্জুনকে মারলেন। অর্জুন তাঁর ধনুক কেটে ধ্বজাও কেটে ফেললেন এবং দুটি তীক্ষ্ণ বাণে সুদক্ষিণকে ঘায়েল করলেন। সুদক্ষিণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এক ভয়ংকর শক্তি অর্জুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তি অর্জুনকে আঘাত করে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। শক্তির আঘাতে অর্জুনের গভীর মূর্ছা হল। চেতনা ফিরে এলে অর্জুন কঙ্কপাত্রসম্পন্ন চৌদ্দটি বাণে সুদক্ষিণ এবং তাঁর ঘোড়া, ধ্বজা, ধনুক এবং সারথিকেও আঘাত করলেন। তারপর তার রথ টুকরো টুকরো করে তীক্ষ্ণ বাণে সুদক্ষিণের বক্ষে আঘাত করলেন। সুদক্ষিণের বর্ম ভেঙে গেল, অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হল এবং গায়ের অলংকারাদি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর কর্ণী নামক এক বাণে অর্জুন তাঁকে ধরাশায়ী করে দিলেন।

রাজন্ ! বীর শ্রুতায়ুধ এবং সুদক্ষিণ এইভাবে নিহত হলে আপনার সৈন্যরা ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি এবং বসাতি জাতির বীর তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। অর্জুন তাঁর বাণে ছয় হাজার যোদ্ধা বধ করলেন। যোদ্ধারা চারদিক দিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ধরল। কিন্তু তারা যত অর্জুনের দিকে এগোতে লাগল ততই অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর তাদের মাথা এবং হাত কেটে ফেলতে লাগল। রণভূমি সেই কর্তিত হাত ও মস্তকে ভরে উঠল। সেইসময় মহাবলী শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু সেখানে এসে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা অর্জুনের ডাইনে

বামে হাজার হাজার বাণ ছুঁড়ে তাঁকে ঢেকে ফেললেন।

শ্রুতায়ু সেই সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর এক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তাতে আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন। এর মধ্যে অচ্যুতায়ু তাঁর ওপর এক তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ছুঁড়লেন। সেই আঘাতে অত্যন্ত আহত হয়ে অর্জুন রথের মধ্যে বসে পড়লেন। অর্জুনকে মৃত মনে করে আপনার সেনারা আনন্দে কোলাহল করে উঠল। অর্জুনকে অচেতন দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁর চেতনা আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। অর্জুন ক্রমশ বল ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পেলেন। অর্জুনের যেন নবজন্ম হল। তিনি দেখলেন তাঁদের রথ বাণে আচ্ছাদিত এবং দুই বীর সামনে দণ্ডায়মান। অর্জুন তৎক্ষণাৎ ঐন্দ্রাস্ত্র স্মরণ করলেন, ঐন্দ্রাস্ত্র থেকে হাজার হাজার বাণ উৎপন্ন হতে লাগল। তিনি বীর দুজনকে আঘাত করলেন। তাঁদের নিক্ষিপ্ত বাণও অর্জুনের বাণে বিদীর্ণ হয়ে আকাশে উড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্জুনের বাণে দুই মহারথীর মস্তক ও হস্তচ্যুত হওয়ায় তাঁরা ধরাশায়ী হলেন। শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুকে এইভাবে বধ হতে দেখে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হল। তারপর অর্জুন তাঁদের অনুগামী পঞ্চাশ রথীকে বধ করে আরও বীর সংহার করতে করতে কৌরবদের দিকে এগোলেন।

শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু বধ হওয়ায় তাঁদের পুত্র নিয়তায়ু এবং দীর্ঘায়ু ক্রুদ্ধ হয়ে বাণবর্ষণ করতে করতে অর্জুনের সামনে এলেন। কিন্তু অর্জুন কুপিত হয়ে এক মুহূর্তে তাঁদের যমালয়ে পাঠালেন। হাতি যেমন কমলবন পদদলিত করে, অর্জুনও তেমনই কৌরব সেনা দলন করতে লাগলেন। কোনো ক্ষত্রিয়বীরই তাঁকে তখন বাধাদান করতে পারছিলেন না। এরমধ্যে গজসেনাসহ অঙ্গদেশীয়, পূর্বীয়, দাক্ষিণাত্য এবং কলিঙ্গ দেশের রাজারা দুর্যোধনের নির্দেশে অর্জুনকে আক্রমণ করল। কিন্তু অর্জুনের গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত বাণে মুহুর্মুহু তাদের মাথা ও হাত কেটে পড়তে লাগল। এই যুদ্ধে অনেক গজারোহী ম্লেচ্ছ ধনঞ্জয়ের বাণে ধরাশায়ী হল। অর্জুন তাঁর বাণজালে সমস্ত সেনাকে আচ্ছাদিত করে মুণ্ডিত, অর্ধমুণ্ডিত, জটাধারী ও শ্মশ্রুগুম্ফ সম্বলিত আচারহীন ম্লেচ্ছদের তাঁর শস্ত্রকৌশলে খণ্ডিত করলেন। তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়ে এই শত শত পার্বত্য যোদ্ধা ভীত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। এইভাবে ঘোড়া, হাতি ও রথসহ বহু বীর সংহার করে বীর ধনঞ্জয় রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

এবার রাজা অম্বষ্ঠ তাঁর গতিরোধ করলেন। অর্জুন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর ঘোড়া বধ করলেন এবং ধনুক কেটে ফেললেন। অম্বষ্ঠ এক ভারী গদা নিয়ে বারংবার অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন অর্জুন দুই বাণে গদাসহ তাঁর দুটি হাত কেটে ফেললেন এবং অপর এক বাণে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। অম্বষ্ঠ মৃত্যুবরণ করে ধরাশায়ী হলেন।

দুর্যোধনের মনোবল ফেরাতে দ্রোণাচার্য কর্তৃক তাঁকে অভেদ্য বর্ম প্রদান এবং অর্জুনের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! অর্জুন যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করার আকাঙ্ক্ষায় দ্রোণ ও কৃতবর্মার সৈন্যদলকে ভেদ করে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর হাতে সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ু নিহত হল তখন সৈন্যদের সেখান থেকে পালাতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন একাই রথে করে শীঘ্রই দ্রোণাচার্যের কাছে এসে বলতে লাগলেন, 'আচার্য ! পুরুষসিংহ অর্জুন আমাদের এই বিশাল সৈন্যকে ছারখার করে ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। আপনি চিন্তা করুন, তাকে বধ করার জন্য আমাদের কী করা উচিত। আপনি আমাদের সব থেকে বড় ভরসা। অগ্নি যেমন সব কিছু জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়, অর্জুনও তেমনই আমাদের সৈন্যদের নষ্ট করে দিচ্ছে। জয়দ্রথকে যারা রক্ষা করবে সেই রাজারা ভীত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে অর্জুন আপনার সৈন্যদের লঙ্ঘন করে ব্যূহতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু দেখা গেল সে আপনার সামনেই ব্যূহতে প্রবেশ করল। আমার সমস্ত সৈন্য বিকল ও বিনষ্টের মতো অসহায় হয়ে পড়েছে। সিন্ধুরাজ তো নিজ গৃহে ফিরেই যাচ্ছিলেন, আপনি তাকে অভয়প্রদান করাতেই

আমি মূর্খতাবশত আপনার ওপর বিশ্বাস করে তাঁকে এখানে থাকতে রাজি করিয়েছি। আমার বিশ্বাস মানুষ যমরাজের কবলে পড়লেও বাঁচতে পারে, কিন্তু রণভূমিতে অর্জুনের হাতে পড়লে জয়দ্রথের প্রাণ কখনো রক্ষা পাবে না। সুতরাং এমন কোনো উপায় করুন, যাতে সিন্ধুরাজ রক্ষা পান। আমি ভয় পেয়ে যদি কোনো অনুচিত কথা বলে থাকি, তাহলে তাতে ক্রুদ্ধ না হয়ে আপনি তাঁকে বাঁচান।'

দ্রোণাচার্য বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার কথায় দোষ ধরছি না। আমার কাছে তুমি অশ্বত্থামারই মতো। সত্য কথা তোমায় বলছি, মন দিয়ে শোনো। অর্জুনের সারথি হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ঘোড়াগুলিও অত্যন্ত তেজী। তাই সামান্য পথ পেলেই সে তৎক্ষণাৎ ঢুকে পড়ে। আমি সমস্ত ধনুর্ধরীদের সামনে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এখন অর্জুন তার কাছে নেই আর সে সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং আমি এখন ব্যূহদ্বার ছেড়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব না। তুমি বংশমর্যাদা ও পরাক্রমে অর্জুনের সমকক্ষ এবং এই পৃথিবীর রাজা। সুতরাং তোমার সৈন্যদের নিয়ে তুমি একাই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে যাও, কিছু ভয় পেয়ো না।'

দুর্যোধন বললেন— 'আচার্যচরণ ! যে অর্জুন আপনার ব্যূহ ভেঙে প্রবেশ করতে পারে, আমি কী করে তাকে প্রতিহত করব ? সে তো সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমার মনে হয় যুদ্ধে বজ্রধারী ইন্দ্রকেও পরাজিত করা সম্ভব, কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। সে কৃতবর্মা এবং আপনাকে পরাস্ত করেছে ; শ্রুতায়ুধ, সুদক্ষিণ, অম্বষ্ঠ, শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ুকে সংহার করেছে এবং সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছকে পরলোকে পাঠিয়েছে—সেই শস্ত্রকুশল দুর্জয় বীর অর্জুনের সঙ্গে আমি কী করে যুদ্ধে পেরে উঠব ?'

দ্রোণাচার্য বললেন—কুরুরাজ ! তুমি ঠিকই বলেছ, অর্জুন অবশ্যই দুর্জয় ; কিন্তু আমি এমন এক উপায় বলছি, যাতে তুমি ওর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে। আজ শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সকল বীর আজ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখবে। আমি তোমার এই স্বর্ণবর্ম এমন মন্ত্রপূত করে দেব, যাতে বাণ অথবা অন্য কোনো অস্ত্র এর কোনো ক্ষতি করতে না পারে। যদি মনুষ্যসহ দেবতা, অসুর, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস এবং ত্রিলোকের অধিবাসীও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলেও তোমার কোনো ভয় নেই। সুতরাং এই বর্ম পরে তুমি নিজেই ক্রোধান্বিত অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাও।

আচার্য এই বলে তখনই আচমন করে শাস্ত্রবিধিমতে মন্ত্রোচ্চারণ করে দুর্যোধনকে সেই সুবর্ণ বর্ম পরিয়ে দিয়ে বললেন—'পরমাত্মা, ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ তোমার কল্যাণ করুন।' তারপর তিনি বললেন—'ভগবান শংকর এই মন্ত্র ও বর্ম ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন, এর দ্বারাই তিনি সংগ্রামে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। ইন্দ্র তারপর এই মন্ত্রপূত বর্ম অঙ্গিরাকে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র বৃহস্পতিকে এবং বৃহস্পতি অগ্নিবেশ্যকে দিয়েছিলেন। অগ্নিবেশ্য এই বর্ম আমাকে দিয়েছিলেন, আমি আজ সেটি তোমার রক্ষার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তোমাকে পরালাম।'

আচার্য দ্রোণের প্রচেষ্টায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রাজা দুর্যোধন ত্রিগর্তদেশের সহস্র রথী এবং অনেক অন্য মহারথীদের সঙ্গে নিয়ে অর্জুনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

—o—

দ্রোণাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সাত্যকির ভয়ানক যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! যখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের পেছনে দুর্যোধনও গেলেন, তখন পাণ্ডবরা সোমক বীরদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত কোলাহল করে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। পুরুষসিংহ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাণ্ডবরা বারংবার দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করতে লাগলেন। আচার্য যেমন বাণবর্ষণ করছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁর ওপর তেমনই বাণ নিক্ষেপ করছিলেন। দ্রোণ পাণ্ডব রথীদের ওপর বাণবর্ষণ করলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণবর্ষণ করে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে প্রতিহত করছিলেন। পাণ্ডবদের আঘাতে ভীত হয়ে কিছু সৈন্য কৃতবর্মার সৈন্যের সঙ্গে জুড়ে গেল। কিছু জলসন্ধের দিকে এবং কিছু দ্রোণাচার্যের কাছেই থাকল। মহারথী দ্রোণ তাঁর সৈন্যদল সংগঠিত করার চেষ্টা করলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাদের

ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছিলেন। শেষে আপনার সেনারা সব এমনভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল যেমন দুষ্ট রাজার দেশ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও লুটেরাদের জন্য নষ্ট হয়।

পাণ্ডবদের আঘাতে সৈন্যরা এইভাবে ত্রিধাবিভক্ত হলে আচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে পাঞ্চালদের বাণ দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর স্বরূপ তখন প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির মতো ভয়ানক হয়েছিল। আচার্য দ্রোণের বাণে আহত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনা এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণে পীড়িত হয়ে দুপক্ষের বীরগণ প্রাণের আশা ত্যাগ করে পূর্ণ শক্তিতে সংগ্রাম করতে লাগল।

এই সময় কুন্তীনন্দন ভীমসেনকে বিবিংশতি, চিত্রসেন এবং বিকর্ণ—এই তিন ভ্রাতা ঘিরে ধরলেন। শিবির পুত্র রাজা গোবাশন এক হাজার যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে কাশীরাজ অভিভূকের পুত্র পরাক্রান্তকে প্রতিহত করলেন। মদ্ররাজ শল্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হলেন। দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শকুনি সাতশত গান্ধার দেশীয় যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে নকুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। অবন্তী দেশের বিন্দ এবং অনুবিন্দ মৎস্যরাজ বিরাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজ বাহ্লীক শিখণ্ডীকে থামালেন। অবন্তীনরেশ প্রভদ্রক একশত বীর সঙ্গে নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হলেন এবং ঘটোৎকচকে ক্রূরকর্মা রাক্ষস অলায়ুধ আক্রমণ করল।

মহারাজ! তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সমস্ত সৈন্যের পেছনে ছিলেন এবং কৃপাচার্য প্রমুখ মহাধনুর্ধরগণ তাঁর রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর দক্ষিণ দিকে অশ্বত্থামা এবং বাঁদিকে কর্ণ ছিলেন, ভূরিশ্রবা প্রমুখ তাঁর পৃষ্ঠরক্ষক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কৃপাচার্য, বৃষসেন, শল এবং শল্য প্রমুখ রণবীরও তাঁর রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিলেন।

ব্যূহের মুখদ্বারে বীরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হচ্ছিল। মাদ্রীপুত্র নকুল এবং সহদেব বাণের বর্ষা করে তাঁদের প্রতি বৈরীভাব রক্ষাকারী শকুনিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সেইসময় শকুনি তাঁর সমস্ত পরাক্রম হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাণের আঘাতে আহত হয়ে শকুনি দ্রোণাচার্যের সৈন্যদলে আত্মগোপন করলেন । সেইসময় দ্রোণ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছিল, দুজনেই দুই পক্ষের বহু বীরের মস্তকচ্যুত করেছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দেখলেন দ্রোণ অত্যন্ত সন্নিকটে এসেছেন, তখন তিনি ধনুর্বাণ রেখে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। আচার্য শত বাণে তাঁর ঢাল ও তলোয়ার কেটে ফেললেন। তারপর চৌষট্টি বাণে তাঁর ঘোড়া, ধ্বজা এবং ছত্র কেটে তাঁর পার্শ্বরক্ষকদেরও ধরাশায়ী করে দিলেন। তারপর তিনি ধনুকের গুণ টেনে ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর এক প্রাণান্তক বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সাত্যকি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাকে মধ্যপথেই খণ্ডিত করলেন এবং আচার্যের হাত থেকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করলেন। সাত্যকি এলে, তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন রথে উঠে তৎক্ষণাৎ দূরে চলে গেলেন।

আচার্য তখন সাত্যকির ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যকির ঘোড়াগুলিও দ্রোণের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর এই দুই বীর পরস্পর বাণযুদ্ধে রত হলেন। তাঁদের বাণে আকাশে বাণের জাল সৃষ্টি হয়ে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। সূর্যের আলো এবং বায়ুও বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। দুজনের ছত্র ও ধ্বজা কেটে গেল, তাঁরা দুজনে প্রাণান্তক বাণ প্রয়োগ করছিলেন। সেই সময় দুপক্ষের বীররা দাঁড়িয়ে দ্রোণ ও সাত্যকির যুদ্ধ দেখছিলেন। বিমানে চড়ে ব্রহ্মা এবং চন্দ্র প্রমুখ দেবতা এবং সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর এবং নাগগণও আশ্চর্য হয়ে তাঁদের নানাভাবে এগিয়ে পিছিয়ে অস্ত্রসঞ্চালন দ্বারা যুদ্ধকৌশল দেখছিলেন। দুই বীর তাঁদের হস্তকৌশলে দুজনকে আহত করছিলেন। সাত্যকি তাঁর সুদৃঢ় বাণে আচার্যের ধনুক কেটে ফেললেন, দ্রোণ তক্ষুণি অন্য ধনুক নিলেন, সাত্যকি সেটিও কেটে ফেললেন। এইভাবে দ্রোণ ধনুক নিতেই সাত্যকি তা কেটে ফেলতে লাগলেন। সাত্যকির এই অতিমানবিক কর্ম দেখে দ্রোণ মনে মনে চিন্তা করলেন যে, যে অস্ত্রবল পরশুরাম, কার্তবীর্য, অর্জুন ও ভীষ্মের আছে, তা সাত্যকির মধ্যেও আছে।

তখন আচার্য একটি নতুন ধনুক নিয়ে তাতে কয়েকটি অস্ত্র চড়ালেন। কিন্তু সাত্যকি তাঁর অস্ত্রকৌশলে সেই সব অস্ত্র কেটে ফেললেন এবং আচার্যের ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাই দেখে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হল। শেষে আচার্য অত্যন্ত কুপিত হয়ে সাত্যকিকে সংহার করার জন্য দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাই দেখে সাত্যকি বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। দুই বীরকে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে দেখে হাহাকার শুরু হয়ে গেল, এমনকী আকাশে পাখির ওড়াও বন্ধ হয়ে গেল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেব সবদিক থেকে সাত্যকিকে রক্ষা করতে লাগলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদির সঙ্গে রাজা বিরাট এবং কেকয়

নরেশ মৎস্য ও শাল্বদেশের সৈন্যদের নিয়ে দ্রোণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে দুঃশাসনের নেতৃত্বে হাজার হাজার রাজকুমার দ্রোণকে শত্রু পরিবেষ্টিত দেখে তাঁর সাহায্যে এলেন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেইসময় ধূলি ও অস্ত্রবর্ষণে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাই সেই যুদ্ধ মর্যাদাহীন হয়ে উঠল—তাতে আপন-পর কোনো জ্ঞান ছিল না।

—o—

বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ এবং কৌরব সেনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব শুশ্রূষা

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিলেন। কৌরবপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেউ আবার ফিরে যাচ্ছিল, কেউ কেউ পালিয়েও যাচ্ছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে দিন শেষ হয়ে আসছিল। কিন্তু অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ জয়দ্রথের দিকে এগোচ্ছিলেন। অর্জুন তাঁর বাণের দ্বারা রথ যাবার রাস্তা তৈরি করে নিচ্ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজন্! অর্জুনের রথ যে রাস্তা ধরে যাচ্ছিল, সেই পথে আপনার সেনারা ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। অর্জুনের শক্তিশালী তীক্ষ্ণ বাণ শত্রু সংহার করে তাদের রক্তপান করছিল। তিনি রথের এক ক্রোশ পর্যন্ত শত্রু নাশ করে দিচ্ছিলেন। অর্জুনের রথ অত্যন্ত তীব্র গতিতে চলছিল। সেইসময় তিনি সূর্য, ইন্দ্র, রুদ্র এবং কুবেরের রথকেও ম্লান করে দিয়েছিলেন।

রথ যখন কৌরব সেনাদের মধ্যে পৌঁছাল, তখন তাঁর ঘোড়াগুলি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং রথ আকর্ষণ করতে গিয়ে খুবই ক্লান্তি বোধ করছিল। তাদের পর্বতের ন্যায় সহস্র মৃত হাতি, ঘোড়া, মানুষ এবং রথের ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছিল। সেই সময় অবন্তী দেশের দুই রাজকুমার তাঁদের সেনাসহ অর্জুনের সামনে হাজির হলেন। তাঁরা উল্লসিত হয়ে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ এবং ঘোড়াগুলিকে শত শত বাণে আঘাত করলেন। অর্জুন তখন কুপিত হয়ে নয়টি বাণে তাঁদের মর্মস্থান বিদ্ধ করে তাঁদের ধনুক ও ধ্বজা কেটে ফেললেন। তাঁরা অন্য ধনুক নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন তখনি তাঁদের ধনুক আবার কেটে ফেললেন এবং আরও বাণ নিক্ষেপ করে তাঁদের ঘোড়া, সারথি, পার্শ্বরক্ষক এবং কয়েকজন অনুগামীকে নিহত করলেন। তারপর তিনি এক ক্ষুরপ্র বাণে বড় ভাই বিন্দের মাথা কেটে ফেললেন, তিনি নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বিন্দকে মৃত দেখে মহাবলী অনুবিন্দ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে গদা হাতে শ্রীকৃষ্ণের ললাটে আঘাত করলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতে এতটুকুও বিচলিত হলেন না। অর্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁর ছয়টি বাণে অনুবিন্দের হাত, পা ও মাথা কেটে ফেললেন, অনুবিন্দ পর্বত শিখরের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেলেন।

বিন্দ ও অনুবিন্দকে মৃত দেখে তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত কুপিত হয়ে বাণবর্ষণ করে তাঁর দিকে দৌড়াল। অর্জুন ক্ষিপ্রতা সহকারে বাণের দ্বারা তাদের বধ করে এগিয়ে চললেন। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'ঘোড়াগুলি অত্যন্ত ক্লান্ত ও আহত হয়েছে। জয়দ্রথও এখনও অনেক দূরে। এই অবস্থায় কী করা উচিত বলে মনে করেন ? আমার যা ঠিক বলে মনে হয়, তা বলছি, শুনুন। আপনি ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দিন এবং ওদের বাণগুলি বার করে দিন।' অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পার্থ ! তুমি ঠিকই বলেছ, আমারও তাই মনে হয়।' অর্জুন বললেন —'কেশব ! আমি কৌরব সেনাদের আটকাচ্ছি, এর মধ্যে আপনি কাজ সেরে ফেলুন।' এই বলে অর্জুন রথ থেকে নেমে ধনুক হাতে সতর্কভাবে পর্বতের ন্যায় দাঁড়ালেন। তখন বিজয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়রা তাঁকে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে 'ভালো সুযোগ পাওয়া গেছে' বলে চিৎকার করে তাঁর দিকে এগোতে লাগল। বিশাল সৈন্য নিয়ে তারা রথ দিয়ে একাকী অর্জুনকে ঘিরে ধরে নানা শস্ত্র ও বাণের দ্বারা অর্জুনকে আচ্ছাদিত করে দিল। কিন্তু বীর অর্জুন তাঁর অস্ত্রের সাহায্যে তাদের সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করে সকলকে

বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। কৌরবের সৈন্যদল সমুদ্রের ন্যায় অপার ছিল। অগণিত রথ যেন তরঙ্গ, ছত্র-পতাকা তার সেনা, হাতিগুলি শিলার টুকরোর মতো অর্জুন তটরূপ হয়ে তাঁর বাণে সেই সমুদ্রকে যেন প্রতিহত করছেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ যখন মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সুযোগেও কৌরবরা কেন অর্জুনকে বধ করতে পারল না ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! লোভ যেমন একাই সমস্ত গুণকে আচ্ছাদিত করে, তেমনই অর্জুন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও রথে উপবিষ্ট সমস্ত রাজাকেই প্রতিহত করে রেখেছিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ ভয় পেয়ে অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! এই যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও ভালো জলাশয় নেই ? তোমার ঘোড়া জলপান করতে চাইছে না।' অর্জুন তক্ষুণি অস্ত্রদ্বারা মাটি খুঁড়ে ঘোড়ার পানের যোগ্য এক সুন্দর জলাশয় তৈরি করলেন। এই জলাশয় বিস্তৃত ও স্বচ্ছ জলে ভরা। সেই জলাশয় দেখতে নারদ মুনি সেখানে পদার্পণ করলেন। অদ্ভুত কর্মকারী অর্জুন বাণের দ্বারা সেখানে এক ঘর তৈরি করলেন, তার থাম, ছাদ এবং দেওয়াল সবই বাণের দ্বারা নির্মিত। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন—'খুবই সুন্দর হয়েছে।' তখন তিনি রথ থেকে নেমে বাণবিদ্ধ ঘোড়াগুলিকে মুক্ত করলেন।
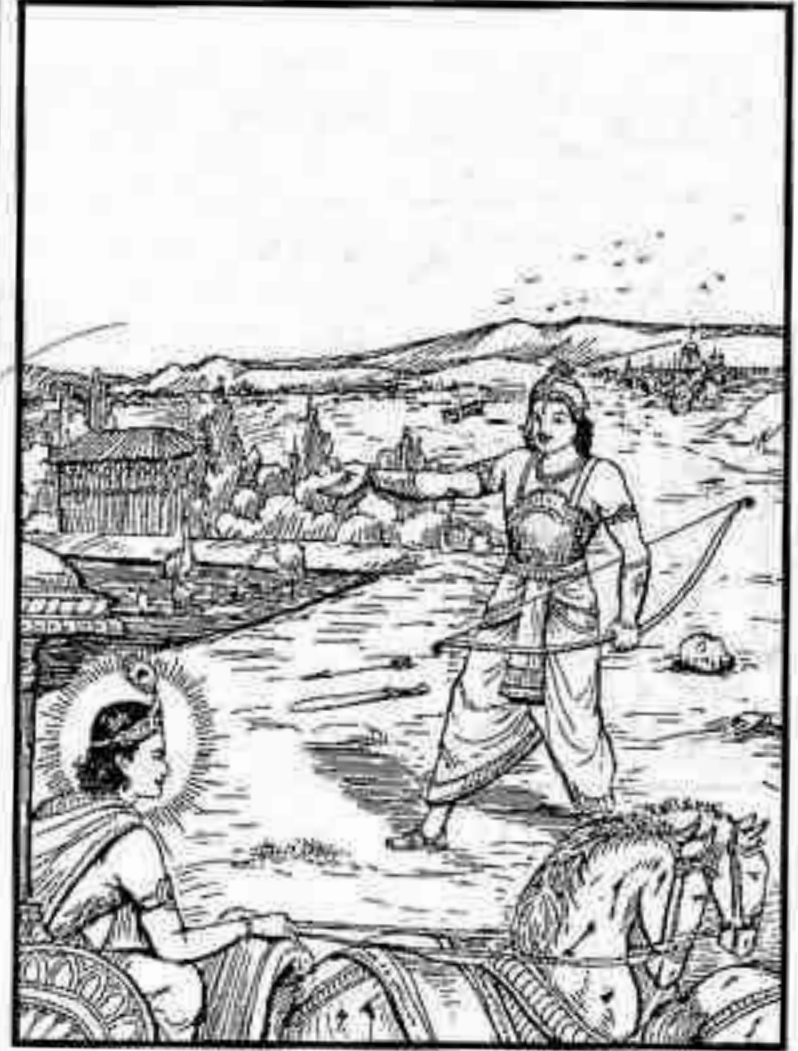
অর্জুনের এই অভূতপূর্ব পরাক্রম দেখে সিদ্ধ, চারণ ও সৈনিকরা তারিফ করতে লাগলেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, রথোপবিষ্ট মহারথীরাও মাটিতে দাঁড়ানো অর্জুনকে কোনো মতেই পরাস্ত করতে পারল না। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ, যেন নারীদের মধ্যে রয়েছেন, এইভাবে হেসে ঘোড়াগুলিকে বাণনির্মিত ঘরে নিয়ে গিয়ে নির্ভয়ে সেবা করতে লাগলেন, তিনি অশ্বচর্যাতে পারদর্শী ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘোড়াগুলির স্নান-খাওয়া ও পরিচর্যা করে, তাদের শ্রম ও ক্লান্তি দূর করে আবার তাদের রথের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি অর্জুনের সঙ্গে সেই রথে চড়ে সবেগে রওনা হলেন।

তখন আপনার পক্ষের যোদ্ধারা বলতে লাগল—'আহা ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল, আমরা তাঁদের কিছুই করতে পারলাম না, ধিক্ আমাদের ! শিশু যেমন খেলনার পরোয়া করে না, তেমনই এঁরা একই রথে বসে আমাদের সেনাকে পরোয়া না করে চলে গেলেন।' তাঁদের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে কোনো

কোনো রাজা বলতে লাগলেন—'একা দুর্যোধনের অপরাধেই সমস্ত সেনা, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং সমস্ত পৃথিবী বিনাশের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র একথা এখনও বুঝছেন না।'

কৌরবপক্ষের বীররা যখন এইসব কথা বলছিলেন, সূর্য তখন অস্তগামী, তাই অর্জুন সবেগে জয়দ্রথের দিকে যাচ্ছিলেন, কেউই তাঁর গতিরোধ করতে পারছিল না। তিনি সমস্ত সেনাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যদের হটিয়ে অত্যন্ত দ্রুত ঘোড়া চালাচ্ছিলেন এবং তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত হচ্ছিল। তাই দেখে শত্রুপক্ষের রথীরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। ধুলায় ধূসরিত হওয়ায় সূর্য ঢেকে গিয়েছিল এবং বাণে আহত হয়ে থাকায় সৈনিকরাও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের দিকে তাকাতে পারছিল না।

দুর্যোধন, অশ্বত্থামা প্রমুখ আট মহারথীর সঙ্গে অর্জুনের সংগ্রাম

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন তখন নির্ভয়ে জয়দ্রথ বধের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের কথা শুনে শত্রুপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত হল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলেন—'ছয়জন মহারথী কৌরব জয়দ্রথকে তাঁদের মধ্যে ঘিরে রেখেছেন, কিন্তু একবার যদি জয়দ্রথের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে, তাহলে সে আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। যদি ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও তাকে রক্ষা করেন, তবুও আমি তাকে বধ করবই।' তখন তাঁদের দুজনের মুখ দেখে আপনার পক্ষের রথী মহারথীরা সকলেই বুঝে গেল যে, অর্জুন অবশ্যই জয়দ্রথকে বধ করবেন।

তখনই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সিন্ধুরাজকে দেখে হর্ষে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁদের এগোতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। আচার্য দ্রোণ তাঁর বর্ম বেঁধে দিয়েছিলেন। তাই তিনি একাকী রথে করে রণক্ষেত্রে এলেন। আপনার পুত্র যখন অর্জুনকে লঙ্ঘন করে এগিয়ে গেলেন, তখন আপনার সৈন্যরা খুশিতে বাদ্য বাজিয়ে দিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! দেখো, দুর্যোধন আজকে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে, আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে ওর মতো কোনো রথী নেই। এখন ওর সঙ্গে যুদ্ধ করা আমি উচিত বলে মনে করি। আজ ও তোমার লক্ষ্য স্বরূপ হয়ে রয়েছে, একে তুমি সাফল্য বলেই মনে করো ; নাহলে এই রাজ্যলোভী কেন তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে মরতে চাইবে ? আজ সৌভাগ্যবশত এ তোমার বাণের নিশানা হয়েছে ; অতএব তুমি এমন কাজ করো, যাতে সে শীঘ্র বীরগতি প্রাপ্ত হয়। পার্থ ! দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যসহ কেউই তোমার সম্মুখীন হতে পারে না, তাহলে একা দুর্যোধনের আর কী কথা।' এই কথা শুনে অর্জুন বললেন—'উত্তম ; এখন আমাকে যদি এই কাজই করতে হয়, তাহলে আপনি সব কাজ ছেড়ে রথ দুর্যোধনের দিকে নিয়ে চলুন।'

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন প্রসন্ন হয়ে রাজা দুর্যোধনের দিকে এগিয়ে চললেন। এই মহাসংকটেও দুর্যোধন ভীত হননি, তিনি তাঁদের গতিরোধ করলেন। তাই দেখে তাঁর পক্ষের বীররা প্রশংসা করতে লাগলেন। রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে আপনার সৈন্যরা আনন্দে কোলাহল করতে লাগল। অর্জুনের ক্রোধ তাতে

বেড়ে গেলে। তখন দুর্যোধন হেসে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উল্লসিত হয়ে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। তাঁদের প্রসন্নতা দেখে সকল কৌরব দুর্যোধনের জীবনের আশা ত্যাগ করে ভীত হয়ে বলতে লাগলেন—'হায় ! মহারাজ মৃত্যুমুখে গিয়ে পড়েছেন।' তাঁদের কোলাহল শুনে দুর্যোধন বললেন—'ভয় পেয়ো না ! আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে মৃত্যুমুখে পাঠাচ্ছি।'

এই বলে তিনি তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুন এবং তাঁর চারটি ঘোড়াকে আঘাত করলেন, তারপর দশ বাণে শ্রীকৃষ্ণের বুকে আঘাত করে একটি ভল্লের দ্বারা তাঁর চাবুক কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন। অর্জুন তখন সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে চোদ্দটি বাণ মারলেন, কিন্তু সেগুলিও তাঁর বর্মে আঘাত করে মাটিতে পড়ল। সেগুলি নিষ্ফল হতে দেখে তিনি আরও চোদ্দটি বাণ ছুঁড়লেন, কিন্তু সেগুলিও বর্মে আঘাত করে মাটিতে পড়ে গেল। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'আজ তো এক নতুন ব্যাপার দেখছি। তোমার বাণ কোনো কাজেই লাগছে না, যেন পাথরে আঘাত করছ। পার্থ ! তোমার বাণ তো বজ্রপাতের মতো ভয়ংকরভাবে শত্রুর দেহে ঢুকে যায় ; কিন্তু আজ এ কী বিড়ম্বনা, তোমার বাণে আজ কোনো কাজই হচ্ছে না।' অর্জুন বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! মনে হয়, আচার্য দ্রোণই তাকে এই শক্তি দিয়েছেন। তার বর্ম ধারণ করার শৈলী আমার অস্ত্রের পক্ষে অভেদ্য। ওর বর্মে ত্রিলোকের শক্তি সমাহিত আছে। আচার্য দ্রোণ তা একমাত্র জানেন এবং তাঁর কৃপায় আমার সেই জ্ঞান আছে। এই বর্ম কোনোভাবেই বাণের দ্বারা ভেদ করা যায় না। শুধু তাই নয়, স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁর বজ্র দ্বারা একে কাটতে পারবেন না। কৃষ্ণ ! আপনি তো এসবই জানেন, তাহলে কেন প্রশ্ন করে আমাকে মোহমুগ্ধ করছেন ? ত্রিলোকে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে অথবা হবে—তা সবই আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনার মতো আর কেউই এত জানেন না। একথা ঠিক যে দুর্যোধন আচার্যের দ্বারা বর্ম পরিধান করে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে এবার আপনিও আমার ধনুক ও হস্তকৌশল দেখুন। বর্মদ্বারা সুরক্ষিত হলেও আমি ওকে পরাজিত করব।'

এই বলে অর্জুন বর্ম ভেদকারী মানবাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করে একসঙ্গে বহু বাণ চড়ালেন। কিন্তু অশ্বত্থামা সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রতিরোধকারী বাণের সাহায্যে সেগুলিকে ধনুকের ওপরেই কেটে ফেললেন। তা দেখে অর্জুন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন ! আমি এই অস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে পারি না ; তাহলে এই অস্ত্র আমাকে এবং আমার সৈন্যদেরই সংহার করবে।' এরই মধ্যে দুর্যোধন নয়টি করে বাণে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করলেন এবং অজস্র বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর বাণবর্ষণ দেখে আপনার পক্ষের বীররা প্রসন্ন হয়ে বাদ্যধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগল। অর্জুন তখন তাঁর কালের ন্যায় করাল ও তীক্ষ্ণবাণে দুর্যোধনের ঘোড়াগুলি ও পার্শ্বরক্ষকদের বধ করলেন। পরে তাঁর ধনুক এবং দস্তানাও কেটে ফেললেন। এইভাবে তাঁকে রথহীন করে দুই বাণে তাঁর হাত বিঁধে তাঁর নখের মধ্যে ঢুকিয়ে রক্তপাত ঘটালেন। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দুর্যোধন পালাতে চেষ্টা করলেন। দুর্যোধনের বিপদ দেখে তাঁর পক্ষের বীররা তাঁর রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন। তাঁরা অর্জুনকে চারদিকে ঘিরে ধরলেন। তাঁদের বাণবর্ষায় অর্জুন বা শ্রীকৃষ্ণ কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না।

অর্জুন তখন গাণ্ডীব টেনে ভয়ানক ধ্বনি করে বাণের দ্বারা শত্রুসংহার করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। সেই শঙ্খনাদ ও গাণ্ডীবের টংকারে ভীত হয়ে সবল-দুর্বল সব প্রাণীই ভীত হল এবং সমুদ্র-পর্বত-আকাশসহ সমস্ত পৃথিবী গুঞ্জন করে উঠল। আপনার পক্ষের বহু বীর অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য ক্ষিপ্রতা সহকারে এগিয়ে এল। ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য, শল্য ও অশ্বত্থামা—এই আট বীর একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের সঙ্গে রাজা দুর্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষার জন্য তাঁকে ঘিরে রাখলেন। অশ্বত্থামা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আক্রমণ করলেন এবং তাঁর ধ্বজা ও ঘোড়াদের আঘাত করলেন। অর্জুনও ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামাকে ছয় বাণ মারলেন এবং কর্ণ ও বৃষসেনকে বাণ বিদ্ধ করে রাজা শল্যের বাণসহ ধনুক কেটে ফেললেন। শল্য তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক নিয়ে অর্জুনকে আঘাত করলেন। তারপর ভূরিশ্রবা, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য এবং মদ্ররাজ তাঁকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন তখন হেসে হস্তকৌশল দেখিয়ে কর্ণ ও বৃষসেনকে বাণের দ্বারা আঘাত করে শল্যের ধনুক কেটে ফেললেন। তারপর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং জয়দ্রথকে আঘাত করলেন। তখন ভূরিশ্রবা ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চাবুক কেটে অর্জুনকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তখন অর্জুন বহুবাণ নিক্ষেপ করে শত্রুদের অগ্রগতি প্রতিহত করলেন।

—o—

শকটব্যূহের প্রবেশ পথে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের বীরদের সংগ্রাম এবং কৌরবপক্ষের বহু বীরের বিনাশ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! অর্জুন জয়দ্রথের দিকে এগিয়ে গেলে আচার্য দ্রোণের দ্বারা প্রতিহত পাঞ্চাল বীররা কৌরবদের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করল ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেদিন দ্বিপ্রহরে কৌরব ও পাঞ্চালদের মধ্যে যে রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হয়, তার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন আচার্য দ্রোণ। সমস্ত পাঞ্চাল এবং পাণ্ডব বীর দ্রোণের রথের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য বড় বড় অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সর্বপ্রথম কেকয় মহারথী বৃহৎক্ষত্র তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে করতে আচার্যের সামনে এলেন। ক্ষেমধূর্তি তার মোকাবিলায় অসংখ্য বাণ চালালেন। তারপর চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু আচার্যকে আক্রমণ করলেন, বীরধন্বা তাঁর সম্মুখীন হলেন। এইভাবে সহদেবকে দুর্মুখ, সাত্যকিকে ব্যাঘ্রদত্ত, দ্রৌপদীর পুত্রদের সোমদত্তের পুত্র এবং ভীমসেনকে রাক্ষস অলম্বুষ প্রতিহত করলেন।

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে নব্বই বাণ নিক্ষেপ করলেন। আচার্য তখন সারথি ও ঘোড়াসহ তাঁকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। কিন্তু ধর্মরাজ তাঁর ক্ষিপ্রতায় সমস্ত বাণ প্রতিরোধ করলেন। তাতে দ্রোণের ক্রোধ বেড়ে গেল। তিনি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের ধনুক কেটে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাজার বাণ বর্ষণ করে তাঁকে ঢেকে দিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির মুদ্ধ হয়ে কর্তিত ধনুক ফেলে অন্য ধনুক নিয়ে আচার্য নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ খণ্ডন করলেন। তারপর তিনি দ্রোণের ওপর এক ভয়ানক শক্তিশালী গদা ছুঁড়ে উল্লাসে গর্জন করে উঠলেন। গদাকে আসতে দেখে দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেটি গদাকে ভস্ম করে যুধিষ্ঠিরের রথের দিকে এগিয়ে চলল। যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাই তাকে শান্ত করে আচার্যকে বাণে বিদ্ধ করলেন ; তখন দ্রোণ তাঁর ধনুক ফেলে যুধিষ্ঠিরের ওপর গদা নিক্ষেপ করলেন। গদা আসতে দেখে যুধিষ্ঠিরও একটি গদা তুলে ছুঁড়লেন। দুটি গদা মাঝপথে ধাক্কা খেয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ল। দ্রোণাচার্য তাতে আরও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি চারটি তীক্ষ্ণ বাণে যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াগুলি বধ করলেন, ভল্লের

সাহায্যে ধনুক কেটে দিলেন এবং ধ্বজা কেটে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকেও আহত করলেন। ঘোড়াগুলি মৃত হওয়ায় যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে সহদেবের রথে চড়ে সবেগে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন।

অন্যদিকে মহাপরাক্রমী কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রকে আসতে দেখে ক্ষেমধূর্তি বাণের সাহায্যে তার বুকে আঘাত করলেন, বৃহৎক্ষত্র ক্ষিপ্রভাবে তাঁকে নব্বই বাণে আঘাত করলেন। তখন ক্ষেমধূর্তি এক তীক্ষ্ণ ভল্লের সাহায্যে কেকয়রাজের ধনুক কেটে আর এক বাণে তাঁকে আহত করলেন। কেকয়রাজ অন্য ধনুক নিয়ে হাসতে হাসতে মহারথী ক্ষেমধূর্তির ঘোড়া, সারথি এবং রথ নষ্ট করে এক তীক্ষ্ণ বাণে ক্ষেমধূর্তির কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক দেহ থেকে পৃথক করে দিলেন। তারপর তিনি পাণ্ডবদের হিতার্থে অকস্মাৎ আপনার সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুকে বীরধন্বা প্রতিহত করলেন। এই দুই বীর একে অপরকে সহস্র বাণে আঘাত করতে লাগলেন। বীরধন্বা কুপিত হয়ে এক ভল্লের আঘাতে ধৃষ্টকেতুর ধনুক দুটুকরো করে দিলেন। চেদিরাজ ধনুকটি

ফেলে এক লৌহশক্তি তুলে দুহাতে ধরে বীরধন্বার ওপর ছুঁড়ে মারলেন। সেই আঘাতে বীরধন্বার বুক দুটুকরো হয়ে গেল। তিনি রথ থেকে মাটিতে পড়ে পরলোকগমন করলেন।

আর একদিকে দুর্মুখ সহদেবকে ষাট বাণ নিক্ষেপ করে গর্জন করে উঠলেন। সহদেব অনায়াসে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করলেন। দুর্মুখ তাঁকে নটি বাণ দিয়ে আঘাত করলেন। সহদেব তখন ভল্লের আঘাতে দুর্মুখের ধ্বজা কেটে, বাণের আঘাতে ঘোড়া ও ধনুক কেটে ফেললেন। তারপর তিনি তাঁর সারথির মস্তকচ্যুত করলেন এবং দুর্মুখকেও বাণের আঘাতে জর্জরিত করে তুললেন। দুর্মুখ তখন নিজ রথ ছেড়ে নিরমিত্রের রথে গিয়ে উঠলেন। সহদেব ক্রুদ্ধ হয়ে এক ভল্লের দ্বারা নিরমিত্রকে আঘাত করলেন। ত্রিগর্তরাজপুত্র নিরমিত্র সেই আঘাতে রথ থেকে পড়ে গেলেন। রাজপুত্র নিরমিত্রকে মৃত দেখে ত্রিগর্তদেশের সৈন্যদের মধ্যে বিষাদ ছেয়ে গেল। এরমধ্যে নকুল আপনার পুত্র বিকর্ণকে পরাস্ত করলেন।

অন্যদিকে ব্যাঘ্রদত্ত তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন। সাত্যকি তাঁর হস্তকৌশলে সেগুলি প্রতিহত করে তাঁর বাণে ধ্বজা, সারথি ও ঘোড়াসহ ব্যাঘ্রদত্তকে ধরাশায়ী করেন। মগধরাজকুমার ব্যাঘ্রদত্ত বধ হওয়ায় মগধদেশের বহু বীর সহস্র বাণ এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু সাত্যকি অতি সহজেই তাদের পরাস্ত করলেন। মহাবাহু সাত্যকির আঘাতে ভীত হয়ে পালাতে থাকা আপনার সেনারা কেউই তাঁর সামনে দাঁড়াতে সাহস করেনি। তাই দেখে দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই সাত্যকিকে আক্রমণ করলেন।

এদিকে শল দ্রৌপদীর পুত্রদের প্রত্যেককে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। তাতে তাঁরা পীড়িত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। তার মধ্যে নকুলের পুত্র শতানীক দুই বাণে শলকে বিদ্ধ করে গর্জন করে উঠলেন। তখন অন্য দ্রৌপদী-কুমারগণও বাণ ছুঁড়ে তাঁকে আঘাত করলেন। শল তখন তাঁদের প্রত্যেককে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন এবং প্রত্যেকের বুকে আঘাত করলেন। অর্জুনের পুত্র চার বাণে তাঁর ঘোড়াগুলি বধ করলেন, ভীমের পুত্র তাঁর ধনুক কেটে গর্জন করে উঠলেন। যুধিষ্ঠিরকুমার তাঁর ধ্বজা কেটে ফেলে দিলেন, নকুল পুত্র সারথিকে রথ থেকে নীচে ফেলে দিলেন এবং সহদেবকুমার তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে শলের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। তাঁকে নিহত হতে দেখে আপনার সৈন্যরা ভীত হয়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল।

অন্যদিকে মহাবলী ভীমসেনের সঙ্গে অলম্বুষ যুদ্ধ করছিলেন। ভীমসেন নয় বাণে সেই রাক্ষসকে ঘায়েল করলেন। সেই রাক্ষস ভয়ানক গর্জন করে ভীমের দিকে দৌড়াল। সে পাঁচ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করে তাঁর সেনার তিন শত রথীকে সংহার করে। পরে আরও চার শত বীরকে বধ করে এক বাণে ভীমসেনকে আঘাত করে। সেই বাণে ভীমসেন গভীরভাবে আহত হয়ে অচেতন হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে এলে তাঁর ভয়ংকর ধনুকে বাণ চড়িয়ে চারদিক থেকে অলম্বুষকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। সেই সময় অলম্বুষের স্মরণ হল যে ভীমসেনই তার ভাই বককে হত্যা করেছিল, তাই সে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে বলল—'দুষ্ট ভীম ! তুমি যখন আমার ভাই বককে হত্যা করেছিলে, সে সময় আমি সেখানে ছিলাম না ; আজ তুমি সেই ফল ভোগ কর।' এই বলে সে অন্তর্ধান করে ভীমের ওপর ভীষণ বাণবর্ষণ করতে লাগল। ভীমসেন সমস্ত আকাশ বাণে পরিব্যাপ্ত করে দিলেন। সেই বাণে পীড়িত হয়ে রাক্ষস আবার তার রথে এসে বসল এবং মাটিতে নেমে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে আবার আকাশে উড়ে গেল। সে ক্ষণে ক্ষণে উঁচু-নীচে, ছোট-বড়, স্থূল-সূক্ষ্ম বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে মেঘের ন্যায় গর্জন করতে লাগল এবং আকাশে উড়ে নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। তার ফলে ভীমসেনের বহু সৈন্য নষ্ট হয়ে গেল। তখন ভীমসেন কুপিত হয়ে বিশ্বকর্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তাতে সবদিকে বহু বাণ প্রকাশমান হল এবং আহত হয়ে আপনার সৈন্যরা পালাতে লাগল। সেই অস্ত্র রাক্ষসের সমস্ত মায়া দূর করে তাকে তীব্র আঘাত করল। ভীমসেনের আঘাতে আহত হয়ে সে সেইখান থেকে দ্রোণাচার্যের সৈন্যের দিকে চলে গেল। সেই রাক্ষসকে পরাজিত করে পাণ্ডবরা সিংহনাদ করে চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুললেন।

হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুষের কাছে এসে তাকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। অলম্বুষ তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচকে আঘাত করল। দুই রাক্ষসে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। ঘটোৎকচ অলম্বুষের বুকে কুড়িটি বাণ মেরে সিংহের মতো গর্জন করতে লাগলেন, অলম্বুষ রণবীর

ঘটোৎকচকে ঘায়েল করে সিংহনাদে আকাশ কাঁপিয়ে তুলল। দুজনেই নানা মায়ার সৃষ্টি করে একে অপরকে মোহমুগ্ধ করছিল। মায়াযুদ্ধে কুশল হওয়ায় তারা দুজনেই মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ঘটোৎকচ যুদ্ধে যে মায়া সৃষ্টি করছিলেন, অলম্বুষ তা নষ্ট করে দিচ্ছিল। তাতে ভীমসেন প্রমুখ মহারথীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

অলম্বুষ তার বজ্রসম প্রচণ্ড ধনুক থেকে ভীমসেন, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, সহদেব, নকুল ও দ্রৌপদীর পুত্রদের ওপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে সিংহনাদ করতে লাগল। তখন তাকে ভীমসেন, সহদেব, যুধিষ্ঠির, নকুল এবং দ্রৌপদীর পুত্ররাও বহু বাণে বিদ্ধ করলেন, ঘটোৎকচও তাকে অসংখ্য বাণে আঘাত করে গর্জন করে উঠলেন। সেই ভীষণ সিংহনাদে সমস্ত পৃথিবী, বন, পর্বত, জলাশয় কেঁপে উঠল। অলম্বুষ তখন প্রত্যেক বীরকে পাঁচটি করে বাণ মারল। তখন পাণ্ডবগণ ও ঘটোৎকচ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে চারদিক থেকে তার ওপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্বার গতি পাণ্ডবদের আঘাতে অর্ধমৃত হয়ে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার সেই অবস্থা দেখে যুদ্ধদুর্মদ ঘটোৎকচ তাকে বধ করার কথা ভাবলেন। তিনি নিজ রথ থেকে অলম্বুষের রথে লাফিয়ে উঠে তাকে তুলে নিয়ে বারংবার ঘুরিয়ে মাটির ওপর আছড়ে ফেললেন। তাই দেখে তার সমস্ত সেনা ভীত হয়ে পড়ল।

বীর ঘটোৎকচের প্রহারে অলম্বুষের সমস্ত দেহ ফেটে গিয়েছিল এবং অস্থিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অলম্বুষকে নিহত হতে দেখে পাণ্ডবরা বিজয়ের আনন্দে সিংহনাদ করে উঠলেন আর আপনার সেনাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

সাত্যকি এবং দ্রোণের যুদ্ধ, রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক সাত্যকিকে অর্জুনের কাছে প্রেরণ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! এখন আমাকে তুমি ঠিক করে বলো যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সাত্যকি কীভাবে দ্রোণাচার্যকে প্রতিহত করল !

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! আচার্য যখন দেখলেন মহাপরাক্রমী সাত্যকি আমাদের সৈন্য ছিন্নভিন্ন করছেন, তখন তিনি নিজে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁকে সহসা সামনে আসতে দেখে সাত্যকি তাঁকে পঁচিশটি বাণ মারলেন। আচার্য তৎক্ষণাৎ তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে আক্রমণ করলেন। সেই বাণ সাত্যকির বর্ম ভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সাত্যকি কুপিত হয়ে দ্রোণকে পঞ্চাশ বাণে ঘায়েল করলেন, আচার্যও তাঁর ওপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। আচার্যের আঘাতে সাত্যকি এত ব্যাকুল হলেন যে কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। তাঁর মনে ত্রাসের সৃষ্টি হল। তা দেখে আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ আনন্দে সিংহনাদ করতে লাগল। তাদের সিংহনাদ শুনে এবং সাত্যকিকে সংকটাপন্ন দেখে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'দ্রুপদপুত্র ! তুমি ভীমসেনাদি সমস্ত বীরকে সঙ্গে নিয়ে সাত্যকির রথের দিকে যাও। আমিও তোমার পেছনে

সমস্ত সৈনিকদের নিয়ে আসছি। এখন সাত্যকিকে রক্ষা করো, সে কালের মুখে পৌঁছেছে।'

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলে সাত্যকিকে রক্ষার জন্য সমস্ত সৈন্য নিয়ে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু আচার্য বাণবর্ষণ করে সকলকে প্রতিহত করতে লাগলেন। সেইসময় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় বীরদের কোনো রক্ষক দেখা যাচ্ছিল না। দ্রোণাচার্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সেনাদের প্রধান প্রধান বীরদের সংহার করছিলেন। তিনি শত শত, হাজার হাজার পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কেকয় বীরদের পরাস্ত করছিলেন। তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়ে যোদ্ধারা আর্তনাদ করছিল। সেইসময় দেবতা, গন্ধর্ব এবং পিতৃপুরুষরাও বলছিলেন যে, 'দেখো, পাঞ্চাল এবং পাণ্ডব মহারথীরা সৈনিকদের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে।'

যেসময় বীরদের ভয়ানক সংহার হচ্ছিল, তখন রাজা যুধিষ্ঠির পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি বিষণ্ণ হয়ে ভাবলেন, 'যেভাবে পাঞ্চজন্য ধ্বনি হচ্ছে এবং কৌরবদের হর্ষধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় অর্জুনের কোনো বিপদ হয়েছে।' এই চিন্তা মনে উঠতেই তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হল, তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সাত্যকিকে বললেন —'শিনিপুত্র ! পূর্বে শ্রেষ্ঠপুরুষগণ সংকটকালে মিত্রের যে ধর্ম স্থির করেছিলেন, এখন তা পালন করার সময় হয়েছে। আমি সব যোদ্ধাদের দিকে দেখে চিন্তা করলাম, তোমার থেকে বেশি হিতকারী আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার ধারণা হল যে সংকটের সময় তার সাহায্যই নেওয়া উচিত যে প্রীতিভাবাপন্ন এবং সর্বতোভাবে অনুকূল। তুমি শ্রীকৃষ্ণের মতোই পরাক্রমী এবং তাঁরই মতো পাণ্ডবদের ভরসাস্থল। তাই আমি তোমাকে একটি দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই, তুমি তা গ্রহণ করো। এখন তোমার বন্ধু, সখা, গুরু, অর্জুনের সংকট উপস্থিত ; তুমি রণক্ষেত্রে গিয়ে তাকে সাহায্য করো। যে ব্যক্তি তার মিত্রের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করে এবং যে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করে, তারা দুজনেই সমান। আমার দৃষ্টিতে মিত্রকে অভয়প্রদানকারী একজন শ্রীকৃষ্ণ আর অন্যজন তুমি। তোমরাই মিত্রের জন্য প্রাণ সমর্পণ করতে পারো। দেখো, যখন একজন পরাক্রমশালী বীর বিজয়লাভের জন্য যুদ্ধ করে, তখন বীরপুরুষরাই তাকে সাহায্য করে, এই কাজ অন্য সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই ভয়ানক যুদ্ধে অর্জুনকে রক্ষা করতে তুমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই। অর্জুনও তোমার বহু কর্মের প্রশংসা করে আমাকে অনেকবার বলেছে যে সাত্যকি তার মিত্র এবং শিষ্য, সে তোমার প্রিয় এবং তুমিও তার প্রিয়। অর্জুনের সঙ্গে থেকে তুমিও কৌরব সংহার করবে এবং তোমার মতো সহায়ক অর্জুনের আর দ্বিতীয় কেউ নেই। আমি যখন তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে দ্বারকা গিয়েছিলাম, সেইসময় আমিও তোমার মধ্যে অর্জুনের প্রতি অদ্ভুত ভক্তিভাব দেখেছিলাম। দ্রোণের কাছে প্রাপ্ত বর্ম বেঁধে দুর্যোধন অর্জুনের দিকে গিয়েছিল। অন্য কয়েকজন মহারথী সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তোমার অত্যন্ত শীঘ্র সেখানে যাওয়া দরকার। ভীমসেন এবং আমরা সকলে সৈনিকদের সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। দ্রোণাচার্য তোমার পশ্চাদ্ধাবন করলে আমরা তাঁর গতিরোধ করব। দেখো, আমাদের সৈন্য রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সিন্ধু-সৌবীর দেশের বীররা অর্জুনকে ঘিরে ধরেছে। তারা জয়দ্রথের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাদের পরাস্ত না করে জয়দ্রথকে জয় করা যাবে না। মহাবাহু অর্জুন আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, এখন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। জানিনা, সে এখনও জীবিত আছে কি না ! সমুদ্রের মতো অপার কৌরবসেনা, সংগ্রামে তাদের সম্মুখীন হতে দেবতাদেরও চিন্তিত হতে হবে। অর্জুন একাকী তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। তার চিন্তায় আমি আজ যুদ্ধে মন দিতে পারিনি। জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ অন্যকেও রক্ষা করেন, তাই তাঁর জন্য আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি তোমাকে সত্য কথা জানাচ্ছি, যদি ত্রিলোক মিলেও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলেও তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারবে না। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের বলহীন পুত্রদের কথাই নেই। কিন্তু অর্জুনের কথা আলাদা, বহু যোদ্ধা একসঙ্গে মিলে যদি তাকে আঘাত করে, তাহলে তার প্রাণ চলে যাবে। সুতরাং অর্জুন যে পথে গেছে তুমিও শীঘ্র সেই পথে তার কাছে যাও। এখন বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে তুমি ও প্রদ্যুম্ন উভয়কেই অতিরথী বলে মনে করা হয়। তুমি অস্ত্রচালনায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সমকক্ষ। সুতরাং আমি তোমাকে যে কাজে নিযুক্ত করছি, তুমি তা পূর্ণ করো।

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সংক্ষিপ্ত মহাভারতের বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

শল্যপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

সৌপ্তিকপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

স্ত্রীপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

শান্তিপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

অনুশাসনপর্ব

আশ্বমেধিকপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

আশ্রমবাসিকপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা

মৌসলপর্ব

মহাপ্রাস্থানিকপর্ব

স্বর্গারোহণপর্ব

---o---

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সংক্ষিপ্ত মহাভারত

কর্ণপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
ওঁ নমঃ পিতামহায়। ওঁ নমঃ প্রজাপতিভ্যঃ।
ওঁ নমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায়। ওঁ নমঃ সর্ববিঘ্নবিনায়কেভ্যঃ।

কর্ণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ আরম্ভ এবং ভীম কর্তৃক ক্ষেমধূর্তি বধ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দ্রোণাচার্যের মৃত্যু হওয়ায় দুর্যোধনাদি রাজন্যবর্গ শোকার্ত ও দিশাহারা হলেন, তাঁদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল। তাঁরা দ্রোণের জন্য শোক-বিলাপ করতে করতে অশ্বত্থামার কাছে এসে বসলেন এবং নানা স্বস্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন ; রাত্রি সমাগত হলে সকলে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। কর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনি সেই রাতটা দুর্যোধনের শিবিরে কাটালেন। শয়নের সময় তাঁরা পাণ্ডবদের প্রতি কৃত অপরাধ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা কপটপাশা খেলে পাণ্ডবদের যেভাবে কষ্ট দিয়েছিলেন, দ্রৌপদীকে পরিপূর্ণ সভায় কেশ ধরে টেনে এনে যে অপমান করেছিলেন— সেই কথা স্মরণ করে তাঁরা অনুতাপানলে দগ্ধ হতে লাগলেন, তাঁদের চিত্ত অশান্ত হয়ে উঠল।

প্রভাত হলে সকলে নিজ নিজ নিত্যকর্ম সমাপন করলেন, তারপর নিয়তিকে মেনে নিয়ে তাঁরা সৈন্যদের প্রস্তুত করে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। দুর্যোধন কর্ণকে

সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন এবং ষোড়শোপচারে ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। পাণ্ডবরাও তাঁদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে যুদ্ধের জন্য গমন

করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! কর্ণ সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হয়ে কী করল, আমাকে তা সবিস্তারে বলো।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কর্ণের সম্মতি পেয়ে দুর্যোধন রণভেরী বাজিয়ে সেনাদের প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। সেইসময় হাতি-ঘোড়া-রথ ও সৈনাদের কোলাহলে রণক্ষেত্র মুখরিত হয়ে উঠল। সেনাপতি কর্ণ এক দেদিপ্যমান রথে চড়ে রণক্ষেত্রে এলেন, তাঁর রথ সর্পচিহ্ন শোভিত, শ্বেত পতাকাযুক্ত ও শ্বেতাশ্বচালিত। রথটি নানা অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ। কর্ণ শঙ্খ বাজালেন, তাঁর শঙ্খধ্বনি শুনে সৈন্যরা সমবেত হল। সমস্ত কৌরব সৈন্য শিবির থেকে বার হয়ে এলে কর্ণ পাণ্ডবদের পরাজিত করার জন্য মকর (কুমির) আকৃতি এক সৈন্যব্যূহ নির্মাণ করলেন। মকর-ব্যূহের প্রধান স্থানে কর্ণ স্বয়ং উপস্থিত রইলেন। মকরের দুই চক্ষুস্থলে শূরবীর শকুনি এবং উলূক দাঁড়ালেন। মস্তক স্থলে অশ্বত্থামা এবং কণ্ঠদেশে দুর্যোধনের ভ্রাতারা থাকলেন। ব্যূহের মধ্যস্থলে বিশাল সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে দুর্যোধন দাঁড়ালেন। বাম চরণ স্থলে কৃতবর্মা এবং রণোন্মত্ত নারায়ণী সেনারা ছিল। দক্ষিণ চরণ স্থলে কৃপাচার্য দাঁড়ালেন। কৃপাচার্যের সঙ্গে মহাধনুর্ধর ত্রিগর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের সৈন্য ছিল। বাম চরণের পেছন দিকে মদ্রদেশের যোদ্ধাদের নিয়ে রাজা শল্য উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ চরণের পেছনে ছিলেন রাজা সুষেণ, তাঁর সঙ্গে এক হাজার রথী এবং তিন শত গজারোহী সৈন্য। ব্যূহের পুচ্ছস্থলে দুই ভ্রাতা—চিত্র এবং চিত্রসেন বিশাল সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিলেন।

এইরূপ ব্যূহ নির্মাণ করে কর্ণ যখন যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন, তাই দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন—'পার্থ ! দেখো, কর্ণ কৌরব সেনাদের কীভাবে ব্যূহবদ্ধ করেছে এবং মহারথী বীরগণ কীভাবে এটি রক্ষা করছেন। দুর্যোধনের সৈন্যদলে যেসব বড় বড় বীর ছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই মারা গেছেন ; এখন যাঁরা জীবিত আছেন, আমি এঁদের এখন অত গুরুত্ব দিই না। এই সৈন্যদলে কর্ণই একমাত্র মহাধনুর্ধর বীর, যাকে দেবতাও পরাজিত করতে বেগ পান। মহাবাহো ! এই কর্ণকে বধ করতে পারলেই তুমি জয়লাভ করবে এবং আমাদের হৃদয়ের ব্যথাও দূর হবে। অতএব তুমি তোমার ইচ্ছামতো সৈন্যব্যূহ রচনা করো।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথায় অর্জুন শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁর সেনাদের নিয়ে ব্যূহ নির্মাণ করলেন। তার বামভাগে ভীমসেন, দক্ষিণভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যভাগে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন। নকুল ও সহদেব—দুজন রইলেন যুধিষ্ঠিরের পেছনে। পাঞ্চাল দেশের যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা অর্জুনের রথের চাকা রক্ষা করতে লাগলেন। বাকি সব বীররা যে যেস্থান পেলেন, সেখানেই একনিষ্ঠ চিত্তে দাঁড়িয়ে গেলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবরা এইভাবে ব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দুই পক্ষই তুমুল নাদে রণদুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। বিজয়াভিলাষী যোদ্ধাদের সিংহগর্জন শোনা যেতে লাগল। মহাধনুর্ধর কর্ণকে ব্যূহের মুখে দণ্ডায়মান দেখে কৌরব যোদ্ধারা দ্রোণাচার্যের বিয়োগ ব্যথা ভুলে গেল।

কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ায় দুজনেই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হলেন। তাঁদের সৈনিকরাও পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হল ; ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী, পদাতিক একে অপরকে প্রহার করতে লাগল। বীরেরা হাতি, ঘোড়া, রথ থেকে পড়ে ধরাশায়ী হতে লাগল। সৈন্য যখন এইভাবে ধ্বংস হচ্ছিল, তখন ভীমসেন ও অন্য পাণ্ডবরা আমাদের সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীমসেন হাতির ওপরে ছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে হাতিতে উপবিষ্ট ক্ষেমধূর্তি তাঁকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে আক্রমণ করলেন। প্রথমে তাঁদের হাতির মধ্যেই যুদ্ধ

আরম্ভ হল। তারপর তাঁরা দুজনে তোমর দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। পরে ধনুক তুলে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই একে অপরের ধনুক কেটে সিংহনাদ করে উঠলেন এবং তোমরের বর্ষণ শুরু করলেন। এরমধ্যে ক্ষেমধূর্তি সবেগে গর্জন করে এক তোমরের দ্বারা ভীমকে আঘাত হেনে অন্য ছয়টি তোমর দিয়ে প্রহার করলেন।

ভীমসেনও ধনুক তুলে বাণবর্ষণ করে তাঁর হাতিকে আঘাত করলেন ; হাতি ভয়ে পালাতে লাগল, তাকে থামালেও থামছিল না। ক্ষেমধূর্তি কোনোমতে তার গতিরোধ করে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে বাণবিদ্ধ করলেন এবং তাঁর হাতিকেও মর্মস্থানে আঘাত করলেন। হাতি সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করল। ভীমসেন তার আগেই মাটিতে লাফিয়ে নেমে গদার আঘাতে শত্রুর হাতিকে বধ করলেন। ক্ষেমধূর্তিও হাতি থেকে নেমে তলোয়ার নিয়ে দৌড়ে এলেন। ভীমসেন তাঁকে গদার দ্বারা আঘাত করলেন। সেই আঘাতে ক্ষেমধূর্তি প্রাণত্যাগ করে হাতির পাশে গিয়ে পড়লেন। মহারাজ ! ক্ষেমধূর্তি কুলুতের যশস্বী রাজা ছিলেন। তাঁকে মৃত দেখে আপনার সেনারা দিশাহারা হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল।

—— ১ ——

বিন্দ-অনুবিন্দ এবং চিত্রসেন ও চিত্র বধ, অশ্বত্থামা এবং ভীমসেনের ভয়ানক যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! মহা ধনুর্ধর কর্ণ তীক্ষ্ণবাণে পাণ্ডবসেনা সংহার করতে লাগলেন। তাঁর নারাচের আঘাতে যূথবদ্ধ হাতিগুলি চিৎকার করে পালাতে লাগল। তাই দেখে রণোন্মত্ত কর্ণকে নকুল আক্রমণ করলেন। অন্যদিকে অশ্বত্থামা দুঃসাহসিক পরাক্রম দেখাচ্ছিলেন, তিনি ভীমের সম্মুখীন হলেন। কেকয়দেশের বিন্দ ও অনুবিন্দের গতি সাত্যকি রোধ করলেন। শ্রুতকর্মা চিত্রসেনের সম্মুখীন হলেন। চিত্রকে প্রতিবিন্ধ্য প্রতিরোধ করলেন। দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন এবং ক্রুদ্ধ অর্জুন সংশপ্তকদের সংহার করছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য এবং শিখণ্ডী কৃতবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। শ্রুতকীর্তি শল্যের সঙ্গে সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন।

সেই যুদ্ধে কেকয় বীর বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকির ওপর শক্তিশালী বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন সাত্যকিও তাঁদের দুজনকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। বিন্দ-অনুবিন্দ সাত্যকির বুকে আঘাত করলে তিনি তাঁদের দুজনের ধনুক কেটে দিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণে তাঁদের অগ্রগতি রোধ করলেন। তাঁরাও অন্য ধনুক নিয়ে সাত্যকিকে বাণবিদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। তাঁদের বাণবর্ষণে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর তিনজনেই একে অন্যের ধনুক কেটে দিলেন। তখন সাত্যকির ক্রোধের সীমা রইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক নিয়ে তাতে এক তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করে অনুবিন্দের মস্তক দেহচ্যুত করলেন।

মহারথী বিন্দ তাঁর বীর ভ্রাতাকে বধ হতে দেখে অন্য একটি ধনুক তুলে অসংখ্য বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করে সিংহনাদ করে উঠলেন। তারপর তাঁর বুক ও হাত লক্ষ্য করে বাণনিক্ষেপ করতে লাগলেন। সাত্যকি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসতে হাসতে বাণের আঘাতে বিন্দকে আহত করলেন। দুই মহারথী একে অপরের সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। রথহীন হয়ে তাঁরা দুজনে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকি বিন্দের ঢালটি দুটুকরো করে কেটে দিলেন। বিন্দও সাত্যকির ঢাল কেটে ফেলে তীক্ষ্ণ তলোয়ার নিয়ে তাঁকে বধ করার জন্য মণ্ডলাকারে ঘুরতে লাগলেন। এর মধ্যে সুযোগ পেয়ে সাত্যকি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপে বিন্দের বর্মসহ দেহ দুটুকরো করে ফেললেন। বিন্দের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল. সাত্যকি তাকে বধ করে যুধামন্যুর রথে গিয়ে উঠলেন। এরমধ্যে আর একটি রথ সজ্জিত হয়ে এলে সাত্যকি তাতে চড়ে পুনরায় কেকয় সেনাদের তীরের আঘাতে সংহার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বাণের আঘাতে কেকয় সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। প্রবল শত্রুর ভয়ে তারা নানাদিকে পালাতে লাগল।

অন্যদিকে শ্রুতকর্মা ক্রোধভরে পঞ্চাশ বাণে

চিত্রসেনকে আহত করলেন। অভিসার নরেশ চিত্রসেনও বাণের দ্বারা শ্রুতকর্মাকে বিদ্ধ করে পাঁচবাণে সারথিকেও
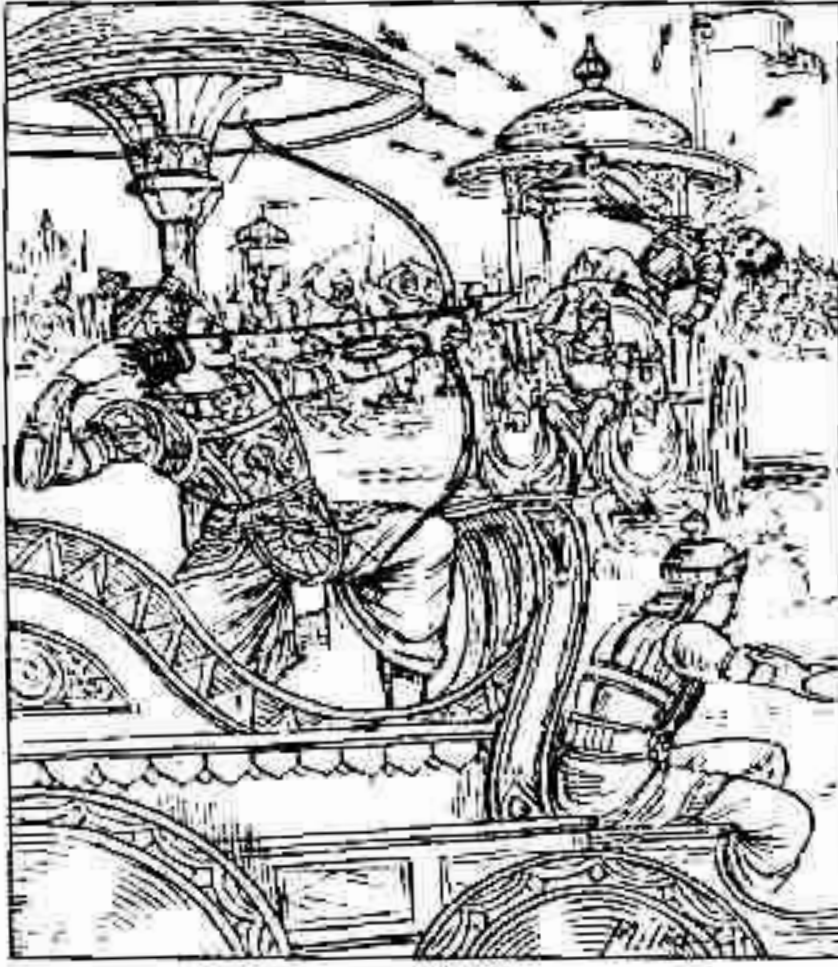
আহত করলেন। তখন শ্রুতকর্মা চিত্রসেনকে তীক্ষ্ণ নারাচ দিয়ে মর্মস্থানে আঘাত করলেন। সেই ভীষণ আঘাতের জবাবে বীরবর চিত্রসেন এক ভল্লের আঘাতে শ্রুতকর্মার ধনুক কেটে দিলেন এবং বাণের দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করলেন। শ্রুতকর্মা পুনরায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শত্রুর ধনুক কেটে ফেললেন এবং অসংখ্য বাণ মেরে তাঁকে ঘায়েল করলেন, তারপর এক তীক্ষ্ণ বাণে চিত্রসেনের মস্তক দেহচ্যুত করে দিলেন। অভিসার নরেশ চিত্রসেনের পতন দেখে তাঁর সৈনিকরা শ্রুতকর্মাকে আক্রমণ করল। কিন্তু তিনি বাণের আঘাতে তাদের সকলকে রণাঙ্গন থেকে হটিয়ে দিলেন।

অন্যদিকে প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচবাণে আহত করে তাঁর সারথিকেও বিদ্ধ করলেন এবং তার ধ্বজাও কেটে দিলেন। তখন চিত্র তার হাত এবং বুক লক্ষ্য করে নটি ভল্ল নিক্ষেপ করলেন। তাই দেখে প্রতিবিন্ধ্য তার ধনুক কেটে পাঁচিশ বাণে তাকেও ঘায়েল করলেন। চিত্র তখন প্রতিবিন্ধ্যের ওপর এক ভয়ংকর শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তিনি হাসতে হাসতে সেই শক্তি কেটে ফেললেন। চিত্র ভয়ংকর এক গদা নিক্ষেপ করলেন। সেই গদা প্রতিবিন্ধ্যের সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করে রথটিও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। প্রতিবিন্ধ্য তার আগেই রথ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি চিত্রকে শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন। তাঁর দিকে শক্তি আসতে দেখে চিত্র সেটি হাত দিয়ে ধরে আবার প্রতিবিন্ধ্যের দিকেই নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তি প্রতিবিন্ধ্যের দক্ষিণ বাহুতে আঘাত করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। প্রতিবিন্ধ্য এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি চিত্রকে বধ করবার জন্য তোমর নিক্ষেপ করলেন। সেই তোমর

চিত্রের বক্ষ ও বর্ম ভেদ করে মাটিতে ঢুকে গেল এবং রাজা চিত্র প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

চিত্রকে মৃত দেখে আপনার সৈনিকরা প্রতিবিন্ধ্যকে অত্যন্ত বেগে আক্রমণ করল, কিন্তু তিনি বাণবর্ষণ করে তাদের হটিয়ে দিলেন। সেইসময় যখন সমস্ত কৌরবসেনা পালিয়ে যাচ্ছিল, শুধু অশ্বত্থামাই মহাবলী ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল।

অশ্বত্থামা এক ভয়ংকর বাণে ভীমকে আঘাত করলেন। পরে অসংখ্য বাণে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। ভীমসেন সহস্রবাণে দ্রোণপুত্রকে আচ্ছাদিত করে সিংহগর্জন করে উঠলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁর বাণের সাহায্যে ভীমসেনের বাণ প্রতিহত করে মৃদু হেসে ভীমের কপালে একটি নারাচের আঘাত করলেন। ভীমসেনও তিনটি নারাচ দিয়ে তাঁর কপালে আঘাত হানলেন। দ্রোণকুমার শত বাণে ভীমসেনকে ঘায়েল করলেন, কিন্তু ভীম তাতে এতটুকুও বিচলিত হলেন না। ভীমও অশ্বত্থামার ওপর বাণের বর্ষা করতে লাগলেন। অশ্বত্থামাও নানা তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ

করতে থাকলে ভীম সেগুলি নাশ করতে লাগলেন। দুজনে ভয়ানক অস্ত্রযুদ্ধ হতে লাগল। বাণের সংঘাত ভীমসেন ও অশ্বত্থামার সেনাদের ওপরে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হতে দেখা যাচ্ছিল। সেই আগুনে অনেক সৈন্য দগ্ধ হচ্ছিল। দুই বীরের সেই অদ্ভুত, অচিন্তনীয় পরাক্রম দেখে সিদ্ধ ও চারণেরা বিস্মিত হয়ে গেল। দেবতা, সিদ্ধ এবং ঋষিগণ তাঁদের প্রশংসা করতে লাগলেন। দুই মহারথীকে মেঘের ন্যায় মনে হচ্ছিল, তাঁরা বাণরূপ জল ধারণ করা শস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ চমকে প্রকাশিত হচ্ছিলেন এবং বাণবর্ষণ করে একে অপরকে ঢেকে দিচ্ছিলেন। দুজনে দুজনের ধ্বজা কেটে সারথি ও ঘোড়াদের বিদ্ধ করলেন এবং একে অন্যকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। দুজনেই আহত হয়ে রথের উপরে পড়ে গেলেন। অশ্বত্থামার সারথি তাঁকে মূর্ছিত দেখে রণভূমি থেকে দূরে নিয়ে গেলেন। ভীমের সারথিও তাঁকে অচেতন জেনে সমরক্ষেত্রের বাইরে চলে গেলেন।

সংশপ্তক ও অশ্বত্থামার সঙ্গে অর্জুনের ভয়ানক সংগ্রাম, অর্জুনের হাতে দণ্ডধার এবং দণ্ড বধ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! সংশপ্তকগণ এবং অশ্বত্থামার সঙ্গে অর্জুনের কেমন যুদ্ধ হল ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! শুনুন। সংশপ্তক সেনা সমুদ্রের ন্যায় দুর্লঙ্ঘনীয় ছিল। অর্জুন তারমধ্যে প্রবেশ করে তুফান তুলেছিলেন। তিনি তেজোদ্দীপ্ত বাণে কৌরববীরদের মস্তক দেহচ্যুত করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সেই রণক্ষেত্র কাটা মুণ্ডে ভরে গেছে। হাজার হাজার বাণবর্ষণ করে অর্জুন গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। তীক্ষ্ণ বাণে শত্রুদের সারথি, ধ্বজা, ধনুক, বাণ এবং রত্নমণ্ডিত হাতি, ঘোড়া কেটে ফেললেন। তাই দেখে বড় বড় যোদ্ধারা মত্ত হস্তীর মতো হুংকার করে তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে করতে অর্জুনকে আক্রমণ করল। অর্জুন এবং কৌরব যোদ্ধাদের মধ্যে ভয়ানক সংগ্রাম শুরু হল। অর্জুনের ওপর সব দিক থেকে অস্ত্রবর্ষণ হতে লাগল, কিন্তু তিনি বিচলিত না হয়ে সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করে বাণের আঘাতে শত্রুবধ করতে লাগলেন। বাতাস যেমন মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তেমনই অর্জুনও শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিলেন।

অর্জুন সেসময় একাই হাজার মহারথীর সমান পরাক্রম দেখাচ্ছিলেন। তাঁর এই বীরত্ব দেখে দেবতা, সিদ্ধ, ঋষি ও চারণগণ তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। দেবতারা দুন্দুভি বাজিয়ে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ওপর পুষ্পবর্ষণ করলেন। তখন সেখানে আকাশবাণী শোনা গেল 'যিনি চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, বায়ুর বল এবং সূর্যের প্রতাপ ধারণ করেছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনরূপে এই রণভূমিতে বিরাজমান। একই রথে উপবিষ্ট এই দুই বীর ব্রহ্মা ও শংকরের ন্যায় অজেয়। এঁরা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর এবং নারায়ণ।'

এই আশ্চর্য আকাশবাণী শুনেও অশ্বত্থামা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করলেন। তিনি দুজনের ওপরেই বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তখন অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামার ধনুক কেটে দিলেন। অশ্বত্থামা তখন অন্য ধনুক নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করে তাঁদের অগ্রগতি প্রতিহত করলেন। তখন অশ্বত্থামাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি সর্বঅঙ্গ দিয়ে অস্ত্রনিক্ষেপ করছেন। এভাবে বাণের দ্বারা অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করে প্রসন্ন হয়ে তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন।

গর্জন শুনে অর্জুন অশ্বত্থামার বাণগুলিকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন, তারপর তিনি সংশপ্তকদের রথ, হাতি, ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা ও পদাতিকদের ওপর ভয়ংকর বাণবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ তিন যোজন দূরে অবস্থিত হাতি, ঘোড়া ও মানুষ বধ করত। অর্জুন বহু হাতি-ঘোড়া ও রথ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। যারা যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি, সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল, তাদের ধনুক, অস্ত্রশস্ত্র, হাত-পা, ছত্র-ধ্বজা, ঘোড়া, ঢাল-বর্ম, রথ, মস্তক—সবই অর্জুন কেটে ফেলতে

লাগলেন। পার্থের বাণের আঘাতে অস্ত্রশস্ত্রসহ সকলেই ধরাশায়ী হতে লাগল।

তাই দেখে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং নিষাদ দেশের বীররা অর্জুনকে বধ করার জন্য হাতিতে সওয়ার হয়ে সেখানে এল। কিন্তু অর্জুন তাদের হাতিদের কবচ, শুঁড়, মাহুত, ধ্বজা ইত্যাদির ওপর বাণ নিক্ষেপ করে সব কেটে ফেলতে লাগলেন। হাতিগুলি বজ্রাহতের ন্যায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। অশ্বত্থামা তখন এক এক বারে দশটি করে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেই বাণ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল। দুজনের শরীর থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল। তাঁদের দুরবস্থা দেখে সকলে মনে করল তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন ! একে মারো, ছেড়ো না। চিকিৎসা না করলে যেমন রোগ বৃদ্ধি পায়, তেমনই গ্রাহ্য না করলে শত্রুও ক্রমশ দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে।' 'যথার্থ'—বলে অর্জুন ভগবানের আদেশ মেনে নিয়ে অশ্বত্থামার হাত, বুক, মাথা এবং পা বাণের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। তারপর ঘোড়ার রাশি কেটে তাদের বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে অশ্বত্থামাকে নিয়ে রণভূমি থেকে পালিয়ে গেল। অশ্বত্থামা অর্জুনের বাণে এত আহত হয়েছিলেন যে তিনি আর রণক্ষেত্রে ফিরে এলেন না। ঘোড়া থামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে তিনি কর্ণের সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সংশপ্তকদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেই সময় উত্তর দিক থেকে পাণ্ডব সেনাদের আর্তনাদ শোনা গেল। সেখানে দণ্ডধার পাণ্ডবদের চতুরঙ্গিণী সেনা সংহার করছিলেন। তা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেইদিকে রথ ঘোরালেন এবং অর্জুনকে বললেন—'মগধদেশের রাজা দণ্ডধার অত্যন্ত পরাক্রমী, তিনি তাঁর তুল্য দ্বিতীয় কাউকে জীবিত রাখেন না। তাঁর শত্রুসংহারকারী এক মহা বলশালী গজরাজ আছে, সে উত্তমভাবে যুদ্ধ করতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্র। এঁরা কোনোভাবেই রাজা ভগদত্ত অপেক্ষা কম নন। প্রথমে তুমি এঁকে সংহার করো, তারপর সংশপ্তকদের বধ কোরো।' এই বলে তিনি অর্জুনকে দণ্ডধারের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি লৌহ বর্ম পরিহিত। বিপক্ষের পদাতিক সৈনিকদের নিজ মদোন্মত্ত গজরাজ দ্বারা পদদলিত করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেখানে উপস্থিত হতেই দণ্ডধার তাঁদের বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন, পরে অর্জুনের ঘোড়াকেও বাণ মারতে লাগলেন এবং অট্টহাসো গর্জন করে উঠলেন।

অর্জুন তখন ভল্লের আঘাতে তাঁর ধনুক-বাণ, ধ্বজা কেটে দিলেন। কুপিত হয়ে দণ্ডধার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে তাঁর রণোন্মত্ত হাতিকে তাঁদের দিকে নিয়ে চললেন এবং নিজেও অস্ত্রনিক্ষেপ করতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে অর্জুন একসঙ্গে তিন বাণে দণ্ডধারের দুই বাহু ও মস্তক কেটে, হাতিটিকেও একশত বাণে আহত করলেন। সেই আঘাতে হাতিটি চিৎকার করে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। তারপরে ধাক্কা খেয়ে আরোহী সহ পড়ে মরে গেল।

দণ্ডধারের মৃত্যু হতে তাঁর ভাই দণ্ড শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করার জন্য আক্রমণ করল। এসেই সে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে তোমর দিয়ে আঘাত করে গর্জন করে উঠল। অর্জুন তখন তার দুই হাত কেটে মস্তকে এক অর্ধচন্দ্রকার বাণ মারলেন। দণ্ডের মস্তক বিচ্ছিন্ন হল এবং সে হাতির

ওপর থেকে নীচে পড়ল। অর্জুন তাঁর হাতিকেও বাণে বিদীর্ণ করলে হাতিটি আহত হয়ে চিৎকার করতে করতে প্রাণ হারাল। পরে অন্য যোদ্ধারাও উত্তম হাতি চড়ে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু সব্যসাচী তাঁদেরও পরলোকে পাঠালেন। তখন শত্রুর বিশাল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং অর্জুন সংশপ্তকদের বধ করার জন্য এগিয়ে গেলেন।

অর্জুনের হাতে সংশপ্তক এবং অশ্বত্থামার হাতে রাজা পাণ্ড্য বধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! অর্জুন মঙ্গল গ্রহের ন্যায় বক্র ও অতিবক্র গতিতে বহুসংখ্যক সংশপ্তক সংহার করলেন। বহু পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও গজারোহী অর্জুনের বাণে পীড়িত হয়ে পালাতে লাগল, অনেকে মারা পড়ল। তিনি নানা অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা শত্রুদের ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা, ধনুক, বাণ, হাতিয়ার, হাত এবং মস্তক কেটে ফেলতে লাগলেন। এর মধ্যে উগ্রায়ুধের পুত্র তিন বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। তাই দেখে অর্জুন তাঁর মস্তক দেহচ্যুত করলেন। উগ্রায়ুধের সৈনিকরা ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে নানা অস্ত্র দিয়ে বিদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু অর্জুন অস্ত্র দিয়ে সেগুলি প্রতিহত করে বাণবর্ষণ করে বহু সৈনিক বধ করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে বললেন—'অর্জুন ! তুমি দুর্বল হচ্ছ কেন ? এই সংশপ্তকদের বধ করে এবার কর্ণকে বধ করার জন্য প্রস্তুত হও।' 'আচ্ছা, তাই করব'—বলে অর্জুন বাকি সংশপ্তকদের সংহার করতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাণ নিয়ে শরসন্ধান করতেন যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলেও ঠিকমতো তা কেউ বুঝতে পারত না। অর্জুনের হস্তকৌশল দেখে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অর্জুনকে বললেন—'পার্থ ! এই পৃথিবীতে দুর্যোধনের জন্য মহাসংহারে রাজারা নিহত হচ্ছেন। আজ তুমি যে পরাক্রম দেখিয়েছ, তা স্বর্গে ইন্দ্রেরই সমকক্ষ।' কথা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন চলে যাচ্ছিলেন, তারই মধ্যে তাঁরা দুর্যোধনের সৈন্যের দিক থেকে শঙ্খ, ভেরী ইত্যাদি নানা বাদ্যধ্বনি শুনতে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই দিকে রথ নিয়ে গেলেন এবং দেখলেন রাজা পাণ্ড্য দুর্যোধনের সেনা ভীষণভাবে ধ্বংস করছেন। দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। রাজা পাণ্ড্য অস্ত্রবিদ্যা এবং ধনুর্বিদ্যাতে কুশলী ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার অস্ত্রের সাহায্যে শত্রু নাশ করছিলেন। শত্রুপক্ষের বীররা তাঁর ওপরে যেসব অস্ত্রনিক্ষেপ করছিল, তিনি নিজের অস্ত্র দ্বারা সেগুলি সব খণ্ডিত করে ওইসব বীরদের যমালয়ে পাঠাচ্ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! তুমি আমাকে রাজা পাণ্ড্যর পরাক্রম, অস্ত্রশিক্ষা, প্রভাব এবং সংগ্রামের কাহিনী বলো।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনি যাঁদের শ্রেষ্ঠ মহারথী বলে মনে করেন, তাঁদের রাজা পাণ্ড্য তাঁর পরাক্রমের কাছে তুচ্ছ বলে মনে করেন। তাঁর সঙ্গে ভীষ্ম এবং দ্রোণের তুলনাও তিনি পছন্দ করেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের থেকে কোনোভাবেই নিজেকে কম বলে মনে করেন না। পাণ্ড্য সমস্ত রাজা এবং অস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কর্ণের সৈন্য সংহার করছিলেন, সমস্ত যোদ্ধাদের ছিন্নভিন্ন করে হাতি এবং তার আরোহীদের পতাকা, ধ্বজা এবং অস্ত্রহীন করে রক্ষকসহ বধ করেছিলেন। পুলিন্দ, খস, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধ্র, কুন্তল, দাক্ষিণাত্য এবং ভোজদেশের যোদ্ধাদের শস্ত্রহীন ও বর্মহীন করে যমালয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে এইভাবে কৌরবদের চতুরঙ্গিণী সেনা বিনাশ করতে দেখে অশ্বত্থামা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। তিনি রাজা পাণ্ড্যকে প্রথমে আঘাত করলে, পাণ্ড্য ও কর্ণী নামক বাণ নিক্ষেপ করে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করলেন। তারপর অশ্বত্থামা মর্মস্থান বিদীর্ণকারী এক ভয়ংকর বাণ নিয়ে রাজা পাণ্ড্যর ওপর হাসতে হাসতে নিক্ষেপ করলেন। তারপর এক অতি তেজসম্পন্ন তীক্ষ্ণ নারাচ রাজা পাণ্ড্যর ওপর দশমী গতিতে[1] প্রয়োগ করলেন। পাণ্ড্য নটি তীক্ষ্ণ বাণে নারাচটি কেটে অশ্বত্থামার

---

[1] দশমী গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ মস্তককে দেহ থেকে পৃথক করে দেয়।

পার্শ্বরক্ষককে বধ করলেন।

শত্রুর ক্ষিপ্রতা দেখে ধনুকটি মণ্ডলাকার করে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। আটটি বলদে টানা আটগাড়ি বাণ অশ্বত্থামা অর্ধপ্রহরেই শেষ করে ফেললেন। তখন তাঁকে ক্রোধান্বিত যমরাজের ন্যায় দেখাচ্ছিল, যারা তাঁকে দেখছিল, তাদেরই ভয়ে হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল। অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণই পাণ্ড্য বায়ব্যাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিহত করে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করছিলেন।

তখন দ্রোণকুমার তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে যমালয়ে পাঠালেন এবং অর্ধচন্দ্রাকার বাণে তাঁর রথের ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন। যদিও রাজা পাণ্ড্য সেই সময় রথহীন হয়ে পড়েছিলেন, তবুও অশ্বত্থামা তাঁকে বধ করেননি। রাজার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ করার ইচ্ছা বজায় ছিল। সেই সময় এক মহাবলশালী গজরাজ অত্যন্ত বেগে সেখানে এল, তার সওয়ারি মারা গিয়েছিল। রাজা পাণ্ড্য হস্তীযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। সেই পর্বতপ্রায় উচ্চ গজরাজ দেখে তিনি তার পিঠে উঠে বসলেন। তিনি হাতিকে অঙ্কুশ মেরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং সিংহনাদ করে দ্রোণপুত্রের ওপর অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্রের আঘাতে অশ্বত্থামার মাথার স্বর্ণমুকুট ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তখন দ্রোণপুত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শত্রুকে পীড়া দেবার জন্য অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পাঁচবাণে হাতির পা থেকে

শুঁড় পর্যন্ত বিদ্ধ করলেন এবং বাকি বাণে রাজার দুই হাত ও মাথা কেটে দিলেন এবং আরও ছয় বাণে পাণ্ড্যের অনুগামী ছয় যোদ্ধাকে সংহার করলেন।

অশ্বত্থামা যখন এইভাবে রাজা পাণ্ড্যকে বধ করে তাঁর কর্তব্য পূর্ণ করলেন, আপনার পুত্র দুর্যোধন তখনই তাঁর মিত্রদের নিয়ে তাঁর কাছে এসে অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে হার্দিক অভিনন্দন জানালেন।

অঙ্গরাজ বধ, সহদেব কর্তৃক দুঃশাসন এবং কর্ণর দ্বারা নকুলের পরাজয় এবং পাঞ্চালদের বধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনার পুত্রের নির্দেশে গজারোহী সেনারা ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করার জন্য আগুয়ান হলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ দেশের হস্তিযুদ্ধে বিশেষ পারঙ্গম বীরগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা ব্যতীত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, মেকল, মদ্র, কোশল, দশার্ণ এবং নিষধ দেশের হস্তিযুদ্ধে নিপুণ বীররাও এলেন। তাঁরা পাঞ্চাল সেনাদের ওপর বাণ ও নানা অস্ত্র বর্ষণ করতে করতে এগোলেন।

তাঁদের আসতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের হাতির ওপর নারাচ বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রত্যেক হাতিকে বাণ নিক্ষেপ করে আহত করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে গজারোহী সেনা পরিবেষ্টিত দেখে পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল যোদ্ধাগণ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গর্জন করতে করতে সেখানে এল এবং হাতিদের ওপর বাণ বর্ষণ করতে আরম্ভ করল। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্র, প্রভদ্রক, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও চেকিতান—সব বীররা চতুর্দিক থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

শত্রুরা তাদের হাতিদের পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত করল, সেই হাতিগুলি ক্রোধপূর্ণ ছিল ; তাই তারা শুঁড়ের দ্বারা রথ, ঘোড়া, মানুষ সবই টেনে ফেলে পদদলিত করতে

লাগল। যোদ্ধাদের গজদন্ত দিয়ে বিদ্ধ করতে লাগল এবং শুঁড়ে করে তুলে আছাড় মারতে লাগল। সাত্যকি সেইসময় অঙ্গরাজের হাতির সম্মুখীন হলেন। সাত্যকি ভয়ংকর বেগবান এক নারাচ দিয়ে অঙ্গরাজের হাতির মর্মস্থলে বিদ্ধ করলেন। হাতি ব্যথার চোটে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। অঙ্গরাজ হাতির ওপরে বসেছিলেন, সেখান থেকে লাফিয়ে নামতে গেলে সাত্যকি তাঁর বুকে এক নারাচ নিক্ষেপ করেন। সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে অঙ্গরাজ মাটিতে আছড়ে পড়লেন। তখন নকুল যমদণ্ডের ন্যায় তিন নারাচের আঘাতে তাঁকে ঘায়েল করে তাঁর হাতিকেও বাণ নিক্ষেপ করে ঘায়েল করলেন। অঙ্গরাজ বহু কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে নকুলের ওপর তোমর বর্ষণ করলে, নকুল সেগুলি টুকরো টুকরো করে এক অর্ধ চন্দ্রাকার বাণে তাঁর মাথা কেটে দিলেন, অঙ্গরাজ হাতির সঙ্গেই প্রাণহীন হয়ে পুনরায় মাটিতে পড়ে গেলেন।

অঙ্গদেশের রাজকুমারের মৃত্যু হলে তাদের মাহুত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হাতির পাল নিয়ে নকুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সঙ্গেই মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ এবং তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারাও নকুলকে বধ করার জন্য তাঁর ওপর নানা অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগল। সেই অস্ত্রবর্ষণে নকুল সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন। তাই দেখে পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং সোমক ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত দ্রুত সেখানে এসে উপস্থিত হল। তখন পাণ্ডবপক্ষের বীরদের সঙ্গে হস্তীযূথের ভয়ানক সংগ্রাম শুরু হল। তাঁদের অস্ত্রের আঘাতে হাতিদের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হল, দাঁত ভেঙে গেল, মর্মস্থলে গভীর আঘাত লাগল। সহদেব আটটি গজরাজকে বাণের আঘাতে আরোহীসহ বধ করলেন।

মহারাজ! সহদেব যখন ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার সেনাদের ভস্ম করছিলেন, তখন দুঃশাসন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সেখানে এলেন। এসেই তিনি সহদেবের বুকে বাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন সহদেব নারাচের আঘাতে দুঃশাসন ও তাঁর সারথিকে বিদ্ধ করলেন। তাই দেখে দুঃশাসন সহদেবের ধনুক কেটে অসংখ্য বাণে তাঁর হাত ও বুকে আঘাত করলেন। তখন সহদেবের ক্রোধের সীমা রইল না, তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুঃশাসনের রথে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। তলোয়ারের আঘাতে গুণসহ ধনুকটি কেটে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সহদেব ধনুকে প্রাণান্তকর বাণ চড়িয়ে দুঃশাসনের ওপর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু তিনি তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন তলোয়ার দিয়ে সেটি দুটুকরো করলেন এবং সহদেবকে ঘায়েল করে তাঁর সারথিকেও বাণবিদ্ধ করলেন। সহদেব এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে কালের ন্যায় এক বিকট বাণ আপনার পুত্রের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ দুঃশাসনের বর্ম ভেদ করে শরীরকে আঘাত করে মাটিতে পড়ল, আপনার পুত্র তাতে অচেতন হয়ে গেল। তাই দেখে সারথি তীক্ষ্ণ বাণে আহত হয়ে রথটিকে রণভূমির থেকে দূরে সরিয়ে নিল।

দুঃশাসনকে পরাস্ত করে সহদেব এবার দুর্যোধনের সেনার ওপর দৃষ্টি দিলেন এবং সব দিক থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে নকুলও কৌরব সৈন্যদের পেছনে হটিয়ে দিচ্ছিলেন। তা লক্ষ্য করে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে সেখানে এসে নকুলের সম্মুখীন হয়ে তাকে প্রতিহত করলেন। তিনি নকুলের ধনুক কেটে ত্রিশ বাণে তাকে ঘায়েল করলেন। নকুলও অন্য ধনুক নিয়ে কর্ণ ও তাঁর সারথির ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন। তারপর এক ক্ষুরপ্রের আঘাতে কর্ণের ধনুক কেটে অসংখ্য বাণে তাঁকে পীড়িত করে তুললেন। নকুলের দ্বারা কর্ণকে পীড়িত হতে দেখে সকল রথীই আশ্চর্যান্বিত হল; দেবতারাও বিস্মিত হলেন।

কর্ণ তখন আর একটি ধনুক নিয়ে নকুলের গলা লক্ষ্য করে বাণ মারলেন। নকুলও কর্ণকে বাণবিদ্ধ করে তাঁর ধনুকের একটি কোণ কেটে দিলেন। কর্ণ-পুনরায় অন্য ধনুক নিয়ে নকুলের চারদিক বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন।

কিন্তু মহারথী নকুল সেই সব বাণ কেটে ফেললেন। দুজনের বাণে আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় অন্তরীক্ষের কোনো বস্তুই দেখা যাচ্ছিল না। দুই মহারথীর দিব্য বাণে যখন দুপক্ষের সেনার বিনাশ হচ্ছিল, তখন সকল যোদ্ধা বাণের আওতার বাইরে গিয়ে দর্শকের ন্যায় যুদ্ধ দেখতে লাগল। সকলে দূরে চলে গেলে দুই মহারথী পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন। কর্ণ হাসতে হাসতে বাণের জাল সৃষ্টি করলেন, মেঘ হলে যেমন অন্ধকার নেমে আসে, কর্ণের বাণে তেমনই অন্ধকার নেমে এল। কর্ণ তারপর নকুলের ধনুক কেটে মৃদুহাস্যে তাঁর সারথিকেও বধ করলেন। তীক্ষ্ণ চারটি বাণে ঘোড়াগুলিও বধ করলেন। পরে বাণের আঘাতে নকুলের দিব্যরথ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন, রক্ষকদের বধ করে ধ্বজা, পতাকা এবং সব অস্ত্রশস্ত্রও নষ্ট করে দিলেন।

রথ, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট হয়ে গেলে নকুল এক পরিঘ তুললেন, কিন্তু কর্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সেটিও টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তখন নকুল ব্যাকুল হয়ে রণভূমি ছাড়বার জন্য উৎসুক হলেন। কর্ণ হাসতে হাসতে তাঁর পেছনে গিয়ে তাঁর গলায় নিজের ধনুকটি ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর বলতে লাগলেন—'পাণ্ডুনন্দন ! এবার থেকে আর বলবানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস কোরো না। তোমার যারা সমকক্ষ, তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করা উচিত। মাদ্রীকুমার, হেরে গেছ তো কী হয়েছে, ? লজ্জা পেয়ো না, যাও, ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাক অথবা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আছে, সেখানে চলে যাও।'

কর্ণ এই কথা বলে নকুলকে ছেড়ে দিলেন। যদিও সেইসময় কর্ণের পক্ষে নকুলকে বধ করা সহজ ছিল, কিন্তু কুন্তীকে দেওয়া শপথবাক্য স্মরণ করে তিনি তাঁকে জীবিত যেতে দিলেন, কারণ কর্ণ অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। এই পরাজয়ে নকুল অত্যন্ত অপ্রস্তুত হলেন। তিনি লজ্জিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের রথে গিয়ে উঠলেন।

সূর্যদেব তখন মধ্য গগনে পৌঁছেছেন। সেই দ্বিপ্রহরকালে সূতপুত্র চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাঞ্চালসেনাদের বধ করছিলেন। শত্রুদের রথ ভেঙে গেল, ধ্বজা-পতাকা ভূলুণ্ঠিত হল, হাতি-ঘোড়া-সারথি বধ হল, পাঞ্চাল সৈন্যও কর্ণের আঘাতে পালাতে লাগল। সেই সময় কর্ণের অস্ত্রে খণ্ডিত হাত-পা-দেহ-মুণ্ড চারদিকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৃঞ্জয় বীরদের ওপর কর্ণ ভয়ানক প্রহার করতে লাগলেন, তা সত্ত্বেও তারা, পতঙ্গ যেমন অগ্নি দেখে ছুটে যায়, তেমনভাবে কর্ণের দিকে গিয়ে আক্রমণ চালাতে লাগল। মহারথী কর্ণ পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন, ক্ষত্রিয়রা তাঁকে প্রলয়কালীন অগ্নি মনে করে তাঁর সামনে থেকে পালাতে লাগল। পাঞ্চালবীর ও যারা জীবিত ছিল, রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল।

উলূক-যুযুৎসু, শ্রুতকর্মা-শতানীক, শকুনি-সুতসোম এবং শিখণ্ডী-কৃতবর্মার মধ্যে যুদ্ধ ; অর্জুন কর্তৃক বহু বীর সংহার এবং দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! এক দিকে আপনার পুত্র যুযুৎসু কৌরবদের বিশাল সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন, তা দেখে উলূক সবেগে তার সামনে এলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এক ক্ষুরপ্র দ্বারা যুযুৎসুর ধনুক কেটে ফেললেন এবং কর্ণী বাণে তাঁকে ঘায়েল করলেন। যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক নিয়ে উলূক এবং তাঁর সারথিকে বহু বাণে বিদ্ধ করলেন। তখন উলূকও তাঁকে বাণবিদ্ধ করে তাঁর ধ্বজা কেটে দিলেন এবং ভল্লের আঘাতে সারথির মস্তক কেটে চার বাণে তাঁর চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন। মহাবলী উলূকের প্রহারে যুযুৎসু অত্যন্ত আহত হয়ে অন্য একটি রথে চড়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। যুযুৎসুকে পরাস্ত করে উলূক সত্বর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীরদের দিকে এগিয়ে চললেন।

অন্যদিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্মা শতানীকের রথ, সারথি এবং ঘোড়া বিনাশ করছিলেন। মহারথী শতানীক ক্রুদ্ধ হয়ে সেই অশ্বহীন রথ থেকেই আপনার পুত্রের ওপর এক গদা নিক্ষেপ করলেন। সেটি তাঁর রথ সারথি এবং ঘোড়াগুলি ভস্ম করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। তখন দুজনেই

রথহীন হয়ে একে অপরকে দেখতে দেখতে রণাঙ্গন ত্যাগ করলেন।

সেইসময় শকুনি তাঁর তীক্ষ্ণবাণে সুতসোমকে ঘায়েল করলেন। কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হলেন না। তিনি তাঁর পিতার শত্রুকে সামনে দেখে হাজার বাণে তাঁকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। কিন্তু শকুনি বাণ দ্বারা সেগুলি সব কেটে ফেললেন। তারপর তিনি সুতসোমের সারথি, ধ্বজা এবং ঘোড়াগুলিকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। সুতসোম তখন তাঁর শ্রেষ্ঠ ধনুকটি নিয়ে রথ থেকে নেমে বাণবর্ষণ করে শকুনিকে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু শকুনি নিজের বাণে সেগুলিও নষ্ট করে দিলেন, তারপর তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে সুতসোমের ধনুক ও অস্ত্রশস্ত্র কেটে দিলেন।

তখন সুতসোম একটি তলোয়ার নিয়ে ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্লুত, সৃত, সম্পাত এবং সমুদীর্ণ ইত্যাদি চতুর্দশ গতিতে সবদিকে ঘোরাতে লাগলেন। তখন তাঁর ওপর যে বাণ নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তিনি তা সবই তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলতে লাগলেন। তখন শকুনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে তাঁর ওপর সর্পের ন্যায় বিষপূর্ণ বাণবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সুতসোম তাঁর অস্ত্রকৌশল ও পরাক্রমে সে সব কেটে ফেললেন। শকুনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সুতসোমের তলোয়ার দুটুকরো করে দিলেন। সুতসোম তখন সেই অর্ধ টুকরো তলোয়ার দিয়েই শকুনিকে আঘাত করলেন। শকুনির ধনুক এবং তার গুণ কেটে মাটিতে পড়ল। তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শ্রুতকীর্তির রথে গিয়ে উঠলেন, এবং একটি অন্য ধনুক নিয়ে বহু শত্রুকে সংহার করে অন্য স্থানে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

অন্যদিকে শিখণ্ডী কৃতবর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর গলা লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ বাণ মারলেন। মহারথী কৃতবর্মা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ওপর ষাট বাণ মারলেন, পরে হাসতে হাসতে এক বাণে তাঁর ধনুক কেটে দিলেন। মহাবলী শিখণ্ডী মুহূর্তেই অন্য ধনুক নিয়ে কৃতবর্মার ওপর তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করলেন। সেটি তাঁর বর্মতে লেগে নীচে গিয়ে পড়ল। তিনি তখন এক তীক্ষ্ণবাণে কৃতবর্মার ধনুক কেটে অসংখ্য বাণে তাঁর বুক ও হাতে আঘাত করলেন। কৃতবর্মার সর্বঅঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হতে লাগল। কৃতবর্মা অন্য এক ধনুক নিয়ে শিখণ্ডীর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই বীর এইভাবে রক্তাক্ত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন, দুজনেই দুজনের প্রাণ বধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

কৃতবর্মা শিখণ্ডীর প্রাণনাশের জন্য এক ভয়ংকর বাণ ছুঁড়লে শিখণ্ডী মূর্ছিত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। সারথি তা লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে রণক্ষেত্রের বাইরে চলে গেলেন। পাণ্ডব সেনারা তাই দেখে ভয়ে পালাতে লাগল।

মহারাজ ! অন্য দিকে অর্জুন আপনার সৈন্য সংহার করছিলেন। আপনার পক্ষে ত্রিগর্ত, শিবি, কৌরব, শাল্ব, সংশপ্তক এবং নারায়ণী সেনারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, সুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্মা এবং ভ্রাতাসহ ত্রিগর্তরাজ—এই সব বীররা যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের ওপর নানাপ্রকার বাণবর্ষণ করছিলেন। যোদ্ধারা অর্জুনের বাণের আঘাতে বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তখন সত্যসেন, মিত্রদেব, চন্দ্রদেব, মিত্রবর্মা, সৌশ্রুতি, শত্রুঞ্জয় এবং সুশর্মা অসংখ্য বাণ ছুঁড়লেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের বাণে বিদ্ধ হয়ে অর্জুনও সমস্ত রাজাদের ঘায়েল করতে লাগলেন। তিনি সৌশ্রুতি, সত্যসেন, শত্রুঞ্জয়, মিত্রদেব, শ্রুতসেন, মিত্রবর্মা এবং সুশর্মাকে বাণবিদ্ধ করে তীক্ষ্ণবাণে শত্রুঞ্জয়কে বধ করলেন, সৌশ্রুতির মস্তক দেহচ্যুত করলেন, তারপর চন্দ্রদেবকে যমরাজের গৃহে পাঠালেন এবং আরও পাঁচবাণে অন্য রাজাদের অগ্রগতি রোধ করলেন।

সেই সময় সত্যসেন ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণ গর্জন করে শ্রীকৃষ্ণের ওপর এক বিশাল তোমর নিক্ষেপ করলেন। সেই তোমর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ঘায়েল করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে আহত হতে দেখে অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর গতি রুদ্ধ করে কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক দেহচ্যুত করলেন। তারপর তীক্ষ্ণবাণে মিত্রবর্মাকে আক্রমণ করে বৎসদন্তদ্বারা তাঁর সারথিকে আঘাত করলেন। মহাবলী অর্জুন শতশত বাণে সংশপ্তকদের আঘাত করে তাদের শত শত বীরকে ধরাশায়ী করলেন। এক ক্ষুরপ্র বাণের আঘাতে মিত্রসেনের মাথা কেটে ফেললেন এবং সুশর্মার গলায় আঘাত করলেন। তখন সমস্ত সংশপ্তক বীর তাঁকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে নানা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করতে লাগল।

এই দেখে মহারথী অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তার থেকে হাজার হাজার বাণ নিষ্কাশিত হতে লাগল, যার আঘাতে বহু রাজকুমার, ক্ষত্রিয় বীর এবং হাতি ঘোড়া মাটিতে গড়াতে লাগল। ধনুর্ধর অর্জুন যখন এইভাবে

সংশপ্তকদের সংহার করতে লাগলেন, তখন তারা দিশাহারা হয়ে অধিকাংশই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। বীরবর অর্জুন তাদের এইভাবে রণাঙ্গনে পরাস্ত করে দিলেন।

রাজন্ ! অন্যদিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির বাণবর্ষণ করছিলেন। রাজা দুর্যোধন স্বয়ং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ধর্মরাজ তাঁকে দেখে বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন নয় বাণে যুধিষ্ঠিরকে ও এক ভল্লের দ্বারা সারথিকে আঘাত করলেন। ধর্মরাজও দুর্যোধনের ওপর বাণের আঘাত করতে লাগলেন। তার আঘাতে দুর্যোধনের চারটি ঘোড়া বধ হল এবং সারথির মস্তক উড়ে গেল। তাঁর ধ্বজা ও ধনুক কেটে, তলোয়ার টুকরো টুকরো করে যুধিষ্ঠির বাণের আঘাতে দুর্যোধনকে পীড়িত করে তুললেন। আপনার পুত্র অশ্ব-সারথিহীন রথ থেকে নেমে পড়লেন। দুর্যোধনের বিপদ দেখে কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। পাণ্ডবরাও তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করে এগোতে লাগলেন। দুই পক্ষে মহা সংগ্রাম শুরু হল। দুপক্ষেরই বীর ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে লাগল, কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, তাকে আর আঘাত করা হচ্ছিল না। যুদ্ধ এমন অবস্থায় পৌঁছাল যে কারো আর আপন-পর জ্ঞান থাকল না। রণক্ষেত্র মৃতদেহে ভরে উঠল, অস্ত্র-শস্ত্র এবং রক্তে রণক্ষেত্র পঙ্কিল হয়ে উঠল। কর্ণ পাঞ্চালদের, অর্জুন ত্রিগর্তের এবং ভীমসেন কৌরব ও গজারোহী সৈন্য সংহার করছিলেন। এইভাবে দিবসের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত কৌরব ও পাণ্ডব সেনাদের ভয়ানক যুদ্ধ চলতে লাগল।

রাজা যুধিষ্ঠির, অর্জুন এবং সাত্যকির সঙ্গে দুর্যোধন ও কর্ণের সংগ্রাম

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! তুমি বলেছ যে যুধিষ্ঠির মহারথী দুর্যোধনকে রথহীন করে দিয়েছিল, তারপরে দুজনে কেমন যুদ্ধ হল ? তাছাড়া তৃতীয় প্রহরের যুদ্ধও কেমন হল ? এইসব বিবরণ তুমি আমাকে শোনাও।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! দুপক্ষের সেনা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন আপনার পুত্র একটি অন্য রথে করে রণক্ষেত্রে এলেন। তিনি তাঁর সারথিকে বললেন—'সূত ! শীঘ্র চলো ; যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির রয়েছেন, সেখানে শীঘ্র আমাকে নিয়ে চলো।' সারথি শীঘ্রই রথ চালিয়ে ধর্মরাজের সামনে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধন এক তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন অন্য একটি ধনুক নিয়ে দুর্যোধনের ধনুক ও ধ্বজা টুকরো টুকরো করে দিলেন। দুর্যোধনও অন্য ধনুক নিয়ে তাঁকে ঘায়েল করলেন। দুই বীর এইভাবে পরস্পরকে আঘাত করে শঙ্খধ্বনি ও সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রের ন্যায় বেগবান তিনটি বাণের দ্বারা দুর্যোধনের বুকে আঘাত করলেন। তার জবাবে আপনার পুত্রও তাঁকে পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণ মারলেন। তারপর তিনি আর একটি লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সেটি আসতে দেখে রাজা যুধিষ্ঠির তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে সেটিকে টুকরো করে, পাঁচবাণে দুর্যোধনকে আঘাত করলেন।

তখন দুর্যোধন গদা নিয়ে সবেগে ধর্মরাজের দিকে দৌড়লেন। তাই দেখে তিনি আপনার পুত্রের ওপর এক দেদীপ্যমান শক্তি ছুঁড়লেন, সেটি তাঁর বর্ম ভেদ করে বুকে আঘাত করল। তাতে তিনি আহত ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন ভীমসেন তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে ধর্মরাজকে বললেন—'মহারাজ ! ওকে আপনি বধ করবেন না।' তা শুনে ধর্মরাজ সরে গেলেন।

আপনার পক্ষের যোদ্ধারা কর্ণকে সামনে রেখে

পাণ্ডব সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে লাগল। কর্ণ অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণ সাত্যকির ওপর নিক্ষেপ করলেন। তখন সাত্যকিও সত্বর কর্ণ এবং তাঁর সারথি, রথ ও ঘোড়াগুলিকে তীক্ষ্ণবাণে আচ্ছাদিত করলেন। কর্ণকে সাত্যকির বাণে আহত হতে দেখে আপনার পক্ষের অতিরথীরা হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। তখন বহু হাতি, ঘোড়া ও সৈন্য সংহার হতে লাগল।

সেই সময় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন নিত্যকর্ম সমাপন করে এবং শাস্ত্রানুসারে ভগবান শংকরের পূজা করে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে দিক্-বিদিক পরিব্যাপ্ত করলেন ; শত্রুদের বহু রথ, অস্ত্র, ধ্বজা এবং সারথি বিনাশ করলেন এবং অনেক হাতি, ঘোড়া ও যোদ্ধাকে যমালয়ে পাঠালেন। তাই দেখে দুর্যোধন একাই বাণবর্ষণ করে তাঁকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন সাত বাণে তাঁর ধনুক, সারথি, ধ্বজা, ঘোড়াগুলি নষ্ট করে ছত্রও কেটে ফেললেন। তারপর তিনি যেই এক প্রাণঘাতক বাণ নিক্ষেপ করেছেন অমনি অশ্বত্থামা মধ্যপথেই সেটি সাত টুকরো করে দিলেন। অর্জুন তখন বাণের আঘাতে অশ্বত্থামার ধনুক, রথ ও ঘোড়া নষ্ট করে কৃপাচার্যের কোদণ্ডও টুকরো করে দিলেন। তারপর তিনি কৃতবর্মার ধনুক-ধ্বজা এবং ঘোড়াগুলি নষ্ট করে দুঃশাসনেরও ধনুক কেটে কর্ণের সামনে এলেন। কর্ণও সাত্যকিকে ছেড়ে অর্জুনের সম্মুখীন হলেন এবং তাঁকে ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।

এরমধ্যে সাত্যকিও এসে পড়লেন এবং কর্ণের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পাণ্ডব পক্ষের অন্যান্য যোদ্ধারাও কর্ণকে আক্রমণ করলেন। যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্র, প্রভদ্রক, উত্তমৌজা, যুযুৎসু, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি, করূষ, মৎস্য এবং কেকয় দেশের বীর, চেকিতান এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—এইসব শূরবীরগণ বহু বলবান সৈন্য নিয়ে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে নানা অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু কর্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সমস্ত অস্ত্র ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন। কর্ণের অস্ত্রদ্বারা আক্রান্ত হয়ে পাণ্ডব সেনারা আহত ও অস্ত্রহীন হয়ে পালাতে লাগল। অর্জুন হাসতে হাসতে বাণের সাহায্যে কর্ণের অস্ত্রগুলি নষ্ট করে দিক্‌বিদিক আকাশ ও পৃথিবী বাণে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। তাঁর বাণ মুশল ও বজ্রের ন্যায় পড়তে লাগল।

আপনার ও পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা এইভাবে বিজয়লাভের আশায় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে সূর্য অস্তাচলে পৌঁছলে চারিদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যোদ্ধারা যে যার শিবিরের দিকে চললেন। কৌরবদের যেতে দেখে বিজয়ী পাণ্ডবরাও তাঁদের শিবিরে ফিরে গেলেন। সমস্ত বীররা বাদ্যসহ সিংহনাদ এবং শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে করতে চলতে লাগলেন। শিবিরে পৌঁছে সৈন্যসামন্ত এবং রথী-মহারথীরা রাত্রের বিশ্রাম নিতে লাগলেন।

কর্ণের প্রস্তাব এবং দুর্যোধনের আগ্রহে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শল্যের কর্ণের সারথি হতে স্বীকার করা

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! তারপর দুর্যোধন কী করলেন ? সেই মন্দবুদ্ধি তো কর্ণের সাহায্যে পাণ্ডবদের পুত্র-মিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণসহ পরাস্ত করবে বলে গর্ব করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হল যে কর্ণ তার পরাক্রমে পাণ্ডবদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেনি। জয়-পরাজয় নিঃসন্দেহে দৈবাধীন। মনে হচ্ছে পাশা খেলার পরিণামের সময় আগত। হায় ! এই দুর্যোধনের জন্য আমাকে শূলের ন্যায় তীব্রকষ্ট সহ্য করতে হবে। আমাকে প্রত্যহ আমার পুত্রদের পরাজিত ও মৃত্যুর খবর শুনতে হচ্ছে। পাণ্ডবদের প্রতিহত করার মতো আমাদের সৈন্যদলে কী কেউ নেই ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! যে ব্যক্তি অতীতের কথা নিয়ে চিন্তা করতে বসে, তার কাজ তো কিছুই হয় না, শুধু চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খায়। এই কাজে আপনার সফল

হওয়া তো দূরের কথা ; কারণ আগেও আপনি জেনে-বুঝেও এর উচিত-অনুচিতের বিষয়ে চিন্তা করেননি। মহারাজ ! পাণ্ডবরা বারবার আপনাকে যুদ্ধ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আপনি তখন মোহবশত কর্ণপাত করেননি। পাণ্ডবদের ওপর আপনি অনেক অবিচার করেছেন। এখনও আপনার জন্যই এই রাজারা একে একে মারা পড়ছেন। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আপনি আর চিন্তা করবেন না। এবার যেভাবে ভীষণ নর-সংহার হয়েছে, তা শুনুন।

রাত্রি প্রভাত হলে কর্ণ রাজা দুর্যোধনের কাছে এলেন এবং বললেন—'রাজন্ ! আজ অর্জুনের সঙ্গে আমার রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে ; তাতে হয় আমি তাকে বধ করব, নাহলে অর্জুন আমার প্রাণনাশ করবে। আমি ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি নষ্ট করে ফেলেছি ; সুতরাং অর্জুন নিশ্চয়ই আমাকে আক্রমণ করবে। এখন আসল কাজের কথা শুনুন। আমার এবং অর্জুনের দিব্য অস্ত্র সমান সমান ; কিন্তু শত্রুর পরাক্রম দমন করায়, হস্ত কৌশলে, যুদ্ধ কৌশলে এবং অস্ত্র সঞ্চালনে অর্জুন আমার সমকক্ষ নয়। এছাড়াও বল-বীর্য, বিজ্ঞান, পরাক্রম এবং নিশানা করায় সে আমার সমকক্ষ হতে পারবে না। আমার এই বিজয় নামক ধনুকটি বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের জন্য তৈরি করেছিলেন। এটির দ্বারাই ইন্দ্র দৈত্যদের পরাজিত করেছিলেন। ইন্দ্র এই ধনুকটি পরশুরামকে দিয়েছিলেন, পরশুরাম আমাকে দিয়েছেন। এই ধনুকটি গাণ্ডীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরশুরাম এর সাহায্যেই একুশবার পৃথিবী জয় করেছিলেন। এর দ্বারাই আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আজ রণক্ষেত্রে বিজয়ী বীর অর্জুনকে ধরাশায়ী করে আমি আপনার ও আপনার বন্ধুদের আনন্দ প্রদান করব। ধর্মানুরক্ত সংযমী ব্যক্তির যেমন কর্মে সাফল্য লাভ স্বাভাবিক, তেমনই এমন কোনো কর্ম নেই যা আমি আপনার জন্য করতে সক্ষম নয়। তবে যে বিষয়ে আমি অর্জুনের থেকে কম, তা আমার অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া উচিত। অর্জুনের ধনুকের গুণ দিব্য, ধনুক অক্ষয় এবং অগ্নিদেব প্রদত্ত অক্ষয় রথও তার আছে, যা কোনোভাবেই ভগ্ন করা যায় না। এছাড়া তার ঘোড়াগুলি, মন যেমন বেগবান, তেমনই বেগবান, ধ্বজাও দিব্য এবং দীপ্তিময়, তার ওপর বিস্ময় বৃদ্ধিকারী এক বানর উপবিষ্ট। তার থেকেও বড় কথা হল যে জগৎ সৃষ্টিকারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনের সারথি। আমাদের পক্ষে মহারাজ শল্য অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারেন। তিনি যদি আমার সারথি হন, তবে নিশ্চয়ই আপনারা বিজয় লাভ করবেন। সুতরাং আপনি তাঁকে আমার সারথি হওয়ার জন্য অনুরোধ করুন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি শকট আমার জন্য বাণ নিয়ে যাবে ও উত্তম ঘোড়া বিশিষ্ট কয়েকটি রথ আমাকে অনুসরণ করুক, যাতে প্রয়োজন হলে আমি সত্বর রথ পরিবর্তন করতে সক্ষম হই। মহারাজ শল্য শ্রীকৃষ্ণের মতোই অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী। তিনি আমার সারথি হলে আমার রথ শ্রীকৃষ্ণের রথের থেকে এগিয়ে যাবে। তখন ইন্দ্রসহ দেবতাদেরও আমার সম্মুখীন হওয়ার সাহস হবে না। আমি আপনার কাছ থেকে এই সাহায্যটুকু চাই। তারপরে রণক্ষেত্রে আমি কীভাবে যুদ্ধ করি, তা আপনি দেখবেন। পাণ্ডবগণের যে কেউ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসুক, আমি তাদের পরাজিত করবই।'

সঞ্জয় বললেন—কর্ণ আপনার পুত্রকে এই কথা বলায় তিনি প্রসন্ন চিত্তে তার প্রশংসা করে বললেন—'কর্ণ ! তুমি যা ঠিক করেছ, তেমনই হবে। বাণ পরিপূর্ণ শকটগুলি তোমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা সব রাজারা তোমাকে অনুসরণ করব।' রাজন্ ! কর্ণকে এই কথা বলে আপনার পুত্র অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মহারথী শল্যের কাছে গিয়ে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তাঁকে বললেন—'মদ্রেশ্বর ! আপনি সত্যবাদী, মহাভাগ এবং শ্রেষ্ঠ বক্তা। আমি নতমস্তকে আপনার কাছে একটি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি অর্জুনের বিনাশ এবং হিতার্থে কেবলমাত্র প্রীতির সূত্রে কর্ণের সারথ্য স্বীকার করুন। আপনি সারথি হলে রাধাপুত্র কর্ণ আমার শত্রুদের পরাজিত করবে। আপনি ব্যতীত কর্ণের ঘোড়ার রশি ধরার উপযুক্ত আর কেউ নেই। আপনি যুদ্ধে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ। সুতরাং ত্রিপুর যুদ্ধের সময় ব্রহ্মা যেমন ভগবান শংকরকে সাহায্য করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন, আপনিও তেমনভাবে কর্ণকে রক্ষা করুন। যুদ্ধের প্রারম্ভে শত্রুসৈন্য কম থাকলেও ওরা আমাদের বহু সৈন্য বিনাশ করেছে, আর এখনকার তো কথাই নেই। সুতরাং আপনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, যাতে পাণ্ডবরা আমাদের অবশিষ্ট সৈন্য সংহার করতে না পারে। অর্জুন আগে যুদ্ধক্ষেত্রে এইভাবে শত্রু সংহার করতে সক্ষম ছিল না। এখন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকায় তার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পাণ্ডব সেনাতে আপনার ও কর্ণের সমতুল্য সৈন্যই রয়েছে, আজ

কর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের বিনাশ করুন। আপনি এমন এক উপায় নির্ধারণ করুন, যাতে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়ের সঙ্গে কুন্তীপুত্রও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রথীদের মধ্যে কর্ণ শ্রেষ্ঠ এবং সারথিদের মধ্যে আপনি সর্বোত্তম। আপনাদের দুজনের মতো মিলিত শক্তির সুযোগ আগে কখনো হয়নি এবং হবেও না। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে অর্জুনকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করেন, আপনিও সেইভাবে কর্ণের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। আপনি সারথি হলে কর্ণ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারও অজেয় হয়ে উঠবে, পাণ্ডবদের তো কথাই নেই।'

দুর্যোধনের কথা শুনে শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত হল এবং ক্রোধে হাত কাঁপতে লাগল। তাঁর নিজের বংশ, ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও বলের অত্যন্ত গর্ব ছিল। তাই তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন—'দুর্যোধন ! তুমি হয় আমাকে অপমান করছ, নাহলে আমার প্রতি তোমার সন্দেহ আছে, তাই তুমি আমাকে সারথির কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছ। কর্ণকে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তুমি তার প্রশংসা করছ। কিন্তু আমি তাকে আমার সমকক্ষ বলে মনে করি না। যদি কোনো বড় বীর থাকে, আমাকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বল, আমি তাকে পরাজিত করে ফিরে যাব। অথবা আজ আমি একাকী যুদ্ধ করব, তখন তুমি আমার পরাক্রম দেখো। আমার বজ্রের মতো শক্ত বাহু দেখো, দেখো আমার এই বিচিত্র ধনুক, সর্পের ন্যায় বাণ ও সুবর্ণমণ্ডিত গদা। আমি আমার তেজে সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারি, পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি এবং সমুদ্র শুষ্ক করে ফেলতে পারি। শত্রুদমনে আমি সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমাকে এই নীচ সূতপুত্রের সারথি হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছ কীভাবে ? আমি এই নীচের থেকে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ, কাজেই তার দাসত্ব করতে আমি কখনোই রাজি হতে পারি না। যে ব্যক্তি প্রেমবশত নিজের আশ্রিত কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নীচ ব্যক্তির অধীন করে, তার উচ্চকে নীচ এবং নীচকে উচ্চ করার পাপ হয়। শ্রুতির মত হল—ব্রহ্মা তাঁর মুখ হতে ব্রাহ্মণদের, হাত থেকে ক্ষত্রিয়দের, বৈশ্যদের জঙ্ঘা থেকে এবং শূদ্রদের তাঁর পা থেকে উৎপন্ন করেছেন। এঁদের মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতি সব বর্ণের রক্ষাকারী, প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের অধিকারী এবং ধনদানকারী। ব্রাহ্মণদের কাজ হল যজ্ঞ করা, অধ্যাপনা করা এবং বিশুদ্ধ দান গ্রহণ করা। বৈশ্যের কর্ম হল কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য এবং ধর্মানুযায়ী দান করা এবং শূদ্রের কর্ম হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সেবায় নিযুক্ত থাকা। আমি কখনো এমন কথা শুনিনি যে ক্ষত্রিয় শূদ্রের সেবা করবে। আমার রাজর্ষি বংশে জন্ম, শাস্ত্রানুসারে আমার রাজ্যাভিষেক হয়েছে, লোকে আমাকে মহারথী বলে, বন্দীরা আমার স্তুতিগান করে। তা সত্ত্বেও আমি একাজ করব, তা কোনোভাবেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এইভাবে অপমানিত হয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারব না। সুতরাং আমি ফিরে যাওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইছি।'

পুরুষসিংহ শল্য এই কথা বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখানে যেসব রাজন্যবর্গ বসেছিলেন তাদের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে থাকলেন। আপনার পুত্র তখন অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি সহকারে তাঁর পথরোধ করে এবং মিষ্ট বাক্যে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! আপনি নিজের বিষয়ে যা মনে করেন, নিঃসন্দেহে তাই ঠিক। কিন্তু আমার বলার অভিপ্রায় কী, অনুগ্রহ করে তা একটু শুনুন। আপনার পূর্বপুরুষ সর্বদা সত্যভাষণই করেছেন ; আমি জানি, সেইজন্য আপনাকে 'আর্তায়নি'[১] বলা হয়। আপনি আপনার শত্রুদের কাছে শল্যের (কাঁটার) সমান, তাই

[১] ঋতু যার অয়ন (আশ্রয়), তাকে 'ঋতায়ন' বলা হয়। সেই বংশে জন্ম নেওয়ায় তাকে 'আর্তায়নি' বলা হয়।

পৃথিবীতে আপনি 'শল্য' নামে খ্যাত। আপনি ধর্মজ্ঞ এবং আগেই আমার প্রিয় কাজ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। সুতরাং আপনি এখন সেই বাক্য কৃপা করে রক্ষা করুন। কর্ণ বা আমি কেউই আপনার থেকে বলশালী নই ; অশ্ববিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যই আপনার কাছে এই অনুরোধ জানাচ্ছি। কর্ণ অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের থেকে শ্রেষ্ঠ আর আপনি অশ্ববিদ্যায় শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ।'

তখন রাজা শল্য বললেন—'দুর্যোধন ! তুমি সকলের সামনে আমাকে শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ বলেছ, তারজন্য আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। ঠিক আছে, আমি কর্ণের সারথ্য স্বীকার করছি। কিন্তু কর্ণের সঙ্গে আমার একটি শর্ত থাকবে। তা হল এই যে, যুদ্ধের সময় আমি কর্ণের সঙ্গে যা কথাই বলি না কেন, তাতে কর্ণ কোনোপ্রকার আপত্তি যেন না করে।' তাতে কর্ণ এবং আপনার পুত্র 'তাই হবে' বলে শল্যের শর্ত মেনে নিলেন।

ত্রিপুরদের উৎপত্তি এবং তাদের বিনাশের প্রসঙ্গ

দুর্যোধন বললেন—মহারাজ শল্য ! পূর্বকালে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতাকে একটি উপাখ্যান বলেছিলেন। সেই কাহিনী আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। সেটি শ্রবণ করুন এবং আমি যে অনুরোধ করেছি, সে বিষয়ে অপরাধ নেবেন না।

পূর্বে তারকাময় নামে এক যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে দেবতারা দৈত্যদের পরাজিত করেছিলেন। তারক দৈত্যের তিন পুত্র ছিল, তাঁদের নাম তারকাক্ষ, কমলাক্ষ এবং বিদ্যুন্মালী। তাঁরা কঠোর নিয়মে ভীষণ তপস্যা করে নিজেদের শরীর শুষ্ক করে ফেলেছিল। তাঁদের সংযম, তপস্যা, নিয়ম এবং সমাধিতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বর দিতে পদার্পণ করলেন। তিন দৈত্য সর্বলোকেশ্বর ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বলল—'পিতামহ ! আপনি আমাদের এমন বর দিন, যাতে আমরা তিনটি নগরে বাস করে সমস্ত পৃথিবীর আকাশপথে বিচরণ করতে পারি। এইভাবে এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে আমরা যেন একস্থানে মিলিত হই। সেইসময় যখন আমাদের তিনটি নগরী মিলিত হয়ে এক হবে, তখন যে দেবতা একটি মাত্র বাণে তাকে বিনাশ করতে সক্ষম হবেন, তিনিই যেন আমাদের মৃত্যুর কারণ হন।' তাতে ব্রহ্মা তাই হবে—এই বর প্রদান করে নিজলোকে চলে গেলেন।

ব্রহ্মার বর পেয়ে দৈত্যরা অত্যন্ত প্রসন্ন হল। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ময়দানবের কাছে গিয়ে তিনটি নগরী নির্মাণ করতে বলল। মতিমান ময় তার তপস্যার প্রভাবে তিনটি পুরী নির্মাণ করল। তার একটি স্বর্ণময়, অপরটি রৌপ্যের এবং তৃতীয়টি লৌহের। স্বর্ণ নির্মিতটি স্বর্গে, রৌপ্যময়টি অন্তরীক্ষে এবং লৌহ নির্মিতটি পৃথিবীতে থাকল। তিনটি নগরীই ইচ্ছামতো যাওয়া-আসা করতে পারত। এর প্রত্যেকটিই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে একশত যোজন বিস্তৃত। এই শহরগুলিতে বড় বড় ভবন, প্রাসাদ, রাজপথ এবং রাজদ্বার শোভিত ছিল। নগরগুলির প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক রাজা ছিল। সুবর্ণময় নগরটি ছিল

তারকাক্ষের, রজতময়টি ছিল কমলাক্ষের এবং লৌহময়ের রাজা ছিল বিদ্যুন্মালী। তিন দৈত্য তাদের পরাক্রমে ত্রিলোকের প্রাণীদের নিজ বশে রেখেছিল। চতুর্দিক থেকে দৈত্যরা এসে এই তিন দৈত্যর সঙ্গে মিলিত হল। তিন নগরীতে বসবাসকারী দৈত্যরা যখনই যা চাইত, ময়াসুর মায়াদ্বারা তখনই তা পূরণ করে দিত।

তারকাক্ষের এক মহাবলী পুত্র ছিল, নাম হরি, সে খুব কঠিন তপস্যা করেছিল। ব্রহ্মা তাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। হরি তাঁকে সন্তুষ্ট হতে দেখে বর প্রার্থনা করল, 'প্রভু আমাদের নগরে এমন এক জলাশয় হোক যাতে অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত যোদ্ধাকে সেখানে ফেললে সে পুনরায় সুস্থ জীবন লাভ করবে।' ব্রহ্মা তাকে এই বরপ্রদান করলে হরি নিজ নগরে মৃতকে জীবিত করার জন্য এক জলাশয় নির্মাণ করল। দৈত্যরা যে রূপ ও যে বেশে মৃত্যুপ্রাপ্ত হত, তাকে ওই জলাশয়ে ফেললে, সে সেই একই রূপ ও বেশে জীবিতাবস্থায় সেখান থেকে উঠে আসত। এইভাবে জলাশয় সৃষ্টি করে সমস্ত জগৎকে কষ্ট প্রদান করত এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তারা সমস্ত দেবতাদের ভয় দেখাতে লাগল। যুদ্ধে তাদের কোনোভাবেই বিনাশ করা সম্ভব ছিল না। তারা লোভ ও মোহে অন্ধ হয়ে মত্ত হয়ে উঠল। লজ্জা বিসর্জন দিয়ে লুটপাট চালাতে লাগল। বরের প্রভাবে মত্ত হয়ে তারা দেবতাদের তাড়িয়ে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে লাগল। মর্যাদাশূন্য সেই দুষ্ট দানবেরা দেবতাদের প্রিয় উদ্যান এবং মুনি-ঋষিদের পবিত্র আশ্রম ধ্বংস করতে লাগল।

সমস্ত জগৎ এইভাবে উৎপীড়িত হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র মরুদ্গণ সমভিব্যাহারে সেই নগরগুলির ওপর বজ্রপাত করতে লাগলেন। কিন্তু ব্রহ্মার বরের প্রভাবে তিনি সেই নগরগুলি ধ্বংস করতে সক্ষম না হওয়ায় ইন্দ্র ভীত হয়ে সব দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে দৈত্যদের নানান অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করলেন। ব্রহ্মাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করে তাদের বধ করার উপায় জানতে চাইলেন। দেবতাদের কাছে সব শুনে ব্রহ্মা বললেন—'যে দৈত্যরা তোমাদের দুঃখ দিচ্ছে, তারা আমার কাছেও অপরাধ করছে। আমি যে সব প্রাণীর কাছেই সমান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধর্মীদের বিনাশ করাই আমার নিয়ম। অতএব এক বাণে ওই তিনটি নগরীকে ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু এই কাজ শ্রীমহাদেব ব্যতীত অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তোমরা সকলে গিয়ে তাঁর কাছে এই বর প্রার্থনা করো। তিনি নিশ্চয়ই ওইসব দৈত্যদের বধ করবেন।'

ব্রহ্মার কথায় ইন্দ্রাদি সব দেবতা তাঁর নেতৃত্বাধীনে শ্রীমহাদেবের শরণে গেলেন। ভগবান শংকর তাঁর শরণাগতদের অভয়প্রদান করেন এবং সকলের আশ্রয়স্বরূপ। তাঁর কাছে গিয়ে দেবতারা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন, তখন তেজোরাশি পার্বতীপতি শ্রীমহাদেব তাঁদের দর্শন দিলেন। সকলে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। মহাদেব তাঁদের আশীর্বাদ করে প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'বলো, তোমাদের কী প্রার্থনা ?'

ভগবানের অনুমতি পেয়ে দেবতারা আশ্বস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 'দেবাদিদেব ! আপনাকে প্রণাম। প্রজাপতি এবং অন্য সকলে আপনার স্তুতি করে থাকেন ; আপনি সকলের স্তুতির যোগ্য পাত্র। শম্ভু ! আমরা আপনাকে নমস্কার জানাই। আপনি সকলের আশ্রয়স্থান এবং সকলের সংহারকারী। সেই ব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে আমরা প্রণাম জানাই। আপনি সকলের অধীশ্বর এবং নিয়ন্তা, বনস্পতি, মানুষ, গো-ধন ও যজ্ঞাদির পতি। আমরা আপনাকে স্মরণ করি। দেব ! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন ; আপনি আমাদের কৃপা করুন।'

ভগবান শংকর তখন প্রসন্ন হয়ে তাদের স্বাগত-সৎকার করে বললেন—'দেবগণ, ভয়ত্যাগ করে বলুন, আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি ?'

দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে ভগবান মহাদেব এইভাবে অভয়প্রদান করলে ব্রহ্মা তাঁর সৎকার করে জগতের হিতার্থে বললেন—'সর্বেশ্বর ! আপনার কৃপায় এই প্রজাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি দানবদের এক মহান বর প্রদান করেছি। সেই বরের প্রভাবে দানবরা সর্বপ্রকারে অজেয় হয়ে উঠেছে। আপনি ব্যতীত আর কেউ তাদের সংহার করতে সক্ষম নয়। দেবতারা আপনার শরণ গ্রহণ করে সেই প্রার্থনাই করছেন, আপনি তাঁদের কৃপা করুন।'

মহাদেব তখন বললেন—'দেবগণ ! আমি ধনুর্বাণ নিয়ে রথে আরোহণ করে সংগ্রামক্ষেত্রে তোমাদের শত্রু সংহার করব। সুতরাং তোমরা আমার জন্য একটি এমন রথ ও ধনুক বাণ সংগ্রহ করো যাতে আমি এই নগরগুলিকে পৃথিবীতে ফেলতে সক্ষম হই।'

দেবতারা বললেন—'দেবেশ্বর ! আমরা যেভাবে পারি ত্রিলোকের তত্ত্বগুলি একত্রিত করে আপনার জন্য এক তেজোময় রথ প্রস্তুত করব।' বিশ্বকর্মার দ্বারা তাঁরা এক দিব্য রথ মহাদেবের জন্য তৈরি করলেন। তাঁরা বিষ্ণু, চন্দ্র এবং অগ্নির বাণ নির্মাণ করলেন, বড় বড় নগর পরিবৃত পর্বত, বন ও দ্বীপ পরিপূর্ণ বসুন্ধরাকেই তাঁর রথের জন্য নির্দিষ্ট করলেন। ইন্দ্র, বরুণ, যম এবং কুবের প্রমুখ লোকপালকে ঘোড়া করলেন এবং মনকে আধার ভূমি করলেন। এইভাবে যখন সেই অত্যুৎকৃষ্ট রথ প্রস্তুত হল, মহাদেব তাতে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র রাখলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড এবং জ্বর—এই অস্ত্রগুলি সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট সেই রথের রক্ষায় নিযুক্ত করা হল। অথর্বা এবং অঙ্গিরা তাঁর চক্ররক্ষক হলেন ; ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং সমস্ত পুরাণ সেই রথের অগ্রে যোদ্ধারূপে অবস্থান করছিলেন ; পৃষ্ঠরক্ষক হলেন ইতিহাস ও যজুর্বেদ ; দিব্য এবং বিদ্যা হল পার্শ্বরক্ষক। স্তোত্র, বষট্‌কার এবং ওঁকার রথের অগ্রভাগে সুশোভিত হল। ছয় ঋতুর দ্বারা সুশোভিত করে মহাদেব নিজের ধনুক তৈরি করলেন এবং নিজের ছায়াকে ধনুকের গুণের স্থানে রাখলেন।

এইভাবে রথ প্রস্তুত হলে মহাদেব কবচ ও ধনুক ধারণ করে বিষ্ণু, সোম এবং অগ্নির দ্বারা নির্মিত দিব্যবাণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দেবতারা সুগন্ধযুক্ত বায়ুকে তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত করলেন। মহাদেব যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে পৃথিবীকে কম্পিত করে রথে আরোহণ করলেন। সকল ঋষি, গন্ধর্ব, দেবতা এবং অপ্সরা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। ভগবান শংকর সেইসময় খড়্গ, বাণ ও ধনুক হস্তে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিলেন। তিনি হেসে বললেন—'আমার সারথি কে হবে ?' দেবতারা বললেন—'দেবেশ্বর ! আপনি যাকে আদেশ করবেন, সে-ই আপনার সারথি হবে—আপনি তাতে কোনো দ্বিধা করবেন না।' তখন ভগবান বললেন—'তোমরা নিজেরাই ভেবেচিন্তে, যে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ, তাঁকে আমার সারথি করো।'

সেই কথা শুনে দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করে বললেন—'প্রভু ! আপনি আগেই আমাদের কথা দিয়েছেন যে আমাদের হিত করবেন, এখন আপনি আপনার কথা রাখুন। দেব ! আমরা যে রথ নির্মাণ করেছি, তা অত্যন্ত পবিত্র এবং দিব্য ; ভগবান শংকরকে তার মহারথী নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার উপযুক্ত কোনো সারথি খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ সারথিকে ভগবান শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে হবে এবং রথ তারই অধীনে থাকবে। আমাদের কাছে আপনি ছাড়া কেউই এর সারথি হওয়ার উপযুক্ত নয়। আপনি সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্ব দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনিই রথে আরোহণ করে রথের রশি নিয়ন্ত্রণ করুন।'

ব্রহ্মা বললেন—'দেবগণ ! তোমরা যা বলছ, তা যথার্থ। সুতরাং ভগবান শংকর যখন যুদ্ধে যাবেন, আমি অবশ্যই তাঁর রথ চালনা করব।'

দেবতারা তখন সমস্ত জগতের স্রষ্টা ভগবান ব্রহ্মাকে মহাদেবের সারথি করলেন। তিনি যখন সেই বিশ্ববন্দনীয় রথে আরোহণ করলেন, ঘোড়াগুলি তখন পৃথিবীতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। পরম তেজস্বী ভগবান ব্রহ্মা রথে আরোহণ করে ঘোড়ার রাশ ধরে মহাদেবকে বললেন—'দেবশ্রেষ্ঠ ! রথে আরোহণ করুন।' ভগবান শংকর তখন বিষ্ণু, সোম ও অগ্নি থেকে উৎপন্ন বাণ নিয়ে ধনুকের দ্বারা শত্রুদের কম্পিত করে রথে আরোহণ করলেন। ভগবান শিব রথে আরোহণ করে নিজ তেজে ত্রিলোককে আলোকিত করতে লাগলেন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবতাদের বললেন—'তোমরা নিশ্চিন্ত হও, এই বাণ ওই পুর-নগরগুলিকে বিনাশ করতে সক্ষম ; তোমরা জেনে রাখো এই বাণের দ্বারাই অসুর বিনাশ হওয়া সম্ভব।'

দেবতারা বললেন—'আপনার কথাই ঠিক। এখন ওই দৈত্যগুলির বিনাশ হয়েছে বলেই মনে করতে হবে। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।' দেবতারা এই কথা চিন্তা করে অত্যন্ত প্রসন্ন হল। দেবাদিদেব মহাদেব তখন সব দেবতাকে নিয়ে সেই দিব্য রথে করে চললেন। তাঁদের এইভাবে যুদ্ধযাত্রা করতে দেখে সমস্ত পৃথিবীবাসী এবং দেবতারা প্রসন্ন হলেন। ঋষিগণ স্তোত্রের দ্বারা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন, গন্ধর্বরা নানাপ্রকার বাদ্য বাদন করতে লাগলেন। ভগবান শংকর হেসে বললেন—'হে প্রজাপতি ! যেদিকে দৈত্যরা আছে, সেইদিকে রথ নিয়ে চলুন।' ব্রহ্মা তখন তাঁর মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান ঘোড়াগুলিকে দৈত্য-দানব সংরক্ষিত তিন নগরীর উদ্দেশ্যে চালালেন।

সেই সময় নন্দীশ্বর ভীষণ গর্জন করে উঠলেন, যাতে

সমস্ত দিক মুখরিত হল। তাঁর এই ভীষণ নাদ শুনে তারকাসুরের বহু দৈত্য বিনাশপ্রাপ্ত হল। সেগুলি ব্যতীত বাকি দানবরা যুদ্ধের নিমিত্ত সামনে এল। তখন ত্রিশূলপাণি ভগবান শংকর ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকে বাণ চড়িয়ে পাশুপতাস্ত্র যুক্ত করলেন। তারপর তিনি তিনটি নগরীকে একত্রিত করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি যখন ধনুক নিয়ে তৈরি হলেন, তখন তিনটি নগরী একত্রিত হল। তাই দেখে দেবতারা আনন্দে হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন এবং সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাঁর স্তুতি ও জয় জয়কার করতে লাগলেন।

এইভাবে যখন মহাতেজস্বী ভগবান শংকর অসুর সংহার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তাঁর সামনে একত্রিত তিনটি পুরী। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর দিব্য ধনুক থেকে ত্রিলোকের সারভূত বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণের আঘাতে তিনটি পুর নষ্ট হয়ে পড়ে গেল। সেই সময় কাতর আর্তনাদ শোনা গেল। মহাদেব অসুরদের ভস্ম করে পশ্চিম সমুদ্রে ফেলে দিলেন। ত্রিলোকহিতকারী ভগবান শিব এইভাবে কুপিত হয়ে সেই ত্রিপুর দগ্ধ করলেন এবং দৈত্যদের নির্মূল করলেন। তারপর তাঁর ক্রোধ হতে উৎপন্ন অগ্নিকে শান্ত করে তিনি বললেন—'তুমি ত্রিলোক ভস্ম কোরো না।'

দৈত্যরা এইভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হলে সমস্ত দেবতা, ঋষি ও লোক প্রকৃতিস্থ হলেন এবং নানা শ্রুতিমধুর বাক্য দ্বারা ভগবান শংকরের স্তুতি করতে লাগলেন। তারপর ভগবানের নির্দেশে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতারা সফল মনোরথ হয়ে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। এইভাবে মহাদেব সমস্ত লোকের কল্যাণ সাধন করেছিলেন। সেইসময় জগৎকর্তা ভগবান ব্রহ্মা যেভাবে শিবের সারথ্য করেছিলেন, আপনিও সেইভাবে বীরবর কর্ণের অশ্ব সঞ্চালন করুন। রাজন্! আপনি যে শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ এবং অর্জুনের থেকে শ্রেষ্ঠ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কর্ণ যদি যুদ্ধ করায় মহাদেবের সমকক্ষ হয়, আপনিও রথ সঞ্চালনে ব্রহ্মা সদৃশ। সুতরাং আপনারা দুজনে মিলে আমার শত্রুদের ওই দৈত্যদের মতেই পরাস্ত করতে সক্ষম। মহারাজ! আপনি এমন কোনো উপায় বার করুন, যাতে আজ কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। কর্ণের, আমাদের এবং আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ এখন আপনার ওপরই নির্ভর করছে। আমাদের বিজয়ও আপনার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আপনি কর্ণের রথ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।'

মহারাজ! কর্ণকে স্বয়ং শ্রীপরশুরাম ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। যদি কর্ণের পাপ থাকত, তাহলে পরশুরাম কখনো একে দিব্য অস্ত্র প্রদান করতেন না। আমি তো মনে করি কর্ণ কোনো ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন দেবপুত্র। সে কবচ-কুণ্ডল পরিধান করেই জন্মলাভ করেছে, বিশালবাহু, মহারথী; সুতরাং তার জন্ম সূতকুলে হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

শল্যকে সারথি করে কর্ণের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান

রাজা দুর্যোধন বললেন—'বীরবর! সারথির রথীর থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি কর্ণের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করবেন। ত্রিপুর নাশের জন্য যেভাবে দেবতারা সমবেতভাবে ব্রহ্মাকে ভগবানের সারথি করেছিলেন, সেইমতো আমিও কর্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় আপনাকেই তার সারথি করতে চাই।'

শল্য বললেন—'রাজন্! ব্রহ্মা যেভাবে মহাদেবের সারথি হয়েছিলেন এবং যেভাবে একই বাণে তিনি সমস্ত দৈত্য সংহার করেছিলেন, তা সবই আমি জানি। এই প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণও বিদিত আছেন। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই জানেন। সেই সব জেনেই তিনি অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেছেন। কর্ণ যদি কোনোভাবে অর্জুনকে বধ করে, তাহলে অর্জুনকে মৃত দেখে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধে ব্যাপৃত হবেন এবং তিনি যখন ক্রুদ্ধ হবেন তখন তোমার সেনার কোনো রাজাই শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হতে পারবে না।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! মদ্ররাজ এই কথা বলায় দুর্যোধন বললেন—'মহারাজ! আপনি কর্ণকে অপমান করবেন না। কর্ণ সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম। যে রাত্রে ঘটোৎকচ বহু মায়া বিস্তার করে যুদ্ধ করছিল, কর্ণই তাকে সেদিন বধ করে, এ তো প্রত্যক্ষ দেখা গেছে। অর্জুনও ভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হতে সাহস পায় না। মহাবলী ভীমকেও কর্ণ ধনুকের খোঁচা দিয়ে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করেছিল এবং 'মূঢ়'! 'পেটুক'! বলে রাগিয়েছিল। সে মাদ্রীপুত্র নকুলকে যুদ্ধে পরাস্ত

করেছিল, তবে কোনো বিশেষ কারণে তাকে বধ করেনি। কর্ণই বৃষ্ণিকুলতিলক সাত্যকিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বলপূর্বক রথহীন করে দিয়েছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন-সহ সৃঞ্জয় বীরদের কয়েকবার অক্লেশে পরাস্ত করেছে। এই মহারথী কর্ণকে পাণ্ডবরা কীকরে পরাস্ত করবে ? কর্ণ কুপিত হলে বজ্রধারী ইন্দ্রকেও পরাজিত করতে পারে। আপনিও সমস্ত অস্ত্র ও বিদ্যায় পারঙ্গম। পৃথিবীতে আপনার ন্যায় বাহুবল আর কারোই নেই। শত্রুর কাছে আপনি শল্যের (শূলের) সমান, তাই আপনি 'শল্য' নামেই প্রসিদ্ধ। সমস্ত যদুবংশ একত্রিত হলেও আপনার হাতে রেহাই পাবে না। রাজন্ ! কৃষ্ণ কি বাহুবলে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? অর্জুন বধ হলে যদি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব সেনাদের রক্ষা করেন, তাহলে কর্ণ মারা গেলে আপনাকেই আমাদের বিশাল বাহিনী রক্ষা করতে হবে। মহারাজ ! আমি আপনার বলের সাহায্যেই ভ্রাতা ও সমস্ত রাজাদের ঋণ থেকে মুক্ত হতে চাই।'

কর্ণ বললেন—'মদ্ররাজ ! ব্রহ্মা যেমন ভগবান শংকরের এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হয়ে তাদের হিত করছেন, আপনি তেমনই সর্বদা আমাদের হিতে তৎপর থাকুন।'

শল্য বললেন—'নিজের অথবা অপরের নিন্দা বা প্রশংসা করা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাজ নয়, তবুও তোমার বিশ্বাসের জন্য আমার বিষয়ে কিছু প্রশংসার কথা শোন। আমি সতর্কতার সঙ্গে অশ্বচালনায়, তাদের দোষ-গুণ সম্পর্কে জানা এবং চিকিৎসায় ইন্দ্রের সারথি মাতলির সমকক্ষ। সুতরাং চিন্তা কোরো না। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আমি তোমার রথ চালাব।'

দুর্যোধন বললেন—'কর্ণ ! মদ্ররাজ শল্য শ্রীকৃষ্ণর থেকেও বড় সারথি। এবার ইনি তোমার রথ চালাবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের রথ চালান, ইনি তেমনই তোমার রথ চালাবেন। এখন তুমি নিঃসন্দেহে পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে পারবে।'

রাজন্ ! কর্ণ তখন প্রসন্ন হয়ে তাঁর সারথিকে বললেন—'সূত ! তুমি সত্বর আমার রথ প্রস্তুত করে নিয়ে এসো।' সারথি কর্ণের বিজয়ী রথটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে 'মহারাজের জয় হোক' বলে নিবেদন করল। কর্ণ শাস্ত্রবিধিমতে সেই রথের পূজা করে, পরিক্রমা করে সূর্যদেবের স্তুতি করলেন। তারপর তিনি মদ্ররাজকে বললেন—'রাজন্ ! রথে আরোহণ করুন।' মহাতেজস্বী শল্য রথের সম্মুখভাগে উঠলেন। তারপর কর্ণও উঠলেন। সেখানে তখন দুই বীরের স্তুতিগান হচ্ছিল। মহারাজ শল্য ঘোড়ার রাশ ধরলেন এবং কর্ণ ধনুকে টংকার তুললেন।

দুর্যোধন তখন কর্ণকে বললেন—'বীরবর ! আমি মনে করেছিলাম যে মহারথী ভীষ্ম এবং দ্রোণ অর্জুন ও ভীমসেনকে বধ করবেন। কিন্তু তাঁরা তা করতে পারেননি। এখন তুমি হয় ধর্মরাজকে বন্দি করো, নাহলে অর্জুন, ভীমসেন ও নকুল, সহদেবকে বধ করো। এবার তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করো। তোমার জয় হোক, কল্যাণ হোক। পাণ্ডু-পুত্রের সমস্ত সৈন্য ভস্ম করে দাও।'

কর্ণ দুর্যোধনের কথায় মদ্ররাজ শল্যকে বললেন—'মহাবাহু ! এগিয়ে চলুন, আমি যাতে অর্জুন-ভীম, নকুল-সহদেব এবং যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে পারি ! আজ পাণ্ডবদের বিনাশ এবং দুর্যোধনের বিজয়ের জন্য আমি হাজার হাজার তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করব।'

শল্য বললেন—'সূতপুত্র ! তুমি পাণ্ডবদের অপমান করছ কেন ? তাঁরা সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গম, মহান ধনুর্ধর, যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, অজেয় এবং অত্যন্ত পরাক্রমী। তাঁরা সাক্ষাৎ ইন্দ্রকেও ভীতিপ্রদান করতে সক্ষম। যখন তুমি অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুকের বজ্রের ন্যায় ভয়ংকর টংকার শুনবে, তখন তোমার এই গীতিবাদ্য থেমে যাবে। যখন ভীমসেন গজারোহী সৈন্যের দাঁত উপড়ে বধ করবে তখন তুমি আর এইসব বলতে পারবে না। তুমি যখন

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেবকে তীক্ষ্ণবাণের সাহায্যে শত্রু সংহার করতে দেখবে, সেইসময় এসব কথা বলতে সক্ষম হবে না।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! মদ্ররাজের এইসব কথা উপেক্ষা করে কর্ণ বললেন—'ঠিক আছে, এখন রথ চালান।'

শল্যকে সারথী করে কর্ণের যুদ্ধভূমির জন্য প্রস্থান এবং দুজনের মধ্যে কটু বার্তালাপ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! মহাধনুর্ধর কর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলে সমস্ত কৌরববীর তাঁকে দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। কর্ণ প্রস্থান করতেই আপনার পক্ষের বীররা মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করে দুন্দুভি ও ভেরীবাদ্য-সহ যুদ্ধভূমির জন্য রওনা হলেন। সেই সময় সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল এবং কর্ণের ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল। সেইখানে কৌরবদের বিনাশের নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক ঘটনা দেখা গেল। কিন্তু দৈববশত সকলেই এমন মোহগ্রস্ত হয়েছিল যে কেউই তা বিশেষ লক্ষ্য করল না। কর্ণ রাজা শল্যকে সম্বোধন করে বললেন—'আমি এখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রথে আরূঢ়, আমি এইসময় ক্রুদ্ধ বজ্রধর ইন্দ্রকেও ভয় পাই না। ভীষ্ম প্রমুখ যোদ্ধাদের যুদ্ধে শায়িত দেখে আমার সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রণক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি ব্যতীত আর কেউই সক্ষম নয়। সে সাক্ষাৎ উগ্ররূপ মৃত্যুর সমান। আচার্য দ্রোণের অস্ত্র সঞ্চালনের কৌশল, বল, ধৈর্য, বিনয় ইত্যাদি সমস্ত গুণই ছিল, তাঁর অনেক দিব্য অস্ত্রশস্ত্রও ছিল, তিনিই যখন কালগ্রাসে পতিত হলেন, তখন আমি আর সকলকে দুর্বল বলেই মনে করি। অস্ত্র-বল, পরাক্রম, ক্রিয়া, নীতি এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রও মানুষকে সুখপ্রদান করতে সক্ষম হয় না। দেখুন, গুরু দ্রোণাচার্যের এইসব ক্ষমতা থাকতেও তিনি শত্রুর হাতে নিহত হলেন। তিনি অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী, বৃহস্পতি ও শুক্রের সমান নীতিকুশল এবং অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিলেন ; তবুও শস্ত্র তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। এখন দুর্যোধনের পরাক্রম কিছুটা দুর্বল, এই অবস্থায় আমি আমার কর্তব্য ভালো ভাবে বুঝতে পারছি। আপনি এবার শত্রুদের দিকে রথ নিয়ে চলুন। যেখানে সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির উপস্থিত, যেখানে ভীমসেন, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, সৃঞ্জয়বীর এবং নকুল-সহদেব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন, সেখানে আমি ব্যতীত আর কোন যোদ্ধা এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন ? তাই মদ্ররাজ ! আপনি সত্বর রণক্ষেত্রে পাঞ্চাল, পাণ্ডব এবং সৃঞ্জয় বীরদের দিকে রথ নিয়ে চলুন। আমি তাদের সম্মুখীন হয়ে হয় তাদের বধ করব, নাহলে আচার্য দ্রোণের পথ অনুসরণ করে যমরাজের কাছে চলে যাব। ধৃতরাষ্ট্র পুত্র মিত্র দুর্যোধন সর্বদাই আমার কল্যাণ চিন্তা করেন। তার জন্য আমি আমার সবকিছু এমনকী প্রাণও উৎসর্গ করতে পারি। এই শ্রেষ্ঠ রথটি আমাকে ভগবান পরশুরাম প্রদান করেছেন ; এর অক্ষদণ্ডে কোনো শব্দ হয় না। এরমধ্যে নানাপ্রকার ধনুক, গদা, বাণ, খড়্গ এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্র রাখা আছে। এটি যাবার সময় বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ানক আওয়াজ হয়, শ্বেতবর্ণের ঘোড়া এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই শ্রেষ্ঠ রথে করে আমি অবশ্যই অর্জুনকে বধ করব। স্বয়ং কালও যদি অর্জুনকে বাঁচাতে চায়, তাহলে আমি তাকেও বিনাশ করব, নচেৎ ভীষ্মের ন্যায় স্বয়ং যমলোকে যাব। বেশি আর কী বলব, তাঁর রক্ষার জন্য যদি যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও তাঁদের অনুচর নিয়ে রণক্ষেত্রে আসেন, তাহলে সবার সঙ্গে ওঁকে পরাজিত করব।'

যুদ্ধের উৎসাহে কর্ণ এইসব বললে মদ্ররাজ হেসে

তাঁকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন—'কর্ণ ! অনেক হয়েছে এবার চুপ করো। তুমি উত্তেজিত হয়ে অনেক বড় বড় কথা বলছ । কোথায় নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর কোথায় তোমার মতো নরাধম ! বলো তো অর্জুন ব্যতীত এমন কে আছে যে সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভগবান দ্বারা সুরক্ষিত যাদবদের রাজভবন থেকে বলপূর্বক স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নীকে হরণ করতে সক্ষম হয় এবং দেবাদিদেব ভগবান শংকরকেও যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে ? বিরাট নগরে গো হরণের সময় যখন পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন তোমাদের সমস্ত সেনা এবং দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও ভীষ্মকে পরাজিত করেছিল, তখন তুমি তাকে পরাস্ত করোনি কেন ? আজ তোমাকে বধ করার জন্যই এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে। তুমি যদি শত্রুভয়ে পালিয়ে না যাও, তাহলে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।'

মদ্ররাজের কটুভাষণ শুনে কৌরব সেনাপতি কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শল্যকে বলতে লাগলেন—'থাক, থাক, আপনি কেন এত কথা বলছেন ? এবার তো অর্জুনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। সে যদি যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করতে পারে তবে আপনার কথাই সত্য বলে মানা হবে।' মদ্ররাজ 'তাই হোক' বলে চুপ করে গেলেন। কর্ণ যুদ্ধের জন্য উৎসুক হয়ে বললেন—'শল্য ! রথ এগিয়ে নিয়ে চলুন।'

যুদ্ধ যাত্রায় কর্ণ তাঁর সেনাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য বলতে লাগলেন—'আজ তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমাকে শ্বেতবাহন অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে, তাকে আমি অঢেল ধন প্রদান করব। তাতেও যদি তার তৃপ্তি না হয় তাহলে রত্নপূর্ণ এক শকট তাকে প্রদান করব। তাতেও সন্তুষ্ট না হলে হাতির ন্যায় বলবান ছয়টি বলদযুক্ত এক স্বর্ণরথ দেব। তাতেও প্রসন্ন যদি না হয় তবে তাকে একশত হাতি, একশত গাভী, একশত স্বর্ণময় রথ, একশত হৃষ্টপুষ্ট, সুশিক্ষিত ঘোড়া এবং স্বর্ণমণ্ডিত শিংবিশিষ্ট চারশত দুগ্ধসম্পন্ন গাভী দেব। এই সব পেয়েও যদি সে প্রসন্ন না হয়, তাহলে সে নিজে যা নিতে চাইবে, তাই তাকে দেব। যে ব্যক্তি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সন্ধান জানাবে, তাদের দুজনকে বধ করে তাদের সমস্ত অর্থ-সম্পদও আমি তাকে দিয়ে দেব।' যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কর্ণ এইসব বলে তাঁর শ্রেষ্ঠ শঙ্খটি বাজালেন। তাঁর কথা শুনে দুর্যোধন এবং তাঁর অনুগামীরা অত্যন্ত উৎসাহিত হলেন। সবদিকে দুন্দুভি ও মৃদঙ্গ ধ্বনি হতে লাগল এবং যোদ্ধারা সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠল।

মদ্ররাজ শল্য তখন হেসে বললেন—'সূতপুত্র ! তোমার হাতির ন্যায় ছয় বলবান বলদ বিশিষ্ট স্বর্ণরথ প্রদান করার প্রয়োজন নেই ; অর্জুন নিজেই তোমার কাছে আসবে। তুমি মূর্খতাবশত কুবেরের মতো ধন বিতরণ করতে চাও, আজ বিনা আয়াসেই তুমি অর্জুনের সাক্ষাৎ পাবে। তুমি যে নির্বোধ ব্যক্তির মতো নিজের সমস্ত সম্পদ দান করতে চাইছ, তাতে মনে হয় অপাত্রে দান করা যে দোষ তা তোমার জানা নেই। তুমি যে বিশাল পরিমাণ ধন দান করতে চাইছ, তার দ্বারা যজ্ঞ করো। তুমি মোহান্ধ হয়ে বৃথাই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে মারতে চাইছ। আমি তো কখনো শুনিনি যে কোনো শৃগাল যুদ্ধে সিংহকে বধ করেছে। তোমার কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। নিঃসন্দেহে তোমার মৃত্যুকাল এসে গেছে। কোনো জীবিত ব্যক্তি এরূপ প্রলাপ বকে না। তুমি যা করতে চাইছ তা এমনই—যেন কোনো ব্যক্তি তার বাহুশক্তির দ্বারা সমুদ্র পার হতে চাইছে অথবা পর্বত শিখর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামতে চাইছে। সব্যসাচী অর্জুন যখন তার দিব্য-ধনুক নিয়ে সেনাদের পীড়িত করে তোমাকেও তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করবে, তখন তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। মাতৃক্রোড়ে থেকে শিশু যেমন চাঁদ ধরতে চায়, তুমিও তেমনই রথে বসে অজ্ঞানবশত তেজস্বী অর্জুনকে পরাস্ত করার কথা চিন্তা করছ। কর্ণ ! বনে খরগোশের সঙ্গে বসবাসকারী শৃগালও যতক্ষণ সিংহকে না দেখে ততক্ষণ নিজেকেই রাজা বলে মনে করে। তেমনই তুমিও রথে উপবিষ্ট থেকে যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে না দেখছ, ততক্ষণ নিজেকে সিংহ বলে মনে করছ। তোমার দৃষ্টি যখনই অর্জুনের ওপর পড়বে, তখনই তুমি শৃগাল হয়ে যাবে। যেভাবে এই পৃথিবীতে নিজ যোগ্যতা অনুসারে ইঁদুর-বিড়াল, কুকুর-বাঘ, শৃগাল-সিংহ, খরগোশ-হাতি, মিথ্যা-সত্য, বিষ ও অমৃত প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ তেমনই তোমাকে ও অর্জুনকে সকলেই যথার্থভাবে জানে।'

শল্যের এরূপ তিরস্কারে অত্যন্ত কুপিত হয়ে কর্ণ বললেন—'শল্য ! গুণবানদের গুণাবলী তো গুণীরাই বিচার করতে পারে, গুণহীনেরা তা বুঝতে পারে না। আপনার তো কোনো গুণই নেই, গুণাগুণের আপনি কী বুঝবেন ? অর্জুনের অস্ত্রশস্ত্র, ক্রোধ, পরাক্রম, ধনুক-বাণ

এবং বীরত্বের কথা আমি যেমন জানি, আপনি তেমনভাবে জানেন না। আমার এই ভয়ংকর বাণ মানুষ, ঘোড়া এবং হাতি সংহারকারী, অত্যন্ত ভীষণ, এগুলি বর্ম ও অস্থিভেদকারী। আমি রুষ্ট হলে এর দ্বারা পর্বতরাজ মেরুকেও ভেঙে ফেলতে পারি। কিন্তু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কারো ওপর আমি এগুলি প্রয়োগ করব না। কারণ সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়দের লক্ষ্মী হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন হল সমস্ত পাণ্ডবদের বিজয়ের আধার। আমি ব্যতীত আর কে আছে যে এদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এদের পরাস্ত করতে সক্ষম ? অর্জুনের কাছে গাণ্ডীব ধনুক আছে আর শ্রীকৃষ্ণের আছে সুদর্শন চক্র। কিন্তু এগুলি ভীত ব্যক্তিদের ভীতিপ্রদর্শনকারী বস্তু, আমার তো এগুলি দেখলে আনন্দ হয়। আপনি দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন, মূর্খ এবং বড় বড় যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। আপনি ভয় পেয়েছেন, তাইজন্য অনর্গল আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছেন। আরে, পাপী দেশে জন্ম নেওয়া ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক দুর্বুদ্ধি শল্য ! আমি এই দুজনকে বধ করে আজ আত্মীয়স্বজন-সহ আপনাকেও বিনাশ করব। আপনি আমাদের শত্রু হয়েও সুহৃদ বেশে আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ভয় দেখাচ্ছেন, আমি আগেই শুনেছিলাম যে মদ্রদেশের লোকেরা দুষ্টচিত্ত, অসত্যভাষী, কুটিল এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারা দুষ্টতা পরিত্যাগ করে না। এই অসভ্যরা মদ্যপান করে, হাসে, চিৎকার করে এবং আজে-বাজে গান গায় এবং যেমন খুশি আচরণ করে ও অশ্লীল কথাবার্তা বলে। তাদের মধ্যে ধর্ম থাকবে কী করে ? তারা অহংকার ও নীচকর্মের জন্য বিখ্যাত। তাই তাদের সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতা কখনোই করা উচিত নয়। স্নেহ বলে কোনো বস্তু এদের মধ্যে নেই। মদ্রদেশের নারীরাও স্বেচ্ছাচারিণী হয়। সুতরাং তাদের গর্ভে জন্মে আপনি ধর্মকথা বলবেন কীভাবে ?

'আমি মতিমান মহারাজ দুর্যোধনের প্রিয় মিত্র। আমার প্রাণ ও সম্পত্তি সবই তাঁর জন্য। মনে হয় পাণ্ডবরা আপনাকে উৎকোচ দিয়েছে, তাই আপনি এইভাবে শত্রুর মতো ব্যবহার করছেন। মনে রাখবেন, নাস্তিকরা যেমন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করতে পারে না, তেমনই আপনার মতো হাজার হাজার ব্যক্তিও আমাকে যুদ্ধে বিমুখ করতে পারবে না। গুরুদেব পরশুরাম আমাকে বলেছেন যুদ্ধে যাঁরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না তাদের কী সদ্গতি হয়, আমি আজ তা স্মরণ করছি। এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে আমাকে এই কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারে। সুতরাং আপনি চুপ করুন। আমি আপনাকে বধ করে মাংসাহারী জীবকে দিতে পারতাম, কিন্তু এক, আমার মিত্র দুর্যোধন ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথা স্মরণ আছে, দুই, আপনাকে বধ করলে নিন্দা হবে, তিন, ক্ষমা করব বলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—এই তিনটি কারণেই আপনি এখনও জীবিত আছেন। আপনি যদি এমন কথা আর কখনো বলেন, তাহলে আমার এই বজ্রতুল্য গদার আঘাতে আপনার মস্তক চূর্ণ করে মাটিতে ফেলে দেব।'

তারপর কর্ণ কঠিন কণ্ঠে বললেন—'চলুন, রথ চালান।'

কর্ণকে রাজা শল্যের এক হংস এবং কাকের উপাখ্যান শোনানো

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! কর্ণের কথা শুনে রাজা শল্য তাঁকে একটি দৃষ্টান্ত শুনিয়ে বললেন—'কুলকলঙ্ক কর্ণ ! আমি তোমাকে একটি কাহিনী শোনাচ্ছি। শোনা যায়, সমুদ্রতীরে কোনো এক ধর্মপ্রাণ রাজার রাজ্যে এক ধনী বৈশ্য বাস করত। সে যাগযজ্ঞকারী, দাতা, ক্ষমাশীল, নিজ কর্মে স্থিত, পবিত্রাত্মা এবং দয়াশীল ছিল। তার কয়েকটি অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। তারা একটি কাককে তাদের উচ্ছিষ্ট ভাত, দুধ ইত্যাদি দিত। সেই উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেয়ে কাকটা খুব হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল এবং অহংকারে সজাতীয় এবং শ্রেষ্ঠ পাখিদের অপমান করতে লাগল। একবার সেই সমুদ্রতীরে গরুড় পক্ষীর ন্যায় দূরদেশবাসী মানস সরোবরের একদল হংস এল। তখন সেই অহংকারী কাক একটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হংসের কাছে গিয়ে বলল—'এসো, আজ

তোমার-আমার মধ্যে ওড়ার প্রতিযোগিতা হোক।' তাই শুনে সমস্ত হংস হেসে উঠে সেই বাচাল কাককে বলল 'আমরা মানস সরোবরবাসী হংস, সমস্ত পৃথিবীতে উড়ে বেড়াই। আমাদের এই লম্বা উড়ানের জন্য সমস্ত পক্ষী আমাদের সম্মান করে। তুমি তো একটি কাক মাত্র, তাহলে এই বলিষ্ঠ হংসকে ওড়ার জন্য আহ্বান করছ কেন ? বলো তো, তুমি কেন আমাদের সঙ্গে উড়তে চাও ?'

হংসের কথা শুনে কাক তাদের বারংবার ধিক্কার দিয়ে নিজে ক্ষুদ্র জাতির হওয়া সত্ত্বেও অহংকার করে বলতে লাগল—'আমি একশত এক প্রকারে উড়তে পারি। তার প্রত্যেকটি একশত যোজন ব্যাপী এবং সেসব অত্যন্ত অদ্ভুত এবং নানাপ্রকারের হয়। তার মধ্যে কয়েকটি উড়ানের নাম হল, উড্ডীন (উঁচুতে ওড়া), অবডীন (নীচে ওড়া), প্রডীন (চারদিকে ওড়া), ডীন (সাধারণ ওড়া), নিডীন (ধীরে ধীরে ওড়া), সংডীন (ললিত গতিতে ওড়া), তির্যগ্‌ডীন (তির্যক গতিতে ওড়া), বিডীন (অপরের ওড়া নকল করা), পরিডীন (সব দিকে ওড়া), পরাডীন (পিছন দিকে ওড়া), সুডীন (স্বর্গের দিকে ওড়া), অভিডীন (সামনের দিকে ওড়া), মহাডীন (প্রচণ্ড বেগে ওড়া), নির্ডীন (পা না নড়িয়ে ওড়া), অতিডীন (অতি প্রচণ্ড বেগে ওড়া), সংডীন ডীন-ডীন (সুন্দর গতিতে আরম্ভ করে পুনরায় নীচের দিকে ওড়া), সংডীনোড্ডীনডীন (সুন্দর গতিতে আরম্ভ করে পুনরায় ওপরের দিকে ওড়া), ডীন বিডীন (এক প্রকার উড়ানে অন্য উড়ান দেখানো), সম্পাত (খানিকক্ষণ সুন্দরভাবে উড়ে পাখা ঝাপটানো), সমুদীষ (কখনো ওপরে কখনো নীচে ওড়া), ব্যতিরিক্তক (কোনো লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় সংকল্প করে ওড়া), গতাগত (কোনো লক্ষ্যের দিকে গিয়ে ফিরে আসা) এবং প্রতিগত (পালটি খাওয়া) ইত্যাদি। আমি তোমাদের সামনে এইগুলি করব ; তখন তোমরা আমার শক্তি বুঝতে পারবে। এর মধ্যে যে কোনো গতিতে আমি আকাশে উড়তে পারি। তোমরা আমাকে বলো আমি কোন গতিতে উড়ব ?'

কাক এই কথা বলায় একটি হংস হেসে বলল—'কাক ! তুমি একশত এক প্রকার ওড়া জানতে পারো ; অন্য সব পাখিরা তো এক প্রকারেরই ওড়া জানে। আমিও এক প্রকার গতিতেই উড়ব। অন্য কোনো গতি আমি জানি না। তোমার যা পছন্দ তুমি সেই গতিতেই উড়তে থাক।'

সেই কথা শুনে সেখানে অন্য যেসব কাক ছিল তারা হেসে বলল, 'আরে এই হংস এক প্রকার গতি দিয়ে একশত এক প্রকারের গতির সঙ্গে কীভাবে জিতবে ?' তখন সেই কাক এবং হংস বাজি রেখে উড়তে লাগল। কাক শতপ্রকারের ওড়ার কায়দায় দর্শকদের চমকিত করে উড়তে লাগল এবং হংস তার নিজস্ব একই মৃদুগতিতে উড়তে

থাকল। কাকের থেকে তার গতি কম ছিল। তাই দেখে কাক অপমান করে তাকে বলতে লাগল, 'হংস উড়ছে ঠিকই, কিন্তু কাকের কাছে এর গতি এত কম।' তাই শুনে হংস ক্রমে তার গতিবৃদ্ধি করে পশ্চিম দিকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। সেই যাত্রায় কাক উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার মতো কোনো দ্বীপ বা গাছ দেখতে পেল না। তখন সে ভীত হয়ে ভাবতে লাগল—'আমি ক্লান্ত হয়ে এই সমুদ্রে পড়ে যাব না তো ?'

শেষে সেই কাক অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে হংসের কাছে এল। তাকে এরূপ বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে হংস সৎব্যক্তিদের ব্রতের কথা স্মরণ করে তাকে বাঁচানোর জন্য বলল—"কী ব্যাপার ! তুমি তো অনেক প্রকার ওড়ার কথা বলেছিলে, কিন্তু তখন তোমার এই গুপ্ত গতির কথা তো বলনি। এখন তুমি কোন গতিতে উড়ছ ? তোমার ঠোঁট ও ডানায় জল লেগে যাচ্ছে।"

কর্ণ ! তখন সেই কাকটি হংসকে বলল—"ভাই হংস ! আমি তো কাক, বৃথাই কথা বলেছি। আমি তোমাকে আমার প্রাণ সমর্পণ করছি, তুমি কোনোভাবে আমাকে জলের মধ্যে থেকে তীর পর্যন্ত নিয়ে চলো।" এই বলে সে

তার ঠোঁট এবং ডানাসহ সমুদ্রে পড়ে গেল। তাই দেখে হংস বলল—"কাক ! তুমি তো খুব অহংকার করে বলেছিলে যে তুমি একশত এক প্রকারে উড়তে জানো। তাহলে এখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছ কেন ?" তখন কাক দুঃখে পীড়িত হয়ে বলল—"হংস ! আমি উচ্ছিষ্ট খেয়ে খেয়ে এমন অহংকারী হয়ে গিয়েছিলাম যে নিজেকে সাক্ষাৎ গরুড় বলে মনে করতাম। সেইজন্য আমি অনেক কাক ও অন্যান্য পাখিদেরও বহু অপমান করেছি। কিন্তু আমি এখন তোমার শরণ গ্রহণ করছি, তুমি আমাকে কোনো দ্বীপের নিকট পৌঁছে দাও। আমি যদি বেঁচে নিরাপদে নিজ দেশে ফিরতে পারি, তাহলে আর কখনো কারও অনাদর করব না। এখন তুমি কোনোভাবে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো।"

এইভাবে দীন বাক্য বলে সে অচেতন প্রায় বিলাপ করতে লাগল। তাকে কা-কা করে সমুদ্রে ডুবতে দেখে হংসের দয়া হল, তখন সে তাকে ডানা দিয়ে আস্তে করে নিজের পিঠে তুলে নিল এবং যেখান থেকে তারা উড়তে আরম্ভ করেছিল, সেইখানে ফিরে এল। সেখানে পৌঁছে সে কাককে নীচে নামিয়ে তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে কোনো দূরদেশে চলে গেল।

কর্ণ ! এইভাবে উচ্ছিষ্ট খাওয়া বলিষ্ঠ সেই কাক তার বলবীর্য ও অহংকার ভুলে নম্র হয়ে গেল। পূর্বকালে যেমন সেই কাকটি বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট খেত, তোমাকেও তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তাদের উচ্ছিষ্ট খাইয়ে রেখেছে, সেইজন্য তুমি তোমার সমকক্ষ এবং তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও অপমান করছ। বিরাটনগরে দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং অন্যান্য আরও অনেকে তোমায় রক্ষা করছিল ; সেই সময় তুমি একাই কেন অর্জুনকে বধ করলে না ? সেই সময় তোমার পরাক্রম কোথায় ছিল ? যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যখন তোমার ভাইকে বধ করল, সেই সময় সমস্ত কৌরব সেনার সামনে তুমিই সর্বপ্রথম পালিয়েছিলে। সেইরূপ দ্বৈতবনে গন্ধর্বরা আক্রমণ করলে সমস্ত কৌরবকে বাদ দিয়ে তুমিই আগে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলে। সেইসময়ও অর্জুনই চিত্রসেন প্রমুখ গন্ধর্বদের যুদ্ধে পরাস্ত করে দুর্যোধন এবং তার রানিদের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে। পরশুরাম রাজাদের সভায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যে পুরানো প্রভাবের কথা বলেছিলেন, তুমি নিশ্চয়ই তা শুনেছ ! এতদ্‌ব্যতীত ভীষ্ম এবং দ্রোণও রাজাদের সামনে এই দুজনের অবধ্যতার কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তাদের কথা তুমি বারবারই শুনছ। আমি

তোমাকে আর কী কী বলব যা দেখে তুমি বুঝবে যে অর্জুন তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। এবার তুমি অতি সত্বর বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং কুন্তীকুমার অর্জুনকে তাদের শ্রেষ্ঠ রথে উপবিষ্ট দেখতে পাবে। সুতরাং কাক যেমন বুদ্ধিমানের মতো হংসের শরণ গ্রহণ করেছিল, তুমিও তেমনই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আশ্রয় গ্রহণ করো। যখন তুমি একই রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে যুদ্ধে পরাক্রম দেখাতে দেখবে, তখন এমন কথা আর বলতে পারবে না. জোনাকী যেমন সূর্য ও চন্দ্রের অপমান করে তেমনই তুমি মূর্খের মতো ওদের অপমান কোরো না। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাদের অসম্মান কোরো না এবং এইরূপ বড় বড় কথা বলা পরিত্যাগ করো।'

কর্ণ এবং শল্যের কটু সম্ভাষণ এবং তাঁদের বোঝানোর জন্য দুর্যোধনের চেষ্টা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! শল্যের অপ্রিয় কথাগুলি শুনে কর্ণ বললেন—'শল্য ! অর্জুনের রথ সঞ্চালক কৃষ্ণের বল এবং অর্জুনের দিব্যাস্ত্রের সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, আপনার তা নেই। তবুও আমি তাদের সঙ্গে অসীম সাহসে যুদ্ধ করব। কিন্তু বিপ্রবর আমাকে যে অভিশাপ দিয়েছেন, আজ তা আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করছে। পূর্বে আমি দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে পরশুরামের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। অর্জুনের হিতার্থে সেখানেও ইন্দ্র আমার কাজে বাধা প্রদান করেন। একবার গুরুদেব আমার জঙ্ঘায় মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন, সেইসময় ইন্দ্র এক বিশ্রী কীটরূপে এসে আমার জঙ্ঘায় ক্ষত সৃষ্টি করে। সেই ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। গুরুদেবের যাতে নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তাই আমি একটুও নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে বসে থাকি। নিদ্রাভঙ্গ হলে গুরুদেব সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। আমাকে এরূপ ধৈর্যশীল দেখে তিনি বলেন, 'আরে ! তুমি তো ব্রাহ্মণ নও ! ঠিক করে বলো, তুমি কোন জাতির ?' তখন আমি সত্য কথা বলি, 'আমি সূত।' আমার কথা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিলেন—'সূত ! তুমি ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে এই ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছ, উপযুক্ত সময়ে তোমার এটি স্মরণে আসবে না।' তাই অত্যন্ত ঘোর সংগ্রামের সময় আমি এটি বিস্মৃত হয়েছিলাম। শল্য ! ভরতবংশে উৎপন্ন অর্জুন অত্যন্ত পরাক্রমী, ভয়ানক এবং সকলের সংহারকারী। মনে হচ্ছে, আজ তুমুল যুদ্ধ হবে এবং সে বহু ক্ষত্রিয় বীরকে সন্তপ্ত করবে। তা সত্ত্বেও সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনের সঙ্গে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করব। আমার অন্য একটি অস্ত্রও আছে, যার সাহায্যে আমি সেই মহাপরাক্রমী অর্জুনকে ধরাশায়ী করব। শল্য ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে জয়-পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েই যুদ্ধ করব। আমি ব্যতীত আর কোনো বীরই ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী অর্জুনের সঙ্গে একাকী রথারূঢ় হয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। আপনি যথার্থ মূর্খ এবং মূঢ়চিত্ত। আপনি আমাকে অর্জুনের বল-পরাক্রমের কথা কী শোনাচ্ছেন ? আমি নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে তার পরাক্রমে প্রসন্ন হয়ে ক্ষত্রিয় সভায় তার পরাক্রমের বর্ণনা করব। যেসব ব্যক্তি অপ্রিয়, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্র, আক্ষেপকারী এবং ক্ষমাশীলদের অপমান করে, তাদের মতো শত শত ব্যক্তিকে আমি মাটিতে মিশিয়ে দিই, কিন্তু আজ সময়ের দিকে তাকিয়ে আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। আমি খুবই সরল ব্যবহার করছি কিন্তু আপনি অত্যন্ত বাঁকাভাবে কথা বলছেন। আপনি অত্যন্ত মিত্রদ্রোহী, সাত পা একসঙ্গে হাঁটলেও বন্ধুত্ব জন্মায়। যাইহোক ! অত্যন্ত কঠিন সময়। রাজা দুর্যোধন রণক্ষেত্রে এসেছেন। তাঁর বিজয়লাভের জন্যই আমি এখানে এসেছি। কিন্তু আপনি অর্জুনেরই গুণগান করে চলেছেন, যদিও ওর সঙ্গে আপনার কোনো প্রীতিসম্পর্ক নেই। আজ বিজয়লাভের জন্য আমি অর্জুনের ওপর অমোঘ এবং অজেয় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করব। এই দিব্যাস্ত্রের প্রভাবে আমি দণ্ডপাণি যম, পাশহস্ত বরুণ, গদাধর কুবের এবং বজ্রপাণি ইন্দ্র অথবা অন্য কোনো শত্রুকেও ভয় পাই না ; সুতরাং আমার শ্রীকৃষ্ণ বা অর্জুনকে কোনোরূপ ভয় পাবার কিছু নেই।

'কিন্তু আমার অন্য একটি ভয় আছে। কোনো এক সময়ের কথা, আমি যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে অস্ত্র পাবার আশায় চেষ্টারত ছিলাম। সেই সময় নানা ভয়ংকর বাণ চালাবার অভ্যাস করতে করতে আমি ভ্রমক্রমে এক যজ্ঞধেনুর গো-বৎসকে বধ করে ফেলি। গো-বৎসটি একাকী বনে বিচরণ করছিল। তাই দেখে তার প্রভু ব্রাহ্মণ আমাকে বললেন—'যেহেতু তুমি এই নিরপরাধ

গোবৎসকে হত্যা করেছ, সুতরাং যুদ্ধের সময় তোমার রথচক্র মাটিতে বসে যাবে এবং তুমি সেই সময় মহা বিপদে পড়বে।' ব্রাহ্মণের সেই প্রবল অভিশাপে আজও আমি ভীত হয়ে আছি। সেই ব্রাহ্মণকে আমি এক সহস্র গাভী এবং ছয় শত বলদ দান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে আমি প্রসন্ন করতে পারিনি। সেই ব্রাহ্মণকে আমি উত্তম গৃহ ও ভোগসামগ্রীসহ বহু সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আমি যখন তাঁর ক্ষমা লাভের জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকি তখন সেই ব্রাহ্মণ বলেন—'সূতপুত্র! আমি যে কথা বলেছি তা বদল হতে পারে না। মিথ্যাভাষণ প্রজাদের বিনাশকারী হয়। যদি আমি আমার কথা মিথ্যা করে দিই, তাহলে আমার পাপ হবে। সুতরাং ধর্মরক্ষার জন্য আমি মিথ্যা বলতে পারব না। আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়ে আমার সদ্গতিতে অন্তরায়ের সৃষ্টি করো না। ত্রিলোকে কোথাও আমার কোনো কথাই মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং তুমি শান্ত হও।'

'যদিও আপনি আমাকে অনেক অসম্মান করেছেন, তা সত্ত্বেও আমি সৌহার্দ্যবশত আপনাকে এই প্রসঙ্গ শোনালাম। এখন আপনি চুপ করে পরবর্তী ঘটনা শুনুন। আপনি আমার সঙ্গী এবং মিত্র, তাই এখনও জীবিত রয়েছেন। এখন আমার ওপরে রাজা দুর্যোধনের এক বড় কাজের ভার রয়েছে, সেই কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার। তাই আমি আপনার সমস্ত কটুবাক্য ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞা করেছি। আপনার মতো হাজার শল্যের সাহায্য ব্যতীতই আমি শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম। কিন্তু মিত্রদ্রোহ অত্যন্ত বড় পাপ, তাই আপনি এখনও জীবিত আছেন।'

শল্য বললেন—'কর্ণ! তুমি তোমার শত্রুদের বিষয়ে যা বলছ সেসব তোমার বাতুলতা। আমি কর্ণের সহায়তা ব্যতীতই শত-সহস্র শত্রুদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারি।'

মদ্ররাজের কথায় কর্ণ তাঁকে পুনরায় তীক্ষ্ণ কটুবাক্য বলতে লাগলেন। তিনি বললেন—'মদ্ররাজ! আমি যা বলছি তা একটু মন দিয়ে শুনুন। এই বিষয়ে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে শুনেছি। একবার তাঁর সভায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ নানা অদ্ভুত দেশ এবং প্রাচীন ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশের নিন্দা করে বলছিলেন—'যা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা এবং কুরুক্ষেত্রের বাইরে এবং সিন্ধু ও পাঁচ শাখা নদীর মধ্যে স্থিত সেই বাহীক দেশ ধর্মশূন্য এবং অপবিত্র। তার থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। আমি এক গোপনীয় কার্যবশত কিছুদিন বাহীক দেশে ছিলাম। সেই সময় আমি তাদের আচার-বিচারের বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছি। যেখানে শাকল নামক নগর এবং আপগা নামে এক নদী আছে। জর্তিকা নামের বাহীক জাতি সেখানে বসবাস করে। তাদের চরিত্র অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওইসব দুশ্চরিত্র, সংস্কারহীন এবং দুরাত্মা বাহীকদের সঙ্গে এক মুহূর্তও থাকতে চাইবে না।' সেই ব্রাহ্মণ বাহীকদের এরূপ দুরাচারী বলে জানিয়েছিলেন। বাহীক দেশের লোকেদের উপনয়ন ইত্যাদি সংস্কার বর্জিত হওয়ায় পতিত বলে মনে করা হয়; তাদের নারীরা গৃহের পরিচারকদের সঙ্গে মৈথুনে রত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে। তারা ধর্মভ্রষ্ট এবং যজ্ঞাধিকার বঞ্চিত। এইসব কারণে তাদের প্রদত্ত হব্য, কব্য এবং দান দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং ব্রাহ্মণরা স্বীকার করেন না। এ কথা খুবই প্রসিদ্ধ। কোনো বিদ্বান ব্রাহ্মণ এমনও বলেছেন যে 'বাহীকেরা কাঠ ও মাটির তৈরি পাত্রে ভোজন করে, তাতে মদ লেগে থাকে, কুকুর সেগুলি চেটে খায়, তবুও সেই পাত্রে খাদ্যগ্রহণ করতে তারা ঘৃণাবোধ করে না। তারা মেষ, উট এবং গাধার দুধ, দই এবং মাখন খায়। শুধু তাই নয়, তারা বর্ণসংকর সন্তান

উৎপাদনকারী, দুরাচারী। শুদ্ধ-অশুদ্ধের বিচার পরিত্যাগ করে তারা সর্বপ্রকার খাদ্যগ্রহণ করে থাকে। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তিদের 'আরট্ট' নামক সেই বাহীকদের সংস্রব ত্যাগ করা উচিত।

এইরূপ কারস্কর, মাহিষক, কলিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক, বীরক এবং দুর্ধর্ম নামক দেশগুলিও পরিত্যাগ করা উচিত। প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, আরট্ট, খশ, বসাতি, সিন্ধু এবং সৌবীর দেশগুলিকে নিন্দিত ও অপবিত্র বলে গণা করা হয়। পাঞ্চাল দেশের লোকেরা বেদাধ্যয়ন করে, কুরুদেশবাসীগণ ধর্মের আশ্রয় নেয়। মৎস্য দেশের লোক সত্যবাদী এবং শূরসেনবাসীগণ যজ্ঞাদি করে থাকে। পূরবের লোক দাসবৃত্তি করে, দক্ষিণীদের ব্যবহার শূদ্রের ন্যায় হয়। বাহীকেরা চোর এবং সৌরাষ্ট্রনিবাসীরা বর্ণসংকর হয়। মগধদেশবাসীগণ ইশারাতেই কথা বুঝে যায়, কোশলের প্রজারা দৃষ্টি সংকেতে সব বোঝে, কুরু ও পাঞ্চালের লোকেরা অর্ধেক বললে পুরো ব্যাপারই বুঝে ফেলে। শাল্ব দেশবাসীগণ পুরো কথা বললে তবে তা হৃদয়ঙ্গম করে। শিবিদেশের প্রজারা পার্বত্য অঞ্চলের লোকের মতো মূর্খ হয়। যবনেরা সব কথাই অনায়াসে বুঝে ফেলে এবং শূরবীর হয়। ম্লেচ্ছজাতির লোকেরা তাদের সংকেত অনুসারে ব্যবহার করে। অন্য সবাই পুরো কথা না বললে বোঝে না। বাহীক ও মদ্র দেশের লোকেরা সম্পূর্ণ বোকা হয়, তারা কোনো রথীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। শল্য ! আপনিও তাই। আপনার উত্তর দেবারও ক্ষমতা নেই। মদ্রদেশ পৃথিবীর সমস্ত দেশের মল। এই কথা জেনে আপনি মুখ বন্ধ করুন ; আমার সঙ্গে শত্রুতা করবেন না, নাহলে প্রথমে আপনাকে বধ করে তারপর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে হত্যা করব।'

শল্য বললেন—'কর্ণ ! তুমি যে দেশের রাজা সেজে আছ, সেই অঙ্গদেশে কী হয় ? নিজের আত্মীয়-কুটুম্ব রোগগ্রস্ত হলে তাকে ত্যাগ করা হয়। খোলা বাজারে নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে লোকে বিক্রয় করে। সেদিন রথী, অতিরথীদের গণনার সময় ভীষ্ম তোমাকে যা বলেছিলেন, তোমার সেই দোষগুলির ওপর নজর দিয়ে ক্রোধ পরিত্যাগ করে শান্ত হওয়া উচিত। সব দেশেই ব্রাহ্মণ আছে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রও আছে এবং সর্বত্র সুন্দর ব্রত পালনকারী সাধ্বীনারীও আছেন। সব দেশে নিজ নিজ ধর্মপালনকারী রাজারা আছেন, যাঁরা দুষ্টদের সাজা দেন। সেইরূপ সর্বত্র ধার্মিক ব্যক্তিরাও থাকেন। কোনো দেশের সব লোকেরাই যে পাপ করে তা ঠিক নয় ; সেইসব দেশে এমন সচ্চরিত্র এবং সদাচারী মানুষও থাকেন, দেবতারাও যাঁর সমকক্ষ হতে পারেন না। কর্ণ ! অন্যের দোষ দেখাতে সকলেই বড় কুশল হয়, কিন্তু তাদের নিজের দোষের ঠিকানা থাকে না। অথবা নিজেদের দোষ জেনেও তারা না জানার ভাণ করে থাকে, যেন তারা কিছু জানেই না।

কর্ণ ও শল্যকে এইভাবে বিবাদ করতে দেখে রাজা দুর্যোধন উভয়কে থামালেন। তিনি কর্ণকে মিত্রভাবে বোঝালেন এবং শল্যের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করলেন। তিনি বারণ করায় কর্ণ তা মেনে নিলেন এবং শল্যের কথার আর কোনো উত্তর দিলেন না। শল্যও শত্রুর দিকে রথের মুখ ঘোরালেন। রাধানন্দন তখন শান্ত মনে শল্যকে পুনরায় রথ চালাবার নির্দেশ দিলেন।

কৌরব-ব্যূহ নির্মাণ, কর্ণ ও শল্যের বাদানুবাদ, অর্জুন কর্তৃক সংশপ্তকদের, কর্ণ দ্বারা পাঞ্চালদের এবং ভীম দ্বারা ভানুসেনের সংহার ও সাত্যকি দ্বারা বৃষসেনের পরাজয়

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কর্ণ তারপর শত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে সর্বভাবে সক্ষম পাণ্ডবদের সেই অনুপম ব্যূহ দেখলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ব্যূহ রক্ষা করছিলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ সিংহের ন্যায় গর্জন করে এগোলেন। নিজের যুদ্ধ চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কৌরব সেনাদের নিয়ে ব্যূহ রচনা করলেন এবং পাণ্ডব সৈন্য সংহার করতে করতে কর্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁর দক্ষিণ দিকে আনলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! রাধানন্দন কর্ণ পাণ্ডবদের এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদি মহান ধনুর্ধরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কেমন ব্যূহ তৈরি করল ? ব্যূহের দুপাশে এবং কাছাকাছি কোন কোন বীর দাঁড়িয়েছিল ? দুই সেনার মধ্যে কেমন যুদ্ধ আরম্ভ হল ? কর্ণ যে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করল, তখন অর্জুন কোথায় ছিল ? অর্জুন কাছে থাকলে কী

যুধিষ্ঠিরকে কেউ আক্রমণ করতে পারত ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনার সেনাদের কেমন ব্যূহ নির্মাণ হয়েছিল, তা শুনুন। কৃপাচার্য, মগধদেশের যোদ্ধা এবং কৃতবর্মা—এঁরা ব্যূহের দক্ষিণ পাশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পক্ষে মহারথী শকুনি এবং তাঁর পুত্র উলূক ছিলেন। তাঁরা তীক্ষ্ণধার ভল্ল ও গান্ধার দেশের অশ্বারোহী সৈন্য এবং পার্বত্য যোদ্ধাদের নিয়ে আপনার সৈন্য রক্ষা করছিলেন। তেমনভাবে চব্বিশ হাজার যুদ্ধকুশল সংশপ্তক ব্যূহের বামপার্শ্বের রক্ষার্থে অবস্থান করছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল কাম্বোজ, শক এবং যবন। এরা সকলেই রথী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যযুক্ত ছিল। মধ্যভাগে ছিলেন কর্ণ, তিনি সৈন্যদলের মুখ্যস্থানে উপস্থিত ছিলেন। কর্ণের পুত্র কর্ণের রক্ষার্থে দাঁড়িয়ে ছিলেন ; দুঃশাসন হাতির পিঠে সৈন্যব্যূহের পশ্চাদ্দেশে অবস্থান করছিলেন। তাঁর পেছনে ছিলেন স্বয়ং রাজা দুর্যোধন, তাঁর রক্ষার্থে তাঁর মহাবলী ভাই মদ্র এবং কেকয় বীরগণ সেনা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। অশ্বত্থামা, কৌরবদের প্রধান মহারথী, মত্ত গজরাজ এবং ম্লেচ্ছ যোদ্ধা—এরা সব দুর্যোধনের রথসেনার পেছন পেছন যাচ্ছিল। বহু অশ্বারোহী, সুসজ্জিত গজারোহী এবং রথী সৈন্যের দ্বারা সুশোভিত এই ব্যূহ দেবতা এবং অসুরদের ব্যূহের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল।

সেনাদের প্রধান স্থানে কর্ণকে উপস্থিত দেখে রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে বললেন—'অর্জুন ! দেখো, কর্ণ যুদ্ধের

জন্য কী বিশাল ব্যূহ তৈরি করেছে। নিজ পক্ষ এবং অন্য পক্ষের শত্রুসৈন্য কেমনভাবে শোভা পাচ্ছে। এইসব দেখে আমাদেরও এই নীতি অনুসরণ করা উচিত। যাতে শত্রুদের এই মহাসেনা আমাদের পরাস্ত করতে না পারে।'

রাজার কথা শুনে অর্জুন হাত জোড় করে বললেন—'আপনার আদেশ অনুযায়ী কাজ হবে।' যুধিষ্ঠির বললেন—'তুমি কর্ণের সঙ্গে, ভীমসেন দুর্যোধনের সঙ্গে, নকুল বৃষসেনের সঙ্গে এবং সহদেব শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করবে। শতানীক দুঃশাসনের সঙ্গে, সাত্যকি কৃতবর্মার সঙ্গে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার সঙ্গে, আমি কৃপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করব। দ্রৌপদীর পুত্ররা শিখণ্ডীকে সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অন্য পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এইভাবে আমাদের পক্ষের প্রধান বীররা শত্রুপক্ষের বীরদের সংহার করবে।'

ধর্মরাজের কথায় ধনঞ্জয় 'তথাস্তু' বলে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সৈনিকদের সেইমতো নির্দেশ দিয়ে নিজে সৈন্যদলের মুখ্যস্থানে গেলেন। মহারথী অর্জুনকে আসতে দেখে শল্য রণোন্মত্ত কর্ণকে পুনরায় বলতে লাগলেন—'কর্ণ ! তুমি বারবার যাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছিলে, সেই কুন্তীনন্দন অর্জুন এসে গেছে। তার রথের তুমুল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এদিকে নানা অলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ওই দেখ, রোমহর্ষণকারী অত্যন্ত ভয়ংকর কবন্ধাকার কেতু নামক গ্রহ সূর্যমণ্ডল ঘিরে অবস্থান করছে। তোমার ধ্বজা বেঁকে গেছে, ঘোড়াগুলি কম্পিত হচ্ছে। আমার এইসব দুর্লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে যে আজ শত-সহস্র রাজা নিহত হয়ে রণশয্যায় শয়ন করবে। যাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ-ধনুক শোভা পাচ্ছে এবং বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি দেদীপ্যমান থাকে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাওয়ার মতো গতি-সম্পন্ন শ্বেতবর্ণের অশ্বচালিত রথে এদিকেই আসছেন। ওই শোনো, গাণ্ডীব ধনুকের টংকার শোনা যাচ্ছে, অর্জুন নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণ শত্রুদের প্রাণ হরণ করছে। যুদ্ধে উপস্থিত বীর রাজাদের ছিন্ন মস্তকে রণক্ষেত্র ভরে উঠছে। নিজের সৈন্যদের দিকে লক্ষ্য দাও, যারা অর্জুনের আঘাতে খুবই কাতর হয়ে উঠেছে। ওই পাণ্ডববীররা সবেগে এসে তোমার পক্ষের রাজাদের সংহার করছে এবং হাতি, ঘোড়া, রথী এবং পদাতিক সৈন্যদের বিনাশ করছে। ওই দেখো, মহাবলী অর্জুন এবার সংশপ্তকদের আহ্বানে ওদিকে এগিয়ে গিয়ে ওই সব শত্রুসমূহ সংহার করছে।

মহারাজ শল্যের কথায় কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'শল্য ! আপনি দেখুন এবার সংশপ্তক বীররা ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে চারদিক দিয়ে আক্রমণ করেছে। এখন তাকে ওখানেই শেষ হয়েছে মনে করুন, ও বাণসমুদ্রে ডুবে গেছে।'

শল্য বললেন—'আরে ! যে ব্যক্তি দুই হাতে পৃথিবীকে তুলে ধরতে পারে, ক্রুদ্ধ হলে সে সমস্ত যোদ্ধাকে ভস্ম করতে পারে এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে নামিয়ে দিতে পারে, সে-ই অর্জুনকে পরাজিত করতে সক্ষম। বেচারি সংশপ্তকদের সেই শক্তি কোথায় ?'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! সেনারা যখন সারিবদ্ধ হল অর্জুন সংশপ্তকদের ওপর এবং কর্ণ পাণ্ডবদের ওপর কীভাবে আক্রমণ করল—আমাকে বিস্তারিতভাবে তার বিবরণ দাও।'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! শত্রুসৈন্যকে ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান দেখে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য অর্জুন ব্যূহ-নির্মাণ করলেন। ব্যূহের মুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন দাঁড়িয়ে সেনাদের শোভাবর্ধন করছিলেন। তাঁকে মূর্তিমান কালের ন্যায় দেখাচ্ছিল। দ্রৌপদীর পুত্ররা চারদিকে থেকে তাঁকে রক্ষা করছিলেন। ব্যূহনির্মাণ হয়ে গেলে অর্জুন সংশপ্তকদের দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গাণ্ডীব ধনুকে টংকার তুলে তাদের দিকে ধাবিত হলেন। সংশপ্তকগণও আত্মত্যাগ যুদ্ধের সংকল্প করে জয়াভিলাষ নিয়ে অর্জুনকে বধ করার জন্য তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবদিক থেকে আক্রমণ করতে লাগল। আমরা অর্জুনের সঙ্গে নিবাত কবচের যুদ্ধের যে ভয়ংকর কথা শুনেছিলাম, সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধও তেমনই ভয়ানক ছিল। অর্জুন শত্রুদের ধনুক-বাণ-তলোয়ার ইত্যাদি নানা অস্ত্রশস্ত্র কেটে ফেললেন এবং বহু বীরের মস্তকও দেহচ্যুত করলেন। তিনি প্রথমে পূর্বদিকে অবস্থিত শত্রুদের বধ করে তারপর উত্তরদিকের শত্রু সংহার করলেন। পরে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সৈন্যও শেষ করে দিলেন। প্রলয় কালে রুদ্র যেমন সমস্ত প্রাণী সংহার করেন, তেমনই অর্জুনও ক্রোধে পূর্ণ হয়ে শত্রুসৈন্য বিনাশ করছিলেন।

সেই সময় পাঞ্চাল, চেদি এবং সৃঞ্জয় দেশের বীররা আপনার সৈনিকদের সঙ্গে দারুণ সংগ্রামে রত হয়েছিল। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং শকুনি কোশল, কাশী, মৎস্য, করুষ, কেকয় এবং শূরসেনের দেশের যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ

করছিলেন। সেই যুদ্ধে অসংখ্য বীরের বিনাশ হচ্ছিল। অন্যদিকে দুর্যোধন তাঁর ভাইদের নিয়ে মদ্রদেশের মহারথী এবং প্রধান প্রধান কৌরব বীরের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিদেশের যোদ্ধা ও সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধরত কর্ণকে রক্ষা করছিলেন। সেই সময় কর্ণ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্য সংহার করে, বড় বড় রথীদের আহত করে যুধিষ্ঠিরকে ব্যথিত করে তোলেন। হাজার হাজার শত্রুনাশ করেন। তারপর বাণবর্ষণ করে প্রভদ্রকের সাতাত্তর শ্রেষ্ঠ বীরকে নিধন করেন। পরে পঁচিশজন পাঞ্চাল বীরকে বধ করে শত-সহস্র চেদিদেশের যোদ্ধাদের যমলোকে পাঠিয়ে দেন। সেই সময় দলে দলে পাঞ্চালরথী এসে কর্ণকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেন। তখন কর্ণ পাঁচটি দুর্ভেদ্য বাণ ছুঁড়ে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন এবং শূরসেন—এই পাঁচ পাঞ্চালকে বধ করলেন। এই যোদ্ধারা নিহত হওয়ায় পাঞ্চাল সৈন্যদলে হাহাকার পড়ে গেল। পাঞ্চালদের দশ রথী কর্ণকে ঘিরে ধরলেন, তাই দেখে কর্ণ তীক্ষ্ণ বাণে তাঁদের ধরাশায়ী করলেন। সেই সময় কর্ণের পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য তাঁর দুর্জয় পুত্র সুষেণ এবং সত্যসেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করছিলেন। কর্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বৃষসেন স্বয়ং তাদের পেছনে থেকে পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করছিলেন।

তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ভীমসেন, জনমেজয়, শিখণ্ডী, প্রধান প্রভদ্রকগণ, চেদি,

কেকয়, পাঞ্চাল, মৎস্যদেশীয় বীর এবং নকুল-সহদেব অস্ত্র ও বর্মে সজ্জিত হয়ে কর্ণকে বধ করার ইচ্ছায় তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। কাছে এসে তাঁরা কর্ণের ওপর বাণবর্ষণ করতে শুরু করলেন। কর্ণের পুত্রগণ এবং আপনার পক্ষের অন্যান্য বীররা তাঁদের অগ্রগমন প্রতিহত করলেন। সুষেণ এক ভল্লের আঘাতে ভীমসেনের ধনুক কেটে নারাচের আঘাতে তাঁর বুকে ক্ষত সৃষ্টি করে অত্যন্ত জোরে গর্জন করতে লাগলেন। ভীমসেন তখন অন্য ধনুক নিয়ে সুষেণের ধনুক কেটে দিলেন। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বাণবিদ্ধ করলেন, তাছাড়া কর্ণকেও অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করলেন। দশ বাণে তাঁর পুত্র ভানুসেনকে ঘোড়া-সারথিসহ যমালয়ে পাঠালেন। তারপর ভীম আপনার সেনাদের দমন করতে আরম্ভ করলেন। তিনি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার ধনুক কেটে তাঁদের দুজনকে গুরুতর আহত করলেন। তিনি দুঃশাসন ও শকুনিকে বাণবিদ্ধ করে উলূক এবং পতত্রিকে রথহীন করে দিলেন। তারপর সুষেণকে বললেন—'এবার তোমাকেও বধ করব', বলে হাতে একটি বাণ নিতেই কর্ণ সেটিকে কেটে ফেললেন এবং ভীমকে বাণবিদ্ধ করলেন। ভীম তখন একটি শক্তিশালী বাণ নিয়ে সুষেণকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন ; কর্ণ সেটিও টুকরো টুকরো করে ভীমসেনকে বধ করার জন্য অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। অন্যদিকে সুষেণ ধনুক তুলে নকুলের দুই হাত ও বুক লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। নকুলও বাণের আঘাতে সুষেণকে ঘায়েল করলেন এবং সিংহ গর্জন করে কর্ণকে ভীত করে তুললেন। তাই দেখে সুষেণের ক্রোধের সীমা থাকল না, তিনি নকুল ও সহদেবের ওপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অপরদিকে সাত্যকি এবং বৃষসেনের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। সাত্যকি বৃষসেনের সারথিকে বধ করে ভল্লের আঘাতে তার ধনুকও কেটে দিলেন। তারপর সাতটি ভল্লের আঘাতে তার ঘোড়াগুলিকে বধ করে তার ধ্বজা কেটে এবং তিন বাণে বৃষসেনের বুকে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে বৃষসেনের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে অচেতন হয়ে পড়ল কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে উঠে ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে বৃষসেন সাত্যকির দিকে ধাবিত হলেন। বৃষসেন যখন সাত্যকির দিকে ছুটে আসছিলেন, তখন সাত্যকি দশবাণে তাঁর ঢাল ও তলোয়ার টুকরো টুকরো করে দিলেন।

এইসময় দুঃশাসনের দৃষ্টি বৃষসেনের উপর পড়ল। তিনি বৃষসেনকে রথ ও অস্ত্রহীন অবস্থায় দেখে তাঁকে তৎক্ষণাৎ নিজ রথে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য রথে চড়ালেন। তারপর মহারথী বৃষসেন এসে দ্রৌপদীর পুত্রদের, সাত্যকিকে, ভীমসেনকে, সহদেবকে, নকুলকে, শতানীককে, শিখণ্ডীকে, ধর্মরাজকে এবং অন্যান্য বীরদের অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে অতিষ্ঠ করে পুনরায় কর্ণের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করতে লাগলেন। সাত্যকি নটি তীক্ষ্ণ বাণে দুঃশাসনের সারথি, ঘোড়াগুলি এবং রথ নষ্ট করে তার কপালে তিনটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। দুঃশাসন তখন অন্য রথে চড়ে কর্ণের উৎসাহ এবং বলবৃদ্ধি করার জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

তারপর কর্ণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রেরা, সাত্যকি, ভীমসেন, সহদেব, নকুল, শতানীক, শিখণ্ডী, ধর্মরাজ এবং অন্যান্য বীরেরা অসংখ্য বাণে পীড়িত করে তুললেন। কর্ণও তাঁদের সকলের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁদের ঘোড়া, সারথি, রথ যখন কর্ণের বাণে আচ্ছাদিত হয়ে গেল, তখন তাঁরা বেগতিক দেখে কর্ণকে যাবার রাস্তা ছেড়ে দিলেন। কর্ণ বাণবর্ষণ করে সেইসব মহাধনুর্ধরদের পরাস্ত করে সহজেই গজারোহী সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। চেদিবীরদের ত্রিশজন বীরকে বধ করে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। তখন শিখণ্ডী, সাত্যকি এবং পাণ্ডবরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারদিক থেকে ঘিরে রক্ষা করতে লাগলেন। তেমনই আপনার পক্ষের যোদ্ধারাও কর্ণকে রক্ষা করতে লাগলেন। তখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এবং কর্ণাদি কৌরবরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

———

কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সংগ্রাম, কর্ণের মূর্ছা, কর্ণ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের পরাজয় এবং ভীমের দ্বারা কর্ণের পরাজয়

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কর্ণ সেই সৈন্য ভেদ করে ধর্মরাজকে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা তাঁর ওপর হাজার প্রকার অস্ত্রবর্ষণ করলে, কর্ণ সেগুলি সবই প্রতিহত করলেন। তিনি তাঁর ভয়ংকর বাণে শত্রুদেরও ঘায়েল করে দিলেন। তাদের হাত-পা-মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। কর্ণের বাণে মৃত হয়ে বহু সৈন্য ধরাশায়ী হল, বহু সৈন্য রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। রণভূমি শত্রুসৈন্যের মৃতদেহে ভরে উঠল। কর্ণ সেই সময় প্রাণান্তকারী যমের ন্যায় ক্রোধান্বিত ছিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈনিকরা তাঁকে প্রতিহত করতে চাইলেও, তিনি তাদের অতিক্রম করে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

কর্ণকে কাছে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির ক্রোধে লাল হয়ে তাঁকে বললেন—'সূতপুত্র ! তুমি যুদ্ধে সর্বদা অর্জুনের সঙ্গে দ্বেষ কর আর দুর্যোধনের প্রত্যেক ব্যাপারেই সায় দিয়ে আমাদের কষ্ট দাও। আজ তোমার যে বল ও পরাক্রম আছে, তা প্রদর্শন কর, তোমার মহাপৌরুষ প্রদর্শন কর।' এই বলে তিনি কর্ণকে বাণ বিদ্ধ করতে লাগলেন। সূতপুত্র কর্ণও হাসতে হাসতে তার প্রতিশোধ নিলেন। যুধিষ্ঠির তখন পর্বত বিদীর্ণকারী যমদণ্ডের ন্যায় এক ভয়ংকর বাণ সূতপুত্রকে বধ করার জন্য নিক্ষেপ করলেন, সেই বাণ বিদ্যুতের মতো আওয়াজ করে সবেগে কর্ণের বাম কোমরে প্রবিষ্ট হল। সেই আঘাতে কর্ণ মূর্ছিত হলেন, তাঁর সমস্ত দেহ শিথিল হয়ে হাত থেকে ধনুক রথের ওপর পড়ে গেল । শল্যের সামনে তিনি এমনভাবে পড়লেন মনে হল তাঁর প্রাণই নেই। রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনের কথা ভেবে কর্ণের ওপর আর অস্ত্র চালাননি। কর্ণকে এই অবস্থায় দেখে কৌরবদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে তাঁর মূর্ছা দূর হলে তিনি বিজয় নামক ধনুক তুলে এক তেজঃপূর্ণ বাণে যুধিষ্ঠিরের অগ্রগতিতে বাধা দিলেন। সেইসময় দুজন পাঞ্চাল রাজকুমার যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ রক্ষা করছিলেন, তাঁরা হলেন চন্দ্রদেব এবং দণ্ডধার। কর্ণ তাঁদের ছুরির মতো দুই বাণে বধ করলেন। তাই দেখে যুধিষ্ঠির পুনরায় কর্ণকে ত্রিশ বাণ মারলেন। সেই সঙ্গে সুষেণ এবং সত্যসেনকেও বাণবিদ্ধ করলেন। তারপর নব্বই বাণে শল্য ও সূতপুত্রকে বিদ্ধ করে, তাদের রক্ষাকারী যোদ্ধাদেরও বাণবিদ্ধ করলেন। তখন কর্ণ হেসে নিজের ধনুকে টংকার তুলে বাণ ও ভল্লের আঘাতে যুধিষ্ঠিরকে আহত করে জোরে গর্জন করে উঠলেন। পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে দৌড়ে এসে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার জন্য কর্ণকে বাণে পীড়িত করতে লাগলেন। সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্ররা, প্রভদ্রক, নকুল-সহদেব, ভীমসেন, ধৃষ্টকেতু, কুরুষ, মৎস্য, কেকয়, কাশী এবং কোশল দেশের যোদ্ধা—এরা সকলে কর্ণের ওপর বাণ-বর্ষণ করতে লাগলেন। পাঞ্চাল দেশীয় জনমেজয়ও তাঁকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই নানা অস্ত্রশস্ত্রে কর্ণকে আঘাত করতে লাগলেন। তাই দেখে কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র স্মরণ করলেন, সেই অস্ত্রে সমস্ত দিক আচ্ছাদিত হয়ে গেল। শরাগ্নির তেজে পাণ্ডববীররা দগ্ধ হতে লাগল। তখন কর্ণ হেসে যুধিষ্ঠিরের ধনুক কেটে দিলেন। তারপর মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বর্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে সারা দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণের রথে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ সাত বাণে তা টুকরো টুকরো করে দিলেন। তারপর যুধিষ্ঠির কর্ণের বাহু, ললাট ও মস্তকে চারটি তোমর দ্বারা আঘাত করে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। কর্ণের দেহ থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল। তিনি এক ভল্লের আঘাতে যুধিষ্ঠিরের ধ্বজা কেটে তিন বাণে পুনরায় তাঁকে আহত করলেন। পরাজিত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির অন্য একটি রথে চড়ে রণক্ষেত্রের বাইরে চলে গেলেন। কর্ণ পশ্চাদ্ধাবন করে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে সবলে ধরতে গেলেন ; কিন্তু তখনই কুন্তীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাঁর মনে পড়ে গেল। এদিকে শল্যও বলে উঠলেন—'কর্ণ ! যুধিষ্ঠিরের গায়ে হাত তুলো না, আমার ভয় হয় ধরতে গেলে ইনি তোমাকে ভস্ম না করে ফেলেন।'

একথা শুনে কর্ণ হেসে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে উপহাস করে বললেন—'যুধিষ্ঠির ! যার উচ্চকুলে জন্ম, যে ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থিত, সে ভীত হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে কীকরে পালায় ? আমার বিশ্বাস যে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মের পালনে একনিষ্ঠ নও। তুমি তো সর্বদা ব্রাহ্মণোচিত স্বাধ্যায় ও যজ্ঞে ব্যাপৃত থাক। কুন্তীনন্দন ! এবার থেকে তুমি আর যুদ্ধ করতে এসো না, যোদ্ধাদের সম্মুখীন হয়ো না এবং কোনো অপ্রিয় বাক্যও তাদের বোলো না। যুদ্ধে যদি আমার মতো লোকদের কটুকথা বলো, তাহলে এরূপ অথবা এর থেকেও কঠিন ফল পাবে। রাজন্ ! নিজ শিবিরে ফিরে যাও অথবা যেখানে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ আছে, সেখানেই চলে যাও।' এই বলে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পাণ্ডব সৈন্য সংহারে ব্যাপৃত হলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে গিয়ে শ্রুতকীর্তির রথে বসে কর্ণের পরাক্রম দেখতে লাগলেন। নিজ সেনাদের পালিয়ে যেতে দেখে ধর্মরাজ কুপিত হয়ে যোদ্ধাদের বললেন—'আরে ! যুদ্ধ বন্ধ করে আছ কেন ? কৌরবদের মারো।' রাজার আদেশ পেয়েই ভীমসেনাদি পাণ্ডব-মহারথীগণ আপনার পুত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেইসময় রথ, হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিক সৈনাদের অস্ত্রাদির ভয়ংকর শব্দ উত্থিত হল এবং দুই পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল। সেই আক্রমণের প্রচণ্ড বেগ সহ্য করতে না পেরে আপনার পুত্রের বিশাল সেনা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল।

তাই দেখে দুর্যোধন বিপক্ষের যোদ্ধাদের বাধা দেবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথায় ফিরে এলো না। কর্ণেরও সেদিকে লক্ষ্য পড়েছিল, তিনি কৌরব

সেনাদের পালাতে দেখে মহারাজ শল্যকে বললেন— 'এবার আপনি ভীমের রথের কাছে চলুন।' শল্য ঘোড়াগুলি ভীমের দিকে চালালেন।

কর্ণকে আসতে দেখে ভীম ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সূতপুত্রকে বধ করার জন্য বীরবর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'তোমরা এখন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করো। আমাদের সামনেই তিনি এইমাত্র এক গভীর সংকট থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। দুরাত্মা কর্ণ দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য আমার সামনেই তাঁর সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী তছনছ করে দিয়েছে। আমি এতে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি ; এবার আমি তার প্রতিশোধ নেব। আজ ভয়ানক সংগ্রাম করে হয় আমি কর্ণকে বধ করব, নাহলে ও আমাকে বধ করবে—আমি এই সত্য কথা বলছি। আমি তোমাদের ওপর রাজার ভার দিচ্ছি, তাঁকে রক্ষার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা কোরো।'

এই কথা বলে মহাবাহু ভীমসেন সিংহনাদে সর্বদিক প্রতিধ্বনিত করে কর্ণের দিকে এগোলেন। ভীমসেনকে এগিয়ে আসতে দেখে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বুকে এক নারাচ দিয়ে আঘাত হানলেন। সূতপুত্রের হাতে আহত হয়ে ভীম তাঁকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং তেজঃপূর্ণ

বাণের দ্বারা তাঁকে আঘাত করলেন। তখন কর্ণ ভীমের ধনুকটি দুটুকরো করে দিলেন। ভীম অন্য ধনুক তুলে কর্ণের মর্মস্থানে বাণ নিক্ষেপ করে অত্যন্ত জোরে গর্জন করে উঠলেন। তারপর সূতপুত্রকে বধ করার জন্য পর্বত বিদীর্ণকারী এক বাণ তাঁর দিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্রসম বাণ সবেগে এসে সূতপুত্রের শরীরে আঘাত করল। সেনাপতি কর্ণ অচৈতন্য হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁকে মূর্ছিত দেখে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে রণক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে গেলেন। কর্ণকে এইভাবে পরাস্ত করে ভীমসেন কৌরবসেনাদের মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

ভীমসেনের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুত্র এবং কৌরব যোদ্ধাদের সংহার

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! ভীমসেন কর্ণকে রথের মধ্যে ফেলে দিল তাতে সে তো এ এক দুষ্কর কাজ করল। কর্ণের ভরসাতেই দুর্যোধন আমাকে বারংবার বলত যে, 'কর্ণ একাকীই সমস্ত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দের যুদ্ধে বধ করবে।' এবার ভীমের হাতে কর্ণকে পরাজিত হতে দেখে আমার পুত্র দুর্যোধন কী করল ?

সঞ্জয় বললেন—'মহারাজ ! সেই মহাসংগ্রামে কর্ণকে পরাজিত হতে দেখে দুর্যোধন ভাইদের ডেকে বললেন—'তোমরা শীঘ্র গিয়ে কর্ণকে রক্ষা করো। ভীমসেনের ভয়ে সে সংকটের অগাধ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে।' রাজ আদেশ পেয়ে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভীমকে বধ করার জন্য তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্রুতর্বা, দুর্ধর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, নন্দ, উপনন্দ, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চা, ধনুর্গ্রাহ, দুর্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ মহারথীরা একযোগে ধাবিত হয়ে এসে ভীমসেনকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তারা সকলে একসঙ্গে বাণবর্ষণ করতে লাগল। মহাবলী ভীমসেন তাদের আঘাতে পীড়িত হচ্ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি আপনার পুত্রদের পাঁচশত রথের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে পঞ্চাশ জন রথীকে যমলোকে পাঠালেন। তারপর ক্রুদ্ধ ভীম এক ভল্লের আঘাতে বিবিৎসুর মস্তক ধড় থেকে আলাদা করে দিলেন। বিবিৎসুকে নিহত হতে দেখে সব ভাই ভীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন ভীম দুই ভল্লের আঘাতে আপনার দুই পুত্র বিকট ও সহের প্রাণ হরণ করলেন। ভীমসেন তেজঃপূর্ণ নারাচের আঘাতে ক্রাথকেও যমলোকে পাঠালেন। মহারাজ ! এইভাবে আপনার বীর ধনুর্ধর পুত্ররা নিহত হওয়ায় রণক্ষেত্রে হাহাকার পড়ে গেল। তাদের সেনা সংহার করে ভীম নন্দ এবং উপনন্দকেও মৃত্যুমুখে পাঠালেন। আপনার পুত্র দুর্যোধন তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে

উঠলেন। তিনি ভীমসেনকে প্রলয়কালীন যমরাজের মতো ভয়ংকর জেনে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আপনার এত পুত্র নিহত হয়েছে দেখে কর্ণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তাঁর নির্দেশে শল্য পুনরায় রথ এগোলেন। তারপর একে অপরকে বধ করার জন্য 'বালি ও সুগ্রীবের' ন্যায় ভয়ংকর যুদ্ধে রত হলেন। কর্ণ তাঁর ধনুক তুলে ভীমসেনকে বাণবিদ্ধ করলেন। ভীমসেনও এক ভয়ংকর বাণ নিয়ে কর্ণের ওপর আঘাত হানলেন। সেই বাণ কর্ণের বর্ম ভেদ করে শরীরে আঘাত করল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে কর্ণ অত্যন্ত আহত হলেন এবং কাঁপতে লাগলেন। তারপর রোষান্বিত হয়ে তিনি ভীমকে পঁচিশ বাণ মারলেন এবং ভীমের ধ্বজা কেটে

দিলেন। এক ভল্লের আঘাতে ভীমের সারথিকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন, ভীমের ধনুক কেটে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে অক্লেশে ভীমসেনকে রথচ্যুত করে দিলেন।

রথ ভেঙে যেতেই ভীম গদা হাতে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং সবেগে আপনার সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে গদার আঘাতে একে একে সৈনিকদের সংহার করতে লাগলেন।

পদব্রজে থেকেও তিনি গদার আঘাতে সাতশত গজারোহী সৈনিককে ধ্বজা এবং অস্ত্রশস্ত্র সমেত বিনাশ করলেন। তারপরে শকুনির মহাবলশালী বাহান্নটি হাতিকে বধ করে একশতের অধিক রথ এবং পদাতিক সৈন্যের নিধন করলেন। মাথার ওপর সূর্য তাপ বিকিরণ করছিলেন এবং সামনে ভীমসেন সন্তপ্ত করছিলেন ; তাই সমস্ত যোদ্ধা রণক্ষেত্র ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। ইতিমধ্যে অন্যদিক থেকে পাঁচশত রথী এসে ভীমকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল এবং বাণবর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ভীম গদার আঘাতে তাদের সকলকে যমালয়ে পাঠালেন। সেইসঙ্গে তাদের ধ্বজা-পতাকা এবং অস্ত্রশস্ত্রও নষ্ট করে দিলেন। তারপর শকুনি প্রেরিত তিন হাজার অশ্বারোহী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করলে ভীমসেন অত্যন্ত বেগে তাদের সম্মুখীন হলেন এবং নানাপ্রকার কৌশল করে গদার আঘাতে তাদের বধ করলেন। তারপর ভীম অন্য একটি রথে চড়ে ক্রোধান্বিত হয়ে কর্ণের সামনে পৌঁছে গেলেন।

সেইসময় কর্ণ ও যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করছিলেন। কর্ণ বাণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করে তাঁর সারথিকে মেরে ফেললেন। সারথি না থাকায় ঘোড়া পালাতে লাগল। তাঁর রথকে চলে যেতে দেখে কর্ণ বাণবর্ষণ করতে করতে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কর্ণকে ধর্মরাজের পেছনে যেতে দেখে ভীমসেন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি বাণের দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ আচ্ছাদিত করলেন এবং কর্ণের ওপর তীব্র বাণবর্ষণ করলেন। কর্ণ ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে ভীমকে ঢেকে দিলেন। কর্ণ ও ভীম দুজনেই নিপুণ ধনুর্ধর ছিলেন। সেই সময় তাঁরা পরস্পরের ওপর বিচিত্র সব বাণের আঘাত করতে লাগলেন। আকাশে মেঘের মতো বাণ দেখা যেতে লাগল। যদিও সেই সময় মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র তাপ বিকীরণ করছিল, কিন্তু বাণের আস্তরণ ভেদ করে সেই তপ্ত প্রভা নীচে আসছিল না। সেই সময় শকুনি, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য—এই পাঁচজন পাণ্ডবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁদের যুদ্ধ করতে দেখে পলায়নরত যোদ্ধারা আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এল এবং যুদ্ধে যোগ দিল। সেই সময় ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। বাণের আওয়াজ বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছিল, দুপক্ষের সিংহগর্জনের কোনো বিরাম ছিল না। দুই পক্ষে এমন যুদ্ধ হচ্ছিল যে রক্তের নদী প্রবাহিত হল। বহু সৈনিক তাতে ডুবে মারা গেল। মাংসাশী শ্বাপদের চিৎকার শোনা

যাচ্ছিল। কাক, শৃগালের রব শোনা যাচ্ছিল। কৌরব-সেনারা আর্তনাদ করছিল। তাদের দশা ঝঞ্ঝায় ভগ্ন তরীর মতো হয়ে উঠল।

অর্জুন কর্তৃক সংশপ্তকগণের সংহার

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! যখন সেই ক্ষত্রিয় সংহারকারী ভীষণ যুদ্ধ চলছিল, সেই সময় অন্যদিকে প্রচণ্ড জোরে গাণ্ডীবের টংকার শোনা যাচ্ছিল। সেইদিকে অর্জুন সংশপ্তক এবং নারায়ণী সেনা সংহার করছিলেন। মহারথী সুশর্মা অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করলেন এবং সংশপ্তকগণও তাঁকে তীর নিক্ষেপ করছিল। সুশর্মা অর্জুনকে দশ বাণে বিদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণহস্তেও তিন বাণ মারলেন। পরে এক বাণে অর্জুনের ধ্বজা ছিন্ন করে দিলেন। ধ্বজাতে আঘাত লাগতেই তার ওপর অবস্থিত বিশাল বানর ভীষণ জোরে গর্জন করে সকলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল। তার সেই গর্জন শুনে আপনার সেনারা কম্পিত হল। তারা কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষণিক পর চেতনা ফিরে এলে অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। সকলে অর্জুনের রথ ঘিরে দাঁড়াল। অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাত সহ্য করে তারা রথ ধরে চিৎকার করতে লাগল, কেউ তাঁর চাকা টানতে লাগল, কেউবা দড়ি টানতে লাগল, কেউ শ্রীকৃষ্ণের বাহু ধরে ঝুলে পড়ল, আবার কেউ রথে উঠে অর্জুনকে ধরতে গেল। শ্রীকৃষ্ণ এক ঝটকায় তাদের রথ থেকে ছুঁড়ে দিলেন, অর্জুনও ধাক্কা দিয়ে তাদের মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর উপযুক্ত বাণে তিনি সংশপ্তকদের আচ্ছাদিত করে দিলেন। অর্জুন দেবদত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন। সেই ধ্বনিতে পৃথিবী ও আকাশ গুঞ্জরিত হল। সেই আওয়াজে সংশপ্তকগণ ভয়ে শিহরিত হল। অর্জুন তখন নাগাস্ত্র প্রয়োগ করে তাদের হাত-পা বেঁধে ফেললেন। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে মাটির পুতুলের মতো পড়ে রইল। সেই অবস্থায় অর্জুন তাদের সংহার করতে আরম্ভ করলেন। সংশপ্তকগণও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অর্জুনকে আঘাত করার চেষ্টা করল, কিন্তু হাত-পা বাঁধা থাকায় তারা নড়তে পারছিল না। সেই অবস্থায় অর্জুন তাদের বধ করলেন।

সুশর্মা তখন গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তাতে গরুড় উপস্থিত হয়ে সাপগুলি খেতে থাকলে, অন্য সাপগুলি ভয়ে পালিয়ে গেল। নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জীবিত যোদ্ধাগণ অর্জুনের রথে বাণ ও নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। অর্জুন তখন বাণের দ্বারা তাদের অস্ত্র নিবারণ করে যোদ্ধাদের সংহার করতে লাগলেন। সুশর্মা অর্জুনের বুকে বাণ নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তাতে ভীষণ আঘাত পেয়ে রথের মধ্যে চেতনা হারালেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরলে, তিনি ঐন্দ্রাস্ত্র স্মরণ করেন। তার থেকে হাজার হাজার বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ ছেয়ে গিয়ে আপনার সেনা-হাতি-ঘোড়া বিনাশ করতে লাগল। তাতে সংশপ্তক এবং নারায়ণী সেনারা অত্যন্ত ভীত হল, কেউই তখন আর অর্জুনের সম্মুখীন হতে সাহস পাচ্ছিলেন না। এইসব আমার নিজের চোখে দেখা। অর্জুন সেখানে দশ হাজার যোদ্ধা বধ করেন। সংশপ্তকদের মধ্যে যারা শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিল, তারা বিজয়লাভের এবং বধ করার ইচ্ছায় অর্জুনকে ঘিরে ধরল। তখন সেখানে অর্জুনের সঙ্গে আপনার সৈনিকদের আবার ভয়ংকর যুদ্ধ হল।

কৃপাচার্য কর্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়, সুকেতু বধ, ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা কৃতবর্মা এবং দুর্যোধনের পরাজয় ও কর্ণদ্বারা পাঞ্চালাদি মহারথীদের সংহার

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! কৌরব সেনারা এইভাবে অর্জুনের আঘাতে পীড়িত হচ্ছে দেখে কৃতবর্মা, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, উলূক, শকুনি, দুর্যোধন এবং তাঁর ভাইরা এসে তাদের রক্ষা করলেন। কৃপাচার্য এত বাণবর্ষণ করলেন যে তাঁর বাণে পাঞ্চালরা আচ্ছাদিত হয়ে গেল। তখন শিখণ্ডী ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাদের সম্মুখীন হলেন এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কৃপাচার্য অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। তিনি শিখণ্ডীর বাণবর্ষণ প্রতিহত করে তাঁকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। তারপর তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে তার সারথি ও ঘোড়াগুলিকে যমালয়ে পাঠালেন। শিখণ্ডী তখন সহসা নিজের রথ থেকে লাফিয়ে নেমে হাতে ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে কৃপাচার্যকে আক্রমণ করলেন। তাঁকে আক্রমণ করতে দেখে কৃপাচার্য অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে ঢেকে দিলেন। শিখণ্ডী নিপুণভাবে তলোয়ার ঘুরিয়ে কৃপাচার্যের বাণগুলি কেটে ফেললেন। এই দেখে কৃপাচার্য সত্বর শিখণ্ডীর ঢাল কেটে

দিলেন। শিখণ্ডী তখন তলোয়ার নিয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। কৃপাচার্য বাণের দ্বারা তাঁকে পীড়িত করতে লাগলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে চিত্রকেতু-নন্দন সুকেতু তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে কৃপাচার্যের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শিখণ্ডী যখন দেখলেন কৃপাচার্য সুকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তখন তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সুকেতু তখন কৃপাচার্যের ওপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। তারপর বাণসমেত তাঁর ধনুকটি কেটে সারথির মর্মস্থানে আঘাত হানলেন।

তাই দেখে কৃপাচার্য ত্রিশ বাণে তাঁর মর্মস্থানে আঘাত করলেন। সুকেতুর সারা দেহ সেই আঘাতে কেঁপে উঠল, তিনি অত্যন্ত আহত হলেন। সেই অবস্থায় কৃপাচার্য এক ক্ষুরপ্র মেরে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। সুকেতু নিহত হওয়ায় তাঁর অগ্রগামী সৈনিকরা ভীত হয়ে নানাদিকে পালিয়ে গেল।

অপর দিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কৃতবর্মা যুদ্ধ করছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধভরে কৃতবর্মার বুকে বাণনিক্ষেপ করে তাঁর সেনাদের ওপরে অসংখ্য বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কৃতবর্মাও হাজার বাণে সেই অস্ত্রবর্ষণ প্রতিহত করলেন, তাই দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন এগিয়ে গিয়ে কৃতবর্মার অগ্রগমন প্রতিরোধ করে তৎক্ষণাৎ এক তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে তাঁর সারথিকে যমালয়ে পাঠালেন। এইভাবে মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন বলবান শত্রুকে পরাজিত করে তীরের আঘাতে কৌরব সেনাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। আপনার সৈনিকরা তখন সিংহনাদ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুপক্ষের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল।

সেই দিন অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে, ভীমসেন কৌরবদের এবং কর্ণ পাঞ্চাল ক্ষত্রিয়দের সংহার করছিলেন। অন্য দিকে দুর্যোধন নকুল ও সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে নকুল এবং তাঁর ঘোড়াদের বিদ্ধ করলেন। তারপর এক ক্ষুরাকৃতি বাণে সহদেবের সুবর্ণময় ধ্বজা কেটে ফেললেন। নকুল ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার পুত্রকে একুশ বাণ মারলেন। সহদেবও পাঁচবাণে দুর্যোধনকে আঘাত করলেন। আপনার পুত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তিনি দুই ভাইয়ের বুকে বাণ দিয়ে আঘাত করলেন এবং ভল্লের আঘাতে তাঁদের ধনুক কেটে ফেললেন। তারপর বাণের আঘাতে তাঁদের আহত করে দিলেন।

ধনুক কেটে যাওয়ায় দুই ভাই পুনরায় অন্য ধনুক নিয়ে

দুর্যোধনের ওপর ভীষণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধনও বাণের ঝড় তুলে দুজনকে প্রতিহত করতে লাগলেন। আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর বাণে। সেইসময় তাঁর রূপ প্রলয়কালীন যমরাজের মতো দেখাচ্ছিল। তখনই পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে এসে নকুল-সহদেবকে পেছনে রেখে তাঁর বাণে দুর্যোধনকে প্রতিহত করলেন। আপনার পুত্র হেসে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অসংখ্য বাণে আঘাত করে সিংহনাদ করে উঠলেন। তারপর তীক্ষ্ণ এক ক্ষুরপ্রের সাহায্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক, বাণসহ দস্তানাও কেটে দিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন অন্য ধনুক নিয়ে দুর্যোধনের ওপর পনেরোটি বাণ নিক্ষেপ করলেন, বাণগুলি তাঁর বর্মভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। দুর্যোধন তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি এক ভল্লের আঘাতে আবার ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক কেটে দিলেন এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর ললাটে বাণ মারলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও কর্তিত ধনুক ফেলে পুনরায় অন্য ধনুক ও ভল্ল হাতে নিলেন। পাঁচ ভল্লের আঘাতে দুর্যোধনের সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করলেন, তারপর তিনি দশ ভল্লের আঘাতে দুর্যোধনের ধনুক, রথ, ছত্র, ধ্বজা এবং অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করে দিলেন। রাজা দুর্যোধন রথ ও অস্ত্রশস্ত্রহীন হয়েছেন দেখে তাঁর ভ্রাতারা তাঁকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। দণ্ডধার নামক রাজা তাঁকে নিজ রথে করে রণভূমির বাইরে নিয়ে গেলেন।

তখন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। দুজনে মহাযুদ্ধ বেধে গেল। সেই সময় পাণ্ডব বা কৌরব কেউই পশ্চাদপসরণ করেনি। পাঞ্চাল যোদ্ধারা বিজয় লাভের আশায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কর্ণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কর্ণ তাদের এই আগ্রাসী ভূমিকা দেখে তাদের অগ্রগামী বীরদের বাণ মারতে লাগলেন। তিনি ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্ল, রোচমান ও সিংহসেনকে তাঁর বাণের নিশানা করলেন। ওইসব বীররাও রথ নিয়ে কর্ণকে ঘিরে ধরলেন। কর্ণ অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি সেই আটজন বীরকে তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত করলেন। তারপর কয়েক হাজার যোদ্ধা নিধন করলেন। তারপর জিষ্ণু, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্র, চিত্রায়ুধ, হরি, সিংহকেতু, রোচমান, শলভ এবং চেদিদেশের মহারথীদেরও মৃত্যুমুখে পাঠালেন। এই যুদ্ধে কর্ণ যে পরাক্রম দেখালেন ভীষ্ম,

দ্রোণ অথবা অন্য কেউই তা দেখাতে পারেননি। তিনি গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক—সবই সংহার করছিলেন। কর্ণের পরাক্রম দেখে আমারও মনে হচ্ছিল যে একজন পাঞ্চাল যোদ্ধাও জীবিত থাকবে না।

সেই মহাসংগ্রামে কর্ণকে পাঞ্চাল সেনা সংহার করতে দেখে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে সবেগে তাঁর দিকে এগোলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং অন্য বহুবীর এসে কর্ণকে ঘিরে ধরলেন। শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি ও বহু প্রভদ্রক যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে কর্ণের ওপর অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু গরুড় যেমন একাই বহু সর্প ধ্বংস করে, তেমনই কর্ণও একাই চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বীরদের আঘাত করছিলেন।

কর্ণ যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, সেইসময় ভীমসেন তাঁর যমদণ্ডের ন্যায় বাণের দ্বারা বাহ্লীক, কেকয়, বসাতীয়, মদ্র এবং সিন্ধুদেশের যোদ্ধাদের সংহার করছিলেন। ভীমের বাণে নিহত রথী, অশ্বারোহী, সারথি, পদাতিক যোদ্ধাগণ এবং হাতি ঘোড়ার মৃতদেহে রণক্ষেত্র ভরে উঠল। সমস্ত সৈনিক ভীমসেনের ভয়ে কাঁপতে লাগল। কর্ণ পাণ্ডব সেনা প্রতিরোধ করছিলেন এবং ভীমসেন কৌরববাহিনী উৎখাত করছিলেন—এইভাবে দুই বীর রণভূমিতে বিচরণ করে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন।

অর্জুন কর্তৃক সংশপ্তকদের নিধন এবং অশ্বত্থামার পরাজয়

সঞ্জয় বললেন—একদিকে এই ভয়ংকর সংগ্রাম চলছিল অন্যদিকে অর্জুন সংশপ্তক সেনার বিনাশ করছিলেন। শত্রুদের পরাজিত করে বিজয়ী অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন ! এই সব সংশপ্তকরা আমার বাণের আঘাত সহ্য করতে না পেরে দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে সৃঞ্জয়দের বিশাল সেনাও বিদীর্ণ হচ্ছে। কর্ণ অন্য দিকে আনন্দের সঙ্গে রাজাদের মধ্যে বিচরণ করছে। দেখুন ! ওর পতাকা দেখা যাচ্ছে। আপনি তো জানেন, কর্ণ কত বড় বলশালী ও পরাক্রমী। অন্য কোনো মহারথী তাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে না। সে আমার সেনাদের হটিয়ে দিচ্ছে, সুতরাং ওর দিকে চলুন। এখানকার যুদ্ধ বন্ধ করে মহারথী কর্ণের দিকে যাওয়া দরকার। আমার তো তাই মনে হয়, আপনার কী মত ?

তাই শুনে ভগবান বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! তুমি আগে শীঘ্রই কৌরবদের নাশ করো' —এই বলে গোবিন্দ রথ চালালেন। সেই হংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণের ঘোড়াগুলি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিয়ে আপনার বিশাল সৈন্যের মধ্যে ঢুকে গেল। তাঁরা আসতেই আপনার সেনারা চার দিকে পালাতে লাগল। অর্জুনকে তাঁর সেনার মধ্যে ঢুকতে দেখে দুর্যোধন সংশপ্তকদের পুনরায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। সংশপ্তক যোদ্ধারা এক হাজার রথ, তিন শত হাতি, চোদ্দ হাজার ঘোড়া এবং দু লাখ পদাতিক সৈন্য নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করল। তারা বাণে আচ্ছাদিত করে অর্জুনকে ঘিরে ধরল।

অর্জুন তখন যমরাজের ন্যায় হাতে পাশ নিয়ে ভয়ংকর রূপ প্রকাশ করলেন। তিনি সংশপ্তকদের আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর বিদ্যুতের ন্যায় বাণে সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল। তাঁর ধনুকের টংকার ধ্বনিতে মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র, পর্বত সব যেন ফেটে যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্জুন দশ হাজার সৈন্য শেষ করে দিলেন। তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শত্রুদের অস্ত্রসহ হাত-পা-মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। অর্জুন এইভাবে সংশপ্তকদের চতুরঙ্গিণী সেনা যখন ধ্বংস করছিলেন তখন সুদক্ষিণের ছোট ভাই সেখানে পৌঁছে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন তখন দুটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণে তাঁর দুটি হাত কেটে ক্ষুরের আঘাতে তাঁর চন্দ্রের মতো সুন্দর মস্তক ধড় থেকে পৃথক করে দিলেন। তিনি রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি পড়তেই ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। অর্জুন এক একটি বাণে কম্বোজ, যবন, শক অশ্বারোহী সংহার করছিলেন। তাদের রক্তে রণক্ষেত্রের মাটি লাল হয়ে উঠল। রথী, সারথি, অশ্বারোহী, গজারোহী, মাহুত সব বিনাশ হল। সেই স্থানে ভয়ংকর নর-সংহার হল।

তখন অশ্বত্থামা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন। সেই সময় তাকে ক্রোধে ভরপুর কালের ন্যায় মনে হচ্ছিল। রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি ভয়ংকর অস্ত্রবর্ষণ শুরু করে দিলেন। অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত বাণ নানাদিক থেকে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ওপর আঘাত করতে লাগল। তাঁরা রথের মধ্যেই বাণে আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন। অশ্বত্থামার বাণে প্রথমে তাঁরা দুজনেই মোহগ্রস্ত হয়ে রইলেন, কিছুই করে উঠতে পারলেন না। তাঁদের অবস্থা দেখে সমস্ত জগৎ হাহাকার করে উঠল। অশ্বত্থামা সেই সময় যে পরাক্রম দেখালেন, তা আগে কখনো দেখা যায়নি। দ্রোণপুত্রকে দেখে অর্জুন যুদ্ধক্রুদ্ধ হয়ে ভাবতে লাগলেন যে অশ্বত্থামা তাঁর সমস্ত পরাক্রম হরণ করে নিয়েছেন।

তাই লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমমিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে বললেন—'পার্থ ! তোমার মধ্যে আমি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছি। আজ দ্রোণকুমার তোমার থেকে অনেক বেশি পরাক্রম দেখাচ্ছে। তোমার মধ্যে কি আর পূর্বের মতো পরাক্রম নেই ? তোমার দীর্ঘ বাহু দুটিতে বলের অভাব হয়ে যায়নি তো ? গাণ্ডীব ধনুক তোমার সঙ্গে আছে তো ? তোমাকে এই সব জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য হল যে, আজ যুদ্ধে দ্রোণকুমার তোমার থেকে বেশি বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। তোমার গুরুপুত্র বলে মনে করে ওকে উপেক্ষা কোরো না। এ উপেক্ষা করার সময় নয়।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন চোদ্দটি ভল্ল হাতে নিয়ে তার দ্বারা অশ্বত্থামার ধনুক, ধ্বজা, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি এবং গদা ধ্বংস করে দিলেন। তারপর 'বৎসদন্ত' নামক এক বাণের দ্বারা তার গলায় এত জোরে আঘাত করলেন যে অশ্বত্থামা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তিনি ধ্বজা

ধরে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁকে অচৈতন্য দেখে সারথি অর্জুনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে রণভূমির বাইরে নিয়ে গেলেন। অর্জুন এইভাবে সংশপ্তকদের, ভীম কৌরব যোদ্ধাদের এবং কর্ণ পাঞ্চালদের এক ক্ষণেই বিনাশ করে ফেললেন। বহু বড় বড় বীর এই যুদ্ধে নিহত হল।

অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কর্ণের যুদ্ধ, অশ্বত্থামা দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং অর্জুন দ্বারা অশ্বত্থামার পরাজয়

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! তারপর দুর্যোধন কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন—'রাধানন্দন ! এই যুদ্ধ স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ, যা আমরা স্বতই প্রাপ্ত হয়েছি। সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই এইরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়। আমরা যদি পাণ্ডবদের বধ করে যুদ্ধজয় করি তবে ধনধান্যে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী লাভ করব আর যদি শত্রুর হাতে মারা পড়ি, তাহলে বীরপুরুষের প্রাপ্তি লাভের যোগ্য পুণ্যলোক লাভ করব।'

দুর্যোধনের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত ক্ষত্রিয়রা হর্ষধ্বনি করলেন। সব দিকে রণভেরি বাজতে লাগল। সেইসময় অশ্বত্থামা সেখানে পৌঁছে আপনার যোদ্ধাদের হর্ষোৎফুল্ল করে বললেন—'আপনারা সকলেই দেখেছেন যে আমার পিতা অস্ত্রত্যাগ করে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছে। তার জন্য আমি মর্মাহত তো বটেই, তাছাড়া দুর্যোধনের উপকারও করতে চাই। অতএব হে ক্ষত্রিয়গণ ! আমি আপনাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করা পর্যন্ত আমি আমার বর্মত্যাগ করব না। আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হলে আমার স্বর্গের পথ যেন রুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অর্জুন অথবা ভীমসেন যে-ই আমার সম্মুখীন হবে, তাদের সকলকেই আমি বিনাশ করব এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

অশ্বত্থামার কথা শুনে কৌরব সেনারা একসঙ্গে পাণ্ডবদের আক্রমণ করল। পাণ্ডবরাও তাদের প্রতি আক্রমণ করলেন ; দুইপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। সেই সময় পাণ্ডব পক্ষে যুধিষ্ঠিরের এবং আমাদের পক্ষে কর্ণের প্রাধান্য ছিল। সংশপ্তকদের মধ্যে কিছু সৈন্য তখনও জীবিত ছিল। তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডব-মহারথীগণ সব রাজাদের সঙ্গে নিয়ে কর্ণের ওপর আক্রমণ করলেন। কিন্তু কর্ণ একাকী সকলের অগ্রগতি রোধ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণকে এক বাণ নিক্ষেপ করে বললেন—'আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও ! পালাচ্ছ কোথায় ?' সেকথা শুনে কর্ণ প্রচণ্ড রেগে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক কেটে তার ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের বর্ম কেটে গেল। তিনিও তখন অন্য ধনুক নিয়ে কর্ণকে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কর্ণ তখন মৃত্যু-দণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর বাণ দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আঘাত করলেন। সাত্যকি সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে আসতে দেখে নিজ হস্ত কৌশলে বাণের দ্বারা সেটি সাত টুকরো করে ফেললেন।

তাই দেখে কর্ণ সাত্যকির ওপর চারদিক থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন এবং সাত নারাচ দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। সাত্যকিও কর্ণকে আঘাত করলেন। দুজনে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে গেল। অশ্বত্থামাও এর মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। তিনি এসেই ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—'ওহে ব্রহ্মহত্যার পাপী ! আমি আজ তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। যদি অর্জুন তোমাকে রক্ষা না করে এবং তুমি যদি পরাঙ্মুখ না হও, তাহলে তোমার পাপের সাজা আজ অবশ্যই পাবে।'

এই শুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'আমার তলোয়ারই তোমার কথার উত্তর দেবে যা তোমার পিতাকে যুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল।' এই বলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধভরে এক তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করলেন। অশ্বত্থামা এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অসংখ্য বাণবর্ষণ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের চারদিক ঢেকে দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও কর্ণের চোখের সামনে দ্রোণকুমারকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন এবং তার ধনুকও কেটে দিলেন। অশ্বত্থামা সেই ধনুক ফেলে অন্য ধনুক দ্বারা পলক ফেলার আগেই ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক, শক্তি, গদা, ধ্বজা, সারথি এবং রথ সমস্ত বিনষ্ট করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল-তলোয়ার হাতে নিলে, মহারথী অশ্বত্থামা ভল্লের আঘাতে সেগুলিও টুকরো টুকরো করে দিলেন। সেই সঙ্গে বহু বাণের আঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ঘায়েল করলেন। তা সত্ত্বেও যখন তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ সাধনে সক্ষম হলেন না, তখন

ধনুক ফেলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধরবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি তখন সেইদিকে পড়ল। তিনি অর্জুনকে বললেন—'পার্থ! দেখো অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবার জন্য বহু চেষ্টা করছে। সে যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করতে সক্ষম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কালের মতো গ্রাস করতে আসছে, তুমি শীঘ্র ওকে রক্ষা করো।' এই বলে মহাপ্রতাপশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিকে অশ্বত্থামা ছিলেন, সেইদিকে রথ চালালেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে আসতে দেখে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করলেন। অর্জুন যখন দেখলেন অশ্বত্থামা দ্রুপদকুমারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি তাঁর ওপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করলেন। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত সেই বাণ অশ্বত্থামার দেহে গিয়ে বিঁধতে লাগল। তাতে পীড়িত হয়ে অশ্বত্থামা দ্রুপদকুমারকে ছেড়ে নিজ রথে গিয়ে বসলেন এবং ধনুক হাতে নিয়ে অর্জুনকে বাণবিদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন।

এরমধ্যে সহদেব এসে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজরথে তুলে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। অর্জুন দ্রোণকুমারকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি অর্জুনের হাতে ও বুকে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুন তখন অশ্বত্থামার ওপর কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিক্ষেপ করলেন, সেটি তাঁর কাঁধে গিয়ে আঘাত করল। সেই আঘাতে অশ্বত্থামা বিহ্বল হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন, তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ করছিলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁর সারথি তৎক্ষণাৎ তাঁকে রণক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন।

মহারাজ! এইভাবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংকটমুক্ত এবং অশ্বত্থামাকে আহত হতে দেখে পাঞ্চাল বীররা সিংহনাদ করে উঠলেন। হাজার হাজার দুন্দুভি বেজে উঠল। সকলে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে গর্জন করতে লাগল। তারপর অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'এবার সংশপ্তকদের দিকে চলুন, তাদের বিনাশ করাই এখন আমার প্রধান কাজ।' তাঁর কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যুৎবেগে তাঁর রথকে সংশপ্তকদের দিকে নিয়ে চললেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন কর্তৃক কৌরবদের আক্রমণ এবং ভীমের পরাক্রমের বর্ণনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! যাওয়ার সময় পথে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়ে অর্জুনকে বললেন—'পাণ্ডুনন্দন! ইনি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির। দেখো, একে বধ করবার জন্য এক মহাধনুর্ধর শক্তিমান কৌরব যোদ্ধা অত্যন্ত বেগে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে। তাঁর রক্ষার জন্য তাঁর পেছনে পাঞ্চাল দেশীয় বীররাও যাচ্ছে। রাজা দুর্যোধনও রথী সৈন্য নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের ওপর আক্রমণ করছে। তারও একই উদ্দেশ্য—যুধিষ্ঠিরকে শেষ করা। সেই কাজে তার ভ্রাতারাও তার সঙ্গে রয়েছে। এইসব গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী এবং পদাতিক—সকলেই তাঁকে ধরবার জন্য যাচ্ছে। দেখো, সাত্যকি এবং ভীম যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে তাদের মধ্যপথেই থামাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওদের সংখ্যা বেশি থাকায় ওরা যুধিষ্ঠিরের দিকে এগিয়েই চলেছে। শত্রুসন্তাপকারী যুধিষ্ঠির যদিও অত্যন্ত বলবান, যুদ্ধকলায় নিপুণ এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করেন, তা সত্ত্বেও কর্ণ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। ধৃতরাষ্ট্রের

পুত্র শূরবীর, তার সাহায্য পেলে কর্ণ অবশ্যই আমাদের মহারাজকে বিপদে ফেলতে সক্ষম। ইনি তার সঙ্গে এবং আরও অন্য বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। সেইসব মহারথীরা এক হয়ে তাঁকে পরাস্ত করেছিল। উপবাস করার ফলে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছেন। ব্রাহ্মবলেই (ক্ষমাতেই) তাঁর বেশি নিষ্ঠা, ক্ষাত্রবলে (নিষ্ঠুরতায়) নয়। কর্ণের সঙ্গে যখন তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, তখন থেকেই তিনি অত্যন্ত সংকটে পড়েছেন। কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বলছে, 'তোমরা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বধ করো।' পার্থ ! এই সব মহারথী স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, পাশুপত, নামক অস্ত্রাদির দ্বারা রাজাকে আচ্ছাদিত করছে। তিনি বিপদগ্রস্ত, এই সময় তাঁর বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি করো, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বীররা সবেগে তাঁর পেছনে ধাবিত হয়েছেন। তাঁদের আশা এবং বিশ্বাস, যদি মহারাজ যুধিষ্ঠির পাতালেও প্রবেশ করেন, তাহলেও কৌরবরা তাঁকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে আসবে। এখন দেখ কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে পাঞ্চালদের দিকে ধাবিত হয়েছে। তার রথের ধ্বজা ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে যেতে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে মহাবাহু ভীমসেন, তিনি সৃঞ্জয় বাহিনী এবং সাত্যকিকে নিয়ে এসে আমাদের সেনার মুখে দণ্ডায়মান। পাঞ্চাল যোদ্ধা ও ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণে কৌরবদের আঘাত করছেন। দেখ, কৌরব সেনারা পালাচ্ছে, তাদের গা দিয়ে রক্তধারা প্রবাহমান। তাদের দুর্দশা দেখলে করুণা হয়। দেখ, ভীমসেন এবার শত্রুসেনা সংহার করছেন। তার জন্য কৌরবসেনা গভীর সংকটে পড়েছে। রথারোহীগণ ভীমের ভয়ে থরহরি কম্পিত হচ্ছে। হাতিরা নারাচের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে ধরাশায়ী হচ্ছে। বড় বড় গজরাজও ভীমের বাণে আহত হয়ে নিজ সৈন্যদলকে পদদলিত করে পালাচ্ছে। অর্জুন ! শোন যুদ্ধজয়ী বীর ভীমসেনের সিংহনাদ শোনা যাচ্ছে। দেখ, সে দশবাণে নিষাদরাজের পুত্রকে বধ করেছে। এখন কৌরবদের বাকশক্তি হারিয়ে গেছে। কৌরবপক্ষের রাজারা আর ভীমসেনের দিকে সোজা দৃষ্টিতে দেখতে সাহস পাচ্ছে না। তাঁর বাণের আঘাতে ভীতসন্ত্রস্ত শত্রুরা কোথাও স্বস্তি পাচ্ছে না।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই কথা শুনে অর্জুন ভীমসেনের দুষ্কর পরাক্রমের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তারপর যে কজন জীবিত শত্রু ছিল তাদের বধ করতে লাগলেন। সংশপ্তক যোদ্ধারা বলবান হলেও অর্জুনের আঘাতে দাঁড়াতে পারল না। ভীত হয়ে নানা দিকে পালিয়ে গেল।

উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের ঘোরযুদ্ধ এবং ভীমসেনের পরাক্রম

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের আঘাতে সেনারা যখন কাতর হয়ে পালাতে লাগল, তখন কৌরবরা কী করল ?

সঞ্জয় বললেন— মহারাজ ! সেই সময় মহাবাহু ভীমের দিকে কর্ণের দৃষ্টি পড়ল। তাঁকে দেখেই কর্ণের চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি তাঁকে আক্রমণ করলেন। ভীমসেনের ভয়ে পলায়নরত আপনার সেনাদের তিনি বহু চেষ্টায় আটকালেন এবং তাদের ব্যূহাকারে দাঁড় করিয়ে পাণ্ডবদের দিকে এগোলেন। তা লক্ষ্য করে পাণ্ডবদের মহারথী ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রক প্রমুখ সর্বশক্তি নিয়োগ করে আপনার সৈন্য সংহার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শিখণ্ডী কর্ণের সম্মুখীন হলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বহু সৈন্য নিয়ে দুঃশাসনের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। নকুল বৃষসেনকে এবং যুধিষ্ঠির

চিত্রসেনকে আক্রমণ করলেন। সহদেব উলূকের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। সাত্যকি শকুনিকে এবং দ্রৌপদীর পুত্ররা কৌরবদের আক্রমণ করলেন। মহারথী অশ্বত্থামা অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। কৃপাচার্য যুধামন্যুর সঙ্গে এবং কৃতবর্মা উত্তমৌজার সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়েছিলেন। ভীমসেন একাকী সমগ্র কৌরব এবং তার সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করলেন।

মহারাজ! রণভূমিতে শিখণ্ডী নির্ভয়ে কর্ণকে তাঁর বাণের নিশানা করে অগ্রগতি রোধ করলেন। বাধা পেয়ে কর্ণ আরও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি শিখণ্ডীর ভ্রূমধ্যে বাণ মারলেন, সেইবাণে আহত হয়ে শিখণ্ডী কর্ণকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করলেন। তখন কর্ণ তিন বাণে শিখণ্ডীর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। শিখণ্ডী তাতে অতি ক্রুদ্ধ হয়ে রথ থেকে নেমে কর্ণকে শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন। কিন্তু

কর্ণ সেই শক্তি টুকরো টুকরো করে শিখণ্ডীকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। শিখণ্ডীর দেহে বহু ক্ষতের সৃষ্টি হল ; তাই কর্ণের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। কর্ণ তখন পাণ্ডব সেনাদের বাণের আঘাতে ধরাশায়ী করতে লাগলেন।

অপর দিকে আপনার পুত্র দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পর্যুদস্ত করে তুলেছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন দুঃশাসনের বুকে বাণ নিক্ষেপ করলেন। দুঃশাসনও এক তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা তাঁর বাম হাতে আঘাত করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে এক তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রর আঘাতে দুঃশাসনের ধনুক কেটে দিলেন। তা লক্ষ্য করে পাঞ্চাল যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে উঠল। তখন আপনার পুত্র অক্লেশে আর একটি ধনুক নিয়ে বাণবর্ষণ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। পাঞ্চাল দেশের সৈনিকরাও তাদের সেনাপতির রক্ষার্থে আপনার পুত্রকে ঘিরে ধরল। আপনার সৈন্যদলের সঙ্গে শত্রুপক্ষের ঘোর সংগ্রাম বেধে গেল।

এর মধ্যে বৃষসেন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে নকুলকে বাণের দ্বারা আঘাত করায় নকুলও প্রত্যুত্তরে এক তীক্ষ্ণ নারাচ তাঁর বুকে নিক্ষেপ করলেন। সেই আঘাতে বৃষসেন অত্যন্ত আহত হলেন। তারপর দুই বীর অসংখ্য বাণে একে অপরকে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। কৌরব সেনারা এর মধ্যে ছত্রভঙ্গ হতে আরম্ভ করল। কর্ণ গিয়ে তাদের বাধা দিতে লাগলেন। তারা চলে গেলে নকুল কৌরবদের আক্রমণ করলেন। কর্ণ পুত্র বৃষসেনও নকুলকে আক্রমণ না করে পিতার পার্শ্বদেশ রক্ষাতেই ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

সহদেবও এইভাবে ক্রুদ্ধ উলূকের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন, তিনি উলূকের সারথি ও তাঁর ঘোড়াগুলিকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। উলূক ছুটে গিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তৎক্ষণাৎ ত্রিগর্তের সেনার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

আর এক দিকে সাত্যকি ও শকুনির মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল। সাত্যকি তীক্ষ্ণ বাণে শকুনিকে আঘাত করলেন এবং এক ভল্লের আঘাতে তাঁর ধ্বজা কেটে দিলেন। শকুনি তাতে অতি ক্রুদ্ধ হলেন ; তিনি সাত্যকির কবচ কেটে তার ধ্বজা টুকরো টুকরো করে দিলেন। সাত্যকি পুনরায় তিন বাণে শকুনিকে আঘাত করলেন, সারথিকেও তিনটি বাণ মারলেন এবং ঘোড়াগুলিকেও বধ করলেন। তখন শকুনি হঠাৎ তাঁর রথ থেকে নেমে উলূকের রথে চড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। সাত্যকি এবার আপনার সৈন্যদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর বাণে আহত হয়ে আপনার সৈনিকরা চারদিকে পালাতে লাগল। বহু সৈন্য রণক্ষেত্রে মারা পড়ল।

অপরদিকে, আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। ভীম তখনই তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করলেন। তারপর রথ এবং ধ্বজাও ভেঙে দিলেন। পাণ্ডব-পক্ষের যোদ্ধারা তাই দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হল।

পরাস্ত হয়ে দুর্যোধন ভীমের সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। অন্যদিকে যুধামন্যু কৃপাচার্যকে পরাস্ত করে তৎক্ষণাৎ তাঁর ধনুক কেটে দিলেন। তখন শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী আচার্য কৃপ অন্য ধনুক নিয়ে বাণের দ্বারা যুধামন্যুর রথের ধ্বজা, সারথি ও ছত্র ধরাশায়ী করলেন। যুধামন্যু নিজে রথ চালিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

আর একদিকে উত্তমৌজা বাণবর্ষণ করে কৃতবর্মাকে ঢেকে দিলেন। তারপর দুজনে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। কৃতবর্মা উত্তমৌজার বুকে আঘাত করলেন, তিনি মূর্ছিত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে সারথি তাঁকে রণক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। তখন কৌরবের সমস্ত সেনা ভীমসেনের ওপর একযোগে আক্রমণ হানল। দুঃশাসন ও শকুনি বিপুল সংখ্যক হাতি নিয়ে ভীমসেনকে ঘিরে ধরে তাঁর ওপর অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলেন। গজারোহী সৈন্য দেখে ভীমের ক্রোধের সীমা থাকল না। তিনি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে হাতি দ্বারাই হাতি সংহার করতে লাগলেন। বাণের আঘাতে হাজার হাজার হাতি বধ করলেন। সেইসময় বিদ্যুৎ ধ্বনির ন্যায় ভীমের ধনুকের টংকার শুনে হাতিগুলি মল-মূত্র ত্যাগ করতে করতে পালাতে লাগল। মহারাজ ! ভীমের সেই পরাক্রম প্রাণী সংহারকারী রুদ্রের মতো হয়ে উঠেছিল।

কর্ণের হাতে পরাজিত ও আহত হয়ে বিশ্রামের জন্য যুধিষ্ঠিরের শিবিরে গমন

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! অপর দিকে যুধিষ্ঠিরকে আসতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর সেনা নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে ধরে অসংখ্য ক্ষুরপ্র দ্বারা আঘাত করে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরও ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার পুত্রকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভল্লের দ্বারা আঘাত করলেন। তাই দেখে তাঁকে বন্দী করার জন্য কৌরব যোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুদের বদ মতলব বুঝতে পেরে মহারথী নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থে এলেন। সেখানে এসেই সহদেব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুর্যোধনকে কুড়িটি বাণ মারলেন। কর্ণ তার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সেনা সংহার করতে লাগলেন। তাঁর বাণে আহত হয়ে সেনারা পালিয়ে গেল। রাজা যুধিষ্ঠির তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি পঞ্চাশটি তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। ধর্মরাজ নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ বাণে আপনার সেনা সংহার করতে লাগলেন। আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের যেদিকে দৃষ্টি যাচ্ছিল, সেদিকের সৈন্যই তিনি বিনাশ করে ফেলছিলেন। তা লক্ষ্য করে কর্ণ অত্যন্ত কুপিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের ওপর নারাচ, অর্ধচন্দ্র এবং বৎসদন্ত ইত্যাদির দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরও তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে আঘাত হানলেন। তখন কর্ণ অক্লেশে বাণ ও ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের বুকে আঘাত করলেন। ধর্মরাজ তাতে গভীরভাবে আহত হলেন। তিনি রথের মধ্যে বসে পড়ে সারথিকে সেখান থেকে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁকে যেতে দেখে সব কৌরব সৈন্য একসঙ্গে 'ওকে ধর, ধর' বলে চিৎকার করতে করতে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। এরমধ্যে পাঞ্চাল যোদ্ধাদের সঙ্গে কেকয় বীররা এসে তাদের গতিরোধ করলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির তখন বাণের আঘাতে যথেষ্ট আহত হয়েছিলেন। তিনি নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ধীরে ধীরে অচৈতন্য প্রায় হয়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেও কর্ণ দুর্যোধনের হিতার্থে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করেন। যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বুকে আঘাত হেনে প্রতিশোধ নিলেন। তারপর তিন বাণে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করেন। নকুল-সহদেবও কর্ণের ওপর বাণবর্ষণ করেন। সূতপুত্র কর্ণও তীক্ষ্ণ দুটি ভল্লের দ্বারা নকুল ও সহদেবকে ঘায়েল করেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াগুলিকে মেরে তাদের ধরাশায়ী করেন। এইভাবে নকুলের ঘোড়াগুলিকেও বধ করেন এবং তাঁর রথদণ্ড ও ধনুক কেটে ফেলেন। রথ ভগ্ন হওয়ায় দুই পাণ্ডুপুত্র যুদ্ধে আহত হয়ে সহদেবের রথে গিয়ে বসেন।

দুই ভাগিনেয়কে রথহীন দেখে মাতুল মদ্ররাজ শল্যের করুণা হল। তিনি সূতপুত্রকে বললেন—'কর্ণ ! তোমার তো আজ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা, তাহলে এত মনোযোগ সহকারে ধর্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন ? এঁদের বধ করে তোমার কী লাভ ? ওদিকে দেখ অর্জুন

त्रिपुर विनाशके लिये देवताओंद्वारा शंकरजीकी स्तुति

Gods pray to Lord Śiva for destroying Tripura

भगवान्के द्वारा अर्जुनकी सर्पमुख बाणसे रक्षा

Lord saves Arjuna from Sarpamukha arrow

युधिष्ठिरकी ललकारपर दुर्योधनका पानीसे बाहर निकल आना

Duryodhana comes out of water challanged by Yudhiṣṭhira

भीमसेन अश्वत्थामासे प्राप्त हुई मणि द्रौपदीको दे रहे हैं

Bhīmasena hands over to Draupadī the Maṇi obtained from Aśwatthāmā

शोकाकुल युधिष्ठिरको देवर्षि नारदके द्वारा सान्त्वना
Nārada consoles the aggrieved Yudhiṣṭhira
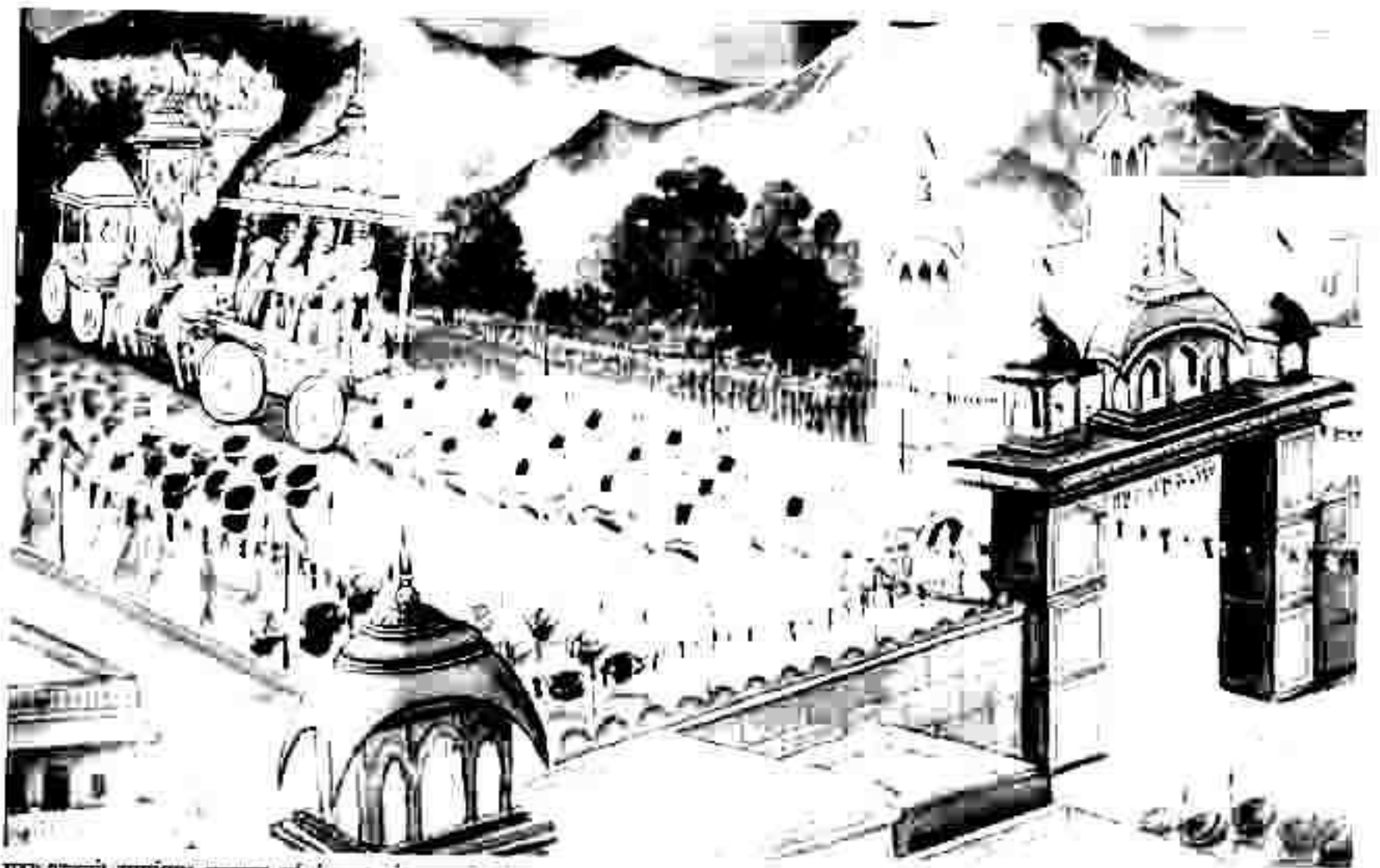
महाभारतको समाप्तिपर महाराज युधिष्ठिरको हस्तिनापुरमा प्रवेश

Yudhisthira enters Hastinapura after Mahabharata ended
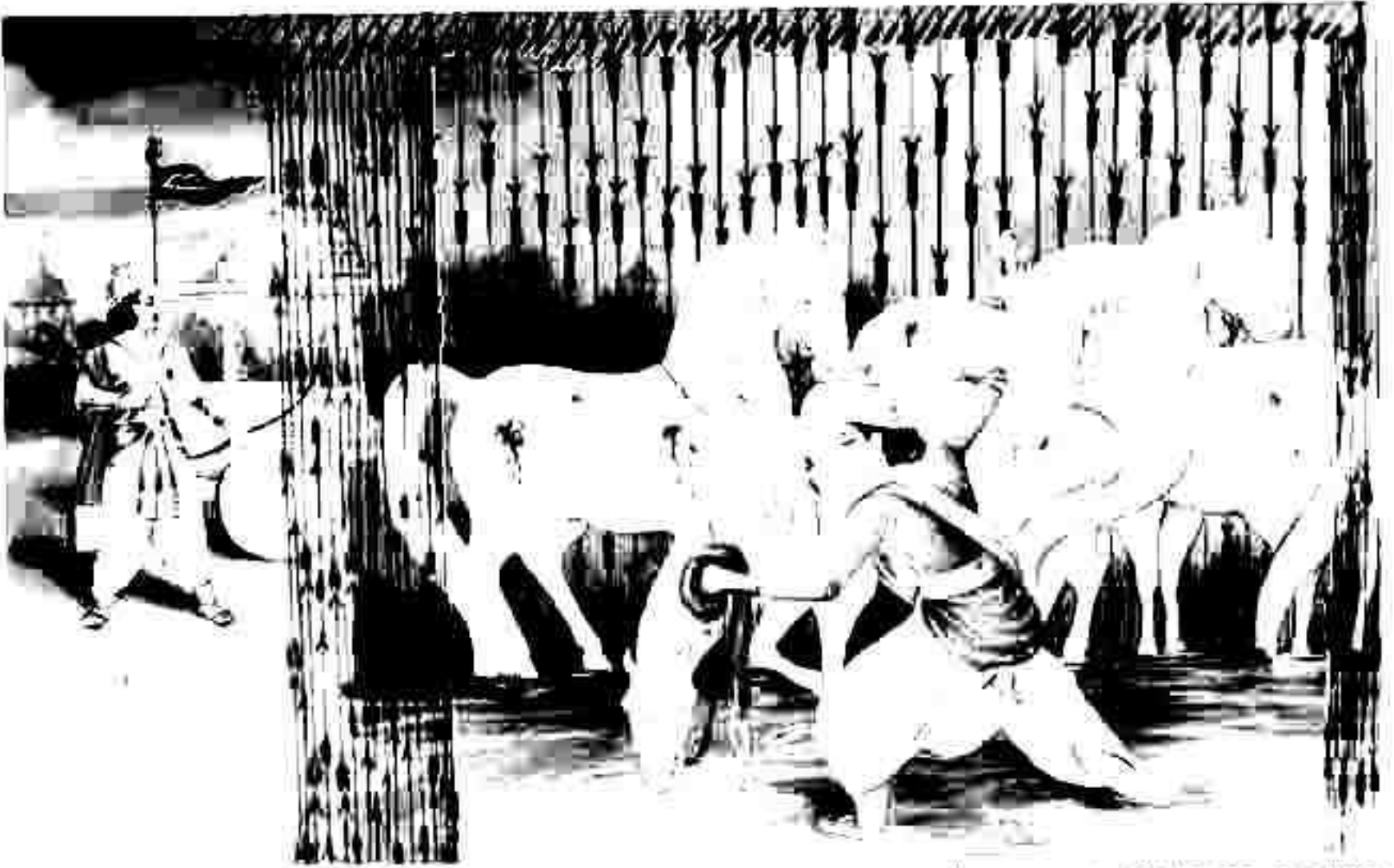
श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनके अश्वोंकी परिचर्या

Krsna nursing the horses of Arjuna

भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा उत्तराके मृत बालकको जिलानेकी घोषणा

The Lord Kṛṣṇa announces enlivenment of Uttarā's still born son

পলকে সেনা সংহার করছে। বাণবর্ষণ করে আমাদের সেনাদের কালের গ্রাসে পাঠাচ্ছে। অন্য দিকে ভীমসেন দুর্যোধনকে গ্রাস করেছে। আমাদের চোখের সামনেই না তাঁকে বধ করে—এই মাদ্রীপুত্রদের বা যুধিষ্ঠিরকে বধ করে কী লাভ হবে ? দুর্যোধনের প্রাণসংকট হয়েছে, গিয়ে তাঁকে রক্ষা করো।'

কর্ণ শল্যের কথায় দেখলেন দুর্যোধন ভীমের হাতে পড়েছেন, তখন তিনি নকুল সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে আপনার পুত্রকে রক্ষা করতে গেলেন। তিনি চলে গেলে যুধিষ্ঠির সহদেবের দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন। রাজা তাঁর পরাজয়ের জন্য লজ্জিত হচ্ছিলেন। নকুল সহদেবের সঙ্গে আহত অবস্থায় শিবিরে পৌঁছে পালঙ্কে শুয়ে রইলেন। কিছু পরে তাঁর দেহক্ষত শুকোলেও হৃদয়ের ক্ষতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর দুই ভ্রাতা মাদ্রী পুত্রদের বললেন—'ভীমসেন মেঘের মতো গর্জন করে যুদ্ধ করছে, তোমরা দুজনে তাকে সাহায্য করার জন্য তার সেনাদের কাছে যাও।' তাঁর অনুমতি পেয়ে নকুল অন্য

রথে চড়লেন, সহদেবের তো রথ ছিলই। দুই ভ্রাতা তাঁদের দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে রথে চড়ে ভীমসেনের সেনাদলের কাছে পৌঁছলেন।

অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার পরাজয়, কর্ণের ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত শিবিরে যাওয়া এবং যুধিষ্ঠিরের তাঁদের কর্ণকে বধ করার উপায় জিজ্ঞাসা করা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সেই সময় অশ্বত্থামা বিশাল এক রথী সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জুনের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁকে আসতে দেখে অর্জুন তাঁর অগ্রগতি রোধ করলেন। তাতে অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তাই দেখে অর্জুন নির্দ্বিধায় দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা সেটি নিবারণ করলেন। সেই সময় অশ্বত্থামাকে বধ করার জন্য যেসব অস্ত্র তিনি প্রয়োগ করলেন, দ্রোণকুমার সে সবই প্রতিহত করলেন। তিনি বাণের দ্বারা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে শ্রীকৃষ্ণের ডান হাতে আঘাত করলেন। অর্জুন তাঁর ঘোড়াগুলিকে আঘাত করে রক্তের নদী বইয়ে দিলেন। তিনি অশ্বত্থামার ধনুক কেটে ফেললেন। তখন অশ্বত্থামা বজ্রের ন্যায় ভয়ংকর পরিঘ নিয়ে অর্জুনকে আঘাত করলেন। অর্জুন সহাস্যে সেটি কেটে ফেললেন, অশ্বত্থামার ক্রোধ তাতে আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তখন অর্জুন মহেন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করে সেটি প্রতিহত করলেন। তারপর বাণের দ্বারা অশ্বত্থামাকে ঢেকে দিলেন। দ্রোণকুমার তাঁর বাণ নিয়ে সেগুলি কেটে দিলেন এবং অসংখ্য বাণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও তাঁর মর্মস্থলে বহু বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং ভল্লের আঘাতে তাঁর সারথিকে ধরাশায়ী করলেন। অশ্বত্থামা তখন নিজেই রথ চালাতে চালাতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে বাণ দ্বারা আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। এর মধ্যে অর্জুন হাসতে হাসতে তাঁর ঘোড়ার রশি ক্ষুরপ্রের দ্বারা কেটে ফেললেন। তখন তাঁর ঘোড়াগুলি বাণের আঘাতে পীড়িত হয়ে পালাতে লাগল। পাণ্ডব সেনারা ও সেই সময় চারদিক থেকে তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করে আপনার সেনাদের বিতাড়িত করতে লাগল। তারা কৌরব সেনাদের এভো

উৎপীড়ন করল যে আপনার পুত্ররা চেষ্টা করেও তাদের পলায়ন রোধ করতে সক্ষম হলেন না।

তখন দুর্যোধন অত্যন্ত স্নেহভরে কর্ণকে বললেন— 'মহাবাহো! দেখ, পাণ্ডবরা আমাদের এই বিশাল সৈন্যকে খুবই কষ্ট দিয়েছে, তুমি থাকা সত্ত্বেও এরা ভীত হয়ে পালাচ্ছে। এখন যা করা উচিত, তাই করো। পাণ্ডবদের তাড়া খেয়ে আমাদের হাজার হাজার যোদ্ধা এখন তোমারই সাহায্য চাইছে।' দুর্যোধনের কথা শুনে কর্ণ হাসতে হাসতে তাঁর ধনুকে ভার্গবাস্ত্র সন্ধান করলেন। তারপর তার থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অগ্নিসম প্রজ্বলিত বাণ প্রকটিত হল। সেই ভয়ংকর বাণে সমস্ত পাণ্ডবসেনা আচ্ছাদিত হল, কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। সেই ভার্গবাস্ত্রের আঘাতে হাজার হাজার হাতি, ঘোড়া, রথী, পদাতিক প্রাণহীন হয়ে পড়তে লাগল। পৃথিবী কেঁপে উঠল, পাণ্ডব সেনারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। কর্ণের আঘাতে পাঞ্চাল ও চেদিদেশের যোদ্ধারা ভয়ে চিৎকার করে পালাতে পালাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে ডাকতে লাগল।

কর্ণের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত সৃঞ্জয়দের আর্তনাদ শুনে কুন্তীনন্দন অর্জুন ভগবান বাসুদেবকে বললেন— 'মহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ! আপনি ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম দেখুন। যুদ্ধে কোনোভাবেই একে বিনাশ করা সম্ভব নয়। ওদিকে কর্ণ তার রথ নিয়ে আমার দিকেই আসছে; এখন তার সামনে থেকে সরে যাওয়া উচিত বলে মনে হয় না।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পার্থ! কর্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে তীব্র আঘাত করেছে। এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তারপর কর্ণকে বধ করো।' এই বলে জনার্দন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এগোলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, যতক্ষণ অর্জুন ধর্মরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, ততক্ষণ কর্ণ যুদ্ধ করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। ভগবানের নির্দেশে অর্জুন রথে করে তাঁর আহত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখতে চললেন। যেতে যেতে তিনি সেনাদের মধ্যে সর্বত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি দ্রুত ভীমসেনের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়?'

ভীম বললেন—'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শিবিরে চলে গেছেন। কর্ণের বাণে আঘাত পেয়ে তিনি খুবই আহত; আশা করি তিনি জীবিত আছেন।'
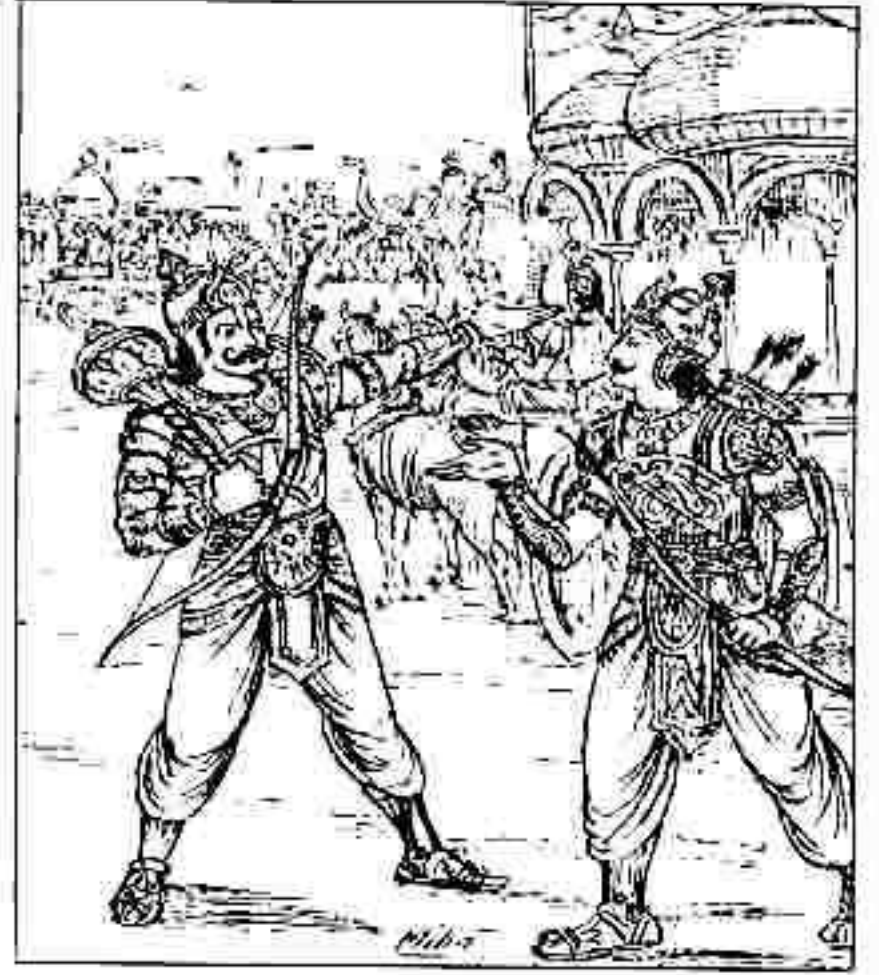
অর্জুন বললেন—'যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আপনি শীঘ্র তাঁর সংবাদ নিন। কর্ণের বাণে গভীরভাবে আহত হয়ে তিনি নিশ্চয়ই শিবিরে গেছেন। তাঁর এখন কী অবস্থা? আপনি শীঘ্রই তাঁর সংবাদ নিয়ে আসুন, ততক্ষণ আমি এইখানে শত্রুসের প্রতিরোধ করছি।'

ভীম বললেন—'অর্জুন! আমি চলে গেলে শত্রুপক্ষের বীররা বলবে ভীমসেন ভয় পেয়েছে। সুতরাং তুমিই গিয়ে মহারাজের সংবাদ নাও।'

অর্জুন বললেন—'আমার শত্রু 'সংশপ্তকরা' সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আজ এদের বধ না করে আমিও এখান থেকে যেতে পারছি না।'

ভীম বললেন—'ধনঞ্জয়! আজ আমি আমার পরাক্রমে ওদের সম্মুখীন হব! তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।'

ভীমসেনের কথা শুনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন— 'হৃষীকেশ! আমি এখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করতে চাই, আপনি শীঘ্র চলুন।' ভগবান তখন গরুড়ের মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়াগুলিকে চালিত করে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে এলেন। তারপর দুজনে রথ থেকে নেমে ধর্মরাজকে প্রণাম করলেন এবং তাঁকে কুশল দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন জানালেন। ধর্মরাজ সেই সময় মনে করেছিলেন

যে কর্ণ মারা গেছেন, তাই তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে বললেন—'দেবকীনন্দন! তোমাকে স্বাগত জানাই। ধনঞ্জয়! তোমাকেও স্বাগত জানাই। তোমাদের দেখে এখন আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি; কারণ তোমরা কুশলে থেকে মহারথী কর্ণকে বধ করেছ। সে সর্ব-অস্ত্রবিদ্যা নিপুণ এবং কৌরবদের অগ্রগামী ছিল। পরশুরাম ওকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে মহাশক্তিশালী করে তুলেছিলেন। যুদ্ধে তাকে হারানো অত্যন্ত কঠিন। কর্ণ বিশ্ববিখ্যাত মহারথী এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিল। দুর্যোধনের হিত সাধনে এবং আমাদের কষ্ট দিতেই সে প্রস্তুত থাকত। আমাদের হিতৈষীদের কাছে সে ছিল কালের ন্যায়। সেই মহাবলী কর্ণকে তোমরা দুজনে বধ করেছ—এ অতি আনন্দের কথা। ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন! কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করেছে। সে আমার দুই চক্ররক্ষক এবং সারথিকেও হত্যা করেছে, ঘোড়াগুলি বধ করে, আমার বহু সৈন্য হত্যা করে আমাকেও পরাজিত করেছে। শুধু তাই নয়, সে আমাকে অপমান করে বহু কটুবাক্য

বলেছে। ধনঞ্জয়! আর কী বলব, আমি এখন ভীমের জন্যই বেঁচে আছি। এই অপমান আমার আর সহ্য হচ্ছে না। কর্ণ আমাকে এত অপমানিত ও আহত করেছে যে আমার আর বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছা নেই। রাজ্য নিয়েই বা আমি আর কী করব? আগে ভীষ্ম, দ্রোণ বা কৃপাচার্যও আমাকে এমন অপমান করেননি, আজ সূতপুত্রের কাছে আমাকে যে পরিমাণ অপমানিত হতে হল। তাই অর্জুন! তোমরা কীভাবে অক্ষত থেকে কর্ণকে বধ করলে? সব সংবাদ আমাকে জানাও। বীরবর! কর্ণের বাণে আমি যখন অত্যন্ত আহত হয়েছিলাম, তখন তাকে বধ করার জন্য আমি তোমাদেরই স্মরণ করেছিলাম, এখন কর্ণকে বধ করে তোমরা সেই আশা সফল করেছ। এবার বলো, সূতপুত্রকে তোমরা কীভাবে বধ করলে?'

—০—

অর্জুনের কাছে কর্ণের জীবিত থাকার সংবাদ পেয়ে অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের ধিক্কার এবং যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত অর্জুনকে ভগবান কর্তৃক ধর্মতত্ত্ব বোঝানো

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অতিরথী বীর অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! আমি যখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে রত, সেই সময় হঠাৎ অশ্বত্থামা বাণবর্ষণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। আমার রথ দেখেই তার সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সেই সেনাদের মধ্যে আমি পাঁচশত বীরকে বধ করে তারপর অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করলাম। অশ্বত্থামা তার তীক্ষ্ণ বাণে আমাকে ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাঘাত করতে লাগল। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় আটশত আটটি বলদ বাণের বোঝা নিয়ে তাকে অনুসরণ করছিল, সেই সমস্ত বাণই সে আমাদের ওপর নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু আমি তার সব বাণই আমার বাণের দ্বারা প্রতিহত করেছি। আমিও তার ওপর বজ্রসম আঘাত হেনেছি। সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় অশ্বত্থামা সূতপুত্রের রথী সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে। কৌরবসেনাদের পরাজিত ও ভীতসন্ত্রস্ত দেখে কর্ণ পঞ্চাশজন প্রধান রথী সহযোগে দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি কর্ণের সৈনিকদের সংহার করে আপনাকে দর্শন করার জন্য কর্ণকে ওখানেই ছেড়ে এসেছি। আমি শুনেছি যে কর্ণ যুদ্ধে আপনাকে অতিমাত্রায় আহত করেছে ; কর্ণ অত্যন্ত ক্রূর, ওর সামনে থেকে সরে এসে আপনি ঠিকই করেছেন। আমার মনে হয় সেই সময় যুদ্ধ থেকে সরে আসাই উচিত ছিল। পাণ্ডবদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আজ কর্ণের পরাক্রম সহ্য করতে সক্ষম। মহারাজ ! সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষা করবেন, রাজকুমার যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা—এঁরা আমার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় থাকবেন। তাহলে আমি এই যুদ্ধে কর্ণকে ধরাশায়ী করব। আপনি যদি চান তাহলে এসে দেখুন আমরা দুজনে কীভাবে একে অপরকে জয়ের চেষ্টা করি। আজ যদি আমি কর্ণকে তার অনুগামী-সহ বধ না করি, তাহলে প্রতিজ্ঞা করে পালন না করায় মানুষের যে দুর্গতি হয়, তা যেন আমি প্রাপ্ত হই। আমি এবার যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আপনার অনুমতি চাইছি। আশীর্বাদ করুন, যেন যুদ্ধে আমি বিজয়লাভ করি। রাজন্ ! আমি সূতপুত্র কর্ণ, তার সেনা এবং সমস্ত শত্রু

সংহার করব।'

যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণের আঘাতে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন, অর্জুনের কাছে তিনি কর্ণের জীবিত থাকার সংবাদ শুনে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন এবং ধনঞ্জয়কে বললেন—'তোমার সেনারা পরাস্ত হয়ে যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে আর তুমি কর্ণকে বধ করতে না পেরে ভীত হয়ে ভীমকে একলা রেখে এখানে পালিয়ে এসেছ, ধিক ! বীরমাতা কুন্তীর গর্ভজাত সন্তানের এ উপযুক্ত কর্ম নয়। দ্বৈতবনে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, তুমি একাই কর্ণকে বধ করবে, অতএব তুমি তাকে জীবিত রেখে এখানে চলে এলে কী করে ? অর্জুন ! তুমি যখন মাত্র সাতদিনের শিশু, তখন দৈববাণী কুন্তীকে বলেছিল যে—'এই বালক ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী হবে, সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করবে, খাণ্ডববনে সমস্ত দেবতা ও প্রাণীদের পরাস্ত করবে। রাজাদের মধ্যে এ মদ্র, কলিঙ্গ, কেকয় এবং কৌরব বীরদের সংহার করবে। জগতে এর থেকে শক্তিশালী কোনো ধনুর্ধর জন্মাবে না। কোনো প্রাণী কখনো একে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। এ সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী এবং জিতেন্দ্রিয় হবে। প্রয়োজন বোধ করলেই সমস্ত প্রাণীদের নিজের অধীনস্থ করবে। চন্দ্রের

মতো এর দেহকান্তি হবে, বায়ুর ন্যায় হবে বেগ। এ স্থৈর্যে মেরু এবং ক্ষমায় পৃথিবীর মতো হবে ; সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, কুবেরের মতো ধনী, ইন্দ্রসম পরাক্রমী এবং ভগবান বিষ্ণুর মতো বলবান হবে। কুন্তী ! অদিতির গর্ভে যেমন শত্রুহন্তা বিষ্ণু জন্ম নিয়েছিলেন, তেমনই এই মহাত্মা পুত্র তোমার গর্ভে জন্ম নিয়েছে। নিজ পক্ষের জয় ও শত্রুপক্ষ সংহারে এর জগৎজোড়া খ্যাতি হবে, এর দ্বারাই বংশ পরম্পরা বিস্তারলাভ করবে।' শত শৃঙ্গ পর্বতের ওপর এইরূপ দৈববাণী হয়েছিল, যা সেখানের অনেক তপস্বী শুনেছেন। কিন্তু তা সত্য হয়নি। এখন দেবতারাও নিশ্চয়ই মিথ্যা বলতে শুরু করেছেন। তোমার প্রশংসাকারী বড় বড় ঋষির মুখেও এই কথা শুনেছি। সেইজন্যই দুর্যোধনের উন্নতিতে আমি কখনোই হতাশ বোধ করিনি এবং আজ পর্যন্ত আমার জানা ছিল না যে তুমি কর্ণকে ভয় পাও। এই অবস্থায় আমি কী করতে পারি ? আজ কৌরব, আমার বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য সমস্ত যোদ্ধাদের সামনে আমাকে সূতপুত্রের বশ্যতা স্বীকার করতে হল, ধিক্ আমার এই জীবনকে। পার্থ ! তোমার মহারথী পুত্র অভিমন্যু যদি আজ জীবিত থাকত তবে সে নিঃসন্দেহে শত্রুপক্ষের সমস্ত যোদ্ধা-মহারথীদের বিনাশ করত। সে জীবিত থাকতে আমাকে কখনো এরূপ অপমান সহ্য করতে হয়নি। ঘটোৎকচ জীবিত থাকলেও আমাকে যুদ্ধে বিমুখ হতে হত না। কিন্তু আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা আর কী বলব, মনে হয় আমার পূর্বজন্মের পাপ অত্যন্ত প্রবল, তাই দুরাত্মা কর্ণ তোমাকে তৃণ সমানও ধর্তব্যের মধ্যে না এনে আমার সঙ্গে ওইরূপ দুর্ব্যবহার করেছে, যা কোনো নির্বান্ধব ও অক্ষম ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়। যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করে, সে-ই সত্যকার বন্ধু ও সুহৃদ—প্রাচীন মুনিরা তাই বলে থাকেন এবং সৎ ব্যক্তিরা সর্বদা তা পালন করেন। কিন্তু তুমি তা করনি। তোমার কাছে বিশ্বকর্মা নির্মিত রথ আছে, যার অক্ষদণ্ড থেকে কখনো শব্দ হয় না এবং যার ধ্বজায় স্বয়ং হনুমান বিরাজমান। উপরন্তু, তোমার হাতে গাণ্ডীব ধনুক বিদ্যমান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার সারথি ! তবুও তুমি কীভাবে কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে ? তোমার যদি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি না থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি অস্ত্রবলে তোমার থেকে বড়, তাকে এই গাণ্ডীব ধনুক দিয়ে দাও। ধিক্ তোমার এই গাণ্ডীব ধনুককে ! তোমার পরাক্রমকেও ধিক্ এবং ধিক্ তোমার এই অসংখ্য

বাণসমূহকে !! অগ্নি প্রদত্ত রথ ও ধ্বজাকেও আমি ধিক্কার জানাই।'

যুধিষ্ঠিরের কথায় অর্জুনের তীব্র ক্রোধ হল। তিনি ধর্মরাজকে বধ করার ইচ্ছায় তলোয়ার হাতে নিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, তিনি ক্রোধ দেখেই অর্জুনের মনের কথা বুঝে বললেন—'অর্জুন ! এ কি ? তুমি তলোয়ার উঠিয়েছ কেন ? এখানে তো এমন কেউ নেই, যার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করবে ? তোমার বধযোগ্য কাউকে তো আমি দেখছি না। তাহলে কাকে বধ করতে চাও ? আমি প্রশ্ন করছি, বল, এখন তুমি কী করবে ভাবছ ?'

শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নে ক্রোধান্বিত অর্জুন যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে বললেন—'গোবিন্দ ! আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, কেউ যদি আমার গাণ্ডীব অন্য কাউকে দিয়ে দিতে বলে, তাহলে আমি তার মাথা কেটে নেব। রাজা আপনার উপস্থিতিতে আমাকে সেই কথা বলেছেন, সুতরাং আমি তাঁকে ক্ষমা করতে পারব না। আজ এঁকে বধ করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব। তাই আমি তলোয়ার হাতে নিয়েছি। এখন আমার কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ? আপনি সমস্ত জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ জানেন ; আপনি যা নির্দেশ দেবেন, আমি তাই করব।'

একথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন —'ধিক্ ! ধিক্ !!' তারপর তিনি অর্জুনকে বললেন—'পার্থ ! আজ বুঝতে পারলাম যে তুমি কখনো বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করনি, তাই

হঠাৎ আজ তোমার এমন ক্রোধ হয়েছে। যে ধর্মবিভাগ জানে, সে কখনো এমন করতে পারে না। এখন তুমি যে আচরণ করলে, এতে তোমার ধর্মভীরুতা এবং অজ্ঞতা প্রকাশ পেল। যে ব্যক্তি না করার উপযুক্ত কাজ করে এবং করার উপযুক্ত কাজ করে না, সে ব্যক্তি অধম। যে স্বয়ং ধর্ম আচরণ করে, শিষ্যের দ্বারা উপাসনা করা হলে তাদের ধর্মোপদেশ দেয় ; ধর্মকে সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে জানা সেই গুরুজনদের এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত, তা তুমি জান না। তাঁদের সিদ্ধান্ত না জানা ব্যক্তিরা কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে তোমার মতোই অসমর্থ ও মোহগ্রস্ত হয়ে যায়। কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, তা জানা অত সহজ নয়। এই জ্ঞান লাভ হয় শাস্ত্র থেকে আর শাস্ত্র সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। অজ্ঞানতাবশত নিজেকে ধর্মবেত্তা মনে করে তুমি যে ধর্মের পালন করতে উদ্যত হয়েছ, তাতে জীবহত্যার পাপ রয়েছে—এই কথা তোমার ন্যায় ধার্মিকদের বোধগম্য হয় না কেন ? সখা ! আমার বিচারে প্রাণী হিংসা না করাই সবথেকে বড় ধর্ম। কারো প্রাণরক্ষার জন্য যদি মিথ্যা বলতে হয়, তো তাই করবে। কিন্তু প্রাণী হত্যা হতে দিও না। তোমার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অন্য সাধারণ মানুষদের মতো নিজ ধর্মজ্ঞ ভাই তথা চক্রবর্তী রাজাকে কেন বধ করতে যাবে ? ভারত ! যে যুদ্ধ করে না, কারো সঙ্গে শত্রুতা রাখে না, রণে বিমুখ হয়ে পালিয়ে যায়, শরণ গ্রহণ করে, হাত জোড় করে থাকে, অসাবধান, এরূপ ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কখনো বধ করা উচিত নয় বলে মনে করেন। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে উপরিউক্ত প্রায় সব ঘটনাই বিদ্যমান। তুমি অবুঝ বালকের মতো আগেই প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ, তাই মূর্খতাবশত অধর্মের কাজ করতে উদ্যত হয়েছ। পার্থ ! বলো তো, ধর্মের দুর্বোধ্য এবং সূক্ষ্ম স্বরূপ ভালোমতো বিচার না করে তুমি কী করে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে প্রস্তুত হলে ? পাণ্ডুনন্দন ! আমি তোমাকে ধর্মরহস্য বলছি। পিতামহ ভীষ্ম, ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির, বিদুর অথবা যশস্বিনী কুন্তী দেবী তোমাকে ধর্মের যে তত্ত্ব উপদেশ দিতে পারতেন, আমি তা ঠিকমতো বলছি, শোনো ! সত্যকথা বলা অতি উত্তম, সত্যের থেকে বড় আর কিছুই নেই, তা সত্ত্বেও সত্যবাদীর কখনো-কখনো সত্যের স্বরূপ ঠিকমতো জানা কঠিন হয়ে পড়ে। সত্যের পালন কীভাবে হয় ? যেখানে সত্যের পরিণাম অসৎ এবং অসত্যের পরিণাম শুভ হয়, সেখানে সত্য না বলে অসত্য বলাই ঠিক। বিবাহকালে, স্ত্রী-প্রসঙ্গে কারো প্রাণ সংকটে পড়লে, সর্বস্ব অপহরণ হওয়ার সময় এবং ব্রাহ্মণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলা যায়। এই পাঁচটি বিষয়ে মিথ্যা বললে পাপ হয় না। যখন কারো সর্বস্ব অপহরণ করা হচ্ছে, তখন সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা কর্তব্য। সেখানে অসত্যই মঙ্গলজনক এবং সত্য পরিত্যাজ্য হয়ে যায়। সেখানে যে ব্যক্তি সত্য বলে তাকে মানুষে মূর্খ বলে মনে করে। প্রথমে সত্য ও অসত্য ভালোভাবে নির্ধারণ করে যা পরিণামে মঙ্গলজনক তাই পালন করা উচিত। কেবলমাত্র বলার দৃষ্টিতে অসত্যরূপ সত্য বলা উচিত নয়। যে ব্যক্তি এরূপ করে, সেই প্রকৃত ধর্মবেত্তা। যে ব্যক্তির বুদ্ধি নিষ্কাম, সেই ব্যক্তি যদি অন্ধ পশু হত্যাকারী বলাক নামক ব্যাধের ন্যায় অত্যন্ত কঠোর কর্ম করেও মহাপুণ্য অর্জন করে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তেমনই যে ব্যক্তি ধর্ম-পালনের ইচ্ছা রেখেও মূর্খ ও ক্রোধী হয়, সেই ব্যক্তি নদীসঙ্গমে বাস করা কৌশিক মুনির মতো অজ্ঞানতাবশত ধর্মপালন করেও যদি মহা পাপভাগী হয়, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।'

অর্জুন বললেন—'ভগবান ! আমাকে বলাক এবং কৌশিক মুনির কথা বলুন, যাতে আমি এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ভারত ! বলাক নামে একটি ব্যাধ

ছিল। সে তার স্ত্রী-পুত্রদের জীবন রক্ষার জন্য মৃগহত্যা করত, কোনো কামনা-বাসনার বশীভূত হয়ে নয়। সে বৃদ্ধ মাতা-পিতা এবং আশ্রিত জনেরও পালন-পোষণ করত। সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত থাকত, সত্য বলত এবং কখনো কাউকে নিন্দা করত না। একদিন সে মৃগবধের জন্য বনে গেছে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে সেইদিন কোনো মৃগের দেখা পেল না। এরমধ্যে সে দেখল একটি পশু জলপান করছে, সেই পশুটি অন্ধ হওয়ায় ঘ্রাণের সাহায্যে সব কাজ করছিল। ব্যাধ আগে কখনো ওইরূপ জানোয়ার দেখেনি, তা সত্ত্বেও সে তাকে মেরে ফেলল। অন্ধ পশুটি মারা যেতেই আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ব্যাধকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বর্গ থেকে এক বিমান নেমে এল। তারমধ্যে অপ্সরারা মনোরম গীতবাদ্য করছিল। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, ওই জন্তুটি পূর্বজন্মে তপস্যা করে সমস্ত প্রাণী সংহার করার বর প্রাপ্ত হয়েছিল, তাই ব্রহ্মা তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই প্রাণীটি সমস্ত জীবকে ধ্বংস করে দেবার জন্য মনঃস্থির করেছিল, তাই তাকে বধ করে ব্যাধ স্বর্গে গমন করেছিল। অতএব ধর্মের স্বরূপ বোঝা প্রকৃতই কঠিন।

সেইরূপ কৌশিক নামে এক তপস্বী ছিলেন, তিনি তেমন শাস্ত্রবিদ্যা জানতেন না। গ্রামের থেকে দূরে নদীর সঙ্গমস্থলে তিনি বাস করতেন। তিনি সত্যকথা বলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি 'সত্যবাদী' বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদিন কয়েকজন লোক ডাকাতের ভয়ে তাঁর আশ্রমের পাশে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। ডাকাতরা তাদের অনেক অনুসন্ধান করছিল খুঁজে পাওয়ার জন্য। তারা সত্যবাদী কৌশিক ঋষির কাছে এসে বলল—'মুনিবর ! কয়েকজন ব্যক্তি এদিকে এসেছিল, তারা কোন দিকে গেছে ? আমরা সত্য কথা জানতে চাই, আপনি যদি জানেন, তাহলে আমাদের দয়া করে বলুন।' তাদের কথায় কৌশিক ঋষি সত্যকথা জানালেন—'এই বনে, যেখানে ঘন লতা-গুল্ম-বৃক্ষ রয়েছে, তারা ওইদিকেই গেছে।' খবর পেয়ে সেই নির্দয় ডাকাতরা তাদের ধরে ফেলে বধ করল। কিংবদন্তীতে এইরকমই আছে।

এইভাবে বাক্যকে অপব্যবহার করায় ব্রাহ্মণের মহাপাপ হল এবং সেই পাপের জন্য তাঁকে নরকভোগ করতে হল ; কারণ ঋষি ধর্মের সূক্ষ্ম স্বরূপ অবিদিত ছিলেন। এইরূপ যারা শাস্ত্রসম্বন্ধে বেশি কিছু জানে না ; মূর্খ, ধর্মের বিভাগগুলি জানে না, সেই ব্যক্তিরা যদি বৃদ্ধ-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে জেনে নিজেদের সন্দেহ দূর না করে, তাহলে তাদের নরক ভোগের মতো মহাকষ্ট ভোগ করতে হয়। এখন তোমার জন্য সংক্ষেপে ধর্মের স্বরূপ জানাচ্ছি। অনেকেই 'পরমজ্ঞান' রূপ ধর্মকে তর্কের দ্বারা জানার চেষ্টা করে থাকে আবার অনেকে বলে থাকেন যে বেদের থেকেই ধর্মজ্ঞান হয়। এক্ষণে আমি যে ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করছি, তা সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখেই করছি। ধর্মের সিদ্ধান্ত হল যে, যা অহিংসাযুক্ত তাই ধর্ম। হিংস্রদের হিংসা থেকে প্রতিহত করার জন্যই ধর্মের এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্মই প্রজাদের ধারণ করে এবং ধারণ করার জন্যই তাকে ধর্ম বলা হয় ; তাই যা প্রাণরক্ষার সঙ্গে যুক্ত—যাতে কোনো প্রাণীকেই অনিষ্ট করা হয় না, ধর্মবেত্তাদের সিদ্ধান্ত হল, সেটিই ধর্ম। যারা অন্যায়ভাবে অর্থ হরণ করার ইচ্ছায় অপরকে দিয়ে সাক্ষী দানে বাধ্য করে, সেখানে মৌন থাকলে যদি অপহরণকারী রক্ষা পায়, তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চুপ থাকা উচিত। কিন্তু বলা যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং কথা না বললে যদি ডাকাতদের সন্দেহ পুষ্টি হয়, তাহলে সেখানে মিথ্যা বলা উচিত। বিনা বিচারে একেই সত্য বলে জানবে। মনীষী বিদ্বানরা বলেন যে, যে ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য প্রতিজ্ঞা করে এবং অন্যভাবে সেটির পালন করে, তার সেই কাজের ফল প্রাপ্তি হয় না। প্রাণসংকটে, বিবাহে, আত্মীয়স্বজনদের প্রাণান্তের সময় বা হাস্য-পরিহাসের সময় যদি অসত্য বলা হয়, তাহলে তা অসত্য বলে পরিগণিত হয় না। ধর্মতত্ত্বজ্ঞানী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই সময় মিথ্যা বলাকে পাপ বলে মনে করেন না। যেখানে ডাকাতদের হাতে ধরা পড়ার থেকে মিথ্যা বললে রেহাই পাওয়া যায়, সেখানে মিথ্যা বলাই উচিত। নিঃসন্দেহে সেটিকে সত্য বলেই জানবে। যতদূর সম্ভব ডাকাতদের অর্থ না দেওয়া উচিত ; কারণ পাপীদের ধন দান করলে দাতা দুঃখ পায়। সুতরাং ধর্মের জন্য মিথ্যা বললেও, তাতে দোষ হয় না। অর্জুন ! আমি তোমার মঙ্গল চাই, তাই আমার বুদ্ধি ও ধর্ম অনুসারে তোমাকে আমি সংক্ষেপে ধর্মের লক্ষণ জানালাম। এগুলি শুনে এবার তুমি বল, এখনো কি তোমার যুধিষ্ঠিরকে বধ করা উচিত বলে মনে হয় ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ভ্রাতৃবধ এবং আত্মহত্যা থেকে রক্ষা এবং যুধিষ্ঠিরকে বনগমন থেকে প্রতিহত করা

অর্জুন বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! কোনো শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষ যেমন উপদেশ দিতে সক্ষম এবং যে অনুসারে আচরণ করলে আমাদের কল্যাণ হওয়া সম্ভব, আপনি তেমন কথাই বলেছেন। আপনি আমাদের পরম অভিভাবক, পরমগতি, সেইজন্য আপনি অতি উত্তম কথা বলেছেন। ত্রিলোকে এমন কিছু নেই, যা আপনার অবিদিত। সুতরাং আপনি পরম ধর্মকে পূর্ণরূপে এবং সম্যকভাবে জানেন। আমি এখন আর রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করা উচিত বলে মনে করি না। আমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করে এমন কিছু বলুন, যাতে আমার প্রতিজ্ঞা পালনও হয় আবার রাজাকে বধ করতে না হয়।

প্রভু ! আপনি তো আমার ব্রত জানেন। কোন মানুষ যদি আমাকে বলে যে 'তুমি তোমার গাণ্ডীব ধনুক এমন কোনো বীরকে প্রদান করো, যিনি অস্ত্রবিদ্যা ও পরাক্রমে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ' তাহলে আমি তার প্রাণ হরণ করব। তেমনই ভীমসেনকে যদি কেউ শ্মশ্রুগুম্ফহীন অথবা খাদ্যলোভী বলে, তাহলে তিনিও তাকে বধ করবেন। রাজা আপনার উপস্থিতিতেই আমাকে বলেছেন যে 'তুমি তোমার ধনুক উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে দাও', এই অবস্থায় আমি যদি এঁকে বধ করি, তাহলে আমি এক মুহূর্তও যুধিষ্ঠির ছাড়া এই জগতে থাকতে পারব না ; আর যদি এঁকে বধ না করি, তাহলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ থেকে কীভাবে মুক্ত হব ? কী করব ? আমি কিছুই স্থির করতে পারছি না। কৃষ্ণ ! জগতের লোকের কাছে আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হোক এবং রাজা যুধিষ্ঠির ও আমার জীবন সুরক্ষিত থাকুক—সেই মতো কোনো পরামর্শ দিন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বীরবর ! শোনো, রাজা যুধিষ্ঠির ক্লান্ত এবং খুবই দুঃখিত হয়েছেন। কর্ণ তীক্ষ্ণবাণে তাঁকে অত্যন্ত আহত করেছে। শুধু তাই নয়, উনি যখন যুদ্ধ করছিলেন না, তখনও কর্ণ এঁকে বাণদ্বারা আঘাত করেছে। তাই দুঃখে ও রাগে উনি তোমাকে কয়েকটি কথা বলে ফেলেছেন। উনি জানেন যে পাপী কর্ণকে একমাত্র তুমিই বধ করতে সক্ষম এবং সে নিহত হলে কৌরবদের শীঘ্রই হারানো সম্ভব। সেইজনাই তিনি ওইসব বলেছিলেন ; তার জন্য এঁকে বধ করা উচিত নয়। অর্জুন ! তোমার যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হয়, তাহলে যে উপায়ে ইনি জীবিত থেকেও মৃতের মতো হন, তা বলছি, শোনো ! এই উপায়টি তোমারও উপযুক্ত মনে হবে। সম্মানীয় ব্যক্তি যতক্ষণ জগতে সম্মান লাভ করেন, ততক্ষণই তাঁকে জীবিত বলে মনে করা হয়, যখন তাঁকে রূঢ় অপমান করা হয়, তখন তাঁকে বেঁচে থাকলেও 'মৃত' বলে মনে করা হয়। তুমি, ভীমসেন, নকুল-সহদেব, অন্য বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং বীররা রাজা যুধিষ্ঠিরকে সর্বদাই সম্মান কর। আজ তুমি তাঁকে একটু অপমানিত করো। যুধিষ্ঠির পূজনীয় হওয়ায় তাকে 'আপনি' বলা উচিত, তবুও তুমি তাঁকে 'তুই' বলে দাও। গুরুজনকে 'তুই' বলা তাঁকে বধ করার মতো বলেই মনে করা হয়। এক সর্বোত্তম শ্রুতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যার দেবতা হলেন অথর্বা এবং অঙ্গিরা নিজ হিতাকাঙ্ক্ষীদের বিনা বিচারেই সেটির পালন করা উচিত। সেই শ্রুতির ভাব হল যে—'গুরুকে তুই বলা তাঁকে বধ না করে মারার সমতুল্য। তাই আমি বলছি, সেই অনুসারে তুমি ধর্মরাজের প্রতি তুই শব্দের প্রয়োগ করো। তোমার মুখ থেকে 'তুই' শব্দ শুনলে ধর্মরাজ তাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মনে করবেন। তারপর তুমি তাঁকে প্রণাম করে সান্ত্বনা দিয়ে তোমার অনুচিত বাক্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ধর্মজ্ঞ। তিনি

তোমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। এইভাবে তুমি মিথ্যাভাষণ ও ভ্রাতৃবধের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্নতা সহকারে সূতপুত্র কর্ণকে বধ করো।'

সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন তাঁর খুব প্রশংসা করলেন এবং ধর্মরাজের প্রতি এমন কটুকথা বলতে লাগলেন, যা আগে কখনো বলেননি। তিনি বললেন—'তুই চুপ কর, কথা বলিস না, তুই তো নিজেই যুদ্ধ থেকে এক ক্রোশ দূরে পালিয়ে এসেছিল, তুই কী নিন্দা

করবি? হ্যাঁ, ভীমসেনের আমাকে নিন্দা করার অধিকার আছে; কারণ তিনি জগতের সমস্ত প্রসিদ্ধ বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন; শত্রুকে আঘাত করছেন। অসংখ্য বীর, বহু রাজা, রথী, অশ্বারোহী, হাজার হাজার হাতিকে মৃত্যুমুখে পৌঁছে কাম্বোজ এবং পার্বত্য যোদ্ধাদের এমনভাবে বিনষ্ট করছেন, যেমন সিংহ মৃগদের করে। তুই তোর কটুবাক্যের দ্বারা আমাকে আর আঘাত করিস না, আমার ক্রোধ আর বাড়াস না।'

অর্জুন ধর্মভীরু ছিলেন, যুধিষ্ঠিরকে এরূপ কঠোর বাক্য বলে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। আমি খুব বড় পাপ করেছি মনে করে তাঁর মনে ভয়ানক দুঃখ হল। উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে তিনি আবার তলোয়ার তুললেন। তা লক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন! একি? আবার কেন তলোয়ার তুলছ? আমাকে বলো, তোমার ইচ্ছাপূরণ করার জন্য আমি অন্য কোনো উপায় জানাব।'

অর্জুন পুরুষোত্তমের কথা শুনে দুঃখিত হৃদয়ে বললেন—'হে কৃষ্ণ! আমি জেদ করে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করে মহাপাপ করেছি, তাই আজ আমি আমার দেহকে বিনাশ করে ফেলব।' অর্জুনের কথা শুনে ভগবান বললেন—'পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠিরকে শুধু 'তুই' বলে তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ কেন? উঃ! শুধু এইজন্য তুমি আত্মঘাতী হতে চাও? অর্জুন! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কখনো এমন কাজ করেন না। ধর্মের স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। অজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে তা আরও শক্ত। এখানে তোমার কী কর্তব্য, বলছি শোনো। ভ্রাতৃবধ করলে যে নরক প্রাপ্ত হয়, আত্মঘাতী হলে তার থেকেও ভয়ানক নরক ভোগ হয়। অতএব এখন তুমি নিজ মুখে নিজের গুণ ব্যাখ্যা কর, তাহলে তোমার নিজের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে বলে ধরে নেওয়া হবে।'

একথা শুনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কথার জন্য অভিনন্দন জানালেন এবং 'তথাস্তু' বলে ধনুকটি অবনমিত করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্! আমার গুণাবলী শুনুন। পিণাকপাণি ভগবান শংকর ব্যতীত আমার মতো ধনুর্ধর আর কেউ নেই; তিনিও আমার বীরত্বে চমৎকৃত। আমি ইচ্ছা করলে সমস্ত জগৎ চরাচর এক মুহূর্তে বিনাশ করতে পারি। আমার চরণে রথ ও ধ্বজা চিহ্ন আছে। আমার মতো বীর যদি যুদ্ধে যান, তাহলে কেউই তাকে পরাজিত করতে পারে না। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—সব দিকের রাজাদেরই আমি পরাভূত করেছি।'

'কৃষ্ণ! এখন আমরা দুজনে বিজয়শালী রথে করে সূতপুত্র কর্ণকে বধ করার জন্য শীঘ্রই রওনা হব। রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হোন, আমি কর্ণকে আজ বিনাশ করব।' একথা বলে তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'আজ হয় কর্ণের মাতা পুত্রহীন হবেন, নাহলে মাতা কুন্তী অর্জুনহীন হবেন। আমি শপথ করে বলছি, কর্ণকে বধ না করে আমি বর্ম পরিত্যাগ করব না।'

এই বলে অর্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁর অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। তারপর লজ্জিত হয়ে যুধিষ্ঠির-চরণে মাথা ঠেকিয়ে, হাত জোড় করে বললেন—'মহারাজ! আমি যা বলেছি, তার জন্য ক্ষমা করুন এবং প্রসন্ন হোন। আমি আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। আমি এখন সর্বভাবে চেষ্টা করে ভীমসেনকে যুদ্ধে বিরত করে সূতপুত্র কর্ণকে বধ করার জন্য যাচ্ছি। রাজন্! আমি সত্য বলছি, আমার জীবন

আপনার প্রিয় কার্য করার জন্যই রয়েছে।' এই বলে তিনি রাজার দুই চরণ স্পর্শ করে রণভূমিতে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের কঠোর বাক্য শুনে পালঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর হৃদয় অনুশোচনায় ভরে গিয়েছিল, তিনি বললেন—'পার্থ ! আমি ভালো কাজ করিনি, তাই তোমাদের নিকট এই সংকট উপস্থিত হয়েছে। আমার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, আমি অলস এবং কাপুরুষ। সুতরাং আজ আমি বনে চলে যাচ্ছি। আমি না থাকলে তোমরা সুখে থাকবে। মহাত্মা ভীমসেন রাজা হওয়ার উপযুক্ত, আমি ক্রোধী এবং কাপুরুষ। তোমার কঠোর বাক্য সহ্য করার শক্তি আমার নেই। এত অপমানিত হয়ে আমার

বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।' এই বলে তিনি বনগমন করতে উদ্যত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাই দেখে তাঁকে প্রণাম করে বললেন—'রাজন্ ! আপনি তো অর্জুনের প্রতিজ্ঞা জানেন যে, যে কেউ তার গাণ্ডীব ধনুক অন্যকে প্রত্যর্পণের কথা বলবে, তাকেই অর্জুন বধ করবে। তা সত্ত্বেও আপনি ওকে সেই কথা বলেছেন। তাই অর্জুন তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য আমার কথায় আপনাকে অসম্মান করেছে। গুরুজনদের অসম্মান করাকেই বধ করা বলে। তাই আমি ও অর্জুন সত্যরক্ষার জন্য আপনার সঙ্গে যে ন্যায় বিরুদ্ধ আচরণ করেছি, তা আপনি ক্ষমা করুন। আমরা দুজনেই আপনার শরণাগত। আমিও অপরাধ করেছি, আপনার চরণ ধরে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি, আমাকেও আপনি ক্ষমা করুন। আজ পৃথিবী কর্ণের রক্তপান করবে, আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, কর্ণ বধ হয়ে গেছে মনে করুন।'

ভগবানের কথা শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে চরণপ্রান্ত থেকে তুলে হাত জোড় করে বললেন—'গোবিন্দ ! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, সত্যই আমার ভুল হয়ে গেছে। মাধব, আপনি এই রহস্য জানিয়ে আমাকে কৃপা করেছেন, অতলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আজ আপনি আমাদের ভীষণ বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনার মতো মিত্রকে পেয়েই আমরা দুটি মহাসংকট-সমুদ্র পার হয়েছি। আমরা অজ্ঞতাবশত মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম, আপনার বুদ্ধিরূপ নৌকার সাহায্যেই মন্ত্রীসহ শোকসাগর পার হয়েছি। হে অচ্যুত ! আমরা আপনাকে পেয়ে সনাথ হয়েছি।'

যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্জুনের ক্ষমা প্রার্থনা, অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ প্রদান, অর্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা অর্জুনের পরাক্রম বর্ণনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! ধর্মরাজের প্রেমপূর্ণ কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই কথা জানালেন। এদিকে অর্জুনও ভগবানের কথানুসারে যুধিষ্ঠিরকে যা বলেছিলেন তাতে 'ভীষণ পাপ হয়েছে' মনে করে পুনরায় অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সহাস্যে তাঁকে বললেন—'অর্জুন ! রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তুই' বলাতেই যদি তুমি এত দুঃখে ডুবে গেছ, তাহলে রাজাকে বধ করলে তোমার কী অবস্থা হত ? সত্যই ধর্মের স্বরূপ জানা অত্যন্ত কঠিন। যারা অল্পবুদ্ধি, তাদের পক্ষে তো আরও মুশকিল। তুমি ধর্মভীরু হওয়ায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করে অবশ্যই

ঘোর অন্ধকারে ডুবে যেতে, ভয়ংকর নরকে পতিত হতে। এখন আমার কথা হল, তুমি কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকেই প্রসন্ন করো। তিনি প্রসন্ন হলে আমরা শীঘ্রই সূতপুত্র কর্ণকে বধ

করতে রওনা হব।'

অর্জুন তখন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং রাজার চরণে পতিত হয়ে বললেন—'রাজন্ ! ধর্মপালনের জন্য ভীত হয়ে আমি যা কিছু বলেছি, সেসব ক্ষমা করে আমার ওপর প্রসন্ন হোন।' ধর্মরাজ দেখলেন অর্জুন তাঁর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদছেন, তখন তিনি তাঁর ভাইকে বুকে তুলে সস্নেহে আলিঙ্গন করে নিজেও কাঁদতে লাগলেন। দুই ভাই অনেকক্ষণ বিলাপ করার পরে দুজনেই প্রেম-প্রীতি ও প্রসন্নতায় ভরে উঠলেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় অর্জুনকে প্রীতি সহকারে আলিঙ্গন করলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করে প্রসন্ন চিত্তে বললেন—'মহাবাহো ! আমি যুদ্ধে পূর্ণশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করছিলাম, কিন্তু কর্ণ সমস্ত সৈনিকের সমক্ষে আমার বর্ম, রথের ধ্বজা, অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া বিনষ্ট করে। কর্ণের সেই কর্ম স্মরণ করে আমি দুঃখভারে পীড়িত হচ্ছি, বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। আজ যদি তোমরা ওকে বধ করতে না পারো, তাহলে অবশ্যই আমি প্রাণ বিসর্জন দেব।'

তাঁর কথা শুনে অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! আমি নকুল-সহদেব ও ভীমসেনের নামে এবং নিজের অস্ত্র ছুঁয়ে
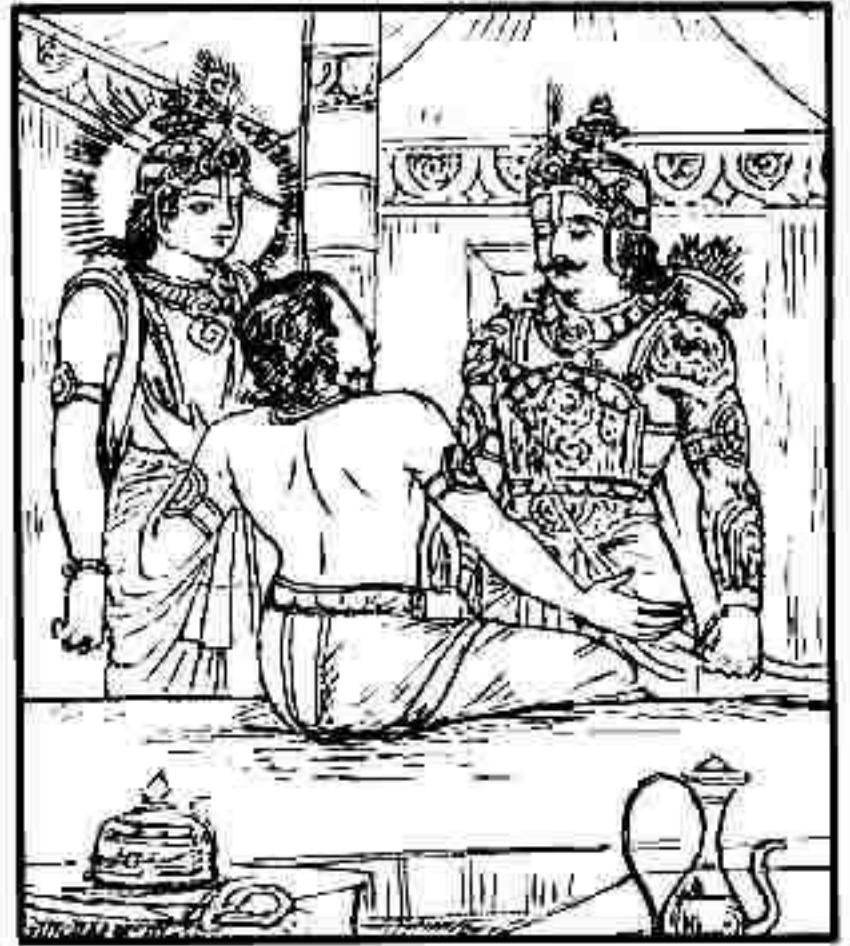
শপথ করছি যে আমি আজকে হয় কর্ণকে বধ করব নচেৎ নিজে প্রাণ হারিয়ে রণভূমিতে শয়ন করব।' রাজাকে এই কথা বলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মাধব ! আজ যুদ্ধে আমি অবশ্যই কর্ণকে বধ করব। আপনার বুদ্ধি বলেই ওই দুরাত্মার বিনাশ হবে।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কথা শুনে বললেন—'অর্জুন ! তুমি মহাবলী কর্ণকে বধ করতে নিজেই সক্ষম। আমি সর্বদাই আশা করি যাতে তুমি কোনোভাবে কর্ণকে বধ করতে পার।' অর্জুনকে একথা বলে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! আপনি কর্ণের বাণে অত্যন্ত আহত হয়েছেন শুনে আমি ও অর্জুন-দুজনে আপনাকে দেখতে এসেছিলাম। সৌভাগ্যের কথা হল যে কর্ণ আপনাকে বধ করতে পারেনি এবং বন্দি করতেও সক্ষম হয়নি। এখন অর্জুনকে শান্ত করে একে বিজয় লাভের আশীর্বাদ দিন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ভ্রাতা অর্জুন ! এসো আমার বক্ষে এসো। তুমি বলার উপযুক্ত হিতের কথাই বলেছ এবং আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছি। ধনঞ্জয় ! আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম, যাও, কর্ণকে বধ করো।'

একথা শুনে অর্জুন পুনরায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। রাজা তাঁকে তুলে আবার আলিঙ্গন করলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন—'ধনঞ্জয় ! তুমি আমাকে অনেক সম্মান করেছ, তাই তোমাকে আশীর্বাদ করছি যে সর্বত্র তোমার যশ বৃদ্ধি হোক এবং

বিজয় লাভ করো।'

অর্জুন বললেন—'মহারাজ! যে কর্ণ আপনাকে বাণের দ্বারা আহত করেছে, তাকে আজ সেই পাপের ভয়ংকর সাজা দেব। আজ তাকে বধ করে তবেই আপনাকে দর্শন করব। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করে এই প্রতিজ্ঞা করছি।'

যুধিষ্ঠির অর্জুনের কথায় অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তখন অর্জুনকে বললেন—'পার্থ! তুমি সর্বদা অক্ষয় যশ, পূর্ণ আয়ু, মনোবাঞ্ছিত কামনা, বিজয় ও বল প্রাপ্ত হও। তোমার জন্য আমি যা কিছু চাই, তা সব যেন তুমি লাভ কর। এখন যাও, শীঘ্রই কর্ণকে বিনাশ করো।'

ধর্মরাজকে প্রসন্ন করে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'গোবিন্দ! আমার রথ প্রস্তুত করা হোক, উত্তম ঘোড়া এবং নানা অস্ত্রশস্ত্র তাতে রাখা হোক, সূতপুত্রকে বধ করার জন্য আমরা শীঘ্র রওনা হব।' অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বললেন—'তুমি পার্থের কথা অনুসারে সবকিছু প্রস্তুত করো।' ভগবানের নির্দেশ পেয়ে দারুক রথটি সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করে উত্তম ঘোড়া সংযোজিত করে অর্জুনের কাছে নিয়ে গেলেন। অর্জুন যখন দেখলেন দারুক রথ নিয়ে এসেছেন, তখন তিনি ধর্মরাজের কাছে অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে তাঁর মঙ্গলময় রথে আরোহণ করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে

আশীর্বাদ করলেন। তারপর অর্জুন কর্ণের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি ভাবতে লাগলেন—'আমি কর্ণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা তো করেছি, কিন্তু তা কী করে রক্ষা করব?' অর্জুনকে চিন্তিত দেখে ভগবান মধুসূদন বললেন—'গাণ্ডীবধারী অর্জুন! তুমি তোমার ধনুকের দ্বারা যেসব বীরদের পরাজিত করেছ, ইহজগতে তুমি ছাড়া আর কেউ তাদের পরাস্ত করতে পারত না। তোমার মতো বীর না হলে কি কেউ দ্রোণ, ভীষ্ম, ভগদত্ত, অবন্তীর রাজকুমার বিন্দ-অনুবিন্দ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ুর সম্মুখীন হতে সাহস করে? তোমার কাছে দিব্যাস্ত্র আছে, তোমার ক্ষিপ্রতা আছে, বল আছে, যুদ্ধ করতে তুমি ভয় পাও না এবং অস্ত্রশস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান আছে। লক্ষ্যভেদ করার কৌশল তুমি জান। লক্ষ্যভেদের সময় তোমার চিত্ত একাগ্র থাকে, ইচ্ছা করলে তুমি গন্ধর্ব ও দেবতাসহ সমস্ত জগৎ চরাচর নাশ করতে সক্ষম। এই ভূমণ্ডলে তোমার মতো যোদ্ধা আর নেই। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার পরে এই মহান গাণ্ডীব ধনুকটিও সৃষ্টি করেছিলেন, যা দ্বারা তুমি যুদ্ধ কর, তাই তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। তা সত্ত্বেও তোমার হিতার্থে আমি জানাচ্ছি যে কর্ণকে নিজের থেকে ছোট মনে করে তাকে অবহেলা কোরো না। আমি তো কর্ণকে তোমার সমকক্ষ অথবা তোমার থেকেও বড় বলে মনে করি। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করে তোমায় তাকে বধ করতে হবে। কর্ণ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী, ক্রুদ্ধ হলে সে কালের সমান হয়ে ওঠে। তার শারীরিক গঠন সিংহের ন্যায় এবং অত্যন্ত বলবান। সে আট রত্নি[1] (একশত আটষট্টি আঙুল) দীর্ঘ, দীর্ঘ বাহু এবং বিশাল বক্ষ সমন্বিত। তাকে জয় করা অত সহজ নয়। সে মহাবীর এবং অভিমানী, যোদ্ধার সমস্ত গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান। সে তার মিত্র কৌরবদের অভয় প্রদানকারী এবং পাণ্ডবদের সর্বদা দ্বেষকারী। আমার মনে হয় একমাত্র তুমিই ওকে বধ করতে পারবে, আর কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আজই সেই দুরাত্মা, ক্রূর, পাপী কর্ণকে বধ করে তোমার মনোরথ পূর্ণ করো।

'অর্জুন! আমি তোমার পরাক্রম জানি, যা নিবারণ করা দেবতা ও অসুরের পক্ষেও কঠিন। সিংহ যেমন মত্ত হাতিকে বধ করে, তুমিও সেইমতো বল ও পরাক্রম দ্বারা

[1] মুষ্টিবদ্ধ হাতের মাপকে রত্নি বলা হয়।

শূরবীর কর্ণকে সংহার করো—আমি তোমাকে সেই নির্দেশ দিচ্ছি। শত্রুদের কাছে তুমি দুর্ধর্ষ, তোমার আশ্রয়ে থেকেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালরা যুদ্ধে অক্ষত রক্ষা পাচ্ছে। তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়েই পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য, করূষ ও চেদিদেশীয় বীরগণ অসংখ্য শত্রু সংহার করেছে। তুমি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যসহ ত্রিলোককে যুদ্ধে জয় করতে সক্ষম, তাহলে কৌরব সেনাদের আর কথা কী ? ইন্দ্রের সমান পরাক্রমী যদি কেউ হয়ও, তবুও তুমি ব্যতীত আর কে রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করতে সক্ষম ? অক্ষৌহিণী সেনার সেনাপতি এবং যুদ্ধে কখনো পশ্চাদপসরণ না করে থাকতেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ ও দুর্যোধনের ন্যায় মহারথীদের তুমি ছাড়া আর কে পরাস্ত করতে পারে ? ভয়ংকর পরাক্রমী তুষার, যবন, খশ, দর্বাভিসার, দরদ, শক, মাঠর, তঙ্গণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্বত্য তথা সমুদ্রতটবাসী যোদ্ধাগণ ক্রোধভরে দুর্যোধনের সাহায্যের জন্য এসেছে, তুমি ব্যতীত এদের অন্য কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।

তুমি রক্ষা না করলে ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান কৌরবদের বিশাল সেনার ওপর কার আক্রমণ করার সাহস হত ? তোমার সাহায্যেই পাণ্ডবপক্ষের বীরগণ তাদের সংহার করেছে। ভীষ্ম অস্ত্রবিদ্যায় অত্যন্ত কুশল ছিলেন, তিনি চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য এবং কেকয় দেশীয় বীরদের বাণে আচ্ছাদিত করে বধ করেছিলেন। তিনি একবার ধনুক হাতে নিলে হাজার রথী বিনাশ করে ফেলতেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ ও হাতি তিনি সংহার করেছিলেন। দশ দিনের যুদ্ধে তিনি তোমাদের বহু সৈন্য ধ্বংস করেছেন। সংগ্রামে ভগবান রুদ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় তাঁর ভয়ংকর রূপ নিয়ে চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয় বীরদের সংহার করে তিনি রথ, ঘোড়া, হাতি, পরিপূর্ণ পাণ্ডব সেনার বিনাশ করেছেন। ভীষ্ম এমনই অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁকেও শিখণ্ডী তোমার রক্ষণাবেক্ষণে থেকে বাণ নিক্ষেপ করেছিল, আজ তিনি শরশয্যায় শায়িত। পার্থ ! জয়দ্রথ বধের সময় তুমি যে পরাক্রম দেখিয়েছিলে, তা তুমি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজারাও সিন্ধুরাজকে বধ করাকে তোমার আশ্চর্যজনক পরাক্রম বলে মনে করেন ; কিন্তু আমি তা মনে করি না ; কারণ তোমার মতো বীরের পক্ষে এ কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আমার বিশ্বাস যে সমস্ত জগতের ক্ষত্রিয়রা যদি একত্র হয়ে তোমার সম্মুখীন হয়, তাহলেও একই দিনে তারা বিনাশপ্রাপ্ত হবে, সেটিই আমার বিচারে তোমার যোগ্য পরাক্রম হবে।

অর্জুন ! যখন থেকে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য বধ হয়েছেন, তখন থেকে এই ভয়ংকর কৌরব সেনাদের যেন সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে। তাদের প্রধান যোদ্ধারা নিহত হয়েছে, ঘোড়া, হাতি, রথ কমে গেছে। এখন এই সৈন্যকুল যেন সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রবিহীন আকাশের মতো শ্রীহীন হয়ে গেছে। এদের প্রধান যোদ্ধারা অনেকেই মৃত, শুধু অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কর্ণ, শল্য ও কৃপাচার্য—এই পাঁচজন মহারথী বেঁচে আছে। এই পাঁচজনকে বধ করে তুমি শত্রুহীন হও এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে নগর-দ্বীপ-সমুদ্র-পর্বত-বন-আকাশ-পাতালসহ সমগ্র পৃথিবী অর্পণ করো। গুরু দ্রোণাচার্যকে সম্মান জানানোর জন্য যদি তুমি অশ্বত্থামার ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখ অথবা আচার্যের গৌরব রক্ষার জন্য যদি তোমার কৃপাচার্যের ওপর দয়া হয়, যদি মাতৃর আত্মীয়দের প্রতি সম্মান রক্ষার্থে কৃতবর্মাকে যমালয়ে পাঠাতে না চাও এবং মাতামাদ্রীর ভ্রাতা বলে মদ্ররাজ শল্যকে বধ করতে না চাও, সে সবও মানা যায়, কিন্তু পাণ্ডবদের প্রতি অত্যন্ত নীচ ব্যবহারকারী এই পাপী কর্ণকে আজ তীক্ষ্ণ বাণে বধ করো। এ কাজ তোমার পক্ষে পুণ্যদায়ক হবে। আমি তোমাকে আদেশ করছি, কর্ণ বধে কোনো দোষ নেই।

দুর্যোধন পাঁচ পুত্রসহ মাতা কুন্তীকে নিশুতি রাত্রে লাক্ষাভবনে পুড়িয়ে মারার যে চেষ্টা করেছিল এবং তোমাদের সঙ্গে যে কপট পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেইসব ষড়যন্ত্রের মূল কারণই দুরাত্মা কর্ণ। দুর্যোধনের সর্বদাই বিশ্বাস ছিল যে কর্ণ তাকে রক্ষা করবে, তাই সে ক্রোধভরে আমাকেও বন্দি করতে চেয়েছিল। সে তোমাদের সঙ্গে যেসব খারাপ ব্যবহার করেছে, তাতে এই পাপাত্মা কর্ণেরই প্রাধান্য ছিল। মিত্র ! দুর্যোধনের ছয়জন মহারথী একত্রে যখন নির্মমভাবে সুভদ্রাকুমারকে বধ করেছিল, সেই ভয়ংকর সংগ্রামে কর্ণই অভিমন্যুর ধনুক কেটেছিল। কর্ণ ধনুক কেটে ফেললে, আর যে পাঁচজন মহারথী ছিলেন, যারা ছল-কপটে অত্যন্ত চতুর, বাণবর্ষণ করে অভিমন্যুকে বধ করে। সেই বীরের এইভাবে মৃত্যু হওয়ায় প্রায় সকলেই অন্তরে ব্যথিত হয়েছিলো, শুধু দুষ্ট কর্ণ এবং দুর্যোধনই আনন্দে অট্টহাস্য করেছিল। শুধু তাই

নয়, কৌরবদের পরিপূর্ণ সভাগৃহে কর্ণ দ্রৌপদীকে এইরূপ কটুবাক্য শুনিয়েছিল—'কৃষ্ণা ! পাণ্ডবরা তো চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেছে ! এখন তুমি অন্য পতি বরণ কর। আজ থেকে তুমি ধৃতরাষ্ট্রের দাসী ; অতএব রাজমহলে গিয়ে কাজকর্ম করো। এখন পাণ্ডবরা আর তোমার স্বামী নয়। ওরা তোমার জন্য কিছুই করতে পারবে না। তুমি দাসদের স্ত্রী এবং নিজেও দাসী।'

ওই পাপী এইভাবে বহু কটু কথা বলেছিল, যা তুমিও শুনেছিলে। এছাড়াও সে তোমাদের প্রতি অন্যায় করে যে যে পাপ করেছিল সেই পাপ এবং তার সম্পূর্ণ জীবনও তোমার বাণে নষ্ট হোক। আজ দুরাত্মা কর্ণ তার শরীরে গাণ্ডীব ধনুক নিক্ষিপ্ত ভয়ংকর বাণে আঘাত পেয়ে আচার্য দ্রোণ ও ভীষ্মের কথাগুলি যেন স্মরণ করে। তোমার বাণে আহত রাজারা যেন দীন ও বিষাদে মগ্ন হয়ে কর্ণকে রথ থেকে পড়তে দেখে হাহাকার করে ওঠে। রাজা শল্যও যেন তোমার বাণে ছিন্নভিন্ন হয়ে রথী ও অশ্বরহিত রথ ত্যাগ করে ভীত হয়ে পলায়ন করে। পার্থ ! যদি তুমি কর্ণের চোখের সামনে তার পুত্রকে বধ করো তাহলে সে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের কথাগুলি স্মরণ করবে। তোমার প্রধান শত্রু দুর্যোধন তোমার হাতে কর্ণ মারা গেছে দেখে তার জীবন ও রাজ্য সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়বে। মনে হচ্ছে পাঞ্চালদেশীয় বীররা, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, শতানীক, নকুল-সহদেব, দুর্মুখ, জনমেজয়, সুধর্মা, এবং সাত্যকি—এরা কর্ণের হাতে পড়েছে, তাদের ভয়ানক আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। যারা মিত্রের জন্য প্রাণের মায়া না করে শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে, সেই শত শত পাঞ্চাল বীরদের কর্ণ যমালয়ে প্রেরণ করছে। এখন তোমার ওদের রক্ষা করা উচিত। ভৃগুবংশীয় পরশুরামের কাছে কর্ণ যে অস্ত্র প্রাপ্ত করেছে, তার ভীষণ রূপ আজ প্রকাশিত হয়েছে। সে ভয়ানক অস্ত্র নিজ তেজে প্রজ্বলিত হয়ে তোমার সেনাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে সন্তপ্ত করছে। ওই দেখ, ভীম ও সৃঞ্জয় বীররা কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার তীক্ষ্ণবাণে পীড়িত হচ্ছে। আমি যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধাদের মধ্যে তুমি ব্যতীত এমন কোনো বীরকে দেখিনি যে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে কুশলে ফিরে আসে। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তেজস্বী বাণের দ্বারা আজ কর্ণকে বধ করে উজ্জ্বল কীর্তি লাভ করো। বীরবর ! আমি সত্য বলছি, একমাত্র তুমিই কর্ণসহ কৌরবদের পরাজিত করতে সক্ষম, অন্য কেউ নয়। অতএব মহারথী কর্ণকে বধ করে তুমি তোমার মনোরথ সফল করো।'

অর্জুনের বীরোচিত হুংকার, দুই পক্ষের সেনার মধ্যে ভীষণযুদ্ধ, সুষেণ বধ, ভীমসেনের পরাক্রম এবং অর্জুনের আগমনে তাঁর প্রসন্নতা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনে অর্জুন মুহূর্তের মধ্যেই শোকরহিত হয়ে প্রসন্ন হলেন। তারপর গাণ্ডীবে টংকার তুলে কেশবকে বললেন—'গোবিন্দ ! আপনি যখন আমার প্রভু এবং রক্ষাকর্তা, তখন আমার জয় সুনিশ্চিত। জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ নির্মাণ আপনারই হাতে, আপনি যার ওপর প্রসন্ন, তার জয়ে আর সন্দেহ কী ? কৃষ্ণ ! কর্ণের তো কথাই নেই, আপনার সাহায্য পেলে আমি ত্রিলোকের সকলকেই পরলোকের পথিক বানাতে পারি। জনার্দন ! পাঞ্চালদের সৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। কর্ণ রণক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করছে। প্রজ্বলিত ভার্গবাস্ত্রের দিকেও আমার দৃষ্টি রয়েছে। নিশ্চয়ই এ সেই সংগ্রাম, যে সংগ্রামে কর্ণ আমার হাতে নিহত হবে এবং যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী এই নিয়ে আলোচনা করবে। আজ আমার গাণ্ডীব ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বাণ কর্ণকে মৃত্যুপারে পৌঁছে দেবে। কৃষ্ণ ! আপনাকে সত্য বলছি, আজ কর্ণ নিহত হলে দুর্যোধন তার রাজ্য ও জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে যাবে। আমার বাণে কর্ণকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে যুধিষ্ঠির আপনার সেই সব কথা স্মরণ করবে, যা আপনি তার হিতার্থে বলেছিলেন। কৌরব সভায় পাণ্ডবদের নিন্দা করে কর্ণ দ্রৌপদীকে যে কঠোর বাক্য বলেছিল, সেজন্য আজ তার অনুতাপ হবে। কর্ণ আজ মারা গেলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা

দুর্যোধনের সঙ্গে ভীত হয়ে এমনভাবে পালাবে, যেমন সিংহের ভয়ে মৃগরা পালায়। কর্ণের পুত্র-মিত্র কাউকেই আজ জীবিত রাখব না। সূতপুত্রের মৃত্যু দেখে আজ দুর্যোধন তার নিজের জন্য চিন্তা করবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর পুত্র-পৌত্র, মন্ত্রী এবং অনুচরসহ রাজ্যের দিক থেকে হতাশ করে দেব। আজ আমি একাকী কৌরব ও বাহ্লীক সেনাদের নিজের বাণে জ্বালিয়ে ছাই করব। আমার এক হাতে বাণ ও অন্য হাতে বাণসহ ধনুকচিহ্ন আছে এবং পায়ে রথ ও ধ্বজা চিহ্ন আছে। আমার মতো সুলক্ষণ যুক্ত যোদ্ধাকে কেউ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে না।

ভগবানকে এই কথা বলে বীর অর্জুন ক্রোধে রক্তলাল করে রণক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলেন। সেই সময় তাঁর মনে দুটি সংকল্প ছিল, ভীমসেনকে সংকট মুক্ত করা এবং কর্ণের মস্তক দেহচ্যুত করা।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! আমার পুত্র এবং পাণ্ডব-সৃঞ্জয়দের মধ্যে আগে থেকেই মহাভয়ংকর যুদ্ধ হচ্ছিল। তারপর অর্জুন সেখানে এলে যুদ্ধ কীরূপ ধারণ করল ?'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! অর্জুন তখন ঘোড়া, সারথিসহ রথ, গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক এবং সমস্ত শত্রুদের তাঁর বাণের আঘাতে যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। তাঁর পৌঁছানোর আগে কৃপাচার্য ও শিখণ্ডী পরস্পর যুদ্ধ করছিলেন। সাত্যকি দুর্যোধনকে আক্রমণ করেছিলেন, শ্রুতশ্রবার সঙ্গে অশ্বত্থামা এবং যুধামন্যুর সঙ্গে চিত্রসেনের যুদ্ধ হচ্ছিল। উত্তমৌজা কর্ণের পুত্র সুষেণকে এবং সহদেব শকুনিকে আক্রমণ করেছিলেন। নকুল পুত্র শতানীক এবং কর্ণপুত্র বৃষসেনের যুদ্ধ হচ্ছিল। নকুল কৃতবর্মাকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাসহ কর্ণকে আক্রমণ করেছিলেন। দুঃশাসন সংশপ্তক সেনাসহ ভীমসেনের ওপর চড়াও হয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে উত্তমৌজা কর্ণপুত্র

সুষেণকে তাঁর বাণের আঘাতে মস্তকচ্যুত করেন। সুষেণের মাথা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে কর্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তমৌজার ঘোড়াগুলি বধ করে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর রথের ধ্বজাও উড়িয়ে দিলেন। উত্তমৌজাও তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে এবং ধারালো তলোয়ারের আঘাতে কৃপাচার্যের পার্শ্বরক্ষক এবং ঘোড়াগুলি বধ করে শিখণ্ডীর রথে গিয়ে আরোহণ করলেন। রথে উঠে তিনি কৃপাচার্যকে রথহীন দেখে তাঁকে আঘাত না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর অশ্বত্থামা সামনে এসে কৃপাচার্যের রথটিকে তাঁর পেছনে রেখে কৃপাচার্যকে উদ্ধার করলেন। অন্যদিকে ভীমসেন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে আপনার সেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

সেই ভয়ানক যুদ্ধে শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে ভীমসেন তাঁর সারথিকে বললেন—'সারথি ! তুমি শীঘ্র ঘোড়া চালিয়ে আমাকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কাছে নিয়ে চলো, আজ আমি তাদের সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করবো।' নির্দেশ পেয়েই

সারথি ঘোড়াগুলিকে দ্রুত চালনা করে রথ নিয়ে আপনার পুত্রের সেনার মধ্যে পৌঁছাল। কৌরব পক্ষের যোদ্ধারাও চতুর্দিক থেকে হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এল। তারা ভীমের রথের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল, ভীমও প্রত্যুত্তরে তাদের আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর আঘাতে মৃত ও আহত হাতি, ঘোড়া, রথী ও পদাতিকের আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। ভীমসেনের আঘাতে রাজাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তাঁরা ভীমকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ভীম তখন প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ শুরু করলেন। ভীমের হাতে পরাভূত হয়ে আপনার সেনারা এবার পালাতে শুরু করল। তাই দেখে প্রসন্ন হয়ে ভীম তাঁর সারথিকে বললেন—'সূত ! ওই যে ধ্বজসমন্বিত বহু রথ এইদিকে আসছে, এরা আমাদের না শত্রুপক্ষের ? যুদ্ধ করার সময় আমি নিজেদের ও শত্রুদের ঠিকমতো পার্থক্য বুঝতে পারি না। এমন না হয় যে আমি আমাদের সৈন্যের ওপরেই বাণবর্ষণ করে ফেলি। বিশোক ! রাজা যুধিষ্ঠির বাণের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছেন। অর্জুন তাঁকে দর্শন করতে গেছে, এখনও আসেনি। জানি না রাজা জীবিত আছেন কিনা। অর্জুনেরও কোনো কুশল সংবাদ পাইনি। এতে আমার দুঃখ হলেও আমি শত্রুসৈন্য ধ্বংস করব। তুমি আমার রথে রক্ষিত সব অস্ত্রশস্ত্রগুলি দেখে নাও, কত অস্ত্র আর অবশিষ্ট আছে তার সংখ্যা কত এবং কী ধরনের বাণ আছে, সব আমাকে ঠিকমতো জানাও।'

বিশোক জানাল—'বীরবর ! এখনও আপনার কাছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়ে গেছে, এত অস্ত্র রয়েছে যে ছটি বলদযুক্ত গাড়িও সেটি নিয়ে যেতে পারবে না। গদা ও তলোয়ারও হাজার হাজার রয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন শীঘ্রই আপনার অস্ত্র শেষ হয়ে যাবে না।'

ভীমসেন বললেন—'সূত ! আজ হয় আমি একাকী সমস্ত কৌরবদের মারব, নাহলে তারাই আমাকে মারবে। এখন দেবতাদের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা যে, যজ্ঞে আবাহন করলেই যেমন ইন্দ্র উপস্থিত হন, তেমনই অর্জুন এখানে এসে পড়ুক। বিশোক ! এই ছিন্নভিন্ন কৌরব সৈন্যদের দেখ, এই রাজারা পালাচ্ছেন কেন ? আমার মনে হচ্ছে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন এসে পড়েছে, অর্জুনই বাণের আঘাতে সমস্ত সৈন্যকে আচ্ছাদিত করছে। কৌরবেরা ভয় পেয়ে সকলেই পালাচ্ছে। রণক্ষেত্রে হাহাকার পড়ে গেছে,

হাতিগুলি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে।'

বিশোক বললেন—'কুমার ভীমসেন ! ক্রোধান্বিত অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুকের ভয়ংকর টংকার আপনি শুনতে পাননি ? পাণ্ডুনন্দন ! অভিনন্দন, আপনার সর্ব কামনা পূর্ণ হয়েছে, ওইদিকে দেখুন ! হস্তী সৈন্যের মধ্যে অর্জুনের রথের কপিধ্বজ দেখা যাচ্ছে, সে ধ্বজার ওপরে বসে শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করে চতুর্দিকে দেখছে। আমি নিজেও তাকে দেখে ভীত হচ্ছি। অর্জুনের ওই বিচিত্র মুকুট, যাতে সূর্যের ন্যায় মণি রয়েছে, তা অতীব সুন্দর। তার পার্শ্বেই রয়েছে দেবদত্ত নামক শ্বেত শঙ্খ। তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাশে সূর্যের ন্যায় কান্তিমান চক্র রয়েছে, যা তাঁর যশবর্ধন করে। যদুবংশীয়েরা সর্বদা এর পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর পাঞ্চজন্যও আছে, এটি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। দেখুন, ভগবানের বক্ষস্থলে কৌস্তুভমণি ও বৈজয়ন্তীমালা কী অপূর্ব শোভাধারণ করে আছে। শ্যামসুন্দর রথের ঘোড়া চালাচ্ছেন এবং মহারথী অর্জুন শত্রু সৈন্য বিতাড়িত করতে করতে এদিকেই আসছেন। ওই দেখুন, অর্জুন তাঁর বাণে ঘোড়া ও সারথিসহ চারশত রথী বধ করে ফেলেছেন, সাতশত হাতি শেষ করেছেন এবং হাজার হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিককে মৃত্যুর পারে পৌঁছে দিয়েছেন। এইভাবে কৌরব যোদ্ধা সংহার করতে করতে মহাবলী অর্জুন আপনার দিকেই আসছেন। আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে।'

ভীমসেন বললেন—'বিশোক ! তুমি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত

সংবাদ দিয়েছ, এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এই সুসংবাদের জন্য আমি তোমাকে চোদ্দোটি গ্রাম সমন্বিত এক জায়গীর প্রদান করব, সেই সঙ্গে একশো দাসী এবং কুড়িটি রথও পারিতোষিক রূপে তুমি লাভ করবে।

অর্জুন ও ভীমসেন দ্বারা কৌরব সেনা সংহার, ভীমের আঘাতে শকুনির মূর্ছিত হওয়া

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র হস্তে নিয়ে জম্ভাসুরকে বধ করার জন্য রওনা হয়েছিলেন, অর্জুনও তেমনই রথে করে বিজয় লাভের জন্য যাত্রা করলেন। তাঁকে আসতে দেখে কৌরবপক্ষের বীররা ক্রোধভরে রথ, ঘোড়া, হাতি ও পদাতিক নিয়ে অর্জুনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর ত্রিলোকের রাজ্য লোভে অসুররা যেমন দেবতা ও ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তেমনই কৌরব যোদ্ধারা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। সেই যুদ্ধ মহারক্তক্ষয়কারী ছিল। সেই সময় কৌরব সেনারা যত অস্ত্র নিক্ষেপ করল, অর্জুন একা সে সবই প্রতিহত করে ফেললেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের মাথা, হাত কেটে ছত্র, ধ্বজা, ঘোড়া, রথ, হাতি সবই বিনাশ করলেন। তারা সব একে একে ধরাশায়ী হল। ধনঞ্জয় এইভাবে তাঁর বজ্রসম বাণের দ্বারা শত্রুদের ঘোড়া, হাতি ও রথের ধ্বজা চূর্ণ করে কর্ণকে বধ করার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে পৌঁছলেন। তাঁকে সেখানে দেখে আপনার অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক ও রথী সৈনিকরা পুনরায় অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একসঙ্গে তাঁকে বাণবিদ্ধ করতে লাগল। অর্জুনও বাণের আঘাতে হাজার হাজার রথী, অশ্বারোহী, গজারোহীকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। অর্জুন যখন কৌরব মহারথীদের এইভাবে বধ করতে আরম্ভ করলেন, তখন তারা তাঁর বাণের ভয়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। তীক্ষ্ণ বাণের আঘাত সহ্য করতে না পেরে তারা ধৈর্যচ্যুত হয়ে অর্জুনকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। এইভাবে সব সৈন্য পালিয়ে গেলে অর্জুন সূতপুত্রের সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। সেই সময়েই ভীমসেন অর্জুনের শুভাগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনিও তখন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে শত্রু দমন করতে লাগলেন। সেই সময় তাঁর অলৌকিক পরাক্রম দেখে কৌরব সৈনিকদের জয়ের সমস্ত আশা চলে গেল।

রাজা দুর্যোধন তখন তাঁর মহাপরাক্রমী ধনুর্ধর যোদ্ধাদের আদেশ দিলেন—'বীরগণ ! ভীমসেনকে বধ করো, এর মৃত্যু হলে আমি মনে করব পাণ্ডবদের সব সেনা বিনাশ হয়েছে।' রাজারা আপনার পুত্রের আদেশে ভীমসেনকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে আরম্ভ করল। ভীমসেনও তীব্র বাণবর্ষণ করে সেই মহাসেনার মধ্যে দিয়ে জায়গা করে বাইরে চলে এলেন। তারপর তিনি হাজার হাজার হাতি, ঘোড়া, পদাতিক সৈন্য বধ করে রক্তের নদী প্রবাহিত করলেন। মহারথী ভীম শত্রু সৈন্যের মধ্যে যেদিকে ঢুকতেন, সেদিকেই লাখ লাখ যোদ্ধা শেষ করে দিতেন। তাঁর পরাক্রম দেখে দুর্যোধন শকুনিকে বললেন—'মামা ! আপনি মহাবলী ভীমকে পরাস্ত করুন। একে পরাজিত করলে পাণ্ডবদের বিশাল সেনা জিতে নিয়েছি বলে মনে করব।'

দুর্যোধনের কথায় শকুনি মহাসংগ্রামের উদ্দেশ্যে নিজ

ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং ভীমসেনের কাছে গিয়ে তাঁর গতিরোধ করলেন। ভীমসেন তখন শকুনির দিকে ফিরলেন। শকুনি তাঁকে তীক্ষ্ণ নারাচ দিয়ে আক্রমণ করলেন। সেটি ভীমের বর্ম ভেদ করে তাঁর দেহে গিয়ে ঢুকল। অত্যন্ত আহত হয়ে ক্রুদ্ধ ভীম শকুনির ওপর এক বাণের আঘাত হানলেন, কিন্তু শকুনি সেটি টুকরো করে ফেললেন। এবার শকুনি ভল্লের দ্বারা সারথি ও ভীমসেনকে বিদ্ধ করলেন, তারপর ভীমের ধ্বজা ও ছত্র কেটে দিলেন, চারবাণে ভীমের চারটি ঘোড়াকেও বধ করলেন।

ভীমসেন তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সুবলপুত্রকে এক লৌহনির্মিত শক্তির দ্বারা আঘাত করলেন। কাছে আসতেই শকুনি সেই শক্তি হাতে ধরে ভীমসেনের ওপরে চালিয়ে দিলেন। সেই শক্তি ভীমের বামহাতে আঘাত করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। তখন ভীম প্রাণের মায়া না করে তীক্ষ্ণ বাণে শকুনির সেনাদের আচ্ছাদিত করলেন। তারপর তাঁর চারটি ঘোড়া এবং সারথিকে বধ করে এক ভল্লের দ্বারা তাঁর রথের ধ্বজা কেটে ফেললেন। শকুনি তৎক্ষণাৎ রথ থেকে নেমে একপাশে দাঁড়িয়ে ভীমের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে বীর ভীম তীব্র বেগে তাঁকে আঘাত করলেন, তারপর তাঁর ধনুক কেটে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। বলবান শত্রুর আঘাতে অত্যন্ত আহত হয়ে শকুনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁকে মূর্ছিত দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন এসে তাঁকে নিজ রথে তুলে রণক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন। তখন কৌরব যোদ্ধারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে পালাতে লাগল। ভীমও বাণবর্ষণ করতে করতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তাঁর অস্ত্রের আঘাতে পীড়িত সৈনিকরা যোদ্ধা কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করল। মহারাজ ! সেইসময় কর্ণই তাদের রক্ষাকর্তা হয়েছিল।

কর্ণের আক্রমণে পাণ্ডবসেনাদের পলায়ন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অগ্রসর হতে দেখে শল্য ও কর্ণের আলাপ-আলোচনা এবং অর্জুন কর্তৃক কৌরব সেনা বিনাশ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! ভীমসেন যখন কৌরব যোদ্ধাদের পর্যুদস্ত করছিলেন, তখন দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা এবং দুঃশাসন এরা সব কী বলল ? সূতপুত্র কীরূপ পরাক্রম দেখালেন ? আমার পুত্রগণ এবং অন্যান্য দুর্ধর্ষ রাজারা কী করলেন ? এ সব আমাকে বলো।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সেদিন তৃতীয় প্রহরে প্রতাপশালী সূতপুত্র ভীমের সামনেই সমস্ত সোমকদের সংহার করে, ভীমসেন ও কৌরবদের অত্যন্ত বলবান সেনা বিধ্বংস করলেন। তারপর কর্ণ শল্যকে বললেন—'এবার রথ পাঞ্চালদের দিকে নিয়ে চলুন।' সেনাপতির নির্দেশে মদ্ররাজ ঘোড়াগুলিকে চেদি, পাঞ্চাল এবং করূষ দেশীয় বীরদের দিকে নিয়ে চললেন। কর্ণের রথ দেখেই পাণ্ডব ও পাঞ্চাল বীররা কম্পিত হল। কর্ণ অগণিত বাণে শত শত, হাজার হাজার বীরদের ধরাশায়ী করতে লাগলেন। পাণ্ডব পক্ষের মহারথীরা তা লক্ষ করে কর্ণকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। সাত্যকি সেই সময় তেজপূর্ণ বাণে কর্ণের গলদেশে আঘাত করলেন। তারপর শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সহদেব, নকুল, এঁরা অসংখ্য বাণে কর্ণকে আঘাত করতে লাগলেন। ভীমও কর্ণের গলা লক্ষ্য করে আঘাত করলেন।

সূতপুত্র তখন অক্লেশে তাঁর ধনুকে টংকার তুলে তেজপূর্ণ বাণে ওইসব যোদ্ধাদের বিদ্ধ করলেন। তিনি সাত্যকির ধনুক ও ধ্বজা কেটে বাণের দ্বারা তাঁর বুকে আঘাত করলেন। তারপর ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ভীমকে ত্রিশটি বাণে পীড়িত করলেন। ভল্লের আঘাতে সহদেবের ধ্বজা কেটে তিন বাণে তাঁর সারথিকে বধ করলেন এবং দ্রৌপদীর পুত্রদের রথহীন করে দিলেন। এই কাজ তিনি এক পলকেই সমাধা করলেন। যারা এই যুদ্ধের দর্শক ছিলেন, তাঁরা কর্ণের এই কাজে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। মহারথী কর্ণ চেদি ও মৎস্য দেশের যোদ্ধাদেরও তাঁর তীক্ষ্ণ তীরের নিশানা করলেন। তাঁর আঘাতে ভীত হয়ে তারা পালিয়ে গেল। কর্ণের এই অদ্ভুত পরাক্রম আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। সিংহের ভয়ে যেমন মৃগকুল আতঙ্কিত

হয়ে পালায়, পাণ্ডব যোদ্ধারাও তেমনই পালিয়ে গেল। পাণ্ডব সেনাদের পালাতে দেখে কৌরব যোদ্ধারা ভৈরব-গর্জন করে এগিয়ে এল। রাজা দুর্যোধন হৃষ্ট চিত্তে নানা বাদ্য বাজাতে লাগলেন। বাদ্যধ্বনি শুনে পাঞ্চাল মহারথীরা মৃত্যুর ভয় না করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এল, কর্ণ তাদের মধ্যে বহু যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করলেন। এইভাবে পাণ্ডবপক্ষের বহু যোদ্ধা বিনাশপ্রাপ্ত হল। অন্য দিকে ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনার পক্ষেরও বহু বীর নিহত হল।

অপরদিকে অর্জুন কৌরবদের চতুরঙ্গিণী সেনা বিনাশ করে যখন এগোলেন তখন ক্রুদ্ধ সূতপুত্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। অর্জুন তখন ভগবান বাসুদেবকে বললেন—'জনার্দন ! দেখুন, সূতপুত্রের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে. এদিকে ভীমসেন ও অন্য যোদ্ধারা কৌরব মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। অন্যদিকে পাঞ্চাল যোদ্ধারা কর্ণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর একদিকে কর্ণের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা করছেন। আমরা যদি ওকে বধ না করি, তাহলে সে সোমকদের সংহার করবে। অতএব আমার মত হল যে আপনি মহারথী কর্ণের কাছে আমাকে নিয়ে চলুন, কর্ণকে বধ না করে আমি ফিরব না।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরুর জন্য আপনার সেনার মধ্য দিয়ে কর্ণের দিকে রথ নিয়ে এগোলেন। তিনি রথে করে যাওয়ার সময়ে চতুর্দিকে দণ্ডায়মান পাণ্ডবসেনাদের আশ্বস্ত করতে করতে এগোলেন। বীরবর অর্জুন আপনার সেনাদের পরাস্ত করতে করতে যাচ্ছিলেন। শ্বেতাশ্ব যুক্ত রথে করে সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনকে আসতে দেখে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে বললেন—'কর্ণ ! তুমি অন্যদের কাছে যার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলে, সেই কুন্তীনন্দন অর্জুন তার গাণ্ডীব ধনুক নিয়ে সামনে উপস্থিত, ওই তার রথ আসছে। আজ যদি ওকে বধ করতে পারো, তাহলে আমাদের জয় হবে। তার ধনুকের গুণে চাঁদ ও তারার চিহ্ন আছে, ধ্বজার ওপর ভয়ংকর বানর দেখা যাচ্ছে, যে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বীরদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করছে। কপিবর অর্জুনের রথের ওপর বসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ পাহারা দিচ্ছে। আজ রণভূমি রাজাদের কর্তিত মুণ্ডে ভরে উঠেছে। ক্ষীণ-পুণ্য প্রাণীর ন্যায় নানা দেশের রাজারা যেন

স্বর্গচ্যুত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। একা সিংহ যেমন হাজার হাজার মৃগকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে, অর্জুনও তেমনই শত্রুসৈন্যকে ব্যাকুল করে তুলেছে। অল্পসময়ের মধ্যেই অর্জুন বহু সৈন্যের প্রাণনাশ করবে, তাই তার ভয়ে কৌরবসেনা ছিন্নভিন্ন হয়ে চতুর্দিকে পালাচ্ছে। ওই দেখ, সব সেনাদের ছেড়ে অর্জুন তোমার কাছে আসবার জন্য উদ্গ্রীব। ভীমসেনকে পীড়িত দেখে অর্জুন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তাই তুমি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়। তুমি ধর্মরাজকে রথহীন করে তাকে

গভীরভাবে আহত করেছ। শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রদের, সাত্যকি, উত্তমৌজা, নকুল এবং সহদেবও তোমার হাতে অত্যন্ত আহত হয়েছে ; এই সব দেখে অর্জুনের চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে, সে সমস্ত রাজাকে সংহার করার জন্য একাই তোমাকে আক্রমণ করতে আসছে। কর্ণ ! এখন তুমি তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এগিয়ে চল, কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কোনো ধনুর্ধর তার সম্মুখীন হতে সাহস পাবে না। শুধু তুমিই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে পরাস্ত করতে সক্ষম, তোমার ওপরেই সেই ভার দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তুমি ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হও। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যের মতোই বলবান, অতএব এই মহাসমরে অর্জুনের গতিরোধ করো। দেখো কৌরব মহারথীরা অর্জুনের ভয়ে পালাচ্ছে, সূতনন্দন ! তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই যে ওদের ভয় দূর করে। সমস্ত কৌরব সেনা তোমাকেই রক্ষক মনে করে তোমার কাছেই আসছে এবং তোমার শরণ পাওয়ার আশায় দাঁড়িয়ে আছে।'

কর্ণ বললেন—'শল্য ! এখন তুমি ঠিক পথে চলেছ এবং আমার সঙ্গে একমত হয়েছ। মহাবাহো ! অর্জুনকে ভয় পেয়ো না। আজ আমার এই হাতও শিক্ষার উপস্থাপনায় রত। আমি একাই পাণ্ডবদের বিশাল সেনা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করব। আমি তোমাকে শপথ করে বলছি। ওই দুই বীরকে হত্যা না করে আমি পিছু হটব না। হয় উভয়কে বধ করব, নাহলে নিজেই প্রাণ হারাব।'

শল্য বললেন—'কর্ণ ! মহারথীরা মনে করেন অর্জুন একা হলেও তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করা অসম্ভব, তারপর তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত, তখন আর বলার কী আছে ? এই অবস্থায় তাঁকে জয় করার সাহস কে করবে ?'

কর্ণ বললেন—'আমি স্বীকার করি যে অর্জুনের মতো মহারথী এই জগতে কখনো হয়নি। তার হাতে ধনুর্গুণ ঠিক আছে, তা কখনো ভীত বা কম্পিত হয় না। অর্জুনের ধনুক অত্যন্ত দৃঢ় এবং সে কুশলতার সঙ্গে শীঘ্র বাণ চালাতে পারে। পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের মতো যোদ্ধা আর নেই। তার বাণ দু ক্রোশ পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম, তার মতো যোদ্ধা পৃথিবীতে আর হতে পারে না। অতিরথী বীর অর্জুন শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছিল, যেখানে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ চক্র পেয়েছিলেন এবং পাণ্ডুনন্দন গাণ্ডীব ধনুক ও শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ, কখনো শূন্য না হওয়া তীরের তূণীর ও বহু দিব্যাস্ত্র। এই সমস্ত বস্তুই অগ্নিদেব উপহার দিয়েছিলেন। তেমনই সে ইন্দ্রলোকে গিয়ে অসংখ্য কালকেয় সংহার করে দেবদত্ত নামক শঙ্খ লাভ করেছিল। সুতরাং এই ভূমণ্ডলে তার থেকে বড়ো যোদ্ধা আর কে আছে ? যে মহানুভব ব্যক্তি তার সুন্দর যুদ্ধকলার দ্বারা সাক্ষাৎ মহাদেবকে প্রসন্ন করে তাঁর কাছ থেকে অমোঘ পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিল, যা ত্রিলোক ধ্বংস করতে সক্ষম। যাঁকে সমস্ত লোকপাল পৃথকভাবে নানা অনুপম দিব্যাস্ত্র প্রদান করেছেন এবং বিরাটনগরে যে একাই আমাদের সব মহারথীকে পরাস্ত করে গোধন পুনরুদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল এবং মহারথীদের বস্ত্রও খুলে নিয়েছিল, এরূপ পরাক্রম ও গুণাদিসম্পন্ন অর্জুনকে, যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও উপস্থিত, যুদ্ধে আহ্বান করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ—এ কথা আমিও ভালোভাবে জানি। তাছাড়া সমস্ত জগৎ একত্রে দশ হাজার বছর ধরে যাঁর গুণাবলী গণনা করে শেষ করতে পারে না ; সেই শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ধারণকারী অনন্ত পরাক্রমী সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ অর্জুনকে রক্ষা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে একই রথে উপবিষ্ট দেখে আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছি, আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। সমস্ত ধনুর্ধরদের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ এবং চক্র যুদ্ধে নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কেউ সক্ষম নয়। এঁরা দুজনেই অত্যন্ত পরাক্রমশালী। হিমালয় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কখনো বিচলিত হতে পারে না। এঁরা দুজনেই মহারথী, শূরবীর এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। শল্য ! বলুন, এইরূপ পরাক্রমী অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমি ব্যতীত অন্য কে যুদ্ধ করতে সক্ষম ? আজ এমন যুদ্ধ হবে, যা আগে কখনো হয়নি। হয় আমি ওদের দুজনকে বধ করব, নচেৎ ওরাই আমাকে ধরাশায়ী করবে।'

এই কথা বলে শত্রুঘাতক কর্ণ মেঘের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন। তারপর তিনি আপনার পুত্র দুর্যোধনের কাছে গেলেন। দুর্যোধন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে আলিঙ্গন করলেন। কর্ণ তখন কুরুরাজ দুর্যোধন, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, ভ্রাতাসহ শকুনি, অশ্বত্থামা এবং নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ও গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক সৈনিকদের বললেন—'রাজাগণ ! আপনারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর আক্রমণ করে তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরুন, সবদিক থেকে যুদ্ধ

শুরু করে ওদের বিশেষভাবে ক্লান্ত করে দিন। আপনাদের দ্বারা ওরা যখন যথেষ্টভাবে আহত হবে, তখন আমি সহজেই ওদের বধ করতে পারব।' ঠিক আছে বলে সমস্ত বীর অর্জুনকে বধ করার জন্য তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।

অর্জুন হাসতে হাসতে তাঁদের সেই নিক্ষিপ্ত বাণগুলি কেটে ফেললেন এবং আপনার সেনাদের ভস্ম করতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, দুর্যোধন ও অশ্বত্থামা অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন ও বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বাণে তাঁদের অস্ত্র টুকরো টুকরো করে দিলেন এবং ক্ষিপ্রতা সহকারে প্রত্যেক মহারথীকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তখন অশ্বত্থামা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করে ঘোড়াগুলিকেও আহত করলেন। তারপর অর্জুনের ধ্বজায় উপবিষ্ট বানরকে তাঁর নারাচের নিশানা করলেন। তা লক্ষ্য করে অর্জুন অশ্বত্থামার ধনুক, সারথির মস্তক, চারটি ঘোড়া এবং ধ্বজা—এগুলি বাণের দ্বারা কেটে ফেলে দিলেন। তারপর হাজার বাণ নিক্ষেপ করে অশ্বত্থামাকে তার মধ্যে বন্দি করে রাখলেন। অর্জুন এবার গর্জন করে দুর্যোধনের ধ্বজা ও ধনুক কেটে ফেললেন, কৃতবর্মার ঘোড়াগুলি বধ করে তাঁর রথের ধ্বজাও খণ্ডিত করলেন। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি আপনার সৈন্যদলের ঘোড়া, সারথি, তূণীর, ধ্বজা, হাতি এবং রথ বিনাশ করে ফেললেন। আপনার সৈন্যরা দিশাহারা হয়ে পলায়ন করল।

অর্জুন ও ভীমসেন কর্তৃক কৌরববীরগণের সংহার এবং কর্ণের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! অন্য দিকে কৌরবদের প্রধান বীররা ভীমসেনকে আক্রমণ করল। কুন্তীনন্দন ভীম কৌরব সমুদ্রে ডুবতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অর্জুন তাঁর রক্ষার জন্য সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি সূতপুত্রের সেনাদের ছেড়ে অন্য রথীদের আক্রমণ করলেন এবং শূরবীরদের যমালয়ে পাঠাতে শুরু করলেন। অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণ আকাশে উঠে ছড়ানো জালের মতো দেখাচ্ছিল। তিনি ভল্ল, ক্ষুরপ্র এবং উজ্জ্বল নারাচ দ্বারা শত্রুদের অঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে মাথা কেটে ফেলছিলেন। রণভূমি যোদ্ধাদের মৃতদেহে পূর্ণ হয়ে উঠল। অর্জুনের বাণে ছিন্নভিন্ন রথ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির দ্বারা রণক্ষেত্র বৈতরণী নদীর ন্যায় অগম্য হয়ে উঠল, সেদিকে তাকালে ভীতি-উৎপাদন হত। সেই সময় ক্রুব মাহুতের প্রেরণায় একসঙ্গে চারশোটি হাতি অর্জুনকে আক্রমণ করল, অর্জুন তাদের ধরাশায়ী করলেন। সমুদ্রে ঝড়ের আঘাতে যেমন জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, তেমনই অর্জুনের তীরের আঘাতে কৌরবসেনা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। গাণ্ডীব ধনুক নিক্ষিপ্ত নানাপ্রকার বাণ বিদ্যুতের ন্যায় আপনার সৈন্যদের দগ্ধ করছিল। জঙ্গলের দাবাগ্নিতে যেমন মৃগ ভীত ও দিশাহারা হয়ে পালায়, তেমনই অর্জুনের বাণে আহত হয়ে কৌরব সেনা চারদিকে পালাতে লাগল। সমস্ত কৌরব সেনা যখন যুদ্ধ-বিমুখ হয়ে চলে গেল, বিজয়ী অর্জুন তখন ভীমের কাছে পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর ভীমের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে রাজা যুধিষ্ঠিরের শরীর থেকে বাণ নিষ্কাশন করা হয়েছে এবং তিনি এখন সুস্থ। এইভাবে কুশল সংবাদ আদান-প্রদান করে অর্জুন ভীমসেনের অনুমতি নিয়ে কর্ণের সেনার উদ্দেশে প্রস্থান করলেন। সেইসময় আপনার পক্ষের দশজন বীর তাঁকে ঘিরে ধরে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগল। ভগবান রথ চালিয়ে তাদের দক্ষিণ দিকে আনলেন। অর্জুনের রথ অন্য দিকে যেতে দেখে তারা পুনরায় আক্রমণ চালাল। তখন অর্জুন তাদের রথের ধ্বজা, ধনুক এবং বাণসমূহ নারাচ ও অর্ধচন্দ্রের দ্বারা কেটে দশ ভল্লের আঘাতে তাদের মাথা উড়িয়ে দিলেন। দশজন কৌরবকে মৃত্যুর পারে পৌঁছিয়ে অর্জুন এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে এগোতে দেখে নব্বই জন সংশপ্তক যোদ্ধা অগ্রসর হল। তারা পশ্চাদপসরণ না করার শপথ নিয়ে অর্জুনকে সব দিক দিয়ে ঘিরে ধরল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের পরোয়া না করে দ্রুত ধাবমান ঘোড়াগুলিকে কর্ণের দিকে চালিত করলেন। সংশপ্তকরা তাই দেখে বাণবর্ষণ করতে করতে পশ্চাদ্ধাবন করল। অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণে সারথি, ধনুক ও ধ্বজা বিনষ্ট করে তাদেরও যমলোকে পাঠালেন। তারা নিহত হওয়ায় কৌরব মহারথীরা রথ, হাতি, ঘোড়া নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করল, তখন তাদের মনে একটুও ভয় ছিল না। তারা একেবারে কাছে এসে শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, প্রাস, গদা, তলোয়ার ও বাণ দিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ

করল, অর্জুন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেগুলিকে নষ্ট করে দিলেন। তারপর আপনার পুত্র দুর্যোধনের নির্দেশে তেরোশো মত্ত হাতিতে চড়ে ম্লেচ্ছজাতির যোদ্ধারা অর্জুনের দুপাশে ঘিরে ধরে নানা ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা তাঁকে পীড়িত করতে লাগল। অর্জুন তীক্ষ্ণ ভল্ল এবং অর্ধচন্দ্রাকার বাণে তাদের অস্ত্রবর্ষণ প্রতিহত করলেন। তারপর নানাপ্রকার বাণে আরোহী সহ হাতিগুলিকে বধ করলেন। অধিকাংশ সেনা নিহত হলে অবশিষ্ট সেনারা ব্যাকুল হয়ে পালিয়ে গেল। সেই সময় ভীমসেন এসে অবশিষ্ট জীবিত অশ্বারোহীদের গদার আঘাতে বিনাশ করতে লাগলেন। ভীমসেন বহু হাতি এবং পদাতিককেও গদার আঘাতে আহত করলেন। তাঁর আঘাতে যোদ্ধাদের মাথা ফাটল, অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ হল, পা ভেঙে গেল। তারা আর্তনাদ করতে করতে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। এইভাবে দশ হাজার পদাতিক সেনাকে বিনাশ করে ক্রোধান্বিত ভীম গদা হস্তে রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন। মহারাজ ! সেইসময় গদাধারী ভীমকে দেখে আপনার সৈনিকরা মনে করছিল যে স্বয়ং যমরাজ কালদণ্ড নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ভীম তারপর গদা হস্তে হস্তীযূথে প্রবেশ করে এক মুহূর্তেই সকলকে যমালয়ে পৌঁছে দিলেন। গজসেনা সংহার করে মহাবলী ভীম পুনরায় নিজ রথে আরোহণ করে অর্জুনকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

তখন কৌরবদের মধ্যে আর্তনাদ শোনা গেল। হাতি, ঘোড়া ও পদাতিকের প্রাণহরণকারী অর্জুনের বাণের আঘাতে সেখানে হাহাকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, সকলেই ভয় পেয়ে একে অন্যের পেছনে লুকোতে চাইছিল। সেই যুদ্ধে এমন কোনো রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী বা পদাতিক সৈন্য ছিল না, যে অর্জুনের বাণের আঘাতে আহত হয়নি। তাঁর পরাক্রম দেখে সকল কৌরবই কর্ণের জীবনের আশা ত্যাগ করল। গাণ্ডীবধারীর আঘাত অসহ্য হওয়ায় সকলেই পরাস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করল। তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ায় ভীত যোদ্ধারা কর্ণকে একাকী রণক্ষেত্রে ফেলে পলায়ন করল। উপরন্তু সাহায্যের জন্য কর্ণের নাম ধরেই ডাকতে লাগল।

মহারাজ ! তারপর আপনার পুত্র কর্ণের রথের কাছে গেলেন। তিনি নিরাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন, সেইসময় কর্ণই দ্বীপের ন্যায় তাঁর রক্ষক হয়েছিলেন। সংসারী জীব যেমন মৃত্যুভয়ে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনার পুত্রও তেমনই ভীত হয়ে কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কর্ণ দেখলেন দুর্যোধন রক্তাপ্লুত হয়ে গভীর সংকটগ্রস্ত হয়েছেন, বাণের আঘাতে ব্যাকুল, তখন তিনি তাঁকে বললেন—'আমার কাছে আসুন, ভয় পাবেন না।' কর্ণ তখন গভীরভাবে চিন্তা করে অর্জুনকে বধ করা স্থির করলেন। তিনি তখন পাঞ্চালদের ওপর আক্রমণ চালালেন। পাঞ্চাল রাজারা তা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা কর্ণের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কর্ণও হাজার হাজার বাণের দ্বারা তাঁদের মৃত্যু মুখে পাঠালেন। তিনি পাঞ্চাল দেশের রাজকুমারদের বিনাশ করতে লাগলেন। কর্ণ 'অঞ্জলিক' নামক বাণ নিক্ষেপ করে জনমেজয়ের সারথিকে ভূপাতিত করলেন এবং তাঁর ঘোড়াগুলিকেও বধ করলেন। তারপর শতানীক এবং সুতসোমকে ভল্লের দ্বারা আঘাত করে তাঁদের ধনুক কেটে দিলেন। বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করে তাঁর ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। তিনি সাত্যকির ঘোড়াগুলিও বিনাশ করে কেকয়রাজকুমার বিশোকককেও বধ করলেন। রাজকুমার নিহত হলে কেকয় সেনাপতি উগ্রকর্মা কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তিনি তাঁর ভয়ংকর বেগবান বাণের দ্বারা কর্ণপুত্র প্রসেনকে ঘায়েল করলেন। কর্ণ তখন তিনটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণে উগ্রকর্মার দু হাত এবং মাথা কেটে ফেললেন। উগ্রকর্মা প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলেন। অন্যদিকে কর্ণ যখন সাত্যকির ঘোড়াগুলিকে বধ করছিলেন তখন তার পুত্র তেজঃপূর্ণ

বাণের দ্বারা সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তারপর সাত্যকির বাণে নিজেও ধরাশায়ী হলেন।

পুত্রের মৃত্যুতে কর্ণের হৃদয়ে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল, তিনি সাত্যকিকে এক শত্রুসংহারকারী বাণ নিক্ষেপ করে বললেন—'শৈনেয় ! এবার তুমি নিহত হলে।' কিন্তু শিখণ্ডী কর্ণের সেই বাণ কেটে তাঁকে তিন বাণে বিদ্ধ করলেন। তখন কর্ণ দুটি ক্ষুরের দ্বারা শিখণ্ডীর ধ্বজা ও ধনুক কেটে বাণের আঘাতে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রের মাথা দেহচ্যুত করলেন এবং এক তীক্ষ্ণ বাণে সুতসোমকেও আহত করলেন। তারপর সূতপুত্র সোমকদের সংহার করার জন্য ভয়ানক যুদ্ধ করলেন। তাদের বহু হাতি, ঘোড়া, রথ বিনাশ করে সমস্ত দিকবিদিক বাণে আচ্ছাদিত করে তুললেন। তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন—এঁরা সকলে গর্জন করতে করতে ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণের দিকে ধাবিত হয়ে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সকলে একসঙ্গে আক্রমণ করেও কর্ণকে রথ থেকে ফেলাতে সক্ষম হলেন না। কর্ণ তাঁদের ধনুক, ধ্বজা, ঘোড়া, সারথি, পতাকা ইত্যাদি কেটে পাঁচবাণে তাঁদের পাঁচজনকে বিদ্ধ করলেন। সূতপুত্র যখন এঁদের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, তখন তাঁর বাণের টংকার শুনে মনে হচ্ছিল বৃক্ষ ও পর্বতসহ সমস্ত পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি সকলকে অসংখ্য বাণে জর্জরিত করে তুললেন। কর্ণ এইভাবে পাঁচ মহারথীকে পরাস্ত করলেন। এই সময় দ্রৌপদীর পুত্রেরা সেখানে এসে তাঁদের মাতুলদের রথে তুলে নিয়ে সংকট থেকে উদ্ধার করলেন।

সাত্যকি কর্ণের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে খণ্ডিত করলেন। তারপর কর্ণকে ঘায়েল করে আপনার পুত্র দুর্যোধনকে বিদ্ধ করলেন। তখন কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, দুর্যোধন, কর্ণ—চারজনে মিলে সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করতে লাগলেন। চার দিকপালের সঙ্গে যেমন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু একাকী যুদ্ধ করছিলেন—তেমনই যদুকুলভূষণ সাত্যকি চারজনের সঙ্গে একাই যুদ্ধ করছিলেন। এরমধ্যে পাঞ্চাল মহারথীরা বর্ম পরিধান করে অন্য নতুন রথে সেখানে এলেন সাত্যকিকে রক্ষা করতে। সেইসময় শত্রু সৈন্যের সঙ্গে আপনার সৈন্যদের ভয়ানক যুদ্ধ হল। বহু রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। তারা পরস্পর একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে লাগল এবং আর্তস্বরে চিৎকার করতে লাগল। বহু সৈনিক প্রাণত্যাগ করে রণক্ষেত্রে শয়ন করল।

—০—

ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান এবং তাকে বধ, যুধামন্যু কর্তৃক চিত্রসেন বধ এবং ভীমের হর্ষোৎগার

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! যখন এই ভয়ংকর সংগ্রাম চলছিল, সেইসময় রাজা দুর্যোধনের অনুজ, আপনার পুত্র দুঃশাসন নির্ভয়ে বাণবর্ষণ করতে করতে ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। তাকে দেখেই ভীমসেন ছুটে গেলেন এবং সিংহ যেমন মৃগকে আক্রমণ করে, তিনিও দুঃশাসনকে সেইভাবে আক্রমণ করলেন। তারপর দুই বীরে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে গেল, দুজনেই প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। এর মধ্যে ভীমসেন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আপনার পুত্রের ধনুক ও ধ্বজা দুটি ক্ষুরের দ্বারা কেটে ফেললেন, এক বাণে তাঁর ললাটে আঘাত করে অন্য বাণে সারথির মাথা দেহচ্যুত করে দিলেন। দুঃশাসনও তখন অন্য ধনুক নিয়ে ভীমকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন এবং নিজেই ঘোড়া চালাতে লাগলেন। তারপর দুঃশাসন ভীমসেনের ওপর এক ভয়ংকর বাণ চালালেন যা বজ্রের সমান অসহনীয়, সেই বাণ ভীমের শরীর ছিদ্র করে দিলে ভীম প্রাণহীনের মতো হাত ছড়িয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এলে তিনি পুনরায় সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন।

দুঃশাসন সেই সময় যুদ্ধে যে পরাক্রম দেখালেন, তা অন্য কেউ দেখাতে পারত না। তিনি বাণের দ্বারা

ভীমসেনের ধনুক কেটে তাঁর সারথিকেও বিদ্ধ করলেন। তারপর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীমকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। ভীমসেন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার পুত্রের ওপর এক ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করলেন। শক্তিকে নিজের দিকে আসতে দেখে আপনার পুত্র দশ বাণে সেটি কেটে ফেললেন। তাঁর এই সকল দুষ্কর কর্ম দেখে সকল সৈনিক হর্ষোৎফুল্ল হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু ভীমসেন তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দুঃশাসনের দিকে তাকিয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন—'বীর দুঃশাসন! আজ তুমি আমাকে তীব্র আঘাত করেছ, এখন তুমি আমার গদার আঘাত সহ্য কর।' এই বলে তিনি দুঃশাসনকে বধ করার জন্য তাঁর ভয়ংকর গদা হাতে নিয়ে বললেন—'দুরাত্মা! আজ এই সংগ্রামে আমি তোমার রক্তপান করব।'

ভীম এই কথা বলতেই দুঃশাসন তাঁর ওপর এক ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করলেন। ভীমও তাঁর ভয়ানক গদা ঘুরিয়ে ছুঁড়লেন। সেই গদা দুঃশাসনের শক্তিকে টুকরো টুকরো করে তাঁর মাথায় গিয়ে আঘাত করল। গদার আঘাতে দুঃশাসনের রথ দশধনুক পেছনে সরে গেল। তাঁর দেহেও বেশ গভীর আঘাত লেগেছিল, বর্ম ছিন্ন হয়েছিল, বসন-ভূষণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, বেদনায় ব্যাকুল হয়ে ছটফট করতে করতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, সেই গদার আঘাতে দুঃশাসনের ঘোড়াগুলি নিহত হল এবং তাঁর রথের ধ্বজাও উড়ে গেল। দুঃশাসনের এই অবস্থা দেখে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধা প্রসন্ন হয়ে সিংহনাদ করতে লাগল।

আপনার পুত্রকে এইভাবে পরাজিত করে ভীমসেন আনন্দিত হয়ে বারংবার সিংহগর্জন করে দশ দিক প্রকম্পিত করলেন। সেই ভৈরব নাদ শুনে আশপাশের যোদ্ধারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। সেই সময় ভীমসেনের পূর্বের কথা স্মরণ হল—'দ্রৌপদী রজস্বলা ছিলেন, তিনি কোনো অপরাধ করেননি, তা সত্ত্বেও তাঁর কেশ আকর্ষণ করে তাঁকে পূর্ণ রাজসভায় এনে বস্ত্র উন্মোচন করা হয়েছিল।' সেই সঙ্গে কৌরবদের দেওয়া আরও নানা কথার আঘাত স্মরণ করে ভীমসেন ক্রোধে জ্বলে উঠে সেখানে উপস্থিত কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মাকে বলতে লাগলেন—'যোদ্ধাগণ! আমি এখনই পাপী দুঃশাসনের প্রাণনাশ করব, তোমরা তাকে বাঁচাতে পারলে বাঁচাও।'

এই কথা বলে ভীমসেন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দুঃশাসনকে বধ করার জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। সিংহ যেমন বড় হাতিকে ধরে, তেমন করে ভীম কর্ণ ও দুর্যোধনের সামনেই দুঃশাসনকে চেপে ধরলেন। তারপর তিনি তলোয়ার তুলে একপা দিয়ে দুঃশাসনের গলা চেপে ধরলেন। দুঃশাসন তখন থরথর করে কাঁপছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে ভীমসেন বললেন—'দুঃশাসন, সেদিনের কথা মনে পড়ে। যেদিন তুমি কর্ণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে উপহাস করে আমাকে 'বলদ' বলেছিলে ? দুরাত্মা! রাজসূয় যজ্ঞে অবভৃথ-স্নানে পবিত্র হওয়া মহারানি দ্রৌপদীর চুল তুমি কোন হাত দিয়ে টেনেছিলে ? বলো, ভীমসেন আজ তোমার কাছে তার জবাব চায়।'

ভীমসেনের কথা শুনে দুঃশাসন তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর জাকুটিও হল, ক্রুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—'এই সেই হাত, যা হাতির শুঁড়ের মতো বলিষ্ঠ, যে হাত হাজার হাজার গাভী দান করেছে এবং বহু ক্ষত্রিয় বীর নিধন করেছে। ভীমসেন! যখন সভাগৃহে কুরুপ্রধানগণ ও তোমরা বসেছিলে, আমি এই হাত দিয়ে দ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণ করে এনেছিলাম।'

দুঃশাসনের গর্বিত কথা শুনে ভীমসেন তাঁর বুকের ওপর উঠে বসে দৃঢ় হাতে ধরে তাঁর ডান হাত উপড়ে নিতে লাগলেন এবং সমস্ত যোদ্ধাদের শুনিয়ে বললেন—'আমি দুঃশাসনের হাত উপড়ে দিচ্ছি, এখনই তাকে বধ করব,

যার শক্তি আছে সে এসে আমার হাত থেকে একে রক্ষা করো।' সমস্ত বীরদের এইভাবে আহ্বান করে মহাবলী ভীম

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দুঃশাসনের হাত উপড়ে নিলেন। দুঃশাসনের সেই হাত বজ্রের মতো কঠিন ছিল, ভীমসেন সেই উৎপাটিত হাতটি দিয়েই সব যোদ্ধাদের সামনে দুঃশাসনকে মারতে লাগলেন। তারপর দুঃশাসনের বুক চিরে তিনি গরম রক্ত পান করতে লাগলেন এবং তলোয়ার

দিয়ে তার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করলেন। তিনি রক্তের স্বাদগ্রহণ করে বললেন—'আমি মাতার দুধ, মধু ও ঘৃত এবং দিব্য রস পান করেছি, দুধ ও দধি থেকে উত্থিত তাজা মাখনের স্বাদও গ্রহণ করেছি। এতদ্ব্যতীত জগতে বহুপ্রকার পানীয় আছে, যেগুলি অমৃতের ন্যায় মধুর স্বাদযুক্ত ; কিন্তু আমার শত্রুর রক্তের স্বাদ এসবের চেয়ে বিশিষ্ট, অধিক সুস্বাদু।'

এই কথা বলে তিনি বারংবার সেই রক্ত আস্বাদন করে অত্যন্ত হর্ষান্বিত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। সেইসময় যারা উপস্থিত ছিল, তাঁকে দেখে সকলেই ভয়ে ব্যাকুল হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। যারা তেমন ভয় পায়নি, তাদেরও হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল। অনেকে ভয়ে চোখবন্ধ করে

চিৎকার করতে লাগল। রক্তপান করার সময় ভীমকে ভীষণ ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। অনেকে ভয়ে চিৎকার করে 'আরে! এ মানুষ নয়, রাক্ষস' বলে চিত্রসেনের সঙ্গে পালাতে লাগল। চিত্রসেনকে পালাতে দেখে যুধামন্যু সেনা নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণে চিত্রসেনকে বিদ্ধ করলেন। চিত্রসেনও যুধামন্যু এবং তাঁর সারথিকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। যুধামন্যু তখন এক তীক্ষ্ণ বাণে চিত্রসেনের মাথা দেহচ্যুত করে দিলেন। ভাইয়ের মৃত্যুতে কর্ণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে নিজ পরাক্রমে পাণ্ডব সেনা সংহার করতে লাগলেন। সেই সময় তেজস্বী নকুল এগিয়ে এসে তাঁর সম্মুখীন হলেন।

এদিকে ভীমসেন দুঃশাসনের রক্ত অঞ্জলি ভরে নিয়ে বিকট গর্জন করে সমস্ত বীরদের শুনিয়ে বলতে লাগলেন—'নীচ দুঃশাসন ! এই দেখ, আমি তোমার রক্তপান করছি। এখন দেখি তুমি কীকরে আমাকে 'বলদ', 'বলদ' বলে ডাকতে পার ! আমাকে বিষ খাইয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে বিষধর সাপ আমাকে দংশন করেছিল। তারপর আমাদের লাক্ষাগৃহে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং পাশা খেলায় পরাজিত করে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের বনে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। সব থেকে বেশি মর্মান্তিক হল এই যে, পূর্ণ সভাগৃহে দ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণ করে আনা হয়েছিল। যুদ্ধে আমাদের বেদনাদায়ক বাণের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে, গৃহেও কখনো সুখে থাকতে পারলাম না। রাজা বিরাটের গৃহে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, সে কথা অবশ্য আলাদা। শকুনি, দুর্যোধন ও কর্ণের পরামর্শে আমাদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তার মূল কারণ তুমিই ছিলে।'

এই বলে ক্রুদ্ধ ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কাছে চলে গেলেন। সেই সময় তাঁর দেহ রক্তে মাখামাখি হয়েছিল। তিনি হেসে বললেন—'বীরগণ ! আমি যুদ্ধে দুঃশাসনের

বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা আজ পূর্ণ করেছি। এবার এই রণযজ্ঞে দুর্যোধনরূপী যজ্ঞপশুকে বধ করে আহুতি দেব এবং কৌরবদের চোখের সামনেই যখন এই দুরাত্মার মাথা পায়ে করে চূর্ণ করব, তখনই আমি শান্তিলাভ করব।' এই বলে ভীম গর্জন করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের দশপুত্র বধ, কর্ণের ভয় এবং শল্যের তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান, নকুল ও বৃষসেনের যুদ্ধ, অর্জুন কর্তৃক বৃষসেন বধ এবং কর্ণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আলোচনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! দুঃশাসন মারা গেলে আপনার পুত্র নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অলোলুপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ এবং সুবর্চা—এই দশ মহারথী এক সঙ্গে ভীমসেনের ওপর আক্রমণ করলেন এবং তাঁকে বাণে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। ভাইয়ের মৃত্যুতে তাঁরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন, তাই বাণের সাহায্যে তাঁরা ভীমের গতি রুদ্ধ করলেন। এই মহারথীদের চারদিক থেকে বাণ মারতে দেখে ভীমসেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তখন তাঁকে কালের মতো মনে হচ্ছিল। তিনি দশটি ভল্লের আঘাতে আপনার দশজন পুত্রকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন।

তাঁদের মৃত্যু হতেই কৌরব সেনারা ভীমের ভয়ে পালাতে লাগল, কর্ণ শুধু চোখ মেলে দেখতে লাগলেন। মহারাজ ! প্রজানাশকারী যমরাজের ন্যায় ভীমের এই পরাক্রম দেখে কর্ণের মনে অত্যন্ত ভয় উৎপন্ন হল। রাজা শল্য তাঁকে দেখে কর্ণের মনোভাব বুঝতে পারলেন। তিনি কর্ণকে কিছু সময়োচিত কথা বললেন—'রাধানন্দন ! ভয় পেয়ো না। তোমার মতো বীরের তা শোভা পায় না। রাজারা ভীমের ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, দুর্যোধনও ভাইয়ের মৃত্যুতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। ভীমসেন যখন দুঃশাসনের রক্ত পান করছিলেন, তখন থেকেই কৃপাচার্য প্রমুখ বীর এবং অবশিষ্ট কৌরবগণ দুর্যোধনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন। সকলেই শোকে ব্যাকুল হয়েছিলেন, তাঁদের চেতনা লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল।

এমতাবস্থায় তুমি তোমার পৌরুষের ওপর আস্থা রাখো এবং ক্ষত্রিয়ধর্মে অনড় থেকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো। দুর্যোধন সমস্ত ভার তোমার ওপরেই অর্পণ করেছে। তুমি তোমার বল ও শক্তি অনুযায়ী তা পালন করো। যদি বিজয়লাভ করো তাহলে বহু যশ লাভ করবে আর পরাস্ত হলে নিশ্চিত অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে।'

শল্যের কথা শুনে কর্ণ তাঁর হৃদয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ভাব (উৎসাহ-ক্রোধ ইত্যাদি) জাগিয়ে তুললেন। এদিকে মহাবীর নকুল বৃষসেনকে আক্রমণ করে বাণের দ্বারা তাঁকে পীড়িত করে তুললেন। তিনি বৃষসেনের ধনুক কেটে ফেললেন। কর্ণপুত্র তখন অন্য ধনুক এনে নকুলকে ঘায়েল করলেন। তিনি নানা অস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাই মাদ্রীপুত্রের ওপর দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি উত্তম অস্ত্রের দ্বারা নকুলের শ্বেতবর্ণের চারটি ঘোড়া বধ করলেন। ঘোড়াগুলি নিহত হলে নকুল ঢাল তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে রণভূমিতে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি বড় বড় রথী, অশ্বারোহী, গজারোহীকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন। বৃষসেনকে ঘায়েল করলেন এবং একাই বহু সৈনিক বধ করলেন।

কর্ণপুত্র তখন তাঁকে বাণবিদ্ধ করে অস্থির করে তুললেন। নকুল তাঁর বাণবর্ষণ ব্যর্থ করে নানা অদ্ভুত কৌশল দেখিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বৃষসেন নকুলের ঢালকে টুকরো টুকরো করে দিলেন, ঢাল খণ্ডিত হওয়ায় নকুল তলোয়ারের সাহায্যে যুদ্ধ করতে থাকলে, বৃষসেন সেটিও খণ্ড-বিখণ্ড করে দিলেন। তারপর এক তেজপূর্ণ বাণে নকুলের বুকে ভীষণ আঘাত করলেন। নকুল অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে ভীমের রথে গিয়ে উঠলেন। তখন এক রথে দুই মহারথীকে বধ করার জন্য বৃষসেন বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেইসময় সেখানে কৌরব পক্ষের অন্যান্য আরও বীর পৌঁছে সকলে মিলে দুই ভাইকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

সেই সময় 'নকুল বৃষসেনের বাণে আহত, তার তলোয়ার ও ধনুক খণ্ডিত হয়েছে এবং সে রথহীন হয়ে গেছে'—এইসব জানতে পেরে দ্রুপদের পাঁচপুত্র, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ গর্জন করতে করতে সেখানে এসে বাণের দ্বারা আপনার সেনার রথ, হাতি, ঘোড়া সংহার করতে লাগলেন। তা দেখে আপনার প্রধান মহারথী কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, উলূক, বৃক, ক্রাথ এবং দেবাবৃধ প্রমুখ বাণের দ্বারা শত্রুদের সেই এগারোজন মহারথীকে এগিয়ে আসতে বাধা দিলেন।

তখন আষাঢ়ে মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ পর্বত-শিখরের ন্যায় উচ্চ, ভয়ংকর বেগসম্পন্ন হাতি নিয়ে কুলিন্দদের সেনা আপনার মহারথীদের আক্রমণ করল। কুলিন্দরাজের পুত্র লৌহবাণের আঘাতে সারথি ও ঘোড়াসহ কৃপাচার্যকে আহত করলেন, কিন্তু পরে কৃপাচার্যের বাণের আঘাতে তিনি হাতিসহ ভূপাতিত হয়ে মারা গেলেন। কুলিন্দরাজের ছোট ভাই শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তিনি সূর্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল তোমর দ্বারা গান্ধাররাজের রথের ধ্বজা ভেঙে জোরে গর্জন করে উঠলেন। কিন্তু শকুনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথা দেহচ্যুত করলেন। কুলিন্দরাজের অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপনার পুত্র দুর্যোধনের বুকে অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে। দুর্যোধন তখন তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে আঘাত করে তাঁর হাতিকেও বিদ্ধ করেন। হাতি রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন কুলিন্দকুমার অন্য হাতি নিয়ে এলেন, তিনি সারথি ও ঘোড়াসহ ক্রাথকে রথসহ আঘাত করলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্রাথ-নিক্ষিপ্ত বাণে বিদীর্ণ হয়ে তিনিও হাতিসহ মৃত হয়ে ধরাশায়ী হলেন।

তারপর এক পার্বত্য রাজা হাতিতে করে এসে ক্রাথরাজাকে আক্রমণ করল। সে তার বাণে ক্রাথের ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা ও ধনুক বিনষ্ট করে তাঁকেও বধ করল। তখন বৃক সেই পার্বত্য রাজাকে বারো বাণে জর্জরিত করে দিলেন। আঘাত পেয়ে রাজার বিশাল গজরাজ বৃকের ওপর পড়ল এবং তার চারটি পায়ের আঘাতে সে রথ ও ঘোড়াসহ বৃককে পদদলিত করল, শেষকালে দেবাবৃধ-কুমারের বাণে আহত হয়ে রাজাসহ সেই গজরাজ যমালয়ে গমন করল। এদিকে দেবাবৃধ-কুমারও সহদেব পুত্রের বাণে আহত হয়ে মারা গেল। এরপরে অন্য কুলিন্দ যোদ্ধা শকুনিকে বধ করার জন্য হাতিতে চড়ে এসে তাঁকে বাণের আঘাতে পীড়িত করতে লাগল, তাই দেখে গান্ধাররাজ তার মাথাও কেটে দিলেন। অন্য দিকে নকুলপুত্র শতানীক আপনার সেনার মধ্যে বড় বড় গজরাজ, ঘোড়া, রথী ও পদাতিকদের সংহার করতে লাগলেন। তখন কলিঙ্গরাজের অন্য এক পুত্র তাঁর সম্মুখীন হলেন। তিনি হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণ বাণে শতানীককে ঘায়েল করলেন। শতানীক ক্রুদ্ধ হয়ে এক ক্ষুরাকার বাণে কলিঙ্গরাজকুমারের মাথা কেটে ফেললেন।

তারপর কর্ণপুত্র বৃষসেন শতানীককে আক্রমণ করলেন। তিনি তিন বাণে নকুলপুত্রকে আহত করে অর্জুন, ভীমসেন, নকুল এবং শ্রীকৃষ্ণকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করলেন। তাঁর এই অলৌকিক পরাক্রম দেখে সমস্ত কৌরব হর্ষান্বিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। অর্জুন দেখলেন কর্ণপুত্র নকুলের ঘোড়াগুলি বধ করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও আহত করেছেন, তখন তিনি কর্ণের সামনে দণ্ডায়মান তাঁর পুত্রের দিকে ধাবিত হলেন। তাঁকে আক্রমণ করতে দেখে কর্ণকুমার অর্জুনকে এক বাণে আহত করে অত্যন্ত জোরে গর্জন করে উঠলেন। তারপর তাঁর বাম হাত লক্ষ্য করে কয়েকটি ভয়ংকর বাণ ছুঁড়লেন এবং পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন।

অর্জুন এবার ক্ষিপ্ত হয়ে বৃষসেনকে বধ করার কথা চিন্তা করলেন। ক্রোধের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত হল এবং চোখ লাল হয়ে উঠল। তখন তিনি হেসে কর্ণ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা এবং অন্য সব মহারথীদের বললেন— কর্ণ! আমার পুত্র অভিমন্যু একাকী ছিল, আমিও তার সঙ্গে ছিলাম না, সেই অবস্থায় তোমরা সকলে মিলে তাকে বধ করেছ—সকলেই এই কাজকে নিন্দা করে। আজ আমি তোমাদের সামনেই তোমার পুত্র বৃষসেনকে বধ করব। রথীগণ ! তোমরা সকলে মিলে তাকে বাঁচাতে পারলে বাঁচাও। কর্ণ ! বৃষসেনকে বধ করার পর আমি তোমাকেও বধ করব। সমস্ত বিবাদের মূলে তুমি, দুর্যোধনের আশ্রয় পেয়ে তোমার অহংকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আজ আমি তোমাকে অবশ্যই বধ করব। দুর্যোধনকে ভীমসেন বধ করবে।'

এই কথা বলে অর্জুন ধনুকে টংকার তুলে নিশানা স্থির করে বৃষসেনকে বধ করার জন্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। তাতে বৃষসেন মর্মস্থলে আঘাত পেলেন। তারপর অর্জুন কর্ণকুমারের ধনুক এবং তাঁর দুহাত কেটে ফেললেন। পরে চার ক্ষুরে তাঁর মাথা ও হাত কেটে ফেললেন। মাথা ও হাত কেটে যাওয়ায় বৃষসেন রথ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পুত্রবধ হওয়ায় কর্ণ শোকে অধীর হয়ে উঠলেন, তিনি রোষভরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন।

মহারাজ ! সেইসময় কর্ণকে আসতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হেসে অর্জুনকে বললেন—'ধনঞ্জয় ! আজ তোমাকে যাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, সেই মহারথী কর্ণ আসছেন, সাবধান হও। দেখ, ওই তাঁর শ্বেতবর্ণ ঘোড়াযুক্ত রথ। স্বয়ং কর্ণ তাতে উপবিষ্ট রয়েছেন। রথে নানাপ্রকার পতাকা শোভা পাচ্ছে এবং ছোট ছোট ঘণ্টা লাগানো আছে। তাঁর ধ্বজার দিকে তাকিয়ে দেখো, সেটি সর্পচিহ্নযুক্ত। বাণবর্ষণ করতে করতে কর্ণ এগিয়ে আসছেন। তাঁকে আসতে দেখে পাঞ্চালমহারথীরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অতএব কুন্তীনন্দন ! তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সূতপুত্রকে বধ করতে হবে। তুমি যুদ্ধে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং ত্রিলোককে জয় করতে সক্ষম, সে কথা আমি জানি। যাঁর মূর্তি অত্যন্ত উগ্র, ভয়ংকর, যাঁর ত্রিলোচন, যিনি মস্তকে জটাজুট ধারণ করেন, সেই ভগবান মহাদেবকে অন্যেরা দেখতেও সক্ষম হয় না, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু তুমি সমগ্র জীবের কল্যাণকারী সেই ভগবান শিবকে যুদ্ধের দ্বারা আরাধনা করেছ। দেবতারাও তোমাকে বর প্রদান করেছেন। সুতরাং তুমি সেই ত্রিশূলধারী দেবাদিদেব ভগবান শংকরের কৃপায় কর্ণকে সেইভাবে বধ করো, যেভাবে ইন্দ্র নমুচিকে বধ করেছিলেন। আমি আশীর্বাদ করছি—যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করবে।'

অর্জুন বললেন—'মধুসূদন ! সর্বলোকেশ্বর গুরু, আপনি আমার ওপর প্রসন্ন, অতএব আমার বিজয় নিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। হৃষীকেশ ! রথটি কর্ণের দিকে নিয়ে চলুন। অর্জুন এখন কর্ণকে না মেরে ফিরবে না। আপনি আজ কর্ণকে আমার বাণে টুকরো টুকরো হতে দেখবেন, নাহলে আমাকে কর্ণের বাণে মৃত দেখবেন। আজ ত্রিলোকের রোমাঞ্চকারী এই ভয়ংকর যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন জগতের লোক এই যুদ্ধের কথা নিয়ে আলোচনা করবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলে অর্জুন এগিয়ে চললেন। তিনি যেতে যেতে বললেন—'হৃষীকেশ ! শীঘ্র চলুন, যুদ্ধের সময় পার হয়ে যাচ্ছে।' অর্জুনের কথা শুনে ভগবান তাঁকে বিজয়লাভের বরপ্রদান করে বেগে ঘোড়া চালালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্জুনের রথ কর্ণের সামনে গিয়ে উপস্থিত হল।

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা এবং শিব কর্তৃক অর্জুনকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা, কর্ণের শল্যের সঙ্গে এবং অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কর্ণ যখন দেখলেন বৃষসেন বধ হয়েছেন, তিনি গভীর দুঃখ পেলেন ; তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল। তারপর ক্রোধে রক্তচক্ষু করে কর্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করে এগোলেন। সেইসময় ত্রিভুবন জয় করতে উদ্যত ইন্দ্র ও বলির ন্যায় সেই দুই বীরকে যুদ্ধে প্রস্তুত দেখে সমস্ত প্রাণী চমকিত হল। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই শঙ্খ ও ভেরী বাজাতে লাগল। যোদ্ধারা সিংহনাদ করতে লাগল, সেই তুমুল আওয়াজে চতুর্দিক গুঞ্জরিত হতে লাগল।

দুই বীর যখন একে অপরের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ধাবিত হলেন, তখন তাঁদের গজরাজ ও কালের ন্যায় মনে হচ্ছিল, তাঁরা ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। রূপ ও গুণে তাঁরা দেবতাদের তুল্য ছিলেন। মনে হচ্ছিল দেবতাদের ইচ্ছায় যেন সূর্য ও চন্দ্র মিলিত হয়েছেন। দুই মহাবলী যোদ্ধাই নানা অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তাঁদের দুজনকে মুখোমুখি দেখে আপনার যোদ্ধারা সকলেই

উৎকণ্ঠিত হলেন। সকলেই চিন্তা করতে লাগলেন,

দুজনের মধ্যে কে জয় লাভ করবেন !

মহারাজ ! কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দেখবার জন্য দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ, পক্ষী, বেদবিদ্ মহর্ষি, শ্রাদ্ধান্নভোজী পিতৃকুল এবং তপবিদ্যা ঔষধির অধিষ্ঠাতা দেবতা নানা রূপ ধারণ করে অন্তরীক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তাঁদের কলরব শোনা যাচ্ছিল। ব্রহ্মর্ষি এবং প্রজাপতিগণের সঙ্গে ব্রহ্মা এবং ভগবান শংকরও দিব্যবিমানে করে যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন। দেবতারা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু ! কৌরব এবং পাণ্ডবপক্ষের এই দুই বীরের মধ্যে কে বিজয়ী হবেন ? প্রজাপতি ! আমরা দেখছি এঁদের মধ্যে কেউ কারও থেকে কম নয়। কর্ণ এবং অর্জুনের বিবাদে সমস্ত জগৎ চিন্তাগ্রস্ত। প্রভু ! আপনি সত্য করে বলুন, এঁদের মধ্যে কে বিজয়ী হবেন ?'

প্রশ্ন শুনে ইন্দ্র দেবাদিদেব পিতামহকে প্রণাম করে বললেন—'প্রভু ! আপনি আগেই বলে দিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের জয়লাভ নিশ্চিত। আপনার সেই কথা সত্য হওয়া উচিত। হে দেব ! আমি আপনাকে প্রণাম জানাই, আমার ওপর প্রসন্ন হোন।'

ইন্দ্রের প্রার্থনা শুনে ব্রহ্মা এবং শংকর বললেন—'দেবরাজ ! মহাত্মা অর্জুনেরই বিজয় নিশ্চিত। তিনি খাণ্ডববনে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছিলেন, স্বর্গে এসে তোমাকেও সাহায্য করেছেন। অর্জুন সত্য ও ধর্মে অটল ; সুতরাং তাঁর বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী এতে কোনোই সন্দেহ নেই। জগতের প্রভু সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ তাঁর সারথি হতে স্বীকার করেছেন ; তিনি মনস্বী, বলবান, শূরবীর, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং তপস্বী। তিনি সম্পূর্ণ ধনুর্বিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন। অর্জুন এইরূপ সমস্ত সদ্‌গুণ যুক্ত ; এতদ্ব্যতীত তাঁর বিজয় দেবতাদেরই বিজয়তুল্য। অর্জুন মনুষ্য সমাজে শ্রেষ্ঠ এবং তপস্বী। তিনি নিজ মহিমায় দৈব বিধানও পরিবর্তিত করতে সক্ষম। যদি তা হয়, তবে অবশ্যই সমস্ত লোক বিনাশপ্রাপ্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে এই জগৎ কখনো টিকতে পারবে না। এঁরা দুজনেই জগৎ সৃষ্টি করেন, এঁরা প্রাচীন ঋষি নর ও নারায়ণ। এঁদের ওপর কারো শাসন চলে না, এঁরাই সকলকে তাঁদের শাসনে রাখেন। দেবলোকে বা ইহলোকে এঁদের সমকক্ষ কেউ নেই। দেবতা, ঋষি এবং চারণদের সঙ্গে ত্রিলোক এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এঁদের শাসনের অন্তর্গত। এঁদের শক্তিতেই সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনেরই বিজয় হবে। কর্ণ বসু অথবা মরুৎদের লোকে গমন করবে।'

ব্রহ্মা এবং ভগবান শংকর এই কথা বললে ইন্দ্র সমস্ত উপস্থিত দেবগণকে ডেকে তাঁদের কথা জানালেন। তিনি বললেন—'আমাদের পূজনীয় প্রভু আমাদের হিতার্থে যা বলেছেন, তা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এখন তাই হবে, অন্যরূপ নয় ; সুতরাং সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।' ইন্দ্রের কথা শুনে সকল প্রাণী বিস্মিত হল এবং আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল এবং তাঁদের ওপর সুগন্ধ পুষ্পবর্ষণ করতে লাগল। দেবতারা নানাপ্রকার দিব্য বাদ্যধ্বনি করতে লাগলেন।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন, শল্য ও কর্ণ নিজেরা নিজেদের শঙ্খ বাজালেন। সেই সময় দুজনে সেনাদের ভয় ধরানো যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। উভয়ের রথেই নির্মল ধ্বজা শোভা পাচ্ছিল। কর্ণের ধ্বজার দণ্ড বজ্রমণ্ডিত, তার ওপর হস্তী চিহ্ন। অর্জুনের ধ্বজার ওপর এক উৎকৃষ্ট বানর উপবিষ্ট, যার মুখ যমরাজের মতো গ্রাস করতে সর্বদাই উন্মুখ। সে তার বিকট মুখব্যাদান করে সকলকে ভয় দেখাতো, তার দিকে তাকানো কঠিন ছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূ বাঁকা করে শল্যের দিকে তাকালেন, যেন নেত্ররূপী বাণে তাঁকে বিদ্ধ করছেন। শল্যও তাঁর

দিকে সেইরূপেই তাকালেন। কিন্তু এতে শ্রীকৃষ্ণেরই জয় হল, শল্য চক্ষু নামিয়ে নিলেন। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়ও এইভাবে দৃষ্টিদ্বারা কর্ণকে পরাস্ত করলেন।

কর্ণ তখন হেসে শল্যকে বললেন—'শল্য ! এই যুদ্ধে যদি অর্জুন আমাকে বধ করে, তাহলে তুমি কী করবে ? সত্য কথা বল।' শল্য বললেন—'কর্ণ ! যদি এরা আজ তোমাকে মেরে ফেলে, তাহলে আমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনকেই পরপারে পাঠাব।'

এইভাবে অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলে, তিনি হেসে বললেন—'পার্থ ! এ কী হতে পারে ? সূর্য কী কখনো তার স্থানচ্যুত হতে পারে, সমুদ্র কী শুষ্ক হতে পারে এবং অগ্নিও কী তার উষ্ণতা পরিত্যাগ করে শৈত্য স্বীকার করতে পারে ? এ সব সম্ভবও হতে পারে ; কিন্তু কর্ণ তোমাকে বধ করবে, এ কখনো সম্ভব নয়। যদি কোনো ভাবে তা হয়, তাহলে জগৎ সংসার উল্টে যাবে। আমি আমার হাত দিয়ে কর্ণ ও শল্যকে পিষে মারব।'

ভগবানের কথা শুনে অর্জুন হেসে ফেললেন এবং বললেন—'জনার্দন ! এই শল্য এবং কর্ণ আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আজ আপনি দেখবেন আমি ছত্র, বর্ম, শক্তি, ধনুক, বাণ, রথ, ঘোড়া এবং রাজা শল্যসহ কর্ণকে বাণের সাহায্যে টুকরো টুকরো করে ফেলব। আজ সূতপুত্রের স্ত্রীদের সিঁথির সিঁদুর মোছার সময় এসেছে। তাঁরা অবশ্যই এই দশাপ্রাপ্ত হবেন। এই অদূরদর্শী মূর্খ, দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আমার সম্মুখ বারংবার তাঁকে বাজে কথা বলেছে এবং আমাদের উপহাস করেছে। সুতরাং আজ অবশ্যই আমি তাকে বধ করব।'

দুর্যোধনের কাছে অশ্বত্থামার সন্ধির প্রস্তাব, দুর্যোধনের তাতে অস্বীকৃতি এবং কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধে অর্জুনকে ভীম ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজিত করে তোলা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! তখন দুর্যোধন, কৃতবর্মা, শকুনি, কৃপাচার্য এবং কর্ণ—এই পাঁচ মহারথী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর প্রাণঘাতী বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এই দেখে ধনঞ্জয় তাঁদের ধনুক, বাণ, তূণীর, হাতি, ঘোড়া, রথ এবং সারথি প্রভৃতিকে বাণের দ্বারা নষ্ট করে দিলেন ; সেই সঙ্গে শত্রুদের মানমর্দন করে সূতপুত্র কর্ণকেও বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। ইতিমধ্যে অর্জুনকে বধ করার জন্য সেখানে শতশত গজারোহী এবং শক, তুষার, যবন ও কম্বোজ দেশের অসংখ্য অশ্বারোহী দ্রুত এগিয়ে এল ; কিন্তু অর্জুন তাঁর বাণ ও ক্ষুরের আঘাতে তাদের অস্ত্র ও মস্তক কেটে মাটিতে ফেললেন এবং হাতি, ঘোড়া, রথ বিনষ্ট করলেন।

তা লক্ষ্য করে আকাশে দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল, সকলেই অর্জুনকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন এবং পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা দুর্যোধনের কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'দুর্যোধন ! এখন শান্ত হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও, বিরোধ করে কোনো লাভ নেই। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করা উচিত নয়। তোমাদের গুরুদেব অস্ত্রবিদ্যায় অতিশয় দক্ষ ছিলেন, তিনি এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ভীষ্মাদি মহারথীদেরও সেই অবস্থা প্রাপ্তি হয়েছে। আমি এবং আমার মাতুল কৃপাচার্য অবধ্য, তাই এখনও জীবিত আছি। সুতরাং এখন তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে

একসঙ্গে চিরকাল রাজ্যশাসন করো। আমি অনুরোধ করলে অর্জুন যুদ্ধ করবে না। শ্রীকৃষ্ণও বিরোধিতা চান না। যুধিষ্ঠির তো সকল প্রাণীর হিতার্থে ব্যাপৃত থাকেন, সুতরাং তিনিও মেনে নেবেন। বাকি থাকলেন ভীমসেন এবং নকুল-সহদেব ; এঁরা ধর্মরাজের আজ্ঞাধীন, তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করবেন না। তোমার সঙ্গে পাণ্ডবদের সন্ধি হলে সমস্ত প্রজার কল্যাণ হবে। তোমার অনুমতি নিয়ে এই রাজারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেন এবং সমস্ত সৈনিকও যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাবে। রাজন্ ! যদি আমার কথায় কর্ণপাত না করো, তাহলে অবশ্যই শত্রুর হাতে মারা পড়বে এবং তখন অনুতাপ করতে হবে। আজ তুমি এবং সমস্ত জগৎ দেখেছে যে অর্জুন একাকী যে পরাক্রম দেখিয়েছে তা ইন্দ্র, যমরাজ, বরুণ এবং কুবেরের পক্ষেও সম্ভব নয়। অর্জুন আমার থেকে বেশি গুণবান, তবুও আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে সে আমার কথা অমান্য করবে না। শুধু তাই নয়, তারা সর্বদা তোমাদের মনের মতো ব্যবহার করবে। সুতরাং রাজন্ ! তুমি প্রসন্ন মনে সন্ধি করে নাও। তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার জন্যই আমি তোমাকে এই প্রস্তাব জানাচ্ছি। তুমি যদি প্রসন্ন চিত্তে এই প্রস্তাব স্বীকার করে নাও তাহলে কর্ণকে আমি যুদ্ধ করতে বারণ করব। বিদ্বান ব্যক্তিরা চার প্রকারের বন্ধুর কথা বলে থাকেন। এক হল নিষ্কাম মিত্র, যাঁর বন্ধুত্ব স্বাভাবিক হয়ে থাকে, দ্বিতীয় সন্ধি করে তৈরি করা মিত্র। তৃতীয় তারা, যাদের অর্থ দিয়ে আপন করা হয়েছে এবং চতুর্থ হল যারা প্রবল প্রতাপ দেখে স্বতঃই কাছে এসে শরণ গ্রহণ করেছে। পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমাদের সর্বপ্রকারেই মিত্রতা সম্ভব। বীরবর ! তুমি যদি প্রসন্নতাপূর্বক পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতা স্বীকার করে নাও, তাহলে তোমার দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ হবে।'

অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে এই সব হিতের কথা বলায় তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—'মিত্র ! তুমি যা বলছ, তা ঠিকই ; তবে এই বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। দুর্বুদ্ধি ভীমসেন দুঃশাসনকে বধ করার পর যা বলেছিল, তা এখনও আমি ভুলিনি। এই অবস্থায় কীকরে শান্তি পাব ? কীভাবে সন্ধি হবে ? গুরুপুত্র ! এখন তোমার কর্ণকে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলা উচিত নয়। কারণ অর্জুন এখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, কর্ণ এখন সহজেই তাকে বধ করতে পারবে।'

অশ্বত্থামাকে এই কথা বলে অনুনয় করে দুর্যোধন তাঁকে প্রসন্ন করলেন, তারপর সৈনিকদের বললেন—'আরে !

তোমরা বাণ হাতে করে চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন ? যাও, শত্রুদের আক্রমণ করে বধ করো।' ইতিমধ্যেই শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে কর্ণ এবং অর্জুন যুদ্ধের জন্য সামনে এসে দাঁড়ালেন। দুজনে একে অপরের ওপর অস্ত্রবর্ষণ শুরু করলেন। রক্তের ধারা প্রবাহিত হল। তাঁরা বজ্রসম বাণে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মতো যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই সময় হাতি, ঘোড়া, পদাতিক সমন্বিত দুপক্ষের সৈন্যবাহিনী ভয়ে কম্পিত হচ্ছিল। কর্ণ তার মধ্যে মত্ত গজের ন্যায় অর্জুনকে বধ করার জন্য এগোলেন। তাই দেখে লোকেরা চিৎকার করে উঠল—'অর্জুন ! এখন দেরি করা ঠিক নয়, কর্ণ সামনে এসেছে, ওকে মেরে ফেলো ; মাথা কেটে ফেলো।' তেমনই আমাদের পক্ষের অনেক যোদ্ধাও কর্ণকে বলতে লাগল—'কর্ণ ! যাও, তোমার তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুনকে বধ করো।'

কর্ণ তখন বাণ দিয়ে অর্জুনকে বিদ্ধ করতে লাগলেন, অর্জুন হাসতে হাসতে কর্ণের কোমরে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাত করলেন। দুজনেই ভয়ংকর বাণে একে অপরকে আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক থেকে যে সব বাণ নিক্ষেপ করলেন, কর্ণ সেগুলি সব নষ্ট করলেন। তখন অর্জুন আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তাতে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়ল। যোদ্ধাদের বস্ত্রে আগুন লেগে গেল, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল তাদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল।

আগ্নেয়াস্ত্রকে শান্ত করার জন্য কর্ণ বরুণাস্ত্র প্রয়োগ

করলেন ; অগ্নি নির্বাপিত হল। সেই সময় আকাশে মেঘ করে চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সবদিকে শুধু জলই দেখা যাচ্ছিল। তখন অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণ নিক্ষিপ্ত বারুণাস্ত্রকে শান্ত করে দিলেন ; মেঘের রাশি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপর অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক এবং বাণগুলি অভিমন্ত্রিত করে অত্যন্ত প্রভাবশালী ঐন্দ্রাস্ত্র বজ্র প্রকট করলেন। তার থেকে নানা ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র হাজার হাজার সংখ্যায় নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। সেই অস্ত্রগুলি কর্ণের সর্ব অঙ্গে, ঘোড়াতে, ধ্বজাতে সর্বত্র বিদ্ধ হতে লাগল। কর্ণের শরীর বাণে আচ্ছাদিত হয়ে রক্তে ভেসে গেল। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, সমুদ্রের ন্যায় গর্জনকারী ভার্গবাস্ত্র নিক্ষেপ করে অর্জুনের ঐন্দ্রাস্ত্র থেকে নিষ্কাশিত হওয়া বাণগুলি টুকরো টুকরো করে দিলেন। নিজের অস্ত্রদ্বারা শত্রুর অস্ত্র প্রশমিত করে কর্ণ পাণ্ডব সেনার রথী, গজারোহী, পদাতিক সংহার করতে লাগলেন। ভার্গবাস্ত্রের প্রয়োগ করে কর্ণ যখন পাঞ্চাল ও সোমকদের আক্রমণ করলেন, অর্জুনও তাঁকে চারদিক থেকে বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। সূতপুত্র বাণের দ্বারা পাঞ্চালদের রথী, পদাতিক সকলকে বিদীর্ণ করতে লাগলেন, তারা চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করতে লাগল। সেই সময় আপনার সৈনিকরা কর্ণ জয়ী হয়েছেন মনে করে সিংহনাদ করে হাততালি দিতে লাগল।

তাই দেখে ভীম ক্রোধভরে অর্জুনকে বললেন—'বিজয় ! ধর্ম অবহেলাকারী এই পাপী কর্ণ আজ তোমার সামনেই কীকরে পাঞ্চাল বীরদের হত্যা করল ? কালিকেয় দানবও তোমাকে পরাস্ত করতে পারেনি, সাক্ষাৎ মহাদেবের সঙ্গে তোমার হাতাহাতি হয়েছে, তাহলে এই সূতপুত্র কীকরে তোমাকে বাণবিদ্ধ করল ? তোমার নিক্ষিপ্ত বাণগুলি সে নষ্ট করে দিয়েছে। আমার তো খুবই আশ্চর্য লাগছে। আরে ! সভাগৃহে দ্রৌপদীকে যে কষ্ট দিয়েছে সেগুলি মনে করো ; এই পাপী নির্ভয়ে আমাদের যে ক্লীব বলেছিল এবং তীক্ষ্ণ কটু বাক্য বলেছিল, সেগুলিও স্মরণ করো। এই সমস্ত কথা স্মরণ করে শীঘ্রই কর্ণকে বধ করো। তুমি এত অসতর্ক কেন ? এখন অসতর্কতার সময় নয়।'

তখন শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বললেন—'বীরবর ! কী ব্যাপার ? তুমি যতবার আঘাত করেছ কর্ণ প্রত্যেক বার তোমার অস্ত্র নষ্ট করে দিয়েছে। আজ তোমার কী হয়েছে ? যুদ্ধে মন নেই কেন ? দেখো তোমার শত্রুরা হর্ষভরে সিংহনাদ করছে। যে ধৈর্য সহকারে তুমি প্রত্যেক যুগে ভয়ংকর রাক্ষস সংহার করেছ, দম্ভোদ্ভব নামক অসুর বিনাশ করেছ, সেই ধৈর্য সহকারে আজ কর্ণকে বিনাশ করো।'

—o—

কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে উত্তেজিত করায় অর্জুন সূতপুত্রকে বধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। সেই সঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'প্রভু ! আমি এবার জগতের কল্যাণ এবং সূতপুত্রকে বধ করার জন্য মহাভয়ংকর অস্ত্র প্রয়োগ করছি। এর জন্য আপনি, ব্রহ্মা, শংকর, সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত বেদবিদ্গণ আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।' ভগবানকে একথা বলে সব্যসাচী ব্রহ্মাকে নমস্কার করে যা মানসিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কর্ণ বাণবর্ষণ করে সেই অস্ত্র প্রতিহত করলেন।

তাই দেখে ভীমসেন ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে সত্য-প্রতিজ্ঞ অর্জুনকে বললেন—'সব্যসাচী ! সকলেই জানে তুমি ব্রহ্মাস্ত্রের উত্তম জ্ঞাতা, অতএব আজ অন্য কোনো উত্তম অস্ত্র সন্ধান করো।' তা শুনে অর্জুন অন্য অস্ত্র ধনুকে সন্ধান করলেন ; তার থেকে প্রজ্বলিত বাণবর্ষণ হতে লাগল। চারিদিক তাতে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। তার থেকে শুধু বাণ নয়, ত্রিশূল, চক্র, নারাচ ইত্যাদি নানা অস্ত্র বহু সংখ্যায় বেরিয়ে এসে যুদ্ধরত সৈন্যদের প্রাণনাশ করতে লাগল। কারো মাথা কাটা পড়ল, কেউ ভয়ে হতজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল, অন্যেরা এদের পড়তে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল। কিরীটধারী অর্জুন শত্রুপক্ষের প্রধান বীরদের এইভাবে সংহার করলেন।

অপরদিকে কর্ণও অর্জুনের ওপর অজস্র বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তারপর ভীম, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে

বাণবিদ্ধ করে জোরে সিংহনাদ করে উঠলেন। অর্জুন পুনরায় বাণ নিক্ষেপ করলেন, তাঁর এক বাণে কর্ণের ধ্বজা ভেঙে গেল, চার বাণে শল্য ও কর্ণ আহত হলেন। অর্জুন রাজকুমার সভাপতিকেও বাণে বিদ্ধ করলেন। দুই বাণে তাঁর ধ্বজা উড়িয়ে ধনুক কেটে ফেললেন, পাঁচ বাণে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করে, দুই বাণে তাঁর দুহাত কেটে অন্য একটিতে মস্তক ভূলুণ্ঠিত করলেন। এইভাবে রাজকুমার নিহত হয়ে রথ থেকে মাটিতে পড়লেন। তারপর অর্জুন আবার কর্ণকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। পরে তিনি অস্ত্রসহ চারশো গজারোহী, আটশো রথী, এক হাজার অশ্বারোহী এবং আট হাজার পদাতিক সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বাণের দ্বারা কর্ণের সারথি, রথ, ঘোড়া ও ধ্বজা আচ্ছাদিত করে দিলেন। এরপর তিনি কৌরবদের নিশানা করলেন। তাঁর আঘাতে কৌরবরা চিৎকার করে কর্ণের কাছে এসে বলতে লাগল—'কর্ণ! তুমি শীঘ্র পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বধ করো। নাহলে সে সমস্ত কৌরবদের নাশ করবে।'

তাদের প্রেরণায় কর্ণ পূর্ণ শক্তি দিয়ে বহু বাণবর্ষণ করে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্য নাশ করতে লাগলেন। কর্ণ ও অর্জুন উভয়েই অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন, তাই নানা অস্ত্র প্রয়োগ করে তাঁরা শত্রু সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। এরমধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির ঔষধের প্রয়োগে এবং শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দেখতে সেখানে উপস্থিত হলেন। নিপুণ বৈদ্যগণ শীঘ্রই তাঁর দেহ থেকে বাণ বার করে ক্ষত সারিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মরাজকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হতে দেখে সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হল।

সেই সময় সূতপুত্র কর্ণ ক্ষুদ্রক নামে একশোটি বাণ অর্জুনকে মারলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও আহত করে অর্জুনকে আবার আঘাত করলেন। ভীমসেনের ওপরও অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন পাণ্ডব ও সোমক বীররা কর্ণকে তেজপূর্ণ বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিল। কিন্তু তিনি অসংখ্য বাণ মেরে তাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। তারপর তাদের অস্ত্র, রথ, ঘোড়া, হাতিও বিনাশ করলেন। আপনার যোদ্ধারা কর্ণের বিজয় হয়েছে মনে করে সিংহনাদ করতে লাগল।

তখন অর্জুন হাসতে হাসতে রাজা শল্যের বর্ম বাণবিদ্ধ করলেন এবং কর্ণকেও আঘাত করলেন। কর্ণের দেহে বহু ক্ষতের সৃষ্টি হল, তাঁর শরীর রক্তাপ্লুত হয়ে উঠল। কর্ণও তখন অর্জুনকে বাণবিদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শ্রীকৃষ্ণের বর্মভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। তা লক্ষ্য করে অর্জুন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি বহু তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের মর্মস্থল বিদ্ধ করলেন। কর্ণ তাতে বিচলিত হয়ে পড়লেন ; কিন্তু ধৈর্যধারণ করে যুদ্ধে স্থির থাকলেন। তারপর অর্জুন বাণের এমন জাল বিস্তার করলেন যে সূর্যের কিরণ, কর্ণের রথ, দিগ্‌বিদিক কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। তিনি কর্ণের পার্শ্বরক্ষাকারী এবং চরণদার, সামনে-পেছনের রক্ষক—সকলকেই পলকের মধ্যে বিনাশ করলেন। শুধু তাই নয়, দুর্যোধন যাদের খুব সম্মান করতেন, সেই দু হাজার কৌরব বীরদেরও রথ, ঘোড়া, সারথিসহ মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিলেন। তখন আপনার অবশিষ্ট জীবিত পুত্রগণ কর্ণের আশ্রয় ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। কৌরব যোদ্ধারা কেউ মৃত কেউবা আহত হয়ে চিৎকার করতে করতে পিতা-পুত্র-ভাই একে-অপরকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। কর্ণ তখন চার দিকে তাকিয়ে সব শূন্য দেখলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত কৌরবরা তাঁকে একাকী রেখেই পলায়ন করেছে ; কিন্তু কর্ণ তাতে একটুও ভয় পেলেন না। তিনি পূর্ণ উৎসাহে অর্জুনকে পুনরায় আক্রমণ করলেন।

ভগবান দ্বারা অর্জুনকে সর্পমুখ বাণ হতে রক্ষা এবং অশ্বসেন নাগ বধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! পলায়নরত কৌরব সৈন্যরা এমন দূরত্বে গিয়ে দাঁড়াল, যেখানে ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বাণ না পৌঁছায়। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে লাগল অর্জুনের অস্ত্র চারদিকে বিদ্যুতের মতো চমকিত হচ্ছে। তারা আরও দেখল যে, কর্ণ তাঁর ভয়ংকর বাণে সেগুলি বিনষ্ট করে দিচ্ছেন। অর্জুন তখন রুদ্র রূপ ধারণ করে কৌরব সৈন্য ভস্ম করতে লাগলেন। কর্ণ তাই দেখে আথর্বণ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। এই শত্রুনাশক অস্ত্র তিনি পরশুরামের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। সেই অস্ত্রের দ্বারা কর্ণ অর্জুনের অস্ত্র রোধ করলেন এবং তাঁকেও তেজপূর্ণ বাণে বিদ্ধ করলেন। কর্ণ ও অর্জুন এত বাণবর্ষণ করতে লাগলেন যে সারা আকাশ ঢেকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, বাণ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সেই যুদ্ধে বীরত্বে, অস্ত্র সঞ্চালনে, মায়াবলে এবং পৌরুষে কখনো সূতপুত্র এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কখনো অর্জুন। একে অপরের অরক্ষিত স্থানে প্রহার করছিলেন ; যোদ্ধারা তাঁদের কাজ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিলেন। সেই সময় যাঁরা অন্তরীক্ষে ছিলেন তাঁরা কর্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন—'বাহ কর্ণ', 'সাবাস অর্জুন' ! এই সব কথা শোনা যাচ্ছিল।

সেই সময় পাতালবাসী অশ্বসেন নাগ, যে অর্জুনকে শত্রু বলে মনে করত, কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ হচ্ছে জেনে অত্যন্ত গতিতে লাফিয়ে সেখানে এসে অর্জুনের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার সেটাই উপযুক্ত সময় ভেবে, বাণের রূপ ধরে কর্ণের তূণীরে ঢুকে গেল। কর্ণ যখন কিছুতেই অর্জুনের পরাক্রমের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না, তখন তাঁর সর্পমুখ বাণের কথা স্মরণ হল। সেই বাণ অতি ভয়ংকর ছিল, অগ্নিতে তাপিত করায় সেটি সর্বদা দেদীপ্যমান থাকত। অর্জুনকে বধ করার জন্যই কর্ণ সেই বাণ অত্যন্ত যত্নে বহুদিন ধরে সুরক্ষিত রেখেছিলেন। তিনি নিত্য তার পূজা করতেন এবং স্বর্ণ তূণীরে চন্দনের গুঁড়োর মধ্যে তাকে রেখেছিলেন। তিনি সেই বাণ ধনুকে চড়িয়ে অর্জুনের দিকে নিশানা করলেন। সেই বাণের স্থানে আসলে অশ্বসেন নাগই ধনুকে উঠেছিল—তাই দেখে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ 'হায় ! হায় !' করতে লাগলেন।

মদ্ররাজ শল্য যখন সেই ভয়ংকর বাণকে ধনুকে চড়াতে দেখলেন, তিনি বললেন —"কর্ণ ! তোমার এই বাণ শত্রুর কণ্ঠে লাগবে না ; একটু দেখে শুনে আবার নিশানা ঠিক করো, যাতে এর দ্বারা মাথা কেটে ফেলা যায়।"

শল্যের কথায় কর্ণের চোখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল, তিনি মদ্ররাজকে বললেন—'মদ্ররাজ ! কর্ণ দুবার নিশানা স্থির করে না। আমার মতো বীর কপটভাবে যুদ্ধ করে না।'

এই কথা বলে কর্ণ বহুবছর ধরে যাকে পূজা করেছেন, সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং অর্জুনকে তিরস্কার করে চিৎকার করে বললেন—'অর্জুন ! তুমি এখনই মারা পড়বে।'

কর্ণের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ অন্তরীক্ষে উঠেই প্রজ্বলিত হল। তাকে সবেগে আসতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খেলার ছলে রথটি তৎক্ষণাৎ পা দিয়ে চেপে দিলেন, চাপ দেওয়ায় রথের চাকা খানিকটা মাটিতে বসে গেল। সেই সঙ্গে স্বর্ণআভরণ ভূষিত ঘোড়াগুলিও মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ল। ভগবানের এই কৌশল দেখে আকাশে তাঁর

প্রশংসায় দিব্য বাণী শোনা গেল। পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল। কর্ণ নিক্ষিপ্ত সেই বাণ রথ নীচু হয়ে যাওয়ায় অর্জুনের কণ্ঠে আঘাত না করে তাঁর মুকুটে গিয়ে আঘাত করল এবং মুকুটটি নীচে পড়ে গেল ; অর্জুনের মুকুটটি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং বরুণলোকেও বিখ্যাত ছিল। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত ছিল তার দ্যুতি। ব্রহ্মা

অত্যন্ত যত্নে ও তপস্যায় সেটি ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। মুকুটটির থেকে অত্যন্ত সুন্দর এক মিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। দৈত্য বধ করার জন্য যখন অর্জুন যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, তখন ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে তাঁকে নিজের হাতে এই মুকুটটি পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মুকুটই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সর্পের বিষে জর্জরিত হয়ে জ্বলন্ত অবস্থায় মাটিতে গিয়ে পড়ল। অর্জুন তাতে একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি মাথার চুলে সাদা কাপড় বেঁধে যুদ্ধে অবিচল থাকলেন। সেই সময় তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন ; কারণ সর্পমুখ বাণের রূপে অর্জুনের শত্রু তক্ষকের পুত্র সেখানে ছিল। কিরীটে আঘাত করে সে পুনরায় তূণীরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্ণ তাকে দেখে ফেলেন। কর্ণের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে—'কর্ণ ! তুমি ভালো করে দেখে শুনে বাণ নিক্ষেপ করনি, তাই আমি অর্জুনের মস্তক ছেদ করতে পারিনি ; পুনরায় লক্ষ্য ঠিক করে বাণ নিক্ষেপ করো, তাহলে আমি তোমার ও আমার শত্রু এই অর্জুনের মাথা কেটে ফেলব।'

কর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ?' নাগ বলল—'আমি নাগ, অর্জুন খাণ্ডববনে আমার মাকে বধ করে অপরাধ করেছে, সেইজন্য ওর সঙ্গে আমার শত্রুতা হয়েছে। যদি স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রও তার রক্ষার্থে আসে, তাহলেও ওকে যমালয়ে যেতে হবে।' কর্ণ বললেন—'নাগ ! কর্ণ আজ অন্যের বলে জয়লাভ করতে চায় না। তোমাকে নিশানা পথে রেখে আমি যদি শত শত অর্জুনকেও বধ করতে পারি, তবুও আমি এক বাণ দুবার নিশানা করি না। আমার কাছে সর্পবাণ আছে, উত্তম প্রচেষ্টা আছে এবং মনে রোষ আছে ; এই সবের সাহায্যে আমি নিজেই অর্জুনকে বধ করব। তুমি প্রসন্ন হয়ে ফিরে যাও।'

কর্ণের উত্তর নাগের সহ্য হল না, সে নিজেই ভয়ানক রূপ ধারণ করে অর্জুনকে বধ করার জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হল। তা লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'এই মহাসর্প তোমার শত্রু, একে বধ করো।' অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—'এ কে ?' ভগবান বললেন—'খাণ্ডববনে যখন তুমি অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করছিলে, সেইসময় এর মাতা পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থে একে পুনরায় গিলে পেটে লুকিয়ে রেখেছিল। যখন এ তার মায়ের সঙ্গে আকাশে উড়ছিল, সেই সময় তুমি দুজনকে এক মনে করে শুধু এর মাকে মেরে ফেলেছিলে। সেই শত্রুতা স্মরণ করে আজ এ তোমার দিকে ধেয়ে আসছে।'

তখন অর্জুন আকাশে বক্রভাবে উড্ডীয়মান সেই নাগকে তেজপূর্ণ ছটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। বাণের আঘাতে তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ল। তার মৃত্যু হলে ভগবান মাটিতে বসে যাওয়া রথটি দুহাতে টেনে তুললেন। সেই সময় কর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে নব্বই বাণে আঘাত করলেন, পরে আর একটি ভয়ানক বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করে সিংহ বিক্রমে গর্জন করে হাসতে লাগলেন।

অর্জুনের বাণের আঘাতে কর্ণের মূর্ছা, মাটিতে বসে যাওয়া চাকা তোলার সময় কর্ণের ধর্মের দোহাই দেওয়া এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়া

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কর্ণের হাস্য এবং প্রসন্নভাব অর্জুন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অসংখ্য বাণে তাঁর মর্মস্থল বিদ্ধ করলেন এবং কালদণ্ডের ন্যায় নব্বই বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। বাণের আঘাতে কর্ণের দেহে অনেক ক্ষত সৃষ্টি হল এবং তিনি খুব বেদনাবোধ করতে লাগলেন। কর্ণের মস্তকে এক হীরা-মাণিক্য শোভিত স্বর্ণ মুকুট এবং কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল শোভিত ছিল। বাণের আঘাতে কর্ণের সুবর্ণ মুকুট কুণ্ডলসহ মাটিতে পড়ে গেল। তাঁর বর্মটিও অত্যন্ত সুন্দর এবং মহার্ঘ ছিল, বহু যত্নে তৈরি সেই বর্মটিও অর্জুন বাণের আঘাতে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ বাণে তিনি কর্ণকে পুনরায় আঘাত করলেন। বাত, পিত্ত, কফের প্রকোপে সান্নিপাত জ্বরে যেমন দেহে ব্যথা-বেদনা হয়, তেমনই শত্রুর আঘাতে কর্ণের শরীরেও বেদনা অনুভূত হতে লাগল। অর্জুন আবার তাঁর শরীরে বাণ নিক্ষেপ করলেন। এইভাবে আঘাতের পর আঘাতে কর্ণ একান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন, তাঁর হাত থেকে

ধনুক পড়ে গেল এবং ক্ষতবিক্ষত দেহে রথে পতিত হয়ে তিনি চৈতন্য হারালেন।

অর্জুন নরশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষের ব্রত পালন করতেন ; তিনি কর্ণকে সংকটে পড়তে দেখে তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করা বন্ধ করলেন। তা লক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে উঠলেন—'একি, পাণ্ডুনন্দন ! এ কেমন ব্যাপার ? বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংকটগ্রস্ত শত্রুকে বধ করে ধর্ম ও যশ প্রাপ্ত হয়। তুমি শীঘ্র একে বধ করার চেষ্টা করো ; এ যদি আবার আগের মতো শক্তি ফিরে পায়, তাহলে আবার তোমাকে আক্রমণ করবে।' তখন অর্জুন 'ঠিক আছে' বলে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান জানিয়ে, তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি 'বৎসদন্ত' নামক বাণে কর্ণকে রথ ও ঘোড়াসহ আচ্ছাদিত করে পূর্ণ শক্তিতে চতুর্দিক বাণে ঢেকে দিলেন।

তারপর কর্ণের চেতনা ফিরে এলে তিনি ধৈর্য ধরে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণ বিদ্ধ করলেন। অর্জুন তখন কর্ণের ওপর এক ভয়ানক বাণ নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে কর্ণের বধের সময়ও উপস্থিত। সেই সময় কাল অদৃশ্যে থেকে কর্ণকে ব্রাহ্মণের শাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর বধের কথা জানিয়ে বললেন—'পৃথিবী এখন তোমার রথের চাকা গ্রাস করতে চাইছেন।' সেই সময় পরশুরাম প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষার স্মৃতি তাঁর মন থেকে দূরীভূত হবার উপক্রম হল। ব্রাহ্মণের অভিশাপ অনুযায়ী তাঁর রথের বাঁদিকের চাকাটি মাটিতে বসে যেতে লাগল

এবং রথটিও কাঁপতে লাগল।

এইভাবে কর্ণের রথের চাকা যখন মাটি গ্রাস করল, পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মরণ হল এবং সর্পমুখবিশিষ্ট ভয়ানক বাণও যখন নষ্ট হয়ে গেল, তখন কর্ণ খুব ভয় পেলেন। তিনি একসঙ্গে এতগুলো সংকটে পড়ে ধৈর্য হারালেন, অত্যন্ত বিষাদমগ্ন হয়ে তিনি হাত নেড়ে ধর্মের নিন্দা করতে লাগলেন—'ধর্মবেত্তা ব্যক্তিরা সর্বদা বলে থাকেন যে ধর্ম অবশ্যই মানুষকে রক্ষা করে। আমিও শাস্ত্রে যেমন শুনেছি, আমার যেমন শক্তি, সেই অনুযায়ী ধর্ম পালনের জন্য সর্বদাই চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ সেও আমাকে মারছে, বাঁচাবার চেষ্টা করছে না। তাই আমার মনে হয় ধর্মও তার ভক্তকে সর্বদা রক্ষা করে না।'

কর্ণ যখন এইসব বলছিলেন তখন তাঁর ঘোড়াগুলি ও সারথি অস্থির হয়ে উঠেছিল। তিনি নিজেও অর্জুনের বাণের আঘাতে বিচলিত হয়েছিলেন। মর্মস্থানে আঘাত লাগায় তিনি আহত হয়েছিলেন, কিছু করার শক্তি ছিল না। এই অবস্থায় থেকে থেকে তিনি ধর্মের নিন্দা করছিলেন। তবুও মরিয়া হয়ে তিনি কৃষ্ণের হাতে এবং অর্জুনকে বাণ বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও তখন কর্ণের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, সেগুলি কর্ণের দেহ ভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সেই আঘাতে কর্ণ কেঁপে উঠলেন, কিন্তু সবলে নিজেকে স্থির রেখে অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তা লক্ষ্য করে অর্জুন তাঁর বাণগুলিকে অভিমন্ত্রিত করে কর্ণের ওপর বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু মহারথী কর্ণের সামনে আসামাত্রই তিনি অর্জুনের বাণগুলি খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'পার্থ ! রাধানন্দন কর্ণ তোমার বাণসমূহ নষ্ট করে দিচ্ছে। তুমি এখন অন্য কোনো উত্তম অস্ত্রের প্রয়োগ করো।' অর্জুন তাঁর কথায় সাবধান হয়ে অভিমন্ত্রিত ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র চড়ালেন এবং সমস্ত দিক বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে কর্ণকে পুনরায় আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। কর্ণ তখন তেজপূর্ণ বাণে তাঁর ধনুকের গুণ কেটে দিলেন, অর্জুন অন্য গুণ পরালে সেটিও কর্ণ কেটে ফেললেন। এইভাবে এগারো বার কর্ণ অর্জুনের গুণ কেটে ফেললেন, কিন্তু তাঁর জানা ছিল না অর্জুনের কাছে একশোটি গুণ রয়েছে। তাই অর্জুন পুনরায় গুণ পরিয়ে সেটি অভিমন্ত্রিত করে বাণবর্ষণ শুরু করলেন। কর্ণ তাঁর অস্ত্র দ্বারা অর্জুনের অস্ত্র কেটে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন, এইভাবে তিনি অর্জুনের থেকেও বেশি পরাক্রম

দেখাতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন অর্জুন কর্ণের বাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তখন বললেন—'অর্জুন! অস্ত্র দ্বারা খুব নিকট থেকে আঘাত করো।' অর্জুন তখন মন্ত্র পড়ে রৌদ্রাস্ত্রকে ধনুকে চড়ালেন এবং সেটি কর্ণের ওপর নিক্ষেপ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিমধ্যেই কর্ণের রথের চাকা অনেকটাই মাটি গ্রাস করেছে; তা লক্ষ্য করে কর্ণ

তৎক্ষণাৎ রথ থেকে নেমে দুহাতে রথের চাকা ধরে রথ তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সপ্তদ্বীপ সমন্বিত এই পৃথিবীকে পর্বত ও বনসহ চার আঙুলে তুলতে সক্ষম, তিনি কিন্তু এই রথটিকে মাটির ভেতর থেকে তুলতে পারলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল, অর্জুনের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—'কুন্তীনন্দন! তুমি খুব বড় বীর; আমি যতক্ষণ না এই চাকা ওপরে উঠিয়ে নিই, ততক্ষণ তুমি একটু অপেক্ষা করো। অধম ব্যক্তিদের পথে চালিত না হয়ে তোমার শ্রেষ্ঠ আচরণ করা উচিত। যে বিধ্বস্ত হয়েছে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ, হাত জোড় করেছে, শরণাগত এবং প্রাণভিক্ষা করছে, অস্ত্র ত্যাগ করেছে, বর্ম খণ্ডিত হয়েছে, অস্ত্র পড়ে গেছে বা ভেঙে গেছে, এইসব মানুষের ওপর উত্তম আচরণকারী যোদ্ধা অস্ত্র নিক্ষেপ করেন না। তুমিও পৃথিবীর মধ্যে বড় বীর এবং সদাচারী, যুদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত। উপনিষদের গভীর জ্ঞানী, দিব্যাস্ত্র জ্ঞাতা ও উদার হৃদয়, যুদ্ধে কার্তবীর্যকেও পরাজিতকারী। মহাবাহো! যতক্ষণ আমি এই মাটিতে আটকে যাওয়া চাকা না ওঠাই, ততক্ষণ অপেক্ষা করো। তুমি রথে উপবিষ্ট আর আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে, তাছাড়া বর্তমানে আমি হতবুদ্ধি, এইসময় আমার ওপর তোমার আঘাত করা উচিত নয়।'

কর্ণের কথা শুনে রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন—'রাধানন্দন! খুবই সৌভাগ্যের কথা যে এখন তোমার ধর্মের কথা মনে পড়ছে। প্রায়শ দেখা যায় যে নীচ ব্যক্তিরা বিপদে পড়ে ভাগ্যের নিন্দা করে, নিজের কৃত কুকর্মের নয়। কর্ণ! পাণ্ডবদের বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর পার হলেও যখন তুমি তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চাওনি, তোমার ধর্ম তখন কোথায় ছিল? তোমারই পরামর্শে রাজা দুর্যোধন যখন ভীমকে বিষমিশ্রিত খাবার খাইয়েছিল এবং সর্প দিয়ে দংশন করিয়েছিল, সেই সময় কোথায় ছিল তোমার ধর্ম? বারণাবত নগরে লাক্ষাভবনে নিদ্রিত অবস্থায় পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার যখন ব্যবস্থা করেছিলে, তোমার ধর্ম সেইসময় কোথায় ছিল? পরিপূর্ণ সভাগৃহে দুঃশাসনের দ্বারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে আনার পর তাঁকে লক্ষ্য করে তুমি যে উপহাস করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? স্মরণ আছে কি তুমি দ্রৌপদীকে বলেছিলে—'কৃষ্ণে, পাণ্ডবরা বিনষ্ট হয়ে

গেছে, চিরকালের মতো দারিদ্র্যে পতিত হয়েছে ; এবার তুমি অন্য কোনো পতি বরণ করো।' এই বলে তুমি যখন বিস্ফারিত নয়নে তাঁকে দেখছিলে, তখন কোথায় ছিল তোমার ধর্ম ? পুনরায় রাজ্যলোভে তুমি শকুনির পরামর্শে যখন পাণ্ডবদের দ্বিতীয়বার জুয়ায় আমন্ত্রণ জানালে, সেই সময় কোথায় ছিল তোমার এই ধর্ম ? অভিমন্যু একাকী, বালক, তা সত্ত্বেও তোমরা বহু মহারথী একত্র হয়ে তাকে ঘিরে ধরে বধ করেছিলে, সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? এই সকল কর্মে যদি ধর্মকে সরিয়ে রাখা হয়, তাহলে আজও ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো লাভ হবে না। অতএব এখন তুমি যতই ধর্মের কথা বলো, আজ তোমার রেহাই নেই। পুষ্কররাজ নলকে জুয়ায় হারিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ পরাক্রমে পুনরায় রাজ্য জয় করেছিলেন এবং যশ লাভ করেছিলেন। নির্লোভ পাণ্ডবরাও সেইরূপ তাদের বাহুবলে শত্রু সংহার করে নিজ রাজ্য লাভ করবে এবং এই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের হাতেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা বিনাশ প্রাপ্ত হবে।'

ভগবান বাসুদেবের কথায় কর্ণ লজ্জায় মাথা নীচু করলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

কর্ণ বধ এবং শল্যের দুর্যোধনকে সান্ত্বনা প্রদান

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কর্ণ তখন নিরুপায় হয়ে পুনরায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'তুমি কর্ণকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা বধ করো।' ভগবানের কথায় অর্জুনের কর্ণের অত্যাচারের কথা স্মরণ হল। তিনি তখন ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর রোমকূপ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোতে লাগল। তা লক্ষ্য করে কর্ণ অর্জুনের ওপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। অর্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই সেটি প্রশমিত করলেন। তারপর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, সেটি নিজ তেজে প্রজ্বলিত হল। কর্ণ বারুণাস্ত্র দ্বারা সেটি শান্ত করলেন ; তাতে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল, চতুর্দিক অন্ধকারে ভরে গেল। কিন্তু অর্জুন তাতে বিচলিত হলেন না। তিনি কর্ণের সামনেই বায়ব্যাস্ত্রে সেই মেঘ সরিয়ে দিলেন।

সূতপুত্র তখন অর্জুনকে বধ করবার জন্য এক জ্বলন্ত অগ্নিসম ভয়ংকর বাণ হাতে নিলেন। যেই সেটি ধনুকে চড়িয়েছেন, তখনই পর্বত, বন-উপবনসহ সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল ; সেই বজ্রসম বাণ অর্জুনের বুকে গভীর আঘাত করল, তাঁর হাত অবশ হয়ে মাথা ঘুরে গেল, গাণ্ডীব ধনুক পড়ে গেল এবং সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। এইসময় সুযোগ পেয়ে কর্ণ রথ থেকে নেমে দুহাতে ধরে চাকা তোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দৈববশে তিনি এতে সফল হলেন না।

তারমধ্যে অর্জুনের চেতনা ফিরে এল ; তিনি যমদণ্ডের ন্যায় একটি বাণ হাতে নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন—'কর্ণ রথে ওঠার আগেই তার মস্তক ছেদন করো'। 'ঠিক আছে' বলে অর্জুন ভগবানের আদেশ মেনে নিলেন এবং কর্ণের ধ্বজায় জ্বলন্ত বাণ নিক্ষেপ করলেন। ধ্বজা ভেঙে গেল এবং সেটি ভেঙে পড়তেই কৌরবদের যশ, অহংকার, বিজয়, মনোবাসনা এবং হৃদয়ও ভেঙে গেল। সেই সময় হাহাকার রব উঠল। অর্জুন তখন কর্ণকে বধ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর তূণীর থেকে ইন্দ্রের বজ্র এবং যমরাজের দণ্ডের ন্যায় আঞ্জলিক নামক বাণ হাতে নিলেন। সেটি অত্যন্ত তীব্রগতিসম্পন্ন ছিল। সেই বাণ সর্বদিকে প্রসারিত কালাগ্নির ন্যায় ভয়ংকর এবং পিনাক ও সুদর্শন চক্রের ন্যায় ভয়ানক। অর্জুন সেই বাণ গাণ্ডীব ধনুকে চড়িয়ে বললেন—'আমি যদি তপস্যা করে থাকি, গুরুজনদের সেবাদ্বারা প্রসন্ন রেখে থাকি, যজ্ঞ করে থাকি এবং হিতৈষী মিত্রদের কথা মন দিয়ে শুনে থাকি, তাহলে সেই সত্যপ্রভাবে এই বাণ যেন আমার শত্রু কর্ণকে নাশ করে।' এই কথা বলে তিনি সেই ভয়ানক বাণ কর্ণকে বধ করবার জন্য তাঁর দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে সেই বাণ সূর্যের ন্যায় তেজ বিকীরণ করে আকাশ ও সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন দিনের তৃতীয় প্রহর, অর্জুন ওই বাণের দ্বারা কর্ণের মস্তক কেটে ফেললেন। আঞ্জলিক দ্বারা কর্তিত কর্ণের মস্তক মাটিতে পড়ল এবং দেহ থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল। সেই

লাভ হল না। দৈব পাণ্ডবদের পক্ষে ছিল, তিনিই ওদের রক্ষা করে আমাদের বিনাশ করেছেন। তোমার পক্ষের প্রমুখ যোদ্ধারা ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রভাবশালী, তাদের পরাক্রম, তেজ, শৌর্য, বল সবই ছিল, তারা প্রায় অবধ্যই ছিল, তবুও পাণ্ডব যোদ্ধারা তাদের পরাস্ত করেছে। সুতরাং ভারত, তুমি দুঃখ কোরো না, এসবই প্রারব্ধের খেলা। সকলে সর্বদা সিদ্ধিলাভ করে না, এই ভেবে ধৈর্য ধারণ করো।'

মদ্ররাজের কথায় এবং মনে মনে নিজের অন্যায়গুলি স্মরণ করে দুর্যোধন অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তাঁর বুদ্ধি কাজ করছিল না। দুঃখে পীড়িত হয়ে তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

দুর্যোধনের বাধা প্রদান সত্ত্বেও ভীম ও অর্জুনের ভয়ে কৌরব সেনার পলায়ন এবং উভয় পক্ষের সেনাদের শিবিরে প্রত্যার্পণ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! কৌরব সেনারা তখন ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পালাচ্ছিল। তাদের এই অবস্থা দেখে দুর্যোধন হাহাকার করে উঠে তাঁর সারথিকে বললেন—'সূত! তুমি ঘোড়াগুলিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলো। হাতে ধনুক নিয়ে যদি আমি সমস্ত সেনার পেছনে অবস্থান করি তাহলে অর্জুন আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সেই অবস্থায় যদি অর্জুন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, নিঃসন্দেহে আমি তাঁকে বধ করব। আজ আমি অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও অহংকারী ভীমকে অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছিয়ে কর্ণের ঋণ থেকে মুক্ত হব।'

দুর্যোধনের এই যোদ্ধৃতুল্য কথা শুনে সারথি ধীরে ধীরে ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে চলল। যুদ্ধে আপনার পক্ষে পঁচিশ হাজার পদাতিক উপস্থিত ছিল, ভীম এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তাদের চতুরঙ্গিণী সেনা দ্বারা ঘিরে ধরে বাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। তারাও অবিচলভাবে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। ভীমসেন সেই সময় ক্রুদ্ধ হয়ে গদা হাতে রথ থেকে নেমে তাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীমসেন ধর্মযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন, তাই নিজে রথে করে পদাতিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন না। তাঁর নিজের শক্তির ওপর আস্থা ছিল। গদা হস্তে যমরাজের ন্যায় বিচরণ করে মহাবলী ভীম আপনার পঁচিশ হাজার যোদ্ধাকে বধ করলেন। অন্য দিকে অর্জুন রথারোহী সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। ওপর আর একদিকে নকুল-সহদেব ও সাত্যকি—তিনজনে দুর্যোধনের সৈন্য সংহার করে শকুনির ওপর আঘাত হানলেন। শকুনির প্রচণ্ড

অশ্বারোহীকে তীক্ষ্ণবাণে বধ করে তাঁরা শকুনির দিকে ধাবিত হলেন। তখন উভয়পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। অনেকের রথ ভেঙে গেল, অনেকে তীরের আঘাতে আহত হল; অর্জুনের হাতেও পঁচিশ হাজার সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হল।

অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ে আপনার সৈনিকদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল। চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ আপনার বিশাল সৈন্য সংহার করে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। তাঁরা আপনার পলায়নরত সৈনিকদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তারপর অর্জুন আবার রথী সৈন্যদের আক্রমণ করলেন এবং তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গাণ্ডীবে টংকার

মুখে সকলকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। সেই টংকারে মাটি থেকে ধুলোর ঝড় উঠে চারিদিক অন্ধকার করে দিল। কেউ কিছু বুঝতে পারছিল না। সেই সময় কৌরব সেনার মধ্যে আবার বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়ে গেল, তাই দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন শত্রুদের আক্রমণ করলেন এবং পাণ্ডবদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন। পাণ্ডব সৈন্য দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনিও ক্রুদ্ধ হয়ে শতশত যোদ্ধাদের যমলোকে পাঠালেন। এই যুদ্ধে আমরা দুর্যোধনের ভয়ানক পরাক্রম লক্ষ করেছি, তিনি একাকী সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন।

দুর্যোধন যখন তাঁর সেনাদের দিকে তাকালেন। দেখলেন সকলেই অত্যন্ত ভয়াক্রান্ত। সকলকে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি বললেন—'যোদ্ধাগণ ! আমি জানি তোমরা ভয় পেয়েছ ; কিন্তু আমার জানা এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে গিয়ে তোমরা পাণ্ডবদের হাত থেকে বাঁচতে পার। এই অবস্থায় পালিয়ে কী লাভ ? এখন শত্রুদের অল্প সেনাই জীবিত এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও অত্যন্ত ক্লান্ত ও আহত, আজ আমি এদের সবাইকে বধ করব। আমাদের বিজয়লাভ নিশ্চিত। এখানে যে সব ক্ষত্রিয় উপস্থিত আছ সকলে মন দিয়ে শোনো—মৃত্যু যখন শূরবীর এবং কাপুরুষ দুজনকেই গ্রাস করে, তখন আমার মতো ক্ষত্রিয়ব্রত পালনকারী হয়েও এমন কে মূর্খ আছে, যে যুদ্ধ করবে না ? আমাদের শত্রু ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে আছে ; যদি

পালাতে চাও তাহলে তার হাতে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। তাই পূর্বপুরুষদের শৌর্যের কথা স্মরণ করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ কোরো না। ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়ার মতো পাপ আর নেই এবং যুদ্ধধর্ম পালন ভিন্ন স্বর্গের জন্য কোনো পথ নেই। যুদ্ধে মৃত যোদ্ধা অবিলম্বে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়।'

আপনার পুত্র এইরূপ ভাষণ দিতে লাগলেও আহত সৈনিকরা কেউই তাঁর কথায় কান দিলেন না। সকলেই চারদিকে পালাতে লাগল। সেই সময় মদ্ররাজ শল্য দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! এই রণক্ষেত্রের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ, কত মানুষ ও ঘোড়ার মৃতদেহ পড়ে

আছে, পর্বতাকার গজরাজ বাণে ছিন্নভিন্ন হয়ে মরে পড়ে আছে আর এই যোদ্ধাগণ—নানা প্রকারের ভোগ, বস্ত্রভূষণ, মনোরম সুখ এবং শরীরও ত্যাগ করে ধর্মের পরাকাষ্ঠা পালন করে নিজের যশ মাত্র সঙ্গী করে স্বর্গে পৌঁছে গেছে। দুর্যোধন ! সূর্যদেব এখন অস্তগামী হয়েছেন, তুমিও শিবিরে ফিরে চলো।'

এই বলে রাজা শল্য চুপ করলেন। তাঁর চিত্ত শোকে ব্যাকুল হয়েছিল। দুর্যোধনের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ, তিনি আর্তস্বরে 'হা কর্ণ ! হা কর্ণ !!' বলে কাঁদছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য রাজাগণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাছে

শিবিরে পৌঁছে দিলেন। সমস্ত কৌরব সূতপুত্রের মৃত্যুতে দুঃখিত ও শোকাকুল হয়েছিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। দর্শক যারা ছিল, তারা কর্ণ ও অর্জুনের এই অদ্ভুত সংগ্রাম দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগল।

মহারাজ! যোগ্য ভিক্ষার্থী ভিক্ষা চাইলে যিনি সর্বদা দান দিতে প্রস্তুত থাকতেন, যিনি কখনো আমার কাছে নেই এই কথা মুখ থেকে বার করেননি, সেই কর্ণ দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুনের হাতে নিহত হয়েছেন। যাঁর সমস্ত ধনসম্পদ ব্রাহ্মণদের অধীন, যিনি ব্রাহ্মণদের জন্য প্রাণ বিসর্জন করতেও কাতর হতেন না, যিনি মহান দাতা, মহারথী, সেই কর্ণ আজ আপনার পুত্রের জয়ের আশা, মঙ্গল এবং রক্ষা—সব কিছু সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গমন করেছেন। কর্ণ নিহত হওয়ার পর সূর্য অস্তাচলে গেলে মঙ্গল ও বুধ বক্র গতিতে উদিত হয়, পৃথিবীতে গড়গড় ধ্বনি শোনা যায়, চারদিকে আগুন লেগে যায়, ধোঁয়ায় চার দিক ঢেকে যায়, সমুদ্রে তুফান ওঠে, সমস্ত প্রাণী ব্যথিত হয় এবং বৃহস্পতি রোহিণীকে ঘিরে চন্দ্র ও সূর্যের মতো তেজস্বী হয়ে প্রকাশিত হয়। তখন পৃথিবী কম্পিত হয়, উল্কাপাত হতে থাকে এবং আকাশে অবস্থিত দেবগণ হাহাকার করে ওঠেন।

এদিকে কর্ণের মৃত্যুতে প্রসন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সুবর্ণমণ্ডিত শ্বেতশঙ্খ একসঙ্গে বাজাতে লাগলেন। সেই আওয়াজে শত্রুদের হৃদয় বিদীর্ণ হল। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্তের গুরুগম্ভীর নিনাদে দিকদিগন্ত গুঞ্জরিত হল। সেই শঙ্খনিনাদ শুনে সমস্ত কৌরব সৈন্য মদ্ররাজ শল্য এবং রাজা দুর্যোধনকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেই সময় সকলে একত্র হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে সম্মান জানাল। তাঁরা দুজনে নবোদিত সূর্য-চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁদের পরাক্রমের কোনো তুলনা ছিল না। তাঁরা শরীর থেকে বাণ বার করে মিত্র পরিবৃত হয়ে আনন্দ সহকারে শিবিরে পৌঁছলেন। কর্ণ নিহত হলে, দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, চারণ, মহর্ষি, যক্ষ এবং নাগেরা বিজয় এবং অভ্যুদয়ের শুভ কামনা করে তাঁদের দুজনের পূজা করলেন। সকলেই তাঁদের প্রশংসা করতে লাগল।

কর্ণের মৃত্যুর পর যখন কৌরব পক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল, তখন আপনার পুত্র রাজা শল্যের পরামর্শ মেনে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিলেন এবং সেনাদের একত্র করে শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন। নারায়ণী সেনা, যারা তখনও জীবিত ছিল, তাদের সঙ্গে কৃতবর্মা, সহস্র গান্ধার সৈন্যসহ শকুনি, গজারোহী সৈন্যসহ কৃপাচার্য ও শিবিরে ফিরে গেলেন। অশ্বত্থামাও পাণ্ডবদের বিজয়োল্লাস দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে শিবিরে ফিরে গেলেন। অবশিষ্ট সংশপ্তকদের সঙ্গে সুশর্মা এবং ভগ্নরাজ রথটি নিয়ে রাজা শল্যও ভীত, লজ্জিত হয়ে শিবিরে ফিরলেন। কর্ণের মৃত্যুতে সমস্ত কৌরব পক্ষ ভয়ে কম্পিত হচ্ছিল, তাদের দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তারা জীবন ও রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করেছিল। দুর্যোধন দুঃখ ও শোকে মগ্ন হয়ে ছিলেন। রাজার নির্দেশে সকল সৈনিক শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম নিল। সেই সময় সকলকেই শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।
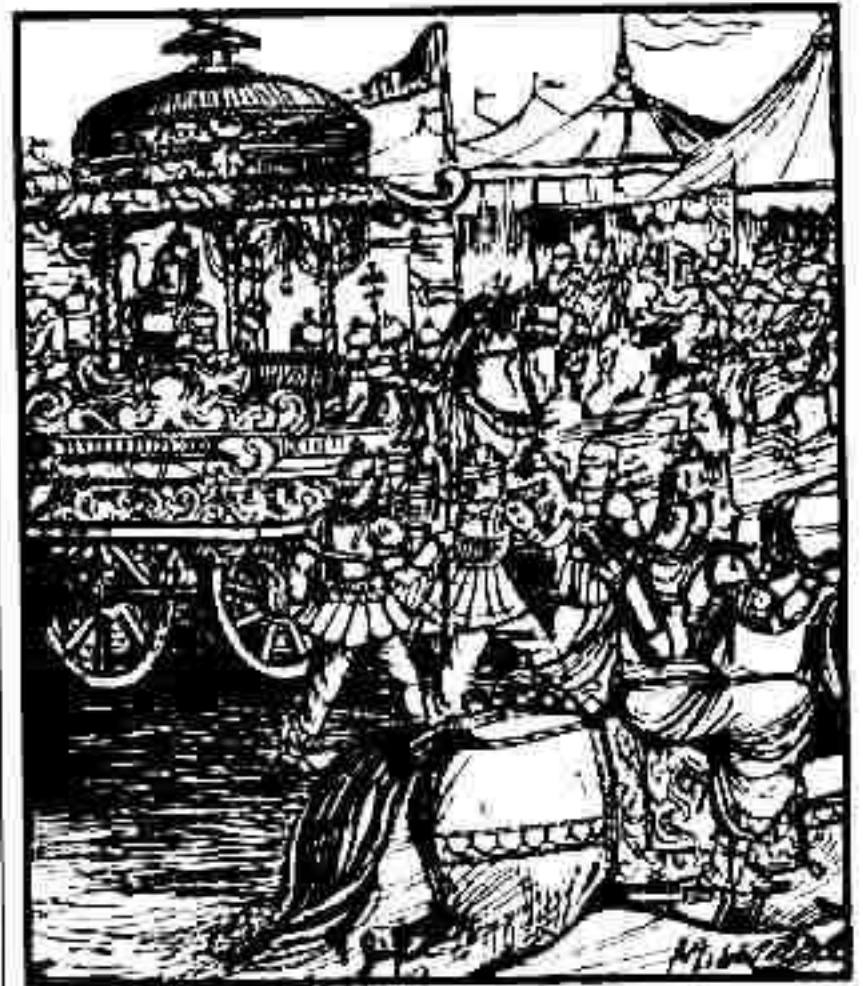
কর্ণ বধের সংবাদে আনন্দিত যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর শোক এবং কর্ণপর্ব শ্রবণের মাহাত্ম্য

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! কর্ণ নিহত হলে যখন কৌরব সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করে মহা আনন্দের সঙ্গে বললেন—'পার্থ! ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে মেরেছিলেন আর তুমি কর্ণকে বধ করেছ। এখন থেকে জগতের লোক বৃত্রাসুর বধের ন্যায় কর্ণ বধের আলোচনা করবে। তুমি অনেকদিন ধরে কর্ণকে যুদ্ধে বধ করতে চেয়েছিলে, তোমার সেই আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল; সুতরাং ধর্মরাজকে এই শুভ সংবাদ জানিয়ে তাঁর কাছে তুমি ঋণমুক্ত হও। তুমি ও কর্ণ যখন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলে, তখন তিনি যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু গভীরভাবে আহত হওয়ায় বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি, শিবিরে ফিরে গিয়েছেন। সুতরাং এখন আমাদের তাঁর কাছেই যাওয়া উচিত।'

অর্জুন 'ঠিক আছে' বলে তাঁর নির্দেশ মেনে নিলেন; তখন ভগবান রথ ঘোরালেন। শিবিরে পৌঁছে তিনি অর্জুনকে সঙ্গে করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাজা তখন স্বর্ণ-পালঙ্কে বিশ্রাম করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে প্রণাম জানালেন। তাঁদের দুজনকে প্রসন্ন দেখে কর্ণ বধ সম্পন্ন হয়েছে মনে করে যুধিষ্ঠির উঠে বসলেন এবং তাঁর আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। দুজনকে আলিঙ্গন করে তিনি বারংবার যুদ্ধের সংবাদ জানতে চাইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের সংবাদ জানালেন। শেষে কর্ণের মৃত্যুর কথা বললেন। তারপর ভগবান মৃদু হেসে হাত জোড় করে বললেন—'মহারাজ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কুশলে আছেন। কর্ণ মারা গেছে এবং আপনার বিজয় ও শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে—এ অত্যন্ত আনন্দের কথা। আজ সূতপুত্র সর্বদেহে বাণ বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে; আপনি একবার আপনার শত্রুকে দেখবেন চলুন। মহাবাহো! আপনি এখন নিষ্কণ্টক পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করুন।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধর্মরাজ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং বললেন—'দেবকীনন্দন! এ অত্যন্ত আনন্দের কথা। আপনি সারথি ছিলেন বলেই অর্জুন কর্ণকে বধ করতে সক্ষম হয়েছে। এ আপনারই বিচক্ষণতার ফল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।' এই বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ডান হাত ধরলেন। তারপর দুজনকে বললেন—'নারদ আমাকে বলেছেন যে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ পূর্বজন্মে নর-নারায়ণ ঋষি ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যাসদেবও অনেক বার এই কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণ! আপনার কৃপাতেই পাণ্ডুনন্দন অর্জুন শত্রুর সম্মুখীন হয়ে জয়লাভ করেছে। যেদিন আপনি যুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করেছিলেন, সেদিনই স্থির হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের মতো বীর যখন আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিহত হয়েছেন, তখন বাকি যাঁরা, তাঁদের আমি মৃত বলেই মনে করি।'

এই বলে রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্ণসজ্জিত রথে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে রণভূমি পরিদর্শনে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন নরবরু কর্ণ অসংখ্য বাণে বিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন। সেই সময় সুগন্ধ তেলে সহস্র স্বর্ণ প্রদীপ জ্বালানো হল, তার আলোয় সকলে কর্ণকে দেখলেন। তাঁর বর্ম ছিন্ন-ভিন্ন, সমস্ত দেহ বাণে বিদীর্ণ। পুত্রসহ কর্ণকে মৃত দেখে যুধিষ্ঠির পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করে

বললেন—'গোবিন্দ ! আপনি বীর, বিদ্বান, সেই সঙ্গে আমার প্রভুও ; আপনার সুরক্ষায় থেকে আজ সত্যই আমি ভ্রাতাসহ রাজা হয়েছি। রাধানন্দন কর্ণ নিহত হওয়ায় দুরাত্মা দুর্যোধন এবার রাজ্য ও জীবন—উভয় হতে নিরাশ হয়ে পড়বে। পুরুষোত্তম ! আপনার কৃপায় আমরা কৃতার্থ হয়েছি ; খুবই খুশির কথা যে গাণ্ডীবধারী অর্জুন বিজয়লাভ করেছে।'

রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে তাঁদের প্রশংসা করলেন। তখন নকুল, সহদেব, ভীমসেন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও পাণ্ডব, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় যোদ্ধারা 'মহারাজের জয় হোক' বলে যুধিষ্ঠিরকে সম্মান জানালেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের গুণগান করতে করতে আনন্দের সঙ্গে শিবিরে

চলে গেলেন। হে রাজন্ ! আপনার অন্যায়ের ফলেই এই রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ ঘটল ; এখন কেন বার বার শোক করছেন ?'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এই অপ্রিয় সংবাদ শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র মূর্ছিত হয়ে শিকড়বিহীন গাছের ন্যায় পড়ে গেলেন। দূরদর্শী গান্ধারীদেবীও কর্ণের মৃত্যুর জন্য বিলাপ করতে লাগলেন। সেই সময় বিদুর গান্ধারীকে এবং সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। দুজনে ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে লাগলেন। রাজভবনের নারীরা গান্ধারীকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় কারো কথা বুঝতে পারছিলেন না। বিদুর ও সঞ্জয় আশ্বাস দিলে তিনি প্রারব্ধ ও ভবিতব্যই প্রধান মনে করে চুপ করে বসে রইলেন।

যে ব্যক্তি কর্ণ ও অর্জুনের এই যুদ্ধ-যজ্ঞ স্বাধ্যায় করেন বা শোনেন, তিনি শাস্ত্রসম্মতভাবে করা যজ্ঞের ফললাভ করেন। সনাতন ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞস্বরূপ ; অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র এবং সূর্যও যজ্ঞরূপ। অতএব যে ব্যক্তি দোষ দৃষ্টি পরিত্যাগ করে এই যুদ্ধ যজ্ঞের বর্ণনা শোনেন বা পড়েন, তিনি সুখী হন এবং তাঁর ওপর ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শংকর সন্তুষ্ট হন। এটি পাঠে ব্রাহ্মণদের বেদপাঠের সমান ফল প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয়গণ বল ও যুদ্ধে জয়লাভ করেন, বৈশ্যরা ধনলাভ করেন এবং শূদ্ররা নীরোগ ও সুস্থ হয়। এতে ভগবান বিষ্ণুর মহিমা গীত হয়েছে, তাই এর পাঠে মানুষের কামনা পূর্ণ হয় এবং সে সুখী হয়। এক বৎসর ধরে সবৎস কপিলা দান করলে যে ফল হয়, কর্ণপর্ব একবার মাত্র পাঠে তাই প্রাপ্তি হয়।

কর্ণপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

শল্যপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর নিত্য সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

ধৃতরাষ্ট্রের বিষাদ, দুর্যোধনকে সন্ধির জন্য কৃপাচার্যের উপদেশ এবং দুর্যোধনের যুদ্ধ বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! কৌরব সেনার সেনাপতি সূতপুত্র বধ হয়ে গেলে আমার পুত্ররা কী করল ? আমার পুত্র যাদেরই সেনাপতি করে, পাণ্ডবরা তাদের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে বধ করে, এর কারণ কী ? তোমাদের চোখের সামনে ভীষ্ম নিহত হলেন, দ্রোণেরও সেই অবস্থা হল, এখন প্রতাপান্বিত কর্ণও বধ হল। মহাত্মা বিদুর আমাকে আগেই বলেছিলেন যে, দুর্যোধনের অপরাধে প্রজানাশ হবে। তিনি যা বলেছেন তাই আজ সত্যে পরিণত হচ্ছে। সেই সময় প্রারব্ধবশত আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, তাই আমি তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করিনি। সঞ্জয় ! কর্ণ নিহত হলে কে আমাদের সেনাপতি হল ? কোন মহারথী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্মুখীন হল ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে যে ভয়ানক জনসংহার হয়েছে, ক্রমশ সে কথা শুনুন। নৌকা করে যারা ব্যবসা করে, সেই ব্যবসায়ীগণ যেমন অথাধ জলে নৌকা ডুবে গেলে ভয় পেয়ে যায়, তেমনই কৌরবদের আশ্রয়দাতা কর্ণ নিহত হলে আপনার সৈনিকরাও ভয়ে কম্পিত হল। তারা অনাথের মতো রক্ষকের সন্ধান করতে লাগল। সায়ংকালে অর্জুনের কাছে পরাস্ত হয়ে যখন শিবিরে সবাই ফিরে এল, তখন কর্ণের মৃত্যুতে ভয় পেয়ে আপনার পুত্ররা সকলেই পলায়নরত। তাঁদের বর্ম নষ্ট হয়েছিল। কোন দিকে যাবে, তাও ঠিক করতে পারছিল না, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। সেই

ভয়ানক যুদ্ধে হাতিরা রথ ভেঙে ফেলল, মহারথীরা অশ্বারোহীদের মেরে ফেলল এবং রণভূমি থেকে পলায়নরত পদাতিক সৈন্যরা ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে গেল।

তখন কৃপাচার্য দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই, মন দিয়ে শোনো, ঠিক মনে হলে সেই অনুসারে কাজ করো। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মহারথী কর্ণ, জয়দ্রথ, তোমার অনেক ভ্রাতা এবং তোমার পুত্র লক্ষ্মণ—এরা সকলেই নিহত হয়েছে ; এখন কে আছে, আমরা যাকে আশ্রয় করে থাকব ? যে বীরদের ওপর যুদ্ধের ভার দিয়ে আমরা রাজ্য পাওয়ার আশা করেছিলাম, তারা দেহত্যাগ করে বেদজ্ঞদের গতি লাভ করেছে। আমরা বহু রাজাকে

পরলোকে পাঠিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুণবান মহারথীদেরও হারিয়েছি। এখন আমরা একাকী হয়ে পড়েছি, এই অবস্থায় আমাদের দীনের ন্যায় আচরণ করতে হবে। যখন সকলে জীবিত ছিল, তখনও কেউ অর্জুনকে পরাস্ত করতে পারেনি। কৃষ্ণের মতো সারথি থাকায় তাকে দেবতারাও পরাস্ত করতে সক্ষম নয়। তাঁর বানর আরূঢ় ধ্বজা দেখে আমাদের বিশাল সেনা থরথরি কম্পিত হচ্ছে। ভীমসেনের সিংহনাদ, পাঞ্চজন্যের ভয়ংকর নিনাদ এবং গাণ্ডীব ধনুকের টংকারে আমাদের উৎসাহ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। অর্জুনের হাতে দোদুল্যমান স্বর্ণমণ্ডিত ধনুককে এমনভাবে চমকিত হচ্ছে যেন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ। বায়ুর বেগে যেমন মেঘ উড়ে চলে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের চালনায় সুন্দর সাজে সজ্জিত ঘোড়াগুলি অর্জুনকে নিয়ে উড়ে যায়। অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অত্যন্ত কুশল ; অগ্নি যেমন শুষ্ক ঘাসকে জ্বালিয়ে ফেলে, অর্জুনও তেমনভাবে তোমার সেনাদের ধ্বংস করেছে। সিংহ যেমন মৃগকে তার গর্জনের দ্বারা ভীত করে, অর্জুনের গাণ্ডীবের টংকারেও তেমনই আমাদের যোদ্ধারা ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে। এই ভয়ংকর সংগ্রাম সতেরো দিন হল শুরু হয়েছে। সেদিন অর্জুনের বাণে জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ দেখেও তোমার কর্ণ কোথায় ছিল ? অনুচর-সহ দ্রোণ, আমি, তুমি, কৃতবর্মা, ভ্রাতাসহ দুঃশাসন—সকলে কোথায় ছিলাম ? সকলেই রণক্ষেত্রে থাকা সত্ত্বেও কেউই অর্জুনকে রোধ করতে পারল না। তোমার আত্মীয়স্বজন, ভ্রাতাগণ, মাতুল, তাঁদের সকলকে অর্জুন নিজ পরাক্রমে জয় করেছিল এবং সকলের সামনেই জয়দ্রথকে বধ করেছিল। এখন আমরা কার ভরসায় থাকব ? এখানে কে আছে যে অর্জুনকে পরাস্ত করতে সক্ষম ? অর্জুনের কাছে নানা দিব্য অস্ত্র আছে। তার গাণ্ডীবের টংকারে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি হয়। সকল যোদ্ধাই ভয় পেয়ে গেছে। অপরদিকে সাত্যকি ও ভীমসেনের যে বেগ, তাতে তারা সমস্ত পর্বত বিদীর্ণ করতেও সক্ষম। সমুদ্রকে শুষ্ক করে দিতে পারে। রাজন্ ! দ্যূতসভায় ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা করে দেখিয়েছে ; বাকি প্রতিজ্ঞাও সে পূর্ণ করবে। পাণ্ডবরা সজ্জন, কিন্তু তোমরা অকারণে তাদের সঙ্গে অনেক অন্যায় করেছ, আজ তারই ফল পাচ্ছ। তোমরা নিজেদের রক্ষার্থে সমস্ত জগতের লোককে একত্রিত করেছিলে, কিন্তু এখন তোমাদেরই জীবনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। দুর্যোধন ! এখন তুমি নিজেকে রক্ষা করো। বৃহস্পতির কথিত নীতি হল, 'যখন শত্রুর থেকে নিজ শক্তি কম অথবা সমান হবে, তখন সন্ধি করে নেওয়া উচিত। নিজ শক্তির থেকে শত্রুর শক্তি কম মনে হলে, তখনই যুদ্ধ করা উচিত।' বল ও শক্তিতে আমরা পাণ্ডবদের থেকে কম হয়ে গেছি, তাই আমার মনে হয় এখন ওদের সঙ্গে সন্ধি করে নেওয়া উচিত। যে রাজা নিজের ভালো বুঝতে পারে না এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অপমান করে, সে শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হয়, তার কখনো ভালো হয় না। রাজা যুধিষ্ঠিরের সামনে মাথা নত করলে যদি আমরা রক্ষা পেয়ে যাই, এতে আমাদেরই মঙ্গল। মূর্খতা করে হেরে যাওয়ায় কোনো বীরত্ব নেই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির তোমাকে রাজ্য প্রদান করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে যা বলবেন, তারা সে সবই মেনে নেবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কথার অসম্মান করবেন না এবং যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবেন না। তাই আমি সন্ধি করাতেই মঙ্গল হবে বলে মনে করি। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই। তুমি মনে কোরো না যে আমি প্রাণভয়ে কাপুরুষের মতো সন্ধির প্রস্তাব করছি। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই এই কথা বলছি। এখন যদি তুমি আমার কথা না শোনো, তাহলে মৃত্যুর সময় তোমার একথা মনে হবে।'

কৃপাচার্যের কথা শুনে দুর্যোধন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি বললেন—'বিপ্রবর ! একজন হিতৈষীর যা বলা উচিত, আপনি তাই বলছেন। শুধু তাই নয়, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপনি আমার মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ এবং যা করার সবই করেছেন। আমার হিতার্থী হওয়ায় আমার ভালোর জন্যই এই সব কথা বলেছেন। কিন্তু একথা আমার নীতিবিরুদ্ধ—যেমন মরণাপন্ন রোগীর ওষুধ ভালো লাগে না, সেই মতো আমারও অবস্থা। রাজা যুধিষ্ঠির মহাধনী ছিলেন, আমি তাঁকে কপট পাশায় হারিয়ে রাজ্যচ্যুত করে পথের ভিখারি করেছিলাম। এখন তিনি আমাকে কীভাবে বিশ্বাস করবেন। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে দূত হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর প্রতি কদর্য আচরণ করেছিলাম, এখন তিনি আমার কথা কেন মেনে নেবেন ? সভামধ্যে বলপূর্বক দ্রৌপদীকে আনা হলে তিনি যে বিলাপ করেছিলেন এবং পাণ্ডবদের রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তারজন্য শ্রীকৃষ্ণ এখনও রুষ্ট হয়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন দুই শরীর হলেও এক প্রাণ ; এঁরা দুজনে একে অপরের অবলম্বন। আগে একথা আমি শুনেছিলাম, এখন প্রত্যক্ষ দেখছি। যখন থেকে তিনি তাঁর ভাগিনেয় অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা শুনেছেন, তখন থেকে তিনি সুখে নিদ্রা যান না। আমরা তাঁদের কাছে অপরাধী, তাঁরা কীকরে আমাদের ক্ষমা করবেন ? মহাবলী ভীমসেন অত্যন্ত কঠোর স্বভাব সম্পন্ন, সে অত্যন্ত ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা করেছে। সে শুষ্ক কাঠের মতো ভেঙে যাবে, কিন্তু নত হবে না। নকুল এবং সহদেবও যমের মতো ভয়ংকর, তারা দুজনেই আমাকে শত্রু বলে মনে করে। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডীরও আমার সঙ্গে শত্রুতা আছে, তারা কেন আমার হিতের জন্য চেষ্টা করবে ? দ্রৌপদী রজস্বলা অবস্থায় এক বস্ত্র পরিধান করে ছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁকে বলপূর্বক রাজসভায় নিয়ে এসে দুঃশাসন সবার সামনে তাঁকে অপদস্থ করেছিল, তাঁর বস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল—তাঁর সেই করুণ অবস্থা আজও পাণ্ডবদের স্মরণে আছে। এখন তাঁদের যুদ্ধ থেকে থামানো যাবে না। দ্রৌপদীকে যখন থেকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তখন থেকে ওরা আমাকে বিনাশ করার সংকল্প গ্রহণ করে মাত্রে শয়ন করে। যতক্ষণ সেই অপমানের প্রতিশোধ না নেওয়া হবে, ততক্ষণের জন্য ওরা এই ব্রত গ্রহণ করেছে। শত্রুতার আগুন এখন পূর্ণভাবে প্রজ্বলিত হয়েছে, এখন আর তা কোনোভাবেই নেভানো সম্ভব নয়। অভিমন্যুকে বধ করার পর অর্জুনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়া আর সম্ভব নয়। যে আমি আসমুদ্র হিমাচল পৃথিবীর রাজত্ব উপভোগ করেছি, এখন পাণ্ডবদের কৃপাপাত্র হয়ে কীকরে রাজত্ব করব ? সমস্ত রাজাদের কাছে মাথা নত করে পাণ্ডবদের অনুগামী হয়ে কীকরে জীবন ধারণ করব ? আমি আপনার কথা খণ্ডন অথবা অসম্মান করছি না ; আমি জানি আপনি স্নেহবশত আমাদের হিতার্থেই এইসব বলছেন। আমি আমার সিদ্ধান্তের কথাই শুধু জানাচ্ছি। আমার মনে হয় এখন আর সন্ধির কোনো অবকাশ নেই। এখন সন্ধির কথা আলোচনা করাও উচিত বলে আমার মনে হয় না। এখন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করি। কাপুরুষতা না দেখিয়ে উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করাই কর্তব্য। আমি পাণ্ডবদের কাছে দীনতাপূর্ণ কথা বলতে পারব না। জগতে কোনো সুখই চিরস্থায়ী নয়, তাহলে রাজ্য বা যশ কীকরে থাকবে ! এখানে কীর্তির জন্যই চেষ্টা করা উচিত এবং যুদ্ধ ব্যতীত কীর্তিলাভ করা যায় না। পালঙ্কে শয়ন করে মৃত্যুকে বরণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যাঁরা বড় বড় যজ্ঞ করে বনে অথবা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁরাই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন। যাঁর বৃদ্ধাবস্থার জন্য শরীর রোগজর্জর হওয়ায় পরিবার-পরিজন কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করেন, সেই অবস্থায় বিলাপ করতে করতে যেসব ক্ষত্রিয় প্রাণত্যাগ করেন তাঁদের 'পুরুষ' বলা যায় না। সুতরাং যাঁরা নানা ভোগাদি পরিত্যাগ করে উত্তম গতি লাভ করেছেন, আমি যুদ্ধ করে তাঁদের লোকে যেতে চাই। যাঁদের আচরণ শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, শূরবীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, নানাযজ্ঞানুষ্ঠানকারী,

তাঁরা স্বর্গলাভ করেন। দেবসভায় তাঁদের অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে স্থান হয়। দেবতাগণ এবং যুদ্ধে যাঁরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, তাঁরা যে পথে যান, আমিও সেখানেই যাব। মিত্র, ভ্রাতা এবং পিতামহকে বধ করিয়ে যদি আমি প্রাণরক্ষার চেষ্টা করি, তাহলে সমস্ত জগৎ অবশ্যই আমার নিন্দা করবে। মিত্র ও ভ্রাতাবিহীন হয়ে পাণ্ডবদের কাছে হীনতা স্বীকার করে যে রাজ্য লাভ করব, তাতে আমার কী প্রয়োজন ? তাই আমি ভালোমতো যুদ্ধ করে স্বর্গই লাভ করব, এছাড়া আমি আর কোনো কিছুই চাই না।'

দুর্যোধনের কথা শুনে সব ক্ষত্রিয়রাই তাঁর প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে সাধুবাদ জানালেন। সকলেই পরাজয়ের কথা ভুলে মনে মনে পরাক্রম দেখাবার কথা ভাবতে লাগলেন। সকলেই যুদ্ধ করতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। সকলের হৃদয় উৎসাহে ভরে উঠল। তারপর সব যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহনকে বিশ্রাম দিয়ে কয়েক ক্রোশ দূরে নিজেদের শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন কালের প্রেরণায় তাঁরা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলেন।

রাজা শল্যের সেনাপতি পদে অভিষেক এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে বিশ্রাম করার সময় সব প্রধান প্রধান যোদ্ধা একত্রিত হলেন। শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন এবং জয়ৎসেন প্রমুখ রাজারা সেখানে রাত্রি কাটালেন। এঁরা সকলে একত্রে রাজা শল্যের কাছে উপবিষ্ট হয়ে দুর্যোধনকে বিধিমতো পূজা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বললেন—'রাজন্ ! আপনি কাউকে সেনাপতি করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন ; কারণ সেনাপতির অধীনে থেকেই আমরা শত্রুদের পরাজিত করতে সক্ষম।'

রাজা দুর্যোধন তখন রথে আরোহণ করে মহারথী অশ্বত্থামার কাছে গেলেন। অশ্বত্থামা যুদ্ধের সমস্ত কলাকৌশল জানতেন, যুদ্ধে তাঁকে যমরাজের সমকক্ষ বলে মনে হোত, তিনি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও শুক্রাচার্যের মতো বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর মধ্যে সর্বপ্রকার শুভলক্ষণ বর্তমান ছিল এবং প্রত্যেক কাজে তিনি নিপুণ এবং বৈদিক জ্ঞানসাগর ছিলেন। শত্রুর বেগ জয়কারী এবং নিজে অজেয় ছিলেন। ধনুর্বেদের (ব্রত, প্রাপ্তি, ধৃতি, পুষ্টি, স্মৃতি, ক্ষেপ, অরিভেদন, চিকিৎসা, উদ্দীপন ও কৃষ্টি) দশ অঙ্গ এবং (শিক্ষা, দীক্ষা, আত্মরক্ষা এবং তার সাধন) চারপাদ ঠিক মতো জানতেন। ছয় অঙ্গসহ চারটি বেদ এবং ইতিহাস পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ সম্পর্কেও তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিল। এই মহাতপস্বী কঠোর ব্রত পালন করে অত্যন্ত নিষ্ঠায় শংকরের আরাধনা করেছিলেন। তাঁর পরাক্রম ও রূপের কোনো তুলনা ছিল না। অশ্বত্থামা সমস্ত বিদ্যায় পারঙ্গম, গুণের সমুদ্র এবং সকলের প্রশংসার পাত্র ছিলেন।

তাঁর কাছে গিয়ে দুর্যোধন বললেন—'আপনি আমাদের গুরুপুত্র, আমাদের সকলের ভরসাস্থল ; সুতরাং আপনি নির্দেশ দিন, কাকে আমরা সেনাপতি

করবে ?'

অশ্বত্থামা বললেন—'আমাদের মধ্যে মহারাজা শল্যই তার উপযুক্ত, তিনি উত্তম কুল, পরাক্রম, তেজ, যশ, লক্ষ্মী এবং সমস্ত সদ্গুণসম্পন্ন। তিনিই আমাদের সেনাপতি হওয়ার যোগ্য। রাজন্ ! এঁকে সেনাধ্যক্ষ করে তুমি বিজয়লাভ আশা করতে সক্ষম।'

দ্রোণকুমারের কথা শুনে সকল যোদ্ধা এবং রাজা শল্যকে ঘিরে ধরে তাঁর জয়গান করতে লাগল। তখন তিনিও অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধ করতে কৃত-সংকল্প হলেন। রাজা শল্য দ্রোণ ও ভীষ্মের ন্যায় পরাক্রমী ছিলেন, তিনি এক উত্তম রথে আসীন হলেন। দুর্যোধন রথ থেকে নেমে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন—

'মিত্র বৎসল ! আপনি শূরবীর, সুতরাং আপনি আমাদের সেনাধ্যক্ষ হোন।'

রাজা শল্য বললেন—'কুরুরাজ ! আপনি যদি আমাকে সেনাপতির সম্মান দেন, তাহলে আমি আপনার কথানুসারে যুদ্ধ করতে রাজি। আমি প্রাণ, রাজ্য ও সম্পদ সব কিছু দিয়ে আপনার প্রিয়কাজ করব।'

দুর্যোধন বললেন—'আপনাকে আমি সেনাপতিরূপে স্বীকার করছি। প্রভু কার্তিকেয় যেমন যুদ্ধে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন, তেমনই আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

শল্য বললেন—'দুর্যোধন ! আমার কথা শুনুন ! রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আপনি মহারথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেও, এঁরা কোনোভাবেই বাহুবলে আমার সমকক্ষ নয়। যদি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যসহ সমস্ত ভূমণ্ডল আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলেও আমি একাকীই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম, আর পাণ্ডবদের তো কথাই নেই। আমি অবশ্যই আপনার সেনাদের সঞ্চালক হব এবং এমন ব্যূহ নির্মাণ করব, যা শত্রুরা লঙ্ঘন করতে পারবে না।'

তারপর রাজা দুর্যোধন শাস্ত্রসম্মতভাবে শল্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন। তাঁর অভিষেক হলে

আপনার সেনারা হর্ষনাদ করে উঠল। নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি হতে লাগল, মদ্রদেশের মহারথীরা অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে রাজা শল্যের স্তুতি করতে লাগলেন—'রাজন্ ! আপনার জয় হোক, আপনি চিরজীবী হোন এবং সমস্ত শত্রু সংহার করুন। আপনি দেবতা, অসুর, মানুষ—সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করতে সক্ষম। এই মরণশীল সোমক আর সৃঞ্জয়দের তো কথাই নেই।'

মদ্ররাজ শল্য এইরূপ সমাদর লাভ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! আজ আমি পাণ্ডবসহ সমস্ত পাঞ্চালদের সংহার করব। নাহলে নিজে মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে চলে যাব। আজ সমস্ত পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল, চেদি এবং প্রভদ্রক যোদ্ধা আমার পরাক্রম এবং ধনুকের মহাবল দেখতে পাবে। পাণ্ডব সেনাদের রণক্ষেত্রে

পরাস্ত করব। তোমার সুখের জন্য আমি দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম এবং কর্ণেরও অধিক পরাক্রমে রণক্ষেত্রে বিচরণ করব।'

মহারাজ! শল্য সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে সমস্ত সৈনিক কর্ণের মৃত্যুর দুঃখ ভুলে প্রসন্ন হয়ে উঠল। আপনার সেনাদের হর্ষধ্বনি শুনে রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সামনে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মাধব! দুর্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি নিযুক্ত করে সমস্ত সেনার উপস্থিতিতে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এখন আপনি যা উচিত

মনে করেন, তাই করুন; কারণ আপনি আমাদের পরামর্শদাতা ও রক্ষক।'

একথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ভারত! আর্তায়নের পুত্র শল্যকে আমি খুব ভালোভাবে জানি। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমী এবং তেজস্বী, যুদ্ধ করার নানাপ্রকার কৌশল তিনি জানেন। আমার তো মনে হয় যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যেমন বীর যোদ্ধা ছিলেন, মদ্ররাজ শল্যও তেমনই দক্ষ। যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ যোদ্ধা আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই। এই পৃথিবীতে কে বলতে পারে, দেবলোকেও আপনার সমকক্ষ এমন কোনো বীর নেই যে ক্রোধযুক্ত মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে বধ করতে সক্ষম। দুর্যোধন যাঁকে সম্মান জানিয়েছেন, সেই শল্য অজেয় বীর, তাঁর মৃত্যু হলে আপনি কৌরবদের বিশাল সেনাকে মৃত বলেই মনে করবেন। আমার কথা শুনে আপনি এখনই শল্যকে আক্রমণ করুন। মাতুল মনে করে তাঁকে দয়া দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ক্ষত্রিয়ধর্মকে সামনে রেখে তাঁকে বধ করুন। আজকের সংগ্রামে আপনি আপনার তপোবল এবং ক্ষাত্রবল দেখান। মহারথী শল্যকে অবশ্যই বধ করুন।'

এই বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে বিশ্রাম করার জন্য নিজ শিবিরে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে রাজা যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতা, পাঞ্চাল এবং সোমকদেরও নিজ নিজ স্থানে যেতে বললেন। সকলে যে যাঁর শিবিরে নিদ্রাযাপন করতে চলে গেলেন।

—o—

শল্যের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ আরম্ভ এবং নকুল কর্তৃক কর্ণের তিন পুত্র বধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! রাত্রি অতিক্রান্ত হলে দুর্যোধন আপনার সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন—'এবার সব মহারথী প্রস্তুত হোন।' রাজার নির্দেশে সমস্ত সৈন্য বর্ম, অস্ত্র ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হল। বাদ্যধ্বনি হতে লাগল, যোদ্ধাদের সিংহগর্জন শোনা গেল। সেই সময় যেসব সৈন্য জীবিত ছিল, তারা মৃত্যুর পরোয়া না করে রণভূমিতে হাজির হল। মদ্ররাজ শল্য সেনাধ্যক্ষ হয়ে মহারথী ও সমস্ত সেনাকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করে যথাস্থানে দাঁড় করালেন। তারপর কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্য রাজারা শপথ গ্রহণ করলেন যে 'আমাদের মধ্যে কেউই একাকী পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। যে একা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে অথবা যে কেউ যুদ্ধরত যোদ্ধাকে একাকী ছেড়ে যাবে তার পাঁচ মহাপাতক এবং পাঁচ উপপাতক লাগবে। অতএব সকলে একে অপরকে রক্ষা করে একসঙ্গে যুদ্ধ করবে।'

এইভাবে শপথ নিয়ে সমস্ত মহারথীরা মদ্ররাজকে সামনে রেখে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ করলেন। পাণ্ডবরাও ব্যূহরচনা করে যুদ্ধ করার জন্য কৌরবদের আক্রমণ করলেন। তাঁদের সেনা ক্ষুব্ধ হয়ে সমুদ্রের ন্যায় গর্জন করে উঠল। পাণ্ডবদের সিংহনাদ শুনে

আপনার পুত্রদের মনে ভীতির সঞ্চার হল। তখন মদ্ররাজ শল্য তাদের ভরসা দিয়ে সর্বতোভদ্র নামক ব্যূহ নির্মাণ করে পাণ্ডবদের ওপর আক্রমণ চালালেন। সেই সময় তিনি সিন্ধুদেশের ঘোড়াযুক্ত এক বিশাল রথে আসীন ছিলেন। এঁর সঙ্গে মদ্রদেশীয় বীর এবং কর্ণের পুত্র অজেয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বামদিকে ত্রিগর্তের সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে কৃতবর্মা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ভাগে শক ও যবন পরিবৃত হয়ে কৃপাচার্য ছিলেন। পৃষ্ঠভাগে কাম্বোজদের সঙ্গে অশ্বত্থামা উপস্থিত ছিলেন। মধ্যভাগে ছিলেন দুর্যোধন স্বয়ং, তাঁর রক্ষার্থে কৌরবদের প্রধান বীররা সেখানে বিরাজমান ছিলেন। শকুনিও বিশাল অশ্বারোহী পরিবৃত ছিলেন। মহারথী কৈতব্য সমস্ত সেনাদের নিয়ে সেখানে যাচ্ছিলেন।

অন্য দিকে পাণ্ডবরাও সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ করে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন ; সেই তিন ভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন—ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি। এঁরা শল্যের সেনাকে আক্রমণ করলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠিরও শল্য বধের ইচ্ছায় সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন কৃতবর্মা ও সংশপ্তকদের আক্রমণ করলেন। ভীমসেন এবং সোমকরা কৃপাচার্যকে আক্রমণ করলেন। নকুল সহদেব শকুনি ও উলূককে আক্রমণ করলেন। এদিকে আপনার পক্ষের কয়েক হাজার সৈন্যও পাণ্ডবদের আক্রমণ করল।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের এবং পাণ্ডবদের কত সৈন্য জীবিত ছিল ?'

সঞ্জয় বললেন—'মহারাজ ! শল্যের সেনাপতিত্বে আমরা যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন আমাদের কাছে এগারো হাজার রথ, দশ হাজার সাতশো হাতি, দুলাখ ঘোড়া এবং তিন কোটি পদাতিক সৈন্য ছিল। পাণ্ডবদের কাছে ছিল ছয় হাজার রথ, ছয় হাজার হাতি, দশ হাজার ঘোড়া এবং প্রায় এক কোটি পদাতিক সৈন্য। কেবলমাত্র এই সেনারাই জীবিত ছিল। তারা সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। প্রাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষের যোদ্ধা একে অপরকে বধ করার ইচ্ছায় এগোতে লাগল। দুপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল, হাজার হাজার অশ্বারোহী, পদাতিক, রথী এবং গজারোহী পরাক্রম দেখিয়ে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল।

মহারাজ ! পাণ্ডবদের প্রহারে আপনার সেনারা অচৈতন্য হয়ে পড়তে লাগল। ভীমসেন এবং অর্জুন আপনার সৈনিকদের মূর্ছিত করে শঙ্খ বাজালেন এবং সিংহনাদ করতে লাগলেন। সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী ধর্মরাজকে সঙ্গে নিয়ে শল্যকে আক্রমণ করলেন। মাদ্রীকুমার নকুল এবং সহদেবও আপনার সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাণ্ডবগণ কৌরব সেনাদের বাণের আঘাতে গুরুতর আহত করলেন। তখন কৌরব-বাহিনী আপনার পুত্রদের সামনেই চার দিকে পালাতে লাগল। সকলেই নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হল, যোদ্ধারা তাদের প্রিয়পুত্র এবং ভ্রাতাকে ছেড়ে, পিতা ও পিতামহকে ত্যাগ করে ঘোড়া এবং হাতি নিয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করল।

সেনাদের এইভাবে পালাতে দেখে প্রতাপশালী মদ্ররাজ তাঁর সারথিকে বললেন—'আমার ঘোড়াগুলিকে শীঘ্রই আগে নিয়ে চলো এবং যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির রয়েছেন, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। আজ যুদ্ধে তিনি আমার সামনে দাঁড়াতে পারবেন না।' সেনাপতির নির্দেশে সারথি রথটিকে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে শল্য একাই সবেগে আক্রমণকারী পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যদলকে প্রতিহত করলেন। সেই সময় মদ্ররাজ শল্যকে অকুতোভয়ে যুদ্ধ করতে দেখে পলায়নরত কৌরব যোদ্ধারাও প্রাণের মায়া না করে ফিরে আসতে লাগল।

এরমধ্যে নকুল চিত্রসেনকে আক্রমণ করলেন, দুজনে একে অন্যের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। উভয়েই

অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম, বলশালী এবং রথযুদ্ধে কৌশলী ছিলেন। দুজনেই একে অপরকে বধ করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে সুযোগ খুঁজছিলেন। দেখতে দেখতে চিত্রসেন এক ভল্লের আঘাতে নকুলের ধনুক কেটে দিলেন, তারপর তিন বাণে তাঁর ললাট বিদ্ধ করে তেজপূর্ণ বাণে তাঁর ঘোড়াগুলিকে যমলোকে পাঠালেন।

ধনুক কেটে এবং রথ ভেঙে গেলে নকুল ঢাল-তলোয়ার হাতে রথ থেকে নেমে চিত্রসেনকে আক্রমণ করলেন। চিত্রসেন তাঁর ওপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু নকুল অত্যন্ত কৌশলী যোদ্ধা ছিলেন, তিনি চিত্রসেনের বাণগুলি ঢালের দ্বারা প্রতিহত করে সমস্ত সেনার সামনেই চিত্রসেনের রথে উঠে তাঁর সুবর্ণ কুণ্ডল ও মুকুট শোভিত মস্তক দেহচ্যুত করে দিলেন। চিত্রসেনের মস্তক রথের পেছনে গিয়ে পড়ল।

চিত্রসেনকে মৃত দেখে পাণ্ডব-মহারথীগণ সিংহনাদ করে উঠল। কিন্তু কর্ণের মহারথী দুই পুত্র সুষেণ ও সত্যসেন তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করে নকুলকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের বাণে নকুলের সারা দেহ বিদ্ধ হল, তা সত্ত্বেও তিনি নতুন ধনুক নিয়ে অন্য রথে আরোহণ করে যমরাজের ন্যায় যুদ্ধে অবিচল হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুই ভ্রাতা তখন নকুলের রথটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে নকুল হাসতে হাসতে সাত বাণে সত্যসেনের ঘোড়া চারটিকে বধ করলেন এবং এক নারাচের আঘাতে তাঁর ধনুক কেটে দিলেন। তখন সত্যসেন অন্য ধনুক ও রথ নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে নকুলকে বাণবর্ষণ করে আচ্ছাদিত করলেন। নকুল তাঁদের আক্রমণ প্রতিহত করে, দুজনকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা দুজনে নকুলকে বাণ মেরে তাঁর সারথিকেও বাণবিদ্ধ করলেন। সত্যসেন দুই বাণে নকুলের ধনুক ও রথের বাঁশ কেটে দিলেন। নকুল তখন রথের বাঁশ হাতে ধরে তাকে অনেক উঁচু করে সত্যসেনকে আঘাত করলেন। বাঁশের সেই ভয়ানক আঘাতে সত্যসেনের বুক শতধা টুকরো হয়ে গেল এবং তিনি প্রাণহীন হয়ে ভূপাতিত হলেন।

প্রিয় ভ্রাতাকে মৃত দেখে সুষেণ ক্রোধান্বিত হয়ে নকুলের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি চারবাণে নকুলের চারটি ঘোড়া বধ করলেন, পঞ্চম বাণে রথের ধ্বজা কেটে, অন্য তিনটি বাণে সারথিকে যমালয়ে পাঠালেন। নকুলকে রথহীন দেখে দ্রৌপদীর পুত্র সুতসোম সবেগে সেখানে তাঁর রথ নিয়ে এলেন। নকুল সেই রথে আরোহণ করে অন্য ধনুক নিয়ে সুষেণের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তারপর সুষেণ নকুল ও সুতসোমকে অসংখ্য বাণে আঘাত হানলেন। নকুল ক্রুদ্ধ হয়ে বাণের দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করে একটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণে তাঁর মস্তক কেটে ফেললেন। তাই দেখে কৌরব সেনারা ভয়ে পালাতে লাগল।

যুধিষ্ঠির ও ভীমের সঙ্গে শল্যের যুদ্ধ, দুর্যোধনের দ্বারা চেকিতান এবং যুধিষ্ঠির দ্বারা চন্দ্রসেন বধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! সেই সময় সেনাপতি শল্য আপনার পলায়নরত সেনাদের থামিয়ে ভয়ংকর সিংহনাদ এবং ধনুকে টংকার ধ্বনি তুলে শত্রুর সম্মুখীন হলেন। রাজা শল্যের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া কৌরব সৈনিক নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে চার দিক দিয়ে ঘিরে শত্রুবধের জন্য এগোতে লাগল। অন্য দিক থেকে সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল-সহদেব প্রমুখ পাণ্ডব যোদ্ধাগণ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সিংহনাদ করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

অর্জুনও সংশপ্তকদের সংহার করে কৌরব সেনাদের ওপর আক্রমণ চালালেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য বীররাও তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করে আপনার সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের আঘাতে কৌরব সৈনিকরা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, তাদের দিক-বিদিক জ্ঞান থাকল না। পাণ্ডবদের বাণে কৌরব সেনার প্রধান বীররা মারা পড়ল। তেমনই আপনার পুত্ররাও পাণ্ডবপক্ষের শত শত বীর সংহার করল। সেই সময় দুপক্ষের আঘাতে উভয় সৈন্যদলই অত্যন্ত সন্তপ্ত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ল। সৈন্যরা পালাতে লাগল, হাতিরা চিৎকার করতে লাগল, ভীষণভাবে প্রাণী সংহার হল। পাণ্ডবরা অত্যন্ত বলবান ছিলেন, তাঁদের নিশানা অব্যর্থ ছিল, তাই কৌরব সেনা অধিক সংহার হতে লাগল। আপনার সেনাদের ক্লেশ দেখে রাজা শল্য তাদের উদ্ধারের জন্য এগোলেন। পাণ্ডবরাও মদ্ররাজের কাছে পৌঁছে তাঁকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন।

মহাবলী মদ্রনরেশ তখন যুধিষ্ঠিরের সামনেই অসংখ্য তীক্ষ্ণবাণে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করতে আরম্ভ করলেন। সেই সময় নানা অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। পর্বতসহ পৃথিবী টলমল করে উঠল, যুদ্ধের রক্ত ক্রমশ ভয়ানক আকার ধারণ করল। মহাবলী শল্য দ্রৌপদীর পুত্রগণ, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং সাত্যকিকে বিদ্ধ করলেন। তিনি প্রত্যেক বীরকে অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তখন প্রভদ্রক ও সোমক ক্ষত্রিয় হাজারে হাজারে নিহত হতে লাগল। তীরের আঘাতে বহু হাতি, ঘোড়া, পদাতিক ও রথী যোদ্ধা ধরাশায়ী হল। কত সৈন্য মূর্ছা গেল এবং কত সৈন্য চিৎকার করে পালাতে লাগল তার ঠিক নেই। মহাবলী মদ্রনরেশ তখন সিংহের ন্যায় গর্জন করছিলেন।

শল্যের বাণে আহত হয়ে পাণ্ডব সেনারা আত্মরক্ষার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে পালিয়ে গেল। শল্য এইভাবে সৈন্যদের মেরে যুধিষ্ঠিরকে ক্লেশ দিতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তখন তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করে শল্যের অগ্রগতি রোধ করলেন। শল্যও যুধিষ্ঠিরের ওপর এক ভয়ংকর বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ সবেগে যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। ভীমসেন তাই দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সাত বাণে শল্যকে বিদ্ধ করলেন। তেমনভাবে সহদেব ও নকুল বাণ দ্বারা শল্যকে আঘাত করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর পুত্ররাও তীব্র বেগে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করল।

শল্যকে বাণের আঘাতে পীড়িত হতে দেখে কৃতবর্মা, কৃপাচার্য, উলূক, শকুনি, অশ্বত্থামা এবং আপনার পুত্রগণ—এঁরা সকলে একত্রিত হয়ে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। কৃতবর্মা বাণের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করলেন, তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নকেও ঘায়েল করলেন। শকুনি দ্রৌপদীর পুত্রদের এবং অশ্বত্থামা নকুল-সহদেবের সম্মুখীন হলেন। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সম্মুখীন হয়ে তাঁদের দুজনকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে আপনার পক্ষের যোদ্ধারা এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা ঘোর যুদ্ধে রত হলেন। মদ্ররাজ শল্য সহদেবের ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। সহদেবও তখন তলোয়ার দিয়ে শল্যের পুত্রের মাথা দেহচ্যুত করলেন। অন্যদিকে অশ্বত্থামা অট্টহাস্য করে

দ্রৌপদীর পুত্রদের প্রত্যেককে দশটি করে বাণ মারলেন এবং কৃতবর্মা ভীমসেনের ঘোড়াগুলিকে যমালয়ে পাঠালেন। ঘোড়াগুলি মারা গেলে ভীমসেন রথ থেকে নেমে কালদণ্ডের ন্যায় গদা নিয়ে কৃতবর্মার ঘোড়া এবং রথের ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন। কৃতবর্মা রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পালিয়ে গেলেন।

অন্য দিকে শল্যও সোমক ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের সংহার করতে করতে তীক্ষ্ণ বাণে যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করতে লাগলেন। তা দেখে ভীমসেন বজ্রের ন্যায় গদাহস্তে শল্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁর চারটি ঘোড়া বধ করলেন। তখন শল্য কুপিত হয়ে ভীমসেনের বুকে তোমর দিয়ে আঘাত করলেন। এতে তাঁর কবচ কেটে সেটি বুকে বিদ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু ভীমসেন তাতে একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি সেটি তাঁর বুক থেকে বার করে মদ্ররাজের সারথিকে ছুঁড়ে মারলেন। সেই আঘাতে সারথির মর্ম বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং সে রক্তবমন করতে করতে রাজার সামনেই গিয়ে পড়ল। মদ্ররাজ রথ থেকে নেমে লৌহ গদা হাতে নিয়ে দূরে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীমসেনও এক ভীষণ গদা হাতে শল্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মহারাজ! জগতে মদ্ররাজ শল্য অথবা যদুনন্দন বলরাম ব্যতীত আর কেউ নেই যে ভীমের এই গদার আঘাত সহ্য করতে সক্ষম। তেমনই শল্যের গদার বেগও ভীম ব্যতীত অন্য কেউ প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিলেন না। দুজনে

তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। মদ্ররাজ তাঁর গদা দিয়ে ভীমসেনের গদায় আঘাত করলে, তা আগুনের মতো জ্বলে উঠল, তার থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হতে থাকল। তেমনই ভীমসেনের গদার আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা যেতে লাগল। গদার আঘাতে দুজনেই আহত ও রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। মদ্ররাজের গদার আঘাতে আহত হয়েও ভীম বিচলিত হলেন না। পর্বতের মতো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। শল্যও ভীমের গদার বারংবার আঘাতে অবিচলিত ছিলেন। চারদিকে সেই গদার আওয়াজ বজ্রপাতের ধ্বনির মতো শোনা যাচ্ছিল। তাঁরা যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে লোহার দণ্ড তুলে পরস্পরকে মারতে লাগলেন। তারপর আবার গদা তুলে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে দুজনেই আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে

গেলেন। দুপক্ষের সেনা তা দেখে হাহাকার করে উঠল। ভীম ও শল্য দুজনেরই মর্মস্থানে গভীর আঘাত লেগেছিল, তাই দুজনেই অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন।

তখনই কৃপাচার্য এসে শল্যকে তাঁর রথে করে তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন। অন্য দিকে ভীম পলক ফেলতে না ফেলতে উঠে পড়ে গদা হাতে মদ্ররাজকে যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগলেন। তখন আপনার সৈনিকরা নানা অস্ত্র নিয়ে পাণ্ডব সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আপনার সেনাদের এগোতে দেখে পাণ্ডব যোদ্ধারাও সিংহনাদ করে দুর্যোধন প্রমুখের ওপর আক্রমণ চালাল। সেই সময় আপনার পুত্র এক প্রাসের দ্বারা

চেকিতানের বুক চিরে দিলেন, তিনি রক্তাপ্লুত অবস্থায়

প্রাণহীন হয়ে রথে পড়ে গেলেন।

তা দেখে পাণ্ডব-মহারথীরা আপনার সেনার ওপর বাণ-বর্ষণ করতে লাগল। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং শকুনি—এঁরা মদ্ররাজকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করার জন্য তাঁকে তীক্ষ্মবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরও মৃদুহাস্যে নারাচ হাতে নিয়ে শল্যের মর্মস্থান বিদ্ধ করলেন। শল্য তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের অগ্রগতি রোধ করে অসংখ্য বাণে তাঁকে ঘায়েল করলেন। যুধিষ্ঠিরও তীক্ষ্ম বাণে শল্যকে আঘাত করলেন : তারপর চন্দ্রসেন এবং তাঁর সারথিকে বাণের দ্বারা আহত করে দ্রুমসেনকে বধ করলেন।

চক্ররক্ষক নিহত হলে শল্য পঁচিশ জন চেদি যোদ্ধা বধ করলেন। তারপর সাত্যকি, ভীমসেন এবং নকুল, সহদেবকে অসংখ্য বাণে ঘায়েল করলেন। রাজা শল্য যখন এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর ওপর বহু তীক্ষ্ম বাণের আঘাত হানলেন এবং রথের ধ্বজা কেটে দিলেন। ধ্বজা কেটে যাওয়ায় শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি সাত্যকি, ভীম, নকুল, সহদেব—প্রত্যেককে বাণের দ্বারা ঘায়েল করলেন এবং যুধিষ্ঠিরের বুকে বাণের জাল বিছিয়ে তাঁকে আহত করলেন।

রাজা শল্যের পরাক্রম, অর্জুন-অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং রাজা সুরথ-বধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! মদ্ররাজ শল্য যখন যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করছিলেন, সেই সময় সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব এসে শল্যকে ঘিরে ধরে অস্ত্র বিদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। ভীমসেন প্রথমে শল্যকে আঘাত করলেন, সাত্যকি তাঁকে একশত বাণ মেরে সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন। নকুল পাঁচ এবং সহদেব সাত বাণে শল্যকে বিদ্ধ করে আহত করলেন।

এই মহারথীদের দ্বারা পীড়িত হয়েও শূরবীর শল্য রণে অবিচলিত হয়ে রইলেন। তিনি সাত্যকি, ভীমসেন ও নকুলকে অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করলেন। তারপর সহদেবকে বাণসহ ধনুক কেটে একুশ বাণে ঘায়েল করলেন। সহদেবও অন্য ধনুক নিয়ে মাতুলকে পাঁচ বাণে আহত করলেন এবং এক বাণে তাঁর সারথিকে ঘায়েল করলেন, পরে পুনরায় বাণের আঘাতে শল্যকে পীড়িত করলেন। তারপর ভীমসেন সত্তর, সাত্যকি নটি এবং ধর্মরাজ ষাট বাণ নিক্ষেপ করলেন। শল্যও প্রত্যেককে পাঁচটি করে বাণে বিদ্ধ করলেন।

তখন সাত্যকি ক্রুদ্ধ হয়ে শল্যকে তোমর দিয়ে আঘাত করলেন, ভীমসেন সর্পের মতো এক নারাচ মারলেন, নকুল শক্তি প্রয়োগ করলেন, সহদেব গদা এবং ধর্মরাজ শতঘ্নী দিয়ে আঘাত হানলেন। পাঁচ বীর নিক্ষিপ্ত পাঁচটি অস্ত্র এক সঙ্গে শত্রুর দিকে ধাবিত হল, কিন্তু শল্য নিজ অস্ত্রের দ্বারা সেগুলিকে প্রতিহত করে সিংহের ন্যায় গর্জন করলেন।

শত্রুর এই গর্জন সাত্যকি সহ্য করতে পারলেন না, তিনি মদ্ররাজ এবং তাঁর সারথিকে বাণবিদ্ধ করলেন। শল্য তখন ক্রোধভরে পাণ্ডবপক্ষের সব মহারথীকে দশটি করে বাণ মারলেন। শল্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই মহারথীরা তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। মহারাজের এই পরাক্রম দেখে দুর্যোধন মনে করলেন যে এখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং

সৃঞ্জয় বীরদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এক ক্ষুরপ্রের সাহায্যে শল্যের চক্ররক্ষককে বধ করে দিলেন। তাই দেখে শল্য বাণবর্ষণ করে পাণ্ডব সৈনিকদের আচ্ছাদিত করলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন—'আজ যুদ্ধে আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা (শল্যকে বধ করার) কেমনভাবে পূর্ণ করব ? শেষে এমন না হয় যে মদ্ররাজ ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সেনাদের বধ করে ফেলে।' তিনি যখন এইসব চিন্তা করছিলেন, তখনই হাতি, ঘোড়া, রথীসহ পাণ্ডব-সৈন্য সেখানে এসে চতুর্দিক থেকে শল্যকে পীড়িত করতে লাগল।

কিন্তু মদ্ররাজ পাণ্ডবদের অস্ত্রবর্ষণ শান্ত করে দিলেন। তারপর আমরা রাজা শল্যের বাণ নিক্ষেপ দেখলাম। তাঁর বাণ আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো পড়ছিল, আকাশ বাণে ছেয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, পাণ্ডব এবং আমাদের কোনো পক্ষের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মদ্ররাজের বাণ-বর্ষণে পাণ্ডব সেনাদের বিচলিত হতে দেখে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হল। যুধিষ্ঠির ও ভীম অত্যন্ত আহত হলেও, যুদ্ধে শল্যকে ছেড়ে গেলেন না। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

অন্যদিকে অশ্বত্থামা ও তাঁর অনুগামী ত্রিগর্তের মহারথীরা বহু বাণে অর্জুনকে আহত করলেন। ধনঞ্জয় তখন তিন বাণে দ্রোণকুমার এবং দুই দুই বাণে অন্য মহারথীদের বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনি আবার বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাতে আপনার যোদ্ধারা ভীষণভাবে আহত হল। তখন তারা এত বাণবর্ষণ করতে লাগল যে অর্জুনের রথের মধ্যভাগ ভরে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সমস্ত অঙ্গ বাণের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেল—তাই দেখে আপনার সৈনিকরা অত্যন্ত আনন্দিত হল।

মহারাজ ! সেই সময় আপনার যোদ্ধারা অর্জুনের যে দশা করলেন তা আগে কখনো হয়নি, তাঁর রথে বিচিত্র সব বাণ লেগেছিল। অর্জুনও আপনার সেনাদের ওপর বাণবর্ষণ করছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত বাণের আঘাতে কৌরব সেনাদের সব কিছু অর্জুনময় বলে মনে হচ্ছিল। অর্জুনরূপ অগ্নি আপনার যোদ্ধারূপ ইন্ধনকে দাবানলের ন্যায় ভস্ম করতে লাগল। লৌহবর্ম পরিহিত দুহাজার রথী সৈন্য অর্জুন তাঁর বাণের আঘাতে ধ্বংস করলেন। প্রলয়কালীন অগ্নি যেমন জগৎকে দগ্ধ করে ধূমবর্জিত হয়ে জ্বলতে থাকে, পার্থও তেমনই শত্রুসংহার করে দেদীপ্যমান হয়ে রইলেন।

পাণ্ডুনন্দনের পরাক্রম দেখে অশ্বত্থামা তাঁর সামনে এসে অগ্রগতি রোধ করলেন। দুজনে তুমুল বাণবর্ষণ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণ বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও অক্লেশে গাণ্ডীবে টংকার তুলে বাণের দ্বারা গুরুপুত্রের পূজা করে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করলেন। অশ্বত্থামা সেই রথের ওপর দাঁড়িয়ে এক মুদ্গর অর্জুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন সেটি সাত টুকরো করে দিলেন। তা লক্ষ্য করে দ্রোণকুমার কুপিত হয়ে অর্জুনের ওপর এক ভয়ংকর পরিঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু পার্থ পাঁচ বাণে সেটি টুকরো টুকরো করে দিলেন। সেই সঙ্গে ভল্লের আঘাতে দ্রোণকুমারকে অত্যন্ত আহত করলেন।

অর্জুনের আঘাতে আহত হলেও অশ্বত্থামা ভয় পেলেন না। তিনি নিজ পৌরুষের ভরসায় রণে অবিচল থেকে পাঞ্চাল মহারথী সুরথের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সুরথও অশ্বত্থামার দিকে বেগে ধাবিত হয়ে তাঁকে বাণের আঘাত করতে লাগলেন। তাতে অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকে কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিয়ে সুরথকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। সেই নারাচ সুরথের বক্ষ ভেদ করল, তিনি প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বীরবর সুরথ নিহত হলে অশ্বত্থামা তাঁর রথে উঠে সংশপ্তক সেনা নিয়ে পুনরায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দ্বিপ্রহরের সময় অর্জুন ও তাঁর শত্রুদের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল। সেখানে কৌরব যোদ্ধাদের পরাক্রম এবং তাদের সঙ্গে একাকী অর্জুনকে যুদ্ধ করতে দেখে আমরা সকলেই খুব আশ্চর্য হলাম।

শল্যের পরাক্রম এবং তাঁর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! এক দিকে দুর্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাসংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন, সেখানে বাণ ও শক্তির অত্যধিক প্রয়োগ হচ্ছিল। উভয় পক্ষেই বাণের সহস্র ধারা বর্ষিত হচ্ছিল। প্রথমে দুর্যোধনই ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তখন অসংখ্য বাণে দুর্যোধনকে বিশেষভাবে আঘাত করেন। তাই দেখে তাঁর ভ্রাতারা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে চারদিকে ঘিরে ধরলেন। তা সত্ত্বেও ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র সঞ্চালনে তাঁর ক্ষিপ্রতা দেখিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

অন্যদিকে শিখণ্ডী প্রভদ্রক সেনা সঙ্গে নিয়ে কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মার সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন। সেখানেও সকলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করছিলেন। এদিকে রাজা শল্য বাণের ঝড় তুলে সাত্যকি ও ভীমসেন-সহ সমস্ত পাণ্ডবদের পীড়িত করে তুলছিলেন। শল্য যখন তাঁর বাণে পাণ্ডব মহারথীদের আহত করছিলেন, তখন সেখানে তাঁর কোনো রক্ষক ছিল না।

তখন শূরবীর নকুল তাঁর মামা শল্যের ওপর তীব্র বেগে
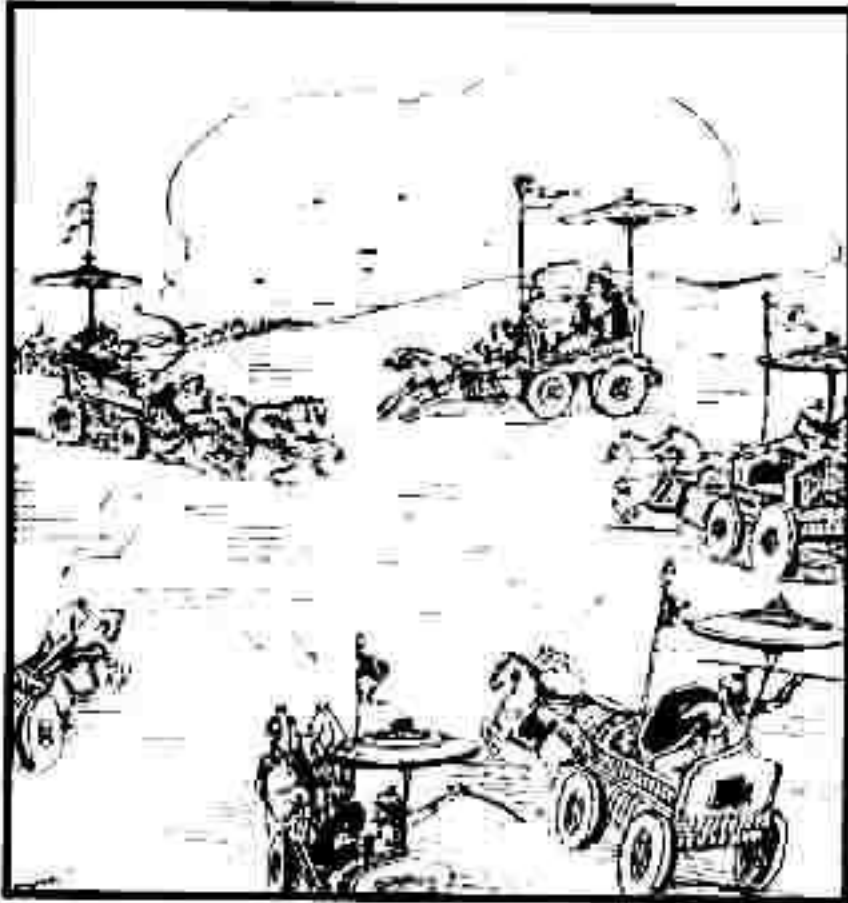
আক্রমণ করলেন এবং বাণবর্ষণ করে তাঁকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তারপর হাসতে হাসতে তিনি শল্যের বুকে দশ বাণে আঘাত হানলেন। ভাগিনেয়র দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শল্যও তাকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করতে লাগলেন। তা দেখে রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব শল্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেনাপতি শল্যও তক্ষুণি তাদের সম্মুখীন হলেন। তিনি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি এবং সহদেবকে অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করলেন।

তারপর মদ্ররাজ ক্ষুরপ্রর আঘাতে নকুলের ধনুক কেটে ফেললেন। নকুল তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক নিয়ে শল্যের রথে বাণবৃষ্টি করে দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির এবং সহদেবও তাঁর বুকে দশটি করে বাণ মারলেন। তারপর ভীম এবং সাত্যকিও তাঁকে ঘায়েল করলেন। তখন মদ্ররাজ ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকিকে প্রথমে নয়টি ও পরে সত্তর বাণে বিদ্ধ করলেন। তারপর শল্য তাঁর ধনুক কেটে রথের ঘোড়াগুলি বধ করে নকুল, সহদেব, ভীমসেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করলেন। এই মহাসংগ্রামে আমি শল্যের অদ্ভুত পরাক্রম প্রত্যক্ষ করেছি ; তিনি একাকী পাণ্ডবদের সমস্ত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন।

এরপর তিনি যুধিষ্ঠিরের অতি নিকটে এসে তাঁকে বাণের দ্বারা পীড়িত করে ভীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই সময় রাজা শল্যের ক্ষিপ্রতা এবং অস্ত্র সঞ্চালনের কৌশল দেখে আপনার এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। শল্যের বাণে অত্যন্ত আহত হয়ে পাণ্ডব যোদ্ধারা যখন কষ্ট পেতে লাগল তখন যুধিষ্ঠিরের আহ্বান এবং রণক্ষেত্র ছেড়ে যেতে বারণ করা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল। এতে ধর্মরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে স্থির করলেন যে "আমার জয় হোক বা মৃত্যু,
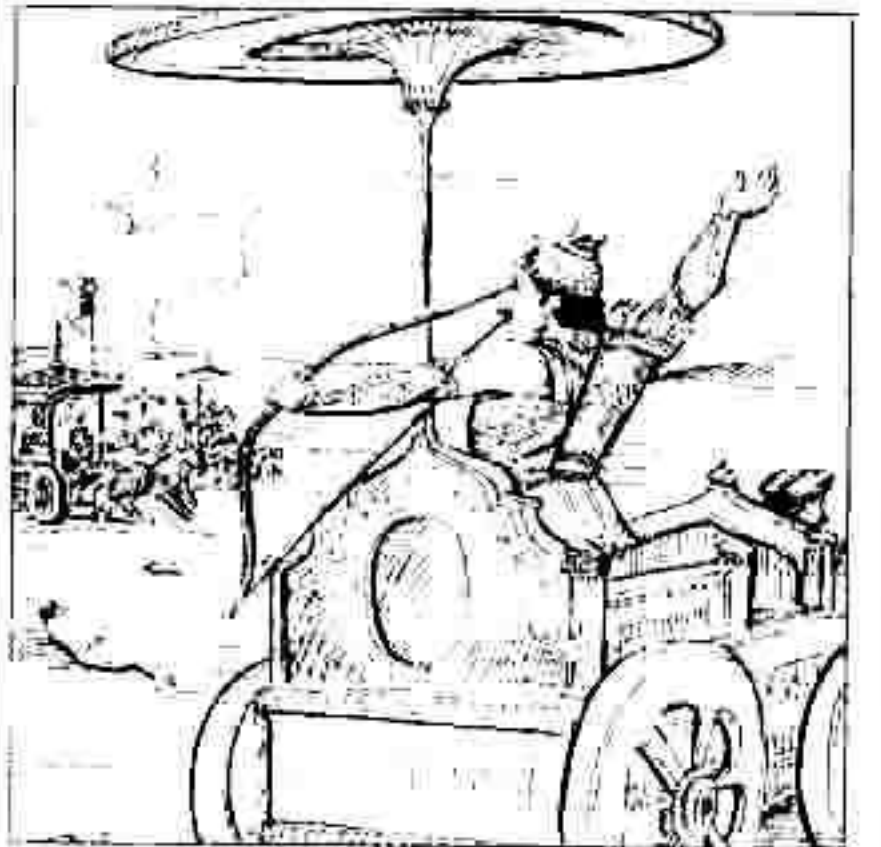
যুদ্ধ আমি অবশ্যই করব।' তখন তিনি নিজের বাহুবল ভরসা করে শল্যকে বাণে পীড়িত করতে লাগলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও নিজ ভ্রাতাদের ডেকে বললেন— 'আমি আমার মনের কথা বলছি। আমার পার্শ্বরক্ষাকারী মাদ্রীকুমার নকুল ও সহদেব এখন ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করে তাঁদের মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করুক। আজ হয় শল্য আমাকে বধ করবেন, নচেৎ আমি তাঁকে বধ করব। আমার এই কথা তোমরা সত্য বলে জেনো। এখন পার্শ্বরক্ষার দায়িত্ব সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর থাকবে। সাত্যকি দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করবে। অর্জুন পশ্চাদভাগ রক্ষার দায়িত্বে এবং ভীমসেন আমার অগ্রে গমন করবে। এরূপ ব্যবস্থা কার্যকর হলে আমি এই মহাসমরে শল্যের থেকে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠব।'

রাজার নির্দেশ সকলে পালন করলেন ; কারণ সকলেই তাঁর প্রিয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে উৎসাহ ভরে গেল। পাঞ্চাল, সোমক এবং মৎস্য দেশীয় বীরগণ আনন্দে হর্ষধ্বনি করল। যুধিষ্ঠির বিজয় অথবা মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা করে মদ্ররাজকে আক্রমণ করলেন। সেই সময় শঙ্খ ও ভেরী বেজে উঠল। পাঞ্চাল যোদ্ধারা সিংহনাদ করে মদ্ররাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আপনার পুত্র দুর্যোধন এবং মদ্ররাজ শল্য তাঁদের গতি রোধ করলেন। শল্য যুধিষ্ঠিরের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধনও বাণবর্ষণ করে তাঁর অস্ত্রবিদ্যার পরিচয় দিলেন।

ভীমসেন তখন দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব প্রমুখ শকুনি ও অন্যান্য বীরদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল, দুর্যোধন ভীমসেনের ধ্বজা কেটে দিলেন, তাঁর ধনুক টুকরো টুকরো করে ফেললেন। ভীমসেন তখন দুর্যোধনের বুকে শক্তির আঘাত করতেই তিনি মূর্ছিত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। দুর্যোধন পড়ে গেলে ভীম ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁর সারথির মাথা দেহ থেকে পৃথক করে দিলেন। সারথির মৃত্যু হতেই ঘোড়াগুলি সবেগে রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করল, চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা আপনার পুত্রকে বাঁচাবার জন্য দৌড়ে গেলেন।

অন্যদিকে যুধিষ্ঠির ভয়ানক ভল্লের সাহায্যে কৌরব যোদ্ধাদের সংহার করতে লাগলেন। তিনি উগ্রগতিতে শত্রুপক্ষের অসংখ্য অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক
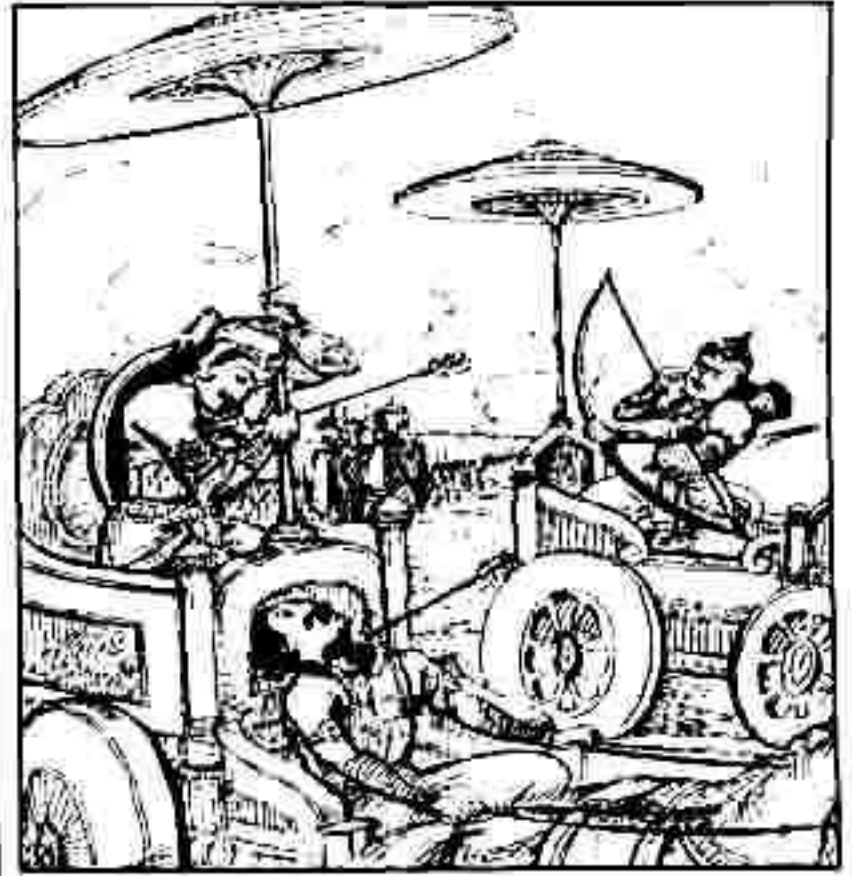
সৈন্য ও তাদের বাহনাদি রথ, ধ্বজা বিনষ্ট করলেন। অতঃপর চতুর্দিকে বাণ বর্ষণ করতে করতে তিনি মদ্ররাজ শল্যের দিকে অগ্রসর হলেন।

যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দেখে আপনার সৈনিকরা ভয়ে কম্পিত হল। শুধু শল্য তাঁর সম্মুখীন হলেন। তাঁরা দুজনে ক্রুদ্ধ হয়ে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন এবং একে অপরকে আহ্বান করে সামনে এলেন। তারপর শল্য তাঁর বাণে যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করলে যুধিষ্ঠিরও বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁদের দুজনের বীরত্ব দেখে সমস্ত সৈনিকরা নিশ্চিত হল যে 'এই দুজনের মধ্যে একজন অবশ্যই জয়ী হবেন।'

শল্য তার মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে অসংখ্য বাণ মারলেন এবং তাঁর ধনুকও কেটে দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির আর একটি ধনুক নিয়ে শল্যকে তিনশো বাণে বিদ্ধ করে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁর ধনুক দ্বিখণ্ডিত করলেন ; তারপর দুই বাণে তাঁর পার্শ্বরক্ষক এবং সারথিকে মৃত্যুর পরপারে পৌঁছে দিলেন ও তাঁর ধ্বজা কেটে দিলেন। তা দেখে দুর্যোধনের সেনারা পালাতে লাগল। মদ্ররাজের এই করুণ অবস্থা দেখে অশ্বত্থামা দৌড়ে এসে তাঁকে নিজরথে তুলে সবেগে পলায়ন করলেন। যুধিষ্ঠির তখন সিংহের ন্যায় গর্জন করছিলেন। মদ্ররাজ শল্য পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত রথে যুধিষ্ঠিরের সামনে এলেন। শল্যের রথে লক্ষ্যভেদকারী যন্ত্রও ছিল, যা দেখে ভয়ে শত্রুর রোমাঞ্চ হয়।

শল্য বধ

সঞ্জয় বললেন—মদ্ররাজ শল্য তখন শ্রাবণের বারির মতো বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি সাত্যকি, ভীমসেন ও সহদেবকে বাণে বিদ্ধ করে যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করতে লাগলেন। শল্য ধর্মরাজের বক্ষদেশ লক্ষ্য করে সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন, যুধিষ্ঠিরও বাণের দ্বারা মদ্ররাজকে বিদ্ধ করলেন। সেই আঘাতে শল্য মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলে তিনি আবার যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন
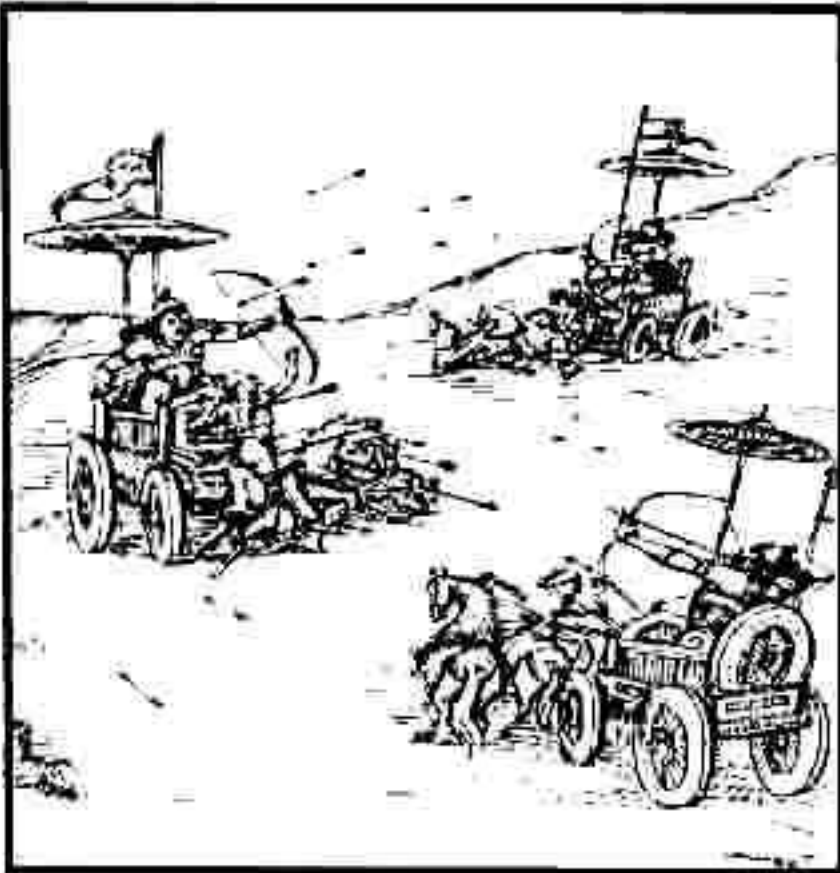
যুধিষ্ঠিরও বাণ নিক্ষেপ করে শল্যের বক্ষে আঘাত করলেন এবং ছটি বাণের সাহায্যে তাঁর কবচ কেটে ফেললেন। মদ্ররাজ শল্য তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের ধনুক দুটুকরো করে দিলেন। যুধিষ্ঠির অন্য একটি ভয়ংকর ধনুক নিয়ে শল্যকে সব দিক দিয়ে বিদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যও নয় বাণে যুধিষ্ঠির ও ভীমের কবচ কেটে তাঁদের হাতেও আঘাত করলেন, তারপরে এক ক্ষুরাকার বাণে যুধিষ্ঠিরের ধনুক কেটে ফেললেন এবং কৃপাচার্য তাঁর সারথিকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় শল্য তাঁর চারটি ঘোড়াও বধ করলেন। তারপরে তিনি যুধিষ্ঠিরের সেনা সংহার করতে শুরু করলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরের একরূপ অবস্থা দেখে ভীমসেন সজোরে বাণ মেরে শল্যের ধনুক কেটে ফেললেন এবং তীরের আঘাতে তাঁকে আহত করলেন। তারপর তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে নকুলের রথের রশি কেটে দিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন ; রাজা শল্যকে যুধিষ্ঠিরের দিকে যেতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্র, শিখণ্ডী ও সাত্যকি শল্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তখন ভীমসেন নয় বাণে শল্যের ঢালটি টুকরো টুকরো করে এক ভল্লের আঘাতে তরবারিও কেটে দিলেন। তারপর হর্ষোৎফুল্ল হয়ে আপনার সেনাদের মধ্যে সিংহগর্জন করে বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর ভয়ংকর গর্জনে আপনার সৈন্যরা ভয়ে অচেতন হয়ে পড়ল।

তারপর শল্য যুধিষ্ঠিরের দিকে এবং যুধিষ্ঠির শল্যের দিকে এগোতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ভগবানের কথা অনুসারে মনে মনে শল্য বধের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে এক রত্নখচিত স্বর্ণমণ্ডিত শক্তি হাতে নিলেন এবং ক্রোধে জ্বলন্ত চোখে মদ্ররাজের দিকে তাকালেন। সেই সময় মদ্ররাজ শল্য যে যুধিষ্ঠিরের চোখের আগুনে ভস্ম হলেন না—তাই যথেষ্ট। তারপর যুধিষ্ঠির সেই ভয়ংকর জ্বলন্ত শক্তি মদ্ররাজের ওপর নিক্ষেপ করলেন ; বেগে নিক্ষেপ করায় সেই শক্তি থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হচ্ছিল। পাণ্ডবগণ চন্দন, মালা এবং উত্তম আসন দিয়ে সর্বদাই এই শক্তিকে পূজা করতেন, সেটি প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত এবং অথর্বা অঙ্গিরা দ্বারা উৎপন্ন কৃত্যার ন্যায় ভয়ংকর ছিল। এর মধ্যে জলচর, স্থলচর এবং নভচর জীবদের ধ্বংস করার শক্তি বিদ্যমান। বিশ্বকর্মা ব্রহ্মচর্যাদি নিয়ম পালন করে একে সৃষ্টি করেছিলেন, এটি ব্রহ্মদ্রোহীদের বিনাশকারী এবং লক্ষ্যভেদে নির্ভুল ছিল। বল ও দক্ষতার সঙ্গে নিক্ষেপ করায় এর বেগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুধিষ্ঠির এটিকে ভয়ংকর মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শত্রু মদ্ররাজের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সেটি এত সবলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে সেই শক্তি প্রতিহত করা যে কারো পক্ষেই অসম্ভব ছিল, তা সত্ত্বেও মদ্ররাজ শল্য সেটি প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই শক্তি তাঁর বক্ষভেদ করে মর্মস্থান বিদীর্ণ করে মাটিতে গিয়ে ঢুকল এবং সঙ্গে নিয়ে গেল রাজার বিশাল যশ। তাঁর অঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রাজা যুধিষ্ঠির তারপর ধনুক নিয়ে ভল্লের আঘাতে পলকের মধ্যে বহু শত্রু নাশ করলেন। তাঁর বাণে আচ্ছাদিত হয়ে আপনার সৈনিকরা চোখ বন্ধ করল এবং নিজেরা নিজেদের আঘাত করে আহত হতে লাগল। তাদের দেহ থেকে রক্তধারা বয়ে যাচ্ছিল, অস্ত্রশস্ত্র চ্যুত হয়ে তারা মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ছিল।

মদ্ররাজের এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি ছিলেন যুবক এবং মদ্ররাজের মতোই গুণসম্পন্ন। শল্যের মৃত্যু হলে তিনি
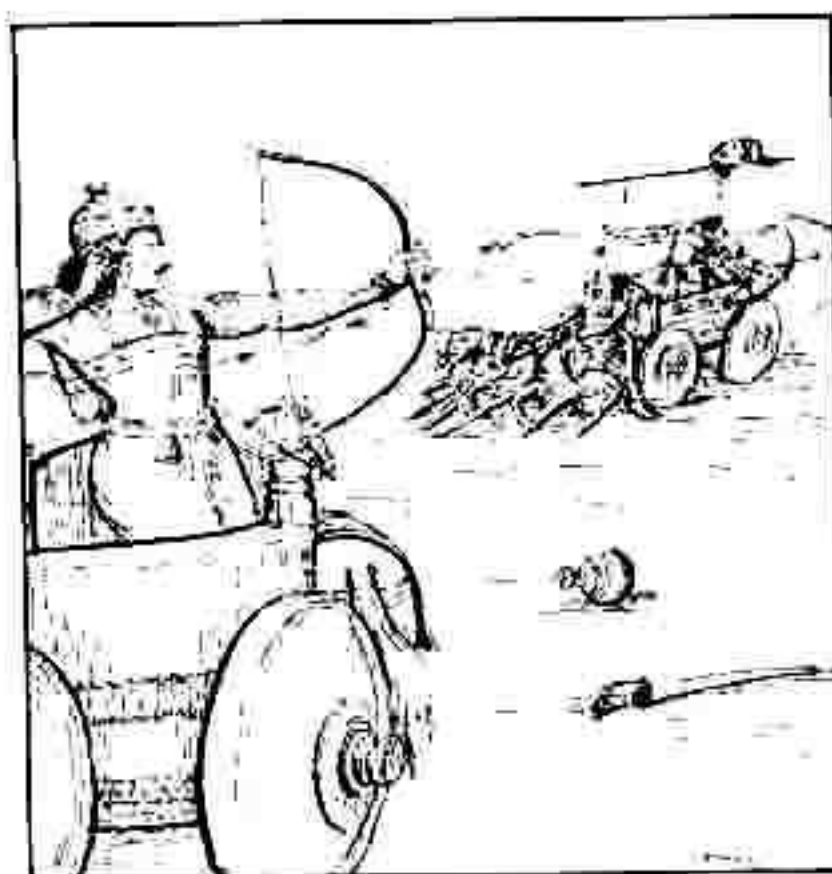
রাজা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁকে নারাচ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। ধর্মরাজ তখন তাঁকে ছয় বাণে বিদ্ধ করে দুটি ক্ষুরাকৃতি বাণে তাঁর ধনুক ও ধ্বজা কেটে ফেললেন। তারপর এক তেজপূর্ণ ভল্লের দ্বারা তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। রক্তাক্ত দেহ রথ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কৌরবসেনাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হল এবং তারা পালাতে লাগল। সাত্যকি পলায়মান কৌরবদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, তখন কৃতবর্মা সেখানে এসে তাঁর গতিরোধ করলেন। দুজনে একে অপরের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কৃতবর্মা সাত্যকি এবং তাঁর ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করলেন এবং এক বাণে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। সাত্যকি অন্য ধনুক নিয়ে কৃতবর্মার বুকে দশটি বাণের আঘাত হানলেন এবং ভল্লের আঘাতে তাঁর রথ ও দণ্ড কেটে দিলেন। তারপর তাঁর ঘোড়া, পার্শ্বরক্ষক এবং সারথিকেও মৃত্যুমুখে পাঠালেন।

কৃতবর্মাকে রথহীন দেখে কৃপাচার্য তাঁকে নিজ রথে করে দূরে নিয়ে গেলেন। দুর্যোধনের সেনারা আবার পালাতে লাগল। পাণ্ডবদের সবেগে আসতে দেখে এবং নিজ পক্ষের সেনাদের পালাতে দেখে দুর্যোধন একাকী পাণ্ডব সেনাদের গতিরোধ করলেন। তিনি রথে বসে পাণ্ডবদের ওপর, ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর এবং আনর্তদেশের রাজার ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। মরণশীল মানুষ যেমন মৃত্যুর হাত থেকে পার পায় না, তেমনই পাণ্ডবরা এই মহারথী দুর্যোধনকে লঙ্ঘন করতে পারছিলেন না।

এদিকে কৃতবর্মা আবার অন্য রথে সেখানে হাজির হলেন। যুধিষ্ঠির চার বাণে কৃতবর্মার ঘোড়াদের বধ করে তেজপূর্ণ ছয় ভল্লের দ্বারা কৃপাচার্যকে ঘায়েল করলেন। ঘোড়া মারা যাওয়ায় কৃতবর্মা রথহীন হলেন—এটি দেখে অশ্বত্থামা তাঁকে নিজ রথে করে যুধিষ্ঠিরের সামনে থেকে দূরে নিয়ে গেলেন। মহারাজ! আপনার ও আপনার পুত্রের অন্যায়ে এইভাবে যুদ্ধ হয়েছিল। শল্য নিহত হলে পাণ্ডবরা প্রসন্ন হয়ে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করতে লাগলেন। নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হতে লাগল, এবং ধ্বনিতে পৃথিবী গুঞ্জরিত হতে উঠল।

মদ্ররাজের অনুচরগণ বধ, কৌরব সেনাদের পলায়ন, ভীম কর্তৃক একুশ হাজার পদাতিক সংহার এবং দুর্যোধনের দ্বারা সেনাদের উৎসাহ প্রদান

সঞ্জয় বললেন—শল্যের মৃত্যু হলে তাঁর অনুগামী সাতশ রথী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। রাজা দুর্যোধন সেই মদ্রদেশীয় বীরদের বললেন—'এখন পাণ্ডব সেনাদের দিকে এগিও না, এগিও না।' কিন্তু তিনি বারংবার
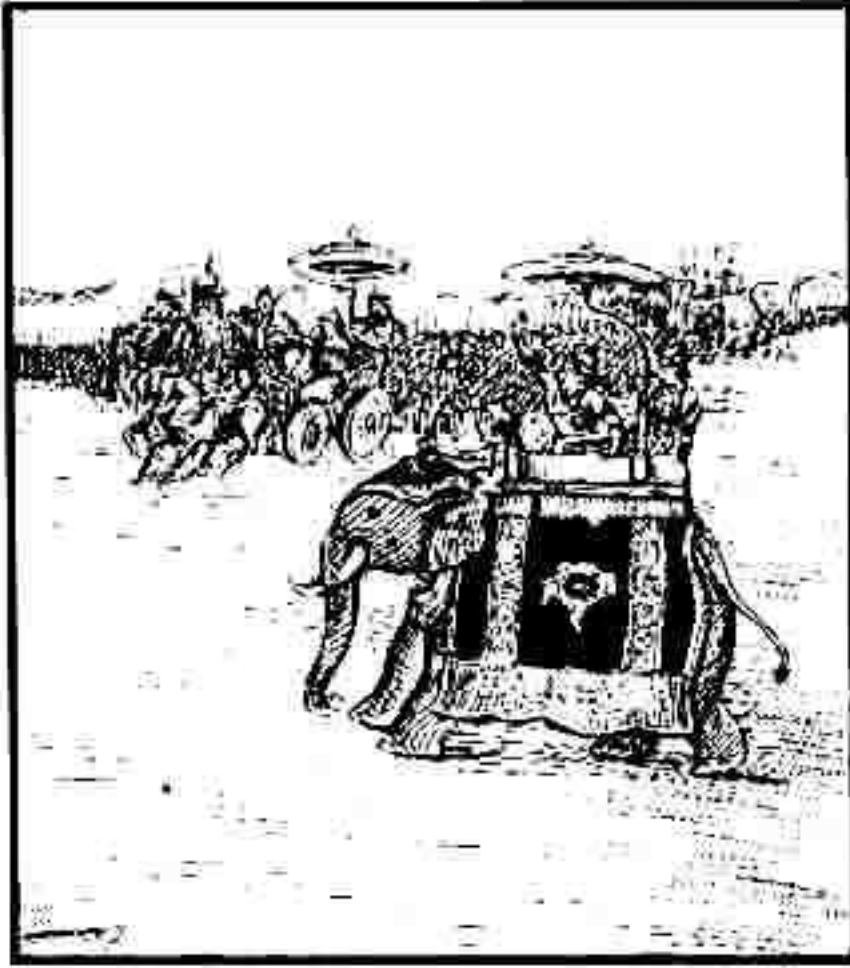
বাধা দিলেও তারা যুধিষ্ঠিরকে বধ করার জন্য তাঁর সেনার মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং ধনুকে টংকার তুলে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল।

এদিকে অর্জুন শুনলেন যে 'শল্য মারা গেছেন এবং তাঁর হিতৈষী মদ্রদেশীয় মহারথীরা ধর্মরাজকে আক্রমণ করেছে।' তিনি তখন গাণ্ডীবে টংকার তুলে সেখানে এসে পৌঁছলেন। সেই সময় অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সোমক যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে চারদিকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছিলেন।

মদ্রদেশীয় যোদ্ধারা এরমধ্যে সেখানে এসে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—'আরে! সেই রাজা যুধিষ্ঠির কোথায় গেলেন? তাঁর শূরবীর ভ্রাতারাও দেখা যাচ্ছে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্ররা, শিখণ্ডী এবং অন্য পাঞ্চাল মহারথীরা সব কোথায়?' এরূপ দুর্বাক্য বল

মদ্ররাজের অনুচরদের ওপর দ্রৌপদীর মহারথী পুত্ররা বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় দুর্যোধন তাঁদের আশ্বস্ত করে পুনরায় বারণ করলেন, কিন্তু কেউই তাঁর নির্দেশ শুনল না। তখন শকুনি দুর্যোধনকে বললেন—'ভারত! তুমি থাকতে এরূপ হওয়া কখনো উচিত নয় যে, মদ্ররাজের সেনারা মারা পড়বে আর আমরা দাঁড়িয়ে তা দেখব। আমরা শপথ নিয়েছি যে আমরা সকলে একসঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব; এই অবস্থায় শত্রুদের আমাদের সেনা-সংহার করতে দেখেও তুমি কেন সহ্য করছ?'
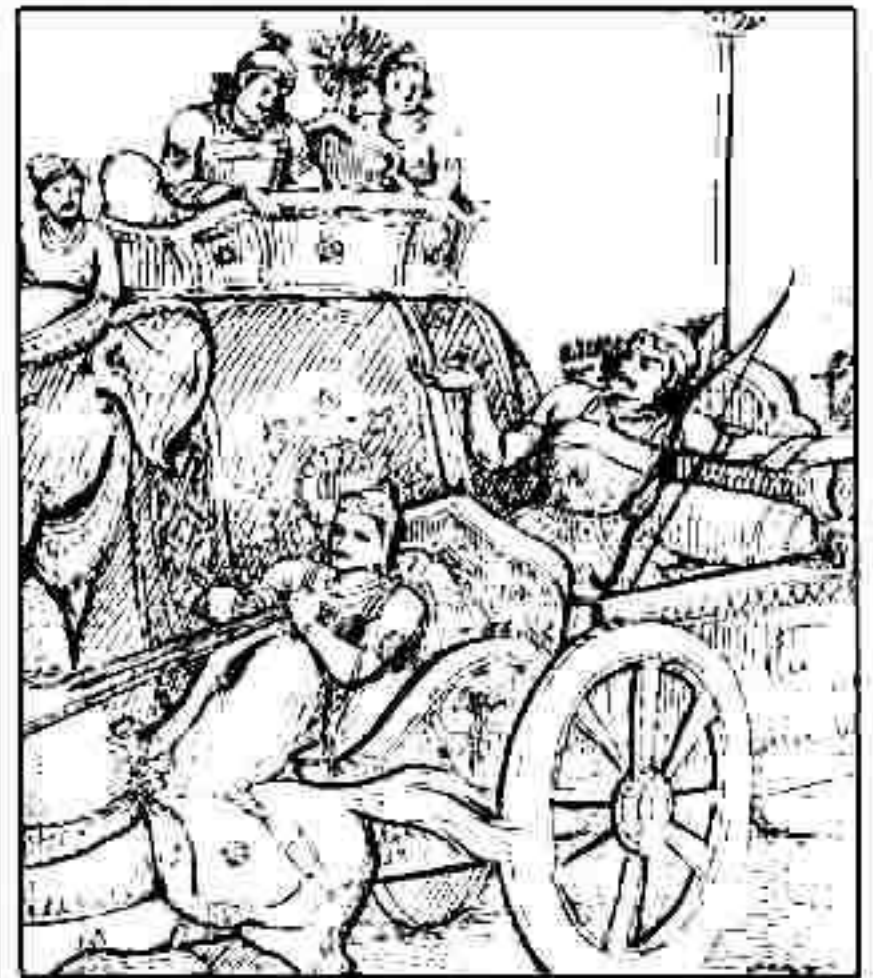
দুর্যোধন বললেন—'আমি কী করব? বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও এরা আমার নির্দেশ শুনছে না, সকলে একসঙ্গে পাণ্ডব সৈন্যদলের দিকে গেছে।'

শকুনি বললেন—'যুদ্ধে আগত সৈনিকরা ক্রুদ্ধ হলে প্রভুর নির্দেশও অমান্য করে থাকে; সুতরাং তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। এখন তাদের উপেক্ষা করার সময় নয়। চলো, আমরা একসঙ্গে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করি।'

শকুনির কথায় রাজা দুর্যোধন বিশাল সৈন্য সমাভিব্যাহারে সিংহনাদ করে পৃথিবী কম্পিত করতে

করতে এগিয়ে চললেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে ছিলাম। ওদিকে পাণ্ডব এবং মদ্ররাজের সৈনিকদের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে মদ্রদেশীয় যোদ্ধা এবং পাণ্ডবদের মধ্যে বহু যুদ্ধে মদ্র দেশীয় যোদ্ধারা সব বধ হয়ে গেল। পাণ্ডবরা তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উচ্ছ্বাস দেখাতে লাগল। আমরা সেখানে যেতে তারা শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করে আমাদের আক্রমণ করল। তারা বিজয়োল্লাসে ভরপুর ছিল, তাদের বাণের আঘাতে দুর্যোধনের সেনারা ভীত হয়ে চারদিকে পালাতে লাগল।

রাজন্ ! শল্যের মৃত্যুতে কৌরবরা হতোদ্যম হয়ে গেল। সেই সময় কোনো যোদ্ধারই একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের মৃত্যুর পর আমাদের যে ভয় ও দুঃখ হয়েছিল, শল্যের মৃত্যুর পরও সেই অবস্থা হল। বিজয়লাভের পরিবর্তে হতাশা ফিরে এল। কৌরবদের প্রধান বীররা মারা গিয়েছিল ; যারা বাকি ছিল, তারাও তীক্ষ্ণ বাণে আহত হয়ে পালাতে লাগল। হাতি ঘোড়া রথে সব পালিয়ে গেল, পদাতিক যোদ্ধারা প্রাণভয়ে সজোরে দৌড় দিল।

কৌরব সৈন্যদের হতোদ্যম হয়ে পালাতে দেখে বিজয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডব ও পাঞ্চালরা বহুদূর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। তাদের বাণের আওয়াজ, সিংহের ন্যায় গর্জন এবং শঙ্খধ্বনি বড়ো ভয়ংকর লাগছিল। সেই আওয়াজে কৌরব সেনা কম্পিত হল। তাদের সেই অবস্থা দেখে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা বলাবলি করতে লাগল—'আজ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির শত্রুদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন এবং দুর্যোধন রাজলক্ষ্মীর কৃপাভ্রষ্ট হয়েছেন। আজ ধৃতরাষ্ট্র শুনে যাবেন যে কুন্তীনন্দনরা ধনুর্ধরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখন তিনি মহাত্মা বিদুরের সত্য ও হিতকারক কথাগুলি স্মরণ করবেন। আজ থেকে তিনিও দাসের মতো অবস্থায় থেকে বুঝবেন যে পাণ্ডবরা কত কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি আজ ভালো করে জানবেন শ্রীকৃষ্ণের কী মহিমা ! অর্জুনের গাণ্ডীবের টংকার কী ভয়ংকর, তাঁর অস্ত্র এবং বাহুর কত বল ? এবার দুর্যোধনের মৃত্যু হলে মহাত্মা ভীমসেনের ভয়ংকর বল সম্বন্ধেও অবহিত হবেন। যাঁদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, নকুল-সহদেব, শিখণ্ডী এবং স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরের মতো বীর উপস্থিত, তাঁরা কেন বিজয়ী হবেন না ? সমস্ত পৃথিবীর প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের রক্ষক, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় করেছেন, তাঁরা কেন বিজয়লাভ করবেন না ?'

এই সব বলতে বলতে সৃঞ্জয় বীররা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে আপনার সেনাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। অর্জুন তখন রথী সৈন্যদের আক্রমণ করেন। নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির ওপর আক্রমণ চালালেন। অন্য দিকে আপনার সৈনিকদের ভীমসেনের ভয়ে পালাতে দেখে দুর্যোধন তাঁর সারথিকে বললেন—'সূত ! দেখ, পাণ্ডব সেনারা কীভাবে আমার সেনাদের তাড়াচ্ছে। যদি সমস্ত সেনার পেছনে আমি নিজে উপস্থিত থাকি, তাহলে অর্জুন আমাকে লঙ্ঘন করে এগোবার সাহস পাবে না, সুতরাং তুমি আমার রথটি ধীরে ধীরে সেনাদের পেছনে তাদের রক্ষা করার জন্য নিয়ে চলো। আমি থাকলে পাণ্ডবদের অগ্রগতি রোধ হবে এবং পলায়নরত সেনারা ফিরে আসবে।'

দুর্যোধনের এই বীরোচিত কথা শুনে সারথি ধীরে ধীরে রথ চালাল। সেই সময় গজারোহী, অশ্বারোহী এবং রথীদের দেখা যাচ্ছিল না, শুধু একুশ হাজার পদাতিক প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে ফিরে এল। তারপর দুপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। তখন ভীমসেন চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে সেই বীরদের সম্মুখীন হলেন। তারা সকলে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে লাগল, তারা ভীমকে পরাস্ত ও বন্দি করার চেষ্টা করতে লাগল।

তা লক্ষ্য করে ভীম ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে হাতে গদা নিয়ে যমরাজের ন্যায় আপনার সৈনিক সংহার করতে লাগলেন। তিনি তাঁর গদার আঘাতে সেই একুশ হাজার সৈন্যকে বধ করলেন। সেই মৃত পদাতিক সৈন্য বড়ো ভয়ংকররূপ ধারণ করেছিল। সেই সময়

যুধিষ্ঠির প্রমুখ আপনার পুত্র দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁরা দুর্যোধন পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না। আমরা তখন আপনার পুত্রের অদ্ভুত পরাক্রম দেখলাম। সমস্ত পাণ্ডব একত্রিত হয়েও একাকী দুর্যোধনকে পরাস্ত করতে পারলেন না। সেই সময় দুর্যোধন লক্ষ্য করলেন তাঁর সেনারা পালাবার জন্য কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েছে ; তখন তিনি

সৈনিকদের ডেকে বললেন—"আরে ! এইভাবে পালিয়ে কী লাভ ? এখন তো শত্রুদের অল্পসংখ্যক সেনাই বেঁচে আছে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অত্যন্ত আহত ; এখন যদি সাহস করে আমরা যুদ্ধে স্থির হয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই আমরা জিতব। এখন তোমরা যদি এই অবস্থায় পলায়ন কর, তাহলে পাণ্ডবরা পশ্চাদ্ধাবন করে তোমাদের অবশ্যই বধ করবে। যখন মৃত্যু অবধারিত, তখন যুদ্ধে মৃত্যু হলে আমাদের কল্যাণ হবে। যখন শূরবীর এবং কাপুরুষ—সকলেরই মৃত্যু নিশ্চিত, তখন এমন কে মূর্খ আছে, যে ক্ষত্রিয় হয়েও যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় ? ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে যদি যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু হয় তাহলে তা পরিণামে সুখপ্রদ হয়। যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম। যদি সে যুদ্ধে জয়ী হয় তাহলে ইহলোকে সুখ ভোগ করে, আর যদি মৃত্যু হয়, তাহলে পরলোকে মহাফলভোগী হয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধের থেকে উত্তম কোনো পথ নেই।"

দুর্যোধনের কথা শুনে সব রাজা তাঁর প্রশংসা করলেন এবং পুনরায় পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন। পাণ্ডবরা ব্যূহ নির্মাণ করে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কৌরব সৈনিকদের আসতে দেখে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে এগোতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গাণ্ডীব ধনুকে টংকার তুলে রথে করে আপনার সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নকুল-সহদেব এবং সাত্যকি শকুনিকে আক্রমণ করলেন। এইভাবে সকলে উৎসাহের সঙ্গে আপনার সেনাদের দিকে ধাবিত হলেন।

শাল্ব বধ, সাত্যকি ও কৃতবর্মার যুদ্ধ এবং দুর্যোধনের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—ম্লেচ্ছ রাজা শাল্ব তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডব-সেনাদল আক্রমণ করলেন। তিনি ঐরাবতের ন্যায় এক পর্বতাকার গজে উপবিষ্ট ছিলেন। ইন্দ্রবজ্রের ন্যায় ভয়ংকর তীক্ষ্ণ বাণে তিনি পাণ্ডবদের বিদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণে সৈন্যদের যমলোকে পৌঁছাতে কত সময় লাগত, তা কৌরব বা পাণ্ডব কেউই বুঝতে পারত না। ম্লেচ্ছ রাজার ওই হাতি রণভূমিতে একা বিচরণ করলেও, পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সোমকরা তাকে হাজার হাজার সংখ্যায় দেখতে পেত, সর্বত্র তাকেই দেখা যেত। সে চারদিক থেকে শত্রু সৈন্য তাড়িয়ে দিত। যোদ্ধারা ভীত হয়ে পড়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াতে সাহস পেত না। নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষ প্রায় বাধাত। হাতির বেগ সহ্য করতে না পেরে পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে চারদিকে
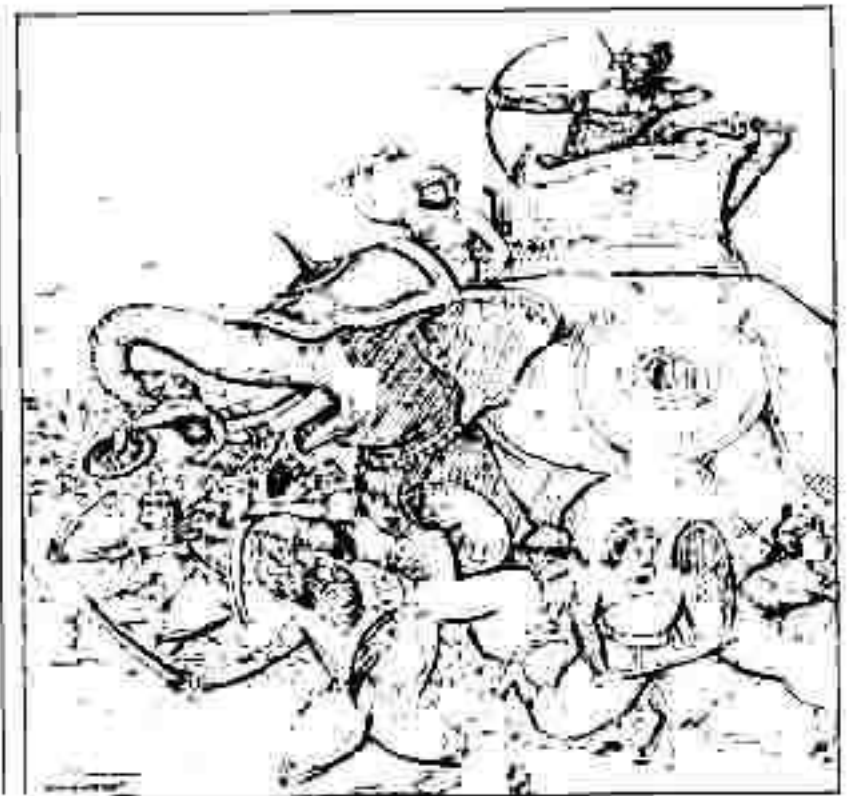
পালিয়ে গেল।

তা লক্ষ্য করে আপনার প্রধান প্রধান যোদ্ধা ম্লেচ্ছরাজের প্রশংসা করে গর্জন করতে ও শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। তাদের সেই শঙ্খনাদ ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি উতলা হয়ে সেই হাতির দিকে এগোলেন। তাঁকে আসতে দেখে শাল্ব দ্রুপদ-পুত্রকে বধ করার জন্য হাতিকে তাঁর দিকে চালনা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন ভয়ংকর তিনটি নারাচ দিয়ে সেই হাতিকে বিদ্ধ করলেন ; তারপর তার কুম্ভস্থল লক্ষ্য করে আরও অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করলেন। হাতি আহত হয়ে পেছন দিকে পালাতে লাগল। কিন্তু শাল্ব তাকে ফিরিয়ে এনে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে নিয়ে গেলেন। নাগরাজকে পুনরায় তাঁর দিকে আসতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীত হয়ে গদা হাতে রথ থেকে নেমে পড়লেন। তার মধ্যে হাতি এসে রথের সারথি ও ঘোড়াগুলিকে পদদলিত করে রথটিকে শুঁড়ে তুলে আছাড় দিয়ে ভাঙল।

পাঞ্চাল রাজকুমারকে শাল্বর হাতি আক্রমণ করেছে দেখে ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি তাঁর কাছে দ্রুত এলেন এবং বাণের দ্বারা হাতির গতি রুদ্ধ করলেন। মহারথীদের দ্বারা গতিরুদ্ধ হওয়ায় হাতি বিচলিত হয়ে উঠল ; তখন রাজা শাল্ব বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর বাণের আঘাতে পাণ্ডব রথীরা পালাতে লাগলেন। শাল্বের পরাক্রম দেখে পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়গণ হাহাকার করে গজরাজকে চারদিকে ঘিরে ধরল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সবেগে তাঁকে আক্রমণ করলেন এবং সেই বিশাল হাতিকে গদার আঘাতে আহত করলেন। সেই

আঘাতে হাতির কুম্ভস্থল ফেটে গেল এবং সে চিৎকার করে রক্তবমন করতে করতে ধরাশায়ী হল। তার মধ্যে সাত্যকি এক তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে শাল্বের মস্তক দেহচ্যুত করলেন। সেই ম্লেচ্ছরাজ গজরাজের সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করলেন।

শাল্বের মৃত্যুতে আপনার সৈন্যব্যূহ ভেঙে সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তা লক্ষ্য করে মহারথী কৃতবর্মা এগিয়ে এসে শত্রুসেনাদের গতি রোধ করলেন। তাঁকে রণভূমিতে উপস্থিত দেখে আপনার পলায়নরত সেনারাও ফিরে এল এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে লাগল। কৃতবর্মার যুদ্ধ কৌশলও অদ্ভুত ছিল। তিনি একাকী সমস্ত পাণ্ডব সেনাদের গতি রোধ করলেন, কৌরবরা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল, তাদের গর্জন শুনে পাঞ্চালরা কম্পিত হল। তার মধ্যে মহাবাহু সাত্যকি সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং রাজা ক্ষেমধূর্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সাত্যকি সাত বাণে ক্ষেমধূর্তিকে তখনই যমালয়ে প্রেরণ করলেন।

তাই দেখে কৃতবর্মা তীব্রভাবে সাত্যকিকে আক্রমণ করলেন, দুজনের মহাসংগ্রাম শুরু হল। পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা দূরে দাঁড়িয়ে সেই ভয়ংকর যুদ্ধ দেখতে লাগল। কৃতবর্মা তীক্ষ্ণ বাণে সাত্যকির ঘোড়াগুলি বধ করলেন। সাত্যকি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে আট বাণে কৃতবর্মাকে আহত করলেন। কৃতবর্মা তিন বাণে তাঁকে আহত করে তাঁর ধনুকও কেটে ফেললেন। সাত্যকি খণ্ডিত ধনুক ফেলে অন্য ধনুক নিয়ে কৃতবর্মার কাছে গিয়ে দশ বাণে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে যমালয়ে পাঠালেন, তারপর ধ্বজাটিও কেটে দিলেন। তখন কৃতবর্মার ক্রোধের সীমা থাকল না, তিনি সাত্যকিকে বধ করার জন্য তাঁকে শূলের দ্বারা আঘাত করলেন, কিন্তু সাত্যকি তীক্ষ্ণ বাণে সেটি কেটে ফেললেন। কৃতবর্মা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কৃতবর্মার অবস্থা দেখে কৃপাচার্য তড়িৎ গতিতে সেখানে এসে তাঁকে নিজ রথে তুলে দূরে সরিয়ে নিলেন। সাত্যকি যুদ্ধে অবিচল হয়ে আছেন এবং কৃতবর্মা রথহীন হয়েছেন দেখে কৌরব সেনাদের মধ্যে পালানো শুরু হল। সেই সময় এমন ধুলোর ঝড় উঠেছিল যে, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তাই আপনার সৈন্যদের পলায়ন শত্রুপক্ষ জানতে পারেনি। সকলে চলে গেলেও দুর্যোধন সেখানে স্থির হয়ে ছিলেন। তিনি শত্রুদের আক্রমণ করে একাকী সমস্ত পাণ্ডব যোদ্ধাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। এছাড়াও তিনি শিখণ্ডী,

দ্রৌপদীর পুত্র, কেকয়, সোমক এবং সৃঞ্জয় যোদ্ধাদেরও তীক্ষ্ণ বাণের নিশানা করলেন। শত্রুপক্ষের হাতি, ঘোড়া, রথ বা মানুষ কেউই তাঁর হাত থেকে রক্ষা পেল না। দুর্যোধন সেই সময় রণক্ষেত্রকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে আপনার পুত্রের অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল—সমস্ত পাণ্ডব একত্র হয়েও তাঁকে রোধ করতে পারলেন না। তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীর পুত্রদের অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। এক ভল্লের আঘাতে সহদেবের ধনুকটিও কেটে ফেললেন।

সহদেব সেই খণ্ডিত ধনুকের পরিবর্তে অন্য বিশাল এক ধনুক নিয়ে দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন। তিনি দশ বাণে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করলেন এবং নকুল, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্ররা, ধর্মরাজ এবং ভীমসেন বাণের আঘাতে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। কিন্তু দুর্যোধন তাতে বিচলিত হলেন না। সেই সময় তাঁর ক্ষিপ্রতা, হস্তকৌশল এবং বীরত্বের কোনো তুলনা ছিল না।

সেই সময় শকুনি যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াগুলি বধ করে তাঁকেও বাণের দ্বারা পীড়িত করে তুললেন। সহদেব তখন রাজাকে নিজ রথে তুলে নিয়ে রণভূমি থেকে দূরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে যুধিষ্ঠির পুনরায় অন্য রথে করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং শকুনির ওপর বাণবর্ষণ করে বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনি ভয়ানক জোরে গর্জন করে উঠলেন।

অন্যদিকে উলূক চারদিকে বাণবর্ষণ করতে করতে এসে নকুলকে আক্রমণ করলেন। নকুল ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করে শকুনি পুত্র উলূককে আচ্ছাদিত করে দিলেন। অন্যদিকে কৃপাচার্য বাণবর্ষণ করে দ্রৌপদীর পুত্রদের বাণের আঘাতে আহত করলেন, তাঁরাও বাণের আঘাতে কৃপাচার্যকে ঘায়েল করলেন। এইভাবে ভয়ানক যুদ্ধ চলতে লাগল, হাতির সঙ্গে হাতি, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়া, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিক সেনার ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। সকলেই একে অপরকে অস্ত্রাঘাত করে সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগল।

দুপক্ষের সেনাদের ঘোর সংগ্রাম এবং শকুনির কূট-যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! এমন ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল যে পাণ্ডবরা আপনার সেনাদের পিছু হটতে বাধ্য করল। তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন অতি কষ্টে সেনাদের বাধা দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির তিন বাণে কৃপাচার্যকে বিদ্ধ করে, চার বাণে কৃতবর্মার ঘোড়াগুলি বধ করলেন। তখন অশ্বত্থামা কৃতবর্মাকে নিজ রথে করে অন্যত্র পৌঁছে দিলেন, কৃপাচার্য সেখানে থেকে গেলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বাণের আঘাতে পীড়িত করতে লাগলেন।

তারপর দুর্যোধন সাতশো রথী পাঠালেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। সেই রথীরা চার দিক থেকে ঘিরে ধরে যুধিষ্ঠিরের ওপর এত বাণবর্ষণ করতে লাগলেন যে রাজা বাণে আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন। শিখণ্ডী প্রমুখ মহারথীগণ তাঁদের এই কাজ সহ্য করতে না পেরে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার জন্য সেখানে এলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। জলের মতো রক্ত প্রবাহিত হল, পাণ্ডব এবং পাঞ্চালরা দুর্যোধন প্রেরিত সাতশো রথীকে মৃত্যুর পারে পৌঁছে দিলেন। তখন পাণ্ডবদের সঙ্গে আপনার পুত্রের মহাযুদ্ধ লেগে গেল। চারদিকে যুদ্ধ চলছিল, দুপক্ষের যোদ্ধারাই ভীষণভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিল।

তখন কপটতাপূর্ণক শকুনি কৌরব যোদ্ধাদের বললেন—'বীরগণ ! তোমরা সামনে থেকে যুদ্ধ করো, আর আমি পেছন থেকে কৌরব সংহার করব।' এই পরামর্শ অনুসারে আমরা যখন পেছন দিকে এগোলাম তখন মদ্রদেশের যোদ্ধারা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠল। এরমধ্যে পাণ্ডব সৈন্যগণ সামনে এসে ধনুকে টংকার তুলে আমাদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই মদ্ররাজার সেনা নিহত হল—তাই দেখে দুর্যোধনের সেনা আবার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। তখন শকুনি বললেন—'বীরগণ ! পালিয়ে কী হবে ? ফিরে এসে যুদ্ধ করো।'

সেই সময় শকুনির কাছে দশ হাজার অশ্বারোহী সেনা ছিল। তাদের নিয়ে তিনি পাণ্ডব সেনার পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে

সমবেতভাবে বাণবর্ষণ করতে শুরু করলেন। সেই আক্রমণে পাণ্ডবদের বিশাল সেনার জোট ভেঙে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সেনাদের এই অবস্থা দেখে সহদেবকে বললেন—'ভ্রাতা ! তুমি মূর্খ শকুনির দিকে লক্ষ্য রাখো, সে পেছন দিক থেকে আমাদের সেনা-সংহার করছে। তুমি দ্রৌপদীর পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে যাও আর শকুনিকে বধ করো। আমি এদিকে পাঞ্চালদের নিয়ে কৌরব রথসেনা ভস্মসাৎ করে দেব।'

ধর্মরাজের নির্দেশে মহাবলী সহদেব সাতশো গজারোহী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার পদাতিক, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শকুনিকে আক্রমণ করলেন। শকুনি তখন পেছন দিক থেকে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করছিলেন। এঁরা গিয়ে শকুনির বহু অশ্বারোহী সৈন্য বধ করলেন। শকুনি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে জীবিত অবশিষ্ট ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেলেন। পাণ্ডবরাও তারপর অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে ফিরে গেলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মত্ত গজারোহী সেনা নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের কাছে পৌঁছলেন। সব যোদ্ধা যখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে চলে গেল, তখন শকুনি ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনার পার্শ্বভাগে এসে বাণবর্ষণ শুরু করলেন। তখন আপনার সেনা ও শত্রু সেনার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। শত শত হাজার-হাজার সৈন্য মরতে লাগল।

সেই যুদ্ধের বেগ একটু কমলে শকুনি আবার বাকি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পাণ্ডব সেনাদের আক্রমণ করলেন। পাণ্ডবরাও ক্ষিপ্রতাসহ পদাতিক, অশ্বারোহী ও গজারোহী সৈন্য নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাণ্ডবরা খুবই উৎসাহী ছিলেন, তাঁরা মণ্ডল তৈরি করে চারদিক থেকে শকুনিকে ঘিরে ধরে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তা দেখে আপনার সেনাদের অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতিক সকলেই পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হল। পাণ্ডব যোদ্ধারা যখন আপনার অধিকাংশ সেনা বধ করে ফেলেছে, তখন শকুনি অবশিষ্ট সাতশো অশ্বারোহী সেনা নিয়ে দুর্যোধনের সেনার মধ্যে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন 'রাজা কোথায় ?' যোদ্ধারা উত্তর দিল—'যেখান থেকে মেঘ গর্জনের ন্যায় তুমুল ধ্বনি আসছে, কুরুরাজ সেখানেই রয়েছেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।'

তাদের কথায় শকুনি, যেখানে বীর পরিবৃত হয়ে দুর্যোধন দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে গেলেন। রথীদের মধ্যে

দুর্যোধনকে দেখে তিনি প্রসন্ন হয়ে সব সৈনিকদের আনন্দ-বর্ধন করে দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! আমি পাণ্ডবদের ঘোড়সওয়ারদের পরাস্ত করেছি, এখন তুমি এই রথীসৈন্যদের পরাস্ত করো ; কারণ প্রাণের মোহ ত্যাগ করে যুদ্ধ না করলে যুধিষ্ঠির আমাদের বশে আসবে না। তার দ্বারা সুরক্ষিত রথীসৈন্য নাশ হলে আমরা গজারোহী ও পদাতিকদেরও বিনাশ করে দেব।'

শকুনির কথা শুনে আপনার সৈনিকরা পুনর্বার পাণ্ডবদের আক্রমণ করল। সকলে ধনুক তূণীরের মুখ খুলে ফেলল। কিছুক্ষণ পরেই শূরবীরদের সিংহনাদের সঙ্গে তাদের ধনুকের ভয়ানক টংকার শোনা যেতে লাগল।

অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের অনীতির কুপরিণাম জানানো এবং কৌরবদের রথসেনা এবং গজসেনা সংহার

সঞ্জয় বললেন—কৌরব বীরদের সবেগে ধনুক ওঠাতে দেখে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন! আপনি অশ্বযুক্ত রথটি ওই সৈন্য-সমুদ্রের দিকে চালনা করুন। আজ আমি তীক্ষ্ণ বাণে শত্রুদের শেষ করব। আজ আঠারো দিন হল এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কৌরবদের পক্ষে যে বিশাল সৈন্য-সমুদ্র ছিল যুদ্ধে তা গোষ্পদে পরিণত হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে পিতামহ ভীষ্মের পতনের পর দুর্যোধন এসে সন্ধি করে নেবে, কিন্তু সেই মূর্খ তা করেনি। ভীষ্ম সত্য এবং হিতকর কথা বলেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় সে তাঁর কথাও মেনে নেয়নি। তারপর ক্রমশ আচার্য দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ প্রমুখ মারা গেলেও এবং সামান্য সংখ্যক সৈন্য জীবিত থাকলেও, যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং অবন্তী রাজকুমারও নিহত হয়েছে, তবুও এই যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না। জয়দ্রথ, বাহ্লীক, রাক্ষস অলায়ুধ, সোমদত্ত, বীর ভগদত্ত, কাম্বোজরাজ এবং দুঃশাসনের মৃত্যু হলেও এই যুদ্ধ থামানো গেল না। ভ্রাতা ভীমসেনের হাতে বহু অক্ষৌহিণী-পতি নিহত হয়েছেন—তা সত্ত্বেও লোভ ও মোহের জন্য এই যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। যার হিতাহিত জ্ঞান থাকে, যে বুদ্ধিমান, সেই ব্যক্তি শত্রুর গুণ, বল, বীরত্ব নিজের থেকে বেশি জেনেও কখনো তার সঙ্গে শত্রুতা করে না। আপনিও পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য তাদের হিতকারক কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেকথা তার মনে ধরেনি। আপনার কথাই যখন সে গ্রাহ্য করেনি, তখন অন্যের কথা সে শুনবে কেন? ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের কথাও যে অগ্রাহ্য করেছে, কী করলে সে সঠিক পথ ধরবে? যে ব্যক্তি মূর্খতাবশত বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা শোনে না, হিতবাক্য বলার জন্য যাকে অপমান করে, তার আর কার কথা ভালো লাগবে? দুর্যোধন নিশ্চয়ই এই কুলকে ধ্বংস করার জন্যই জন্মেছে। মহাত্মা বিদুর আমাকে বারবার বলেছিলেন যে 'দুর্যোধন বেঁচে থাকতে কখনো তোমাদের রাজ্যের ভাগ দেবে না, সর্বদাই তোমাদের ক্ষতি করবে, তাকে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে পরাস্ত করা অসম্ভব।' আজ সেই সমস্ত কথাই সত্য বলে মনে হচ্ছে। যে মূর্খ ব্যক্তি ভগবান পরশুরামের মুখ থেকে সত্য ও হিতকর বাণী শুনেও তা অবহেলা করে, সে তো নিশ্চয়ই বিনাশের জন্য অপেক্ষা করে আছে। দুর্যোধনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বহু সিদ্ধপুরুষ বলেছিলেন যে, এই দুরাত্মার জন্য ক্ষত্রিয়কুলের মহা সংহার হবে। তাঁদের কথা আজ সত্য বলে প্রমাণিত ; কারণ দুর্যোধনের জন্যই অসংখ্য রাজা নিহত হয়েছে। আপনি আমাকে দুর্যোধনের সেনার দিকে নিয়ে চলুন ; আজ আমি সমস্ত কৌরব সেনা বধ করব।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন যখন উপরোক্ত কথাগুলি বললেন তখন তিনি ঘোড়া চালিয়ে নির্ভয়ে শত্রুসেনার মধ্যে রথ নিয়ে প্রবেশ করলেন। চতুর্দিকে অর্জুনের শ্বেত অশ্ব দেখা যেতে লাগল এবং মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে তেমনই অর্জুন বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণ যোদ্ধাদের বজ্রের ন্যায় আঘাত হেনে বর্মভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়তে লাগল। অর্জুনের বাণ তাঁর নামাঙ্কিত থাকত, সেইরূপ বাণে নিহত হাতি ঘোড়া মানুষে সমস্ত রণক্ষেত্র ভরে গেল। জ্বলন্ত অগ্নি যেমন রাশিকৃত খড় জ্বালিয়ে দেয়, অর্জুনও তেমনভাবে শত্রুসৈন্য ভস্ম করতে লাগলেন। এদের বিনাশ করার জন্য অর্জুনের এক একটি বাণই যথেষ্ট। নানা প্রকার বাণের আঘাতে তিনি একাই সমস্ত সৈন্য সংহার করলেন।

যদিও কৌরব সৈন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী ছিল না এবং পূর্ণ শক্তি নিয়েই যুদ্ধ করছিল, কিন্তু অর্জুন তাঁর গাণ্ডীবের দ্বারা তাদের বিজয়াভিলাষ ব্যর্থ করে দিলেন। ধনঞ্জয়ের বাণ বজ্রের ন্যায় অসহ্য এবং অত্যন্ত তেজপূর্ণ ছিল। তার আঘাতে আপনার সেনাদের মনোবল ভেঙে গেল এবং দুর্যোধনের সামনেই তারা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। সকলে যে যার ভাই-বন্ধু, আত্মীয়স্বজনকে যেখানে-সেখানে ফেলে চলে গেল। বহু মহারথী পার্থের বাণে আহত হয়ে রণভূমিতে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। তখন কেউ এসে তাঁদের রথে করে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিল, অনেকে আহতদের ফেলে রেখেই যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

কেউ আবার পিতা বা পুত্রের শিবিরে যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিল।

কৌরব পক্ষের কিছু যোদ্ধা পাণ্ডব সেনাদের আক্রমণ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও শতানীক আপনার রথসেনার সম্মুখীন হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন পূর্ণ উদ্যমে আপনার বিশাল সৈন্য সংহার করতে প্রস্তুত হলেন। তা লক্ষ্য করে আপনার পুত্র তাঁর ওপর নানা প্রকারের বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও তখন নারাচ, অর্ধনারাচ ও বৎসদন্ত ইত্যাদি শীঘ্রগামী বাণে দুর্যোধনের বাহু ও বক্ষে আঘাত করলেন। আপনার পুত্রের বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নও অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, তাই তিনি দুর্যোধনকে আঘাত করে তাঁর চারটি ঘোড়াকেই বধ করলেন। তারপর ভল্লের আঘাতে সারথির মস্তক দেহচ্যুত করলেন। দুর্যোধন তখন অন্য ঘোড়ার পিঠে চেপে শকুনির কাছে পালিয়ে গেলেন।

এইভাবে রথসেনা বিনাশ হলে আমাদের তিন হাজার গজারোহী সৈন্য এসে পাঁচ পাণ্ডবকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁর সারথি ; সেই অর্জুন পর্বতাকার গজরাজ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তাদের নারাচ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। সেখানে দেখা গেল অর্জুনের এক একটি বাণে বিশাল গজরাজ ধরাশায়ী হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে

ভীমও তাঁর রথ থেকে নেমে বিশাল গদা হাতে যমের ন্যায় হাতিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর হাতে গদা দেখে আপনার সৈনিকরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ভীমের গদার আঘাতে হাতিগুলি আহত হয়ে এদিক-সেদিক পালাতে লাগল। গজসেনার এই দুর্দশা দেখে আপনার সেনারা ভয়ে কম্পিত হল। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেবও এইভাবে গজারোহী সৈনিকদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন।

সেই সময় অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা রথসেনার মধ্যে দুর্যোধনকে খুঁজছিলেন, তাঁকে না পেয়ে, সেখানে উপস্থিত ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করলেন — 'রাজা দুর্যোধন কোথায় ?' তারা বলল—'সারথির মৃত্যু হওয়ায় তিনি পাঞ্চালরাজের দুর্ধর্ষ সেনার সম্মুখীন না হয়ে শকুনির কাছে চলে গেছেন।'

তখন তিন জন বীর পাঞ্চালরাজের দুর্ধর্ষ সৈন্যব্যূহ ভেঙে শকুনির কাছে গেলেন। তাঁরা চলে গেলে পাণ্ডব-পক্ষের যোদ্ধারা শত্রুসৈন্য সংহার করতে থাকল। তাদের তীব্র আক্রমণের মুখে আমাদের যোদ্ধারা জীবনের আশা ত্যাগ করল। তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও কমে গিয়েছিল এবং চতুর্দিক থেকে শত্রুসৈন্য তাদের ঘিরে ফেলেছিল। তাদের এই বিপদে আমি জীবনের আশা ত্যাগ করে অন্য চার মহারথীসহ পাঞ্চালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলাম। কিন্তু অর্জুনের বাণে পীড়িত হয়ে আমরা পাঁচজন পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হল ; কিন্তু দ্রুপদকুমার আমাদের পরাস্ত করে দিলেন। সেখান থেকে আমরা যখন অন্য দিকে গেলাম তখন মহারথী সাত্যকিকে দেখা গেল। তিনি একেবারে কাছেই এসে পড়েছিলেন, আমাদের দেখেই তিনি চারশো রথী নিয়ে আক্রমণ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের কবল থেকে কোনো মতে রক্ষা পেলেও সাত্যকির সৈন্যের মধ্যে আমরা আটকে গেলাম। কিছুক্ষণ সেখানে ভয়ানক সংগ্রাম হল। সাত্যকি আমাদের সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করে দিলেন। ইতিমধ্যে ভীমসেনের গদা এবং অর্জুনের নারাচের আঘাতে সেখানকার সমস্ত গজসেনা ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল।

ভীম দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের বারোজন পুত্র বধ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আলোচনা এবং অর্জুনের ত্রিগর্ত-সংহার

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! গজসেনা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে ভীমসেন আপনার অন্য সেনাদের সংহার করতে শুরু করলেন। তিনি ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন। দুর্যোধনকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে আপনার অবশিষ্ট পুত্ররা ভীমসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুর্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিষহ, দুর্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ এবং শ্রুতর্বা চারদিক থেকে ভীমের ওপর আক্রমণ করলেন। ভীমসেন তখন নিজের রথে আরোহণ করে আপনার পুত্রদের মর্মস্থলে তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি এক ক্ষুরপ্রের আঘাতে দুর্মর্ষণের মাথা কেটে ফেললেন। তারপর এক ভল্লের আঘাতে শ্রুতান্তের জীবনান্ত করলেন। এরপরে হাসতে হাসতে জয়ৎসেনকে এক নারাচ দিয়ে আঘাত করে রথ থেকে ফেলে দিলেন, মাটিতে পড়েই তাঁর মৃত্যু হল।

তা লক্ষ্য করে শ্রুতর্বা কুপিত হয়ে ভীমসেনকে অসংখ্য বাণের আঘাত করলেন। ভীমসেন তাতে কুপিত হয়ে জৈত্র, ভূরিবল ও রবিকে তাঁর তীক্ষ্ণ তীরের নিশানা করলেন। বাণের আঘাতে এই তিন মহারথী প্রাণহীন হয়ে রথ থেকে পড়ে গেলেন। তারপরে ভীম এক নারাচের আঘাতে দুর্বিমোচনকে মৃত্যুর পারে পৌঁছে দিলেন। দুষ্প্রধর্ষ এবং সুজাতকেও দুই বাণের আঘাতে যমালয়ে পাঠালেন। তখন দুর্বিষহ তাঁর ওপর আক্রমণ চালালেন, তাঁকে আসতে দেখে ভীম তাঁর ওপর এক ভল্ল নিক্ষেপ করলেন, তাতে আহত হয়ে দুর্বিষহ রথ থেকে মাটিতে পড়ে মারা গেলেন।

ভীমসেনকে একাই তাঁর অনেক ভাইকে বধ করতে দেখে শ্রুতর্বা ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকে টংকার তুলে ভীমসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীমকে আঘাত করে তিনি তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। মহারথী ভীম তখন অন্য ধনুক নিয়ে আপনার পুত্রের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শ্রুতর্বাও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমের বাহু ও বক্ষ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীম এতে গুরুতর আহত হলেন। তিনি রোষভরে শ্রুতর্বার ঘোড়া এবং সারথিকে যমলোকে প্রেরণ করলেন। রথহীন হয়ে শ্রুতর্বা যখন ঢাল ও তলোয়ার হাতে
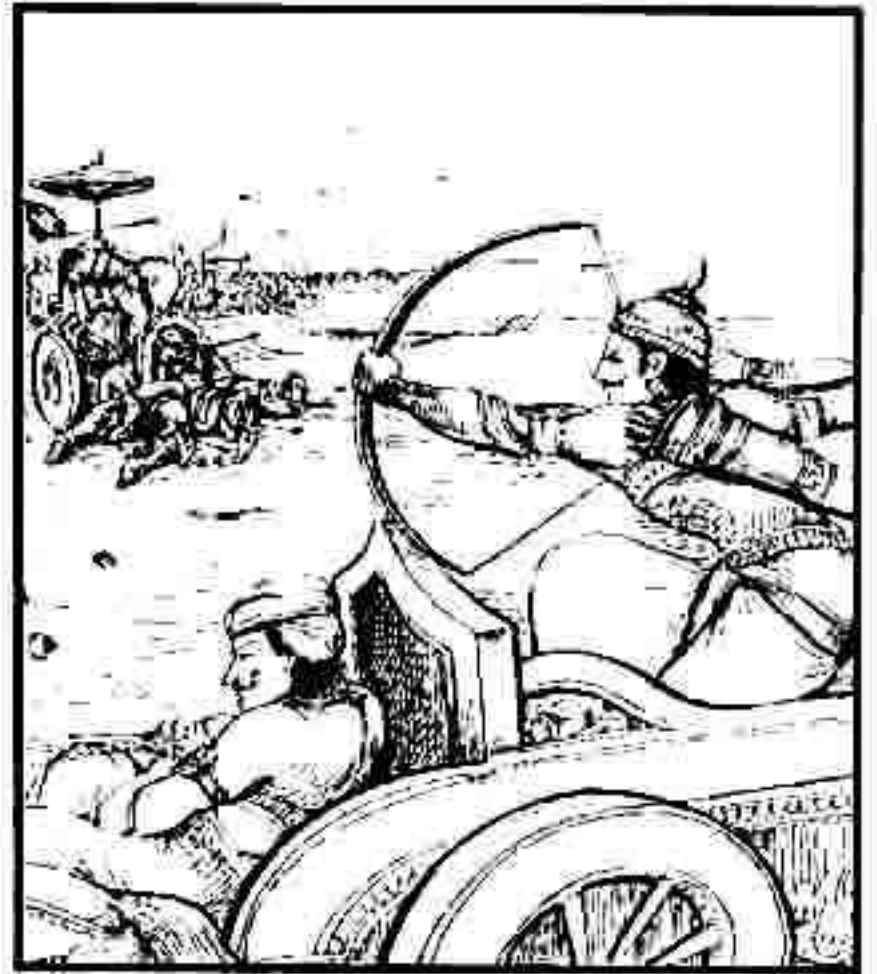
নিচ্ছিলেন, তখনই ভীম এক ক্ষুরপ্রের আঘাতে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত করে দিলেন। তিনি মারা যেতে আপনার সৈন্যরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে যুদ্ধ করার জন্য ভীমের দিকে ধাবিত হল। ভীমও তাদের সম্মুখীন হলেন, তারা তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল। ভীম তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে বর্মসজ্জিত পাঁচশত মহারথী বিনাশ করে সাত শত গজারোহী সৈন্য বধ করলেন। তারপর আট শত অশ্বারোহী এবং দশ হাজার পদাতিককে মৃত্যুর পারে পৌঁছে তিনি বিজয়শ্রীর দ্বারা সুশোভিত হলেন।

ভীমসেন যখন আপনার পুত্রদের বধ করছিলেন, সেই সময় আপনার সৈনিকরা তাঁর দিকে তাকাতেও সাহস পাচ্ছিল না। ভীমসেন সমস্ত কৌরব এবং তাদের অনুগামীদের মেরে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন ; তারপর বিকট গর্জন করে সমস্ত বলশালী গজরাজকে ভয় পাইয়ে দিলেন। সেই যুদ্ধে যেসব যোদ্ধা বেঁচে ছিল, তাদেরও মনোবল ভেঙে গিয়েছিল।

মহারাজ ! দুর্যোধন এবং সুদর্শন—আপনার এই দুই পুত্রই শুধু বেঁচে ছিলেন। তাঁরা অশ্বারোহী সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করছিলেন। দুর্যোধনকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখে
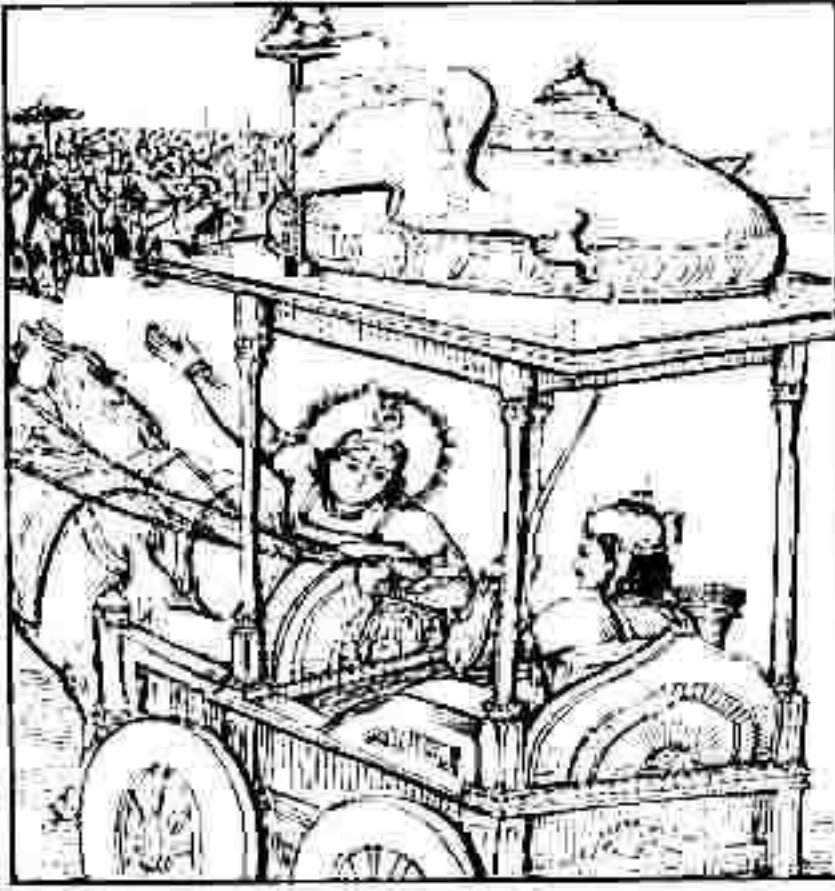
দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন! শত্রুদের অধিকাংশ যোদ্ধা নিহত হয়েছে। দেখ, সাত্যকি সঞ্জয়কে বন্দি করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। অন্য দিকে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থামা—এই তিনজন রাজা দুর্যোধনকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে যুদ্ধে রত রয়েছেন। আর একদিকে প্রভদ্রকদের সেনা সংহার করে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দিব্যকান্তিতে শোভা পাচ্ছেন। আর ওই যে দুর্যোধন! সেনাব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন! কৌরব পক্ষের যোদ্ধারা তোমাকে আসতে দেখে পালিয়ে না যায়, তার আগেই দুর্যোধনকে বধ করো। ওদের সেনা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, সুতরাং এখন আক্রমণ করলে এই পাপী পালাতে পারবে না।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন বললেন—'মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের সব পুত্রই ভীমসেনের হাতে নিহত হয়েছে। এই দুজন, যারা এখনও জীবিত আছে, এরাও বেঁচে থাকবে না। শকুনির সৈন্যদলে এখনও পাঁচশো অশ্বারোহী, দুশো রথী, একশোর কিছু বেশি হাতি এবং তিন হাজার পদাতিক অবশিষ্ট আছে। দুর্যোধনের সেনার মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ত্রিগর্তরাজ, উলূক, শকুনি, কৃতবর্মা প্রমুখ কয়েকজন মাত্রই যোদ্ধা বেঁচে আছেন, বাকি সব মারা গেছে। এখন এঁদেরও শেষ সময় এসেছে। আজ যে আমার সামনে আসবে, সে দেবতা হলেও, তাকে বধ করব। সমস্ত বিবাদ আজ সমাপ্ত হবে। দুর্যোধনও যদি পালিয়ে না যায়, তাহলে সে তার রাজলক্ষ্মী এবং প্রাণ, দুই-ই হারাবে। আপনি রথ চালান, আমি এখনই সকলকে বধ করব।'

অর্জুনের কথায় ভগবান দুর্যোধনের সেনাদের দিকে ঘোড়া চালালেন, ভীমসেন এবং সহদেবও সঙ্গে চললেন। তিন মহারথী দুর্যোধনকে বধ করার জন্য সিংহনাদ করে এগোলেন। তখন আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সম্মুখীন হলেন। সুশর্মা ও শকুনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন ঘোড়ায় চড়ে সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি অতি ক্ষিপ্রতা সহকারে সহদেবের মাথায় এক প্রাসের দ্বারা আঘাত করলেন। সহদেব সেই আঘাতে মূর্ছিত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, সমস্ত শরীর রক্তাপ্লুত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দুর্যোধনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

অন্যদিকে অর্জুন অশ্বারূঢ় যোদ্ধাদের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। তিনি বাণের দ্বারা সমস্ত সেনা সংহার করলেন। তারপর ত্রিগর্ত সেনাদের আক্রমণ করলেন। তাঁকে আসতে দেখে সমস্ত ত্রিগর্ত মহারথী একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অর্জুন সত্যকর্মাকে এক ক্ষুরপ্র দ্বারা আঘাত করে তার রথের দণ্ড কেটে দিলেন, পরে আর একটি ক্ষুরপ্রতে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। তারপর তিনি সব যোদ্ধার সামনেই সত্যেষুকে ধরে এনে বধ করলেন, এরপর প্রস্থল দেশের অধিপতি সুশর্মাকে তিন বাণে বিদ্ধ করে সেখানে উপস্থিত সমস্ত রথীদের তাঁর বাণের নিশানা করলেন। পরে সুশর্মার

ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করে হাসতে হাসতে যমদণ্ডের ন্যায় এক ভয়ংকর বাণে তাঁর বক্ষ ছেদ করলেন। সুশর্মা প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সুশর্মার মৃত্যু হলে অর্জুন তাঁর পঁয়ত্রিশজন পুত্রকেও পিতার অনুগামী করলেন। তারপর তাঁর সমস্ত অনুগামীদের যমালয়ে পাঠিয়ে তিনি অবশিষ্ট জীবিত কৌরব সেনা মধ্যে প্রবেশ করলেন।

অন্য দিকে ভীমসেন হাসতে হাসতে বাণবর্ষণ করে সুদর্শনকে আচ্ছাদিত করলেন। আঘাত করতে করতে তিনি এক তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রের সাহায্যে সুদর্শনের মাথা দেহচ্যুত করে দিলেন। তাই দেখে তাঁর অনুচরেরা ভীমকে চারদিক দিয়ে ঘিরে বাণবর্ষণ করতে লাগল।

ভীমসেন তখন তেজপূর্ণ বাণে তাদের চারদিক আচ্ছাদিত করে অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের সকলকে সংহার করলেন। তখন দু-দলের যোদ্ধাদের মধ্যে কোনো তফাৎ দেখা যাচ্ছিল না, উভয় সেনা মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল।

—o—

শকুনি এবং উলূক বধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! পুনরায় যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল, শকুনি সেই সময় সহদেবকে আক্রমণ করেন। সহদেবও সুবলপুত্রের ওপর বাণবর্ষণ করতে থাকেন। শকুনির সঙ্গে তাঁর পুত্র উলূকও ছিলেন ; তিনি ভীমসেনকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। সেই সঙ্গে শকুনিও ভীমসেনকে বিদ্ধ করে সহদেবের ওপরও বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুপক্ষের যোদ্ধাদের বাণবর্ষণে সমস্ত দিক আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। ভীম ও সহদেব দুজনেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ংকরভাবে শত্রু-সংহার করছিলেন। তাঁদের শতশত বাণে আচ্ছাদিত হয়ে আপনার সেনারা অন্ধকারপূর্ণ আকাশের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল।

এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে যখন কৌরবদের অতি অল্প সেনা বেঁচে রইল তখন পাণ্ডব যোদ্ধারা হর্ষান্বিত হয়ে উৎসাহের সঙ্গে তাদের শেষ করতে উদ্যত হল। এই সময় শকুনি সহদেবের মাথায় প্রাসের আঘাত করলে সহদেব অচেতন প্রায় অবস্থায় রথের মধ্যে বসে পড়লেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে প্রতাপশালী ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনির সেনাদের গতিরোধ করলেন এবং নারাচের আঘাতে শত শত যোদ্ধা সংহার করলেন। তারপর তিনি সিংহগর্জন করলেন। সেই আওয়াজে হাতি, ঘোড়াসহ সৈনিকরা কেঁপে উঠল। তারা ভয়ে পালাতে শুরু করল। তাদের পালাতে দেখে দুর্যোধন বললেন—'আরে, পাপীগণ! ফিরে এসো, পলায়ন করে কী লাভ? যেসব বীর যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে প্রাণত্যাগ করে, তারা জগতে কীর্তিস্থাপন করে এবং পরলোকে উত্তম সুখ ভোগ করে।'

তাঁর কথা শুনে শকুনির সৈনিকরা মৃত্যুভয় না করে পুনরায় পাণ্ডবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাণ্ডব যোদ্ধারাও যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এল। তার মধ্যে সহদেব সুস্থ হয়ে শকুনিকে বাণে বিদ্ধ করলেন, তাঁর ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করে শকুনির ধনুকও কেটে ফেললেন। তখন শকুনি অন্য ধনুক নিয়ে সহদেব এবং ভীমের প্রতি অজস্র বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। উলূকও শকুনির মতো ভীম ও সহদেবকে সত্তর বাণে ঘায়েল করলেন। তখন ভীম তাঁর তেজপূর্ণ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করে শকুনিকে চৌষট্টি বাণ মেরে তাঁর পার্শ্বরক্ষকদেরও বাণের নিশানা করলেন।

ভীমের নারাচে আহত যোদ্ধারা ক্রুদ্ধ হয়ে সহদেবের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। তখন সহদেব এক ভল্লের আঘাতে তাঁর সামনে দাঁড়ানো উলূকের মাথা কেটে দিলেন। তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পুত্রের মৃত্যু দেখে শকুনির মহাত্মা বিদুরের কথা স্মরণ হল। তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল, অশ্রুপূর্ণ চোখে চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর তিনি সহদেবের সামনে গিয়ে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সহদেব সেই বাণগুলি কেটে ফেলে শকুনির ধনুক টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন শকুনি সহদেবকে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করলেন, কিন্তু সহদেব হাসতে হাসতে সেই তলোয়ারও দুটুকরো করে দিলেন। শকুনি তখন গদাঘাত করলেন, কিন্তু সেটি গিয়ে মাটিতে পড়ল। শকুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এক ভয়ংকর শক্তি সহদেবের ওপর প্রয়োগ করলেন ; কিন্তু সহদেব বাণের আঘাতে সেটি তিন টুকরো করে দিলেন।

এইভাবে সেই শক্তিও নষ্ট হয়ে গেলে শকুনি খুবই ভীত হলেন এবং আপনার সৈনিকদের মধ্যেও আতঙ্ক সঞ্চারিত

হল। তারা সকলেই শকুনির সঙ্গে পালাতে লাগল। সেইসময় পাণ্ডবরা জোরে জোরে সিংহনাদ করতে লাগলেন। প্রায় সব কৌরব যোদ্ধাই রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। শকুনিকে পালাতে দেখে সহদেব ভাবলেন—'এ আমার ভাগ, একে বধ করতে হবে।' এই চিন্তা করে নিজের মহান ধনুকে টংকার তুলে তিনি শকুনির পশ্চাদ্ধাবন করে বাণের আঘাতে তাঁকে ঘায়েল করে বললেন—'মূর্খ শকুনি ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থিত হয়ে যুদ্ধ করো, পরাক্রম দেখিয়ে পৌরুষের পরিচয় দাও। সেইদিন সভায় পাশাখেলার সময় তো উল্লাসে মগ্ন হয়েছিলে, আজ তার ফল দেখো ! যে সব দুরাত্মা আমাদের উপহাস করেছিল, আজ তারা সব নিহত হয়েছে। শুধু কুলাঙ্গার দুর্যোধন এবং তার মাতুল, তুমি বেঁচে আছ। আমি অবশ্যই তোমার শিরশ্ছেদ করব।'

এই বলে সহদেব শকুনি ও ঘোড়াদের বাণবিদ্ধ করলেন, তারপর তাঁর ছত্র, ধ্বজা, ধনুক কেটে সিংহ গর্জন করলেন এবং বহু বাণের আঘাতে তাঁর মর্মস্থল বিদ্ধ করলেন। শকুনি এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সহদেবকে বধ করবার জন্য দুহাতে প্রাস নিয়ে আক্রমণ করলেন। সহদেব শকুনির প্রাস এবং হাত দুটিকে তিন ভল্লের আঘাতে একসঙ্গে কেটে ফেললেন। তারপর খুব সাবধানে এক মজবুত লোহার ভল্ল ধনুকে লাগিয়ে শকুনির মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। তাঁর মস্তক ও প্রাণহীন দেহ মাটিতে গিয়ে পড়ল।

শকুনির এই অবস্থা দেখে আপনার যোদ্ধারা ভীত হয়ে নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নানা দিকে পালিয়ে গেল।

গাণ্ডীবের টংকার শুনে তারা অর্ধমৃত হয়ে গিয়েছিল, কারো রথ ভেঙে গেল, কারো ঘোড়া মরে গেল, কারো হাতি মৃত্যুমুখে পড়েছিল। শকুনির মৃত্যু হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণসহ সমস্ত পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁরা যোদ্ধাদের হর্ষ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। সকলেই সহদেবের এই কাজের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, 'বীরবর ! তুমি যে এই কপট এবং দুরাত্মা শকুনিকে পুত্রসহ বধ করেছ, তা যথার্থই বীরোচিত।'

দুর্যোধনের সরোবরে প্রবেশ এবং যুযুৎসুর হস্তিনাপুর গমন

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! শকুনির মৃত্যুতে তাঁর অনুচররা তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পাণ্ডবদের চার দিক দিয়ে ঘিরে ধরল। অর্জুন এবং ভীমসেন তাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। তারা শক্তি, ঋষ্টি এবং প্রাস হাতে নিয়ে সহদেবকে বধ করার জন্য আসছিল, কিন্তু অর্জুন গাণ্ডীবের সাহায্যে তাদের সেই সংকল্প ব্যর্থ করলেন। তিনি ভল্লের আঘাতে তাদের অস্ত্রসহ বাহু এবং মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন এবং তাদের ঘোড়াগুলিকেও বধ করলেন।

সেনাদের এইভাবে নিহত হতে দেখে রাজা দুর্যোধনের তীব্র ক্রোধ হল। তিনি অবশিষ্ট সেনাদের একত্র করলেন, তাদের মধ্যে একশত রথী আর বাকি কিছু গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক ছিল। সকলে একত্রিত হলে দুর্যোধন তাদের বললেন—'বীরগণ ! তোমরা মিলিতভাবে পাণ্ডবদের বধ করো, সেইসঙ্গে সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকেও সংহার করো, তারপর আমার কাছে ফিরে এসো।'

দুর্যোধনের আদেশ শিরোধার্য করে সেই রণোন্মত্ত

বীরেরা পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হল। তাদের আসতে দেখে পাণ্ডবরাও বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাণ্ডবদের হাতে ওই সেনারা নিহত হল, তাদের কোনো রক্ষাকর্তা ছিল না। এদের মধ্যে একজন সৈন্যও বেঁচে থাকল না।

মহারাজ ! আপনার পুত্র একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্রিত করেছিলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়া তাদের সব শেষ করে দিয়েছিল। আপনার পক্ষে যাঁরা যুদ্ধ করছিলেন সেই হাজার হাজার রাজার মধ্যে দুর্যোধনকেই একমাত্র বেঁচে থাকতে দেখা গেল, তিনিও অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন। চার

দিকে যখন তাকিয়ে দেখলেন তখন তাঁর কাছে সব শূন্য বলে মনে হচ্ছিল। দুর্যোধন দেখলেন তিনি একা, কোনো যোদ্ধা সঙ্গে নেই এবং পাণ্ডবরা সকলেই প্রসন্ন ও সফল মনোরথ। তখন তাঁর বড় দুঃখ হল। তাঁর রথও নেই, ঘোড়াও নেই। দুর্যোধন তখন পালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! আমার সব সৈনিক নিহত হওয়ায় শিবির শূন্য হয়ে গেলে পাণ্ডবদের কত সৈন্য বেঁচে ছিল ? একাকী আমার মূর্খ পুত্র দুর্যোধন তখন কী করল ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! পাণ্ডবদের কাছে সেইসময় দু হাজার রথী, সাতশো গজারোহী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং দশ হাজার পদাতিক ছিল। রাজা দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো সাহায্যকারীকে না দেখে, নিজের মৃত ঘোড়াগুলিকে সেখানেই ফেলে পদব্রজে পূর্ব দিকে এগোলেন। যে দুর্যোধন এগারো অক্ষৌহিণী সেনার প্রভু ছিলেন, আজ তিনিই গদা হস্তে একাকী পদব্রজে সরোবরের দিকে পালাচ্ছিলেন। পথে যেতে যেতে মহাত্মা বিদুরের বলা কথা তাঁর স্মরণ হল। তিনি ভাবলেন—'আহা, এই যে মহাসমরে এত ক্ষত্রিয় সংহার হল, মহা বুদ্ধিমান বিদুর তা আগেই জেনেছিলেন।' এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি সরোবরে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে চললেন। তখন তাঁর হৃদয় সমস্ত সেনাদের মৃত্যুর জন্য শোকগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

রাজন্ ! দুর্যোধনের সেনার মধ্যে কয়েক লক্ষ বীর ছিলেন, কিন্তু সেই সময় অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য ব্যতীত আর কাউকেই জীবিত দেখা যাচ্ছিল না। আমাকে বন্দি দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন হেসে সাত্যকিকে বললেন—'একে বন্দি করে কী লাভ ? একে জীবিত রেখেও তো আমাদের কোনো লাভ নেই।' তাঁর কথা শুনে সাত্যকি আমাকে বধ

করার জন্য তলোয়ার তুললেন ; কিন্তু বেদব্যাস হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন—'সঞ্জয়কে জীবিত ছেড়ে দাও, একে বধ কোরো না।'

ব্যাসদেবের কথা শুনে সাত্যকি আমাকে বললেন—'সঞ্জয় ! যাও, নিজের কল্যাণ সাধন করো।' তাঁর আদেশ পেয়ে সন্নাহ খুলে আমি ওখান থেকে হস্তিনাপুরের জন্য রওনা হলাম। সেই সময় আমার কাছে কোনো বর্ম বা

অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। চলতে চলতে যখন এক ক্রোশ চলে এলাম, তখন দেখলাম দুর্যোধন একাকী গদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সমগ্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত। আমাকে দেখে তাঁর চোখে জল ভরে এল, তিনি ভালোভাবে আমার দিকে তাকাতে পারলেন না। আমিও তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে গভীর দুঃখ পেলাম। কিছুক্ষণ আমিও কোনো কথা বলতে পারলাম না।

তারপর আমি তাঁকে আমার বন্দি হওয়ার এবং ব্যাসদেবের কৃপায় মুক্তিলাভের সংবাদ জানালাম। শুনে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর তাঁর ভাই ও সেনাদের অবস্থা জানতে চাইলেন। আমি যা কিছু

স্বচক্ষে দেখেছিলাম, সব তাঁকে জানালাম এবং বললাম— 'রাজন্ ! আপনার ভাইয়েরা মারা গেছেন এবং সমস্ত সেনা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। রণভূমি থেকে যাওয়ার সময় ব্যাসদেব আমাকে জানিয়েছেন যে আপনার পক্ষে মাত্র তিনজন মহারথী জীবিত আছেন।'

তা শুনে দুর্যোধন বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজকে গিয়ে বল যে 'আপনার পুত্র দুর্যোধন এই মহাসংগ্রামে জীবিত আছে, সে জলপূর্ণ সরোবরে শুয়ে আছে এবং খুবই আহত।' এই বলে তিনি সেই সরোবরে প্রবেশ করে মায়া দ্বারা জলের প্রবেশ রোধ করলেন। তারপর কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল ; তাঁদের ঘোড়াগুলি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল। আমার কাছে এসে তাঁরা বললেন – 'সঞ্জয় ! সৌভাগ্যের কথা যে তুমি বেঁচে আছ।' তারপর আপনার পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! আমাদের রাজা দুর্যোধন কী জীবিত আছেন ?'

আমি তাঁদের দুর্যোধনের কুশল সংবাদ জানালাম এবং

দুর্যোধন আমাকে যে সংবাদ দিয়েছিলেন, তা শুনিয়ে, যে সরোবরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সেটিও দেখালাম।

আমার কথা শুনে সেই মহারথীরা কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে বিলাপ করলেন, তারপরে পাণ্ডবদের রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তাঁরা আমাকেও কৃপাচার্যের রথে তুলে নিলেন। সকলে শিবিরে ফিরে এলেন। সূর্যাস্তের সময় হয়েছিল, শিবিরের প্রহরী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল ; আপনার পুত্রদের মৃত্যুসংবাদ শুনে সকলে একসঙ্গে কেঁদে উঠল। তারপর নারীদের রক্ষায় নিযুক্ত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ রাজরানিদের সঙ্গে করে নগরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। হতভাগিনী রানিগণ পতিদের মৃত্যুর খবর শুনে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁদের ক্রন্দনে চতুর্দিক ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

রাজমন্ত্রী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, তাঁর গলা ধরে এল ; তিনি রানিদের নিয়ে নগরের দিকে রওনা হলেন, সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু সিপাহী ছিল। রাজপ্রাসাদে থাকার সময় যেসব রানিদের সূর্যও দেখতে পেত না, তাঁদের আজ নগরে প্রবেশ করার সময় সাধারণ লোকেরাও দেখতে লাগল। সেই সময় ভীমসেনের ভয়ে গোপালক ও

মেষপালকগণও নগরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সেই ছুটোছুটির সময় যুযুৎসু শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে পেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'ভয়ংকর পরাক্রমশালী পাণ্ডবরা একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার প্রভু রাজা দুর্যোধনকে পরাস্ত করে দিয়েছেন, তাঁর সব ভাইদের বধ করেছেন এবং ভীষ্ম দ্রোণের মতো কৌরব বীররাও প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ভাগ্যবশত আমি বেঁচে গিয়েছি। দুর্যোধনের মন্ত্রীরা রানিদের নিয়ে নগরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছেন। এখন আমারও উচিত যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে জিজ্ঞাসা করে ওঁদের সঙ্গে নগরে ফিরে যাওয়া।' এই কথা ভেবে তিনি যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, যুযুৎসুর কথা শুনে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

যুযুৎসু তখন রথে আরোহণ করে অত্যন্ত বেগে ঘোড়া চালিয়ে রানিদের সঙ্গে নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। তখন সূর্যাস্ত হচ্ছিল। নগরে পৌঁছে তাঁর গলা ধরে এল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সেই সময় তাঁর সঙ্গে বিদুরের সাক্ষাৎ হল, তাঁকে দেখেই বিদুরের অশ্রু প্রবাহিত হল। তিনি বিনীতভাবে যুযুৎসুকে বললেন —'পুত্র ! কুরুবংশের সকলে মারা গেলেও তুমি যে জীবিত আছ —এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির নগরে প্রবেশ করার আগেই তুমি কীকরে এলে ? তা আমাকে বিস্তারিতভাবে

বলো।'

যুযুৎসু বললেন—'তাত ! নিজ বংশ, ভাই ও পুত্রসহ যখন মাতুল শকুনি বিনাশপ্রাপ্ত হলেন, তখন রাজা দুর্যোধন অরক্ষিত হয়ে পড়ায় তাঁর হৃত ঘোড়াগুলিকে সেখানেই পরিত্যাগ করে ভয়ে পূর্বদিকে পালিয়ে যান। তিনি চলে যেতেই শিবিরের সকলে ভয়ে পালাতে শুরু করে। নারীদের রক্ষকরাও রাজা এবং তাঁর ভাইয়ের রানিদের শিবিকায় বসিয়ে পালিয়ে আসে। আমিও তখন রাজা যুধিষ্ঠির এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে এদের

রক্ষার্থে হস্তিনাপুর ফিরে আসি।'

যুযুৎসুর কথা শুনে বিদুর ভাবলেন, 'এই অবস্থায় যা করা উচিত ছিল, যুযুৎসু তাই করেছে।' তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রশংসা করে বললেন—'পুত্র! তুমি ঠিকই করেছ, দয়ালু হওয়ায় তুমি তোমার কুলধর্ম রক্ষা করেছ। এই ভয়ানক সংগ্রামের থেকে তুমি কুশলে ফিরেছ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। অন্ধ পিতার তুমিই সাহায্যকারী লাঠি। বিপদমগ্ন, দুঃখগ্রস্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র তুমি জীবিত আছ। আজ এখানে বিশ্রাম করো, কাল প্রভাতে যুধিষ্ঠিরের কাছে চলে যেয়ো।'

এই বলে বিদুর অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি যুযুৎসুকে নিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করলেন। তখন সেখানে নগরের নানা প্রান্তের লোক এসে দুঃখ ও শোকে আকুল হয়ে বিলাপ করছিল। রাজভবন আনন্দশূন্য ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল, রাজভবনের এই করুণ অবস্থা দেখে বিদুর অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি আবেগে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে সেখান থেকে নগরে ফিরে গেলেন। যুযুৎসু সেই রাত নিজ গৃহে অতিবাহিত করলেন।

ব্যাধদের দ্বারা দুর্যোধনের সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের সরোবরে গমন এবং কৃপাচার্য ও অন্যান্যদের দূরে সরে যাওয়া

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয়! পাণ্ডবরা রণভূমিতে যখন আমাদের সমস্ত সেনা সংহার করল, সেই সময় জীবিত মহারথী কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা কী করলেন? মূর্খ দুর্যোধন কী করল?'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! রাজধানীরা যখন নগরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং শিবিরের অন্য লোকেরাও পলায়ন করল তখন সমস্ত শিবির জনশূন্য দেখে এই তিন মহারথী তাপাক্রান্ত হৃদয়ে সরোবরের দিকে রওনা হলেন।

অন্যদিকে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধনকে বধ করার জন্য এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাঁর খোঁজ পেলেন না। তাঁদের বাহন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই তাঁরা সকলে নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

তারপর কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা সেই সরোবরে গেলেন, যেখানে দুর্যোধন বিশ্রাম করছিলেন। তাঁরা সেখানে দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্! ওঠো, আমাদের সঙ্গে চলো, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। হয় বিজয়ী হয়ে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করো নতুবা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গপ্রাপ্ত হও। পাণ্ডবদেরও সমস্ত সেনা তুমি সংহার করেছ, সামান্য যা বেঁচে আছে, তারাও অত্যন্ত আহত। এখন তোমার আক্রমণ তারা সহ্য করতে পারবে না। আমরা সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করব। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।'

দুর্যোধন বললেন—'এত নরসংহারের পরেও আপনারা জীবিত ফিরে এসেছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমরা নিশ্চয়ই শত্রুদের পরাস্ত করতে পারব; কিন্তু এখন আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমাদের ক্লান্তি দূর করে নিই, তারপরেই আমরা যুদ্ধ জিততে পারব। আপনারাও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং আমিও অত্যন্ত আহত। অন্য দিকে পাণ্ডবদের বল এবং উৎসাহবৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এখন ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছে আমার নেই। আজ এক রাত্রি বিশ্রাম করে কাল আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

সঞ্জয় বললেন—দুর্যোধনের কথা শুনে অশ্বত্থামা বললেন—'রাজন্! তোমার কল্যাণ হোক। ওঠো, আমরা অবশ্যই শত্রুদের পরাজিত করব। আমি যাগযজ্ঞ, দান, সত্য, জপ প্রভৃতির শপথ করে বলছি, আজ আমি সোমকদের অবশ্যই বধ করব। আজ রাত্রেই যদি আমি শত্রু সংহার না করি তাহলে সৎপুরুষের প্রাপ্ত যজ্ঞের ফল যেন আমি না পাই।'

তাঁরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছিলেন, সেই সময় মাংসের বোঝা নিয়ে পরিশ্রান্ত কয়েকজন ব্যাধ জলপান করার জন্য অকস্মাৎ সেই সরোবরে এল। তাদের

ভীমসেনের ওপর খুব শ্রদ্ধা ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে ব্যাধেরা তাঁদের একান্ত-বার্তালাপ শুনে ফেলল। তারা দুর্যোধনের কথাও শুনেছিল। সব দেখেশুনে তারা বুঝে গেল যে 'রাজা দুর্যোধন জলের মধ্যে লুকিয়ে আছেন, তাঁর যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নেই। তবুও এই মহারথীগণ তাঁকে যুদ্ধে প্ররোচিত করছেন।'

তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল—'আরে, এতো বোঝাই যাচ্ছে যে দুর্যোধন সরোবরের জলে

লুকিয়ে আছেন। সুতরাং ভীমসেনকে গিয়ে বলা উচিত যে দুর্যোধন জলের মধ্যে রয়েছেন। তাহলে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন এবং আমাদের পুরস্কার দেবেন। এই শুষ্ক মাংস বহন করে বৃথা কষ্ট পেয়ে কী লাভ ?'

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা খুব আনন্দিত হল, তাদের খুব অর্থের লোভ ছিল। মাংসের বোঝা মাথায় নিয়ে তারা শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পাণ্ডবরাও দুর্যোধনকে খুঁজে বার করার জন্য চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু সকলেই ফিরে এসে জানাল যে 'তিনি কোথায় পালিয়ে গেছেন, কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।' দূতের কথায় রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন।

দুর্যোধনের খবর না পেয়ে পাণ্ডবরা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়েছিলেন। তার মধ্যে ব্যাধেরা সেখানে এল। তারা

ভীমসেনের কাছে গিয়ে যা দেখেছিল ও শুনেছিল, সে সব জানিয়ে দিল। ভীমসেন তাদের প্রভূত অর্থ দিয়ে বিদায় করে ধর্মরাজের কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ! আপনি যার জন্য চিন্তা করছিলেন, সেই দুর্যোধনের খবর ব্যাধেরা দিয়ে গেছে। সে মায়া দ্বারা জলের গতি রোধ করে দ্বৈপায়ন সরোবরের মধ্যে বিশ্রাম করছে।' এই আনন্দ সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠিরাদি সকল ভ্রাতাই খুব খুশি হলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সকলে সরোবরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক ক্ষত্রিয়েরা ও ছিলেন। তাঁদের রথের ঘর্ঘরধ্বনি বহু দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। সেই সময়

অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্র ও বাকি পাঞ্চাল যোদ্ধা, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং শত শত পদাতিক যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন সকলের সঙ্গে সেই ভয়ংকর দ্বৈপায়ন সরোবরের কাছে, যেখানে দুর্যোধন লুকিয়ে ছিলেন, সেখানে পৌঁছলেন।

যুধিষ্ঠিরের সেনারা যখন রওনা হয়েছিল, তখন তাদের মহা কোলাহল শুনে কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! বিজয়োল্লাসে ভরপুর হয়ে পাণ্ডবরা এদিকেই আসছে, আপনি অনুমতি দিলে আমরা কিছুক্ষণের জন্য সরে যাই।' তাঁদের কথা শুনে দুর্যোধন বললেন—'আচ্ছা, আপনারা এখন আসুন।' বলে তিনি জলের মধ্যে ঢুকে গেলেন এবং মায়াদ্বারা জলের গতি রোধ করে দিলেন। কৃপাচার্য প্রমুখ মহারথীগণ রাজার অনুমতি নিয়ে শোকমগ্ন হয়ে সেখান থেকে দূরে সরে গেলেন। পথে তাঁরা এক বটবৃক্ষ দেখে তার নীচে গিয়ে বসলেন, সেইসময় তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন। বটবৃক্ষের নীচে বসে তাঁরা রাজা দুর্যোধনের বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। এখন

কীভাবে যুদ্ধ করা হবে ? রাজা দুর্যোধনের কী দশা হবে ? পাণ্ডবরা কীকরে দুর্যোধনের খোঁজ পাবে ? রথের ঘোড়া খুলে দিয়ে তাঁরা সকলে সেখানে বসে এইসব ভাবতে লাগলেন।

—:○:—

যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের কথোপকথন, যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে দুর্যোধনের কোনো একজন পাণ্ডবের সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রস্তুত হওয়া

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সরোবরে পৌঁছে যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মাধব ! দেখুন, দুর্যোধন জলের মধ্যে কেমন মায়া প্রয়োগ করেছে, সে জলকে আটকে রেখে এখানে বিশ্রাম করছে। সে মায়া সৃষ্টি করতে অত্যন্ত নিপুণ। কিন্তু স্বয়ং ইন্দ্রও যদি তাকে সাহায্য করার জন্য আসেন, তা হলেও জগৎ দুর্যোধনকে মৃতই দেখতে পাবে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ভারত ! মায়াবীর এই মায়া আপনি মায়ার সাহায্যেই নষ্ট করে ফেলুন ; আপনিও জলে মায়া প্রয়োগ করে ওকে বধ করুন। রাজন্ ! চেষ্টাই সবথেকে বেশি শক্তিশালী, আর কিছু নয়। চেষ্টা এবং উপায়ের দ্বারাই বড় বড় দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ; সুতরাং আপনিও চেষ্টা করুন।'

ভগবানের কথা শুনে যুধিষ্ঠির সহাস্যে জলে লুকিয়ে থাকা আপনার পুত্রকে বললেন—'সুযোধন ! তুমি জলের মধ্যে এই অনুষ্ঠান কী জন্য আরম্ভ করেছ ? সমস্ত ক্ষত্রিয় এবং নিজ কুলের সংহার করিয়ে এখন নিজের জীবন রক্ষার জন্য জলে লুকিয়ে আছ ? তোমার সেই দর্প ও অহংকার কোথায় গেল, এখানে এসে ভয়ে লুকিয়ে রয়েছ কেন ? রাজসভায় তোমাকে সকলে বীর বলতো, কিন্তু তুমি যখন জলের মধ্যে ঢুকে রয়েছ, তোমার সেই শৌর্য ব্যর্থ বলেই মনে করি। যে ব্যক্তি কৌরব বংশে জন্ম নেওয়ার জন্য গর্ব প্রকাশ করত, সে-ই যুদ্ধের ভয়ে জলের মধ্যে কীকরে লুকিয়ে আছে ? এই যুদ্ধে পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয়, সম্বন্ধী, মিত্র, মাতুল সকলকে হত্যা করিয়ে এখন তুমি সরোবরে এসে লুকিয়ে রয়েছ ? তোমার পৌরুষ কোথায়

গেল, কোথায় গেল তোমার অহংকার এবং বজ্রের ন্যায় গর্জন ? তুমি তো মস্ত বড় অস্ত্রবিদ, কোথায় গেল সেই সমস্ত জ্ঞান ? এখন সরোবরে কী করে নিদ্রা যাচ্ছ ? ভারত ! ওঠো, ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমাদের পরাস্ত করে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করো অথবা আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে চিরকালের মতো রণভূমিতে নিদ্রা যাও।'

ধর্মরাজের কথা শুনে আপনার পুত্র জলের মধ্যে থেকেই উত্তর দিল—'মহারাজ ! কোনো প্রাণীর ভয়

পাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু আমি কারোর ভয়ে এখানে আসিনি। আমার কাছে রথ এবং অস্ত্র কিছুই নেই। পার্শ্বরক্ষক এবং সারথিও মৃত। সমস্ত সেনা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, আমি একা ; সেইজন্য আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলাম। রাজন্ ! আমি প্রাণ রক্ষার তাগিদে অথবা কোনো ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বা মনের দুঃখে এই জলের মধ্যে আসিনি ; অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ার জন্যই এখানে এসেছি। তুমিও আমার মতো একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপরে উঠে আবার উভয়ে যুদ্ধ করব।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সুযোধন ! আমরা সকলে বিশ্রাম করে নিয়েছি এবং বহুক্ষণ ধরে তোমার খোঁজ করছি, সুতরাং তুমি এখনই উঠে যুদ্ধ করো। যুদ্ধ করে সমস্ত পাণ্ডবদের বধ করে সমৃদ্ধিশালী হয়ে রাজ্য ভোগ করো অথবা আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে বীরের প্রাপ্য পুণ্যলোকে গমন করো।'

দুর্যোধন বললেন—'রাজন্ ! যাদের জন্য আমি রাজ্য পেতে চেয়েছিলাম, আমার সে সব ভ্রাতাগণ মৃত্যুবরণ করেছে। পৃথিবীর সব পুরুষরত্ন এবং ক্ষত্রিয়বীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে ; এখন এই পৃথিবী বিধবা নারীর ন্যায় শ্রীহীন হয়ে পড়েছে ; সুতরাং একে লাভ করার জন্য আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তবে এখনও পাণ্ডব এবং পাঞ্চালদের উৎসাহ ভঙ্গ করে তোমাকে পরাস্ত করার আশা রাখি। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়ায় আমার দৃষ্টিতে এই যুদ্ধের আর কোনো প্রয়োজন নেই। আজ থেকে এই সমগ্র পৃথিবী তোমার, আমি আর একে চাই না। আমার পক্ষের সমস্ত বীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে ; সুতরাং এই রাজ্যে আর আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি মৃগচর্ম ধারণ করে আজ থেকে বনবাস করব। আপন বলতে আজ আমার আর কেউ নেই, তাই আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। এখন তুমি যাও, যে পৃথিবীর সব রাজা মৃত, যোদ্ধারা সব বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, সেই পৃথিবীকে আনন্দপূর্বক উপভোগ করো ; কারণ তোমার জীবিকা (যুদ্ধ জয়) ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

যুধিষ্ঠির বললেন—রাজন্ ! তুমি জলে বসে প্রলাপ বোকো না, আমি এই পৃথিবী তোমার কাছ থেকে দান হিসাবে নিতে চাই না। আমি যুদ্ধে তোমাকে পরাস্ত করেই এটি উপভোগ করতে চাই। এখন তুমি আর এই পৃথিবীর রাজা নও, তাহলে তুমি কীকরে এটি দান করবে ? আমরা যখন ধর্মত নিজেদের বংশে শান্তিরক্ষা করতে চেয়েছিলাম, তখন তুমি কেন আমাদের রাজ্যভাগ দাওনি ? তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কঠিন জবাব দিয়েছিলে, আর এখন রাজ্য দিতে চাও ? একি উন্মাদের মতো কথা ! এখন তুমি কাউকে রাজ্য দিতেও পারো না, নিয়ে নিতেও পারো না, তাহলে দান করতে চাও কী করে ? আগে তো সূচাগ্র মেদিনীও দিতে রাজি ছিলে না আর এখন সমগ্র পৃথিবী দান করতে প্রস্তুত হয়ে গেছ ? ব্যাপার কী ? মনে আছে, তুমি আমাদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলে ? ভীমকে বিষপান করিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলে, বিষধর সাপের কামড় খাইয়েছিলে। শুধু তাই নয়, তুমি কপট জাল বিছিয়ে আমাদের সমগ্র রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে। তোমার আদেশেই দ্রৌপদীর কেশ ও বস্ত্র আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং তুমি নিজে দ্রৌপদীকে কু-কথা বলেছিলে। পাপী ! এই সব

কারণেই তোমার জীবন বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন ওঠো, যুদ্ধ করো, এতেই তোমার মঙ্গল।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্যোধন স্বভাবত ক্রোধী, যুধিষ্ঠির তাকে এইভাবে বলায় তার কী দশা হল ? রাজা হওয়ায় সে সকলের সম্মানের পাত্র, তাই তাকে কখনো এরূপ তিরস্কার শুনতে হয়নি। কিন্তু এদিন তাকে যুধিষ্ঠিরের কাছে তিরস্কার শুনতে হয়েছে, যে তার পরম শত্রু। সঞ্জয় ! বল এই সব কটু কথা শুনে দুর্যোধন কী জবাব দিল ?'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! জলের মধ্যে উপবিষ্ট দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা যখন এইভাবে অপমান করেন, তখন তাঁদের কটুবাক্য শুনে দুর্যোধন ক্রোধে হাত নাড়তে নাড়তে মনে মনে যুদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'তুমি তোমার সব ভ্রাতা এবং হিতৈষীদের সঙ্গে নিয়ে এসেছ, তোমার সঙ্গে রথ এবং অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, আর আমি একাকী। তুমি রথে বসবে আর আমি পথে দাঁড়িয়ে—এই অবস্থায় আমি কীকরে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব ? যুধিষ্ঠির ! তুমি তোমাদের পক্ষের এক একজন বীরের সঙ্গে এক একবার আমাকে যুদ্ধ করতে দাও। একজনের সঙ্গে বহু লোকের যুদ্ধ করা ঠিক নয়। রাজন্ ! আমি তোমাকে অথবা ভীমকে ভয় পাই না। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন অথবা পাঞ্চালদের জন্যও ভীত নই। নকুল, সহদেব অথবা সাত্যকিকে তো গ্রাহ্যই করি না, এরা ছাড়াও তোমার যেসব সৈন্য আছে, তাদেরও আমি পরোয়া করি না, আমি একাই সকলকে পরাস্ত করতে সক্ষম। আজ ভ্রাতাসহ তোমাকে বধ করে আমি বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা, শকুনি এবং আমার পুত্রগণ, মিত্রগণ, হিতৈষী, ভ্রাতা, বন্ধুবান্ধবের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাব।

এই বলে দুর্যোধন চুপ করলে যুধিষ্ঠির বললেন—'দুর্যোধন ! আমি জেনে খুশি হলাম যে তুমি এখনও যুদ্ধের কথা ভাবছ। তোমার যদি মনে হয় আমাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তবে তাই করো। তোমার যে কোনো পছন্দ মতো একটি অস্ত্র নিয়ে রণক্ষেত্রে এসো এবং একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করো। অন্য সকলে দর্শকরূপে থাকবে। তাছাড়া তোমার আর একটি কামনা পূর্ণ করব, আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করলে সমস্ত রাজ্য তুমি পেয়ে যাবে আর যদি তুমি নিহত হও, তাহলে অবশ্যই স্বর্গ পাবে।'

দুর্যোধন বললেন—'যদি একজনের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যে কোনো যোদ্ধাকে আমার সামনে পাঠিয়ে দাও। তোমার কথা অনুসারে আমি অস্ত্রের মধ্যে শুধু গদা পছন্দ করছি। তোমাদের মধ্যে একজন, যার আমাকে পরাস্ত করার ক্ষমতা আছে, গদা হাতে পদব্রজে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক। যুধিষ্ঠির ! আমি এই গদার আঘাতে তোমাকে, তোমার ভ্রাতাদের, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও তোমার অন্য সৈনিকদেরও পরাস্ত করতে সক্ষম। আমি তো ইন্দ্রকেও ভয় পাই না, তাহলে তোমাকে কীসের ভয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'গান্ধারীনন্দন ! ওঠো, এক-একজনের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করেই তোমার পৌরুষের পরিচয় দাও। এসো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, ইন্দ্রও যদি সাহায্য করেন তাহলেও তুমি আজ জীবিত থাকতে পারবে না।'

মহারাজ ! যুধিষ্ঠিরের কথা দুর্যোধন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি কাঁধে লৌহ গদা নিয়ে জলের ভেতর থেকে বাইরে এলেন। তখন সকলেই তাঁকে দণ্ডধারী যম বলে মনে করল। তাঁকে বার হতে দেখে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ প্রসন্ন হয়ে করতালি দিলেন।

দুর্যোধন সেই তালিকে উপহাস মনে করে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'পাণ্ডবগণ ! তোমরা এই উপহাসের ফল পাবে। তোমরা আমার হাতে নিহত হয়ে এই পাঞ্চালদের সঙ্গে শীঘ্রই যমলোকে পৌঁছাবে।'

এই বলে তিনি হাতে গদা নিয়ে দাঁড়ালে, পাণ্ডবরা তাঁকে ক্রুদ্ধ যমরাজের মতো মনে করতে লাগলেন। তিনি মেঘের ন্যায় গর্জন করে গদা দেখিয়ে সমস্ত পাণ্ডবদের যুদ্ধে আহ্বান করে বলতে লাগলেন—'যুধিষ্ঠির ! তোমরা একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসো ; কারণ একজন বীরের সঙ্গে বহুজনের যুদ্ধ ন্যায়সম্মত নয়। তোমরা যদি সকলেই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, তাহলেও আমি প্রস্তুত, কিন্তু সেই কাজ উচিত না অনুচিত, তা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দুর্যোধন ! যখন অনেক মহারথী মিলে একাকী অভিমন্যুকে বধ করেছিলে, তখন তোমার এই ন্যায়-অন্যায় বোধ কোথায় ছিল ? তোমার ধর্ম যদি এই কথা বলে যে বহু যোদ্ধা মিলে একজনকে বধ করবে না, তাহলে সেদিন তোমার পরামর্শে বহু মহারথী একত্রিত হয়ে অভিমন্যুকে কেন মেরেছিল ? সত্যই, নিজে সংকটগ্রস্ত

হলে প্রায় সকলেই ধর্মের দোহাই দেয় ! অতীত অতীতই, যেতে দাও, বর্ম পরো এবং তোমার অন্য আবশ্যকীয় বস্তু আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। তাছাড়া আগে যা বলেছি, সেই মতো তোমাকে আর একটি সুযোগ দিচ্ছি—তুমি পাঁচ পাণ্ডবের মধ্যে যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও একজনকে বেছে নাও। তাকে বধ করতে পারলে, রাজা তোমার হবে আর যদি মারা যাও তাহলে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি তো হবেই। তাছাড়া, বল তোমার জন্য আর কী করতে পারি। জীবন রক্ষা ছাড়া যা যা ইচ্ছা চেয়ে নাও।

সঞ্জয় বললেন—দুর্যোধন তখন সুবর্ণ বর্ম ও সুন্দর শিরস্ত্রাণ—এই দুটি জিনিস চেয়ে নিয়ে পরিধান করলেন। তারপর হাতে গদা নিয়ে বললেন—'রাজন্ ! তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোনো একজন এসে আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধ করুক। নকুল, সহদেব, ভীম, অর্জুন অথবা তুমি—যে কেউ হোক না কেন, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করব। আমার বিশ্বাস যে গদাযুদ্ধে আমার সমকক্ষ কেউ নেই, এই গদার সাহায্যে আমি তোমাদের সকলকে বধ করতে সক্ষম। যদি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ হয় তাহলে তোমাদের কেউই আমার সমকক্ষ নও। আমার এই গর্বিত

বাক্য বলা উচিত নয়, তবুও বলতে হচ্ছে। বলার প্রয়োজনই বা কী, তোমাদের সামনেই আমি সব সত্য প্রমাণ করে দেখাব। যে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, গদা নিয়ে আমার সামনে এসো।'

যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার, ভীমের প্রশংসা, ভীম ও দুর্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধ, বলরামের আগমন এবং তাঁকে স্বাগত জানানো

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! দুর্যোধন যখন এই বলে বারংবার গর্জন করছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! আপনি একি দুঃসাহস পূর্ণ কথা বললেন যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করেই রাজা হয়ে যাও। দুর্যোধন যদি অর্জুন, নকুল, সহদেব অথবা আপনাকে যুদ্ধের জন্য বেছে নেয়, তাহলে কী হবে ? আমি আপনাদের কারোরই মধ্যে তেমন শক্তি দেখছি না, যে গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের সম্মুখীন হতে পারে। সে ভীমকে বধ করার জন্য ভীমের লৌহমূর্তির সঙ্গে ত্রয়োদশ বৎসর ধরে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করছে। এখন দুর্যোধনের সামনে ভীমসেন ব্যতীত আর কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। আপনি আবার আগের মতোই পাশা খেলা শুরু করলেন। আপনার এই প্রস্তাব শকুনির কপট পাশার থেকেও ভয়ংকর। আমি জানি ভীমসেন বলবান এবং

সমর্থ, কিন্তু রাজা দুর্যোধন অনেক অভ্যাস করেছে। এক দিকে যদি বলবান ব্যক্তি হয় আর অন্যদিকে বেশি অভ্যাসকারী ব্যক্তি হয়, তাহলে দুজনের মধ্যে বেশি অভ্যাসকারীই জয়ী হয়। সুতরাং মহারাজ ! আপনি শত্রুকে সহজ রাস্তা দেখিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলেছেন আর আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে সব শত্রুকে জয় করার পর যখন একজন মাত্র বাকি এবং সে বিপদগ্রস্ত, নিজ হাতে আসা রাজ্য বাজি রেখে হেরে যায় এবং একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করার শর্ত রেখে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে ! ন্যায়সঙ্গতভাবে যুদ্ধ হলে ভীমেরও জয়লাভ সুনিশ্চিত নয়। কারণ দুর্যোধনের অভ্যাস তার থেকে অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও আপনি কথা দিলেন যে 'আমাদের যে কোনো একজনকে বধ করলেও তুমি রাজা হবে।'

একথা শুনে ভীমসেন বললেন—'মধুসূদন ! আপনি চিন্তা করবেন না। আজ আমি যুদ্ধে দুর্যোধনকে অবশ্যই পরাজিত করব। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তো নিশ্চিতভাবেই ধর্মরাজের জয় দেখতে পাচ্ছি। আমার গদা দুর্যোধনের গদার থেকে দেড়গুণ ভারী। আমি এর সাহায্যে দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস রাখি। আপনারা শুধু আমার কৌশল দেখুন, দুর্যোধনের ক্ষমতা কত ? আমি দেবতাসহ ত্রিলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম।'

সঞ্জয় বললেন—ভীমসেনের কথা শুনে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রশংসা করে বললেন—'মহাবাহো ! এতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই যে রাজা যুধিষ্ঠির তোমাদের জন্যই শত্রুদের পরাজিত করে উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রই তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করেছে। বহু রাজা, রাজকুমার এবং হাতি তোমার দ্বারাই মৃত্যুর পারে গমন করেছে। তেমনই আজ দুর্যোধনকে বধ করে তুমি আসমুদ্র রাজত্ব ধর্মরাজের অধীন করো। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করলে পাপী দুর্যোধনের অবশ্যই মৃত্যু হবে। দেখো, তুমি ওর দুটি জঙ্ঘা ভেঙে তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করবে।'

সাত্যকিও পাণ্ডুনন্দন ভীমের প্রশংসা করলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালরাও তাঁর প্রতি সম্মান দেখালেন। তারপর ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'ভ্রাতা ! আমি দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই, এই পাপী আমাকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। আমার হৃদয়ে বহুদিন ধরে ওর জন্য ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, সেই ক্রোধ আজ ওর ওপর বর্ষণ করে, গদার আঘাতে একে বিনাশ করে আপনার হৃদয়ের কাঁটা দূর করে দেব, আপনি প্রসন্ন হোন। এবার রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমার হাতে তাঁর পুত্র মারা গেছে শুনে শকুনির পরামর্শে যে সব অশুভ কর্ম করেছেন, সেগুলি স্মরণ করে প্রায়শ্চিত্ত করবেন।'

এই কথা বলে ভীম গদা নিয়ে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে

আহ্বান করেছিলেন, তেমনভাবে দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দুর্যোধন সেই আহ্বান সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হলেন। সেই সময় দুর্যোধনের মনে কোনো ভয়, গ্লানি বা ব্যথা ছিল না, তিনি সিংহের মতো নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে ভীম বললেন—'দুর্যোধন ! তুমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের ওপর যেসব অত্যাচার করেছ এবং বারণাবতে আমাদের যে ক্ষতি করেছ, সেসব স্মরণ করো। পরিপূর্ণ সভাগৃহে রজস্বলা দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়েছ, শকুনির পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কপটভাবে পাশা খেলায় হারিয়েছ এবং নিরপরাধ পাণ্ডবদের প্রতি যেসব অত্যাচার তুমি করেছ, সে সবের মহাফল আজ স্বচক্ষে দেখে নাও। তোমার জন্যই আজ আমাদের প্রিয় পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, শল্য এবং শত্রুতার স্রষ্টা শকুনি—এরা সকলেই মারা গেছে। তোমার ভাই, পুত্র, সৈন্য এবং আরও বহু বীর মৃত্যুবরণ

করেছে। এখন এই বংশনাশকারী একমাত্র তুমিই বেঁচে আছ। আজ এই গদার আঘাতে তোমাকে বধ করব—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আজ তোমার অহংকার চূর্ণ করব এবং রাজ্যের জন্য তোমার লালসা চিরতরে দূর করব।'

দুর্যোধন বললেন—'বৃকোদর! এত কথায় কাজ কী, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, আজ তোমার যুদ্ধ করার আশা পূর্ণ করব। পাপী! দেখছ না? আমি হিমালয়ের শৃঙ্গের মতো ভারী গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছি, আমার হাতে গদা থাকতে কোন শত্রু আমাকে পরাস্ত করতে সাহস করবে? ন্যায়ত যুদ্ধ হলে ইন্দ্রও আমাকে পরাজিত করতে পারবেন না। কুন্তিনন্দন বৃথা গর্জন কোরো না, তোমার কত শক্তি তা যুদ্ধে প্রদর্শিত করো।'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! ভীমসেন ও দুর্যোধনের

মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, তখনই দুই প্রিয় শিষ্যের যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে শ্রীবলরাম সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁরা গিয়ে বলরামের চরণ স্পর্শ করলেন এবং শাস্ত্রীয় রীতিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বলরাম শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ এবং গদাধারী দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন—'মাধব! আজ বিয়াল্লিশ দিন হল আমি পরিভ্রমণে বেরিয়েছি। পুষ্যা নক্ষত্রে রওনা হয়ে আজ শ্রবণা নক্ষত্রে ফিরে এসেছি। এখন আমি আমার দুই শিষ্যের গদাযুদ্ধ দেখতে চাই—তাই এখানে এসেছি।'

রাজা যুধিষ্ঠির বলরামকে আলিঙ্গন করে কুশল বার্তা নিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও তাঁকে প্রণাম করে আলিঙ্গন করলেন। ভীমসেন ও দুর্যোধন গদা উত্তোলন করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারপর বলরাম সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করে সব রাজাদের কুশল সমাচার নিলেন।

তারপর বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আলিঙ্গন করে তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করলেন। তাঁরা দুজনেও প্রেমভরে তাঁকে সম্মান জানালেন। তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলরামকে বললেন—'ভ্রাতা বলরাম! এখন আপনি এই দুই ভাইয়ের মহাযুদ্ধ দেখুন।' তাঁর কথায় বলরাম মহারথীদের দ্বারা সম্মানিত এবং প্রসন্ন হয়ে রাজাদের মধ্যভাগে গিয়ে বসলেন। তারপর ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে শত্রুতার অন্তকারী রোমাঞ্চকর গদাযুদ্ধ শুরু হল।

বলরামের তীর্থযাত্রা এবং প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব

জনমেজয় বললেন—"মুনিবর ! মহাভারতের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বলরাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি নিয়ে অন্য বৃষ্ণিবংশীয়দের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় রওনা হওয়ার সময় বলেছিলেন যে 'আমি দুর্যোধনকেও সাহায্য করব না, পাণ্ডবদেরও নয়' ; তাহলে সেই সময় তিনি কেন সেখানে শুভাগমন করেছিলেন। আপনি আমাকে সেকথা বিস্তারিত ভাবে জানান।"

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পাণ্ডবরা যখন উপপ্লব্য নগরে শিবির স্থাপন করেছিলেন, তখনকার কথা। পাণ্ডবরা সকলের হিতার্থে শ্রীকৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল যাতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তি বজায় থাকে—কলহ বিবাদ না হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সকলের হিতার্থে নানাভাবে বোঝালেন। কিন্তু তিনি ভগবানের কথা মেনে নিলেন না। সন্ধির প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় ভগবান উপপ্লব্য নগরে ফিরে এসে পাণ্ডবদের বললেন, 'কৌরবরা এখন কালের বশে রয়েছে, তাই আমার কথা বুঝল না। পাণ্ডবগণ ! এবার তোমরা পুষ্যা নক্ষত্রে যুদ্ধ করার জন্য আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো।' তারপর যখন সৈন্যদের ভাগ করা হচ্ছিল তখন বলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মধুসূদন ! তুমি কৌরবদেরও সাহায্য কোরো।' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এই প্রস্তাব মেনে নিলেন না ; তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পুষ্যা নক্ষত্রে তীর্থযাত্রার জন্য রওনা হলেন। পথে তিনি তাঁর সেবকদের নির্দেশ দিলেন দ্বারকায় গিয়ে তীর্থযাত্রার উপযোগী সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আনার জন্য। সেই সঙ্গে অগ্নিহোত্রের অগ্নি এবং যজ্ঞাদির পক্ষে উপযুক্ত ব্রাহ্মণও সমাদরপূর্বক নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর সোনা রূপা, গাভী, বস্ত্র, ঘোড়া, হাতি, রথ ইত্যাদিও নিয়ে আসতে বললেন।

বলরাম এইরূপ নির্দেশ দিয়ে সরস্বতী নদীর তট ধরে তীর্থযাত্রার জন্য রওনা হলেন ; তাঁর সঙ্গে ঋত্বিক, সুহৃদ, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রথ, হাতি, ঘোড়া, সেবক, বলদ প্রভৃতি ছিল। তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রান্ত-অবসন্ন রোগী, বালক, বৃদ্ধদের সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত সামগ্রী সঙ্গে নিয়েছিলেন। ক্ষুধার্তদের আহার দেবার জন্য সর্বত্র অন্নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। যে কোনো স্থানে যে কোনো ব্রাহ্মণ খাবার ইচ্ছা জানালে, তাকে তৎক্ষণাৎ খাদ্য পরিবেশন করা হত। বিভিন্ন তীর্থে বলরামের নির্দেশে তাঁর সেবকরা খাদ্য-পানীয়ের অঢেল আয়োজন করে রাখত। ব্রাহ্মণদের সম্মানার্থে বহুমূল্য বস্ত্র, খাট-বিছানা প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। এই যাত্রায় সকলেই স্বচ্ছন্দে যাত্রা করেছিলেন।

যাত্রীদের পথ অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্ণয় করা হত, সকলে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করতেন। সকলেই সর্বদা প্রসন্ন থাকতেন, সেই সঙ্গে নানা বস্তু কেনাবেচাও চলত। মহাত্মা বলরাম নিজ মনকে বশে রেখে পুণ্যতীর্থে ব্রাহ্মণদের ধনদান করতেন। যজ্ঞ করে হাজার দুগ্ধবতী গাভী দান করতেন। তিনি গোরুর শিং সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সুন্দর বস্ত্রও দিয়েছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরে তীর্থে বহু দান করে বলরাম ক্রমশ কুরুক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেন।

জনমেজয় বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আপনি আমাকে সরস্বতীর তীরবর্তী তীর্থাদির গুণপ্রভাব এবং তার উৎপত্তির কথা বলুন। সেইসব তীর্থ গমনের কী ফল ? সেই যাত্রায় সিদ্ধি কীভাবে হয় ? বলরাম কীভাবে গিয়েছিলেন, তার ক্রম বলুন, আমার সবকিছু শোনার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—'রাজন্ ! সরস্বতী তীরবর্তী তীর্থাদির বিস্তার, তার প্রভাব এবং উৎপত্তির পবিত্র কথা আমি তোমাকে বলছি, শোনো। যাদবনন্দন বলদেব ব্রাহ্মণ এবং ঋত্বিকদের নিয়ে প্রথমেই প্রভাস তীর্থে গেলেন, যেখানে চন্দ্র রাজযক্ষ্মার কষ্ট থেকে মুক্তি এবং তাঁর হৃত তেজ ফিরে পেয়েছিলেন, যে তেজের দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করেন। চন্দ্রকে প্রভাযুক্ত করার জন্যই এই প্রধান তীর্থ পৃথিবীতে 'প্রভাস' নামে বিখ্যাত।'

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! ভগবান সোমের যক্ষ্মা হল কেন ? তিনি এই তীর্থে কীভাবে স্নান করলেন, সেখানে ডুব দিতেই কী তিনি রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যবান হয়ে গেলেন ? এই সব কথা আমাকে বিস্তারিতভাবে জানান।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দক্ষ প্রজাপতির সন্তানদের মধ্যে কন্যা সন্তানই বেশি ছিল। তাদের মধ্যে সাতাশজনের চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁদের সকলকে 'নক্ষত্র' বলা হোত। চন্দ্রের সঙ্গে যে নক্ষত্রের

যোগ হয়, তাঁদের গণনার জন্য এরা সাতাশ রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই অনুপম সুন্দরী ছিলেন। তার মধ্যে রোহিণী ছিলেন সর্বোত্তম সুন্দরী, তাই রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের অনুরাগ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি, তিনিই ছিলেন চন্দ্রের হৃদয়-বল্লভা। জনমেজয় ! পূর্বকালে চন্দ্র রোহিণী-নক্ষত্রের সঙ্গেই বেশি দিন থাকতেন। তাই নক্ষত্র নামধারিণী অন্য স্ত্রীরা ঈর্ষান্বিত ও কুপিতা হয়ে তাঁদের পিতা প্রজাপতির কাছে গিয়ে বললেন—'পিতৃদেব ! সোম সর্বদাই রোহিণীর সঙ্গে থাকে, আমাদের প্রতি তার কোনো স্নেহ নেই। সুতরাং আমরা আপনার কাছেই থাকব এবং এখানেই তপস্যায় রত থাকব।'

তাঁদের কথা শুনে দক্ষ সোমকে ডেকে এনে বললেন—'তুমি তোমার সব স্ত্রীদের প্রতি সমভাব বজায় রাখো, সকলের সঙ্গে এক রূপ ব্যবহার করো, তাহলেই তুমি পাপ হতে মুক্ত হবে।'

তারপর দক্ষ তাঁর কন্যাদের বললেন—'তোমরা এবার চন্দ্রের কাছে যাও, এখন থেকে সে আমার নির্দেশ অনুসারে তোমাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবে।' পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা পুনরায় পতিগৃহে গেলেন। কিন্তু চন্দ্রের ব্যবহারে কোনো পার্থক্য দেখা গেল না। রোহিণীর প্রতি তাঁর প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, তিনি তাঁর কাছেই সর্বদা থাকতেন। তখন বাকি কন্যারা পুনরায় একত্রে পিতার কাছে গিয়ে বললেন—'পিতা ! সোম আপনার নির্দেশ মানেননি, এখন আমরা এখানে থেকে আপনার সেবা করব।' দক্ষ সেই কথা শুনে আবার চন্দ্রকে ডেকে এনে বললেন—'তুমি তোমার সব স্ত্রীদের সঙ্গে সমব্যবহার করো, নাহলে আমি অভিশাপ দেব।' কিন্তু চন্দ্র তাঁর কথার সম্মান না করে রোহিণীর সঙ্গেই থাকতে লাগলেন।

দক্ষ যখন সেই সংবাদ জানতে পারলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যক্ষ্মারোগের সৃষ্টি করলেন। সেই রোগ চন্দ্রের শরীরে বাসা বাঁধলো। ক্ষয়রোগে পীড়িত হয়ে চন্দ্র প্রতিদিন ক্ষীণ হতে লাগলেন। চন্দ্র রোগমুক্তির জন্য বহু চেষ্টা করলেন, যজ্ঞাদি করলেন কিন্তু দক্ষের শাপ থেকে মুক্তি পেলেন না। চন্দ্রের প্রভা নষ্ট হওয়ায় অন্ন ইত্যাদি ঔষধিও উদ্গম হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যা জন্মাত তাতেও কোনো স্বাদ বা গন্ধ থাকত না। অন্নাদি উদ্গম বন্ধ হওয়ায় প্রাণীদেরও বিনাশ হতে লাগল, সমস্ত প্রজা দুর্বল হয়ে যেতে লাগল।

দেবতারা তখন চন্দ্রের কাছে এসে বললেন—'আপনার এ কী রূপ হয়েছে ? এতে আলোর প্রভা নেই কেন ? আমাদের সব বলুন, আপনার কাছে সমস্ত শুনে তারপর আমরা এর কোনো উপায় নির্ধারণ করব।'

তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তরে চন্দ্র তাঁর অভিশাপের কারণ জানালেন এবং শাপরূপে যক্ষ্মারোগ হওয়ার কথা জানালেন। দেবতারা তাঁর কথা শুনে দক্ষের কাছে গিয়ে বললেন—'প্রজাপতি ! আপনি চন্দ্রের ওপর প্রসন্ন হয়ে তাকে শাপ থেকে নিবৃত্ত করুন। তিনি ক্ষয় হওয়ায় প্রজারাও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তৃণ, লতা, ঔষধি ইত্যাদি নানাপ্রকার বীজ—সবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলি নষ্ট হয়ে গেলে আমরাও বিনাশপ্রাপ্ত হব। তখন আমাদের ছাড়া জগৎ কীকরে থাকবে ? এই কথা স্মরণে রেখে আপনার চন্দ্রকে কৃপা করা উচিত।'

দেবতাদের কথা শুনে প্রজাপতি বললেন—'আমার কথার অন্যথা হবে না। একটি শর্তে তার প্রতি অভিশাপের প্রভাব কম হতে পারে। চন্দ্র যদি তার সব পত্নীদের সঙ্গে সমব্যবহার করে তাহলে সরস্বতী নদীর তীরে উত্তম তীর্থে স্নান করলে সে আবার হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

দক্ষ প্রজাপতির নির্দেশে সোম সরস্বতীর প্রথম তীর্থ প্রভাস ক্ষেত্রে গেলেন। অমাবস্যার দিন তিনি স্নান করলে তাঁর প্রভা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করতে লাগলেন। দেবতারা তখন তাঁকে নিয়ে প্রজাপতির কাছে গেলেন। তিনি দেবতাদের বিদায় জানিয়ে চন্দ্রকে বললেন—'পুত্র ! আজ থেকে নিজ পত্নীদের এবং ব্রাহ্মণদের কখনো অপমান করবে না। যাও, সতর্ক হয়ে আমার নির্দেশ পালন করো।'

এই বলে দক্ষ চন্দ্রকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। চন্দ্র নিজ লোকে ফিরে গেলেন এবং সমস্ত প্রজা আগের মতোই প্রসন্ন হল। জনমেজয় ! চন্দ্র যেজন্য শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন, সেই সমগ্র বৃত্তান্ত তোমাকে জানালাম। সেই সঙ্গে সমস্ত তীর্থের প্রধান প্রভাস তীর্থের প্রভাবও শোনালাম। সেই তীর্থে স্নান করার পর বলরাম চমসোদ্ভেদ নামক তীর্থে গেলেন, সেখানে নিয়মনীতি মেনে স্নান করার পর তিনি দান করলেন এবং সেখানে এক রাত্রি কাটালেন। পর দিন তিনি উদপান তীর্থে গেলেন, সেখানে স্নান করলে মানুষের কল্যাণ হয় ; এখানে সরস্বতী নদীর জল অন্তঃসলিলা।

উদপান তীর্থের উৎপত্তি এবং ত্রিত মুনির উপাখ্যান

বৈশম্পায়ন বললেন—'মহারাজ ! উদপান তীর্থে পৌঁছে বলরাম ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের বহু দ্রব্য দান করলেন, সেখানে গিয়ে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই তীর্থে আগে ত্রিত মুনি বাস করতেন, তিনি অনেক বড় তপস্বী এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সেখানে কুয়োর মধ্যে থেকেই তিনি সোমপান করছিলেন। তাঁর দুই ভ্রাতা ছিলেন, তাঁরা তাঁকে কুয়োতে ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি ওদের দুজনকে শাপ দিয়েছিলেন।'

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! এই উদপান (কুয়ো) তীর্থ কীকরে হল ? তাঁর দুভাই তাঁকে কেন পরিত্যাগ করেছিলেন, কেন কুয়ার মধ্যে ফেলেছিলেন ? কুয়ার মধ্যে তিনি কীভাবে যজ্ঞ এবং সোমপান করেন—সব আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! আগের যুগের কথা। তিন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁরা মুনিবৃত্তি করতেন, তাঁদের নাম ছিল একত, দ্বিত এবং ত্রিত। তাঁরা সকলেই বেদবেত্তা ছিলেন এবং তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোকে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁদের পিতা ছিলেন ধর্মাত্মা গৌতম। পুত্রদের তপ, নিয়মপালন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য পিতা গৌতম তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। গৌতম পরলোক গমন করলে তাঁর যজমানেরা তাঁর পুত্রদের সম্মান ও সৎকার করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে ত্রিত মুনি তাঁর শুভকর্ম এবং বেদাধ্যয়নের দ্বারা পিতার ন্যায় সম্মানিত হয়ে উঠলেন।

একদিনের কথা, একত এবং দ্বিত যজ্ঞ ও অর্থের জন্য চিন্তা করছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন—'আমরা ত্রিতকে সঙ্গে নিয়ে যজমানদের যজ্ঞ করিয়ে দক্ষিণারূপে প্রচুর গো-ধন প্রাপ্ত হব। তারপরে যজ্ঞ করে প্রসন্নতা সহকারে সোমপান করব।' এই চিন্তা করে তাঁরা দুই ভ্রাতা যজমানের কাছে গিয়ে শাস্ত্রীয়ভাবে যজ্ঞ করিয়ে বহু গাভী লাভ করলেন। সেই সব নিয়ে তাঁরা পূর্ব দিকে চললেন। ত্রিত মুনি আনন্দিত মনে আগে আগে চলছিলেন এবং একত ও দ্বিত পেছন পেছন পশু-ধন নিয়ে আসছিলেন।

এই বিশাল গো-ধন দেখে একত ও দ্বিত ভাবছিলেন যে, 'কী উপায়ে এই গো-ধন সম্ভার ত্রিতকে না দিয়ে আমাদের দুজনের কাছে রাখা যায়।' তারপর দুজনে আলোচনা করতে লাগলেন—'ত্রিত বিদ্বান, সে যজ্ঞ দ্বারা পুনরায় গো-ধন পেয়ে যাবে। এই গোধন আমরা দুজনে অন্যত্র নিয়ে যাই এবং ত্রিতকে আলাদা করে দিই। ওর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে চলে যাক।'

এইভাবে আলোচনা করতে করতে তাঁরা পথ চলছিলেন। রাত্রিকাল, পথে এক মেষ দাঁড়িয়েছিল। পাশেই সরস্বতী নদীর ধারে এক বিশাল ইঁদারা (খুব বড় কূপ)। ত্রিত মুনির দৃষ্টি সেই মেষের ওপর পড়ল, তাকে দেখে মুনি ভীত হয়ে দৌড়তে গিয়ে সেই ইঁদারার মধ্যে পড়ে গেলেন। ইঁদারার মধ্যে থেকে তিনি আর্তনাদ করতে লাগলেন। তাঁর দুই ভ্রাতা সেই আর্তনাদ শুনেও তাঁকে বাইরে আনার চেষ্টা করলেন না। তাঁদের মেষের ভয় তো ছিলই, লোভে পড়ে তাঁরা নিজের ছোট ভাইকে সেই ইঁদারায় ফেলে রেখে চলে গেলেন। সেই ইঁদারাতে জল ছিল না, শুধু বালি ভর্তি ছিল আর চতুর্দিকে ঘাস ও লতা বেড়ে উঠেছিল, তাই দিয়ে সেই ইঁদারার ওপর দিক আচ্ছাদিত ছিল।

কুয়োয় পড়ে ত্রিতের মৃত্যুভয় হল। কিন্তু তাঁর সোমপানের ইচ্ছা নিবৃত্ত হয়নি। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, ভাবতে লাগলেন—'এর মধ্যে থেকে আমি কীকরে সোমপান করব ?' তখনই কুয়োর মধ্যে বেড়ে ওঠা এক লতা তিনি দেখতে পেলেন ; তিনি সেই বালুময় কুয়ায় মধ্যে জলের চিন্তা করে সংকল্প দ্বারা অগ্নি স্থাপন করলেন। তারপর নিজের মধ্যে হোতৃত্বের এবং সেই লতার মধ্যে সোমের ভাবনা করে মনে মনে ঋক্, যজুঃ ও সামের চিন্তা করলেন। তারপর কাঁকরে শিলার ভাবনা করে তাতে পেষণ করে লতা থেকে সোমরস বার করলেন। পরে জলে ঘিয়ের সংকল্প করে তিনি দেবতাদের ভাগ সুনির্দিষ্ট করে সোমরস প্রস্তুত করে তুমুল নাদে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। মহাত্মা ত্রিতের সেই বেদমন্ত্রের আওয়াজ স্বর্গ পর্যন্ত গুঞ্জিত হল।

দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সেই ধ্বনি শুনলেন। তাই শুনে তিনি দেবতাদের বললেন—'ত্রিত মুনি যজ্ঞ করছে, আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত। সে অত্যন্ত বড় তপস্বী ; না গেলে ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য দেবতা সৃষ্টি করবে।' বৃহস্পতির কথা শুনে সব দেবতা একত্রিত হয়ে ত্রিত মুনির সান্নিধ্যে গেলেন। সেখানে তাঁরা কুয়াটি এবং যজ্ঞে দীক্ষিত ত্রিত মুনিকে দেখলেন। মুনিকে অত্যন্ত তেজস্বী দেখাচ্ছিল।

দেবতারা বললেন—'আমরা আমাদের ভাগ নিতে এসেছি।' ত্রিত বললেন—'দেবগণ ! দেখুন, আমি কী অবস্থায় পড়ে আছি।' এই বলে তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবতাদের ভাগ অর্পণ করলেন।

দেবতারা তাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মুনিকে বললেন—'তুমি ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করো।' মুনি বললেন—'এই কুয়া থেকে আমাকে মুক্ত করুন এবং যে ব্যক্তি এই কুয়াতে আচমন করবে, তার সোমপানকারীর মতো যেন গতিলাভ হয়।' রাজন্ ! ত্রিতমুনি এই কথা বলতেই কুয়ার মধ্যে তরঙ্গমালা সুশোভিত সরস্বতী নদী আবির্ভূতা হলেন, সেই জলের সঙ্গেই তিনি উঠে কুয়ার বাইরে এলেন। দেবতাগণ 'তথাস্তু' বলে তাঁর প্রার্থিত বরপ্রদান করলেন এবং নিজ নিজ ধামে ফিরে গেলেন।

ত্রিত মুনিও প্রসন্নতাপূর্বক গৃহে ফিরে এলেন। সেখানে তাঁর দুই ভ্রাতাকে দেখে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন ; তিনি অত্যন্ত কঠোর বাক্যে দুজনকে শাপ দিলেন—'তোমরা লোভে পড়ে আমাকে কুয়ায় ফেলে পালিয়ে এসেছ, তাতে মহাপাপ করেছ, অতএব তোমরা শৃগাল হয়ে বড় বড় দাঁত নিয়ে এদিক-সেদিক ঘোরো। তোমাদের থেকে নানা পশুর উৎপত্তি হবে।' তিনি এই কথা বলতেই দুই ভ্রাতাকে শৃগালরূপে দেখা গেল।

বলরাম নদীর মধ্যে অবস্থিত উদপান তীর্থ দর্শন করে তার প্রশংসা করলেন এবং সেই জলে আচমন করে সেখানকার ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের নানা বস্ত্র দান করলেন। তারপর তিনি বিনশন তীর্থের দিকে রওনা হলেন।

বিনশন প্রভৃতি তীর্থের বর্ণনা, নৈমিষীয় এবং সপ্তসারস্বত তীর্থাদির বিশেষ বৃত্তান্ত

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সরস্বতী নদী সেখানে মাটির নীচে দিয়ে অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত ছিল, তাই ঋষিগণ একে 'বিনশন তীর্থ' বলতেন। বলরাম সেখানে পূজা করে এগিয়ে চললেন এবং সরস্বতীর উত্তর ভাগে সুভূমিক নামক তীর্থে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি বহু অপ্সরা এবং গন্ধর্ব দেখতে পেলেন। সেই পবিত্র তীর্থে স্নান ও দান করে তিনি গন্ধর্ব তীর্থে গেলেন, সেখানে তপস্যারত বিশ্বাবসু প্রমুখ প্রধান-প্রধান গন্ধর্ব গীত-বাদ্য ও নৃত্য করছিলেন। সেই তীর্থে স্নান করে বলরাম ব্রাহ্মণদের সোনা-রূপা ও নানা বস্ত্র দান করলেন। তারপর তাঁদের ভোজন করিয়ে বহুমূল্য অর্থ ও বস্ত্রদান করে তাঁদের কামনা পূর্ণ করলেন।

তারপর তিনি গর্গস্রোত নামক তীর্থে গেলেন, বৃদ্ধ গর্গ এখানে তপস্যা করে তাঁর অন্তঃকরণ পবিত্র করেছিলেন এবং কালের জ্ঞান, কালের গতি, নক্ষত্র ও গ্রহাদির গতির আনাগোনা, দারুণ উৎপাত এবং শুভ লক্ষণ ইত্যাদি জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর নামেই এই তীর্থ 'গর্গস্রোত' নামে বিখ্যাত। সেখানেও বলরাম ব্রাহ্মণদের বিধিপূর্বক ধনদান করে নানা ভোজ্য দ্রব্যে তাঁদের আপ্যায়িত করে 'শঙ্খতীর্থে' গেলেন। সেখানে তিনি মেরুগিরির ন্যায় এক উচ্চ শঙ্খ দেখলেন, যেটি বহু ঋষির দ্বারা সেবিত। সেখানেই সরস্বতীর তীরে তিনি এক বিশাল বৃক্ষ দেখলেন, যেখানে সহস্র সহস্র যক্ষ, বিদ্যাধর, রাক্ষস, পিশাচ এবং সিদ্ধ বাস করতেন। তাঁরা অন্ন ত্যাগ করে ব্রত ও নিয়ম পালন করে মাঝে মাঝে সেই বৃক্ষের ফলই খেতেন। বলদেব সেখানে ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের বাসন ও বস্ত্র প্রদান করলেন। তারপর তিনি পরম পবিত্র দ্বৈতবনে এলেন। সেই বনে বসবাসকারী ঋষি-মুনিদের দর্শন শেষে তিনি সেখানে অবগাহন স্নান সেরে ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের বিবিধ ভোজ্যপদার্থ দান করলেন। সেইস্থান থেকে রওনা হয়ে তিনি সরস্বতীর দক্ষিণ পার্শ্বে কিছুদূরে অবস্থিত 'নাগধন্বা' তীর্থে গেলেন, যেখানে চোদ্দ হাজার ঋষি অবস্থান করতেন। সেই স্থানে দেবতারা বাসুকিকে সর্পের রাজরূপে অভিষেক করেছিলেন। সেইস্থানে কারোরই সর্পদংশনের ভয় ছিল না। বলরাম সেখানেও ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করলেন। তারপর তিনি পূর্বদিকে চললেন, সেখানে প্রতিস্থানে তীর্থ দেখা যেতে থাকল। সেই সব তীর্থে বলরাম মুনি-ঋষিদের কথা অনুযায়ী ব্রত-নিয়ম পালন করলেন। তারপর সর্বপ্রকার

দান করে তিনি তাঁর অভীষ্ট পথে রওনা হলেন। নৈমিষারণ্যবাসী মুনিদের দর্শনেচ্ছায় যেতে যেতে যখন পশ্চিম দিকে প্রবাহিত সরস্বতী নদী পূর্বদিকে ফিরেছে তিনি সেইখানে গিয়ে পৌঁছলেন। সরস্বতী নদীকে পেছন দিকে ঘুরতে দেখে বলরাম অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! সরস্বতী নদী পূর্বদিকে কেন ফিরেছিল ? বলরামের আশ্চর্য হওয়ার নিশ্চয়ই কারণ ছিল, নদীর পেছন ফেরার কারণ কী ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সত্যযুগের কথা, নৈমিষারণ্যের তপস্বীগণ একত্রে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক মহাসত্র আরম্ভ করেছিলেন। সেখানে সম্মিলিত হওয়ার জন্য বহু ঋষির সমাগম হয়েছিল। সত্র সমাপনকালে তীর্থের কারণে সেখানে বহু ঋষি-মহর্ষির শুভাগমন হয়েছিল। সেই সংখ্যা অত্যধিক হয়ে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরের তীর্থ সকল নগরের রূপ ধারণ করেছিল। নদীতীরে নৈমিষারণ্য থেকে সমন্তপঞ্চক পর্যন্ত ঋষি-মুনিগণ অবস্থান করছিলেন। তাঁরা সেখানে হোম-যজ্ঞ করছিলেন, তাঁদের উচ্চারিত বেদ-মন্ত্রাদির গম্ভীর ধ্বনি চতুর্দিকে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। মহারাজ ! সেই ঋষিদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বালখিল্য, অশ্মকুট[১], দন্তোলূখলী[২], প্রসংখ্যান[৩] ছিলেন। কেউ কেবলমাত্র বায়ু দ্বারা জীবনধারণ করতেন। সকলেই মাটির বেদিতে শয়ন করতেন এবং নানাপ্রকার নিয়মে ব্যাপৃত থাকতেন। এই সব ঋষি সরস্বতী তীরে এসে শোভাবৃদ্ধি করতে লাগলেন। কিন্তু বলরাম সেখানে থাকার স্থান না পেয়ে নিরাশ ও চিন্তিত হলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে সরস্বতী দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন। তিনি বহু কুঞ্জ নির্মাণ করে ঋষিদের জন্য তীর্থভূমি তৈরি করে পশ্চিমদিকে ঘুরলেন। মহানদী ঋষিদের আগমন সফল করার জন্য এক অদ্ভুত কাজ করলেন। সরস্বতীর নির্মিত সেই নিকুঞ্জগুলিই 'নৈমিষীয়' নামে বিখ্যাত। সেই স্থানেও বলরাম বিধিমতো স্নান-পূজা করে ব্রাহ্মণদের নানাবিধ ভোজ্য পদার্থ ও বাসন ইত্যাদি দান করে 'সপ্তসারস্বত' নামক তীর্থে চলে গেলেন। সেখানে বায়ু, জল, ফল বা পাতা খেয়ে থাকা বহু মহাত্মা বাস করতেন। তাঁদের বেদধ্বনির গম্ভীর আওয়াজ সর্বত্র শোনা যেত, তাঁরা সকলেই অহিংসক এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! সপ্তসারস্বত তীর্থ কীভাবে প্রকাশিত হল ? আমি সেই বৃত্তান্ত বিধিপূর্বক শুনতে চাই।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সাতটি নদী সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ এবং তা সমস্ত জগতে প্রবাহিত। এদের বিশেষ নাম হল—সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু এবং বিমলোদকা। শক্তিশালী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সরস্বতীকে আবাহন করেছেন। কোনো এক সময়ের কথা। পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, যজ্ঞশালায় সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বিরাজমান ছিলেন। পুণ্যাহ ঘোষিত হচ্ছিল, সর্বত্র বেদ-মন্ত্র ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, দেবতাগণ যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ব্রহ্মা স্বয়ং যজ্ঞের দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর যজ্ঞের সময় সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছিল। ধর্ম ও অর্থকুশল মানুষ মনে মনে যা চিন্তা করছিলেন, তাই প্রাপ্ত হচ্ছিলেন। সেই সময় ঋষিগণ পিতামহকে বললেন—'এই যজ্ঞ অধিক গুণসম্পন্ন বলে প্রতিভাত হচ্ছে না ; কেননা নদীশ্রেষ্ঠ সরস্বতী এখানে আবির্ভূতা হননি।' তাই শুনে ব্রহ্মা সরস্বতীকে স্মরণ করলেন, তাঁকে আবাহন করতেই 'সুপ্রভা' নামধারিণী সরস্বতী পুষ্কর তীর্থে আবির্ভূতা হলেন। পিতামহের সম্মানার্থে সেখানে সরস্বতী নদীকে প্রকাশিত হতে দেখে মুনিরা যজ্ঞের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন।

এইরূপ নৈমিষারণ্যেও বেদের স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত মুনিগণ সরস্বতীর আবাহন করলে সেখানে 'কাঞ্চনাক্ষী' নাম্নী সরস্বতী নদী আবির্ভূতা হলেন। তেমনই রাজা গয় যখন যজ্ঞ করছিলেন, তখন সেই স্থানেও সরস্বতীকে আবাহন করা হয়, সেখানে 'বিশালা' নামধারিণী সরস্বতী আবির্ভূতা হন, তাঁর গতি অত্যন্ত তীব্র। তিনি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উদ্ভূত। কোনো এক সময়ে, উত্তর কোশল প্রান্তে উদ্দালক

[১] পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে করে যাঁরা ফল খান।

[২] দাঁত দিয়ে যাঁরা উদূখলের কাজ করেন, অর্থাৎ উদূখলের পরিবর্তে দাঁতে চিবিয়ে খাদ্য গ্রহণ করেন।

[৩] যাঁরা গুনে গুনে ফল খান।

মুনি যজ্ঞ করছিলেন। তিনিও সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। তিনি স্মরণ করতেই সরস্বতী সেই দেশে আবির্ভূতা হলেন এবং মুনিরা তাঁকে পূজা করলেন। সেই নদী 'মনোরমা' নামে বিখ্যাত ; কারণ ঋষিরা তাঁকে প্রথমে নিজের মনে স্মরণ করেছিলেন।

ঋষভ দ্বীপে 'সুরেণু' নামক সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হয়েছিল। রাজা কুরু যখন কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করছিলেন, সেই সময় সেখানে সরস্বতী নদী প্রকাশিত হয়েছিল। গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করার সময় প্রজাপতি দক্ষ যখন সরস্বতীকে স্মরণ করেন তখন সেখানেও সুরেণুই প্রকাশিত হয়। সেইরূপ মহাত্মা বশিষ্ঠও একবার কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করছিলেন, সেখানে তিনি সরস্বতীকে আবাহন করেন ; তাঁর আবাহনে 'ওঘবতী' আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা একবার হিমালয় পর্বতেও যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি যখন সরস্বতীকে আবাহন করেন তখন 'বিমলোদক' প্রকাশিত হন। এই সাত সরস্বতীর জল যেখানে মেশে, সেই স্থানকেই 'সপ্ত সারস্বত' বলা হয়। আমি তোমাকে সাত সরস্বতীর নাম ও বৃত্তান্ত জানালাম। এঁদের দ্বারাই পরমপবিত্র সপ্ত সারস্বত তীর্থ প্রসিদ্ধ হয়েছে।

রুষঙ্গুর আশ্রমে আর্ষ্টিষেণাদি ও বিশ্বামিত্রের তপস্যা, যাযাত তীর্থের মহিমা এবং অরুণাতে স্নান করায় ইন্দ্রের উদ্ধার

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! বলরাম সেই তীর্থে আশ্রমবাসী ঋষিদের পূজা করে এক রাত কাটালেন। তিনি ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন সামগ্রী দান করে সারারাত উপবাসে কাটালেন। পরদিন প্রভাতে তীর্থে স্নান করে মুনি ঋষিদের অনুমতি নিয়ে তিনি ঔশনস তীর্থে গেলেন। একে কপালমোচন তীর্থও বলা হয়। পূর্বে ভগবান রাম এখানে এক রাক্ষসবধ করে তার মাথা দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই মাথা (কপাল) মহোদর মুনির জঙ্ঘায় গিয়ে লেগেছিল। সেখানেই সেই মুনি মুক্তিলাভ করেছিলেন এবং ওইস্থানে শুক্রাচার্যও তপস্যা করেছিলেন, যার জন্য তাঁর হৃদয়ে নীতিবিদ্যার সম্পূর্ণ স্ফুরণ হয়েছিল। বলরাম সেই তীর্থে পৌঁছে ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার ধন প্রদান করেছিলেন।

তারপর তিনি রুষঙ্গুর আশ্রমে গেলেন, যেখানে আর্ষ্টিষেণ উগ্র তপস্যা করেছিলেন। রুষঙ্গু মুনি এই স্থানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়—রুষঙ্গু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সর্বদা তপস্যায় ব্যাপৃত থাকতেন। এক দিন তিনি অত্যন্ত ভেবেচিন্তে দেহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তখন তাঁর সকল পুত্রদের ডেকে বললেন আমাকে পৃথূদক তীর্থে নিয়ে চলো। সেখানে গিয়ে রুষঙ্গু বিধিমতো স্নানাদি করে তাঁর পুত্রদের বললেন—'সরস্বতী নদীর উত্তর কিনারে এই যে পৃথূদক তীর্থ, এতে স্নান করে গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র জপ করতে করতে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, তাকে আর পুনর্জন্মের কষ্ট ভোগ করতে হয় না। বলরাম সেই পবিত্র তীর্থে স্নান করে ব্রাহ্মণদের দান করলেন। তারপর পিতামহ ব্রহ্মা যেখানে সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং যেখানে আর্ষ্টিষেণ, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি এবং বিশ্বামিত্রাদি রাজর্ষিগণ মহাতপ করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, সেই স্থানে গেলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আর্ষ্টিষেণ কীরূপ মহাতপ করেছিলেন ? সিন্ধুদ্বীপ দেবাপি ও বিশ্বামিত্রও কীভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন ? সেসব কথা আমাকে বলুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সত্যযুগের কথা, আর্ষ্টিষেণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি গুরুগৃহে বাস করে সর্বদা বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকতেন। যদিও তিনি বহুদিন গুরুকুলে বাস করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর বিদ্যাও সমাপ্ত হয়নি এবং বেদাভ্যাসও সম্পূর্ণ হয়নি। এতে তিনি মনে মনে মর্মাহত হয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। সেই তপের প্রভাবে তিনি বেদের উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন এবং বিদ্বান হওয়ার সঙ্গে সিদ্ধিলাভও করলেন। তিনি এই তীর্থে তিনটি বরদান করলেন, 'আজ থেকে যে ব্যক্তি সরস্বতী নদীর এই তীর্থে স্নান করবে তার অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ হবে, এখানে সাপের ভয় থাকবে না এবং কিছু

সময় এখানে বাস করলে মহাফল লাভ হবে।'

এইভাবে কৃষঙ্গুর আশ্রমেই আর্ষ্টিষেণ মুনি সিদ্ধিলাভ করেন। সেইখানেই রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ এবং দেবাপি তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। সর্বদা তপস্যারত বিশ্বামিত্রও এখানেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়—পৃথিবীতে 'গাধি' নামে বিখ্যাত এক মহান রাজা রাজত্ব করতেন, বিশ্বামিত্র তাঁরই পুত্র। বলা হয় রাজা গাধি একজন বড় যোগী ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্য সমর্পণ করে দেহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তখন প্রজারা রাজাকে প্রণাম করে বলে—'মহারাজ ! আপনি বনে যাবেন না, আমাদের মহাভয় থেকে রক্ষা করুন।'

প্রজাদের কথায় গাধি বললেন—'আমার পুত্র সমস্ত জগতের রক্ষাকর্তা হয়ে থাকবে।' এই বলে তিনি বিশ্বামিত্রকে রাজসিংহাসনে বসালেন এবং নিজে দেহত্যাগ করে স্বর্গগমন করলেন। বিশ্বামিত্র রাজা হলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তিনি পূর্ণত রাজ্যরক্ষা করতে পারলেন না। একদিন তিনি জানতে পারলেন যে প্রজারা রাক্ষসের জন্য অত্যন্ত ভীত হয়েছে। তিনি অতি চতুরঙ্গিনী সেনা নিয়ে রাজধানী থেকে রওনা হলেন। বহুদূর পেরিয়ে তিনি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে পৌঁছলেন। তাঁর সৈনিকরা সেই আশ্রমে নানা উপদ্রব করতে লাগল। সেই সময়ে বশিষ্ঠ মুনি আশ্রমে এলেন। তিনি দেখলেন এই মহা বন চারদিকে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে। তখন তিনি তাঁর কামধেনু গাভীকে বললেন—'তুমি ভয়ংকর ভীলদের উৎপন্ন করো।' ঋষির আদেশে ধেনু ভয়ংকর মানুষদের উৎপন্ন করল, তারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের আক্রমণ করে সেখান থেকে তাদের হটিয়ে দিল। বিশ্বামিত্র যখন শুনলেন যে তাঁর সেনারা পরাস্ত, তখন তিনি তপস্যাকে শ্রেষ্ঠ মেনে নিয়ে মনে মনে তপস্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

তারপর তিনি সরস্বতীর উপরিউক্ত তীর্থে এসে একাগ্র চিত্তে ব্রত ও নিয়ম পালন করে শরীর শুদ্ধ করতে লাগলেন। কিছুদিন জলপান করে কাটালেন, তারপর হাওয়া খেয়ে থাকলেন, তারপর পাতা চিবিয়ে প্রাণধারণ করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মুক্ত আকাশের নীচে শুতেন এবং আরও অনেক নিয়মাদি পালন করতেন।

দেবতারা তাঁর ব্রতপালনে বিঘ্নপ্রদান করতে লাগলেন, কিন্তু কোনোভাবেই তাঁর মনকে সরাতে পারলেন না। বিশ্বামিত্র অনেক প্রকার তপস্যা করতে লাগলেন। সেই সময় তাঁকে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী দেখাত। তাঁকে সেই কঠোর তপস্যায় ব্যাপৃত দেখে ব্রহ্মা এসে তাঁকে বরপ্রার্থনা করতে বললেন। বিশ্বামিত্র বর চাইলেন—'আমি যেন ব্রাহ্মণ হই।' ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলে তাঁর প্রার্থনা মেনে নিলেন। মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র এইভাবে কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

সেই তীর্থে পৌঁছে বলরাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের বহু ধন, দুগ্ধবতী গাভী, বাহন, বস্ত্র, আভূষণ ও খাদ্য-পানীয় দান করলেন। তারপর তিনি বক ও দালভ্য মুনির আশ্রমে গেলেন। সেখানে বেদমন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছিল। সেখানে পৌঁছে তিনি ব্রাহ্মণদের নানা বস্তু দান করলেন। তারপর যযাতি তীর্থে গেলেন। এখানে রাজা যযাতি যজ্ঞে সরস্বতী নদীকে ঘি ও দুধের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন। এখানে যজ্ঞ করে যযাতি স্বর্গলোকে গমন করেন। সরস্বতী রাজা যযাতির ঔদার্য ও নিজের প্রতি তাঁর সনাতন ভক্তি প্রত্যক্ষ করে তাঁর যজ্ঞে আগত সমস্ত ব্রাহ্মণদের সকল কামনা পূর্ণ করেছিলেন। রাজার যজ্ঞবৈভব দেখে দেবতা ও গন্ধর্বগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু মানবকুল পরম আশ্চর্য হয়েছিলেন। সেই তীর্থেও নানাপ্রকার দান করে বলরাম বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গেলেন। সেখানেই স্থাণু তীর্থ, যেখানে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র তপস্যা করেছিলেন এবং যেখানে দেবতারা কার্তিকেয়কে দেব সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই তীর্থে স্নান করেই দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মন্ ! ইন্দ্র কীকরে ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয়েছিলেন ? এই তীর্থে স্নান করে কীকরে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন ?'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! প্রাচীন কালে, নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে ভীত হয়ে সূর্যকিরণের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁকে কোনো সিক্ত অস্ত্র দিয়ে মারবেন না এবং কোনো শুষ্ক অস্ত্র দিয়েও না ; রাত্রেও মারবেন না, দিনেও নয়। এই বিষয়ে তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা করার পর একদিন যখন চারদিক কুয়াশায় ছেয়ে গিয়েছিল, ইন্দ্র জলের ফেনা দিয়ে নমুচির মাথা কেটে নিয়েছিলেন। সেই কাটা মস্তক ইন্দ্রকে অনুগমন করে বলেছিল—'মিত্র

হত্যাকারী, পাপী, কোথায় যাচ্ছ ?' সেই মস্তক যখন এইভাবে বারংবার প্রশ্ন করতে লাগল, তখন ইন্দ্র ভয় পেয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সব সংবাদ জানালেন। সব শুনে ব্রহ্মা বললেন—'ইন্দ্র ! তুমি অরুণা নদীর তীরে যাও। পূর্বকালে সরস্বতী গুপ্তভাবে গিয়ে অরুণাকে নিজ জলে পূর্ণ করেছিলেন, সুতরাং সেটি অরুণা ও সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গম। সেখানে গিয়ে যজ্ঞ ও দান করো। সেখানে ডুব দিয়ে স্নান করলে তুমি পাপ মুক্ত হবে।'

ব্রহ্মার কথায় ইন্দ্র সরস্বতী তীরের নিকুঞ্জে গেলেন এবং সেখানে যজ্ঞ করে অরুণা নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করলেন। তাতে তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্ন মনে স্বর্গে চলে গেলেন। নমুচির সেই কর্তিত মস্তকও অরুণার জলে ডুবে অক্ষয় লোকে গমন করল।

বলভদ্র সেই তীর্থে স্নান করে নানা দান করলেন এবং সেখান থেকে সোমতীর্থে রওনা হলেন। পূর্বে সোম এইস্থানে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, অত্রিমুনি যার হোতা ছিলেন। সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে দানব, দৈত্য ও রাক্ষসদের সঙ্গে দেবতাদের ভয়ংকর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধকে তারক-সংগ্রাম বলা হয়, সেই যুদ্ধে স্বামী কার্তিকেয় তারকাসুর বধ করেছিলেন। এই তীর্থেই কার্তিকেয়কে দেব সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করা হয়েছিল এবং তিনি চিরকালের মতো সেখানে নিবাস করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইস্থানেই বরুণও জলরাজ্যে অভিষিক্ত হন। বলরাম সেই তীর্থে স্নান করে কার্তিকেয়র পূজা করে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, বস্ত্র দান করলেন। পরে এক রাত্রি সেখানে বাস করে অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্ত হলেন।

সোমতীর্থ, অগ্নিতীর্থ এবং বদরপাচনতীর্থের মহিমা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! দেবতারা সোমতীর্থে কীভাবে বরুণের অভিষেক করেছিলেন ? সেসব কাহিনী আমাকে বলুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! প্রথম সত্যযুগের কথা, সমস্ত দেবতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন—'প্রভু ! দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সর্বদা আমাদের ভয় থেকে রক্ষা করে থাকেন, সেই মতো আপনিও নদীসমূহকে পালন করুন। আপনার নিবাস হবে সমুদ্রে এবং সমুদ্রও সর্বদা আপনার অধীনে থাকবে। চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনারও হ্রাস-বৃদ্ধি হবে।'

বরুণ 'এবমস্তু' বলে দেবতাদের অনুরোধ মেনে নিলেন। তখন সকলে মিলে তাঁকে জলের রাজা করে তাঁর অভিষেক ও পূজা করলেন। তারপর তাঁরা নিজ নিজ ধামে গমন করলেন। তারপর ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রক্ষা করেন, তেমনই বরুণও নদী, নদ, সরোবর ও সমুদ্রগুলিকে রক্ষা করতে লাগলেন।

বলরাম সেই তীর্থে পৌঁছে স্নান ও ব্রাহ্মণদের দান করে সেখান থেকে অগ্নিতীর্থে গেলেন। সেখানে শমীর মধ্যে লুকিয়ে থাকায় অগ্নিদেবকে কেউ দেখতে পেত না। জগতের প্রকাশ নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত দেবতা ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন— 'প্রভু ! ভগবান অগ্নিদেবকে দেখা যাচ্ছে না, এর কারণ কী ? এমন না হয় যে অগ্নির অভাবে সমস্ত প্রাণী বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং আপনি অগ্নিদেবকে প্রকাশিত করুন।'

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'সমগ্র জগতের উৎপন্নকারী ভগবান অগ্নি কেন অদৃশ্য হয়েছিলেন ? দেবতারা কীকরে তাঁর সন্ধান পেলেন। আমাকে ঠিকমতো সব বলুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি ভৃগু অগ্নিদেবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি ভীত হয়ে শমীর মধ্যে লুকিয়েছিলেন। তিনি অদৃশ্য হলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা দুঃখিত হৃদয়ে তাঁকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। অনুসন্ধান করতে করতে তাঁরা অগ্নিতীর্থে এসে অগ্নিদেবকে শমীর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখলেন। তাঁকে পেয়ে সকলেই প্রসন্ন চিত্ত হলেন। তাঁরা যেমন এসেছিলেন, সেইভাবেই ফিরে গেলেন। অগ্নিদেব ব্রহ্মবাদী ভৃগুর শাপে সর্বভুক হয়ে উঠলেন। তারপর সেই তীর্থে স্নান করে তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। পূর্বে ব্রহ্মা ও সব দেবতাদের সঙ্গে অগ্নিতীর্থে অবগাহন করেছিলেন এবং এখানে বিভিন্ন দেবতাদের তীর্থ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন।

বলরাম এখানে স্নান-দান করে কৌবের তীর্থে গেলেন, যেখানে ভয়ানক তপস্যা করে কুবের ধনের

দেবতা হয়েছিলেন। কৌবের তীর্থে স্নান করে বলরাম ব্রাহ্মণদের ধনদান করলেন ; পরে কুবেরবন দর্শন করলেন, এখানেই কুবের তপস্যা করেছিলেন। যক্ষরাজা এখানে অনেক বরলাভ করেছিলেন। ধনের প্রভুত্ব, শংকর ভগবানের সঙ্গে মিত্রতা, দেবত্ব, লোকপালত্ব এবং নলকুবেরের ন্যায় পুত্র—সব কিছু কুবের এইস্থানে তপস্যা করেই লাভ করেছিলেন। এখানেই মরুদ্গণ একত্রিত হয়ে কুবেরকে লোকপাল পদে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে যক্ষরাজ্য ও হংস সমন্বিত পুষ্পক বিমান প্রদান করেছিলেন। বলরাম এখানে স্নান করে বহু দান করলেন। তারপর তিনি গেলেন বদরপাচন নামক তীর্থে। পূর্বে এইস্থানে ভরদ্বাজের অনুপম রূপবতী কন্যা শ্রুতাবতী ইন্দ্রকে পতিরূপে লাভ করার জন্য উগ্র তপস্যা করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্যসহ বহু কঠোর নিয়ম পালন করেছিলেন। শ্রুতাবতীর সদাচার, তপস্যা ও ভক্তি দেখে ইন্দ্র তাঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'শুভে ! আমি তোমার তপস্যা, নিয়মপালন এবং ভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে এবং এই শরীর ত্যাগ করে তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গলোকে নিবাস করবে।' মহাভাগে ! এই পবিত্র তীর্থে অরুন্ধতীসহ সপ্তর্ষি নিবাস করতেন। এক দিন তাঁরা অরুন্ধতীকে এখানে একাকী রেখে ফলমূল আহরণের জন্য হিমালয়ে চলে যান। সেই সময় দ্বাদশ বৎসর বর্ষা হয়নি। ঋষিগণ সেখানে কিছু না পাওয়ায় আশ্রম করে থাকতে লাগলেন। এদিকে কল্যাণী অরুন্ধতী নিরন্তর তপস্যায় রত ছিলেন। তাঁকে কঠোর নিয়ম পালন করতে দেখে বরদায়ক ভগবান শংকর সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণের রূপধারণ করে সেখানে এসে বললেন—'কল্যাণী, আমাকে ভিক্ষা দাও।' অরুন্ধতী বললেন—'বিপ্রবর ! অন্ন শেষ হয়ে গেছে, অল্প কুল আছে, এগুলি খেয়ে নিন।' মহাদেব বললেন—'শুভে ! এগুলি রান্না করে দাও।' তাঁর কথায় অরুন্ধতী ব্রাহ্মণকে খুশি করবার জন্য সেই ফলগুলি আগুনে রান্না করতে লাগলেন। সেই সময় তিনি পরম পবিত্র, মনোহর এবং দিব্য এক উপাখ্যান শুনতে পেলেন। তিনি না খেয়ে সেই কুল রান্না করতে করতে সেটি শুনতে লাগলেন ; তারপরে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী সেই ভয়ংকর অনাবৃষ্টির কাল শেষ হয়ে গেল। সেই ভয়ানক সময় তাঁর কাছে এক দিনের মতো প্রতীত হল। সপ্তর্ষিরাও ফল নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছলেন। ভগবান তখন প্রসন্ন হয়ে বললেন—'ধর্মজ্ঞা দেবী, এখন তুমি আগের মতো ঋষিদের সেবা করো। তোমার তপস্যা ও নিয়ম পালন দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।'

এই বলে ভগবান শংকর তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করলেন এবং ঋষিদের তাঁর মহত্ত্বপূর্ণ আচরণের বর্ণনা করে বললেন—'মুনিগণ ! তোমরা হিমালয়ের গুহায় থেকে যে তপ করেছ এবং অরুন্ধতী এখানে থেকে যে তপস্যা করেছে, এই দুটির কোনো তুলনা হয় না। অরুন্ধতীর তপস্যাই শ্রেষ্ঠ। সে দ্বাদশবর্ষ ধরে অনাহারে থেকে কুল রান্না করতে করতে দুষ্কর তপস্যা করেছে।' তারপর তিনি অরুন্ধতীকে বললেন—'কল্যাণী ! তোমার যা ইচ্ছা হয় বর প্রার্থনা করো।' অরুন্ধতী বললেন—'ভগবান ! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই স্থান যেন 'বদরপাচন' নামক তীর্থ হয় এবং সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের যেন এই স্থান অত্যন্ত প্রিয় হয়। যে ব্যক্তি এখানে পবিত্রভাবে তিন রাত্রি বাস করবে ও উপবাস করবে, তার যেন দ্বাদশবৎসর ব্যাপী তীর্থ সেবন এবং উপবাস করবার ফল লাভ হয়।'

ভগবান শংকর 'এবমস্তু' বলে বর প্রদান করলেন, পরে সপ্তর্ষিদের স্তুতিগান শুনে নিজ ধামে গমন করলেন। অরুন্ধতী এত বছর না খেয়ে থাকলেও ক্লান্ত হননি এবং তাঁর মুখেও কোনো শীর্ণ ভাব ছিল না। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে ঋষিগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন।

অরুন্ধতী এইভাবে এইস্থানে পরমসিদ্ধি লাভ করেন, তুমিও আমার জন্য অরুন্ধতীর মতোই উত্তম ব্রত পালন করেছ। আমি তোমার নিয়মে সন্তুষ্ট হয়ে এই তীর্থের সম্বন্ধে এক বিশেষ বরপ্রদান করছি—যে ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করে একাগ্রচিত্তে এক রাতও এখানে বাস করবে, সে দেহত্যাগ করে দুর্লভ লোকে যাবে।

বৈশম্পায়ন বললেন—পবিত্র চরিত্র শ্রুতাবতীকে এই বলে ইন্দ্র স্বর্গে চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার পর পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল, দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল, সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হল। শ্রুতাবতীও তখন দেহত্যাগ করে স্বর্গে গেলেন এবং ইন্দ্রপত্নীরূপে বিরাজমান হলেন। বলরাম সেই বদরপাচন তীর্থে স্নান ও দান করে ইন্দ্রতীর্থে চলে গেলেন।

ইন্দ্রতীর্থ ও আদিত্য তীর্থের মহিমা, দেবল-জৈগীষব্য মুনি এবং বৃদ্ধকন্যা ক্ষেত্রের কথা

বৈশম্পায়ন বললেন—ইন্দ্রতীর্থে গিয়ে বলরাম বিধিমতো স্নান করে ব্রাহ্মণদের ধন ও বস্ত্র প্রদান করলেন। ইন্দ্রতীর্থে দেবরাজ একশত যজ্ঞ করেছিলেন, বৃহস্পতি তাতে বহু ধন দিয়েছিলেন, বহুপ্রকার দক্ষিণা ও দান করা হয়েছিল। এইভাবে শত যজ্ঞ পূর্ণ করায় ইন্দ্র 'শতক্রতু' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর নামেই এই পরম পবিত্র, কল্যাণকারী এবং সনাতন তীর্থ 'ইন্দ্রতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেখানে স্নান দান করার পর বলরাম রামতীর্থে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে পরশুরাম অনেক বার ক্ষত্রিয় বধ করে পৃথিবী বিজয় করেছিলেন আর কশ্যপ মুনিকে আচার্য করে বাজপেয় এবং একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সসাগরা পৃথিবী দক্ষিণারূপে দান করে বনে চলে গিয়েছিলেন। সেই পাবন তীর্থে বসবাসকারী মুনিদের সাদর প্রণাম করে বরুণ সেখানে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, বলরাম সেই যমুনাতীর্থে এলেন। সেই স্থানে ঋষিদের পূজা করে তিনি সকলকে সন্তুষ্ট করেন এবং অন্য যাজকদেরও তাদের ইচ্ছানুসারে দান দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। তারপর তিনি আদিত্য তীর্থে গেলেন, যেখানে ভগবান সূর্য পরমাত্মার পূজা করে জ্যোতির আধিপত্য ও অনুপম প্রভাব লাভ করেছিলেন। এছাড়াও ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, দ্বৈপায়ন ব্যাস, শুকদেব এবং আরও অনেক যোগসিদ্ধ মহাত্মা ও সরস্বতীর সেই পবিত্র তীর্থে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

পূর্বে দেবল মুনি এখানে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং তপস্বী ছিলেন। কায়মনোবাক্যে তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাব রাখতেন। ক্রোধ তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। তাঁর কেউ নিন্দা করুক বা প্রশংসা তিনি সবই সমানভাবে গ্রহণ করতেন, অনুকূল বা প্রতিকূল বস্তু প্রাপ্তি হলেও তাঁর মনোভাব এক প্রকারই থাকত। তিনি ধর্মরাজের মতোই সমদর্শী ছিলেন। সোনা ও মাটিকে সমান চোখে দেখতেন। দেবতা, অতিথি এবং ব্রাহ্মণদের সর্বদা পূজা করতেন এবং প্রত্যহ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করে ধর্মাচরণে ব্যাপৃত থাকতেন।

এক সময় জৈগীষব্য মুনি সেই তীর্থে এসে যোগশক্তির দ্বারা ভিক্ষুকের বেশ ধরে দেবলের আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। মহর্ষি জৈগীষব্য যোগসিদ্ধ ছিলেন এবং সর্বদা যোগেতে অবস্থান করতেন। জৈগীষব্য দেবলের আশ্রমে থাকলেও দেবল মুনি তাঁর সামনে যোগ-সাধনা করতেন না। এইভাবে দুজনে একত্রে বহুদিন থাকলেন।

তারপর কিছুদিন এমন হল যে জৈগীষব্য মুনিকে সবসময় দেখা যেত না, তিনি শুধু আহারের সময় দেবলের আশ্রমে আসতেন। তখন দেবল তাঁর শক্তি অনুযায়ী শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে তাঁর পূজা এবং অতিথি সৎকার করতেন, এইভাবেও বহুদিন গেল। একদিন জৈগীষব্য মুনিকে দেখে দেবলের মনে চিন্তার উদয় হল, তিনি ভাবলেন 'বহু দিন ধরে আমি এঁর পূজা করছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ভিক্ষু আমাকে কোনো কিছু জানাননি।'

এইভাবে তিনি হাতে কলশি নিয়ে আকাশপথে সমুদ্রের দিকে গেলেন। গিয়ে দেখলেন ভিক্ষু ভদ্রলোক আগেই সেখানে পৌঁছেছেন। তখন দেবল মুনি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যান্বিতও হলেন, তিনি ভাবলেন—'ইনি আমার আগে কী করে এলেন? এঁর তো স্নানও হয়ে গেছে!' মহর্ষি দেবলও স্নান এবং গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করলেন। নিত্য-কর্ম সমাপ্ত করে তিনি আবার আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। আশ্রমে এসে দেখলেন জৈগীষব্য সেখানে বসে আছেন। তখন দেবল মুনি আবার চিন্তাগ্রস্ত হলেন—'এঁকে তো সমুদ্রের ধারে দেখে এলাম, ইনি আশ্রমে কখন আর কীভাবে এলেন?'

এই ভেবে তাঁর জৈগীষব্যকে ঠিকমতো জানার ইচ্ছা হল। আশ্রমে এসে তিনি আকাশ মার্গে প্রস্থান করলেন। সেখানে তিনি অন্তরীক্ষচারী অনেক সিদ্ধকে দর্শন করলেন, সেইসঙ্গে মহর্ষি দেবল দেখলেন জৈগীষব্য মুনি সিদ্ধগণের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। তারপর তাঁকে স্বর্গলোকে যেতে দেখলেন, সেখান থেকে পিতৃলোকে, যমলোকে, চন্দ্রলোকে এবং চন্দ্রলোক থেকে একান্তে যজ্ঞকারী অগ্নিহোত্রীদের উত্তম লোকে গমন করতে দেখলেন। এইভাবে দর্শ-পৌর্ণমাস যজ্ঞকারী লোকে এবং অন্য বহু লোকেও তাঁকে যেতে দেখা গেল। রুদ্র, বসু এবং বৃহস্পতির স্থানেও তাঁকে পৌঁছতে দেখা গেল।

তারপর তিনি পতিব্রতাদের লোকে গিয়ে অন্তর্হিত হলেন, দেবল মুনি তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। তিনি তখন জৈগীষব্যের প্রভাব, ব্রত এবং অনুপম যোগসিদ্ধির

বিষয়ে চিন্তা করে সিদ্ধদের জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাতেজস্বী জৈগীষব্যকে দেখতে পাচ্ছি না, আপনারা বলবেন, তিনি কোথায় ?' সিদ্ধরা বললেন—'দেবল ! জৈগীষব্য ব্রহ্মলোকে গমন করেছেন, সেখানে তোমার গতি নেই।'

সিদ্ধদের কথা শুনে দেবল মুনি ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন। আশ্রমে পৌঁছে তিনি দেখলেন জৈগীষব্য মুনি আগে থেকে আশ্রমে এসে বসে আছেন। দেবল মুনি তাঁর তপ ও যোগের প্রভাব দেখেছিলেন, তাই নিজের ধর্মযুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন ; তারপর বিনয়ের সঙ্গে তিনি মুনির শরণাগত হয়ে বললেন—'ভগবান ! আমি মোক্ষধর্ম গ্রহণ করতে চাই।' তাঁর কথা শুনে এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত জেনে জৈগীষব্য তাঁকে জ্ঞান উপদেশ দিলেন, সেই সঙ্গে যোগের নিয়ম জানিয়ে শাস্ত্র অনুসারে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কেও উপদেশ দিলেন।

মুনিবর দেবলও গার্হস্থ্য-ধর্ম পরিত্যাগ করে মোক্ষধর্ম আপন করে নিলেন এবং পরা সিদ্ধি এবং পরম যোগ প্রাপ্ত হলেন। রাজা জনমেজয় ! জৈগীষব্য এবং দেবল দুজনের আশ্রম যেখানে ছিল, সেই উত্তম স্থানই তীর্থ হয়ে উঠল। বলরাম সেই তীর্থে স্নান করে ব্রাহ্মণদের দান করে অন্যান্য ধার্মিক কাজ সম্পন্ন করে সেখান থেকে গেলেন সারস্বত তীর্থে। এইস্থানে পূর্বে যখন দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময় সরস্বতীর পুত্র সারস্বত মুনি ব্রাহ্মণদের বেদ পড়িয়েছিলেন। সারস্বত মুনির নামে প্রসিদ্ধ এই তীর্থে দান করে বলরাম সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে যেখানে বৃদ্ধকন্যা তপস্যা করেছিলেন, সেই বিখ্যাত তীর্থে গিয়ে পৌঁছলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! পুরাকালে কুমারী কী উদ্দেশ্যে তপস্যা করেছিলেন এবং তপস্যায় কোন নিয়মাদি পালন করেছিলেন ? কেভাবে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—'রাজন্ ! প্রাচীন কালে 'কুণিগর্গ' নামে এক মহাযশস্বী ঋষি ছিলেন ; তিনি ভীষণ তপস্যা করে নিজ তেজ বলে এক সুন্দরী কন্যা উৎপন্ন করেন। কন্যাকে দেখে মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কিছুকাল পরে তিনি দেহত্যাগ করে স্বর্গে গেলেন। তখন আশ্রমের ভার সেই কন্যার ওপর পড়ল। তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে, উগ্র তপস্যায় নিমগ্ন থেকে ও নিত্য উপবাস করে পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পূজা করতে লাগলেন। এইভাবে উগ্র তপস্যায় তাঁর বহুকাল কেটে গেল, তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গেলেন। তখন তিনি পরলোক গমনের কথা চিন্তা করলেন। তাঁর দেহত্যাগের ইচ্ছা দেখে নারদ এসে বললেন—'দেবী ! তোমার তো এখনও বিবাহ সংস্কার হয়নি, তাহলে তুমি কী করে উত্তম লোক পাবে ? আমি দেবলোকে এই কথা শুনেছি। তুমি তপস্যা অনেক করেছ, কিন্তু উত্তম লোকের অধিকার লাভ করতে পারনি।'

নারদের কথা শুনে কন্যা ঋষিদের সভায় গিয়ে বললেন—'যে আমাকে বিবাহ করবে, আমি তাকে আমার তপস্যার অর্ধাংশ প্রদান করব।' তাঁর কথা শুনে গালবের পুত্র শৃঙ্গবান বললেন—'কল্যাণী ! আমি এই শর্তে তোমার পাণিগ্রহণ করব, যে বিবাহের পর তুমি একরাত্রি আমার সঙ্গে থাকবে।'

বৃদ্ধা কুমারী তাতে রাজি হয়ে মুনিকে পতি রূপে গ্রহণ করলেন। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে গালবনন্দনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সংস্কার হল। রাত্রিকালে তিনি সুন্দরী তরুণীর রূপধারণ করে মুনির কাছে গেলেন। দিব্য অঙ্গরাগের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। তাঁকে দেখে শৃঙ্গবান ঋষি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি এক রাত তাঁর সঙ্গে কাটালেন। প্রভাত হতেই কন্যা মুনিকে বললেন—'বিপ্রবর ! আপনি যে শর্ত করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনার সঙ্গে থেকেছি, এখন অনুমতি দিন, আমি যাই।'

এই বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। যেতে যেতে তিনি আবার বললেন—'যে ব্যক্তি একাগ্র চিত্তে দেবতাদের তৃপ্ত করে এই তীর্থে এক রাত নিবাস করবে, তার আটান্ন বছর ধরে ব্রহ্মচর্য পালন করার ফল প্রাপ্ত হবে।' এই বলে সেই সাধ্বী দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন, মুনি তাঁর দিব্যরূপ চিন্তা করে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি কন্যার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁর তপস্যার অর্ধভাগ পেলেন এবং সিদ্ধ হয়ে কন্যার পথ অনুসরণ করলেন। রাজন্ ! বৃদ্ধকন্যার এই হল পরিচয়, যা আমি জানালাম। বলরাম এই তীর্থে এসে শল্যের মৃত্যুসংবাদ পেলেন। এখানেও তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করলেন। তারপর সমন্তপঞ্চক দ্বার দিয়ে বহির্গত হয়ে তিনি ঋষিদের কুরুক্ষেত্র-সেবনের ফল জিজ্ঞাসা করলেন। তখন মহাত্মারা যথাযথভাবে বলরামকে সেই ক্ষেত্র সেবনের ফল জানালেন।

সমন্তপঞ্চক তীর্থের (কুরুক্ষেত্রের) মহিমা এবং নারদের কথায় বলরামের ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ দেখতে যাওয়া

ঋষিগণ বললেন—'বলরাম ! সমন্তপঞ্চক সনাতন ক্ষেত্র, একে প্রজাপতির উত্তর বেদী বলা হয়। প্রাচীন কালে দেবতাগণ এখানে অনেক বড় যজ্ঞ করেছিলেন এবং বুদ্ধিমান মহাত্মা কুরু পূর্বে এখানে বহু বছর ধরে ক্ষেত্রের জমি চাষ করেছিলেন, তাই তাঁর নামেই এই স্থান 'কুরুক্ষেত্র' নামে খ্যাত।'

বলরাম জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবরগণ ! মহাত্মা কুরু এই ক্ষেত্রে কেন হাল চালিয়েছিলেন ?'

ঋষিগণ বললেন—'বলরাম ! পূর্বে রাজা কুরু যখন সকালে এখানে হাল চাষ করতেন, তখনকার কথা। ইন্দ্র তখন স্বর্গ থেকে এসে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! আপনি কেন এই কষ্ট করছেন ? কোন অভিপ্রায়ে আপনি জমি চাষ করছেন ?' কুরু বললেন—'ইন্দ্র ! যারা এই ক্ষেত্রে মারা যাবে, তারা পুণ্যবানদের লোকে যাবে।'

এই জবাব শুনে ইন্দ্রের হাসি পেল, তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাতে রাজর্ষি কুরুর উৎসাহ কমল না, তিনি সেখানে জমি চাষ করতেই লাগলেন। ইন্দ্র কয়েকবার তাঁকে প্রশ্ন করেও একই উত্তর পেয়ে ফিরে গেলেন। কুরুও কঠোর তপস্যা সহকারে হালকর্ষণ করতে লাগলেন। ইন্দ্র তখন তাঁর মনের কথা অন্য দেবতাদের জানালেন। দেবতারা সেকথা শুনে বললেন—'সম্ভব হলে রাজর্ষিকে বরপ্রদান করে এই কাজে বিরত করুন। নাহলে তিনি তাঁর কার্যে সফল হলে মানুষ যজ্ঞ না করেই যখন স্বর্গে আসতে থাকবে তখন আমাদের যজ্ঞভাগ নষ্ট হয়ে যাবে।'

তখন ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে বললেন—'রাজন্ ! আপনি আর কষ্ট করবেন না, আমার কথা শুনুন ; আমি বর দিচ্ছি, যে মানুষ অথবা পশু এখানে অনাহারে থেকে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে, সে স্বর্গের অধিকারী হবে।' রাজা কুরু 'ঠিক আছে' বলে ইন্দ্রের আদেশ মেনে নিলেন, ইন্দ্রও রাজার অনুমতি নিয়ে প্রসন্ন মনে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

বলরাম ! রাজর্ষি কুরু এই শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে এই ক্ষেত্র কর্ষণ করেছিলেন। পৃথিবীতে এর থেকে বড় কোনো পবিত্র স্থান নেই। যে ব্যক্তি এখানে তপস্যা করবে, সে দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে যাবে, যে দান করবে, সে তার দান করা বস্তুর হাজার গুণ ফিরে পাবে। যে সর্বদা নিবাস করবে, তাকে যমালয়ে যেতে হবে না। যদি কোনো রাজা এখানে বড় যজ্ঞ করে, তাহলে যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন তার স্বর্গে থাকার সৌভাগ্য লাভ হবে। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও কুরুক্ষেত্রের বিষয়ে এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন যে—'কুরুক্ষেত্রের ধুলা যদি হাওয়ায় উড়ে কোনো পাপীর দেহে পড়ে, তাহলে তার উত্তমলোকে গতি হবে। এইস্থানে বড় বড় দেবতা, উত্তম ব্রাহ্মণ এবং রাজারাও যজ্ঞ করে উত্তমগতি লাভ করেছেন। তরন্তুক থেকে নিয়ে আরন্তুক পর্যন্ত এবং রামহ্রদ থেকে আরম্ভ করে মচক্রুক পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানই হল কুরুক্ষেত্র এবং সমন্তপঞ্চক তীর্থ। একে প্রজাপতির উত্তর বেদীও বলা হয়। এই ক্ষেত্র অত্যন্ত পবিত্র এবং কল্যাণকর, দেবতারাও এর সম্মান করেন। এটি সকল শুভগুণসম্পন্ন ; তাই এখানে মৃত সব ক্ষত্রিয় অক্ষয়গতি প্রাপ্ত হন।' সাক্ষাৎ ইন্দ্র এই কথা বলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবতা একথা সমর্থন করেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—বলরাম তখন কুরুক্ষেত্র দর্শন ও বহু ধন দান করে এক দিব্য আশ্রমে গেলেন। সেখানে তিনি মুনিদের জিজ্ঞাসা করলেন—'এই সুন্দর আশ্রম কার ?' তাঁরা বললেন—'বলরাম ! প্রথমে এখানে ভগবান বিষ্ণু তপস্যা করেছিলেন, তারপর অক্ষয় ফল প্রদানকারী বহু যজ্ঞ এই আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাল্যকাল থেকে ব্রহ্মচর্য পালনকারী এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণীও এখানে তপস্যা করেছেন, তিনি শাণ্ডিল্য মুনির কন্যা।'

ঋষিদের কথা শুনে বলরাম তাঁকে প্রণাম করে হিমালয়ের নিকট অবস্থিত সেই আশ্রমে গেলেন। সেখানকার উত্তম তীর্থ এবং সরস্বতীর উদ্গমভূত স্রোত দর্শন করে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর কারপবন তীর্থে গিয়ে সেখানকার স্বচ্ছ, শীতল, পবিত্র জলে অবগাহন করে এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করে ব্রাহ্মণদের দান করলেন। পরে এক রাত্রি সেখানে বাস

করে তিনি ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে গেলেন, সেটি যমুনার তীরে অবস্থিত। সেইস্থানে এসে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্যমা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। বলরাম সেখানে স্নান-দান করে ঋষি ও সিদ্ধগণের সঙ্গে বসে উত্তম বাক্য শ্রবণ করলেন।

সেই সময় নারদ দণ্ড, কমণ্ডলু ও বীণা হাতে সেখানে এলেন। বলরাম তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বিধিমতো পূজা

করে, তাঁর কাছে কৌরবদের কথা জানতে চাইলেন। নারদ, যেভাবে কৌরবদের মহাসংহার হয়েছিল, তা আনুপূর্বিক জানালেন। তখন বলরাম দুঃখিত হয়ে বললেন—'তপোধন ! এখন সেখানকার কী অবস্থা, সেখানে যে রাজারা এসেছিলেন তাঁদেরই বা কী দশা হয়েছে ? যদিও এ কথা আমি আগেই সংক্ষেপে শুনেছি, এখন সেখানকার খবর বিস্তারিতভাবে জানার জন্য উৎকণ্ঠা হচ্ছে।'

নারদ বললেন—'ভীষ্ম তো আগেই শরশয্যায় শায়িত। তাঁর পরে দ্রোণাচার্য, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং তার পুত্র পরলোক গমন করে। ভূরিশ্রবা, শল্য এবং অন্যান্য মহাবলী রাজাদেরও সেই অবস্থা হয়। এই সব রাজা দুর্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত নিজেদের প্রাণ বলিদান করেছে। এখন যারা বেঁচে আছে, তাদের নাম শুনুন। দুর্যোধনের সেনাদলে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা—এই তিন প্রধান বীর জীবিত। শল্য মারা গেলে এঁরাও প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পালিয়ে এসে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে আছে। মায়াদ্বারা সরোবরের জল বন্ধ করে সে তার মধ্যে শুয়ে ছিল। ইতিমধ্যে পাণ্ডবরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে কটুবাক্যের দ্বারা দুর্যোধনকে মনে দুঃখ দিতে লাগলেন। তিনিও শক্তিশালী, অতএব কটুবাক্য কেন সহ্য করবেন ! হাতে গদা নিয়ে উঠে ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। এবার দুজনের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হবে। আপনি যদি আগ্রহী থাকেন, তাহলে বিলম্ব না করে চলুন, আপনার দুই শিষ্যের গদা-যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—নারদের কথা শুনে বলরাম তাঁর সঙ্গে আগত ব্রাহ্মণদের পূজা করে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং সেবকদের দ্বারকায় যাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি তারপর সরস্বতীর উদ্গম স্থান পর্বত শিখর থেকে নেমে তীর্থের মহান ফল শুনে ব্রাহ্মণদের কাছে তার মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন—'সরস্বতী তীরে বাস করে যে সুখ ও আনন্দ তা অন্যত্র কোথায় পাবে ? সরস্বতীর সেবা করে স্বর্গে যাওয়া মানুষ, সদাই তাঁকে স্মরণ করেন। সরস্বতী সব থেকে পবিত্র নদী, জগতের কল্যাণকারী, সরস্বতীকে পেয়ে মানুষ ইহলোক ও পরলোকে পাপের জন্য শোক করে না।'

তারপর বারংবার সরস্বতীকে দেখতে দেখতে বলরাম সুন্দর রথে আরোহণ করে শিষ্যদের গদাযুদ্ধ দেখার জন্য অতি শীঘ্র দ্বৈপায়ন হ্রদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

বলরামের পরামর্শে সকলের সমন্তপঞ্চক গমন এবং ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ শুরু

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্র সেই ভয়ংকর যুদ্ধের কথা শুনে ব্যথিত হৃদয়ে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সূত ! গদাযুদ্ধের সময় বলরামকে উপস্থিত দেখে আমার পুত্র ভীমসেনের সঙ্গে কেমনভাবে যুদ্ধ করল ?'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! বলরামকে সেখানে উপস্থিত হতে দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত খুশি হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে দেখে দণ্ডায়মান হলেন এবং প্রসন্ন ভাবে তাঁর পূজা করে বসার আসন দিয়ে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। বলরাম তাঁকে বললেন—'রাজন্ ! আমি ঋষিদের কাছে শুনেছি এই কুরুক্ষেত্র অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ। এটি স্বর্গ প্রদানকারী, দেবতা, ঋষি, মহাত্মা, ব্রাহ্মণ সর্বদা তাঁর সেবা করেন, এখানে যুদ্ধে প্রাণত্যাগকারী ব্যক্তি অবশ্যই স্বর্গে ইন্দ্রের সঙ্গে কালযাপন করেন। সুতরাং আমরা এখান থেকে সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে যাব, এটি দেবলোকে প্রজাপতির উত্তর বেদী নামে বিখ্যাত। এটি ত্রিভুবনের অত্যন্ত পবিত্র এবং সনাতন তীর্থ, এখানে যুদ্ধে যার মৃত্যু হয়, সে অবশ্যই স্বর্গলোকে গমন করে।

'ঠিক আছে' বলে যুধিষ্ঠির বলরামের আদেশ মেনে নিলেন এবং তাঁরা সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাজা দুর্যোধনও এক বিশাল গদা হস্তে পাণ্ডবদের সঙ্গে পদব্রজে রওনা হলেন। তখন শঙ্খধ্বনি হচ্ছিল, ভেরী বাজছিল এবং যোদ্ধাদের সিংহনাদে সমস্ত দিক ভরে গিয়েছিল। তাঁরা সকলে কুরুক্ষেত্রের সীমানায় এলেন এবং পশ্চিম দিকে এগিয়ে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এক উত্তমতীর্থে পৌঁছলেন। সেই স্থান তাঁরা গদাযুদ্ধের জন্য নির্বাচন করলেন।

তখন ভীম বর্ম পরে হাতে বিশাল গদা নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুর্যোধনও স্বর্ণমণ্ডিত বর্ম পরে ভীমের সামনে দণ্ডায়মান হলেন। দুই ভাই ক্রোধভরে একে অপরকে দেখতে লাগলেন। দুর্যোধনের চোখ ক্রোধে লাল হয়েছিল। তিনি ভীমসেনের দিকে তাকিয়ে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। ভীমও গদা উঁচিয়ে দুর্যোধনকে আহ্বান করলেন। দুজনেই প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, দুজনেই অত্যন্ত

পরাক্রমশালী। তাঁদের দুজনকে তখন রাম-রাবণ অথবা বালি-সুগ্রীবের মতো মনে হচ্ছিল।

দুর্যোধন তখন কেকয়, সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং নিজের ভাইদের সঙ্গে দণ্ডায়মান যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'ভীমসেনের সঙ্গে আমার যে যুদ্ধ স্থির হয়েছে, আপনারা কাছে বসে তা প্রত্যক্ষ করুন।' দুর্যোধনের এই কথা সকলেরই পছন্দ হল। সকলে তখন বসলেন। চারদিকে রাজারা বসলেন, মধ্যখানে ভগবান বলরাম বিরাজমান হলেন ; কারণ সকলেই তাঁকে সম্মান করতেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—এই প্রসঙ্গ শুনে ধৃতরাষ্ট্রের অত্যন্ত দুঃখ হল, তিনি সঞ্জয়কে বললেন—'সূত ! যার পরিণাম এত দুঃখদায়ক হয়, সেই মানবজন্মকে ধিক্ ! আমার পুত্র একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিল, সে সমস্ত রাজাদের আদেশ দিত, সমগ্র পৃথিবী সে একাকী উপভোগ করেছে, কিন্তু অবশেষে এমন অবস্থা হল যে গদা হাতে নিয়ে তাকে পদব্রজে যুদ্ধে যেতে হল। একে প্রারব্ধ (ভাগ্যের পরিহাস) ভিন্ন আর কীই-বা বলা যায় ?'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনার পুত্র মেঘের ন্যায়

গর্জন করে যখন ভীমকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন, সেইসময় ভয়ানক উৎপাত শুরু হল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, ভীষণ ঝড় বইতে লাগল। ধুলোর ঝড় উঠল, চার দিক অন্ধকারে ভরে গেল। আকাশ থেকে শত শত উল্কাবৃষ্টি হতে লাগল। অমাবস্যা ছাড়াই সূর্যে যেন গ্রহণ লেগে গেল। বৃক্ষলতাসহ পৃথিবী কম্পিত হল। পর্বত শিখর ভেঙে পড়তে লাগল। কুয়োর জল ওপরে উঠে এল। কাউকে দেখা না গেলেও অনেক মানুষের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

এই সমস্ত অলক্ষণ দেখে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন— 'ভ্রাতা! আপনার হৃদয়ে যে কাঁটা বিঁধে আছে, তা আজ দূর করব। সে আর হস্তিনাপুরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এই দুষ্ট আমার শয্যায় সাপ ফেলেছিল, খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিল, প্রমাণকোটিতে নিয়ে গিয়ে আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, লাক্ষাভবনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল, সভার মধ্যে আমাদের নিয়ে তামাসা করেছিল, সর্বস্ব অপহরণ করেছিল। সেইজন্য আমাদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। আজ সেই সবের প্রতিশোধ নিয়ে আমি সেই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করব। একে বধ করে আমার আত্মার ঋণ শোধ করব। এই দুষ্টের আয়ু পূর্ণ হয়েছে, এখন সে তার পিতা-মাতাকে দর্শন করতে পারবে না। এই কুলকলঙ্ক আজ রাজ্য, লক্ষ্মী এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়বে।'

মহাপরাক্রমী ভীম একথা বলে গদা নিয়ে দুর্যোধনকে আহ্বান করলেন। দুর্যোধনও গদা উত্তোলন করলে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন— 'দুর্যোধন! বারণাবতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুমি যে পাপ করেছ, আজ তা স্মরণ করো। তুমি পূর্ণ সভায় রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে কষ্ট দিয়েছ, কপট পাশা খেলায় তুমি ও শকুনি রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যে প্রতারণা করেছ—আজ তার প্রতিশোধ নেব। আনন্দের ব্যাপার হল যে আজ তুমি সামনে আছ। তোমার জন্যই পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কর্ণ ও শল্যের ন্যায় বীর যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তোমার ভাই রা এবং আরও বহু ক্ষত্রিয় বীর যমলোকে গেছে। সর্বাগ্রে শত্রুতা সৃষ্টিকারী শকুনি এবং দ্রৌপদীকে দুঃখ-প্রদানকারী প্রাতীকামীও নিহত হয়েছে। এখন তুমি শুধু বেঁচে আছ, সুতরাং তোমাকে এই গদার আঘাতে মৃত্যুর পারে পাঠাব—এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

রাজন্! ভীমসেন গর্জন করে এই কথা বললে, তা শুনে আপনার পুত্র স্পর্ধার সঙ্গে জবাব দিলেন— 'বৃকোদর! এতো স্পর্ধায় কাজ কী? চুপ করে গদাযুদ্ধ করো। আজ তোমার যুদ্ধের সমস্ত সাধ মিটিয়ে দেব। দুর্যোধনকে তুমি অন্য সাধারণ লোকের মতো ভেবো না, তোমার মতো লোকের ধমকে আমি ভয় পাই না। তোমার সঙ্গে গদাযুদ্ধ করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের, আমার সৌভাগ্য যে আজ দেবতারা তা পূর্ণ করেছেন। এখন বেশি কথায় কোনো লাভ নেই। পরাক্রমের দ্বারা কথার সত্যতা প্রমাণ করো, বিলম্ব কোরো না।'

দুর্যোধনের কথা শুনে সকলে প্রশংসা করলেন, ভীম গদা নিয়ে সবেগে ধাবিত হলেন। দুর্যোধনও গর্জন করে তাঁর সম্মুখীন হলেন। তারপর দুজনে মত্ত হস্তীর মতো যুদ্ধ করতে লাগলেন। বজ্রপাতের ন্যায় গদার ভয়ংকর আওয়াজ হতে লাগল। দুজনেই গদাঘাতে রক্তাপ্লুত হয়ে গেলেন। ক্রমাগত গদাযুদ্ধ করতে করতে উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তাই একটু বিশ্রাম করলেন। তারপর আবার যুদ্ধ শুরু করলেন।

ভীম ও দুর্যোধনের ভয়ংকর গদাযুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! দুই ভাই আবার যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন, এবং একে অপরকে বধ করার অবকাশ খুঁজতে লাগলেন। উভয়ের গদা যমদণ্ড ও বজ্রের ন্যায় ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। ভীম যখন তাঁর গদা ঘুরিয়ে আঘাত করছিলেন তখন সেই ভয়ংকর ধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে গুঞ্জায়িত হচ্ছিল। দুর্যোধন তাতে অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছিলেন। চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভীমসেনের গদাঘাত করার দৃশ্য অপূর্ব ছিল।

দুজনেই নিজেকে আঘাত থেকে বাঁচাবার নানা কৌশল প্রদর্শন করছিলেন। নানা প্রকার কৌশল করা, শত্রুকে আঘাত করা, শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া, এগিয়ে গিয়ে পেছিয়ে আসা, সবেগে শত্রুকে আঘাত করা, শত্রুর চেষ্টা বিফল করা, সতর্কভাবে দাঁড়ানো, শত্রু সামনে এলে তাকে আক্রমণ করা, প্রহার করার জন্য চার দিকে ঘোরা—ইত্যাদি নানাপ্রকার কৌশলে দুজনে খুবই পটু ছিলেন। দুজনেই একে অপরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছিলেন। এইভাবে তাঁরা ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভয়ংকর যুদ্ধ করছিলেন। দুজনেই নিজ নিজ মণ্ডলে অবস্থান করছিলেন। ডানদিকে ছিলেন দুর্যোধন, বাঁয়ে ভীমসেন। সেই সময় দুর্যোধন ভীমের পাঁজরে গদার আঘাত করলেন, কিন্তু ভীমসেন তা গ্রাহ্য না করে যমদণ্ডের ন্যায় তাঁর গদা তুলে দুর্যোধনকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলেন। দুর্যোধন তখন ভীমসেনকে পুনরায় আঘাত করলেন। গদার আঘাতে ভীষণ শব্দ হচ্ছিল এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছিল।

দুর্যোধন যুদ্ধকৌশলে ভীমসেনের থেকে বেশি দক্ষ বলে প্রতিভাত হচ্ছিলেন। ভীমসেনও বায়ু বেগে গদা চালাচ্ছিলেন, এরমধ্যে আপনার পুত্র কৌশল দেখিয়ে ভীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীমও ক্রোধভরে তাঁর গদায় আঘাত করলেন। দুই গদার আঘাতে ভয়ংকর শব্দ হল, আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল। ভীমসেন সবেগে তাঁর গদা ছুঁড়লেন, গদা মাটিতে পড়তেই মাটি কেঁপে উঠল। দুর্যোধন তখন ভীমসেনের মাথায় গদার আঘাত করলেন, কিন্তু ভীমসেন এতেও ভয় পেলেন না।

তারপর ভীম আপনার পুত্রকে আক্রমণ করলেন, দুর্যোধন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে তাঁর আঘাত বিফল করে দিচ্ছিলেন। লোকেরা এই দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছিল। তিনি তখন ভীমসেনের বুকে গদার আঘাত করলেন, সেই

আঘাতে ভীম মূর্ছিত প্রায় হয়ে পড়লেন, কিছুক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে দুর্যোধনের পাঁজরে তীব্র আঘাত করলেন। সেই আঘাতে ব্যাকুল হয়ে আপনার পুত্র হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে সৃঞ্জয়রা হর্ষধ্বনি করে উঠল। দুর্যোধন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পের মতো গর্জন করতে লাগলেন। তিনি ভীমসেনকে এমনভাবে দেখতে লাগলেন, যেন ভস্ম করে ফেলবেন। তিনি ভীমসেনের মাথা চূর্ণ করার জন্য গদা হাতে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। কাছে গিয়ে তিনি ভীমের কপালে গদার প্রহার করলেন। কিন্তু ভীম অবিচলভাবে পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, সেই আঘাত তাঁকে একটুকুও বিচলিত করতে পারেনি।

তারপর তিনিও দুর্যোধনের ওপর তাঁর লৌহ গদার প্রহার করলেন। সেই আঘাতে আপনার পুত্রের শিরা-উপশিরা দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাই দেখে পাণ্ডবরা হর্ষান্বিত হয়ে সিংহনাদ

করতে লাগলেন। কিন্তু পরে তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং এক সুশিক্ষিত যোদ্ধার ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে সুযোগ বুঝে তিনি সামনে দণ্ডায়মান ভীমসেনকে গদা দিয়ে আঘাত করলেন. সেই আঘাতে ভীমের শরীর শিথিল হয়ে গেল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তা লক্ষ্য করে দুর্যোধন গর্জন করতে লাগলেন। তাঁর গদার প্রাঘাতে ভীমের বর্ম ভেঙে গিয়েছিল। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে পাণ্ডবরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভীমের চেতনা ফিরে এল। তিনি তাঁর রক্তাপ্লুত মুখ মুছে, আস্তে আস্তে চোখ খুললেন এবং ধৈর্য ধরে নিজেকে সংযত করে উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে দেখে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন ! এই দুই বীরের মধ্যে কাকে আপনার শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় ; কার মধ্যে কোন গুণ

বেশি ? আমাকে বলুন।' ভগবান বললেন—'দুজনেই সমানভাবে শিক্ষালাভ করেছে। ভীম অধিক শক্তিশালী কিন্তু অভ্যাস ও কৌশলে দুর্যোধন ভীমের থেকে এগিয়ে। যদি ভীমসেন ন্যায়পূর্বক যুদ্ধ করে, তাহলে সে কখনো জিততে না ; ভীম কপট পাশা খেলার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে যুদ্ধে গদার আঘাতে দুর্যোধনের জঙ্ঘা চূর্ণ করে দেবে। আজ সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত। অর্জুন ! আমি আজ না বলে থাকতে পারছি না যে ধর্মরাজের জন্য পুনরায় এক নতুন সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। বহু চেষ্টা করে ভীষ্মাদি কৌরব বীরদের বধ করে আমরা বিজয় ও যশ প্রাপ্তির দুয়ারে উপস্থিত হয়েছিলাম, কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই বিজয়কে আবার সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। একজনের হারজিতের দ্বারা সকলের হার-জিতের শর্ত করে তিনি যে এই ভয়ংকর যুদ্ধকে পাশার দানে পরিণত করে রেখেছেন, এ তাঁর মস্ত ভুল হয়েছে। দুর্যোধন যুদ্ধের কৌশল জানে, বীর এবং একটি সিদ্ধান্তে অবিচল হয়ে থাকে। এই বিষয়ে শুক্রাচার্য কথিত এক শ্লোক শোনা যায়, যাতে নীতির তত্ত্ব নিহিত. আমি তার ভাবার্থ বলছি—'যুদ্ধে মৃতপ্রায় শত্রু যদি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় এবং আবার যুদ্ধ করতে ফিরে আসে, তাহলে তাকে সভীত (ভয়) করে চলা উচিত ; কারণ সে এক নিশ্চিত সংকল্পে পৌঁছেছে (এই সময় সে মৃত্যুকেও ভয় পায় না)। যে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সাহস করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ইন্দ্রও তার সামনে দাঁড়াতে পারেন না।' দুর্যোধনের সেনা বিনষ্ট হয়েছে, সে পরাস্ত হয়েছিল, রাজ্য পাওয়ার আশা না থাকায় সে বনে চলে যেতে চেয়েছিল। তাই সে পালিয়ে এসে এই সরোবরে লুকিয়ে ছিল। এরূপ হতাশ শত্রুকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে ? এখন আমার দুর্ভাবনা হচ্ছে যে দুর্যোধন না আবার আমাদের পরাজিত করে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়।'

ভীমের প্রহারে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, দুর্যোধনকে ভীমের তিরস্কার এবং যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

সঞ্জয় বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন ভীমসেনকে লক্ষ্য করে নিজের বাম উরুতে সংকেত দিতে লাগলেন। ভীম তাঁর সংকেত বুঝতে পারলেন। তখন তিনি গদা নিয়ে নানা কৌশল দেখাতে দেখাতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য ডাইনে-বাঁয়ে বক্রগতিতে ঘুরতে লাগলেন। আপনার পুত্রও ভীমকে বধ করার জন্য ক্ষিপ্র গতিতে গদা সঞ্চালন করছিলেন। দুজনেই গদা ঘুরিয়ে শত্রুকে শেষ করে দিতে চাইছিলেন। তাঁদের গদার আঘাতে আগুনের ফুলকি ঝরে পড়ছিল। তার থেকে বজ্রপাতের মতো ভয়ানক আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হলে, দুজনেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপরে আবার উঠে গদা হাতে আক্রমণ করছিলেন।

গদার ভয়ংকর আঘাতে দুজনেরই দেহ জর্জরিত হয়েছিল, দুজনেই রক্তাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। অর্জুন ভীমকে যে ইশারা করেছিলেন, দুর্যোধন তা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনি সহসা ভীমের থেকে দূরে সরে গেলেন। যখন তিনি কাছে ছিলেন, সেই সময় ভীম সবেগে তাঁর ওপর গদাঘাত করেন, কিন্তু তিনি ক্ষিপ্র গতিতে সেই স্থান থেকে সরে দাঁড়ান, ফলে গদার আঘাত তাঁর গায়ে না লেগে মাটিতে পড়ে। গদার আঘাত বাঁচিয়ে এবার দুর্যোধন ভীমের ওপর গদার আঘাত করলেন ; ভীমের গভীর আঘাত লাগল। তাঁর শরীর থেকে রক্তের ধারা বইতে লাগল এবং তিনি মূর্ছিত প্রায় হয়ে পড়লেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁর মূর্ছিত হওয়া বুঝতে পারলেন না ; কারণ ভীম অত্যন্ত বেদনা সহ্য করেও অবিচল ছিলেন। দুর্যোধন ভাবলেন এবার ভীম আঘাত করবেন, তাই তিনি আঘাত না করে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভীম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তীব্র বেগে আক্রমণ করলেন। তাঁকে ক্রুদ্ধ হয়ে আসতে দেখে দুর্যোধন তাঁর আঘাত ব্যর্থ করার জন্য ভীমকে বিভ্রান্ত করে ওপরে লাফাতে গেলেন, ভীম তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে গর্জন করে দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুর্যোধন লাফাতে গেলে ভীম তীব্র বেগে তাঁর উরুতে গদা দিয়ে প্রহার করলেন। সেই বজ্রসম গদার আঘাতে আপনার পুত্রের দুটি উরুই ভগ্ন হল এবং তিনি আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলেন।

যিনি একদিন সব রাজাদের সর্বোপরি ছিলেন, সেই বীর দুর্যোধনের পতন হতেই বায়ু ঝড়ের বেগে বইতে লাগল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল। আকাশে যক্ষ, রাক্ষস এবং পিশাচদের কোলাহল শোনা গেল। কবন্ধেরা নাচতে লাগল। কুয়ো এবং সরোবর থেকে রক্তপ্রবাহ হতে দেখা গেল, নদী উজানে বইতে লাগল। নারীদের মধ্যে পুরুষ-ভাব ও পুরুষদের নারীভাব পরিলক্ষিত হল। এইরূপ নানাপ্রকার অদ্ভুত উৎপাত দেখা যেতে লাগল। দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণেরা আপনার পুত্রের অদ্ভুত সংগ্রামের আলোচনা করতে করতে ফিরে গেলেন।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনার পুত্রকে এইভাবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে পাণ্ডব এবং সোমকরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তখন প্রতাপশালী ভীমসেন দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বললেন—'ওরে মূর্খ ! পূর্বে পরিপূর্ণ সভাগৃহে তুমি একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে নিয়ে যে তামাসা করেছিলে এবং আমাদের বলদ বলে অপমানিত করেছিলে, সেই উপহাসের ফল আজ ভোগ কর।' এই বলে বামপাদ দ্বারা তাঁর মুকুটটি ফেলে তাঁর মাথা পা দিয়ে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন—'আমরা শত্রুকে পরাজিত করার জন্য কোনো ছলনার আশ্রয় নিইনি, আগুনে পোড়াবার চেষ্টা করিনি, কপট পাশা খেলিনি বা কোনো প্রতারণা করিনি, শুধু নিজের বাহুবলের সাহায্যে শত্রুদের শায়েস্তা করেছি।'

ভীমসেন এই কথা বলে হাসলেন ; তারপর যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং সৃঞ্জয়বীরদের ধীরে ধীরে বললেন—'আপনারা দেখেছেন তো ? যারা রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে রাজসভার মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিল, যারা তাঁকে বেআব্রু করার চেষ্টা করেছিল, সেইসব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পাণ্ডবদের হাতে নিহত হয়েছে। এ সবই দ্রুপদকুমারীর তপস্যার ফল। যারা আমাদের সারহীন এবং নপুংসক বলেছিল তাদের সকলকেই অনুগ-পরিজনসহ মৃত্যুর পারে পৌঁছে দিয়েছি।

তারপর ভীম দুর্যোধনের কাঁধের ওপর থেকে গদা তুলে তাঁকে কপটাচারী বলে পুনরায় তাঁর মস্তকে পদাঘাত করলেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যবহার ধর্মাত্মা সোমকদের পছন্দ হল না। সেইসময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁকে বললেন— 'ভ্রাতা ভীম ! তুমি তোমার শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছ, তোমার প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ হয়েছে ; এবার শান্ত হও। দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত কোরো না, ধর্ম লঙ্ঘন কোরো না। এই দুর্যোধন একদিন এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিল, কৌরবদের রাজা ছিল, আমাদের আত্মীয় ; সুতরাং একে পদাঘাত করা উচিত নয়। এর ভ্রাতারা এবং মন্ত্রীরা নিহত হয়েছে, সেনা বিনষ্ট হয়েছে এবং নিজেও যুদ্ধে মরণোন্মুখ ; সুতরাং এর অবস্থা

সর্বপ্রকারে শোচনীয়, এ দয়ার পাত্র, একে ব্যঙ্গ করা উচিত নয়। একবার ভাবো ; এর সন্তান বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ; পিণ্ড-জল প্রদান করার কেউ নেই। তাছাড়া এ-তো আমাদেরই ভ্রাতা, এর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা কী উচিত ? একে পদাঘাত করে তুমি উচিত কাজ করনি। ভীম ! লোকে তোমাকে ধার্মিক বলে জানে, তবে তুমি কেন রাজাকে অপমান করছ ?'

ভীমকে এই কথা বলে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে গেলেন এবং শোকার্ত চিত্তে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— 'রাজন্ ! আমাদের ওপর রাগ কোরো না ! নিজের জন্যও শোক কোরো না। কারণ সব প্রাণীকেই তার পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ভয়ংকর ফল ভোগ করতে হয়। তুমি নিজের অপরাধেই এতো বড়ো সংকটে পড়েছ। লোভ, অহংকার এবং মূর্খতার জন্য মিত্র, ভাই, পিতৃব্য, পুত্র, পৌত্রকে বিনাশ করিয়ে শেষে তুমিও মৃত্যুমুখে পতিত হলে। তোমার অপরাধের জন্যই আমাদের তোমার ভ্রাতা, পুত্র, মিত্রদের বধ করতে হল। নিয়তিকে কেউ রদ করতে পারে না। ভ্রাতা ! তোমার নিজ আত্মার জন্য শোক করা উচিত নয়। তোমার মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের মতো উত্তমভাবে হয়েছে, যা সকলে কামনা করে। এখন আমরাই সর্বপ্রকারে শোক করার যোগ্য। কারণ এবার আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ও বন্ধু-বিহনে জীবন কাটাতে হবে। ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রদের স্বামীহারা স্ত্রীরা যখন আমাদের সামনে আসবে, তখন আমরা কীভাবে তাদের দিকে তাকাব ? রাজন্ ! তুমি তো স্বর্গের পথ ধরেছ, তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে স্থান পাবে।'

যুধিষ্ঠির এই কথা বলে শোকে অধীর হলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলাপ করতে লাগলেন।

ক্রোধান্বিত বলরামকে শান্ত করে যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! রাজা দুর্যোধন যখন অন্যায় গদাযুদ্ধে পতিত হল, তখন বলরাম কী বললেন ? তিনি তো গদাযুদ্ধ বিশেষজ্ঞ, তিনি নিশ্চয়ই এই অন্যায়ে চুপ করে থাকেননি ; তাহলে তিনি কী বললেন, বলো !'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! ভীমসেন আপনার পুত্রের ঊরুতে আঘাত করলে বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সব রাজাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলতে লাগলেন—

'ভীমসেন ! ধিক্ ! ধিক্, তোমাকে ধিক্কার দিই। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এই যুদ্ধে তুমি নাভির নিম্নস্থ অঙ্গে গদাঘাত করেছ।' আজ ভীম যে অন্যায় করেছে, গদাযুদ্ধে এর আগে কখনো তা হয়নি। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট করা আছে 'গদাযুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত করা উচিত নয়।' কিন্তু এই মূর্খ তার কিছুই জানে না, তাই ইচ্ছামতো কাজ করছে।

তারপর তিনি দুর্যোধনের দিকে তাকালেন, তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর চোখ ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠল ; তিনি আবার বলতে লাগলেন—'কৃষ্ণ ! দুর্যোধন আমার মতোই বলবান, এর সঙ্গে গদাযুদ্ধ করার মতো কোনো যোদ্ধা নেই। আজ অন্যায় যুদ্ধে শুধু দুর্যোধনকেই পরাস্ত করা হয়নি, আমাকেও অপমান করা হয়েছে। শরণাগতের দুর্বলতা দেখে শরণপ্রদানকারীর অপমান করা হচ্ছে।' এই বলে তিনি তাঁর হাল কাঁধে নিয়ে ভীমসেনের দিকে ধাবিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দুহাত দিয়ে বলরামকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে শান্ত করার জন্য বললেন—

'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ! ছয় প্রকারে নিজের উন্নতি হয়—নিজের বৃদ্ধি, শত্রুর ক্ষতি, নিজের মিত্র বৃদ্ধি, শত্রুর মিত্রের ক্ষতি, নিজের মিত্রের মিত্র বৃদ্ধি, শত্রুর মিত্রের মিত্রহানি। নিজের অথবা মিত্রের যখন বিপরীত দশা ঘিরে ধরে, তখন মনে গ্লানি হয়। আপনি জানেন পাণ্ডবরা স্বভাবতই আমাদের মিত্র ; এঁরা বিশুদ্ধ পুরুষার্থের ওপর নির্ভরশীল, পিসিমাতার পুত্র হওয়ায় এঁরা সর্বভাবেই আমাদের আপনজন। শত্রুরা কপটব্যবহার করে এঁদের নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। রাজসভায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে তার গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবে। প্রতিজ্ঞা পালন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, ভীম তারই পালন করেছে। মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে শাপ দিয়েছিলেন যে, 'ভীম গদার আঘাতে তোমার উরুভঙ্গ করবে।' সুতরাং এই ঘটনা অবধারিত ছিল, এতে আমি ভীমের কোনো দোষ দেখছি না। অতএব আপনি শান্ত হন। পিসিমাতা এবং সুভদ্রার জন্য এঁদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয় সম্পর্ক ; তাছাড়া মিত্রও। সুতরাং এঁদের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি। অতএব আপনি ক্রোধ করবেন না।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মজ্ঞ বলরাম বললেন—'সৎপুরুষরা ভালোভাবে ধর্মের আচরণ করেছেন, কিন্তু তা অর্থ ও কাম—এই দুই বস্তু দ্বারা সংকুচিত হয়ে যায়। অত্যন্ত লোভীর অর্থ এবং অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তির কাম—এই দুটিই ধর্মের ক্ষতি করে। যেসব মানুষ কামের দ্বারা ধর্ম ও অর্থকে, অর্থের দ্বারা ধর্ম ও কামকে এবং ধর্মের দ্বারা কাম ও অর্থের ক্ষতি না করে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটিই সেবন করে, তারাই সুখের ভাগী হয়। ভীমসেন ধর্মের হানি করে সেসব কলুষিত করেছে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ভ্রাতা ! জগতে সকলেই আপনাকে ক্রোধরহিত ও ধর্মাত্মা বলে জানেন ; অতএব শান্ত হোন, ক্রোধ করবেন না। স্মরণ করুন, কলিযুগ আসন্ন প্রায়। ভীমের প্রতিজ্ঞার কথাও ভুলবেন না। পাণ্ডবদের শত্রুতা এবং প্রতিজ্ঞার ঋণ থেকে মুক্ত হতে দিন।'

সঞ্জয় বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বলরাম সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি সকল রাজাদের আবার বললেন—'ধর্মাত্মা রাজা দুর্যোধনকে অধর্মপূর্বক বধ করার জন্য জগতে ভীমসেনকে কপটতার সঙ্গে যুদ্ধকারী বলা হবে। দুর্যোধন ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ করছিল ; সেই অবস্থায় দুর্যোধন নিহত হয়েছে, সুতরাং সে সনাতন সদ্গতি প্রাপ্ত হবে।' এই বলে রোহিণীনন্দন বলরাম দ্বারকার দিকে যাত্রা করলেন। তিনি চলে গেলে পাঞ্চাল, বৃষ্ণি, পাণ্ডববীররা বিষণ্ণ হলেন। যুধিষ্ঠিরও মর্মাহত হয়ে, মুখ নীচু করে চিন্তামগ্ন হলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ ! আপনি নীরবে অধর্মের অনুমোদন করছেন

কেন ? দুর্যোধনের ভ্রাতা এবং সাহায্যকারীরা নিহত হয়েছে, বেচারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে ; এই অবস্থায় ভীম তার মস্তকে পদাঘাত করছে আর আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে তা চুপ করে দেখে যাচ্ছেন ? এমন হচ্ছে কেন ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'কৃষ্ণ ! ভীমসেন যে ক্রোধভরে এর মস্তকে পা দিয়ে আঘাত করেছে, তা আমারও ভালো লাগেনি। আমার কুলেরই এক অংশ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় আমি খুশি নই। কিন্তু কী করব ? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা সর্বদা আমাদের সঙ্গে ছলনা করেছে, কটুবাক্য বলেছে এবং আমাদের বনবাসে পাঠিয়েছে। ভীমসেনের মনে এই সবের জন্য বড়ই ক্ষোভ ছিল, সেকথা মনে রেখেই আমি তার এইসব কাজ উপেক্ষা করেছি।'

ধর্মরাজের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে বললেন—'বেশ, যা হবার হয়েছে। রাজন্ ! আপনার ভ্রাতাকে বধ করে ভীমসেন এখন খুবই খুশি।' তখন ভীম যুধিষ্ঠিরের সামনে এসে হাতজোড় করে প্রণাম করে বিজয়োল্লাসের সঙ্গে বললেন—'মহারাজ ! আজ এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আপনার অধীন। এখন আপনি ধর্মপালনপূর্বক রাজ্যশাসন করুন। এবারে কণ্টক দূরীভূত হয়ে রাজ্য মঙ্গলময় হয়েছে। আপনাকে যারা কটুবাক্য বলেছিল, সেই দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন এই সমগ্র রাজ্য আপনার।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সৌভাগ্যের কথা যে রাজা দুর্যোধনও বধ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমতো কাজ করে আমরা পৃথিবী জয় করেছি। এটি খুবই উত্তম যে তুমি মাতার ঋণ মুক্ত হয়েছ এবং নিজের ক্রোধও শান্ত করেছ। শত্রু মৃত এবং তুমি বিজয়লাভ করেছ, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা।'

—o—

দুর্যোধনের শিবিরে এসে সেটি পাণ্ডবদের দ্বারা অধিকার করা, অর্জুনের রথ ভস্মীভূত হওয়া

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! ভীমসেন দুর্যোধনকে বধ করেছে দেখে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়রা কী করল ?'

সঞ্জয় বললেন—'মহারাজ ! আপনার পুত্র নিহত হলে শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়রা বিজয়োৎসবে মগ্ন হল। তারা তাদের উত্তরীয় ছুঁড়ে ছুঁড়ে সিংহনাদ করতে লাগল। কেউ ধনুকে টংকার দিতে লাগল, কেউ শঙ্খ বাজাল, কেউ আবার দামামা বাজাতে লাগল। অনেকে হাসাহাসি ক্রীড়া করতে লাগল। কয়েকজন ভীমসেনকে বলতে লাগল—দুর্যোধন গদাযুদ্ধ করে অনেক পরিশ্রম করেছিল, তাকে বধ করে আপনি অত্যন্ত পরাক্রম দেখিয়েছেন। নানাপ্রকার কৌশল দেখিয়ে সর্বপ্রকার গতিতে যুদ্ধ করা দুর্যোধনকে ভীমসেন ব্যতীত আর কেই বা বধ করতে পারত ? ভীম ! শত্রুদের পরাস্ত করে দুর্যোধনকে বধ করায় এই পৃথিবীতে আপনি মহাযশ লাভ করেছেন। এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা।'

এইভাবে যেখানেই কিছু লোক একত্রিত হচ্ছিল, তারা ভীমসেনের যুদ্ধের আলোচনা ও প্রশংসা করছিল। পাঞ্চাল এবং পাণ্ডবরাও প্রসন্ন হয়ে ভীমের সম্পর্কে নানা অলৌকিক কথা বলছিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজাগণ ! মৃত ব্যক্তিকে কটুবাক্য দ্বারা আর মারা উচিত নয়। এই পাপী তো তখনই মারা গেছে, যখন লজ্জা বিসর্জন দিয়ে লোভে পড়েছিল এবং পাপীদের সহায়তা নিয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল। বিদুর, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ভীষ্ম, এবং সঞ্জয়দেব বহু অনুরোধ শুনেও সে পাণ্ডবদের পৈতৃক সম্পত্তি ফেরৎ দেয়নি। এখন একে মিত্র বা শত্রু কিছুই বলা যায় না, এ মহা নীচ। কাঠের মতো জড়। একে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেও কোনো লাভ নেই। সকলে এখন রথে করে শিবিরে চলুন।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সব রাজারা নিজ নিজ শঙ্খ বাজিয়ে শিবিরের দিকে রওনা হলেন। সর্বপ্রথমে পাণ্ডবগণ, তাঁদের পেছনে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্ররা এবং অন্য ধনুর্ধর যোদ্ধারা যাচ্ছিলেন। সকলে প্রথমে দুর্যোধনের শিবিরের দিকে গেলেন। রাজা না থাকায় সেটি শ্রীহীন দেখাচ্ছিল। সেখানে কিছু মন্ত্রী এবং

অন্য লোক বসেছিল। অবশিষ্ট সকলে রানিদের নিয়ে রাজধানী চলে গিয়েছিল। পাণ্ডবরা পৌঁছলে তাঁদের সেবার জন্য দুর্যোধনের সেবকরা মলিন বস্ত্র পরে হাত জোড় করে উপস্থিত হল। পাণ্ডবরা দুর্যোধনের শিবিরে এসে রথ থেকে নামলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন— তুমি তোমার অক্ষয় তূণ এবং ধনুক নিয়ে রথ থেকে নেমে যাও, পরে আমি নামব। এতে তোমার মঙ্গল হবে।'

অর্জুন তাই করলেন। তখন ভগবান ঘোড়াগুলির দড়ি খুলে দিয়ে নিজেও রথ থেকে নেমে পড়লেন। সর্বপ্রাণীর ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নামতেই রথের ওপর আসীন দিব্য কপিও অন্তর্হিত হল ; তারপর সেই বিশাল রথ, যা দ্রোণাচার্য ও কর্ণের দিব্যাস্ত্রে দগ্ধ-প্রায় হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ আগুনে জ্বলে উঠল। তার সমস্ত

উপকরণ—লাগাম, ঘোড়া প্রভৃতি জ্বলে ভস্ম হয়ে গেল। তাই দেখে পাণ্ডবরা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। অর্জুন হাত জোড় করে ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—'গোবিন্দ ! এ কী আশ্চর্যজনক ঘটনা। এই রথ কেন হঠাৎ পুড়ে গেল ? আমি যদি শোনার উপযুক্ত হই, তাহলে আপনি আমাকে বলুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন ! যুদ্ধে নানা অস্ত্রের আঘাতে এই রথ আগেই দগ্ধ হয়েছিল, শুধু আমি উপবিষ্ট ছিলাম বলে তা ভস্ম হয়নি। আজ তোমার সব কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই আমি এই অনুপম রথকে ছেড়ে দিয়েছি, সেইজন্য এটি এখন ভস্ম পরিণত হল। ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে এটি আগেই দগ্ধ হয়েছিল।'

ভগবান তারপর ঈষৎ হাসা করে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে বললেন—'কুন্তীনন্দন ! আপনার শত্রু পরাস্ত হয়েছে, আপনি বিজয়লাভ করেছেন—এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব এবং আপনি নিজে এই বিনাশকারী সংগ্রামে কুশলপূর্বক রক্ষা পেয়েছেন, এ বড়ই আনন্দের কথা। এবার আপনি কী করবেন, তা শীঘ্র ঠিক করুন। উপপ্লব্যতে আমি যখন অর্জুনের সঙ্গে আপনার কাছে এসেছিলাম, তখন আপনি আমাকে মধুপর্ক দিয়ে বলেছিলেন—'কৃষ্ণ ! অর্জুন তোমার ভ্রাতা এবং মিত্র, একে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করো।' সেদিন আমি আপনার আদেশ মেনে নিয়েছিলাম। আপনার অর্জুনকে আমি সর্বভাবে রক্ষা করেছি। সে ভ্রাতাসহ এই রোমাঞ্চকর যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন—'জনার্দন ! দ্রোণ এবং কর্ণ যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, তা আপনি ব্যতীত আর কে সহ্য করতে সক্ষম হত ? বজ্রধারী ইন্দ্রও তার সম্মুখীন হতে পারতেন না। আপনার কৃপাতেই সংশপ্তকগণ পরাজিত হয়েছে। অর্জুন এই মহাসংগ্রামে কখনো যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেনি তা আপনারই অনুগ্রহের ফল। আপনার দ্বারা আমাদের বহুবার কার্যসিদ্ধ হয়েছে। উপপ্লব্য নগরে মহর্ষি ব্যাস আগেই আমাকে বলেছিলেন যে, 'যেখানে ধর্ম, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ ; এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই বিজয়।'

তারপর সব বীররা আপনার শিবিরে প্রবেশ করে অর্থভাণ্ডার, রত্নের সামগ্রী, ভাণ্ডার এবং শিবিরও অধিকার করে নিলেন। সোনা, রূপা, মণি-মাণিক্য, মহার্ঘ বস্ত্র, মহার্ঘ বিছানা, মৃগচর্ম সবই নিয়ে নিলেন। সেই সঙ্গে অসংখ্য দাস-দাসীকেও নিজেদের অধিকারে আনলেন। মহারাজ ! সেই সময় আপনার অক্ষয় ধনভাণ্ডার পেয়ে পাণ্ডবরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা সেখানে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বিশ্রামের সময় শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আজকের রাত্রিটি আমাদের মঙ্গলের জন্য

শিবিরের বাইরেই কাটানো উচিত।' 'বেশ তাই হবে' বলে শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির সঙ্গে পাণ্ডবরা শিবিরের বাইরে চলে গেলেন।' তাঁরা পরম পবিত্র ওঘবতী নদীর ধারে রাত কাটালেন।

সেইসময় রাজা যুধিষ্ঠির সময়োচিত কর্তব্য বিচার করে বললেন—'মাধব! একবার পুত্রশোকে অধীর গান্ধারীকে শান্ত করার জন্য আপনাকে হস্তিনাপুরে যেতে হবে, এই কাজ আমি উচিত বলে মনে করি। কারণ ভীমের অন্যায় গদাযুদ্ধে দুর্যোধনকে নিহতের ঘটনা তাঁকে ক্রোধান্ধ করে রেখেছে।'

—০—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা প্রদান করে ফিরে আসা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারীর কাছে কেন পাঠিয়েছিলেন? তিনি আগে যখন সন্ধির জন্য কৌরবদের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, যার ফলে যুদ্ধ হয়েছিল। এখন সব যোদ্ধা যখন বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, দুর্যোধন ভূপতিত হয়েছেন, পাণ্ডবরা শত্রুহীন হয়েছেন, তখন এমন কী প্রয়োজন হল, যার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে যেতে হল? আমার মনে হচ্ছে কোনো বড় কার্য উদ্ধারের জন্যই তাঁকে যেতে হয়েছিল।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! তুমি সঠিক প্রশ্নই করেছ। আমি এর প্রকৃত কারণ জানাচ্ছি, শোনো! ভীম গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে মহাবলী দুর্যোধনকে বধ করেছিলেন—তাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীত হয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন দুর্যোধনের মাতা গান্ধারী অত্যন্ত তেজস্বিনী নারী, তিনি জীবনভোর কঠোর তপস্যা করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি ত্রিলোক ভস্ম করে ফেলতে পারেন, তাই সর্বপ্রথম তাঁকে শান্ত করা উচিত। নচেৎ আমাদের কাছে যখন তিনি তাঁর পুত্রকে অন্যায়পূর্বক বধ করা হয়েছে জানবেন, তখন তিনি আমাদের ভস্ম করে ফেলবেন। এইসব চিন্তা করে ধর্মরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'গোবিন্দ! আপনার কৃপাতেই আমরা নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করেছি, নিজেদের পৌরুষের দ্বারা তা পাওয়ার আশা দুরাশামাত্র। আপনি সারথি হয়ে আমাদের সহায়তা ও রক্ষা করেছেন। যদি আপনি এই যুদ্ধে অর্জুনের কর্ণধার না হতেন, তবে সমুদ্রের মতো এই বিশাল কৌরব সেনাকে হারিয়ে কীকরে বিজয়লাভ করতাম! আমাদের জন্য আপনি বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। নানা অস্ত্রাঘাত, শত্রুদের কঠোর বাক্য, সবই আপনাকে শুনতে হয়েছে। দুর্যোধন নিহত হওয়ায় সে সবই সফল হয়েছে। যদিও আমরা জয়লাভ করেছি, তবুও আমার হৃদয় সন্দেহের দোলায় দোলায়িত। মাধব! আপনি দেবী গান্ধারীর ক্রোধের কথা চিন্তা করুন, তিনি নিত্য কঠোর তপস্যারত হওয়ায় শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ বধ হয়েছে শুনে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ভস্ম করে ফেলবেন। তাই এখন তাঁকে শান্ত করা প্রয়োজন। পুরুষোত্তম! তিনি যখন পুত্রশোকে অধীর হয়ে ক্রোধপূর্ণ চোখে তাকাবেন, তখন আপনি ব্যতীত অন্য কে তাঁর সামনে দাঁড়াতে সাহস করবে? তাই তাঁকে শান্ত করার জন্য আপনার একবার তাঁর কাছে যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। আপনার থেকেই এই জগতের উদ্ভব হয়েছে এবং আপনার থেকেই প্রলয়। সুতরাং আপনিই সম্যক কারণযুক্ত সময়োচিত বাক্যে দেবী গান্ধারীকে শান্ত করতে পারবেন। ব্যাসদেবও সেখানেই আছেন। পাণ্ডবদের হিতার্থে কোনো উপায় বার করে গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত করুন।'

ধর্মরাজের কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দারুককে স্মরণ করলেন এবং তাঁকে রথ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। দারুক অতি শীঘ্র রথ সাজিয়ে, তাতে ঘোড়া জুড়ে ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন। ভগবান রথে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নগরে প্রবেশ করে রথ থেকে নেমে ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর আসার খবর দিয়ে রাজমহলে প্রবেশ করলেন। সেখানে প্রথমেই তিনি ব্যাসদেবের দর্শন পেলেন, তিনি আগেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেব এবং ধৃতরাষ্ট্রের চরণ স্পর্শ করে গান্ধারীকেও প্রণাম করলেন।

তারপর ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ শোকে আচ্ছন্ন থাকার পর, মুখ হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'ভারত! আপনি বয়োবৃদ্ধ। কালের গতিতে যা কিছু হয়েছে এবং হচ্ছে আপনি সে সবই জানেন। পাণ্ডবগণ সর্বদাই আপনার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেছে। তারা চেয়েছিল যাতে কোনোভাবেই তাদের কুল বিনাশপ্রাপ্ত না হয়। তারা সর্বতোভাবে নির্দোষ; তা সত্ত্বেও তাদের কপটতাপূর্বক পাশায় হারিয়ে বনবাসে পাঠানো হয়েছিল। নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের অজ্ঞাতবাসের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার কষ্ট তারা ভোগ করেছে। যখন যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন আমি নিজে আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে বিবাদ বন্ধ করার জন্য সর্বসমক্ষে শুধু পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম। কিন্তু কালের প্রেরণায় আপনিও আমার অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে শুধু আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং বিদুরও আপনাকে সর্বদা সন্ধির জন্য অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু আপনি কারো কথাই শোনেননি। সত্যই, যার মনের ওপর কালের প্রভাব পড়ে, সে এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি হতে থাকে, তখনও আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল! একে কালের প্রভাব বা নিয়তি ছাড়া আর কীই বলা যায়? এই জীবন প্রকৃতপক্ষে মহাকালেরই অধীন। মহারাজ! আপনি পাণ্ডবদের দোষারোপ করবেন না, তাদের কোনোই অপরাধ নেই। তারা কখনো ধর্ম বা ন্যায় থেকে চ্যুত হয়নি। আপনার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও কিছুমাত্র কমেনি। এখন তো আপনি ও গান্ধারীদেবী পাণ্ডবদেরই পিণ্ডজলের প্রত্যাশী। তাদের থেকেই আপনার বংশ বৃদ্ধি হবে। পুত্রের থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ফল এখন পাণ্ডবদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। সুতরাং আপনারা পাণ্ডবদের প্রতি মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না, তাদের শত্রু ভাববেন না। নিজেদেরই অপরাধ বা ভুল মনে করে তাদের কল্যাণ করুন, তাদের রক্ষা করুন। মহারাজ! আপনি তো জানেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার চরণে কত ভক্তি রাখেন, কত শ্রদ্ধা করেন। তিনি তাঁর ক্ষতিকারক শত্রুদের সংহার করেও রাতদিন তাদের শোকে অধীর থাকেন, তাঁর মনে একটুও শান্তি নেই। আপনার এবং গান্ধারীর জন্যও তিনি শোকাকুল হয়ে আছেন। দ্বিধাবশত তিনি আপনার সামনে আসতে সাহস করেননি।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ শোকাতুরা গান্ধারী দেবীকে বললেন—'কল্যাণী! আমি আপনাকে যা বলি, মন দিয়ে শুনুন। জগতে আপনার মতো তপস্বিনী নারী আর নেই। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, সেদিন

সভায় আমার সামনেই আপনি উভয়পক্ষের হিতকারী ধর্মযুক্ত কথা বলেছিলেন; কিন্তু আপনার পুত্ররা তা শোনেনি। দুর্যোধন বিজয়াভিলাষী ছিল, তাকে আপনি রুক্ষভাবে বলেছিলেন—'ওরে মূর্খ! ধর্ম যেদিকে থাকে, সেদিকেই জয়।' দেবী! আপনার কথাই আজ সত্য হয়েছে, সুতরাং শোক করবেন না। আপনার মধ্যে তপস্যার অনেক শক্তি আছে, আপনি আপনার ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে সমগ্র চরাচর ভস্ম করে ফেলার শক্তি রাখেন; তবুও আপনি পাণ্ডবদের বিনাশের কথা মনে স্থান দেবেন না।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে গান্ধারী বললেন—'কেশব! তুমি ঠিকই বলেছ। এতক্ষণ আমার মনে বড় কষ্ট ছিল, চিন্তার আগুনে আমি জ্বলছিলাম; তাই আমার বুদ্ধি বিচলিত হয়ে পড়েছিল—আমি পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তা করছিলাম। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার বুদ্ধি স্থির হয়েছে—ক্রোধের আবেশ চলে যাচ্ছে। জনার্দন! এই

রাজা অন্ধ তথা বৃদ্ধ এবং এঁর পুত্ররা নিহত হয়েছে—তাই তিনি শোকে পীড়িত হয়েছেন, এখন বীর পাণ্ডবদের সঙ্গে তুমিই এঁর সাহায্যপ্রদানকারী।'

এই বলে গান্ধারী আঁচলে মুখ ঢেকে শোকাপ্লুত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। পুত্রশোকে তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নানাভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্য প্রদান করলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে আশ্বাস দিয়ে ভগবান অশ্বত্থামার ভীষণ সংকল্প স্মরণ করলেন, পরে তিনি সত্বর উঠে ব্যাসদেবকে প্রণাম করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'মহারাজ! এবার আমি যাওয়ার অনুমতি চাই, আপনি শোক করবেন না। এখন অশ্বত্থামার মনে পাপ চিন্তার উদয় হয়েছে, তাই সত্বর চলে যাচ্ছি, সে আজ রাত্রেই পাণ্ডবদের বধ করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

একথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বললেন—'জনার্দন! তাহলে তুমি শীঘ্র যাও এবং পাণ্ডবদের রক্ষা করো। আমরা শীঘ্রই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।' তখন ভগবান দারুককে নিয়ে শীঘ্র রওনা হলেন। তিনি চলে গেলে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিতে লাগলেন। শিবিরে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হস্তিনাপুরের সমস্ত সমাচার জানালেন।

দুর্যোধনের বিলাপ এবং অশ্বত্থামার বিষাদ, প্রতিজ্ঞা ও সেনাপতিপদে অভিষেক

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয়! আমার পুত্র অত্যন্ত অভিমানী ছিল। পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতার জন্য তার ওপর ভয়ানক সংকট এসে পড়েছিল। ঊরু ভগ্ন হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেলে ভীমসেন যখন তার মস্তকে পা রাখল, তখন সে কী বলল?'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! ঊরুভঙ্গ হয়ে দুর্যোধন মাটিতে পড়ে ধুলায় ধূসরিত হলেন। তারপর মাথায় হাত রেখে তিনি চার দিকে তাকালেন। তারপর বহু কষ্টে কোনোরূপে মাথার চুল ঠিক করে তিনি জলভরা চোখে আমার দিকে তাকালেন এবং দু হাত দিয়ে মাটি চাপড়ে আবেগ ভরে বলে উঠলেন—'ওঃ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, শকুনি, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, শল্য এবং কৃতবর্মার মতো বীর আমার রক্ষক ছিলেন; তা সত্ত্বেও আজ আমার এই দশা হল। 'কালকে' কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। যে একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিল, আজ তার এই অবস্থা। সঞ্জয়! আমার পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে যারা জীবিত আছে, তাদের বলবে যে, ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে আমাকে মেরেছে। ক্রূরকর্মকারী পাণ্ডবরা ভীষ্ম, দ্রোণ, ভূরিশ্রবা এবং কর্ণকে কপটতাপূর্বক বধ করে আমার সঙ্গে তুলনা করে কলঙ্কের টিকা লাগিয়ে নিয়েছে। আমার বিশ্বাস এই কুকর্মের জন্য তাদের সৎপুরুষদের সভায় অনুতাপ করতে হবে। এমন কে বিদ্বান ব্যক্তি আছেন, যিনি মর্যাদা ভঙ্গকারীদের সম্মান প্রদর্শন করবেন? পাপী ভীমসেন যেমন আজকে উল্লাস করেছে, অধর্ম দ্বারা বিজয় লাভ করে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন খুশি হবে? আমার ঊরু ভঙ্গ হয়েছে; এই অবস্থায় ভীম যে আমার মাথায় পদাঘাত করেছে, তার থেকে আর আশ্চর্যের কথা কী হতে পারে? আমার এই সংবাদ জেনে পিতা-মাতা-শোকে মর্মাহত হবেন, তাঁদের গিয়ে বলবে—আমি যজ্ঞ করেছি; যাদের ভরণ-পোষণ করার, তাদের পালন করেছি এবং আসমুদ্র পৃথিবী ভালোভাবে শাসন করেছি। আমার বন্ধু-বান্ধবদের সাদর সম্মান করেছি এবং অনুগতদের পালন করেছি; ধর্ম, অর্থ, কামের সেবন করেছি; অন্য রাষ্ট্র আক্রমণ করে জিতেছি এবং পরাজিত রাজাদের শাসন করেছি। যারা আমার প্রিয় ব্যক্তি, তাদের সর্বদা মঙ্গল করেছি। তাহলে আমার চেয়ে ভালো আর কার হবে? বিধিমতো বেদাদি অধ্যয়ন করেছি, নানাপ্রকার দান করেছি, সারা জীবনে কোনো অসুখ আসেনি। আমি ধর্মের সাহায্যে বিজয় প্রাপ্ত করেছি, ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয়গণ যে মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করেন, আমি তাই লাভ করেছি। এর থেকে ভালো জীবনের অন্ত আর কী হতে পারে? আনন্দের কথা হল এই যে আমি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিনি, আমার মনে কোনো দুর্ভাবনা উৎপন্ন হয়নি। এ সত্ত্বেও নিদ্রিত বা পাগল ব্যক্তিকে যেমন বিষপ্রদান করে

মারা হয়, সেইভাবে এই পাপী যুদ্ধধর্ম লঙ্ঘন করে আমাকে বধ করেছে।'

আপনার পুত্র তারপর খবর সংগ্রহকারীদের বললেন—'অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যকে আমার কথা জানাবে—বহুবার নিয়ম ভঙ্গ করে পাপপ্রবৃত্ত এই পাণ্ডবদের আপনারা কখনো বিশ্বাস করবেন না। আমি ভীমকর্তৃক অধর্মপূর্বক বধ হয়েছি। যাঁরা আমার জন্য স্বর্গে গেছেন সেই আচার্য দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, বৃষসেন, শকুনি, জলসন্ধ, ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, দুঃশাসন প্রমুখ ভ্রাতা ও লক্ষণ, দুঃশাসনকুমার এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র রাজাদের মতো আমিও স্বর্গলোকে চলে যাব। শুধু চিন্তা হল যে আমার ভগিনী দুঃশলা তার পতি এবং ভ্রাতাদের মৃত্যুসংবাদ শুনে কী অবস্থায় থাকবে। পুত্র ও পৌত্রের স্বামীহারা স্ত্রীদের নিয়ে আমার মাতা-পিতা কী করবেন ? ব্যাখ্যা করতে কুশল এবং সন্ন্যাসীর বেশে পরিভ্রমণকারী চার্বাকের যদি আমার অবস্থা গোচরে আসে, তাহলে সে অবশ্যই আমার শত্রুতার প্রতিশোধ নেবে। আমি এই ত্রিভুবন প্রসিদ্ধ সমন্তপঞ্চকে প্রাণত্যাগ করছি, অতএব আমি অক্ষয়-লোক লাভ করব।'

রাজন্ ! আপনার পুত্রের বিলাপ শুনে সমবেত সকলের চোখে জল ভরে গেল। তারা ব্যাকুল হয়ে অন্যদিকে চলে গেল। দূতেরা এসে অশ্বত্থামাকে গদাযুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এবং অন্যায়ভাবে উরুভঙ্গের কথা জানাল। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই ফিরে গেলেন।

সংবাদ বাহকের মুখে দুর্যোধনের নিহত হওয়ার সংবাদ জেনে জীবিত কৌরব মহারথী অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা—যাঁরা নিজেরাও তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আহত ছিলেন, দ্রুতগামী ঘোড়া জুড়ে রথে করে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধভূমিতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন দুর্যোধন মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করছেন, সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ক্রোধে তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত এবং চোখ লাল হয়ে তাঁকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

রাজাকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে কৃপাচার্য প্রমুখরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁরা রথ থেকে নেমে দুর্যোধনের পাশে গিয়ে বসলেন। অশ্বত্থামার চোখে জল ভরে এল, তিনি হতাশ হয়ে বললেন—'রাজন্ ! এই পৃথিবীতে সত্য বলে কিছু নেই। নচেৎ আপনার মতো সম্রাট ধুলোয় পড়ে থাকেন ? যিনি একদিন সমগ্র ভূমণ্ডলের রাজা ছিলেন, যিনি সকলের ওপর আদেশ জারী করতেন, তিনি আজ এই নির্জন স্থানে কীভাবে একাকী পড়ে আছেন ! আজ আমরা দুঃশাসন, মহারথী কর্ণ বা সব হিতৈষী মিত্রদের দর্শন পাচ্ছি না—এ কেমন কথা ? প্রকৃতপক্ষে কালের গতি জানা বড়ই কঠিন। সময়ের রকম ফের দেখুন, আপনি রাজাদের অগ্রগণ্য হয়েও আজ তৃণের সঙ্গে ধুলোতে পড়ে আছেন। মহারাজ ! আপনার সেই শ্বেত-ছত্র কোথায় ? কোথায় চামর আর সেই বিশাল সৈন্যরাশি ? কী কারণে কোন কাজ হবে, তা বোঝা বড়ই কঠিন ; কারণ আপনি সমস্ত প্রজার মাননীয় রাজা হয়েও আজ এই অবস্থায় পড়ে আছেন। আপনি তো ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করার সাহস রাখতেন ; সেই আপনারই যখন এরূপ বিপদ হল, তখন নিশ্চিতভাবে বলা যায় কোনো মানুষেরই সম্পত্তি স্থির থাকতে পারে না।'

অশ্বত্থামার এই দুঃখের কথা শুনে শোকে দুর্যোধনের চোখ জলে ভরে গেল। তিনি দুহাতে চোখ মুছে কৃপাচার্য প্রমুখকে বললেন—'মিত্রগণ ! মর্ত্যলোকের এমনই নিয়ম, বিধাতার সৃষ্ট ধর্মই এইরকম ; তাই কালক্রমে একদিন সমস্ত প্রাণীকেই মরতে হবে। তা আজ আমি প্রাপ্ত হয়েছি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একদিন আমি এই ভূমণ্ডলের রাজা ছিলাম আর আজ এই অবস্থায় পৌঁছেছি। কিন্তু আমি এই ভেবে খুশি যে যুদ্ধে অনেক বড় বড় বিপদ এলেও আমি কখনো পিছু হটিনি। পাপীরা আমাকে ছলপূর্বক মেরেছে। আমি যুদ্ধে সর্বদাই উৎসাহ দেখিয়েছি এবং আমার আত্মীয় বন্ধুরা মারা যাওয়ার পর নিজেও যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করছি ; এতে আমি খুবই খুশি। সৌভাগ্যের বিষয় হল যে আপনারা এই যুদ্ধে জীবিত আছেন। সেই সঙ্গে আপনারা কুশলে আছেন এবং কিছু করতে সক্ষম—সেটিও আমার কাছে খুবই আনন্দের বিষয়। আমার ওপর আপনাদের ভালোবাসা আছে, তাই আমার মৃত্যুতে আপনারা দুঃখ পাচ্ছেন, কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই, যদি বেদ সত্য হয়, তাহলে আমি অক্ষয়লোকের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি ; তাই আমার জন্য শোক করা উচিত নয়। আপনারা আপনাদের সামর্থ্য অনুসারে যুদ্ধে পরাক্রম দেখিয়েছেন এবং সর্বদা আমাকে বিজয়ী করার চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু দৈবের বিধান কে লঙ্ঘন করতে পারে ?'

মহারাজ ! এই কথা বলতে বলতে দুর্যোধনের চোখে আবার জল ভরে এল এবং শরীর যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে উঠল ; তাই আর কিছু বলতে না পেরে চুপ করে রইলেন। রাজার এই অবস্থা দেখে অশ্বত্থামারও চোখ জলে ভরে গেল, তাঁর হৃদয় শোকে ভারাক্রান্ত হল। সেইসঙ্গে শত্রুদের ওপর তাঁর ক্রোধ জন্মাল। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে হাতে হাত চেপে বললেন—'রাজন্ ! এই পাপীরা ক্রূরকর্মের দ্বারাই আমার পিতাকে বধ করেছিল ; কিন্তু তাতে আমার তত দুঃখ হয়নি, যত আজ আপনার এই অবস্থা দেখে হচ্ছে। এবার আমার কথা শুনুন—আমি যত যজ্ঞ করেছি, যত দান-পুণ্য-ধর্ম করেছি, সে সবের সত্য-শপথ করে বলছি—আমি শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনে নানা উপায়ে পাঞ্চালদের যমালয়ে পাঠাব। আপনি শুধু তার জন্য আদেশ দিন।'

অশ্বত্থামার কথা শুনে দুর্যোধন মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং কৃপাচার্যকে বললেন—'আচার্য ! আপনি শীঘ্র জলপূর্ণ কলসী নিয়ে আসুন।' কৃপাচার্য রাজার কথায় জলপূর্ণ কলস নিয়ে এলে, তিনি বললেন—'বিপ্রবর ! আপনি যদি আমার জন্য ভালো কিছু করতে চান, তাহলে দ্রোণকুমারকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করুন, আপনার মঙ্গল হোক।' রাজার নির্দেশে কৃপাচার্য

অশ্বত্থামার অভিষেক করলেন। তারপর দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে চারদিক সিংহনাদে কম্পিত করে সেখান থেকে চলে গেলেন। দুর্যোধন রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে রইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে গিয়ে এই তিন মহারথী পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

শল্যপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

সৌপ্তিকপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

তিন মহারথীর এক বনে বিশ্রাম এবং পাণ্ডবদের কপটতা-পূর্বক বধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে অশ্বত্থামার পরামর্শ

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা—এই তিন বীর দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে সূর্যাস্তের সময় শিবিরের কাছে পৌঁছলেন। তার মধ্যে তাঁরা বিজয়াভিলাষী পাণ্ডব বীরদের ভীষণ সিংহনাদ শুনতে পেলেন। পাণ্ডবদের আক্রমণের আশঙ্কায় তাঁরা ভীত হয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে চললেন এবং কিছু দূরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্যোধনের দশ হাজার হাতির বল ছিল। তাকে ভীমসেন বধ করেছে একথা বিশ্বাস হয় না। আমার পুত্রের দেহ বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিল, পাণ্ডবরা তাকেও সংগ্রামে পরাস্ত করেছে। এর দ্বারাই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নিয়তির থেকে রক্ষা পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সঞ্জয় ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লোহা দিয়ে তৈরি, তাই নিজের একশত পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনেও এটি সহস্র টুকরো হয়নি। এখন পুত্রহীন হয়ে আমরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কীজন্য জীবিত থাকব ? আমি রাজার পিতা, নিজেও রাজাই ছিলাম। পাণ্ডবদের দাস হয়ে কীভাবে জীবন কাটাব ? ওহো ! যে একাকী আমার শতপুত্রকে বধ করেছে এবং আমার জীবনের শেষ দিনগুলো দুঃখে ভরে দিয়েছে, সেই ভীমসেনকে কীকরে আমি সহ্য করব ? হে সঞ্জয় ! তুমি বলো, আমার পুত্র দুর্যোধন এইভাবে অধর্মপূর্বক নিহত হলে কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামা কী করল ?'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! আপনার পক্ষের এই তিন মহারথী কিছুদূরে গিয়ে এক লতাগুল্ম ভরা ভয়ংকর জঙ্গল দেখতে পেলেন। সেখানে ঘোড়াকে জলপান করিয়ে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর হলে তাঁরা সেই ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই বনের মধ্যে তাঁরা এক বিশাল বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন যার হাজার হাজার শাখা চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। সেই বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে তিন মহারথী রথ থেকে নেমে স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা করলেন। এর মধ্যে সূর্য

অস্তাচলে গেলেন, রাত্রির আধিপত্য শুরু হল। আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের শোভা দেখা যেতে লাগল। রাত্রি হয়েছিল, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামা শোক ও দুঃখে মগ্ন হয়ে সেই বটবৃক্ষের নীচে বসে কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত থাকায় তাঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লেন। যদিও তাঁরা মহামূল্য পালঙ্কে শয়ন করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সর্বপ্রকার সুখসামগ্রীসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু এখানে তাঁরা অনাথের মতো পড়ে রইলেন।

অশ্বত্থামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই সহজে তাঁর নিদ্রা এল না। তিনি বনের চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে বটবৃক্ষের ওপর অনেক কাক দেখতে পেলেন। সেই রাত্রে বটবৃক্ষের শাখায় হাজার হাজার কাক আশ্রয় নিয়েছিল। তখন অশ্বত্থামা দেখলেন এক ভয়ংকর পেঁচা সেদিকে আসছে। পেঁচাটি বটবৃক্ষের এক ডালের ওপর উঠে বহু কাককে আক্রমণ করতে লাগল। সে নখ দিয়ে কিছু কাকের পাখা ভেঙে দিল, কারো মাথা কেটে ফেলল আবার কারো

পা ভেঙে দিল। এইভাবে সে অনেক কাককে মেরে ফেলল। সেই বটবৃক্ষটি কাকের দেহ ও পাখায় ভরে গেল।

রাত্রিকালে পেঁচার এই কপটতাপূর্ণ কাজ লক্ষ্য করে অশ্বত্থামাও সেরূপ কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি সেই নির্জন স্থানে বিচরণ করতে করতে ভাবতে লাগলেন—'এই পাখিটি আমাকে যুদ্ধ করবার জন্য অনুপ্রেরণা দিল, আমার এই সময় এর প্রয়োজন ছিল। পাণ্ডবরা বিজয় লাভ করে অত্যন্ত তেজস্বী, বলবান ও উৎসাহী হয়ে আছে। এই সময় আমি শক্তির দ্বারা তাদের পরাজিত করতে পারব না। কিন্তু রাজা দুর্যোধনের সামনে আমি ওদের বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছি। এখন ন্যায়তে যুদ্ধ করতে গেলে আমাকে প্রাণ হারাতে হবে। অবশ্য ছলনা দ্বারা আমি সাফল্য পেতে পারি এবং শত্রুরও নিঃসন্দেহে সংহার হবে। পাণ্ডবরাও তো পদে পদে বহু নিন্দনীয় ও কুকর্ম করেছে। যুদ্ধধর্মে এই কথাও প্রচলিত আছে যে, 'যেসব সেনা রাত্রিকালে নিদ্রিত, যাদের সেনানায়ক বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, যাদের যোদ্ধা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তাদের ওপরও শত্রুর আঘাত করা উচিত।' এইভাবে চিন্তা করে দ্রোণপুত্র রাত্রে নিদ্রিত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল বীরদের বধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর তিনি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে জাগিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। দুই মহাবীর অশ্বত্থামার কথা শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। অশ্বত্থামা তখন এক মুহূর্ত চিন্তা করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন—'মহারাজ দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন। তাঁকে অনেক ক্ষুদ্র যোদ্ধা মিলে ভীমসেনের হাতে বধ করিয়েছে। পাপী ভীম এক রাজ্যাভিষিক্ত সম্রাটের মাথায় পদাঘাত করেছে—কী জঘন্য কাজ সে করেছে। হায়! পাণ্ডবরা কৌরবদের কীভাবে সংহার করেছে যে আজ আমরা মাত্র তিনজন বেঁচে আছি। আমি এসবই সময়ের ফের বলে মনে করি। মোহবশত আপনাদের যদি বুদ্ধি বিভ্রম না হয়ে থাকে, তাহলে এই ভয়ানক সংকটের সময় আমাদের কী কর্তব্য, দয়া করে তা বলুন।'

কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামার কথোপকথন

কৃপাচার্য বললেন—'মহাবাহো! তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি ; এবার আমার কিছু কথা শোনো। সকল মানুষই দৈব ও পুরুষার্থ—দুপ্রকার কর্মে আবদ্ধ। এই দুটি ব্যতীত আর কিছু নেই। শুধু দৈব বা শুধু পুরুষার্থ দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় না। সাফল্যের জন্য দুটিরই প্রয়োজন। এই দুইয়ের মধ্যে দৈবই ফলের সিদ্ধান্ত করে তা দেবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান লোকেরা কুশলতা সহকারে পুরুষার্থেই লেগে থাকে। মানুষের সমস্ত কাজ ও প্রয়োজন এই দুটির দ্বারাই সিদ্ধ হয়। তার কৃতকর্মের সিদ্ধিও দৈবেরই অধীন এবং দৈবের আনুকূল্যেই তার ফল লাভ হয়। কর্মকুশল ব্যক্তি দৈব অনুকূল না হলে যে কাজেই হাত দেয়, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করলেও তার কোনো ফল পায় না। তাছাড়া যারা অলস এবং অন্যমনস্ক, তাদের কোনো কাজ করতেই ভালো লাগে না। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির তা অপছন্দ ; কারণ জগতে কোনো কাজ প্রায়শই নিষ্ফল হতে দেখা যায় না, তাছাড়া কর্ম না করলে দুঃখ দেখা দেয়। যারা চেষ্টা না করেও দৈবযোগেই সর্বপ্রকার ফল লাভ করে অথবা যারা চেষ্টা করেও কোনো ফল পায় না—এমন লোক বিরল হয়। তবুও তৎপরতার সঙ্গে কার্যে ব্যাপৃত মানুষ আনন্দে জীবন কাটাতে পারে এবং অলসেরা কখনো সুখ পায় না। এই জগতে যারা তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করে প্রায়শ তাদেরই হিতসাধন হতে দেখা যায়। তারা কাজ আরম্ভ করলেও যদি কোনো ফল না পায়, তাহলেও তাদের নিন্দা করা যায় না। কিন্তু যারা কোনো কিছু না করেই ফলপ্রাপ্ত হয়, লোকে তাদের নিন্দা ও দ্বেষ করে। তেমনই যে ব্যক্তি দৈব ও পুরুষার্থ—উভয়ের যোগ না মেনে শুধু দৈব অথবা পুরুষার্থের ভরসায় থাকে, সে নিজের অহিত সাধনই করে—বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এটি হল দৃঢ়সিদ্ধান্ত।

'কয়েকবার চেষ্টা করার পরেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তাহলে তাতে পুরুষার্থের অভাব এবং দৈব—এই দুই কারণ থাকে। কিন্তু পুরুষার্থ না থাকলে কোনো কর্ম সিদ্ধ হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি বৃদ্ধদের সেবা করে, তাঁদের কাছে কল্যাণসাধনের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁদের কথা অনুসারে কাজ করে, তার সেই আচরণকেই সঠিক বলে মানা হয়। কাজ আরম্ভ করে বৃদ্ধজনদের সম্মানিত ব্যক্তির কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত। কাজের সাফল্যে এটিকেই পরম কারণ বলে মনে করা হয় এবং তাঁরাই সিদ্ধিলাভ করেন—বলা হয়। যে ব্যক্তি বৃদ্ধদের কথা শুনে কাজ আরম্ভ করে, সে খুব শীঘ্রই তার কাজের ফল পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি রাগ, ক্রোধ, ভয় বা লোভ এই জাতীয় কোনো কাজে প্রবৃত্ত হয়, সে সেই কাজে সাফল্য লাভ করে না এবং শীঘ্রই ঐশ্বর্য-ভ্রষ্ট হয়। দুর্যোধনও লোভী এবং মন্দবুদ্ধি পুরুষ। সে অসমর্থ হয়েও মূর্খতাবশত বিনা বিচারেই হিতৈষীদের কথায় অসম্মান করে দুষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শে এই কাজ আরম্ভ করেছিল। পাণ্ডবরা গুণাদিতে তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, অনেক বারণ করা সত্ত্বেও দুর্যোধন তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে বসেছিল। সে প্রথম থেকেই অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাবের ছিল, তাই ধৈর্য ধারণ করেনি এবং তার মিত্রদের কথাও শোনেনি। তাই তাকে বিফল হয়ে অনুতাপ করতে হয়েছে। আমরা সেই পাপীর পক্ষ নিয়েছিলাম, তাই আমাদেরও এই কষ্ট ভোগ করতে হল। আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু এই দুঃখে সন্তপ্ত হওয়ায় আমার বুদ্ধিতেও কোনো হিতের কথা আসছে না। মানুষ নিজে যখন হিতাহিত চিন্তা করতে পারে না, তখন তার সুহৃদদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। সেখানেই সে সৎ-বুদ্ধি ও নম্রতা লাভ করতে পারে এবং সেখান থেকেই সে তার হিতসাধনের কথাও জানতে পারে। হিতার্থীরা যেমন পরামর্শ দেবেন, সেই অনুসারেই তার কাজ করা উচিত। সুতরাং আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী দেবী ও মহামতি বিদুরের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেব এবং তাঁরা যেমন বলবেন, সেই অনুসারেই কাজ করব—আমার তো তাই মনে হয়। এ কথা নিশ্চিত যে কাজ আরম্ভ না করলে সাফল্য পাওয়া যায় না এবং যে ব্যক্তি চেষ্টা করেও সফল হয় না, তার প্রারব্ধই খারাপ মনে করা উচিত।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! আচার্য কৃপের এই ধর্ম ও অর্থযুক্ত শুভ পরামর্শ শুনে অশ্বত্থামা শোকে অধীর হয়ে অগ্নির ন্যায় জ্বলতে লাগলেন। তারপর মনকে শক্ত করে কৃপ ও কৃতবর্মাকে বললেন—'প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি পৃথক পৃথক হয় এবং তাতেই তারা তুষ্ট থাকে। সকলেই নিজেকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলে মনে করে। সকলে নিজের বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলে ভাবে। তারা বারবার অপরের বুদ্ধির নিন্দা এবং নিজবুদ্ধির গর্ব করতে থাকে। যদি কোনো

কারণবশত কারো বুদ্ধি অনেকের সঙ্গে একমত হয় তাহলে তারা সন্তোষ লাভ করে এবং একে অপরকে সম্মান জানায়। কিন্তু কালক্রমে আবার সেই মানুষদেরই বুদ্ধি বিপরীত হলে একে অপরের বিরুদ্ধ আচরণ করে। মানুষের চিত্ত প্রায়শই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়, তাই তাদের বিভিন্ন চিত্তে বিভিন্ন প্রকারের বুদ্ধি হয়। এক ব্যক্তি যুবাবস্থায় একপ্রকার বুদ্ধিতে মুগ্ধপ্রায় হয়, মধ্যম অবস্থায় তার ওপর অন্যপ্রকার বুদ্ধি চেপে বসে এবং বৃদ্ধাবস্থায় তার আবার অন্য প্রকারের বুদ্ধি হয়। মানুষের যখন বড় কোনো বিপদ আসে অথবা যখন সে বিশাল অর্থ-সম্পদ লাভ করে, তখন তার বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত হয়। এইরূপ একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির প্রকাশ হয়ে থাকে এবং সেই সময় তার নিজেরই আগের বুদ্ধি অরুচিকর হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী যে কথা ঠিক বলে মনে করেন, তাতেই নিজের ভাব স্থির রাখেন, তাঁর বুদ্ধি উদ্যোগের সহায়ক হয়। সকলেই নিজেদের বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে নানাপ্রকার চেষ্টা করে এবং তাতেই নিজেদের হিত বলে মনে করে। আজ বিপদে পড়ে আমার যে বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তা আমি আপনাকে জানাচ্ছি। এতে আমার শোক দূরীভূত হবে। প্রজাপতি প্রজাদের উৎপন্ন করে তাদের কর্মের বিধান করেন এবং প্রত্যেক বর্ণকে এক-একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন করেন। তিনি ব্রাহ্মণকে সর্বোত্তম বেদ-বিদ্যা, ক্ষত্রিয়কে উত্তম-তেজ, বৈশ্যকে ব্যবসায়-বুদ্ধি ও শূদ্রকে সমস্ত বর্ণের অনুকূল থাকার যোগ্যতা দিয়েছেন। সংযমহীন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত খারাপ, তেজহীন ক্ষত্রিয়রা নিষ্কর্মা, অকুশল বৈশ্য নিন্দনীয় এবং অন্য বর্ণের প্রতি প্রতিকূল আচরণকারী শূদ্র অধম হয়ে থাকে। আমি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অতি পূজনীয় উত্তম কুলেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু মন্দভাগ্যের জন্য এই ক্ষাত্রধর্মের পালন করতে হচ্ছে। ক্ষাত্রধর্ম জেনেও যদি আমি ব্রাহ্মণত্বের আড়াল নিয়ে এই মহান কর্ম না করি তাহলে সৎপুরুষরা আমার এই আচরণকে ভালো বলবেন না। আমি রণক্ষেত্রে দিব্যধনুক ও অস্ত্রধারণ করেছি। আমার পিতা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, এখন আমি কোন মুখে কথা বলব ? সুতরাং আমি ক্ষাত্রধর্মের আশ্রয় নিয়ে পিতা ও রাজা দুর্যোধনের পথই অনুসরণ করব। আজ পাঞ্চাল বীরেরা বিজয়লাভ করে বর্ম ত্যাগ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। সুতরাং আজ রাত্রে সেই নিদ্রিতদের ওপর আক্রমণ করে শিবিরের মধ্যে তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলব। তবেই আমি শান্তি পাব। দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ যে দুর্গম পথ ধরেছে, সেই পথে আমি আজ পাঞ্চালদের পাঠিয়ে ছাড়ব। আজ রাত্রেই আমি পশুর ন্যায় বলপ্রয়োগে পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মাথা ভেঙে দেব এবং তীক্ষ্ণ তলোয়ারের সাহায্যে নিদ্রিত পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বীরদের মাথা কেটে নেব এবং সমস্ত নিদ্রিত পাঞ্চাল সেনা বিনাশ করে সুখী ও সফল মনোরথ হব।'

কৃপাচার্য বললেন—'বৎস ! তুমি নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরার পাত্র নও। আজ পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রতিশোধ নেবার জন্য যখন তুমি ঠিকই করেছ, তাহলে তাই হোক। কাল প্রভাতে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। আজ তুমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আছ, সুতরাং এখন ঘুমিয়ে নাও। তাহলে তোমার কিছুটা বিশ্রাম হবে। ঠিকমতো নিদ্রা হলে তোমার চিত্ত স্থির হবে। তারপর যদি তুমি শত্রুদের সম্মুখীন হও তাহলে অবশ্যই তাদের বধ করতে সক্ষম হবে। আমরাও সারারাত ঘুমিয়ে ক্লান্তি ও পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। রাত্রি প্রভাত হলে যে শত্রু সামনে আসবে, আমরা তিনজনে একত্রে তাকে বধ করব। সংগ্রামভূমিতে যদি তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকি আর কৃতবর্মা তোমাকে রক্ষা করেন, তাহলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও আমাদের পরাক্রম সহ্য করতে সক্ষম হবেন না। বৎস ! কৃতবর্মা এবং আমি পাণ্ডবদের যুদ্ধে পরাস্ত না করে কখনো পিছু হটব না। হয় রণক্ষেত্রে পাণ্ডবসহ ক্রোধাতুর পাঞ্চালদের বধ করে ফিরব, নচেৎ সেখানেই প্রাণত্যাগ করে স্বর্গলাভ করব। আমি সত্য বলছি, কাল আমরা পূর্ণশক্তিতে সংগ্রামে তোমাকে সাহায্য করব।'

মাতুল কৃপাচার্য এইভাবে হিতকথা বলায় অশ্বত্থামা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন—'যে ব্যক্তি দুঃখী, ক্রোধে পরিপূর্ণ, অর্থ চিন্তায় চিন্তিত অথবা কার্য-সিদ্ধির জন্য ভাবনা-চিন্তায় ব্যস্ত, তার কী করে ঘুম আসবে ? একটু ভেবে দেখুন এই চারটি চিন্তাই আমাকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। ক্রোধে আমার ঘুম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই পাপীরা যেভাবে আমার পিতাকে বধ করেছে, সেই কুকর্ম দিনরাত আমার হৃদয় জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। আপনি সেসবই প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অবস্থায় আমার মতো মানুষ এক মুহূর্তও কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে ! আমি পাঞ্চালদের মুখে 'দ্রোণ মারা গেছে'

এই কথাটি শুনেছি। তাই আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করে বেঁচে থাকতে পারছি না। রাজা দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়েছে। তাঁর এই দুঃখের কথা শুনে এমন কে কঠোর হৃদয় আছে, যার চোখে জল আসবে না ? আমি বেঁচে থাকতে আমার মিত্রমণ্ডলীর এই দুর্দশা হওয়ায় আমার শোক ও প্রতিহিংসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল আমার মন সেই চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকে। সেই পরিস্থিতিতে আমার ঘুম কী করে আসবে ? স্বস্তি বা কী করে পাব ? দূতরা যখন আমাকে আমাদের পরাজয়ের সংবাদ জানাল তখন আমার হৃদয়ে যেন আগুন ধরে গেল। তাই আমি আজই সেই নিদ্রিত শত্রুদের সংহার করে বিশ্রাম করব এবং নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোব।'

কৃপাচার্য বললেন—'অশ্বত্থামা ! আমার সিদ্ধান্ত হল এই যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির নয় এবং ইন্দ্রিয়ের ওপর যার আধিপত্য নেই, সে ধর্ম ও অর্থ সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। তেমনই মেধাবী হলেও যে বিনয়ী হতে শেখেনি, সেও ধর্ম ও অর্থের নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। মূর্খ যোদ্ধা বহুদিন ধরে পণ্ডিতের সেবা করলেও ধর্মরহস্য জানতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক মুহূর্ত পণ্ডিতের কাছে থাকলে তখনই ধর্মকে জেনে যায়। যে ব্যক্তি ধর্ম উপাখ্যান শ্রবণ করার ইচ্ছাসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, সংযতেন্দ্রিয়, সে সমস্ত শাস্ত্রই বুঝতে পারে। কিন্তু যে দুরাত্মা এবং পাপী ব্যক্তি ভালো কাজ ত্যাগ করে দুঃখরূপ ফলপ্রদানকারী কর্ম করে, তাকে কোনোভাবেই সেই সব দুষ্কর্ম থেকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। যারা সনাথ, তাদের সুহৃদরা একরূপ কর্ম করতে বাধা দেয়। কিন্তু তার প্রারব্ধে যদি সুখ পাওয়ার থাকে, তবে সে বাধা মেনে নেয়, নচেৎ নয়। বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিকে সৎপুরুষগণ অম্ল-মধুর বাক্যে বুঝিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন, নচেৎ সঠিক পথে না ফিরলে তাকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। পুত্র ! তুমিও মনকে বশে এনে কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হও এবং আমার কথা শোনো, যাতে তোমার অনুতাপ করতে না হয়। যে ব্যক্তি নিদ্রিত, যে অস্ত্রত্যাগ করেছে, রথ ও ঘোড়া ছেড়ে এসেছে, যে 'আমি আপনার শরণাগত' বলে, যার বাহন বিনষ্ট হয়েছে, এই পৃথিবীতে তাদের বধ করা ধর্মত ভালো বলা হয় না। এখন রাত্রিকালে সব পাঞ্চালবীর বর্ম খুলে রেখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। যে ব্যক্তি এই অবস্থায় তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে, সে অবশ্যই বিনা নৌকায় অগাধ নরকে ডুবে যাবে। পৃথিবীতে তোমাকে সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আজ পর্যন্ত তোমার মধ্যে কোনো ক্ষুদ্রতম দোষও দেখা যায়নি। তুমি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। সুতরাং কাল যখন সূর্য উদিত হবে তখন সব প্রাণীদের সম্মুখেই তোমার শত্রুদের রণে পরাস্ত করবে।'

অশ্বত্থামা বললেন—'মাতুল ! আপনি যা বলছেন, নিঃসন্দেহে তা ঠিক কথা। কিন্তু পাণ্ডবরা এই ধর্মমর্যাদাকে প্রথমেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যক্ষভাবে আপনার এবং সমস্ত রাজাদের সামনে আমার অস্ত্রহীন পিতাকে বধ করেছিলেন। রথীশ্রেষ্ঠ কর্ণের যখন রথের চাকা আটকে গিয়েছিল এবং তিনি অত্যন্ত সংকটে পড়েছিলেন, সেইসময় অর্জুন তাঁকে বধ করেছিল। পিতামহ ভীষ্মকেও শিখণ্ডীর আড়াল থেকে অর্জুন বধ করেছিল, সেইসময় তিনি অস্ত্রাদি ফেলে নিরস্ত্র ছিলেন। বীরবর ভূরিশ্রবা অনশন ব্রতে উপবেশন করেছিলেন এবং সমস্ত রাজা বাধাপ্রদান করা সত্ত্বেও সাত্যকি তাঁকে বধ করে। মহারাজ দুর্যোধনকেও ভীম গদাযুদ্ধে আহ্বান করে সব রাজাদের সামনে অন্যায়ভাবে বধ করেছে। সেইজন্য আমাকে যদি কীট-পতঙ্গাদির জন্মও নিতে হয়, তবুও আমি আমার পিতার হত্যাকারী এই পাঞ্চালদের রাত্রে নিদ্রামগ্ন-অবস্থায় হত্যা করব। আমি যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, সেটি সম্পন্ন করার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছি। এইসময় আমার ঘুম আসবে কী করে, আর শান্তিই বা কেমন করে পাব ? জগতে এমন কেউ এখনও জন্মগ্রহণ করেনি যে আমার এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে সক্ষম।'

শ্রীমহাদেবকে অশ্বত্থামার প্রহার, পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের পর তাঁর থেকে খড়্গ প্রাপ্তি

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কৃপাচার্যকে একথা বলে দ্রোণপুত্র একাকী নিজ ঘোড়া নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তখন কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি রথ প্রস্তুত করছ কেন ? কী করার কথা ভাবছ ? আমরা তোমার সঙ্গেই আছি, সুখ-দুঃখে তোমার সঙ্গেই থাকব।' একথা শুনে অশ্বত্থামা যা করতে মনস্থ করেছিলেন, তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন—'ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার পিতাকে তখনই মেরেছিল, যখন তিনি শস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং আজ সেই পাপী পাঞ্চালপুত্রকে আমি সেইরূপ পাপকর্মের আশ্রয় নিয়ে শস্ত্র ও বর্মহীন অবস্থায় বধ করব। আমার সিদ্ধান্ত হল যে, সে যেন যুদ্ধে নিহত কোনো সশস্ত্র ব্যক্তির প্রাপ্তব্য শ্রেষ্ঠ লোক না পায়। আপনারা শীঘ্রই বর্মধারণ করুন ও অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমার সঙ্গে সুযোগের প্রতীক্ষা করুন।'

এই কথা বলে অশ্বত্থামা রথে আরোহণ করে শত্রুদের শিবিরের দিকে রওনা হলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাও রওনা হলেন। সেই রাত্রে, যখন সকলেই নিদ্রিত, তিনি পাণ্ডবদের শিবিরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে তিনি দেখলেন দরজায় সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী এক বিশালকায় ব্যক্তি দণ্ডায়মান। সেই মহাপুরুষকে দেখে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেছিলেন, তার ওপর মৃগচর্ম জড়ানো, সর্পের যজ্ঞোপবীত গায়ে। তাঁর বিশাল বাহুতে নানা প্রকার অস্ত্র সুশোভিত ছিল। শরীরের ওপরদিকে বড় বড় সর্প বাঁধা ছিল, মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বার হচ্ছিল। তাঁর প্রচণ্ড কিরণে শঙ্খ, চক্র, গদাধারণকারী শত-শত, হাজার-হাজার বিষ্ণু প্রকাশিত হচ্ছিলেন।

জগৎকে ভীতসন্ত্রস্তকারী সেই অদ্ভুত পুরুষকে দেখেও অশ্বত্থামা ভয় পেলেন না, পরিবর্তে তাঁর ওপর নানা দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। সেই দেবতা অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রই আত্মসাৎ করলেন। তাই দেখে অশ্বত্থামা অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান এক রথশক্তি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সেটিও তাঁর গায়ে লেগে ভেঙে গেল। অশ্বত্থামা তখন এক ধারালো তলোয়ার নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন, সেটি তাঁর দেহে লীন হয়ে গেল। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে গদা নিক্ষেপ করলে, সেটিও তিনি গলাধঃকরণ করলেন।

এইভাবে অশ্বত্থামার সব অস্ত্র শেষ হয়ে গেলে তিনি ভীত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন, তিনি দেখলেন সমস্ত আকাশ বিষ্ণুদ্বারা ভরে আছে। অস্ত্রহীন অশ্বত্থামা এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে আচার্য কৃপের কথা স্মরণ করে বলতে লাগলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সুহৃদের অপ্রিয় হিতবচন শোনে না, সে আমারই মতো বিপদে পড়ে শোক করে। যে মূর্খ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কথার অসম্মান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। মানুষের গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, নারী, মিত্র, মাতা, গুরু, দুর্বল, মূর্খ, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, সদ্য নিদ্রোত্থিত, মত্ত, উন্মত্ত এবং অসতর্ক ব্যক্তির ওপর অস্ত্রাঘাত করা উচিত নয়। গুরুজনেরা এই শিক্ষাবিধান করেছেন। কিন্তু আমি সেই শাস্ত্রীয় সনাতন পথ লঙ্ঘন করে কুপথ অবলম্বন করেছি, তাই এই ঘোর বিপদে পড়েছি। মানুষ যখন কোনো কাজ আরম্ভ করে মাঝপথেই ভয় পেয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন বুদ্ধিমান লোকেরা তাকে মূর্খ

বলে। এই কাজ করার সময় প্রথমেই আমার ত্রাস উপস্থিত হয়েছিল। নাহলে দ্রোণপুত্র কোনো যুদ্ধে পিছু হটে না। কিন্তু এই মহাভূত আমার সম্মুখে বিধাতার দণ্ডের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। আমি অনেক ভেবেও একে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার বুদ্ধি যে অধর্ম দ্বারা কলুষিত হয়েছে, নিশ্চয়ই সেটিকে দমন করার জন্যই এই ভয়ংকর বিপদ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমাকে যে এখন যুদ্ধ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে দৈবেরই বিধান। সত্যই দৈবের অনুকূলতা না থাকলে মানুষের কোনো কাজই সফল হতে পারে না। সুতরাং আমি এখন ভগবান শংকরের শরণ গ্রহণ করছি ; যিনি জটাজুটধারী, দেবতাদের বন্দনীয়, উমাপতি, সর্বপাপহারী এবং ত্রিশূলধারী, তিনিই এই ভয়ানক দৈব বিঘ্ন বিনাশ করতে সক্ষম।'

এই কথা ভেবে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথ থেকে নেমে দেবাদিদেব শ্রীমহাদেবের শরণাগত হয়ে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'আপনি উগ্র, অচল, কল্যাণময়, রুদ্র, শর্ব, সকল বিদ্যার অধীশ্বর, পরমেশ্বর, পর্বতে শয়ন করেন, বরদায়ক দেবতা, জগৎ উৎপন্নকারী জগদীশ্বর, নীলকণ্ঠ, অজ, শুক্র, দক্ষযজ্ঞবিনাশকারী, সর্বসংহারক, বিশ্বরূপ, ভীষণ নেত্রসম্পন্ন, বহুরূপ, উমাপতি, শ্মশানবাসী, গর্বিত, মহাগণাধ্যক্ষ, খট্বাঙ্গধারণকারী। আপনি রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, মস্তক জটায় সুশোভিত, ব্রহ্মচারী এবং ত্রিপুরাসুর বিনাশকারী। আমি অত্যন্ত শুদ্ধ হৃদয়ে আত্মসমর্পণ করে আপনার পূজা করছি। সকলেই আপনার স্তুতি করেন, আপনি সকলেরই আরাধ্য। আপনিই ভক্তদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী, গজচর্মে সুশোভিত, রক্তবর্ণ, নীলগ্রীব, অসহনীয়, শত্রুদের কাছে দুর্জয়, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সৃষ্টিকারী, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, ব্রতধারী, তপোনিষ্ঠ, অনন্ত, তপস্বীগণের আশ্রয়, বহুরূপবিশিষ্ট, গণপতি, ত্রিনয়ন, নিজ পার্ষদদের প্রিয়, ধনেশ্বর, পৃথিবীর মুখস্বরূপ, পার্বতীর প্রাণেশ্বর, প্রভু কার্তিকেয়র পিতা, পীতবর্ণ, বৃষবাহন, দিগম্বর। আপনার বেশ অত্যন্ত উগ্র ; আপনি পার্বতীকে বিভূষিত করতে তৎপর, ব্রহ্মাদি থেকে শ্রেষ্ঠ, পরাৎপর এবং আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। আপনি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারণ করেন, সমস্ত দিকের অন্তিম সীমা, সব দেশের রক্ষক, সুবর্ণময় বর্ম ধারণকারী, আপনার স্বরূপ দিব্য এবং আপনি আপনার মস্তকে অলংকাররূপে চন্দ্রকলাকে ধারণ করেছেন, আমি অত্যন্ত সমাহিত হয়ে আপনার শরণ গ্রহণ করছি। যদি আজ এই দুস্তর বাধাবিপত্তি পার হয়ে যাই তাহলে সমস্ত ভূতাদির সংঘাতরূপ এই শরীরকে বলি দিয়ে আপনার পূজা করব।'

অশ্বত্থামার এইরূপ দৃঢ় ভক্তি দেখে তাঁর সামনে এক স্বর্ণময় বেদী উদ্ভূত হল, সেই বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত হল। সেই অগ্নিতে বহু-গণ প্রকাশিত হল, তাদের মুখ ও নেত্র দেদীপ্যমান ছিল ; তাঁদের অনেক মস্তক, পদ ও হস্ত ছিল ; তাঁদের বাহুতে নানারত্ন বিজড়িত অলংকার সুশোভিত ছিল। তাঁরা হাত ওপরে তুলে রেখেছিলেন। তাঁদের দেহ পর্বতের ন্যায় বিশাল, তাঁরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রসহ সমস্ত দ্যুলোক ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন এবং তাঁদের মধ্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ—চার প্রকারের প্রাণী সংহার করার ক্ষমতা ছিল। তাঁদের কোনোকিছুর ভয় ছিল না। ইচ্ছানুযায়ী বিচরণকারী এবং ত্রিলোকের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সর্বদা আনন্দময়, বাণীর অধীশ্বর মৎসরহীন ছিলেন এবং ঐশ্বর্যশালী হলেও তাঁরা অহংকারী ছিলেন না। তাঁদের অদ্ভুত কর্মে ভগবান শংকরও সর্বদা চমকিত হতেন এবং কায়মনোবাক্যে ও কর্মের দ্বারা সর্বদা তাঁদের আরাধনা করতেন। তাই ভগবান শংকরও সর্বদা তাঁদের পুত্রের ন্যায় রক্ষা করতেন।

এইসকল গণ বড়ই ভয়ংকর ছিলেন। এঁদের দর্শনে ত্রিলোক ভীতসন্ত্রস্ত হয়। মহাবলী অশ্বত্থামা কিন্তু এঁদের দেখে ভয় পেলেন না। তিনি নিজেকেই এঁদের কাছে বলিরূপে সমর্পণ করতে চাইলেন। এই কাজ করার জন্য তিনি ধনুককে সমিধ, বাণসমূহকে দর্ভ এবং নিজ দেহকে হবি করলেন। সোমদেবের মন্ত্র পড়ে তিনি অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিতে উদ্যত হয়ে হাত জোড় করে ভগবান রুদ্রের স্তব করতে লাগলেন—'বিশ্বাত্মন্ ! এই বিপদের সময় আপনার প্রতি ভক্তিভাবে সমাহিত হয়ে আমি এই পূজা সমর্পণ করছি। আপনি এটি স্বীকার করুন। সমস্ত ভূত আপনাতে অবস্থিত, আপনি সমস্ত ভূতে অবস্থিত। আপনার থেকেই প্রধান গুণগুলির ঐক্য হয়। বিভো ! আপনি সমস্ত প্রাণীর আশ্রয় ; এই শত্রুর পরাভব যদি আমার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে হবিরূপে অর্পণ করা

আমার এই দেহ গ্রহণ করুন।'

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এই কথা বলে সেই দেদীপ্যমান অগ্নিবেদীতে উঠে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অগ্নির মধ্যে আসনে বসলেন। তাঁকে হবিরূপে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বসে থাকতে দেখে ভগবান শংকর হেসে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সারল্য, ত্যাগ, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, ভক্তি, ধৈর্য, বুদ্ধি এবং বাক্যের দ্বারা আমাকে যথোচিত আরাধনা করেছেন। তাই তাঁর থেকে বেশি প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নেই। পাঞ্চালদের রক্ষা করে আমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছি ; কিন্তু কালক্রমে এখন এঁরা নিস্তেজ হয়ে গেছেন এবং এঁদের আয়ুরও অবশেষ নেই।' এই বলে ভগবান শংকর অশ্বত্থামাকে একটি তীক্ষ্ণ তলোয়ার দিয়ে তাঁর শরীরে লীন হয়ে গেলেন। অশ্বত্থামাতে তিনি আবিষ্ট হলে অশ্বত্থামা অত্যন্ত তেজস্বী হয়ে গেলেন।

অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ডব ও পাঞ্চাল বীরদের সংহার

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবার পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করলেন। কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা দ্বারে রক্ষা করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা তাঁদের সঙ্গে পেয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং শান্তভাবে বললেন—'আপনারা দুজনে প্রস্তুত থাকলে সব ক্ষত্রিয়দের সংহার করতে পারেন, এই নিদ্রিত সামান্য কয়েকজন যোদ্ধাদের তো কথাই নেই ! আমি শিবিরের মধ্যে ঢুকে ওদের কালের মতো বিনাশ করতে আরম্ভ করব। আপনারা শুধু এইটুকু করবেন যে ওরা যেন কেউ জীবিত পালাতে না পারে।'

এই কথা বলে দ্রোণপুত্র পাণ্ডবদের বিশাল শিবিরে দরজা দিয়ে না প্রবেশ করে মাঝখান দিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর অজ্ঞাতস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবির কোথায় জানতেন। চুপচাপ তিনি সেখানে পৌঁছে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, যোদ্ধারা পরিশ্রান্ত হয়ে অচৈতন্যের মতো নিদ্রামগ্ন। এদের কাছেই এক মহার্ঘ শয্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নও নিদ্রায় আছেন। অশ্বত্থামা তাঁকে পদাঘাতে জাগালেন। বলোন্মত্ত অশ্বত্থামার পদাঘাতে জেগে উঠে মহাবলী অশ্বত্থামাকে শিবিরের মধ্যে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন যেই উঠতে যাবেন, অশ্বত্থামা তখনই তাঁর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে মাটিতে আছাড়

মারলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেইসময় নিদ্রা ও ভয়ে অবদমিত

হয়েছিলেন, তাই অশ্বত্থামার প্রহারে নিরুপায় হয়ে গেলেন। অশ্বত্থামা দুই হাঁটু দিয়ে তাঁর গলা ও বুক চেপে ধরলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন চিৎকার করতে করতে ছটফট করতে লাগলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁকে পশুর মতো প্রহার করলেন। শেষকালে তিনি অশ্বত্থামাকে নখ দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে কোনোমতে বললেন, 'আচার্যপুত্র ! বৃথা দেরি কোরো না, আমাকে অস্ত্রের আঘাতে শেষ করে দাও।' এইটুকু বলা মাত্র অশ্বত্থামা তাঁকে জোরে চেপে ধরে তাঁর অস্পষ্ট কথা শুনে বললেন—'ওরে কুলকলঙ্ক ! নিজের আচার্যকে যে হত্যা করে, সে পুণ্যলোক পায় না। তাই তোমাকে অস্ত্রদ্বারা বধ করা উচিত নয়।' এই বলে কুপিত হয়ে পদাঘাতে তাঁর মর্মস্থানে আঘাত করলেন। এইসময় ধৃষ্টদ্যুম্নের চিৎকারে সেই গৃহের নারী ও রক্ষীগণ জেগে গেল। তারা এক অলৌকিক পরাক্রমশালী পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করছে দেখে তাকে অশরীরী বলে মনে করল। তাই তারা ভীত হয়ে কথা বলতে সাহস করল না।

অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নৃশংসভাবে পশুর মতো বধ করলেন। তারপর তিনি সেই শিবির থেকে বেরিয়ে এসে রথে চড়ে সমস্ত শিবিরে ঘুরতে লাগলেন। পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত দেখে তাঁর রানিগণ এবং রক্ষীকুল শোকে অধীর হয়ে পড়ল। তাঁদের কোলাহলে আশপাশের ক্ষত্রিয় বীরেরা চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—'কী হল ?' 'কী হল ?' তখন নারীগণ আর্তকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে বলল—'শীঘ্র এসো ! আমরা তো বুঝতে পারছি না, রাক্ষস না মানুষ, কে এসেছিল, পাঞ্চালরাজকে বধ করে রথে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' একথা শুনে যোদ্ধারা একত্রিত হয়ে অশ্বত্থামাকে ঘিরে ধরল। কিন্তু কাছে যেতেই অশ্বত্থামা তাদের রুদ্রাস্ত্রের সাহায্যে বধ করলেন।

তারপর অশ্বত্থামা কাছের এক তাঁবুতে উত্তমৌজাকে পালঙ্কে নিদ্রারত দেখলেন। তারও গলা ও বুক পদদলিত করলেন, উত্তমৌজা চিৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁকেও অশ্বত্থামা পশুর মতো হত্যা করলেন। যুধামন্যু ভাবলেন কোনো রাক্ষস উত্তমৌজাকে বধ করেছেন, তাই তিনি গদা হাতে দৌড়ে গিয়ে অশ্বত্থামার বুকে আঘাত করলেন। অশ্বত্থামা লাফিয়ে তাঁকে ধরে মাটিতে আছাড় মারলেন। মুক্তি পাওয়ার জন্য যুধামন্যু বহু ছটফট করলেন কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁকেও পশুর মতো বধ করলেন।

এইভাবে তিনি নিদ্রামগ্ন অন্য মহারথীদেরও একে একে আক্রমণ করলেন। তাঁরা সব ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। অশ্বত্থামা সকলকেই তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুর পারে পাঠালেন। শিবিরের বিভিন্নভাগে মধ্যম শ্রেণীর সৈনিকদের নিদ্রায় বেহুঁশ দেখে তিনি তলোয়ারের আঘাতে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। এইভাবে বহু যোদ্ধা, হাতি, ঘোড়াকে তিনি মৃত্যুমুখে পাঠালেন। অশ্বত্থামার সমস্ত শরীর রক্তে ভরে গেল, তখন তাঁকে সাক্ষাৎ কালের ন্যায় দেখাচ্ছিল। সেই সময় যেসব মহারথী জেগে উঠেছিলেন, তাঁরা তাঁকে রাক্ষস ভেবে ভয়ে চোখবন্ধ করে ছিলেন। অশ্বত্থামা এইভাবে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে সমস্ত স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দ্রৌপদীর পুত্ররা যখন ধৃষ্টদ্যুম্নের মৃত্যুসংবাদ পেলেন, তাঁরা তখন নির্ভয়ে অশ্বত্থামার ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা তাঁর দিব্য অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং প্রতিবিন্ধ্যকে বধ করলেন। সুতসোম প্রথমে প্রাস দিয়ে আঘাত করলেন, তারপর তলোয়ার নিয়ে দ্রোণপুত্রের দিকে এগোলেন। অশ্বত্থামা তলোয়ার-সহ তাঁর হাত কেটে পাঁজরে তীব্র আঘাত করলেন। সেই আঘাতে সুতসোম প্রাণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন নকুলের পুত্র শতানীক একটি রথের চাকা তুলে অত্যন্ত বেগে অশ্বত্থামার বুকে আঘাত করলেন। অশ্বত্থামাও তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করলেন। শতানীক অত্যন্ত আহত হয়ে মাটিতে পড়লে, অশ্বত্থামা তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। তখন শ্রুতকর্মা পরিঘ হাতে অশ্বত্থামার দিকে গিয়ে তাঁর বাম গালে আঘাত করলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁর তীক্ষ্ণ তলোয়ার দিয়ে তাঁর মুখে এমন জোরে আঘাত করলেন যে তাঁর চেহারা বিকৃত হয়ে গেল এবং শ্রুতকর্মা অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মহারথী শ্রুতকীর্তি তাই দেখে অশ্বত্থামার সামনে এসে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ঢালের দ্বারা বাণবর্ষা প্রতিহত করে তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন।

তারপর অশ্বত্থামা নানা অস্ত্রের দ্বারা শিখণ্ডী ও প্রভদ্রককে মারতে লাগলেন। তিনি এক বাণে শিখণ্ডীর ভ্রূ-এর মধ্যস্থলে আঘাত করে কাছে গিয়ে এক তরোয়ালের

আঘাতে তাঁকে দু টুকরো করে দিলেন। শিখণ্ডীকে বধ করে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে অত্যন্ত বেগে প্রভদ্রককে আক্রমণ করলেন। রাজা দ্রুপদের যে কয়েকজন সৈন্য জীবিত ছিল, তাদের শেষ করে এবারে তিনি দ্রুপদের পুত্র, পৌত্র এবং আত্মীয়দের খুঁজে খুঁজে হত্যা করলেন।

অশ্বত্থামার সিংহনাদ শুনে পাণ্ডব সৈন্যদের হাজার হাজার বীর জেগে উঠল। তিনি তাদের কারো হাত, কারো পা, কারো পাঁজর কেটে দিলেন, তারা ভয়ানক চিৎকার করতে লাগল। আহত বীররা, 'এ কে, কোথা থেকে এল, কীসের শব্দ'—এইসব বলে চেঁচাতে লাগল। তাদের কাছে অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ যমের ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় বীররা বর্মরহিত ও বর্মপরিহিত থাকা সত্ত্বেও তাদের সকলকেই অশ্বত্থামা যমলোকে পাঠালেন। যারা নিদ্রায় অচেতন প্রায় হয়েছিল, তারা এই ভয়ানক শব্দে চমকিত হয়ে জেগে উঠে ভয়ে এদিক-ওদিক লুকিয়ে পড়ল।

এরপর অশ্বত্থামা আবার রথে চড়ে হাতে ধনুক নিয়ে অন্য যোদ্ধাদের বধ করতে লাগলেন। হাতে ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে সমস্ত ছাউনিতে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সিংহনাদ শুনে যোদ্ধারা চমকিত হয়ে পড়ছিল ; ফলে নিদ্রা ও ভয়ে হতচকিত অবস্থায় তারা এদিক-ওদিক পালাতে লাগল, চিৎকার করে নানা উলটো-পালটা কথা বলতে লাগল, তাদের চুল এলোমেলো, চক্ষু রক্তবর্ণ। তাই কেউই কাউকে চিনতে পারছিল না। কেউ ভয়ে পায়খানা-প্রস্রাব করে ফেলছে, কেউ আবার মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। হাতি-ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে নানাদিকে ছুটছে, তাদের পায়ের নীচে কত লোক পড়ে মরে যাচ্ছে। এইসব ছোটাছুটিতে সেই শিবির ধুলায় ধূসরিত হয়ে উঠল, সেই ধুলায় রাত্রের অন্ধকার দ্বিগুণ হয়ে গেল। পিতা-পুত্র, ভাই-বন্ধু একে অপরকে চিনতে পারছিল না। এইভাবে তারা নিজেরাই নিজের নিজের আপনজনকে আঘাত হানতে লাগল। দৈববশে তাদের বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

বহু বীর অস্ত্র ও বর্ম ছাড়াই শিবিরের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, শিবিরের বাইরে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা পাহারায় ছিলেন। তাঁরা কাউকে জীবিত পালাতে দিলেন না। অশ্বত্থামার প্রসন্নতার জন্য তাঁরা শিবিরের তিন দিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। সেই আগুনে চতুর্দিক আলোকিত হলে অশ্বত্থামা সামনে যাকে দেখতে পেলেন তলোয়ার দ্বারা তাকেই দু টুকরো করে ফেললেন। এইভাবে কারো হাত, কারো পা, কারো মাথা কেটে তিনি শিবিরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

সেই অন্ধকার রাত্রি বড় ভয়ংকর হয়ে উঠল। হাজার হাজার মৃত-অর্ধমৃত মানুষ, হাতি, ঘোড়ায় পরিবৃত সেই স্থান দেখলে অত্যন্ত সাহসী লোকেরও হৃদয় কম্পিত হত। লোকেরা হাহাকার করে বলতে লাগল, 'আজ পাণ্ডবদের কাছে না থাকাতেই আমাদের এই দুর্গতি। অর্জুনকে অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস—কেউই পরাজিত করতে পারে না, কারণ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রক্ষক।' কিছুক্ষণ পরে সমস্ত কোলাহল শান্ত হয়ে গেল। সমস্ত মাটি রক্তে রক্তাপ্লুত হয়েছিল, তাই ধুলোর ঝড় এক মুহূর্তে থেমে গিয়েছিল। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ হাজার হাজার বীরকে মেরে ফেললেন, যারা প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছিল বা ভয়ে হতচকিত হয়ে পড়েছিল। রাজন্! এইভাবে সেই মধ্যরাতে দ্রোণপুত্র পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যকে কিছুক্ষণের মধ্যেই যমালয়ে পাঠালেন।

প্রভাতের আলো উঁকি দিতেই অশ্বত্থামা শিবিরের বাইরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর হাতের তলোয়ার রক্তে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল, যেন সেটি তাঁর আর এক অঙ্গ। নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেই কঠিন কর্ম করে অশ্বত্থামা পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে তৃপ্তি পেলেন। তিনি বাইরে এসে প্রসন্ন হয়ে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে তাঁর কাজের ইতিবৃত্তান্ত জানালেন। তাঁরাও অশ্বত্থামাকে খুশি করার জন্য জানালেন যে তাঁরা সেইস্থানে হাজার হাজার পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীর বধ করেছেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! অশ্বত্থামা তো আমার পুত্রের বিজয়লাভের জন্যই প্রাণপণ করেছিল। তাহলে এই মহান কর্ম আগে কেন করেনি ?'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! অশ্বত্থামা পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকিকে ভয় পেতেন। তাই তিনি এতদিন এই কাজ করতে পারেননি। এই সময় তাঁরা ওখানে না থাকাতে তিনি এই কাজ করতে সক্ষম হন।

অশ্বত্থামা তারপর আচার্য কৃপ ও কৃতবর্মাকে আলিঙ্গন করলেন, তাঁরাও তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর অশ্বত্থামা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললেন—'আমি সমস্ত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, সংগ্রামে জীবিত সকল মৎস্য এবং সোমক বীরদের বিনাশ করেছি। এখন আমার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। অতএব রাজা দুর্যোধন যেখানে, সেখানে যাওয়া যাক। তিনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে তাঁকে এই সমাচার শোনাতে হবে।'

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্যাদি কর্তৃক দুর্যোধনকে সব খবর জানানো এবং দুর্যোধনের মৃত্যু

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! এই তিন মহারথী সমস্ত পাঞ্চাল বীর এবং দ্রৌপদীর পুত্রদের বধ করে রাজা দুর্যোধন যেখানে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়েছিলেন, সেই স্থানে এলেন। তাঁরা দুর্যোধনের দেহে প্রাণের সামান্য চিহ্ন লক্ষ্য করলেন। তাঁর মুখ দিয়ে রক্তবমন হচ্ছিল, চারদিকে শকুন, হিংস্র পশু তাঁকে ঘিরে ধরেছিল, তারা দুর্যোধনকে ভক্ষণের চেষ্টা করছিল কিন্তু দুর্যোধন অতি কষ্টে তাদের আটকে রেখেছিলেন। সেইসময় তাঁর অত্যন্ত বেদনা হচ্ছিল।

দুর্যোধনকে এইভাবে কষ্টে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তিন বীর মর্মবেদনায় কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা হাত দিয়ে তাঁর মুখের রক্ত মুছে অত্যন্ত দীনভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

কৃপাচার্য বললেন—'হায়! বিধাতার কাছে কোনো কাজই কঠিন নয়। আজ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি রাজা দুর্যোধন এইভাবে রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। রাজমহলে যেমনভাবে মহারানি শয়ন করতেন এই স্বর্ণমণ্ডিত গদাও সেইভাবে দুর্যোধনের সঙ্গে শয়ন করে আছে। কালের কুটিলতা দেখ, যে শত্রুসূদন সম্রাট কোনো সময় মূর্ধাভিষিক্ত রাজাদের আগে চলতেন, আজ তিনি ধুলায় ধূসরিত হয়ে পড়ে আছেন। যাঁর সামনে শত শত রাজা ভয়ে মাথা নীচু করে থাকতেন, তিনি আজ এই বীরশয্যায় শায়িত, আগে যাঁকে অনেক ব্রাহ্মণ অর্থ প্রাপ্তির জন্য ঘিরে থাকতেন, তাঁকে আজ মাংসের লোভে মাংসাশী প্রাণীরা ঘিরে ধরেছে।'

অশ্বত্থামা বললেন—'রাজশ্রেষ্ঠ! আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলা হত। আপনি সাক্ষাৎ ভগবান সংকর্ষণের শিষ্য এবং যুদ্ধে কুবেরের সমকক্ষ। তাসত্ত্বেও ভীম কী করে আপনাকে আঘাত করলেন! আপনি ধর্মজ্ঞ, ক্ষুদ্র ও পাপী ভীমসেন কীভাবে আপনাকে আহত করল! কালের গতি বোঝা সত্যই বড় কঠিন। ভীমসেন আপনাকে ধর্মযুদ্ধে আহ্বান করে অধর্মপূর্বক আপনার ঊরুভঙ্গ করেছেন। এইভাবে অধর্মপূর্বক মেরে যখন ভীম আপনাকে পদাঘাত করছিলেন, তখনও কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির সেই নীচকে কিছুই বলেননি। তাঁদের ধিক্! ভীম কপটতাপূর্বক আপনাকে পরাজিত করেছেন। তাই যতদিন পৃথিবীতে প্রাণী থাকবে, ততদিন যোদ্ধারা তাঁর নিন্দা করবে। মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দের যে উত্তমগতির কথা বলেছেন, যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করায় তা আপনি লাভ করেছেন। রাজন্! আপনার জন্য আমি চিন্তা করছি না; আমার তো আপনার পিতা এবং মাতা গান্ধারীর জন্য দুঃখ হচ্ছে, যাঁদের সব পুত্রই কালপ্রাপ্ত হয়েছে। হায়! তাঁরা এখন ভিখারি হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরবেন, সব সময় পুত্রশোক তাঁদের কষ্ট দেবে। ধিক্ বৃষ্ণিবংশজাত কৃষ্ণ এবং দুষ্টবুদ্ধি অর্জুনকে, যাঁরা মস্তবড় ধর্মজ্ঞ হওয়ার অহংকার করেও ভীমসেনকে যুদ্ধের সময় বাধা দেননি। এই নির্লজ্জ পাণ্ডবরা কোন মুখে বলবে যে তারা দুর্যোধনকে এভাবে বধ করেছে? গান্ধারীনন্দন! আপনি ধন্য যে যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। ধিক্কার দিই কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও আমাকে, যে আমরা আপনার ন্যায় মহারাজের সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারলাম না। আমরা যে আপনাকে অনুসরণ করতে পারলাম না—তাতে মনে হয় আমরা আপনার সুকৃতির কথা চিন্তা করতে পারলাম না—এমনিই মারা যাব, স্বর্গ বা অর্থ—কোনোটাই লাভ করব না। জানিনা আমরা কী কর্ম করেছি, যার জন্য আপনার সঙ্গে স্বর্গ গমনে বাধাপ্রাপ্ত হলাম। নিঃসন্দেহে বড় দুঃখে এই পৃথিবীতে আমাদের দিন কাটবে। রাজন্! আপনি না থাকলে আমরা কী করে সুখ-শান্তি পাব? আপনি স্বর্গগমন করছেন, সেখানে সব মহারথীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে। তাঁদের বয়স এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুসারে আপনি আমাদের হয়ে নমস্কার জানাবেন। প্রথমে আপনি সমস্ত ধনুর্ধরীর ধ্বজাস্বরূপ আচার্যকে পূজা করে তাঁকে জানাবেন যে আজ অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেছে। তারপর মহারাজ

বাহ্লীক, মহারথী জয়দ্রথ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং আরও যাঁরা স্বর্গগমন করেছেন, আমার হয়ে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করবেন।

রাজন্ ! আপনার প্রাণশক্তির যদি কিছু অবশেষ থাকে তাহলে আমার একটা কথা শুনুন, এতে আপনি মনে শান্তি পাবেন। এখন পাণ্ডবপক্ষে তারা পাঁচ ভাই, সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ—এই সাত বীর জীবিত আছে আর আমাদের পক্ষে আমি কৃতবর্মা এবং আচার্য কৃপ—এই তিনজন বেঁচে আছি। দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নেরা সকলে এবং সমস্ত পাঞ্চাল এবং যুদ্ধে জীবিত মৎস্য বীরদের বিনাশ করা হয়েছে। বিপক্ষের যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, তা শুনুন। তাদের শিশুদেরও বধ করা হয়েছে। তাদের শিবিরে যত যোদ্ধা ও হাতি-ঘোড়া ছিল, আজ সকলকেই আমি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি। পাপী ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমি পশুর ন্যায় নৃশংসভাবে হত্যা করেছি।

দুর্যোধন অশ্বত্থামার এই মনমুগ্ধকর কাজ শুনে কিছুটা চেতনা ফিরে পেলেন, তিনি বললেন—'মিত্র ! আজ আচার্য কৃপ এবং কৃতবর্মার সঙ্গে যে কাজ তুমি করেছ, তা ভীষ্ম, কর্ণ এবং তোমার পিতাও করতে পারেননি। তুমি শিখণ্ডী ও সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে যে বধ করেছ, তাতে আমি নিজেকে ইন্দ্রের সমান বলে মনে করছি। তোমার মঙ্গল হোক, এবার স্বর্গেই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।' এই বলে দুর্যোধন চুপ করলেন এবং সুহৃদদের দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে প্রাণত্যাগ করলেন। তিনি স্বয়ং পুণ্যধাম স্বর্গলোকে গেলেন, তাঁর নশ্বর দেহ পৃথিবীতে পড়ে রইল। রাজন্ ! এইভাবে আপনার পুত্র দুর্যোধনের মৃত্যু হল। তিনি

রণাঙ্গনে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেছিলেন আর সর্বশেষে তাঁর মৃত্যু হল। মৃত্যুর আগে দুর্যোধন তিন বীরকে আলিঙ্গন করেন। অশ্বত্থামার মুখে এই করুণ সংবাদ শুনে শোকাকুল হয়ে প্রভাত হতেই আমি নগরে চলে আসি। এইভাবে আপনারই অদূরদর্শিতায় কৌরব ও পাণ্ডবদের ভীষণ সংহার হল। আপনার পুত্রের স্বর্গবাস হওয়ায় আমি অত্যন্ত শোকার্ত। ব্যাসদেবের কৃপায় প্রাপ্ত আমার দিব্য দৃষ্টি এখন নষ্ট হয়ে গেছে।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর মৃত পুত্রদের জন্য শোক এবং দ্রৌপদীর প্রেরণায় অশ্বত্থামাকে বধ করার জন্য ভীমসেনের গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাত্রি প্রভাত হলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি রাজা যুধিষ্ঠিরকে শিবিরে নিদ্রিত বীরদের বিনাশের খবর জানাল। সে বলল—'মহারাজ ! রাজা দ্রুপদের পুত্রদের সঙ্গে দ্রৌপদীর সকল পুত্রেরা নিশ্চিন্তে শিবিরে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিহত হয়েছে। আজ রাত্রে ক্রূর কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামা আপনার সমস্ত শিবির বিনাশ করেছেন। তাঁরা নানা অস্ত্র সহকারে হাজার হাজার যোদ্ধা, হাতি-ঘোড়া সংহার করেছে। কৃতবর্মার কিছুটা দয়া ছিল, তাই সব সৈন্যের মধ্যে একমাত্র আমি কোনোপ্রকারে বেঁচে এসেছি।'

সারথির সেই অশুভ কথা শুনে পুত্রশোকে ব্যাকুল যুধিষ্ঠির মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব তাঁকে পরিচর্যা করতে লাগলেন। চেতনা ফিরে এলে তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন—

'হায় ! আমরা তো শত্রুদের পরাস্ত করেছিলাম, কিন্তু আজ ওরা আমাদের পরাজিত করল। আমরা ভ্রাতা, সমবয়সী, পিতা, পুত্র, মিত্র, বন্ধু, মন্ত্রী, পৌত্রদের হত্যা করে জয়লাভ করেছিলাম ; কিন্তু এইভাবে জিতেও আজ আমরা হেরে গেলাম। কখনো-কখনো অনর্থ অর্থের মতো মনে হয় এবং অর্থের মতো প্রতিভাত বস্তু অনর্থক রূপে পরিগণিত হয়। তেমনই এই বিজয় আমাদের কাছে পরাজয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর শত্রুদের পরাজয় ও তাদের কাছে বিজয় রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ইহজগতে প্রমাদের থেকে বেশি মানুষের আর কোনো মৃত্যু নেই। প্রমাদী মানুষকে অর্থ সর্বভাবে ত্যাগ করে এবং অনর্থই তাকে ঘিরে ধরে। সে বিদ্যা, তপ, বৈভব, যশ কোনো কিছুই লাভ করতে পারে না। শত্রুরা ক্রোধবশত যাদের নিদ্রিত অবস্থায় বধ করেছে, তারা নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করেছে। কিন্তু আমার দ্রৌপদীর জন্য চিন্তা হচ্ছে ; কারণ তিনি যখন ভ্রাতাদের, পুত্রদের এবং বৃদ্ধ পিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মৃত্যু সংবাদ পাবেন, সেই সময় শোকজনিত দুঃখ কেমন করে সইবেন ? তাঁর হৃদয় তো বিদারিত হবে।'

যুধিষ্ঠির এরূপ দীনভাবে বিলাপ করতে করতে নকুলকে বললেন—'ভ্রাতা ! তুমি যাও গিয়ে অভাগিনী দ্রৌপদীকে তাঁর মাতৃকুলের নারীদের সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসো।' ধর্মরাজের নির্দেশে নকুল রথে চড়ে যেখানে পাঞ্চাল রাজকুলের মহিলাগণ এবং দ্রৌপদী ছিলেন সেখানে গেলেন। নকুল চলে গেলে যুধিষ্ঠির শোকাকুল হৃদয়ে সুহৃদদের সঙ্গে সেইস্থানে গেলেন, যেখানে তাঁর পুত্ররা নিহত হয়ে পড়েছিলেন। সেই ভয়ানক স্থানে পৌঁছে তিনি তাঁর সুহৃৎ, সখা ও কুটুম্বদের রক্তাপ্লুত হয়ে মৃত পড়ে থাকতে দেখলেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাথা কাটা অবস্থায় দেখে মহারাজ যুধিষ্ঠির মর্মাহত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল এবং তিনি বারবার মূর্ছিত হতে লাগলেন। তাঁর সুহৃদরা অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সেইসময় শোকাকুলা দ্রৌপদীকে নিয়ে নকুল এসে পৌঁছলেন। তিনি উপপ্লব্য নামক স্থানে ছিলেন। নিজ পুত্রদের নিহত হওয়ার সংবাদে দ্রৌপদী অত্যন্ত শোকাহত হলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এসেই শোকাকুলা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

দ্রৌপদীকে পড়ে যেতে দেখে ভীম দৌড়ে এসে দুহাত

দিয়ে তাঁকে ধরলেন এবং সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। দ্রৌপদী কাঁদতে কাঁদতে যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! আপনার পুত্ররা ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছে শুনে আপনি তো ওদের স্মরণও করবেন না, কিন্তু পাপী অশ্বত্থামা ওদের নিদ্রিত অবস্থায় বধ করেছে শুনে আমার হৃদয় জ্বলে উঠছে। আপনি যদি আজই সঙ্গীসহ সেই পাপীকে হত্যা না করেন এবং সে তার কুকর্মের ফল না পায় তাহলে মনে রাখবেন আমি আজীবন এখানে অনশন ব্রত শুরু করে দেব।'

এই কথা বলে যশস্বিনী দ্রৌপদী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে বসলেন। ধর্মরাজ তাঁর প্রিয়ার কাছে বসে বললেন, 'ধর্মজ্ঞে ! তোমার ভ্রাতারা এবং পুত্ররা ধর্মযুদ্ধ করে বীরগতি লাভ করেছে। এদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। অশ্বত্থামা এখান থেকে বহু দূরে দুর্গম বনে চলে গেছে, তাকে বধ করলেও তুমি কী করে তা জানতে পারবে ?'

দ্রৌপদী বললেন—'রাজন্ ! আমি শুনেছি অশ্বত্থামার মাথায় জন্ম থেকেই এক মণি আছে। সুতরাং যুদ্ধে সেই পাপীকে বধ করে তার মণিটা নিয়ে আসতে হবে। আমার একান্ত ইচ্ছা হল আমি সেটি আপনার মাথায় পরিয়ে জীবন ধারণ করব।' ধর্মরাজকে এই কথা বলে দ্রৌপদী ভীমসেনের কাছে গিয়ে বললেন—'ভীমসেন ! আপনি ক্ষাত্রধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র

যেমন শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন, আপনিও সেইভাবে এই পাপীকে বধ করুন। এখানে আপনার মতো পরাক্রমী পুরুষ আর কেউ নেই। বারণাবত নগরে পাণ্ডবরা যখন বিপদে পড়েছিলেন, তখন আপনিই তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। হিড়িম্বাসুরের বিরুদ্ধে আপনিই সকলের রক্ষক ছিলেন। বিরাট নগরে কীচক যখন আমাকে বিরক্ত করে, তখন আপনিই সেই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করেন। আপনি যেভাবে এইসব বড় বড় কাজ করেছিলেন, সেইভাবেই এই দ্রোণপুত্রকে বধ করে প্রসন্নতা লাভ করুন।'

দ্রৌপদীর এইরূপ বিলাপ ও ভয়ানক শোক ভীমসেন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অশ্বত্থামাকে বধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে এক সুন্দর ধনুক হাতে রথে উঠলেন, নকুল তাঁর সারথি হলেন। তিনি ধনুকে টংকার দিয়ে রওনা হলেন। শিবির থেকে বেরিয়ে তিনি অশ্বত্থামার রথের চিহ্ন ধরে সবেগে এগিয়ে চললেন।

অশ্বত্থামার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের এক পূর্বপ্রসঙ্গ জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভীমসেন চলে যাওয়ার পর যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজকে বললেন—'রাজন্ ! আপনার ভাই ভীমসেন পুত্রশোকবশত অশ্বত্থামাকে বধ করার জন্য একাকী রওনা হলেন। সে আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা। তাহলে এই দুঃসময়ে আপনি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন না কেন ? আচার্য দ্রোণ তাঁর পুত্রকে যে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, তা সমস্ত পৃথিবী ভস্ম করে দিতে সক্ষম। সেই ব্রহ্মাস্ত্র তিনি প্রসন্ন হয়ে অর্জুনকেও দিয়েছিলেন। অশ্বত্থামা অত্যন্ত অসহনশীল ব্যক্তি, সে একাই এই অস্ত্রশিক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল। আচার্য তার চপলতা অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে অতি বিপদে পড়েও যেন সে এর প্রয়োগ না করে, বিশেষ করে কোনো মানুষের ওপরে যেন কখনোই প্রয়োগ করা না হয়, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অশ্বত্থামা সৎপুরুষের মতো জীবনযাপন করছে না।

পিতার অপ্রিয় বাক্য শুনে দুরাত্মা অশ্বত্থামা সমস্ত সুখের আশা ত্যাগ করে বড়ই দুঃখে ঘুরে বেড়াত। একবার, আপনারা যখন বনবাসে ছিলেন, সে দ্বারকায় এসে বৃষ্ণিবংশীয়দের সঙ্গে বাস করেছিল এবং তারা অশ্বত্থামার খুব আদর-যত্ন করেছিল। একদিন অশ্বত্থামা একান্তে আমার কাছে এসে বলেছিল—'কৃষ্ণ ! আমার পিতা কঠিন তপস্যা করে অগস্ত্যের কাছ থেকে যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছেন, এ তাঁর কাছে যেমন আছে, আমার কাছেও আছে। সুতরাং যদুশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার কাছ থেকে সেই দিব্যাস্ত্র নিয়ে আপনার চক্র আমাকে প্রদান করুন।'

আমি তাকে বললাম—দেখো ! আমার ধনুক, শক্তি, চক্র ও গদা এখানে রয়েছে, এরমধ্যে তুমি যেগুলি নিতে চাও, তা আমি তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি যা ওঠাতে পারো এবং যেটি দ্বারা যুদ্ধ করতে পারো, সেই অস্ত্র নিয়ে নাও আর আমাকে যে অস্ত্র দিতে চাও, তারও প্রয়োজন নেই। তখন সে আমার কাছে স্পর্ধা দেখিয়ে হাজার মুখবিশিষ্ট নাভিসম্পন্ন লোহার চক্রটি নিতে চায়। আমি বললাম—'নিয়ে নাও'। সে তৎক্ষণাৎ উঠে বাম হাতে সেটি নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সেটিকে ওইস্থান থেকে বিন্দুমাত্র

নড়াতে পারল না। তারপর ডান হাত দিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই তুলতে পারল না, তখন সে বিষণ্ণ হয়ে সরে গেল। নিজের উদ্দেশ্যে অসফল হয়ে সে যখন নিরাশ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'যার ধ্বজায় বানর চিহ্ন সুশোভিত সেই গাণ্ডীবধারী অর্জুন, দেবতা ও মানুষ—সকলের মধ্যেই সম্মানিত। সে দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ উমাপতি ভগবান শংকরকেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছে। তার থেকে বেশি প্রিয় জগতে আমার আর কেউ নেই। কিন্তু তুমি যা বললে, তেমন কথা সে কখনো মুখ দিয়ে বার করেনি। আমি দ্বাদশ বৎসর হিমালয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে ভীষণ তপস্যা দ্বারা এই অস্ত্র লাভ করেছি। সাক্ষাৎ সনৎকুমার প্রদ্যুম্নরূপে আমার সহধর্মিণী রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু যে চক্র তুমি চাইছ, তা তিনিও কখনো চাননি। মহাবলী বলরাম এবং গদ ও শাম্বও কখনো এটি নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তুমি ভরতবংশের আচার্য দ্রোণের পুত্র এবং সকল যাদব তোমাকে সম্মান করে। তাহলে এই চক্র নিয়ে তুমি কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও ?'

আমার এই কথা শুনে অশ্বত্থামা বলল—'কৃষ্ণ ! আমি আপনাকে পূজা করে আপনার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে চাই। প্রভু ! সত্য বলছি, আমি এই দেব-দানব পূজিত আপনার চক্রটি চাইছি, যাতে আমি অজেয় হতে পারি। কিন্তু এখন আমি আমার দুর্লভ কামনা পূর্ণ না করেই চলে যাচ্ছি, আপনি শুধু বলুন 'তোমার কল্যাণ হোক'। এই ভয়ংকর চক্রটি বীর শিরোমণি আপনিই ধারণ করেছেন। এর মতো চক্র জগতে দ্বিতীয় আর নেই এবং এটি ধারণ করার শক্তি আপনি ব্যতীত আর কারোরই নেই।' এই বলে অশ্বত্থামা রথের উপযুক্ত সুন্দর ঘোড়া এবং বস্ত্র নিয়ে চলে গেল। সে অত্যন্ত ক্রোধী, দুষ্ট, চঞ্চল এবং ক্রূর স্বভাববিশিষ্ট। তার ব্রহ্মাস্ত্রেরও জ্ঞান আছে। সুতরাং এইসময় ভীমসেনকে রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অশ্বত্থামা ও অর্জুনের একে অন্যের ওপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ এবং নারদ ও ব্যাসদেবের তাদের শান্ত করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে এক অস্ত্রসজ্জিত রথে আরোহণ করলেন, সেই রথের রঙ নবোদিত সূর্যের মতো লাল। তার ডানদিকে শৈব্য এবং বামদিকে সুগ্রীব নামক ঘোড়া লাগানো হয়েছিল। রথের পাশে সংযুক্ত মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক দুটি ঘোড়াও রথ টানছিল। সেই রথের ওপর বিশ্বকর্মা নির্মিত রত্নখচিত ধ্বজা মায়ার ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল। তার ধ্বজায় পক্ষীরাজ গরুড় বিরাজ করছিলেন। সেই চমৎকার রথে শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করলে অর্জুন ও রাজা যুধিষ্ঠিরও তাতে আরোহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ রথ চালিয়ে দিলেন। ঘোড়াগুলি দ্রুতগতিতে ভীমকে অনুসরণ করে শীঘ্রই তাঁর রথের কাছে পৌঁছে গেল। ভীম সেইসময় ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুবধ করার জন্য উন্মুখ ছিলেন ; তাই এঁরা থামতে বললেও তিনি গতি কমালেন না। সকলে গঙ্গাতীরে পৌঁছলেন। তাঁরা শুনেছিলেন অশ্বত্থামা সেখানেই আছেন। সেই স্থানে পৌঁছে তাঁরা গঙ্গাতীরে পরম যশস্বী ব্যাসদেবকে বহু ঋষির সঙ্গে উপবিষ্ট থাকতে দেখলেন। তাঁদের কাছেই ক্রূরকর্মা অশ্বত্থামা ছিলেন। তিনি সারা দেহে ঘৃত মাখিয়ে রেখেছিলেন এবং কুশবস্ত্র পরিধান করেছিলেন। কুন্তীনন্দন ভীম তাঁকে দেখেই, 'ওরে, দাঁড়িয়ে থাক' বলে ধনুক বাণ হাতে চিৎকার করে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন দেখলেন যে ধনুর্ধর ভীম এবং তাঁর পেছনে রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন তাঁর দিকে আসছেন, তখন তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন এবং ভাবলেন এবার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের সময় হয়েছে। তিনি দ্রুত সেই দিব্যাস্ত্রের চিন্তা করে একটি লোহার শিক বাম হাতে তুলে সংকল্প করলেন যে 'পৃথিবী পাণ্ডবহীন হয়ে যাক', তারপর ক্রোধভরে সমস্ত পৃথিবীকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে সেই প্রচণ্ড অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তার ফলে সেই শিকটিতে অগ্নি উৎপন্ন হল এবং প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ত্রিলোক ভস্ম করতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার উদ্যোগ দেখেই তার মনোভাব বুঝে ছিলেন। তিনি অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! অর্জুন !

আচার্য দ্রোণের শেখানো দিব্য অস্ত্র তো তুমিও জানো, এবার তা প্রয়োগের সময় হয়েছে। তুমি নিজেকে এবং ভ্রাতাদের রক্ষার জন্য এখন তার প্রয়োগ করো ; কারণ ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাই প্রতিহত করা সম্ভব।' শ্রীকৃষ্ণ একথা বলতেই অর্জুন ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। তিনি প্রথমে 'আচার্য পুত্রের মঙ্গল হোক' এবং পরে 'আমার ভ্রাতাদের এবং আমার মঙ্গল হোক' বলে দেবতা ও গুরুজনদের প্রণাম জানালেন। তারপর 'এই ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা শত্রুর ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমিত হোক' —এই সংকল্পসহ সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করে তাঁর সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনের নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্র প্রলয়ানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। অন্যদিকে মহাতেজস্বী অশ্বত্থামার অস্ত্র তেজোমণ্ডল ঘিরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে লাগল। ব্রহ্মাস্ত্র দুটি একে অন্যটিকে আঘাত করায় ভীষণ শব্দে উৎপন্ন হল, হাজার হাজার উল্কাপাত হতে লাগল। সমস্ত প্রাণী ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠল। আকাশে ভয়ানক শব্দ হতে লাগল। সর্বত্র আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়ল, বন-পর্বত-সহ সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হল।

এইভাবে দুটি অস্ত্রের তেজে সমস্ত পৃথিবী সন্তপ্ত হল। তাই দেখে অর্জুন ও অশ্বত্থামাকে শান্ত করার জন্য দেবর্ষি

নারদ ও ব্যাসদেব একই সঙ্গে দর্শন দিলেন। এই দুই মুনিশ্রেষ্ঠ দেবতা ও মানুষদের পূজনীয় এবং অত্যন্ত যশস্বী। তাঁরা সমস্ত লোকের হিতকামনায় সেই দুই অস্ত্র প্রশমিত করার জন্য তার মধ্যে এসে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগলেন—'পূর্বকালে যে নানা অস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ জন্মেছিলেন, তাঁরা কখনো এই অস্ত্র মানুষের ওপর প্রয়োগ করেননি। তাহলে বীরগণ ! তোমরা দুজন এই মহা অনিষ্টকর কাজ করবার সাহস করলে কী করে ?'

সেই অগ্নিসম দুই তেজস্বী মহাপুরুষকে দেখে অর্জুন সত্বর তাঁর দিব্যাস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন এবং হাতজোড় করে বললেন—'মুনিবর ! আমি শত্রু নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমিত করার উদ্দেশেই এই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলাম। এখন আমার অস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়ায় পাপী অশ্বত্থামা তার অস্ত্র প্রভাবে আমাদের সকলকে ভস্ম করে ফেলবে। সুতরাং এখন যা করলে আমাদের সকলের এবং সর্বলোকের হিত হয়, তার জন্য আমাদের পরামর্শ দিন।' অর্জুন তাঁর দিব্যাস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন, যেটি ফেরানো দেবতাদের পক্ষেও কঠিন ছিল। যুদ্ধে সেটি একবার নিক্ষেপ করলে অর্জুন ব্যতীত স্বয়ং ইন্দ্রও তা প্রশমিত করতে পারতেন না। এই অস্ত্র ব্রহ্মতেজ থেকে উৎপন্ন, অসংযমী ব্যক্তি এটি নিক্ষেপ করতে সক্ষম হলেও ব্রহ্মচারী ব্যতীত আর কারো পক্ষেই তা প্রশমন করা সহজ ছিল না। কোনো ব্রহ্মচর্যহীন ব্যক্তি সেটি একবার নিক্ষেপ করে প্রশমন করার চেষ্টা করলে, সেই অস্ত্র আত্মীয়সহ তার মাথা কেটে ফেলত। অর্জুন ব্রহ্মচারী ও ব্রতী ছিলেন ; দুষ্প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু ভয়ানক বিপদ না এলে অন্য কোনো সময় তিনি এটি প্রয়োগ করতেন না। অর্জুন সত্যবাদী, শূরবীর, ব্রহ্মচারী এবং গুরুর নির্দেশ পালনকারী ছিলেন। তাই তিনি সেই অস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন।

অশ্বত্থামাও যখন তাঁর অস্ত্রের সামনে দুই ঋষিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, তিনিও ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমিত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তা পারলেন না। তিনি তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন—'মুনিবর ! আমি ভীমসেনের ভয়ে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছিলাম, তাই নিজ প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি। ভীমসেন দুর্যোধনকে রণক্ষেত্রে বধ করার জন্য নিয়মবিরুদ্ধ আচরণ করে অধর্ম করেছে। তাই সংযমী না হয়েও আমি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি ; এখন এটিকে প্রশমিত করতে আমি সক্ষম নই। আমি অগ্নিমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে পাণ্ডবদের বিনাশের উদ্দেশ্যে এই দুর্দমনীয় অস্ত্র

নিক্ষেপ করেছি। সুতরাং এটি এখন সমস্ত পাণ্ডবদের প্রাণ হরণ করবে। এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদের বধের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করে আমি অবশ্যই অত্যন্ত পাপ করেছি।'

ব্যাসদেব বললেন—'পুত্র! ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান অর্জুনেরও আছে, কিন্তু সে ক্রুদ্ধ হয়ে অথবা তোমাকে বধ করার জন্য তা নিক্ষেপ করেনি। সে তার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তোমার ব্রহ্মাস্ত্রকে শান্ত করার জন্যই তা প্রয়োগ করেছিল এবং এখন তা ফিরিয়েও নিয়েছে। ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেও তোমার পিতার উপদেশ মেনে মহাবাহু অর্জুন ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচলিত হয়নি। সে এমন ধীর, বীর এবং সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, তা সত্ত্বেও তোমার মধ্যে কেন একে তার ভ্রাতাদের সঙ্গে বধ করার কুবুদ্ধি জাগল ? দেখো, যে দেশে একটি ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অপর ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রশমিত করা হয়, সেখানে দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। তাই প্রজা হিতার্থে অর্জুন তোমার ব্রহ্মাস্ত্র নষ্ট করেনি। তোমার পাণ্ডবদের, নিজেকে এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করা উচিত। তাই এবার তুমি তোমার দিব্যাস্ত্র ফিরিয়ে নাও। এবার তোমার ক্রোধ শান্ত হওয়া উচিত এবং পাণ্ডবদেরও স্বাভাবিক থাকা উচিত। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির অধর্ম দ্বারা বিজয়ে ইচ্ছুক নন। তোমার মাথায় যে মণি আছে, তা তুমি এঁকে দিয়ে দাও, সেটি নিয়ে পাণ্ডবরা তোমার প্রাণ দান করবে।'

অশ্বত্থামা বললেন—'পাণ্ডবরা কৌরবদের যত ধন ও রত্নসামগ্রী লাভ করেছে আমার এই মণি তাদের সবার চেয়ে বেশি দামী। এটি ধারণ করলে শস্ত্র, ব্যাধি বা ক্ষুধার দ্বারা অথবা দেবতা, দানব, নাগ, রাক্ষস বা চোরদের থেকেও কোনো ভয় থাকে না। এই মণির এমন অদ্ভুত প্রভাব যে আমার পক্ষে এটি ত্যাগ করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে যে আদেশ দিয়েছেন, তা আমাকে পালন করতেই হবে। কিন্তু আমার নিক্ষিপ্ত এই দিব্যাস্ত্র তো ব্যর্থ হতে পারে না। একে প্রয়োগ করার পর ফেরানোর সামর্থ্য আমার নেই। সুতরাং আমি এই অস্ত্র উত্তরার গর্ভের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করছি। আপনার আদেশ আমি কখনো লঙ্ঘন করি না ; কিন্তু কী করব, এটি আমার বশে নেই।'

ব্যাসদেব বললেন—'বেশ, তাই হোক, মনে আর কোনোপ্রকার কটু চিন্তা রেখো না। এই অস্ত্র উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করেই শান্ত হোক।'

বৈশম্পায়ন বললেন—'রাজন্! অশ্বত্থামা তখন সেই অস্ত্র উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে অশ্বত্থামাকে বললেন—কিছুদিন আগে বিরাট কন্যা উত্তরা যখন উপপ্লব্য নগরীতে ছিলেন, এক তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেছিলেন, কৌরবদের পরিক্ষয় হলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্মাবে। সেই ব্রাহ্মণের কথা সত্য হবে। এই পরিক্ষিৎই পাণ্ডবদের বংশধারক হবে।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অশ্বত্থামা ক্রোধভরে বলে উঠলেন—'কেশব ! তুমি পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে যা বলছ, তা কখনো হবে না। আমার বাক্য মিথ্যা হবে না। আমার এই ভয়ানক অস্ত্র অবশ্যই তার গর্ভে আঘাত করবে।'

শ্রীভগবান বললেন—'এই দিব্যাস্ত্রের আঘাত অবশ্যই অমোঘ, কিন্তু সেই গর্ভে মৃত পুত্র উৎপন্ন হলেও দীর্ঘজীবন লাভ করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই সকলে তোমাকে ভীরু, পাপী ও কাপুরুষ বলে মনে করে ; কারণ তুমি বারবার পাপই করে থাক এবং বালকদের হত্যা কর। তাই তোমাকে এই পাপের ফল ভোগ করতেই হবে। তুমি তিন হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে এবং কোনো স্থানে কোনো ব্যক্তির সঙ্গেই তোমার বাক্যালাপ হবে না। তোমার শরীর থেকে পূতিগন্ধময় রক্তের দুর্গন্ধ বার হবে, সেইজন্য তুমি মানুষের মধ্যে থাকতে পারবে না। দুর্গম বনে বাস করবে। পরীক্ষিৎ দীর্ঘায়ু লাভ করে বেদব্রত ধারণ করবে এবং আচার্য কৃপ থেকে সর্বপ্রকার অস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হবে। এইভাবে উত্তম অস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সে ক্ষাত্রধর্ম অনুসরণ করে ষাট বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। দুরাত্মন্ ! দেখবে, এই পরীক্ষিৎ নামের রাজা তোমার চোখের সামনেই কুরুবংশের রাজসিংহাসনে আরোহণ করবে। তোমার অস্ত্রের আঘাতে সে অবশ্যই মরে যাবে। কিন্তু আমি তাকে পুনরায় জীবিত করব। নরাধম ! তখন তুমি আমার সত্য ও তপের প্রভাব দেখতে পাবে।'

ব্যাসদেব বলতে লাগলেন—'দ্রোণপুত্র ! তুমি আমার কথা না শুনে অত্যন্ত ক্রূর কর্ম করেছ। ব্রাহ্মণ হয়েও তোমার আচরণ অতি নীচ, তাই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা অবশ্যই সত্য হবে ; কেননা এখন তুমি স্বধর্ম পরিত্যাগ করে ক্ষাত্রধর্ম স্বীকার করে নিয়েছ।'

অশ্বত্থামা বললেন—'ব্রহ্মন্ ! ভগবান কৃষ্ণের কথা ঠিক হোক। মানুষের মধ্যে শুধু আমি এখন থেকে আপনার সঙ্গেই থাকব।'

——॥——

পাণ্ডব কর্তৃক দ্রৌপদীকে মণি প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশ্বত্থামার অদ্ভুত পরাক্রমের রহস্য জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! অশ্বত্থামা তারপর পাণ্ডবদের মণি প্রদান করে সকলের সামনেই বিষণ্ণ মনে বনে চলে গেলেন। পাণ্ডবরাও শ্রীকৃষ্ণ, নারদ এবং ব্যাসদেব সমভিব্যাহারে দ্রুত মনস্বিনী দ্রৌপদীর কাছে এলেন। তিনি তখনও অনাহারে বসে ছিলেন। তাঁরা দ্রৌপদীর চারদিকে বসলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীমসেন দ্রৌপদীকে অশ্বত্থামার দিব্য মণি প্রদান করে

বললেন, "ভদ্রে ! এই মণি নাও, তোমার পুত্রদের হত্যাকারীকে আমরা পরাস্ত করেছি। এখন ওঠো, শোক পরিত্যাগ করে ক্ষাত্রধর্মের কথা ভাবো। শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবদের কাছে যাচ্ছিলেন, তখন তুমি তাঁকে বলেছিলে যে, 'কেশব ! পাণ্ডবরা আজ আমার অপমানের কথা বিস্মৃত হয়ে শত্রুদের সঙ্গে মিলন চায় ; তাই আমি মনে করি, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, ভ্রাতা নেই, এমন কি তুমিও নেই।' সুতরাং তুমি এখন তোমার সেই ক্ষত্রিয়-ধর্মোচিত বাক্যগুলি স্মরণ করো। পাপী দুর্যোধন নিহত হয়েছে, আমি মৃতপ্রায় দুঃশাসনের রক্তও পান করেছি, দ্রোণপুত্রকেও পরাস্ত করেছি ; ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র ভেবে পরাজিত করেও ছেড়ে দিয়েছি। অশ্বত্থামার সমস্ত যশ মাটিতে মিশে গেছে। আমরা তার মণি ছিনিয়ে নিয়ে তার অস্ত্রশস্ত্র ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।"

সেই কথা শুনে দ্রৌপদী বললেন—'গুরুপুত্র আমার কাছেও গুরুতুল্য। আমি শুধু আমার অনিষ্টের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। এই মণিটি এখন মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর মস্তকে ধারণ করুন।'

রাজা যুধিষ্ঠির সেই মণিটি গুরুর আশীর্বাদ মনে করে মস্তকে ধারণ করলেন। তারপর পুত্র শোকাতুরা দ্রৌপদী উঠে নিজ স্থানে চলে গেলেন।

রাজন্ ! সেই রাত্রে যেসব বীর নিহত হয়েছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁদের জন্য শোকাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'কৃষ্ণ ! অশ্বত্থামা তো অস্ত্রবিদ্যায় তেমন কুশল ছিল না ; তাহলে সে আমার সব মহারথী পুত্র এবং হাজার হাজার যোদ্ধার সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করতে পারল, অস্ত্রবিশারদ দ্রুপদপুত্রকে কী করে হত্যা করল ? সে এমন কী পুণ্যকর্ম করেছে, যার প্রভাবে সে একাই আমাদের সব সৈন্যকে বিনাশ করল।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অশ্বত্থামা অবশ্যই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর দেবাদিদেব ভগবান শিবের শরণ নিয়েছিল, তাই সে একাকী অনেক যোদ্ধা সংহার করেছে। মহাদেব প্রসন্ন হলে অমরত্বও প্রদান করতে পারেন আর এতো পরাক্রম দান করেন যে, ইন্দ্রকেও বিনাশ করা সম্ভব হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাদেবের স্বরূপ আমি ভালোমতো জানি এবং আমি তাঁর অনেক প্রাচীন কর্মও জানি। তিনি সমস্ত প্রাণীর আদি-মধ্য ও অন্ত। এই সমস্ত জগৎ-সংসার তাঁর প্রভাবেই চলছে। সেই মহান বীর্যশালী মহাদেব অশ্বত্থামার ওপর প্রসন্ন হয়েছিলেন। সেইজন্যই অশ্বত্থামা আপনার মহারথী পুত্রদের এবং পাঞ্চালরাজকে হাজার হাজার অনুগামীসহ ধরাশায়ী করেছে। এখন আপনি আর তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। মহাদেবের কৃপাতেই অশ্বত্থামা এই কাজ করেছে। এখন আপনার যা করণীয় আছে, সেই কাজ করুন।

সৌপ্তিকপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

স্ত্রীপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় ও বিদুরের সান্ত্বনা প্রদান

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর! দুর্যোধন এবং তাঁর সমস্ত সেনা সংহার হয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র কী করলেন? তেমনই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এবং কৃপাচার্য প্রমুখ তিন মহারথীরা তারপর কী করলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র তাঁর শতপুত্রের সংহার হওয়ায় শোকে অধীর হলেন, পুত্রশোকে তাঁর হৃদয়ে আগুন জ্বলতে লাগল, তিনি চিন্তায় ডুবে গেলেন। সেই সময় সঞ্জয় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ! আপনি কেন চিন্তা করছেন? শোক তো ভাগ করে নেওয়া যায় না। রাজন্! এই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মারা গেছে, এই পৃথিবী নির্জন ও শূন্য হয়ে গেছে। এবার আপনি আপনার পুত্র ও আত্মীয়স্বজনদের শ্রাদ্ধ-শান্তি করান।'

সঞ্জয়ের এই দুঃখময় কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-পৌত্রের শোকে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর সাবধানে উঠে বললেন—আমার পুত্র, পৌত্র, মন্ত্রী এবং সকল সুহৃদগণই নিহত হয়েছে। এখন এই পৃথিবীতে আমাকে দুঃখ ভোগ করার জন্যই বেঁচে থাকতে হবে। এমন জীবনে কী লাভ? আমার রাজ্য নষ্ট হয়ে গেছে, ভ্রাতা বন্ধু সকলেই যুদ্ধে মৃত, প্রথম থেকেই আমার চোখ নেই। হায়! আমি আমার হিতৈষী, পরশুরাম, নারদ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কথাও শুনিনি। শ্রীকৃষ্ণ সভার মধ্যে আমাকে আমার মঙ্গলের জন্য বলেছিলেন যে, 'রাজন্! বৃথা শত্রুতা কোরো না, পুত্রদের সংযত করো।' কিন্তু আমি এমনই মূর্খ যে তাঁর কথা গ্রহণ করিনি। ভীষ্মের ধর্মানুকূল পরামর্শও মেনে নিইনি। তাই এখন আমাকে ভয়ানকভাবে অনুতাপ করতে হচ্ছে। সঞ্জয়! এই জন্মে করা এমন কোনো পাপের কথা স্মরণ হচ্ছে না, যার জন্য আমাকে এই ফল ভোগ করতে হয়। পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কোনো ভয়ানক অন্যায় করেছি। সেইজন্যই বিধাতা আমাকে এই দুঃখময় অবস্থায় ফেলেছেন। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, সব ভ্রাতা-বন্ধু শেষ হয়ে গেছে এবং দৈববশত আমার হিতৈষী ও মিত্রদেরও বিনাশ হয়েছে। জগতে আমার থেকে দুঃখী আর কে আছে। সুতরাং পাণ্ডবরা যেন আজই আমাকে ব্রহ্মলোকের পথে যাত্রা করতে দেখে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে করতে অনেক কথা বলতে লাগলেন। সঞ্জয় রাজার শোককে শান্ত করার জন্য বললেন—'রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধন অতি মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও শল্য—যাঁরা সমস্ত জগৎ কণ্টকাকীর্ণ করেছিলেন, তাঁরাই তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি

নিজের পিতামহ ভীষ্ম, মাতা গান্ধারী, পিতৃব্য বিদুর, গুরু দ্রোণ, আচার্য কৃপ ও মহামতি নারদের কথাও শোনেননি। এমন কী তিনি অন্যান্য ঋষি এবং অতুলনীয় তেজস্বী ব্যাসদেবের কথাও শোনেননি। তাঁর শুধু যুদ্ধ করারই আগ্রহ থাকত। সেইজন্য দুর্যোধন কখনো শ্রদ্ধাপূর্বক ধর্মানুষ্ঠানও করেননি এবং ক্ষত্রিয়দের কোনো ধর্মকেও সম্মান জানাননি। তিনি বৃথাই এত ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করালেন। আপনার বাধা প্রদান করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে আপনি কিছু বলেননি। আপনার কথা কেউই অনাদর করতে পারত না, তা সত্ত্বেও আপনি নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতির বিচার করেননি। মানুষের যথাশক্তি সময় থাকতে এমন কাজ করা উচিত, যাতে পরে তাকে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে না হয়। আপনি পুত্রস্নেহে আবদ্ধ হয়ে সে যা চায় তাই অনুমোদন করেছেন, যার জন্য আজ আপনাকে অনুতাপ করতে হচ্ছে। এখন তার জন্য শোক করা উচিত নয়। শোক করলে অর্থ লাভ হয় না, ফললাভ হয় না, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয় না এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তিও হয় না। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে তাতে জ্বলতে জ্বলতে পরে অনুতাপ করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। আপনার পুত্রগণ এবং আপনি পাণ্ডবরূপ অগ্নিকে নিজেদের বাক্যবায়ুর সাহায্যে তীব্র করেছিলেন এবং তাতে লোভরূপ ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন। সেই আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল তখন আপনার পুত্ররা তাতে পতঙ্গের ন্যায় পড়ে বাণরূপ অগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁদের জন্য আপনার শোক করা উচিত নয়। অশ্রুপাত করায় আপনাকে অত্যন্ত বিষাদমগ্ন দেখাচ্ছে। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এরূপ হওয়া উচিত নয়, বুদ্ধিমান লোকেরা একে ভালো বলে মনে করে না। শোকাশ্রু অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় মানুষকে পুড়িয়ে ফেলে। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা মনকে শান্ত করে শোক ও ক্রোধ ত্যাগ করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—মহাত্মা সঞ্জয় এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রের শোকের বেগ প্রশমিত করে দিলেন। তারপর মহাত্মা বিদুর তাঁর অমৃতময় মধুর বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন—'রাজন্! আপনি কেন মাটিতে পড়ে আছেন, আসন গ্রহণ করুন এবং মনকে সংযত করে শান্ত হোন। জগতে সকল প্রাণীরই তো অন্তিমে এই গতি হয়। সমস্ত ভৌতিক পদার্থের অন্ত পতনেই হয়; সমস্ত যোগ বিয়োগেই সমাপ্ত হয়। তেমনই জীবনের অন্ত মরণেই হয়। যমরাজ শূরবীর ও কাপুরুষ উভয়কেই নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, তখন এইসব বীর ক্ষত্রিয়রা কেন যুদ্ধ করবে না। রাজন্! অন্তিম আগত হলে কেউ বেঁচে থাকে না। যে যুদ্ধ করে না সে মারা যায় আবার যে যুদ্ধ করে সে কখনো কখনো যুদ্ধে বেঁচেও যায়। মৃত্যু এলে কেউই বেঁচে থাকে না। যত প্রাণী আছে, তারা আগে ছিল না এবং শেষেও থাকবে না, কেবল মধ্যবর্তীকালে তাদের দৃষ্টিগোচর করা যায়। তাই তাদের জন্য শোক করা উচিত নয়। শোকের দ্বারা মানুষ মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে যেতে পারে না অথবা মরতেও পারে না। মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি যখন এইরূপ, তখন আপনি কেন শোক করছেন?

রাজন্! এছাড়া যুদ্ধে মৃত বীরদের জন্য আপনার তো শোক করাই উচিত নয়। শাস্ত্র যদি সঠিক হয় তাহলে ওরা সকলেই পরমগতি লাভ করেছে। এই যুদ্ধে মৃত প্রায় সকল বীরই স্বাধ্যায়শীল এবং সদাচারী ছিল আর তারা সকলেই শত্রুর সামনে নির্ভয়ে থেকে বীরগতি লাভ করেছে। তাই তাদের জন্য শোক করার অবকাশ কোথায়? জন্মের আগে এরা সকলে ছিল না, এখন আবার পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। এরা কেউ আপনার ছিল না, আপনিও এদের নন। তাহলে শোক করার কারণ কী। যুদ্ধে যারা মারা যায় তারা স্বর্গলাভ করে আর যারা মারে, তারা কীর্তিলাভ করে। এইভাবে দেখলে আমাদের দৃষ্টিতে দুপক্ষেরই মহালাভ, যুদ্ধে নিষ্ফলতা তো নেই-ই। মানুষ দান ও দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞ এবং তপস্যা করলেও এতো সহজে স্বর্গলাভ করে না যত সহজে যুদ্ধে নিহত হলে যোদ্ধারা তা প্রাপ্ত হয়। তাই ক্ষত্রিয়দের কাছে ইহলোকে ধর্মযুদ্ধের থেকে বড় আর কোনো পুণ্যকর্ম নেই। সুতরাং আপনি মনকে শান্ত করে শোক ত্যাগ করুন। এইভাবে শোকাকুল হয়ে আপনার শরীর নষ্ট করা উচিত নয়। জগতে বহুবার জন্মগ্রহণ করে আপনি হাজার হাজার মাতা-পিতা এবং স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গ লাভ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কে আমার আর আমি কার? শোক ও ভয়ের শত সহস্র স্থান আছে কিন্তু সেগুলি সবই সাধারণ পুরুষদের জন্য, বুদ্ধিমানদের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না।

কুরুশ্রেষ্ঠ! কালের কাছে কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নয় এবং কারো প্রতি তার কোনো উদাসীন ভাবও নেই। সে সকলকেই মৃত্যুর দিকে আকর্ষণ করছে। কালই প্রাণীদের

যুদ্ধ করে এবং কালই তাদের বিনাশ করে। কালের কবল থেকে নিস্তার পাওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। রূপ-যৌবন-অর্থ-আরোগ্য-প্রিয়সঙ্গ—এ সবই অনিত্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তির এতে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। এই দুঃখ তো সমস্ত দেশের, এর জন্য আপনি একা শোকে করবেন না। প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকে মুহ্যমান হলেও, তাতে শোক দূর হয় না। কারণ চিন্তা দ্বারা দুঃখ কখনো কমে না, এতে তা আরও বেড়ে যায়। শোকের দ্বারা মানুষ কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং অর্থ-ধর্ম ও কামরূপ ত্রিবর্গদ্বারা বঞ্চিত থাকে। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন আর্থিক স্থিতিতে ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বাবস্থাতেই অবিচল থাকে।

মানুষের উচিত মানসিক দুঃখগুলি মনঃসংযম দ্বারা এবং শারীরিক কষ্টগুলি চিকিৎসার দ্বারা দূর করা। একেই বলা হয় বিজ্ঞানের বল। তাদের মূর্খের মতো ব্যবহার করা উচিত নয়। মানুষের পূর্বকৃত কর্মগুলি সবসময় তার সঙ্গে থাকে। মানুষ যে অবস্থায় যেমন যেমন শুভ, অশুভ কর্ম করে, তেমনই সে তার ফলও ভোগ করে। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই তার শত্রু এবং তার পাপ-পুণ্যের সাক্ষীও সে নিজে। শুভ কর্ম করলে সে সুখ পায়, পাপ কাজে দুঃখভোগ করে। এইভাবে মানুষ সর্বদা তার কৃতকর্মেরই ফল পায়, না-করা কর্মের নয়।

বিদুর কর্তৃক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে জগতের চরিত্র, তার ভয়ংকরতা এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ের বর্ণনা

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—পরম বুদ্ধিমান বিদুর ! তোমার সুবচন শুনে আমার শোক প্রশমিত হয়েছে। আমি তোমার সারগর্ভ কথা আরও শুনতে চাই।

মহাত্মা বিদুর বললেন—মহারাজ ! চিন্তা করলে এই সমস্ত জগৎই অনিত্য বলে মনে হয়। এটি কলাগাছের মতো, ক্ষণস্থায়ী। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনই সে নতুন নতুন দেহ ধারণ করে। জীব তার পূর্বকর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করে এবং পরে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ যখন জগতের স্বরূপই আগমাপায়ী (আসা-যাওয়াযুক্ত) হয়ে থাকে তখন আপনি কার জন্য শোক করছেন ? এই জগতে যারা বুদ্ধিমান, সত্ত্বগুণান্বিত, সকলের হিতার্থী এবং প্রাণীদের সমাগমকে কর্মানুসারে জানে, তারাই পরমগতি লাভ করে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—বিদুর ! জগতের স্বরূপ অত্যন্ত গভীর। সুতরাং আমি শুনতে চাই একে কীভাবে জানা যায়। তুমি তা বিস্তারিতভাবে জানাও।

বিদুর বললেন—মহারাজ ! গর্ভাশয়ে রজ ও বীর্যের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। প্রথমে জীব বীর্য ও রক্তের সংযোগে থাকে, কিছুদিন পর পাঁচ মাস হলে সেটি চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হয়ে পিণ্ডে নিবাস করে। তারপর ক্রমশ সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন তাকে রক্ত-মাংসপূর্ণ অপবিত্র গর্ভাশয়ে থাকতে হয়। ক্রমশ প্রকৃতির নিয়মে তার পা ওপরে গিয়ে মাথা নীচের দিকে চলে আসে, সেই সময় যোনিমুখে থাকায় তাকে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়। তারপর সঙ্কীর্ণ যোনিদ্বার দিয়ে তাকে কষ্ট করে বাইরে আসতে হয় এবং জগতে এসে নানা প্রকার উপদ্রব সহ্য করতে হয়। ক্রমে যত বড় হতে থাকে, ততই তাকে নতুন ব্যাধি ও সমস্যা ঘিরে ধরে। এইভাবে নিজ কর্মের দ্বারা পীড়িত হয়ে সে জীবন কাটায়। নানা পাশে ও বাসনে আবদ্ধ হওয়ায় সে কোনোদিন তৃপ্ত হয় না এবং ভালো-মন্দ কর্মের জ্ঞানও থাকে না। শুধুমাত্র ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিই নিজের চিত্তকে কুমার্গ থেকে বাঁচাতে সক্ষম হন। সাধারণ জীব যমদ্বারে পৌঁছেও তা চিনতে পারে না। কাল এসে তাকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে, তার তখন কথা বলার শক্তি থাকে না। সেই সময় তার যা কিছু পাপ ও পুণ্য থাকে, তা সামনে আসে, কিন্তু দেহবন্ধনে আবদ্ধ থাকায় সে নিজের উদ্ধারের জন্য কোনো চেষ্টা করে না। হায় ! লোভের বন্ধনে বদ্ধ হয়ে মানুষ জগতে নিজেই প্রতারিত হয়ে চলেছে। সে লোভ, ক্রোধ ও ভয়ে পাগল হয়ে নিজেকে ঠিক রাখে না। যদি সে কুলীন হয় তাহলে অকুলীনদের হেয়দৃষ্টিতে দেখে নিজের কৌলিন্য নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে। ধনী হলে ধনগর্বে মত্ত হয়ে নির্ধনদের অবজ্ঞা করে। অপরকে মূর্খ বলে কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে না। এইভাবে অন্যের নিন্দা করে, কিন্তু নিজেকে বশে রাখার

কথা কখনো চিন্তাও করে না। যখন বুদ্ধিমান ও মূর্খ, ধনী ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন এবং প্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিষ্ঠিত—সকলেই শ্মশানে গিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে, তখন কোনো ব্যক্তিই তাদের মধ্যে এমন কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না, যাতে তাদের কুল ও প্রতিপত্তির বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে। মৃত্যুর পর যখন সকলেই একই ভাবে পৃথিবীতে শায়িত হয় তখন এই মূর্খরা কেন একে অপরকে প্রতারণা করে ? এই বিনাশশীল পৃথিবীতে যে ব্যক্তি এই বেদোক্ত উপদেশ সাক্ষাৎ বা কারো কাছে শুনে জন্ম থেকেই ধর্মাচরণ করে, সে অবশ্যই পরমগতি লাভ করে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! ধর্মের এই গূঢ় রহস্যের সমাধান বুদ্ধির দ্বারাই হতে পারে। সুতরাং তুমি আমাকে বিস্তারিতভাবে বুদ্ধিমার্গের কথা বলো।

বিদুর বললেন—রাজন্ ! ভগবান স্বয়ম্ভুকে প্রণাম জানিয়ে আমি এই জগৎরূপ গহন বনের সেই স্বরূপ বর্ণনা করছি, যা মহর্ষিরা নিরূপণ করেছিলেন। এক ব্রাহ্মণ কোনো এক বিশাল বনে যাচ্ছিলেন। তিনি এক দুর্গম স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি ব্যাঘ্র, সিংহ, হাতি, কুমীর প্রভৃতি ভয়ংকর জন্তু-পরিবৃত দেখে খুব ভয় পেলেন ; তাঁর মনে অত্যন্ত আলোড়ন হল। তিনি নানাদিকে দৌড়ে এক সুরক্ষিত স্থান খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু তিনি বনে কোনো সুরক্ষিত স্থান দেখতে পেলেন না, ফলে বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশাও রইল না। তিনি লক্ষ্য করলেন সেই ভীষণ জঙ্গল চতুর্দিক থেকে জাল দিয়ে ঘেরা। এক ভয়ংকর নারী সেটি তার হাত দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছে এবং পর্বতের ন্যায় উচ্চ পাঁচ মাথা সমন্বিত এক নাগও তাকে সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যস্থলে লতাপাতা পরিপূর্ণ গভীর কুয়ো ছিল। ব্রাহ্মণ এদিক-ওদিক যেতে গিয়ে সেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলেন। কিন্তু লতাজালে আটকে তাঁর মাথা নীচে ও পা ওপরদিকে হয়ে ঝুলে রইল।

ব্রাহ্মণ দেখলেন কুয়োর মধ্যে এক বিশাল সর্প আর ওপরে কুয়ার পাশে এক বিশালকায় হাতি রয়েছে। তার দেহের রঙ সাদা ও কালো এবং ছয় মুখ ও বারো পা বিশিষ্ট। সে ধীরে ধীরে কুয়োর দিকে এগিয়ে আসছে। কুয়োর ধারে যে গাছগুলি ছিল, তার শাখাপ্রশাখায় মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করেছিল। তা থেকে মধুর ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। মধু স্বভাবতই সকলের প্রিয়, তাই লতাগুল্মে ঝুলে থেকেও ব্রাহ্মণ সেই মধু পান করতে লাগলেন। সেই সংকটকালেও তাঁর মধুপান করতে করতে তৃষ্ণা শান্ত হয়নি। এই জীবনের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য জন্মায়নি। যে বৃক্ষের ডালে তিনি ঝুলে ছিলেন, সেই গাছটিকে সাদা ও কালো ইঁদুর প্রত্যহ কাটত। ব্রাহ্মণ সেই অবস্থায় তাঁর পরিণামের কথা চিন্তা করে নানা ভয়ে ভীত হয়ে থাকতেন। সেই জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র জন্তু এবং উগ্র নারীর ভয় ছিল, কুয়োর মধ্যে সাপ আর ওপরে হাতির ভয় ছিল, তার ওপরে আর এক ভয় ছিল ইঁদুরের গাছ কাটায় এবং মৌমাছির কামড়ের। এইভাবে সংসার-সমুদ্রে ভয়ানক অবস্থায় থেকেও সেই ব্রাহ্মণ অবিচল অবস্থায় অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর তাতেও বৈরাগ্যের উদয় হয়নি।

মহারাজ ! মোক্ষতত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এটি জেনে ধর্মাচরণ করলে মানুষ পরলোকে সুখলাভ করতে সক্ষম হয়। যে বিশাল বনের কথা বলা হয়েছে, সেটি প্রকৃতপক্ষে এই বিস্তৃত জগৎ-সংসার। যে দুর্গম জঙ্গলের কথা বলা হয়েছে, তা হল সংসারের গভীরত্ব, যে হিংস্র জন্তুর কথা বলা হয়েছে, সেগুলি নানাপ্রকার ব্যাধি এবং উগ্ররূপা নারী হল বৃদ্ধবয়স, যা মানুষের রূপ-রঙ নষ্ট করে দেয়। বনের কুয়ো হল মানুষের শরীর, নীচে যে সর্প অবস্থান করছে, তা হল কাল, যা সমস্ত দেহধারীকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। কুয়োর মধ্যে যে লতায় ব্রাহ্মণ ঝুলে ছিলেন, সেটি হল জীবনের আশা আর ওপরে ছয় মুখ বিশিষ্ট হাতি হল সংবৎসর, ছটি মুখ ছয় ঋতু আর বারোটি পা, বারো মাস। সেই বৃক্ষটি যা ইঁদুরে কাটছিল তা হল রাত ও দিন। মানুষের নানা প্রকার কামনাগুলি হল মধুমক্ষিকা। মৌমাছিদের বাসা থেকে যে মধু পড়ছে, সেগুলি ভোগ থেকে প্রাপ্ত নানা রস মনে করুন, যাতে মানুষ অধিকাংশ সময় মগ্ন থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সংসার চক্রকে এইভাবেই মনে করে থাকেন। সেইজন্যই তাঁরা বৈরাগ্যরূপ তরবারি দিয়ে এর বন্ধন কেটে দেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তুমি খুবই তত্ত্বদর্শী, আমাকে গভীর তত্ত্বপূর্ণ সুন্দর এক কাহিনী শোনালে। তোমার এই অমৃতময় বাণী শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

বিদুর বললেন—মহারাজ ! এবার আমি বিস্তারিতভাবে সেই পথের বিবরণ শোনাচ্ছি, যা শুনলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জগতের দুঃখ থেকে মুক্তি পায়। রাজন্ ! দীর্ঘপথ

অতিক্রমকারী মানুষ যেমন পরিশ্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে, তেমনই অজ্ঞান ব্যক্তিরা সংসার যাত্রায় চলতে চলতে মাঝে মাঝে গর্ভের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করে নেয়। বিবেকী ব্যক্তিরাই জগৎ-সংসার থেকে মুক্ত হন। তাই শাস্ত্রজ্ঞ মানুষগণ গর্ভবাসকে পথের রূপক বলেছেন এবং গভীর সংসার জগৎকে জঙ্গল বলেছেন। মানুষ এবং চরাচর প্রাণীদের এই হল সংসার চক্র। বিবেকী মানুষদের এতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিকেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হিংস্র জীব বলেছেন। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এইসব ব্যাধিতে দুঃখ কষ্ট ভোগ করলেও সংসারে বিমুখ হয় না। তারা কোনোমতে এইসব ব্যাধি থেকে মুক্তি পেলেও বৃদ্ধাবস্থায় তাদের নানা দুঃখ পেতে হয়। এইভাবে সাধারণ জীব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এবং মজ্জা ও মাংসপূর্ণ পাঁকে আশ্রয়হীন দেহগর্তে আবদ্ধ থাকে। বৎসর, মাস, পক্ষ ও দিন-রাত—এ সবই ক্রমশ তাদের রূপ ও আয়ু বিনাশ করতে থাকে। এইগুলি যে কালেরই প্রতিনিধি, মূঢ় জীব তা জানে না।

কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন প্রাণীর শরীর রথের ন্যায়, সত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সমন্বিত বুদ্ধি এর সারথি, ইন্দ্রিয়াদি ঘোড়া এবং মন তার লাগাম। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এই ধাবমান অশ্বের পেছনে দৌড়ায়, সে এই সংসারচক্রে নিজেও চাকার মতো ঘুরতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্থির বুদ্ধিতে একে নিজের বশে রাখে, তাকে আর পুনর্বার এই জগতে আসতে হয় না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংসার থেকে মুক্ত হওয়ারই চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখেন, ক্রোধ ও লোভমুক্ত, সত্যবাদী এবং সন্তুষ্ট, তিনিই শান্তিলাভ করেন। নিজের মনকে নিয়ন্ত্রিত করে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তার দ্বারা এই সংসার দুঃখরূপ মহারোগ বিনাশ করাই মানুষের কর্তব্য। সংযমী চিত্ত দ্বারা এই দুঃখ থেকে যেমন মুক্তি লাভ করা যায়, সেইরূপ পরাক্রম, ধন, মিত্র অথবা হিত—কারো সাহায্যেই তা পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য মানুষকে দয়াভাবে স্থিত থেকে শীল প্রাপ্ত করা উচিত। সংযম, ত্যাগ এবং অপ্রমাদ—এই তিনটি ঘোড়া মানুষকে পরমাত্মার ধামে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি শীলরূপ লাগাম ধরে এই ঘোড়ায় সংযুক্ত মনরূপ রথে আরোহণ করে থাকে, সে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান করে, সে ভগবান বিষ্ণুর নির্বিকার পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অভয়দানে মানুষ যে ফল লাভ করে, হাজার যজ্ঞ এবং নিত্য উপবাসেও সে ফল লাভ হয় না। এ কথা সত্য যে প্রাণীদের নিজের আত্মার থেকে বেশি প্রিয় আর কোনো বস্তু নেই। কারণ মৃত্যু কারোই ইষ্ট নয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির সকল জীবকেই দয়া করা উচিত। যে বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা নানাপ্রকার মায়া-মোহতে আবদ্ধ থাকে, তাদের বিভিন্ন প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করে জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। সূক্ষ্মদৃষ্টি মহাপুরুষগণ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করে থাকেন।

শোকমগ্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে মহর্ষি ব্যাসের সান্ত্বনা প্রদান

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! বিদুরের কথা শুনে পুত্রশোকে ব্যাকুল রাজা ধৃতরাষ্ট্র মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁকে অচেতন হয়ে পড়ে যেতে দেখে শ্রীব্যাসদেব, বিদুর, সঞ্জয়, সুহৃদবর্গ এবং বিশ্বাসভাজন দ্বাররক্ষীরা শীতল জল ও বাতাস দিয়ে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। বহুক্ষণ সেবা করার পর তাঁর চেতনা ফিরে এলে তিনি ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—'এই মনুষ্য-জন্মকেই ধিক্কার! তাতে বিবাহাদির দ্বারা পরিবার বৃদ্ধি করা আরও দুঃখজনক। তারজন্যই বারংবার নানা দুঃখ উৎপন্ন হয়। পুত্র, ধন, সুহৃৎ এবং আত্মীয় বিনাশে বিষ ও অগ্নিদাহ তুল্য দুঃখভোগ করতে হয়। সেই দুঃখে শরীরে জ্বালা সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধিনাশ হয়। এরূপ বিপদে পড়লে মানুষের বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ভালো বলে মনে হয়। সুতরাং আজ আমিও প্রাণবিসর্জন দেব।'

মহাত্মা ব্যাসদেবকে এই কথা বলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকাকুল হৃদয়ে পুত্রের চিন্তায় মগ্ন হয়ে মৌন রইলেন। ভগবান ব্যাসদেব তখন তাঁকে বললেন—''ধৃতরাষ্ট্র! তুমি সব শাস্ত্র শুনেছ, বুদ্ধিমান এবং ধর্ম ও অর্থ সাধনে কুশল। মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না, তা তুমি অবশ্যই জান। মর্তলোক অনিত্য, পরমপদ নিত্য। জীবনের অবসান

মরণেই হয়—এই সব জেনেও তুমি কেন শোক করছ ? এই শত্রুতার শুরু তো তোমার সামনেই হয়েছিল। তোমার পুত্রকে নিমিত্ত করে স্বয়ং কালই এটি অঙ্কুরিত করেছে। এই কৌরবকুল ধ্বংস হওয়ারই ছিল, তাহলে তুমি সেই শূরবীরদের জন্য কেন শোক করছ ? তারা সকলেই পরমগতি লাভ করেছে। বহুকালের কথা, একবার আমি ইন্দ্রের সভায় গিয়েছিলাম, সেখানে সব দেবতাদের আমি একত্রিত দেখেছিলাম। সেইসময় এক বিশেষ প্রয়োজনে ধরিত্রী মাতা নারীর রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলেন—'দেবগণ ! আপনারা যে কাজের জন্য ব্রহ্মার সভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা এখন শীঘ্রই পূর্ণ করুন।' তাঁর কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু বললেন—'রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন তোমার কাজ করবে। তারজন্য বহু রাজা কুরুক্ষেত্রে এসে নিজেদের সুদৃঢ় অস্ত্রাঘাতে একে অপরকে বধ করবে। এইভাবে এই যুদ্ধে তোমার সমস্ত ভার লাঘব হবে। এখন তুমি গিয়ে সকলকে ধারণ করো।''

রাজন্ ! তোমার পুত্র দুর্যোধন কলির অংশরূপেই গান্ধারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিল। সেইজন্যই সে ওইরূপ অসহনশীল, চঞ্চল, ক্রোধী এবং কুনীতিভক্ত হয়েছিল। দৈবক্রমে তার ভ্রাতাগণও তেমনই ছিল এবং মাতুল শকুনি ও পরম বন্ধু কর্ণও তেমনি জুটিল। এরা সকলেই পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য দৈবক্রমেই একসঙ্গে জন্ম নিয়েছিল। রাজা যেমন হন, তাঁর প্রজারাও তেমনই হয়ে থাকে। প্রভু ধার্মিক হলে তাঁর অধার্মিক প্রজাও ধার্মিক হয়ে ওঠে। অনুচরদের প্রবৃত্তি যে প্রভুর দোষগুণ অনুসারে হয়ে থাকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজন্ ! দুষ্ট রাজাদের সংসর্গে থাকার জন্যই তোমার সব পুত্ররা নিহত হয়েছে। দেবর্ষি নারদ সে কথা জানেন। তোমার পুত্র তার নিজের অপরাধেই মৃত্যুবরণ করেছে। তুমি তার জন্য শোক কোরো না ; কারণ এটি শোকের বিষয় নয়। পাণ্ডবরা তোমার কাছে কোনো অন্যায় করেনি। তোমার পুত্ররাই দুষ্ট ছিল, তাদের জন্যই রাজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজসূয় যজ্ঞের সময় দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের সভাতে তাঁকে বলেছিলেন—''রাজন্ ! তোমার যেসব কাজ করার আছে করে নাও। এমন সময় আসবে যখন সমস্ত কৌরব-পাণ্ডব নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'' দেবর্ষি নারদের কথা শুনে সেইসময় পাণ্ডবরা অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। আমি তোমাকে দেবসভার গুপ্ত সংবাদ জানালাম। এগুলি তোমাকে জানাবার উদ্দেশ্য এই—যাতে তোমার শোক দূর হয় এবং যুদ্ধকে দৈবী ঘটনা মনে করে পাণ্ডু পুত্রদের ওপর স্নেহের ভাব বজায় থাকে। আমি যুধিষ্ঠিরকেও একান্তে ডেকে এই কথা জানিয়েছি। সেইজন্যই তারা এই যুদ্ধ বন্ধ করবার বহু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দৈব অত্যন্ত প্রবল। জগৎ-চরাচরের প্রাণীদের সঙ্গে কালের যে সম্পর্ক, তা কেউই বোধ করতে পারে না। রাজন্ ! তুমি তো অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ধর্মাত্মা, প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যু রহস্য তোমার জানা আছে। তাহলে মোহমুগ্ধ হচ্ছ কেন ? রাজা যুধিষ্ঠির যদি জানতে পারে যে তুমি শোকাতুর হয়ে বারংবার অচেতন হয়ে পড়ছ, তাহলে সে প্রাণত্যাগ করবে। বীর যুধিষ্ঠির সর্বদা পশুপক্ষীর ওপরও কৃপাভাব রাখে, তাহলে তোমার প্রতি সে কেন দয়াভাব পোষণ করবে না ! সুতরাং আমার নির্দেশ মেনে এবং বিধির বিধান মনে করে, পাণ্ডবদের করুণাপূর্বক নিজ প্রাণধারণ করো। এরূপ আচরণ করলে জগতে তুমি কীর্তিলাভ করবে, ধর্ম-অর্থ লাভ করবে এবং দীর্ঘকালের তপস্যার ফললাভ করবে। তোমার মনে যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পুত্রশোক উৎপন্ন হয়েছে, বিচাররূপ জলের সাহায্যে তাকে শান্ত করো।''

বৈশম্পায়ন বললেন—অতুল তেজস্বী ব্যাসদেবের

বাণী শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন, তারপর বললেন—'দ্বিজবর ! শোকজাল আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকায় আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত ছিল তাই বারংবার মূর্ছা যাচ্ছিলাম। এখন আপনার উপদেশ শুনে আমি যথাসম্ভব শোক পরিহার করে প্রাণধারণ করতে চেষ্টা করবো।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে সত্যবতীনন্দন ভগবান ব্যাসদেব সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

বিদুরের কথায় কুরুকুলের নারীদের সঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্রের দিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যাত্রা এবং পথে কৃপাচার্য প্রমুখের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রস্থানের পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র কী করলেন ? মহামনা রাজা যুধিষ্ঠির এবং কৃপাচার্য প্রমুখ তিন মহারথীই বা কী করলেন ? এতদ্ব্যতীত সঞ্জয়ও যা বলেছিলেন, কৃপা করে সেসব কথাও আমাকে বলুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধন নিহত এবং সমস্ত সৈন্য বিনাশপ্রাপ্ত হলে সঞ্জয়ের দিব্য দৃষ্টিও চলে গেল। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ ! বিভিন্ন দেশের বহু রাজা আপনার পুত্রদের সঙ্গে পিতৃলোকে গমন করছেন। সুতরাং আপনি এবার আপনার পুত্র-পৌত্র, আত্মীয়স্বজন সকলেরই প্রেতকর্মাদি সম্পন্ন করান।'

সঞ্জয়ের এই দুঃখজনক কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রাণহীনের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন বিদুর তাঁকে বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! উঠুন, এইভাবে পড়ে আছেন কেন ? শোক করবেন না। জগতের সব জীবের অন্তিম গতিই এই হয়ে থাকে। প্রাণীরা জন্মের আগে থাকে না এবং অন্তকালেও থাকে না। শুধু মধ্য সময়েই তারা দৃষ্টিগোচরে আসে, সুতরাং তাদের জন্য শোক কীসের ? আপনি যে রাজাদের জন্য শোকগ্রস্ত হচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শোকের যোগ্য নন, কেননা তাঁরা সকলেই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। শূরবীররা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন, বড় বড় যজ্ঞ, তপস্যা অথবা বিদ্যাভ্যাসের দ্বারাও তা প্রাপ্ত হয় না। এঁরা সকলেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় প্রাণত্যাগ করেছেন, অতএব তাঁদের জন্য শোক কীসের ? রাজন্ ! আমি আগেও আপনাকে বলেছি যে, ক্ষত্রিয়ের কাছে স্বর্গলাভের জন্য ন্যায় যুদ্ধের থেকে কোনো শ্রেষ্ঠ সাধন আর নেই। সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করে শোক ত্যাগ করুন।'

বিদুরের কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রথ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়ে বললেন 'গান্ধারী এবং ভরতবংশের সমস্ত নারীদের শীঘ্র এখানে নিয়ে এসো এবং বধূমাতা কুন্তীর সঙ্গে অন্যান্য যে সব নারী আছেন, তাঁদেরও ডাকো।' ধর্মজ্ঞ বিদুরকে একথা বলে তিনি রথে আরোহণ করলেন। সেই সময়েও তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। গান্ধারীও পুত্রশোকে অধীর ছিলেন। পতির নির্দেশে তিনি কুন্তী ও অন্যান্য নারীদের নিয়ে সেখানে এলেন। সেখানে এসে তাঁরা সকলেই শোকাতুর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। সেই আর্তনাদে বিদুরও শোকাকুল হলেন, কিন্তু তিনি ধৈর্য রক্ষা করে নারীদের সকলকে রথে উঠিয়ে নগরের বাইরে এলেন। কুরুবংশের গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শোকাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। যেসব নারী অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন, পতির মৃত্যুতে তাঁরাও সাধারণের চোখের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাঁরা এলোকেশে, আভরণহীন অবস্থায় একবস্ত্র ধারণ করে অনাথার ন্যায় রণভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যাঁরা নিজ সখীদের সামনেও এই বেশ পরিধান করতে লজ্জা পেতেন, তাঁরা তাঁদের গুরুজনের সামনে এই বেশে রওনা হলেন। তাঁদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হৃদয়ে রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চললেন।

তাঁরা হস্তিনাপুর থেকে এক ক্রোশ দূরে যেতেই কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থামা—এই তিন মহারথীর সাক্ষাৎ পেলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখেই তাঁদের হৃদয় ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠল, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! দুর্যোধনের সৈন্যদলের মধ্যে আমরা তিন জনই মাত্র বেঁচে আছি। বাকি

সব সেনা বিনষ্ট হয়েছে।' কৃপাচার্য গান্ধারীকে বললেন—'গান্ধারি ! তোমার পুত্রবা নির্ভয়ে যুদ্ধ করেছে এবং বহু শত্রু বধ করেছে। যুদ্ধে তারা বহু বীরোচিত কাজ করেছে। এখন তারা তেজোময় দেহ ধারণ করে স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বিহার করছে। তোমার শূরবীর পুত্ররা কেউই যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণ বলেছেন যুদ্ধে অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হলে সে পরমগতি লাভ করে। সুতরাং তাদের জন্য শোক করা বৃথা। আর একটি সুখের কথা, ওদের শত্রু পাণ্ডবরাও যে শান্তিতে আছে তা নয়। অশ্বত্থামা ও আমরা যা করেছি, তা শোনো। আমরা যখন জানলাম যে ভীম অধর্মপূর্বক দুর্যোধনকে হত্যা করেছে তখন আমরা পাণ্ডবদের শিবিরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় ভীষণভাবে তাদের হত্যা করেছি। আমরা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমস্ত পাঞ্চালদের এবং দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পুত্রদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছি। তোমার পুত্রদের শত্রুদের সংহার করে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমরা মাত্র তিন জন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠব না। পাণ্ডবরা মস্ত বড় বীর এবং মহান ধনুর্ধর। এখন তারা তাদের পুত্রদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমাদের পদচিহ্ন ধরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সবেগে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। তাদের সম্মুখীন হওয়ার মতো মনোবল আমাদের নেই। সুতরাং রানি ! আমাদের যাওয়ার অনুমতি দাও এবং তুমি শোকাকুল হয়ো না। রাজন্ ! আপনিও আমাদের যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন এবং ক্ষাত্রধর্মের কথা ভেবে ধৈর্যধারণ করুন।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথাগুলি বলে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থামা তিন জনে সবেগে গঙ্গার দিকে ঘোড়া ছোটালেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পৃথক পৃথক রাস্তা ধরলেন। কৃপাচার্য হস্তিনাপুরের পথে, কৃতবর্মা নিজের দেশের দিকে এবং অশ্বত্থামা ব্যাস আশ্রমের রাস্তায় চললেন। এইভাবে পাণ্ডবদের ক্ষতি করায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এই তিন বীর একে অপরকে দেখতে দেখতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই পাণ্ডবরা অশ্বত্থামার কাছে পৌঁছে তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সঙ্গে পাণ্ডবদের সাক্ষাৎকার, ভীমসেনের ওপর গান্ধারীর ক্রুদ্ধ হওয়া এবং তাঁকে ব্যাসদেব এবং ভীমসেনের শান্ত করা

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠির সংবাদ পেলেন যে তাঁর বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য যুদ্ধে মৃত বীরদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করার জন্য হস্তিনাপুর থেকে রওনা হয়েছেন। তিনি তখন তাঁর ভ্রাতাগণ সমভিব্যাহারে শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হলেন। শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং যুযুৎসুও তাঁদের সঙ্গে চললেন, পাঞ্চাল মহিলাসহ দ্রৌপদীও তাঁদের অনুসরণ করলেন। গঙ্গাতীরে পৌঁছে তাঁরা ক্রন্দনরত মহিলাদলকে দেখতে পেলেন। ক্রন্দনরতা নারীগণ রাজার দেখে হাজার হাজার সংখ্যায় দলবেঁধে হাত তুলে পরলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! আজ আপনার ধর্মজ্ঞতা এবং দয়াভাব কোথায় গেল যে এইভাবে আপনি আপনার আত্মীয়স্বজন, পুত্র

মিত্র, গুরু-ভ্রাতা সকলকে বিনাশ করলেন। এঁদের সকলকে এবং অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রদের হারিয়ে আপনি এখন রাজ্য নিয়ে কী করবেন ?"

সেইসব ক্রন্দনরতা নারীদের অতিক্রম করে মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে তাঁর চরণে প্রণাম জানালেন। পরে অন্য সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে নিজ নিজ নাম জানিয়ে প্রণাম করলেন। মহারাজ পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন, তিনি বিষণ্ণভাবে যুধিষ্ঠিরকে

আলিঙ্গন করলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর অন্তর ক্রোধে ভরে উঠল এবং তিনি ভীমকে অগ্নির ন্যায় ভস্ম করার কথা চিন্তা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই তাঁর অভিপ্রায় বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি ভীমের হাত ধরে তাঁকে আটকালেন এবং এক লৌহনির্মিত ভীম ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এগিয়ে দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। তিনি লৌহ-ভীমকে সত্যকারের ভীমসেন মনে করে বাহুর আলিঙ্গনে চূর্ণ করে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দেহে দশ হাজার হাতির শক্তি ছিল। কিন্তু লৌহনির্মিত ভীমকে চূর্ণ করার ফলে তাঁর বুকে অত্যন্ত চাপ পড়ে এবং মুখ দিয়ে রক্তপাত হতে থাকে। তিনি রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন। সঞ্জয় সেইসময় তাঁকে শান্ত করলেন। ক্রোধ শান্ত হলে তিনি 'হা ভীম ! হা ভীম !' করে ক্রন্দন করতে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ শান্ত হয়ে গেছে এবং ভীমসেন বধ হয়েছেন মনে করে অত্যন্ত কাতর হয়েছেন, তখন তিনি বললেন—'রাজন্ ! আপনি শোক করবেন না, আপনার হাতে ভীম বধ হয়নি। এটি ভীমের লৌহনির্মিত মূর্তি, যাকে আপনি চূর্ণ করেছেন। আপনাকে ক্রোধের বশীভূত দেখে আমি ভীমসেনকে আপনার কাছে যেতে বাধা প্রদান করেছি। কালের কাছে গেলে যেমন কেউ বাঁচে না, তেমনই আপনার হাতের বন্ধনে পড়লে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। এই ভেবেই আপনার পুত্র ভীমের যে লৌহমূর্তি নির্মাণ করেছিল, সেটিকেই আমি আপনার সামনে রেখেছিলাম। পুত্রশোকের আগুন আপনার মনকে ধর্মচ্যুত করেছে, তাই আপনার ভীমকে বধ করার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু ভীমকে বধ করা আপনার উচিত নয়। সুতরাং আমরা সর্বত্র শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যা কিছু করছি, তা আপনারও সমর্থন করা উচিত ; মনকে বৃথা শোকাকুল করবেন না। রাজন্ ! আপনি বেদ এবং সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, পুরাণ এবং সমস্ত রাজধর্মও আপনার জানা আছে। এত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়েও নিজের দোষে হওয়া এই কুটুম্ব বধ দেখে আপনি কেন এত কুপিত হচ্ছেন ? আমি তো আগেই আপনার কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করেছিলাম এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও সঞ্জয় আপনাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন ; কিন্তু তখন আপনি আমাদের কথা মেনে নেননি। যে ব্যক্তিকে বোঝালেও নিজের হিতাহিত বোঝে না, সে অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়ায় বিপদে পড়লে শোকই করে থাকে। আপনি নিজ দোষেই এই বিপদে পড়েছেন। তাহলে ভীমসেনের ওপর ক্রোধ করছেন কেন ? দুর্যোধন ঈর্ষাবশত দ্রৌপদীকে সভায় জোর করে এনেছিল ; সেই শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ভীমসেন তাকে বধ করেছে। আপনি নিজের এবং আপনার পুত্রের অপরাধগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আপনিই তো নির্দোষ পাণ্ডবদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছেন।'

রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরূপ পরিষ্কারভাবে সমস্ত কথা বললেন তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলতে লাগলেন—'মাধব ! তুমি সত্য কথাই বলছ। অত্যন্ত মঙ্গলের কথা যে তুমি বাধাপ্রদান করায় ভীম আমার বাহু-বন্ধনের মধ্যে আসেনি। আমি এখন সুস্থ হয়েছি, আমার ক্রোধ অপনীত হয়েছে, এখন আমি পাণ্ডুর বীর মধ্যম পুত্রকে দেখতে চাই। আমার সমস্ত পুত্র এবং প্রধান প্রধান রাজারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে।

এখন পাণ্ডু পুত্ররাই আমার শান্তি ও প্রীতির আশ্রয়।' এই কথা বলে তিনি ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব সকলকেই কাঁদতে কাঁদতে আলিঙ্গন করলেন এবং 'তোমাদের কল্যাণ হোক' বলে আশীর্বাদ করলেন।

এরপরে তাঁর অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গান্ধারীর কাছে গেলেন। গান্ধারীর মনে পাণ্ডবদের প্রতি বৈরীভাব আছে—মহর্ষি ব্যাস একথা আগেই জানিয়েছিলেন। তাই তিনি দ্রুত গান্ধারীর কাছে গেলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে এবং মনের একাগ্রতার দ্বারা সকল প্রাণীর অন্তরের ভাব বুঝতে পারতেন। তাই গান্ধারীর কাছে গিয়ে তিনি বললেন—'গান্ধারী ! তুমি পাণ্ডুপুত্র

যুধিষ্ঠিরের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ো না, শান্ত হও। তুমি যে কথা বলতে চাও, তা উচিত হবে না। মন দিয়ে আমার কথা শোনো। বিগত আঠারো দিনে তোমার বিজয়-অভিলাষী পুত্র নিত্য তোমার কাছে প্রার্থনা জানাত যে, 'মাতা, আমি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আমার কল্যাণের জন্য আমাকে আশীর্বাদ করুন।' সে এই প্রার্থনা করলেও তুমি প্রত্যেকবারই তাকে বলতে 'যেখানে ধর্ম, সেখানেই বিজয়।' এইভাবে প্রথমে তোমার মুখ থেকে যে সত্য কথা বার হত তা আমার স্মরণে আছে। তাছাড়াও তুমি সকল প্রাণীরই হিতাকাঙ্ক্ষী। এখন পাণ্ডবরা বিজয়লাভ করেছে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যুধিষ্ঠিরই অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তুমি তো সর্বদাই অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাহলে এখন কেন ক্ষমা ত্যাগ করছ ? হে ধর্মজ্ঞা, তুমি অধর্ম পরিত্যাগ করো ; তুমি ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখেই বলেছিলে যে, 'যেখানে ধর্ম, সেখানেই বিজয়।' সুতরাং তুমি ক্রোধ শান্ত করো। তুমি সত্যবাদী ও সংযমী, তোমার আচরণ অসংযত হওয়া উচিত নয়।'

গান্ধারী বললেন—'ভগবান ! পাণ্ডবদের প্রতি আমার মনে কোনো দ্বেষ নেই এবং আমি তাদের বিনাশও চাই না। কিন্তু পুত্রশোকের জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আছে। কুন্তীপুত্রদের রক্ষা করা যেমন কুন্তীর কর্তব্য তেমন আমার এবং মহারাজেরও কর্তব্য তাদের পাশে দাঁড়ান। কৌরবদের বিনাশ হয়েছে দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই। এতে অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব বা যুধিষ্ঠিরের কোনো দোষই নেই। কৌরবরা অহংকারবশত যুদ্ধ করে নিজেরাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সাহসী ভীম দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করে, শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তাকে নাভির নীচে গদার আঘাত করেছে—এই অনুচিত কার্যের জন্যই আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছে। ধর্মজ্ঞ মহাপুরুষরা যাকে 'ধর্ম' বলেছেন, তা কি শূরবীররা প্রাণের লোভে রণভূমিতে ত্যাগ করতে পারেন ?'

গান্ধারীর কথা শুনে ভীম ভীত হয়ে বিনয় সহকারে তাঁকে বললেন—'মাতা ! এটি ধর্ম হোক অথবা অধর্ম, আমি প্রাণভয়ে নিজের রক্ষার জন্যই এই কাজ করেছিলাম, আপনি সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার মহাবলী পুত্রকে ধর্মযুদ্ধে কেউই পরাস্ত করতে পারত না। কিন্তু আগে সে অধর্মের সাহায্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছিল এবং আমাদের বারংবার অপদস্থ করেছিল। সেই সময়েও আমার ভয় ছিল যে দুর্যোধন গদাযুদ্ধে না আমাকে হত্যা করে। তাই আমি এই কাজ করেছি। দেখুন, আপনার পুত্র আমাদের অনেক ক্ষতি ও অপ্রিয় কাজ করেছে। পরিপূর্ণ সভাগৃহে সে দ্রৌপদীকে নিজ ঊরুদেশ দেখিয়ে আহ্বান করেছিল। তখনই আমাদের তাকে বধ করা উচিত ছিল, কিন্তু ধর্মরাজের নির্দেশে আমরা চুপ করে বসেছিলাম। তারপর সে আরও শত্রুতা করতে থাকে এবং বনবাসকালে আমাদের নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। তাই

আমি এই কাজ করেছি।'

গান্ধারী বললেন—'পুত্র! তুমি আমার পুত্রের কাজের যে বর্ণনা করলে তাতে তাকে বধযোগ্য মনে করা যায় না। উপরন্তু তুমি রণক্ষেত্রে যে দুঃশাসনের রক্তপান করেছ, তাকে সকল সৎ ব্যক্তিই নিন্দা করবেন, এমন কাজ কোনো আর্য ব্যক্তি করেন না। এই ক্রূর কর্ম তোমার কখনো করা উচিত হয়নি।'

ভীমসেন বললেন—'মাতা! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি রক্তপান করিনি, সেই রক্ত আমার দাঁত এবং ওষ্ঠের মধ্যে যায়নি, কর্ণ তা জানে। আমি শুধু হাতই রক্তাপ্লুত করেছিলাম। দ্যূতক্রীড়ার সময় যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ ধরে টেনে এনেছিল, সেই সময় ক্রোধান্বিত হয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমি যদি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করতাম, তাহলে অনন্তকাল ক্ষাত্রধর্ম থেকে পতিত হতাম। তাই আমি এই কাজ করেছি।'

গান্ধারী বললেন—'ভীম! আমি বৃদ্ধা হয়েছি, আমাদের রাজ্যও তুমি দখল করে নিয়েছ। এরূপ অবস্থায় আমাদের এই দুই অন্ধের সাহায্যের জন্য যষ্টির মতো আমাদের একটি পুত্রকেও জীবিত রাখোনি। তুমি যদি আমাদের একজন পুত্রকেও জীবিত রাখতে তাহলে আমরা এত দুঃখ পেতাম না, মনে করতাম তুমি তোমার ধর্ম পালন করেছ।'

ভীমসেনকে একথা বলে পুত্র-পৌত্র বিনাশের দুঃখে

পীড়িতা গান্ধারী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়?' এই কথা শুনে ধর্মরাজ কম্পিত হৃদয়ে হাতজোড় করে তাঁর সামনে এসে অত্যন্ত নম্রভাবে বললেন—'দেবী! আপনার পুত্রের হত্যাকারক ক্রূরকর্মা যুধিষ্ঠির আপনার সামনে উপস্থিত। সমস্ত পৃথিবীর রাজাদের বিনাশ করার কারণ আমিই, তাই আমি অভিশাপের যোগ্য; আপনি আমাকে শাপ দিন। আমি আমার সুহৃদদের শত্রু; এইসব বন্ধুদের সংহার করিয়ে এখন আমার জীবন, রাজ্য অথবা ধন—কোনো কিছুই লাভের ইচ্ছা নেই।'

মহারাজ যুধিষ্ঠির গান্ধারীর সামনে দাঁড়িয়ে এই কথা বললেও কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোল না, তিনি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর চরণ ধরতে গেলে গান্ধারীর দৃষ্টি চোখের বন্ধন থেকে যুধিষ্ঠিরের নখের ওপর পড়ল, তাতেই তাঁর সুন্দর নখ কালো হয়ে গেল। তা লক্ষ্য করে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পেছনে সরে দাঁড়ালেন এবং অন্য ভ্রাতারাও এদিক-ওদিক সরে গেলেন। তাঁদের এভাবে ভয় পেতে দেখে গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত হল, তিনি মাতার ন্যায় তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবরা মাতা কুন্তীর কাছে

গেলেন। বহুদিন পর কুন্তী তাঁর পুত্রদের দেখলেন, পুত্রদের কষ্ট স্মরণ করে তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হল, তিনি আঁচলে মুখ ঢেকে চক্ষের জল ফেলতে লাগলেন। তাঁকে দেখে

পাণ্ডবদেরও চক্ষে জল ভরে এল। তিনি প্রত্যেক পুত্রের গায়ে বারবার হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। সকলেরই দেহে অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুত্রহীনা দ্রৌপদীকে দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, পাঞ্চালকুমারী মাটিতে পড়ে কাঁদছিলেন।

দ্রৌপদী বললেন—'আর্যে ! অভিমন্যুসহ আপনার সকল পৌত্রই আজ কোথায় চলে গেছে। আমার পুত্ররাই যখন নেই, তখন রাজ্য নিয়ে আমি কী করব ?'

কুন্তী তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—তারপর তিনি শোকাকুলা দ্রৌপদীকে তুলে নিয়ে গান্ধারীর কাছে গেলেন। পাণ্ডবরাও সকলে তাঁর সঙ্গে গেলেন। গান্ধারী তখন পুত্রবধূ দ্রৌপদী এবং যশস্বিনী কুন্তীকে বললেন—'কন্যা ! এইভাবে শোকাকুলা হয়ো না। আমার দিকে দেখ, কেমন দুঃখের পাহাড় আমার ওপর ভেঙে পড়েছে। আমি এই লোকক্ষয়কে নিয়তির পরিহাস বলে মনে করি। এই রোমাঞ্চকর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাই হয়েছে। বিদুর যা বলেছিলেন, এ তেমনই হয়েছে। আমার মানসিক অবস্থাও তোমার মতই। এখন বল কে কাকে সান্ত্বনা দেবে ? প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেষ্ঠকুলের সংহার আমার অপরাধেই সংঘটিত হয়েছে।'

রণক্ষেত্রে পৌঁছে নারীদের বিলাপ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীর তাদের দুর্দশার বর্ণনা

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! গান্ধারী অত্যন্ত পতিব্রতা, ভাগ্যবতী ও তপস্বিনী ছিলেন। তিনি সর্বদা সত্যভাষণ করতেন। মহর্ষি ব্যাসের বরে তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তারই প্রভাবে তিনি দূর থেকেই কৌরবদের রণক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই দেখে তিনি বিলাপ করছিলেন। বহুদূরে হলেও তাঁর মনে হচ্ছিল রণক্ষেত্র নিকটেই। সেই স্থান অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল, মৃত প্রাণীর অস্থি, কেশ, রক্তে পরিপূর্ণ ছিল এবং বহু মৃত মানুষ ও পশু সেখানে পড়েছিল।

ভগবান ব্যাসদেবের নির্দেশে রাজা যুধিষ্ঠির, অন্য ভ্রাতাগণ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুকুলের সব নারীদের সঙ্গে নিয়ে রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে সেই নারীরা যুদ্ধে তাঁদের মৃত ভ্রাতা, পুত্র, পিতা ও পতিকে দেখলেন। সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে রাজবধূরা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে রথ থেকে পড়ে গেলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, কেউ আবার মাটিতে আছাড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। পাঞ্চাল এবং কুরুকুল বধূদের কাছে এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা।

সেই দুঃখিনী নারীদের আর্তনাদে কুরুক্ষেত্রের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতে দেখে ধর্মজ্ঞা গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে বললেন—'মাধব ! দেখো আমার এইরূপ স্বামীহারা রাজবধূগণ কীভাবে বিলাপ করছে। এরা ভরতকুল-ভূষণদের স্মরণ করে তাদের পুত্র-পতি-ভ্রাতা-পিতার দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। বীরবর ! এই যুদ্ধক্ষেত্র দেখে আমার হৃদয় শোকে জ্বলে উঠছে। মধুসূদন ! এই পাঞ্চাল এবং কৌরবদের বিনাশে আমার মনে হচ্ছে যেন পঞ্চভূতেরই বিনাশ হয়েছে। কোনো ব্যক্তি কী কল্পনা করতে পারত যে এই যুদ্ধে জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম এবং অভিমন্যুর মতো বীর মারা পড়বে ? হায় ! আমার কাছে এর থেকে বড় দুঃখ আর কী হতে পারে ? আমি নিশ্চয়ই বিগত জন্মে কোনো পাপকর্ম করেছি। তাই আমাকে নিজ চোখে আমার পুত্র, পৌত্র এবং ভ্রাতাদের মৃত্যু দেখতে হল।' পুত্র-শোকাকুলা গান্ধারী এইরূপ দীনভাবে বিলাপ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণকে এইসব বলতে লাগলেন ; তার মধ্যে তাঁর দৃষ্টি মৃত পুত্র দুর্যোধনের দিকে পড়ল।

দুর্যোধনকে মৃত দেখে শোকাতুরা গান্ধারী কর্তিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় মাটির ওপর পড়ে গেলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি রক্তাপ্লুত দুর্যোধনের মৃতদেহ দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে 'হা পুত্র ! হা পুত্র !' বলে কাঁদতে লাগলেন। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন—'বার্ষ্ণেয় ! এই বিধ্বংসী সংগ্রাম যখন স্থির হল, তখন দুর্যোধন হাত জোড় করে আমাকে বলেছিল, 'মাতা ! আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি যুদ্ধে বিজয়লাভ করি।' তখন আমি বলেছিলাম—'জয় সেখানেই থাকে, যেখানে ধর্ম বিরাজ করে, কিন্তু তুমি যদি

ভীত না হও, তাহলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হলে দেবতাদের মতো প্রাপ্তব্য লোক অবশ্যই লাভ করবে।' আমি আগেই এই কথা দুর্যোধনকে বলেছিলাম, তাই এজন্য আমার কোনো শোক হচ্ছে না। আমার মহারাজের জন্যই চিন্তা হচ্ছে, যাঁর সমস্ত আত্মীয়ই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কালের বিপরীত গতি কেমন দেখো ! যে দুর্যোধন রাজাদের অগ্রে থাকত, সে আজ ধুলায় শায়িত রয়েছে। ওহো ! যে দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সে আজ নিজের অপরাধেই মৃত্যুবরণ করেছে। এই অভাগা বড়ই মূর্খ ছিল। নিজের পিতা এবং বিদুরের ন্যায় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে অপমান করেছিল, তাই আজ কালগ্রাসে পতিত হয়েছে। আমার যে পুত্র ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করেছে, সে আজ মৃত্যুবরণ করে মাটিতে শয্যা পেতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি স্বর্ণবেদীর ন্যায় তেজস্বিনী লক্ষ্মণের মাতাকে দেখো, আজ তারও বিপর্যস্ত অবস্থা। আমার এই পুত্রবধূ অত্যন্ত উদার হৃদয়সম্পন্ন। জানি না তার কী অবস্থা ! সে তার পুত্রের জন্য শোকাকুল, না পতির জন্য ? যাইহোক, যদি বেদ ও শাস্ত্র সত্য হয় তাহলে দুর্যোধন অবশ্যই তার বাহুবলের প্রতাপে অবিনাশী লোক লাভ করবে।

মাধব ! দেখো, অন্যদিকে আমার শতপুত্র পড়ে আছে। ভীমসেন তার গদার আঘাতে এদের সকলকে গদাযুদ্ধে পরাজিত করেছে। আমার সব থেকে বেশি দুঃখ এইজন্য হচ্ছে যে আমার পুত্রদের মৃত্যুতে আমার এই তরুণী পুত্রবধূরা অনাথের ন্যায় রণক্ষেত্রে ঘুরছে। হায় ! যারা পায়ে নূপুর পরে রাজমহলের মখমলে পা ফেলত, তারাই আজ বিপদে পড়ে রক্তাপ্লুত এই কঠিন রণভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সুকুমারী রাজকুমারী লক্ষ্মণের মাতাকে দেখে আমি ধৈর্য রাখতে পারছি না। দেখো ! এই মহিলাদের কেউ তাদের ভ্রাতা, পিতা বা পুত্রকে মৃত পড়ে থাকতে দেখে তাদের হাত ধরে বিলাপ করছে। শুধু তাই নয়, অনেক বয়স্কা এবং বৃদ্ধা নারীও তাঁদের আত্মীয়দের এই দারুণ সংগ্রামে হারিয়ে শোক করছেন।

এদিকে দেখো, দুঃশাসন শায়িত। শত্রুসূদন মহাবীর ভীম একে যুদ্ধে বধ করে, এর বুকের রক্তপান করেছে। দ্রৌপদীর কথায় এবং পাশাখেলার সময় অপমানের কথা স্মরণ করে ভীম আমার এই পুত্রের কী দুর্গতি করেছে। কৃষ্ণ ! আমি দুর্যোধনকে তখনই বলেছিলাম 'তুমি মৃত্যুর দড়িতে বাঁধা শকুনির সঙ্গ ত্যাগ করো। এই কুবুদ্ধি মাতুলকে কলহপ্রিয় বলে জেনো। তুমি একে এখনই ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করো। মূর্খ ! তুমি কি জানো না ভীমসেন কেমন অসহনশীল ব্যক্তি, কেন তুমি তাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছ ?' আজ তারই ফলস্বরূপ ভীমসেনের আঘাতে দুঃশাসন তার সুদীর্ঘ বাহু ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। ক্রুদ্ধ ভীম দুঃশাসনকে যুদ্ধে নিহত করে তার রক্তপান করেছে। এ তার এক অতি নিষ্ঠুর কর্ম।

মাধব ! দেখো, এই আমার পুত্র বিকর্ণ পড়ে রয়েছে। ওকে তো সকলেই বুদ্ধিমান বলে প্রশংসা করত। ভীম তাকেও শতটুকরো করে বধ করেছে। নানা প্রকারের বাণে তার মর্মস্থান ছিন্নভিন্ন হলেও, এখনও তার দেহকান্তি বজায় আছে। ওই শত্রুসংহারকারী দুর্মুখ শুয়ে আছে। সমরশূর ভীম তার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ওকেও বধ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ ! এর সামনে যুদ্ধে তো কেউ দাঁড়াতেই পারত না, শত্রুরা একে কী করে বধ করল ? এদিকে দেখো, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন চিত্রসেন মৃত পড়ে আছে। এ-তো ধনুর্ধরদের আদর্শ ছিল।

'কেশব ! এই অভিমন্যুকে বলবীর্যে অর্জুন এবং তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হত। সে তো একাকী আমার পুত্রের অভেদ্য ব্যূহ ভেঙে দিয়েছিল। দেখ, কেশব দেখ ! সেও বহুলোককে বধ করে নিজে নিহত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আমি দেখছি যে সে মৃত হলেও তার অতুল তেজস্বী রূপ নষ্ট হয়নি। দেখ, বিরাটকন্যা অনিন্দিতা উত্তরা, তার অল্পবয়স্ক বীর পতিকে মৃত দেখে কীভাবে শোক করছে। সে বারংবার পতির কাছে গিয়ে তার গায়ের ধুলো পরিষ্কার করছে। দেখো, উত্তরা তার রক্তাক্ত চুলগুলি হাত দিয়ে ঠিক করে তার মাথাটি ক্রোড়ে নিয়ে, সে যেন জীবিত—এইভাবে জিজ্ঞাসা করছে, 'আপনি তো স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্র। আপনাকে রণক্ষেত্রে ওইসব মহারথীরা কীভাবে বধ করল ? ক্রূরকর্মা কৃপাচার্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ এবং অশ্বত্থামাকে ধিক্, যাঁরা আমাকে অনাথা করেছেন। যুদ্ধে বহু যোদ্ধা একত্রিত হয়ে আপনাকে বধ করেছেন, তা দেখেও আপনার পিতা কী করে এখনও জীবিত আছেন ?'

'প্রাণনাথ ! আপনি অস্ত্রের দ্বারা যে পুণ্যলোক জয় করেছেন, আমিও সেইখানে নিজ ধর্ম ও ইন্দ্রিয় সংযমের সাহায্যে আসছি, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন।

সম্ভবত মৃত্যুর সময় না এলে কারো পক্ষে তা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন হয়, তাই তো অভাগিনী আমি আপনার মৃত্যু দেখেও এখনও জীবিত আছি। বীর ! ইহলোকে আপনার সঙ্গে আমার মাত্র ছয় মাসই অবস্থান ছিল, সপ্তম মাসেই আপনি পরলোক গমন করেছেন।' উত্তরার এইরূপ বিলাপ দেখে মৎস্যরাজকুলের অন্যান্য নারীরা তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু রাজা বিরাটকে মৃত দেখে তাঁরা নিজেরাও ক্রন্দন করতে লাগলেন। গরমে, কষ্টে এবং পরিশ্রমের জন্য এঁদের সকলেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং শরীরও খারাপ হয়েছিল। এদিকে রণক্ষেত্রের সামনের ভাগেই উত্তর, কাম্বোজকুমার, সুদক্ষিণ, লক্ষ্মণ প্রমুখ কয়েকটি শিশু মৃত হয়ে পড়ে আছে। মাধব ! এদের দিকেও দৃষ্টিপাত করো।'

অন্যান্য মৃত বীরদের দেখে গান্ধারীর বিলাপ এবং শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ প্রদান

গান্ধারী আবার বললেন—শ্রীকৃষ্ণ ! দেখো, বহু মহারথীকে ধরাশায়ী করে রক্তাক্ত অবস্থায় কর্ণ এই রণাঙ্গনে পড়ে আছে। এ বড়ই অসহনশীল, ক্রোধী, কুশলী ধনুর্ধর এবং মহাবলী ছিল। কিন্তু অর্জুনের হাতে নিহত হয়ে আজ সে এখানে শয়ন করে আছে। আমার মহারথী পুত্রও পাণ্ডবদের ভয়ে ভীত হয়ে একেই সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করেছিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্বদাই একে ভয় পেত ; এর জন্য চিন্তিত থাকায় সে ত্রয়োদশ বৎসর শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারেনি। কর্ণ প্রলয় কালের অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং হিমালয়ের মতো অটল ছিল, সেই দুর্যোধনের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু দেখো, আজ কর্ণ বায়ু-উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পড়ে আছে। এর পত্নী বৃষসেনের মাতা মাটিতে পড়ে করুণ ক্রন্দন করে বিলাপ করছে। হায় ! এ অতি হৃদয় বিদারক। মহাবাহু কর্ণকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সুষেণের মাতা শোকস্তব্ধ হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। দেখো, চেতনা ফিরে পেয়ে সে আবার মাটিতে পড়ে গিয়ে বিলাপ করছে।

এদিকে দেখো, ভীমসেনের বধ করা অবন্তিনরেশ পড়ে রয়েছে। তার রানিরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। শ্রীকৃষ্ণ ! মহারাজ প্রতীপের পুত্র বাহ্লীক অত্যন্ত সাহসী ও ধনুর্ধর ছিলেন। তিনিও ভল্লের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে রণক্ষেত্রে শায়িত রয়েছেন। মৃত হলেও তাঁর দেহকান্তি নষ্ট হয়নি। অন্যদিকে রাজা জয়দ্রথ পড়ে রয়েছে। অর্জুন তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা পার হয়ে তাকে হত্যা করেছে। তার অনুরাগিনী পত্নীরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে। জনার্দন ! যখন সে বনের মধ্যে থেকে দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, পাণ্ডবরা তখনই একে বধ করতে পারত। সেইসময় তারা দুঃশলার কথা ভেবেই তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। হায় ! আর একবার কেন তারা দুঃশলার মান রক্ষা করল না ? দেখো, আমার কন্যা স্বামীহারা হয়ে কীরূপ বিলাপ করছে। কৃষ্ণ ! বলো, আমার কাছে এর থেকে বেশি বেদনাদায়ক আর কী হতে পারে ? আমার অল্পবয়স্কা কন্যা স্বামীহারা হয়ে গেল এবং আরও বহু নারীর পতি মারা গেল। হায় ! আমার দুঃশলাকে একটু দেখ। স্বামীর মস্তক দেখতে না পেয়ে সে শোক ও ভীতবিহ্বল হয়ে এদিক-ওদিকে সেটি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এদিকে নকুলের মাতুল শল্য নিহত হয়ে পড়ে আছেন। ধর্মজ্ঞ স্বয়ং ধর্মরাজই এঁকে যুদ্ধে বধ করেছে। যুদ্ধস্থলে কর্ণের সারথির কাজ করার সময় তিনি পাণ্ডবদের জয়ী করার জন্য তার তেজ ক্ষীণ করছিলেন। দেখো, এঁকেও চারদিক থেকে এর রানিরা ঘিরে রেখেছেন। ওদিকে পার্বত্য রাজা ভগদত্ত হাতে হাতির অঙ্কুশ নিয়ে মাটিতে মরে পড়ে আছেন। এঁর সঙ্গে অর্জুনের প্রচণ্ড রোমাঞ্চকর ও ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল। এঁর যুদ্ধকৌশল দেখে অর্জুনও একবার হতচকিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু শেষে অর্জুনের হাতেই এর মৃত্যু হয়। দেখো, যাঁর মতো বল ও পরাক্রম জগতে বিরল, সেই ভীষণ কর্মকারী ভীষ্ম ওদিকে শরশয্যায় শায়িত আছেন। কেশব ! এই প্রতাপশালী নরসূর্য তাঁর অস্ত্রাঘাতে শত্রুদের তাপিত করে রেখেছিলেন। হায় ! আজ তিনি অস্তাচলে যাওয়ার পথে। বীরোচিত শরশয্যায় শায়িত এই

অখণ্ড ব্রহ্মচারী ভীষ্মকে দর্শন করো। ইনি আজ পর্যন্ত তাঁর ব্রত থেকে বিচ্যুত হননি। ভগবান স্বামী কার্তিকেয় যেমন সুশোভিত হয়েছিলেন, ইনিও তেমনই কর্ণি, নালীক এবং নারাচ জাতির বাণশয্যায় শায়িত আছেন। অর্জুন তিনটি বাণে এঁর মাথার নীচে বালিশ রচনা করে দিয়েছে। নিজ পিতার নির্দেশ পালন করার জন্য ইনি অখণ্ড ব্রহ্মচারী ছিলেন, সেইজন্য ইনি জগৎব্যাপি সুযশ লাভ করেছেন। যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং সর্বজ্ঞ। মানুষ হয়েও তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে তিনি দেবতাদের সমকক্ষ। আজ পিতামহ ভীষ্মও যখন বাণের আঘাতে রণক্ষেত্রে পড়ে রয়েছেন, তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে প্রকৃতপক্ষে কেউ-ই যুদ্ধকুশল, পরাক্রমশালী বা বিদ্বান নয়। বিধাতা যাকে জীবনে সাফল্য প্রদান করেন, তাকেই লোকে শ্রেষ্ঠ বলে থাকে। মাধব ! দেবতুল্য পিতামহ ভীষ্ম যখন স্বর্গে গমন করবেন, তখন কুরুকুলের লোকেরা কার কাছে ধর্ম-বিষয়ক প্রশ্ন করবে ?

অন্যদিকে দেখো, কৌরবদের মাননীয় আচার্য দ্রোণ পড়ে রয়েছেন। সবপ্রকার অস্ত্রজ্ঞান যেমন ইন্দ্রের আছে, তেমনই পরশুরাম এবং আচার্য দ্রোণেরও ছিল। যাঁর কৃপায় অর্জুন বহু দুষ্কর কর্ম করেছে, সেই দ্রোণ আজ মৃত্যুবরণ করেছেন, এঁর অস্ত্রবিদ্যা এঁকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি ! এঁর যে বন্দনীয় চরণ শতশত শিষ্য পূজা করত, দেখো, আজ শৃগাল তা নিয়ে টানাটানি করছে। তাঁর মৃত্যুর বাথায় কৃপী অচেতন প্রায় হয়ে তাঁর কাছে দীনভাবে বসে আছে। দেখো তার এবিনাস্ত কেশরাশি, মুখ নীচু করে সে ক্রন্দন করছে। তাঁর শিষ্যরা চিতায় অগ্নি স্থাপন করে তার ওপর আচার্যের শব রেখে সামগান করতে করতে কাঁদছে। দেখো, তারা এবার কৃপীকে সঙ্গে নিয়ে চিতা প্রদক্ষিণ করে গঙ্গার দিকে রওনা হয়েছে।

মাধব ! কাছেই পড়ে থাকা ভূরিশ্রবাকে দেখ। তার পত্নীরা এর মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে বিলাপ করছে। শোকের জন্য তারা অত্যন্ত কৃশ হয়ে গেছে এবং আর্তস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বারংবার মাটিতে আছড়ে পড়ছে। তাদের এই দশা দেখে মনে বড়ই দুঃখ হচ্ছে। দেখো, ওরা বলছে যে—'সাত্যকির এই কাজ অত্যন্ত অধর্মপূর্ণ এবং কীর্তিনাশক হয়েছে।' এক পত্নী স্বামীর হাতটি কোলে নিয়ে দীনভাবে বিলাপ করে বলছে—'এই হাত বহু শূরবীরকে সংহার করেছে, মিত্রদের অভয় দিয়েছে এবং সহস্র গোদান দান করেছে। যখন অন্যের সঙ্গে সংগ্রামরত থাকায় তুমি অসতর্ক ছিলে, সেইসময় শ্রীকৃষ্ণের কাছে দণ্ডায়মান অর্জুনই এটি কেটে দিয়েছে।' অর্জুনের এইরূপ নিন্দা করে সেই সুন্দরী চুপ করল। তার সঙ্গে অন্যান্য সপত্নীগণ শোক সাগরে নিমগ্ন হল।

এই দেখো, সহদেব কর্তৃক নিহত গান্ধাররাজ মহাবলী শকুনি। আজ এই রণক্ষেত্রে শায়িত। এ অত্যন্ত মায়াবী ছিল। নানাপ্রকার রূপ ধারণ করতে পারত। কিন্তু পাণ্ডবদের প্রতাপে তার সমস্ত মায়া ভস্ম হয়ে গেছে। সে তার কপট মায়ার প্রভাবেই যুধিষ্ঠিরের বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেছিল, কিন্তু আজ নিজের জীবনই হারিয়ে বসেছে। কৃষ্ণ ! দেখো, দুর্ধর্ষ বীর কম্বোজনরেশ পড়ে রয়েছে। কম্বোজদেশের গালিচা অত্যন্ত আরামদায়ক, শোওয়ার উপযুক্ত। অথচ সেই রাজা মৃত্যুবরণ করে ধুলোর শয্যায় শায়িত। দেখো, কলিঙ্গরাজ পড়ে আছে। তার পাশেই মগধদেশের রাজা জয়ৎসেন, তার পত্নীরা তাকে ঘিরে ধরে বিলাপ করছে। অন্যদিকে কোশলনরেশ রাজকুমার বৃহদ্বলকে ঘিরেও তার পত্নীরা কান্নাকাটি করছে। দেখো, ওই যে দৃষ্টদ্যুম্নের বীর পুত্র পড়ে আছে, তার কাছে আচার্যেরই বধ করা পাঞ্চালরাজা দ্রুপদ শুয়ে আছেন, বৃদ্ধ পাঞ্চালরাজের দুঃখিনী পত্নীগণ এবং পুত্রবধূগণ তাঁর অগ্নিসংস্কার করে প্রদক্ষিণ করছে।

দেখো ওইদিকে দ্রোণদ্বারা নিহত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুকে তাঁর পত্নীরা নিয়ে যাচ্ছে। ইনি অত্যন্ত শূরবীর ও মহারথী ছিলেন। হাজার-হাজার শত্রু বধ করার পরেই তিনি নিহত হন। তাঁর সুন্দরী ভার্যারা তাঁকে ক্রোড়ে তুলে বিলাপ করছে। এদিকে দ্রৌপদীর শরবিদ্ধ পুত্র পড়ে আছে। আমার পুত্র দুর্যোধনের বীর পুত্র লক্ষ্মণও তার পিতাকে অনুগমন করেছে। দেখো, ওই অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ মরে পড়ে রয়েছে। এখনও তাদের হাতে ধনুর্বাণ ও খড়্গ ধরা রয়েছে। কৃষ্ণ ! পঞ্চপাণ্ডব এবং তুমি তো অবধ্য। তাই দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ এবং কৃতবর্মার মতো বীরদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছ।

মাধব ! বিধাতার পক্ষে কোনো কাজই কঠিন নয়। দেখো না, কথায় কথায় ক্ষত্রিয়রাই ক্ষত্রিয়দের সংহার করে ফেলল। আমার পুত্রদের বিনাশ তো সেইদিনই হয়েছে, যেদিন তুমি সান্ধির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে উপপ্লব্য নগরে ফিরে গিয়েছিলে। মহামতি ভীষ্ম এবং বিদুর আমাকে সেইদিনই

বলেছিলেন যে 'এবার তোমার পুত্রদের জন্য মায়া-মমতা ত্যাগ করো।' তাঁদের সেই দূরদৃষ্টি কী করে মিথ্যা হবে? তাই এত শীঘ্রই আমার পুত্ররা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গেল।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণকে এইসব বলে গান্ধারী শোকে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। দুঃখের আধিক্যে তাঁর বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। চেতনা ফিরে এলে পুত্রশোকের প্রাবল্যে তাঁর সমস্ত অঙ্গ ক্রোধে ভরে গেল এবং রোষ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—'কৃষ্ণ! পাণ্ডব ও কৌরব নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব করে বিনাশপ্রাপ্ত হল। কিন্তু

তুমি সক্ষম হয়েও কেন তাদের উপেক্ষা করলে? তোমার তো বহু অনুচর ও সৈন্য ছিল। দুপক্ষকেই তুমি নিজ বলে সংযত করতে পারতে এবং তোমার বাক্য দ্বারা তাদের বোঝাতে পারতে। কিন্তু তুমি এই কৌরব সংহারকে উপেক্ষা করেছ। এখন তুমি তার ফল ভোগ করো। আমি পতি সেবা করে যে তপ সঞ্চয় করেছি তার প্রভাবে তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—'তুমি কৌরব ও পাণ্ডব দুই ভ্রাতাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধকে উপেক্ষা করেছ। তাই তুমিও তোমার বন্ধুবান্ধবকে বধ করবে। আজ থেকে ছত্রিশতম বৎসরে তুমিও বন্ধুবান্ধব, মন্ত্রী-পুত্র বিনাশ হয়ে গেলে এক অতি সাধারণ কারণে অনাথের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে। আজ যেমন এই ভরতবংশের নারীরা বিলাপ করছে, সেইরূপ তোমার আত্মীয় নারীরা ও তোমার বন্ধুবান্ধবরা বিনাশে মাথা ঠুকে কাঁদবে।'

গান্ধারীর এই কঠোর বাক্য শুনে মহামনা শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্য করে বললেন—'ভদ্রে! আমি জানি এই প্রকারই হবে। যা কিছু অবশ্যম্ভাবী ছিল, তার জন্যই তুমি অভিশাপ দিয়েছ। বৃষ্ণিবংশ যে দৈবী কোপেই নাশ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি ব্যতীত আর কেউই এটি বিনাশ করতে সক্ষম নয়। মানুষের কী সাধ্য, দেবতা বা অসুরও এঁদের বিনাশ করতে পারবে না। তাই এই যদুবংশ নিজেদের মধ্যে কলহ দ্বারাই বিনষ্ট হবে।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত ভীত হলেন। তাঁরা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, তাঁদের জীবনের আর কোনো আশা রইল না।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তা এবং মৃত যোদ্ধাদের অন্তিম সংস্কার

শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—গান্ধারী! ওঠো! শোক কোরো না। তোমার অপরাধেই এই কৌরবদের বিনাশ হয়েছে। তুমি তোমার দুষ্ট পুত্রদের খুব ভালো বলে মনে করেছিলে। যে দুর্যোধন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বৃথা শত্রুতাকারী এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের নির্দেশ অমান্যকারী ছিল; তাকেই তুমি প্রশ্রয় দিয়েছিলে। তাহলে তোমার কৃত অপরাধে আমার কী দোষ?

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় বাক্য শুনে গান্ধারী চুপ করে গেলেন। তখন ধর্মজ্ঞ রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অজ্ঞানজনিত মোহ ত্যাগ করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুধিষ্ঠির! এই যুদ্ধে যেসব সেনা নিহত হয়েছে, তাদের সংখ্যা যদি তোমার জানা থাকে, তাহলে আমাকে বলো।'

যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজ! এই যুদ্ধে একশ ছেষট্টি

কোটি বিশ হাজার বীর নিহত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত চোদ্দ হাজার যোদ্ধা নিখোঁজ এবং দশ হাজার একশত পঁয়ষট্টি বীরেরও কোনো সংবাদ জানা নেই।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—মহাবাহো ! আমি তোমাকে সর্বজ্ঞ বলে মনে করি। তাহলে তুমি বলো, এদের সকলের কী গতি হল ?

যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজ ! যে সব সত্যকার বীর এই যুদ্ধের আগুনে নিজেদের শরীর সমর্পণ করেছেন, তাঁরা ইন্দ্রের ন্যায় পুণ্যলোক লাভ করেছেন ; যাঁরা ভেবেছেন, 'একদিন তো মরতেই হবে, অতএব যুদ্ধ করেই প্রাণবিসর্জন দাও'—এভাবে উৎসাহশূন্য চিত্তে যুদ্ধ করতে করতে যাঁরা মৃত্যুলাভ করেছেন, তাঁরা গন্ধর্বদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন আর যারা রণক্ষেত্রে থেকেও প্রাণভিক্ষার সময় বা যুদ্ধ থেকে পলায়নের সময় অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছে, তারা যক্ষলোকে গিয়েছে। কিন্তু যেসব মহাপুরুষকে শত্রুরা পরাজিত করেছে, যাঁদের যুদ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, অস্ত্রহীন অবস্থায় ছিলেন এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও যাঁরা শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি—এইভাবে ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে গিয়ে যাঁরা তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা যে ব্রহ্মলোকেই গেছেন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এছাড়া যারা কোনোভাবে এই রণক্ষেত্রের মধ্যে মারা গেছে, তারা উত্তর কুরু দেশে জন্মগ্রহণ করবে।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—পুত্র ! তুমি এমন কোন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ যে এইসব বিষয়ে তুমি সিদ্ধদের ন্যায় বলছ ? আমার শোনার উপযুক্ত হলে আমাকে বলো।

যুধিষ্ঠির বললেন—কিছুদিন আগে আপনার নির্দেশে বনে বিচরণ করতে করতে আমি যখন তীর্থযাত্রায় রওনা হচ্ছিলাম, তখন মহর্ষি লোমশের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছ থেকেই আমি এই অনুস্মৃতি লাভ করেছি। তার আগে জ্ঞানযোগের প্রভাবেও আমি দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—যুধিষ্ঠির ! এখানে যে অনেক অনাথ-সনাথ যোদ্ধা মরে পড়ে রয়েছে, তুমি কী তাদেরও বিধিবৎ দাহ করাবে ? এদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যারা অগ্নিহোত্রীও ছিল না এবং তাদের সংস্কার করারও কেউ নেই। পুত্র ! এখানে তো বহুজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার আছে। আমরা কার কার করব ?

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির কৌরবদের পুরোহিত সুধর্মা, নিজেদের পুরোহিত ধৌম্য এবং সঞ্জয়, বিদুর, যুযুৎসু, ইন্দ্রসেন প্রমুখ অনুচর এবং সমস্ত সারথিদের নির্দেশ দিলেন যে, 'আপনারা শাস্ত্রীয় রীতিতে এদের সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করুন, যাতে কারো দেহ অনাথের ন্যায় বিনষ্ট না হয়ে যায়।' ধর্মরাজের নির্দেশ পেয়েই সকলে চন্দন, ধূপ, কাঠ, তেল, ঘি, সুগন্ধ দ্রব্য, রেশম বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী জোগাড় করতে লাগল। তারা ভাঙা রথ এবং অস্ত্রগুলিকে এক স্থানে জমা করল। তারপর কুশলতার সঙ্গে চিতা প্রস্তুত করে তার ওপর প্রধান প্রধান রাজাদের মৃতদেহ রেখে শাস্ত্রবিধিমতে তাঁদের দাহকর্ম সমাপন করল। তারপর রাজা দুর্যোধন, তাঁর নিরানব্বইজন ভ্রাতা, রাজা শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনের পুত্র, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, শতাধিক সৃঞ্জয়বীর, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পুত্ররা, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্র, কেকয়রাজ, ত্রিগর্তরাজ, ঘটোৎকচ, অলম্বুষ এবং জলসন্ধ—এদের সকলের এবং আরও হাজার হাজার রাজাকে তারা অগ্নিতে ঘৃত ধারায় প্রজ্বলিত করে দাহ করালেন। কারো কারো জন্য শ্রাদ্ধকর্মও করালেন, কারো জন্য সামগান করালেন। সেই রাত্রে সামগানের ধ্বনি এবং নারীদের ক্রন্দনের আওয়াজে সকলের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিল। তারপরে সেখানে বহুদেশ থেকে সমাগত যে অনাথ ব্যক্তিরা নিহত হয়েছিল, তাদের সকলের মৃতদেহ একত্রিত করে বিদুর ঘৃতমিশ্রিত দণ্ডের সাহায্যে জ্বালিয়ে দিলেন। এইভাবে সমস্ত রাজার দাহকার্য সমাপন করে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে গঙ্গাতীরে গেলেন।

—○—

সব নারীদের নিজ নিজ আত্মীয়ের প্রতি জলাঞ্জলি প্রদান এবং কুন্তীর মুখে কর্ণের জন্মরহস্য জেনে ভ্রাতাসহ যুধিষ্ঠিরের শোকাকুল হওয়া

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সকলেই সাধুসেবিত পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁরা দেহের বস্ত্র ও অলংকার খুলে ফেললেন। তারপর কুরুকুলের নারীগণ বিমর্ষ চিত্তে ক্রন্দন করতে করতে পতি ও পুত্রের জন্য জলাঞ্জলি দিলেন এবং ধর্মবিধি জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। যখন এই সব বীরপত্নীরা জলদান করছিলেন, তখন কুন্তী কাঁদতে কাঁদতে ক্ষীণস্বরে বললেন—'পুত্রগণ ! অর্জুন যাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছে, যে বীর সর্বলক্ষণসম্পন্ন ছিল, যাকে তোমরা রাধার গর্ভে উৎপন্ন হওয়া সূতপুত্র বলে মনে করতে, যে দুর্যোধনের সমস্ত সেনাকে নিয়ন্ত্রণ করত, পৃথিবীতে যার ন্যায় পরাক্রমশালী কোনো রাজা ছিল না এবং যে দিব্য কবচকুণ্ডল ধারণ করে থাকত, সেই সূর্যের ন্যায় তেজস্বী কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। সে ভগবান সূর্যের দ্বারা আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল। তার জন্য তোমরা জলাঞ্জলি দাও।'

মাতার এই আদেশ শুনে সমস্ত পাণ্ডবভ্রাতা কর্ণের জন্য শোকাকুল হয়ে হতবাক এবং বিষণ্ণ হলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাতা ! কর্ণ সাক্ষাৎ সমুদ্রের মতো গম্ভীর ছিল, অর্জুন ব্যতীত অন্য কোনো বীর তার সামনে দাঁড়াতে পারত না। দেবপুত্র হয়ে তিনি কীভাবে আপনার গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করলেন ! এই কথা আপনি কোন কারণে এতদিন গোপন করে রেখেছিলেন ? আমার ছিল যেমন অর্জুনের বাহুবলের ভরসা, তেমনই তিনি ছিলেন কৌরবদের বল-ভরসা। ওহো ! এই রহস্য গোপন করে আপনি আমাদের সর্বনাশ করেছেন। কর্ণের মৃত্যুতে আজ আমার সকল ভ্রাতা অত্যন্ত মর্মাহত। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্র, পাঞ্চালবীর এবং কৌরবরা নিহত হওয়াতে আমার যা বেদনা হয়েছে, কর্ণের মৃত্যুতে তার শতগুণ বেশি হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এখন আমার কর্ণের জন্য খুবই শোক হচ্ছে, আমার হৃদয় এমনভাবে জ্বলছে, যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। যদি এই কথা আমি আগে জানতাম তাহলে আমাদের কাছে পৃথিবী কেন, স্বর্গেরও কোনো বস্তু অপ্রাপ্য থাকত না। তাহলে এই কুরুকুল উচ্ছেদকারী ভীষণ যুদ্ধও হত না।'

এইভাবে বিলাপ করতে করতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের

নামে জলাঞ্জলি দিলেন। তখন সব নারীরাই ক্রন্দনরতা। তারপর কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃপ্রেমবশত কর্ণের পত্নীদের ডাকিয়ে আনালেন এবং তাঁদের নিয়ে শাস্ত্রবিধিমতে কর্ণের শেষকৃত্য সমাপন করলেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন—'আমি অত্যন্ত পাপী ! আমি না জেনে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করেছি। সুতরাং তাঁর পত্নীদের হৃদয়ে আমার প্রতি যদি কোনো স্নেহ থেকে থাকলে তা দূর হওয়া উচিত।' এই বলে তিনি আকুল হৃদয়ে গঙ্গা থেকে ভ্রাতাদের নিয়ে তীরে উঠে এলেন।

স্ত্রীপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

শান্তিপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান করে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক কর্ণের পূর্ব চরিত্র বর্ণনা

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—নিজেদের সমস্ত আত্মীয় ও সুহৃদদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদানের পরে পাণ্ডব, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র এবং ভরতবংশের সমস্ত নারীগণ আত্মশুদ্ধির জন্য মাসাধিক নগরের বাইরে গঙ্গাতীরে কাটালেন। সেই সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কাছে বহু সিদ্ধ, মহাত্মা এবং দেবর্ষির সমাগম হল। তাঁদের মধ্যে দ্বৈপায়ন ব্যাস, নারদ, দেবল, দেবস্থান, কণ্ব এবং তাঁদের শিষ্যরাও ছিলেন। এঁরা ছাড়াও বহু বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ এবং স্নাতকও এসেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সব মহর্ষিদের শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজা-অর্চনা করলেন। তাঁরা যুধিষ্ঠির প্রদত্ত বহুমূল্য আসন গ্রহণ করলেন। পূজা-অর্চনা স্বীকার করে এইসব হাজার হাজার ঋষি-মহর্ষি গঙ্গার তীরে শোকবিহ্বল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান করতে লাগলেন।

সর্বপ্রথম মহর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রমুখ মুনির সঙ্গে আলোচনা করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্! আপনি নিজ বাহুবল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সমস্ত পৃথিবী জয় করেছেন। সৌভাগ্যের কথা হল—এই

ভয়ংকর সংগ্রামে আপনি জীবিত এবং সুস্থ। এখন আপনি প্রসন্ন মনে ক্ষাত্রধর্ম পালনে আগ্রহী তো ?' এই

রাজলক্ষ্মীকে লাভ করে আপনার কোনো দুঃখ বা শোক আছে কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়, ব্রাহ্মণদের কৃপা এবং ভীম ও অর্জুনের বাহুবলে আমি সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করেছি ; কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রতিদিন এই এক দুঃখ বিরাজ করে যে, আমি লোভবশত আমার কুল সংহার করেছি। সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর প্রিয় পুত্রদের যুদ্ধের বলি হতে দেখে এখন এই বিজয়লাভ পরাজয়ের মতো মনে হচ্ছে। দ্রৌপদী সর্বদাই আমাদের মঙ্গল ও হিতার্থে তৎপর, তার পুত্র এবং ভ্রাতা সকলেই নিহত হয়েছে ; তার দিকে তাকালে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই। হে দেবর্ষি ! এই সব দুঃখ তো আছেই, অন্য আর একটি বিষয় বলছি। আমার মাতা কুন্তী কর্ণের জন্ম-রহস্য গোপন করে আরও মনোবেদনা দিয়েছেন। যাঁর দেহে দশ হাজার হাতির তুল্য শক্তি ছিল, জগতে যাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না, যিনি বুদ্ধিমান, দাতা, দয়ালু এবং ব্রতপালনকারী ছিলেন, যাঁর মধ্যে শৌর্যের অহংকার ছিল, যিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অস্ত্র চালাতেন এবং বিচিত্র প্রকারে যুদ্ধ করতেন, যাঁর অদ্ভুত পরাক্রম ছিল, সেই কুশলী কর্ণকে মাতা কুন্তী গুপ্তভাবে জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বিদেহী আত্মাদের জলদান করার সময় মাতা কুন্তী এই রহস্য জানিয়েছেন যে তিনি ভগবান সূর্যের অংশে জন্মেছিলেন। অনেক দিনের কথা যখন কুন্তীর গর্ভ থেকে সর্বগুণসম্পন্ন কর্ণের জন্ম হয়। সেইসময় মাতা তাঁকে এক ভেলায় করে গঙ্গাতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁকে সমস্ত জগৎ রাধার পুত্র বলে জানত, তিনি আমাদের সহোদর ভ্রাতা এবং কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। আমি না জেনে রাজ্যলোভে নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়েছি—এ কথা স্মরণ করলে আমার শরীর অবশ হয়। আমরা পঞ্চভ্রাতা কেউই জানতাম না যে মহাবীর কর্ণ আমাদেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কিন্তু আমাদের মাতা জানতেন। শুনেছি মাতা কুন্তী আমাদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন ; তিনি বলেছিলেন, 'পুত্র ! তুমি রাধার পুত্র নও, আমার পুত্র।' কিন্তু কর্ণ তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেননি—সন্ধি করতে রাজি হননি। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'মাতা ! আমি দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে অক্ষম। তোমার কথা শুনে যদি আমি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করি তাহলে আমি নীচ, নৃশংস ও কৃতঘ্ন বলে পরিচিত হব। লোকে বলবে কর্ণ অর্জুনকে ভয় পেয়েছে। তাই যুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে জয় করে আমি ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করব।'

তা শুনে কুন্তী বলেছিলেন—'বেশ তাই হোক, তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো, কিন্তু বাকি চার ভ্রাতাকে অভয়প্রদান করো।' এই বলে কুন্তী কম্পিতা হলেন। তাঁর সেই অবস্থা দেখে বুদ্ধিমান কর্ণ বললেন—'দেবী ! তোমার চার পুত্র যদি আমার হাতে বন্দিও হয়, তাহলেও আমি তাদের প্রাণবধ করব না। আমি নিহত হলে অর্জুন থাকবে, অর্জুন নিহত হলে আমি থাকব। এইভাবে উভয় পরিস্থিতিতেই তোমার পাঁচপুত্র জীবিত থাকবে।' কুন্তী বললেন—'পুত্র ! তোমার ভ্রাতাদের কল্যাণ কোরো।' এই বলে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন। এই রহস্য কুন্তীও প্রকাশ করেননি, কর্ণও নয় ; তাই ভ্রাতার হাতে সহোদর ভ্রাতার বধ হল—অর্জুন মহাবীর কর্ণকে বধ করলেন। তাই আমার হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। কর্ণ ও অর্জুনের সাহায্য পেলে আমি ইন্দ্রকেও জয় করতে পারতাম। ধৃতরাষ্ট্রের দুরাত্মা পুত্র যখন রাজসভায় দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করছিল এবং কর্ণের কঠোর বাক্য শোনা যাচ্ছিল, সেই সময় আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু কর্ণের পদপ্রান্তে দৃষ্টি পড়তেই আমার ক্রোধ শান্ত হয়ে যাচ্ছিল। কর্ণের দুটি পা আমার মাতা কুন্তীর পায়ের মতোই মনে হচ্ছিল। কিন্তু অনেক চিন্তা করেও আমি তার কারণ খুঁজে পাইনি। মুনিবর ! কর্ণের রথের চাকা কেন পৃথিবী গ্রাস করেছিল ? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ কেন এরূপ শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন, আমাকে সেই বৃত্তান্ত জানান। আমি আপনার কাছ থেকে সব বিস্তারিত জানতে চাই ; কারণ আপনি সর্বজ্ঞ, অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্তই জানেন।'

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠির সেইসব কথা জানতে চাইলে—কর্ণ যেভাবে শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন, নারদ মুনি সেই সব বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন—'ভারত ! এগুলি দেবতাদের গুপ্ত কথা, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি। কোনো এক সময় সমস্ত দেবতারা একত্রিত হয়ে আলোচনা করেন যে, এমন কী উপায় আছে, যার দ্বারা ভূমণ্ডলের সমস্ত ক্ষত্রিয়-সমাজ অস্ত্রাঘাতে পবিত্র হয়ে স্বর্গগমন করতে পারেন। সেই কথা ভেবে তাঁরা সূর্যের সাহায্যে কুমারী কুন্তীর গর্ভে এক তেজস্বী শিশুর সৃষ্টি করেন। সেই কর্ণ। সে পরশুরামের কাছে ধনুর্বেদ শিক্ষা করে। শিশুকাল থেকেই সে ভীমসেনের শক্তি, অর্জুনের অস্ত্রচালনায়

দক্ষতা, তোমার বুদ্ধি এবং নকুল-সহদেবের বিনয় ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের মিত্রতা দেখে ক্রোধে জ্বলে যেত। তোমার ওপর প্রজাদের অনুরাগের কথা জেনে চিন্তায় দগ্ধ হত। তাই অল্পবয়স থেকেই কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে মিত্রতা করেছিল।'

ধনঞ্জয়ের ধনুর্বিদ্যার পরাক্রম লক্ষ্য করে একদিন কর্ণ দ্রোণাচার্যকে একান্তে বলল—'গুরুদেব ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করা এবং ফিরিয়ে আনার বিদ্যা শিক্ষা করতে চাই।' কর্ণের যে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, দ্রোণাচার্য তা জানতেন ; তার দুষ্ট প্রকৃতিও দ্রোণাচার্যের অজানা ছিল না। তাই তিনি কর্ণের অনুরোধ শুনে বললেন—'কর্ণ ! শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ই শুধুমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষার অধিকারী, অন্য কেউ নয়।' তাঁর কথা শুনে কর্ণ 'আপনার কথা যথার্থ' বলে তাঁকে প্রণাম জানাল। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে সহসা সেখান থেকে চলে গেল। কর্ণ ক্রমশ মহেন্দ্র পর্বতে পৌঁছল এবং পরশুরামের কাছে গিয়ে ভৃগুবংশী ব্রাহ্মণরূপে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে শিষ্যত্ব লাভের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হল। পরশুরামও তার গোত্র ইত্যাদি জেনে তাকে শিষ্যরূপে স্বীকার করে বললেন—'বৎস ! তোমাকে স্বাগত জানাই, তুমি প্রসন্ন মনে এখানে থাকো।'

কর্ণ মহেন্দ্র পর্বতে থেকে শাস্ত্রীয় রীতিতে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করতে লাগল। সেই সময় কর্ণের গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ এবং দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তাই তাঁদের সঙ্গে কর্ণের বন্ধুত্ব হল। একদিন, কর্ণ আশ্রমের কাছে সমুদ্র কিনারে বিচরণ করছিল, তার হাতে তলোয়ার ও সঙ্গে ধনুক ছিল। সেইসময় কোনো এক বেদপাঠীর গরু সেখানে এসে হাজির হয়, মুনি অগ্নিহোত্রে ব্যস্ত ছিলেন। কর্ণ না জেনে সেটিকে হিংস্র জন্তু মনে করে বধ করে। পরে যখন ভুল বুঝতে পারল তখন সে ব্রাহ্মণকে গিয়ে তার অজ্ঞানতাবশত অপরাধের কথা জানাল। তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য কর্ণ বলল—'মুনিবর ! আমি না জেনে আপনার গাভী হত্যা করেছি ; কৃপা করে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

ব্রাহ্মণ রেগে উঠে তাকে ধমক দিয়ে বললেন—'দুরাচারী ! তোমাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত ; আপাতত তোমাকে ক্ষমা করলাম। তবে তোমার জীবনের অন্তিম লগ্নে তোমার রথের চাকা পৃথিবী গ্রাস করবে ; সেই সময়ে ভীত

হয়ে পড়লে সেই অবস্থায় শত্রু তোমায় বধ করবে।' সেই শাপ শুনে কর্ণ ব্রাহ্মণকে বহু গাভী, ধন-রত্ন দিয়ে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ জানালেন—'সমস্ত জগৎ একত্রিত হয়েও আমার কথা ব্যর্থ করতে পারবে না।' তাঁর কথায় কর্ণ অত্যন্ত ভীত হল। মনে মনে এই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করতে করতে কর্ণ পরশুরামের কাছে ফিরে গেল।

কর্ণের বাহুবল, গুরুভক্তি, ইন্দ্রিয় সংযম এবং সেবাভাব দেখে পরশুরাম তার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রয়োগ এবং উপসংহারসহ তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র-বিদ্যা তাকে বিধিপূর্বক শিক্ষা দিলেন। পরে একদিন পরশুরাম কর্ণের সঙ্গে আশ্রমের কাছেই বেড়াচ্ছিলেন। উপবাস করায় তাঁর দেহ দুর্বল ছিল, তাই ক্লান্ত থাকায় তাঁর নিদ্রা আসছিল। কর্ণের ওপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস এবং স্নেহ ছিল, তাই তিনি তার ক্রোড়ে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলেন। এইসময় রক্তমাংসভোজী এক ভয়ানক কীট সেখানে এসে কর্ণের উরুর ওপর উঠল। উরু ছিদ্র করে সেই কীট রক্তপান করতে লাগল। কীটের দংশনে অসহ্য ব্যথা অনুভূত হলেও গুরুদেব জেগে উঠবেন এই আশঙ্কায় কর্ণ সেই তীব্র দংশন-ব্যথা সহ্য করতে লাগল, কীটটিকে সরানোর চেষ্টাও করল না।

কর্ণের দেহনির্গত রক্তধারায় পরশুরামের শরীর সিক্ত হলে তিনি জেগে উঠে শঙ্কিত হয়ে বললেন—'সর্বনাশ !

এ কী হয়েছে ? ভয় ত্যাগ করে ঠিকমতো বলো।' কর্ণ তখন তাঁকে কীটদংশনের কথা জানাল। মুনিবর যেই কীটটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তৎক্ষণাৎ কীটটি মারা গেল ; কিন্তু

এক অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। এরমধ্যে আকাশে এক ভয়ানক রাক্ষসকে দেখা গেল। সে দুই হাত জোড় করে পরশুরামকে বলল—'মুনিবর ! আপনি আমাকে এই নরকের কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন, এ আমার পক্ষে অতি মঙ্গল কাজ হয়েছে। আপনাকে প্রণাম জানাই এবং যেখান থেকে এসেছি সেইখানেই চলে যাচ্ছি।' পরশুরাম জিজ্ঞাসা করলেন—'আরে ! তুমি কে আর কেনই বা এই নরকে পড়েছিলে ?' সে উত্তর দিল—'তাত ! সে সত্যযুগের কথা, আমি দংশনামক অসুর ছিলাম। আমি একদিন ভৃগুমুনির প্রাণপ্রিয় পত্নীকে বলপূর্বক অপহরণ করেছিলাম। তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিয়েছিলেন—'পাপী তুই কীট হয়ে নরকে জন্মাবি।' আমি তখন তাঁর কাছে এই শাপের মুক্তি কী করে হবে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন তাঁর বংশে পরশুরাম জন্মাবেন, সেই পরশুরামের দৃষ্টি আমার ওপর পড়লেই আমি শাপমুক্ত হব। এইভাবে আমি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলাম এবং আজ আপনার দৃষ্টিপাতে আমি সেই শাপ হতে মুক্তিলাভ করেছি।' এই কথা বলে সেই মহা অসুর পরশুরামকে প্রণাম করে চলে গেল।

পরশুরাম তখন ক্রোধভরে কর্ণকে বললেন—'বৎস ! এই কীট দংশনের যে ভয়ানক কষ্ট তুমি সহ্য করেছ, কোনো ব্রাহ্মণ কখনো তা সহ্য করতে পারে না। তোমার ধৈর্য ক্ষত্রিয়ের মতো বলে মনে হচ্ছে। সত্য করে বলো তুমি কে ?' তাঁর প্রশ্নে কর্ণ ভয় পেয়ে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য বলল—'ব্রহ্মন্ ! আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় থেকে পৃথক সূত জাতিতে জন্মলাভ করেছি। লোকে আমাকে রাধাপুত্র কর্ণ বলে জানে। ব্রহ্মাস্ত্র জানার জন্য আমি আপনাকে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছি। আমাকে কৃপা করুন। বিদ্যাদানকারী নিঃসন্দেহে পিতৃতুল্য গুরু, তাই আমি আপনার কাছে নিজেকে ভার্গব-গোত্র বলে জানিয়েছিলাম।'

এই কথা বলে কর্ণ বিনীতভাবে হাত জোড় করে তাঁর সামনে মাটিতে বসে কাঁপতে লাগল। পরশুরাম তা দেখে হেসে বললেন—'মূর্খ ! তুমি ব্রহ্মাস্ত্রের লোভে মিথ্যা কথা বলে আমার সঙ্গে কপট ব্যবহার করেছ, তাই আমার অভিশাপ, তুমি যখন তোমার সমকক্ষ যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হবে, তখন আমার প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র তোমার স্মরণে থাকবে না। তুমি এবার এখান থেকে চলে যাও, এখানে মিথ্যাবাদীর স্থান নেই। তবে আমার আশীর্বাদে যুদ্ধে কোনো ক্ষত্রিয় তোমার সম্মুখীন হতে পারবে না।' পরশুরামের কথায় কর্ণ তাঁকে প্রণাম করে সেখান থেকে ফিরে এলেন। দুর্যোধনের কাছে এসে তিনি জানালেন যে তিনি ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করে এসেছেন।

যুধিষ্ঠিরের গৃহত্যাগ করে বনবাসের ইচ্ছা, অর্জুন কর্তৃক তার নিবারণের প্রচেষ্টা

নারদ বললেন—রাজন্ ! কর্ণের সঙ্গে জরাসন্ধের একবার যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে পরাজিত হয়ে জরাসন্ধ কর্ণকে তাঁর মিত্র করে নিলেন এবং তাকে চম্পানগরী উপহার দেন। আগে কর্ণ কেবল অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি দুর্যোধনের অনুমতি নিয়ে চম্পাতেও (চম্পারণে) রাজত্ব করতে লাগলেন। এই সময় ইন্দ্র একদিন তোমার (যুধিষ্ঠিরের) মঙ্গলের জন্য কর্ণের কাছে তাঁর কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা চেয়েছিলেন। এই দিব্য কবচ-কুণ্ডল কর্ণের জন্ম সময় থেকেই তাঁর শরীরে ছিল ; তা সত্ত্বেও সে ইন্দ্রকে ওই বস্তু দুটি প্রদান করে। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তাঁকে বধ করতে সক্ষম হয়। প্রথমত সে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ও পরশুরাম কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়েছিল, দ্বিতীয়ত সে নিজেই কুন্তীকে কথা দিয়েছিল যে অর্জুন ব্যতীত অন্য চার ভ্রাতাকে সে বধ করবে না। তাছাড়া যুদ্ধকালে মহারথীদের গণনার সময় পিতামহ ভীষ্ম কর্ণকে 'অর্ধরথী' বলে অপমান করেছিলেন। এরপর শল্য তাঁর তেজ হরণ করে শ্রীকৃষ্ণের নীতিতে কাজ করেছিলেন। এইসব ব্যাপার সবই কর্ণের বিপক্ষে গিয়েছিল আর অর্জুন রুদ্র, যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, দ্রোণ ও কৃপাচার্যের কাছে দিব্যাস্ত্র লাভ করেছিল, যার জন্য সে কর্ণকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবু সে যুদ্ধেই নিহত হয়েছে, তাই শোকের যোগ্য নয়।

বৈশম্পায়ন বললেন—দেবর্ষি নারদ এইকথা বলে চুপ করলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকমগ্ন হয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন। তাঁর অবস্থা দেখে কুন্তী শোকে বিহ্বল হয়ে উঠলেও নিজেকে সংযত করে মধুর বাক্যে তাঁকে বললেন—'পুত্র ! কর্ণের জন্য শোক কোরো না। চিন্তা ত্যাগ করে আমার কথা শোনো। আমি এবং ভগবান সূর্য কর্ণকে জানাবার চেষ্টা করি যে যুধিষ্ঠির প্রমুখ তোমার ভাই। এক হিতৈষী সুহৃদের যা বলার ছিল, সূর্যদেব তা সবই বলেছিলেন। তিনি স্বপ্নে এবং আমার সাক্ষাতেও তাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সে মৃত্যুর বশীভূত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মুখ ছিল, তাই আমিও পরে তাকে উপেক্ষা করেছিলাম।'

মাতার কথায় যুধিষ্ঠিরের চোখ জলে ভরে এল। তিনি শোকে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন—'মা ! তুমি এই রহস্যময় ঘটনা লুকিয়ে রেখেছিলে, তাই আজ আমাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হল।' তারপর তিনি শোকার্ত চিত্তে জগতের সমস্ত নারীকে অভিশাপ দিলেন যে, 'আজ থেকে কোনো নারী গোপন কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না।' তারপরে তিনি মৃত পুত্র-পৌত্র-আত্মীয়-কুটুম্বকে স্মরণ করে শোকমগ্ন হলেন এবং অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—'অর্জুন ! আমরা যদি বৃষ্ণিবংশীয় অথবা অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়দের নগরে গিয়ে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতাম তাহলে আজ আত্মীয়দের নিধন করে আমাদের এই দুর্দশা ভোগ করতে হত না। ক্ষত্রিয়দের আচার, তাদের শক্তি, পৌরুষ এবং ক্রোধকে ধিক্কার। এইজন্যই আমরা এই বিপদে পড়েছি। ক্ষমা, দম, শৌচ, বৈরাগ্য, মাৎসর্যের অভাব, অহিংসা, সত্য কথা বলা—বনবাসীদের এইসব ধর্মই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা লোভ ও মোহবশত রাজ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দম্ভ ও মানের আশ্রয় নিয়ে এই দুর্দশায় আবদ্ধ হয়েছি। এখন ত্রিলোকের রাজ্য দিলেও কেউ আমাদের প্রসন্ন করতে পারবে না। হায় ! আমরা এই পৃথিবীর অধিকার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অবধ্য রাজাদেরও বধ করেছি আর এখন বন্ধুবান্ধবদের হারিয়ে অনাথের মতো জীবন কাটাতে হচ্ছে। ওহো ! সমগ্র পৃথিবী এবং স্বর্ণলোভেও আমাদের সেইসব বন্ধুদের হত্যা করা উচিত হয়নি। তা সত্ত্বেও আমরা তাদের বধ করেছি। সেই শোকে আমি শান্তি পাচ্ছি না। ধনঞ্জয় ! শুনেছি মানুষের কৃতকর্মের পাপ শুভকর্মাদির আচরণের দ্বারা, অন্যকে শোনালেতে, অনুতাপে এবং দান তপ-ত্যাগ-তীর্থযাত্রা ও শ্রুতি-স্মৃতি পাঠ দ্বারা অপনীত হয়। শ্রুতিতে বলা আছে সর্বত্যাগী পুরুষকে আর জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়তে হয় না। সেই ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন[১]। সেই অনুসারে যোগমার্গ প্রাপ্ত হয়ে যখন বুদ্ধি স্থির হয়, তখন মানুষ পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। তাই ভেবে আমিও শীতোষ্ণ এবং দ্বন্দ্ব-ধর্মে রহিত হয়ে মুনি বৃত্তি অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি করতে চাই। তাই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি, রাজ্য, সুখভোগ

---

(১)'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'

পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমি মায়া-মমতা ত্যাগ করে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হয়ে কোনো জঙ্গলে চলে যাব, আমার রাজ্য অথবা সুখভোগে কোনো আগ্রহ নেই।'

ধর্মরাজ একথা বলে চুপ করলে অর্জুন বললেন—

'মহারাজ! এ অত্যন্ত দুঃখের কথা এবং হৃদয়ের দৌর্বল্য যে আজ আপনি অলৌকিক পরাক্রমের দ্বারা প্রাপ্ত এই উত্তম রাজ্যলক্ষ্মীকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছেন। যদি ত্যাগ করার বাসনাই ছিল, তাহলে ক্রোধের বশীভূত হয়ে কেন রাজাদের সকলকে হত্যা করলেন? নিজের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পরিত্যাগ করে আপনি যখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গৃহে গৃহে ভিক্ষা করতে থাকবেন, তখন জগৎ কী বলবে? সর্বপ্রকার শুভকর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে অশুভ এবং অকিঞ্চন হয়ে মূর্খ মানুষের মতো আপনি কেন ভিক্ষা করা উচিত মনে করছেন? এই উত্তম রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবী আপনার অধীন হওয়ার পরে এখন আপনি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করে বনে যাচ্ছেন। এ যদি মূর্খতা না হয় তাহলে কী? আপনি যদি যাগযজ্ঞাদি কর্ম পরিত্যাগ করেন তাহলে অন্য অসাধু ব্যক্তিরা আপনার আদর্শই সামনে রেখে যজ্ঞাদি কর্ম থেকে বিরত হবে। সেই অবস্থায় তাদের সমস্ত পাপ আপনাতে বর্তাবে। সর্বস্ব ত্যাগ করে অকিঞ্চন হওয়া, পরের দিনের জন্য সংগ্রহ না রেখে প্রত্যহ ভিক্ষান্ন গ্রহণ—এসব মুনিদের ধর্ম, রাজাদের নয়। রাজধর্ম পালন হয় ধনদৌলতের সাহায্যে। মহারাজ অর্থের দ্বারা ধর্মও হয়, লৌকিক কামনাও পূর্ণ হয় এবং স্বর্গ সাধনভূত যজ্ঞও হয়। শুধু তাই নয়, অর্থ ব্যতীত জীবিকা নির্বাহও সম্ভব হয় না। যার অর্থ সম্পদ থাকে তার বহু বন্ধুবান্ধব হয় এবং তাকেই পুরুষ মানুষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে মান্য হয়। মানুষ ধনহীন অবস্থায় কারো কাছে অর্থ চাইলে, তারপক্ষে সেটি পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়; কিন্তু ধনবান ব্যক্তির ধন বৃদ্ধি পায়। জঙ্গলে যেমন একটি হাতির পেছনে বহু হাতি জড়ো হয়, তেমনই অর্থই অর্থকে আকর্ষণ করে আনে। অর্থের দ্বারা বংশ মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, নির্ধনের ইহলোকেও সুখ নেই পরলোকেও নেই। কারণ ধন বিনা মানুষ ধর্মকৃত্য ঠিকমতো অনুষ্ঠান করতে পারে না। যার অর্থের অভাব থাকে, অনুচরের অভাব থাকে, অতিথির আসা-যাওয়া কম থাকে, সে ব্যক্তি দুর্বল হয়। শুধু দেহের দৌর্বল্যকে দুর্বল বলা হয় না। রাজার সর্বপ্রকারে অর্থ সংগ্রহ করে তার দ্বারা যত্ন সহকারে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করা উচিত। সনাতন বেদের তাই নির্দেশ। ধনের দ্বারাই মানুষ যজ্ঞ করে ও করায়, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার কাজও অর্থের দ্বারা সম্পন্ন হয়। রাজারা অন্য দেশ জয় করে যে ধন আহরণ করেন, তার দ্বারাই সমস্ত শুভকর্ম তাঁরা সম্পন্ন করে থাকেন। আমি কোনো রাজারই এমন ধন দেখিনি, যা অন্যের কাছ থেকে আহরণ করা নয়। প্রাচীনকালে যাঁরা রাজর্ষি হয়েছিলেন এবং এখন স্বর্গে নিবাস করেন, তাঁরাও রাজধর্মের এরূপ ব্যাখ্যাই করেন। রাজন্! এই পৃথিবী প্রথমে রাজা দিলীপের অধিকারে ছিল। তারপর ক্রমশ এর ওপর নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ এবং মান্ধাতার আধিপত্য জন্মায়। সেটি আজ আপনার অধীন হয়েছে। সুতরাং ওইসব রাজাদের ন্যায় আপনারও, যাতে সব কিছু দক্ষিণারূপে দান করা হয়, সেই সর্বস্ব দক্ষিণ নামক দ্রব্যময় যজ্ঞ করার সময় হয়েছে। যে রাজা দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাঁর সকল প্রজা সেই যজ্ঞের শেষে অবভৃথ স্নান করে পবিত্র হয়। সুতরাং আপনি সমস্ত প্রাণীর কল্যাণার্থে যজ্ঞ করুন। ক্ষত্রিয়দের জন্য এটিই সনাতন পথ, এটিই হল অভ্যুদয়ের পথ।'

যুধিষ্ঠিরের বনবাসী, মুনি এবং সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছাকে নিবারণের জন্য ভীম ও অর্জুনের প্রয়াস

যুধিষ্ঠির বললেন—'অর্জুন ! কিছুক্ষণ মন দিয়ে আমার কথা শোনো, তারপর তা নিয়ে চিন্তা করো ; তাহলে তুমিও আমার কথা বুঝতে পারবে। তোমার কথায় কী আমি সেই পথ পরিত্যাগ করব, যে পথে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বদা গমন করেছেন ? না, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয় ; আমি জাগতিক সুখ পরিত্যাগ করে অবশ্যই সেই পথ অনুসরণ করব এবং বনে ফল-মূল আহার করে কঠোর তপস্যা করব। প্রাতঃকালে এবং সায়াহ্নে স্নানাদি সমাপন করে পূজা-অর্চনা করব, মৃগবল্কল ও জটা ধারণ করব। শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে তপস্যা করে শরীর শুষ্ক করব। একান্তে থেকে তত্ত্ব-বিচার করব এবং যেদিন যা পাব তাই দিয়ে জীবনযাপন করব। এইভাবে মুনিদের মতো কঠোরতম নিয়মাদি পালন করে দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা করব। অথবা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করে মস্তক মুণ্ডন করে এক একদিন এক একটি বৃক্ষ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে শরীর ক্ষীণ করব এবং প্রিয়-অপ্রিয়ের চিন্তা ত্যাগ করে বৃক্ষতলে নিবাস করব। হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করব, নিন্দা ও স্তুতিকে সমতুল্য মনে করব, আশা মমতা পরিত্যাগ করে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে যাব, কোনো বস্তু সংগ্রহ করব না, আপন আত্মায় রমণ করে সর্বদা প্রসন্ন মনে থাকব। কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করব না অর্থাৎ মৌনব্রত পালন করব। চর ও অচর প্রাণীদের হিংসা করব না, কাউকে পরিহাস করব না, সকলের প্রতি সমভাব বজায় রাখব। ইন্দ্রিয়াদিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত রেখে চলব। যে কোনো পথে চলব, কাউকে পথনির্দেশ জিজ্ঞাসা করব না। কোনো বিশেষ স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা রাখব না, চলার কোনো উদ্দেশ্য রাখব না ; এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ থাকবে না, পিছনে দেখার কৌতূহলও থাকবে না। নির্বিকার চিত্তে অন্তরাত্মার দিকে দৃষ্টি রেখে দেহাভিমান রহিত হয়ে থাকব। ভিক্ষান্ন সুস্বাদু হোক বা স্বাদবর্জিত—তার বিচার করব না। ভিক্ষান্নের জন্য গৃহস্বামীর দ্বারে হাত পাতব। সেখানে ভিক্ষা না পেলে দ্বিতীয় গৃহে, সেখানেও না পেলে তৃতীয় গৃহে—এভাবে সাতটি ঘর পর্যন্ত ভিক্ষা করব, অষ্টম গৃহে কিছুতেই ভিক্ষার জন্য হাত পাতব না। রান্নার কাজ সমাপ্ত হলে এবং উপস্থিত সকলের ভোজন করার পর তথা ভিক্ষুকাদিরা থালাপত্র নিয়ে চলে যাবার পর, দিনে একবার মাত্র মাধুকরী করব। সর্বদিকের স্নেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করব। জীবন ও মৃত্যুতে কোনো রাগ-দ্বেষ থাকবে না। কোনো ব্যক্তি যদি আমার এক হাত কেটে নেয় তার ওপর কোনো রাগ করব না। তেমনই যদি আর একজন চন্দন দিয়ে পূজা করে তার প্রতিও কোমল ভাব পোষণ করব না। জীবিকা নির্বাহের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছুই করব না। সকল ইন্দ্রিয় থেকে সংযত হয়ে মনের সংকল্পগুলি নিজের অধীনে রাখব। বুদ্ধি পরিমার্জিত করে সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত থাকব। এইভাবে বীতরাগ হয়ে থাকলে আমি অক্ষয় শান্তিলাভ করব। ইহজগতে জরা-মৃত্যু-জন্ম-ব্যাধি হতেই থাকবে, তাই জগতে সুস্থভাবে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। এই অপার জগৎ ত্যাগ করলেই সুখ পাওয়া যায়। আজ বহুদিন পর আমি এই বিশুদ্ধ বিবেকরূপ অমৃত লাভ করেছি ; এর সাহায্যে আমি অক্ষয়, অবিকারী এবং সনাতন স্থান লাভ করতে চাই। তাই মুনিবৃত্তি ধারণ করে আমি জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-জন্মপীড়িত এই জগত থেকে দেহত্যাগপূর্বক নির্ভয়পদ লাভ করতে ইচ্ছুক।'

সব শুনে ভীমসেন বললেন —'রাজন্ ! আপনি এই রাজধর্মের নিন্দা করে যখন আলস্যে জীবন কাটাতে মনস্থির করেছেন, তখন বেচারি কৌরবদের বিনাশের কী প্রয়োজন ছিল ? আপনার এই সিদ্ধান্ত যদি আমরা আগে বুঝতে পারতাম, তাহলে অস্ত্রও ধরতাম না এবং কাউকে বধও করতাম না। আপনার মতোই সন্ন্যাস জীবনযাপনের সংকল্প গ্রহণ করে আমরাও ভিক্ষাই করতাম। তাহলে রাজাদের সঙ্গে এই ভীষণ যুদ্ধ হত না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ক্ষত্রিয়দের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন, রাজ্যে অধিকার বজায় রাখবে এবং তাতে বাধাপ্রদানকারীকে হত্যা করবে। দুষ্ট কৌরবরাও আমাদের রাজ্য প্রাপ্তিতে বাধাস্বরূপ ছিল, তাই আমরা তাদের বধ করেছি ; এখন আপনি ধর্মপালন করে এই পৃথিবী উপভোগ করুন। অন্যথায় আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কোনো মানুষ যখন কোনো আশা নিয়ে এক বিশাল অট্টালিকা তৈরি করে, তারপর সেই অট্টালিকা যদি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তার যে দশা হয়,

আমাদের সেই দশাই হবে। আপনি যে সন্ন্যাসের কথা চিন্তা করছেন, এখন তার সময় নয়। যাঁদের বিচারদৃষ্টি সূক্ষ্ম, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই সময়ে ত্যাগ করাকে প্রশংসা করেন না ; তাঁরা একে স্বধর্ম লঙ্ঘন বলে মনে করেন। যে ব্যক্তি পুত্র-পৌত্র পালনে অসমর্থ, দেবতা-ঋষি ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করে না, অতিথি সংকারের ক্ষমতা রাখে না, সেই ব্যক্তি জঙ্গলে গিয়ে আরামে জীবন কাটাতে পারে। আপনার মতো শক্তিশালী ব্যক্তির এই কাজ নয়। রাজার তো কর্ম করাই উচিত ; যে কর্মত্যাগ করে, সে কখনো সিদ্ধি লাভ করে না।'

তারপর অর্জুন বললেন—মহারাজ ! এই বিষয়ে তপস্বীদের সঙ্গে একবার ইন্দ্রের আলোচনা হয়েছিল। সেই প্রাচীন ঘটনা আপনাকে শোনাচ্ছি। কোনো এক সময়ের কথা, কিছু কুলীন নাবালক ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য জঙ্গলে চলে আসে। এটিই ধর্ম মনে করে তারা অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। আত্মীয় পরিজন এবং বাবা মায়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা ব্রহ্মচর্য পালন করতে থাকে। একদিন তাদের ওপর ইন্দ্রদেবের কৃপা হয়। তিনি সুবর্ণময়

পক্ষীরূপে তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের শুনিয়ে বলতে লাগলেন—'যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজনকারী মহাত্মারা যে কর্ম করেছেন, তা অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা হওয়া কঠিন। তাঁদের সেই কর্ম অত্যন্ত পবিত্র ও উত্তম জীবন। তাঁদের মনোরথ সফল হয়েছে এবং সেই ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা উত্তম গতি লাভ করেছেন।'

ঋষিরা বলল—'বাঃ ! এই পক্ষী যজ্ঞশিষ্ট ভোজনকারীদের প্রশংসা করছে, এ তো আমাদেরই প্রশংসা ; কারণ আমরাই তো যজ্ঞশিষ্ট অন্নভোজন করি।'

পক্ষী বলল—আরে ! আমি তোমাদের প্রশংসা করছি না। তোমরা তো উচ্ছিষ্ট গ্রহণকারী মূর্খ ; পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে আছো। যজ্ঞশিষ্ট অন্নগ্রহণকারী অন্যাত্মা হয়।'

ঋষিরা বলল—পক্ষী ! এটি কল্যাণকারী সাধন মনে করেই আমরা এই পথ গ্রহণ করেছি। এখন তোমার কথা শুনে তোমার ওপর আমাদের শ্রদ্ধা হচ্ছে ; সুতরাং যেটি কল্যাণকারী সাধন ; তা আমাদের বলো।

পক্ষী বলল—তোমাদের যদি আমার ওপর বিশ্বাস থাকে তাহলে আমি যথার্থ সত্য জানাচ্ছি, শোনো। চতুষ্পদের মধ্যে গরু, ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ, শব্দের মধ্যে প্রণবাদি মন্ত্র এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদের জন্য জাতকর্মাদি সংস্কার হল শাস্ত্রবিহিত ; ব্রাহ্মণ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন সময়ে সময়ে তার সংস্কার হওয়া উচিত। মৃত্যুর পরেও তার শ্মশানভূমিতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এবং গৃহে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজ বিধি অনুসারে কাজ করা উচিত। বেদোক্ত যজ্ঞকর্মই তার পক্ষে স্বর্গারোহণের উত্তম পথ। যেখানে এইসব কর্ম বিধিবৎ অনুষ্ঠিত হয়, সেই গৃহস্থ-আশ্রমই সব থেকে বড় আশ্রম হয়ে ওঠে। যারা কর্মের নিন্দা করে, তাদের কুপথগামী বলে জানতে হবে। তারা অতি পাপী। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ—এই তিনটি হল সনাতন পথ। যেসব মূর্খ এইসব পরিত্যাগ করে অন্য মার্গে গমন করে, তারা বেদবিরুদ্ধ পথের আশ্রয় নেয়। যাগযজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাদের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদের এবং শ্রাদ্ধ দ্বারা লোকান্তরিত পিতৃপুরুষকে তৃপ্ত করাই হল সনাতন ধর্ম। এগুলি পালন করে গুরুজনদের সেবা করাই হল কঠোর তপস্যা। এই দুষ্কর তপস্যা করেই দেবতারা মহাবিভূতি লাভ করেছেন। যার কারো প্রতি ঈর্ষা নেই, যে সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত, সেই ব্রাহ্মণ এগুলিকেই তপস্যা বলে মনে করেন। জগতে ব্রতকেই তপ বলে, কিন্তু তা এর থেকে মধ্যম শ্রেণীর। যারা যজ্ঞশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে, তারা অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়। দেবতা, পিতৃপুরুষ, অতিথি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের অন্ন দিয়ে সবার পরে যে ভোজন

করে, তাকেই যজ্ঞশিষ্ট অন্ন ভোজনকারী বলা হয়। যে নিজ ধর্মে স্থিত হয়ে সুদৃঢ় ব্রত পালন এবং সত্যভাষণ করে তাকে এই জগতের গুরু বলে মনে করা হয়।'

অর্জুন বললেন—মহারাজ ! সেই ব্রাহ্মণকুমারেরা পক্ষীরূপধারী ইন্দ্রের ধর্ম ও অর্থযুক্ত বাক্য শুনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, 'আমরা যা করছি, তা হিতকর নয়।' তখন তারা বনবাস ত্যাগ করে গৃহে ফিরে গেল এবং গার্হস্থ্যধর্ম পালন করতে লাগল। সুতরাং আপনিও ধৈর্য ধারণপূর্বক সমস্ত পৃথিবীতে অকণ্টক হয়ে রাজ্যশাসন করুন।

যুধিষ্ঠিরকে নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী কর্তৃক বোঝানো

অর্জুনের কথা সমাপ্ত হলে নকুলও তাঁর কথা অনুমোদন করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! বিশাখযূপ নামক ক্ষেত্রে সমস্ত দেবতাদের দ্বারা অগ্নি স্থাপনা করার চিহ্ন বর্তমান আছে ; এতে আপনার বোঝা উচিত যে দেবগণও বৈদিক কর্মাদি এবং তার ফলে বিশ্বাস করেন। যারা বেদের নির্দেশের বিরুদ্ধে চলে, তাদের নাস্তিক মনে করা উচিত। বৈদিক কর্ম পরিত্যাগ করে কেউই স্বর্গে যেতে পারে না। বেদবেত্তা বিদ্বানরা বলেন যে গৃহস্থাশ্রম সমস্ত আশ্রমের থেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের অভিমতও শুনুন—'যে ধর্মপূর্বক উপার্জন করা অর্থ যজ্ঞাদি কর্মে ব্যবহার করে, সেই শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই ত্যাগী হয়ে থাকে।' যার কোনো ঘর-দ্বার নেই, এদিক-ওদিক বিচরণ করে, মৌন হয়ে বৃক্ষতলে শয়ন করে, যে কখনো রান্না করে না এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, সেরূপ ত্যাগীকে ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী বলা হয়। যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ বা হর্ষ করে না, কারো বিরুদ্ধে কথা বলে না এবং প্রতিদিন বেদের স্বাধ্যায় করে, তাকে ত্যাগী বলা হয়। একবার মহর্ষিগণ চার আশ্রমের বিবেককে মাপকযন্ত্রে তুলেছিলেন। তিন আশ্রম ছিল একদিকে, অন্যদিকে ছিল গার্হস্থ্য-আশ্রম। কিন্তু সেই বিচারে এই তিনটির থেকে গার্হস্থ্যাশ্রম মহত্ত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তখন থেকে তাঁরা স্থির করেছিলেন যে সেটিই উত্তম পথ, সেটিই লোকবেত্তাদের গতি। যিনি এই চিন্তা করেন, তিনিও ত্যাগী। গৃহত্যাগ করে জঙ্গলে গেলে কেউ ত্যাগী হয় না। জঙ্গলে গিয়েও যার হৃদয়ে কামনা জাগ্রত থাকে, তার কপালে যমরাজ দুর্ভোগের টীকা এঁকে দেন ; শম-দম-ধৈর্য-সত্য-শৌচ-সারল্য-যজ্ঞ-ধারণা এবং ধর্ম—এই সবই ঋষিদের পক্ষে নিত্য পালনীয়। পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং অতিথি পালন গৃহস্থাশ্রমেই হয়ে থাকে। শুধু এই আশ্রমেই ধর্ম-অর্থ ও কাম—এই তিন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। এখানে বাস করে বেদবিহিত বিধি পালনকারী ত্যাগীর কখনো বিনাশ হয় না এবং তিনি কখনো পারলৌকিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত হন না। কোনো কোনো ঋষি সদ্গ্রন্থের স্বাধ্যায়রূপ যজ্ঞ করে থাকেন, কোনো ঋষি জ্ঞানযজ্ঞে তৎপর থাকেন আবার কিছু লোক মনে মনে ধ্যানরূপ মহাযজ্ঞ বিস্তার করেন। চিত্তকে একাগ্র করার যে সাধন-মার্গ, তার আশ্রয়গ্রহণকারী দ্বিজ ব্রহ্মভূত হয়ে ওঠেন, দেবতাও তাঁর দর্শনের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। যে রাজার ওপর আত্মীয়স্বজনের ভার থাকে, তাঁর গৃহত্যাগের বিধান থাকে না। তাঁর রাজসূয়, অশ্বমেধ সর্বমেধ ইত্যাদি যজ্ঞ করে তাতে ধনদান করা উচিত। রাজার প্রমাদে ডাকাতেরা প্রবল হয়ে প্রজার ওপর অত্যাচার করে, সেই সময় রাজা যদি প্রজাকে রক্ষা না করেন, তাহলে তাঁকে কলিরই মূর্তিমান স্বরূপ বলে জানতে হবে। যে রাজা দান করেন না, শরণাগতকে রক্ষা করেন না, তিনি পাপের ভাগী হন ; তাঁকে শুধু দুঃখই ভোগ করতে হয়, সুখ তাঁর ভাগ্যে জোটে না। যা কিছু মনকে আবদ্ধ করে, সেগুলি ত্যাগ করলে মানুষ ত্যাগী হয়, শুধু গৃহত্যাগ করলে তাকে ত্যাগী বলা হয় না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধানে সর্বদা ব্যাপৃত থাকে, তার কখনো ক্ষতি হয় না। মহারাজ ! পূর্ববর্তী রাজারা যা করেছেন, সেই স্বধর্মে স্থিত হয়ে শত্রু জয় করার পর, আপনি ছাড়া আর কে শোক করে ?'

তখন সহদেব বললেন—'ভারত ! শুধু বাহ্য বস্তু ত্যাগ করলে সিদ্ধিলাভ হয় না। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুগুলি ত্যাগ করলেও যে সিদ্ধিলাভ হয় কী না হয়, তাতে সন্দেহ আছে। বাহ্য পদার্থ ত্যাগ করে দৈহিক সুখভোগে আসক্ত ব্যক্তির যে ধর্ম বা সুখ লাভ হয়, তা আমাদের শত্রুদের হোক। কিন্তু দৈহিক স্বার্থে আসা বস্তুগুলির মমতা ত্যাগ করে অনাসক্তভাবে পৃথিবীর রাজ্যশাসনকারীদের যে ধর্ম

অথবা সুখ প্রাপ্তি হয়, তা যেন আমাদের হিতৈষী মিত্ররা প্রাপ্ত হয়। দুই অক্ষরের 'মম' (এটি আমার—এই ভাব) মৃত্যু আর তিন অক্ষরের 'না মম' (আমার নয়—এই ভাব) অমৃত সনাতন ব্রহ্ম। মহারাজ ! জীব যদি নিত্য হয় তাহলে তার অবিনাশী হওয়া নিশ্চিত। তাহলে প্রাণীদের শরীর বধ করা হলে প্রকৃতপক্ষে তাদের হিংসা করা হয় না। অন্যদিকে শরীরের সঙ্গেই যদি জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ মানা হয়, তাহলে সমস্ত বৈদিক কর্মমার্গই ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হবে। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্তে বনবাসের চিন্তা না করে পূর্বপুরুষেরা যে পথ ধরে চলেছিলেন, তারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। রাজন্ ! বনে বাস করে সেখানকার ফল ফুলে জীবিকা নির্বাহ করেও যিনি দ্রব্যাদিতে মমত্ববোধ রাখেন, তিনি মৃত্যুমুখেই অবস্থান করেন। প্রাণীদের বাহ্যরূপ একপ্রকার ও আন্তরিক রূপ অন্যপ্রকার হয়ে থাকে ; আপনি সেই দিকে নজর রাখুন। যিনি সকলের মধ্যে বিরাজমান আত্মাকে দেখেন, তিনি মহাভয় থেকে মুক্ত হন। আপনি আমার পিতা, মাতা, ভাই, গুরু—সব কিছু। আমি আর্ত, তাই দুঃখে না জানি কী প্রলাপ বলেছি ; আপনি সেসব ক্ষমা করুন। আমি সত্য-মিথ্যা যা কিছু বলেছি, তা আপনার চরণে ভক্তি থাকার জন্যই বলেছি।'

বৈশম্পায়ন বললেন—নিজ ভ্রাতাদের মুখে বেদের সিদ্ধান্ত শুনেও যখন যুধিষ্ঠির চুপ করে থাকলেন তখন ধর্মজ্ঞা দ্রৌপদী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মধুর কণ্ঠে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন—'মহারাজ ! আপনার ভ্রাতারা আপনার সংকল্প জেনে বিমর্ষ হয়েছেন। তা সত্ত্বেও আপনি মত পরিবর্তন করে এঁদের আশ্বস্ত করছেন না কেন ? এরা সর্বদাই আপনার জন্য দুঃখ সহ্য করেছে, এখন তাদের উচিত বাক্য বলে আনন্দ প্রদান করুন। আপনার স্মরণ থাকতে পারে, দ্বৈতবনে যখন আপনার ভ্রাতারা সকলে আপনার সঙ্গে শীত-গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টি বাদলে কষ্ট ভোগ করেছিল, সেই সময় আপনি এদের ধৈর্য প্রদান করে বলেছিলেন—'ভ্রাতাগণ ! আমরা যুদ্ধে দুর্যোধনকে বধ করে এই সসাগরা পৃথিবী ভোগ করব। সেই সময় বড় বড় যজ্ঞ করে পর্যাপ্ত দানদক্ষিণা করার সময় তোমাদের বনবাসের এই দুঃখ সুখে পরিণত হবে।' ধর্মরাজ ! যদি এই কথা স্থির করেছিলেন, তাহলে সেই সময় একথা কেন বলেছিলেন ? আপনি নিজে যখন এইসব কথা বলে এদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিলেন, তাহলে এখন কেন আমাদের

হৃদয়ে দুঃখ দিচ্ছেন ? আপনার উচিত দণ্ড ধারণ করে এই পৃথিবী পালন করা। কারণ দণ্ড প্রদান না করলে ক্ষত্রিয়দের শোভাবৃদ্ধি হয় না। সেই রাজা পৃথিবী উপভোগ করতে পারে না এবং প্রজারাও সুখী হয় না। রাজাদের পরম ধর্মই হল, দুষ্টকে দণ্ডদান এবং সৎ ব্যক্তির পালন আর যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা।

যে রাজা পরিস্থিতি বিচার করে ক্ষমা করে এবং ক্রোধও করে, দান দেয় ও কর গ্রহণ করে, শত্রুদের ভয় প্রদর্শন করে এবং শরণাগতকে নির্ভয়ে রাখে, দুষ্টদের দণ্ড দেয় এবং দীন ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করে, তাকেই ধর্মাত্মা রাজা বলা হয়। আপনি এই সসাগরা পৃথিবী শাস্ত্র শুনিয়েও পাননি অথবা দানে এবং কাউকে প্রতারণা করেও নয় বা ভিক্ষা করেও নয়। শত্রুদের প্রবল সেনা সংহার করে তবেই আপনি জয়লাভ করেছেন, সুতরাং আপনার এই রাজ্য উপভোগ করা উচিত। মহারাজ ! বহু দেশের সঙ্গে যুক্ত জম্বুদ্বীপে আপনি কর বসিয়েছেন ; জম্বুদ্বীপের মতোই যে মেরু গিরির পশ্চিমে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, সেটি অধিকার করেছেন, মেরুর পূর্বদিকে ক্রৌঞ্চদ্বীপের মতোই যে শাকদ্বীপ, তাতেও কর বসিয়েছেন এবং মেরুর উত্তর দিকে আরও যে শাকদ্বীপের সমকক্ষ ভদ্রাশ্বদ্বীপ আছে, সেগুলিও শাসন করছেন। এছাড়াও আরও বহু যে দ্বীপ ও অন্তর্দ্বীপ আছে, সমুদ্র লঙ্ঘন করে সেগুলির ওপরও আপনি অধিকার লাভ করেছেন। ভ্রাতাদের সাহায্যে এমন অনুপম পরাক্রমের

এবং দ্বিজাতির দ্বারা সম্মানিত হয়েও আপনি কেন প্রসন্ন হচ্ছেন না?' আমার অনুরোধ আপনি এই ভ্রাতাদের অভিনন্দিত করুন।

'মহারাজ! আমার শ্বশ্রূমাতা কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সবই তাঁর মানস চক্ষে থাকে। তিনি আমাকে বলেছিলেন—'পাঞ্চালরাজকুমারী! রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি হাজার হাজার রাজা সংহার করে তোমাকে অত্যন্ত সুখী করবেন।' কিন্তু আপনার আচরণ দেখে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে। যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও তাকেই অনুসরণ করে। আপনার উন্মত্তবৎ আচরণে পাণ্ডবরাও উন্মত্ত হয়ে গেছে। যে উন্মত্তের ন্যায় কাজ করে তার কখনো মঙ্গল হয় না ; উন্মার্গে যে চলে তার চিকিৎসা করানো উচিত। জগতে আমিই সর্বাপেক্ষা অধম, যে পুত্রদের মৃত্যুর পরও জীবিত থাকতে চায়। এঁরা সকলেই আপনাকে বোঝাতে চাইছেন, কিন্তু আপনি বুঝতেই চাইছেন না। আমি সত্যই বলছি, এই সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব ছেড়ে আপনি নিজেই বিপদকে আহ্বান করছেন। রাজন্! আপনি মান্ধাতা এবং অম্বরীষের ন্যায় তেজস্বী ; সমস্ত প্রজাকে ধর্মপূর্বক পালন করে পর্বত-বন-দ্বীপসহ এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করুন। শোকে বিহ্বল হবেন না। নানা যজ্ঞাদি করে ব্রাহ্মণদের দান করুন।'

অর্জুনের দণ্ডনীতি সমর্থন এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ভীমের চেষ্টা

বৈশম্পায়ন বললেন—দ্রুপদকুমারীর কথা শুনে অর্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—'রাজন্! সমস্ত প্রজাকে শাসন ও রক্ষা করা রাজদণ্ডের দ্বারাই সম্ভব হয়, সমস্ত কিছু নিশ্চেষ্ট হলেও রাজদণ্ড সদা সতর্ক থাকে ; তাই বিদ্বান ব্যক্তিরা দণ্ডকেই রাজার ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। দণ্ডের দ্বারা ধর্ম-অর্থ ও কাম রক্ষা পায় ; তাই এই দণ্ডকে ত্রিবর্গ বলা হয়। রাজদণ্ডই ধনধান্য রক্ষা করে, তাই আপনি দণ্ড ধারণ করুন। জগতের দিকে দেখুন—কত পাপী দণ্ডভোগের ভয়ে পাপ করে না ; দণ্ডের প্রভাবেই সকল কার্য ঠিকমতো চলে। অধিকাংশ লোকই দণ্ডের ভয়ে একে অপরের সর্বনাশ করতে দ্বিধাবোধ করে। দণ্ড যদি সকলকে রক্ষা না করত, তাহলে জগতের প্রাণী ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হত। দণ্ড উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে শাস্তি দেয় এবং দুষ্টকে দমন করে, তাই বিদ্বান ব্যক্তিরা একে 'দণ্ড' বলে। ব্রাহ্মণ যদি অন্যায় করেন তাহলে তাঁকে বাক্য দ্বারা অপমান করাই তাঁর দণ্ড, বেতনরূপে শুধুমাত্র অন্নসংস্থানের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ের সেবা গ্রহণ করা হল তাঁকে দণ্ড প্রদান করা ; বৈশ্যের দণ্ড হল তার থেকে জরিমানা আদায় করা ; কিন্তু শূদ্রের কাছ থেকে সেবা গ্রহণই হল তাকে দণ্ড দেওয়া ; দণ্ডের রূপেই তাকে দিয়ে কাজ করানো হয়। মানুষকে প্রমাদ থেকে বাঁচাবার এবং তার অর্থ-সম্পদ রক্ষা করার জন্য যে এক মর্যাদা স্থির করা হয়েছে, তাকেই বলা হয় দণ্ড। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—সকলেই দণ্ডের ভয়ে নিজ নিজ পথে স্থির থাকে। ভয় বিনা কেউই যজ্ঞ করে না, দান দেয় না বা প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় থাকে না।

রুদ্র, কার্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, বায়ু, মৃত্যু, কুবের, রবি, বসু, সাধ্য এবং বিশ্বদেব—এসকল দেবতাই দণ্ডপ্রদানকারী ; তাই এঁদের প্রতাপের জন্য সকলেই বিনম্রভাবে এঁদের প্রণাম করে, পূজা করে। জগতে আমি এমন কাউকে দেখি না যে অহিংসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ; কারণ প্রত্যেক ক্রিয়াতেই কিছু না কিছু হিংসার সম্পর্ক থাকে। বিধাতার যা বিধান, বিদ্বান ব্যক্তিরা তাতে মোহগ্রস্ত হন না। মহারাজ! যে জাতিতে আপনার জন্ম, সেই অনুসারেই আপনার আচরণবিধি হওয়া উচিত। জলে বহুপ্রকারের জীব থাকে, ধরিত্রীতে এবং বৃক্ষের ফলেও বহুপ্রকার কীট থাকে ; এমন কোনো মানুষ নেই, যারা এদের হিংসা থেকে সর্বতোভাবে রক্ষা পায়। কিন্তু একে জীবননির্বাহ ছাড়া আর কীই বা বলা যায়? এমন কত সূক্ষ্ম জীবাণু আছে, যা শুধুমাত্র

অনুমান করা যায়। মানুষ পলক ফেলামাত্রই তারা মারা যায়। সুতরাং এই সব জীবদের হিংসা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।'

জগতে যখন থেকে দণ্ডনীতির প্রচলন হয়েছে, তখন থেকে সমস্ত প্রাণীদের সমস্ত কার্য সুচারুরূপে হতে থাকে। জগতে ভালো-মন্দ ভাগ করার দণ্ড যদি না থাকত, তাহলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত, অনেকেই যথার্থ পথ অনুসরণে সচেষ্ট হত না। যেসব নাস্তিক মানুষ ধর্মমর্যাদা নষ্ট করে বেদাদির নিন্দা করে, দণ্ডনীতির শাসনে তারাও শীঘ্রই সুপথে আসে। জগতে সর্বথা ন্যায়যুক্ত মানুষ পাওয়া খুবই কঠিন, দণ্ডের ভয়ে সকলে ঠিক পথে চলে, দণ্ডের ভয়েই লোকেরা মর্যাদা-পালনে তৎপর হয়। চার বর্ণের লোকেরা যাতে আনন্দে থাকে, সবার মধ্যে সুনীতি বজায় থাকে এবং পৃথিবীতে ধর্ম ও অর্থ রক্ষা হয়—সেই উদ্দেশ্যেই বিধাতা দণ্ডের বিধান করেছেন। পক্ষী এবং হিংস্র প্রাণী যদি দণ্ডকে ভয় না পেত, তাহলে তারা পশু, মানুষ এবং যজ্ঞের জন্য সংরক্ষিত দ্রব্যও খেয়ে নিত। সমস্ত ধর্মকর্ম লোপ পেত এবং সব মর্যাদা নষ্ট হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, যেসব যজ্ঞে বিধিপূর্বক যথেষ্ট দক্ষিণা প্রদান করা হয়, বৎসর ব্যাপী সেই যজ্ঞও বিনা বাধায় করা যেত না। আশ্রমধর্ম ঠিকমতো পালন হত না এবং কেউ বিদ্বানও হতে পারত না। লাঠির ভয় না থাকলে উট, ঘোড়া, বলদ—এরাও ঠিকমতো গাড়ি টানত না। অনুচর তার প্রভুর এবং বালক তার মাতাপিতার কথা শুনত না। যুবতী স্ত্রী তার সতীধর্মে স্থির থাকত না। দণ্ডের কারণেই সমগ্র প্রজা সুশৃঙ্খলে আছে, মানুষের ইহলোক ও পরলোক দণ্ডের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেস্থানে দণ্ড প্রয়োগের সঠিক নিয়ম বিদ্যমান, সেখানে ছল, পাপী ও ঠগী দেখা যায় না। মানুষের সব কাজই যে ধনের অধীন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ধন দণ্ডের অধীন। দেখুন, এই দণ্ডের কী মহিমা!

জীবনযাত্রা সুব্যবস্থিত করার জন্য ধর্মের প্রতিপাদন করা হয়েছে। এমন কোনো বস্তু নেই যাতে সবই গুণ অথবা একেবারে গুণবর্জিত। প্রত্যেক কাজেই ভালো এবং মন্দ দুই-ই দেখা যায়। এই সব কথা চিন্তা করে আপনি সনাতন ধর্ম পালন করুন। যজ্ঞ করুন, দান করুন এবং প্রজা ও মিত্রদের রক্ষা করুন।

অর্জুনের কথা শেষ হলে ভীমসেন বলতে লাগলেন—'রাজন্! আপনি সর্ব ধর্ম জানেন; আপনাকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি মনে মনে কয়েকবার ঠিক করেছিলাম যে, বলব, কিছু বলব না! কিন্তু দুঃখবোধ বেশি হওয়ায় বলতেই হচ্ছে। আপনার মোহ দেখে আমরা বিকল ও নির্বল হয়ে পড়ছি। আপনি জগতের গতি ও অগতি উভয়ই জানেন; ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানও আপনার অজানা নয়। এই পরিস্থিতিতেও আপনাকে রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার যে কারণ, তা বলছি; আপনি শুনুন। মানুষের ব্যাধি দুপ্রকার—শারীরিক এবং মানসিক। এই দুইয়ের উৎপত্তি অন্যোন্যাশ্রিত। একটি ছাড়া অন্যটি হওয়া সম্ভব নয়। কখনো শারীরিক ব্যাধি থেকে মানসিক ব্যাধি হয়, কখনো মানসিক ব্যাধি থেকে শারীরিক। যে ব্যক্তি বিগত শারীরিক বা মানসিক দুঃখের জন্য শোক করে, সে এক দুঃখ থেকে অন্য দুঃখে পতিত হয়। তার এই দুপ্রকার অনর্থ থেকে কখনো মুক্তি মেলে না।

তাই ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে যেমন আপনার যুদ্ধ হয়েছিল, তেমনই মনের সঙ্গেও আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। এখন সেই সময় এসেছে। এই যুদ্ধে কোনো অস্ত্র চাই না এবং কোনো মিত্র বা আত্মীয়ের সাহায্যও নয়। আত্মশক্তিতে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। মনকে জয় না করলে, আপনার যে কী অবস্থা হবে, তা বলতে পারি না। তবে তাকে জয় করলে আপনি কৃতার্থ হবেন। প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যুর কথা ভেবে আপনি বুদ্ধি স্থির রাখুন এবং পিতৃ-পিতামহের রাজ্য শাসন করুন। পাপী দুর্যোধন যে তার অনুচরসহ পরলোকগমন করেছে, তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা; এখন আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করুন। আমরা সকলেই আপনার দাস।'

—

যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমকে তিরস্কার এবং মুনিবৃত্তির প্রশংসা, রাজা জনকের দৃষ্টান্ত দিয়ে অর্জুনের যুধিষ্ঠিরকে বোঝানো

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীমসেনের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'ভীম ! অসন্তোষ, প্রমাদ, উন্মত্ততা, রাগ, অশান্তি, বল, মোহ, অভিমান ও উদ্বেগ—এই প্রবল পাপ তোমার মনকে বশীভূত করেছে ; তাই তোমার রাজ্য পাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। ভাই ! ভোগের আসক্তি ত্যাগ করো এবং বন্ধন মুক্ত হয়ে শান্ত ও সুখী হও। আগুন যতই লেলিহান হোক, তাতে ইন্ধন প্রদান না করলে তা নিজেই শান্ত হয়ে যায়। তেমনই তুমি তোমার জঠরাগ্নিকে অল্প আহার দ্বারা শান্ত করো, মনে হয় এখন তোমার ক্ষুধা অনেক বেশি। প্রথমে নিজের ক্ষুধা জয় করো ; তাহলে বোঝা যাবে যে এই বিজিত পৃথিবীর দ্বারা তুমি কল্যাণ লাভ করেছ। ভীমসেন ! তুমি মানুষের ভোগবাসনা ও ঐশ্বর্যের প্রশংসা করছ ; কিন্তু যাঁরা ভোগরহিত এবং তোমার থেকে দুর্বল, সেই মুনি-ঋষিরাই সর্বোত্তমপদ প্রাপ্ত করেন। যাঁরা পাতা ভক্ষণ করে থাকেন, জল অথবা বাতাস খেয়ে বাঁচেন, সেই তপস্বীরাই নরক জয় করেন। সেখানে তোমার ন্যায় বীরের বীরত্ব কাজ করে না একদিকে সসাগরা পৃথিবী শাসনকারী রাজা, অন্যদিকে পাথর ও সোনাকে একভাবে দেখা মুনি, এঁদের দুজনের মধ্যে মুনিই কৃতার্থ, রাজা নয়। নিজের মনোবাসনার জন্য বড় বড় কাজ আরম্ভ কোরো না, আশা বা মমতা রেখো না। তাহলে তুমি ইহলোকে এবং পরলোকেও শোকরহিত স্থান প্রাপ্ত হবে। যাঁরা ভোগাসক্তি বর্জন করেছেন, তাঁরা কখনো শোকগ্রস্ত হন না। তাহলে তুমি কেন ভোগের চিন্তা করছ ? সম্পূর্ণ ভোগ যদি তুমি পরিত্যাগ করো তাহলে মিথ্যা থেকে মুক্তি পাবে। পরলোকের দুটি পথ প্রসিদ্ধ—পিতৃযান এবং দেবযান। সকাম যজ্ঞকারী পিতৃযানে গমন করে এবং মোক্ষ অধিকারী দেবযানে। মহর্ষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য এবং স্বাধ্যায়ের বলে এমন স্থানে পৌঁছান যেখানে মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। রাজা জনক সমস্ত দ্বন্দ্বরহিত এবং জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তিনি মোক্ষস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন। পূর্বে তিনি যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, লোকে বলে তা এইরূপ—'অন্যের দৃষ্টিতে আমার অনন্ত ধন আছে, কিন্তু তা আমার নয়। সমগ্র মিথিলা ভস্মীভূত হলেও, আমার কিছুই পুড়বে না।' যিনি নিজে দ্রষ্টারূপে থেকে এই দৃশ্য প্রপঞ্চকে দেখেন, তিনিই প্রকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান পুরুষ। অজ্ঞাত তত্ত্বের জ্ঞান এবং সম্যক বোধকারী বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা হয়। মানুষ যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে একই দেবতাকে অবস্থিত দেখে এবং তাঁর থেকেই সব কিছু বিস্তার হয়েছে বলে মনে করে, তখন সে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। বুদ্ধিমান এবং তপস্বীই সেই উত্তম গতি লাভ করেন। যে জড় এবং জ্ঞানহীন, যার মধ্যে শুদ্ধ বুদ্ধি এবং তপের অভাব থাকে, সেইরূপ ব্যক্তি ওইস্থানে পৌঁছতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ বুদ্ধিরই মহিমা।'

রাজা যুধিষ্ঠির এই বলে চুপ করলেন, তখন অর্জুন আবার বললেন—'মহারাজ ! জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাজা জনক এবং তাঁর পত্নীর বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস বলে থাকেন। রাজা জনকও রাজ্য পরিত্যাগ করে ভিক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ; সেই সময় তাঁর রানি দুঃখিত হয়ে তাঁকে যা বলেছিলেন, আপনাকে বলছি।

'জনশ্রুতি আছে, একদিন রাজা জনকের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তিনি অর্থ-সম্পদ, সন্তান, স্ত্রী, অগ্নিহোত্রও পরিত্যাগ করে ভিক্ষুকের ন্যায় মুষ্টিভিক্ষা করে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। স্বামীর এই অবস্থা দেখে রানি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি একদিন একান্তে রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! আপনার এই ভিক্ষুকের মতো মুষ্টিভিক্ষার ওপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। আপনার এই চেষ্টা এবং প্রতিজ্ঞা রাজধর্মবিরুদ্ধ। এই মহান রাজ্য পরিত্যাগ করে যদি আপনি সামান্য অন্নতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে এত অতিথি, দেবতা, ঋষি এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ কীভাবে হবে ? আমার তো মনে হয় আপনার সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা। আপনি কর্মত্যাগ করেছেন, তাই দেবতা, অতিথি এবং পরিবারবর্গও আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন। আপনি থাকতেই আপনার মাতা পুত্রহীনা হয়েছেন এবং এই অভাগিনী কৌশল্যাও পতিহীনা। আপনি ঠিক করে বলুন—এই নানাপ্রকার বস্ত্র-অলংকার পরিত্যাগ করে আপনি কেন সন্ন্যাসী হয়েছেন ? কেন এইরূপ নিষ্ক্রিয় জীবন কাটাচ্ছেন ? সমগ্র প্রাণীর কাছে আপনি পিতৃসম, সকলেই তাদের নানারূপ তৃষ্ণা দূর করতে আপনার কাছে আসত। এমন এক সময় ছিল যে আপনি

ফলপূর্ণ বৃক্ষের ন্যায় সর্বজীবের ক্ষুধা দূর করতেন ; কিন্তু এখন মুষ্টিভিক্ষার জন্য নিজেই অন্যের কাছে হাত পাতবেন। সবকিছু পরিত্যাগ করেও সামান্য খাদ্যের জন্য যখন অন্যের কৃপা চাইতে হয় তখন এই ত্যাগে এবং রাজত্ব করায় পার্থক্য কী ? দুইই তো একই প্রকার, তাহলে কেন কষ্ট করছেন ? মুষ্টিভিক্ষার প্রয়োজনই যখন থাকল, তখন সর্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা থাকে কী করে ?

মহারাজ ! আমার ওপর যদি আপনার কৃপা থাকে, তাহলে এই পৃথিবী পালন করুন এবং রাজমহল, বস্ত্র-অলংকার ব্যবহার করুন। যে বরাবর দান গ্রহণ করে এবং নিরন্তর নিজে দান করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য কী ? তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? তা আপনি নিজেই স্থির করুন। সাধু-সন্তদের অন্নদান করার জন্য রাজার প্রয়োজন থাকে ; যদি দানকারী রাজা না থাকেন তাহলে মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাকারী মহাত্মাদের জীবন-নির্বাহ হবে কীভাবে ? অন্নের দ্বারাই প্রাণ পুষ্ট হয়, তাই অন্নদানকারী প্রাণদাতার তুল্য। গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে পৃথকভাবে থেকেও ত্যাগী ব্যক্তি গৃহস্থের সাহায্যেই জীবনধারণ করে। যিনি আসক্তিরহিত এবং সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত, শত্রু ও মিত্রে সমান ভাব পোষণ করেন, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন, মুক্তই থাকেন। বহুলোক দানগ্রহণ ও জীবনধারণের জন্য মস্তক মুণ্ডন করে গেরুয়া বসন পরিধান করে গৃহত্যাগ করে; তারাও নানাপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকায়, ভোগের খোঁজেই ঘুরে বেড়ায়। অন্তরের রাগ-দ্বেষ দূর না হলে গেরুয়া বসন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার তো ধারণা যে ধর্মের ধ্বজাধারী এইসব ব্যক্তি তাদের জীবিকা অর্জনের জন্যই এইরূপ ধারণ করে। সে যা হোক, আপনি সাধু-মহাত্মাদের পালন-পোষণ করে জিতেন্দ্রিয় হয়ে পুণ্যলোকের ওপর অধিকার লাভ করুন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন গুরুর জন্য যজ্ঞবস্তু সংগ্রহ করে অথবা নিরন্তর বহু দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞ করে থাকে, তার থেকে বড় ধর্মপরায়ণ আর কে হতে পারে ?'

(রানি এইভাবে বোঝানোতে রাজা জনক সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন) । রাজা জনক জগতে তত্ত্বজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনিও মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতো আপনিও মোহগ্রস্ত হবেন না। আমরা যদি সর্বদা দান ও তপস্যাতে তৎপর থেকে নিজ ধর্ম অনুসরণ করি, দয়া ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হই, কাম-ক্রোধ দোষ ত্যাগ করি এবং যথেষ্ট দানধ্যানাদি দ্বারা প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকি তাহলে গুরু ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সেবা করে আমরা অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত করতে সক্ষম হব। এইভাবে ব্রাহ্মণ সেবা করে, সত্যভাষী হয়ে দেবতা, অতিথি ও সমস্ত প্রাণীদের সেবা করতে থাকলে আমরা নিজেদের ইষ্ট স্থান প্রাপ্ত হব।

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—ভ্রাতা ! আমি ধর্ম প্রতিপাদনকারী এবং পর ও অপর ব্রহ্ম নিরূপণকারী উভয় প্রকার শাস্ত্রই জানি আর কর্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগ উভয়ই প্রতিপাদনকারী বেদবাক্যের জ্ঞানও আমার আছে। এতদ্ব্যতীত পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদনকারী বাক্যসমূহও আমি যুক্তি দিয়ে বিচার করেছি এবং সেই বাক্যের যে তাৎপর্য, তাও আমি বিধিবৎ জানি। তুমি তো শুধু শস্ত্রবিদ্যাতেই পারদর্শী এবং বীরের ধর্ম পালন কর। শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম তুমি জানতে সক্ষম নও। যাঁরা শাস্ত্রের সূক্ষ্মরহস্য জানেন এবং ধর্মবিচার করতে দক্ষ, তাঁরাও আমাকে তোমার মতো উপদেশ দিতে পারেন না। তা সত্ত্বেও ভ্রাতৃপ্রীতিবশত তুমি যা বলেছ, তা ন্যায়সঙ্গত এবং উচিত কথাই , এতে আমি তোমার ওপর প্রসন্নই হয়েছি। যুদ্ধ ধর্মে এবং সংগ্রামকুশলতায় ত্রিলোকে তোমার সমান কেউ নেই। কিন্তু যেসব মহানুভবদের বুদ্ধি পরমার্থতে নিযুক্ত, তাঁদের বিচার হল তপ ও ত্যাগ উভয়ই একে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠ। অর্জুন ! তুমি যে মনে করছ অর্থের থেকে বড় কোনো বস্তু নেই, তা ঠিক নয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থের কোনো গুরুত্ব নেই, একথা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। ইহলোকে তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত বহু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দেখা যায়। এঁরা সব তপস্বী ঋষি—যাঁরা অন্তিমকালে সনাতনলোক প্রাপ্ত হন। এমন অনেক অজাতশত্রু ধৈর্যবান বনবাসী আছেন, যাঁরা বনে থেকে স্বাধ্যায় করে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। মোক্ষমার্গী ব্যক্তিদের গতি অনির্বচনীয়। তাই যোগকেই সর্বসাধনের প্রধান বলে মানা হয়। তবে তার স্বরূপ জানা অত্যন্ত কঠিন। বিদ্বান ব্যক্তিরা সার-অসার বস্তুর সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করতে থাকেন এবং তাঁরা নিজ স্বরূপে অবস্থিত হয়ে এখানেই মুক্ত হয়ে যান। এই আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম, চক্ষুর দ্বারা তা দেখা যায় না এবং বাক্য দ্বারাও তা বলা সম্ভব নয়। যাঁরা অত্যন্ত যুক্তিকুশল ও বিদ্বান, তাঁরাও এই আত্মতত্ত্বের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হন, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। এইরূপ বড় বড় বুদ্ধিমান, শ্রোত্রিয় এবং শাস্ত্রজ্ঞদের কাছেও এটি অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয়। কিন্তু অর্জুন ! তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তপ, জ্ঞান এবং ত্যাগের দ্বারাই সেই নিত্য মহান সুখ প্রাপ্ত হন।

—০—

মহর্ষি দেবস্থান এবং অর্জুনের রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোঝানো

শ্রীবৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠিরের কথা শেষ হলে সেখানে উপস্থিত দেবস্থান নামক এক তপস্বী যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে আরম্ভ করলেন—'অজাতশত্রু ! আপনি ধর্মানুসারে এই পৃথিবী জয় করেছেন, একে আপনার এইভাবে ত্যাগ করা উচিত নয়। রাজন্ ! ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রম ব্রহ্মকে লাভ করার চারটি সোপান, বেদে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং ক্রম অনুসারেই আপনার এগুলি পার হওয়া উচিত। আপনি এখন বড় বড় যজ্ঞ করুন। ঋষিরা স্বাধ্যায় যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ জ্ঞানযজ্ঞও করেন। গৃহস্থেরা যজ্ঞের জনাই অর্থ সঞ্চয় করে। তারা যদি নিজেদের শরীর অথবা কোনো অযোগ্য কার্যের জন্য অর্থের অপব্যয় করে তাহলে ভ্রূণহত্যার ন্যায় দোষের ভাগী হয়। ব্রহ্মা যজ্ঞের জনাই সম্পদের সৃষ্টি করে পুরুষকে তার রক্ষক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং যজ্ঞের জনাই সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা উচিত। তাহলে শীঘ্রই কামনায় সিদ্ধিলাভ হয়। রাজন্ ! অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুত্ত অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে ইন্দ্রের পূজা করেন। তাঁর যজ্ঞে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পদার্পণ করেছিলেন, তাঁর সমস্ত যজ্ঞপাত্রগুলি স্বর্ণনির্মিত ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামও নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন। তিনিও অনেক অর্থব্যয় করে ইন্দ্রের পূজা করেছিলেন, তাতে তিনি পুণ্যাত্মা এবং শোকরহিত হয়েছিলেন। তাই সমস্ত ধন যজ্ঞেই ব্যয় করা উচিত।

রাজন্ ! মানুষের মনের সন্তুষ্টিই স্বর্গ থেকে বড়, সন্তোষই সব থেকে বড় সুখ, জগতে সন্তোষের থেকে বড় আর কিছু নেই। কিন্তু তা তখনই হয় যখন মানুষ তার সমস্ত কামনাগুলিকে সংযত করে। তখনই নিজ অন্তঃকরণে পরমাত্মার আত্মজ্যোতিঃ স্বরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। মানুষ যখন কিছুকে ভয় পায় না, তখন তার থেকেও কারো কোনো ভয় থাকে না। সে কাম এবং দ্বেষ জয় করে আত্মার সাক্ষাৎ পায়।

কিছু লোক শান্তির প্রশংসা করে আবার কিছু লোক উদ্যোগের গুণগান করে। কেউ এর একটিকে ভালো বলে, কেউ আবার দুটিরই প্রশংসা করে। কেউ যজ্ঞ করা ভালো বলে, কেউ বলে সন্ন্যাস, কেউ ভাল বলে দান করাকে। কেউ আবার সবকিছু ছেড়ে চুপ করে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকে, কোনো কোনো ব্যক্তি রাজ্য লাভ করে প্রজাপালনই উচিত কাজ মনে করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই সমস্ত দেখে-শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কাউকে ঈর্ষা না করা, সত্যাচরণ করা, দান করা, সবার ওপর সদ্ভাব রাখা, ইন্দ্রিয় দমন করা, নিজ স্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করা তথা শীল লজ্জা, অচঞ্চলতা—এগুলিই প্রধান ধর্ম এবং স্বায়ম্ভুব মনুও তাই বলেছেন।

রাজন্ ! আপনিও নিজগুণে সেই ধর্মপালন করুন। ভূপতির ধর্ম হল ইন্দ্রিয়াদিকে নিজ বশে রাখা, প্রিয় ও অপ্রিয়তে সমভাবে থাকা, যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অন্ন গ্রহণ করা, শাস্ত্র-রহস্য জানা, দুষ্ট দমন করা, সাধুদের রক্ষা করা, প্রজাদের ধর্মপথে এনে তাদের সঙ্গে ধর্মানুসারে ব্যবহার করা, শেষে পুত্রের হাতে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করে বনে গমন করা। সেখানেও ফল-মূলাদির দ্বারা জীবন নির্বাহ করে আলস্য পরিত্যাগ করে শাস্ত্রোক্ত কর্ম বিধিপূর্বক আচরণ করা উচিত। যে রাজা এরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্মজ্ঞ, তাঁর ইহলোক এবং পরলোক দুইই ঠিক থাকে। এইভাবে যে রাজারা ধর্ম অনুসরণ করতেন, সত্য দান এবং তপস্যায় ব্যাপৃত থাকতেন, দয়াদি গুণসম্পন্ন হতেন, কাম-ক্রোধ দোষ থেকে দূরে থাকতেন, প্রজাপালনে তৎপর থাকতেন, তাঁরাই উত্তম গতি লাভ করতেন। এইভাবে রুদ্র, বসু, আদিত্য, সাধ্য এবং বহু রাজর্ষিও এই ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং নিরন্তর সাবধানে থেকে নিজ নিজ পবিত্র কর্ম-আচরণ করেই স্বর্গলাভ করেছিলেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দেবস্থান মুনির বক্তব্য শেষ হলে অর্জুন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে, যিনি তখনও অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন, বললেন—'রাজন্ ! আপনি ধর্মজ্ঞ, ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে এই দুর্লভ রাজ্য লাভ করেছেন। তাহলে আপনি এত শোকাহত কেন ? মহারাজ ! আপনি ক্ষাত্রধর্মের কথা চিন্তা করুন। ক্ষত্রিয়ের কাছে ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুলাভ করাও বহু যজ্ঞের থেকে বড়। তপ ও ত্যাগ ব্রাহ্মণের ধর্ম। অন্যের অর্থে জীবিকা নির্বাহ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। আপনি তো সমস্ত ধর্মই জানেন, ধর্মাত্মা, বুদ্ধিমান, কর্মকুশল এবং জগতের সমস্ত বিষয়ের ওপর

আপনি দৃষ্টি রাখেন। ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে শত্রুদের পরাস্ত করে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করেছেন। সুতরাং এখন মনকে বশীভূত করে আপনি যজ্ঞ-দানের অনুষ্ঠান করুন। দেখুন, ইন্দ্র ছিলেন কশ্যপ ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু নিজ কর্ম দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয় হয়ে গেলেন। তিনি পাপপরায়ণ নিরানব্বইটি জাতি বধ করেন। তাঁর এই কর্ম জগতে প্রশংসনীয় বলে মানা হয়। সুতরাং যা হয়ে গেছে তার জন্য আপনি শোক করবেন না। এই সব বীরেরা ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করে পরমগতি লাভ করেছেন।"

মহর্ষি ব্যাসের শঙ্খ ও লিখিত এবং রাজা হয়গ্রীবের দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রজাপালনের জন্য উৎসাহিত করা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অর্জুন এইভাবে মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টা করলেও কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির কোনো উত্তর দিলেন না। তখন মহর্ষি ব্যাস বলতে আরম্ভ করলেন—সৌম্য ! অর্জুন একেবারেই ঠিক কথা বলেছে। গার্হস্থ্য-ধর্ম অত্যন্ত উত্তম এবং শাস্ত্রেও তা বর্ণিত আছে।

ধর্মজ্ঞ ! তুমি শাস্ত্রানুসারে স্বধর্মেরই আচরণ করো। গৃহত্যাগ করে বনগমন করা তোমার উচিত নয়। দেখো ! দেবতা, পরিবার, অতিথি এবং অনুচর—এদের নির্বাহ গৃহস্থের দ্বারাই হয়ে থাকে। সুতরাং তুমি এদের পালন পোষণ করো। গৃহপালিত পশু-পক্ষী এবং প্রাণীদের খাদ্য গৃহস্থের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তাই গৃহস্থ-ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি বেদজ্ঞ এবং অনেক তপস্যা করেছ, সুতরাং তুমি এই পৈতৃক রাজ্যের ভার বহন করতে সর্বপ্রকারে সক্ষম। রাজন্ ! তপ, যজ্ঞ, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধ্যান, একান্ত সেবন, সন্তোষ এবং শাস্ত্রজ্ঞান—এই সব ব্রাহ্মণদের সিদ্ধিপ্রদান করে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সম্বন্ধে যদিও তুমি অবহিত, তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে জানাচ্ছি—যজ্ঞ, বিদ্যাভ্যাস, শত্রুদের আক্রমণ করা, রাজ্যলক্ষ্মী প্রাপ্তিতে কখনো সন্তুষ্ট না হওয়া, দণ্ডপ্রদান করা, প্রজাপালন করা, সমস্ত বেদের জ্ঞান লাভ করা, তপস্যা, সদাচার, দ্রব্যোপার্জন এবং সুপাত্রকে দান দেওয়া ক্ষত্রিয়ের এই সব কর্ম তাঁকে ইহলোক ও পরলোক—উভয় স্থানেই সাফল্য প্রদান করে। এইসবের মধ্যে অন্যায়কারীকে দণ্ডপ্রদান করা রাজার সব থেকে প্রধান ধর্ম। সেইজন্য তাঁর সর্বদা শক্তি-সমর্থ থাকা প্রয়োজন, কারণ শক্তির সাহায্যেই দণ্ডবিধান করা সম্ভব। রাজন্ ! ক্ষত্রিয়গণ এই ধর্মের সাহায্যেই সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হন। আমরা শুনেছি রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ডধারণ দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই বিষয়ে এক প্রাচীন কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ, তুমি মন দিয়ে সেটি শোনো।

শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই ভাই ছিলেন। তাঁরা ছিলেন খুব বড় তপস্বী। বাহুদা নদী তীরে তাঁদের পৃথক পৃথক আশ্রম ছিল, সেই আশ্রম ছিল অতি রমণীয় এবং ফল-পুষ্প পরিপূর্ণ। একবার লিখিত শঙ্খের আশ্রমে আসেন, দৈববশত সেই সময় শঙ্খ বাইরে গিয়েছিলেন। লিখিত ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে সেখানকার গাছ থেকে পাকা ফল পেড়ে সেখানেই বসে খেতে লাগলেন। এরমধ্যে শঙ্খ এলেন এবং লিখিতকে ফল খেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভ্রাতা ! তুমি এই ফল কোথায় পেলে ?' তখন

লিখিত হাসতে হাসতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে গিয়ে বললেন—'আমি তো এই সামনের গাছ থেকে পেড়ে নিয়েছি।' শঙ্খ বললেন—'তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে ফল পেড়েছ, এ তো চুরি করা! অতএব তুমি রাজার কাছে যাও আর তাঁকে সব কিছু জানিয়ে বল যে, 'রাজন্! কারো কাছে জিজ্ঞাসা না করে অন্যের জিনিস নিয়ে আমি চুরির ন্যায় অপরাধ করেছি, অতএব আপনি আপনার ধর্মপালন করুন এবং আমাকে শীঘ্রই এই অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রদান করুন।'

ভ্রাতার আদেশ শিরোধার্য করে লিখিত রাজা সুদ্যুম্নের কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্! আমি অনুমতি না নিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গাছের ফল খেয়ে নিয়েছি, অতএব আপনি আমাকে শাস্তি দিন।'

সুদ্যুম্ন বললেন—'বিপ্রবর! আপনি যদি দণ্ডপ্রদানে রাজার অধিকার মনে করেন, তাহলে ক্ষমা করার অধিকারও তাঁর আছে। সুতরাং আমি আপনাকে ক্ষমা করছি। এছাড়া আর কোনো সেবা থাকলে আমাকে আদেশ করুন। আমি তা পালন করার চেষ্টা করব।'

কিন্তু রাজা বারংবার প্রার্থনা করলেও লিখিত শাস্তির জন্যই আগ্রহ জানালেন। এছাড়া কোনো কথাই তিনি শুনতে চাইলেন না। তখন রাজা চোরের দণ্ড হিসাবে তাঁর দুহাত কেটে দিলেন। দণ্ড পেয়ে লিখিত দীনভাবে শঙ্খের কাছে এসে প্রার্থনা করলেন যে, 'আমি দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছি, এবার আপনি এই মন্দমতিকে ক্ষমা করুন।'

শঙ্খ বললেন—'ভ্রাতা! আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। তুমি তো ধর্মজ্ঞ, তোমা দ্বারা ধর্ম উল্লঙ্ঘন হয়েছিল, সেই দণ্ডই তুমি প্রাপ্ত হয়েছ। এখন তুমি শীঘ্র বাহুদা নদী তীরে গিয়ে দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করো। ভবিষ্যতে কখনো যেন তোমার অধর্মে মতি না হয়।'

শঙ্খের কথা শুনে লিখিত বাহুদার পুণ্য জলে স্নান করে তর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তখনই তাঁর সুন্দর দুটি হাত পুনরায় স্বস্থানে ফিরে এল। তিনি এতে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং ভ্রাতাকে গিয়ে হাত দেখালেন। শঙ্খ বললেন—'ভ্রাতা! তুমি ভয় পেয়ো না, আমি আমার তপস্যার প্রভাবেই তোমার হাত উৎপন্ন করেছি।' তখন লিখিত জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিপ্রবর! আপনার তপস্যার যদি এত প্রভাব, তাহলে আপনি কেন প্রথমেই আমার শুদ্ধি করালেন না?' শঙ্খ বললেন—'তোমার কথা ঠিক কিন্তু তোমাকে দণ্ড দেওয়ার অধিকার আমার নেই, এই কাজ রাজার। এতে রাজারও শুদ্ধি হয়েছে এবং পিতৃপুরুষের সঙ্গে তুমিও পবিত্র হয়ে গেছ।' এইভাবে প্রচেতার পুত্র দক্ষও উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম হল প্রজাপালন করা। সুতরাং রাজন্! আপনি শোক ত্যাগ করুন। ভ্রাতা অর্জুনের হিতপ্রদ কথা শুনুন। ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য দণ্ডধারণ করা, মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাস জীবন নয়।

'তাত! বনবাসকালে তোমার ধীর বীর ভাইরা যে মনোবাসনা করেছিল, তা এখন সফল হতে দাও। তুমি নহুষপুত্র যযাতির ন্যায় পৃথিবী পালন করো। ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম ভোগ করো। পরে প্রসন্নমনে বানপ্রস্থে যেও। প্রথমে অতিথি, পরিবার ও দেবতাদের ঋণ শোধ করো, তারপর অন্য সব কাজ করবে। এখন তুমি সর্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করো। তুমি যদি ভ্রাতাদের সঙ্গে বড় বড় যজ্ঞ এবং দান ইত্যাদি কর, তবে অতুল যশ লাভ করবে। রাজন্! আমি তোমাকে যা বলছি, তা মন দিয়ে শোনো, তাহলে তুমি ধর্মচ্যুত হবে না। দেখো, যে রাজা করের ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করেও রাষ্ট্রকে রক্ষা করে না, সে প্রজাদের এক চতুর্থাংশ পাপের ভাগীদার হয়। রাজা যদি ধর্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করেন তাহলে পতিত হন আর যদি ধর্মশাস্ত্র অনুসরণ করেন তবে তিনি নির্ভয়ে থাকেন। কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করে রাজা যদি সমস্ত প্রজার ওপর সমদৃষ্টি বজায় রাখেন, তাহলে

শাস্ত্রোক্ত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করায় তাঁর কোনোপ্রকার পাপসংসর্গ হয় না। শত্রুদের নিজের বল ও পরাক্রমের দ্বারা অধীনে রাখা উচিত। পাপীদের সঙ্গে কখনো মেলামেশা করা উচিত নয় এবং রাজা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। শূরবীর, শ্রেষ্ঠ, সৎকর্মকারী, বিদ্বান, বেদাধ্যয়নকারী, ব্রাহ্মণ এবং ধনবানদের বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। বহু শ্রুত ব্যক্তিকে ধর্মকৃত্যে নিযুক্ত করা উচিত, কোনো ব্যক্তি যতই গুণবান হোন, তাঁকে কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। যে রাজা প্রজাকে রক্ষা করেন না, উদ্ধত স্বভাব, মানী, মান্য পুরুষকে সম্মান করেন না, গুণাদিতেও দোষদৃষ্টি রাখেন, তিনি পাপযুক্ত হন এবং জগতে তিনি ক্রূর ব্যক্তি বলে পরিচিত হন। অনেক সময়ে প্রজারা রাজার দিক থেকে সুরক্ষিত না হলে অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দৈবী বিপত্তিতে রাজ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং ডাকাত-লুটেরার উপদ্রব শুরু হয়, তাতে রাজাই দোষের ভাগী হন। কিন্তু সম্পূর্ণ চিন্তা ও নীতির সঙ্গে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার পরও যদি সাফল্য না পাওয়া যায় তাহলে রাজার কোনো পাপ হয় না।'

'রাজন্! আমি এই বিষয়ে তোমাকে হয়গ্রীবের কাহিনী শোনাচ্ছি। হয়গ্রীব যুবক শূরবীর এবং পবিত্র কর্মকারী ছিলেন। তিনি যুদ্ধে তাঁর শত্রুদের পরাস্ত করেছিলেন, কিন্তু পরে নিঃসহায় হওয়ায় শত্রুরা তাঁকে পরাজিত করে বধ করে। হয়গ্রীব শত্রুদমন ও প্রজাপালনে অত্যন্ত কুশলী ছিলেন, তিনি অত্যন্ত যশও লাভ করেছিলেন। তিনি বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে ন্যায় অনুসারে নিজ রাজ্য পালন করেন, অহংকারকে তিনি কাছে আসতে দিতেন না এবং বহু যজ্ঞও তিনি করেছিলেন। এইভাবে সমস্ত লোকে নিজ সুযশ ব্যাপ্ত করে তিনি স্বর্গে সুখ ভোগ করছিলেন। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা দৈবী এবং দণ্ডনীতি দ্বারা তিনি মানুষী সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং ধর্মশাস্ত্র অনুসারে প্রজাপালন করেছিলেন। হয়গ্রীব ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান, ত্যাগী, শ্রদ্ধালু এবং কৃতজ্ঞ। ইহলোকে তিনি বহু পুণ্যকর্ম করেছিলেন। দেহত্যাগের পর তিনি সেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা স্বনামধন্য মেধাবী, বিদ্বান, মাননীয় এবং তীর্থস্থানে দেহত্যাগকারীরা লাভ করেন।'

যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেবের কালের মহিমা শোনানো এবং যুধিষ্ঠিরের অর্জুনের প্রতি পুনরায় শোক প্রকাশ করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! ব্যাসদেবের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর! এই পৃথিবীর রাজ্য এবং নানা প্রকার ভোগাদিতে আমার মন প্রসন্ন হয় না, এই শোক আমাকে দগ্ধ করে দিচ্ছে। যাদের পতি ও পুত্র বিনাশ হয়েছে, সেই সকল অবলাদের বিলাপ আমাকে একটুও শান্তি পেতে দিচ্ছে না।'

রাজা যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে বেদপারঙ্গম শ্রীব্যাসদেব বললেন—'রাজন্! যারা নিহত হয়েছে, কোনো কর্ম অথবা যজ্ঞাদির দ্বারা তারা আর ফিরে আসবে না। মেধা অথবা শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা অসময়ে কোনো বস্তু লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কখনো কখনো মূর্খ ব্যক্তিও উত্তম বস্তু লাভ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কার্যসিদ্ধির জন্য সময়েরই প্রাধান্য দেখা যায়। শিল্প, মন্ত্র এবং ঔষধিও দুর্ভাগ্যের সময় কাজ দেয় না। সময়ের অনুকূলতা থাকলে যখন সৌভাগ্যের উদয় হয় তখন সেটিই সাফল্য এবং বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়ে থাকে। সময় হলেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, অসময়ে কোনো বৃক্ষেও ফল-ফুল হয় না, অনুকূল সময় না এলে পাখি, সাপ, হরিণ, হাতি ইত্যাদি প্রাণীর কাম ভাব প্রকাশিত হয় না, হস্তিনী প্রভৃতিও গর্ভধারণ করে না; শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ঋতুও সময়মতো আসে, সময় হলেই জন্ম বা মৃত্যু হয়, শিশু কথা বলতে আরম্ভ করে, মানুষের যৌবন উদ্গম হয় এবং বপন করা বীজ অঙ্কুরিত হয়। সেইরূপ সূর্যের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটাও নির্দিষ্ট সময় না এলে হয় না। রাজন্! রাজা সেনজিৎ এই বিষয়ে যে প্রাচীন উপদেশ দিয়েছিলেন, তা তোমাকে শোনাচ্ছি।

রাজা বলেছিলেন—এই দুঃসহ কালচক্র সকল মানুষের ওপরই প্রভাব ফেলে, পৃথিবীর সকল পদার্থ সময় হলে জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অর্থ, পত্নী, পুত্র অথবা মাতা-পিতার বিনাশ হলে লোকে 'হায়! কি দুঃখ' ভেবে সেই

দুঃখ নিবৃত্তির উপায় ভাবতে থাকে। কিন্তু তুমি মূর্খের মতো কেন এখনই শোক করছ ! যারা শোকেরই প্রতিমূর্তি, তাদের জন্য কীসের শোক ? দুঃখ মনে করলে দুঃখ এবং ভয় মনে করলে ভয়ের বৃদ্ধি হয়। এই শরীরও আমার নয় আর সমস্ত জগৎও আমার নয় । এটি যেমন আমার, তেমনই সকলের। এইভাবে দেখলে জীব কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। শোকের হাজার হাজার উপসর্গ উপস্থিত হয় আবার হর্ষেরও তাই। কিন্তু সেগুলির প্রভাব মূর্খদের ওপরই পড়ে, বিদ্বানদের ওপর নয়। জগতে শুধু দুঃখই আছে, সুখ খুবই ক্ষণস্থায়ী। তাই লোকে দুঃখই ভোগ করে। সুখের পেছনে দুঃখ আর দুঃখের পেছনে সুখ চক্রের মতো থাকে। দুঃখেই সুখের অন্ত হয়ে থাকে। কখনো কখনো দুঃখ থেকেও সুখপ্রাপ্তি হয়। তাই যে নিত্য সুখের অভিলাষী, তাকে সুখ-দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করতে হবে। সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় প্রাপ্তিতে অবসন্ন না হয়ে প্রসন্নতার সঙ্গে সেগুলিকে গ্রহণ করা উচিত। নিজ স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে অনুকূল আচরণ করলেই জানতে পারবে কার কী হেতুতে কী প্রকার সম্বন্ধ আছে।

যুধিষ্ঠির ! সুখ-দুঃখের মর্ম জানা পরমধর্মজ্ঞ মহামতি সেনজিতের এই হল বক্তব্য। যে ব্যক্তির কাছে যা দুঃখপ্রদায়ক, তার থেকে কখনো শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। দুঃখ কখনো শেষ হয় না, একের পর এক আসতেই থাকে। সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-বিনাশ, লাভ-ক্ষতি, জীবন-মরণ—এইসব চক্রাকারে চলতেই থাকে। সুতরাং তার জন্য ধীর ব্যক্তির আনন্দ বা শোক করা উচিত নয়। রাজার কর্তব্য হল যুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ করা, যুদ্ধ করা, দণ্ডনীতি ঠিকমতো ব্যবহার করা এবং যজ্ঞে দান ও দক্ষিণা প্রদান করা। এতেই তাঁর শুদ্ধি হয়। যে রাজা কুশলতার সঙ্গে ন্যায়পূর্বক রাজ্যশাসন করেন, অহংকার ত্যাগ করে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, প্রজাদের ধর্ম অনুসারে পরিচালনা করেন, যুদ্ধে জয়লাভ করে রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন, সোমযাগ করত প্রজাপালন করেন, যুক্তিসম্মতভাবে দণ্ডবিধান করেন, বেদ-শাস্ত্র ভালোভাবে অধ্যয়ন করেন এবং চার বর্ণের মানুষদের নিজ নিজ ধর্মে স্থিত রাখেন, তিনি শুদ্ধচিত্ত হয়ে অন্তকালে স্বর্গসুখ লাভ করেন এবং তিনি স্বর্গবাসী হলেও দেশবাসী, মন্ত্রিগণ তাঁর আচার-আচরণের প্রশংসা করেন, সেই রাজাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা উচিত।'

শ্রীব্যাসদেবের কথা শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন—'ভ্রাতা ! তুমি মনে করছ যে, অর্থের থেকে বড় আর কিছুই নেই এবং নির্ধনের স্বর্গ সুখ বা অর্থ প্রাপ্তি হতে পারে না, তা ঠিক নয়। অনেক মুনি তপস্যায় ব্যাপৃত থেকেই সনাতনলোক লাভ করেছেন। যে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থেকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিদের সম্প্রদায় পরম্পরা রক্ষা করেন, দেবতারা তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলেন। যাঁরা স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ এবং ধর্মনিষ্ঠ, তাঁদের তুমি ঋষি বলে জানবে। অজ, পৃশ্নি, সিকত, অরুণ এবং কেতু নামক ঋষিগণ স্বাধ্যায়ের দ্বারাই স্বর্গ লাভ করেছিলেন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং নিগ্রহ—এই সকল কর্ম অত্যন্ত কঠিন। এই বেদোক্ত কর্মের আশ্রয় নিয়ে লোক দক্ষিণায়ন মার্গে স্বর্গলোকে গমন করে ; কিন্তু যারা নিয়মানুসারে উত্তর মার্গের দিকে দৃষ্টি রাখে, তাদের যোগীদের প্রাপ্তব্য সনাতন লোকের উপলব্ধি হয়। প্রাচীন কালের বিদ্বান ব্যক্তিগণ উভয়মার্গের মধ্যে উত্তরমার্গেরই প্রশংসা করেন। বাস্তবে সন্তোষই সর্বাপেক্ষা বড় স্বর্গ, সন্তোষই সব থেকে বড় সুখ। সন্তোষের থেকে বড় আর কোনো জিনিস নেই। যেসব ব্যক্তি ক্রোধ ও হর্ষ জয় করেছেন, তাঁরাই এই উত্তম সিদ্ধি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে রাজা যযাতির কথিত এই গাথাটি প্রসিদ্ধ, যাতে মনোনিবিষ্ট করলে পুরুষ কচ্ছপের ন্যায় তার সমস্ত বাসনাগুলিও গুটিয়ে ফেলে !

রাজা যযাতি বলেছিলেন—যখন এই ব্যক্তি কাউকে ভয় পায় না এবং তাকেও কেউ ভয় পায় না, তার কোনো বস্তুতেই আগ্রহ বা বিরক্তি থাকে না, তখন সে ব্রহ্মকে লাভ করে। যখন সে কায়মনোবাক্যে সমস্ত জীবের প্রতি দুর্ভাবনা ত্যাগ করে, তখন সে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করে। যার মদ ও মোহ দমিত হয়েছে, যে বহু পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে মোক্ষ সুলভ হয়।

অর্জুন ! আমি দেখতে পাচ্ছি, যে ব্যক্তি অর্থের বাসনায় কর্মরত, তার পক্ষে ত্যাজ্য কর্ম থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। শোক ও ভয়রহিত হয়ে যে ব্যক্তি সদাচার অনুষ্ঠান করে, তার সামান্য ধনতৃষ্ণা থাকলেও সে অন্যের সঙ্গে এমন শত্রুতা করে যে সে পাপের পরোয়া করে না। ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্যই ধনসৃষ্টি করেছেন এবং যজ্ঞ রক্ষার জন্যই মানুষ উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং যজ্ঞের জন্যই সমস্ত ধন ব্যবহার করা উচিত। তাকে ভোগে লাগানো উচিত নয়। সুতরাং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদের ধনকে দান ও যজ্ঞে লাগানো উচিত। যা ধনসম্পদ পাওয়া যায় তা দানেই দেওয়া উচিত,

ভোগে না। দান করার সময়ও দুটি কথা মনে রাখতে হবে। এক, কুপাত্রের হাতে যেন ধন না পড়ে এবং দ্বিতীয় সুপাত্র যেন তা ঠিকমতো পায়।

অর্জুন ! এই যুদ্ধে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, দ্রুপদ, বৃষসেন, ধৃষ্টকেতু এবং বিভিন্ন দেশের বহু রাজার জীবনাবসান হয়েছে। এই সমস্ত মিত্র বধের আমিই মূল কারণ। হায় ! আমি অত্যন্ত ক্রূর এবং রাজ্য লোলুপ, আমি নিজে আমার আত্মীয়দের মূলোচ্ছেদ করেছি, তাই আমার শোক কিছুতেই দূর হচ্ছে না, আমি শোকাতুর হয়ে পড়ছি। আমি কত বড় মূর্খ এবং গুরুদ্রোহী ! এই রাজ্য কতদিন থাকবে ? অথচ এরই লোভে আমি আমাদের পিতামহ ভীষ্মকে হত্যা করেছি। আরে, তিনিই আমাদের পালনপোষণ করে বড় করেছিলেন। গুরু দ্রোণাচার্যের আমার সত্যবাদিতায় বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি পুত্রবধের সত্যতা সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি হাতির অজুহাতে তাঁকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। এই ভয়ানক পাপে আমার কোন লোকে গতি হবে ? হায় ! আমার থেকে বড় পাপী আর কে আছে ! আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও বধ করিয়েছি। রাজ্যের লোভেই আমি বালক অভিমন্যুকে কৌরব সেনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলাম। তখন থেকে আমি আর তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। বেচারি দুঃখিনী দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রই নিহত হয়েছে, তার শোক আমাকে কষ্ট দেয়। আমি এখানে বসেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। এই গঙ্গাতীরেই প্রাণ বিসর্জন দেব, সকলে আমাকে এই প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনুমতি প্রদান করুন।'

মহর্ষি ব্যাসদেবের রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশ্মা মুনির কথিত ধর্মোপদেশ বর্ণনা

শ্রী বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁর আত্মীয়দের শোকে সন্তপ্ত হয়ে প্রাণবিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখে শ্রীব্যাসদেব তার শোক দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন—'যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে অশ্মা ব্রাহ্মণ কথিত এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, মন দিয়ে শোনো। একবার বিদেহরাজ জনক দুঃখ ও শোকের বশীভূত হয়ে মহামতি বিপ্রবর অশ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'যারা নিজেদের কল্যাণ চায়, তাদের কীরূপ আচরণ করা উচিত ?'

অশ্মা বললেন—'রাজন ! মানুষ যখন জন্মায়, তখন থেকেই দুঃখ ও শোক তার নিত্যসঙ্গী। এগুলি মানুষের জ্ঞানকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে যেমন বায়ু মেঘকে করে থাকে। সেইজন্যই মানুষের মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে 'আমি কুলীন, আমি সিদ্ধ, আমি কোনো সাধারণ মানুষ নই।' সেই ধারণার বশীভূত হয়ে সে পিতা পিতামহ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ খরচ করে ভিখারি হয়ে যায় এবং অন্যের অর্থ হস্তগত করার চিন্তা করতে থাকে। নিজের মর্যাদার বিষয় তার খেয়াল থাকে না। সে অনুচিত পথে ধন জমাতে থাকে। তখন রাজারা তাকে দণ্ডপ্রদান করেন। তাই মানুষের সুখ বা দুঃখ যাই আসুক, তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়াই উচিত। কারণ তা দূর করার কোনো উপায়ই নেই। অপ্রিয় ঘটনা, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বিয়োগ, ইষ্ট, অনিষ্ট, সুখ-দুঃখ—এসবই প্রারব্ধ (ভাগ্য) অনুসারে হয়। তেমনই জন্ম-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতিও দৈবাধীন। চিকিৎসককেও রোগী হতে দেখা যায়, বলবান ব্যক্তিও কখনো কখনো শক্তিহীন হয়ে পড়ে, ধনী ব্যক্তিকেও ভিখারি হতে দেখা যায়। কালের এই গতি বড় রহস্যময়। উচ্চবংশে জন্ম, পুরুষার্থ, আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য—এ সবই প্রারব্ধের অধীন। যে ভিখারি, প্রতিপালনের কষ্ট হলেও কয়েকটি সন্তান তার গৃহে জন্ম নেয়, আর যে সম্পন্ন, একটি সন্তানও তার ভাগ্যে জোটে না। বিধাতার কর্ম বড়ই বিচিত্র। ব্যাধি, অগ্নি, জল, শস্ত্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিপদ, বিষ, জ্বর, মৃত্যু, উচ্চস্থান থেকে পতন—এ সবই জীবের জন্মানোর সঙ্গেই স্থির হয়ে যায়। সেই নিয়ম অনুসারেই তাকে ওই পরিস্থিতিতে যেতে হয়। আজ পর্যন্ত কেউ এর থেকে মুক্তি পায়নি, পাবেও না। এইভাবে কালের প্রভাবেই জীবদের অনুকূল ও প্রতিকূল পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, দিন, রাত, নক্ষত্র, নদী ও পর্বতকেও কাল ব্যতীত অন্য কে সৃষ্টি করে এবং স্থির রাখে ? শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষার চক্রও কালযোগে পরিবর্তিত হয়। মানুষের সুখ-

দুঃখের বিষয়েও একই ব্যাপার। রাজন্ ! মানুষের ওপর যখন জরা-মৃত্যুর আক্রমণ হয় তখন কোনো ওষুধ, মন্ত্র, হোম, যজ্ঞ তাকে রক্ষা করতে পারে না। ইহজগতে বহু পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র আমাদের হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে চিন্তা করে দেখ, তারা কার এবং আমরা কাদের আপন বলব ? পথ চলার সময় পথচারীদের মতোই আমাদের স্ত্রী-বন্ধু ও সুহৃদগণের সঙ্গে কালযাপন হয়। সুতরাং বিচারশীল মানুষদের মনে মনে চিন্তা করা উচিত যে আমি কোথায় ? কোনখানে যাব ? আমি কে ? এখানে কেন এসেছি এবং কার জন্য কেন শোক করছি ? এই জগৎ-সংসার অনিত্য, চক্রের ন্যায় তা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। জীবন-পথে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, মিত্রাদির সমাগম যেমন পান্থশালায় একত্রিত পথিকদের মতো।

কল্যাণকামী ব্যক্তিদের শাস্ত্রাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে তাতে শ্রদ্ধা রাখা উচিত। পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ তর্পণ, দেবতাদের পূজা এবং যজ্ঞানুষ্ঠান ঠিকমতো সম্পন্ন করে তবেই ধর্ম-অর্থ-কাম উপভোগ করা উচিত। হায় ! এই সমগ্র জগৎ অগাধ কালসমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। এতে জরা-মৃত্যুর ন্যায় অসংখ্য জন্তু ভর্তি ; কিন্তু জীবের তাতে খেয়ালই নেই। চিকিৎসকগণও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-কটু নানা প্রকার ঔষধ দিয়ে থাকেন, তবুও জীব এই মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয় না। বড় বড় চিকিৎসকগণও যেমন এই জরা-বৃদ্ধত্ব দূর করতে পারেন না, তেমনই তপস্বী, স্বাধ্যায়-শীল, দানী, বড় বড় যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণও জরা-মৃত্যু রোধ করতে পারেন না। দিন-রাত, পক্ষ, মাস, বর্ষ উপস্থিত হয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। মৃত্যুর এই দীর্ঘ পথ সকল জীবকেই অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং এমন কোনো মানুষ নেই, যাকে কালের বশীভূত হয়ে যেতে না হয়। নিজ দেহের সঙ্গেই যখন চিরস্থায়ী সম্পর্ক থাকে না, তখন অন্যান্য জনের সঙ্গে কীকরে থাকবে ?' রাজন্ ! আজ তোমার পিতা-পিতামহ কোথায় গেলেন ? এখন তুমিও তাঁদের দেখতে পাচ্ছ না, তাঁরাও তোমাকে দেখছেন না। স্বর্গ বা নরককে মানুষ চর্মচক্ষে দেখতে পায় না। সেগুলি দেখার জন্য সৎপুরুষেরা শাস্ত্রের সাহায্য নেন। সুতরাং তুমি শাস্ত্রানুরূপ আচরণই করো।

মানুষের প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। তারপর গৃহস্থাশ্রমে এসে পিতৃ-পিতামহ ও দেবতাদের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সন্তান উৎপাদন করবে। এরূপ সূক্ষ্মদর্শী গৃহস্থেরা নিজ হৃদয়ের শোক পরিত্যাগ করে ইহলোক, স্বর্গলোক ও পরমাত্মার আরাধনা করা উচিত। যে রাজা শাস্ত্রানুসারে ধর্ম আচরণ ও দ্রব্য সংগ্রহ করেন, সমস্ত জগতে তাঁর সুযশ ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যাসদেব বললেন—যুধিষ্ঠির ! অশ্মা মুনির কাছে এইভাবে ধর্মরহস্য জেনে রাজা জনকের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি শোকহীন হয়ে মুনির অনুমতি নিয়ে নিজ ভবনে চলে গিয়েছিলেন। তুমিও তাঁর মতো শোক ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও। মনকে প্রসন্ন করো এবং শাস্ত্রধর্ম অনুসারে জয় করা এই পৃথিবীর রাজ্যশাসন করো।

সৃঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে নারদ কথিত বহু রাজাদের দৃষ্টান্ত শুনিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোঝানো

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ব্যাসদেবের উপদেশ শুনে রাজা যুধিষ্ঠির কোনো কথা বললেন না। তাঁকে মৌন দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মাধব ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বজনদের শোকে অত্যন্ত পীড়িত ; তিনি শোক সাগরে নিমজ্জিত। আপনি তাঁকে সান্ত্বনা দিন।'

অর্জুনের কথা শুনে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বসলেন। ধর্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের কথা উপেক্ষা করতে পারতেন না ; অল্পবয়স থেকেই তাঁর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের থেকে বেশি স্নেহ ছিল। শ্রীশ্যামসুন্দর তাঁর হাত ধরে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন—'রাজন্ ! আপনি আর শোক করবেন না। আপনার শরীর ও মন এতে দুর্বল হয়ে পড়ছে। যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। স্বপ্নভঙ্গ হলে যেমন স্বপ্নলব্ধ বস্তুগুলি পাওয়া যায় না, তেমনই রণাঙ্গনে মৃত ব্যক্তিদেরও

জীবিত হওয়ার আশা করা বৃথা। তাঁরা সকলেই যোদ্ধাদের সম্মুখীন হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন এবং শস্ত্রাঘাতে নিহত হওয়ায় তাঁরা সকলেই স্বর্গে গেছেন, সুতরাং আপনি তাঁদের জন্য শোক করবেন না। তাঁরা সকলেই বড় শূরবীর, ক্ষাত্রধর্মে তৎপর এবং বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা বীরযোগ্য উত্তমগতি লাভ করেছেন, তাঁদের জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। এই বিষয়ে আমি আপনাকে এক প্রাচীন-প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি।

রাজা সৃঞ্জয় একবার পুত্রশোকে কাতর ছিলেন। তখন তাঁকে মহর্ষি নারদ বলেছিলেন—'সৃঞ্জয় ! তুমি, আমি এবং সমস্ত প্রজাদের মধ্যে কেউই সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত নয়, সুতরাং এর জন্য কী শোক করবে ? তুমি শোক প্রশমন করো এবং আমি যা বলি শোনো। প্রাচীন রাজাদের এ অত্যন্ত সুন্দর প্রসঙ্গ। এটি শুনলে ক্রূর গ্রহ প্রশমিত হয় এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়।

রাজন্ ! আমরা শুনতে পাচ্ছি যে রাজা সুহোত্র দেহত্যাগ করেছেন, তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্র এক বর্ষ ধরে তাঁর রাজ্যে সুবর্ণ বর্ষণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যকালে পৃথিবীর বসুমতী নাম চরিতার্থ হয়েছিল। নদীগুলিও সেই সময় সুবর্ণে পূর্ণ ছিল। ইন্দ্র জলজন্তুগুলিকেও স্বর্ণ নির্মিত করে দিয়েছিলেন। রাজা সুহোত্র সমস্ত স্বর্ণ একত্র করে কুরুজাঙ্গলে রেখে এক বিশাল যজ্ঞ করে সমস্ত ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। সৃঞ্জয় ! তিনি অর্থ-ধর্ম-কাম-মোক্ষ—এই চারটিতেই জগতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্রের থেকেও বেশি পুণ্যবান ছিলেন। কিন্তু শেষকালে তিনিও মারা গেলেন, তাই তোমারও পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

'সৃঞ্জয় ! উশীনরের পুত্র শিবির মৃত্যুর কথাও আমরা শুনেছি। প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাঁর ন্যায় রাজ্যভার বহন করার যোগ্য কোনো রাজা অতীত বা ভবিষ্যতে দেখেননি। তোমার পুত্র যজ্ঞও করেনি, দক্ষিণাও দেয়নি। তোমার এবং তোমার পুত্রের থেকে সে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। তিনিও পরমগতি প্রাপ্ত হয়েছেন ; সুতরাং তুমি তোমার পুত্রের জন্য শোক কোরো না।

দুষ্মন্তের পুত্র ভরত হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একশত রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। তিনিও তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; কিন্তু তিনিও কালগ্রাসে গমন করেছেন ; অতএব তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ পুত্রশোক করা অনুচিত।

'সৃঞ্জয় ! শোনা যায় দশরথনন্দন রাম প্রজাদের নিজ সন্তানের ন্যায় পালন করতেন। তাঁর রাজ্যে কোনো অনাথা, বিধবা ছিল না, মেঘ সময়মতো বৃষ্টি প্রদান করত, যথেষ্ট অন্ন উৎপন্ন হত, সর্বত্র উত্তম সময় বিরাজ করত। তখন কেউই জলে ডুবে মারা যেত না, আগুনে কেউ পুড়ত না, রোগের কোনো ভয় ছিল না। নারী-পুরুষের সহস্র বৎসর করে আয়ু হত, কোথাও কোনো কলহ-বিবাদ হত না। প্রজাগণ ধর্মে তৎপর থাকত এবং সকলেই সন্তুষ্ট, পূর্ণকাম, নির্ভয় এবং সত্যবাদী ছিল। রাম যতদিন রাজ্যপালন করেছেন, বৃক্ষগুলি ফল-ফুলে পরিপূর্ণ থাকত, গাভীগুলি দুগ্ধবতী ছিল। রাম পর্যাপ্ত দক্ষিণাপ্রদান করে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, সেখানে কারো যেতে কোনো বাধা ছিল না। মহাবাহু রাম নিত্য নব যৌবনসম্পন্ন, শ্যামবর্ণ, অরুণ নয়ন, আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর মুখশ্রীবিশিষ্ট, সিংহস্কন্ধ ছিলেন। তিনি একাদশ সহস্র বৎসর সময় পর্যন্ত অযোধ্যার রাজা ছিলেন। সেই তিনিও যখন পরলোক গমন করেছেন, তোমার পুত্রের তো কথাই নেই। সুতরাং তুমি তার জন্য শোক কোরো না।

'আমরা শুনেছি যে রাজা ভগীরথও জীবিত নেই। তিনি যজ্ঞের সময় স্বর্ণভূষণ সজ্জিত দশ লাখ কন্যা দক্ষিণাতে দান করেছিলেন। প্রত্যেক কন্যা চার ঘোড়াবিশিষ্ট রথে উপবিষ্ট ছিল, রথের পেছনে স্বর্ণ ও কমল মালা বিভূষিত শত শত

হাতি এবং প্রত্যেক হাতির পেছনে হাজার হাজার ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার পেছনে হাজার হাজার গাভী ও প্রত্যেক গাভীর সঙ্গে এক এক হাজার ছাগল ও ভেড়া থাকত। ত্রিলোকে প্রবাহিত গঙ্গা তাঁর কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তাই গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী। কিন্তু দেখো, তিনিও জীবিত নেই। অতএব তোমার পুত্রদের জন্য শোক করা উচিত নয়।

'সৃঞ্জয় ! শোনা যায় রাজা দিলীপও জীবিত নেই। তাঁর মহান কর্মের কথা এখনও ব্রাহ্মণরা বলে থাকেন। তিনি যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন, ইন্দ্রাদি দেবতারা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞপাত্রগুলি ছিল স্বর্ণনির্মিত এবং সেই যজ্ঞোৎসবে ছয় হাজার দেবতা এবং গন্ধর্বরা সপ্ত স্বরে নৃত্য করেছিলেন। যাঁরা সত্যবাদী মহাত্মা দিলীপকে দর্শন করেছিলেন, তাঁরাও স্বর্গের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজমহলে বেদধ্বনি, ধনুকের টংকার এবং যাচকদের কোলাহল কখনো বন্ধ হত না। কিন্তু মৃত্যু তাঁকেও ছাড়েনি। সুতরাং তুমি পুত্রের জন্য শোক কোরো না।

'যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতাও মারা গেছেন। তাঁর পিতা ভ্রমক্রমে যজ্ঞের অভিমন্ত্রিত জল পান করে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর জন্ম হয়েছিল পিতার উদর থেকে। তিনি অত্যন্ত বৈভবশালী ও ত্রিলোক বিজয়ী ছিলেন। তাঁর রূপ সাক্ষাৎ দেবতার মতো সুন্দর ছিল। তাঁকে রাজা যুবনাশ্বের ক্রোড়ে শায়িত দেখে দেবতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন যে, এই বালক কার দুগ্ধ পান করবে ! তখন ইন্দ্র বললেন 'মাং ধাতা' (আমার দুগ্ধ পান করবে)। তাই তাঁর নাম হল মান্ধাতা। তখন ইন্দ্রের হাত থেকে দুধের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে এবং ইন্দ্র সেই দুধ শিশুকে পান করান। সেই দুধ পান করে ওই শিশু একই দিনে একশত পল বৃদ্ধি পেয়ে বারোদিনে বারো বৎসরের বালকের মতো বেড়ে উঠল। সেই বালক অত্যন্ত ধর্মাত্মা, শূরবীর এবং যুদ্ধে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী ছিল। মান্ধাতা রাজা অঙ্গার, মরুত্ত, গয়, অঙ্গ এবং বৃহদ্রথকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। সূর্যের উদয় স্থান থেকে অস্ত হওয়ার স্থান পর্যন্ত যতদূর সূর্যের কিরণ পড়ত সেই সমস্ত দেশ রাজা মান্ধাতারই অধীনে ছিল। তিনি একশত অশ্বমেধ ও একশত রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন এবং দশ যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন উঁচু স্বর্ণ মৎস্য তৈরি করিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। কিন্তু এখন সেই পরমপ্রতাপী মান্ধাতার কোনো চিহ্নই নেই। তাহলে তুমি তোমার পুত্রের জন্য কেন শোক করছ ?

'সৃঞ্জয় ! নাভাগের পুত্র অম্বরীষ আর ইহলোকে নেই—এই সংবাদও সর্বজনবিদিত। তিনি বিশাল যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের এমন আদর-অভ্যর্থনা করেছিলেন যে তাঁর প্রশংসা করে বলা হয় 'এমন যজ্ঞ আগে কেউ করেনি আর ভবিষ্যতেও কেউ করবে না।' সেই যজ্ঞে যে লক্ষ লক্ষ রাজা সেবাকার্য করেছিলেন, তাঁরা সকলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ভোগ করার জন্য উত্তরায়ণমার্গে হিরণ্যগর্ভলোকে গিয়েছিলেন ; কিন্তু করাল কাল তাঁকেও রেহাই দেয়নি, সুতরাং তুমি তোমার পুত্রশোক ত্যাগ করো।

'রাজন্ ! আমরা শুনেছি যে চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দুও দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর এক লক্ষ রানি ছিল। তাদের দ্বারা রাজা দশ লক্ষ পুত্র জন্ম দেন। প্রত্যেক রাজকুমার এক শত কন্যাকে বিবাহ করে। প্রত্যেক কন্যার জন্য শত শত হাতি ছিল এবং এক একটি হাতির সঙ্গে শত শত রথ। এক একটি রথের পেছনে শত শত ঘোড়া এবং এক একটি ঘোড়ার পেছনে শত শত গাভী ছিল। এই ক্রমানুসারে এক একটি গাভীর সঙ্গে শত শত মেষ কন্যাপণে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু মহারাজ শশবিন্দু এক অশ্বমেধ যজ্ঞে এই সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদের সমর্পণ করেন। তোমার থেকে এই রাজা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবেতেই উত্তম ছিল। তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন ; অতএব তুমি পুত্র শোক ত্যাগ করো।

'সৃঞ্জয় ! অমূর্তরয়ার পুত্র গয়ের মৃত্যুর কথাও আমরা শুনেছি। একবার যজ্ঞে অগ্নিদেব তাঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। গয় তখন বললেন— 'অগ্নিদেব ! আপনার কৃপায় আমার অক্ষয় ধন হোক, ধর্মে যেন শ্রদ্ধা থাকে, সত্যে যেন অনুরাগ থাকে।' এইভাবে অগ্নিদেবের কৃপায় তার সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তিনি হাজার বছর ধরে পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং চাতুর্মাস্যে বহুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং হাজার বছর ধরে প্রত্যহ প্রভাতে এক এক লক্ষ গাভী এবং শত শত ঘোড়া ব্রাহ্মণদের দান করতেন। কিন্তু শেষে কাল তাঁকেও ছাড়েনি, সুতরাং তুমি পুত্রশোক ত্যাগ করো।

'রাজন্ ! ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা সগর আর এই পৃথিবীতে নেই বলে শোনা যায়। তাঁর ষাট হাজার পুত্র ছিলেন, যাঁরা পিতার অনুসরণ করতেন। নিজ বাহুবলে তিনি এই

পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দেবতাদের তৃপ্ত করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের স্বর্ণমহল দান করেছিলেন। তিনি সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী খনন করেছিলেন, তাই তাঁর নাম অনুসারে সমুদ্রের আর এক নাম 'সাগর'। কিন্তু শেষকালে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। অতএব তুমি তোমার পুত্রের জন্য শোক কোরো না।

'সৃঞ্জয় ! বেনের পুত্র রাজা পৃথুও আর ইহজগতে নেই। মহর্ষিগণ মহান বনের মধ্যে তাঁর রাজ্যাভিষেক করেছিলেন এবং তাঁর নাম 'পৃথু' রেখেছিলেন এই ভেবে যে, ইনি সমস্ত জগতে ধর্মের মর্যাদা প্রোথিত (স্থাপিত) করবেন। তাঁকে দেখে প্রজারা এক বাক্যে স্বীকার করেছিল যে রাজা পৃথুকে পেয়ে সকলেই খুবই আনন্দিত। প্রজাদের রঞ্জন করার জন্যই তাঁকে 'রাজা' বলা হত। যে সময় তিনি রাজত্ব করতেন, তখন বিনা বপনে ধান্য উৎপন্ন হত, গাভীগুলি উত্তম দুগ্ধবতী ছিল। মানুষ নীরোগ, পূর্ণকাম ও নির্ভয় ছিল। তারা ইচ্ছামতো ক্ষেতে বা গৃহে থাকত। রাজা যখন সমুদ্রের কাছে যেতেন, সমুদ্র স্থির হয়ে যেত এবং নদীগুলিও প্রবাহিত হত না। তিনি এক অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের একুশটি সোনার পর্বত দান করেছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁকেও কালগ্রাসে পতিত হতে হয়, সুতরাং তুমি পুত্রশোক পরিত্যাগ করো।' এইভাবে উপদেশ দিয়ে দেবর্ষি নারদ সৃঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! তুমি চুপ করে কী ভাবছ ? তুমি কী আমার কথা শোননি ? আমি যা বলেছি তা বৃথা নয়।'

সৃঞ্জয় বললেন—'মহর্ষে ! আপনার উপদেশ ব্যর্থ হয়নি। আপনাকে দর্শন করে আমার সমস্ত শোক দূর হয়েছে। আপনার কথা শোনার আগ্রহ আমার এখনও দূর হয়নি, অমৃতপানের ন্যায় তার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। তবুও আমার ইচ্ছা, আপনার কৃপায় পুত্রের সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়।'

নারদ বললেন—'রাজন্ ! মহর্ষি পর্বত তোমাকে সুবর্ণষ্ঠীবী নামক পুত্র দিয়েছিলেন। সে এখন গত হয়েছে। সেই স্থানে আমি তোমাকে এক হাজার বছরের আয়ুসম্পন্ন হিরণ্য নামক অন্য পুত্র প্রদান করছি।'

শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য সমাপ্ত হলে নারদও তাঁর কথার অনুমোদন করলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণষ্ঠীবির চরিত্র শুনিয়ে বললেন যে, 'রাজন্ ! সৃঞ্জয় যখন তাঁর মৃত পুত্রকে জীবিত করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখালেন, তখন

আমি তাকে জীবিত করে দিলাম। তাতে তার মাতা-পিতা অত্যন্ত প্রসন্ন হল। কালান্তরে পিতার স্বর্গবাস হলে সুবর্ণষ্ঠীবি এগারো শত বৎসর পৃথিবী শাসন করেন এবং পরে স্বর্গগমন করেন। ধর্মরাজ ! এখন আপনি শোক দূর করুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের কথা অনুযায়ী নিজ পৈতৃক রাজসিংহাসনে উপবেশন করে শাসনভার গ্রহণ করুন। এই সব করে যদি আপনি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহলে আপনি অভীষ্ট লোক লাভ করবেন।'

মহর্ষি ব্যাসদেব দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম-উপদেশ প্রদান

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণের মুখে দেবর্ষি নারদের উপদেশ শুনে রাজা যুধিষ্ঠির চুপ করে রইলেন। তাঁকে শোকগ্রস্ত দেখে সর্ব ধর্মের রহস্য জ্ঞাতা মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন—'যুধিষ্ঠির ! রাজাদের ধর্মই হল প্রজাপালন করা। সুতরাং তুমি তোমার পৈতৃক রাজসিংহাসন স্বীকার করো। বেদে তপস্যাকে ব্রাহ্মণদের নিত্য ধর্ম বলে জানানো হয়েছে। ক্ষত্রিয় তো সর্ব ধর্মের রক্ষকই। যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হয়ে ধর্মবিধি উল্লঙ্ঘন করে, সে লোক মর্যাদার ঘাতক। ক্ষত্রিয়দের নিজ বাহুবলে তাদের দমন করা উচিত। যে ব্যক্তি মোহবশত শাস্ত্র না মানে, সে সেবক হোক বা পুত্র, তপস্বী হোক অথবা কোনো প্রিয়জন, সেই পাপীকে সর্ব প্রকারে দমন করে বিনাশ করতে হয়। যে রাজা এর বিপরীত আচরণ করে তার পাপ হয়। যে রাজা ধর্ম নষ্ট হচ্ছে দেখেও রক্ষা করে না, তাকে ধর্মের ঘাতক বলা হয়। তুমি তো অনুচরসহ সেই ধর্ম-ঘাতকদেরই বিনাশ করেছ ; সুতরাং তুমি তোমার ধর্মে অটল আছ। তাহলে কেন শোক করছ ? রাজার ধর্মই হল দুষ্টকে বধ করা, সুপাত্রে দান করা ও প্রজাদের রক্ষা করা।'

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'তপোধন ! আপনি সকল ধর্মজ্ঞের শিরোমণি। ধর্মতত্ত্ব আপনার কাছে সর্বদা প্রত্যক্ষ। আপনার কথায় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ; কিন্তু মুনিবর ! এই রাজ্যের জন্য আমি বহু অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করে ফেলেছি, সেই সব কর্মই আমাকে পীড়িত করছে।'

শ্রীব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! রাজার কর্তব্যই হল উদ্ধত পুরুষদের দণ্ডপ্রদান করা। সেই নিয়মেই তুমি কৌরবদের বধ করেছ। সুতরাং তুমি আর শোকগ্রস্ত হয়ো না। দোষদুষ্ট জেনেও নিজ ধর্ম পালন করায় এরূপ আত্মগ্লানি তোমাকে শোভা পায় না। শাস্ত্রে পাপকর্মের যে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা আছে, ইহলোকেই তা করা সম্ভব, শরীর ত্যাগ করলে তা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং রাজন্ ! তুমি জীবিত থাকলেই তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে। প্রায়শ্চিত্ত করার আগেই যদি দেহত্যাগ হয়ে যায়, তাহলে তোমার শুধু অনুতাপই হবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন— 'পিতামহ ! আমি রাজ্য লোভে আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, কাকা, শ্বশুর, গুরু, মামা, পিতামহ, বহু ক্ষত্রিয় বীর, আত্মীয়স্বজন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রাজাদের বিনাশ করেছি। তার জন্য আমি কী শাস্তি পাব ? এই চিন্তা আমাকে সর্বক্ষণ পীড়িত করছে। আমি যখন এই পৃথিবীকে সেই সব শ্রীসম্পন্ন নৃপ শূন্য দেখি আর এই ভীষণ জ্ঞাতিবধ এবং এতে নিহত শত শত বীর ও কোটি কোটি লোকের কথা স্মরণ করি তখন আমার অত্যন্ত অনুতাপ হয়। আহা ! আজ যেসব অবলা তাঁদের পুত্র-পৌত্র-ভ্রাতাদের হারিয়েছেন, তাঁদের কী দশা হবে ? তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের বিনাশকারী এই পাণ্ডবদের এবং যাদবদের দোষ দিচ্ছেন ও নিভৃতে দীনভাবে অশ্রুপাত করছেন। বিপ্রবর ! সেইসব নারীদের তাঁদের মৃত আত্মীয়দের প্রতি যে ভালোবাসা, তাতে আমার মনে হয় যে তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রাণত্যাগ করবেন। ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অতএব এতে আমার নারীহত্যার পাপ হবে। নিজ সুহৃদদের বধ করে আমি অত্যন্ত পাপ করেছি ; এখন আমাকে নরকেই যেতে হবে। সুতরাং আমি এবার ভয়ানক তপস্যা করে প্রাণ বিসর্জন দেব। আপনার যদি তপস্যা করার জন্য কোনো উত্তম স্থান জানা থাকে, কৃপা করে আমাকে বলুন।'

ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! তুমি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজ ধর্মানুসারেই তুমি এই ক্ষত্রিয়দের বধ করেছ, তারজন্য শোক কোরো না। এরা সকলেই নিজ নিজ অপরাধে বিনষ্ট হয়েছে। তুমি, ভীম-অর্জুন-নকুল বা সহদেব কেউই এদের বধ করেনি। কালই এদের সংহার কর্তা। তার কেউ পিতাও নেই, মাতাও নেই, সে কারো ওপর দয়া করে না, সে শুধু প্রজাদের কর্মের সাক্ষীস্বরূপ। তোমার যুদ্ধ তো নিমিত্তমাত্র ছিল। কাল এইভাবেই এক প্রাণীর দ্বারা অপরকে হত্যা করায়। এই সংহার কর্মের জন্য সে এক ভগবানেরই স্বরূপ। এছাড়াও তোমার কৌরবদের বিনাশকারী কর্মগুলির ওপরও দৃষ্টিপাত করা উচিত, যার জন্য তাদের কালগ্রাসে পতিত হতে হল। তোমার মনে যদি এদের মৃত্যুর জন্য সন্তাপ হয়ে থাকে, তাহলে সেই দোষ থেকে মুক্তিলাভের জন্য তুমি প্রায়শ্চিত্ত করে নাও। রাজন্ ! এমন শোনা যায় যে পূর্বকালে রাজলক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বারো হাজার বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছে। তাতে দেবতারা দৈত্যদের সংহার করে স্বর্গ ও পৃথিবীর ওপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন। যারা ধর্ম নাশ

করে অধর্মকে বাড়াতে চায়, তাদের বিনাশ করাই উচিত। এই যুদ্ধে দেবতারা অষ্টআশি হাজার শালাবৃক নামক দৈত্যদের বধ করেছিলেন। যদি একটি ব্যক্তিকে মারলে বাকি ব্যক্তিরা সুখে থাকে অথবা এক আত্মীয়কে মারলে দেশ শান্তিতে থাকে, তাহলে তাকে বিনাশ করলে কোনো দোষ হয় না। রাজন্! কোনো কোনো সময় অধর্ম বলে দেখা কর্মই ধর্ম হয়ে ওঠে এবং ধর্ম বলে প্রতীত হওয়া কর্ম অধর্ম হয়ে যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির ধর্ম ও অধর্মের রহস্য ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত। ধর্মরাজ! তুমি শাস্ত্র শ্রবণ করেছ, অতএব ধর্মাধর্মের বিষয়ে নিজ বুদ্ধিকে স্থির রাখো। দেখো! পূর্বকালে দেবতাদের যে ধর্মমার্গ ছিল, তুমি তাই অনুসরণ করেছ। তোমার মতো ধর্মপ্রাণ মানুষ কখনো নরকের দ্বার দেখে না। সুতরাং তুমি তোমার ভাই ও সুহৃদদের সান্ত্বনা প্রদান করো। যে ব্যক্তি হৃদয়ে পাপ চিন্তা রেখে কুকর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তার জন্য লজ্জিত হয় না, তাকে পাপের ভাগী হতে হয়—শাস্ত্রে এরূপ বলা আছে। এইরূপ পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না, এবং এর ক্ষয়ও হয় না। তোমার হৃদয় তো শুদ্ধ। যুদ্ধের ইচ্ছা না থাকলেও শত্রুদের অপরাধে তোমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং এজন্য তুমি অনুতাপও করছ। তারজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ খুবই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। এই যজ্ঞ করলে তুমি মনে শান্তি ফিরে পাবে। ইন্দ্র ও মরুতদের পরাস্ত করে একে একে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাই তিনি 'শতক্রতু' নামে প্রসিদ্ধ। এইভাবে স্বর্গে আধিপত্য লাভ করে তিনি পাপ থেকে মুক্ত হন। স্বর্গলোকে দেবতা এবং ঋষিরাও তাঁর পূজা করেন। তুমিও নিজ পরাক্রমে এই বসুন্ধরাকে লাভ করেছ, নিজ বাহুবলেই রাজাদের পরাস্ত করেছ। এখন তুমি তোমার মিত্রদের সঙ্গে তাদের দেশ ও রাজধানীতে গিয়ে তাদের ভ্রাতা, পুত্র বা পৌত্রদের নিজ নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করো। যেসব রাজার উত্তরাধিকারী এখনো গর্ভে, সেই প্রজাদের সান্ত্বনা প্রদান করো। এইভাবে সমস্ত প্রজাদের প্রতিপালন করে রাজ্য শাসন করো। যে রাজাদের পুত্র নেই, সেখানে তাদের কন্যাদেরই রাজসিংহাসনে বসাও। ভরতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে সমগ্র রাজ্যে শান্তি স্থাপন করো। তারপর তুমি অসুরবিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের অর্চনা করো। রাজন্! এই যুদ্ধে যে সব ক্ষত্রিয় নিহত হয়েছে, তাদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। তারা কালের শক্তিদ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে নিজেদের কুকর্মের জন্যই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ক্ষাত্রধর্ম পালনের পূর্ণ ফল তারা লাভ করেছে। তুমি এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছ। এই রাজ্য পালন করে তুমি ধর্ম রক্ষা করো। এটিই মৃত্যুর পর তোমার কল্যাণ সাধন করবে।'

পাপ এবং তার প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! কৃপা করে বলুন কোন কর্ম করলে মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এবং কী করলে মানুষ সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়।

ব্যাসদেব বললেন—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম না করে নিষিদ্ধ কর্ম করে থাকে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যে ব্রহ্মচারী সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের সময় ঘুমিয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তির নখ ও দাঁত কালো রং-এর[1] তার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। এতদ্ব্যতীত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকাকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করলে, ব্রাহ্মণকে বধ করলে, নিন্দাকারী, কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহের পর তার জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে বিবাহ করলে, যে ব্রহ্মচারীর ব্রত নষ্ট হয়ে গেছে, দ্বিজের হত্যাকারী, অপাত্রে দানকারী, সুপাত্রে দান না করা, মাংস বিক্রয়কারী, গ্রাম দহনকারী, বেতন গ্রহণ করে বেদপাঠ করানো গুরু, স্ত্রী হত্যাকারী, অপরের গৃহে অগ্নি সংযোগকারী, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জীবিকা-নির্বাহকারী, গুরুর অপমান ও সদাচার লঙ্ঘনকারী—এগুলিকেই পাপ বলা হয়, এদের সকলের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

এছাড়াও, যারা লোক নিন্দিত এবং অন্যান্য অনুচিত কাজ করে থাকে সেগুলিও বলছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শোনো। নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করা, অন্যের ধর্মাচরণ করা, অনধিকারীর দ্বারা যজ্ঞ করানো, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগতকে পরিত্যাগ করা, মাতা-পিতা-পরিবার-পরিজন সেবকাদির ভরণ পোষণ না করা, দুধ-রস ইত্যাদি বিক্রয় করা, পশু-পক্ষী বধ করা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দান-দক্ষিণা না দেওয়া, গোগ্রাস প্রভৃতি নিত্য প্রাত্যহিক

[1] কারণ 'স্বর্ণহারী তু কুনখী সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ' এই স্মৃতি অনুসারে সেই ব্যক্তি পূর্বজন্মে সোনা চুরি করত এবং সুরাপায়ী ছিল।

যোগ্য বস্ত্র প্রদান না করা, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা না দেওয়া এবং ব্রাহ্মণের ধন ছিনিয়ে নেওয়া—যারা ধর্মতত্ত্ব জানে, তাদের এই সব কর্ম না করা উচিত।

রাজন্! যে ব্যক্তি পিতার সঙ্গে কলহ করে, গুরু-পত্নীর সঙ্গে সমাগম করে, ঋতুকালে নিজ পত্নীর সঙ্গে সংসর্গ করে না, সেই ব্যক্তি ধর্মত্যাগকারী। সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে উপরে যেসব কর্মের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে করার যোগ্য কর্ম না করলে এবং না-করার যোগ্য কর্ম করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এখন যেসব কারণে এই কর্মগুলি করলেও মানুষের পাপ হয় না, সেগুলি আমার কাছে শোনো।

যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কোনো বেদ-বেদান্তের পারঙ্গম ব্রাহ্মণ হাতে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে তাহলে তাকে হত্যা করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। রাজন্! এই বিষয়ে বেদ মন্ত্রেও উল্লেখ আছে। আমি তোমাকে সেই কথাই বলছি, যা বেদ-বাক্য অনুসারে ধর্ম বলে মনে করা হয়। যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ম উল্লঙ্ঘনকারী কোনো ব্রাহ্মণকে বধ করে, তাহলে তারও ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। না জেনে অথবা প্রাণ-সংকটের সময় যদি মদিরা পান করো তাহলে ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে তার পুনঃসংস্কার করা উচিত। এটি অন্য সব অভক্ষ্য-ভক্ষণের ব্যাপারেও মনে রাখা উচিত। যদি এরূপ ভুল হয়ে থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তার শুদ্ধিকরণ হয়।

চৌর্যকার্য সর্বদাই নিষিদ্ধ, কিন্তু বিপদের সময় গুরুর জন্য যদি কেউ চুরি করে তাহলে তাতে দোষ হয় না। কোনো কামনা না নিয়ে যদি চুরি করা হয় এবং চুরির বস্তু যদি নিজে ভোগ করা না হয় এছাড়া বিপদের সময় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কারো ধন নেওয়া হয় তাহলেও চুরির পাপ হয় না। নিজের অথবা অন্য কারো প্রাণ রক্ষা করার জন্য, গুরুর জন্য, একান্তে স্ত্রীর সঙ্গে অথবা বিবাহ প্রসঙ্গে মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় না। কোনো কারণে যদি স্বপ্নে বীর্য স্খলন হয়, তাহলে ব্রহ্মচারীর ব্রত ভঙ্গ হয় না, কিন্তু এই জন্য তার জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পতিত হয়ে যায় অথবা সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে কোনো দোষ থাকে না। অজ্ঞানতাবশত কোনো ব্রাহ্মণকে দান করলে এবং যোগ্য ব্রাহ্মণকে আপ্যায়ন না করলেও কোনো দোষ হয় না। ব্যাভিচারিণী নারীকে তিরস্কার করলে কোনো দোষ হয় না, এরূপ করলে সেই নারী শুদ্ধ হয়ে যায় এবং সেই নারীর ভরণ-পোষণকারীর কোনো দোষ হয় না। যে অনুচর কাজ করতে অক্ষম, তাকে ত্যাগ করায় দোষ নেই এবং গাভীদের জন্য বনে আগুন জ্বালানোতে কোনো দোষ ধরা হয় না। রাজন্! আমি যেসব কর্মের কথা বললাম, সেই অনুসারে পালন করলে কোনো দোষ হয় না। এবার আমি বিস্তারিতভাবে প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা করছি।

রাজন্! কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং দানের দ্বারা মানুষ তখনই নিজ পাপ থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম, যদি সে আর পাপে প্রবৃত্ত না হয়। কেউ যদি ব্রহ্মহত্যা করে থাকে, তাহলে সে যেন ভিক্ষা করে একবার আহার করে, নিজের সমস্ত কাজ নিজে সম্পাদন করবে, নিত্য ব্রহ্মচর্য ব্রতে থাকবে, ভিক্ষা করার সময় দাঁড়িয়ে থাকবে, কাউকে ঈর্ষা করবে না, মাটিতে শয়ন করবে এবং লোকের কাছে নিজের কর্মের কথা প্রকাশ করবে। বারো বছর এরূপ করলে তার শুদ্ধি হয়ে যায়। অথবা নিজ ইচ্ছায় কোনো অস্ত্রধারী বিদ্বানের হাতে নিহত হয়, বা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করে অথবা মাথা নীচু করে যে কোনো একটি বেদ পাঠ করত তিন বার একশ যোজন দূরত্ব অতিক্রম করে অথবা কোনো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিজ সর্বস্ব সমর্পণ করে দেয় বা কোনো ব্রাহ্মণকে তার সমস্ত জীবন-নির্বাহ করার মতো সামগ্রীসহ একটি ঘর দান করে দেয়। এইরূপ গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষাকারী ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কৃচ্ছ্রব্রত অনুসারে আহার করে তাহলে ছয় বৎসরে, মাসিক কৃচ্ছ্রব্রত অনুসারে ভোজন করলে তিন বৎসরে এবং এক এক মাসে ভোজনক্রম পরিবর্তন করে অত্যন্ত তীব্র কৃচ্ছ্রব্রত অনুসারে অন্নগ্রহণ করলে এক বর্ষেই ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।[১] এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা উচিত নয়। এইভাবে,

[১] তিন দিন প্রাতঃকাল, তিন দিন সায়ংকাল এবং তিন দিন না চেয়ে যে খাদ্য পাওয়া যায় তাই খাওয়া এবং তিন দিন উপবাস—এটি হল বারো দিনের কৃচ্ছ্রব্রত। এইভাবে ছ বছর থাকলে ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্তি লাভ হয়। এই ক্রম যদি তিন দিনে পরিবর্তিত না হয়ে সমমাসে (তিন মাসে) এক এক সপ্তাহে এবং বিষম মাসে আট দিন করে পরিবর্তিত হয়ে এক এক মাসের কৃচ্ছ্র ব্রতের অনুসারে চলে তাহলে তিন বৎসরে শুদ্ধি হতে পারে এবং যদি এক মাস প্রাতঃকাল, এক মাস সায়ংকাল, এক মাস অযাচিত আহার এবং এক মাস উপবাস—এইভাবে চার মাস করে কৃচ্ছ্রব্রত অনুসারে চলা যায় তাহলে এক বছরেই ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।—(নীলকণ্ঠী)

উপবাস করলে শীঘ্রই শুদ্ধি হতে পারে। এছাড়া অশ্বমেধযজ্ঞ করলেও পাপ দূর হয়। শ্রুতিতে বলা আছে যারা এইভাবে অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নান করে তারা সকলেই সর্বপাপ মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের জন্য যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করে, সেও ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্ত হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী হলেও যে ব্যক্তি সু-ব্রাহ্মণকে এক লক্ষ গাভী দান করে, সেও সর্ব পাপ মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি পঁচিশ হাজার দুগ্ধবতী কপিলা গাভী সৎপাত্রে দান করে সেও ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়। মৃত্যুর সময় দরিদ্র সৎ ব্যক্তিকে গোবৎসসহ দুগ্ধবতী এক হাজার গাভী দান করলেও মানুষ এই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। যে রাজা কাম্বোজ দেশে উৎপন্ন একশটি অশ্ব সৎ-ব্রাহ্মণকে দান করে, সেও এই ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পায়। যে ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তিকে তার মনোরথ পূর্ণ করে দান করে এবং তা নিয়ে আলোচনা করে না সেও পাপমুক্ত হয়।

জলহীন দেশে পর্বত থেকে পড়ে এবং অগ্নিতে প্রবেশ করে অথবা মহাপ্রস্থানের বিধিতে হিমালয়ে গিয়ে প্রাণ দিলে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত হয়। কোনো ব্রাহ্মণ সুরাপান করলে বৃহস্পতিসব নামক যজ্ঞ করলে সে শুদ্ধ হয়। একবার মদ্যপান করার পর যে নিষ্কপটভাবে ভূমিদান করে এবং আর সুরাপান করে না, সে-ও শুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি গুরুপত্নী সমাগম করে তারও প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। মিথ্যা বলে জীবিকা নির্বাহকারী অথবা গুরুর অপমানকারী ব্যক্তি গুরুকে তাঁর ইচ্ছামতো বস্ত্র প্রদান করলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যার ব্রহ্মচর্যব্রত খণ্ডিত হয়েছে তার ব্রহ্মহত্যার জন্য উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

যদি কোনো ব্যক্তি কারো কিছু অপহরণ করে থাকে তাহলে কোনো উপায়ে সেই পরিমাণ সামগ্রী ফিরিয়ে দিলে সে পাপমুক্ত হতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকাকালে যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করে, তাহলে দুই ভ্রাতা বারো দিন সংযমের সঙ্গে কৃচ্ছ্রব্রত পালন করলে পাপমুক্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পরে বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে আবার বিবাহ সংস্কার করে নেয়, তাহলেও দোষ-নিবৃত্ত হয় এবং তাদের পিতৃপুরুষের উদ্ধারে সাহায্য হয় এবং এতে তার স্ত্রীরও দোষ স্খালন হয়। যদি স্ত্রীর দ্বারা কোনো প্রকারের পাপাচরণের সন্দেহ হয় তাহলে পুনরায় রজোদর্শন হয়ে তার শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সমাগম করবে না। পশু-পক্ষী হত্যাকারী এবং বৃক্ষচ্ছেদনকারী ব্যক্তি তিনদিন বায়ুভক্ষণ করে জনসমক্ষে নিজ কুকর্মের কথা জানালে পাপমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি কোনোপ্রকার হিংসা করে না, রাগ-দ্বেষ এবং মান-অপমান শূন্য, বেশি কথা বলে না, মিতাহারী হয়ে পবিত্র, নির্জন স্থানে বাস করে গায়ত্রী জপ করে, সে সর্বপাপ মুক্ত হয়। অন্যসব পাপের শুদ্ধির জন্যও ব্রাহ্মণগণ ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে প্রমাণভূত শাস্ত্রাদির কৃপায় এই বিধি নিশ্চিত করেছে। যে ব্যক্তি দিনে আকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখে, রাত্রে খোলা জায়গায় শয়ন করে, দিনে ও রাত্রে তিনবার করে স্নান করে এবং এই ব্রত পালনের সময় নারী, শূদ্র ও পতিতের সঙ্গে বাক্যালাপ করে না, সে অজানিতভাবে করা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। মানুষকে তার সমস্ত শুভ-অশুভ কর্মের ফল মৃত্যুর পর ভোগ করতে হয়। তাই দান, তপ, শুভ কর্মের দ্বারা পুণ্যবৃদ্ধি করা উচিত, যাতে পাপ অবদমিত হয়। সর্বদা শুভ কর্মের আচরণ করবে, পাপকর্ম থেকে দূরে থাকবে, সুপাত্রে ধনদান করবে একপ করলে মানুষ পাপ-মুক্ত হয়।

রাজন্ ! এইভাবে বিবেচক ব্যক্তিদের জন্য ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, বাচ্য-অবাচ্য এবং জেনে-না জেনে করা পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। জেনে-শুনে যে পাপ করা হয়, তা বেশি পাপযুক্ত হয় আর না-জেনে করলে, সেটিকে কম পাপযুক্ত বলে ধরা হয়। উপরিউক্ত বিধিতে পাপের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব। যারা আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান, এই বিধি তাদের জন্য বলা হয়েছে। নাস্তিক, শ্রদ্ধাহীন, দাম্ভিক, হিংসুক ব্যক্তিদের কাছে এর কোনো মূল্য নেই। যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুখ ভোগ করতে চায়, তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ধর্ম ও আচরণ অনুসরণ করা উচিত। রাজন্ ! তুমি নিজ প্রাণ রক্ষা এবং স্বধর্ম পালনের জন্যই এদের বধ করেছ ; এই কারণেই পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তা সত্ত্বেও তোমার যদি অনুতাপ হয়ে থাকে তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারো। এইভাবে অনার্য ব্যক্তির ন্যায় দুঃখী হয়ে নিজের বিনাশ করা খুবই অনুচিত কাজ।

প্রায়শ্চিত্তযোগ্য কর্ম, অন্নের অশুদ্ধি এবং দানের অনধিকারীর বিষয়ে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রসঙ্গ

ব্যাসদেব বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে এক পুরানো ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে। একবার বহু তপস্বী ঋষি একত্র হয়ে স্বায়ম্ভুব মনুর কাছে গিয়ে তাঁকে ধর্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন, 'দান, অধ্যয়ন, তপ, কার্য ও অকার্য এদের স্বরূপ কী ?'

তাঁদের জিজ্ঞাসা শুনে মনু বললেন—'আমি সংক্ষেপে ধর্মের যথার্থ স্বরূপ জানাচ্ছি, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। শাস্ত্রে যেসব পাপের প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নেই, সেগুলি নিবৃত্তির জন্য মন্ত্র-জপ, হোম ও উপবাস করা উচিত। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হলে, পবিত্র নদীতে স্নান করলে এবং যেখানে প্রায়শ্চিত্তকারী লোকেরা বাস করে সেই স্থানে থাকলে, ব্রহ্মগিরি ইত্যাদি পবিত্র পর্বতে বাস করলে, সুবর্ণ ভক্ষণ করলে, রত্নগর্ভা নদী বা সরোবরে স্নান করলে, দেবস্থানে গেলে এবং ঘৃত পান করলে—এই পুণ্যকর্ম দ্বারা মানুষের তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয়। মানুষের কখনো গর্ব করা উচিত নয় এবং যদি দীর্ঘায়ু হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতের বিধিতে তিন দিন উষ্ণ দুধ, ঘৃত এবং জল পান করা উচিত।

বিনাদানে কোনো বস্তু গ্রহণ না করা, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যায় তৎপর থাকা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ—এ সবই ধর্মের লক্ষণ। একই ক্রিয়া দেশ ও কালভেদে ধর্ম বা অধর্ম হয়ে যায়। চুরি করা, মিথ্যা বলা, হিংসা করা ইত্যাদি অধর্ম কার্যও অবস্থা বিশেষে ধর্ম বলে মানা হয়। বিবেচক ব্যক্তিরা জানেন যে ধর্ম এবং অধর্ম উভয়ই দেশকালের বিচারে অধর্ম ও ধর্ম দুই-ই হতে পারে। লোক ও বেদে ধর্মের দুটি ভাগ—প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম। এরমধ্যে নিবৃত্তি ধর্মের ফল মোক্ষরূপ অমৃতত্ব এবং প্রবৃত্তি ধর্মের ফল জন্ম-মৃত্যু। অশুভ কর্ম দ্বারা অশুভ ফল মেলে আর শুভ কর্মে শুভ ফল। ফলের শুভাশুভের জন্যই কর্মগুলিও শুভ ও অশুভ হয়।

যদি জেনে বুঝে কোনো অশুভ কর্ম হয়ে যায়, তাহলে শাস্ত্রে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। রাজা যদি দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড না দেন তাহলে তার শুদ্ধির জন্য এক দিন উপবাস করা উচিত এবং পুরোহিত যদি রাজাকে ধর্মোপদেশ না দেন, তবে তিন দিন উপবাস করলে তার শুদ্ধি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তার জাতি, আশ্রম ও কুলধর্ম পরিত্যাগ করে, তার শুদ্ধি কোনো প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা হয় না। যদি ধর্মনির্ণয়ে কোনো বিবাদ হয় তাহলে বেদ ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ দশ বা তিন জন ব্রাহ্মণকে ডেকে তার নির্ণয় করাবে এবং তাঁদের মতানুসারে কার্য করবে।

এখন খাদ্যের বিষয়ে বিচার করা হচ্ছে। প্রেতের (মৃতাত্মার নিমিত্ত) জন্য প্রস্তুত করা অন্ন, সূতিকার অন্ন দশ দিনের আগে খাওয়া উচিত নয়, তেমনই যে গাভীর সন্তান হয়েছে, দশ দিন তার দুধ খাওয়া উচিত নয়। রাজার অন্ন তেজ নাশকারী, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজ নাশ করে এবং স্বর্ণকার বা পতি-পুত্রহীনা নারীর অন্ন আয়ুক্ষয় করে। সুদখোরের অন্ন বিষ্ঠাসম, বৈশ্যের বীর্যসম। কাপুরুষ, যজ্ঞ বিক্রেতা, মুচি, ব্যাভিচারিণী নারী, ধোপা, বৈদ্য, চৌকিদার—এদের অন্নও গ্রহণযোগ্য নয়। যাকে সমাজ দোষী বলে, যে নর্তকীর সাহায্যে জীবিকা-নির্বাহ করে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত থাকলেও যে বিবাহ করে, বন্দি এবং জুয়াড়ির অন্নও অখাদ্য। যা বাম হাতে আনীত, বাসী, যার ওপর মদের ছিটে পড়েছে, উচ্ছিষ্ট, যা লুকিয়ে রাখা ছিল, তাও গ্রহণের যোগ্য নয়। যেসব পদার্থ আটা, আখ, দুধ বা শাককে পচন ধরিয়ে তৈরি করা হয় এবং ছাতু, খৈ, দই মিশ্রিত ছাতু, এগুলি দেরি হয়ে গেলে খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না। পায়েস, খেচরান্ন বা মালপোয়া যদি দেবতার জন্য তৈরি না হয়, তাহলে খাওয়া উচিত নয়, এগুলি দেবতা, ঋষি, অতিথি ও কুলদেবতাকে নৈবেদ্য প্রদান করে খাওয়া উচিত। গৃহে সন্ন্যাসীর ন্যায় অনাসক্তভাবে থাকা উচিত। যে তার অনুকূল স্ত্রীর সঙ্গে এইভাবে বসবাস করে সে ধর্মের পূর্ণ ফল ভোগ করে।

ধর্মাত্মা ব্যক্তির যশোলোভে, ভয়ের জন্য অথবা নিজ উপকারীকে কোনো দান দেওয়া উচিত নয়। নর্তকী, ভাঁড় (হাস্যকৌতুককারী), মদমত্ত, উন্মত্ত, চোর, নিন্দুক, বোবা, নিস্তেজ, অঙ্গহীন, বেঁটে, দুষ্ট, কুলহীন বা সংস্কার শূন্য ব্যক্তিদেরও দান করা উচিত নয়। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করেননি, তাকে দান দেওয়া উচিত নয়। বিধিহীন দান দেওয়া এবং নেওয়া দুই-ই উচিত নয়, তাতে উভয়েরই হানি হয়, এতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই

ক্ষতি হয়। পাথরের নৌকায় ভর করে সমুদ্র অতিক্রমণে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেমন জলে ডুবে মরে, তাদেরও সেই অবস্থা হয়। কাঠ ভিজে থাকলে যেমন আগুন জ্বলে না, তেমনই যে দানগ্রহণে, তপ স্বাধ্যায় ও সদাচারের অভাব হয়, তা নিষ্ফল হয়। দুরাচারীর সংসর্গে শাস্ত্রাভ্যাস দূষিত হয়ে যায়। যে ব্রাহ্মণ বেদহীন এবং অশাস্ত্রজ্ঞ হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং অন্যের গুণে দোষ দেখে না, তাকে দয়া করে দান করা উচিত। শিষ্টাচার বা পুণ্য হবে ভেবে তাকে কিছু দেয়া যায় না, কারণ বেদহীন ব্রাহ্মণ শুধু নামেই ব্রাহ্মণ হয়। জলবিহীন কূপ এবং ভস্মে করা যজ্ঞ যেমন ব্যর্থ হয়, মূর্খকে দান করাও তেমনই নিষ্ফল হয়। দানগ্রহণকারী মূর্খ দাতার শত্রু, সে দাতার ধন হরণ করে এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষের হব্য-কব্য নাশ করে। এরূপ ব্যক্তিকে দান করলে দাতার পুণ্যলোকের প্রাপ্তি হয় না। যুধিষ্ঠির ! তুমি যা জানতে চেয়েছিলে আমি সেই অনুসারে সংক্ষেপে স্বায়ম্ভুব মনুর সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ তোমাকে জানালাম। এই মহত্ত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ সকল কল্যাণকামীর শোনা উচিত।'

——১——

ব্যাসদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মেনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে আগমন

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আমি রাজাদের এবং চার বর্ণের ধর্মকে বিস্তারিতভাবে জানতে চাই। কৃপা করে বলুন, বিপদের সময় এঁদের কোন নীতির দ্বারা কাজ করা উচিত। প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে আপনি যা বলেছেন, তাতে আমি মানসিক স্বস্তি ফিরে পাচ্ছি।'

ব্যাসদেব বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তুমি যদি ধর্মরহস্য সম্পূর্ণভাবে জানতে চাও তাহলে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের কাছে যাও। গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম সর্বজ্ঞ এবং সর্বপ্রকার ধর্মের মর্মজ্ঞ ; তাই ধর্মবিষয়ে তোমার মনে যত প্রশ্ন আছে, তিনি সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন। যে ধর্মশাস্ত্র শুক্রাচার্য এবং দেবগুরু বৃহস্পতি জানেন, সেটিই কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম শুক্রাচার্য এবং তাঁদের কাছে সুবিনাস্তভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ব্রহ্মচর্যব্রতে শিক্ষা গ্রহণ করে বশিষ্ঠের কাছে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেছেন, ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র পরমতেজস্বী সনৎকুমারের কাছে অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করেছেন, মার্কণ্ডেয় ঋষির কাছে সম্পূর্ণভাবে যতিধর্ম শিক্ষা করেছেন এবং পরশুরাম ও ইন্দ্রের কাছে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছেন। মনুষ্য-কুলে জন্ম গ্রহণ করেও তিনি মৃত্যুকে ইচ্ছাধীন করেছেন। পবিত্র চরিত্র ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁর সভাসদ ছিলেন। যখন কোনো ধর্মসভার আয়োজন হত, তাতে এমন কোনো বিষয় ছিল না, যা তাঁর অজানা। তিনি ধর্ম ও অর্থের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানেন, তিনিই তোমাকে ধর্ম উপদেশ দেবেন। আর কিছুকাল পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। অতএব তাঁর প্রাণত্যাগের পূর্বেই তুমি সেখানে যাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর ! আমি আমার আত্মীয় ও বন্ধুদের যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করেছি। আমি সকল লোকের কাছে অপরাধী এবং পৃথিবীর সর্বনাশকারী। শুধু তাই নয়, পিতামহ সর্বদা নিষ্কপটভাবে যুদ্ধ করছিলেন ; কিন্তু আমি ছলনাদ্বারা তাঁকে হত্যা করিয়েছি। এই অবস্থায় আমি কীভাবে তাঁকে মুখ দেখাব ?'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পরবর্গের হিত কামনায় তাঁকে বললেন, 'নৃপশ্রেষ্ঠ ! এখন আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। ভগবান ব্যাস যা বলছেন, তাই করুন। ইনি অতুল তেজস্বী এবং আপনার গুরুসদৃশ ; এঁর নির্দেশ মান্য করে আপনি ব্রাহ্মণদের, আপনার সুহৃদ, আমাদের, দ্রৌপদীর এবং সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল করুন।'

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলায় মহামনা মহারাজ যুধিষ্ঠির সকলের হিতার্থে আসন ত্যাগ করে উঠলেন। তিনি বেদ, উপনিষদ, মীমাংসা, নীতি ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। এবার নিজ কর্তব্য স্থির করে তিনি শান্তি পেলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। নগরে প্রবেশ করার সময় তিনি সকল দেবতা এবং হাজার হাজার ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। শ্বেতবর্ণের ষোলোটি বৃষ বাহিত রথে তিনি আরোহণ করলেন। সেই রথ নতুন বস্ত্র

এবং চর্মে আবৃত ছিল, মহাপরাক্রমী কুন্তীনন্দন ভীম রথ চালাচ্ছিলেন। অর্জুন শ্বেতছত্র ধারণ করেছিলেন, মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব চামর এবং পাখা নিয়েছিলেন। পাঁচ ভাই যখন এইভাবে সাজসজ্জা করে রথে আরোহণ করলেন, তখন তাঁদের দেখে মনে হল যেন পঞ্চদেবতা

মূর্তিধারণ করে একত্রে উপবেশন করেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পেছনে একটি রথে যুযুৎসু যাচ্ছিলেন, এঁরা ছাড়া শৈব্য এবং সুগ্রীব নামক ঘোড়ায়টানা সুবর্ণময় রথে করে সাত্যকির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রথের সামনে তাঁর জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী একটি পালকিতে করে যাচ্ছিলেন। এঁদের সকলের পেছনে কুন্তী, দ্রৌপদী এবং কুরুকুলের নারীরা নানাপ্রকার যানারোহণে যাচ্ছিলেন। বিদুর সর্বপশ্চাতে থেকে এঁদের দেখাশোনা করছিলেন। এঁদের সকলের পেছনে অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈন্যসামন্ত, বাদ্যযন্ত্র, হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সকলে আসছিল। এইভাবে সূত, মাগধ ও বৈতালিকদের স্তুতি শুনতে শুনতে মহারাজ যুধিষ্ঠির নগরে প্রবেশ করলেন।

হস্তিনাপুর নগরে যখন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসামন্তসহ সকলের পদার্পণ হল, সেই সময় নাগরিকেরা বাসভবন এবং রাজপথগুলি নানা রঙের ফুল-পতাকা ও সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিল। নগরের দ্বারে জলপূর্ণ কলস রাখানো হয়েছিল, নানাদিকে আনন্দদায়ী স্বস্তিবাক্য শোনা যাচ্ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয়স্বজনসহ সেই সুসজ্জিত হস্তিনাপুর নগরে প্রবেশ করলেন।

পাণ্ডবগণের প্রবেশের সময় পুরবাসীরা তাঁদের দেখার জন্য সমবেত হল। পুরনারীরা পঞ্চভ্রাতার প্রশংসা করে লজ্জাবশত ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন—'পাঞ্চালকুমারী! তুমি ধন্য যে এই পুরুষশ্রেষ্ঠদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছ। তোমার সমস্ত পুণ্যকর্ম ও ব্রত সফল।' তাঁদের প্রশংসাবাক্যে এবং নাগরিকদের মধুর সম্ভাষণে সমস্ত নগর মুখরিত হয়ে উঠল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে রাজপথ দিয়ে রাজমহলে এসে পৌঁছলেন। তখন দরবারে সমবেত সকল প্রজা, বিশিষ্ট নগরবাসীগণ এবং নানা দেশের অতিথিবর্গ তাঁদের কাছে এসে প্রণাম জানিয়ে সুমিষ্ট বাক্য বলতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—'মহারাজ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনি ধর্ম ও পরাক্রমের সাহায্যে আপনার অপহৃত সাম্রাজ্য ফিরে পেয়েছেন। আপনি শত বৎসর আমাদের রাজারূপে থেকে প্রজাপালন করুন।' এইভাবে রাজদ্বারে মাঙ্গলিক বচনদ্বারা সকলে তাঁদের আপ্যায়ন করলেন। ব্রাহ্মণরাও দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। সেগুলি যথাযোগ্য স্বীকার করে মহারাজ রথ থেকে নেমে রাজভবনে এলেন। রাজভবনের অন্দরে এসে তিনি ফুল-চন্দন-রত্ন দিয়ে কুলদেবতার পূজা ও দর্শন করলেন। পরে বাইরে এসে মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের দর্শন করলেন। তারপর মহারাজ গুরু ধৌম্য এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে তাঁদের পুষ্প-বস্ত্র-রত্ন-স্বর্ণ ইত্যাদির দ্বারা শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজা করলেন। পুণ্যাহবাচন ঘোষিত হল, তাতে সমস্ত আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল, সেই আওয়াজ সুহৃদদের কাছে পরম পবিত্র ও আনন্দদায়ক ছিল, চতুর্দিকে জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

এর মধ্যে ব্রাহ্মণ বেশে আত্মগোপনকারী চার্বাক রাক্ষস বলল—'যুধিষ্ঠির! আমি এই সব ব্রাহ্মণদের হয়ে বলছি, তোমাকে ধিক্! তুমি অত্যন্ত দুষ্ট রাজা, নিজের বন্ধু ও আত্মীয়দের হত্যা করেছ। নিজের গুরুজনদের হত্যা করিয়েছ, এখন তোমার মৃত্যু হওয়াই ভালো। এইরূপ জীবনধারণে কী লাভ?'

তার কথা শুনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত লজ্জিত ও ব্যাকুল হলেন, প্রতিবাদস্বরূপ তিনি একটি কথাও বললেন না।

তিনি বিনীত কণ্ঠে বললেন—'বিপ্রগণ ! আপনাদের কাছে প্রার্থনা জানাই, আপনারা প্রসন্ন হোন ; এখন আমার বিপদের সময়, এই সময় আমাকে এরূপ ধিক্কার জানানো আপনাদের উচিত নয়।'

যুধিষ্ঠিরের কাতর অনুরোধ শুনে ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বললেন—'মহারাজ ! এ আমাদের কথা বলছে না। আমরা সকলেই আশীর্বাদ করছি যে আপনার রাজ্যে রাজলক্ষ্মী সর্বদা বিরাজ করুন।' তারপর সেই সব মহাত্মা ব্রাহ্মণরা জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে চার্বাককে চিনতে পেরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'এতো দুর্যোধনের মিত্র চার্বাক নামের রাক্ষস। এখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে তার মঙ্গল করতে চায়। ধর্মাত্মন্ ! আমরা তোমাকে এমন কোনো কথা বলিনি। তোমার এবং তোমার ভ্রাতাদের মঙ্গল হোক।' রাজন্ ! তারপর সেই সব ব্রাহ্মণরা ক্রোধে হুঙ্কার করে সেই রাক্ষসকে মেরে ফেললেন। ব্রাহ্মণদের তেজে সেই রাক্ষস ভস্ম হয়ে গেল। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁদের সকলের পূজা করলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর সুহৃদেরা এতে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, তাঁর রাজ্য ব্যবস্থা এবং তাঁর দ্বারা লোকান্তরিত আত্মীয়স্বজনের শ্রাদ্ধ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠির এবার শোক ও সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্বদিকে মুখ করে অপূর্ব সুন্দর সুবর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাঁর দিকে মুখ করে অন্য একটি সুবর্ণ সিংহাসনে সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করলেন এবং মহারাজের দুদিকে দুটি মণিময় আসনে ভীম ও অর্জুন আসীন হলেন। একদিকে স্বর্ণখচিত হাতির দাঁতের আসনে নকুল, অন্যদিকে সহদেবসহ মাতা কুন্তী উপবেশন করলেন। সেই মতো কুরুকুল পুরোহিত সুধর্মা, পিতৃব্য বিদুর, কুলপুরোহিত ধৌম্য এবং কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রও পৃথক পৃথক স্বর্ণখচিত সিংহাসনে আসীন হলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছেই যুযুৎসু, সঞ্জয় এবং গান্ধারীরও আসন পাতা ছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে উপবেশন করে শ্বেত পুষ্প, অক্ষত, ভূমি, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মণি স্পর্শ করলেন। সিংহাসনের কাছেই মৃত্তিকা, সুবর্ণ, নানা রত্নাদি, সর্ব ঔষধযুক্ত অভিষেক পাত্র, জলপূর্ণ তাম্র পাত্র, রৌপ্য ও মৃত্তিকা নির্মিত বাসন, পুষ্প, ধান্য, গোরস, শমী, পীপল এবং পলাশের সমিধ, মধু, ঘৃত ও শঙ্খ—এইসব সামগ্রী একত্র করা ছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে পুরোহিত ধৌম্য পূর্ব ও উত্তর কোণে শাস্ত্রোক্ত বিধিতে বেদী প্রস্তুত করেন। পরে সেই সর্বতোভদ্র আসনে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীকে বসিয়ে বেদমন্ত্র দ্বারা তাঁদের দিয়ে যজ্ঞ করান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ জলপূর্ণ করে ধর্মরাজের অভিষেক করেন। তারপরে তাঁর কথায় রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সকলে পাঞ্চজন্যের দ্বারা তাঁদের অভিষিক্ত করেন।

অভিষেক হতেই নানা বাদ্যধ্বনি বাজান হল। ধর্মানুসারে মহারাজ প্রজাদের সমস্ত উপহার স্বীকার করেন এবং তাঁদের বহু পুরস্কারে সম্মানিত করেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে তাঁদের সহস্র মোহর দক্ষিণা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণরা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে 'মঙ্গল হোক, জয় হোক' বলে আশীর্বাদ করেন। তারপর তাঁরা মহারাজের প্রশংসা করে বললেন—'অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনি বিজয়লাভ করেছেন। আপনি নিজ পরাক্রমে ধর্ম রক্ষা করতে সক্ষম। প্রজাদের সৌভাগ্য যে আপনি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই কুশলে আছেন। এবার আপনি রাজ্যশাসন করতে থাকুন।' তারপর সমাগত সজ্জন ব্যক্তিগণ যুধিষ্ঠিরকে সম্মান জানালেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদের সহযোগে সেই বিশাল সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

প্রজাদের অভিনন্দনের উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পিতৃসম, আমার কাছে ইনি ইষ্টদেবতুল্য। যারা আমার প্রিয় হতে চায় তাদের এঁর নির্দেশ

মেনে চলতে হবে এবং এঁর যা ভালো লাগে, তাই করতে হবে। আমারও প্রধান কর্তব্য হল সাবধানে এঁর সেবা করা। যদি আপনারা আমাকে কোনো সম্মান প্রদান করতে চান, তাহলে আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এঁর প্রতি আগের মতোই সম্ভ্রমবোধ বজায় রাখবেন। আমার, আপনাদের এবং সমস্ত পৃথিবীর প্রভু ইনিই। সমগ্র রাষ্ট্র এবং পাণ্ডবরা এঁরই অধীন। আপনারা আমার এই প্রার্থনা হৃদয় থেকে স্বীকার করুন।

তারপর যুধিষ্ঠির সমবেত পুরবাসীদের বিদায় জানালেন এবং ভীমসেনকে যুবরাজ করলেন। মহামতি বিদুরকে রাজকার্য সম্পর্কীয় পরামর্শ, সন্ধি-বিগ্রহ, প্রস্থান, স্থিতি, আশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—এই ছয়টি স্থির করার অধিকার সমর্পণ করলেন। কী কী করা উচিত, কী নয়—এর বিচার এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব স্থির করার ভার তিনি বয়োবৃদ্ধ সঞ্জয়কে দিলেন। সৈন্যের হিসাব রাখা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজের ভার নকুলকে দিলেন। শত্রুদের আক্রমণ করা এবং দুষ্টদমনের কাজ দিলেন অর্জুনকে। ব্রাহ্মণ-দেবতাদের কাজে নিযুক্ত করলেন মহর্ষি ধৌম্যকে। সহদেবকে নিজের সঙ্গে রাখলেন, তিনি সবসময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখাশোনা করতেন। রাজা যাঁকে যে কাজের যোগ্য বুঝলেন, তাঁকেই সেই কাজের ভার দিলেন। তিনি বিদুর, যুযুৎসু ও সঞ্জয়কে বললেন—'আপনারা সকলে সদাসতর্ক থেকে প্রত্যহ আমার বৃদ্ধ পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করবেন। এঁর সব কাজ সম্পূর্ণভাবে করবেন। এই রাষ্ট্রের সমস্ত কাজই এঁর নির্দেশে করা হবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে মৃত তাঁর আত্মীয়স্বজনদের পৃথকভাবে শ্রাদ্ধ করালেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের শ্রাদ্ধে অন্ন, গাভী ও বহুমূল্য রত্নাদি দান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নিয়ে দ্রোণ, কর্ণ, বিরাট রাজা, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ঘটোৎকচ প্রমুখের শ্রাদ্ধ করলেন। যে সকল রাজাদের বংশে পুত্র আদি কেউ জীবিত ছিল না, তাদেরও শ্রাদ্ধ করলেন। হিতৈষী আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে ধর্মশালা ও পুষ্করিণী নির্মাণ করালেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির তাঁদের ঊর্ধ্বদৈহিক সংস্কার করিয়ে ঋণমুক্ত হলেন এবং ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করে কৃতার্থতা অনুভব করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, কুন্তী প্রভৃতি গুরুজনদের যুধিষ্ঠির পূর্বের ন্যায় সেবা করতে লাগলেন এবং পরিজনদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করতে লাগলেন। দীন-দুঃখী, অনাথ-অন্ধদের জন্য গৃহ নির্মাণ এবং যারা পতি-পুত্রহীনা, এদের সকলের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করলেন। সকলের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে সকলের ওপর রাজা যুধিষ্ঠির কৃপা ভাব বজায় রাখতেন।

—— ০ ——

যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি, ভ্রাতা ও আত্মীয় কুটুম্বদের আপ্যায়ন এবং নানাপ্রকার দান

বৈশম্পায়ন বললেন—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়ে গেলে তিনি হাত জোড় করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'প্রভু ! আপনার কৃপা, নীতি, বল, বুদ্ধি ও পরাক্রমের সাহায্যেই আমরা এই পিতা-পিতামহের রাজ্য লাভ করেছি। কমললোচন ! আমি আপনাকে বারংবার প্রণাম জানাই। পবিত্র হৃদয় ব্রাহ্মণগণ আপনাকে বহু নামে স্তুতি করে থাকেন। সমগ্র সৃষ্টি আপনারই লীলা, আপনার থেকেই এর উৎপত্তি, আপনিই এর আত্মা ; আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। সর্বব্যাপী হওয়ায় আপনি 'বিষ্ণু' এবং বিজয়ী হওয়ায় আপনি 'জিষ্ণু' নামে খ্যাত। হরে ! আপনিই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠধামের অধিপতি বৈকুণ্ঠ এবং ক্ষর-অক্ষর পুরুষের অতীত পুরুষোত্তম। পুরাণপুরুষ পরমাত্মারূপে আপনিই সাত বার অদিতির গর্ভ হতে অবতাররূপে উৎপন্ন হয়েছেন[1]। আপনিই পৃশ্নিগর্ভ নামে

---

[1]আদিত্য ও বামনরূপে দুবার অদিতির গর্ভ হতে এবং পৃশ্নিগর্ভ, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে পাঁচবার তাঁর জন্মাদুর্গত পৃশ্নি আদি অন্য রূপের গর্ভে ভগবানের আবির্ভাবের কথা এখানে বলা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ। বিদ্বানগণ ত্রিযুগে আবির্ভূত হওয়ায় আপনাকে 'ত্রিযুগ' নামে বলে থাকেন। আপনার কীর্তি অত্যন্ত পবিত্র, আপনি ইন্দ্রিয়ের প্রেরক এবং যজ্ঞস্বরূপ। আপনাকে হংস বা শুদ্ধ আত্মা বলা হয়। ত্রিনেত্রসম্পন্ন ভগবান শংকর এবং আপনি অভিন্ন। আপনিই বিভু ও দামোদর। বরাহ, অগ্নি, বৃহদ্ভানু (সূর্য), বৃষভ (ধর্ম), গরুড়ধ্বজ, অনকীসাত (শত্রুর তেজ সহ্যকারী), পুরুষ (অন্তর্যামী), শিপিবিষ্ট, যজ্ঞমূর্তি এবং উরুক্রম (বামন) প্রভৃতি আপনারই নাম। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উগ্রসেনাপতি। সত্যস্বরূপ, অন্নদাতা, স্বামী কার্তিকেয়ও আপনিই। আপনি রণে কখনো বিচলিত না হয়ে শত্রুদের পরাস্ত করেন। বৈদিক সংস্কারযুক্ত দ্বিজ এবং সংস্কারহীন দ্বিজেতর মানুষও আপনারই স্বরূপ। আপনিই কামনা বর্ষণকারী বৃষ (ধর্ম)। কৃষ্ণধর্ম (যজ্ঞস্বরূপ), বৃষদর্ভ (ইন্দ্রের দর্প দলনকারী) এবং বৃষাকপিও (হরির) আপনি। আপনিই সিন্ধু (সমুদ্র), নির্গুণ পরমাত্মা ও সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিরূপ ত্রিবিধ তেজ ; ওপর, নীচ এবং মধ্য—তিন দিকও আপনি। আপনি বৈকুণ্ঠধাম থেকে এসে পৃথিবীতে অবতাররূপ ধারণ করেছেন। আপনি সম্রাট, বিরাট, স্বরাট এবং দেবরাজ ইন্দ্র। এই জগৎ আপনার থেকেই উৎপন্ন। আপনি সর্বব্যাপক, নিত্য সত্তারূপ ও নিরাকার পরমাত্মা। আপনিই কৃষ্ণ (সকলকে আকর্ষণকারী) এবং কৃষ্ণবর্ত্মা (অগ্নি)। আপনাকেই লোকে অভীষ্ট সাধক, অশ্বিনীকুমারদের পিতা, কপিল মুনি, বামন, যজ্ঞ, ধ্রুব, গরুড় এবং যজ্ঞসেন বলে। আপনি ময়ূর-পুচ্ছধারী এবং প্রাণীদের মায়াদ্বারা বন্ধনকারী। আপনি সমগ্র আকাশ ব্যাপ্তকারী মহেশ্বর এবং পুনর্বসু নক্ষত্র। সুবভ্রু (অতি পিঙ্গলবর্ণ), রুক্মযজ্ঞ, সুষেণ, দুন্দুভি, গর্ভাস্তনেমি (কালচক্র), শ্রীপদ্ম, পুষ্কর, পুষ্পধারী ঋভু, বিভু অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সদাচারী—এই নামগুলি দ্বারা আপনারই কীর্তন করা হয়। আপনিই জলনিধি সমুদ্র, ব্রহ্মা, পবিত্র ধাম এবং ধামের জ্ঞাতা। কেশব ! বিদ্বান ব্যক্তিরা আপনাকেই হিরণ্যগর্ভ এবং স্বধা, স্বাহা ইত্যাদি নামে ডাকে। কৃষ্ণ ! আপনিই এই জগতের আদি কারণ। আপনিই এটি সৃষ্টি করেন এবং আপনাতেই এর প্রলয় হয়। বিশ্বযোনে ! এই সমস্ত বিশ্ব আপনারই অধীন। শঙ্খ, চক্র, গদাধারণকারী পরমাত্মন ! আপনাকে আমি বারংবার প্রণাম করি।'

ধর্মরাজ এইভাবে সভামধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন জানালেন। এরপর রাজা দরবারে আগত প্রজাদের বিদায় জানালেন। তাঁরা সকলে রাজার অনুমতি নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। তারপর যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"প্রিয় ভ্রাতাগণ ! বিগত মহাসমরে শত্রুরা নানাশস্ত্র প্রহারে তোমাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করেছে। তোমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং বহু কষ্ট সহ্য করেছ ; এখন যাও, নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করো। বিশ্রামের পর সুস্থ হলে কাল আবার আমরা একত্রিত হব।"

তারপর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে দুর্যোধনের মহল সমর্পণ করলেন, সেখানে বহু অট্টালিকা শোভা পাচ্ছিল, পরিপূর্ণ রত্নভাণ্ডার এবং বহু দাস-দাসী সেবা করার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল। মহাবাহু ভীম সেই মহলে গেলেন। দুর্যোধনের রাজমহল যেমন সুসজ্জিত ছিল, দুঃশাসনের মহলও তেমনই সাজানো ছিল। সেখানেও সব কিছুর প্রাচুর্য ছিল, ভবনগুলি সুবর্ণমণ্ডিত এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। রাজার নির্দেশে দুঃশাসনের মহল মহাবাহু অর্জুন পেলেন। দুর্মর্ষণের মহল দুঃশাসনের থেকেও সুন্দর ও সুসজ্জিত ছিল। সেটি মণি-মাণিক্য ও সুবর্ণ সজ্জিত হওয়ায় কুবের ভবনের থেকেও মনোহর ছিল। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেই মহল নকুলকে সমর্পণ করলেন। দুর্মুখের স্বর্ণমণ্ডিত মহলও তেমনই সুন্দর ছিল, সেটি সহদেবকে প্রদান করা হল। যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্মা এবং ধৌম্য—এঁরা সব নিজ নিজ বাসস্থানেই থাকলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে নিয়ে অর্জুনের মহলে গেলেন। সব রাজারা অত্যন্ত প্রসন্ন মনে পান ভোজন করে রাত্রি প্রভাত হলে রাজা যুধিষ্ঠিরের দরবারে উপস্থিত হলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর ! রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভের পর যেসব কার্য করলেন, তা সবিস্তারে বলুন, সেই সঙ্গে ত্রিভুবনের গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রও বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করে সর্বপ্রথম চার বর্ণের মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিলেন। তারপর হাজার হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে এক এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করলেন। যেসব ভৃত্য, শরণাগত অতিথি রাজার ওপর নির্ভরশীল, তাদের বহু সামগ্রী প্রদান করে সন্তুষ্ট করলেন। পুরোহিত ধৌম্যকে সহস্র গাভী, ধন, স্বর্ণ এবং বহু বস্ত্রালঙ্কার দান করলেন। গুরুর ন্যায়

কৃপাচার্যের পূজা করলেন, বিদুরকেও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। রাজা তাঁর আশ্রিতদের অন্ন-বস্ত্রের সুব্যবস্থা করে প্রসন্ন করলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্র যুযুৎসুরও সুব্যবস্থা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের সেবায় সমগ্র সাম্রাজ্য নিবেদন করে যুধিষ্ঠির সর্বান্তকরণে নিশ্চিন্ত এবং সুখি হলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পিতামহ ভীষ্মের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—সমস্ত নগরের প্রজাদের এইভাবে সন্তুষ্ট করে রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন ভগবান এক রত্নমণ্ডিত সুবর্ণ পালঙ্কে উপবিষ্ট, তাঁর শ্যামসুন্দর দেহ নীল মেঘের ন্যায় সুশোভিত, শরীর থেকে তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সমস্ত অঙ্গে নানা দিব্য অলংকার শোভা পাচ্ছিল। তাঁর পীতাম্বর পরিহিত শ্যামদেহ স্বর্ণমণ্ডিত নীলকান্তমণির ন্যায় দেখাচ্ছিল। বক্ষস্থলে কৌস্তুভমণি ছিল উজ্জ্বল। ত্রিলোকে এই মনোহর রূপের কোনো তুলনা নেই। ভগবানের কাছে পৌঁছে রাজা যুধিষ্ঠির মৃদু হাস্যে বললেন—'ভগবান ! আপনার কৃপায় আমরা বিজয়ী হয়েছি এবং স্বধর্ম রক্ষা করতে পেরেছি।'

রাজা এইভাবে অনেক কথা বললেন, কিন্তু ভগবান তার কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি তখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'পরমেশ্বর ! এ কী, আপনি কার ধ্যান করছেন ? মাধব ! আপনার শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে, দেহ-মন বুদ্ধি স্থির এবং আপনার দেহ জড়ের মতো নিশ্চেষ্ট। স্থির বায়ুর মধ্যে যেমন দীপশিখা নিষ্কম্প থাকে, আপনিও তেমনই স্থির, পাষাণ মূর্তি হয়ে রয়েছেন। আমার যদি শোনার অধিকার থাকে এবং আমার কাছে গোপন করার বিষয় না হয়, তাহলে আপনি আমার এই উৎকণ্ঠা দূর করুন। আমি আপনার শরণাগত হয়ে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। পুরুষোত্তম ! আপনিই এই জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা, আপনিই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ, আপনি অনাদি, অনন্ত, সকলের আদি কারণ। আমি আপনার শরণাগত ভক্ত, মাথা নত করে আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনি আমাকে এই ধ্যানের রহস্য বলুন।'

যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা শুনে মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্যে বললেন—'রাজা ! শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম এখন আমার ধ্যান করছেন, তাই আমার মনও তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছে। যিনি তেইশ দিন পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হননি, সেই ভীষ্ম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিকে একাগ্র করে বুদ্ধির সাহায্যে মনকেও নিজের অধীন করে আমার শরণ গ্রহণ করেছিলেন, তাই আমার মনও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ভগবতী গঙ্গা যাঁকে নিজ গর্ভে ধারণ করেছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে যিনি শিক্ষালাভ করেছেন, যিনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র এবং চতুরঙ্গ বেদ সম্বন্ধে পারঙ্গম, সমস্ত বিদ্যার আধার, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান যাঁর দৃষ্টির সামনে প্রসারিত, সেই শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা ভীষ্মের অন্তরে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম। নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম স্বর্গবাসী হলে এই পৃথিবী অমাবস্যার রাত্রের মতো শ্রীহীন হয়ে যাবে। অতএব

আপনি গঙ্গানন্দন ভীষ্মের কাছে চলুন এবং তাঁকে প্রণাম করে মনে যা প্রশ্ন থাকে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের স্বরূপের হেতু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্যুর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী যজ্ঞাদি কর্মগুলি এবং চার আশ্রম ও রাজাদের ধর্ম সম্পর্কে আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। কৌরব বংশের ভারবহনকারী এই ভীষ্মরূপ সূর্য যখন অস্তাচলে যাবেন, তখন সর্বপ্রকার জ্ঞানের প্রকাশ ব্যাহত হবে ; সেইজন্য আমি আপনাকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য বলছি।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—'মাধব ! আপনি ভীষ্মের প্রভাব সম্বন্ধে ঠিক কথা বলেছেন ; তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমিও তাঁর প্রভাব জানি। আমি তাঁর মহাসৌভাগ্য ও প্রভাবের কথা বহু ব্রাহ্মণদের কাছে শুনেছি। আপনি সমস্ত জগতের বিধাতা ; তাই আপনার কথার অন্যথা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রভু ! আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহলে আপনার সঙ্গেই আমরা ভীষ্মের কাছে যেতে চাই। সূর্যের উত্তরায়ণ হলেই তিনি দেবলোকে গমন করবেন, সুতরাং এখনই আপনার তাঁকে দর্শন দেওয়া দরকার।'

ধর্মরাজের কথা শুনে মধুসূদন নিকটে উপবিষ্ট সাত্যকিকে রথ প্রস্তুত করতে বললেন। নির্দেশ পেয়ে সাত্যকি শিবিরের বাইরে এসে দারুককে রথ প্রস্তুত করে আনতে বললেন। সাত্যকির নির্দেশানুসারে দারুক রথ প্রস্তুত করে আনলেন। সেই রথের চারদিক স্বর্ণমণ্ডিত ছিল, ভেতরের দিকটি মণিমুক্তা দিয়ে সাজানো। সূর্যের কিরণে সেই মণিমুক্তা নানা রংয়ের আভা বিকীরণ করত। সেই রথে শৈব্য এবং সুগ্রীব নামের ঘোড়া জোড়া ছিল। রথ তৈরি করে দারুক ভগবানের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে তাঁকে সংবাদ দিল।

ভীষ্ম কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম কীভাবে শরীর ত্যাগ করলেন ? তখন তিনি কোন যোগ ধারণ করেছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তুমি পবিত্রভাবে একাগ্রচিত্তে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাত্মা ভীষ্মের দেহত্যাগের বৃত্তান্ত শোনো। দক্ষিণায়ন সমাপ্ত করে সূর্য যখন উত্তরায়ণে এলেন, সেইসময় ভীষ্ম ধ্যান মগ্ন হয়ে পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর আশপাশে বহু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অবস্থান করছিলেন। বেদজ্ঞ ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবল, মৈত্রেয়, বশিষ্ঠ, কৌশিক (বিশ্বামিত্র), হারিত, লোমশ, দত্তাত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গল্য, পরশুরাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ু, সংবর্ত, পুলহ, কচ, কশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ডু, মাণ্ডব্য, ধৌম্র, কৃষ্ণানুভৌতিক, উলুক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্কুরি এবং পূরণ—এঁরা এবং আরও বহু সৌভাগ্যশালী মুনি যাঁরা শ্রদ্ধা, শম-দম ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ভীষ্ম নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। শরশয্যায় শায়িত থেকে তিনি পবিত্রভাবে হাত জোড় করে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছিলেন। ধ্যান করতে করতে তিনি অত্যন্ত হর্ষান্বিত হলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল, তিনি জগৎ স্বামী যোগেশ্বর ভগবান বাসুদেবের স্তুতি করতে লাগলেন।

ভীষ্ম বললেন —আমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্য যে স্তব স্তুতি করব, তা বিস্তারিত হোক অথবা সংক্ষিপ্ত, তা শুনে পুরুষোত্তম আমার ওপর সন্তুষ্ট হোন। যিনি স্বত শুদ্ধ, যাঁকে প্রাপ্তির পথও সর্বতোভাবে শুদ্ধ, যিনি সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হংসরূপ এবং প্রজাপালনকারী পরমেষ্ঠি, আমি সেই পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি। সমস্ত জগৎ ধারণকারী শ্রীহরি হলেন পরব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনি অনাদি, অনন্ত। দেবতা বা ঋষি কেউই তাঁকে জানতে পারেন না। একমাত্র এই নারায়ণই সকলকে জানেন। ঋষিগণ নারায়ণ হতেই উৎপন্ন হয়েছেন, সিদ্ধ এবং নাগও তাঁর থেকেই আবির্ভূত। দেবতা এবং দেবর্ষিও তাঁকে অবিনাশী পরমাত্মা বলে জানেন। কিন্তু 'ভগবান নারায়ণ কে, কোথা থেকে আবির্ভূত হয়েছেন—

তাঁর যথার্থ জ্ঞান দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস বা সর্প—কারোরই নেই। তাঁতেই সমস্ত প্রাণী অবস্থান করে, তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হয়। সূত্রে যেমন মণিমুক্তা গ্রথিত হয়ে মালা হয়, তেমনই পরমাত্মাসূত্রে জগৎ ও প্রাণীসমূহ কার্য-কারণসহ গ্রথিত আছে। সমস্ত বিশ্ব তাঁর আধারেই অবস্থিত, এই সব তাঁরই সৃষ্টি। শ্রীহরির সহস্র সহস্র মস্তক, পদ, বাহু, নেত্র এবং মুখ। তিনিই জগতের পরম আধার, তাই তাঁকে নারায়ণ বলা হয়। তিনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর এবং স্থূল হতে স্থূল, তিনি উত্তম হতেও সর্বোত্তম। বাক ও অনুবাকে (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মধ্যে) এবং কর্ম ও ব্রহ্মের প্রতিপাদনকারী বাক্যগুলিতে যে সত্য প্রতিপাদিত হয়েছে তা সৎকর্মা ভগবান বাসুদেবেরই। তিনিই 'সাম' সঙ্গক মন্ত্রগুলির পরমার্থ তত্ত্ব। বিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁর নিত্য নিবাস (সাক্ষাৎকার) হয়। তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—তিনি এই চার রূপেই আবির্ভূত হন এবং ভক্তগণ এই চার দিব্য নামেই তাঁর পূজা করে থাকেন। ভগবান বাসুদেবের প্রসন্নতার জন্য নিত্য তপ (নৈত্তিক কর্ম) করা হয়, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি সকলের আত্মা, সর্বজ্ঞ, সর্বস্বরূপ এবং সকলের উৎপন্নকারী। অরণী যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত রাখে, তেমনই দেবকী মাতা এই ভূমণ্ডলে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, বেদ, যজ্ঞের রক্ষার্থে যাঁকে বসুদেবের সহায়তায় জন্ম দেন, সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে অনন্যভাবে স্থিত সাধক মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যে শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মারূপ গোবিন্দকে জ্ঞানদৃষ্টিতে সাক্ষাৎ করেন, যাঁর পরাক্রম ইন্দ্র ও বায়ুর থেকেও বেশি, যিনি সূর্যের চেয়েও তেজস্বী এবং যাঁর স্বরূপ মানুষের মন- বুদ্ধি ইন্দ্রিয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, আমি সেই প্রজাপালক পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

পুরাণাদিতে যাঁকে 'পুরুষ' নামে বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁকে যুগের প্রারম্ভে 'ব্রহ্মা' এবং যুগান্তের সময় 'সঙ্কর্ষণ' বলা হয়েছে, আমি সেই উপাস্য পরমেশ্বরের উপাসনা করি। যিনি এক হয়েও বহুরূপে প্রকাশমান, সমস্ত কামনাপূরণকারী, যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত অনন্য ভক্ত যে পরমাত্মাকে পূজা করেন, যাঁকে জগতের কোষাগার বলা হয়, যাঁর মধ্যে সমস্ত প্রজা অবস্থিত, যে পরমার্থ সত্যস্বরূপ এবং একাক্ষর ব্রহ্ম (প্রণব), সৎ-অসতের অতীত, যাঁর আদি-মধ্য-অন্ত নেই, যাঁকে দেবতা এবং ঋষিরা ঠিকমতো জানতে পারেন না, মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে সমস্ত দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও নাগগণ যাঁকে সর্বদা পূজা করেন, জাগতিক দুঃখ দূর করার যিনি ঔষধিস্বরূপ, যিনি জন্ম-মৃত্যুর অতীত স্বয়ম্ভু এবং সনাতন দেবতা, যিনি নেত্র ও বুদ্ধির অগোচর, সেই ভগবান নারায়ণের আমি শরণ গ্রহণ করি। যিনি এই বিশ্বের বিধাতা ও জগৎ চরাচরের প্রভু, যাঁকে জগৎ-সংসারের সাক্ষী ও অবিনাশী পরমপদ বলা হয়, আমি সেই পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি।

যিনি স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং দৈত্য সংহারক, এক হয়েও যাঁকে অদিতি দেবী তাঁর গর্ভে বারো আদিত্য রূপে জায়গা দিয়েছেন, সেই সূর্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি তাঁর অমৃতময় কলাধারা শুক্লপক্ষে দেবতাদের এবং কৃষ্ণপক্ষে পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত করেন এবং যিনি সমস্ত দ্বিজের রাজা, সেই চন্দ্ররূপে প্রকাশিত পরমাত্মাকে প্রণাম। যিনি অজ্ঞানময় মহা অন্ধকারের অতীত এবং জ্ঞানালোকে প্রকাশিত আত্মা, যাঁকে জেনে মানুষ মৃত্যুর গ্রাস থেকে মুক্তি পায়, সেই জ্ঞেয়রূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। উক্থ নামক বৃহৎ যজ্ঞের সময়, অগ্ন্যাধান কালে এবং মহাযাগে ব্রাহ্মণরা যাঁকে ব্রহ্মরূপে পূজা করেন, সেই বেদভগবানকে নমস্কার। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ যাঁর আশ্রয়, পঞ্চ হবিষ্য যাঁর স্বরূপ, গায়ত্রী প্রভৃতি সাত ছন্দ যাঁর সাত তন্ত্র, সেই যজ্ঞরূপে প্রকাশমান পরমাত্মাকে প্রণাম। চার[১], চার[২], দুই[৩], পাঁচ[৪] ও দু[৫] অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্রদ্বারা যাঁকে হবিষ্য অর্পণ করা হয়, সেই হোমস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। যজুঃ নামধারণকারী যে বেদরূপ পুরুষ, গায়ত্রী ইত্যাদি ছন্দ যাঁর হস্ত-পদাদি অবয়ব, যজ্ঞ যাঁর মস্তক, 'রথন্তর' এবং 'বৃহৎ' নামক সামই যাঁর সান্ত্বনাপূর্ণ বাণী, সেই স্তোত্ররূপ ভগবানকে প্রণাম। যিনি সহস্র বর্ষে পূর্ণ হওয়া প্রজাপতির যজ্ঞে স্বর্ণপাখাবিশিষ্ট পক্ষীরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেই হংসরূপধারী পরমেশ্বরকে প্রণাম। পদসমূহ যাঁর অঙ্গ, সন্ধি যাঁর শরীরের সংযোগস্থল, স্বর ও ব্যঞ্জন যাঁর কাছে অলংকারস্বরূপ, যাঁকে দিব্য অক্ষর বলা হয়, সেই পরমেশ্বরকে বাণীরূপে নমস্কার। যিনি ত্রিলোকের হিতার্থে যজ্ঞময় বরাহরূপ ধারণ করে এই পৃথিবীকে রসাতল থেকে উত্থিত করেছেন, সেই বীর্যস্বরূপ ভগবানকে প্রণাম। যিনি নিজ যোগমায়ার আশ্রয় নিয়ে শেষনাগের সহস্র ফণায় নির্মিত পালঙ্কে শয়ন করেন, সেই

[১] আশ্রাবয়। [২] অস্তু শ্রৌষট্‌। [৩] যজ। [৪] যে যজামহে। [৫] বষট্‌।

নিদ্রাস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। যাঁর সমস্ত ব্যবহার শুধু ধর্মেরই জন্য, বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মোক্ষের সাধনভূত বৈদিক উপায়ে কাজ করে যিনি সাধুদের ধর্ম-মর্যাদার প্রসার করেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচরণদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ফলাকাঙ্ক্ষা করেন, সেইসব ব্যক্তি বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা যাঁকে পূজা করেন, সেই ধর্মময় ভগবানকে প্রণাম। যে অনঙ্গের প্রেরণায় সমস্ত অঙ্গধারী প্রাণী জন্ম নেয়, যাতে সমস্ত প্রাণী উন্মত্ত হয়ে ওঠে, সেই কামরূপে উদ্ভাসিত পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি স্থূল জগতে অব্যক্তরূপে বিরাজমান, বিশিষ্ট মহর্ষিগণ যাঁর তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, যিনি সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজমান, সেই ক্ষেত্ররূপী পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে ত্রিবিধ বলে প্রতীত হন, গুণাদি কার্যভূত ষোলো বিকারের দ্বারা আবৃত হলেও নিজ স্বরূপেই স্থিত থাকেন, সাংখ্য মতানুসারে যাঁকে উক্ত ষোলো বিকারের সাক্ষী ও তার থেকে নির্লিপ্ত সতেরোতম তত্ত্ব (পুরুষ) বলে মানা হয় সেই সাংখ্যরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। যিনি নিদ্রা জয় করে প্রাণের ওপর বিজয়লাভ করেছেন এবং ইন্দ্রিয়াদি বশ করে শুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত হয়েছেন, সেই নিরন্তর যোগাভ্যাসে ব্যাপৃত যোগীগণ সমাধিতে যাঁর জ্যোতির্ময় স্বরূপ সাক্ষাৎ করেন, সেই যোগরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম। পাপ ও পুণ্য ক্ষয় হলে পুনর্জন্ম ভয়মুক্ত শান্তচিত্ত সন্ন্যাসী যাঁকে প্রাপ্ত হন, সেই মোক্ষরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। সৃষ্টির এক হাজার যুগ পার হলে প্রচণ্ড জ্বালাযুক্ত প্রলয়কালীন অগ্নিরূপ ধারণ করে যিনি সমস্ত প্রাণীদের সংহার করেন, সেই উগ্ররূপধারী পরমাত্মাকে প্রণাম। এইভাবে সমস্ত ভূতাদি ভক্ষণ করে যিনি এই জগৎকে জলময় করে দেন এবং নিজে বালকরূপ ধারণ করে অক্ষয়বটের পাতার ওপর শয়ন করেন, সেই মায়াময় বালমুকুন্দকে নমস্কার। যাঁর ওপর এই বিশ্ব নির্ভরশীল, সেই ব্রহ্মাণ্ডকমল যে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের নাভি থেকে প্রকটিত হয়েছে, সেই কমলরূপধারী পরমেশ্বরকে প্রণাম।

যাঁর সহস্র মস্তক, যিনি অন্তর্যামীরূপে সবার মধ্যে বিরাজমান, যাঁর স্বরূপ কোনো সীমায় আবদ্ধ নয়, চার সমুদ্র মিলে একার্ণব হলে যিনি যোগনিদ্রার আশ্রয়ে শয়ন করেন, সেই যোগনিদ্রারূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। যাঁর মস্তকে কেশের পরিবর্তে মেঘ, শরীরের সন্ধিস্থলে নদী এবং উদরে চারটি সমুদ্র, সেই জলরূপী পরমেশ্বরকে প্রণাম। সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ বিকার যাঁর হতে উৎপন্ন হয়, যাঁতে সবকিছু লয়প্রাপ্ত হয়, সেই কারণরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি রাত্রেও জাগ্রত থাকেন আর দিনেও সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন এবং যিনি সর্বদা সকলের ভালোমন্দ দেখে থাকেন, সেই দ্রষ্টারূপী পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি প্রত্যেক যুগে যোগমায়ার বলে অবতাররূপ ধারণ করেন এবং মাস, ঋতু, অয়ন ও বর্ষাদির দ্বারা সৃষ্টি ও প্রলয় করে থাকেন, সেই কালরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম। ব্রাহ্মণ যাঁর মুখ, ক্ষত্রিয় জাতি যাঁর বাহু, বৈশ্য জঙ্ঘা ও উদর এবং শূদ্র যাঁর চরণাশ্রিত, সেই চাতুর্বর্ণরূপ পরমেশ্বরকে শতকোটি প্রণাম। অগ্নি যাঁর মুখ, স্বর্গ মস্তক, আকাশ নাভি, পৃথিবী পা, সূর্য নেত্র, দিগন্ত কান, সেই লোকরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম।

যিনি কালের অতীত, যজ্ঞের অতীত এবং অতীতেরও অতীত, সমস্ত বিশ্বের যিনি আদি, কিন্তু যাঁর কোনো আদি-অন্ত নেই, সেই বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরকে প্রণাম। বৈশেষিক দর্শনে বর্ণিত রূপ-রস ইত্যাদি গুণে আকৃষ্ট হয়ে যারা বিষয় সেবনে প্রবৃত্ত হয়, তাদের সেই বিষয়াসক্তি থেকে যিনি রক্ষা করেন, সেই রক্ষকরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম। যিনি অন্নজলরূপ ইন্ধনকে লাভ করে শরীরের মধ্যে রস ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করেন এবং সমস্ত প্রাণীদের ধারণ করেন, সেই প্রাণাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার। প্রাণরক্ষার জন্য যিনি চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়——চার প্রকার অন্নের ভোগ গ্রহণ করেন এবং স্বয়ংই উদরস্থ অগ্নিরূপে তা হজম করেন, সেই পাকরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি নরসিংহরূপে দানবরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন, সেই সময় যাঁর চক্ষু ও কেশ পিঙ্গল বর্ণের দেখাচ্ছিল, বিশাল দাঁত এবং নখই যাঁর আয়ুধ, সেই দর্পরূপধারী ভগবান নরসিংহকে প্রণাম। যাঁকে দেবতা, গন্ধর্ব, দৈত্য বা দানব ঠিকমতো জানতে পারে না, সেই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম। যে সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীমান অনন্ত নামক শেষনাগরূপে রসাতলে বাস করে সমস্ত জগৎ নিজ মস্তকে ধারণ করেন, সেই বীর্যরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি এই সৃষ্টি পরম্পরা রক্ষার জন্য সমস্ত প্রাণীকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করে মোহমুগ্ধ করে রাখেন, সেই মোহরূপ ভগবানকে নমস্কার। অন্নময়াদি পঞ্চ কোষে স্থিত অন্তরতম আত্মার জ্ঞান হওয়ার পরে বিশুদ্ধ বোধের দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি যাঁকে লাভ করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম।

যাঁর স্বরূপ কোনো প্রমাণের বিষয় নয়, যাঁর বুদ্ধিরূপ

নেত্র সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং যাঁর মধ্যে অনন্ত বিষয়ের সমাবেশ, সেই দিব্যাত্মা পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি জটা ও দণ্ড ধারণ করেন, লম্বোদরবিশিষ্ট এবং যাঁর কমণ্ডলু তূণীরের কাজ করে, সেই ব্রহ্মারূপী ভগবানকে প্রণাম। যিনি ত্রিশূলধারণকারী এবং দেবতাদের প্রভু, যাঁর ত্রিনেত্র এবং দেহ বিভূতি ভূষিত, সেই রুদ্ররূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম। যাঁর মস্তক অর্ধচন্দ্রভূষিত, দেহ সর্পের যজ্ঞোপবীত শোভিত, যিনি হাতে পিণাক ও ত্রিশূল ধারণ করে আছেন, সেই উগ্ররূপধারী ভগবান শংকরকে প্রণাম। যিনি সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং তাদের জন্মমৃত্যুর কারণ, যাঁর মধ্যে ক্রোধ ও মোহের লেশমাত্র নেই, সেই শান্তাত্মা পরমেশ্বরকে প্রণাম। যাঁর মধ্যে সবকিছু বিদ্যমান, যাঁর থেকে সব উৎপন্ন হয়, যিনি স্বয়ং সর্বস্বরূপ, সর্বব্যাপক এবং সর্বময়, সেই সর্বাত্মাকে প্রণাম।

এই বিশ্বসৃষ্টিকারী পরমেশ্বর ! আপনাকে প্রণাম। বিশ্বের আত্মা এবং বিশ্ব উৎপত্তির স্থানভূত জগদীশ্বর, আপনাকে প্রণাম ! আপনি পঞ্চভূতের অতীত এবং সমস্ত প্রাণীদের কাছে মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম। ত্রিলোক ব্যাপ্ত আপনাকে প্রণাম। ত্রিভুবনের অতীত আপনাকে প্রণাম, সমস্ত দিগন্তে ব্যাপ্ত আপনাকে প্রণাম। আপনি সমস্ত পদার্থের পূর্ণ ভাণ্ডার, জগৎ-সংসার উৎপন্নকারী অবিনাশী ভগবান বিষ্ণু, আপনাকে প্রণাম। হৃষীকেশ ! আপনি সকলের জন্মদাতা এবং সংহারকর্তা। আপনি কারো কাছে পরাজিত হন না। ত্রিলোকে আমি আপনার জন্ম-কর্মের রহস্য জানতে পারি না, আমি তো শুধু তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা আপনার যে সনাতন রূপ, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখি। আপনার মস্তক দ্বারা স্বর্গলোক, পদযুগল দ্বারা পৃথিবীলোক এবং তিনপদক্ষেপের দ্বারা তিনলোক আবৃত। আপনি সনাতন পুরুষ। দিক্‌সকল আপনার বাহু, সূর্য আপনার নেত্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা হলেন আপনার বীর্য ; অতিশয় প্রবল বায়ুরূপে আপনি ওপরের সপ্ত লোকে ব্যাপ্ত রয়েছেন। যাঁর কান্তি অতসীর ফুলের মতো শ্যামবর্ণ, দেহে পীতবস্ত্র শোভা পায়, যিনি তাঁর স্বরূপ থেকে কখনো চ্যুত হন না, সেই ভগবান গোবিন্দকে যাঁরা স্মরণ করেন, তাঁরা কখনো ভয় পান না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একবার প্রণাম করলে তা দশ অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে করা স্নানের সমান ফলপ্রদান করে। তাছাড়া প্রণামের বৈশিষ্ট্য হল—দশ অশ্বমেধ যজ্ঞকারী পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামকারী ব্যক্তি আর ভব-বন্ধনে আবদ্ধ হন না। যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ব্রত গ্রহণ করেছেন, যিনি নিত্য শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করে নিদ্রা যান এবং প্রভাতে তাঁকে স্মরণ করেই গাত্রোত্থান করেন, তিনি কৃষ্ণস্বরূপ হয়ে তাঁর সঙ্গে মিশে যান, যেমন যজ্ঞের আগুনে ঘৃত মিশে যায়।

যিনি ব্রাহ্মণদের প্রিয় এবং গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, যাঁর দ্বারা সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হয়, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান গোবিন্দকে প্রণাম। 'হরি' এই দুটি অক্ষর দুর্গম পথে সংকটের সময় প্রাণের জন্য পথচলতি মূল্য ; জগৎ-সংসারের রোগ হতে মুক্তি দেবার জন্য ঔষধ তুল্য এবং সর্বপ্রকার শোক-দুঃখ থেকে উদ্ধারকারী। সত্য যেমন বিষ্ণুময়, তেমনই এই সত্যের প্রভাবে আমার সকল পাপ যেন বিনষ্ট হয়। দেবতা শ্রেষ্ঠ কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! আমি আপনার শরণাগত ভক্ত, অভীষ্ট গতি লাভ করতে চাই ; কীসে আমার কল্যাণ, তা আপনিই জানেন। যিনি বিদ্যা ও তপস্যার জন্মস্থান, যাঁকে অন্য কেউ জন্ম দিতে পারে না, সেই ভগবান বিষ্ণুকে আমি এইভাবে বাণীরূপ যজ্ঞদ্বারা পূজা করছি। ভগবান জনার্দন যেন এতে আমার ওপর প্রসন্ন হন। নারায়ণই পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরম তপ, নারায়ণই সর্বোত্তম দেবতা এবং ভগবান নারায়ণই সর্বদা সকল বস্তুতে বিরাজমান।

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীষ্মের মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই নিবিষ্ট ছিল। তিনি ওপরে বর্ণিত স্তুতি করে 'নমঃ কৃষ্ণায়' বলে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভগবানও তাঁর যোগবলে ভীষ্মের ভক্তি জানতে পেরে অব্যক্তরূপে সেইখানে পৌঁছলেন এবং ত্রিলোকের বিষয় বোধকারী দিব্য জ্ঞান প্রদান করে ফিরে গেলেন। যখন ভীষ্মের কথা বন্ধ হল তখন সেখানে উপস্থিত মহর্ষিগণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলেন এবং ধীরে ধীরে ভীষ্মের প্রশংসা করতে লাগলেন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের ভক্তিভাব দেখে সত্বর তাঁর রথে আরোহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এক রথে গেলেন, অন্য রথে মহাত্মা যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন আরোহণ করলেন। তৃতীয়টিতে ভীম, নকুল, সহদেব— তিন ভ্রাতা

বসলেন। কৃপাচার্য, যুযুৎসু এবং সঞ্জয়ও রথে করে ভীষ্ম সকাশে রওনা হলেন। সেইসময় পথে বহু ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছিলেন, ভগবান প্রসন্নতা সহকারে তা শুনছিলেন। কিছু লোক হাত জোড় করে ভগবানের চরণে প্রণাম জানাচ্ছিল, ভগবান তাঁদের আনন্দ প্রদান করে চলে যাচ্ছিলেন।

ঋষি পরশুরামের চরিত্র

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠির, অন্যান্য পাণ্ডবগণ এবং কৃপাচার্যাদি সকলে তাঁদের নিজ নিজ রথে উপবিষ্ট হয়ে কুরুক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরশুরামের পরাক্রম শোনাতে লাগলেন—'রাজন্ ! এই যে পাঁচটি সরোবর দেখা যাচ্ছে, এগুলি 'রামহ্রদ' নামে প্রসিদ্ধ। পরশুরাম একুশবার এই হ্রদগুলের ক্ষত্রিয়দের সংহার করে এই কুণ্ডগুলিকে তাদের রক্তে প্লাবিত করেছিলেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'যদুনাথ ! পরশুরাম পূর্বে একুশবার এই পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করলে, পুনরায় কীকরে ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি হল ? তিনি কেন ক্ষত্রিয়দের সংহার করেছিলেন ? আপনি আমার এই সন্দেহ দূর করুন ; কারণ বেদ-শাস্ত্র আপনার থেকে বড় নয়।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠির একথা জিজ্ঞাসা করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সব ঘটনা কীভাবে ঘটেছিল, তা জানালেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—কুন্তীনন্দন ! আমি মহর্ষিদের কাছে পরশুরামের প্রভাব, পরাক্রম এবং জন্মের কথা যেভাবে শুনেছি, তা আপনাকে শোনাচ্ছি ; শুনুন ! প্রাচীনকালে জহ্নু নামে এক রাজা ছিলেন ; তাঁর পুত্রের নাম ছিল অজ। অজের পুত্র বলাকাশ্ব এবং বলাকাশ্বের পুত্রের নাম ছিল কুশিক। কুশিক অত্যন্ত ধর্মজ্ঞ ছিলেন, তিনি পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন ; তাই ইন্দ্রই তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম হয় গাধি। রাজা গাধির এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম সত্যবতী। রাজা ভৃগুনন্দন ঋচীক মুনির সঙ্গে কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দেন। সত্যবতী অত্যন্ত সদাচারশীলা ছিলেন, তাঁর শুদ্ধভাবে মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। ঋচীক মুনি সত্যবতী এবং তাঁর মাতা দুজনেরই পুত্র লাভার্থে চরু তৈরি করে সত্যবতীকে ডেকে বললেন—'কল্যাণী ! এখানে দুই পাত্র চরু আছে, এরমধ্যে একটি তুমি নিজে গ্রহণ করো, অন্যটি তোমার মাকে দিও। তাহলে তোমার মাতার গর্ভে এক তেজস্বী পুত্র জন্ম নেবে, যে বহু ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করবে, কোনো ক্ষত্রিয়ই তাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। তেমনই তোমার জন্য যে চরু প্রস্তুত করেছি, তাতে তোমার এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পুত্র লাভ হবে, যে মনকে বশীভূত করে মস্ত তপস্বী হবে।'

স্ত্রীকে এই কথা বলে ঋচীক মুনি বনে তপস্যা করতে গেলেন। সেইসময় রাজা গাধি তাঁর পত্নীকে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে ঋচীকের আশ্রমে এলেন। সত্যবতী তখন দুই হাতে চরু নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে মায়ের কাছে এলেন এবং মুনি তাঁকে যেসব কথা বলেছিলেন, সেগুলি মাকে জানালেন। তাঁর মা ভ্রমক্রমে কন্যার চরুটি নিজে গ্রহণ করে তাঁর চরুটি সত্যবতীকে দিয়ে দিলেন।

তারপর সত্যবতী ক্ষত্রিয় বিনাশকারী গর্ভধারণ করলেন। তাঁর অবস্থা দেখে ঋচীক মুনি বললেন—'কল্যাণী ! আমি তোমার চরুতে ব্রাহ্মণের তেজ স্থাপন করেছিলাম এবং তোমার মাতার চরুতে ক্ষত্রিয়ের সব তেজ প্রদান করেছিলাম ; কিন্তু এখন চরু বদল হয়ে যাওয়ায় সেগুলি হবে না। তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণ হবে আর তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়।' একথা শুনে সত্যবতী কম্পিত হলেন, তিনি পতির চরণে মস্তক রেখে বললেন—'পতিদেব ! একথা বলবেন না, ব্রাহ্মণরহিত পুত্রলাভের আশীর্বাদ আপনি আমাকে করবেন না।'

ঋচীক বললেন—কল্যাণী ! তোমার গর্ভে এমন পুত্র হবে বলে আমি একাজ করিনি, শুধু চরু বদল হওয়ার জন্যই এরূপ ভীষণ পরাক্রমী পুত্র তোমার গর্ভে জন্ম নেবে।

সত্যবতী বললেন—মুনিবর ! আপনি তো ইচ্ছা করলে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে একটি পুত্র উৎপন্ন করা এমন কী কঠিন কাজ ? আমাকে এমন পুত্রদান করুন যে শান্ত ও সরল হবে। আমার পৌত্র যেমনই হোক, আমি শান্ত স্বভাবযুক্ত পুত্রই প্রার্থনা করি।

ঋচীক বললেন—ভদ্রে ! ঠিক আছে, তুমি যা চাও, তাই হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সত্যবতী তারপর জামদগ্নি মুনিকে জন্ম দিলেন, তিনি অত্যন্ত বড় তপস্বী, শান্ত ও নিয়ম পালনকারী ছিলেন। অন্যদিকে কুশিকনন্দন গাধির স্ত্রী বিশ্বামিত্রের জন্ম দিলেন, যিনি সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং ব্রহ্মর্ষির পদবি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জামদগ্নি যে উগ্রস্বভাবসম্পন্ন পুত্রের জন্ম দিলেন, তিনিই পরশুরাম। পরশুরাম সমস্ত বিদ্যা এবং ধনুর্বেদে পারঙ্গম ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়কুল সংহারকারী এবং জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। গন্ধমাদন পর্বতে মহাদেবকে প্রসন্ন করে তিনি তাঁর কাছ থেকে বহু অস্ত্র এবং অত্যন্ত শক্তিশালী পরশু (কুঠার) লাভ করেছিলেন। জগতে তাঁর সম্মুখীন হওয়ার মতো কেউ ছিল না।

সেই সময়ের কথা, রাজা কৃতবীর্যের অর্জুন নামে এক অত্যন্ত তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যিনি হৈহয়বংশের রাজা ছিলেন। তিনি দত্তাত্রেয়ের কৃপায় সহস্র বাহু লাভ করেন। তিনি মহা তেজস্বী চক্রবর্তী রাজা ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী, যা নিজ বাহুবলে জয় করে ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়েছিলেন। একবার অগ্নিদেব তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাঁর সহস্র বাহুর পরাক্রমের ওপর নির্ভর করে তাঁকে ভিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর বাণের অগ্রভাগে অবস্থান করে অগ্নিদেব বহু গ্রাম, নগর, দেশ, গোশালা ভস্মীভূত করেন। বায়ুর সাহায্যে অগ্নির প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অগ্নি হৈহয়রাজের সাহায্যে জঙ্গল ও পর্বতও ভস্মীভূত করতে থাকেন। তিনি আপব মুনির শূন্য আশ্রমও পুড়িয়ে দেন। তখন আপব মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে অভিশাপ দেন—'তুমি আমার এই জঙ্গলও ভস্মীভূত করে ফেলেছ, সুতরাং যুদ্ধে পরশুরাম তোমার এই হাতগুলি সব কেটে ফেলবে।'

অর্জুন সেই অভিশাপকে তত গুরুত্ব দিলেন না। তাঁর পুত্ররা ছিল অত্যন্ত বলশালী অহংকারী এবং ক্রূর। শাপের জন্য সেই তারাই পিতার বধের কারণ হয়ে দাঁড়াল। একদিন তারা জামদগ্নির গাভীর গোবৎসটিকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। পরশুরাম তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে অর্জুনের বাহুগুলি কেটে ফেললেন এবং গো বৎসটি নিয়ে ফিরে এলেন। অর্জুনের পুত্ররা অত্যন্ত মূর্খ ছিল, তারা ক্রুদ্ধ হয়ে জামদগ্নির আশ্রমে গেল। সেই সময় পরশুরাম সমিধ ও কুশ আনয়নের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। অর্জুনের পুত্ররা সুযোগ বুঝে জামদগ্নির মস্তক কেটে ফেলল। পরশুরাম আশ্রমে এসে পিতাকে নিহত দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, তাঁর ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন করার প্রতিজ্ঞা করে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রথমেই হৈহয়দের আক্রমণ করলেন। পরশুরাম তাঁর পরাক্রমে কার্তবীর্যের সমস্ত পুত্র ও পৌত্রদের বধ করলেন এবং হাজার হাজার হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করলেন। সেইসময় বহু ক্ষত্রিয় বেঁচে গিয়েছিল, তারাই ক্রমশ মহাপরাক্রমী ভূপাল হয়ে উঠল। তারপর পরশুরাম পুনরায় অস্ত্রধারণ করে ক্ষত্রিয় শিশুদের পর্যন্ত হত্যা করলেন। কিন্তু তখনও ক্ষত্রিয় নারীদের গর্ভের শিশুরা বেঁচে গিয়েছিল ; কিন্তু তাদের কেউ জন্মগ্রহণ করলেই পরশুরাম সন্ধান করে তাদের বধ করতেন। সেইসময় কিছু ক্ষত্রিয় নারীগণ নিজেদের গর্ভরক্ষা করতে সক্ষম হন। এইভাবে একুশ বার ক্ষত্রিয় সংহার করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং পৃথিবী কাশ্যপমুনিকে দান করেছিলেন। তখন বাকি ক্ষত্রিয়দের রক্ষার জন্য কাশ্যপমুনি পরশুরামকে বলেন—'রাম ! তুমি দক্ষিণ সমুদ্রতীরে যাও, আমার রাজ্যে আর কখনো বাস কোরো না।'

একথা শুনে পরশুরাম চলে গেলেন। সমুদ্র তাঁর জন্য স্থান নির্ধারিত করে দিল, সেই দেশ শূর্পারক দেশ নামে প্রসিদ্ধ ; একে অপরান্ত ভূমিও বলা হয়। কশ্যপমুনি পরশুরাম প্রদত্ত পৃথিবী স্বীকার করে সেগুলি ব্রাহ্মণদের সমর্পণ করে স্বয়ং বনে চলে গেলেন। সেইসময় কোনো পরাক্রমশালী রাজা না থাকায় চতুর্দিকে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ল। বলবান লোকেরা দুর্বলদের কষ্ট দিতে লাগল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কারো প্রভুত্বই স্থায়ী হয়নি। কালক্রমে পাপীদের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হতে লাগল। অত্যাচারে পীড়িত হয়ে এই পৃথিবী রসাতলে যেতে লাগল। তাই দেখে কশ্যপ তাঁর উরুর সাহায্য দিয়ে তাকে আটকালেন, তাই তাকে 'উর্বী' বলা হত। তখন এই পৃথিবী নিজ রক্ষার জন্য কশ্যপকে প্রসন্ন করে বর চাইলেন—'ব্রহ্মন্ ! আমি বহু হৈহয়বংশী ক্ষত্রিয় নারীদের গর্ভের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাঁরা আমাকে রক্ষা করবেন। এছাড়াও পুরুবংশীয় বিদূরথেরও একপুত্র জীবিত আছেন, যাঁকে ঋক্ষবান পর্বতের ওপর ভল্লুকরা পালন করছেন। এইভাবে মহর্ষি পরাশর দয়াপরবশ হয়ে রাজা সৌদাসের

পুত্রদের জীবন রক্ষা করেছেন। রাজা শিবিরও এক তেজস্বী পুত্র আছে, যার নাম গোপতি। তাকে বনের গাভীরা বড় করেছে। রাজা প্রতর্দনের পুত্র বৎসও জীবিত আছে, যাকে গোশালাতে গো-বৎসেরা পালন করেছে। দিবিরথের পুত্রকে মহর্ষি গৌতম গঙ্গাতীরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মহা তেজস্বী বৃহদ্রথও জীবিত আছেন, তাঁকে গৃধ্রকূট পর্বতে হনুমানেরা প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং মরুত্ত বংশে জাত বহু ক্ষত্রিয় বালককে সমুদ্র রক্ষা করেছে। এইসব রাজপুত্র বালক বিভিন্ন স্থানে আছে, এরা যদি আমাকে রক্ষা করে তাহলে আমি স্থিরভাবে থাকতে পারি। এদের পিতা-পিতামহ পরশুরামের হাতে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আমি ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘনকারী ক্ষত্রিয় দ্বারা নিজের রক্ষা করতে চাই না। ধার্মিক পুরুষদের সংরক্ষণেই থাকব। আপনি শীঘ্র এর ব্যবস্থা করুন।'

পৃথিবীর অনুরোধ শুনে কশ্যপ উপরিউক্ত রাজকুমারদের একত্র করলেন এবং তাঁদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। রাজন্ ! আপনার জিজ্ঞাসায় আমি এই প্রাচীন ইতিহাস শোনালাম।

—— ১ ——

ভীষ্মের প্রশংসায় শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণকে ধর্মোপদেশ দানের জন্য অনুরোধ করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহারাজ যুধিষ্ঠির, পিতামহ ভীষ্ম যেখানে শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, সেখানে এসে পৌঁছলেন। এই নির্জন স্থানটি ওঘবতী নদীর তীরে অবস্থিত। দূর থেকে ভীষ্মকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, চার ভ্রাতা, কৃপাচার্য এবং অন্য সকলে নিজ নিজ রথ থেকে নেমে, যেখানে ঋষিগণ উপবেশন করেছিলেন, সেইখানে এলেন। তাঁরা সকলে প্রথমে ব্যাসদেব ও অন্যান্য মহর্ষিদের প্রণাম করলেন, পরে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ঘিরে উপবেশন করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—'পিতামহ ! বাণের আঘাতে যে কষ্ট আপনাকে সহ্য করতে হয়েছে, সেই ব্যথা আর পীড়া দিচ্ছে না তো ? কারণ অনেক সময় মানসিক দুঃখ থেকে শারীরিক দুঃখ বেশি প্রবল হয়—তা সহ্য করা কষ্টকর। শরীরে একটি ছোট্ট কাঁটা ফুটলেও তীব্র কষ্ট হয়, তাই আপনি যে শরশয্যায় শায়িত আছেন, তার জন্য যন্ত্রণা তো অধিক হবেই। তবু আপনার সম্পর্কে একথা বলা উচিত নয় ; কারণ আপনি জানেন—প্রাণীদের জন্ম ও মৃত্যু হতেই থাকে। তাই একে দৈবের বিধান মনে করে আপনি হয়ত ভয় পাননি। আপনি তো দেবতাদেরও উপদেশ দিতে সক্ষম। আপনার জ্ঞান সকলের থেকে বেশি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সবই আপনি দেখতে পান। প্রাণীকুলের বিনাশকাল, ধর্মের ফলাফল এবং কখন সেটি ফলপ্রসূ হবে—সবই আপনার নখদর্পণে রয়েছে। আপনি যথার্থ ধর্মজ্ঞ এবং এক অতি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে হাজার হাজার নারী পরিবৃত থেকেও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। ত্রিলোকে আমি আপনার ন্যায় সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ, শূরবীর এবং পরাক্রমী ব্যক্তি দেখিনি, যিনি শরশয্যায় শায়িত থেকেও নিজ তপোবলে স্বভাবসিদ্ধ মৃত্যুকে রোধ করতে সক্ষম। তাত ! সত্য, তপ, দান এবং যজ্ঞাচরণে, বেদ, ধনুর্বেদ এবং নীতিশাস্ত্রের জ্ঞানে, কোমল ব্যবহারে, আন্তর্বাহ্যশুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দমন, সকল প্রাণীর হিতসাধনে আমি আপনার মতো অন্য কোনো মহারথীকে দেখিনি। সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষসদের আপনি একাকীই পরাজিত করতে সক্ষম, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। মহাবাহু ! আপনি গুণাদিতে বসুদের থেকে কোনো অংশেই কম নন। তাই ব্রাহ্মণরা আপনাকে নবম বসু বলে থাকেন। পুরুষদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ, এবং নিজ শক্তির দ্বারা দেবতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। আমি এই পৃথিবীতে আপনার ন্যায় গুণযুক্ত মানুষ কখনো দেখিনি এবং আছে বলে শুনিনি। আপনি আপনার গুণাবলীর জন্য দেবতাদের থেকেও অধিক এবং তপস্যার দ্বারা সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করতে সক্ষম ; তাই আপনার কাছে একটি নিবেদন করতে চাই। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয়স্বজন, ভ্রাতা-বন্ধু বিনাশে খুবই দুঃখী হয়ে আছেন, আপনি কোনোভাবে তাঁর শোক প্রশমিত করুন। শাস্ত্রে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের যেসব ধর্ম বলা আছে, সেসবই আপনি জানেন। চার বিদ্যায়

যেসব ধর্মের প্রতিপাদন করা হয়েছে, চার প্রকারের হোতাদের যে কর্তব্য, যোগ ও সাংখ্যে যে সনাতন ধর্ম বর্ণিত আছে, সেসবই আপনি ব্যাখ্যাসহ জানেন। দেশ, জাতি ও কুলধর্মও আপনার বিদিত। বেদকথিত ধর্ম এবং শিষ্ট পুরুষদের বলা সদাচারও আপনার অজ্ঞাত নয়। ইতিহাস ও পুরাণের অর্থও আপনার জ্ঞাত আছে, সেগুলি আপনি ব্যতীত কেউ সমাধান করতে সক্ষম নয়। তাই রাজন্! যুধিষ্ঠিরের চিত্তে যে শোকের উদয় হয়েছে, তাকে আপনি শান্ত করুন।'

শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলি শুনে ভীষ্ম অল্প একটু মাথা তুলে হাত জোড় করে স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন—'সমস্ত লোকের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার। হৃষীকেশ! আপনিই সকলের উৎপত্তি ও সংহারকারী। আপনি কারো কাছে পরাজিত হন না। এই বিশ্ব আপনারই সৃষ্টি, আপনিই এর আত্মা এবং উৎপত্তির স্থান। আপনি পঞ্চভূতের অতীত এবং প্রাণীদের মোক্ষস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার। ত্রিলোকে ব্যাপ্ত পরমেশ্বর, আপনাকে প্রণাম এবং ত্রিলোকের অতীত বিরাজমান প্রভু আপনাকে প্রণাম। যোগীশ্বর! আপনিই সকলের শরণদানকারী, আপনাকে নমস্কার। পুরুষোত্তম! আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন, তারই প্রভাবে আমি এখন ত্রিলোকে আপনার দিব্য ভাব দেখতে পাচ্ছি এবং আপনার সেই সনাতন স্বরূপও আমি দেখছি। আপনি অমিত তেজস্বী বায়ুরূপে ওপরের সপ্তলোক পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আকাশ আপনার মস্তকে এবং পৃথিবী আপনার চরণে পরিব্যাপ্ত। সকল দিক আপনার বাহু, সূর্য নেত্র এবং শুক্রাচার্য বীর্য। আপনার শ্যাম দেহ পীতাম্বর পরিধানে বিজলিসহ মেঘের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। কমলনয়ন দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণাগত ভক্ত, আমি অভীষ্ট গতি লাভ করতে চাই। আমার যাতে কল্যাণ হয়, আপনি সেই উপায়ই ভাবুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার মধ্যে আপনার পরাভক্তি আছে, তাই আপনি আমার দিব্য দর্শন লাভ করেছেন। ভারত! আপনি আমার ভক্ত এবং আপনার স্বভাবও শুদ্ধ ও সরল, সেই সঙ্গে আপনি জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী, সত্যবাদী, দানী এবং পরম পবিত্র। আপনি আপনার তপস্যার বলে আমার দর্শন পাওয়ার অধিকারী। আপনার সেবার জন্য দিব্যলোক প্রস্তুত, সেখানে গেলে আর ইহলোকে ফিরে আসতে হয় না। আপনার জীবনের আর ছাপ্পান্ন দিন বাকি আছে, তারপর আপনি এই শরীর ত্যাগ করে আপনার শুভকর্মের ফলস্বরূপ উত্তম লোকে গমন করবেন। দেখুন, দেবতা এবং বসুগণ বিমানে উপবেশন করে আকাশে অদৃশ্যভাবে থেকে উত্তরায়ণে সূর্য যাওয়ার জন্য আপনার প্রতীক্ষা করছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে লোকে গিয়ে পুনরায় জগতে ফিরে আসেন না, আপনিও সেখানেই যাবেন। বীরবর! আপনি চলে গেলে ইহলোকে দিব্য জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে ; তাই এঁরা ধর্মজিজ্ঞাসা নিয়ে আপনার কাছে এসেছেন। সুতরাং আপনি এখন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম, অর্থ ও যোগের সম্যক বিষয় বর্ণনা করে এঁর শোক অপনোদন করুন।'

ভীষ্মের অক্ষমতা জানানো, তাঁকে বরপ্রদান করে ভগবানের প্রস্থান এবং পরদিন পুনরায় সকলকে নিয়ে সেইস্থানে উপস্থিত হওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-অর্থ বিষয়ক কথা শুনে শান্তনুনন্দন করজোড়ে বললেন—'জগদীশ্বর! আপনি কল্যাণকারী নারায়ণ! আপনার অপার করুণা। আপনি কখনো আপনার মহিমা-চ্যুত হন না। আজ আপনার কথা শুনে আমি আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আর আপনাকে কী বলব, কেননা বাণীর সমস্ত বিষয় আপনার বেদরূপ বাণীতে অবস্থিত। যে ব্যক্তি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে দেবলোকের বৃত্তান্ত জানাবার সাহস রাখে, সেই সকল বাণে বিদ্ধ হওয়ায় আমার যে কষ্ট ও বেদনা হচ্ছে, তাতে আমার সমস্ত অঙ্গ পীড়ায় শিথিল হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধি কাজ করছে না। এখন আমার কিছু বলার ক্ষমতা নেই। বিষ ও আগুনের ন্যায় এই বাণ আমাকে নিরন্তর পীড়িত করছে, শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণবায়ু নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্য উতলা হয়ে আছে। শক্তি হ্রাস পাওয়ায় জিহ্বা কাজ করছে না। এই অবস্থায় কীকরে কথা বলব। প্রভু! আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন। ক্ষমা করুন, আমি

কিছু বলতে পারছি না। আপনার সামনে ধর্মোপদেশ দিতে গেলে বৃহস্পতিও কুণ্ঠাবোধ করবেন, আমার তো কথাই নেই। এখন তো আমার দিকেরও জ্ঞান নেই এবং আকাশ ও পৃথিবীর সম্বন্ধেও কোনো ধারণা করতে পারছি না। শুধুমাত্র আপনার শক্তিতেই প্রাণধারণ করে আছি। অতএব ধর্মরাজের যাতে মঙ্গল হয়, তা আপনিই বলুন ; কারণ স্বয়ং আপনি শাস্ত্রগুলিরও শাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি জগতের কর্তা এবং সনাতন পুরুষ, আপনি থাকতে আমার ন্যায় মানুষ কীকরে উপদেশ দিতে পারে ? গুরু থাকলে কী শিষ্য উপদেশ দানের অধিকারী হতে পারে ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'গঙ্গানন্দন ! আপনি সর্বতোভাবে আপনার যোগ্য কথাই বলেছেন ; কারণ আপনি সর্বজ্ঞ। তাছাড়া বাণের আঘাতে যে কষ্টের কথা বললেন, তাতে আমি প্রসন্ন হয়ে আপনাকে বর দিচ্ছি ; তা গ্রহণ করুন। এখন থেকে আপনার আর ক্লান্তি বোধ হবে না, মূর্ছা বা জ্বালাও নয় এবং পীড়াও হবে না। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাও চলে যাবে। আপনার অন্তরে সর্বপ্রকার জ্ঞান উদ্ভাসিত হবে। আপনার বুদ্ধি কোনো বিষয়েই কুণ্ঠিত হবে না। মন সর্বদা সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকবে। রজোগুণ বা তমোগুণ তার ওপর প্রভাব ফেলবে না। আপনি যে কোনো ধর্ম বা অর্থযুক্ত বিষয় চিন্তা করবেন, আপনার বুদ্ধি সাফল্যের সঙ্গে তা এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করে স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজ—এই চার প্রকারের প্রাণী দেখতে পাবেন এবং আপনার জ্ঞানদৃষ্টিতে সংসার-বন্ধনগ্রস্ত আবদ্ধ জীবদেরও সাক্ষাৎকার লাভ করবেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ ঋক্, সাম ও যজুঃ বেদ মন্ত্রের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, নানা বাদ্য বেজে উঠল। সূর্য পশ্চিমে অস্তগমন করতে উদ্যত হলেন। তখন সমবেত সকল মহর্ষি উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় চাইলেন। পাণ্ডবসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, সঞ্জয় এবং কৃপাচার্য তাঁদের সকলকে প্রণাম করলেন। তারপর তাঁরা 'আগামী কাল আবার সাক্ষাৎ হবে' বলে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবরাও ভীষ্মের কাছে বিদায় গ্রহণ করে নিজেদের সুন্দর রথে আরোহণ করে চতুরঙ্গিণী সেনার সঙ্গে হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। পাণ্ডব মহারথীদের সামনে ও পিছনে দুই দিকেই সেনা চলছিল। কিছুক্ষণ পর পূর্বদিকে চন্দ্রের উদয় হল। চন্দ্রালোকে উৎফুল্ল সৈন্যদল যথাসময়ে কৌরব-রাজধানী হস্তিনাপুরে গিয়ে পৌঁছাল এবং সকলেই নিজ নিজ স্থানে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পালঙ্কে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, অর্ধপ্রহর বাকি থাকতে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রোত্থিত হয়ে সনাতন ব্রহ্ম স্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হলেন। তারপর পুরাণ ও স্মৃতির মর্মজ্ঞ পুরুষগণ সেখানে এসে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন। শঙ্খ ও মৃদঙ্গ ধ্বনি হতে লাগল, বীণা ও বংশীর মনোরম ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের মহলেও মাঙ্গলিক গীতি-বাদ্য হতে লাগল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃস্নান করলেন, তারপর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে যজ্ঞ করলেন। পরে চতুর্বেদ জ্ঞাতা এক হাজার ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে এক এক হাজার গাভী দান করলেন। তারপর মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করে সাত্যকিকে নির্দেশ দিলেন—'যুযুধান ! রাজমহলে গিয়ে খোঁজ নাও রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে দর্শন করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত কী না।'

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে সাত্যকি তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার প্রতি কী আদেশ।' সেই কথা শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন—'ধনঞ্জয় ! আমার রথ প্রস্তুতের আদেশ দাও। আজ সৈন্য সঙ্গে যাবে না, শুধু আমরাই যাব। আজ থেকে পিতামহ ভীষ্ম গূঢ় রহস্য উপদেশ প্রদান করবেন ; যাঁরা সেসব শুনতে চান না, তাঁদের সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নেই।'

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন সেইমতো ব্যবস্থা করলেন। তিনি এসে জানালেন মহারাজের রথ প্রস্তুত। তখন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণের ভবনে গেলেন। তাঁরা উপস্থিত হতেই সাত্যকি সহ শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করলেন। রথে উঠে একে অন্যকে কুশল বিনিময় করলেন—'রাত্রি নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হয়েছে তো !' তারপর নানা আলোচনা করতে করতে তাঁরা কুরুক্ষেত্রের দিকে এগোলেন এবং যেখানে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন সেইস্থানে এসে পৌঁছালেন। সেখানে এসে সকলে রথ থেকে নামলেন এবং হাত তুলে মহর্ষিদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির সকলের সঙ্গে ভীষ্মকে দর্শন করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের আলাপ-আলোচনা এবং ভীষ্মের সম্মতিতে প্রশ্ন করার জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুতি

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মহামুনি ! পাণ্ডবগণ যখন শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন, সেই সময় কী আলোচনা হল, আমাকে সব বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সেই সময় নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ এবং বহু সিদ্ধও সেইখানে পদার্পণ করেছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে যাঁরা মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন সেই যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ ভীষ্মের কাছে গিয়ে শোকপ্রকাশ করতে লাগলেন। দেবর্ষি নারদ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে তারপর উপস্থিত রাজা এবং পাণ্ডবদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'মহানুভবগণ ! ভীষ্ম এখন ভগবান সূর্যের ন্যায় অস্ত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, অতএব এখন তাঁর কাছে কিছু গূঢ় তথ্য জানবার আশা রাখি। চার বর্ণের যে বিভিন্ন ধর্ম, তা সবই ইনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীর ত্যাগ করে উত্তম লোকে গমন করবেন ; সুতরাং আপনারা এঁর কাছে আপনাদের মনে যে প্রশ্ন আছে, তা জেনে নিন।'

মহর্ষি নারদের কথায় রাজারা সকলে ভীষ্মের কাছে এলেন ; কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলেন না। সকলেই একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মধুসূদন ! আপনি ছাড়া আর কারোরই পিতামহকে প্রশ্ন করতে সাহস নেই ; সুতরাং আপনিই কথা বলতে আরম্ভ করুন। দেব ! আমাদের মধ্যে আপনিই সব থেকে বড় ধর্মজ্ঞ।' যুধিষ্ঠির এই কথা বললে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজেন্দ্র ! আপনার রাত্রি সুখে অতিবাহিত হয়েছে তো ? আপনার বুদ্ধি এবং বিবেক নিশ্চয়ই এখন জাগরিত হয়েছে, সর্বপ্রকার জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে। আপনার হৃদয়ে আর দুঃখ নেই তো ? মনের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে তো ?'

ভীষ্ম বললেন—'বাসুদেব ! আমার দেহের জ্বালা, মোহ, ক্লান্তি, বৈকল্য, শোক ও রোগ—এসবই আপনার কৃপায় অচিরাৎ দূর হয়েছে। এখন আমি হস্তগত ফলের ন্যায় অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকাল মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। বেদাদিতে যে ধর্ম কথিত আছে এবং বেদান্তদ্বারা যাকে জানা যায় আপনার আশীর্বাদের প্রভাবে সেই সব ধর্ম আমি জানি। জনার্দন ! মহর্ষি ব্যক্তিগণ যে ধর্ম-উপদেশ দিয়েছেন, তাও আমার হৃদয়ে বিরাজমান। দেশ-জাতি ও কুলধর্ম সম্পর্কেও আমি অপরিচিত নই। চার আশ্রমের ধর্মে যে তত্ত্ব আছে, তাও আমার মনে স্ফুরিত হচ্ছে ; সমস্ত রাজধর্মও আমি বিদিত আছি। যে বিষয়ে যা কিছু বলার আছে আমি তার সবই বর্ণনা করব। আপনার কৃপায় এখন আমার কল্যাণময় বুদ্ধি উদয় হয়েছে, আপনার ধ্যানে বলবৃদ্ধি পেয়ে আমি যুবকের শক্তি অনুভব করছি। এখন আমার কল্যাণকর উপদেশ প্রদানের শক্তি এসেছে ; কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হল যে আপনি কেন নিজে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দান করছেন না ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভীষ্ম ! যশ এবং শ্রেয়ের মূল আমিই। জগতের সদ্-অসৎ যে পদার্থ, সবকিছু আমা হতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমি যশোপূর্ণই আছি। এখন আপনার যশবৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তাই আমি আপনাকে প্রজ্ঞা দান করেছি। রাজন্ ! যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, ততদিন সমস্ত জগতে আপনার অক্ষয় কীর্তি অম্লান থাকবে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা উপদেশ প্রদান করবেন, তা বৈদিক সিদ্ধান্তের ন্যায় এই ভূমণ্ডলে গণ্য হবে। যারা আপনার উপদেশকে আদর্শ মনে করে জীবনে প্রতিফলিত করবে, তারা মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার পুণ্যফল লাভ করবে। জগতে আপনার সুযশ যাতে দিগন্ত বিস্তৃত হয়, সেইজন্যই আমি আপনাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছি। রাজন্ ! মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা ভূপালেরা আপনার কাছে ধর্ম জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছে, এদের উপদেশ প্রদান করুন। আপনি যথার্থই শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সদাচার পালন করেছেন, সেইসঙ্গে রাজধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মেও বিশেষজ্ঞ। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কেউই আপনার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখেনি। সকল রাজাই স্বীকার করেন যে আপনি সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা। আপনি সর্বদাই ঋষি ও দেবতাদের উপাসনা করেছেন, সুতরাং আপনার অবশ্যই ধর্ম-উপদেশ প্রদান করা উচিত। বিদ্বান ব্যক্তিদের ধর্ম হল যারা জিজ্ঞাসু, শোনার ইচ্ছা পোষণ করে, শুধুমাত্র

তাদের প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া। প্রশ্ন করলেও যিনি উপদেশ দেন না, তাঁর অত্যন্ত দোষ হয় ; সুতরাং এঁরা শোনার ইচ্ছায় আপনার কাছে এসেছে, আপনি এঁদের অবশ্যই উপদেশ প্রদান করুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে মহাতেজস্বী ভীষ্ম বললেন—'গোবিন্দ ! আপনার আশীর্বাদে এখন আমার মন স্থির হয়েছে এবং বাক্যে বল এসেছে। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এখন আমাকে ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করুক ; আমি প্রসন্ন হয়ে তাকে ধর্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করব। যার মধ্যে ধৈর্য, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য, ক্ষমা, ধর্ম এবং তেজ সর্বদা বিদ্যমান ; যে আত্মীয়স্বজন, অতিথি, অনুচর এবং শরণাগতদের সর্বদা সম্মান করে ; সত্য-দান-তপ-বীরত্ব, শান্তি, দক্ষতা ও স্থৈর্য ইত্যাদি যার মধ্যে সদা বর্তমান ; যে কামনা, ক্রোধ, ভয় অথবা স্বার্থলোভে কখনো অধর্ম করে না ; যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন ও ধর্মে যার সর্বদা মতি থাকে ; যে শাস্ত্রের রহস্য শ্রবণ করে এবং যে নিত্য শান্ত থাকে, সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাজন্ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার কাছে আসতে সঙ্কোচ বোধ করছেন, নিজেকে অপরাধী ভেবে ভীত হচ্ছেন। যিনি তাঁর পূজনীয়, সম্মানের পাত্র, যাঁদের প্রতি তাঁর ভক্তি অসীম এবং যাঁরা গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনদের অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের সকলকে বাণে বিদীর্ণ করায়, তিনি লজ্জা ও ভয়ে আপনার সামনে আসছেন না।

ভীষ্ম বললেন—শ্রীকৃষ্ণ ! দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেমন ব্রাহ্মণদের ধর্ম, তেমনই যুদ্ধে বিপক্ষীয়দের বধ করাও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। জ্যেষ্ঠ পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা, গুরু, শ্যালক, বন্ধু—যেই হোক, সে যদি অধর্মপথে চলে, তাহলে তাকে যুদ্ধে বধ করাই ধর্ম। গুরুও যদি লোভ বশে পাপের সঙ্গ নেয় এবং নিজের ধর্ম থেকে সরে আসে, তবে তাকে বধ করা ক্ষত্রিয়দের ধর্ম। যে লোভবশত ধর্মের সনাতন মর্যাদায় দৃষ্টি রাখে না, তাঁকে যে যুদ্ধে নিহত করে, তাকে ক্ষত্রিয়-ধর্মজ্ঞ মনে করা উচিত। যুদ্ধে যে ক্ষত্রিয় রক্তনদী প্রবাহিত করে, তাকে ধর্মজ্ঞ বলা হয়। যুদ্ধে শত্রু আহ্বান করলে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। মনু বলেছেন যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কাছে ধর্মের পোষক, স্বর্গপ্রদানকারী এবং যশপ্রদানকারী।

ভীষ্মের কথা শুনে ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চরণে মাথা নত করলেন। ভীষ্ম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে প্রসন্ন করলেন এবং আশীর্বাদ করে বললেন—'পুত্র ! উপবেশন করো ; ভয় পেয়ো না ; সংকোচ পরিত্যাগ করে যা জানতে চাও বলো আমি উত্তর দেব।'

—o—

যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় ভীষ্মের রাজোচিত শিষ্টাচারের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকে প্রণাম করে উপস্থিত গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন যে রাজধর্মই শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে বিস্তারিতভাবে রাজধর্ম সম্বন্ধে বলুন। রাজধর্মে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবকিছুরই সমাবেশ থাকে। ঘোড়াকে বশ করতে যেমন চাবুক ও হাতিকে বশ করতে অঙ্কুশের প্রয়োজন হয়, তেমনই সমস্ত পৃথিবীকে স্বমহিমায় রাখার জন্য রাজধর্মের প্রয়োজন থাকে। প্রাচীন রাজর্ষিরা যার সেবা করেছেন, সেই রাজধর্মে রাজা যদি মোহবশত ভুল করে বসেন তাহলে সংসারে অরাজকতার সৃষ্টি হয় এবং সকলে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সূর্য উদয় হলে যেমন অন্ধকার নাশ হয়, তেমনই রাজধর্ম মানুষের অশুভ গতি রোধ করে। সুতরাং আমার জন্য সর্বপ্রথমে রাজধর্ম নিরূপণ করুন ; কারণ আপনি সমস্ত ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমরা সকলে আপনার কাছ থেকেই শাস্ত্রের পরম রহস্য জ্ঞাত হতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আপনাকেই সকল বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন।

ভীষ্ম বললেন—আমি মহাধর্ম, বিশ্ববিধাতা শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত ব্রাহ্মণদের নমস্কার করে সনাতন ধর্ম বর্ণনা করছি। যুধিষ্ঠির ! এখন তুমি একাগ্র হয়ে আমার কাছে রাজধর্ম এবং আরও যা কিছু শুনতে চাও, তা পূর্ণরূপে শোনো। কুরুশ্রেষ্ঠ ! রাজার সর্বপ্রথম কাজ হল প্রজাদের মঙ্গলসাধন করা—তাদের প্রসন্ন রাখা। তার জন্য রাজার দেবতাদের শাস্ত্রমতে পূজা-অর্চনা এবং ব্রাহ্মণদের পূর্ণ সম্মান জানানো উচিত। কারণ দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজার দ্বারা রাজা ধর্মঋণ থেকে মুক্তিলাভ করে এবং প্রজারা তাকে সম্মান জানায়। পুত্র ! তুমি জয়লাভের জন্য সর্বদা পৌরুষ দেখাবে ; পুরুষার্থ ব্যতীত শুধু দৈবের দ্বারা রাজার কর্ম

সিদ্ধ হয় না। যদিও কার্যসিদ্ধির জন্য দৈব ও পুরুষার্থ উভয়ই সমান, তবুও আমি এরমধ্যে পৌরুষকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। আরম্ভ করা কাজ যদি আশানুরূপ না হয়, তার জন্য মনে দুঃখ করবে না. নিজে সর্বদা কাজে ব্যাপৃত থাকবে—রাজাদের এটিই হল প্রধান নীতি।

সত্য ব্যতীত অন্য কোনো কিছু রাজাদের সিদ্ধি প্রদান করে না, সত্যপরায়ণ রাজা ইহলোকে ও পরলোকে সদাই সুখে থাকেন। ঋষিদেরও সত্যই পরম ধন। তেমনই রাজাদেরও সত্য ভিন্ন অন্য কোনো সাধন বিশ্বাস প্রদান করে না। যে রাজা গুণবান, শীলবান, মনকে বশে রাখেন, কোমলস্বভাবসম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নবদন এবং দাতা, তিনি কখনো রাজলক্ষ্মী ভ্রষ্ট হন না। কুরুনন্দন ! সদা কোমল ব্যবহারকারী রাজাকে কেউ মানে না এবং সর্বদা কঠোরভাবে শাসনকারী রাজার জন্যও সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে ; তাই তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী কোমল ও কঠোর ব্যবহার করা উচিত। পুত্র ! ব্রাহ্মণদের তুমি কখনো দণ্ডপ্রদান করবে না। মনু এই বিষয়ে যে দুটি শ্লোক বলেছেন, তা তুমি সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করে রাখবে। অগ্নি জল থেকে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ থেকে এবং লৌহ আকরিক থেকে উৎপন্ন হয় ; এইগুলির তেজ অন্যত্র কাজ করে, কিন্তু নিজের উৎপন্নকারী কারণে গিয়ে শান্ত হয়ে যায়। লোহা দিয়ে যখন পাথরে আঘাত করা হয়, আগুনে জল দেওয়া হয় এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের হিংসা করে, তখন এই তিনটিই দুর্বল হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ভেবে তোমার সর্বদা ব্রাহ্মণদের নমস্কার করা উচিত। যদিও এই কথা বলা আছে, তবুও ব্রাহ্মণ যদি ত্রিলোকের ক্ষতি করে তাহলে তাকেও বাহুবলে পরাস্ত করায় কোনো দোষ নেই। এই ব্যাপারে শুক্রাচার্য দুটি শ্লোক বলেছেন, তার তাৎপর্য মন দিয়ে শোনো, 'ব্রাহ্মণ যতই বেদজ্ঞ হোক, তিনি যদি শাস্ত্র ভুলে রেখে শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে আসেন তাহলে ধর্মপালনকারী রাজার স্বধর্ম অনুসারে তাঁকে অবশ্যই বন্দি করা উচিত। নষ্ট হওয়া ধর্মকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই ধর্মজ্ঞ ; সেই আততায়ীকে মারলে তাকে ধর্মনাশক বলা হয় না। ক্রোধপূর্ণ আততায়ীকে তার ক্রোধই বিনাশ করে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ব্রাহ্মণ অপরাধ করলে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কারের দণ্ডই দেওয়া উচিত, তাকে শারীরিক দণ্ড দেওয়ার বিধান নেই। বসন্ত ঋতুতে যেমন সূর্য অধিক শীতল থাকে না আবার অধিক গরমও নয়, তেমনই রাজারও অধিক কঠোর বা অত্যন্ত কোমল হওয়া উচিত নয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং আগম—এই চার প্রমাণের দ্বারা আপন-পর জেনে নেওয়া উচিত। তুমি সর্বপ্রকার ব্যসন পরিত্যাগ করবে ; ব্যসনে আসক্ত মানুষকে জগতে অপমানিত হতে হয়। প্রজার সঙ্গে রাজার ব্যবহার গর্ভিণী নারীর মতো হওয়া উচিত। গর্ভিণী নারী যেমন নিজের প্রিয় ভোজন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে শুধু গর্ভস্থ সন্তানের হিতের দিকে মনোনিবেশ করে, ধর্মাত্মা রাজারও তেমনই নিজের খেয়াল না করে যাতে সকলের মঙ্গল হয়, সেই কাজ করা উচিত।

পাণ্ডুনন্দন ! তুমি কখনো ধৈর্যচ্যুত হয়ো না। যে অপরাধীকে দণ্ডদানে সংকুচিত হয় না এবং সর্বদা ধৈর্য ধারণ করে, সেই রাজা কখনো ভীত হয় না। পরিচারকদের সঙ্গে বেশি হাসি-তামাসা করা উচিত নয়, তার কী মন্দ ফল হয় শোনো। পরিচারকেরা বেশি বন্ধুস্থানীয় হলে প্রভুকে অপমান করে বসে, নিজেদের অবস্থান ভুলে যায় এবং প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করে। শুধু তাই নয়, রাজার ওপরও হুকুম চালাতে থাকে এবং উৎকোচ নিয়ে, জাল কারবার করে রাজকার্যে বিঘ্নপ্রদান করে। জাল নির্দেশপত্র বার করে রাজার সম্পদ হরণ করে, অন্তঃপুরের রক্ষকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং রাজার মতো বেশধারণ করে ঘুরতে থাকে। এমনকি রাজার সঙ্গে নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করে তাঁর গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। হাসি-তামাশাকারী এবং কোমলস্বভাবসম্পন্ন রাজা হলে ভৃত্যগণ তাঁকে অবহেলা করতে থাকে এবং তাঁর হাতি-ঘোড়া-রথ নিজেরাই ব্যবহার করতে থাকে। রাজসভায় সবার সমক্ষে রাজার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে বলতে থাকে, 'রাজন ! আপনার দ্বারা এই কাজ হওয়া কঠিন, আপনার এই ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ।' রাজাকে কুপিত হতে দেখে হেসে উড়িয়ে দেয় এবং রাজা সম্মান জানালেও সে প্রসন্ন হয় না। রাজার গুপ্তকথা এবং দোষগুলিও অন্যের কাছে প্রকাশ করে। রাজা কাছে থাকলেও সে নির্ভয়ে রাজার পোশাক-আশাক পরে তাঁর সঙ্গে তামাসা করতে থাকে। তাকে কোনো কাজের ভার দিলে, সেটি খারাপ কাজ বলে সেই কাজ করে না এবং যা বেতন দেওয়া হয়, তাতে সন্তুষ্ট থাকে না। লোকে যেমন পাখির খেলা দেখায় তেমনই তারা রাজার সঙ্গে খেলা করে সাধারণ মানুষের কাছে বলতে থাকে—'রাজা তো আমার হাতের পুতুল, আমার কথাতেই চলে।' যুধিষ্ঠির ! রাজা যদি পরিহাসশীল ও কোমল স্বভাবের হন, তাহলে উপরে উল্লিখিত নানা দোষ তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

রাজার নীতিপূর্ণ ব্যবহারের বর্ণনা

ভীষ্ম বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! রাজার উদ্যোগী হওয়া উচিত। যে রাজা নারীর মতো চুপ করে বসে থাকে, সেই রাজার কেউ প্রশংসা করে না। এই বিষয়ে শুক্রাচার্য কথিত একটি শ্লোক আছে—সাপ যেমন বিলে থাকা ইঁদুরদের গিলে ফেলে, তেমনই যে রাজা যুদ্ধ করে না এবং যে ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক নয়, এই দুজনকেই পৃথিবী গ্রাস করে অর্থাৎ তারা পুরুষার্থ সাধন ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করে। যারা সন্ধি করার উপযুক্ত, তাদের সঙ্গে সন্ধি করো, যারা বিরোধ করার যোগ্য, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করো। রাজ্যের সাতটি অঙ্গ—রাজা, মন্ত্রী, মিত্র, রাজকোষ, দেশ, কেল্লা এবং সৈন্য। এরমধ্যে কারো বিরুদ্ধে যদি কেউ বিপরীত আচরণ করে, সে গুরু হোক বা মিত্র, সে বধযোগ্য। মহারাজ মরুৎ কথিত এক প্রাচীন শ্লোক আছে, যা বৃহস্পতির মত অনুসারে রাজার অধিকারের ওপর আলোকপাত করে, তার ভাব হল—অহংকারপূর্ণ হয়ে কর্তব্য-অকর্তব্যে মন না দেওয়া এবং কুপথে চলা মানুষটি যদি নিজের গুরুও হয় তাহলেও তাকে দণ্ডদানের সনাতন-বিধি আছে। রাজা সগর, নগরের জনসাধারণের হিতার্থে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল 'অসমঞ্জস'। তিনি পুরবাসী বালকদের ধরে নিয়ে গিয়ে সরযূ নদীতে ডুবিয়ে দিতেন, তাই তাঁর পিতা তাঁকে বহিষ্কার করেছিলেন। সুতরাং প্রজাবর্গকে পালন করাই রাজার সনাতন ধর্ম। সত্য রক্ষা এবং ব্যবহারে সরলতাও রাজোচিত কর্তব্য। অন্যের ধন হরণ না করা; যাকে যা দেবার তা সময়মতো দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। রাজাকে পরাক্রমশালী, সত্যবাদী ও ক্ষমাশীল হতে হয়। যে রাজা এরূপ করে, সে কখনো সন্মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয় না।

যিনি মনকে বশে রাখেন, ক্রোধ জয় করেছেন, শাস্ত্রের তাৎপর্য নিশ্চিতরূপে জানেন, যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষতে ব্যাপৃত থাকেন, নিজের গুপ্ত চিন্তা কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য। রাজার চার বর্ণের ধর্মগুলি রক্ষা করা উচিত। জগৎকে ধর্মসংকর থেকে রক্ষা করা রাজার সনাতন ধর্ম। রাজা কাউকেই বিশ্বাস করবেন না; বিশ্বাসী ব্যক্তিকে অতিবিশ্বাস করবেন না। রাজনীতির ছয়টি গুণ[1] হয়ে থাকে—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সমাশ্রয়; এই সমস্ত দোষ-গুণের ওপর সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। যমরাজের মতো ন্যায়কর্তা হবেন এবং কুবেরের মতো ধন একত্র করবেন। স্থান, বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের হেতুভূত দশবর্গের[2] সর্বদা খেয়াল রাখবেন। যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা নেই, তাকে পালন করবেন। রাজার সর্বদা প্রসন্নমুখে কথা বলা উচিত। বৃদ্ধদের সেবা করবেন, আলস্য এবং লোভ ত্যাগ করবেন, সন্তুষ্ট হওয়ার মতো স্বভাবসম্পন্ন হবেন। উত্তম ব্যক্তিদের ধন অপহরণ করবেন না, অসৎ ব্যক্তিদের থেকে অর্থ আদায় করে সৎ পুরুষদের দান করবেন, মনকে বশে রাখবেন। সময়মতো দান করবেন এবং সর্বদা শুদ্ধ ও সদাচারী থাকবেন।

যে শূরবীর এবং ভক্ত; শত্রু যাকে ভাঙতে পারে না, যে কুলীন, নীরোগ এবং শিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, নিজের সম্মানের রক্ষক, অপরকে অপমান করে না, ধর্মপরায়ণ, সাধু ও পর্বতের ন্যায় অবিচল, শাস্ত্রজ্ঞ, লোকব্যবহার জ্ঞাতা, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে—এমন লোককে সাহায্যকারী করবে। তাকে নিজের মতোই সুখ-সুবিধা প্রদান করবে। শুধু রাজোচিত ছত্র-ধারণ করা এবং হুকুমজারী করা—এই দুটি অধিকার রাজার নিজের কাছে রাখা উচিত। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রজার প্রতি একই ব্যবহার রাখবে। যে রাজা এরূপ করে, তাকে কোনো কষ্ট পেতে হয়

---

[1] শত্রুকে আক্রমণ করলে যদি দেখা যায় যে শত্রু বেশি বলবান, তাহলে তার সঙ্গে সন্ধি করাকে বলা হয় 'সন্ধি'। দুজনের শক্তি সমান হলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে বলে 'বিগ্রহ'। শত্রু দুর্বল হলে তার দুর্গ ইত্যাদিতে আক্রমণ করাকে বলে 'যান'। যদি শত্রু প্রথমে আক্রমণ করে এবং তারা প্রবল হয়, তখন নিজেদের দুর্গে লুকিয়ে থেকে যে আত্মরক্ষা করা হয়, তাকে 'আসন' বলে। আক্রমণ-কারী শত্রু মধ্যমশ্রেণীর হলে 'দ্বৈধীভাবে'র সাহায্য নেওয়া হয়। তাতে উপরে ও ভিতরে দুরকম ভাব দেখানো হয়। আক্রমণকারীর দ্বারা পীড়িত হয়ে মিত্র রাজার সাহায্য নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করাকে বলা হয় 'সমাশ্রয়'।

[2] মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, রাজকোষ ও দণ্ড—এই পাঁচ 'প্রকৃতি'র কথা বলা হয়েছে। এগুলিই নিজের ও শত্রুপক্ষের মিলিত হলে 'দশবর্গ' হয়। যদি দুপক্ষের মন্ত্রী ইত্যাদি সমান হয়, তাহলে উভয় পক্ষের স্থিতি বজায় থাকে। নিজ পক্ষে এর আধিক্য থাকলে সেগুলি বৃদ্ধির সাধক হয় আর কম হলে ক্ষয়ের কারণ হয়।

না। যে সকলকে সন্দেহ করে এবং সকলের ধন হরণ করে, সেই লোভী, কুটিল রাজা একদিন নিজের লোকের হাতেই মারা পড়ে। যে রাজা অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ থেকে প্রজাদের আপন করার চেষ্টা করে, সে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও তাদের বশীভূত হয় না। পরাজিত হলেও নিজ প্রজাদের সাহায্যে পুনরায় সে নিজ স্থান ফিরে পায়। যে ক্রোধ করে না, কোনো ব্যসনে বদ্ধ হয় না, অল্প করে কর নেয়, ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, সে সকলের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠে। যে বুদ্ধিমান, ত্যাগী, শত্রুদের দুর্বলতা জানে, চতুর্বর্ণের ন্যায়-অন্যায় জানে, ক্রোধ জয় করে, উদারচিত্ত, কোমল-স্বভাবসম্পন্ন, আত্মপ্রশংসা থেকে দূরে থাকে, যার রাজ্যে মানুষ নির্ভয়ে থাকে, রাজাদের মধ্যে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

যার রাজ্যে বসবাসকারী নাগরিক ন্যায়-অন্যায় বোঝে, যার দেশের লোক ধর্ম-কর্মে ব্যাপৃত, আসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, আজ্ঞাপালনকারী, বিবাদ থেকে দূরে থাকে, দানশীল, সেই প্রকৃতপক্ষে রাজা। যে রাজার রাজ্যে ছল, কপট, কূটনীতি, মায়া ও মাৎসর্যের অভাব, তাঁর দ্বারাই সনাতন ধর্মের নির্বাহ হয়। যে বিদ্বানদের সমাদর করে এবং শাস্ত্রীয় অর্থ চিন্তা এবং পরোপকারে ব্যাপৃত থাকে, সে সৎপুরুষদের পথে চলে এবং দান করে, শত্রু যার গুপ্ত চিন্তা জানতে পারে না, সেই রাজাকেই রাজ্য চালানোর যোগ্য বলে মনে করা হয়। রাজ্যাকাঙ্ক্ষী রাজাদের কাছে প্রজাদের রক্ষার থেকে বড় আর কোনো সনাতন ধর্ম নেই। মনু রাজধর্ম বর্ণনা করে দুটি শ্লোক বলেছেন, তা হল, সমুদ্র যাত্রায় যেমন ভগ্ন নৌকা পরিত্যাগ করা হয়, তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে আচার্য উপদেশ প্রদান করে না, যে ঋত্বিক বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে না, যে রাজা প্রজাদের রক্ষা করে না, যে পত্নী কটুবাক্য বলে, যে গোপালক শহরে থাকতে চায় এবং যে নাবিক জঙ্গলে থাকতে ভালোবাসে—এই ছয়জনকে পরিত্যাগ করা উচিত।

—০—

রাজ্যশাসনের কয়েকটি উপায়

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! প্রজাপালন সমস্ত ধর্মের সার। ভগবান বৃহস্পতিও এই ধর্মের প্রশংসা করেন। তিনি ব্যতীত ভগবান বিশালাক্ষ, তপস্বী শুক্রাচার্য, ইন্দ্র, দক্ষ, মনু, ভরদ্বাজ, মুনিবর গৌরশিরা এবং রাজধর্ম রচনাকারী অন্যান্য বেদবাদীগণও প্রজাপালনের প্রশংসা করেন। এখন আমি তোমাকে রাজধর্মের পালনীয় কয়েকটি বিষয় জানাচ্ছি। গুপ্তচর রাখা, অন্য রাষ্ট্রে নিজ প্রতিনিধি (রাষ্ট্রদূত) নিযুক্ত করা, সময়মতো বেতন ও ভাতা প্রদান, যুক্তিপূর্বক কর আহরণ, অন্যায়ভাবে প্রজার অর্থ শোষণ না করা, সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখা, বীরত্ব, কার্যকুশলতা, সত্য, প্রজাদের হিতচিন্তা, সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ না করা, কুলীন ব্যক্তিদের কাছে রাখা, সংগ্রহযোগ্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিজের সহায়ক রাখা, সেনাদের উৎসাহিত করা, প্রজাদের নিজে দেখাশোনা করা, কার্যকালে কষ্ট অনুভব না করা, রাজকোষ বৃদ্ধির চেষ্টা করা, নিজে নগরের রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা—এই ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভর না করা, যদি লোকজনেরা নিজেদের মধ্যে কোনো বিভেদকামী সংগঠন তৈরি করে তবে তাদের মধ্যেই দলাদলি সৃষ্টি করে সেটি ভেঙে দেওয়া, শত্রু-মিত্র এবং মধ্যস্থদের ওপর যথোচিত লক্ষ্য রাখা, নীতিধর্ম পালন করা এবং দুষ্টদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা—রাজধর্মের এগুলিই হল মূল কথা। বলবান ব্যক্তির নিজ দুর্বল শত্রুকেও ছোট বলে জানা উচিত নয়। আগুন অল্প হলেও তা সব কিছু পুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং বিষ অতি সামান্য হলেও মানুষের প্রাণ নিতে পারে। ক্রূর রাজা তার বিশাল রাজ্য নিজ অধিকারে রাখতে পারে না অপরদিকে যে অত্যন্ত কোমল স্বভাব সে এই পদের ভার রক্ষা করতে পারে না। তাই রাজার মধ্যে ক্রূরতা ও কোমলতা উভয়েরই সামঞ্জস্য থাকা উচিত। যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে অল্প কথায় রাজধর্ম সম্পর্কে জানালাম। তোমার যদি আর কিছু জানার থাকে, জেনে নাও।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভীষ্মের বক্তব্য শুনে ভগবান ব্যাস, অশ্ব, বাসুদেব, দেবস্থান, কৃপ, সাত্যকি ও সঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে 'অপূর্ব', 'অপূর্ব' বলে তাঁর

প্রশংসা করতে লাগলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ চোখে তাঁর চরণ স্পর্শ করে বললেন—পিতামহ ! এখন সূর্য অস্তাচলে যাবেন, সুতরাং আমি আগামীকাল আপনাকে জিজ্ঞাসা করব।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাচার্য এবং যুধিষ্ঠির প্রমুখ উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করে ভীষ্মকে পরিক্রমা করে রথে আরোহণ করে দৃশদ্বতী নদীতীরে এলেন। সেখানে স্নান-তর্পণ সন্ধ্যাপূজা সেরে তাঁরা হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

—o—

ব্রহ্মার নীতিশাস্ত্র এবং রাজা পৃথুর প্রসঙ্গ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পরের দিন প্রত্যূষেই পাণ্ডব এবং যাদবরা নিত্যকর্ম সেরে রথে আরোহণ করে কুরুক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। সেখানে ভীষ্মের কাছে পৌঁছে তাঁরা ব্যাসদেব এবং অন্যান্য মহর্ষিদের প্রণাম করে ও তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে ভীষ্মের চারদিকে বসলেন। তারপর পরমতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! ইহলোকে এই যে 'রাজা' শব্দটি প্রসিদ্ধ, এর উৎপত্তি কী করে হয়েছিল—কৃপা করে আমাকে বলুন। যাকে আমরা রাজা বলি, সেও একজন মানুষই। তার দেহ এবং প্রাণ অন্য মানুষেরই মতো এবং জন্ম-মরণ ইত্যাদি সব গুণেই সে অন্য ব্যক্তির মতো। তা সত্ত্বেও শূরবীর এবং সৎ মানুষপূর্ণ এই বৃহৎ পৃথিবী সে একাই কেন পালন করে ? আমার এর প্রকৃত কারণ জানার ইচ্ছা আছে, কৃপা করে আপনি এর রহস্য জানান।'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! সত্যযুগের প্রারম্ভে রাজা বা রাজ্য নামে কোনো বস্তু ছিল না। তখন কোনো দণ্ডও ছিল না এবং দণ্ডদাতাও নয়। সমস্ত প্রজা নিজেদের মধ্যে ধর্মের সম্পর্কে একে অপরকে রক্ষা করত। পরে সকলে মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠে, তাই তাদের বিবেক লুপ্ত হয়ে যায়, তার ফলে তাদের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। সকলেই লোভে আসক্ত হয়ে যার কাছে যে বস্তু নেই, তা পাবার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। সেগুলির মধ্যে কাম নামক অন্য এক দোষ তাদের মোহগ্রস্ত করে। তাদের কামের অধীন দেখে রাগ (আসক্তি)ও আধিপত্য বিস্তার করে। এইভাবে কাম ও রাগের (আসক্তির) অধীন হয়ে মানুষ কর্তব্যাকর্তব্য বিস্মৃত হয়। এমন গম্য-অগম্য, বাচ্য-অবাচ্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য এবং দোষ অদোষ কোনোটিই আর তাদের কাছে ত্যজনীয় থাকল না। মানব সমাজে এইভাবে ধর্মবিপ্লব হওয়ায় বেদও লুপ্ত হতে থাকল। বেদ লুপ্ত হওয়ায় ধর্মমর্যাদাও নষ্ট হয়ে গেল। তখন দেবতারা অত্যন্ত ভয় পেলেন, তাঁরা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। তাঁরা হাত জোড় করে ব্রহ্মাকে বললেন, 'ভগবান ! মনুষ্যলোকে যে সনাতন বেদ ছিল, লোভ-মোহ ইত্যাদির কুপ্রভাবে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, এতে আমরা অত্যন্ত ভীত হয়েছি। প্রভু ! বেদ নাশ হওয়ায় ধর্মও নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষ যাগ-যজ্ঞাদি সমস্ত শুভকর্ম পরিত্যাগ করছে ; তাই আমরা অত্যন্ত সংশয়গ্রস্ত হয়েছি। আপনি আমাদের পক্ষে যা হিতকর হয়, তা বলুন।'

স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মা তখন তাঁদের বললেন—'দেবতাগণ ! ভীত হয়ো না। আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য কোনো উপায় ভেবে দেখছি।' তারপর তিনি ভেবে-চিন্তে এক লাখ অধ্যায়ের এক নীতিশাস্ত্র রচনা করলেন। তাতে ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের বর্ণনা ছিল। সেই গ্রন্থ 'ত্রিবর্গ' নামেই বিখ্যাত। চতুর্থ বর্গ মোক্ষ, তার ফল এবং গুণ এর থেকে পৃথক। যুধিষ্ঠির ! এই শাস্ত্রে সাম, দান, দণ্ড, ভেদ এবং উপেক্ষা—এই পাঁচ উপায়ের সম্পূর্ণ বর্ণনা আছে। ভয়, সৎকার এবং অর্থের দ্বারা যথাক্রমে নিম্ন, মধ্যম ও উত্তম প্রকারের সন্ধি স্থাপন এবং আক্রমণ করার চারটি উপযুক্ত সুযোগের বর্ণনা এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের বিস্তারিত নিরূপণও এতে ভালোভাবে করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এতে প্রকাশ্য ও গুপ্ত সেনাদের কথাও বিবেচিত হয়েছে ; তারমধ্যে প্রকট হওয়া সেনা আট প্রকারের এবং গুপ্ত সেনার বহু বিভাগ থাকে। প্রকাশ্য সেনার আট অঙ্গ হল—রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক, বেগার খাটা, লোক, নৌকা, দূত এবং যুদ্ধ সম্পর্কীয় উপদেশ প্রদানকারী। শুধু তাই নয়, এতে পথের গুণাগুণ, ভূমির গুণাগুণ, বল,

হাতি, ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক সৈন্যদের স্ফূর্তি ও সুস্থ করে রাখার নানা উপায়, নানাপ্রকার ব্যূহনির্মাণ, নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধ করা এবং সেখান থেকে নিরাপদে পালানোর রীতি এবং শস্ত্র রক্ষার উপায়ও জানানো হয়েছে। দূতের প্রভাবে হওয়া রাষ্ট্রের বৃদ্ধি, শত্রু-মিত্র-নিরপেক্ষ বিভাগ, বলশালীদের বিনাশ এবং প্রতিরোধ, শাসন-সম্পর্কীয় নানা সূক্ষ্মকার্য, মল্লক্রীড়া এবং অস্ত্র সঞ্চালনের বিধি, যাদের ভরণ-পোষণ করার ব্যবস্থা নেই, তাদের পালন-পোষণ, সুপাত্রে দান দেওয়া, ব্যসন থেকে দূরে থাকা, রাজার গুণ, সেনাপতির লক্ষণ, ধর্ম-অর্থ ও কামের সাধন এবং সেগুলির গুণাগুণ, আশ্রিতদের জীবিকা নির্বাহ। সকলের প্রতি সদয় থাকা, প্রমাদ থেকে দূরে থাকা, যে সম্পদ পাওয়া যায়নি, তা পাওয়া এবং প্রাপ্ত সম্পদ বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি প্রাপ্ত সম্পদ সুপাত্রে দান করা, ধর্মের জন্য অর্থ ব্যয় এবং ভোগ ও দুঃখ নিবারণে ধনের ব্যবহার করা—এইসব বিষয় এই শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কাম ও ক্রোধ থেকে উৎপন্ন দশটি উগ্র ব্যসনের কথাও এখানে উল্লিখিত আছে। নীতিশাস্ত্রের আচার্যগণ মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান এবং স্ত্রীপ্রসঙ্গ—এই চারটি কামজনিত এবং বাক্যের কটুত্ব, উগ্রতা, মারামারি, শরীর কষ্টদেওয়া, ত্যাগ করা এবং আর্থিক ক্ষতি করা—এই ছয়টিকে ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া ব্যসন বলে জানিয়েছেন। নানাপ্রকার যন্ত্র এবং তার প্রয়োগ, শত্রুরাষ্ট্র আক্রমণ করা এবং তাদের সেনাদের আঘাত করা ও তাদের আবাসস্থল নষ্ট করার কথাও এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। পুরাতন বাড়ি ও বৃক্ষ ধ্বংস করা, যাগ-যজ্ঞের নিয়ম, সৈন্যদের জিনিসপত্র, কবচ ধারণ, কবচ তৈরির বিধি নিয়ম—এ সবই এই শাস্ত্রে বলা হয়েছে। রণবাদ্য বাজানো, মণি, পশু, পৃথিবী, বস্ত্র, দাস-দাসী এবং স্বর্ণ—এই ছয় প্রকার সম্পদ প্রাপ্ত করা এবং শত্রুর এই ছটি বস্তু বিনাশ করা, নতুন জয় করা দেশে শান্তি স্থাপন করা, সৎ ব্যক্তিদের সমাদর করা, বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা বাড়ানো, হোম ও দানের বিধি, আহারাদির ব্যবস্থা, সর্বদা আস্তিকবুদ্ধি রাখা, একাকী হলেও ওঠা-বসার রীতি, সভ্যতা, মধুরভাষণ এবং উৎসব ইত্যাদির পরে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা—এই সবই এই শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। দেশ, জাতি এবং কুলের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চারটি পদার্থের লক্ষণ এবং এগুলি প্রাপ্ত করার উপায়, যাতে মানুষের আর্য ধর্ম থেকে পতন না হয়, সে সবই 'ত্রিবর্গে' বর্ণিত আছে। এই নীতিশাস্ত্র রচিত হলে ব্রহ্মা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদের এই কথা জানালেন।

ব্রহ্মা বললেন—দণ্ডনীতি নামে বিখ্যাত এই বিদ্যা ত্রিলোকে বিদ্যমান। প্রকৃত পক্ষে দণ্ডতেই রাজ্য ব্যবস্থা চলে, দণ্ডনীতি ষড়গুণযুক্ত। মহাত্মাদের মধ্যে এটি অগ্রস্থানে থাকবে। এই শাস্ত্রে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সবকিছুরই আলোচনা আছে।

সর্বপ্রথম ভগবান শংকর এই নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি জীবদের আয়ু কম হতে দেখে এই শাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করেন। তখন এই গ্রন্থকে 'বৈশালাক্ষ' বলা হল। ইন্দ্র এটি গ্রহণ করেন। এর মধ্যে মোট দশ হাজার অধ্যায় ছিল। ভগবান ইন্দ্রও একে সংক্ষিপ্ত করে শুধু পাঁচ হাজার অধ্যায় রাখেন, তখন এটি 'বাহুদন্তক' নামে খ্যাত হয়। তারপর বৃহস্পতি এটিকে তিন হাজার অধ্যায়ে সঙ্কুচিত করেন এবং সেটি 'বার্হস্পত্য' নামে প্রসিদ্ধ হয়। যোগাচার্য শুক্র একে সংক্ষিপ্ত করে এক হাজার অধ্যায় করেন। মহর্ষি মনু মানুষের আয়ুষ্কাল হ্রাস হতে দেখে লোকহিতার্থে এই শাস্ত্র আরও সংক্ষিপ্ত করেন।

এই নীতিশাস্ত্র রচনার পর মৃত্যুর মানসকন্যা সুনীথা এবং রাজা অঙ্গের পুত্র বেনের জন্ম হয়। সে রাগ-দ্বেষের অধীন হয়ে প্রজাদের মধ্যে অধর্ম প্রচার করতে লাগল। তাই দেখে বেদজ্ঞ মুনিগণ তাঁকে অভিমন্ত্রিত কুশের দ্বারা বধ

করলেন। তারপর দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছে দেখে বেনের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করলেন, তার থেকে ইন্দ্রের ন্যায় এক রূপবান ব্যক্তি নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর দেহে কবচ, কোমরে তলোয়ার এবং কাঁধে ধনুর্বাণ ছিল। তিনি বেদাঙ্গে পারঙ্গম ধনুর্বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বেনপুত্র হাত জোড় করে মুনিদের বললেন—'মুনিগণ! ধর্ম ও অর্থ নির্ণয়কারী সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমি অবগত আছি। এর দ্বারা আমার কী করা কর্তব্য—তা বলুন।' দেবতা ও মহর্ষিগণ বললেন—'তোমার যে কর্ম ধর্মযুক্ত মনে হয়, নিঃশঙ্ক হয়ে সেই কাজ করো। প্রিয়-অপ্রিয় চিন্তা না করে সর্বজীবে সমভাব বজায় রাখো। কাম-ক্রোধ-লোভ ও মানকে দূরে রাখো। সর্বদা ধর্মে দৃষ্টি রাখো এবং যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে বিচলিত হবে, তাকে বাহুবলে দমন করো।' বেনপুত্র বললেন—'মহানুভব! ব্রাহ্মণ আমার সদা বন্দনীয়, তাঁদের দণ্ড প্রদান করতে পারব না।' মুনিরা তা শুনে বললেন—'ঠিক আছে।'

তখন বেদনিধি ভগবান শুক্রাচার্য তাঁর পুরোহিত নিযুক্ত হলেন এবং বালখিল্যগণ মন্ত্রীপদ গ্রহণ করলেন। এই বেনপুত্র পৃথু ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম বংশধর ছিলেন। শোনা যায় পৃথুর সময় পৃথিবী অত্যন্ত অসমতল ছিল, পৃথুই একে সমতল করেন। কথিত আছে যে, ভগবান বিষ্ণু, ইন্দ্র, দেবতাগণ, প্রজাপতি, ঋষি ও ব্রাহ্মণ—এঁরা সকলে মিলে পৃথুর অভিষেক করেন। স্বয়ং পৃথিবী দেবীও রত্নের ডালি নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সমুদ্র, হিমালয় এবং ইন্দ্র তাঁকে অক্ষয় ধন প্রদান করেছিলেন এবং যক্ষ-রাক্ষসের প্রভু ভগবান কুবেরও প্রচুর ধন দিয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠির! রাজা পৃথু সংকল্প করা মাত্রই কোটি কোটি হাতি, রথ, ঘোড়া, পদাতিক উপস্থিত হল। তাঁর রাজ্যে বৃদ্ধাস, দুঃসময়, রোগ-ব্যাধি, সর্প, চোর অথবা একে অপরকে ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। তিনি যখন সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে চলতেন, তখন তার জল স্থির হয়ে যেত এবং পর্বতও রাস্তা করে দিত। তিনি এই পৃথিবী থেকে সতেরো প্রকার শস্যাদি আহরণ করেছিলেন। মহাত্মা পৃথু ইহলোকে ধর্মের পালন করেছিলেন এবং সমস্ত প্রজার মনোরঞ্জন করেছিলেন, তাই তিনি রাজা নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা তাঁকে ক্ষত্রিয় এবং ধর্মানুসারে ভূমি প্রোথিত করেছিলেন, তাই এর নাম হল 'পৃথ্বী'। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু তাঁকে এমন মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'রাজন্! কোনো ব্যক্তি তোমার আদেশ অমান্য করবে না, তোমার থেকে বড় হবে না'। রাজা পৃথুর দেহে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর আবেশ ছিল। তাই সমস্ত জগৎ তাঁকে দেবতার ন্যায় মান্য করে, তাঁর সামনে মাথা নত করত।

রাজন্! তাই গুপ্তচর দ্বারা প্রজাদের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রেখে তুমি সর্বদা তাদের দণ্ডনীতি অনুসারে পালন করবে। এমন না হয় যে তাদের সঙ্গে মিলে কোনো শত্রু তোমার ক্ষতি করে। রাজা যে শুভকর্ম করেন, তা প্রজাদের ভালোর জন্যই হয়। তাঁর দৈবীগুণ ব্যতীত আর কী কারণ থাকতে পারে, যাতে সারা দেশ একই ব্যক্তির অধীনে থাকে। রাজাও অন্য মানুষেরই মতো, তবুও সমস্ত দেশ তাঁর আজ্ঞাধীন থাকে। রাজদণ্ডের অত্যন্ত মহত্ত্ব আছে; তার জন্যই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায় ও নীতি আচরিত হয়।

যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মার এই নীতিশাস্ত্রে পুরাণাদির আবির্ভাব, মহর্ষিদের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্রের বংশ, চতুরাশ্রম, চার প্রকার হোত্র কর্ম, চতুর্বর্ণ, চারপ্রকার বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপ, জ্ঞান, অহিংসা, সত্যাসত্য, বৃদ্ধদের সেবা, দান, শৌচ, সতর্কতা এবং দয়া—এই সবই বর্ণিত আছে। যা কিছু এই পৃথিবীতে আছে এবং যা নীচে আছে, সবই ব্রহ্মার শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে রাজাদের যা কিছু মহত্ত্ব, আমি সে সবই তোমাকে শোনালাম। এখন বলো আর কী শুনতে চাও?

—○—

রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মের চার বর্ণ ও চার আশ্রমের ধর্ম শোনানো

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা যুধিষ্ঠির তখন হাত জোড় করে পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! চার বর্ণ, চার আশ্রম এবং রাজাদের কী কী ধর্ম নির্দিষ্ট রয়েছে তার পৃথকভাবে বর্ণনা করুন। এমন কী কী কর্ম আছে, যা করলে রাষ্ট্রের বৃদ্ধি হয় এবং কোন্ কর্ম করলে রাজা, নগরবাসী এবং রাজসেবকদের অভ্যুদয় হয়। রাজার কোন প্রকারের কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়ক, মন্ত্রী, ঋত্বিক, পুরোহিত ও আচার্যদের ত্যাগ করা উচিত। বিপদকালে কীরূপ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা উচিত এবং কোন্ ব্যক্তিদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

ভীষ্ম বললেন—ধর্মের মহিমা মহান ; সুতরাং আমি ধর্মের বিধাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে সনাতন ধর্মের বর্ণনা করছি। অক্রোধ, সত্যভাষণ, অর্থ ভাগ করে ভোগ করা, ক্ষমা, নিজ স্ত্রীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন, শৌচ, অদ্রোহ, সারল্য এবং পালনীয় ব্যক্তিদের পালন-পোষণ—এই নটি ধর্ম সকল বর্ণের কাছে সমানভাবে পালনীয়। এবার ব্রাহ্মণদের ধর্ম জানাচ্ছি—ইন্দ্রিয়দমন ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ধর্ম। এতদ্ব্যতীত স্বাধ্যায় (অধ্যয়ন)ও তাদের প্রধান ধর্ম ; কারণ এর দ্বারাই তাদের সব কর্ম সম্পন্ন হয়। যদি নিজ ধর্মে স্থিত, শান্ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত ব্রাহ্মণ কোনোপ্রকার অসৎকর্ম না করে ধনপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তা দান বা যজ্ঞে দেওয়া উচিত। সৎব্যক্তিদের মধ্যে অর্থ ভাগ করেই তা উপভোগ করা উচিত—বিদ্বানদের এইরূপই অভিমত। ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র স্বাধ্যায়েই কৃতকৃত্য হয়ে যায়, অন্য কর্ম তারা করুক অথবা না করুক। দয়ার প্রাধান্য থাকায় তাদের সকল জীবের মিত্র বলে বলা হয়।

রাজন্ ! এবার ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা শোনো। ক্ষত্রিয়দের দান করা উচিত, কিন্তু ভিক্ষা করা উচিত নয়। তেমনই যজ্ঞ করা উচিত, করানো নয়। সে বেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করবে, কিন্তু অধ্যাপনা করবে না, প্রজাপালন করবে, দুষ্কৃতকারীদের মারতে সিদ্ধ হস্ত হবে এবং রণক্ষেত্রে পরাক্রম দেখাবে। যে রাজা শাস্ত্রজ্ঞ এবং বড় বড় যজ্ঞ করে, যুদ্ধে বিজয়প্রাপ্ত হয়, সেই রাজাই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়। দান, স্বাধ্যায় এবং যজ্ঞ যেমন রাজাদের কল্যাণের সহায়ক, যুদ্ধও তেমনই তার পক্ষে নিঃশ্রেয়সের সাধন। তাই ধর্মোপার্জনের জন্য রাজার অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিত। তার সমস্ত প্রজাকে তাদের নিজ নিজ ধর্মে স্থিত রেখে তাদের দ্বারা সর্বপ্রকার ধর্মকৃত্য করানো উচিত। রাজা প্রজাপালনেরই কৃতকৃত্যতা লাভ করে, অন্য কর্ম সে করুক অথবা না করুক। তার বলের প্রাধান্য থাকায় তাকে প্রজাদের ইন্দ্র বলা হয়।

এবার বৈশ্যদের সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বলছি। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং পবিত্রভাবে ধন সংগ্রহ করা—এদের প্রধান কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত এদের সতর্কতার সঙ্গে সর্বপ্রকার পশুপালন করা উচিত। যদি এরা কোনো শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করে, তাহলে তাকে 'বিকর্ম' বলা হয়। পশুপালনে বৈশ্যগণ অত্যন্ত সুখ পায়, তাই তাদের কখনো এমন সিদ্ধান্ত নিতে নেই যে, 'আমরা পশুপালন করব না।'

এবার তোমাকে শূদ্রদের ধর্ম জানাচ্ছি। ব্রহ্মা শূদ্রদের তিন বর্ণের দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাই শূদ্রদের তিন বর্ণের সেবায় ব্যাপৃত থাকা উচিত। এদের সেবা করলেই তাদের অত্যন্ত সুখলাভ হতে পারে। শূদ্রদের কখনো ধনসঞ্চয় করা উচিত নয়। কারণ ধনলাভ করে তারা পাপে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজেদের থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের অধীন করে রাখতে চায়। তাদের যদি কোনো ধর্মকৃত্য করার হয়, তাহলে রাজার আদেশানুসারে কাজ করতে হয়।

এবার আমি শূদ্রদের বৃত্তির বর্ণনা করছি, যাতে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। তিন বর্ণের লোকেদের অবশ্যই শূদ্রদের ভরণ-পোষণের ভার নিতে হয়। সেবার পরিবর্তে তাদের পরিবার পালনের সব জিনিস দেওয়া উচিত। নিজেদের ব্যবহার করা পুরাতন সামগ্রী তাদের দিয়ে দিতে হয়, কারণ ধর্মত সেগুলি তাদেরই সম্পত্তি। সেবাপরায়ণশূদ্র যে দ্বিজের কাছে যাবে, তাঁর উচিত সেই শূদ্রের জীবিকার ব্যবস্থা করা, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের তাই বক্তব্য। শূদ্রদেরও কখনো বিপদের সময় তার প্রভুকে ত্যাগ করা উচিত নয়। প্রভু নিঃসন্তান হলে তাঁর পিণ্ডদান করা উচিত এবং তিনি বৃদ্ধ হলে তাঁর ভরণ- পোষণের ভারও নেওয়া কর্তব্য। এতে যদি অর্থ নিঃশেষ হয় তবুও শূদ্রকে স্বামীর ভরণ-পোষণে রত থাকতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই অর্থ শূদ্রের নয়, এতে তো তার মনিবের অধিকারই বজায় থাকে।

শাস্ত্রে তিন বর্ণের জন্য যজ্ঞের বিধান আছে এবং শূদ্রের জন্য মন্ত্রহীন যজ্ঞের বিধি আছে। স্বাহা-কার, বষট্-কার এবং মন্ত্র—এতে শূদ্রের অধিকার নেই। সুতরাং শূদ্র শ্রৌত যজ্ঞের দীক্ষা না নিয়ে শুধু পাকযজ্ঞেই যজ্ঞ করবে। বলা হয়েছে এই পাকযজ্ঞের দক্ষিণা হল একটি পূর্ণপাত্র[1]। তিন বর্ণ যে যজ্ঞ করবে, শূদ্রও সেই যজ্ঞের ফল লাভ করে। কারণ শ্রদ্ধাযজ্ঞ সব যজ্ঞের প্রধান। যজ্ঞকারীরও পরমদেব হল শ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মণ হলেন শূদ্রের পরমদেব। সুতরাং নিজ শ্রদ্ধার বলে শূদ্র ব্রাহ্মণাদির কৃত যজ্ঞের ফলের অধিকারী হয়। শূদ্রের ঋক্, সাম ও যজুর্বেদে অধিকার নেই, তা সত্ত্বেও তার ইষ্ট হলেন প্রজাপতি। এইরূপ মানসিক যজ্ঞের অধিকার সকল বর্ণেরই আছে। মানুষ যে ইন্দ্রিয় জয় করে প্রভাত ও সন্ধ্যায় শ্রদ্ধাসহকারে পূজার্চনা করে, তারও প্রধান কারণ শ্রদ্ধা। যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন দ্বিজ বিধিবিধানসহ যজ্ঞকে জানে এবং যার আত্মজ্ঞানবিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রকৃত অধিকারী। যদি কোনো চোর, পাপীও যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে তাকেও 'সাধু' বলা হয়। ঋষিরাও তাদের প্রশংসা করেন ; সুতরাং সিদ্ধান্ত হল যে সব বর্ণের লোকেদেরই নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত। ত্রিলোকে যজ্ঞের ন্যায় কোনো ধর্ম নেই ; তাই মানুষকে ঈর্ষারহিত হয়ে নিজ সামর্থ্য অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে যাগযজ্ঞ করা উচিত।

যুধিষ্ঠির ! এবার তুমি চার আশ্রমের নাম এবং কর্মের কথা শোন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রম। এরমধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমের বিশেষ মহিমা থাকে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জটাধারণ ও উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্বলাভ করে বেদাধ্যয়ন করবে, তারপর গার্হস্থ্যাশ্রমে অগ্ন্যাধান কর্ম করে তার সাহায্যে তিন ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয় সংযম করে স্ত্রীসহ অথবা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বাণপ্রস্থে যাওয়া উচিত। এই আশ্রমে আরণ্যকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বনবাসীদের ধর্ম জেনে তারপর ব্রহ্মচর্য সহকারে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভোগে বিরত হওয়া উচিত। মহারাজ ! মোক্ষকামী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য পালনের পরই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে।

সন্ন্যাসীদের মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করা উচিত। যেখানে সূর্যাস্ত দেখা যাবে, সেখানেই অবস্থান করবে, কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করবে না, নিজের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করবে না এবং যা পাওয়া যায় তাতেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করবে, সবার প্রতি সমভাব রাখবে, ভোগাদি থেকে দূরে থাকবে এবং হৃদয়ে কোনো বিকার আসতে দেবে না। এইসব ধর্মের জন্য এই আশ্রম সাক্ষাৎ ক্ষেমধাম অর্থাৎ কল্যাণের স্থান হয়ে থাকে। এখানে পুরুষ অবিনাশী পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয়।

এখন গৃহস্থধর্মের কথা বলছি। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করে সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন করে এবং সন্তান উৎপন্ন করার পর এই আশ্রমের মুনিজনোচিত কঠোর ধর্ম পালন করে সেও ক্রমে ইন্দ্রিয় ভোগে বিরত হয়। গৃহস্থের নিজ পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, শাস্ত্রাজ্ঞা পালন করা কর্তব্য, শঠতা এবং কপটতা থেকে দূরে থাকবে, পরিমিত আহার করবে, দেবতার আরাধনায় তৎপর থাকবে, অপরের উপকার স্মরণ রাখবে, সত্য ও মৃদুভাষণ করবে, দয়া ও ক্ষমাযুক্ত হয়ে থাকবে, ইন্দ্রিয়াদি সংযম করবে, গুরু এবং শাস্ত্রাজ্ঞা মেনে চলবে, দেবতা ও পিতৃ-পুরুষের তৃপ্তির জন্য যজন-যাজন করবে, ব্রাহ্মণদের নিত্য অন্নদান করবে, ঈর্ষা থেকে দূরে থাকবে, অন্যান্য সকল আশ্রম-ধর্মের পোষণ করবে এবং সর্বদা যাগযজ্ঞাদিতে উৎসাহিত থাকবে।

ব্রহ্মচারীকে প্রধানরূপে আচার্যের সেবায় তৎপর থাকতে হবে, ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে নিজের ব্রত পালন করবে, বেদের স্বাধ্যায় এবং নিত্য পূজা-পাঠাদি করবে, গুরুজনদের প্রতিদিন প্রণাম করবে এবং স্নান, সন্ধ্যাপূজা, জপ, হোম, স্বাধ্যায় এবং অতিথি-সৎকার—নিয়মিতভাবে এই ছটির পালন করবে। এগুলিই হল ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ধর্ম।

---

[1] পূর্ণপাত্রের পরিমাণ হল—আট মুঠো অন্নকে 'কিঞ্চিৎ' বলা হয়, আট কিঞ্চিতে এক 'পুষ্কল' হয় এবং চার পুষ্কলে এক পূর্ণপাত্র হয়। এইভাবে দুশো ছাপ্পান্ন মুঠিতে এক পূর্ণপাত্র হয়।

সর্বসাধারণের ধর্ম, রাজধর্মের মহত্ত্ব এবং সেই বিষয়ে ইন্দ্রবেশধারী ভগবান বিষ্ণু ও মান্ধাতার কথাবার্তার বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! এবার আপনি সেই ধর্মের বর্ণনা করুন যা সর্বপ্রকারে কল্যাণকারক, সুখপ্রদ, পরম পুণ্যপ্রদ, অহিংসক ও সর্বলোকের গ্রহণযোগ্য এবং সহজে পালনীয়।

ভীষ্ম বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূর্বোক্ত চারটি আশ্রম ব্রাহ্মণদের জন্য বলা হয়েছে। অন্য তিন বর্ণ তার অনুবর্তন করে না। তেমনই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের ধর্ম পালন করে, সেই মন্দমতি ব্যক্তির ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দা হয় এবং মৃত্যুর পর তার নরকবাস হয়। যে ব্রাহ্মণ ছটি কর্মে তৎপর থাকে, চার আশ্রমের সব ধর্মের আচরণ করে, তপস্বী, নিরপেক্ষ এবং উদার, সে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করে, তার দ্বারা সেই ব্যক্তির মধ্যে সেই গুণই আসে।

রাজন্ ! ধনুর্বাণ চালানো, শত্রু দমন করা, চাষবাস করা, ব্যবসায় বা পশুপালন করা অথবা অর্থের জন্য অপরের সেবা করা—এগুলি ব্রাহ্মণদের অকর্তব্য। মনীষি গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্মই করা কর্তব্য এবং কৃতকৃত্য হলে তাঁর বনবাস করাই উপযুক্ত বলা হয়। ব্রাহ্মণের রাজসেবা, কৃষি ধন, ব্যবসায় জীবিকা, কুটিলতা, পরস্ত্রীগমন এবং সুদের ব্যবসা—এগুলি থেকে দূরে থাকা উচিত। যে ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র, অধার্মিক, কুলটার স্বামী, নিন্দুক, নৃত্যকারী, রাজসেবক অথবা অন্য কোনো দুষ্কর্মকারী হয়, সে অত্যন্ত অধম, তাকে শূদ্র বলে জানবে এবং শূদ্রের আসনেই আহার করাবে। এরূপ ব্রাহ্মণকে দেবপূজা প্রভৃতি কার্য থেকে দূরে রাখা উচিত। যে ব্রাহ্মণ মর্যাদাশূন্য, অপবিত্র, ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং নিজধর্ম পরিত্যাগকারী, তাকে দান দেওয়া না দেওয়ারই সমান। তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলা উচিত যিনি জিতেন্দ্রিয়, সোমপানকারী, সদাচারী, কৃপালু, সহনশীল, নিরপেক্ষ, সরল, মৃদু এবং ক্ষমাশীল। যারা এর বিপরীত তাদের কীকরে ব্রাহ্মণ বলা যায় ?

রাজন্ ! ধর্মানুসারে ক্ষত্রিয়দের প্রথমে প্রজাপালন করা, রাজসূয়, অশ্বমেধ এবং অন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করা, শাস্ত্রাজ্ঞা অনুসারে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা প্রদান করা এবং সংগ্রামে বিজয়লাভ করা উচিত। তারপর প্রজারক্ষার জন্য রাজ্যে নিজ পুত্রের অভিষেক করা এবং নিজ পুত্র রাজ্য শাসনের উপযুক্ত না হলে অন্য ক্ষত্রিয়কুমারকে দত্তক নিয়ে তাকে রাজ্য সমর্পণ করবে। এইভাবে পিতৃযজ্ঞের দ্বারা পিতৃপুরুষের এবং যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা দেবতা ও ঋষিদের পূজা করে যে ক্ষত্রিয় বৃদ্ধ বয়সে অন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে চায়, সে মোক্ষপ্রাপ্ত করতে পারে। গৃহস্থধর্ম ত্যাগ করলেও ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসধর্ম পালনকালে জীবন রক্ষার জন্য ভিক্ষার আশ্রয় নেওয়া উচিত। কিন্তু গৃহস্থধর্মে নিজের সেবা করাবার জন্য এরূপ করা ঠিক নয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য তিন বর্ণের জন্য চতুরাশ্রম ধর্ম পালন করা অনিবার্য নয়। ক্ষত্রিয়ের কাছে রাজধর্মই প্রধান। এমনিও রাজার ধর্ম সব ধর্মের মধ্যে প্রধান। এর দ্বারা সকল বর্ণের পালন করা হয়। রাজধর্মে সর্বপ্রকার দানের সমাবেশ হয় এবং দানকেই সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্ম বলা হয়। রাজদণ্ড যদি না থাকে, তবে বেদত্রয়ী বিনষ্ট হয় এবং বেদত্রয়ী নাশে সর্বধর্ম লুপ্ত হয়। পুরাতন রাজধর্মকে এইভাবে ত্যাগ করলে সমস্ত আশ্রম-ধর্মেই বাধা আসতে পারে। রাজধর্মে সর্বপ্রকার দীক্ষার সমাবেশ আছে এবং সমস্ত বিদ্যা এবং সমস্ত লোকও রাজধর্মের অধীন ; সুতরাং ক্ষত্রিয়ের কাছে রাজধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির ! আমি আগেই বলেছি যে ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই তিন আশ্রমধর্মের গৃহস্থের ধর্মের অন্তর্ভাব হয়ে যায় এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তিন বর্ণের আশ্রয়, কারণ সমস্ত লোক ও পুণ্যকর্মেরই আধার রাজধর্ম। এই বিষয়ে আমি ধর্ম ও অর্থ নির্ণয়কারী এক ইতিহাস শোনাচ্ছি।

প্রাচীনকালে মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অনাদি-অনন্ত ভগবান নারায়ণের দর্শনলাভের ইচ্ছায় এক যজ্ঞ করেন। তিনি ভগবানের চরণে মাথা রেখে তাঁকে দর্শন দানের জন্য প্রার্থনা করেন। ভগবান তখন ইন্দ্রের রূপ ধারণ করে রাজাকে দর্শন দেন। মান্ধাতা তখন সেখানে উপস্থিত

অন্য রাজা ও সভাসদসহ ইন্দ্ররূপধারী ভগবান বিষ্ণুর পূজা করেন। তারপরে তাঁদের দুজনের মধ্যে এইরূপ আলোচনা হয়—

ইন্দ্র বললেন—রাজন্! তুমি সমস্ত মানুষের রাজা, তাই তোমার মনে যেসব কামনা আছে, আমি সেগুলি পূরণ করব। তুমি সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং শূরবীর। তোমার বুদ্ধি, ভক্তি এবং সুদৃঢ় ভক্তির জন্য দেবতারা তোমার ওপর অত্যন্ত প্রীত। সুতরাং তোমার ইচ্ছামতো বর প্রদান করার জন্য আমি প্রস্তুত।

মান্ধাতা বললেন—ভগবন্! আমি আপনার চরণে মাথা নত করছি এবং আপনাকে প্রসন্ন করে আদিদেব ভগবান বিষ্ণুকে দর্শন করতে চাই। এখন আমার সর্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ করে বনে যাওয়ার ইচ্ছা; কারণ পৃথিবীতে সব সৎ ব্যক্তিই সংসার ধর্ম পালনের পর এই পথই অনুসরণ করেন; আমি ক্ষাত্রধর্মদ্বারা প্রাপ্ত পুণ্যলোক তো প্রাপ্ত হয়েছি এবং জগতে নিজ কীর্তিও স্থাপন করেছি, কিন্তু যে ধর্ম আদিদেব শ্রীবিষ্ণু ভগবান থেকে প্রবৃত্ত হয়েছে, তার আচরণ আমি করতে জানি না।

ইন্দ্র বললেন—আদিদেব ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে প্রথমে রাজধর্মই নিষ্ক্রান্ত হয়, অন্য ধর্ম তার অঙ্গ এবং সেগুলি পরেই বিকশিত হয়েছে। সব ধর্মের অন্তর্ভাব ক্ষাত্রধর্মেই হয়, তাই ক্ষাত্রধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ভগবান ক্ষাত্রধর্মের দ্বারা শত্রু দমন করে দেবতা ও ঋষিদের রক্ষা করেছিলেন। তিনি যদি অসুর আক্রান্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা না করতেন তাহলে ব্রাহ্মণদের বিনাশ হওয়ায় চার বর্ণ এবং চার আশ্রমের সমস্ত ধর্মই বিনাশপ্রাপ্ত হত। এই সনাতন ধর্ম শতবার বিনষ্ট হয়েছে; কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম একে পুনরায় উজ্জীবিত করেছে। এইজন্যই যুগে যুগে সনাতন ধর্ম উদ্ধার লাভ করেছে। তাই মনুষ্যসমাজে এই ধর্মকেই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলে মানা হয়। যুদ্ধে শরীর বিসর্জন দেওয়া, সমস্ত প্রাণীদের দয়া করা, লোক-ব্যবহারের জ্ঞানলাভ করা, ভীত প্রজাদের রক্ষা করা এবং দুঃখী লোকেদের দুঃখ দূর করা—এ সমস্তই রাজাদের ক্ষাত্রধর্মের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যারা কাম-ক্রোধে আবদ্ধ থাকে এবং মর্যাদা রক্ষা করে চলে না, তারা রাজ-দণ্ডের ভয়ে অপরাধ করতে সাহস পায় না এবং যাঁরা সর্বধর্মপালনকারী শিষ্ট ব্যক্তি, তাঁরা সদাচার পালন করে স্বধর্ম উপদেশ প্রদান করতে পারেন। রাজা তাঁর প্রজাদের পুত্রের ন্যায় পালন করেন, তাই এতে কোনো সন্দেহই নেই যে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে সব প্রাণীই নির্ভয়ে জগতে বিচরণ করে। সুতরাং জগতে ক্ষাত্রধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, সনাতন, নিত্য, অবিনাশী এবং সর্ব জীবের হিতকারী, মোক্ষেই এর পর্যবসান হয়।

রাজন্! তোমার ন্যায় লোকহিতৈষী পুরুষের ক্ষাত্রধর্মই পালন করা উচিত। এটি পালন না করলে প্রজা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে রাজা সর্ব প্রাণীর ওপর দয়াদৃষ্টি রাখেন, তাঁর এটিই নিজের প্রধান ধর্ম মনে করা উচিত। তিনি এই পৃথিবীর সংস্কার করাবেন, রাজসূয়-অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে অবভৃত স্নান করবেন, ভিক্ষার আশ্রয় নেবেন না, প্রজাপালন করবেন এবং যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দেবেন। বিভিন্ন উপায়, নিয়মাদি ও পুরুষার্থের দ্বারা চাতুর্বর্ণ স্থাপন ও সুরক্ষিত রাখার জন্য ক্ষাত্রধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয় এবং এতেই সর্ব ধর্ম নিহিত আছে। যাগ-যজ্ঞ করানো এবং প্রথমে যে চতুরাশ্রমের কথা বলা হয়েছে, তা পালন করাই ব্রাহ্মণের কর্তব্য এবং প্রধান ধর্ম। যে বিপ্র তা পালন করেন না, তাঁকে শূদ্রের ন্যায় অস্ত্র দ্বারা বধ করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ অধর্মে প্রবৃত্ত, সে সম্মানের পাত্র হতে পারে না, তাকে কারো বিশ্বাস করাও উচিত নয়।

মান্ধাতা বললেন—দেবরাজ! আমার রাজ্যে যেসব যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ এবং কাম্বোজ প্রভৃতি জাতির লোক থাকে এবং যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্রের সন্তানেরা আছে, তাদের নিজ নিজ ধর্ম কীভাবে পালন করা উচিত ? এতদ্ব্যতীত যারা লুট-পাট করে জীবিকা-নির্বাহ করে, তাদের সঙ্গে আমার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত ?'

ইন্দ্র বললেন—রাজন্ ! যারা লুট-পাট করেই জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের দ্বারা তাদের মাতা, পিতা, আচার্য, গুরু, আশ্রমবাসী এবং রাজাদের সেবা করানো উচিত, বেদোক্ত ধর্ম-কর্ম এবং পিতৃশ্রাদ্ধ করানো কর্তব্য, কুয়ো, আশ্রম প্রভৃতি নির্মাণ করানো উচিত এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মণদের দান করা উচিত। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, শৌচ, অদ্রোহ, যাগ-যজ্ঞ করিয়ে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়া প্রয়োজন এবং বড় আকারে ব্রহ্মভোজ করানো উচিত। রাজন্ ! প্রজাপতি ব্রহ্মা এইসব মানুষদের কর্তব্য আগেই নির্ধারণ করেছেন। তা যথাবৎ পালন করা উচিত।

মান্ধাতা বললেন—দেবরাজ ! মানবসমাজে সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমেই দস্যু দেখা যায়। তারা শুধু বিভিন্ন রূপে লুক্কায়িত থাকে।

ইন্দ্র বললেন—রাজন্ ! যখন দণ্ডনীতি লোপ পায় এবং রাজধর্ম উপেক্ষিত হয় তখন সকল প্রাণীই কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই সত্যযুগ সমাপ্ত হলে বহু বেশধারী সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হবে এবং সমস্ত আশ্রমে নানা রদ-বদল ঘটবে। লোকের কাম ও ক্রোধ প্রবল হবে, তখন তারা বেদ ও পুরাণের দিকে মনোযোগ না দিয়ে অন্যপথে চলবে। উদার হৃদয় রাজারা যখন দণ্ডনীতির সাহায্যে পাপীদের পাপাচরণে বাধা দেন, তখন সনাতন ধর্ম হ্রাস পায় না। রাজা সকলেরই সম্মানের পাত্র। যে ব্যক্তি তাঁকে অপমান করেন, তাঁর দান, যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধ কখনো সফল হয় না। রাজা মানুষের অধিপতি, সনাতন, দেবস্বরূপ এবং ধর্মরক্ষাকারী হন ; যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে প্রবৃত্তি ধর্মের গতি বিচার করেন, আমি তাঁকে মাননীয় ও পূজ্য বলে মনে করি, তার মধ্যেই ক্ষাত্রধর্ম অবস্থান করে।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মান্ধাতাকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে ইন্দ্ররূপধারী ভগবান বিষ্ণু তাঁর সনাতন ও অবিনাশী ধামে চলে গেলেন। ভগবান বিষ্ণু প্রথমে এইভাবে রাজধর্ম প্রচলন করেছিলেন এবং সৎপুরুষেরা সেইরূপ আচরণ করতে লাগলেন। সুতরাং তুমিও তোমার পূর্বপুরুষ স্বীকৃত এই ক্ষাত্রধর্মের আচরণ করো।

—o—

রাজধর্মে চার আশ্রমের ধর্ম সমাবেশ

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি মানুষের চার আশ্রমের কথা বলেছেন, আপনি কৃপা করে এবার তার বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সনাতন ধর্মের সম্বন্ধে জ্ঞান আমারও যেমন আছে, তোমারও তাই, তবুও যদি আমার কাছে জানতে চাও, তাহলে শোনো। সদাচারে প্রবৃত্ত হয়ে চার আশ্রমের ধর্মপালনকারী মানুষ যে ফললাভ করে, সেই ফলই যে রাজা রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করে দণ্ডনীতি অনুসারে রাজ্য শাসন করেন, তিনিও প্রাপ্ত হন। যদি রাজা সর্বপ্রাণীর ওপর সমদৃষ্টি বজায় রাখেন, তাহলে তিনি সন্ন্যাসীরা যে গতি প্রাপ্ত হন, তাই লাভ করেন। যে রাজা আত্মতত্ত্ব জানেন এবং যিনি দয়া ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবগত আছেন, তিনি গৃহস্থ আশ্রমিকদের প্রাপ্তব্য লোক লাভ করেন। এইভাবে যিনি সম্মানীয় ব্যক্তিদের অভীষ্ট বস্তু দিয়ে সম্মানিত করেন, তিনি ব্রহ্মচারীদের অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হন এবং যিনি তাঁর স্বজাতীয়, স্বজন ও সুহৃদদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তিনি বাণপ্রস্থীদের অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও আশ্রমিকদের সৎকার করেন, পিতৃশ্রাদ্ধ, ভূতযজ্ঞ, অতিথিসেবা ও দেবপূজা করেন এবং যিনি সৎব্যক্তিদের সংকারের জন্য শত্রুরাষ্ট্র জয় করেন, সেই রাজা বাণপ্রস্থ লোক প্রাপ্ত হন। সমস্ত প্রাণী এবং নিজ রাষ্ট্র পালন, প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন, ক্ষমা, আচার্যপূজা এবং গুরুসেবা—এইসব ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সাধন। যুদ্ধে যে রাজা সিদ্ধান্ত নেন যে 'হয় দেশ রক্ষা করব, নাহলে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেব', তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। যে রাজা সকল প্রাণীর প্রতি নিষ্কপট এবং সরল ব্যবহার করেন, তিনিও বাণপ্রস্থীদের প্রাপ্ত লোক লাভ করেন। যিনি বালক, বৃদ্ধ ও সকল প্রাণীদের দয়া করেন, সেই রাজা

সকল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন।

কেউ যদি অত্যাচারিত হয়ে রাজার শরণাগত হয়, তাহলে তাকে রক্ষাকারী রাজা গৃহস্থাশ্রমীদের লোক প্রাপ্ত হন। এইভাবে যে রাজা চরাচরে প্রাণীদের রক্ষা ও পূজা করেন এবং পূজনীয় ও আত্মজ্ঞ সৎব্যক্তিদের পালন করেন, তিনিও গৃহস্থদের প্রাপ্ত লোক লাভ করেন। যে ব্যক্তি বিধাতা রচিত ধর্মে যথার্থ রীতিতে অবস্থান করেন, তিনি সকল আশ্রমের প্রাপ্তব্য পুণ্যফল লাভ করেন। মানুষের আশ্রম অনুসারে স্থান, কুল ও আয়ুর মর্যাদা রাখা উচিত। যিনি বহু উপহার ও সম্পত্তি দ্বারা প্রাণীদের সংকার করেন এবং সর্বাবস্থায় ধর্মের ওপরেই দৃষ্টি রাখেন, সেই রাজা সকল আশ্রমের শুভফল লাভ করেন। যে রাজার রাজ্যে ধর্মকুশল ব্যক্তি সুরক্ষিত থেকে ধর্মাচরণ করতে সক্ষম হন, রাজা সেই পুণ্যের অংশ প্রাপ্ত হন। যে রাজা ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রক্ষা করেন না, তিনি সেই ব্যক্তিদের পাপের ভাগী হন। যে ব্যক্তি ধার্মিক ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য রাজার সহায়তা করেন, তিনি অপরের ধর্মের অংশ লাভ করেন। যুধিষ্ঠির ! এই বিষয় সর্বতোভাবে স্পষ্ট যে আমরা যে ধর্মে স্থিত, সেই গৃহস্থাশ্রম অন্য সকল আশ্রমের থেকে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি দণ্ড ও ক্রোধ পরিত্যাগ করে সমস্ত প্রাণীকে আপন মনে করেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ ভোগ করেন। জীবের হৃদয়ে যখন জগতে কোনো ভোগের প্রতিই আসক্তি থাকে না, তখন সে সত্ত্বে স্থিত হয় এবং পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

রাজন্ ! তুমি বেদাধ্যয়ন রত এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণদের এবং অন্য সব লোকেদের রক্ষার জন্য চেষ্টা করো। দেশে, বনে এবং আশ্রমে বাস করে লোকে যত ধর্ম করে, তাদের রক্ষা করায় রাজা শতগুণ পুণ্য লাভ করেন। আমি তোমাকে এই কয়েক প্রকারের রাজধর্মের কথা জানালাম। এগুলি অত্যন্ত প্রাচীন এবং সনাতন, তুমি এগুলি পালন করো। যদি তুমি প্রজাপালনে তৎপর থাক, তাহলে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ধর্মাচরণের ফল তুমি লাভ করবে।

প্রজার অভ্যুদয়ের জন্য রাজার আবশ্যকতা নির্ধারণ এবং এই বিষয়ে বৃহস্পতি ও রাজা বসুমনার কথোপকথনের উল্লেখ

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি তো চার আশ্রম এবং চার বর্ণের ধর্মের কথা জানালেন, এবার আমাকে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্যের কথা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হল রাজার অভিষেক করা ; কারণ প্রভু ও সৈন্যবিহীন রাজ্য চোর অকাতে নষ্ট করে দেয়। যে রাজ্যে রাজা থাকে না, সেখানে অনুশাসন থাকে না। লোকে সেখানে একে অপরকে গ্রাস করতে থাকে। সেই রাজাবিহীন রাজ্যকে ধিক্কার। অরাজক দেশে বাস করা কারো পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। কোনো রাজ্য লোলুপ প্রবল শত্রু যদি রাজ্যকে আক্রমণ করে, তাহলে এগিয়ে গিয়ে তাকে স্বাগত জানানো উচিত ; কারণ পৃথিবীতে অরাজকতার থেকে বড় আর পাপ নেই। সুতরাং যারা উন্নতিতে ইচ্ছুক তাদের সর্বদা নিজের দেশে একজন রাজা নিযুক্ত করে রাখা উচিত। যে দেশে কোনো রাজা থাকে না সেখানকার লোক ধন বা নারীর সুখ ভোগ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পাপীরাও সুখে থাকে না ; কারণ একজনের অর্থ দুজনে মিলে লুট করলে আবার সেই অর্থ অনেকে মিলে লুট করে নেয়। সেখানে যারা দাস নয়, তাদেরও দাসরূপে পরিগণিত করা হয়, নারীদের বলপূর্বক অপহরণ করা হয়। তাই দেবতারা প্রজাপালনকারী রাজা সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে যদি দণ্ডধারী রাজা না থাকে, তাহলে জলস্থিত মৎস্যের ন্যায় বলবান ব্যক্তিরা দুর্বলকে আত্মসাৎ করে।

শোনা যায় রাজাবিহীন হওয়ায় পুরাকালে বহু প্রজা বিনষ্ট হয়েছে। অবশেষে প্রজা তখন দুঃখিত হৃদয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু ! রাজা না থাকলে আমরা শেষ হয়ে যাব। আপনি আমাদের জন্য একজন রাজাকে নিযুক্ত করুন।' তখন ব্রহ্মা মনুকে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু মনু রাজ্য ভার গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি পাপকে ভয় পাই, রাজ্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন

কাজ। বিশেষ করে মানুষের পক্ষে তো এ কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে ; কারণ তাদের আচরণ সর্বদাই অসত্যপূর্ণ হয়।' তখন ব্রহ্মা বললেন—'তুমি তাতে ভয় পেয়ো না, যারা কুকাজ করে, তাদের পাপ হয়। তুমি অত্যন্ত বলবান এবং প্রতাপশালী রাজা হবে, কেউই তোমাকে অবদমন করতে পারবে না এবং তোমার জন্য আমরা সকলেই সুখলাভ করব। তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে প্রজারা যে ধর্মাচরণ করবে, তার চতুর্থাংশ ফল তুমি প্রাপ্ত হবে। সেই ধর্মের প্রভাবে তুমি আমাদেরও পোষণ করতে পারবে। এখন যাও, তুমি বিজয়লাভ করো এবং শত্রুদমন করো। তুমি সর্বদাই জয়লাভ করবে।'

ব্রহ্মার নির্দেশে মহারাজ মনু বিশাল সৈন্য নিয়ে শত্রু দমনে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর মহত্ত্ব দেখে সকলেই ভীত হয়ে ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করল। মনু এইভাবে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে শত্রুদমন করলেন এবং প্রজাদের নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত করলেন। অতএব যে ব্যক্তির ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা হবে তাকে সর্বপ্রথম প্রজাদের অনুগ্রহ করার জন্য কোনো রাজা নিযুক্ত করতে হবে এবং তাঁকে প্রতিদিন ভক্তি সহকারে অভিবাদন করতে হবে। ইহলোকে যাঁকে নিজের লোকেরা সম্মান করে, তাঁকে অন্য ব্যক্তিরাও মান্য করে আর যাকে নিজের লোকেরা অবহেলা করে, সে অন্যের চোখেও হেয় হয়ে যায়। রাজাকে অপরে নিন্দা করলে, তা সকলের পক্ষেই দুঃখজনক হয়। তাই প্রজাদের উচিত রাজাকে আনুগত্যের নানা সামগ্রী উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মান জানানো। সেই সম্মান পেলে রাজা দুর্জয় হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মধ্যে প্রজাদের রক্ষা করার শক্তি সঞ্চারিত হয়।

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! ব্রাহ্মণরা কেন রাজাকে দেবরূপ বলে থাকেন ? কৃপা করে আমাকে সেই রহস্য জানান।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! রাজা বসুমনা এই কথা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বৃহস্পতি তাঁকে বলেছিলেন, 'রাজন্ ! পৃথিবীতে যে ধর্ম পরিলক্ষিত হয়, রাজাই তার মূল আধার। রাজার ভয়েই প্রজারা একে অপরকে আক্রমণ করে না। প্রজা যখন মর্যাদা ত্যাগ করে লোভের বশীভূত হয়, তখন রাজাই অনুশাসনের সাহায্যে তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। রাজা না থাকলে অল্প জলের মাছ এবং বনে থাকা পাখির মতো প্রজারাও নিজেদের মধ্যে কথায় কথায় ঝগড়া মারামারি করে বিনাশপ্রাপ্ত হত। তখন শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল মানুষের ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করত এবং তাতে বাধা দিলে সেইসব গরিবদের হত্যা করত। পাপীরা সাধারণ মানুষের ধন-বস্ত্র-বাহন-অলংকার সব লুটে নিত। রাজা রক্ষা না করলে ধর্মাত্মাদের নানা আঘাত সহ্য করতে হত, অধর্মের বিস্তার হত, পাপীরা মাতা-পিতা, বৃদ্ধ, আচার্য, অতিথি, গুরু প্রভৃতিকে দুঃখ দিতে থাকত ; ধনীদের মৃত্যু ও বন্ধনের কষ্ট সহ্য করতে হত, কোনো ব্যক্তিই কোনো বস্তুর ওপর নিজ স্বত্ব জাহির করতে পারত না ; লোক অকালেই কালের গ্রাসে যেত, দেশে দস্যুর প্রাধান্য বেড়ে যেত, কৃষিকাজ নষ্ট হত, ব্যবসা-বাণিজ্য মাটিতে মিশে যেত ; নীতি ও কর্মকাণ্ড লোপ পেত ; বিপুল দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞ দেখা যেত না এবং বিবাহ অথবা সমাজ-সংগঠন বলেও কিছু অবশিষ্ট থাকত না। রাজা যদি প্রজাকে পালন না করেন, তাহলে সমস্ত জগতে ত্রাস ছড়িয়ে পড়বে। এক মুহূর্তেই এই জগৎ-সংসার বিনাশপ্রাপ্ত হবে ; তখন ব্রহ্মহত্যাকারীও আরামে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করবে। চোর যখন-তখন চৌর্যকর্ম করবে, ধর্মমর্যাদা ভেঙে পড়বে, লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিকে পালাতে থাকবে, অন্যায় ছড়িয়ে পড়বে, প্রজা বর্ণসংকর হয়ে উঠবে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। রাজা দ্বারা সুরক্ষিত হয়েই লোকে নির্ভয়ে বাস করে এবং সুখে নিদ্রা যায়। ধর্মনিষ্ঠ রাজা যদি

পৃথিবী রক্ষা না করেন, তাহলে লোকে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে থাকে। রাজা যদি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহলে নারীরা নানা মূল্যবান বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে পুরুষ বিনাই পথে যেতে সাহস করেন, লোকে ধর্মাচরণ করে, মিছামিছি কাউকে কষ্ট দেয় না, তিন বর্ণের লোক নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং সকলেই বিদ্যাভ্যাস করে। যখন রাজা সর্বপ্রকারে তাঁর ধর্ম ও কর্ম ঠিকভাবে করেন এই জগতের কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই তখন ঠিকমতো চলতে থাকে।

রাজা না থাকলে সর্বভাবে প্রাণীর বিনাশ হতে থাকে, তিনি থাকলেই সকলে রক্ষা পায়। এই অবস্থায় রাজাকে কে অসম্মান করবে ? যে ব্যক্তি রাজার প্রিয় এবং তাঁর হিত করে, তার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই ভালো হয় আর যে মনে মনেও রাজার অহিত কামনা করে, সে ইহজগতেও কষ্ট পায় এবং মৃত্যুর পরেও তাকে নরকের দ্বার দেখতে হয়। 'এ তো মানুষ'—এই ভেবে কখনো রাজাকে অপমান করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ইনি মানুষরূপে বিরাজমান দেবতা। রাজা সময়-অসময়ে অগ্নি, সূর্য, মৃত্যু, কুবের, যম—এই পঞ্চদেবতার রূপ ধারণ করেন। তিনি অগ্নিরূপ ধারণ করে প্রজাদের কষ্টদানকারী দুষ্ট ব্যক্তিদের উগ্র তেজে দগ্ধ করেন। সূর্যরূপ ধারণ করে গুপ্ত নেত্র দ্বারা প্রজাদের প্রবৃত্তিগুলি অনুধাবন করেন। তিনি মৃত্যুসমান হয়ে ওঠেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শত শত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের পুত্র-পৌত্র এবং পরামর্শদাতাদের বধ করেন। আবার তিনি সাক্ষাৎ যমরাজের মতো কঠোর দণ্ডপ্রদান করে অধার্মিকদের দমন করেন এবং ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের দয়া প্রদর্শন করেন। কখনো কুবেরের মতো উপকারী ব্যক্তিদের ধন ও স্ত্রী-রত্ন প্রদান করেন এবং অপকারীদের ধন-রত্ন অপহরণ করে নেন। যে ব্যক্তি কার্যকুশল, পুণ্যকর্মা এবং ঈর্ষাশূন্য ও ধর্মের বৃদ্ধি চায়, তার কখনো রাজার নিন্দা করা উচিত নয়। রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ কখনো সুখ পায় না, সে রাজার যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন। প্রজ্বলিত অগ্নির সামনে পড়ে যদিও কখনো কেউ রক্ষা পেতে পারে কিন্তু রাজার ক্রোধের সামনে পড়লে কেউ কখনো রক্ষা পায় না। রাজার সম্পদ থেকে মৃত্যুর ন্যায় দূরে থাকা উচিত। রাজদ্রব্য স্পর্শ করলে মানুষের প্রাণসংকট হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির রাজার বস্তু নিজের জিনিস মনে করে রক্ষা করা উচিত।

সুতরাং যে ব্যক্তি উন্নতি করতে চায়, তাকে সংযমী হয়ে, জিতেন্দ্রিয় হয়ে, মেধাবী হয়ে, বিচারশক্তি রক্ষা করে, চতুরতার সঙ্গে রাজার পক্ষে থাকা উচিত। রাজারও সেই মন্ত্রীকে সম্মান জানানো উচিত যিনি কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান, উদার, সুদৃঢ় ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মনিষ্ঠ এবং সর্বদা নীতি অনুসরণকারী। যে ব্যক্তি নিজের ওপর দৃঢ় অনুরাগ রাখে, বুদ্ধিমান, ধর্মজ্ঞ, সংযতেন্দ্রিয়, শূরবীর এবং উদার ও সকলকে বাদ দিয়ে একাই সব কাজ করতে প্রস্তুত, এমন ব্যক্তিকে রাজার কাছে অবশ্যই রাখা উচিত। রাজাই হলেন প্রজাদের গৌরবপূর্ণ হৃদয় ও তাদের গতি, প্রতিষ্ঠা এবং প্রধান সুখ। যেসব ব্যক্তি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করে। রাজাও সত্য, দমন ও সৌহার্দপূর্ণভাবে পৃথিবী শাসন করেন এবং বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান করে সনাতন স্বর্গস্থান লাভ করেন।' বৃহস্পতি এইরূপে উপদেশ প্রদান করলে কোশলরাজ বসুমনা যত্ন সহকারে তাঁর প্রজাদের পালন করতে লাগলেন।

রাজার প্রধান প্রধান কর্তব্য এবং যুগনির্মাণে দণ্ডনীতির প্রাধান্যের বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজার প্রধান কর্তব্য কী ? তাঁর কীভাবে দেশরক্ষা করা উচিত ? শত্রুকে কীভাবে জয় করা উচিত ? কীভাবে দূত নিযুক্ত করা কর্তব্য এবং চতুর্বর্ণ, অনুচর, স্ত্রী ও পুত্রদের কীভাবে নিজের প্রতি বিশ্বাস আনা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! তুমি রাজার আচরণ সম্বন্ধে মনোযোগ দিয়ে শোনো। রাজা এবং তাঁর প্রতিনিধির প্রথমে কী করা উচিত, আমি তোমাকে বলছি। রাজার প্রথমেই নিজ মনকে বশীভূত করা উচিত, তারপর শত্রুদের পরাস্ত করবার চেষ্টা করতে হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়কে বশে রাখাই মনের বিজয় ; যে রাজা জিতেন্দ্রিয় তিনিই শত্রুদমন করতে সক্ষম। রাজাকে দুর্গের মধ্যে, রাজ্যের সীমানায়, নগর ও গ্রামের উদ্যানগুলিতে সেনা নিযুক্ত করতে হয়। এইরূপ সমস্ত পাল্লতে, গ্রাম ও নগরের ভেতর, প্রাসাদের আশপাশেও

সর্বত্র উপযুক্ত সংখ্যায় সাহায্যকারী রাখা উচিত। যাদের ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, যারা দেখতে মূর্খের ন্যায়, অন্ধ এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পরিশ্রম সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন, তাদের গুপ্তচর করা উচিত। মন্ত্রী, মিত্র এবং পুত্রের ওপরও গুপ্তচর নিযুক্ত করা উচিত। দেশ, নগর এবং সামন্ত রাজ্যেও এদের এমনভাবে নিযুক্ত করবে, যেন তারা নিজেরাই একে অপরকে চিনতে না পারে। নিজের গুপ্তচর দ্বারা বাজার, বিহার, সমাজ, সন্ন্যাসী, উদ্যান, পণ্ডিত সভা, পথ-ঘাট, চৌমাথা, সভা-স্থল এবং ধর্মশালাতে অবস্থানকারী শত্রুর গুপ্তচরদের খবর রাখা কর্তব্য। রাজা যদি আগেই শত্রুর গতিবিধির খবর পেয়ে যান, তাহলে রাজার দেশ শাসনে অত্যন্ত সুবিধা হয়।

রাজার যদি নিজের পক্ষ দুর্বল বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলে শত্রু সে খবর পাওয়ার আগেই তার সঙ্গে সন্ধি করে নিতে হয়। এতে যদি কিছুমাত্র লাভ আছে মনে হয়, তাহলে সন্ধি করতে দেরি করা উচিত নয়। যে রাজা গুণবান, উৎসাহী, ধর্মজ্ঞ এবং সদাচারী ; ধর্মানুসারে প্রজা পালনকারী রাজার তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। যদি রাজার অবস্থা সংকটপূর্ণ হয়, তাহলে যে অপরাধীদের প্রথমে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং জনতা যাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ, তাদের বিনাশ করা উচিত। যাদের থেকে কোনো প্রকার উপকার বা বা অপকারের সম্ভাবনা নেই এবং যারা মাথা তুলে কথা বলার সাহস রাখে না, রাজা তাদের উপেক্ষা করবেন। যে রাজার শত্রু-দমনের সামর্থ্য থাকে এবং যাঁর সেনা দুর্ধর্ষ, তিনি রাজধানীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করে শত্রু যখন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, অসাবধান এবং দুর্বল, তখন তাদের আক্রমণ করার আদেশ দেবেন। শত্রু বলবান হলেও সর্বদা তার অধীন হয়ে থাকবে না। নিজে দুর্বল হলেও গুপ্তরূপে তার শক্তি হ্রাসের চেষ্টা করবে এবং তার মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্রদের মধ্যে ভেদভাব এনে দেবে।

যে রাজা রাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁর সর্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা উচিত নয়। বৃহস্পতি সাম দান ও ভেদ—এই তিন উপায়ে অর্থ প্রাপ্তির কথা বলেছেন। প্রজার আয়ের ষষ্ঠাংশ প্রজাদের রক্ষার জন্য কর হিসাবে রাজার নেওয়া উচিত। প্রজাদের ওপর রাজার সন্তানসম স্নেহ রাখা কর্তব্য, কিন্তু ন্যায়বিচারের সময় পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। ন্যায় বিচারের সময় বাদী প্রতিবাদীর কথা শোনার জন্য বিচারশীল বিদ্বান ব্যক্তি নিযুক্ত করা উচিত। কারণ ন্যায়ের শুদ্ধিই রাজ্যের আধার খনি, ব্যবসায়ের স্থান, নৌকাঘাট ইত্যাদি স্থানে কর গ্রহণের জন্য বিশ্বাসী এবং রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত। যে রাজা ঠিকমতো ন্যায়বিচার করেন, তাঁরই ধর্মলাভ হয়। ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া রাজার প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া তাঁর বেদ-বেদাঙ্গ জ্ঞাতা, তপোনিষ্ঠ, দানশীল এবং যাগ-যজ্ঞপরায়ণ হওয়া উচিত। রাজার মধ্যে এই গুণ নিরন্তর স্থিরভাবে থাকা উচিত।

কোনো দুর্বল রাজাকে যদি কোনো বলবান শত্রু আক্রমণ করে, তাহলে সেই রাজার দুর্গের মধ্যে গিয়ে মিত্রদের সঙ্গে সাম-ভেদ এবং যুদ্ধ নিয়ে পরামর্শ করাই যুক্তিযুক্ত । যুদ্ধ করাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহলে পশুশালাগুলিকে বন থেকে এনে পথের ওপর রাখবে। ধনী এবং সেনাধিপতিদের বারংবার বুঝিয়ে এমন স্থানে নিয়ে যাওয়া হোক যাতে তারা রাজ্যের সমস্ত খাদ্য নিজেদের অধিকারে রাখে। নদীর সেতু সব ভেঙে দেওয়া হোক, শত্রুদের যেসব স্থানে লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা, সেগুলি ভেঙে ফেলা হোক। দেবালয়ের বৃক্ষগুলি বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত ছোট গাছগুলি এবং বড় গাছের ডালগুলি কেটে ফেলা হবে। নগরের চারিধারে পরিখা কেটে সেগুলি জলপূর্ণ করে কুমির ছেড়ে দেবে এবং নগরে উচ্চ প্রাচীর তুলে দেবে। হাওয়া চলাচল করার জন্য এবং পালাবার সুব্যবস্থার জন্য বড় বড় ফটক এবং পরিখার ওপর সেতুর ব্যবস্থা রাখবে। গোপন সুড়ঙ্গে ভারী যুদ্ধযন্ত্র এবং কামান বসাবে এবং তার ওপর নিজ অধিকার কায়েম রাখবে। দুর্গের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী এবং ইন্ধন জমা করে রাখবে, জলের জন্য নূতন কূপ খনন করবে এবং পুরাতনগুলিকে সংস্কার করিয়ে রাখবে। যে ঘরগুলি খড়ের, তার ওপর মাটির প্রলেপ দেবে এবং আগুন যাতে না লাগে সেজন্য ঘাসের জমি পরিষ্কার রাখবে। দিনের বেলা পূজার সময় ছাড়া আগুন জ্বালাবে না। যেখানে আগুনের প্রয়োজন, সেখানেও সতর্কতার সঙ্গে আগুন জ্বালাবে। নগর রক্ষার জন্য ঢাক বাজিয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে যে অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাবে, তাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে। এইসময় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নগরের বাইরে বার করে দিতে হবে, রাজপথ প্রশস্ত করতে হবে এবং বাজার-দোকানের যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যের ভাণ্ডার, অস্ত্রাগার, সেনাছাউনী, রাজমহল ইত্যাদি

এমনভাবে সুরক্ষিত রাখবে যাতে অন্য কেউ এগুলি দেখতে না পায়। আহতদের চিকিৎসার জন্য ঔষধপত্রের সুব্যবস্থা রাখবে। এই সময় যেসব মন্ত্রী, অনুচর, পুরবাসীদের ওপর সন্দেহ থাকে তাদের নিজ বশে রাখবে। কোনো কাজে সাফল্য এলে সাহায্যকারীকে প্রচুর অর্থ ও উপহার দান করে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করবে।

নিজ শরীর, মন্ত্রী, কোষ, সেনা, মিত্র, রাষ্ট্র এবং নগর—এই সাতটিকে 'রাষ্ট্র' বলা হয়। রাজাকে যত্ন সহকারে তা রক্ষা করতে হয়। যে রাজা ছয় গুণ, তিন বর্গ এবং তিন পরমবর্গ জানেন, তিনি এই পৃথিবীকে ভোগ করতে সক্ষম। এর মধ্যে ছয় গুণ কী কী তা শোনো—সন্ধি করে শান্তিতে থাকা, আক্রমণ করা, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা, আক্রমণ করে শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেওয়া, শত্রুদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা এবং দুর্গ অথবা অন্য কোনো রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা। তিন বর্গ হল—ক্ষয়, স্থিতি এবং বৃদ্ধি ; আর তিন পরমবর্গ হল—ধর্ম, অর্থ ও কাম। অঙ্গিরার পুত্র দেবর্ষি বৃহস্পতির বক্তব্য হল যে, সর্বপ্রকার কর্তব্য পূরণ করে, পৃথিবী ভালোভাবে পালন করে প্রজাদের ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে রাজা পরলোকে সুখপ্রাপ্ত হয়। যে রাজা তাঁর প্রজাদের সুন্দরভাবে পালন করেছেন, তাঁর আর তপস্যা বা যজ্ঞ করার কী প্রয়োজন ? তিনি তো সমস্ত ধর্মই জানেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! দণ্ডনীতি এবং রাজা এই দুটি কোন ব্যবহারের দ্বারা সাফল্য লাভ করতে পারে—আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! দণ্ডনীতির দ্বারা রাজা এবং প্রজার যে মহাভাগ্য সিদ্ধ হয়, আমি তা যুক্তিপূর্ণ শব্দে বলছি, শোনো। রাজা যদি দণ্ডনীতি ঠিকভাবে প্রয়োগ করেন, তাহলে সব বর্ণের লোকেদের তা ধর্মে স্থির রাখে এবং তাদের অধর্ম পথে যেতে বাধা দেয়। এইভাবে মর্যাদা নষ্ট না হলে এবং সবকিছু কুশলে থাকায় প্রজাদের কোনো ক্লেশ থাকে না এবং তিন বর্ণ শাস্ত্রানুসারে শান্তিতে থাকার জন্য চেষ্টা করে আর তাতেই মানবজাতির সুখ নিহিত থাকে। তোমার এই সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে রাজার স্থিতি সময়ের অধীন অথবা সময় রাজার অধীন ; কারণ বাস্তবিক সময়ই রাজার অধীন। রাজা যখন দণ্ডনীতির পূর্ণ ব্যবহার করেন, তখন পৃথিবীতে পূর্ণভাবে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সেই সত্যযুগে শুধুমাত্র ধর্মই অবস্থান করে, অধর্ম কোথাও দেখা যায় না এবং কোনো বর্ণের মানুষেরই অধর্মে রুচি হয় না। সেই সময় প্রজাদের যোগ-ক্ষেম স্বতই সিদ্ধ হয় এবং সর্বত্র বৈদিক গুণ বিস্তার লাভ করে। সকল ঋতুই সুখ ও স্বাস্থ্য সৃষ্টি করে, লোকের মন প্রসন্ন থাকে, মানুষের আয়ু দীর্ঘ হয়, কোনো নারী বিধবা হয় না, কোনো কৃপণ ব্যক্তি দেখা যায় না। পৃথিবীতে বিনা আয়াসে খাদ্য উৎপন্ন হয়, সব কিছু সুলভ হয়। এসবই সত্যযুগের ধর্ম।

তারপর রাজা যখন দণ্ডনীতির চতুর্থ অংশ পরিত্যাগ করে তিনটি অংশকে ব্যবহার করে তখন ত্রেতাযুগ শুরু হয়। তখন ধর্মের তিন অংশের সঙ্গে অধর্মের এক অংশও ব্যবহৃত হতে থাকে এবং চাষবাস করলে তবেই খাদ্য উৎপন্ন হয়। এরপর রাজা যখন নীতির অর্ধভাগ পরিত্যাগ করে শুধু অর্ধভাগ অনুসরণ করেন, তখন দ্বাপরযুগ আরম্ভ হয়। সেই সময় ধর্মের দুই ভাগ ও অধর্মের দুই ভাগ অনুবর্তিত হয় এবং চাষবাসের অর্ধেক ফল পাওয়া যায়। শেষে রাজা যখন দণ্ডনীতি পরিত্যাগ করে প্রজাকে দুঃখ দিতে শুরু করেন, তখন পৃথিবীতে কলিযুগ শুরু হয়। কলিযুগে অধর্মেরই প্রাধান্য হয়, ধর্ম কোথাওই দেখা যায় না। সকল বর্ণেরই মন ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। শূদ্ররা ভিক্ষা করে এবং ব্রাহ্মণরা সেবা করে জীবিকা-নির্বাহ করে, যোগক্ষেম বিনাশপ্রাপ্ত হয়, বর্ণ সংকরতা (জাতির সাঙ্কর্যকারক দোষ) ছড়িয়ে পড়ে, বৈদিক কর্ম বিধিসম্মতভাবে সম্পন্ন না হওয়ায় গুণহীন হয়ে যায়, ঋতুগুলি সুখপ্রদ থাকে না, সেগুলি রোগের কারণ হয়ে ওঠে। মানুষের স্বর, বর্ণ ও মন মলিন হয়ে ওঠে, সর্বত্রই বিভিন্ন প্রকারের রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। লোক অসময়ে মৃত্যুবরণ করে, দেশে বিধবাদের আধিক্য দেখা যায়। প্রজারা ক্রূর হয়ে ওঠে। বৃষ্টি কোথাও কোথাও হয়, চাষবাস সর্বত্র ভালোভাবে হয় না। এইভাবে রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ রচনাকারী হন।

রাজা সত্য যুগ রচনা করলে তাঁর অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় ; ত্রেতাযুগ রচনা করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় না ; দ্বাপর যুগের সৃষ্টি করলে নিজ পুণ্য অনুসারে কেবল কিছু সময়ের জন্য স্বর্গলাভ ঘটে এবং যদি কলিযুগ সৃষ্টি করেন, তাহলে তাঁর অত্যন্ত পাপ হয়। এইজন্য তাঁকে বহুদিন নরক ভোগ করতে হয় এবং প্রজার পাপে ডুবে অপযশ ও পাপের ভাগী হতে হয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়দের দণ্ডনীতির জ্ঞান লাভ করে সেই অনুসারে আচরণ করা উচিত। যদি এর ঠিক ঠিক ব্যবহার

করা হয় তাহলে তিনি মাতাপিতার ন্যায় প্রজাবর্গকে পালন-পোষণ করতে সক্ষম হন। সকল প্রাণীর অস্তিত্ব দণ্ডনীতির উপর নির্ভরশীল এবং রাজার ধর্ম হল দণ্ডনীতিতে যুক্ত থাকা। সুতরাং যুধিষ্ঠির তুমি নীতিনিষ্ঠ হয়ে ধর্মানুসারে প্রজাপালন করো। তাহলে তুমি দুর্জয় স্বর্গলোক লাভ করতে পারবে।

—o—

রাজার ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রাপ্তিকারী ছত্রিশটি গুণের বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কীরূপ আচরণ করলে রাজা ইহলোকে ও পরলোকে সহজেই সুখপ্রদানকারী বস্তু লাভ করতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এরূপ ছত্রিশটি গুণ আছে, রাজা যদি সেই গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে এটি হতে পারে। আমি সেগুলি ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করছি—(১) ধর্মাচরণ করবে, কিন্তু কটু ব্যবহার করবে না। (২) আস্তিক থেকে অন্যের সঙ্গে প্রীতি-ব্যবহার ত্যাগ করবে না। (৩) ক্রূর না হয়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। (৪) মর্যাদা অতিক্রম না করে বিষয় উপভোগ করবে। (৫) দীনভাব না এনে প্রিয়ভাষণ করবে। (৬) শূরবীর হবে কিন্তু দম্ভযুক্ত কথা বলবে না। (৭) দান করবে, কিন্তু অপাত্রে নয়। (৮) স্পষ্ট ব্যবহার করবে, কিন্তু কঠোর হবে না। (৯) দুষ্টের সঙ্গে মিশবে না। (১০) বন্ধুর সঙ্গে কলহ করবে না। (১১) যে রাজভক্ত নয়, সেরূপ দূতের থেকে কাজ নেবে না। (১২) কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজের কাজ করবে। (১৩) দুষ্টকে নিজের কথা বলবে না। (১৪) নিজের গুণ গাইবে না। (১৫) সাধুর ধন হরণ করবে না। (১৬) নীচব্যক্তির আশ্রয় নেবে না। (১৭) ভালোভাবে না জেনে শাস্তি দেবে না। (১৮) গুপ্তকথা প্রকাশ করবে না। (২১) কাউকে ঈর্ষা করবে না, নারীদের রক্ষা করবে। (২২) শুদ্ধভাবে থাকবে, কাউকে ঘৃণা করবে না। (২৩) অধিক স্ত্রী-সঙ্গ করবে না। (২৪) স্বাদু হলেও অহিতকর খাদ্য গ্রহণ করবে না। (২৫) নিরভিমান হয়ে সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মান জানাবে। (২৬) নিষ্কপটভাবে গুরুসেবা করবে। (২৭) দম্ভহীন হয়ে দেবপূজা করবে। (২৮) অনিন্দিত উপায়ে লক্ষ্মীলাভের ইচ্ছা রাখবে। (২৯) শ্রদ্ধাসহকারে গুরুজনদের সেবা করবে। (৩০) কার্যকুশল হবে, কিন্তু অবসরের কথা ভাববে। (৩১) শুধুমাত্র ঝামেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোষামোদকারী কথা বলবে না। (৩২) কাউকে কৃপা করার সময় আক্ষেপ করবে না। (৩৩) না জেনে কাউকে প্রহার করবে না। (৩৪) শত্রুকে মেরে শোক করবে না। (৩৫) হঠাৎ করে ক্রুদ্ধ হবে না। (৩৬) যে তোমার অপকার করেছে, তার প্রতি কখনো কোমল ব্যবহার করবে না। রাজন্ ! যদি নিজের মঙ্গল চাও তাহলে রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে এইরূপ আচরণ করো। তুমি যদি তা না করো তাহলে চরম বিপদে পড়বে। যে রাজা এইসব গুণের অনুসরণ করেন, তিনি ইহলোকে সুখ পান এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে সম্মানলাভ করেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পিতামহ ভীষ্মের এই উপদেশ শুনে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম করলেন।

—o—

রাজধর্মের বর্ণনা, রাজার বিদ্বান পুরোহিতদের প্রয়োজনীয়তা এবং উভয়ের মধ্যে মিল থাকায় লাভ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কীভাবে প্রজাপালন করলে রাজা চিন্তা থেকে রক্ষা পান এবং যথোচিত ন্যায় করতে পারেন ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে এর তো শেষ হবে না ; সুতরাং সংক্ষেপেই বলছি। রাজগৃহে যখন শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মশীল ব্রাহ্মণ পদার্পণ করেন, তখন তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাবে, বসার জন্য আসন দেবে, বিধিনিয়ম সহকারে পূজা করে প্রণাম করবে, তারপর পুরোহিতের পরামর্শে অন্য সব রাজকার্য করবে। ধার্মিক এবং মাঙ্গলিক কার্য পূর্ণ করে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাবে এবং নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি ও বিজয়লাভের জন্য তাঁর মুখ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। রাজার সরল স্বভাব সম্পন্ন হয়ে ধৈর্য ও বুদ্ধির বলে সত্যের আশ্রয় নিয়ে কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যে রাজা কাম ও ক্রোধের সাহায্যে ধন আহরণ করতে চায়, সেই মূর্খ ধর্মকে ত্যাগ করলেও, অর্থ প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয় না। লোভী ও মূর্খ ব্যক্তিদের তুমি অর্থ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করবে না। যারা বুদ্ধিমান এবং নির্লোভ, তাদের উপরেই সব কাজের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। মূর্খদের সেই অধিকার দিলে, তারা কাজগুলি ঠিকমতো না জেনে কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে অন্যায় ভাবে প্রজাদের কষ্টদান করে। প্রজার উৎপাদিত অন্নের ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করে, শাস্ত্রানুসারে অপরাধীদের দণ্ডপ্রদান করে এবং রাজার অধীনে থাকা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর নিয়ে ধন সংগ্রহ করা উচিত। রাজার ধর্মানুসারে কর নেওয়া উচিত এবং শাস্ত্রোক্ত রীতিতে কাজ করে সাবধানতার সঙ্গে নিজ রাজ্যের প্রজাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা উচিত। যে রাজা আলস্য পরিত্যাগ করে, রাগ-দ্বেষ বর্জন করে সর্বদা প্রজাদের রক্ষা করে, দান করে এবং সর্বদা ন্যায়পরায়ণ থাকে, সেই রাজার প্রতি প্রজার বিশেষ ভালোবাসা জন্মায়। তুমি লোভবশত কখনো ধন আহরণের চেষ্টা কোরো না ; কারণ অন্যায়ভাবে উপার্জিত ধন মন্দ কাজে নষ্ট হয়ে যায়। যে ধনলোভী রাজা মোহবশে প্রজাদের থেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধভাবে বেশি কর আদায় করে তাদের কষ্টপ্রদান করে, সে নিজেই নিজের বিনাশ ডেকে আনে। যেমন দুধের লোভে গাভীর স্তন কাটলে দুধ পাওয়া যায় না, তেমনই অন্যায়ভাবে প্রজাকে দোহন করলে রাষ্ট্রের উন্নতি হয় না। যে দুগ্ধবতী গাভী পালন করে, সে রোজই দুধ পায়। এইরূপ ন্যায্যভাবে রাষ্ট্ররক্ষাকারী তাঁর এই সৎকর্মের দ্বারাই লাভবান হন। মা যেমন নিজে তৃপ্ত থাকলে তবেই শিশুকে যথেষ্ট দুগ্ধপান করান, তেমনই রাজ্যধারা সুরক্ষিত হলেই পৃথিবী ইচ্ছানুসারে অন্ন ও স্বর্ণদান করে। মালি যেমন জলসেচন করে চারাগাছকে বাড়িয়ে তোলে, তোমারও তেমন করে প্রজাদের উন্নতিসাধন করা উচিত। এরূপ ব্যবহার করলে তুমি চিরকাল রাজ্য রক্ষা করে সুখভোগ করতে পারবে। ভারত ! তুমি যদি কখনো ভিখারি হয়ে যাও, তবুও ধনী ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা কোরো না। ব্রাহ্মণদের যথাসাধ্য ধন ও আশ্বাস প্রদান এবং তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করলে তবেই তুমি উত্তমলোক প্রাপ্ত হবে।

এইভাবে ধর্মানুকূল ব্যবহার করে তুমি প্রজাপালন করো, তাহলে কখনো তোমাকে অনুতাপ করতে হবে না। প্রজাকে রক্ষা করা রাজার পরম ধর্ম। সমস্ত প্রাণীকে দয়া এবং তাদের রক্ষা করার থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই। রাজা রক্ষাকার্যে নিযুক্ত হলে সকলকে দয়া করেন, তাই ধর্মজ্ঞ পুরুষদের কাছে তিনি সব থেকে বড় ধর্মাত্মা। প্রজাকে ভয় থেকে রক্ষা করতে রাজা যদি একদিনও গাফিলতি করেন, তাহলে সেই পাপের ফল তাঁকে এক হাজার বছর ধরে ভুগতে হয় আর একদিন যদি তিনি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাহলে তিনি যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাতে দশ হাজার বছর স্বর্গে থেকে তার ফলভোগ করেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থী ব্যক্তিরা নিজ ধর্মপালন করে অনেককালে যে লোক প্রাপ্ত হন, রাজা ধর্মপূর্বক ক্ষণকালের প্রজাপালনে সেটি লাভ করেন। অতএব কুন্তীনন্দন ! তুমি চেষ্টা করে আমার কথানুযায়ী ধর্মপালন করো। তাহলে তুমি পুণ্যের ফল পাবে এবং তোমার মনে কখনো কোনো চিন্তা হবে না।

যুধিষ্ঠির ! ধর্ম ও অর্থ ঠিকমতো বোঝা কঠিন। তাই রাজার উচিত প্রত্যেক কাজে সৎপরামর্শ দেওয়ার জন্য একজন বহুদর্শী বিদ্বানকে রাজপুরোহিত নিয়োগ করা। যেখানে রাজা ও পুরোহিত দুজনেই ধর্মাত্মা এবং রাজনীতির গূঢ় বিচারগুলি সম্পর্কে অবহিত, সেই রাজ্যের প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়। দুজনেই যদি ধর্মের প্রতি আস্থাশীল এবং একে অন্যের বিশ্বাসের পাত্র হন, অত্যন্ত তপস্বী এবং পরস্পর হিতৈষী হন, উভয়ের হৃদয়-বিচার একই প্রকার হয় তাহলে তাঁরা নিজ প্রজাদের উন্নতি করতে এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষকেও তৃপ্ত করতে সক্ষম হন। যদি ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) ও ক্ষত্রিয় (রাজা) দুজনের মধ্যে সদ্ভাব থাকে তাহলে প্রজারা সুখ পায়, আর যদি দুজনের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে তাহলে প্রজাদের সর্বনাশ হয়। এই ব্যাপারে কথোপকথনরূপে রাজা পুরূরবা এবং মহর্ষি কাশ্যপের এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, সেটি শোনো—

রাজা পুরূরবা মহর্ষি কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করলেন—

যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একে অন্যকে পরিত্যাগ করে, তাহলে অন্য বর্ণের লোকেরা কাকে প্রধান বলে জানবে, প্রজারা কার পক্ষ নেবে ?

কশ্যপ বললেন—রাজন্ ! ব্রাহ্মণ যেখানে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিরোধ করে সেখানে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য বিনষ্ট হয়। যখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করে, তখন তার বেদাধ্যয়ন বন্ধ হয়ে যায়, তার পুত্রদের উন্নতি হয় না, তার গৃহে যজ্ঞ হয় না এবং বালক বেদাধ্যয়ন করতে পারে না। ব্রাহ্মণদের পরিত্যাগকারী ক্ষত্রিয়দের ধন বৃদ্ধি হয় না, সন্তানরা পড়াশুনা বা যজ্ঞ করে না। সেই ক্ষত্রিয় নিজ পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ডাকাতের মতো ডাকাতি করতে থাকে। তাই উভয়ের মিলেমিশে থাকা উচিত। তাহলে উভয়েই উভয়কে রক্ষা করতে পারবে। ব্রাহ্মণের উন্নতির আধার ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ। দুই জাতি যখন একে অপরের আশ্রয়ে থাকে তখন তাদের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যদি প্রাচীনকাল থেকে আসা এই মৈত্রী নষ্ট হয়, তাহলে সবই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। চার বর্ণের প্রজারা মোহগ্রস্ত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য ভুলে যায়, তাতে তাদের বিনাশ হতে থাকে। ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ সুরক্ষিত থাকলে তা সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ করে এবং তাকে যদি রক্ষা না করা হয়, তাহলে তার থেকে সর্বক্ষণ দুঃখ ও পাপবৃদ্ধি হতে থাকে। যেখানে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ডাকাতের উপদ্রবে অসহায় হয়ে বেদাধ্যয়নে বঞ্চিত হয় এবং তার জন্য নিজের প্রাণরক্ষা চায় (তবুও কোনো রক্ষক না থাকায় তাকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে), সেই দেশে তখন বর্ষা হয় না এবং মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।

শুকনো কাঠের সঙ্গে থাকলে যেমন ভিজা কাঠও জ্বলে ওঠে, তেমনই পাপীর সংস্পর্শে থাকলে ধর্মাত্মাদেরও সমান দণ্ড ভোগ করতে হয়। তাই কখনো পাপীদের সঙ্গ করা উচিত নয়। পুণ্যাত্মারা যে লোক প্রাপ্ত হন, তা হল সুখের খনি এবং অমৃতের কেন্দ্র। সেখানে ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে, তাতে সোনার মতো আলো ছড়ায়। সেখানে মৃত্যু বা বৃদ্ধত্বের প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে কারো কোনো দুঃখ থাকে না। ব্রহ্মচারীগণ মৃত্যুর পর সেই লোকে গিয়ে আনন্দ অনুভব করেন। পাপীরা নরক গমন করে, সেখানে সর্বদা অন্ধকার। সেখানে সর্বদা শোক ও দুঃখ বিরাজ করে। পাপাত্মা ব্যক্তিরা সেখানে বহু বর্ষ ধরে কষ্ট ও শোক ভোগ করে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য হলে প্রজাদের দুঃসহ দুঃখ ভোগ করতে হয়। এইসব ভেবে রাজাকে এক বহুদর্শী বিদ্বান পুরোহিত নিযুক্ত করতে হয়। রাজার নিজের রাজ্যাভিষেকের আগেই পুরোহিতকে বরণ করে নিতে হয় ; কারণ ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বেদবেত্তা বিদ্বানরা বলেন সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়েছেন। তাই তাঁরা বর্ণজ্যেষ্ঠ, সম্মাননীয় এবং পূজনীয়। শুধু তাই নয়, এঁরা প্রত্যেক বস্তু প্রথমে ভোগ করার অধিকারী। সুতরাং বলবান হলেও রাজার কর্তব্য হল ধর্মানুসারে সমস্ত উত্তম বস্তু প্রথমে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা। ব্রাহ্মণ-জাতি ক্ষত্রিয়কে উন্নতিশীল করে তোলে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উন্নতির কারণ হয়। সুতরাং রাজার সর্বদা ব্রাহ্মণদের বিশেষ সম্মান করা উচিত।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত শক্তির প্রভাব এবং রাজার ধর্মানুকূল আচরণের বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা রাজার অধীন এবং রাজার অভ্যুদয় এবং সংরক্ষণ হল পুরোহিতের অধীন। যেখানে ব্রাহ্মণ নিজ তেজে প্রজার অদৃষ্ট ভয় দূর করেন এবং রাজা তাঁর বাহুবলে তাদের প্রত্যক্ষ ভয় নিবারণ করেন, সেই রাজ্যে সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি পায়। এই ব্যাপারে লোকে রাজা মুচুকুন্দ এবং কুবেরের আলোচনারূপ এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকে। একবার মহারাজ মুচুকুন্দ সারা পৃথিবী জয় করে নিজের বল পরীক্ষা করার জন্য অলকাপতি কুবেরকে আক্রমণ করেন। কুবের তখন তাঁকে প্রতিরোধের জন্য রাক্ষস সেনা পাঠালেন। রাক্ষসরা মুচুকুন্দের সৈনা সংহার করতে লাগল। তাই দেখে মুচুকুন্দ তাঁর বিদ্বান পুরোহিত বশিষ্ঠকে দোষারোপ করতে লাগলেন। বশিষ্ঠ তখন তাঁর উগ্র তপস্যার দ্বারা সেই রাক্ষসদের বিনাশ করলেন।

কুবের তখন রাজা মুচুকুন্দের কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! আগেও তোমার মতো শক্তিমান রাজা জন্মেছিলেন এবং তাঁরাও পুরোহিতদের সহায়তা লাভ করেছিলেন ; কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি যে ব্যবহার করছ, তা কেউ করেনি, কেউ আমাকে আক্রমণ করেনি। মহারাজ ! যদি তোমার বাহুতে শক্তি থাকে, তবে তা দেখাও। ব্রাহ্মণের শক্তির ওপর কেন এত ভরসা করছ ?'

কুবেরের কথা শুনে মুচুকুন্দ বললেন—'অলকাপতে ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়কে ব্রহ্মাই উৎপন্ন করেছেন। উভয়েরই এক মূল। ব্রাহ্মণদের তপ ও মন্ত্রের বল থাকে আর ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র ও বাহুবল। তাঁদের বল ও প্রচেষ্টা যদি পৃথক পৃথক হয়, তাহলে তাঁরা জগৎ সংসার রক্ষা করতে পারেন না। অতএব উভয়কে একসঙ্গে থেকেই প্রজাপালন করতে হয়। আমিও সেই নীতি অনুসারেই কাজ করি, তাহলে আপনি কেন এই নিয়ে আক্ষেপ করছেন ?'

তা শুনে কুবের মুচুকুন্দকে বললেন—'রাজন্ ! আমি কাউকে রাজ্য দানও করি না, অথবা অন্যের রাজ্য হরণও করি না, তা সত্ত্বেও আজ আমি তোমাকে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করছি। তুমি একে উপভোগ করো।' কুবের এই কথা বলায় মুচুকুন্দ বললেন—'মহারাজ ! আমি আপনার প্রদত্ত রাজ্য চাই না। আমি নিজ বাহুবলে জয় করা রাজ্যই উপভোগ করব।'

ভীষ্ম বললেন—মুচুকুন্দকে এইরূপ ক্ষত্রিয়ধর্মে অটল দেখে কুবের অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। পরে রাজা মুচুকুন্দ নিজ রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং ক্ষাত্রধর্ম পালন করে নিজ বাহুবলে প্রাপ্ত পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। যে ধর্মজ্ঞ রাজা এইভাবে ব্রাহ্মণের আশ্রয় নিয়ে তাঁর সহায়তায় রাজকার্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি না-জেতা পৃথিবীও জয় করে মহাযশভাগী হন। ব্রাহ্মণদের যেমন সর্বদা সন্ধ্যা-বন্দনা, তর্পণ ইত্যাদি কর্মে নিযুক্ত থাকা উচিত ; তেমনই ক্ষত্রিয়দেরও সর্বদা শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া উচিত। জগতে যা আছে, তা এই দুইয়েরই অধীন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! রাজার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, যাতে তিনি প্রজাদের উন্নতি করতে পারেন এবং নিজেও পুণ্যলোকের অধিকার লাভ করেন ?'

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! রাজার সর্বদা দান, যজ্ঞ, উপবাস এবং তপস্যাদি শুভ কর্মানুষ্ঠান করে ধর্ম সহকারে প্রজাপালন করা উচিত। যদি ধার্মিক ব্যক্তি গৃহে আসেন তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ এবং ধন ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করতে হয় ; কারণ রাজা যখন সর্বের সম্মান করেন, তখন দেশের সর্বত্র রাজার সম্মান বৃদ্ধি পায়। রাজা যেমন কর্ম করেন, প্রজারাও তেমনই করতে ভালোবাসে। রাজার উচিত শত্রুদের যমরাজের ন্যায় দণ্ডদানের জন্য

সর্বদা প্রস্তুত থাকা এবং ডাকাতদের ঘরে প্রাণদণ্ড দেওয়া। স্নেহ বা স্বার্থবশত কোনো দুষ্টের অপরাধ কখনো ক্ষমা না করা। রাজার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে প্রজা যেসব ধর্ম, স্বাধ্যায়, দানপুণ্য, যজ্ঞ ইত্যাদি করে, রাজা তার এক-চতুর্থাংশ ফল লাভ করেন। রাজা যদি প্রজাকে রক্ষা না করেন, তাহলে রাজ্যের মধ্যে যা কিছু পাপকার্য হয়, তার এক-চতুর্থাংশের পাপের ভাগও তাঁকেই বহন করতে হয়। কিন্তু লোকের মত হল, রাজাকে সেই অবস্থায় প্রজার পুরো পাপের ফল ভোগ করতে হয়, কারো আবার মত যে অর্ধেক ফলভোগ করতে হয়। সেইরূপ রাজাকে ক্রুর ও মিথ্যাবাদী বলা হয়।

আমি এবার সেই উপায় বর্ণনা করছি, যাতে রাজা এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। যদি কারো অর্থ চুরি হয়, তাহলে রাজা তা ফিরিয়ে আনতে অসমর্থ হলে নিজ কোষ থেকে প্রজাকে সেই অর্থপ্রদান করবেন। তা সম্ভব না হলে রাজার কর্মচারীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দিয়ে দেবেন। যারা ব্রাহ্মণদের কষ্ট দেবে, তাদের রাজ্যে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণদের কৃপা পেলে রাজা কৃতার্থ হয়ে যান। প্রাণীরা যেমন মেঘ (বর্ষা) এবং পাখিরা গাছের সাহায্যে জীবনানির্বাহ করে, তেমনই সব মানুষ রাজার আশ্রয়ে জীবনধারণ করে। যে রাজা কামী, ক্রুর এবং লোভী, তিনি প্রজাপালন করতে সক্ষম হন না।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আমি নিজ সুখের জন্য একটুও রাজ্য চাই না। আমি ধর্মের জন্যই রাজ্য পছন্দ করেছিলাম, কিন্তু এতে ধর্ম নেই। এই অবস্থায় রাজ্য নিয়ে আমি কী করব ? আমি তাহলে ধর্ম করার জন্য বনেই যাব এবং সেখানকার পবিত্র উপবনে থেকে ধর্মসাধনা করব। রাজদণ্ড ত্যাগ করব এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মুনিদের ন্যায় ফলাহার করে জীবন ধারণ করব।

ভীষ্ম বললেন—আমি জানি তোমার হৃদয় অত্যন্ত কোমল, কিন্তু এটি কোনো রাজগুণ নয়। কোমল স্বভাবের মানুষ রাজ্যশাসন করতে পারে না। তোমাকে অত্যন্ত ধার্মিক, কোমল এবং দয়ালু দেখে লোকে কাপুরুষ ভাববে, তোমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা হবে না। তোমার পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। তুমি যেভাবে থাকতে চাও, তা রাজোচিত নয়। এইভাবে বৈরাগ্য ও কোমল স্বভাব নিয়ে তুমি প্রজাপালন ধর্মের ফল প্রাপ্ত হবে না। তোমার পিতা পাণ্ডু তোমার জন্য শৌর্য, বীর্য ও সত্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন ; কুন্তীরও তাই প্রার্থনা ছিল যেন তোমার মহত্ত্ব ও ঔদার্য বৃদ্ধি পায়। দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং প্রজাপালন—এইসব কর্মের জন্যই তোমার জন্ম হয়েছে। রাজধর্ম জ্ঞাতা ব্যক্তি রাজ্যলাভের পর কাউকে দানের দ্বারা, কাউকে শক্তির দ্বারা এবং কাউকে মধুর বাক্যে নিজ বশে করে নেয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তাত ! স্বর্গলাভের উত্তম সাধন কী ?

ভীষ্ম বললেন—ভীত মানুষ যার কাছে গেলে শান্তিলাভ করতে পারে, সেই স্বর্গের সব থেকে বড় অধিকারী। সুতরাং তুমি প্রসন্ন মনে কুরুদেশের রাজা হও এবং সৎব্যক্তিদের রক্ষা ও দুষ্ট দমন করে স্বর্গলাভ করো। যেমন প্রাণীরা মেঘ ও পাখিরা গাছের সাহায্যে জীবননির্বাহ করে, তেমনই সুহৃদ এবং সজ্জন ব্যক্তিরা তোমার আশ্রয়ে জীবননির্বাহ করুক। যে রাজা ধৃষ্ট, শূর, প্রহারকারী, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, প্রজাদের স্নেহ করেন এবং দানশীল হন তাঁর আশ্রয়েই মানুষ জীবননির্বাহ করে।

উত্তম ও অধম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজার ব্যবহার এবং কেকয় রাজার উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কিছু কিছু ব্রাহ্মণ তাঁদের বর্ণোচিত কাজে ব্যাপৃত থাকেন, আর কিছু নিজ বর্ণের বিপরীত কর্ম করেন, এর পার্থক্য কী, আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যাঁরা বিদ্বান এবং উত্তম লক্ষণ-সম্পন্ন, যাঁদের দৃষ্টি সর্বত্র সমান, সেই ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মার সমান মনে করা হয়। যাঁরা ঋক্, যজু এবং সামবেদ অধ্যয়ন করে নিজ কর্মে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেবতার সমান মনে করা হয়। যারা স্বকর্ম পরিত্যাগ করে কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, সেই ব্রাহ্মণেরা শূদ্র তুল্য। এইরূপ যারা বেদ অধ্যয়ন করেনা, অগ্নিহোত্র করে না, তারাও শূদ্রতুল্য। ধার্মিক রাজার এদের

কাছ থেকে কর ও বেগার নেওয়ার অধিকার থাকে। বিচারালয়ে অভিযুক্তকে উপস্থিত করার জন্য ডাকার কাজ, বেতন নিয়ে দেবমন্দিরে পূজার কাজ, জ্যোতিষী, গ্রামের পুরোহিত, পথে কর আদায়কারীর কাজ—এই পাঁচ প্রকারের কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ চণ্ডালের সমান। ঋত্বিক, রাজপুরোহিত, মন্ত্রী, রাজদূত এবং গুপ্তচরের কাজ যারা করে, সেই ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয়তুল্য মানা হয়। ঘোড়সওয়ার, হাতিসওয়ার, রথী ও পদাতিক সৈন্যের কাজ করা ব্রাহ্মণদের বৈশ্যের মতো মনে করা হয়। রাজার কোষাগারে অর্থ সংকট দেখা দিলে রাজা উপরিউক্ত ব্রাহ্মণদের থেকে কর আদায় করতে পারেন। শুধু যাঁরা ব্রহ্মা ও দেবতার সমকক্ষ, সেই ব্রাহ্মণদের থেকে কর নেওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সব বর্ণেরই অর্থের প্রভু হলেন রাজা এবং যেসব ব্রাহ্মণ তাদের ধর্মের বিপরীত কর্ম করে, তাদের অর্থের ওপরও রাজারই অধিকার বর্তায়। রাজা কর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের যেন কোনোমতেই ক্ষমা না করেন, বরং ধর্মের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তাদের দণ্ডপ্রদান করে ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী থেকে তাদের পৃথক করে দেন। বেদবেত্তা স্নাতক জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় নেই দেখে যদি চুরি করে, তাহলে রাজার কর্তব্য হল তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হলেও যদি সে চুরি করে তবে তাকে সপরিবারে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! কোন কোন মানুষের অর্থে রাজার অধিকার থাকে এবং রাজার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত ?'

ভীষ্ম বললেন—রাজা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণেরই ধনের প্রভু এবং যে ব্রাহ্মণ নিজ কর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, তার ধনেও রাজার অধিকার থাকে। কর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে রাজার উদাসীন হওয়া উচিত নয়, তাদের দণ্ডপ্রদান করে সুপথে ফিরিয়ে আনাই রাজার ধর্ম। রাজ্যে যদি কোনো ব্রাহ্মণ চুরি করে তবে তা রাজার অপরাধ বলেই গণ্য হবে, তার পাপ রাজাকেই ভোগ করতে হয়। এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে কেকয়রাজ বনে বাস করে তপস্যা ও স্বাধ্যায় করতেন। একদিন তাঁকে এক ভীষণ রাক্ষস ধরে, রাজা তখন রাক্ষসকে বলেন—"আমার রাজ্যে একজনও চোর, দুরাচারী বা মদ্যপায়ী নেই। অগ্নিহোত্র না যজ্ঞ করে না, এমনও কেউ নেই। তাহলে তুমি কীকরে আমাকে ধরলে ? আমার রাজ্যে এমন কোনো ব্রাহ্মণ নেই যাঁরা বিদ্বান বা তপস্বী নন। আমার রাজ্যের লোকেরা পর্যাপ্ত দক্ষিণা না দিয়ে যজ্ঞ করায় না, ব্রতধারণ না করে বেদ পাঠ করে না। ব্রাহ্মণরা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন এবং দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্মে ব্যাপৃত থেকেই জীবিকা নির্বাহ করে। সব ব্রাহ্মণই মৃদুস্বভাব, সত্যবাদী, নিজ ধর্ম পালনকারী এবং আমার সম্মানের পাত্র ; সকলেই রাজা থেকে বৃত্তি পান। আমার রাজ্যের ক্ষত্রিয়রা কারো কাছে ভিক্ষা চায় না, নিজেরাই দান করে। তারা সত্যবাদী এবং ধার্মিক। বেদ পাঠ করে, পড়ায় না। যজ্ঞ করে, করায় না। ব্রাহ্মণদের রক্ষা করে এবং যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। আমার রাজ্যে বৈশ্যগণও নিজকর্মে ব্যাপৃত থাকে। তারা ছলকপট ত্যাগ করে কৃষিকার্য, গোরক্ষা ও ব্যবসায়ে জীবিকা নির্বাহ করে। আলস্যে জীবন কাটায় না, সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকে। উত্তম ব্রত পালন করে এবং সত্যবাদী। অতিথি আপ্যায়ন করে এবং সকলের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখে। সকলেই সংযমী এবং কেউ কখনো পবিত্রতা ত্যাগ করে না। আমার রাজ্যের শূদ্রগণও কখনো নিজ কর্তব্যে বিমুখ হয় না ; এরা ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করে জীবন কাটায় এবং কখনো কারো নিন্দা করে না।

"আমিও দীন-দুঃখী, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্বল, আতুর এবং নারীদের অন্ন-বস্ত্র প্রদান করে থাকি। আমার কুলধর্ম, দেশধর্ম, জাতিধর্মের পরম্পরা কখনো লুপ্ত হতে দিই না। আমার রাজ্যের তপস্বীদের আমি সর্বদাই পূজা ও রক্ষা করি, তাঁদের সম্মান সহকারে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করি। আমি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিদের তাদের ভাগ অর্পণ না করে ভোজন করি না, পরস্ত্রীর দিকে কুদৃষ্টি দিই না। বিদ্বান, বৃদ্ধ ও তপস্বীদের অসম্মান করি না। যখন সমস্ত রাজ্য নিদ্রা যায়, তখনও আমি দেশরক্ষার জন্য সতর্ক থাকি। আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞানী, তপস্বী এবং ধর্মজ্ঞ ; তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সমস্ত রাজ্যের প্রভু। আমি ধন দান করে বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা করি ; সত্যভাষণ ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা করে পুণ্যলোক লাভ করতে চাই এবং সেবাদ্বারা গুরুজনদের খুশি রাখি। আমার রাজ্যে বিধবা নারী নেই এবং অধম, ধূর্ত, চোর অনধিকারীদের দিয়ে যজ্ঞকারী, পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণ কোথাও কেউ খুঁজে পাবে না। তাই আমি রাক্ষসদের

একটুও ভয় পাই না।'

রাক্ষস বলল—'কেকয়রাজ ! আপনি সর্বাবস্থাতেই ধর্মের ওপর দৃষ্টি রাখেন ; অতএব আপনার মঙ্গল হোক, আপনি গৃহে যান। আমি আপনাকে ছেড়ে ফিরে যাচ্ছি। যিনি গোধন, ব্রাহ্মণ এবং প্রজাদের রক্ষা করেন, সেই রাজারা রাক্ষসকে ভয় পান না।'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! সেইজন্য ব্রাহ্মণদের সর্বদা রক্ষা করা উচিত। সুরক্ষিত থাকলে এঁরাও রাজাকে রক্ষা করেন। ঠিকমতো ব্যবহার করলে রাজা ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ লাভ করেন। সুতরাং রাজার কর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কর্তব্য, এটিই তাঁদের ওপর রাজার অনুগ্রহ। যে রাজা তাঁর নগর ও রাষ্ট্রের প্রজাদের সঙ্গে এইরূপ ধর্মপূর্ণ ব্যবহার করেন, তিনি ইহলোকে সুখ ভোগ করে শেষে স্বর্গলোকেও ইন্দ্রের ন্যায় সুখ ভোগ করেন।

বিপদকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্তব্য এবং ঋত্বিকদের লক্ষণ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত ! ব্রাহ্মণরা যদি স্ববৃত্তিতে জীবনযাপন করতে না পারে তাহলে দুর্দিনে তারা বৈশ্যধর্ম অনুসারে জীবিকানির্বাহ করতে পারে কী ?

ভীষ্ম বললেন—জীবিকা নষ্ট হলে সংকটের সময় ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় ধর্মদ্বারাও জীবননির্বাহ করতে অসমর্থ হয় তাহলে বৈশ্যধর্ম অনুসারেও কৃষিকাজ করে বা গোপালন করে জীবনযাপন করতে পারে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতকুলভূষণ ! এবার বলুন, ব্রাহ্মণ বৈশ্যধর্ম অনুসারে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন কোন বস্তুর কেনা-বেচা করলে তারা স্বর্গলোকের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না ।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণদের মদ্য, মাংস, মধু, লবণ, তিল, রন্ধন করা অন্ন, ঘোড়া, বলদ, গাভী, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু—সর্বাবস্থায় এই সকলের ব্যবসা ত্যাগ করা উচিত ; এগুলির আদান প্রদান করলে ব্রাহ্মণের নরকে যেতে হয়। ছাগ অগ্নি, মেষ বরুণ, ঘোড়া সূর্য, পৃথিবী বিরাট এবং গাভী যজ্ঞ এবং সোমের স্বরূপ ; এগুলি কোনোভাবেই বিক্রী করা উচিত নয়। কাঁচা অন্ন দিয়ে রন্ধন করা অন্ন নিলে অধর্ম হয় না। এই ব্যাপারে সনাতন কাল থেকে চলে আসা ধর্মের কথা বলছি, শোনো। আমি আপনাকে একটি বস্তু দিচ্ছি, তার পরিবর্তে আপনি আমাকে অন্য একটি বস্তু দিন এই কথা বলে দুজনের রুচি অনুযায়ী বদল করলে তাকে ধর্ম মানা হয়। জোর করে বদল করা উচিত নয়। এই প্রকার ব্যবহার ঋষিগণ ও অন্য সংব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ ! যদি সমস্ত প্রজা অস্ত্রধারণ করে এবং স্বধর্ম ত্যাগ করে, তখন তো ক্ষত্রিয়দের শক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে ; তখন রাজা কীভাবে রাজ্য রক্ষা করবে ? কীভাবে সকলকে আশ্রয় দেবে ?

ভীষ্ম বললেন—সেই সময় বেদ ও শাস্ত্রে বলীয়ান ব্রাহ্মণরা সব দিক থেকে এসে রাজার শক্তি বৃদ্ধি করবেন। যে রাজার শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, সেই রাজা ব্রাহ্মণের বলের আশ্রয়ে নিজের উন্নতিসাধন করবে। ডাকাত এবং অপকর্মকারীরা যখন প্রজাদের মধ্যে বর্ণসংকরতা করবে এবং তাদের জন্য ধর্মমর্যাদা উল্লঙ্ঘন হবে, তখন সেই অত্যাচার রোধ করবার জন্য সমস্ত জাতির লোকেরা যদি

অস্ত্রধারণ করে, তাতে কোনো দোষ হয় না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ক্ষত্রিয় জাতির লোকেরাই যদি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সেইসময় ব্রাহ্মণ অথবা বেদকে কে রক্ষা করবে ? সেই সময়ে বিপ্রদের কী কর্তব্য, তাঁরা কার শরণ গ্রহণ করবেন ?

ভীষ্ম বললেন—সেই সময় ব্রাহ্মণরা তাঁদের তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, অস্ত্র-শস্ত্র, বল, সদ্ব্যবহার অথবা ছল-কপট ইত্যাদির সাহায্যে, যেকোনভাবেই হোক, ক্ষত্রিয় দমনের জন্য প্রচেষ্টা করবেন ; কারণ ক্ষত্রিয়রাই যখন প্রজাদের ওপর, বিশেষত ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণই তাদের দমন করতে পারেন ; কারণ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হতেই উৎপন্ন। জল থেকে অগ্নি, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় এবং পাথর থেকে লোহার উৎপত্তি হয়, এর প্রভাব সর্বত্র কাজ করলেও উৎপন্নকারী মূল কারণের সঙ্গে সংঘাত করতে গেলে তা শান্ত হয়ে যায়। লোহা যখন পাথর কাটে, অগ্নি জলের সংস্পর্শে আসে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে সংঘাত করে তখন এই তিনটিই নষ্ট হয়ে যায়। যদিও ক্ষত্রিয়ের তেজ এবং বল প্রচণ্ড এবং অজেয়, তাহলেও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সংঘাতে গেলে তা কম হয়ে যায়। যদি কখনো ব্রাহ্মণের শক্তি কমে যায় এবং ক্ষত্রিয়ও দুর্বল হয়ে পড়ে, সেইসময় অন্য সব বর্ণের লোকেরা যদি ব্রাহ্মণের ওপর অত্যাচার করতে থাকে, তখন যেসব ব্যক্তি ধর্মের, ব্রাহ্মণদের এবং নিজেদের রক্ষার জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করে দুষ্টদের প্রতিহত করেন সেইসব মহান ব্যক্তিরা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণকে রক্ষা করার জন্য সকলের অস্ত্র গ্রহণের অধিকার থাকে। যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং নিরাহারে ব্রতধারণকারী ব্যক্তিরা যে উত্তমলোক প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মণদের জন্য যাঁরা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁরা তাঁদের থেকেও উত্তমলোক লাভ করেন। ব্রাহ্মণও যদি তিন বর্ণের লোকেদের রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহলে তাঁর দোষ হয় না। যাঁরা ব্রাহ্মণদের হিংসাকারী দুরাচারীদের দমন করার জন্য যুদ্ধে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন, তাঁদের সাধুবাদ জানাই। মনু বলেছেন এই সব লোকেরা ব্রহ্মলোক লাভ করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের পরে অবভৃথ-স্নানকারী ব্যক্তি যেমন পাপরহিত হয়ে পবিত্র হয়ে ওঠে, তেমনই যুদ্ধে অস্ত্রদ্বারা মৃত বীরও পবিত্র হয়ে যায়। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী ধর্মাত্মা মানুষও যদি দেশ-কাল-পরিস্থিতি অনুসারে অপরের রক্ষার্থে কঠোর ব্যবহার—হিংসারূপ পাপ করেন, তা হলেও তিনি উত্তম গতি লাভ করেন। নিজ রক্ষার্থে, অন্য বর্ণে যদি মন্দ কিছু আসে তাকে বাধা দেবার জন্য অথবা দুষ্টদের দণ্ড দেবার জন্য যদি ব্রাহ্মণ অস্ত্রগ্রহণ করেন, তাহলে তাঁর দোষ হয় না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যখন ডাকাতরা সক্রিয় হয়, ক্ষত্রিয় শক্তিহীন হয়ে পড়ে, সমস্ত বর্ণের লোকেরা একে অন্যের নারীদের সঙ্গে কামভোগে লিপ্ত হয় এবং প্রজাদের রক্ষা করার কোনো পথ দেখা যায় না, সেই সময় যদি কোনো বলবান ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অথবা শূদ্রদের ধর্মরক্ষার জন্য দণ্ডধারণ করে, তাহলে সে কি রাজা হতে পারে, রাজকার্যের ভার গ্রহণ করতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যে অপার সংকট থেকে রক্ষা করে, নৌকাকে সলিল সমাধি থেকে রক্ষা করে, সে শূদ্র হোক বা অন্য কেউ, সর্বদাই সম্মানের যোগ্য। ডাকাত বা লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণের শিকার হয়ে কষ্ট পেতে থাকা অনাথ প্রজাদের দ্বারা সুখ দেয়, তাদেরই বন্ধু মনে করে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করা উচিত। অপরের ভয় দূরকারী মানুষ যে-ই হোক, সে সম্মানের যোগ্য। কাঠের হাতি, চামড়ার তৈরি, অকর্মণ্য মানুষ, অনুর্বর ক্ষেত্র, বৃষ্টি না হওয়া মেঘ, নিরক্ষর ব্রাহ্মণ এবং রক্ষা না করা রাজা—এরা সবাই নিরর্থক। যে সর্বদা সৎব্যক্তিদের রক্ষা করে এবং দুষ্টদমন করে, সে-ই রাজা হওয়ার যোগ্য। সেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের ভার গ্রহণে সক্ষম।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যজ্ঞের ঋত্বিক কেমন হওয়া উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যে ঋক্, সাম, যজুর্বেদ আদি, মীমাংসায় পটু এবং রাজার জন্য শান্তি-পুষ্টি ইত্যাদি কর্ম করে, সেই ঋত্বিক হবার যোগ্য। তার বিচারে ন্যায়কারী অপরের হিতৈষী, সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, দয়ালু, সত্যবাদী, সুদ ত্যাগকারী এবং সরল-স্বভাবের হওয়া উচিত। তেমনই যে বিদ্বান ব্যক্তি দ্রোহ ও অহংবর্জিত, লজ্জা ক্ষমা, শম-দম ইত্যাদি গুণযুক্ত, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, ধীর, অহিংসক, রাগ-দ্বেষবর্জিত, কুলীন, শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারী এবং জ্ঞানেই সন্তুষ্ট, তিনিই 'ব্রহ্মা'র আসনে উপবেশন করার অধিকারী। তাত ! এই সব ঋত্বিকগণই মহান এবং সম্মানের যোগ্য।

—o—

মিত্র ও অমিত্রের পরিচয়

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মও অনেক সময় অন্যের সাহায্য ব্যতীত করা কঠিন হয়ে ওঠে। আর রাজার কাজ তো অন্যের সহায়তা বিনা হওয়া সম্ভবই নয়। তাই মন্ত্রীর প্রয়োজন। এখন আপনি বলুন রাজার মন্ত্রী কেমন হওয়া উচিত ? তাঁর স্বভাব এবং আচরণ কী প্রকারের হবে, কোন্ ব্যক্তির ওপর বিশ্বাস করা যায় এবং কার ওপর নয় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজার চারপ্রকার মিত্র হয়—সহার্থ, ভজমান, সহজ এবং কৃত্রিম[1]। পঞ্চম মিত্র হল ধর্মাত্মা, তিনি কোনো একজনের পক্ষপাতী হন না এবং অর্থের বিনিময়ে কপটতাপূর্বক মিত্র সাজেন না। যেদিকে ধর্মের ভাগ বেশি, তিনি সেই পক্ষেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন অথবা যে রাজা ধর্মে স্থিত, সেই রাজাই তাঁকে আকর্ষণ করেন। উপরিউক্ত মিত্রদের মধ্যে 'ভজমান' এবং 'সহজ'কেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, বাকি দুজনের থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। প্রকৃতপক্ষে নিজ কার্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বপ্রকার মিত্রের থেকেই সাবধানে থাকা উচিত। রাজার, মিত্রকে রক্ষার ব্যাপারে কখনো অসাবধান হওয়া উচিত নয় ; কারণ অসাবধান রাজাকে সকলেই অসম্মান করে। মানুষের চিত্ত চঞ্চল, তাই ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যায় আবার খারাপ মানুষও ভালো হয়ে ওঠে, শত্রু মিত্র এবং মিত্র শত্রু হয়ে যায়, সুতরাং কার ওপর কে বিশ্বাস করবে ? তাই প্রধান কর্মগুলির ভার অন্যের ওপর না দিয়ে নিজের সামনেই করিয়ে নেওয়া উচিত। কারো ওপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা অকাল মৃত্যুকে আহ্বান করার সমান ; অন্ধবিশ্বাসী বিপদে পড়তে পারে। সে যাকে বিশ্বাস করে তার ইচ্ছার ওপরই তাকে নির্ভর করতে হয়। তাই রাজার কিছু লোককে বিশ্বাস করতে হয় তবে এতেও তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। এটিই সনাতন রাজনীতি।

রাজার অনুপস্থিতিতে যে লোক রাজ্য অধিকার করতে পারে, তার থেকে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত ; কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাকে শত্রুর মধ্যে গণনা করেছেন। যে ব্যক্তি রাজার অভ্যুদয় দেখে তাঁর আরও উন্নতি কামনা করে এবং অবনতি হলে দুঃখ পায়, সেই শ্রেষ্ঠ মিত্র। নিজে না থাকলে যে ব্যক্তির বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা উচিত এবং যখন নিজের ধনবৃদ্ধি হয়, তখন যথাশক্তি তাঁকে সমৃদ্ধিশালী করে দেওয়া উচিত। যিনি ধার্মিক কর্মেও রাজার লোকসান কমাবার কথা চিন্তা করেন, রাজার ক্ষতি দেখে যিনি ভীত হন, তাঁকেই উত্তম মিত্র বলে জানবে। যারা ক্ষতি চায় তাদের তো শত্রুই বলা হয়। যে মিত্রের উন্নতি দেখে হিংসা করে না এবং বিপদ দেখলে ভয় পায়, সেই মিত্র নিজের আত্মার সমান। যাকে দেখতে সুন্দর, কণ্ঠস্বর মিষ্ট, ক্ষমাশীল, ঈর্ষারহিত, প্রতিষ্ঠিত এবং কুলীন, তারা পূর্বোক্ত মিত্র থেকেও উচ্চশ্রেণীর। যার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, স্মরণশক্তি তীব্র, কার্যসাধনে কুশল এবং স্বভাবত দয়ালু, মান-অপমানে যার হৃদয়ে দুর্ভাব আসে না, সেরূপ মানুষ যদি ঋত্বিক, আচার্য অথবা অত্যন্ত সম্মানিত মিত্র হয়, তাহলে তাকে তুমি নিজ গৃহে মন্ত্রী করে রাখতে পারো ; সে তোমার বিশেষ সম্মানের পাত্র। তাকে রাজকীয় গুপ্তবিচার এবং ধর্ম-অর্থের রহস্য সম্বন্ধে পরিচিত রাখবে। তোমার তার ওপর পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা উচিত। একটি কাজে একজন ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করবে, দুই বা তিনজনকে নয় ; কারণ তাহলে তাদের মধ্যে পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে। কারণ একটি কার্যে নিযুক্ত অনেক ব্যক্তির মধ্যে প্রায়শ মতভেদ হতে দেখা যায়।

যিনি কীর্তিকে প্রাধান্য দেন এবং মর্যাদায় স্থির থাকেন, শক্তিমান পুরুষদের দ্বেষ বা অনর্থ করেন না, কামনা, ভয়, লোভ অথবা ক্রোধেও যিনি ধর্মত্যাগ করেন না, যাঁর মধ্যে কার্যকুশলতা ও প্রয়োজন অনুসারে কথাবার্তা বলার পূর্ণ

[1] সহার্থ মিত্র তাঁকে বলা হয়, যিনি কোনো শর্তে একে অন্যের সহায়তার জন্য মিত্রতা করেন। কোন নির্দিষ্ট শত্রুর ওপর আমরা দুজনে একসঙ্গে আক্রমণ করব, জয়লাভ করে দুজনে তার সম্পদ আধাআধি ভাগ করে নেব—এইসব শর্তে 'সহার্থ' মিত্রদের মধ্যে হয়। যাদের সঙ্গে বংশানুক্রমে দৃঢ় মিত্রতা থাকে, তাদের 'ভজমান' বলা হয়। যাদের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা থাকে, তাদের 'সহজ' মিত্র বলা হয় এবং অর্থ ইত্যাদি দিয়ে যাদের আপন করা হয় তাদের 'কৃত্রিম' মিত্র বলা হয়।

যোগ্যতা থাকে, তাঁকে তুমি তোমার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবে। যিনি কুলীন, শীলবান, সহনশীল, শূরবীর, আর্য, আড়ম্বরপূর্ণ কথা বলেন না, বিদ্বান, কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণে কুশল, তাঁকে অমাত্যের পদে বসাবে এবং সম্মানের সঙ্গে তাঁকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। তিনি তোমার উত্তম সাহায্যকারী প্রমাণিত হবেন এবং সর্বপ্রকার কার্য দেখাশোনা করবেন।

যুধিষ্ঠির ! তুমি নিজ পরিজনদের মৃত্যুর সমান মনে করে তাঁদের সর্বদা ভয় করবে। প্রতিবেশী রাজা যেমন পাশের রাজার উন্নতি সহ্য করতে পারে না, তেমনই একজন আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের উন্নতি সহ্য করতে পারে না। যার আত্মীয়-পরিজন নেই, সেও সুখে থাকে না ; তাই কুটুম্বদের অবহেলা করা উচিত নয়। বন্ধুবান্ধবহীন মানুষকে অন্য লোকেরা দমিত রাখার চেষ্টা করে ; সেই সময় নিজের ভাই বন্ধুই সাহায্য করে। যদি বাইরের লোক নিজ জাতির লোকেদের অপমান করে, তাহলে স্বজাতীয়রা তা কখনো বরদাস্ত করে না। নিজের জাতির অপমানকে তারা নিজেরই অপমান মনে করে। এইরূপ কুটুম্ব থাকলে ভালোও হয় আবার মন্দও। জাতির লোকেরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অভিবাদনও করে না। তাদের মধ্যে গুণ-অবগুণ দুইই দেখা যায়। রাজার কর্তব্য হল তার নিজের জাতির লোকদের বাক্য ও কর্মের দ্বারা আপ্যায়ন করা। সর্বদা তাদের মঙ্গল করা, কখনো কোনো ক্ষতি হতে না দেওয়া। তাদের বিশ্বাস না করলেও বিশ্বাস করার মতোই ব্যবহার করবে। তাদের দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করবে না। যে ব্যক্তি সর্বদা সতর্ক হয়ে এরূপ ব্যবহার করে, তার শত্রুও প্রসন্ন হয়ে তার সঙ্গে মিত্রতার ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আত্মীয়, পরিজন, মিত্র, শত্রু এবং উদাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে এই নীতি অনুসারে ব্যবহার করে, তার সুযশ চিরকাল বজায় থাকে।

মন্ত্রীর পরীক্ষা—কালকবৃক্ষীয় মুনির উপাখ্যান

ভীষ্ম বললেন—আগে যা বলা হয়েছে, তা রাজনীতির প্রথম বৃত্তি ; এবার দ্বিতীয়টি শোনো। যে ব্যক্তি রাজার আর্থিক উন্নতি করবে, তাকে সর্বদা রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। যদি মন্ত্রী রাজকোষ থেকে অর্থ অপহরণ করে আর কোনো অনুচর বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেটি জানিয়ে দিতে আসে তাহলে গোপনে তার কথা সাগ্রহে শোনা উচিত এবং মন্ত্রীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা উচিত ; কারণ অর্থ-অপহরণকারী মন্ত্রী প্রায়শই এরূপ ব্যক্তিদের হত্যা করে থাকে। যারা রাজকোষ লুট করে তারা একত্র হয়ে রক্ষককে কষ্ট দেয় ; রাজা যদি সেই রক্ষকের সুরক্ষার বন্দোবস্ত না করেন তাহলে বেচারি বেঘোরে মারা পড়ে। এই ব্যাপারে প্রাচীন কালের লোকেরা কালকবৃক্ষীয় মুনি এবং কোশলরাজের আলোচনার উদাহরণ দিয়ে থাকেন।

শোনা যায় একবার কোশল দেশের রাজা ক্ষেমদর্শীর কাছে কালকবৃক্ষীয় নামে এক মুনি পদার্পণ করেন। তিনি একটি কাককে বন্ধ খাঁচায় নিয়ে রাজ্যের সংবাদ জানার জন্য রাজার রাজ্যে কয়েকবার পরিক্রমা করেছিলেন। সেই সময় তিনি সকলকে বলতেন—'সজ্জনগণ ! তোমরাও কাকের বিদ্যা শেখো ; আমি শিখেছি, কাক আমাকে অতীত ও ভবিষ্যতের সব কথা বলে দেয়।' এইভাবে ঘোষণা করতে করতে তিনি বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং রাজ্য পরিক্রমা করলেন। সেই সময়ে তিনি রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের নানা অন্যায় ও কার্যকলাপ লক্ষ্য

করেন। রাষ্ট্রের সমস্ত রাজকর্মের সন্ধান নিয়ে তিনি তার প্রকৃত তথ্য জেনে যান। যারা রাজার ধন অপহরণ করত, তাদেরও তিনি চিনে ফেলেন। পরে তিনি কাকটিকে নিয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন এবং বললেন—'আমি এই রাজ্যের সব কিছু জানি।' প্রথমেই তিনি রাজমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন—'আমার কাক বলছে তুমি অমুক স্থানে অমুক কাজ করেছ, রাজার রাজকোষ থেকে চুরি করেছ, এই বিষয় অমুক অমুক ব্যক্তি জানে। সুতরাং তুমি শীঘ্রই রাজার কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করো।' এইভাবে তিনি আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে বললেন, তারাও রাজকোষ থেকে চুরি করেছিল। মুনি সকলকে বলছিলেন যে তাঁর কাকের কথা কখনো মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি, সুতরাং এরা অবশ্যই অপরাধী।

মুনি যখন এইভাবে রাজকর্মচারীদের তিরস্কৃত করলেন তখন তারা রাত্রে মুনি নিদ্রা গেলে সকলে মিলে তাঁর কাককে মেরে ফেলল। সকালে উঠে মুনি যখন দেখলেন যে কাকটি বাণবিদ্ধ হয়ে খাঁচায় মরে পড়ে আছে, তখন তিনি রাজা ক্ষেমদর্শীর কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্! আপনি প্রজার ধন ও প্রাণের রক্ষক, আমি আপনার কাছে অভয় প্রার্থনা করছি ; যদি অনুমতি দেন আপনার হিতের কথা বলি।' রাজা বললেন—'বিপ্রবর! আমি নিজের মঙ্গল চাই আর আপনি আমার মঙ্গলের কথাই বলতে চান, এই অবস্থায় অভয়-দান করব না কেন ? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করব। আপনি যা কিছু বলতে চান, বিনা দ্বিধায় বলুন।'

মুনি বললেন—মহারাজ! আপনার কর্মচারীদের মধ্যে কোনজন অপরাধী এবং কে নিরপরাধ—এই খবর জেনে কারা আপনার ক্ষতি করতে পারে, সেসব আমি আপনাকে জানাতে এসেছি। নীতিজ্ঞ মানুষদের বক্তব্য হল যে, যাদের সঙ্গে রাজার ওঠাবসা করতে হয়, তাদের বিষধর সাপ বলে মনে করতে হয় ; কারণ রাজার যেমন বহু মিত্র থাকে তেমনই বহু শত্রুও থাকে। রাজার সঙ্গে যারা থাকে, তারা ওইসব লোকেদের ভয় পায়। রাজারও তাদের থেকে মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা থাকে। যে নিজের মঙ্গল চায়, তার কখনো রাজার কাছে ভুল করা উচিত নয়। জ্বলন্ত আগুনের কাছে মানুষ যেমন সতর্ক হয়ে যায়, তেমনই শিক্ষিত ব্যক্তিরও রাজার কাছে সাবধানে থাকা উচিত। রাজা প্রাণ ও ধন উভয়েরই প্রভু। তিনি যখন ক্রুদ্ধ হন তখন সাপের মতোই ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। সুতরাং অনুচরদের প্রাণ হাতে নিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাজার সেবা করা উচিত। কোনো কটু কথা যেন বলা না হয়, ওঠা, বসা, দাঁড়ানো, চলা বা ইশারা করার সময় যেন কোনো উদ্ধত আচরণ না হয়, তার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। রাজাকে প্রসন্ন করলে, তিনি দেবতার ন্যায় সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং ক্রুদ্ধ হলে অগ্নির মতো সমূলে দহন করেন।

আমার মতো মুনি বিপদের সময় বুদ্ধিপূর্বক সাহায্য করে। রাজন্! আপনি জানেন না, আমার কাকটি আপনার মঙ্গল করতে গিয়েই মারা গেছে। কিন্তু তার জন্য আমি আপনাকে অথবা আপনার সুহৃদদের দোষ দেব না ; আপনি নিজেই আপনার হিত ও অহিত চিনে নিন, নিজে রাজকার্য দেখুন, অন্যের ওপর বিশ্বাস রাখবেন না। যারা আপনার গৃহে বাস করে আপনারই ধন অপহরণ করে, তারা প্রজাদের মঙ্গল চায় না। তারাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। যারা আপনার বিনাশ করে এই রাজ্য অধিকার করতে চায়, তারাই অন্তঃপুরে যাতায়াতকারী পরিচারকদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করছে। কেননা তাতেই তাদের কার্যসিদ্ধি হবে, নচেৎ নয়। সুতরাং আপনার সাবধানে থাকা উচিত। আমি আপনার কাছে কোনো কামনা নিয়ে আসিনি, তা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রকারীরা আতঙ্কিত হয়ে আমার কাককে বধ করেছে, একথা আমি তপোবলের দ্বারা জেনেছি। হিমালয়ের কন্দরে যেমন কাঁটাগাছ, পাথর থাকে এবং সেখানে সিংহ-বাঘ বাস করায় মানুষের যাওয়া অসম্ভব হয়, তেমনই দুষ্ট অমাত্যদের জন্য এই রাজ্যেও কারো পক্ষে বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এখানে বসবাস করা হিতকারী নয়, কেননা এখানে ভালো মন্দের একই বিচার। পাপী এবং পুণ্যাত্মা (অপরাধী ও নিরপরাধ) উভয়েরই মারা পড়ার ভয়। ন্যায়তে পাপীর দণ্ড পাওয়া উচিত, পুণ্যাত্মার কোনো ক্ষতি হওয়া উচিত নয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই স্থান থেকে সরে যাওয়া উচিত। সীতা নামে একটি নদী আছে, যেখানে নৌকা ডুবে যায় ; আপনার এখানকার রাজনীতিও সেইরূপ। এখানে আমার ন্যায় সাহায্যকারীরও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা।

রাজন্! আপনি যাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন, যাকে পালন-পোষণ করেছেন, সেই আপনার ক্ষতি করতে চায়। আমি রাজার সঙ্গে থাকা অমাত্যদের স্বভাব-চরিত্র জানি, তাই ভয়ে ভয়ে সাবধানে থাকি, সাপের সঙ্গে মানুষ যেমন

ভয়ে ভয়ে থাকে। এই দেশের রাজা জিতেন্দ্রিয় কী না, তাঁর অনুচরেরা তাঁর বশে থাকে তো ? রাজার ওপর তাদের শ্রদ্ধা আছে তো ? রাজা তাঁর প্রজাদের ভালোবাসেন তো ?'—এইসব জানার জন্যই আমি এখানে এসেছিলাম। আপনাকে দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি ; কিন্তু আপনার মন্ত্রীকে ভালো বলে মনে হয় না। আমি যে আপনার মঙ্গল চাই—এইসব লোকেরা আমার মধ্যে সেটাই সব থেকে বড় দোষ দেখেছে। আমি যদিও এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি, তবুও তারা আমার মধ্যে সেই দোষই খুঁজে পেয়েছে। সাপের মতো দুষ্ট শত্রুর থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। তাই আমি আর এখানে থাকতে চাই না।

রাজা বললেন—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার প্রাসাদে থাকুন, আমি অত্যন্ত যত্ন ও আদরে আপনাকে রাখব। যারা আপনাকে থাকতে দিতে চায় না, তারা নিজেরাই থাকবে না। তারপর তাদের নিয়ে কী করা যায়, তা আপনিই ভাবুন। মুনিবর ! আমি কীপ্রকারে রাজদণ্ড যথাযথভাবে প্রয়োগ করব এবং আমাদ্বারা উত্তম কর্ম হবে, আপনি ভালোভাবে চিন্তা করে আমাকে কল্যাণ পথে চালিত করুন।

মুনি বললেন—রাজন্ ! প্রথমে কাক মারার যে অপরাধ, তা প্রকাশ না করে এক এক জন মন্ত্রীর অধিকার খর্ব করে তাদের দুর্বল করে দিন। তারপর অপরাধের কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে জেনে ক্রমশ এক এক ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে পাঠান। এক এক করে মারার কথা বলছি এইজন্য যে, বহুলোককে যদি এক প্রকারের দোষী বলা হয়, তাহলে সকলে মিলে এক হয়ে যায় ; সেই সময় তারা বড় বড় বাধাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এই গোপন কথা যাতে অন্যেরা জেনে না যায়, তাই এই কথা বলছি।

রাজন্ ! আমি এবার আপনাকে আমার পরিচয় প্রদান করছি—আপনার সঙ্গে আমার পুরানো সম্পর্ক আছে, আমি আপনার পিতার প্রিয় মিত্র—কালকবৃক্ষীয় মুনি। আপনার রাজ্যে যখন সংকট উপস্থিত হয়েছিল এবং আপনার পিতার স্বর্গবাস হয়েছিল, সেই সময় আমি কামনা-বাসনা ত্যাগ করে তপস্যা করতে গিয়েছিলাম। আপনার ওপর বিশেষ স্নেহ থাকায় আমি পুনরায় এখানে এসেছি এবং আপনাকে এইসব কথা বলছি এইজন্য যাতে আপনি আর এদের ষড়যন্ত্রে না পড়েন। আপনি সুখ ও দুঃখ উভয়ই দেখেছেন, দেবতার ইচ্ছায় আপনি এই রাজ্য লাভ করেছেন। তাহলে আপনি কেন মন্ত্রীদের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ভুল করছেন !

তারপর বিপ্রবর কালকবৃক্ষীয়ের আগমনে রাজ পরিবারে মঙ্গলপাঠ হতে লাগল। পুরোহিতের বংশেও হর্ষ দেখা দিল। কালকবৃক্ষীয় মুনি তাঁর ক্ষমতায় কোশলরাজকে পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট করে দিলেন। তিনি কয়েকটি উত্তম যজ্ঞ করলেন। কোশলরাজও পুরোহিতের সুপরামর্শ শুনে তাঁর কথামতো সব কাজ করলেন, ফলে তিনি সমস্ত পৃথিবীতে বিজয় লাভ করলেন।

সভাসদ্গণের লক্ষণ এবং গুপ্ত পরামর্শ শোনার অধিকারী

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজার সভাসদ, সহায়ক, সুহৃদ, পরিচ্ছদ (সেনাপতিদের) এবং মন্ত্রী কেমন হওয়া উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যাঁরা লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরল এবং কোনো বিষয় ভালোভাবে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা রাখেন, সেইরূপ ব্যক্তিই সভাসদ নিযুক্ত হবার উপযুক্ত। মন্ত্রী, শূরবীর, বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, কাজে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদেরই সহায়ক করার চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কুলীন—নিজ শক্তি গোপন করে না, সুখে, দুঃখে, অসুখে এবং আহত হলেও যে সঙ্গ ত্যাগ করে না, সেই সুহৃদ হওয়ার উপযুক্ত। যে নিজ দেশে এবং উত্তম কুলে জন্ম নিয়েছে, শীলবান, সংকেত বোঝার উপযুক্ত, দয়ালু, দেশ-কালের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রভুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—এমন ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করবে ; কারণ বিদ্বান, সত্যবাদী, সদাচারী, উত্তম ব্রত পালনকারী এবং সর্বদা সঙ্গ প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষ তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না। যে কামনা, ভয়, ক্রোধ এবং লোভেও ধর্মত্যাগ করে না, যে অহংবর্জিত, সত্যবাদী, শান্ত, মনকে জয় করেছে, অপরের দ্বারা সম্মানিত এবং বিভিন্ন সময়ে কঠিন কাজে উত্তীর্ণ হয়েছে তাকেই তুমি গুপ্ত পরামর্শদাতা করবে। যাদের সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্পর্ক থাকে, উত্তম কুলে জন্ম, বিশ্বাসী,

প্রশংসনীয়, লোভ দেখিয়ে যাকে বিচলিত করা যায় না, ব্যভিচার দোষ বর্জিত, বৈদিক পথে বিশ্বাসী, নিরহংকারী, বংশানুক্রমে রাজার কাছে কাজ করে এসেছে, তেমন ব্যক্তিকেই মন্ত্রী করা উচিত। যাঁদের মধ্যে বিনয়যুক্ত বুদ্ধি, সুন্দর স্বভাব, তেজস্বীতা, ধৈর্য, ক্ষমা, পবিত্রতা, প্রেম এবং স্থৈর্য থাকে, তাঁদের এই গুণগুলি পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, তাঁরা রাজকার্যের ভার গ্রহণে সিদ্ধ, তাহলে তাঁদের মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত। এরূপ পাঁচ জন মন্ত্রীর প্রয়োজন। তাঁরা সব সুবক্তা, শূর এবং প্রত্যেক বিষয় ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। যারা মূর্খ এবং দুর্বুদ্ধিশালী, তারা কার্যভার গ্রহণ করলেও কাজের পরিণাম জ্ঞান করতে সক্ষম হয় না। যে মন্ত্রী রাজার প্রতি অনুরক্ত নয়, তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয় ; তার সামনে গুপ্ত পরামর্শ করা ঠিক নয়। সেই কপট মন্ত্রী গুপ্ত পরামর্শ জেনে অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলে রাজাকে এমনভাবে বিনাশ করে, যেমন মত্ত হাওয়ার বেগে আগুন বৃক্ষকে ভস্ম করে। যার স্বভাব সরল নয়, সে যতই অনুরক্ত হোক, বুদ্ধিমান হোক বা অন্য গুণসম্পন্ন হোক, সে কখনো গুপ্ত পরামর্শ শোনার অধিকারী হতে পারে না।

যার শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং নগরের মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন থাকে না, তাকে সুহৃদ বলে মনে করা উচিত নয়, সে শত্রুতুল্য ; তার গুপ্ত পরামর্শ শোনার অধিকার নেই। মূর্খ, অপবিত্র, জড়, শত্রুসেবক, বাক্যবাগীশ, ক্রোধী ও লোভী মানুষও শত্রুই হয়ে থাকে। এদেরও গুপ্ত কথা বলা উচিত নয়। অত্যন্ত সম্মানের পাত্র, বিদ্বান এবং প্রীতিভাজন যতই হোক, যদি সে নবাগত হয়, তাহলে সেও গুপ্ত মন্ত্রণা শোনার অধিকারী নয়। যার পিতাকে অধর্মাচরণের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, তার পুত্রকে সম্মানজনকভাবে তার পিতৃপদে নিযুক্ত করলেও, গুপ্তকথা তাকে বলা উচিত নয়।

যার বুদ্ধি শুদ্ধ এবং ধারণাশক্তি প্রবল, যার স্বদেশে জন্ম, বিদ্বান এবং বিভিন্ন কর্মদ্বারা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত, সে গুপ্ত পরামর্শ শোনার অধিকারী। যে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, মিত্র ও শত্রুপক্ষের লোকেদের প্রকৃতি জানে এবং রাজার অভিন্ন সুহৃদ, সে ও গুপ্ত পরামর্শ শুনতে পারে। যে সত্যবাদী, শীলবান, গাম্ভীর্যবান, লজ্জাশীল এবং কোমলস্বভাবসম্পন্ন ও বংশানুক্রমে রাজার সেবা করে এসেছে, সেও মন্ত্রণা শোনার অধিকারী। সন্তুষ্ট, সৎব্যক্তি দ্বারা সম্মানিত, সত্যবাদী, চতুর, পাপকে ঘৃণাকারী, রাজকীয় মন্ত্রণা বুঝতে সক্ষম, উপযুক্ত সুযোগের সদ্‌ব্যবহারকারী এবং শূরবীর, এইরূপ মানুষকেই পরামর্শ শোনার যোগ্য বলা হয়। যে রাজা বহুকাল ধরে রাজ্য ভোগ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁর গুপ্ত মন্ত্রণা সেই ব্যক্তিকেই বলা উচিত যে সমস্ত জগৎকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিজ বশে আনার শক্তি ধারণ করে। নগর ও দেশের লোক যাঁকে ধর্মত বিশ্বাস করেন, যিনি নীতিবিদ, তিনিই গুপ্ত মন্ত্রণা শোনার অধিকারী। কমপক্ষে তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত। মন্ত্রীদের উচিত রাজা, অমাত্য, সেনাধ্যক্ষ প্রভৃতির প্রকৃতি এবং শত্রুর ওপরও দৃষ্টি রাখা ; কারণ রাজার রাজ্যের মূল হল মন্ত্রীদের প্রকৃত পরামর্শ। সেই আধারেই রাজ্যের উন্নতি হয়। যে মন্ত্রী রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা লুকিয়ে রাখেন, তিনিই বুদ্ধিমান। মন্ত্রীই রাজার কবচ, সেনা প্রভৃতি শরীরমাত্র।

রাজদূত রাজ্যের মূল এবং গুপ্ত মন্ত্রণা তার বল। যদি মন্ত্রী অহংকার, ক্রোধ, মান, ঈর্ষা ত্যাগ করে রাজাকে অনুসরণ করে, তাহলে রাজা সুখী হয়। যারা পাঁচ প্রকারের ছলরহিত, সেই মন্ত্রীদের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণা করা উচিত। রাজা প্রথমে তিনজন মন্ত্রীকে পৃথকভাবে ডেকে তাদের পরামর্শ জেনে বিচার করবেন, তারপর নিজের যা সিদ্ধান্ত সেটি এবং অপরের সিদ্ধান্তের ধর্ম, অর্থ ও কামের তত্ত্ব বুঝতে পারা পুরোহিত ব্রাহ্মণকে জানিয়ে তার পরামর্শ শুনবেন। সেই সময় পুরোহিত যা সিদ্ধান্ত নেবে, তার সঙ্গে যদি সকলে একমত হয় তাহলে ওই সিদ্ধান্তটি কার্যে পরিণত করবেন। বিদ্বানেরা বলেন—সর্বদা এইভাবে মন্ত্রণা করবে এবং যে সিদ্ধান্ত প্রজাদের অনুকূলে আনার পক্ষে অধিক প্রবল, তাকে কার্যে পরিণত করতে হয়। যেখানে গুপ্ত পরামর্শ করা হবে, সেখানে আশপাশে কোনো অন্ধ, পঙ্গু, মূর্খ প্রভৃতিকে আসতে দেবে না। মহলের উচ্চতলায় অথবা শূন্য, ফাঁকা ময়দানে, যেখানে বড় গাছ বা লম্বা ঘাস নেই—এইসব স্থানে বসে উপযুক্ত সময়ে গুপ্ত পরামর্শ করবে।

রাজার ব্যবহারিক নীতি এবং তাঁর নিবাসের উপযুক্ত নগরের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজা কীভাবে প্রজাপালন করবে, যাতে সে ধর্মানুসারে প্রজাদের প্রেম ও অক্ষয় কীর্তি লাভ করতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—যে রাজা তার ভাব শুদ্ধ রেখে নিষ্কপট ব্যবহারের দ্বারা প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকে, সে ধর্ম ও কীর্তি প্রাপ্ত হয় এবং তার ইহলোক-পরলোকে মঙ্গল হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মহাপ্রাজ্ঞ ! আমাকে বলুন, রাজার ব্যবহার কেমন হবে এবং রাজা কাদের নিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করবে ? আমার মনে হয় আপনি আগে যেসব গুণাদির বর্ণনা করেছেন, তা কোনো একটি ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! তোমার কথা যথার্থ। সত্যই ওই সব গুণ কোনো একটি ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া দুর্লভ। তাই রাজা কীরূপ লোকেদের নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে, আমি সেই কথা সংক্ষেপে জানাচ্ছি। যিনি বেদ-পারঙ্গম, স্নাতক, অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ, নির্ভীক এই প্রকার চার জন ব্রাহ্মণ, শক্তিমান ও অস্ত্রশস্ত্রে পারঙ্গম আট জন ক্ষত্রিয়, ধনধান্য-সম্পন্ন একুশ জন বৈশ্য, বিনয়ী ও পবিত্র আচারসম্পন্ন তিন জন শূদ্র, আট[1] গুণাদিযুক্ত এবং পুরাণ বিদ্যায় বিদ্বান এক সূত জাতির মানুষ—এইরূপ লোকেদের নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে। এই মণ্ডলের সকলেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হওয়া উচিত। সমস্ত মন্ত্রীমণ্ডল নির্ভীক, পরনিন্দা না করা, শ্রুতি-স্মৃতি বিদ্বান, বিনয়ী, সমদর্শী, বাদী-প্রতিবাদীর মামলা সামলাতে সমর্থ, নির্লোভ এবং সাত[2] প্রকার দুর্ব্যসন মুক্ত হওয়া উচিত। এর মধ্যে আট জন প্রধান ব্যক্তিকে মন্ত্রী নির্বাচিত করে রাজা তাঁদের সঙ্গে গুপ্ত শলা-পরামর্শ করবেন। এঁদের সকলের রায়ে যা স্থির হবে, দেশে সেই নিয়মই প্রচলিত হবে।

যুধিষ্ঠির ! এরূপ ব্যবহারের সাহায্যে তুমি সর্বদা প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। যে রাজা প্রজাদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে, ধর্মত তাদের পালন করে না, তার হৃদয়ে সর্বদা ভীতি থাকে এবং তার পরলোকও নষ্ট হয়ে যায়। রাজার মন্ত্রী হোক অথবা রাজকুমার, ন্যায়ই যার মূল, সেই ন্যায়াসনে উপবেশন করে যদি রাজা ধর্মপূর্বক প্রজাদের রক্ষা না করে এবং রাজ্যের অন্য অমাত্যবর্গও যদি প্রজাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে, তাহলে রাজার সঙ্গে তাদেরও নরক গমন করতে হয়। বলবানদের অত্যাচারে পীড়িত দীন-দুঃখী ও আর্ত মানুষ যখন রাজার শরণ চাইবে, তখন রাজারই উচিত অনাথের নাথ হয়ে তাদের রক্ষা করা। পাপীদের অপরাধ অনুসারে দণ্ডপ্রদান করা উচিত। তাদের মধ্যে যারা ধনী, তাদের ধন থেকে বঞ্চিত করা উচিত, অর্থহীনদের কয়েদ করে রাখা উচিত এবং যারা অত্যন্ত দোষী তাদের অন্যরকম শাস্তি দিয়ে সুপথে আনার চেষ্টা করতে হয়।

যারা রাজাকে বধ করার চেষ্টা করে, গৃহে অগ্নি সংযোগ করে, চুরি করে বা বর্ণসংকর করে সন্তান উৎপাদন করে—এদের অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। রাজা যদি রাগ-দ্বেষরহিত ও সমরজ্ঞানযুক্ত হয় এবং অপরাধীকে অপরাধ অনুরূপ সাজা দেয় তাহলে রাজার কোনো পাপ হয় না, তার দ্বারা সনাতন ধর্মই পালিত হয়। কিন্তু যে মূর্খ নিজ ইচ্ছানুসারে দণ্ড দেয়, সে ইহলোকে তো কলঙ্কিত হয়ই ; মৃত্যুর পরে তাকে নরকগমন করতে হয়। অপরের কথা শুনেই কাউকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয় ; অপরাধ সম্বন্ধে ভালোভাবে খবর নিয়ে তবেই দণ্ডপ্রদান করা কর্তব্য। রাজা কখনোই দূতকে বধ করবে না। দূত-হত্যাকারী রাজা মন্ত্রী-সহ নরকে গমন করে। দূতের সাতটি গুণ থাকা উচিত—উত্তম কুলে জন্ম, আত্মীয়স্বজন প্রতিপত্তিশালী, দূতের বাকচাতুর্য, কার্যকুশলতা, প্রিয় বাক্য বলা, সত্যবাদী এবং স্মরণশক্তিসম্পন্ন—এগুলি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজার প্রতিহারী বা দ্বারপালেরও এই গুণগুলি থাকা উচিত। সন্ধি-বিগ্রহের উপযুক্ত সময় জানা, ধর্মশাস্ত্রে

---

[1] সেবা করতে সর্বদা প্রস্তুত, মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা, সেটি ঠিকমতো বোঝা, স্মরণে রাখা, কোন কাজের কী পরিণতি—তা বিচার করা, এক উপায়ে কার্যসিদ্ধ না হলে কী করা উচিত ?—এইভাবে চিন্তা করা, শিল্প ও ব্যবহারের খোঁজ রাখা এবং তত্ত্ব বোধ হওয়া—পৌরাণিক সূতের এই আটটি গুণ হওয়া উচিত।

[2] শিকার, জুয়া, পরস্ত্রীসঙ্গ, মদিরাপান — এই চারটি কামজনিত দোষ এবং আঘাত করা, গালি দেওয়া, অন্যের জিনিস নষ্ট করা—এই তিনটি ক্রোধজনিত দোষ মিলে সাতটিকে দুর্ব্যসন বলা হয়।

তত্ত্বজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ধীর, লজ্জাশীল, রহস্য গোপনকারী, কুলীন, সাহসী ও শুদ্ধ হৃদয়সম্পন্ন মন্ত্রী হলে তা অত্যন্ত ভালো হয়। সেনাপতিরও এই গুণগুলি থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত সেনাপতির অস্ত্রচালনা, নানাপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগ করার ক্ষমতা, পরাক্রমী, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার কষ্ট ধৈর্য সহকারে সহন করা এবং শত্রুর দুর্বলতা ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। রাজা অন্যের বিশ্বাস জয় করবেন, কিন্তু নিজে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। নিজ পুত্রের ওপরও পূর্ণ বিশ্বাস থাকা ঠিক নয়। এসব নীতিশাস্ত্রের তত্ত্ব, আমি তোমাকে জানালাম। কারো ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করা রাজাদের এক পরম গোপনীয় গুণ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজা কীরূপ নগরে বাস করবেন ? আগে থেকে নির্মিত রাজধানীতে, নাকি নতুন নগর স্থাপন করে ?

ভীষ্ম বললেন—যেখানে সমস্ত রকমের সম্পদ প্রচুর পরিমাণে আছে, তেমন ছয় প্রকারের দুর্গ বা কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে নতুন নগর স্থাপন করা উচিত। প্রথম হল ধন্বদুর্গ। যার চারদিক বহুদূর পর্যন্ত নির্জলা বা মরুভূমি, তাকে বলা হয় ধন্বদুর্গ। দ্বিতীয় হল মহীদুর্গ। সমতল জমির মধ্যে তৈরি কেল্লা বা তহখানা। তৃতীয়, গিরিদুর্গ, যা পাহাড়ের উচ্চ শিখরে অবস্থিত হয়। চতুর্থ, সামরিক দুর্গ, পঞ্চম, মৃত্তিকা দুর্গ—বালির ওপর টিলা পরিবেষ্টিত এবং ষষ্ঠ, বনদুর্গ—কণ্টকপূর্ণ ঘন জঙ্গল পরিবেষ্টিত। যে নগরে এর কোনো একটি দুর্গ আছে, অন্ন ও অস্ত্রের প্রাচুর্য আছে, যার চারপাশ মজবুত প্রাচীর পরিবেষ্টিত এবং গভীর প্রশস্ত খাল আছে, যেখানে হাতি, ঘোড়া এবং রথের অভাব নেই, বিদ্বান ও কারিগর বাস করে, আবশ্যক বস্তুর প্রাচুর্য আছে, ধার্মিক ও কর্মকুশল মানুষ বাস করে, প্রশস্ত পথ এবং বাজার যার শোভাবর্ধন করে, ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ, যেখানে পূর্ণশান্তি বিরাজমান, যেখানে মানুষ নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে, যেখানে বহু বড় বড় যোদ্ধা এবং ধনী বাস করে, বেদমন্ত্র ধ্বনি গুঞ্জরিত হয় এবং যেখানে সর্বদা সামাজিক উৎসব ও দেবপূজার ধারা চলতে থাকে—এরূপ নগরের মধ্যে নিজ বশে থাকা মন্ত্রী ও সেনাদের নিয়ে রাজার বাস করা উচিত।

রাজার কর্তব্য হল, সেই নগরের রাজকোষ, সৈন্য, মিত্র বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসার উন্নতি করা। নগরের আশপাশের সমস্ত দোষ দূর করা। অন্ন ও অস্ত্রভাণ্ডার যত্ন সহকারে বৃদ্ধি করতে থাকা। সর্ববস্তুর সংগ্রহবৃদ্ধি করা, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার উন্নতিসাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কাঠ, লোহা, ধান, কয়লা, বাঁশ, তেল, ঘি, মধু, ঔষধ, অস্ত্রশস্ত্র, বাণ, ঢাল, বেত ইত্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখা। কুয়া, জলাশয়, বৃক্ষগুলি রক্ষা করা। আচার্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, মহান ধনুর্ধর, কারিগর, জ্যোতিষী ও বৈদ্যদের যত্ন সহকারে রক্ষা করা। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, কার্যকুশল, শূরবীর, বহুজ্ঞ এবং সাহসী ব্যক্তিদের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করা। যত্নপূর্বক ধার্মিকদের রক্ষা করা ও পাপীদের শাস্তি দেওয়া রাজার ধর্ম। সকল বর্ণকে তাদের নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত রাখা। রাজার নিজের হাতে এইসব দায়িত্ব রাখবে, দূতেদের সঙ্গে আলোচনা, গুপ্ত পরামর্শ করা, রাজকোষের খবর রাখা, অপরাধীদের দণ্ড প্রদান—এগুলির ওপরেই রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় থাকে। গুপ্তচররূপী নেত্রের দ্বারা সর্বদা এইসব বিষয়ে দৃষ্টি রাখবে যে শত্রু, মিত্র এবং অন্যান্য ব্যক্তি নগর বা প্রান্তে কী কাজ করছে। তাদের কাজের সম্পর্কে জেনে তারপর সাবধানে তার প্রতিকার করা উচিত। রাজভক্তদের সম্মান করবে এবং হিংসাকারীদের কারাগারে রাখবে।

নিত্য নানাপ্রকার যজ্ঞ করবে, কাউকে কষ্ট না দিয়ে দান করবে। প্রজাদের রক্ষা করবে এবং এমন কোনো কাজ করবে না যাতে ধর্ম পালনে ব্যাঘাত হয়। দীন, অনাথ, বৃদ্ধ ও বিধবাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করবে, তাদের যোগ-ক্ষেমের বন্দোবস্ত করবে। রাজ্যে যেসব তপস্বী থাকেন তাঁদের তোমার শরীর, কার্য, রাষ্ট্র সম্পর্কে জানাবে এবং তাঁদের সামনে বিনীতভাবে থাকবে। যে ব্যক্তি তাঁর সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন, সেই কুলীন, বহুজ্ঞ তপস্বীকে আহার-আসন ও শয্যা দিয়ে সম্মানিত করবে। যতই বিপদ আসুক না কেন, রাজার তপস্বীকে বিশ্বাস করা উচিত। কারণ চোর-ডাকাতরাও তাঁদের বিশ্বাস করে। কমপক্ষে চারজন তপস্বীকে রাজার সহায়ক করে রাখা উচিত। তারমধ্যে একজনের নিজ রাজ্যে, একজন শত্রু রাজ্যে, একজন জঙ্গলে এবং একজনের সামন্তদের নগরে থাকা

উচিত। তাঁদের সম্মানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বস্তু দেওয়া উচিত। নিজ রাজ্যের তপস্বীদের ন্যায় শত্রু রাজ্যে বসবাসকারী তপস্বীদের সম্মান করা উচিত ; কারণ বিপদের সময় তিনি শরণার্থী রাজাকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রশ্ন অনুসারে রাজার কেমন নগরে থাকা উচিত, তা সংক্ষেপে আমি জানালাম।

—— ০ ——

রাষ্ট্রের রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় এবং প্রজার নিকট থেকে কর আহরণের নিয়ম

যুধিষ্ঠির বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি এবার জানতে চাই যে রাষ্ট্রের রক্ষা এবং বৃদ্ধি কীভাবে করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! একটি গ্রামের, দশটি গ্রামের, কুড়িটি গ্রামের, একশটি গ্রামের এবং এক হাজার গ্রাম প্রতি এক একজন অধিপতি নির্বাচন করা উচিত। গ্রামের অধিপতির কর্তব্য হল, গ্রামবাসীদের দ্বারা যে অপরাধ হয় তার সমস্ত খবর নিয়ে তা বিস্তারিতভাবে দশ গ্রামের অধিপতির কাছে পাঠানো। এইভাবে দশ গ্রামের অধিপতি কুড়ি গ্রামের অধিপতির কাছে, কুড়ি গ্রামের অধিপতি একশত গ্রামের অধিপতি এবং একশত গ্রামের অধিপতি এক হাজার গ্রামের অধিপতির কাছে পাঠাবেন। তারপর হাজার গ্রামের অধিপতি নিজে রাজার কাছে গিয়ে সংগৃহীত সমস্ত সংবাদ ও তথ্য রাজাকে জানাবেন। গ্রামের উৎপাদিত শস্যে গ্রামের লোকেদেরই অধিকারে থাকবে। তারা বেতন হিসাবে নির্ধারিত কিছু অংশ পাবে। গ্রাম থেকে যা উৎপন্ন হবে তা দশ গ্রামের অধিপতিকে কর হিসাবে পাঠাতে হবে। দশ গ্রামের অধিপতি কুড়ি গ্রামের অধিপতিকে কর দেবে, তারা তাই দিয়ে নিজেদের ভরণ-পোষণ করবে। যে শত গ্রামের অধিপতি তার দৈনন্দিন ব্যয়ের জন্য এক গ্রামের সম্পূর্ণ আয় দিতে হবে ; সেই গ্রাম যেন জনবহুল ও সম্পন্ন হয়। (আয়ের বিতরণের ব্যবস্থা যুক্তভাবে কয়েকজন নির্বাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে করতে হবে, কেননা যদি একশত গ্রামের অধিপতির সোজাসুজি আয় প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয় তাহলে সে প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করতে পারে।) তেমনই এক হাজার গ্রামের অধিপতির জন্য একটি নগরের আয় দেওয়া উচিত। এর হাতে যুদ্ধসম্পর্কীয় বা গ্রামের ব্যবস্থা ইত্যাদির যে কার্যভার সমর্পণ করা হয়েছে, তা দেখাশুনার জন্য এক মন্ত্রী (রাজ্যপাল) নিযুক্ত করা উচিত। তিনি হবেন ধর্মজ্ঞ, আলস্যরহিত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। অথবা প্রত্যেক বড় বড় নগর বা জেলায় এক একজন অধ্যক্ষ (কালেক্টর) নিযুক্ত করা উচিত, যিনি সেখানকার সমস্ত কাজ দেখাশোনা করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। তিনি নিজ মণ্ডলের সমস্ত গ্রামাধ্যক্ষের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রেখে তাদের কাজ পরীক্ষা করে দেখবেন। প্রত্যেক নগরাধ্যক্ষের কাছে গুপ্তচর থাকা উচিত, তারা প্রজার সঙ্গে গ্রামাধ্যক্ষের আচরণ সঠিক হচ্ছে কিনা তার সংবাদ দেবে। গ্রামের অধ্যক্ষ প্রজাদের পাপী, অত্যাচারী লোকেদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

জিনিসপত্র কেনা-বেচা, পথের দূরত্ব, জিনিসপত্র নিয়ে আসা-যাওয়ার খরচ এইসব দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যবসায়ীদের ওপর রাজকর বসানো উচিত। তেমনই জিনিসপত্র তৈরি, তার মান, শিল্পকারদের মজুরি ইত্যাদির খবর রেখে তারপর কর বসানো উচিত। কর যেন বেশি না হয় এবং করপ্রদানকারী তা দিতে কষ্ট বোধ না করে, তাদের কাজ এবং লাভের দিকে দৃষ্টি রেখেই কর বসাতে হবে। অতি লোভের জন্য যেন ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এবং প্রজাদের জমিবাড়ি নষ্ট না হয়। অতি কর আহরণকারী রাজাকে কোনো প্রজাই প্রীতির চক্ষে দেখে না। সেই অবস্থায় সেই রাজার কল্যাণ হবে কীভাবে ? প্রজাদের ভালোবাসা নষ্ট হলে, তাতে কোনো লাভ হয় না। বুদ্ধিমান রাজার উচিত গো-বৎস পালনের ন্যায় রাষ্ট্রকে সযত্নে পালন করা। গো-বৎস যেমন ক্ষুধা অনুসারে ভরপেট দুধ পান করে বলশালী হলে, তবেই ভারী কাজ করতে সমর্থ হয়, কিন্তু গাভীর দুধ দোহন করে নিলে, দুধপান করতে না দিলে গো-বৎস দুর্বল হয়ে কাজে অসমর্থ হয় তেমনই রাজ্যের প্রজাদের বেশি দোহন করলে তারা দরিদ্র ও বলহীন হয়ে পড়ে, তাদের দ্বারা কোনো বড় কাজ হয় না। যে রাজা অনুগ্রহ করে তাঁর রাষ্ট্র রক্ষা করেন এবং উচিতমতো কর নিয়ে কার্যভার নির্বাহ করেন, তাঁর সত্যকারের মঙ্গল হয়। বিপদের সময় রাজার প্রয়োজনের জন্য বপ্তানি করে রাজকোষে অর্থ

সংগ্রহ করা উচিত এবং নিজের রাষ্ট্রের অর্থ-কোষেরও ঠিকমতো খবর রাখা অবশ্য কর্তব্য।

যদি দেশের উপর কোনো সংকট আসে, তাহলে অর্থের প্রয়োজনে প্রজাদের সেই সম্পর্কে অবহিত করা উচিত। তাদের জানাতে হবে—'সজ্জনগণ ! আমাদের দেশে এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হয়েছে, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের শত্রু বহু লুটেরাকে নিয়ে আমাদের দেশকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। এই ভীষণ বিপদ ও দারুণ ভয়ের সময় আপনাদের রক্ষা করার জন্য অর্থ সাহায্য চাইছি। বিপদ কেটে গেলে আপনাদের অর্থ ফিরিয়ে দেব। শত্রুর হাতে পড়লে তারা সব লুট করে নেবে, কিছুই ফিরে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া শত্রু এলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাও ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হবে, তাদের জন্যই প্রতিরক্ষার প্রয়োজন। আপনাদের সাহায্য পেলে আমি এদের রক্ষা করে আপনাদের সুখী করব। আমার ক্ষমতা থাকতে আমি রাষ্ট্রকে তথা আপনাদের কোনো কষ্ট দেব না। এখন এই বিপদের সময় আপনাদের কিছু কষ্ট করতে হবে।'

সময়ের গতিবিধি সম্বন্ধে অবহিত রাজা এইভাবে মিষ্টবাক্যে প্রজাদের বুঝিয়ে যতটুকু প্রয়োজন অর্থ সাহায্য নেবে। নগরের চতুষ্পার্শে প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে, সৈন্যদের ভরণ-পোষণ করতে হবে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, সকলের যোগক্ষেমের ব্যবস্থা করতে হবে—এই কাজে প্রয়োজন মতো ব্যবসায়ীদের থেকে কর নিতে হবে। রাজা ব্যবসায়ীদের লাভ-ক্ষতিতে উদাসীন থাকলে, ব্যবসায়ীরা রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, তাই তাদের সঙ্গে কঠোরভাবে নয়, কোমলভাবে কথা বলা উচিত। তাদের সান্ত্বনা প্রদান করে, রক্ষা করে, অর্থ-সাহায্য নিয়ে তাদের স্থিতি কায়েম করার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সর্বদা তাদের আস্থাভাজন হয়ে থাকতে হয়। তাদের পরিশ্রমের মূল্য সর্বদা দেওয়া উচিত ; কারণ তারাই রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করে। সুতরাং বুদ্ধিমান রাজা সর্বদা তাদের প্রিয় কাজ করে থাকে। তাদের ওপর সামান্য কর ধার্য করবে এবং এমন ব্যবস্থা রাখবে, যাতে তারা নির্ভয়ে দেশের সর্বত্র বিচরণ করতে পারে। যুধিষ্ঠির ! রাজার পক্ষে এর থেকে বেশি হিতকর কাজ আর নেই।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজা সংকটগ্রস্ত না হয়েও যদি রাজকোষ বৃদ্ধি করতে চান, তাহলে তাঁর কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—ধর্মনিষ্ঠ রাজা দেশ-কালের পরিস্থিতি স্মরণে রেখে নিজ বল ও বুদ্ধি অনুসারে প্রজার হিতসাধনে ব্যাপৃত থেকে সর্বদা তাদের পালন করবেন। যাতে প্রজাদের এবং নিজের ভালো হয়, সেই কাজ সমস্ত রাষ্ট্রে প্রচার করবেন। যেমন ভ্রমর ধীরে ধীরে ফুলের মধুপান করে, গাছটিকে নষ্ট করে না ; যেমন মানুষ গো-বৎসকে কষ্ট না দিয়ে ধীরে ধীরে গাভীর দুধ দোহন করে, গাভীকে দুর্বল করে ফেলে না ; তেমনই রাজারও ধীরে ধীরে কর আদায় করা উচিত। বাঘিনী যেমন তার শিশুকে দাঁতে ধরে এদিক-ওদিক করলেও, সে কষ্ট পায় না, তেমনই বিচারপূর্বক রাজার করগ্রহণ করা উচিত যাতে প্রজারা কষ্ট না পায়। উচিত সময়ে উপযুক্ত কাজের জন্য প্রজাকে বুঝিয়ে কর আদায় করা উচিত, এটি অসময়ে অথবা অনুচিত কাজের জন্য নয়। পানশালা, বারবণিতা, বারবণিতাদের দালাল, মদ্যপ, জুয়াড়ি এইসব খারাপ কাজ যারা করে, তারা সমস্ত দেশকে রসাতলে পাঠায় ; এদের দণ্ডপ্রদান করে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত ; নচেৎ এরা রাজ্য থেকে ভালো লোকদের সর্বনাশ করে। মনু প্রথম থেকেই সকল প্রাণীর জন্য নিয়ম তৈরি করেছেন যে, বিপদের সময় ছাড়া অন্য সময়ে কেউ কারো কাছে ভিক্ষা চাইবে না। এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে সকলেই ভিক্ষা করে জীবিকা-নির্বাহ করত, কাজকর্ম করত না, সমস্ত জগৎ-সংসার নষ্ট হয়ে যেত। রাজাই সকলকে নিয়মের মধ্যে রাখতে সক্ষম। যে রাজা প্রজাদের আপন সীমার মধ্যে রাখেন না প্রজাবর্গের পাপের এক-চতুর্থাংশ তাঁকে ভোগ করতে হয়। সকলে তাদের সীমানার মধ্যে থাকলে প্রজাদের পুণ্যের এক-চতুর্থাংশের তিনি ভাগীদার হন ; তাই রাজার উচিত সমস্ত পাপীকে দণ্ডপ্রদান করে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা।

উপরোক্ত মদিরালয় এবং বেশ্যালয় ইত্যাদি স্থান বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কারণ এতে মানুষের আসক্তি বৃদ্ধি পায়। আসক্তির বশে মানুষ মাংসাহার করে, মদ্যপান করে এবং পরধন ও পরস্ত্রী অপহরণ করে। নিজে তো এসকল দুষ্কর্ম করেই, অপরকে দিয়েও করায়। যাদের কাছে কোনো সংগ্রহ নেই, তারা যদি বিপদের সময় সাহায্য চায় তবে তা ধর্ম মনে করে এবং দয়া করে দিয়ে দেওয়া উচিত, কোনো

ভয় বা জবরদস্তিতে নয়। তোমার রাজ্যে ভিখারি এবং ডাকাত যেন না থাকে ; কারণ তারা শুধু প্রজার ধন অপহরণ করে, তাদের উন্নতির জন্য কিছু করে না। যারা জীবেদের অনুগ্রহ করে এবং প্রজাদের উন্নতিতে সহায়ক হয়, রাজ্যে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। প্রাণী নিধনকারী লোকেদের রাজ্যে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। যে অমাত্য অত্যধিক খাজনা আদায় করে, তাকে দণ্ডপ্রদান করা উচিত এবং সে কত খাজনা আদায় করছে তার জন্য নিরীক্ষক নিযুক্ত করা উচিত।

কৃষিকার্য, গোরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি ব্যবসায়ে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত করা উচিত। তাদের সমস্ত সংকট থেকে রাজার রক্ষা করা উচিত। রাজার কর্তব্য হল ধনী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে তাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বলা, 'আপনারা আমার সহায়ক থাকবেন এবং প্রজাদের ওপর সহৃদয় দৃষ্টি বজায় রাখবেন।' ধনী ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ এবং সমস্ত প্রাণীর আধার। বিদ্বান, শূরবীর, ধনী, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, তপস্বী, সত্যবাদী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই প্রজাদের রক্ষা করেন। তাই যুধিষ্ঠির ! তুমি সব প্রাণীদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখো এবং সত্য, সরলতা, প্রেম, ক্ষমা ও দয়া প্রভৃতি সদ্‌ধর্ম পালন করো। এরূপ করলে তোমার দণ্ডধারণের ক্ষমতা, রাজকোষ, মিত্র এবং রাজ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

রাজার নীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং তার দ্বারা ধর্মপালনের প্রয়োজনীয়তা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে বৃক্ষের ফল পাওয়া যায়, মনে রাখবে তোমার রাজ্যে সেই বৃক্ষ যেন কেউ কাটতে না পারে। মূল এবং ফলকে ধর্মত ব্রাহ্মণের ধন বলা হয়, সেইজন্যও গাছ কাটা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যদি নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করতে না পেরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার মনস্থ করে, তাহলে রাজার কর্তব্য হল ব্রাহ্মণকে সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাহলে তারা নিঃসন্দেহে ফিরে আসবে। এতেও যদি ব্রাহ্মণ কিছু না বলে তাহলে তাকে অনুরোধ করে বলা উচিত—'বিপ্রবর ! আমার পূর্ব অপরাধ মনে রাখবেন না, সে সব ভুলে যান।' এইভাবে বিনয়ের সঙ্গে তাকে প্রসন্ন করা রাজার সনাতন ধর্ম। কৃষিকার্য, পশুপালন ও বাণিজ্য—এইগুলি তাদের জীবিকা, কিন্তু তিন বেদ সকলকেই রক্ষা করে। যারা এই বেদাবলীর অধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞ বৈদিক কর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তারা দুষ্টলোক, ডাকাত ; তাদের দমন করার জন্যই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করেছেন। যুধিষ্ঠির ! তুমি শত্রুদের জয় করো, প্রজাদের রক্ষা করো, নানাপ্রকার যজ্ঞ করো এবং যুদ্ধে বীরের মতো সংগ্রাম করো, কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোরো না।

সকলের মঙ্গলের জন্য রাজার সর্বদা যুদ্ধের প্রস্তুতি রাখা উচিত এবং শত্রুর গতিবিধির খবর রাখার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করা প্রয়োজন। যারা তোমার অন্তরঙ্গ এবং আত্মীয়, তাদের দ্বারা বাইরের লোকেদের রক্ষা করো আর যারা বাইরের, তাদের দ্বারা অন্তরঙ্গ আত্মীয়দের রক্ষা করো। তারপর সকলের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করে তুমিও সকলকে রক্ষা করতে থাকো। 'আমার দুর্বলতা কী, কী ধরনের আসক্তি আমার আছে, কী খারাপ জিনিস আমার মধ্যে আছে যা এখনও দূর হয়নি, কী কারণে আমার মধ্যে এই দোষগুলি আসে ?'—তোমার সর্বদা এই বিষয়গুলি নিয়ে আত্ম-বিশ্লেষণ করা উচিত। কাল পর্যন্ত আমার যে ব্যবহার ছিল, লোকে তার প্রশংসা করত কী না ! সমস্ত রাষ্ট্রে এবং দেশের প্রান্তে আমার যশ লোকে পছন্দ করে কী না ?'—এসব জানার জন্য বিশ্বাসী গুপ্তচর পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হয়।

পুত্র যুধিষ্ঠির ! যারা ধর্মজ্ঞ, ধৈর্যশীল এবং সংগ্রামে কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, যারা রাজ্যে বাস করে জীবিকা-নির্বাহ করে অথবা রাজার আশ্রয়ে থাকে, যারা অমাত্য এবং কারো পক্ষপাতী নয়, তারা তোমার প্রশংসা করুক অথবা নিন্দা, এদের সকলেরই আপ্যায়ন করা তোমার কর্তব্য ; কারণ কারো কোনো কাজ যে সবসময় পছন্দ হবে—তা সম্ভব নয়। সকল প্রাণীরই শত্রু, মিত্র থাকে। ভারত ! সামগ্রী কেনে যারা, তারা যেন তোমার রাজ্যে করের ভারে পীড়িত হয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে না থাকে। কৃষকরা অত্যধিক খাজনার ভারে পীড়িত হয়ে রাজ্যত্যাগ করে না যায়। কৃষকরাই রাজার ভার বহন করে এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের ভার নেয়। এদের প্রদত্ত

অন্নেই দেবতা, পিতৃপুরুষ, মানুষ ও অন্যান্য জীবদের জীবিকা নির্বাহ হয়।

আমি এতক্ষণ রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করলাম। এর দ্বারা রাজাদের রক্ষা হয়। এই বিষয়ে পরে আরো জানাচ্ছি। ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য ঋষি প্রসন্ন হয়ে যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতাকে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা তোমাকে বলছি, শোনো—

উতথ্য বললেন—মান্ধাতা ! রাজার কর্তব্য ধর্ম রক্ষা ও তার প্রচার, বিষয়-সুখ উপভোগ তার জন্য নয়। তোমার জানা উচিত যে রাজা সমস্ত জগতের রক্ষক। রাজা যদি ধর্মাচরণ করে, তাহলে দেবতা হয় আর ধর্মত্যাগ করলে নরকে পতিত হয়। ধর্মের ওপরই সমস্ত জগতের স্থিতি এবং ধর্ম রাজার আশ্রয়েই থাকে। পরম ধর্মাত্মা এবং শ্রীসম্পন্ন রাজাকে ধর্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ বলা হয়, রাজা যদি ধর্মপালন না করে, তবে দেবতা তার নিন্দা করেন এবং তাকে পাপমূর্তি মনে করা হয়। যে নিজ ধর্মে প্রবৃত্ত থাকে, তারই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সমস্ত জগৎ সেই মঙ্গলময় ধর্মই অনুসরণ করে। রাজা যদি পাপরোধ না করে তাহলে দেশে ধর্মের উচ্ছেদ হয় এবং সর্বত্র মহা অধর্ম ছড়িয়ে পড়ে, ফলে প্রজারা দিন রাত শঙ্কায় থাকে। 'এটি আমার জিনিস, ওটি আমার নয়'—এইসব বলাও তখন কঠিন হয়ে যায়। সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা স্থির করা কোনো ধার্মিক ব্যবস্থাই তখন থাকে না। পাপের বল বৃদ্ধি হলে মানুষের নিজের নিজের স্ত্রী, ক্ষেত-খামার কিছুই আর নির্দিষ্ট থাকে না। দেবতার পূজা বন্ধ হয়ে যায়, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণ হয় না, অতিথি সেবা হয় না, ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক বেদাধ্যয়ন করে না, যজ্ঞ করে না। বৃদ্ধ জন্তুদের মতো মানুষও ভয়ে ভয়ে কালযাপন করে।

ইহলোক ও পরলোকের দিকে দৃষ্টি রেখে ঋষিরা স্বয়ং রাজা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা ভেবেছিলেন—'রাজা সব প্রাণীদের মধ্যে মহান এবং ধর্মের সাক্ষাৎ বিগ্রহ হবে।' অতএব যার মধ্যে ধর্ম বিরাজমান, তাকেই রাজা বলে। তাই রাজার কর্তব্য হল ধর্মপালন ও তার প্রসার ঘটানো। ধর্মবৃদ্ধি পেলে সমস্ত প্রাণীর অভ্যুদয় হয় এবং ধর্মের হানিতে সকলের হানি হয়, তাই ধর্মকে লোপ পেতে দেওয়া উচিত নয়। ব্রহ্মা প্রাণীর কল্যাণার্থেই ধর্ম সৃষ্টি করেছেন, তাই নিজ দেশে ধর্মপ্রচার করা উচিত, এতে প্রজাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে। রাজা তাকেই বলে, যে ধর্মে অবিচল থেকে প্রজাপালন করে। সুতরাং তুমিও কাম-ক্রোধ ত্যাগ করে ধর্মকে রক্ষা করো। ধর্মই রাজাদের সবথেকে বড় কল্যাণকারী মিত্র।

ধর্মের মূল হল ব্রাহ্মণ ; তাই ব্রাহ্মণদের সম্মান করা উচিত। ব্রাহ্মণদের ইচ্ছা পূর্ণ না করলে রাজার প্রাণে ভয় আসে। রাজন্ ! সম্পত্তির পুত্র হল দর্প, যা অধর্মের অংশ থেকে উৎপন্ন। সে বহু দেবতা, অসুর এবং রাজর্ষিদের বিনাশ করেছে। তাকে যে জয় করে, সে-ই রাজা হয়, দর্প দ্বারা পরাজিত হলে তাকে দাস বলা হয়। যদি তুমি বহুকাল ধরে রাজত্ব করতে চাও তাহলে এমন আচরণ করো যাতে তোমার দর্প ও অধর্ম উৎসাহ না পায়। মত্ত, অসতর্ক, বালক এবং পাগলদের থেকে দূরে থাক, যদি এরা তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করতে চায়, তবে এদের সেবা থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকবে। তেমনই যাকে একবার কয়েদ করা হয়েছে, সেই মন্ত্রীর থেকে, পরস্ত্রী থেকে, দুর্গম পর্বত থেকে এবং হাতি, ঘোড়া ও সর্পের থেকে দূরে থাকবে। কৃপণতা, অহংভাব, দম্ভ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করবে। বন্ধ্যা, বারাঙ্গনা, পরস্ত্রী এবং কুমারী কন্যার সঙ্গে সমাগম করবে না। রাজা যখন ধর্ম সম্বন্ধে অসাবধান থাকে তখন উত্তম কুলে বর্ণসংকর মানুষের অংশে পাপী রাক্ষস জন্ম নেয়, নপুংসক, কানা, খোঁড়া, বোবা, বুদ্ধিহীন সন্তানের জন্ম হয়। তাই প্রজাদের হিতের কথা চিন্তা করে রাজার বিশেষভাবে ধর্মের আচরণ করা উচিত।

রাজার প্রমাদে আরও অনেক ক্ষতিকর দোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বর্ণসংকর জন্মের জন্য পাপকর্ম বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মে শীত এবং শীতে গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। কখনো খরা দেখা দেয়, কখনো বন্যা। প্রজাদের মধ্যে নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। আকাশে ধূমকেতু ও ভয়ানক গ্রহ দেখা দেয় এবং রাজার বিনাশের নানা লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। যে রাজা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সে প্রজাদের রক্ষা করতেও সক্ষম হয় না। প্রথমে তার প্রজা বিনষ্ট হয়, পরে স্বয়ং রাজা। যখন দুজন ব্যক্তি একজনের বস্তু লুট করে এবং বহু ব্যক্তি মিলে দুজনের বস্তু ছিনিয়ে নেয়, কুমারী কন্যাকে বলাৎকার করা হয়, সেই সমস্ত অপরাধের দোষ রাজার ওপর বর্তায়। রাজা ধর্মত্যাগ করে যখন প্রমাদে লিপ্ত হন, তখন কোনো ব্যক্তিই নিজের সম্পত্তিকে নিজের বলতে পারে না।

ধর্মাচরণ দ্বারা লাভ এবং রাজার ধর্ম

উতথ্য বললেন—রাজন্! রাজা যখন ধর্মাচরণ করেন তখন ঠিকমতো বর্ষা হয়, ফলে যে ধান্য ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রজার পালন-পোষণ হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এইসব যুগ রাজার আচরণে স্থিত ; রাজাই যুগের প্রবর্তক। চার বর্ণ, চার বেদ এবং চার আশ্রম—এগুলি সবই রাজার প্রমাদে নষ্ট হয়ে যায়। রাজা যখন ধর্মে অসাবধান হন তখন গার্হপত্য, আহ্বনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি—এই তিন অগ্নি, ঋক, সাম, যজু—এই তিন বেদ এবং দক্ষিণাসহ সমস্ত যজ্ঞ পণ্ড হয়ে যায়। রাজাই প্রাণীর রক্ষাকর্তা এবং তিনিই তাদের বিনাশকারী। ধর্মাত্মা হলে তিনি জীবনদাতা হন, পাপী হলে বিনাশকারী। রাজা প্রমাদগ্রস্ত হলে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব ও মিত্র সকলে শোক করে। তাঁর হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি পশুও ক্লেশ পায়। বিধাতা দুর্বল প্রাণীদের রক্ষার জন্যই বলসম্পন্ন রাজার সৃষ্টি করেছেন। দুর্বল প্রাণীরা রাজার ওপরই নির্ভরশীল। রাজন্! দুর্বল মানুষ, মুনি এবং বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি আমি বড় দুঃসহ বলে মনে করি, তাই তুমি দুর্বলদের কখনো কষ্ট দিও না। তারা নিজেদের ক্রোধাগ্নিতে যে কুল ভস্মসাৎ করে, তাতে অঙ্কুর উদ্গম হয় না, মূলসহ তার উচ্ছেদ হয়ে যায়। সুতরাং নিজের বলের অহংকারে দুর্বল মানুষকে শোষণ করবে না। আমি এই ভেবে শঙ্কিত যে, অগ্নি যেমন তার আশ্রয় কাঠকে ভস্মসাৎ করে তেমনই দুর্বল মানুষের দৃষ্টি যেন তোমাকে ভস্ম করে না দেয়। মিথ্যা অপরাধে ধৃত দীন-দুর্বল মানুষ যখন অশ্রুপাত করে তখন তার অশ্রুতে কলঙ্ক লেপনকারীর পুত্র-পৌত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বীজ বপন করলে যেমন তাতে তৎক্ষণাৎ ফল পাওয়া যায় না, সময় এলে তবেই ফল হয়, তেমনই পাপের ফলও তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না। যেখানে দুর্বল মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়, সেখানে কোনো রক্ষক একে বাঁচাতে আসে না, সেখানে সেই পাপী দৈব প্রেরিত ভয়ানক শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

যদি রাজা লোভবশত কোনো গরিবের দীন প্রার্থনা না শুনে তার ধন অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই রাজার মহাবিনাশ আসন্ন। রাজ্যের প্রজারা যখন রাজার গুণগান করে ধর্মাচরণ ও বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, রাজা তখন সেই পুণ্যের ভাগী হন আবার প্রজারা যখন ধর্মের স্বরূপ না বুঝে অধর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন রাজাকে পাপের ভাগী হতে হয়। অত্যাচারী পাপী ব্যক্তিরা যেখানে সশরীরে বিচরণ করে, সৎপুরুষের দৃষ্টিতে তাকে কলিযুগ বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাজা যখন দুষ্ট ব্যক্তিদের দণ্ড প্রদান করেন, সাধুদের সম্মান দেন তখন তাঁর রাজ্যে সর্বত্র উন্নতি হতে থাকে।

নিজ আশ্রিতদের অন্নপ্রদান করা, মন্ত্রীদের সম্মান জানানো এবং শক্তিগর্বে গর্বিতদের দমন করা রাজার ধর্ম। কায়-মনো-বাক্যে সমস্ত প্রজাদের রক্ষা করা, পুত্র অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা না করা হল রাজার ধর্ম। রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, ডাকাতদের মূলোচ্ছেদ করা ও যুদ্ধে বিজয়লাভ—এগুলিকে বলা হয় রাজধর্ম। যদি প্রিয়তম ব্যক্তিও কোনো কাজে বা বাক্যে পাপ করে, তাহলে রাজার কর্তব্য তাকে ক্ষমা না করে শাস্তিপ্রদান করা। শরণাগতকে পুত্রের ন্যায় পালন করবে এবং ধর্মের মর্যাদা ভঙ্গ করবে না। রাজ্যের লোকেরা যখন রাগ-দ্বেষ বর্জন করে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রচুর দক্ষিণাসহ যজ্ঞ করেন, তখন সেই যজ্ঞ রাজারই করা বলে জানবে। দীন-দুঃখী-বৃদ্ধ ও অনাথদের অশ্রুমোচন করে তাদের প্রসন্ন করা, মিত্রবৃদ্ধি করা, শত্রু সংহার করা, সাধু-ব্যক্তিদের সৎকার, সত্য-পালন, ভূমিদান এবং ভৃত্য পোষণ করা রাজার ধর্ম। যাঁর মধ্যে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই প্রতিষ্ঠিত—যিনি দুষ্টকে দণ্ড দেন এবং সৎ ব্যক্তিদের প্রতি কৃপা রাখেন, সেই রাজা ইহলোক ও পরলোকে শান্তি পান। রাজা দুষ্ট ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করলে যম এবং ধার্মিকদের অনুগ্রহ লাভ করে পরমেশ্বরের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হন। রাজা যখন তাঁর ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখেন, তখন তিনি রাজ্য শাসনে সক্ষম থাকে আর যখন তা বশে থাকে না, তখন তিনি মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। ঋত্বিক, পুরোহিত এবং আচার্যকে সম্মান করবে এবং তাদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করবে—এই রাজার ধর্ম। যমরাজ যেমন সমস্ত প্রাণীকে সমানভাবে শাসন করেন, রাজাকেও তেমনই ভেদভাব না রেখে সমস্ত প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। প্রমাদ ত্যাগ করে ক্ষমা, বিবেক, ধৈর্য এবং সদ্বুদ্ধির শিক্ষা নেওয়া উচিত। প্রাণীদের সামর্থ্যের জ্ঞান রাজার থাকা উচিত। মিষ্টি বাক্য বলা এবং নগর ও দেশের লোকেদের রক্ষা করা উচিত।

তাত ! রাজ্য রক্ষা তিনিই করতে সক্ষম, যিনি বুদ্ধিমান ও বীর হওয়ার সঙ্গে দণ্ডদানের প্রণালীও জানেন। যে দণ্ড দিতে ইতস্তত করে সেই মূর্খ এবং কাপুরুষ ; সে রাজ্য রক্ষা করবে কীভাবে ? তোমার সুন্দর, কুলীন, রাজভক্ত এবং বহুজ্ঞ মন্ত্রীদের নিয়ে আশ্রমবাসী তপস্বী এবং অন্য ব্যক্তিদের বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়া উচিত। তাহলে তোমার সমস্ত প্রাণীর পরমধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হবে, ফলে স্বদেশে বা বিদেশে কোথাওই তোমার ধর্ম নষ্ট হবে না। এইভাবে বিচার করলে ধর্মই অর্থ ও কাম থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচ্য হবে। ধর্মাত্মা ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করে। মানুষকে সম্মান প্রদান করলে সে সম্মানদাতার হিতার্থে নিজ পুত্র ও স্ত্রীকে বিসর্জন দিতে পারে। প্রাণীদের নিজের পক্ষে রাখতে হয়, তাদের কিছু দিতে হয়, মিষ্ট বাক্য বলতে হয়, প্রমাদ ত্যাগ করে পবিত্র থাকতে হয়—এসবই রাজার ঐশ্বর্য বৃদ্ধির মহান সাধন। মান্ধাতা ! তুমি এইসব ব্যাপার কখনো উপেক্ষা করবে না। ইন্দ্র, বরুণ, যম এবং সমস্ত রাজর্ষি এরূপ ব্যবহারই করেছেন, তুমিও সেটি পালন করো। যে রাজা ধর্ম-আচরণ করে, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব সর্বদা তার সুযশ গান করতে থাকেন।

ভীষ্ম বললেন—উতথ্য মুনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করলে মান্ধাতা নির্ভীকভাবে তা পালন করে কারো সাহায্য ছাড়াই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ! তুমিও মান্ধাতার ন্যায় ধর্মপালন করে এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে থাক।

রাজার আচরণের ব্যাপারে বামদেবের উপদেশের উল্লেখ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে ধর্মনিষ্ঠ রাজা নিজ ধর্মে স্থিত থাকতে চায়, তার কীরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বামদেবের উপদেশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বসুমনা নামক এক বিচারকুশল, ধৈর্যশীল এবং পবিত্র আচরণসম্পন্ন রাজা একবার পরম তপস্বী মুনিবর বামদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মুনিবর ! আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন যাতে সেই অনুসারে আচরণের দ্বারা আমি যেন কখনো ধর্ম থেকে পতিত না হই।' তখন মহাতেজস্বী তপোনিষ্ঠ মুনি বামদেব বলতে থাকেন—'রাজন্ ! তুমি ধর্মেরই অনুষ্ঠান করো, ধর্মের থেকে বড় কোনো বস্তু নেই। যে রাজা ধর্মে স্থির থাকেন, তিনিই এই পৃথিবীকে নিজ বশে রাখেন। যার দৃষ্টিতে অর্থের থেকেও ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব থাকে আর যে ধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের চেষ্টা করে, ধর্মের জন্য তার শোভা বৃদ্ধি পায়। নচেৎ যে রাজা অধর্মোন্মুখ হয়ে ওঠেই মত্ত থাকে তাকে ধর্ম ও অর্থ দুই-ই পরিত্যাগ করে। যে দুষ্ট তার পাপী মন্ত্রীর সাহায্যে ধর্মের ক্ষতি করে, সে সপরিবারে প্রজাদের বধ্য হয় ; তার সর্বনাশ হতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি হিতবাক্যগ্রহণকারী, ঈর্ষাশূন্য, জিতেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমান, সেই রাজার বৃদ্ধি তেমনভাবে হয় যেমন নদীর প্রবাহে সমুদ্রের হয়। ধর্ম-অর্থ কাম বৃদ্ধি এবং মিত্রসম্পন্ন হলেও রাজার কখনো নিজেকে পরিপূর্ণ বলে মনে করা উচিত নয়। রাজার এই ধর্মযুক্ত গুণই প্রজাদের সৎপথে রাখার একমাত্র আধার। এর দ্বারা তিনি যশ, কীর্তি, বৈভব ও প্রজা লাভ করেন। কিন্তু যে রাজা কৃপণ, স্নেহশূন্য, প্রজাদের দণ্ড প্রদানকারী ও বুদ্ধিহীন এবং যে অপরাধীদের চিনতে পারে না, তার ইহলোকে অপকীর্তি হয় এবং মৃত্যুর পর তাকে নরকবাস করতে হয়। যিনি অপরকে মান প্রদান করেন, দানী, মধুরভাষী, ধর্মকেই সব থেকে বড় বলে মনে করেন, সেই রাজা বহু দিন সুখে রাজত্ব করেন।

যে রাজ্যে রাজা নিজের শক্তির অহংকারে দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করে, সেখানে প্রজারাও সেই পাপী রাজাকে অনুসরণ করে। তাতে লোকেদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই রাজা খুব শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

রাজা যদি কাউকে কখনো দণ্ড দেন, তাহলে পরে তার সঙ্গে প্রিয় ব্যবহারও করা উচিত। এইভাবে অপ্রিয় ব্যক্তিও যদি প্রিয় ব্যবহার পেতে থাকে তাহলে অল্প সময়েই সে প্রিয় হয়ে ওঠে। মিথ্যা কথা বলবে না ; কেউ কিছু বলার আগেই তার প্রিয় কাজ করবে ; কোনো কামনার বশে, ক্রোধান্বিত হয়ে বা দ্বেষবশত ধর্মত্যাগ করবে না, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে সংকোচ করবে না, চিন্তা না করে কোনো কথা বলবে না, কোনো কাজে তাড়াতাড়ি করবে না

এবং কারো প্রতি দৃষ্টি রাখবে না। এরূপ আচরণ করলে শত্রুও বশীভূত হয়। কোনো কিছু যদি প্রিয় হয়, তবে অত্যধিক প্রসন্ন হবে না এবং অপ্রিয় হলে ভয় পাবে না। রাজকোষে অর্থাভাব হলেও চিন্তাক্লিষ্ট হবে না, সেই সময়ও প্রজাদের হিত চিন্তা করবে। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্য উপস্থিত হয়, তাতে জিতেন্দ্রিয়, অনুগত, পবিত্র, সক্ষম এবং প্রীতিমান ব্যক্তিদের নিযুক্ত করবে। তেমনই যার মধ্যে এইসব গুণ আছে এবং যে রাজাকে প্রসন্ন রাখতে সক্ষম, প্রভুর কাজ করার সময় সর্বদা সতর্ক থাকে, তাকে অর্থ ব্যবস্থার ভার সমর্পণ করা উচিত। যে রাজা মূর্খ, ইন্দ্রিয়লোলুপ, লম্পট, লোভী, দুরাচারী, দুষ্ট, কপট, হিংসুটে, অনুদার, মদ্যপ, জুয়াড়ি এবং আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ব্যক্তিকে মহত্ত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করে, তার রাজ্যলক্ষ্মী নষ্ট হয়ে যায়। যে রাজা নিজেকে এবং শরণাগতদের রক্ষার ঠিকমতো ব্যবস্থা করে, তার প্রজাবৃদ্ধি হয় এবং সেই রাজার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

রাজন্! জগতে সবই পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল, কিছুই নিরাপদ নয়; তাই রাজার ধর্মে স্থির থেকে ধর্মানুসারে প্রজাপালন করা কর্তব্য। দুর্গ রক্ষার সাধন, যুদ্ধের সামগ্রী, ন্যায়ের ব্যবস্থা, মন্ত্রীদের সৎপরামর্শ এবং প্রজাদের যথাসাধ্য সুখী করা—এই পাঁচ বিষয়ে রাজ্যের উন্নতি হয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে এই সব ব্যাপারে মন দেওয়া সম্ভব নয়; তাই এগুলি যোগ্য ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করলে রাজা বহুকাল রাজ্য ভোগ করতে পারেন। যে ব্যক্তি দানশীল, মৃদুস্বভাব, পবিত্র চরিত্র এবং দুঃখেও নিজের লোকেদের পরিত্যাগ করেন না, লোকে তাঁকেই রাজা নিযুক্ত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনোমতো না হওয়ায় নিজ হিতৈষীর কথা শোনে না, সর্বদা বেপরোয়াভাবে থাকে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের আচরণ অনুসরণ করে না, সে ক্ষাত্রধর্ম থেকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি প্রধান প্রধান মন্ত্রীদের অবজ্ঞা করে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের কথা শোনে, দ্বেষবশত নিজের সদ্‌গুণসম্পন্ন আত্মীয়দেরও সম্মান করে না, যে চঞ্চলচিত্ত ও ক্রোধী, সে সর্বদা মৃত্যুর মুখে অবস্থান করে। অসময়ে কখনো কর বসাবে না। অপ্রিয় হলেও কখনো দুঃখিত হবে না, প্রিয় হলেও হর্ষোৎফুল্ল হবে না, সর্বদা শুভ কর্মে ব্যাপৃত থাকবে; এই কথাটি মনে রাখবে যে কোন রাজা আমাকে ভালোবাসেন, কে শুধু ভয়ের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং কে এর মধ্যবর্তী অবস্থায় আছে। বলবান হলেও দুর্বল শত্রুকে কখনো উপেক্ষা করবে না। যারা পাপবুদ্ধিসম্পন্ন তারা তাদের সর্বগুণসম্পন্ন, প্রিয়ভাষী প্রভুর সঙ্গেও বিদ্রোহ করতে ছাড়ে না, তাই এরূপ ব্যক্তিদের কখনো বিশ্বাস করবে না।

রাজ্যের মূল যদি মজবুত না হয় তাহলে রাজার অন্য অনধিকৃত দেশের ওপর আক্রমণ করা উচিত নয়; কারণ যার মূলে দুর্বলতা থাকে, সেই রাজার এর থেকে কোনো লাভ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে রাজার দেশ ধন-ধান্যে পূর্ণ, প্রজারা রাজভক্ত ও সন্তুষ্ট, যার সুযোগ্য মন্ত্রী এবং সৈনিকেরা সন্তুষ্ট, সুশিক্ষিত এবং শত্রুসংহারে সমর্থ, সেই রাজা অল্প সেনা নিয়েও বিজয়লাভে সক্ষম হন। যে রাজার পুরবাসী এবং দেশবাসী জীবেদের প্রতি দয়াশীল এবং ধনসম্পন্ন, তার ভিত শক্ত বলা হয়। যার বৈভব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে সব প্রাণীর ওপর দয়াদৃষ্টি রাখে, তৎপরতাপূর্বক কার্য সমাধা করে, নিজ শরীরের প্রতি যত্ন নেয়, সেই রাজার রাজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনো এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে সাধারণ লোকে ভুল বোঝে। বরং তার এমন কাজ করা উচিত যাতে সকলের হিত হয়। যে রাজা এরূপ ব্যবহার করে, সে ইহলোক এবং পরলোকে সুখে বাস করে।

ভীষ্ম বললেন—বামদেবের কথা শুনে রাজা বসুমনা সব কাজই সেইভাবেই করলেন। তুমিও যদি সেইরূপ আচরণ করো, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমার উভয় লোকে সুখ লাভ হবে।

যুদ্ধনীতির বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কোনো ক্ষত্রিয় রাজা যদি অন্য ক্ষত্রিয় রাজাকে আক্রমণ করে, তাহলে তার সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যদি সেই রাজা বর্ম না পরে থাকে তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়। যদি বর্ম পরে আসে, তাহলে নিজেও প্রস্তুত হয়ে একজনের সঙ্গে একজনেরই যুদ্ধ করা উচিত। যদি সেই রাজা সৈন্যসহ আসে তাহলে নিজেও সৈন্যসমেত গিয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করবে। যদি সে কপটযুদ্ধ করে, তাহলে তুমিও কপটযুদ্ধ করবে এবং ধর্মযুদ্ধ করলে ধর্মানুসারেই তার সম্মুখীন হবে। শত্রু যদি সংকটগ্রস্ত হয় তখন তার ওপর আঘাত করবে না, ভীত ও পরাস্ত শত্রুকেও আক্রমণ করবে না। যে বলহীন, যার পুত্র মারা গেছে, যার অস্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে, যার বাহন নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে কখনো আঘাত করবে না। সেই ব্যক্তি যদি তোমার শিবিরে এসে পড়ে, তাহলে তার চিকিৎসা করবে অথবা তাকে তার গৃহে পৌঁছে দেবে, এই হল সনাতন ধর্ম। সুতরাং ধর্মানুসারে যুদ্ধ করা কর্তব্য। স্বায়ম্ভুব মনুও এই কথা বলেছেন। সৎব্যক্তিদের মধ্যে সর্বদাই সজ্জনের ধর্ম বিরাজমান, তাতে স্থিত থাকবে, কখনো চ্যুত হবে না। যে ক্ষত্রিয় ধর্মযুদ্ধ অধর্মের দ্বারা জয় করে, সে পাপী এবং নিজেকেই নিজে বিনাশ করে। এইভাবে অধর্মের দ্বারা বিজয়লাভ করা অসৎ ব্যক্তিদের কাজ, সৎ ব্যক্তিদের, অধর্মকেও ধর্মদ্বারাই জয় করা উচিত। পাপের দ্বারা বিজয়লাভ করার চেয়ে ধর্মপূর্বক মৃত্যুও শ্রেয়। তবে এই কথা ঠিক যে অধর্মের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। আর তা মূল ও শাখা উভয়ই জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। পাপী ব্যক্তি পাপপূর্ণ উপায়ে ধনলাভ করে প্রসন্ন হয় এবং 'ধর্ম বলে কিছু নেই' মনে করে পবিত্র ব্যক্তিদের হাসি ঠাট্টা করে। এইভাবে তাদের পাপবুদ্ধি পেতে থাকায় শেষে তারা পাপেই নিমজ্জিত থাকে। তাদের ধর্মে শ্রদ্ধা থাকে না, তাই অবশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নদীতীরে থাকা বৃক্ষ যেমন মূলসহিত নদীতে উপড়ে পড়ে, এই পাপীরাও তেমনই সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং রাজার ধর্মপূর্বকই ধন এবং বিজয়লাভ করা উচিত।

রাজন্‌ ! রাজার কখনো অধর্মের দ্বারা বিজয়লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। অধর্ম দ্বারা জয়লাভ করে কোন্‌ রাজা সুখলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন ? অধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত জয় অস্থায়ী এবং তা স্বর্গ থেকে পতন ঘটায়, সেটি রাজা ও রাজ্য—উভয়কেই নাশ করে। যে যোদ্ধার বর্ম খণ্ডিত হয়েছে, যে 'আমি আপনারই' বলে হাত জোড় করেছে, যে অস্ত্র ত্যাগ করেছে, তাকে বন্দি করে রাখো, বধ কোরো না। এক বছর বন্দিদশায় থাকলে তার নতুন জন্ম হয় এবং সে বিজয়ী রাজার পুত্রের ন্যায় হয়ে ওঠে ; তাই এক বছর পর তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি নিজ পরাক্রমে কোনো নারীকে হরণ করে আনা হয়, তাহলে এক বছর পর্যন্ত তাকে কোনো প্রশ্ন করবে না। তারপরও তাকে জিজ্ঞাসা করলে যদি সে অন্য কাউকে বরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। তেমনই অর্থ ও দাস-দাসী যা কিছু নিজ পরাক্রমে জিতে আনবে, সেগুলিও এক বছর নিজের কাছে রেখে তারপর তার প্রভুকে প্রত্যর্পণ করবে। যদি চোর বা অন্য অপরাধীদের ধন ছিনিয়ে আনা হয় তাহলে সেগুলিও নিজের কাছে রাখবে না, সকলের কাজে ব্যয় করবে। যদি গাভী ছিনিয়ে আনা হয়ে থাকে তবে তা ব্রাহ্মণকে দান করে দেবে।

দুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যদি সন্ধি করবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্রাহ্মণ এসে পড়েন, তাহলে তখনই যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত। দুপক্ষের কোনো এক পক্ষ যদি ব্রাহ্মণকে অপমান করে, তাহলে সে সনাতন কালের মর্যাদা ভঙ্গ করে ; এরূপ ক্ষত্রিয়কে জাতিচ্যুত করে দেওয়া উচিত, তাকে ক্ষত্রিয় সভায় স্থান দেওয়া উচিত নয়, কারণ সে অধম। যে রাজা জয়লাভ করতে চান, তাঁর এই আচরণ অনুসরণ করা উচিত নয়। ধর্মযুদ্ধে যে বিজয় প্রাপ্তি হয়, তার থেকে বড় অন্য কোনো লাভ নেই। আক্রমণকারী রাজার বিজয় প্রাপ্তির পর সেই দেশের ক্রুদ্ধ প্রজাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে, পারিতোষিক দিয়ে প্রসন্ন করা উচিত। রাজাদের এই হল প্রধান নীতি। এরূপ না করে তাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করলে তারা সেই দেশ ছেড়ে চলে যায় এবং শত্রুর সঙ্গে মিলে বিজয়ী রাজার বিপদের প্রহর গুণতে থাকে এবং বিপদের সময় এলে শত্রুর সাহায্যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই রাজাকে দমন করে।

যে রাজার দেশ বিস্তৃত, ধনধান্যসম্পন্ন এবং প্রজারা রাজভক্ত এবং যার সেবক ও মন্ত্রীরা সন্তুষ্ট থাকে,

সেই রাজার মূল মজবুত বলা হয়। যে রাজা ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞদের সমাদর করেন, তিনিই লোকগতি জানেন। প্রাচীন কালের ধর্মজ্ঞ রাজাদের এই হল ধর্ম। যে রাজার নিজ বৈভব বৃদ্ধি করার ইচ্ছা থাকে, তাঁর সর্বপ্রকার যুদ্ধ কৌশলদ্বারা বিজয় লাভ করার ইচ্ছা থাকা উচিত, কপটতা বা দম্ভের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

যুদ্ধে হওয়া হিংসার প্রায়শ্চিত্ত এবং বীর ও কাপুরুষদের প্রাপ্ত হওয়া লোকাদির বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! ক্ষাত্রধর্মের থেকে বেশি পাপপূর্ণ আর কোনো ধর্ম নেই; কারণ রাজা যুদ্ধের সময় বহু মানুষকে হত্যা করেন। সুতরাং কৃপা করে বলুন এমন কোন্ কর্ম আছে যাতে এই পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! পাপীদের দণ্ডপ্রদান এবং সৎব্যক্তিদের আশ্রয়দান করলে, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান করলে রাজারা সর্বপ্রকার দোষমুক্ত হয়ে শুদ্ধ হয়ে যান। একথা ঠিক যে বিজয়লাভের আশায় রাজারা প্রথমে অনেককে কষ্ট দেন, কিন্তু বিজয়লাভের পর তো তাঁরাই প্রজাদের উন্নতি বিধান করেন। তাঁরা দান, যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভাবে নিজেদের সমস্ত পাপ দূর করেন, পরে তা পুণ্যবৃদ্ধির কারণ হয়। যেমন কৃষক জমি পরিষ্কার করার সময় ঘাস ও আগাছা কেটে ফেলে, কিন্তু তাতে তার জমি নষ্ট হয় না, তেমনই রাজা অস্ত্রাঘাতে সেনাদের সন্তপ্ত করলেও, তাঁর কর্মের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় যখন সেই রাজা যুদ্ধে জীবিত ব্যক্তিদের উন্নতি সাধন করেন। যে রাজা প্রজাদের ধনক্ষয়, প্রাণনাশ এবং দুঃখ থেকে রক্ষা করেন এবং তস্করদের হাত থেকে তাদের বাঁচান, তাঁকে ধনদায়ক ও সুখপ্রদ বলে মানা হয়। যে রাজা নির্ভয়ে শত্রুদের আক্রমণ করেন, দেবতারা পৃথিবীতে তাঁর থেকে বড় আর কাউকে মনে করেন না। রাজা অস্ত্রযুদ্ধে শত্রুর শরীরে যতগুলি ক্ষতের সৃষ্টি করেন, তাঁর সর্বপ্রকার কামনাপূরণকারী ততগুলি অবিনাশী লোক লাভ হয়। রাজার শরীর থেকে যুদ্ধ-স্থলে যে রক্তপাত হয়, তাতেই রাজা সর্বপাপমুক্ত হয়ে যান। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন যে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধকালে যে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করে, তাতেই তাদের তপ বৃদ্ধি পায়। বীরপুরুষরা শত্রুর সম্মুখীন হয়, এটি তাদের স্বর্গের পথে এগিয়ে যায় আর কাপুরুষ ব্যক্তি নিজের সঙ্গীদের সংকটে ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায়। যেসব ক্ষত্রিয় এরূপ বিপরীত ব্যবহার করে তাদের মৃত্যুদণ্ডই শ্রেয়। রাজন্! ক্ষত্রিয়ের গৃহশয্যাতে মৃত্যু কাম্য নয়। যাদের মধ্যে বীরত্বের অহংকার থাকে, তাদের এই দুর্বলতা অধর্মস্বরূপ এবং নিন্দার যোগ্য। যে ক্ষত্রিয় রোগশয্যায় পড়ে বিলাপ করে এবং আত্মীয় ও আশ্রিতদের শোকগ্রস্ত করে, সে ব্যক্তি নিন্দার যোগ্য। সত্যকার ক্ষত্রিয় নিজ ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে শত্রুবধ করতে করতে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় মনে করে। সে কখনো যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না এবং নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পূর্ণ শক্তিতে শত্রুর সম্মুখীন হয়। তাতেই তার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। এরূপ শূরবীর যদি শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে অক্ষয়লোকই লাভ করে।

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! যে শূরবীর যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না এবং রণাঙ্গনেই প্রাণত্যাগ করে, তার কোন লোক প্রাপ্তি হয়—কৃপা করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! এই বিষয়ে এক পুরানো কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে—এতে রাজা প্রতর্দন এবং মিথিলাধিপতি জনকের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। সেই সময় তত্ত্বজ্ঞ মিথিলাধিপতি তাঁর যোদ্ধাদের স্বর্গ ও নরক দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন—'বীরগণ! দেখো! যারা যুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রাম করে তারা এই তেজোময় লোক লাভ করে, এটি সর্বপ্রকার কামনাপূরণকারী। আর যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে ইহলোকে তাদের অপযশ হয় এবং শেষকালে ওই যে ভয়ানক নরক দেখা যাচ্ছে, সেখানেই তাদের গমন করতে হয়। এটি দেখে এবার তোমরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে শত্রুদের পরাস্ত করো, যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চিরকালের মতো নরকে পতিত হয়ো না। স্বর্গের সুন্দর দ্বার তাদের জন্যই উন্মুক্ত, যারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করে।'

রাজা জনকের কথা শুনে মৈথিল বীররা শত্রুদের পরাস্ত করে নিজ প্রভুকে প্রসন্ন করে। সুতরাং বীর ব্যক্তির সর্বদা যুদ্ধে সম্মুখে থাকা উচিত। গজারোহীদের মধ্যে রথীদের নিযুক্ত করবে, রথীদের পরে অশ্বারোহীদের রাখবে, তাদের মধ্যস্থলে অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত পদাতিক সৈন্যদের রাখবে। যে রাজা তার সেনাদের দ্বারা এইরূপ ব্যূহ নির্মাণ করে, সে সর্বদাই বিজয়লাভ করে। অতএব তুমিও সর্বদা তোমার সেনাদের এইভাবে সংগঠিত করবে। যে যোদ্ধা রণভূমি থেকে পলায়ন করে, বীরপুরুষরা তাকে বধ করতে চায় না। তাই পলায়নরত যোদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করবে না। স্থাবর পদার্থ চলমান প্রাণীর অন্ন, দন্তহীন প্রাণী সদন্ত প্রাণীর খাদ্য, জল হচ্ছে তৃষ্ণার্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ এবং কাপুরুষ ব্যক্তি হল শূরবীরদের খাদ্য। তাই ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তি করজোড়ে প্রণাম করে বারংবার বীরদের শরণ গ্রহণ করে। সমস্ত জগৎ শূরবীরদের বাহুর ওপর নির্ভরশীল। তাই বীরপুরুষদের সর্বদা সম্মান করা উচিত। ত্রিলোকে শৌর্যের ন্যায় বড় কোনো বস্তু নেই। শূরবীরই সকলকে পালন করে, সমস্ত জগৎ তারই আশ্রিত।

———০———

সৈন্য সঞ্চালনের বিধি, যোদ্ধাদের লক্ষণ এবং বিজয়ের চিহ্নগুলির বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! ধর্মের যৎকিঞ্চিৎ উল্লঙ্ঘন করে বিজয়াভিলাষী রাজা কীভাবে কাপুরুষদের উৎসাহিত করে তাদের রণক্ষেত্রে স্থিত রাখবেন, তা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! কারো কারো মত হল ধর্ম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেউ বলে এর আধার যুক্তিবাদ, কারো মতে সৎপুরুষের আচরণই হল এর আধার, আবার অন্যেরা একে সাধনাধীন বলে মানেন। জগতে কার্যসাধনের জন্য সরল ও কুটিল—দুই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা কাজ করা হয়। রাজার এই দুই জ্ঞানই থাকা উচিত। যতদূর সম্ভব জেনে-শুনে কুটিল বুদ্ধি প্রয়োগ করবে না, কিন্তু শত্রু যদি আক্রমণ করে তাহলে কুটিল বুদ্ধির সাহায্যে তাদের দমন করে আত্মরক্ষা করবে। যদি শত্রুকে আক্রমণ করতে হয়, তাহলে লৌহ দুর্গ, কবচ, চামর, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, লাল ও হলুদ বর্ম, নানা রংয়ের ধ্বজা-পতাকা, তলোয়ার, ঢাল ইত্যাদি বহু সংখ্যায় মজুত রাখবে। যদি অস্ত্র প্রস্তুত থাকে এবং শত্রুও আক্রমণ করতে উন্মুখ হয়, তবে চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসে আক্রমণ করাই প্রশস্ত ; কারণ তখন কৃষিকার্য শেষ হয়ে যায়, পৃথিবীতে জলের প্রাচুর্য থাকে এবং ঋতুও নাতিশীতোষ্ণ থাকে। তাই এই সময় আক্রমণ করবে অথবা যে সময় শত্রু বিপদগ্রস্ত হয়েছে জানবে, সেই সময় তার ওপর আক্রমণ হানবে। শত্রুদমনের পক্ষে এটিকে উত্তম সময় বলে মানা হয়। সেনাদের যুদ্ধে যাবার রাস্তাটি যেন প্রশস্ত থাকে এবং আশপাশেই যেন প্রয়োজনমতো জল ও ঘাস থাকে। বনে বিচরণকারী দূতরা এর ভালো খবর রাখে। তাই বিজয়াভিলাষী বীর সেনাদের পথপ্রদর্শনে তাদেরই নিযুক্ত করা উচিত। সেনাদের সামনে কুলীন ও শক্তিশালী যোদ্ধদল রাখবে।

শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুর্গ এমন হওয়া উচিত যার চারদিকে জলপূর্ণ খাদ ও উচ্চ প্রাচীর থাকবে। তাতে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। যুদ্ধকুশল ব্যক্তিরা শিবির স্থাপনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রেখে ময়দানের থেকে জঙ্গলকেই ভালো বলে মনে করে। সেখানে একটু মধ্যস্থলে সেনা ছাউনি স্থাপন করা সম্ভব। তাছাড়াও সেই স্থানে পদাতিকদের লুকিয়ে থাকার, শত্রুকে আক্রমণ করার এবং বিপদের সময় লুকিয়ে পড়ারও সুবিধা থাকে।

যোদ্ধাদের উচিত সপ্তর্ষি নক্ষত্রাদিকে পেছনে রেখে পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধ করা। সেনাদের এমন ভাবে দাঁড় করাবে যাতে সূর্য, বায়ু এবং শুক্র পশ্চাৎভাগে থাকে। অশ্বারোহী সেনার জন্য যুদ্ধ বিশারদেরা বলেছেন, যে ময়দানে নোংরা, জল, বাঁধ ও পাথরের টুকরো না থাকে, সেই ময়দানই অশ্বারোহী যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত। যেখানে নোংরা এবং গর্ত নেই, সেই ভূমি রথসেনাদের পক্ষে উপযুক্ত। যেখানে উঁচু-নীচু গাছ ও জল থাকে সেই স্থান গজারোহীদের জন্য অনুকূল এবং যে ভূমি দুর্গম, উঁচু-নীচ, বাঁশ ও বেতে ভরা, পাহাড়-জঙ্গল পরিপূর্ণ, সেই স্থান পদাতিকদের জন্য ভালো বলে মনে করা হয়। যে সৈন্যদলে রথ ও ঘোড়ার আধিক্য থাকে তাদের জন্য শুষ্ক দিনই শ্রেষ্ঠ। যে রাজার গজারোহী ও পদাতিকের বাহুল্য তাদের পক্ষে

বর্ষাকাল উপযুক্ত। এই সব কথা মনে রেখে দেশ ও কাল অনুসারে ব্যবহার করবে। যে রাজা এইসব বিষয় বিবেচনা করে শুভ তিথি ও নক্ষত্র দেখে আক্রমণ করে, সে তার সেনা ঠিক মতো সঞ্চালন করে বিজয়লাভ করে।

যারা শায়িত আছে, পিপাসার্ত, ক্লান্ত অথবা পলায়নরত তাদের আঘাত করবে না। অস্ত্র ও বর্ম খুলে ফেলার পরে, যুদ্ধস্থলে যাওয়ার সময়, জলপান করার সময় এবং আহারের সময়ও কাউকে বধ করবে না। তেমনই যে অত্যন্ত ভয় পেয়েছে, পাগল হয়ে গেছে, আহত হয়েছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে, অসতর্ক হয়ে আছে, অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত, শিবিরের দিকে পালাচ্ছে, তাদেরও আঘাত করবে না।

যারা শত্রু সৈন্য ছিন্নভিন্ন করতে সক্ষম এবং নিজেদের সংগঠিত করার শক্তি রাখে, তাদের রাজার সঙ্গে রাখা উচিত এবং তাদের দ্বিগুণ বেতন এবং উত্তম আহার দেওয়া প্রয়োজন। সেনাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করে তাকে দশ জন সৈনিকের নায়ক করবে, কিছু লোককে একশত জনের নায়ক এবং কিছু লোককে এক হাজার জনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করবে। প্রধান প্রধান বীরদের একত্রিত করে তাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাবে যে আমরা যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বহুদূর পর্যন্ত যাব, কাউকে একটুও জায়গা ছাড়ব না। তাদের আরও বুঝিয়ে দিতে হয় যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে কী দোষ হয়। তাতে নিজ প্রয়োজনের ক্ষতি, পালাবার সময় শত্রুর হাতে নিহত হওয়া এবং অপযশ তো হয়ই, এছাড়া লোকের কাছে নানাপ্রকার অপ্রিয় ও বেদনাদায়ক কথাও শুনতে হয়। যারা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তারা নামেই মানুষ, তারা শুধু যোদ্ধা সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র, ইহলোক বা পরলোক কোথাও তারা সুখ পায় না। সুতরাং তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাবে যে আমরা স্বর্গ কামনায় যুদ্ধে প্রাণাহুতি দেব। হয় বিজয়লাভ করব নাহলে যুদ্ধে নিহত হয়ে সদ্গতি লাভ করব। যারা এইরূপ শপথ গ্রহণ করে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, তারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

সৈন্যব্যূহ রচনার সময় সর্বাগ্রে ঢাল-তলোয়ারধারী সৈন্যদল রাখবে, পেছনে রথীদের দাঁড় করাবে, এদের মধ্যস্থলে পরিবারের লোক রাখবে। শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য যেসব পুরাতন সৈনিক আছে, তারা আগে থাকবে এবং পশ্চাতে থেকে অগ্রসর হওয়া পদাতিক সৈন্যদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। ভীতব্যক্তিদেরও উৎসাহিত করতে হবে। যদি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বহু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে রাজার সূচীমুখ নামক ব্যূহ নির্মাণ করে দুহাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে—'দেখো, দেখো ! শত্রুসৈন্য পালাচ্ছে। আমাদের মিত্রসেনা এসে পড়েছে, না থেমে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' এইভাবে উত্তেজিত করে সাহসের সঙ্গে শত্রুর ওপর আঘাত হানবে। যারা সৈন্যের আগের দিকে থাকবে তাদের তর্জন-গর্জন, মুখে নানাপ্রকার শব্দ এবং নানাবিধ বাদ্য বাজানো উচিত।

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যুদ্ধ করার জন্য কীরূপ স্বভাব, আচরণ ও রূপবিশিষ্ট যোদ্ধা উপযুক্ত এবং তাদের অস্ত্র ও বর্ম কেমন হওয়া উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! অস্ত্র ও বাহন যোদ্ধাদের দেশ ও কুল অনুসারে হওয়া উচিত এবং নিজ নিজ কুলাচার অনুসারেই তারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। গান্ধার ও সিন্ধুসৌবীর দেশের যোদ্ধারা দাঁতাল প্রাসের সাহায্যে যুদ্ধ করে, তারা অত্যন্ত নির্ভীক এবং বলশালী। উশীনর দেশের বীররা সর্বপ্রকার শস্ত্রে কুশল এবং অত্যন্ত বলশালী। পূর্বদেশের যোদ্ধারা গজযুদ্ধে পারদর্শী তারা কপটযুদ্ধ করতেও জানে। যবন, কম্বোজ, মথুরার যোদ্ধারা মল্লযুদ্ধে পারঙ্গম, দক্ষিণী বীররা তলোয়ার যুদ্ধে পটু। যে যোদ্ধাদের আওয়াজ এবং চোখ সিংহ বা শার্দুলের ন্যায়, তারা খুব বড় যোদ্ধা হয়ে থাকে। যাদের আওয়াজ মেঘের ন্যায়, মুখ ক্রোধযুক্ত, শরীর উটের মতো, নাক ও জিভ বাঁকা তারা বহুদূর পর্যন্ত দৌড়তে পারে এবং দূর থেকে নিশানা বিদ্ধ করতে পারে। যাদের শরীর বাঁকা এবং চুল পাতলা, তারা অত্যন্ত শীঘ্রগামী, চঞ্চল এবং অতিকষ্টে তাদের বশে আনতে হয়। যাদের শরীর সুগঠিত, প্রশস্ত বক্ষ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুডৌল, তারা যুদ্ধের আওয়াজ শুনলেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, যুদ্ধ করাতেই তাদের আনন্দ। যাদের চক্ষু বাঁকা, উচ্চ ললাট, নিম্নোষ্ঠ পাতলা, যাদের বাহুতে বজ্রচিহ্ন এবং আঙুলে চক্র চিহ্ন থাকে, যাদের শিরা দেখা যায়, তারা যুদ্ধ আরম্ভ হলেই সবেগে শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মত্ত হাতির ন্যায় দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। যাদের কেশের অগ্রভাগ হলুদ এবং দ্বিধাবিভক্ত, অস্থি ও মুখ শক্ত, মজবুত, কাঁধ উঁচু, ঘাড় মোটা, মাথা গোল এবং কণ্ঠস্বর কঠোর হয়, তারা অত্যন্ত ক্রোধী হয়ে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যাদের ধর্মজ্ঞান থাকে না, অহংকারী, উগ্র, দেখতে ভয়ংকর এরূপ মানুষ প্রায়শই নীচজাতির হয়ে

থাকে, এরাও বাঁচা-মরার আশা ত্যাগ করে যুদ্ধ করে, কখনো পালিয়ে যায় না। তাদের সর্বদা আগে রাখা উচিত। তারা সাহসের সঙ্গে আঘাত সহ্য করে এবং প্রতি আক্রমণও করে। এইসব অধার্মিক ব্যক্তিদের মর্যাদা-পালনের কোনো খেয়াল থাকে না, তারা কখনো কখনো অকারণে রাজার ওপর রুষ্ট হয়, তাই এদের মিষ্টবাক্যে বুঝিয়ে বশে রাখতে হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সেনা বিজয়ের শুভ লক্ষণ কী ? আমি তা জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে শুভ লক্ষণ দেখে সেনাদের বিজয়ী হওয়া অনুমান করা যায়, তা বলছি, শোনো। দৈব প্রকোপেই মানুষের ওপর কালের প্রেরণা হয় ; বিদ্বান ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষুতে তা জেনে তার প্রতিকার করে। জপ- হোম ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা দৈবী উপদ্রব শান্ত হয়। যার সেনার বাহন ও সৈনিক প্রসন্ন এবং উৎসাহযুক্ত বলে মনে হয়, তার অবশ্যই বিজয়লাভ হয়। সেনাদের যুদ্ধযাত্রার সময় যদি অল্প অল্প হাওয়া বয়, সামনে রামধনুর উদয় হয়, রৌদ্র ওঠে, মাঝে মাঝে মেঘের ছায়া হয়, শিয়াল, কাক অনুকূল দিকে আসে তাহলে যুদ্ধ বিজয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা অথবা ডান দিকে যেতে থাকা অগ্নিশিখা দেখা এবং হোমের পবিত্র গন্ধ পাওয়া—এগুলি বিজয় প্রাপ্তির ভাবী শুভ চিহ্ন। শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি, রণভেরীর উচ্চ নিনাদ এবং যোদ্ধাদের অনুকূল থাকাও জয়লাভের শুভচিহ্ন। সেনাদের রণক্ষেত্রে যাওয়ার সময় মৃগযূথ পেছনে বা বামদিকে দেখা এবং যুদ্ধের সময় ডান দিকে থাকা শুভলক্ষণ। কিন্তু সামনের দিকে দেখা ভালো লক্ষণ নয়। হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও নীলকণ্ঠ পাখি যদি মঙ্গলসূচক আওয়াজ করে এবং সৈনিকদের উৎসাহী এবং প্রসন্ন দেখায়, তাহলে ভাবী জয়লাভ অনুমান করা হয়। যার সেনা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র, কবচ ও ধ্বজা সুশোভিত, যুদ্ধরত সৈনিকদের চেহারায় প্রসন্নভাব ফুটে উঠেছে, শত্রুরা সেই ফৌজের দিকে তাকাতে সাহস করে না, তারা অবশ্যই শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে। যার সেনা প্রভুর সেবায় উৎসাহিত থাকে, অহংকারবর্জিত, পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সদাচার পালনকারী—এগুলি সেই সৈনাদলের বিজয়ের শুভলক্ষণ। যোদ্ধাদের মন যখন তাদের পছন্দমতো শব্দ-স্পর্শ ও সুগন্ধে ভরে যায় এবং তাদের মধ্যে মনোবল সঞ্চারিত হয়, তখন সেটি বিজয়ের লক্ষণ বলে জানতে হবে। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের সময় কাক ডানদিকে প্রবেশ করে এবং শব্দ করে বাঁদিকে উড়ে যায় তাহলে সেটি শুভলক্ষণ। কাক পেছনের দিকে থাকলেও কার্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু সামনে এলে বিজয়ে বাধাসৃষ্টি হয়। যুধিষ্ঠির ! চতুরঙ্গিণী সেনা একত্রিত করার পরেও তোমাকে প্রথমে সামনীতির সাহায্যে শত্রুর সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা করা উচিত। যুদ্ধে প্রাণহানির পর যে জয়লাভ হয়, তাকে উত্তম মনে করা হয় না। সেটিও হঠাৎবা দৈবেচ্ছায় পাওয়া যায়—আগে থেকে তার কিছু ঠিক থাকে না।

তাছাড়াও সেনাদল যখন ছত্রভঙ্গ হয় তখন তাকে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়। তাতে যত বড় বীরই থাকুন না কেন, কিছু সেনা পালাচ্ছে দেখে সকলেই পালাতে থাকে ; প্রকৃত কোনো কারণ থাক বা না থাক। কিন্তু সুবংশে জন্ম নেওয়া, সুসংগঠিত এবং রাজাদ্বারা সম্মানিত পাঁচ-ছয়জন বীর যদি যুদ্ধে অবিচল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যান তাহলে তাঁরা অবশ্যই জয়লাভ করেন। যতক্ষণ সন্ধি হওয়ার সম্ভবনা থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করা উচিত নয়। প্রথমে সামনীতির আশ্রয় নিয়ে শত্রুকে বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত, তা ফলপ্রসূ না হলে ভেদনীতি অনুসারে তাদের মধ্যে বিভেদ করার চেষ্টা করবে, তাতেও সাফল্য না পেলে দান নীতি প্রয়োগ করবে—অর্থ দিয়ে শত্রুর সাহায্যকারীকে বশে আনার চেষ্টা করবে, যদি কিছুতেই কাজ না হয়, কেবল তখনই যুদ্ধ শুরু করা উচিত।

কুন্তীনন্দন ! সৎপুরুষরাই ক্ষমা করতে পারে, দুষ্টেরা নয়। ক্ষমা করা এবং না করার প্রয়োজন বলছি, এটি বোঝার চেষ্টা করো। যে রাজা শত্রুদের পরাস্ত করার পর তার অপরাধ ক্ষমা করে, তার যশবৃদ্ধি হয়। শত্রুও তাকে বিশ্বাস করতে থাকে। রাজার উচিত শত্রুকে পুত্রস্নেহে বিনা ক্রোধে বশ করা, বিনাশ না করা। যুধিষ্ঠির ! রাজা যদি উগ্র স্বভাবের হয় তাহলে সব প্রাণী তাকে অপছন্দ করতে থাকে আর কোমল হলে সকলে অবহেলা করে, তাই রাজাকে প্রয়োজন অনুসারে উগ্র ও কোমল হতে হয়। শত্রুকে প্রহার করার সময় এবং প্রহার করার আগে তাকে মিষ্ট বাক্য বলবে। প্রহারের পরেও দুঃখ করে তাকে দয়া প্রদর্শন করবে এবং শত্রুর উদ্দেশ্যে বলবে—'আহা ! আমার সৈন্যেরা যে এত মানুষ বধ করেছে, তা আমার ভালো লাগেনি। আমি বারণ করলেও তারা কর্ণপাত করেনি।

আহা, এরা তো বধযোগ্য ছিল না। তারা যুদ্ধে কখনো পিছু হটেনি ; এরূপ বীরপুরুষ জগতে দুর্লভ। আমার যে সৈন্যেরা এদের বধ করেছে, তারা আমার অত্যন্ত অপ্রিয় কাজ করেছে।'

শত্রুপক্ষের সৈনাদের সামনে এইভাবে দুঃখপ্রকাশ করে একান্তে নিজ সৈনিকদের প্রশংসা করবে। যারা বীর যোদ্ধাদের বধ করেছে তাদের সম্মান জানাবে। এইভাবে শত্রুপক্ষের দ্বারা নিহত ও আহত তোমার বীরদের জন্যও দুঃখপ্রকাশ করবে, তাদের ধৈর্য প্রদান করবে। তাতে সকলেরই সহানুভূতি লাভ হবে। এইভাবে যে সর্বাবস্থায় সাম নীতির দ্বারা কাজ করে, সেই ধর্মজ্ঞ রাজা সকলের প্রিয় হয়, তার কারো হতে ভয় থাকে না, সবপ্রাণী তাকে শ্রদ্ধা করে এবং সে ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র উপভোগ করতে পারে। সুতরাং যে রাজ্যভোগ করতে চায়, সেই রাজার সকলের বিশ্বাসভাজন হয়ে পৃথিবীকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করা উচিত।

——০——

কালকবৃক্ষীয় মুনির উপদেশ—রাজ্য, রাজকোষ ও সেনাদি হারানো অসহায় রাজার কর্তব্য

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজা যদি ধর্মাত্মা হয় কিন্তু চেষ্টা করলেও অর্থলাভ করতে না পারে, এবং তার কাছে অর্থকোষ ও সৈন্যসামন্ত না থাকে, সেই অবস্থায় মন্ত্রীরাও তাকে অবজ্ঞা করতে থাকে এই পরিস্থিতিতে সুখ আকাঙ্ক্ষাকারী রাজার কী করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি রাজকুমার ক্ষেমদর্শীর কাহিনী বলছি, মন দিয়ে শোনো। প্রাচীন কালের কথা, কোশলরাজকুমার ক্ষেমদর্শীকে একবার অত্যন্ত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তার সৈন্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন সে কালকবৃক্ষীয় মুনির কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানতে চাইল।

রাজকুমার বলল—ব্রহ্মন্ ! মানুষকে অর্থের ভাগীদার মনে করা হয়। কিন্তু আমার মতো ব্যক্তি বারংবার চেষ্টা করলেও যদি রাজ্যলাভ না করতে পারে, তবে তার কী করা উচিত ? আত্মহত্যা করা, দীনতা দেখানো, অন্যের শরণাগত হওয়া বা অন্য কোনো নীচ কাজ—এসব আমি করতে চাই না। এছাড়া আর কী উপায় আছে ? আমার বহু অর্থ ছিল, কিন্তু স্বপ্নের মতো তা সব মিলিয়ে গেছে। আমার কাছে অর্থ বলে আর কিছুই নেই, তবুও তার মোহ ত্যাগ করতে পারছি না। আমি রাজলক্ষ্মী থেকে ভ্রষ্ট, দীন এবং আর্ত হয়ে এই অবস্থায় পড়েছি। এখন কী উপায়ে আমি সুখ ও শান্তি পাব, আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে সেই উপদেশ প্রদান করুন।

কোশলরাজকুমার তাঁকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে মহাতেজস্বী মুনিবর কালকবৃক্ষীয় তাকে বললেন—'রাজকুমার ! তুমি যেসব বস্তু 'আছে' বলে মনে করছ, আগে থেকেই জেনে নাও যে সেগুলি কল্পনামাত্র। যে বুদ্ধিমান পুরুষ এটি মনে রাখে সে কঠিনতম বিপদে পড়লেও দিশা হারায় না। যার উৎপত্তি হয়, তার নাশও হয় ; যা উৎপন্ন হয়েছে, তার বিনাশও হবে। শোকের এত শক্তি নেই যা তাকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচায়, তাই শোক করা বৃথা। রাজকুমার ! বলো তো আজ তোমার পিতা কোথায় ? কোথায় গেলেন তোমার পিতামহ ? আজ তুমিও তাঁদের দেখতে পাচ্ছ না, তাঁরাও তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। এই শরীর অনিত্য জেনেও, তুমি কেন তাঁদের জন্য শোক করছ ? একটু ভেবে দেখ যে, এক দিন তুমিও থাকবে না। সকলেই এক দিন নিশ্চিতভাবে শেষ হয়ে যাবে। আজকে যার বয়স কুড়ি বা ত্রিশ, তারা সব একশ বছরের আগেই পরলোক গমন করবে। এই অবস্থায় মানুষ যদি বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করতে না পারে তাহলে অন্তত তার এগুলির প্রতি মমত্বটুকু তো ত্যাগ করা উচিত। 'এই বস্তু আমার নয়'—এটি মেনে নিয়ে নিজের কল্যাণ তো করতে পারে। ভবিষ্যতে যা পাওয়া যাবে সেগুলিকেও 'আমার নয়' মনে করবে এবং যা পেয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই বিষয়ে এই ভাব রাখতে হয় যে 'এসব আমার ছিল না'।

প্রারব্ধই (ভাগ্য) সর্বাপেক্ষা প্রবল, সে-ই দেয় এবং সে-ই নিয়ে নেয়, যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা-পোষণ করে সে-ই বিদ্বান, সে সৎপুরুষদের মধ্যে স্থান পায়।'

রাজকুমার বলল—আমি মনে করি সমস্ত রাজ্য আমি দৈব ইচ্ছায় অনায়াসে লাভ করেছিলাম, এখন মহাবলশালী কাল তা সব ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন যেখানে যা কিছু পাই, তাতেই আমার জীবন-নির্বাহ করছি।

মুনি বললেন—রাজকুমার ! যথার্থ তত্ত্ব জেনে গেলে মানুষ কোনো কিছুর অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে শোক করে না। তোমারও তাই করা উচিত। এখন যদি দৈববশত কিছু পেয়ে যাও, তাহলে কী আগের মতো আনন্দে থাকতে পারবে ? আজ রাজ্যলক্ষ্মী থেকে বঞ্চিত হয়েও কী তুমি যথার্থভাবে হৃদয়ে শোক পরিত্যাগ করবে ? পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলরূপে যখন মানুষের ভোগসামগ্রী অপহৃত হয়, তখন সে বিধাতাকে দায়ী করে এবং স্বতঃপ্রাপ্ত পরিমিত পদার্থে সে সন্তুষ্ট হয় না। জগতের মানুষ প্রায়শ ঈর্ষা ও অহংকারে মত্ত থাকে। কিন্তু তুমি তো তেমন নও ? অন্যের সম্পত্তি দেখে তোমার মনে ঈর্ষা বোধ হয় না তো ? যোগধর্ম যারা জানে এবং ধীর ব্যক্তিরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেরাই রাজ্যলক্ষ্মী এবং পুত্র-পৌত্রাদি পরিত্যাগ করে। ধন যদিও পরম দুর্লভ কিন্তু তা চঞ্চল, তা জেনে সাধারণ মানুষেরও এটি পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তুমি তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তুমি জান যে ভোগ প্রারব্ধের অধীন এবং তা অস্থির, তা সত্ত্বেও না চাইবার বস্তুগুলি চাইছ এবং অত্যন্ত দীনভাবে তার জন্য শোক করছ। পুত্র ! এইসব কামনা পরিত্যাগ করো এবং যাতে জীবের কল্যাণ হয়, তা জানার চেষ্টা করো। তোমার কাছে যা অর্থরূপে প্রতীত হচ্ছে সে সবই অনর্থ, অর্থকে তুমি অনর্থরূপেই জানবে। এই ভোগ পদার্থের পেছনে কত লোকের সমস্ত অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। অন্য লোকের ভোগজনিত সুখকেই অক্ষয় মনে করে তার জন্য ধন-সম্পদ কামনা করে। বহু ব্যক্তিই ধনসম্পত্তিতে এত মগ্ন হয়ে যায় যে, তার থেকে বড় কোনো সুখের কথা তারা ভাবতে পারে না। কিন্তু বহু কষ্টে উপার্জিত তাদের সেই অভীষ্ট ধন যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদের সম্মানের সব কিছু তছনছ হয়ে যায়। তখন তাদের অর্থে বৈরাগ্য আসে। কিন্তু সামান্য কিছু মানুষই নিজেদের কল্যাণে ব্রতী হয় এবং পরলোকে সুখ পাবার আশায় লৌকিক ভোগ থেকে সরে গিয়ে ধর্মের শরণ নেয়। কিছু ব্যক্তি এমনও থাকে যারা ধনলোভে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয় ; অর্থ ভিন্ন জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্যই তাদের জানা নেই। তাদের দীনতা ও মূর্খতা এমনই যে এই অনিত্য জীবনের জন্য মোহবশে অর্থকেই একমাত্র কাম্য বস্তু মনে করে। সংগ্রহের অন্ত বিনাশ, জীবনের অন্ত মরণ এবং সংযোগের অন্ত বিয়োগ একথা জেনে কে এইসবে নিজের মন লাগাবে ? রাজন্ ! হয় মানুষ ধন ত্যাগ করে নয়তো ধন মানুষকে ত্যাগ করে ; একদিন না একদিন এরূপ অবশ্যই হয়—এই কথা জেনেও এমন কে আছে যে অর্থের জন্য চিন্তা করবে ?

এরূপ বিপদ শুধুমাত্র তোমারই হয়নি, অন্যেরও অর্থ ও আত্মীয়-বান্ধব বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এই কথা জেনে নিজের মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখ—ভয় পেয়ো না। তুমি তো উত্তমরূপে জ্ঞানী, তোমার মতো ব্যক্তির শোক করা উচিত নয়। তোমার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত কম, তোমার মধ্যে চঞ্চলতার দোষ নেই, তোমার হৃদয় কোমল এবং বুদ্ধি একই সিদ্ধান্তে স্থির থাকে। তুমি জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী, তোমার মতো মানুষের শোক করা উচিত নয়। তোমার কপটতাপূর্ণ, শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধ বৃত্তি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ক্রূরতাও ত্যাগ করা উচিত, এটি অত্যন্ত দূষিত ও পাপপূর্ণ বৃত্তি, কাপুরুষেরাই এর আশ্রয় গ্রহণ করে। তুমি ফলমূলের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে একাই বনে বিচরণ করো। বাক্-সংযম করে মনকে নিজের বশে রাখো এবং সকল প্রাণীর হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকো, সকলকে দয়া করো। জঙ্গলের ফল-মূলে সন্তুষ্ট থেকে, জঙ্গলে একাকী বিচরণ করাই বিদ্বানের যোগ্য বৃত্তি।

কালকবৃক্ষীয় মুনির কূটনীতি জানানো এবং রাজা জনকের সঙ্গে ক্ষেমদর্শীর মিলন ঘটানো

মুনি বললেন—রাজকুমার ! এখন আমি তোমাকে রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য এক নীতি বলছি,- যদি সেই অনুসারে কাজ করো তাহলে পুনরায় তুমি বিশাল রাজ্য লাভ করতে পারবে। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়, দম্ভ পরিত্যাগ করে শত্রুরও সেবা করো, তার সামনে হাত জোড় করে মাথা নত করো। উত্তম ও বিশুদ্ধ ব্যবহারে তার বিশ্বাসের পাত্র হও। যদিও বিদেহরাজ জনক তোমার শত্রু, তা সত্ত্বেও তুমি যদি তাঁকে প্রসন্ন করতে পারো, তাহলে তিনি তোমায় বহু ধন দেবেন ; কারণ তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ। যদি তা হয়, তবে তুমি বহু শুদ্ধ হৃদয়, দুর্ব্যসন বর্জিত এবং উৎসাহী সহায়ক পাবে। যে ব্যক্তি শাস্ত্র অনুকূল আচরণ করে নিজ মন ও ইন্দ্রিয় বশে রাখে, সে নিজেকে তো উদ্ধার করেই সেইসঙ্গে প্রজাদেরও হিতসাধন করে। রাজা জনক অত্যন্ত ধীর এবং শ্রীসম্পন্ন, তিনি যখন তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবেন, তখন সকলেই তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবে। তারপর তুমি মিত্র-সৈন্য একত্রিত করবে এবং অভিজ্ঞ ও ধীসম্পন্ন মন্ত্রীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে। তারপর শত্রুর শত্রুর সঙ্গে মিলে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে ফেলবে।

অন্য উপায় হল অত্যন্ত দুর্লভ পদার্থ, নারী, বসনাদি, আসবাবপত্র, রথ বা বাহন, বহু ব্যয়ে নির্মিত মহল ইত্যাদিতে শত্রুকে আসক্ত করো এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার পশুপক্ষী পালন করার শখ সঞ্চারিত করো ; যাতে এইসব ব্যসনে অর্থ ক্ষয় হয়ে তোমার শত্রুর আর্থিক ক্ষমতা কমে যায়।

বুদ্ধিমানদের বিশ্বাসভাজন হয়ে শত্রুর রাজ্যে ভ্রমণ করো এবং কুকুর, হরিণ এবং কাকের মতো সতর্ক থেকে মিত্রধর্ম পালন করো।[১] শত্রুর দ্বারা এমন বৃহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু করাও, যা শেষ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। বলবান ব্যক্তিদের সঙ্গে তার বিরোধ করিয়ে দাও। নানাবিধ কর্মে ব্যয় করিয়ে তার রাজকোষ শূন্য করে দাও। শত্রুর রাজকোষ ক্ষীণ হলেই সে বশে আসে। সম্ভব হলে তাকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে নিযুক্ত করে তার দ্বারা দক্ষিণারূপে সর্বস্ব দান করিয়ে দাও। তাতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। পরে কোনো মুক্ত পুরুষকে আমন্ত্রণ করে শত্রুকে এমন উপদেশ শোনাও যাতে সে রাজ্য ত্যাগ করার ইচ্ছা পোষণ করে। যদি তার শরীর নীরোগ হয় তাহলে ঔষধ প্রয়োগে তাকে হত্যা করো এবং তার হাতি, ঘোড়া ইত্যাদিও বধ করো। এগুলি ছাড়াও আরও বহু উপায় আছে, যার সাহায্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর সর্বনাশ করতে পারে।

রাজকুমার বললেন—ব্রহ্মন্ ! আমি দম্ভ ও কপটতার আশ্রয়ে জীবিত থাকতে চাই না। অধর্মের দ্বারা আমার যদি অনেক বড় সম্পত্তিও পাওয়ার হয়, তাও আমি পেতে চাই না। এইসব অসৎ উপায় আমি আগেই ত্যাগ করেছি, আমাকে যেন কেউ সন্দেহ না করে এবং আমার ও অন্য সকলের যেন মঙ্গল হয়। ক্রূর ব্যবহার করে আমার এই জগতে বাঁচার ইচ্ছা নেই। সুতরাং আমি অধর্ম আচরণ করতে পারব না, আপনারও আমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।

মুনি বললেন—রাজকুমার ! তুমি সত্যবাদী এবং গুণসম্পন্ন। তুমি স্বভাবতই ধর্মাত্মা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অতএব তোমার এবং রাজা জনকের কল্যাণের জন্য আমি নিজেই চেষ্টা করব। অথবা তোমার দুজনের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করব যা স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী হবে। তুমি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেছ এবং বিদ্বান, দয়ালু ও রাজ্য পরিচালনায় নিপুণ, তোমার মতো যোগ্য ব্যক্তিকে সকলেই মন্ত্রী নিযুক্ত করতে চাইবে। যদিও তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছ এবং ভীষণ বিপদে পড়েছ, তা সত্ত্বেও তুমি ক্রূর হয়ে যাওনি, দয়াশীল হয়েই জীবন কাটাতে চাও। সুতরাং যখন

---

[১]যেমন কুকুর অত্যন্ত সজাগ হয়, তেমনই শত্রুর গতিবিধি দেখার জন্য জেগে থাকবে। হরিণ যেমন অতি সতর্ক হয়, ভয়ের আশঙ্কা থাকলেই পালিয়ে যায়, তেমনই সবসময় সতর্ক থাকবে ভয়ের ব্যাপার এলেই সেখান থেকে সরে পড়বে আর কাক যেমন মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করে, কাউকে হাত ওঠাতে দেখলেই সেখান থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উড়ে পালায়, তেমনই শত্রুর কর্মপ্রচেষ্টার দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

বিদেহরাজ জনক আমার আশ্রমে আসবেন, তখন তাঁকে তোমার কথা বলব, তিনি অবশ্যই তা পালন করবেন।

এইভাবে আশ্বাস প্রদান করে মুনি বিদেহরাজকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন—'রাজন্ ! এইরাজকুমার উচ্চ বংশজাত, আমি এর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত। এর হৃদয় দর্পণের ন্যায় শুদ্ধ ও স্বচ্ছ ; শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি সর্বভাবে একে পরীক্ষা করেছি, এর মধ্যে

কোনোপ্রকার দুরভিসন্ধি নেই। সুতরাং তুমি এর সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করো এবং আমাকে যেমন বিশ্বাস করো, একেও তেমনই বিশ্বাস করো। মন্ত্রী ছাড়া কোনো রাজাই তিন দিনও চালানো যায় না এবং শূরবীর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হয়। ধর্মাত্মা রাজার জন্য জগতে মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সত্যকারের সহায়ক নেই। এই রাজকুমার মহাত্মা ব্যক্তি, এ সৎ ব্যক্তিদের পথ গ্রহণ করেছে। তুমি যদি ধর্মসাক্ষী করে একে সম্মানের সঙ্গে আপন করে নাও, তাহলে এই ব্যক্তি তোমার সব শত্রুকে নিজের অধীন করবে। আমার কথা শুনে তুমি একে তোমার মন্ত্রী নিযুক্ত করে এর হিতসাধন করো। জয় পরাজয় চিরকাল কারো থাকে না ; তাই অন্যের সম্পদ হরণ করে যেমন ভোগ করছ, তেমনই তোমার সম্পত্তি অন্য কেউ ক্ষমতা বলে ভোগ করলে তাও সময়ে সময়ে মানতে হয়। যে অপরকে সংহার করে, তার নিজেরও বধ হওয়ার ভয় সর্বদা বজায় থাকে।

মুনির কথা শুনে রাজা জনক তাঁকে পূর্ণ সম্মান জানিয়ে, তাঁর কথা অনুমোদন করে বললেন—'মুনিবর ! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং সর্বদা অপরের কল্যাণ কামনা করেন ; সুতরাং আপনার আদেশ মেনে নিলে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল হবে। আমার প্রতি আপনার যা আদেশ আমি তা সবই পূর্ণ করব। এতো আমার পরম কল্যাণের বিষয়, এখন অন্যপ্রকার চিন্তা করার কোনোই প্রয়োজন নেই।'

তারপর মিথিলা নরেশ কোশলরাজকুমারকে নিকটে ডেকে বললেন—'রাজন্ ! আমি ধর্ম ও নীতির আশ্রয় নিয়ে সমস্ত জগতে বিজয়লাভ করেছি। কিন্তু আজ আপনি নিজগুণে আমাকে জয় করেছেন। আমি আপনাকে অন্তর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করুন।' তারপর দুজনে মুনিকে পূজা করে একসঙ্গে গৃহে গেলেন। বিদেহরাজ কোশল রাজকুমারকে নিজ মহলে নিয়ে গিয়ে পাদ্য, অর্ঘ, আচমন ও মধুপর্কের দ্বারা তাঁকে বিধিবৎ সম্মান জানালেন এবং তাঁর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করালেন। পণস্বরূপ নানাপ্রকার রত্ন উপহার দিলেন। রাজাদের এই হল পরম ধর্ম। তাঁদের পরস্পর মিলেমিশে থাকা উচিত।

—○—

মাতা, পিতা এবং গুরুকে সেবার উপদেশ, সত্য-অসত্যকে জানা এবং ব্যবহারিক নীতির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত! ধর্মের পথ বিস্তৃত এবং বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত ; এর মধ্যে কোন ধর্মটি আপনি সবথেকে প্রধান এবং বিশেষভাবে আচরণযোগ্য বলে মনে করেন, যার অনুষ্ঠান করলে আমি ইহলোক ও পরলোকে ধর্মের ফল লাভ করতে পারি।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! আমি মাতা, পিতা এবং গুরুজনের পূজাকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করি। এর পালনকারী ব্যক্তি পুণ্যলোকে তো উত্তম স্থান লাভ করেই, ইহজগতেও সে মহৎ সুযশ লাভ করে। মাতা, পিতা, গুরুজন যে কাজ করতে নির্দেশ দেন, তা ধর্মের অনুকূল হোক বা বিরুদ্ধ, সেটি অবশ্যই পালন করা উচিত। অন্য কোনো কর্ম ধর্মের অনুকূল হলেও এঁদের আদেশ না পেলে করা উচিত নয়।

মাতা, পিতা, গুরু—এঁরাই তিন লোক, এঁরাই তিন আশ্রয়, এঁরাই তিন বেদ ও তিন অগ্নি। পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি এবং গুরু আহবনীয়াগ্নি। লৌকিক অগ্নির থেকে মাতা-পিতা ইত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির গৌরব অধিক। এই তিন ব্যক্তির সেবায় যদি ভুল না করো তাহলে তুমি ত্রিলোক জয় করবে। পিতার সেবা দ্বারা ইহলোক, মাতার সেবা দ্বারা পরলোক এবং গুরুর সেবা দ্বারা ব্রহ্মলোক পার হয়ে যাবে ; তাই তুমি সর্বদা তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। এরূপ করলে তুমি উত্তম যশ, পরম কল্যাণ এবং মহাফল-প্রদানকারী ধর্ম লাভ করবে।

এই তিনজনের আদেশ কখনো উল্লঙ্ঘন করবে না। এঁদের আহারের পূর্বে কখনো আহার করবে না, এঁদের ওপর কোনো দোষারোপ করবে না, সর্বদা এঁদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে—এটি সব থেকে বড় পুণ্য। এই আচরণের দ্বারাই তুমি পবিত্র যশ, কীর্তি এবং উত্তমলোক লাভ করবে। যে এই তিন জনকে সম্মান করে, জেনে রাখো সে সমস্ত জগৎকে সম্মান করেছে এবং যে এঁদের অসম্মান করে, তার সমস্ত শুভকর্ম ব্যর্থ হয়ে যায়, তার ইহলোকেও যশ মেলে না, পরলোকেও সুখলাভ হয় না। আমি সর্বপ্রকার শুভকর্ম করে এই গুরুজনদেরই অর্পণ করি : তাতে সেই কর্মের পুণ্য শত-সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ত্রিলোক আজ আমার দৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে।

দশ শ্রোত্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন আচার্য (কুলগুরু বা দীক্ষাগুরু), দশ আচার্যের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন উপাধ্যায় (বিদ্যাগুরু)। দশ উপাধ্যায়ের থেকে অধিক গুরুত্ব হল পিতার এবং দশজন পিতার থেকে অধিক গৌরব হল মাতার। মাতা সমস্ত জগতের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো গৌরব আর কারো নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস হল যে গুরু (আচার্য) মাতা-পিতার থেকেও শ্রেষ্ঠ। মাতা-পিতা শুধু এই দেহটির জন্ম দেন, কিন্তু আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদানকারী আচার্যের দ্বারা যে জন্ম লাভ হয়, তা দিব্য, অজর এবং অমর। মাতা-পিতা যদি কোনো অপরাধ করেন, তাহলেও তাঁদের ওপর কখনো হাত তোলা উচিত নয়।

যারা বিদ্যালাভ করে গুরুর সম্মান করে না, কাছে থেকেও কায়-মনো-বাক্যে গুরুর সেবা করে না, তাদের ভ্রূণ হত্যার পাপ হয়। জগতে তাদের থেকে বড় পাপী আর নেই। গুরুর যেমন কর্তব্য শিষ্যকে আত্মোন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া, তেমনই শিষ্যেরও ধর্ম গুরুর সেবা করা। যে ধর্মপালন দ্বারা মানুষ পিতাকে প্রসন্ন করে, তাতে প্রজাপতি ব্রহ্মাও প্রসন্ন হন এবং যে আচরণের দ্বারা মাতাকে প্রসন্ন করে, তাতে সমস্ত পৃথিবীর পূজা হয়। কিন্তু যে ব্যবহারের দ্বারা শিষ্য তার গুরুকে প্রসন্ন করে, তাতে পরব্রহ্ম পরমাত্মার পূজা সম্পন্ন হয়, তাই গুরু মাতা-পিতার থেকেও অধিক পূজনীয়। গুরুকে পূজা করলে ঋষি এবং পিতৃপুরুষও প্রসন্ন হন, তাই গুরু পরম পূজনীয়। মাতা, পিতা ও গুরুকে কখনো অপমান করা উচিত নয়, তাঁদের কোনো কাজের নিন্দা করা উচিত নয়। গুরুজনের সেবা দেবতা ও মহর্ষিরাও স্বীকার করেন। যারা মনে মনে বা ক্রিয়াদ্বারা উপাধ্যায়, পিতা ও মাতার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যারা মাতা-পিতার দ্বারা নিজের পালন-পোষণ করিয়ে বৃদ্ধবয়সে তাঁদের দেখাশুনা করে না, তাদের

গর্ভহত্যার পাপ হয় ; জগতে তাদের থেকে বড় পাপী আর নেই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, নারীহত্যাকারী এবং গুরু-হত্যাকারী—এই চারপ্রকার পাপীর কোনো প্রায়শ্চিত্তের কথা আমার জানা নেই ; মাতা-পিতা ও গুরুর সেবাই হল মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম, কল্যাণের সাধন এর থেকে বড় আর কোনো কর্ম নেই।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত! যে ব্যক্তি ধর্মপথে অবস্থান করতে চায়, তার কীরূপ ব্যবহার করা উচিত ? সত্য ও অসত্য কীভাবে জানা যায় ? কখন সত্য বলা উচিত আর কখন অসত্য ? ধর্মের লক্ষণ কী ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! সত্য ভাষণই উত্তম, সত্যের থেকে বড় কিছু নেই। কিন্তু জগতের মানুষ সত্য-অসত্যকে ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাই সেকথা বলছি। যেখানে অসত্যের পরিণাম সত্য এবং সত্যের পরিণাম অসত্য, সেখানে সত্য না বলে অসত্যই বলা উচিত। এই সময়ে যারা সত্য বলে, সেই মূর্খেরা মারা পড়ে। সুতরাং পরিণামের দ্বারা সত্য-অসত্য স্থির করে যারা সত্য বলে, তারাই ধর্মজ্ঞ। যারা অনার্য, যাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, যারা অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের, সেই ব্যক্তিরাও কখনো অন্ধ পশুহত্যাকারীদের মতো মহাপুণ্য করে নেয়।[1] প্রাণীদের উন্নতি এবং কল্যাণের জন্যই ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাই হল ধর্ম। 'ধর্ম' নাম এইজন্য হয়েছে যে এটি সকলকে ধারণ করে ; ধর্মের দ্বারাই সমস্ত প্রজা জীবন ধারণ করে ; ধর্ম অধোগতি থেকে জীবনকে রক্ষা করে ; সুতরাং যে কর্মের দ্বারা প্রাণীদের জীবনকে রক্ষা হয়, তাই ধর্ম—এটি জেনে রাখা উচিত। জীব হিংসা যাতে না হয়, তার জন্য ধর্মউপদেশ দেওয়া হয়েছে ; সুতরাং যে কর্ম অহিংসা দ্বারা যুক্ত, তাকেই ধর্ম বলা হয়।

যদি চোর কোনো ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি চুরি করার জন্য তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে এবং ঠিকানা না বলায় সেই ধনী রক্ষা পায়, তাহলে কোনো উত্তর দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু না বললে যদি চোরের মনে সন্দেহ হয়, তাই কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং শপথ করে মিথ্যা বললে যদি তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তবে সত্যের চেয়ে অসত্য বলাই যুক্তিযুক্ত। এই সময়ের জন্য শাস্ত্রকারদের এটিই সিদ্ধান্ত। নিজ ক্ষমতা থাকলে পাপীদের অর্থ দেওয়া উচিত নয় ; কারণ তাদের ধন দিলে তারা দাতাকেই কষ্ট দেয়। যদি কেউ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের অধীনে এনে শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে ঋণের অর্থ আদায় করে এবং এক্ষেত্রে ঋণদাতার দাবিকে প্রমাণিত করতে যদি কয়েকজন সাক্ষী প্রয়োজন হয় তথা সাক্ষ্যদানে যদি কোনো সত্য কথাকে গোপন করা হয় তাহলে সকলকেই মিথ্যাবাদী বলা হবে। কিন্তু প্রাণসংকটের সময়, বিবাহকালে, ধন ও অপরের ধর্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে অসত্য বলা যেতে পারে। কোনো নীচ জাতির লোক অন্যের কার্যসিদ্ধির জন্য অঙ্গীকার করে ধর্মের নামে ভিক্ষা চায় তবে তাকে অবশ্যই ভিক্ষা দেওয়া উচিত। যেসব ব্যক্তি ধার্মিক আচারভ্রষ্ট হয়ে পাপমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত। যেসব দুষ্ট পাপমার্গের আশ্রয় নিয়ে ধর্মমার্গ পরিত্যাগ করে পাপের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে, সেই পাপাত্মাদের সর্বপ্রকারে বধ করা কর্তব্য, কেননা সকল পাপীদেরই চিন্তা হল যে কোনো উপায়ে ধনসম্পদ সংগ্রহ করা। এইসব লোক অপরকে অসহ্য কষ্ট প্রদান করে। তারা দেবলোকও প্রাপ্ত হয় না, ইহলোকও নয় ; তারা প্রেত গতি লাভ করে। যারা যজ্ঞ করে না, তপস্যা থেকে দূরে থাকে, এরূপ মানুষের সঙ্গ তুমি কখনো কোরো না।

পাপীদের বিশ্বাস যে ধর্ম বলে কিছু নেই। এদের যারা বধ করে, তাদের পাপ হয় না। কপটতার সঙ্গে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি কাক-শকুনের সমান হয়। মৃত্যুর পর তারা ওইরূপ জন্মই লাভ করে। যে ব্যক্তি যার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে—তারও সেই ব্যক্তির সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করা উচিত—এই ধর্ম (ন্যায়)। কপট লোকের সঙ্গে কপট ব্যবহার এবং সদাচারী ব্যক্তির সঙ্গে সদাচার করবে।

দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় এবং মানুষের স্বভাব চেনার জন্য বাঘ ও শিয়ালের কথা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! জগতের জীব ভিন্ন ভিন্ন কারণে নানাপ্রকার কষ্ট পাচ্ছে ; কী উপায়ে তারা এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে, কৃপা করে আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! যে দ্বিজরা নিজ মনকে বশীভূত করে শাস্ত্রোক্ত চারটি আশ্রমে বসবাস করে সেই অনুসারে আচরণ করে, তারা এই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যারা দম্ভ করে না, যাদের জীবিকা নিয়মিত, যারা বিষয়াসক্তির বশীভূত হয় না, অন্যের থেকে কটুবাক্য শুনেও প্রতি উত্তর দেয় না, মার খেলেও প্রতিশোধ নেয় না, নিজে দান করে—কারো কাছে কিছু চায় না, অতিথিদের সর্বদা আশ্রয় প্রদান করে, কখনো কারো নিন্দা করে না, নিত্য নিয়মপূর্বক স্বাধ্যায় করে, ধর্মজ্ঞ, মাতা-পিতার সেবায় ব্যাপৃত থাকে, দিবসকালে নিদ্রা যায় না—তারা দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে।

যারা কায়-মনো-বাক্যে কখনো পাপ করে না, কোনো জীবকে কষ্ট প্রদান করে না, রাজা হয়ে লোভবশত প্রজার ধন ছিনিয়ে নেয় না, দেশকে সর্বভাবে রক্ষা করে, তাদের কখনো দুঃখ পেতে হয় না। যারা শুধু নিজ স্ত্রীর সঙ্গেই ধর্মানুকূল সমাগম করে, যুদ্ধে মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করে জয়লাভ করতে চায়, তারা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যারা প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলে না, সমস্ত প্রাণীই তাদের বিশ্বাস করে। তারা কখনো দুঃখ পায় না। শুধুমাত্র শুভকর্ম প্রদর্শনের জন্য নয়, যারা সর্বদা মিষ্টবাক্য বলে, যাদের অর্থ ধর্ম-কর্মে ব্যয় হয়, তারা দুস্তর বিপদও পার হয়ে যায়। যারা তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে, অল্পবয়স থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, বেদ, বিদ্যা ও ব্রতে পারদর্শী, যাদের রজোগুণ ও তমোগুণ শান্ত হয়ে গেছে, যারা সর্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত, যাদের থেকে অন্য প্রাণী ভয় পায় না এবং নিজেরাও কাউকে ভয় করে না, সমস্ত জগৎকে আত্মার ন্যায় দেখে, তারা কঠিনতম বিপদও পার হয়ে যায়।

অপরের সম্পত্তি দেখে যাদের মনে ঈর্ষা হয় না, যারা অশালীন বিষয়-ভোগ থেকে দূরে থাকে, দেবগণকে প্রণাম করে এবং সব ধর্মের কথা শোনে, যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও শান্তি বিদ্যমান, নিজেরা সম্মান চায় না কিন্তু অপরকে সম্মান করে, যাদের ক্রোধ জয় করার শক্তি থাকে এবং অপরের ক্রোধ শান্ত করে দেয় আর কখনো কারো ওপর ক্রোধ করে না, তারা সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে পার হয়ে যায়। যারা জন্মকাল থেকে মধু, মাংস ও মদ্যপান করে না, যারা স্বাদের জন্য নয়—জীবন রক্ষার জন্য আহার গ্রহণ করে, বিষয়-বাসনা তৃপ্তির জন্য নয়—সন্তান কামনায় স্ত্রী-সঙ্গম করে, যারা সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর ভগবান নারায়ণকে ভক্তি করে, তারা দুস্তর দুঃখ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। নারায়ণের শরণ গ্রহণ করলে ভক্তের দুঃখ থেকে মুক্তি হয়—এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যারা এই অধ্যায় পাঠ করে বা ব্রাহ্মণের মুখে শোনে, তারাও দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। এখানে সংক্ষেপে মানুষের কর্তব্য জানানো হল, যাতে তারা ইহলোকে ও পরলোকে বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তাত ! বহু কঠোর স্বভাববিশিষ্ট মানুষ ওপর থেকে কোমল ও শান্ত হয়ে থাকে এবং কোমল স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে কঠোর মনে হয় ; এদের ঠিক কীভাবে চেনা যায় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে এক পুরানো কাহিনী আছে যা বাঘ ও শিয়ালের সংবাদ রূপে প্রচলিত ; তোমাকে বলছি, শোনো। অনেক দিনের কথা, পুরিকা নামে এক নগর ছিল, সেটি বহু ধনধান্যেসম্পন্ন ছিল। সেখানে পৌরিক নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত ক্রূর এবং নীচ ছিলেন। সর্বদা অন্য প্রাণীদের হিংসা করতেন। ক্রমশ তাঁর আয়ু শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর পর তিনি শিয়াল হয়ে জন্মালেন, কিন্তু তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণে ছিল। আগের জন্মের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হল এবং মনে বৈরাগ্য এল। তখন তিনি হিংসা ত্যাগ করে সত্য কথা বলার ব্রত নিলেন। সারা দিনে একবার খেতেন, গাছ থেকে যে ফল পড়ে যেত তাই খেতেন। যে শ্মশানে জন্মেছিলেন, সেখানেই থাকতে পছন্দ করতেন।

শিয়ালের এই পবিত্র আচরণ তার জাতি ভাইরা পছন্দ করল না। তারা মিষ্ট ভাষায় তাকে নিজেদের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল, তারা বলল—'ভাই শিয়াল ! তুমি মাংসাহারী জীব, শ্মশানে থাক আবার পবিত্র আচার-বিচারে থাকতে চাও, এ তোমার বিপরীত চিন্তা। ভাই,

আমাদের মতো হয়ে থাক, আমরা তোমাকে খাবার এনে দেব, তুমি এই আচরণ পরিত্যাগ করো। আমরা তোমার জন্য খাদ্যবস্তু এনে দেব। আমাদের জাতির যা খাদ্য, তোমারও সেই খাদ্য আহার করা উচিত।

তাদের কথা শুনে শিয়াল সাবধান হয়ে মিষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তাদের বুঝিয়ে বলল—'বন্ধুগণ! খারাপ ব্যবহারের জন্যই আমাদের জ্ঞাতকে কেউ বিশ্বাস করে না। ভালো স্বভাব ও আচরণের দ্বারাই কুলের প্রতিষ্ঠা হয়; তাই আমি এমন কাজ করতে চাই যাতে আমাদের বংশের যশবৃদ্ধি হয়। আমার শ্মশানে বাস করার কথা বলছ, আশ্রম বা কুটির নির্মাণ করেই যে থাকতে হবে, ধর্মে এমন কিছু লেখা নেই। আশ্রমে থেকেও যদি কেউ গো-হত্যা করে, তাহলে কী তার পাপ হবে না? আর শ্মশানে বাস করে যদি কেউ গাভীদান করে, তাহলে কী তার পুণ্য বৃথা হয়? তোমাদের জীবন অসন্তোষপূর্ণ, নিন্দনীয়, ধর্মের হানির জন্য দূষিত, ইহলোকে ও পরলোকে অনিষ্ট ফলপ্রদানকারী, সেইজন্য আমি এসব পছন্দ করি না।'

শিয়ালের এই আচার-ব্যবহারের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন এক বাঘ এসে সম্মান জানিয়ে, তাকে শুদ্ধ এবং বুদ্ধিমান জেনে তার মন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল।

বাঘ বলল—'সৌম্য! তুমি আমার সঙ্গে চলো এবং ইচ্ছামতো থেকো। একটা কথা তোমাকে জানাতে চাই, আমাদের জাতির স্বভাব অত্যন্ত কঠোর, জগতে সকলেই তা জানে। তুমি যদি কোমল ব্যবহার করে আমার হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকো, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে।'

শিয়াল বলল—'বনরাজ! আপনি আপনার যোগ্য কথাই বলেছেন এবং আপনি যে ধর্ম ও অর্থ-সাধন কুশল এবং শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন সহায়ক খুঁজছেন, তা অত্যন্ত সঙ্গত। মহাভাগ! তার জন্য আপনার এমন একজন চাই যার আপনার প্রতি অনুরাগ আছে, যার নীতিজ্ঞান আছে, যে সন্ধি করাতে কুশল, বিজয়াভিলাষী, লোভরহিত, বুদ্ধিমান, হিতৈষী এবং উদার—এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সহায়ক করে পিতা ও গুরুর ন্যায় তাকে সম্মান করা উচিত। আপনি আমাকে যে সুবিধাগুলি দেবেন, তা আমার প্রয়োজন নেই। আমি সুখভোগ এবং ঐশ্বর্য কিছুই চাই না। আপনার পুরানো অনুচরদের সঙ্গে আমার স্বভাবও মিলবে না, তারা দুষ্ট প্রকৃতির জীব, আপনাকে আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলবে। আমার স্বভাবেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আমি পাপীদের সঙ্গেও কঠোর ব্যবহার করি না। আমি অনেক দূরের কথা ভাবছি। আমার উৎসাহ কখনো কম হবে না, আমার শক্তিও বেশি আছে। আমি কৃতার্থ এবং প্রত্যেক কাজই সফলতার সঙ্গে করতে সক্ষম। স্বচ্ছন্দে বনে বিচরণ করি। আমার মতো বনবাসীদের জীবন আসক্তিরহিত এবং নির্ভয়পূর্ণ হয়ে থাকে। এক স্থানে অনায়াসে জল পাওয়া যায় অন্য স্থানে ভীতিপ্রদানকারী সুখাদ্য—এই দুইয়ের মধ্যে ভয়শূন্য স্থানই আমার পছন্দ। রাজার কাছে থাকলে সর্বদা ভয়ে ভয়েই থাকতে হয়। মিথ্যা অপরাধে রাজার হাতে যত রাজ অনুচরেরা নিহত হয়েছে, সত্য অপরাধে তত নয়। মহারাজ! আমাকে যদি মন্ত্রিত্বের কার্যভার গ্রহণ করতেই হয়, তাহলে আমি একটি শর্ত রাখতে চাই, সেই অনুযায়ী আপনার আমার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আমার আত্মীয়দের আপনি সম্মান করবেন, তাদের হিতবাক্য শুনবেন। আমি আপনার অন্য কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে কখনো পরামর্শ করব না। শুধু একান্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এবং আপনার হিতের কথা বলব। আপনিও আপনার জাতিভাইদের কাজের সম্বন্ধে আমাকে ভালো-মন্দ কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার সঙ্গে পরামর্শ করার পর যদি আপনার পূর্বের মন্ত্রীদের কিছু ভুল প্রমাণিত হয়, তবুও তাদের প্রাণনাশ করবেন না এবং কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে আমার আপনজনদের মারবেন না।

বাঘ 'বেশ রাজি' বলে শিয়ালকে সম্মান জানাল। শিয়ালও তার মন্ত্রী হওয়া মেনে নিল। তখন তাকে খুব স্বাগত-অভ্যর্থনা জানানো হল; প্রত্যেক কাজেই তার প্রশংসা হতে লাগল। সেসব লক্ষ্য করে পূর্বেকার অনুচর ও মন্ত্রীরা রাগে জ্বলে উঠল। সকলেই তাকে হিংসা করতে লাগল। তাদের মনে দুষ্টভাব ভরা ছিল, তারা দল বেঁধে বারবার শিয়ালের কাছে এসে বন্ধুত্ব করে তাকে নিজেদের মতো দোষী করার চেষ্টা করতে লাগল। শিয়াল আসার আগে তাদের অন্যরকম ব্যবস্থা ছিল, অন্যের বস্তু হরণ করে তারা উপভোগ করত। কিন্তু এখন তারা আর কিছু করে উঠতে পারে না, কারো ধন নিতে পারে না, কারণ শিয়াল সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল শিয়ালও তাদের দলে মিশে যায়, তাই তারা নানাপ্রকারে তাকে অর্থলোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টানতে চেয়েছিল।

কিন্তু শিয়াল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল, সে তাদের ফাঁদে পড়েনি—তারাও ধৈর্য ছাড়েনি। অনুচরেরা তার প্রাণনাশ করার প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং সকলে মিলে সেই চেষ্টাই করছিল। একদিন বাঘের খাওয়ার জন্য যে মাংস তৈরি করা হয়েছিল, তারা সেটি চুরি করে শিয়ালের বাসায় রেখে এসেছিল। শিয়াল মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়ার সময়ই বাঘকে বলে দিয়েছিল যে, 'রাজন্ ! তুমি যদি আমার বন্ধুত্ব চাও, তাহলে কারো কথায় আমাকে বিনাশ করবে না।'

এদিকে বাঘ ক্ষুধার্ত হয়ে আহারের জন্য উঠে দেখল তার খাবারের মাংস নেই। বাঘ অনুচরদের বলল চোরকে খুঁজে আনতে। তখন যারা এইসব কাণ্ড করেছিল, তারা বাঘকে জানাল—'মহারাজ ! নিজেকে যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলে মনে করে, সেই শিয়াল মহাশয়ই আপনার মাংস অপহরণ করেছে।' শিয়ালের এই ধৃষ্টতার কথা শুনে বাঘ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন শিয়ালের প্রতিকূল কিছু বলার সুযোগ হয়েছে দেখে আগের মন্ত্রীরা বাঘকে বলতে লাগল—'রাজন্ ! ও তো মুখেই ধর্মাত্মা সেজে আছে, স্বভাবে অত্যন্ত কুটিল, পাপী। ওপর থেকে ধর্মের রূপ ধরে আছে। তার সব আচার-আচরণই লোক দেখানো।' এই বলে তারা তৎক্ষণাৎ শিয়ালের বাসা থেকে সেই মাংস নিয়ে এল। বাঘ তাদের কথা শুনে যখন নিশ্চিত হল যে শিয়ালই তার মাংস চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, তখন সে শিয়ালকে বধ করার নির্দেশ দিল।

বাঘের মা যখন এই কথা জানতে পারল, তখন সে হিতবাক্যের দ্বারা পুত্রকে বোঝাবার জন্য এল এবং বলল—'পুত্র ! আমার মনে হয় এর মধ্যে কোনো কপট ষড়যন্ত্র আছে। তুমি এতে বিশ্বাস কোরো না। স্বার্থে বাধা পড়লে যাদের মনে ক্রোধের উদয় হয় তারা নির্দোষীকে দোষী প্রতিপন্ন করে। প্রায়শই লোকেরা নিজের থেকে উচ্চপদে কাউকে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়, কারো উন্নতি এরা সহ্য করতে পারে না। সেই ব্যক্তি যতই পবিত্র ও শুদ্ধ হোক, এরা তার ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। লোভীরা শুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা তপস্বীদের হিংসা করে। তেমনই মূর্খেরা পণ্ডিতদের, দরিদ্র ধনীদের, পাপীরা ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের এবং রূপহীনরা রূপবানদের হিংসা করে। বিদ্বানদের মধ্যেও এমন কত অবিবেচক, লোভী ও কপট মানুষ হয়, যারা বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষ খুঁজে বার করে। একদিকে তোমার ঘর যখন শূন্য ছিল, তখন তোমার মাংস চুরি হয়েছে, অন্যদিকে এমন একজন যে দিলেও মাংস নিতে চায় না, সে মাংস চুরি করল—এই দুটি বিষয় ভালো করে ভেবে দেখ। জগতে বহু অসভ্য প্রাণীকে সভ্যের ন্যায় এবং সভ্য প্রাণীকে অসভ্যের ন্যায় দেখায়, এইভাবে তাদের মধ্যে তারতম্য থাকে, অতএব তাদের পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। যে ভালোমতো অনুসন্ধান করে তারপর নিজের মত প্রকাশ করে, তাকে অনুতাপ করতে হয় না। রাজার পক্ষে কাউকে বধ করা কোনো কঠিন কাজ নয়, এতে তার খ্যাতিও বৃদ্ধি পায় না। শক্তিশালী পুরুষ ক্ষমা করলে তার প্রশংসা করা হয়, তার যশবৃদ্ধি হয়। পুত্র ! একবার ভাবো, তুমি নিজেই শিয়ালকে মন্ত্রী করেছ, তোমার সামন্তদের মধ্যে এর খ্যাতি বৃদ্ধি হয়েছে। এরূপ সুযোগ্য মন্ত্রী পাওয়া খুবই কঠিন, সে তোমার হিতৈষী ; সুতরাং তাকে তোমার রক্ষা করা উচিত। যে অন্যের মিথ্যা কলঙ্কের কথায় নির্দোষীকে অপরাধী মনে করে শাস্তি দেয়, সেই রাজা দুষ্ট মন্ত্রীদের প্রভাবে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।'

বাঘের মা যখন এইসব উপদেশ দিচ্ছিল, তখন শত্রুদের মধ্যে থেকে এক ধর্মাত্মা উঠে বাঘের কাছে এল, সে শিয়ালের চর ছিল। সে ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিল। তখন বাঘ শিয়ালের সচ্চরিত্রতার কথা জেনে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করল এবং স্নেহপূর্বক তাকে বারংবার আলিঙ্গন করতে লাগল।

শিয়াল নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল, সে বাঘের অনুমতি নিয়ে উপবাসে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। বাঘ তাকে সেই কার্য করতে বাধা দিয়ে তাকে নানাভাবে আদর-আপ্যায়ন করল। সেই সময় স্নেহবশত তার চিত্ত বিকল হয়ে গিয়েছিল, মালিকের সেই অবস্থা দেখে শিয়ালের কণ্ঠ রোধ হয়ে এল, সে বাঘকে প্রণাম করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল—রাজন্ ! আপনি আগে আমাকে সম্মানিত করে, পরে অপমানিত করে শত্রুর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি আর আপনার কাছে থাকার যোগ্য নই। যাকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে, সম্মানিত স্থান থেকে নীচে নামানো হয়েছে, যার সর্বস্ব অপহরণ করা হয়েছে, যে দুর্বল, লোভী, ক্রোধী, ভীতু, যার অর্থ নিয়ে নেওয়া

হয়েছে, যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে—এরূপ সেবক সেই মালিকেরই সঙ্গে পরে শত্রুতা করে। আপনি নিজে পরীক্ষা করে, যোগ্য মনে করে আমাকে মন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন, এখন আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমাকে অপমান করেছেন, এই অবস্থায় আমার ওপর আপনার আর বিশ্বাস থাকবে না, আমিও আপনাকে বিশ্বাস করতে না পেরে উদ্বেগে থাকব। আপনি আমাকে সন্দেহ করবেন আর আমিও আপনাকে সর্বদা ভয় পাব। অন্যদিকে অপরের দোষ অনুসন্ধানকারী ভৃত্যরাও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, আমার ওপর তাদের কোনোরকম সহানুভূতি নেই, এদের সন্তুষ্ট রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। প্রীতিবন্ধন যখন একবার নষ্ট হয়ে যায় তখন সেটি পূর্ববৎ করা কঠিন হয়। আর যা পূর্ববৎ জোড়া থাকে তা ভাঙাও শক্ত হয়। কিন্তু যেটি বারবার ভাঙে, তাকে জোড়া মুস্কিল হয়। রাজাদের চিত্ত চঞ্চল হয়, তাদের পক্ষে সুযোগ্য লোক চেনা অত্যন্ত কঠিন। শত শত রাজার মধ্যে একজনই এমন পাওয়া যায়, সে সর্বভাবে সক্ষম হয় এবং কাউকে সন্দেহ করে না।'

এইভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যুক্তিপূর্ণ সান্ত্বনা বাক্য বলে শিয়াল বাঘকে প্রসন্ন করে বনে চলে গেল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল, তাই বাঘের অনুনয়-বিনয় না শুনে আমৃত্যু অনশনে থাকার ব্রতগ্রহণ করে একস্থানে উপবেশন করল এবং দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেল।

—o—

শক্তিশালী শত্রুর সামনে নম্র হওয়া ও মূর্খের কথা অগ্রাহ্য করার উপদেশ এবং রাজা ও রাজসেবকের গুণাদির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! রাজা এক দুর্লভ রাজ্য পেয়েও যদি সৈন্য বা রাজকোষের অর্থরহিত হন, তাহলে তাঁর থেকে শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে তিনি কীকরে যুদ্ধ করবেন ?

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে সমুদ্র ও নদীর কথোপকথনের পুরানো কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়। কোনো এক সময়ের কথা, নদীদের প্রভু—সমুদ্র, নদীদের কাছে নিজের মনের এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল—'নদীগণ !

আমি লক্ষ্য করেছি, তোমাদের জলে যখন বন্যা হয়, তোমরা বড় বড় বৃক্ষের মূল, শাখাসহ উপড়ে নিজের স্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত করো, কিন্তু সেই উৎপাটিত গাছগুলির মধ্যে বেতগাছ দেখা যায় না। বেত তো অত্যন্ত সরু, তাতে কোনো শক্তিই থাকে না আর সেগুলি নদীর ধারেই হয়ে থাকে ; তাহলেও তোমরা সেগুলিকে উপড়ে নাও না কেন ? এর কারণ কী ? তাকে দুর্বল মনে করে কি তোমরা ছেড়ে দাও, নাকি সে তোমাদের কোনো উপকার করেছে ? বেতের গাছ কেন তট থেকে ছেড়ে আসে না ? এ বিষয়ে আমি তোমাদের কথা জানতে চাই।'

তাঁর কথা শুনে গঙ্গাদেবী অর্থপূর্ণ, যুক্তিসম্মত এবং মনে দাগ কাটার মতো উত্তর দিলেন—'প্রভু ! বড় বড় বৃক্ষরাজি মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার স্রোতের সামনে মাথানত করে না, এই প্রতিকূল ব্যবহারের জন্যই তাদের স্থান ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু বেত নদীর বেগ দেখেই ঝুঁকে আসে, তারা সময়ানুসারে ব্যবহার করতে জানে, সর্বদা আমাদের অধীনে থাকে, মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে না ; এই অনুকূল ব্যবহারের জন্যই তাদের স্থান ছেড়ে আসতে হয় না।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এইরূপ যে রাজা তার থেকে বলবান এবং বিনাশ করতে সক্ষম শত্রুর প্রবল প্রাথমিক বেগ মাথানত করে সহ্য করে নেয় না, সে শীঘ্রই নাশ হয়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার এবং শত্রুর সার-অসার,

বল-পরাক্রম জেনে সেই অনুসারে আচরণ করে, সে কখনো পরাজিত হয় না। সুতরাং যখন শত্রুর পরাক্রম নিজের থেকে বেশি বলে মনে হয়, বিদ্বান ব্যক্তির তখন বেতের মতো নম্র হওয়া উচিত। বুদ্ধিমানের এই লক্ষণ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত ! যদি কোনো অসভ্য মূর্খ ব্যক্তি মিষ্ট অথবা তীক্ষ্ণ বাক্যে পূর্ণ সভাগৃহের মধ্যে কোনো বিদ্বান ব্যক্তির নিন্দা করে, তাহলে বিদ্বান ব্যক্তির তার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যে নিন্দাকারীর ওপর ক্রুদ্ধ হয় না, সে নিন্দাকারীর পুণ্যের ভাগী হয়ে স্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। তাই কটুবাক্য যে বলে তাকে বিভ্রান্ত মনে করে উপেক্ষা করা উচিত। সেই মূর্খ পাপ করে তথা নিজের তারিফ করে সর্বদা বলতে থাকে যে 'আমি অমুক লোককে সভাগৃহে এমন কথা শুনিয়ে দিয়েছি যে, সে লজ্জায় মুখ নীচু করে ছিল, মুখ শুকিয়ে গিয়ে মৃতের মতো বসে ছিল।' এইভাবে নিজের নিন্দনীয় কাজের উল্লেখ করে আত্মপ্রশংসা করতে থাকে। এরূপ নীচ ব্যক্তিদের সযত্নে পরিহার করতে হয়। মূর্খেরা যা বলে বিদ্বানদের তা সহ্য করে যেতে হয়। জঙ্গলে যেমন কাকগুলি বৃথাই 'কা'-'কা' করে, তেমনই মূর্খ ব্যক্তিও অকারণে অপরের নিন্দা করে অনুচিত আচরণে বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ সৃষ্টি করে। জগতে যার পক্ষে কোনো কিছু বলা বা করা অসম্ভব নয়, তেমন মানুষের সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়। যে ব্যক্তি সামনে প্রশংসা করে এবং পেছনে নিন্দা করে, সে তো কুকুরের সমান ; তার ইহলোক ও পরলোক দুই-ই নষ্ট হয়ে গেছে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির এরূপ প্রাণীর সংস্পর্শ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আমি এবার জানতে চাই যাতে রাজ্যের মঙ্গল হয়, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতে কল্যাণ ও অভ্যুদয়কারী, যাতে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়, সেই উপায় আমাকে বলুন ; কারণ আপনি এবং মহামন্ত্রী বিদুরই আমাদের বংশের হিতের জন্য সর্বদা রাজধর্মের উপদেশ প্রদান করে থাকেন। রাজা একাকী সমস্ত রাজ্য রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং তার কাছে কেমন ও কীরূপ গুণসম্পন্ন অনুচর থাকা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! কেউই সাহায্যকারী ছাড়া একাকী রাজ্য পরিচালনা করতে পারে না ; রাজা কেন, সহায়ক ব্যতীত কোনো কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। সিদ্ধ হলেও তা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে যায় ; অতএব সেবক থাকা প্রয়োজন। যার সকল সেবক সহায়ক, জ্ঞানী-গুণী, হিতৈষী, কুলীন—সেই রাজাই রাজ্যসুখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি কুলীন, যাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে শত্রুরা বশ করতে পারে না, যে রাজার সঙ্গে থেকে তাকে সুপরামর্শ প্রদান করে, সময়জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিগত ব্যাপার নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে না—যে রাজার কাছে এমন মন্ত্রী থাকে, সেই রাজাই রাজ্যের সুফল ভোগ করে। যে রাজার সহায়ক তার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখিত হয়, রাজার আর্থিক উন্নতির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং সত্যবাদী, সেই রাজ্যসুখ লাভ করে। যার দেশ দুঃখী নয়, যার বিচার-বিবেচনা উচ্চমানের এবং যে সর্বদা সৎমার্গে চলে, সেই রাজা রাজ্য ভোগ করে। বিশ্বাসী, সন্তুষ্ট এবং রাজকোষ বৃদ্ধিকারী, খাজাঞ্চী দ্বারা যার রাজকোষ সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেই রাজাই উত্তম। যাকে লোভ দিয়ে ভাঙানো যায় না, সঞ্চয়শীল, সুপাত্র, বিশ্বাসী মানুষকে যদি অন্নাদি-ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সেই রাজ্যের বিশেষভাবে উন্নতি হয়। যার নগরে কর্ম অনুসারে ফলপ্রদানকারী শঙ্খমুনি রচিত ন্যায়ের পালন পরিলক্ষিত হয়, সেই রাজাই ধর্মের ফল লাভ করেন। যে রাজা নিজের কাছে গুণী ব্যক্তির সমাবেশ করে এবং সময় অনুযায়ী রাজনীতির সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় নামক ছয়টি গুণের উপযোগ করে, সেই ধর্মের ফল পায়।

বুদ্ধিমান রাজার উচিত প্রথমে তার অনুচর ও মন্ত্রীদের সত্যতা, শুদ্ধতা, সরলতা, স্বভাব, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সদাচার, কৌলিন্য, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বল, পরাক্রম, প্রভাব, বিনয় ও ক্ষমা ইত্যাদি গুণের সম্বন্ধে জেনে নেওয়া। তারপর যাকে যে কার্যের জন্য যোগ্য মনে হয়, তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করে তার রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করা। অনুসন্ধান না করে কাউকে মন্ত্রী করবে না ; কারণ নীচ কুলের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় রাজার মঙ্গল হয় না এবং রাজ্যের উন্নতিও হয় না। কোনো কুলীন ব্যক্তি অপরাধ না করা সত্ত্বেও যদি রাজা তাকে অসম্মান করে, তাহলে সেই

ব্যক্তি তার কৌলিন্যতার জন্য কখনো রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে না। কিন্তু নীচকুলের মানুষ রাজার আশ্রয়ে থেকে দুর্লভ ঐশ্বর্য উপভোগ করলেও যদি কোনো কারণে রাজা তার নিন্দা করে, তাহলে সে রাজার শত্রু হয়ে যায়। সুতরাং মন্ত্রী তাকেই করবে যে ব্যক্তি কুলীন, শিক্ষিত, বুদ্ধিবান, জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিপুণ, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, সহনশীল, স্বদেশবাসী, কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ, অল্পে সন্তুষ্ট, নিজ প্রভু ও মিত্রের উন্নতিকামী, দেশ-কাল সম্পর্কে অবহিত, হিতৈষী, নিরলস, সন্ধি-বিগ্রহের সম্পর্কে অবহিত, দেশবাসীর প্রিয়, ব্যূহ নির্মাণে পারদর্শী, সেনাদের উৎসাহিত করতে দক্ষ, মানুষ চেনার ক্ষমতাসম্পন্ন, অহংকারবর্জিত, নির্ভীক, কার্যদক্ষ, বলবান, উচিত কর্মকারী, শুদ্ধ, রাজনীতিজ্ঞ, উদ্যোগী, জড়তা বর্জিত, শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন, মিষ্টভাষী, ধীর, শূরবীর এবং যে দেশ-কাল অনুযায়ী কর্মে সংলগ্ন থাকে।

যে রাজা এরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রী করে এবং কখনো তাকে অসম্মান করে না তার রাজ্যের খ্যাতি চাঁদের আলোর মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজারও উপরিউক্ত গুণে গুণবান হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মপরায়ণতা এবং প্রজাপালনাদি গুণও থাকা আবশ্যক। রাজা ধীর, ক্ষমাশীল, পবিত্র, মানুষ এবং সময় সম্বন্ধে সজাগ, গুরুজনের সেবাকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, স্মরণ-শক্তিসম্পন্ন, ন্যায়ের পথ অনুসরণকারী, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়ভাষী, শ্রদ্ধাবান এবং দুঃখীদের সাহায্যকারী হবে। সে যেন অহংকারী না হয়, কর্তব্যপরায়ণ হবে, নিজের ভক্তদের প্রীতির চক্ষে দেখবে, উপযুক্ত মানুষ সংগ্রহ করবে, জড়ত্ব ত্যাগ করবে, সদা প্রসন্নবদনে থাকবে, অনুচরদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, ক্রোধী হবে না, উদার হৃদয় হবে, রাজদণ্ড কখনো ত্যাগ করবে না, ন্যায় অনুযায়ী রাজদণ্ড ব্যবহার করবে, গুপ্তচররূপ নেত্র দ্বারা সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং ধর্ম ও অর্থের বিষয়ে সর্বদা পারদর্শী হবে। এরূপ বহু গুণসম্পন্ন রাজাই প্রজাদের কাছে বাঞ্ছনীয় হয়।

রাজন্! রাজ্য রক্ষার সহায়তায় থাকা সমস্ত সৈনিকেরও এরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত। সেজন্য ভালো ব্যক্তির অনুসন্ধান করতে হয় এবং এদের কখনো অসম্মান করা উচিত নয়। যার যোদ্ধারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে, কৃতজ্ঞ, অস্ত্র চালনায় নিপুণ, নির্ভয়, ধর্মজ্ঞ এবং ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী—এই পৃথিবী সেই রাজার অধীন হয়।

যে রাজা সেবকদের গুণ এবং স্বভাব জেনে, তাদের যোগ্য কার্যে নিযুক্ত করে, সেই রাজা রাজ্যের সুফল ভোগ করে। মন্ত্রীপদেও তাকেই নিযুক্ত করা উচিত, যার মধ্যে সেই পদের অনুরূপ গুণ এবং কার্যভার পরিচালনার যোগ্যতা আছে। যে রাজা ভৃত্যকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেয়, সেই রাজা রাজ্য থেকে সুখ পায় ; সেই জন্য মূর্খ, ক্ষুদ্র, বুদ্ধিহীন, অজিতেন্দ্রিয় এবং নীচকুলের মানুষদের রাজ্যের উচ্চ পদে নিযুক্ত করা উচিত নয়। যারা সজ্জন, কুলীন, শূর, জ্ঞানী, কারো নিন্দা করে না, উত্তম, পবিত্র, কর্মদক্ষ, তারাই রাজার মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য। এরূপ সাহায্যকারী লাভ করলে সমস্ত পৃথিবী জয় করা সম্ভব। যেসব ব্যক্তি নির্দেশ পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রভুর কাজ সম্পন্ন করে এবং সর্বদা রাজার হিতকামনা করে, সেই সেবকদের সর্বদা খুশি রাখা উচিত। রাজার সযত্নে নিজ রাজকোষ রক্ষা করা উচিত। কারণ রাজকোষই রাজ্যের প্রাণশক্তি, তার দ্বারাই রাজার উন্নতি হয়। যুধিষ্ঠির ! ভাণ্ডার গৃহও ভালো ভালো খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ভরে রাখবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যোগ্য ব্যক্তির হাতে রাখবে। এইভাবে ধন ও ধান্য সংগ্রহ করে রাখবে। তোমার যুদ্ধকুশল যোদ্ধাদের শারীরিক পটুতা বজায় রাখতে সর্বদা অভ্যাসে রাখবে। আত্মীয়-বন্ধুদের দেখাশোনা করবে এবং তাদের হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকবে। দেশবাসীদেরও ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

—— o ——

রাজধর্ম এবং দণ্ডদানের রূপরেখা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! এবার আপনি সংক্ষেপে আমাকে প্রাচীন রাজাদের ধর্মপালন সম্বন্ধে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ক্ষত্রিয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হল—সমস্ত প্রাণীদের রক্ষা করা। কিন্তু তা কীকরে সম্ভব ? আমি সেই কথাই বলছি, শোনো ! রাজার সময় মতো উগ্র শান্ত ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করতে হয়। যে কাজের জন্য যেটি হিতকর বলে মনে হয়, তাতে তাঁর সেই রূপ ধারণ করা উচিত। (উদাহরণ—অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানের সময় উগ্ররূপ, দীনকে অনুগ্রহ করার সময় শান্ত, দয়ালুরূপ)। এভাবে বহুরূপ ধারণকারী রাজার সাধারণ কাজও নষ্ট হয় না। শরৎ ঋতুতে যেমন ময়ূর ডাকে না তেমনই রাজাও মৌন থেকে গুপ্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে না। যদি কথা বলতেই হয় তাহলে মিষ্টবাক্য বলবে, তা-ও অতি অল্প।

রাজা সকলের প্রিয় কাজ করবে, কিন্তু ধর্মে বাধা আসতে দেবে না। যার সুব্যবহারে প্রসন্ন হয়ে সমস্ত প্রজা তাকে আপন বলে মনে করে, সেই রাজা পর্বতের ন্যায় অচল হয়। সূর্য যেমন সবার ওপর সমানভাবে নিজ কিরণ বর্ষণ করে, তেমনই রাজা ন্যায় কাজের সময় কোনো পক্ষপাতিত্ব করবে না। প্রিয়-অপ্রিয়কে সমান মনে করে একমাত্র ধর্মেরই রক্ষা করবে। যে ব্যক্তি কুলধর্ম, প্রকৃতি ধর্ম এবং দেশধর্ম সম্পর্কে অবহিত ও মিষ্টভাষী, যার যৌবন কলঙ্কিত হয়নি, যে হিত-সাধনে ব্যাপৃত, ধৈর্যবান, নির্লোভ, শিক্ষিত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম-অর্থ রক্ষা করে, তেমন পুরুষকেই রাজ্যের সবকাজে লাগানো উচিত।

এইভাবে সদা সতর্ক থেকে রাজ্যের প্রত্যেক কার্য আরম্ভ ও সমাপ্ত করা উচিত। মনে সন্তোষ রাখবে এবং গুপ্তচরদের সাহায্যে রাষ্ট্রের সব ঘটনার সংবাদ রাখবে। যার ক্রোধ ও হর্ষ নিষ্ফল হয় না, যার দয়া সর্বোপরি বিদিত, যে যথার্থ কারণেই দণ্ড প্রদান করে এবং নিজেকে ও নিজের দেশকে রক্ষা করে, সেই রাজাই রাজধর্মের জ্ঞাতা। সূর্য যেমন তার কিরণের দ্বারা জগৎকে নিরীক্ষণ করে, রাজারও তেমনই নিজের নেত্রদ্বারা সর্বদা রাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করা উচিত। সময়ানুসারে কাজ করবে এবং রাজকোষের কথা কাউকে জানাবে না। মৌমাছি যেমন সমস্ত ফুল থেকে অল্প অল্প মধু সংগ্রহ করে মধুভাণ্ডার গড়ে তোলে, রাজারও তেমনই প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা উচিত।

রাজ্যরক্ষা এবং বেতনাদি প্রদান করার পর যে অর্থ অবশেষ থাকে সেটি ধর্ম ও নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা উচিত। শাস্ত্রজ্ঞ রাজার যতদূর সম্ভব, রাজকোষের অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়। অল্প ধন সংগ্রহ হলেও, তার অনাদর করবে না, শত্রুকে কখনো ছোটো মনে করবে না, বুদ্ধির দ্বারা নিজের অবস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করবে এবং মূর্খকে কখনো বিশ্বাস করবে না। স্মরণশক্তি, চাতুর্য, সংযম, বুদ্ধি, শরীর, ধৈর্য, শৌর্য এবং দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে অজ্ঞতা না থাকা—ধনবৃদ্ধির এই আটটি সাধন। শত্রু বালক, বৃদ্ধ এবং যুবক হোক না কেন, সাবধানে না থাকলে সে মানুষকে বিনাশ করতে পারে। সুতরাং মনকে বশে রাখে যে রাজা, সে শত্রুর দিকে অসতর্ক থাকে না। লাভ-ক্ষতি-রক্ষা ও সংগ্রহ ইত্যাদিকে ভালোভাবে জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা বিগ্রহ করে, এতে বুদ্ধিমানের মতো স্থির চিত্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। পরিমার্জিত বুদ্ধি বলশালীকেও পরাস্ত করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলকে রক্ষা করে। বলশালী শত্রুকে বুদ্ধির দ্বারাই সংকটগ্রস্ত করা যায়, তাই বুদ্ধির দ্বারা বিচার করার পরে যে কাজ করা হয়, সে কাজই উত্তম হয়। যে রাজা সর্বপ্রকার দোষ ত্যাগ করেছে, সেই ধৈর্যশীল রাজা সামান্য সৈন্যের দ্বারাই সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়।

স্নেহশীল হয়েই প্রজাদের ওপর থেকে কর গ্রহণ করবে, তাদের কষ্ট না দিয়ে, নিজের কঠিন প্রভাব না দেখিয়েই কর আদায় করবে। লোভী ব্যক্তি অন্যের ধন, ভোগসামগ্রী, স্ত্রী. পুত্র, সমৃদ্ধি আত্মসাৎ করে নিতে চায়, তার মধ্যে সর্বপ্রকার দোষের বিস্তার হতে থাকে ; অতএব লোভীকে নিজের কাছে রাখবে না। যে রাজা ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণদের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে, যে মন্ত্রীদের দ্বারা সুরক্ষিত, প্রজার বিশ্বাসপাত্র এবং কুলীন, সে সমস্ত সামন্ত-রাজাদের নিজবশে রাখতে সক্ষম। রাজন্ ! আমি সংক্ষেপে যে রাজধর্মের বর্ণনা করলাম, বুদ্ধিদ্বারা তার বিচার করে উপযোগ কোরো। যে এগুলি ঠিকমতো বুঝে আচরণ করে, সে-ই নিজ রাজ্য রক্ষা করতে পারে। যার সুখভোগ হঠকারিতা, অন্যায় এবং আইনের বলে অবস্থিত, সেই রাজা পরলোকে উত্তম গতি লাভ করে না এবং তার রাজ্য-সুখও বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি যে সনাতন রাজধর্মের বর্ণনা করলেন, সেই অনুসারে দণ্ডই সবকিছুর ঊর্ধ্বে, দণ্ডের আধারেই সবকিছু নির্ভর করছে। দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, মহাত্মা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ এবং জগতের সমস্ত প্রাণীর জন্য দণ্ডই কল্যাণের সাধন। এর ওপরই জগৎ চরাচর প্রতিষ্ঠিত ; তাই আমি জানতে চাই দণ্ড কী ? কেমন ? তার স্বরূপই বা কী প্রকার ? কার আধারে এটি স্থিত, সেই সঙ্গে বলুন যে দণ্ডের উপাদান কী ? কীসে তার উৎপত্তি হয়েছে, তার আকার কেমন এবং তা কীভাবে সতর্ক হয়ে সমস্ত প্রাণীকে শাসন করার জন্য জাগ্রত থাকে ?

ভীষ্ম বললেন—কুরুনন্দন ! দণ্ডের স্বরূপ এবং কীভাবে তা ব্যবহৃত হয়, তা সবই তোমাকে জানাচ্ছি, শোনো। এই সংসারে সব কিছুই দণ্ডের অধীন। ধর্মের মধ্যে দণ্ডকে গণনা করা হয়, একে ন্যায়ও বলা হয়। জগতে যাতে কোনোভাবে ধর্ম ও ন্যায় লোপ না পায়—তার জন্য দণ্ড আবশ্যক। মর্যাদাপূর্বক ব্যবহারের রক্ষার জন্যই একে ব্যবহার বলা হয়। পূর্বকালে মনু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে রাজা প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান ভেবে পক্ষপাতিত্ব না করে দণ্ডের ঠিকমতো ব্যবহার করে প্রজাপালন করবেন—তাঁর সেই কাজকে ধর্ম বলে মনে করা হবে। আমি যে দণ্ডের কথা বলেছি, তা ব্রহ্মার মহান বাক্য। সর্বপ্রথম মনুই এটি বলেছিলেন, তাই একে 'প্রাগ্বচন' বলা হয় এবং ব্যবহারের প্রতিপাদন করার জন্য এটি প্রয়োগ করা হয়। দণ্ডের ঠিকমতো প্রয়োগ হলেই ধর্ম, অর্থ ও কামের অস্তিত্ব বজায় থাকে ; তাই দণ্ড এক মহান দেবতা। এর স্বরূপ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। তলোয়ার, ধনুক, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুগুর, বাণ, মুসল, চক্র, পাশ, দণ্ড ইত্যাদি যে সব আঘাত করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র আছে, সেই সবের রূপে সর্বাত্মা দণ্ডই মূর্তিমান হয়ে বিচরণ করে। এগুলিই অপরাধীকে বিদ্ধ করে, পীড়িত করে, কাটে এবং মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এইভাবে দণ্ডই জগতে সর্বত্র বিচরণ করে।

সর্বত্র ব্যাপক হওয়ার কারণ দণ্ড হল ভগবান বিষ্ণু এবং মানুষের অয়ন (আশ্রয়) হওয়ায় তাঁকে নারায়ণ বলা হয়। এটি মহান সনাতন স্বরূপ ধারণ করে, তাই তাকে মহাপুরুষ বলা হয়। এইভাবে দণ্ডনীতিকেও ব্রহ্মার কন্যা বলা হয় ; লক্ষ্মী, বৃত্তি, সরস্বতী এবং জগদ্ধাত্রীও তারই নাম ; দণ্ডের এইরূপ নানাস্বরূপ আছে। অর্থ-অনর্থ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, বল-অবল, দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য, গুণ-দোষ, কাম-অকাম, ঋতু-মাস, রাত-দিন, ক্ষণ, প্রমাদ-অপ্রমাদ, হর্ষ-বিষাদ, শম-দম, দৈব-পুরুষার্থ, বন্ধ-মোক্ষ, ভয়-অভয়, হিংসা-অহিংসা, তপ, যজ্ঞ, সংযম, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য, নীতি-অনীতি, শক্তি-অশক্তি, মান-অপমান, ব্যয়-অব্যয়, দান, কাল-অকাল, সত্য-অসত্য, জ্ঞান, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, অকর্মণ্যতা-উদ্যোগ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, কঠোরতা-কোমলতা, মৃত্যু, আসা-যাওয়া, বিরোধ-অবিরোধ, কর্তব্য-অকর্তব্য, অসূয়া-অনসূয়া, লজ্জা-অলজ্জা, সম্পত্তি-বিপত্তি, স্থান, তেজ, কর্ম, পাণ্ডিত্য, বাক্‌শক্তি ও তত্ত্ববোধ—এ সবই দণ্ডবিধির বিবিধ রূপ।

যুধিষ্ঠির ! জগতে যদি দণ্ড ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে লোকে একে অপরকে শেষ করে দিত। দণ্ডের ভয়েই কেউ কারো ওপর আঘাত করে না। দণ্ডদ্বারা সুরক্ষিত থেকেই প্রজারা তার রাজার দিন দিন উন্নতিসাধন করে, তাই দণ্ড সকলের চালিকা শক্তি। দণ্ড এই জগৎকে শীঘ্রই সত্যে স্থাপিত করে। সত্যেই ধর্মের স্থিতি এবং ধর্ম ব্রাহ্মণদের মধ্যে থাকে। ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ বেদের স্বাধ্যায় করেন, বেদ হতেই যজ্ঞ উৎপন্ন হয়েছে, যজ্ঞের দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন। প্রসন্ন দেবতাগণ প্রত্যহ ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেন, তাতে ইন্দ্র প্রজাগণের ওপর অনুগ্রহ করে (সময়মতো বর্ষার দ্বারা কৃষির সহায়তা করে) অন্ন প্রদান করেন এবং সমস্ত প্রাণীর প্রাণ অন্নের ওপরই নির্ভর করে। তাই দণ্ডদ্বারাই প্রজাদের অবস্থিতি বজায় থাকে, দণ্ডই তাদের জন্য সর্বদা জাগ্রত থাকে। দণ্ড সদা সাবধান থাকে এবং তা অবিনাশী, রক্ষারূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য সে ক্ষত্রিয়। দণ্ডের আট নাম হল—ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা এবং জীব। উত্তম কুল, অত্যন্ত ধনবান ও ধীমান মন্ত্রী, বুদ্ধি, তেজ, ওজ, সাহসরূপ বল এবং (পূর্বে কথিত) অষ্টাঙ্গ বলদ্বারা উপার্জন করার যোগ্য যে ধনধান্য এবং অর্থের বল, এসব রাজার কাছে থাকা উচিত। হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক, নৌকা, বেগার, দেশের প্রজা ও মেষ ইত্যাদি পশু—এই আট অঙ্গসম্পন্ন বল। রথী, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, নিয়ম বিশারদ, জ্যোতিষী, দৈব অনুকূল করার জন্য পূজাপাঠকারী, অর্থ, মিত্র, ধান্য ও অন্য সব সামগ্রী—এই সাত প্রকৃতি এবং আট অঙ্গযুক্ত সেনার শরীর। এই সেনা

দণ্ডেরই অন্তর্গত, অতএব দণ্ডই রাজ্যের প্রধান শক্তি ; সেটিই উৎপত্তির মুখ্য কারণ।

ঈশ্বর জগৎ রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়কে দণ্ড প্রয়োগের অধিকার দিয়েছেন। সকলের প্রতি সমভাবে পক্ষপাতরহিত হয়ে ব্যবহার করলেই দণ্ডের স্বরূপ রক্ষা হয়। রাজার কাছে দণ্ডরূপ ধর্মাপেক্ষা বেশি আর কিছুই পূজনীয় নয়। ব্রহ্মা স্বধর্ম-স্থাপন ও লোকরক্ষার জন্যই দণ্ডনীতিময় ধর্মের উপদেশ প্রদান করেছেন।

দণ্ডই সনাতন ব্যবহার, ব্যবহারই বেদ, বেদই ধর্ম এবং ধর্মই সৎপুরুষদের পথ। লোকপিতামহ ব্রহ্মাই সৎপুরুষ, যিনি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, মানুষ, সর্পাদিযুক্ত জগৎ রচনা করেছিলেন। পরে বাদী-প্রতিবাদীর বিবাদ নির্ণয়রূপ যে ব্যবহার (ন্যায়), তার উপদেশ দেন। ব্রহ্মা ন্যায় করার সময় ন্যায়কর্তার সামনে এই আদর্শ রাখেন যে যদি মাতা-পিতা-ভাই-স্ত্রী ও পুরোহিতও নিজ ধর্মে স্থির না থাকে, তাহলে রাজার উচিত তাকে দণ্ডপ্রদান করা ; তাঁর কাছে কেউই অদণ্ডনীয় নয়।

দণ্ডের উৎপত্তি এবং ক্ষত্রিয়ের হাতে দণ্ড প্রদানের অধিকার আসার পরম্পরার বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—এই দণ্ডের উৎপত্তির বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে। আমি তোমাকে তার সম্বন্ধে বলছি। অঙ্গদেশে বসুহোম নামে এক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মাত্মা। কোনো এক সময়ের কথা। রাজা বসুহোম তাঁর রানিকে নিয়ে পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং ঋষিগণ পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক স্থানে গিয়েছিলেন। সেটি হিমালয় পর্বতের এক শিখর। একদিন সেখানে মণ্ডাবটের নীচে পরশুরাম তাঁর জটা বেঁধে রেখেছিলেন, তখন থেকে ঋষিরা তার নাম 'মুঞ্জপৃষ্ঠ' রেখেছিলেন। সেখানে ভগবান শংকরের নিবাস। রাজা বসুহোম সেখানে থেকে বহু বেদোক্তগুণ অর্জন করলেন। তিনি তপপ্রভাবে দেবর্ষিতুল্য হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত হতে থাকলেন।

একদিন রাজা মান্ধাতা তাঁকে দর্শন করতে গেলেন। মহারাজ বসুহোমকে কঠোর তপস্যায় রত দেখে তিনি বিনীতভাবে সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। সেইসময় অঙ্গরাজও পাদ্য-অর্ঘ্য অর্পণ করে মান্ধাতার আতিথ্য-সৎকার করে তাঁর রাজ্যের কুশল-সংবাদ জানতে চাইলেন। তারপর প্রজাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং অনুচরদের কথা জিজ্ঞাসা করে তিনি বললেন—'মহারাজ! বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?'

মান্ধাতা বললেন—'রাজন্ ! আপনি বৃহস্পতির সিদ্ধান্তসমূহ পূর্ণ অধ্যয়ন করেছেন, সেই সঙ্গে শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্রও বিশেষভাবে জেনেছেন। তাই আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে, দণ্ডের উৎপত্তি কেমন করে হল ? এর কার্য-কারণ কী ? এবং দণ্ড-প্রয়োগের ভার ক্ষত্রিয়দের ওপর কেন অর্পণ করা হয়েছে ? আমি শিষ্যভাবে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি এই সম্বন্ধে বলুন।'

বসুহোম বললেন—'রাজন্ ! দণ্ড সমস্ত জগৎকে নিয়মের মধ্যে রক্ষা করে, এটি ধর্মের সনাতন আত্মা, এর উদ্দেশ্য হল—প্রজাদের উদ্দামতা থেকে রক্ষা করা। কীভাবে এর উৎপত্তি হল, বলছি, শুনুন। শোনা যায় যে, কোনো এক সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো যোগ্য ঋত্বিক পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করেন, সেই গর্ভ এক হাজার বর্ষ ধরে তাঁর মস্তকে অবস্থিত ছিল। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হলে ব্রহ্মার একবার হাঁচি আসে, হাঁচির সঙ্গে সেই গর্ভও নাসাপথে বাইরে এসে পড়ে। তার থেকে যে বালক জন্ম নেয়, সে প্রজাপতি ক্ষুপ—এই নামে প্রসিদ্ধ। প্রজাপতি ক্ষুপই ব্রহ্মার যজ্ঞে ঋত্বিক হয়েছিলেন। (যজ্ঞের দীক্ষা নেওয়ার পরে ব্রহ্মার চেহারায় বিনয়, শান্তি ইত্যাদি গুণের ঝলক দেখা দিল। প্রজাদের শাসন করার সময় তাঁর দেহে যে উগ্রতা দেখা যাচ্ছিল, তা আর ছিল না, তাই) যজ্ঞ শুরু হওয়া মাত্রই প্রত্যক্ষভাবে শান্তরূপের প্রাধান্য হওয়ায় দণ্ড অদৃশ্য হল। ফলে প্রজাদেরও দণ্ড (শাস্তি) পাওয়ার ভয় দূর হয়ে গেল।

দণ্ড লুপ্ত হতেই প্রজাদের মধ্যে বর্ণসংকরতার (ব্যভিচারের) মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কর্তব্য-অকর্তব্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, পেয়-অপেয় এবং গম্য-অগম্যের বিচার দূর হয়ে গেল এবং একে অপরের প্রাণ নিতে শুরু করল। নিজের এবং অন্যের ধন একই মনে করে দখল করে নিল। কুকুরেরা যেমন এক টুকরো মাংস নিয়ে মারামারি করে,

তেমনই মানুষেও একে অপরের ধন নিয়ে মারামারি করতে লাগল। বলবানেরা দুর্বল মানুষকে হত্যা করতে থাকল। সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে গেল।

তা লক্ষ্য করে পিতামহ ব্রহ্মা সনাতন ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করে মহাদেবকে বললেন—'ভগবন্‌! আপনি এখন কৃপা করে এর উপায় স্থির করুন, যাতে প্রজাদের মধ্যে বর্ণসংকরতা ছড়িয়ে না পড়ে।' ভগবান শূলপানি তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিজেকেই দণ্ড রূপে রূপান্তরিত করলেন। তাতে প্রজাদের মধ্যে ধর্মযুক্ত আচরণ হতে দেখে নীতিদেবী সরস্বতী লোক-বিখ্যাত দণ্ডনীতি রচনা করেন। তারপর ত্রিশূলধারী ভগবান শংকর কিছু চিন্তা করার পর এক-একটি অংশের এক একজন করে রাজা সৃষ্টি করলেন। তিনি ইন্দ্রকে দেবতাদের, যমকে পিতৃপুরুষের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসদের, মেরুকে পর্বতের, সমুদ্রকে স্রোতস্বিনীদের, বরুণকে জল ও অসুরদের, মৃত্যুকে প্রাণের, বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণদের, অগ্নিকে বসুদের, সূর্যকে তেজের, চন্দ্রকে তারাদের এবং ঔষধির, কুমার কার্তিকেয়কে ভূতদের এবং কালকে সকলের রাজা করে দিলেন। এরপরে ভগবান শূলপানি স্বয়ং রুদ্রদের রাজা হলেন। ব্রহ্মাপুত্র ক্ষুপকে তিনি সমস্ত প্রজাদের আধিপত্য প্রদান করলেন।

তারপর ব্রহ্মার সেই যজ্ঞ যখন যথা নিয়মে সমাপ্ত হল তখন মহাদেব ধর্মরক্ষক ভগবান বিষ্ণুর সংকার করে তাঁকে সেই দণ্ড অর্পণ করলেন। বিষ্ণু সেটি অঙ্গিরাকে দিলেন, অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে, ভৃগু ঋষিদের, ঋষিরা লোকপালদের, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুকে এবং মনু সূক্ষ্ম-ধর্ম এবং অর্থের রক্ষার জন্য সেটি নিজ পুত্রদের সমর্পণ করলেন। সুতরাং ধর্ম অনুসারে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেই দণ্ডবিধান করা উচিত। দুষ্টদের দমন করাই দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপরাধীর থেকে যে সুবর্ণ ইত্যাদি সম্পদ আদায় করা হয়, তা বাইরের লোকেদের ভয় পাওয়াবার জন্যই, অর্থকোষ বৃদ্ধি করার জন্য নয়। ছোটখাট অপরাধের জন্য প্রজাদের অঙ্গচ্ছেদ করা, হত্যা করা, শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া বা দেশ থেকে বহিষ্কার করা উচিত নয়। বৈবস্বত মনু প্রজাদের রক্ষা করার জন্যই তাঁর পুত্রের হাতে দণ্ড সমর্পণ করেছিলেন, সেটিই পরম্পরায় অধিকারীদের হাতে এসে প্রজাদের রক্ষার জন্য নিরন্তর জাগ্রত থাকে।

প্রজাপালন এবং দণ্ডের অধিকার ব্রহ্মার কাছ থেকে মহাদেব প্রাপ্ত হন, তাঁর থেকে বিশ্বদেবদের, বিশ্বদেবদের থেকে ঋষিগণ, ঋষিগণের থেকে সোম, সোম থেকে সনাতন দেবতাগণ এবং দেবতাগণ থেকে ব্রাহ্মণরা সেটি প্রাপ্ত হন। সেইসময় ব্রাহ্মণরাই লোকরক্ষার জন্য সতর্ক থাকতেন। পরে ক্ষত্রিয়রা এই অধিকার ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে লাভ করেন। তখন থেকে ক্ষত্রিয়রাই জগৎ রক্ষা করে আসছেন। এই কালরূপ দণ্ড সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তেও জাগরিত থাকে। সে-ই সমস্ত লোকের ঈশ্বর বা প্রজাপতি। এটি সাক্ষাৎ মহাদেবের স্বরূপ। ধর্মজ্ঞ রাজার ন্যায় অনুসারেই দণ্ডের ব্যবহার করা উচিত।

ভীষ্ম বললেন—যে রাজা বসুহোম কথিত এই সিদ্ধান্ত শোনে এবং সেই অনুযায়ী ঠিকমতো কার্যে পরিণত করে, তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। দণ্ড সম্বন্ধে যত কথা আছে, তা সবই আমি তোমাকে জানালাম। দণ্ডই সমস্ত জগৎকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে।

ত্রিবর্গের বিচার এবং আঙ্গরিষ্ঠ ও কামন্দকের সংবাদ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তাত! আমি এখন জানতে চাই যে ধর্ম, অর্থ ও কামের নির্ণয় কীভাবে করা উচিত? ধর্ম-অর্থ-কাম কী উদ্দেশ্যে করা হয়? এর উৎপত্তির কারণ কী? এগুলি কখনো একসঙ্গে কখনো পৃথকভাবে কেন থাকে?

ভীষ্ম বললেন—জগতে যখন মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সে ধর্মপূর্বক কিছু অর্থপ্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় যথাযোগ্য কাল, কারণ এবং সম্যক কর্মানুষ্ঠানুসারে ধর্ম-অর্থ-কাম—তিনটি একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ধর্ম অর্থের কারণ এবং কামকে অর্থের ফল বলা হয়। কিন্তু এই তিনেরই মূল কারণ হল সংকল্প। সংকল্প হল বিষয় রূপ এবং বিষয়াদির সার্থকতা হল ইন্দ্রিয়াদির উপভোগে। ধর্ম,

অর্থ ও কামের এই হল মূল। এর থেকে নিবৃত্ত হওয়াকেই মোক্ষ বলে। কর্মফলের আশা ত্যাগ করে ত্রিবর্গ সেবন করলে তার পর্যবসানও মোক্ষতেই হয়। মানুষ যদি তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় তবে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে ওঠে। অর্থ সিদ্ধির জন্য বুঝে-শুনে ধর্মানুষ্ঠান করলেও কখনো অর্থ সিদ্ধি হয়, কখনো হয় না ; এছাড়া কখনো অন্যান্য কাজেও অর্থ সিদ্ধি হয় আবার কখনো অর্থ নষ্টও হয়। ফলেচ্ছা ধর্মের মল, যেমন সঞ্চয় বৃত্তি হল অর্থের মল এবং স্বগুণবর্জিত হয়ে অর্থাৎ সন্তান উৎপত্তির উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু ইন্দ্রিয়সুখে কাম সেবন করা হল কামের মল।

বিজ্ঞ লোকেরা এই বিষয়ে রাজা আঙ্গরিষ্ঠ এবং কামন্দক ঋষির উপাখ্যান বলে থাকেন। সে এক প্রাচীন কাহিনী। কোনো এক সময়ের কথা, কামন্দক ঋষি তাঁর আশ্রমে বসেছিলেন ; তাঁকে প্রণাম করে রাজা আঙ্গরিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! রাজা যদি কাম ও মোহের বশে কোনো পাপ করে এবং পরে তার অনুতাপ হয়, তাহলে সেই পাপ দূর করার জন্য তার কী প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ?'

কামন্দক বললেন—রাজন্ ! যে ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করে কেবল সুখভোগের উদ্দেশ্যে কামসেবন করে, তার বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশই মোহ, তা ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই নষ্ট করে। এতে মানুষ নাস্তিক হয় এবং দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় প্রজারা তার সঙ্গ ত্যাগ করে, সাধু এবং ব্রাহ্মণরাও তাকে পরিত্যাগ করে। তখন তার জীবনে বিপদ আসে এবং সে প্রজাদের হাতেই মৃত্যুবরণ করে। অতএব আচার্যরা তার কর্তব্য হিসাবে বলেছেন—নিজ পাপের নিন্দা, নিরন্তর বেদাধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণদের সৎকার করা উচিত। ধর্মে মন স্থির করে, উত্তম কুলে বিবাহ করবে। উদার ও ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে, জলে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে এবং সর্বদা প্রসন্ন থাকবে। পাপীদের রাজ্যচ্যুত করে ধর্মাত্মাদের সঙ্গ করবে। মিষ্ট বাক্য এবং উত্তম কর্মের দ্বারা সকলকে প্রসন্ন রাখবে ও অন্যের গুণগান করবে। যে রাজা এইভাবে আচরণ স্থির করে, সে শীঘ্রই নিষ্পাপ হয়ে সকলের সম্মানের পাত্র হয়। এভাবে তার কঠিনতম পাপও দূর হয়।

শীল নিরূপণ—ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—নরশ্রেষ্ঠ ! মানুষ জগতে ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ শীলেরই অধিক প্রশংসা করে থাকে। আপনি যদি আমাকে তা শোনার অধিকারী মনে করেন, তাহলে কৃপা করে বলুন শীলের লক্ষণ কী ? কীভাবে তা প্রাপ্ত করা যায় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! ইন্দ্রপ্রস্থে যখন তোমার রাজসূয় যজ্ঞ হয়েছিল, সেই সময় তোমার অনুপম সমৃদ্ধি এবং সভাভবন দেখে দুর্যোধনের অত্যন্ত ঈর্ষা হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে সে তার পিতাকে সমস্ত কথা জানিয়েছিল। তখন ধৃতরাষ্ট্র তাকে বলেন—'পুত্র ! তুমি যদি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় অথবা তার থেকে বেশি রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করতে চাও, তাহলে শীলবান হও। শীলের দ্বারা ত্রিলোক জয় করা যায়। শীলবানদের পক্ষে এই সংসারে কোনো বস্তুই দুর্লভ নয়। মান্ধাতা এক রাত্রে, জনমেজয় তিন রাত্রে এবং নাভাগ মাত্র সাত রাত্রেই এই পৃথিবী জয় করেছিলেন। এই সকল রাজাই শীলবান ও দয়ালু ছিলেন। সুতরাং তাঁদের গুণের মূল্য হিসাবে পৃথিবী স্বেচ্ছায় তাঁদের অধীন হয়েছিল।'

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভারত ! যার দ্বারা রাজারা অতি শীঘ্র ভূমণ্ডলের রাজ্য লাভ করেছিলেন, সেই শীল কীভাবে লাভ করা যায় ?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—এই বিষয়ে এক পুরাতন কাহিনী আছে, শীলের প্রসঙ্গে নারদ সেই কথা বলেছিলেন। অনেক দিনের কথা, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁর শীলের সাহায্যে ইন্দ্রের রাজ্য অধিকার করে ত্রিলোকও নিজের অধীন করেন। সেই সময় ইন্দ্র বৃহস্পতির কাছে গিয়ে ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারের উপায় জানতে চান। বৃহস্পতি তাঁকে এর বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য শুক্রাচার্যের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে একাগ্র চিত্তে সেই কথাই জানতে চাইলেন। শুক্রাচার্য বললেন, 'এর বিশেষ জ্ঞান মহাত্মা প্রহ্লাদের কাছে আছে।' এই কথা শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত খুশি হয়ে ব্রাহ্মণ বেশে প্রহ্লাদের কাছে গেলেন।

সেখানে গিয়ে তিনি বললেন—'রাজন্! আমি শ্রেয়-লাভের উপায় জানতে চাই ; আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন।' প্রহ্লাদ বললেন—'বিপ্রবর ! আমি ত্রিলোকের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যস্ত থাকি ; তাই আপনাকে উপদেশ দেওয়ার মতো সময় আমার নেই।' ব্রাহ্মণ বললেন—'মহারাজ ! যখন সময় পাবেন, তখনই আমি আপনার কাছ থেকে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করতে চাই।'

ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠা দেখে প্রহ্লাদ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং শুভ সময় এলে তাঁকে জ্ঞানের তত্ত্ব বোঝালেন। ব্রাহ্মণও তাঁর গুরুভক্তির বিশেষ পরিচয় দিলেন। তিনি প্রহ্লাদের ইচ্ছানুযায়ী ন্যায়োচিত রীতিতে তাঁকে যথোচিত সেবা করলেন, পরে যথা সময়ে তাঁকে অনেক বার এই প্রশ্নই করলেন যে, 'ত্রিভুবনের উত্তম রাজ্য আপনি কীকরে লাভ করলেন ? আমাকে এর রহস্য বলুন।'

প্রহ্লাদ বললেন—'বিপ্রবর ! আমি 'রাজা' এই অহংকারবশে কখনো আমি ব্রাহ্মণদের নিন্দা করি না, অন্যদিকে তাঁরা যখন আমাকে শুক্রনীতি সম্পর্কে উপদেশ দেন, সেই সময় সংযম সহকারে তাঁদের কথা শুনি এবং তাঁদের নির্দেশ শিরোধার্য করি। যথাসাধ্য শুক্রাচার্য কথিত নীতিপথে চলি, ব্রাহ্মণদের সেবা করি, কারো দোষ দেখি না, ধর্মে মন ন্যস্ত রাখি, ক্রোধ জয় করে মনকে বশে রেখে ইন্দ্রিয়াদিকেও সর্বদা বশে রাখি। আমার এই ব্যবহার জেনেই বিদ্বান ব্রাহ্মণরা আমাকে নানা সদুপোদেশ প্রদান করেন, আমি তাঁদের কথামৃত পান করি। তাই চন্দ্র যেমন নক্ষত্রদের ওপর রাজত্ব করে, আমিও তেমনই স্বজাতির ওপর রাজত্ব করি। শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্রই এই পৃথিবীর অমৃত, উত্তম নেত্র এবং শ্রেয় লাভের সর্বোত্তম উপায়।'

প্রহ্লাদের কাছে এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েও ব্রাহ্মণ তাঁর সেবায় ব্যাপৃত থাকলেন। তখন প্রহ্লাদ বললেন—'বিপ্রবর ! তুমি আমাকে গুরুর ন্যায় সেবা করছ, তোমার এই আচরণে প্রসন্ন হয়ে আমি তোমাকে বর দিতে চাই। তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব।'

ব্রাহ্মণ বললেন—মহারাজ ! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে আমার প্রিয় কাজ করতে চান, তাহলে আমাকে আপনার শীল গ্রহণ করার বর প্রদান করুন।

তাঁর এই বর চাওয়াতে প্রহ্লাদ অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন. তিনি ভাবলেন 'ইনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন।' তা সত্ত্বেও তিনি 'তথাস্তু' বলে তাঁকে বর প্রদান করলেন। বর প্রাপ্ত হয়ে বিপ্র বেশধারী ইন্দ্র তো চলে গেলেন, কিন্তু প্রহ্লাদের অত্যন্ত চিন্তা হল। তিনি ভাবতে লাগলেন কী করা উচিত ? কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। এরমধ্যে তাঁর শরীর থেকে এক পরম কান্তিমান ছায়াময় তেজ মূর্তিধারণ করে প্রকাশিত হল। তাকে দেখে প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে ?' উত্তর এল—'আমি শীল, তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, তাই চলে যাচ্ছি। এবার যে তোমার শিষ্যরূপে একাগ্রচিত্তে সেবাপরায়ণ হয়ে এখানে ছিল ওই ব্রাহ্মণের দেহে বাস করব।' এই বলে সেই তেজ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করল।

সেই তেজ অদৃশ্য হতেই অপর একটি তেজ তার শরীর থেকে প্রকাশমান হল। প্রহ্লাদ তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে ?' সে বলল—'প্রহ্লাদ ! আমাকে ধর্ম বলে জেনো। আমিও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাছে যাচ্ছি ; কারণ যেখানে শীল থাকে, সেখানেই আমি থাকি।' এই বলে ধর্ম বিদায় নিতেই তৃতীয় তেজোময় বিগ্রহ দর্শন দিল। তাকেও সেই প্রশ্ন করা হল—'আপনি কে ?' সেই তেজস্বী উত্তর দিল—'অসুরেন্দ্র ! আমি সত্য, আমিও ধর্মকে অনুগমন করছি।' সত্য যাওয়ার পর আর এক মহাবলী পুরুষ সম্মুখে এল, জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানাল—'আমাকে সদাচার বলে। সত্য যেখানে থাকে, আমিও সেখানেই থাকি।' তার চলে যাওয়ার পর তাঁর শরীর থেকে অত্যন্ত জোরে গর্জন করতে করতে এক তেজস্বী পুরুষ সম্মুখস্থ হল। পরিচয় জানতে চাওয়ায় সে বলল—'আমি বল, সদাচার যেখানে গেছে, সেখানেই আমি যাচ্ছি।' এই বলে সেও চলে গেল।

তারপর প্রহ্লাদের দেহ থেকে এক প্রভাময়ী দেবী আবির্ভূত হলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—'আমি লক্ষ্মী, তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, তাই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি ; কারণ বল যেখানে থাকে, আমিও সেখানেই থাকি।' প্রহ্লাদ আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? ওই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কে ? আমি তার পরিচয় জানতে চাই।' লক্ষ্মী বললেন—'তুমি যাকে উপদেশ প্রদান করেছ, তিনি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের রূপে স্বয়ং সাক্ষাৎ ইন্দ্র।' ত্রিলোকে তোমার যে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে ছিল, তা তিনি নিয়ে নিয়েছেন। ধর্মজ্ঞ ! তুমি শীলের দ্বারাই ত্রিলোক বিজয় করেছিলে, তা জেনেই ইন্দ্র তোমার শীল অপহরণ করেছেন। ধর্ম, সত্য, সদাচার, বল এবং আমি

(লক্ষ্মী)—এগুলি সবই শীলের আধারেই বিরাজিত—শীলই সবকিছুর মূল।'

এই বলে লক্ষ্মী এবং শীল ইত্যাদি সমস্ত গুণ ইন্দ্রের কাছে চলে গেল। এই কথা শুনে দুর্যোধন পুনরায় তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কুরুনন্দন ! আমি শীলের তত্ত্ব জানতে চাই, আমাকে বুঝিয়ে বলুন এবং কীভাবে তা প্রাপ্ত করা যায়, সেই উপায়ও আমাকে বলে দিন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! শীলের স্বরূপ এবং তা পাবার উপায় মহাত্মা প্রহ্লাদ প্রথমেই জানিয়েছেন। আমি সংক্ষেপে শীলপ্রাপ্তির উপায় জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো—কায়-মনো-বাক্যে কারুর সঙ্গে দ্রোহ করবে না, সকলের ওপর দয়া করবে। নিজ শক্তি অনুসারে দান করবে—এগুলিই উত্তম শীল, সকলেই এর প্রশংসা করে থাকে। নিজের যে কাজ বা পুরুষার্থ দ্বারা অপরের মঙ্গল না হয় এবং যা করলে সঙ্কোচ বোধ হয়—সেই কাজ কখনো করা উচিত নয়। অল্প কথায় এই হল শীলের স্বরূপ। পুত্র ! এই তত্ত্ব ঠিকমতো বুঝে নাও এবং যদি যুধিষ্ঠিরের থেকেও বেশি সম্পত্তি লাভ করতে চাও, তাহলে শীলবান হও।'

ভীষ্ম বললেন—'কুন্তীনন্দন ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তুমিও সেই আচরণ করো, তাহলে তুমিও সেই ফল পাবে।'

যম ও গৌতমের কথোপকথন এবং বিপদকালে রাজার ধর্ম

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! অমৃত পান করলে যেমন তৃপ্তি না হয়ে পান করার ইচ্ছা বেড়েই চলে, তেমনই আপনার উপদেশ শুনে আমার মন ভরছে না, বরং আরও অধিক শোনার ইচ্ছা হচ্ছে ; সুতরাং ধর্মের কথা আরও বলুন। আপনার ধর্মোপদেশরূপ অমৃত পান করে আমার তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভীষ্ম বললেন—আমি এখন তোমাকে একটি প্রাচীন কাহিনী শোনাচ্ছি। পারিযাত্র নামক পর্বতের ওপর মহর্ষি গৌতমের মহান আশ্রম ছিল। গৌতম সেইখানে ষাট হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। একদিন উগ্র তপস্যারত সেই মহামুনির আশ্রমে লোকপাল যমরাজ স্বয়ং এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ঋষির দর্শনে প্রসন্ন হয়ে যম তাঁকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?'

গৌতম বললেন—ধর্মরাজ ! আপনি কৃপা করে বলুন কী কাজ করলে মানুষ মাতা-পিতার ঋণ থেকে মুক্ত হয় এবং পবিত্র ও দুর্লভ লোক কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

যমরাজ বললেন—মানুষ তপস্যার অভ্যাস করবে, বাহির এবং অন্তরে পবিত্র থেকে সর্বদা সত্য ধর্ম পালন করবে। তার প্রত্যহ মাতা-পিতার সেবায় ব্যাপৃত থাকা উচিত এবং উপযুক্ত রাজার বহু দক্ষিণা দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা উচিত, এর দ্বারাই উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যদি রাজার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, মিত্ররা তাকে ত্যাগ করে এবং তার কাছে অর্থ ও সৈন্য না থাকে, তাহলে তার কী গতি হয় ? দুষ্ট মন্ত্রীদের দ্বারা রাজ্যের গুপ্তকথা ফাঁস হয়ে গেলে, রাজ্যভ্রষ্ট দুর্বল রাজার ওপর যখন বলবান শত্রু আক্রমণ করে এবং সামনীতির দ্বারা সন্ধির কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তখন কী করলে তার মঙ্গল হতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি তো অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছ ; তুমি যদি প্রশ্ন না করতে, তবে আমি ওই সময়ে ধর্মের পালনীয় উপদেশ দিতে পারতাম না। ধর্মের বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা তার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্র দ্বারা ধর্ম শ্রবণ করে তার পালনকারী এবং সদাচার পূর্বক সাত্ত্বিক জীবনযাপনকারী মানুষ অত্যন্ত বিরল। উপরিউক্ত সংকটের সময় রাজাদের জীবন রক্ষার জন্য আমি এমন উপায় বলছি, যাতে ধর্মের অংশই বেশি, মন দিয়ে শোনো। কিন্তু আমি ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে এইভাবে ধর্মের প্রশংসা করতে চাই না।

বিপদের সময় যদি প্রজাদের পীড়ন করে অর্থ আদায় করা হয়, তাহলে পরে তা রাজার কাছে মৃত্যুর সমান হয়ে ওঠে। সকলেরই এই মত। পুরুষ যেমন যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তেমন তেমনই তার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে ; তখন জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তার বিশেষ আগ্রহ জন্মায় এবং তার দ্বারা সে নিজেই সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় খুঁজে বার করে।

এখন তোমার প্রশ্ন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক কথা শোনো—

অর্থভাণ্ডার নষ্ট হলেই রাজার বল নষ্ট হয়। তাই তার উচিত প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে অর্থকোষ বৃদ্ধি করা। পরে সুসময় হলে প্রজাদের ধন ইত্যাদি দিয়ে অনুগ্রহ করবে—এটিই চিরকালের ধর্ম। প্রাচীনকালেও রাজারা বিপদের সময় এই উপায়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ধর্ম এক আর বিপদগ্রস্ত মানুষের ধর্ম অন্য। তাই প্রথমে অর্থ সংগ্রহ করে পরে ধর্মপালন করা উচিত।

রাজা এমন আচরণ করবে, যাতে তার ধর্মও বজায় থাকে আর শত্রুর অধীন না হতে হয়। সে যেন নিজেকে বিপদগ্রস্ত না করে। নানা উপায়ের দ্বারা নিজের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে হয়। ধর্মবিদদের ধর্মে নিপুণতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত এবং ক্ষত্রিয়দের বাহুবলে। যেমন ব্রাহ্মণ জীবিকা বিনা কষ্ট পেলে যজ্ঞের অনধিকারীদের দ্বারাও যজ্ঞ করিয়ে নেয় এবং না খাওয়ার উপযুক্ত খাদ্যও খেয়ে নেয়, তেমনই জীবিকাহীন ক্ষত্রিয়ও তপস্বী এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেরই ধন নিয়ে নিতে পারে। অর্থভাণ্ডার ও সৈন্য নষ্ট হওয়ায় সকলের দ্বারা অপমানিত হলেও ক্ষত্রিয়ের কখনো ভিক্ষা করা উচিত নয় বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় নিজ ধর্ম অনুসারে যুদ্ধে বিজয়লাভ করে যে ধন উপার্জন করে, তাই উত্তম। তার নিজ গোষ্ঠীর কাছেও ভিক্ষা করে জীবন-নির্বাহ করা উচিত নয়।

বিপদকালে রাজা এবং রাজ্যের প্রজা—একে অপরকে রক্ষা করা উচিত, তাই ধর্ম। যদি প্রজাদের কোনো বিপদ আসে তাহলে রাজা রাশি রাশি ধন দিয়ে তাদের বিপদ হতে উদ্ধার করবে, তেমনই রাজার কোনো সংকট হলে প্রজাদের উচিত তাকে রক্ষা করা। রাজা জীবিকার জন্য কষ্ট পেলেও অর্থকোষ, রাজদণ্ড, সেনা, মিত্র এবং অন্য সঞ্চিত সাধনগুলিকে কখনো রাজ্য থেকে অপসারণ করা উচিত নয়। মহামায়াবী শম্বাসুরের বক্তব্য হল যে, মানুষের নিজের খাদ্যের অন্ন থেকেও বাঁচিয়ে বীজরক্ষা করা উচিত—ধর্মজ্ঞদের এই মত। যে রাজ্যের প্রজাদের অন্নকষ্ট থাকে এবং মানুষ জীবিকার জন্য বিদেশে পাড়ি দেয়, সেই রাজাকে ধিক্কার। রাজার মূল হল অর্থকোষ ও সৈন্য, সৈন্যের মূল হল অর্থ ; তাই সবকিছুর মূল অর্থকে বৃদ্ধি করা। অর্থ না থাকলে সেনা কীকরে থাকবে ? সুতরাং বিপদের সময় ধন-সংগ্রহের জন্য প্রজাদের যদি একটু বেশি কর দিতে হয়, তাহলে রাজার কোনো দোষ হয় না। যুধিষ্ঠির ! রাজার কাছে রাজ্য রক্ষার থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই, এটিই রাজার প্রধান ধর্ম বলা হয়। ওপরে এই ধর্মের বিপরীতে প্রজাকে কষ্ট দিয়ে যে ধন আহরণের কথা বলা হয়েছে, তা শুধু বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সর্বকালের জন্য নয়। সুতরাং ধর্ম দ্বারাই কিছু অর্থ সংগ্রহ করবে, এর জন্য কখনো অধর্মের আশ্রয় নেবে না।

—০—

বিপদগ্রস্ত রাজার কর্তব্য এবং মর্যাদাপালনকারী দস্যুদের সদ্‌গতির বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে রাজার শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, যে দীর্ঘসূত্রী, যার নগর ও রাষ্ট্র শত্রু অধিকার করে নিয়েছে, যার মন্ত্রীরা একমত নয়, বলবান শত্রুরা যাকে আশঙ্কিত করে তুলেছে, তার কী করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! বহিরাগত শত্রু যদি ধর্ম ও অর্থে কুশল এবং পবিত্র চরিত্রের হয়, তাহলে তার সঙ্গে শীঘ্রই সন্ধি করে নেবে এবং নিজ রাজ্যকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে। অর্থ ও সেনা ত্যাগ করলেই যদি বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাহলে অর্থ ও ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কেন নিজ মৃত্যু ডেকে আনবে ?

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মন্ত্রীরা যদি গোপনে ষড়যন্ত্র করে, অন্যদিকে নগর ও গ্রাম শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, অর্থ ভাণ্ডার খালি হয়ে যায় এবং গুপ্তমন্ত্রণাও প্রকাশিত হয়ে যায়, সেই অবস্থায় রাজার কী করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—এই অবস্থায় হয় শীঘ্র সন্ধি করে নিতে হয় নাহলে অকস্মাৎ প্রবল পরাক্রম দেখিয়ে শত্রুকে রাজ্যের বাইরে বার করে দিতে হয়। এই কাজে যদি মৃত্যুও হয় তবে তার পরলোকে মঙ্গলই হয়। যদি সেনাদের রাজার প্রতি আনুগত্য থাকে এবং তাদের উৎসাহ প্রবল থাকে তবে অল্প হলেও তাদের সাহায্যে রাজা পৃথিবী জয় করতে পারেন। রাজা যুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গে যান এবং শত্রুকে বধ করলে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যখন রাজার লোকরক্ষারূপ পরমধর্ম পালন করা সম্ভব না হয় এবং পৃথিবীতে তাঁর জীবিকার সমস্ত সাধন লুটেরারা অধিকার করে নেয়, তখন তার কী করা উচিত ? আর এরূপ বিপদ উপস্থিত হলে যে ব্রাহ্মণ দয়াবশত তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ

করতে পারেন না, তিনি কীভাবে জীবিকা-নির্বাহ করবেন ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই অবস্থায় ব্রাহ্মণকে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের বলেই জীবন-নির্বাহ করতে হবে এবং রাজার যদি নিজ রাজ্য আবার ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা হয় তাহলে রাজ্যের ব্যবস্থা কোনোরূপ বদল না করে প্রজাদের আপন মনে করে তাদের রক্ষার জন্য, স্বেচ্ছায় না দিলেও তাদের সম্পত্তি অধিকার করবে কিন্তু (বিপদে পড়লেও) ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য এবং ব্রাহ্মণ বা সম্মানীয় ব্যক্তির ধন নেবে না, তাদের কষ্ট দেবে না। আমি সর্বলোকের কালোত্তীর্ণ নিয়মের কথা তোমাকে জানালাম। সকলেরই এই কথা বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী আচরণ করা উচিত। যদি দেশের বহু লোক রোষবশত রাজার কাছে একে অপরের নামে স্তুতি বা নিন্দা করে তাহলে তাদের কথায় রাজার কাউকে সম্মান বা অপমান করা উচিত নয়। কারণ অপরের নিন্দা করা হল দুষ্ট লোকেদের স্বভাব এবং সৎব্যক্তিরা সর্বদাই অন্যের গুণগান করে থাকেন। যারা ভগবানের অবতার এবং সৎব্যক্তিদের দ্বারা সর্বভাবে সম্মানিত এবং বিবেক-বিচারে শ্রেষ্ঠ, রাজার সেই ধর্ম-আচরণই করা উচিত। সৎপুরুষরা যে বিনয়যুক্ত পথ অনুসরণ করেন, সেই পথেই রাজার চলা উচিত , রাজর্ষিদের আচরণ তেমনই হয়ে থাকে।

রাজন্ ! রাজার নিজের এবং শত্রুর রাজ্য থেকে ধন আহরণ করে রাজকোষ পূর্ণ করা উচিত। অর্থের দ্বারা ধর্মের বৃদ্ধি হয় এবং রাজ্যও প্রসারিত হয়। রাজকোষ রক্ষা করা ও তার বৃদ্ধি করা রাজার চিরকালের ধর্ম, কিন্তু রাজা যদি বলহীন হয় তাহলে তার কাছে রাজকোষ থাকবে কীভাবে ? সৈন্যবিনা রাজ্য কীভাবে থাকে ? রাজ্যহীনের কাছে লক্ষ্মী কীকরে থাকবে ? সুতরাং রাজার সর্বদাই রাজকোষ, সেনা এবং মিত্র বৃদ্ধি করা উচিত। শুষ্ক কাঠ যেমন ভেঙে দু টুকরো হলেও কখনো নত হয় না, তেমনই রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হলেও কখনো যেন নত না হয়। রাজার এমন লোকমর্যাদা স্থাপন করা উচিত, যাতে প্রজারা তার ওপর প্রসন্ন থাকে। জগতে সাধারণ কাজেও মর্যাদারই সম্মান হয়। জগতে এমন লোকও আছে যারা ইহলোকে বা পরলোক, কিছুই মানে না। এরূপ নাস্তিকদের কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। যারা যুদ্ধ করে না তাদের বধ করা, পরস্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা, কৃতঘ্নতা, ব্রাহ্মণের ধন নিয়ে নেওয়া, কারো সর্বস্ব অপহরণ করা, কোনো গ্রাম আক্রমণ করে তার প্রভুত্ব করা—এইসব ব্যাপারকে ডাকাতেরাও নিন্দনীয় বলে মনে করে।

যুধিষ্ঠির ! যে ডাকাত মর্যাদা পালন করে, তার মৃত্যু হলেও দুর্গতি হয় না। এই বিষয়ে এক প্রাচীন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। কায়ব্য নামে এক নিষাদপুত্র দস্যু হয়েও সিদ্ধিলাভ করেছিল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বীর, শাস্ত্রজ্ঞ, অক্রূর, আশ্রম-ধর্ম পালনকারী, ব্রাহ্মণভক্ত ও গুরুপূজক ছিল। সে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদ নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার দেশ-কাল সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞান ছিল এবং সর্বদা পারিযাত্র পর্বতের ওপর বিচরণ করত। সমস্ত প্রাণীর স্বভাব সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা ছিল, তার নিশানায় কখনো ভুল হত না এবং তার অস্ত্রও অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। সে একাকী হাজার সেনাকে পরাস্ত করতে পারত এবং সেই বিশাল বনে বসবাস করে সে তার অন্ধ ও বধির পিতা-মাতা ও অন্যান্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা করত। সে সম্মানীয় ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করে তাঁদের ভোজন করাত এবং তাঁদের নানাপ্রকার সেবা করত।

একবার মর্যাদা অতিক্রমকারী ও নানা ক্রূরকর্মকারী কয়েক হাজার দস্যু তাকে এসে বলল—'তুমি দেশ-কাল ও সময় সম্পর্কে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বীর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুতরাং আমাদের সকলের ইচ্ছা তুমি আমাদের দলপতি হও। তুমি আমাদের যেরূপ নির্দেশ দেবে, আমরা সেইমতো কাজ করব। তুমি মাতা-পিতার মতো আমাদের যথোচিতভাবে রক্ষা করো।'

তখন কায়ব্য বলল—প্রিয় ভ্রাতাগণ ! তোমরা কখনো নারী, ভীত মানুষ, বালক বা তপস্বীদের প্রহার করবে না এবং যে যুদ্ধ করতে চায় না, তাকে বধ করবে না। নারীদের কখনো বলপূর্বক হরণ করবে না, স্ত্রী-হত্যা থেকে দূরে থাকবে, ব্রাহ্মণদের হিতের প্রতি খেয়াল রাখবে, তাঁদের রক্ষার প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করবে, কখনো সত্য পরিত্যাগ করবে না, যে গৃহে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিদের সেবা হয়—সেখানে বিঘ্ন ঘটাবে না। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণকেই বিশেষভাবে রক্ষা করতে হয় তাই প্রয়োজন হলে নিজের সর্বস্ব দিয়েও তাঁদের সেবা করতে হয়। দেখো, ব্রাহ্মণেরা কুপিত হয়ে যার অনিষ্ট-চিন্তা করেন, তাকে ত্রিলোকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে অথবা তাকে বিনাশ করতে চায়, সূর্যোদয় হলেও তার অন্ধকার দূর হয় না। যে ব্যক্তি সৎপুরুষদের দুঃখ দেয়, শাস্ত্রে তাকে বধ করার নির্দেশ আছে। দুষ্ট দমনের জন্যই দণ্ডবিধান করা হয়, ধন বৃদ্ধি করার জন্য নয়। দস্যুজাতিতে জন্ম নিয়েও যে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আচরণ

করে, সে ডাকাত হলেও সিদ্ধিলাভ করে। দেখো, এইসব কথা যদি তোমরা মেনে নাও, তাহলে আমি তোমাদের দলপতি হতে পারি।)

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! দস্যুরা সকলেই কায়ব্যের নির্দেশ অনুসরণ করল। এতে সকলেরই উন্নতি হল এবং সকলেই পাপ কাজ ছেড়ে দিল। এই পুণ্য কর্মের দ্বারা কায়ব্যেরও সিদ্ধিলাভ হল ; কারণ এইভাবে সে সৎপুরুষদের রক্ষা করল এবং দস্যুদেরও পাপ থেকে বাঁচাল। যে ব্যক্তি প্রতিদিন কায়ব্যচরিত্র শ্রবণ ও স্মরণ করে, তার কোনো প্রাণী হতে ভয় থাকে না।

রাজার পক্ষে ধনসংগ্রহের স্থান এবং অনাগত বিপদ থেকে সাবধান থাকার জন্য তিন মৎস্যের দৃষ্টান্ত

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! রাজারা যে উপায়ে নিজ কোষ বৃদ্ধি করে, সেই বিষয়ে মহাত্মারা ব্রহ্মা কথিত কয়েকটি গাথার উল্লেখ করে থাকেন। রাজার যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী দ্বিজের অর্থ নেওয়া এবং দেবোত্তর সম্পত্তিও করযুক্ত করা উচিত নয়। তবে ডাকাত এবং যারা ধর্ম-কর্ম করে না, তাদের সম্পদ নিতে পারে। যে ব্যক্তি হবিষ্যান্নের দ্বারা দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অতিথিদের পূজা করে না, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা তার ধনকে নিরর্থক বলে থাকেন। ধার্মিক রাজার এই ধন নিয়ে প্রজাপালন করা উচিত। যে রাজা এরূপ দুষ্ট ব্যক্তিদের ধন নিয়ে সৎপুরুষকে দেয়, তাকে সর্বপ্রকারে ধর্মজ্ঞ বলা হয়। পৃথিবীর ধুলা পেষণ করলে যেমন তা আরও মিহি হয়, তেমনই বিচার-বিশ্লেষণ করলে ধর্মের স্বরূপ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে থাকে।

যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি সময়ের আগেই কাজের ব্যবস্থা করে নেয় তাকে বলা হয় 'অনাগতবিধাতা' এবং যার যথাকালে কাজ করার যুক্তি জাগ্রত হয়, তাকে বলে 'প্রত্যুতপন্নমতি'। এরা দুজনেই সুখ পেতে পারে, আর দীর্ঘসূত্রী নষ্ট হয়ে যায়। আমি দীর্ঘসূত্রীর কর্তব্য-অকর্তব্যের স্থিরতা নিয়ে এক সুন্দর কাহিনী বলছি, মন দিয়ে শোনো। একটি পুষ্করিণীতে সামান্য জল এবং তাতে অনেক মাছ ছিল। এতে তিন জন কার্যকুশল মৎস্য ছিল। এদের একজন অনাগতবিধাতা (দীর্ঘকালজ্ঞ), দ্বিতীয় জন প্রত্যুৎপন্নমতি এবং তৃতীয় জন ছিল দীর্ঘসূত্রী। একদিন কয়েকজন জেলে এসে সেই পুষ্করিণীর জল বার করে দিতে আরম্ভ করে। পুকুরের জল কমে যাচ্ছে দেখে দীর্ঘদর্শী আগাম বিপদের আশঙ্কায় দুই সাথীকে বলল, 'মনে হয় এই জলাশয়ের সকল প্রাণীদের ওপর এক বিপদ আসছে ; তাই যতক্ষণ আমাদের বার হওয়ার পথ বন্ধ না হয় তারমধ্যে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। তোমাদের যদি আমার পরামর্শ উচিত বলে মনে হয়, তাহলে চলো আমরা অন্য স্থানে চলে যাই।' তখন দীর্ঘসূত্রী বলল—'তুমি ঠিকই বলেছ, তবে আমার মনে হয় আমাদের এত শীঘ্র কিছু করার দরকার নেই।' তখন প্রত্যুৎপন্নমতি বলল—'আরে ! যখন সময় আসবে আমার বুদ্ধি ঠিক পথ বার করবে।' দুজনের এরূপ চিন্তা দেখে মহামতি দীর্ঘদর্শী সেইদিনই একটি নালা পথে গভীর জলাশয়ে চলে গেল।

কিছু পরে জেলেরা দেখল জলাশয়ের জল প্রায় বার হয়ে গেছে, তখন তারা জালে করে সব মাছগুলিকে ধরে ফেলল। সব মাছের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রীও জালে ধরা পড়েছিল। জেলেরা জাল ওঠাতে গিয়ে দেখল প্রত্যুৎপন্নমতি মৃতের মতো সেখানে মাছেদের মধ্যে পড়ে আছে। জেলেরা সব মাছ নিয়ে আর একটি গভীর জলাশয়ে গিয়ে মাছগুলি ধুতে লাগল, সেইসময় প্রত্যুৎপন্নমতি জাল থেকে বেরিয়ে চলে গেল, মন্দবুদ্ধি দীর্ঘসূত্রী ধরা পড়ে মারা গেল।

এইভাবে যে ব্যক্তি মোহবশত সমুপস্থিত বিপদ দেখতে পায় না, সে দীর্ঘসূত্রী মৎস্যের ন্যায় শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে মনে করে আমি খুব কার্যকুশল, আগে থেকে নিজের উপায় খোঁজে না, সে প্রত্যুৎপন্নমতি মাছের ন্যায় সংশয়ে থাকে। তাই বলা হয় অনাগতবিধাতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতি—এরা দুজনে সুখে থাকে এবং দীর্ঘসূত্রী বিনষ্ট হয়। ঋষিরা এদেরই ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রে প্রধান অনধিকারী বলে থাকেন এবং এরাই ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তি দেশ ও কাল সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করে সাবধানে যথাযথভাবে নিজের কাজ করে, সে অবশ্যই কিছু শুভ ফল লাভ করে।

শত্রু পরিবেষ্টিত রাজার কর্তব্য বিষয়ে বিড়াল ও ইঁদুরের কাহিনী

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি সেই বিষয়ে জানতে চাই, যার আশ্রয়ে থাকলে রাজা শত্রুপরিবেষ্টিত হলেও মোহগ্রস্ত হয় না। বহু বলবান শত্রু যখন কোনো দুর্বল রাজাকে বন্দি করার জন্য তৈরি হয়, তখন সেই অসহায় একাকী রাজার কী করা উচিত ? সে তাদের মধ্যে কার সঙ্গে সন্ধি করবে আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ? বলশালী হওয়া সত্ত্বেও সে যদি শত্রুদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তার কীরূপ আচরণ করা উচিত ? রাজার কাছে তো সব কর্তব্যের মধ্যে এটিই প্রধান এবং আপনার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ব্যতীত আর কেউই এই বিষয়ে কিছু বলতে সক্ষম নন। সুতরাং আপনি এই বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত বলুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! তুমি আমাকে উচিত প্রশ্নই করেছ। বিপদের সময় কী করা উচিত তা সকলে জানে না। আমি তোমাকে সেসব জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শত্রু কখনো মিত্র হয় এবং মিত্রেরও মন পরিবর্তিত হয়ে সে শত্রু হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে শত্রু-মিত্রের পরিস্থিতি কখনো এক প্রকার থাকে না। অতএব নিজ কর্তব্য-অকর্তব্য এবং দেশ-কালের বিচার করে কারো ওপর বিশ্বাস আবার কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এই বিষয়ে বটবৃক্ষে বাস করা এক বিড়াল ও এক ইঁদুরের কথোপকথনরূপ প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

কোনো এক জঙ্গলে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। সেটি বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত ছিল এবং তাতে বহু পাখি বাসা বেঁধে বাস করত। বটবৃক্ষ বহু দূর পর্যন্ত শিকড় বিস্তৃত করে মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। সেই বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বহু সর্প এবং বন্য জন্তু বাস করত। সেই বৃক্ষের শিকড়ে পলিত নামে এক বুদ্ধিমান ইঁদুর বাস করত। ইঁদুরটি যে গর্তে বাস করত তার প্রবেশপথ ছিল একশতটি। বটগাছের ওপরে লোমশ নামে এক বিড়ালের বাসা ছিল। সে বহুদিন ধরে গাছের ওপর থেকে পাখি ধরে খেয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাত। একবার এক চণ্ডাল এসে বনের মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করল। সে সূর্যাস্তের সময় নিত্যদিন তার জাল বিছিয়ে দিয়ে দড়িগুলো ঠিকভাবে বেঁধে নিশ্চিন্তে নিজের আস্তানায় গিয়ে নিদ্রা যেত। রাত্রে বহু বন্য জন্তু এসে তার জালে ধরা পড়ত, চণ্ডাল সকালে উঠে তাদের ধরে ফেলত। বিড়াল যদিও অত্যন্ত সাবধানে থাকত, তা সত্ত্বেও সে একদিন জালে আটকে গেল। পলিত ইঁদুর বিড়ালটিকে বন্দি দেখে নির্ভয়ে বনে খাবার খুঁজতে বেরোল। হঠাৎ তার দৃষ্টি চণ্ডালের জালের দিকে পড়ল, যেখানে চণ্ডাল জন্তুদের ধরার জন্য মাংসখণ্ড আটকে রেখেছিল। পলিত ইঁদুর জাল বেয়ে উঠে সেই মাংস খণ্ডগুলি খেতে লাগল। মাংস খাওয়ার সময় সে মনে মনে জালে আটকে পড়া শত্রুদের কথা ভেবে হাসছিল। এর মধ্যে সে আর একটি শত্রুকে দেখতে পেল, সেটি হরিণ নামে একটি বেজী, ওখানেই সে বাসা করে থাকত। ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে সে জিভ লক্‌লক্ করতে করতে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। এদিকে ইঁদুর দেখল গাছের ওপরে তার আর এক মহাশত্রু চন্দ্রক নামের পেঁচা বসে আছে। এইভাবে পেঁচা এবং বেজীর মাঝখানে পড়ে তার হৃৎকম্প উপস্থিত হল, সে চিন্তায় মগ্ন হল।

তখন তার এক বুদ্ধি মনে এল। সে ভাবতে লাগল 'কোনো প্রাণী যখন বিপদে পড়ে বিনাশের মুখোমুখি হয়, তখন যেমন করে হোক তার নিজের প্রাণরক্ষা করতে হয়, এখন আমার যে বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তাতে সবদিক থেকে আমার প্রাণ নাশের আশঙ্কা। এইসময় আমি যদি মাটিতে নেমে পালাই, তবে বেজী আমাকে খেয়ে ফেলবে। যদি এখানে থাকি পেঁচা তুলে নিয়ে যাবে, আর জাল কেটে ফেললে বিড়ালও আমাকে ছাড়বে না। কিন্তু এই অবস্থায় ভয় পেলে চলবে না। বিড়াল আমার মহাশত্রু, কিন্তু এখন সে-ও ভীষণ বিপদে পড়েছে। এখন দেখি, সে নিজের রক্ষার বিনিময়ে আমার প্রস্তাব মেনে নেয় কী না ! সম্ভবত এই বিপদের সময় সে আমার কথা মেনে নেবে। আচার্যের মত হল যে, বিপদের সম্মুখীন হলে জীবনরক্ষার জন্য বলবান ব্যক্তিরও নিকটবর্তী শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত। মূর্খ মিত্রের থেকে বুদ্ধিমান শত্রুও ভালো। তাই এখন চিরশত্রু বিড়ালের দ্বারাই আমার জীবন রক্ষা হওয়া সম্ভব। অতএব আমি ওর জীবন রক্ষার জন্য সাহায্য করি।'

তারপর সেই পরিণামদর্শী ইঁদুর বিড়ালকে ডেকে বলল—'ভাই বিড়াল ! তুমি বেঁচে আছো তো ? আমি তোমাকে বন্ধু হিসাবে বলছি এবং যাতে তোমার প্রাণরক্ষা হয়, তার জন্য কামনা করছি। এতে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল। ভাই, ভয় পেয়ো না, তুমি আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকবে। যদি তুমি আমায় না মারো, তাহলে আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারি। আমি অনেক ভেবে চিন্তে তোমার

এবং আমার জন্য এক উপায় বার করেছি, তাতে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল হবে। দেখো, ওই বেজী আর পেঁচা, আমাকে মারবে বলে বসে আছে। এখনও আক্রমণ করেনি বলে বেঁচে আছি। পেঁচা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওকে দেখে আমার খুব ভয় করছে। সৎ ব্যক্তিরা সাত পা একসঙ্গে চললেই তাদের বন্ধুত্ব হয় ; তুমিও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তুমি আমার বন্ধু। এখন আর আমার তোমার থেকে ভয় নেই আর এতদিন সঙ্গে থাকার জন্য আমি ধর্মরক্ষা করব। আমার সাহায্য ব্যতীত তুমি এই জাল থেকে বেরোতে পারবে না, তুমি যদি আমাকে না মারো, তাহলে আমি তোমার জালের বাঁধন কাটতে পারি। তাই আমার ইচ্ছা, যাতে আমাদের মধ্যে মিত্রতা বৃদ্ধি পায় আর আমরা নিরাপদে থাকতে পারি। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কাঠের সাহায্যে গভীর নদী পার হয়, তখন সে নদী পার হয়ে কাঠটিকে নদীতে না ভাসিয়ে পাড়েই রেখে দেয়, এইভাবে আমাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব হতে পারে। আমি তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করব, তুমিও আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে।'

পলিত নামক ইঁদুরটি যখন এইভাবে দুজনের মঙ্গলের কথা বলল, তখন তা যুক্তিযুক্ত মনে করে বুদ্ধিমান বিড়াল নিজের অবস্থা বুঝে ইঁদুরকে বলল—'সৌম্য ! তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও জেনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এখন আমি অত্যন্ত বিপদে পড়েছি আর তুমি আমার থেকেও কঠিন বিপদে পড়েছ। অতএব আমাদের দুজন বিপদগ্রস্তের মধ্যে শীঘ্রই সন্ধি হওয়া প্রয়োজন। আমি সময়মতো তোমার উপকার করার চেষ্টা করব। এই বিপদ দূর হলে তোমার উপকার ব্যর্থ হবে না। এখন আমার অহংকার দূর হয়েছে, তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। এখন আমি তোমার শরণাগত, তুমি যা বলবে আমি তাই করব।'

লোমশ বিড়ালের কথা শুনে পলিত তাকে এই অভিপ্রায়পূর্ণ কথা বলল—'এখন আমার বেজীকে বড় ভয় হচ্ছে, আমি তোমার নীচে গিয়ে লুকোচ্ছি। তুমি আমাকে রক্ষা করো, মেরে ফেলো না। এদিকে ওই পেঁচাও আমার প্রাণের গ্রাহক হয়ে আছে, এদের থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি শপথ করে বলছি, পরে তোমার জাল আমি কেটে দেব।'

ইঁদুরের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে লোমশ তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ কণ্ঠে বলল—'তুমি এখনই এখানে এসো, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমার প্রাণপ্রিয় সখা। এখন তোমার কৃপাতেই আমার প্রাণরক্ষা হবে। এসো, আমরা দুজনে সন্ধি করে নিই। ভাই, এই সংকট থেকে মুক্ত হলে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সর্বদাই তোমার জন্য হিতকর কাজ করব।'

ইঁদুর বলল—'সৌম্য ! এই বিপদ থেকে রক্ষা পেলে আমিও তোমার প্রীতি-সম্পাদন করব। যদিও উপকারের পরিবর্তে উপকার করলেও তাতে উপকারকারীর ঋণ শোধ হয় না ; কারণ পরবর্তীজন তো উপকৃত হওয়ার পরেই উপকার করে, কিন্তু প্রথম উপকারকারী কোনো কিছুর বিনিময়ে তা করে না।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বিড়ালকে এইভাবে ভালো করে তার স্বার্থ বুঝিয়ে ইঁদুর আনন্দ সহকারে তার কোলে আশ্রয় নিল। বিড়ালও তাকে অভয় প্রদান করে মাতা-পিতার মতো যত্ন করে তাকে কোলে নিয়ে রক্ষা করতে লাগল। বেজী এবং পেঁচা ইঁদুরকে বিড়ালের কোলে লুকোতে দেখে হতাশ হয়ে গেল এবং তাদের দুজনের এই ভালোবাসা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। তারপর নিরাশ হয়ে যে যার স্থানে চলে গেল। ইঁদুর দেশ-কাল সম্পর্কে অবহিত ছিল, সে বিড়ালের দেহের ওপর উঠে চণ্ডালের আসবার প্রতীক্ষা করতে করতে ধীরে ধীরে জাল কাটতে লাগল। বিড়াল বন্ধনের জন্য কাতর হয়েছিল, সে দেখল ইঁদুর তাড়াতাড়ি জাল কাটছে না। তাই সে ইঁদুরকে দ্রুত বাঁধন কাটার জন্য বলল, 'সৌম্য ! তুমি তাড়াতাড়ি করছ না কেন ? দেখো, চণ্ডাল এসে পড়বে, সে আসার আগেই তাড়াতাড়ি জাল কেটে দাও।'

পলিত ইঁদুর বলল—'ভাই, চুপ করো, ভয় পেয়ো না। আমি ঠিক সময় মতোই তোমার বাঁধন কেটে দেব, ভুল হবে না। অসময়ে কাজ করলে, যে কাজ করে তার মঙ্গল হয় না, ঠিক সময়ে করলে, তার থেকে অনেক লাভ হয়। সময়ের আগে যদি তোমাকে ছেড়ে দিই, তাহলে তোমার থেকেই আমার ভয় থাকবে। সুতরাং তুমি সময়ের প্রতীক্ষা করো, এত তাড়াতাড়ি করছ কেন ? চণ্ডালকে যখন অস্ত্র নিয়ে আসতে দেখব, তখন তুমি ভয় পাচ্ছ দেখেই তোমার বন্ধন কেটে দেব। তখন ভয়ে তুমি গাছে উঠে পড়বে আর আমি গর্তে ঢুকে পড়ব।'

ইঁদুরের কথা শুনে বিড়াল বলল, 'ভালো লোকেরা বন্ধুর কাজ প্রীতি সহকারে করে, তোমার মতো নয়। দেখো, আমি তো তোমার বিপদ দেখে তোমাকে তখনি বাঁচিয়ে দিলাম। অতএব তোমারও তাড়াতাড়ি জাল কেটে আমাকে রক্ষা করা উচিত। তুমি এমন কাজ করো, যাতে দুজনেরই মঙ্গল হয়। যদি পূর্বে আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তা মনে রেখো না। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি তোমার মনের দুঃখ দূর করো।'

ইঁদুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং নীতিজ্ঞ ছিল, সে বিড়ালকে বলল—যে মিত্রের থেকে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে, তার এভাবেই কাজ করা উচিত, যেমন সাপুড়ে সাপের ছোবল বাঁচিয়েই খেলা দেখায়। যে ব্যক্তি বলবানের সঙ্গে সন্ধি করে নিজের রক্ষার কথা মনে রাখে না, তার সেই বন্ধুত্ব কুপথ্য ভোজনের মতো অহিতকর হয়ে ওঠে। এমন মিত্রের কাজ অসম্পূর্ণই রাখা উচিত। চণ্ডাল এলে তোমার তখন তার ভয়ে পালাবার কথাই মনে আসবে, সেইসময় তুমি আমাকে ধরতে পারবে না। আমি অনেক তন্তু কেটে ফেলেছি, আর মাত্র একটি বাঁধন বাকি আছে। সেটি আমি ঠিক সময়ে কেটে দেব, তুমি ভয় পেয়ো না।'

এইভাবে কথায় কথায় রাত কেটে গেল। লোমশের ভয় বাড়তে লাগল। ভোর হতেই দেখা গেল পরিঘ নামক চণ্ডাল অস্ত্র হাতে আসছে, তাকে সাক্ষাৎ যমদূত বলে মনে হচ্ছে। তাকে দেখেই বিড়াল ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাকে ভীত

দেখে ইঁদুর তৎক্ষণাৎ তার জাল কেটে দিল। জাল থেকে মুক্ত হয়েই বিড়াল গাছের ওপর উঠে গেল আর ইঁদুর তার কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চণ্ডাল নানাভাবে উল্টে-পাল্টে জালটি দেখল, তারপর নিরাশ হয়ে জাল নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে বিড়াল গাছের ডালের ওপর বসে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইঁদুর পলিতকে বলল—'ভাই! তুমি আমার সঙ্গে কথাবার্তা না বলে হঠাৎ গর্তে ঢুকে পড়লে কেন? তুমি আমার অত্যন্ত উপকার করেছ, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি কী আমাকে ভয় পাচ্ছ? বিপদের সময় তুমি আমাকে বিশ্বাস করে আমার জীবন দান করেছ। তোমার যা ক্ষমতা, সেই অনুসারে তুমি তার পূর্ণ ব্যবহার করেছ। এখন তো আমি তোমার বন্ধু, এখন আমাদের এই বন্ধুত্ব উপভোগ করা উচিত। আমার যত বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা তোমার এমন সেবা করবে, যেমন শিষ্যেরা গুরুর জন্য করে থাকে। আমিও তোমার এবং তোমার বন্ধু-বান্ধবের উপযুক্ত সম্মান করব। আরে, এমন কে অকৃতজ্ঞ আছে যে তার জীবনদাতার সম্মান করবে না। তুমি আমার, আমার দেহের ও গৃহের প্রভু; আমার যা কিছু আছে তুমি সে সবের ব্যবস্থাপক হও। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এখন থেকে তুমি আমার মন্ত্রীত্ব স্বীকার করো এবং পিতার মতো আমাকে সদুপদেশ দাও। আমি আমার জীবনের শপথ করে বলছি, এখন থেকে আমাকে আর ভয় পেয়ো না। বুদ্ধিতে তুমি তো সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য। নিজের সুপরামর্শরূপী মন্ত্রে আমার জীবন দান করে তুমি আমাকে তোমার অধীন করে নিয়েছ।'

বিড়ালের এইরূপ মিষ্টবাক্য শুনে পরমনীতিজ্ঞ ইঁদুর বলল—'ভাই! যার বেঁচে থাকায় স্বার্থ-সাধন হয় এবং মৃত্যুতে ক্ষতি হয়, সেই তার মিত্র হতে পারে আর এই মিত্রতা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তাদের মধ্যে স্বার্থ-বিরোধ না হয়। মিত্রতা কোনো স্থায়ী জিনিস নয় এবং শত্রুতাও সর্বদা বজায় থাকে না। স্বার্থের অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায়ই মিত্র শত্রু হয়ে ওঠে আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুও মিত্র হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিত্রকে বিশ্বাস করে এবং শত্রুর থেকে সর্বদা সশঙ্ক থাকে, নীতিশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে কারো সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক রাখে না, কোনো এক সময়ে তার সর্বতোভাবে মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। পিতা-মাতা-পুত্র-মাতুল-ভাগিনেয় এবং আত্মীয়-মিত্র সকলেই স্বার্থের

জনাই একে অপরের সঙ্গে বাঁধা থাকে। নিজের প্রিয় পুত্রও যদি স্বার্থের পরিপন্থী হয়, পিতা-মাতা তাকেও ত্যাগ করে। জগতে সব লোক সর্বদা নিজেকেই রক্ষা করতে চায়, অতএব তুমি স্বার্থকেই সবকিছুর সার বলে জেনো। সব জীবই স্বার্থের সঙ্গী। আমার তো জগতে কারো ভালোবাসাই অকারণ বলে মনে হয় না। যদিও কখনো কখনো ভাইদের মধ্যে বা পতি-পত্নীর মধ্যে ক্রোধবশত ঝগড়া-বিবাদ হয়, তবু স্বভাবত তাদের মধ্যে প্রেম থাকে। আমাদের ভালোবাসাও এক বিশেষ কারণে হয়েছে। এখন বল, কী কারণে আমি ভাবব যে তুমি আমাকে ভালোবাস ? মিত্রতা ও শত্রুতার ভাব মেঘের মতো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে থাকে। আজই তুমি আমার শত্রু হতে পার, আবার আজই মিত্র হতে পার। আমাদের প্রীতি ততক্ষণই ছিল, যতক্ষণ বিশেষ পরিস্থিতি বজায় ছিল। সে কাজ পূর্ণ হওয়ার পর আমরা আবার শত্রু হয়ে গেছি। তোমার কাজ পূর্ণ হয়েছে, আমারও বিপদ কেটে গেছে। এখন আমাকে খাদ্য হিসাবে ভাবা ছাড়া তোমার আর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার নয়। আমি তোমার খাদ্য আর তুমি আমার খাদক, আমি দুর্বল, তুমি বলবান। আমাদের শক্তি সমান নয়, সুতরাং বিনা প্রয়োজনে আমাদের সন্ধি হওয়া সম্ভবপর নয়। আমি ভালোভাবেই জানি তুমি ক্ষুধার্ত এবং এখন তোমার খাওয়ার সময়। তাই তুমি আমাকে বোকা বানিয়ে খাদ্য হিসাবে পেতে চাও। তাই তুমি স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে বসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও। কিন্তু মিত্র ! তুমি আমার যে সেবা করতে চাও, আমার তা পারার যোগ্যতা নেই। তোমার প্রিয় পুত্র এবং স্ত্রী যখন আমাকে তোমার কাছে বসে থাকতে দেখবে, তখন তারা আমাকে কেন ছাড়বে ? অতএব আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না। আমাদের মিলনের যে কারণ ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। যে নিজের শত্রু, দুষ্ট, কষ্টে পড়েছে, ক্ষুধার্ত এবং আহারের সন্ধান করছে তার কাছে কোনো অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও কীকরে যাবে ? অতএব ভাই, তোমার মঙ্গল হোক ; আমি চললাম, দূর থেকেও আমি তোমাকে ভয় পাই। এবার তুমিও ফিরে যাও। আমার উপকারের কথা যদি তোমার মনে থাকে তাহলে সর্বদা বন্ধুভাব বজায় রেখো, সুযোগ পেয়ে আমাকে আক্রমণ করে বসো না। যদি প্রকৃতই তোমার দৃষ্টি স্বার্থপর না হয়ে থাকে, তাহলে বলো তোমার কী কাজ করব ? আমি তোমাকে সব দিতে পারি, শুধু নিজেকে সমর্পণ করতে পারি না। নিজেকে রক্ষা করার জন্য সন্তান, রাজ্য, রত্ন এবং ধন ইত্যাদি সবই ত্যাগ করা সম্ভব এ তার বেশি কথা কী ! জীবের সর্বস্ব দিয়েও নিজের জীবন রক্ষা করা উচিত ; আমি শুনেছি যে প্রাণ থাকলে সবই আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব।'

পলিত এইভাবে স্পষ্ট ভাষায় কথা বললে বিড়াল অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলল—'ভাই ! আমি সত্যের শপথ করে বলছি, মিত্রদ্রোহ অত্যন্ত দূষণীয় ব্যাপার। তুমি যে আমার উপকার করেছ—তাকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তুমি অত্যন্ত নীতিযুক্ত কথা বলেছ, তোমার চিন্তা আমার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মেলে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তোমার উল্টো কথা ভাবা উচিত নয়। তুমি আমার প্রাণদান করে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ এবং আমিও ধর্মজ্ঞ, গুণগ্রাহী এবং কৃতজ্ঞ, বিশেষত তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত প্রীতি আছে। সুতরাং তোমারও আমার সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করা উচিত। তোমার কথায় আমি বন্ধু-বান্ধবসহ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। আমাদের মতো মনস্বীদের সব বুদ্ধিমানেরাই বিশ্বাস করে। অতএব তোমার আমার ওপর কোনো আশঙ্কা করা উচিত নয়।'

বিড়াল যখন এইভাবে তার অত্যন্ত প্রশংসা করল, তখন গম্ভীর স্বভাব ইঁদুর বলল—'তুমি প্রকৃতই সাধু। তোমার মুখ থেকে যা শুনেছি, তা সঠিক। তাতে আমি প্রসন্নও হয়েছি। তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব না। এই ব্যাপারে শুক্রাচার্য দুটি কথা বলেছেন, তুমি মন দিয়ে শোনো—(১) যখন দুজন শত্রুর ওপর এক প্রকারের বিপদ উপস্থিত হয়, তখন দুর্বলের সবল শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে যুক্তিদ্বারা কাজ করা উচিত এবং কাজ হয়ে গেলে তাকে আর বিশ্বাস করতে নেই। (২) যে অবিশ্বাসের পাত্র, তাকে কখনো বিশ্বাস করবে না এবং যে বিশ্বস্ত তাকেও অত্যন্ত বিশ্বাস করবে না এবং নিজের প্রতি সকলের বিশ্বাস উৎপন্ন করবে, কিন্তু নিজে অপরকে বিশ্বাস করবে না। নীতিশাস্ত্রেরও সংক্ষিপ্ত সার হল যে কাউকে পূর্ণ বিশ্বাস না করাই ভালো। সুতরাং শত্রুর প্রতি বিশ্বাস না রাখাই জীবের পক্ষে মঙ্গল মনে করা হয়। লোমশ ভাই ! তোমাদের কাছ থেকে সর্বদাই আমার নিজেকে রক্ষা করা উচিত। সেইভাবে তুমিও তোমার জন্মশত্রু চণ্ডালের থেকে দূরে থাকবে।'

চণ্ডালের নাম শুনেই বিড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে সেখান থেকে লাফ দিয়ে অন্যত্র চলে গেল এবং ইঁদুরও তার গর্তে

ঢুকে পড়ল।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এইভাবে দুর্বল এবং একাকী হয়েও পলিত ইঁদুর নিজ বুদ্ধিবলে একাধিক শত্রুকে হারিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং বিপদের সময় বুদ্ধিমান ব্যক্তির শত্রুর সঙ্গেও সখ্যতা করতে হয়। দেখো ইঁদুর এবং বিড়াল—এরা একে অন্যের সাহায্য নিয়ে বিপন্মুক্ত হয়েছিল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি তোমাকে ক্ষাত্রধর্মের পথ দেখালাম। যে ব্যক্তি ভয় আসার আগেই সশঙ্ক থাকে, ভয় প্রায়শই তার সামনে আসে না। কিন্তু যে নিঃশঙ্ক হয়ে অপরকে বিশ্বাস করে, তাকে অত্যন্ত বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। যে ব্যক্তি নির্ভয়ে বিচরণ করে সে কারো কোনো পরামর্শ শোনে না ; কিন্তু যে নিজেকে অজ্ঞ বলে মনে করে, সে বারংবার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে যায়। অতএব অপরকে নির্ভরতা দেখালেও, ভয়ে থাকা উচিত এবং বিশ্বাস প্রদর্শন করলেও অপরকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

রাজন্ ! এইভাবে সন্ধি ও যুদ্ধবিগ্রহে সময়ের বিচার করে সংকট থেকে মুক্তি পাবার উপায় করবে। যখন নিজের এবং শত্রুর ওপর সমান বিপদ এসে পড়বে, তখন বলবান শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তার সঙ্গে থেকে অত্যন্ত যুক্তির সাহায্যে কাজ করবে এবং কাজ পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে আর বিশ্বাস করবে না। এই নীতি অর্থ-ধর্ম-কাম—তিনটিই সিদ্ধ করে। এই অনুযায়ী আচরণ করে তুমি অভ্যুদয় প্রাপ্ত করো এবং প্রজাপালন করো। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সর্বদা সংসর্গ করবে। তাদের সঙ্গ ইহলোক ও পরলোক—উভয় স্থানেই পরমকল্যাণকারী হয়। রাজন্ ! আমি তোমাকে যে বিড়াল ও ইঁদুরের কাহিনী শোনালাম, এটি শান্তি এবং যুদ্ধ উভয় সময়েই বিশেষভাবে রক্ষা করে। সর্বদা এটি মনে রেখে রাজার শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার করা কর্তব্য।

শত্রু থেকে সর্বদা সাবধান থাকার ব্যাপারে রাজা ব্রহ্মদত্ত ও পূজনী পাখির প্রসঙ্গ এবং ব্রাহ্মণ সেবার মাহাত্ম্য

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বলছেন যে শত্রুকে কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়, রাজা যদি কাউকে বিশ্বাস না করে তাহলে কীভাবে রাজ্য পরিচালনা করবে ? আপনার এই অবিশ্বাসের কথা শুনে তো আমার বুদ্ধিবিভ্রম হচ্ছে, কৃপা করে আপনি আমার এই সংশয় দূর করুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই ব্যাপারে রাজা ব্রহ্মদত্তের তাঁর মহলে বসবাসকারী 'পূজনী' নামক এক পাখির সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল, তা শোনো। কাম্পিল্য নগরে রাজা ব্রহ্মদত্তের প্রাসাদ ছিল। তার অন্তঃপুরে বহুদিন ধরে পূজনী নামে এক পাখি বাস করত। সে তির্যক যোনিতে জন্মালেও সকল প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারত। সেখানেই তার এক শাবক জন্ম নেয় এবং সেইদিনই রানিরও এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পূজনী প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে দুটি করে ফল নিয়ে আসত। তার থেকে একটি সে রাজকুমারকে দিত এবং অন্যটি নিজ সন্তানকে খাওয়াত। পূজনীর আনীত ফল অমৃতের ন্যায় স্বাদু এবং বল-তেজ বৃদ্ধিকারক ছিল। সেই ফল খেয়ে খেয়ে রাজকুমার অত্যন্ত হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠল। একদিন তার দাসী তাকে ক্রোড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন বালকটির দৃষ্টি পূজনীর শাবকের ওপর পড়ল। রাজকুমার বালকসুলভ চপলতায় দাসীর কোল থেকে নেমে পূজনীর শাবকের সঙ্গে খেলতে লাগল। হঠাৎ সে জোরে গলা টিপে ধরে শাবকটিকে মেরে ফেলে দাসীর কাছে ফিরে এল। পূজনী ফল নিয়ে এসে দেখল যে রাজকুমার তার সন্তানকে মেরে ফেলেছে। নিজের সন্তানের এই দুর্গতি দেখে তার চোখ জলে ভরে গেল, সে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল—'ক্ষত্রিয়দের সংসর্গে থাকা অথবা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা ঠিক নয়। এরা সকলেরই অপকার করে, এদের কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। দেখো, এই রাজকুমার কী অকৃতজ্ঞ, ক্রূর এবং বিশ্বাসঘাতক ; আজ আমি এর শত্রুতার প্রতিশোধ নেব।' এই ভেবে সে তার ঠোঁট দিয়ে রাজকুমারের দুটি চক্ষু নষ্ট করে দিল।

তাই দেখে ব্রহ্মদত্ত ভাবলেন যে পূজনী রাজকুমারকে তার কুকর্মেরই শাস্তি দিয়েছে ; তাই তিনি পূজনীকে বললেন, 'পূজনী ! আমরা তোমার কাছে অপরাধ করেছিলাম, তুমি তার প্রতিশোধ নিয়েছ। এখন আমরা দুজনেই সমান ; সুতরাং তুমি এখন থেকে এখানেই

থাকো, অন্যত্র যেয়ো না।'

পূজনী বলল—'রাজন্! যখন কারো সঙ্গে শত্রুতা হয়, তখন তার মিষ্ট কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাতে শত্রুতা তো দূর হয় না, সেই বিশ্বাসকারীই মারা যায়। একবার শত্রুতা শুরু হলে পুত্র-পৌত্র পর্যন্ত তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না। তাই যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। যে বিশ্বাসনীয় নয় তাকে বিশ্বাস করবে না এবং যে বিশ্বাসের পাত্র তাকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না। অতি বিশ্বাসের ফলে উদ্ভূত বিপত্তি তাকেই সমূলে নাশ করে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমাদের আর মিলন হওয়া সম্ভব নয়। আমি যে জন্য এখানে বাস করতাম, সেই পরিবেশ এখন নষ্ট হয়ে গেছে। বহুদিন ধরে আমি অত্যন্ত আদরে আপনার প্রাসাদে বাস করেছি। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে ; সুতরাং আমাকে শীঘ্রই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—যে ব্যক্তি অপকারের পরিবর্তে অপকার করে তাকে অপরাধী বলা যায় না। এর দ্বারা অপকারকারী ঋণমুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং তুমি এখানেই থাকো, কোথাও যেও না।

পূজনী বলল—রাজন্! যার অপকার করা হয় এবং যে অপকার করে, তাদের কখনো মিলন হয় না। এটি দুজনের হৃদয়েই বিঁধতে থাকে।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—পূজনী! এতে তো শত্রুতা দূর হয় এবং অপকারকারীর পাপের ফলও ভোগ করতে হয় না। তাই অপকার সহ্যকারী এবং অপকারীর মিলন তো হতেই পারে।

পূজনী বলল—এভাবে শত্রুতা কখনো দূর হয় না এবং শত্রু আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, এই মনে করে, তাকে বিশ্বাস করাও উচিত নয়। এই অবস্থায় বিশ্বাস করলে, প্রাণের আশা ত্যাগ করতে হয়, তাই তাকে আর মুখ না দেখানোতেই মঙ্গল।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—নিজেদের মধ্যে শত্রুতা পোষণকারী যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা জন্মায়, তখন আর তাদের মধ্যে শত্রুতা থাকে না।

পূজনী বলল—রাজন্! পণ্ডিতরা ভালোভাবেই জানেন যে পাঁচটি কারণে শত্রুতা হয়—স্ত্রীর জন্য, গৃহ ও জমির জন্য, কঠোর বাক্যের জন্য, নিজেদের মধ্যে বিবাদের জন্য এবং অপরাধের জন্য। দাবানল যেমন কোনো ভাবেই শান্ত হয় না তেমনই ক্রোধাগ্নিও অর্থের দ্বারা, পরামর্শের দ্বারা, শাসনের দ্বারা দূর করা যায় না। শত্রুতার ফলে উৎপন্ন আগুন এক পক্ষ বিনষ্ট না হলে কখনো শান্ত হয় না। যে প্রথমে অপরাধ করেছে, সে ধন ও মান দিয়ে যথোচিত আপ্যায়ন করলেও, তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এতদিন আমি আপনার কোনো অপকার করিনি এবং আপনিও আমার কোনো ক্ষতি করেননি, তাই আমি আপনার মহলে বাস করতাম। কিন্তু এখন আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—পূজনী! জগতে কালের প্রেরণায় নানাপ্রকার ক্রিয়া হতে থাকে, কালের প্রেরণাতেই লোকে নানা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এতে কে কার প্রতি অপরাধ করে? কালই জন্ম ও মৃত্যুর প্রেরক। কালের জন্যই জীবের জীবনান্ত হয়। তাই যা কিছু ঘটেছে, তাতে আমি তোমার কোনো দোষ দেখি না। তুমি নিশ্চিন্তে এখানে থাক, কেউ তোমাকে কোনোপ্রকার কষ্ট দেবে না। তুমি যে অপরাধ করে ফেলেছ, আমি তা ক্ষমা করেছি, এখন তুমিও আমাকে ক্ষমা করো।

পূজনী বলল—আপনি যদি কালকেই সমস্ত কিছুর কারণ বলে মনে করেন, তাহলে কারোর সঙ্গেই কারোর শত্রুতা হওয়া উচিত নয়। তাহলে নিজের আত্মীয়স্বজন বধ

হলে লোকে কেন তার প্রতিশোধ নেয় এবং শোকাকুল হয়ে বিলাপ করে ? আসলে দুঃখ পাওয়াতে সকলে উদ্বিগ্ন হয় কেননা সুখ সকলেরই প্রিয় আর দুঃখের বহু রূপ। বার্ধক্যে দুঃখ হয়, ধনক্ষয়ে দুঃখ হয়, অপ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকলে দুঃখ হয় এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদেও দুঃখ হয়। বধ ও পরাধীনতার জন্য সকলেরই দুঃখ হয় এবং স্ত্রীর জন্য তো স্বাভাবিকরূপেও অধিক দুঃখ হয়ে থাকে। রাজন্! আমার যা অপকার হয়েছে এবং আমিও আপনার যে ক্ষতি করেছি, তা আমরা শতবর্ষেও ভুলতে পারব না। এইভাবে আমরা একে অপরের ক্ষতি করায় আমাদের কখনো মিলন হওয়া সম্ভব নয়। আপনি যখনই আপনার পুত্রের দুর্দশার কথা স্মরণ করবেন, তখনই আপনার শত্রুতা সজীব হয়ে উঠবে। এই মরণান্ত শত্রুতা একবার জন্মালে যেমন মাটির কলস একবার ভেঙে গেলে তাকে অক্ষত করা অসম্ভব হয়, তেমনিই আপনি যে প্রীতিবন্ধন চাইছেন তাও অসম্ভব। যখন কোনো বংশে একবার দুঃখদায়ক শত্রুতা বাসা বাঁধে, তখন তা আর মেটে না। তাকে স্মরণ করাবার লোক সবসময়ই থাকে ; তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বংশে একজনও থাকে, ততক্ষণ সেই শত্রুতা মেটে না। তাই কারো কিছু নষ্ট করে দেবার পর রাজার আর তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ব্রহ্মদত্ত বললেন—অবিশ্বাস করলে তো মানুষ জগতে কিছুই লাভ করতে পারবে না। মনে যদি ভয় থেকে থাকে তাহলে তার জীবনই মাটি হয়ে যাবে।

পূজনী বলল—রাজন্! যার দুপায়ে আঘাত লেগেছে, সে যদি সেই আঘাতসহ চলতে থাকে, তাহলে যত সাবধানতা অবলম্বন করুক না কেন, পায়ে ক্ষত হবেই। যে ব্যক্তি তার পীড়িত চক্ষুকে বাতাস থেকে রক্ষা না করে, বাতাসেই তার চক্ষু বেশি পীড়িত হবে। যে ব্যক্তি নিজের শক্তির কথা না ভেবে অজ্ঞানতাবশত ভয়ংকর পথে চলা শুরু করে, তার জীবন সেই পথেই শেষ হয়ে যায়। যে কৃষক বর্ষার কথা না ভেবে চাষ করতে থাকে, তার পরিশ্রম বৃথা যায়। যে ব্যক্তি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ করে, তার কাছে সেই খাদ্য অমৃত হয়ে ওঠে, কিন্তু যে পরিণাম চিন্তা না করে কুপথ্য ভোজন করে, তার জীবন সেই খাদ্যই শেষ করে দেয়। দৈব এবং পুরুষার্থ—এরা একে অপরের আশ্রয়ে থাকে, উদার ব্যক্তি সর্বদা শুভকর্ম করে আর কাপুরুষ দৈবের ভরসায় থাকে। যে ব্যক্তি কর্ম ছেড়ে বসে থাকে সে দারিদ্রের ফাঁদে পড়ে সর্বদা দুর্গতির শিকার হয়ে থাকে। তাই মানুষের সর্বস্ব পণ রেখে নিজের হিত করা উচিত। বিদ্যা, শৌর্য, দক্ষতা, বল এবং ধৈর্য—এই পাঁচটি হল মানুষের স্বাভাবিক মিত্র। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদাই এইগুলির আশ্রয়ে থাকে। গৃহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ত্রী, পৃথিবী এবং সুহৃদ—এগুলি মধ্যম স্থানের মিত্র ; মানুষ এগুলি চেষ্টা করলে পেতে পারে। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সে সর্বত্রই আনন্দে থাকে। বুদ্ধিমানের অল্প অর্থ থাকলেও তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে দক্ষতা সহকারে কাজ করে এবং সংযমের দ্বারা সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু বুদ্ধিহীন ব্যক্তি গৃহ, পৃথিবী, স্বদেশ এবং স্বজনের চিন্তায় মগ্ন থেকে সর্বদা দুঃখে থাকে। নিজ জন্মভূমিতে যদি রোগ ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয় তবে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত। যদি থাকতেই হয়, তাহলে সর্বদা সম্মানের সঙ্গে থাকা উচিত। তাই আমি অন্যত্র চলে যাব, এখানে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। দুষ্টা ভার্যা, দুষ্ট পুত্র, কুটিল রাজা, দুষ্ট মিত্র, দূষিত সম্বন্ধ এবং দুষ্ট দেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। কুপুত্রের ওপর কীকরে বিশ্বাস করা সম্ভব ? দুষ্টা ভার্যাকে কীকরে প্রেম নিবেদন করা যায় ? কুরাজ্যে শান্তি পাওয়া অসম্ভব এবং দুষ্ট দেশে জীবন-নির্বাহ হবে কীরূপে ? কুমিত্রের স্নেহ কখনো স্থির থাকে না, তাই তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা কঠিন। স্ত্রী তাকেই বলে, যে মধুরবাক্য বলে। পুত্র সেই ,যার থেকে সুখ পাওয়া যায়। মিত্র সেই, যাকে বিশ্বাস করা যায় এবং দেশ তাকে বলে, যেখানে জীবিকা-নির্বাহ হয়। রাজা তাকেই বলা হয়, যার শাসনে দেশে শান্তি বজায় থাকে, লোকে নির্ভয়ে বাস করে, দরিদ্রেরা সুবিধে পায়। যে দেশের রাজা গুণবান এবং ধর্মপরায়ণ হয়, সেখানে স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধব সকলেই আনুকূল্য পায়। অনাচারী রাজার অত্যাচারে প্রজাদের সর্বনাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-অর্থ-কাম—এই তিনেরই মূল রাজা। তাই তাঁর সতর্ক হয়ে সর্বদা প্রজাপালন করা উচিত। রাজার প্রজার কাছ থেকে তাদের আয়ের ষষ্ঠাংশ কররূপে নিয়ে তাদেরই প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করা উচিত। যে রাজা কর নিয়েও প্রজাদের ভালোভাবে দেখাশোনা করে না, সেই রাজা চোরের সমান। প্রজাকে অভয় দিয়ে রাজা যদি লোভের বশে সেরূপ ব্যবহার না করে তাহলে সমস্ত প্রজার পাপ একত্রে রাজার ওপর পড়ে এবং রাজাকে নরকবাস করতে হয়। যদি

কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ব্যাধ যদিও সেই সময় নিজে কষ্টে ছিল, তবুও সে তাকে তুলে খাঁচায় বন্ধ করে রাখল। ব্যাধ তো ছিল পাপাত্মা, সে পাপ কাজই করত, এইসময়ও সে পাপই করল। এরমধ্যে সে দেখল কাছেই এক বিশাল বৃক্ষে বহু পাখি বাসা বেঁধে আছে। কিছুক্ষণ পরে মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যাধও ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবল 'আমার বাড়ি তো এখান থেকে অনেক দূরে, আজ এখানেই থেকে যাই ; এই ভেবে সে গাছতলায় রাত কাটাবার জন্য করজোড়ে প্রণাম করে বলল—'এই বৃক্ষের অধিপতি দেবতার আমি শরণ করছি।' এই প্রার্থনা করে সে পাতা বিছিয়ে একটি শিলার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

রাজন্! সেই বৃক্ষশাখায় বহু দিন ধরে এক কপোত বাস করত। তার স্ত্রী পায়রাটি (কপোতী) সকাল হতেই খাবার আনতে গেছে, তখনও ফেরেনি। রাত্রি হয়ে গেছে দেখে সেই কপোত চিন্তিত হল। সে বলতে লাগল—'আরে ! আজ এত ঝড়-বৃষ্টি গেল আর আমার প্রিয় কপোতী এখনও ফিরে এল না। তার এখনও না ফেরার কী কারণ হতে পারে ? জানিনা বনের মধ্যে সে কুশলে আছে কি না। তাকে ছাড়া আমার বাসা শূন্য মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে গৃহিণী না থাকলে ঘরকে ঘর বলা যায় না—গৃহিণীকেই 'ঘর' বলা হয়। যে ঘরে গৃহিণী নেই, তা বনের সমান। আমার মধুরভাষিণী গৃহিণী যদি না ফেরে তবে আমার জীবন রেখে কী হবে ? সে এমনই পতিব্রতা ছিল যে আমি স্নান না করলে সে স্নান করত না, আমার আহার না হলে সে আহার করত না। সেইরকম আমি বসলে সে বসত, আমি ঘুমোলে তবে সে ঘুমোত। আমাকে প্রসন্ন দেখলে সে আনন্দিত হত আর বিষণ্ণ দেখলে সেও বিষণ্ণ হয়ে যেত। আমি একাকী বাইরে কোথাও গেলে তার মন খারাপ হয়ে যেত। আমি ক্রুদ্ধ হলে সে মিষ্ট কথায় আমার ক্রোধ শান্ত করত। সে অত্যন্ত পতিব্রতা, পতির আশ্রিতা এবং পতির প্রিয় কাজে তৎপর থাকত। পুরুষের ধর্ম-অর্থ-কামে প্রধানত স্ত্রীই সাহায্যকারিণী হয়। দূর-দেশে স্ত্রীই বিশ্বস্ত মিত্রের কাজ করে। পুরুষের সর্বোত্তম সম্পত্তি হল তার স্ত্রী। যে ব্যক্তি বহুদিন ধরে রোগগ্রস্ত অথবা বিপদে পড়ে আছে তার কাছে স্ত্রীর চেয়ে উত্তম সাহায্যকারী আর কেউ নেই। পুরুষের স্ত্রীর মতো কোনো বন্ধু নেই এবং ধর্মসাধনেও তার মতো সাহায্যকারী কেউ নেই। যার গৃহে সাধ্বী এবং মধুর ভাষিণী ভার্যা নেই, তার বনে বাস করা উচিত। তার কাছে ঘরও যা বনও তাই।

ভীষ্ম বললেন—কপোতটি যখন এইভাবে বিলাপ করছিল, তখন ব্যাধের খাঁচায় ধৃত কপোতী তার ক্রন্দন শুনে বলল—'আহা ! আমার কী সৌভাগ্য যে আমার প্রিয় পতিদেব এইভাবে আমার গুণগান করছে। স্ত্রীর ইষ্টদেব হল পতি। যার পতিদেব প্রসন্ন থাকে না, সেই নারী দাবানলে দগ্ধ হওয়া পুষ্পের ন্যায় ভস্ম হয়ে যায়। তখন সে কপোতকে বলল, হে স্বামীন্ ! আমার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, যদি পারেন তাহলে এই শরণাগতকে রক্ষা করুন। দেখুন, এই ব্যাধ আমাদের বাসার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, সে ক্ষুধা ও শীতে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, আপনি এর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করুন। স্বামী ! জগন্মাতা গাভী এবং ব্রাহ্মণ বধ করলে যে পাপ হয়, শরণাগতকে অযত্ন করলে সেই পাপই হয়। ভগবান আমাদের কপোতী বৃত্তি দিয়েছেন। নিজ জাতি ধর্ম অনুসারে আপনার ন্যায় মনস্বীর এখন সেরূপ আচরণই করা উচিত। যে গৃহস্থ যথাশক্তি আশ্রমধর্ম পালন করে, মৃত্যুর পর সে অক্ষয়লোক লাভ করে। সুতরাং আপনি শরীরের প্রতি মমতা ত্যাগ করে ধর্ম ও অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এই ব্যাধকে আপ্যায়ন করে প্রসন্ন করুন। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আপনার জীবন নির্বাহ করার জন্য দ্বিতীয় কবুতরী পেয়ে যাবেন।' খাঁচায় বন্দি সেই তপস্বিনী কবুতরী তার স্বামীকে এই কথা বলে অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে স্বামীকে দেখতে লাগল।

স্ত্রীর এই ধর্মানুসার যুক্তিযুক্ত কথা শুনে কপোত অত্যন্ত প্রসন্ন হল, তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। সে নিত্য পক্ষী-হিংসায় জীবন-নির্বাহকারী ব্যাধের দিকে তাকিয়ে তাকে যথোচিত স্বাগত জানিয়ে বলল—'বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ? আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন। ঘরে আসা অতিথির সেবা করা সকলেরই কর্তব্য, পঞ্চযজ্ঞের অধিকারী গৃহস্থের এটাই প্রধান ধর্ম। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থেকে পঞ্চমহাযজ্ঞ করে না, ধর্মানুসারে সে ঐহিক ও পারলৌকিক—কোনো সুখই পায় না। তাই আপনার কী ইচ্ছা বলুন ; কোনো দুঃখ পাবেন না। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।'

তার কথা শুনে ব্যাধ বলল—'আমি ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট পাচ্ছি, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার কোনো উপায় করো।' সেকথা

শুনে কপোতটি মাটিতে পড়ে থাকা পাতা জড়ো করল এবং তা জ্বালাবার জন্য আগুন আনতে শীঘ্রই উড়ে গেল। কামারের গৃহ থেকে জ্বলন্ত কয়লা এনে পাতায় ফেলে সে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। ব্যাধ আগুনের তাপ নিতে লাগল। শরীর গরম হলে ব্যাধের সব কিছু ঠিক হয়ে গেল, কাতর চোখে কপোতের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দাও।'

ব্যাধের কথায় কপোত মনে মনে চিন্তিত হল, সে ভাবতে লাগল এখন কী করা যায়। সে নিজের অক্ষমতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে লাগল। ক্ষণিক বাদেই সে একটি উপায় খুঁজে পেল। সে বলল—'আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আপনার আহারের ব্যবস্থা করছি।' এই বলে সে শুকনো পাতার আগুন উসকে দিয়ে বলে উঠল—'ঋষি, দেবতা এবং মহানুভব পিতৃপুরুষের কাছে শুনেছি যে অতিথি সৎকার করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। সৌম্য ! আপনি আমাদের অতিথি, তাই আমি আপনার আপ্যায়নের কথা চিন্তা করেছি। আপনি আমার ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।' এই বলে কপোতটি প্রসন্ন বদনে অগ্নি পরিক্রমা করে তাতে ঝাঁপ দিল। কপোতকে আগুনে পড়তে দেখে ব্যাধ মনে মনে ভাবল—'আরে ! এ আমি কী করলাম ? হায় ! আমি বড় নিষ্ঠুর, আমার কর্ম বড়ই

নিন্দনীয়, এতে নিঃসন্দেহে আমার খুব পাপ হবে।' এইভাবে সে বিলাপ করতে করতে বারংবার নিজ জীবিকা-বৃত্তির নিন্দা করতে লাগল।

ব্যাধের যদিও খুব খিদে পেয়েছিল, তা সত্ত্বেও কপোতকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখে সে বলতে লাগল—'হায় ! আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং মূর্খ, এ আমি কী করলাম। আমার জীবন অত্যন্ত দুঃখময়, আমার দ্বারা রোজই এরূপ পাপ কর্ম হয়ে থাকে। আমি সর্বতোভাবে অবিশ্বাসী, দুষ্টবুদ্ধি এবং নিষ্ঠুর বুদ্ধিসম্পন্ন। সমস্ত শুভকাজ ছেড়ে আমি এই পাখি শিকারের মতো নিষ্ঠুর কাজে জীবিকা নির্বাহ করি। আর এই কপোত কী মহান ! সে নিজেকে আগুনে সমর্পণ করে আমাকে খাদ্য দিয়েছে, এর দ্বারা সে আমাকে ধর্ম উপদেশই দিয়েছে। আমিও এবারে স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করে আমার প্রাণত্যাগ করব। আজ থেকে আমি সর্বপ্রকার ভোগত্যাগ করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে শরীর শুষ্ক করব এবং উপবাস করে পরলোকের পথ পরিষ্কার করব। ওহে ! নিজ শরীর বিসর্জন দিয়ে এই কপোত জানিয়ে গেল যে অতিথি সেবা কী করে করতে হয়। সুতরাং আমিও এবার থেকে ধর্মাচরণ করব ; মানুষের সর্বোত্তম আশ্রয় হল ধর্ম।' এই ভেবে সেই ব্যাধ লাঠি, তীর, জাল ফেলে কপোতীকে মুক্ত করে দিল এবং তপস্যা করার জন্য মহাপ্রস্থান করল।

ব্যাধ চলে গেলে কপোতী তার পতির জন্য অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল—'প্রিয়তম ! আমি স্মরণ করতে পারি না, তুমি কখনো আমার কোনো অপ্রিয় কাজ করেছ কিনা। তুমি অত্যন্ত আদর যত্নে আমার লালন-পালন করতে। আমি তোমার সঙ্গে অনেক সুখ ভোগ করেছি, আমার আজ আর কিছুই থাকল না। নারী তার পিতা-ভ্রাতা-পুত্রের কাছে সামান্যই সাহায্য পায়, স্বামীই তাকে সুখপ্রদান করে। সুতরাং এমন নারী কে আছে যে তার স্বামীকে সম্মান করবে না। স্ত্রীর কাছে পতির মতো আর কেউ নেই, তার কাছে ধন ও সর্বস্বের থেকেও পতিই পরম গতি। স্বামী ! এখন তোমা বিহনে আমার এই জীবনে আর কীবা প্রয়োজন ? কোন্ সতী নারী তার পতি বিহনে বেঁচে থাকতে চায় ?' কপোতী এইভাবে মর্মাহত হয়ে বিলাপ করতে করতে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাধ দেখল কপোত নানা রংয়ের ফুলের মালা এবং বিচিত্র বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হয়ে এক বিমানে আরোহণ করেছে, সেখানে বহু মহাপুরুষ তার সেবায় উপস্থিত।

সেই বিমানে মহাত্মা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সে স্বর্গগমন করল এবং পুণ্যকর্মের জোরে সেখানে আনন্দে বাস করতে লাগল।

ব্যাধ তাদের দুজনকে বিমানে চড়ে স্বর্গে যেতে দেখল এবং তাদের এইরূপ সদ্‌গতি দেখে বড়ই অনুতপ্ত হল। সে ভাবতে লাগল, 'আমিও এইরূপ তপস্যা করে পরমগতি লাভ করব।' মনে মনে এই চিন্তা করে সে সেখান থেকে রওনা হল এবং মমত্ব ত্যাগ ও বায়ু-ভক্ষণ করে উদামরহিত হয়ে এক কন্টকবহুল বনে প্রবেশ করল। তার সারা শরীর কাঁটার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাতাসের আঘাতে গাছে গাছে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুন হাওয়ার বেগে প্রচণ্ডভাবে জ্বলতে লাগল, তাতে বনের সমস্ত পশুপক্ষী পুড়ে ভস্ম হতে থাকল। তা দেখে ব্যাধ নির্ভয় চিত্তে দাবানলের মধ্যে ঢুকে গেল। অচিরেই সেও পুড়ে ভস্ম হয়ে পরমগতি লাভ করল। কিছুক্ষণ পর সে দেখল যে সে আনন্দের সঙ্গে স্বর্গে বিরাজমান এবং বহু যক্ষ, গন্ধর্ব ও সিদ্ধের মধ্যে সেও ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

এইভাবে এই কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিনজনই তাদের পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গগমন করে। যে নারী এইভাবে তার পতির অনুগমন করে সে এই কপোতীর ন্যায় স্বর্গলোকে বিরাজ করে। রাজন্! শরণাগতকে রক্ষা করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এর ফলে গো-বধের মতো পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হয়। এই পাপনাশক পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করলে মানুষ দুর্গতিগ্রস্ত হয় না এবং সে স্বর্গসুখের অধিকারী হয়।

নির্বুদ্ধিতাবশত কৃত পাপের নিবৃত্তির বিষয়ে রাজা জনমেজয় ও ইন্দ্রোত মুনির প্রসঙ্গ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! কোনো ব্যক্তি যদি অজ্ঞানে কোনোপ্রকার পাপকাজ করে তবে সে কীভাবে তার থেকে মুক্ত হতে পারে?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! এই বিষয়ে শুনক বংশজাত ইন্দ্রোত মুনি রাজা জনমেজয়কে যে প্রাচীন প্রসঙ্গ বলেছিলেন, তা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। পূর্বকালে পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয়[1] অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন। অজ্ঞানেই তাঁর দ্বারা ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। তাই তাঁর পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। সেই পাপাগ্নি জ্বালায় তিনি দিন রাত দগ্ধ হচ্ছিলেন। তাই তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তীব্র তপস্যা করতে শুরু করেন। সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে তিনি বহু ব্রাহ্মণের কাছে ব্রহ্মহত্যা নিবৃত্তির প্রায়শ্চিত্তের উপায় জিজ্ঞাসা করতেন। এই সময়ে তিনি মহাতপস্বী শুনক বংশীয় ইন্দ্রোত মুনির কাছে পৌঁছলেন এবং তাঁর দুপায়ে পড়লেন। রাজাকে দেখে ঋষি অত্যন্ত তিরস্কার করে তাঁকে বললেন—'আরে মহাপাপী! তুই এখানে কী করে এলি? আমার কাছে তোর কী কাজ? তুই এখনই এখান থেকে চলে যা, তোর এখানে থাকা আমার ভালো লাগছে না। ব্রাহ্মণ বধ করার জন্য তোর চিত্ত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সর্বক্ষণ পাপ চিন্তা করায় তোর জীবন ব্যর্থ এবং ক্লেশময় হয়েছে। এই দুষ্কর্মে তোর পিতৃবংশ নরকে পতিত হয়েছে, তাঁরা তোর ওপর যেসব আশা করেছিলেন, আজ সেসবই বৃথা হয়ে গেছে। যাঁদের পূজা করলে মানুষ স্বর্গ, আয়ু, সুযশ এবং সন্তান লাভ করে, সেই ব্রাহ্মণদেরই তুই বিনা কারণে হিংসা করিস। তোর পাপের জন্য তুই বহুবর্ষ ধরে মাথা নীচু করে নরকে পতিত থাকবি। সেখানে লোহার মতো চঞ্চু সমন্বিত শকুন এবং অন্য পাখিরা তোকে ঠুকরে খাবে এবং তারপর তোকে পাপযোনিতে জন্ম নিতে হবে। তুই যদি মনে করে থাকিস যে ইহলোকে যখন পাপের কোনো ফল মেলে না তখন পরলোকে আর কী ফল হবে, তাহলে যমদূত নিশ্চয়ই তোকে এর ফল বুঝিয়ে দেবে।'

মুনিবর ইন্দ্রোতের কথা শুনে রাজা জনমেজয় বললেন—'মুনে! আমি অবশ্যই ধিক্কারের যোগ্য। আপনি ভালোমন্দ যা বলেছেন, তা যথার্থ। আমি আপনার কৃপার ভিখারি। আমি পরিতাপরূপী অগ্নির দ্বারা পাপরাশি ভস্ম করছি। নিজ কুকর্মের কথা ভেবে আমার মনে একটুও শান্তি নেই। সত্য বলছি, যমরাজকে আমার খুবই ভয় হচ্ছে। আমার হৃদয়ে যে পাপের কাঁটা বিদ্ধ হয়ে আছে, তা বার না করে আমি বেঁচে থাকতে পারছি না। আপনি এর থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় বলে দিন। আমি চাই আমার বংশের যেন বিনাশ না হয়, জগতে যেন তার অস্তিত্ব থাকে। আমার কর্মের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত; এখন আপনি আমাকে

[1] এই পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয় অর্জুনের পৌত্র ও প্রপৌত্র নয়।

রক্ষা করুন। পণ্ডিতরা যেমন বালকের বিচার-বুদ্ধিতে মন দেন না, পিতা যেমন তাঁর পুত্রের অপরাধ দেখতে পান না, তেমনই আমার বুদ্ধি ও কাজের ওপর মন না দিয়ে আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন।'

ইন্দ্রোত বললেন—তুমি ব্রাহ্মণদের শক্তি এবং বেদ-শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত তাদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তো অবগত আছ। তাই ব্রাহ্মণদের শরণগ্রহণ করো এবং এমন কাজ করো, যাতে তুমি শান্তি পাও। ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন হলে তোমার পরলোকে মঙ্গল হবে, অথবা যদি তুমি তোমার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে থাক তাহলে সর্বদা ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখো।

জনমেজয় বললেন—আমি আমার পাপের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। এরপর আমি আর কখনো ধর্মলোপ করব না। আমার কল্যাণের জন্য ইচ্ছা হচ্ছে আর এখন আপনার সেবার জন্য আমি উপস্থিত, আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন।

ইন্দ্রোত বললেন—রাজন্! আমিও চাই যে তুমি দম্ভ ও মান ত্যাগ করে আমার প্রতি প্রকৃত প্রীতিসম্পন্ন হও, সমস্ত প্রাণীর হিতে তৎপর হও এবং ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দাও। আমি শুধু ধর্মের কথা মনে রেখেই তোমাকে স্বীকার করছি। আমার প্রধান উদ্দেশ্য হল যাতে তুমি ব্রাহ্মণদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখো। তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে কখনো ব্রাহ্মণদের প্রতি অবিচার করবে না।

জনমেজয় বললেন—ব্রহ্মন্! আমি আপনার চরণ-

স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি যে এখন থেকে আর কখনো মন-বাক্য ও কর্মদ্বারা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধাচরণ করব না।

ইন্দ্রোত বললেন—রাজন্! এখন তোমার হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আমি তোমাকে ধর্ম উপদেশ দেব। লোকে বলে যে, রাজা যদি দুশ্চরিত্র হয় তাহলে সমস্ত রাষ্ট্র তার জন্য সন্তপ্ত হয়। তুমিও আগে তাই ছিলে কিন্তু এখন তোমার দৃষ্টি ধর্মের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা উদার, কৃপণ অথবা তপস্বী হতে পারে, কিন্তু বিনা বিচারে কোনো কাজ করলে তা বেদনাদায়ক হয়। প্রত্যেক কাজই ভাবনা-চিন্তা করে করা উচিত। যজ্ঞ পরম পবিত্র এবং সেটিই রাজাকে পূর্ণভাবে পবিত্র করে তোলে। সেটি ভালোভাবে অনুষ্ঠান করলে তুমি পরমকল্যাণকারী ধর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। এইরূপ পবিত্র ক্ষেত্রে যাত্রাতেও অত্যন্ত পুণ্য হয়। কুরুক্ষেত্র পবিত্র স্থান, সরস্বতী নদী তার থেকে অধিক পবিত্র, সরস্বতীর থেকেও অন্য অনেক বেশি পবিত্র তীর্থ আছে এবং তার থেকেও পৃথুদক আরও পবিত্র। সেখানে স্নান করলে এবং তার জল পান করলে মানুষ যখনই পরলোকে যায়, তার জীবন সফল হবে। যদি তুমি মহা সরোবর, পুষ্কর, প্রভাস, উত্তর-মানস সরোবর ইত্যাদি তীর্থে গিয়ে স্নান করো তাহলে তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে।

এছাড়া তুমি ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতাও সম্পাদন করো। তারা যদি তোমাকে অপমান করে এবং নানাভাবে উপেক্ষা করে তাহলেও তুমি কখনো তাঁদের প্রতি রুষ্ট হবে না। এইভাবে সব কাজ করলে তুমি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। মানুষ যদি কোনো অপরাধ করে, তাহলে তার জন্য অনুতাপ করলে সে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদি আবার কোনো পাপ কাজ হয়ে যায়, তাহলে 'আর কখনো এমন কাজ করব না' বলে প্রতিজ্ঞা করলে পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব এবং দৃঢ়নিশ্চিত হবে যে ভবিষ্যতে সর্বদা ধর্ম আচরণই করবে, তাহলে তৃতীয়বারের পাপ থেকে রক্ষা পাবে। পবিত্র ভাবে তীর্থাদি ভ্রমণ করলে বহু পাপ থেকে মুক্তি হয়। তপস্যারত মানুষ সব পাপ থেকে তখনই মুক্তি পেয়ে যায়। যে ব্যক্তির কলঙ্ক হয়েছে সে একবৎসরব্যাপী অগ্নির উপাসনা করলে তার থেকে মুক্তি সম্ভব। গর্ভহত্যাকারী ব্যক্তির পাপ তিনবৎসরব্যাপী অগ্নির আরাধনা করলে তা থেকে মুক্ত হতে পারে অথবা মহাতীর্থ দর্শনে যাত্রা করলে পাপমুক্তি হয়। যে ব্যক্তি যত প্রাণী হত্যা করেছে, সেই

ব্যক্তি সেই জাতির ততগুলি প্রাণীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলে পাপমুক্ত হয়। মনু বলেন 'জলে তিনবার ডুব দিয়ে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করলে মানুষ সেইরূপ পাপ থেকে মুক্তি পায় যেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষে অবভৃত স্নান করলে হয়। এর দ্বারা শীঘ্রই তার সব পাপ বিনাশ হয়, সে সম্মান লাভ করে এবং সবপ্রাণী প্রসন্ন হয়ে তার সামনে দাঁড়ায়।' বৃহস্পতির মত হল যে 'মানুষ যদি না জেনে কোনো পাপ করে বসে তাহলে পরে বুদ্ধিপূর্বক পুণ্যকর্ম করলে সেই পাপ ক্ষালন হয়, ধৌত করলে বস্ত্রাদির ময়লা যেমনভাবে দূর হয়।' সূর্য যেমন প্রাতঃকালে উদিত হয়ে রাত্রের সমস্ত অন্ধকার দূর করে দেয়, তেমনই মানুষ শুভকর্ম করলে তার সমস্ত পাপের অন্ত হয়।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! রাজা জনমেজয়কে এইরূপ উপদেশ দিয়ে মুনিবর ইন্দ্রোত তাঁকে দিয়ে বিধিপূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। তাতে তাঁর সব পাপ নষ্ট হয়ে গিয়ে তিনি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেন।

মৃতের পুনর্জীবন প্রাপ্তির বিষয়ে এক ব্রাহ্মণ বালকের জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি কখনো এমন ব্যক্তিকে দেখেছেন বা তার কথা শুনেছেন, যে একবার মারা গিয়ে আবার জীবিত হয়েছে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! পূর্বকালে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে গৃধ্র ও শিয়ালের সংবাদরূপে একটি ঘটনা হয়েছিল, তুমি সেটি শোনো। একবার এক ব্রাহ্মণের বহু কষ্টে লাভ হওয়া সুন্দর বালকপুত্র বাল্যাবস্থাতেই মারা যায়। তার আত্মীয়রা কাঁদতে কাঁদতে তাকে নিয়ে শ্মশানে যায়। তারা বালকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত করুণভাবে কাঁদতে থাকে। মৃতদেহটি মাটিতে শোয়ালেও তারা সেখান থেকে চলে আসতে পারছিল না। তাদের কান্না শুনে এক গৃধ্র সেখানে এসে তাদের বলল—'আপনারা এখন এই বালককে এখানে রেখে চলে যান, বৃথা দেরি করবেন না। যারা তাদের মৃত আত্মীয়কে নিয়ে শ্মশানে আসে এবং যারা আসে না, সকলকেই আয়ু সমাপ্ত হলে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়। এই শ্মশানভূমি গৃধ্র ও শৃগালে পরিপূর্ণ, এখানে সর্বত্র নরকঙ্কাল পড়ে আছে, তাই সকল প্রাণীর কাছেই এটি ভয়াবহ, আপনাদের এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। প্রাণীদের গতি এমনই যে একবার কালগ্রাসে পড়লে তারা আর ফিরে আসে না। এই মর্ত্যলোকে জন্ম নিলে মরতেই হবে। দেখুন, সূর্য অস্তাচলের পথে, এবার আপনারা বালকের মায়া ছেড়ে ঘরে ফিরে যান।'

যুধিষ্ঠির ! সেই গৃধ্রের কথা শুনে তারা বালকটিকে মাটিতে শায়িত রেখে কাঁদতে কাঁদতে রওনা হল। এর মধ্যে এক কালো রংয়ের শিয়াল তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বলল—'মানুষগণ ! বাস্তবিক তোমরা অত্যন্ত স্নেহহীন। আরে মূর্খগণ ! এখনও তো সূর্যাস্ত হয়নি, এতো ভয় পাচ্ছ কেন ? একটু তো স্নেহশীল হও ? হতে পারে, কোনো শুভ মুহূর্তের প্রভাবে এই বালক জীবন ফিরে পাবে। তোমরা কী নির্দয় ! তোমরা পুত্রস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়ে এই শিশুপুত্রকে মাটিতে কুশ বিছিয়ে শুইয়ে দিয়েছ আর এই ভয়ংকর শ্মশানে তাকে ফেলে চলে যাচ্ছ ? দেখ, পশুপক্ষী তাদের শাবকদের পালনপোষণ করলে ইহলোক বা পরলোকে কোনো ফল পায় না তবুও তাদের শাবকদের প্রতি কত স্নেহ ! মানুষের মধ্যে স্নেহ কোথায় যে তাদের শোক হবে ? তোমাদের বংশধর এই বালককে একলা ফেলে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? আরে ! কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলে ভালোবাসার চোখে তাকে একটু দেখ। শরীর ক্ষীণ হওয়ার সময়, মামলায় হেরে যাওয়ার সময় এবং শ্মশানে যাওয়ার সময় বন্ধু ও আত্মীয়রাই সঙ্গে যায়, অন্যেরা নয়। হায় ! এই কমলনয়ন বালককে ছেড়ে তোমরা কীকরে ফিরে যাচ্ছ ?' শৃগালের কথা শুনে তারা সকলেই মৃত বালকের কাছে ফিরে এল।

তখন সেই গৃধ্র বলতে লাগল—'আরে বুদ্ধিহীন মানুষেরা ! এই তুচ্ছ মন্দবুদ্ধি শিয়ালের কথায় তোমরা ফিরে এলে ? শুষ্ক কাঠের মতো এই পঞ্চভূতহীন দেহের জন্য তোমরা কেন শোক করছ ? তোমরা এখন তীব্র তপস্যায় রত হও, তাহলে তোমাদের সব পাপ দূর হয়ে যাবে। তপস্যার প্রভাবে সব কিছু পাওয়া সম্ভব, বৃথা বিলাপে কী হবে ? ধন-সম্পদ, মণি-রত্ন, স্ত্রী-পুত্র সবেরই মূল তপ, তপের দ্বারাই সবকিছু পাওয়া সম্ভব। মানুষ পূর্বজন্মের

কর্মানুসারেই সুখ-দুঃখ সঙ্গে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পিতার কর্মের দ্বারা পুত্র বা পুত্রের কর্মে পিতা আবদ্ধ নয়। সকলেই নিজ নিজ পাপ-পুণ্যের দ্বারা আবদ্ধ এবং শেষে এই মৃত্যুপথেই যেতে হয়। সুতরাং তোমরা যত্নসহকারে ধর্মাচরণ করো, অধর্মে মতি রেখো না, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সময়ানুসার আচরণ করো। শোক ও দৈন্য পরিত্যাগ করো, পুত্রের মায়া-মমতা থেকে দূরে থাক, একে এখানেই রেখে চলে যাও। দেখো, যে যতই প্রিয় হোক না কেন, শ্মশানে আত্মীয়-বন্ধুরা বেশিক্ষণ থাকে না। স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে চোখে জল নিয়ে মৃতদেহ সংকার করে আত্মীয়দের ফিরে যেতেই হয়। বুদ্ধিমান হোক বা মূর্খ, ধনী হোক বা নির্ধন, মৃতাত্মাকে নিজের শুভ-অশুভ কর্মের ফল নিয়ে কালের অধীন হতেই হয়। শোক করেই বা তোমরা কী করবে ? সকলেরই শাসক কাল, যে সকলকেই একভাবে দেখে। এই করাল কাল যুবক, বালক, বৃদ্ধ এবং গর্ভস্থ জীবদেরও আত্মসাৎ করে ; এই জগতের এমনই গতি।'

তখন শৃগাল বলল—'আরে ! তোমরা তো পুত্রস্নেহে আকুল ছিলে, কিন্তু এই মন্দবুদ্ধি গৃধ্র তোমাদের স্নেহ শিথিল করে দিয়েছে। তাই তার সরল, যুক্তিযুক্ত এবং আপাতদৃষ্টিতে বাস্তব কথায় তোমরা স্নেহ বিসর্জন দিয়ে গৃহে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিলে। আরে, এতো তোমাদের রক্ত-মাংস থেকেই উদ্ভূত, তোমাদের শরীরের অঙ্গ এবং পিতৃবংশ বৃদ্ধিকারী। একে এই বনে ফেলে কোথায় যাবে ? আচ্ছা, এটুকু করো, যতক্ষণ সূর্য অস্ত না যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করো, তারপর তোমরা একে সঙ্গে নিয়ে যেও, নয়তো এখানেই বসে থেকো।'

গৃধ্র বলল—'মনুষ্যসকল ! আমি এক হাজার বছর আগে জন্মেছি, কিন্তু কখনো কোনো নারী বা পুরুষকে মৃত্যুর পর জীবিত হতে দেখিনি। দেখ, এর মৃতদেহ নিস্তেজ কাঠের মতো হয়ে গেছে। এরূপ প্রাণহীন দেহ ছেড়ে তোমরা কেন চলে যাচ্ছ না ? তোমাদের এই স্নেহ ও পরিশ্রম বৃথা, এতে কোনো ফল হবে না। আমি যদিও তোমাদের কিছু কঠোর কথা বলছি, কিন্তু তা হেতুপূর্ণ এবং মোক্ষধর্ম সমন্বিত, সুতরাং আমার কথা শুনে তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাও। কোনো মৃত আত্মীয়কে দেখে তার কাজের কথা স্মরণ করে মানুষের শোক দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।'

গৃধ্রের কথা শুনে সকলেই আবার ফিরে চলল, তখন শৃগাল শীঘ্র তাদের কাছে এসে বলতে লাগল—'ভাইসব ! দেখ তো, এই বালকের দেহবর্ণ কেমন সোনার মতো দেদীপ্যমান। এ একদিন তার পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করবে। তোমরা গৃধ্রের কথায় কেন একে পরিত্যাগ করে যাচ্ছ ? একে ছেড়ে গেলে তোমাদের স্নেহ, বিয়োগ ব্যথা এবং শোক তো কমবে না, তোমাদের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। একবার রাজর্ষি শ্বেতের পুত্রও মারা গিয়েছিল, কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ শ্বেত তাকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তেমনই তোমারও যদি কোনো সিদ্ধ, মুনি বা দেবতা পেয়ে যাও তাহলে তোমাদের দুঃখ দেখে তিনি কৃপা করতে পারেন।'

শিয়ালের কথা শুনে তারা আবার শ্মশানে ফিরে এসে বালকের মাথা ক্রোড়ে নিয়ে কাঁদতে লাগল। তাদের কান্নার শব্দে গৃধ্র তাদের কাছে এসে বলল, 'আরে ভাই ! তোমরা এই বালককে কেন অশ্রুজলে স্নান করাচ্ছ ? এই বালক ধর্মরাজের নির্দেশে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা বড় তপস্বী, ধনবান এবং বুদ্ধিমান, তাদেরও মৃত্যুমুখে যেতে হয় এবং শেষকালে এই শ্মশানেই আশ্রয় নিতে হয়। সুতরাং বারংবার ফিরে এসে এই শোকের বোঝা মাথায় নিয়ে কোনো লাভ নেই। এর পুনর্জীবনের কোনো আশা নেই। যে ব্যক্তি একবার দেহ থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করে, সে আর কখনো সেই দেহে ফেরে না। শত শত শৃগালও যদি তার জন্য নিজেদের বলিদান করে, তবুও এই বালক আর প্রাণ ফিরে পাবে না। তবে যদি রুদ্রদেব, স্বামী কার্তিকেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু একে বরদান করেন, তাহলে এই বালক বাঁচতে পারে। তোমাদের চোখের জলে বা দীর্ঘশ্বাসে এ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হবে না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অপ্রিয় আচরণ, কটুভাষণ, অপরের সঙ্গে দ্রোহ, অধর্ম এবং অসত্য দূর থেকেই পরিত্যাগ করা উচিত এবং ধর্ম, সত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ন্যায়, সর্বভূতে দয়া, অকুটিলতা এবং সৃজনতা ইত্যাদি গুণ যত্নের সঙ্গে সম্পাদন করা উচিত। এখন এই বালকের মৃত্যুর পর বৃথা রোদন করে তোমরা কী পাবে ?'

গৃধ্রের কথায় তারা বালককে সেখানেই রেখে কাঁদতে কাঁদতে গৃহে ফিরে চলল। তখন শিয়াল আবার বলল—'আরে ! তোমাদের ধিক্ ! তোমরা এই গৃধ্রের কথায় বুদ্ধিহীনের মতো পুত্রস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়ে কীকরে ফিরে যাচ্ছ ? এই গৃধ্র অত্যন্ত পাপী। এর কথায় তোমরা এই

রূপবান এবং কুলের শোভাবৃদ্ধিকারী বালককে পরিত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ ? আমি সত্য বলছি, আমার এই বালককে জীবিত বলেই মনে হচ্ছে। এর মৃত্যু হয়নি ; একে ছেড়ে গেলে তোমরা সুখ পাবে না। দেখ, তোমাদের সুখের সময় উপস্থিত হয়েছে, বিশ্বাস রাখ, তোমরা অবশ্যই সুখ পাবে।'

গৃধ্র বলল—'এই বন্য প্রদেশ প্রেতাদিপূর্ণ ; এখানে বহু যক্ষ-রাক্ষস বসবাস করে, এ অতি ভয়ংকর স্থান। তোমরা সূর্যাস্তের আগেই এর ক্রিয়াকর্ম সমাপন কর। এখানে ভয়ংকর দেহধারী মাংসাহারী জীব থাকে, তারা রাত্রে তোমাদের বিরক্ত করবে। এই বন্যভূমি খুবই ভীতিজনক, এখানে থাকলে তোমরা খুবই ভয় পাবে। এই বালকের দেহ কাঠের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। তোমরা একে রেখে গৃহে ফিরে যাও।'

শৃগাল বলল—'দাঁড়াও, দাঁড়াও ! যতক্ষণ সূর্যের আলো আছে, ততক্ষণ এখানে কোনো ভয় নেই। সেই সময় পর্যন্ত তোমরা স্নেহপূর্বক এই বালকের কাছেই থাক। যদি তোমরা এই গৃধ্রের কঠোর ভীতিপ্রদ কথা শোন তাহলে এই বালককে চিরদিনের জন্য হারাতে হবে।'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই গৃধ্র ও শৃগাল উভয়েই ক্ষুধার্ত ছিল। তারমধ্যে গৃধ্র বলতে লাগল যে সূর্য অস্ত হয়ে গেছে আর শৃগাল বলছিল এখনও অস্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এরা দুজনেই নিজ নিজ কাজ গোছানোর চেষ্টা করছিল। দুজনেই জ্ঞানের কথা বলায় পারদর্শী ছিল। তাই তাদের কথা শুনে লোকগুলি একবার বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করছিল, আবার পরক্ষণে ফিরে আসছিল। নিজেদের মতলব সিদ্ধ করার ছুতোয় গৃধ্র ও শৃগাল তাদের ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল, তারা শোকাকুল হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। সেই সময় পার্বতী দেবীর প্রেরণায় ভগবান শংকর সেখানে আবির্ভূত হলেন। তিনি লোকগুলিকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন সকলেই অত্যন্ত বিনীতভাবে ভারাক্রান্ত চিত্তে বলল—'প্রভু ! আমাদের একমাত্র পুত্রের বিয়োগে

আমরা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছি, তার পুনর্জীবনের আশায় উতলা হয়ে আছি। সুতরাং আপনি এই বালককে জীবন দান করে আমাদের রক্ষা করুন।' তারা অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালে মহাদেব বালককে জীবন দান করে তাকে শত বৎসর আয়ুর আশীর্বাদ করলেন এবং সেইসঙ্গে গৃধ্র ও শৃগালের ক্ষুধা মেটানোর বর দিলেন। এই বর লাভ করে তারা ভগবানকে প্রণাম করল এবং সকলেই হর্ষোৎফুল্ল মনে কৃতকৃত্য হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

রাজন্ ! যদি কোনো ব্যক্তি দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে কোনো কাজে মনোনিবেশ করে, তার থেকে না সরে যায়, তাহলে ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই সে সফলতা লাভ করে। দেখো, ভগবান শংকরের কৃপায় সেই দুঃখী মানুষেরা সুখ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং বালকের পুনর্জীবন লাভ করে তারা আনন্দিত মনে গৃহে ফিরে গিয়েছিল। যিনি ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষের পথ প্রদর্শনকারী এই আখ্যান শোনেন, তিনিও ইহলোকে ও পরলোকে নিরন্তর সুখলাভ করেন।

———○———

প্রবল শত্রু থেকে বাঁচার উপায় জানানোর জন্য শাল্মলী বৃক্ষ এবং বায়ুর প্রসঙ্গ

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! কোনো দুর্বল ব্যক্তি যদি মূর্খতার বশে কোনো বলশালী ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং সেই বলবান ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে তাহলে সেই দুর্বল ব্যক্তি কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে ?

ভীষ্ম বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই বিষয়ে শাল্মলী বৃক্ষ এবং বায়ুর আলোচনারূপ এক পুরাতন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। বহু দিন পূর্বে হিমালয় পর্বতে এক বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। তার সবুজ পাতা ও লম্বা লম্বা শাখা বহুদূর বিস্তৃত ছিল, সেটি চারশত হাত জুড়ে লম্বা ছায়া বিস্তার করে বিরাজমান থাকত। বহু বন্য হাতি, মৃগ তার নীচে বিশ্রাম নিত। বহু ব্যবসায়ী, বনবাসী, তপস্বীও সেই পথে যাবার সময় কিছুক্ষণ এই বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করত। একদিন দেবর্ষি নারদ সেইদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বৃক্ষের লম্বা লম্বা শাখা ও ডাল দেখে বৃক্ষের কাছে গিয়ে বললেন—'শাল্মলে, তুমি অত্যন্ত রমণীয় এবং মনোহর। বৃক্ষপ্রবর ! তোমার জন্য আমরা নিত্য সুখ পাই। তোমার ছত্র-ছায়ায় বহু পশু-পক্ষী নিবাস করে। তোমার এই দীর্ঘ-পত্র-বহুল শাখা বায়ু কখনো ভেঙে দেয় না। তাহলে পবন দেবের সঙ্গে তোমার বিশেষ প্রেম বা মিত্রতা আছে নাকি ? তাই তিনি সর্বদা তোমাকে রক্ষা করেন ? আরে, বায়ু যখন সবেগে আসে তখন ছোট-বড় সর্বপ্রকার বৃক্ষ এমনকী পর্বত শিখরকেও নড়িয়ে দেয়। তবে, ভয়ংকর হওয়া সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বা মৈত্রী কারণেই অবশ্য বায়ুদেব তোমাকে সর্বদা রক্ষা করেন। তুমি হয়তো তাঁর সামনে বিনীতভাবে বলো যে 'আমি তো আপনারই'—তাই তিনি তোমাকে রক্ষা করে থাকেন।

শাল্মলী বৃক্ষ বলল—ব্রহ্মন্ ! বায়ু আমার মিত্র, সুহৃদ অথবা বন্ধু কিছুই নয়। সে ব্রহ্মাও নয় যে আমাকে রক্ষা করবে। আমার মধ্যে যে ভীষণ বল ও পরাক্রম আছে, তার সামনে বায়ুর বল অষ্টাদশ অংশের এক অংশেরও সমান নয়। যখন সে বৃক্ষ-পর্বত এবং অন্যান্য বস্তু ভাঙচুর করতে করতে এইদিকে আসে তখন আমি নিজ পরাক্রমে তার গতিরোধ করি।

দেবর্ষি বললেন—শাল্মলে, এই ব্যাপারে তোমার বক্তব্য ঠিক নয়। জগতে বায়ুর মতো বলবান কেউ নেই। ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবেরও তাঁর সমকক্ষ নয়, তোমার তো কথাই নেই। জগতে জীব যা কিছু করে, বায়ু তার সকলের প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে তুমি অত্যন্ত অসার ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, শুধু কথা বলতেই জানো, তাই এত মিথ্যা বলছ। চন্দন, স্পন্দন, সাল, সরল, দেবদারু, বেত ইত্যাদি তোমার থেকে শক্তিশালী বৃক্ষরাও বায়ুকে কখনো অনাদর করে না। তারা নিজেদের এবং বায়ুর বল ভালোমতোই জানে, তাই তারা সর্বদা বায়ুর সামনে মাথা নত করে। তুমি যে বায়ুর বল সম্বন্ধে অবহিত নও, এ তোমার মূর্খতা। আমি এখন বায়ুর কাছে গিয়ে তোমার এই কথা জানাচ্ছি।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! শাল্মলীকে এইভাবে তিরস্কার করে ব্রহ্মবিদ্ শ্রেষ্ঠ নারদ বায়ুর কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন। তাতে বায়ুর অত্যন্ত ক্রোধ হল, তিনি শাল্মলীর কাছে গিয়ে বললেন—'শাল্মলী ! নারদের সামনে তুমি আমার নিন্দা করেছ ? তুমি জানো না আমি সাক্ষাৎ বায়ুদেব ? আমি এখনই তোমাকে আমার শক্তির সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছি। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির সময় তোমার ছায়াতে বিশ্রাম করেছিলেন ; তাই আমি এখন পর্যন্ত তোমাকে কৃপা করেছি এবং তুমি আমার বেগ থেকে রক্ষা পেয়েছ। কিন্তু তুমি আমাকে সাধারণ ভেবে অবজ্ঞা করছ। ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমার আসল রূপ দেখাচ্ছি, যাতে তুমি আর কখনো আমাকে অসম্মান করতে সাহস না পাও।'

বায়ুর কথা শুনে শাল্মলী হেসে বলল—'পবনদেব ! তুমি যদি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাক, তাহলে অবশ্যই নিজের ক্ষমতা দেখাবে। দেখি, ক্রোধ করে তুমি আমার কী অনিষ্ট করবে ? আমি তোমার থেকে বেশি বলশালী, তাই তোমাকে একটুও ভয় পাই না। আরে, বলবান তো সে-ই হয় যার বুদ্ধিবল থাকে। শুধু শারীরিক বলে বলীয়ান হলেই তাকে বলবান বলা যায় না।'

শাল্মলীর কথা শুনে পবন বললেন—'আচ্ছা, কাল আমি তোমাকে আমার পরাক্রম দেখাব।' রাত্রি হয়ে গেল। শাল্মলী নিজেকে বায়ুর মতো বলশালী না দেখে ভাবল, 'আমি দেবর্ষি নারদকে ঠিক কথা বলিনি। বায়ুর কাছে আমি পরাক্রমে নিতান্তই অসমর্থ। আমি আরও অনেক বৃক্ষের থেকেও যে দুর্বল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ কেউ নেই। সুতরাং আমি বুদ্ধির সাহায্যেই

বায়ুর ভয় থেকে মুক্ত হব। অন্য বৃক্ষেরাও যদি এইরূপ বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে বনে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে কুপিত বায়ুদ্বারা তাদেরও কোনোপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না।

ভীষ্ম বললেন—শাল্মলী এইরূপ স্থির করে নিজেই তার শাখাপ্রশাখা, ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে প্রাতঃকালে বায়ুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। সময় হলে বায়ু ক্রোধভরে শন্‌শন্‌ আওয়াজ তুলে বহু বিশাল বৃক্ষ ধরাশায়ী করতে করতে সেইখানে এলেন। তিনি যখন দেখলেন শাল্মলী বৃক্ষ তার ডালপালা ফুল-পাতা সব ফেলে কঙ্কালসার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তাঁর সব ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি হেসে বললেন—'আরে শাল্মলী ! আমিও তোমার এইরূপ চেহারা করতে চেয়েছিলাম। তোমার ফুল-পাতা-শাখা বিনষ্ট হয়ে অঙ্কুরও ঝরে গেছে। নিজের কুমতিতেই তুমি আমার পরাক্রমের শিকার হয়েছ।'

বায়ুর কথা শুনে শাল্মলী অত্যন্ত সংকোচ বোধ করল এবং নারদের কথা স্মরণ করে অনুতাপ করতে লাগল। রাজন্‌ ! এইরূপ যে ব্যক্তি দুর্বল হয়েও নিজের বলবান শত্রুর বিরোধিতা করে, তাকে মূর্খ শাল্মলীর মতোই অনুতাপ করতে হয়। তাই বলবান শত্রুর সঙ্গে কখনো শত্রুতা করতে নেই। বস্তুত মানুষের কাছে তার বুদ্ধি ও বলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো জিনিস নেই ; তাই সক্ষম বালক, মূর্খ, অন্ধ, বধির ব্যক্তিকে এবং নিজের থেকে বিশেষ বলবান ব্যক্তিকেও সমীহ করে চলা উচিত। অবশ্য তোমার মধ্যে এই গুণাবলীর বাহুল্য রয়েছে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! এখন পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছু রাজধর্ম ও বিপদকালে পালনীয় ধর্মের কথা শোনালাম। বলো, আর কী শুনতে চাও ?

লোভে পাপ, শিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষণ, অজ্ঞানের দোষ এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি এখন শুনতে চাই যে পাপের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপ কী এবং কীসের থেকে তার প্রবৃত্তি হয়।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্‌ ! শোনো লোভ হল অতি ভয়ংকর রাক্ষস এবং লোভের থেকেই পাপের প্রবৃত্তি হয়। লোভ থেকেই পাপ, অধর্ম ও দুঃখ জন্ম নেয় এবং তারই আবর্তে মানুষ পাপী হয়ে ওঠে, এইসব কপটতার মূলই হল লোভ। লোভ থেকেই কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান এবং স্বভাবের উৎপত্তি হয়। লোভের থেকেই ক্ষমাহীনতা, নির্লজ্জতা, লক্ষ্মীনাশ, ধর্মক্ষয়, চিন্তা এবং অপকীর্তি জন্ম নেয় এবং লোভ থেকেই কৃপণতা, অতি তৃষ্ণা, অকর্মে প্রবৃত্তি, কুল, অভিমান, রূপ-ঐশ্বর্যের অহংকার, সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দ্রোহ, সকলকে অপমান, সকলের প্রতি অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি দোষের প্রাদুর্ভাব হয়। অপরের ধন হরণ করা, অন্যের স্ত্রী-কন্যার মর্যাদা নষ্ট করা, মন ও বাক্যের চঞ্চলতা, নিন্দাতে রুচি, কাম এবং স্বাদেন্দ্রিয়র প্রাবল্য, মিথ্যাভাষণের প্রবৃত্তি, অপরকে ঘৃণা করা, খাটো করা, ঈর্ষা এবং অকরণীয় কাজ করে যাওয়া—এই সব অপকর্মের কারণই হল লোভ। মানুষ বৃদ্ধ হলেও তার লোভ কম হয় না। বহু নদীর জলরাশি আত্মসাৎ করেও যেমন সমুদ্রের তৃপ্তি হয় না, তেমনই বহু ধন ও ভোগ্য পদার্থ পেলেও লোভীর মন ভরে না। রাজন্‌ ! এর প্রকৃত স্বরূপ দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, নাগ বা জগতের কোনো প্রাণী বলতে পারে না। সুতরাং সংযতচিত্ত ব্যক্তিকে যেন-তেন প্রকারে এই মোহ ও লোভকে বশে রাখতে হয়। লোভী মানুষের মধ্যে দম্ভ, দ্রোহ, নিন্দা, ঈর্ষা—এই সমস্ত দোষ থাকে। বহুশ্রুত ব্যক্তিরা বড় বড় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করেন এবং সর্বপ্রকার প্রশ্নেরও সমাধান করেন, কিন্তু এই পাপরূপী লোভের কবলে পড়ে তাঁরা বহু দুঃখ ভোগ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে দ্বেষ ও ক্রোধের আধিক্য থাকে, শিষ্টাচার থেকে এঁরা বহু দূরে থাকেন। মিষ্টবাক্য বললেও অন্তরে কঠোর ভাব পোষণ করেন। তাদের অবস্থান ঘাসে ঢাকা ইঁদারার মতো। এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্রমনা এবং ধর্মের নামে লোকেদের ঠকিয়ে বেড়ান। এই লোভগ্রস্ত দুরাত্মা মানুষদের জন্যই সমাজে নানা বিকার উদ্ভূত হয় এবং লোকেরা কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়।

এবার আমি তোমার কাছে শিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনা করছি : তাঁদের কাছেই তুমি তোমার মনের সন্দেহ দূর করবে।

তাদের সঙ্গ করলে মানুষের পুনর্জন্ম এবং পরলোকের ভয় থাকে না। এঁদের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি থাকে না, এঁরা প্রিয়-অপ্রিয় সমানভাবে দেখেন, এঁদের কাছে শিষ্টাচার এবং ইন্দ্রিয় সংযম অত্যন্ত প্রিয়, সুখ-দুঃখে সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সত্যই তাঁদের পরম লক্ষ্য হয়। এঁরা দান করেন, গ্রহণ করেন না। তাঁরা অত্যন্ত দয়ালু এবং পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং অতিথি সেবাপরায়ণ হন। এঁরা অপরের হিতার্থে সর্বদা উদ্যত থাকেন, সকলের প্রতি উপকারী, সর্বপ্রকার ধর্মের পালনকারী, অন্যের জন্য সর্বস্ব দান করতে সক্ষম এবং অত্যন্ত বড় বীর হন। কোনো ব্যক্তি তাঁদের নিজ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। তাঁদের আচরণের সঙ্গে পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিদের আচরণে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাঁরা কাউকে আতঙ্কগ্রস্ত করেন না এবং তাঁরা চপলস্বভাব ও ক্রূর নন এবং সর্বদা সৎপথে অবস্থান করেন। সৎব্যক্তিদের সর্বদা এঁদের সঙ্গ করা উচিত। এঁদের মধ্যে অহিংসাবৃত্তির প্রাধান্য থাকে, কাম-ক্রোধ থাকে না। এঁরা সদাচারশীল এবং মর্যাদা-পালনকারী হয়ে থাকেন। তুমি এঁদের সেবা করবে এবং যা জিজ্ঞাসা করার তা এঁদের কাছেই জেনে নেবে। রাজন্ ! তাঁদের ধর্ম অর্থ অথবা যশ লাভের জন্য হয় না, শরীরের আবশ্যক ক্রিয়ার মতো তাঁরা ধর্ম পালনকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে ভয়, ক্রোধ, চপলতা এবং শোকের লেশমাত্রও থাকে না। তাঁরা ধর্মের ভান করেন না এবং ধর্মপালনে তাঁদের কোনো স্বার্থ জড়িত থাকে না। তাঁরা লোভ ও মোহবর্জিত এবং সত্য ও সরলতা পালন করেন। এইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে সর্বদা প্রীতির সম্পর্ক রাখবে। এঁরা সর্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত এবং সমদর্শী। এঁদের দৃষ্টিতে লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় এবং জীবন-মরণে কোনো পার্থক্য থাকে না। এঁরা দৃঢ় পরাক্রমী, উন্নতিশীল এবং সত্ত্বময় পথ অনুসরণ করেন। তুমি ইন্দ্রিয় জয় করে অত্যন্ত সতর্কভাবে এইসকল ধর্মপ্রিয় ও দিব্যগুণসম্পন্ন মহাত্মাদের সেবা করবে। এঁরা সকলেই অত্যন্ত গুণবান। অন্যান্য ব্যক্তিরা শুধু বড় বড় কথাই বলে থাকে।

যুধিষ্ঠির বললেন—তাত ! আপনি সমস্ত অনর্থের কারণ লোভের বর্ণনা করেছেন, এখন আমি অজ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত পাপ করে এবং তাতে নিজের যে ক্ষতি হয় তা বোঝে না, সাধু ব্যক্তিদের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হয়, জগতে তার নিন্দা হয়। অজ্ঞানের জন্যই জীব নরকে পতিত হয়, অজ্ঞানের জন্যই তার দুর্দশা হয় এবং অজ্ঞানতার জন্যই সে কষ্টে পড়ে বিপদগ্রস্ত হয়। রাগ-দ্বেষ-হর্ষ-মোহ-শোক-অহংকার-কাম-ক্রোধ-দর্প-নিন্দা-তন্দ্রা-আলস্য-ইচ্ছা-সন্তাপ-ঈর্ষা ও পাপকাজ করা—এগুলি সবই অজ্ঞানের অন্তর্গত। রাজন্ ! অজ্ঞান এবং লোভ—উভয়ই এক জেনো ; কারণ এদের পরিণাম একই—একই প্রকার মন্দ ফলপ্রদানকারী। অজ্ঞানতা থেকেই লোভের উৎপত্তি হয়, লোভ বৃদ্ধি হলে অজ্ঞানতাও বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ লোভ থাকে অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়, লোভের ক্ষয় হলে অজ্ঞানতাও হ্রাস হয়। অজ্ঞান ও লোভের জন্যই জীবকে নানা জন্ম পরিগ্রহণ করতে হয়। অজ্ঞান থেকে লোভ এবং লোভ থেকে অজ্ঞান—এই দুটি একে অপরের আশ্রিতা। লোভ থেকেই সমস্ত দোষ প্রকটিত হয় ; তাই লোভকে পরিত্যাগ করা উচিত। জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিত এবং অন্য বহু রাজা লোভ পরিত্যাগ করেই দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির ! তুমিও লোভ ত্যাগ করো, তাহলে তুমি ইহলোক ও পরলোকে সুখ পাবে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জগতে শ্রেয় প্রতিপাদন করার বহু দর্শন (মত) আছে ; কিন্তু আপনি যা শ্রেয় মনে করেন যা ইহলোক ও পরলোকেও কল্যাণকারী, আমাকে সেইগুলি বলুন। ধর্মের পথ অত্যন্ত দুর্গম, তার বহু শাখাপ্রশাখা আছে, তার মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম—অবশ্য পালনীয় বলে মনে করা হয় ? বহু শাখাবিশিষ্ট এই মহান ধর্মের প্রকৃত মূল কী ?—আপনি সবিস্তারে আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে উপায় অবলম্বন করলে তোমার শ্রেয় (কল্যাণ) লাভ হবে, তা বলছি, শোনো। অমৃত পান করলে যেমন পূর্ণতৃপ্তি লাভ হয়, তেমনই এই জ্ঞান লাভ করলে তুমি পূর্ণ তৃপ্ত হবে। ধর্মের বহু বিধান, মহর্ষিগণ তাঁদের জ্ঞান অনুসারে সেগুলি বর্ণনা করেছেন।

সে সবেরই আধার হল দম, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম। ধার্মিক সিদ্ধান্ত জানা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দমকে মুক্তির সাধন বলে থাকেন। বিশেষত ব্রাহ্মণদের কাছে দমই সনাতন ধর্ম। এর দ্বারাই তাঁদের শুভকর্ম যথাবৎ সিদ্ধ হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণদের কাছে দম দান, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়ের থেকেও বড়। দম তেজ বৃদ্ধি করে এবং পবিত্র করে। তেজস্বী ব্যক্তি দমের সাহায্যে পাপরহিত হয়ে পরমপদ লাভ করেন। জগতে দমের ন্যায় অন্য কোনো ধর্মের কথা আমি জানি না। ধর্মপালনকারীদের সকলেই এর প্রশংসা করেছেন। ইন্দ্রিয় সংযম এবং মনোনিগ্রহে যুক্ত ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করেন। তাঁরা মহান ধর্মের ফলপ্রাপ্ত হন। তাঁদের মন সর্বদা প্রসন্ন থাকে। যার ইন্দ্রিয়াদি ও মন বশে থাকে না, তাকে বারংবার দুঃখভোগ করতে হয় এবং সে নিজ দোষেই নানা বাধাবিপত্তি ও অনর্থের সম্মুখীন হয়। চার আশ্রমেই দমকে উত্তম সাধন বলা হয়েছে। যেসব ব্যক্তিদের হৃদয়ে দম (সংযম) উৎপন্ন হয়েছে, আমি তাদের লক্ষণ বলছি, শোনো—ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সাম্য, সত্য, সারল্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দক্ষতা, কোমলতা, লজ্জা, স্থৈর্য, উদারতা, অক্রোধ, সন্তোষ, মিষ্টভাষী, অপরকে কষ্ট না দেওয়া এবং অন্যের দোষ না দেখা—এই সব গুণ যাঁর মধ্যে থাকে, বুঝতে হবে তাঁদের মধ্যে সংযম উদয় হয়েছে। তাঁরা গুরুজনদের সম্মান এবং সর্বপ্রাণীকে দয়া করে থাকেন।

সংযমী ব্যক্তিরা পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, অহংকার, রোষ, ঈর্ষা এবং অন্যের অপমান—এই সব দুর্গুণকে প্রশ্রয় দেন না। সংযমরক্ষাকারীর কখনো নিন্দা হয় না, তাঁর মনে কোনো কামনা থাকে না। 'আমি তোমার, তুমি আমার, ওর জন্য আমার স্নেহ আছে, আমার জন্য ওর'—এই প্রকার সম্বন্ধ তিনি পোষণ করেন না। যিনি অপরের প্রশংসা ও নিন্দা থেকে দূরে থাকেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। যিনি সুশীল এবং সবার প্রতি বন্ধুভাব বজায় রাখেন, যাঁর মন নানাপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত, তিনি মৃত্যুর পর সুফল লাভ করেন। সদাচারী, সুশীল, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মার স্বরূপ জ্ঞাত বিদ্বান ব্যক্তি ইহলোকে সম্মান এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হন। ইহজগতে যে সব শুভ (কল্যাণকর) কর্ম আছে, সৎপুরুষেরা যা আচরণ করেছেন, সেগুলিই জ্ঞানী মুনিদের আচরিত পথ। তাঁরা স্বভাবতই সেই আচরণ করে থাকেন, কখনো তা ত্যাগ করেন না। জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ গৃহত্যাগ করে নির্জন বনে আশ্রয়গ্রহণ করে দেহ-মুক্তির প্রতীক্ষায় রত থেকে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বিচরণ করেন। এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। যাঁর কোনো প্রাণী থেকে ভয় নেই এবং যাঁর থেকে অন্য প্রাণীরা ভয় পায় না, সেই দেহাভিমানবর্জিত মহাত্মা কাউকে ভয় পান না। তিনি সকল প্রাণীতে সমভাব বজায় রেখে সকলকে মিত্রের ন্যায় অভয়প্রদান করেন। আকাশে পাখি এবং জলে জলচর প্রাণীর গতি যেমন দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তির গতিও জানা যায় না। যিনি গৃহত্যাগ করে মোক্ষের জন্য চেষ্টা করেন, তিনি তেজোময় লোক প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মরাশিতে উৎপন্ন পিতামহ ব্রহ্মার উত্তম ধাম, মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারাই লাভ হয়। যাঁর কোনো প্রাণীর সঙ্গে বিরোধ নেই, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সেই জ্ঞানীর ইহজগতে পুনর্জন্মের ভয় থাকে না। সংযমের একমাত্র দোষ হল, লোকে ক্ষমাশীল হওয়ায় তাঁকে অক্ষম মনে করে। কিন্তু এর সব থেকে বড় গুণ হল, ক্ষমা ধারণ করায় তিনি অনেক উত্তম লোক লাভ করেন ; কারণ ক্ষমাতে মানুষের সহ্যশক্তি বাড়ে। সংযমী ব্যক্তির বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অসংযমীর বনে গিয়ে লাভ নেই। সংযমী ব্যক্তি যেখানে বাস করেন, সেটিই বন, সেটিই আশ্রম।

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীষ্মের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দে মগ্ন হলেন, যেন অমৃতপানে তৃপ্ত হয়েছেন। তিনি ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং ভীষ্মও প্রসন্ন বদনে তাঁর সব প্রশ্নের সমাধান করতে লাগলেন।

তপ এবং সত্যের মহিমা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দোষের বর্ণনা এবং নৃশংস ব্যক্তির লক্ষণ

ভীষ্ম বললেন—বিদ্বান ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে এই সমস্ত জগতের মূল কারণ হল তপ। যে মূর্খ কখনো তপ করেনি, সে কখনো কর্মে সাফল্য পাবে না। প্রজাপতি তপের দ্বারাই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং ঋষিগণ তপের সাহায্যেই বেদাদি জ্ঞান লাভ করেছেন। বিধাতা ফল-মূল-অন্ন প্রভৃতিও তপের দ্বারাই উৎপন্ন করেছেন। তপঃসিদ্ধ মহাত্মা ব্যক্তিগণ ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করে থাকেন। প্রত্যেক সাধনার মূলই হল তপস্যা। জগতে যেসব দুর্লভ বস্তু আছে, তপস্যার দ্বারাই তা সুলভ হয়। মদ্যপায়ী, চোর, ভ্রূণহত্যাকারী পাপী ব্যক্তিও ভালোভাবে তপস্যা করে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।

তপস্যার অনেক স্বরূপ, কিন্তু তারমধ্যে উপবাসে থাকার থেকে বড় কোনো তপস্যা নেই। দানের থেকে বড় কোনো দুষ্কর ধর্ম নেই, মাতার সেবার থেকে বড় কোনো আশ্রম নেই, ত্রিবেদে বিদ্বান ব্যক্তিদের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ব্যক্তি নেই এবং সন্ন্যাস তো মহান তপ। ঋষি, পিতৃপুরুষ, দেবতা, মানুষ, অন্যান্য চরাচর জীবও তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে। তপস্যার দ্বারাই সকলে সিদ্ধিলাভ করে। দেবতারাও তপস্যার সাহায্যে এত বড় মহিমা লাভ করেছেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃপুরুষ এবং দেবতা—এঁরা সকলেই সত্যভাষণরূপ ধর্মের প্রশংসা করেন, সুতরাং আমি জানতে চাই সত্য কী ? কী তার লক্ষণ, কীভাবে তা লাভ করা যায় এবং সত্যপালন করলে কী লাভ হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সৎপুরুষ সর্বদাই সত্যরূপ ধর্মপালন করেন। সত্য সনাতন ধর্ম। সত্যকে সম্মান করা উচিত ; কারণ সত্যই জীবের পরম গতি। সত্যই ধর্ম, তপ, যোগ এবং সনাতন ব্রহ্ম। সত্যই পরম যজ্ঞ। সত্যের ওপরই সব কিছু নির্ভরশীল। এখন আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে সত্যের আচার, লক্ষণ এবং তা প্রাপ্তির উপায় জানাচ্ছি। সমস্ত জগতে সত্যের (সেটির অতিরিক্ত) তেরোটি ভেদ আছে বলে মানা হয়—সত্য, সমতা, দম, ঈর্ষ্যার অভাব, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা (সহনশীলতা), অন্যের দোষ না দেখা, ত্যাগ, ধ্যান, আর্যত্ব (শ্রেষ্ঠ আচরণ), ধৈর্য, অহিংসা ও দয়া—এসবই সত্যের স্বরূপ।

নিত্য, অবিনাশী এবং অবিকারী হওয়াই সত্যের লক্ষণ। কারো সঙ্গে বিরোধ না করাকেই যোগ বলা হয় এবং এর দ্বারাই সত্যপ্রাপ্তি হয়। রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ জয় করে মিত্র ও শত্রুতে সমভাব রাখাই হল সমতা। কারো বস্তুতে লোভ না করা, সদা গাম্ভীর্য ও ধৈর্য রক্ষা করা, নির্ভয় থাকা এবং মনকে নীরোগ রাখা—এই সবই দমের (মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের) লক্ষণ। জ্ঞান দ্বারাই এর প্রাপ্তি হয়। দান এবং ধর্মের সময় নিজ মনকে বশে রাখা—বিদ্বান লোকেরা একে 'মৎসরতার অভাব' বলে থাকেন। সদা সত্য পালন করলেই মানুষ মৎসরতা ত্যাগ করতে পারে। সহ্য না করার মতো অপ্রিয় বাক্য শুনেও যে ক্ষমা করে দেয়, তাকেই সৎপুরুষ বলে মানা হয়। সত্যবাদীদের মধ্যেই ক্ষমাগুণ পরিলক্ষিত হয়। যে বুদ্ধিমান পুরুষ অপরের কল্যাণ করে এবং মনে কখনো দুঃখবোধ করে না, যার মন ও বাক্য সদাই শান্ত ; তাকে লজ্জাবান বলা হয়। এই লজ্জা নামক গুণ ধর্ম-আচরণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়। ধর্মের জন্য কষ্ট সহ্য করাকে তিতিক্ষা (সহনশীলতা) বলা হয়। লোকের সামনে আদর্শ উপস্থাপন করার জন্য, এটি অবশ্য পালনীয়। ধৈর্যের দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয়। আসক্তি ও বিষয় ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত না হলে ত্যাগের সিদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তি নিজেকে গোপন রেখে আসক্তিবর্জিত হয়ে যত্ন সহকারে জীবের কল্যাণের জন্য কর্ম করে, তার সেই শ্রেষ্ঠ আচরণকেই বলা হয় আর্যত্ব। সুখ বা দুঃখে মন বিকারগ্রস্ত না হওয়াকেই বলা হয় ধৈর্য। যে নিজের উন্নতি চায়, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বদা ধৈর্য ধারণ করা উচিত। সদা ক্ষমা করবে, সত্য বলবে এবং হর্ষ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করবে। এরূপ আচরণযুক্ত বিদ্বান ব্যক্তি ধৈর্য লাভ করে। মন, বাক্য অথবা ক্রিয়ার দ্বারা কখনো কোনো প্রাণীকে হিংসা করবে না, সকলের ওপর অনুগ্রহ (দয়াভাব) রাখবে এবং দান করবে—এগুলি মানুষের সনাতন ধর্ম। এইরূপ পৃথক পৃথকভাবে বলা উপরিউক্ত সকল ধর্ম সত্যেরই স্বরূপ। রাজন্ ! সত্যের গুণাবলী বলে শেষ করা যায় না। তাই ব্রাহ্মণ, পিতৃপুরুষ এবং দেবতারাও সত্যের প্রশংসা করেন। সত্য থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই আর মিথ্যা থেকে বড় কোনো পাপ নেই। সত্যই ধর্মের আধার ; সুতরাং

সত্যলোপ করা উচিত নয়। সত্যের দ্বারা দানের, দক্ষিণাসহ যজ্ঞের, ত্রিবিধ অগ্নিতে আহুতির এবং ধর্ম নির্ণয়কারী বেদাদির স্বাধ্যায়ের ফলও প্রাপ্ত হয়। একদিকে যদি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যদিকে সত্যের ফল রেখে তুলনা করা যায়, তাহলে অশ্বমেধ যজ্ঞের থেকে সত্যের ওজনই বেশি হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, বিধিৎসা (নতুন কর্ম শুরু করার ইচ্ছা), পরাসুতা (কঠোরতাপূর্ণ কর্ম করা), লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, নিন্দা, দোষদৃষ্টি, ক্রূরতা এবং ভয়—এই সব দোষ কীসের থেকে উৎপন্ন হয়, আমাকে ঠিক করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—তোমার দ্বারা কথিত এই তেরোটি দোষ প্রাণীদের অত্যন্ত প্রবল শত্রু, এরা মানুষকে সব দিক থেকে ঘিরে থাকে। যে সাবধানে থাকে না, তাকে এই সকল শত্রু নানাভাবে কষ্ট দেয়। মানুষকে দেখলেই এগুলি পশুর মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বলপূর্বক তার বিনাশ সাধন করে। এদের থেকেই সকলে দুঃখ পায় এবং এগুলির প্রেরণাতেই পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। এগুলি কীসের থেকে উৎপন্ন হয়, কীভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কীকরে বিনাশ হয়, তা সবই বলছি। সর্বপ্রথম ক্রোধের উৎপত্তির কথা বলছি, একাগ্রচিত্তে শোনো। ক্রোধ লোভ হতে উৎপন্ন হয় এবং অপরের প্রতি দোষদৃষ্টি থাকলে বৃদ্ধি পায়। ক্ষমার দ্বারা তার বৃদ্ধি রুদ্ধ হয় এবং ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। কামের উৎপত্তি হয় সংকল্প থেকে, তার সেবা করলে বাড়ে আর আসক্তিবর্জিত হয়ে ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। অপরের দোষ দেখাকে বলে অসূয়া, এটি ক্রোধ এবং লোভ হতে উৎপন্ন হয়। সকল প্রাণীর ওপর দয়া, মনে বৈরাগ্য এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হলে এটি বিনষ্ট হয়ে যায়। অজ্ঞান থেকে মোহ উৎপন্ন হয়, পাপের আচরণ করতে থাকলে তা বৃদ্ধি পায় এবং সৎপুরুষের সৎসঙ্গে সহজেই তা নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন আত্মজ্ঞান বিরোধী শাস্ত্র অবলোকন করে, তখন তার (স্বর্গ কামনায়) নতুন নতুন কর্ম আরম্ভের ইচ্ছা (বিধিৎসা) জাগে, তত্ত্বজ্ঞান হলে তার নিবৃত্তি হয়। যার ওপর ভালোবাসা থাকে, তার বিয়োগে শোক হয়, কিন্তু যখন মানুষ বুঝতে পারে যে এই শোক বৃথা, এতে কোনোই লাভ নেই, তৎক্ষণাৎ সে শান্তি লাভ করে।

পরাসুতা অর্থাৎ কঠোর কর্মে প্রবৃত্তি হয় ক্রোধ, লোভ এবং অভ্যাসের ফলে। এর নিবৃত্তি হয় সব প্রাণীর ওপর দয়া করলে এবং মনে বৈরাগ্য হলে। সত্য ত্যাগ করলে এবং দুষ্টের সঙ্গ করলে মাৎসর্য দোষ উৎপন্ন হয়, সৎপুরুষের সেবা করলে তার নিবৃত্তি হয়। নিজের উত্তম কুল, ঐশ্বর্যের অহংকার এবং সবজান্তা ভাবের জন্য মানুষের মনে অহংকার আসে, কিন্তু এগুলির আসল রূপ জানলে তা শীঘ্রই দূর হয়ে যায়। মনে কামনার উদয় হলে এবং অপরকে হাসি-খুশি দেখলে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়, বিবেকশীল বুদ্ধির সাহায্যে তা দূরীভূত হয়। সমাজ থেকে ভ্রষ্ট নীচ মানুষদের দ্বেষপূর্ণ ও অপ্রামাণিক বাক্য শুনে ভ্রমিত হলে নিন্দা করার অভ্যাস হয়, কিন্তু ভালো লোকেদের ব্যবহারের দিকে নজর দিলে তা দূর হয়ে যায়। যারা অনিষ্টকারী বলবান মানুষদের থেকে প্রতিশোধ নিতে অক্ষম, তাদের হৃদয়ে দোষ দেখার প্রবৃত্তি (অসূয়াবোধ) উৎপন্ন হয়, কিন্তু দয়াভাবের উদয় হলে তা নিবৃত্ত হয়। প্রায়শই কৃপণ মানুষ দেখে নিজের মধ্যে কৃপণতার বোধ আসে, কিন্তু মানুষ যখন ধর্মে স্থির থেকে সেই দোষটি বুঝতে পারে, তখন তা নিজেই শান্ত হয়ে যায়। প্রাণীদের ভোগের প্রতি যে আগ্রহ দেখা যায়, তা অজ্ঞানতার জন্যই হয়। ভোগের ক্ষণভঙ্গুরতা দেখে তার নিবৃত্তি ঘটে। শান্তি ধারণ করলে উপরিউক্ত সমস্ত দোষই জয় করা সম্ভব। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে এই তেরোটি দোষই বিদ্যমান ছিল ; আর তুমি সত্য গ্রহণ করতে চাও ; তাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সেবা করে তুমি এদের ওপর জয়লাভ করেছ।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! সাধুপুরুষদের দর্শন ও সেবা দ্বারা আমি জেনেছি যে কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার কীভাবে করা হয়। কিন্তু নৃশংস (ক্রূর) ব্যক্তি এবং তাদের কর্ম সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। নৃশংস ব্যক্তিরা ইহলোকে এবং পরলোকেও শোকের আগুনে জ্বলতে থাকে, সুতরাং আপনি আমাকে নৃশংস মানুষ এবং তাদের কর্ম সম্পর্কে কিছু বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! নৃশংস মানুষদের মনে অত্যন্ত ঘৃণ্য ইচ্ছা সুপ্ত থাকে, তারা হিংসাপ্রধান কর্ম আরম্ভ করতে চায়। নিজেরা তো অপরের নিন্দা করে এবং অপরেও তাদের নিন্দা করে, (যদি তাদের ইচ্ছানুসারে কাজ না হয় তাহলে) তারা নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করে। প্রদত্ত দান সম্বন্ধে লোকেদের জানাতে থাকে এবং অসাধুতা, নীচতা, শঠতা করতে কখনো পিছপা হয় না।

ভোগ্য বস্তু একাই উপভোগ করে, নিজের আশ্রিতদেরও তা দেয় না। তারা অহংকারী এবং বিষয়াসক্ত হয়, বৃথা অহংকার দেখায়। সকলকে সন্দেহ করে এবং প্রত্যেককে বঞ্চনা করে। আপন লোকেদের প্রশংসা করে এবং দ্বেষবশত আশ্রমগুলিকে লাঞ্ছনা করে। তাদের মধ্যে বর্ণসংকরতার দোষ থাকে। নৃশংস কর্মের ব্যক্তিরা সর্বদা হিংসার জন্যই ঘুরে বেড়ায়, গুণ-অগুণ সমান বলে মনে করে, অধিক মিথ্যা বলে এবং অত্যন্ত লোভী ও অস্থির চিত্ত হয়। তারা ধর্মাত্মা এবং গুণবান মানুষদেরই পাপী বলে মনে করে এবং নিজ স্বভাব অনুসারে কাউকেই বিশ্বাস করে না। যেখানে কারো বদনাম হয়, সেখানে তার গুপ্ত দোষগুলি প্রকাশ করে দেয় এবং নিজের ও অপরের অপরাধ এক হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের জীবিকার জন্য অপরের সর্বনাশ করে। যে তার উপকার করে, সে মনে করে উপকারী তার ফাঁদে পড়েছে এবং যদি উপকারীকে কোনো সাহায্য করে, তাহলে বহুদিন সে তাই নিয়ে অনুতাপ করে। যে ব্যক্তি অপরের সামনে উত্তম খাদ্য একাকী নিঃশেষ করে, তাকেও নৃশংস বলা উচিত। যারা প্রথমে ব্রাহ্মণদের দিয়ে পরে বন্ধু-বান্ধবসহ নিজেরা আহার করে তারা ইহলোকে সুখী হয় এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। যুধিষ্ঠির! তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি নৃশংস পুরুষের লক্ষণ জানালাম। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত এই নৃশংস ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা।

পাপ এবং তার প্রায়শ্চিত্ত

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! বেদ ও উপনিষদে পারঙ্গম বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞকারী হন এবং তার ধন চোরে অপহরণ করে অথবা তিনি যদি নির্ধন হন, তাহলে রাজার কর্তব্য হল সেই ব্রাহ্মণকে আচার্যের অনুরূপ দক্ষিণা প্রদান করা, পিতৃশ্রাদ্ধ করাবার জন্য এবং অধ্যয়নের জন্য অর্থ প্রদান করা। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের উচিত হল রাজার নিকট মহত্ত্ব প্রকাশ না করা। ব্রাহ্মণকে এই জগতের কর্তা, শাসক, রক্ষক এবং দেবতা বলা হয়, সুতরাং তাঁর প্রতি অমঙ্গলসূচক এবং কটুবাক্য বলা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় তাঁর বাহুবলের দ্বারা, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও যজ্ঞের শক্তিতে বিপদের সময় নিজেদের রক্ষা করবেন। কন্যা, যুবতী, মন্ত্রের জন্য অনভিজ্ঞ, মূর্খ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি—এরা যজ্ঞের অধিকারী নয়। এরা যার জন্য যজ্ঞে আহুতি দেয়, তাদের সঙ্গে নিজেরাও নরকে গমন করে। মানুষ যা পুণ্য কর্ম করে, সেগুলি শ্রদ্ধা সহকারে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে করা উচিত। পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান না করে যজ্ঞ করা উচিত নয়। দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ প্রজা ও পশুনাশ করে এবং স্বর্গপ্রাপ্তিতে বাধাপ্রদান করে। কেবল তাই নয়, তা ইন্দ্রিয়, যশ, কীর্তি এবং আয়ুও ক্ষীণ করে।

যে ব্রাহ্মণ রজস্বলা নারী সমাগম করে, যে গৃহে অগ্নি স্থাপনা করেনি এবং যে অবৈদিক রীতিতে যজ্ঞ করে—তারা সকলেই পাপী। যে গ্রামে একই ইঁদারার জল সকলে পান করে সেখানে বারো বৎসর বসবাস করলে এবং শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করলে ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়ে যায়। কোনো ব্রাহ্মণ যদি এক রাত্রি কোনো নীচবর্ণের মানুষের সেবা করে অথবা তার সঙ্গে একত্র বাস করে বা একাসনে বসে, তাহলে তার যে পাপ হয়, তার শুদ্ধি তিন বৎসর ব্যাপী ব্রত পালন করে পৃথিবীতে বিচরণ করলে হতে পারে। পরিহাস কালে, স্ত্রীর কাছে, বিবাহের সময়, গুরুর হিতার্থে অথবা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলায় দোষ হয় না, এই পাঁচটি জায়গায় অসত্য কথনে পাপ হয় না। নীচ বর্ণের লোকের কাছে যদি উত্তম বিদ্যা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার কাছে সেটি শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। সোনা অপবিত্র স্থানে পড়ে থাকলেও বিনা দ্বিধায় তা তুলে নেওয়া উচিত এবং বিষ উৎপত্তির স্থানে যদি অমৃত পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত।

গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে, বর্ণসংকরতা নিবারণার্থে এবং নিজ রক্ষার জন্য বৈশ্যগণও অস্ত্রধারণ করতে পারে। মদ্যপান, ব্রহ্মহত্যা এবং গুরুপত্নীগমন—এই মহাপাপ-গুলির জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লিখিত নেই। যে কোনো উপায়ে প্রাণত্যাগ করলে, তবেই এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, শাস্ত্রের তাই নির্দেশ। অন্যের সোনা আত্মসাৎ করা, চুরি করা, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা—মহাপাপ। মদ্য পান করলে, অগম্যা নারীতে গমন করলে, পতিতের

সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে, ব্রাহ্মণেতর হয়ে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সমাগম করলে মানুষ শীঘ্রই পতিত হয়। পতিতের সঙ্গে থেকে তার যজ্ঞে অংশগ্রহণ করলে, তাকে পড়ালে অথবা তার গৃহে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিলে সেই মানুষ এক বৎসরের মধ্যে পতিত হয়।

উপরিউক্ত পাপগুলি ব্যতীত বাকি যত পাপ আছে, তার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করে পাপ কার্য থেকে বিরত হওয়া উচিত। পূর্বোক্ত (মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতক, গুরুপত্নীগামী) তিন প্রকার পাপীদের মৃত্যুর পর তাদের দাহকার্য সমাধা না করেই আত্মীয়দের উচিত তাদের ধন-সম্পত্তি অধিকার করা। এর জন্য দ্বিতীয়বার চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজ মন্ত্রী অথবা গুরু, যেই হোন না কেন, এঁরা পতিত হলে ধর্মপরায়ণ রাজার উচিত কর্তব্য হল তাঁদের পরিত্যাগ করা এবং নিজ শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা। যতক্ষণ তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ না হন ততক্ষণ রাজার সঙ্গে কোনো কথা বা মন্ত্রণা করা উচিত নয়।

পাপী ব্যক্তি ধর্মাচরণ ও তপস্যার দ্বারাই নিজ পাপ ক্ষালন করতে পারে। চোরকে 'এ চোর' বলামাত্র চোরের সমান পাপের ভাগী হতে হয় এবং যে চোর নয়, তাকে চোর বললে সেই ব্যক্তির চোরের দুগুণ পাপ হয়। কুমারী কন্যা যদি নিজ ইচ্ছায় চরিত্র ভ্রষ্ট হয়, তাহলে তার ব্রহ্মহত্যার তিন চতুর্থাংশ পাপ হয় এবং তাকে যে ব্যক্তি নষ্ট করে সে এক চতুর্থাংশ পাপের ভাগীদার হয়। ব্রাহ্মণকে গালি দিলে বা তাঁর গায়ে হাত তুললে মহাপাপ হয়। শতবর্ষ ধরে সেই ব্যক্তিকে প্রেতের যোনী এবং এক হাজার বছর ধরে নরকবাস করতে হয়। তাই ব্রাহ্মণকে গালি দেওয়া বা মারা উচিত নয়। ব্রাহ্মণকে আঘাত করলে তার রক্তে যত বালিকণা সিক্ত হয়, তত বছর সেই আঘাতকারীকে নরক বাস করতে হয়।

ভ্রূণ হত্যাকারী যদি যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করে অথবা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেয়, তাহলে সে পাপ থেকে মুক্তি পায়। মদ্যপায়ী ব্যক্তি যদি অতিশয় গরম মদ্যপান করে এবং সেই কারণে তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে মদ্যপানের পাপ থেকে মুক্ত হয়। গুরুপত্নীর সঙ্গে সমাগমকারী ব্যক্তি যদি নারীআকারসম্পন্ন তপ্ত লৌহমূর্তি আলিঙ্গন করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে ওই পাপ থেকে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ হত্যাকারী ব্যক্তি যদি সেই ব্রাহ্মণের অস্থি নিয়ে নিজের পাপ-কাহিনী লোকেদের বলতে থাকে এবং বারো বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা তিনবার স্নান ও তপস্যা করে, তবে সে শুদ্ধিলাভ করে।

এইরূপ যে ব্যক্তি জেনেশুনে গর্ভিণী নারীকে হত্যা করে, তার দুটি ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। মদ্যপায়ী ব্যক্তি মিতাহারী ও ব্রহ্মচারী হয়ে ভূমিতে শয়ন করবে এবং তিন বৎসর বা তার বেশি সময় ধরে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করবে, তারপর এক হাজার বলদ বা সমপরিমাণ গাভি ব্রাহ্মণকে দান করবে। এতে সে শুদ্ধিলাভ করবে। বৈশ্য হত্যা করলে দু-বৎসর পূর্বোক্ত নিয়মে থাকবে এবং ব্রাহ্মণদের একশত বলদ এবং একশত গাভি দান করবে। শূদ্রহত্যাকারী ব্যক্তি এক বৎসর উক্ত নিয়ম পালন করে একটি বলদ এবং একশত গাভি দান করবে। কুকুর, শূকর এবং গর্দভ হত্যাকারী ব্যক্তিও শূদ্রহত্যাকারীর মতোই প্রায়শ্চিত্ত করবে। বিড়াল, নীলকণ্ঠ, ভেক, কাক, সাপ এবং ইঁদুর মারলেও পশু-হত্যার মতোই পাপ হয়।

এখন অন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হচ্ছে—অজ্ঞানতাবশত পোকা-মাকড় ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রাণী বধ হলে তার জন্য অনুতাপ করবে ; অন্য প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য এক এক বৎসর করে ব্রত পালন করা উচিত। শ্রোত্রিয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে তিন বৎসর এবং অন্য পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক হলে দু-বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন এবং চতুর্থ প্রহরে একবার মাত্র ভোজন গ্রহণ করা উচিত। পরস্ত্রীর সঙ্গে ওঠা-বসা, থাকা এবং ভ্রমণ করলে তিন দিন শুধু জলাহার করে থাকা উচিত। আগুনে অপবিত্র বস্তু ফেলে যেই বস্তুকে অবহেলা করলে সেই ব্যক্তির জন্যও একই বিধান রয়েছে।

যে ব্যক্তি অকারণে পিতা, মাতা এবং গুরুকে পরিত্যাগ করে, ধর্মশাস্ত্রের বিধানে সে পতিত হয়। পত্নী যদি ব্যভিচারিণী হয় এবং বিশেষভাবে সেই কাজে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে কেবলমাত্র অন্ন ও বস্ত্র দেবে। অপর নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে পুরুষকে যে ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলা হয়েছে, এই নারীও সেই প্রায়শ্চিত্ত করবে। যে নারী তার সদ্‌গুণসম্পন্ন পতিকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষের সঙ্গে সমাগম করে, সেই কুলটাকে রাজা চৌরাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। সেইরূপ ব্যভিচারী ব্যক্তিকে অগ্নিতপ্ত লোহার খাটে রেখে কাঠ দিয়ে আগুনে পোড়াবে। পতি অবহেলাকারিণী ব্যভিচারী নারীরও এই

দণ্ড হওয়া উচিত। যদি পাপ করার পর এক বৎসরের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহলে তাকে এর দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এর সংসর্গে যদি কেউ দু-বৎসর থাকে, তবে সেই ব্যক্তির মুনিদের ন্যায় তিন বৎসর বিচরণ করা উচিত এবং মুনিদের মতোই ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তার সঙ্গে যারা থাকে তাদের পাঁচ বৎসর ধরে এই নিয়ম পালন করা কর্তব্য।

যে ব্যক্তি (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকায়) অধর্মপূর্বক বিবাহ করে, তাকে পরিবেত্তা বলা হয়, অবিবাহিত ভ্রাতাকে পরিবিত্তি বলে এবং সেই স্ত্রী পরিবেদ্যা—এই তিন জনকে পতিত মানা হয়। এই তিন জনের পৃথকভাবে নিজেদের শুদ্ধির জন্য এক মাস ধরে চান্দ্রায়ণ অথবা কৃচ্ছ্রব্রত পালন করা উচিত। অথবা সেই পরিবেত্তা তার স্ত্রীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে নিয়ে গিয়ে পুত্রবধূরূপে সমর্পণ করবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদেশ দিলে পুনরায় স্ত্রীকে স্বীকার করলে তবেই দুই ভ্রাতা এবং পত্নী ধর্মত পাপ থেকে মুক্ত হবে।

মানুষের জন্য এইরূপ উত্তম প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। এদের মধ্যে যারা দান করতে সক্ষম, তাদের জন্য দানের বিধান আছে। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শুধুমাত্র গোদানের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়েছে। আমি তোমার কাছে এই সমস্ত সনাতন প্রায়শ্চিত্তের কথা বর্ণনা করলাম।

—o—

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয়ে বিদুর এবং পাণ্ডবদের মতামত

বৈশম্পায়ন বললেন—এই কথা বলে ভীষ্ম যখন নিরুত্তর হলেন তখন রাজা যুধিষ্ঠির গৃহে গিয়ে তাঁর চার ভ্রাতাকে নিয়ে বিদুরকে প্রশ্ন করলেন—'ধর্ম, অর্থ, এবং কাম—এই তিনটির মধ্যে কোনটি উত্তম, কোনটি মধ্যম এবং কোনটি লঘু ? এই তিনটি লাভ করার জন্য বিশেষ করে কীসে মন নিবিষ্ট করতে হয় । এ বিষয়ে আপনারা নিজেদের মতামত জানান।' এই কথা শুনে সর্বপ্রথমে মহাত্মা বিদুর ধর্মশাস্ত্র স্মরণ করে বলতে শুরু করলেন।

বিদুর বললেন—'বহু শাস্ত্র অনুশীলন, তপ, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, ভাবশুদ্ধি, দয়া, সত্য এবং সংযম—এই সব হল আত্মার সম্পদ। যুধিষ্ঠির ! তুমি এইগুলি প্রাপ্ত করো। ঋষিগণ ধর্মের সাহায্যেই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করেছেন, ধর্মের আধারের ওপরই সমস্ত জগৎ অবস্থান করছে, ধর্মের দ্বারাই দেবতাগণ উন্নতি সাধন করেছেন এবং ধর্মেই অর্থের স্থিতি। বিদ্বান মনিষীগণ ধর্মকে উত্তম, অর্থকে মধ্যম এবং কামকে লঘু বলে জানিয়েছেন। সুতরাং মনকে বশে রেখে ধর্মকেই প্রধান ধ্যেয় করা উচিত এবং সমস্ত প্রাণীদের সঙ্গে সেরূপ ব্যবহারই করা উচিত, যেমন আমরা নিজেদের জন্য আশা করি।'

বিদুরের কথা শেষ হলে অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! এ হল কর্মভূমি। এখানে জীবিকার সাধনভূত কর্মেরই প্রশংসা করা হয়। কৃষিকার্য, ব্যবসায়, গোপালন ইত্যাদি নানাপ্রকার মাধ্যম—এ সবই অর্থপ্রাপ্তির সাধন। অর্থই সমস্ত কর্মের মর্যাদা। অর্থ (ধন) ব্যতীত ধর্ম ও কাম সিদ্ধ হয় না। ধনবান ব্যক্তি অর্থের দ্বারাই উত্তম ধর্মপালন এবং দুর্লভ কামনা প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। সর্বপ্রকার সংগ্রহরহিত, সঙ্কোচশীল, শান্ত এবং গেরুয়া বসন পরিহিত, শ্মশ্রু সমন্বিত বিদ্বান ব্যক্তিকেও ধনের আকাঙ্ক্ষা করতে দেখা যায়। আবার এমনও দেখা যায় যে কেউ স্বর্গলাভের জন্য আগ্রহী হয়ে বংশ পরম্পরাগত নিয়ম পালন, নিজ বর্ণের ধর্ম ও অনুষ্ঠান ঠিকমতো পালন করে—তা সত্ত্বেও তাঁর অর্থের আকাঙ্ক্ষা থাকে। ধনবান তাঁকেই বলা হয়, যিনি নিজ ভৃত্যদের উত্তম ভোগ এবং শত্রুদের দণ্ড বিধান করে তাদের বশে রাখেন। মহারাজ, আমার তো তাই মত ! এবার আপনি নকুল ও সহদেবের কথা শুনুন। এরা দুজনে কিছু বলতে উৎকণ্ঠিত হয়েছে।'

এরপর ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে বিদ্বান মাদ্রীকুমার নকুল এবং সহদেব বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! মানুষের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদির সময়েও ছোট বড় নানা উপায়ে দৃঢ়তাপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। ধন দুর্লভ এবং অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, এর প্রাপ্তি হলে মানুষ জগতে নিজের সমস্ত কামনা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। ধর্মযুক্ত অর্থ এবং অর্থযুক্ত ধর্ম—অমৃতসমান লাভদায়ক হয়ে থাকে। তাই আমরা ধর্ম এবং অর্থ—উভয়কেই সম্মান করি। নির্ধন মানুষের কামনা পূরণ হয় না আর ধর্মহীন মানুষ ধনলাভ করবে কীভাবে ? সুতরাং প্রথমে ধর্ম আচরণ এবং

তারপরে ধর্ম অনুসারে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। তারপর কামনা পূরণ করতে হয়। এইভাবে ত্রিবর্গ সংগ্রহ করলে মানুষ সফল মনোরথ হয়।'

নকুল, সহদেব এই কথা বলে চুপ করলেন। তখন ভীমসেন এইভাবে বলতে আরম্ভ করলেন—'ধর্মরাজ ! যার মধ্যে কামনা নেই, তার মধ্যে অর্থ ও ধর্ম পালনের কোনো আগ্রহ থাকে না। কামনা ব্যতীত কোনো কামই (ভোগ) হয় না। তাই ত্রিবর্গে কামই সবথেকে বড়। ঋষিগণও কোনো না কোনো কামনা নিয়েই তপস্যায় রত হন ; ফল-মূল-পাতা খেয়ে, বায়ু ভক্ষণ করে সতর্কতার সঙ্গে সংযম পালন করেন। কামনার থেকেই মানুষ বেদাদি স্বাধ্যায় করে, শ্রাদ্ধ-যজ্ঞ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং দান করে ও প্রতিগ্রহ গ্রহণ করে থাকে। ব্যবসায়ী, চাষী, গোপালক, কারীগর, শিল্পকার এবং দেবতা সম্পর্কীয় কার্য যারা করে, তারাও নিজনিজ কার্যে ব্যাপৃত থাকে। সমস্ত কাজই কামনা দ্বারা ব্যাপ্ত। সুতরাং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটিই এক সঙ্গে উপভোগ করা উচিত। যে এরমধ্যে একটি স্বীকার করে, সে অধম, দুইয়ের আশ্রয় গ্রহণকারী মধ্যম এবং যে তিনটিই উপভোগ করে থাকে সেই ব্যক্তিকে উত্তম বলা হয়।'

এই বলে ভীমসেন চুপ করলে যুধিষ্ঠির বললেন—তোমরা যে ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছ এবং বেদ-পুরাণের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার জিজ্ঞাসায় তোমরা তোমাদের যে সিদ্ধান্ত জানালে সে সব আমি শুনলাম। এখন তোমরা আমার কথা শোনো—'যে ব্যক্তি পাপেও ব্যাপৃত নয়, পুণ্যেও নয় ; অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত নয়, ধর্ম বা কাম উপভোগেও নয় ; যার কাছে মাটির ঢেলা এবং সোনা এক সমান, সেই সর্বপ্রকার দোষবর্জিত ব্যক্তি দুঃখ ও সুখপ্রদানকারী সিদ্ধি থেকে চিরকালের মতো মুক্ত হয়ে যান। স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মা বলেন, 'যার মনে আসক্তি থাকে, তার কখনো মুক্তি হয় না।' কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গরহিত, সেই দুর্লভ পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ করে ; তাই গূঢ়তত্ত্বের জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে জগতের পক্ষে হিতকারী।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা যুধিষ্ঠিরের বলা উক্তি অত্যন্ত উত্তম, যুক্তিযুক্ত এবং মনোগ্রাহী, তা শুনে সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং হর্ষধ্বনি করলেন। সকলে হাতজোড় করে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন। মহামনা যুধিষ্ঠিরও তাঁদের প্রশংসা করলেন এবং পুনরায় গঙ্গানন্দন ভীষ্মের কাছে এসে তাঁকে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করলেন।

—o—

কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত এবং কৃতঘ্ন গৌতমের কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সৌম্য স্বভাবের মানুষ কেমন হয়ে থাকে ? কার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখা উত্তম ? ভবিষ্যতে এবং বর্তমানেও কোন্ ব্যক্তি উপকার করতে সক্ষম ? কৃপাপূর্বক সেই কথা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! কার সঙ্গে সন্ধি করা উচিত এবং কার সঙ্গে নয়, আমি সেগুলি তোমাকে সহজভাবে জানাচ্ছি ; মন দিয়ে শোনো। যে ব্যক্তি লোভী, ক্রূর, ধর্মত্যাগী, কপট, শঠ, শূদ্র, পাপী, সকলকে সন্দেহ করে, অলস, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, নিন্দনীয়, গুরুপত্নীর সঙ্গে ব্যভিচারকারী, সংকটের সময় পরিত্যাগ করে, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদ-নিন্দাকারী, মিথ্যাবাদী, সকলের দ্বেষের পাত্র, দ্বেষী, পাপপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী, ধূর্ত, মিত্রের অপকার করে, অন্যের ধন হস্তগত করতে চায়, অন্যায়ভাবে ক্রোধ করে, চঞ্চলচিত্ত, অকস্মাৎ শত্রুতা করে, নিজের কাজের জন্য বন্ধুত্ব করে, বাস্তবে বন্ধুদ্বেষী, মুখে মিত্রতার কথা আর অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী, কুটিল দৃষ্টিসম্পন্ন, মদ্যপায়ী, ক্রোধী, নির্দয়, অন্যকে কষ্ট প্রদানকারী, মিত্রদ্রোহী, প্রাণী হিংসাকারী, কৃতঘ্ন এবং নীচ, এদের সঙ্গে কখনো সন্ধি করা উচিত নয়।

এবার সন্ধি করার যোগ্য ব্যক্তিদের কথা জানাচ্ছি, শোনো। যে ব্যক্তি কুলীন, বাক্‌পটু, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুশল, রূপবান, গুণবান, নির্লোভ, কাজ করতে কখনো নিরুৎসাহ হয় না, কৃতজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, মধুর স্বভাববিশিষ্ট, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয়—রাজা তাকেই নিজের মিত্র করবে। যে নিজ শক্তি অনুযায়ী কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে এবং সন্তুষ্ট থাকে, যে অকারণে ক্রোধ করে না, যে

উদাসীন হলেও মনে কখনো কুচিন্তা করে না, অর্থ তত্ত্ব জানে, নিজে কষ্ট পেলেও হিতৈষী ব্যক্তিকে সাহায্য করে থাকে—তাকে মিত্র করবে। যে মিত্রের প্রতি বিরক্ত হয় না, সকলের বিশ্বাসের পাত্র এবং ধর্মানুরাগী, যার দৃষ্টিতে মাটি এবং সোনা একই মূল্যের, যে সর্বদা নিজ প্রভুর কাজে তৎপর—এরূপ উত্তম ব্যক্তির সঙ্গে যে রাজা সন্ধি করে, তার রাজ্য চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সর্বদা শাস্ত্র স্বাধ্যায় করে, ক্রোধকে বশে রাখে এবং যুদ্ধে প্রবল হয়, যার উত্তম কুলে জন্ম, যে শীলবান এবং উত্তম গুণাদি যুক্ত, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই মিত্র হবার উপযুক্ত।

যাদের আমি দোষযুক্ত বলেছি, তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি অত্যন্ত নীচ, কৃতঘ্ন এবং মিত্র হত্যাকারী হয়ে থাকে। এইসব দুরাচারীদের সর্বদা নিজের থেকে তফাতে রাখবে—সকলেরই তাই মত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! আপনি যাদের মিত্রদ্রোহী এবং কৃতঘ্ন বললেন, তাদের স্বরূপ কীভাবে জানা যায়? আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে তোমাকে এক প্রাচীন কাহিনী শোনাচ্ছি; এটি হল উত্তর দিকে স্থিত একটি ম্লেচ্ছ দেশের ঘটনা। মধ্যদেশে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি একেবারেই বেদ পড়েননি। একদিন তিনি একটি সম্পন্ন গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামে এক দস্যু বাস করত, সে ছিল অত্যন্ত ধনী, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং দাতা। ব্রাহ্মণ তার গৃহে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন। দস্যু ব্রাহ্মণের থাকার জন্য একটি ঘর এবং সারা বৎসরের জন্য তার খাদ্যের ব্যবস্থা করে, নতুন বস্ত্র এবং এক যুবতী দাসীরও ব্যবস্থা করে দিল, সেই দাসী পতিবিহীনা ছিল।

দস্যুর কাছে সমস্ত বস্তু লাভ করে ব্রাহ্মণ মনে মনে অত্যন্ত খুশি হয়ে দাসীর সেবায় আনন্দে বসবাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের নাম ছিল গৌতম। তিনিও দস্যুর মতোই প্রত্যহ বনে বিচরণকারী হাঁস শিকার করতে লাগলেন। হিংসায় তাঁকে অত্যন্ত দক্ষ দেখা গেল। দয়া তাঁর ধারে কাছে ছিল না। সর্বদা প্রাণী হত্যাতেই ব্যস্ত থাকতেন। সেই ব্রাহ্মণ ডাকাতের সংস্পর্শে থেকে সম্পূর্ণ ডাকাত হয়ে উঠলেন।

এইভাবে দস্যুর গ্রামে সুখে বাস করে, পাখি শিকার করে কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর, সেই গ্রামে আর একজন ব্রাহ্মণ এলেন, যিনি ছিলেন স্বাধ্যায়পরায়ণ, পবিত্র, বিনয়ী, নিয়মপূর্বক আহারকারী, ব্রাহ্মণভক্ত, বেদে পারদর্শী বিদ্বান এবং ব্রহ্মচারী। তিনি গৌতমের গ্রামেরই অধিবাসী এবং তাঁর প্রিয় মিত্র ছিলেন। তিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করতেন না, তাই সেই দস্যু পরিবৃত গ্রামে তিনি ব্রাহ্মণের ঘর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি গৌতমের গৃহে গিয়ে পৌঁছলেন; তখন গৌতমও সেখানে ছিলেন। দুজনের সাক্ষাৎ হল। ব্রাহ্মণ দেখলেন গৌতমের কাঁধের ওপর মৃত হংস এবং হাতে ধনুক-বাণ। তাঁর সারা দেহ রক্তরঞ্জিত, তাঁকে রাক্ষসের মতো দেখাচ্ছে এবং তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। এই অবস্থায় গৌতমকে দেখে আগন্তুক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সংকোচ বোধ করলেন। তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—'আরে! তুমি মোহবশত এসব কী করছ? ব্রাহ্মণ হয়ে ডাকাতে পরিণত হয়েছ? নিজের পূর্বপুরুষদের কথা একটু স্মরণ করো, তাঁদের কী খ্যাতি ছিল, তাঁরা বেদে কত বিদ্বান ছিলেন। আর তুমি তাঁদের বংশে জন্ম নিয়ে এমন কুলকলঙ্ক হয়েছ? এখনও নিজেকে চেনার চেষ্টা করো। ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্ব, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, সংযম ও দয়া ইত্যাদি সদ্‌গুণ স্মরণ করে এখানে ডাকাতদের সঙ্গে থাকা বর্জন করো।'

নিজের হিতৈষী সুহৃদের কথা শুনে গৌতম মনে মনে কিছু চিন্তা করে আর্তস্বরে বললেন—'দ্বিজবর! আমি নির্ধন এবং বেদের এক অক্ষরও জানি না, তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য এখানে এসেছি; আজ আপনার দর্শন লাভে আমার জীবন সফল হল। আপনি রাত্রে এখানে থাকুন; কাল প্রভাতে আমরা একসঙ্গে চলে যাব।' ব্রাহ্মণ দয়ালু ছিলেন, গৌতমের অনুরোধে তিনি সেখানেই থেকে গেলেন, কিন্তু তিনি গৌতমের কোনো জিনিসই স্পর্শ করলেন না। যদিও ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং গৌতম তাঁকে খাওয়ার জন্য অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই সেখানে অন্ন গ্রহণ করলেন না।

প্রভাত হলে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেখান থেকে চলে গেলে গৌতমও গৃহ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে রওনা হলেন। যেতে যেতে তিনি এক দিব্য রমণীয় বনে উপস্থিত হলেন। সেখানকার সমস্ত গাছ ফুলে ভর্তি ছিল, নিজ শোভায় তা নন্দনবনকেও ম্লান করে দিচ্ছিল। সেই বনে যক্ষ ও কিন্নর বিচরণ করত। চারদিকে পাখির কলরব শোনা যাচ্ছিল। নানাপ্রকার পাখি সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এরই মধ্যে গৌতম এক পল্লবিত বিশাল বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন, সেটি

চারদিকে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত ছিল, সুন্দর শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বৃহৎ ছাতার মতো দেখাচ্ছিল। সেই মনোরম বৃক্ষটি দেখে গৌতম প্রসন্ন হলেন এবং তার ছায়ায় গিয়ে বসলেন। সেই বৃক্ষের পবিত্র বাতাসে তিনি অতিশয় শান্তিলাভ করলেন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে সূর্য অস্ত গেল।

সেইসময় এক উত্তম পক্ষী ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে নিজ বিশ্রামস্থলে এল। সেই পক্ষীটি ওই বৃক্ষের ওপরই বাস করত। তার নাম ছিল নাড়ীজঙ্ঘ। সে ছিল বকরাজ ব্রহ্মার প্রিয় বন্ধু এবং কশ্যপের পুত্র। সে পৃথিবীতে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিল। দেবকন্যার গর্ভে জন্ম হওয়ায় তার দেহকান্তি দেবতাদের মতো ছিল। সে অত্যন্ত বিদ্বান এবং দিব্য তেজে দেদীপ্যমান ছিল। গৌতম সেই সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ছিলেন, তাই সে পাখিটিকে আসতে দেখে তাকে বধ করার জন্যই তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

তখন রাজধর্মা বলল—বিপ্রবর ! এটি আমার গৃহ, আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আপনি আমার এখানে পদার্পণ করেছেন। আমি আপনাকে স্বাগত জানাই। সূর্য অস্ত হয়েছে, সন্ধ্যার সময় আপনি উত্তম অতিথিরূপে এখানে এসেছেন ; তাই শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমি আপনার অভ্যর্থনা করব। রাত্রে আমার আতিথ্য স্বীকার করে কাল প্রভাতে আপনি এখান থেকে রওনা হবেন। আমি মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, আমার মাতা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। আপনার মতো গুণবান অতিথিকে আমি স্বাগত জানাই।

এই কথা বলে রাজধর্মা গৌতমকে শাস্ত্রসম্মতভাবে অভ্যর্থনা জানাল। শালফুলের দিব্য আসন তৈরি করে তাঁকে বসতে দিল। বড় বড় মাছ এনে আগুন জ্বেলে রান্নার ব্যবস্থা করল। ব্রাহ্মণ আহার করে তৃপ্ত হলে, তাঁর ক্লান্তি দূর করার জন্য সেই তপস্বী পাখি তার নিজ ডানা বিস্তার করে হাওয়া করতে লাগল। বিশ্রামের পরে রাজধর্মা তাঁকে তাঁর গোত্র জিজ্ঞাসা করল ; কিন্তু উত্তরে গৌতম অন্য কিছু না বলে কেবল বলে দিলেন যে 'আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম।' তারপর রাজধর্মা তাঁর জন্য পাতা বিছিয়ে দিব্য ফুল দিয়ে সুন্দর বিছানা প্রস্তুত করল। গৌতম আরামে তাতে শয়ন করলেন। তিনি শয়ন করলে রাজধর্মা তাঁকে এইস্থানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করল। গৌতম বললেন—'মহাপ্রাজ্ঞ ! আমি দরিদ্র, অর্থের জন্য সমুদ্রের দিকে এগোতে চাই।' রাজধর্মা প্রসন্ন হয়ে বলল—'দ্বিজবর ! আপনি আর সমুদ্র পর্যন্ত যাওয়ার কথা চিন্তা করবেন না,

এখানেই আপনার কাজ হয়ে যাবে, এখান থেকেই অর্থ নিয়ে আপনি গৃহে ফিরে যাবেন। বৃহস্পতির মত অনুযায়ী চার প্রকারে অর্থপ্রাপ্তি হয়—বংশপরম্পরা দ্বারা, দৈব-অনুকূলতায়, কর্মের দ্বারা এবং মিত্রের সহায়তায়। এখন আমি আপনার মিত্র হয়ে গিয়েছি, আপনার জন্য আমার হৃদয়ে পূর্ণ সৌহার্দ্য আছে। সুতরাং আমি চেষ্টা করব যাতে আপনার অর্থপ্রাপ্তি হয়।'

তারপর প্রাতঃকাল হলে রাজধর্মা ব্রাহ্মণের সুখের কথা চিন্তা করে তাঁকে বললেন—'সৌম্য ! আপনি এই পথ ধরে যান, আপনার কার্যসিদ্ধ হবে। এইস্থান থেকে তিন যোজন দূরে আমার এক মিত্র বাস করে, তার নাম বিরূপাক্ষ। সে রাক্ষসদের রাজা এবং মহাবলশালী। আপনি তার কাছে চলে যান, নিঃসন্দেহে সে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে।' তার কথায় গৌতম বিরূপাক্ষের নগরের দিকে রওনা হলেন, তাঁর ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় ইচ্ছামতো অমৃতের ন্যায় মিষ্ট ফল খেতে খেতে তিনি দ্রুত এগিয়ে চললেন এবং মেরুব্রজ নামক নগরে পৌঁছলেন। সেই নগরের চারদিকে পাহাড় থাকায় প্রাচীরের মধ্যে পার্বত্য দুর্গ ছিল। তার প্রধান দরজাও একটি পর্বত। নগর রক্ষার জন্য সর্বত্র পাথরের বড় বড় দেওয়াল এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিল।

রাক্ষসরাজকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে আপনার বন্ধু তাঁর এক প্রিয় অতিথিকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। সংবাদ পেয়ে রাক্ষসরাজ তাঁর অনুচরদের বললেন—

'গৌতম নগরদ্বারে এলে, তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।' আদেশ পেয়েই অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ গৌতমের কাছে গিয়ে বলল—'আপনাকে স্বাগত, আমাদের রাজা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।' আমন্ত্রণ শুনেই গৌতমের ক্লান্তি দূর হল, তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন। রাক্ষসরাজের সমৃদ্ধি দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সেবকদের সঙ্গে তিনি সত্বর রাজমহলে উপস্থিত হলেন।

বিরূপাক্ষ তাঁকে বিধিসম্মতভাবে পূজা করলেন। তারপর গৌতম উত্তম আসনে উপবেশন করলে রাক্ষসরাজ তাঁর গোত্র, শাখা, ব্রহ্মচর্যাবস্থায় কৃত স্বাধ্যায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু গৌতম গোত্র (জাতি) ব্যতীত আর কিছুই বলতে পারলেন না। তখন রাক্ষসরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'ভদ্র ! আপনার নিবাস কোথায় ? আপনার স্ত্রী কোন জাতির ? নির্ভয়ে এগুলি ঠিক করে বলুন।' গৌতম বললেন—'আমি মধ্যদেশে জন্মেছি, কিন্তু আমি ভীলেদের গৃহে থাকি। আমার স্ত্রীও শূদ্রজাতির এবং আমার পূর্বে সে অন্যের পত্নী ছিল। আমি আপনার কাছে সত্য কথাই জানাচ্ছি।'

একথা শুনে রাক্ষসরাজ মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'এখন কী করা উচিত ? এ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ এবং মহাত্মা রাজধর্মার সুহৃদ। রাজধর্মাই একে আমার কাছে পাঠিয়েছে। সুতরাং তার প্রিয় কাজ আমি অবশ্যই করব। আজ কার্তিকি পূর্ণিমা, আমার এখানে আজ হাজার হাজার ব্রাহ্মণ আহার করবেন। তাঁদের সঙ্গে এঁকেও আহার করিয়ে অর্থ প্রদান করা উচিত।'

তারপর আহারের সময় হলে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ স্নান করে রেশম বস্ত্র পরিধান করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রাক্ষসরাজের নির্দেশে সেবকরা মাটির ওপর সুন্দর কুশাসন পেতে দিল। ব্রাহ্মণেরা তার ওপর উপবেশন করলে রাক্ষসরাজ তিল, জল এবং কুশ দিয়ে তাঁদের বিধিবৎ পূজা করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশ্বদেব, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নিদেবের ভাবনা করে তাঁদের সকলকে চন্দন এবং ফুলের মালা পরালেন। সেই উত্তমরীতিতে পূজা-অর্চনাতে ব্রাহ্মণদের শোভা বর্ধিত হয়েছিল। তারপর তিনি হীরক মণ্ডিত স্বর্ণথালায় উত্তম ঘৃতে প্রস্তুত খাদ্য পরিবেশন করলেন।

আহারের পর ব্রাহ্মণদের সামনে ধনরত্নের ভাণ্ডার উপস্থিত করে বিরূপাক্ষ বললেন—'দ্বিজবরগণ ! আপনারা নিজেদের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য অনুসারে এই রত্ন নিয়ে নিন এবং যে স্বর্ণপাত্রে আপনারা আহার করেছেন, সেটিও নিয়ে যান।' রাক্ষসরাজের কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছামতো রত্ন নিয়ে নিলেন। উত্তম বস্ত্র ও রত্নদ্বারা সম্মানিত হয়ে ব্রাহ্মণেরা সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। বিরূপাক্ষ তারপর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ব্রাহ্মণদের বললেন—'বিপ্রগণ ! আজকের দিনটিতে আপনাদের রাক্ষস হতে কোনোপ্রকার ভয় নেই, আনন্দ সহকারে আপনারা নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করুন। দেরি করবেন না।'

তাঁর কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা দ্রুত সেখান থেকে রওনা হলেন। গৌতমও সোনার থলি নিয়ে দ্রুত হেঁটে বটবৃক্ষের নিকট চলে এলেন। তিনি অত্যন্ত কষ্টে সেই বোঝা বইছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন, ক্ষুধাতেও তিনি কাতর হয়েছিলেন। রাজধর্মা নামক সেই পক্ষীটি তার ডানার হাওয়া দিয়ে গৌতমের ক্লান্তি অপনোদন করল এবং তাঁর খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিল। আহার ও বিশ্রামের পর গৌতম ভাবলেন—আমি লোভ ও মোহবশত সোনার অত্যন্ত ভারী বোঝা নিয়ে এসেছি। এখন অনেক দূর যেতে হবে, পথে খাওয়ারও কিছু নেই। কেমন করে প্রাণধারণ করব ? এই কথা ভেবে সেই কৃতঘ্ন ভাবতে লাগল, এই বকদের রাজা রাজধর্মা এখানেই রয়েছে, একে মেরে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাই না কেন ?

ভীষ্ম বললেন—রাজধর্মা পাখিটি গৌতমকে বিশ্বাস করে তাঁর কাছেই শুয়ে ছিল। তখন সেই দুষ্ট কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ তাকে হত্যা করার জন্য সামনে যে আগুন জ্বলছিল, তার থেকে এক জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত রাজধর্মাকে আঘাত করে হত্যা করলেন। রাজধর্মাকে বধ করে গৌতম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, সেই হত্যার পাপের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল না। তিনি সেই মৃত পক্ষীর পাখা ছাল খুলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন এবং সোনার পুঁটলি মাথায় নিয়ে দ্রুত গৃহের পথ ধরলেন। পরদিন বিরূপাক্ষ তাঁর পুত্রকে বললেন—'পুত্র ! আজ পক্ষী শ্রেষ্ঠ রাজধর্মার দর্শন পাইনি। সে তো প্রত্যহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করতে যেত এবং ফেরার পথে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যেত না। এদিকে দুই সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, কিন্তু সে আমার গৃহে এল না, আমার মনে নানাপ্রকার ভয় হচ্ছে, না জানি আমার

মিত্রের কী হয়েছে ? তুমি তাঁর খবর নাও। সেই অধম ব্রাহ্মণ তাকে মেরে ফেলেনি তো ? তাকে অত্যন্ত নির্দয় এবং দুরাচার বলে মনে হচ্ছিল, তার চেহারা তো তেমনই ভয়ানক ছিল, যেন কোনো দুষ্ট ডাকাত ! নীচ গৌতম এখান থেকে তার কাছেই গিয়েছিল, তাই আমার মনে অত্যন্ত উদ্বেগ হচ্ছে। পুত্র ! তুমি শীঘ্র রাজধর্মার কাছে গিয়ে দেখ সে বেঁচে আছে কি না।'

পিতার নির্দেশ শুনে পুত্র বহু রাক্ষস সমভিব্যাহারে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে দেখল, রাজধর্মার কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। রাক্ষসরাজের পুত্র তাই দেখে ক্রন্দন করতে লাগল এবং গৌতমকে ধরার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে তার অনুসন্ধানে গেল। কিছু দূর গিয়েই রাক্ষসেরা গৌতমকে ধরে ফেলল, তার কাছেই রাজধর্মার মৃতদেহ এবং অস্থি পাওয়া গেল। তাঁকে নিয়ে রাক্ষসেরা তৎক্ষণাৎ মেরুব্রজে ফিরে এল। রাক্ষসেরা রাজধর্মার মৃতশরীর এবং পাপী কৃতঘ্ন গৌতমকে রাজার কাছে হাজির করল। মিত্রের এই অবস্থা দেখে বিরূপাক্ষ, তাঁর মন্ত্রীরা, পুরোহিত—সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। রাজমহল শোকে নিমগ্ন হল। রাজা তখন বললেন—'পুত্র ! এই পাপীকে বধ করো এবং সব রাক্ষসেরা এর মাংস ইচ্ছামতো ভাগ করে খেয়ে নাও, কারণ এই পাপাত্মা সর্বদা পাপই করত।'

রাক্ষসরাজের নির্দেশেও রাক্ষসেরা সেই পাপীর মাংস খেতে চাইল না। তারা অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে বলল—'মহারাজ ! আপনি আমাদের এর পাপ ভক্ষণ করতে বলবেন না।' রাজা বললেন—'ঠিক আছে, তোমরা এই কৃতঘ্নকে দস্যুদের কাছে পাঠিয়ে দাও।' আদেশ পেয়েই রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে দস্যুদের দিয়ে দিল। কিন্তু দস্যুরাও তার মাংস খেতে রাজি হল না। মাংসাহারী জীবও কৃতঘ্নের মাংস খেল না। ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, চোর এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী মানুষদের পাপ থেকে উদ্ধার লাভের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য কোনো উপায়ের কথা বলা হয়নি।

বিরূপাক্ষ তারপর বকরাজ রাজধর্মার জন্য এক চিতা তৈরি করে বহু রত্ন, চন্দন এবং বস্ত্রদ্বারা তাকে উত্তমরূপে সাজালেন। তারপর বকরাজার শব তার ওপর রেখে বিধিসম্মতভাবে দাহকার্য সমাধা করলেন। সেইসময় দক্ষরাজকন্যা সুরভী দেবী আকাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ থেকে দুগ্ধমিশ্রিত ফেনা গিয়ে রাজধর্মার চিতায় পড়ল এবং সেই স্পর্শে রাজধর্মা জীবিত হয়ে উঠল। তখন সে উড়ে বিরূপাক্ষের কাছে গেল এবং দুই মিত্র আলিঙ্গনবদ্ধ হল। দেবরাজ ইন্দ্রও তখন বিরূপাক্ষের নগরে এসে পৌঁছলেন এবং তাকে বললেন—'অতি সৌভাগ্যের বিষয়ে যে তোমার সাহায্যে রাজধর্মা পুনর্জীবন লাভ করেছে।' তারপর রাজধর্মা ইন্দ্রকে প্রণাম করে বলল—'সুরেশ্বর ! আপনার যদি আমার ওপর কৃপা থাকে, তবে আমার মিত্র গৌতমের জীবনদান করুন।' ইন্দ্র তার কথা মেনে নিলেন এবং অমৃত ছিটিয়ে ব্রাহ্মণের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। গৌতম জীবিত হলে রাজধর্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মিত্রভাবে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে ধন সমেত বিদায় করে স্বস্থানে ফিরে এলেন।

গৌতম পুনরায় ভীলদের গ্রামে গিয়েই বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে সেই শূদ্রাণীর গর্ভে বহু পাপাচারী পুত্রের জন্ম দিলেন। তখন দেবতারা গৌতমকে মহাশাপ দিয়ে বললেন—'এই পাপী কৃতঘ্ন দ্বিতীয় স্বামী স্বীকারকারী পত্নীর গর্ভে বহু সন্তান উৎপন্ন করেছে, এই পাপের জন্য একে মহা নরকে পতিত হতে হবে।'

ভীষ্ম বললেন—ভারত ! নারদ আমাকে একথা বহুদিন আগে শুনিয়েছেন আজ স্মরণ করে তোমাকে জানালাম। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যশ, স্থান ও সুখ কীকরে পাবে ? কৃতঘ্নকে কেউই বিশ্বাস করে না, কৃতঘ্নের উদ্ধারের কোনো পথ নেই। মানুষকে অত্যন্ত সংযত হয়ে মিত্রদ্রোহ পাপ থেকে রক্ষা পেতে হয়। কারণ যে মিত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে ঘোর নরকে পতিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং সৎ মিত্র করার ইচ্ছা থাকা উচিত। কারণ মিত্রের দ্বারাই সব কিছু প্রাপ্ত হয়। মিত্রের সাহায্যেই মানুষ বিপদ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির মিত্রদের আদর-অভ্যর্থনা করা উচিত। যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, পাপী, নির্লজ্জ, মিত্রদ্রোহী, কুলাঙ্গার এবং পাপাচারী, তাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। রাজন্ ! আমি মিত্রদ্রোহকারী পাপপরায়ণ কৃতঘ্ন মানুষের চরিত্র শোনালাম ; এবার আর কী জানতে ইচ্ছা হয় ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাত্মা ভীষ্মের এই কাহিনী শুনে যুধিষ্ঠির মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

শোকাকুল চিত্তের শান্তির জন্য রাজা সেনজিৎ এবং ব্রাহ্মণের কথোপকথনের বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আজ পর্যন্ত আপনি রাজধর্ম-সম্পর্কীয় শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির উপদেশ দিয়েছেন। এবার আপনি আশ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলি বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বেদ সর্বত্রই ধর্মের বিধানে পরিপূর্ণ। ধর্মের অনেক দ্বার রয়েছে। জগতে এমন কোনো কর্ম নেই, যার ফল না হয়। মানুষ যতই জগতের পদার্থ-সমূহকে সারহীন এবং ক্ষণভঙ্গুর বলে মনে করে, ততই তার মনে বৈরাগ্য জন্মাতে থাকে। সুতরাং এই প্রপঞ্চ বহু দোষপূর্ণ—এই চিন্তা করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির মোক্ষের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সম্পদ বিনষ্ট হলে এবং স্ত্রী-পুত্র অথবা পিতার মৃত্যু হলে কীভাবে শোক দূর করা যায়, কৃপা করে তার বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যখন অর্থ-সম্পদ বিনাশ হয় অথবা স্ত্রী-পুত্র বা পিতার মৃত্যু হয়, তখন 'হায় ! জগৎ-সংসার কী দুঃখময়' এই কথা ভেবে শোক দূর করার চেষ্টা করবে। এই বিষয়ে উদাহরণরূপে এক পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। সেনজিৎ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রশোকে অত্যন্ত শোকাতুর হয়েছিলেন। তাঁকে বিমর্ষ দেখে এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজন্ ! মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় আপনি কেন মোহগ্রস্ত হচ্ছেন ? আপনি নিজেই শোকের যোগ্য, অপরের জন্য কেন শোক করছেন ? আরে, একদিন আমি, আপনি এবং অন্য সকলেই সেখানে যাব, যেখান থেকে এসেছি।'

সেনজিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—তপোধন ! আপনার এমন কী তপস্যা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্ত্রবল আছে, যা লাভ করে আপনি বিষাদগ্রস্ত হন না ?

ব্রাহ্মণ বললেন—দেখুন, এই জগতে উত্তম, মধ্যম এবং অধম—সব প্রাণীই দুঃখগ্রস্ত ও নানা কর্মে আবদ্ধ। আমি এই দেহ বা পৃথিবীকে কখনোই নিজের বলে মনে করি না। এটি যেমন আমার তেমনই অন্যেরও এই ভেবে এর জন্য আমি দুঃখ পাই না এবং সেইজন্যই আমি দুঃখ-শোক থেকে রহিত থাকি। সমুদ্রে ভাসমান দু-টুকরো কাঠ যেমন কখনো একসঙ্গে মিলে যায় আবার কখনো পৃথক হয়ে যায়, তেমনই ইহলোকে প্রাণীদের সমাগম হয় আর এইভাবেই পুত্র, পৌত্র, জাতি, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির কল্পনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং এইসবে বিশেষ স্নেহ রাখা উচিত নয় ; কারণ এদের সঙ্গে অবশ্যই একদিন বিচ্ছেদ ঘটবে। আপনার পুত্র কোনো এক অজ্ঞাতস্থান থেকে এসেছিল, আবার অজ্ঞাতদেশেই ফিরে গেছে। তাকে আপনিও আগে জানতেন না। সেও আপনাকে জানত না। সুতরাং আপনি তার কে, যে তার জন্য শোকগ্রস্ত হচ্ছেন ? জগতে বিষয়তৃষ্ণা থেকে যে ব্যাকুলতা উৎপন্ন হয়, তার নামই দুঃখ এবং সেই দুঃখ বিনাশ হওয়াকেই সুখ বলা হয়। সুখ থেকেই বারংবার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এইভাবে সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ চক্রের ন্যায় আবর্তিত হয়। বর্তমানে আপনাকে সুখের স্থিতি থেকে দুঃখে পড়তে হয়েছে, অতএব এবার আপনি সুখলাভ করবেন। কোনো প্রাণীই সর্বদা সুখে বা সর্বদা দুঃখে থাকে না। মানুষ নানাপ্রকার স্নেহ-মমতায় আবদ্ধ থাকে এবং বালির বাঁধ দেওয়ার মতো কাজে অসফল হয়ে দুঃখভোগ করে। মানুষ স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের জন্য নানাপ্রকার পাপ করতে থাকে, কিন্তু ইহলোকে ও পরলোকে তাকে সেসবের জন্য কষ্টকর ফলগুলি একাকী ভোগ করতে হয়। বৃদ্ধ হাতি যেমন পঙ্কে আবদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে, সব মানুষই তেমন স্ত্রী-পুত্রাদির আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে শোক সমুদ্রে ডুবে থাকে। পুত্র, ধন বা আত্মীয়-বন্ধুর বিনাশ হলে মানুষ ভীষণ দুঃখগ্রস্ত হয়, কিন্তু সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু সবই দৈবের অধীন। মানুষ হিতৈষী পরিবৃত হোক অথবা শত্রুবেষ্টিত, বুদ্ধিমান হোক বা নির্বুদ্ধি—দৈবের আনুকূল্য পেলে তবেই মানুষ সুখলাভ করতে সক্ষম হয়। নচেৎ হিতৈষীও সুখপ্রদান করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জগতের গতি একমাত্র প্রাজ্ঞব্যক্তিই বুঝতে পারে, অন্য কেউ নয়।

যিনি বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হয়েছেন, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, যাঁর

মধ্যে মৎসরতার অভাব, তাঁকে অর্থ বা অনর্থ কখনো দুঃখ দিতে পারে না। কিন্তু যিনি বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত করেননি, তিনি অবস্থা অনুসারে অত্যন্ত হর্ষ এবং অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যা প্রাপ্ত হয়, সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করা। শোকের সহস্র কারণ থাকে এবং ভয়েরও শত শত অবকাশ, এগুলি দিন দিন মূর্খদের ওপরই প্রভাব বিস্তার করে, বুদ্ধিমানদের ওপর নয়। যারা বুদ্ধিমান, বিচারশীল, শাস্ত্রাভ্যাসী, ঈর্ষাহীন, সংযমী এবং জিতেন্দ্রিয়, তাদের শোক স্পর্শ করতে পারে না। এই সিদ্ধান্তে অটল থেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংযত চিত্ত হয়ে ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যক্তি উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্ব জানে, শোক তাকে স্পর্শ করে না। মানুষ যখন কোনো বস্তুতে আসক্ত হয়, তখন সেটিই তার দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। সে বিষয়গুলির মধ্যে যেসব বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করে, তার থেকেই তার সুখবৃদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়াদির পশ্চাতে ধাবিত হয়, সে সেগুলির সঙ্গেই বিনষ্ট হয়ে যায়। জগতে যত বিষয় সুখ আছে এবং যা কিছু স্বর্গীয় আনন্দ আছে, সে সব তৃষ্ণাক্ষয়ের সুখের ষোড়শাংশের এক অংশের সমান হতে পারে না। মানুষ বুদ্ধিমান হোক বা মূর্খ অথবা শূরবীর—সে পূর্বজন্মে শুভ বা অশুভ যেমন কর্ম করেছে, তাকে তেমনই ফল ইহজন্মে ভোগ করতে হয়। জীবদের এইভাবে নানাপ্রকার প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। অতএব এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে কামনা ত্যাগরূপগুণে যুক্ত মানুষ সুখে থাকে। সুতরাং সর্বপ্রকার ভোগের আগ্রহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে। হৃদয়ে উৎপন্ন এই কাম হৃদয়েই পুষ্ট হয়ে মৃত্যুরূপে পরিণত হয়। (যখন এর সিদ্ধিতে কোনোপ্রকার বাধা আসে তখন) বিদ্বানেরা একেই ক্রোধ বলে চিহ্নিত করেন। কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গুটিয়ে নেয়, তেমনই জীব যখন নিজের সমস্ত কামনা সংকুচিত করে নেয় তখন তার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বয়ং প্রকাশ আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। সে যখন কাউকে ভয় পায় না এবং অন্য কেউ তার থেকে ভীত হয় না ; কোনো বস্তুর ইচ্ছা বা কাউকে দ্বেষ করে না, তখন সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যখন সত্য-অসত্য, শোক-আনন্দ, ভয়-অভয়, প্রিয়-অপ্রিয় উভয়ই ত্যাগ করে, তখন পরম শান্তচিত্ত হয়ে যায়। পুরুষ যখন মন, বাক্যে ও কর্মে কারো প্রতি অন্যায় ভাব পোষণ করে না, সেই সময় সে ব্রহ্মলাভ করে। দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যা দুস্ত্যজ, মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলেও যাতে শৈথিল্য আসে না, সেই তৃষ্ণা যে ব্যক্তি ত্যাগ করে, সে সুখী হয়। রাজন্ ! এই বিষয়ে পিঙ্গলা কথিত এক গাথা সুপ্রসিদ্ধ, যাতে জানা যায় যে সে ক্লেশপূর্ণ অবস্থায় পড়েও তৃষ্ণা ত্যাগ করে দেওয়ায় শুদ্ধ সনাতন ধর্ম লাভ করেছিলেন।

একবার পিঙ্গলা নামক এক বারবণিতা অনেকক্ষণ ধরে এক সংকেত স্থানে অপেক্ষা করছিল, তবুও তার কাছে তার প্রেমিক এসে পৌঁছয়নি। এতে সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শান্ত মনে চিন্তা করল—আমার সত্যকার প্রিয়তম তো সর্বদাই সুস্থ থাকেন। আমি বহুদিন যাবৎ তাঁর সঙ্গে থেকেছি, তা সত্ত্বেও এমনই উন্মত্ত হয়ে গিয়েছি যে এতদিন কাছে থেকেও তাঁকে চিনতে পারিনি। যে সেই সত্যকার প্রিয়তমকে পায়, সে আর অন্য কাউকে কীভাবে পতিরূপে স্বীকার করবে ! এখন আমারও মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে, আজ থেকে আমি সব কামনা বিসর্জন দিলাম। এখন থেকে ভোগ রূপধারী এই নরকরূপী ধূর্ত মানুষ আর আমাকে মোহগ্রস্ত করতে পারবে না। দৈববশত পূর্ব পুণ্যের উদয় হলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হয়। তাই আজ নিরাশাই আমাকে জিতেন্দ্রিয় করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যার কোনোপ্রকার আশা নেই, সেই সুখনিদ্রায় মগ্ন থাকতে পারে। আশা না থাকাই সব থেকে বড় আনন্দ। দেখো, আশা নিরাশায় পরিণত হওয়াতেই আজ পিঙ্গলা আনন্দে নিদ্রা যাচ্ছে।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! ব্রাহ্মণ যখন এইরূপ নানা যুক্তিপূর্ণ কথা বললেন তখন রাজা সেনজিতের শোক দূর হল এবং চিত্ত শান্ত হল। তিনি প্রসন্ন হয়ে আনন্দে জীবন কাটাতে লাগলেন।

———○———

কল্যাণকামীর কর্তব্য বিষয়ে পিতা-পুত্রের সংবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সমস্ত জীবের প্রাণ সংহারকারী এই কাল অনন্তরূপে চলেছে। এরূপ অবস্থায় কী করলে মানুষের কল্যাণ হতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে পিতা ও পুত্রের সংবাদরূপ এক পুরাতন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে, শ্রবণ করো। কোনো এক স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের 'মেধাবী' নামে প্রসিদ্ধ এক বুদ্ধিমান পুত্র ছিল। সে মোক্ষ, ধর্ম ও অর্থে কুশল এবং লোকস্থিতি সম্বন্ধেও জ্ঞানী ছিল। একদিন সে তার স্বাধ্যায়-পরায়ণ পিতার কাছে গিয়ে বলল—'পিতা ! মানুষের আয়ু প্রতিনিয়ত শেষ হয়ে যাচ্ছে এই কথা জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কী করা উচিত ? আপনি আমাকে যথার্থ ধর্ম উপদেশ দিন, যাতে আমি তা পালন করতে পারি।'

পিতা বললেন—পুত্র ! মানুষের প্রথমে ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে বেদ অধ্যয়ন করা উচিত, তারপর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে পিতৃপুরুষের সদ্গতির জন্য পুত্রের জন্ম-দান ও অগ্ন্যাধানপূর্বক যজ্ঞাদি করা উচিত। অতঃপর বাণপ্রস্থ আশ্রমে বসবাস করে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করা কর্তব্য।

পুত্র বলল—পিতা ! এই লোক তো অত্যন্ত তাড়িত এবং সর্বত্র পরিবেষ্টিত বলে মনে হয়, অমোঘ বস্তু সমূহের এখানে পতন হচ্ছে ; তা সত্ত্বেও কীকরে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলছেন ?

পিতা বললেন—পুত্র ! তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন ? আরে, এই লোক কার দ্বারা তাড়িত, কে একে সবদিকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং এর মধ্যে কোন অমোঘবস্তুর পতন হচ্ছে ?

পুত্র বলল—দেখুন ! মৃত্যু একে অত্যন্ত তাড়িত করছে, জরাবস্থা একে সবদিক দিয়ে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দিন রাত এতে নিত্য পতিত হয় (আসা-যাওয়া করে)। এটি কি আপনি লক্ষ্য করেননি ? অমোঘ রাত্রিগুলি নিত্য আসে এবং চলে যায়। আমি একথা ভালোভাবেই জানি যে মৃত্যু আমার কথায় ক্ষণভরও অপেক্ষা করবে না। এসব জেনেও আমি নিজের কল্যাণ সাধনে কেন ব্যস্ত হব না। প্রতিটি রাত্রি প্রভাত হলে যখন জীবনের একদিন শেষ হয়ে যায়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির বোঝা উচিত যে একটি দিন বৃথা গেল ; এই অবস্থায় কে সুখী থাকতে পারে ? মানুষের কামনা পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যু তাকে আক্রমণ করে ; সুতরাং কালবিলম্ব না করে কল্যাণকর কাজগুলি শীঘ্রই করে ফেলা উচিত, সময় যেন বৃথা না যায় ; কারণ মৃত্যু যে কোনো সময় এসে হাজির হবে। যে কাজ কাল করার, তা আজই করুন ; যা পরে করবে ভেবেছেন, তা এখনই করে ফেলুন। কারণ মৃত্যু কখনো কাজ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে না। সুতরাং যৌবনেই মানুষের ধর্মাচরণ করা উচিত। ধর্মাচরণ করলে মানুষের যশ বৃদ্ধি হয় এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ হয়। স্ত্রী-পুত্রাদিতে মোহগ্রস্ত হয়ে মানুষ তাদের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে এবং নানাবিধ উচিত-অনুচিত কাজের দ্বারা তাদের পোষণ করে। সে পুত্র-কলত্র ও গৃহপালিত পশু প্রভৃতির বৃদ্ধিতেই রত থাকে এবং তার চিত্ত সে সবেই আসক্ত থাকে। সে নিত্য ভোগে ব্যাপৃত থাকে, তবুও সে শান্তি পায় না। সেই অবস্থাতেই মৃত্যু তাকে এমনভাবে গ্রাস করে, যেমন বাঘ নিদ্রিত শিকারকে ধরে। মানুষ তার গৃহস্থালীর কাজে অনবরত ব্যস্ত থাকে; এই অবস্থাতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষ দুর্বল হোক বা বলবান, শূরবীর হোক অথবা ভীতু, মূর্খ হোক বা বিদ্বান—তার কামনা পূরণের আগেই মৃত্যু তার ইহজগতের লীলা শেষ করে দেয়। পিতা ! এই দেহে যখন জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং নানা দুঃখ অনবরত তাড়া করছে তখন আপনি কীকরে নিশ্চিন্তে আছেন ? জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু এবং বৃদ্ধত্ব মানুষের সঙ্গী হয়। সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম পদার্থের সঙ্গেই এর সম্পর্ক থাকে। সুতরাং লোকালয়ে বাস করে স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি পোষণ করা হল প্রকৃতপক্ষে জীবের রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকার মতো অবস্থা। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই শুধু এই বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, পাপী ব্যক্তিরা নয়। যে ব্যক্তি কায়-মনো-বাক্যে কোনো জীবকে কষ্ট দেয় না, সেই জীবও তার জীবন ও অর্থহানি করে না। সত্য পালন ছাড়া কোনো মানুষই নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে না, তাই অসত্য ত্যাগ করা উচিত ; কারণ সত্যের মাঝেই অমৃত ও মৃত্যু উভয়ই বিদ্যমান। মোহের দ্বারা মৃত্যু হয় আর সত্যে অমরত্ব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং এখন থেকে আমি হিংসা হতে দূরে থাকব, সত্যের অনুসন্ধান করব, কাম-ক্রোধ হৃদয় থেকে দূর করব, সুখ-দুঃখে সমভাব রাখব। যাতে অপরে সুখী হয়

তেমন ব্যবহার করব এবং মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত হব। (নিবৃত্তিপরায়ণ হয়ে) আমি শান্তিযজ্ঞ করব, ইন্দ্রিয়াদি দমন করব, মননশীল হয়ে ব্রহ্মযজ্ঞে তৎপর থাকব এবং জপরূপ বাগ্‌যজ্ঞ, ধ্যানরূপ মনোযজ্ঞ এবং গুরু-শুশ্রূষাদিরূপ কর্মযজ্ঞ আচরণ করব। যার মন ও বাক্য সর্বদা একাগ্র থাকে এবং যে তপ, ত্যাগ ও সত্যে তৎপর থাকে, সে সব কিছু প্রাপ্ত হয়। জগতে জ্ঞানের ন্যায় কোনো নেত্র নেই, সত্যের সমান তপ নেই, ক্রোধের সমান কোনো দুঃখ নেই এবং ত্যাগের মতো কোনো সুখ নেই। একান্তবাস, সমতা, সত্যভাষণ, সদাচার, অহিংসা, সরলতা এবং সর্বপ্রকার কাম্য কর্ম থেকে নিবৃত্তি—ব্রাহ্মণের এর সমান আর কোনো ধন নেই। পিতা! একদিন যখন আপনাকে মরতেই হবে, তখন এই ধন, স্বজন বা পরিবারের কাছে প্রতিদান পাবার কী আছে ? নিজ অন্তরে অবস্থিত আত্মার অনুসন্ধান করুন। ভাবুন তো আজ আপনার পিতা-পিতামহ কোথায় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! পুত্রের কথা শুনে পিতা যা করলেন, সত্যধর্মে তৎপর থেকে তুমিও তাই করো।

সুখ-দুঃখের চিন্তা এবং ত্যাগের মহিমা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! ধনী এবং নির্ধন উভয়েই স্বাধীনভাবে কাজ করে, তা সত্ত্বেও তারা সুখ ও দুঃখ কীভাবে লাভ করে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! কিছুদিন পূর্বে শম্পাক নামে এক শান্ত, জীবন্মুক্ত, ত্যাগী ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে আমাকে বলেছিলেন যে ইহজগতে যেসব মানুষ জন্মগ্রহণ করে, (তারা ধনী বা নির্ধন, যাই হোক) জন্ম থেকেই তাদের সুখ-দুঃখ ঘিরে ধরে। বিধাতা যখন তাকে সুখ ও দুঃখ—দুইয়ের কোনো একটি পথে নিয়ে যান তখন তার সুখে প্রসন্ন বা দুঃখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যদি তুমি অকিঞ্চন থাকো, তবে সুখ আস্বাদন করতে পারবে। যে অকিঞ্চন হয় সে আনন্দে কাল কাটায়। জগতে অকিঞ্চনতাতেই আনন্দ, সেটিই হিতকারক, কল্যাণময় এবং নিরাপদ। এই পথে কোনো শত্রুভয় নেই। আমি দেখেছি ত্রিলোকে অকিঞ্চন, শুদ্ধ এবং সর্বদিকে অনাসক্ত পুরুষের মতো আর কেউ নেই। আমি অকিঞ্চনতা ও রাজ্য উভয়কে ওজন করে দেখেছি। গুণে অধিক হওয়ায় রাজ্যের থেকে অকিঞ্চনতার ভার বেশি। অকিঞ্চনতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য হল যে ধনী ব্যক্তি সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত থাকে। যে ব্যক্তি ধনত্যাগ করে মুক্তস্বরূপ হয়েছে, তার অগ্নি, অরিষ্ট, মৃত্যু বা চোরের ভয় থাকে না। সে ইচ্ছামতো বিচরণ করে, শান্তিতে জীবন কাটায়। দেবতারাও তার স্তুতি করেন। ধনী ব্যক্তি লোভ ও ক্রোধের জন্য নিজেকে ভুলে থাকে। সে প্রায়শই পাপ করে থাকে, কঠোর বাক্য বলে। সে যদি সমস্ত পৃথিবীও দান করতে চায়, তবুও তার দিকে কে তাকাবে ? সে সর্বদা সম্পদের ভক্ত হয়ে থাকে এবং এই ধন-সম্পদ সেই মূর্খকে মোহমুগ্ধ করে রাখে। বায়ু যেমন শরতের মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্থ তেমনই তার চিত্ত হরণ করে। সে নিজেকে রূপবান ও ধনবান ভাবে এবং মনে করে আমি অত্যন্ত কুলীন, কোনো সাধারণ ব্যক্তি নই। এইজন্য তার চিত্ত মত্ত হয়ে থাকে। ভোগাসক্ত হওয়ায় সে পিতৃ-পিতামহের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করে এবং নির্ধন হয়ে অন্যের অর্থ অপহরণের চিন্তা করে। সে যখন এইভাবে মর্যাদা লঙ্ঘন করে যেখান সেখান থেকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে তখন রাজপুরুষ তাকে বাধা দেয়। এভাবে তাকে জগতে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং অনিত্য দেহের সঙ্গে থাকা পুত্রৈষণা ইত্যাদি লোকধর্মের দিকে না তাকিয়ে নিজ কুকর্মের ফলে অবশ্য প্রাপ্তব্য এইসকল মহাদুঃখের প্রতিকারের জন্য চিন্তা করে উপযুক্ত চিকিৎসা করা উচিত। কোনো মানুষই ত্যাগ না করে সুখ পায় না, পরমাত্মাকেও লাভ করে না এবং নির্ভয়ে ঘুমোতেও পারে না। অতএব তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করে সুখী হও।

যুধিষ্ঠির! শম্পাক মুনি হস্তিনাপুরে আমাকে এই কথা বলেছিলেন। সুতরাং ত্যাগকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়।

তৃষ্ণা ত্যাগের বিষয়ে মঙ্কির দৃষ্টান্ত এবং বিদেহরাজ জনক এবং মুনিবর বৌধ্যের উক্তি

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কোনো ব্যক্তি যদি বহু চেষ্টা করেও অর্থলাভ করতে না পারে, তাহলে ধনতৃষ্ণায় নিমজ্জিত থেকেও সে কী করলে সুখ পাবে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! সকলের প্রতি সমত্বভাব রাখা, অর্থের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট না থাকা, সত্যভাষণ করা, ভোগাদিতে বিরত থাকা এবং কর্মে আসক্ত না হওয়া—এই পাঁচটি ব্যাপারে সচেতন হলে মানুষ সুখ পেতে পারে। এই বিষয়ে একবার মঙ্কি অনাসক্তভাবে যা বলেছিল সেই পুরাতন ইতিহাস আমি তোমাকে বলছি।

মঙ্কি ধন উপার্জনের জন্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করলেন না। তখন তিনি তাঁর সামান্য সঞ্চিত অর্থের দ্বারা দুটি ভারবহন যোগ্য বলদ ক্রয় করলেন। একদিন তিনি তাদের কাঁধে জোয়াল রেখে কাজ করাবার জন্য যাচ্ছিলেন। পথমধ্যে একটি উট বসেছিল। বলদ দুটি তাকে মধ্যস্থলে রেখে ছুটতে লাগল, যখন সেগুলি উটের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, তখন উট বিরক্ত হয়ে উঠে বলদ দুটিকে জোয়ালসহ ঘাড়ে নিয়ে ছুটতে লাগল। এইভাবে উটের দ্বারা বলদদুটিকে অপহরণ হতে দেখে মঙ্কি বললেন—'মানুষ যতই সচেষ্ট হোক, তার ভাগ্যে না থাকলে সে যাই করুক তার অর্থপ্রাপ্তি হয় না।' ইতিপূর্বে বহুবার অসাফল্যের সম্মুখীন হওয়ার পরও আমি আরও একবার অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখো ! বিধাতা বলদ দুটিকে অপহরণ করে আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। এই সময় কাকতালীয়ভাবেই উটটি আমার বলদ দুটিকে ঘাড়ে করে ছুটে পালাল। এ শুধুমাত্র দৈবেরই লীলা। যদি কোনো পুরুষকে সফল হতে দেখা যায়, তবে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে তাতে দৈবেরই আশীর্বাদ রয়েছে। সুতরাং যে সুখের আশা রাখে, তার বৈরাগ্যের আশ্রয় নেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি ধনোপার্জনের চিন্তা ত্যাগ করে, সে সুখে নিদ্রা যায়। আহা ! শুকদেব মুনি ভালো কথাই বলেছেন যে—'যে ব্যক্তির সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যায় এবং যে সেই কামনাগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, এই দুইয়ের মধ্যে কামনা প্রাপ্তকারীর থেকে কামনা ত্যাগকারীই শ্রেষ্ঠ।'

'ওহে কামনার দাস ! তুমি সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হও, শান্তির সন্ধান করো, বিষয়াসক্তি ত্যাগ করো। এই অর্থবাসনা তোমাকে বারংবার বিপদগ্রস্ত করেছে, তা সত্ত্বেও তুমি এর থেকে মুক্ত হওনি। তুমি বারবার ধন সঞ্চয় করেছ এবং তা বারবার নষ্ট হয়ে গেছে। ওরে মূঢ় ! এই অর্থলোলুপতা থেকে তুমি কবে মুক্ত হবে ? ওরে, আমার একী মূর্খতা, আমি যে তোমার হাতের খেলনা হয়ে রয়েছি। কোন্ ব্যক্তি অপরের দাস হয়ে থাকতে চায় ? হে কামনা ! অবশ্যই তোমার হৃদয় বজ্রনির্মিত, তাই শত শত অনর্থ সহ্য করেও এটি দ্বিধাবিভক্ত হয় না। আমি তোমার উৎস জানি। তুমি সংকল্প থেকেই উৎপন্ন হও। ধনের সংকল্প থেকে সুখলাভ হয় না, ধনপ্রাপ্তি হলেও চিন্তা বৃদ্ধি হয় এবং একবার হস্তগত হয়েও বিনষ্ট হলে মৃত্যু-সম কষ্ট হয়। চেষ্টা করলেও কোনো নিশ্চয়তা নেই তা আর ফিরে পাওয়া যাবে কি না ! পেলেও তাতে সন্তোষ আসে না, আরও পাওয়ার ইচ্ছা জাগে। গঙ্গাজল পান করতে করতে যেমন পানের ইচ্ছা বেড়ে যায়, ধনের স্বভাবও তেমনই, তৃষ্ণার নিবৃত্তি হতে দেয় না। আমি ভালোভাবে বুঝেছি যে তুমি আমার সর্বনাশ করবে, সুতরাং এখন তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। যে প্রাণ আমার ভূতসমষ্টিরূপ দেহে বাস করছে, সেও স্বেচ্ছায় এখানে থাক অথবা চলে যাক। তুমি অহংকার এবং কাম-ক্রোধেরই অনুচর। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, সুতরাং আমি এবার কামনা ত্যাগ করে সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করব। সমস্ত ভূতকে আমি আমার শরীর ও মনে অবলোকন করে বুদ্ধিকে যোগে, চিত্তকে শ্রবণ-মননাদিতে এবং আত্মাকে ব্রহ্মতে নিবিষ্ট করব। এইভাবে সর্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করে আনন্দে সর্বত্র বিচরণ করব, যাতে তুমি আমাকে আর দুঃখে ফেলতে না পারো। কাম, তৃষ্ণা, শোক এবং পরিশ্রমের উৎপত্তিস্থলও তুমিই। আমার মনে হয় অর্থনাশ হওয়ার যে দুঃখ, তা খুবই কষ্টকর। অর্থে যে সামান্য সুখের ভাগ দেখা যায়, তাও দুঃখেরই অংশ। যে ব্যক্তির কাছে অর্থ আছে বলে মনে হয়, তাকে ডাকাতেরা মেরে ফেলে অথবা নানাভাবে কষ্ট দিতে পারে। আমি একথা আগেই জানি যে

অর্থলোলুপতা হল দুঃখস্বরূপ। কাম ! তোমার ইচ্ছাপূরণ করা অত্যন্ত কঠিন। তুমি মহাকাশের মতো অনন্ত। তুমি আমাকে দুঃখে ফেলতে চাও। কিন্তু এবার তুমি আর আমার ওপর অধিকার কায়েম করতে পারবে না। দৈববশত অর্থনাশ হওয়ায় আমি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং আমি আর ভোগের আকাঙ্ক্ষা করব না। আমি আজ পর্যন্ত বহু দুঃখ ভোগ করেছি। এতদিন পর্যন্ত আমি এত মূর্খ ছিলাম যে কিছুই বুঝতাম না। এখন অর্থনাশ হওয়াতে আমার সব অশান্তি দূর হয়েছে ; এখন আমি শান্তিতে নিদ্রা যাব। কাম ! আমি মনের সব আশা ত্যাগ করে তোমাকে বিদায় করব। তুমি আর আমার কাছে থাকতে পারবে না।

যারা আমাকে অপমান করবে, তাদের আমি ক্ষমা করব ; যারা আমাকে কষ্ট দেবে, তাদের কোনো ক্ষতি করব না ; যারা দ্বেষ করবে, তাদের অপ্রিয় ব্যবহারের প্রত্যুত্তর না করে মিষ্ট কথা বলব। আমি তৃপ্ত ও স্থির চিত্ত থাকব এবং যা অনায়াসে পাওয়া যাবে, তাতেই জীবন নির্বাহ করব। তুমি আমার শত্রু, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেব না। তুমি জেনে রাখো, আমি বৈরাগ্য, সুখ, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা এবং সর্বভূতে দয়া—এই সব গুণ লাভ করেছি। সুতরাং কাম, লোভ, তৃষ্ণা এবং কৃপণতার উচিত হল আমাকে ত্যাগ করা। এখন আমি সত্ত্বগুণে স্থিত হয়েছি, কাম ও লোভ হতে মুক্তি পেয়ে সুখলাভ করেছি। সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো লোভে পড়ে আমি আর দুঃখ পেতে চাই না। মানুষ যেসব কামনা পরিত্যাগ করে, সেইসবে সে সুখলাভ করে, কামনার বশীভূত হয়ে সে সর্বদা দুঃখই পেয়ে থাকে। দুঃখ, নির্লজ্জতা এবং অসন্তোষ—এগুলি কাম ও ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয় ; আমি এখন পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, পূর্ণভাবে শান্ত, কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছি এবং বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করছি। ইহলোকে যে বিষয়সুখ এবং দিব্যমহাসুখ, সেসব তৃষ্ণাক্ষয় থেকে হওয়া সুখের ষোড়শ অংশের এক অংশেরও সমান নয়।'

রাজন্ ! মঙ্কি এই বুদ্ধি লাভ করে বিষয় হতে নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছিলেন। দুটি বলদ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি অমরত্ব লাভ করেন। তিনি কামের মূলোচ্ছেদ করে সুখ লাভ করেন। পরম শান্ত বিদেহরাজ জনকও একবার বলেছিলেন—'আমার ধন অনন্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে কিছুই নেই। যদি মিথিলাপুরী ভস্ম হয়ে যায়, তাতেও আমার কিছু পোড়ে না।'

কথিত আছে, কোনো এক সময় নহুষপুত্র যযাতি পরম বৈরাগী, শান্তাত্মা বোধ্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন, যাতে আমি শান্তিলাভ করি। এমন কোনো জ্ঞান আছে যার আশ্রয় নিয়ে আপনি শান্ত ও সানন্দে বিচরণ করে থাকেন ?'

বোধ্য বললেন—'রাজন্ ! আমি কাউকে উপদেশ দিই না বরং অন্যের উপদেশ অনুসারে আচরণ করে থাকি। আমি তোমাকে প্রাপ্ত উপদেশের লক্ষণ জানাচ্ছি, তুমি নিজেই তার বিচার করো। পিঙ্গলা, পক্ষী, সর্প, সারঙ্গ, বাণ প্রস্তুতকারী এবং কুমারী—এই ছয়টি আমার গুরু। মহারাজ ! আশা অত্যন্ত প্রবল, নিরাশাতেই সুখ নিহিত। পিঙ্গলা আশাকে নিরাশাতে পরিণত করে সুখে নিদ্রা যায়। পক্ষী মাংসের টুকরো নিয়ে যাওয়ার সময় অন্য পক্ষী তাকে বিরক্ত করে, তখন সেই মাংসখণ্ডটি ফেলে দেওয়ায় সে শান্তিলাভ করে। সর্প অন্যের নির্মিত গর্তে আনন্দে থাকে ; গৃহ তৈরি করার পরিশ্রম দুঃখেরই রূপ, তাতে কোনো সুখ নেই। সারঙ্গ পক্ষী যেমন কারো সঙ্গে শত্রুতা না করে অহিংসাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করে, তেমনভাবে মুনিগণ ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে আনন্দে জীবন কাটায়। এক বার এক বাণ প্রস্তুতকারীকে দেখেছি, সে তার কাজে এমনই ব্যাপৃত ছিল যে রাজা তার পাশ দিয়ে চলে গেলেও সে তা জানতে পারেনি। (এক কুমারী কন্যা ধান ভানছিল, তাতে তার হাতের চুড়িগুলির আওয়াজ হচ্ছিল। সে সংকোচবশত সব চুড়ি ভেঙে ফেলে দুহাতে মাত্র দুটি চুড়ি রাখল, যাতে চুড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল) তাই আমি ঠিক করেছি যে অনেকে একত্রে থাকলে ঝগড়া-বিবাদ হয় আর মাত্র দুজন থাকলেও কথাবার্তা হতে থাকে। তাই আমি ওই কুমারী কন্যার হাতের এক-একটি চুড়ির মতো একাই বিচরণ করব।'

সন্তদের ব্যবহারের বিষয়ে প্রহ্লাদ ও অবধূত ব্রাহ্মণের বার্তালাপ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি সদাচারের নিয়মাবলী জানেন। কৃপা করে বলুন মানুষ কীরূপ ব্যবহারের দ্বারা শোকহীন হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারে এবং এমন কী কাজ আছে যাতে সে উত্তম গতি লাভ করে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। এটি অসুররাজ প্রহ্লাদ এবং অজগর মুনির সংবাদ। এক শুদ্ধচিত্ত এবং নির্বিকার ব্রাহ্মণকে পৃথিবীতে বিচরণ করতে দেখে একবার পরম বুদ্ধিমান প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রহ্মন্ ! আপনি স্বস্থ, শক্তিমান, মৃদু, জিতেন্দ্রিয়, কর্মজগৎ থেকে দূরে অবস্থিত, অন্যের প্রতি দোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, মিষ্টভাষী এবং তত্ত্বজ্ঞ হয়েও বালকের মতো আচরণকারী। আপনার কোনো কিছু লাভের ইচ্ছা নেই এবং ক্ষতি হলেও কোনো প্রকার চিন্তা করেন না। আপনাকে সর্বদাই তৃপ্ত বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলিকে গ্রাহ্য না করে আপনি সাক্ষীর ন্যায় মুক্তরূপে বিচরণ করেন। মুনিবর ! আপনার কাছে এমন কী বিবেক-বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান অথবা বৃত্তি আছে ? যদি উচিত বলে মনে করেন, কৃপা করে আমাকে শীঘ্র বলুন।'

প্রহ্লাদ এরূপ জিজ্ঞাসা করায় সেই মতিমান মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁকে মধুর বাক্যে বললেন—'প্রহ্লাদ, দেখো ; এই জগতের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং নাশের কারণ হল প্রকৃতি ; সুতরাং আমি তার জন্য হর্ষিত বা ব্যথিত হই না। যত সংযোগ আছে সেগুলির বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী এবং যত সঞ্চয় আছে তার পর্যবসানও বিনাশশীল জেনে রাখো। এইসব দেখে আমি কোথাও আমার মনকে লাগাই না। অসুররাজ ! পৃথিবীতে যত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আছে, আমি স্পষ্টই তাদের মৃত্যু দেখতে পাই। আকাশে যেসব ছোট বড় পক্ষী বিচরণ করে, সেগুলিকে সময় হলে পড়তে দেখা যায়। এইভাবে সব প্রাণীকে মৃত্যুর অধীন দেখে সকলের প্রতি সমভাব রেখে আমি আনন্দে নিদ্রা যাই। যদি অনায়াসে পাওয়া যায় তাহলে কখনো কখনো খুব আহার করি, না হলে বহুদিন ধরে কিছুই না খেয়ে থাকি। কখনো চালের কণা খেয়ে থাকি কখনো তিলের খোল খেয়ে নিই। এইভাবে ভালো-মন্দ সর্বপ্রকারই আহার করি। আমি কখনো রেশম, পশম বা চর্মের বসন পরিধান করি, কখনো মূল্যবান বস্ত্র পরি। দৈববশত যদি কোনো ধর্ম অনুকূল বস্তু লাভ করি, তবে তা ত্যাগ করি না, কিন্তু কখনো কোনো দুর্লভ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি সর্বদাই অজগর-বৃত্তিতে থাকি। এই ব্রত অত্যন্ত সুদৃঢ়, কল্যাণময়, শোকহীন, পবিত্র এবং অতুলনীয়। মহাজ্ঞানী পণ্ডিতেরাও একে স্বীকার করেন। যারা মূঢ়মতি তাদেরই এটি অপ্রিয় লাগে এবং তারা এর থেকে দূরে সরে যায়। আমার মতি অবিচল, আমি ধর্মচ্যুত হইনি, আমার গতি পরিমিত এবং আমি ভয়, রাগ-দ্বেষ ও লোভ-মোহ পরিত্যাগ করেছি। আমি সর্বদা শুদ্ধ অন্তঃকরণে এই অজগর বৃত্তি পালন করি। প্রকৃতিতে যা ফল-মূল ভোজ্যাদি পাওয়া যায়, তাতেই জীবন-নির্বাহ করি এবং প্রারব্ধ অনুসারে দেশ-কালের উপযুক্ত আচরণ করি। এইভাবে হীন ব্যক্তিও যা পালন করে না, সেই অজগর ব্রতের আমি আচরণ করে থাকি। কৃপণেরা অর্থসংগ্রহের জন্য নিরন্তর ভালো-মন্দ ব্যক্তিদের সেবা করে, তাই দেখে এবং সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, প্রীতি-অপ্রীতি ও জীবন-মৃত্যু বিধাতার হাতে জেনে আমি ভয়, রাগ, মোহ এবং অভিমান পরিত্যাগ করেছি এবং ধৈর্য ও সদ্বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছি। আমার শোয়া-বসার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, আমি স্বভাবতই যম, নিয়ম, ব্রত, সত্য এবং শৌচ পালন করি, কোনো ফলেই আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। এইভাবে অত্যন্ত আনন্দে আমি অজগর-ব্রত পালন করি। মন, বাণী এবং বুদ্ধিকে উপেক্ষা এবং প্রিয় ভোগাদিকে অনিত্য জ্ঞান করে অজগর-বৃত্তির পালন করি। মূর্খ ব্যক্তিরা এই অতি দুষ্কর তপ ঠিকমতো বুঝতে পারে না ; আমি একে সর্বতোভাবে নির্দোষ ও অবিনাশী বলে মনে করি এবং সর্বপ্রকার দোষ ও তৃষ্ণা দূর করে মানুষের মধ্যে বিচরণ করে থাকি।'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! যে মহাপুরুষ রাগ, ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধ ত্যাগ করে এই অজগর-ব্রত পালন করেন, তিনি ইহলোকে নির্মল আনন্দে বিচরণ করেন।

মানুষের সদ্‌বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত—এই বিষয়ে কাশ্যপ ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্রের কথোপকথন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কৃপা করে বলুন মানুষের বন্ধুবান্ধব, কর্ম, ধন এবং বুদ্ধি—এগুলির মধ্যে কার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! প্রাণীদের প্রধান আশ্রয় তাদের বুদ্ধি। বুদ্ধিই তার সব থেকে বড় শক্তি এবং জগতে শুভ বুদ্ধিই প্রাণীদের কল্যাণকারী হয়। রাজা বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি এবং মঙ্কি বুদ্ধি বলেই নিজেদের অর্থ সিদ্ধ করেছিলেন। জগতে বুদ্ধির চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এই বিষয়ে ইন্দ্র এবং কাশ্যপ ব্রাহ্মণের কথোপকথনরূপী প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কথিত আছে পূর্বকালে কাশ্যপ নামে এক অতি সংযমী, তপস্বী ঋষিপুত্র ছিলেন। ধনমদে মত্ত কোনো এক বৈশ্য তাঁকে রথের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। পড়ে যাওয়ায় কাশ্যপ অত্যন্ত দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'জগতে নির্ধন মানুষের জীবন বৃথা, সুতরাং আমি আত্মহত্যা করব।' তাঁকে এইরূপ ক্ষুব্ধ হতে দেখে ইন্দ্র

শৃগালের রূপ ধারণ করে ঋষির কাছে এসে বললেন—'মুনিবর ! মনুষ্যদেহ লাভের জন্য সকল প্রাণী উৎসুক হয়ে থাকে, তার মধ্যে সকলেই ব্রাহ্মণের প্রশংসা করে থাকে। আপনি তো মানুষ, ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। এরূপ দুর্লভ জন্ম লাভ করে আপনার তাতে দোষানুসন্ধান করা উচিত নয়। আরে, ভগবান যাকে দুটি হাত দিয়েছেন তার সকল মনোরথই সিদ্ধ হয়েছে জানবেন। এখন যেমন আপনার ধনের জন্য লালসা হচ্ছে, সেইরকম আমি শুধু হাত পাওয়ার জন্যই ব্যগ্র। আমার কাছে হাতের থেকে বড় লাভ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। দেখুন, আমার দেহে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু হাত না থাকায় আমি তা বার করতে পারছি না। কিন্তু যারা ভগবানের কাছ থেকে হাত লাভ করেছে, তারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাতে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম। বিনা হাতের দীন, দুর্বল এবং বাক্‌হীন প্রাণীরা যে দুঃখ সহ্য করে, সৌভাগ্যবশত তা আপনাকে সহ্য করতে হয় না। ভগবানের অত্যন্ত কৃপা যে আপনি শৃগাল, কীট, ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ বা অন্য কোনো প্রাণী হয়ে জন্মাননি। কাশ্যপ ! এই (হাত) লাভের জন্য আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এর বেশি আর কী চাই ? আপনি তো সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমার অবস্থা দেখুন, আমাকে পোকা কামড়ে দিচ্ছে, কিন্তু হাত না থাকায় ওদের কাছ থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি না। আত্মহত্যা মহাপাপ, তা ভেবে আমি মরতেও পারি না, কারণ আমি চাই এর থেকেও নিম্ন যোনিতে যেন জন্ম না হয়। এখন আমার শৃগাল জন্ম, এও অতি নীচ জন্ম, কিন্তু আরও বহু প্রাণী এর থেকেও নীচ যোনিতে আছে। মানুষ ধনী হলে রাজা চায়, রাজত্ব পেলে দেবত্বের আকাঙ্ক্ষা করে, তারপরে ইন্দ্রপদ লাভ করতে চায়। এইভাবে তার তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রিয় বস্তু পেলেও তৃপ্তি হয় না, তৃষ্ণার আগুন জলের দ্বারা নেভে না। ইন্ধন পেলে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হয় তৃষ্ণাও তেমনই বাড়তে থাকে। আপনি এইভাবেই কষ্টে আছেন তবে এইভাবেই হর্ষও হতে পারে। সুখ-দুঃখ একসঙ্গেই থাকে, অতএব এতে শোক করার কী আছে ? বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিই সমস্ত কামনার মূল, সেগুলি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো বশে রাখা উচিত।

দেখুন, মায়ার চক্র এমনই যে নীচ জাতির মানুষেরাও তাদের নিজ নিজ জন্মে প্রসন্ন থাকে, তারাও শরীর ত্যাগ করতে চায় না। শুধু তাই নয়, আপনি অন্ধ-খঞ্জ, রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের দেখুন, তারাও নিজেদের জীবনে প্রসন্ন

থাকে। আর আপনি তো ব্রাহ্মণ, আপনার নীরোগ শরীর, জগতে কেউ আপনার নিন্দা করে না। যদি আপনাকে জাতিচ্যুত করার মতো কোনো সত্যকার কলঙ্কও লেগে থাকে, তাহলেও প্রাণত্যাগের চিন্তা করা উচিত নয়, আপনি ধর্মপালন করার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনি যদি আমার কথা শোনেন এবং তা বিশ্বাস করেন, তাহলে বেদোক্ত কর্মের প্রকৃত ফল আপনি লাভ করবেন। আপনি সতর্কতার সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং অগ্নিহোত্র করুন, সত্যভাষণ করুন, ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখুন, দান করুন এবং অন্যের সঙ্গে স্পর্ধা করা থেকে দূরে থাকুন। যে ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অন্য কোনো চিন্তা কেন করবেন এবং খারাপ কথাও কেন মনে স্থান দেবেন ? পূর্বজন্মে আমি একজন পণ্ডিত ছিলাম এবং কুতর্ক করে বেদের নিন্দা করতাম। সেই সময় মিথ্যা তর্কের ওপর আমার বিশেষ প্রীতি ছিল। আমি সভাস্থলে নানাপ্রকার কুতর্ক করতাম এবং যেসব ব্রাহ্মণ বেদবিচারে রত হতেন, তাঁদের কুকথা বলে অনেক বড় বড় কথা বলতাম। বেদাদির ওপর আমার কোনো আস্থা ছিল না, তাঁদের প্রত্যেক কথায় প্রশ্ন করতাম এবং মূর্খ হয়েও নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করতাম। বিপ্রবর ! এই শৃগাল জন্ম আমার সেই কুকর্মেরই পরিণাম। এখন আমি রাতদিন এমন সাধনা করতে চাই যাতে আবার মনুষ্যজন্ম লাভ করতে পারি। সেই জন্মে আমি সন্তুষ্ট এবং সাবধান থাকব, যজ্ঞ, দান ও তপে যেন আমার অনুরাগ হয়, জানার উপযুক্ত বস্তুগুলি যেন জানতে পারি এবং যা ত্যাগের যোগ্য তাকে ত্যাগ করতে পারি।'

কাশ্যপ মুনি তখন বিস্মিত হয়ে বললেন—'আরে ! তুমি তো অত্যন্ত কুশল এবং বুদ্ধিমান।' এই বলে তিনি জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে ইনি শচীপতি ইন্দ্র। তখন তিনি তাঁকে পূজা করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! যে শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয়, ধনাঢ্য ব্যক্তি যজ্ঞ-দানাদি শুভ কর্ম করেন, তিনি উত্তরোত্তর বৈভব এবং সুখলাভ করেন। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করে, তার তেমনই ফল লাভ হয় আর যখন সে নিদ্রা যায়, তখন তার সঙ্গে তার কর্মফলও সুপ্ত হয়ে যায়। কর্মের এমনই গতি যে তার শোয়া-বসা, চলা-ফেরা এবং কাজ করার সময় ছায়ার মতো সেগুলি কর্তার সঙ্গে লেগে থাকে। যে ব্যক্তি পূর্বজন্মে যেমন যেমন কর্ম করেছে, কর্মবিধান অনুসারে তার তেমনই ফল ভোগ করতে হয়। যেমন ফুল ও ফল প্রকৃতির নিয়মেই সময়মতো সৃষ্ট হয় তেমনই পূর্বকৃত কর্মও যথাসময়ে ফল দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। গো-বৎস যেমন হাজার গাভীর মধ্যে নিজ মাতাকে চিনে নেয় তেমনই কর্ম তার কর্তার পেছনে লেগে থাকে। যেমন ভিজিয়ে রাখা কাপড় একবার ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনই যে উপবাসপূর্বক তপস্যা করে, সে মহাসুখ লাভ করে। আকাশে যেমন পাখির এবং জলে মাছের চরণ চিহ্ন দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানীদেরও গতি বোঝা যায় না। সুতরাং যে কাজ নিজের অনুকূল এবং হিতকর বলে মনে হয়, সেই কাজই করা কর্তব্য।

——○——

জগৎ-সংসার এবং শরীরাদির মূল তত্ত্বগুলির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এই স্থাবর-জঙ্গম জগতের উৎপত্তি কোথা থেকে হল এবং প্রলয়কালে এটি কোথায় চলে যায় ? সমুদ্র, আকাশ, পর্বত, মেঘ, ভূমি, অগ্নি এবং বায়ুর সহিত এই জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন ? প্রাণীদের উৎপত্তি, বর্ণ-বিভাগ, শুদ্ধি-অশুদ্ধির নিয়ম এবং ধর্মাধর্ম বিধি—কীকরে এসবের কল্পনা হয়েছে ? জীবিত প্রাণীদের জীবের স্বরূপ কেমন ? তার মধ্যে যারা মারা যায়, তারা কোথায় যায় এবং তাদের ইহলোক থেকে পরলোকে যাওয়ার ক্রম কী ?—এসব বিষয় আপনি আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে এক পুরাতন কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। এক বার পরম তেজস্বী মহর্ষি ভৃগু কৈলাস শিখরে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে দেখে ভরদ্বাজ মুনি এই প্রশ্নই করেন। তখন ভৃগু বললেন—"মুনে ! মহর্ষিগণ শুনেছেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভে এক মানস দেবতা ছিলেন। তিনি অনাদি-অনন্ত, অভেদ্য এবং অজর-অমর ছিলেন। তিনি 'অব্যক্ত' নামে প্রসিদ্ধ এবং শাশ্বত, অক্ষয় ও অবিনাশী ছিলেন। তাঁর থেকেই সব জীবের উৎপত্তি হয়

এবং মৃত্যুর পর তাঁতেই বিলীন হয়। সেই স্বয়ম্ভু মানস দেব প্রথমে এক তেজোময় দিব্যকমল সৃষ্টি করেন। তার থেকে বেদস্বরূপ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। তিনি 'অহংকার' নামেও প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত ভূতাদির আত্মা এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা। এই যে পঞ্চ মহাভূত, এর বাস্তবিক স্বরূপও ব্রহ্মাই। পর্বত তাঁর অস্থি সকল, পৃথিবী তাঁর মেদ এবং মাংস, সমুদ্র রুধির, আকাশ উদর, বায়ু তাঁর শ্বাস, অগ্নি তেজ, নদীগুলি তাঁর শিরা-উপশিরা, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর দুই নেত্র, আকাশ মস্তক, পৃথিবী পা এবং দিকগুলি তাঁর হস্ত। এই অচিন্ত্য পুরুষকে জানা সিদ্ধদের পক্ষেও কষ্টকর। তিনিই ভগবান বিষ্ণু এবং 'অনন্ত' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি সমস্ত ভূতাদির আত্মা এবং অন্তর্যামী। যার চিত্ত মলিন, সে তাঁকে জানতে পারে না।"

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আকাশ, দিক, পৃথিবী এবং বায়ুর পরিমাণ কত—তা জানিয়ে আমার সন্দেহ দূর করুন।

তখন মহর্ষি ভৃগু বললেন—মুনিবর ! এই আকাশ অনন্ত, এর অনেক মস্তক এবং দেবতাদের নিবাসস্থান। এতে তাঁদের লোকও স্থিত রয়েছে। এটি অত্যন্ত রমণীয় এবং এত বিশাল যে কোথাওই তার অন্ত দেখা যায় না। ওপরে যারা যায় তারা পৃথিবীর নীচে স্থিত চাঁদ ও সূর্যকে দেখতে পায় না। সেখানে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দেবতা স্বয়ং নিজ প্রকাশে প্রকাশিত থাকেন, কিন্তু সেই তেজস্বী নক্ষত্রগণও সেই আকাশের অন্ত পান না ; কারণ তা অনন্ত এবং দুর্গম। শুধু আকাশ নয়, অগ্নি, বায়ু এবং জলের পরিমাণ জানাও দেবতাদের কাছে অসম্ভবই। ঋষিগণ বিবিধ শাস্ত্রে ত্রিলোক এবং সমুদ্রের পরিমাণের বিষয়ে যদিও কিছু বলেছেন, কিন্তু যা দৃষ্টির অতীত এবং ইন্দ্রিয়াদি যেখানে পৌঁছতে পারে না, সেই পরমাত্মার পরিমাণ কে বলতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, এই সিদ্ধ এবং দেবতাদের গতিও তো পরিমিত ; সুতরাং পরমাত্মার 'অনন্ত' নাম তাঁর গুণাদিরই অনুরূপ।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! জগতে এই পাঁচ ধাতুকেই 'মহাভূত' বলা হয়, ব্রহ্মা এগুলিকে জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে রচনা করেছিলেন এবং যাদের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। কিন্তু ব্রহ্মা তো আরও সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি করেছিলেন, তাহলে শুধু এদেরই 'ভূত' বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ?

ভৃগু বললেন—মুনে ! এই পাঁচটি অসীম, তাই এঁদের 'মহা' বলা হয় এবং এঁদের থেকেই সমস্ত স্থূল ভূতাদির উৎপত্তি হয় ; সুতরাং এঁদের পঞ্চমহাভূত সংজ্ঞাই সঠিক। মানুষের দেহও এই পঞ্চভূতেরই মিলনে সৃষ্টি। মানুষের গতি অর্থাৎ চলা ফেরা হল বায়ুর অংশ, শূন্যতা আকাশের অংশ, উষ্মা হল অগ্নির অংশ, রক্ত ইত্যাদি তরল পদার্থ জলের অংশ এবং অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি শক্তপদার্থ পৃথিবীর অংশ। স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জগৎ এই পঞ্চভূত থেকেই উৎপন্ন এবং চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ইন্দ্রিয়াদিও এই সবেরই পরিণাম।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আপনি বললেন যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম এই পঞ্চ মহাভূত থেকেই উৎপন্ন, কিন্তু স্থাবর দেহগুলিতে তো এই পঞ্চ তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় না। বৃক্ষের কথাই ধরুন—আপাতদৃষ্টিতে তারা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, গন্ধ বা রস অনুভব করে না এবং স্পর্শেরও স্থান নেই। তাহলে এগুলিকে পঞ্চভৌতিক বলা হয় কীকরে ? এতে দূরত্ব বা অগ্নির অংশ দেখা যায় না, পৃথিবী বা বায়ুর ভাগও দেখা যায় না এবং আকাশেরও কোনো প্রমাণ নেই। তাই এগুলিকে ভৌতিক বলা যায় না।

ভৃগু বললেন—মুনে ! যদিও বৃক্ষকে ঘন (শক্ত) বলে মনে হয়, তা সত্ত্বেও তার মধ্যে আকাশের ভাগ অবশ্যই আছে। তাই তাতে প্রতিদিন ফল-ফুল ফোটা সম্ভব হয়। তার

মধ্যে যে উষ্মা আছে, তার থেকেই তার পাতা, ছাল, ফল ও ফুল তৈরি হয়, এগুলি কুসুমিত হয় এবং ঝরে যায়, এর দ্বারা তাতে স্পর্শও প্রমাণিত হয়। এও দেখা যায় যে ভীষণভাবে বিদ্যুৎ চমকালে গাছের ফল-ফুল ঝরে যায়। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই শব্দগ্রহণ হয়। সুতরাং বৃক্ষ যে শুনতে পায় এর দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। দেখো, লতা বৃক্ষকে চারদিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওপর দিকে উঠতে থাকে ; কেউই নিজের পথ না দেখে চলে না, এতেই প্রমাণিত হয় যে গাছ দেখতেও পায়। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দ্বারা এবং নানাপ্রকার ধোঁয়া দিলে গাছও নীরোগ হয়, তখন তাতে ফুল-ফল জন্মায়, এর দ্বারা তার ঘ্রাণ ক্ষমতাও প্রমাণিত হয়। বৃক্ষের রসনেন্দ্রিয়ও আছে ; কারণ বৃক্ষ তার মূল বা শিকড় দ্বারা জলপান করে। বৃক্ষের অসুখ হলে মূলে ঔষধযুক্ত জল দিলে বৃক্ষটি নীরোগ হয়ে যায়। মানুষ যেমন কমলের নাল দিয়ে জল টেনে নেয় গাছও তেমনই নিজের পাদ (মূলের) সাহায্যে জল পান করে। তাই একে 'পাদপ' বলা হয়। বৃক্ষের মধ্যে সুখ-দুঃখের জ্ঞানও দেখা যায় এবং কাটলে আবার বাড়তে থাকে, এতে প্রমাণিত হয় এর প্রাণ আছে, অচেতন নয়। বৃক্ষ তার মূলের দ্বারা জল টেনে নিয়ে তার মধ্যেকার বায়ু ও অগ্নির দ্বারা পরিপাক করে। এইভাবে আহার পরিপাক হওয়ায় তাকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখায় এবং সে বৃদ্ধিলাভ করে। জঙ্গমের শরীরেও পঞ্চভূত বিরাজ করে, কিন্তু তার স্বরূপে ভেদ থাকে। দেহের ত্বক-মাংস-অস্থি-মজ্জা-স্নায়ু—এই পাঁচ বস্তু পৃথ্বীময় ; তেজ-ক্রোধ-চক্ষু-উষ্মা-জঠরানল—এই পাঁচটি অগ্নিময়, নাসিকা-কর্ণ-মুখ-হৃদয়-উদর—এই পাঁচটি আকশের অংশ ; কফ-পিত্ত-স্বেদ-রক্ত-মেদ—এই পাঁচটি জলীয় অংশ এবং প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান—এই পাঁচটি বায়ুর বিকার। প্রাণের সাহায্যে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, ব্যানের সাহায্যে বলপূর্বক যে কাজ হয় সেগুলি করে থাকে, অপানের গতি হল শরীরে ওপর থেকে নীচে সমান ভাবে অবস্থান করে এবং উদানের দ্বারা মানুষ উচ্ছ্বাস গ্রহণ করে এবং কণ্ঠতালু ইত্যাদি স্থানভেদে শব্দোচ্চারণ করে। এইভাবে এই পাঁচটি বায়ু প্রত্যেক দেহধারীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াদি করায়।

ভূমির জন্যই জীব নিজের মধ্যে গন্ধ-গুণ অনুভব করে, জলের জন্য রসকে জানতে পারে, তেজোময় চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে, বায়ুময় ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ অনুভব করে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এগুলিকে পৃথিবীর গুণ বলে মানা হয়। এরমধ্যে আমি গন্ধগুণের কথা বিস্তারিতভাবে বলছি। ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, নির্হারী, সংহত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ এবং বিশদ ভেদে পার্থিব গন্ধ নয় প্রকারের হয়। শব্দ-স্পর্শ-রূপ ও রস—এগুলিকে জলের গুণ মানা হয়। এরমধ্যে রসজ্ঞানের কথা বিস্তারিত শোনো। উদারচেতা ঋষিগণ রসের নানা ভেদের কথা বলেছেন। তারমধ্যে মধুর, লবণ, তিক্ত, কষা, অম্ল ও কটু—এই ছয় প্রকারের রস জলময়। শব্দ-স্পর্শ ও রূপ—এই তিনটি তেজের গুণ। তেজ থেকেই রূপের জ্ঞান হয় এবং তার নানা ভেদ আছে। হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, গোল, সাদা, কালো, লাল, হলুদ, নীল, অরুণবর্ণ, কঠোর, নরম, স্নিগ্ধ, মৃদু ও দারুণ—এই ষোলোটি রূপের প্রকার। শব্দ ও স্পর্শ—এই দুটি বায়ুর গুণ। বায়ুর প্রধান গুণ স্পর্শ এবং তা নানাপ্রকার। উষ্ণ, শীত, সুখদায়ক, দুঃখদায়ক, স্নিগ্ধ, বিশদ, কর্কশ, মৃদু, রুক্ষ, হাল্কা, ভারী এবং অধিক ভারী—স্পর্শের এই বারোটি ভেদ। আকাশের একমাত্র গুণ হল শব্দ। তা কয়েক প্রকার, সেটির প্রধানত সাতটি ভেদ—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। ব্যাপক রূপে শব্দ সর্বত্র, কিন্তু বিশেষরূপে এর উপলব্ধি বাদ্য যন্ত্রাদির দ্বারা হয়। বাদ্যযন্ত্রে বা মেঘগর্জনে, গাড়ির শব্দে যে আওয়াজ শোনা যায় এবং জড় ও চেতনে যতপ্রকার শব্দ হয়, সেসবই এই সপ্ত ভেদের অন্তর্গত। আকাশজনিত শব্দের এইরূপ নানাভেদ এবং তা বায়ুর গুণ স্পর্শের সঙ্গে মিলেই শোনা যায়। জল, অগ্নি ও বায়ু—এই তিনতত্ত্ব দেহধারীদের মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে, এগুলিই শরীরের মূল এবং প্রাণে ওতপ্রোত হয়ে শরীরে অবস্থান করে।

---o---

জীবের নিত্যত্ব ও অস্তিত্বের বর্ণনা ; চারবর্ণের উৎপত্তি এবং তাদের কর্ম

ভরদ্বাজ বললেন—মুনিবর ! মৃত্যুর সময় যে গোদান করা হয় তার স্বরূপ কী ? এই গাভী আমাকে পরলোকে পার করে দেবে, এই ভেবে কি মুমূর্ষু ব্যক্তি গোদান করে ? কিন্তু সেই ব্যক্তি তো গোদান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে সেই গাভী তাকে কীভাবে পার করবে ? এতদ্ব্যতীত গাভী, তার দাতা এবং গ্রহীতা—এই তিনটিকেই বিনষ্ট হতে দেখা যায়। তাহলে এদের সমন্বয় হয় কীভাবে ? এদের মধ্যে যে মরে তাকে হয় পশু খেয়ে নেয়, অথবা পর্বত থেকে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় বা অগ্নিতে ভস্ম হয়ে যায়। সেই অবস্থায় তাদের পুনরায় জীবিত হওয়া সম্ভবই নয়। কারণ যে মরে যায়, সে আর ফিরে আসে না।

মহাত্মা ভৃগু বললেন—ভরদ্বাজ ! জীবের করা দান বা কর্মের কখনো বিনাশ হয় না। জীব মৃত্যুর পরই অন্য দেহে আশ্রয় নেয়, তার আগের দেহটিরই কেবল বিনাশ হয়, আত্মার নয়।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! এখন কৃপা করে বলুন যে দেহধারীদের শরীরে যদি শুধুমাত্র অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ এবং জল-তত্ত্বই বিদ্যমান, তাহলে তাদের মধ্যে বাসকারী জীবের স্বরূপ কী ? শরীরকে কাটা-ছেঁড়া করলে তো তার মধ্যে কোনো জীবের উপলব্ধি নেই, এই অবস্থায় পঞ্চভৌতিক দেহকে যদি জীবরহিত জড় বলে মনে করা হয় তাহলে প্রশ্ন আসে যে শরীর বা মনে পীড়া হলে সেই দুঃখ কে অনুভব করে ? জীব কোনো কথা কানে শোনার ফলে মনে পীড়া হলে সেই দুঃখ কে অনুভব করে ? জীব সব কথাই কানের দ্বারা শোনে ; কিন্তু মনে কোনো ব্যাকুলতা থাকলে দুই কান খোলা অবস্থায় সে কিছুই শুনতে পায় না ; তাই মনের অতিরিক্ত কোনো জীবের অস্তিত্ব মনে করা বৃথা। নেত্রের সঙ্গে মনের সংযুক্তি ঘটলেই জীব দৃশ্য বস্তু দেখতে পায়, মনে ব্যাকুলতা থাকলে সে দেখতে পায় না। তেমনই নিদ্রিত প্রাণী সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকলেও দেখতে পায় না, গন্ধ পায় না, শুনতে পায় না এবং কথা বলতেও পারে না, স্পর্শ এবং রসও সে অনুভব করতে পারে না। সুতরাং প্রশ্ন হল এই দেহে হর্ষ এবং ক্রোধ কে উৎপন্ন করে ? শোক এবং উদ্বেগ কার হয় ? ইচ্ছা, ধ্যান, দ্বেষ এবং কথাবার্তা কে বলে ?

ভৃগু বললেন—মুনে ! মনও পঞ্চভূতের অন্তর্গত, শরীরে তার কোনো অতিরিক্ত অস্তিত্ব নেই। একমাত্র অন্তরাত্মাই এই দেহ সঞ্চালন করেন। তিনিই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এবং অন্যান্য গুণাদির অনুভব করে থাকেন। তিনিই পঞ্চেন্দ্রিয়ের গুণাদি ধারণকারী মনের দ্রষ্টা এবং তিনিই এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রত্যেক অবয়বে ব্যাপ্ত হয়ে সুখ-দুঃখ অনুভব করেন। যখন আত্মার শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না তখন এই দেহেরও সুখ বা দুঃখের অনুভূতি থাকে না। (এর দ্বারা মনের অতিরিক্ত তার সাক্ষী আত্মার অস্তিত্ব স্বতই প্রমাণিত হয়ে যায়।) দেহস্থিত শক্তিস্বরূপ আত্মা যখন এর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন শরীরের রূপ-স্পর্শ, তাপ ইত্যাদি জ্ঞান আর থাকে না এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে। আত্মা যখন প্রকৃতির গুণে যুক্ত হয়, তখন তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে এবং সেই গুণ থেকে যখন মুক্ত হয়ে যায়, তখন তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞকে তুমি আত্মা বলেই জানবে। তিনি পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর ন্যায় এই দেহে থাকলেও এর থেকে পৃথক। তাঁর জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতের কল্যাণ হয়। তিনিই সকলের দ্বারা কর্মপ্রচেষ্টা করান এবং করেন। দেহ বিনষ্ট হলেও জীব বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যে জীবের মৃত্যুর কথা বলে তারা অজ্ঞানী, তাদের সেই কথা মিথ্যা। জীব মৃতদেহ ত্যাগ করে অন্য শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্থূল শরীরের নাশকেই মৃত্যু বলা হয়।

আত্মা এইভাবে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করেন। অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় তা প্রকাশ পায় না। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণই তীব্র এবং সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন। যে বিদ্বান ব্যক্তি পরিমিত আহার করে রাত্রের প্রথম ও শেষ প্রহরে সর্বদা ধ্যানযোগ অভ্যাস করেন, তিনি শুদ্ধচিত্ত হওয়ায় নিজ অন্তরেই সেই আত্মার দর্শন লাভ করেন। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তাঁর শুভাশুভ কর্ম হতে সম্বন্ধ দূর হয় এবং সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়ে অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে নিজ তেজে সূর্য ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত ব্রাহ্মণ-মরীচি প্রমুখ প্রজাপতি উৎপন্ন করেন। তারপর স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত সত্য, ধর্ম, তপ, সনাতন বেদ, আচার এবং শৌচাদির নিয়ম তৈরি করেন। এরপরে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, দৈত্য, অসুর, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস,

নাগ, পিশাচ এবং মানুষ উৎপন্ন করেন। মানুষের চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বিভাজন করেন এবং প্রাণীদের মধ্যে এইরূপ যে আরও নানাবর্ণ বিদ্যমান, সেগুলিও রচনা করেন। ব্রাহ্মণগণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় লাল, বৈশ্যগণ হলুদ এবং শূদ্রগণকে কালো রং করেছেন।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর! এই কালো-সাদা সব মানুষের ওপরই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা এবং ক্লান্তির প্রভাব পড়ে। সকলের দেহ থেকেই ঘাম, ময়লা, মূত্র, কফ, পিত্ত ও রক্ত বার হয়। এরূপ অবস্থায় রঙের সাহায্যে কীভাবে বর্ণবিভাগ করা সম্ভব হয়? বৃক্ষাদি স্থাবর এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে অসংখ্য জাতি বিদ্যমান; তারাও নানা রংয়ের; অতএব তাদের বর্ণের বিভাগ কী করে সম্ভব?

মহাত্মা ভৃগু বললেন—প্রথমে বর্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। ব্রহ্মা হতে উৎপন্ন হওয়ায় সমস্ত জগৎই ব্রাহ্মণ ছিল। পরে বিভিন্ন কর্মের জন্য এদের মধ্যে বর্ণভেদ করা হয়। যারা নিজ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম পরিত্যাগ করে বিষয়ভোগে আসক্ত হয়েছে, তীক্ষ্ণ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয়েছে, বীরোচিত কাজ পছন্দ করে এবং সেইজন্য তাদের দেহবর্ণও লাল হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণ 'ক্ষত্রিয়' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। যারা গাভীর পরিচর্যা করাকেই নিজেদের বৃত্তি করেছে, কৃষিকার্যে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য গাত্রবর্ণ পাণ্ডুবর্ণে পরিবর্তিত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণধর্ম ত্যাগ করেছে, সেই দ্বিজদের 'বৈশ্য' বলা হয়। যারা শৌচ ও সদাচার ভ্রষ্ট হয়ে হিংসা ও অসত্যের আশ্রয় নিয়েছে, লোভবশত সকল প্রকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাই তাদের গাত্রবর্ণ মলিন হয়ে গেছে, তাদের 'শূদ্র' বলা হয়। এইভাবে চারটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। যে ব্রাহ্মণ বেদের নির্দেশানুসারে চলেন এবং সর্বদাই বেদ, ব্রত ও নিয়মাদি পালন করেন, তার তপস্যা কখনো নষ্ট হয় না। যারা এই জগৎকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলে জানে না, তারা দ্বিজ নামের অধিকারী নয়। এরূপ লোকেরা নানা ইতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিহীন, স্বেচ্ছাচারী, পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত ও ম্লেচ্ছ হয়। পরে ঋষিগণ তাঁদের তপস্যার বলে এমন কিছু প্রজা উৎপন্ন করেছিলেন, যারা তাদের ধর্মকর্মে দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থান করে। কিন্তু যে সৃষ্টি আদিদেব ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যাঁর মূল ব্রহ্মা স্বয়ং এবং যা অক্ষয়, অব্যয় ও ধর্মে তৎপর সেই সৃষ্টিকে মানসী সৃষ্টি বলা হয়।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর! আমাকে বলুন কোন কর্মের দ্বারা মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হয়?

ভৃগু বললেন—যিনি জাতকর্মাদি সংস্কারসম্পন্ন, পবিত্র এবং বেদস্বাধ্যায়ে সংলগ্ন, (যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং দান-প্রতিগ্রহ)—এই ছটি কর্মে স্থিত থাকেন, শৌচ ও সদাচার পালন এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন করেন, গুরুর প্রতি ভক্তি রাখেন এবং নিত্য নিয়মাদি পালন করেন; যাঁর মধ্যে সত্য, দান, দ্রোহ না করা, সকলের প্রতি কোমল ভাব রাখা, লজ্জা, দয়া ও তপস্যার মতো সদগুণ পরিলক্ষিত হয়, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। যিনি যুদ্ধ ইত্যাদি কর্ম করেন এবং বেদাদি অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকেন, ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং প্রজাদের থেকে কর গ্রহণ করে তাদের রক্ষা করেন, তাঁদের ক্ষত্রিয় বলা হয়। এইরূপ যাঁরা বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করে ব্যবসায়, পশুপালন এবং কৃষিকার্য করেন, দান করেন এবং পবিত্রভাবে থাকেন, তাঁদের বৈশ্য বলা হয়। কিন্তু যারা বেদ ও সদাচার পরিত্যাগ করে সব কিছু আহার করে এবং সর্বপ্রকার কাজ করে, সর্বদা অপবিত্রভাবে থাকে, তাদের শূদ্র বলা হয়।

যদি এইসব ব্রাহ্মণোচিত সত্যাদি গুণ শূদ্রের মধ্যে দেখা যায়, এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে না থাকে, তাহলে সেই শূদ্র 'শূদ্র' নয় এবং ব্রাহ্মণও 'ব্রাহ্মণ' নয়। সর্বভাবে লোভ ও ক্রোধ জয় করাই পবিত্র জ্ঞান এবং আত্মসংযম। ক্রোধ ও লোভ মানুষের কল্যাণে সর্বদাই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে; সুতরাং পূর্ণ শক্তি দিয়ে ক্রোধ ও লোভ দমন করা উচিত। ক্রোধ হতে শ্রীকে, মাৎসর্য থেকে তপকে, মান-অপমান থেকে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। যার সকল কর্ম কামনা বন্ধনরহিত এবং যে ত্যাগের আগুনে সব কিছু আহুতি দিয়েছে, সে-ই ত্যাগী এবং বুদ্ধিমান। কোনো প্রাণীকে হিংসা করবে না, সকলের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার করবে, স্ত্রী-পুত্রাদির মমতা এবং আসক্তি ত্যাগ করে বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে সেই স্থিতি লাভ করবে, যা ইহলোক ও পরলোকে নির্ভয় এবং শোকরহিত করে। নিত্য তপ করবে, মননশীল হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করবে, আসক্তির আশ্রয়ভূত দেহ-গৃহ ইত্যাদিতে আসক্ত না হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করার ইচ্ছা করবে। মনকে প্রাণে ও প্রাণকে ব্রহ্মে স্থাপন করবে। বৈরাগ্যের দ্বারাই নির্বাণ (মোক্ষ) লাভ হয়, তা লাভ করলে

কোনো অনাত্ম পদার্থের চিন্তা আসে না। সংসার থেকে বৈরাগ্য হলে ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে অনায়াসেই প্রাপ্ত করে। সর্বদা শৌচ এবং সদাচার পালন করা এবং সমস্ত প্রাণীর ওপর দয়া রাখা—এগুলিই ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

সত্যের মহিমা, অসত্যের দোষ, দানাদির ফল এবং আশ্রমধর্মের বর্ণনা

ভৃগু বললেন—মুনে! সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ, সত্যই প্রজা সৃষ্টি করে, সত্যের আধারেই জগৎ সংসার বিরাজমান এবং সত্যের দ্বারাই মানুষ স্বর্গ লাভ করে। অসত্য অন্ধকারের রূপ, তা সর্বদা নীচে পতিত করে। অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত মানুষ জ্ঞানের আলো দেখতে পায় না। যা সত্য তাই ধর্ম, যা ধর্ম তাই প্রকাশ (জ্ঞান) এবং যা প্রকাশ তাই সুখ। এইরূপ যা অসত্য তাই অধর্ম, যা অধর্ম সেটিই অন্ধকার (অজ্ঞান) এবং যা অন্ধকার তাই দুঃখ। জগৎ-সংসার শারীরিক ও মানসিক দুঃখে পরিপূর্ণ, এতে যা সুখ তাও পরিণামে দুঃখপ্রদানকারী। এই উপলব্ধি করে বুদ্ধিমান পুরুষ কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হল দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করা।

অসত্য থেকে তম (অজ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তমোগ্রস্ত মানুষ অধর্মকে অনুসরণ করে, ধর্ম অনুসরণ করে না ; সুতরাং যারা ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অসত্য ইত্যাদিতে আচ্ছাদিত, তারা ইহলোকে বা পরলোক কোথাও সুখলাভ করে না। নানাপ্রকার রোগ, ব্যাধি এবং তাপে সন্তপ্ত হতে থাকে, দেহাদি বন্ধনের কষ্ট সহ্য করে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে ক্লেশ ভোগ করে। শুধু তাই নয়, তাদের ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম থেকে উৎপন্ন ভয় ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। বন্ধুবান্ধবদের মৃত্যু, ধন-নাশ এবং প্রিয় ব্যক্তির বিচ্ছেদ জনিত কারণে মানসিক শোকেরও শিকার হতে হয়। এইভাবে তাদের জরা ও মৃত্যুতেও নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করতে হয়।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর! দান, ধর্ম, তপ, স্বাধ্যায় এবং অগ্নিহোত্রের কী ফল ?

মহাত্মা ভৃগু বললেন—অগ্নিহোত্রের দ্বারা পাপ বিনাশ হয়, স্বাধ্যায়ের দ্বারা পরম শান্তি লাভ হয়, দানের দ্বারা ভোগের প্রাপ্তি এবং তপের দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মা যে চার আশ্রম সৃষ্টি করেছেন, সেগুলির ধর্ম কী ? দয়া করে আমাকে বলুন।

ভৃগু বললেন—জগৎ কল্যাণকারী ভগবান ব্রহ্মা ধর্মরক্ষার জন্য পূর্বেই চার আশ্রমের উপদেশ প্রদান করেছিলেন। তার মধ্যে ব্রহ্মচর্য হল প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে শিষ্যকে গুরুগৃহে বাস করে বেদাদির স্বাধ্যায় করতে হয়। এই আশ্রমে বাসকারী ব্রহ্মচারীর অন্তর-বাহ্য শুদ্ধি, বৈদিক সংস্কার ও ব্রত-নিয়ম পালন দ্বারা নিজের মনকে বশে রাখতে হয়। প্রভাত ও সন্ধ্যা—দুটি সময়ে সন্ধ্যা, সূর্যোপস্থান এবং অগ্নিহোত্রের দ্বারা অগ্নিদেবের উপাসনা করা উচিত। তন্দ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করে প্রত্যহ গুরুপ্রণাম করবে, বেদাদি অধ্যয়ন এবং তার অর্থ চিন্তা করবে। এইরূপ দিন চর্যার দ্বারা নিজের মনকে পবিত্র করবে। প্রভাত, দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা—তিনবার স্নান করবে। ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরু ও অগ্নির সেবা করবে, প্রত্যহ ভিক্ষা করে, ভিক্ষান্ন গুরুকে অর্পণ করবে। নিজ অন্তঃকরণও গুরুর পদে সমর্পণ করবে, গুরুর অভিপ্রায় বুঝে অথবা যে কাজের জন্য তিনি আদেশ দেবেন, তার বিপরীত আচরণ করবে না। গুরুকে প্রসন্ন করে তাঁর কৃপায় স্বাধ্যায়ের অবকাশ পেলে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হবে। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে (যার ভাব হল) 'যে দ্বিজ গুরুর আরাধনা করে বেদাদি জ্ঞান লাভ করে, অন্তকালে তার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং তার মানসিক সংকল্প সিদ্ধ হয়।'

'গার্হস্থ্য'কে দ্বিতীয় আশ্রম বলা হয়। এবার আমি তার পালন যোগ্য আচরণের ব্যাখ্যা করছি। সদাচার পালনকারী ব্রহ্মচারী যখন গুরুকুলে বাস করে বিদ্যালাভ সমাপ্ত করে এবং সমাবর্তনের পরে স্নাতক হয়ে যায়, তখন যদি তার পত্নীসহ ধর্মাচরণ করার এবং পুত্রাদিরূপ ফল লাভের ইচ্ছা হয়, তাহলে তার জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের বিধান আছে ; কারণ এতে ধর্ম, অর্থ ও কাম তিনেরই প্রাপ্তি হয়। তাই ত্রিবর্গ-সাধনের ইচ্ছায় গৃহস্থকে উত্তম কর্মের দ্বারা ধন-সংগ্রহ করা উচিত এবং তার সাহায্যে সংসার-নির্বাহ করা কর্তব্য। গৃহস্থ-আশ্রমকে সকল আশ্রমের মূলস্বরূপ বলা হয়। গুরুকুল বাসকারী ব্রহ্মচারী, বনে বনবাসকারী সংকল্প পূর্বক ব্রত, নিয়ম ও ধর্মপালনকারী বাণপ্রস্থী এবং সর্বত্যাগী

সন্ন্যাসীদেরও গৃহস্থাশ্রম থেকেই ভিক্ষা ইত্যাদি প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্য হল যে অন্য সব আশ্রমবাসীরই গৃহস্থাশ্রম থেকে নির্বাহ হয়। গৃহস্থ দ্বারা কৃত অতিথি সৎকারের বিষয়ে একটি শ্লোক আছে (যার সারাংশ হল) — যে গৃহস্থ-বাড়ি থেকে ভিক্ষুক শূন্যহাতে ফিরে যায় সে সেই গৃহস্থকে নিজের পাপ সমর্পণ করে এবং বিনিময়ে গৃহস্থের সমস্ত পুণ্য নিয়ে যায়।

এছাড়াও গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞ করলে দেবতা, শ্রাদ্ধ করলে পিতৃপুরুষ, শাস্ত্রের শ্রবণ, পঠন-পাঠন ও ধারণা জন্মালে ঋষি তথা সন্তান উৎপন্ন করলে প্রজাপতি প্রসন্ন হন। গৃহস্থের কর্তব্যের বিষয়ে আরও দুটি শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে (যার সারাংশ হল) — বাক্য এমন বলা উচিত, যাতে সব প্রাণীর প্রতি স্নেহ ভরা থাকে এবং শ্রুতিমধুর লাগে। অন্যকে দুঃখ দেওয়া, প্রহার করা বা কটুবাক্য বলা ভালো নয়। কাউকে অপমান করা, অহংকার করা এবং গর্ব দেখানো—এগুলির ভীষণ নিন্দা করা হয়েছে। কোনো জীবকে হিংসা না করা, সত্যভাষণ করা এবং মনে ক্রোধের উদয় হতে না দেওয়া—এগুলি আশ্রমবাসীদের উপযোগী তপ। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে সর্বদা ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি লাভ করে, সে ইহলোকে সুখ অনুভব করে অন্তকালে শিষ্ট পুরুষদের গতি লাভ করে।

বাণপ্রস্থ হল তৃতীয় আশ্রম। এই আশ্রমবাসীগণ ধর্ম অনুসরণ ও তপের অনুষ্ঠান করে পবিত্র তীর্থাদি, নদীতীর এবং জন্তু পরিবৃত একান্ত বনে পরিভ্রমণ করেন। গৃহস্থগণ ব্যবহৃত সুন্দর বস্ত্র, স্বাদু আহার এবং বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করে এঁরা বনের ফল-মূল আহার করেন। সেই আহারও দিনে মাত্র একবার পরিমিতরূপে করেন। নির্দিষ্ট স্থানে আসন বিছিয়ে উপবেশন করেন। কাঁকুরে জমি, বালি, পাথর— যে কোনো স্থানে তাঁরা নিদ্রা যান। কাশ, মৃগচর্ম অথবা কুশ দিয়ে দেহ আবৃত করেন। নিয়মিত স্নানাদি, বলিবৈশ্বদেব ও অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন। প্রভাতে যজ্ঞ-পূজার জন্য সমিধ, কুশ এবং পুষ্পাদি সংগ্রহ করে পূজা অর্চনা করার পরই তাঁরা বিশ্রামের জন্য সময় পান। শীত-গ্রীষ্ম এবং হাওয়ার বেগ সহ্য করতে করতে তাঁদের দেহের ত্বক রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যায়। নানাপ্রকার নিয়ম পালন করতে থাকায় তাদের রক্ত-মাংস শুকিয়ে দেহ অস্থিসার হয়ে ওঠে। যে সব ব্যক্তি নিয়মাদি পালন করে ব্রহ্মর্ষি দ্বারা আচরিত এই যোগচর্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা নিজ কর্ম-দোষসমূহ ভস্ম করে দুর্লভলোক লাভ করেন।

এবার সন্ন্যাসীদের আচরণের কথা বলা হচ্ছে। সন্ন্যাস হল চতুর্থ আশ্রম। এই আশ্রমে প্রবেশকারী ব্যক্তি, অগ্নিহোত্র, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার পরিত্যাগ করে বিষয়-আসক্তির বন্ধন মুক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যান। মাটি, পাথর, সোনা সমমূল্য মনে করেন। ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত করেন না। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন—সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। স্থাবর, অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ প্রাণীদের প্রতি কায়-মনো-বাক্যে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না। মঠ বা আশ্রম তৈরি করেন না। তাঁরা পরিব্রাজকরূপে জীবন অতিবাহিত করেন এবং পর্বত গুহা, বৃক্ষমূল, দেবমন্দির ইত্যাদিতে রাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নগর বা গ্রামে কখনো বেশিদিন আশ্রয় নেন না। প্রাণ ধারণের জন্য গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করে বিশুদ্ধ ধর্মপালনকারীদের গৃহে যান এবং শ্রদ্ধার দান হিসেবে যা পান তাই দিয়েই জীবন-ধারণ করেন। কাম, ক্রোধ, দর্প, লোভ, মোহ, কৃপণতা, দম্ভ, নিন্দা, অভিমান এবং হিংসা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকেন।

এই বিষয়ে শ্লোক আছে (যার ভাব এইপ্রকার) — 'যে মুনি সমস্ত প্রাণীকে অভয়প্রদান করে বিচরণ করেন, তাঁর কোনো প্রাণী হতে ভয় থাকে না। যিনি অগ্নিহোত্র নিজ দেহে আরোপিত করে দেহস্থিত অগ্নির উদ্দেশ্যে মুখের দ্বারা ভিক্ষায় প্রাপ্ত হবিষ্যের হোম করেন, তিনি অগ্নিহোত্রিদের প্রাপ্ত লোকে গমন করেন। যিনি বুদ্ধিকে সংকল্পরহিত করে পবিত্র হয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করেন, তিনি পরম শান্ত জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।' বেদে প্রতিপাদিত আশ্রম ধর্মের আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি জগতের ধর্ম-অধর্ম জানে, সেই জ্ঞানী।

ভীষ্ম বললেন—মহর্ষি ভৃগু এই উপদেশ দেওয়ায় ধর্মাত্মা ভরদ্বাজ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর পূজা করলেন।

আচরণবিধি এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এবার আমি আপনার কাছ থেকে আচরণবিধি শুনতে চাই ; কারণ আপনি সর্বজ্ঞ।

ভীষ্ম বললেন—মানুষের পথমধ্যে, গবাদি পশুর মধ্যে, ধান ক্ষেতে মল-মূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। শৌচাদি ও মুখ-হাত প্রক্ষালনের পরই নদীতে স্নান করা উচিত। তারপর সন্ধ্যা বন্দনা এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষের আরাধনা করা উচিত। প্রত্যহ সূর্যোপস্থান করবে। সূর্যোদয়ের সময় কখনো শুয়ে থাকবে না। সন্ধ্যা ও প্রভাত—উভয় সময়ে সূর্যোপাসনা ও গায়ত্রী জপ করবে। দুই হাত, দুই পা ও মুখ—এই পাঁচ অঙ্গ পরিষ্কার করে পূর্বদিকে মুখ করে আহার করবে। আহারের সময় মৌন থাকবে। পরিবেশিত অন্নের নিন্দা করবে না, তা স্বাদু মনে করে সানন্দে গ্রহণ করবে। আহারের পর হাত ধুয়ে উঠবে। রাত্রে ভিজে পায়ে শোবে না। দেবর্ষি নারদ একেই আচার বলেছেন। যজ্ঞশালা প্রভৃতি পবিত্র স্থান, বলদ, দেবতা, গোশালা, চৌরাস্তা, ব্রাহ্মণ, ধার্মিক মানুষ ও মন্দিরকে সর্বদা নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে রেখে হাঁটবে। গৃহে অতিথি, অনুচর এবং কুটুম্বদের জন্য একই প্রকার আহার প্রস্তুত করাই উত্তম বলে মনে করা হয়। শাস্ত্রে মানুষকে দুবারই আহার করার নির্দেশ দেওয়া আছে—সকালে এবং সন্ধ্যায়, মধ্যবর্তী সময়ে খাওয়া উচিত নয়। এরূপ করলে মানুষকে উপবাসী মনে করা হয়। হোমের সময় অগ্নিতে হোম এবং যে শুধু ঋতুস্নানের সময় স্ত্রীসমাগম করে সেই এক পত্নীব্রত ধারণকারী বুদ্ধিমান গৃহস্থকেও ব্রহ্মচারী বলা হয়। ব্রাহ্মণের ভোজনের অবশিষ্ট অংশ (যজ্ঞশিষ্ট) অন্ন অমৃত তুল্য হয়ে থাকে ; এরূপ অন্নগ্রহণকারী সৎপুরুষ সৎস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। যে মাটির ঢেলা ভাঙে, দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং সর্বদা অপরিষ্কার হাত ও মুখে থাকে, সে কখনো দীর্ঘায়ু হয় না।

মানুষ স্বদেশে হোক বা পরদেশে, কাছে আসা অতিথিকে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে দেওয়া উচিত নয়। জীবিকার জন্য কাজ করা হলে যে অর্থাদি সংগৃহীত হয়, তা মাতা-পিতা আদি গুরুজনকে নিবেদন করা উচিত। গুরুজনরা কাছে এলে তাঁদের আসন দিয়ে বসাবে এবং প্রণাম করবে। গুরু সেবা করলে আয়ু, যশ ও লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়। উদয়কালে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকবে না, নগ্ন পরস্ত্রীর দিকে তাকাবে না। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করবে। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণদের প্রণাম কোরো—এটি হল শাস্ত্রের নির্দেশ। দেবমন্দিরে, গো সেবার সময়, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাদি কর্মে, শাস্ত্র স্বাধ্যায়কালে এবং আহারের সময় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কাজ করবে। চুল কাটার সময়, হাঁচি এলে, স্নান ও আহারের সময় এবং রুগ্নঅবস্থায় ব্রাহ্মণদের স্মরণ-প্রণাম করা উচিত ; এর দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয়। সূর্যের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করবে না, নিজ বিষ্ঠার দিকে তাকাবে না, স্ত্রীর সঙ্গে এক আসনে শয়ন করা ও এক থালাতে আহার করা ত্যাগ করবে। নিজের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে নাম ধরে এবং 'তুই' বলে সম্বোধন করবে না। নিজের থেকে ছোটো বা সমবয়স্ক ব্যক্তির নাম ধরলে কোনো দোষ হয় না।

পাপীদের হৃদয়ই তাদের পাপের কথা জানিয়ে দেয় ; যারা জেনেশুনে তাদের পাপ মহাপুরুষদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মানুষ যদি সেই পাপকে দেখতে নাও পায়, ভগবান তো দেখতে পান। পাপী ব্যক্তির গোপন করা পাপ তাকে পুনর্বার পাপেই চালিত করে এবং ধর্মাত্মার ধর্মত গুপ্ত রাখা ধর্ম তাকে পুনরায় ধর্মেই প্রবৃত্ত করে। মূর্খ ব্যক্তি পাপ করে তা ভুলে গেলেও পাপ তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে । কোনো কামনা পূরণের জন্য ধন সঞ্চিত করলে, সেই ধন উপভোগের জন্য খরচ করতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা করে না, কারণ মৃত্যু কারো জন্য অপেক্ষা করে না (কামনা পূরণ হোক বা না হোক, সময় হলেই মৃত্যু হবে)। মনীষী ব্যক্তিদের বক্তব্য হল যে মনে মনে করা ধর্মই প্রকৃত ধর্ম ; সুতরাং মনে মনেই সমস্ত জীবের কল্যাণ চিন্তা করা উচিত। বেদোক্ত বিধির সাহায্যে একাকী ধর্মাচরণ করা উচিত, অন্যের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মই মানুষের সুখ প্রাপ্তির উন্মুক্ত দ্বার, ধর্মই স্বর্গের দেবতাদের অমৃত। ধর্মাত্মা ব্যক্তি মৃত্যুর পর ধর্মের বলেই সর্বদা সুখভোগ করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষের জন্য শাস্ত্রে যে অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয়ে বলা হয়েছে সেটি কী ? তার স্বরূপ কেমন ? এই চরাচর জগৎ কী থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রলয়কালে কীসে লীন হয়ে যায় ? আমাকে এ-সবই বুঝিয়ে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! তুমি আমার কাছে যে অধ্যাত্মজ্ঞানের কথা জানতে চাইছ, আমি তার ব্যাখ্যা করছি। এটি অতীব কল্যাণকর এবং সুখস্বরূপ। আচার্যগণ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ব্যাখ্যার সঙ্গেই অধ্যাত্মজ্ঞানের বর্ণনা

করেছেন। তা মেনে চললে মানুষ প্রসন্নতা ও সুখ লাভ করে। এটি সমস্ত প্রাণীর জন্যই হিতকারী। যারা এটি উপলব্ধি করে, তাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও অগ্নি—এই পঞ্চ মহাভূত সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। জলের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র থেকে উঠে আবার সমুদ্রেই লীন হয়ে যায়, তেমনই এই পঞ্চ মহাভূতও যে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়, পুনরায় তাতেই লীন হয়ে যায়। শব্দ, শ্রোত্র এবং সমস্ত ছিদ্র আকাশের কাজ ; স্পর্শ, ত্বক, চেষ্টা—এই তিনটি বায়ুর ; রূপ, নেত্র এবং পরিপাক ক্ষমতা—এগুলি তেজের ; রস, জিহ্বা এবং ক্লেদ—জলের এবং গন্ধ, নাসিকা ও শরীর—পৃথিবীর গুণ। এইভাবে দেহে পঞ্চ মহাভূত এবং ষষ্ঠ হল মনের অবস্থান। ইন্দ্রিয়াদি এবং মন—এগুলি জীবকে বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে। এই ছয়টি ব্যতীত বুদ্ধি হল সপ্তম এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হল অষ্টম। ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহ গ্রহণ করে, মন সংকল্প-বিকল্প করে, বুদ্ধি তার ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করে। এটি দেহের বাইরে এবং ভেতরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পুরুষের নিজ ইন্দ্রিয়াদির পরীক্ষা করে সে সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখা উচিত ; কারণ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়েই থাকে। মানুষ তার বুদ্ধিবলে জীবসকলের আসা-যাওয়ার অবস্থা জেনে ধীরে ধীরে তা নিয়ে বিচার করতে থাকলে পরম শান্তিলাভ করে। এই চরাচর জগৎ বুদ্ধির উদয় হলেই উৎপন্ন হয় এবং তার লয়ের সঙ্গেই লীন হয়ে যায় ; তাই সকলকে বুদ্ধিময় বলা হয়।

বুদ্ধি যার দ্বারা দেখে, তাকে নেত্র বলা হয় ; যার দ্বারা শোনে, তাকে শ্রোত্র বলা হয় ; যার সাহায্যে গন্ধ গ্রহণ করে তাকে ঘ্রাণ বলা হয়। সে-ই রসনাদ্বারা স্বাদ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ অনুভব করে, এইভাবে বুদ্ধিই বিকার প্রাপ্ত হয়ে নানারূপের দ্বারা বিষয়াদি গ্রহণ করে। সে যে দ্বার দিয়ে কোনো বিষয় গ্রহণ করতে চায়, মন সেই আকার ধারণ করে। বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করার জন্য বুদ্ধির যে পাঁচটি অধিষ্ঠান, তাকেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা উচিত। প্রাণীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণ সর্বদা বিদ্যমান থাকে এবং সেইজন্যই তাদের মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বুদ্ধি দেখা যায়। সত্ত্বগুণ থেকে সুখ, রজোগুণ থেকে দুঃখ এবং তমোগুণ থেকে মোহ উৎপন্ন হয়।

শরীর বা মনে কোনো প্রকার প্রসন্নতা যখন হয়, সুখ-শান্তি অনুভূত হয়, হর্ষ বৃদ্ধি পায় তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বলে বুঝতে হবে। যখন কোনো কারণে বা অকারণে অসন্তোষ, শোক, সন্তাপ, লোভ এবং অসহনশীলতার ভাব দেখা যায় তখন তাকে রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ বলে জানতে হবে। তেমনই যখন অপমান, মোহ, প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা ঘিরে ধরে, সেগুলিকে তখন তমোগুণের বিবিধ রূপ বলে বুঝতে হবে। বুদ্ধি এবং আত্মা—এই দুটি সূক্ষ্মতত্ত্ব, তা সত্ত্বেও এর মধ্যে যে পার্থক্য থাকে সেই দিকে দৃষ্টি দাও। বুদ্ধি গুণাদি সৃষ্টি করে এবং আত্মা এই সব কিছুর থেকে পৃথকভাবে থাকে। যেমন ফল এবং তার মধ্যে থাকা কীট—দুটি একসঙ্গে থাকলেও একটি অপরটির থেকে ভিন্ন, তেমনই বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর এক বলে প্রতীত হলেও বাস্তবে তা পৃথক পৃথক। সত্ত্বাদি গুণ জড় হওয়ার জন্য আত্মাকে জানে না, কিন্তু আত্মা চেতন, তাই গুণাদিকে জানে। কলসের মধ্যে স্থিত প্রদীপের আলো যেমন ছিদ্রপথে প্রকাশিত হয়ে আলোকিত করে, তেমনই শরীর স্থিত পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াদি ও মন-বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত পদার্থের উপলব্ধি করায়। বুদ্ধি গুণাদি উৎপন্ন করে, আত্মা সাক্ষী হয়ে থাকে। বুদ্ধি ও আত্মার এই সম্বন্ধ অনাদিকালের। যে ব্যক্তি কাম থেকে মন সরিয়ে আত্মাতে অনুরক্ত হয় ও আত্মতত্ত্বেই মনন করে, সে সব প্রাণীর আত্মা হয় এবং এই সাধনার দ্বারা উত্তম গতি লাভ করে।

জলে বিচরণশীল হাঁস যেমন জলে থাকলেও তাতে লিপ্ত হয় না, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নির্লিপ্ত হয়ে বিচরণ করেন। নির্লিপ্ত থাকাই আত্মার স্বরূপ, তেমনই নিজ বুদ্ধিতে স্থির হয়ে মানুষ দুঃখে শোকগ্রস্ত ও সুখে হর্ষান্বিত যেন না হয়। সর্বজীবে সমভাব রাখবে। অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি যেমন নদীতে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনই জ্ঞানময় নদীতে অবগাহন করে মলিন হৃদয় ব্যক্তিও শুদ্ধ ও আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠে। এটিই হল বিশুদ্ধ অধ্যাত্মজ্ঞান। যে ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা জীবের জন্ম-মৃত্যু রহস্য বিচার করে উত্তম জ্ঞান লাভ করে, সে অক্ষয় সুখলাভ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম-অর্থ-কাম ঠিকমতো জেনে, তা পরিত্যাগ করেছে এবং যোগযুক্ত চিত্তে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে, সে-ই তত্ত্বদর্শী। তার অন্য কোনো বস্তু জানার আগ্রহ থাকে না। সেই পরমাত্মাকে জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। অজ্ঞানীদের জগতে সবকিছুতে যে মহাভয় থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে একটুও ভয় পান না।

ধ্যানযোগের বর্ণনা এবং জপের মহিমা জ্ঞাপনের জন্য এক জাপক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! আমি এবার তোমাকে ধ্যানযোগের কথা বর্ণনা করছি, এটি জেনে মহর্ষিগণ ইহলোকে সনাতন সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগীদের উচিত শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য করে নিত্য সত্ত্বগুণে স্থিত থাকা এবং সর্ব প্রকারের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে শৌচ, সন্তোষ নিয়মাদি পালন করে, যেস্থানে স্ত্রীসংসর্গ এবং ধ্যান বিরোধী বস্তু না থাকে, সেইরূপ স্থানে ধ্যানমগ্ন হওয়া, যাতে মনে সম্পূর্ণ ভাবে শান্তি বিরাজ করে। যোগসাধক ইন্দ্রিয়কে বিষয়াদি থেকে গুটিয়ে কাঠের মতো নিশ্চলভাবে স্থিত হয়ে মনকে একাগ্র করে পরমাত্মাকে নিবিষ্ট করা। সেইসময় ধ্যানে এমন নিমগ্ন হওয়া উচিত যাতে কানে কোনো শব্দ না শোনা যায়, ত্বকে স্পর্শ অনুভূত না হয়, চোখ-স্পর্শেন্দ্রিয়, নাসিকা—কোনো ইন্দ্রিয়ই যেন সচল না থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়কে মোহগ্রস্ত করার কোনো বিষয়েই যেন আকাঙ্ক্ষা না থাকে। বুদ্ধিমান যোগী প্রথমে ইন্দ্রিয়াদিকে মনে স্থির করে, তারপর পঞ্চেন্দ্রিয় সহ মনকে ধ্যানে একাগ্র করে।

এইভাবে চেষ্টা করলে প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়সহ মন স্থির হয়ে যায়, কিন্তু পরে মেঘে বিদ্যুৎ চমকের মতো মন বারংবার বিষয়াদির দিকে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাতার ওপর জলবিন্দু যেমন সবদিকে যেতে থাকে, তেমনি ধ্যানে স্থিত সাধকের মনও সবদিকে ছুটতে থাকে। একাগ্র হলে কিছুক্ষণ মন ধ্যানে স্থির থাকে, পরে তা নাড়ীমার্গে প্রবেশ করলে বায়ুর মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। এরূপ বিক্ষেপে ধ্যানমগ্ন সাধকের খেদ বা চিন্তা করা উচিত নয় ; বরং আলস্য ও মাৎসর্য পরিত্যাগ করে ধ্যানের দ্বারা মনকে পুনরায় একাগ্র করার চেষ্টা করা উচিত।

যোগী যখন ধ্যান করতে আরম্ভ করেন, তখন ক্রমশ বিচার, বিবেক এবং বিতর্ক নামক ধ্যান হয়। ধ্যানের সময় মনে যতই কষ্ট হোক, ভয় পেয়ে সাধকের তা থেকে সরে আসা উচিত নয় ; বরং আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাতে নিমগ্ন থাকা উচিত। প্রতিদিন মন ও ইন্দ্রিয়াদি ধ্যানমার্গে স্থাপন করে যোগাভ্যাস করলে ইন্দ্রিয়াদি সহ মন স্বতই শান্ত হয়ে যায়। এইভাবে মনোনিগ্রহপূর্বক ধ্যানকারী যোগীর যে দিব্যসুখ লাভ হয়, তা মানুষ কোনো উদ্যোগ বা দৈব সহায়তাতেও লাভ করতে পারে না। ধ্যানজনিত সুখ মানুষ যতই অনুভব করে, ততই সে ধ্যানে আরও বেশি অনুরক্ত হয়। এইভাবে যোগিগণ ধ্যানের সাহায্যে সুখ-দুঃখরহিত নির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—জপকারী ব্যক্তিগণ কী ফললাভ করেন ? তাঁরা কোন লোকে স্থান পান ? জপের বিধি কী ? জাপক কাকে বলে এবং জপযোগ্য মন্ত্র কী ?—এই সমস্ত কথা আমাকে বলুন ; কারণ আপনি সর্বজ্ঞ।

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে জ্ঞানীগণ যম, কাল ও ব্রাহ্মণের সংবাদরূপে এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। সেটি তোমাকে বলছি।

একদা হিমালয় পর্বতের গুহায় এক মহাযশস্বী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কৌশিক বংশে পিপ্পলাদের পুত্ররূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্ণ বেদজ্ঞ ছিলেন এবং ছয় অঙ্গসহ অপরোক্ষ জ্ঞানও প্রাপ্ত করেছিলেন—তা সর্বদাই তাঁর জীহ্বাগ্রে বিরাজ করত। একবার তিনি সংহিতা (গায়ত্রী) জপ করতে করতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এই নিয়ম পালন করতে করতে এক হাজার বছর কেটে গেল। তারপর সাবিত্রী দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'ব্রহ্মর্ষে ! আমি

তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, বলো কী চাও ? তোমার কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ করব ?'

দেবীর কথা শুনে ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ বললেন—'শুভে ! এই মন্ত্র জপে আমার আগ্রহ উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি পায়

মনের একাগ্রতা দিন দিন যেন উন্নত হয়।' তা শুনে দেবী মধুর বাক্যে উত্তর দিলেন—'তুমি যা চাও, তাই হবে। আমি চেষ্টা করব যাতে তুমি নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মধাম লাভ করো। তাছাড়া তুমি আমার কাছে যে বর চেয়েছ, তা-ও প্রাপ্ত হবে। তুমি একাগ্রচিত্ত হয়ে যথানিয়মে জপ করো, ধর্ম স্বয়ং তোমার কাছে আসবেন। কাল, মৃত্যু ও যমরাজও তোমার কাছে পদার্পণ করবেন। তাঁদের সঙ্গে তোমার ধর্ম নিয়ে আলোচনা হবে।'

ভীষ্ম বললেন—সাবিত্রী দেবী এইকথা বলে নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। অন্যদিকে সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণও একশত দিব্যবছর ধরে জপ করতে থাকলেন। তিনি মন ও ইন্দ্রিয়াদি সর্বদা বশে রাখতেন, ক্রোধ জয় করেছিলেন এবং অপরের দোষ দেখতেন না। এইভাবে যখন তাঁর নিয়ম পূর্ণ হল তখন ধর্ম প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'ব্রাহ্মণ! আমার দিকে তাকাও, আমি স্বয়ং ধর্ম, তোমাকে দর্শন করতে এসেছি। এই জপ থেকে তুমি যে ফল প্রাপ্ত করেছ, তা শোনো—মানুষ ও দেবতাদের প্রাপ্ত করার যত লোক আছে, তুমি সেসবই জয় করেছ। তুমি দেবলোক অতিক্রম করে উচ্চলোকে পদার্পণ করবে ; তাই মুনে! এবার তুমি প্রাণত্যাগ করো এবং যে লোকে যেতে ইচ্ছা করো, সেখানে যাও। এই দেহ ত্যাগ করার পরই তুমি অন্য লোকে যেতে সক্ষম হবে।'

ব্রাহ্মণ বললেন—ধর্ম! আমি এইসব লোক নিয়ে কী করব। আপনি সুখী হয়ে নিজ স্থানে গমন করুন।

ধর্ম বললেন—মুনিবর! তোমাকে অবশ্যই এই দেহ ত্যাগ করতে হবে, এরপর তুমি স্বর্গে যাও অথবা তোমার যেমন ইচ্ছা তাই করো।

ব্রাহ্মণ বললেন—ধর্ম! আমি দেহবিহীন হয়ে স্বর্গে বাস করতে চাই না। আপনি গমন করুন, আমার স্বর্গে যাওয়ার একটুও ইচ্ছা নেই। আমি এইস্থানেই গায়ত্রী জপ করে আনন্দে থাকব।

ধর্ম বললেন—বিপ্রবর! তুমি যদি শরীর ত্যাগ করতে না চাও, তাহলে দেখো, কাল, মৃত্যু এবং যম নিজেরাই তোমার কাছে আসছেন।

তারপর যম, কাল, মৃত্যু তিনজনই ব্রাহ্মণের কাছে এসে পৌঁছলেন। সর্বপ্রথম যমদেবতা বললেন—'আমি যম, তোমাকে জানাতে এসেছি যে তুমি তোমার জপের উত্তম ফল লাভ করেছ। এখন তোমার স্বর্গে যাওয়ার উত্তম সময় উপস্থিত।' মৃত্যু বললেন—'ধর্মজ্ঞ! আমাকে মৃত্যু বলে জেনো। আমি কালের প্রেরণায় তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

ব্রাহ্মণ বললেন—সূর্যপুত্র যম, মহাত্মা কাল, মৃত্যু এবং ধর্মকে আমি স্বাগত জানাই। বলুন, আমি আপনাদের কী সেবা করতে পারি?

এই বলে ব্রাহ্মণ তাঁদের সকলকে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রসন্ন মনে বললেন—'এবার আমার প্রতি কী আদেশ?' ইতিমধ্যে রাজা ইক্ষ্বাকু তীর্থযাত্রার পথে সেখানে এসে হাজির হলেন। রাজর্ষি সকলকে পূজা এবং প্রণাম করে, কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর
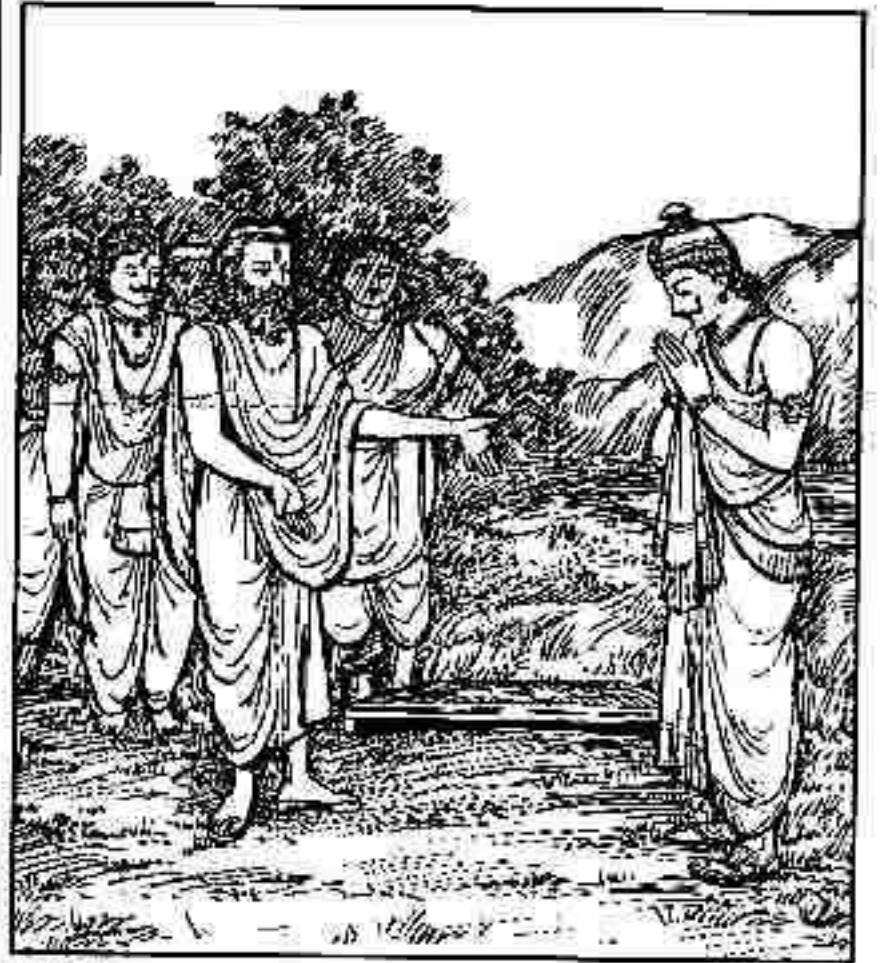
ব্রাহ্মণও রাজাকে আসন ও পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে কুশল প্রশ্ন করে বললেন—'মহারাজ! আপনাকে স্বাগত জানাই। বলুন, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার কী সেবা করতে পারি?'

রাজা ইক্ষ্বাকু বললেন—আমি রাজা, আপনি ব্রাহ্মণ ; তাই আমি আপনাকে ধন দিতে চাই, আপনার কত সম্পদ প্রয়োজন, আমাকে বলুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্! ব্রাহ্মণ দুপ্রকারের হয়—এক প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণকারী, দুই নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয়-গ্রহণকারী। আমি প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। যাঁরা প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করেন, আপনি তাঁদের দান করুন। আমি দান গ্রহণ করি না। তবে আপনার যদি কিছু ইচ্ছা

থাকে বলুন, আপনাকে কী দেব ? আমার তপোবলের দ্বারা আপনার কী কার্য সম্পন্ন করব ?

রাজা বললেন—আপনি যদি আমাকে কিছু দিতেই চান, তাহলে একশত বছর ধরে জপ করে আপনি যে ফল প্রাপ্ত হয়েছেন, সেটিই দিয়ে দিন।

ব্রাহ্মণ বললেন—তথাস্তু, আপনি আমার জপের উত্তম ফল গ্রহণ করুন।

রাজা বললেন—আপনার মঙ্গল হোক, আমি যে জপের ফল চেয়েছি, তাতে আমার প্রয়োজন নেই ; তাই চলে যাচ্ছি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; আপনার এই জপের ফলের বর্ণনা করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—এর ফল কী হবে তা আমি জানি না, কিন্তু আমি যা জপ করেছি তা সবই আপনাকে অর্পণ করেছি। ধর্ম, যম, মৃত্যু এবং কাল—সকলেই এর সাক্ষী রয়েছে।

রাজা বললেন—ব্রহ্মন্ ! যদি জপের ফল আপনার জানা না থাকে তাহলে সেই অজ্ঞাত ফল আমার কী কাজে লাগবে ? সংশয়যুক্ত ফল আমি চাই না। সেটি আপনার কাছেই থাক।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্ ! আমি আমার জপের ফল আপনাকে প্রদান করেছি। এখন আর অন্যথা হবে না। আমাদের দুজনেরই নিজ কথায় দৃঢ় থাকা উচিত। জপ করার সময় আমি কখনো ফল কামনা করিনি, সুতরাং জপের ফল কী ?—তা আমি কেমন করে জানব। আপনি 'দিন' বলে চাওয়ায়, আমিও 'দিচ্ছি' বলে দিয়ে দিয়েছি—এই অবস্থায় আমার কথা মিথ্যা হতে পারে না। আপনি ধৈর্যধারণ করে সত্য রক্ষা করুন। আমার এই স্পষ্ট কথা যদি আপনি মেনে না নেন, তাহলে অসত্যের মহাপাপ আপনাকে স্পর্শ করবে। আপনি এখানে পদার্পণ করে আমার কাছে জপের ফল চেয়েছিলেন, তা আমি আপনাকে অর্পণ করেছি ; এখন আপনি নিজ সত্যে অবিচল থেকে আমার অর্পণ করা ফল স্বীকার করুন। মিথ্যাবাদী মানুষেরা ইহলোকেও সুখ পায় না, পরলোকেও নয়। তা পূর্বপুরুষদেরও উদ্ধার করে না, অতএব পরবর্তী বংশধরদের কীভাবে উদ্ধার করবে ? সত্য-দ্বারা জীব পরলোকে যেমন উদ্ধার লাভ করে, যজ্ঞ-দান বা নিয়মাদি দ্বারাও তা হয় না। লোকে আজ পর্যন্ত যত তপস্যা করেছে এবং ভবিষ্যতেও যত তপস্যা করবে, সেই লক্ষ লক্ষ তপস্যা একত্র করলেও তা পূর্বপুরুষদেরও উদ্ধার

করে না, অতএব পরবর্তী বংশধরদের কীভাবে উদ্ধার করবে ? সত্যদ্বারা জীব পরলোকে যেমন উদ্ধার লাভ করে, যজ্ঞ-দান বা নিয়মাদি দ্বারাও তা হয় না। লোকে আজ পর্যন্ত যত তপস্যা করেছে এবং ভবিষ্যতেও যত তপস্যা করবে, সেই লক্ষ লক্ষ তপস্যা একত্র করলেও, তার মহত্ত্ব সত্যের থেকে বড় বলে প্রমাণিত হবে না। সত্যই একমাত্র অবিনাশী ব্রহ্ম, সত্যই অক্ষয় তপ, সত্যই অবিনাশী যজ্ঞ এবং সত্যই সনাতন বেদ। বেদাদিতে সত্যেরই মহিমা গীত হয়েছে। সত্য দ্বারাই শ্রেষ্ঠফল লাভ হয়। ধর্ম এবং ইন্দ্রিয় সংযমের সিদ্ধিও সত্য দ্বারাই হয়। সত্যের ওপরেই সব কিছু আধারিত। সত্যই বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রত এবং ওঁ-কারস্বরূপ। সত্যের প্রভাবেই প্রাণীদের জন্ম এবং সন্তান প্রাপ্তি হয়। সত্যের বলেই বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য তাপ প্রদান করে এবং অগ্নি বহ্নিমান হয়। স্বর্গও সত্যের ওপরই অবস্থিত। যজ্ঞ-তপ-বেদ-স্তোত্র-মন্ত্র এবং সরস্বতী—সবই সত্যের স্বরূপ। আমি শুনেছি, কোনো সময় ধর্ম ও সত্যকে তুলনা করলে সত্যের পাল্লাই ভারী হয়। যেখানে ধর্ম, সেখানেই সত্য। সত্য দ্বারাই সবকিছু বৃদ্ধি হয়। তাই রাজন্ ! আপনিও সত্যের ওপর দৃঢ় হয়ে থাকুন। অসত্য আচরণ করবেন না। আমার অর্পণ করা জপের ফল যদি আপনি স্বীকার না করেন, তাহলে ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সংসারে ঘুরতে থাকবেন। যে দান করার প্রতিজ্ঞা করে পরে দান করে না অথবা যে ভিক্ষা চেয়ে পরে সেই দান নেয় না—এরা দুজনেই অধর্ম আচরণকারী হয়। সুতরাং আপনি আমার এবং নিজের কথা মিথ্যা হতে দেবেন না।

রাজা বললেন—ব্রহ্মন্ ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম প্রজাকে রক্ষা করা এবং যুদ্ধ করা। ক্ষত্রিয়দের দাতা বলা হয়। সেই অবস্থায় আমি কী করে আপনার কাছ থেকে দানগ্রহণ করব ?

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্ ! দান গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিনি এবং তা দেবার জন্য আমি আপনার গৃহেও যাইনি। আপনি নিজেই এখানে এসে চেয়েছিলেন, এখন কেন গ্রহণ করতে আপত্তি করছেন ?

রাজা বললেন—বিপ্রবর ! যদি আপনি আপনার জপের উত্তম ফল প্রদান করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে এক কাজ করুন ; আমাদের দুজনের যা পুণ্যফল আছে, তা একত্র করে উভয়েই একসঙ্গে ভোগ করি। ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করার অধিকার আছে এবং ক্ষত্রিয়রা শুধু দান করেন,

গ্রহণ করেন না। আপনি তা নিশ্চয়ই শুনেছেন, সুতরাং আমরা একসঙ্গে উভয়ের কর্মফল ভোগ করব। আপনি যদি এতে সম্মতি না দেন তাহলে কর্মফল ভোগ করারও প্রয়োজন নেই। আমি অনুরোধ করি যে আপনি আমার শুভকর্মগুলির সমস্ত ফল গ্রহণ করুন—তাহলে আমার ওপর আপনার মহা অনুগ্রহ করা হবে।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্! আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি যা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছি, তা গ্রহণ করুন ; কারণ সেটি আমার কাছে আপনার গচ্ছিত বস্তু হিসাবে আছে। আপনি গ্রহণ না করলে আমি অভিশাপ দেব।

রাজা বললেন—যে কাজের এই পরিণাম, সেই রাজার ধর্মকে ধিক। এখন আমাকে আপনার সমান ফলভাগী হওয়ার জন্য এই দানগ্রহণ করতে হবে। ইতিপূর্বে আমি কখনো কারো কাছ থেকে দান নেবার জন্য হাত পাতিনি। কিন্তু আজ আমাকে তাই করতে হল। আপনি আমার গচ্ছিত বলে যা কিছু মনে করেন, তা প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্! আমি গায়ত্রী জপ করে যত পুণ্য সংগ্রহ করেছি, সেসব আপনাকে দান করলাম।

রাজা বললেন—বিপ্রবর ! আমি হাতে সংকল্পের জল নিয়েছি। এবার আপনিও আমার দান গ্রহণ করুন। যাতে আমরা একসঙ্গে থেকে সমান ফলের অংশীদার হই।

ভীষ্ম বললেন—সেই ব্রাহ্মণ তখন রাজার অনুরোধ মেনে নিলেন এবং সেইস্থানে আগত ধর্ম, যম, কাল ও মৃত্যুর পূজা করে তাঁদের সকলকে প্রণাম করলেন। রাজা এবং ব্রাহ্মণের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত জেনে দেবরাজ ইন্দ্রও বহু দেবতা এবং লোকপালের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ, নদী, পর্বত, সমুদ্র এবং তীর্থাদির শুভাগমন হল। তপ, বেদ, বেদান্ত, স্তোত্র, সরস্বতী, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, সপরিবারে চিত্রসেন, নাগ, সিদ্ধ, মুনি, প্রজাপতি এবং অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান বিষ্ণুও সেখানে দর্শন দিলেন। সেই সময় আকাশে নানা বাদ্য বাজতে লাগল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

তারপর জাপক ব্রাহ্মণ এবং রাজা ইক্ষ্বাকু—দুজনে একসঙ্গে তাঁদের মনকে সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেন। প্রথমে (মূলাধার চক্র থেকে কুণ্ডলিনী উঠিয়ে) প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান—এই পাঁচ প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে (অনাহত চক্রে) স্থাপন করলেন, তারপরে মনকে প্রাণ ও অপানের সঙ্গে মিশিয়ে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করে দুই ভ্রূর মধ্যে আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করলেন। এইভাবে মনকে জয় করে দৃষ্টিকে একাগ্র করে প্রাণসহ মনকে মূর্ধাতে স্থাপন করে দুজনেই সমাধিমগ্ন হলেন। সেই সময় তাঁদের দুজনের শরীর জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট এবং স্থির হয়েছিল। তার মধ্যে মহাত্মা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে এক জ্যোতি নির্গত হয়ে সোজা স্বর্গের দিকে চলে গেল। চারদিকে তখন মহা কোলাহল শুরু হল। সকলেই সেই দিব্য জ্যোতির স্তুতি করতে লাগলেন। সেই জ্যোতি এক বিশাল পুরুষের আকৃতি ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে পৌঁছালে, তিনি এগিয়ে এসে তাকে স্বাগত জানালেন এবং মধুর বাক্যে বললেন—'ব্রাহ্মণদেব ! যোগিগণ যে ফল প্রাপ্ত হন, জপকারীগণও সেই ফল লাভ করেন ; বরং জপকারীগণ, যোগীদের থেকেও উত্তম ফল লাভ করেন ; সুতরাং আপনি এখন আমাতে অবস্থান করুন।' আদেশ পেয়ে সেই ব্রাহ্মণের তেজ ব্রহ্মার মুখগহ্বরে প্রবেশ করল। এইভাবে রাজা ইক্ষ্বাকুও ভগবান ব্রহ্মাতে লীন হলেন।

তখন সমস্ত দেবতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন—প্রজাপতি ! আপনি যে এগিয়ে এসে এই ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানালেন, তাতে জানা গেল যে জপকারীগণ যোগীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন। এই জাপক ব্রাহ্মণকে সদ্গতির উদ্দেশ্যেই আপনি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমরাও তা প্রত্যক্ষ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনি ব্রাহ্মণ ও রাজাকে একই প্রকার সম্মান দিয়ে সমান ফলের অংশীদার করেছেন। আজ আমরা জপের মহান ফল নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম।

ব্রহ্মা বললেন—জপের ফল এই প্রকারই হয়ে থাকে। যারা মহাস্মৃতি ও অনুস্মৃতি পাঠ করে এবং যোগে অনুরক্ত থাকে, তারাও শরীর ত্যাগ করে এইরূপ উত্তম গতি লাভ করে। আচ্ছা, এবার তোমরা নিজ নিজ স্থানে গমন করো।

এই বলে ব্রহ্মা সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন এবং দেবতারাও তাঁর নির্দেশে নিজ নিজ ধামে ফিরে এলেন। অন্য মহাত্মাগণও ধর্মের সৎকার করে প্রসন্ন মনে তাঁদের অনুসরণ করলেন। যুধিষ্ঠির ! জপকারীগণ এরূপ ফললাভ করেন, তাঁদের এই সদ্গতি হয়। আমি যা শুনেছিলাম, তোমাকে জানালাম। এবার আর কী শুনতে চাও।

—০—

মনু এবং বৃহস্পতির সংবাদ—মনুর দ্বারা জ্ঞানযোগাদির ফল এবং পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জ্ঞানযোগ এবং বেদের নিয়মানুসারে কৃত কর্মযোগের কী ফল ? সর্বপ্রাণীর মধ্যে স্থিত আত্মার জ্ঞান কী প্রকারে হয় ?

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে প্রজাপতি মনু এবং মহর্ষি বৃহস্পতির সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়। কোনো এক সময়ের কথা, দেবতা এবং ঋষিদের মণ্ডলীতে প্রধান মহর্ষি বৃহস্পতি প্রজাপতি মনুকে প্রণাম
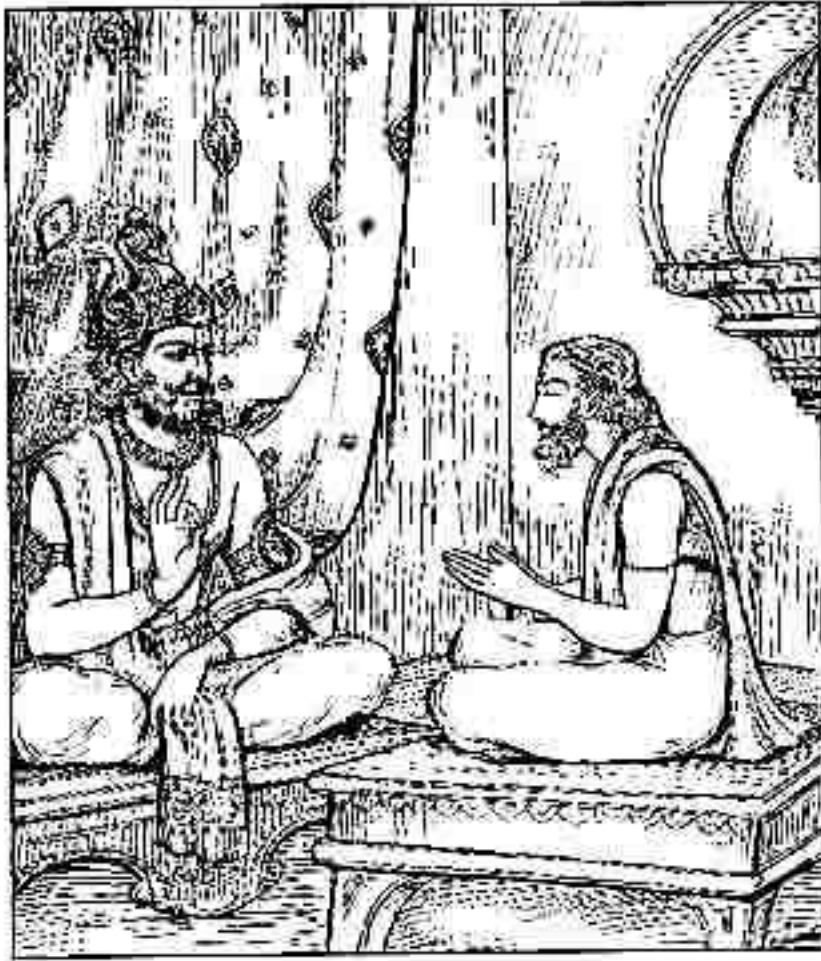
করে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্ ! যিনি এই জগতের কারণ এবং বৈদিক কর্মগুলির অধিষ্ঠান, বিপ্রগণ যাকে জ্ঞানের ফল বলে থাকেন এবং মন্ত্রের দ্বারা যে তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হয় না, সেই বস্তুর যথাবৎ বর্ণনা করুন। যার থেকে পৃথিবী এবং পার্থিব জগৎ, বায়ু এবং অন্তরীক্ষ, জলজন্তু ও জল, দেবতা এবং দেবলোকের উৎপত্তি হয়েছে, সেই সনাতন বস্তু কী ? আমাকে বলুন। আমি ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদ ও ছন্দ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, কল্প ও শিক্ষা অধ্যয়ন করেছি, তা সত্ত্বেও আমার আকাশ ইত্যাদি পঞ্চভূতাদির উপাদান কারণের জ্ঞান হয়নি। সুতরাং আপনি সাধারণ ও বিশেষণযুক্ত শব্দের সাহায্যে কৃপা করে এই বিষয়ের পূর্ণ বর্ণনা করুন এবং দয়া করে বলুন জ্ঞান ও কর্মের ফল কী ? জীব কীভাবে এক দেহ থেকে বেরিয়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে ?

মহাত্মা মনু বললেন—যার যে বিষয় প্রিয়, তার সেই সব বিষয় সুখ বলে মনে হয় এবং যা অপ্রিয় হয়, সেটিই তার কাছে দুঃখরূপ বলে প্রতীত হয়। ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য সংসারে কর্ম করা হয় এবং ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়ের থেকে বাঁচার জন্য জ্ঞানযোগের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। বৈদিক কর্ম সাধারণত সকাম ভাবনা যুক্ত ; কিন্তু যা কামনা থেকে মুক্ত, তা পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করাতে সক্ষম হয়। মানুষ যাতে নিষ্কাম-ভাবে কর্মানুষ্ঠান করে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলের প্রশংসা যারা করে তাদের সেই বাক্য কামনাসক্ত ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং এই কামনা থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা উচিত। নিত্য কর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা আসক্তিরূপী দোষ দূরীভূত হওয়ায় অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন অন্তরে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয় এবং মানুষ কর্মের অগোচর কামনাতীত পরব্রহ্ম লাভ করে। মন ও কর্মের দ্বারাই জগৎ সংসার সৃষ্ট হয়েছে। এই দুটি বন্ধনের কারণ হয়েও ব্রহ্মলাভেরও পথ হয়ে ওঠে ; বেদবিহিত কর্ম অক্ষয় ফলও (মোক্ষ) প্রদান করে এবং নশ্বর ফলও প্রাপ্ত করায়। মনের দ্বারা ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করাই অক্ষয় ফল প্রাপ্তির কারণ, অন্য কোনো কারণ নেই। যখন রাত্রি প্রভাত হয়, অন্ধকার সরে যায়, সেইসময় চক্ষু যেমন কণ্টকাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করে, তেমনই বুদ্ধিও মোহ আবরণ সরে গেলে বিবেকযুক্ত হয়ে ত্যজনীয় অশুভ কর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। বিধিপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণা, অন্নদান ও মনের সমাধি—এই পাঁচ অঙ্গদ্বারা সম্পন্ন হলেই কর্ম ফল দিতে সক্ষম হয়। শব্দ-রূপ-পবিত্ররস-সুখদ স্পর্শ এবং সুন্দর গন্ধ—এগুলিই কর্মের ফল, কিন্তু মানুষ নিজ (কর্ম অনুষ্ঠানকারী) শরীর দ্বারা এই ফল প্রাপ্ত করার শক্তি রাখে না, কর্মের ফলরূপে যে লোক বা শরীর প্রাপ্ত হয়, তা লাভ করলে এইগুলি প্রাপ্ত করে। জীব এক শরীরে যেসব শুভাশুভ কর্ম করে, অন্য শরীর ধারণ করলে তবেই তার ফল ভোগ করে ; কারণ

শরীরই সুখ-দুঃখ ভোগের সাধন। মন ও বাক্যের সাহায্যে করা শুভাশুভ কর্মাদির ফল মন ও বাক্যের দ্বারাই ভোগ করতে হয়। ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ নিজ কর্মের দ্বারা যেমন কর্ম সম্পাদন করে, তদনুসার গুণে প্রেরিত হয়ে সে কর্মফল ভোগ করে। মাছ যেমন জলের স্রোতের সঙ্গে ভেসে যায়, তেমনই মানুষকেও তার পূর্বের কর্মের প্রবাহে প্রবাহিত হতে হয়। এই অবস্থাতেও সে শুভ কর্মের ফললাভ করে প্রসন্ন হয় এবং অশুভ কর্মফল লাভে দুঃখ পায়।

এবার, যার দ্বারা এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, যা জেনে মনকে বশকারী মহাত্মাগণ এই সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করেন এবং বেদমন্ত্রাদির পদও যা প্রতিপাদন করতে পারে না, সেই অনির্বচনীয় পরমাত্মার বিষয়ে কিছু বলছি, মন দিয়ে শোনো। পরব্রহ্ম পরমাত্মা নানাপ্রকার রস ও গন্ধরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ-রূপ থেকে পৃথক। তিনি মন-বুদ্ধির অগোচর, অব্যক্ত ও নির্গুণ ; এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি প্রজাদের জন্য রূপ-রস ইত্যাদি পঞ্চ বিষয় সৃষ্টি করেছেন। তিনি নারী-পুরুষ-নপুংসক কোনোটিই নন। তিনি সৎও নন, অসৎও নন এবং উভয়রূপও নন। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম। তাঁর কখনো ক্ষরণ (নাশ) হয় না, তাই তাঁকে অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়।

অক্ষর থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে। এই পৃথিবী থেকেই পার্থিব জগৎ উৎপন্ন হয়। পার্থিব শরীর জলে লয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশ জল থেকে অগ্নিতে, অগ্নি থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে পরমাত্মাতে লীন হয়। পরমাত্মা প্রাপ্তি হলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। পরমাত্মা ঠাণ্ডা নন, গরমও নন, তিনি না কোমল, না কঠোর, না মধুর, না তিক্ত। তিনি শব্দ-গন্ধ ও রূপরহিত। তাঁর স্বরূপ সবার থেকে বিশিষ্ট। ত্বক স্পর্শকে, জিহ্বা রসকে, নাসিকা গন্ধ, কান শব্দ এবং নেত্র রূপকে অনুভব করে। এইসব ইন্দ্রিয়াদি পরমাত্মাকে নিজ জ্ঞানের অন্তর্গত করতে পারে না। অধ্যাত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করতে সক্ষম হয় না।

সুতরাং যাঁরা জিহ্বা থেকে রসকে, নাসিকা থেকে গন্ধকে, কান থেকে শব্দাদিকে, ত্বক থেকে স্পর্শকে এবং চক্ষু থেকে রূপকে সরিয়ে মনকে অন্তর্মুখী করে নেন, তাঁরাই নিজ মূলস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রুতির বক্তব্যানুসারে ব্যাপক ঈশ্বর এবং সাধক জীব—উভয়ই যাঁর স্বরূপ, যিনি সম্পূর্ণ লোকে অবস্থান করেন—কূটস্থ, সকলের কারণ এবং স্বয়ং সব কাজ করেন, তিনিই কারণ-তত্ত্ব, তিনি ব্যতীত অন্য সবই কার্যমাত্র। কোনো ব্যক্তি যদি কুঠার দিয়ে কাঠ কেটে তার মধ্যে আগুন খুঁজতে চায়, তবে তাতে অগ্নি বা ধূম, কোনোকিছুই দেখতে পাবে না। তেমনই এই শরীর কেটে ফেললেও কেউ অন্তর্যামী আত্মার দর্শন লাভ করবে না, কারণ তিনি শরীর হতে ভিন্ন। কিন্তু সেই কাঠকে যথা নিয়মে মন্থন করলে যেমন অগ্নি ও ধূম দুইই দেখা যায়, তেমনই যোগের সাহায্যে মন ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মাতে সমাহিত করলে বুদ্ধিমান পুরুষ নিজ স্বরূপভূত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে সক্ষম হন। স্বপ্নে যেমন মানুষ নিজ দেহকে আত্মার থেকে পৃথক রূপে শায়িত অবলোকন করে, তেমনই দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি—এই সতেরোটি তত্ত্বদ্বারা গঠিত লিঙ্গশরীর থেকে জীবাত্মা শরীরকে নিজের থেকে পৃথক বলে জানবে। যে ব্যক্তি এটি জানে না, সেই এক শরীর থেকে অন্য শরীরে জন্ম নিতে থাকে। আত্মা শরীর থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন, তা দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু ইত্যাদিতে কখনো লিপ্ত হয় না। কেউই এই চর্মচক্ষু দ্বারা আত্মার স্বরূপ দেখতে পায় না। নিজ ত্বকের দ্বারা তাকে স্পর্শ করতে পারে না এবং নিজ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তার কোনো কার্য সিদ্ধ করতে পারে না। ইন্দ্রিয়াদি তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকে দেখতে পান। জীব নিজ দৃশ্য শরীর ত্যাগ করে যখন অন্য অদৃশ্য শরীরে প্রবেশ করে তখন আগেকার স্থূল দেহটিকে পঞ্চভূতে মিশে যাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে অন্য দেহের আশ্রয় নিয়ে তাকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করে। মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহের পাঞ্চভৌতিক অংশ নিজ নিজ মহাভূতে মিশে যায়, কিন্তু শ্রোত্রাদি সতেরোটি তত্ত্বের লিঙ্গ শরীর কর্ম-বাসনাতে আবদ্ধ হয়ে অন্য স্থূল দেহে প্রবেশ করে পঞ্চবিষয়াদি উপভোগ করে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দের, ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর গুণ গন্ধের, তৈজস নেত্রেন্দ্রিয় তেজের গুণ রূপের, রসনেন্দ্রিয় জলের গুণ রসের এবং ত্বক ইন্দ্রিয় বায়ুর গুণ সম্পর্কে উপভোগ করে। ইন্দ্রিয়াদির পাঁচ বিষয় পঞ্চ মহাভূতে বিরাজ করে, পঞ্চ মহাভূত ইন্দ্রিয়াদিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদি মনের অনুগামিনী, মন বুদ্ধির আশ্রিত এবং বুদ্ধি আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত।

—০—

আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়তা

মহাত্মা মনু বললেন—হে দেবগুরু বৃহস্পতি ! মানুষ আত্মাকে নেত্রদ্বারা দর্শন করতে পারে না, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না এবং কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করতে পারে না। এই শ্রোত্রাদি নিজেই নিজেকে দেখতে পায় না। আত্মা সর্বজ্ঞ এবং সকলের সাক্ষী ; সর্বজ্ঞ হওয়ায় তিনি সকলকে দেখেও থাকেন। কিন্তু মানুষ প্রত্যক্ষভাবে না দেখলেও হিমালয়ের অন্য দিক বা চন্দ্রের পৃষ্ঠভাগের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলতে সক্ষম নয় যে সেগুলি নেই, তেমনই সমস্ত ভূতাদির জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় না হলেও 'তা নেই'—একথা বলা যায় না। রূপসমন্বিত বস্তুগুলি উৎপন্ন হওয়ার আগে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হলে বিলীন হয়ে যায়, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন সেগুলির বিলীনের বিষয় স্থির করে নেয় আর সূর্যের উদয় ও অস্তের দ্বারা যেমন সূর্যের গতি প্রকৃতির অনুসন্ধান সম্ভব হয়, তেমনই বিবেকবান ব্যক্তি বুদ্ধিরূপ দীপের সাহায্যে দূরস্থ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। যেমন মৃগের সাহায্যে মৃগ, পক্ষীর সাহায্যে পক্ষী এবং হাতির সাহায্যে হাতিকে ধরা হয়, তেমনই জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে জ্ঞানের সাহায্যেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়। শোনা যায় যে, সাপের পা সাপই চিহ্নিত করতে সক্ষম। তেমনই সমস্ত শরীরে অবস্থিত জ্ঞেয় আত্মাকে পুরুষ জ্ঞানের সাহায্যেই জানতে পারে। যেমন অন্ধকারময় রাহুর চাঁদের দিকে আসা এবং ফিরে যাওয়ার সময় তাকে দেখা যায় না, তেমনই জীবাত্মার শরীরে আসা এবং ত্যাগ করে যাওয়ার সময় তাকে জানা যায় না। চন্দ্র ও সূর্যের সংযোগ হলে যেমন রাহুকে দেখা যায়, তেমনই দেহতে সংযুক্ত হলে আত্মাকে 'দেহধারী' বলে মনে হয়। কিন্তু রাহু যখন চন্দ্র ও সূর্য থেকে পৃথক হয় তখন তাকে যেমন উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি দেহ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে জীবকে দেখা যায় না। অমাবস্যার রাত্রে যেমন চাঁদ নিজে অদৃশ্য থেকে নক্ষত্রাদিতে মিশে থাকে, তেমনই জীব শরীর থেকে মুক্ত হয়ে নিজ কর্মের ফলস্বরূপ অন্য শরীরে যুক্ত হয়।

মানুষ যেমন পরিষ্কার, স্থির জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ ও স্থির হলে সে জ্ঞানদৃষ্টিতে জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম হয়। জল অপরিষ্কার হলে এবং তরঙ্গ উঠলে যেমন কোনো প্রতিবিম্ব দেখা সম্ভব হয় না, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল হলে বুদ্ধির সাহায্যে আত্মাকে অনুভব করা সম্ভব হয় না। অজ্ঞান থেকে অবিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং সেই অবিদ্যাতে মন রাগ-দ্বেষ ইত্যাদিতে আবদ্ধ হয়। এইভাবে মন দূষিত হওয়ায় তার অধীনস্থ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও দূষিত হয়ে যায়। তাই অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ে সর্বদা নিমগ্ন হয়ে থাকলেও কখনো তৃপ্ত হয় না এবং নিজ প্রারব্ধ অনুসারে বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বারংবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। পাপের কারণেই মানুষের তৃষ্ণার কোনো অন্ত হয় না ; যখন পাপরাশি সমাপ্ত হয়, তখনই তার তৃষ্ণার বিনাশ হয়। বিষয়াদির সংস্পর্শে, সর্বদা তাতেই আবিষ্ট থাকলে এবং মনে মনে বিপরীত পথ অবলম্বন করে থাকলে পরব্রহ্ম লাভ হয় না। পাপকর্মগুলি যখন ক্ষয় হয়ে যায় তখনই মানুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। দর্পণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হলে যেমন প্রতিবিম্ব স্বচ্ছভাবে দেখা যায়, তেমনই সে নিজ শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মাকে দর্শন করে। বিষয়ের দিকে ইন্দ্রিয়াদি আকৃষ্ট হওয়ায় মানুষ দুঃখী হয়ে থাকে, সেইদিক থেকে মন সরে গেলে সে সুখী হতে পারে। সুতরাং মানুষকে তার বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়ের দিক থেকে সরিয়ে বশে রাখা উচিত। ইন্দ্রিয়াদির থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং পরমাত্মা জ্ঞানের থেকেও শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত পরমাত্মা থেকেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানের থেকে বুদ্ধি ও তার থেকে মন বিকশিত হয়। এই মনই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়ে বিষয়গুলি দেখে। যে ব্যক্তি শব্দাদি বিষয়, সম্পূর্ণ ব্যক্ত পদার্থ ও প্রাকৃত বিষয়গুলি পরিত্যাগ করে, সে-ই অমৃতত্ব লাভ করে। কিন্তু সকামকর্ম করে যে ব্যক্তি, সে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়ে সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ভোগ করতে থাকে। ইন্দ্রিয়সহকারে বিষয় গ্রহণ না করলে পুরুষের বিষয় তো ত্যাগ হয়, কিন্তু তার আসক্তি থেকে যায়। সে পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করলে তবেই এই আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়। যখন বুদ্ধি কর্মজনিত গুণাদি থেকে মুক্ত হয়ে মননাত্মিকা বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, সেই সময় মন ব্রহ্মে লীন হয়ে তদ্রূপ হয়ে যায়। পরব্রহ্ম স্পর্শ, শ্রবণ, রসন, দর্শন, ঘ্রাণ ও সংকল্প সর্বপ্রকার কর্মরহিত ; তাই তাঁর কাছে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধিই পৌঁছতে পারে। বিষয় মনে লয় হয়ে

যায়, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জ্ঞানে এবং জ্ঞান পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়াদি মনকে জানে না, মন বুদ্ধিকে জানে না এবং বুদ্ধি অব্যক্ত আত্মাকে জানে না ; কিন্তু অব্যক্ত আত্মা এই সবগুলিকেই জানে।

—o—

আত্মদর্শনের উপায়

মহাত্মা মনু বললেন—বৃহস্পতি ! যখন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ আসে তখন তার জন্য মানুষের চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। দুঃখের চিন্তা না করাই তার ঔষধ। চিন্তা করলে সেটি সামনে এসে যায় এবং দুঃখ অত্যন্ত বেড়ে যায়। তাই মানসিক দুঃখ বিচার-বিবেচনার দ্বারা এবং শারীরিক ব্যাধি ঔষধের দ্বারা দূর করতে হয়। এটি হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামর্থ্য। মূর্খ ব্যক্তির মতো কখনো শোক করা উচিত নয়। রূপ-যৌবন-জীবন-ধন-সম্পদ-আরোগ্য ও প্রিয় সমাগম—এসবই অনিত্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এর প্রতি লোভ (আসক্তি) থাকা উচিত নয়। সমস্ত রাষ্ট্রের যে দুঃখ, তার জন্য একজন ব্যক্তির শোক করা উচিত নয়। তবে যদি সেই ব্যক্তির দুঃখ উপশমের কোনো প্রতিকার জানা থাকে, তাহলে শোক না করে প্রতিকারের উপায় করা উচিত। মানুষের জীবনে সুখের থেকে দুঃখই যে অধিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অনুরক্ত হয়, তাকে মোহবশত মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি সুখ, দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেছে, সে পরব্রহ্মকে লাভ করে। বিবেক-বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি তার জন্য শোকগ্রস্ত হন না। বিষয়াদি উপার্জনে দুঃখ থাকে, তার রক্ষা করায়ও সুখ নেই এবং দুঃখ-কষ্টের দ্বারাই তা অর্জিত হয় ; সুতরাং তার বিনাশে চিন্তা করা উচিত নয়।

যখন বুদ্ধি তার কর্মজনিত সংস্কারাদিসহ চিত্তের মননাত্মিকা বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখন ধ্যানযোগজনিত সমাধিদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের সম্ভাবনা থাকে। নাহলে, জলের স্রোত যেমন পর্বত শিখর থেকে নির্গত হয়ে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই গুণাত্মিকা বুদ্ধি গুণময় পদার্থের দিকে ধাবিত হয়। যখন এটি ধ্যানযোগের সাহায্যে নির্গুণ তত্ত্বের কাছে পৌঁছায়, সেইসময় কষ্টিপাথর দিয়ে পরীক্ষার দ্বারা যেমন সোনা হস্তগত হয় তেমনই, তার পরব্রহ্ম অনুভূত হয়। সুতরাং সব দ্বার রুদ্ধ করে মনে স্থিত হওয়া উচিত। এইভাবে মনে একাগ্রতা এলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়। গুণাদি ক্ষয় হলে যেমন পঞ্চমহাভূত নিবৃত্ত হয়, তেমনই বুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিসহ মনে (অহংকারে) লীন হয়ে যায়। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যখন অন্তর্মুখ হয়ে মনে স্থিত হয় তখন সেটি মনঃস্বরূপই হয়ে যায়। মন বিভিন্নপ্রকার গুণাদিতে যুক্ত থাকে, কিন্তু তা যখন ধ্যানজনিত গুণাদিতে যুক্ত হয় তখন সব গুণ ত্যাগ করে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠে। সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম বোধ করাবার কোনো দৃষ্টান্ত জগতে নেই। যেখানে বাক্য পৌঁছায় না, সেই বস্তুকে কোন বিষয় দিয়ে বর্ণনা করা যায় ? তাই তপের দ্বারা, অনুমান দ্বারা, শমাদি গুণের দ্বারা, ব্রাহ্মণাদি জাতির ধর্মপালন করে এবং শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করে পরব্রহ্মকে জানার চেষ্টা করা উচিত। গুণাতীত ব্যক্তি সেই অতর্কনীয় পরব্রহ্মকে অন্তর-বাহিরে সমানভাবে অনুভব করতে সক্ষম হন।

বৃহস্পতি ! ধর্ম পালনের দ্বারা শ্রেয় বৃদ্ধিলাভ করে এবং অধর্ম দ্বারা অকল্যাণ হয়। আসক্ত পুরুষ প্রকৃতির রাজ্যে থাকে এবং সংসার বিরাগী ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করে। মানুষ যখন শব্দাদি পাঁচ বিষয়সহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বশে আনে, তখন সে সর্বত্র ব্যাপ্তিস্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ করে। সেইসময় সেই ব্যক্তি অনুভব করে যে সূত্র যেমন রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য বা মৃত্তিকার গুটিকায় গ্রথিত হয়ে তাতে ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে এই আত্মা গাভী, অশ্ব, মানুষ, হাতি, মৃগ ও কীটপতঙ্গ সমস্ত প্রাণীর দেহেই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। যে যে দেহ যেমন যেমন কর্ম করে, সেই সেই শরীরে তার তেমনই ফল প্রাপ্ত হয়।

আগে মানুষের সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়, তারপর সেটি প্রাপ্ত করার ইচ্ছা জাগে, পরে তার জন্য চেষ্টা ও কর্ম করা হয় এবং কর্ম করলে তদনুসারে ফলের প্রাপ্তি হয়। এইভাবে ফলকে কর্মস্বরূপ, কর্মকে জ্ঞেয়স্বরূপ, জ্ঞেয়কে জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানকে সদসৎস্বরূপ বলে জানতে হবে। তেমনই জ্ঞান, ফল, জ্ঞেয় এবং কর্ম—এই সব ক্ষয় হলে যে ফল প্রাপ্তি হয়, সেই পরমাত্মাকেই তুমি জ্ঞেয়মাত্রে ব্যাপ্ত প্রকৃত

জ্ঞান বলে জানবে। সেই পরমতত্ত্বকে যোগিগণই অনুভব করেন, বিষয়াদিতে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তি নিজ আত্মায় স্থিত সেই পরব্রহ্মকে অনুভব করতে পারে না। এখানে যা দেখা যায়, তারমধ্যে বৃহৎ পৃথিবীর থেকেও বৃহৎ হল জল, জলের থেকে বৃহৎ তেজ, তেজের থেকে বৃহৎ বায়ু, বায়ুর থেকে বৃহৎ আকাশ, আকাশের থেকে বৃহৎ হল মন, মনের থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকে বৃহৎ কাল এবং কালের থেকে বৃহৎ হলেন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর থেকেই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি, সেই ভগবান বিষ্ণুর কোনো আদি, অন্ত বা মধ্য নেই। আদি-মধ্য-অন্তরহিত হওয়ায় তিনি অবিনাশীও। তিনি সমস্ত দুঃখের অতীত। দুঃখই দূরীভূত হয়। অবিনাশী বিষ্ণুকেই পরব্রহ্ম বলা হয়। তিনিই পরমধাম এবং পরমপদ। তাঁর কাছে পৌঁছলে জীব কালের অধিকার থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সাধনহীনতা এবং কর্মজনিত অন্তরায়ের জন্য মানুষ তাঁর কাছে পৌঁছবার পথ দেখতে পায় না। লোকে বিষয়াদিতে আসক্ত থাকে, স্বর্গাদি স্থায়ী সুখের ওপর তাদের দৃষ্টি থাকে এবং তারা পরমাত্মা ব্যতীত আরও অনেক বস্তু পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। তাই তাদের ব্রহ্মলাভ হয় না। মানুষ এই জগতে যা কিছুতে সুখ দেখে, সে সবই সে পেতে চায়। এই ভাবে সে বিষয়ের পেছনে ঘুরে মরে, নির্বিষয় পরমাত্মাকে লাভ করার তার কখনো ইচ্ছা হয় না। যে এই তুচ্ছ বিষয়াদিতে আবদ্ধ থাকে, সে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে কী করে জানতে পারে ? পরমাত্মা বাস্তবিক অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। আমরা ধ্যানের সাহায্যে সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাঁকে অনুভব করতে পারলেও বাক্যের দ্বারা তাঁর বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মানুষের বুদ্ধিকে জ্ঞানদ্বারা নির্মল করা উচিত, বুদ্ধির দ্বারা মনকে এবং মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদি শোধন করতে হয়। তবেই সে অক্ষর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম। পরমাত্মা অজ, পুণ্যবানদের পরমগতি, স্বয়ংসিদ্ধ, সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, অবিনাশী, সনাতন, আদি-মধ্য-অন্ত রহিত এবং ধ্রুব। তাঁকে জানলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে।

ভগবান বিষ্ণু হতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং বরাহ-অবতারের বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কমল নয়ন ভগবান বিষ্ণু অবিনাশী, সমস্ত জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান, অজেয় এবং ব্যাপক। তিনি নারায়ণ, হৃষিকেশ, গোবিন্দ এবং কেশব—এই নামেও বিখ্যাত। আমি তাঁর স্বরূপের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! আমি এই প্রসঙ্গ জামদগ্নি-নন্দন ভগবান পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মুখ থেকে শুনেছি। মহর্ষি অসিত, দেবল, বাল্মীকি এবং মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও এই অদ্ভুত রহস্যের বর্ণনা করে থাকেন। ভগবান বিষ্ণু সবাকার ঈশ্বর এবং নিয়ন্তা। তিনি পুরুষ এবং বিরাট প্রভৃতি বহু নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্বব্যাপক। পৃথিবীতে ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সেই শার্ঙ্গধন্বা ভগবানের যে চরিত্রগুলি জানেন এবং পুরাণবেত্তা যাঁর নিরূপণ করেন, সেসব আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। এই পুরুষোত্তম সমস্ত ভূতের আত্মা ; তিনিই তাঁর সংকল্প দ্বারা আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চভূত সৃষ্টি করেছেন। সেই সর্বভূতেশ্বর ভগবান বিষ্ণু পৃথিবী রচনা করে জলে শয়ন করেছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ তেজসম্পন্ন হয়ে মনের দ্বারাই সমস্ত ভূতের অগ্রজ ভগবান সংকর্ষণকে উৎপন্ন করেন। ভগবান সংকর্ষণই সমস্ত ভূতের আধার এবং ভূত-ভবিষ্যতের সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করেন।

এরপর তাঁর নাভি থেকে সূর্যের সমান তেজসম্পন্ন এক কমল উৎপন্ন হয়। তার থেকে সমস্ত ভূতের পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা প্রকাশিত হন, তাঁর অঙ্গ কান্তিতে সমস্ত দিক আলোয় দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেইসময় অন্ধকার হতে আদিদৈত্য মধুর জন্ম হল। ভগবান পুরুষোত্তম ব্রহ্মার হিতার্থে সেই উগ্রকর্মা অসুরকে বধ করেন। মধুকে বধ করার জন্যই ভগবানকে সমস্ত দেবতা, দানব ও মানুষ 'মধুসূদন' বলে থাকে। তারপর ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও দক্ষ—এই সাত মানসপুত্রকে উৎপন্ন করেন। এঁদের মধ্যে সব থেকে অগ্রজ মরীচি তাঁর মন থেকে কাশ্যপকে উৎপন্ন করেন। মহর্ষি কাশ্যপ অত্যন্ত তেজস্বী এবং ব্রহ্মবিদ্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রহ্মা মরীচির থেকেও শ্রেষ্ঠ দক্ষকে নিজ অঙ্গুলি

থেকে উৎপন্ন করেন। তিনি 'প্রজাপতি' পদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রজাপতি দক্ষের প্রথমে তেরোটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এঁদের মধ্যে দিতি সর্বজ্যেষ্ঠা। সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, পরমযশস্বী মরীচিনন্দন কাশ্যপ এঁদের সকলকে বিবাহ করেন। এর পর দক্ষের আরও দশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং তিনি তাঁদের ধর্মের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই কন্যাদের থেকে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, সাধ্য ও মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন।

প্রজাপতি দক্ষের এর পরেও আরও সাতাশটি অনুজা কন্যা ছিল। তাঁদের সকলের পতি হলেন মহাভাগ চন্দ্র। কাশ্যপের অন্যান্য পত্নীর দ্বারা গন্ধর্ব, অশ্ব, পক্ষী, গাভী, কিম্পুরুষ, মৎস্য, উদ্ভিজ্জ, বনস্পতি প্রভৃতি উৎপন্ন হল। অদিতির থেকে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলী আদিত্যদের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরাক্রমে দেবতাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং দানব ও দৈত্যদের পরাজয় হয়। বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানব দনুর পুত্র ছিলেন। দিতির থেকে মহাবলী দৈত্যরা জন্মগ্রহণ করেন।

এরপরে ভগবান দিন, রাত, ঋতু, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদির দ্বারা কালের গতি নিরূপণ করেন এবং নিজ সংকল্প থেকেই মেঘ, স্থাবর-জঙ্গম এবং সমস্ত পদার্থসহ পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি নিজ মুখ থেকে বহু ব্রাহ্মণ, হস্ত থেকে বহু ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা থেকে বহু বৈশ্য এবং চরণ থেকে বহু শূদ্র উৎপন্ন করলেন। এইভাবে চার বর্ণের সৃষ্টি করে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে সবকিছুর অধ্যক্ষ করলেন। মহাতেজস্বী ব্রহ্মা বেদবিদ্যারও বিধাতা হলেন। তারপর তিনি ভূত এবং মাতৃগণের অধ্যক্ষ বিরূপাক্ষ, পাপীদের দণ্ডপ্রদানকারী পিতৃরাজ যম, ধনাধ্যক্ষ কুবের এবং জলচরদের প্রভু বরুণকে উৎপন্ন করলেন। এই সব দেবতাদের অধ্যক্ষ পদে তিনি ইন্দ্রকে নিযুক্ত করলেন।

সেইসময় মানুষের যমরাজ থেকে কোনো ভয় ছিল না। মানুষ তাদের ইচ্ছামতো জীবিত থাকতে পারত। সন্তান উৎপন্ন করার জন্যেও তাদের মৈথুন-কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন হত না। সংকল্পমাত্রেই তারা সন্তান সৃষ্টি করতে পারত। এরপর ত্রেতাযুগ এলেও মৈথুন ধর্মের প্রচার হয়নি। সেইসময় স্পর্শমাত্রেই সন্তান উৎপন্ন হত। দ্বাপরযুগে মৈথুন দ্বারা প্রজাসৃষ্টির আরম্ভ হয় এবং কলিযুগে সকলেই দাম্পত্যভাবে বাস করতে লাগল।

রাজন্! এইভাবে সমস্ত জগৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ লোকের বৃত্তান্ত জানেন যে নারদ তিনিই আমাকে এই প্রসঙ্গ শুনিয়েছেন। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যতা যথার্থরূপে স্বীকার করেছেন। এই সত্যপরাক্রমী কমলনয়ন ভগবান কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন, এঁর মহিমা অচিন্ত্যনীয়।

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! ভগবান কৃষ্ণ অবিনাশী এবং সকলের ঈশ্বর। আপনি এঁর প্রভাব এবং পূর্বকর্মগুলি যথাসম্ভব বর্ণনা করুন, তা শুনতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে। তিনি জগৎপ্রভু হয়েও কীজন্য মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছেন, কৃপা করে আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! একবার আমি শিকার করতে করতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে দেখলাম সহস্র সহস্র মুনি উপবেশন করে আছেন। মুনিগণ মধুপর্ক সমর্পণ করে আমাকে যথোচিত সম্মান জানান, আমিও তাঁদের আতিথ্য স্বীকার করে তাঁদের অভিনন্দন জানাই। তারপর মহর্ষি কাশ্যপ আমাকে যে হৃদয়গ্রাহী কথা বলেন, তুমি তা একাগ্রচিত্তে শোনো।

পূর্বকালে নরকাসুর ইত্যাদি সহস্র সহস্র দানব ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হয় এবং বলের অহংকারে মত্ত হয়ে ওঠে। তাদের আরও বহু সাথি যুদ্ধের জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। দেবতাদের বৈভব তাদের কাছে অসহ্য ছিল। ফলে অসুরদের উপদ্রব এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে দেবতা এবং দেবর্ষিগণ আত্মগোপন করে থাকতে লাগলেন। দেবতারা দেখলেন ভয়ানক আকৃতিধারী দানবেরা পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের জন্য শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং পৃথিবী দুঃখভারে নিমজ্জিত হচ্ছে। তাই দেখে দেবতারা ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন—'ব্রহ্মন্! দানবদের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, এই অত্যাচার আমরা কী করে সহ্য করব?'

ব্রহ্মা বললেন—'দেবতাগণ! আমি আগেই এই বিপত্তি দূর করার উপায় ঠিক করে রেখেছি। দানবেরা বর লাভ করে বল ও দর্পে মত্ত হয়ে আছে। তাদের বশীভূত করা দেবতাদের পক্ষেও অসম্ভব। বর্তমানে তারা অব্যক্ত স্বরূপ ভগবান বিষ্ণুকেও ভয় পায় না। দেখো, বিষ্ণু এখন বরাহ-রূপ ধারণ করেছেন। এই ভূমির নীচে যেখানে দানবেরা হাজার হাজার সংখ্যায় থাকে, ভগবান বরাহ সেখানেই গিয়ে তাদের সকলকে সংহার করবেন।' ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতা সকল আশ্বস্ত হলেন।

মহাতেজস্বী ভগবান বিষ্ণু তখন বরাহরূপ ধারণ করে

অতি দ্রুত পৃথিবীর নিম্নে দানবদের কাছে গেলেন এবং তাঁদের ভীত করার জন্য ভয়ানক শব্দ করতে লাগলেন। তাঁর সেই ভয়ংকর গর্জনে সমস্ত জগৎ কম্পিত হল এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও ভীত হয়ে উঠলেন। সমস্ত জগতের স্থাবর-জঙ্গম সকলেই হতচকিত হয়ে গেল। সেই ভীষণ গর্জনে বহু দানব মূর্ছিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। ভগবান রসাতলে পৌঁছে সেই দেবশত্রুদের অস্থি-মজ্জা তাঁর পায়ের ক্ষুরে পিষে দিলেন।

তখন দেবতারা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্ ! এই শব্দ কোথায় হচ্ছে ? আমরা তা বুঝতে পারছি না। এ কে এবং কীসের শব্দ, যাতে সমস্ত জগৎ বিহ্বল হয়ে উঠেছে ? সমস্ত দেবতা এবং দানবদের মধ্যে আতঙ্ক ছেয়ে গেছে।' ইতিমধ্যে ভগবান বরাহ ওপরে উঠে এলেন। ঋষিগণ তাঁর স্তুতি করছিলেন। তাঁকে দেখে ব্রহ্মা বললেন—'দেবতাগণ ! সাবধান, ইনি সমস্ত বিঘ্ননাশক ভগবান বিষ্ণু, সমস্ত ভূতের আত্মা, তাদের রক্ষক এবং প্রভু, মহাযোগী ও আত্মার আত্মা। দেখো, ইনি মহাবলী ও বিশালকায় বরাহরূপ ধারণ করে সমস্ত দৈত্যরাজাদের বধ করে এখানে পদার্পণ করেছেন। ইনি যে অদ্ভুত কর্ম করেছেন, তোমরা সকলে সম্মিলিতভাবেও তা করতে পারতে না। তোমাদের কোনোরূপ সন্তাপ, ভয় বা শোক করা উচিত নয়। ইনিই সমগ্র জগতের রচয়িতা, পালক এবং সংহারকর্তা। সমস্ত জগৎ উদ্ধার করতে গিয়ে ইনিই এই মহাগর্জন করেছেন। এই কমলনয়ন ভগবানই সমস্ত জগতের বন্দনীয়, অবিনাশী এবং সমস্ত ভূতের আদিকারণ ও নিয়ামক।

—o—

গুরু-শিষ্যের সংবাদ উল্লেখ করে যোগ ও সদাচার নিরূপণ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এবার আপনি আমাকে মোক্ষের প্রধান কারণ—যোগের প্রকৃত স্বরূপ বলুন। আমি সেটি জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে গুরু-শিষ্যের সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

এক ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য ছিলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী, মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁর কাছে এক বুদ্ধিমান, কল্যাণকামী, সমাহিত চিত্ত শিষ্য আসেন। তিনি আচার্যের চরণ-স্পর্শ করে হাতজোড় করে বললেন—'গুরুদেব ! আপনি যদি আমার সেবায় প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার মনে যে এক কঠিন প্রশ্ন জেগেছে, কৃপা করে তার উত্তর দিন। স্বামিন্ ! আমি এবং আপনি এই জগতে কোথা থেকে এলাম ? আমি লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত ভূতাদির মধ্যে তাদের উপাদান কারণ সমান, তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কারো বৃদ্ধি, কারো হ্রাস কেন হয় ? পৃথিবীতে বৈদিক, স্মার্ত এবং বর্ণাশ্রমধর্মসম্বন্ধীয় যে বাক্য প্রসিদ্ধ, কীভাবে তার সমন্বয় হওয়া সম্ভব, ভগবন্ ! আমাকে কৃপাপূর্বক এই সমস্ত কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন।'

গুরু বললেন—পুত্র ! শোনো, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ; তুমি বেদের অত্যন্ত গূঢ় রহস্য জানতে চেয়েছ, এটিই অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং এটিই সমস্ত বিদ্যা ও শাস্ত্রাদির সর্বস্ব। বিশ্বাত্মা বেদের মূলকারণ যে ওঁ-কার তা বাসুদেব, সত্য, জ্ঞান, যজ্ঞ, তিতিক্ষা, দম এবং আর্জবস্বরূপ। বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাকেই বলেন পুরুষ, সনাতন ব্রহ্ম। বৃষ্ণিবংশে উৎপন্ন এই ভগবান কৃষ্ণ তিনিই। তুমি আমার কাছে তাঁর ইতিহাস শোনো। এই অতুল তেজস্বী দেবাদিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণের থেকে, ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ের থেকে, বৈশ্যদের বৈশ্যের থেকে এবং শূদ্রদের শূদ্রের থেকে শোনা উচিত। তুমি শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণকারী চরিত্র শোনার অধিকারী ; অতএব মন দিয়ে শোনো। শ্রীকৃষ্ণই আদি-অন্তরহিত কালচক্র। তাঁর মধ্যে এই তিন লোক চক্রের ন্যায় আবর্তিত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণই অক্ষর, অব্যক্ত, অমৃত, সনাতন পরব্রহ্ম। এই অবিনাশী পরমাত্মাই পিতৃপুরুষ, দেবতা, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি রচনা করেন। এইভাবে কল্পের প্রারম্ভে নিজ মায়ায় অবস্থিত হয়ে ইনি বেদ, শাস্ত্র এবং সনাতন লোকধর্মাদি অভিব্যক্ত করেন। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিভিন্ন ঋতুর লক্ষণ প্রকাশিত হতে থাকে; প্রত্যেক যুগে তেমনই তদনুরূপভাবে অভিব্যক্তি হতে থাকে। কালক্রমে সেই যুগগুলিতে যে সব বস্তু উদ্ভাবিত হয়, সেইসময় পরম্পরায় সেইরূপ জ্ঞানও উৎপন্ন হতে থাকে। কল্পের শেষে বেদ ও ইতিহাস লুপ্ত হয়, সেগুলি সর্গের (সৃষ্টির) প্রারম্ভে ভগবান স্বয়ম্ভুর আদেশে মহর্ষিগণ তপস্যার সাহায্যে পুনরায় প্রাপ্ত করেন। তখন স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মার বেদের, বৃহস্পতির বেদাঙ্গের, শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্রের, নারদের গন্ধর্ববিদ্যার, ভরদ্বাজের ধনুর্বিদ্যার, গার্গ্যের দেবর্ষিদের চরিত্রের এবং কৃষ্ণাত্রেয়র চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞান হয়। সেই সময় বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ন্যায় ইত্যাদি বিভিন্ন তন্ত্রাদি রচনা করেন। তাঁরা যুক্তি, শাস্ত্র এবং আচরণদ্বারা যা উপদেশ দিয়েছেন, তোমার তা পালন করা উচিত।

পরব্রহ্ম, অনাদি সব কিছুর অতীত ; তাঁকে দেবতা ও ঋষিগণও জানতে পারেন না। একমাত্র জগৎ পালক নারায়ণই তাঁকে জানেন। নারায়ণের থেকেই ঋষি, প্রধান দেবতাগণ, অসুর এবং রাজর্ষিগণ সেই ব্রহ্মকে জেনেছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত দুঃখের পরমৌষধ। প্রকৃতি যখন পুরুষ হতে অধিষ্ঠিত বিবিধ পদার্থগুলি সৃষ্টি করতে থাকেন তখন তাঁর দ্বারা কারণসহ জগৎ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তার থেকে অহংকার, অহংকার থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আটটি হল মূল প্রকৃতি। সমস্ত জগৎ তাতেই অবস্থিত। তার থেকেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও এক মন—এই ষোলোটি বিকার হয়। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত এবং বাক্—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয় এবং এইসবে ব্যাপক যে সর্বগত চিত্ত, তা হল মন। মন সর্বরূপ। আহারের সময় এটি জিহ্বারূপ হয়ে যায়, কথা বলার সময় তাকেই বাক্ বলা হয়। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিশে মন সেই রূপে প্রকাশিত হয়। মনকে সত্ত্বগুণের কার্য বলা হয় এবং সত্ত্বকে অব্যক্তের। সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষের উচিত আত্মাকে সমস্ত ভূতের আত্মা অব্যক্ততে (মূল প্রকৃতিতে) অবস্থিত বলে অনুভব করা।

এইভাবে সম্পূর্ণ পদার্থ প্রকৃতির অতীত সেই নিরঞ্জনদেবে অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত জগৎ চরাচর নির্বাহ করছেন। সেই পরমাত্মা এইসব পদার্থে সৃষ্ট নবদ্বারযুক্ত পবিত্র নগরকে ব্যাপ্ত করে এতে শয়ন করেন, তাই তাঁকে 'পুরুষ' বলা হয়। এই পুরুষ জরা-মরণরহিত, ব্যাপক, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন, সূক্ষ্ম এবং সমস্ত ভূত ও গুণাদির আশ্রয়। অগ্নি যেমন কাঠে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি আত্মা শরীরে থাকলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। যত্নসহকারে মন্থন করলে যেমন কাঠের আগুন প্রজ্বলিত হয়, তেমনই যোগাভ্যাসের সাহায্যে শরীরে স্থিত আত্মার সাক্ষাৎকার করা সম্ভবপর হয়। স্বপ্নাবস্থাতে যেমন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ জীবাত্মা এই শরীর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, তেমনই মৃত্যুর পর এই আত্মা অন্য দেহ গ্রহণ করে। কর্মের দ্বারাই অন্য দেহ উপলব্ধ হয় এবং নিজকৃত প্রবল কর্মই তাকে অন্য শরীরে নিয়ে যায়।

রাজন্ ! স্থাবর-জঙ্গম যে চার প্রকার প্রাণী আছে, তা অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে অব্যক্তেই সমাহিত হয়। যেমন অশ্বত্থ গাছের মধ্যে অব্যক্তরূপে এক বিশাল বৃক্ষ সমাহিত আছে, কিন্তু বৃক্ষরূপে আসায় সেটি ব্যক্ত হয়ে যায়, তেমনই এই সমস্ত জগৎ অব্যক্ত থেকেই উৎপন্ন হয়। লোহা যেমন অচেতন পদার্থ হলেও চুম্বকের দ্বারা আকর্ষিত হয়, তেমনই শরীর উৎপন্ন হলে তার স্বাভাবিক সংস্কার এবং অবিদ্যা, কাম, কর্ম ইত্যাদি অন্য গুণগুলি তার দিকে আকর্ষিত হয়। আত্মা সমস্ত কিছুর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। এটি নিত্য সর্বগত, মনের হেতু এবং উপলক্ষণ, অজ্ঞানরূপ কর্মই হল জগতের উৎপত্তির কারণ। এই কারণ দ্বারা যুক্ত হয়ে জীব কর্মাদি সংগ্রহ করে এবং কর্ম থেকে বাসনা ও বাসনা থেকে পুনরায় কর্ম হয়ে থাকে। এইভাবে এই আদি-অন্ত-শূন্য মহান সংসারচক্র চলতে থাকে। এই সমস্ত জগৎ

আসক্তিগ্রস্ত হওয়ায় অজ্ঞানজনিত ভোগের দ্বারা কর্মচক্রে ঘুরে মরে। জীব অহংকারের অধীন হয়ে তৃষ্ণাবশত কর্মে সংলগ্ন থাকে এবং সেই কর্ম আগামী কার্য-কারণ-সংযোগের হেতু হয়ে ওঠে ; সুতরাং বুদ্ধিমান পুরুষের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জেনে নেওয়া উচিত। এই দুটির একাত্মতায় অভ্যস্ত হওয়ায় জীব নিজ শুদ্ধ স্বরূপের খোঁজ পায় না।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! গুরুদেব এইভাবে শিষ্যের প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন। যেমন রান্না করা বীজে কখনো অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তেমনই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ আত্মাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। কর্মনিষ্ঠ পুরুষ যেমন প্রবৃত্তি ধর্মকেই ভালো বলে মনে করেন, তেমনই বিজ্ঞাননিষ্ঠদের কাছে জ্ঞানাভ্যাসের থেকে বড় আর কোনো বস্তু শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় না। বেদজ্ঞ এবং বৈদিক কর্মে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া অত্যন্ত বিরল। বৈদিক কর্মাদির পরিণাম হল স্বর্গ বা মোক্ষ। এই দুটির মধ্যে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ হওয়ায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকলের প্রশংসিত নিবৃত্তিরূপ মোক্ষমার্গই আকাঙ্ক্ষা করেন। সৎপুরুষেরা সর্বদা এই পথই অবলম্বন করেছেন। সুতরাং এটি অধিক নির্দোষ। এটি সেই বুদ্ধি যা অনুসরণ করলে মানুষ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দেহাভিমানী পুরুষ এইপথ অবলম্বন করতে পারে না। তারা ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বহু রাজস-তামস ভাবে যুক্ত হয়ে অজ্ঞানতাবশত বহু ধারায় নিজেকে বেঁধে ফেলে।

সুতরাং যে ব্যক্তি দেহাধ্যাস থেকে মুক্ত হতে চায়, তার কোনোপ্রকার অবৈধ আচরণ করা উচিত নয়। তার নিজের জন্য নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষদ্বার খুলতে হয়, স্বর্গাদি পুণ্যলোকের প্রলোভনে যেন আবদ্ধ না হয়। যে ব্যক্তি একবার ধর্মমার্গ অবলম্বন করে পুনরায় লোভের বশীভূত হয়ে কাম-ক্রোধ, মোহের আশ্রয় নিয়ে অধর্ম করতে থাকে, সে তার পরিবারসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কল্যাণকামী ব্যক্তির রাগ-দ্বেষের অধীন হয়ে শব্দাদি বিষয় সেবন করা উচিত নয়। বিষয়াদির কারণেই সত্ত্বাদি গুণের সংসর্গ থেকে হর্ষ-ক্রোধ ও বিষাদ জন্মায়। এই দেহ পঞ্চভূতের বিকার এবং সত্ত্ব-রজঃ-তম, তিন গুণে যুক্ত। ফলে এ কার স্তুতি করবে এবং কাকে খারাপ বলবে ? শব্দাদি বিষয়ে শুধুমাত্র মূর্খরাই আসক্ত হয়। যেমন বনবাসী সন্ন্যাসীগণ মিষ্টান্ন খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করে শরীর নির্বাহের জন্য স্বাদহীন, রুক্ষ, শুষ্ক খাবার গ্রহণ করেন, তেমনই সংসারী গৃহস্থ মানুষদের পরিশ্রমযুক্ত হয়ে রোগীর ঔষধ ভক্ষণের মতো কেবল শরীর নির্বাহের জন্য পরিমিত এবং সাত্ত্বিক আহার করা উচিত। উদারচিত্ত পুরুষের উচিত হল সত্য, শৌচ, সারল্য, ত্যাগ, তেজ, উৎসাহ, ক্ষমা, ধৈর্য, বুদ্ধি, মন ও তপের প্রভাবে সমস্ত বিষয়াত্মক ভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে শান্তির ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়কে বশে রাখে। এরূপ না হলেই জীব অজ্ঞানতাবশত সত্ত্ব-রজঃ ও তমে মোহগ্রস্ত হয়ে নিরন্তর চক্রের ন্যায় ঘুরে বেড়ায় ; সুতরাং বুদ্ধিমান পুরুষ অজ্ঞতাজনিত দোষগুলি ভালো করে পরীক্ষা করবে এবং এর থেকে উৎপন্ন হওয়া দুঃখ ও অহংকার থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করবে।

রাজন্ ! এখন আমি তোমাকে সত্ত্বাদি গুণের কাজের কথা বলছি, শোনো। প্রসন্নতা, হর্ষজনিত প্রীতি, অসন্দেহ, ধৈর্য এবং স্মৃতি—এগুলি সত্ত্বগুণের কার্য। কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয়, ক্লান্তি, বিষাদ, শোক, অপ্রসন্নতা, মান, দর্প এবং অনার্যভাব—এসবই রজোগুণ এবং তমোগুণের কার্য। এগুলির গুণাগুণ বিচার করে তারপর পরীক্ষা করে দেখবে যে এরমধ্যে কোন কোন দোষ আমার মধ্যে বিদ্যমান। এইভাবে বিচার করে এইসব দোষগুলি থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবে।

সমস্ত প্রকার দোষ থেকে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মচর্যের উপদেশ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষের কোন দোষগুলি মন থেকে ত্যাগ করা উচিত, কোনগুলি বুদ্ধিদ্বারা শিথিল করা উচিত, কোন দোষ বারংবার আসে এবং কোন জিনিস মোহবশত ফলহীন বলে মনে হয় ? বুদ্ধিমান পুরুষের নিজ বুদ্ধির দ্বারা যুক্তিপূর্বক কোন্ দোষের প্রাবল্য বা প্রভাবহীনতা সম্বন্ধে নির্ধারণ করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মূল কারণ অজ্ঞানসহ

দোষাদির বিনাশ হলে পুরুষ বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ছেনির আঘাতে যেমন লোহার শিকল কেটে দেওয়া হয়, তেমনই ধ্যানসংস্কৃত বুদ্ধি তমোগুণজনিত দোষগুলি নষ্ট করে তার সঙ্গে নিজেও শান্ত হয়ে যায়। যদিও রজোগুণ, তমোগুণ এবং কাম ও মোহরহিত শুদ্ধ তত্ত্ব—এই তিন গুণই দেহোৎপত্তির মূল কারণ, তবুও আত্মবান পুরুষের কাছে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনই হল সত্ত্বগুণ। সুতরাং সংযমশীল পুরুষের রজোগুণ-তমোগুণ থেকে দূরে থাকা উচিত। এই দুটি থেকে মুক্ত হলে বুদ্ধি নির্মল হয়। মানুষ যখন রজোগুণের অধীনে থাকে, তখন সে নানারূপ অধর্মযুক্ত কাজ করে থাকে, তার মধ্যে দীনভাব এসে যায় এবং সে নানাভাবে ভোগসেবন করে থাকে। তমোগুণের অধীন হলে সেই ব্যক্তি লোভ ও ক্রোধজনিত কর্মে আবদ্ধ হয়ে থাকে, হিংসাতে তার বিশেষ অনুরাগ হয় এবং সবসময় নিদ্রা ও পরচর্চায় ব্যাপৃত থাকে। সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণকারী পুরুষ শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক ভাবই দেখে থাকেন। তিনি অত্যন্ত নির্মল ও কান্তিমান হন এবং তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিদ্যার প্রাধান্য থাকে।

রাজন্! রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে মোহের উৎপত্তি হয় এবং তার থেকে ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প উৎপন্ন হয়। এই সব নাশ হলে মানুষ শুদ্ধ হয়। এইরূপ পুরুষই সেই অক্ষয়, অবিনাশী, সর্বব্যাপক, অব্যক্ত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে সক্ষম হন। তাঁর মায়ায় আবৃত হয়ে গেলে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক নাশ হয় এবং সে অজ্ঞান ও মোহের অধীন হয়ে ক্রোধের ফাঁদে আবদ্ধ হয়। ক্রোধ হতে কাম উৎপন্ন হয় এবং তারপরে লোভ-মোহ-মান-দর্প এবং অহংকারের উদ্ভব হয়, অহংকার থেকে কর্মে প্রবৃত্তি জন্মায়। এইভাবে কর্ম করতে থাকলে ফলস্বরূপ মানুষ জন্ম-মরণের নিমিত্ত হয়ে ওঠে। জন্মগ্রহণকারী প্রাণীকে শুক্র-শোণিতের সংযোগের ফলে মল-মূত্রে পরিপূর্ণ, রক্ত রঞ্জিত, দুর্গন্ধযুক্ত গর্ভাশয়ে নিয়তকাল কাটিয়ে পুনরায় জন্মাতে হয়। সুতরাং তৃষ্ণার দ্বারা জর্জরিত এবং কাম-ক্রোধে আবদ্ধ পুরুষ যদি তার থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা করে তাহলে তাকে স্ত্রী-সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ স্ত্রীলোক ভয়ানক কৃত্যা রাক্ষসীর সমান, তারা অজ্ঞানী মানুষকে মোহে আবদ্ধ করে। নারীর রজঃ ও পুরুষের বীর্যের সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষ যেমন নিজ অঙ্গ থেকে উকুন ত্যাগ করে, তেমনই নিজের না হয়েও নিজের বলে কথিত সন্তানদেরও ত্যাগ করা উচিত। এই দেহ থেকে উৎপন্ন স্বেদ দ্বারা উকুনের সৃষ্টি হয় আবার কর্মফলরূপে বীর্য দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির উভয়ের মায়া বন্ধনকে উপেক্ষা করা উচিত। এই কথা স্মরণ রাখতে হয় যে শরীর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখপ্রাপ্তি হয়, সেই দুঃখ বৃদ্ধি পায় শরীরে অহং-অভিমান রাখলে। অহংকার ত্যাগ করলে দুঃখ দূর হয় এবং যার দুঃখ দূর হয়ে যায়, সে-ই মুক্ত।

রাজন্! এবার আমি তোমাকে শাস্ত্রের দৃষ্টিতে মোক্ষের উপায় বলছি। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করে, সে পরমগতি লাভ করে। যত প্রাণী আছে, মানুষ তার মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে দ্বিজ এবং দ্বিজদের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্ব ভূতের আত্মা, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী হন। তাঁদের পরমাত্মতত্ত্বের পূর্ণ জ্ঞান হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তি পথে একাকী থাকলে যেমন নানাপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়, তেমনই জ্ঞানহীন ব্যক্তিও জগতে নানা প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হয়। তাই জ্ঞানী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কায়-মনো-বাক্যে পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৈর্য এবং স্মৃতি—এই শ্রেষ্ঠ গুণগুলি প্রায় সকল ধর্মের মানুষের মধ্যেই দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্মচর্যকে শাস্ত্রে ব্রহ্মেরই স্বরূপ বলে মানা হয়। এটি সর্ব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরুষ এর দ্বারা পরমগতি লাভ করতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রত ভালো ভাবে পালন করে, তার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, মধ্যম ব্রহ্মচারী স্বর্গলাভ করে এবং কনিষ্ঠ বিদ্বান ব্রাহ্মণের জন্ম লাভ করে। ব্রহ্মচর্য অত্যন্ত কঠোর ব্রত ; তার উপায় শোনো। রজোগুণের বৃত্তি বৃদ্ধিলাভ করলে ব্রাহ্মণের উচিত তা প্রশমিত করা, নারীদের কথা শুনবে না, তাদের বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখবে না, তাতে দুর্বলচিত্ত মানুষের মনে কামের বিকার আসতে পারে। ব্রহ্মচারীর যদি কাম-বিকার হয়, তাহলে তার কৃচ্ছ্রব্রত করা উচিত এবং যদি স্বপ্নে বীর্যপাত হয় তাহলে জলে ডুব দিয়ে তিন বার অঘমর্ষণ মন্ত্রের জপ করা উচিত। বিবেকশীল ব্যক্তির এইভাবে সংযত ও বুদ্ধিযুক্ত চিত্তে নিজ অন্তঃকরণে উৎপন্ন কাম-বিকারের নাশ করা উচিত। হৃদয়ে এক মনোবহা নামক নাড়ি আছে, সেটি সংকল্পের দ্বারা সমস্ত শরীর থেকে বীর্য আকর্ষণ করে শরীরের বাইরে বার করে দেয়। যেমন দুধে মিশ্রিত ঘি কে মন্থন করে পৃথক করা হয়, তেমনই শরীরে ব্যাপ্ত বীর্য

সংকল্প দ্বারা মন্থন করলে পৃথক হয়ে যায়। স্বপ্নাবস্থাতেও স্ত্রীসঙ্গে রত না হলেও শুধুমাত্র মানসিক বিকারের ফলেও মনোবহ নাড়ি বীর্যকে দেহ থেকে বার করে দেয়।

যে ব্যক্তি এটি জানে যে বীর্যের গতিই বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী, সেই ব্যক্তি সংসারে বীতরাগ ও নির্দোষ হয়ে যায় এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না। সে কেবল দেহনির্বাহের জন্য কর্ম করে থাকে। মনের দ্বারা নির্বিকল্প অবস্থায় স্থিতিলাভ করে এবং প্রাণকে সুষুম্নাতে নিয়ে গিয়ে অবশেষে মোক্ষ লাভ করে। যার এরূপ বোধ হয়েছে যে বিশ্বরূপে মনই অবস্থান করে, সেই মহাত্মাগণের প্রণবোপাসনা পরিশুদ্ধ মন প্রকাশপূর্ণ ও নির্মল হয়ে যায়। সুতরাং মনকে বশীভূত করার জন্য মানুষের নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। তাহলে সে রজোগুণ-তমোগুণ থেকে মুক্তিলাভ করে যথেচ্ছগতি প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়।

মুক্তির জন্য চেষ্টা করার উপদেশ

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! বিষয়-ভোগে আসক্ত থাকা প্রাণী সর্বদাই দুঃখ ভোগ করে। যে মহাত্মারা তাতে আসক্ত হন না, তাঁরাই পরম গতি লাভ করেন। এই জগৎ জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধত্বের দুঃখ, নানাপ্রকার ব্যাধি ও মানসিক চিন্তায় পূর্ণ। বুদ্ধিমান মানুষকে তা জেনে মোক্ষের জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাকে কায়-মনো-বাক্যে পবিত্র থেকে অহংকার ত্যাগ করে, শান্তচিত্ত, জ্ঞানবান এবং নিষ্কাম হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করে সুখে বিচরণ করতে হয়। জীবের ওপর দয়া করতে থাকলেও তাদের প্রতি মনে আসক্তি জন্মাতে পারে—এই ভেবে দয়া এবং মমতাকেও উপেক্ষা করা উচিত এবং এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে সমস্ত জগৎই তার নিজ নিজ ফল ভোগ করছে। মানুষ শুভ বা অশুভ যেমনই কর্ম করে, তার ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়, তাই বুদ্ধি ও ক্রিয়ার দ্বারা সর্বদা শুভকর্মেরই আচরণ করা উচিত। জীবে হিংসা না করা, সত্য বলা, সকল প্রাণীদের প্রতি সরল হওয়া, ক্ষমা করা এবং প্রমাদ থেকে রক্ষা পাওয়া—যে ব্যক্তির মধ্যে এই সকল গুণ থাকে সে সুখী হয়।

যে ব্যক্তি এই অহিংসাদিকে সমস্ত প্রাণীর পক্ষে সুখদায়ক এবং দুঃখ পরিত্যাগকারী পরম ধর্ম বলে মনে করে, সে-ই সর্বজ্ঞ এবং সুখী হয়। তাই বুদ্ধির দ্বারা মনকে সমাহিত করবে এবং কোনো প্রাণীর প্রতি রাগ বা দ্বেষ করবে না। কারো অহিত চিন্তা করবে না, দুর্লভ বস্তু কামনা করবে না, নশ্বর পদার্থের চিন্তা ত্যাগ করবে এবং সকলভাবে চেষ্টা করে মনকে জ্ঞানের সাধনায় (শ্রবণ-মনন ইত্যাদিতে) ব্যাপৃত করে রাখবে। বেদান্ত শ্রবণ এবং দৃঢ় প্রচেষ্টার দ্বারা উত্তম জ্ঞান লাভ হয়। যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং সত্য কথা বলতে আগ্রহী, তার এমন কথা বলা উচিত যা সত্য হওয়ার সঙ্গেই হিংসা, পরনিন্দা, কপটতা, কটুতা, ক্রূরতা, পরিহাস ইত্যাদি দোষ রহিত হয়। এই প্রকার বাক্যও স্বল্প মাত্রায় এবং সাবধানের সঙ্গে বলা উচিত। জগতের সমস্ত ব্যবহারই বাক্য দ্বারা গ্রথিত, তাই সুন্দর বাক্য বলবে এবং যদি বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহলে বুদ্ধির সাহায্যে মনকে বশ করে নিজ কৃত কুকর্মও লোককে জানিয়ে দেবে। (কারণ প্রকাশিত হলে পাপের মাত্রা কমে যায়।) রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইন্দ্রিয়াদির প্রেরণায় মানুষ সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং ইহলোকে কষ্ট ভোগ করে শেষে নরকগামী হয়। তাই কায়-মনো-বাক্যে এমন কর্ম করবে যাতে শান্তি বজায় থাকে।

(নগরপালের ভয়ে পলাতক) চোর যেমন চুরি করা দ্রব্য ফেলে দিয়ে সুখ পাবার আশায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে থাকে, তেমনই মানুষ রাজসিক ও তামসিক কর্মগুলি ত্যাগ করলে শুভগতি লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার সংগ্রহ-রহিত, নিরীহ, একান্তবাসী, স্বল্পাহারী, তপস্বী এবং জিতেন্দ্রিয়, যার সমস্ত ক্লেশ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়েছে এবং যে যোগানুষ্ঠান প্রেমিক এবং মনকে বশে রাখে, সে তার স্থির চিত্তের দ্বারা নিঃসন্দেহে পরব্রহ্ম লাভ করে। বুদ্ধিমান এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তির উচিত বুদ্ধিকে নিজ বশে রাখা তারপর বুদ্ধির দ্বারা মন এবং মনের দ্বারা বিষয়-পরায়ণ ইন্দ্রিয়কে নিজ অধীন করে নেওয়া, ফলে ইন্দ্রিয়াদি প্রসন্ন হয়ে ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে ওঠে। তখন তার সঙ্গে মনের ঐক্য হওয়ায় অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রকাশ উদ্ভাসিত হয়।

সেইজন্য যোগশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে আচরণ করা উচিত এবং যোগসাধনা কালে যে উপায়ে চিত্তবৃত্তি স্থির রাখা সম্ভব, সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত। ভিক্ষাদ্বারা শাক, রুটি, ফল-মূল যা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে জীবিকা

নির্বাহ করা উচিত। দেশ, কাল ও নিয়ম অনুযায়ী সাত্ত্বিক আহার করা উচিত। সাধনা শুরু করলে মধ্যপথে থেমে যেতে নেই। আগুনের যেমন ধীরে ধীরে তেজ বাড়তে থাকে, তেমনই জ্ঞানের সাধনকে ক্রমশ প্রদীপ্ত করতে হয়। এরূপ করলে জ্ঞান উদিত সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হতে থাকে। জ্ঞানী পুরুষ কাল, জরা এবং মৃত্যু জয় করে অক্ষর, অবিনাশী, অবিকারী, অমৃত এবং সনাতন ব্রহ্ম লাভ করে।

নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করার ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির স্বপ্নদোষের দিকে দৃষ্টি রেখে নিদ্রা সর্বথা ত্যাগ করা উচিত। কারণ প্রায়শই জীবকে স্বপ্নে রজোগুণ ও তমোগুণ ঘিরে ধরে। জ্ঞানের চর্চা এবং তত্ত্ব-বিচারে মগ্ন হলে জাগ্রত থাকার অভ্যাস তৈরি হয় ; যে ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সে তো সদাই জাগ্রত থাকে। ইন্দ্রিয়াদি ক্লান্ত হলে সকলের নিদ্রা আসে, কিন্তু সেইসময় যদিও ইন্দ্রিয়াদি লয় হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও মন জাগ্রত থাকে তাই নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা যায়। জাগ্রত অবস্থায় কর্মে নিমজ্জিত মানুষের সংকল্প যেমন মনোরাজ্যেরই বিভূতি, তেমনই স্বপ্নও মনের সঙ্গেই সম্পর্কিত। কামনাসক্ত মানুষ অসংখ্য জন্মের বাসনাগুলিকে স্বপ্নে অনুভব করে। তার মনে যেসব ভাব লুক্কায়িত থাকে সেসব অন্তর্যামী জেনে থাকেন। পূর্বজন্মের কর্মানুসারে সত্ত্ব, রজঃ, তম—কোনো গুণ যদি প্রকাশ পায় তাতে মনের ওপরে যে সংস্কার পড়ে, সূক্ষ্মভূতের প্রেরণায় স্বপ্নে তেমনই আকার প্রকাশিত হয়। স্বপ্নদর্শন হলেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ সুখ-দুঃখ অনুভূত করানোর জন্য উপস্থিত হয়ে যায়। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা হৃদয়ে যেসব সংকল্পের উদয় হয় স্বপ্নে মন সেই সংকল্পগুলিকে আনন্দের সঙ্গে ভোগ করে। আত্মার প্রভাবেই আকাশ ইত্যাদি ভূতে মনের গতি হয়, কোথাও তা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং আত্মাকে অবশ্যই জানা উচিত। কারণ আকাশ ইত্যাদি সমস্ত দেবতা আত্মাতেই অবস্থিত। তপস্যা দ্বারা মনের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, তখন তাতে সূর্যের ন্যায় জ্ঞানময় আলোক উদ্ভাসিত হয়। দেবতাগণ তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আর অসুরেরা তপস্যায় বিঘ্ন প্রদানকারী দম্ভ-দর্প ইত্যাদি (অজ্ঞানকে) ধরে থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্মতত্ত্ব গুণপ্রধান দেবতা এবং অসুরের কাছে গুপ্ত, তারা এর খবর রাখে না ; কারণ তত্ত্ববেত্তা পুরুষ একে জ্ঞানস্বরূপ বলে থাকে। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ—এ সবই দেবতা ও অসুরদের গুণ। এরমধ্যে সত্ত্বগুণ দেবতাদের এবং বাকি গুণ দুটি অসুরদের। ব্রহ্ম এই সব গুণের অতীত, অক্ষর, অমৃত, স্বয়ংপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ। শুদ্ধ-অন্তঃকরণযুক্ত মহাত্মা তা জানতে পারেন। যাঁরা এটি জেনে যান, তাঁরা পরমগতি লাভ করেন। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণই ব্রহ্মের বিষয়ে কিছু সঠিক কথা বলতে পারেন অথবা মন ও ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে সরিয়ে একাগ্র হলেও সেই অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

যে ব্যক্তি পরম ঋষি ভগবান নারায়ণ কথিত ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব জানে না, তার পরব্রহ্মের জ্ঞান নেই। ব্যক্ত (স্থূল জগৎ) মরণশীল এবং অব্যক্ত অমৃতপদ। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রবৃত্তিরূপ ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন ; সেই প্রবৃত্তি ধর্মপালন করলে জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সেটি পুনরাবৃত্তিরূপ। নিবৃত্তি-ধর্মে পরমগতি লাভ হয়। তাই সেটি মোক্ষ স্বরূপ। শুভাশুভ কর্মের জ্ঞাতা, নিবৃত্তিপরায়ণ এবং সর্বদা তত্ত্ব-চিন্তায় ব্যাপৃত মুনিগণই সেই উত্তম গতি লাভ করেন।

তাই বিচারশীল ব্যক্তির উচিত প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষকে (ক্ষেত্রজ্ঞকে) জানা ; তারপর এই দুটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে পরম মহান ঈশ্বর তত্ত্ব আছে, তার বিশেষ জ্ঞানলাভ করা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সৃষ্টি করাই তার স্বভাব। ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব এর বিপরীত, তা স্বয়ং গুণরহিত এবং প্রকৃতির কার্যাবলীর দ্রষ্টা। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চেতন। গুণসকল লিঙ্গাদিরহিত হওয়ায় এরা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হয় না। উভয়ই স্থূল পদার্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে চরাচর জগৎ উৎপন্ন হয়। জীব ইন্দ্রিয়াদির সহযোগে কর্ম করার জন্য তাকে কর্তা বলা হয়।

যে দিব্য সম্পদ অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চায়, সেই ব্যক্তির নিজ মন শুদ্ধ রাখা উচিত এবং শরীরে কঠোর নিয়মাদি পালন করে নিষ্কাম তপের অনুষ্ঠান করা উচিত। আন্তরিক তপ চৈতন্যময় প্রকাশযুক্ত, তাতে তিনলোক ব্যাপ্ত। সূর্য ও চন্দ্রও তপের দ্বারাই আকাশে প্রকাশিত হয়ে থাকে। জগতে তপ শব্দ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তপের ফল প্রকাশ এবং জ্ঞান। রজোগুণ ও তমোগুণ নাশকারী নিষ্কাম কর্মই হল তপ। ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা শারীরিক তপ, বাক্য ও মন সংযমকে মানসিক তপ বলা হয়।

যাঁরা বৈদিক বিধি জানেন এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করেন সেই দ্বিজাতীয়দের অন্নকে উত্তম বলে মনে করা হয়। সেই অন্ন নিয়মপূর্বক গ্রহণ করলে রজোগুণ হতে উৎপন্ন

পাপ প্রশমিত হয় এবং সাধক ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে বীতরাগ হয়ে ওঠে। তাই ভিক্ষার দ্বারা ততটুকু অন্নগ্রহণ করা উচিত, যা জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন। এইরূপ যোগযুক্ত মনের দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রাপ্ত করে নেওয়া উচিত। ধৈর্য হারানো উচিত নয়।

কিছু যোগী আসনের দ্বারা শরীরকে নিরোগ রেখে বুদ্ধির দ্বারা মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেন এবং ইন্দ্রিয় থেকে নিজের সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজের থেকে সূক্ষ্ম হওয়ায় প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কেউ কেউ শাস্ত্রে কথিত ক্রমে উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে করতে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছে বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্ম অনুভব করেন। কেউ কেউ যোগের সাহায্যে অন্তঃকরণকে পবিত্র করে নিজ মহিমায় স্থিত হয়ে সেই পরমপুরুষকে লাভ করেন, যিনি অব্যক্তের থেকেও শ্রেষ্ঠ। এইভাবে কেউ আবার ধ্যান-ধারণার দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেউ আবার সেই পরমদেবকে চিন্তা করেন, যাঁকে বিদ্যুতের মতো সহসা প্রকাশিত হওয়া এবং অক্ষর বলা হয়। কিছু লোক তপস্যার সাহায্যে নিজ পাপরাশি দগ্ধ করে অন্তিমকালে ব্রহ্মলাভ করেন। এই সব মহাত্মাগণ উত্তম গতি লাভ করেন। যাঁর মন জ্ঞানের সাধনে ব্যাপৃত, তিনি মর্ত্যলোকের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে রজোগুণরহিত তথা ব্রহ্মভূত হয়ে পরমগতি (মোক্ষ) লাভ করেন। বেদজ্ঞ বিদ্বানেরা এইভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তকারী ধর্মের বর্ণনা করেছেন। নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে উপাসনাকারী সকল সাধকই উত্তম গতি লাভ করেন। যাঁরা রাগাদি দোষরহিত সুদৃঢ় জ্ঞানলাভ করেন, তাঁদের মুক্তিলাভ হয়। যাঁরা সমস্ত ঐশ্বর্যযুক্ত, অজ, দিব্য এবং অব্যক্ত নামসম্পন্ন ভগবান বিষ্ণুর ভক্তিভাবে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁরা জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত ও নিষ্কাম হয়ে যায় এবং নিজ অন্তরে শ্রীহরিকে অবস্থিত জেনে অব্যয়স্বরূপ হয়ে যান, তাঁদের আর ইহজগতে ফিরে আসতে হয় না। যাঁরা প্রকৃতি ও তার কর্ম এবং সনাতন পুরুষকে ঠিকমতো জানেন, তাঁরা তৃষ্ণারহিত হয়ে মোক্ষ লাভ করেন। জগতে শরণ প্রদানকারী ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান নারায়ণ জীবদের দয়া করার জন্যই এই অমৃতময় জ্ঞানকে প্রকাশ করেছেন।

—০—

মহর্ষি পঞ্চশিখের রাজা জনককে উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মোক্ষধর্মজ্ঞানী মিথিলানরেশ জনক মানবীয় ভোগাদি পরিত্যাগ করে কীরূপ আচরণ দ্বারা মোক্ষলাভ করেছিলেন ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! শোনো, এ সেই সময়ের কথা, যখন মিথিলায় জনকবংশীয় রাজা জনদেবের রাজ্য ছিল। জনদেব সর্বদাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নিয়ে চিন্তা করতেন। তাঁর রাজদরবারে সবসময় একশোজন আচার্য থাকতেন, যিনি রাজাকে বিভিন্ন আশ্রমের ধর্ম উপদেশ প্রদান করতেন। একবার কপিলাপুত্র মহামুনি পঞ্চশিখ সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমাকালে মিথিলায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্মের জ্ঞাতা এবং তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। সব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁর মনে কোনোপ্রকার সন্দেহ ছিল না। তিনি সর্বদা নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বিচরণ করতেন। ঋষিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কামনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। তিনি তাঁর উপদেশের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ে অতি দুর্লভ সনাতন সুখের প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। সাংখ্যের বিদ্বানগণ তাঁকে সাক্ষাৎ প্রজাপতি কপিল মুনিরই স্বরূপ বলে মনে করতেন। তাঁকে দেখে মনে হত যে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক ভগবান কপিল স্বয়ং পঞ্চশিখের রূপধারণ করে মর্ত্যলোকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই দীর্ঘজীবী মুনি আসুরির প্রথম শিষ্য। তিনি একহাজার বছর ধরে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কপিলা নামে একজন ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনি তাঁর দুগ্ধ দিয়ে পঞ্চশিখকে পালন করেছিলেন, সেইজন্য পঞ্চশিখকে তাঁর পুত্র বলা হত।

ধর্মজ্ঞ পঞ্চশিখ উত্তমজ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাজা জনক একশত আচার্যের ওপর সমভাবে অনুরক্ত জেনে পঞ্চশিখ তাঁর রাজদরবারে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথায় সব আচার্যকে মুগ্ধ করে দিলেন। মহারাজ জনক কপিলানন্দন পঞ্চশিখের জ্ঞান দেখে তাঁর

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর একশো আচার্যের সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে রওনা হলেন। মুনিবর পঞ্চশিখ রাজাকে তাঁর

অনুগামী দেখে, তাঁকে যোগ্য অধিকারী বুঝে সাংখ্যমত অনুযায়ী তাঁকে মোক্ষধর্ম সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। প্রথমে তিনি জন্মগ্রহণের কষ্টের কথা বলেন, তারপর কর্মের ক্লেশের কথা বলেন। তারপরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ভোগাদির ক্ষণভঙ্গুরতা ও দুঃখরূপের প্রতিপাদন করে সবদিক দিয়ে বীতরাগ হওয়ার উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন—'যা একদিন বিনাশপ্রাপ্ত হবে, যে জীবনের কিছু ঠিক নেই, সেই অনিত্য শরীরের বন্ধু-বান্ধব অথবা স্ত্রী-পুত্রাদিতে কী প্রয়োজন ? এই কথা ভেবে যে ব্যক্তি এইসব একমুহূর্তে পরিত্যাগ করে, তাকে আর মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি, বায়ু—এগুলি সর্বদা এই শরীরকে রক্ষা করে—একথা ভালোভাবে জেনে নিলে এর প্রতি আর কী করে আসক্তি হতে পারে ? যা একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সেই শরীরের সুখ কোথায় ?' পঞ্চশিখের এই উপদেশ, যেগুলি ভ্রম ও বঞ্চনারহিত, সর্বতোভাবে নির্দোষ এবং আত্মার জ্ঞানকারক, তা শুনে রাজা জনক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

জনক জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! জ্ঞানীরা মৃত্যুর পর আবার সংসারে ফিরে আসেন কী ? সেইসময় তাঁদের যদি কোনো বিশেষ সত্তা না থাকে, তাহলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের ফল কী হবে ?

রাজা জনকের এই প্রশ্ন শুনে জ্ঞানী মহাত্মা পঞ্চশিখ বুঝতে পারলেন যে রাজা জনকের বুদ্ধি এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আত্মা-নাশ সম্পর্কে ইনি ভুল বুঝেছেন, তাই ইনি হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছেন। তাঁর অবস্থা জেনে মহর্ষি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—রাজন্ ! মুক্তাবস্থায় আত্মা বিনাশপ্রাপ্তও হয় না এবং কোনো বিশেষ আকারও গ্রহণ করে না। যা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এই শরীরও ইন্দ্রিয় ও মনের সমূহমাত্র। যদিও এগুলি সবই পৃথক, তবুও এগুলি একে অপরের আশ্রয় নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। প্রাণীদের শরীরে উপাদানরূপে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচটি ধাতু থাকে। এগুলি স্বাভাবিকভাবেই একত্র হয়ে আবার পৃথক হয়ে যায়। এই পঞ্চ তত্ত্বের মিলনেই বিভিন্ন প্রকার দেহ নির্মিত হয়। চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক—এগুলিকে পাঁচ ইন্দ্রিয় বলা হয় ; এগুলির উৎপত্তির কারণ মন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এবং মূর্ত দ্রব্য—এই ছটি গুণ জীবের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের সাধক। এগুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ হলেই বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয়।

যেসব ব্যক্তি গুণাদির সংঘাতরূপ এই শরীরকেই আত্মা বলে মনে করে, মিথ্যা জ্ঞানের জন্য তারা অনন্ত দুঃখ পায় এবং তাদের জন্ম পরম্পরার কখনো ছেদ হয় না। অপর দিকে যাদের কাছে এই দৃষ্টিগোচর প্রপঞ্চ অনাত্মারূপে সিদ্ধ হয়েছে, তাদের এর প্রতি মমত্ববোধ বা অহং-ভাব থাকে না, তাহলে তারা দুঃখ পাবে কীভাবে ? কারণ তাদের আর দুঃখ দেবার কোনো আধারই থাকে না। এবার আমি তোমায় সেই শাস্ত্রের কথা বলছি, যাতে ত্যাগের প্রাধান্য আছে। মন দিয়ে শোনো। এটি তোমার মোক্ষের সহায়ক হবে। যারা মুক্তির জন্য যত্নশীল, তাদের সকাম কর্ম এবং দ্রব্যাদি-পরিত্যাগ করা উচিত। যারা ত্যাগ না করে বৃথাই বিনীত হওয়ার ভাণ করে, তাদের বহুকষ্ট সহ্য করতে হয়। শাস্ত্রে দ্রব্য ত্যাগ করার জন্য যজ্ঞাদি কর্ম, ভোগ ত্যাগ করার জন্য ব্রত, দৈহিক সুখ ত্যাগ করার জন্য তপ এবং সমস্ত কিছু ত্যাগ করার জন্য যোগের অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি ত্যাগের সীমা। সর্বস্ব ত্যাগের এই একমাত্র পথই হল দুঃখ হতে মুক্তি পাবার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। যারা এর আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাদের দুর্গতি ভোগ করতে হয়।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন—এই সবমিলে এগারোটি ইন্দ্রিয় ; এইগুলিকে মনরূপ জেনে বুদ্ধির সাহায্যে সত্বর এগুলিকে ত্যাগ করা উচিত। শ্রবণ করার সময় শ্রোত্ররূপ ইন্দ্রিয়, শব্দরূপ বিষয় এবং মনরূপ কর্তা—এই তিনটি উপস্থিত থাকে। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভব করার সময় বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং মন—এই তিনটির উপস্থিতি থাকে। এইভাবে তিন-তিনটির পাঁচ সমুদায় থাকে, যার দ্বারা বিষয়াদি গ্রহণ করা হয়। এই কর্তা-কর্ম এবং করণরূপী তিন প্রকারের ভাব বারংবার উপস্থিত হতে থাকে। এর মধ্যে প্রত্যেকটির সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—তিন প্রকার ভেদ হয়ে থাকে। অনুভবও তিন প্রকারের, যার মধ্যে হর্ষ-শোক ইত্যাদির সমাবেশ থাকে। হর্ষ-প্রীতি-আনন্দ-সুখ এবং চিত্তের শান্তিলাভ সাত্ত্বিক গুণের লক্ষণ। অসন্তোষ, সন্তাপ, শোক, লোভ ও ক্রোধ—তা যে কোনো কারণ বা অকারণে হোক, রজোগুণের চিহ্ন। অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন, (অনাবশ্যক নিদ্রা) আলস্য—এগুলি যেভাবেই হোক, তমোগুণেরই নানাপ্রকার রূপ।

শব্দের আধার শ্রোত্রেন্দ্রিয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের আধার আকাশ, সুতরাং তা আকাশরূপই। এইরূপ ত্বক, নেত্র, জিহ্বা এবং নাসিকাও ক্রমশ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আশ্রয় এবং নিজ আধারভূত মহাভূতের স্বরূপ। এই সবগুলির অধিষ্ঠান মন ; তাই সবই মনস্বরূপ। কারণ যখন সকল ইন্দ্রিয়াদির কাজ যেক্ষণে শুরু হয়, তখন সেইসব বিষয়গুলি এক সঙ্গে অনুভব করার জন্য মনই সবার মধ্যে অনুগতরূপে উপস্থিত থাকে, তাই মনকে একাদশতম ইন্দ্রিয় বলা হয় এবং বুদ্ধিকে দ্বাদশতম বলে মানা হয়।

এইভাবে সমস্ত প্রাণী অনাদি অবিদ্যার ফলে স্বভাবত ব্যবহারপরায়ণ হয়ে আছে। এই অবস্থায় জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে আত্মার বিনাশের প্রশ্ন কোথায় ? সনাতন আত্মা কীভাবে বিনাশ হবে ? নদ ও নদী যেমন সমুদ্রে মিশে নিজের ব্যক্তিত্ব (রূপ) ও নাম ত্যাগ করে দেয়, তেমনই সমস্ত প্রাণী নিজ পরিচ্ছিন্ন রূপ ও নাম ত্যাগ করে মহৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়—এই হল তাদের মোক্ষ। এই অবস্থায় মৃত্যুর পর যখন উপাধি ত্যাগ হয়, তখন জীবের আর কোনো বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না।

এই মোক্ষবিদ্যা জেনে সতর্কভাবে যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, সে জলে কমল-পত্রের ন্যায় কর্মের অনিষ্ট ফলে কখনো লিপ্ত হয় না। সন্তানদের প্রতি আসক্তি এবং বিভিন্ন দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান—এসবই মানুষের সুদৃঢ় বন্ধনের কারণ হয়। যখন সে এই বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে সুখ-দুঃখের চিন্তা ত্যাগ করে ; তখন লিঙ্গ শরীরের অহং-ভাব ত্যাগ করে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি (মুক্তি) লাভ করে। শ্রুতির মহাবাক্যের ওপর বিচার এবং শাস্ত্রকথিত মঙ্গলময় (শম-দম ইত্যাদি) সাধনের অনুষ্ঠান করলে মানুষ জরা-মৃত্যু ভয়রহিত হয়ে সুখে নিদ্রা যায়। যখন পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় এবং তার থেকে প্রাপ্তব্য সুখ-দুঃখাদি ফল বিনাশপ্রাপ্ত হয় তখন সকল বস্তুতে আসক্তিরহিত ব্যক্তি আকাশের মতো নির্লেপ হয়ে নির্গুণ আত্মার সাক্ষাৎলাভ করে। জীব কর্মজালে পড়ে ঘুরে মরে। কর্মজাল থেকে মুক্তিলাভ করলেই সে দুঃখরহিত হয়। সাপ যেমন তার খোলস ত্যাগ করে সেটি উপেক্ষা করে চলে যায়, তেমনই যে ব্যক্তি শরীরে আসক্তি না রেখে তার প্রতি আপনত্বের অহংকার পরিত্যাগ করে, সে দুঃখ থেকে মুক্তি পায়। যেমন বৃক্ষের প্রতি আসক্তিবিহীন পাখি ভূপাতিত বৃক্ষ ছেড়ে উড়ে যায়, তেমনই যে ব্যক্তি লিঙ্গ শরীরের আসক্তি ত্যাগ করেছে, সেই মুক্ত পুরুষ সুখ-দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করে উত্তম গতি লাভ করে।

ভীষ্ম বললেন—আচার্য পঞ্চশিখের কথিত এই অমৃতময় জ্ঞান শুনে রাজা জনক এক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন এবং সর্বপ্রকার শোকত্যাগ করে অত্যন্ত সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। একবার তিনি মিথিলা নগরীকে আগুনে পুড়তে দেখে নির্বিকারভাবে বলেছিলেন যে, 'এই নগরী পুড়ে যাওয়াতে আমার কিছু দগ্ধ হয় না।'

রাজন্! এই অধ্যায়ে মোক্ষ-তত্ত্বের নির্ণয় করা হয়েছে ; যে সর্বদা এর স্বাধ্যায় এবং চিন্তা করবে, সে কোনো উপদ্রবের শিকার হবে না, দুঃখ কখনোই তার কাছে আসতে সাহস করবে না। রাজা জনক যেমন পঞ্চশিখের সমাগমে এই জ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়েছিলেন, তদনুরূপ সেই ব্যক্তিও মোক্ষ লাভ করবে।

—০—

দমের মহিমা, ব্রত ও তপের বর্ণনা, প্রহ্লাদ কর্তৃক ইন্দ্রকে উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভারত ! মানুষ কী করলে সুখী হয় এবং কী করলে সে সিদ্ধের ন্যায় জগতে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বেদার্থ বিচারকারী জ্ঞানী ব্যক্তি সাধারণত সকল বর্ণের জন্য এবং বিশেষত ব্রাহ্মণের জন্য মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমরূপ 'দমের'ই প্রশংসা করে থাকেন। যে ব্যক্তি দম পালন করেনি, সে নিজকর্মে পূর্ণ সাফল্য পায় না। কারণ ক্রিয়া, তপ এবং সত্য—এই সবগুলিরই আধার হল 'দম'। দমের দ্বারা তেজ বৃদ্ধি পায়। দমকে পরম পবিত্র বলা হয়। দমনশীল ব্যক্তি পাপ ও ভয়রহিত হয়ে 'মহৎ' পদ প্রাপ্ত করে। 'দম' পালনকারী ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখে জাগে, সুখে জগতে বিচরণ করে এবং সর্বদাই প্রসন্ন থাকে। দমের দ্বারাই তেজ ধারণ করা হয়, দমনশীল ব্যক্তিই রজোগুণকে জয় করে এবং সেই ভেতরের কাম-ক্রোধাদি শত্রুসমূহকে নিজ হতে পৃথক দেখতে পায়। যার মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে না, তাকে হিংস্র জন্তু মনে করে জগতের সমস্ত প্রাণীর তার থেকে ভয় হয়। এইসব উদ্দণ্ড মানুষের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দমন করার জন্যই ব্রহ্মা রাজার সৃষ্টি করেছেন। চার আশ্রমে দমকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। সমস্ত আশ্রমধর্ম পালন করলে যে ফল পাওয়া যায়, শুধু দমের পালনেই তার থেকে বেশি ফল লাভ হয়। এবার দমই যার উৎপত্তির উৎস আমি সেইসব গুণের কথা বর্ণনা করছি। কৃপণতা না থাকা, আবেশ না আসা, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অক্রোধ, সারল্য, অধিক কথা না বলা, অহং-ভাব ত্যাগ করা, গুরুপূজা, কারো গুণে দোষদৃষ্টি না করা, জীবে দয়া করা, বিবাদ না করা, মিথ্যাভাষণ, নিন্দা ও স্তুতি থেকে দূরে থাকা, সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা, ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের চিন্তা না করা—দম পালন দ্বারা এইসব গুণ প্রবর্তিত হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কারো সঙ্গে শত্রুতা করেন না, সকলের প্রতিই তাঁর সদ্ভাব থাকে। তিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাব বজায় রাখেন, সদাচারসম্পন্ন, শীলবান, প্রসন্নচিত্ত, ধৈর্যবান এবং দোষাদি দমনে সক্ষম হন। দমনশীল পুরুষ সমস্ত প্রাণীকে দুর্লভ বস্তু প্রদান করেন—অপরকে সুখ দিয়ে নিজে প্রসন্ন এবং সুখী হয়ে থাকেন। তিনি সকলের হিতে ব্যাপৃত থাকেন এবং কাউকে দ্বেষ করেন না। বৃহৎ জলাশয়ের মতো তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ থাকে না। তিনি সর্বদা জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত এবং প্রসন্ন থাকেন। যিনি সকল প্রাণীতে নির্ভয় থাকেন এবং সমস্ত প্রাণী যাঁর কাছে নির্ভয়ে থাকে, সেই দমনশীল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকলের প্রণম্য হয়ে থাকেন। যিনি অধিক সম্পত্তি পেয়ে হর্ষোৎফুল্ল হন না, সংকটে পড়লেও যিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন না, তাঁকে দ্বিজ, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয় বলা হয়। যিনি শাস্ত্রজ্ঞাতা, বৈদিক অনুষ্ঠান পালনকারী, সদাচারী এবং পবিত্র, সর্বদা দম পালন করেন, তিনি মহান ফল প্রাপ্ত হন। যাঁদের অন্তঃকরণ দূষিত, তাঁরা দোষদৃষ্টির অভাব, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, মিষ্ট বাক্য বলা, সত্যভাষণ, দান এবং উদ্যোগশীলতা ইত্যাদি গুণগুলিকে আপন করে নেন না। তাঁদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অহংকার দেখানো ইত্যাদি বদ্‌গুণ থাকে ; তাই উত্তম ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণদের উচিত জিতেন্দ্রিয় হয়ে কাম ও ক্রোধকে বশে রাখা, ব্রহ্মচর্য পালন করে ঘোর তপস্যায় রত হওয়া এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষারত হয়ে নির্দ্বন্দ্বভাবে জগতে বিচরণ করা।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ ! জগতে মানুষ প্রায়শ উপবাস করাকেই তপস্যা বলে থাকে, বাস্তবে কী সেটিই তপ, না অন্য কিছু ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সাধারণ মানুষ যে এক মাস বা পনেরো দিন উপবাস করাকে তপ বলে, তাতে আত্মজ্ঞানে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়, তাই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের বিচারে সেটি তপ নয়। তাঁদের মতে ত্যাগ এবং বিনয়ই উত্তম তপ ; তা পালনকারী মানুষ নিত্য উপবাসী এবং সতত ব্রহ্মচারী বলে কথিত হন। ত্যাগী এবং বিনয়ী ব্রাহ্মণকেই মুনি ও দেবতা মানা হয়। সুতরাং তিনি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থেকেও যেন সর্বদা ধর্মপালন করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং নিত্য জাগ্রত (সাবধানে) থাকেন। আমিষাদি আহার করেন না, সর্বদা পবিত্র থাকেন। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতময় অন্নগ্রহণ ও দেবতা, ব্রাহ্মণের পূজা করা উচিত। তাঁর সর্বদা যজ্ঞশিষ্ট অন্নের ভোক্তা, অতিথিসেবায় ব্রতী, শ্রদ্ধালু এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষ নিত্য উপবাসী, সতত ব্রহ্মচারী, যজ্ঞশিষ্ট অন্নের ভোক্তা এবং

অতিথি সেবায় ব্রতী কীভাবে হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সকাল ও সন্ধ্যায় আহার করে মধ্যবর্তী সময়ে অনাহারী থাকে, তাকে নিত্য উপবাসী বলে মনে করা হয়। যে দ্বিজ শুধু ঋতু-সমাগমের সময় স্ত্রী-সমাগম করে, সত্য কথা বলে এবং জ্ঞানে অবস্থান করে, সে সর্বদাই ব্রহ্মচারী। নিত্য দান যে করে তাকে পবিত্র বলে মানা হয়। যে কখনো দিবসে নিদ্রা যায় না, তাকে সর্বদা জাগ্রত বলে মনে করা উচিত। যে ব্যক্তি সর্বদা ভরণপোষণের যোগ্য মাতা-পিতাদি এবং অতিথিদের ভোজনের পরেই আহার গ্রহণ করে, সে অমৃত ভোজন করে থাকে। এই নিয়ম পালনের দ্বারা সে স্বর্গলোক জয় করে। শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ তাকেই যজ্ঞশিষ্ট অন্নভোক্তা বলে থাকেন। এরূপ ব্যক্তি অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়, তিনি ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর ধামে নিবাস করেন এবং অপ্সরাসহ সমস্ত দেবতা তাঁকে পরিক্রমা করেন। দেবতা ও পিতৃপুরুষের সঙ্গে বাস করে তিনি পুত্র-পৌত্রাদিসহ আনন্দ উপভোগ করেন। এভাবে তিনি অতি উত্তম গতি লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এই জগতে শুভ বা অশুভ যেসব কর্ম হয়, তা পুরুষকে তার সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়ে থাকে। কিন্তু পুরুষ সেই কর্মের কর্তা কি না—আমার এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং আমি আপনার মুখ থেকে তার ঠিকমতো সমাধান শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানীরা ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের কথোপকথনরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। প্রহ্লাদের মনে কোনো বিষয়ে আসক্তি ছিল না। তাঁর পাপ মুছে গিয়েছিল। দম্ভ ও অহংকার তাঁর মধ্যে একটুও ছিল না। তিনি ধর্ম-মর্যাদা পালন করতেন এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থান করতেন। তিনি চরাচর প্রাণীর উৎপত্তি ও লয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অপ্রিয় হলেও তিনি ক্রোধ করতেন না এবং প্রিয় লাভ হলেও হর্ষান্বিত হতেন না। মাটি ও সোনায় তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। তিনি আত্মার কল্যাণকারী জ্ঞানযোগে অবস্থান করতেন। পরমাত্মতত্ত্ব তিনি নিশ্চিতরূপে জেনেছিলেন। এরূপ সর্বজ্ঞ, সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় প্রহ্লাদকে একান্তে বসে থাকতে দেখে তাঁর বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য ইন্দ্র তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—দৈত্যরাজ ! যে গুণ লাভ করলে জগতে যে কোনো মানুষই সম্মানিত হতে পারে, তা সবই তোমার মধ্যে বিরাজমান। তোমার আত্মতত্ত্বের জ্ঞান আছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তোমার মতে কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন কী ? তোমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছিলে, শত্রুর বশীভূত হয়েছিলে এবং রাজ্যলক্ষ্মী চ্যুত হয়েছিলে, এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তুমি কেন শোকগ্রস্ত হওনি ? প্রহ্লাদ ! তুমি সংকটগ্রস্ত হয়েও কী করে নিশ্চিন্ত থাক ? তোমার এই স্থিতির কারণ আত্মজ্ঞান, না ধৈর্য ? ইন্দ্রের এই জিজ্ঞাসায় নিশ্চিত সিদ্ধান্তকারী প্রহ্লাদ নিজ জ্ঞানের বর্ণনা করে মধুর স্বরে বললেন।

প্রহ্লাদ বললেন—যারা প্রাণীদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না, অবিবেকের কারণে তাদের মোহ উপস্থিত হয়। জ্ঞানী কখনো মোহগ্রস্ত হন না। সর্বপ্রকার ভাব স্বভাবতই আসা-যাওয়া করে ; তাতে পুরুষের কোনো উদ্যোগ থাকে না এবং উদ্যোগ না থাকায় পুরুষ তার কর্তা হয় না, তা সত্ত্বেও তার মধ্যে কর্তৃত্বের অহংবোধ উদয় হয়। যে আত্মাকে শুভ-অশুভ কর্মের কর্তা বলে মনে করে, তার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করায় আমি তাকে দোষে আবৃত বলে মনে করি। ইন্দ্র ! পুরুষই যদি কর্তা হত, তাহলে সে নিজ কল্যাণের জন্য যা কিছু করত, তা সবই সিদ্ধ হত, তার কখনো পরাজয় ঘটত না। কিন্তু দেখা যায় যে যারা লাভের জন্য চেষ্টা করে, তারা প্রায়শই তাতে বঞ্চিত থেকে যায়। সুতরাং এতে পুরুষের উদ্যোগের সম্পর্ক কোথায় ? কত প্রাণীকেই আমরা লক্ষ্য করেছি তারা বিনা চেষ্টাতেই অনিষ্ট প্রাপ্ত হয় অথবা ইষ্ট লাভ করে না। কত সুন্দর বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে কুরূপ এবং মূর্খ মানুষের কাছে ধন প্রাপ্তির আশা করতে দেখা যায়। স্বভাবের প্রেরণাতেই যখন শুভ-অশুভ সর্বপ্রকার গুণ লাভ হয় তখন তার ওপর অভিমান করার কারণ কী ? আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি যে স্বভাবের দ্বারাই সব কিছু পাওয়া যায়। আমার আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধিও এর বিপরীত ধারণা পোষণ করে না। এখানে শুভ-অশুভ কর্মের যে ফললাভ হয়, লোকে তাকে কর্মেরই কারণ বলে মনে করে ; অতএব আমি তোমাকে কর্মের বিষয়ই সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করছি। শোনো। সমস্ত কর্ম স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়, যে এই কথা ঠিকভাবে জানে, দর্প না অহং-অভিমান তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

ইন্দ্র ! আমি ধর্মের গতি এবং সমস্ত ভূতের অনিত্যতা

সম্পর্কে জানি। তাই সবকিছু বিনাশশীল জেনে কারো জন্য শোক করি না। মমতা, অহংকার, কামনা ত্যাগ করে, সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত হয়ে, আত্মনিষ্ঠ এবং অসঙ্গ হয়ে প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশ লক্ষ্য করি। যে মন ও ইন্দ্রিয়কে অধীন করে তৃষ্ণা ও কামনা ত্যাগ করেছে, যে সর্বদা অবিনাশী আত্মার ওপর দৃষ্টি রাখে, সে কখনো কষ্ট পায় না। প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির প্রতি আমার মনে রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ, কোনোটাই নেই, আমি কাউকে শত্রু বা আত্মীয় বলে মনে করি না। আমি স্বর্গ, পাতাল বা মর্ত্যলোক, কোনোটিরই কামনা করি না, জ্ঞান-বিজ্ঞান অথবা জ্ঞেয়র জন্যও আমার কোনো অভিলাষ নেই।

ইন্দ্র বললেন—প্রহ্লাদ ! কী উপায়ে এরূপ বুদ্ধি ও এই প্রকার শান্তি লাভ হয়, আমি তা জানতে চাই, আমাকে বলো।

প্রহ্লাদ বললেন—ইন্দ্র ! সরলতা, সাবধানতা, বুদ্ধির নির্মলতা, চিত্তের স্থিরতা ও গুরুজনদের সেবা করলে পুরুষ মহৎ পদলাভ করতে সক্ষম হয়। এই গুণগুলিকে আয়ত্ত করলে স্বভাবতই জ্ঞান লাভ হয়, স্বভাবতই শান্তি পাওয়া যায়।

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের উত্তর শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে প্রহ্লাদের কথার প্রশংসা করলেন। শুধু তাই নয়, ত্রিভুবনপতি ইন্দ্র দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পূজা করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজ ধাম স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন।

———০———

নমুচি ও বলির সঙ্গে ইন্দ্রের কথোপকথন—কালের মহিমা বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে আর একটি পুরানো ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময়ের কথা, ইন্দ্র নমুচি নামক দৈত্যের কাছে গিয়ে বললেন—'নমুচি ! তোমাকে বন্দি করা হয়েছিল, রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছিলে, শত্রুর বশীভূত হয়েছিলে এবং রাজ্যলক্ষ্মী চ্যুত হয়েছিলে। এরূপ শোকের মধ্যে পড়েও তুমি শোকগ্রস্ত হওনি—এতো অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা ?'

নমুচি বললেন—ইন্দ্র ! শোক করলে শরীরে কষ্ট হয় এবং শত্রু প্রসন্ন হয়, তাহলে শোক কেন করব ? শোকের দ্বারা তো দুঃখ দূরীভূত হয় না। সন্তাপের দ্বারা রূপ, কান্তি, আয়ু এবং ধর্ম—সকলই নাশ হয়। সুতরাং অনিচ্ছাবশত আগত দুঃখের চিন্তা ত্যাগ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিজের কল্যাণের জন্য চিন্তা করা উচিত। পুরুষ যখন কল্যাণে মন সন্নিবেশ করে, তখনই যে তার সমস্ত অর্থ সিদ্ধ হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জগতের শাসনকর্তা একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই ; তিনিই গর্ভাশ্রিত প্রাণীকেও শাসন করেন। তার প্রেরণা অনুযায়ীই আমরা কার্য করি। পুরুষের যে বস্তু যেমন প্রাপ্ত হওয়ার কথা, তার সেই প্রকারই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বিধাতা জীবকে যেমন যেমন গর্ভে ফেলেন, তাকে সেখানেই থাকতে হয় ; সে নিজ ইচ্ছায় অন্য কোথাও যেতে পারে না। যে অবস্থা যখন আসে, সেটি হওয়ার ছিল—এইরূপ ভাব রেখে যে পরিস্থিতিকে সহর্ষে স্বীকার করে, সে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। মাঝে মাঝে সকলকেই কষ্টভোগ করতে হয়, তার জন্য কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। দুঃখ পাওয়ার কারণ হল এই যে পুরুষ বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বেষ করে নিজেকে তার কর্তা বলে মনে করে। ঋষি, দেবতা, শক্তিমান অসুর, বৈদিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ পুরুষ এবং বনবাসী মুনি—এর মধ্যে কে আছেন, যিনি বিপদে পড়েননি। কিন্তু যাঁর সদ-অসৎ জ্ঞান থাকে, তিনি মোহগ্রস্ত হন না। বিবেকশীল ব্যক্তি কখনো ক্রোধ করেন না, বিষয়াদিতে আসক্ত হন না, দুঃখজনক পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হন না তথা সুখের প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হন না। ভয়ানক কঠিন আর্থিক পরিস্থিতিতেও শোকগ্রস্ত হন না বরং সেই পরিস্থিতিতেও তিনি হিমালয়ের ন্যায় স্বভাবতই অবিচল থাকেন। যিনি অর্থসিদ্ধির জন্য মোহগ্রস্ত হন না, সংকটে পড়লেও যিনি ধৈর্য হারান না এবং সুখ-দুঃখের মধ্যেও সমভাবে বিরাজ করেন, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করা হয়। যিনি ধর্মতত্ত্ব জেনে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে বস্তু পাওয়া সম্ভব নয়, তাকে কোনো মন্ত্র, বল, পরাক্রম, বুদ্ধি, পুরুষার্থ, শীল, সদাচার এবং অর্থসম্পদের সাহায্যেও পাওয়া যায় না, তার জন্য শোক কীসের ? জীবের প্রারব্ধে যে যে সুখ ও দুঃখ নির্ধারিত আছে, সেগুলিই সে পায়। যেখানে যাওয়ার প্রারব্ধ থাকে, সেখানেই যায় এবং যা কিছু তার পাওয়ার থাকে, ততটাই সে পেয়ে থাকে—এই ভেবে যে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না এবং সর্বপ্রকার দুঃখে নিশ্চিন্ত থাকে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি বন্ধুবান্ধব অথবা রাজ্যনাশ হলে ঘোর সংকটে পড়ে যায়, তার কল্যাণের কী উপায় আছে ? জগতে আপনার থেকে উত্তম কোনো বক্তা নেই ; তাই একথা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যার স্ত্রী-পুত্র মারা গেছে, সুখ অপহৃত হয়েছে, অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং এই কারণে যে কঠিন বিপদে পড়েছে ; তার ধৈর্য ধারণ করাতেই কল্যাণ। তাত ! যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা সাত্ত্বিক বৃত্তির সাহায্য নিয়ে থাকে, সেই ঐশ্বর্য ও ধৈর্যপ্রাপ্ত হয় এবং সেই কার্যকুশল। এই বিষয়েও আমি আরও একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিচ্ছি, যেটি বলি ও ইন্দ্রের কথোপকথনরূপে আছে।

দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্য এবং দানবদের ভয়ানক সংহার হয়েছিল। বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণু তাঁর পায়ে ত্রিলোক মেপে অধিকার করেছিলেন। শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ছিলেন দেবতাদের রাজা। চার বর্ণের লোক তাদের নিজ নিজ ধর্মে অবস্থান করত। দেবতাদের উত্তমরূপে পূজা করা হত। ত্রিভুবনের অভ্যুদয় হচ্ছিল এবং সকলকে সুখী দেখে ব্রহ্মাও প্রসন্ন ছিলেন। এই সময়ের কথা। একদিন ইন্দ্র তাঁর ঐরাবত নামক গজরাজে চড়ে ত্রিলোক ভ্রমণে বার হলেন। তাঁর সঙ্গে রুদ্র, বসু, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, নাগ, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণও ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা একসময় সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে এক পর্বতের গুহায় বিরোচনকুমার বলি বিরাজ করছিলেন। তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই ইন্দ্র বজ্র হাতে নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতাদের মধ্যে ঐরাবতের ওপরে আসীন দেখেও দৈত্যদের প্রভু বলির মনে কোনোপ্রকার ভয় বা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়নি। তিনি নির্ভয়ে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ইন্দ্র বললেন—'বিরোচনকুমার ! তোমার শত্রুর সমৃদ্ধি দেখেও তুমি কষ্ট পাওনি, তার কারণ কী ? পরাক্রম, গুরুজনদের সেবা অথবা তপের দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হওয়ায় কী তোমার শোক হয় না ? অপরের কাছে এরূপ আচরণ অত্যন্ত কঠিন। তুমি শত্রুদের বশীভূত হয়ে উত্তম স্থান (স্বর্গরাজ্য) থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ—এই শোচনীয় অবস্থায় পড়েও তুমি কেন শোকগ্রস্ত হচ্ছ না ? পূর্বে পিতা-পিতামহের রাজ্যে তুমি মহারাজ হয়েছিলে ; এখন সেই রাজ্য শত্রুরা অধিকার করেছে—তা দেখেও তুমি কেন শোক করছ না ? লক্ষ্মী এবং অর্থ হারিয়েও দুঃখ না করা অত্যন্ত কঠিন। তোমা ছাড়া এমন আর কে আছে যে ত্রিভুবনের রাজ্য হারিয়েও বেঁচে থাকার উৎসাহ রাখে ?'

এরূপ নানা কঠোর ভাষা ইন্দ্র বলিকে বললেন। বলি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই সব শুনে নির্ভয়ে তার উত্তর দিলেন।

বলি বললেন—ইন্দ্র ! আমি যখন কালের হাতে বন্দি হয়েছি, তখন আর আমাকে দম্ভ দেখিয়ে কী লাভ ? আমি দেখছি আজ তুমি বজ্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ। আগে তোমার মধ্যে এতে সাহস ছিল না ; এখন যেনতেন প্রকারে শক্তিলাভ করে পরাক্রম দেখাচ্ছ ? তুমি ভিন্ন আর কে এত কঠোর বাক্য বলতে পারে ? যে সক্ষম হয়েও তার হাতে আসা বীর শত্রুদের দয়া করে, তাকেই মহাপুরুষ বলে মানা হয়। দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখন একজনের জয় এবং অপরজনের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে থাকে। তাই তুমি একথা ভেবো না যে তুমি তোমার বল ও পরাক্রমেই জয়লাভ করেছ। আজ তুমি ভালো অবস্থায় আছ, আমি নেই—এসব তোমার বা আমার চেষ্টার ফল নয়। সুতরাং তুমি আমাকে অপমান কোরো না। জীবকে সময় সময় কখনো সুখ এবং কখনো দুঃখ পেতে হয়। যেমন কাল তোমাকে এখন রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছে, তেমনই কাল আমাকেও হয়ত একসময়ে রাজা করবে। সময় যখন খারাপ হয় তখন কাল-পীড়িত মানুষকে তার বিদ্যা, তপ, দান, মিত্র এবং বন্ধুবান্ধবও রক্ষা করতে পারে না। শত আঘাতেও কেউ উপস্থিত অনর্থকে রোধ করতে পারে না। ইন্দ্র ! তুমি যে নিজেকে এই পরিস্থিতির কর্তা বলে মনে করছ—এই অহংকারই তোমার দুঃখের কারণ হবে। পুরুষ নিজেই যদি কর্তা হত, তাহলে অন্য কেউ তার উৎপন্নকারী হত না ; কিন্তু সে অপরের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাই ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউই কর্তা নয়।

দেবরাজ ! তোমার বুদ্ধি সাধারণ লোকেদের মতো, তাই অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে তোমার লক্ষ্য নেই। জগতে কিছু মূর্খ আছে, যাঁরা মনে করে থাকে যে তুমি নিজের পরাক্রমেই এই উত্তম পদ লাভ করেছ। কিন্তু আমার ন্যায় মানুষেরা, যারা জগতের অবস্থিতি জানে, সময়ের ফেরে পড়েও তারা শোক-মোহ বা ভ্রমে পড়ে না। আমি,

তুমি অথবা অন্য কেউ যাঁরা ভবিষ্যতে দেবতাদের অধিপতি হবেন একদিন ওই পথেই যাবেন, যেখানে আগে বহু ইন্দ্র প্রস্থান করেছেন।

যদিও আজ তুমি দুর্ধর্ষ হয়ে অত্যন্ত তেজে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছ ; কিন্তু স্মরণ রেখো, সময় হলে তুমিও আমার মতো কালের শিকার হবে। আজ পর্যন্ত হাজার হাজার ইন্দ্র কালগ্রাসে পতিত হয়েছে, কালের ওপর কারোরই কর্তৃত্ব চলে না। তুমি এই দেহ প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীর জন্মদানকারী সনাতন দেব ব্রহ্মার মতো নিজেকে অনেক বড় বলে মনে করছ, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে তোমার এই ইন্দ্রপদ আজ পর্যন্ত কারো জন্য অবিচল বা অনন্তকাল ধরে থাকেনি—এখানে কত ইন্দ্র এসেছে এবং চলে গেছে। তুমিই শুধু মূর্খতাবশত এটি নিজস্ব বলে মনে করছ।

দেবরাজ ! বিনাশশীল হওয়ার জন্য যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেই রাজ্যের ওপর তুমি বিশ্বাস কর, যা স্থায়ী নয়, তাকে স্থায়ী বলে মনে কর ; এ কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ; কারণ কাল যাকে ঘিরে আছে, সে এরূপই ভেবে থাকে। যে রাজ্যলক্ষ্মীকে মোহবশত নিজের বলে মনে করছ, তা তোমারও নয়, আমারও নয়, অন্য কারোরই নয়। ইনি কারো কাছেই অবিচলরূপে বিরাজ করেন না। বহু রাজার কাছে ছিলেন, এখন তোমার কাছে এসেছেন। ইনি স্বভাবত চঞ্চলা, সুতরাং কিছুদিন তোমার কাছে থেকে আবার অন্যত্র চলে যাবেন। আজ পর্যন্ত ইনি যে কত রাজাকে পরিত্যাগ করেছেন, তা গণনা করা সম্ভব নয়। তোমার পরেও বহু রাজন্যবর্গ এই রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করবেন। পূর্বকালে ইনি যেসব রাজার কাছে ছিলেন, আজ আর তাদের দেখা যায় না। পৃথু, পুরূরবা, ময়, ভীম, নরকাসুর, শম্বরাসুর, অশ্বগ্রীব, পুলোমা, স্বর্ভানু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, হ্রীনিষেব, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান, বৃষ, সত্যেষু, ঋষভ, বাহু, কপিলাক্ষ, বিরূপক, বাণ, কার্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বদংষ্ট্র, নৈর্ঋতি, সংকোচ, বরীতাক্ষ, বরাহাশ্ব, রবিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ, বিষাণ্ড, বিস্কর, মধু, হিরণ্যকশিপু, কৈটভ—এঁরা এবং আরও বহু দৈত্য, দানব, রাক্ষস পূর্বে পৃথিবীর প্রভু হয়েছিলেন। যেসব পূর্ববর্তী রাজাদের নাম আমরা শুনতে পাই, তাঁরা সকলেই কালের গতিতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন ; কারণ কালই সবথেকে বেশি বলবান।

তুমিই যে শুধু শত যজ্ঞ করেছ, তা নয়। ওঁইসব রাজারাও শত শত যজ্ঞ করেছিলেন, সকলেই ধর্মাত্মা ছিলেন এবং নিরন্তর যজ্ঞেই ব্যাপৃত থাকতেন। তোমার মতোই তাঁরাও আকাশে বিচরণ করতেন, বহু মায়া জানতেন এবং ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করতেন। তাঁদের তেজ ও প্রতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কাল এঁদেরও সংহার করেছেন। এই পৃথিবী উপভোগ করার পর যেদিন তোমাকে এটি ত্যাগ করতে হবে, সেদিন তুমি তোমার শোক প্রশমন করতে পারবে না ; সুতরাং বিষয়ভোগের ইচ্ছা পরিহার করো, রাজ্যলক্ষ্মীর অহংকার ত্যাগ করো। তবেই তুমি রাজ্যনাশ হলেও ধৈর্য সহকারে সেই শোক সহ্য করতে পারবে। শোকের সময় শোক কোরো না এবং আনন্দে হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না। ইন্দ্র ! আমার এই কটু সত্যের জন্য ক্ষমা কোরো। আর দেরি নেই, তোমার ওপরও কালের আক্রমণ হবে, তুমিও তার থেকে ভয়প্রাপ্ত হবে। এখন তুমি তীক্ষ্ণ বাক্য বাণে আমাকে বিদ্ধ করছ। আমি শান্ত হয়ে বসে আছি, তাই নিজেকে অনেক সুখী বলে মনে করছ। কিন্তু মনে রেখো, যে কাল আমাকে আক্রমণ করেছে, সে তোমাকেও ছাড়বে না। দেবতাদের এক হাজার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই তুমি ইন্দ্র হয়ে থাকবে।

দেবেন্দ্র ! তুমি আমাকে জানো, আমিও তোমায় জানি। তাহলে আর আমার কাছে এত অহংকার কেন দেখাচ্ছ ? আমি যখন রাজা ছিলাম, তখন যে পরাক্রম দেখিয়েছিলাম, তা তোমার অজানা নয়। তার একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। প্রথমে যখন দেবাসুর-সংগ্রাম হয়েছিল, সেই সময়কার কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি ; আমি একাই সমস্ত আদিত্য, রুদ্র, সাধ্য, বসু এবং মরুদ্গণকে পরাস্ত করেছিলাম। আমার পরাক্রমে দেবতাদের মধ্যে পালাবার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তোমার মাথায়ও কত পাহাড় ভেঙেছিলাম ; কিন্তু এখন আমি আর কী করব, কালকে লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন। তোমার হাতে বজ্র থাকলেও আমি শুধু কিল-ঘুসির দ্বারাই তোমাকে মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু আমার এখন পরাক্রম দেখানোর নয়, ক্ষমা করার সময়। তাই তোমার সব অপরাধ চুপ করে সহ্য করছি, সেজন্যই তুমিও মিথ্যে অহংকার দেখিয়ে যাচ্ছ। মানুষ যেমন দড়ি দিয়ে পশুকে বাঁধে, তেমনই ভয়ংকর কালও তার পাশে আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। পুরুষের লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ,

কাম-ক্রোধ, জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মোক্ষ—এসবই কালের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। যে কালের প্রভাবকে জানে, সে কষ্টেও শোক করে না ; কারণ দুঃখ করলে শোক লাঘবে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না, এই ভেবে আমি শোক করি না। শোকগ্রস্ত মানুষকে শোক তার বিপদ থেকে মুক্ত তো করেই না, বরং তার শক্তি ক্ষীণ করে দেয় ; তাই আমি শোক করি না।

বলির কথা শুনে ইন্দ্রের ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি শান্ত হয়ে বললেন—"দৈত্যরাজ ! বজ্রসম আমার উদ্যত হাত দেখে মারার ইচ্ছায় আগত মৃত্যুর হৃদয়ও কেঁপে ওঠে, অতএব এমন কে আছে যে ভয় পাবে না ; কিন্তু তোমার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং স্থির, তাই সেটি একটুও বিচলিত হয় না। তুমি ধৈর্যশীল বলে তোমার ভয় হয় না। প্রকৃতপক্ষে কালকে পরিহার করা যায় না, তা লঙ্ঘনের কোনো উপায় নেই। কাল সব প্রাণীর সঙ্গেই একপ্রকার ব্যবহার করে। সে দিন-রাত-মাস-ক্ষণ-লয় এবং সবকিছুর হিসাব করে প্রাণীকে দুঃখ দিতে থাকে। নদীতে হঠাৎ বন্যা হলে যেমন নদী কিনারের গাছকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনই 'এই কাজ আজ করব, ওটি কাল করব' এরূপ চিন্তারত মানুষকে কাল হঠাৎ করে এসে অধিকার করে। 'আরে ! ওকে তো এখনই দেখলাম, ও কী করে মারা গেল ?'—এইভাবে কালের গতিতে ভেসে যাওয়া মানুষের প্রলাপ শুনতে পাওয়া যায়। ধন-ঐশ্বর্য-ভোগ ও স্থান—এ সবই কালের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কালই সমস্ত প্রাণীর জীবন হরণ করে। জন্মের পরিণাম মৃত্যু। যা কিছু দেখা যায়, সবই বিনাশশীল, অস্থির ; তা সত্ত্বেও এই কথা সবসময় স্মরণে রাখা কঠিন হয়। অবশ্য তুমি তত্ত্বজ্ঞ এবং স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই তুমি ভীত নও। কাল অত্যন্ত প্রবল, সে সমস্ত জগৎকে আক্রমণ করে বশীভূত করে রেখেছে। কাল কখনো দেখে না, কে ছোট আর কে বড় ; সে সকলকেই তার আগুনে পুড়িয়ে দেয়, তবুও কারো চেতনা হয় না। লোকে ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা এবং মোহতে আবদ্ধ হয়ে নিজের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তুমি বিদ্বান, জ্ঞানী এবং তপস্বী, কালের লীলা এবং তার তত্ত্ব জানো, সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানে তুমি নিপুণ এবং তত্ত্ব বিচারে কুশল ও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

আমার বিশ্বাস যে তুমি তোমার বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত লোকের তত্ত্ব জেনে নিয়েছ। তুমি সর্বত্র বিচরণ করেও সবার থেকে মুক্ত, তোমার কোথাও কোনো আসক্তি নেই। তুমি ইন্দ্রিয়াদি জয় করেছ, তাই রজোগুণ ও তমোগুণ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তুমি হর্ষ ও শোকরহিত আত্মার উপাসনা কর। সব প্রাণীর প্রতি তোমার সৌহার্দ্য আছে, কারো প্রতি বৈরিতা নেই। তোমার চিত্তে সর্বদাই শান্তি বিরাজমান। তোমাকে দেখে আমার মনে দয়ার সঞ্চার হচ্ছে। আমি তোমার মতো জ্ঞানীকে বন্ধন করে মারতে চাই না। এখন আমার দিক থেকে তোমার আর কোনো বাধা নেই। তুমি সুস্থ ও সুখী থাক।"

এই বলে দেবরাজ ইন্দ্র গজরাজে উঠে সেখান থেকে রওনা হলেন এবং সমস্ত অসুর জয় করে সকলের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে আনন্দে থাকতে লাগলেন। সেই সময় সুব্রাহ্মণেরা তাঁর স্তুতি করল এবং তিনি স্বর্গলোকে ফিরে এসে সুখে দিনযাপন করতে লাগলেন।

ইন্দ্রের কাছে লক্ষ্মীর আগমন এবং দানব-দৈত্যদের উত্থান-পতনের কারণ জানানো

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে পুরুষের উত্থান-পতন আসন্ন তার পূর্ব লক্ষণ কীরূপ ? কৃপা করে তা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যার উত্থান-পতন আসন্ন, তার মনই পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ করে। এই বিষয়ে লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রের কথোপকথন রূপে এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হচ্ছে, শোনো। কোনো এক সময়ের কথা, দেবর্ষি নারদ প্রভাতে নিদ্রা ত্যাগ করে পবিত্র জলে স্নান করার জন্য ধ্রুবলোকের দ্বার থেকে উৎপন্ন গঙ্গাতীরে গিয়ে জলে নামলেন। এর মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রও সেইখানে এলেন। তারপর দুজনেই ডুব দিয়ে মনকে একাগ্র করে সংক্ষেপে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন। অতঃপর দুজনে গঙ্গাতীরে, সুবর্ণ বালুকাকীর্ণ ঘাটে বসে অনেক পুণ্যাত্মা, দেবর্ষি এবং মহর্ষিদের কাছ থেকে পুণ্য কথা শুনতে লাগলেন। দুজনে একাগ্র চিত্তে যখন এইসব শুনছিলেন তখন কিরণজালে মণ্ডিত হয়ে ভগবান সূর্যনারায়ণ উদিত

হলেন। দুজনে তখন দণ্ডায়মান হয়ে সূর্যোপস্থান করলেন।

সেই সময় আকাশে এক দিব্যজ্যোতি দেখা গেল, যা ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছিল। সেটি ভগবান বিষ্ণুর বিমান, নিজ প্রভায় ত্রিলোককে আলোকিত করে সেটি অনুপম শোভা বিস্তার করছিল। নারদ এবং ইন্দ্র সেই বিমানে সাক্ষাৎ

লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করলেন, তিনি পদ্মপত্রের ওপর বিরাজমান ছিলেন। সুন্দরী রমণী শ্রেষ্ঠা লক্ষ্মীদেবী উত্তম বিমান থেকে নেমে ইন্দ্র ও নারদের কাছে এলেন। ইন্দ্র ও নারদ এগিয়ে দেবীর কাছে গিয়ে হাতজোড় করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে নিজেদের নাম নিবেদন করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন ?'

লক্ষ্মীদেবী বললেন—ইন্দ্র ! ত্রিলোকের চরাচর প্রাণী আমার স্বরূপপ্রাপ্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে। আমি সমস্ত প্রাণীকে ঐশ্বর্য প্রদানের নিমিত্ত সূর্য কিরণে প্রস্ফুটিত কমলে উদ্ভাসিত হয়েছি। আমাকে লোকে পদ্মা, শ্রী এবং পদ্মমালিনী বলে। আমিই লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, সমৃদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি এবং স্মৃতি। ধর্মশীল পুরুষের দেশে, নগরে এবং গৃহে আমার নিবাস। যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না যে রাজা, সেই বিজয় দ্বারা সুশোভিত বীর রাজার দেহে আমি সর্বদা উপস্থিত থাকি। নিত্য ধর্মাচরণকারী, বুদ্ধিমান, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, বিনয়ী এবং দানশীল পুরুষদের মধ্যে সদাই নিবাস করি। আমি সত্য ও ধর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আগে অসুরদের মধ্যে থাকতাম, কিন্তু এখন তাদের ধর্মের বিপরীত দেখে তোমাদের এখানে থাকার চিন্তা করছি।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—দেবী ! দৈত্যদের আচরণ আগে কেমন ছিল, যার জন্য আপনি ওদের কাছে ছিলেন, আর এখন কী দেখলেন যে ওদের ছেড়ে আমার কাছে এসেছেন ?

লক্ষ্মীদেবী বললেন—যারা নিজ ধর্ম পালন করে এবং ধৈর্য থেকে বিচলিত হয় না ; সেই প্রাণীদের মধ্যে আমি নিবাস করি। আগে দৈত্যরা দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকত। দেবতা, পিতৃপুরুষ, গুরু ও অতিথিদের পূজা করত। তাদের সর্বদা সত্য কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল, নিজেদের ঘর-দ্বার তারা পরিষ্কার করে রাখত। প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করত এবং তারা গুরুসেবক, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী ছিল। তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল, ক্রোধ ছিল না, তারা দাতা ছিল কিন্তু পরনিন্দা করত না। ঈর্ষা ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভরণ-পোষণ করত। তাদের মধ্যে অমর্ষ বা অহংকার ছিল না, সবার স্বভাব ভালো ছিল, সকলেই দয়ালু ছিল, সকলের মধ্যে সরলতা, সুদৃঢ় ভক্তি এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের গুণ ছিল। সকলেই নিজ ভৃত্য ও মন্ত্রীদের সন্তুষ্ট রাখত এবং কৃতজ্ঞ ও মধুরভাষী ছিল। তারা সকলকে যথাযোগ্যরূপে সম্মান করত, ধন দান করত, ব্রত-নিয়ম পালন করত এবং উপবাস ও তপে ব্যাপৃত থাকত। তারা সকলের বিশ্বাসপাত্র ছিল। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করত এবং রাতে কখনো দধি ও ছাতু খেত না। প্রাতঃকালে ঘৃত এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক বস্তু দর্শন করত এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করত। সর্বদা ধর্মচর্চায় রত থাকত এবং প্রতিগ্রহ থেকে দূরে থাকত। রাত্রের অর্ধভাগে নিদ্রা যেত, দিনে কখনো নিদ্রা যেত না।

কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্বল, রোগী এবং নারীদের দয়া করত এবং তাদের অন্ন-বস্ত্র দান করত। ব্যাকুল, বিষাদগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন, ভীতসন্ত্রস্ত, রোগী, দুর্বল এবং যার সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে, তাদের সর্বদা সান্ত্বনা প্রদান করত। ধর্মাচরণ করত, একে অপরের প্রাণ হরণ করত না। কাজের সময় পরস্পর অনুকূল এবং গুরুজন ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবায় তৎপর থাকত। পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং অতিথিদের বিধিবৎ পূজা করে, তাদের অর্পণ করার পর

অবশিষ্ট অন্ন প্রত্যহ প্রসাদরূপে গ্রহণ করত, সকলেই সত্যবাদী এবং তপস্বী ছিল। তারা উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে একাকী আহার করত না। প্রথমে অপরকে দিয়ে তারপর নিজেরা গ্রহণ করত। সকল প্রাণীকে আপন মনে করে দয়া করত। বুদ্ধিমত্তা, সরলতা, উৎসাহ, অহংকারহীনতা, পরম সৌহার্দ্য, ক্ষমা, সত্য, দান, তপ, পবিত্রতা, দয়া, কোমল বাক্য এবং মিত্রদের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রীতি—এই সব সদ্‌গুণ সর্বদা তাদের মধ্যে বিরাজ করত। নিদ্রা, আলস্য, অপ্রসন্নতা, দোষদৃষ্টি, অবিবেক, অসন্তোষ, বিষাদ, কামনা ইত্যাদি দোষ তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারত না। এইরূপ গুণসম্পন্ন দানবদের কাছে আমি সৃষ্টিকাল থেকে এখন পর্যন্ত বহুযুগ ধরে থেকেছি।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তাদের গুণে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। আমি দেখেছি দৈত্যদের মধ্যে ধর্ম বলে আর কিছু নেই, তারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে গেছে। প্রবীণ ব্যক্তিরা যখন সভায় বসে কোনো আলোচনা করতে থাকে তখন গুণহীন দৈত্যেরা তাদের দোষ বার করে তামাশা করতে থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সভায় প্রবেশ করলেও যুবকেরা আসনে বসেই থাকে, আগের মতো সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানায় না। পিতা থাকতেই পুত্র মালিক হয়ে যায়। পুত্র পিতার এবং পত্নী পতির নির্দেশ মানে না। মাতা-পিতা, বৃদ্ধ, আচার্য, অতিথি এবং গুরুর সম্মান জানানো উঠে গেছে। সন্তানদের লালনপালনও সেরূপভাবে হয় না। দেবতা, পিতৃপুরুষ, অতিথি এবং গুরুজনদের পূজা এবং অন্নদান না করেই সকলে আহার গ্রহণ করে। তাদের রন্ধন কক্ষও পবিত্র থাকে না। দৈত্যরা দুধে ঢাকনা না দিয়ে খোলা রেখে দেয় এবং ঘি-পাত্র উচ্ছিষ্ট হাতে স্পর্শ করে। পশুদের গৃহে বেঁধে রাখে এবং তাদের পরিমাণমতো খেতেও দেয় না। বালক ও শিশুদের সামনে দানবেরা আহার করে, তাদের খেতেও দেয় না। পরিচারকদের ক্ষুধার্ত রেখে নিজেরাই খেয়ে নেয়। তারা সূর্যোদয় হলেও নিদ্রা যায়, প্রভাতকে রাত্রি মনে করে। তাদের গৃহে সব সময় কলহ লেগে থাকে। তারা আশ্রমবাসী মহাত্মাদের প্রতি এবং নিজেদের মধ্যেও দ্বেষ করে থাকে।

তাদের মধ্যে বর্ণসংকর সন্তান উৎপন্ন হচ্ছে ; কারো মধ্যে পবিত্রতা নেই। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের অথবা মূর্খদের সম্মান এবং অসম্মান করায় কোনো পার্থক্য রাখে না। তাদের দাসীগণ নানারূপ সাজসজ্জা করে দুরাচারিণী রমণীদের মতো চলা-ফেরা, ওঠা-বসা এবং কটাক্ষ করতে থাকে। ক্রীড়ার সময় পুরুষেরা নারীবেশ এবং নারীরা পুরুষবেশ ধারণ করে। বহু দানব তাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত জমিজমা ছিনিয়ে নিয়েছে। যারা ব্যবসায়ী তারা সর্বদাই অন্যের ধন হস্তগত করে নেবার চিন্তা করে। শিষ্যদের মধ্যে গুরুকে সেবা করার ভাবই নেই, অন্যদিকে গুরুই শিষ্যের সেবা করেন। বধূ শ্বশুর-শাশুড়ির সমক্ষেই পরিচারকদের ওপর হুকুম চালায়। পত্নী পতিকে শাসন করে এবং নাম ধরে ডাকে। যাদের হিতৈষী এবং মিত্র বলে মনে করা হত, তারাই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের ধন-সম্পদ নষ্ট হলে দ্বেষবশত তাই নিয়ে হাসি-তামাশা করে। সকলেই নাস্তিক, কৃতঘ্ন এবং পাপাচারী হয়ে গেছে। যে খাদ্য খাওয়া উচিত নয়, তাই খাবে এবং মর্যাদা ত্যাগ করে ইচ্ছামতো আচরণ করবে। তাই তাদের চেহারায় আর আগের মতো সেই কান্তি নেই।

দেবেন্দ্র ! যখন থেকে এই দৈত্যেরা ধর্মের বিপরীত আচরণ শুরু করেছে, তখনই আমি স্থির করেছি যে আর আমি এদের কাছে থাকব না। সেই কারণেই আমি ওদের ত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি ; তুমি আমাকে স্বীকার করো। আমি যেখানে বসবাস করব, সেখানে আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সংনতি, ক্ষমা এবং জয়া—এই আট দেবীও আমার সঙ্গে বাস করবে। আটজনের মধ্যে জয়াই প্রধান। এই আটজন দেবী আমার সঙ্গেই অসুরদের ত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছে। দেবতাদের মন ধর্মে ব্যাপৃত থাকে, তাই আমরা এখন এখানেই বাস করব।

ভীষ্ম বললেন—লক্ষ্মীদেবীর কথা শুনে দেবর্ষি নারদ এবং ইন্দ্র তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানালেন। সেই সময় শীতল, সুখপ্রদ, সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই পবিত্র স্থানে লক্ষ্মীদেবীসহ ইন্দ্রকে দর্শন করার জন্য সমস্ত দেবতা উপস্থিত হলেন। তারপর ইন্দ্র মহর্ষি নারদ ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে স্বর্গে এলেন এবং দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে সভায় বিরাজিত হলেন। দেবর্ষি নারদ লক্ষ্মীদেবীর শুভাগমনের প্রশংসা করতে লাগলেন। পিতামহ ব্রহ্মার লোকে অমৃত বর্ষা হতে লাগল। দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল। চতুর্দিক নির্মল ও শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠল। লক্ষ্মীদেবীর আগমনে জগতে সময়মতো বর্ষা হতে লাগল, কেউই ধর্মপথ থেকে বিচলিত হত না। পৃথিবীতে বহু রত্নখনি আবিষ্কৃত হল। মানুষ, দেবতা, কিন্নর, যক্ষ এবং

রাক্ষসদের সমৃদ্ধি বেড়ে গেল। তারা সর্বদাই প্রসন্নভাবে থাকতে লাগল। গাভী দুগ্ধ প্রদানের সঙ্গে সমস্ত কামনাও পূরণ করতে লাগল। কেউই কঠোর বাক্য বলত না। যেসব ব্যক্তি ইন্দ্র ও দেবতাদের দ্বারা কৃত ভগবতী লক্ষ্মীর আরাধনা সম্বন্ধিত এই অধ্যায় ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে পাঠ করেন, তাঁরা যদি ধন লাভে ইচ্ছুক হন, তবে প্রচুর মাত্রায় সম্পত্তি লাভ করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে উত্থান-পতনের পূর্ব লক্ষণের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে, আমি তার উত্তর লক্ষ্মীদেবী কথিত দানবদের উত্থান-পতনের কারণ রূপে বলে দিয়েছি। তুমি পরীক্ষা করে এর যাথার্থ্য স্থির করতে পার।

দেবলকে জৈগীষব্যের সমত্ববুদ্ধির উপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উগ্রসেনের নিকট দেবর্ষি নারদের গুণাবলির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কীরূপ শীল, কী প্রকার আচরণ, কেমন বিদ্যা এবং কী পরিমাণ পরাক্রমযুক্ত হলে মানুষ প্রকৃতির অতীত, অবিনাশী, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে মোক্ষোপযোগী ধর্মপালনে ব্যাপৃত থাকে, সে-ই প্রকৃতির অতীত, অবিনাশী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে জৈগীষব্য মুনি এবং অসিত-দেবলের কথোপকথনরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়।

একবার সমস্ত ধর্মবেত্তা মহাজ্ঞানী জৈগীষব্য মুনিকে অসিত-দেবল জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আপনাকে কেউ প্রণাম করলেও আপনি বেশি প্রসন্ন হন না আবার কেউ নিন্দা করলেও তার ওপর ক্রুদ্ধ হন না—এ আপনার কেমন বুদ্ধি, কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এর ফল কী ?

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সেই মহাতপস্বী সন্দেহরহিত, পবিত্র এবং সার্থক বাক্যে বললেন।

জৈগীষব্য বললেন—মুনিবর ! পুণ্যকর্মকারী মানুষেরা যার প্রভাবে উত্তম গতি ও পরম শান্তিলাভ করেন ; সেই বুদ্ধির কথা তোমায় বলছি, শোনো—মহাত্মা ব্যক্তিকে যদি কেউ নিন্দা করে, প্রশংসা করে অথবা তাঁর সদাচার ও পুণ্যকর্মগুলিকে আড়াল করে রাখে, তা সত্ত্বেও তিনি সকলের প্রতি একপ্রকারই বুদ্ধি রাখেন। তাঁকে কেউ কটুবাক্য বললে, তার পরিবর্তে তিনি কিছুই বলেন না। মন্দ ব্যবহার যারা করে, তাদের প্রতিও মন্দ ব্যবহার করেন না। নিজে মার খেলেও, যে মারে তাকে আঘাত করতে চান না। ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমানের কাজই ভালোভাবে করে থাকেন। যা হয়ে গেছে, তার জন্য শোক করেন না। কোনো কিছুর জন্য প্রতিজ্ঞা করেন না, তাঁর জ্ঞান পরিপক্ক হয়ে থাকে। তিনি মহাবুদ্ধিমান, ক্রোধজয়ী এবং জিতেন্দ্রিয় হন। কায়-মনো-বাক্যে কখনো কারো প্রতি অন্যায় করেন না, মনে ঈর্ষা রাখেন না। অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা থেকে দূরে থাকেন। নিজ নিন্দা বা প্রশংসা শুনে তাঁর চিত্তে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না। তিনি সর্বতোভাবে শান্ত ও সমস্ত প্রাণীর হিতে সংলগ্ন থাকেন। হৃদয়ের অজ্ঞান গ্রন্থি খুলে চতুর্দিকে আনন্দের সঙ্গে বিচরণ করেন। তাঁর কোনো শত্রু থাকে না, তিনিও কারো শত্রু হন না। যে সব মানুষের এইরূপ আচরণ হয়, তাঁরা সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। যাঁরা ধর্মজ্ঞ হয়ে ধর্মানুসারে চলেন, তাঁরা সুখী হন এবং যারা ধর্মপথ ভ্রষ্ট হয়, তাদের সর্বদা দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমিও ধর্মপথ অবলম্বন করেছি, সুতরাং আমার নিন্দা শুনে কাকে দ্বেষ করব ? প্রশংসা শুনেও বা কেন হাসব ? নিন্দাতেও আমার কোনো ক্ষতি হয় না, প্রশংসাতেও কোনো লাভ হয় না। তত্ত্ববেত্তাদের উচিত অপমানকে অমৃততুল্য ভেবে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং সম্মানকে বিষতুল্য মনে করে তাতে ভয় পাওয়া। নির্দোষ মহাত্মা পুরুষ অপমানিত হয়েও ইহলোকে ও পরলোকে সুখে নিদ্রা যান, কিন্তু তাঁর অপমানকারী ব্যক্তি নিজের অপরাধেই মারা পড়ে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তম গতি লাভ করতে চান, তিনি এই ব্রত আচরণ করে সুখী হন এবং ইন্দ্রিয়াদিকে বশে রেখে অবিনাশী ব্রহ্মপদ লাভ করেন। তিনি যে গতি প্রাপ্ত হন তা দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসদের কাছেও অত্যন্ত দুর্লভ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জগতে কোন্

ব্যক্তি সকল লোকের প্রিয় এবং সমস্ত গুণযুক্ত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে

আমি শ্রীকৃষ্ণ এবং উগ্রসেনের সংবাদ শোনাচ্ছি, যা নারদের বিষয়ে আলোচিত হয়েছিল। একদিন উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন ! সকলেই নারদের গুণের প্রশংসা করেন, তাতে মনে হয় তিনি অত্যন্ত গুণবান ; সুতরাং তুমি আমার কাছে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করো।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাজন্ ! শুনুন ; আমি দেবর্ষি নারদের উত্তম গুণগুলি সংক্ষেপে জানাচ্ছি। তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনই সচ্চরিত্র, কিন্তু তার জন্য তাঁর মনে একটুও অহংকার নেই। তাই তিনি সর্বত্র সম্মানিত হন। নারদের মধ্যে অসন্তোষ, ক্রোধ, চাপল্য, ভয় ইত্যাদি দোষ নেই। তিনি কোনো কামনা বা লোভের জন্য নিজের মত পরিবর্তন করেন না ; তাই সকলের পূজনীয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রে বিদ্বান ; ক্ষমাশীল, শক্তিমান, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী হওয়ায় তাঁকে সর্বত্র পূজা করা হয়। তেজ, যশ, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিনয়, উত্তম কুল এবং তপস্যাতেও ইনি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্বভাব অত্যন্ত ভালো, তিনি সকলকে সম্মান করেন, পবিত্রভাবে থাকেন এবং ভালো কথা বলেন। কাউকে ঈর্ষা করেন না। এইসকল গুণের জন্যই তাঁকে সর্বত্র সম্মান করা হয়। তিনি সকলের মঙ্গল করেন, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র ক্লেদ নেই, তাঁর সহ্যশক্তিও খুব বেশি এবং তিনি সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, তাই তাঁর কাছে কেউ প্রিয়ও নেই, কেউ অপ্রিয়ও নয়। তাঁর বহু শাস্ত্রের জ্ঞান আছে এবং তাঁর কথা বলার ভঙ্গিও অতি বিচিত্র। পূর্ণ পাণ্ডিত্য থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে লোভ বা শঠতা নেই। কৃপণতা, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি দোষ তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। আমার প্রতি তাঁর দৃঢ় ভক্তি আছে। তাঁর হৃদয় শুদ্ধ, তিনি শাস্ত্রজ্ঞাতা, দয়ালু এবং মোহাদি দোষবর্জিত। তাঁর বুদ্ধিতে সন্দেহের কোনো স্থান নেই, তিনি অত্যন্ত সুবক্তা। তাঁর মন বিষয়োপভোগের দিকে যায় না, তিনি কখনো নিজের প্রশংসা করেন না। ঈর্ষা থেকে দূরে থাকেন এবং মিষ্টবাক্য বলেন, তাই তিনি সর্বত্র সম্মানিত হন। তিনি কোনো শাস্ত্রকে দোষদৃষ্টিতে দেখেন না, সময়কে বৃথা যেতে দেন না এবং নিজ মনকে বশে রাখেন। তাঁর বুদ্ধি পবিত্র, সমাধিতে তিনি কখনো তৃপ্তি লাভ করেন না, কর্তব্য পালনের জন্য সর্বদা উদ্যত থাকেন এবং কখনো প্রমাদ করেন না। লোকেরা তাদের ভালো কাজে তাঁকে সর্বদা স্মরণ রাখে। তিনি কারো গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করেন না। অর্থ প্রাপ্তিতে তাঁর প্রসন্নতা আসে না এবং না পেলেও দুঃখিত হন না। তাঁর বুদ্ধি স্থির এবং মন আসক্তিরহিত, তাই সকল স্থানে তাঁর পূজা হয়ে থাকে। তিনি সমস্ত গুণে সুশোভিত, কার্যকুশল, পবিত্র, নীরোগ, সময়ের মূল্য বোঝেন এবং পরমপ্রিয় আত্মতত্ত্বের জ্ঞাতা, তাই তিনি সকল লোকের প্রিয় !

শুকদেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্যাসদেবের কালের স্বরূপ এবং সৃষ্টির উৎপত্তি জানানো

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আমি এবার জানতে চাই যে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি কী থেকে হয় ? তাদের লয় কোথায় হয় ? পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য কার ধ্যান এবং কোন কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত ? কালের স্বরূপ কী এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে মানুষের আয়ু কেমন হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে ভগবান

ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেবকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তোমাকে সেই প্রসঙ্গে বলছি। একদিন শুকদেব বেদব্যাসকে তাঁর মনের সন্দেহ নিরসনে জিজ্ঞাসা

করলেন—'পিতা ! পাপীদের কে উৎপন্ন করেন ? কালতত্ত্বের জ্ঞানলাভে কী পরিণাম পাওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণদের কী কর্তব্য ? আপনি কৃপা করে আমাকে সব বলুন।'

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! সৃষ্টির প্রারম্ভে অনাদি, অনন্ত, অজ, দিব্য, অজর, অমর, অবিকারী, অতর্ক এবং জ্ঞানাতীত ব্রহ্মই বিরাজ করতেন। তিনি কালস্বরূপ। কালের কলা, কাষ্ঠা ইত্যাদি যত প্রকার ভিন্নতা আছে, তা সবই তাঁর অবয়ব। মহর্ষিগণ পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলা এবং তিন কাষ্ঠায় এক মুহূর্ত এবং ত্রিশ মুহূর্তে একটি রাত-দিন মান্য করেন। ত্রিশ দিন-রাতে এক মাস এবং বারো মাসে এক বছর। এক বর্ষে দুই অয়ন হয়, তাকে দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ বলা হয়। মনুষ্যলোকের দিন ও রাতের বিভাগ সূর্য করে থাকে। রাত্রি নিদ্রা যাবার জন্য এবং দিন কাজকর্ম করার জন্য। মানুষের এক মাসে পিতৃপুরুষের এক দিন-রাত হয়। শুক্লপক্ষ তাঁদের দিন আর কৃষ্ণপক্ষ তাঁদের রাত্রি। মানুষের একটি বছর দেবতাদের একটি দিন রাতের সমান। উত্তরায়ণ তাঁদের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। মানুষের যে দিন রাতের কথা বলা হয়েছে, সেই হিসাবে আমি এবার ব্রহ্মার দিন রাতের মান বলছি। সেই সঙ্গে চার যুগের বর্ষ সংখ্যাও পৃথকভাবে বলছি। দেবতাদের চার হাজার বছরে এক সত্যযুগ হয়। তার মধ্যে চারশত দিব্য বর্ষে সন্ধ্যা হয় এবং তত বর্ষেরই সন্ধ্যাংশও হয়। এইরূপে সত্যযুগের পূর্ণ সময় আটচল্লিশ শত দিব্য বছর। বাকি তিন যুগে এই সংখ্যা ক্রমশ এক-চতুর্থাংশ করে কমে যায় অর্থাৎ ত্রেতাযুগ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশসহ ছত্রিশ শত বছরের, দ্বাপর চব্বিশ শত বছরের এবং কলি বারোশত বছরের হয়ে থাকে। এই চার যুগ প্রবাহরূপে সর্বদা বিরাজিত লোকগুলি ধারণ করে। এই যুগাত্মক কাল হল ব্রহ্মবেত্তাদের সনাতন ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সত্যযুগে ধর্ম ও সত্যের চারটি চরণই বিরাজ করে—সেই সময় ধর্ম ও সত্যের পুরোপুরি পালন হয়। কেউই অধর্মে প্রবৃত্ত হয় না। অন্য যুগগুলিতে ধর্মের এক এক চরণ ক্রমশ নষ্ট হতে থাকে এবং চুরি, অসত্য এবং ছল-কপটের দ্বারা অধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যযুগের মানুষ নীরোগ এবং পূর্ণকাম হয়, তাদের আয়ু চারশত বছর হয়ে থাকে। ত্রেতা যুগে তাদের আয়ু এক-চতুর্থাংশ কমে তিনশত বছর হয়। এইভাবে দ্বাপরে দুইশত এবং কলিতে একশত বছর আয়ু হয়। ত্রেতাদি যুগে বেদের স্বাধ্যায় কম হতে থাকে, মানুষের আয়ুও কমে যায়, কামনা পূরণে বাধা আসতে থাকে এবং বেদ অধ্যয়নের ফলও কমে যায়। যুগের হ্রাস অনুসারে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগে মানুষের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়। সত্যযুগে তপস্যাকে সব থেকে বড় ধর্ম মানা হয়েছিল, ত্রেতাতে জ্ঞানকে উত্তম বলা হত, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এইভাবে দেবতাদের বারো হাজার বছরে এক চতুর্যুগ হয়। এক হাজার চতুর্যুগ পার হলে ব্রহ্মার একদিন পূর্ণ হয়। তেমনই এক হাজার চতুর্যুগ পার হলে তাঁর এক রাত্রি পূর্ণ হয়। ভগবান ব্রহ্মা তাঁর দিবসের প্রারম্ভে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং রাতে যখন প্রলয়ের সময় হয় তখন সবকিছু নিজের মধ্যে লীন করে যোগনিদ্রার আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। প্রলয়ের শেষ হলে অর্থাৎ রাত্রি অতিক্রান্ত হলে তিনি জেগে ওঠেন। এইভাবে একহাজার চতুর্যুগ যে ব্রহ্মার একদিন এবং এক হাজার চতুর্যুগে যে একরাত্রির কথা বলা হয়েছে, যাঁরা এটি ঠিকমতো বোঝেন তাঁরাই কালের তত্ত্ব জানতে পারেন। রাত্রিশেষ হলে ব্রহ্মা জেগে উঠে প্রথমে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন করেন, পরে তার থেকে স্থূল জগৎ ধারণকারী মনের উৎপত্তি হয়।

পুত্র ! তেজোময় ব্রহ্মই সবের বীজ, তার থেকেই এই

জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। সেই এক ভূত থেকেই স্থাবর ও জঙ্গম দুইয়ের উৎপত্তি হয়। আগে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা তাঁর দিনের প্রারম্ভে জেগে জগৎ-সৃষ্টি করতে শুরু করেন। সর্বপ্রথম মায়াদ্বারা মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তার থেকে স্থূল সৃষ্টির আধারভূত মন উৎপন্ন হয়। পরে সৃষ্টির ইচ্ছায় প্রেরিত হয়ে মন নানা প্রকার আকার ধারণ করে, তার থেকে শব্দগুণ-সম্পন্ন আকাশের উৎপত্তি হয়। তারপর যখন আকাশে বিকার হয় তখন তার থেকে অত্যন্ত পবিত্র ও বলবান বায়ুতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। তার গুণ হল স্পর্শ। বায়ু বিকৃত হলে তার থেকে জ্যোতির্ময় অগ্নিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তার গুণ হল রূপ। আবার তেজে বিকার এলে তার থেকে রসময় জলতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। জল থেকে পৃথিবী এবং তার গুণ গন্ধের প্রাদুর্ভাব হয়। পরে উৎপন্ন বায়ু ইত্যাদি ভূত নিজের নিজের পূর্ববর্তী ভূতাদির গুণও ধারণ করে।

পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন—এই ষোলোতত্ত্বের সমাহারে শরীর নির্মিত হয়। এই সবগুলির আশ্রয় হওয়ার জন্যই দেহকে শরীর বলা হয়। শরীর উৎপন্ন হলে তাতে জীবের ভোগাবশিষ্ট কর্মাদির সঙ্গে সূক্ষ্ম মহাভূত প্রবেশ করে। সমস্ত প্রজার আদি কর্তা হওয়ায় ব্রহ্মাকে প্রজাপতি বলা হয়, তিনিই চরাচর প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, মানুষ, নানাপ্রকার লোক, নদী, সমুদ্র, দিক্, পর্বত, বনস্পতি, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ এবং সর্পদেরও তিনিই সৃষ্টি করেন। নিত্য ও অনিত্য পদার্থেরও তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রাণীদের দ্বারা যেমন কর্ম করা হয়ে থাকে, দ্বিতীয়বার জন্ম নিলেও তারা সেই পূর্বকৃত কর্মের বাসনাদ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তেমন কর্মই করতে থাকে। একটি জন্মে মানুষ হিংসা-অহিংসা, কোমলতা-কঠোরতা, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি যে সব গুণ ধারণ করে নেয়, পরের জন্মেও সেই সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই সব গুণই পছন্দ করে থাকে এবং সেইরূপ কার্যেই রত হয়।

সত্ত্বগুণে স্থিত সমদর্শী পুরুষ তপকেই জীবের কল্যাণের মুখ্য সাধন বলে থাকেন। তপের মূল হল শম এবং দম। পুরুষ তার মনে যেসব কামনা আকাঙ্ক্ষা করে, সে সবই সে তপের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। জগৎ উৎপত্তিকারী পরমাত্মার প্রাপ্তিও তপের দ্বারা হয়, তপোবলের দ্বারাই মানুষ সমস্ত প্রাণীর ওপর তার প্রভুত্ব বিস্তার করে। তপের প্রভাবেই মহর্ষিগণ পূর্বজন্মে পঠিত বেদাদি স্মরণ করেন। তপঃশক্তিতে সম্পন্ন হয়েই ব্রহ্মা আদি-অন্তরহিত বেদ-বিদ্যা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন এবং পরবর্তী ঋষিদের মধ্যে প্রচার করেছেন। নিজ রাত্রি শেষ হলে ব্রহ্মা যে প্রাণীদের জন্ম প্রদান করেন তাদের নাম, নানা প্রকারের পার্থক্য, তপ, ধার্মিক কর্ম, যজ্ঞ, কীর্তি ও মোক্ষের সাধনগুলি বেদ অনুসারেই প্রকাশিত করেছেন। ঋষিগণের নাম, দেবতাদের উৎপত্তি, প্রাণিগণের রূপ এবং তাদের কর্মাদির বিধানও বেদবাক্যানুসারে সম্পন্ন হয়।

ব্রহ্মের দুটি স্বরূপ—এক শব্দব্রহ্ম, অন্যটি পরব্রহ্ম। এই দুটিরই জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। যার শব্দব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান হয়, সে সহজেই পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করতে পারে। সত্যযুগের লোকেরা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদে কথিত সকাম যজ্ঞকে আত্মার থেকে পৃথক ভেবে ধ্যানযোগরূপ তপের অনুষ্ঠান করতেন। তারপর ত্রেতাযুগে যে মহাশক্তিশালী পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিলেন, তিনি সমস্ত চরাচর জগৎকে নিয়মের মধ্যে রেখেছিলেন। সেইসময় বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালনের সুব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দ্বাপরযুগে আয়ু কমে যাওয়ায় লোকের মধ্যে উপরিউক্ত গুণাদি কমে যেতে লাগল। কলিযুগে তো বেদ লুপ্তপ্রায় হয়ে গেল। সেইসময় অধর্মে পীড়িত হয়ে বেদ ও যজ্ঞও লুপ্ত হয়ে যায়। পুত্র ! তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি সৃষ্টি, কাল, কর্ম, বেদ ও কর্মফল ইত্যাদির বিষয়ে কিছু জানালাম।

প্রলয়ের ক্রম, ব্রাহ্মণকে দান করার মহিমা এবং ব্রাহ্মণদের কর্তব্য বর্ণনা

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! আমি এখন তোমায় জানাচ্ছি যে, ব্রহ্মার দিন শেষ হলে রাত্রি আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কীভাবে এই জগৎ লয় হয় এবং ব্রহ্মা কীভাবে এই স্থূল জগৎকে সূক্ষ্ম করে নিজের মধ্যে লীন করে নেন। যখন প্রলয়ের সময় আসে তখন ওপর থেকে সূর্য এবং নীচে থেকে অগ্নির সপ্ত রশ্মি জগৎকে ভস্ম করে দিতে থাকে। সর্বপ্রথম পৃথিবীর চরাচর প্রাণী এই জ্বালায় দগ্ধ হয়ে ধুলোয় মিশে যায়। তখন এই পৃথিবী বৃক্ষ ও তৃণবর্জিত হয়ে

কচ্ছপের পিঠের ন্যায় দেখাতে থাকে। পরে যখন পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে, তখন গন্ধহীন পৃথিবী তার কারণভূত জলে লীন হয়ে যায়। তখন জল ভয়ানক আওয়াজ করে চারদিকে আছড়ে পড়ে, উত্তাল তরঙ্গ উঠতে থাকে, সম্পূর্ণ বিশ্ব তাতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তারপর তেজ জলের গুণ রসকে গ্রহণ করে নেয় এবং রসহীন জল তেজে লীন হয়ে যায়। সেই সময় সমস্ত আকাশ জ্বলন্ত চুল্লির ন্যায় প্রতিভাত হয়। তারপর তেজের গুণ রূপকে বায়ু-তত্ত্ব গ্রহণ করে নেয় ; তাতে আগুন ঠান্ডা হয়ে বায়ুতে মিশে যায় এবং হাওয়ার বেগবৃদ্ধি পায়। হাওয়া প্রচণ্ড তেজে প্রবাহিত হতে থাকে। এরপরে আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করে এবং হাওয়া শান্ত হয়ে আকাশে লীন হয়ে যায়, তখন শব্দগুণ যুক্ত শুধু আকাশ থেকে যায়। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের নামও থাকে না। তারপর দৃশ্য প্রপঞ্চ ব্যক্তকারী মন আকাশের গুণ শব্দকে, যা মন থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল, নিজের মধ্যে লীন করে নেয়। এইভাবে পঞ্চভৌতিক সৃষ্টি ব্রহ্মার মনে লয় হওয়াকেই ব্রাহ্ম প্রলয় বলে। এই ক্রমানুসারে সমস্ত ভূতের প্রলয়স্থানও হলেন ব্রহ্মা।

তোমাকে জ্ঞানের সুযোগ্য অধিকারী জেনে পরমাত্মাপ্রাপ্ত যোগীদের জানার যোগ্য প্রলয়ের বৃত্তান্ত আমি তোমাকে বিস্তারিতভাবে জানালাম। এইভাবে এক-এক হাজার যুগে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি হতে থাকে এবং দিনের প্রারম্ভে সৃষ্টি ও রাত্রের প্রারম্ভে প্রলয়ের ধারা চলতে থাকে।

শুকদেব ! এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণের কর্তব্যের কথা জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। ব্রাহ্মণ বালকের জাতকর্ম থেকে সমাবর্তন পর্যন্ত বিধিমতো সংস্কার হওয়া উচিত। প্রত্যেক সংস্কারে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য। উপনয়নের পর বেদজ্ঞ আচার্যের সেবায় নিযুক্ত থেকে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করবে। তারপর সেবা-শুশ্রূষা ও দক্ষিণার দ্বারা গুরুঋণ থেকে মুক্ত হয়ে তার সমাবর্তন-সংস্কার হওয়া উচিত। পরে আচার্যের অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রমের মধ্যে কোনো একটি আশ্রমে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে আজীবন থাকবে অথবা ক্রমশ সব আশ্রমেই প্রবেশ করবে।

সব ধর্মের মূল হল গার্হস্থ্যাশ্রম। এই আশ্রমে বাস করে অন্তর রাগ-দ্বেষ শূন্য করলে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সর্বত্র সিদ্ধিলাভ করে। গৃহস্থ পুরুষ পুত্র উৎপন্ন করে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়, বেদাদির স্বাধ্যায় করে ঋষিঋণ থেকে এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে দেবঋণ থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে তিন ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে সে নিজ বর্ণ ও আশ্রমের জন্য বিহিত কর্মাদি সম্পাদন করে নিজেকে পবিত্র করে তুলবে। তারপরে অন্য আশ্রমে প্রবেশ করবে। এই পৃথিবীতে যে স্থান পবিত্র এবং উত্তম বলে মনে হবে সেখানে বসবাস করে সে নিজেকে যশস্বী এবং আদর্শ পুরুষ তৈরি করার প্রচেষ্টা করবে। মহান তপ, পূর্ণ বিদ্যাধ্যয়ন, ব্রত, যজ্ঞ অথবা দান করলে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের যশ বৃদ্ধি পায়। তার কীর্তি যতদিন এই জগতে তার সুযশ বিস্তার করে থাকে ততদিন সে পুণ্যবানদের অক্ষয়লোকে বাস করে দিব্য সুখ ভোগ করতে থাকে। ব্রাহ্মণদের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন এবং দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তার অনুচিত প্রতিগ্রহ এবং ব্যর্থদান নেওয়া উচিত নয়। দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, গুরু, বৃদ্ধ, রোগী এবং ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য দেওয়ার জন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ স্বীকার করা উচিত। পারমার্থিক উন্নতির জন্য যত্নশীল ব্রাহ্মণদের নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রস্তুত আহারসামগ্রী থেকে অন্নও দেওয়া উচিত। যোগ্য ব্রাহ্মণের জন্য কোনো বস্তুই অদেয় নয়। মহান ব্রতধারী রাজা সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করে স্বর্গে গিয়েছিলেন। অত্রির পুত্র রাজা ইন্দ্রদমন যোগ্য ব্রাহ্মণদের নানাপ্রকার ধন দান করে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দেবাবৃধ স্বর্ণছত্র দান করে তাঁর দেশের প্রজাদের সঙ্গে স্বর্গলোক গমন করেছিলেন। অত্রিবংশে উৎপন্ন মহাতেজস্বী সাংকৃতি তাঁর শিষ্যদের নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করে উত্তমলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণদের এগারো লক্ষ গাভী দান করে দেশবাসীদের সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন। সাবিত্রী দুটি দিব্য কুণ্ডল দান করেছিলেন এবং রাজা জনমেজয় ব্রাহ্মণদের জন্য নিজ শরীর পরিত্যাগ করেছিলেন—তার জন্য দুজনেই উত্তমলোক লাভ করেন। বিদেহরাজ নিমি তাঁর রাজ্য এবং জামদগ্নিনন্দন পরশুরাম ও রাজা গয় নগরসহ সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। একবার বৃষ্টি না হওয়ায় বশিষ্ঠ দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সমস্ত প্রজাকে জীবনদান করেছিলেন। করন্ধমের পুত্র রাজা মরুৎ মহর্ষি অঙ্গিরাকে নিজকন্যা এবং পাঞ্চালদেশের রাজা ব্রহ্মদত্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের মহানিধি শঙ্খ দান করে উত্তমলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্মণদের জন্য নিজ প্রাণ

বিসর্জন দিয়েছিলেন। রাজা শতদ্যুম্ন মহর্ষি মুদ্গলকে সর্বপ্রকার সুখভোগসম্পন্ন সুবর্ণময় গৃহদান করেছিলেন এবং শাম্বরাজা দ্যুতিমান ঋচীক মুনিকে নিজ রাজ্য অর্পণ করেছিলেন। এই সব রাজাই উত্তমলোক লাভ করেছিলেন। রাজর্ষি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিজ কন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেন এবং রাজা মদিরাশ্বও হিরণ্যহস্ত ঋষির কাছে নিজ কন্যা সমর্পণ করেন—তার জন্য এই দুজনেই সর্বপ্রকার কামনা ও উত্তমলোক লাভ করেন। রাজা প্রসেনজিৎ বৎস সমেত এক লাখ গাভী দান করেন এবং উত্তমলোক প্রাপ্ত হন। আরও বহু জিতেন্দ্রিয় পুরুষ দান ও তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ করেছেন। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, ততদিন তাঁদের কীর্তি এই জগতে বিরাজ করবে।

ব্রাহ্মণের ঋক, সাম, যজুঃ—এই তিন বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে প্রবীণ, অধ্যাত্মজ্ঞানে কুশল এবং সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে থাকেন, সেই মহাভাগ উৎপত্তি ও প্রলয়তত্ত্ব প্রত্যক্ষের মতো অবলোকন করেন। ব্রাহ্মণদের ধর্মানুকূল জীবন গঠন করা উচিত এবং শিষ্ট পুরুষদের মতো সদাচার পালন করা কর্তব্য। কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দিয়ে জীবন-যাপন করা উচিত। তারা মহাত্মা ব্যক্তিদের আশ্রয়ে থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে, সৎপুরুষ হবে এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কুশল হবে। নিজ ধর্মের অনুকূল নিত্যকর্মাদির অনুষ্ঠান করবে। কর্তব্যপরায়ণ সত্ত্বগুণী মহাত্মাদের সঙ্গ করবে এবং গৃহস্থাশ্রমে থেকে অধ্যয়নাদি ছয়টি কর্মে ব্যাপৃত থাকবে। এরূপ আচরণকারীকেই উত্তম ব্রাহ্মণ বলে মানা হয়।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে সর্বদা শ্রদ্ধাপূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারা পরমাত্মার পূজা করা উচিত। সর্বদা ধৈর্য ধারণ করতে হয়, প্রমাদ থেকে দূরে থাকবে, মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবে, ধর্মাত্মা হবে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হবে এবং হর্ষ, অহংকার এবং ক্রোধরহিত হবে। এরূপ ব্রাহ্মণকে কখনো দুঃখভোগ করতে হয় না। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপ, লজ্জা, সরলতা, ইন্দ্রিয় সংযমদ্বারা সে নিজ তেজ বৃদ্ধি করবে এবং পাপ নাশ করবে। এইভাবে পাপরহিত হয়ে নিজ মেধাশক্তিকে জাগ্রত করবে এবং মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে কাম ও ক্রোধ জয় করে ব্রহ্মপদ লাভের চেষ্টা করবে। অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের শ্রদ্ধা করবে। কটু কথা বলবে না ও হিংসা করবে না। ব্রাহ্মণদের এই হল পরম্পরাগত কর্তব্য। কর্মের তত্ত্ব জেনে তার অনুষ্ঠান করলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হয়। একথার কখনোই বিস্মরণ হওয়া উচিত নয় যে প্রাণীদের মোহগ্রস্তকারী কাল সর্বদাই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। বুদ্ধিমান এবং ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা জ্ঞানময় নৌকার সাহায্যে সংসার সমুদ্র পার হয়ে যায় ; কারণ তারা দোষগুণ বিচার করে দোষ পরিত্যাগ করে গুণকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু কামনাসক্ত, চঞ্চলচিত্ত, মন্দবুদ্ধি, অজ্ঞানী ব্যক্তি সন্দেহে পড়ে এই সংসার সমুদ্র পার হতে পারে না। তারা সাহস হারিয়ে ফেলে আর এগোতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমানদের ভবসাগর থেকে পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ভবসাগর অতিক্রমের জন্য প্রকৃত অর্থে যেন ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। উত্তম কুলে জাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ—এই তিন কর্মকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে তাতে যেন প্রবৃত্ত হয় এবং অধ্যয়ন, যজন ও দান—এই তিন কর্ম যেন অবশ্য পালন করে। যেমন ভাবেই হোক নিজ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে। জ্ঞানের দ্বারা যেন এই ভবসাগর অবশ্যই পার হয়ে যায়। যাদের বৈদিক সংস্কার বিধিমতো সম্পন্ন হয়েছে, যারা নিয়মে থেকে মন ও ইন্দ্রিয় জয় করেছে, সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ইহলোক ও পরলোকের সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হয় না। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ক্রোধ ও ঈর্ষা ত্যাগ করে উপরোক্ত নিয়ম পালনে ব্যাপৃত থাকবে। নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই ভোজন করবে। সৎ পুরুষদের ধর্ম ও শিষ্টাচার পালন করবে, এমন কর্ম করবে যাতে কেউ কষ্ট না পায় এবং লোকে তাকে নিন্দা না করে। ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী, সদাচারী ও কুশল হওয়া উচিত। যারা নিজ ধর্ম অনুসারে কার্য করে, শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ধর্ম-অধর্মের তত্ত্বকে জানে, তারা সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করে যায়। ধৈর্য, অপ্রমাদ, ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। হর্ষ, অহংকার ও ক্রোধ ত্যাগ করা ব্রাহ্মণদের সনাতন ধর্ম। জ্ঞানলাভ করে কর্মের অনুষ্ঠান করলে তারা সর্বত্র সিদ্ধিলাভ করে।

—○—

জ্ঞান দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি, ধ্যানের সহায়ক যোগ এবং সাত প্রকার ধারণার বর্ণনা

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! মোক্ষলাভের ইচ্ছা থাকলে মানুষের জ্ঞানবান হওয়া উচিত। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে ডুবতে থাকা মানুষ নৌকা পেলে সমুদ্র পার হয়ে যায়, তেমনই সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার জন্য বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্য নেওয়া কর্তব্য। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানময় নৌকার সাহায্যে অজ্ঞানীদেরও ভবসমুদ্র পার হবার উপায় করে দেন। ধ্যানযোগের সাধনাকারী মুনিদের উচিত যে তাদের হৃদয়ের রাগ-দ্বেষাদি দোষ দূর করে পাপমুক্ত হয়ে যোগের সাহায্যে পৌঁছানোর জন্য দেশ, কর্ম, অনুরাগ, অর্থ, উপায়, অপায়, নিশ্চয়, চক্ষুষ, আহার, সংহার, মন ও দর্শন—এই বারোটি উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা।[1]

যার উত্তম জ্ঞান (মোক্ষ) প্রাপ্ত করার ইচ্ছা থাকে, তার বুদ্ধির দ্বারা মন ও বাক্য জয় করা উচিত। মানুষ শূরবীর হোক বা দুঃখী, এইরূপ সাধনাদ্বারা সে জরা-মৃত্যুরূপ দুর্গম সাগর পার হয়ে যায়। উপরিউক্তরূপে যোগপ্রবৃত্ত মানুষ যদি ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করে তাহলে সে বৈদিক কর্মফলের সীমাও লঙ্ঘন করে যায়। অক্ষরব্রহ্ম প্রাপ্ত করার ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ সহজেই সাফল্য পাওয়া সম্ভব, আমি সেই উপায় জানাচ্ছি। কোনো এক বিষয়ে চিত্ত স্থাপন করাকে বলা হয় ধারণা। ধারণা সাত প্রকার[2]। সাধককে মৌনাবলম্বন করে যম-নিয়ম পালন করে এর অভ্যাস করা

---

[1]ধ্যানযোগের সাধকদের সমতল ও পবিত্র স্থানে আসন পাতা উচিত। সেইসব স্থানে যেন বালি, কাঁকর, পাথর বা আগুন না থাকে, কোনো শব্দ যেন সেখানে শোনা না যায় এবং আশেপাশে বসতি, সর্বজনীন ইঁদারা, পুকুর বা নদীর ঘাট যেন না থাকে। সেইস্থান যেন সাধকের পছন্দমতো হয়, তাঁর মন বসে। পাহাড়ের গুহা অথবা সেইরূপ কোনো একান্ত স্থানই ধ্যানের পক্ষে উপযুক্ত। সেইরূপ স্থানে আসন পাতাকে 'দেশযোগ' বলা হয়। আহার, বিহার, নিদ্রা ইত্যাদি যেন সব পরিমিত এবং নিয়মানুকূল হয়। একেই 'কর্মনামক যোগ' বলা হয়। সদাচারী শিষ্যকে নিজের সেবা ও সহায়তার জন্য রাখাকে 'অনুরাগ যোগ' বলে। আবশ্যক সামগ্রীর সংগ্রহকে 'অর্থযোগ' বলা হয়। ধ্যানোপযোগী আসনে উপবেশন করা হল 'উপায়যোগ'। সাংসারিক বিষয় এবং আত্মীয়-কুটুম্ব থেকে আসক্তি ও মমতা সরিয়ে নেওয়াকে 'অপায়যোগ' বলা হয়। গুরু এবং বেদ-শাস্ত্রের ওপর বিশ্বাসের নাম 'নিশ্চয়যোগ'। চক্ষুর ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদিকে বশে রাখাকে বলা হয় 'চক্ষুর্যোগ'। শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক আহারকে বলা হয় 'আহারযোগ'। বিষয়াদি এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রোধ করাকে বলা হয় 'সংহারযোগ'। মনের সংকল্প, বিকল্পকে শান্ত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'মনোযোগ'। জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ ইত্যাদির সময় যে মহাদুঃখ উপস্থিত হয়, তার চিন্তা করে সংসারে বীতরাগ হওয়াকে বলা হয় 'দর্শনযোগ'। যার যোগের সিদ্ধি প্রাপ্তি করার ইচ্ছা থাকে, তাকে এই বারোটি যোগ অবশ্য সিদ্ধ করে নিতে হয়।

[2]শরীরের মধ্যে ক্রমশ মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অব্যক্ত ও অহংকার—এই সাত তত্ত্বের চিন্তা করা হয়। এগুলি সাত প্রকারের ধারণা। এগুলি এইভাবে বুঝতে হবে—পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত পৃথিবীর স্থান ভেবে তাতে পৃথিবীর ধারণা করা উচিত। হাঁটু থেকে পায়ুদ্বার পর্যন্ত জলের স্থান। পায়ু থেকে হৃদয় পর্যন্ত অগ্নির স্থান, হৃদয় থেকে ভ্রূমধ্য স্থান পর্যন্ত বায়ুর স্থান এবং ভ্রূমধ্য থেকে মূর্ধা পর্যন্ত আকাশ মানা হয়। জল ইত্যাদির স্থানে নিজ নিজ তত্ত্বগুলিরই ধারণা করা উচিত। তার নিয়ম হল—পৃথিবী অর্থাৎ পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ভাবনাদ্বারা প্রণবসহ লং বীজ ও বায়ুদেবতাকে স্থাপন করে চতুর্মুখ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ধ্যান করবে। দু ঘন্টা এইভাবে ধ্যান করলে পৃথিবীতত্ত্ব জয় হয়। এইরূপ জলের স্থানে প্রণবসহ বং বীজ এবং বায়ু দেবতাকে স্থাপন করে ধ্যানে দেখবে যে সেখানে চতুর্ভুজ ভগবান নারায়ণ বিরাজমান। তাঁর শুদ্ধ স্ফটিক সম নির্মল দেহ পীতাম্বর শোভিত। তিনি সাধকের দিকে তাকিয়ে মৃদুহাস্য করছেন। দুঘন্টা এরূপ ধারণা করলে সর্ব রোগ বিনাশ হয়। অগ্নিস্থানেও প্রণব এবং রং বীজসহ বায়ু দেবতাকে স্থাপন করে সেখানে এইরূপ ধ্যান করবে—'মধ্যাহ্নকালের সূর্যের ন্যায় অতি তেজস্বী, ত্রিনেত্রধারী বরদাতা ভগবান শংকর উপস্থিত। তাঁর সারা অঙ্গে বিভূতি শোভিত, তাঁকে অতি প্রসন্ন দেখাচ্ছে।' দু ঘন্টা পর্যন্ত এই ধারণা সিদ্ধ হলে অগ্নিভয় থাকে না। বায়ুর স্থান অর্থাৎ হৃদয় থেকে ভ্রূমধ্যভাগে পূর্ববৎ ভাবনাদ্বারা প্রণবযুক্ত যং বীজ এবং বায়ু দেবতাকে স্থাপন করে তাতে অগ্নিতত্ত্বের ন্যায় ভগবান শংকরেরই ধ্যান করবে। এই ধারণা সিদ্ধ হলে বায়ুর ন্যায় আকাশে বিচরণ ক্ষমতা লাভ হয়। আকাশতত্ত্বের স্থানেও প্রণবযুক্ত হং বীজের সঙ্গে বায়ু দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে তাতে আকাশের ন্যায় নিরাকার ভগবান সদাশিবকে বিন্দুরূপে চিন্তা করবে। অব্যক্তের ধারণায় নাদের চিন্তা করা হয়। অহংকারের ধারণায় স্থূলদেহের আসক্তি পরিত্যাগ করে 'আমিই এই সম্পূর্ণ বিশ্ব' এরূপ চিন্তা করা হয়। তারপর যোগী তত্ত্বকে সাক্ষাৎ করেন। (নীলকণ্ঠীর আধারে)

উচিত। দূর ও নিকটের ভেদে সাতটিই অবান্তর ধারণাও হয়। তাকে প্রধারণা বলে। (চন্দ্র, সূর্য, ধ্রুবমণ্ডল এগুলির ধারণা দূরস্থ এবং নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য, কণ্ঠকূপ ইত্যাদির ধারণা সমীপস্থ)। এই ধারণাগুলির দ্বারা ক্রমশ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অব্যক্ত এবং অহংকারের ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়। এবার যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত যোগীর কিছু অনুভবের কথা জানানো হচ্ছে এবং ধারণাপূর্বক ধ্যান করার সময় যে পৃথিবী জয় ইত্যাদি সিদ্ধিলাভ হয়, সেগুলিও বর্ণনা করা হচ্ছে।

সাধক যখন স্থূল দেহাভিমান থেকে মুক্ত হয়ে ধ্যানে অবস্থান করে, সেই সময় সূক্ষ্মদৃষ্টিযুক্ত হওয়ায় সে কিছু কিছু এই রূপ চিহ্ন দর্শন করে থাকে। প্রথমে পৃথিবীকে ধারণ করায় মনে হয় কুয়াশার মতো কোনো সূক্ষ্ম বস্তু সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত করে আছে।[1]এ হল প্রথম রূপ। যখন কুয়াশা নিবৃত্ত হয় তখন অন্য রূপ দর্শন হয়। সে তখন নিজ দেহের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ আকাশে সর্বত্রই জল দেখে। জলতত্ত্বের ধারণা করার সময় এই অনুভব হয়, তারপর জলতত্ত্বের ধারণা লয় হয়ে গেলে, অগ্নিতত্ত্বের ধারণার সময় সর্বত্র অগ্নির জ্বালা দেখা যায়। সেটিও লয় হলে যোগীর আকাশে সর্বত্র প্রবাহিত বায়ু অনুভূত হয় এবং সে স্বয়ংও নিজেকে সূতোর মতো লঘু ও হালকা হয়ে নিজেকে নিরাধার আকাশে বায়ুর সঙ্গে স্থিত বলে মনে করে। সেই সময় যোগী তার শরীরের হৃদয়ের উপরিভাগই শুধু দেখতে পায়। এইভাবে তেজের সংহার করে যোগী যখন বায়ুর ওপর বিজয়লাভ করে তখন বায়ুর সূক্ষ্মরূপ আকাশে লীন হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র ছিদ্ররূপ নীলাকাশ থেকে যায়। সেই অবস্থায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষাকারী যোগীর চিত্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে যায়। তার নিজ স্থূল শরীরের সামান্যতম আভাসও থাকে না।

এই সব রূপ (চিহ্ন) দেখা দেওয়ার পরে যোগী যে সব ফলপ্রাপ্ত হয়, তা শোনো—পার্থিব ঐশ্বর্য সিদ্ধ হলে যোগীর সৃষ্টি করার শক্তি আসে। সে প্রজাপতির ন্যায় নিজ শরীর থেকে প্রজা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যার বায়ুতত্ত্ব সিদ্ধ হয় সে কারো সাহায্য ব্যতিরেকেই হাত, পা অথবা আঙুল দিয়ে পৃথিবী কম্পিত করতে সক্ষম হয়। আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের সমান হয়ে সর্বত্র বিচরণ করে এবং নিজেকে অদৃশ্য করতে পারে। যার জলতত্ত্বে অধিকার হয়, সে ইচ্ছা করলে বড় জলাশয়ের জল পান করে ফেলতে পারে। অগ্নিতত্ত্ব সিদ্ধ করলে, যোগীর শরীর এত তেজঃপূর্ণ হয় যে কেউ তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না ; পরে তেজ শান্ত হলে দেখা সম্ভব হয়। অহংকার জয় করলে পঞ্চভূত যোগীর বশীভূত হয়। পঞ্চভূত ও অহংকার—এই ছয় তত্ত্বের আত্মা হল বুদ্ধি, তাকে জয় করলে সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়। তখন বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়।

যে যোগী মমত্ববোধ ও অহংকার ত্যাগ করেছে, যে শীতোষ্ণ দ্বন্দ্বগুলি সমানভাবে সহ্য করে, যার সংশয় দূর হয়েছে ; যে কখনো ক্রোধ ও দ্বেষ করে না, মিথ্যা বলে না, কারো কাছে মার খেয়ে বা তিরস্কৃত হয়েও তার অহিত চিন্তা করে না, সকলের ওপর মিত্রভাব বজায় রাখে, যে কায়-মনো-বাক্যে এবং কর্মে কোনো জীবকে কষ্ট দেয় না এবং সবার ওপর সমান ভাব পোষণ করে ; সেই যোগী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। যে কোনো বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে না, জীবন-নির্বাহের জন্য যা পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, যে নির্লোভ, নিশ্চিন্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং পূর্ণকাম, সব প্রাণীতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, মাটি-পাথর ও সোনাকে সমমূল্যে দেখে, যার দৃষ্টিতে প্রিয়-অপ্রিয়ের পার্থক্য নেই, ধৈর্যশীল, নিন্দা ও স্তুতি যার চিত্তে কোনো প্রভাব ফেলে না, যে কোনোকিছু কামনা না করে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করে এবং কোনো জীবকে হিংসা করে না—এরূপ জ্ঞানবান যোগী সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে উপায়ে যোগী মুক্তি লাভ

[1]এই অনুভব এইরূপ হয়। সাধক যখন পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশে পৃথিবী-তত্ত্ব ধারণা করেন তখন ধারণা সিদ্ধ হলে সেই স্থান লয় হয়ে যায় এবং সেখানে কুয়াশার মতো দেখা যায়। সেই সময় হাঁটুর উপরিভাগ এবং আকাশ কুয়াশার দ্বারা আচ্ছাদিত মনে হয়। এই স্থিতিকে পৃথিবীর ওপর জয়লাভের চিহ্ন বলে মানা হয়। এরপর যখন হাঁটুর ওপর পায়ু পর্যন্ত ভাগে জলতত্ত্বের ধারণা করা হয় তখন সেই কুয়াশা ও পৃথিবীর স্থান অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পায়ু থেকে উপরের ভাগ কল্পান্তের সমুদ্রে নিমজ্জিত বলে মনে হয়। এটি জলতত্ত্বে ভূমির লয় এবং জলতত্ত্বের ওপর বিজয় লাভের সংকেত। এইরূপ উত্তরোত্তর ধারণাগুলির দ্বারা ভূতাদির লয় এবং তাদের ওপর অধিকার লাভ করা যায়।

করে, তা বলছি, শোনো—যোগের দ্বারা যে ঐশ্বর্য অথবা সিদ্ধি লাভ হয়, তা অগ্রাহ্য করে পূর্ণভাবে বীতরাগ হয়ে যাওয়া উচিত। এরূপ করলে মোক্ষলাভ হয়। এইপ্রকার ভাব বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার বুদ্ধিরই আমি বর্ণনা করেছি। যে উপরিউক্ত রূপে সাধনা করে দ্বন্দ্বরহিত হয় সে-ই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

—o—

বুদ্ধির প্রশংসা, প্রাণীদের তারতম্য, জ্ঞানের সাধন ও তার মহিমা

শুকদেব জিজ্ঞাসা করলেন—পিতৃদেব ! যার সাহায্যে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে, সেই জ্ঞানের স্বরূপ কেমন ? প্রবৃত্তি ধর্মের দ্বারা মুক্তি হয়, না নিবৃত্তিধর্মের দ্বারা ? আমাকে বলুন।

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! যে বুদ্ধিমান হয়, সেই খেলার জন্য স্থান ও থাকার জন্য ঘর তৈরি করতে পারে, সেই রোগ নির্ণয় করে সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করতে পারে। বুদ্ধির দ্বারাই অর্থ লাভ হয় এবং বুদ্ধিই কল্যাণ করে। যদিও রাজন্যবর্গ প্রায়শ এক প্রকারেরই হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান হয়, সেই রাজ্য উপভোগ করে এবং অন্যদের শাসন করে। বুদ্ধির দ্বারাই প্রাণীর স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ তথা বড়-ছোটর জ্ঞান হয়। বুদ্ধিই সকলের পরম গতি। জগতে নানাপ্রকারের প্রাণী আছে, তাদের জন্ম অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা হয়—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। স্থাবর প্রাণীর থেকে জঙ্গম প্রাণী শ্রেষ্ঠ ; কারণ তাদের চলা ফেরার শক্তি থাকে। জঙ্গম প্রাণীদের মধ্যে দুই এবং ততোধিক পদবিশিষ্ট প্রাণী হয়ে থাকে। বহুপদবিশিষ্ট অপেক্ষা দুই পদ বিশিষ্ট প্রাণীই শ্রেষ্ঠ। দুই পদ বিশিষ্ট প্রাণীও দুই প্রকার—মনুষ্য এবং খেচর। এর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ ; কারণ তাদের খাদ্য প্রভৃতি উপভোগ করার সামর্থ্য থাকে। মানুষও দুই প্রকার—উত্তম ও মধ্যম। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করায় মধ্যমের থেকে উত্তমই শ্রেষ্ঠ। মধ্যম মানুষও দুই প্রকার। ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মে অনভিজ্ঞ। এদের মধ্যে ধর্মজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। কারণ তাদের কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিচার শক্তি থাকে। ধর্মজ্ঞও দুপ্রকারের হয়—বেদজ্ঞ এবং যারা বেদজ্ঞ নয়। এদের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; কারণ বেদ তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বেদ জানা ব্যক্তিও দুপ্রকারের হয়—এক, যারা প্রবচন করায় কুশল এবং অন্যেরা যারা এতে পারদর্শী নয়। এদের মধ্যে প্রবচনকারীই শ্রেষ্ঠ ; কারণ বেদে কথিত সমস্ত ধর্ম তাদের স্মরণ থাকে এবং তাদের দ্বারা অপরে বৈদিক ধর্ম, কর্ম ও তার ফলের জ্ঞান লাভ করে। প্রবচনকারী বিদ্বানও দুপ্রকার—এক আত্মতত্ত্বজ্ঞানী এবং অন্যেরা যারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেনি। এদের মধ্যে আত্মজ্ঞ পুরুষই শ্রেষ্ঠ ; কারণ তারা জন্ম-মৃত্যুর তত্ত্ব অবগত। যারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ উভয় ধর্মকে জানে, তারাই সর্বজ্ঞ, সর্ববেত্তা, ত্যাগী, সত্যসংকল্প, সত্যবাদী, পবিত্র এবং শক্তিমান। যারা বেদশাস্ত্রের জ্ঞাতা এবং তত্ত্বনির্ণয় করে ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হয়েছে, দেবতারা তাদেরই ব্রাহ্মণ বলে মানেন। পুত্র ! যারা জ্ঞানবান হয়ে অন্তরে-বাইরে পরিব্যাপ্ত অধিযজ্ঞ (পরমাত্মা) এবং অধিদৈবত (পুরুষ) উভয়কে সাক্ষাৎ করে, তারাই দেবতা, তারাই দ্বিজ। তাদের মধ্যেই এই সম্পূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। তাদের মাহাত্ম্যের কোনো তুলনা নেই। জন্ম-মৃত্যু-কর্মের সীমা উল্লঙ্ঘন করে তারা সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর এবং স্বয়ম্ভু হয়।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মহর্ষি ব্যাসের এই উপদেশ শুনে শুকদেব তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে মোক্ষধর্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে উৎসুক হয়ে বললেন—'পিতা ! প্রজ্ঞাবান, বেদবেত্তা, যাজ্ঞিক, দোষদৃষ্টিবর্জিত ও শুদ্ধিবুদ্ধি পুরুষ প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা অজ্ঞাত অলৌকিক ব্রহ্মকে কীভাবে প্রাপ্ত হয় ? তপ, ব্রহ্মচর্য, সর্বস্ব ত্যাগ, মেধাশক্তি, সাংখ্য এবং যোগ—এর মধ্যে কোন সাধন দ্বারা তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় ? মানুষ কোন্ উপায় অবলম্বন করলে মন ও ইন্দ্রিয়াদি একাগ্র করতে সক্ষম হয় ? আপনি কৃপা করে আমাকে সব বলুন।'

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! বিদ্যা, তপ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সর্বস্বত্যাগ ব্যতীত কেউই সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। বিধাতার প্রথম সৃষ্টি হল সম্পূর্ণ মহাভূত, তিনি প্রাণীদের দেহে অবস্থিত। পৃথিবী দ্বারাই দেহ নির্মিত হয়েছে। তৈলাক্ত

বস্তুগুলি ও ঘর্ম ইত্যাদি হল জলের অংশ, অগ্নি থেকে চক্ষু এবং বায়ু থেকে প্রাণ ও অপান উৎপন্ন হয়েছে। নাক-কান ইত্যাদি ছিদ্র আকাশ তত্ত্বের স্বরূপ। চরণদ্বয়ে বিষ্ণু, হস্তদ্বয়ে ইন্দ্র এবং উদরে অগ্নিদেবতা ভোক্তারূপে অবস্থান করেন। কর্ণে শ্রোত্র ইন্দ্রিয় এবং দিকগুলি থাকে। রসনায় বাক্ ইন্দ্রিয় এবং সরস্বতী বাস করেন। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্—এগুলি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এগুলিকে বিষয়ানুভবের দ্বার বলা হয়। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ—এগুলি ইন্দ্রিয়াদির বিষয়। এগুলিকে ইন্দ্রিয়ের থেকে পৃথক বলে জানা উচিত। সারথি যেমন ঘোড়াগুলিকে নিজ আয়ত্তে রেখে ইচ্ছামতো চালিত করে, তেমনই মন ইন্দ্রিয়াদিকে বশে রেখে সেগুলিকে বিষয়াদির দিকে প্রেরণ করে থাকে ; হৃদয়ে অবস্থিত জীবাত্মা সর্বদাই মনকে শাসনে রাখে। মন যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা এবং সেগুলিকে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত করতে সক্ষম, তেমনই হৃদয়াস্থিত জীবাত্মাও মনের প্রভু এবং তাকে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করতে সক্ষম। ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদির রূপ, রস ইত্যাদি বিষয়, স্বভাব (শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি ধর্ম), চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব—এগুলি সর্বদা দেহধারীদের শরীরে অবস্থান করে। বিদ্বান পুরুষ এইভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয়, ছয় স্বভাব ইত্যাদি গুণসম্পন্ন—এই ষোলো তত্ত্বের দ্বারা আবৃত নিজ বিশুদ্ধ আত্মাকে বুদ্ধির দ্বারা অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ করে থাকে। সেই মহান আত্মাকে নেত্র বা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা দর্শন করা যায় না। এটি বিশুদ্ধ মনরূপ প্রদীপের দ্বারা বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। পরমাত্মা রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ ও গন্ধবর্জিত, অবিকারী এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়রহিত, তা সত্ত্বেও শরীরের মধ্যেই তাকে অনুসন্ধান করা উচিত। যে ব্যক্তি এই বিনাশশীল শরীরে অব্যক্তভাবে স্থিত পরমেশ্বরকে জ্ঞানময় দৃষ্টিদ্বারা নিরন্তর সাক্ষাৎ করতে থাকে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীগণ বিদ্যা ও উত্তম কুলযুক্ত ব্রাহ্মণে এবং গোরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকে। যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পরমাত্মা সমস্ত চরাচর প্রাণীর মধ্যে বাস করেন। জীবাত্মা যখন সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে অবস্থিত দেখে, তখনই সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। নিজ শরীরে যেমন আত্মা থাকেন, তেমনই অন্য শরীরেও তাঁর বাস—যে ব্যক্তির এই জ্ঞান সর্বক্ষণ বজায় থাকে, সে অমৃতত্ত্ব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। সকল প্রাণীর আত্মাই যার আত্মা—এই জ্ঞানে স্থিত হয়ে যে সকল প্রাণীর হিতসাধনে রত, যে আগ্রহশূন্য এবং ব্রহ্মপদ লাভে ইচ্ছুক—তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে দেবতাগণও মোহিত হয়ে যান। যেমন আকাশে পাখি এবং জলে মাছ চলাচল করলে তাদের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানীদের গতিও জানা যায় না।

কাল সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করে, কিন্তু যেখানে কালও বিনাশপ্রাপ্ত হয়—যা কালেরও কাল, সেই আত্মাকে কেউ জানতে পারে না। পরমাত্মা ওপরে, নীচে, এদিকে-ওদিকে বা মধ্যস্থলে নেই। তিনি একস্থান থেকে অন্যস্থানে যান না। সম্পূর্ণ জগৎ তাঁর মধ্যেই অবস্থিত। তাঁর স্বরূপের বাইরে কোনো স্থান নেই। যদি ধনুক হতে নিক্ষিপ্ত বাণ অথবা মনের সমান গতিতে কেউ নিরন্তর ছুটে চলে, তবুও সে জগতের কারণস্বরূপ পরমেশ্বরের কোনো অন্ত পেতে পারে না। তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম এবং তাঁর থেকে স্থূল বস্তুও আর কিছু নেই। তাঁর সর্বত্র হস্ত-পদ, সর্বদিকে চক্ষু ও মস্তক এবং মুখ ও কান ; কারণ তিনি জগতে সবকিছু ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তমও তিনিই। সর্বপ্রাণীর মধ্যে তিনি অবস্থান করলেও, কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। ক্ষর এবং অক্ষর ভেদে দুই প্রকারের পুরুষ রয়েছে। সমস্ত ভূত হল ক্ষর (বিনাশশীল) এবং দিব্য অমৃতস্বরূপ চেতন আত্মা হল অক্ষর (অবিনাশী)। হংস নামে যে অবিনাশী জীবাত্মার প্রতিপাদন করা হয়েছে, তা হল কূটস্থ অক্ষর। এইভাবে যে বিদ্বান পুরুষ সেই অক্ষর আত্মাকে যথার্থরূপে জানতে পারে, সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

——০——

যোগ দ্বারা পরমাত্মা-প্রাপ্তির বর্ণনা

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র! তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি যথারীতি জ্ঞানের বিষয়ে বর্ণনা করেছি। এবার যোগের কথা বলছি, শোনো—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে পরম আত্মার সঙ্গে তার ঐক্যস্থাপন করাই যোগশাস্ত্রের মতে উত্তম জ্ঞান। এটি লাভ করার জন্য যোগীকে শম-দম ইত্যাদি সাধনসম্পন্ন হতে হবে। যোগী অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের চিন্তা করবে, আত্মাতেই অনুরাগ রাখবে, শাস্ত্রাদির তত্ত্ব জানবে এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করবে, কাম-ক্রোধ-লোভ-ভয়-স্বপ্ন—যোগের এই হল পাঁচটি দোষ। এই দোষগুলি দূর করে নিজেকে যোগ্য অধিকারী করে তুলবে। তারপর গুরুর শ্রীমুখ থেকে আধ্যাত্ম-জ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করবে।

এবার ওই পাঁচটি দোষ জয় করার উপায় বলা হচ্ছে। মনকে বশে রেখে ক্রোধ এবং সংকল্প ত্যাগ করলে কামকে জয় করা সম্ভব হয়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ করলে ধৈর্যশীল ব্যক্তি নিদ্রা জয় করতে সক্ষম হয়। ধৈর্যের আশ্রয় নিয়ে মানুষের বিষয় ভোগ এবং আহারের চিন্তা দূর করা উচিত। চক্ষুর সাহায্যে হাত ও পায়ের, মনের দ্বারা চক্ষু ও কান এবং কর্মের দ্বারা মন ও বাক্য সংযত করা উচিত। সতর্কতার সাহায্যে ভয় এবং বিদ্বানদের সেবাদ্বারা দম্ভ পরিত্যাগ করা উচিত।

যোগের সাধনাকারীর এইভাবে আলস্য পরিত্যাগ করে যোগসম্পর্কীয় দোষগুলি জয় করার চেষ্টা করা কর্তব্য। অগ্নি ও ব্রাহ্মণদের পূজা এবং দেবতাদের প্রণাম করা উচিত। কারো মনে দুঃখপ্রদানকারী হিংসাপূর্ণ কথা বলা উচিত নয়। তেজোময় ব্রহ্ম সব কিছুর বীজ (কারণ)। যা কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেসব তাঁরই রস (কার্য)। সমস্ত চরাচর জগৎ সেই ব্রহ্মেরই ঈক্ষণের (সংকল্পে) পরিণাম। ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, আচার, শুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা তেজ বৃদ্ধি হয়ে পাপ নাশ হয় এবং সাধকের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়ে সে 'বিজ্ঞান' প্রাপ্ত হয়। যোগীর উচিত সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমভাব রাখা। যা কিছু পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা, পাপগুলি ধুয়ে ফেলে তেজস্বী, মিতাহারী এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে কাম-ক্রোধ জয় করে ব্রহ্মপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করা।

যোগী মন ও ইন্দ্রিয়াদি একাগ্র করে রাত্রের প্রথম ও শেষ প্রহরে ধ্যানস্থ হয়ে মনকে আত্মায় স্থিত করবে। কলসের একস্থানে ছিদ্র হলে যেমন সমস্ত জল সেখান দিয়ে বার হয়ে যায়, তেমনই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটি ইন্দ্রিয়ও বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে ওই পথেই সাধকের শাস্ত্রীয় জ্ঞান লুপ্ত হয়; তাই জেলেরা মাছ ধরার সময় যেমন জাল কাটে যে মাছ, তাকে আগে ধরে, পরে অন্য মাছদের ধরে, তেমনই সাধকের প্রথমে নিজ মনকে বশে রাখতে হয়। তারপর চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা এইসব ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনে স্থাপিত করে ইন্দ্রিয়সহ মনকে বুদ্ধিতে লীন করবে, এতে ইন্দ্রিয়ের মালিন্য দূর হয়ে তাতে নির্মলভাব আসে। তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটে। যোগী নিজ অন্তঃকরণে ধূমবর্জিত অগ্নি, দীপ্তিমান সূর্য এবং আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় আত্মাকে দর্শন করে। যোগী সকলকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সবকিছুর মধ্যে অবস্থিত দেখে। যে মহাত্মা ব্রাহ্মণ জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, বিদ্বান ও সমস্ত প্রাণীর হিতে তৎপর থাকে, সে-ই পরমাত্মার দর্শন লাভ করতে পারে। যে যোগী একান্তে বসে কঠিন নিয়মাদি পালন করে একাগ্রচিত্তে যোগাভ্যাস করে, সে অল্প সময়ের মধ্যেই অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

যোগসাধনায় অগ্রসর হওয়ার সময় মোহ, ভ্রম এবং নানা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়, দিব্য সুগন্ধ পাওয়া যায়, দিব্য রূপ দর্শন হতে থাকে, নানাপ্রকার অদ্ভুত রস ও স্পর্শ অনুভব হতে থাকে। ইচ্ছামতো শীত-গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, হাওয়ার মতো চলা-ফেরার শক্তি আসে, প্রতিভা বৃদ্ধি পায়, দিব্য পদার্থ আপনিই এসে উপস্থিত হয়—এইসব সিদ্ধি পেয়েও যোগীর সেগুলি উপেক্ষা করা উচিত এবং মনকে সেদিক থেকে ফিরিয়ে এনে আত্মাতেই নিমগ্ন রাখা, নিয়মপূর্বক থাকা এবং পর্বতের ওপর, শূন্য গৃহ বা দেবমন্দির অথবা বৃক্ষের নীচে বসে তিন বার (প্রভাতে, রাতের প্রথম প্রহর ও শেষ প্রহরে) যোগাভ্যাসে থাকতে হয়। ধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন সর্বদা অর্থের চিন্তাতেই মগ্ন থাকে, তেমনই যোগসাধকও ইন্দ্রিয়াদিকে সংযমে রেখে হৃদয়কমলে স্থিত আত্মাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করবে। মনকে উদ্বিগ্ন করবে না, যেভাবে চঞ্চল মনকে রোধ করা সম্ভব, তাই করা প্রয়োজন এবং সাধনা থেকে কখনো বিচলিত হওয়া উচিত নয়। যোগসাধক মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোথাও আসক্ত হবে

না, সবদিকে উপেক্ষার ভাব রাখবে, নিয়মিত আহার করবে এবং লাভ-ক্ষতিকে সমদৃষ্টিতে দেখবে। প্রশংসা ও নিন্দাকেও সমানভাবে গ্রহণ করবে। কারো জন্য ভালো এবং কারো জন্য মন্দ চিন্তা করবে না। সর্বপ্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি বজায় রাখবে। বায়ুর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করেও আসক্তিহীন থাকবে। লাভ হলেও হর্ষোৎফুল্ল হবে না এবং ক্ষতি হলেও তা নিয়ে বিষণ্ণ হবে না। এইভাবে স্বস্থচিত্ত ও সমদর্শী থেকে ছয় মাস ধরে নিত্য যোগাভ্যাস করে যে সাধু, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎ লাভ করে।

ধনের জন্য প্রাণীদের বৈকল্য দেখে তাতে বীতরাগ হয়ে মাটির ডেলা, পাথর ও সোনাকে সমান মূল্যের ভাববে। নীচবর্ণের পুরুষ বা নারী হলেও, তার যদি ধর্ম লাভ করার ইচ্ছা হয়, তবে যোগমার্গ অবলম্বন করলে সে-ও পরমগতি লাভ করে। যে ব্যক্তি নিজ মনকে বশীভূত করেছে, সে-ই অজ, পুরাতন, অজর, সনাতন, নিত্যমুক্ত, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ থেকেও মহত্তর আত্মার দর্শন লাভ করতে সক্ষম।

মহর্ষি ব্যাসদেবের এই উপদেশ বিচার করে যে এই অনুযায়ী আচরণ করে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রহ্মার সমকক্ষ হয়ে পরমগতি লাভ করে।

কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রমের বর্ণনা

শুকদেব জিজ্ঞাসা করলেন—পিতা ! বেদে কর্ম করার বিধান আছে এবং কর্ম ত্যাগ করারও বিধান আছে, সুতরাং আমি জানতে চাই যে কর্ম করলে মানুষের কী ফল লাভ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্মত্যাগ করলে কী ফল প্রাপ্তি হয় ?

ভীষ্ম বললেন—শুকদেব একথা জিজ্ঞাসা করায় ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! আমি এই দুটি পথের বর্ণনা করছি—এরমধ্যে একটি হল ক্ষর (বিনাশশীল) আর অপরটি অক্ষর (অবিনাশী)। ক্ষর কর্মময় এবং অক্ষর জ্ঞানময়। বেদে দুটি পথের বর্ণনা করা হয়েছে—একটি প্রবৃত্তিধর্মের পথ আর অন্যটি নিবৃত্তিধর্মের—এরমধ্যে নিবৃত্তিধর্মের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কর্ম (অবিদ্যা)-দ্বারা মানুষ বন্ধনগ্রস্ত হয়, জ্ঞানদ্বারা মানুষ মুক্ত হয়। তাই দূরদর্শী সন্ন্যাসীগণ কর্ম সম্পাদন করেন না। কর্ম করলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়, ষোলো তত্ত্বদ্বারা নির্মিত দেহধারণ করতে হয় ; কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে জীব নিত্য, অব্যক্ত এবং অবিনাশী পরমাত্মাকে লাভ করে। কিছু অল্পবুদ্ধি মানুষ সকাম কর্মের প্রশংসা করে থাকে, তাই তারা ভোগাসক্ত হয়ে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা ধর্মের তত্ত্ব ভালোভাবে জেনে সর্বোত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে, তারা কর্মের তত প্রশংসা করে না, যেমন প্রত্যহ নদীর জল পানকারী ব্যক্তি কুয়ার জলে সন্তুষ্ট হয় না। কর্মের ফল হল সুখ-দুঃখ এবং জন্ম-মৃত্যু ; কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সেই স্থান লাভ হয় যেখানে গেলে মানুষ দুঃখ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পায়। যেখানে জন্ম-মৃত্যু পৌঁছায় না এবং জীব আর এই জগৎ-সংসারে ফিরে আসে না। জ্ঞান হওয়া মাত্রই অক্লেশে প্রাপ্ত, কখনো বিচ্যুত না হওয়া অব্যক্ত, অচল এবং নিত্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ হয়। তখন সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব এবং মানসিক সংকল্প বাধার সৃষ্টি করে না। সেই স্থিতি প্রাপ্তকারী ব্যক্তি সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সকলকে মিত্র বলে মনে করে এবং সর্বপ্রাণীর হিতে তৎপর থাকে।

তাত ! জ্ঞানী এবং কর্মাসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। জ্ঞানীর ক্ষয় নেই এবং কর্মাসক্ত ব্যক্তিরা চন্দ্রকলার ন্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তারা মন ও ইন্দ্রিয়রূপ একাদশ বিকারযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পদ্মপত্রের ওপর জলের ন্যায় যে স্বপ্রকাশ চিন্ময় দেবতা হৃদয়াকাশে বিরাজমান, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ (পরমাত্মা) বলে জানতে হবে এবং যোগের দ্বারা যিনি চিত্তবশে এনেছেন, সেই জীবাত্মাও তাঁরই স্বরূপ।

শুকদেব বললেন—পিতৃদেব ! এই জগতে যুগ যুগ ধরে যে সদাচার পালিত হয়ে আসছে, আমি তা জানতে চাই এবং সাধু-মহাত্মাগণ যা করে থাকেন, আমিও সেইরূপ আচরণ করতে চাই। আপনার উপদেশের সাহায্যে আমি পবিত্র হয়ে গিয়েছি এবং জগতের রীতি-নীতি সম্পর্কেও জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি। আমি এবার ধর্মাচরণের দ্বারা বুদ্ধিমার্জিত করে স্থূল দেহের অহংকার ত্যাগ করে সেই অবিনাশী স্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করব।

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! ব্রহ্মা পূর্বকালে আচার-

ব্যবহারের যে বিধান করেছিলেন, আগেকার সৎ ব্যক্তি এবং ঋষি-মহর্ষিগণ তাই পালন করে এসেছেন। ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেই পুণ্যলোক অধিকার করেছেন, তাই যারা নিজেদের কল্যাণ কামনা করে তাদের ব্রহ্মচর্য পালন করে আত্মবল লাভ করতে হবে। তারপর বাণপ্রস্থের নিয়মে বনবাস করে ফলমূল আহার ও পুণ্যতীর্থে ভ্রমণপূর্বক তপস্যা করা। প্রাণীহিংসা থেকে দূরে থাকা এবং সন্ন্যাসী হয়ে ভিক্ষাদ্বারা জীবননির্বাহ করে আত্মতত্ত্ব চিন্তা করা কর্তব্য। ভিক্ষার জন্য গৃহস্থের ঘরে আহার্য প্রস্তুতের পরই তাদের সেখানে যাওয়া উচিত। সন্ন্যাসী হয়ে ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্বাহ করা এবং আত্মতত্ত্ব চিন্তা করা এইভাবে জীবন কাটায় যে পুরুষ, সে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠে। শুকদেব! তুমিও স্তুতি, নমস্কার এবং শুভাশুভ বিষয় ত্যাগ করে ফলমূল যা পাওয়া যায়, তাইতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করে বনে একাকী বিচরণ করতে থাকো।

শুকদেব জিজ্ঞাসা করলেন—পিতা! কর্ম করা উচিত এবং কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য—বেদের যে এই দুপ্রকারের বচন, লোকদৃষ্টিদ্বারা বিচার করলে তা পরস্পর বিরুদ্ধ বলে প্রতীত হয়। এটি প্রামাণিক না অপ্রামাণিক? বিরোধ থাকায় একে শাস্ত্রীয় বচন বলে কীকরে মনে করা যায়? এবং দুটিই প্রামাণিক হয় কীভাবে? সেই সঙ্গে বলুন যে কর্মের বিরোধ না করে কীভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব?

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র! কর্ম করা এবং না করার পৃথক পৃথক অধিকারী থাকে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থ—এরা কর্ম করার অধিকারী এবং সন্ন্যাসী কর্ম ত্যাগ করে থাকেন। নিজ নিজ আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রোক্ত নিয়মাদি পালন করলে সকলেই উত্তম গতি লাভ করতে সক্ষম। কোনো একজন ব্যক্তিও যদি রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করে এই চার আশ্রম ধর্ম ক্রমশ বিধিমতো পালন করতে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই পরব্রহ্ম লাভ করবে। এই চার আশ্রম ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মের কাছে পৌঁছবার জন্য চারটি সোপানকেই সমান বলে মনে করা হয়। এদের সাহায্যে মানুষ ব্রহ্মলোক লাভ করতে সক্ষম হয়। ধর্ম ও অর্থে কুশলতা লাভ করার জন্য জীবনের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত গুরু বা গুরুপুত্রের সেবায় নিয়োজিত থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। ব্রহ্মচারী কারো নিন্দা করবে না, গুরুর শয়নের পরে শয়ন করবে এবং তাঁর জাগ্রত হওয়ার আগেই গাত্রোত্থান করবে। গুরুগৃহে একজন শিষ্য বা দাসের যা করণীয়, তা অবশ্যই পালন করবে। সর্বদা গুরুর কাছে থাকবে। সর্ব সময় কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। কাজ থেকে অবসর পেলে অধ্যয়ন করবে। সকলের প্রতি উদার হবে, কাউকে দোষ দেবে না। আচার্য ডেকে পাঠালে তৎক্ষণাৎ তাঁর সেবায় উপস্থিত হবে। অন্তর-বাইরে পবিত্র, প্রতিটি কাজে কুশল এবং গুণবান হবে। আলোচনা কালে মাঝে-মধ্যে শ্রবণকারীর অনুকূল ও প্রিয় প্রসঙ্গ উপস্থাপন করবে। ইন্দ্রিয়াদি নিজ বশে রেখে গুরুর প্রতি নম্র দৃষ্টিতে তাকাবে। আচার্যের আহার না হলে আহার করবে না, তাঁর বসার আগে বসবে না এবং তিনি শয়ন না করা পর্যন্ত শয়ন করবে না। দুহাতে তাঁর দুই পাদস্পর্শ করবে (ডান হাতে ডান পা এবং বাম হাতদ্বারা বাম পা স্পর্শ করবে) এবং প্রণাম জানাবে। এইভাবে অভিবাদন করে পরে হাত জোড় করে তাঁকে বলবে, 'গুরুদেব! এবার আমাকে পাঠ দিন। আমি সব কাজ পূর্ণ করেছি, অন্য কাজও করব। যে কাজের জন্য আদেশ দেবেন, তা শীঘ্রই পূর্ণ করব।' এইভাবে তাঁর কাছে নিবেদন জানিয়ে তাঁর নির্দেশে অন্য কাজ করবে এবং কাজ সম্পূর্ণ হলে গুরুদেবকে জানিয়ে দেবে। যেসব গন্ধ এবং রস ব্রহ্মচারীর পক্ষে সেবন করা নিষিদ্ধ, তা পরিহার করবে। সমাবর্তনের পরে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। ধর্মশাস্ত্রের তাই নিয়ম। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীদের জন্য শাস্ত্রে আরও যত নিয়ম বিস্তারিতভাবে বলা আছে, তা সবই পালন করে এবং গুরুর নিকটে থাকবে। এইভাবে যথাসাধ্য গুরুর সেবা করে তাঁকে প্রসন্ন রাখবে এবং ব্রহ্মচর্যব্রত পূর্ণ হলে তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমাবর্তন করবে। এরপরেই গৃহস্থাশ্রমে যাওয়ার অনুমতি লাভ করা যায়।

—০—

গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের বর্ণনা

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! গৃহস্থ পুরুষ তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ভাগ গার্হস্থ্য আশ্রমে অতিবাহিত করবে। ধর্মানুসারে বিবাহ করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নি স্থাপন করবে এবং নিত্য নিয়মে থেকে দুবার অগ্নিহোত্র করবে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের জন্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ চার প্রকার জীবিকার কথা বলেছেন—(এক বৎসরের জন্য) ধান সংগ্রহ করে রাখবে, (এক মাসের জন্য) কুণ্ড ভর্তি করে অন্যান্য অন্ন রাখবে, সারাদিনের জন্য অন্ন প্রস্তুত করে রাখবে অথবা কপোতী বৃত্তিতে থাকবে। এদের মধ্যে প্রথমের থেকে দ্বিতীয়গুলি শ্রেষ্ঠ। প্রথম শ্রেণী অনুসারে জীবিকা নির্বাহকারী ব্রাহ্মণের যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপন, দান-প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি কর্ম, দ্বিতীয় শ্রেণীদের জন্য অধ্যয়ন, যজন এবং দান—এই তিনটি কর্ম এবং তৃতীয় শ্রেণীদের জন্য অধ্যয়ন ও দান—এই দুটি কর্মের বিধান রয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীদের শুধুমাত্র ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) করা উচিত। শাস্ত্রে গৃহস্থদের জন্য বহু শ্রেষ্ঠ নিয়ম উল্লিখিত আছে। তারা শুধুমাত্র নিজেদেরই জন্য আহার প্রস্তুত করবে না, দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অতিথিদের জন্যও করবে। দিবসে কখনো নিদ্রা যাবে না, রাত্রের প্রথম প্রহর এবং শেষ প্রহরেও নিদ্রাতে থাকবে না। সকাল ও সন্ধ্যায় আহার করবে, মধ্যবর্তী সময়ে কিছু খাবে না। ঋতুকালের অতিরিক্ত সময়ে স্ত্রী-সহবাস করবে না। সর্বদা একথা স্মরণে রাখবে যে তোমার গৃহে কোনো ব্রাহ্মণ অতিথি ক্ষুধার্ত নেই তো ? তাঁর আদর-আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি হয়নি তো ? তোমার গৃহে যদি অতিথিরূপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, স্নাতক, শ্রোত্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়ানিষ্ঠ ও তপস্বী আসেন, তাহলে তাঁর যথাবিধি সৎকার করে হব্য ও কব্য সমর্পণ করা উচিত। কপট সাধু অথবা বিদ্বান বেশধারী মানুষ যদি গৃহে আসে, তাহলে সে-ও গৃহস্থের গৃহে অন্ন পাবার অধিকারী। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীকে তো সর্বদাই অন্নদান করা উচিত। এর অর্থ হল যে গৃহস্থ ব্যক্তির উত্তম ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত—সকল মানুষকেই যোগ্যতানুসারে অন্নদান করা উচিত।

গৃহস্থের সর্বদা পবিত্র ও অমৃত অন্ন ভোজন করা উচিত। পোষ্যবর্গকে ভোজন করাবার পরে যে অন্ন থাকে তা হল পবিত্র এবং পঞ্চযজ্ঞের অবশিষ্ট যে অন্ন তাকে অমৃত বলা হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজ স্ত্রীর প্রতিই অনুরক্ত থাকবে ; ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে জিতেন্দ্রিয় হবে এবং কারো প্রতি দোষারোপ করবে না। সে ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য, মাতুল, অতিথি, শরণাগত, বৃদ্ধ, বালক, রোগী, বৈদ্য, জ্ঞাতি-ভাই, মাতা, পিতা, কুটুম্ব, ভাই, পুত্র, পত্নী, কন্যা এবং সেবকদের সঙ্গে কখনো বিবাদ করবে না। যে এদের সঙ্গে কলহ করে না, সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। এদের অধীনে যারা থাকে, তারা জগতে জয়লাভ করে। আচার্য ব্রহ্মলোকের প্রভু এবং পিতা প্রজাপতিলোকের ঈশ্বর। অতিথি ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিক দেবলোকের এবং জ্ঞাতি ভাই বিশ্বদেবলোকের অধিকারী—এদের সকলকে সেবা করলে ওইসব লোক প্রাপ্তি হয়। মাতা ও মাতুলকে সন্তুষ্ট করলে পৃথিবীতে অধিকার লাভ হয়। বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও দুর্বল প্রাণীর সেবাদ্বারা আকাশলোকে বিজয় প্রাপ্তি হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায়, স্ত্রী ও পুত্র নিজেরই শরীর এবং সেবকগণ নিজের ছায়ার মতো। কন্যা তো আরো বেশি দয়ার যোগ্য, তাই এদের জন্য কখনো অসম্মানিত হলেও, সহ্য করে নেওয়া উচিত।

গৃহস্থ ধর্ম পালনকারী বিদ্বানদের নিশ্চিন্ত হয়ে ধর্মাচরণ করা উচিত এবং অর্থ লোভে কোনো কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। উন্নতিকামী পুরুষদের শাস্ত্রোক্ত আশ্রমধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করা উচিত। যে রাজ্যে পূর্বোক্ত তিন প্রকার বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী পূজনীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন, সেই রাজ্য উন্নত হয়। এই বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী গৃহস্থ তার দশ পূর্বপুরুষ এবং পরবর্তী দশ উত্তর পুরুষদের পবিত্র করে থাকে এবং সে বিষ্ণুলোক সদৃশ উত্তমলোক প্রাপ্ত হয় অথবা জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাদের মতো শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। উদার চিত্ত গৃহস্থগণ পরম রমণীয় স্বর্গলোক লাভ করে। ব্রহ্মা গৃহস্থ-আশ্রমকে স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন বলে জানিয়েছেন, সুতরাং যারা এই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে নিয়মাদি পালন করতে থাকে, তারা স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। তারপরে বাণপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত। এটি তৃতীয় আশ্রম এবং এটিকে গৃহস্থাশ্রম থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এবার এই আশ্রমের ধর্ম বলছি, শোনো—

গৃহস্থ পুরুষের চুলে যখন সাদা রং ধরবে, দেহে বলিরেখা দেখা দেবে এবং পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করবে, তখন জীবনের তৃতীয় ভাগ অতিবাহিত করার জন্য বাণপ্রস্থ আশ্রমে থাকা উচিত। গৃহস্থাশ্রমে সে যে অগ্নির উপাসনা

করত, বাণপ্রস্থেও তাই করা উচিত। প্রত্যহ দেবপূজা করবে, নিয়মে থাকবে, নিয়মিত ভোজন করবে, তৃতীয় প্রহরে একবার অন্নগ্রহণ করবে এবং প্রমাদ থেকে দূরে থাকবে। গৃহস্থেরই ন্যায় অগ্নিহোত্র, গো-সেবা এবং পূর্ণরূপে যজ্ঞের পালন করা বাণপ্রস্থের ধর্ম। বিনা চাষে উৎপন্ন ধান, যব বনবাসী মুনি এবং অতিথিকে প্রদান করার পর অবশিষ্ট অন্নে জীবন নির্বাহ করবে। বাণপ্রস্থেও পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান আছে, তাতেও চারপ্রকার বৃত্তির কথা বলা হয়েছে। সেই অনুসারে, কেউ সারাদিনের জন্য, কেউ সারামাসের জন্য, কেউ এক বৎসরের জন্য, কেউ দ্বাদশ বৎসরের জন্য অতিথি সেবা এবং যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অন্ন সঞ্চিত রাখে। বাণপ্রস্থীদের বর্ষার সময় খোলা মাঠে এবং হেমন্ত ঋতুতে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গ্রীষ্মের সময় পঞ্চাগ্নির দ্বারা শরীর তপ্ত করা এবং সর্বদা অল্প ভোজন করা উচিত। বাণপ্রস্থী মহাত্মাগণ মাটিতে শয়ন করে, একস্থানে আসন স্থাপন করে বসে এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও উপাসনা করে। কিছু লোক যা পাওয়া যায়, তার দ্বারাই জীবন নির্বাহ করে। কেউ কন্দ-মূলদ্বারা, কেউ ফলাহার করে জীবিকা চালায়। এইভাবে বাণপ্রস্থ আশ্রমে নিবাসকারী ব্যক্তি অত্যন্ত কঠোর নিয়ম পালন করে। এদের জন্য উপরিউক্ত নিয়ম ব্যতীত আরো বহু নিয়ম শাস্ত্রে বলা আছে।

বৎস ! সত্য সংকল্পধারী যাযাবর নামক ঋষি, ধর্মে প্রবীণতা প্রাপ্ত বহু সংখ্যক উগ্র তপস্বী মুনি এবং অসংখ্য ব্রাহ্মণ বাণপ্রস্থ আশ্রম স্বীকার করেছেন। বালখিল্য এবং সৈকতও বাণপ্রস্থী ছিলেন। এই সকল জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা বনে বাস করে দুস্তর কর্মদ্বারা ক্লেশ সহ্য করে সদা ধর্মে ব্যাপৃত থেকেছেন। তাই তাঁদের সংকল্প সিদ্ধ হয়েছিল। তাঁরা তারকা থেকে ভিন্ন হয়েও জ্যোতির্ময় স্বরূপে দৃষ্টিগোচর হতেন। কেউ তাঁদের অসম্মান করতে পারত না।

এইভাবে বাণপ্রস্থের মেয়াদ পূর্ণ হলে যখন জীবনের শেষ চতুর্থ ভাগ বাকি থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অসুখে শরীর আক্রান্ত হয়, তখন সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। সন্ন্যাস আশ্রমের দীক্ষা নেওয়ার সময়, একদিনে সম্পন্ন হয় তেমন যজ্ঞ করে, নিজের সম্পূর্ণ অর্থ দক্ষিণায় দিয়ে দিতে হয়। তারপর আত্মারই যজন, আত্মাতেই প্রেম এবং আত্মার সঙ্গেই ক্রীড়া করবে। সর্বপ্রকারে আত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করবে। অগ্নিহোত্রের অগ্নি আত্মাতে আরোপিত করে সমস্ত সংগ্রহ পরিত্যাগ করবে। নচেৎ যে যজ্ঞ শীঘ্র সম্পন্ন হয় (ব্রহ্মযজ্ঞাদি) সেইগুলি এবং দর্শপৌর্ণমাসাদি ইষ্ট ততক্ষণ পালন করা উচিত যতক্ষণ আত্মযজ্ঞের অভ্যাস না হয়। আত্মযজ্ঞের বিধি হল এইরূপ নিজের হৃদয়কে গার্হপত্য, মনকে অন্বাহার্যপচন এবং মুখকে আহবনীয় অগ্নি মনে করে তিনি অগ্নিকে নিজ শরীরে স্থাপন করে রাখবে। দেহ ত্যাগ হওয়া পর্যন্ত প্রাণাগ্নি হোত্র বিধির দ্বারা যজন করতে থাকবে। সন্ন্যাসী অন্নের নিন্দা না করে যজুর্বেদের 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি[১] মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ অন্নের প্রথম পাঁচ গ্রাস গ্রহণ করবে। তৎপশ্চাৎ আচমন করে মৌন হয়ে বাকি অন্ন গ্রহণ করবে।

যে ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করে সন্ন্যাসী হন, তিনি মৃত্যুর পর তেজোময় লোকে গমন করেন এবং অন্তকালে মোক্ষলাভ করেন। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সুশীল এবং পাপবর্জিত হয়, তারা ইহলোক এবং পরলোকে কোনো কিছু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনো কর্ম করতে চায় না। ক্রোধ, মোহ, সন্ধি, বিগ্রহ পরিত্যাগ করে তারা সর্বভাবে উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করে। যারা অহিংসা, যম, শৌচ, সন্তোষ ইত্যাদি নিয়মাদি পালন করায় কখনো কষ্ট অনুভব করে না এবং সন্ন্যাস-আশ্রম বিধানকারী শাস্ত্র-বচন অনুসারে ত্যাগময় অগ্নিতে নিজের সর্বস্ব আহুতি দিতে চায়, তাদের ইচ্ছানুযায়ী গতি (মুক্তি) লাভ হয় ; এরূপ জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ আত্মজ্ঞানীদের মুক্তির বিষয়ে কোনো সন্দেহের স্থান নেই।

যারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করে একাকী বিচরণ করে, তারা সর্বব্যাপক হওয়ায় নিজেরাও কাউকে ত্যাগ করতে পারে না এবং অন্যেও তাদের ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। সন্ন্যাসী কখনো অগ্নিতে হবন করবেন না, গৃহ বা মঠে থাকবেন না, কেবল ভিক্ষা গ্রহণের জন্যই গ্রামে যাবেন এবং একদিনের অন্ন সংগ্রহ করবেন। চিত্তবৃত্তিকে সংযত রাখবেন, দিন-রাতে কেবলমাত্র একবার লঘু ও নিয়মানুকূল খাদ্য গ্রহণ করবেন। কারোকে সঙ্গে রাখবেন না এবং সব প্রাণীকেই উপেক্ষা করবেন—সন্ন্যাসীদের

[১] ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। এই পাঁচটি মন্ত্র এক একবার পড়ে এক এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করা উচিত।

এইগুলি হল লক্ষণ। সন্ন্যাসী কাউকে কটু কথা বলবেন না। ব্রাহ্মণদের প্রতি যাতে কটুকথা বলা না হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। ব্রাহ্মণদের যাতে হিত হয়, সেইরূপ কথা বলবেন, নিজ নিন্দা শুনলেও সংযত থাকবেন— ভব-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার এই হল উপায়। যিনি নিজ সর্বব্যাপী স্বরূপে স্থিত হওয়ায় একাকী সমস্ত আকাশে পরিপূর্ণের মতো হয়ে রয়েছেন এবং যিনি নাম-রূপে মিথ্যা বুদ্ধি রাখায় জন-পরিপূর্ণ স্থানও শূন্য বলে মনে করেন, দেবতারা তাঁকেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞানী) বলে মনে করেন। যিনি, যে কোনো কিছু (বস্ত্র, বল্কল ইত্যাদি) দ্বারা নিজ শরীর আবৃত করেন, সময়-অসময়ে (রুক্ষ-শুষ্ক) যা কিছু পাওয়া যায় তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন এবং যে কোনো স্থানে শয়ন করে থাকেন, যাঁর দৃষ্টিতে নারী ও মৃতের মধ্যে তফাৎ থাকে না, মান-অপমানে বিচলিত হন না, সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলে মনে করেন। সন্ন্যাসীর জীবন বা মৃত্যু কোনো কিছুতেই আসক্ত থাকা উচিত নয়। সেবক যেমন তার প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় থাকে, তেমনই সন্ন্যাসীরও কালের প্রতীক্ষায় থাকা উচিত। মন ও বাক্যে কোনো মলিনতা আসতে দেওয়া উচিত নয় এবং সর্বপাপ মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে শত্রুহীন হয়ে যাওয়া উচিত। যিনি এই স্থিতি লাভ করেছেন, জগৎ সংসারে তাঁর আর কীসের ভয় ? যিনি কোনো প্রাণী হতে ভীত হন না এবং কোনো প্রাণীও যাঁর থেকে ভীত হয় না, সেই মোহমুক্ত পুরুষের কারো থেকে ভয় হয় না। যিনি হিংসা করেন না, সমদর্শী, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং সকলকে শরণ প্রদান করেন, তিনি উত্তম গতি লাভ করেন। এইরূপ জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত হয়ে যিনি ভয় ও কামনারহিত হয়েছেন, মৃত্যুও তাঁকে অধিকার করতে পারে না ; তিনি স্বয়ং মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেন। যিনি সর্বপ্রকার আসক্তিমুক্ত হয়ে মুনিবৃত্তি ধারণ করেন, আকাশের ন্যায় নির্লেপ ও স্থির, কোনো বস্তুই নিজের বলে মনে করেন না, একাকী বিচরণ করে শান্তভাবে থাকেন, যাঁর জীবন ধর্মের জন্য এবং ধর্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে হয়, যাঁর দিন ও রাত্রি শুভ কর্মে অতিবাহিত হয়, যিনি নিষ্কাম হওয়ায় সকাম কর্ম আরম্ভ করেন না, নমস্কার ও স্তুতির থেকে দূরে থাকেন এবং সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন, দেবতাদের মতে তিনিই ব্রাহ্মণ। পৃথিবীর সকল প্রাণীই সুখে আনন্দিত ও দুঃখে ভীত হয় ; অতএব যাঁর প্রাণীদের ভীত হতে দেখে মনে দুঃখ হয়, সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির ভীতিদায়ক কর্ম করা উচিত নয়। জীবকে অভয় প্রদান করা সব দানের থেকে বড়। যিনি আগেই হিংসা ত্যাগ করেছেন, তিনি সর্বপ্রাণী থেকে ভয়মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করেন। যিনি নিজে কোনো নিন্দার কাজ করেন না এবং অপরকে নিন্দা করেন না, সেই ব্রাহ্মণই পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ করতে সক্ষম হন। যাঁর মোহ এবং পাপ দূরীভূত হয়েছে, তিনি ইহলোক অথবা পরলোকের ভোগে আসক্ত হন না। এরূপ সন্ন্যাসীদের রোষ ও মোহ স্পর্শ করতে পারে না। তারা মাটি ও সোনাকে সমদৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং শত্রু-মিত্র ও মান-অপমানরহিত হন। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ থাকে না এবং উদাসীনের ন্যায় তাঁরা সর্বত্র বিচরণ করেন।

শুকদেব ! দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদি প্রকৃতির যেসব বিকার, সেগুলি ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) ওপরই আধারিত। এগুলি জড় হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে পারে না, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ এই সবগুলিকেই জানেন। বুদ্ধিমান সারথি যেমন তার ঘোড়াকে নিজ বশীভূত করে কাজ করিয়ে নেয়, তেমনই ক্ষেত্রজ্ঞও নিজ বশে রাখা মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত কার্য সিদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়াদির থেকে তার বিষয়, বিষয় থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি) এবং অব্যক্ত থেকে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। তিনি সকলের সীমা এবং পরম গতি। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত এই পরমাত্মা দৃষ্টিগোচর হন না। সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী মহাত্মারাই সূক্ষ্ম এবং উত্তম বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে অনুভব করতে সক্ষম। সন্ন্যাসীদের কর্তব্য হল মনসহ ইন্দ্রিয়াদি এবং তার বিষয়গুলি বুদ্ধির দ্বারা অন্তরাত্মাতে লীন করে নানা দৃশ্যের চিন্তা না করা। ধ্যানের সাহায্যে মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে বিবেক দ্বারা স্থিত করে শান্তভাবে থাকা উচিত। এরূপ করলে অমৃতপদ লাভ হয়। যারা ইন্দ্রিয়াদির বশে থাকে, তারা বিবেচনাশক্তি বিসর্জন দেয় এবং কামাদি শত্রুর হাতে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই সর্বসংকল্প নাশ করে চিত্তকে সূক্ষ্মবুদ্ধিতে লীন করো, তবেই কালের ওপর বিজয় লাভ করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, চিত্ত প্রসন্ন হওয়ায় সেই সন্ন্যাসী শুভ-অশুভ ত্যাগ করে আত্মনিষ্ঠ হয়ে অনন্ত আনন্দ (মোক্ষ-সুখ) অনুভব করেন। প্রসন্নতার লক্ষণ হল সর্বদা সুষুপ্তির সমান সুখ অনুভূত হওয়া এবং

বায়ুরহিত স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো মনে কোনো চঞ্চলতা না আসা।

যে ব্যক্তি মিতাহারী এবং শুদ্ধচিত্ত হয়ে রাতের প্রথম প্রহর ও শেষ প্রহরে আত্মাকে পরমাত্মার ধ্যানে সন্নিবিষ্ট করে, সেই নিজের অন্তরে পরমাত্মার দর্শন লাভ করে। পুত্র ! আমি যে উপদেশ প্রদান করলাম এটি পরমাত্মার জ্ঞান প্রদানকারী শাস্ত্র, সমস্ত উপনিষদের রহস্য। শুধুমাত্র অনুমান বা আগম-দ্বারা এর জ্ঞান হয় না, অনুভবের দ্বারা এটি ঠিকমতো বোঝা যায়। এটি হল ধর্ম ও অর্থের সারভূত উপাখ্যান। ঋকবেদের দশ হাজার মন্ত্র মন্থন করে আমি এই উপদেশামৃত নির্দিষ্ট করেছি। যেমন দধি মন্থনে মাখন, কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি নির্গত হয়। তদনুরূপ বেদ মন্থন করে আমি এই সারকথা জানিয়েছি। তুমি শুধুমাত্র ব্রতধারী স্নাতককেই এই উপদেশ প্রদান করবে। যার মন শান্ত নয়, ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই এবং যে তপস্বী নয়, তাকে এই জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি বেদে অনভিজ্ঞ, অভক্ত, দোষদর্শী, কুটিল, বৃথাতর্কধারী, নিন্দাকারী, সেও এই জ্ঞানের অধিকারী নয়। প্রশংসনীয়, শান্ত, তপস্বী এবং সেবাপরায়ণ শিষ্য ও প্রিয় পুত্রকে এই গূঢ় ধর্মের উপদেশ দেওয়া উচিত, অন্য কাউকে নয়। যদি কেউ রত্নপূর্ণ ধরিত্রীও প্রদান করে তাহলেও তত্ত্ববেত্তা পুরুষ তার থেকে এই জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এবার আমি তোমার প্রশ্ন অনুসারে এর থেকেও গূঢ় অধ্যাত্মজ্ঞানের উপদেশ দেব যা মানবীয় জ্ঞানের অতীত, যা শুধু মহর্ষিগণই জানেন এবং উপনিষদে যা বর্ণিত আছে। এখন তোমার যে বস্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় এবং যে বিষয়ে তোমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করো এবং তার উত্তরে আমি যা বলি মন দিয়ে শোনো।

অধ্যাত্মজ্ঞান এবং তার সাধনগুলির বর্ণনা

শুকদেব বললেন—পিতৃদেব ! অধ্যাত্মজ্ঞান বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করুন।

মহর্ষি ব্যাস বললেন—পুত্র ! আমি অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি শোনো। মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ে প্রাণীর শরীর গঠিত। এগুলি সর্বত্র একই প্রকার হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক জীবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। সম্পূর্ণ চরাচর জগতই পঞ্চভূতময়। পঞ্চভূত হতেই সবকিছুর উৎপত্তি হয় এবং তাতেই সব লয়প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সকল প্রাণীর মধ্যে তাদের কর্মানুসারে অল্পবিস্তরভাবে পঞ্চমহাভূতের সন্নিবেশ করেছেন।

শুকদেব জিজ্ঞাসা করলেন—পিতা ! দেহের অবয়বে বিভিন্ন মাত্রায় যে পঞ্চমহাভূত সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তা কীভাবে জানা যায় ? শরীরে ইন্দ্রিয়াদিও আছে, গুণও আছে, এরমধ্যে কোনটি কোন মহাভূতের কার্য তার জ্ঞান কীভাবে হতে পারে ?

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! আমি ক্রমশ এই বিষয়টি প্রতিপাদন করছি, একাগ্রচিত্তে শোনো। শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয় এবং শরীরের সমস্ত ছিদ্র আকাশ থেকে উৎপন্ন। প্রাণ, চেষ্টা এবং স্পর্শের উৎপত্তি বায়ু থেকে। রূপ, চক্ষু এবং জঠরানল—এই তিনটি অগ্নির কার্য। রস, রসনা ও স্নেহ—এগুলি জলের গুণ। গন্ধ, নাসিকা ও শরীর—ভূমির কার্য। এইগুলি হল ইন্দ্রিয়সহ পঞ্চভৌতিক বিকার। গুণাদির স্পর্শ বায়ুর, রস জলের, রূপ তেজের, শব্দ আকাশের এবং গন্ধ ভূমির কার্য। কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসারিত করে আবার গুটিয়ে নেয়, তেমনই বুদ্ধিও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয়াদির দিকে প্রসারিত করে নিজেকে পুনরায় সংকুচিত করে নেয়। বুদ্ধিই গুণাদির স্বরূপ ধারণ করে এবং মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বুদ্ধিরূপ। বুদ্ধির অভাবে গুণ বা ইন্দ্রিয়াদির অস্তিত্বই নেই। মানুষের দেহে পাঁচ ইন্দ্রিয়, ষষ্ঠ তত্ত্ব হল মন। সপ্তম তত্ত্ব বুদ্ধি এবং অষ্টম হল ক্ষেত্রজ্ঞ। চক্ষু দেখার কাজ করে, মন সন্দেহ করে এবং বুদ্ধি সেটি স্থির করে ; কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞকে সেই সবকিছুর সাক্ষী বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটি গুণ মন হতে উৎপন্ন এবং সর্বপ্রাণীর মধ্যে সমানভাবে বিরাজমান, কার্যের দ্বারাই তাদের জানা যায়। যখন হর্ষ, প্রেম, আনন্দ, সমতা এবং স্বচ্ছচিত্তের বিকাশ হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বলে বুঝতে হবে। অভিমান, অসত্যভাষণ, লোভ, মোহ, এবং অসহনশীলতা—এগুলি রজোগুণের চিহ্ন। মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য এবং অজ্ঞান তমোগুণের প্রভাব বলে

জানা উচিত।

শুকদেব ! কর্ম করলে তিন প্রকারে প্রেরণা পাওয়া যায়, প্রথমে মনে নানা প্রকারের ভাব ওঠে, পরে বুদ্ধি তা স্থির করে, তারপরে হৃদয় তার অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা বিচার করে। তারপরে কর্মে প্রবৃত্তি হয়। ইন্দ্রিয়াদির থেকে তার বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াদি গ্রহণ করার জন্য বুদ্ধিই বিকৃত হয়ে নানারূপ ধারণ করে, সেটিই যখন শ্রবণ করে তখন শ্রোত্র বলা হয়, স্পর্শ করার সময় স্পর্শেন্দ্রিয় বলা হয়। দেখার সময় দৃষ্টি এবং রসাস্বাদনের সময় রসনা হয়ে যায়, যখন গন্ধ গ্রহণ করে তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলা হয়। বুদ্ধির এই বিকারগুলিকেই ইন্দ্রিয় বলা হয়। মানুষ যখন কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করে তখন তার বুদ্ধি মনরূপে পরিণত হয়। নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি পৃথকরূপে প্রতীয়মান হলেও বুদ্ধিতেই অবস্থান করে, এগুলিকে নিজ অধীনে রাখা উচিত ; কারণ মানুষ যখন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে, তখন যেমন প্রদীপের আলোয় কোনো বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তেমনই তার জ্ঞানালোকে আত্মার সাক্ষাৎকার হতে থাকে। জলচর পাখি যেমন জলে বিচরণ করেও তাতে নিমগ্ন হয় না, তেমনই মুক্তযোগী সংসারে থেকেও তার দোষ-গুণে লিপ্ত হন না। যে ব্যক্তি নিজ পূর্বকৃত কর্ম পরিত্যাগ করে সর্বদা পরমাত্মার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, সে সমস্ত প্রাণীর আত্মা হয়ে ওঠে এবং কখনো বিষয়াসক্ত হয় না। গুণ আত্মাকে জানে না, কিন্তু আত্মা সর্বদাই তাদের জানে, কেননা আত্মা গুণাদির দ্রষ্টা। গুণ ও আত্মার মধ্যে এই হল পার্থক্য।

প্রকৃতিই গুণাদি সৃষ্টি করে। আত্মা উদাসীনের ন্যায় আলাদা থেকে তা শুধু সাক্ষীর মতো দেখে যায়। মাকড়সা যেমন নিজ শরীর নিঃসৃত লালা থেকে তন্তু সৃষ্টি করে, তেমনই প্রকৃতিও সমস্ত ত্রিগুণাত্মক পদার্থের জননী। কারো কারো মত হল যে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যখন গুণাদি নাশ করা হয়, তখন তা আর পুনরায় উৎপন্ন হয় না, সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় ; কারণ তার আর কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। তারা এইভাবে ভ্রম ও অবিদ্যার নিবারণকেই মুক্তি বলে মনে করে। অন্যদের মত হল ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। এই দুই মতের ওপর নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করে সিদ্ধান্ত স্থির করা উচিত এবং নিজ মহৎ স্বরূপে স্থিত হওয়া কর্তব্য। আত্মা অনাদি-অনন্ত, তা জেনে মানুষের হর্ষ ও ক্রোধ ত্যাগ করে সর্বদা মাৎসর্যরহিত হয়ে বিচরণ করা উচিত। হৃদয়ের অবিদ্যাময় গ্রন্থি—যা বুদ্ধির চিন্তা ধর্মের দ্বারা সুদৃঢ় হয়ে থাকে, তা ছেদন করে শোক ও সন্দেহ-রহিত হয়ে চিরকালের জন্য সুখী হতে হয়। যেমন সাঁতার না জানা ব্যক্তি নদীজলে পড়ে গেলে জলে ডুবে গিয়ে নানা দুঃখ সহ্য করে, কিন্তু যে সাঁতার জানে সে জলে ডুবে গেলেও কোনো কষ্ট না পেয়ে সাঁতার কেটে ফিরে আসে, তেমনই অজ্ঞানী ব্যক্তি এই সংসার-সমুদ্রে ডুবে দুঃখ পায় এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে লাভ করেছে, সেই তত্ত্ববেত্তা পুরুষ সংসার সমুদ্র পার হয়ে যায়। যে জগতের সমস্ত প্রাণীর গমনাগমনের তত্ত্ব অবগত এবং তাদের বিষম অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত, সে পরমশান্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণদের এই জ্ঞানপ্রাপ্ত করার শক্তি স্বাভাবিকভাবেই থাকে। মন এবং ইন্দ্রিয়াদির সংযম এবং আত্মার জ্ঞান—মোক্ষ-প্রাপ্তির পক্ষে এই হল পর্যাপ্ত সাধন। শম এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা পুরুষ অত্যন্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ হয়ে ওঠে। বুদ্ধের (জ্ঞানীর) এতদ্‌ব্যতীত আর কী লক্ষণ হতে পারে ? বুদ্ধিমান মানুষ এই আত্মতত্ত্ব জেনে কৃতার্থ হয়ে যায়। জ্ঞানী পুরুষগণ যে সনাতন গতি প্রাপ্ত হন, তার থেকে ভালো উত্তম গতি আর কেউ লাভ করে না। কিছু ব্যক্তি মানুষকে রোগী ও দুঃখী দেখে তাদের মধ্যে দোষের অনুসন্ধান করে আবার অন্যেরা তাদের অবস্থা দেখে দুঃখ করে। কিন্তু যাদের নিত্য ও অনিত্য বোঝার বুদ্ধি থাকে, তারা শোকও করে না, দোষ-দৃষ্টিতেও দেখে না। এইসব লোককেই কুশল বলে জানতে হবে। কর্মপরায়ণ মানুষ নিষ্কামভাবে যে কর্ম অনুষ্ঠান করে, তা আগের করা সকাম কর্মগুলিকে বিনাশ করে দেয়, কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তাঁর ইহজন্ম অথবা পূর্বজন্মে কৃত কর্মগুলি তাঁর জীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়, তার মহিমা এবং কামস্বরূপ বৃক্ষ ছেদনের উপদেশ

শুকদেব বললেন—পিতা ! এবার আপনি সেই ধর্মের বর্ণনা করুন, যা সব ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং যার থেকে আর কোনো ধর্ম বড় নয়।

মহাত্মা ব্যাস বললেন—পুত্র ! আমি ঋষিগণ বর্ণিত প্রাচীন ধর্ম, যা সব ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ, তার বর্ণনা করছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শোনো। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে সযত্নে রাখেন, তেমনই বুদ্ধিবলে মানুষের বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গুলিকে যত্নসহকারে সংযমে রাখা উচিত। মন ও ইন্দ্রিয়াদির একাগ্রতাই সবথেকে বড় তপস্যা, এটিই সব থেকে বড় ধর্ম। মনসহিত ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধিতে স্থাপন করে নিজেতেই নিজে সন্তুষ্ট থাকবে, নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে না। যখন ইন্দ্রিয়াদি নিজ বিষয় থেকে সরে গিয়ে বুদ্ধিতে স্থিত হবে, তখনই তুমি সনাতন পরমাত্মার দর্শন লাভ করবে। ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান সেই পরমেশ্বরই সকলের আত্মা এবং পরম মহান ; মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাঁর দর্শন লাভ করেন। পুরুষ প্রজ্বলন্ত জ্ঞানময় প্রদীপের সাহায্যে নিজ অন্তকরণে সেই আত্মাকে দর্শন করে। শুকদেব ! তুমিও এইভাবে আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠো। উত্তম বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বপ্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্নচিত্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হও। সেই অবস্থায় তুমি সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয় স্পষ্টভাবে দর্শন করবে। শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মাগণ এবং তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ সংসারসাগর পার হওয়ার সাধনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মেনে নিয়েছেন। পুত্র ! আমি তোমাকে সর্বব্যাপী পরমাত্মার জ্ঞানের সাধন জানালাম, যে কেউ পরম পবিত্র, হিতৈষী এবং ভক্ত হবে, তাকে এই উপদেশ প্রদান করা উচিত। এটি পরম গোপনীয়, গুহ্য জ্ঞান আত্মার দর্শন প্রদানকারী। এটি স্বয়ং অনুভব করা উচিত। এই পরব্রহ্ম-পরমাত্মা দুঃখ-সুখের অতীত এবং ভূত-ভবিষ্যতের কারণ ; তিনি নারী-পুরুষ বা নপুংসক কোনোটিই নন। নারী বা পুরুষ, যেই এই ব্রহ্মকে জানতে পারবে, তার আর পুনর্জন্ম হবে না। মোক্ষ সিদ্ধির জন্যই এই আত্মজ্ঞানরূপ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা হয়। পুত্র ! সর্বপ্রকার মতের দ্বারা এই বিষয় যেমনভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, আমি সেইভাবেই এটি বর্ণনা করেছি।

গন্ধ ও রস ইত্যাদি বিষয়ে রাগ-দ্বেষ না হওয়া, সুখের আসক্তি থেকে দূরে থাকা এবং মান-মর্যাদা, যশ-কীর্তির ইচ্ছা ত্যাগ করা—তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের এগুলিই আচার। গুরু সেবায় নিয়োজিত হয়ে, ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক সম্পূর্ণ বেদ পাঠ এবং তার জ্ঞান প্রাপ্ত করলেই কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে যায় না। যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকে আপন মনে করে, তাদের দয়া করে এবং সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব বেদের তত্ত্বজ্ঞ হয়ে মৃত্যুকে নিজের অধীন করে রাখে, সে-ই সত্যকার ব্রাহ্মণ। বিধি পরিত্যাগ করে, নানাপ্রকার ইষ্ট এবং বড় বড় দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করলেই কেউ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে না। যখন সে অন্য প্রাণী থেকে ভীত হয় না এবং অন্য প্রাণীও তাকে দেখে ভীত হয় না, যখন সেই ব্যক্তি ইচ্ছা ও দ্বেষ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, সেই সময় সে ব্রহ্মভাব লাভ করে এবং তখনই সে ব্রাহ্মণ হওয়ার অধিকারী হয়। যখন কায়-মনো-বাক্যে কোনো প্রাণীর ক্ষতি করার চিন্তা আসে না, সেই সময় মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। জগতে কামনাই একমাত্র বন্ধন, যে কামনা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। বহু নদীর দ্বারা অনবরত জলের প্রবাহ পতিত হলেও সমুদ্র যেমন কখনো নিজ মর্যাদা ত্যাগ করে না, বিচলিত হয় না, তেমনই সম্পূর্ণ ভোগ যে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে কোনো বিকার উৎপন্ন না করেই প্রবেশ করে যায়, তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন ; যারা ভোগ কামনা করে, তারা নয়। বেদের সারই সত্য, সত্যের সার ইন্দ্রিয় সংযম, তার সার হল দান এবং দানের সার তপস্যা। তপস্যার সার ত্যাগ, ত্যাগের সার সুখ, সুখের সার স্বর্গ এবং স্বর্গের সার মনোনিগ্রহ। মানুষকে সন্তুষ্ট চিত্তে শান্তির উত্তম উপায় সত্ত্বগুণকে আপন করার ইচ্ছা রাখা উচিত। সত্ত্বগুণ মনের তৃষ্ণা, শোক ও সংকল্প সর্বতোভাবে নষ্ট করে দেয়। পুরুষের শোকশূন্য, মমত্বরহিত, শান্তি, প্রসন্নচিত্ত ও মাৎসর্যহীন হওয়া উচিত—এই পাঁচ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে। যে ব্যক্তি দেহাভিমান মুক্ত হয়ে সত্ত্বপ্রধান সত্য, দম, দান, তপ, ত্যাগ ও শম—এই ছয় গুণ এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ তিন সাধন দ্বারা অনুভূত আত্মাকে এই শরীরেই জেনে যায়, সে পরমশান্তি লাভ করে। যা উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, সংস্কার শূন্য, স্বভাবসিদ্ধ এবং শরীরের মধ্যে অবস্থিত, সেই ব্রহ্মকে লাভ করে মানুষ আনন্দের ভাগী হয়। নিজের মনকে

অবিচল রেখে আত্মাতে স্থাপিত করায় পুরুষ যে সুখ ও সন্তোষ লাভ করে, তা অন্য কোনো উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। যাকে পেলে বিনা আহারে তৃপ্তি লাভ হয়, যে ধন পেলে ধনী-দরিদ্র উভয়েই সন্তুষ্ট হয়, যার আশ্রয় পেলে ঘৃতাদি সেবন না করেও মানুষ নিজ দেহে অনন্ত বল অনুভব করে, সেই ব্রহ্মকে যে জানে, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের জন্ম-মরণের ভয় থাকে না। যখন সম্পূর্ণ আসক্তি মুক্ত হয়ে মানুষ সমত্বে স্থিত হয়, তখন এই শরীরে অবস্থান করেও সে ইন্দ্রিয়াদির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যে কার্যময় প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করে কারণরূপ ব্রহ্মে স্থিত হয়, সেই জ্ঞানী পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই জগতে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না।

মানুষের হৃদয়-ভূমিতে মোহরূপ বীজ থেকে উৎপন্ন এক্ অদ্ভুত বৃক্ষ আছে, তার নাম কাম। ক্রোধ ও অভিমান তার স্কন্ধ, কর্মের বেগ সঞ্চয়ের পাত্র এবং অজ্ঞান তার মূল। প্রমাদরূপী জলদ্বারা তাকে সেচন করা হয়। অসূয়া তার পাতা এবং পূর্বজন্মে কৃত পাপগুলি তার সার। শোক তার শাখা, মোহ ও চিন্তা তার প্রশাখা এবং ভয় হচ্ছে তার অঙ্কুর, তাতে তৃষ্ণারূপী লতা জড়িয়ে আছে। লোভী মানুষরা লৌহ শৃঙ্খলের মতো বাসনা বন্ধনে বদ্ধ হয়ে সেই বৃক্ষকে চারদিক দিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার ফল আস্বাদন করতে চায়। যে বাসনা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেই কাম-বৃক্ষকে কেটে ফেলে, সে-ই জাগতিক সুখ-দুঃখ ত্যাগ করে তার বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু যে মূর্খ ফলের লোভে সেই বৃক্ষে আরোহণ করে, সে বিষ-খাওয়া রোগীর ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ওই কাম-বৃক্ষের মূল বহুদূর বিস্তৃত। বিদ্বান ব্যক্তিরাই তাদের জ্ঞানের প্রভাবে সমতারূপ অস্ত্রের সাহায্যে তাকে বলপূর্বক ছেদন করে। এইভাবে যে ব্যক্তি কামনাগুলিকে বন্ধনরূপ জেনে তার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার উপায় জেনে যায়, সে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

পঞ্চভূতের গুণাদি বর্ণনা এবং ধর্মের প্রতিপাদন

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ভগবান ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেবকে আগে যেরূপ ভূতাদির গুণসমূহ প্রতিপাদন করেছিলেন, আমি পুনরায় সেগুলি তোমাকে বলছি ; শোনো—স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, কাঠিন্য, বীজ অঙ্কুরিত করার শক্তি, গন্ধ, গন্ধ গ্রহণ করার শক্তি, স্থূলত্ব, সংঘাত, আশ্রয়দান, সহনশীলতা এবং ধারণশক্তি—এগুলি সবই মৃত্তিকার গুণ। শীতলতা, রস, ক্লেদ (ভিজে যাওয়া), দ্রবত্ব, স্নেহ, সৌম্যভাব, জিহ্বা, বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়া, বরফ ইত্যাদির রূপে জমে যাওয়া এবং পার্থিব পদার্থসমূহ সিদ্ধ করা—এসব জলের গুণ। দুর্ধর্ষ হওয়া, জ্বলে ওঠা, গরম হাওয়া, পরিপাক, প্রকাশ, শোক, রাগ, শীঘ্রগমন, তীক্ষ্ণতা, শিখার ঊর্ধ্বমুখী হওয়া—এই সব অগ্নির গুণ। স্পর্শ, বাগিন্দ্রিয়, স্থান, চলার স্বাতন্ত্র্য, বল, শীঘ্রগামিতা, শরীরের ময়লা নিষ্কাশন করা, উৎক্ষেপণ ইত্যাদি কর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া, প্রাণ এবং জন্ম-মৃত্যু—এগুলি বায়ুর গুণ। শব্দ, ব্যাপকতা, ছিদ্র হওয়া, কোনো স্থূল পদার্থের আশ্রিত না হওয়া, নিজে কোনো দ্বিতীয় আধারে না থাকা, অব্যক্ততা (রূপ ও স্পর্শরহিত হওয়া), নির্বিকারতা, অপ্রতিঘাত এবং ভূতত্ব—এসব আকাশের গুণ। এই পঞ্চাশটিকে পঞ্চমহাভূতের গুণ বলা হয়েছে। ধৈর্য, তর্ক-বিতর্কের কৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, ক্ষমা, শুভ সংকল্প, অশুভ সংকল্প ও চঞ্চলতা—মনের এই নটি গুণ। ইষ্ট এবং অনিষ্ট বৃত্তির বিনাশ করা, উৎসাহ, চিত্তকে একাগ্র করা, সন্দেহ এবং দৃঢ়তা—এই পাঁচটি হল বুদ্ধির গুণ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! ধর্মের ব্যাপারে প্রায় সব লোকেরই সংশয় বজায় থাকে, তাই আমার প্রশ্ন হল—ধর্মের স্বরূপ কী ? কোথা থেকে তার উৎপত্তি ? ইহলোকে সুখ পাওয়ার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেটিই ধর্ম, না পরলোকে কল্যাণের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে ধর্ম বলা হয় ? অথবা ইহলোক-পরলোক কল্যাণকারী যে কর্ম তাকেই ধর্ম বলা হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বেদ, স্মৃতি এবং সদাচার—এই তিনটি ধর্মের জ্ঞান করায়। কিছু বিদ্বান অর্থকেও ধর্মের পরিচায়ক বলে মনে করে। শাস্ত্রে যেসব ধর্মানুকূল কাজের কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী মানুষ তাকে

নিজ বুদ্ধির দ্বারা স্থির করে পালন করে। লোক-ব্যবহার স্থিরীকৃত করার জন্যই ধর্মের মর্যাদা স্থাপন করা হয়েছে। ধর্মপালন করলে ইহলোক ও পরলোকে সুখ পাওয়া যায়। যে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে না, সে পাপে প্রবৃত্ত হয়ে দুঃখ-রূপ ফল ভোগ করে। সত্য কথা বলা শুভ কর্ম, সত্যের থেকে বড় আর কিছুই নেই, সত্যই সবকিছু ধারণ করে আছে এবং সত্যেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত। ভয়ংকর কর্ম করে যে ব্যক্তি, সেই পাপীও ভিন্ন ভিন্ন সত্যের শপথ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ করে না। সকলেই সত্যের আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তারা যদি নিজেদের মধ্যে সত্যের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তাহলে পরস্পর যুদ্ধ করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। অন্যের ধন চুরি করা উচিত নয়, এ হল সনাতন ধর্ম। কিছু বলবান ব্যক্তি নিজেদের শক্তির অহংকারে নাস্তিকতার আশ্রয় নিয়ে ধর্মকে দুর্বলদের আশ্রয় বলে মনে করে ; কিন্তু কালক্রমে তারাও যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন নিজেদের রক্ষার্থে তাদেরও ধর্মের আশ্রয় নেওয়াই ভালো বলে মনে হয়। জগতে কেউই সর্বাপেক্ষা বলবান ও সুখী হয় না। তাই তোমারও নিজের মনে কখনো কুটিলতার চিন্তা আসতে দেওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি কখনো কারো ক্ষতি করে না, তার চোর, বদমায়েশ অথবা রাজার থেকে কখনো ভয় থাকে না। সদাচারী মানুষ সর্বদা নির্ভয়ে থাকে। গ্রামে ঢুকে পড়া হরিণের মতো চোর সকলকে ভয় পায়। সে যেমন অনেকের প্রতি বহুভাবে অত্যাচার করে থাকে, তেমনি অপরকেও সে অত্যাচারী মনে করে। কিন্তু যার স্বভাব শুদ্ধ, তার কোথাও কোনো আশঙ্কা থাকে না, সে সর্বদা প্রসন্ন থাকে এবং কারো থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা করে না। প্রাণীহিতে ব্যাপৃত মহাত্মাগণ দানকেই উত্তম ধর্ম বলে থাকেন ; কিন্তু বহু ধনবান ব্যক্তি এগুলি গরিবদের কথিত ধর্ম বলে মনে করে। কিন্তু যখন ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং ধননাশ হয়ে এই ধনীও দীন হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, তখন সে-ও এই দান-ধর্মকে উত্তম বলে মনে করে। জগতে কেউই সব থেকে বেশি ধনবান ও সুখী হয় না ; তাই ধনের অহংকার কখনো করা উচিত নয়।

মানুষ অপরের যে ব্যবহার পছন্দ করে না, তারও অপরের সঙ্গে সেই ব্যবহার করা উচিত নয় ; কারণ যা নিজের অপ্রিয়, তা অপরেরও অপ্রিয় মনে হতে পারে। যে অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, সে অন্য কাউকে সেই কর্ম করতে দেখলে কীকরে বাধা দেবে ? তার তো অন্যকে দুরাচারী বলার কোনো অধিকারই নেই। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তির কথা জানতে পারে, তবে সে তা সহ্য করতে পারে না, আমার তাই বিশ্বাস। যে নিজে বাঁচতে চায়, তার অন্যের প্রাণ নেওয়ার কী অধিকার থাকে ? মানুষ নিজের জন্য যে সুখ-সুবিধা চায়, অন্যেও যেন তা পায়—এই চিন্তা করে নিজের উদ্বৃত্ত ধন গরীবদের দান করা উচিত। তাই জন্য বিধাতা ধনবৃদ্ধির জন্য কুসীদ বৃত্তির প্রচার করেছেন। যে পথে গমন করলে দেবতাদের দর্শন লাভ হয়, সর্বদা সেই পথে চলা উচিত। অর্থ আয় যদি বেশি হয়, তাহলে যজ্ঞ-দানাদি শুভকর্ম করা উচিত। সকলকে সুখী করলে যা পাওয়া যায়, তাকেই ধর্ম বলা হয়। তেমনই অপরকে দুঃখ প্রদান করাকে অধর্ম বলে। যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে সংক্ষেপে ধর্ম ও অধর্মের লক্ষণ জানালাম। বিধাতা পূর্বকালে সৎব্যক্তিদের জন্য যে উত্তম আচরণের বিধান করেছিলেন, তা বিশ্বের কল্যাণ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত এবং তার থেকেই ধর্মের সূক্ষ্ম স্বরূপের জ্ঞান হয়।

যুধিষ্ঠিরের ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন, তার উত্তরে পিতামহ ভীষ্মের জাজলি এবং তুলাধার বৈশ্যের সংবাদ বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি যে বেদ প্রতিপাদিত সূক্ষ্ম ধর্মের বর্ণনা করলেন, তা আমিও কিছু কিছু জানি এবং আমিও তা অনুমানে বলতে পারি। কিন্তু এখনও আমার কিছু প্রশ্ন বাকি থেকে গেছে, তা সমাধান করুন। আপনার বক্তব্য অনুসারে সৎ ব্যক্তিদের আচরণ হল ধর্ম এবং যারা ধর্মাচরণ করে, তারাই সৎপুরুষ—এই অবস্থায় একটি অপরটির আশ্রিত হওয়ার লক্ষ্য এবং লক্ষণের পার্থক্য ঠিকমতো জানা যায় না ; তাহলে সদাচার

ধর্মের লক্ষণ কীরূপে হতে পারে ? শাস্ত্রবিদগণ ধর্ম নির্ণয়ে বেদকেই প্রমাণ বলে জানিয়েছেন ; কিন্তু আমি শুনেছি বেদ যুগে যুগে হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ধর্মের বিষয়ে বেদের যে সিদ্ধান্ত, প্রত্যেক যুগে তা পরিবর্তিত হচ্ছে। সত্যযুগে যে ধর্ম ছিল, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে তা পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের সামর্থ্য অনুসারে যুগ-ধর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যখন এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বৈদিক-ধর্মের পরিবর্তন হচ্ছে তখন বেদের বাণীকে সত্য বলা লোকরঞ্জন ব্যতীত আর কী হতে পারে ? বেদ হতেই স্মৃতির উদ্ভব এবং সর্বত্রই তার প্রচার। সম্পূর্ণ বেদ যদি প্রামাণ্য হয়, তাহলে স্মৃতিও প্রামাণ্য হতে পারে। কিন্তু যখন নিজেরই অঙ্গভূত স্মৃতির সঙ্গে বেদের বিরোধ, তখন তাকে প্রমাণভূত শাস্ত্র বলে কীকরে মেনে নেওয়া যায় ? ধর্মের স্বরূপ আমরা জানি বা না জানি, অন্যেরা বললেও তা বুঝতে পারি বা না পারি। কিন্তু স্পষ্টভাবে এটা বলা যায় যে ধর্ম ছুরির ধার থেকে সূক্ষ্ম এবং পর্বতের থেকেও ভারী। বৈদিক এবং স্মার্ত-সনাতন ধর্ম ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে কলির শেষে একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না ; কারণ সেই সময় অত্যন্ত দুষ্ট লোকেরা কামনাগ্রস্ত হয়ে ব্যর্থ ধর্মাচরণের ভাণ করে এবং মূর্খেরা তাকেই ধর্ম বলে মনে করে। শুধু তাই নয়, তারা সাধু ব্যক্তিদের সত্য ধর্মকেও প্রলাপ বলে অভিহিত করে এবং সেই আচরণ পালনকারী সৎ ব্যক্তিদের পাগল বলে তামাশা করে।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে তুলাধার বৈশ্যের জাজলি ঋষির সঙ্গে ধর্মাবিষয়ক যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। জাজলি নামের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বনে বাস করতেন। নিজ তপোবলের সাহায্যে তিনি সমস্ত লোক অবলোকনের শক্তি লাভ করেছিলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জাজলি কী দুষ্কর কর্ম করেছিলেন, যার জন্য তিনি এরূপ উত্তম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! জাজলি মুনি অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্নান করে অগ্নিহোত্র ও বাণপ্রস্থের নিয়ম পালন ও সর্বদা স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকতেন। বনে তপস্যা করার সময় তিনি বর্ষার সময় উন্মুক্ত আকাশের নীচে শুতেন এবং হেমন্ত ঋতুর (ঠান্ডার) সময় জলের মধ্যে বসে থাকতেন। সেইরূপ গ্রীষ্মকালে ভীষণ গরম এবং গরম হাওয়ার কষ্ট সহ্য করতেন। যেসব জায়গায় শুতে লোকে কষ্ট পায়, জাজলি মুনি সেইরূপ বিছানায় শুতেন। যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ত, তিনি নিজ মস্তকে সেই আঘাত সহ্য করতেন, তাই তাঁর চুল সবসময় ভিজে থাকত, যারজন্য সেগুলি জটায় পরিণত হয়েছিল। একবার জাজলি মুনি নিরাহার অবস্থান করে শুধুমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে কাঠের ন্যায় অবিচলভাবে থেকে ভীষণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেইসময় তাঁকে জড় মনে করে একজোড়া পাখি তাঁর জটায় বাসা তৈরি করেছিল। মহর্ষি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তিনি পাখিদের তৃণ দিয়ে বাসা তৈরি করতে দেখেও চুপ করে রইলেন। মহর্ষি একটুও নড়াচড়া করছিলেন না, তাই পাখিরা বিশ্বাস করে সেখানেই মহাসুখে থাকতে লাগল। বর্ষা ঋতু চলে গিয়ে শরৎ ঋতুর আগমন হলে, পাখিরা তাঁর মস্তকের ওপরেই

ডিম পাড়ল। মহর্ষি তা জেনেও নিজ স্থানে অটল হয়ে দণ্ডায়মান থাকলেন, তিনি সর্বদা ধর্মেই ব্যাপৃত থাকতেন। পাখি দুটি প্রত্যহ খাবার আনার জন্য এদিক-ওদিক যেত এবং ফিরে আবার মহর্ষির জটাতেই রাত্রি কাটাত। মুনির মস্তকে তারা অত্যন্ত আনন্দে বাস করত। কিছুদিন পর ডিম ফুটে পক্ষীশাবক বার হল এবং সেগুলি সেখানেই বড় হতে লাগল, মুনি তখনও অটলভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছুদিন পর শাবকগুলির ডানা পুষ্ট হল, জাজলি তা জেনে অত্যন্ত হর্ষান্বিত হলেন। শাবকেরা এবার খাবার জন্য বার হতে

লাগল, তারা দিনের বেলায় বেরিয়ে সন্ধ্যার সময় ফিরত। তাতেও মুনি কখনো নড়েননি। পক্ষীমাতা শাবকদের দেখাশুনা ছেড়ে দিল, তারা নিজেরাই বাইরে যেত-আসত। তারা প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ফিরত, তবে মাঝে মাঝে কখনো চার-পাঁচদিন বাইরে থেকে তারপর ফিরত, কিন্তু মহর্ষি তাতেও বিচলিত না হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একবার এই পক্ষীগুলি উড়ে গিয়ে এক মাস ধরে ফিরল না, কিন্তু জাজলিমুনি একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তারপরেও যখন তারা ফিরল না, তখন মুনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি নিজেকে সিদ্ধ বলে মনে করতে লাগলেন এবং মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন। তারপর নদীতে স্নান করে অগ্নিতে হোম করার পর সূর্যোদয় হলে তাঁর উপস্থান করলেন। নিজ মস্তকে পাখির জন্ম ও বৃদ্ধির কথা মনে করে তিনি নিজেকে মহা ধর্মাত্মা বলে ভাবতে লাগলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি ধর্মলাভ করেছি।' তখন আকাশবাণী শোনা গেল 'জাজলি ! তুমি ধর্মে কখনো তুলাধারের সমকক্ষ হবে না। কাশীপুরীতে তুলাধার নামক এক মহাবুদ্ধিমান বৈশ্য বাস করে, সে মস্ত বড় ধর্মাত্মা ; কিন্তু সে-ও এমন কথা বলে না, যেমন কথা আজ তুমি বলছ।'

আকাশবাণী শুনে জাজলি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, তিনি তুলাধারকে দেখার জন্য সেখান থেকে রওনা হলেন এবং অনেকদিন পর কাশী এসে পৌঁছলেন। সেখানে এসে তিনি তুলাধারকে জিনিসপত্র বিক্রি করতে দেখলেন। মহাত্মা তুলাধারও জাজলিকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের স্বাগত-সৎকার করলেন।

তুলাধার বললেন—বিপ্রবর ! আপনি যে আমার কাছে আসছেন, সে কথা আমি জানতে পেরেছিলাম, এখন আমার কথা শুনুন। আপনি সমুদ্রতীরে এক বনে দণ্ডায়মান থেকে ভীষণ তপস্যা করেছেন। তাতে সিদ্ধিলাভ করার পর আপনার মস্তকে পক্ষী শাবকের জন্ম দেয় এবং আপনি তাদের সযত্নে রক্ষা করেন। তারপর তাদের পাখা গজালে তারা উড়ে অন্যত্র চলে গেলে, আপনি নিজেকে ধর্মাত্মা মনে করে অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেন। সেইসময় আকাশবাণী হয় এবং আকাশবাণীতে আমার কথা শুনে আপনি ব্যথিত চিত্তে আমার কাছে এসেছেন। বিপ্রবর ! আদেশ করুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি ?

ভীষ্ম বললেন—বুদ্ধিমান তুলাধারের এই কথায় জপকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাজলি বললেন—'বৈশ্যবর ! তুমি তো সর্বপ্রকার বনস্পতি, ওষধি, শিকড়, ফল ইত্যাদি বিক্রি কর, এরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাপূর্ণ বুদ্ধি কোথায় পেলে ? আমাকে দয়া করে বলো।'

তুলাধার বললেন—মুনিবর ! আমি বহু প্রাচীন এবং সকলের হিতকামী সনাতন ধর্মের গূঢ় রহস্য জানি। কোনো প্রাণীকে হিংসা না করে জীবিকা নির্বাহ করাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মান্য হয়। আমি সেই অনুসারেই জীবন নির্বাহ করে থাকি। থাকবার জন্য কাঠ এবং ঘাস-পাতা দিয়ে আমার ঘর তৈরি করেছি। আমি অসক্ত, পদ্মক, তুঙ্গকাষ্ঠ, চন্দন ইত্যাদি গন্ধ এবং নানা ছোট বড় বস্তুসমূহ বিক্রয় করি। আমি নানাপ্রকার পানীয় বিক্রয় করলেও মদিরা বিক্রয় করি না। এই সব জিনিস আমি অন্যের কাছ থেকে কিনে আনি, নিজে প্রস্তুত করি না। এসব বিক্রয় করার সময় আমি কোনো কপটতার আশ্রয় নিই না। যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর সুহৃদ এবং মন বাক্য ও কর্মে সকলের হিতে রত থাকে, সেই প্রকৃত ধর্মকে জানে। আমি কারো সঙ্গে বেশি মেলামেশা করি না, কারো সঙ্গে বিরোধও করি না, আমি কোথাও রাগ করি না, দ্বেষও নয় ; সকল প্রাণীর প্রতি আমার মনে একই ভাব থাকে। এই আমার ব্রত। জিনিষপত্রের ওজনে আমি কোনো কারচুপি করি না, অন্যের কাজের নিন্দা বা প্রশংসা করি না। মাটি, পাথর বা সোনায় কোনো পার্থক্য দেখি না। বৃদ্ধ, রোগী বা দুর্বল ব্যক্তি যেমন বিষয় ভোগের স্পৃহা করে না, আমার মনেও সেইরূপ কোনো স্পৃহা নেই, যখন কোনো ব্যক্তি অপরকে ভয় পায় না, অন্যেও তাকে ভয় করে না ; যখন সেই ব্যক্তি কাউকে দ্বেষ বা কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না এবং কোনো প্রাণীর প্রতি তার মনে কু-চিন্তার উদ্রেক হয় না, তখনই সেই ব্রহ্মলাভ করে। মৃত্যুমুখে পড়লে যেমন সকলে ভীত হয়, তেমনই যার নামে সকলে ভয়ে কম্পিত হয়, কটুবাক্য ও কঠোর দণ্ড প্রদানকারীকে সেই মহাভয়ের সম্মুখীন হতে হয়। যিনি বৃদ্ধ এবং পুত্র-পৌত্র পরিবৃত হয়ে শাস্ত্রানুসারে আচরণ করেন, কোনো জীবকে হিংসা করেন না, সেই মহাত্মার আচরণানুসারে আমিও কাজ করে থাকি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সদাচার পালনের দ্বারা শীঘ্রই ধর্মরহস্য জেনে থাকেন। নদীর ধারায় বাহিত তৃণ-কাষ্ঠ ইত্যাদির সঙ্গে কখনো কখনো অন্য তৃণ-কাষ্ঠাদির সংযোগ ঘটে,

সেই সংযোগ দৈবের ইচ্ছাতেই হয়, হঠাৎ করে হয় না। তেমনই জগতের প্রাণীদের মধ্যেও সংযোগ-বিয়োগ হতে থাকে। যার থেকে জগতের কোনো প্রাণী ভয়বোধ করে না, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী থেকে অভয় লাভ করে থাকেন। যার থেকে সব প্রাণী ভয় পায়, তাকেও অন্যের কাছে ভয় পেতে হয়। এই অভয়দান রূপ ধর্ম সযত্নে পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে, সে সহায়বান, দ্রব্যমান্, সৌভাগ্যশালী এবং পরলোকে কল্যাণভাগী হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অভয়দানে সক্ষম, বিদ্বান ব্যক্তিরা তাকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে থাকে। এদের মধ্যে যারা ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের ইচ্ছা পোষণ করে তারা কীর্তি ও মান-যশের জন্য অভয়দানরূপ ব্রত পালন করে ; কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, তারা ব্রহ্মলাভের জন্য এর আশ্রয় গ্রহণ করে। তপ, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশের দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, শুধু অভয়দানের দ্বারাই সেগুলি লাভ করা যায়। অহিংসার থেকে বড় আর কোনো ধর্ম নেই। যে ব্যক্তি সব প্রাণীতেই নিজের উপস্থিতি অনুভব করে এবং সকলকে আত্মভাবে দেখে, সে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। তার বিশেষ কোনো স্থান লাভ হয় না, দেবতারাও তার গতির খবর পায় না। বিপ্রবর ! সর্বদানের উত্তমদান হল প্রাণীদের অভয়-দান দেওয়া। আপনাকে আমি সত্য কথা বলছি, বিশ্বাস করুন।

ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কোনো ধর্মই নিষ্ফল হয় না। স্বর্গ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূক্ষ্মধর্মের কথা সহজে সকলে বুঝতে সক্ষম হয় না। যারা পশুকে কষ্ট দেয়, তাদের হত্যা করে, তাদের বধ করে খায়, মানুষ হয়ে মানুষকে দাস করে রাখে, তাদের পরিশ্রমের ফল নিজেরা উপভোগ করে, যারা বধ ও বন্ধনের দুঃখ জেনেও অপরকে সেই কষ্ট দেয়, এরূপ লোকেদের কি আপনি নিন্দা করবেন না ? পঞ্চ ইন্দ্রিয় যুক্ত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, যজ্ঞ, যমরাজ প্রমুখ দেবতার নিবাস ; তবুও তাদের বিক্রি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তারা কি নিন্দনীয় নয় ? ছাগ অগ্নির, ভেড়া বরুণের, ঘোড়া সূর্যের এবং পৃথিবী বিরাটের রূপ, গাভী এবং গো-বৎস চাঁদের স্বরূপ। এগুলি বিক্রি করলে কল্যাণ হয় না। আমি তেল, ঘি, মধু এবং বনস্পতি বিক্রয় করি, এতে কোনো ক্ষতি নেই। বহু মানুষ মশা-মাছিবর্জিত দেশে উৎপন্ন, সুখে পালিত পশুদের তাদের মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মশা-মাছি অধ্যুষিত স্থানে নিয়ে যায় এবং তাদের নানাপ্রকার কষ্ট দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। বেচারি পশুগুলি এতে অত্যন্ত কষ্ট পায়। আমি এগুলি ভ্রূণহত্যার থেকেও বড় পাপ বলে মনে করি। শ্রুতিতে গাভীকে অবধ্য বলা হয়েছে ; তাহলে তাকে বধ করার চিন্তা কেন ? যারা তাদের বধ করে তারা মহাপাপ করে। এইরূপ অমঙ্গলকারী ও ভয়ংকর আচরণ জগতে অত্যন্ত প্রচলিত। কোনো ব্যাপার প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে মনে করে আপনি এর খারাপ দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। কোনো ধর্মকে পরিণামের কথা চিন্তা করেই মেনে নেওয়া উচিত। কাউকে অনুকরণ করে কিছু করতে নেই। এবার আমি আমার আচরণ সম্পর্কে কিছু জানাচ্ছি, শুনুন ! যে আমাকে আঘাত করে এবং যে প্রশংসা করে, উভয়েই আমার কাছে সমান। আমি তাদের কাউকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বলে মনে করি না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ধর্মেরই প্রশংসা করেন, এটিই যুক্তিসঙ্গত। যতিগণও এটি পালন করেন এবং ধর্মাত্মা ব্যক্তিগণও ভালোভাবে চিন্তা করে সর্বদা ধর্মেরই অনুসরণ করেন।

—০—

জাজলিকে তুলাধার এবং পক্ষীদের উপদেশ

জাজলি বললেন—বণিক মহাশয় ! তুমি হাতে তুলাদণ্ড নিয়ে জিনিস ওজন করতে করতে যে ধর্ম কথা বলছ, তাতে স্বর্গের দ্বারও বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রাণীদের জীবিকাও বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার জানা উচিত যে অন্ন এবং পশুদের দ্বারাই মানুষের জীবন-নির্বাহ হয়। পশুদ্বারা উৎপন্ন করা অন্ন দ্বারাই যাগযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তুমি তো নাস্তিকদের মতো কথা বলছ। পশুদের কষ্টের কথা ভেবে যদি কৃষি ইত্যাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে সকলের জীবিকাই সঙ্কটময় হয়ে যাবে।

তুলাধার বললেন—ব্রহ্মন্ ! অপরকে কষ্ট না দিয়ে কীভাবে জীবন-নির্বাহ করা যায়, আমি সেই উপায় জানাচ্ছি, শুনুন ! আপনি আমাকে নাস্তিক বলছেন, কিন্তু

আমি নাস্তিক নই এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করছি না। যজ্ঞ উত্তম কর্ম ; কিন্তু তার স্বরূপ ঠিকভাবে জানা লোক পাওয়া দুর্লভ। ব্রাহ্মণদের জন্য যজ্ঞের যে বিধান, তাকে আমি প্রণাম জানাই এবং সেই যজ্ঞ জানেন যে ব্রাহ্মণেরা, তাঁদের চরণে মাথা নত করে প্রণাম করছি। আমার দুঃখ এই যে এখন ব্রাহ্মণেরা তাঁদের যজ্ঞ পরিত্যাগ করে ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত বহু লোভী ও নাস্তিক ব্যক্তি বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য না জেনে সত্য বলে প্রতীত হওয়া মিথ্যা যজ্ঞের প্রচার করছে। শুভ কর্মের দ্বারা যে হবিষ্য সংগ্রহ করা হয়, সেই হোমেই দেবতা প্রসন্ন হন। শাস্ত্রবাক্যানুসারে নমস্কার, স্বাধ্যায় এবং অন্নরূপ হবিষ্যের দ্বারা দেবতাদের পূজা হওয়া সম্ভব। যারা কামনার বশীভূত হয়ে যজ্ঞ করে, পুষ্করিণী খনন করায় বা বাগান তৈরি করে, তাদের সেইরূপই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। লোভীর সন্তান লোভী এবং সমদর্শীর সন্তান সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। যজমান এবং ঋত্বিক নিজেরা যেমন হয়ে থাকেন, তাঁদের প্রজারাও সেইরূপ হয়। আকাশ থেকে যেমন নির্মল জলের বর্ষণ হয়, তেমনই শুদ্ধভাবে করা যজ্ঞের দ্বারা যোগ্য প্রজার উৎপত্তি হয়। বিপ্রবর ! অগ্নিতে সমর্পণ করা আহুতি সূর্যমণ্ডলে পৌঁছে যায়। সূর্যের থেকে জল বর্ষণ হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন সৃষ্টি হয় এবং অন্ন থেকে সমস্ত প্রাণী জীবনধারণ করে। আগে লোকে কর্তব্য পালনের জন্য যাগ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হত, মনে কোনো প্রকার কামনা রাখত না। তাই তাদের মনোবাসনা স্বতই পূর্ণ হত। বিনা চাষ-আবাদেই প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হত এবং মানুষের শুভ সংকল্প থেকেই প্রচুর বৃক্ষ-লতা ও ফল-ফুল উৎপন্ন হত। মানুষ যজ্ঞ করলেও, তার কোনো ফল লাভ হল কিনা, তা নিয়ে চিন্তা করত না। যেসব ব্যক্তি যজ্ঞ করলে ফল পাব কি না, এই ভেবে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়, তারা লোভী, ধূর্ত এবং দুষ্ট প্রকৃতির। এইসব লোক নিজ অশুভ কর্মের জন্য পাপীদের নির্দিষ্ট লোকে গমন করে। যারা প্রমাণভূত বেদকে কুতর্কের দ্বারা অপ্রমাণিত করার দুঃসাহস করে, তারা মূর্খ এবং পাপাত্মা, তারাও পাপীদের জন্য নির্দিষ্ট লোক প্রাপ্ত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি করার যোগ্য কর্মগুলি নিত্যকর্ম মনে করে করে এবং কখনো পালন করতে না পারলে ভীত হয়ে ওঠে, যার দৃষ্টিতে (ঋত্বিক, হবিষ্য, মন্ত্র এবং অগ্নি ইত্যাদি) সব কিছুই ব্রহ্ম এবং যে কখনো নিজের কর্তৃত্বের অহংকার করে না, সেই সত্যকার ব্রাহ্মণ। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণেরা সত্যবাদী, ইন্দ্রিয় সংযমী এবং পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য উৎসুক থাকতেন। তাঁদের ধনাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁরা ত্যাগী, ঈর্ষারহিত, দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানী, আত্মযজ্ঞে স্থিত এবং প্রণব জপে তৎপর থাকতেন, নিজেরা সন্তুষ্ট থেকে অপরকেও সন্তোষ প্রদান করতেন।

ব্রহ্ম সর্বাত্মক, সমস্ত দেবতা তাঁরই স্বরূপ। তিনি ব্রহ্মবেত্তার মধ্যে অবস্থান করেন ; তাই তিনি তৃপ্ত হলে সকল দেবতা তৃপ্ত হন। যেমন সমস্ত রসে তৃপ্ত মানুষ কিছুই কামনা করে না, তেমনই যে ব্যক্তি জ্ঞানানন্দে পূর্ণ, তার সর্বদা তৃপ্তি বজায় থাকে, সে বিষয়-সুখ প্রাপ্ত করতে চায় না। ধর্মই যার আধার, যে ধর্মকেই সুখ বলে মনে করে এবং যে সমস্ত কর্তব্য ও অকর্তব্য স্থির করে নিয়েছে, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই পরমাত্মার স্বরূপ ঠিকমতো জানতে পারে। ভবসাগর পার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন যে জ্ঞানসম্পন্ন মনীষিগণ, তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যাত্মা সেবিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, সেখানে গেলে কারো কোনো দুঃখ শোক থাকে না, যেখান থেকে পতিত হবার ভয় নেই এবং যেখানে কোনো রোগ-ব্যাধি থাকে না। এই সাত্ত্বিক মহাপুরুষগণ স্বর্গ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যশ ও অর্থের জন্য যজ্ঞ করেন না, তাঁরা সৎপুরুষদের পথ অবলম্বন করেন। তাঁরা অহিংসা-প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। বনস্পতি, অন্ন এবং ফল-মূলাদিকেই তাঁরা হবিষ্য বলে মানেন। ফলের আকাঙ্ক্ষাকারী লোভী ঋত্বিক তাঁদের যজ্ঞ করান না। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ নিজেকেই যজ্ঞের উপকরণ মনে করে মানসিক যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন। যাঁরা কর্মত্যাগ করেছেন, তাঁরাও লোক সংগ্রহার্থে মানসিক যজ্ঞে প্রবৃত্ত থাকেন। লোভী ঋত্বিক এরূপ লোকেদেরই যজ্ঞের পুরোহিত হন। তাঁরা মোক্ষের ইচ্ছা করেন না। সাধু ব্যক্তিরা নিজেরা ধর্মাচরণ করেই প্রজাদের স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় জানিয়ে থাকেন। সৎপুরুষদের আচরণ অনুসারে আমার বুদ্ধিও সর্বত্র সমানভাবেই অবস্থান করে। সিদ্ধসংকল্প জ্ঞানী মহাত্মাদের ইচ্ছা অনুসারে বলদ নিজে গাড়িতে জুড়ে তাদের বয়ে নিয়ে যায় এবং দুগ্ধদানকারী গাভী সর্বপ্রকার ইচ্ছা পূরণ করে দুগ্ধপ্রদান করে। যার মনে কোনো কামনা নেই, যে কোনো ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম আরম্ভ করে না, নমস্কার ও স্তুতি থেকে দূরে থাকে, যার কর্মবন্ধন ক্ষীণ হয়ে গেছে, দেবতারা তাকেই ব্রাহ্মণ বলে মানেন।

জাজলি জিজ্ঞাসা করলেন—বৈশ্যপ্রবর ! আমি

আত্মযাজী মুনিদের মানসিক যজ্ঞের তত্ত্ব কখনো শুনিনি, সম্ভবত তা বোঝাও কঠিন ; কারণ পূর্বকালীন মহর্ষিরা তা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেননি এবং অর্বাচীন মহর্ষিগণও তা প্রচার করেন না। সেই পরিস্থিতিতে দুর্বোধ্য হওয়ায় অবিবেকী মানুষেরা মানসিক যজ্ঞানুষ্ঠান করতে সক্ষম হয় না, তাহলে তাদের কী গতি হবে ? তারা কোন্ কর্মের দ্বারা সুখ লাভ করতে পারে ? তা বলো । তোমার কথায় আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে।

তুলাধার বললেন—ব্রহ্মন্ ! অশ্রদ্ধা ইত্যাদি দোষের জন্য দম্ভপূর্ণ পুরুষদের যজ্ঞকে যজ্ঞ বলা যায় না, তাদের মানসিক যজ্ঞ করার অধিকারও থাকে না, ক্রিয়ারূপ যজ্ঞেরও নয়। শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যক্তি ঘি, দুধ, দধি এবং পূর্ণাহুতির দ্বারা নিজেদের যজ্ঞ পূর্ণ করেন। শ্রদ্ধাযুক্তদের মধ্যে যাঁরা অসমর্থ, তাদের যজ্ঞ গাভীর পুচ্ছের লোমদ্বারা, শিংদ্বারা এবং পদধূলির দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়।[১] যারা এইভাবে শুধুমাত্র ঘি-দুধ ব্যবহার করে অহিংসা-প্রধান যজ্ঞ আরম্ভ করে, তারা যজমান-পত্নীর অবর্তমানেও মানসিকভাবে তাকে কল্পনা করে নেয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাকেই পত্নী মেনে নেয় এবং ইষ্টদেবতার পূজা করে যজ্ঞস্বরূপ ভগবান বিষ্ণুকে লাভ করে। বিপ্রবর ! আত্মাই প্রধান তীর্থ। আপনি তীর্থসেবার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবেন না। যে আমার কথা অনুসারে অহিংসা প্রধান ধর্মাচরণ করে, সে উত্তমলোক লাভ করে। ব্রহ্মন্ ! আমি ধর্মের যে স্বরূপ সামনে রেখেছি, তা সজ্জন পালন করে, না দুর্জন ? এই কথা পরীক্ষা করে দেখুন, তাহলেই আপনি এর যথার্থতা উপলব্ধি করবেন। দেখুন, আকাশে এই যে এত পাখি উড়ছে, এরা আপনার মাথায় তৈরি বাসায় জন্ম নিয়েছে। এখন ওরা হাত-পা গুটিয়ে বাসায় ফেরার জন্য ত্বরান্বিত হয়ে যাচ্ছে। আপনি এদের পুত্রের ন্যায় পালন করেছেন, ওরা আপনাকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করে। আপনি নিঃসন্দেহে ওদের পিতৃতুল্য। সুতরাং ওদের ডাকুন (এবং ওদের কাছ থেকেই অহিংসা-প্রধান ধর্মের মহিমা শুনুন)।

ভীষ্ম বললেন—তুলাধারের কথা শুনে জাজলি সেই পাখিদের ডাকলেন, তখন তারা এসে ধর্মোপদেশ দেওয়ার জন্য মানুষের মতো স্পষ্ট ভাষায় বলতে লাগল—'ব্রহ্মন্ ! হিংসা এবং তার চিন্তাবর্জিত হয়ে যে কর্ম করা হয়, তা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী হয়। হিংসা শ্রদ্ধানাশ করে এবং নষ্ট হওয়া শ্রদ্ধা হিংসুক মানুষের সর্বনাশ করে। যে লাভ-ক্ষতিতে সমভাবে থাকে, শ্রদ্ধালু, সংযমী এবং শান্তচিত্ত ও কর্তব্য মনে করে যজ্ঞানুষ্ঠান করে ; তার যজ্ঞই সফল হয়। শ্রদ্ধা সবকিছু রক্ষা করে, তার প্রভাবে বিশুদ্ধ জন্ম লাভ হয়। ধ্যান ও জপের থেকেও শ্রদ্ধার গুরুত্ব অধিক। যদি কর্মে বাক্য দোষে মন্ত্র ঠিকমতো উচ্চারিত না হয় এবং মনের চঞ্চলতার জন্য ইষ্টদেবের ধ্যানে বিক্ষেপ এসে পড়ে, তাহলেও শ্রদ্ধা থাকলে সব দোষ দূর হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা না থাকলে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ এবং ধ্যানের দ্বারা কর্মপূরণ হয় না—শ্রদ্ধাহীন কর্ম ব্যর্থ হয়ে যায়। এই বিষয়ে প্রাচীন ব্যক্তিরা ব্রহ্মা কথিত গাথা শুনিয়ে থাকেন। তা এইরূপ—আগে দেবগণ শ্রদ্ধাহীন পবিত্র এবং পবিত্রতা বিহীন শ্রদ্ধা একই প্রকার মনে করতেন। সেইরূপ তাঁরা কৃপণ বেদবিদ্ এবং মহাদাতা সুদখোরদের অন্নেও কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করতেন না। একবার কোনো এক যজ্ঞে তাঁদের এই ব্যবহার দেখে প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন—'দেবগণ ! তোমাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে উদার ব্যক্তির অন্ন তার শ্রদ্ধার জন্যই পবিত্র হয়ে থাকে এবং কৃপণের অন্ন অশ্রদ্ধার জন্য দূষিত। (সুতরাং শ্রদ্ধাহীন পবিত্রের থেকে পবিত্রতাবিহীন শ্রদ্ধাযুক্তের অন্নই গ্রহণযোগ্য। এইরূপ বেদবেত্তা এবং সুদখোরদের মধ্যে বেদবেত্তার অন্নই শ্রদ্ধাপূত এবং গ্রহণযোগ্য)। অর্থাৎ উদারের অন্নই গ্রহণ করা উচিত, কৃপণ এবং সুদখোরের অন্ন নয়। যার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, সে দেবযজ্ঞের অধিকারী নয়। ধর্মজ্ঞেরা তার অন্ন অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। অশ্রদ্ধা সব থেকে বড় পাপ এবং শ্রদ্ধা পাপ থেকে মুক্ত করে। সাপ যেমন তার খোলস পরিত্যাগ করে, শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিও তেমনই পাপ ত্যাগ করে। শ্রদ্ধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে পবিত্রতা হয়, তা সমস্ত পাপ থেকে নিবৃত্তির পর যে পবিত্রতা হয় তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। যার রাগ-দ্বেষাদি দোষ দূরীভূত হয়েছে, সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই বাস্তবিক পবিত্র। এমন ব্যক্তির আর তপ এবং আচার-ব্যবহারের কী প্রয়োজন ? এই পুরুষ হল শ্রদ্ধাময়। অতএব যার যেমন শ্রদ্ধা, সেটিই হল তার বাস্তবিক স্বরূপ। ধর্ম ও অর্থের তত্ত্বজ্ঞ

[১]গাভীর পুচ্ছের দ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণ এবং তার শৃঙ্গের জলে অভিষেক হয়। গাভীর পদধূলির স্পর্শে সর্বপাপ নাশ হয়।

সৎপুরুষেরা এইভাবেই ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা ধর্মদর্শন নামক মুনির কাছে জিজ্ঞাসা করেই এই ধর্মজ্ঞান প্রাপ্ত করেছি। বিপ্রবর ! আপনি এর ওপর বিশ্বাস রাখুন। এর অনুকূল আচরণ করলে আপনি পরমাত্মাকে লাভ করবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত মানুষ সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক নিজ ধর্মে স্থিত থাকে, তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানা উচিত।

ভীষ্ম বললেন—তারপর তুলাধার এবং জাজলি কিছুকালের মধ্যেই দিব্যলোক লাভ করলেন এবং সেখানে সুখে বাস করতে লাগলেন। তুলাধার সনাতন ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর উপদেশ শুনে জাজলি মুনি শান্তিলাভ করেছিলেন।

রাজা বিচক্ষুকের অহিংসা ধর্মের প্রশংসা এবং চিরকারীর উপাখ্যান

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! রাজা বিচক্ষু, প্রাণীদের দয়া করার সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস তোমাকে শোনাচ্ছি। এক সময় কোনো এক যজ্ঞশালায় রাজা দেখলেন যে, বলদের মাথা কাটা হয়েছে এবং অনেক গোরু আর্তনাদ করছে। হিংসার এই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি দেখে রাজা স্থির থাকতে পারলেন না ; তিনি তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানালেন—'ওহো ! বেচারি গোরুগুলি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে, এদের হত্যা কোরো না। জগতের সমস্ত গোরুর কল্যাণ হোক। যারা ধর্ম মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, মূর্খ, যারা আত্মতত্ত্বের বিষয়ে বিভ্রান্ত এবং ভণ্ড ও নাস্তিক, তারাই হিংসার সমর্থন করে। মানুষ নিজ ইচ্ছাতেই যজ্ঞ বেদীতে পশুদের বলিদান করে। ধর্মাত্মা মনু সর্বকর্মেই অহিংসার প্রশংসা করেছেন। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বৈদিক প্রমাণ দ্বারা ধর্মের সূক্ষ্ম স্বরূপ নির্ণয় করে তা পালন করা উচিত। কোনো প্রাণীকে হিংসা না করাই সর্ব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। মিতাহারী হয়ে কঠোর নিয়ম পালন করবে, বেদের ফলশ্রুতিতে আসক্ত না হয়ে তা ত্যাগ করবে, আচারের নামে অনাচারে প্রবৃত্ত হবে না। কৃপণ মানুষও ফলাকাঙ্ক্ষা করে। যজ্ঞে মদ্য-মাংস-মৎস্য ইত্যাদির ব্যবহার ধূর্তদেরই ব্যবস্থা। বেদে কোথাও-ই এর আলোচনা নেই। লোকে মান, মোহ এবং লোভের বশীভূত হয়ে জিহ্বার লোলুপতায় নিষিদ্ধ বস্তু খাওয়া-দাওয়া করে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ সার্থক যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব মেনে নেন এবং পুষ্প ও মিষ্টান্ন ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে পূজা করেন। বেদে যাকে যজ্ঞসম্পর্কীয় বৃক্ষ বলা হয়েছে, তাই যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়। শুদ্ধচিত্ত সত্ত্বগুণী ব্যক্তিগণ তাঁদের বিশুদ্ধ ভাবনাদ্বারা প্রোক্ষণ ইত্যাদির সংস্কার করে যে হবিষ্য প্রস্তুত করেন, তাই দেবতাদের অর্পণ করার যোগ্য হয়ে থাকে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি আমার পরম গুরু। কৃপা করে বলুন, যদি গুরুজনের নির্দেশে কোনো কঠিন কাজ করার প্রয়োজন হয়, তখন সেই কাজ শীঘ্র করা উচিত নাকি, সময় নিয়ে সেই কাজটি পরীক্ষা করে তবে করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে, যা আঙ্গিরসকুলে জন্মগ্রহণ করা চিরকারীর সঙ্গে সম্পর্কিত। বলা হয় মহর্ষি গৌতমের চিরকারী নামে এক পুত্র ছিল, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি চিরকাল জেগে এবং শুয়ে থাকতেন। যে কোনো কাজই বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করতেন এবং চিরবিলম্বের পরই কাজটি পুরো করতেন। তাই সকলে তাঁকে চিরকারী বলতে থাকে। যারা দূরদর্শী নয়, সেই মন্দবুদ্ধি লোকেরা তাঁকে অলস এবং অবুঝ বলত। একদিন গৌতম তাঁর স্ত্রীর ব্যভিচার লক্ষ্য করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং নিজের অন্য পুত্রদের নির্দেশ দিয়ে চিরকারীকে বললেন—'পুত্র ! তুমি তোমার পাপীয়সী মাকে হত্যা করো।' বিনা বিচারে এই আদেশ দিয়ে মহর্ষি গৌতম বনে চলে গেলেন এবং চিরকারী 'হ্যাঁ' বলেও নিজ স্বভাব অনুযায়ী বহুক্ষণ ধরে তাই নিয়েই চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—'কী করা যায়, যাতে পিতার আদেশও পালন করা হয় এবং মায়ের প্রাণও রক্ষা পায়। ধর্মের অজুহাতে আমার ওপর এক ভয়ানক সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্য ব্যক্তিদের মতো আমি এই কাজ করায় সাহস কীভাবে করব ? পিতার আদেশ পালন করা পরম ধর্ম, সেই সঙ্গে মাকে রক্ষা করাও আমার প্রধান কর্তব্য। পুত্র তো পিতা-মাতা উভয়েরই অধীন। সুতরাং কী করি যাতে আমার ধর্ম আমাকে কষ্টে না ফেলে ! পিতা স্বয়ং

তাঁর শীল, সদাচার, গোত্র এবং কুলরক্ষার নিমিত্ত স্ত্রীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং মাতা ও পিতা দুজনেই আমাকে জন্ম দিয়েছেন। তাহলে আমি নিজেকে দুজনেরই সন্তান বলে কেন মনে করব না ? জাতকর্ম ও উপকর্মের সময় পিতা যে আমাকে পাথরের ন্যায়[১] সুদৃঢ় এবং কুঠারের[২] মতো শত্রুসংহারক হওয়ার আশীর্বাদ দিয়েছেন ও নিজ আত্মা[৩] বলে অনুগৃহীত করেছেন, তা তাঁর গৌরব স্থির করার পর্যাপ্ত প্রমাণ। ভরণ-পোষণ এবং অধ্যাপন করার জন্য পিতা পুত্রের প্রধান গুরু। তিনি যা আদেশ করেন, ধর্ম মনে করে তা স্বীকার করা উচিত। বেদের এই স্থির সিদ্ধান্ত। পুত্র পিতার স্নেহের পাত্র, কিন্তু পিতা পুত্রের সর্বস্ব। একমাত্র পিতাই পুত্রকে শরীর ইত্যাদি সব কিছু অর্পণ করেন ; তাই কোনো চিন্তা না করেই পিতার আদেশ পালন করা উচিত। যে পুত্র পিতার আদেশ পালন করে, তার সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভাধান এবং সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের দ্বারা পিতাই পুত্র উৎপন্ন করেন। তিনিই অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন, লেখাপড়া শেখান এবং লোকব্যবহার শিক্ষা দেন। পিতাই ধর্ম, পিতাই স্বর্গ এবং পিতাই সবথেকে বড় তপ। পিতা প্রসন্ন হলে সর্বদেবতা প্রসন্ন হন। পিতা যা বলেন, তা পুত্রের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। পিতা প্রসন্ন হয়ে পুত্রকে অভিনন্দন জানালে, পুত্রের সব পাপ নষ্ট হয়। বৃক্ষ তার ফুল ও ফল ত্যাগ করে, কিন্তু পিতা অতি বড় সংকটেও স্নেহবশত পুত্রকে ত্যাগ করেন না। সুতরাং পুত্রের কাছে পিতার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। পিতার মাহাত্ম্য নিয়ে তো আমি আলোচনা করলাম, এবার মায়ের বিষয়ে জানাচ্ছি।

অরণী যেমন অগ্নির উৎপত্তির কারণ, তেমনই আমি যে এই পাঞ্চভৌতিক মনুষ্য-দেহ লাভ করেছি, তা মাতারই দান। জগতের সমস্ত দুঃখী জীব মাতার কাছেই সান্ত্বনা লাভ করে। মাতা যতদিন জীবিত থাকেন, মানুষ নিজেকে সনাথ বলে মনে করে। তাঁর মৃত্যুর পর সে অনাথ হয়ে যায়। পুত্র-পৌত্র পরিবৃত শত বৎসরের বৃদ্ধ ব্যক্তির যদি মাতা জীবিত ও থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর কাছে শিশুর মতো আনন্দ লাভ করেন। পুত্র সক্ষম হোক বা অক্ষম, হৃষ্টপুষ্ট হোক অথবা দুর্বল, মাতা সর্বদাই তাকে রক্ষা করেন। মাতার ন্যায় পালন-পোষণকারী আর কেউ হয় না। মাতার দেহাবসান হলে মানুষ নিজেকে বৃদ্ধ বলে ভাবতে থাকে, সে অত্যন্ত একাকী হয়ে যায় এবং মনে হয় জগৎ তার কাছে শূন্য হয়ে গেছে। মাতার ছত্রছায়ায় যে সুখ, তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। মাতার তুল্য আর কেউ নেই। পুত্রের কাছে মাতার ন্যায় রক্ষক ও প্রিয় আর কাউকে পাওয়া যায় না। গর্ভে ধারণ করার জন্য তিনি 'ধাত্রী' এবং জন্ম দেওয়ার জন্য তাঁকে 'জননী' বলে। দুধ পান করিয়ে পুত্রের অঙ্গ বৃদ্ধি করান বলে তাঁকে 'অম্বা' বলা হয়। বীরপ্রসবিনী হওয়ায় তাঁকে 'বীরসূ' এবং শুশ্রূষা করায় তিনি 'শুশ্রূ'। এরূপ মাতাকে কোন পুত্র বধ করে ? পুত্রের কী গোত্র এবং কে তার পিতা, তা মাতাই একমাত্র জানেন। শিশুপুত্রকে পালন-পোষণ করে মা বিশেষ সুখলাভ করেন, তিনি পুত্রকে পিতার থেকে অধিক স্নেহ করেন।

পুরুষ তাঁর পত্নীকে ভরণ-পোষণ করায় ভর্তা এবং পালন করার জন্য পতি নামে অভিহিত হন। এই দুই গুণ না থাকলে তিনি ওইসব নামের যোগ্য হন না (তাই আমার পিতাও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে ভর্তা বা পতির কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছেন)। বাস্তবে স্ত্রীর কোনো অপরাধ হয় না। ব্যভিচারের মহাপাপ পুরুষই করে থাকে, তাই সমস্ত অপরাধই তার। নারীর সব থেকে বড় দেবতা পতি। নারী কখনো পতির সেবায় পরাঙ্মুখ হয় না। ইন্দ্র পিতার ন্যায় রূপ ধারণ করে আমার মাতার কাছে এসেছিলেন, মাতা তাঁকে নিজ পতি মনে করে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ; এমতাবস্থায় নারী নয় পুরুষকেই দোষী মনে করা উচিত। কারণ সকল অপরাধের মূল হল পুরুষই। নারীরা অবলা হওয়ায় পুরুষদের অধীন হয়ে থাকে। কোনো অপরাধে তাঁদের নিজেদের কোনো হাত থাকে না, সুতরাং তাঁকে দোষারোপ করা উচিত নয়। মাতার গৌরব পিতার থেকেও বেশি। এক তো তিনি নারী হওয়ায় অবধ্য, দ্বিতীয় তিনি আমার পূজনীয়া মাতা। অবুঝ পশুরাও স্ত্রী ও মাতাকে অবধ্য বলে মনে করে ; তাহলে আমি বুদ্ধিমান হয়ে কীকরে তাঁকে বধ করব ?

বিলম্ব করার স্বভাব হওয়ায় চিরকারী বহুক্ষণ এইসব ভাবতে লাগলেন, এরমধ্যে তাঁর পিতা ফিরে এলেন, সেই সময় তাঁর অত্যন্ত অনুতাপ হচ্ছিল। তিনি দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মনে মনে বলতে লাগলেন—ওহো !

[১]অশ্মা ভব। [২]পরশুর্ভব। [৩]আত্মা বৈ পুত্রনামাসি।

ত্রিভুবনের প্রভু ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে আমার আশ্রমে এসেছিলেন। আমি মিষ্ট বাক্যে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর পূজা করি। আমিই যখন এইভাবে তাঁকে আমার গৃহে স্থান দিয়েছিলাম আর তিনি কামপীড়িত হয়ে এরূপ নিন্দনীয় কর্ম করেছেন, তাতে আমার স্ত্রীর কী অপরাধ ? হায় ! ঈর্ষাবশত আমার চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, তাই আমি পাপসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি। সেই পতিব্রতা নারী আমার দুঃখের ভাগ গ্রহণ করত, ভার্যা হওয়ায় সে আমার থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারিণী ছিল ; কিন্তু আমি তাকে হত্যা করেছি। এখন কে আমাকে এই পাপ থেকে রক্ষা করবে ? আমি উদার চিত্ত চিরকারীকে তার মাতাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছি, সে যদি বিলম্ব করে তার নাম সার্থক করে তাহলে আমি স্ত্রী-হত্যার পাপ থেকে রক্ষা পেতে পারি। পুত্র চিরকারী ! তোমার কল্যাণ হোক, যদি তুমি এই কাজে দেরি করে থাক, তাহলে তোমার চিরকারী নাম সফল হবে। আজ বিলম্ব করে চিরকারী হও এবং তোমার মাতা ও আমার তপস্যা রক্ষা করো, সেই সঙ্গে আমাকে ও নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করো। তোমার মাতা বহুদিন ধরে তোমার জন্মের আশা করেছিল, বহুদিন ধরে তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিল। সুতরাং আজ তাকে রক্ষা করে তোমার চিরকারীতাকে সফল করে তোলো।

মনের দুঃখে এই কথা ভাবতে ভাবতে মহর্ষি গৌতম আশ্রমে এসে দেখলেন যে চিরকারী মায়ের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। চিরকারী পিতাকে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং অস্ত্র ফেলে পিতাকে প্রসন্ন করার জন্য তাঁর চরণ ধরলেন। পুত্রকে চরণে পতিত এবং স্ত্রীকে প্রকৃত লজ্জিত দেখে মহর্ষি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি চিরকারীকে বক্ষে তুলে আলিঙ্গন করে, তাঁর প্রশংসা করে, আশীর্বাদ ও উপদেশ দিয়ে বললেন—'বৎস ! তুমি চিরজীবী হও, তোমার কল্যাণ হোক, এইভাবে চিরকাল চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করবে। আজ তোমার চিরকারীতার জন্যই আমি এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। পুত্র !

অনেকদিন ধরে ভেবে-চিন্তেই কারো সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত। যাকে মিত্র করবে, তাকে সহসা ত্যাগ করবে না। এরূপ মৈত্রীই বহুদিন বজায় থাকে। রাগ, দর্প, অহংকার, দ্রোহ, পাপ ও কারো অপ্রিয়কাজ করতে যে খুব চিন্তা করে, সে প্রশংসনীয় হয়। বন্ধু, সুহৃদ, ভৃত্য এবং নারীদের গোপন অপরাধের কারণ নির্ণয়েও তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! গৌতম তাঁর পুত্রের এইরূপ চিন্তাভাবনা করে বিলম্বে কাজ করার প্রবণতা দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এইভাবে প্রত্যেক কাজে সঠিক চিন্তা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছালে পরে অনুতাপ করতে হয় না। যাঁরা বিদ্বান ও সাধুপুরুষদের সেবায় বহু দিন নিয়োজিত থেকে নিজের মনকে বশে রাখেন, তাঁরা চিরকাল সম্মানলাভ করেন। ধর্মোপদেশকারী ব্যক্তিকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, তবে তিনি উপযুক্ত চিন্তা করেই তার উত্তর দেন। মহাতপস্বী গৌতম তাঁর চিরকারী পুত্রের সঙ্গে আনন্দে বহু বৎসর আশ্রমে কাটালেন ; পরে দেহত্যাগ করে পুত্রসহ স্বর্গে গেলেন।

———০———

অহিংসাপূর্বক রাজ্যশাসন করার বিষয়ে দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের সংবাদ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজা কাউকে হিংসা না করে কী করে প্রজাদের রক্ষা করবেন ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই ব্যাপারে দ্যুমৎসেন এবং সত্যবানের কথোপকথনরূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। শোনা যায়, একদিন সত্যবান দেখলেন তাঁর পিতার আদেশে বহু অপরাধীকে ফাঁসি দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ; তখন তিনি পিতার কাছে গিয়ে বললেন—'পিতা ! একথা সত্য যে কখনো কখনো অধর্মের মতো দেখা কর্মও ধর্ম হয়ে ওঠে আবার ধর্ম বলে যা প্রতীত হয় সেটিও অধর্মের রূপ ধারণ করে। তা সত্ত্বেও কারো প্রাণ গ্রহণ করা কোনোভাবেই ধর্ম হতে পারে না।

দ্যুমৎসেন বললেন—পুত্র ! অপরাধীকে যদি বধ না করা হয়, তাহলে ধর্ম-অধর্ম সব মিলেমিশে এক হয়ে যাবে। কলিযুগে লোকেরা অপরের বস্তু গ্রাস করে নিতে চায়, তারা বলতে থাকে 'এই বস্তু আমার, ওর নয়।' এই অবস্থায় দণ্ড না দিয়ে কীভবে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করা সম্ভব ? তুমি যদি দণ্ড ভিন্ন কোনো শাসনের উপায় জেনে থাক, তাহলে বলো।

সত্যবান বললেন—পিতা ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণকে ব্রাহ্মণদের অধীন করে রাখা উচিত। চার বর্ণের লোকেরা যখন ধর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তা পালন করতে থাকবে তখন তাদের অনুকরণে অন্য ব্যক্তিরাও—সূত-মাগধ প্রভৃতিও ধর্মাচরণ করতে থাকবে। যদি কেউ ব্রাহ্মণের আদেশ মেনে না নেয় তখন ব্রাহ্মণের রাজাকে গিয়ে জানাতে হবে, 'অমুক ব্যক্তি আমার কথা শোনে না।' তখন রাজা সেই ব্যক্তিকে দণ্ড দেবেন। দণ্ড বিধানে তাকে বধ করার বিধান যেন না থাকে। নীতি-শাস্ত্রের আলোচনা এবং অপরাধীর কার্যগুলি ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা না করে দণ্ডপ্রদান করা ঠিক নয়। রাজা যখন অপরাধীদের বধ করান, তখন তাদের সঙ্গে বহু নিরপরাধ মানুষ—তাদের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিও কালের গ্রাসে পতিত হয় ; সুতরাং রাজাকে ভালো করে ভেবে দেখে দণ্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। দুষ্ট ব্যক্তিও সাধু-সঙ্গে সুশীল হয়ে উঠতে পারে। তাই দুষ্টদের প্রাণদণ্ড দিয়ে তাদের মূলোচ্ছেদ করা উচিত নয়। তাদের মূলোচ্ছেদ করা সনাতন ধর্ম নয়। সামান্য শারীরিক দণ্ড প্রদান করা উচিত, যাতে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অথবা তাদের সর্বস্ব নিয়ে নেবার ভয় দেখাতে হয়, বন্দি করে রাখতে হয়, নাহলে কান বা নাক কেটে কুরূপ করে দিতে হয়। প্রাণদণ্ড দিয়ে তাদের আত্মীয়দের কষ্টপ্রদান করা কখনো উচিত নয়। তেমনই যদি তারা পুরোহিত ব্রাহ্মণের শরণ গ্রহণ করে, তাহলেও রাজা তাকে দণ্ড দেবেন না। প্রজাপতির নির্দেশ আছে যে কোনো দুষ্ট ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে 'আজ থেকে আমি আর কোনো পাপ বা অপরাধ করব না' তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সে যদি বারংবার অপরাধ করতে থাকে, তাহলে দণ্ড না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডধারী সন্ন্যাসীও যদি পাপ বা অন্যায় করেন, তাহলে তাঁদেরও দণ্ড দেওয়া উচিত।

দ্যুমৎসেন বললেন—পুত্র ! যেভাবেই হোক প্রজাদের ধর্ম-মর্যাদার মধ্যে রাখা উচিত, সেটিই হল রাজার ধর্ম। লুণ্ঠনকারীদের বধ না করলে তারা সকল প্রজাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। আগে মানুষকে সুপথে আনা সহজ ছিল ; কারণ তাদের স্বভাব ছিল কোমল। সত্যের ওপর তাদের আস্থা ছিল এবং দ্রোহ ও ক্রোধের মাত্রাও তাদের মধ্যে খুব কম ছিল। সেই সময় অপরাধীকে ধিক্কার দেওয়াকেই কঠিন দণ্ড বলে মনে হত। তারপর ক্রমশ মানুষের মধ্যে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন অপরাধীকে তিরস্কার করে ছেড়ে দেওয়া হত। ক্রমে জরিমানা আদায়ের প্রথা চালু হল, এখন তো প্রাণদণ্ডও প্রচলিত রয়েছে। তাতেও মানুষকে নিয়ন্ত্রণের ভেতরে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। লুণ্ঠনকারীরা দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, মানুষ—কারোরই আপন নয়। এরা শ্মশানে গিয়ে মৃতের অঙ্গ থেকেও গহনা খুলে নেয়। এদের কে সুপথে আনবে ? যারা এদের বিশ্বাস করে, তাদের মূর্খ বলে জানতে হবে।

সত্যবান বললেন—পিতা ! আপনি যদি লুণ্ঠনকারীদের বধ না করে তাদের সৎপথে আনতে না পারেন, তাহলে অন্য কোনো উপায়ে তাদের দস্যুবৃত্তি বন্ধ করুন। বহু রাজা জনগণের কল্যাণের জন্য কঠোর তপস্যা করেন ; তাঁদের তপস্যা দেখে রাজ্যে বসবাসকারী দুষ্ট লোকেরা লজ্জিত হয়ে নিজেদের আচরণ সংশোধন করে রাজার মতোই সদাচারী হয়ে ওঠে। বহু প্রজা শুধু ভয় পেয়েই সুপথে চলে

আসে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ সদ্ব্যবহারের দ্বারাই প্রজাদের ওপর বহুদিন ধরে শাসন করেন। তাঁরা অপরাধীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন না। রাজা উত্তম আচরণ করলে, অপরেও তাঁকে অনুকরণ করে। মানুষের স্বভাবই হল শ্রেষ্ঠ মানুষদের আচরণ অনুসরণ করা। যে রাজা নিজে বিষয় ভোগ করার জন্য ইন্দ্রিয়ের গোলাম হয়ে থাকে, নিজের মনকে বশে রাখতে পারে না, সে যদি অন্যকে সদাচারের উপদেশ দেয়, তাহলে লোকে তা নিয়ে তামাশা করে, হেসে উড়িয়ে দেয়। কোনো ব্যক্তি যদি দম্ভ বা মোহবশত রাজার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে, তাহলে যে কোনো উপায়ে তাকে দমন করা উচিত। এতে সে তার খারাপ স্বভাব পরিত্যাগ করবে। যে রাজা পাপ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে চায়, তার আগে নিজের মনকে বশে রাখা উচিত। এরপর যদি নিজের প্রিয় বন্ধুবান্ধবও অপরাধ করে তাহলে তাদেরও ভীষণ শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। পাপাচারীদের যদি কঠিন সাজা দেওয়া না হয়, তাহলে পাপ বৃদ্ধি পাবে ও ধর্ম হ্রাস হতে থাকবে।

পিতা ! এক দয়ালু ব্রাহ্মণ আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, 'পুত্র সত্যবান ! আমার পূর্বপুরুষেরা কৃপা করে আমাকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন, তাই সত্যযুগে ধর্ম যখন পূর্ণভাবে অবস্থিত, তখন রাজার পূর্বোক্ত অহিংসাময় দণ্ডেরই বিধান করা উচিত। ত্রেতাযুগ এলে ধর্মের প্রচার এক-চতুর্থাংশ কম হয়ে যায় (সেই সময় অবস্থা অনুসারে বাগদণ্ডের দ্বারা প্রজাশাসন করা উচিত)। দ্বাপরে ধর্মের দুই পদ অবশিষ্ট থাকে ; অতএব তখন মানুষের আয়ু, শক্তি এবং কালের বিচার করে দণ্ডবিধান করা উচিত। স্বায়ম্ভুব মনু প্রাণীদের ওপর অনুগ্রহ করে বলেছেন যে, মানুষের অহিংসা ধর্মেরই পালন করা উচিত ; যাতে তারা সত্যস্বরূপ পরমাত্মা প্রাপ্তিকারী ধর্মের মহান ফল থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়।'

কপিলের স্যূমরশ্মির কাছ থেকে নিবৃত্তিপ্রধান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! একই উদ্দেশ্য নিয়ে চলা গার্হস্থ্য ধর্ম এবং যোগধর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! দুটি ধর্মই মহান, দুটিই সঠিক ভাবে পালন করা কঠিন, দুটিই উত্তম ফলপ্রদানকারী এবং সৎপুরুষগণ দুটিরই আচরণ করেছেন। আমি এই দুটি ধর্মের উপযোগিতা বলছি ; তুমি একাগ্র চিত্তে শোনো ; এতে তোমার মনের অস্থিরতা দূরীভূত হবে। এই বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ স্যূমরশ্মি ও কপিলের সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন, তা হল এইরূপ—

কপিল বললেন—হে স্যূমরশ্মি ! যম নিয়ম পালনকারীরা যদি জ্ঞানমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করে পরব্রহ্ম লাভ করেন, তাহলে সমস্ত জগতে কোথাও তাঁদের গতি অবরুদ্ধ হয় না। শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব তাঁকে কষ্ট দিতে পারে না। তাঁরা কখনো কোথাও মাথা নত করেন না এবং কাউকে আশীর্বাদও দেন না, তাঁরা কোনো কামনা-বন্ধনে আবদ্ধ হন না। সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত, পবিত্র ও শুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁরা বিচরণ করেন। তাঁদের বুদ্ধি সর্বদা স্থির সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করে মোক্ষকে আপন করে নেন, ব্রহ্মেই নিবাস করেন এবং নিজেরাও ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠেন। শোক-দুঃখ তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না এবং রজোগুণের লেশমাত্র তাঁদের মধ্যে থাকে না। তাঁরা সনাতনলোক প্রাপ্ত হন। এই উত্তম গতি লাভ করার পর তাঁদের আর গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের কী প্রয়োজনীয়তা থাকে ?

স্যূমরশ্মি বললেন—জ্ঞান লাভ করে পরব্রহ্মে স্থিত হওয়াই যদি পুরুষার্থের চরম সীমা হয়, যদি সেটিই উত্তম গতি হয়, তাহলে তো গৃহস্থ ধর্মের মহত্ত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ গৃহস্থদের সাহায্য ব্যতীত কোনো আশ্রম চলে না এবং জ্ঞানের নিষ্ঠাও প্রদান করা যায় না। যেমন সমস্ত প্রাণী মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেই জীবনধারণ করে, তেমনই গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করেই অন্য আশ্রম টিকে থাকে। গৃহস্থই যজ্ঞ এবং তপ করে, মানুষ তার কল্যাণের জন্য যা কিছু চেষ্টা করে, যা কিছু ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে সবের মূলই গৃহস্থাশ্রম। সমস্ত প্রাণীই সন্তান উৎপাদন করে সুখী হয় : কিন্তু সন্তানের মুখ দর্শনের জন্য গার্হস্থ্য আশ্রম ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা কি সম্ভব ? বৈদিক ধর্মের সনাতন মর্যাদা হল ত্রিলোকের হিতকারী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণে গর্ভাধানের আগে বেদ-মন্ত্রের ব্যবহার হয়। তারপর প্রত্যেক সংস্কারে এবং অন্যান্য কার্যেও বেদের আবশ্যকতা হয়। এই বেদ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, মানুষ পিতৃপুরুষ, দেবতা ও ঋষিদের কাছে ঋণী। এই অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে থেকে সেই ঋণ শোধ না করলে কারো মোক্ষলাভ হয় না। বেদকে অবহেলা নয়, সেই অনুসারে কর্ম করলেই মানুষ পরব্রহ্ম লাভ করে।

কপিল বললেন—বুদ্ধিমান ব্যক্তির দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র এবং চাতুর্মাস্যাদি বৈদিক কর্মগুলির অনুষ্ঠান করা উচিত ; কারণ তাতেই সনাতন ধর্মের অবস্থিতি। কিন্তু যাঁরা সন্ন্যাস ধর্ম স্বীকার করে কর্মানুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন এবং ধীর, পবিত্র ও ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত ; তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই দেবতাদের তৃপ্ত করেন। যিনি সমস্ত প্রাণীর আত্মা, সকলকে আত্মভাবে দেখেন এবং যাঁর কোনো বিশেষ পদ (স্থান) নেই ; সেই জ্ঞানী পুরুষের গতির খবর রাখতে দেবতারাও মোহমুগ্ধ হয়ে যান। কল্যাণকামীদের ইন্দ্রিয় সংযম করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি পাশা খেলে না, অন্যের ধন আত্মসাৎ করে না, নীচ ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করে না এবং ক্রোধান্বিত হয়ে কাউকে আঘাত করে না, সে সর্বদা সুরক্ষিত থাকে। কাউকে গালি না দেওয়া, বৃথা বাক্য না বলা, অপরের নিন্দা না করা, অল্প এবং সত্য বাক্য বলা, এবং সর্বদা সাবধানে থাকা—এর দ্বারা বাক্ ইন্দ্রিয় রক্ষা পায়। উপবাস করবে না, আবার অত্যধিক ভোজনও করবে না, আহারের জন্য লালায়িত থাকবে না, সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে এবং জীবন নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক খাদ্য গ্রহণ করবে না—এর দ্বারা উদর সংযম হয়। পরস্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করবে না, একপত্নীব্রত ধারণ করবে এবং ঋতুকাল ভিন্ন স্বপত্নির সঙ্গেও সমাগম করবে না ; এর দ্বারা উপস্থেন্দ্রিয় রক্ষা পায়। যার উপস্থ, উদর, হাত-পা এবং বাক্যের সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার সুরক্ষিত হয় ; সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক দ্বিজ। যার ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই, তার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরূপ মানুষের তপ ও যজ্ঞে কী লাভ ? যার কাছে সামান্য পরণীয় ব্যতীত আর কোনো বস্ত্র নেই, যে বিনা শয্যায় শয়ন করে, বালিশের পরিবর্তে হাতেই মাথা রেখে নিদ্রা যায় এবং সর্বদা শান্ত হয়ে থাকে, দেবতারা তাকেই ব্রাহ্মণ বলে মানেন। যে অপরের দেওয়া সুখ-দুঃখ মনে রাখে না, প্রকৃতি এবং তার কার্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাত, যার সমস্ত প্রাণীর গতির জ্ঞান আছে, দেবতারা তাকেই ব্রাহ্মণ বলে মনে করেন। যে সকল প্রাণী থেকে নির্ভয়ে থাকে, অন্য প্রাণীরাও যার থেকে ভয় পায় না, যে সমস্ত প্রাণীরা আত্মা, দেবতাদের মতে তাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। যার আশ্রয়ে সম্পাদিত তপ জগতের মূলভূত অজ্ঞান নাশ করে, সেই সাধু মনোচিত আচারের অত্যন্ত মহিমা থাকে। এটি অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, সেটিই মুমুক্ষুদের সনাতন ধর্ম এবং তার ফলে কখনো প্রতিবন্ধকতা আসে না। এটি সমস্ত ধর্মে ওতোপ্রোত হয়ে থাকে এবং এটি বিপদ ও প্রমাদরহিত। যারা এই আচার পালনে অসমর্থ, তারাই পরমেশ্বর প্রাপ্তিকারী ও অবশ্যম্ভাবী ফলপ্রদানকারী কল্যাণময় কর্মগুলিকে ফলহীন বলে থাকে। গুণাদির কার্যভূত যেসব যাগ-যজ্ঞাদি আছে, তার স্বরূপ এবং বিধি-বিধান বোঝা কঠিন, বুঝতে পারলেও তার অনুষ্ঠান করা মুশকিল হয় এবং অনুষ্ঠান করলেও তার থেকে বিনাশশীল ফলই প্রাপ্তি হয়—একথা তুমিও জানো।

স্যূমরশ্মি বললেন—ব্রহ্মন্ ! আমার নাম স্যূমরশ্মি, আমি জ্ঞানলাভের জন্য এখানে এসেছি। আমার বক্তব্য আমার পক্ষ সমর্থন করার জন্য নয়। কল্যাণের ইচ্ছা নিয়ে সরলভাবে আমার কথা আপনাকে নিবেদন করেছি। এখন আমি আপনার শরণাগত, শিষ্য মনে করে আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। চার বর্ণ এবং আশ্রমের লোকেরা শুধুমাত্র সুখের জন্যই নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং আপনি কৃপা করে বলুন অক্ষয় সুখ কী ?

কপিল বললেন—যে কোনো বর্ণ বা আশ্রমে প্রবৃত্তি হোক না কেন, যে কর্মের আচরণ শাস্ত্র অনুসারে (কামনা ও অহংকার ত্যাগ করে) করা হয়, সেটি পুরুষার্থের প্রকৃত সাধন হয়। যে ব্যক্তি যে বর্ণ বা আশ্রমের কর্তব্য পালন করে, সে সেখানেই অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বিবেক অনুসরণ করে, তার সমস্ত দোষ জ্ঞানের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে যায়। শাস্ত্রীয় পথ থেকে বিচ্যুত হলে যে কোনো বৃত্তিরই আশ্রয় নেওয়া হোক, সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় এবং প্রজাদের সর্বনাশ করে।

—০—

ব্রহ্মজ্ঞানে সকল আশ্রমের অধিকার জানিয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের নিরূপণ

কপিল বললেন—সকলের জন্য বেদই প্রমাণ, কেউই বেদ উল্লঙ্ঘন করতে পারে না। ব্রহ্মের দুটি রূপ বলে জানতে হবে—শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে অগ্নিহোত্রাদি কর্মে নিযুক্ত থাকেন এবং কখনো পাপকর্মে প্রবৃত্ত হন না, তাঁর মানসিক সংকল্প সিদ্ধ হয় এবং তাঁর বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম লাভ হয়। তাঁরা কারো ওপর ক্রোধ করেন না এবং কাউকে দোষারোপও করেন না। তাঁদের মধ্যে অহংকার এবং মৎসর ইত্যাদি দুর্ভাবনা থাকে না, জ্ঞানের সাধন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে তাঁদের নিষ্ঠা জন্মায়। তাঁদের জন্ম, কর্ম ও জ্ঞান সবই শুদ্ধ হয় এবং তাঁরা সমস্ত প্রাণীর হিতে তৎপর থাকেন। এরূপ বহু রাজা ও ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা নিজেদের কর্মত্যাগ না করে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করে বিধিমতো সাধন করেছেন। তাঁরা সকল প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি রাখতেন ; সরল, সন্তুষ্ট, জ্ঞাননিষ্ঠ, ধর্মের ফল প্রত্যক্ষ অনুভবকারী এবং শুদ্ধচিত্ত হতেন, তাঁরা শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দুটিতেই শ্রদ্ধা রাখতেন। তাঁরা ব্রতাদি পালন করে প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ করতেন এবং কষ্টে বা দুর্গম স্থানে থাকলেও ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকতেন। তাতেই তাঁদের সুখ বলে মনে হত। এইভাবে সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করায় তাঁদের অত্যন্ত তেজস্বী বলে মান্য হত। তাঁরাও বিষয়-বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করে শাস্ত্রই অনুসরণ করতেন। তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র, নিয়মনিষ্ঠ এবং যশস্বী হতেন। কামনা এবং কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েও তাঁরা নিত্য যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করতেন, কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করে অত্যন্ত কঠোর কর্মের আচরণ করতেন। তাঁদের উদার কর্মের জন্য সর্বত্র তাঁরা প্রশংসিত হতেন। তাঁরা স্বভাবে অত্যন্ত উদারচিত্ত, সরল, শান্তিপরায়ণ এবং স্বধর্মনিষ্ঠ হতেন। তাই তাঁদের যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রানুসারী কর্ম, সময়মত করা শাস্ত্রানুশীলন এবং সংকল্প—এগুলি অনন্ত ফলপ্রদায়ক হত—একথা আমরা শুনেছি। এরূপ ধীর, বীর এবং কঠোর কর্মের আচরণকারী স্বকর্মনিষ্ঠ পুরুষদের তপ অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য ভয়ংকর শস্ত্রে পরিণত হত।

ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ এক আশ্রমধর্মকেই চার প্রকারে বিভক্ত বলে মানেন। সন্তগণ বিধিমতো সেটি পালন করে পরমগতি প্রাপ্ত হন। কোনো কোনো ব্যক্তি সন্ন্যাসী হয়ে, কেউ আবার বনে বাস করে বাণপ্রস্থ দ্বারা, কেউ গৃহে বাস করে গৃহস্থ হয়ে, কেউ আবার ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সেবা দ্বারা সেই আশ্রমধর্ম পালন করে পরমপদ প্রাপ্ত হন। এই দ্বিজগণকেই আকাশে নক্ষত্ররূপে দেখা যায়। এঁরা সকলে সন্তোষের সাহায্যেই এই দুর্লভপদ লাভ করেছিলেন—এরূপই বৈদিক সিদ্ধান্ত। যাঁরা এরূপ ব্রহ্মচর্য পালন করে, গুরুসেবায় তৎপর থাকেন, দৃঢ় সিদ্ধান্তসম্পন্ন ও সমাহিত হন, তাঁদেরই 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়। চার বর্ণ এবং চার আশ্রমের সেই তৃষ্ণাহীন, বিশুদ্ধবুদ্ধি এবং মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য জাগ্রতাদি তিন অবস্থার সাক্ষী তূরীয় অবস্থার অনুভব প্রদানকারী সেই শম-দমাদিরূপ ধর্ম প্রকৃতপক্ষেই যথার্থ ধর্ম। শুদ্ধচিত্ত এবং সংযতাত্মা ব্রাহ্মণ সেই সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যিনি সন্তুষ্ট চিত্ত এবং ত্যাগী তিনিই জ্ঞানের অধিকারী। এই মোক্ষদায়িনী বিদ্যা সন্ন্যাসীদেরও সনাতন ধর্ম। এই যতিধর্ম অন্য আশ্রম ধর্মের সঙ্গে মিলিত থাক বা স্বাধীন, একে যে কেউ নিজ শক্তি অনুসারে পালন করে, তার অবশ্যই কল্যাণ হয়। কেবল শক্তিহীন (সাধনায় যারা তৎপর থাকে না) ব্যক্তিদেরই এই ধর্মপালনের সামর্থ্য থাকে না, পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণ এর সাহায্যে পরমপদ লাভের সাধনা করে সংসার থেকে মুক্তিলাভ করেন।

স্যমরশ্মি জিজ্ঞাসা করলেন—মহাভাগ ! আপনি তো জ্ঞাননিষ্ঠ এবং গৃহস্থেরা কর্মনিষ্ঠ হয়ে থাকে। কিন্তু আপনি এখন নিষ্ঠায় সব আশ্রমেরই একতা প্রতিপাদন করছেন। এইরূপ জ্ঞান ও কর্মের ঐক্য ও পার্থক্য—এতে বিভ্রান্ত হওয়ায় এদের ঠিক ঠিক পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং আপনি কৃপা করে সেটি আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

কপিল বললেন—কর্ম মনকে শুদ্ধ করে এবং জ্ঞান পরমগতি রূপ। কর্মের সাহায্যে যখন চিত্তের দোষ নষ্ট হয়ে যায় তখন মানুষ রসস্বরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হয়। সকল প্রাণীর ওপর দয়া, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, নিরভিমানিতা, লজ্জা, তিতিক্ষা এবং শম—এগুলি ব্রহ্ম প্রাপ্তির অন্যতম উপায়। এগুলির দ্বারা পুরুষ পরব্রহ্ম লাভ করে। বিদ্বান ব্যক্তিদের কর্মফলের এই সিদ্ধান্ত জানা উচিত। জ্ঞাননিষ্ঠ, সন্তুষ্ট, শান্ত, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি যে স্থিতি লাভ করেন, তাকেই বলা হয় 'পরমগতি'। যে

পুরুষগণ সম্পূর্ণ বেদ এবং তার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ঠিকমতো জানেন, তাঁদের 'বেদজ্ঞ' বলা হয়, এ ভিন্ন সবই অর্থহীন। বেদজ্ঞ পুরুষ সকল বিষয়ই জানেন ; কারণ বেদে সব কিছুরই সমাবেশ আছে। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সকল বিষয়ই বেদে আছে। সমগ্র শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, এই দৃশ্যজগৎ প্রতীতিকালে ভাসিত হয় কিন্তু যথার্থ দৃষ্টি উন্মোচিত হলে এটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সদসৎ-স্বরূপ ব্রহ্মই এই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত। সব কিছু ত্যাগ করলেই তাঁর প্রাপ্তি লাভ হয়। সম্পূর্ণ বেদে তারই প্রতিপাদন করা হয়েছে। তিনি নিজ আনন্দস্বরূপের দ্বারা সর্বত্র অনুগত এবং অপবর্গ (মোক্ষ)-তে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই ব্রহ্ম ঋত, সত্য, জ্ঞাত, জ্ঞাতব্য, সকলের আত্মা, চরাচর মূর্তি, বিশুদ্ধ সুখস্বরূপ, মঙ্গলময়, সর্বোৎকৃষ্ট, অব্যক্তেরও কারণ এবং অবিনাশী। জ্ঞাননেত্রসম্পন্ন পুরুষ তেজ, ক্ষমা এবং শান্তিরূপ শুভসাধনার সাহায্যে আকাশের ন্যায় সঙ্গ বিবর্জিত, অবিনাশী এবং একরস সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন। যা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবেত্তা থেকে অভিন্ন, সেই পরব্রহ্মকে আমরা নত মস্তকে স্বীকার করি।

ধর্মের সার্থকতা জানানোর জন্য একজন ব্রাহ্মণ ও কুণ্ডধার মেঘের কাহিনী

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! বেদে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনেরই প্রশংসা করা হয়েছে। আপনি আমাকে বলুন, এরমধ্যে কোনটি লাভ করা সবথেকে উত্তম।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে এক প্রাচীন কাহিনী আছে। একবার কুণ্ডধার নামক মেঘ প্রসন্ন হয়ে তাঁর এক ভক্তকে কৃপা করেছিলেন। আমি সেই কাহিনী তোমাকে শোনাচ্ছি। কোনো এক সময় এক গরীব ব্রাহ্মণ সকামভাবে ধর্ম করতে চেয়েছিল। সে তখন যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য অর্থের আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিল। পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে দেবতাদেরও পূজা করে, কিন্তু তাতেও তার অর্থপ্রাপ্তি হয় না। একদিন সে তার কাছে দেবতাদের সেবক কুণ্ডধার মেঘকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তাঁকে দেখেই ব্রাহ্মণের মনে ভক্তিভাব উৎপন্ন হল এবং সে ভাবতে লাগল 'এই দেবতা আমাকে নিশ্চয়ই অনেক ধন দেবেন।' এই ভেবে সে ধূপ, দীপ, চন্দন, পুষ্প ও নানাপ্রকার নৈবেদ্য দিয়ে তাঁর পূজা করল। কিছুক্ষণ পরে মেঘ প্রসন্ন হয়ে বললেন—'সৎ পুরুষেরা ব্রহ্ম হত্যা, সুরাপান, চুরি এবং ব্রতভঙ্গকারীদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞের জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই।'

তারপর সেই ব্রাহ্মণ কুশশয্যায় শয়ন করল। সে শম, দম, তপ এবং ভক্তি-ভাবসম্পন্ন শুদ্ধ হৃদয় ব্যক্তি ছিল। সেই রাতেই কুণ্ডধারের প্রতি তার ভক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। সে স্বপ্নে বহু দেবতার দেখা পেল। তাদের মধ্যে মণিভদ্র নামে এক দেবশ্রেষ্ঠ অন্য দেবতাদের সামনে নানাপ্রকারের ফলযাচক প্রস্তুত করছিলেন। দেবতারা সেই ফলযাচকদের শুভকর্ম অনুসারে তাঁদের রাজ্য এবং ধন ইত্যাদি প্রদান করেছিলেন। এরমধ্যে কুণ্ডধার দেবতাদের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। মণিভদ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কুণ্ডধার ! তুমি কী চাও ?'

কুণ্ডধার বললেন—এই ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত।

আপনারা যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার এই ব্রাহ্মণ ভক্তের উপর একটু কৃপা করুন যাতে এ কিছু সুখ পায়।

তখন দেবতাদের মনোভাব বুঝে মণিভদ্র তাঁকে বললেন, 'ওঠো ! ওঠো ! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। এবার প্রসন্ন হও। কুণ্ডধার ! এই ব্রাহ্মণের যদি ধনলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে একে তার মনের মতো অর্থ দিয়ে দাও।'

কিন্তু কুণ্ডধার ভাবলেন যে মানবদেহ চঞ্চল এবং বিনাশশীল, তাই তিনি বললেন, 'আমি চাই এই ব্রাহ্মণের বুদ্ধি তপে ব্যাপৃত হোক। আমি আমার ভক্তকে রত্নপূর্ণ পৃথিবী বা কোনো বিশাল অর্থরাশি দিতে চাই না, আমার ইচ্ছা যে সে ধার্মিক হয়ে উঠুক।'

মণিভদ্র বললেন—'রাজ্য এবং অন্য নানাপ্রকার সুখও সর্বদা ধর্মেরই ফল। সুতরাং ওকে ফল ভোগ করতে দাও না ? এতে কোনো শারীরিক ক্লেশও নেই।'

ভীষ্ম বললেন—কিন্তু তাতেও কুণ্ডধার ধর্মের প্রতিই আগ্রহ দেখাতে লাগলেন। তাতে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ মণিভদ্র বললেন—'তোমার ওপর এবং এই ব্রাহ্মণের ওপর সকল দেবতাই প্রসন্ন হয়েছেন। সুতরাং এই ব্যক্তি ধর্মাত্মা হবে এবং এর বুদ্ধি ধর্মেই স্থির থাকবে।' তখন সেই মেঘ সফল মনোরথ হয়ে স্বস্তি লাভ করলেন। তিনি এমন বর পেলেন যা অন্যদের কাছে অত্যন্ত দুর্লভ।

এরমধ্যে ব্রাহ্মণ লক্ষ্য করলেন তাঁর কাছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বহুমূল্য বস্ত্র রয়েছে। সেগুলি দেখে ব্রাহ্মণের বৈরাগ্যের উদয় হল। সে বলতে লাগল—'আমার তপস্যার উদ্দেশ্য এই কুণ্ডধার বুঝতে পারেননি, তাহলে অপরে কীকরে বুঝবে ? ঠিক আছে, এখন আমি বনেই যাচ্ছি, ধর্মময় জীবনযাপন করাই সব থেকে ভালো।'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! সেই ব্রাহ্মণ তখন বনে বাস করে উগ্র তপস্যায় ব্যাপৃত হল। সে দেবতা ও অতিথিদের সৎকার করে অবশিষ্ট ফলমূলাদির দ্বারা জীবননির্বাহ করত। পরে ফল-মূল ত্যাগ করে পাতা খেয়ে কাটাত। তারপর পাতা ছেড়ে জল খেয়ে থাকত। তারপর কয়েকবছর বায়ুভক্ষণ করেই ছিল। এইভাবে ধর্মে শ্রদ্ধা রেখে কঠোর তপস্যা করতে থাকায় তার দিব্যদৃষ্টি লাভ হল। তার মনে হতে লাগল যে যদি আমি প্রসন্ন হয়ে কাউকে ধন বা রাজ্য দিতে চাই, তাহলে সে অবশ্যই রাজা হবে, আমার বাক্য মিথ্যা হবে না। এরমধ্যে তার তপপ্রভাবে এবং ভক্তিভাবে প্রসন্ন হয়ে কুণ্ডধার প্রকাশিত হলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে বিধিমতো পূজা করলেন। কুণ্ডধার তাঁকে বললেন—'বিপ্রবর তুমি খুব ভালো দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছ। তার দ্বারা তুমি রাজাদের গতিবিধি এবং বিভিন্ন লোক নিজে দেখে নাও।' ব্রাহ্মণ দিব্যনেত্রে দেখতে পেল যে হাজার হাজার রাজা নরকে পড়ে রয়েছে। কুণ্ডধার বললেন—'তুমি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পূজা করেছ। অতএব তুমি যদি অর্থ লাভ করেও দুঃখই পেতে, তা হলে আমার কী উপকার হত আর তোমার ওপরই বা আমার কী অনুগ্রহ মনে করা হত, বলো ? ওদের দশাগুলি তুমি আর একবার ভালো করে দেখো। জানি না, মানুষ ভোগের লালসা কেন করে ? এজন্য তাদের স্বর্গের দ্বার তো প্রায় বন্ধই হয়ে যায়।' এবার ব্রাহ্মণ দেখল যে সেই ভোগী পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মদ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। কুণ্ডধার বললেন—'দেখো ! সকল প্রাণীই এই সব দোষে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু দেবতার কৃপায় আজ তুমি নিজ তপের প্রভাবে অপরকেও রাজ্য ও ধন দান করতে সক্ষম হয়েছ।'

রাজন্ ! তখন ব্রাহ্মণ কুণ্ডধারের সামনে মাথা নত করে বললেন—'আপনি আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেছেন। আপনার স্নেহ না বুঝে আমি কাম ও লোভের জন্য আপনার প্রতি যে ব্যবহার করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।' কুণ্ডধার বললেন—'আমি আগেই তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি'—এই বলে সেই ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করে অন্তর্হিত হলেন। এইভাবে কুণ্ডধারের কৃপায় তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে সেই ব্রাহ্মণ সর্বলোকে বিচরণ করতে থাকলেন। আকাশ পথে চলা, সংকল্পদ্বারা অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করা, ধর্ম, শক্তি, যোগের সাহায্যে যে পরমগতি লাভ হয়ে থাকে, সেই সব সিদ্ধিও ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হলেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, সন্তগণ, যক্ষ, মানুষ ও চারণ—এঁরা সকলেই ধার্মিকদেরই সম্মান করেন, ধনাঢ্য বা কামাসক্তদের নয়। রাজন্ ! তোমার ওপর দেবতাদের অনেক অনুগ্রহ আছে, তাই তোমার বুদ্ধি ধর্মে স্থিত রয়েছে। ধনে সুখের ভগ্নাংশমাত্র প্রাপ্ত হয়, পরমসুখ থাকে ধর্মেতেই।

—০—

পাপী, ধর্মাত্মা, অনাসক্ত (বীতরাগ) ও মুক্ত হওয়ার উপায় এবং মোক্ষের সাধনসমূহের বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষ কীভাবে পাপী হয় ? কীরূপে ধর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বৈরাগ্য কী করে হয় এবং কী উপায়ে মোক্ষলাভ করে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! তুমি সকল ধর্ম সম্বন্ধেই অবগত, তা সত্ত্বেও ধর্মমর্যাদার মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য আমাকে প্রশ্ন করছ। আচ্ছা, তুমি প্রথমেই মোক্ষ, বৈরাগ্য, পাপ এবং ধর্মবিষয়ে শোনো। মানুষ বিষয়সমূহকে ঠিকভাবে জানার জন্য তাতে ইচ্ছাপূর্বক প্রবৃত্ত হয়। এতে যে বিষয়ে তার অনুরাগ হয়, সে সেটি পাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে। সে তার প্রিয় রূপ, রস, গন্ধ বারংবার ব্যবহার করতে চায়। এর ফলে সে সেগুলিতে অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং তা ক্রমশ দ্বেষ, লোভ এবং মোহরূপে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। এইভাবে লোভ-মোহ-রাগ-দ্বেষগ্রস্ত হয়ে তার বুদ্ধি ধর্মে প্রবৃত্ত হয় না। তখন সে কপটভাবে ধর্মাচরণ করে এবং কপটভাবেই ধন আহরণ করতে চায়। বুদ্ধি কপটতায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তখন তার পাপে রুচি হয়। তখন যদি তার আত্মীয়-বন্ধু তাকে পাপ করতে বারণ করে তখন সে শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে তাদের যুক্তিসম্মত উত্তর দিতে থাকে। রাগ এবং মোহের জন্য তার অধর্ম তিনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে—সে পাপ চিন্তা করতে থাকে, পাপ কথা বলতে থাকে এবং পাপ কাজ করতে থাকে। সাধু লোকেরা তার দোষ দেখতে পেলেও অসাধু আচরণসম্পন্ন লোকেরা তার মিত্র হয়ে ওঠে। সে ইহলোকেও সুখ পায় না, পরলোকের তো কথাই নেই।

মানুষ এইভাবেই পাপী হয়ে ওঠে। এবার ধর্মাত্মাদের কথা শোনো। ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা সর্বদা কল্যাণকারী ধর্মের আচরণ করেন, তাই তাঁদের কল্যাণই হয়। তাঁরা কল্যাণপ্রদ ধর্মের সাহায্যে উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি সুখ-দুঃখের মর্ম বোঝে, নিজের বুদ্ধিতে রাগ-দ্বেষ দোষাদি অবলোকনে সমর্থ এবং সৎ ব্যক্তিদের সেবা করে, সেই ব্যক্তির বুদ্ধি সাধুজনের সেবা এবং সৎকর্মাদির দ্বারা বিকশিত হয়, ধর্মেই সে আনন্দ লাভ করে এবং ধর্মই তার জীবনের আধার হয়ে ওঠে। তার মন ধর্মযুক্ত কর্মের দ্বারাই ধন লাভের জন্য চেষ্টা করে থাকে। এই প্রকার আচরণের দ্বারাই পুরুষ ধর্মাত্মা হয় এবং সে ধর্মনিষ্ঠ সুহৃদ লাভ করে। এরূপ সত্যকার মিত্র এবং পবিত্র ধন পেয়ে সে ইহলোকে সুখী থাকে এবং পরলোকেও সুখ পায়। এইসব পুরুষ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) ওপর প্রভুত্বলাভ করে। কিন্তু ধর্মের এরূপ ফল পেয়েও সে হর্ষে উৎফুল্ল হয় না। এতে তৃপ্ত না হয়ে সে বিবেক দৃষ্টির দ্বারা বৈরাগ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসাধন করে। জ্ঞাননেত্রের উদয় হওয়ায় যখন তার কাম-রস-গন্ধে সুখবোধ হয় না এবং তার মন শব্দ, স্পর্শ ও রূপেও আবদ্ধ হয় না, তখন সে সকল কামনা থেকে মুক্ত হয়ে যায় ; এবং কিছুতেই ধর্ম ত্যাগ করে না। সমস্ত লোককে বিনাশশীল জেনে সে ধর্মের ফলভূত স্বর্গাদির ইচ্ছাও পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে। তারপর মোক্ষলাভের জন্য প্রযত্ন করে। এইভাবে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হতে থাকে, তার ফলে সে পাপকাজ পরিত্যাগ করে ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে এবং মোক্ষের প্রাপ্তিতেও যোগ্য হয়ে ওঠে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার কাছে পাপ, ধর্ম, বৈরাগ্য এবং মোক্ষ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে, তাই আমি তোমাকে তার সম্বন্ধে জানালাম। অতএব তুমি সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে ধর্মাচরণ করবে ; কারণ যারা ধর্মে স্থিত থাকে তারা পরম সিদ্ধিলাভ করে।

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি প্রযত্ন দ্বারা মোক্ষলাভের কথা বলেছেন ; বিনা প্রযত্নে নয়। সুতরাং আমি এখন আপনার কাছ থেকে বিধিবৎ তার উপায়ের কথা শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি নানাভাবে সর্বদা সর্বপ্রকার হিতকর সাধনের অনুসন্ধানে রত, সুতরাং তোমার মধ্যে এই সূক্ষ্ম বস্তু পরীক্ষা করার গুণ থাকাই উচিত। দেখো, যে পথ পূর্ব সমুদ্রের দিকে যায়, তা পশ্চিমদিকে যেতে পারে না। মোক্ষেরও তেমনই একটিই পথ ; আমি বিস্তারিতভাবে তার আলোচনা করছি, শোনো। মুমুক্ষু ব্যক্তির উচিত হল ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে, সংকল্প ত্যাগের দ্বারা কামনাকে, ভগবদ্ ধ্যানাদি সাত্ত্বিক গুণের দ্বারা নিদ্রাকে, অপ্রমাদ দ্বারা ভয়কে, আত্মার চিন্তা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসকে, ধৈর্যের দ্বারা ইচ্ছা, দ্বেষ ও কামকে নাশ করবে। ভ্রম, মোহ এবং সংশয়রূপ আবরণকে শাস্ত্র-অভ্যাস দ্বারা এবং লক্ষ্যের বিস্মৃতি ও চিত্তের চঞ্চলতা—

এই দুটি দোষ জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা দমন করবে। বাত-পিত্তজনিত উপদ্রব এবং রোগাদিকে হিতকারক, সুপাচ্য ও পরিমিত আহারদ্বারা, লোভ ও মোহ সন্তুষ্টির দ্বারা, বিষয়াদি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা নিরাকরণ করবে। অধর্মকে দয়া দ্বারা, ধর্মকে আচরণ দ্বারা, আশাকে ভবিষ্যৎ-চিন্তা ত্যাগ করে এবং অর্থকে আসক্তি ত্যাগ করে জয় করবে। বস্তু আদির অনিত্যতা চিন্তা করে মমতাকে, যোগাভ্যাসের দ্বারা ক্ষুধাকে, করুণার দ্বারা অহং-ভাব এবং সন্তোষের দ্বারা তৃষ্ণা ত্যাগ করবে। তন্দ্রাকে দাঁড়িয়ে থেকে, তর্ক-বিতর্ককে সিদ্ধান্ত দ্বারা, বহু ভাষণকে মৌনতার দ্বারা এবং ভয়কে শৌর্যের দ্বারা বশ করবে। বাক্যাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি মনে, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে আত্মাতে, আত্মাকে শুদ্ধ চেতন পরমাত্মাতে নিরোধ করবে। মানুষের এইভাবে শান্ত ও পবিত্রকর্মা হয়ে সেই পরমাত্মপদের জ্ঞান লাভ করা উচিত। তার জন্য মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় এবং নিদ্রা—এই পাঁচটি দোষ ত্যাগ করে বাক্-সংযম করে যোগাভ্যাস করা কর্তব্য। ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, নম্রতা, ক্ষমা, শৌচ, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম—এইগুলির সাহায্যে মানুষের তেজ বৃদ্ধি পায় এবং তার পাপনাশ হয়, তার সংকল্প সিদ্ধ হয় এবং হৃদয়ে প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। এই ভাবে যখন সেই ব্যক্তি নিষ্পাপ ও তেজস্বী হয়ে ওঠে তখন মিতাহারী হয়ে, ইন্দ্রিয় সংযম করে, কাম-ক্রোধ বশ করে, নিজ শুদ্ধ স্বরূপকে পরব্রহ্মপদে স্থিত করার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করতে হয়। অমূঢ়তা, অনাসক্তি, কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করা, দীনতা, গর্ব এবং উদ্বেগ থেকে দূরে থাকা এবং নিষ্কামভাবে মন, বাক্য ও শরীরের সংযম করা—মোক্ষলাভের এই হল শুদ্ধ ও নির্মল পথ।

ভূত ও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে নারদ ও দেবল মুনির এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের বিষয়ে মাণ্ডব্য ও জনকের কথোপকথন

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! দেবর্ষি নারদ এবং দেবলের কথোপকথনরূপ একটি প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। একদিন বুদ্ধিমান-শ্রেষ্ঠ বয়োবৃদ্ধ দেবলকে বসে থাকতে দেখে দেবর্ষি নারদ তাঁকে প্রাণীদের উৎপত্তি ও প্রলয় বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রহ্মন্! এই স্থাবর-জঙ্গম জগৎ কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রলয়ের সময় এটি কোথায় লীন হয়ে যায়?'

দেবল বললেন—'দেবর্ষে! জগৎ সৃষ্টির সময় পরমাত্মা যার থেকে সমস্ত প্রাণ রচনা করেন, ভৌতিক বিজ্ঞানমনস্ক বিদ্বানেরা তাদের 'পঞ্চভূত' বলে থাকে। পরমাত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কাল এঁদের সাহায্যেই প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। যারা এছাড়া অন্য তত্ত্ব ভূতের উপাদান কারণ বলে থাকে, তারা নিঃসন্দেহে অসত্য কথন করে। নারদ! পঞ্চ ভূত এবং ষষ্ঠ কাল নিত্য অবিচল, অবিনাশী এবং তেজোময় মহত্তত্ত্বের স্বাভাবিক কলা। কোনো যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা এই দৃষ্টির অতিরিক্ত আর কোনো তত্ত্ব বলা সম্ভব নয়। তাই এই সম্পর্কে আর কেউ অন্য কথা বললে তার কথার কোনো মূল্য নেই। তুমি স্থির জেনে রাখো যে, এই ছটিই জগৎ রূপে স্থিত। পাঁচ মহাভূত, কাল এবং ভাব ও অভাব অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার এবং অজ্ঞান—এই আট তত্ত্বই নিত্য এবং এগুলিই সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। প্রাণীদের শরীর মৃত্তিকার বিকার, শ্রোত্রেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় আকাশ থেকে, নেত্রেন্দ্রিয় সূর্য থেকে, প্রাণ বায়ু থেকে এবং রক্ত জল থেকে। বিদ্বানদের মত হল যে, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বিষয় গ্রহণ করে। এই ইন্দ্রিয় পাঁচটির দেখা, শোনা, গন্ধ পাওয়া, আস্বাদন ও স্পর্শ করা—পাঁচটি গুণ আছে। কিন্তু এই পঞ্চ বিষয়াদির জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের হয় না, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব)ই এদের জানতে পারে। শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ, চিত্তের থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধির থেকেও ক্ষেত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জীব প্রথমে নিজ ইন্দ্রিয়দ্বারা তাদের পৃথক পৃথক বিষয়গুলি প্রকাশ করে, পরে মনের দ্বারা বিচার করে বুদ্ধিদ্বারা তার সিদ্ধান্ত করে। অধ্যাত্মচিন্তাকারী ব্যক্তি পাঁচ ইন্দ্রিয় এবং চিত্ত, মন ও বুদ্ধি—এই আটটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলেন।

হস্ত-পদ-পায়ু-উপস্থ ও মুখ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়।

এগুলির বিবরণ শোনো। মুখে অবস্থিত ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন কথা বলা ও আহার করার, পদ চলার, হস্ত কাজ করার, পায়ু এবং উপস্থ ত্যাগ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করে। এগুলি ব্যতীত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হল বল অর্থাৎ প্রাণ। আমি তোমাকে সকল ইন্দ্রিয় এবং তার জ্ঞান, কর্ম, গুণ জানালাম। নিজ নিজ কর্মে ক্লান্ত হয়ে ইন্দ্রিয়াদি যখন শ্রান্ত হয়ে যায়, তখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয়াদি নিবৃত্ত হলেও যদি মন নিবৃত্ত না হয়ে বিষয়াদি উপভোগ করতে থাকে, তাকে তখন স্বপ্নাবস্থা বলে বুঝতে হবে। জাগ্রত অবস্থাতে যা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাবে বজায় থাকে, সেগুলিরই ভোগপ্রদ কর্মের সাহায্যে স্বপ্নে অনুভূত হয়।

পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ-মন-চিত্ত ও বুদ্ধি—এই চোদ্দটি ইন্দ্রিয় এবং সত্ত্বাদি তিনগুণ—এই সতেরোটি তত্ত্ব স্বীকৃত। এর থেকে পৃথক অষ্টাদশতম হল জীব, যা শরীরে থাকে এবং নিত্য। যখন জীবের বিয়োগ হয়, তখন শরীর এবং তাতে অবস্থিত এই তত্ত্বও থাকে না। যেমন গৃহে বসবাসকারী পুরুষ একটি ঘর ভেঙে গেলে অন্য এক ঘরে, অন্য ঘরটিও ভাঙলে তৃতীয় ঘরে আশ্রয় নেয়, তেমনই এই জীবাত্মা কালের প্রেরণায় অবিদ্যা, কাম ও কর্মের দ্বারা এক দেহ থেকে অন্য দেহে যেতে থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেহের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত মনে করে, তাই দেহের বিয়োগে তারা দুঃখিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমানদের সিদ্ধান্ত আত্মার অসঙ্গতার বিষয়ে দৃঢ় থাকে, তাই তারা এতে দুঃখ পায় না। বাস্তবে এই জীব কখনো কারো কিছুই নয়। এ হল নিত্য এবং একাকী ; সুখ-দুঃখের কারণ হল দেহ। আত্মা কখনো উৎপন্ন হয় না এবং বিনষ্ট হয় না। যখন তার এই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন সে দেহ ধারণ থেকে মুক্তি পেয়ে পরমগতি লাভ করে। দেহ পুণ্য-পাপময়। কর্মক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এরও ক্ষয় হতে থাকে। এইভাবে শরীর ক্ষয় হলে জীবদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। পুণ্য-পাপের ক্ষয়ের জন্য আত্মজ্ঞানই সাধন। সেটি ক্ষয় হয়ে যখন জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই বিদ্বানেরা তাকে পরমগতি লাভ বলে থাকেন।

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! আমরা অত্যন্ত ক্রূর এবং পাপী। হায়! আমরা শুধু যশ ও অর্থের জন্য আমাদের ভাই, পিতা, পৌত্র, আত্মীয়, বন্ধু, পুত্রদের নিধন করেছি। আমাদের এই তৃষ্ণা কীভাবে দূর হবে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মাণ্ডব্য একবার রাজা জনককে এই রূপ প্রশ্নই করেছিলেন। তখন বিদেহরাজ যে কথা বলেছিলেন, আমি সেই প্রাচীন কথা তোমাকে বলছি। রাজা জনক বলেছিলেন, 'আমার কোনো কিছুই নেই, তাই আমি আনন্দে জীবন কাটাই। মিথিলপুরীতে আগুন লাগলেও আমার কিছুই পুড়ে যাবে না। যিনি বোধসম্পন্ন, তাঁর অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ও তুচ্ছ বলে মনে হয় ; কিন্তু অজ্ঞানীদের তুচ্ছ বিষয়ও মোহগ্রস্ত করে দেয়। ইহলোকে যে কামজনিত সুখ এবং পরলোকে যে দিব্য সুখ, এই দুটিই তৃষ্ণাক্ষয়ের উপরান্তে উদ্ভাসিত সুখের ষোড়শতম অংশেরও সমকক্ষ নয়। গোবৎসের শৃঙ্গের ন্যায় অর্থের সঙ্গে ভোগতৃষ্ণাও বৃদ্ধি পায়। অল্প বস্তুও নিজের ভাবলে, তার বিনাশ হলে তা দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। তাই কামনা বৃদ্ধি করা উচিত নয়। কামনার আসক্তিই হল দুঃখরূপ। কোনোভাবে অর্থপ্রাপ্তি হলে, তা ধর্মে নিয়োগ করা উচিত ; ভোগের সামগ্রী সংগ্রহে নয়। বিদ্বান ব্যক্তিরা অন্য প্রাণীদেরও নিজের মতো দেখেন। তাই তাঁরা কৃতকৃত্য এবং শুদ্ধচিত্ত হয়ে সমস্ত বস্তু ত্যাগ করেন। তাঁরা সত্য-অসত্য, হর্ষ-শোক, প্রিয়-অপ্রিয়, ভয়-অভয় ইত্যাদি দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে প্রকৃত শান্ত ও নির্বিকার হয়ে যান। দূষিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে বিষয়-তৃষ্ণা ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন, বৃদ্ধ হলেও তাদের এই তৃষ্ণা যায় না, এটি আজীবন থাকা রোগেরই মতো। সুতরাং এটি ত্যাগ করাতেই সুখ।'

রাজার এবংবিধ বচন শুনে মাণ্ডব্য মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর কথার প্রশংসা করে তিনি মোক্ষের জন্য তৎপর হলেন।

—০—

সন্ন্যাসীর স্বভাব, আচরণ এবং ধর্মের বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! প্রকৃতির অতীত যে পরব্রহ্ম অবিনাশী পরমধাম—কীরূপ স্বভাব, আচরণ, বিদ্যা ও কর্মে তৎপর পুরুষ তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! যে ব্যক্তি মোক্ষ ধর্মে তৎপর, স্বল্পাহারী ও জিতেন্দ্রিয় তিনি এই প্রকৃতির অতীত অবিনাশী পদ লাভ করেন। মুনির কর্তব্য হল গৃহ ত্যাগ করে লাভ-ক্ষতিতে সমান ভাব বজায় রাখা। নিজ অভীষ্ট পদার্থ পেলেও, তা উপেক্ষা করবে। কায়-মনো-বাক্যে কোনো বস্তু দূষিত করবে না, অর্থাৎ মন, বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা কারো প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না এবং কারো উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলবে না। কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেবে না, সূর্যের ন্যায় সর্বদা বিচরণ করবে এবং কখনো কারো সঙ্গে শত্রুতা করবে না। নিন্দা সহ্য করবে, কারো প্রতি অভিমান করবে না, কেউ ক্রোধ করলেও তাকে প্রিয় বাক্য এবং হিতবচন বলবে। গ্রামে থেকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে অনুকূল-প্রতিকূল ব্যবহার করবে না এবং ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন কারো ঘরে আগে থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে যাবে না। মূর্খেরা নানাভাবে বিরক্ত করলেও শান্ত থাকবে, কঠোর বাক্য বর্জন করবে। সর্বদা মৃদু ব্যবহার করবে, কারো প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবে না, উদ্বেগশূন্য থাকবে এবং অহংকারপূর্ণ কথা বলবে না। গৃহস্থের বাড়িতে যখন রান্না সমাপ্ত হয়ে সকলের আহার করা হয়ে যাবে, সেই সময় সন্ন্যাসীর ভিক্ষা চাওয়া উচিত। আহার কম পেলে বা না পেলে দুঃখী হবে না এবং যথেষ্ট আহার পেলেও প্রসন্ন হবে না। তুচ্ছ লৌকিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করবে না। যেখানে বিশেষ সমাদর লাভ হয়, সেখানে ভিক্ষা করবে না। এতদ্ব্যতীত সংকারবশত যদি আরও কিছু লাভ হওয়ার থাকে, তার থেকেও দূরে থাকবে। ভিক্ষালব্ধ অন্নের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। বিশ্রামের জন্য নির্জন-স্থানে থাকবে। শূন্য গৃহ, বৃক্ষতল, বনের মধ্যে বা গুহার ভেতর অজ্ঞাতভাবে থেকে আত্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকতে হয়। অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় অবিচল অবিনাশী সমস্বরূপ ব্রহ্মভাবে অবস্থিত থাকবে এবং নিজ কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত পাপ-পুণ্য ফলের চিন্তা করবে না। সর্বদা তৃপ্ত এবং পূর্ণত সন্তুষ্ট থাকবে, মন এবং ইন্দ্রিয় প্রসন্ন রাখবে, ভয়কে কাছে আসতে দেবে না, প্রণবাদি জপে তৎপর থাকবে ও বৈরাগ্যের আশ্রয় নিয়ে মৌন থাকবে। দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক পদার্থে অনাত্মদৃষ্টির অভ্যাস রাখবে, জীবের জন্ম-মৃত্যুর বিচার করবে, কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করবে না, সবার ওপর সমান স্নেহভাব রাখবে, আত্মলাভের জন্য প্রশান্তচিত্ত, মিতাহারী এবং জিতেন্দ্রিয় থাকবে। তপস্বীদের বাক্য, মন, ক্রোধ, হিংসা, উদর এবং উপস্থ—এগুলির বেগ বশে রাখা উচিত। যেখানে নিন্দা বা প্রশংসা হয়, সেখানে সমানভাবে থেকে তা থেকে উদাসীন থাকবে। এই প্রকার আচরণ সন্ন্যাস আশ্রমে অতি পবিত্র বলে মানা হয়।

সন্ন্যাসীদের উদার চিত্ত, সর্বপ্রকারে জিতেন্দ্রিয়, সর্বভাবে সঙ্গবর্জিত, সৌম্য, অনিকেত ও সমাহিতচিত্ত হওয়া উচিত। তার পূর্বাশ্রমের পরিচিত দেশে থাকা উচিত নয়। গৃহস্থ এবং বাণপ্রস্থীদের সংসর্গেও থাকা উচিত নয়। নিজ পছন্দ প্রকাশ না করে যে বস্তু পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং অভীষ্ট বস্তু পেলেও প্রসন্ন হওয়া উচিত নয়। সন্ন্যাস আশ্রম জ্ঞানীদের কাছে মোক্ষস্বরূপ কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিদের কাছে এটি শ্রমরূপ। হারীত মুনি এই সন্ন্যাস-ধর্মকে বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট মোক্ষ-প্রাপ্তির বিমান বলে জানিয়েছেন। যে ব্যক্তি সকলকে অভয়-দান করে গৃহত্যাগ করেন, তিনি তেজোময়লোক প্রাপ্ত হন এবং অজর-অমর হয়ে যান।

———○———

ব্রাহ্মী স্থিতির বর্ণনা কালে ভীষ্মের বৃত্রাসুরের কাহিনী বর্ণনা

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! সকলেই আমাকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় আমার থেকে বেশি দুঃখী আর কেউ নেই। প্রকৃতপক্ষে শরীর ধারণ করাই মহাদুঃখের। জানিনা এই দুঃখনাশক সন্ন্যাস আমরা কবে গ্রহণ করব ? জানিনা কবে এই রাজ্যপাট ছেড়ে বনে যেতে পারব ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! কোনো বস্তুই অনন্ত নয়, সবকিছুরই সীমা আছে। আসা-যাওয়াও কালের নিয়ম ; ইহলোকে কোনো কিছুই অবিচল নয়। তুমি যা মনে করছ তাও ঠিক নয় ; কারণ ঐশ্বর্যে যদি আসক্তি জন্মায় তবেই সেটি দোষের কারণ হয়। তোমরা তো ধর্মাত্মা, সুতরাং উপযুক্ত সময়ে (শমাদি) অভ্যাসের সাহায্যে মোক্ষপ্রাপ্ত করবে। জীব পাপ-পুণ্যের কারণেই সুখ-দুঃখ থেকে উৎপন্ন হওয়া তমোগুণেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু যখন জ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নষ্ট হয়, তখন সে সনাতন পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করে। রাজন্ ! এই বিষয়ে এক প্রাচীন কাহিনী আছে। ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হয়ে বৃত্রাসুর কীরূপ আচরণ করেছিলেন তাতে তা বলা হয়েছে। তুমি তা শোনো।

বৃত্রাসুরকে দেবতারা পরাস্ত করেছিলেন, তার রাজ্য অপহৃত হয়েছিল এবং তার কোনো সাহায্যকারী ছিল না ; তা সত্ত্বেও তিনি শুধুমাত্র রাগ-দ্বেষ শূন্য বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে শত্রুদের মধ্যে নিশ্চিন্তে থাকতেন। তাঁর সেই ঐশ্বর্যহীন অবস্থা দেখে শুক্রাচার্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'দানবরাজ ! তোমাকে দেবতারা পরাজিত করেছে, তবুও তোমার মনে কোনো দুঃখ আছে বলে মনে হয় না, এর কারণ কী ?'

বৃত্রাসুর বললেন—ব্রহ্মন্ ! আমি সত্য ও তপের প্রভাবে জীবদের জন্মমৃত্যু রহস্য সঠিকভাবে যে অনুধাবন করেছি, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই এসব বিষয়ে আমার আনন্দ বা দুঃখ হয় না। জীব কালের অধীন হয়ে পাপবশত নরকে পতিত হয় এবং কেউ আবার নিজ পুণ্যের প্রভাবে দিব্যলোকে গিয়ে আনন্দে থাকে। এইভাবে নিজ পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে অবশিষ্ট কর্মের ফলভোগ করার জন্য তাকে বারংবার জন্মাতে ও মরতে হয়। কামনা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বহু জীব নরকে পতিত হয় এবং ক্রমে বিবশ হয়ে পশু-পক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। আমি এইভাবে জীবকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়তে দেখেছি। শাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত হল যে, যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনই ফল পায়। এইভাবে সমস্ত জগৎ ভগবানের কালের নিয়মানুসারে আবর্তিত হয়।

তাঁকে এরূপ কথা বলতে দেখে শুক্রাচার্য বললেন—'তুমি তো অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাহলে অসুরভাবনাশকারী এরূপ বাক্য বলছ কেন ?'

বৃত্রাসুর বললেন—ব্রহ্মন্ ! আপনি এবং অন্যান্য মহামতি মহানুভবরা তো নিশ্চয়ই জানেন যে আমি আগে বিজয়লাভের জন্য অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলাম। সেইসময় তপের প্রভাবে আমি ত্রিলোকে সবার থেকে বড় হয়ে উঠেছিলাম এবং অন্যের থেকে বহু ভোগসামগ্রী জয় করে নিয়েছিলাম। আমি সর্বদা নির্ভয়ে আকাশে বিচরণ করতাম, জগতের কোনো প্রাণী আমাকে পরাজিত করতে পারত না। এইভাবে আমি যে ঐশ্বর্য আহরণ করেছিলাম, নিজ কর্ম দোষে সেসবই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি শান্ত চিত্তে আছি, সেসব আর চিন্তা করি না। আমি যখন দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম, সেইসময় তাঁর সাহায্যে আসা ভগবান শ্রীহরিকে আমি দর্শন করেছি। সেই প্রভু নারায়ণ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষ, অনন্ত, শুক্ল, বিষ্ণু, সনাতন, মুঞ্জকেশ, হরিপ্রভু এবং সমস্ত ভূতের পিতামহস্বরূপ। ভগবন্ ! আমার তপস্যার কিছু অংশ অবশ্যই এখনও অবশিষ্ট আছে, তাই আমি আপনার কাছে কর্মফলের বিষয়ে প্রশ্ন করার ইচ্ছা করি। কৃপা করে বলুন কোন্ উত্তম ফল লাভ করে জীব অজর-অমর হয়ে যায় এবং কোন্ কর্ম এবং জ্ঞানের সাহায্যে তা প্রাপ্তি হয় ?

শুক্রাচার্য এবং বৃত্রাসুর যখন এইসব আলোচনা করছিলেন, তখন সেখানে মহামুনি সনৎকুমার ভ্রাতাগণ তাঁর সংশয় দূর করার জন্য পদার্পণ করলেন। শুক্রাচার্য এবং দানবরাজ বৃত্র তাঁকে পূজা করলে তাঁরা সুদৃশ্য আসনে উপবেশন করলেন। তাঁরা আরামে উপবেশন করলে মহর্ষি

শুক্র বললেন—'ঋষিবর ! কৃপা করে এই দানবরাজকে ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বলুন।' তা শুনে শ্রীসনৎকুমার বললেন—'দেবপ্রবর ! ভগবান বিষ্ণুর উত্তম মাহাত্ম্য শুনুন। দেখুন, এই সমস্ত বিশ্ব তাতেই অবস্থিত। তিনিই সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই প্রলয়কালে এদের সংহার করেন এবং কল্পান্তরের প্রারম্ভে তিনিই পুনরায় প্রাণী সৃষ্টি করেন। সমস্ত প্রাণী তাঁতেই লীন হয় এবং তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়। তাঁকে যজ্ঞদ্বারা অথবা শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা কেউই লাভ করতে সক্ষম হয় না। তাঁকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-সংযমদ্বারাই লাভ করা সম্ভব। যে ব্যক্তি বাহ্য ও আভ্যন্তর কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে বুদ্ধির দ্বারা (নিষ্কামভাবে) মনকে শুদ্ধ করে, সে অনন্ত সুখ লাভ করে। কর্মের দ্বারা জীবের শুদ্ধি বহু জন্মে লাভ হয়। কিন্তু কোনো কোনো জীব মহাপ্রচেষ্টার দ্বারা একই জন্মে শুদ্ধ হয়ে যায়। ভগবান নারায়ণ অনাদি, অনন্ত এবং তিনিই সমস্ত চরাচরের প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি বিশ্বের সংহারকারী, সকলের নিয়ামক এবং শুদ্ধ চিৎরূপ। তিনিই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ক্ষর ও অক্ষর রূপে বিরাজ করেন। পৃথিবী তাঁর চরণ, স্বর্গলোক মস্তক, দিক-বিদিক হস্ত, আকাশ কান, সূর্য নেত্র, চন্দ্র মন, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি এবং জল রসনেন্দ্রিয়। সমস্ত গ্রহ তাঁর ভ্রূমধ্যে স্থিত এবং তাঁর তেজের দ্বারা নক্ষত্রসমূহ প্রকটিত। সত্ত্ব, রজঃ, তম—তিনটি গুণই নারায়ণস্বরূপ। সমস্ত আশ্রমের এবং জপাদি কর্মের ফলও তিনি এবং এই অব্যয় পরমাত্মাই কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের ফল। বেদমন্ত্র তাঁর রোম, প্রণব তাঁর বাণী এবং অনেক বর্ণ এবং আশ্রম তাঁর আশ্রয়। তিনি বহু মুখবিশিষ্ট। তিনিই হৃদয়ে আশ্রিত ধর্ম, আত্মদর্শনরূপ পরম ধর্ম, তপ এবং সৎ-অসৎ-স্বরূপ ; তিনিই শ্রুতি, শাস্ত্র, যজ্ঞপাত্র এবং ষোড়শ ঋত্বিক, তিনিই প্রজাপতি, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম ও কুবের। যখন মানুষের জ্ঞানচক্ষু খোলে, তখনই তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়। জগতের উৎপত্তি থেকে প্রলয় পর্যন্ত একটি কল্প হয়। এরূপ কোটি কোটি কল্প পর্যন্ত জীব জন্মায় ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। জীব অজ্ঞানতাবশত নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে। এইভাবে নিত্য শুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্মানুসন্ধান করে জীব সেই শুদ্ধচিন্মাত্রভাবরূপ পরমগতি লাভ করে এবং তার দ্বারা সেই অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়, যা সনাতন ব্রহ্ম এবং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। মহাবলী দৈত্যরাজ ! আমি তোমাকে নারায়ণের প্রভাব শোনালাম।'

বৃত্রাসুর বললেন—ভগবন্ ! আপনার কথা অত্যন্ত সময়োচিত বলে মনে হচ্ছে। এখন আমার আর কোনো দুঃখ নেই। আপনার কথা শুনে আমি শোক ও পাপরহিত হয়েছি। মহর্ষে ! অনন্ত ও মহাতেজস্বী বিষ্ণুরই প্রবল চক্র আবর্তিত হচ্ছে। সনাতন স্থান থেকেই সমস্ত সৃষ্টি প্রবৃত্ত হচ্ছে। তিনিই পরমাত্মা ও পুরুষোত্তম এবং তাঁতেই সমস্ত জগৎ অবস্থিত।

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সনৎ-কুমার বৃত্রাসুরের কাছে যাঁর কথা বললেন, তিনি ভগবান বিষ্ণু এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তো ?

ভীষ্ম বললেন—মূলে স্থিত যে ভগবান দেবাদিদেব, তিনি নিজ স্বরূপে স্থিত হয়েই নিজ শক্তিদ্বারা বহু প্রকার পদার্থ সৃষ্টি করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অষ্টমাংশে উৎপন্ন বলে জেনো। সেই অষ্টমাংশের দ্বারাই তিনি ত্রিলোক রচনা করেন। এই অবিনাশী ভগবান মহান শক্তিমান এবং সকলের অধীশ্বর। কল্পের শেষে তিনি জলের ওপর শয়ন করেন। এই সনাতন এবং অনন্ত পরমাত্মা নিজ সত্তাস্ফূর্তির দ্বারাই সমস্ত কার্য-কারণ সম্পূর্ণ করেন এবং সর্বদা একরস হয়েও শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে বিচরণ করেন ; কিন্তু এই স্বরূপেও তিনি উপাধিদ্বারা আবদ্ধ নন এবং নিজের মধ্যে স্থিত এই নানাপ্রকার সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেন।

ইন্দ্র দ্বারা বৃত্রাসুর বধের প্রসঙ্গ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! অতুলনীয় তেজস্বী বৃত্রাসুরের ধর্মনিষ্ঠা ধন্য এবং তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান তথা বিষ্ণুভক্তিও ধন্যবাদের যোগ্য। ভরত শ্রেষ্ঠ ! এরূপ প্রভাবশালী বৃত্রকে ইন্দ্র কীভাবে বধ করেছিলেন এবং তাঁদের যুদ্ধ কীভাবে হয়েছিল—সেই প্রসঙ্গ শোনার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে, কৃপা করে তা বিস্তারিতভাবে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! অনেকদিন আগের কথা, দেবরাজ ইন্দ্র রথে করে দেবতাদের নিয়ে বৃত্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রওনা হলেন। তাঁরা দেখলেন তাঁদের সামনে পর্বতের ন্যায় বিশালকায় বৃত্রাসুর দণ্ডায়মান। তিনি পাঁচ শত যোজন উচ্চ এবং তিন শত যোজন চওড়া। বৃত্রাসুরের সেই বিশাল দেহ দেখে, যা ত্রিলোকের কাছে দুর্জয় ছিল, দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলেন। শেষে যুদ্ধ বেধে গেল এবং দুই পক্ষে রণবাদ্যের ভীষণ আওয়াজ হতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের তুমুল সংগ্রাম হচ্ছিল। সমস্ত ভূমণ্ডল দেবতা ও অসুরের সেনাদের নানাপ্রকার দিব্য অস্ত্রশস্ত্রে গর্জে উঠল। সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখার জন্য ব্রহ্মা এবং অন্য সব দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব সকলেই নিজ নিজ বিমানে সেখানে উপস্থিত হলেন।

ধর্মাত্মা বৃত্র আকাশে উঠে ইন্দ্রের ওপর পাথর বর্ষণ করতে লাগলেন। দেবতারা তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁরা চারদিক থেকে বাণবর্ষণ করে বৃত্রের পাথর নিক্ষেপ করা বন্ধ করলেন ; কিন্তু মহাবলী বৃত্র ছিলেন অত্যন্ত মায়াবী। তিনি মায়া যুদ্ধের দ্বারা ইন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করলেন, ইন্দ্র মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন বশিষ্ঠ ঋষি রথন্তর সামদ্বারা তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন, তিনি বললেন—'দেবরাজ ! তুমি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দৈত্য ও অসুরদের সংহারকএবং ত্রিলোকের বলসম্পন্ন। তাহলে এত বিষাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন ? দেখো, তোমার সামনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, সূর্য এবং সকল মহর্ষি দণ্ডায়মান আছেন ; সুতরাং তুমি নির্ভয়ে শত্রু সংহার করো।'

ভীষ্ম বললেন—মহাত্মা বশিষ্ঠের কথা শুনে ইন্দ্রের দেহে শক্তির সঞ্চার হল। তিনি মহাযোগসম্পন্ন হয়ে বৃত্রের সমস্ত মায়া বিনাশ করলেন। তখন বৃহস্পতি এবং অন্য মহর্ষিগণ বৃত্রাসুরের পরাক্রম দেখে মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে বিনাশ করার জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন জগৎপতি ভগবান শংকরের তেজ ভীষণতাপ রূপে বৃত্রাসুরের শরীরে প্রবেশ করল এবং বিশ্বত্রাতা ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের বজ্রে অবস্থিত হলেন। তারপর মহামতি বৃহস্পতি, পরম তেজস্বী বশিষ্ঠ এবং অন্য সব মহর্ষিগণ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে একত্রে বলতে লাগলেন, 'দেবরাজ ! বৃত্রকে বধ করুন।' মহাদেব বললেন—'দেবেশ্বর ! বৃত্রাসুর বলপ্রাপ্তির জন্য ষাট হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছে, তাই ব্রহ্মা তাকে বরপ্রদান করেছেন। তিনি বৃত্রকে যোগীর মতো শক্তি, অদ্ভুত মায়াশক্তি, মহা পরাক্রম এবং বিচিত্র তেজ প্রদান করেছেন। দেখো, এখন আমার তেজ তার দেহে প্রবেশ করছে। এখন বৃত্রাসুর (তাপের জন্য) অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে রয়েছে, এখনই তুমি বজ্রের দ্বারা ওকে সংহার করো।' ইন্দ্র বললেন—'প্রভু ! আপনার কৃপাতেই আমি আপনার উপস্থিতিতে এই দুর্জয় দৈত্যকে হত্যা করব।'

রাজন্ ! বৃত্রাসুরের দেহে যখন তাপ প্রবেশ করল, তখন দেবতা ও ঋষিরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। এদিকে তীব্র জ্বরে আক্রান্ত দৈত্যাসুর বৃত্র হাই তুলতে তুলতে প্রচণ্ড জোরে গর্জন করে উঠলেন, সেই সময়ই ইন্দ্র তাঁর ওপর বজ্র নিক্ষেপ করলেন। সেই কালাগ্নিসম পরম তেজস্বী বজ্র বৃত্রকে তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত করল। দেবতারা চতুর্দিক থেকে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। বৃত্রকে মৃত দেখে পরমযশস্বী ইন্দ্র বিষ্ণুতেজে ব্যাপ্ত বজ্রকে নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করলেন।

কুরুশ্রেষ্ঠ ! তখন বৃত্রের মৃতদেহ থেকে মহাভয়াবহ

ব্রহ্মহত্যা নির্গত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসন্ধান করতে লাগল। দেবরাজ তখন স্বর্গের দিকে যাচ্ছিলেন, ব্রহ্মহত্যা তাঁর দেহে প্রবেশ করল। ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ইন্দ্র কমলনালে প্রবেশ করে বহু বছর সেখানেই লুকিয়ে থাকলেন। ইন্দ্র তাঁকে দূর করার বহু চেষ্টা করলেও তাকে ছাড়াতে পারলেন না। তখন তিনি পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে মাথানত করে প্রণাম জানালেন। ব্রহ্মা মধুর বাক্যে ব্রহ্মহত্যাকে শান্ত করে বললেন—'কল্যাণী! ইনি দেবরাজ, তুমি এঁকে মুক্তি দাও। তুমি আমার এই প্রিয় কাজটি করো এবং বলো আমি তোমার জন্য কী করতে পারি, তুমি কী চাও ?'

ব্রহ্মহত্যা বলল—আপনি ত্রিলোকের প্রভু এবং সম্মানিত। আপনি প্রসন্ন থাকলে আমি মনে করি আমার সর্ব কামনাই পূর্ণ হয়েছে। আপনিই ত্রিলোক রক্ষার নিমিত্ত ধর্ম মর্যাদা স্থাপন করেছেন। আপনিই নিয়ম করেছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বধ করবে তাকে ব্রহ্মহত্যা স্পর্শ করবে ; কিন্তু এখন যদি আপনি চান তাহলে আমি ইন্দ্রকে মুক্তি দিচ্ছি। আপনি আমাকে অন্য কোনো স্থান বলে দিন।

ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যাকে বললেন—'ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য স্থান ঠিক করছি।' তারপর তিনি কোনোভাবে ব্রহ্মহত্যাকে ইন্দ্র হতে সরিয়ে দিলেন। তখন ব্রহ্মা স্মরণ করতেই অগ্নিদেব সেখানে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্ ! আমার প্রতি কী আদেশ ?' ব্রহ্মা বললেন—'আমি ইন্দ্রকে পাপমুক্ত করার জন্য এই ব্রহ্মহত্যাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি, তার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ তুমি গ্রহণ করো।' অগ্নি বললেন—'প্রভো ! আপনার আদেশ শিরোধার্য, কিন্তু আমি এই পাপ থেকে কীভাবে নিবৃত্ত হব—তা জানতে চাই।' ব্রহ্মা বললেন—'অগ্নে ! কোনো স্থানে প্রজ্বলিত অবস্থায় কোনো পুরুষ যদি অজ্ঞতাবশত তোমার কাছে এসে বীজ, ওষধি ইত্যাদি দ্বারা তোমায় পূজা না করে তাহলে তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপ তাকে স্পর্শ করবে।' ব্রহ্মা একথা বলায় অগ্নি তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং ব্রহ্মহত্যার এক-চতুর্থাংশ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করল।

এরপরে পিতামহ বৃক্ষ, তৃণ এবং ঔষধিদের ডেকে তাদেরও এই কথা বললেন। তারা একথা শুনে বলল—'ত্রিলোকীনাথ ! আপনার আদেশে আমরা ব্রহ্মহত্যার এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করব, কিন্তু আপনি আমাদের এর থেকে মুক্তি পাবার উপায়ও বলে দিন।' ব্রহ্মা বললেন—'যে ব্যক্তি পুণ্যতিথিতে বৃক্ষাদি ছেদন করবে, ব্রহ্মহত্যা তাকে স্পর্শ করবে।' তখন বৃক্ষাদি তাঁর নির্দেশ মেনে নিল এবং ব্রহ্মাকে পূজা করে নিজ নিজ স্থানে গমন করল।

তারপর ব্রহ্মা অপ্সরাদের ডেকে মিষ্ট বাক্যে তাঁদের বললেন—'সুন্দরীগণ ! এই ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের কাছে এসেছিল, এর এক-চতুর্থাংশ তোমরা গ্রহণ করো।' অপ্সরারা বললেন—'দেবেশ্বর ! আপনার আদেশে আমরা একে গ্রহণ করতে সম্মত আছি ; কিন্তু এর থেকে আমাদের মুক্তির সময়ও কৃপা করে ঠিক করুন।' ব্রহ্মা বললেন—'তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, যে ব্যক্তি রজস্বলা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবে, এ তার কাছে চলে যাবে।' তখন অপ্সরারা ব্রহ্মার নির্দেশ শিরোধার্য করে নিজ স্থানে চলে গেলেন।

তারপর লোকবিধাতা ব্রহ্মা মনে মনে জলের সংকল্প করলেন। জলদেবতা সত্বর সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন—'প্রভো ! আমি এসেছি, বলুন, আমার প্রতি কী আদেশ ?' ব্রহ্মা বললেন—'দেখো, এই ব্রহ্মহত্যা বৃত্রের দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ইন্দ্রের কাছে এসেছে। আমার আদেশে এর এক-চতুর্থাংশ তুমি গ্রহণ করো।' জলদেবতা বললেন—'লোকেশ্বর ! আপনার আদেশ মেনে নিতে আমি রাজি আছি ; কিন্তু এর থেকে উদ্ধার লাভের উপায় আপনি বলে দিন।' ব্রহ্মা বললেন—'যে নির্বুদ্ধ ব্যক্তি জলে থুতু-কফ বা মল-মূত্র ফেলবে, ব্রহ্মহত্যা তোমাকে পরিত্যাগ করে তার কাছে গিয়ে বাস করবে।'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এইভাবে ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে ছেড়ে ব্রহ্মার নির্দেশিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলে গেল। তারপর ব্রহ্মার নির্দেশে ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। মহারাজ ! দেবরাজ শক্র (ইন্দ্র) সূক্ষ্মবুদ্ধির সাহায্যে বৃত্রাসুরকে বধ করেন। যারা পুণ্যতিথিতে ব্রাহ্মণসভায় এই দিব্য কথা শোনাবেন তাঁদের কোনোরূপ পাপ হবে না। আমি তোমাকে বৃত্রাসুর প্রসঙ্গে ইন্দ্রের অদ্ভুত চরিত্র শোনালাম। এবার বলো তুমি আর কী শুনতে চাও ?

———০———

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—বৈশম্পায়ন ! বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ কীভাবে নষ্ট হয়েছিল ? শোনা যায় দেবী পার্বতীকে ব্যথিতমনা জেনে ভগবান শংকর দক্ষের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তারপর দক্ষ কীভাবে তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর যজ্ঞ পূর্ণ করেন ? আমি সেই প্রসঙ্গ জানতে চাই, আপনি কৃপা করে আমাকে সঠিক ঘটনা বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! অনেক দিনের কথা, হিমালয়ের কাছে গঙ্গাদ্বারে, যেখানে ঋষি এবং সিদ্ধদের নিবাস, সেইখানে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাদ্বারা স্থানটি সুশোভিত ছিল। ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দক্ষ সেখানে ঋষিদের মণ্ডলীতে বসে ছিলেন। সেইসময় পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গলোক নিবাসী মানুষেরা এবং দেবতাগণ হাতজোড় করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। দানব, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু, বিশ্ববসু, বিশ্বসেন আদি গন্ধর্বগণ, সমস্ত অপ্সরা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণের সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবতা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য পদার্পণ করেছিলেন। সোমপা-আজ্যপা প্রমুখ পিতৃপুরুষগণ, ঋষি এবং ব্রহ্মাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁরা ছাড়াও জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—চার প্রকারের জীবই সেখানে নিমন্ত্রিত ছিল। দেবতারা তাঁদের স্ত্রীসহ বিমানে পরিভ্রমণকালে অগ্নির ন্যায় শোভাপূর্ণ পরিলক্ষিত হচ্ছিলেন।

মহামুনি দধীচিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখলেন দেবতা-দানব সকলেই সেখানে উপস্থিত, কিন্তু ভগবান শংকরকে দেখা যাচ্ছে না ; মনে হয়, তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়নি—এই কথা ভেবে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'সজ্জনগণ ! যেখানে ভগবান শিবের পূজা হয় না, তা যজ্ঞ নয়, ধর্মও নয়। (তাই এই যজ্ঞকে যজ্ঞ বলা যায় না।) এতে ভয়ংকর পরিণাম হবার সম্ভাবনা ; কিন্তু মোহবশত কেউ তা লক্ষ্য করছে না।' এই বলে মহাযোগী দধীচি ধ্যানাবিষ্ট হয়ে ভগবান শংকর এবং বরদায়িনী দেবী পার্বতীকে দর্শন করলেন ; তাঁদের কাছেই দেবর্ষি

নারদকেও দেখা গেল। তাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

তারপর দধীচি ভাবলেন যে এরা সকলেই একমত হয়ে মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেননি—ধ্যানে এই কথা মনে হতেই তিনি যজ্ঞশালা থেকে দূরে সরে গিয়ে বলতে লাগলেন—'যারা পূজনীয় ব্যক্তির পূজা না করে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাদের নরকগামী হতে হয়। আমি আজ পর্যন্ত কখনো মিথ্যা বলিনি, পরেও বলব না। এইসকল দেবতা এবং ঋষিদের আমি জানাচ্ছি যে, ভগবান শংকর সম্পূর্ণ জগতের প্রাণকর্তা, সমস্ত জীবের রক্ষক এবং প্রভু ! দেখো তিনি এই যজ্ঞে অগ্রভোক্তারূপে উপস্থিত হবেন। আমি জানি, সকলের পরামর্শেই তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়নি, কিন্তু আমার মনে হয় ভগবান শংকরের থেকে কোনো দেবতাই বড় নয়। যদি তা সত্য হয়, তাহলে দক্ষের এই বিশাল যজ্ঞ ধ্বংস হবে।'

দক্ষ বললেন—মহর্ষে ! দেখুন, শাস্ত্রমতে মন্ত্রদ্বারা পবিত্র করা এই হবি সুবর্ণ পাত্রে রাখা হয়েছে, আমি এটি ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করব, যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনিই প্রভু (সক্ষম), বিভু (ব্যাপক) এবং আহ্বনীয় (যজ্ঞ ভাগ সমর্পণ করার জন্য যোগ্য)।

(অন্যদিকে কৈলাশে) দেবী পার্বতী অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে ভগবান শংকরকে বলছিলেন—'ওঃ ! আমি কী দান, ব্রত বা তপস্যা করব, যাতে আমার পতিদেব অর্ধেক বা এক-

তৃতীয়াংশ ভাগ পেতে পারেন।'

পত্নীকে ক্ষোভভরে এই কথা বলতে শুনে ভগবান শংকর প্রসন্ন হয়ে বললেন—'দেবী ! আমি সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর। আমার বিষয়ে কী মনে করা উচিত, তা তুমি জান না। যাদের চিত্ত একাগ্র নয়, যেসব ব্যক্তি অসাধু, তাদের আমার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না। এখন ইন্দ্রাদি দেবতাসহ ত্রিলোকের বাসিন্দা মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন। যজ্ঞে আমারই স্তুতি করা হয়, সামগান করা ব্রাহ্মণগণ রথন্তর সামরূপে আমার মহিমাই গান করেন। বেদজ্ঞ ব্যক্তি আমারই যজনা করেন এবং ঋত্বিকগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবেশ্বরী ! এসব আমি আত্মপ্রশংসা করার জন্য বলছি না। দেখো যার জন্য তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ, সেই যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য এক পুরুষকে আমি উৎপন্ন করছি।'

প্রাণাধিক প্রিয় উমাকে এই কথা বলে ভগবান মহেশ্বর তাঁর মুখগহ্বর থেকে এক ভয়ংকর ভূত প্রকটিত করলেন, যাকে দেখলেই ভয়ে রোমাঞ্চ হয়। তখন মহেশ্বর তাঁকে দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করার আদেশ দিলেন। সেই সিংহতুল্য পরাক্রমশালী পুরুষ পার্বতীর ক্রোধ শান্ত করার জন্য খেলাচ্ছলে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করে দিলেন। সেই সময় ভবানীর ক্রোধ থেকে প্রকটিত ভয়ংকর আকারসম্পন্ন মহাকালীও অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন।

সেই পুরুষটির নাম বীরভদ্র, তাঁর শৌর্য, বল এবং রূপ ভগবান শংকরের মতোই ছিল। তিনি ছিলেন মূর্তিমান

ক্রোধস্বরূপ, তাঁর বল, বীর্য ও পরাক্রম ছিল অপরিসীম। যজ্ঞ ধ্বংস করার আদেশপ্রাপ্ত হওয়ামাত্র সর্বপ্রথমে ভগবান শংকরকে প্রণাম করলেন, তারপর নিজ শরীরের লোমকূপ থেকে 'রৌম্য' নামক অনুচরদের উৎপন্ন করলেন, তারা ছিল রুদ্রের মতো ভয়ংকর, শক্তিশালী এবং পরাক্রমী। এই মহাকায় বীরগণ শত শত হাজার হাজার দল সৃষ্টি করে তীব্র বেগে যজ্ঞ-ধ্বংস করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের হট্টগোলে আকাশ কম্পিত হতে লাগল। তাদের মহাকোলাহল শুনে দেবতারা কম্পিত হলেন, পর্বতগুলি টুকরো টুকরো হয়ে গেল, ধরিত্রী কেঁপে উঠল এবং সমুদ্রে তুফান উঠল। শুধু তাই নয় সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র তাদের দীপ্তি হারাল। চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল! দেবতা, ঋষি, মানুষ সকলেই ভূমিতে লুকিয়ে পড়লেন, কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না।

দক্ষের দ্বারা অপমানিত হয়ে ভূতেরা কুপিত হয়ে উঠল। তারা প্রথমেই যজ্ঞশালায় আগুন লাগিয়ে দিল। কেউ আবার নানাভাবে আঘাত করতে লাগল। কেউ জিনিসপত্র উপড়ে ফেলতে লাগল ; আরও অনেকে যজ্ঞ সামগ্রী নষ্ট করতে লাগল। কেউ বাসনপত্র ভাঙতে থাকল আবার কেউ অলংকারাদি ভেঙে ফেলতে লাগল। সমস্ত যজ্ঞের জিনিস-পত্র এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। দুধের নদী বইতে লাগল, মিষ্টদ্রব্যাদি বালির মতো ছড়িয়ে গেল। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে সবই ভয়ংকর রুদ্রেরা নানাভাবে ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করতে লাগল। দেবতাদের ভীত ও উদ্বিগ্ন করে তারা বহু প্রকার ভয়ংকর তামাশা করতে লাগল।

এইভাবে ভয়ানক কর্মকাণ্ডদ্বারা বীরভদ্র সেই যজ্ঞকে সর্বভাবে বিনষ্ট করে দিল। তারপর সে সবপ্রাণীকে ভয় দেখিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং প্রজাপতি দক্ষ হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে ?' বীরভদ্র বলল, 'আমরা শিব ও পার্বতী নই, আমার নাম বীরভদ্র । আমি ভগবান রুদ্রের কোপ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আর এ হল ভদ্রকালী ; ভগবতী উমার ক্রোধ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। দেবাদিদেব শংকরের আদেশে আমরা দুজনে এই যজ্ঞ বিনাশ করার জন্য এখানে এসেছি। বিপ্রবর ! তুমি উমানাথ ভগবান শিবের শরণ গ্রহণ করো ; কারণ তাঁর ক্রোধ বরদানের থেকেও উত্তম।'

বীরভদ্রের কথা শুনে ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দক্ষ ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে স্তুতি করতে লাগলেন—'যিনি সমস্ত জগতের শাসক, পালক, মহৎ আত্মা, নিত্য, অবিকারী এবং সনাতন দেবতা, আমি সেই মহাদেবের শরণ গ্রহণ করছি।'

দক্ষ এই কথা বলতেই সহস্র সূর্যের ন্যায় তেজ ধারণকারী দেবদেবেশ্বর ভগবান শিব হঠাৎ অগ্নিকুণ্ড থেকে আবির্ভূত হয়ে সহাস্য বদনে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! বল, তোমার কী প্রিয়কাজ আমি করব ?' সেই সময় দেবগুরু বৃহস্পতি বেদ উচ্চারণ করে ভগবানের স্তুতি করলেন। তারপর প্রজাপতি দক্ষ দুই নেত্রে জলপূর্ণ অবস্থায় ভয় ও শঙ্কায় বললেন—'মহেশ্বর ! যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং আমাকে দয়ার পাত্র মনে করে বরপ্রদান করতে চান, তাহলে আমি বহুদিন ধরে পরিশ্রম করে যে যজ্ঞসামগ্রী জোগাড় করেছিলাম, যা আপনার অনুচরেরা নষ্ট করে দিয়েছে, সেগুলি যাতে বৃথা না যায় এবং তার দ্বারা যাতে এই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়—কৃপা করে তাই করুন।'

ভগবান 'তথাস্তু' বলে দক্ষের অনুরোধ মেনে নিলেন।

প্রজাপতি দক্ষের ভগবান শিবের স্তুতি

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর, প্রজাপতি দক্ষ ভগবান শংকরের কাছে নতজানু হয়ে বহু নামে তাঁর স্তুতি করলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তাত ! যে নামে দক্ষ ভগবান শিবের স্তব করলেন, আমার সেগুলি শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে, কৃপা করে আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! অদ্ভুত পরাক্রমশালী দেবাদিদেব শিবের প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ সর্বপ্রকার নাম বলছি, শোনো।

(দক্ষ বললেন)—দেবদেবেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। আপনি দেবশত্রু দানব সেনাদের সংহারক এবং দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তিকে বর্ধিত করে থাকেন। দেবতা ও দানব সকলেই আপনার পূজা করে। আপনি সহস্র নেত্রযুক্ত হওয়ায় আপনি সহস্রাক্ষ। আপনার ইন্দ্রিয়াদি সব থেকে বিলক্ষণ অর্থাৎ পরোক্ষ বিষয়ও গ্রহণ করে থাকে, তাই আপনাকে বিরূপাক্ষ বলা হয়। আপনি ত্রিনেত্রধারী হওয়ায় আপনাকে ত্র্যক্ষ বলা হয়। যক্ষরাজ কুবেরেরও আপনি প্রিয় (ইষ্টদেব)। আপনার হাত ও পা সর্বদিকে, সর্বদিকে চক্ষু, মুখ ও মস্তক এবং কানও সর্বদিকে। জগতে যা কিছু আছে, আপনি সব কিছু ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ এবং পাণিকর্ণ—এই সাতজন পার্ষদ আপনারই স্বরূপ—এদের সকলের রূপে আপনাকে বন্দনা করি। আপনার শত শত উদর, শতশত আবর্ত এবং শত শত জিহ্বা তাই আপনি শতোদর, শতাবর্ত এবং শতজিহ্ব নামে প্রসিদ্ধ ; আপনাকে প্রণাম। গায়ত্রী জপ করেন যাঁরা, তাঁরা আপনার মহিমাই গান করে থাকেন এবং সূর্যোপাসকগণ সূর্যের রূপে আপনারই আরাধনা করেন। মুনিগণ আপনাকে ব্রহ্মাস্বরূপ বলেন এবং যাজ্ঞিকেরা আপনাকেই ইন্দ্র বলেই মানেন। জ্ঞানী মহাত্মাগণ আপনাকে জগতের অতীত এবং আকাশের মতো ব্যাপক বলে মনে করেন। সমুদ্র ও আকাশের ন্যায় মহৎস্বরূপ ধারণকারী মহেশ্বর। গোশালাতে যেমন গোমাতারা বাস করে তেমনই আপনার ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এবং যজমানরূপ আট মূর্তির মধ্যে সমস্ত দেবতার বাস। আমি আপনার দেহে চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, সূর্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং বৃহস্পতিকেও দেখতে পাচ্ছি। আপনিই কার্য, কারণ, প্রযত্ন এবং করণরূপ। সৎ ও অসৎ পদার্থ আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়ে আপনাতেই লীন হয়ে যায়।

আপনি সকলের উৎপত্তির কারণ হওয়ায় ভব, সংহারকারী হওয়ায় শর্ব, রু অর্থাৎ পাপ দূর করায় রুদ্র, বরদাতা হওয়ায় বরদ এবং পশুদের (জীবদের) পালক হওয়ায় পশুপতি নামে খ্যাত। আপনি অন্ধকাসুরকে বধ করেছেন, তাই আপনাকে অন্ধকঘাতী বলা হয় ; আপনাকে বারংবার নমস্কার জানাই। আপনি তিনটি জটা ও তিনটি মস্তক ধারণ করেন, আপনার হাতে ত্রিশূল শোভা পাচ্ছে। আপনি ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্রধারী এবং ত্রিপুরবিনাশক ; আপনাকে প্রণাম। ক্রোধবশত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করায় আপনার নাম চণ্ড। আপনার উদরে সমগ্র জগৎ এমনভাবে অবস্থিত যেন কুণ্ডে জল, তাই আপনাকে কুণ্ড বলা হয়। আপনি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডধারণকারী এবং দণ্ডধারী। সমকর্ণ অর্থাৎ সকলকে আপনি সমানভাবে শোনেন। দণ্ড

ধারণকারী মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীগণ আপনারই স্বরূপ। আপনাকে প্রণাম করি। আপনি বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, আপনিই জগৎ রূপে বিস্তৃত। রজোগুণ আপন করায় 'বিলোহিত' এবং তমোগুণের আশ্রয় নেওয়াতে আপনাকে 'ধূম্র' বলা হয়। আপনার গ্রীবায় নীল রঙয়ের চিহ্ন থাকায় আপনাকে নীলগ্রীব বলা হয় ; আমরা আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনার মতো আর কেউ নেই, আপনি নানাপ্রকার রূপধারণ করেন এবং পরম কল্যাণময় শিবস্বরূপ। আপনিই সূর্যমণ্ডল এবং তাতে বিরাজমান সূর্য। আপনার ধ্বজা ও পতাকায় সূর্যের চিহ্ন আছে ; আপনাকে নমস্কার। প্রমথগণের অধীশ্বর ভগবান শিব আপনাকে প্রণাম। আপনার স্কন্ধ বৃষের ন্যায় সুন্দর, আপনি সর্বদা পিণাক-ধনু ধারণ করে থাকেন, শত্রুদমনকারী এবং দণ্ডস্বরূপ। কিরাতবেশে বিচরণ করার সময় আপনি ভোজপত্র এবং বল্কলবস্ত্র ধারণ করেন। হিরণ্য (সবুর্ণ) উৎপন্ন করায় আপনাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। হিরণ্য কবচ এবং মুকুট ধারণ করায় আপনি হিরণ্যকবচ এবং হিরণ-চূড়ক নামে প্রসিদ্ধ। আপনি হিরণ্যের অধিপতি, আপনাকে সাদর নমস্কার।

যাঁদের স্তুতি করা হয়েছে, যাঁদের স্তুতি করা হচ্ছে এবং যাঁরা স্তুতি যোগ্য, তাঁরা সকলেই আপনার স্বরূপ। আপনি সর্ব, সর্বভক্ষী এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; আপনাকে সাদর প্রণাম। আপনিই হোতা, আপনিই মন্ত্র, আপনার ধ্বজা ও পতাকা শ্বেতবর্ণের ; আপনাকে প্রণাম। আপনার নাভি থেকে সমগ্র জগৎ আবির্ভূত। আপনি জগৎ-সংসার চক্রের নাভিস্থান (কেন্দ্র) এবং আবরণেরও আবরণ ; আপনাকে আমাদের প্রণাম। আপনার নাসিকা অত্যন্ত কৃশ, তাই আপনাকে কৃশনাস বলা হয়, আপনার অবয়ব কৃশ হওয়ায় আপনাকে কৃশাঙ্গ বলা হয়। আপনি আনন্দমূর্তি, অতি প্রসন্নভাবে থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শায়িত অন্তর্যামী পুরুষ, প্রলয়কালে যোগনিদ্রার আশ্রয়ে শায়িত এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পান্ত নিদ্রা থেকে উত্থিত। আপনি ব্রহ্মারূপে সর্বত্র অবস্থিত এবং কালরূপে সর্বদা দ্রুতগামী। মস্তক মুণ্ডিত সন্ন্যাসী এবং জটাধারী তপস্বীও আপনারই স্বরূপ। আপনাকে প্রণাম। আপনার তাণ্ডবনৃত্য সর্বদা হয়ে চলেছে। আপনি শৃঙ্গাদি বাদ্যে নিপুণ, গীতি-বাদ্যে মগ্ন থাকেন ; আপনাকে প্রণাম। আপনি সর্বাপেক্ষা প্রবীণ এবং সর্বগুণে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। বলাভিমানী ইন্দ্রের মান আপনিই মর্দন করেছিলেন। আপনি কালের নিয়ন্তা এবং সর্বশক্তিমান। মহাপ্রলয় এবং অবান্তর প্রলয় আপনারই স্বরূপ, আপনাকে আমার প্রণাম। প্রভু ! আপনার অট্টহাসি দুন্দুভির ন্যায় ভয়ংকর। আপনি ভীষণ ব্রত ধারণকারী। দশবাহু সমন্বিত উগ্র মূর্তিধারী আপনাকে আমার নমস্কার। আপনি ভয়ংকর হয়েও নির্ভয় এবং শম ইত্যাদি উত্তম ব্রত পালন করেন ; আপনাকে আমার প্রণাম। বীণা আপনার প্রিয়, আর বৃষ (বৃষ্টিকর্তা), বৃষা (ধর্মবৃদ্ধিকারী), গোবৃষ (নন্দী) এবং বৃষ (ধর্ম) ইত্যাদি নামে আপনি প্রসিদ্ধ। কটঙ্কট (নিত্য গতিশীল), দণ্ড (শাসক) এবং পচপচ (সকল ভূতাদিকে সংহারকারী)ও আপনার নাম। আপনি সবথেকে শ্রেষ্ঠ, বরস্বরূপ ও বরদাতা, উত্তম মালা, গন্ধ, বস্ত্র ধারণ করেন এবং ভক্তদের আকাঙ্ক্ষার থেকে বেশি বর প্রদান করেন ; আপনাকে প্রণাম।

অনুরাগ ও বিরাগ দুই-ই যাঁর স্বরূপ, যিনি ধ্যানপরায়ণ, রুদ্রাক্ষমালাধারী, কারণরূপে সর্বত্রব্যাপী এবং কার্যরূপে পৃথকভাবে প্রতিভাত, যিনি সমগ্র জগৎকে আলো ও ছায়া প্রদান করেন, সেই ভগবান শংকরকে নমস্কার। অঘোর, ঘোর এবং ঘোর থেকেও ঘোরতর রূপধারণকারী শিব, শান্ত এবং অতি শান্তস্বরূপে দর্শনদানকারী ভগবান শিবকে প্রণাম। একপাদ, বহুনেত্র এবং এক মস্তকবিশিষ্ট আপনাকে প্রণাম। ভক্তপ্রদত্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সানন্দে গ্রহণ এবং তার পরিবর্তে ভক্তকে অপার ধনরাশি প্রদান করার ইচ্ছা রাখা ভগবান রুদ্রকে নমস্কার। যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টির কারিগর, গৌরবর্ণ এবং সর্বদা শান্তস্বরূপে বিরাজমান, যাঁর ঘণ্টাধ্বনি শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করে, সেই মহেশ্বরকে প্রণাম। যাঁর একটিমাত্র ঘণ্টা হাজার ঘণ্টাধ্বনির সমকক্ষ, ঘণ্টার মালা যাঁর প্রিয়, যিনি গন্ধ ও কোলাহলরূপ, সেই ভগবান শিবকে প্রণাম। যিনি 'হুঁ' বলে ক্রোধ এবং আন্তরিক শান্তি প্রকাশ করেন, পরব্রহ্মের চিন্তায় তৎপর থাকেন, শান্তি ও ব্রহ্মচিন্তাকেই প্রিয় বলে মানেন ; পর্বতের ওপর এবং বৃক্ষের নীচে যাঁর বাস, যিনি সর্বদা শান্ত থাকার আদেশ প্রদান করেন, সেই মহাদেবকে প্রণাম। যিনি জগতের তরণ-তারণকারী, যজ্ঞ, যজমান, হবন এবং অগ্নিরূপ, সেই ভগবান শংকরকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞ নির্বাহক, দমনশীল, তপস্বী, তাপপ্রদানকারী ; নদী, নদীতীর এবং নদীপতি সমুদ্র যাঁর নিজস্বরূপ, সেই ভগবান শিবকে প্রণাম

জানাই। অন্নদাতা, অন্নপতি এবং অন্নভোক্তারূপ মহেশ্বরকে নমস্কার। যাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ, সহস্র শূল এবং সহস্র নেত্র, যিনি প্রভাত সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ও বালকরূপধারী, সেই শংকর ভগবানকে প্রণাম। নিজ বালক অনুচরদের রক্ষক, বালকদের ক্রীড়াসঙ্গী, বৃদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ এবং ক্ষোভ প্রদানকারী আপনাকে প্রণাম। আপনার কেশ গঙ্গার তরঙ্গদ্বারা অঙ্কিত, আপনি ব্রাহ্মণের ছটি কর্ম—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন এবং স্বয়ং (অধ্যয়ন, যজন ও দানরূপ) তিন কর্মের অনুষ্ঠান করেন ; আপনাকে আমার প্রণাম। আপনি বর্ণ ও আশ্রমের বিভিন্ন কর্মগুলি বিধিমতো বিভাজন করেন, কলকল ধ্বনি, ঘোষস্বরূপ ও স্তবস্তুতির যোগ্য আপনাকে বারংবার প্রণাম। আপনার নেত্র শ্বেত, হলুদ, কালো এবং রক্তিম বর্ণ সমন্বিত, আপনি প্রাণবায়ু জয়কারী, দণ্ডরূপে প্রজাদের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটভঙ্গকারী এবং কৃশদেহ ধারণকারী, আপনাকে প্রণাম। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রদানের বিষয়ে আপনার কীর্তি বর্ণনার যোগ্য। আপনি সাংখ্যস্বরূপ, সাংখ্যযোগিদের প্রধান এবং সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্তকারী ; আপনাকে প্রণাম। আপনি রথে এবং বিনা রথেও ভ্রমণ করেন। জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই চারপথেই আপনার রথ পরিভ্রমণ করে। আপনি কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণকারী এবং সর্পরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন ; আপনাকে প্রণাম।

ঈশান ! আপনার দেহ বজ্রের ন্যায় কঠোর। হরিকেশ ! আপনাকে নমস্কার। ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপ পরমেশ্বর ! আপনি ত্রিনেত্রধারী এবং অম্বিকার স্বামী ; আপনাকে নমস্কার। আপনি কামস্বরূপ, কামনাপূরণকারী, কামদেবের বিনাশকারী, তৃপ্ত-অতৃপ্তের বিচারকারী, সর্বস্বরূপ, সব কিছু প্রদানকারী, সকলের সংহারক এবং সন্ধ্যাকালের মতো রক্তবর্ণ ; আপনাকে প্রণাম। মহান মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণসম্পন্ন মহাকাল ! আপনাকে নমস্কার। আপনার শ্রীবিগ্রহ স্থূল, জীর্ণ জটাসম্পন্ন এবং বল্কল ও মৃগচর্মধারী। আপনি দেদীপ্যমান সূর্য এবং অগ্নির ন্যায় জ্যোতির্ময় জটাদ্বারা সুশোভিত। আপনি সহস্র সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত এবং সর্বদা তপস্যারত ; আপনাকে প্রণাম। আপনি জগৎকে মোহগ্রস্ত করেন এবং গঙ্গার অজস্র ধারা মস্তকে ধারণ করেন, তাই আপনার কেশরাশি সর্বদা সিক্ত থাকে। আপনি চন্দ্রাবর্ত (চন্দ্রকে বারবার ক্ষয় বৃদ্ধির চক্রে নিক্ষেপকারী), যুগাবর্ত (যুগপরিবর্তনকারী) ও মেঘাবর্ত (বায়ুরূপে মেঘদের পরিভ্রমণকারী) ; আপনাকে নমস্কার। আপনিই অন্ন, অন্নাদ, ভোক্তা, অন্নদাতা, অন্নভোজী, অন্নস্রষ্টা, পাচক, পক্কান্নভোজী, পবন এবং অগ্নিরূপ। দেবদেবেশ্বর ! জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ—এই চার প্রকারের প্রাণপুরুষও আপনিই। আপনিই চরাচর জীবদের সৃষ্টি ও সংহারকারী। ব্রহ্মবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনাকেই ব্রহ্মজ্ঞানীদের ব্রহ্ম বলে থাকেন। ব্রহ্মবাদী বিদ্বানগণ আপনাকেই মনের পরম কারণ, আকাশ, বায়ু, তেজ, ঋক্, সাম এবং প্রণব বলে থাকে। সুরশ্রেষ্ঠ ! সামগানকারী বেদবেত্তা পুরুষ 'হায়ি হায়ি, হুবা হায়ি, হাবু হায়ি' প্রভৃতি উচ্চারণ দ্বারা নিরন্তর আপনারই মহিমা গীত করেন। যজুর্বেদ এবং ঋগ্বেদ আপনারই স্বরূপ। আপনিই হবিষ্য। বেদ ও উপনিষদের স্তুতিদ্বারা আপনার মহিমাই ব্যাখ্যা করা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিম্নবর্ণের লোকেরা আপনারই স্বরূপ। মেঘ, বিদ্যুৎ এবং বজ্র এগুলিও আপনার আরেক রূপ। সম্পূর্ণ বছর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, কাষ্ঠা, গ্রহ-নক্ষত্র এবং কলাও আপনারই অংশমাত্র। বৃক্ষের মধ্যে প্রধান বৃক্ষ বট-অশ্বত্থাদি, পর্বতের মধ্যে শিখর, বন্য জন্তুর মধ্যে বাঘ, পাখির মধ্যে গরুড়, সর্পের মধ্যে অনন্ত, সমুদ্রের মধ্যে ক্ষীরসাগর, যন্ত্রের (অস্ত্রের) মধ্যে ধনুক, শস্ত্রের মধ্যে বজ্র এবং ব্রতের মধ্যে সত্য আপনিই। আপনিই ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ, মোহ, ক্ষমা, অক্ষমা, ব্যবসায়, ধৈর্য, লোভ, কাম, ক্রোধ, জয় এবং পরাজয়। আপনি গদা, বাণ, ধনুক, খাটের অঙ্গ এবং ঝর্ঝর নামক অস্ত্রধারণকারী। আপনিই ছেত্তা (ছেদনকারী), ভেত্তা (ভেদনকারী), প্রহর্তা (প্রহারকারী), নেতা, মন্তা (মননকারী) এবং পিতা। দশ প্রকারের ধর্ম, অর্থ এবং কামও আপনি। গঙ্গা ইত্যাদি নদী, সমুদ্র, খাল, পুষ্করিণী, লতা, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগ, পক্ষী, দ্রব্য, কর্মসমারম্ভ, ফুল ও ফলপ্রদানকারী কালও আপনিই।

দেবতাদের আদি-অন্ত আপনি। আপনিই গায়ত্রীমন্ত্র এবং ওঁ-কারস্বরূপ। হরিত, লোহিত, নীল, কৃষ্ণ, সম, অরুণ, কপিল, কপোত এবং শ্যামমেঘের সমান রঙ—এই দশ প্রকার রঙও আপনি। বর্ণরহিত হওয়ায় আপনি অবর্ণ এবং সুন্দর বর্ণের হওয়ায় আপনাকে সুবর্ণ বলা হয়। আপনি বর্ণস্রষ্টা এবং মেঘের ন্যায়। আপনার নামে সুন্দর

বর্ণের অক্ষরের ব্যবহার করা হয়েছে, তাই আপনি সুবর্ণ-নাম্না এবং সুবর্ণ প্রিয়। আপনিই ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, অগ্নি, উপপ্লব (গ্রহণ), চিত্রভানু (সূর্য), রাহু এবং ভানু। হোত্র, হোতা, হবনের পদার্থ, হবন ক্রিয়া এবং তার (তার ফল প্রদানকারী) পরমেশ্বরও আপনিই। বেদের ত্রিসৌপর্ণ নামক শ্রুতিতে এবং যজুর্বেদের শতরুদ্রিয় প্রকরণে যে বহু বৈদিক নাম আছে সেগুলি সবই আপনার।

আপনি পবিত্র থেকেও পবিত্র এবং মঙ্গলের থেকেও মঙ্গল। আপনিই গিরিক (অচেতনের চেতনা আনেন), হিংড়ুক (গমনাগমনকারী), বৃক্ষ (সংসার), জীব, দেহ, প্রাণ, সত্ত্ব, রজ, তম, অপ্রমদ (স্ত্রীবর্জিত-ঊর্ধ্বরেতা), প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ-নিমেষ (চক্ষু উন্মীলন-নিমীলন), শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা। আপনার উদর ও মুখ মহান। লোমগুলি সূচাগ্রের ন্যায়। আপনি চরাচরস্বরূপ, গীত-বাদ্যের তত্ত্ব জানেন। গীত-বাদ্য আপনার অত্যন্ত প্রিয়। আপনি মৎস্য, জলধর এবং জালধারী মকর। তা সত্ত্বেও আপনি বন্ধনের অতীত। আপনি কেলিকলাযুক্ত এবং কলহরূপ। আপনি অকাল, অতিকাল, দুষ্কাল এবং কাল। মৃত্যু, ক্ষুর (কাটার যন্ত্র), কৃত্য (কাটার যোগ্য), পক্ষ (মিত্র) এবং অপক্ষ ভয়ংকর (শত্রুপক্ষনাশকারী)ও আপনিই। আপনি মেঘের ন্যায় কালো করালদ্রংষ্ট্রা এবং প্রলয়কালীন মেঘ। ঘন্ট (প্রকাশবান), অঘন্ট (অব্যক্ত প্রকাশসম্পন্ন), ঘটী (কর্মফলযুক্তকারী), ঘন্টী (ঘন্টা-সম্পন্ন), চরুচেলী (জীবেদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন যিনি) এসবই আপনার নাম। আপনিই ব্রহ্ম, অগ্নিস্বরূপ, দণ্ডী, মুণ্ড এবং ত্রিদণ্ডধারী। চারযুগ এবং চারবেদ আপনারই স্বরূপ এবং চারপ্রকারের হোতৃকর্মের আপনিই প্রবর্তক। চার আশ্রমের আপনিই আরাধ্য এবং চারবর্ণের সৃষ্টিকারীও আপনি। আপনি অক্ষপ্রিয়, ধূর্ত, গণাধ্যক্ষ এবং গণাধিপ নামে প্রসিদ্ধ। আপনি রক্তবস্ত্র এবং রক্তিম ফুলের মালায় শোভিত থাকেন, পর্বতের ওপর শয়ন করেন এবং গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করেন। আপনিই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পী (কারিগর) এবং সর্বপ্রকার শিল্পকলার প্রবর্তক।

আপনি ভগদেবতার চক্ষু ছেদন করার জন্য অঙ্কুশ, চণ্ড (অত্যন্ত ক্রোধী) এবং পূষার দাঁত বিনাশকারী। স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার, নমস্কার এবং নমোনমঃ ইত্যাদি পদ আপনারই নাম। আপনি গূঢ় ব্রতধারী, গুপ্ত তপস্যাকারী, তারকমন্ত্র এবং তারাযুক্ত আকাশ। ধাতা (ধারণকারী), বিধাতা (সৃষ্টিকারী), সংধাতা (যুক্তকারী), বিধাতা, ধরণ এবং অধর (আধাররহিত)ও আপনারই নাম। আপনি ব্রহ্মা, তপ, সত্য, ব্রহ্মচর্য, আর্জব (সারল্য), ভূতাত্মা (প্রাণীদের আত্মা), ভূতাদির সৃষ্টিকারী, ভূত (নিত্যসিদ্ধ), ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের উৎপত্তির কারণ। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ধ্রুব (স্থির), দান্ত (দমনশীল) এবং মহেশ্বর। দীক্ষিত (যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণকারী), অদীক্ষিত, ক্ষমাবান, দুর্দান্ত, উদ্দণ্ড প্রাণীদের বিনাশকারী, চন্দ্রের আবৃত্তিকারী (মাস), যুগের আবৃত্তিকারী (কল্প), সংবর্ত (প্রলয়) এবং সংবর্তকও (পুনরায় সৃষ্টি সঞ্চালনকারীও) আপনি। আপনিই কাম, বিন্দু, অণু (সূক্ষ্ম) এবং স্থূলরূপ। আপনি ফুল-মালা অধিক পছন্দ করেন। আপনি নন্দীমুখ, ভীমমুখ (ভয়ংকর মুখবিশিষ্ট), সুমুখ, দুর্মুখ, অমুখ (মুখরহিত), চতুর্মুখ, বহুমুখ এবং যুদ্ধের সময় শত্রু সংহার কালে অগ্নিমুখ। হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা), শকুনি, মহাসর্পের প্রভু (শেষনাগ) এবং বিরাটও আপনিই। আপনি অধর্মনাশক, মহাপার্শ্ব, চণ্ডধার, গণাধিপ, গোনর্দ, গাভীদের বিপদ হতে রক্ষাকারী, নন্দীতে আরোহণকারী, ত্রৈলক্যরক্ষক, গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণরূপ), গোমার্গ (ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়), অমার্গ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), শ্রেষ্ঠ, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প, কম্প, দুর্বারণ (যার সম্মুখীন হওয়া কঠিন), দুর্বিষহ (অসহ্য বেগসম্পন্ন), দুঃসহ, দুর্লঙ্ঘ্য, দুষ্প্রকম্প, দুর্বিষ, দুর্জয়, জয়, শশ (শীঘ্রগামী), শশাঙ্ক (চন্দ্র) এবং শমন (যমরাজ)। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, বৃদ্ধাবস্থা এবং মানসিক চিন্তা দূরকারীও আপনিই। আপনিই আধিব্যাধি এবং তা নিরাময়কারীও। আমার যজ্ঞরূপ মৃগ হত্যাকারী এবং আধিব্যাধি আনয়ন ও নিরাময়কারীও আপনিই। (কৃষ্ণরূপে) মস্তকে শিখণ্ড (ময়ূর পক্ষ) ধারণ করায় আপনি শিখণ্ডী। পুণ্ডরীকের (কমলের) ন্যায় সুন্দর নেত্র হওয়ায় আপনাকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলা হয়। আপনি কমল বনে বাস করেন, দণ্ডধারণ কারী, ত্র্যম্বক, উগ্রদণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের সংহারক। বিষাগ্নি পানকারী, দেবশ্রেষ্ঠ, সোমরসপায়ী এবং মরুদ্‌গণের ঈশ্বর। দেবাদিদেব! জগন্নাথ! আপনি অমৃত পানকারী ও গণেদের প্রভু। আপনি বিষাগ্নি ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন এবং দুধ ও সোমরস পান করেন। আপনি স্বর্গভ্রষ্ট জীবেদের প্রধান রক্ষক এবং তুষিত নামক দেবতাদের আদিভূত ব্রহ্মাকেও পালন করেন। আপনি হিরণ্যরেতা (অগ্নি), পুরুষ

(অন্তর্যামী), স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক। বালক, যুবক এবং বৃদ্ধও আপনি। নাগেশ্বর ! আপনি বিশ্বকৃৎ (জগতের সংহারক), বিশ্বকর্তা (প্রজাপতি), বিশ্বকৃৎ (ব্রহ্মা), বিশ্ব রচনাকারী প্রজাপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের ভারবহনকারী, বিশ্বরূপ, তেজস্বী এবং সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট। চন্দ্র, সূর্য আপনার নেত্র, পিতামহ ব্রহ্মা আপনার হৃদয়। আপনিই সমুদ্র, সরস্বতী আপনার বাণী, অগ্নি ও বায়ু বল এবং আপনার চক্ষু খোলা ও বন্ধ করাই হল দিন ও রাত্রি।

শিব ! আপনার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণভাবে জানা ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা প্রাচীন ঋষিদের পক্ষেও সম্ভব নয়। আপনার সূক্ষ্ম রূপ আমরা দেখতে পাই না। প্রভু ! পিতা যেমন তাঁর ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনই আপনিও আমাকে রক্ষা করুন। অনঘ ! আমি আপনার দ্বারা রক্ষা পাওয়ার যোগ্য, আপনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবেন ; আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ভক্তদের সর্বদা কৃপা করে থাকেন, আমি সর্বদাই আপনার ভক্ত। যিনি সকল মানুষের ওপর মায়াজাল বিস্তার করে সকলের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে আছেন, অদ্বিতীয় এবং সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত কামনার অন্ত হলে যিনি প্রকাশিত হন ; সেই পরমেশ্বর নিত্য আমাকে রক্ষা করুন। যারা নিদ্রাবশীভূত না হয়ে প্রাণের ওপর বিজয়লাভ করেছেন এবং ইন্দ্রিয় জয় করে সত্ত্বগুণে স্থিত হয়েছেন—সেই যোগিগণ ধ্যানে যে জ্যোতির্ময় তত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন, সেই যোগাত্মা পরমেশ্বরকে প্রণাম। যিনি জটা ও দণ্ড ধারণ করেছেন, যাঁর বিশাল উদর, কমণ্ডলুই যাঁর তূণীর, সেই ব্রহ্মারূপে বিরাজমান ভগবান শিবকে প্রণাম। যাঁর কেশরাশিতে মেঘপুঞ্জ, দেহের সন্ধিতে নদী এবং উদরে চারটি মহাসাগর বিরাজমান, সেই জল স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। যিনি প্রলয়কাল উপস্থিত হলে একার্ণবের জলে শয়ন করেন, আমি সেই সলিলশয্যা ভগবানের শরণ গ্রহণ করি। যিনি রাত্রে রাহুর মুখে প্রবেশ করে স্বয়ং চন্দ্রের অমৃত পান করেন এবং স্বয়ং আবার রাহু হয়ে সূর্যের গ্রহণ ঘটিয়ে থাকেন, সেই পরমাত্মা আমাকে রক্ষা করুন। নবজাত শিশুদের ন্যায় যে দেবতা ও পিতৃপুরুষ যজ্ঞে নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করেন, তাঁকে নমস্কার। তিনি 'স্বাহা ও স্বধা' দ্বারা নিজ ভাগ প্রাপ্ত করে প্রসন্ন হোন ! যে রুদ্র অঙ্গুষ্ঠমাত্র জীবরূপে সমস্ত দেহধারীদের মধ্যে বিরাজমান, তিনি সর্বদা আমার রক্ষা ও বৃদ্ধি করুন। যিনি দেহের মধ্যে থেকে নিজে ক্রন্দন না করে দেহধারীদেরই ক্রন্দন করান, স্বয়ং হর্ষিত না হয়ে তাদেরই হর্ষিত করেন, তাঁকে আমি শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। নদী, সমুদ্র, পর্বত, গুহা, বৃক্ষাদির মূল, গোশালা, দুর্গম পথ, বন, চৌরাস্তা, সড়ক, নদীতীর, হস্তিশালা, অশ্বশালা, রথশালা, পুরাতন উদ্যান, জীর্ণ গৃহ, পঞ্চ ভূত, দিক্-বিদিক্, চন্দ্র-সূর্য এবং তাদের কিরণে, রসাতলে এবং অন্যান্য স্থানে যাঁরা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে ব্যাপ্ত, তাঁদের সবাইকে আমি বারংবার প্রণাম জানাই। যাঁর সংখ্যা, প্রমাণ এবং রূপের কোনো সীমা নেই, যাঁর গুণের পরিমাপ করা যায় না, সেই রুদ্রকে আমি সর্বদা নমস্কার করি।

আপনি সমস্ত ভূতের জন্মদাতা, সকলের পালক ও সংহারক এবং সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা। নানাপ্রকার দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা আপনাকেই যজনা করা হয় এবং আপনিই সকলের কর্তা ; তাই আমি আপনাকে পৃথকভাবে নিমন্ত্রণ করিনি। অথবা দেব ! আপনার সূক্ষ্ম মায়ায় আমি মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম, তাই আপনাকে নিমন্ত্রণের এই ত্রুটি। দেবাদিদেব ! আমি ভক্তিভাব নিয়ে আপনার শরণ নিয়েছি, অতএব এবার আমার ওপরে প্রসন্ন হোন। আমার হৃদয়, বুদ্ধি, মন সব আপনাতেই সমর্পিত।

প্রজাপতি দক্ষ এইভাবে মহাদেবের স্তুতি করে চুপ করলেন। তখন ভগবান শিব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে দক্ষকে বললেন—'উত্তম ব্রত পালনকারী দক্ষ ! তোমার স্তুতিতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার কাছে নিবাস করবে। প্রজাপতে ! আমার প্রসাদে তুমি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং এক সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হবে।' লোকনাথ ভগবান শিব তারপর প্রজাপতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'দক্ষ ! এই যজ্ঞে যে বিঘ্ন প্রদান করা হয়েছে, তার জন্য তুমি দুঃখ কোরো না। আমি আগের কল্পেও তোমার যজ্ঞ ধ্বংস করেছিলাম। এই ঘটনা পূর্বকল্প অনুসারেই হয়েছে। সুব্রত ! আমি আবার তোমাকে বরপ্রদান করছি, তুমি স্বীকার করো এবং প্রসন্নবদন ও একাগ্রচিত্তে আমার কথা শোনো। আমি পূর্বকালে ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্যযোগ এবং তর্কদ্বারা নিশ্চিত করে দেবতা ও দানবদের জন্য দুস্কর তপস্যা করেছিলাম। সেই ব্রতের নাম পাশুপতব্রত। আমিই সেই কল্যাণময় ব্রত রচনা করেছিলাম। সেই ব্রতের দ্বারা মহান ফল প্রাপ্তি হয়। মহাভাগ ! সেই পাশুপতব্রতের ফল তুমি লাভ করো ; এবার তুমি তোমার মানসিক চিন্তা ত্যাগ করো।'

এই বলে মহাদেব তাঁর পত্নী পার্বতী ও অনুচরদের নিয়ে দক্ষের কাছ থেকে চলে গেলেন। যে ব্যক্তি দক্ষদ্বারা কৃত এই স্তব কীর্তন বা শ্রবণ করে, তার কখনো অমঙ্গল হয় না এবং সে দীর্ঘায়ু লাভ করে। সমস্ত দেবতাদের মধ্যে যেমন ভগবান শংকর শ্রেষ্ঠ, তেমনই সমস্ত স্তবের মধ্যে এই স্তব শ্রেষ্ঠ। এটি সাক্ষাৎ বেদের সমান। যারা যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য, কাম, অর্থ, ধন বা বিদ্যালাভ করতে চায়, তাদের সকলেরই এই স্তোত্র ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করা উচিত। রোগী, দুঃখী, দীন, চোরের হাতে পড়া, ভীতসন্ত্রস্ত, রাজার কাছে অপরাধী মানুষও এই স্তোত্র পাঠ করলে মহাভয় থেকে মুক্তিলাভ করে। তারা এই দেহেই ভগবান শিবের অনুচরদের সমকক্ষ যোগ্যতা লাভ করে এবং তেজস্বী, যশস্বী এবং নির্মল হয়ে যায়। যেখানে এই স্তোত্র পাঠ হয়, সেখানে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত এবং বিনায়ক কোনো বিঘ্ন করে না। যে নারী ব্রহ্মচর্য পালন করে ভক্তিভরে ভগবান শংকরের এই স্তোত্র শ্রবণ করে, সে দেবতার ন্যায় পিতা ও পতির ঘরে পূজিত হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এটি শ্রবণ ও কীর্তন করে, তার সকল কার্যই সফল হয়। এই স্তোত্র পাঠ করলে মনে মনে চিন্তা করা ও বাক্যে প্রকাশ করা সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়। মানুষের উচিত ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা শৌচ-সন্তোষ ইত্যাদি নিয়ম পালনপূর্বক কার্তিকেয়, পার্বতী ও নন্দিকেশ্বর প্রমুখ অঙ্গদেবতাদের পূজা করে এবং তাঁদের বলি অর্পণ করে, তারপরে একাগ্রচিত্তে এই নামসমূহ পাঠ করা। এইভাবে পাঠ করলে সে কামনা অনুসারে ধন, কাম ও উপভোগের সামগ্রী লাভ করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। তাকে আর ইতর যোনিতে জন্ম নিতে হয় না। পরাশরনন্দন ভগবান ব্যাস এইভাবে এই স্তোত্রের মাহাত্ম্য জানিয়েছেন।

---o---

সমঙ্গের নারদকে তাঁর শোকহীন স্থিতির বর্ণনা এবং নারদের গালব মুনিকে শ্রেয় লাভের উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জগতের জীব দুঃখ ও মৃত্যুর জন্য সদাই ভয়ে ভয়ে থাকে ; সুতরাং আপনি এমন উপদেশ দিন, যাতে আমাদের ওইগুলির ভয় না থাকে।

ভীষ্ম বললেন—ভারত ! এই বিষয়ে নারদ ও সমঙ্গের সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। একবার নারদ সমঙ্গকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনে ! তোমাকে সর্বদা আনন্দমগ্ন ও শোকহীন দেখায়। তোমাকে কখনো লেশমাত্র উদ্বিগ্ন দেখায় না। তুমি সর্বদা সন্তুষ্ট এবং নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে বালকের ন্যায় কাজ করে যাও, এর কারণ কী ?'

সমঙ্গ বললেন—মুনিবর ! আমি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বরূপ এবং তার তত্ত্ব জানি, তাই আমার মনে কখনো বিষাদ আসে না। আমার কর্মের আরম্ভ এবং তার ফলোদয় কালেরও জ্ঞান আছে, লোকে যে নানাপ্রকার কর্মফল প্রাপ্ত হয়, তাও আমি জানি, তাই আমি কখনো দুঃখিত হই না। জগতে বিদ্বান, মূর্খ, অন্ধ, জড়ও জীবিত থাকে এবং সুস্থ শরীরসম্পন্ন দেবতা, বলবান এবং নির্বল সকলেই নিজ নিজ কর্মানুসারে জীবন ধারণ করে, সেইভাবে আমিও জীবন ধারণ করে আছি। ধনীও জীবিত থাকে, দরিদ্রও ; সেইভাবে আমিও জীবিত বলে মনে করবেন। মানুষ যেজন্য কাউকে প্রাজ্ঞ (বুদ্ধিমান) বলে, সেই প্রজ্ঞার (বুদ্ধির) মূল হল ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা। যে মূঢ় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদি শোক ও মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে, তার প্রজ্ঞালাভ হয় না। মূর্খের যে গর্ব, তা মোহেরই রূপ। মূঢ় ব্যক্তিদের ইহলোকেও সুখ হয় না, পরলোকেও নয়। কাউকেই সর্বদা দুঃখ ভোগ করতে হয় না বা সর্বদা সুখ লাভও হয় না। জগতের স্বরূপ পরিবর্তিত হতে দেখে আমার ন্যায় মানুষ কখনো শোক করে না ; অনুকূল ভোগ বা সুখ লাভ করে তাকে অভিনন্দিত করে না এবং প্রতিকূল দুঃখ প্রাপ্ত হয়েও কখনো চিন্তিত হয় না। যার চিত্ত স্থির হয়েছে, সে কখনো অপরের ধন আশা করে না, অনেক সম্পত্তি লাভ করেও আনন্দে উৎফুল্ল হয় না এবং ধন নষ্ট হলেও তার জন্য দুঃখ করে না ; কারণ বন্ধুবান্ধব, ধন, উত্তম কুল, শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্র এবং বীর্য—এগুলির কোনোটিই দুঃখ দূর করতে সক্ষম নয়। মানুষ তার গুণের জন্যই পরলোকে শান্তি পায়। যার চিত্ত যোগযুক্ত নয়, সে সমত্ববুদ্ধি লাভ করে না। যোগ ব্যতীত সুখও পাওয়া যায়

না। দুঃখের (প্রতিকূল বুদ্ধি) ত্যাগ ও ধৈর্য—এই দুটিই সুখের মূল। প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হলে হর্ষ হয়, হর্ষ থেকে অহংকার বৃদ্ধি পায় এবং অহংকার নরকগামী করে, তাই আমি ওই তিনটিই ত্যাগ করে থাকি। শোক, ভয় এবং অহং-অভিমান—এগুলি প্রাণিদের সুখ-দুঃখ অনুভূতি জাগায় এবং মোহে আবদ্ধ করে। তাই যতদিন এই দেহ থাকে, ততদিন আমি এগুলিকে সাক্ষীর মতো দেখে থাকি এবং অর্থ, কাম, শোক, সন্তাপ, তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগ করে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করি। অমৃত পানকারীরা যেমন মৃত্যুকে ভয় পায় না, তেমনই আমারও ইহলোক বা পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম, লোভ এবং অন্য কিছুতে ভয় নেই। নারদ! আমি মহান এবং অক্ষয় তপস্যা করে এই জ্ঞান লাভ করেছি, তাই শোক উপস্থিত হলেও, তা আমাকে দুঃখের সাগরে ফেলে না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—যারা শাস্ত্রের তত্ত্ব জানে না, যাদের মন সর্বদা সংশয়গ্রস্ত এবং যারা পরমার্থকে লাভ করার কোনো নিশ্চিত পথ স্থির করেনি, তাদের কী করে কল্যাণ হবে ? দয়া করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সর্বদা গুরুজনদের পূজা, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপাসনা এবং শাস্ত্রাদি শ্রবণ—এই তিনটি কল্যাণের অমোঘ সাধন। এই বিষয়েও দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি গালবের প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময় গালব মুনি কল্যাণ প্রাপ্তির ইচ্ছায় জ্ঞানানন্দে পূর্ণ এবং সর্বদা মনকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখা দেবর্ষি নারদের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'মুনিবর ! আপনি উত্তমগুণযুক্ত, জ্ঞানী আর আমি আত্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞ এবং মূঢ়, সুতরাং আপনি আমার সন্দেহ দূর করুন। শাস্ত্রে বহুপ্রকার কর্তব্য-কর্ম বলা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আমার কাছে একই প্রকারের মনে হয়। তার মধ্যে কোনটি অনুষ্ঠান করলে আমার জ্ঞানে প্রবৃত্তি হতে পারে, তা আমি নিরূপণ করতে পারছি না, সেটি আপনি স্থির করে দিন। সকল আশ্রমই ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং 'এটিই শ্রেষ্ঠ', 'এটিই শ্রেষ্ঠ' এই বলে সকলের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। অন্য দিকে বিভিন্ন শাস্ত্রদ্বারা নানারূপ উপদেশ পেয়ে মানুষ নানাপ্রকার কর্মে স্থিত হয় এবং সকলেই নিজ নিজ শাস্ত্রের প্রশংসা করে থাকে, এদিকে আমিও নিজ শাস্ত্রে সন্তুষ্ট। এই অবস্থায় ওদের এবং নিজেকে সমভাবে সন্তুষ্ট দেখে আমি কল্যাণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। যদি শাস্ত্র এক হত তাহলে (এক হওয়ার জন্য) শ্রেয়ের উপায় স্পষ্টভাবে বোঝা যেত ; কিন্তু বহু শাস্ত্র শ্রেয়মার্গকে অত্যন্ত গূঢ় করে ফেলেছে, ফলে সেগুলি সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে ; তাই আমি আপনার শরণ গ্রহণ করছি, কৃপা করে আমাকে শ্রেয়ের বাস্তবিক পথের উপদেশ প্রদান করুন।

নারদ বললেন—তাত ! আশ্রম চার প্রকারের এবং শাস্ত্রে তাকে পৃথক পৃথকভাবে কল্পনা করা হয়েছে। তুমিও গুরুর শরণ নিয়ে সেই সব যথার্থরূপে জানো। ওই চার আশ্রমগুলির স্বরূপ ও গুণ ভিন্ন ভিন্ন। স্থূলদৃষ্টিতে বিচার করলে এগুলি সর্বোত্তম অভীষ্ট অর্থাৎ শ্রেয়মার্গের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান করাতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিদ্বানই আশ্রমগুলির পরমতত্ত্ব ঠিকভাবে বুঝেছেন। যা ভালোভাবে কল্যাণ করে এবং সংশয়রহিত, তাকেই শ্রেয় বলা হয়। সুহৃদকে অনুগ্রহ করা, শত্রুভাবাপন্ন দুষ্ট পুরুষকে দণ্ড প্রদান করা এবং ধর্ম, অর্থ, কাম সংগ্রহ করা—বিদ্বান ব্যক্তিরা একেই শ্রেয় বলেন। পাপ-কর্ম থেকে দূরে থাকা, নিত্য পুণ্যকর্ম করা, সৎ পুরুষদের সঙ্গে থেকে সঠিকভাবে সদাচার পালন করা, সমস্ত প্রাণীর প্রতি কোমল ও সহজভাবে ব্যবহার করা, মিষ্ট কথা বলা, দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অতিথিদের তাঁদের নির্দিষ্ট ভাগ প্রদান করা এবং ভরণ-পোষণযোগ্য ব্যক্তিদের ত্যাগ না করা—শ্রেয়ের এগুলিই নিশ্চিত সাধন। সত্য বলাও অন্যতম শ্রেয় ; কিন্তু সত্য যথার্থভাবে জানা অত্যন্ত কঠিন। আমি তো তাকেই সত্য বলি, যাতে প্রাণীদের প্রকৃত হিত হয়। অহংকার পরিত্যাগ করা, প্রমাদ বন্ধ করা, সন্তুষ্ট থাকা, একাকী থেকে ধর্মপালন করা, ধর্মাচরণপূর্বক বেদ ও বেদান্তের স্বাধ্যায় এবং তা জানার ইচ্ছা কল্যাণের অমোঘ সাধন। যেসব ব্যক্তি কল্যাণ প্রাপ্তি করতে চায়, তাদের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—এই বিষয়গুলি বেশি সেবন করা উচিত নয়। রাত্রে বেড়ানো, দিনে শয়ন করা, আলস্য, পরচর্চা, গর্ব, অধিক পরিশ্রম, একেবারেই পরিশ্রম না করা—যারা শ্রেয় প্রাপ্তি করতে চায়, তাদের কাছে এগুলি পরিত্যাজ্য।

অপরের নিন্দা করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। নিজের যা বিশেষত্ব, তা উত্তম গুণের সাহায্যে প্রকাশ করা উচিত। অধম ব্যক্তিরাই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার চেষ্টা করে, তারা অপরের নিন্দা করে এবং নিজেদের দোষকে গুণবানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যারা অপরের নিন্দা এবং নিজেদের গুণগান করে না, সেই সর্বগুণসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তিরাই মহাযশের ভাগী হয়। ফুলের পবিত্র এবং মধুর সুগন্ধ কিছু না বলেই সকলকে মোহিত করে এবং সূর্য কিছু না বলেই আকাশে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় ; তেমনই জগতে এমন বহু বস্তু আছে, যা কিছু না বলে নিজ যশে প্রকাশিত হয়। বিদ্বান ব্যক্তি গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকলেও তার প্রসিদ্ধি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। খারাপ কথা জোর করে বললেও কেউ তাকে সম্মান করে না—কিন্তু ভালো কথা ধীরে বললেও তা প্রকাশিত হয় এবং সকলের ওপর তার প্রভাব পড়ে। অহংকারী মূর্খ ব্যক্তির অসার কথা তার দূষিত হৃদয়ের পরিচয় দেয় ; তাই গুণী লোকেরা প্রজ্ঞার (জ্ঞানের) সন্ধান করে ; আমার তো সব প্রাণীর জন্য জ্ঞান লাভ করাই ভালো মনে হয়। বুদ্ধিমান জ্ঞানবান ব্যক্তির জিজ্ঞাসিত না হয়ে কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। অন্যায়ভাবে প্রশ্ন করলেও কারো কথার উত্তর দেবে না, জড়ের ন্যায় চুপ করে থাকবে।

মানুষের সর্বদা ধার্মিক সাধু, মহাত্মা এবং স্বধর্মপরায়ণ উদার ব্যক্তিদের কাছে থাকা উচিত। যেখানে চারটি বর্ণের বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণ দেখা যায়, সেইস্থানে শ্রেয়র ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থান করা উচিত নয়। কোনো কর্ম আরম্ভ না করা এবং যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ব্যক্তিও পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে থাকলে পুণ্যের ভাগী হয় এবং পাপীদের সঙ্গে থাকলে পাপের ভাগী হয়—যেমনভাবে শীতল ও তাপের সংস্পর্শে এলে ঠান্ডা ও গরমের অনুভূতি হয়। ভৃত্যবর্গ এবং অতিথিদের ভোজন করানোর পর যে ব্যক্তি রসাস্বাদনের দিকে দৃষ্টি না রেখে ভোজন করে তাকে বিঘসাশী বলে ; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ রসনার কথা ভেবে স্বাদু-অস্বাদু বিচার করে ভোজন করে, সে কর্মপাশে আবদ্ধ হয়। যেখানে ব্রাহ্মণ অন্যায়ভাবে প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দেয়, আত্মজ্ঞানীর সেই দেশ পরিত্যাগ করা উচিত।

যেখানে মানুষ মাৎসর্য এবং শঙ্কারহিত হয়ে ধর্মাচরণ করে, সেখানে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের অবশ্যই বাস করা উচিত। যেখানে মানুষ অর্থের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে, সেখানে বাস করলে পাপ হয়। যেখানে জীবনরক্ষার জন্য লোক পাপকর্ম করে, যেখানে রাজা ও তার অনুচরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যেখানে মানুষ তার আত্মীয়দের আগেই আহার করে, জ্ঞানী ব্যক্তির সেই দেশ ত্যাগ করা উচিত। যেস্থানে ধর্মে শ্রদ্ধাযুক্ত সনাতনধর্মী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণই যজ্ঞ ও অধ্যয়ন কাজে নিযুক্ত থাকেন, সেই স্থানে নিবাস করা উচিত। যেখানে স্বাহা (অগ্নিহোত্র), স্বধা (শ্রাদ্ধ) এবং বষট্‌কারের (ইন্দ্রযজ্ঞের) ঠিকমতো অনুষ্ঠান হয়, যেখানে লোকে না চাইলেও ভিক্ষা পায়, যেখানে দুষ্টদের দণ্ডপ্রদান করা হয় এবং সাধু ব্যক্তিদের সম্মান করা হয়, সেই পুণ্যশীল মহাত্মাদের মধ্যে বাস করা উচিত। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের ওপর ক্রোধ এবং সাধু-মহাত্মাদের ওপর অত্যাচার করে এমন লোভী ও উগ্র ব্যক্তিদের যে দেশে অত্যন্ত কঠোর দণ্ড প্রদান করা হয় এবং যেখানকার রাজা সর্বদা ধর্মপরায়ণ হয়ে ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করেন এবং সমস্ত কামনার প্রভু হয়েও বিষয়ভোগে বিমুখ থাকেন, সেই স্থানে নির্দ্বিধায় বাস করা উচিত ; কারণ রাজার স্বভাব যেমন হয়, প্রজারাও তেমনই হয়ে থাকে। এরূপ রাজা নিজ কল্যাণের সময় উপস্থিত হলে তাঁর প্রজাদেরও কল্যাণ করে থাকেন।

তাত ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি শ্রেয়মার্গের কথা সংক্ষেপে জানালাম। বিস্তারিতভাবে আত্মকল্যাণের পরিগণনা করা সম্ভবই নয়। যে এইভাবে জীবন অতিবাহিত করে এবং প্রাণীদের হিতে ব্যাপৃত থাকে, সেই ব্যক্তির স্বধর্মরূপ তপস্যার অনুষ্ঠানে ইহলোকেই পরম কল্যাণ প্রাপ্তি হয়।

অরিষ্টনেমির রাজা সগরকে মোক্ষের উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! আমার মতো রাজার পক্ষে যোগযুক্ত হয়ে কীভাবে পৃথিবী পালন করা সম্ভব? কোন্ গুণসম্পন্ন হলে আসক্তি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব?

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে রাজা সগরের জিজ্ঞাসার উত্তরে অরিষ্টনেমি যে উত্তর দিয়েছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস আমি তোমাকে বলছি।

সগর জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্! শ্রেয়প্রাপ্তির সর্বোত্তম উপায় কী? কী করলে মানুষ ইহলোকেই পরম সুখ (মোক্ষ) লাভ করতে পারে? আমার তা জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ভীষ্ম বললেন—সগরের এইরূপ জিজ্ঞাসায় সমস্ত শাস্ত্রবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তার্ক্ষ্য (অরিষ্টনেমি) দৈবীসম্পত্তিতে গুণবান জেনে তাঁকে উত্তম উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'সগর! জগতে মোক্ষসুখই প্রকৃত সুখ, কিন্তু যারা ধন ও ধান্য উপার্জনে ব্যস্ত
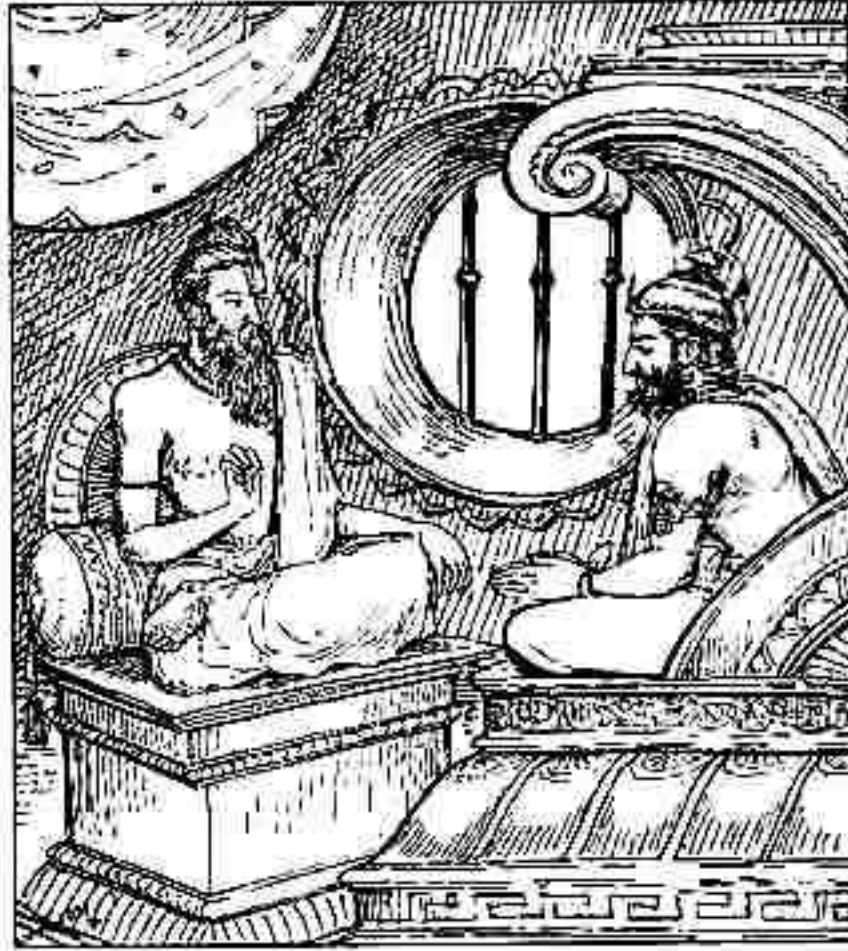
এবং পুত্র ও পশুতে আসক্ত, সেইসকল মূর্খ মানুষ যথার্থ জ্ঞান লাভ করে না। যার বুদ্ধি বিষয়াসক্ত, তার মন অশান্ত হয়ে থাকে, এরূপ পুরুষের চিকিৎসা করা কঠিন। স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ অজ্ঞান ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয় না। এবার আমি তোমাকে স্নেহবন্ধনগুলির পরিচয় দিচ্ছি, শোনো। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এই কথা মন দিয়ে শোনা উচিত। তুমি ন্যায়পূর্বক ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়াদি অনুভব করে তার প্রভাব থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং আনন্দের সঙ্গে বিচরণ করো; সন্তান হয়েছে কি না, তা নিয়ে চিন্তা কোরো না। ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে যেসব কৌতূহল থাকে, তা মিটিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে বিচরণ করো এবং দৈবেচ্ছায় যেসব লৌকিক পদার্থ প্রাপ্ত হয় তাতে সমভাব বজায় রাখো—রাগদ্বেষ কোরো না। মুক্ত পুরুষ সুখী হয়ে জগতে নির্ভয়ে বিচরণ করে; কিন্তু যার চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়, সে কীটের মতো আহার সংগ্রহ করতে করতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই যারা আসক্তিরহিত, তারাই ইহজগতে সুখী, আসক্তিই মানুষকে বিনাশ করে। যদি তুমি মোক্ষাভিলাষী হও, তাহলে তোমার পরিবার-পরিজনদের পালন-পোষণ কীভাবে হবে?—এই চিন্তা ত্যাগ করো। প্রাণী নিজেই জন্ম নেয়, নিজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নিজেই সুখ-দুঃখ ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারেই তার আহার, বস্ত্র এবং মাতা-পিতার সংগ্রহ করা সম্পদ প্রাপ্ত হয়। জগতে যা কিছু প্রাপ্তি হয়, তা পূর্বকৃত কর্মফলের অতিরিক্ত কিছু নয়। পৃথিবীর সমস্ত জীব নিজ কর্মের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে জগতে বিচরণ করে এবং বিধাতা তার প্রারব্ধ অনুসারে যেটুকু ভোগ নির্দিষ্ট করেছেন, তাই প্রাপ্ত হয়। যে নিজেই (শরীরের দৃষ্টিতে) মাটির ঢেলার ন্যায় জড়, অপরের অধীন ও অস্থির, তার স্বজন-বন্ধুর রক্ষা ও পালন-পোষণ করার অহংকার হয় কী করে? ভেবে দেখো, তোমার পরিচর্যার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মৃত্যু তোমার স্বজনকে অধিকার করে নেয়, তখন তোমার জোর কোথায় থাকে? তোমার আত্মীয়রা যদি জীবিত থাকে এবং তাদের ভরণ-পোষণ কার্য অবশেষ থাকে তাহলেও তোমাকে এদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেউ যখন ইহজগৎ থেকে চলে যায়, তখন সে সেখানে সুখে থাকে, না দুঃখে? একথাও তুমি জানতে পারো না। তুমি মারা যাও অথবা জীবিত থাকো, তোমার আত্মীয়রা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে—এই কথা জেনে তোমার নিজের কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত হওয়া উচিত। সংসারে কে কার? ভালোভাবে তার বিচার করে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের মনকে মোক্ষে ব্যাপৃত করবে।

এখন পরবর্তী কথায় মন দাও—যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি জয় করেছেন, সেই সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই মুক্ত বলে বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি মোহগ্রস্থ হয়ে প্রমাদবশত জুয়া, মদ্যপান, স্ত্রীসংসর্গ এবং মৃগয়া ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাকেও মুক্ত বলা হয়। যে সর্বদা যোগযুক্ত হয়ে নারীতেও আত্মদৃষ্টি রাখে—তাকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখে না, সেই প্রকৃত অর্থে মুক্তপুরুষ। যে প্রাণীদের জন্ম, মৃত্যু এবং কর্মতত্ত্ব ঠিকমতো জানে, সেও এই জগতে মুক্ত হয়েই বিরাজ করে। যে বহু খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে নিজের জন্য ন্যূনতম আহার সংগ্রহ করে (অধিক সংগ্রহ করতে চায় না) এবং বিশাল প্রাসাদের মধ্যে নিজের জন্য ক্ষুদ্র শোয়ার জায়গা করে নেয়, সে মুক্ত হয়ে যায়। যে অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকে, যাকে মায়া ছুঁতে পারে না, যার কাছে পালঙ্ক ও ভূমিশয্যা একপ্রকার, যে রেশমী বস্ত্র, কুশনির্মিত কাপড় এবং বল্কলকে সমচক্ষে দেখে জগৎকে পাঞ্চভৌতিক বলে মনে করে এবং যার কাছে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, ইচ্ছা-দ্বেষ, ভয়-উদ্বেগ সবই সমান, সে সর্বতোভাবে মুক্ত। যে এই দেহকে রক্ত-মল-মূত্র এবং বহুদোষের আধার বলে মনে করে এবং কখনো ভোলে না যে বৃদ্ধ হলে লোলচর্ম হবে, চুল সাদা হবে, দেহ দুর্বল হবে, সৌন্দর্য চলে যাবে, চোখে ভালো দেখা যাবে না, শ্রবণশক্তি এবং প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে, সেই ব্যক্তি মোক্ষলাভ করে। ঋষি, দেবতা, অসুর সকলেই ইহলোক থেকে পরলোকে চলে গেছেন ; হাজার হাজার প্রভাবশালী রাজাকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়েছে—একথা সর্বদা যে স্মরণে রাখে, সে মুক্ত হয়ে যায়।

'জগতে ধন দুর্লভ এবং ক্লেশ সুলভ। আত্মীয়দের পালন পোষণ করতেও এখানে কষ্ট করতে হয়। শুধু তাই নয়, গুণহীন সন্তান এবং অবুঝ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হয়। এইভাবে জগতে কষ্টই বেশি দেখা যায়—এইসব জেনে কোন্ ব্যক্তি মোক্ষলাভ করতে চাইবে না ? শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞানলাভ করে যে ব্যক্তি জগৎকে অসার বলে মনে করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকারে মুক্ত। আমার কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে গৃহস্থাশ্রমে থাকো অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে ; সেখানেই মুক্তের ন্যায় আচরণ করো।'

অরিষ্টনেমির উপরিউক্ত উপদেশ শুনে রাজা সগর মোক্ষোপযোগী গুণাদিযুক্ত হয়ে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

—o—

রাজা জনককে পরাশর মুনির উপদেশ
(পরাশর গীতা)

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! অমৃত পান করলে যেমন মন ভরে না, তেমনই আপনার উপদেশ শুনেও আমার পূর্ণ তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই জিজ্ঞাসা করি পুরুষ কোন্ কর্ম করলে ইহলোকে ও পরলোকে পরম কল্যাণ লাভ করতে পারে ? কৃপা করে আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই ব্যাপারেও আমি তোমাকে পূর্বের মতো এক প্রাচিন প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি। একবার মহাযশস্বী রাজা জনক মহাত্মা পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুনিবর ! সমস্ত প্রাণীর জন্য ইহলোকে ও পরলোকে কোন কর্ম কল্যাণকর ?' রাজার প্রশ্ন শুনে তপস্বী পরাশরমুনি তাঁকে অনুগ্রহ করার জন্য বললেন—

(পরাশর মুনি বললেন)—রাজন্ ! ধর্ম আচরণই ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণকর হয়। ধর্মের শরণাগত মানুষই স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। সকল আশ্রমে স্থিত মানুষ

নিজ নিজ ধর্মে আস্থা রেখে স্ব-কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন। সংসারে জীবিকা নির্বাহের জন্য চার প্রকার জীবিকার বিধান আছে (ব্রাহ্মণদের জন্য দান গ্রহণ, ক্ষত্রিয়ের জন্য কর গ্রহণ, বৈশ্যদের জন্য কৃষিকর্ম এবং শূদ্রদের জন্য সেবা)। মানুষ যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে, সেই অনুযায়ী জীবিকাও সে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্বজন্মে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেনি, সে সুখ পায় না। দেহত্যাগের পর মানুষ পুণ্যকর্মের সুখই প্রাপ্ত হয়। আগের জন্মে যে কর্ম করা হয়নি, তার ফল পাওয়া যায় না। এই কথাই সর্বদা মনে রাখো যে (মন, বাক্য, চক্ষু ও হস্তের দ্বারা করা) চার প্রকারের কর্মই পরের জন্মে ফলের প্রাপ্তি করায়। লোকযাত্রা নির্বাহ এবং মনের শান্তির জন্য বৈদিক শ্লোকগুলিকে প্রমাণ বলে মানা হয়। মানুষ চক্ষু, মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা চার প্রকারের কর্ম করে থাকে, তার মধ্যে যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনই ফল পায়। কর্মের ফলরূপে কখনো সুখ, কখনো দুঃখ এবং কখনো দুই-ই প্রাপ্ত হয়। পাপ বা পুণ্য কর্ম যেমনই হোক, ফল ভোগ না করে তার বিনাশ হয় না। মানুষ যতক্ষণ পাপের ফলরূপ দুঃখভোগ থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ তার পুণ্য অক্ষয় হয়ে থাকে। পাপজনিত দুঃখের সমাপ্তি হলে জীব তার পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করতে শুরু করে। পুণ্যফল ভোগ সমাপ্ত হলে আবার পাপের ফল ভোগ শুরু হয়।

ইন্দ্রিয়সংযম, ক্ষমা, ধৈর্য, তেজ, সন্তোষ, সত্যভাষণ, লজ্জা, অহিংসা, দুর্বাসনের অভাব এবং দক্ষতা—এইসব গুণ সুখপ্রদানকারী। মানুষের আজীবন পাপ বা পুণ্যে আসক্ত না হয়ে নিজের মনকে পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। জীব অন্যের করা শুভ বা অশুভ কর্মের ফল ভোগ করে না। সে নিজে যে কর্ম করে, তারই ফল পায়। মানুষ যে কর্মের নিন্দা করে, সেই কর্ম করা কারো উচিত নয়, সে সেই কাজ করলে জগতে উপহাস্য হয়। ভীত ক্ষত্রিয়, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য বিচার না করে খাদ্য গ্রহণকারী এবং সত্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, বেরোজগারী বৈশ্য, অলস শূদ্র, শীলরহিত বিদ্বান, সদাচারবর্জিত কুলীন, দুরাচারিণী স্ত্রী, বিষয়াসক্ত যোগী, শুধুমাত্র নিজের জন্য খাদ্যপ্রস্তুতকারী মানুষ, মূর্খ বক্তা, রাজা বিহীন রাষ্ট্র এবং অজিতেন্দ্রিয়, স্নেহহীন রাজা—এরা সকলেই শোকের যোগ্য।

রাজন্ ! আয়ু দুর্লভ বস্তু, তা লাভ করে আত্মাকে নিম্নগামী করা উচিত নয়। পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাকে ঊর্ধ্বগামী করার চেষ্টা করা উচিত। পুণ্যকর্মের দ্বারাই মানুষ উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করে ; পাপীর কাছে যা অত্যন্ত দুর্লভ। অজান্তে যে পাপ হয়, তা তপস্যার দ্বারা বিনাশ করা উচিত। কারণ সেই পাপ পাপরূপ ফলই দেয়। সুতরাং দুঃখপ্রদানকারী পাপকর্ম কখনো করা উচিত নয়। পাপের ফল যে কী কষ্টদায়ক হয়, তা আমি জানি। তার দ্বারা প্রভাবিত মানুষ অনাত্মাতেই আত্মবুদ্ধি করে থাকে। রঙবিহীন বস্ত্র ধুলে সাদা হয়ে যায়, কিন্তু কালো রঙে রঞ্জিত বস্ত্র ধুলেও সাদা হয় না। পাপকেও তেমনই কালো রঙ বলে বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি জেনেশুনে পাপ করে পরে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শুভকর্ম করে, সে ওই দুটি কর্মের ফলই পৃথকভাবে ভোগ করে। না জেনে যে হিংসাকার্য হয়, অহিংসাব্রত পালন করলে তা দূর হয়। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে পাপ করা হয়, তা কখনো দূর করা যায় না—বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানগণ এই কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমি মনে করি পাপ বা পুণ্য জেনেশুনে করা হোক অথবা না জেনে, তার কিছু ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। দেবতা এবং মুনিরা যে কর্ম করেছেন, ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের তার অনুকরণ করা উচিত নয় এবং তার নিন্দাও করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি অত্যন্ত ভাবনা-চিন্তা করে 'এই কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে কি না' এই কথা স্থির করে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে, তাকে অবশ্যই কল্যাণকামী বুঝতে হবে।

সুতরাং রাজার উচ্চাকাঙ্ক্ষী শত্রুদের জয় করা উচিত। প্রজাদের ন্যায়পূর্বক পালন করবে, নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করবে এবং বৈরাগ্য ভাব উদয় হলে মধ্যম বা অন্তিম অবস্থায় বনে গিয়ে বাস করবে। রাজন্ প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয়সংযমী এবং ধর্মাত্মা হয়ে সমস্ত প্রাণীকে আপন ভাবা উচিত। যারা বিদ্যা, তপস্যা এবং অবস্থায় অপেক্ষাকৃত বড়, তাদের যথাশক্তি সম্মান করা উচিত। নরেন্দ্র ! সত্যভাষণ এবং ভালো ব্যবহারে সকলেই সুখ লাভ করে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দান করা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিগ্রহ নেওয়া—দুইয়ের মহত্ত্বই সমান, তা সত্ত্বেও প্রতিগ্রহ স্বীকার করার থেকে দাতা হয়ে দান করা অধিক পবিত্র বলে মনে করা হয়। যে ধন ন্যায়সংগতভাবে প্রাপ্ত এবং ন্যায়সংগত ভাবেই বৃদ্ধি লাভ করেছে, তা ধর্মের উদ্দেশ্যে রক্ষা করা উচিত—ধর্মশাস্ত্রের তাই সিদ্ধান্ত। যারা ধর্মকাঙ্ক্ষী, তাদের ক্রূর কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন করা

উচিত নয়। অধর্মের দ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি করার চিন্তা মনেও আনতে নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তি ঠান্ডা বা গরম জল পবিত্রভাবে অতিথিকে অর্পণ করে, সে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়ার সমান ফল প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা রাজা রন্তিদেব ফল-মূল-পত্র দ্বারা ঋষিদের পূজা করে যে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই সিদ্ধি সকলেরই অভিলষিত। মহারাজ শৈব্য ফল ও পত্রের দ্বারা মাঠের মুনিকে সন্তুষ্ট করে উত্তম-লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রত্যেক মানুষই দেবতা, অতিথি, ভৃত্যবর্গ এবং পিতৃলোক এমনকি নিজের কাছেও ঋণী হয়ে জন্মগ্রহণ করে ; তাই তার সেই ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। বেদাদির স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদের, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদের, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃকুলের এবং স্বাগত-সৎকার দ্বারা অতিথিদের ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এইরূপ বেদবাণীর শ্রবণ-মনন, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নগ্রহণ, জীবেদের রক্ষা করলে মানুষ সেই ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করে।

ঋষি-মুনিদের কাছে ধন ছিল না, তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজ সাধনা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁরা বিধিবদ্ধভাবে অগ্নিহোত্র করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অসিত, দেবল, নারদ, পর্বত, কক্ষীবান্, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, আত্মজ্ঞানী তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, হরিশ্মশ্রু, কুণ্ডধার এবং শ্রুতশ্রবা প্রমুখ মহর্ষি একাগ্রচিত্ত হয়ে ঋক্‌বেদের মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুর স্তব করেছিলেন এবং তাঁর কৃপাতেই তপস্যা করে উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যাঁরা পূজার যোগ্য ছিলেন না, তাঁরাও বিষ্ণুর স্তব করে উন্নত হয়ে তাঁকে লাভ করেছিলেন। ইহলোকে নিন্দনীয় আচরণ করে কারোরই উন্নতির আশা করা উচিত নয়। ধর্মপালন করে যে ধন লাভ হয়, তাই সত্যকার ধন। পাপাচারের দ্বারা প্রাপ্ত ধন ধিক্কারের যোগ্য। ধনের আশায় সনাতন ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। রাজেন্দ্র ! যে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করে সেই ধর্মাত্মা এবং পুণ্যাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কারণ সম্পূর্ণ বেদ (আহ্বানীয়, দক্ষিণ ও গার্হস্থ্য) তিন অগ্নির মধ্যে অবস্থিত। যার সদাচার কখনো লুপ্ত হয় না, সেই ব্রাহ্মণ (অগ্নিহোত্র না করলেও) অগ্নিহোত্রীই হয়ে থাকেন। সদাচার সম্পন্ন হলে অগ্নিহোত্র করা সম্ভব না হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সদাচার ত্যাগ করে কেবল অগ্নিহোত্র কখনো কল্যাণকর হয় না। অগ্নি, আত্মা, মাতা, জন্মদাতা পিতা এবং গুরু—এই সকলের যথাযোগ্য সেবা করা উচিত। যে অহং-অভিমান পরিত্যাগ করে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবা করে, বিদ্বান এবং কামনাহীন হয়ে সকলকে প্রিয়ভাবে দেখে, চাতুর্যরহিত হয়ে ধর্মাচরণ করে এবং অপরকে দমন করে না, সে-ই ইহলোকে শ্রেষ্ঠ এবং সৎব্যক্তিরাও তাকে সম্মান করেন।

শূদ্রের উত্তম বৃত্তি হল তিন বর্ণের সেবা করা। যদি ভক্তিভরে সে তা পালন করে তাহলে সে ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে। আমার মনে হয় ধর্মজ্ঞ সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকা সবসময়ই মঙ্গল, কিন্তু অসৎ ব্যক্তির সংসর্গ কোনোভাবেই ভালো নয়। সাধু ব্যক্তিদের কাছে থাকলে নীচ বর্ণের মানুষেরও মানসিক উন্নতি হয়। শ্বেত বস্ত্র যেমন যে কোনো রঙে রঞ্জিত করা যায়, সেইরূপ যেমন সঙ্গ করা হয়, তেমনই প্রভাব নিজের ওপর পড়ে। তাই গুণাদিতেই অনুরক্ত হওয়া উচিত, দোষাদিতে নয় ; কারণ মানুষের জীবন অনিত্য এবং চঞ্চল। যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ—উভয় অবস্থাতেই শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই শাস্ত্র-তত্ত্ব জানে। ধর্মের বিপরীত কর্ম যদি অধিক লাভদায়ক হয় তবুও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই কর্ম করা উচিত নয়। কারণ তাতে কখনো মঙ্গল হয় না। যে রাজা অপরের হাজার হাজার গাভী অপহরণ করে দান করে এবং প্রজাদের রক্ষা করে না, সে নামেই দাতা, দানের কোনো ফলই সে পায় না ; সেই রাজা প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠনকারী, রাজা নয়। যে রাজা ব্রাহ্মণদের সেবা ও দক্ষিণা প্রদান করার পর নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে, তার উত্তম ফল লাভ হয়। নিজে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করে যে দান করা হয়, তাকে সর্বোত্তম বলে মানা হয়। চাওয়ার পরে যে দান করা হয় বিদ্বানেরা তাকে মধ্যম দান বলেন এবং অবহেলা বা অশ্রদ্ধার সঙ্গে যা কিছু দেওয়া হয়, সত্যবাদী মুনিগণ সেই দানকে অধম বলে থাকেন। মানুষ সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে, নানা উপায়ের দ্বারা তার সর্বদা এর থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে হয়। অত্যন্ত কঠিন হলেও এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ জয়ের সাহায্যে, বৈশ্য অর্থদ্বারা এবং শূদ্র সেবার সাহায্যে

প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ থেকে প্রাপ্ত, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ জয় করে আনা, বৈশ্যের ন্যায়পূর্বক (কৃষিকার্যাদি হতে) প্রাপ্ত এবং শূদ্রের সেবাকার্যের দ্বারা পাওয়া অর্থ অল্প হলেও উত্তম বলে মনে করা হয়। সেই ধন যদি ধর্মকার্যে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা মহান ফল প্রদান করে। ব্রাহ্মণ যদি জীবিকার অভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের কর্মে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে পতিত হয় না ; কিন্তু শূদ্রের কর্ম করলে তখনই পতিত হয়। শূদ্র যদি সেবাকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে তাহলে সে ব্যবসা, পশুপালন বা শিল্পকলা ইত্যাদির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তাতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-গীত করা, মদ্য-মাংস বিক্রয় করা, লোহা বা চামড়া বিক্রি করা—এই সব কাজ নিন্দনীয়। শূদ্রেরও যদি পূর্ব পরম্পরা থেকে একাজ না হয়ে থাকে, তবে নিজে থেকে এই কাজ আরম্ভ করা উচিত নয়। যার গৃহে পূর্ব থেকে এই কাজ চলে আসছে, তারও এগুলি ত্যাগ করলে মহাধর্ম হয়। সিদ্ধিলাভ করার পর যদি কোনো ব্যক্তি অহংকারবশত পাপাচরণ করতে থাকে, তবে তার অনুকরণ করা উচিত নয়। পুরাণে উল্লিখিত আছে, পূর্বে অধিকাংশ লোকই সংযমী, ধার্মিক এবং ন্যায় অনুসরণকারী ছিল। সেইসময় অপরাধীদের শুধুমাত্র ধিক্কারই দণ্ডরূপে দেওয়া হত। জগতে মানুষের মধ্যে সর্বদা ধর্মেরই প্রশংসা করা হত। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সদগুণেরই পূজা করতেন ; কিন্তু ধর্মের এই প্রচার অসুরদের সহ্য হল না। তারা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সমস্ত প্রজার দেহে ছড়িয়ে পড়ল। তখন প্রজাদের মধ্যে ধর্মনাশকারী দর্পের (অহংকারের) প্রাদুর্ভাব হল। দর্পের পরে ক্রোধ উৎপন্ন হল। ক্রোধে আক্রান্ত হওয়ায় তাদের লজ্জা দূর হল এবং বিনয়যুক্ত সদাচার লুপ্ত হল। তারপর মোহ বৃদ্ধি হল, মোহের ফলে তাদের পূর্বের মতো বিচারশক্তি থাকল না, সকলেই নিজ নিজ সুখের জন্য অপরকে কষ্ট দিতে লাগল। তখন তাদের সঠিকপথে আনতে ধিক্কার দণ্ড আর উপযুক্ত ছিল না। সব মানুষই দেবতা ও ব্রাহ্মণদের অপমান করে ইচ্ছামতো আচরণ করতে লাগল।

সেই অবস্থায় সমস্ত দেবতা ভগবান শংকরের শরণাগত হলেন। তখন শিব দেবতাদের তেজে প্রবল একটি বাণে তিন নগরসহ আকাশে বিচরণশীল সমস্ত অসুরদের নাশ করে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। সেই অসুরদের রাজা ভীষণ আকারসম্পন্ন, পরাক্রমশালী ছিল। দেবতারা তাকে অত্যন্ত ভয় পেতেন ; কিন্তু ভগবান শূলপাণি তাকেও মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিলেন। তার মৃত্যু হলে সব মানুষই প্রকৃতিস্থ হয়ে পূর্বের মতোই বেদ ও শাস্ত্রের জ্ঞাতা হয়ে উঠল। তারপর সপ্তর্ষিগণ ইন্দ্রকে স্বর্গে দেবতাদের রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং তাঁরা মানুষের শাসনকার্যে ব্যাপৃত হলেন। সপ্তর্ষির পর বিপৃথু নামক রাজা ভূমণ্ডলের প্রভু হলেন এবং আরও বহু ক্ষত্রিয় ছোটো ছোটো মণ্ডলের অধিপতি হলেন।

তাই আমি শাস্ত্রানুসারে যথাযথ চিন্তা করে বলছি, মানুষের অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা উচিত, হিংসাত্মক কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্ম করার জন্য ন্যায় পরিত্যাগ করে পাপাশ্রিত পথে যেন অর্থ সংগ্রহ না করে ; কারণ তাতে তার কল্যাণ হয় না। রাজন্! তুমিও এইভাবে জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয় হয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার বজায় রেখে প্রজা, ভৃত্য এবং পুত্রদের স্বধর্ম অনুসারে পালন করো। ইষ্ট-অনিষ্টলাভ, শত্রুতা-ভালোবাসা অনুভব করতে করতেই হাজার হাজার জন্ম কেটে যায়। তাই তুমি (যদি কল্যাণ চাও, তাহলে) সদগুণের প্রতি অনুরাগ করো, দোষে নয়। মহারাজ ! মানুষের যেমন ধর্ম-অধর্মে প্রবৃত্তি হয়, তেমন মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে হয় না। ধর্মপরায়ণ বিদ্বান সকলকেই আত্মভাবে দেখে জগতে বিচরণ করে। কোনো জীবকে হিংসা করা উচিত নয়। মানুষের মন যখন কামনা ও সংস্কাররহিত এবং অসত্য থেকে দূরে চলে যায়, তখন সে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

গৃহস্থাশ্রমে মানুষের গোধন, কৃষিকার্য, ধন-দৌলত, স্ত্রী-পুত্র এবং ভৃত্যের সঙ্গে সম্পর্ক হয় এবং এইভাবে প্রবৃত্তিমার্গে থেকে সে প্রতিদিন এগুলির সংস্পর্শে আসে ; কিন্তু এইগুলির অনিত্যতা না জানায় তার মনে মায়া-মমতা রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসবের বশীভূত হয়ে মানুষ যখন বস্তুতে আসক্ত হয়, তখন মোহের কন্যা রতি এসে তাকে বশীভূত করে ফেলে। রতির উপাসনাকারী ভোগী ব্যক্তিকেই সকলে কৃতার্থ বলে মনে

করে এবং রতির দ্বারা যে বিষয় সুখ লাভ করা যায়, অন্য কোনো সুখকে সে তার থেকে বড় বলে মনে করে না। তখন তার মনে লোভ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সে আসক্তির বশে নিজের পরিজনের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে, তাদের পালন-পোষণের জন্য ধন বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে। মানুষ যদিও জানে কোন কাজ খারাপ, তা সত্ত্বেও সে অর্থের জন্য সেই কাজই করে থাকে এবং সন্তানের স্নেহে আবদ্ধ থাকায় পরিবারের কারো মৃত্যু হলে সে তার জন্য শোকমগ্ন হয়ে পড়ে। অর্থের জন্য যখন জগতে তার সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় তখন সে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে যাতে অর্থ নষ্টের ফলে তার সম্মানও না নষ্ট হয়ে যায়। ভোগবিলাসের সামগ্রীতে অধিকার লাভের জন্য যা কিছু প্রয়োজন বলে মনে করে, সে সময় নষ্ট না করে তাই করে থাকে। এভাবে একদিন সে নিজেই শেষ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যারা শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে এবং তাতে সুখলাভের আশা করে না, সেই সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মবাদী পুরুষেরাই সনাতন পদ লাভ করে। সংসারী জীবেদের যখন তাদের স্নেহ সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুত্রাদির জীবনাবসান হয়, অর্থনাশ হয় অথবা রোগ ও চিন্তার জন্য কষ্ট ভোগ করতে হয়। তখনই তাদের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য থেকে আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা আসে। জিজ্ঞাসার দ্বারা শাস্ত্রাদির স্বাধ্যায়ে মন নিবিষ্ট হয়, স্বাধ্যায়ের দ্বারা তাদের মনে হয় যে তপস্যাই কল্যাণের সাধন। রাজন্ ! জগতে এরূপ বিবেকবান মানুষ দুর্লভ, যে স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির সুখে উদাসীন হয়ে (শ্রেয়-প্রাপ্তির জন্য) তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়া স্থির করে। তপস্যায় সকলের অধিকার থাকে, হীন বর্ণের জন্যও (তাদের অধিকার অনুযায়ী) তপস্যার বিধান আছে ; তপস্যাই জিতেন্দ্রিয় এবং মনোনিগ্রহসম্পন্ন পুরুষকে স্বর্গের পথে নিয়ে যায়। পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মপরায়ণ থেকে ব্রতে স্থিত হয়ে তপস্যার দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, সাধ্য, পিতৃগণ, মরুদ্গণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং অন্যান্য স্বর্গবাসী দেবতাগণ তপের সাহায্যেই সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছিলেন। ব্রহ্মা পূর্বে যেসব (মরিচী মুখ্য) ব্রাহ্মণদের উৎপন্ন করেছিলেন, তাঁরা তপস্যার প্রভাবেই পৃথিবী ও আকাশকে পবিত্র করে সর্বত্র বিচরণ করতেন। মর্তলোকে যেসব গৃহস্থ রাজা-মহারাজাদের উত্তম কুলে জন্মাতে দেখা যেত, সেসব তাঁদের তপস্যার ফল। ত্রিভুবনে এমন কোনো বস্তু নেই, যা তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায় না।

সুতরাং মানুষ সুখেই থাক বা দুঃখে, মন ও বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্র বিচার করে লোভ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অসন্তোষ দ্বারা দুঃখ হয়। লোভের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়তে ভ্রান্তি হয়। ভ্রান্তি হলে অনভ্যাসজনিত বিদ্যার ন্যায় মানুষের বুদ্ধি নাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হলে তার বিবেক নষ্ট হয়ে যায় ; তাই দুঃখের অবস্থায় মানুষকে উগ্র তপস্যা করতে হয়। যা নিজের প্রিয় বলে মনে হয়, তাকে সুখ বলা হয় এবং যা মনের প্রতিকূল, তাকে দুঃখ বলা হয়। তপস্যা করলে সুখ এবং না করলে দুঃখ হয়। এইরূপ তপ করা এবং না করার যে ফল, তাও তুমি ভালোভাবে জেনে নাও। যে ব্যক্তি পাপরহিত তপস্যা করে, সে সর্বদা কল্যাণভাগী হয় এবং যে ব্যক্তির ধর্ম, তপ ও দান করার ইচ্ছা হয় না, পাপাচরণ করে সে নরকে পতিত হয়। মানুষ সুখে হোক অথবা দুঃখে—যে কখনো সদাচার থেকে বিচ্যুত হয় না, তাকেই শাস্ত্রদর্শী বলে মান্য হয়। একটি বাণ ধনুক থেকে ছুঁড়ে মাটিতে পড়তে যত সময় লাগে, সেইটুকু সময় ধরে স্পর্শেন্দ্রিয়, জিহ্বা, চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণের বিষয়ে সুখ হয়। সেই সুখ যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন মনে বড় বেদনা অনুভব হয়। এইটুকুর জন্যই অজ্ঞ ব্যক্তি (বিষয় সুখে লিপ্ত থাকে ; তারা) সর্বোত্তম মোক্ষসুখের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সর্বদা ধর্মপালনকারী মানুষের কখনো অর্থ বা ভোগের অভাব হয় না ; সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তির বিনা দ্বন্দ্বে প্রাপ্ত বিষয়ই ভোগ করা উচিত। আমার বিচারে স্বধর্মযুক্ত উপার্জনের জন্যই চেষ্টা করা উচিত। উত্তম কুলে জাত, সম্মানিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং অক্ষমতার জন্য ধর্ম-কর্মরহিত এবং আত্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও লৌকিক কর্ম যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন তপস্যা ব্যতীত এমন কোনো কর্ম নেই যা তাদের অক্ষয় ফল প্রদান করতে পারে। গৃহস্থদের সর্বদা নিজ কর্তব্যে স্থির থেকে স্বধর্ম পালন করে কুশলতাপূর্বক যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম করা উচিত। সমস্ত নদ-নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনই সমস্ত আশ্রমবাসী গৃহস্থদের সহায়তাতেই জীবন ধারণ করে থাকে।

———০———

রাজা জনকের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন এবং পরাশর মুনির দ্বারা তার সমাধান
(পরাশর গীতা)

রাজা জনক বললেন—মুনিবর ! আপনি আমাকে প্রথমে বর্ণের বিশেষ ধর্মের কথা বলুন ; পরে সাধারণ ধর্মের বিষয়েও জানাবেন ; কারণ আপনি সর্ব বিষয় বর্ণনায় কুশল।

পরাশর মুনি বললেন—রাজন্ ! ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম হল—দান গ্রহণ, যজ্ঞ করানো এবং অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়ের উত্তম ধর্ম হল প্রজা রক্ষা করা। বৈশ্যের প্রধান ধর্ম হল কৃষিকার্য, গোরক্ষা এবং ব্যবসায়। শূদ্রদের প্রধান ধর্ম এবং কর্ম হল দ্বিজাতির সেবা। বর্ণগুলির বিশেষ ধর্মের কথা জানানো হল, এবার এদের সাধারণ ধর্মের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে শোনো। দয়া, অহিংসা, সতর্কতা, দান, শ্রাদ্ধকর্ম, অতিথি সৎকার, সত্য, অক্রোধ, নিজ পত্নীতে সন্তুষ্ট চিত্ত, পবিত্রতা বজায় রাখা, কারো দোষ না দেখা, আত্মজ্ঞান ও সহনশীলতা—এসবই সাধারণ ধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলা হয় ; উপরিউক্ত ধর্মে এই তিন বর্ণের সমান অধিকার। এই তিন বর্ণের মানুষ বিপরীত কর্মের আচরণ করলে পতিত হয় এবং নিজ বর্ণোচিত কর্মে স্থিত থাকলে উন্নতি প্রাপ্ত করে। শূদ্র জাতির জন্য কোনো বৈদিক সংস্কারের বিধান নেই। তাদের বেদোক্ত কর্ম করারও অধিকার নেই ; কিন্তু পূর্বোক্ত সাধারণ ধর্মে তাদের জন্য কোনো নিষেধ করা হয়নি। হীন বর্ণের মানুষেরা যদি নিজেদের মুক্তি চায়, তাহলে সদাচার পালন করে আত্মাকে উন্নত করবার সমস্ত ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করা উচিত নয়। নিম্নবর্ণের মানুষেরা যেমনই সদাচার পালন করতে থাকে, তেমনই ইহলোক ও পরলোকে সুখ ও আনন্দ ভোগ করতে থাকে।

রাজা জনক জিজ্ঞাসা করলেন—মহামুনে ! মানুষ নিজ কর্মের জন্য দোষের ভাগী হয়, না জাতির জন্য ? আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়েছে, আপনি এর সমাধান করুন।

পরাশর বললেন—মহারাজ ! কর্ম এবং জাতি দুইই যে দোষকারক এতে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু এতে যে বিশেষ তত্ত্ব আছে, তা বলছি, শোনো—জাতি ও কর্মের মধ্যে কোনোটির সাহায্যেই মন্দ কর্ম করা উচিত নয়। দূষিত (চণ্ডালাদি) জাতি হয়েও যে পাপ করে না, সেই ব্যক্তি পাপভাগী হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি উত্তম জাতিতে জন্মগ্রহণ করেও নিন্দনীয় কর্ম করে, সেই কর্ম তাকে দূষিত করে তোলে ; সুতরাং নীচজাতির থেকে নীচ কর্মই বেশি খারাপ।

জনক জিজ্ঞাসা করলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এই জগতে এমন কোনো ধর্মানুকূল কর্ম আছে, যাতে কখনো কোনো প্রাণীর ক্ষতি না হয় ?

পরাশর বললেন—মহারাজ ! যে কর্ম অহিংস এবং সর্বদা মানুষকে রক্ষা করে, আমি সেগুলি বলছি, শোনো। যারা অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে উদাসীনভাবে সব কিছুকে অবলোকন করে তারা সর্বপ্রকার চিন্তারহিত হয়ে ক্রমশ কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় এবং প্রশ্রয়, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম ও উত্তম ব্রতযুক্ত হয়ে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে জরা-মৃত্যুরহিত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়। রাজন্ ! সকল বর্ণের লোকেরা যদি হিংসা-প্রধান কর্ম ত্যাগ করে ধর্ম পালন এবং সত্যভাষণ করতে থাকে, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে স্বর্গ লাভ করতে সক্ষম হয়।

যে ব্যক্তি পিতা, মিত্র, গুরু ও পত্নীর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করে না, সেই গুণহীন ব্যক্তি পিতা প্রভৃতির কাছ থেকে কোনো সুখ পায় না ; কিন্তু যে তাঁদের অনন্য ভক্ত, প্রিয়বাদী, হিতসাধনে তৎপর এবং তাঁদের আজ্ঞাবহনকারী, সে পিতা এবং গুরুজনের সেবার যথাযোগ্য ফল অবশ্যই লাভ করে। পিতা মানুষের সবথেকে বড় দেবতা, জ্ঞান প্রাপ্তি সব থেকে বড় লাভ এবং যে ইন্দ্রিয়াদি ও তার বিষয়সমূহ জয় করেছে, সেই পরমাত্মাকে লাভ করে। ক্ষত্রিয় বালক যদি রণাঙ্গনে আহত হয়ে বাণের চিতায় ভস্ম হয়, তাহলে সে দেবদুর্লভ লোকে গমন করে এবং সেখানে সর্বপ্রকারে স্বর্গ সুখ ভোগ করে। রাজন্ ! যে যুদ্ধ করে ক্লান্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত, যে অস্ত্রত্যাগ করেছে, ক্রন্দনশীল, যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, যার কাছে যুদ্ধের কোনো সাজ সরঞ্জাম নেই, যে যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছে, রুগ্ন, প্রাণভিক্ষা করছে এবং বালক বা বৃদ্ধ—এদের বধ করা উচিত নয়। তবে, যার কাছে যুদ্ধ করার সাজ সরঞ্জাম থাকে, যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং নিজের সমকক্ষ, সেই ক্ষত্রিয়কে পরাজিত করার চেষ্টা করা উচিত। নিজের সমান এবং নিজের থেকে বড় বীরের হাতে প্রাণবিসর্জন

দেওয়াকে সম্মানের বলা হয়। নিজের থেকে দুর্বল, কাতর অথবা দীন পুরুষের কাছে মৃত্যুবরণ করা নিন্দনীয়। কারণ পাপী এবং অধম শ্রেণীর মানুষের হাতে যে মৃত্যুবরণ করে, তাকেও পাপী বলে মনে করা হয়। মৃত্যুমুখে যে পতিত হয়েছে, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু যার আয়ু বর্তমান, তাকে কেউ বধ করতে পারবে না। যেসব গৃহস্থ মৃত্যুর পর শুভ ফল চায়, তাদের কোনো পবিত্র নদীতীরে শুভকর্ম করার কালে মৃত্যু হলে, তা সব থেকে উত্তম মৃত্যু বলে মানা হয়।

জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যেসব জীব চলাফেরা করতে পারে, তাদের শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। এদের মধ্যে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ। দ্বিজদের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধিমানদের মধ্যে বিচারকুশলদের শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। এদের মধ্যে যারা অহং-অভিমানবর্জিত, তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। সূর্যের উত্তরায়ণে উত্তম নক্ষত্র এবং পবিত্র মুহূর্তে যার মৃত্যু হয়, তাকে পুণ্যাত্মা বলে জানবে ; সে কাউকে কষ্ট না দিয়ে (প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা) নিজ পাপ বিনাশ করে এবং সামর্থ্য অনুসারে শুভকর্ম করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে। বিষপান করে, গলায় দড়ি দিয়ে, আগুনে পুড়ে, ডাকাতের হাতে বা হিংস্র পশুর আঘাতে যে মৃত্যু হয়, সেগুলিকেও অধম শ্রেণীর মনে করা হয়। পুণ্যকর্মকারী মানুষ এইভাবে প্রাণ বিসর্জন করে না। রাজন্ ! পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হয়। যার মধ্যে পুণ্যের ভাগ অর্ধেক অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য দুই-ই যুক্ত, তার প্রাণ মধ্যদ্বার (অর্থাৎ মুখ, চোখ ইত্যাদি) দিয়ে নির্গত হয়ে যায় ; আর যে ব্যক্তি শুধুই পাপকার্য করে তার প্রাণ অধোমার্গ (অর্থাৎ পায়ু) দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়।

পুরুষের একটি মাত্র শত্রু, যার মতো আর কিছু নেই, তা হল অজ্ঞান ; যার দ্বারা আবৃত ও প্রেরিত হয়ে মানুষ অত্যন্ত কঠোর কর্ম করতে থাকে। সেই শত্রুকে পরাজিত করতে সেই সক্ষম, যে বেদোক্ত ধর্মপালনপূর্বক বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবা করে প্রজ্ঞা (স্থির বুদ্ধি) লাভ করে ; কারণ অজ্ঞানময় শত্রু জয় করা চেষ্টাসাধ্য ব্যাপার, যেটি প্রজ্ঞারূপ বাণের আঘাতেই বিনাশলাভ করে। দ্বিজের প্রথমে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থেকে বেদাধ্যয়ন এবং তপস্যা করা উচিত। পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে নিজ শক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা উচিত। তারপর নিজ পুত্রকে ঘর-পরিবার রক্ষায় নিযুক্ত করে কল্যাণ পথে স্থিত হয়ে ধর্মপালনের জন্য বাণপ্রস্থ অবলম্বন করা উচিত।

রাজন্ ! মনুষ্য জন্মই এরূপ অদ্বিতীয়, যা লাভ করে শুভকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার উদ্ধার করা সম্ভব। এমন কী কাজ করা যায়, যাতে আমাদের এই মনুষ্যজন্ম থেকে পতিত না হতে হয়—এই চিন্তা করে এবং বৈদিক প্রমাণগুলি বিচার করে সকলেরই ধর্মানুষ্ঠান করা উচিত। এই দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করেও যারা অপরকে হিংসা করে এবং ধর্মের অনাদর করে ও কামনাশক্ত হয়ে পড়ে, তারা মহালাভ থেকে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে এবং সকলকে অন্নদান করে, মিষ্ট বাক্য বলে, সকলের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, সে পরলোকে সম্মানিত স্থান লাভ করে। রাজন্ ! সরস্বতী নদী, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র, পুষ্কর ক্ষেত্র এবং পৃথিবীতে আরও যেসব পবিত্র তীর্থ আছে, সেখানে গিয়ে দান করবে, শান্তভাবে থাকবে এবং তপস্যা ও তীর্থবারির দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করবে। মানুষ তার শক্তি অনুসারে ইষ্টি, পুষ্টি (শান্তিকর্ম), যজন, যাজন, দান, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি যেসব উত্তম কার্য করে, তা সে নিজের জন্যই করে। ধর্মশাস্ত্র এবং ষড়ঙ্গবেদ পুণ্যকর্মকারী মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্মোপদেশ দেয়।

ভীষ্ম বললেন—মহাত্মা পরাশর মুনি যখন মিথিলা নরেশকে এই সব উপদেশ প্রদান করেন, তখন তিনি তাঁকে আবার প্রশ্ন করেন—

রাজা জনক জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! শ্রেয়ের সাধন কী ? উত্তমগতি কাকে বলে ? কোন্ কর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয় না এবং কোথায় গেলে জীবকে আর ফিরে আসতে হয় না ?

পরাশর বললেন— শ্রেয়ের মূল হল অনাসক্তি এবং জ্ঞান। জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত গতিই সর্বাপেক্ষা উত্তম গতি। নিজের করা তপ এবং সুপাত্রকে দান—এগুলি কখনো নষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি অধর্মের বন্ধন উচ্ছেদ করে ধর্মে অনুরক্ত হয় এবং সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করে, সে উত্তম সিদ্ধি লাভ করে। যে একহাজার গাভী ও একশত ঘোড়া দান করে অথবা সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান করে—এদের মধ্যে অভয়দানকারীই শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিষয়াদির মধ্যে বাস করলেও তাতে (আসক্তিবিহীন হওয়ায়) লিপ্ত হন না ; কিন্তু যার বুদ্ধি দূষিত, সে বিষয়ের মধ্যে না থাকলেও তাতে লিপ্ত হয়ে থাকে। জল যেমন পদ্মপত্রে স্থির

থাকে না, তেমনই অধর্ম জ্ঞানী পুরুষকে লিপ্ত করতে পারে না ; কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তিকেই পাপ বিশেষভাবে আশ্রয় করে। অধর্ম ফলপ্রদানের জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করে, তা কখনো কর্তাকে ত্যাগ করে না। সময় এলে সেই পাপের ফল তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। প্রমাদবশত যে ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা কৃত পাপের বিচার করে না এবং শুভ-অশুভ কাজে আসক্ত থাকে, সে মহাভয় প্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে যে বীতরাগ হয়ে ক্রোধ জয় করে এবং সদাচার পালন করে, সে বিষয়ের মধ্যে থেকেও পাপ করে না। নদীর ধারার সামনে বাঁধ দিলে যেমন জল বাড়তে থাকে, তেমনই যে ধর্মের বন্ধনে মর্যাদায় আবদ্ধ থাকে তার শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাকে কখনো দুঃখ পেতে হয় না। শুদ্ধ সূর্যকান্তমণি যেভাবে সূর্যের তেজগ্রহণ করে, সাধকও সেইভাবে সমাধি দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ গ্রহণ করেন। যেমন তিলের তেল নানাপ্রকার সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে মনোরম গন্ধ গ্রহণ করে, তেমনই শুদ্ধচিত্ত পুরুষদের সত্ত্বগুণ সৎপুরুষদের সঙ্গগুণে বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু যার বুদ্ধি বিষয়ে আসক্ত হয়, তার কোনোভাবে নিজের হিতের জ্ঞান থাকে না। মানুষের জন্য ধর্ম করার কোনো বিশেষ সময় নির্দিষ্ট নেই, কারণ মৃত্যু কারো জন্যই অপেক্ষা করে না। মানুষ যখন সর্বদা মৃত্যুর মুখেই থাকে, তখন তার সর্বদা ধর্ম-আচরণ করাই শোভনীয়। অন্ধব্যক্তি যেমন প্রতিদিন অভ্যাসবশত সতর্কতার সঙ্গে নিজ গৃহে ফিরে আসে, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তি যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা সেই পরমগতি লাভ করেন। জন্মে মৃত্যু এবং মৃত্যুতে জন্ম নিহিত থাকে। যে মোক্ষ-ধর্ম জানে না, সেই অজ্ঞান ব্যক্তি জগৎ-সংসারে আবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়। জ্ঞানমার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি ইহলোকেও সুখ পায়, পরলোকেও বিস্তার (অর্থাৎ অগ্নিহোত্র এবং বৃহদ-যাগযজ্ঞাদি কর্ম) ক্লেশসাধ্য এবং সংক্ষেপ (অর্থাৎ ত্যাগ ইত্যাদি সাধন) সুখপূর্বক করা যায়। এরমধ্যে কর্মবিস্তার পরার্থ—অনাত্মভূত স্বর্গলোক প্রাপ্ত করায় ; কিন্তু ত্যাগকে (সংক্ষেপ) আত্মার কল্যাণকারী বলে মান্য হয়।

যেমন (জল থেকে তোলার সময়) পদ্মের ডাঁটিতে লেগে থাকা ময়লা শীঘ্রই ধুয়ে যায়, তেমনই ত্যাগী পুরুষের আত্মা মনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মন আত্মাকে যোগের দিকে নিয়ে যায় এবং যোগী এই মনকে যোগযুক্ত (আত্মাতে লীন) করে। এইভাবে যখন সে যোগে সিদ্ধিলাভ করে, তখন তার পরমাত্মার দর্শন প্রাপ্তি হতে থাকে। যে ব্যক্তি এই বাহ্য ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্য বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হয়ে সেগুলিকেই নিজের প্রধান কাজ বলে মনে করে, সে নিজ প্রকৃত কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়। যে বিষয়ভোগে আসক্ত থাকে, সে কখনো মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু যে ভোগাদি ত্যাগ করে, সেই মুক্ত হবার সিদ্ধান্ত নেয়। জন্মান্ধ যেমন কখনো রাস্তা দেখতে পায় না, তেমনই কামাসক্ত ব্যক্তি মায়ারূপ কুয়াশায় আবৃত থাকায় মোক্ষের পথ দেখতে পায় না। দিন ও রাত্রিময় সংসারে বৃদ্ধত্বের রূপ ধারণ করে মৃত্যু সমস্ত প্রাণীকে গ্রাস করতে থাকে। জীব জগতে জন্মলাভ করে নিজ পূর্বকৃত কর্মফলই ভোগ করে থাকে। মানুষ যখনই যে কর্ম করে, তার শুভাশুভ কর্ম সর্বদা তার সঙ্গে থাকে। সমুদ্রে যেমন সবদিক থেকে নদী এসে মিশে যায়, তেমনই মন যোগের বশীভূত হয়ে মূলপ্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়।

যার মন নানাপ্রকার স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, সেই অজ্ঞান বশীভূত জীব বালির বাঁধের ন্যায় ভেঙে পড়ে। যে দেহধারী ব্যক্তি এই দেহকেই ঘর-বাহির—ভিতরের পবিত্রতাকেই তীর্থ মনে করে জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করে, সেই ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করে। কোনো না কোনো বাসনা নিয়েই লোক বন্ধু হয়, আত্মীয়েরাও কোনো কারণবশতই সম্পর্ক রাখে, শুধু তাই নয় স্ত্রী-পুত্র-অনুচরগণও অর্থের আকাঙ্ক্ষা করে। মাতা-পিতাও কাউকে কিছু দেন না। নিজকৃত দানই পরলোকের পথে পাথেয়র কাজ করে। প্রত্যেক প্রাণীই নিজ কর্মের ফলই ভোগ করে। পূর্বজন্মের করা সমস্ত শুভাশুভ কর্ম জীবকে নিয়ত অনুসরণ করে। কর্মফল উপস্থিত জেনে অন্তরাত্মা নিজ বুদ্ধিকে সেই অনুযায়ী প্রেরণা দান করে। যে পূর্ণ উদ্যোগের সাহায্যে সেই অনুযায়ী সাহায্যকারী সংগ্রহ করে, তার কোনো কাজই অপূর্ণ থাকে না।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! জ্ঞানী মহাত্মা পরাশর মুনির শ্রীমুখ হতে এই যথার্থ উপদেশ শুনে ধর্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ রাজা জনক অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

সাধ্যগণকে হংসের উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জগতে বিদ্বানেরা সত্য, দম, ক্ষমা এবং প্রজ্ঞার প্রশংসা করেন ; এই বিষয়ে আপনার কী মত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই ব্যাপারে সাধ্যগণের সঙ্গে হংসের যে আলোচনা হয়েছিল, সেই পুরানো বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। এক সময় নিত্য অজ প্রজাপতি হংসের স্বরূপ ধারণ করে ত্রিলোকে বিচরণ করছিলেন, নানা স্থানে ভ্রমণের পর তিনি সাধ্যগণের কাছে পৌঁছলেন।

সেই সময় সাধ্যগণ তাঁকে বললেন—হংস ! আমরা সাধ্যদেবতা, আপনাকে মোক্ষধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই : কারণ আপনি মোক্ষতত্ত্বের জ্ঞাতা। মহাত্মন্ ! আমরা শুনেছি আপনি পণ্ডিত এবং ধীর বক্তা। আপনার উত্তম বাণী (অথবা কীর্তি) সর্বত্র প্রচারিত। তাই জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু কী ? আপনার মন রমণ করে কোথায় ? পক্ষীরাজ ! সর্বকার্যের মধ্যে যে কাজ আপনি সব থেকে উত্তম বলে মনে করেন এবং যে কাজ করলে জীব সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে শীঘ্র মুক্তি লাভ করে, আমাদের সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

হংস বললেন—অমৃত পানকারী দেবতাগণ ! আমি শুনেছি যে তপ, ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যভাষণ এবং মনোনিগ্রহ ইত্যাদি কাজই সর্বাপেক্ষা উত্তম। হৃদয় উন্মুক্ত করে প্রিয় এবং অপ্রিয়কে বশীভূত করবে (অর্থাৎ তাদের জন্য আনন্দ বা শোক করবে না)। কারো মনে দুঃখ দেবে না, অপরকে নিষ্ঠুর বাক্য বলবে না, নীচ ব্যক্তির কাছ থেকে শাস্ত্রের কথা শুনবে না, যে কথা শুনে অন্যের উদ্বেগ বৃদ্ধি হয় সেরূপ অমঙ্গলময় কথা বলবে না। বাক্যরূপ বাণ মুখ থেকে নির্গত হলে তার আঘাতে মানুষ দিন রাত শোকমগ্ন হয়ে থাকে। সেই বাণ অপরের মর্মে আঘাত করে, তাই বিদ্বান ব্যক্তির কারো ওপর বাক্যবাণ প্রয়োগ করা উচিত নয়। অন্য কেউ যদি বিদ্বান ব্যক্তিকে কটু বাক্যের দ্বারা আহত করে, তাহলেও তাঁর শান্ত থাকা উচিত। অপরের ক্রোধেও যে ব্যক্তি প্রসন্ন থাকে, সে সেই ক্রোধী ব্যক্তির পুণ্য অধিকার করে নেয়। যে ব্যক্তি জগতে নিন্দা সৃষ্টিকারীর প্রতিও শান্ত এবং প্রসন্ন থাকে, যে অন্যের দোষ দেখে না, সেই ব্যক্তি তার ওপর ঈর্ষাকারী ব্যক্তির পুণ্য লাভ করে। আর্যব্যক্তিগণ ক্ষমা, সত্য, সরলতা এবং দয়াকে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। বেদাধ্যয়নের ফল হল সত্যভাষণ, তার ফল ইন্দ্রিয়সংযম এবং ইন্দ্রিয়সংযমের ফল হল মোক্ষ। সমস্ত শাস্ত্রের এই আদেশ। যার বাক্য, মন, ক্রোধ, তৃষ্ণা, উদর ও জননেন্দ্রিয়ের প্রচণ্ড বেগ সহ্য করে নেয়, তাকেই আমি ব্রাহ্মণ ও মুনি বলে মেনে নিই। ক্রোধীর থেকে অক্রোধী, অসহনশীল থেকে সহনশীল, অমানুষ থেকে মানুষ এবং অজ্ঞানীর থেকে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি একজনের গালি শুনেও পরিবর্তে তাকে গালি দেয় না, সেই ক্ষমাশীল ব্যক্তির অবদমিত ক্রোধ, গালি যে দেয় তাকে ভস্ম করে ফেলতে পারে এবং তার পুণ্যও নিয়ে নেয়। অপরের মুখে কঠোর বাক্য শুনেও যে ব্যক্তি তাকে কঠোর বা প্রিয় বাক্য বলে না এবং কারো কাছে মার খেয়েও যে তাকে মারে না বা তার খারাপ চায় না, সেই মহাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দেবতারাও সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। পাপকারী ব্যক্তি অবস্থায় নিজের থেকে বড় হোক বা সমকক্ষ, তার দ্বারা অপমানিত হয়ে, মার খেয়ে, কটুবাক্য শুনেও তাকে ক্ষমা করা উচিত। তাহলে সেই ব্যক্তি পরম সিদ্ধি লাভ করে।

যদিও আমি সর্বভাবে পূর্ণ (কোনো কিছু জানার বা পাওয়ার আমার আর বাকি নেই), তা সত্ত্বেও আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গ করে থাকি। আমি তৃষ্ণা বা ক্রোধের বশীভূত নই। আমি লোভের বশে ধর্মকে অতিক্রম করি না এবং

বিষয় আকাঙ্ক্ষায় কোথাও যাই না। কেউ আমাকে অভিশাপ দিলেও আমি তাকে শাপ দিই না ; ইন্দ্রিয়সংযমকেই আমি মোক্ষের দ্বার মনে করি। এখন তোমাদের এক অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলছি, শোনো—মনুষ্যজন্মের থেকে বড় জন্ম আর কিছুই নেই। চাঁদ যেমন মেঘের আবরণ মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়, তেমনই পাপ মুক্ত শুদ্ধচিত্ত পুরুষ ধৈর্যপূর্বক কালের প্রতীক্ষা করে থাকে, তাতেই সে সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তি নিজের মনকে বশে করে সকলের সম্মানের পাত্র হয় এবং যার প্রতি সকলেই প্রসন্নযুক্ত মধুরবাক্য বলে, সেই ব্যক্তি দেবভাব প্রাপ্ত হয়। কারো প্রতি ঈর্ষাযুক্ত মানুষ যেভাবে তার দোষ বর্ণনা করে থাকে, সেইভাবে সে তার গুণের কথা বলতে চায় না। যার মন ও বাক্য সুরক্ষিত হয়ে পরমাত্মার জপ ও চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে বেদাধ্যয়ন, তপ ও ত্যাগ—এই সবেরই ফল লাভ করে।

তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যারা কটুবাক্য বলে, অসম্মান করে এবং অজ্ঞ—তাদের দোষ দেখাবার চেষ্টা না করা। বিদ্বানদের উচিত অপমানিত হয়ে অমৃত পান করার মতো সন্তুষ্ট থাকা ; কারণ অপমানিত মানুষ সুখে নিদ্রা যায় আর অপমানকারী বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ক্রোধী ব্যক্তি যে যজ্ঞ করে, দান করে এবং তপস্যা করে, সেই সব কর্মের ফল যমরাজ হরণ করেন। ক্রোধী ব্যক্তির সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। দেবতাগণ ! যে পুরুষ তার দেহের চার দ্বারকে (উপস্থ, উদর, দুটি হাত এবং বাণী) পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই ধর্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা, দয়া, ধৈর্য ও ক্ষমা বিশেষভাবে পালন করে, স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকে, অন্যের বস্তু গ্রহণ করতে চায় না, একান্তে বাস করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। আমার কাছে সত্যের থেকে বড় আর কিছুই নেই। আমি সর্বত্রই দেবতা ও মানুষদের বলে থাকি সত্যই স্বর্গে পৌঁছবার একমাত্র সাধন।

মানুষ যেমন লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করে, যেমন হতে চায়, তেমনই হয়। সাদা কাপড় যেমন যে রঙে রাঙানো হয়, সেই রঙ ধারণ করে, তেমনই মানুষও সাধু, অসাধু, তপস্বী বা চোর-যার সঙ্গ করে, তারই গুণ প্রাপ্ত হয়। দেবতারা সর্বদা সৎ পুরুষের সঙ্গ করেন—তাদের কথা শোনেন, তাই তাঁরা মানুষের অল্পস্থায়ী ভোগাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। যারা বিষয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির স্বরূপ ঠিকমতো জানে, চন্দ্র বা বায়ু কেউই তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। যারা দোষ পরিত্যাগ করে হৃদয় মধ্যস্থিত পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকে, তারাই সৎপুরুষদের পথে চালিত হয়। যারা সর্বদা আত্মচিন্তা করে এবং কাম-বাসনায় ব্যাপৃত থাকে, চুরি করে, কঠোর বাক্য বলে, তারা যদি প্রায়শ্চিত্ত করে সেই দোষ মুক্তও হয়, তাহলেও দেবতারা সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গেই সদ্ভাব যাপন করেন। কথা বলার থেকে না বলাই শ্রেয়, যদি কথা বলতেই হয় তবে সত্যকথা বলা বাক্যের দ্বিতীয় বিশেষত্ব, ধর্মযুক্ত কথা বলা তৃতীয় এবং প্রিয় কথা বলা হল চতুর্থ বিশেষত্ব।

সাধ্যরা জিজ্ঞাসা করলেন—হংস ! এই জগৎকে কে আবৃত করেছে ? এর স্বরূপ কি প্রকাশিত হয় না ? মানুষ কেন মিত্রদের পরিত্যাগ করে ? সে কেন স্বর্গে যেতে পারে না ?

হংস বললেন—দেবতাগণ ! এই জগৎকে অজ্ঞান আবৃত করে রেখেছে। পরস্পরের ঈর্ষার জন্য এর স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। মানুষ লোভের বশে মিত্রকে ত্যাগ করে এবং আসক্তির জন্য স্বর্গে যেতে পারে না।

সাধ্যগণ জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি পরম সুখী ? বহুলোকের সঙ্গে বাস করেও যিনি মৌন থাকেন, তিনি কে ? দুর্বল হয়ে বলশালী কোন জন ? এবং কোন ব্যক্তি কারো সঙ্গে কলহ করে না ?

হংস বললেন—ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি জ্ঞানী, তিনিই একমাত্র পরম সুখী। জ্ঞানী ব্যক্তিই বহুজনের সঙ্গে থেকেও মৌন থাকেন। তিনি দুর্বল হয়েও বলবান এবং কারো সঙ্গে কলহ করেন না।

সাধ্যগণ জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেবত্ব কী ? সাধুত্ব কী এবং তার মধ্যে অসাধুত্ব এবং মনুষ্যত্ব কী ?

হংস বললেন—ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদ-শাস্ত্রাদির অধ্যয়নকেই দেবত্ব বলা হয়, ব্রতাদি পালনই তাদের সাধুত্ব, অপরের নিন্দা করা অসাধুতা এবং মৃত্যু লাভ করাই তাদের মনুষ্যত্ব।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! হংস ও সাধ্যগণের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, আমি তা তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। এই দেহই কর্ম সাধনের মাধ্যম এবং সদ্ভাব হল সত্যবস্তু।

—৩—

সাংখ্য ও যোগের পার্থক্য এবং যোগমার্গের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তাত ! সাংখ্য ও যোগের পার্থক্য কী ? কৃপা করে আমাকে বলুন ; কারণ আপনার সর্ববিষয়ে জ্ঞান আছে।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সাংখ্যের বিদ্বান সাংখ্যের এবং যোগজানা ব্যক্তিগণ যোগের প্রশংসা করে থাকেন। উভয়েই নিজ নিজ পক্ষের সমর্থনে উত্তম উত্তম যুক্তি এবং প্রমাণ দিয়ে থাকেন। যোগের মনীষী বিদ্বানগণ নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে উত্তম যুক্তি উপস্থিত করে বলেন, যে ব্যক্তি বিষয়সমূহে আসক্তিহীন হয়, সে-ই দেহত্যাগের পর মুক্তিলাভ করে ; অন্য কোনো উপায়ে মোক্ষ প্রাপ্তি করা সম্ভব নয়। এইভাবে তাঁরা সাংখ্যকেই মোক্ষদর্শন বলে থাকেন। তোমার মতো ব্যক্তির শিষ্ট ব্যক্তিদের মতই গ্রহণ করা উচিত ; কারণ শিষ্ট পুরুষেরা তোমার প্রশংসা করে থাকেন। যোগের বিদ্বানগণ প্রধানত প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই মেনে থাকেন এবং সাংখ্যমতাবলম্বীগণ শাস্ত্র-প্রমাণের ওপর বিশ্বাস রাখেন ; কিন্তু আমি ওই দুই মতকেই তাত্ত্বিক মনে করি। শিষ্ট ব্যক্তিগণ উভয় মতকেই সম্মান করেন। শাস্ত্র অনুসারে যদি সেগুলিকে মেনে চলা যায় তাহলে দুটির দ্বারাই পরমগতি লাভ করা সম্ভব। অন্তর-বাহিরের পবিত্রতা, তপ, প্রাণীদের ওপর দয়া এবং ব্রতাদি পালন ইত্যাদিকে উভয় মতেই সমানভাবে স্বীকার করা হয়েছে। শুধু তার শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়াতে পার্থক্য আছে।

যুধিষ্ঠির ! যোগী পুরুষগণ কেবল যোগবলেই আসক্তি, মোহ, স্নেহ, কাম এবং ক্রোধ—এই পাঁচটি দোষের মূলোচ্ছেদ করে পরমপদ লাভ করেন। বৃহৎ মৎস্যগুলি যেমন জাল কেটে জলে ডুবে থাকে, যোগীরাও তেমনই নিজেদের পাপ নাশ করে পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হন। যোগবল-সম্পন্ন ব্যক্তি লোভের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম নির্মল কল্যাণময় পথ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্প আগুনে বড় কাঠ দিলে যেমন সেটি নিভে যায়, তেমনই দুর্বল যোগী মহাযোগ সাধনের ভারে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেইরূপ যোগীরও যোগবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় যখন তাঁরা মহাশক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের তেজ প্রকাশ পেতে থাকে, তখন তাঁদের মধ্যে প্রলয়কালীন সূর্যের ন্যায় সমস্ত জগৎকে শুষ্ক করার শক্তি আসে। জলের স্রোতে যেমন দুর্বল মানুষ ভেসে যায়, তেমনই দুর্বল যোগী বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়েন। হাতি যেমন মহা জলপ্রবাহের গতিরোধ করে, যোগীও তেমন তাঁর যোগের মহাবলের সাহায্যে বিষয়াসক্তি দমন করেন। যোগশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও পঞ্চমহাভূতে প্রবেশ করেন। অমিত তেজসম্পন্ন যোগীর কাছে ক্রুদ্ধ যমরাজ, অন্তক এবং চূড়ান্ত পরাক্রমী মৃত্যুরও জোর চলে না। তিনি যোগবলের সাহায্যে হাজার হাজার রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারেন। আবার সূর্যের মতো সেই তেজ প্রতিহত করে সমস্ত রূপ নিজের মধ্যে লীন করে উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। বলশালী যোগী বন্ধন মুক্ত করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। তাঁর যে নিজেকে মুক্ত করার পূর্ণ শক্তি থাকে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

রাজন্ ! আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ যোগের দ্বারা প্রাপ্ত কয়েকটি সূক্ষ্ম শক্তি বিষয়ে তোমার কাছে বর্ণনা করব এবং আত্ম-সমাধির জন্য যা চিত্তে ধারণ করা হয়, সেই বিষয়ে কিছু সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব, শোনো—সতর্ক ধনুর্ধারী যেভাবে চিত্তকে একাগ্র করে লক্ষ্যভেদ করে, সেইভাবে যে যোগী মনকে পরমাত্মার প্রতি নিবিষ্ট করেন, তিনিই নিঃসন্দেহে মোক্ষ লাভ করেন। যেমন তৈলভর্তি পাত্র মস্তকে নিয়ে সতর্ক ব্যক্তি সাবধানে একাগ্র চিত্তে সিঁড়িতে ওঠে, তেমনই যোগযুক্ত হয়ে যোগী আত্মাকে পরমাত্মাতে স্থিত করেন। সেই সময় তাঁর আত্মা নির্মল এবং সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়ে থাকে। যে যোগী সমাধি দ্বারা আত্মাকে পরমাত্মাতে স্থিত দেখে স্থির ভাবে অবস্থান করেন, তিনি নিজ পাপ বিনাশ করে পবিত্র ব্যক্তিদের প্রাপ্য অবিনাশী পদ লাভ করেন। যে যোগী যোগের মহান ব্রতে একাগ্রচিত্ত হয়ে নাভি, কণ্ঠ, মস্তক, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, নাক, কান, নেত্র ইত্যাদি দ্বারা আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করেন, তিনি তাঁর শুভাশুভ কর্মগুলি শীঘ্রই ভস্ম করেন এবং ইচ্ছামাত্রেই উত্তম যোগের আশ্রয়ে থেকে মুক্তিলাভ করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যোগী কী আহার করলে এবং কী কী জয় করলে যোগশক্তি প্রাপ্ত হন ?

ভীষ্ম বললেন—যিনি ধানের খুদ এবং তিলের খোল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তেল, ঘি পরিত্যাগ করেন, তিনি যোগবল প্রাপ্ত করেন। দীর্ঘদিন ধরে দিনে একবার

যবের শরবৎ খান যে যোগী, তিনি শুদ্ধচিত্ত হয়ে যোগবল প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন। কাম-ক্রোধ, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ভয়-শোক-শ্বাস, প্রিয় বিষয়, দুর্জয় অসন্তোষ, ভয়ানক তৃষ্ণা, স্পর্শ, নিদ্রা এবং আলস্য জয়কারী বীতরাগ মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বাধ্যায় ও ধ্যান সম্পাদন করে বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মার সূক্ষ্ম স্বরূপ উপলব্ধি (সাক্ষাৎকার) করেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ যোগের এই পথ দুর্গম বলে জানিয়েছেন, যে কোনো শক্তিশালী যোগীই এই পথ কুশলতাপূর্বক অতিক্রম করতে পারেন। এই পথ বহু ভয়ানক জন্তু পরিপূর্ণ নির্জন বনের ন্যায় দুর্গম, এই দুর্গম পথ অত্যন্ত বন্ধুর। যেমন তীক্ষ্ণ ছুরির ওপর চেষ্টা করে বসতে পারলেও, কিন্তু যার চিত্ত শুদ্ধ নয়, সেরূপ ব্যক্তি যোগধারণাতে স্থির থাকতে পারে না। যিনি সর্বপ্রকার নিয়ম মেনে যোগধারণাতে অবস্থান করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন ; আমি তোমাকে যোগবিষয়ক সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। যোগসাধনার কার্যগুলি দ্বিজাতীয়দের জন্যই নিশ্চিত করা হয়েছে, অর্থাৎ এইসবে তাদেরই অধিকার। যোগসিদ্ধ মহাত্মা ইচ্ছা করলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করে পরব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তিনি নিজ যোগ বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ধর্ম, কার্তিকেয় এবং ব্রহ্মপুত্রে সনকাদির বিগ্রহে প্রবেশ করতে পারেন। এইভাবে তিনি চন্দ্র, বিশ্বদেব, সর্প, পিতৃগণ, বন, পর্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, নাগ, বৃক্ষ, যক্ষ, দিক্, গন্ধর্ব, নারী ও পুরুষের যে কোনো রূপ ধারণ করতে সক্ষম। যুধিষ্ঠির ! পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধিত এই পরম কল্যাণময় প্রসঙ্গ তোমাকে শোনালাম। যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ ভগবান নারায়ণের স্বরূপ হয়ে যান।

---o---

সাংখ্যের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি যোগ্যতা অনুসারে শিষ্ট পুরুষদের যোগমার্গের যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন, এবার আমি সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিধি জানতে চাই, কৃপা করে বলুন ; কারণ ত্রিলোকের সম্পূর্ণ জ্ঞানই আপনি বিদিত আছেন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! আত্মতত্ত্বজ্ঞানী সাংখ্যশাস্ত্রের বিদ্বানদের সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা শোনো, যেসব কথা ঈশ্বর প্রাপ্ত কপিল প্রমুখ মহর্ষি বর্ণনা করেছেন। এই মতে কোনো ভুল দেখা যায় না, এতে বহু গুণ উপলব্ধ হয়, দোষ দেখা যায় না। যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব, পিতৃপুরুষ, তির্যক যোনি, গরুড়, মরুদ্‌গণ, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, অসুর, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগী, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মারও সব কিছুকে সদোষ জেনে জগতের মানুষের পরমায়ু ও সুখের পরমতত্ত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করে নেয় তথা বিষয়াসক্ত মানুষেরা সময় সময়ে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয় তাকে ; তির্যক যোনি এবং নরকগামী জীবেদের দুঃখকে স্বর্গ এবং বেদের ফলশ্রুতি জেনে জ্ঞান, সাংখ্য ও যোগমার্গের গুণ-দোষও জেনে যায় এবং সত্ত্বগুণের দশ, রজোগুণের নয়, তমোগুণের আট, বুদ্ধির সাত, মনের ছয় এবং আকাশের পাঁচ গুণের জ্ঞান প্রাপ্ত করে আত্মার প্রাপ্তিকারী মার্গ, প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্মবিচারকে ঠিক মতো জেনে নেয় ; সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং মোক্ষ উপযোগী সাধনগুলির অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হয়ে সাংখ্যযোগী পরম মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। চক্ষু রূপের, নাসিকা গন্ধের, কর্ণ শব্দের, জিহ্বা রসনার, ত্বক স্পর্শের আশ্রয়। তেমনই বায়ুর আশ্রয় আকাশ, মোহের আশ্রয় তমোগুণ, লোভের আশ্রয় ইন্দ্রিয়াদির বিষয়। গতির আধার বিষ্ণু, বলের ইন্দ্র, উদরের অগ্নি, পৃথিবী দেবীর আধার জল। জলের তেজ, তেজের বায়ু, বায়ুর আকাশ, আকাশের মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের অধিষ্ঠান হল বুদ্ধি। বুদ্ধির আশ্রয় তমোগুণ, তমোগুণের আশ্রয় রজোগুণ, রজোগুণের আশ্রয় সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ থাকে প্রকৃতির আশ্রয়ে, প্রকৃতি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা পরম তেজস্বী ভগবান নারায়ণে স্থিত। নারায়ণের আশ্রয় মোক্ষ, কিন্তু মোক্ষের কোনো আশ্রয় নেই (একথা যিনি জানেন, তিনিও মুক্ত হয়ে যান)।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনার দেখায় এমন কী কী দোষ আছে, যা নিজ শরীর হতেই উৎপন্ন। আপনি কৃপা করে আমার প্রশ্নের সমাধান করুন।

ভীষ্ম বললেন—শত্রুসূদন ! কপিল বা সাংখ্য মতানুযায়ী জ্ঞানী বিদ্বান এই দেহের মধ্যে পাঁচটি দোষের কথা বলেন, সেগুলি হল—কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা এবং শ্বাস—এই পাঁচটি দোষ সমস্ত দেহধারীর মধ্যে দেখা যায়। সৎব্যক্তি ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে, সংকল্প ত্যাগের দ্বারা কামের, সত্ত্বগুণের সেবনে নিদ্রার, প্রমাদের ত্যাগে ভয়ের এবং অল্প আহার দ্বারা শ্বাস-দোষকে বিনাশ করেন। রাজন্ ! মহাবুদ্ধিমান সাংখ্যের বিদ্বান, অসংখ্য গুণের দ্বারা গুণগুলিকে, অসংখ্য দোষের দ্বারা দোষগুলিকে এবং অসংখ্য বিচিত্র হেতুদ্বারা বিচিত্র হেতুগুলিকে বিশেষভাবে জেনে ব্যাপক জ্ঞানের প্রভাবে জগৎকে নশ্বর, বিষ্ণুর অসংখ্য মায়ায় আবৃত, পট চিত্রের ন্যায় জড়, অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্তের মতো ভয়ংকর, বর্ষার জলবুদ্বুদের মতো ক্ষণভঙ্গুর, সুখহীন, পরাধীন, নষ্ট প্রায়, পঙ্কে বদ্ধ হাতির মতো রজোগুণ ও তমোগুণে আবদ্ধ বলে মনে করেন। তাই তাঁরা সন্তানাদির আসক্তি দূর করে তপস্যা এবং শাস্ত্রের সাহায্যে রাজসিক, তামসিক এবং সাত্ত্বিক বিষয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের দেহাশ্রিত ভোগের আসক্তি মুক্ত হন। তারপর এই সিদ্ধ যতিগণ দুঃখরূপ এই জগৎ-সংসার সাগর জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে পার হন, তাঁরা এই দুস্তর জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম নির্মল আকাশস্বরূপ পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন। তাঁরা আর জগতে ফিরে আসেন না। একেই বলে পরম গতি। যাঁরা সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত, সত্যবাদী, সরল এবং সমস্ত প্রাণীর ওপর দয়াশীল, সেই মহাত্মাদের এইরূপ গতি লাভ হয়।

এইরূপ সাংখ্যযোগী পাপ ও পুণ্যরহিত হয়ে প্রকৃতিকেও অতিক্রম করে নির্দ্বন্দ্ব, মায়ার অতীত, অবিনাশী ভগবান নারায়ণকে প্রাপ্ত হন, এই নারায়ণদেব হলেন নির্গুণ ও নির্বিকার পরমাত্মা। তাঁকে প্রাপ্ত করলে জীবকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সাংখ্যযোগীদের এই উত্তম গতি লাভ হয়। কোনো জ্ঞানই এর সমকক্ষ নয়, এটিকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে মানা হয়। এতে অক্ষর, ধ্রুব এবং পূর্ণ সনাতন ব্রহ্মেরই প্রতিপাদন হয়েছে। সেই ব্রহ্ম আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, দ্বন্দ্বাতীত, শাশ্বত, কূটস্থ এবং নিত্য—মনীষী পুরুষরা এই কথা বলে থাকেন। তাঁর থেকেই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হয়। মহর্ষিগণ শাস্ত্রে তাঁরই প্রশংসা করেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সেই অনন্ত, অচ্যুত, পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রার্থনা ও স্তুতি করেন। যোগে উত্তম সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী এবং অপার জ্ঞানসম্পন্ন সাংখ্যবেত্তা পুরুষও তাঁর গুণগান করেন। কুন্তীনন্দন ! এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে এই সাংখ্যশাস্ত্রই সেই নিরাকার পরমেশ্বরের আকার।

রাজন্ ! মহাত্মা পুরুষদের মধ্যে, বেদে, যোগশাস্ত্রে এবং পুরাণে যে নানাপ্রকার জ্ঞানের কথা পাওয়া যায়, সে সবই সাংখ্য থেকে আগত। ইতিহাসে, সৎ ব্যক্তিদের লিখিত অর্থশাস্ত্রে, সংসারে যা কিছু জ্ঞান, সে সবই সাংখ্য থেকে প্রাপ্ত। মন ও ইন্দ্রিয় সংযম, উত্তম বল, সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং পরিণামে সুখপ্রদানকারী যে সূক্ষ্ম তপের কথা বলা হয়েছে, সে সব সাংখ্যশাস্ত্রে যথাবৎ বর্ণনা করা হয়েছে। সাংখ্যজ্ঞানী দেহত্যাগের পর ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। সাংখ্যের জ্ঞান অত্যন্ত বিশাল এবং অতি প্রাচীন। এটি মহাসাগরের মতো অগাধ, নির্মল এবং উদারভাবে পরিপূর্ণ। এই অপ্রমেয় জ্ঞান ভগবান নারায়ণ পূর্ণরূপে ধারণ করেন। যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে সাংখ্যতত্ত্ব জানালাম। এই পুরাতন বিশ্বের রূপে ভগবান নারায়ণই বিরাজমান ; তিনিই জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা।

ক্ষর এবং অক্ষরের বিষয়ে করালজনক ও বশিষ্ঠের আলোচনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সেই অক্ষর-তত্ত্ব কী, যা লাভ করলে জীব পুনরায় এই জগতে ফিরে আসে না এবং ক্ষর পদার্থই বা কাকে বলে, যা জানলে পৃথিবীতে আসা-যাওয়া বজায় থাকে। ক্ষর-অক্ষরের প্রকৃত স্বরূপ আমি জানতে ইচ্ছুক। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, মহাভাগ ঋষি এবং যতিগণ বলেছেন আপনার জ্ঞান অনন্ত। সূর্য আর মাত্র কিছুদিনই দক্ষিণায়নে অবস্থান করবেন, উত্তরায়ণ হলেই আপনি পরমধামে চলে যাবেন ; তখন আমরা এই কল্যাণময় বাণী কার কাছ থেকে শুনব ? আপনার অমৃতময় কথা শুনে আমার জ্ঞান তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব আপনি

আমাকে ক্ষর-অক্ষরের বিষয়ে কিছু বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে করালজনক এবং বশিষ্ঠের আলোচনারূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা করছি। কোনো এক সময়ের কথা। সূর্যসম তেজস্বী মুনি বশিষ্ঠ তাঁর আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। রাজা করালজনক সেখানে উপস্থিত হয়ে হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম

জানিয়ে বিনয়যুক্ত মধুর স্বরে বললেন—'মুনিবর ! জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেখান থেকে পুনরাগমন করেন না, আমি সেই সনাতন ব্রহ্মের বর্ণনা শুনতে ইচ্ছা করি। এতদ্ব্যতীত যাকে ক্ষর বলা হয় সেটি এবং যাতে এই জগতের লয় হতে থাকে সেই নির্বিকার, আনন্দস্বরূপ এবং কল্যাণময় অক্ষর-তত্ত্বের জ্ঞানও লাভ করতে চাই (সুতরাং আপনি সেইসব বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন)।'

বশিষ্ঠ মুনি বললেন—রাজন্ ! এই জগতের যে ক্ষরণ (লয়) হয় তাকে এবং যা কখনো ক্ষতির (নষ্ট) হয় না সেই অক্ষর সম্বন্ধে বলছি, শোনো—দেবতাদের বারো হাজার বছরে এক চতুর্যুগ হয় এবং দশ হাজার চতুর্যুগকে এক কল্প বলে, একেই ব্রহ্মার একদিন বলা হয়, সেইরূপই দীর্ঘ হয় তাঁর রাত্রি, তা শেষ হলে তিনি জেগে উঠে এই বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি নিরাকার হলেও সাকার জগতের সৃষ্টি করেন। এঁর মধ্যে অণিমা ইত্যাদি শক্তির স্বাভাবিক নিবাস, তিনি অবিনাশী জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর, সর্বত্র হস্ত-পদসম্পন্ন, সর্বদিকে চক্ষু, মস্তক ও মুখ এবং সর্বদিকে কর্ণ ; কারণ তিনি জগতে সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত, তিনি ব্যাপ্তিস্বরূপ। তিনিই ভগবান হিরণ্যগর্ভ, তাঁকেই বুদ্ধি বলা হয়। তাঁকেই যোগশাস্ত্রে মহান, বিরিঞ্চি এবং অজ নামে ডাকা হয়, সাংখ্য শাস্ত্রে তাঁকে বহু নামে বর্ণনা করা হয়। তাঁর বহুপ্রকার অদ্ভুত রূপ আছে, তাঁকে বিশ্বের আত্মা এবং একাক্ষর বলা হয়। এই নানাত্মক জগৎ তাঁতেই ব্যাপ্ত, তিনি নিজ স্বরূপেই ত্রিলোকের সৃষ্টি করেছেন। বহুরূপ ধারণ করায় তাঁকে বিশ্বরূপ বলা হয়। এই মহাতেজস্বী ভগবান আত্মশক্তির দ্বারা মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করে পরে অহংকার ও তার অভিমানী দেবতা প্রজাপতিকে উৎপন্ন করেন। এরমধ্যে নিরাকার থেকে সাকার রূপে উৎপন্ন হওয়া প্রজাপতিকে বিদ্যাসর্গ বলা হয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহংকারকে অবিদ্যাসর্গ। অবিধি (জ্ঞান) এবং বিধির (কর্ম) উৎপত্তিও এই পরমাত্মা থেকেই হয়, শ্রুতি ও শাস্ত্রের অর্থবিচারকারী বিদ্বানগণ তাঁকে বিদ্যা এবং অবিদ্যা নামেও নির্দেশ করেন। অহংকার থেকে সূক্ষ্ম ভূতাদির সৃষ্টি হয়, তাকে তৃতীয় সর্গ বলে বুঝতে হয়। রাজসিক, তামসিক এবং সাত্ত্বিক ভেদে তিন প্রকার অহংকার থেকে চতুর্থ সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় বৈকৃত সর্গ। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই পাঁচ মহাভূত এবং রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয় বৈকৃত সর্গের অন্তর্গত, এই দশটি একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়। এই চব্বিশটি তত্ত্ব সমস্ত প্রাণীর শরীরে উপস্থিত থাকে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ এর যথার্থ স্বরূপ জেনে কখনো শোক করেন না। জগতে যত দেহধারী আছে, তাদের সবার মধ্যে এই তত্ত্বের সমুদায়কে দেহ বলে বোঝা উচিত। দেবতা, মানুষ, দানব, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব, কিন্নর, সর্প, চারণ, পিশাচ, দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মাছি, দুর্গন্ধী পোকা, ইঁদুর, কুকুর, চণ্ডাল, হরিণ, হাতি, ঘোড়া, গাধা, সিংহ, বৃক্ষ, গোরু প্রভৃতি রূপে যা কিছু রূপ পরিগ্রহকারী প্রাণী বিদ্যমান, সবার মধ্যেই এই তত্ত্বগুলি উপস্থিত থাকে। পৃথিবী, জল ও আকাশেই প্রাণীদের নিবাস, আর কোথাও নয়। এই সম্পূর্ণ পাঞ্চভৌতিক জগৎকে ব্যক্ত বলা হয় এবং প্রতিদিন এর ক্ষরণ (ক্ষয়) হয়ে থাকে। তাই একে ক্ষর বলা হয়। এইভাবে সেই অব্যক্ত অক্ষর থেকে উৎপন্ন হওয়া এই ব্যক্তসংজ্ঞক মোহাত্মক জগৎ ক্ষরিত হওয়ায় ক্ষর নাম ধারণ করে। ক্ষর-তত্ত্বে সর্বপ্রথম মহত্তত্ত্বরই সৃষ্টি হয়েছে, সেটিই ক্ষরের পরিচয়। রাজন্ ! তোমার জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি ক্ষর-অক্ষরের বিষয়ে বর্ণনা করলাম।

বশিষ্ঠমুনি কর্তৃক জীবের অজ্ঞতার বর্ণনা

বশিষ্ঠ বললেন—রাজন্ ! জীব অজ্ঞানবশত এক দেহ থেকে অন্য দেহে হাজার-হাজার বার জন্মগ্রহণ করে। সে দোষগুণের জন্য কখনো তির্যক যোনিতে কখনো দেবতা হয়ে জন্ম নেয়। রেশমকীট যেমন নিজের সৃষ্টি করা তন্তুতে নিজেকেই চতুর্দিক থেকে আবৃত করে, তেমনই এই নির্গুণ আত্মাও নিজের দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃত গুণের দ্বারা নিজেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বয়ং (আত্মা) সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বরহিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকে। দেহধারণ করে সে নানা রোগের শিকার হয়, নিজেকে কখনো তির্যক যোনির জীব বলে মনে করে আবার কখনো দেবত্বের অহং ধারণ করে। এই অভিমানের জন্যই সে শরীর দ্বারা কৃত কর্মের ফল ভোগ করে। অজ্ঞানে আবৃত মানুষ নানাভাবে, নানা শয্যায় (মাঠে, ইঁট-পাথরে, কন্টকে, পাঁকে) শয়ন করে। নানাপ্রকার দামী-অদামী বস্ত্রধারণ করে, কখনো রাজবেশ পরে, কখনো সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করে, কখনো আবার উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের ভোজনও নানাপ্রকার হয়, কখনো একদিন অন্তর আহার করে, কখনো প্রত্যহ খায় আবার কখনো দিনে তিন-চার বার খায়। কেউ কেউ পাঁচ-ছয়দিন বাদে খায়, কেউ পনেরো দিন বাদে, আবার কেউ একমাস ধরে কিছু আহার করে না। কেউ ফল-মূল খায়, কেউ জল বা বাতাস খেয়ে থাকে, কেউ তিলের খোল ও দই খায়। কখনো কখনো গোময়, গোমূত্র, শুষ্ক পত্র অথবা বৃক্ষচ্যুত ফল খেয়েও জীবন ধারণ করে। সিদ্ধিলাভের আশায় মানুষ নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম পালন করে। কখনো চান্দ্রায়ন ব্রত অনুষ্ঠান করে, কখনো চতুর্বর্ণাশ্রম মেনে চলে, আবার কেউ কুপথও অনুসরণ করে। তারা কেউ ঝরনার পাশে বাস করে, কেউ নদী তীরে, কেউ একান্তে নির্জন বনে, কেউ পর্বত গুহায়, আবার কেউ জনপদে। একান্তে যারা থাকে তারা জপ, ব্রত, নিয়ম, তপ, যজ্ঞ ও নানা ধর্মানুষ্ঠান করে থাকে। জনপদে যারা বাস করে, তারা ব্যবসায় করে, কেউ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন করে, আবার কেউ বৈশ্য-শূদ্রের মতো কাজ করে। কেউ দীন-দুঃখী-অন্ধদের দান করে আবার কেউ অজ্ঞানবশত নিজের মধ্যে সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিবিধ গুণ এবং ধর্ম-অর্থ-কামের অহংকার করে। এইভাবে আত্মা নিজের স্বরূপে প্রকৃতির দ্বারা বহু প্রকার বিভাগ সৃষ্টি করে। কখনো স্বাহা, কখনো স্বধা, কখনো বষট্‌কার আবার কখনো নমস্কারে প্রবৃত্ত হয়, কখনো যজ্ঞ করে ও করায়, কখনো অধ্যয়ন করে ও করায়, কখনো দান করে অথবা দান নেয়—এইভাবে নানাপ্রকার কার্য করে থাকে। কখনো জন্ম নেয়, কখনো মৃত্যু বরণ করে আবার কখনো বিবাদে বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। বিদ্বান ব্যক্তিদের বক্তব্য হল এগুলি সবই শুভাশুভ কর্মমার্গ।

জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকৃতিদেবীরই কাজ। সূর্য যেমন প্রতি সন্ধ্যায় নিজ কিরণ সংহৃত করে, তেমনই জগদাত্মা প্রলয়কালে এই গুণগুলি সংহার করে একাকী বিরাজ করেন। এইভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কাজ চলতে থাকে এবং আত্মা (নিজে গুণরহিত হয়েও প্রকৃতির সঙ্গে থেকে) লীলার জন্য নিজের মধ্যে নানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর গুণের অহংভাব আরোপ করে নেয়। সৃষ্টি এবং প্রলয় যার ধর্ম, সেই প্রকৃতিকে (প্রকৃতির কার্যকে) বিকৃতি করে তিন গুণের প্রভু আত্মা কর্ম-মার্গে প্রবৃত্ত হয়ে প্রকৃতি-কৃত প্রত্যেক ত্রিগুণাত্মক কার্যকে নিজের বলে মেনে নেয়। এইভাবে প্রকৃতির প্রেরণায় সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, কিন্তু জীবাত্মা অজ্ঞানবশত মনে করে যে এগুলি তাকেই দুঃখ প্রদান করছে (তাই সে দুঃখিত হয়)। সে লিঙ্গশরীর-হীন হয়েও নিজেকে তার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করে এবং কালধর্ম (মৃত্যু)রহিত হয়েও নিজেকে কালধর্মী (মরণশীল), সত্ত্ব থেকে পৃথক হয়েও সত্ত্বরূপ এবং তত্ত্বরহিত হয়েও তত্ত্বস্বরূপ বলে মনে করে। সে যদিও ক্ষেত্র থেকে বিশিষ্ট, তবুও নিজেকে ক্ষেত্র বলে মানে, সৃষ্টির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও সে সমস্ত সৃষ্ট জগৎকে নিজের বলে মনে করে। সে কোথাও না গেলেও, নিজেকে গমনশীল ভাবে। অজ্ঞানী জীব এইভাবে অজন্মা হয়েও নিজেকে জন্মগ্রহণকারী, নির্ভয় হয়েও ভীত, অক্ষর (অবিনাশী) হয়েও ক্ষর (বিনাশশীল) মনে করে। এইভাবে অজ্ঞানের জন্য এবং অজ্ঞান ব্যক্তির সাহচর্য করার জীবের নিরন্তর পতন হতে থাকে এবং তাকে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয়। সে পশু, পক্ষী, মানুষ ও দেবতারূপে হাজার-হাজারবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করে।

———○———

আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির পার্থক্য এবং যোগ ও সাংখ্যের পরিচয়

রাজা জনক বললেন—মুনিবর ! যেমন পুরুষ ব্যতীত নারী এবং নারী ব্যতীত পুরুষ সন্তান উৎপন্ন করতে পারে না ; উভয়ের সংসর্গেই দেহ উৎপন্ন হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের একে অপরের সম্বন্ধের দ্বারাই সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় পুরুষ মোক্ষ অসম্ভব বলে মনে হয়। যদি মোক্ষের কাছে পৌঁছবার (অর্থাৎ তাকে স্পষ্টভাবে বোঝার) কোনো দৃষ্টান্ত থাকে তাহলে বলুন ; কারণ আপনার সব কিছুই প্রত্যক্ষ। আমারও মুক্তিলাভের ইচ্ছা আছে—আমিও সেই দেহরহিত, জরারহিত, ইন্দ্রিয়াতীত, নির্বিকার পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করি।

বশিষ্ঠ মুনি বললেন—রাজন্ ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে যা বলেছ, তা ঠিকই। তুমি যে বেদ এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছ তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার তত্ত্ব ঠিকভাবে বোঝোনি। যে বেদ ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে ও স্মরণ রাখে অথচ তার তত্ত্ব বুঝতে পারে না, তার সেই গ্রন্থপাঠ বৃথা। সে কেবল গ্রন্থের বোঝাই বহন করে। যে ব্যক্তি স্থূল ও মন্দবুদ্ধি হওয়ায় বিদ্বানদের সভায় শাস্ত্রগ্রন্থের কেবলমাত্র অর্থও বলতে পারে না, সে সেই গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয় করবে কীভাবে ? অতএব এখন আমি সাংখ্য ও যোগের জ্ঞানী-মহাত্মা পুরুষের মতে মোক্ষের যেমন স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে সেটি যথার্থরূপে জানাচ্ছি, শোনো—যোগী যে তত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন, সাংখ্য বিদ্বানগণও সেই স্থান লাভ করেন। যাঁরা সাংখ্য ও যোগকে একই ফল প্রদানকারী বলে মনে করেন, তাঁরাই বুদ্ধিমান। যেমন বীজ থেকে বীজের উৎপত্তি, তেমনই দ্রব্য থেকে দ্রব্যের, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়ের এবং দেহ থেকে দেহের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু পরমাত্মা ইন্দ্রিয়, বীজ, দ্রব্য এবং দেহরহিত, নির্গুণ, সুতরাং তাতে গুণ কীভাবে সম্ভব ? আকাশ ইত্যাদি গুণ যেমন সত্ত্বাদি গুণ হতে উৎপন্ন হয় এবং তাতেই লীন হয়, তেমনই সত্ত্বাদি গুণও প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয়ে প্রকৃতিতেই লীন হয়ে যায়। আত্মা জন্ম-মৃত্যুরহিত, অনন্ত, সবকিছুর দ্রষ্টা এবং নির্বিকার। আত্মাভিমানের জন্যই তাকে (আত্মাকে) গুণ-স্বরূপ বলে মনে হয়। গুণ গুণবানের মধ্যেই থাকে, নির্গুণ আত্মার মধ্যে গুণ থাকা কী করে সম্ভব ? তাই গুণের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানী-বিদ্বান পুরুষদের সিদ্ধান্ত হল যে, জীবাত্মা যখন প্রাকৃত গুণাদিতে তার আপনত্বের অহংকার পরিত্যাগ করে, তখন দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে সে তার বিশুদ্ধ পরমাত্ম স্বরূপকে সাক্ষাৎ করে। তাই সাংখ্য ও যোগের জ্ঞানিগণ বলে থাকেন যে যিনি সত্ত্বাদি গুণরহিত, অব্যক্ত, নিয়ামক, নির্গুণ, অন্তর্যামী, নিত্য এবং সবকিছুর অধিষ্ঠাতা সেই পরমাত্মা হলেন প্রকৃতির গুণাদি থেকেও অনুপম বিশিষ্ট পঁচিশতম তত্ত্ব। জ্ঞানী ব্যক্তি যখন এই অব্যক্ত তত্ত্ব ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেন তখন তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সর্বদা একই রূপে স্থিত পরমাত্মা হলেন অক্ষর এবং নানারূপে প্রতীত হওয়া জগৎকে ক্ষর বলা হয়। এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ক্ষর ও অক্ষরের স্বরূপ।

জনক জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আপনি অক্ষরের একটি রূপ এবং ক্ষরের বহুরূপের কথা বলেছেন ; কিন্তু আমার মনে এখনও এই দুটি স্বরূপের বিষয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে। যদিও আপনি ক্ষর ও অক্ষরকে বোঝার জন্য কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু আমার বুদ্ধি চঞ্চল হওয়ায় সেগুলি বিস্মৃত হয়েছি, তাই নানাত্ব এবং একত্বরূপ দর্শন আমি পুনরায় শুনতে চাই। ক্ষর, অক্ষর, যোগ এবং ভেদ-অভেদের বিষয় পূর্ণরূপে বলুন।

বশিষ্ঠ মুনি বললেন—রাজন্ ! তুমি যা জানতে চাও, আমি সব জানাচ্ছি। এখন আমি বিশেষভাবে যোগবিধির বর্ণনা করছি, শোনো—যোগের প্রধান কর্তব্য ধ্যান, যোগীদের এটি প্রধান শক্তি। যোগিগণ ধ্যানের দুটি প্রকারের কথা বলেন, মনের একাগ্রতা এবং প্রাণায়াম। প্রাণায়ামও দুই প্রকারের সগুণ এবং নির্গুণ। মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ এবং ভোজন—এই তিন কালের সময় বাদ দিয়ে বাকি সময় যোগাভ্যাস করা উচিত। যোগসাধক মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে সরিয়ে শুদ্ধভাবে অবস্থিত হবেন এবং মহাত্মাগণ যাঁকে চব্বিশ তত্ত্বের অতীত অবিনাশী বলেছেন, সেই পরমাত্মার ধ্যান করবেন। তাঁর সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করে মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে মনকে আত্মাতে একাগ্র করা কর্তব্য। যখন যোগী মনের দ্বারা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করে প্রস্তরের ন্যায় অবিচল হন, শুষ্ক কাঠের ন্যায় নিষ্কম্প হন, তখন তাঁকে যোগযুক্ত বলা হয়। যখন তাঁর দেখা, শোনা, গন্ধ পাওয়া বা স্পর্শ করা

প্রভৃতির জ্ঞান থাকে না, মনে যখন কোনোপ্রকার সংকল্পের উদয় হয় না এবং কাঠের মতো স্থির থেকে তিনি কোনো বস্তুর অহংকার বা সুখ বোধ করেন না, সেই সময় তাঁকে শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত এবং যোগযুক্ত বলা হয়। সেই অবস্থায় তিনি বায়ুহীন স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। লিঙ্গশরীরের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকে না। এরূপ যোগসিদ্ধ পুরুষের ঊর্ধ্ব, অধঃ বা মধ্য— কোনো স্থানে গতি হয় না। ধ্যাননিষ্ঠ যোগী তাঁর হৃদয়ে প্রজ্বলিত অগ্নি, কিরণমালামণ্ডিত সূর্য এবং বিদ্যুতের ন্যায় তেজস্বী আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন। ধৈর্যশীল, মনীষী, বেদবেত্তা এবং মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই সেই অজ এবং অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের দর্শন লাভ করে থাকেন। সেই ব্রহ্ম অণুর থেকে অণু, মহানের থেকেও মহান। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিনি অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত, কিন্তু কেউই তাঁর দর্শন পায় না ; শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারাই তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। সেই মহান ব্রহ্ম অজ্ঞানান্ধকারের অতীত, তাই বেদের পারগামী সর্বজ্ঞ পুরুষেরা তাঁকে তমোনুদ (অজ্ঞাননাশক) বলেছেন। তাঁকে নির্মল, অজ্ঞানরহিত, লিঙ্গরহিত এবং উপাধিশূন্য পরমাত্মা বলা হয়। এটিই হল যোগিগণের যোগ, এছাড়া যোগের আর কী লক্ষণ হতে পারে ? এইরূপ সাধনাকারী যোগী সবকিছুর দ্রষ্টা অজর-অমর পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। এই পর্যন্ত আমি তোমাকে যোগদর্শন সম্বন্ধে জানালাম।

এবার আমি সাংখ্য বর্ণনা করছি, এটি বিচারপ্রধান দর্শন। রাজন্ ! প্রকৃতিবাদী বিদ্বান মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলেন, তার থেকে অন্য তত্ত্ব উৎপত্তি হয়, যাকে মহত্তত্ত্ব বলা হয়, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার নামক তৃতীয় তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে, অহংকার থেকে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ) সৃষ্টি হয়েছে। এই আটটিকে প্রকৃতি বলা হয়, এর থেকে যোলোটি তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, যাকে বিকার বা বিকৃতি বলা হয়। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, একাদশতম মন এবং পাঁচ স্থূল ভূত—এই হল যোলোটি বিকার। সাংখ্য শাস্ত্রের জ্ঞানিগণের মত হল যে প্রকৃতি এবং তার বিকারই সাংখ্যশাস্ত্রের চব্বিশ তত্ত্ব। যে তত্ত্ব যার থেকে উৎপন্ন, সেটি তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি পরমাত্মার সান্নিধ্যে অনুলোমক্রমের অনুসারে তত্ত্ব রচনা করে (অর্থাৎ প্রকৃতি হতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে সূক্ষ্ম ভূতাদির ক্রমপূর্বক সৃষ্টি হয়ে থাকে) ; কিন্তু তার সংহার হয় বিলোমক্রম থেকে (অর্থাৎ পৃথিবীর হয় জলে, জলের হয় তেজে, তেজের লয় হয় বায়ুতে। এইভাবে সমস্ত তত্ত্বই নিজ নিজ কারণে লীন হয়)। সমুদ্রে উত্থিত তরঙ্গ যেমন তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, তেমনই সম্পূর্ণ তত্ত্ব অনুলোম ক্রম থেকে উৎপন্ন হয়ে বিলোমক্রমে লীন হয়। এইভাবে জগৎ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়ে, তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তত্ত্ববেত্তা পুরুষদের প্রকৃতির একত্ব এবং নানাত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত। এইরূপ পুরুষও প্রলয়কালে একই রূপে থাকে, কিন্তু সৃষ্টির সময় প্রকৃতি প্রেরণাকারী হওয়ায় বহুত্বের জন্য বহুরূপে তার প্রতীতী হয়। পরমাত্মাই প্রকৃতিকে নানারূপে পরিণত করেন। প্রকৃতি এবং তার বিকারকে ক্ষেত্র বলা হয়। চব্বিশ তত্ত্ব ভিন্ন যে পঁচিশতম তত্ত্ব—তাই হল মহান আত্মা। তিনি ক্ষেত্রের মধ্যে অধিষ্ঠাতারূপে বাস করেন। সমস্ত ক্ষেত্রের অধিষ্ঠান হওয়ার জন্যই তাঁকে অধিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি অব্যক্ত সজ্ঞক সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে জানেন, তাই তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয় এবং প্রাকৃত শরীরে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট থাকায় তিনি পুরুষ নাম ধারণ করেন ; প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্র এক বস্তু এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অন্য। ক্ষেত্র অব্যক্ত (প্রকৃতি) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ তার জ্ঞাতা পঁচিশতম তত্ত্ব আত্মা। একেই বলা হয় সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যবাদীগণ প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলে মানেন এবং এর চব্বিশটি তত্ত্বের কৃত জ্ঞান লাভ করেন এবং এর থেকে ভিন্ন যে পঁচিশতম তত্ত্ব আত্মা, তখন তার জ্ঞান হয়। পুরুষ যখন নিজেকে প্রকৃতি থেকে পৃথক বলে জেনে যায়, তখনই সে ব্রহ্মরূপে স্থিত হয়। আমি তোমাকে সম্যগ্‌দর্শনের (সাংখ্যের) স্বরূপ বর্ণনা করলাম, যারা তাঁকে এইভাবে জানে তারা সেই সমস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করে। সেই জ্ঞান প্রাপ্তকারী পুরুষ ইহজগতে আর ফিরে আসে না, তারা পরাপরস্বরূপ অবিনাশী অক্ষর-ভাব প্রাপ্ত হয়। যাদের বুদ্ধি নানাত্ব দর্শন করে, তারা সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় না, তাদের বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সম্পূর্ণ জগৎকে অব্যক্ত বলা হয় এবং পঁচিশতম আত্মা তার থেকে পৃথক, যারা এই তত্ত্ব জানে, তাদের আর জন্মগ্রহণের ভয় থাকে না।

বুদ্ধিমান পুরুষ যখন জেনে যান যে 'আমি অন্য আর প্রকৃতি আমা হতে ভিন্ন', তখন প্রকৃতিকে ত্যাগ করার ফলে তিনি নিজ শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হন। তাঁকে সেই সময় প্রকৃতির

সঙ্গে মিলিত বলে প্রতীত হলেও প্রকৃতপক্ষে তার থেকে তিনি ভিন্ন। যখন তিনি প্রাকৃত গুণাবলীতে মুগ্ধ হন না, তখন তিনি দ্রষ্টারূপে স্থিত হয়ে পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন এবং পরে আর তা ত্যাগ করেন না। (জীবাত্মার যখন বিবেক জাগ্রত হয়, তখন সে অনুতাপ করতে থাকে) ওঃ! এ আমি কী করলাম, মাছের মতো অজ্ঞতাবশত নিজেই এতদিন এই ভবজালে ডুবে মরেছি। মাছ যেমন জলকেই নিজের জীবনের আধার মনে করে এক সরোবর থেকে অন্য সরোবরে গমন করে, সেইরূপ আমিও অজ্ঞতাবশত এক দেহ থেকে অন্য দেহে পরিভ্রমণে রত থেকেছি। প্রকৃতপক্ষে জগতে পরমাত্মাই আমার বন্ধু, তাঁর সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হওয়া উচিত। আগে আমি যাই থাকি না কেন, এখন তো আমি তাঁর অভিন্নতা লাভ করেছি, এতেই আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি, আমি অবশ্যই তাঁর মতো, তিনি যেমন অত্যন্ত নির্মল, আমিও তাই। আমি আসক্তিরহিত হয়েও অজ্ঞতা ও মোহের বশীভূত হয়ে এতদিন এই আসক্তিপূর্ণ জড় প্রকৃতিতে বাস করছি। সে আমাকে এত আকৃষ্ট করেছে যে আমি সময়ের কোনো হিসাবই রাখতে পারিনি। আমি নির্বিকার হয়েও এই বিকারময় প্রকৃতির দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছি। আর আমি এর সঙ্গে থাকব না। কিন্তু এতে তার কোনো অপরাধ নেই, সমস্ত দোষই আমার ; কারণ আমিই পরমাত্মার থেকে বিমুখ হয়ে এতে আসক্ত হয়েছিলাম। যদিও আমার কোনো মূর্তি নেই, তথাপি আমি প্রকৃতির নানারূপে স্থিত হয়েছি। দেহরহিত হয়েও আমি মমতার দ্বারা পরাভূত হয়ে দেহধারী হয়েছি। এই মমতা বিভিন্ন জন্মে পরিভ্রমণ করিয়ে আমার কী দুর্দশাই না করেছে! এইভাবে বহু জন্মধারণ করায় আমার চৈতন্য লোপ পেয়েছিল। এখন এই অহংসম্পন্ন প্রকৃতির সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। এখনও সে বহুরূপ ধারণ করে আমার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি তার প্রলোভন বুঝেছি। মমতা ও অহংবোধ থেকে পৃথক হয়ে গেছি। এবার থেকে এইসব পরিত্যাগ করে নিরাকার পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করব এবং তাঁর সমত্ব লাভ করব। পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য হলেই আমার কল্যাণ হবে, এই প্রকৃতির সঙ্গ করলে নয়।

এইভাবে উত্তম বিবেচনার দ্বারা নিজ শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত করে (চব্বিশ তত্ত্বের অতীত) পঁচিশতম আত্মা ক্ষরভাব (বিনাশশীলতা) ত্যাগ করে নিরাময় অক্ষরভাব প্রাপ্ত হয়। রাজন্! বেদে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, আমি সেইরূপ ক্ষর-অক্ষর বিবেচনাকারী জ্ঞান তোমাকে জানালাম। সন্দেহরহিত সূক্ষ্ম এই জ্ঞান অত্যন্ত নির্মল। এবার আমি তোমাকে যা বলছি, তা মন দিয়ে শোনো— আমি সাংখ্য ও যোগের যে বর্ণনা করেছি, তাতে এই দুটিকে পৃথক দুটি শাস্ত্র বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা সাংখ্যদর্শন, তাই যোগদর্শন (কারণ উভয়ের ফল একই)। রাজন্! আমি প্রীতিভরে এই শুদ্ধ সনাতন এবং সকলের আদিভূত ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছি। যে ব্যক্তি বেদের নির্দেশানুসারে চলে না, তাকে এই উত্তম জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করা উচিত নয়। এই জ্ঞান প্রাপ্ত করার সে-ই অধিকারী, যে জিজ্ঞাসুভাবে শরণাগত হয়। অসত্যবাদী, শঠ, কামাসক্ত, কপট, পণ্ডিতম্মন্য এবং অপরকে কষ্টপ্রদানকারী মানুষও এই জ্ঞানের অধিকারী নয়। কারা এই জ্ঞান লাভের অধিকারী, তা শোনো—শ্রদ্ধাযুক্ত, গুণবান, পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা, বিশুদ্ধ যোগী, বিদ্বান, সর্বদা বেদোক্ত কর্মকারী, ক্ষমাশীল, সকলের হিতৈষী, একান্তবাসী, শাস্ত্রবিধি সম্মানকারী, বিবাদহীন, বহুজ্ঞ, বিজ্ঞ, শম-দমসম্পন্ন ব্যক্তি এই জ্ঞানের অধিকারী। যাদের মধ্যে উপরিউক্ত গুণের অভাব থাকে, তাদের এই বিশুদ্ধ পরব্রহ্মের জ্ঞান দান করা উচিত নয়। বিদ্বান ব্যক্তিদের বক্তব্য হল যে এই গুণাদিহীন ব্যক্তিদের উপদেশ দিলে, সেটি তাদের কল্যাণ করে না এবং কুপাত্রে উপদেশ প্রদান করলে বক্তারও মঙ্গল হয় না। রাজন্! যে ব্রত এবং নিয়মাদি পালন করে না, সে সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব প্রদান করলেও, তাকে এই উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় জয়কারী ব্যক্তিকে অবশ্যই এই জ্ঞানের উপদেশ দান করা উচিত।

করাল! তুমি আমার থেকে পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করেছ, এখন তোমার মনে কোনো ভয় থাকা উচিত নয়। এই ব্রহ্ম পরম পবিত্র, শোকরহিত, আদি-মধ্য-অন্ত শূন্য, জন্ম-মৃত্যু থেকে রক্ষাকারী, নিরাময়, নির্ভয় ও কল্যাণময়। সমস্ত জ্ঞানের এটিই তাত্ত্বিক অর্থ। সেই জ্ঞানলাভ করে তুমি মোহ পরিত্যাগ করো। তুমি আজ আমার কাছ থেকে যেরূপ সনাতন ব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ, আমিও সেইভাবে সনাতন হিরণ্যগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মার শ্রীমুখ হতে এই জ্ঞান লাভ করেছি।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশ অনুসারে পঁচিশতম তত্ত্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপ আমি

তোমাকে জানালাম। ইনিই সেই ব্রহ্ম, যাঁকে জানলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। যারা এটি ঠিকমতো জানে না। তারাই বারংবার জন্ম নেয়। যারা জেনে যায়, তারা অজর-অমর হয়ে যায়। তাত ! এই পরম কল্যাণময় জ্ঞান আমি দেবর্ষি নারদের শ্রীমুখ থেকে শুনেছি। শ্রীব্রহ্মার থেকে বশিষ্ঠ মুনি এবং বশিষ্ঠ মুনি থেকে দেবর্ষি নারদ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নারদ থেকে প্রাপ্ত সনাতন ব্রহ্মের এই জ্ঞান পরমপদ ; তা জেনে তুমি সর্বপ্রকার শোক ত্যাগ করো। রাজন্ ! যে ব্যক্তি ক্ষর-অক্ষরকে জানে, তার সংসারে ভয় থাকে না ; যে জানে না, সে-ই ভয়ে ভয়ে থাকে। মূর্খ মানুষ এটি না জানায় বারংবার তাকে এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয় এবং হাজার হাজার জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট সহ্য করতে হয়। অজ্ঞানরূপ সমুদ্র অব্যক্ত, অগাধ এবং ভয়ংকর, এতে বহুপ্রাণী প্রত্যহ কষ্ট পেতে থাকে। তুমি আমার উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে এই ভবসাগর অতিক্রম করেছো। রজোগুণ এবং তমগুণ তোমাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না (তুমি শুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত হয়েছ)।

রাজকুমার বসুমানকে এক ঋষির ধর্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! কোনো এক সময়ের কথা। জনক বংশের এক রাজকুমার বসুমান শিকার করতে এক নির্জন বনে গেলেন। সেখানে তিনি ভৃগুবংশজাত এক ব্রহ্মর্ষির সাক্ষাৎ পেলেন, তিনি সেখানেই বাস করছিলেন। বসুমান তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণাম জানালেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'মুনিবর ! এই

বিনাশশীল দেহে কামের অধীনে থাকা মানুষ ইহলোক ও পরলোকে কীভাবে নিজের কল্যাণসাধনা করতে সক্ষম ?'

ঋষিবর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—রাজকুমার ! ধর্মই সৎপুরুষদের কল্যাণ করে এবং ধর্মই তাদের আশ্রয়। ত্রিলোকের চরাচর প্রাণী ধর্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তুমি সর্বদাই বিষয়রস গ্রহণ করতে চাও, তোমার কামনার তৃষ্ণা কেন শান্ত হয় না। মোহগ্রস্ত বুদ্ধির জন্য এখন তোমার কামনাগুলিকে অত্যন্ত মিষ্টি বলে মনে হয়, তার থেকে যে পতন হতে পারে, সেদিকে তোমার দৃষ্টি নেই। জ্ঞানের ফল যারা চায়, তাদের পক্ষে জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, তেমনই ধর্মের ফল যারা চায়, তাদেরও ধর্মের সঙ্গে পরিচয় করা প্রয়োজন। দুষ্ট ব্যক্তি যদি ধর্মলাভ করতে চায়, তাহলে তার পক্ষে সৎ কর্ম সম্পাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে আর সাধু ব্যক্তি যদি ধর্মানুষ্ঠানের ইচ্ছা করেন, তাহলে তাঁর পক্ষে কঠিন থেকে কঠিনতম কাজও সহজ হয়ে ওঠে। বনে বাস করেও যে ব্যক্তি সুখভোগ করতে চায়, তাকে গ্রাম্য মানুষ বলেই মনে করা উচিত। কিন্তু গ্রামে থেকে যে ব্যক্তি বনবাসী মুনিদের মতো জীবনযাপন করে তাকে বনবাসী বলেই গণ্য করা কর্তব্য। প্রথমেই নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিতে যে গুণ দোষ থাকে, তা তুমি ঠিক মতো স্থির করে নাও, তারপর একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে কায়মনোবাক্যে ধর্মানুষ্ঠান করো। প্রতিদিন নিয়ম ও পবিত্রতা পালন করে সাধু পুরুষদের সৎকার করে দান করা উচিত। সাধুদের প্রতি দোষদৃষ্টি রাখা উচিত নয়, শুভকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত ধন সৎপাত্রে অর্পণ করা উচিত, ক্রোধ ত্যাগ করা কর্তব্য, দান করার পর অনুতাপ অথবা তার প্রচার করা উচিত নয়। দয়ালু, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরল এবং দেহে ও কর্মে শুদ্ধ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র। নিজ জাতের উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করা পতিদ্বারা সম্মানিত

স্ত্রীকে উত্তম নারী বলে মনে করা হয়। তেমনই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের বিদ্বান ছয়টি কর্ম (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ) সম্পাদন করে সর্বদাই শুদ্ধ এবং উত্তম পাত্ররূপে বিবেচিত হয়। এইভাবে দেশ, কাল এবং পাত্রের বিচার করে যে দান দেওয়া হয় তাতেই ধর্ম হয় এবং দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করে যে দান করা হয় তা অধর্মরূপে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি নিজ দোষ বিনাশ করে ধর্মাচরণ করে, ধর্ম তাকে পরলোকে সুখী করে। সকল প্রাণীর মধ্যেই ভালো-মন্দের বিচার থাকে। মানুষের উচিত তার চিত্তকে অশুভ-চিন্তা থেকে সরিয়ে শুভ চিন্তায় ব্যাপৃত করা। বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে সকলের দ্বারা সম্পাদিত সর্ব কর্মের সম্মান করা উচিত, তুমিও নিজ ধর্ম অনুসারে যে কর্মে অনুরাগ থাকে ইচ্ছা অনুসারে তা পালন করো, মনকে স্থির করো, শান্ত এবং বুদ্ধিমান হও, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো আচরণ করো। যারা সৎপুরুষের সঙ্গ করে, তারা সেই পুরুষের প্রতাপে এমন উপায় লাভ করে যা তাদের ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী হয়। ধৃতিই (মনের স্থৈর্য) কল্যাণের মূল, রাজর্ষি মহাভিষ ধৃতিমান না হওয়াতেই স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছিলেন এবং রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হলেও ধৃতির বলেই উত্তমলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তুমিও ধর্মজ্ঞ এবং তপস্বী বিদ্বানদের সেবা করো, এর দ্বারা তোমার বুদ্ধি উন্নত হবে এবং তুমি কল্যাণ লাভ করবে।

মুনির উপদেশ শুনে রাজকুমার বসুমান নিজ মনকে কামনা থেকে সরিয়ে ধর্মে ব্যাপৃত করলেন।

রাজা জনককে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ, সাংখ্য মত অনুসারে সৃষ্টি-প্রলয় ও গুণাদির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! যা ধর্ম-অধর্মরহিত, সংশয় শূন্য, জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত, পাপ-পুণ্যহীন, নিত্য, নির্ভয়, কল্যাণময়, অক্ষর, অব্যয়, পবিত্র এবং ক্লেশরহিত তত্ত্ব, আপনি আমাকে সেই উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম বললেন—ভারত ! এই ব্যাপারে তোমাকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাচ্ছি। একবার দেবরাতের পুত্র মহাযশস্বী রাজা জনক জ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বিপ্রবর ! ইন্দ্রিয় কী ? প্রকৃতির কয়টি ভাগ ? প্রকৃতির অতীত কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ কী ? তারও অতীত নির্গুণ তত্ত্ব কী ? সৃষ্টি ও প্রলয়ের স্বরূপ কী ? কৃপা করে আমাকে সব বলুন। আমি আপনার কৃপাপাত্র এবং অজ্ঞান, তাই প্রশ্ন করছি। আপনি জ্ঞানভাণ্ডার, তাই আপনার কাছ থেকেই এবিষয়ে শোনার জন্য ইচ্ছা হচ্ছে।'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—রাজন্ ! তুমি যা জানতে চাও, সেই যোগ এবং সাংখ্যের পরম রহস্যময় জ্ঞান আমি তোমাকে বলছি, শোনো। যদিও তোমার কোনো কিছুই অজ্ঞাত নেই, তবুও যদি আমার কাছে শুনতে চাও, তাহলে শোনো ; কারণ জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে কেউ কিছু জানতে চাইলে, তা জানানোই উচিত, এই হল সনাতন ধর্ম। প্রকৃতির তত্ত্ব আটটি এবং বিকার ষোলোটি। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের জ্ঞানীরা বলেছেন অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল এবং তেজ—এই আট তত্ত্ব প্রকৃতির। এবারে বিকারের নাম শোনো—চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, হাত[illegible], পায়ু, লিঙ্গ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হল বিকার। এর মধ্যে হস্ত-পদ ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয় এবং শব্দ ও স্পর্শকে বিশেষ বিষয় বলা হয়, নেত্র ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সবিশেষ বলা হয়, এগুলি সব মিলে পনেরো, এর সঙ্গে ষোড়শতম বিকার হল মন। রাজন্ ! অব্যক্ত প্রকৃতি হতে মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধির) উৎপত্তি হয়, বিদ্বানগণ একে প্রথম এবং প্রাকৃত সৃষ্টি বলেন। মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়, তা হল দ্বিতীয় সর্গ, যাকে বুদ্ধ্যাত্মক সৃষ্টি বলে। অহংকার থেকে মন প্রকাশলাভ করে, যাকে তৃতীয় আহংকারিক সৃষ্টি বলে। মন থেকে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়েছে, তাকে চতুর্থ মানসী সৃষ্টি বলা হয়। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয় পঞ্চভূত থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এদের ভৌতিক সর্গ বলা হয়, এটি পঞ্চম সৃষ্টি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বককে ষষ্ঠ সর্গ বলা হয়, এটি বহুচিন্তাত্মক (মানস) সৃষ্টি। কর্ণ ইত্যাদির পর কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়েছে, এটি সপ্তম সর্গ।

এটি ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি। তারপর প্রাণবায়ুর সঙ্গেই সমান, ব্যান এবং উদানের নিম্নভাগ উৎপন্ন হয়েছে, একে নবম সর্গ বলা হয়। অষ্টম এবং নবম সর্গকে বলা হয় আর্জবক সৃষ্টি। রাজন্ ! আমি শ্রুতি অনুসারে নয় প্রকার সৃষ্টি এবং চব্বিশ প্রকার তত্ত্বের বর্ণনা করলাম।

এবার তত্ত্বাদির সংহারের বৃত্তান্ত শোনো। আদি-অন্তরহিত নিত্য, অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মা যে ভাবে বারবার সৃষ্টি ও লয় করেন, তা বর্ণনা করছি। ব্রহ্মা যখন দেখেন যে তাঁর দিবাকাল সমাপ্ত হয়ে রাত্রি আসন্ন, তখন তাঁর মনে শয়নের ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি অহংকারের অভিমানী দেবতা রুদ্রকে সংহার করার নির্দেশ দেন। সেই রুদ্রদেব তখন প্রচণ্ড সূর্যের স্বরূপ ধারণ করেন এবং নিজের দ্বাদশ স্বরূপ সৃষ্টি করে অগ্নির ন্যায় জ্বলে ওঠেন। তারপর তিনি তেজে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ—এই চার প্রকার প্রাণী সমন্বিত সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ করেন। পলক ফেলতে না ফেলতেই চরাচর বিশ্ব ধ্বংস হয়ে কচ্ছপের পিঠের রূপ ধারণ করে। তারপর অমিত বিক্রমশালী রুদ্র পৃথিবীকে জলের মহাপ্রবাহে ভাসিয়ে দেন। এরপর কালাগ্নির তাপে সমস্ত জল শুষ্ক হয়ে যায়। তখন আগুন ভয়ানক রূপ ধারণ করে এবং বায়ু তার সঙ্গে মিলিত হয়ে চারদিকে ভীষণভাবে জ্বলতে থাকে। তারপর বায়ুকে আকাশ, আকাশকে মন, মনকে অহংকার, অহংকারকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বকে প্রজাপতি শম্ভু গ্রাস করেন। এই শম্ভু অণিমা, লঘিমা এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধিসম্পন্ন, সকলের ঈশ্বর, জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অবিকারী। তিনি সর্বত্র হস্ত-পদসম্পন্ন, সর্বদিকে চক্ষু, মস্তক ও মুখ এবং তাঁর সর্বদিকে কান ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। তিনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা, অনন্ত, পরম মহান এবং সর্বেশ্বর, তিনি সমস্ত বিশ্বকে নিজের মধ্যে লীন করে নেন। এইভাবে সবকিছুর শেষে সর্বস্বরূপ, অক্ষয়, অব্যয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের স্রষ্টা এবং সর্বপ্রকার দোষবর্জিত পরমেশ্বরই শেষ পর্যন্ত থাকেন। রাজন্ ! আমি তোমাকে এই তত্ত্বগুলির সংহারের ক্রম পর্যায় জানালাম।

রাজন্ ! প্রকৃতি স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করার জন্য নিজেরই ইচ্ছাতে শত-সহস্র গুণ উৎপন্ন করে। মানুষ যেমন একটি প্রদীপ থেকে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে নেয়, তেমনই প্রকৃতি পুরুষের এক একটি গুণ থেকে বহু গুণ উৎপন্ন করে। আনন্দ, প্রীতি, মন ও ইন্দ্রিয়াদির প্রসন্নতা, সুখ, শুদ্ধি, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, দৈন্য, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, অঋণী, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, শৌচ, সরলতা, সদাচার, অলোলুপতা, হৃদয়ে সম্ভ্রম না থাকা, ইষ্টানিষ্টের বিয়োগ ব্যাখ্যা না করা, দানের দ্বারা মনকে বশে রাখা, কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা না করা, পরোপকার এবং সব প্রাণীকে দয়া করা—এসব গুণ সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন হয়। রূপ, ঐশ্বর্য, বিগ্রহ, ত্যাগের অভাব, নির্দয়তা, সুখ-দুঃখে আসক্তি, পরচর্চায় প্রীতি, বিবাদ-বিসংবাদে অংশ নেওয়া, অহংকার, মানী ব্যক্তিদের অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা সৃষ্টি, পরস্বাপহরণ, নির্লজ্জতা, কুটিলতা, ভেদবুদ্ধি, কঠোরতা, কাম, মদ, দর্প এবং দ্বেষ—এগুলিকে বলা হয় রজোগুণের কাজ। মোহ, অপ্রকাশ (অজ্ঞতা), তামিস্র (ক্রোধ), অন্ধতামিস্র (মৃত্যু), নানাপ্রকার খাদ্যে রুচি, খাদ্যে সন্তুষ্ট না থাকা, পানীয় দ্রব্যে অতৃপ্তি, সুগন্ধী, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, বাক্যবাগীশ, প্রমাদে মত্ত থাকা, নৃত্য-গীতাদিতে প্রীতি এবং ধর্মবিদ্বেষ—এগুলিকে তামসগুণ বলে জানা উচিত।

রাজন্ ! সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিচারশীল পণ্ডিতগণ বলেন যে সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের উত্তম, রজোগুণীদের মধ্যম এবং তমোগুণীদের অধম স্থান প্রাপ্তি হয়, শুধু পুণ্য করলে মানুষ ঊর্ধ্বলোকে গমন করে, পুণ্য ও পাপ দুটিই করলে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, পাপাচার করলে মানুষের অধোগতি (নরক গমন) হয়। এবার আমি সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিন গুণাদির দ্বন্দ্ব এবং সন্নিপাতের[১] বর্ণনা করছি। সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণ, রজোগুণের সঙ্গে তমোগুণ অথবা তমোগুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণের মিলন দেখা যায়। সত্ত্বগুণযুক্ত মানুষের দেবলোক প্রাপ্তি হয়, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ দুটি যুক্ত হলে মনুষ্য-জন্ম লাভ হয় এবং রজোগুণ ও তমোগুণ যুক্ত জীবকে তির্যক যোনিতে জন্ম নিতে হয়। যার মধ্যে তিন গুণের সংযুক্তি থাকে, তাকেও মনুষ্য যোনিতে জন্ম নিতে হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ ও পুণ্যরহিত হয়, সেই মহাত্মাদের অক্ষয়, অবিকারী, অমৃতময় এবং সনাতন স্থান প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীদেরই সেই উত্তম পদ সুলভ হয়ে থাকে।

---

[১]দুই গুণের মিলনকে দ্বন্দ্ব এবং তিন গুণের মিলনকে সন্নিপাত বলা হয়।

রাজা জনক জিজ্ঞাসা করলেন—মহামতি ! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি, অনন্ত, মূর্তিহীন, অচল। উভয়েরই গুণ অপ্রকম্য এবং উভয়েই নির্গুণ ও বুদ্ধির অগোচর। তাহলে আপনি একটিকে কেন অচেতন বলেছেন এবং অপরটিকে চৈতন্যযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ ? আপনি পূর্ণভাবে মোক্ষধর্মের পালনকারী ; তাই আপনার মুখ থেকেই আমি সম্পূর্ণ মোক্ষধর্ম শোনার ইচ্ছা করি। পুরুষের অস্তিত্ব, কেবলত্ব, প্রকৃতির সঙ্গে ভিন্নত্ব স্পষ্টীকরণ করুন। দেহাশ্রয়কারী ইন্দ্রিয়-দেবতাদের সম্বন্ধে বলুন এবং বলুন মরণশীল জীবের প্রাণ শরীর ত্যাগ করে কোন স্থান প্রাপ্ত হয় ? এসবই স্পষ্ট করে বলুন। সেই সঙ্গে পৃথকভাবে সাংখ্য ও যোগের জ্ঞান এবং মৃত্যুসূচক চিহ্নগুলির বর্ণনা করুন ; কারণ সমস্ত জ্ঞান আপনার কাছে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—রাজন্ ! ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এবং গুণাতীত পুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব আমি বলছি, শুনুন। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ বলে থাকেন, যাদের গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তারা গুণবান হয়ে থাকে এবং যারা গুণের সংসর্গ-রহিত, তাদের নির্গুণ বলা হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি স্বভাবতই গুণসম্পন্না, তা গুণাদি অতিক্রম করে না। তার কোনো বস্তুর জ্ঞান হয় না। অপরদিকে পুরুষ স্বভাবতই জ্ঞানী, সে সর্বদা অবহিত থাকে যে, সে ছাড়া আর কোনো চেতন পদার্থ নেই। সুতরাং ক্ষর হওয়ায় প্রকৃতি অচেতন (জড়) এবং নিত্য ও অক্ষর হওয়ায় পুরুষ চেতন। কিন্তু যতক্ষণ পুরুষ বারংবার অজ্ঞানবশত গুণাদির সংসর্গ করে এবং নিজের অসঙ্গ স্বরূপকে চিনতে না পারে, ততক্ষণ তার মুক্তি হয় না। সে নিজেকে প্রকৃতির (প্রজার) অনুগামী মেনে নেওয়ায় তাকে প্রকৃতিধর্মী বলা হয়। স্থাবর পদার্থের বীজ উৎপন্ন করার জন্য তাকে বীজধর্মা বলা হয় এবং গুণাদির উৎপত্তি ও প্রলয়ের কর্তা হওয়ায় তাকে গুণধর্মা বলা হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রের জ্ঞান-সিদ্ধ যতিগণ সাক্ষী এবং অদ্বিতীয় হওয়ায় পুরুষকে একক (প্রকৃতির সঙ্গরহিত বলে) বলে মনে করেন। অহং-অভিমানের জন্য তার সুখ-দুঃখ অনুভূত হয়, কারণরূপে নিত্য এবং অব্যক্ত আর কার্যরূপে নিত্য এবং ব্যক্ত। সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দয়াদৃষ্টিসম্পন্ন, শুধুমাত্র জ্ঞানীর আশ্রয় গ্রহণকারী সাংখ্য জ্ঞানিগণ প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে বহু বলে মানেন। পুরুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক ও নিত্য এবং অব্যক্ত (প্রকৃতি) পুরুষ থেকে ভিন্ন এবং অনিত্য। যারা জ্ঞানহীন তারা এইসব ঠিকমতো বুঝতে পারে না। যারা প্রকৃতি এবং পুরুষকে একে অপরের থেকে পৃথক বলে জানে না, তারা বারংবার ঘোর নরকে পতিত হয়। আমি তোমাকে সাংখ্যশাস্ত্রের মত জানালাম, সাংখ্যশাস্ত্রের বিদ্বানেরা এইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য বিচার করে কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়েছেন।

যোগ এবং মৃত্যুসূচক চিহ্নাদির বর্ণনা

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—রাজন্ ! আমি সাংখ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান তোমাকে জানিয়েছি, এবার যোগশাস্ত্রের জ্ঞানের কথা শোনো। সাংখ্যের সমকক্ষ কোনো জ্ঞান নেই এবং যোগের সমান কোনো বল নেই, উভয়ের লক্ষ্যই এক এবং দুইয়ের দ্বারাই মৃত্যুর ভয় দূর হয়। যারা এই দুটি শাস্ত্রকে সর্বতোভাবে পৃথক বলে মনে করে, তারা অজ্ঞ। আমি বিচার দ্বারা পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে উভয়কেই এক বলে মনে করি। যোগী যে তত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন, সাংখ্যের বিদ্বানও তা প্রাপ্ত হন। যাঁরা সাংখ্য এবং জ্ঞানকে এক বলে মানেন, তাঁরাই তত্ত্ববেত্তা। যোগসাধনায় রুদ্রেরই (প্রাণশক্তিরই) প্রাধান্য থাকে, প্রাণ নিজের বশীভূত করলে যোগী এই শরীরেই দশদিকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। যোগী যতক্ষণ স্থূল দেহে থাকেন ততক্ষণ তিনি যোগবলের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরে লোক-লোকান্তরে বিচরণ করেন। স্থূলদেহ ত্যাগ করলে তিনি পরমসুখরূপ মোক্ষ লাভ করেন। মনীষী ব্যক্তিদের বক্তব্য হল যে বেদে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই প্রকার যোগ বর্ণিত আছে। স্থূল যোগ অণিমাদি আট প্রকার সিদ্ধি প্রদান করে এবং সূক্ষ্ম যোগ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি) আট গুণ (অঙ্গে) যুক্ত। যোগের প্রধান কর্তব্য হল প্রাণায়াম, যা সগুণ ও নির্গুণ—

দুই প্রকার ভেদবিশিষ্ট। মনের ধারণার[১] সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রাণায়াম হল সগুণ এবং প্রাণকে (ইন্দ্রিয়কে) নিগ্রহপূর্বক মনকে সমাধিতে একাগ্র করাকে নির্গুণ প্রাণায়াম বলা হয়। সগুণ প্রাণায়াম মনকে নির্গুণ (বৃত্তিশূন্য) করে স্থির করতে সাহায্য করে। এইভাবে (প্রাণায়ামের দ্বারা) মনকে বশ করে শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে একান্তবাসকারী আত্মাতেই রমণকারী জ্ঞানীর পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটি আসক্তি, এইগুলি দূর করা উচিত। তারপর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি মনে স্থির করে লয় ও বিক্ষেপকে শান্ত করবে। মনকে অহংকারে, অহংকারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে স্থাপন করবে। এইভাবে সব কিছুর লয় করে কেবল সেই পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত, যিনি রজোগুণরহিত, নির্মল, নিত্য, অনন্ত, শুদ্ধ, কূটস্থ, অন্তর্যামী, অভেদ্য, অজর, অমর, অবিকারী, সকলের শাসনকারী ও সনাতন ব্রহ্ম।

রাজন্ ! এবার সমাধিতে অবস্থিত যোগীদের লক্ষণ শোনো। তৃপ্ত মানুষ যেমন সুখে নিদ্রা যায়, যোগযুক্ত পুরুষের চিত্তেও তেমনই সর্বদা প্রসন্নতা বিরাজ করে, তিনি সমাধি থেকে বিরত হতে চান না, তাঁর প্রসন্নতার এটিই লক্ষণ। তৈলপূর্ণ প্রদীপ যেমন অচঞ্চল বায়ুতে নিষ্কম্পভাবে জ্বলতে থাকে, তার শিখা স্থিরভাবে ওপরের দিকে উঠে থাকে, সমাধিনিষ্ঠ যোগীও তেমনই স্থির, অকম্পিতভাবে থাকেন। বৃষ্টির আঘাতে যেমন পর্বত চঞ্চল হয় না, তেমনই নানাপ্রকার বিক্ষেপ এলেও যোগী বিচলিত হন না। সতর্ক ব্যক্তি দুই হাতে তেলভর্তি পাত্র নিয়ে সিঁড়ি আরোহণের সময় বহু মানুষ হাতে তরবারি নিয়ে ভয় দেখালেও যেমন ভীত হন না এবং একফোঁটা তেলও পড়ে যায় না, তেমনই উচ্চস্থিতি প্রাপ্ত একাগ্রচিত্ত যোগী ইন্দ্রিয়ের স্থিরতার জন্য সমাধি থেকে বিচলিত হন না। যোগসিদ্ধ মহাত্মার এটিই লক্ষণ বলে জানতে হবে। যিনি এইভাবে সমাধিতে স্থির হন, তিনি অবিনাশী পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই সাধনা দ্বারা মানুষ দেহত্যাগের পর (প্রকৃতির সংসর্গ-বর্জিত) পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন, যোগীদের এটিই যোগ, এই তত্ত্ব জেনে মনীষী পুরুষেরা কৃত কৃতার্থ হয়ে যান।

বিদেহরাজ ! এবার আমি বিদ্বান ব্যক্তিদের কথিত মৃত্যুসূচক চিহ্নের বর্ণনা করব। যে ব্যক্তি অরুন্ধতী বা ধ্রুবতারা, যা সে আগে দেখেছে, কিন্তু আর দেখতে পায় না, পূর্ণ চন্দ্রের মণ্ডল এবং প্রদীপের শিখা দক্ষিণ দিকে খণ্ডিতরূপে দেখতে পায়, সেই ব্যক্তি মাত্র এক বৎসর জীবিত থাকবে। যে ব্যক্তি অন্যের চোখে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় না, তারও আয়ু এক বৎসরই মাত্র বাকি আছে জানবে। যার সুন্দর কান্তি নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, স্বভাবে বিপরীত ভাব দেখা যায়, যে শ্যামবর্ণের হলেও পাণ্ডুবর্ণে পরিণত হতে থাকে, দেবতাদের অসম্মান করে, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাদ করে, সে ব্যক্তি ছয়মাসের বেশি জীবিত থাকে না। যে ব্যক্তি সূর্য ও চন্দ্রকে মাকড়সার জালের মতো ছিদ্রযুক্ত দেখে এবং দেবমন্দিরের সুগন্ধ বস্তুর মধ্যে দুর্গন্ধ অনুভব করে সে সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যার নাক ও কান বেঁকে যায়, দাঁত ও চোখের রং নষ্ট হয়ে যায়, যে বারংবার মূর্ছিত হতে থাকে, যার শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে, যার বাম চোখে হঠাৎ করে জল ঝরতে থাকে, যার মাথা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়, তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

এই মৃত্যুসূচক চিহ্নগুলি জেনে মনকে বশে রাখা সাধকদের রাতদিন পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত এবং মৃত্যু আসন্ন জেনে সতর্ক থাকা উচিত। এরূপ করলে সাধক সেই সনাতন পদ প্রাপ্ত করেন, যা অশুদ্ধ চিত্ত মানুষের পক্ষে দুর্লভ। সেই পদ অক্ষয়, অজ, অচল, অবিকারী, পূর্ণ এবং কল্যাণময়।

—০—

[১]কোনো এক স্থানে চিত্ত স্থাপন করাকে বলা হয় ধারণা।

যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক মোক্ষধর্মের বর্ণনা

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—রাজন্ ! তুমি যে অব্যক্ত পরব্রহ্মের বিষয়ে জানতে চেয়েছ, তা অত্যন্ত গূঢ়, মন দিয়ে শোনো—প্রথম কথা, আমি কঠোর তপস্যা করে ভগবান সূর্যের আরাধনা করেছি। একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'ব্রহ্মর্ষে ! তুমি ইচ্ছা মতো বর প্রার্থনা করো, দুর্লভ হলেও আমি তোমাকে তা দেব, কারণ তোমার কঠোর তপস্যায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, আমার প্রসন্নতা লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ।' তাঁর কথা শুনে আমি বললাম, 'ভগবন্ ! আমার যজুর্বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, আমি সেই পরম জ্ঞান লাভ করতে চাই।' ভগবান সূর্য তখন বললেন—'বিপ্রবর ! আমি তোমাকে যজুর্বেদ প্রদান করছি। তুমি মুখ খোলো, বাগ্‌দেবী সরস্বতী তোমার ভেতর প্রবেশ করবেন।' তাঁর আদেশে আমি মুখব্যাদান করলাম এবং দেবী সরস্বতী মুখে প্রবিষ্ট হলেন। তিনি প্রবেশ করতেই আমার শরীরে জ্বালাবোধ হল এবং আমি তা শান্ত করার জন্য জলে প্রবেশ করলাম। আমাকে কষ্ট পেতে দেখে ভগবান সূর্য বললেন—'তাত ! আর কিছুক্ষণ কষ্ট সহ্য করো, তারপর এটি আপনিই শান্ত হয়ে যাবে।' কিছুক্ষণ পর আমার জ্বালা শান্ত হয়ে গেলে ভগবান বললেন—'দ্বিজবর ! পরকীয় শাখা এবং উপনিষদ সমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেদ তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে আর তুমি সম্পূর্ণ শতপথের প্রণয়ন (সম্পাদন) করবে। তারপর তোমার বুদ্ধি মোক্ষতে স্থির হবে এবং তুমি সেই অভীষ্ট পদ লাভ করবে, যে পদ সাংখ্যবেত্তা এবং যোগীরাও লাভ করতে ইচ্ছা করেন।'

এই কথা বলে সূর্যদেব প্রস্থান করলেন আর আমি তাঁর কথা শুনে নিজ গৃহে ফিরে এলাম। গৃহে এসে আমি অত্যন্ত প্রসন্নতার সঙ্গে সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করলাম। আমি স্মরণ করতেই স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ বিভূষিত সরস্বতী দেবী ওঁ-কারকে সঙ্গে নিয়ে আমার সামনে আবির্ভূত হলেন। তখন আমি তাঁকে এবং ভগবান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করে, তাঁদের ধ্যান করতে বসলাম। সেই সময় আমি অত্যন্ত আনন্দসহ রহস্য সংগ্রহ এবং পরিশিষ্ট ভাগসহ সমগ্র শতপথ সংকলন করি। তারপর আমার শতজন শিষ্য আমার কাছে সেই শতপথ অধ্যয়ন করে। এভাবে সূর্যদেবের কাছে উপদেশ লাভ করে পনেরো শাখার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে আমি বেদ্যতত্ত্বের জ্ঞানার্জন করেছি।

একদিন বেদান্ত-জ্ঞান কুশল বিশ্বাবসু নামে এক গন্ধর্ব আমার কাছে সত্য এবং সর্বোত্তম জ্ঞাতব্য বস্তু কী, তার বিচার করতে এলেন। তিনি আমার কাছে এসে বেদবিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে বললাম—'গন্ধর্ব-রাজ ! সমস্ত প্রাণী যার থেকে উৎপন্ন হয় এবং যাতে লীন হয়, সেই বেদপ্রতিপাদ্য জ্ঞেয় পরমাত্মাকে যারা জানে না, তাদের বারংবার জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করতে হয়। সর্বাঙ্গ বেদ পাঠ করেও যাঁর বেদবেদ্য পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়নি এবং বেদবেত্তা হয়েও যাঁর বেদ্য-অবেদ্যর তত্ত্বজ্ঞান হয়নি সেই মূর্খ শুধুমাত্র শাস্ত্র-জ্ঞানের বোঝাই বহন করে। পুরুষকে তৎপর হয়ে প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত ; যাতে তাকে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়তে না হয়। জগতে জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরা কখনো শেষ হয় না এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডে কথিত সমস্ত কর্মই নশ্বর—এই কথা চিন্তা করে বিনাশশীল কর্ম পরিত্যাগ করবে এবং অক্ষর ধর্ম সেবায় ব্যাপৃত হবে। যে ব্যক্তি সর্বদা পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করে, সে প্রকৃতিবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছাব্বিশতম তত্ত্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করে। অজ্ঞ ব্যক্তি পঁচিশতম তত্ত্বরূপ জীবাত্মা এবং সনাতন পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করে ; কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের দৃষ্টিতে উভয়ই এক। পরমপদ আকাঙ্ক্ষাকারী সাংখ্যজ্ঞানী এবং যোগীও জন্ম-

মৃত্যুর ভয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে ভিন্ন দৃষ্টি পোষণ করেন না।

বিশ্বাবসু বললেন—বিপ্রবর ! আপনি পঁচিশতম তত্ত্ব জীবাত্মাকে পরমাত্মার থেকে অভিন্ন বলেছেন, কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা, না অন্য কিছু ? এই বিষয়ে আমার ধারণা স্পষ্ট নয় ; সুতরাং আপনি সেটি স্পষ্ট করে বলুন। আমি মুনিবর জৈগীষব্য, অসিত, দেবল, পরাশর, বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক্র, গৌতম, গর্গ, আর্ষ্টিষেণ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার এবং পিতা কশ্যপের মুখেও প্রথমে এই বিষয়ে প্রতিপাদন শুনেছি। তারপর রুদ্র, বিশ্বরূপ, অন্যান্য দেবতা, পিতৃগণ, দৈত্যদের থেকেও এই জ্ঞানলাভ করেছি। এই সকল বিজ্ঞ মহানুভবগণ জ্ঞেয় তত্ত্বকে পূর্ণ এবং নিত্য বলেন। এখন আমি এই বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত শুনতে চাই ; কারণ আপনি বিদ্বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রবক্তা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এমন কোনো বিষয় নেই যা আপনি জানেন না। আপনাকে বেদাদির ভাণ্ডার বলে মানা হয়। দেবলোক এবং পিতৃলোকেও আপনার প্রসিদ্ধি আছে। ব্রহ্মলোকে গমনকারী ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণও আপনার মহিমা বর্ণনা করেন। সাক্ষাৎ ভগবান সূর্য আপনাকে বেদের জ্ঞান প্রদান করেছেন এবং আপনি নিজেও সম্পূর্ণ সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রের জ্ঞাতা। সমস্ত চরাচর প্রাণী সম্বন্ধে আপনি যে পূর্ণ জ্ঞানী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; তাই আপনার মুখ থেকেই সেই তত্ত্ব জ্ঞান শুনতে চাই।

তখন আমি বললাম—গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ ! তুমি অত্যন্ত মেধাবী। তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করছ, তার শাস্ত্রীয় উত্তর শোনো—প্রকৃতি জড়, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-জীবাত্মা প্রকৃতিকে জানে কিন্তু প্রকৃতি জীবাত্মাকে জানে না। সাংখ্য ও যোগের জ্ঞানী প্রকৃতিকে বলেন 'প্রধান'। সাক্ষী পুরুষ বিবেক-বিচারের দ্বারা চব্বিশতম তত্ত্ব প্রকৃতিকে, পঁচিশতম তত্ত্ব স্বয়ংকে এবং ছাব্বিশতম তত্ত্ব পরমাত্মাকে অনুভব করে। কিন্তু জীবাত্মা যদি অহংকার করে যে, আমার থেকে বড় কেউ নেই, তাহলে সে পরমাত্মাকে দেখেও দেখতে পায় না ; কিন্তু সবই পরমাত্মার গোচরে থাকে। জীবাত্মার যখন এই জ্ঞান হয় যে আমি পৃথক এবং প্রকৃতি আমার থেকে সর্বতোভাবে পৃথক, তখন সে প্রকৃতির সঙ্গবর্জিত হয়ে ছাব্বিশতম তত্ত্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে এবং যখন সে পরমাত্মার দর্শন লাভ করে তখন সে সর্বজ্ঞ জ্ঞানী হয়ে পুনর্জন্ম বন্ধন থেকে চিরমুক্তি লাভ করে।

বিশ্বাবসু বললেন—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ! আপনি সব দেবতার কারণ স্বরূপ ব্রহ্মের বিষয়ে যথাবৎ যে বর্ণনা করলেন তা সত্য, শিব, সুন্দর এবং সকলের কল্যাণকর। আপনার মন যেন সর্বদা এইপ্রকার জ্ঞানে স্থিত থাকে। আপনার মঙ্গল হোক (এবার আমি বিদায় নেব)।

বিশ্বাবসু আমার দিকে সৌম্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই কথা বলে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর আমাকে প্রদক্ষিণ করে তিনি স্বর্গলোকে গমন করলেন। রাজা জনক ! ব্রহ্মাদি দেবলোকে, পৃথিবীতে বা পাতালে বাস করে যারা কল্যাণময় মোক্ষমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, বিশ্বাবসু তাদের সকলকে এই জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেছেন। সাংখ্যজ্ঞানে নিষ্ঠাযুক্ত সাংখ্যবেত্তা, যোগধর্মপালনকারী যোগী এবং অন্যান্য মোক্ষাভিলাষীদের জন্য এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী। জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, অজ্ঞানের দ্বারা নয় ; তাই প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করা উচিত, যার সাহায্যে মানুষ জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা নীচকুলে উৎপন্ন মানুষ থেকে যদি জ্ঞান লাভ হয় তাহলে মানুষের সর্বদা তাদের শ্রদ্ধা করা উচিত ; কারণ শ্রদ্ধালুর মধ্যে জন্ম-মৃত্যু প্রবেশাধিকার পায় না। ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, নাভি থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে ; অতএব কোনো বর্ণকেই ব্রহ্মের থেকে পৃথক বলে মনে করা উচিত নয়। মানুষ অজ্ঞতার জন্যই কর্মানুসারে জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার ভয়ানক অজ্ঞতাই তাকে নানাপ্রকার প্রাকৃত জন্মে আবর্তন করায়। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হয়। আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে সকল বর্ণের মানুষই নিজ নিজ আশ্রমে বাস করে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। ব্রাহ্মণ হোক বা ক্ষত্রিয়াদি অন্য কোনো বর্ণ—যে জ্ঞানে স্থিত হয়, মোক্ষ তার পক্ষে নিত্য প্রাপ্ত। রাজন্ ! তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ, তার উত্তর আমি দিয়েছি, এখন তোমার শোক পরিহার করা উচিত। তোমার কল্যাণ হোক, যাও, যেমন করে পারো, এই জ্ঞানে পারদর্শী হও।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! পরম বুদ্ধিমান ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই উপদেশ লাভ করে মিথিলানরেশ অত্যন্ত

আনন্দিত হলেন। তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে মুনিকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে বিদায় জানালেন। মুনি প্রস্থান করলে মোক্ষ জ্ঞাতা দেবরাতনন্দন রাজা জনক সুবর্ণসহ এক কোটি গাভী এবং বহু ব্রাহ্মণকে রত্নসামগ্রী প্রদান করলেন। তারপর মিথিলারাজ্য পুত্রকে সমর্পণ করে তিনি যতি ধর্ম পালন করতে লাগলেন। তিনি সম্পূর্ণ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র স্বাধ্যায় করে নিশ্চিত হলেন যে 'আমি অনন্ত'। তারপর ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সত্য-অসত্য, জন্ম-মৃত্যুকে প্রাকৃত (প্রকৃতি-জনিত এবং মিথ্যা) জেনে শুধু নিজ শুদ্ধ স্বরূপকেই নিত্য বলে মেনে নিলেন। রাজন্‌ ! সাংখ্য ও যোগের জ্ঞানী নিজ নিজ শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে সেই ব্রহ্মকে ইষ্ট-অনিষ্ট মুক্ত, স্থির, পরাৎপর, নিত্য এবং পবিত্র বলে মানেন ; সুতরাং তুমিও তাই জেনে পবিত্র হও। যা কিছু দেওয়া হয়, যা প্রাপ্ত হয়, যে দেয় এবং যে গ্রহণ করে, সে সবই একই আত্মা ; তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। সর্বদা এই ভাবটি মনে রেখো, এর বিপরীত চিন্তা মনে কখনো স্থান দিও না। যার অব্যক্ত প্রকৃতির জ্ঞান নেই, সগুণ-নির্গুণ পরমাত্মা চেনার বুদ্ধি নেই, সেই ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তীর্থাদিতে বাস করা উচিত। স্বাধ্যায়, তপ অথবা যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না, (এগুলি তাঁর তত্ত্ব জ্ঞান লাভের সহায়ক হয়ে থাকে)। এগুলির সাহায্যে পরমাত্মাকে জেনে মানুষ মহিমান্বিত হয়। মহত্তত্ত্বের উপাসনাকারী মহত্তত্ত্বকে এবং অহংকারের উপাসক অহংকার প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু মহত্তত্ত্ব এবং অহংকারের থেকেও শ্রেষ্ঠ কোনো স্থান আছে, যা সকলেরই লাভ করা প্রয়োজন। যারা শাস্ত্রানুসারে চলে, তারাই প্রকৃতির অতীত, নিত্য, জন্ম-মৃত্যুরহিত, মুক্ত এবং সদসৎস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত করে। যুধিষ্ঠির ! আমি এই জ্ঞান রাজা জনকের কাছ থেকে লাভ করেছি, রাজা জনক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। জ্ঞান সব থেকে উত্তম সাধন, যজ্ঞ এর সমকক্ষ হতে পারে না। মানুষ জ্ঞানের সাহায্যে এই দুর্গম ভবসাগর পার হয়ে যায়। যজ্ঞের সাহায্যে মানুষ তা পার হতে পারে না। অতএব তুমি প্রকৃতির অতীত, মহৎ, পবিত্র, কল্যাণময়, নির্মল এবং মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করো। জ্ঞানযজ্ঞের উপাসনা করলে তুমি নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি হয়ে উঠবে। পূর্বকালে যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে যে উপনিষদের (জ্ঞান) উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মনন করলে মানুষ সনাতন, অবিনাশী, শুভ, অমৃতময় এবং শোকরহিত ব্রহ্মলাভ করে।

ব্যাসদেব কর্তৃক পুত্র শুকদেবকে উপদেশ

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ব্যাসপুত্র শুকদেবের বৈরাগ্য হয়েছিল কেন ? আমার এই ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে ; আমি সেই বিষয়ে জানতে চাই। এছাড়া আপনি আমাকে অব্যক্ত এবং ব্যক্ত তত্ত্বের স্বরূপ ও জন্মরহিত ভগবানের লীলাকথা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্‌ ! পুত্র শুকদেবকে সর্বতোভাবে নির্ভয় এবং সাধারণ ব্যক্তির মতো আচরণ করতে দেখে শ্রীব্যাসদেব তাঁকে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করালেন এবং তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হয়ে ধর্মের পালন করো ; শীত-গ্রীষ্ম এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে প্রাণকে জয় করো ; সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অদোষদর্শন, জিতেন্দ্রিয়তা, তপস্যা, অহিংসা এবং অক্রূরতা ইত্যাদি ধর্ম বিধিমতো পালন করো ; সত্যে অবিচল থাকো এবং সর্বপ্রকার কুটিলতা ত্যাগ করে ধর্মে অনুরাগ রাখো। দেবতা এবং অতিথিদের সংকার করে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে তার দ্বারা প্রাণ রক্ষা করবে। দেখো পুত্র ! এই দেহ জলের বুদ্বুদের মতো ক্ষণভঙ্গুর, প্রিয়জনের সঙ্গে বসবাসও সর্বদা সম্ভব নয় ; তাহলে তুমি কেন নিশ্চিন্ত আছ ? তোমার শত্রুরা সর্বদা সতর্ক, জাগরিত এবং তোমার ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু শিশুর মতো তোমার কিছুতেই খেয়াল নেই। দিন কেটে যাচ্ছে, তোমার আয়ুও দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে আসছে। এইভাবে জীবন সমাপ্ত হয়ে আসছে, তবুও তুমি সতর্ক হচ্ছ না। নাস্তিকেরা পরলোক সম্বন্ধীয় কাজের দিকে চোখ বন্ধ করে থাকে, তারা সর্বদা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকে। যেসব ব্যক্তি বুদ্ধি বিভ্রমে পড়ে ধর্মে দ্বেষ করে এবং কুপথে চলে, তাদের অনুগামীদেরও দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই যে মহাপুরুষ ধর্মবলসম্পন্ন, সন্তুষ্ট ও শ্রুতিপরায়ণ থেকে সর্বদা ধর্মপথে আরূঢ় থাকেন, তুমি সর্বদা সেবা করে, তাঁর কাছ থেকে নিজের কর্তব্য জেনে নাও। সেই ধর্মজ্ঞ জ্ঞানীর

মত জেনে তুমি তোমার সুবুদ্ধির দ্বারা কুপথগামী মনকে বশে রাখো। যার কেবল বর্তমান সুখের দিকেই দৃষ্টি থাকে সেই ব্যক্তি কর্তব্য-অকর্তব্য দেখতে পায় না। তুমি ধর্মরূপ সিঁড়ি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে তাতে আরোহণ করো। রেশমকীটের মতো মন যদি বাসনায় আবদ্ধ থাকে, তাহলে কখনো তোমার চেতনা হবে না। নাস্তিক এবং ধর্মমর্যাদাভঙ্গকারী ব্যক্তিদের তুমি নির্ভয়ে উচ্ছেদ করো। কাম, ক্রোধ, মৃত্যু এবং যার মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ স্রোত বর্তমান এমন বিষয়াশারূপ নদী তুমি সাত্ত্বিকী ধৃতিরূপ নৌকা করে পার হও এবং এই জন্মরূপ দুর্গম পথও পার হয়ে যাও। সমস্ত জগৎ মৃত্যুদ্বারা ব্যাপ্ত এবং বৃদ্ধাবস্থায় প্রপীড়িত। তুমি ধর্মময় নৌকার সাহায্যে এটি পার হয়ে যাও। মানুষ শুয়েই থাকুক অথবা বসে, মৃত্যু সব সময় তার অনুসন্ধান করে। এইভাবে মৃত্যু যখন অকস্মাৎ তোমাকে বিনাশ করবে, তখন তুমি শান্তিতে থাক কী করে? মানুষ ভোগসামগ্রী সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকে, তাতে তার তৃপ্তি হয় না, এমন সময় অকস্মাৎ মৃত্যু এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়। তোমার যদি এই অন্ধকারময় সংসারে প্রবেশ করতেই হয়, তাহলে হাতে ধর্মবুদ্ধিরূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে নাও। জীবের বহু জন্ম পার হয়ে মানব জন্মে এই ব্রাহ্মণ শরীর লাভ হয়; তাই পুত্র! একে সফল করা উচিত। ব্রাহ্মণের শরীর ভোগ-বিলাসের জন্য নয়। তপস্যার ক্লেশ সহ্য করার জন্য এবং মৃত্যুর পর অনন্ত সুখভোগ করার জন্য ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করা হয়েছে। বহু তপস্যার পর ব্রাহ্মণ শরীর হয়। সেটি প্রাপ্ত হয়ে বিষয়ানুরাগে আবদ্ধ হয়ে তাকে নষ্ট করা উচিত নয়; বরং সর্বদা স্বাধ্যায়, তপস্যা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে তৎপর থেকে কুশল কর্মে ব্যাপৃত থাকতে হয়। মানুষের আয়ুরূপ অশ্ব ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে। তার স্বভাব অব্যক্ত, কলা-কাষ্ঠাদি তার শরীর, এর স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ক্ষণ, ত্রুটি, নিমেষ ইত্যাদি তার লোম, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ তার নেত্র এবং মাস হল তার অঙ্গ। তোমার জ্ঞানদৃষ্টি যদি অন্ধের মতো অন্যকে অনুসরণকারী হয়ে থাকে, তাহলে এটি নিরন্তর সবেগে দৌড়চ্ছে দেখে তোমার মন ধর্মে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। যারা এখানে ধর্মপথ ত্যাগ করে যথেচ্ছ আচরণ করে এবং অন্যকে ভালো-মন্দ কথা বলে নিজেরা নিরন্তর কুপথে চলে, তারা মৃত্যুর পর বহুবিধ নারকীয় যাতনা সহ্য করতে থাকে। যে রাজা সর্বদা ধর্মপরায়ণ হয়ে উত্তম ও অধম প্রজাদের যথাযোগ্য পালন করেন, তিনি পুণ্যাত্মাদের লোক প্রাপ্ত হন এবং বহুপ্রকার ধর্মাচরণ করায় তিনি দুর্লভ এবং নির্দোষ সুখ লাভ করেন; কিন্তু যে গুরুজনদের নির্দেশ উল্লঙ্ঘন করে, সেই অসৎ ব্যক্তি এমন লোকে যায়, যেখানে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছামতো আচরণ করে স্বায়ম্ভুব মনুর রচিত ধর্মের দশ[১] প্রকার মর্যাদা ভঙ্গ করে, সেই পাপাত্মা পিতৃলোকের অসিপত্র বনে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত লোভী, অসত্য প্রেমী এবং সর্বদা মিথ্যা বলে, যে ব্যক্তি নানাপ্রকার কূট কর্মে অপরকে দুঃখ দেয়, সেই পাপাত্মা ঘোর নরকে পতিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে। তাকে উষ্ণ মহানদী বৈতরণীতে ডুব দিতে হয়, অসিপত্র বনে অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয় এবং পরশু বনে শয়ন করতে হয়। এইভাবে মহানরকে পড়ে সে খুবই আতুর হয়ে ওঠে। তুমি ব্রহ্মলোকাদি বড় বড় স্থানের কথা বললেও, পরম পদের দিকে তোমার দৃষ্টি নেই। ভবিষ্যতে যে মৃত্যুর পরিচারিকা বৃদ্ধাবস্থা আসবে, তার তুমি সন্ধানই রাখো না। এইভাবে চুপ করে বসে আছ কেন? দেখো তোমার খুব বিপদ আসতে পারে; সুতরাং তুমি পরমানন্দ-প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হও। তোমাকে মৃত্যুর পর যমরাজের আদেশে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হবে; তাই তুমি কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা করে ধর্মোপার্জনপূর্বক প্রকৃত সুখলাভের উপায় করো। তোমার সামনে যখন যমরাজের দূত আসবে, সে একাই তোমাকে যমের সামনে নিয়ে যাবে; অতএব তুমি পরলোকে সুখপ্রদানকারী ধর্মাচরণ করো। পূর্বজন্মে তোমার সামনে যে প্রাণনাশক বায়ু প্রবাহিত হয়েছিল, আজ তা কোথায়? যখনই মৃত্যুরূপ মহাভয় উপস্থিত হবে, তুমি দেখবে সমস্ত পৃথিবী ঘূর্ণিত হচ্ছে। পুত্র! তুমি যখন শরীর ত্যাগ করে যাবে তখন ব্যাকুলতার জন্য তোমার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব তুমি সুদৃঢ় সমাধি প্রাপ্ত করো। দেখো, দেখতে দেখতে বৃদ্ধাবস্থা তোমার শরীর জর্জর করে ফেলবে, আর

[১]ধৃতিঃ ক্ষমা দোমহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

ধৃতি, ক্ষমা, মনোনিগ্রহ, অস্তেয়, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—মনু কথিত ধর্মের এই হল দশটি লক্ষণ।

রোগ যার সারথি, সেই কালভগবান এসে তোমার শরীর নষ্ট করে দেবে। তাই এই জীবন নষ্ট হওয়ার আগেই তুমি তপস্যা করে নাও। এই মনুষ্যদেহে অবস্থিত কাম-ক্রোধাদি চারদিক থেকে তোমাকে আক্রমণ করবে, সুতরাং তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করো। মৃত্যুর সময় প্রথমে তো তুমি ভীষণ অন্ধকার দেখবে, তারপর পর্বত শিখরে সুন্দর বৃক্ষ দেখতে পাবে ; সুতরাং তুমি আত্মকল্যাণের জন্য শীঘ্র চেষ্টা করো। এই ইন্দ্রিয়গুলি যা তোমার মিত্র বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এরা তোমার শত্রু, তারা নানাভাবে তোমার বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। তাই তুমি পরম পুরুষার্থের জন্য চেষ্টা করো। যে ধন প্রাপ্ত হলে রাজা বা চোরের ভয় থাকে না, মৃত্যু হলেও যা সঙ্গ ছাড়ে না, তাই অর্জন করার চেষ্টা করো। নিজ কর্মদ্বারা প্রাপ্ত সেই পুণ্যরূপ ধন পরলোকে কাউকে ভাগ দিয়ে হয় না। সেখানে যার যা গচ্ছিত, সে তাই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তুমি এমন ধন দাও যা অক্ষয় এবং অবিনাশী এবং নিজেও সেই ধন সঞ্চয় করো।

'পুত্র ! জীব জীবিতাবস্থায় যেসব শুভাশুভ কর্ম করে, মৃত্যুর পর সেটিই তার সঙ্গে যায়। মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জন কেউই তার সঙ্গে যায় না। ভালো-মন্দ কাজের দ্বারা জীব যা আহরণ করে, শরীর ত্যাগের পর সেগুলি তার কোনো কাজেই আসে না। ইহলোকে অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য—এই তিন দেবতা জীবের শরীর আশ্রয় করে থাকেন, তাঁরাই জীবের ধর্মাচরণগুলি দেখেন এবং তাঁরাই পরলোকে সাক্ষী হয়ে থাকেন। দিন সমস্ত পদার্থকে প্রকাশিত করে আর রাত্রি সেগুলিকে লুক্কায়িত করে। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং সকল বস্তুকে স্পর্শ করেন। সুতরাং তুমি সর্বদা নিজ ধর্ম পালন করো। পরলোকে শুধুমাত্র নিজ কর্মের ফলই ভোগ করতে হয়। সেখানে পুণ্যাত্মারা বিমানে চড়ে ইচ্ছামতো বিহার করেন। শুদ্ধচিত্ত পুরুষ ইহলোকে যেমন শুভকর্ম করেন, পরলোকে তেমনই ফলপ্রাপ্ত হন। যাঁরা গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন, তাঁরা প্রজাপতি, বৃহস্পতি অথবা ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

'পুত্র ! তোমার বয়স চব্বিশ পার হয়েছে, তুমি এখন পঁচিশ বছরের যুবক। এইভাবে তোমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, তুমি ধর্মসঞ্চয় করো। দেখো, কাল তোমার ইন্দ্রিয়ের শক্তি শিথিল করে দিচ্ছে ; সেগুলি নষ্ট হওয়ার আগেই তুমি ধর্মোপার্জনের চেষ্টা করো। তুমি যখন শরীর ত্যাগ করবে, তখন তোমার আশেপাশে কেউ থাকবে না। তোমাকে যখন একাকীই যেতে হবে তখন তোমার নিজের বা অপরের শরীরে কী প্রয়োজন ?

'পুত্র ! আমি আমার শাস্ত্রজ্ঞান এবং অনুমানের সাহায্যে তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, তুমি সেই অনুযায়ী আচরণ করো। যে ব্যক্তি নিজ কর্মের দ্বারা শুধু শরীর নির্বাহ করে এবং ফলের আশায় দান করে, সে অজ্ঞান ও মোহজনিত গুণে আবদ্ধ হয় ; কিন্তু যে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে, সে পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এরূপ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাই সার্থক হয়। মানুষ যে স্থানে বাস করে এবং সেখানকার বস্তুসমূহে প্রীতি রাখে, সেগুলিই তার পক্ষে বন্ধনরজ্জু হয়ে ওঠে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা সেই রজ্জু ছেদ করে উত্তমলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু পাপীরা তা কাটতে পারে না। পুত্র ! তোমার যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন এই ধন, বন্ধু, পুত্রদের কাছে কী আশা করো ? সুতরাং তুমি বুদ্ধিরূপ গুহায় লুক্কায়িত আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করো। একবার ভাবো, তোমার সমস্ত পিতৃ-পিতামহগণ কোথায় গেছেন ? যে কাজ কাল করার, তা আজই করে ফেলা উচিত। যে কাজ দ্বিপ্রহরে করার, তা সকালেই করে নাও ; কারণ মৃত্যু কখনো কারো কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষা করে না। মানুষের মৃত্যু হলে তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণ সঙ্গে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করে ফিরে আসে। সুতরাং তুমি পরমতত্ত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা করো এবং প্রমাদ, সংশয় ত্যাগ করে নাস্তিক, নির্দয় এবং পাপবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের থেকে দূরে থেকো। কখনো ভুলেও তাদের সঙ্গে থেকো না। সমস্ত জগৎ যখন এইভাবে কালের অধীন হয়ে দুঃখ ভোগ করছে, তুমি তখন ধৈর্য-ধারণ করে সর্বপ্রকার ধর্মাচরণ করো।

'যে ব্যক্তি পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের এই সাধন ভালোভাবে জানে, সে ইহলোকে পূর্ণভাবে স্বধর্ম পালন করে পরলোকে সুখভোগ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম মার্গ ঠিকমতো অনুসরণ করে, তার কখনো ক্ষতি হয় না। যে ধর্মকে বৃদ্ধি করে, সে পণ্ডিত এবং যে ধর্মচ্যুত হয়, সে মোহগ্রস্ত। যে ব্যক্তি ধর্মাচরণ করে, সে নিজ কর্ম অনুসারে ফল পায়। এইরূপ যে ধর্মের পারগামী, সে স্বর্গলাভ করে, যে কর্তব্যচ্যুত হয়, সে নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি ভোগ ত্যাগ করে এই দেহে তপস্যা করে, তার কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। এই জগতে তোমার সহস্রাধিক মাতা-পিতা এবং

শতাধিক স্ত্রী-পুত্র হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তারা কার এবং আমরাই বা কার ! আমি তো একাই, আমার কেউ নেই, আমিও কারো নই। তোমার সেই অতীত মাতা-পিতাতে আর কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাঁদেরও তোমার সঙ্গে কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁরা নিজ নিজ কর্মানুসারে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তুমিও তোমার কর্ম অনুসারে উৎপন্ন হয়েছো এবং যেমন কর্ম করবে তেমনই গতি লাভ করবে। ইহলোকে ধনী ব্যক্তিকেই তাদের আত্মীয়স্বজন-পরিজনেরা ঘিরে থাকে, কিন্তু দরিদ্রদের আত্মীয়েরা জীবিত থাকতেই তাদের পরিত্যাগ করে। মানুষ স্ত্রী-পুত্রাদির জন্যই পাপ করে এবং সেজন্যই ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে।

'সুতরাং পুত্র ! আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি, তুমি সেই অনুসারে আচরণ করো। এই লোক কর্মভূমি—এই কথা ভেবে দিব্যলোক আকাঙ্ক্ষাকারী পুরুষদের শুভকর্ম করা উচিত। এই কালরূপ রাঁধুনি সব জীবকে বলপূর্বক রন্ধন করছে। যে ধন দান বা ভোগে না লাগে, তাতে কী লাভ ? যে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা ধর্মাচরণ না হয়, তাতে কী লাভ ? যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় বা সংযমী নয়, সেই জীবাত্মাতে কী লাভ ?'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! শ্রীব্যাসদেবের এই হিতোপদেশ শুনে শুকদেব তাঁর পিতার কাছ থেকে মোক্ষতত্ত্ব উপদেশ লাভের জন্য রাজা জনকের কাছে চলে গেলেন।

দান, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি শুভকর্মের উপযোগিতার বর্ণনা এবং শুকদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! দান, যজ্ঞ, তপ এবং গুরুজনদের সেবা করলে কী ফল লাভ হয়, তা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! যারা দেবতা ও অতিথিদের সুখে রাখে অথবা উদার, সাধুভক্ত এবং যজ্ঞে দক্ষিণা প্রদানকারী, সেই আত্মজ্ঞানীরা কল্যাণপ্রদ মার্গ লাভ করেন, ধর্মত্যাগকারী মানুষ ব্যর্থ হয়ে যায়। পাপ-পুণ্য কখনো মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে না. মানুষ যেভাবে চলে পাপ-পুণ্যও সেইভাবে তাকে অনুগমন করে. ছায়ার মতো তা মানুষকে অনুসরণ করে থাকে। মানুষ পূর্বে যেরূপ কর্ম করেছে, তার ফল অবশ্যই সে ভোগ করবে। মানুষ তার শুভাশুভ কর্মের দ্বারাই নিজের সুখ-দুঃখের বিধান করে। সে গর্ভাবস্থা থেকেই তার পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করতে থাকে। ময়লা বস্ত্র জলে ধৌত করলে যেমন পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনই উপবাসের দ্বারা তাপিত মানুষের হৃদয় স্বচ্ছ হয় এবং দীর্ঘকালীন অনন্ত সুখ লাভ করে। যারা দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করে, তাদের পাপ দূর হয় এবং সর্ব কামনা সিদ্ধ হয়। যেমন আকাশে পাখিদের এবং জলে মাছেদের চরণচিহ্ন দেখা যায় না, তেমনই পুণ্যকর্মকারীদের গতির ঠিকানা পাওয়া যায় না। অপরের কথায় খারাপ কাজ করা ঠিক নয়, যা নিজের কাছে প্রিয়, অনুরূপ ও হিতকারক, সেই কর্মই করা উচিত।

রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ব্যাসদেবের গৃহে মহাতপস্বী এবং ধর্মাত্মা শুকদেব কীভাবে জন্মগ্রহণ করলেন এবং তিনি কীভাবে পরম সিদ্ধি লাভ করলেন তা আমাকে বলুন। বাল্যাবস্থাতেই শুকদেবের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করার প্রবৃত্তি কীভাবে হল ? জগতে তাঁকে ছাড়া আর কারো মধ্যে এমন বৈরাগ্য দেখা যায়নি ? আপনি আমাকে শুকদেবের মাহাত্ম্য, আত্মযোগ এবং বিজ্ঞান সঠিকভাবে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে শুকদেবের জন্মবৃত্তান্ত, যোগপ্রভাব এবং অজ্ঞানীদের পক্ষে অগম্য তাঁর উৎকৃষ্ট গতির কথা বলছি। একবার মেরুপর্বতের শিখরে ভগবান শংকর ভয়ানক ভূতগণের সঙ্গে বিচরণ করছিলেন। পর্বত রাজকন্যা দেবী উমাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেইসময় ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই পর্বতে তপস্যা করছিলেন। তিনি এই সংকল্প নিয়ে তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন যে 'আমার অগ্নি, ভূমি, জল, বায়ু অথবা আকাশের ন্যায় ধৈর্যশালী এক পুত্র যেন জন্মায়। তিনি শত বৎসর শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণ করে উমাপতি মহাদেবের তপস্যায় রত ছিলেন। এরূপ কঠোর তপস্যা করলেও তাঁর প্রাণ ত্যাগ হয়নি বা কোনো ক্লান্তি আসেনি। এতে ত্রিলোক

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিল। আমি এই বৃত্তান্ত ভগবান মার্কণ্ডেয়র কাছে শুনেছি। তিনি সর্বদাই আমাকে দেবতাদের চরিতকথা শোনাতেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ ! ব্যাসদেবের এরূপ তপস্যা ও ভক্তি দেখে মহাদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং মনে মনে তাঁকে অভীষ্ট বর প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাঁর কাছে এসে স্মিত হেসে বললেন—'ব্যাসদেব ! তুমি অগ্নি, বায়ু, ভূমি, জল

ও আকাশের ন্যায় মহান এবং পবিত্র পুত্র লাভ করবে। সে ভগবদ্‌ভাবে পূর্ণ হবে, ভগবানেই তার বুদ্ধি সংলগ্ন থাকবে, ভগবানই তাঁর আত্মাস্বরূপ হবেন এবং একমাত্র ভগবানকেই সে তার আশ্রম জানবে। তার তেজে ত্রিলোক ব্যাপ্ত হবে এবং সে মহাযশ প্রাপ্ত হবে।'

এই উত্তম বর লাভ করার পর একদিন সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব অগ্নি উৎপন্ন করার জন্য অরণি মন্থন করছিলেন। সেই সময় তাঁর দৃষ্টি পড়ল পরম রূপবতী ঘৃতাচী অপ্সরার ওপর। তাঁর রূপে ব্যাসদেব আকর্ষিত হলেন, তখনই অকস্মাৎ তাঁর বীর্য অরণির মধ্যে স্খলিত হল। মহাতপস্বী শুকদেব তার থেকে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি ধূম্রবিহীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। তখনই নদী শ্রেষ্ঠ গঙ্গাদেবী মূর্তিমতি হয়ে মেরুপর্বতে এসে নিজ জলধারাতে তাঁর অভিষেক করলেন। আকাশ থেকে তাঁর জন্য দণ্ড ও কৃষ্ণ মৃগচর্ম বর্ষিত হল। বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, নারদ, হাহা, হূহূ প্রমুখ গন্ধর্ব তাঁর জন্মের স্তুতি গান করতে লাগলেন। সেই সময় ইন্দ্রাদি লোকপাল, দেবতা, দেবর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিও সেখানে উপস্থিত হলেন। বায়ু দিব্য পুষ্পের বৃষ্টি করলেন, চরাচর সমস্ত জগৎ আনন্দিত হয়ে উঠল। তাঁর জন্মকালেই পার্বতীদেবীসহ ভগবান শংকর এসে শাস্ত্রীয় রীতিতে তাঁর যজ্ঞোপবীত সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে প্রেমপূর্বক সুন্দর কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করলেন।

মহামতি শুকদেব এইভাবে ব্রহ্মচারী হয়ে সেখানে বাস

করতে লাগলেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মধ্যে রহস্য ও সংগ্রহসহ সম্পূর্ণ বেদ উপস্থিত ছিল। তিনি বৃহস্পতিকে নিজের গুরুরূপে বরণ করেন এবং তাঁর থেকেই সমগ্র বেদ, ইতিহাস এবং রাজনীতির শিক্ষা লাভ করেন, এবং তাঁকে দক্ষিণা প্রদান করে গৃহে ফিরে এলেন। সেখানে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে মহাতপস্যা করতে লাগলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই জ্ঞান ও তপস্যার জন্য দেবতা ও ঋষিদের মাননীয় এবং সংশয় দূরকারী হয়ে উঠলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল মোক্ষধর্মের ওপর তাই গার্হস্থ্য ইত্যাদি তিন আশ্রমের দিকে তাঁর মন ছিল না।

পিতার নির্দেশে শুকদেবের মিথিলায় গমন এবং জনকের রাজমহলে তাঁর অভ্যর্থনা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! শুকদেব মোক্ষ বিচার করে সেটি প্রাপ্তির ইচ্ছায় পিতা ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'প্রভো ! আপনি মোক্ষধর্মে নিপুণ ; সুতরাং আমাকে উপদেশ দিন, যাতে আমি চিত্তে শান্তি পাই। পুত্রের কথা শুনে মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন, 'পুত্র ! তুমি মোক্ষ এবং অন্যান্য ধর্ম অধ্যয়ন করো।' পিতার নির্দেশে শুকদেব সম্পূর্ণ যোগ এবং সাংখ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। ব্যাসদেব যখন বুঝলেন যে আমার পুত্র মোক্ষধর্ম কুশল এবং ব্রহ্মতেজসম্পন্ন হয়েছে ও সমস্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মার সমকক্ষ হয়েছে, তখন তিনি তাঁকে বললেন—'পুত্র ! এবার তুমি মিথিলার রাজা জনকের কাছে যাও, তিনি তোমাকে সমস্ত মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন করাবেন। সেখানে যাওয়ার সময় মনে রেখো, যে পথ ধরে সাধারণ মানুষ যাত্রা করে, তুমিও সেই পথে চলবে, নিজ যোগশক্তির বলে আকাশপথে কখনো যাবে না। পথে সুখ-সুবিধার খোঁজ করবে না ; তাহলে তাতে তোমার আসক্তি আসবে। রাজা জনক আমাদের যজমান, তাঁর কাছে কোনোরূপ অহংকার প্রকাশ করবে না। তিনি যা আদেশ করবেন, প্রসন্ন মনে তা পালন করবে। মোক্ষশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান আছে, তিনি তোমার সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করবেন।

পিতার কথা শুনে ধর্মাত্মা মুনি শুকদেব মিথিলার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যদিও তিনি আকাশপথে সমগ্র পৃথিবী লঙ্ঘন করতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি তিনি পদব্রজেই যাত্রা করলেন। পথে তাঁকে বহু পর্বত, নদী, তীর্থ এবং সরোবর পার হতে হল। সর্প ও বন্যজন্তু অধ্যুষিত বহু জঙ্গলও পার হতে হল। তিনি ক্রমশ মেরুবর্ষ (ইলাবৃত), হরিবর্ষ এবং হৈমবত্ (কিংপুরুষ) বর্ষ পার হয়ে ভারতবর্ষে এলেন। চীন এবং হূণ ইত্যাদি দেশ পার হয়ে তিনি আর্যাবর্তে প্রবেশ করলেন। পিতার নির্দেশে তিনি সমস্ত পথই পদব্রজে পার করলেন। পথে অতি সুন্দর সব নগর এবং বসতি দেখা গেল, বিচিত্র রত্ন সামগ্রী দৃষ্টিগোচর হল, কিন্তু শুকদেব সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। এইভাবে চলতে চলতে তিনি ধর্মাত্মা রাজা জনকের রাজা বিদেহ-প্রান্তে এসে পৌঁছলেন ; কিন্তু সেখানে আসতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। মিথিলায় তিনি বহু গ্রাম দেখলেন যা অন্ন-জল এবং খাদ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। সমস্ত গ্রামে ধন-ধান্য পরিপূর্ণ গোশালা ছিল। সেইখানে বহু গাভী একত্রিত ছিল। কৃষিক্ষেত্র শস্যপূর্ণ ছিল।

শুকদেব এইভাবে বিদেহ রাজ্যে প্রবেশ করে জনকের রাজধানী মিথিলার সুরম্য উপবনের কাছে পৌঁছলেন। নগরে প্রবেশ করে তিনি রাজমহলের প্রথম দরজায় এসে ভেতরে প্রবেশ করতে গেলেন। সেইসময় দ্বারপালেরা এসে তাঁর পথরোধ করল, কিন্তু শুকদেব তাতে ক্রুদ্ধ বা
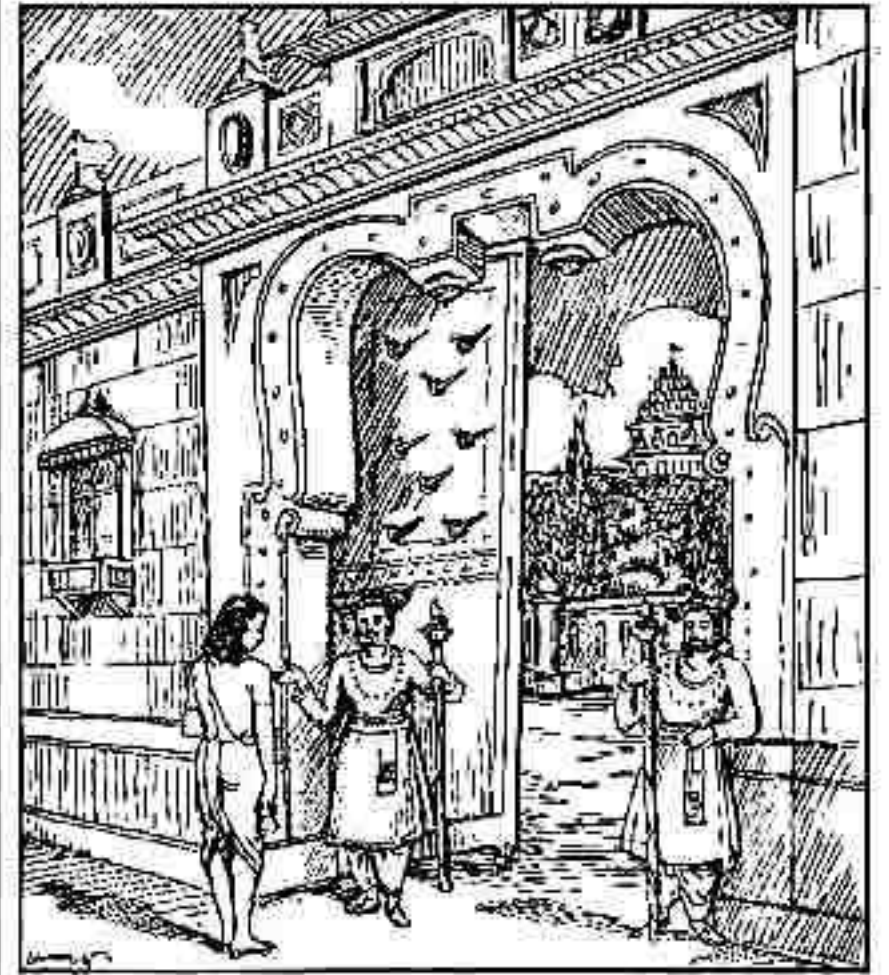
দুঃখিত না হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তার ক্লান্তি, সূর্যের উত্তাপ তাঁকে সন্তপ্ত করতে পারেনি, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তাঁকে কষ্ট দিতে পারেনি। তাঁর মনে কোনোপ্রকার বৈকল্য দেখা যায়নি। তিনি রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ছায়ার দিকেও একটু সরলেন না।

এদের মধ্যে একজন দ্বারপাল নিজের ব্যবহারে দুঃখিত হল। সে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো তেজস্বী শুকদেবকে রোদের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাতজোড় করে প্রণাম করে শাস্ত্রমতে তাঁকে অভ্যর্থনা করে মহলের একটি কক্ষে পৌঁছে দিল। সেই কক্ষে বসে শুকদেব মোক্ষধর্মেরই চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজমন্ত্রী হাতজোড় করে সেখানে পদার্পণ করলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মহলের তৃতীয় অংশে গেলেন। সেখানে অন্তঃপুর সংলগ্ন এক সুন্দর বাগিচা ছিল, যার নাম প্রমদাবন। মন্ত্রী তাঁকে

সেইখানে এক সুন্দর আসনে বসিয়ে গেলেন।

মন্ত্রী চলে যেতেই পঞ্চাশজন বারাঙ্গনা শুকদেবের সেবা করার জন্য শীঘ্র এসে উপস্থিত হল। তারা সকলেই অত্যন্ত রূপসী এবং নবযুবতী ছিল। তারা সকলেই সুন্দর বেশধারণ করেছিল। তারা কথা-বার্তা এবং নৃত্য-গীতে অত্যন্ত

পারদর্শী ছিল, রূপে অপ্সরাদেরও হার মানিয়ে দিত। তারা পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করে বিধিপূর্বক শুকদেবকে অভ্যর্থনা করে স্বাদু খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করে তৃপ্ত করল। তারপর বারাঙ্গনারা তাঁকে নিয়ে প্রমোদবন ভ্রমণে বার হয়ে নানা বস্তু দেখাতে লাগল। সেই সময় তারা হাসি-গান-কথায় শুকদেবের সেবায় ব্যাপৃত হয়েছিল।

কিন্তু অরণি থেকে উৎপন্ন শুকদেবের অন্তঃকরণ অত্যন্ত শুদ্ধ ছিল, তিনি ইন্দ্রিয় ও ক্রোধ জয় করেছিলেন। তাঁর মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না এবং সর্বদাই নিজ কর্তব্য পালন করতেন। তাই সেই নারীদের সেবায় তিনি আনন্দিত বা ক্রুদ্ধ হননি। তারপর সেই সুন্দরী রমণীগণ দেবতাদের বসার উপযুক্ত এক রত্নখচিত পালঙ্ক এবং বহুমূল্য বিছানা নিয়ে এল শুকদেবের বিশ্রামের জন্য। শুকদেব প্রথমে হাত-পা ধুয়ে সন্ধ্যাপোসনা করলেন, তারপর পবিত্র আসনে বসে মোক্ষতত্ত্ব চিন্তা করতে করতে ধ্যানস্থ হলেন। রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। পরে যোগশাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাত্রের মধ্যম ভাগে নিদ্রা গেলেন। পুনরায় ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে শৌচাদি নিত্য নিয়মের পর নারী পরিবৃত থেকেও ধ্যানমগ্ন হলেন। এইভাবে ব্যাসনন্দন দিন ও রাত্রি সেই রাজভবনে অতিবাহিত করলেন।

রাজা জনক কর্তৃক শুকদেবের পূজা এবং তাঁর প্রশ্নের সমাধান

ভীষ্ম বললেন—ভারত! তারপর রাজা জনক অন্তঃপুরের সমস্ত রমণী এবং পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রীসহ শুকদেবের কাছে এলেন। সর্বাগ্রে পুরোহিত আসন ও নানা রত্নাদি নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং রাজা মস্তকে অর্ঘ্যপাত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। গুরুপুত্রের নিকট পৌঁছে তিনি পুরোহিতের হাত থেকে সর্বতোভদ্র নামক রত্নখচিত আসন নিয়ে শুকদেবকে বসতে দিলেন। ব্যাসনন্দন রাজা প্রদত্ত আসনে উপবেশন করলে রাজা শাস্ত্র অনুসারে তাঁকে পূজা করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করে তাঁকে একটি গাভী দান করলেন। শুকদেব সেই পূজা স্বীকার করে রাজার কুশল সংবাদ নিলেন, পরে শুকদেবের নির্দেশে রাজা জনক তাঁর অনুচরসহ মাটিতে বসে হাত-জোড় করে শুকদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন—'মুনে! আপনি কীজন্য এখানে শুভাগমন করেছেন?'

শুকদেব বললেন—রাজন্ ! আপনার কল্যাণ হোক। আমার পিতা আমাকে বলেছেন 'তোমার যদি প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি ধর্মবিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে তুমি সত্বর আমার যজমান বিদেহরাজ জনকের কাছে যাও। তিনি মোক্ষধর্মের জ্ঞাতা, সুতরাং তিনি তোমার সব জিজ্ঞাসার সমাধান করবেন। তাঁর নির্দেশেই আমি আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আপনি ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিন। ব্রাহ্মণের কর্তব্য কী ? মোক্ষের স্বরূপ কীপ্রকার ? মোক্ষ প্রাপ্তি তপস্যা থেকে হয় না কি জ্ঞান থেকে ?

জনক বললেন—তাত ! ব্রাহ্মণের জন্ম থেকে কী কী করা কর্তব্য, তা শোনো। যজ্ঞোপবীত সংস্কার হওয়ার পর ব্রাহ্মণ-বালকদের বেদাধ্যয়ন করা উচিত। অধ্যয়নকালে গুরুসেবা, তপের অনুষ্ঠান এবং ব্রহ্মচর্য পালন—এই তিনটির পালন হল তার পরম কর্তব্য। স্বাধ্যায় এবং তর্পণের দ্বারা বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হলে গুরুদক্ষিণা প্রদান করবে, তাঁর আদেশ নিয়ে সমাবর্তন সংস্কারের পর গৃহে ফিরে আসবে। তারপর বিবাহ করে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করবে এবং শুধুমাত্র নিজ স্ত্রীর সঙ্গেই সম্পর্ক রাখবে। কাউকে ঈর্ষা না করে ন্যায় আচরণ করবে এবং অগ্নি স্থাপন করে প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করবে। তারপর পুত্র-পৌত্রের জন্ম হলে বনে বাস করে বাণপ্রস্থ ধর্ম পালন করবে। সেই সময়ও অগ্নিহোত্র ও অতিথি সেবা করবে। তারপর ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে অগ্নিহোত্রের অগ্নি স্বয়ং-এ আরোপ করে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে যাবে এবং বীতরাগ হয়ে ব্রহ্মচিন্তাসম্পন্ন সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করবে।

শুকদেব জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো ব্যক্তির যদি ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ হয় এবং তার চিত্তের রাগ-দ্বেষ দূরীভূত হয়, তাহলেও কি তার বাকি তিনটি আশ্রমে বাস করার প্রয়োজন থাকে ?

জনক বললেন—জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত যেমন মোক্ষলাভ হয় না, তেমনই সদ্‌গুরুর সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না। গুরু এই সংসার সাগর থেকে পার করেন, তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানকে নৌকার তুল্য বলা হয়। মানুষ সেই জ্ঞান লাভ করে কৃত-কৃতার্থ হয়ে যায়। প্রাচীনকালে বিদ্বান ব্যক্তিগণ লোকমর্যাদা ও কর্মপরম্পরা রক্ষা করার জন্য চার আশ্রমের ধর্ম পালন করতেন। এইভাবে নানা কর্মানুষ্ঠান করে শুভাশুভ কর্মের আসক্তি পরিহার করায় তাঁরা মোক্ষলাভ করতেন। বহুজন্ম ধরে (শুভ) কর্ম সম্পাদনের ফলে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াদি পবিত্র হলে শুদ্ধ হৃদয় মানুষ প্রথম আশ্রমেই মোক্ষরূপ জ্ঞান লাভ করে নিত। সেটি লাভ করে যদি ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহলে পরমাত্মা আকাঙ্ক্ষাকারী জীবন্মুক্ত বিদ্বানদের বাকি তিন আশ্রমে যাওয়ার কী প্রয়োজন ? বিদ্বান ব্যক্তিদের রাজসিক ও তামসিক দোষ পরিত্যাগ করে সাত্ত্বিক মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মাকে দর্শন করা উচিত। যিনি সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি সংসারে কোথাওই আসক্ত হন না। তিনি বাসাত্যাগকারী পাখির মতো এই দেহ থেকে মুক্ত হয়ে নির্দ্বন্দ্ব এবং শান্ত হয়ে পরলোকে অক্ষয়পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।

তাত ! এই বিষয়ে রাজা যযাতি কথিত গাথা শুনুন। মোক্ষশাস্ত্রজ্ঞানিগণ যা সর্বদা স্মরণে রাখেন। নিজের মধ্যেই আত্মজ্যোতি প্রকাশিত হয়, অন্যত্র নয়। সেই জ্যোতি সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই সমানভাবে বিরাজমান। সমাধিতে নিজ চিত্ত ভালোভাবে একাগ্র করেন যে পুরুষ, তিনিই আত্মজ্যোতির সাক্ষাৎলাভ করেন। যাকে অন্য কোনো প্রাণী ভয় পায় না, যিনি নিজেও অন্য কোনো প্রাণীতে ভীত হন না এবং যিনি ইচ্ছা-দ্বেষরহিত, তিনি শীঘ্রই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। মানুষ যখন মন-বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কারো মন্দ চায় না, সেই সময় সে ব্রহ্মরূপ হয়ে যায়। মানুষ যখন মোহসৃষ্টিকারী ঈর্ষা, কাম ত্যাগ করে নিজ মনকে আত্মায় নিবিষ্ট করে তখন সে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। যখন মানুষের সমস্ত প্রাণীর ওপর সমান ভাব হয় এবং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব তার মনে কোনো প্রভাব ফেলে না, তখন সে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়ে ওঠে। যখন নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ, সুবর্ণ-মৃত্তিকা, শীত-গ্রীষ্ম, অর্থ-অনর্থ, প্রিয়-অপ্রিয়, জীবন-মরণ মানুষের কাছে সমান হয়ে যায়, তখন তার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ যেমন প্রদীপের আলোয় প্রকাশিত হয়, তেমনই বুদ্ধিরূপ প্রদীপের সাহায্যে অজ্ঞানে আবৃত আত্মার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়।

বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ শুকদেব ! উপরিউক্ত সমস্ত বিষয় আপনার মধ্যে বিদ্যমান দেখছি। এছাড়াও যা কিছু জানার বিষয় আছে, তা আপনি ঠিক মতো জানেন। ব্রহ্মর্ষে ! আমি আপনাকে ভালোভাবে জানি, আপনি আপনার পিতার কৃপা ও শিক্ষার সাহায্যে বিষয়াদির অতীত হয়েছেন। তাঁর কৃপাতেই আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছি, তাই আমি আপনার

স্থিতি জানতে পেরেছি। আপনার বিজ্ঞান, আপনার গতি এবং আপনার ঐশ্বর্য—এইগুলি অধিক পরিমাণে আপনাতে বিদ্যমান ; কিন্তু আপনি তা অবহিত নন। বালক স্বভাববশত, সংশয় দ্বারা অথবা মোক্ষপ্রাপ্ত না হওয়ার কাল্পনিক ভয়ে মানুষ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হলেও তাদের মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। যখন সৎসঙ্গের দ্বারা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি হলে সন্দেহ দূর হয়, তখন হৃদয়ের গ্রন্থি খুলে মানুষ মোক্ষলাভ করে। আপনার জ্ঞানলাভ হয়েছে এবং আপনার বুদ্ধিও স্থির ; কিন্তু বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ব্যতীত কেউই পরব্রহ্ম লাভ করে না। আপনি সুখ-দুঃখে কোনো পার্থক্য বোঝেন না, আপনার মনে বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আপনার নৃত্য-গীতে অনুরাগ নেই, বস্তুতে আসক্তি নেই, কিছুতে ভয় নেই। মহাভাগ ! মৃত্তিকা ও সুবর্ণ আপনার চোখে এক। আমি এবং অন্যান্য মনীষী বিদ্বানগণও আপনাকে অক্ষয় ও অনাময় পথে (মোক্ষমার্গে) স্থিত বলে মনে করি। ব্রহ্মন্ ! ব্রাহ্মণ হওয়ার যে ফল এবং মোক্ষের যে স্বরূপ, আপনার স্থিতি তাতে বিদ্যমান। এখন আর কী জানতে ইচ্ছা করেন ?

———o———

শুকদেবের পিতার কাছে প্রত্যাবর্তন, শিষ্যদের প্রতি ব্যাসদেবের স্বাধ্যায়ের বিধি বর্ণনা এবং শুকদেবকে অনধ্যায়ের কারণ জানানো

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! রাজা জনকের কথা শুনে শুদ্ধ অন্তঃকরণসম্পন্ন শুকদেব এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছেলেন এবং বুদ্ধির দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ করে তাতে স্থিত হয়ে কৃতার্থ চিত্তে ফিরে গেলেন। সেই সময় তিনি গভীর সুখ ও শান্তিলাভ করলেন। তারপর তিনি হিমালয় পর্বত লক্ষ্য করে বায়ুবেগে সোজা উত্তর দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর পিতা ব্যাসদেবের পরম রমণীয় আশ্রম দেখতে পেলেন। সেখানে ব্যাসদেব শিষ্য পরিবৃত হয়ে সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি এবং পৈলকে বেদপাঠ করাচ্ছিলেন। সেই সময় ব্যাসদেব শুকদেবকে দেখতে পেলেন, তাঁকে প্রজ্বলিত অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় তেজস্বী দেখাচ্ছিল। অরণি গর্ভ হতে উৎপন্ন মহামুনি শুক নিকটে এসে পিতার চরণে প্রণাম জানালেন এবং তাঁর শিষ্যদের ও পিতাকে মিথিলার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। সেখানে রাজা জনকের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল, প্রসন্ন মনে তিনি সেই সব পিতাকে নিবেদন করলেন। তারপর মুনিবর ব্যাসদেব পুত্র ও শিষ্যদের অধ্যয়ন করাতে সেই হিমালয় শিখরেই বাস করতে লাগলেন।

কোনো এক সময়ের কথা, ব্যাসদেবের শিষ্যগণ—যাঁরা বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করেছিলেন, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সাঙ্গবেদ পারঙ্গম এবং তপস্বী, গুরুকে চারদিক থেকে ঘিরে উপবিষ্ট হয়ে হাতজোড় করে বললেন—'গুরুদেব ! আপনার কৃপায় আমরা অত্যন্ত তেজস্বী হয়েছি এবং আমাদের যশও বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি আর একবার কৃপা করে আমাদের কিছু উপদেশ প্রদান করুন, আমাদের এই প্রার্থনা।'

ব্যাসদেব বললেন—প্রিয় শিষ্যগণ ! যারা ব্রহ্মলোকে অক্ষয় নিবাস করতে চায়, তাদের কর্তব্য হল অধ্যয়নের ইচ্ছা নিয়ে আগত ব্রাহ্মণকে সর্বদাই বেদপাঠ করানো। তোমরা বহুজন মিলে বেদের বিস্তার ঘটাও। যে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে না, যার মন বশে নেই এবং যে শিষ্য ভাব নিয়ে পড়তে আসেনি, তাদের বেদাধ্যয়ন করাবে না। যাকে বেদপাঠ করাবে, তার মধ্যে শিষ্য হওয়ার এই গুণগুলি আছে কি না পরীক্ষা করবে। যার সদাচার জানা হয়নি, তাকে কখনো বিদ্যাদান করবে না। যেমন সোনাকে অগ্নিতে তপ্ত করলে, কষ্টিপাথরে পরখ করলে তবেই তা প্রকৃত কিনা চেনা যায়, তেমনই উত্তম কুল ও গুণাদির দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করতে হয়। শিষ্যদের কখনো অনুচিত বা ভীতিপ্রদ কাজে লাগাবে না। তোমাদের শিক্ষাদানের পর যার যেমন বুদ্ধি এবং যে যেমন পরিশ্রম করবে, সেই অনুযায়ী সেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করবে। তোমাদের উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, সব মানুষ যেন দুঃখ থেকে পার পেয়ে যায়, সকলের কল্যাণ হয়। ব্রাহ্মণদের সম্মুখে রেখে চার বর্ণকেই উপদেশ দেওয়া উচিত। বেদাধ্যয়ন অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ কাজ, এটি অবশ্য করণীয়। যে মোহবশত বেদ-পারঙ্গম ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, সে এই অনিষ্ট চিন্তার জন্য পরাভব প্রাপ্ত হয়। যে ধর্মবিধি উল্লঙ্ঘন করে প্রশ্ন করে এবং যে ধর্ম অনুসারে উত্তর দেয় না, এদের দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় অথবা তারা দ্বেষের পাত্র হয়। আমি তোমাদের স্বাধ্যায়ের বিধি বললাম, এগুলি স্মরণ করে

রাখলে শিষ্যদের মহা উপকার হওয়া সম্ভব।

ভীষ্ম বললেন—গুরু ব্যাসদেবের উপদেশ শ্রবণ করে তাঁর তেজস্বী শিষ্যরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিজেরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে ব্যাসদেবকে বললেন—'মুনিবর! আপনি আমাদের ভবিষ্যতের হিতের চিন্তা করে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমাদের অত্যন্ত সময়োচিত মনে হয়েছে, আমরা অবশ্যই তা পালন করব। মহামুনে! আপনি যদি চান তবে আমরা বেদ প্রচারের নিমিত্ত এই পর্বত থেকে পৃথিবীতে নেমে যেতে চাই।' শিষ্যদের কথা শুনে ব্যাসদেব ধর্ম ও অর্থযুক্ত বাক্যে উত্তর দিলেন—'পৃথিবী বা দেবলোক যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয়, যেতে পারো। কিন্তু ভুল কোরো না ; কারণ বেদে বহু প্ররোচনামূলক শ্রুতি আছে।'

সত্যনিষ্ঠ গুরুর নির্দেশ পেয়ে সকল শিষ্য তাঁর চরণে মস্তক রেখে প্রণাম করলেন এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। পৃথিবীতে এসে তাঁরা চার্তুর্হোত্র (অগ্নিহোত্র থেকে সোমযাগ পর্যন্ত কর্ম) প্রচার করলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দ্বারা যজ্ঞ করিয়ে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। দ্বিজাতিদের মধ্যে তাঁদের বিশেষ সম্মান ছিল। যজ্ঞ করানো এবং বেদের শিক্ষা প্রদান করাই ছিল তাঁদের জীবিকা এবং এই কর্মের জন্যই জগতে তাঁরা অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

শিষ্যদের চলে যাওয়ার পর সেখানে শুধু ব্যাসদেব এবং শুকদেব রইলেন। তাঁরা চুপচাপ একান্তে বসে নানাপ্রকার চিন্তায় মগ্ন হলেন। সেই সময় মহাতপস্বী নারদ সেখানে এসে ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে মিষ্ট বাক্যে বললেন, 'ব্রহ্মর্ষে! আজ এই আশ্রমে বেদমন্ত্র ধ্বনি কেন শোনা যাচ্ছে না? আপনি একাকী কী চিন্তা করছেন? বেদধ্বনি না হওয়ায় পর্বতে আগের মতো শোভা নেই। দেবর্ষিদের দ্বারা সেবিত হলেও এই শৈলশিখর ব্রহ্মনাদ ব্যতীত ভীলেদের গৃহের ন্যায় শ্রীহীন মনে হচ্ছে। এখানকার ঋষি, দেবতা এবং মহাবলী গন্ধর্বগণও বেদধ্বনি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আগের মতো শোভা পাচ্ছেন না।' দেবর্ষি নারদের কথা শুনে ব্যাসদেব বললেন—'দেবর্ষে! আপনি আমার মনের কথাই বলেছেন, আপনিই এমন কথা বলতে পারেন। আপনি সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা এবং সর্ব বিষয় জানতে উৎকণ্ঠিত থাকেন। ত্রিলোকে যা ঘটে, সে সবই আপনি জানেন ; আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি? এসময় আমার কী কর্তব্য তা আপনি বলুন ;
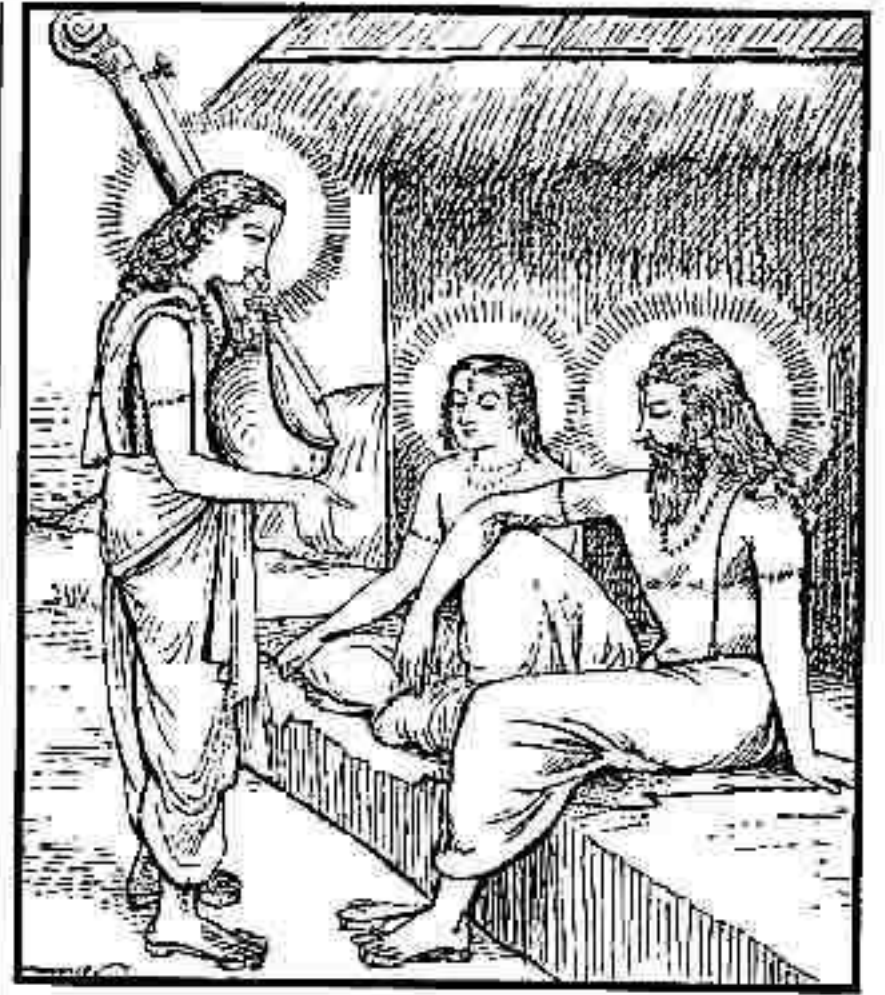
কারণ প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ায় আজ আমার মন প্রসন্ন নয়।'

নারদ বললেন—ব্যাসদেব! বেদ পাঠ করে তার অভ্যাস (আবৃত্তি) না করা বেদাধ্যয়নের মল (দোষ), ব্রত পালন না করা ব্রাহ্মণের মল, বাহীক দেশে লোক পৃথিবীর মল এবং নতুন নতুন দৃশ্য দেখা বা নতুন নতুন কথা জানার উৎকণ্ঠা রাখা নারীদের পক্ষে দোষণীয় ; সুতরাং আপনি আপনার বুদ্ধিমান পুত্রের সঙ্গে সর্বদা বেদের স্বাধ্যায়ে রত থাকুন।

ভীষ্ম বললেন—দেবর্ষি নারদের কথা শুনে পরম ধর্মাত্মা ব্যাসদেব 'খুব ভালো কথা' বলে তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়ে পুত্র শুকদেবকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিভুবন গুঞ্জরিত করে উচ্চৈঃস্বরে বেদ-মন্ত্রাদি উচ্চারণ করতে লাগলেন। এরমধ্যে সামুদ্রিক হাওয়ার প্রভাবে ভীষণ জোরে ঝড় উঠল। তখন ব্যাসদেব অনধ্যায় কাল মনে করে পুত্রকে বেদপাঠ করতে বারণ করলেন। তিনি বারণ করায় শুকদেবের তার কারণ জানার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হল, তাই দেখে ব্যাসদেব বললেন—'পুত্র! বাইরের হাওয়া যখন প্রবল বেগে বয়, সেই সময় বেদমন্ত্র ঠিকমতো উচ্চারিত হয় না। জগৎ তখন সেই অবস্থায় মহাভয়ের সম্মুখীন হয় ; তাই ব্রহ্মবেত্তাগণ ঝড়ের সময় বেদপাঠ করেন না।' একথা বলার পর বায়ু শান্ত হয়ে গেলে ব্যাসদেব পুত্রকে অধ্যয়ন করার আদেশ দিয়ে আকাশ গঙ্গার তীরের দিকে গমন করলেন।

শুকদেবকে নারদের উপদেশ

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! ব্যাসদেব চলে যাওয়ার পর সেই আশ্রমের একান্ত স্থানে বসে শুকদেব যখন স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আসতে দেখে শুকদেব বেদোক্ত বিধির দ্বারা অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন। নারদ প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা
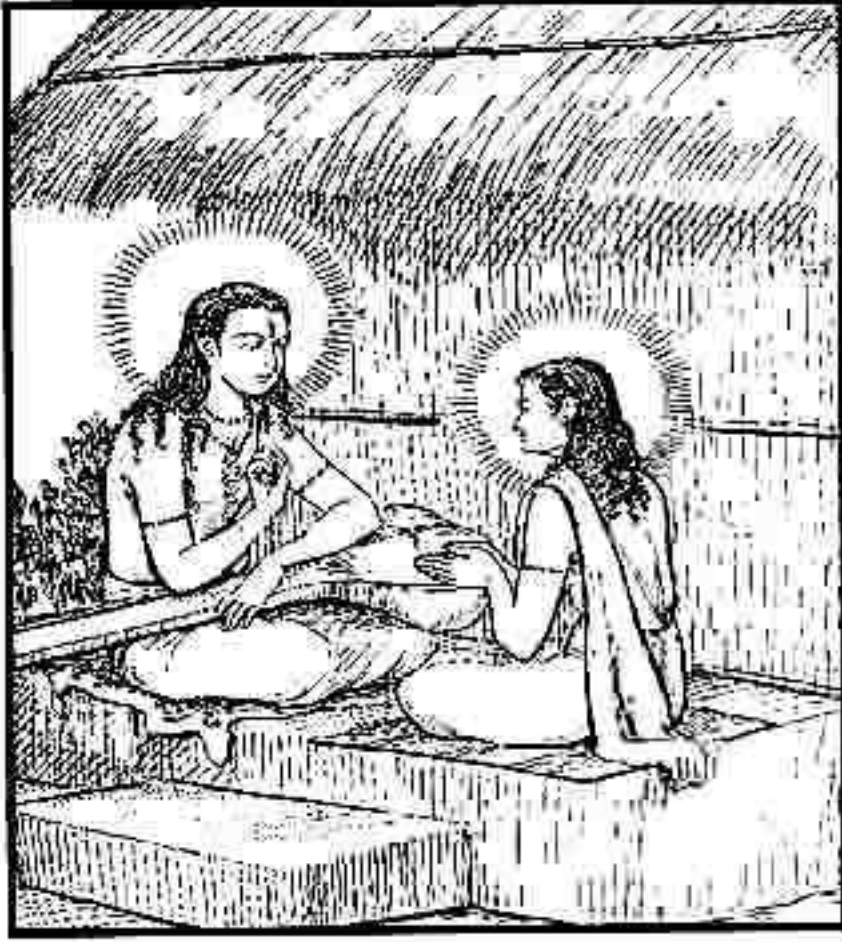
করলেন—'বৎস! আমি তোমার কী প্রিয় এবং উত্তম কাজ করতে পারি?' সেই কথা শুনে শুকদেব বললেন—'ইহলোকে যা পরমকল্যাণকারক, আমাকে কৃপা করে সেই উপদেশ প্রদান করুন।'

নারদ বললেন—এক সময় পবিত্র অন্তঃকরণসম্পন্ন ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ইচ্ছায় এই প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে সনৎকুমার উপদেশ দিয়েছিলেন—'বিদ্যার সম কোনো নেত্র নেই, সত্যের সমান কোনো তপস্যা নেই, রাগের সমান কোনো দুঃখ এবং ত্যাগের সমান কোনো সুখ নেই। পাপকর্ম থেকে দূরে থাকবে, সর্বদা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করবে, সাধু ব্যক্তিদের মতো ব্যবহার করবে এবং সদাচার পালন করবে। এগুলিই সর্বোত্তম শ্রেয়ের (কল্যাণের) সাধন। যেখানে সুখের নামই নেই—সেই মানব শরীর পেয়ে যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হয়, সে মোহগ্রস্ত হয়। বিষয়াদির সংযোগ দুঃখরূপ হয়ে থাকে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি চঞ্চল হয়। বিষয়াদির আসক্তি মোহজাল বিস্তার করে এবং মোহজালে আবদ্ধ ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখই ভোগ করে। যে কল্যাণ লাভে ইচ্ছুক, তার সর্বতোভাবে কাম ও ক্রোধ অবদমন করা কর্তব্য, কারণ এই দুটি দোষই কল্যাণের পথে বিঘ্ন স্বরূপ। মানুষের ক্রোধ থেকে তপস্যাকে, অশান্তি থেকে লক্ষ্মীকে, মান-অপমান থেকে বিদ্যাকে এবং ভ্রম থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। ক্রূর স্বভাব পরিত্যাগ করা সব থেকে বড় ধর্ম, ক্ষমা সব থেকে বড় বল, আত্মার জ্ঞান সব থেকে বড় জ্ঞান এবং সত্যের থেকে বড় আর কিছুই নেই। সত্য কথা বলা সব থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও, হিতকারী বাক্য সত্যের থেকেও বড়। যাতে প্রাণীদের হিত হয়, মঙ্গল হয়, তাকেই আমি সত্য বলে মানি। যে নতুন নতুন কর্মারম্ভ পরিত্যাগ করেছে, যার মনে কোনো কামনা নেই, যে কোনো বস্তু সংগ্রহ করে না এবং যে সবকিছু ত্যাগ করেছে, সে-ই বিদ্বান এবং পণ্ডিত। যে নিজ বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে বিষয় সেবন করে, যার চিত্ত শান্ত, নির্বিকার এবং একাগ্র, যে ব্যক্তি নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বাস করেও তাতে একাত্ম না হয়ে পৃথকভাবে থাকে, সে মুক্ত এবং তার অত্যন্ত শীঘ্র পরম কল্যাণ প্রাপ্তি হয়। যার কোনো প্রাণীর দিকে দৃষ্টি না যায়, যে কাউকে স্পর্শ বা কথাবার্তা বলে না, সে পরম কল্যাণ লাভ করে কারো সঙ্গে শত্রুতা করবে না। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব জানে এবং মনকে বশে রাখে, তার কোনো বস্তু সংগ্রহ করা উচিত নয় এবং কামনা ও চঞ্চলতা ত্যাগ করা উচিত। তাহলে পরম কল্যাণের সিদ্ধি হয়। তাত শুকদেব ' তুমি সংগ্রহ ত্যাগ করে জিতেন্দ্রিয় হও এবং সেইপদ প্রাপ্ত করো যা ইহলোকে ও পরলোকে নির্ভয় ও সর্বতোভাবে শোকরহিত। যিনি ভোগ পরিত্যাগ করেছেন, তিনি কখনো শোকগ্রস্ত হন না ; তাই প্রত্যেক মানুষের ভোগাসক্তি ত্যাগ করা উচিত। সৌম্য ! যে ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করে, সে দুঃখ ও সন্তাপ থেকে মুক্তি পায়। যে পরমাত্মাকে জয় করার ইচ্ছা করে, তার তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মননশীল, সংযতচিত্ত এবং বিষয়াদিতে অনাসক্ত থাকা উচিত। যে ব্রাহ্মণ ত্রিগুণাত্মক বিষয়ে আসক্ত না হয়ে সর্বদা একান্তবাস করে, সে অত্যন্ত শীঘ্র মোক্ষলাভ করে। যে মুনি জাগতিক প্রাণীর মধ্যে থেকেও একাকীতে আনন্দ পায়, তাকে জ্ঞানানন্দ দ্বারা তৃপ্ত বলে

জানতে হবে ; যে জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত হয়, সে কখনো শোকগ্রস্ত হয় না। জীব সর্বদা কর্মের অধীন হয়ে থাকে, শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে সে দেবতা হয়, শুভ-অশুভ আচরণ দ্বারা মনুষ্যজন্ম লাভ করে এবং শুধুমাত্র অশুভ কর্মের প্রভাবে সে পশু-পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইসব জন্মে জীবকে সর্বদা জরা-মৃত্যু এবং নানাপ্রকার দুঃখের শিকার হতে হয়। এইভাবে জগতে জন্মগ্রহণ করা প্রতিটি প্রাণী সন্তাপের আগুনে তাপিত হয়—এই কথায় তুমি মনোযোগ দাও না কেন ? এখানে নানাপ্রকার বস্তু সংগ্রহের কোনো প্রয়োজন নেই ; কারণ সংগ্রহ থেকে মহাদোষ সৃষ্টি হয়। রেশমকীট নিজ সংগ্রহের জন্যই আবদ্ধ হয়। স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়তে আসক্ত ব্যক্তি সেইরূপ দুঃখ ভোগ করে, যেমন জঙ্গলের বৃদ্ধ হাতি পুকুরের কাদায় পড়ে কষ্ট-ভোগ করে। জালে বদ্ধ মাছ যেমন জলের বাইরে এলে ছটফট করে তেমনই স্নেহজালে আবদ্ধ কষ্ট পেতে থাকা প্রাণীদের কথা ভেবে দেখ ! জগতে আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, শরীর-সংগ্রহ—সবই অপরের, বিনাশশীল ; এর মধ্যে নিজের বলে আছে শুধু পাপ আর পুণ্য। যেখানে থাকার স্থান নেই, সাহায্য করার কেউ নেই, নিজ দেশের কোনো সাথি নেই, যা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অবলম্বনহীন, সেই পথে তুমি একাকী যাবে কী করে ? তুমি যখন পরলোকের পথে যাবে, কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না, শুধু তোমার পাপ ও পুণ্য সঙ্গে যাবে। অর্থ (পরমাত্মা) লাভের জন্যই বিদ্যা, কর্ম, পবিত্রতা এবং বিস্তৃত জ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয় ; যখন অর্থ সিদ্ধি (পরমাত্মা প্রাপ্তি) হয়ে যায় তখন মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। সংসারী মানুষের বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি হয়, তা তার পক্ষে বন্ধনের রজ্জু হয়ে দাঁড়ায়। পুণ্যাত্মা ব্যক্তি সেই রজ্জু থেকে মুক্ত হয়ে পরমার্থের পথে এগিয়ে যায় ; কিন্তু পাপী ব্যক্তি তা ছেদন করতে পারে না। জগৎ এক স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায়, তীরগুলি তার রূপ, মন স্রোত, স্পর্শ দ্বীপ এবং রস তার প্রবাহ। গন্ধ হল তার কীট, শব্দ জল এবং স্বর্গরূপ দুর্গম ঘাটি, শরীররূপ নৌকার সাহায্যে তা পার করা সম্ভব। ক্ষমা তার লগী এবং ধর্ম একে স্থির রাখার নোঙ্গর। ত্যাগরূপ বায়ুর সাহায্য পেলে এই নদী শীঘ্র পার করা সম্ভব। এই দেহ পঞ্চভূতের আশ্রয়, এতে অস্থির থাম লাগানো, রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি, চামড়ায় আবৃত। এতে মল-মূত্র ভর্তি, যা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। এ দেহ জরা ও শোকে ব্যাপ্ত, রোগের আশ্রয়, আতুর, রজোগুণরূপ ধুলায় পরিপূর্ণ এবং অনিত্য, সুতরাং তোমার এর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা উচিত। এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ পঞ্চমহাভূত হতে উৎপন্ন, তাই তার থেকে ভিন্ন নয়। পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি এবং সত্ত্বাদি গুণ—এই সতেরো তত্ত্ব সমুদয়কে অব্যক্ত বলা হয়। এর সঙ্গেই (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বুদ্ধি এবং অহংকারের আশ্রয়ভূত) সমস্ত বিষয়গুলি এক করলে যে চব্বিশ তত্ত্বের সমষ্টি হয়, তাকে বলা হয় ব্যক্তাব্যক্ত সমুদয়। যে এই সব তত্ত্বদ্বারা যুক্ত, তাকে বলা হয় পুরুষ। যে ব্যক্তি ধর্ম-অর্থ-কাম-সুখ-দুঃখ ও জীবন-মৃত্যু ঠিকমতো বোঝে, সে-ই উৎপত্তি এবং প্রলয়ের তত্ত্বও যথার্থরূপে জানে। জ্ঞানের সম্পর্কে যা কিছু আছে, তা পরম্পরায় জানা উচিত। যেসব পদার্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায়, সেগুলি ব্যক্ত, আর যেগুলি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়ার জন্য অনুমান করা হয়, তাকে অব্যক্ত বলে। জ্ঞানী ব্যক্তি জগতে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে জগতকে বিস্তৃত দেখেন। তাঁর ভূত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান থাকে এবং তাঁর সেই জ্ঞানশক্তি কখনো নষ্ট হয় না। সেই প্রভাবেই তিনি সর্বাবস্থায় সমস্ত ভূতকে দর্শন করেন। যিনি জ্ঞান শক্তিতে মোহজনিত নানাক্লেশ পার হয়েছেন, তিনি সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে বাস করলেও কখনো অশুভ কর্মে লিপ্ত হন না। অজ্ঞান ব্যক্তি প্রারব্ধকর্মের জন্য নানা কষ্ট ভোগ করে জগতে ঘুরে বেড়ায়। তাই তুমি কর্ম থেকে নিবৃত্ত, সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত, সর্বজ্ঞ, ভাব-অভাবরহিত হও। বহু জ্ঞানী ব্যক্তি সংযম ও তপস্যা বলে বন্ধন উচ্ছেদ করে অনন্ত সুখপ্রদানকারী পরম সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করেছেন।'

———০———

শুকদেবকে দেবর্ষি নারদের উপদেশ এবং শুকদেবের সূর্যলোকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

নারদ বললেন—শুকদেব ! শাস্ত্র, শোক দূর করে, সেটি শান্তিময় এবং কল্যাণকারক। যে শোক নাশ করার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ করে, সে উত্তম বুদ্ধি লাভ করে সুখী হয়। শোকের হাজার হাজার এবং ভয়ের শত শত স্থান, সেগুলি প্রত্যহ মূর্খ ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ; বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ওপর তাদের প্রভাব চলে না। তাই অমঙ্গল নাশের জন্য আমি তোমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করছি, শোনো—বুদ্ধি যদি নিজ বশে থাকে, তাহলে শোক চিরকালের মতো দূরীভূত হয়। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিই অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগে মনে দুঃখ পায়। যে বস্তু অতীতের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তার গুণাগুণ স্মরণ করা উচিত নয় ; কারণ যে সেগুলি স্মরণ করে, তার আসক্তি দূর হয় না। যেখানে আসক্তি বৃদ্ধি পায় সেই বস্তুকে অনিষ্টকর মনে করে তাতে দোষদৃষ্টি রাখা উচিত। তাহলে ওইসব বস্তুতে বৈরাগ্য আসে। যে ব্যক্তি বিগত বিষয় নিয়ে শোক করে, তার কখনো অর্থ, ধর্ম, যশ প্রাপ্তি হয় না ; সে সেই বস্তুর জন্য দুঃখ করলেও, তার অভাব দূর হয় না। সকল প্রাণীরই উত্তম পদার্থের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি হয়, কোনো কিছুতেই শোক স্থায়ী হয় না। যে ব্যক্তি অতীতে মৃত কোনো ব্যক্তি অথবা নষ্ট হওয়া কোনো পদার্থের জন্য নিত্য শোক করে, সে এক দুঃখ থেকে অন্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এইভাবে তাকে দুভাবে কষ্ট ভোগ করতে হয়। যে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করে জগতে সর্বদা সংঘটিত জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের দিকে দৃষ্টি রাখে, সে কখনো ওইসবের জন্য অশ্রুপাত করে না। যে সব কিছু সম্যক্ দৃষ্টিদ্বারা দেখে, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো অশ্রুপাত করে না। যদি কোনো শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হয় এবং তা দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য চিন্তা করা উচিত নয়। দুঃখ দূর করার মহৌষধ হল সেটি নিয়ে চিন্তা না করা। চিন্তাদ্বারা সেটি কমে না, বরং বেড়ে যায়। তাই মানসিক ক্লেশ বুদ্ধির দ্বারা এবং শারীরিক ক্লেশ ঔষধ সেবন দ্বারা দূর করা উচিত। শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে তা হওয়া সম্ভব। দুঃখ এলে শিশুর মতো ক্রন্দন করা উচিত নয়। রূপ, যৌবন, অর্থ, আরোগ্য এবং প্রিয়জন সঙ্গ—এসবই অনিত্য, বিদ্বান ব্যক্তির তাতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। সমস্ত দেশে আগত কোনো সংকটের জন্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের শোক করা উচিত নয়। যদি সেই সংকট থেকে উদ্ধার করার কোনো পথ জানা থাকে, তাহলে শোক ত্যাগ করে তাই করা উচিত। জীবনে সুখের থেকে দুঃখই বেশি হয় ; কিন্তু যে সুখ ও দুঃখ দুটি চিন্তাই পরিত্যাগ করে, সে অক্ষয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। অর্থ উপার্জন করতে বড় কষ্ট করতে হয়, তা রক্ষা করতেও সুখ নেই এবং ব্যয় করতেও কষ্ট হয় ; সুতরাং অর্থকে সকল অবস্থাতেই দুঃখদায়ক মনে হয়, তা নষ্ট হলে দুঃখ করা উচিত নয়। মানুষ অর্থ সংগ্রহের দ্বারা পূর্বাপেক্ষা উচ্চস্থিতি লাভ করেও কখনো তৃপ্ত হয় না, আরও বেশি আশা নিয়েই সে মারা পড়ে ; বিদ্বান ব্যক্তি তাই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে। সংগ্রহের অন্ত হল বিনাশ, উচ্চে আরোহণ করার অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মরণ। তৃষ্ণার কখনো অন্ত হয় না, সন্তোষই পরম সুখ, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্তোষকেই পরম ধন বলে মনে করেন। আয়ু সর্বদাই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, ক্ষণভরও অপেক্ষা করে না। নিজ শরীরই যখন অনিত্য তখন অন্য কোন্ বস্তুকে নিত্য বলা যাবে ? যে ব্যক্তি সকলপ্রাণীর মধ্যে মনের অতীত পরমাত্মার চিন্তা করে সে জগৎ-সংসারের যাত্রা সমাপ্ত করে এবং পরমপদ সাক্ষাৎ করে শোক থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পায়। যেমন জঙ্গলে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে থাকা পশুকে ব্যাধ এসে সহসা আক্রমণ করে, তেমনই কামনার জন্য ব্যস্ত অতৃপ্ত মানুষকে মৃত্যু এসে তুলে নিয়ে যায় ; তাই সকলের দুঃখ থেকে বাঁচার উপায় ভাবা উচিত। যে শোক ত্যাগ করে কার্য আরম্ভ করে এবং কোনোকিছুতে আসক্ত হয় না, তার মুক্তি হয়। ধনী হোক বা নির্ধন সকলেরই উপভোগকালে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বিষয়ে কিঞ্চিৎ সুখভোগ হয়, তারপরে সেগুলি নিরস হয়ে ওঠে। প্রাণীদের একে অপরের সঙ্গে মিলনের পূর্বে কোনো দুঃখ থাকে না, মিলনের পরে যখন বিচ্ছেদ হয় তখনই দুঃখের অনুভূতি হয় ; তাই চিন্তাশীল ব্যক্তির নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে কখনো শোক করা উচিত নয়। ধৈর্যের দ্বারা শিশ্ন ও উদর, নেত্রের দ্বারা হাত ও পায়ের, মনের দ্বারা চোখ ও কানের এবং সদ্বিদ্যার দ্বারা মন ও বাক্যের রক্ষা করা উচিত। যে পূজনীয় এবং অন্য ব্যক্তির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে শান্তভাবে বিচরণ করে এবং অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ, নিষ্কাম এবং লোভহীন থেকে একাকী বিচরণ করে, সে-ই সুখী এবং বিদ্বান হয়।

মানুষ যখন সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ বলে মনে করে, সেই অবস্থায় বুদ্ধি, নীতি এবং পুরুষার্থও তাকে রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান লাভের জন্য মানুষের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত ; কারণ যত্নশীল ব্যক্তি কখনো দুঃখ পায় না। আত্মা সবার চেয়ে প্রিয়, তাকে রোগ-জরা-মৃত্যু থেকে রক্ষা করা উচিত। শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি শরীরকে পীড়িত করে। তৃষ্ণায় কাতর, দুঃখী এবং বিবশ অবস্থাতেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণকারী মানুষের দেহ বিনাশের দিকে এগিয়ে চলে। নদীর স্রোত যেমন এগিয়েই চলে, তেমনই রাত ও দিন প্রতি নিয়ত মানুষের আয়ু অপহরণ করে অগ্রসর হতে থাকে। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের পরিবর্তন দেহধারণকারী জীবদের জরাজীর্ণ করতে থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও থামে না। সূর্য নিজে অজর হয়েও প্রত্যহ উদয়-অস্ত হয়ে প্রাণীদের সুখ-দুঃখ নাশ করতে থাকে। রাত্রিগুলি বহু অপূর্ব ও প্রিয়-অপ্রিয় ঘটনাসমূহ নিয়ে আসে এবং চলে যায়। জীব যদি কৃতকর্মের ফলে পরাধীন না হত তাহলে ইচ্ছামতো তার সকল কামনাই পূর্ণ হত। অত্যন্ত সংযমী,বুদ্ধিমান এবং চতুর মানুষকেও (বর্তমানের) কর্মফল হতে বঞ্চিত হতে দেখা যায় আবার গুণহীন, মূর্খ, নীচ ব্যক্তিকেও কারো আশীর্বাদ ব্যতীতই সমস্ত কামনা পূর্ণ হতে দেখা যায়। কোনো কোনো মানুষ সর্বদাই প্রাণী হিংসায় ব্যাপৃত থাকে এবং জগৎকে ঠকাতে থাকে, তবুও সে সুখ ভোগ করে থাকে। কত লোক এমন আছে, যারা কোনো কাজ না করে চুপ করে বসে থাকে, তবুও লক্ষ্মী তাদের কাছে নিজে হাজির হন, আবার কত লোক বহু পরিশ্রম করেও মনোমতো জিনিস পায় না। এসবই মানুষের প্রারব্ধের ফল। বীর্য একস্থানে সৃষ্টি হয়ে অন্যত্র গিয়ে সন্তান উৎপাদন করে। কখনো তা গর্ভধারণ করাতে সক্ষম হয় আবার কখনো তা বিফলে যায়। কত লোক পুত্র-পৌত্রের আকাঙ্ক্ষায় নানাপ্রকার চেষ্টা করে, তবুও তাদের সন্তান হয় না, আর বহু মানুষ সন্তান চায় না, তা সত্ত্বেও তাদের ঘর সন্তানে ভরে ওঠে। কত গর্ভ এমনও আছে যা বহু তপস্যার পর এক কুলাঙ্গার সন্তান জন্ম নেয়, আবার এমনও হয় যে আমোদ-প্রমোদে জন্মগ্রহণ করে সন্তান পিতার সঞ্চিত বিপুল ধনরাশির উত্তরাধিকার হয়। কিছু গর্ভ পূর্ণতার আগেই নষ্ট হয়ে যায়, আর কিছু জন্মেই মৃত্যুবরণ করে।

বাঘ যেমন মৃগকে কষ্টপ্রদান করে, তেমনই নানা ব্যাধি মানুষকে পীড়িত করে, তখন তাদের ওঠা-বসার ক্ষমতা থাকে না। এক সময় এক ব্যাধিপীড়িত মানুষ বৈদ্যকে বহু অর্থপ্রদান করে তবু বৈদ্য পীড়া দূর করার বহু চেষ্টা করেও সফল হয় না। ঔষধ সেবনকারী বহু বৈদ্য মৃত মৃগের ন্যায় ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ে। তারা নানাপ্রকার ঔষধ পান করলেও বৃদ্ধাবস্থার পীড়া তাদের পীড়িত করে। এই পৃথিবীতে যখন পশু-পক্ষীদের এবং দরিদ্র মানুষদের রোগ-ব্যাধি কষ্ট দেয় তখন কে তাদের চিকিৎসা করে ? তাদের প্রায়শ রোগ হয়ই না। কিন্তু বড় বড় পশু যেমন ছোট পশুদের আক্রমণ করে, তেমনই প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন দুর্দ্ধর্ষ রাজাদেরও নানা ব্যাধি আক্রমণ করে। এইভাবে সব লোক ভবসাগরের প্রবল প্রবাহে শোক ও মোহে ডুবে থাকে। দেহধারী মানুষ ধন, রাজ্য ও কঠোর তপস্যার প্রভাবেও প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করতে পারে না। যদি চেষ্টার ফল মানুষের নিজের হাতে হত, তাহলে কোনো মানুষই বৃদ্ধ হত না বা মৃত্যুবরণ করত না। সকলের সব কামনা পূর্ণ হত এবং কাউকেই অপ্রিয় কিছু দেখতে হত না। সকলেই জগতে সবার ওপরে স্থান পেতে চায় এবং তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করে থাকে ; কিন্তু তাতে সফলতা লাভ করে না। প্রমাদরহিত, শূরবীর এবং পরাক্রমী পুরুষও ঐশ্বর্য এবং মদিরার নেশায় উন্মত্ত মানুষদের সেবা করে। কত লোকের কষ্ট আপনাআপনিই কমে যায় এবং কিছু লোক তাদের নিজেদের অর্থই ঠিক সময়ে ফেরৎ পায় না। কর্মের ফলে অত্যন্ত বৈষম্য দেখা যায়। কিছু লোক পালকি চড়ে যায় আর কিছু লোক পালকি বহন করে। কত লোক স্ত্রীর মৃত্যুর পর একাকী জীবন কাটায় আবার অনেকের বহু নারী থাকে। এইসব দেখে তুমি মোহগ্রস্ত হোয়ো না। ঋষিশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে অত্যন্ত বাস্তব কথা জানালাম।

নারদের কথা শুনে পরম বুদ্ধিমান এবং নির্মল হৃদয় শুকদেব মনে মনে গভীর চিন্তা করলেন ; কিন্তু সহসা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর তাঁর নিজ ধর্মের কল্যাণময়ী গতি স্থির হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন—'আমি সর্বপ্রকার উপাধি মুক্ত হয়ে কীভাবে সেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হব ? যাতে এই জগৎ-সংসারে আর ফিরতে না হয়। যেখানে গেলে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, আমি সেই পরমভাব লাভ করতে চাই। সর্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করে আমি উত্তম গতি লাভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, এখন আমি সেখানেই যাব, যেখানে গেলে আমার আত্মা শান্তিলাভ করবে এবং যেখানে আমি অক্ষয়, অবিকারী এবং সনাতনরূপে অবস্থিত থাকব। কিন্তু যোগ

ব্যতীত সেই পরমগতি লাভ করা সম্ভব নয়। কর্মের দ্বারা দেহবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব, তাই আমি যোগের আশ্রয় নিয়ে এই স্থূল-শরীর পরিত্যাগ করে শক্তিরূপে তেজোময় আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করব। দেবতাগণ চন্দ্রের অমৃত পান করে যেমন তাকে ক্ষীণ করেন, সূর্যদেবের সেইরূপ ক্ষয় হয় না। ধূমমার্গে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করা জীব কর্মভোগ সমাপ্ত করে পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং নতুন কর্মফল ভোগ করার জন্য পুনরায় চন্দ্রলোকে যায়। অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যারা গমন করে তাদের পুনরাগমন থেকে মুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রের সর্বদা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার সেই হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা কখনো শেষ হয় না, এইসব ভেবে আমি চন্দ্রলোকে যাওয়ার ইচ্ছা করি না। সূর্যদেব তাঁর প্রচণ্ড তাপে জগৎকে সন্তপ্ত করেন। তিনি সকলের তেজ নিজে গ্রহণ করেন (তাঁর তেজ কখনো হ্রাস হয় না) ; তাই তাঁর মণ্ডল সর্বদা জ্যোতির্ময় থাকে। তাই আমি সেই উদ্দীপ্ত তেজসম্পন্ন আদিত্যমণ্ডলে যেতে ইচ্ছা করি, সেখানে আমি নির্ভয়ে থাকব, কেউ আমাকে পরাজিত করতে পারবে না। এই দেহ সূর্যলোকে স্থাপন করে আমি ঋষিদের সঙ্গে সূর্যদেবের দুঃসহ তেজে প্রবেশ করব, তার জন্য আমি নাগ, নগ, পর্বত, পৃথিবী, দিক-দিগন্ত, দেব-দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসদের কাছে অনুমতি চাইছি। আজ আমি জগতের সমস্ত ভূতে প্রবেশ করব ; সমস্ত দেবতা এবং ঋষি আমার যোগশক্তির প্রভাব দেখবেন।'

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শুকদেব জগদ্বিখ্যাত দেবর্ষি নারদের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর অনুমতি লাভ করে তিনি তাঁর পিতা মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে এসে তাঁর চরণে প্রণাম জানালেন এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর পিতার কাছে সূর্যলোকে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন এবং মোক্ষ বিচার করতে করতে সিদ্ধগণের নিবাসস্থান কৈলাস পর্বত শিখরে প্রস্থান করলেন।

শুকদেবের ঊর্ধ্বগতির বর্ণনা এবং ব্যাসদেবকে মহাদেবের আশ্বাস প্রদান

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ব্যাসপুত্র শুকদেব কৈলাস শিখরে পৌঁছে একান্তে সমতল ভূমিতে উপবেশন করে শাস্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা সম্পূর্ণ শরীরে আত্মার ধারণা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর সূর্যোদয় হলে তিনি বিনীতভাবে পূর্বদিকে মুখ করে বসে যোগে প্রবৃত্ত হলেন। সেখানে পশু-পক্ষী না থাকায় কোনো কোলাহল ছিল না। সর্বপ্রকার সঙ্গবর্জিত হয়ে তিনি আত্মার সাক্ষাৎ করে অত্যন্ত খুশি হলেন ; তারপর মোক্ষমার্গ উপলব্ধি করার জন্য যোগের আশ্রয় নিয়ে মহা যোগেশ্বর হয়ে তিনি আকাশে বিচরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন তিনি দেবর্ষি নারদের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে নিজ যোগ সম্বন্ধে নিবেদন করে বললেন—'তপোধন ! এখন আমি মোক্ষমার্গের দর্শন লাভ করেছি, আপনার কল্যাণ হোক, এখন আমি সেখানে যেতে প্রস্তুত ; আপনার কৃপায় অভীষ্ট গতি লাভ করব।'

নারদের অনুমতি পেয়ে ব্যাসনন্দন শুকদেব তাঁকে প্রণাম করে পুনরায় যোগে স্থিত হয়ে কৈলাস-পর্বত থেকে লাফিয়ে আকাশে উঠে গেলেন। তারপর বায়ুর রূপ ধারণ করে অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে লাগলেন। সেইসময় শুকদেবের তেজ সূর্য ও অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হয়েছিল। তিনি নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিলোককে আত্মভাবে দেখতে দেখতে বহুদূরে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে নির্ভয়ে শান্ত ও একাগ্রচিত্তে ওপর দিয়ে যেতে দেখে সমস্ত চরাচরের প্রাণী নিজ নিজ শক্তি ও রীতি অনুযায়ী তাঁর পূজা করলেন, দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করলেন। ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ পরম ধর্মাত্মা শুকদেব পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে মৌনভাবে এগোতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মলয় পর্বতে পৌঁছলেন, যেখানে উর্বশী এবং পূর্বচিত্তি নামক দুই অপ্সরা সর্বদা বিরাজ করেন। ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবকে এইভাবে যেতে দেখে ওই দুই অপ্সরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলেন—আহা ! এই বেদাভ্যাসী ব্রাহ্মণের বুদ্ধি কী একাগ্র দেখ, তিনি কেমন অল্প সময়েই পিতার সেবা দ্বারা উত্তম বুদ্ধি লাভ করে চন্দ্রের ন্যায় আকাশে বিচরণ করছেন। ইনি অত্যন্ত বড় তপস্বী এবং পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতাও এঁকে গভীর স্নেহ করতেন, তাহলে তিনি কী করে একে যাওয়ার অনুমতি দিলেন ? উর্বশীর কথা শুনে শুকদেব অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, পর্বত, বন, নদী ও সরোবরের দিকে তাকালেন। সেই সময় এঁদের সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ হাতজোড় করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে

শুকদেবের দিকে তাকালেন। তখন শুকদেব তাঁদের বললেন—'দেবিগণ ! আমার পিতা যদি আমার নাম করে যদি ডাকতে ডাকতে এদিকে চলে আসেন,তাহলে আপনারা সতর্কভাবে উত্তর দেবেন। আমার ওপর আপনাদের স্নেহ আছে, তাই আমার এই কথাটা মেনে নিন।' তাঁর কথা শুনে সমুদ্র,নদী, পর্বত এবং বনসহ সম্পূর্ণ দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা সবদিক থেকে উত্তর দিলেন—'উত্তম ঋষি, উত্তম, আপনি যেমন নির্দেশ দিচ্ছেন, তেমনই হবে।'

তারপর মহাতপস্বী শুকদেব সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলেন। তিনি চার প্রকার দোষ,আট প্রকার তমোগুণ এবং পাঁচ প্রকার রজোগুণ পরিত্যাগ করে সত্ত্বগুণও ত্যাগ করলেন। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। তারপর তিনি নিত্য, নির্গুণ এবং লিঙ্গরহিত ব্রহ্মপদে স্থিত হলেন। সেইসময় ধূম্রহীন অগ্নির ন্যায় তাঁর তেজ দেদীপ্যমান হয়েছিল। ইন্দ্র সরস এবং সুগন্ধি জল বর্ষণ করলেন, দিব্যগন্ধসহ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। শুকদেব এগিয়ে গিয়ে পর্বতের দুটি দিব্য শিখর দেখতে পেলেন, তার একটি হিমালয়ের অপরটি মেরুপর্বতের। হিমালয়ের শিখর রজতবর্ণ হওয়ায় শ্বেতশুভ্র দেখাত এবং সুমেরুর স্বর্ণময় পর্বত শৃঙ্গ হরিদ্রাভ দেখাত। এগুলি শত শত যোজন বিস্তৃত। উত্তর দিকে যাওয়ার সময় শুকদেব এই দুটি শিখর দেখে নির্ভয়ে তার ওপর উঠলেন। সেই মহাপর্বতও তাঁর গতি রোধ করতে পারল না, সেটি দ্বিধাবিভক্ত হল এবং শুকদেব এগিয়ে গেলেন। তাই দেখে সেই পর্বতে বসবাসকারী সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব এবং ঋষিগণ সমবেত স্বরে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। সেই হর্ষধ্বনি আকাশে গুঞ্জরিত হল এবং চারি-দিকে শুকদেবের প্রতি সাধুবাদ শোনা যেতে লাগল। সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং বিদ্যাধরগণ তাঁকে পূজা করলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে যে পুষ্পবৃষ্টি হল তাতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। তারপর উর্ধ্বলোকে গিয়ে শুকদেব আকাশগঙ্গা দর্শন করলেন।

তাঁকে এইভাবে সিদ্ধিলাভ করতে দেখে তাঁর পিতা বেদব্যাসও উত্তম গতির আশ্রয় গ্রহণ করে স্নেহবশত তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি এক নিমেষেই সেইখানে উপস্থিত হলেন যেখান থেকে শুকদেব পর্বত অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যাসদেব পর্বতের দুটি ভাগ দেখলেন। সেই স্থানে বসবাসকারী ঋষিগণ এসে ব্যাসদেবকে তাঁর পুত্র শুকদেবের অলৌকিক কর্ম-কাহিনী শোনালেন। ব্যাসদেব সেই কাহিনী শুনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন। তাঁর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনে সকলের আত্মরূপ শুকদেব সর্বব্যাপক স্বরূপে 'ভোঃ' এই একাক্ষর শব্দে উত্তর দিলেন, সেইসময় সমস্ত চরাচর জগৎ সেই ধ্বনি উচ্চারণ করল। তখন থেকে এখনও পর্যন্ত পর্বত শিখরে অথবা গুহার কাছে যখনই কোনো আওয়াজ করা হয়, তখনই সেখান থেকে শুকদেবের শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নিজের প্রভাব বিস্তার করে শুকদেব এইভাবে অন্তর্ধান করলেন এবং শব্দাদিগুণ ত্যাগ করে পরমপদ লাভ করলেন।

অমিত তেজস্বী পুত্রের এই মহিমা দেখে ব্যাসদেব তাঁর কথা চিন্তা করতে করতে পর্বতের শিখরের ওপর পৌঁছলেন। এরমধ্যে দেবতা ও গন্ধর্ব পরিবেষ্টিত হয়ে এবং মহর্ষি পূজিত পিনাকধারী ভগবান শংকর সেখানে পদার্পণ করে পুত্রশোকে কাতর বেদব্যাসকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন—'ব্রহ্মর্ষে ! তুমি আগে অগ্নি, ভূমি, জল, বায়ু এবং আকাশের মতো শক্তিশালী পুত্রের জন্য বর চেয়েছিলে ; তোমার তপস্যার প্রভাবে এবং আমার কৃপায় তুমি সেইরূপ পুত্রই লাভ করেছিলে। সে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন এবং অত্যন্ত পবিত্র ছিল। এখন সে এমন উত্তম গতি লাভ করেছে যা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এবং দেবতাদেরও দুর্লভ। তাহলে তুমি তার জন্য শোক করছ কেন ? যতদিন জগতে পর্বত ও সমুদ্রের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন তোমার এবং তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্তি এখানে বিরাজ করবে ; আমার কৃপায় এই জগতে তুমি সর্বদা তোমার পুত্রের ছায়া দেখতে পাবে।'

ভগবান শংকর বেদব্যাসকে এইভাবে আশ্বস্ত করলে ব্যাসদেব সর্বত্র তাঁর পুত্রের ছায়া অনুভব করতে করতে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন। যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি শুকদেবের জন্ম এবং তাঁর পরম-পদ প্রাপ্তির কথা বিস্তারিতভাবে জানালাম। সর্বপ্রথম দেবর্ষি নারদ আমাকে এই কাহিনী শুনিয়েছিলেন। মহাযোগী ব্যাসদেব কথাবার্তার প্রসঙ্গে বারংবার এইকথা বলতেন। যে ব্যক্তি মোক্ষধর্মযুক্ত এই পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করবে, সে শান্তিপরায়ণ হয়ে পরমগতি (মোক্ষ) লাভ করবে।

বদরিকাশ্রমে ভগবান নারায়ণ কর্তৃক দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের সমাধান

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসীরা যদি সিদ্ধিলাভ করতে চান, তাহলে তাঁদের কোন দেবতার আরাধনা করা উচিত ? দেবযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞের বিধি কী ? মুক্তপুরুষ কোন গতি লাভ করেন ? মোক্ষের স্বরূপ কী ? দেবতাদের দেবতা এবং পিতৃলোকেরও পিতা কে ? অথবা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কী ? আমাকে এইসব দয়া করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি অত্যন্ত গূঢ় প্রশ্ন করেছ, তার উত্তর বুঝিয়ে বলা সহজ নয়। এই বিষয়ে জ্ঞানীরা দেবর্ষি নারদ এবং নারায়ণ ঋষির সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন যে ভগবান নারায়ণ সমস্ত জগতের আত্মা, চতুর্মূর্তি এবং সনাতন দেবতা, তিনিই ধর্মের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সত্যযুগে তাঁর চার স্বায়ম্ভুব অবতার হয়েছিল, সেগুলি হল—নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ। তাঁর মধ্যে অবিনাশী নর এবং নারায়ণ বদরিকাশ্রমে গিয়ে ঘোর তপস্যায় রত হন। তপস্যা করতে করতে তাঁরা দুজন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন, তাঁদের শরীরের শিরা দেখা যাচ্ছিল। তপস্যায় তাঁদের তেজ এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে দেবতারাও তাঁদের দিকে তাকাতে পারতেন না। তাঁরা যাদের কৃপা করতেন, তারাই শুধু তাঁদের দেখতে পেত। একদিন শীঘ্রগামী নারদ পরিভ্রমণ করতে করতে বদরিকাশ্রমে গিয়ে পৌঁছিলেন। সেখানে নর ও নারায়ণের নিত্যকর্মের যখন সময় হল তখন নারদের মনে তা দেখার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হল। তিনি ভাবলেন—আহা ! এ হল সেই ভগবানের স্থান, যেখানে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর ও নাগসহ সমস্ত লোক নিবাস করে। প্রথমে এরা একই রূপে বিদ্যমান ছিল, পরে ধর্মের বংশে চার প্রকার স্বরূপ ধারণ করে এদের আবির্ভাব। এঁরা তাঁদের ধর্মাচরণ দ্বারা ধর্মের বৃদ্ধি করেছেন এবং অনুগৃহীত করেছেন। আগে কোনো কারণবশত হরি এবং কৃষ্ণ এখানে তপস্যা করতেন, এখন ধর্মাচরণে এগিয়ে থাকা নর ও নারায়ণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, এঁরা দুজনেই পরমধাম, এঁরা সমস্ত প্রাণীর পিতা, দেবতা এবং পরম যশস্বী। কিন্তু এঁরা এখানে অন্য কোন দেবতা বা পিতৃপুরুষের পূজা-অর্চনা করছেন ?'

মনে মনে ভক্তিপূর্বক এই কথা চিন্তা করে দেবর্ষি নারদ দুই দেবতার কাছে এলেন। ভগবান নর ও নারায়ণ দেবতা ও পিতৃপুরুষদের পূজা সমাপ্ত করে নারদকে দেখতে পেলেন এবং তাঁকেও শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে পূজা করলেন।
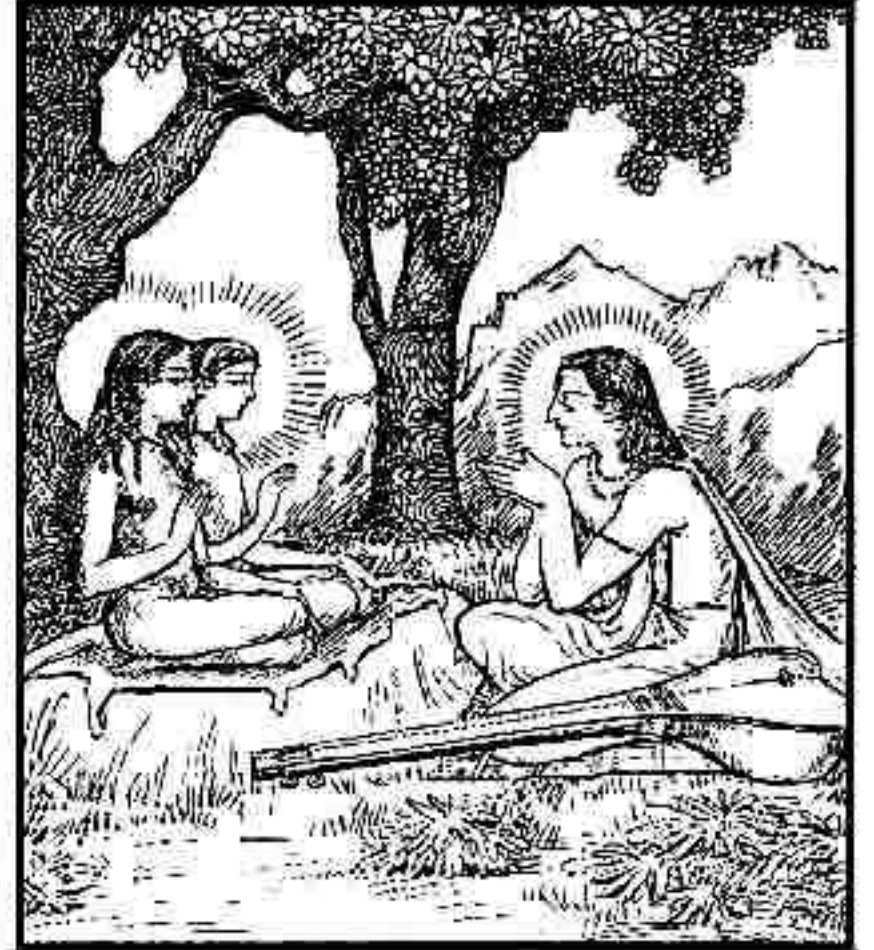
তাঁদের এই আশ্চর্যজনক আচরণ দেখে নারদ তাঁদের নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্ ! সম্পূর্ণ বেদ-বেদাঙ্গ এবং পুরাণে আপনাদের মহিমা গীত হয়ে থাকে। আপনারা জন্মরহিত সনাতন মাতা-পিতা এবং সর্বোত্তম অমৃতরূপ। আপনাদের মধ্যেই ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকালীন সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। চার আশ্রমের লোক আপনাদেরই পূজা করেন : আপনারাই জগতের মাতা, পিতা, এবং সনাতন গুরু, তা সত্ত্বেও আপনারা কোন্ দেবতা বা পিতৃপুরুষের পূজা করে থাকেন—তা আমি বুঝতে পারছি না (সুতরাং এই রহস্য কৃপা করে সমাধান করুন)।

শ্রীভগবান নারায়ণ বললেন—'দেবর্ষে ! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছ, তা অত্যন্ত গভীর ও রহস্যময়। যদিও এই সনাতন রহস্য প্রকাশ করা উচিত নয়, তবুও তোমার ভক্তি দেখে তোমার কাছে এই বিষয়টি যথার্থ রূপে বর্ণনা করব। যা সূক্ষ্ম, অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল এবং ধ্রুব, যা ইন্দ্রিয়াদি, বিষয় এবং সমস্ত ভূতগণের অতীত, বিদ্বানেরা

যাকে সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত ও অন্তর্যামী বলেছেন, সেই পরমাত্মা থেকেই ত্রিগুণময় অব্যক্ত উৎপন্ন হয়েছে, যাকে প্রকৃতি বলা হয়। সেই শুভ-অশুভস্বরূপ পরমাত্মাই আমাদের দুজনের উৎপত্তির কারণ। আমরা দুজনে তাঁকেই দেবতা ও পিতা জ্ঞানে পূজা করি। তাঁর থেকে বড় কোনো দেবতা বা পিতা নেই। তিনি আমাদের আত্মা। ব্রহ্মন্! তিনিই লোকেদের উন্নতির পথে নিয়ে যাবার জন্য ধর্মমর্যাদা স্থাপন করেছেন। দেবতা এবং পিতৃপুরুষের পূজা করা উচিত, এটিই তাঁর নির্দেশ। ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম, যম, মরিচী, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠি, সূর্য, চন্দ্র, কর্দম, ক্রোধ এবং বিক্রীত—এই প্রজাপতিগণ সেই পরমাত্মা হতেই উৎপন্ন হয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশিত সনাতন মর্যাদা পালনে রত। আদর্শ ব্রাহ্মণ তাঁর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত দেবতা ও পিতৃসম্বন্ধীয় কার্যগুলি ঠিক মতো জেনে নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করে। স্বর্গবাসী প্রাণীদের মধ্যে যিনিই সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করেন তিনিই তাঁর কৃপায় উত্তম গতি প্রাপ্ত হন।

যে ব্যক্তি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধিরূপ সতেরোটি গুণ, সমস্ত কর্ম ও পঞ্চদশ কলা থেকে নিজেকে পৃথক্ বলে মনে করে, সেই মুক্ত ; শাস্ত্রের তাই সিদ্ধান্ত। মুক্ত পুরুষদের গতি পরমাত্মা, শাস্ত্রে যাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। সেই পরমাত্মাকে সর্বগুণসম্পন্ন ও নির্গুণ বলা হয়। জ্ঞানযোগের দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয়। তাঁর থেকেই আমাদের দুজনের উৎপত্তি হয়েছে, তা জেনেই আমরা সেই সনাতন পরমাত্মার পূজা করি। চার বেদ, চার আশ্রম ও নানা মতের আশ্রয়গ্রহণকারী সকলেই ভক্তিসহকারে তাঁর পূজা করেন এবং তিনি এঁদের সকলকেই উত্তম ফল প্রদান করেন। যে ব্যক্তি সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে এবং অনন্য ভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ এই লাভ হয় যে সে তাঁর স্বরূপে প্রবেশ করে। নারদ! তোমার প্রেম ও ভক্তির জন্যই আমরা তোমাকে এই পরম গোপনীয় বিষয় জানালাম।

দেবর্ষি নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন এবং ভীষ্মের যুধিষ্ঠিরকে উপরিচরের চরিত্র বর্ণনার প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তির কথা জানানো

ভীষ্ম বললেন—পুরুষোত্তম নারায়ণ নারদকে এই কথা জানালে তিনি বললেন—'ভগবন্! এবার আপনি আপনার অবতার রূপে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন, আমি এখন (শ্বেতদ্বীপে স্থিত) আপনার আদি বিগ্রহ দর্শনে গমন করছি। লোকনাথ! আমি বেদের স্বাধ্যায় এবং তপস্যা করেছি, কখনো অসত্য কথা বলিনি, সর্বদা গুরুজনদের সম্মান করি, কারো গুপ্ত কথা কখনো অপরের কাছে প্রকাশ করি না, শত্রু ও মিত্রে সর্বদা সমভাব বজায় রাখি এবং আদিদেব পরমাত্মার শরণ নিয়ে সর্বদা অনন্যভাবে তাঁর ভজনা করি। এই সব কারণে আমার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, এরূপ অবস্থায় আমি সেই অনন্ত পরমেশ্বরের দর্শন লাভে বঞ্চিত থাকব কেন?'

নারদের কথা শুনে সনাতন ধর্মের রক্ষক ভগবান নারায়ণ তাঁকে যথোপযুক্তভাবে পূজা করে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অনুমতি লাভ করে নারদ সেই প্রাচীন ঋষির পূজা করে যোগযুক্ত হয়ে আকাশপথে মেরু পর্বতে পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মেরু শিখরের একান্তস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে যখন তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তখন তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। ক্ষীর সাগরের উত্তর ভাগে শ্বেতনামে যে প্রসিদ্ধ বিশাল দ্বীপ আছে, সেটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। সেই দ্বীপে সর্বপ্রকার পাপরহিত শ্বেতবর্ণকায় মানুষ বসবাস করে। তারা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদিরহিত হওয়ায় শব্দাদি বিষয় উপভোগ করে না, তাদের শারীরিক প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজন হয় না এবং তাদের দেহ থেকে সর্বদা সুগন্ধ নির্গত হয়। পাপী মানুষেরা তাদের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তাদের শরীর এবং অস্থি বজ্রের মতো দৃঢ় হয়ে থাকে, তারা দিব্য রূপের অধিকারী এবং মান-অপমানকে সমভাবে দেখে। তারা স্বভাবত যোগশক্তিসম্পন্ন হয়, মস্তকের আকার ছাতার মতো এবং গলার স্বর মেঘের মতন। যাঁর থেকে সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি এবং যিনি বেদ, ধর্ম, শান্তবৃত্তিতে অবস্থিত মুনি ও সমস্ত দেবতাদের সৃষ্টি

করেছেন—সেই পরমেশ্বরকে শ্বেতদ্বীপ নিবাসীরা ভক্তিপূর্বক নিজ হৃদয়ে ধারণ করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! শ্বেতদ্বীপবাসী ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়, আহার এবং চেষ্টারহিত হয় কেন ? তাদের দেহ থেকে সুগন্ধ নির্গত হয় কেন ? কীভাবে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল এবং তারা কীরূপ উত্তম গতি লাভ করে ? এই লোকে মুক্তিলাভকারী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সমস্ত লক্ষণ বলা হয়েছে, শ্বেতদ্বীপ নিবাসীদেরও আপনি তেমনই বলেছেন, এদের দুপক্ষের মধ্যে এই সমতা কেন ? এইসব জানার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বোধ করছি।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এ বিষয় বহুল প্রচারিত, একথা আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি ; এখন আমি তোমাকে সংক্ষেপে এর সারাংশ জানাচ্ছি। পূর্বকালে পৃথিবীতে উপরিচর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন, তিনি ইন্দ্রের মিত্র এবং ভগবান নারায়ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা ধর্মাচরণ করতেন ও পিতাকে ভক্তি করতেন, আলস্য তাঁর কাছ থেকে সর্বদাই দূরে থাকত। নারায়ণের বরেই তিনি এই ভূ-সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন। সূর্যের কাছে উপদেশ লাভ করে বৈষ্ণব শাস্ত্র বিধিদ্বারা প্রথমে তিনি ভগবান নারায়ণের পূজা করতেন, পরে উদ্বৃত্ত পূজাসামগ্রী দিয়ে তিনি পিতৃদেব এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করতেন। প্রথমে তাঁর আশ্রিত ব্যক্তিদের অন্ন দিয়ে সকলের পরে নিজে আহার গ্রহণ করতেন, সর্বদা সত্য কথা বলতেন এবং প্রাণীহিংসা থেকে দূরে থাকতেন। দেবাদিদেব জনার্দনকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভক্তি করতেন, এইসব দেখে ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে তাঁর সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন ও একই সিংহাসনে উপবেশন করতেন। রাজা উপরিচর তাঁর রাজ্য, ধন, পত্নী, বাহন ইত্যাদি সবই ভগবানের কৃপায় প্রাপ্ত মনে করে সবকিছু তাঁকেই সমর্পণ করতেন। সেই মহাত্মা রাজার কাছে পাঞ্চরাত্র আগমের প্রধান বিদ্বানেরা সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। ভগবানকে অর্পণ করা প্রসাদ রাজা প্রথমে তাঁদেরই দিতেন। রাজা ধর্মপূর্বক রাজ্য শাসন করতেন, কখনো অসত্যের আশ্রয় নিতেন না, তাঁর মনে কখনো খারাপ চিন্তার উদয় হত না এবং নিজে কখনো ক্ষুদ্রতম পাপও করতেন না।

(এবার আমি বলছি, কীভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল, শোনো) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ—এই সাত প্রসিদ্ধ ঋষিকে চিত্রশিখণ্ডী বলা হয়। এঁরা ঐকমত্য হয়ে মেরু গিরিশিখরে এক উত্তম শাস্ত্র প্রস্তুত করেন, যা চতুর্বেদের সিদ্ধান্তের অনুকূল। সপ্তঋষির মুখনিঃসৃত সেই শাস্ত্রে উত্তম লোকধর্মের সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। উপরিউক্ত ঋষিগণ একাগ্রচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সংযমপরায়ণ, অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা এবং সত্যধর্মে তৎপর। তাঁরা কোন সাধনার দ্বারা সংসারের কল্যাণ হবে, কী করলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হবে, কোন উপায়ে জগতের কল্যাণ হবে—সেই সব বিষয় চিন্তা করে উক্ত শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। সেই শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বর্ণনা আছে, এতে নানাপ্রকার মর্যাদা এবং স্বর্গ ও মর্তলোকের স্থিতিরও বর্ণনা করা হয়েছে। উপরিউক্ত ঋষিগণ এক সহস্র দিব্য বছর তপস্যা করে ভগবান নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন, তাতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান দেবী সরস্বতীকে তাঁদের বর দানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। নারায়ণের নির্দেশে সমগ্র জগতের হিত করার উদ্দেশ্যে দেবী সরস্বতী সেই ঋষিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন তপস্বী ব্রাহ্মণেরা সেই শাস্ত্রে যথার্থরূপে শব্দ, অর্থ ও হেতুযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করলেন। তাঁদের এই প্রথম রচিত গ্রন্থই ওঁ-কার এবং স্বরবিভূষিত তন্ত্রশাস্ত্র। ঋষিগণ সর্বপ্রথম করুণাময় ভগবানকেই সেই শাস্ত্র শ্রবণ করান, সেটি শ্রবণ করে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে অদৃশ্য থেকে বললেন—'মুনিবরগণ ! তোমরা একলক্ষ শ্লোক সমন্বিত যে উত্তম শাস্ত্র প্রস্তুত করেছ, তাতে সম্পূর্ণ লোকধর্মের প্রচার হবে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয়ে এটিকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের সমান বলে গণ্য করা হবে। ব্রহ্মা, মহাদেব, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী, জল, অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূত নামধারী পদার্থ এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যেমন নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী আচরণাদির প্রমাণভূত রূপে স্বীকৃত, তেমনই তোমাদের রচিত এই উত্তম শাস্ত্রও প্রামাণিক বলে গণ্য হবে। এই আমার নির্দেশ। স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র অনুসারেই ধর্মের উপদেশ দেবেন। শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতি যখন জন্মগ্রহণ করবেন তখন তাঁরা দুজনেও তোমাদের রচিত এই শাস্ত্রেরই অনুমোদন করবেন। স্বায়ম্ভুব মনু, শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতির শাস্ত্রগুলি যখন জগতে ভালোভাবে প্রচারিত হবে তখন প্রজাপালক বসু (উপরিচর) বৃহস্পতির কাছে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে। সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত সেই রাজা আমার বড় ভক্ত

হবে এবং সেই শাস্ত্র অনুযায়ী সমস্ত কার্য সম্পাদন করবে। তোমাদের রচিত এই শাস্ত্র সব শাস্ত্রের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে, এতে ধর্ম, অর্থ এবং উত্তম প্রশ্নের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর প্রচারে তোমাদের প্রজা বৃদ্ধি হবে এবং রাজা উপরিচরও রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন এবং মহাপুরুষ হবে ; কিন্তু তার মৃত্যুর পর এই শাস্ত্র জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে সব কথা আমি তোমাদের জানালাম।

এই কথাগুলি বলে ভগবান ঋষিদের কাছ থেকে কোনো অজ্ঞাত স্থানে চলে গেলেন। তারপর সকলের হিতার্থী সেই ঋষিগণ ধর্মের মূলভূত সেই সনাতন শাস্ত্র জগতে প্রচার করলেন। পরে আদি কল্পের প্রারম্ভিক যুগে বৃহস্পতির প্রাদুর্ভাব হলে সর্বাঙ্গ বেদ এবং উপনিষদসহ সেই শাস্ত্র তাঁরা বৃহস্পতিকে অধ্যয়ন করালেন। তারপর ধর্মপ্রচার এবং লোকেদের ধর্ম-মর্যাদায় স্থাপনকারী সেই ঋষিগণ তপস্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদের অভীষ্ট স্থানে গমন করলেন।

রাজা উপরিচরের যজ্ঞে একত প্রমুখ মুনি দ্বারা বৃহস্পতিকে শ্বেতদ্বীপ এবং ভগবানের মহিমা জ্ঞাপন

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বৃহৎ, ব্রহ্ম এবং মহৎ—এই তিনটি শব্দ এক অর্থের বাচক। বৃহস্পতির মধ্যে এই তিনটি শব্দের গুণই উপস্থিত ছিল। তাই তাঁকে বৃহস্পতি বলা হত। রাজা উপরিচর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে চিত্রশিখণ্ডী বিরচিত তন্ত্রশাস্ত্র বিধিবৎ অধ্যয়ন করেন এবং পরে পৃথিবীর রাজ্যপালন করতে থাকেন। একবার রাজা মহাঅশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু করেন। সেই যজ্ঞের হোতা হলেন বৃহস্পতি এবং প্রজাপতির তিন পুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত এবং ধনুষ, রৈভ্য, অর্বাবসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা কপিল, আদি কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৈত্তিরি, কণ্ব এবং দেবহোত্র—এই ষোলোজন ঋষি সদস্য হলেন। সেই মহাযজ্ঞে সর্বপ্রকার সামগ্রী একত্রিত করা হয়েছিল। রাজা উপরিচর পবিত্র উদার এবং নিষ্কামভাবে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। জঙ্গলে প্রাপ্ত পদার্থদ্বারাই সেই যজ্ঞে দেবতাদের নৈবেদ্য কল্পনা করা হয়েছিল। সেই সময় পুরাণপুরুষ ভগবান নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে রাজাকে দর্শন দান করেন ; আর কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। ভগবান স্বয়ং অলক্ষ্যে থেকে তাঁর জন্য অর্পিত পুরোভাগ আঘ্রাণ করে গ্রহণ করেন। বৃহস্পতি তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি রাজা উপরিচরকে বলেন—'রাজন্ ! আমি যে নৈবেদ্য নিবেদন করেছি, তা আমার সামনে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়ে দেবতাদের গ্রহণ করা উচিত (এই ভাগ অলক্ষ্যে লুকিয়ে নেওয়া উচিত নয়)।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সকল দেবতাই যখন দর্শন দান করে নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করেন, তখন ভগবান বিষ্ণু তা করেননি কেন ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! বৃহস্পতি যখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন তখন রাজা উপরিচর এবং তাঁর সকল সদস্যগণ তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগল। তারা শান্তভাবে বলল—'ব্রহ্মন্ ! আপনার ক্রোধ করা উচিত নয়। আপনি এই নিবেদন যাঁকে অর্পণ করেছেন, সেই ভগবান কখনো ক্রোধ করেন না, তাঁকে আমরা কেউই ইচ্ছামতো দেখতে পাই না। তিনি যাকে কৃপা করেন, একমাত্র সেই তাঁর দর্শন লাভ করতে পারে।' এরপর একত, দ্বিত, ত্রিত ও চিত্রশিখণ্ডী নামধারী ঋষিগণ বললেন—"বৃহস্পতে ! আমাদের ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়। একবার আমরা কল্যাণ কামনায় সকলে উত্তর দিকে যাত্রা করেছিলাম, সেখানে মেরুর উত্তরে ক্ষীরসাগরের তীরে একটি পবিত্র স্থান আছে। সেইখানে আমরা সহস্র বৎসর ধরে এক পায়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে কঠোর তপস্যা করেছি। আমাদের একমাত্র সংকল্প ছিল যে 'আমরা যেন সাধনা করে সনাতন দেবতা ভগবান নারায়ণের দর্শন লাভ করি।' যখন আমাদের ব্রত এবং অবভৃত স্নান সমাপন হল, সেইসময় অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে আকাশবাণী শোনা গেল—'বিপ্রবরগণ ! তোমরা প্রসন্ন চিত্তে নিষ্ঠাভরে তপস্যা করেছ, তোমরা ভগবানের ভক্ত এবং জানতে চাও যে কীভাবে সর্বব্যাপক পরমাত্মার দর্শন লাভ করা যায়। তার উপায় শোনো—ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরভাগে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি শ্বেতদ্বীপ আছে। সেই স্থানে ভগবান নারায়ণের ভজনকারী

ব্যক্তিরা থাকে, তারা চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান, স্থূল ইন্দ্রিয়বর্জিত, নিরাহারী এবং নিশ্চেষ্ট হয়, তাদের দেহ থেকে সুগন্ধ নির্গত হয় এবং তারা ভগবানের অনন্য ভক্ত। তোমরা সেই শ্বেতদ্বীপে যাও, ভগবান সেখানে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দান করেন।'

সেই আকাশবাণী শুনে আমরা তাঁর বর্ণিত পথে শ্বেতনামক মহাদ্বীপে পৌঁছলাম। সেইসময় আমাদের হৃদয় ভগবানেই নিবিষ্ট ছিল, আমরা তাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করতেই আমাদের দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হল, সেখানকার নিবাসীদের সম্মুখে আমাদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেল, তাই আমরা কাউকেই দেখতে সক্ষম হইনি। তারপরে দৈবাৎ আমাদের হৃদয়ে এই চিন্তার স্ফুরণ হল যে 'তপস্যা ব্যতীত আমরা এখানে ভগবানকে সহজে দেখতে পাব না', এই চিন্তা আসতেই আমরা পুনরায় একশত বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলাম। সেই তপস্যা পূর্ণ হতে আমরা সেখানে বসবাসকারী পুরুষদের দর্শন পেলাম। তারা চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং সর্বশুভলক্ষণসম্পন্ন ছিল। তারা প্রত্যহ ঈশান কোণের দিকে মুখ করে করজোড়ে ব্রহ্মার মানস-মন্ত্র জপ করত। তাদের এই একাগ্রতায় ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। প্রলয়কালে সূর্যের যেমন প্রভা হয়, সেই দ্বীপবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির সেইরূপ প্রভা ছিল। তখন আমাদের মনে হচ্ছিল যে এই দ্বীপ তেজেরই নিবাস স্থল। সেখানে কেউ ছোট বা বড় ছিল না, সকলেই সমান তেজস্বী। কিছুক্ষণ পরে আমাদের সামনে একসঙ্গে যেন হাজার হাজার প্রভা প্রকাশিত হল। আমরা দেখলাম সেখানকার সমস্ত মানুষ একসঙ্গে প্রসন্ন হয়ে হাত জোড় করে 'নমো নমঃ' বলতে বলতে দ্রুত সেই প্রভার দিকে যাচ্ছে। তারপর তাদের স্তুতি পাঠের তুমুল ধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হল। সকলেই সেই তেজস্বী পুরুষকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করছিল। সেই তেজের সামনে আমাদের চক্ষু ও ইন্দ্রিয়াদি কাজ করছিল না, তাই আমরা স্পষ্টভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু স্তুতিপাঠের উচ্চ ধ্বনি কানে আসছিল। সকলে বলছিল—'পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার জয় হোক। বিশ্বভাবন! আপনাকে প্রণাম! মহাপুরুষদেরও পূর্বপুরুষ হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার।'

তখন পবিত্র ও সুগন্ধ বায়ু বহু দিব্যপুষ্প এবং ওষধি নিয়ে এল, তার দ্বারা সেখানকার অনন্য ভক্তগণ অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সেই তেজস্বী পুরুষের পূজা করলেন। তাঁদের কথায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে ভগবান অবশ্যই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হইনি। সেই সময় কোনো বিদেহী দেবতা আমাদের বললেন—'মুনিবরগণ! তোমরা শ্বেতদ্বীপবাসী ইন্দ্রিয়-রহিত পুরুষদের দর্শন করেছ। এদের দর্শন করা ভগবৎ-দর্শনেরই সমান। এবারে তোমরা তোমাদের স্থানে ফিরে যাও, বিলম্ব কোরো না। ভগবানে অনন্য ভক্তি না হলে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব। বহুদিন ধরে তাঁকে ভক্তি করতে করতে যখন সম্পূর্ণভাবে অনন্যতা উপস্থিত হয় তখন তাঁর দর্শন ইচ্ছামতো পাওয়া সম্ভব হয়। এখন তোমাদের এক বিশাল কাজ করতে হবে। এই সত্যযুগ সমাপ্ত হলে বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রেতাযুগ যখন আরম্ভ হবে, সেই সময় দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য তোমরা তাঁদের সাহায্য করবে।' এই অমৃতসম মধুর কথা শুনে আমরা ভগবৎ-কৃপায় নিজ অভীষ্ট স্থানে এসে পৌঁছলাম। বৃহস্পতে! আমরা এইভাবে অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করেছিলাম, হব্য-কব্য দ্বারা পূজা করেও আমরা ভগবানের দর্শন লাভে সমর্থ হইনি। তাহলে তুমি কী করে নিজেকে তাঁর দর্শনের অধিকারী বলে মনে করো? ভগবান নারায়ণ মহান দেবতা, একমাত্র তিনিই হব্য-কব্যের ভোক্তা এবং জগৎ-সৃষ্টিকারী, তিনি অনাদি, অনন্ত; সেই অব্যক্ত পরমেশ্বরকে দেবতা এবং দানবও পূজা করেন।''

একত, দ্বিত, ত্রিত প্রমুখ সদস্য এইভাবে বোঝানোতে উদার বুদ্ধিসম্পন্ন বৃহস্পতি সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করে ভগবানের পূজা করলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে রাজা উপরিচরও আগের মতো প্রজাপালন করতে লাগলেন।

—c—

বহু নামের দ্বারা দেবর্ষি নারদ-কৃত ভগবানের স্তুতি

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! আমি শ্বেতদ্বীপ নিবাসী ব্যক্তিদের অবস্থিতির বর্ণনা করলাম, এবার দেবর্ষি নারদ যেভাবে শ্বেতদ্বীপে গিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। সেই মহাদ্বীপে পৌঁছে দেবর্ষি নারদ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন সেখানকার ব্যক্তিদের দেখে মাথা নত করে প্রণাম করে মনে মনে পূজা করলেন। শ্বেতদ্বীপবাসী পুরুষেরাও নারদকে স্বাগত-সৎকার করলেন। তারপর তিনি ভগবানের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাঁর নাম জপ করতে লাগলেন এবং কঠোর নিয়ম পালন করে সেখানে বাস করতে থাকলেন। নারদ তাঁর দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলে একাগ্র চিত্তে নির্গুণ-সগুণরূপ বিশ্বাত্মা, ভগবান নারায়ণের স্তুতি করতে লাগলেন—'দেবদেবেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ এবং জগতের সাক্ষীস্বরূপ। ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষোত্তম (ক্ষর-অক্ষর পুরুষ থেকে উত্তম), অনন্ত, পুরুষ, মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম (পরমাত্মা), ত্রিগুণ, প্রধান, অমৃত, অমৃতাখ্য, অনন্তাখ্য, ব্যোম, সনাতন, সদসদ্ব্যক্তাব্যক্ত, ঋতধামা, আদিদেব, বসুপ্রদ, প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, বনস্পতি, মহাপ্রজাপতি, ঊর্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি, মরুৎপতি, সলিলপতি, পৃথিবীপতি, দিক্‌পতি, পূর্বনিবাস (মহাপ্রলয়ের সময় জগতের আধারভূত), গুহ্য, ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, মহারাজিক, চাতুর্মহারাজিক, ভাসুর (প্রকাশমান), মহাভাসুর, সপ্তমহাভাগ, যাম্য, মহাযাম্য, সংজ্ঞাসংজ্ঞ, তুষিত, মহাতুষিত, প্রমর্দন (মৃত্যুরূপ), পরিনির্মিত, অপরিনির্মিত, অপরিমিত (অনন্ত), বশবর্তী, অবশবর্তী, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, যজ্ঞসম্ভব, যজ্ঞযোনি, যজ্ঞগর্ভ, যজ্ঞহৃদয়, যজ্ঞস্তুতি, যজ্ঞভাগহর, পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞকালকর্তৃপতি (অহোরাত্র, মাস, ঋতু, অয়ন এবং সংবৎসররূপ কালের স্বামী), পাঞ্চরাত্রিক, বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত, মানসিক, নামনামিক (সম্পূর্ণ নামের নামী), পরস্বামী (পরমেশ্বর), সুস্নাত, হংস, পরমহংস, মহাহংস, পরমযাজ্ঞিক, সাংখ্যযোগ, সাংখ্যমূর্তি, অমৃতেশয়, হিরণ্যেশয়, দেবেশয়, কুশেশয়, ব্রহ্মেশয়, পদ্মেশয়, বিশ্বেশ্বর এবং বিষ্বক্সেন প্রভৃতি আপনারই নাম। আপনি জগদন্বয় (জগতে ওতপ্রোত) এবং জগতের প্রকৃতি। অগ্নি আপনার মুখ, আপনি বড়বানল, আহুতি, সারথি, বষট্‌কার, ওঁ-কার, তপ, মন, চন্দ্র, নেত্র, আজ্য (ঘৃত), সূর্য, দিগগজ, দিগ্‌ভানু (দিক্ প্রকাশকারী), বিদিগ্‌ভানু (কোণ প্রকাশকারী) এবং হয়গ্রীব। আপনি প্রথম ত্রিসৌপর্ণমন্ত্র, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ধারণকারী এবং পঞ্চাগ্নিরূপ। নাচিকেত নামে প্রসিদ্ধ ত্রিবিধ অগ্নিও আপনি। আপনি শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ নামক ছয় অঙ্গের ভাণ্ডার। প্রাগ্‌জ্যোতিষ, জ্যেষ্ঠসামগ, সাত্ত্বিক-ব্রতধারী, অথর্বশিরা, পঞ্চমহাকল্প, ফেনপাচার্য, বালখিল্য, বৈখানস, অভগ্নযোগ (পূর্ণযোগ), অভগ্নপরিসংখ্যান (পূর্ণ বিচার), যুগাদি, যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল (ইন্দ্র), প্রাচীনগর্ভ, কৌশিক, পুরুষ্টুত, পুরুহূত, বিশ্বকৃত (বিশ্বকর্মা), বিশ্বরূপ, অনন্তগতি, অনন্তভোগ, অনন্ত, অনাদি, অমধ্য, অব্যক্তমধ্য, অব্যক্তনিধন, ব্রতাবাস (ব্রতের আশ্রয়), সমুদ্রবাসী, যশোবাস (যশের নিবাস), তপোবাস (তপের অধিষ্ঠান), দমাবাস (সংযমের আধার), লক্ষ্মীনিবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্যাবাস, শ্রীবাস, সর্বাবাস (সকলের নিবাস স্থান), বাসুদেব, সর্বচ্ছন্দক (সকলের ইচ্ছাপূরণকারী) হরিহয়, হরিমেধ (যজ্ঞ), মহাযজ্ঞভাগহর, বরপ্রদ, সুখপ্রদ, ধনপ্রদ, হরিমেধ (ভগবদ্‌ভক্ত) যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র, সর্বকৃচ্ছ্র, নিয়মধর, নিবৃত্তভ্রম (ভ্রমরহিত), প্রবচনগত (ব্যাখ্যাপরায়ণ), পৃশ্নিগর্ভ-প্রবৃত, প্রবৃত্তবেদক্রিয় (বৈদিক কর্মাদির প্রবর্তক), অজ, সর্বগতি, সর্বদর্শী, অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মহাত্মশরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরণ্ময়, বৃহদ্, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্র্য, প্রজাসৃষ্টিকারী, প্রজাঅন্তকারী, মহামায়াধারী, চিত্র শিখণ্ডী, বরদ, পুরোডাশ গ্রহণকারী, গতাধ্বর (সমাপ্তযজ্ঞ), ছিন্নতৃষ্ণ (তৃষ্ণারহিত), ছিন্নসংশয়, সর্বতোবৃত্ত (সর্বব্যাপক), নিবৃত্তরূপ, ব্রাহ্মণরূপ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বমূর্তি, মহামূর্তিবান্ধব, ভক্তবৎসল এবং ব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতি নামে সম্বোধিত পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার! আমি আপনার ভক্ত এবং আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এখানে উপস্থিত হয়েছি। একান্তে দর্শনদানকারী পরমাত্মা, আপনাকে বারংবার প্রণাম জানাই।

শ্বেতদ্বীপে দেবর্ষি নারদের ভগবৎ-দর্শন লাভ এবং ভগবান-কর্তৃক তাঁর ভবিষ্যৎ অবতারসমূহের কার্যের পূর্বাভাস প্রদান

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! নারদ এইভাবে গুহ্য ও সত্য নামে যখন ভগবানের স্তুতি করলেন, তখন ভগবান বিশ্বরূপ ধারণ করে তাঁকে দর্শন দিলেন। তাঁর বিগ্রহের কিছু

অংশ চন্দ্রের থেকেও নির্মল আর অবশিষ্টাংশ চন্দ্রের থেকেও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কোনো অঙ্গ অগ্নির মতো দেদীপ্যমান আর কোনো অংশ নক্ষত্রের ন্যায় জাজ্বল্যমান। শরীরের কোনো অংশে ময়ূরপুচ্ছের বর্ণচ্ছটা, কোনো অংশ স্ফটিকের মতো, কোনো অংশ কাজল কালো, কোনো স্থান সুবর্ণময় আবার কোনো স্থান শ্বেতবর্ণের। কিছু ভাগ শ্বেতবৈদূর্যের ন্যায়, কিছু নীল বৈদূর্যের মতো, কিছু ইন্দ্রনীলমণির সঙ্গে তুলনীয়, কিছু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আবার কিছুটা মুক্তা মালার মতো। সনাতন ভগবান এইভাবে নিজ দেহে নানা রং ধারণ করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য নেত্র, অগুণতি মস্তক, পা, উদর, হাত। আবার কোথাও কোথাও তাঁর আকৃতি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তিনি একটি মুখ থেকে ওঁ-কার-সহ গায়ত্রীমন্ত্র জপ এবং অন্য মুখগুলিতে চার বেদ এবং আরণ্যকের গান করছিলেন। তিনি বেদ, কমণ্ডলু, উজ্জ্বলমণি, কুশ, মৃগচর্ম, দণ্ড, লেলিহান আগুন হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর পদদ্বয়ে চরণ-পাদুকা শোভা পাচ্ছিল। ভগবানের প্রসন্ন রূপ দেখা যাচ্ছিল। তাঁর দর্শন লাভ করে নারদ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করলেন। দেবতাদের আদিকারণ অবিনাশী পরমাত্মা নারদকে বললেন—'দেবর্ষে! মহর্ষি একত, দ্বিত, ত্রিতও আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এখানে এসেছিল, কিন্তু তারা আমার দর্শন পায়নি। প্রকৃতপক্ষে আমার অনন্য ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ আমার দর্শন পায় না। তুমি আমার অনন্য ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই আমার দর্শন লাভ করেছ। বিপ্রবর! ধর্মের ঘরে যিনি অবতার হয়ে জন্মেছেন, সেই নর-নারায়ণও আমারই স্বরূপ; তুমি সর্বদা তাঁদের ভজনা করো। আমি আজ তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমার কোনো বর চাওয়ার থাকলে চেয়ে নাও।'

নারদ বললেন—ভগবন্! আপনার দর্শনলাভেই আমার তপ, যম ও নিয়মের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়েছে। আপনার দর্শন লাভই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বরদান।

ভগবান বললেন—আমাকে কেউই চক্ষুর সাহায্যে দেখতে সক্ষম হয় না। তুমি যে আমাকে দেখতে পাচ্ছ, তা আমারই রচিত মায়ার প্রভাব। আমি সর্বব্যাপক এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা। প্রাণীর দেহ বিনাশ হলেও আমি বিনষ্ট হই না। মুনিবর! যারা আমার একান্ত ভক্ত তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী এবং সিদ্ধ। তারা রজোগুণ ও তমোগুণ মুক্ত হয়ে আমাতেই প্রবেশ করবে। মুনিবর! দেখো, আমার দক্ষিণ অংশে একাদশ রুদ্র এবং বাম অংশে দ্বাদশ আদিত্য বিরাজমান। আমার অগ্রভাগে অষ্ট বসু, পৃষ্ঠভাগে দুই অশ্বিনীকুমার অবস্থিত। দেখো, সম্পূর্ণ প্রজাপতি, সপ্ত ঋষি, বেদ, যজ্ঞ, অমৃত, ওষধি এবং নানাপ্রকার যম-নিয়মও আমার দেহে মূর্তিমান। আট প্রকারের ঐশ্বর্যও এখানে সাকাররূপে প্রকাশমান। শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্তি, পৃথিবী এবং বেদমাতা সরস্বতীদেবীও আমার মধ্যেই বিরাজমান, তাঁদের দর্শন করো। দেখো, নক্ষত্রশ্রেষ্ঠ ধ্রুবকে দেখা যাচ্ছে। মেঘ, সমুদ্র, সরোবর এবং নদীগুলিরও মূর্তি পরিগ্রহরূপে দেখো। চারপ্রকার পিতৃপুরুষ শরীর ধারণ করে দৃশ্যমান রয়েছে, সেই সঙ্গে আমার মধ্যে স্থিত সত্ত্ব গুণাদি অবলোকন করো। আমিই দেবতা এবং পিতৃগণের পিতা এবং হয়গ্রীবরূপ ধারণ করে সমুদ্রের মধ্যে বায়ব্য কোণে বাস করি। সাংখ্যের আচার্য আমাকে বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন

এবং সূর্যমণ্ডলে স্থিত কপিল বলে থাকে। বেদে যে হিরণ্যগর্ভের স্তুতি করা হয়, তা আমিই এবং যোগিগণ যাতে রমণ করেন, সেই যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাও আমিই। এখন আমি ব্যক্তরূপ ধারণ করে আকাশে অবস্থান করছি; হাজার যুগ পার হলে এই জগৎ সংহার করব এবং চরাচরের সমস্ত প্রাণীকে সংহার করে নিজের মধ্যে লীন করে আমি একাকী নিজ বিদ্যাশক্তির সঙ্গে বিহার করব। পরে সৃষ্টির সময় আগত হলে আবার সেই বিদ্যাশক্তির সাহায্যেই জগৎ সৃষ্টি করব এবং কিছুকাল পরে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মধ্যখানে আমি দশরথনন্দন 'রাম' রূপে জন্মগ্রহণ করব। তখন সমস্ত জগতের কণ্টকরূপ পুলস্ত্য কুলনাশক রাক্ষসরাজ রাবণকে তার সহযোগীসহ বিনাশ করব। তারপর দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে কংসবধের উদ্দেশ্যে মথুরায় অবতাররূপে যাব এবং দেবতাদের কণ্টকরূপ বহু দানব বধ করে দ্বারকাপুরীতে বাস করব। সেখানে নিবাসকালে দেবমাতা অদিতির অনিষ্টকারী ভূমিপুত্র নরকাসুর, সুর এবং পীঠ নামক দানব সংহার করব এবং তাদের প্রাগজ্যোতিষপুর নামক নগরের ধনধান্য দ্বারকায় নিয়ে আসব। তারপর বাণাসুরের প্রিয় এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্ববন্দিত দেবতা মহাদেব এবং কার্তিকেয়কে যুদ্ধে পরাস্ত করব এবং সহস্র বাহুসম্বলিত বলিপুত্র বাণাসুরকে পরাজিত করে সৌর বিমানে অবস্থিত শাল্বাদি বীরদের মৃত্যুমুখে প্রেরণ করব। শুধু তাই নয়, মহর্ষি গর্গের তেজে বলীয়ান কালযবনও আমার হাতে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সেই গিরিব্রজে (রাজগৃহীতে) জরাসন্ধ নামে এক ভীষণ শক্তিশালী অসুর রাজা হবে, যে অন্য রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে থাকবে। আমার বুদ্ধিতে সেও বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এইভাবে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপঢৌকন নিয়ে আগত বলবান রাজা মহারাজাদের মধ্যে শিশুপালের মস্তকও ছেদন করব। মহাভারতে সকলকে পরাস্ত করে ভ্রাতাগণসহ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে অধিষ্ঠিত করব। সেইসময় জগতে লোকেরা বলতে থাকবে যে 'শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রূপে নর ও নারায়ণ ঋষি জগৎ কল্যাণের জন্য ক্ষত্রিয়কুল সংহার করছেন।' এইভাবে পৃথিবীর ভার লাঘব করে আমি দ্বারকার সমস্ত যাদবদেরও ভীষণভাবে সংহার করব। নারদ! তোমার ভক্তির জন্যই আমি তোমাকে ভূত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা জানালাম।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! বিশ্বরূপধারী অবিনাশী ভগবান নারায়ণ এই কথাগুলি বলে অন্তর্হিত হলেন। তখন মহাতেজস্বী নারদ ভগবানের মনোবাঞ্ছিত অনুগ্রহ লাভ করে নর-নারায়ণকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে বদরিকাশ্রমে রওনা হলেন। দেবর্ষি নারদই এই কাহিনী বলেছেন, আমি লোকপরম্পরাতে জেনেছি। আমার পিতা আমাকে যা বলেছিলেন, তাই আমি তোমাকে শোনালাম।

সৌতি বললেন—শৌনক! বৈশম্পায়নের কাছ থেকে শোনা এই সম্পূর্ণ কাহিনী তোমাকে শোনালাম। রাজা জনমেজয় এই কাহিনী শুনে বিধিপূর্বক ভগবৎ অর্চনা করলেন। তোমরাও তপস্বী এবং ব্রতপালনকারী, নৈমিষারণ্য বসবাসকারী প্রায় সমস্ত ঋষি বেদবিদ্‌গণের প্রধান। সৌভাগ্যবশত তোমরা সকলেই এই মহাযজ্ঞে একত্রিত হয়েছ, সুতরাং বিধিপূর্বক যজ্ঞ করে সেই সনাতন পরমেশ্বরের পূজা করো।

———o———

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের নিজ নামের ব্যাখ্যা শোনানো

জনমেজয় বললেন—ব্রহ্মন্! আমি প্রজাপতিগণের প্রভু ভগবান শ্রীহরির নাম শ্রবণ করতে চাই। আপনি বর্ণনা করুন যা শ্রবণ করে আমি পবিত্র হতে পারি।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! ভগবান শ্রীহরি অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে নিজ গুণ ও কর্মানুসারে তাঁর নামের যে ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন, তাই তোমাকে শোনাচ্ছি, শোনো—কোনো এক সময় অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ভগবান! আপনি অতীত ও বর্তমানের প্রভু, সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকারী, অবিনাশী, জগতের আশ্রয়, ঈশ্বর এবং অভয়প্রদানকারী। দেবদেব! বেদ এবং পুরাণে মহর্ষিগণ কর্মানুসারে আপনার যেসব গূঢ় নাম বলেছিলেন, আপনার কাছ থেকে তার ব্যাখ্যা শুনতে চাই, দয়া করে বলুন।

ভগবান বললেন—অর্জুন! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, উপনিষদ, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদে মহর্ষিগণ আমার অনেক নাম

বলেছেন, তার মধ্যে কিছু নাম গুণানুসারে এবং কিছু কর্মানুসারে। এখন আমি সেই নামসমূহের ব্যাখ্যা করছি, মন দিয়ে শোনো। যাঁর প্রসাদে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হতে রুদ্র উৎপন্ন হয়েছেন, সেই নির্গুণ-সগুণরূপ বিশ্বাত্মা ভগবান নারায়ণকে নমস্কার। তিনিই সমগ্র চরাচর জগতের উৎপত্তির কারণ। তাঁর থেকেই সৃষ্টি, প্রলয় ইত্যাদি সমস্ত বিকারের উৎপত্তি। তিনিই তপ, যজ্ঞ এবং যজমান। পুরাণ-পুরুষ এবং বিরাট-পুরুষও তাঁরই নাম। প্রলয়ের রাত্রি পার হলে সেই অমিত তেজস্বী নারায়ণের কৃপায় এক কমল সৃষ্টি হয় এবং তাঁরই কৃপায় সেই কমল থেকে ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মার দিন শেষ হলে ক্রোধের আবেশে আগত ভগবানের ললাট হতে সংহারকারী রুদ্র উৎপন্ন হন। এইভাবে এই দুই দেবতা-ব্রহ্মা এবং রুদ্র ভগবানের প্রসাদ এবং ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এবং তাঁরই বর্ণিত পথে সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিমিত্তমাত্র। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই নারায়ণের ইচ্ছায় হয়। এদের মধ্যে সংহারকারী রুদ্রের জটাজুটধারী, জটিল, শ্মশানবাসী, কঠিন ব্রত পালনকারী, রুদ্র, যোগী পরম দারুণ, দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশকারী এবং ভগদেবতার চক্ষু ছেদনকারী প্রভৃতি কয়েকটি নাম উল্লিখিত আছে। পাণ্ডুনন্দন ! ভগবান রুদ্রও নারায়ণেরই স্বরূপ। সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরের পূজা করলে ভগবান নারায়ণেরই পূজা করা হয়। আমি সমস্ত জগতের আত্মা, তাই আমি প্রথমে নিজ আত্মারূপ রুদ্রেরই পূজা করি। যদি আমি বরদাতা ভগবান শংকরের পূজা না করি, তাহলে অন্য কেউই সেই আত্মরূপ শংকরকে পূজা করবে না, কেননা সকলে আমার কাজকেই আদর্শ মনে করে তা অনুসরণ করে। যে রুদ্রকে জানে, সে আমাকে জানে, সে আমাকে মানে, যে তাঁকে পূজা করে, সে আমাকেও পূজা করে। রুদ্র এবং নারায়ণের একই সত্তা, যা দুটি স্বরূপ ধারণ করে জগতে বিচরণ করে। রুদ্র ব্যতীত অন্য কেউই আমাকে বরদান করতে সক্ষম নয়, এই কথা ভেবেই আমি পুত্র লাভের জন্য নিজ আত্মারূপ ভগবান রুদ্রের আরাধনা করেছিলাম। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ঋষিও ভগবান নারায়ণের পূজা করেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালে যে সব প্রাণী বাস করে, তাদের সকলেরই প্রধান হলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, তিনি সকলেরই পূজার যোগ্য। অর্জুন ! সকলকে যিনি শরণ দেন তুমি সেই ভগবানকে সর্বদা নমস্কার করো। চার প্রকারের মানুষ আমার ভক্ত হয়ে থাকে ; তা তুমি আগেই শুনেছ। এদের মধ্যে যারা আমার অনন্য ভক্ত, আমাকে ব্যতীত অন্য দেবতার ভজনা করে না, তারাই শ্রেষ্ঠ ; আমিই তাদের পরমগতি। তারা কর্ম করলেও ফলের আশা করে না। বাকী তিন প্রকারের যে ভক্ত, তারা ফল কামনা করে এবং ফলকামনাকারীরা পতিত হয়। কিন্তু ফলকামনা ত্যাগী জ্ঞানী ভক্তগণ সর্বোত্তম ফল লাভ করে। জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মা, শিব অথবা অন্য দেবতাদের সেবা করলেও অন্তকালে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। অর্জুন ! আমি তোমাকে ভক্তদের পার্থক্যের কথা জানালাম। তুমি এবং আমি দুজনে নর-নারায়ণ ঋষি এবং পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য আমরা মনুষ্য দেহ ধারণ করেছি। আমি অধ্যাত্ম যোগ জানি এবং 'আমি কে এবং কোথা থেকে এসেছি' সে সম্পর্কেও আমার জ্ঞান আছে। লৌকিক অভ্যুদয়ের প্রবৃত্তিধর্ম এবং নিঃশ্রেয়স প্রদানকারী নিবৃত্তি ধর্ম আমার অজ্ঞাত নয়। একমাত্র আমিই সমস্ত মানুষের আশ্রয়ভূত সনাতন পরমাত্মা।

নর (পুরুষ) থেকে উৎপন্ন হওয়ায় জলকে নার বলা হয়, সেই নার (জল) প্রথমে আমার অয়ন (নিবাসস্থান) ছিল, তাই আমাকে 'নারায়ণ' বলা হয়। (যা আচ্ছাদন করে অথবা যেটি কারো নিবাসস্থান তাকে বাসু বলা হয়)। আমিই সূর্যের রূপ ধারণ করে নিজ কিরণে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করি এবং আমাতেই সমস্ত প্রাণী নিবাস করে, সেজন্য আমার নাম 'বাসুদেব'। আমি সমস্ত প্রাণীর গতি ও উৎপত্তির স্থান, আমি আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত করে আছি, আমার দেহকান্তি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, সকল প্রাণী অন্তকালে আমাকেই পাবার ইচ্ছা করে, এই সব কারণে লোকে আমাকে 'বিষ্ণু' বলে থাকে। মানুষ 'দম'-এর (সংযমের) দ্বারা সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে আমাকে লাভ করতে চায়, তাই আমাকে 'দামোদর' বলা হয়। অন্ন, বেদ, জল ও অমৃতকে পৃশ্নি বলা হয়, সেগুলি সর্বদা আমার গর্ভে থাকে, অতএব আমার নাম 'পৃশ্নিগর্ভ'। জগৎ তাপিতকারী সূর্য, অগ্নি এবং চন্দ্রের যে কিরণ প্রকাশিত হয়, সেগুলিকে আমার কেশ বলা হয়, সেই কেশ যুক্ত হওয়ায় সর্বজ্ঞ বিদ্বানগণ আমাকে 'কেশব' বলেন। সূর্য ও চন্দ্র আমার চক্ষু এবং তাদের কিরণকে আমার কেশ বলা হয়। এরা উভয়ে জগৎকে শান্তি ও তাপ প্রদান করে হর্ষিত করে তাই একে হৃষী বলা এবং তারাই আমার কেশ হওয়ায় আমাকে 'হৃষীকেশ' বলা হয়। যজ্ঞে 'ইলোপহূতা সহ দিবা' ইত্যাদি

মন্ত্রে আবাহন করলে আমি নিজ ভাগ হরণ (স্বীকার) করি এবং আমার দেহবর্ণও হরিত (শ্যাম), তাই আমাকে 'হরি' বলা হয়। প্রাণীদের সার বা বলের নাম-ধাম এবং ঋতের অর্থ হল সত্য। আমার নাম-ধাম হল ঋত—এই চিন্তা করে ব্রাহ্মণেরা আমাকে 'ঋতধামা' বলেন। (গোবিন্দের অর্থ হল পৃথিবী প্রাপ্তকারী) পূর্বকালে পৃথিবী যখন জলে ডুবে রসাতলে গিয়েছিল, তখন আমি (বরাহ অবতাররূপে) তা প্রাপ্ত করেছিলাম ; তাই দেবতারা 'গোবিন্দ' নামে আমার স্তব করেছিলেন। আমার শিপিবিষ্ট নামের ব্যাখ্যা হল রোমহীন প্রাণীকে শিপি বলা হয়। এটি নিরাকারের উপলক্ষণ এবং বিষ্টের অর্থ ব্যাপক। আমি নিরাকাররূপে জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি, তাই আমাকে 'শিপিবিষ্ট' বলা হয়। সকল প্রাণীর দেহে অবস্থিত আমি আত্মা, আমি কখনো জন্মাইনি এবং পরেও জন্ম নেব না, তাই আমার নাম 'অজ'। আমি কখনো অসৎ বা অশ্লীল কথা বলিনি ; সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুত্রী সরস্বতী আমার বাণী আর সৎ ও অসৎ (সৎ এবং তাৎ) আমারই মধ্যে স্থিত ; তাই আমার নাভিকমলরূপ ব্রহ্মলোকে স্থিত ঋষিগণ আমাকে 'সত্য' বলেন। আমি কখনো 'সত্য' থেকে চ্যুত হই না, আমা হতেই সত্য উৎপন্ন হয়েছে, সত্যের জন্যই আমি পাপরহিত এবং সাত্বত জ্ঞান থেকে (পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণব তন্ত্র থেকে) আমার স্বরূপ বোধ হয়। এই সব কারণে আমাকে 'সাত্বত' বলা হয়। অর্জুন ! ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, সেটিই শান্তিময় পরব্রহ্ম, সেই ধর্ম বা ব্রহ্ম থেকে আমি কখনো চ্যুত হই না ; তাই আমাকে 'অচ্যুত' বলা হয়। (অধঃ শব্দের অর্থ পৃথিবী, অক্ষের অর্থ আকাশ এবং 'জ'-এর অর্থ এগুলি জয় করা বা ধারণ করা) পৃথিবী এবং আকাশ—উভয় ধারণ করার জন্য আমাকে 'অধোক্ষজ' বলা হয়। মহর্ষিগণ অধোক্ষজ শব্দটিকে পৃথক তিনটি পদের সমষ্টি বলে মনে করেন—'অ'-এর অর্থ লয়স্থান, 'ধোক্ষ'-এর অর্থ পালনস্থান এবং 'জ'-এর অর্থ উৎপত্তিস্থান। উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের স্থান একমাত্র নারায়ণ ; সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে 'অধোক্ষজ' বলা যায় না। প্রাণীদের প্রাণের পুষ্টিকারী ঘৃত আমার স্বরূপভূত অগ্নিদেবের অর্চিষ অর্থাৎ জ্বালা বৃদ্ধিকারী ; তাই বেদজ্ঞগণ আমাকে 'ঘৃতার্চি' বলেন। জীব বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন বস্তুর (ধাতু) দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং এগুলি ক্ষীণ হলে বিনষ্ট হয় ; তাই আয়ুর্বেদজ্ঞগণ আমাকে বলেন 'ত্রিধাতু'। আমার স্বরূপভূত ভগবান ধর্ম জগতে বৃষ নামে বিখ্যাত এবং বৈদিক শব্দকোষেও ধর্মরূপে আমাকে বৃষ বলা হয়। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, তাই প্রজাপতি কশ্যপ আমাকে 'বৃষাকপি' বলেন। আমি জগতের সাক্ষী এবং সর্বব্যাপক ঈশ্বর, দেবতা, অসুরগণও আমার আদি-মধ্য-অন্তের খোঁজ পান না, তাই আমি 'অনাদি', 'অমধ্য' এবং 'অনন্ত' নামে পরিচিত। ধনঞ্জয় ! যা শুচি—পবিত্র এবং শ্রবণ যোগ্য, আমি তাই শ্রবণ করি ; তাই আমার নাম 'শুচিশ্রবা'। পূর্বে আমি একশৃঙ্গ বরাহের রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীকে জল থেকে বার করেছিলাম ; তাই আমার নাম 'একশৃঙ্গ'। বরাহ অবতারকালে আমার দেহে তিনটি ককুদ (উচ্চ স্থান) ছিল, তাই আমি 'ত্রিককুদ্' নামে বিখ্যাত। সাংখ্যশাস্ত্র বিচারকারী আচার্যগণ আমাকে আদিত্যমণ্ডলে স্থিত বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন, সনাতন দেবতা কপিল বলেছেন। বেদে যাঁর স্তুতি করা হয় এবং যোগিগণ সর্বদা যাঁর পূজা করেন, সেই তেজস্বী 'হিরণ্যগর্ভ' আমিই। বেদবিদগণ আমাকেই একুশ হাজার শ্লোকযুক্ত 'ঋক্‌বেদ' এবং এক সহস্র শাখাসম্পন্ন 'সামবেদ' বলে থাকেন। আরণ্যকে ব্রাহ্মণেরা আমারই গান করেন। তাঁরা আমার পরম দুর্লভ ভক্ত। একশত এক শাখাযুক্ত যজুর্বেদে আমারই মহিমা গীত হয়েছে। অথর্ববেদবিদগণ আমাকেই আভিচারিক প্রয়োগযুক্ত পঞ্চকল্পাত্মক 'অথর্ববেদ' বলে মানেন। বেদের বিভিন্ন শাখায় যে গান হয়, সেখানে যত স্বর এবং বর্ণ উচ্চারণের রীতি, সব আমারই সৃষ্টি। আমিই বরদাতা হয়গ্রীব। প্রাচীনকালে আমি ধর্মপুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তাই আমাকে 'ধর্মজ' বলা হয়। গন্ধমাদন পর্বতে যাঁরা অখণ্ড তপস্যা করেছিলেন, সেই নর ও নারায়ণ আমারই স্বরূপ।

দেবর্ষি নারদ ও নর-নারায়ণের কথাবার্তা এবং সৌতি কর্তৃক ভগবানের মহিমা বর্ণন

জনমেজয় বললেন—ব্রহ্মন্ ! দধি থেকে যেমন মাখন, মলয় থেকে চন্দন, বেদ থেকে আরণ্যক এবং ঔষধি থেকে অমৃত আহরণ করা হয়, আপনি তেমনভাবে নারায়ণের অমৃতবাণী বর্ণনা করেছেন। সেই ভগবান নারায়ণ সকল প্রাণীর উৎপন্নকারী এবং সকলের ঈশ্বর। নারায়ণের তেজ অদ্ভুত, তাঁর সাক্ষাৎলাভ করা কঠিন। কল্পের অন্তে ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব এবং চরাচরের সমস্ত প্রাণী যাতে লীন হয়, সেই নারায়ণের থেকে উৎকৃষ্ট এবং পবিত্র আর কেউ নেই। নারায়ণের মহিমা শুনলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তা জগতের সমস্ত আশ্রম দর্শন করলে বা তীর্থ স্নান করলেও পাওয়া যায় না। সমস্ত বিশ্বের প্রভু শ্রীহরির উপদেশ সর্বপাপবিনাশকারী, সর্বাগ্রে সেই উপদেশ শুনে আমি সর্বতোভাবে পবিত্র হয়ে গেছি। আমার পূজনীয় পিতামহ অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় মহাভারতে যে বিজয় লাভ করেছিলেন, তা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয় ; কারণ ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুর সহায়তা পেলে জগতে কোনো কিছুই দুর্লভ বলে আমি মনে করি না। আমার পূর্বপুরুষরা সকলেই ধন্য, যাঁদের মঙ্গল ও কল্যাণ করার জন্য সাক্ষাৎ জনার্দন প্রস্তুত ছিলেন। সমস্ত জগৎ যাঁকে পূজা করে, সেই ভগবান নারায়ণকে বহু তপস্যা করলে তবেই দর্শন করা যায়, কিন্তু আমার পিতামহ অনায়াসেই শ্রীবৎস চিহ্ন বিভূষিত ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ তার থেকেও বেশি পূজার পাত্র ; আমি তাঁকে সাধারণ তেজস্বী বলে মনে করি না ; কেননা তিনি শ্বেতদ্বীপে গিয়ে সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। ভগবৎকৃপায় তিনি তাঁর শ্রীবিগ্রহকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিলেন। আমি জানতে চাই যে দেবর্ষি নারদ কী কারণে শ্বেতদ্বীপ থেকে ফিরে নর-নারায়ণ দর্শনের জন্য বদরিকাশ্রমে গেলেন এবং সেখানে তিনি কতদিন দুই ঋষির সেবায় অতিবাহিত করলেন, সেখানে তিনি নর-নারায়ণকে কী প্রশ্ন করেন এবং মহাত্মা নর-নারায়ণ তাঁকে কী উত্তর প্রদান করেন। কৃপা করে সেসব আমাকে বলুন।

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! আমি প্রথমেই অমিত তেজস্বী ভগবান ব্যাসদেবকে নমস্কার জানাই। তাঁর কৃপাতেই আমি নারায়ণের কথা বলার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি। শ্বেতদ্বীপে শ্রীহরিকে দর্শন করে নারদ অত্যন্ত দ্রুত মেরুপর্বতে ফিরে এলেন। ভগবানের আদেশ তিনি দৃঢ় চিত্তে অঙ্গীকার করলেন। মেরু থেকে রওনা হয়ে তিনি গন্ধমাদন পর্বতের কাছে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে বদরিকাশ্রমে গেলেন। সেখানে তিনি প্রাচীন ঋষি নর-নারায়ণকে দর্শন করলেন, তাঁরা মহাব্রত পালনে রত থেকে তপস্যায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁদের সর্বজগতে আলো দানকারী সূর্যের থেকেও তেজস্বী দেখাচ্ছিল। তাঁদের বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন সুশোভিত ছিল, দুজনের মস্তকই জটাসম্বলিত, হাতে হংস এবং চরণে চক্রচিহ্ন বিরাজিত। বিশাল বক্ষ, সুলম্বিত বাহু, মেঘের ন্যায় কণ্ঠস্বর, সুন্দর মুখ, প্রশস্ত ললাট, সুন্দর নাসিকায় তাঁদের অপূর্ব মহিমামণ্ডিত দেখাচ্ছিল। শুভলক্ষণসম্পন্ন এই দুই মহাপুরুষকে দর্শন করে দেবর্ষি নারদ প্রকৃতই প্রসন্ন হলেন। ভগবান নর এবং নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে স্বাগত-সৎকার করে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। নারদ তাঁদের দুজনকে দেখে মনে মনে বললেন—'আমি শ্বেতদ্বীপে যাঁদের দর্শন করেছিলাম, এই দুজনের মূর্তি তাঁদেরই মতো।' এই ভেবে তিনি তাঁদের প্রদক্ষিণ করে একটি সুন্দর কুশাসনে উপবেশন করলেন। ভগবান নারায়ণ তখন নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবর্ষে ! তুমি শ্বেতদ্বীপে গিয়ে আমাদের মূলস্বরূপ সনাতন পরমাত্মাকে দর্শন করেছ কি ?'

নারদ বললেন—ভগবন্ ! বিশ্বরূপধারী সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে আমি দর্শন করেছি। দেবতা এবং ঋষিগণসহ সম্পূর্ণ জগৎ তাঁর মধ্যে বিরাজমান। আপনাদের দুই সনাতন পুরুষকে দেখেছি এবং আমি এখন সেই শ্বেতদ্বীপবাসী ভগবানকেই দর্শন করছি। সেখানে শ্রীহরির মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখেছিলাম, আপনারা দুজনেও সেই একই লক্ষণসম্পন্ন। শুধু তাই নয়, আমি আপনাদের দুজনকেও শ্রীহরির কাছে দেখেছিলাম, তাঁর দ্বারা প্রেরিত হয়েই আমি এখানে এসেছি। আপনারা ছাড়া এই জগতে আর কে আছেন, যিনি তেজ ও শ্রীতে তাঁর সমকক্ষ। তিনি আমাকে ধর্ম-উপদেশ প্রদান করেছেন এবং ভবিষ্যতে অবতার কার্য কেমন হবে, তারও বর্ণনা করেছেন।

শ্বেতদ্বীপে যে পঞ্চেন্দ্রিয় বর্জিত শ্বেতবর্ণের পুরুষেরা আছেন, তাঁরা সকলেই জ্ঞানী ও ভক্ত এবং ব্রাহ্মণ তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁরা বিশ্বপালনকারী, সর্বব্যাপক এবং ভক্তবৎসল। তাঁরাই কর্তা, কারণ এবং কার্য। তাঁদের কান্তি ও বল অনন্ত। তাঁরা হেতু, আদেশ, বিধি, তত্ত্বরূপ এবং মহাযশস্বী। দয়ালু পরমাত্মাই ত্রিলোকে শান্তি বিস্তার করেছেন। যাঁদের বুদ্ধি অনন্যভাবে একমাত্র ভগবানেই সংলগ্ন থাকে, সেই ভক্তগণ দ্বারা অর্পিত প্রত্যেক ক্রিয়াই ভগবান স্বয়ং শিরোধার্য করেন। জগতে অনন্য ভক্ত ব্যতীত তাঁর প্রিয় আর কেউ নেই।

নর-নারায়ণ বললেন—নারদ ! তুমি শ্বেতদ্বীপে সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ করেছ, সুতরাং তুমি ধন্য। প্রকৃতপক্ষে তোমার ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা আছে। সেই প্রভু অব্যক্ত প্রকৃতিরও মূল কারণ ; তাঁকে দর্শন করা প্রকৃত-পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। দেবর্ষে ! আমি সত্যই বলছি, ইহ- জগতে ভগবানের কাছে ভক্তের থেকে প্রিয় আর কেউ নেই। তাই তিনি তোমাকে দর্শন দান করেছেন। এক হাজার সূর্য একত্রিত হলে যত কান্তি হওয়া সম্ভব, সেই স্থানটির কান্তি তাকেও অতিক্রম করে, যে স্থানে ভগবান বিরাজ করেন। বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মারও প্রভু সেই পরমেশ্বর থেকেই ক্ষমার উৎপত্তি, যা পৃথিবীতে পরিলক্ষিত হয়। তিনি সমস্ত প্রাণীর হিতকারী, তাঁর থেকেই রস উৎপন্ন, যা জলের গুণ এবং তার জন্য বহু কিছু জলে দ্রবীভূত হয়। তাঁর থেকেই রূপগুণবিশিষ্ট তেজের প্রকাশ, যার দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় সূর্যদেব জগতে প্রকাশিত হন। সেই পুরুষোত্তম থেকে স্পর্শের উৎপত্তি, যার দ্বারা সংযুক্ত হয়ে বায়ু সমস্ত জগতে প্রবাহিত হয়। এই লোকেশ্বর শব্দেরও উৎপত্তির কারণ, যাঁর সঙ্গে আকাশ নিরন্তর সংযুক্ত এবং যাঁর জন্য আকাশ অনাবৃত থাকে। সমস্ত প্রাণীতে স্থিত মনের উৎপত্তির কারণও তিনিই। সেই মনের দ্বারা সংযুক্ত হয়েই চন্দ্র উদীয়মান হয়। সেই ভগবান বিদ্যাশক্তির সঙ্গে নিজ সত্যধামে বিরাজমান। তপোধন ! আমরা তোমাকে শ্বেতদ্বীপেও দেখেছি। ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তোমার মনে যে সংকল্পের উদয় হয়েছিল তা সবই আমরা অবহিত আছি। এই জগৎ-সংসারে শুভ-অশুভ যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, দেবাদিদেব ভগবান তা সবই তোমাকে জানিয়েছেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত ভগবান নর ও নারায়ণের কথা শুনে নারদ করজোড়ে তাঁদের প্রণাম জানালেন এবং নারায়ণের মন্ত্র নিষ্ঠাভরে জপ করতে করতে এক হাজার দিব্য বৎসর তাঁদের আশ্রমে অতিবাহিত করলেন। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ছিল ভগবানের ধ্যান ও পূজা করা। এইভাবে ভগবানের চরিত গাথা শুনে এবং তাঁকে দর্শন করে এক হাজার বৎসর পূর্ণ হলে দেবর্ষি নারদ বদরিকাশ্রম ছেড়ে হিমালয় পর্বতে নিজ আশ্রমে চলে গেলেন। তারপর বিখ্যাত তপস্বী নর-নারায়ণ পুনরায় তপস্যায় মগ্ন হলেন। জনমেজয় ! তুমি প্রথমেই সেই কথা শুনে পবিত্র হয়েছ। যে ব্যক্তি অবিনাশী ভগবান নারায়ণের প্রতি কায়মনোবাক্যে দ্বেষভাব রাখে, তার ইহলোক বা পরলোক কোথাওই স্থান হয় না। তার পিতৃকুলও সর্বদা নরকে বাস করে। ভগবান বিষ্ণু সকলের আত্মা, তাঁকে কে হিংসা করবে ? রাজন্ ! আমার গুরু গন্ধবতী-নন্দন বেদব্যাস এই শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তাঁর মুখেই আমি এইসব শুনেছি এবং সে-সবই তোমাকে শোনালাম। এবার তুমি তোমার সংকল্প অনুসারে এই মহাযজ্ঞ পূর্ণ করো।

সৌতি বললেন—শৌনক ! বৈশম্পায়নের মুখে এই মহান উপাখ্যান শুনে রাজা জনমেজয় তাঁর যজ্ঞ পূর্ণ করার কাজ শুরু করলেন। তুমি নৈমিষ্যারণ্যবাসী ঋষিদের কাছে, যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে, সেই নারায়ণীয় উপাখ্যান আমি তোমাকে শোনালাম। পরমপূজ্য ঋষি নারায়ণ সমস্ত মানুষ এবং জগতের প্রভু। এই বিশাল পৃথিবী তিনিই ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বৈদিক ধর্ম এবং বিনয় পালনকারী, শম ও দমের নিধি, যম-নিয়মপরায়ণ, দেবতাদের হিত-সাধনকারী, অসুর বিনাশক, তপের ভাণ্ডার, মহাযশ ভাজন, মধুকৈটভ বধকারী, ধার্মিক ব্যক্তিদের সদ্গতি অভয় প্রদানকারী এবং যজ্ঞভাগগ্রহণকারী—তুমি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করো। যিনি সমস্ত জগতের সাক্ষী, অজ, অন্তর্যামী, পুরাণপুরুষ, সূর্যসমতেজস্বী, ঈশ্বর এবং সকলের গতি, তোমরা সকলে সেই পরমেশ্বরকে একাগ্রচিত্তে প্রণাম করো। তিনি এই জগতের আদিকারণ, মোক্ষের আশ্রয়, সূক্ষ্মস্বরূপ, সকলের শরণ প্রদানকারী, অবিচল এবং সনাতন পুরুষ। মন সংযমকারী সাংখ্যযোগী তাঁকেই লাভ করেন।

হয়গ্রীব-অবতার, নারায়ণের মহিমা এবং ভক্তিধর্মের পরম্পরার বর্ণনা

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! আমরা পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য শুনেছি এবং তিনি ধর্মের গৃহে যে নর-নারায়ণরূপে অবতার হয়ে এসেছিলেন, সে কথাও জেনেছি। এখন আমরা জানতে চাই যে জগৎ ধারণকারী ভগবান কেন অদ্ভুত রূপ ও প্রভাবযুক্ত হয়গ্রীব অবতার ধারণ করেছিলেন ? সেই রূপে ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা কোন্ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন ?

সৌতি বললেন—শৌনক ! ভগাবনের হয়গ্রীব অবতারের কাহিনী শুনে রাজা জনমেজয়ও তোমার মতোই আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'বিপ্রবর ! ব্রহ্মা ভগবানকে যে হয়গ্রীবরূপে দর্শন করেছিলেন, তা কীজন্য হয়েছিল, কৃপা করে তা বলুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এই জগতে যত প্রাণী আছে, তারা সকলেই ঈশ্বরের সংকল্প থেকে উৎপন্ন হয়ে পঞ্চমহাভূতের সঙ্গে যুক্ত। বিরাট-স্বরূপ ভগবান নারায়ণ এই জগতের ঈশ্বর এবং স্রষ্টা, তিনিই সকল জীবের অন্তরাত্মা, বরদাতা, সগুণ এবং নির্গুণরূপ। এবার তুমি পঞ্চভূতের আত্যন্তিক প্রলয়ের কথা শোনো। পূর্বকালে যখন এই পৃথিবী একার্ণবের জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন ব্যক্ততে, ব্যক্ত অব্যক্ত প্রকৃতিতে, অব্যক্ত পুরুষে (ব্রহ্মাতে) এবং পুরুষ সর্বব্যাপক পরমাত্মায় লয় হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তখন বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন শ্রীহরি যোগনিদ্রার আশ্রয় নিয়ে কারণরূপ জলে শয়ন করেন। নানা গুণে উৎপন্ন হওয়া অদ্ভুত সৃষ্টির সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তাঁর নিজ মহাগুণ স্মরণ হল, তার দ্বারা অহংকার সৃষ্টি হল। সেই অহংকারই চতুর্মুখসম্পন্ন ব্রহ্মা, যিনি সর্বলোকের পিতামহ এবং হিরণ্যগর্ভ নামে বিখ্যাত। সেই সময় ভগবানের নাভি থেকে কমল উৎপন্ন হয়, তার থেকে কমললোচন ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। অতিতেজস্বী সনাতন দেবতা ব্রহ্মা সহস্রদল কমলের ওপর বিরাজমান হয়ে যখন চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তখন তিনি দেখলেন সমস্ত জগৎ জলে জলময়। ব্রহ্মা তখন সত্ত্বগুণে স্থিত হয়ে প্রাণী সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি যে কমলের ওপর আসীন ছিলেন, তার পাতা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। সেই পাতার ওপর আগে থেকেই জলের দুটি বিন্দু ছিল, সে দুটি রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রতীক। অনাদি-অনন্ত ভগবান অচ্যুত সেই জলবিন্দু দুটির দিকে তাকালেন। তারমধ্যে একটি জলবিন্দুতে ভগবানের দৃষ্টি পড়তেই সেটি তমোময় মধু নামক দৈত্যের আকারে পরিণত হল। সেই দৈত্যের গাত্রবর্ণ মধুর মতো ছিল, দেহকান্তি ছিল অতি সুন্দর। জলের দ্বিতীয় বিন্দু, যা কিছুটা কঠোর ছিল, তা থেকে নারায়ণের আদেশে রজোগুণ-সম্পূর্ণ কৈটভ নামক দৈত্য উৎপন্ন হয়। তমোগুণ এবং রজোগুণ যুক্ত এই দুই দৈত্য মধু ও কৈটভ অত্যন্ত বলবান ছিল। কমলাসনে উপবিষ্ট জগৎ-রচনায় প্রবৃত্ত ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টি পড়তেই তারা দুজনে কমলনালের দিকে ধাবিত হল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা সাকাররূপে চার বেদকে ব্রহ্মার দৃষ্টির সামনেই হরণ করে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের মধ্যে ঈশানকোণে স্থিত রসাতলে প্রবেশ করল।

বেদগুলি অপহৃত হওয়ায় ব্রহ্মা অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন, তিনি মনে মনে পরমাত্মাকে বলতে লাগলেন—'ভগবন্ ! বেদই আমার উত্তম নেত্র, বেদই আমার বল, বেদই আমার আশ্রয় এবং বেদই আমার উপাস্য দেবতা। আমার সেই বেদসমূহ দুই দানব সবলে কেড়ে নিয়েছে। সেগুলি হারিয়ে আমি চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখছি। বেদ বিনা আমি কীভাবে জগৎ-সংসার সৃষ্টি করব ? আমার ওপর এই মহাসংকট এসে পড়েছে, তীব্র শোকে আমার হৃদয় বিদারিত হচ্ছে।' এরূপ বিলাপ করতে করতে তাঁর মনে সহসা চিন্তা এল যে তিনি ভগবান শ্রীহরির স্তব করবেন। এই কথা স্মরণে আসতেই তিনি হাত জোড় করে পরম আরাধ্য পরমাত্মার স্তুতি করতে লাগলেন—'ভগবন্ ! আপনি আমার পূর্বপুরুষ, বেদ আপনার হৃদয়, আপনি জগতের আদি কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সাংখ্যযোগনিধি, সর্বশক্তিমান, আপনাকে নমস্কার। ব্যক্ত জগৎ এবং অব্যক্ত প্রকৃতি উৎপন্নকারী পরমাত্মন্ ! আপনার স্বরূপ অচিন্ত্য। আপনি কল্যাণময় পথে (মোক্ষে) স্থিত। বিশ্বপালক ! আপনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা, অযোনি সম্ভূত, জগতের আধার এবং স্বয়ম্ভু। আমি আপনার কৃপাতেই উৎপন্ন হয়েছি। আপনি কমলনেত্র, আপনার শ্রীবিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময়, আপনিই ঈশ্বর এবং স্ব-ভাব। আপনিই আমার জন্ম দিয়েছেন এবং আপনার কৃপাতেই আমার ওপর কালের জোর চলে না।

আপনি আমাকে বেদরূপ নেত্র প্রদান করেছিলেন, কিন্তু দানবেরা তা কেড়ে নিয়েছে। সেগুলি বিহনে আমি অন্ধপ্রায় ; সুতরাং আপনি কৃপা করে আমাকে তা পুনর্বার ফিরিয়ে দিন ; আমি আপনার প্রিয় ভক্ত এবং আপনি আমার প্রিয়তম প্রভু।'

ব্রহ্মার স্তুতি শুনে সর্বব্যাপক ভগবান নারায়ণ যোগনিদ্রা ত্যাগ করে বেদ উদ্ধার করতে তৎপর হলেন। তিনি নিজ ঐশ্বর্যের সাহায্যে অন্য দেহ ধারণ করলেন, সেই দেহ

চন্দ্রের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন। তাঁর মস্তক ঘোড়ার মস্তকের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং বেদের আশ্রয়স্থল। তাঁর নাসিকা ছিল অত্যন্ত সুন্দর, মস্তক ছিল নক্ষত্র এবং তারা যুক্ত। আকাশ ও পাতাল ছিল তাঁর কান এবং সমস্ত ভূত ধারণকারী পৃথিবী ছিল তাঁর ললাট। গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁর নিতম্ব, মহাসমুদ্র তাঁর ভ্রূ, সূর্য ও চন্দ্র তাঁর নেত্র, সন্ধ্যা নাসিকা, ওঁ-কার সংস্কার, বিদ্যুৎ জিভ, সোমপানকারী পিতৃদেবগণ দাঁত, গোলোক এবং ব্রহ্মলোক তাঁর ওষ্ঠ, কালরাত্রি ছিল তাঁর গ্রীবা। এইরূপ বহু মূর্তিদ্বারা আবৃত হয়গ্রীবের রূপ ধারণ করে সেই জগদীশ্বর সেইখান থেকে অন্তর্হিত হলেন এবং রসাতলে প্রবেশ করে পরম যোগের আশ্রয় নিয়ে শিক্ষার নিয়মানুসারে উদাত্ত স্বরযুক্ত সামবেদ গীত করতে লাগলেন। নাদ এবং স্বরবিশিষ্ট সামগানের সেই মধুর ধ্বনি রসাতলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, সেই ধ্বনি সর্বপ্রাণীর হিতসাধনকারী ছিল। দুই অসুর সেই ধ্বনি শুনে বেদসমূহকে বেঁধে রসাতলের একদিকে ফেলে যেদিক থেকে সেই ধ্বনি আসছিল, সেই দিকে ধাবিত হল। তখন ভগবান হয়গ্রীব সেই স্থানে গিয়ে রসাতলে পড়ে থাকা সমস্ত বেদ হস্তগত করলেন এবং তা এনে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করলেন। তারপর তিনি পূর্বরূপ ধারণ করে আগের মতো শয়ন করলেন।

এদিকে, দানবদ্বয় যেখান থেকে শব্দ শোনা গিয়েছিল, সেইখানে এসে কিছু দেখতে না পেয়ে দ্রুত সেইস্থানে ফিরে এল, যেস্থানে তারা বেদগুলি ফেলে এসেছিল ; কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখল সেইস্থানে কিছুই নেই, সব শূন্য। তখন সেই বলশালী দৈত্য দুজন সবেগে ওপর দিকে উঠে রসাতলের বাইরে এল। ওপরে এসে তারা দেখল জলের ওপর শেষনাগের শয্যায় এক চন্দ্রসম কান্তিমান পুরুষ নিদ্রা যাচ্ছেন। যোগনিদ্রায় শায়িত সেই পুরুষ বিশুদ্ধ সত্ত্বসম্পন্ন ভগবান স্বয়ং। তাঁকে দেখে দানবরাজ মধু ও কৈটভ অট্টহাস্য করে রজোগুণ ও তমোগুণের আবেশে নিজেরা বলতে লাগল—এই যে শ্বেতবর্ণের ব্যক্তি এখানে নিদ্রা যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে সেই রসাতল থেকে বেদ চুরি করে এনেছে। এ কার পুত্র, এখানে সাপের ওপর শুয়ে আছে কেন ?' এইসব বলতে বলতে তারা দুজনে শ্রীহরির নিদ্রা ভঙ্গ করল। তাদের যুদ্ধের জন্য উৎসুক দেখে ভগবান পুরুষোত্তম উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং ভগবান

মধুসূদন ব্রহ্মার মান রক্ষার্থে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রভাবিত দুই দৈত্যকে বধ করলেন। এইভাবে বেদগুলি ফিরিয়ে এনে এবং মধু-কৈটভকে বধ করে তিনি ব্রহ্মার শোক দূর করলেন। তারপর বেদের দ্বারা সম্মানিত এবং ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ব্রহ্মা সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি করলেন। ভগবান তাঁকে লোকরচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে অন্তর্ধান করলেন। এইভাবে শ্রীহরি প্রবৃত্তি ধর্ম প্রচার করার জন্য হয়গ্রীবরূপ ধারণ করেছিলেন। তাঁর এই বরদায়ক রূপ অতি প্রাচীন এবং বিখ্যাত। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ এই অবতারের কথা শোনে বা স্মরণ করে, তার অধ্যয়ন কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। রাজন্! তুমি যা জানতে চেয়েছিলে, সেই হয়গ্রীব অবতারের প্রাচীন কাহিনী আমি তোমাকে শোনালাম। এই উপাখ্যান বেদ অনুমোদিত। পরমাত্মা কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে যে যে শরীর ধারণ করতে চাইতেন, স্বয়ংই তা ধারণ করতেন। তিনি বেদ ও তপস্যার নিধি এবং সাংখ্য, যোগ, ব্রহ্মা ও হবিষ্যস্বরূপ। নারায়ণেই বেদাদি পর্যবসিত হয়, যজ্ঞ নারায়ণেরই স্বরূপ, তপ নারায়ণকেই প্রাপ্ত করায় এবং নারায়ণ প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ গতি (মোক্ষ)। শুধু তাই নয়, ঋত ও সত্যও নারায়ণেরই স্বরূপ, যার পালনে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, সেই নিবৃত্তিপ্রধান ধর্মও নারায়ণকেই লক্ষ্য করায়। প্রবৃত্তিধর্মও নারায়ণেরই স্বরূপ। ভূমির উত্তম গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ এবং আকাশের গুণ শব্দ—এগুলি কোনোটিই নারায়ণের থেকে পৃথক নয়। মন, কাল, নক্ষত্র-মণ্ডল, কীর্তি, শ্রী, লক্ষ্মী, সমস্ত দেবতা, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র—এই সবই নারায়ণের স্বরূপ। পুরুষ, প্রধান, প্রভাব, কর্ম এবং দেবতা এগুলি যে বস্তুর কারণ, তা-ও নারায়ণেরই রূপ। অধিষ্ঠান, কর্তা, বিভিন্ন প্রকারের করণ, নানাপ্রকার প্রচেষ্টা এবং দৈব—এই পাঁচ কারণ রূপে সর্বত্র শ্রীহরিই বিদ্যমান। যেসব ব্যক্তি সর্বব্যাপক হেতুদ্বারা তত্ত্বগুলি জানার আগ্রহ রাখেন, তাঁদের কাছে মহাযোগী নারায়ণই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব। সম্পূর্ণ লোক, ব্রহ্মাদি দেবতা, মহাত্মা ঋষি, সাংখ্য জ্ঞানী, যোগী এবং আত্মজ্ঞানী যতি—এঁদের সকলেরই মনের কথা ভগবান জানেন ; কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের কথা কেউ জানে না। সমস্ত বিশ্বে যারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, দান করে এবং মহা তপস্যা করে, তাদের সকলেরই আশ্রয় ভগবান বিষ্ণু। তিনি নিজ ঐশ্বর্যযোগে স্থিত থাকেন। সমস্ত প্রাণীর আবাস স্থান হওয়ায় তিনি বাসুদেব নামে খ্যাত। এই পরম মহর্ষি নারায়ণ নিত্য, মহাঐশ্বর্যযুক্ত এবং গুণরহিত হলেও গুণহীন কাল যেমন ঋতুর গুণাদিতে যুক্ত হয়, তেমনই তিনিও সময় সময় গুণাদি স্বীকার করে নেন। সেই মহাত্মার গমনাগমন কেউই জানতে পারে না। জ্ঞানী মহর্ষিগণই সেই নিত্য অন্তর্যামী পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন।

জনমেজয় বললেন—ব্রহ্মন্ ! ভগবান অনন্যভাবে ভজনকারী তাঁর সকল ভক্তকে আনন্দ দান করেন এবং তাঁদের বিধিবদ্ধ পূজা স্বীকার করেন—এ অতি আনন্দের কথা। জগতে যাদের বাসনা দগ্ধ হয়েছে এবং যারা পাপ-পুণ্যরহিত হয়েছে, তারা পরম্পরায় যে গতি লাভ করে, সেগুলিও আপনি বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু আমার মনে হয় যে ব্রাহ্মণ উপনিষদসহ সমস্ত বেদ নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধ্যায় করে এবং যে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করে, তাদের থেকেও সে-ই উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, যে ভগবানের অনন্য ভক্ত। ভগবন্! এই ভক্তিরূপ ধর্মের উপদেশ কে দিয়েছিলেন, তিনি কোনো দেবতা, না ঋষি ? একান্ত ভক্তের নিত্যচর্যা কী রূপ ? সেগুলি কবে থেকে প্রচলিত ? আমার এইসব জানার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হচ্ছে। কৃপা করে আমার এই সন্দেহ দূর করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! কৌরব ও পাণ্ডবদের সৈন্যদল যখন যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্র ময়দানে উপস্থিত ছিল এবং অর্জুন যুদ্ধ করতে ইতস্তত করছিলেন, তখন স্বয়ং ভগবান তাঁকে গীতায় এই ধর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সৃষ্টির আদিতে যখন ভগবান নারায়ণের থেকে ব্রহ্মার মানসিক জন্ম হয়, তখন তিনিও অমিত তেজস্বী ব্রহ্মাকে এই ধর্মোপদেশ দিয়ে বলেছিলেন—'তুমি যুগের ধর্ম এবং নিষ্কাম কর্মের বিধান করো।' এই উপদেশ প্রদান করে তিনি অজ্ঞানান্ধকারের অতীত স্বীয় পরম ধামে গমন করেন। তারপর সকলকে বরপ্রদানকারী লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন সর্বোত্তম সত্যযুগের শুরু হয়, তখন ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে এই ধর্মের উপদেশ দেন। দক্ষ তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে যিনি সবিতার (বিবস্বানের) থেকে বড় ছিলেন, এই ধর্মের বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে বিবস্বান এই ধর্ম প্রাপ্ত হন, তারপর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে এবং মনু লোককল্যাণের জন্য নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর ইক্ষ্বাকুর উপদেশে

এই ধর্ম বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। জগতের প্রলয়কালে এই ধর্ম পুনরায় ভগবানে লীন হয়ে যাবে। দেবর্ষি নারদ সাক্ষাৎ জগদীশ্বর নারায়ণের কাছ থেকে এই ধর্ম লাভ করেছেন। এই মহান ধর্ম সর্ব প্রথম এবং সনাতন, এর তত্ত্ব বোঝা এবং এটি ঠিকমতো পালন করা অত্যন্ত কঠিন, তা সত্ত্বেও ভগবানের ভক্ত এটি সর্বদা পালন করে থাকে। এই ধর্ম জেনে ক্রিয়ারূপে ঠিকভাবে পালন করলে এবং অহিংসা ধর্মে স্থিত হলে ভগবান শ্রীহরি প্রসন্ন হন। রাজন্ ! আমি গুরুর প্রসাদে অনন্য ভক্তদের ধর্মের বর্ণনা করলাম। যার হৃদয় শুদ্ধ নয়, তার পক্ষে এই ধর্ম ঠিকমতো বোঝা কঠিন। ভগবানে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন মানুষ প্রায়শ দুর্লভ। যদি এই জগৎ ভগবানের অনন্য ভক্ত, অহিংসক, আত্মজ্ঞানী ও সমস্ত প্রাণীর হিতকারী মানুষে ভরে ওঠে, তাহলে সর্বত্র সত্যযুগ বিরাজ করবে, কোথাও সকাম কর্মের অনুষ্ঠান হবে না। আমার গুরু ভগবান ব্যাস ঋষিদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকে প্রদানকালে স্বয়ং শ্রবণ করে এই উপদেশ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করেছিলেন। ব্যাসদেব প্রাচীন কালে মহাতপস্বী নারদের কাছে এই ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নারায়ণের আরাধনায় ব্যাপৃত অনন্য ভক্ত চন্দ্রের ন্যায় গৌর কান্তিসম্পন্ন পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান অচ্যুতকে প্রাপ্ত হন।

---o---

অতিথির কথায় ধর্মারণ্যের নাগরাজের নিকট গমন এবং সূর্যমণ্ডল থেকে তিনি ফিরে এলে তাঁর কাছে উঞ্ছবৃত্তির মহিমা শ্রবণ

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনার কথিত কল্যাণময় মোক্ষধর্ম আমি শ্রবণ করেছি, এখন আপনি আশ্রমধর্ম পালনকারী মানুষদের পক্ষে যা সর্বোত্তম ধর্ম, তার উপদেশ করুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে আমি তোমাকে এক প্রাচীন কাহিনী বলছি, শোনো। দেবর্ষি নারদ পুরাকালে এই কাহিনী ইন্দ্রকে বলেছিলেন। একবার নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গমন করেন। ইন্দ্র তাঁকে কাছে বসিয়ে পূর্ণ মর্যাদায় আপ্যায়ন করেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর নারদকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবর্ষে ! আপনি এদিকে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছেন কী ? আপনি সিদ্ধপুরুষ, ত্রিলোকে বিচরণ করেন, জগতে এমন কোনো বিষয় নেই যা আপনার অজ্ঞাত। আপনি যদি কিছু দেখে, শুনে তা অনুভব করে থাকেন, তাহলে আমাকে বলুন।'

ইন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করায় নারদ বললেন—গঙ্গার দক্ষিণতীরে মহাপদ্মনামক এক বিশিষ্ট নগর আছে। সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি শান্তভাবে, একাগ্র চিত্তে থাকতেন, তাঁর জন্ম হয়েছিল অত্রিগোত্রে। তিনি বেদ-পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর মনে কোনো প্রকার প্রশ্ন ছিল না। তিনি সর্বদা ধর্মপরায়ণ, ক্রোধরহিত, নিত্য সন্তুষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, তপ ও স্বাধ্যায় নিষ্ঠ, সত্যবাদী এবং সৎপুরুষদের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁর গৃহে ন্যায় পথে অর্জিত ধন থাকত, তাঁর আত্মীয়স্বজনও বিপুল সংখ্যক ছিল। ব্রাহ্মণোচিত শীলযুক্ত এবং উত্তম কর্মদ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। একবার তিনি বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম এবং শিষ্টাচার—এই ত্রিবিধ ধর্ম নিয়ে মনে মনে বিচার করে ভাবলেন 'কী করলে আমার কল্যাণ হবে, কার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ?' এইভাবে প্রত্যহ চিন্তা করলেও তিনি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। একদিন যখন তিনি এই চিন্তায় মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন সেখানে এক পরম ধর্মাত্মা এবং একাগ্র চিত্ত ব্রাহ্মণ অতিথি রূপে এলেন। ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে যথারীতি আপ্যায়ন করলেন। পরে তিনি উপবেশন করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিপ্রবর ! আপনার মধুর বাক্যে আপনার প্রতি আমার আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে, আপনাকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে। আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই। আমি আমার পুত্রকে গৃহস্থ-ধর্ম অর্পণ করে শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ করতে চাই, আমার পক্ষে কোন পথ শ্রেয় হবে দয়া করে বলুন। আমার ইচ্ছা আমি একাকী বাস করে আত্মার আশ্রয় নিয়ে তাতেই অবস্থান করি। আজ পর্যন্ত পুত্ররূপ ফল লাভের আশায় বিষয় ভোগেই দিন কাটিয়েছি। এবার পরলোকের জন্য আধ্যাত্মিক সম্পদ সংগ্রহ করতে চাই। এই সংসার-সমুদ্র থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই, কিন্তু তার জন্য কী পথ অবলম্বন করা উচিত, তা জানি না। যখন

দেখতে ও শুনতে পাই যে, বিষয়ে সম্পর্কিত থাকায় সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করে এবং সমস্ত প্রাণীর ওপরই যমরাজের পরোয়ানা উদ্যত, তাই ভোগ প্রাপ্ত হলেও আমার মনে সেই ভোগের কোনো আগ্রহ নেই, সুতরাং আপনি আমাকে বুদ্ধিপ্রদান করুন যাতে আমি ধর্মের পথে যেতে পারি।

অতিথি বললেন—ব্রাহ্মণদেব ! এই ব্যাপারে আমার বুদ্ধিও কাজ করে না, সুতরাং আমি এই প্রশ্নের নির্ণয় করতে সক্ষম নই। কিছু ব্যক্তি বাণপ্রস্থ ধর্ম পালন করেন, কিছু গার্হস্থ্য ধর্ম আশ্রয় করে থাকেন। কেউ রাজধর্ম, কেউ আত্মজ্ঞান, কেউ গুরুসেবা এবং কেউ বা মৌন ব্রত অবলম্বন করেন। কিছু লোক মাতা-পিতার সেবায়, কিছু অহিংসায়, কিছু ব্যক্তি সত্যভাষণ দ্বারা এবং কিছু মানুষ যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গগমন করে। কিছু লোক উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে স্বর্গে গমন করে। বহু বুদ্ধিমান মানুষ সন্তুষ্ট চিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে বেদোক্ত ব্রত পালন করে এবং স্বাধ্যায় করে স্বর্গলোকে স্থান লাভ করে। জগতে এইরূপ ধর্মের বহু পথ উন্মুক্ত আছে। সেসব দেখে আমারও বুদ্ধি-বিভ্রম হচ্ছে, তবুও আমি তোমাকে পরম্পরাগত উপদেশ প্রদান করব। আমার গুরু এই বিষয়ে যা বলেছেন তা বলছি শোনো—পূর্বকল্পে যেখানে ধর্মচক্র স্থাপন করা হয়েছিল, সেই নৈমিষারণ্যে গোমতী নদী তীরে নাগপুর নামে এক নগর আছে। সেই নগরে পদ্মনাভ নামক এক ধর্মাত্মা নাগ বাস করে। পদ্ম নামে তার প্রসিদ্ধি। সে মন-বাক্য ও কর্মদ্বারা সকল প্রাণীকে প্রসন্ন রাখে এবং জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা—এই তিন পথ আশ্রয় করে চলে। বিষম আচরণকারী পুরুষদের সে সাম, দান, দণ্ড এবং ভেদ-নীতির সাহায্যে সুপথে পরিচালিত করে, সমদর্শীকে রক্ষা করে এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়কে বিচার দ্বারা কুপথে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। তুমি তার কাছে গিয়ে বিধিপূর্বক (শিষ্যভাবে) তোমার অভীষ্ট প্রশ্ন করো। সেই নাগই তোমাকে পরম ধর্মের উপদেশ প্রদান করবে। নাগরাজ সব অতিথির আপ্যায়ন করে, সে শাস্ত্রজ্ঞ এবং তার বুদ্ধি অত্যন্ত তীব্র। সে অনুপম এবং বাঞ্ছনীয় সদ্‌গুণসম্পন্ন ; স্বভাবও জলের মতো স্বচ্ছ। সে সর্বদা স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকে। তপ, ইন্দ্রিয়সংযম এবং সদাচার তার শোভা বৃদ্ধি করে। সে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী, দাতা শিরোমণি, ক্ষমাশীল, সদাচার পালনকারী, সত্যবাদী, দোষদৃষ্টিবর্জিত, শীলবান, জিতেন্দ্রিয়, যজ্ঞশেষ অন্নভোজী, কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞাত, কারো সঙ্গে শত্রুতা করে না, সকল প্রাণীর হিতে ব্যাপৃত, পবিত্র এবং উত্তম কুলে জাত।

ব্রাহ্মণ বললেন—বিপ্রবর ! আমার ওপর এক ভারী বোঝা চেপেছিল, আপনি আজ তা লাঘব করলেন। আপনার কথায় আমি অত্যন্ত সান্ত্বনা লাভ করলাম। পথশ্রমে ক্লান্ত পথিককে শয্যা, তৃষিতকে জল এবং ক্ষুধার্তকে অন্ন দিলে যেমন সন্তোষলাভ হয়, প্রেমিকের দর্শন লাভে যে আনন্দ পাওয়া যায়, আপনার কথা শুনে আজ আমি সেই আনন্দলাভ করলাম। মহাত্মন্ ! আপনি আমাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি সেই অনুসারে কাজ করব। এখন সূর্যাস্ত আগত, আজ রাত্রে আপনি এখানে থেকে বিশ্রাম নিন এবং ক্লান্তি দূর করুন, প্রভাত হলে রওনা হবেন।

তখন অতিথি সেই ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর গৃহে রাত্রে বিশ্রাম করলেন। সমস্ত রাত তাঁরা দুজনে মোক্ষ-ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে কাটালেন। প্রভাত হলে সেই অতিথি ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্মানিত হয়ে রওনা হলেন। ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ তাঁর পরিজনের অনুমতি নিয়ে অতিথি নির্দেশিত নাগরাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে এক মুনির আশ্রমে গিয়ে নাগরাজের খোঁজ করলেন। মুনি তাঁকে পথের নির্দেশ দিলে তিনি সেই নির্দেশ অনুসারে নাগরাজের স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। নাগরাজের দ্বারে গিয়ে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলে নাগরাজের পতিব্রতা ধর্মজ্ঞ পত্নী সেইখানে এসে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণকে পূজা করে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন—'ব্রাহ্মণদেব ! আদেশ করুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?'

ব্রাহ্মণ বললেন—দেবী ! তুমি মধুর বাক্যে আমাকে স্বাগত জানিয়ে পূজা করেছ, তাতে আমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আমি নাগরাজকে দর্শন করতে চাই। আমার সব থেকে বড় কাজ এবং মনোবাসনা জানালাম, সেইজন্যই আমি তাঁর আশ্রমে এসেছি।

কিন্তু নাগরাজ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি সূর্যের রথ চালাতে গিয়েছিলেন ; ব্রাহ্মণ তখন বললেন—'দেবী ! নাগরাজ ফিরে এলে শান্তভাবে তাঁকে আমার আগমন বার্তা দিও। আমি তাঁর প্রতীক্ষায় গোমতী নদী তীরে অবস্থান করছি।' এই কথা বলে ব্রাহ্মণ গোমতী তীরে গিয়ে অনাহারে তপস্যা করতে লাগলেন। তিনি অনাহারে থাকায় সেখানকার নাগেরা অত্যন্ত দুঃখিত হল। নাগরাজের বন্ধু-

বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র সকলে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাঁকে বারংবার পূজা করে অনুরোধ করতে লাগল—'তপোধন! আজ ছয়দিন আপনি এখানে এসেছেন, কিন্তু আপনি এখনও আমাদের আহার আনতে নির্দেশ দেননি। আমাদের গৃহে আপনি অতিথিরূপে এসেছেন, আমরা আপনার সেবার জন্য উপস্থিত। আপনাকে সেবা করা আমাদের কর্তব্য ; কারণ আমরা গৃহস্থ। ব্রাহ্মণদেব ! আপনি ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আমাদের আনীত ফলমূল, দুধ অথবা অন্ন গ্রহণ করুন। এই বনে বাস করে আপনি আহার ত্যাগ করেছেন, এতে আমাদের ধর্মপালনে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। বালক-বৃদ্ধ আমরা সকলেই এই ব্যাপারে ব্যথিত। কারণ আমাদের কুলে এমন কেউ নেই যে দেবতা, অতিথি ও বন্ধুদের অন্ন না দিয়ে তার আগেই আহার করে নেয়।'

ব্রাহ্মণ বললেন—নাগগণ ! আপনাদের কথায় আমি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেছি। নাগরাজ আসতে আর মাত্র আট দিন বাকি আছে, তখনও যদি তিনি এসে না পৌঁছোন, তাহলে আমি আপনাদের কথা মতো আহার করব। তাঁর আসার জন্য আমি এই ব্রত পালন করছি, আপনারা কৃপা করে এতে বাধা দেবেন না। আমার জন্য কষ্ট পাবেন না, আপনারা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান।

ব্রাহ্মণের কথায় নাগগণ তাদের প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল। তারপর নাগরাজের কাজ শেষ হলে সূর্যদেবের অনুমতি নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে এলেন। নাগরাজের পত্নী তাঁর পা ধোওয়ার জল নিয়ে উপস্থিত হল। নাগরাজ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কল্যাণী ! আমার বলা বিধি অনুসারে তুমি দেবতা-অতিথি পূজায় তৎপর ছিলে তো ? আমি না থাকায় ধর্মে কোনো বিচ্যুতি হয়নি তো ?'

নাগপত্নী বলল—নাগরাজ ! পতির আদেশ পালন করা পত্নীর সব থেকে বড় ধর্ম, একথা আমি ভালোভাবে জানি। আপনি যখন সর্বদা ধর্মে অবস্থান করেন, তাহলে আমি কীকরে সন্মার্গ ত্যাগ করে কুমার্গে যাব ? মহাভাগ ! দেব আরাধনায় কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। অতিথি-সৎকারের জন্যও আমি সর্বদা সতর্ক থাকি, আলস্যকে কাছে আসতে দিই না ; কিন্তু আজ পনেরো দিন ধরে এক ব্রাহ্মণ-দেবতা এখানে পদার্পণ করেছেন, তিনি কোনো কাজের কথা বলছেন না, শুধু আপনাকে দর্শন করতে চান এবং সেইজন্য ব্যগ্র হয়ে কঠোর ব্রত ধারণ করে গোমতী তীরে অবস্থান করছেন। তাঁকে আমি কথা দিয়েছি যে নাগরাজ এলেই তাঁকে তাঁর কাছে প্রেরণ করব, সুতরাং এখন আপনার গোমতী তীরে গিয়ে ব্রাহ্মণ-দেবতাকে দর্শন দান করা উচিত।

নাগ জিজ্ঞাসা করলেন—প্রিয়ে ! ব্রাহ্মণরূপে তুমি কাকে দর্শন করেছ ? তিনি কোনো দেবতা, না মানুষ ? আরে, মানুষের মধ্যে কে আমাকে দেখতে চাইবে, আর যদি দর্শন করার ইচ্ছা হয়ও তবু এইভাবে আদেশ দিয়ে কে ডাকবে ?

নাগপত্নী বলল—স্বামিন্ ! তাঁর সারল্য দেখে মনে হল, তিনি কোনো দেবতা নন। আমার বিশেষভাবে মনে হল তিনি আপনার কোনো বড় ভক্ত। চাতক পাখি যেমন জলের জন্য বর্ষার অপেক্ষা করে, তেমনই এই ব্রাহ্মণও আপনার দর্শনের প্রতীক্ষা করছেন। অতএব আপনি স্বাভাবিক ক্রোধ পরিত্যাগ করে তাঁকে দর্শন প্রদান করুন। তাঁর আশাভঙ্গ করে নিজেকে ভস্ম করবেন না। যে ব্যক্তি আশা নিয়ে আসা শরণাগত জীবের অশ্রুমোচন করে না, সে রাজাই হোক বা রাজপুত্র, তার ভ্রূণ হত্যার পাপ হয়। মৌন থাকলে জ্ঞানরূপ ফল প্রাপ্তি হয়, দান করলে যশবৃদ্ধি হয়, সত্য কথা বললে বাক্যের পটুত্ব এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। ন্যায়পূর্বক ধন উপার্জন করলে উত্তম ফল লাভ হয়। স্বেচ্ছায় সম্পাদিত কোনো কাজে যদি অপরের দ্বেষের কারণ না হয় এবং আত্মার কল্যাণকারী হয়, তবে তা করলে কেউ নরকে পতিত হয় না।

নাগ বললেন—প্রিয়ে ! জাতিদোষের কারণেই আমাকে কখনো কখনো অহংকার ও রোষের শিকার হতে হয় ; কিন্তু আজ তুমি তোমার উপদেশ রূপ অগ্নির দ্বারা আমার সংকল্পজনিত ক্রোধ ভস্ম করে দিয়েছ। আমার দৃষ্টিতে ক্রোধের থেকে বেশি মোহগ্রস্তকারী কোনো দোষ নেই এবং ক্রোধের জন্যই সর্পজাতির বেশি বদনাম। তাই আজ তোমার কথায় তপস্যার শত্রু এবং কল্যাণ ভ্রষ্টকারী এই ক্রোধকে আমি সংযত করছি। তোমার মতো গুণবতী পত্নী লাভ করে আমি আমার সৌভাগ্যকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রিয়ে, আমি তাহলে গোমতী নদীর তীরে, যেখানে ব্রাহ্মণ-দেবতা অবস্থান করছেন, সেখানে যাচ্ছি। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করব যাতে তিনি কৃতার্থ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই বলে নাগরাজ মনে মনে ব্রাহ্মণের কথা চিন্তা করতে করতে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে মধুর স্বরে বললেন—দ্বিজবর ! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার ওপর ক্রুদ্ধ

হবেন না। আমি স্নেহবশত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, বলুন কী প্রয়োজনে আপনি এখানে এসেছেন এবং গোমতী নদীর তীরে একান্তে আপনি কার উপাসনা করছেন ?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমার নাম ধর্মারণ্য, নাগরাজ পদ্মনাভকে দর্শন করার জন্য এখানে এসেছি, তাঁর সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে। তাঁর আত্মীয়দের কাছে শুনেছি যে তিনি এখান থেকে দূরে কোথাও গেছেন। তাই কৃষক যেমন বর্ষার জন্য অপেক্ষা করে আমিও সেইভাবে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছি আর তাঁর কল্যাণের জন্য বেদপারায়ণ করছি।

নাগ বললেন—মহাভাগ ! আপনার আচরণ অত্যন্ত কল্যাণময়। আপনি একজন সৎপুরুষ এবং সজ্জনদের ওপর দয়াশীল ; অন্যের ওপর স্নেহদৃষ্টি রাখেন। আমিই সেই নাগ, যার সঙ্গে আপনি দেখা করতে চান ; আপনি আপনার কী ইচ্ছা বলুন ? আমি আপনার কী কাজ করতে পারি ? আমার পত্নীর কাছে আপনার আগমনের সংবাদ পেয়ে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আপনি আপনার গুণে আমাদের সকলকে আপন করে নিয়েছেন ; আপনি নিজের কল্যাণের কথা না ভেবে আমাদেরই কল্যাণের কথা চিন্তা করছেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—নাগরাজ আমি আপনাকে দর্শনের ইচ্ছায় এখানে এসেছি এবং আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমার মনে এক নতুন প্রশ্নের উদয় হয়েছে, আগে তার উত্তর দিন। তারপর আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করব। আপনি সূর্যের একচক্রসম্পন্ন রথ চালানোর জন্য গিয়েছিলেন, সেখানে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে থাকলে কৃপা করে বলুন।

নাগরাজ বললেন—ব্রহ্মন্ ! ভগবান সূর্য বহু আশ্চর্যের স্থান, যাঁর তেজ পরমাত্মার নিবাসস্থল, যাঁর হতে নানাপ্রকার বীজ উৎপন্ন হয়, যাঁর সহায়তায় সমস্ত চরাচর আবর্তিত এবং যাঁর মণ্ডলে অনাদি-অনন্ত সনাতন পুরুষোত্তম নারায়ণ বিরাজমান তাঁর থেকে বেশি আশ্চর্যের বস্তু আর কী হতে পারে ? কিন্তু এর থেকেও বেশি এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার আমি বলছি, শুনুন—প্রাচীন কালের কথা, দ্বিপ্রহরের সময় ভগবান ভাস্কর জগৎকে তাপিত করছিলেন, সেইসময় সূর্যের ন্যায় আর একজন তেজস্বী পুরুষকে দেখা গেল। তিনি তাঁর তেজে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে যেন আকাশ চিরে সূর্যের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তিনি কাছে এলে সূর্য তাঁর সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে তাঁর দুহাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনিও তাঁর সম্মান রক্ষার্থে ডান হাত বাড়ালেন। তারপর আকাশ ভেদ করে তিনি সূর্যে মিশে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তেজরাশির সঙ্গে একাকার হয়ে সূর্যস্বরূপ হয়ে গেলেন। তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে দুজনের মধ্যে আসল সূর্য কোন জন, যিনি রথে আসীন, না যিনি এখনই পদার্পণ করলেন ? এরূপ প্রশ্ন উদয় হওয়ায় আমরা সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ভাস্কর ! দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় যিনি আকাশ লঙ্ঘন করে এখানে এলেন, তিনি কে ?'

সূর্য বললেন—ইনি উঞ্ছবৃত্তির পালনকারী এক সিদ্ধ মুনি, যিনি দিব্যলোক লাভ করেছেন। ফল, মূল, শুকনো পাতা, জল ও বায়ু—এগুলি তাঁর ভোজন-সামগ্রী ছিল। ইনি সংহিতা মন্ত্রদ্বারা ভগবান শংকরের স্তুতি করেছেন। তিনি সর্বদা মনকে বশে রাখতেন, নিঃসঙ্গ ও নিস্পৃহ ছিলেন। মাটিতে পড়ে থাকা বীজ তুলে তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন ; এবং সমস্ত প্রাণীর হিতে তৎপর থাকতেন। এরূপ লোকের যে উত্তম গতি লাভ হয়, তেমন দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর এবং নাগ—কেউই লাভ করতে সক্ষম নয়।

বিপ্রবর ! সূর্যমণ্ডলে আমি এই আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি। সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষগণ এইরূপ ইচ্ছানুসার উত্তমগতি লাভ করে থাকেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—নাগরাজ ! এটি যে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আমি শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার মনে যে অভিলাষ ছিল, তার অনুকূল কথা বলে আপনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আপনার কল্যাণ হোক, এখন আমি এখান থেকে চলে যাব। আপনি মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করবেন।

নাগ বললেন—দ্বিজবর ! আপনি তো আপনার মনের কথা এখনও বলেননি, তাহলে কোথায় যাচ্ছেন ? যেজন্য এসেছিলেন, তা তো বলুন ? সেই কার্য সিদ্ধ হলে আমার অনুমতি নিয়ে যাবেন। আমার ওপর আপনার অগাধ ভালোবাসা, তাই গাছের নীচে বসে পথিকের মতো শুধু আমাকে দেখে চলে যাওয়া আপনার উচিত নয়। আমার আপনার প্রতি ভক্তি আছে, আপনারও আমার প্রতি, এই অবস্থায় আমার সমস্ত পরিবার আপনারও, তাহলে এখানে থাকতে আপনার সঙ্কোচ কীসের ?

ব্রাহ্মণ বললেন—মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনার কথা ঠিক। আপনিও যা, আমিও তাই, আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি, আপনি এবং সমস্ত প্রাণী পরমাত্মাতে লীন হলে সর্বদা একরূপই প্রাপ্ত হবে। নাগরাজ ! পুণ্য-সংগ্রহের বিষয়ে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল, কিন্তু এখন তা দূরীভূত হয়েছে। এখন আমি উঞ্ছব্রত পালন করে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করব, এই আমার সিদ্ধান্ত। আপনার সাহায্যে আমার কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়েছে ; আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনার কল্যাণ হোক, এবার আমাকে যাবার অনুমতি দিন।

ব্রাহ্মণ এইভাবে নাগরাজের অনুমতি নিয়ে উঞ্ছব্রতের দীক্ষা গ্রহণের জন্য ভৃগুবংশী চ্যবন ঋষির কাছে গেলেন। তিনি দীক্ষা প্রদান করলে ব্রাহ্মণ ধর্মানুকূল ব্রত পালন করতে লাগলেন। উঞ্ছবৃত্তি মহিমাতে সম্বন্ধ রক্ষাকারী এই কাহিনী তিনি মহর্ষি চ্যবনকেও বলেন। মহর্ষি চ্যবন রাজা জনকের রাজসভায় দেবর্ষি নারদকে এই পবিত্র কথা শুনিয়েছিলেন, নারদ ইন্দ্রকে এবং ইন্দ্র ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির ! পরশুরামের সঙ্গে যখন আমার ভয়ংকর যুদ্ধ হয়, তখন বসুগণ আমাকে এই কাহিনী শুনিয়েছিলেন। এখন তুমি আমার কাছে পরমধর্ম সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় আমি এই পবিত্র কাহিনী তোমাকে শোনালাম। তারপর সেই ব্রাহ্মণ অন্য বনে চলে গেলেন। এবং সেখানে উঞ্ছবৃত্তি (মাটিতে পড়ে থাকা আনাজ ও বীজ আহরণ) দ্বারা পরিমিত আহার করে যম-নিয়ম পালন করতে লাগলেন।

শান্তিপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

অনুশাসনপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

যুধিষ্ঠিরকে বোঝানোর জন্য ভীষ্ম-কর্তৃক গৌতমী ব্রাহ্মণী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু এবং কালের সংবাদ বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! আপনি শান্তি লাভ করার বহু সূক্ষ্ম উপায়ের কথা জানিয়েছেন, কিন্তু আমার হৃদয় এখনও শান্ত হয়নি। বাণের আঘাতে ছিন্নভিন্ন এবং গভীর ক্ষতপূর্ণ আপনার এই দেহ দেখে আমি একটুও শান্তি পাচ্ছি না। বারংবার আমার পাপের কথা মনে হচ্ছে। পর্বত নিঃসৃত ঝরনার মতো আপনার শরীর থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে, নিজ চোখে আপনার এই রক্তাক্ত দেহ দেখে আমি বেদনায় মর্মাহত হয়ে যাচ্ছি। আমার জন্যই অন্যান্য রাজারাও তাদের পুত্র-বান্ধব-সহ মৃত্যুবরণ করেছে, এর থেকে দুঃখের কারণ আর কী হতে পারে? আমি আপনার জীবন শেষ করে দিলাম। আপনাকে এই দুঃখময় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমি শান্তি পাচ্ছি না। আপনি যদি আমার মঙ্গল চান তাহলে এমন কিছু উপদেশ প্রদান করুন যাতে পরলোকে এই পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।

ভীষ্ম বললেন—মহাভাগ! তুমি তো পরাধীন (কাল, অদৃষ্ট এবং ঈশ্বরের অধীন), তাহলে নিজেকে এই শুভাশুভ কর্মের অধীন মনে করছ কেন? প্রকৃতপক্ষে আত্মার কর্তৃত্বহীন স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই বিষয়ে জ্ঞানিগণ গৌতমী ব্রাহ্মণী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু এবং কালের কথোপকথন রূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। পূর্বকালে গৌতমী নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনি শান্তি সাধনে রতা ছিলেন। একদিন তিনি দেখলেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে সাপে দংশন করেছে এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তখনই অর্জুনক নামে এক ব্যাধ সেই সাপটিকে ধরে সেখানে নিয়ে এসে দুঃখিত চিত্তে গৌতমীকে বলল—'দেবী! এই নীচ সাপটিই তোমার পুত্রের প্রাণ নাশের কারণ। শীঘ্র বল, কীভাবে আমি একে হত্যা করব? জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেব নাকি দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলব? বালক হত্যাকারী এই সাপের
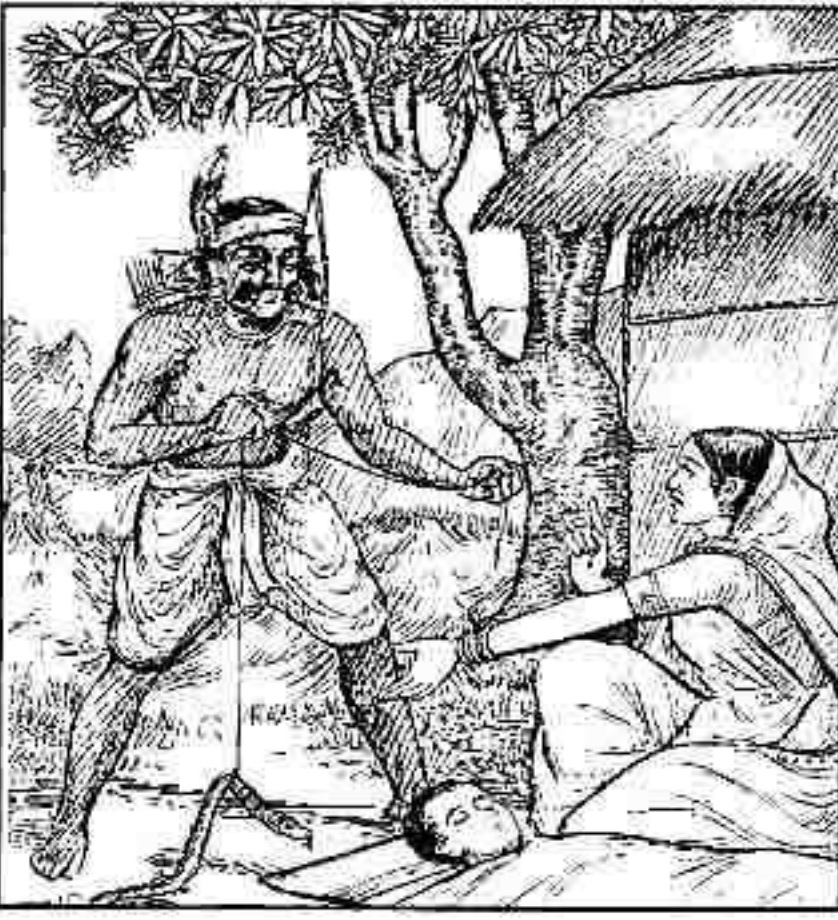
বেশিদিন বেঁচে থাকা উচিত নয়।'

গৌতমী সেই ব্যাধকে বললেন—অর্জুনক ! তুমি এখনও ছেলেমানুষ, একে ছেড়ে দাও। একে বধ করা ঠিক নয়। যা অবশ্যম্ভাবী তা কেউ রোধ করতে পারে না, এই কথা জেনেও ভবিতব্যকে উল্লঙ্ঘন করে কে পাপের ভাগী হবে, একে জীবিত ছেড়ে দিলেও কোনো ক্ষতি হবে না। অতএব একে বধ করে কে নরকে যাবে ?

ব্যাধ বলল—দেবী ! আমি জানি, বয়স্ক ব্যক্তিরা কোনো প্রাণীর কষ্ট দেখলে এইভাবে দুঃখ পায়। কিন্তু উপদেশ তো সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য। আমার মনে বিষাদ ছেয়ে আছে, সুতরাং আমি অবশ্যই এই সাপটিকে মেরে ফেলব। সাপটি মরে গেলে তুমিও পুত্রশোক ত্যাগ করো।

গৌতমী বললেন—আমার মতো মানুষ পুত্রশোকে দুঃখ করে না। সজ্জন ব্যক্তি সর্বদা ধর্মে স্থিত থাকে। এই বালকের মৃত্যু এই ভাবেই হওয়ার ছিল, তাই আমি এই সাপটিকে হত্যার সম্মতি দিতে পারি না। তুমিও দয়া করে এই সাপকে ক্ষমা করে ছেড়ে দাও।

ব্যাধ বলল—মহাভাগে ! শত্রুকে বধ করা উচিত।

গৌতমী বললেন—অর্জুনক ! শত্রুকে বন্দি করে তাকে বধ করে কী লাভ ? তাকে মুক্তি না দিলে কোন্ কামনার সিদ্ধি হবে ? আমি কেন সাপকে ক্ষমা করব না ? এবং কেন আমি মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টা থেকে বঞ্চিত হব ?

ব্যাধ বলল—গৌতমী ! এই একটি সাপ থেকে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করতে হবে (কারণ এই সর্প জীবিত থাকলে বহু মানুষকে দংশন করবে)। একটি জীবকে রক্ষা করে বহু জীবের প্রাণহরণ কখনো উচিত নয়। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা অপরাধীকে পরিত্যাগ করেন ; সুতরাং তুমিও এই পাপী সাপকে বিনাশ করো।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ব্যাধ বারংবার তাঁকে প্রলুব্ধ করলেও মহাভাগা গৌতমী সাপকে মারার কথা চিন্তা করলেন না। তখন বন্ধন-পীড়িত সাপটি ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে মানুষের মতো বলল—'ওরে শিশু অর্জুনক ! এতে আমার কী দোষ ? আমি তো পরাধীন, মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করেছে, তার কথাতেই আমি এই বালককে দংশন করেছি, ক্রোধান্বিত হয়ে বা নিজের ইচ্ছায় নয়। এতে যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, তা আমার নয়, মৃত্যুর।'

ব্যাধ বলল—ওরে সর্প ! তুমি যদিও অন্যের অধীন হয়ে এই পাপ করেছ, তা সত্ত্বেও তুমি তো কারণই, তাই তুমিও অপরাধী। সুতরাং তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত।

সাপ বলল—দণ্ড, চক্র ইত্যাদি মাটির বাসন তৈরির কাজে মাটি কারণ হলেও তা কুমোরের অধীন, তাকে স্বাধীন বলা যায় না, তেমনই আমিও মৃত্যুর অধীন। সুতরাং তুমি আমার ওপর যে দোষারোপ করছ, তা ঠিক নয়।

ব্যাধ বলল—তুমি অপরাধের কারণ বা কর্তা না হলেও বালকটির মৃত্যু তোমার জন্যই হয়েছে, তাই আমি মনে করি তুমি বধযোগ্য। নীচ ! তুমি বালক হত্যাকারী, ক্রূর, বধযোগ্য হয়েও নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য কেন কথা বাড়াচ্ছ ?

সাপ বলল—ব্যাধ ! যজমানের গৃহে যেমন ঋত্বিকগণ অগ্নিতে আহুতি দিলেও ফল পান না, তেমনই এই অপরাধের শাস্তি আমার পাওয়া উচিত নয় ; মৃত্যুই প্রকৃত অপরাধী।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মৃত্যুর প্রেরণায় বালককে দংশনকারী সাপ যখন এইভাবে নিজের দোষ স্খালন করছিল, তখন মৃত্যু এসে সেখানে বলতে আরম্ভ করল—সর্প ! কালের প্রেরণায় আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তাই এই বালকের মৃত্যুর জন্য তুমিও দায়ী নও, আমিও দায়ী নই। বাতাস যেমন মেঘকে এদিকে-ওদিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, আমিও তেমনি কালের বশীভূত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সেগুলি কালের প্রেরণাতেই প্রাণীরা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী এবং স্বর্গলোকে যত

স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ আছে, তা সবই কালের অধীন। সমস্ত জগৎই কালের অনুসরণকারী। জগতে যতপ্রকার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম এবং তার ফল আছে, সে সবই কালের বশীভূত। এই কথা জেনেও তুমি কেন আমাকে দোষ দিচ্ছ ? এই অবস্থায় যদি আমার দোষ হয়ে থাকে, তাহলে তুমিও নির্দোষ নও।

সাপ বলল—মৃত্যু ! আমি তোমাকে দোষী মানি না, নির্দোষও মানি না। আমার কথা হল যে তুমি বালককে দংশন করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছিলে এই ব্যাপারে কালের দোষ আছে কি না, তা নির্ণয় আমি করব না, করার কোনো অধিকারও আমার নেই। উপরন্তু আমার ওপর যে দোষ আরোপ করা হয়েছে, তা যেভাবেই হোক আমাকে নিবারণ করতে হবে। তবে আমি সেটিও চাই না যে আমার পরিবর্তে মৃত্যুই দোষী বলে নির্ধারিত হোক।

তারপর, সর্প অর্জুনককে বলল—তুমি এবার মৃত্যুর কথা শুনেছ তো ? আমি সর্বতোভাবে নির্দোষ, সুতরাং আমাকে বেঁধে আর বৃথা কষ্ট দিও না।

ব্যাধ বলল—সর্প ! আমি তোমার ও মৃত্যুর কথা শুনেছি ; কিন্তু তাতে তুমি যে নির্দোষ, তা প্রমাণিত হয় না। এই বালকের মৃত্যুর জন্য তোমরা উভয়েই সমান দোষী, তাই আমি দুজনকেই অপরাধী বলে মনে করছি, তোমরা কেউই নিরপরাধ নও। সজ্জনদের দুঃখ প্রদানকারী এই ক্রুর এবং দুরাত্মা মৃত্যুকে ধিক্।

মৃত্যু বলল—ব্যাধ ! আমরা দুজনেই কালের অধীন, অবশ হয়ে তার হুকুম পালন করি। তুমি যদি ভালোভাবে চিন্তা কর, তাহলে আমাদের দোষ দেখতে পাবে না। জগতে সব কাজই কালের প্রেরণায় হয়ে থাকে।

তারা সকলে যখন এইসব কথাবার্তা বলছিল সেইসময় কাল সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং সর্প, মৃত্যু এবং ব্যাধকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল—'ব্যাধ ! আমি, মৃত্যু অথবা এই সর্প কেউই অপরাধী নই। আমরা প্রাণীদের মৃত্যুর প্রেরক নই। এই বালক যে কর্ম করেছে, তাতেই সে মৃত্যুবরণ করেছে, বালকের বিনাশের জন্য তার কর্মই দায়ী। কুমোর যেমন মাটির তাল থেকে নানাপ্রকার মূর্তি তৈরি করে, তেমন মানুষ তার কর্মের দ্বারা নানাপ্রকার কর্মফল সৃষ্টি করে এবং ভোগ করে। আলো এবং ছায়া যেমন পরস্পর সম্বন্ধিত তেমনই কর্ম এবং কর্তাও পরস্পর সম্বন্ধিত। এইভাবে বিচার করলে আমি, তুমি, মৃত্যু, সর্প অথবা এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী—কেউই বালকের মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়। শিশু স্বয়ংই মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

কালের কথায় গৌতমী ব্রাহ্মণী নিশ্চিত হলেন যে মানুষ তার কর্মানুসারেই ফল ভোগ করে, তাই তিনি অর্জুনককে বললেন—'ব্যাধ ! সত্যিই এই বালকের মৃত্যুর জন্য কাল, সর্প বা মৃত্যু দায়ী নয়, সে নিজ কর্মফলেই মারা গেছে। তুমি সাপকে ছেড়ে দাও, কাল এবং মৃত্যুও নিজ নিজ স্থানে গমন করুক।'

ভীষ্ম বললেন—তারপর কাল, মৃত্যু এবং সর্প যে যার স্থানে চলে গেল এবং অর্জুনক ও গৌতমীরও শোক দূরীভূত হল। যুধিষ্ঠির ! তুমি এই উপাখ্যান শুনে শান্তি লাভ করো, শোক ত্যাগ কর। সব মানুষই নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন লোকে গমন করে। তুমি বা দুর্যোধন নিমিত্ত মাত্র। এ সবই কালের কাজ, সেই সমস্ত রাজাদের সংহার করেছে।

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীষ্মের এই কথা শুনে মহাতেজস্বী ধর্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দূর হল এবং তিনি পুনরায় ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—০—

অতিথি-সংকারের বিষয়ে সুদর্শনের উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কোনো মানুষ কি গার্হস্থ্য ধর্মের পালন করে মৃত্যু-জয় করেছে ?

ভীষ্ম বললেন—এক গৃহস্থ যেমনভাবে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুকে জয় করেছে সেই বিষয়ে এক প্রাচীন উপাখ্যানের উদাহরণ দেওয়া হয়। প্রজাপতি মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু সূর্যের মতো তেজস্বী ছিলেন, তাঁর একশত পুত্র ছিল। তাঁর দশম পুত্রের নাম ছিল দশাশ্ব, তিনি মাহিষ্মতী নগরীর রাজা ছিলেন। দশাশ্ব অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং সত্যপরাক্রমী ছিলেন। তাঁর পুত্রও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মাত্মা, তিনি পৃথিবীতে মদিরাশ্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মদিরাশ্বের পুত্র দ্যুতিমানও মহাতেজস্বী ছিলেন। তাঁর পুত্র সুবীর ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। সুবীরের পুত্র দুর্জয় এবং দুর্জয়ের পুত্র

দুর্যোধন। দুর্যোধন অশ্বিনীকুমারের ন্যায় কান্তিমান ছিলেন। তাঁকে সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হত। তিনি ছিলেন ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী। যুদ্ধে তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করেননি। ইন্দ্র তাঁর রাজ্যে নিয়মিত বৃষ্টিপাত করাতেন। তাঁর সমস্ত রাজ্য ও নগর নানাপ্রকার রত্ন, পশু এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকত। তাঁর রাষ্ট্রে কোনো দীন, দুঃখী, রোগী অথবা দুর্বল মানুষ ছিল না। রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত উদার, মৃদুভাষী, কারো দোষ না দেখা, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা, কোমলস্বভাব ও পরাক্রমী ছিলেন। নানা সময়ে তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, সত্যভাষণ করতেন, দান করতেন এবং কাউকে অপমান করতেন না। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। দেবনদী নর্মদা একবার সেই পুরুষসিংহে আসক্ত হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। নর্মদার গর্ভে দুর্যোধনের ঔরসে কমলনয়না কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাঁর নাম ছিল সুদর্শনা। তিনি নাম অনুযায়ীই সুদর্শনা ছিলেন। তার আগে পৃথিবীতে সেরূপ সুন্দরী নারী জন্মায়নি। সাক্ষাৎ অগ্নিদেব রাজকুমারী সুদর্শনার ওপর আসক্ত হয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে রাজার কাছে এসে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলেন। রাজা ভগবান অগ্নির কাছ থেকে এই বর প্রার্থনা করলেন—'অগ্নিদেব ! এই নগর রক্ষার জন্য আপনাকে সর্বদা এর নিকটে থাকতে হবে।' অগ্নি 'এবমস্তু' বলে রাজার প্রার্থনা স্বীকার করে নিলেন। তখন থেকে আজ অবধি মাহিষ্মতী নগরীর নিকট অগ্নিদেব উপস্থিত থাকেন। দক্ষিণ দিক বিজয় করার সময় সহদেবও তাঁকে দর্শন করেছিলেন।

রাজা দুর্যোধন তখন বস্ত্রালংকারে বিভূষিত করে অগ্নিদেবের নিকট তাঁর কন্যা সমর্পণ করেন, অগ্নিদেবও বৈদিক বিধি অনুসারে সুদর্শনাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। সুদর্শনার রূপ, স্বভাব, উত্তম কুল, শারীরিক গঠন এবং শোভা দেখে অগ্নিদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। কিছুকাল পরে তাঁর গর্ভে এক পুত্র জন্মায়, তার নাম রাখা হয় সুদর্শন। সুদর্শন রূপে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ছিলেন এবং শিশুবয়সেই তাঁর সনাতন পরব্রহ্মের জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেইসময় রাজা নৃগের পিতামহ ওঘবান পৃথিবীতে রাজত্ব করতেন। তাঁর ওঘবতী নামে দেবকন্যার মতো সুন্দরী এক কন্যা ছিল। তিনি নিজে এসে তাঁর কন্যাকে সুদর্শনের স্ত্রীরূপে প্রদান করেন। সুদর্শন ওঘবতীকে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতে লাগলেন। সুদর্শন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তেজস্বী ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেই তিনি মৃত্যুকে জয় করবেন। একদিন সুদর্শন তাঁর পত্নী ওঘবতীকে বললেন—'কল্যাণী ! তুমি কখনো কোনো অতিথির ইচ্ছার প্রতিকূল কাজ করবে না। অতিথি যেসব বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন, সর্বদা তাঁদের তাই দিতে থাকবে। যদি নিজ শরীরও দান করতে হয়, তাহলেও অতিথিকে বিমুখ করবে না ; কারণ গৃহস্থের পক্ষে অতিথি সেবার থেকে বড় অন্য কোনো ধর্ম নেই। আমার কথা মেনে নিয়ে সর্বদা তা স্মরণে রাখবে।'

তাঁর কথা শুনে ওঘবতী দুই হাত জোড় করে মস্তকে ঠেকিয়ে বললেন—'স্বামীন্ ! আপনার আদেশ হলে এমন কোনো কাজ নেই যা আমি করতে পারি না।' তারপর একদিন অগ্নিপুত্র সুদর্শন যজ্ঞের সমিধ আনয়নের জন্য বাইরে গেলেন, সেই সময় তাঁদের গৃহে একজন ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে এসে ওঘবতীকে বললেন—'সুন্দরী ! তুমি যদি গৃহস্থোচিত ধর্মের সম্মান করো, তাহলে আমায় অতিথি হিসাবে স্বীকার করো।' ব্রাহ্মণের কথা শুনে যশস্বিনী রাজকন্যা বেদোক্ত বিধির দ্বারা তাঁকে পূজা করলেন এবং আসন, পাদ্য, অর্ঘ্যাদি নিবেদন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বিপ্রবর ! আপনার কী বস্তু প্রয়োজন ? আপনার সেবায় কী উৎসর্গ করব ?' ব্রাহ্মণ বললেন—'কল্যাণী ! তোমার সঙ্গই আমার প্রয়োজন, যদি গৃহস্থ-ধর্ম মানো, তাহলে তোমার শরীর দান করে আমার প্রিয় কাজ সম্পন্ন করো।' রাজকন্যা অন্য কোনো অভীষ্ট বস্তু চাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণকে বহু অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি রাজকন্যার সঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই চাইলেন না। তখন ওঘবতীর তাঁর স্বামীর নির্দেশের কথা স্মরণ হল এবং সঙ্কিত চিত্তে তিনি ব্রাহ্মণের কথা মেনে নিলেন। তখন ব্রাহ্মণ হেসে ওঘবতীর সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরই সুদর্শন সমিধ নিয়ে ফিরে এলেন এবং আশ্রমের দ্বারে এসে পত্নীকে ডাকতে লাগলেন। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—'দেবী ! তুমি কোথায় ?' কিন্তু রাজকন্যা কোনো উত্তর দিচ্ছিলেন না। অতিথিরূপী ব্রাহ্মণ তাঁকে স্পর্শ করায়, তিনি নিজেকে অপবিত্র বলে মনে করছিলেন ; তাই লজ্জিত হয়ে চুপ করে ছিলেন, কথা বলছিলেন না। সুদর্শন আবার জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন—'আমার সাধ্বী স্ত্রী কোথায় ? কোথায় গেল ? আমাকে সেবা করার থেকে আর কোন্ বড় কাজ এসে পড়ল ? সদা সরলভাবে থাকা, সত্যবাদী পতিব্রতা পত্নী আজ আগের মতো হাসামুখে আমাকে স্বাগত জানাতে

আসছে না কেন ?'

তাঁর কথা শুনে আশ্রমের ভেতর থেকে ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন—'অগ্নিকুমার ! তোমার বোঝা উচিত যে আমি একজন ব্রাহ্মণ, তোমার গৃহে অতিথি রূপে এসেছি। তোমার স্ত্রী অতিথি-সৎকার করবে বলে কথা দিয়েছে। সেইজন্যই এই সুন্দরী আমার সেবায় ব্রতী হয়েছে ; এখন তোমার যা উচিত মনে হয় তা করো।' সুদর্শন মন, বাক্য, নেত্র এবং ক্রিয়ার দ্বারাও ঈর্ষা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন—বিপ্রবর ! আপনি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আমি এতে খুবই প্রসন্ন ; কারণ গৃহে আগত অতিথির পূজা করা গৃহস্থের সব থেকে বড় ধর্ম। যার গৃহে আগত অতিথি পূজা পেয়ে থাকেন, বলা হয় সেই গৃহস্থের কাছে তার থেকে বড় ধর্ম আর কিছুই নেই। আমার প্রাণ, স্ত্রী এবং আর যা ধন-সম্পদ আছে, সে-সবই অতিথির জন্য, আমি সেই ব্রতই গ্রহণ করেছি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল, দশদিক—এই দশ দেবতা প্রাণীর শরীরে বাস করে সর্বদা তাদের পাপ-পুণ্যের ওপর দৃষ্টি রাখেন।

সুদর্শন এই কথা বলতেই চারদিক থেকে শোনা যেতে লাগল—'তোমার কথা সত্য, এতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।' ব্রাহ্মণ তারপর গৃহ থেকে বাইরে এসে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করে ধর্মাত্মা সুদর্শনকে সম্বোধন করে বললেন—'অগ্নিকুমার ! তোমার কল্যাণ হোক, আমি ধর্ম, তোমার সত্য পরীক্ষার জন্য এখানে এসেছি। তুমি সত্য প্রতিজ্ঞ, একথা জেনে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। যে মৃত্যু সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করে, তুমি তাকে জয় করেছ। তোমার ধৈর্যে পরাজিত হয়ে মৃত্যু তোমার অধীন হয়ে গেছে। নরশ্রেষ্ঠ ! তোমার স্ত্রী অত্যন্ত পতিব্রতা এবং সাধ্বী ; ত্রিলোকের কোনো পুরুষের সাধ্য নেই যে তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। সে নিজ পাতিব্রত্য গুণে এবং তোমার গুণে সর্বদা সুরক্ষিত। কেউই তাকে পরাভব করতে পারবে না। সে যে কথা বলবে, তাই সত্য হবে। নিজ তপোবল যুক্ত এই ব্রহ্মবাদিনী নারী জগৎ পবিত্র করার জন্য নিজ অর্ধ শরীর দ্বারা ওঘবতী নামে শ্রেষ্ঠ নদীতে পরিণত হবে এবং অর্ধেক শরীর দ্বারা তোমার সেবা করবে। তুমিও তার সঙ্গে তোমার তপস্যার প্রাপ্ত সেই সনাতন লোকে গমন করবে, যেখান থেকে আর জগতে ফিরে আসতে হয় না। তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ, সুতরাং তুমি এই দেহেই সেই সনাতন লোকে যাবে। নিজ পরাক্রমে তুমি পঞ্চভূত লঙ্ঘন করে মনের ন্যায় বেগবান হয়ে গেছ। এই গৃহস্থ ধর্ম আচরণ করেই তুমি কাম ও ক্রোধ জয় করেছ এবং এই রাজকুমারীও তোমার সেবা দ্বারা আসক্তি, রাগ, আলস্য, মোক্ষ, দ্রোহ ইত্যাদি দোষ জয় করেছে।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রও সুন্দর রথে করে সুদর্শনকে সাক্ষাৎ করতে এলেন। এইভাবে তিনি (অতিথি-সৎকার দ্বারা) মৃত্যু, আত্মা, লোক, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, কাল, মন, আকাশ, কাম এবং ক্রোধও জয় করেছিলেন। তাই তুমি মনে মনে নিশ্চয় জেনো যে গৃহস্থ পুরুষের কাছে অতিথির থেকে বড় অন্য কোনো দেবতা নেই। অতিথি যদি পূজিত হয়ে মনে মনে গৃহস্থের কল্যাণ চিন্তা করেন তাহলে তাতে যে ফল পাওয়া যায়, একশত যজ্ঞেও তার বেশি হয় না, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই কথা বলে থাকেন। যে গৃহস্থ সুপাত্র এবং সুশীল অতিথি এলে তার আপ্যায়ন করে না, সেই অতিথি গৃহস্থকে নিজ পাপ প্রদান করে গৃহস্থের পুণ্য নিয়ে চলে যায়। পুত্র ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে পূর্বকালে এক গৃহস্থ যেভাবে মৃত্যুর ওপর বিজয় প্রাপ্ত করেছিলেন, সেই উত্তম কাহিনী আমি শোনালাম। যে বিদ্বান ব্যক্তি প্রতিদিন সুদর্শনের এই কাহিনী বলেন, তিনি পুণ্যলোক প্রাপ্ত করেন। (**এটি এক অসাধারণ পুরুষের চরিত্র, সাধারণ মানুষদের এর অনুকরণ করা উচিত নয়।**)

—○—

বিশ্বামিত্রের জন্ম-কাহিনী এবং তাঁর পুত্রদের নাম

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! তিন বর্ণের মানুষদের পক্ষে যদি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা কঠিন, তাহলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও কী করে ব্রাহ্মণ হলেন ? আমি এর সঠিক কাহিনী শুনতে চাই, কৃপা করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! পূর্বকালে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও যেভাবে ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন, সেই ঘটনা সবিস্তারে শোনো। ভরতবংশে আজমীঢ় নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্র মহারাজ জহ্নু, যিনি গঙ্গাকে তাঁর কন্যারূপে স্বীকার করেছিলেন। জহ্নুর পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের পুত্র ছিলেন বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র বল্লভ, তিনি সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্মের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁর ইন্দ্রের ন্যায় এক কান্তিমান পুত্র জন্মায়, তার নাম ছিল কুশিক। কুশিকের পুত্র মহারাজ গাধি। গাধির কোনো পুত্র ছিল না, তাই তিনি সন্তান কামনায় বনে গিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে লাগলেন। সেই যজ্ঞে তিনি এক কন্যা লাভ করেন, যিনি অনুপম সুন্দরী ছিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবনের পুত্র বিখ্যাত তপস্বী ঋচীক রাজার কাছে সেই কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলেন। রাজা গাধি বললেন—'ভৃগুনন্দন ! আপনি আমাকে শুল্করূপে এক হাজার এমন ঘোড়া এনে দিন, যা চাঁদের মতো কান্তিমান এবং বায়ুর মতো বেগবান। সেগুলির একটি কান কৃষ্ণবর্ণের হবে।'

সেকথা শুনে চ্যবনপুত্র ঋচীকমুনি জলদেবতা অদিতি-নন্দন বরুণের কাছে গিয়ে বললেন—'দেবশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার কাছে কৃষ্ণবর্ণের একটি কানসম্পন্ন, চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান এক হাজার ঘোড়া ভিক্ষা চাইছি।' বরুণ বললেন—'ঠিক আছে, আপনি যেখানে চাইবেন, সেখানেই এইরূপ ঘোড়া উপস্থিত হবে।' তখন ঋচীক একটি স্থানে গিয়ে ঘোড়ার কথা চিন্তা করতে লাগলেন, চিন্তা করতেই চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান এক হাজার তেজস্বী ঘোড়া জল থেকে উত্থিত হল। কনৌজের নিকটবর্তী সেই স্থান আজও অশ্বতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ঋচীক তখন সেই ঘোড়াগুলিকে কন্যার শুল্কস্বরূপ রাজা গাধিকে অর্পণ করলেন। রাজা তাই দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং শাপের ভয়ে কন্যাকে বস্ত্রালংকারে সজ্জিত করে ঋচীকমুনিকে সমর্পণ করলেন। ব্রহ্মর্ষি বিধিমতো কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন এবং সত্যবতীও তাঁকে পতিরূপে পেয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সত্যবতীর ব্যবহারে ঋচীকমুনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরদান করতে ইচ্ছুক হন। রাজকন্যা তাঁর
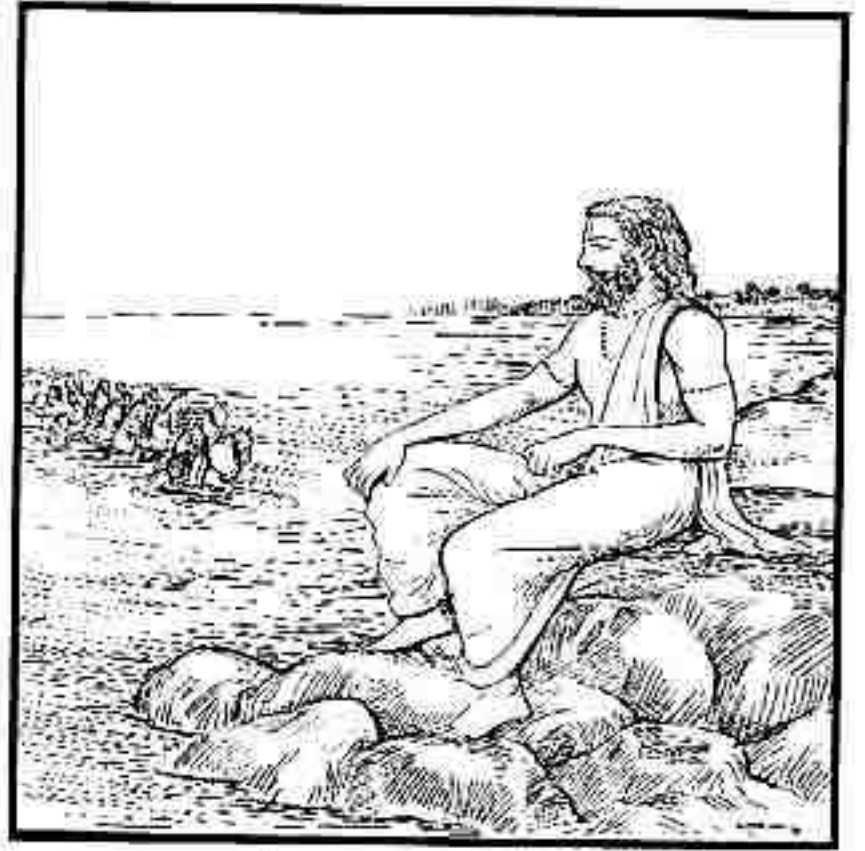
মাতাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। সব শুনে তাঁর মাতা বললেন—পুত্রী ! তোমার পতির আমাকেও কৃপা করা উচিত। তাঁকে বলো, তিনি যেন আমাকেও পুত্র প্রদান করেন ; ঋচীকমুনি মহান তপ করেছেন, তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম। মাতার নির্দেশে সত্যবতী শীঘ্রই পতির কাছে গেলেন এবং মাতার কথা তাঁকে নিবেদন করলেন। তাঁর মাতার অভিপ্রায় জেনে ঋচীক সত্যবতীকে বললেন—'প্রিয়ে ! আমার কৃপায় তোমার মাতা অচিরেই এক গুণবান পুত্র লাভ করবেন, তোমার প্রেমপূর্ণ অনুরোধ নিষ্ফল হবে না, তোমার গর্ভেও এক গুণবান পুত্র জন্মাবে, যাতে আমাদের বংশ পরম্পরা বজায় থাকে। তোমার মাতা তাঁর ঋতুস্নানের পরে যেন অশ্বত্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেন আর তুমি উদুম্বর বৃক্ষকে, তাহলে তোমরা দুজনেই পুত্র লাভ করবে। তোমাদের জন্য আমি দুটি মন্ত্রপূত চরু তৈরি করেছি, এর একটি তুমি খাও, অপরটি মাকে দিও। এরূপ করলে তোমাদের দুজনেরই পুত্র সন্তান জন্মাবে।' তা শুনে সত্যবতী খুবই আনন্দিত হল। সে সবকথা মাকে গিয়ে বলল এবং চরুর কথাও নিবেদন করল। সব শুনে তার মা মেয়েকে বলল—'তোমার স্বামী অভিমন্ত্রিত করে যে চরু তোমায় দিয়েছেন সেটি আমাকে দাও এবং আমারটি তুমি গ্রহণ করো। আলিঙ্গন করার সময় আমরা বৃক্ষও অদল-বদল করে নেব। আমি তোমার মা, যদি আমার কথা মনঃপূত হয় তবে সেরকম করো।

অতঃপর দুই মাতা-পুত্রী তেমনই করলেন এবং

দুজনেরই গর্ভ সঞ্চার হল। মহর্ষি ঋচীক গর্ভবতী সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তাঁকে বললেন—'শুভে ! মনে হচ্ছে তোমরা চরু এবং বৃক্ষ দুটিই বদল করে ব্যবহার করেছ। আমি তোমার চরুতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মতেজ সন্নিবেশিত করেছিলাম আর তোমার মাতার চরুতে সমস্ত ক্ষত্রিয়োচিত শক্তি স্থাপন করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তোমার গর্ভে ত্রিভুবন বিখ্যাত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মগ্রহণ করবে আর তোমার মাতা এক বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তানের জন্ম দেবেন ; কিন্তু তোমাদের বদলা-বদলির জন্য তোমার মাতার গর্ভে ত্রিভুন-বিখ্যাত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মগ্রহণ করবে তুমি এক ঘোর ক্ষত্রিয় পুত্রের জন্ম দেবে। মাতার স্নেহের বশে তুমি ঠিক কাজ করনি।' পতির কথায় সত্যবতী শোক-সন্তপ্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে এলে তিনি স্বামীর পায়ে মাথা রেখে বললেন—'ব্রহ্মর্ষে ! আমি আপনার পত্নী, আপনাকে প্রসন্ন করতে চাই, আমাকে কৃপা করুন। আমার পুত্র যেন ক্ষত্রিয় না হয় বরং আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়োচিত হোক, কিন্তু আমার পুত্র যেন তেমন না হয়, আমাকে সেই বর প্রদান করুন।' মহাতপস্বী তখন তাঁর পত্নীকে বললেন—'ঠিক আছে, তাই হবে।'

কিছুকাল পর সত্যবতী জামদগ্নি নামে এক উত্তম পুত্রের জন্ম দিলেন এবং রাজা গাধির যশস্বিনী পত্নী ঋচীক মুনির কৃপায় ব্রহ্মবাদী বিশ্বামিত্রের জন্ম দিলেন। সেইজন্যই মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং ক্ষত্রিয় হয়েও তিনি ব্রাহ্মণ বংশের পরম্পরা বজায় রাখেন। তাঁর পুত্র অত্যন্ত তেজস্বী, তপস্বী, ব্রহ্মবেত্তা, ব্রাহ্মণ বংশ বৃদ্ধিকারী এবং গোত্রের প্রবর্তক ছিলেন। মধুচ্ছন্দা, দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বভ্রু, কালপথ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূণ, উলূক, যমদূত, সৈন্ধবায়ন, বল্গুজঙ্ঘ, গালব, বজ্র, সালংকায়ন, লীলাঢ্য, নারদ, কূর্চামুক, বাদুলি, মুসল, বক্ষোগ্রীব, আঙ্ঘ্রিক, শিলযূপ, শিত, শুচি, চক্রক, মারুতন্তব্য, বাতঘ্ন, আশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পর, পৌরব, তন্তু, কপিল, তাড়কায়ন, উপগহন, আসুরায়ণ, মার্দমর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জঙ্গারি, বাভ্রবায়ণি, ভূতি, বিভূতি, সুত, সুরকৃত, অরালি, নাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বকনখ, সেয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, চারুমৎস্য, শিরীষী, গার্দভি, উর্জযোনি, উদাপেক্ষী, নারদী—এঁরা সকলেই ছিলেন বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং যদিও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন তা সত্ত্বেও ঋচীক মুনি তাঁর মধ্যে ব্রহ্ম তেজের আধান করেছিলেন। যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে সোম, সূর্য এবং অগ্নির মতো তেজস্বী বিশ্বামিত্রের জন্মের কথা জানালাম।

স্বামীভক্ত ও দয়ালু পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানাতে গিয়ে ইন্দ্র এবং তোতাপাখির কথোপকথনের উল্লেখ

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আমি এখন দয়ালু এবং ভক্ত পুরুষদের গুণের কথা শুনতে চাই, কৃপা করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই ব্যাপারে তোতাপাখির সঙ্গে ইন্দ্রের যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেই প্রাচীন কাশিরাজের কাহিনী বলছি, শোনো—এক ব্যাধ বিষাক্ত বাণ নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে হরিণ খুঁজতে লাগল। এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে কয়েকটি হরিণ দেখতে পেল। তৎক্ষণাৎ সে তাদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল ; কিন্তু লক্ষ্য ভুল হওয়ায় সেই বাণটি এক বিশাল বৃক্ষে গিয়ে বিদ্ধ হল। ফলে তীক্ষ্ণ বিষ সমস্ত বৃক্ষে ছড়িয়ে পড়ল এবং বৃক্ষের ফল ও পাতা ঝরে গেল, গাছটিও শুকিয়ে যেতে লাগল। সেই বৃক্ষের কোটরে এক তোতা পাখি বহুদিন ধরে বাস করত। তার সেই বৃক্ষটির সঙ্গে খুব ভালোবাসা ছিল, তাই বৃক্ষটি শুকিয়ে গেলেও সে গাছটি ছেড়ে কোথাও গেল না। সে

বাইরে যাওয়া বন্ধ করল এবং খাওয়াদাওয়াও ত্যাগ করল। সেই ধর্মাত্মা তোতাপাখি কৃতজ্ঞতাবশত বৃক্ষের সঙ্গেই শুকিয়ে যেতে লাগল। তার উদারতা, ধৈর্য, অলৌকিক চেষ্টা এবং সুখ-দুঃখের সমান বৃত্তি দেখে ইন্দ্র আশ্চর্যান্বিত হলেন। তারপর তিনি ভাবলেন 'এ কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ; কারণ সর্বত্র, সব প্রাণীর মধ্যে সব রকম ব্যাপার দেখা যায়।' তারপর ইন্দ্র পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে এসে পক্ষীকে বললেন—'পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক ! আমি একটি কথা জানতে ইচ্ছা করি, তুমি এই বৃক্ষ ছেড়ে যাচ্ছ না কেন ?' ইন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তোতাপাখি মস্তক নত করে প্রণাম জানিয়ে বলল—'দেবরাজ ! আপনাকে স্বাগত। আমি আমার তপোবলের সাহায্যে আপনাকে চিনেছি।' তার কথা শুনে ইন্দ্র মনে মনে বললেন—'বাহ ! কি অদ্ভুত ব্যাপার ! তারপর বৃক্ষের প্রতি তোতাপাখির ভালোবাসার কারণ জিজ্ঞাসা করে বললেন—'শুক ! এই বৃক্ষতে কোনো পাতাও নেই, ফলও নেই, কোনো পাখিও এখন এতে বাস করে না। এতো বড় জঙ্গল এখানে রয়েছে, তুমি এই শুকনো গাছে কেন রয়েছ ? এখানে তো আরও অনেক গাছ আছে, যাদের কোটর পাতাদ্বারা ঢাকা থাকে, দেখতে সুন্দর-সবুজ এবং খাওয়ার জন্য বহু ফল-ফুলে পূর্ণ। এই বৃক্ষের জীবন শেষ হয়ে গেছে, এর আর ফল-ফুল প্রদানের শক্তি নেই। সুতরাং তুমি বিবেচনা করে এই শুকনো গাছটি ত্যাগ করো।'

ভীষ্ম বললেন—ধর্মাত্মা শুক ইন্দ্রের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীন স্বরে বললেন—'দেবরাজ ! আমি এই বৃক্ষতেই জন্মেছি এবং বহু কিছু শিখেছি। এই বৃক্ষ আমাকে সন্তানের মতো রক্ষা করেছে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছে, তাই এই বৃক্ষের ওপর আমার অগাধ ভক্তি। আমি একে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এর প্রতি আমার দয়াধর্ম পালন করছি। আপনি এই অবস্থায় আমাকে কেন বৃথা পরামর্শ দিচ্ছেন ? অন্যের ওপর দয়া করাই সাধু পুরুষদের সর্বোত্তম ধর্ম বলা হয়। সহস্রাক্ষ ! দেবতাদের যখন ধর্ম বিষয়ে কোনো সন্দেহ হয়, তখন তাঁরা আপনার কাছে তার উত্তর জেনে নেন, তাই আপনাকে দেবতাদের রাজা করা হয়েছে। সুতরাং আপনি আমাকে এই বৃক্ষটি পরিত্যাগ করার কথা বলবেন না ; কারণ এই বৃক্ষ যখন জীবিত ছিল, তখন আমি এর সাহায্যেই জীবন ধারণ করেছি, আর আজ যখন এর শক্তি নেই, তখন একে ত্যাগ করে চলে যাব, তা কী করে সম্ভব।'

তোতার কোমল বাক্য শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি শুকের দয়াভাবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো।' শুক তখন বলল—'এই বৃক্ষ

যেন আগের মতো ফলে-ফুলে ভরে ওঠে।' তার ভক্তি এবং শান্ত-স্বভাব দেখে ইন্দ্র আরও প্রসন্ন হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অমৃত বর্ষণ করে সেই বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করলেন। তখন তাতে নতুন পাতা, শাখা এবং ফল উদ্গম হল। তোতার সুদৃঢ় ভক্তিতে সেই বৃক্ষ পূর্বের মতো শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠল এবং শুকেরও আয়ু শেষ হওয়ায় সে তার কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন সুন্দর ব্যবহারের জন্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হল। রাজন্ ! শুকের সঙ্গ পেয়ে বৃক্ষ যেমন তার হারানো শ্রী ও শক্তি লাভ করেছিল, তেমনই ভক্তিমান পুরুষের সাহায্য লাভ করে মানুষ তার সমস্ত কামনা সিদ্ধ করে নেয়।

——○——

ভাগ্য অপেক্ষা পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠত্ব

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! দৈব (ভাগ্য) এবং পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই ব্যাপারে বশিষ্ঠ এবং ব্রহ্মার কথোপকথনরূপ এক প্রাচীন ঘটনার উদাহরণ দেওয়া হয়। পূর্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! প্রারব্ধ এবং মানুষের প্রচেষ্টার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ?

ব্রহ্মা বললেন—বীজ না হলে কোনো বস্তুই উৎপন্ন হয় না। বীজ থেকেই বীজ উৎপন্ন হয় এবং বীজ থেকে ফল উৎপন্ন হয়। কৃষক জমিতে যেমন বীজ বপন করে, সেই অনুসারে তার ফল উৎপন্ন হয়। তেমনই পাপ বা পুণ্য যেরূপ কাজ করা হয় তেমনই ফল প্রাপ্ত হয়। বীজ বপন না করলে যেমন ফল পাওয়া যায় না, তেমনই প্রারব্ধও পুরুষার্থ বিনা কাজ করে না। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করে সে তার ভালো বা মন্দ কর্মের ফল নিজেই ভোগ করে, জগতে এটি প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শুভ কর্ম করলে সুখ এবং পাপ করলে দুঃখ প্রাপ্তি হয়। পুরুষার্থী মানুষ সর্বত্র সম্মান লাভ করে ; কিন্তু যে নিষ্কর্মা, সে অসহ্য দুঃখভোগ করে। মানুষ তপস্যার দ্বারা রূপ, সৌভাগ্য, নানাপ্রকার রত্ন লাভ করে। এইরূপে কর্ম দ্বারাই সব কিছু পাওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু ভাগ্যের অপেক্ষায় বসে থাকা নিষ্কর্ম ব্যক্তি কিছুই পায় না। জগতে পুরুষার্থ দ্বারা স্বর্গ, ভোগ, প্রতিষ্ঠা ও বিদ্বত্ত্ব—এ সবই উপলব্ধ হয়। নক্ষত্র, নাগ, যক্ষ, চন্দ্র, সূর্য এবং বায়ু প্রভৃতি দেবতা পুরুষার্থ দ্বারাই মনুষ্যলোক থেকে দেবলোকে গমন করেছেন। যে ব্যক্তি চেষ্টা করে না ; সে ধন, মিত্র, ঐশ্বর্য, দুর্লভ লক্ষ্মী কিছুই প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয় না। কৃপণ, নপুংসক, উদ্যোগরহিত, কাজ করতে অনিচ্ছুক এবং শৌর্য ও তপস্যাহীন পুরুষ ধন লাভ করতে পারে না। যে ব্যক্তি চেষ্টা না করে দৈবের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে নপুংসককে পতি স্বীকার করে নেওয়া নারীর মতো বৃথাই দুঃখ বহন করতে হয়। পুরুষার্থপূর্বক চেষ্টা করলে মানুষের দৈব-বিধান অনুসারে ফল লাভ হয় ; কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে দৈব কাউকে কোনো ফল দিতে পারে না। দেবতাগণও নিজ পরাজয়ের আশঙ্কায় প্রায়শ মানুষের পারমার্থিক কাজে ভয়ংকর বিঘ্নপ্রদান করেন, কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের কিছুই নষ্ট করতে পারেন না। পূর্বকালে রাজা যযাতি দৈববশত স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পৌত্রেরা তাঁদের পুণ্য কর্মদ্বারা পুনরায় তাঁকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। তেমনই ইলার পুত্র রাজর্ষি পুরুরবাও ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টায় স্বর্গ প্রাপ্ত হন। যেমন অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ হাওয়ার সংস্পর্শে এসে ভয়াল অগ্নিতে পরিণত হয়। তেমনই দৈবও পুরুষার্থের সহায়তায় বড় হয়ে ওঠে। তেল সমাপ্ত হলে যেমন প্রদীপ নিভে যায়, তেমনই কর্মনাশ হলে দৈবও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নিষ্কর্ম ব্যক্তি বিরাট ধন ভাণ্ডার, নানাপ্রকার ভোগ এবং নারী পেয়েও তা উপভোগ করতে সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি দান করার জন্য নির্ধন হয়ে গেছে, সেই সংব্যক্তির কাছে তার সংকর্মের জন্য ভগবানও উপস্থিত হয়ে থাকেন ; সুতরাং তার গৃহ মনুষ্যলোকের থেকে শ্রেষ্ঠ দেবলোকস্বরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে দান করা হয় না, সেই ঘর যদি অনন্ত সমৃদ্ধিপূর্ণ হয় তাহলেও তা দেবতাদের দৃষ্টিতে শ্মশানতুল্য। জগতে কোনো উদ্যোগহীন ব্যক্তিকে ফলে-ফুলে পূর্ণ হতে দেখা যায় না। দৈবের এমন ক্ষমতা নেই যে কুপথে যাওয়া ব্যক্তিকে সুপথে আনয়ন করবে। শিষ্য যেমন গুরুকে অনুসরণ করে, দৈবও তেমন পুরুষার্থকেই অনুসরণ করে থাকে। অর্জিত পুরুষার্থই যেখানে চায় দৈবকে সঙ্গে নিয়ে যায়। বশিষ্ঠ ! আমি পুরুষার্থের পরিণাম দেখেই তোমাকে এইসব কথা জানালাম।

কর্মের ফল বর্ণনা এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এবার শুভ কর্মের ফল কী তা বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—ভারত ! তুমি যা জিজ্ঞাসা করছ, তা ঋষিদের কাছেও রহস্যের বিষয় ; কিন্তু তোমাকে বলছি, শোনো ! মৃত্যুর পর পুরুষের যেমন গতি হয়, তাও বর্ণনা করছি। মানুষ যে অবস্থায় যে শুভ বা অশুভ কর্ম করে, অন্য জন্ম ধারণ করলে সেই অবস্থায় সেই কর্মফল ভোগ করে। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম করা হয়, তা কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাই মানুষের কর্তব্য হল গৃহে যদি কোনো অতিথি আসে তাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখা, তার সেবায় মন দেওয়া, মিষ্ট বাক্যে তাকে সন্তুষ্ট করে রাখা, তাকে ভালোভাবে আদর-আপ্যায়ন করা এবং যাওয়ার সময় তাকে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া—এই পাঁচটি কাজ করাকে গৃহস্থের জন্য পঞ্চ দক্ষিণ যজ্ঞ বলা হয়। যে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অপরিচিত পথিককে প্রসন্নভাবে অন্নদান করে, সে মহাপুণ্যফল প্রাপ্ত করে। যে অতিথির পূজার জন্য আসন, পা ধোওয়ার জল, প্রদীপ, অন্ন এবং থাকার স্থান দেয়, সেই অতিথি-সৎকারকেও পঞ্চ দক্ষিণ যজ্ঞ বলা হয়।

যে ব্যক্তি কোনো ব্রত ধারণপূর্বক উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করে, তার অন্য জন্মে উত্তম গৃহ ও শয্যা লাভ হয় । নিয়মপূর্বক চীর ও বল্কলধারণকারী বস্ত্র ও অলংকারাদি প্রাপ্ত হয়। যোগ ও তপস্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ উত্তম বাহন লাভ করে। অগ্নি উপাসনাকারী রাজার শক্তি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি মাথা ঝুলিয়ে তপস্যা করে, জলে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সর্বদা একাকী শয়ন করে, সে মনোবাঞ্ছিত গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি রণভূমিতে বীরশয্যা (মৃত্যু) প্রাপ্ত হয়, সে স্বর্গগামী হয়। দানের দ্বারা ধন প্রাপ্তি হয়, মৌনব্রত পালন করলে অন্যের দ্বারা নির্দেশ পালন করানোর (বাকসিদ্ধি) ক্ষমতা লাভ হয়। তপস্যার দ্বারা ভোগ সামগ্রী লাভ হয় এবং ব্রহ্মচর্য পালন করলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। অহিংসা-ধর্ম আচরণে রূপ-ঐশ্বর্য এবং আরোগ্য লাভ হয়। ফল-মূল আহারকারী রাজ্য এবং পাতামাত্র আহার করে থাকা ব্যক্তি স্বর্গলোক প্রাপ্ত করে। উপবাসকারী ব্যক্তি সর্বত্র সুখ পায়। শাকাহারীগণ গোধন এবং তৃণ ভক্ষণকারীর স্বর্গ লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ সর্বদা জল পান করে জীবন নির্বাহ করে, অগ্নি হোত্র করে এবং মন্ত্র সাধনে তৎপর থাকে, সে রাজ্য লাভ করে। নিরাহার ব্রতকারীরা স্বর্গলাভ করে । যে ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসরের জন্য ব্রতদীক্ষা নিয়ে অন্নত্যাগ করে এবং তীর্থস্নান করে থাকে, সে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগকারী বীরদের থেকেও উত্তম লোক লাভ করে। যে সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন করে, সে তৎক্ষণাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি পায় এবং যে মানসিক ধর্ম আচরণ করে, সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। গো-বৎস যেমন সহস্র গাভীর মধ্যে নিজের জন্মদাত্রী গাভীকে চিনে নেয়, তেমনই কর্মফলও সেই কর্মকারী ব্যক্তিকে অনুসরণ করে। ফুল ও ফল যেমন কারো দ্বারা প্রেরিত না হয়ে আপনা থেকেই বিকশিত হয়, তেমনই পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল আপনা থেকেই কাজ করে। মানুষ জরাগ্রস্ত হলে তার চুল, দাঁত, চোখ এবং কানও জীর্ণ হয়ে যায়, শুধু তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না। মানুষ যে কার্যের দ্বারা পিতাকে প্রসন্ন করে, তাতে প্রজাপতিও প্রসন্ন হন। মাতা সন্তুষ্ট হন, এমন কর্মদ্বারা পৃথিবীরও পূজা করা হয় এবং যার দ্বারা উপাধ্যায় তৃপ্ত হন, তাতে ব্রহ্মের পূজাও সম্পন্ন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই তিনজনকে সম্মান করেছে, জেনো তার দ্বারা সমস্ত ধর্মেরই সমাদর করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলিকে অনাদর করে, তার সমস্ত যজ্ঞাদি-কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এইরূপ শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তির সম্বন্ধে মুনিবর ব্যাস যা বলেছিলেন, সেসব আমি তোমাকে শোনালাম। এখন আর কী শুনতে চাও ?

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জগতে কে পূজনীয় ? আপনি কাকে বন্দনা করেন ? কী আশা করেন ? গভীর সংকটে আপনি কাকে স্মরণ করেন ? ইহলোকে ও পরলোকে হিতকারক কাজ কী ? আপনি কৃপা করে আমাকে এই সব বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে বংশে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত পরম্পরাগত ধার্মিক কার্য পালন করা হয় এবং তার জন্য কেউ কোনোরূপ দুঃখের অনুভব করে না, আমি সেই বংশের আশা রাখি। যারা বিনীতভাবে বিদ্যাভ্যাস করে, ইন্দ্রিয় সংযম করে এবং মিষ্ট ভাষা বলে ; যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারী, অক্ষর তত্ত্বজ্ঞানী এবং সৎপুরুষ তাঁদের কাছ থেকে মেঘের মতো গম্ভীর স্বরযুক্ত কল্যাণময় মনোহর বাণী শোনা যায়। রাজা সেই মহাত্মাদের কথা শুনলে, সেগুলি তাঁকে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করে। যে প্রতিদিন

তাঁদের বচন শোনে, সে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন হয়। এইরূপ সাধুব্যক্তি এবং তার শ্রোতাদের আমি সর্বদা সঙ্গ কামনা করি। যারা পবিত্রভাবে ব্রাহ্মণদের তৃপ্তির জন্য সুন্দরভাবে রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করে, তারাও আমার খুব প্রিয়। পুত্র ! কুলীন, ধর্মাত্মা, তপস্বী এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণের কথাই নেই, আমি যদি সাধারণ ব্রাহ্মণও হতাম, তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। এই জগতে তোমার থেকে প্রিয় আমার আর কেউ নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণ আমার কাছে তোমার থেকেও প্রিয়। শুধু তাই নয়, আমি পিতা, পিতামহ এবং সুহৃদদেরও কখনো ব্রাহ্মণের থেকে প্রিয় বলে মনে করিনি। আমি কখনো কোনো ব্রাহ্মণের ক্ষতি করিনি। আমি মন, বাক্য ও কর্মদ্বারা ব্রাহ্মণদের জন্য যে সামান্য উপকার করেছি, তার ফলেই এই শরশয্যাতেও আমি কষ্ট অনুভব করছি না। পুণ্যবানরা যে নির্মল ও পবিত্রলোক প্রাপ্ত হয়, তা আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। এবার শীঘ্রই আমি চিরকালের জন্য সেই লোকে যাব।

যুধিষ্ঠির ! যেমন নারীদের পতি সেবাই জগতে পরম ধর্ম, পতিই তার দেবতা এবং পরমগতি বলা হয়, তেমনই ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণ সেবাই পরমধর্ম এবং ব্রাহ্মণই দেবতা ও পরমগতি। ক্ষত্রিয় যদি শত বৎসর বয়স্ক এবং ব্রাহ্মণ দশ বৎসরের হয়, তা সত্ত্বেও তাদের পুত্র এবং পিতা বলে জানতে হবে, পিতা ব্রাহ্মণ এবং পুত্র ক্ষত্রিয়। তাই ব্রাহ্মণদের পুত্রের ন্যায় রক্ষা, গুরুর ন্যায় উপাসনা এবং অগ্নির ন্যায় পরিচর্যা করা উচিত। সরল, সত্যবাদী এবং সমস্ত প্রাণীর হিতে রত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সর্বদা সেবা করা উচিত। যুধিষ্ঠির ! তোমার সর্বদা এইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণের গৃহে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে আছে কি না।

শৃগাল ও বানরের কথা—প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্মণকে না দেওয়া এবং তার ধন নিয়ে নেওয়ার দোষ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যারা ব্রাহ্মণদের দান দেবার প্রতিজ্ঞা করে পরে লোভপূর্বক না দেয়, তাদের কী গতি হয় ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যে দান করার প্রতিজ্ঞা করেও দেয় না, সে সারা জীবনে সম্পাদিত হোম, দান এবং তপস্যাদি যে পুণ্যকর্ম করে, সব নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে এক হাজার শ্যামকর্ণ অশ্ব দান করলে তবেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ হতে মুক্তি হয়। এই বিষয়ে শিয়াল এবং বানরের সংবাদরূপ এক প্রাচীন কাহিনীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। পূর্বকালে, এক শিয়াল এবং এক বানরের এক স্থানে সাক্ষাৎ হয়। এরা দুজনে পূর্বজন্মে মানুষ ও পরস্পরের বন্ধু ছিল। এই জন্মে শিয়াল ও বানররূপে জন্ম হয়েছে। শিয়ালকে শ্মশানে মৃতদেহ খেতে দেখে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে বানর বলল—'ভাই ! পূর্ব জন্মে তুমি এমন কী ভয়ংকর পাপকর্ম করেছিলে যে তোমাকে এই শ্মশানে গলিত, ঘৃণ্য মৃতদেহ খেতে হচ্ছে ?' শিয়াল উত্তর দিল—'আমি ব্রাহ্মণকে দান করব প্রতিজ্ঞা করেও তা দিইনি ; সেই পাপের জন্য আমাকে এই
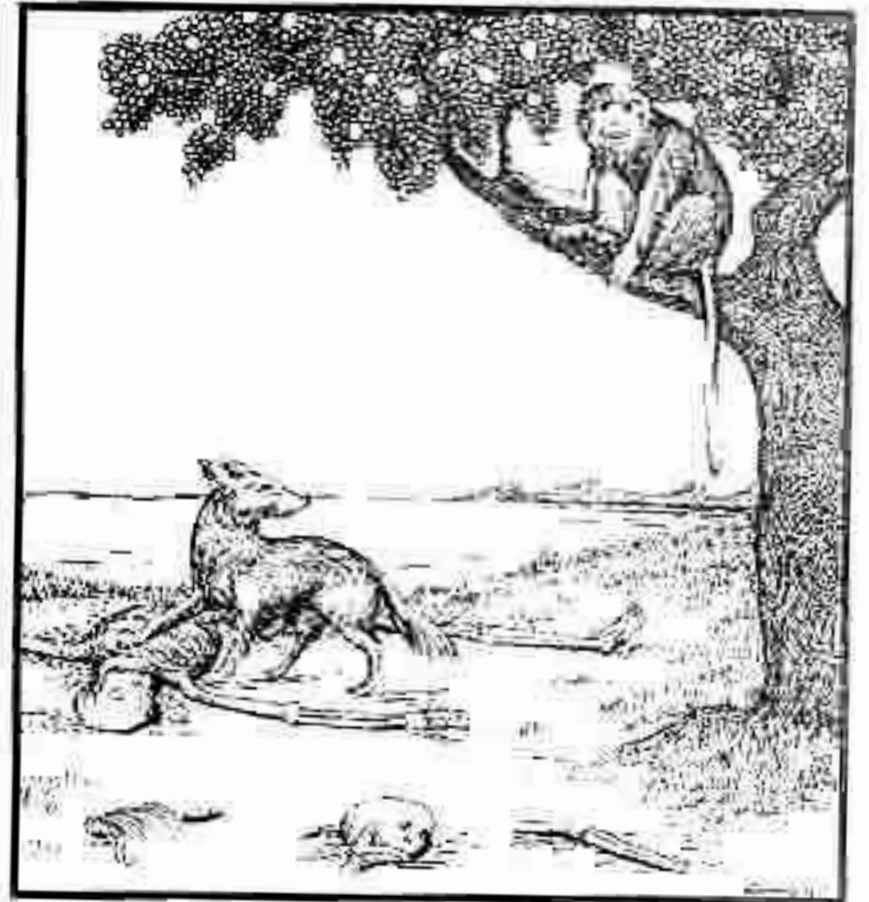
পাপ-জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। এবার তুমি বল, তুমি এমন কী পাপ করেছ, যার জন্য তোমাকে বানর হতে হল ?' বানর বলল—'আমি সর্বদা ব্রাহ্মণদের ফল চুরি করে খেতাম, সেই পাপে বানর হয়েছি। সুতরাং বিজ্ঞ পুরুষদের

কখনো ব্রাহ্মণের ধন নেওয়া উচিত নয়, তাদের সঙ্গে কখনো বিবাদ করা উচিত নয় এবং যদি তাদের কিছু দান করার প্রতিজ্ঞা করা হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই দিয়ে দিতে হয়।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তাই কারোরই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যদি কোনো অপরাধ করে, তা ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। বালক, দরিদ্র বা দীন হলেও কোনো ব্রাহ্মণকে অপমান করা উচিত নয়। তাঁকে কোনো আশা দিতে নেই, এবং যদি তা দেওয়া হয়, তবে অবশ্যই পূর্ণ করা প্রয়োজন ; কারণ আশা দিয়ে তা পূর্ণ না করলে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে পারেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যখন আশা পূর্ণ হলে আশীর্বাদ প্রদান করে তখন তা দাতার কাছে ঔষধের সমান হয়ে তার পুত্র-পৌত্র, স্বজন-বান্ধব, মন্ত্রী, নগর-দেশের কল্যাণ করে শক্তিশালী করে তোলে। পৃথিবীতে সহস্র কিরণসম্পন্ন সূর্যদেবের প্রচণ্ড তেজের মতো ব্রাহ্মণের তেজও পরিলক্ষিত হয়। তাই যারা উত্তম বংশে জন্মগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের ব্রাহ্মণকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পালন করতে হয়। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করলে দেবতা ও পিতৃপুরুষ সন্তুষ্ট হয় ; তাই বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অবশ্য দান করা উচিত। ব্রাহ্মণ মহাতীর্থ বলে গণ্য হন। তাঁরা কোনো সময় গৃহে এলে আদর-আপ্যায়ন না করে তাঁদের যেতে দিতে নেই।

শূদ্রকে বিশেষ উপদেশ দেওয়ায় অনর্থ প্রাপ্তি—এক শূদ্র ও মুনির কাহিনী

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কোনো ব্যক্তি যদি সৌহার্দবশত কোনো অধম জাতির ব্যক্তিকে গূঢ় উপদেশ প্রদান করেন, তবে তার কোনো দোষ হয় কি ? আমি সেটি সঠিকভাবে শুনতে চাই ; কারণ ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! কোনো নীচ জাতির মানুষকে উপদেশ প্রদান করা উচিত নয় ; কারণ বলা হয় যে এতে উপদেশ প্রদানকারীর মহা দোষ হয়। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত শোনো, যা দুঃখে পতিত এক নীচ জাতির ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

হিমালয়ের নিকট এক অতি সুন্দর পবিত্র আশ্রম ছিল, সেখানে সিদ্ধ এবং চারণরা বিচরণ করতেন। তার আশেপাশের বনদেশ সর্বদা ফল-ফুলে পূর্ণ থাকত। সেই আশ্রমে ব্রত ও নিয়মপালনকারী বহু তপস্বী ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। সেখানে সর্বত্র বেদমন্ত্রের ধ্বনি শোনা যেত। বহু বালখিল্য ঋষি এবং সন্ন্যাসী সেই আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি করতেন। সেখানে একদিন এক শূদ্র এল। আশ্রমবাসী মুনিরা তাকে স্বাগত জানালেন ; সেই শূদ্রের তখন তপস্যা করার ইচ্ছা হল এবং সে কুলপতির চরণ স্পর্শ করে বলল—'দ্বিজবর ! আমি আপনার কাছে ধর্মের উপদেশ শুনতে চাই, আপনি কৃপা করে আমাকে শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস দীক্ষা দিন। আমি নীচ শূদ্র বর্ণ, আপনার শরণাগত। আমার ওপর প্রসন্ন হোন।' কুলপতি বললেন—'পুত্র ! শূদ্রের সন্ন্যাস ধারণের অধিকার নেই, তাই তুমি সন্ন্যাসী বেশে এখানে থাকতে পারবে না। তোমার এখানে থাকার হলে উচ্চবর্ণের সেবা করে থাকতে পারো। সেবার দ্বারাই তুমি খুব উত্তমলোক লাভ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

কুলপতির কথা শুনে সেই শূদ্র ভাবতে লাগল এখন আমার কী করা উচিত ? শূদ্রের জন্য শাস্ত্রের বিধান যদি এরূপই হয়, তাহলে আমি তাই করব যাতে আমার মঙ্গল হয়। এই কথা ভেবে সে আশ্রম থেকে চলে গিয়ে দূরে এক পর্ণকুটির তৈরি করে সেখানে যজ্ঞ বেদী, থাকবার জায়গা, দেবালয় নির্মাণ করে নিয়মপূর্বক বাস করতে লাগল। সে প্রত্যহ নিয়ম অনুসারে স্নান করে দেবালয়ে গিয়ে দেবতার পূজা, বলি ও হোম করত, ফলাহার করে ইন্দ্রিয়কে বশে রাখত। তার কাছে অন্ন, ফল ইত্যাদি যা কিছু থাকত তা অতিথি সেবায় ব্যয় করত। এইভাবে নিয়ম পালন করতে করতে সেই শূদ্র মুনির বহুদিন অতিক্রান্ত হল। একদিন এক মুনি সৎসঙ্গের জন্য সেই আশ্রমে পদার্পণ করলেন। শূদ্র বিধিমতো আদর-আপ্যায়ন করে তাঁকে সন্তুষ্ট করল। সেই তেজস্বী ধর্মাত্মা ঋষি তারপর বহুবার সেই শূদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে লাগলেন। সেই শূদ্র একবার তপস্বী ঋষিকে বলল—'মুনে ! আমি পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে চাই, আপনি কৃপা করে সেই কাজ সম্পন্ন করুন।' মুনি 'ঠিক আছে' বলে তার প্রার্থনা স্বীকার করে নিলেন।

তখন শূদ্র ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদন করে জঙ্গল থেকে কুশ, আসন, অন্ন ইত্যাদি শ্রাদ্ধের দ্রব্য সংগ্রহ করল। তারপর তপস্বী মুনির আদেশানুসারে বুদ্ধিমান শূদ্র শ্রাদ্ধের দ্রব্যসমূহ বিধিবদ্ধভাবে সমর্পণ করল। শ্রাদ্ধ কার্য সমাপ্ত হলে মুনি শূদ্রের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং শূদ্র ধর্মমার্গে স্থিত হল।

তারপর দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করে সেই শূদ্র বনেই প্রাণত্যাগ করে নিজ পুণ্যপ্রভাবে এক রাজবংশে মহা তেজস্বী বালকরূপে জন্মগ্রহণ করল। সেই তপস্বী ঋষিও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে সেই রাজবংশেরই পুরোহিতের গৃহে জন্ম নিলেন। এইভাবে সেই শূদ্র এবং মুনি একই স্থানে জন্মালেন। তাঁরা একসঙ্গে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হলেন। ঋষি বেদ, কল্প, জ্যোতিষশাস্ত্রে পূর্ণ পাণ্ডিত্য লাভ করলেন, সাংখ্যশাস্ত্রেও তাঁদের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিছুদিন পর বৃদ্ধ রাজার দেহাবসান হল। প্রজারা তখন রাজকুমারকে রাজা করল। রাজা হয়ে তিনি পুরোহিতের গৃহে জন্ম নেওয়া সেই ঋষিকেই পুরোহিত করলেন। পুরোহিতকে সর্বকাজে সামনে রেখে তিনি ধর্মপূর্বক সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন। পুরোহিত প্রত্যহ রাজার সামনে যখনই পুণ্যাহবাচন করতেন বা কোনো ধার্মিক কার্য করতেন, রাজা তাঁকে দেখে হেসে উঠতেন। পুরোহিত রাজার এই ব্যবহার বহুদিন লক্ষ্য করলেন এবং নিজেকে উপহাস্য মনে করে দুঃখিত হতেন। একদিন তিনি একান্তে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন—'রাজন্ ! আপনি যদি আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে আমি একটি বর প্রার্থনা করি। কিন্তু তার আগে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার সঠিক উত্তর দেবেন।' রাজা বললেন—'নিশ্চয়ই, যদি জানা থাকে তাহলে অবশ্যই উত্তর দেব।'

তখন পুরোহিত বললেন—'প্রতিদিন আমি যখন পুণ্যাহবাচন করি বা কোনো ধর্ম কৃত্য করি বা শান্তি হোম ইত্যাদি কাজে প্রবৃত্ত হই, তখন আপনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন, এর কারণ কী ? আপনি বিনা কারণে হাসেন না, এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, আমাকে সেটি বলুন। আমি সেটি জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।' রাজা বললেন—'বিপ্রবর ! আমি পূর্বজন্মে শূদ্র ছিলাম, আর আপনি মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন আপনি আমার ওপর কৃপা করে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমাকে শ্রাদ্ধবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। আসন, কুশ ও হব্য-কব্যের বিধি জানিয়েছিলেন। সেই কর্মদোষেই আপনি পুরোহিতরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন আর আমি রাজা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমার লাভের জন্য উপদেশ প্রদানের ফল আপনি এইভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই কথা ভেবেই আমার হাসির উদ্রেক হয়। আপনাকে অপমান করার জন্য আমি উপহাস করি না, কারণ আপনি আমার গুরু। আপনাকে যে আপনার তপস্যার বিপরীত ফল ভোগ করতে হচ্ছে, তারজন্য আমার দুঃখ ও সন্তাপ হচ্ছে। আপনার পূর্বজন্মের কথা আমার স্মরণ আছে, তাই আপনাকে দেখে হাসি। আপনার অত বড় তপস্যা শুধু আমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্যই নষ্ট হয়ে গেল, তাই পুরোহিতের কাজ ছেড়ে এখন চেষ্টা করুন, যাতে পরজন্মে এর থেকেও নীচ জন্ম না নিতে হয়।

ভীষ্ম বললেন—রাজা যখন পুরোহিতকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি সমস্ত অর্থ জমি-বাড়ি ব্রাহ্মণদের দান করে দিলেন এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণদের নির্দেশানুসারে কঠোর ব্রত পালন করে বহু তীর্থে স্নান করলেন। ব্রাহ্মণদের গাভী এবং নানা জিনিস দান করে নিজ অন্তঃকরণ পবিত্র করলেন। তারপর মনকে বশীভূত করে তিনি পূর্বজন্মের আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। তপস্যার প্রভাবে তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করলেন এবং সেই আশ্রমে বসবাসকারী অন্যান্য সব ঋষিদের সম্মানভাজন হয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির ! যদিও তিনি পূর্বজন্মে মহাঋষি ছিলেন, তা সত্ত্বেও শূদ্রকে উপদেশ দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত কষ্টে পড়েছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের কোনো নীচ বর্ণের মানুষকে উপদেশ প্রদান করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজ বলা হয়—এদের মধ্যে উপদেশ দান করলে ব্রাহ্মণ দোষের ভাগী হয় না। সুতরাং ধর্মপালনে ইচ্ছুক বিদ্বান ব্যক্তিদের খুব ভাবনা-চিন্তা করে উপদেশ দান করা উচিত। অর্থ লাভের আশায় উপদেশ প্রদানকারী মানুষ নিজেই ধর্মের হানি করে। কেউ প্রশ্ন করলে ভালো করে ভাবনা-চিন্তা করে স্থির সিদ্ধান্তে এসে তার উত্তর দেওয়া উচিত এবং উপদেশ এমনই হওয়া উচিত যাতে ধর্মের শ্রী বৃদ্ধি হয়। রাজন্ ! উপদেশের সম্পর্কে সব কথা তোমাকে জানালাম। নীচকে উপদেশ দিলে মহা ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়, তাই তাদের উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।

যুধিষ্ঠিরের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর এবং দানের উপযুক্ত উত্তম পাত্রের লক্ষণ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যেসব ব্যক্তি যথার্থভাবে জীবন অতিবাহিত করতে চায় তাদের কী করা উচিত ? কীরূপ স্বভাব ধারণ করে জীবন যাপন করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! শরীরের তিনটি, বাক্যের চারটি এবং মনের তিনটি—এইরূপ মোট দশপ্রকারের কর্ম ত্যাগ করা উচিত। হিংসা, চুরি এবং পরস্ত্রীগমন—এই তিনটি শরীরদ্বারা হওয়া পাপ, এগুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। বৃথা বাক্যব্যয়, নিষ্ঠুর কথা বলা, পরনিন্দা ও মিথ্যা বলা—এই চারটি বাক্যদ্বারা হওয়া পাপ। এইগুলি কখনো মুখে বা মনে আনা উচিত নয়। অন্যের ধন আত্মসাৎ করার চেষ্টা না করা, সর্বপ্রাণীর ওপর ভালোবাসা রাখা এবং কর্মের ফল অবশ্যই পাওয়া যায়—এই কথায় বিশ্বাস রাখা এই তিনটি আচরণ মনের দ্বারা করা উচিত। এগুলি সর্বদা করা উচিত এবং এর বিপরীত অপরের ধনে লোভ করা, সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে শত্রু ভাব রাখা এবং কর্মফলে বিশ্বাস না করা—এই তিনটি মানসিক পাপ, এর থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। তাই মানুষের কর্তব্য হল যেন সে কায়মনোবাক্যে কখনো অশুভ কর্ম না করে ; কারণ শুভ-অশুভ যেমন কর্ম সে করে, তদনুসারে তাকে এর ফল ভোগ করতে হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! বিদ্বানদের কথা হল যে দৈবকার্যে ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রাদ্ধে অবশ্যই তাকে পরীক্ষা করবে। এর কারণ কী ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যজ্ঞ-হোম ইত্যাদি দেবকার্যের সিদ্ধি ব্রাহ্মণের অধীন নয়, দেবতার অধীন। যজমানেরা যে দেবতাদের কৃপাতেই যজ্ঞ করে থাকেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রাদ্ধ-কর্মের সিদ্ধি ব্রাহ্মণদেরই অধীন ; সুতরাং এতে সর্বদা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদেরই আমন্ত্রণ করা উচিত, বুদ্ধিমান মার্কণ্ডেয় অনেক আগেই একথা বলে রেখেছেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যিনি অপরিচিত বিদ্বান, তপস্বী অথবা যজ্ঞকারী, তাঁকে কেন দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করা হয় ?

ভীষ্ম বললেন—এই বিষয়ে পৃথ্বী, কাশ্যপ, অগ্নি এবং মার্কণ্ডেয় মুনি—এই চারজন তেজস্বীদের মত শোনো।

পৃথ্বী বললেন—মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত মাটির ঢেলা যেমন তৎক্ষণাৎ গলে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনই যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ—এই তিন বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী ব্রাহ্মণের সমস্ত দুষ্কর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কাশ্যপ বললেন—যে ব্রাহ্মণ শীলবর্জিত, তাঁর সাংখ্য পুরাণ ও ছয় অঙ্গসহ অর্জিত বেদের জ্ঞান এবং উত্তম কুলে জন্ম—এই সব মিলেও তাঁকে উত্তম গতি প্রদান করতে পারে না।

অগ্নি বললেন—যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করে নিজেকে অত্যন্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করেন এবং নিজ পাণ্ডিত্যে গর্ব করেন এবং যিনি নিজের বিদ্যাশক্তির দ্বারা অন্যের যশ নাশ করেন, তিনি ধর্মভ্রষ্ট হয়ে সত্য পালনে বঞ্চিত হন, তাই তিনি বিনাশশীল লোক প্রাপ্ত হন।

মার্কণ্ডেয় বললেন—যদি তুলাদণ্ডের একদিকে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অপরদিকে সত্যকে রেখে ওজন করা হয় তাহলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়তো সত্যের অর্ধেকের কাছাকাছিও হবে না।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এইভাবে অপার তেজস্বী পৃথ্বী, কাশ্যপ, অগ্নি এবং মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণদের বিষয়ে নিজেদের মত জানিয়ে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে আহার করে তাহলে (তার ব্রত নষ্ট হওয়ায়) তাকে প্রদত্ত দান কী করে সফল হবে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! গুরু যাকে নির্দিষ্ট বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করার আদেশ দেন তাকে আদিষ্টী বলা হয়। এরূপ বেদ-পারঙ্গম আদিষ্টী ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধের ভোজন গ্রহণ করেন তাহলে তাঁর ব্রত স্বতই নষ্ট হয়ে যায় (এতে দাতার দান দূষিত হয় না)।[১]

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! বিদ্বানরা বলেন

[১]শ্রাদ্ধের ভোজন গ্রহণে যোগ্য ব্রাহ্মণদের বিষয়ে স্মৃতিতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—'কর্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নি ব্রহ্মচারিণঃ। পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ॥ এবং 'ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ'॥ অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্ঠ, তপস্বী, পঞ্চাগ্নিসেবি, ব্রহ্মচারী ও মাতৃ-পিতৃ ভক্ত—এই পাঁচপ্রকারের ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সম্পত্তি—এদের ভোজন করালে শ্রাদ্ধকর্ম

যে, ধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং ফল বহু প্রকারের ; কৃপা করে বলুন তার কারণ কী ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, কোমলতা, ইন্দ্রিয় সংযম ও সরলতা—এগুলি ধর্মের নিশ্চিত লক্ষণ। যারা নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে ধর্মের প্রশংসা করে অথচ নিজেরা তা পালন করে না, তারা পাষণ্ড। এইসব ব্যক্তিদের যারা বস্ত্র, অলংকার, গোধন বা অশ্বাদি দান করে, তারা নরকে পতিত হয়। যেসব মূর্খ বলিবৈশ্বদেবের সময় (মধ্যাহ্ন ভোজন গ্রহণের পূর্বে দেবতাদির উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি) আগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে না, তারা পাপময় লোক প্রাপ্ত হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! উত্তম ব্রহ্মচর্য কী ? ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ কী ? সর্বোত্তম পবিত্রতা কাকে বলে দয়া করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! মদ এবং মাংস ত্যাগ ব্রহ্মচর্যের থেকেও শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ এটিই উত্তম ব্রহ্মচর্য)। বেদোক্ত মর্যাদায় অবস্থিত থাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে সরিয়ে রাখাই সর্বোত্তম পবিত্রতা।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কখন মানুষের ধার্মিক কৃত্য করা উচিত ? কখন অর্থ উপার্জনে মন দিতে হয় এবং কখন সুখভোগে প্রবৃত্ত হতে হয় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! পূর্বাহ্নে অর্থোপার্জনের দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত, তারপর ধর্মপালন করা কর্তব্য এবং সবশেষে সুখভোগে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কোনো এক বস্তুতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণ এবং গুরুজন ব্যক্তিদের সম্মান এবং সেবা করবে, সব প্রাণীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, নম্রভাবে থাকবে, মিষ্টবাক্য বলবে। রাজসভায় মিথ্যা কথা বলা, রাজার কাছে কারো নামে নালিশ জানানো এবং গুরুর সঙ্গে কপট ব্যবহার—এই তিনটি ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ। রাজার উপর হাত তুলবে না, গোরুকে আঘাত করবে না। যারা এই কাজ করে, তারা ভ্রূণ হত্যার পাপভাগী হয়। বেদের স্বাধ্যায় এবং অগ্নিহোত্র ত্যাগ করবে না এবং ব্রাহ্মণের নিন্দা থেকে দূরে থাকবে ; এই সব দোষই ব্রহ্মহত্যার সমান।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন ব্রাহ্মণদের সৎপুরুষ বলে মনে করতে হবে এবং কাকে দান করলে মহাফল প্রাপ্তি হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যিনি ক্রোধরহিত, ধর্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয় সংযম করে থাকেন, সেই ব্রাহ্মণকে সাধুপুরুষ বলে জানতে হবে এবং তাঁকে দান করলে মহাফল লাভ হয়। যাঁর কোনো অভিমান নেই, যিনি সবকিছু সহ্য করে থাকেন, যাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর, যিনি জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণীর হিতকারী এবং সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন, তাঁকে দান করলে মহাফল লাভ হয়। যিনি নির্লোভ, পবিত্র, বিদ্বান, দান গ্রহণে সংকোচ বোধ করেন, সত্যবাদী এবং কর্তব্যপরায়ণ, তাঁকে দান করলেও মহাফল পাওয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ অঙ্গসহ চার বেদ অধ্যয়ন করেন এবং ব্রাহ্মণোচিত ছয়টি কর্মে (অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন, দান-প্রতিগ্রহ) প্রবৃত্ত থাকেন, ঋষিগণ তাঁকে দানের উত্তম পাত্র বলে মনে করেন। উপরোক্ত গুণাদি যুক্ত ব্রাহ্মণদের দান করলে মহাফল লাভ হয়। যদি উত্তম বুদ্ধি-সম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারী এবং সুশীল ইত্যাদি গুণসম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণও দান স্বীকার করে নেন, তাহলে তাতে দাতার সম্পূর্ণ কুল উদ্ধার হয়ে যায়। সুতরাং এরূপ গুণবান ব্যক্তিকেই গো, অশ্ব, অন্ন, অর্থ প্রভৃতি দান করা উচিত। তাহলে মানুষকে মৃত্যুর পর কখনো অনুতাপ করতে হয় না। একজন মাত্র উত্তম ব্রাহ্মণ সমস্ত কুলকে উদ্ধার করতে সক্ষম, তারপর যদি তিনি উপরোক্ত গুণাদিযুক্ত হন তাহলে

পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। এবং নিজের কন্যার পুত্র যদি ব্রহ্মচারী হয় তাহলে তাকেও যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করানো উচিত। এরূপ করলে শ্রাদ্ধকর্তা পুণ্যভাগী হন। শুধু শ্রাদ্ধেই এই ছাড় দেওয়া হয়েছে। শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনো কর্মে ব্রহ্মচারীকে প্রলুব্ধ করে যে তার ব্রতভঙ্গ করে, সে দোষের ভাগী হয় এবং তার প্রদত্ত দানেরও পূর্ণ ফললাভ করে না। তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে যে 'মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ। দাতা তৎফলমাপ্নোতি প্রতিগ্রাহী ন দোষভাক্।।' অর্থাৎ যদি কোনো সুপাত্র (ব্রহ্মচারী ইত্যাদি) কে দান মনস্থ করা হয়, তাহলে মনে মনে তার ধ্যান করবে এবং তাকে দান করার উদ্দেশ্যে হাতে সংকল্প করার জল নিয়ে সেটি জলেই দিয়ে দেবে। তাতে দাতা দান করার ফল প্রাপ্ত হয় এবং দানগ্রহীতাকে দোষের ভাগী হতে হয় না। সৎ ব্যক্তিকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে এই কথা বলা হয়েছে।

—নীলকণ্ঠী টীকার আধারে

তো কথাই নেই। সুতরাং সুপাত্রের অনুসন্ধান করা উচিত। সৎব্যক্তি দ্বারা সম্মানিত গুণবান ব্রাহ্মণের কথা যদি দূর থেকেও জানা যায়, তাহলে তাকে উপযুক্তভাবে আহ্বান করে সম্মান জানানো উচিত।

ত্যাজ্য অন্ন, শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দানপাত্র, নরক এবং স্বর্গ প্রদানকারী কর্মগুলির নিরূপণ

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! দেবতা এবং ঋষিগণ শ্রাদ্ধকালে, দেবযজ্ঞে ও পিতৃযজ্ঞে যে-সব কর্মের বিধান করেছেন, সে-সব আমি আপনার মুখে শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! মানুষের কর্তব্য হল স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পূর্বাহ্নে দেবসম্বন্ধীয় কার্য, অপরাহ্ণে পিতৃকার্য এবং মধ্যাহ্নে মনুষ্য-কার্য (অতিথি-সৎকার ইত্যাদি) সম্পন্ন করা। অসময়ের দান রাক্ষসদের ভাগে যায়। যে ভোজ্যপদার্থ কেউ লঙ্ঘন করেছে, উচ্ছিষ্ট করেছে কিংবা ঝগড়া-বিবাদ পূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে অথবা যার ওপর রজস্বলা নারী দৃষ্টিপাত করেছে, সেগুলিও রাক্ষসেরই ভাগ। যার জন্য প্রচার করা হয়েছে, ব্রতহীন মানুষ যা ভোজন করেছে, যে অন্ন কুকুর স্পর্শ করেছে অথবা দৃষ্টিপাত করেছে, যাতে চুল বা পোকা পড়েছে, যা হাঁচি বা অশ্রুজলে দূষিত হয়েছে অথবা অপমান করে দেওয়া হয়েছে, সেই অন্নও রাক্ষসেরই ভাগ। মন্ত্রজ্ঞানরহিত, শস্ত্রধারী তথা দুরাচারী পুরুষের আহার করা, অন্যের উচ্ছিষ্ট, দেবতা, পিতৃগণ, অতিথি এবং বালকদের না দিয়েই নিজের জন্য আনা হয়, সেই অন্নও রাক্ষসভোগ বলে জানতে হবে। রাজন্ ! মন্ত্র এবং বিধিহীন শ্রাদ্ধের অন্ন, ঘৃতাহুতি না দেওয়া আহারের অন্ন এবং অন্নের প্রথম ভাগ কোনো দুরাচারীকে দেওয়া হলে সেই অন্নও রাক্ষসের ভাগ বলে মনে করা হয়। এইভাবে যে আহার রাক্ষসদের প্রাপ্ত হয়ে থাকে তার বর্ণনা করা হল।

এবার দানযোগ্য ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করার জন্য কিছু বলছি, শোনো। যেসব ব্রাহ্মণ পতিত, জড় বা উন্মাদ হয়েছে, তারা দেবকার্য বা পিতৃকার্যে নিমন্ত্রণ পাবার অধিকারী নয়। যার শরীরে শ্বেতীর দাগ থাকে, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, ক্ষয়রোগগ্রস্ত, নপুংসক এবং মৃগী রোগী ও অন্ধ, তাদেরও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা উচিত নয়। বৈদ্য, পূজারি, পাষণ্ড, মদ্যবিক্রেতা, গায়ক, নর্তক, জাদুকর, বৃথা কথনকারী, পালোয়ান এবং যে শূদ্রকে বিদ্যাদান করে অথবা তাকে দীক্ষা দেয় এমন ব্রাহ্মণকেও শ্রাদ্ধে ডাকা উচিত নয়। বেতন নিয়ে বেদ শিক্ষাদানকারী এবং বৃত্তি নিয়ে বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধের যোগ্য নয়। কারণ তাঁরা বেদকে বিক্রি করেন। যে পূর্বে সমাজের নেতা ছিল পরে শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করেছে, সেই ব্রাহ্মণ উত্তম বিদ্বান হলেও শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণের যোগ্য নয়। যারা অগ্নিহোত্র করে না, মৃতদেহ বহনের কাজ করে, চুরি করে, পতিত, অপরিচিত, গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি এবং পুত্রিকাধর্ম[1] অনুসারে মাতামহের গৃহে বাসকারী ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে ভোজনের অধিকারী নয়। যে ব্রাহ্মণ ঋণ বা সুদের দ্বারা অথবা প্রাণী বিক্রয় করে জীবিকা-নির্বাহ করে, যে স্ত্রীর অধীনে থাকে, বেশ্যার পতি, অগ্নিহোত্র করে না, তাকেও শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ করা উচিত নয়।

রাজন্ ! দেবযজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধে যেসব ব্রাহ্মণকে বর্জন করা উচিত, তাদের উল্লেখ করা হল। এখন দান দেওয়া এবং গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বর্ণনা করছি, যারা শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ হয়েও কোনো বিশেষ গুণের জন্য অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহ্য মানা হয়েছে ; তাদের বিষয়ে শোনো। যে ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য করেও ব্রতপালন করেন, সদ্গুণসম্পন্ন, ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং গায়ত্রীমন্ত্রের জ্ঞাতা, তাঁকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে। যিনি যুদ্ধে ক্ষাত্রধর্ম পালন করেন এবং কুলীন, অগ্নিহোত্র করেন, একই গ্রামে বাস করেন, চুরি করেন না এবং অতিথি আপ্যায়নে তৎপর, তাঁকেও নিমন্ত্রণ করা উচিত। যিনি ত্রি-সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন, ভিক্ষাদ্বারা

[1] কোনো ব্যক্তি যখন তাঁর কন্যাকে এই শর্তে বিবাহ দেন যে, কন্যার প্রথম পুত্রকে তিনি নিজ পুত্র হিসাবে দত্তক নেবেন, তাকে বলা হয় 'পুত্রিকা ধর্ম অনুসারে বিবাহ'। এই নিয়মে প্রাপ্ত পুত্র শ্রাদ্ধ ভোজনের অধিকারী নয়।

জীবিকা নির্বাহ করেন, ক্রিয়ানিষ্ঠ ; যিনি প্রভাতে ধনী সন্ধ্যায় কপর্দকশূন্য তথা সন্ধ্যায় ধনী প্রভাতে কপর্দকশূন্য হয়ে যান, জীব হিংসা করেন না, যাঁর মধ্যে দোষ-ত্রুটি কম থাকে, তাঁদেরও শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। যিনি দন্তরহিত, বৃথাতর্ক করেন না, যোগ্য স্থান থেকে ভিক্ষাগ্রহণ করেন, তিনি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাবার অধিকারী। যিনি প্রথমে কঠোর কর্ম করে ধন সংগ্রহ করেছেন, পরে অতিথি-সেবা ব্রত ধারণ করেছেন, তাঁকে শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ করা যায়। যে অর্থ, বেদ বিক্রয় করে বা স্ত্রীর উপার্জন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে অথবা লোকের কাছে দীনতা দেখিয়ে ভিক্ষা করা হয়েছে, সেই ধন শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের দেওয়ার উপযুক্ত নয়।

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হলে 'অস্তু স্বধা' ইত্যাদি উচিত বাক্যের প্রয়োগ করে না, তার মিথ্যা শপথের পাপ হয়। ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হলে 'অস্তু স্বধা' এই বাক্য উচ্চারণ করলে পিতৃপুরুষ প্রসন্ন হন, ক্ষত্রিয়কে সেই স্থানে শ্রাদ্ধের সমাপ্তিতে 'পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' (পিতৃপুরুষ যেন সন্তুষ্ট হন) এই বাক্য উচ্চারণ করা উচিত এবং বৈশ্যের গৃহে 'অক্ষয্যমস্তু' (শ্রাদ্ধের দান অক্ষয় হোক) বলা কর্তব্য। তেমনিই ব্রাহ্মণের গৃহে যদি দেবকার্য সম্পন্ন হয় তাহলে ওঁ-কারসহ পুণ্যাহ কর্মাদির বিধান আছে (অর্থাৎ 'ওঁ পুণ্যাহম্' উচ্চারণ করবে)। ক্ষত্রিয়ের গৃহে ওঁ-কাররহিত পুণ্যাহবাচনের বিধি আছে (অর্থাৎ শুধুমাত্র 'পুণ্যাহম' উচ্চারণ করবে)। বৈশ্যের গৃহে দেবকার্যে 'দেবতাঃ প্রীয়ন্তাম্' (দেবগণ প্রসন্ন হোন) এই বাক্য উচ্চারণ করবে। এবার ক্রমশ কর্মানুষ্ঠানের বিধি শোনো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণের জাত কর্মাদি সংস্কার বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক করা উচিত। উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণকে কুশের, ক্ষত্রিয়কে প্রত্যঞ্চার এবং বৈশ্যের বল্বজের (এক প্রকারের তৃণের) মেখলা ধারণ করা উচিত।

এবার দাতা এবং দান গ্রহীতার ধর্ম-অধর্মের বর্ণনা শোনো। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বললে যত পাপ হয়, তার চতুর্গুণ ক্ষত্রিয়ের এবং আটগুণ বৈশ্যের হয়। যদি কোনো ব্রাহ্মণ আগে থেকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের অন্য কোথাও গিয়ে আহার করা উচিত নয়। তিনি যদি তা করেন, তবে তাঁকে নীচ বলে মনে করা হয় এবং তাঁর পশু-হত্যার পাপ হয়। তেমনিই কোনো ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য আগে থেকে নিমন্ত্রণ করলে ব্রাহ্মণ যদি অন্যত্র গিয়ে খাদ্য গ্রহণ করেন তাহলেও তাঁকে নিম্নশ্রেণীর মনে করা হয় এবং পশু হত্যার অর্ধেক পাপের ভাগীদার হতে হয়। রাজন্ ! যে ব্রাহ্মণ তিন বর্ণেরই গৃহে দেবযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধে অস্নাত অবস্থায় আহার করেন অথবা লোভবশত নিজ গৃহে অশৌচ থেকেও অন্যের গৃহে শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণ করেন, তাঁর মিথ্যা শপথ গ্রহণের পাপ হয়। যে ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনের অছিলায় অন্যের কাছে অর্থভিক্ষা করে, তার মিথ্যা বলার জন্য পাপ হয়। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বেদ-ব্রত পালন না করা ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে মন্ত্র উচ্চারণ করে অন্ন পরিবেশন করে, তারও মিথ্যা শপথ গ্রহণের পাপ হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! দেবযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধকর্মে যে দান করা হয়, সেই দান কীরূপ ব্যক্তিকে দিলে মহান ফল লাভ হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! কৃষক যেমন বৃষ্টির পথ চেয়ে থাকে, তেমনই যাঁর গৃহে পত্নী তাঁর স্বামীর প্রসাদ পাবার প্রতীক্ষা করেন, তাঁকে তুমি অবশ্যই ভোজন করাবে। যিনি সদাচারী, আহার না করায় দুর্বল হয়ে পড়েছেন, যাঁর জীবিকা ক্ষীণ হয়ে গেছে, এরূপ ব্যক্তি যদি যাচক হয়ে আসেন, তবে তাঁকে দান করলে মহাফল লাভ হয়। যিনি সদাচারের ভক্ত, যাঁর গৃহে সদাচার পালিত হয়, যাঁর সদাচারই বল এবং সদাচারকেই যিনি পরলোকের সহায়তা প্রদায়ক মনে করেন, বিশেষ প্রয়োজন হলে তবেই যিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁকে দান করলে মহান ফল প্রাপ্ত হয়। চোর এবং শত্রুভয়ে পীড়িত হয়ে যে ব্যক্তি কেবল আহার প্রার্থনা করে থাকে, যার মনে কোনো প্রকার কপটতা নেই এবং অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ায় যার শিশুরা খাবারের জন্য ব্যাকুল, সেই ব্যক্তিকে দান করলে মহাফল লাভ হয়। দেশে বিপ্লবের সময় যাঁর অর্থ এবং পরিবার অপহৃত হয়েছে, সেরূপ ব্রাহ্মণ যদি অর্থ চাইতে আসেন তাহলে তাঁকে দান করলে মহাফল লাভ হয়। ব্রত ও নিয়মপালনে রত ব্রাহ্মণ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যদি অর্থ প্রার্থনা করে এবং যিনি ধর্মের ভণ্ডামি বর্জন করায় অন্নহীন এবং দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সেইসব ব্রাহ্মণদেরও ধন দান করলে অত্যন্ত পুণ্য হয়। বলশালী ব্যক্তি যেসব নিরপরাধ মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করেছে, তারা যদি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্ন চায় এবং যারা তপস্বী, তপোনিষ্ঠদের জন্য ভিক্ষা চায় এইসব লোকেদের কিছু

দিলে তার মহান ফল পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির ! কাদের দান করলে মহাফল প্রাপ্তি হয়, সেসব আমি তোমাকে জানালাম। এবার যেসব কর্মের দ্বারা মানুষকে স্বর্গে বা নরকে যেতে হয়, তা শোনো। যে ব্যক্তি গুরুর উপকার অথবা কাউকে ভয় থেকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে, সে নরকে যায়। অপরের পত্নী অপহরণকারী, অন্য নারীর সতীত্ব নাশকারী, দূত সেজে অপরের স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তির কাছে প্রেরণকারী, অপরের সম্পদ অনিষ্টকারী বা অপহরণকারী এবং পরনিন্দাকারী ব্যক্তিগণ নরকে পতিত হয়। যারা অন্যের ঘর নষ্ট করে, যারা অনাথ, বৃদ্ধা, তরুণী, বালিকা, ভীতসন্ত্রস্ত এবং তপস্বিনী নারীদের ছলনা করে এবং যারা অপরের জীবিকা নষ্ট করে, ঘর ভেঙে দেয়, পতি-পত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, মিত্রদের মধ্যে বিরোধ এনে দেয় ও কারো আশা ভঙ্গ করে, তারাও নরকগামী হয়। নিন্দাকারী, কুল-ধর্মের মর্যাদা বিনাশকারী, অন্যের উপার্জনে নির্ভরকারী, মিত্রের উপকার বিস্মৃতকারী, পাষণ্ড, নিন্দুক, ধার্মিক নিয়মবিরোধী এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরে আসা ব্যক্তিগণও নরকে পতিত হয়। যার ব্যবহার সকলের খারাপ লাগে। যে লাভ ও বৃদ্ধির দিকে বিষম দৃষ্টি রাখে, যে দূতের কাজ করতে ও কোনো মানুষকে চিনতে ভুল করে, যে সর্বদা জীবহিংসায় প্রবৃত্তি রাখে, যে বেতনভুক পরিশ্রমী পরিচারককে কিছু দেবার আশা দিয়ে, দেবার সময় কোনো ছুতোয় তাকে বহিষ্কৃত করে, তাকে নরকে যেতে হয়। যে পিতৃপুরুষ এবং দেবপূজা পরিত্যাগ করে অগ্নিতে আহুতি না দিয়েই অতিথি, পোষ্যবর্গ এবং পত্নী ও শিশুদের আগে আহার করে, যে বেদ বিক্রয় করে, বেদ নিন্দা করে, আশ্রম মর্যাদার পালন করে না, বেদ বিরুদ্ধ কার্য করে, অধর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, কেশ-বিষ-দুগ্ধ বিক্রয় করে, ব্রাহ্মণ, কন্যা ও গাভীর কার্যে বিঘ্ন প্রদান করে, অস্ত্র বিক্রয় করে ও তৈরি করে এবং যারা পথ অবরোধ করে, তারা সকলেই নরকগামী হয়। যারা শুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপক, ভৃত্য এবং ভক্তদের ত্যাগ করে, যারা বলদকে নপুংসক করে, পশুদের বন্দি করে রাখে, যে রাজা প্রজাদের উপার্জিত সামগ্রীর ষষ্ঠভাগ কর হিসাবে গ্রহণ করেও তাদের রক্ষা করে না, যে সক্ষম হয়েও দান করে না, এরা সকলেই নরকগামী হয়। যে ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান এবং বহুদিন ধরে তার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিকে কাজ শেষ হওয়ায় ত্যাগ করে এবং যে শিশু, বৃদ্ধ এবং ভৃত্যদের না দিয়ে নিজেই প্রথমে আহার করে, তাকেও নরকে যেতে হয়।

এইভাবে নরকগামী মানুষদের বর্ণনা করা হল। এবার স্বর্গগমনকারীদের বর্ণনা করছি। যাঁরা দান, তপস্যা এবং সত্যের দ্বারা ধর্ম অনুসরণ করেন, গুরু শুশ্রূষা এবং বিদ্যাধ্যয়ন করে প্রতিগ্রহে অনুরাগ রাখেন না, যাঁর চেষ্টায় মানুষ ভয়, পাপ, বাধা, বিঘ্ন, দারিদ্র্য ও রোগ থেকে মুক্তিলাভ করে, যিনি ক্ষমাশীল, ধীর, ধর্ম-কর্মে উৎসাহী এবং মাঙ্গলিক আচারসম্পন্ন, যাঁরা মদ, মাংস ও পরস্ত্রী থেকে দূরে থাকেন ও আশ্রম, কুলধর্ম, দেশ, নগরকে রক্ষা করেন, সেইসব ব্যক্তি স্বর্গে গমন করেন। যিনি বস্ত্র, অলংকার, খাদ্য-পানীয় এবং অন্নদান করেন, অপরের বিবাহ দেন, সর্বপ্রকার হিংসা থেকে দূরে থাকেন, সব সহ্য করেন এবং সকলকে আশ্রয়দান করেন, যিনি জিতেন্দ্রিয় হয়ে মাতা-পিতার সেবা করেন, ভ্রাতাদের স্নেহ করেন, যিনি ধনী, যুবক এবং বলশালী হয়েও ইন্দ্রিয় বশে রাখেন, যিনি অপরাধীকেও দয়া করেন, যাঁর স্বভাব মৃদু এবং মৃদু স্বভাবের লোকের ওপর ভালোবাসা রাখেন, যিনি অপরকে সেবা করেই সুখী হন, যিনি হাজার হাজার মানুষকে খাদ্য পরিবেশন করেন, ধন দান করেন এবং রক্ষা করেন, তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। যিনি স্বর্ণ, গাভী, গাড়ি, বিবাহের সামগ্রী, দাস-দাসী ও বস্ত্র দান করেন, যিনি অপরের জন্য আশ্রয়, গৃহ, জমি ও গ্রাম প্রদান করেন, যিনি যে কোনো বংশে জন্ম নিয়ে বহু পুত্র এবং শতবর্ষ আয়ু যুক্ত হয়ে অন্যকে দয়া করেন এবং ক্রোধকে বশে রাখেন, তিনি স্বর্গে গমন করেন। ভারত ! আমি তোমাকে পরলোকে কল্যাণকারী দেবকার্য ও পিতৃকার্যের বর্ণনা করলাম এবং প্রাচীনকালে ঋষিগণ কথিত দান-ধর্ম এবং তার মহিমা নিরূপণ করলাম।

ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ এবং বিবিধ তীর্থাদির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! ব্রাহ্মণকে হত্যা না করলেও মানুষের কী করে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়? কৃপা করে এর সঠিক কারণ বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! পূর্বে আমি একবার ব্যাসদেব উপস্থিত হলে যে প্রশ্ন করেছিলাম (এবং উনি আমাকে তার যে উত্তর দিয়েছিলেন) সেসব তোমাকে বলছি, মন দিয়ে শোনো। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মুনে! ব্রাহ্মণকে হিংসা না করলেও কোন কর্ম করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়?' এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ধর্মনিপুণ ব্যাসদেব আমাকে সন্দেহরহিত এই উত্তর দিয়েছিলেন, 'ভীষ্ম! যে ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্বাহের কোনো সংস্থান নেই, তাকে ভিক্ষা দেবার জন্য ডেকে এনে পরে ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। যে দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তটস্থ থাকা বিদ্বান ব্যক্তির জীবিকা ছিনিয়ে নেয় এবং পিপাসার্ত গোরুর জলপানে বিঘ্নপ্রদান করে, তাকেও ব্রহ্মহত্যার পাতক বলে জানবে। যে ব্যক্তি উত্তম কর্তব্য বিধানকারী শ্রুতি এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগুলিকে না জেনে-বুঝে দোষারোপ করে, যে ব্যক্তি নিজ রূপবতী কন্যার বিবাহের বয়স হলেও যোগ্য পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেয় না, তাদেরও ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। যে পাপপরায়ণ মূর্খ ব্যক্তি বিনাকারণে ব্রাহ্মণের মর্মভেদী শোকের শিকার হয়, যে অন্ধ, খঞ্জ এবং বোবা মানুষের সর্বস্ব হরণ করে এবং যে মোহবশত আশ্রম, বন, গ্রাম অথবা নগরে আগুন লাগিয়ে দেয়, তাকেও ব্রহ্মঘাতী বলে জানতে হবে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! তীর্থ দর্শন ও তীর্থস্নান করা এবং তার মাহাত্ম্য শ্রবণ করা শ্রেয়স্কর বলা হয়েছে, সুতরাং আমি তীর্থাদির বর্ণনা শুনতে চাই। এই পৃথিবীতে যত পবিত্র তীর্থ আছে, কৃপা করে সেগুলি বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! পূর্বকালে অঙ্গিরা তীর্থসমূহের বর্ণনা করেছিলেন, সেই কথা শোনো। এর দ্বারা তুমি উত্তম ধর্মলাভ করবে। কোনো এক সময়ের কথা, মহামুনি অঙ্গিরা নিজ তপোবনে বিরাজ করছিলেন। সেই সময় উত্তম ব্রত আচরণকারী গৌতম তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'মহামুনে! তীর্থে স্নান করলে মৃত্যুর পর কী ফল প্রাপ্তি হয়? তার যথাযথ বর্ণনা করুন।'

অঙ্গিরা বললেন—মানুষ উপবাস করে চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তায় সাত দিন ধরে যদি স্নান করে তাহলে সে (সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে) মুনির ন্যায় নির্মল হয়ে যায়। কাশ্মীর প্রান্তের যেসব নদী মহানদ সিন্ধুতে মেশে, সেইসব নদী এবং সিন্ধুতে স্নান করলে শীলবান ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, সমুদ্র দেবিকা, ইন্দ্রমার্গ এবং স্বর্ণবিন্দু—এই তীর্থে স্নান করলেও মানুষ স্বর্গযাত্রা করে। হিরণ্যবিন্দু তীর্থে স্নান করে সেখানকার প্রধান দেবতা ভগবান কুশেশয়কে পবিত্রভাবে প্রণাম করলে মানুষের সব পাপ দূর হয়ে যায়। গন্ধমাদন পর্বতের কাছে ইন্দ্রতোয়া নামে নদীতে এবং কুরঙ্গক্ষেত্রের ভিতর করতোয়া নদীতে স্নান করে তিন রাত্রি উপবাস করেন যে ব্যক্তি, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং পরমপবিত্র ও শুদ্ধ হয়ে যান। গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), কুশাবর্ত, বিল্বক, নীলপর্বত এবং কন্‌খল তীর্থে স্নান করলে মানুষ পাপরহিত হয়ে স্বর্গে গমন করে। যদি কোনো ব্যক্তি ক্রোধরহিত, সত্য প্রতিজ্ঞ এবং অহিংসক হয়ে ব্রহ্মচর্যপালন করে সলিলহ্রদ তীর্থে স্নান করে, তাহলে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। যে স্থানে ভাগিরথী উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, সেটি ভগবান শংকরের (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালরূপ) ত্রিবিধ স্থান। সেই ত্রিস্থান নামক তীর্থে স্নান করে যে এক মাস ধরে উপবাস করে, তার দেবদর্শন লাভ হয়। সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ এবং ইন্দ্রমার্গে পিতৃপুরুষের তর্পণকারী মানুষ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে, সে অমৃত ভোগ লাভ করে (অর্থাৎ সে দেবতা হয়ে যায়)। মহাশ্রমতীর্থে স্নান করে প্রতিদিন পবিত্রভাবে অগ্নিহোত্র করে যে ব্যক্তি একমাস যাবৎ উপবাস করে, সে সিদ্ধ হয়ে যায়। যে লোভ ত্যাগ করে ভৃগুতুঙ্গক্ষেত্রের মহাহ্রদনামক তীর্থে স্নান করে এবং তিন রাত অনাহারে থাকে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপ হতে মুক্ত হয়। কন্যাকূপে স্নান করে বলাকা তীর্থে যে তর্পণ করে, দেবতাদের মধ্যে তার কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং সে নিজ যশে সুশোভিত হয়। দেবিকাকুণ্ড, সুন্দরিকাকুণ্ড এবং অশ্বিনীকুমার ক্ষেত্রে স্নান করলে মৃত্যুর পর অন্য জন্মে রূপ ও তেজ প্রাপ্তি হয়। মহাগঙ্গা এবং কৃত্তিকাঙ্গারক তীর্থে স্নান করে এক পক্ষ ধরে নিরাহারে থাকলে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গে গমন করে। যে বৈমানিক এবং কিঙ্কিণীকাশ্রম তীর্থে স্নান করে, সে অপ্সরাদের দিব্যলোকে সম্মানিত হয়ে ইচ্ছানুসারে বিচরণ

করে। যে ব্যক্তি কালিকাশ্রমে স্নান করে বিপাশা নদীতে পিতৃ-তর্পণ করে এবং ক্রোধ বর্জন করে ব্রহ্মচর্য পালন করে ত্রিরাত্রি সেখানে বাস করে, সে জন্ম-মৃত্যু-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি কৃত্তিকাশ্রমে স্নান করে পিতৃ-তর্পণ ও মহাদেবকে প্রসন্ন করে, সে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করে। মহাপুরতীর্থে স্নান করে পবিত্রতা সহকারে তিন রাত্রি উপবাস করলে কোনো প্রাণী বা মানুষ থেকে ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি দেবদারু বনে স্নান করে তর্পণ করে এবং পবিত্রভাবে সাত রাত সেখানে বাস করে, তার পাপমোচন হয় এবং মৃত্যুর পর সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব এবং দ্রোণশর্মপদ তীর্থের ঝরনায় স্নান করে, তাকে অপ্সরাগণ সেবা করেন। জনস্থানে (গোদাবরী জলে) এবং চিত্রকূটে মন্দাকিনীর জলে স্নান করে উপবাসকারী ব্যক্তি রাজলক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত হয়। শ্যামাশ্রম তীর্থে গিয়ে সেখানে স্নান, উপবাস এবং একপক্ষ বাস করলে (গন্ধর্বলোকের) অন্তর্ধান ইত্যাদি ভোগ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি কৌশিকী নদীতে স্নান করে নিষ্কামভাবে একুশ রাত বায়ুপান করে থাকে, সে স্বর্গলাভ করে। যে মতঙ্গবাপী তীর্থে স্নান করে, তার এক রাত্রেই সিদ্ধিলাভ হয়। যে অনালম্ব, অন্ধক এবং সনাতন তীর্থে ডুব দেয় এবং নৈমিষারণ্যের স্বর্গ তীর্থে স্নান করে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক মাসাবধি পিতৃতর্পণ করে, সে যজ্ঞের ফললাভ করে। গঙ্গাহ্রদ এবং উৎপ্লাবন তীর্থে স্নান করে এক মাস ধরে পিতৃতর্পণ করলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে এবং কালঞ্জর গিরি তীর্থে মাসাবধি কাল স্নান এবং তর্পণ করলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। ষষ্টি হ্রদে স্নান করলে অন্নদানের থেকে অধিক ফল লাভ হয়। মাঘমাসের অমাবস্যায় প্রয়াগরাজে তিন কোটি দশ হাজার তীর্থের সমাগম হয়। যারা নিয়মপূর্বক উত্তম ব্রত পালন করে মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নান করে, তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করে। যারা পবিত্রভাবে মরুদ্গণ তীর্থ, পিতৃগণের আশ্রম ও বৈবস্বত তীর্থে স্নান করে, তারা নিজেরাই তীর্থস্বরূপ হয়ে যায়। যারা ব্রহ্মসর (পুষ্কর) এবং ভাগীরথী (গঙ্গা) নদীতে স্নান করে পিতৃতর্পণ করে সেখানে এক মাস অনাহারে থাকে, তারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত করে। উৎপাতক তীর্থে স্নান এবং অষ্টাবক্রতীর্থে তর্পণ করে বারো দিন নিরাহারে থাকলে যজ্ঞের ফল লাভ হয়। গয়াতে অশ্মপৃষ্ঠে (প্রেতশিলাতে) যাত্রা করলে প্রথম, নিরবিন্দ পর্বতে গেলে দ্বিতীয় এবং ক্রৌঞ্চপদী নামক তীর্থে যাত্রা করলে তৃতীয় ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্তিলাভ হয়। কলবিঙ্ক তীর্থে স্নান করলে বহু তীর্থ গমনের ফল লাভ হয়। অগ্নিপুর তীর্থে ডুব দিয়ে স্নান করলে অগ্নিকন্যাপুরে নিবাস লাভ হয়। করবীপুরে স্নান, বিশালাতে তর্পণ এবং দেবহ্রদে মর্জন করলে মানুষ ব্রহ্মরূপ হয়ে ওঠে। যারা সর্বপ্রকার হিংসা ত্যাগ করে জিতেন্দ্রিয়ভাবে আবর্ত-নন্দা এবং মহানন্দা তীর্থ সেবন করে, তারা নন্দন বনে অপ্সরা দ্বারা সেবিত হয়। যারা কার্তিক পূর্ণিমাতে কৃত্তিকা যোগে একাগ্র চিত্তে উর্বশী এবং লৌহিত্যতীর্থে ভক্তিনিষ্ঠ হয়ে স্নান করে, তারা পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ করে। রামহ্রদে (পরশুরাম কুণ্ডে) স্নান এবং বিপাশা নদীতে তর্পণ করে বারো দিন উপবাস করে যে ব্যক্তি, সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়। মানুষ যদি মহাহ্রদে স্নান করে শুদ্ধচিত্তে এক মাস নিরাহারে থাকে, তাহলে সে জামদগ্নির মতো সদ্গতি লাভ করে। যে হিংসা ত্যাগ করে সত্য প্রতিজ্ঞা করে বিন্ধ্যাচলে বাস করে এবং নিজ শরীরকে কষ্ট দিয়ে বিনয়পূর্বক তপস্যা করে, সে একমাসের মধ্যেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নর্মদা নদী এবং শূর্পারক ক্ষেত্রের জলে স্নান করে একপক্ষ ধরে নিরাহারে থাকে যে ব্যক্তি সে পরজন্মে রাজকুমার হয়। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক একাগ্রচিত্তে তিন মাস ধরে জম্বুমার্গে যাত্রা করে, সে একদিন-রাতেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে কোকামুখ তীর্থে স্নান করে আঞ্জলিকাশ্রম তীর্থে গিয়ে শাক আহার করে চীরবস্ত্র ধারণ করে কিছুকাল নিবাস করে, তার দশবার কন্যাকুমারী তীর্থ সেবনের ফল লাভ হয় এবং তাকে কখনো যমরাজের গৃহে যেতে হয় না। যে ব্যক্তি কন্যাহ্রদে (কন্যাকুমারী তীর্থে) বাস করে, সে মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করে। যে একাগ্রচিত্তে প্রভাস তীর্থে অমাবস্যা তিথি পালন করে, তার এক রাত্রেই সিদ্ধিলাভ হয় এবং দেহত্যাগের পর সে অমর (দেবতা) হয়ে যায়। উজ্জানক তীর্থ, আর্ষ্টিষেণ এবং পিঙ্গার আশ্রমে স্নান করলে সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ হয়। যে ব্যক্তি কুল্যা নদীতে স্নান করে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করে তিন রাত উপবাস করে সেখানে থাকে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে পিণ্ডারক তীর্থে স্নান করে এক রাত সেখানে বাস করে, প্রভাত হলে সে পবিত্র হয়ে যায় এবং তার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ধর্মারণ্যে সুশোভিত ব্রহ্মসরে স্নান করে যে ব্যক্তি, সে পবিত্র হয়ে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ

করে। মৈনাক পর্বতে এক মাস ধরে স্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা করলে মানুষ কাম জয় করে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করে। একশত যোজন যাত্রা করে কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর মানস তীর্থে স্নান করে যে ব্যক্তি সে ভ্রূণহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়। নন্দীশ্বর মূর্তি দর্শন করলে সর্বপাপ দূর হয় এবং স্বর্গমার্গ নামক তীর্থে স্নান করলে মানুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ভগবান শংকরের শ্বশুর হিমবান পর্বত পরম পবিত্র এবং জগদ্বিখ্যাত, সেটি সব রত্নের খনি এবং সিদ্ধ ও চারণ সেবিত। বেদান্ত বিদ্বান যে সব দ্বিজ এই জীবনকে বিনাশশীল মনে করে উক্ত পর্বতে বাস করেন এবং দেবপূজা ও মুনিদের প্রণাম করে শাস্ত্রীয় মতে অনশনের দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁরা সিদ্ধ হয়ে সনাতন ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ জয় করে তীর্থে নিবাস করে, তার সেই তীর্থযাত্রার পুণ্যে কোনো বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে সমস্ত তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা রাখে, দুর্গম ও অগম্য হওয়ায় শারীরিক কারণে সেখানে যেতে পারে না, সে যেন কায়মনোবাক্যে সেই তীর্থের কথা স্মরণে রাখে। এই তীর্থ সেবন কার্য পরমপবিত্র, পুণ্যপ্রদ, স্বর্গের উত্তম সাধন এবং বেদের গুপ্ত রহস্য। প্রত্যেক তীর্থ পবিত্র এবং স্নানের যোগ্য হয়ে থাকে।

তীর্থের এইসব মাহাত্ম্য দ্বিজাতিদের নিজ হিতৈষী সাধু পুরুষদের, সুহৃদদের এবং নিজ অনুগত শিষ্যের কর্ণগোচর করা উচিত। মহাতপস্বী অঙ্গিরা এই কথা গৌতমকে বলেছিলেন এবং অঙ্গিরাকে এই মাহাত্ম্য কাশ্যপ মুনি শুনিয়েছিলেন। এই গাথা মহর্ষিদের শ্রবণযোগ্য এবং পরমপবিত্র। যে ব্যক্তি সাবধানে সর্বদা এটি পাঠ করে, সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করে।

শ্রীশ্রীগঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ক্ষমায় ব্রহ্মা, পরাক্রমে ইন্দ্র এবং তেজে সূর্যের সমকক্ষ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শয়ন করে কালের প্রতীক্ষা করছিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করছিলেন, সেইসময় বহু দিব্য সন্ন্যাসী ভীষ্মকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁরা হলেন—অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, স্থূলশিরা, সংবর্ত, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য, সুমতি, বিশ্বামিত্র, প্রমতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, ব্যাস, চ্যবন, কশ্যপ, ধ্রুব, দুর্বাসা, জামদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ঠ, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্বত, সুধন্বা, একত, নিতম্ভূ, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, পরশুরাম এবং কচ প্রমুখ। এইসকল মহাত্মা সেইখানে পদার্পণ করলে ভ্রাতাসহ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁদের যথোচিত সম্মানে পূজা করেন। তারপর তাঁরা সুখপূর্বক উপবেশন করে ভীষ্মের সঙ্গে মধুর মনোহর বাক্যালাপ আরম্ভ করলেন। শুদ্ধহৃদয়সম্পন্ন সেই মহর্ষিদের কথা শুনে ভীষ্ম পরম সন্তুষ্ট হলেন। তারপর সেই মহর্ষিগণ ভীষ্ম এবং পাণ্ডবদের কাছে বিদায় গ্রহণ করে অন্তর্ধান করলেন। তারপর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করে পুনরায় তাঁকে ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! কোন দেশ, কোন প্রান্ত, কোন কোন আশ্রম, কোন পর্বত এবং কী কী নদী পুণ্যদৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বুঝতে হবে ?'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই ব্যাপারে শিলোঞ্ছ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী এক ব্যক্তির কোনো এক সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে যে বার্তালাপ হয়েছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস শোনো। কোনো একজন সিদ্ধপুরুষ সমগ্র পৃথিবীকে অনেকবার পরিক্রমা করার পর শিলোঞ্ছ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী এক শ্রেষ্ঠ গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হন। সেই গৃহস্থ ব্যক্তি তাঁর বিধিমতো পূজা করেন। তিনি প্রসন্ন হয়ে অত্যন্ত সুখে সারারাত সেই গৃহস্থের গৃহে অতিবাহিত করেন। প্রভাত হলে সেই গৃহস্থ স্নান করে পবিত্র হয়ে প্রাতঃকালীন নিত্য কর্মে রত হন। সেই কাজে নিবৃত্ত হয়ে তিনি আবার সেই সিদ্ধ অতিথির সেবায় উপস্থিত হলেন। তারপর দুজনে একান্তে বসে সুখে বেদ-বেদান্ত নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন। কিছুক্ষণ পর শিলোঞ্ছ বৃত্তিধারী ব্যক্তি তোমারই ন্যায় প্রশ্ন করলেন—কোন দেশ, জনপদ (প্রান্ত), আশ্রম, পর্বত, নদী পুণ্য দৃষ্টিতে সর্বোত্তম বলে মনে করা হয় ?

সিদ্ধ বললেন—ব্রহ্মন্ ! সেই দেশ, জনপদ, আশ্রম এবং পর্বত পুণ্যদৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ, যার মধ্যে দিয়ে নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা প্রবহমানা। গঙ্গাতীরে বাস করলে জীব যে উত্তম গতি লাভ করে, তা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ এবং ত্যাগের দ্বারাও সহজে লাভ করা যায় না। যে দেহধারীর শরীর গঙ্গার জলে ভেজানো হয় বা মৃত্যুর পর যার অস্থি গঙ্গায় অর্পণ করা হয়, সে কখনো স্বর্গচ্যুত হয় না। যেসব মানুষের সমস্ত কাজ গঙ্গাজলেই সম্পন্ন হয়, তারা মৃত্যুর পর পৃথিবীর নিবাস ত্যাগ করে স্বর্গে বিরাজ করে। যে জীবনের প্রথম দিকে পাপকর্ম করে পরে গঙ্গাতীরে পবিত্রভাবে বসবাস করে, সেও উত্তম গতি লাভ করে। গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে, সেই ব্যক্তির পুণ্য এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে শত শত যজ্ঞ করলেও তা হয় না। মানুষের অস্থি যত বছর ধরে গঙ্গাজলে থাকে, তত হাজার বছর সে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সূর্য যেমন উদয়ের সময় ঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রকাশিত হয়, তেমনই গঙ্গাজলে স্নান করে যে ব্যক্তি, তার পাপ বিনাশ হয় এবং সে সুশোভিত হয়। যে দেশ এবং জনপদ গঙ্গার মঙ্গলময় জল থেকে বঞ্চিত, সেগুলি চাঁদবিহীন রাত এবং পুষ্পহীন বৃক্ষের মতো সম্পদবর্জিত। সূর্য বিনা আকাশ যেমন শোভাযুক্ত হয় না, তেমনই গঙ্গারহিত দেশ ও জনপদ শ্রীহীন হয়। ত্রিলোকে যত প্রাণী আছে, তারা সকলেই গঙ্গার পবিত্র জলে তর্পণ করলে তৃপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সূর্যকিরণে তপ্ত গঙ্গাজল পান করে, তাকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। এক ব্যক্তি যদি দেহ শোধনকারী এক হাজার চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করে এবং অন্য এক ব্যক্তি কেবল গঙ্গাজল পান করে, তাহলে দুজনকেই সমান পুণ্যফলের অধিকারী বলে মনে করা হয়। এক হাজার যুগ ধরে একপায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যাকারী ব্যক্তি একমাস ধরে গঙ্গাস্নানকারী ব্যক্তির পুণ্যের সমকক্ষ হতে পারেন কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। একজন ব্যক্তি মাথা নীচু করে দশ হাজার যুগ ধরে বৃক্ষে ঝুলে থাকলেও, অন্যজন যে স্বেচ্ছায় গঙ্গাতীরে বাস করে, তার অপেক্ষা কম পুণ্যবান বলা হয়। আগুনে পুড়ে যেমন তুলো তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যায়, তেমনই গঙ্গাজলে স্নান করলে মানুষের সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। এই জগতে যারা দুঃখে ব্যাকুল হয়ে কোনো আশ্রয়ের খোঁজ করে, তাদের কাছে গঙ্গা-তীরের ন্যায় অন্য কোনো আশ্রয় নেই। গরুড়কে দেখলেই যেমন সমস্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনই গঙ্গাদর্শন মাত্রে মানুষের মনে ধর্মভাবের উদয় হয়। জগতে যার কোনো আধার নেই এবং যে ধর্মের শরণ গ্রহণ করেনি, তাকে আধার এবং শরণ দিতে গঙ্গাই থাকেন। মা গঙ্গাই তার কল্যাণকারী এবং রক্ষাকবচের মতো তাকে সুরক্ষিত রাখেন। যে নীচ ব্যক্তি গভীর পাপগ্রস্ত হয়ে নরকে পতিত হয়, সেও যদি গঙ্গার শরণ গ্রহণ করে, তাহলে মৃত্যুর পর গঙ্গাই তাকে উদ্ধার করেন। যে ব্যক্তি সর্বদা গঙ্গাস্নান করে, তাকে অবশ্যই মুনি এবং ইন্দ্রাদি দেবতার সমান বলে মানা হয়। বিনয় এবং সদাচারবর্জিত, অমঙ্গলকারী ও নীচব্যক্তিও গঙ্গার শরণ নিলে ক্রমশ শিবস্বরূপ হয়ে ওঠে। যেমন দেবতাদের অমৃত, পিতৃগণের স্বধা, নাগেদের সুধা তৃপ্ত করে, তেমনই মানুষের কাছে গঙ্গাজলই পূর্ণ তৃপ্তিস্বরূপ। ক্ষুধার্ত শিশু যেমন মায়ের কাছে যায়, তেমনই কল্যাণ কামনাকারীরা গঙ্গার উপাসনা করে। যেমন ব্রহ্মলোককে সব লোকের থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তেমনই স্নানকারী মানুষের কাছে গঙ্গাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গাতটের মৃত্তিকা নিজ মস্তকে লাগায়, তার অজ্ঞান অন্ধকার নাশ হয়ে সূর্যের ন্যায় নির্মল স্বরূপ ধারণ করে। গঙ্গার জল চুম্বনকারী বাতাস যখন মানুষের দেহ স্পর্শ করে, তখনই তার সমস্ত শরীর নির্মল হয়ে যায়। দুঃখে আকুল হয়ে মৃত্যুর পথ চেয়ে থাকা ব্যক্তি যদি গঙ্গাদর্শন করে, তাহলে তার মনে এমন প্রশান্তি আসে যে সে সবদুঃখ তখনই ভুলে যায়।

গঙ্গাতীরে বাস করলে যে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়, তা স্বর্গে থেকে সমস্ত সুখভোগ করলেও পাওয়া যায় না। মন, বাক্য ও ক্রিয়াদ্বারা মানুষ যে পাপ করে, গঙ্গাদর্শন করলে সেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে সে যে পরম পবিত্র হয়ে ওঠে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গঙ্গা দর্শন, গঙ্গাজল স্পর্শ এবং গঙ্গাজলে অবগাহন স্নান করলে মানুষের সাত পুরুষ ধরে ঊর্ধ্বতন তত্তোর্ধ পিতৃপুরুষ এবং অধঃস্তন পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শোনে, গঙ্গা তীরে যাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করে, গঙ্গাদর্শন করে, গঙ্গাজল পান করে, স্পর্শ করে, গঙ্গায় স্নান করে, তার দুই কুল ভগবতী গঙ্গা উদ্ধার করে দেন। গঙ্গা দর্শন, স্পর্শ, জলপান এবং গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তনে শত শত, হাজার হাজার পাপীকে উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি তার জীবন, জন্ম এবং বিদ্যা সফল করতে চায়, তার গঙ্গাতীরে গিয়ে দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করা উচিত। মানুষ গঙ্গাস্নান করে যে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত করে, তা পুত্র, অর্থ বা অন্য কোনো ক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায় না। শক্তি থাকলেও যে পবিত্র জলবাহী কল্যাণময়ী গঙ্গাকে দর্শন করে না, সে জন্মান্ধ, খঞ্জ এবং মৃতের তুল্য। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা মহর্ষি এবং ইন্দ্রাদি দেবতাও যাঁর উপাসনা করেন, বিদ্বান ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীরাও যাঁর শরণ গ্রহণ করেন, কোন্ মানুষ সেই গঙ্গার শরণ নেবে না ? যে মানুষ প্রাণত্যাগের সময় মনে মনে গঙ্গা স্মরণ করে, সে পরমগতি লাভ করে। যে ব্যক্তি সারাজীবন গঙ্গার উপাসনা করে, কোনো পাপই তাকে স্পর্শ করে না। যে পরম পবিত্র গঙ্গাকে ভগবান শংকর নিজ মস্তকে ধারণ করেছেন এবং যিনি তিন নির্মল মার্গে প্রবাহিত হয়ে ত্রিলোকের শোভাবর্ধন করেছেন, মানুষ তার জল পান করে কৃতার্থ হয়ে যায়। (গঙ্গাতে ভক্তি রাখা মানুষের) মাতা, পিতা, পুত্র, স্ত্রী এবং অর্থনাশ হলেও তত দুঃখ হয় না যত দুঃখ হয় গঙ্গার বিচ্ছেদে। গঙ্গাদর্শনে যত প্রশান্তি আসে, তত ভ্রমণে বা অভীষ্ট বিষয়াদি ভোগে এবং পুত্র ও অর্থলাভেও হয় না। যে গঙ্গাতে শ্রদ্ধা রাখে, তাঁতে মন নিবিষ্ট করে রাখে, গঙ্গার কাছে বাস করে, তাঁর আশ্রয় নিয়ে ভক্তিভরে তাঁকে অনুসরণ করে, সে ভগবতী ভাগীরথীর প্রিয় হয়ে থাকে। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গে বাসকারী সমস্ত ছোট-বড় প্রাণীর সর্বদা গঙ্গায় স্নান করা উচিত। সৎব্যক্তিদের এটি সবথেকে উত্তম কাজ। আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, দশদিকে যাঁর খ্যাতি বিস্তৃত, নদীগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ভগবতী ভাগীরথীর জল সেবন করে সকল মানুষই কৃতার্থ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি অন্য লোককে 'এটি গঙ্গানদী' বলে দর্শন করায়, তার পক্ষে ভগবতী ভাগীরথীই (অক্ষয়পদ প্রদানকারী হয়ে থাকে)। ইনি কার্তিকেয় এবং সুবর্ণকে নিজ গর্ভে ধারণ করেছেন, পবিত্র জলধারা বহনকারী এবং পাপনাশিনী। ইনি আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। এঁর জল সমস্ত জগতের কাছে পেয়। গঙ্গাজলে প্রাতঃকালে স্নান করলে ধর্ম-অর্থ-কাম ত্রিবর্গের সিদ্ধি হয়। গঙ্গা গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা, ভগবান শংকরের পত্নী এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভা। ইনি ভূমণ্ডলে বসবাসকারী প্রাণীদের কল্যাণকারী, পরম সৌভাগ্যবতী এবং ত্রিলোকের পুণ্য প্রদানকারী। গঙ্গাজলে স্নান-সন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণ এবং তরঙ্গদ্বারা গঙ্গানদী সুশোভিতা। ইনি সর্বপ্রথম স্বর্গলোক থেকে নিম্নদিকে যাত্রা করেন, সেই সময় ভগবান শংকর তাঁকে মস্তকে ধারণ করেন। তারপর হিমালয় পর্বতে এসে সেইখান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। শ্রীগঙ্গা স্বর্গের জননী। সবের কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠা, রজগুণরহিত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, মৃত প্রাণীদের সুখশয্যা, পবিত্র জলধারা প্রবাহিতকারীণী, যশপ্রদানকারী, জগৎ রক্ষাকারী, সৎস্বরূপা এবং সিদ্ধগণের অভীষ্ট দেবী ভগবতী গঙ্গা তাঁর জলে স্নানকারীর কাছে স্বর্গের পথ হয়ে ওঠেন। ক্ষমা, রক্ষা এবং ধারণ করায় পৃথিবীর সমান ; তেজে অগ্নি ও সূর্যসম শোভাময়ী গঙ্গা স্বামী কার্তিকেয়র মাননীয়া মাতা। ব্রাহ্মণ জাতিকে অনুগ্রহ করায় ব্রাহ্মণগণও সর্বদা তাঁকে সম্মান করেন। ঋষিগণ যাঁর স্তুতি করেন, যিনি ভগবান বিষ্ণুর চরণ হতে উৎপন্ন, অত্যন্ত প্রাচীন এবং পরম পবিত্র জলপূর্ণ, সেই ভগবতী ভাগীরথীকে মনে মনে শরণ নিলেও মানুষ ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হয়। মাতা যেমন নিজপুত্রকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে দেখেন, গঙ্গাও তেমনই সর্বাত্মকভাবে তাঁর আশ্রয়ে আগত প্রাণীদের কৃপাদৃষ্টিতে দেখে তাদের সর্বগুণসম্পন্ন লোকে আশ্রয় প্রদান করেন। তাই যারা ব্রহ্মলোক লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের নিজ মনকে বশে রেখে সর্বদা মাতৃভাবে গঙ্গা উপাসনা করা কর্তব্য। যিনি অমৃতময়ী, দুগ্ধপ্রদানকারী গাভীর ন্যায় সকলকে পরিপুষ্ট করেন, সব কিছু দেখে থাকেন, অন্ন প্রদানকারীণী ও পর্বতধারণকারী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাঁর আশ্রয় নেন এবং যাঁকে ব্রহ্মাও প্রাপ্ত হতে চান, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদের সেই ভগবতী

গঙ্গাদেবীর আশ্রয় অবশ্য গ্রহণ করা উচিত। রাজা ভগীরথ তাঁর উগ্র তপস্যা দ্বারা ভগবান শংকর-সহ সমস্ত দেবতাকে প্রসন্ন করে গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে আনয়ন করেন। তাঁর শরণ গ্রহণ করলে মানুষের ইহলোকে অথবা পরলোকে কোনো ভয় থাকে না।

ব্রহ্মন্ ! আমি নিজ বুদ্ধিতে চিন্তা করে গঙ্গাদেবীর গুণাবলীর এক অংশ বিবৃত করেছি। আমার এত শক্তি নেই যে আমি তাঁর সমস্ত গুণ বর্ণনা করি। কখনো চেষ্টা করলে মেরুগিরির রত্নরাজি এবং সমুদ্রের জলের মাপ নির্ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু গঙ্গাজলের গুণাদি বর্ণনা করা অসম্ভব। সুতরাং আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যে গঙ্গার মাহাত্ম্য জানালাম, তাতে বিশ্বাস রেখে মন, বাক্য, ক্রিয়া, ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তুমি তাঁর আরাধনা করো। তাহলে তুমি খুব শীঘ্র দুর্লভ সিদ্ধিলাভ করে, ত্রিলোকে নিজ যশ বিস্তার করে গঙ্গাদেবীর সেবায় প্রাপ্ত অভীষ্ট লোকে ইচ্ছামতো বিচরণ করবে। মহাপ্রভাবশালী ভগবতী ভাগীরথী তোমার এবং আমার বুদ্ধিকে যেন সর্বদা স্বধর্মানুকূল গুণাদি দ্বারা যুক্ত করেন। শ্রীগঙ্গাদেবী অত্যন্ত ভক্তবৎসলা, তিনি জগতে তাঁর ভক্তদের সুখী করে থাকেন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সেই উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন পরম তেজস্বী সিদ্ধ শিলোঞ্ছ বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ ত্রিপথগা গঙ্গাদেবীর যথার্থ গুণের নানা বর্ণনা করে অন্তরীক্ষে অন্তর্ধান করলেন এবং সেই ব্রাহ্মণও গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য জেনে তাঁর বিধিমতো উপাসনা করে পরম দুর্লভ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। কুন্তীনন্দন ! তুমিও এইভাবে পরাভক্তি সহকারে সর্বদা গঙ্গাদেবীর উপাসনা করো। তাহলে তুমি উত্তম সিদ্ধি লাভ করবে।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভীষ্ম কথিত শ্রীগঙ্গাস্তুতিযুক্ত এই ইতিহাস শুনে ভ্রাতাগণসহ্ রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। গঙ্গাস্তবযুক্ত এই পবিত্র ইতিহাস যে শ্রবণ বা পাঠ করবে, সে সর্বপাপ হতে মুক্ত হবে।

—o—

রাজা বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি বিদ্যা, বুদ্ধি, সদাচার, শীল এবং সর্বপ্রকার গুণাদিসম্পন্ন। আপনি বয়সেও সবার চেয়ে বড়। জগতে আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই, যাকে সর্বপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় ; সুতরাং কৃপা করে বলুন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র কী উপায়ে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত করতে পারে ? কোন্ তপস্যা, কী কর্মের অনুষ্ঠান অথবা কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সম্ভব ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা কঠিন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি বলছেন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা কঠিন, কিন্তু আমি (আপনার কাছেই) শুনেছি যে পূর্বকালে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এবং এটিও শোনা যায় যে রাজা বীতহব্যও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন ; সুতরাং আপনি বলুন, কোন্ বরে অথবা তপস্যার দ্বারা রাজা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মহাযশস্বী রাজর্ষি বীতহব্য যেভাবে দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, সেই বৃত্তান্ত শোনো। পূর্বকালে ধর্মপূর্বক প্রজাপালনকারী মহাত্মা মনুর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম শর্যাতি। শর্যাতির বংশে রাজা বৎস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দুটি পুত্র হয় হৈহয় এবং তালজঙ্ঘ। তাঁরা দুজনেই রাজা হন। হৈহয়ের (অন্য নাম ছিল বীতহব্য) দশটি পত্নী ছিল, তাঁদের গর্ভে একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যাঁরা যুদ্ধে কখনো পশ্চাদ্‌পদ হতেন না। সেইসময় কাশীতে হর্যশ্ব নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা রাজত্ব করতেন, তিনি দিবোদাসের পিতামহ ছিলেন। বীতহব্যের পুত্রেরা হর্যশ্বের রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং তাঁকে গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে প্রয়াগের কাছে যুদ্ধে নিহত করলেন। তারপর হর্যশ্বের পুত্র সুদেবকে, যিনি দেবতার মতো তেজস্বী এবং ধর্মাত্মা ছিলেন, কাশীর রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। কিন্তু বীতহব্যের পুত্রেরা এসে তাঁকেও যুদ্ধে নিহত করলেন। এরপর সুদেবের পুত্র দিবোদাস কাশীর রাজা হলেন। সেই মহাতেজস্বী রাজা যখন জিতেন্দ্রিয় বীতহব্যের পুত্রদের পরাক্রম শুনলেন তখন ইন্দ্রের নির্দেশে বারাণসী নামক নগরী স্থাপন করলেন। এর

চৌহদ্দী গঙ্গার উত্তর তীর থেকে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত প্রসারিত। এর মধ্যে অবস্থিত বারাণসী নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভমানা। এখানে নিবাসকারী রাজা দিবোদাসের ওপরও হৈহয় বংশীয় রাজারা আক্রমণ করেন। তখন মহাতেজস্বী রাজা দিবোদাস নগরীর বাইরে এসে শত্রুর সম্মুখীন হলেন। দুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে এক হাজার দিন (দুবছর নয়মাস দশদিন) ধরে দেবাসুর সংগ্রামের মতো ভয়ংকর যুদ্ধ চলল। তাতে রাজা দিবোদাসের বহু বাহন ও সৈন্য বিনষ্ট হল, তাঁর অর্থভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল এবং তিনি অত্যন্ত করুণ অবস্থায় পতিত হলেন। শেষকালে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করে পালিয়ে প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পৌঁছে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। বৃহস্পতিনন্দন ভরদ্বাজ অত্যন্ত সুশীল এবং দিবোদাসের পুরোহিত ছিলেন। রাজাকে সেখানে আসতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'মহারাজ ! আপনি এখানে এসেছেন কেন ? সব সংবাদ আমাকে বলুন। আপনার পক্ষে যা মঙ্গলজনক হবে, আমি তা নিঃসন্দেহে পূর্ণ করব।'

রাজা বললেন—মুনিবর ! বীতহব্যের পুত্রেরা আমার বংশ বিনাশ করেছে, আমি একাকী পালিয়ে এসে আপনার শরণাগত হয়েছি।

তাঁর কথা শুনে মহাভাগ ভরদ্বাজ মুনি বললেন—'সুদেব নন্দন ! ভয় পাবেন না। আমি যজ্ঞ করব, তাতে আপনি পুত্রলাভ করবেন, যার সাহায্যে আপনি বীতহব্যের সহস্রাধিক পুত্র বধ করবেন।' এই বলে ভরদ্বাজ মুনি রাজার জন্য পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ প্রভাবে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল, যে জগতে প্রতর্দন নামে প্রসিদ্ধ। সে জন্মগ্রহণ করেই এত বড় হয়ে গেল যে তাকে তেরো বছরের বালক মনে হত। সেইসময় সে সম্পূর্ণ বেদ এবং ধনুর্বেদ বলতে পারত। ভরদ্বাজ মুনি তাকে যোগশক্তিসম্পন্ন করে তার দেহে জগতের সমস্ত তেজ সঞ্চারিত করে দিলেন।

তারপর রাজকুমার প্রতর্দন যখন দেহে কবচ ও ধনুক ধারণ করলেন, দেবর্ষিগণ তখন তাঁর যশগান করতে লাগলেন। তিনি ঢাল, তলোয়ার নিয়ে ধনুকে টংকার দিয়ে এগোতে লাগলেন। তাঁকে দেখে রাজা দিবোদাস অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে যুবরাজ করে নিজে কৃতকৃত্য হলেন। তারপর দিবোদাস শত্রুদমন প্রতর্দনকে বীতহব্যের পুত্রদের বধ করতে পাঠালেন। পিতার আদেশে সেই শত্রুবিজয়ী বীর হৈহয়নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং রথে চড়ে গঙ্গা পার হয়ে শীঘ্রই সেখানে পৌঁছলেন। তাঁর রথের ভয়ংকর আওয়াজে রণনিপুণ হৈহয় রাজকুমারেরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বিশাল রথে চড়ে নগরের বাইরে এসে বাণবর্ষণ করে প্রতর্দনকে আক্রমণ করলেন। তখন তেজস্বী রাজকুমার প্রতর্দন অস্ত্রবর্ষণ করে শত্রুদের অস্ত্রবর্ষণ বন্ধ করে বজ্র ও অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত বাণ ও ভল্লের আঘাতে তাদের মাথা কেটে ফেললেন। হৈহয় বীরেরা রক্তে প্লাবিত হয়ে শত শত, হাজার হাজার সংখ্যায় ধরাশায়ী হলেন। তখন তাঁদের মূলোৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

পুত্রেরা নিহত হলে রাজা বীতহব্য নগর ত্যাগ করে মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে গিয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করলেন। মহর্ষি ভৃগু রাজাকে অভয় দিলেন। এরমধ্যে রাজকুমার প্রতর্দন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি আশ্রমে গিয়ে বললেন—'এই আশ্রমে মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য কে আছে ? ভৃগুর কাছে গিয়ে আমার আগমন বার্তা জানান, আমি মহর্ষি ভৃগুর দর্শনাকাঙ্ক্ষী।' মহামুনি ভৃগু প্রতর্দনের আগমন বার্তা পেয়ে আশ্রমের বাইরে এসে তাঁকে বিধিমতো আপ্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজেন্দ্র !

বলুন, আমাকে আপনার কী প্রয়োজন ? রাজকুমার মুনিকে তাঁর আগমনের কারণ জানিয়ে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! রাজা

বীতহব্যকে আশ্রম থেকে বার করে দিন, এঁর পুত্রেরা আমার সমস্ত কুল ধ্বংস করেছে, কাশীর প্রান্ত নষ্ট করেছে এবং সমস্ত রত্নরাজি লুট করেছে। এঁর নিজের পরাক্রমের অত্যন্ত অহংকার ছিল ; আমি এঁর শতপুত্রকে নিহত করেছি। এবার এঁকেও বধ করে আমি পিতৃঋণ শোধ করব।' তাঁর কথা শুনে মহর্ষি ভৃগু করুণাঘন হয়ে বললেন—'এখানে কোনো ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহ্মণ।' সত্যবাদী ভৃগুর কথা শুনে প্রতর্দন তাঁকে প্রণাম করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'মুনিবর ! তা যদি হয়, আমি কৃতার্থ হলাম ; কারণ আমার পরাক্রমে এই রাজা তাঁর জাতি ত্যাগ করেছেন। এবার আমাকে যাবার অনুমতি দিন এবং আমার কল্যাণের জন্য আশীর্বাদ করুন।'

মহর্ষি ভৃগু প্রতর্দনকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, তিনি ফিরে গেলেন। এইভাবে ভৃগুর বচনমাত্রে রাজা বীতহব্য ব্রহ্মর্ষি হয়ে গেলেন। ক্ষত্রিয় হয়েও ভৃগুর কৃপায় তিনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হলেন।

দেবর্ষি নারদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূজ্য পুরুষের লক্ষণ জানানো এবং উশীনরের শরণাগত কপোতকে রক্ষা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ত্রিভুবনে কোন্ কোন্ ব্যক্তি পূজনীয় ? তার বিস্তারিত বর্ণনা করুন। আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার জ্ঞান তৃষ্ণা বৃদ্ধি হচ্ছে।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন শোনো। কোনো এক সময়ের কথা, দেবর্ষি নারদ হাতজোড় করে গুণবান ব্রাহ্মণদের পূজা করছিলেন। তাঁকে এইরূপ করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আপনি কাকে নমস্কার করছেন ? আপনার হৃদয়ে যাঁর প্রতি অত্যন্ত সম্মান আছে এবং আপনি যাঁর সামনে মস্তক নত করেন, এরূপ লোকের পরিচয় যদি আমার শোনার উপযুক্ত মনে হয়, তাহলে দয়া করে বলুন।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—গোবিন্দ ! যাঁরা বরুণ, বায়ু, আদিত্য, পর্জন্য, অগ্নি, রুদ্র, স্বামী কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী এবং সরস্বতীকে সর্বদা প্রণাম করেন, তাঁরা আমার প্রণম্য। তপস্যাই যাঁদের ধন, যাঁরা বেদ জ্ঞাতা, সর্বদা বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই পরমপূজনীয় পুরুষদেরই আমি সর্বদা পূজা করে থাকি। যিনি আহারের পূর্বে দেবতার পূজা করেন, অহংকার করেন না, সন্তুষ্ট থাকেন এবং ক্ষমাশীল, তাঁকে আমি প্রণাম করি। যিনি ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, মনকে বশে রাখেন, বিধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সত্য, ধর্ম, পৃথিবী ও গোমাতাকে পূজা করেন, তিনি আমার প্রণম্য ব্যক্তি। যিনি বনে ফলাহার করে তপস্যায় ব্যাপৃত থাকেন, অন্য কোনো প্রকার সম্পদ সংগ্রহ করেন না এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ হন, আমি সর্বদা তাঁর সামনে মাথা নত করি। যিনি মাতা-পিতা এবং পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে সক্ষম, যিনি সর্বদা অতিথি সেবার ব্রতধারণ করেছেন এবং যিনি দেবযজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই শুধু আহার করেন, তাঁকে আমি প্রণাম করি। যিনি বেদাধ্যয়ন করে অসামান্য এবং বাক্‌পটু হন, ব্রহ্মচর্য পালনে এবং যজ্ঞ করানো ও বেদ-পড়ানোতে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁকে আমি সর্বদাই পূজা করি। যিনি সর্বদা সমস্ত প্রাণীর ওপর প্রসন্ন থাকেন এবং সূর্যোদয় থেকে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বেদস্বাধ্যায় করেন, তিনি আমার পূজ্য। যিনি গুরুকে প্রসন্ন করতে এবং স্বাধ্যায় করার জন্য সর্বদা যত্নশীল থাকেন, যাঁর ব্রত কখনো ভঙ্গ হয় না, যিনি গুরুজনের সেবা করেন এবং কারো দোষ দেখেন না, তাঁকে আমি প্রণাম করি। যিনি সুন্দর ব্রত পালনকারী, মননশীল, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং হব্য-কব্য গ্রহণকারী, তিনি আমার নমস্কারের যোগ্য। যিনি গুরুকুলে বাস করে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, তপস্যায় যাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, যিনি কখনো অর্থ বা সুখ চিন্তা করেন না, তাঁর কাছে আমি মাথা নত করি।

যদুনন্দন ! যাঁর মনে মমতা নেই, যিনি দ্বন্দ্বাতীত হয়েছেন, যিনি সর্বস্বসহ লজ্জাও পরিত্যাগ করেছেন, যাঁর সংসারে কোনো প্রয়োজন নেই, যিনি বেদের শক্তিলাভ করে দুর্ধর্ষ, প্রবচন করায় কুশল এবং ব্রহ্মবাদী, যিনি অহিংসা ও সত্যের ব্রত নিয়েছেন এবং যিনি ইন্দ্রিয়-সংযম এবং মনোনিগ্রহের সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন, তিনি আমার প্রণামের যোগ্য। যে গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ কপোত-বৃত্তিতে থেকে সর্বদা দেবতা এবং অতিথি পূজায় ব্যস্ত থাকেন, তাঁর চরণে

আমি মাথা নত করি। যাঁর কার্যে ধর্ম-অর্থ-কাম তিনের নির্বাহ হয়, কোনো একটিরও হানি না হয় এবং যিনি সর্বদা শিষ্টাচারে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁকে আমি নমস্কার করি। যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ত্রিবর্গের মঙ্গলকামী, লোভহীন এবং পুণ্যশীল হন, তিনি আমার বন্দনীয়। যিনি নানাপ্রকার ব্রত পালনকালে শুধুমাত্র জল বা বায়ু পান করে থাকেন এবং যজ্ঞশেষে অন্নভোজন করেন, তাঁর চরণে আমি প্রণাম করি। যিনি নারী-পরিগ্রহরহিত, অগ্নিহোত্রের আশ্রয় নিয়েছেন, বেদই যাঁর সবথেকে বড় আশ্রয় এবং যিনি সব প্রাণীকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাঁকে আমি বন্দনীয় বলে মনে করি। যিনি লোকের কল্যাণ করেন, জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, উত্তম কুলে যাঁর জন্ম, যিনি অজ্ঞাননাশকারী, সূর্যের ন্যায় জগতে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, তাঁর সামনেও আমি সর্বদা মাথা নত করে থাকি।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! আপনিও সর্বদা ব্রাহ্মণদের পূজা করুন। যিনি সকলের অতিথি সৎকার করেন, গো-ব্রাহ্মণ এবং সত্যের ওপর ভালোবাসা রাখেন, তিনি কঠিন সংকট অবলীলায় অতিক্রম করে থাকেন। যিনি সর্বদা মনকে বশে রাখেন, কারো দোষে দৃষ্টি দেন না এবং প্রত্যহ স্বাধ্যায়ে রত থাকেন, তিনি মহাসংকট থেকে উদ্ধার পেয়ে যান। যিনি সব দেবতাদের পূজা করেন, একমাত্র বেদের আশ্রয় নেন, শ্রদ্ধা রাখেন এবং ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করেন, তিনিও বহু বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন। যিনি ব্রত পালন করেন এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দান ও নমস্কার করেন, তিনি দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করেন। তপস্বী, আবাল্য ব্রহ্মচারী, তপস্যাদ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণসম্পন্ন, দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃদেবের পূজাকারী এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোক্তা ব্যক্তিও দুর্গম বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যান। যিনি অগ্নিস্থাপন করে যথা নিয়মে প্রণাম করে সেটি সর্বদা প্রজ্বলিত করে রাখেন এবং যিনি সোম যজ্ঞে বিধিবৎ আহুতি করেন, তিনি সংকট পার হয়ে যান এবং যিনি আপনার মতো সর্বদা মাতা-পিতা ও গুরুজনদের সম্মান করেন, তাঁরও দুঃখ দূর হয়।

এই বলে নারদ উপদেশ শেষ করলেন । একটু পরে ভীষ্ম পুনরায় জানালেন, কুন্তীনন্দন ! তুমিও সর্বদা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ এবং অতিথিদের পূজা করে থাকো, সুতরাং তুমিও মনোবাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হবে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ, তাই আপনার কাছ থেকে ধর্মবিষয়ক কথা শুনতে চাই। এবার দয়া করে বলুন যাঁরা তাঁদের শরণাগত অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ—এই চার প্রকারের প্রাণীদের রক্ষা করেন, তাঁরা কী ফল প্রাপ্ত করেন ?

ভীষ্ম বললেন—ধর্মনন্দন ! শরণাগতকে রক্ষা করলে যে মহান ফল লাভ হয়, সেই বিষয়ে তুমি এক প্রাচীন কাহিনী শোনো। কোনো এক সময়ের কথা, একটি বাজপাখি এক সুন্দর পায়রাকে আহারে উদ্যত হয়েছিল। পায়রাটি ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে মহাভাগ রাজা বৃষদর্ভের (উশীনর-নরেশের) শরণ নিয়েছিল। রাজা অত্যন্ত পুণ্যবান ছিলেন। তিনি যখন পায়রাটিকে ভীত হয়ে তাঁর ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে দেখলেন তখন তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'কপোত ! এবার আর কোনো প্রাণী থেকে ভয় পাবার কিছু নেই ; কিন্তু তুমি বলো, কেন এবং কে তোমাকে ভীতি প্রদান করেছে ? তুমি কী অপরাধ করেছ ? যার জন্য ভয় পেয়ে এখানে এসেছ ? আমি তোমাকে অভয় প্রদান করছি, তুমি আমার কাছে আসাতে আর কেউ তোমাকে ধরবার চেষ্টা করবে না। আমার এই কাশীরাজ্য এবং এই জীবন তোমার জন্য উৎসর্গ করব। বিশ্বাস রাখ, এখন তোমার আর কোনো ভয় নেই।'

তখনই বাজপাখি সেখানে এসে হাজির হয়ে বলল—'রাজন্ ! এই কপোত আমার খাদ্য। এর মাংস, মজ্জা, রক্ত ও মেদ আমার পক্ষে উপকারী। এর দ্বারা আমার ক্ষুধা দূর হবে এবং আমি পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করব। আপনি আমাকে বাধা দেবেন না। আমি ক্ষুধার্ত, অনেক দূর থেকে আমি এর অনুসরণ করে এসেছি। আমার নখের আঘাতে কপোত বেশ আহত হয়েছে, এ মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে। আপনি একে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন না। আপনাকে রাজা করা হয়েছে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য। ক্ষুধার্ত পাখির আহারে বাধা দেওয়ার আপনার কোনো অধিকার নেই। যদি আপনার শক্তি থাকে, তাহলে শত্রু, অনুচর, স্বজন এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির ওপর আপনি আপনার পরাক্রম দেখান। আকাশচারীদের ওপর পৌরুষ প্রদর্শন করবেন না। ধর্মের জন্য যদি কপোতকে রক্ষা করেন, তাহলে আমার মতো ক্ষুধার্ত পাখির কথাও আপনার চিন্তা করা উচিত। সনাতন কাল থেকে দেবতারা কপোতকে বাজপাখির খাদ্যরূপেই নির্দিষ্ট করেছেন। প্রাচীন কাল থেকে লোকেরা

জানে যে বাজপাখি পায়রাকে আহার করে। মহারাজ উশীনর ! যদি পায়রার প্রতি আপনার এত স্নেহ, তাহলে আপনি আমাকে পায়রার সমান ওজনের মাংস আপনার নিজের দেহ থেকে খেতে দিন।'

রাজা বললেন—বাজ ! তুমি একথা বলে আমাকে অনুগৃহীত করেছ। ভালো কথা, আমি তাই করছি।

এই বলে রাজা উশীনর তাঁর মাংস কেটে ওজন করতে লাগলেন। সেই সংবাদ শুনে অন্তঃপুরে রানিরা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এবং হাহাকার করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেবক, মন্ত্রী ও রানিদের বিলাপে সেখানে ভয়ার্ত কোলাহল শোনা গেল। প্রথমে আকাশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু তখন আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। রাজার এই সাহসী কার্য দেখে পৃথিবী কেঁপে উঠল। তিনি নিজের পাঁজর, হাত ও জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে কেটে দাঁড়িপাল্লায় চাপাতে লাগলেন, তবুও তা পায়রার সমান ওজন হচ্ছিল না। যখন রাজার শরীরের মাংস শেষ হয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল, দেহে শুধু অস্থিমাত্র সার দেখা গেল, তখন তিনি মাংসকাটা বন্ধ করে নিজেই ওজনে উঠে বসলেন।

তাই দেখে ইন্দ্রসহ ত্রিলোকের দেবতা রাজা উশীনরের সামনে উপস্থিত হলেন এবং আকাশে ভেরী ও দুন্দুভি বাজতে লাগল। দেবতারা রাজা বৃষদর্ভকে (উশীনরকে) অমৃত দিয়ে স্নান করালেন, তাঁর ওপর দিব্যপুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। এরমধ্যে এক বিমান এসে উপস্থিত হল যা সুবর্ণনির্মিত ও রত্নখচিত ছিল। রাজর্ষি উশীনর তাতে চড়ে সনাতনলোক প্রাপ্ত হলেন। যুধিষ্ঠির ! তোমারও শরণাগত প্রাণীদের এইভাবে রক্ষা করা উচিত। যে ব্যক্তি তার ভক্ত, প্রেমিক এবং শরণাগতকে রক্ষা করে এবং সর্বপ্রাণীর ওপর দয়া রাখে, সে পরলোকে সুখলাভ করে। যে রাজা সদাচারী হয়ে সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, সে নিজ কর্মদ্বারা সব বস্তু প্রাপ্ত হয়। সত্য-পরাক্রমী, ধীর এবং শুদ্ধ হৃদয়সম্পন্ন কাশী-নরেশ রাজর্ষি উশীনর নিজ কর্মদ্বারা ত্রিলোকে বিখ্যাত হয়েছেন। যদি অন্য কোনো ব্যক্তিও এইভাবে শরণাগতকে রক্ষা করে তাহলে সেও রাজা উশীনরের ন্যায় সদ্‌গতি লাভ করবে। রাজর্ষি বৃষদর্ভের এই চরিত্র যে সর্বদা বর্ণনা করবে এবং শ্রবণ করবে, সে পুণ্যাত্মা হবে।

ব্রাহ্মণদের মহত্ত্ব বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজার সমস্ত কর্মে কার গুরুত্ব সর্বাধিক । তিনি কোন কর্মানুষ্ঠান করায় ইহলোক ও পরলোকে সুখী হয়ে থাকেন ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! সিংহাসনে আসীন হয়ে যে রাজা সুখী হতে চান, তাঁর প্রধান কর্তব্য হল ব্রাহ্মণদের সেবা করা। প্রত্যেক রাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সর্বদা সম্মান করা উচিত । নগর এবং নগর প্রান্তে বসবাসকারী বহু শ্রুত ব্রাহ্মণদের মিষ্টবাক্যে, উত্তম ভোগ-সামগ্রী প্রদান করে এবং সাদর সম্মান জানিয়ে পূজা করা উচিত। রাজা যেভাবে নিজেকে এবং নিজ পুত্রদের রক্ষা করেন, ব্রাহ্মণদেরও সেইভাবে রক্ষা করবেন, এই তাঁর প্রধান কর্তব্য। ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পূজনীয় ব্যক্তিদেরও সুস্থির চিত্তে পূজা করবেন ; কারণ তাঁরা শান্তিতে থাকলেই সমস্ত রাষ্ট্র শান্ত এবং সুখী থাকতে পারে। রাজার কাছে ব্রাহ্মণই পিতার ন্যায় পূজনীয়, বন্দনীয় এবং মাননীয়। প্রাণীদের জীবন যেমন বর্ষার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল, তেমনই জগতের জীবনযাত্রাও ব্রাহ্মণদের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা যখন ক্রুদ্ধ হন তখন দাবানলের মতো ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকান। তখন অতি বড় সাহসী ব্যক্তিও ভয় পেয়ে যায়, কারণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে গুণই অধিক পরিমাণে থাকে। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণ ঘাস-ফুলে ঢাকা কূপের মতো নিজ তেজ লুকিয়ে রাখেন এবং কেউ নির্মল আকাশের মতো দেদীপ্যমান হন। কেউ রাগী হন, আবার কেউ নরম প্রকৃতির হয়ে থাকেন। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ চাষবাস ও গোরক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, কোনো ব্রাহ্মণ ভিক্ষার ওপর নির্ভর করেন, কিছু ব্রাহ্মণ সকল কাজেই দক্ষ হন। এইরূপ নানা প্রকারের ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এইসব ধর্মজ্ঞ এবং সৎপুরুষ ব্রাহ্মণদের সর্বদা পূজা করা উচিত। প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণেরা দেবতা, মানুষ, নাগ ও রাক্ষসদের পূজনীয়। এদের মধ্যে কেউই ব্রাহ্মণদের জয় করতে পারে না। ব্রাহ্মণ চাইলে যে দেবতা নয়, তাকেও দেবত্ব দান করতে পারেন, আবার দেবতাকেও দেবত্ব ভ্রষ্ট করে দিতে পারেন। তাঁরা যাঁকে রাজা করতে চান, তিনিই রাজা হতে পারেন। যাঁকে রাজার রূপে দেখতে চান না,

তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রাজন্ ! আমি তোমাকে সত্য বলছি, যে মূর্খ ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে, সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ যাঁর প্রশংসা করেন, তাঁর অভ্যুদয় হয় এবং যাকে শাপ দেন, এক মুহূর্তে তার পরাজয় ঘটে। শক, যবন, কম্বোজ প্রভৃতি জাতিও প্রথমে ক্ষত্রিয়ই ছিল ; ব্রাহ্মণদের উত্তম দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়াতেই তারা ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প এবং মাহিষক ইত্যাদি ক্ষত্রিয়জাতিও ব্রাহ্মণদের কুদৃষ্টি পড়ায় শূদ্রে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়াই কল্যাণপ্রদ, তাঁদের পরাজিত করা ঠিক নয়। কখনো ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা উচিত নয়। যেখানে তাঁদের অযথা নিন্দা হয়, সেখানে মুখ নিচু করে চুপ করে থাকা অথবা উঠে চলে যাওয়া উচিত। এই পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ জন্মায়নি বা জন্মাবে না, যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে সুখে বেঁচে থাকার সাহস করে। হাওয়াকে মুষ্টিবদ্ধ করা, চাঁদকে হাত দিয়ে ছোঁয়া এবং পৃথিবীকে তুলে ধরা যেমন অবাস্তব, তেমনই এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদের ওপর আধিপত্য করা দুষ্কর কর্ম।

সেইজন্য রাজাদের উচিত উত্তম আহার, বস্ত্র এবং মনোবাঞ্ছিত পদার্থ নিয়ে নমস্কার করে সর্বদা স্তন কল্যাণকামী ব্রাহ্মণদের পূজা করা এবং পিতার ন্যায় তাঁদের পালন-পোষণের দিকে দৃষ্টি রাখা, তাহলেই রাজ্যে শান্তি থাকতে পারে। সুতরাং তোমার রাজ্যে পবিত্র এবং ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের অবশ্যই আশ্রয় দেওয়া উচিত। কুলীন, ধর্মজ্ঞ এবং উত্তম ব্রতধারী ব্রাহ্মণকে নিজ গৃহে স্থান দেওয়া উচিত। কারণ ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত হবিষ্যই দেবতারা স্বীকার করেন। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, পৃথিবী, আকাশ, দিক—এই সবের অধিষ্ঠাতা দেবতা সর্বদা ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করে অন্নগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ যার অন্নগ্রহণ করেন না, পিতৃপুরুষও তার অন্ন স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণকে দ্বেষকারী পাপী পুরুষের অন্ন, দেবতাও গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হলে দেবতা এবং পিতৃপুরুষও সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট রাখেন যাঁরা, তাঁরা মৃত্যুর পর উত্তম গতি লাভ করেন, তাঁদের কোনোদিন বিনাশ হয় না। হবিষ্যদ্বারা ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করলে দেবতা এবং পিতৃগণও তাতে তৃপ্ত হন। প্রজাগণ যার থেকে উৎপন্ন হয়, সেই যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম ব্রাহ্মণ দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

জীব যেখান থেকে উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যুর পর যেখানে যায় সেই পরমাত্মাকে, স্বর্গ এবং নরকের পথ, অতীত ও ভবিষ্যৎকে ব্রাহ্মণই জানেন। যিনি নিজ ধর্মকে জানেন, তিনিই সত্যকার ব্রাহ্মণ। যারা ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে, তাদের কখনো পরাজয় হয় না এবং মৃত্যুর পর তাদের বিনাশ হয় না। ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত বাক্য যারা সাদরে স্বীকার করে, সেই মহাত্মাগণ কখনো পরাভবের সম্মুখীন হন না। তেজ ও বলে তাপিত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হলেই তাদের তেজ ও বল শান্ত হয়ে যায়। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তালজঙ্ঘ, অঙ্গিরার সন্তানেরা নীপবংশী রাজাদের এবং ভরদ্বাজ হৈহয় ও ইলার পুত্রদের পরাস্ত করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের কাছে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তা সত্ত্বেও কৃষ্ণমৃগচর্মধারণকারী ব্রাহ্মণেরা তাদের পরাজিত করেছিল। জগতে যা কিছু বলা, শোনা বা পড়া যায়, সে-সবই তুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অগ্নির ন্যায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে অবস্থিত থাকে।

এই বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পৃথিবীর সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'কল্যাণী ! তুমি সমস্ত প্রাণীর মা, তাই আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করি, গৃহস্থ মানুষ কোন কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজ পাপ নাশ করতে সক্ষম ?'

পৃথিবী বললেন—তারজন্য মানুষকে ব্রাহ্মণদের সেবা করা উচিত। এটিই সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও উত্তম কাজ। ব্রাহ্মণদের সেবাকারী ব্যক্তির সমস্ত দোষ নষ্ট হয়ে যায়। ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং উত্তম বুদ্ধিও ব্রাহ্মণের থেকেই প্রাপ্তি হয়। উত্তম জাতিসম্পন্ন, ধর্মজ্ঞ, উত্তম ব্রত পালনকারী এবং পবিত্র ব্রাহ্মণের নিত্য সেবা করা উচিত। মাধব ! দেখুন ব্রাহ্মণগণ নিজ প্রভাবে চাঁদে কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছেন, সমুদ্রের জল নোনতা করে দিয়েছেন এবং ইন্দ্রের দেহে এক হাজার চিহ্ন উৎপন্ন করেছেন। তাঁদেরই প্রভাবে সেই চিহ্নগুলি নেত্র-রূপে পরিণত হয়েছে ; যার জন্য ইন্দ্রকে 'সহস্রাক্ষ' বলা হয়। তাই যারা কীর্তি, ঐশ্বর্য এবং উত্তমলোক প্রাপ্ত করতে চায়, তাদের ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করা উচিত।

ভীষ্ম বললেন—পৃথিবীর কথা শুনে ভগবান মধুসূদন তার প্রশংসা করে বললেন—'আহা ! তুমি খুব ভালো কথা বলেছ।' যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণদের এই মাহাত্ম্য শুনে

তোমার সর্বদা পবিত্রভাবে তাঁদের পূজা করা উচিত, তাতে তোমার কল্যাণ হবে। মহাভাগ্যশালী ব্রাহ্মণ জন্ম হতেই সমস্ত প্রাণীদের বন্দনীয়, গৃহস্থের অতিথি এবং প্রথমে আহার করার অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ সর্ব অর্থ সিদ্ধিকারী, সকলের সুহৃদ এবং দেবতাদের মুখ ও পূজিত হওয়ায় তাঁরা মঙ্গলকামনা এবং আশীর্বাদ দিয়ে মানুষের কল্যাণচিন্তা করেন। পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের পূর্ববৎ উৎপন্ন করে তাঁদের বুঝিয়েছিলেন যে, তোমাদের জন্য স্বধর্ম পালন এবং ব্রাহ্মণদের সেবা করা ব্যতীত অন্য কোনো কর্তব্য নেই। ব্রাহ্মণকে রক্ষা করলে তিনি তাঁর রক্ষককে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মণকে সেবা করলে তোমাদের কল্যাণ হবে। বিদ্বান ব্রাহ্মণদের শূদ্রোচিত কর্ম করা উচিত নয়। শূদ্রের কর্ম করলে তাঁর ধর্ম নষ্ট হয়। স্বধর্ম পালন করলে লক্ষ্মী, বুদ্ধি, তেজ এবং প্রতাপযুক্ত ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং স্বাধ্যায়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয়। ব্রাহ্মণ আহুনীয় অগ্নিতে স্থিত দেবতাগণকে যজ্ঞে তৃপ্ত করে অত্যন্ত তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠেন। দ্বিজগণ ! তোমরা যদি কোনো প্রাণীর বিরাগভাজন না হয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযম করে স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকো, তবে তোমাদের সর্ব কামনা পূর্ণ হবে। মনুষ্যলোকে এবং দেবলোকে যা কিছু ভোগ্যসামগ্রী আছে, তা সবই জ্ঞান, নিয়ম এবং তপস্যাদ্বারা লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির ! বুদ্ধিমান ব্রহ্মা এইভাবে ব্রাহ্মণদের কৃপাপূর্বক যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, আমি সেই ব্রহ্মগীতা তোমাকে শোনালাম। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কান্বশিরা, শৌণ্ডিক, দরদ, দার্ব, চৌর, শবর, বর্বর, কিরাত এবং যবন—এরা সকলেই প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল ; কিন্তু ব্রাহ্মণের কোপে এরা পতিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের তিরস্কারে অসুরদের সমুদ্রে (নোনাজলে) বাস করতে হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের কৃপাতেই দেবগণ স্বর্গ নিবাসী হয়েছেন। যেমন আকাশকে স্পর্শ করা, হিমালয়কে নড়ানো, বাঁধ দিয়ে গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ করা অসম্ভব, তেমনই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদের পরাজিত করাও অসম্ভব। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধ করে ভূমণ্ডলে রাজত্ব করা যায় না ; কারণ ব্রাহ্মণ মহাত্মা এবং দেবতাদেরও দেবতা। যুধিষ্ঠির ! তুমি যদি সসাগরা পৃথিবী ভোগ করতে চাও তাহলে দান ও সেবার দ্বারা সর্বদা ব্রাহ্মণদের পূজা করো। দান গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণদের তেজ শান্ত হয়ে যায়, তাই যাঁরা দান গ্রহণ করেন না, সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা তোমার কুল রক্ষা করা উচিত।

এই ব্যাপারে ইন্দ্র এবং শম্বরাসুরের কথোপকথনরূপ এক প্রাচীন কাহিনীর উদাহরণ দেওয়া হয়, সেটি শোনো। কোনো এক সময়ের কথা, দেবরাজ ইন্দ্র রজোগুণসম্পন্ন জটাধারী তপস্বীর রূপ ধরে একটি নড়বড়ে রথে করে অপরিচিত ব্যক্তির রূপে শম্বরাসুরের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি শম্বরাসুরকে প্রশ্ন করলেন—'শম্বরাসুর ! তুমি কী উপায়ে তোমার জাতির লোকেদের শাসন করো ? এরা তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানে কেন ? ঠিক করে সব বলো।'

শম্বরাসুর বলল—'আমি কখনো ব্রাহ্মণদের দোষ দেখি না। তাঁদের মতকেই নিজের মত বলে মনে করি এবং শাস্ত্র বাক্যের উপদেশ প্রদানকারী বিপ্রদের সম্মান করি তাঁদের সুখপ্রদান করার চেষ্টা করি। তাঁদের কথা কখনো অবহেলা করি না, কখনো তাঁদের কাছে কোনো অপরাধ করি না, তাঁদের পূজা করে কুশল জিজ্ঞাসা করি, তাঁদের প্রণাম করি। ব্রাহ্মণেরাও অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণেরা অসাবধানে থাকলেও আমি সর্বদা সাবধানে থাকি। তাঁরা নিদ্রা গেলেও আমি জেগে থাকি। তাঁরা আমাকে শাস্ত্রীয় অনুশাসন পালনকারী, ব্রাহ্মণভক্ত এবং দোষদৃষ্টিরহিত জেনে সদুপদেশরূপ অমৃতবর্ষণ করেন। সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা আমাকে যা বলেন, আমি একান্তচিত্তে তা গ্রহণ করি। আমার মন সর্বদা ব্রাহ্মণে সন্নিবিষ্ট থাকে এবং তাঁদের অনুকূলে সব সময় কাজ করি। তাঁদের বাক্যে যে উপদেশের মধুর রস প্রবাহিত হয়, তা আস্বাদন করতে থাকি। তাই নক্ষত্রের ওপর চন্দ্রের ন্যায় আমি আমার জাতির লোকেদের শাসন করি। ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত শাস্ত্র উপদেশ শুনে সেই অনুযায়ী আচরণ করাই পৃথিবীতে সর্বোত্তম অমৃত এবং সর্বোত্তম দৃষ্টি। আমার পিতা এটি জেনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি মহাত্মা ব্রাহ্মণদের মহিমা দেখে চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ব্রাহ্মণেরা কীভাবে সিদ্ধিলাভ করেছেন ?'

চন্দ্র বললেন—সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তপস্যাদ্বারাই সিদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছেন। এঁরা বাক্যের দ্বারা বল প্রাপ্ত হন। প্রথমে গুরুগৃহে বাস করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে, ক্লেশ সহ্য করে, প্রণবসহ বেদাধ্যয়ন করা উচিত। শেষে ক্রোধ ত্যাগ করে শান্তভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। সন্ন্যাসীর সর্বত্র সমদৃষ্টি বজায় রাখা উচিত। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বেদ নিজ পিতৃগৃহে

থেকে অধ্যয়ন করেন, তিনি জ্ঞানী এবং প্রশংসনীয় হলেও বিদ্বানেরা তাঁকে গ্রাম্য বলে থাকেন (প্রকৃতপক্ষে গুরুগৃহে বাস করে বেদ অধ্যয়ন করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়)। যুদ্ধ করে না যে ক্ষত্রিয় এবং প্রবাসে থাকে না যে ব্রাহ্মণ, তাদের এই পৃথিবী সমাদর করে না। মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যে অহংভাব হয়, তাতে তাদের লক্ষ্মীনাশ হয়। কন্যা গর্ভধারণ করলে এবং ব্রাহ্মণ সর্বদা গৃহে থাকলে তাদের দূষিত বলে মনে করা হয়।

আমার পিতা চন্দ্রের কাছে এই কথা শুনে ব্রাহ্মণদের পূজা করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসারে আমিও উত্তম ব্রতধারী ব্রাহ্মণদের পূজা করি।

ভীষ্ম বললেন—দানবরাজ শম্বরের কাছে এই কথা শুনে ইন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূজা করেন এবং তাতেই তিনি মহেন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হন।

দানের যোগ্য পাত্র পুরুষদের পরীক্ষা এবং স্ত্রীরক্ষা বিষয়ে দেবশর্মা ও বিপুলের কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! দানের পাত্র কে ? অপরিচিত ব্যক্তি অথবা বহুদিন ধরে একত্রে বসবাস করে এমন ব্যক্তি অথবা দূরদেশ থেকে আগত ব্যক্তি ? এদের মধ্যে যোগ্যপাত্র কে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ কর্মের কারণে দানের পাত্র আবার কিছু লোক মৌনব্রতের পালনের জন্য। যে ব্যক্তি (যজ্ঞ অথবা গুরুদক্ষিণা ইত্যাদি দেওয়ার উদ্দেশ্যে) কোনো বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন তিনিও দানের পাত্র। আত্মীয়স্বজনকে কষ্ট না দিয়ে দান করা উচিত। যাঁর ওপর ভরণপোষণের ভার থাকে, ভরণীয় পোষ্যবর্গকে কষ্ট দিয়ে অন্যকে দান করলে তিনি পতিত হন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আগে থেকে পরিচিত নয় অথবা যে ব্যক্তি বহুদিন ধরে একসঙ্গে থেকেছে, অথবা দূর দেশ থেকে এসেছে—বিদ্বান ব্যক্তিরা এই তিনপ্রকার ব্যক্তিকে দানের যোগ্য পাত্র মনে করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কেউ যাতে দুঃখ না পায় এবং ধর্ম পালনেও যাতে বাধা সৃষ্টি না হয় দান এইভাবে করা উচিত ; কিন্তু দানের যোগ্যপাত্র কীভাবে চেনা যায় ? যাতে তাকে দান করে পরে অনুতাপ না হয় ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য, শিষ্য, সম্বন্ধী, বান্ধব, বিদ্বান এবং দোষদৃষ্টিবর্জিত ব্যক্তি—এরা সকলেই পূজনীয় এবং মাননীয়। এর বিপরীত আচরণকারী ব্যক্তি আপ্যায়নের যোগ্য নয়। সুতরাং ভালো করে ভেবে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত। অক্রোধ, সত্যপরায়ণ, অহিংসা, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা, দ্রোহ এবং অহং-অভিমানবর্জিত, লজ্জা, সহনশীলতা এবং মনোনিগ্রহ —যার মধ্যে এইসব গুণ স্বভাবত দেখা যায় এবং অন্য কোনো দুর্গুণ চোখে না পড়ে, সেই ব্যক্তিই দান ও সম্মানের যোগ্য পাত্র। যে ব্যক্তি বহুদিন ধরে সঙ্গে থাকে, সেও দানের পাত্র এবং যে হঠাৎ জরুরি প্রয়োজনে উপস্থিত হয়েছে, সে পরিচিত হোক বা অপরিচিত, সেও দান ও সম্মানের যোগ্য। বেদগুলিকে অপ্রামাণিক বলে মনে করা, শাস্ত্র নির্দেশ উল্লঙ্ঘন করা এবং সর্বত্র অব্যবস্থা করে রাখা, এসবই বিনাশের কারণ। যে ব্রাহ্মণ নিজের পাণ্ডিত্যের দর্পে বৃথা তর্কের আশ্রয় নিয়ে বেদসমূহের নিন্দা করে, সৎ ব্যক্তিদের সভায় মিথ্যা তর্ক করে জয়লাভ করে, শাস্ত্রানুকূল যুক্তির ধার ধারে না, উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করে এবং অত্যধিক কথা বলে, সকলকে সন্দেহ করে, বালক ও মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করে কঠোর বাক্য বলে, এরূপ ব্যক্তিকে অস্পৃশ্য বলে বুঝতে হবে। বিদ্বানদের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির আচরণ কুকুরের সমান। কুকুর যেমন চিৎকার করতে থাকে এবং কামড়াতে আসে, তেমনই ওই ব্যক্তিও তর্ক করতে এবং শাস্ত্রবচন খণ্ডন করার জন্য ঘুরে বেড়ায় (এরূপ ব্যক্তি দানের যোগ্য পাত্র নয়)। জাগতিক ব্যবহারের প্রতি মানুষকে দৃষ্টি দিতে হয়, ধর্ম ও নিজ কল্যাণের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে সর্বদা নিজের উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তি (যাগ-যজ্ঞ করে) দেবতাদের, (বেদাদির স্বাধ্যায় করে) ঋষিদের, (সৎপুত্রের জন্ম দেয় এবং শ্রাদ্ধ করে) পিতৃপুরুষকে, (দান দিয়ে) ব্রাহ্মণদের এবং (অতিথি-সৎকার করে) অতিথিদের ঋণ থেকে মুক্ত হয় এবং ক্রমশ বিশুদ্ধ (নিষ্কাম) ও বিনয়যুক্তভাবে

শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই গৃহস্থ কখনো ধর্মভ্রষ্ট হয় না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এই জগতে পুরুষ কীভাবে তরুণী নারীদের রক্ষা করবে ? যারা সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য করে তোলে এবং ভালো ব্যবহার করলে বা না করলেও মনে বিকার উৎপন্ন করে, এরূপ নারীদের কে রক্ষা করতে পারে ? যদি কোনোভাবে তাদের রক্ষা করা সম্ভবপর হয় অথবা পূর্বে কেউ তাদের রক্ষা করে থাকে তাহলে তা আমাকে বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—মহাবাহো ! তুমি নারীদের বিষয়ে যা বলছ, তা ঠিকই, এতে অসত্য কিছু নেই। এই ব্যাপারে আমি তোমাকে পুরাতন এক কাহিনী বলছি, তাতে মহাত্মা বিপুল কীভাবে তাঁর গুরুপত্নীকে রক্ষা করেছিলেন, তা বর্ণিত আছে। প্রকৃতপক্ষে তরুণী নারীরা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়। তারা ময়দানব নির্মিত মায়া। ক্ষুরের ধার, বিষ, সর্প এবং অগ্নি একদিকে, আর নারীরা অন্যদিকে। প্রাচীন কালের কথা, দেবশর্মা নামে এক মহা প্রসিদ্ধ সৌভাগ্যশালী ঋষি ছিলেন। রুচি নামে তাঁর এক পত্নী ছিলেন, যিনি ছিলেন পৃথিবীর অদ্বিতীয়া সুন্দরী নারী। তাঁর রূপে দেবতা, দানব, গন্ধর্বও মত্ত হয়ে যেত। ইন্দ্র তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন। মহামুনি দেবশর্মা স্ত্রীচরিত্রের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন এবং এও জানতেন যে দেবরাজ ইন্দ্র নারীর প্রতি অত্যন্ত মোহ। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত যত্নে রক্ষা করতেন। একবার তিনি যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন চিন্তা করলেন—'আমি যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত হলে আমার স্ত্রীকে কেমন করে রক্ষা করব ?' তারপর মনে মনে তাঁর রক্ষার উপায় নিশ্চিত করে সেই মহাতপস্বী ভৃগু-গোত্রে জাত তাঁর প্রিয় শিষ্য বিপুলকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আমি যজ্ঞ করতে যাচ্ছি, তুমি আমার পত্নী রুচিকে নিজ শক্তিতে রক্ষা কোরো। কারণ দেবরাজ ইন্দ্র একে অধিকার করবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। অতএব তুমি সর্বদা সাবধানে থাকবে ; ইন্দ্র নানাপ্রকার রূপ ধারণ করতে সক্ষম।'

বিপুল অত্যন্ত জিতেন্দ্রিয় এবং উগ্র তপস্বী ছিলেন, তাঁর দেহকান্তি ছিল অগ্নি ও সূর্যের মতো এবং তিনি সত্যবাদী ও ধর্মজ্ঞ ছিলেন। গুরুর নির্দেশ শুনে তিনি বললেন—'যথা আজ্ঞা গুরুদেব, আমি তাই করব।' তারপর গুরু গমনোদ্যত হলে বিপুল জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনে ! ইন্দ্র কী কী রূপ ধারণ করে থাকেন ? তাঁর শরীর এবং তেজ কেমন ? কৃপা করে আমাকে এসব বলুন।'

দেবশর্মা বললেন—'পুত্র ! ইন্দ্র অত্যন্ত মায়াবী, সে বারংবার বহুপ্রকার রূপ পরিবর্তন করে। কখনো মাথায় মুকুট, হাতে বজ্র এবং ধনুক, কানে কুণ্ডল ধারণ করে আসে আবার পরমুহূর্তেই চণ্ডালের মতো রূপ ধারণ করে। কখনো হৃষ্ট-পুষ্ট বিশাল দেহ ধারণ করে, কখনো মলিন বস্ত্র পরে দীন-দুঃখী রূপে দেখা দেয়। নিজ দেহের রং কখনো ফর্সা, কখনো শ্যামল আবার কখনো কালো করে রাখে। এক মুহূর্তে কুরূপ ধারণ আবার পরমুহূর্তেই রূপবান হয়ে ওঠে। কখনো বৃদ্ধ সাজে কখনো যুবক। সে টিয়াপাখি, কাক, কোকিল, হাঁস, সিংহ, বাঘ, হাতি, দেবতা এবং দৈত্য—সকলেরই রূপ ধারণ করতে সক্ষম। এমনকী মশা বা মাছির রূপও ধারণ করতে পারে। কেউই তাকে ধরতে পারে না। অন্যের তো কথাই নেই, এমনকী যিনি এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করেছেন, সেই বিধাতাও তাকে বশে আনতে পারেন না। অন্তর্ধান করা ইন্দ্রকে শুধুমাত্র জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যেই দেখা যায়। এইভাবে সে বহুরূপ ধারণ করে, সুতরাং তুমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমার স্ত্রী রুচিকে রক্ষা করবে, যাতে যজ্ঞের জন্য সংরক্ষিত অন্ন ভক্ষণকারী সারমেয়র মতো ইন্দ্র তাকে স্পর্শ করতে না পারে।'

এই বলে মহাভাগ দেবশর্মা মুনি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। গুরুর কথা শুনে বিপুল অত্যন্ত চিন্তান্বিত হলেন এবং গুরুপত্নীকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন—'গুরু-পত্নীকে রক্ষার জন্য আর কী উপায় করব ? মায়াবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং পরাক্রমশালীও। আশ্রম অথবা কুটিরের দ্বার বন্ধ করলেই তার আসা বন্ধ করা যাবে না। কেননা সে নানাপ্রকার রূপধারণ করতে সক্ষম। হয়তো বায়ুর রূপ ধরেই গৃহে প্রবেশ করে গুরুপত্নীকে স্পর্শ করবে। অতএব আমি

রুচির শরীরে প্রবেশ করে থাকব, পুরুষার্থের দ্বারা এঁকে রক্ষা করা যাবে না, কারণ ইন্দ্র বহুরূপী। যোগবলের সাহায্যেই আমি রুচিকে রক্ষা করব। আমার সূক্ষ্ম অবয়বের দ্বারা আমি এঁর প্রত্যেক অবয়বে প্রবেশ করব। যদি তা করতে পারি, তাহলে আমার দ্বারা এক আশ্চর্যজনক কাজ করা হবে। পদ্মপাতার ওপর জল যেমন নির্লিপ্তভাবে স্থির থাকে, আমিও তেমনভাবে অনাসক্ত হয়ে গুরুপত্নীর মধ্যে নিবাস করব। আমি রজোগুণ থেকে মুক্ত, আমার দ্বারা কোনো অপরাধ হওয়া সম্ভব নয়। এভাবে আমি অত্যন্ত সাবধানে গুরু-পত্নীর শরীরে বাস করব।' এইরূপে ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে, বেদ-শাস্ত্রাদি বিচার করে এবং নিজের ও গুরুর তপস্যাকে মনে রেখে বিপুল গুরুপত্নীকে রক্ষা করার উপরিউক্ত উপায়ই ঠিক করলেন। তারপর তিনি রুচির কাছে বসে নানাপ্রকার কথায় তাঁকে ব্যস্ত করে রাখলেন। এরপর নিজের দুই চোখ তাঁর দুই চোখে নিবিষ্ট করলেন এবং নিজের চোখের কিরণ তাঁর চোখের কিরণে জুড়ে দিয়ে সেই পথ দিয়ে আকাশে প্রবিষ্ট হওয়া বায়ুর ন্যায় রুচির শরীরে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি ছায়ার মতো অন্তর্হিত হয়ে কোনো প্রকার চেষ্টা না করেই গুরুপত্নীর দেহ নিশ্চেষ্ট করে স্থিত হয়ে গেলেন। যতদিন তাঁর গুরু যজ্ঞ সমাপ্ত করে না ফিরে এলেন, ততদিন এইভাবে তিনি গুরু-পত্নীকে রক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর এরমধ্যে একদিন দিব্য রূপধারী ইন্দ্র, রুচিকে লাভ করার জন্য উপযুক্ত সময় ভেবে সেখানে এলেন এবং অত্যন্ত রূপবান পুরুষের রূপধারণ করে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। সেখানে প্রবেশ করে ইন্দ্র দেখলেন বিপুলের দেহ চিত্রের মতো নিশ্চল, চক্ষু স্থির হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে মনোহর নয়না চন্দ্রমুখী রুচি বসে আছেন। রুচি ইন্দ্রকে দেখে উঠে দাঁড়াতে গেলেন, তাঁর সুন্দর রূপ দেখে রুচি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন যে 'তুমি কে ?' বিপুল রুচির ওঠার আগ্রহ দেখে যোগবলে তাঁকে নিশ্চেষ্ট করে দিলেন। তখন দেবরাজ অত্যন্ত মধুর স্বরে তাঁকে বললেন—'সুন্দরী ! আমি দেবতাদের রাজা ইন্দ্র, তোমার জন্যই এখানে এসেছি। তোমার কথা মনে আসতেই কামের বশীভূত হয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। এখন দেরি কোরো না, সময় চলে যাচ্ছে।' ইন্দ্রের কথা গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থিত বিপুলও শুনলেন এবং ইন্দ্রকে দেখলেন ; কিন্তু তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকায় রুচি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। গুরুপত্নীর ব্যবহার দেখে বিপুল তাঁর মনোভাব বুঝে গেলেন, তাই তিনি যোগবলে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখলেন এবং যোগবন্ধন দ্বারা তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি বন্ধন করে রাখলেন।

যোগবলের দ্বারা মোহিত রুচিকে নির্বিকার দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি আবার বললেন—'সুন্দরী ! এসো, এসো।' একথা শুনে রুচি তাঁকে কোনো অনুকূল উত্তর দিতে চাইলেন, কিন্তু বিপুল তাঁর কথা উল্টোপাল্টা করে দিলেন। তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হল—'আরে ! তুমি এখানে কী প্রয়োজনে এসেছ ?' অন্যের বশ হওয়ায় এই উদাসীনতাপূর্ণ কথা বলে রুচি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন আর ইন্দ্রও অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিনি রুচির ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করে, দিব্যদৃষ্টিতে তাঁর শরীর অবস্থিত বিপুল মুনিকে দেখতে পেলেন। দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় রুচির দেহে ঘোর তপস্যায় মগ্ন বিপুল মুনিকে দেখে ইন্দ্র কম্পিত হলেন। অভিশাপের ভয়ে তাঁর সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল। তখন মহাতপস্বী বিপুল গুরু-পত্নীর শরীর পরিত্যাগ করে নিজ দেহে প্রবেশ করে ভীত সন্ত্রস্ত ইন্দ্রকে বললেন—'পাপী পুরন্দর ! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নীচ, তুমি সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে থাকো। দেবতা এবং মানুষ তোমাকে আর বেশিদিন পূজা করবে না। তুমি কি সেই দিনের কথা ভুলে গেছ, যখন গৌতম তোমার সমস্ত দেহে ভগ চিহ্ন দিয়ে তোমাকে জীবিত ছেড়েছিল ? তোমার কি আর সেই ঘটনা মনে নেই ? আমি জানি তুমি মূর্খ, তোমার মন তোমার বশে নেই এবং তুমি মহাচঞ্চল। পাপী ! দূর হয়ে যাও এখান থেকে ; আমি এই নারীকে রক্ষা করছি। তোমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমি তোমাকে ভস্ম করতে চাই না ; কিন্তু আমার বুদ্ধিমান গুরু অত্যন্ত ভয়ংকর, তোমাকে দেখলে তিনি তাঁর ক্রোধদীপ্ত চক্ষুর তেজে তখনই তোমাকে ভস্ম করে ফেলবেন। আর কখনো এমন কাজ কোরো না, নচেৎ এমন হবে যে তোমাকে ব্রহ্মতেজের প্রভাবে পুত্র-মন্ত্রীসহ বিনাশ হতে হবে। তুমি যদি নিজেকে অমর মনে করে এই কাজ করো তাহলে (তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি) এভাবে কারো শীল নষ্ট কোরো না। তপস্যার দ্বারা কোনো কিছুই অসাধ্য নয় (অর্থাৎ তপস্বী অমর

ব্যক্তিকেও বধ করতে পারে)।'

ভীষ্ম বললেন—মহাত্মা বিপুলের কথায় ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কিছু না বলে নিঃশব্দে অন্তর্ধান করলেন। তিনি যাওয়ার পরমুহূর্তে মহাতপস্বী দেবশর্মা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যজ্ঞ পূর্ণ করে আশ্রমে ফিরে এলেন। গুরু ফিরে আসায় তাঁর প্রিয় কার্য সম্পন্নকারী বিপুল তাঁকে প্রণাম করে তাঁর সুরক্ষিতা পত্নী সতী-সাধ্বী রুচিকে তাঁর নিকট সমর্পণ করলেন। তারপর শান্তচিত্ত বিপুল পুনরায় আগের মতো নিঃশঙ্কভাবে গুরুর সেবা করতে লাগলেন। গুরুদেব যখন বিশ্রাম নিয়ে তাঁর পত্নীর সঙ্গে বসেছিলেন, তখন বিপুল তাঁকে ইন্দ্রের সমস্ত কাহিনী শোনালেন। সব শুনে সেই প্রতাপশালী মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং বিপুলের শীল, সদাচার, তপস্যা, নিয়ম, গুরুসেবা, তাঁর প্রতি ভক্তি এবং ধর্মে নিষ্ঠা দেখে শিষ্যকে বারংবার সাধুবাদ দিলেন। তারপর সেই ধর্মাত্মা মুনি তাঁর ধর্মপরায়ণ শিষ্য বিপুলকে বরপ্রার্থনা করতে বললেন। গুরুর আদেশে বিপুল বললেন—'সর্বদা ধর্মে যেন আমার স্থিতি থাকে।' গুরু তাঁকে সেই বরপ্রদান করলে, মহাত্মা বিপুল তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে কঠোর তপস্যাতে প্রবৃত্ত হলেন।

কথা গোপন করা সম্বন্ধে বিপুলকে স্মরণ করানো এবং তাঁকে নিয়ে দেবশর্মার সপত্নী স্বর্গে গমন করা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! গুরুপত্নীকে রক্ষা করে এবং প্রচুর তপস্যা করে বিপুল ভাবতে লাগলেন—'আমি দুই লোক জয় করেছি।' তারপর, কিছুদিন কেটে যাবার পর একদিন এক দিব্যলোকের সুন্দরী মনোহর রূপ ধারণ করে আকাশপথে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁর দেহ থেকে কিছু দিব্য সুগন্ধী সুন্দর পুষ্প দেবশর্মার আশ্রমের কাছে মাটিতে পড়ল। রুচি সেই পুষ্পটি তুলে রেখে দিলেন। তাঁর এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, নাম প্রভাবতী। অঙ্গরাজ চিত্ররথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। একবার সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে সুন্দরী রুচি তাঁর চুলে সেই দিব্য ফুল লাগিয়ে অঙ্গরাজের গৃহে গেলেন। অঙ্গরাজরানি ভগিনীর কাছে সেই ফুল দেখে তা আনিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। রুচি আশ্রমে ফিরে এসে তাঁর স্বামীকে সব কথা জানালেন। ঋষি তাঁর স্ত্রীর কথা স্বীকার করে বিপুলকে ডেকে ওইরকম ফুল আনতে আদেশ দিয়ে বললেন—'তুমি শীঘ্র যাও।'

মহাতপস্বী বিপুল গুরুর নির্দেশের কোনো অন্যথা না করে 'যথা আজ্ঞা' বলে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে যেস্থানে আকাশ থেকে ফুল পড়েছিল, সেখানে গেলেন। সেখানে আরও অনেক ফুল পড়েছিল, তখনও সেগুলি শুকনো হয়নি। সেই সুন্দর ফুলগুলি পেয়ে বিপুল অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সেগুলি নিয়ে তৎক্ষণাৎ চম্পাবৃক্ষ পরিবেষ্টিত চম্পা নগরীর দিকে রওনা হলেন। এক নির্জন বনে গিয়ে তিনি এক জোড়া নারী-পুরুষ দেখলেন, তাঁরা একে অন্যের হাত ধরে গোলাকারে ঘুরছিলেন। তারমধ্যে একজন গতি বাড়িয়ে দিলেন, অন্যজনের গতি ধীর হওয়ায় দুজনের মনোমালিন্য বেধে গেল। একজন বললেন—'তুমি তাড়াতাড়ি চলছ।' অন্যজন বললেন—'না'। দুজনে এইভাবে একে অপরকে অস্বীকার করতে লাগলেন। এইভাবে ঝগড়া করতে করতে দুজনে বিপুলকে লক্ষ্য করে শপথ করে বললেন—'আমাদের দুজনের মধ্যে যে মিথ্যা কথা বলছে, তার পরলোকে সেই দুর্গতি হবে, যা এই বিপুল প্রাপ্ত করবে।' কিছুপরে বিপুল ছয়জন পুরুষকে দেখতে পেলেন, তাঁরা সোনা-রূপার পাশা নিয়ে জুয়া
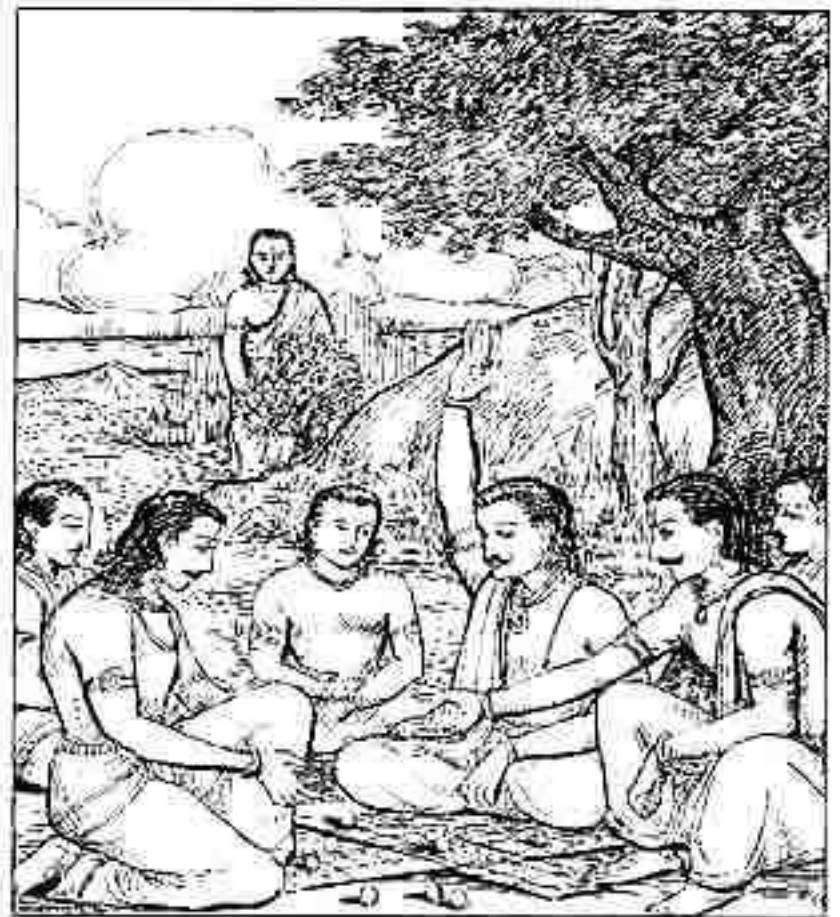
খেলছিলেন এবং লোভ ও হর্ষে উন্মত্ত হয়েছিলেন। তাঁরাও একই শপথ করছিলেন, যা আগে সেই নারী-পুরুষ যুগল করেছিলেন। তাঁরা বিপুলকে লক্ষ্য করে বললেন—'আমাদের মধ্যে যে লোভবশত অন্যথা করবে, সে সেই গতি প্রাপ্ত হবে, যা পরলোকে এই বিপুল লাভ করবে।' তাঁদের কথা শুনে বিপুল জন্ম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নিজের সমস্ত কর্ম স্মরণ করলেন, কিন্তু কোনো পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে পারলেন না। এদিকে তাঁদের কথা শুনে তাঁর হৃদয়ে যেন জ্বালা ধরল ; তাই তিনি নিজ কর্মগুলি নিয়ে পুনরায় গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করতে করতে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর তাঁর মনে হল, তিনি যে রুচিকে রক্ষা করার সময় নিজ লক্ষণেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁর লক্ষণেন্দ্রিয়তে এবং মুখদ্বারা তাঁর মুখে প্রবেশ করেছিলেন, এই সত্য কথা তিনি গুরুর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যুধিষ্ঠির ! বিপুল মনে মনে এটিকেই পাপ বলে মনে করলেন এবং সেটি সত্যই পাপকর্ম ছিল। চম্পানগরীতে গিয়ে তিনি ফুলগুলি গুরুকে অর্পণ করে ভক্তিভবে তাঁর পূজা করলেন। শিষ্যকে আসতে দেখে দেবশর্মা জিজ্ঞাসা করলেন—'বিপুল ! ওই মহাবনে তুমি কী দেখলে ?'

বিপুল বললেন—ব্রহ্মর্ষে ! আমি এক জোড়া নারী-পুরুষ এবং কয়েকজন পুরুষকে দেখেছি ; কিন্তু তাঁরা কে, যাঁরা আমাকে ভালোভাবে জানেন ?

দেবশর্মা বললেন—বিপুল ! তুমি যে নারীপুরুষের যুগলকে দেখেছ, তাঁদের দিন ও রাত্রি বলে জেনো। তাঁরা চক্রবৎ ঘুরে থাকেন, তাঁরা তোমার পাপের কথা জানেন এবং যে ছয় পুরুষকে হর্ষান্বিত হয়ে জুয়া খেলতে দেখেছ, তাঁদের ছয় ঋতু বলে জেনো। তাঁরাও তোমার পাপের সঙ্গে পরিচিত। মানুষ যতই একান্তে লুকিয়ে পাপ করুক না কেন, ঋতুগুলি এবং রাত দিন তা সবসময় দেখে থাকেন। তুমি হর্ষ ও অহংবশত গুরুকে তোমার পাপকর্মের কথা জানাওনি, সেই কথা স্মরণ করাবার জন্য তোমাকে তারা এই কথা শুনিয়েছে। দিন-রাত এবং ঋতুগুলি মানুষের পাপ-পুণ্যের কথা সর্বদা জেনে থাকে। তুমি যে কর্ম করেছ, তা আমাকে বলোনি, তাই তুমি পাপকর্মকারী মানুষদের গতি প্রাপ্ত হতে। কোনো তরুণী নারীকে পাপকর্ম থেকে রক্ষা করা তোমার সাধ্য নয়, তা সত্ত্বেও তুমি নিজে কোনো পাপ করোনি, তাই আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। তোমার কোনো দুরাচার দেখলে আমি নিঃসন্দেহে ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে অভিশাপ দিতাম ; কিন্তু তুমি যথাসাধ্য আমার স্ত্রীকে রক্ষা করেছ, তাই আমি তোমার ওপর বিশেষভাবে প্রসন্ন হয়েছি। এবার তুমি অনায়াসেই স্বর্গে যেতে পারবে।

বিপুলকে কথাগুলি বলে দেবশর্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং নিজ পত্নী ও শিষ্যসহ স্বর্গে গিয়ে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ! অনেকদিন আগের কথা, মহামুনি মার্কণ্ডেয় গঙ্গাতীরে কথা প্রসঙ্গে আমাকে এই উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন। তাই তোমাকে বলি সর্বদা যত্ন সহকারে নারীদের রক্ষা করা উচিত ; কেননা তাঁদের মধ্যে ভালোমন্দ দুপ্রকারই দেখা যায়। নারীরা সাধ্বী এবং পতিব্রতা হলে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী হন। জগতে তাঁদের সম্মান হয় এবং তাঁদের সমস্ত জগতের মাতা মনে করা হয়। শুধু তাই নয়, পতিব্রত্যের প্রভাবে তাঁরা সমগ্র পৃথিবী ধারণ করে থাকেন। কিন্তু দুশ্চরিত্রা রমণী কুলনাশিনী হয়, তাদের মনে সদা পাপই থাকে। এরূপ নারীদের শারীরিক লক্ষণ দ্বারা চেনা যায়। মানুষের নারীর প্রতি অত্যধিক আসক্ত বা ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়। ধর্মে দৃষ্টি রেখে উদাসীনভাবে তাদের উপভোগ করা উচিত। তা নাহলে মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আসক্তিবন্ধন থেকে সর্বভাবে মুক্ত থাকাই সর্বত্র উত্তম বলে মানা হয়।

———○———

কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আবশ্যক চিন্তা-ভাবনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যা সমস্ত ধর্মের, কুটুম্বিতার, গৃহের এবং দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিদের মূল, সেই কন্যাদান বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। সকল ধর্মের মধ্যে একেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় যে, কেমন পাত্রের হাতে কন্যার সম্প্রদান হওয়া উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! সৎব্যক্তিদের উচিত প্রথমে পাত্রের স্বভাব, আচরণ, বিদ্যা, কুল-মর্যাদা এবং কর্ম সম্পর্কে সঠিক সংবাদ নেওয়া। তারপর যদি সর্বভাবে সুযোগ্য বলে প্রতীত হয়, তাহলে তাকে কন্যাসমর্পণ করবে। এইভাবে যোগ্য পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া উত্তম ব্রাহ্মণের ধর্ম—একে বলা হয় ব্রাহ্মবিবাহ। যৌতুক বা পণ ইত্যাদির দ্বারা পাত্রকে অনুকূল করে যে কন্যাদান করা হয়, তা হল শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দের সনাতন ধর্ম—তাকে ক্ষাত্রবিবাহ বলে। নিজ মাতাপিতার স্থির করা পাত্রকে ছেড়ে কন্যা যাকে পছন্দ করে এবং যে কন্যাকে চায় এরূপ পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ করাকে বেদজ্ঞগণ গান্ধর্ববিবাহ বলেন। কন্যার বন্ধুবান্ধবদের প্রলোভিত করে, বহু অর্থ দিয়ে যে কন্যাকে ক্রয় করা হয়, মনীষী ব্যক্তিরা তাকে আসুর-বিবাহ বলেন। কন্যার অভিভাবকদের পীড়ন করে, তাদের হত্যা করে ক্রন্দনশীল কন্যাকে গৃহ থেকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়া রাক্ষসদের কাজ (তাকে রাক্ষস-বিবাহ বলে)। এই পাঁচপ্রকার (ব্রাহ্ম, ক্ষাত্র, গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস) বিবাহের মধ্যে পূর্বের তিনটি বিবাহ ধর্মানুকূল, বাকি দুটি পাপময় আসুর এবং রাক্ষস-বিবাহ কখনো করা উচিত নয়[১]।

যে কন্যার পিতা এবং ভ্রাতা নেই, তাকে কখনো বিবাহ করা উচিত নয় ; কারণ তাকে পুত্রিকা ধর্মসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। (যদি পিতা-ভ্রাতাদি ঋতুমতী হওয়ার আগে কন্যার বিবাহ না দেয় তাহলে) ঋতুমতী হওয়ার পরে তিন বছর পর্যন্ত কন্যা তার বিবাহের জন্য অপেক্ষা করবে, চতুর্থ বর্ষে কন্যা নিজের ইচ্ছানুযায়ী পতি বরণ করে নেবে। এই অবস্থায় তার সন্তানকে নিকৃষ্ট মানা যাবে না। যারা এই বিরুদ্ধ আচরণ করে, তাদের নিন্দা হয়। যে কন্যা মাতার সাপিণ্ড্য এবং পিতার গোত্রের না হয়, মনু তাকে বিবাহ করা ধর্মানুকূল বলেছেন।[২]

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যদি এক ব্যক্তি বিবাহ স্থির করে কন্যার শুল্ক (মূল্য) দিয়ে থাকে, অন্যজন শুল্ক দেবার প্রতিশ্রুতি করে বিবাহ স্থির করে, তৃতীয়জন সেই কন্যাকে বলপূর্বক নিয়ে যাবার কথা বলে, চতুর্থজন তার ভ্রাতা-বন্ধুদের অর্থের লোভ দেখিয়ে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয় এবং পঞ্চমজন তার পাণিগ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেই কন্যাকে ধর্মত কার পত্নী বলে মনে করা হবে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! কন্যার ভ্রাতা-বন্ধু যে কন্যাকে ধর্মপূর্বক পাণিগ্রহণ বিধিদ্বারা দান করে দেয় অথবা যাকে শুল্ক নিয়ে দান করে দেয়, সেই কন্যাকে ধর্মপূর্বক বিবাহকারী অথবা শুল্ক দিয়ে কিনে নিয়ে যদি নিজ গৃহে নিয়ে যায় তাহলে এতে কোনোপ্রকার দোষ হয় না। কন্যার আত্মীয়-কুটুম্বদের অনুমতি থাকলে বৈবাহিক মন্ত্র এবং হোম করা উচিত, তাহলেই মন্ত্র সফল হয়। যেক্ষেত্রে পিতামাতা কন্যাদান করেননি, সেক্ষেত্রে মন্ত্র প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যে প্রতিজ্ঞা করা হয়, তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয় এবং তাতে যদি বন্ধু-বান্ধবের সমর্থন থাকে, তাহলে তা আরও উত্তম হয়ে থাকে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যদি একজন

---

[১]স্মৃতিতে নিম্নলিখিত আটপ্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে—(১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) আর্ষ (৪) প্রজাপত্য (৫) গান্ধর্ব (৬) আসুর (৭) রাক্ষস এবং (৮) পিশাচ। কিন্তু এখানে ব্রাহ্ম, ক্ষাত্র, গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস—এই পাঁচপ্রকার বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এখানে যে ব্রাহ্মবিবাহের কথা বলা হয়েছে, তাতে স্মৃতি কথিত দৈব ও আর্ষবিবাহও অন্তর্গত বলে জানতে হবে। তেমনই এখানে বর্ণিত রাক্ষসবিবাহে উপরিউক্ত পৈশাচ বিবাহকে ধরে নিতে হবে এবং ক্ষাত্রবিবাহই প্রজাপত্য বিবাহ।

[২]সপিণ্ড্য নিবৃত্তির সম্বন্ধে স্মৃতির উক্তি হল—**বধ্বা বরস্য বা তাতঃ কূটস্থাদ্ যদি সপ্তমঃ। পঞ্চমী চেত্তয়োর্মাতা তৎসাপিণ্ড্যং নিবর্ততে।।** অর্থাৎ 'যদি পাত্র অথবা কন্যার পিতা মূল পুরুষ থেকে সপ্তম পুরুষে জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং মাতা পঞ্চম পুরুষে জন্ম নিয়ে থাকেন তাহলে বর ও কন্যার জন্য সাপিণ্ড্য নিবৃত্তি হয়ে যায়।' পিতার দিকের সাপিণ্ড্য সাতপুরুষ ধরে চলে এবং মাতার পাঁচ প্রজন্ম ধরে। সাত পুরুষে একজনই পিণ্ডপ্রদানকারী হয়, তিনজন পিণ্ডভাগী হয় এবং তিনজন লেপভাগী হয়।

পাত্রের সঙ্গে কন্যাদান করার কথা দিয়ে শুল্ক নিয়ে নেওয়া হয় আর তারপরে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অর্থ ও কর্ম-সম্পন্ন অত্যন্ত যোগ্য পাত্র পাওয়া যায়, তাহলে আগের পাত্রটিকে কন্যা সমর্পণ করতে অস্বীকার করা উচিত, না উচিত নয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! শুল্ক দেওয়া মাত্রই কোনো কন্যা কারো পত্নী হয়ে যায় না। শুল্ক প্রদানকারীও এই কথা জেনেই শুল্ক দেয়। এতদ্ব্যতীত যে কন্যার শুল্ক গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে তাকে দান (বিক্রয়) করে না। কন্যার ভ্রাতা-বন্ধু যখন পাত্রের কোনো বিপরীত গুণ (বৃদ্ধত্ব ইত্যাদি) দেখতে পায়, তখনই শুল্ক চায়। যদি পাত্রকে ডেকে বলা হয় যে তুমি আমার কন্যাকে অলংকার দিয়ে বিবাহ করে নাও এবং সে কন্যাকে অলংকৃত করে বিবাহ করে, তাহলে সেই বিবাহও ধর্মানুকূল হয়ে থাকে। এইভাবে কন্যার জন্য গহনা নিয়ে যে কন্যাদান করা হয়, সেটি শুল্ক বা বিক্রয় কোনোটিই নয়। কন্যার জন্য কোনো বস্তু নিয়ে কন্যাদান করা সনাতন ধর্ম। যারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বলে থাকে যে 'আমি আপনার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেব', 'আপনাকে কন্যা দেব না', এবং 'অবশ্যই আপনাকে দেব', তাদের এইসব কথা কন্যা দেবার আগে কিছু না বলারই মতো। মহর্ষিদের মত হল অযোগ্য পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করা উচিত নয় ; কারণ সুযোগ্য পুরুষকে কন্যাদান করলে কাম-সম্বন্ধীয় সুখ লাভ এবং সুযোগ্য সন্তান উৎপন্ন হয়। কন্যা ক্রয়-বিক্রয়ে নানাপ্রকারের দোষ থাকে, একথা তুমি বহু দিন পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা করার পর বুঝতে পারবে। দাম দিলে বা নিলে কেউ কারো পত্নী হয়ে যায় না। এমন কথা আগেও কখনো হয়নি। যদি বলো, 'শুল্কের দ্বারাই পত্নীত্ব স্থির হয়, শুধু পাণিগ্রহণ দ্বারা নয়' তাহলে সে কথা ঠিক নয় ; কারণ এর বিপরীত স্মৃতির কথা হল—'পিতা যদি শুল্ক নিয়েও থাকে, তা সত্ত্বেও সুযোগ্য পাত্র পেলে তার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত।' যারা শুল্কের দ্বারাই পত্নীত্ব স্থির হয় বলে মনে করে, পাণিগ্রহণের দ্বারা নয়, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের কথা 'উপযুক্ত' মনে করেন না। কন্যাদানই জগতে প্রসিদ্ধ, কিনে অথবা জিতে আনা নয়। কন্যাদানকেই বিবাহ বলা হয়। যারা কিনে অথবা বলপূর্বক আনাকেই পত্নীত্বের কারণ বলে মনে করে, তারা ধর্মকে জানে না। যারা ক্রয় করে তাদের কন্যাদান করা উচিত নয়, অথবা যারা বিক্রয় করে, এরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ পত্নী কেনা-বেচার জিনিস নয়। যারা দাসী কেনাবেচা করে, তারা অত্যন্ত লোভী এবং পাপাত্মা ; এরূপ লোকই পত্নী কেনাবেচার চিন্তা করে। এই ব্যাপারে পূর্বকালে লোকেরা সত্যবানকে প্রশ্ন করেছিলেন—'মহাপ্রাজ্ঞ ! কন্যার শুল্ক দেবার পর যদি শুল্ক প্রদানকারীর মৃত্যু হয় তাহলে তার অন্যের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে কি না ?' তাদের প্রশ্ন শুনে সত্যবান বললেন—'উত্তম পাত্র যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। এছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে নেই। শুল্কপ্রদানকারী জীবিত থাকলেও সুযোগ্য পাত্র পেলে তাকেই কন্যা প্রদান করবে, অতএব পূর্বোক্ত পাত্রের মৃত্যু হলে এক্ষেত্রে বলার কি আছে ? কন্যার পাণিগ্রহণের আগে বৈবাহিক মঙ্গলাচার হওয়ার পরেও যদি অন্য সুযোগ্য পাত্রকে কন্যাদান করা হয়, তাহলে দাতার শুধুমাত্র মিথ্যাভাষণের পাপ হয় (পাণিগ্রহণের আগে কন্যাকে বিবাহিত বলে মনে করা হয় না)। সপ্তপদীর সপ্তম পদে বৈবাহিক মন্ত্র সমাপ্ত হয় অর্থাৎ সপ্তপদী বিধি পূর্ণ হলেই কন্যা পত্নীত্বে স্থিত হয়। যে ব্যক্তিকে সংকল্প করে কন্যাদান করা হয়, সেই তার পাণিগ্রহীতা পতি হয় এবং তাকেই তার পত্নী বলা হয়। বিদ্বান ব্যক্তিরা কন্যাদানের এই বিধি জানিয়েছেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে কন্যার শুল্ক নেওয়া হয়ে গেছে এবং তার শুল্কদানকারী পতি উপস্থিত নেই (অন্যদেশে চলে গিয়েছে) তার পিতার কী করা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সন্তানহীন ধনি ব্যক্তির কাছ থেকে যদি পিতা শুল্ক নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কর্তব্য হল পাত্র না ফেরা পর্যন্ত কন্যাকে সর্বভাবে রক্ষা করা। ক্রয় করা কন্যার যতক্ষণ শুল্ক ফেরত দেওয়া না হয়, ততক্ষণ কন্যা সেই শুল্ক প্রদানকারীরই বলে মনে করা হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যার পুত্র নেই, শুধু কন্যা আছে, তার কাছে সে-ই পুত্রের সমান। তাহলে কন্যা থাকতে অন্য লোক কীভাবে তার ধনের অধিকারী হতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! পুত্র আত্মার সমান এবং কন্যা ও পুত্রে কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে আত্মস্বরূপ কন্যা থাকতে অন্য কেউ কীভাবে তার অর্থ নিতে পারে ? মাতা পণ হিসাবে যা অর্থ পেয়েছেন, তার ওপর কন্যারই

অধিকার। সুতরাং যার পুত্র নেই, তার ধনলাভের অধিকারী একমাত্র তার দৌহিত্র। কারণ সে তার পিতা ও মাতামহের পিণ্ডদানকারী। ধর্মের কাছে পুত্র ও দৌহিত্রে কোনো পার্থক্য নেই। যদি প্রথমে কন্যা জন্মায় এবং তাকে পুত্ররূপে স্বীকার করে নেওয়া হয় আর তার পরে পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহলে পুত্র ও কন্যা উভয়েই সেই পিতার ধনের সম অধিকারী হবে। (কিন্তু ঔরস পুত্র সেই ধনের অধিক অংশ পায়)। অন্যের পুত্র যদি দত্তক নেওয়া হয় তাহলে তার থেকে নিজ কন্যাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। (সুতরাং সে পৈতৃক অর্থের অধিক অংশের অধিকারিণী হয়)। যে কন্যাকে শুল্ক নিয়ে বিক্রয় করা হয়েছে, তার পুত্র শুধু তার পিতারই উত্তরাধিকারী হয়। তাকে দৌহিত্ররূপে নিজ ধনের অধিকারী করা যুক্তিসঙ্গত নয় ; কারণ আসুর-বিবাহে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে অপরের দোষদর্শনকারী, পাপাচারী, অপরের ধন আত্মসাৎকারী, শঠ এবং ধর্মের বিপরীত আচরণকারী হয়ে থাকে। এই বিষয়ে প্রাচীন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা যমের দ্বারা গীত এই গাথাটি বর্ণনা করেন যে—'যে ব্যক্তি নিজ পুত্রকে বিক্রয় করে অর্থ লাভ করতে চায় অথবা জীবিকার জন্য শুল্ক নিয়ে কন্যাকে বিক্রয় করে, সে অতি ভয়ানক কালসূত্র নামক নরকে পতিত হয়ে নিজেরই মল-মূত্র ভক্ষণ করে।' যে ব্যক্তি কুমারী কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে উপভোগ করে, সে অন্ধকারময় নরকে পতিত হয়। নিজ সন্তান তো দূরের কথা, কোনো মানুষকেই বিক্রয় করা উচিত নয়। অধর্ম পথে যে ধন আসে, তাতে কোনো ধর্ম হয় না।

(বিবাহের সময় কন্যার শ্বশুরালয়ের তরফে) কুমারী পূজার (কন্যার সৎকারের) রূপে যে বস্ত্রালংকার প্রাপ্ত হয়, তা গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই ; কিন্তু সে সবই কন্যাকে দিয়ে দেওয়া উচিত। কল্যাণকামনাকারী পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর এবং দেবরদের উচিত তাদের কন্যাকে বস্ত্র-অলংকার দ্বারা সম্মান জানানো। স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ না করলে সে পুরুষকে প্রসন্ন রাখতে পারে না, সেই অবস্থায় পুরুষের সন্তান বৃদ্ধি হয় না, তাই পত্নীকে সর্বদা ভালোবাসা ও আনন্দ দিতে হয়। যেখানে নারীদের সম্মান হয়, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন মনে নিবাস করেন। যেখানে নারীদের অসম্মান হয়ে থাকে, সেখানে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়। যে কুলে স্ত্রী-কন্যারা দুঃখ পায়, সেই কুল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ মনু নারীদের পুরুষের অধীন করে বলেছেন—'হে মানব ! নারীগণ অবলা, ঈর্ষাপরায়ণা, ক্রোধী, পতির হিতাকাঙ্ক্ষী, সম্মান আকাঙ্ক্ষী এবং বিবেকশক্তিবর্জিত, তবুও তারা সম্মানের যোগ্য ; অতএব তোমরা সর্বদা এঁদের সম্মান করবে ; কারণ নারীজাতিই ধর্ম প্রাপ্তির কারণ। তোমাদের পরিচর্যা এবং সম্মান নারীদেরই অধীন। সন্তান-উৎপাদন, তাদের পালন-পোষণ এবং প্রসন্নতা সহকারে লোকযাত্রা নির্বাহ নারীদের ওপরই নির্ভরশীল। তোমরা যদি নারীদের সম্মান করো, তাহলে তোমাদের সমস্ত কার্য যথাযথ সমাপন হবে।'

(নারীদের কর্তব্য সম্পর্কে) রাজা জনকের কন্যা এক শ্লোক বলেছেন, যার সারাংশ হল—'নারীদের যজ্ঞাদি কর্ম, শ্রাদ্ধ এবং উপবাস করা আবশ্যক নয় ; তাদের ধর্ম শুধু পতিসেবা করা। পতিসেবাদ্বারাই নারী স্বর্গ জয় করতে সক্ষম।' কুমারী অবস্থায় নারীকে তার পিতা রক্ষা করেন, যৌবনকালে পতি তার রক্ষক এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের ওপর সেই ভার ন্যস্ত হয় ; সুতরাং নারীর কখনো স্বাধীনভাবে থাকা উচিত নয়। যুধিষ্ঠির ! নারীরাই গৃহের লক্ষ্মী, পুরুষদের উচিত তাদের ভালোভাবে রক্ষা করা। নিজ বশে রেখে পালন করলেই নারী গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা হয়ে ওঠে।

বর্ণসংকরের উৎপত্তি এবং কৃতক পুত্রের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষ যদি ধন লোভে অথবা কামবশত অন্য বর্ণের নারীর সঙ্গে সমাগম করে, তাহলে বর্ণসংকর সন্তানের জন্ম হয়। এইভাবে উৎপন্ন হওয়া বর্ণসংকর মানুষদের ধর্ম কী ? এবং তাদের কী কী কাজ ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! পূর্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের (ধর্মের) জন্য শুধুমাত্র চার বর্ণ এবং তাদের পৃথক পৃথক কর্মগুলিরই সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সর্ব বর্ণের অধম শূদ্র যদি কোনো শ্রেষ্ঠ বর্ণের নারীর সঙ্গে সমাগম করে, তাহলে তার থেকে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে চার বর্ণ থেকে পৃথক এবং তাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় (চণ্ডাল ইত্যাদি) বলে মনে করা হয়। ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে সংসর্গ করে, তবে তার থেকে বর্ণবাহ্য সূত জাতি উৎপন্ন হয়, যাদের কাজ স্তুতি ইত্যাদি করা। বৈশ্য জাতির পুরুষ, ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে

সমাগম করলে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাকে সব বর্ণ থেকে পৃথক বৈদেহক এবং মৌদ্‌গল্য বলা হয় (তাদের দ্বারা অন্তঃপুর রক্ষা ইত্যাদি কাজ করানো হয়)। শূদ্রদ্বারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র ভয়ংকর কর্মকারী চণ্ডাল হয়। সে গ্রামের বাইরে বাস করে এবং তাদের দ্বারা বধ্য-ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড দেওয়ার কাজ করানো হয়। এই সব হতভাগ্য ব্যক্তি নীচবর্ণ দ্বারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের বর্ণসংকার বলা হয়। বৈশ্যের দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতির নারীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাকে বন্দী এবং মাগধ বলা হয়। এরা লোকের স্তুতি করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। এইরূপ যদি শূদ্র ক্ষত্রিয় জাতির স্ত্রীর সঙ্গে সমাগম করে তাহলে তার গর্ভে মৎস্য ধরা নিষাদ জাতির জন্ম হয় আর যদি সে বৈশ্য নারীর সঙ্গে সংসর্গ করে তবে আয়োগব জাতির পুত্র উৎপন্ন হয়, তারা কাঠের কাজ করে জীবন চালায়। বর্ণসংকর ব্যক্তি যদি নিজ বর্ণসংকর স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করে তাহলে তার নিজের মতো বর্ণসম্পন্ন পুত্রই জন্মায় আর যখন নিজের থেকেও হীন জাতির স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করে, তখন নীচ সন্তানের জন্ম হয়। সেই সন্তানকে তার মাতার জাতির বলে মনে করা হয়। এইভাবে বর্ণসংকর মানুষও যদি পরস্পর বিভিন্ন জাতির স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করে তাহলে তাদের থেকে নিন্দনীয় সন্তানই জন্মায়। শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল নামক বাহ্য জাতি সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন করে, তেমনই বাহ্যজাতির মানুষও ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের নারীদের সঙ্গে সংসর্গ করে নীচ জাতির পুত্র উৎপন্ন করে, তাদের বাহ্যতর বলা হয়। এইভাবে বাহ্য এবং বাহ্যতর জাতি থেকে ক্রমশ পনেরো প্রকারের অতি নিকৃষ্ট বর্ণ উৎপন্ন হয়। যে জাতির পুরুষ রাজাদের শৃঙ্গার কার্য জানে এবং দাস না হয়েও দাসবৃত্তি দ্বারা জীবিকা চালায়, তারা সৈরন্ধ্র ; তাদের পত্নীদের সৈরন্ধ্রী বলে। মাগধ জাতির সৈরন্ধ্রী নারীর সঙ্গে যদি বাহ্য জাতীয় আয়োগব পুরুষ সমাগম করে তাহলে তার থেকে আয়োগব জাতির সৈরন্ধ্র পুত্র জন্ম নেয়, তার (মাগধী সৈরন্ধ্রীর) যদি বৈদহ জাতির পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ হয় তাহলে মদ্যপ্রস্তুতকারী মৈরেয় জাতির পুরুষ উৎপন্ন হয়। নিষাদের দ্বারা মগধজাতির সৈরন্ধ্রীর গর্ভে মদ্‌গুর জাতির পুরুষ উৎপন্ন হয়, যাদের দাসও বলা হয়। তারা নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। চণ্ডাল এবং মাগধী সৈরন্ধ্রীর সংযোগে শ্বপাক নামে অধম চণ্ডালের উৎপত্তি হয়। এরা মৃতদেহ রক্ষার কাজ করে। এইভাবে মগধ জাতির সৈরন্ধ্রী নারী আয়োগব ইত্যাদি চার জাতির সঙ্গে সমাগম করে মায়াদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী চারপ্রকার ক্রূর মানুষ উৎপন্ন করে। আয়োগব জাতির পাপী নারীরা বৈদেহ জাতির পুরুষের সঙ্গে সমাগম করে ক্রূর মায়াজীবী পুত্র উৎপন্ন করে। নিষাদের সংযোগে মদ্রনাভ নামক জাতির জন্ম হয় এবং চণ্ডালের সংযোগে পুক্কস জাতির উৎপত্তি হয়। মদ্রনাভ জাতির পুরুষ গাধায় চড়ে এবং পুক্কস জাতির লোকেরা মৃতের কাপড় পরে এবং ভাঙা বাসনে খায়। এই প্রকার এই তিন নীচ জাতির মানুষ আয়োগবের সন্তান। নিষাদজাতির নারী যদি বৈদেহ পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করে, তবে ক্ষুদ্র, অন্ধ্র এবং কারাবর নামক চামারের উৎপত্তি হয়, এই তিন জাতি গ্রামের বাইরে বাস করে। চণ্ডাল পুরুষ এবং নিষাদ জাতির নারীর সংযোগে পাণ্ডুসৌপাক জাতির জন্ম হয়, এরা বাঁশের জিনিস তৈরি করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। বৈদেহ জাতির নারীর সঙ্গে নিষাদের সংসর্গ হলে আহিণ্ডক এবং চণ্ডালের সংসর্গ হলে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাক এবং চণ্ডালের একই বৃত্তি। নিষাদ জাতির নারীর সঙ্গে চণ্ডালের সংসর্গে অন্তেবসায়ী নামক জাতির জন্ম হয়, এরা সর্বদা শ্মশানে বাস করে। নিষাদ ইত্যাদি বাহ্য জাতির লোকও এদের অচ্ছুত বলে মনে করে।

এইভাবে মাতাপিতার বর্ণ-ব্যতিক্রমে বর্ণসংকর জাতি উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে কিছুর সম্বন্ধে জানা যায়, কিছু গুপ্ত থাকে। কর্মদ্বারাই এদের চিনে নিতে হয়। শাস্ত্রে চার বর্ণের ধর্মই স্থির করা হয়েছে, অন্যদের নয়। ধর্মহীন বর্ণের মধ্যে (বর্ণসংকর জাতির মধ্যে) কারোরই কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। যারা জাতির বিচার না করে ইচ্ছানুসারে অন্য বর্ণের নারীর সঙ্গে সংসর্গ করে এবং যারা যজ্ঞের অধিকার ও সাধুপুরুষ দ্বারা বহিষ্কৃত, এরূপ বর্ণবাহ্য মানুষের দ্বারাই বর্ণসংকর সন্তান উৎপন্ন হয়। এরা নিম্ন রুচি অনুযায়ী কাজ করে বিভিন্ন প্রকারের জীবিকা গ্রহণ করে। এরূপ লোক লৌহ অলংকার ধারণ করে পথে-ঘাটে, পর্বতে-বৃক্ষতলে নিবাস করে। এদের উচিত অলংকার অথবা অন্য কিছু নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করা এবং প্রকাশ্যে বসবাস করা। তারা যদি গো-ব্রাহ্মণের সহায়তা করে, নিষ্ঠুর কর্ম ত্যাগ করে, সকলকে দয়া করে, সত্য কথা বলে, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে এবং নিজে কষ্ট পেয়েও অপরকে রক্ষা করে, তাহলে এই বর্ণসংকর মানুষদের যে পারমার্থিক

উন্নতি হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যারা চার বর্ণ থেকে বহিষ্কৃত, বর্ণসংকর মনুষ্যের দ্বারা উৎপন্ন এবং অনার্য হয়েও (ওপর থেকে দেখলে) আর্য বলেই প্রতীত হয়, আমরা কীভাবে তাদের চিনতে পারব ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যারা (সজ্জনদের বিপরীত) নানাপ্রকার কর্মে যুক্ত থাকে, সেই কলুষিত গর্ভে জন্ম নেওয়া মানুষকে তাদের কর্মদ্বারাই জানা যায়। তেমনই সজ্জনসুলভ ব্যবহারে গর্ভের শুদ্ধতা নিশ্চিত করা উচিত। এই জগতে অনার্য ব্যবহার, অনাচার, ক্রূরতা এবং অকর্মণ্যতা ইত্যাদি দোষ মানুষের কলুষিত জন্মের (বর্ণসংকরতার)ই প্রমাণ করে। বর্ণসংকর ব্যক্তি তার পিতা কিংবা মাতা অথবা দুজনেরই স্বভাব অনুসরণ করে। সে কোনোভাবেই নিজ প্রকৃত স্বভাব লুকিয়ে রাখতে পারে না। ব্যাঘ্র যেমন তার বিচিত্র গাত্রবর্ণ এবং রূপে তার মাতাপিতার মতোই হয়ে থাকে, মানুষ তেমনই তার পিতামাতাকেই অনুসরণ করে। অমুক ব্যক্তি কোন কুলে, কার ঔরসে জন্মেছে এই কথা অত্যন্ত গুপ্ত হলেও যার জন্ম সংকর যোনির দ্বারা হয়েছে, সে অল্প বিস্তর তার পিতার স্বভাবই পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কৃত্রিম পথের আশ্রয় নিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মতো আচরণ করে সে বাস্তবে শুদ্ধ বর্ণের অথবা সংকরবর্ণের, তা সেই ব্যক্তির আচার-আচরণ দেখলেই বোঝা যায়। সংসারে প্রাণী নানাপ্রকার ব্যবহার করে থাকে, আচার-ব্যবহার ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই যা জন্মরহস্য প্রকাশ করতে সাহায্য করে। বর্ণসংকর ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও তার দৈহিক কার্য নীচমার্গ থেকে সরতে চায় না। উত্তম, মধ্যম বা নিকৃষ্ট যে প্রকার স্বভাবদ্বারা তার শরীর গঠিত হয়েছে, তেমন স্বভাবই তার কাছে আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। উচ্চজাতির মানুষও যদি শিষ্টতারহিত হয় তাহলে তার সৎকার করা উচিত নয় এবং শূদ্রও যদি ধর্মজ্ঞ এবং সদাচারী হয় তাহলে তাকে বিশেষ সম্মান দেখানো উচিত। মানুষ তার শুভাশুভ কর্ম, ভদ্র আচরণ এবং কুলের দ্বারাই নিজের পরিচয় দেয়। যদি তার কুল নষ্টও হয়ে যায় তাহলে সে তার নিজ কর্মের দ্বারা শীঘ্রই তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। ওপরে যতপ্রকার নীচ যোনির কথা বলা হয়েছে, সেগুলিতে এবং অন্য নীচ জাতিতে বিদ্বান ব্যক্তির সন্তানোৎপাদন করা উচিত নয়, সেগুলি পরিত্যাগ করাই সর্বতোভাবে উত্তম ও উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কৃতক পুত্র কেমন হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মাতাপিতা যাকে ত্যাগ করেছে এবং যার মাতাপিতার পরিচয় জানা নেই, সেই বালককে যে পালন করে, তাদের এই পুত্রকে কৃতক পুত্র বলা হয়। যে মাতাপিতা তাকে নিজের পুত্রের মতো পালন করে, তাদের বর্ণ মতোই বালকের বর্ণ হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এই বালকের কীরূপ সংস্কার হওয়া উচিত ? তার সঙ্গে কোন জাতির কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যার মাতাপিতা ত্যাগ করেছে, সে তার পালক-পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাই তার পালক পিতার উচিত, তার নিজ বর্ণ অনুসারে পুত্রের সংস্কার করা এবং নিজ জাতির কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া। এইভাবে আমি তোমাকে সব কথা জানালাম। তুমি আর কী শুনতে চাও ?

গাভীদের মাহাত্ম্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি চ্যবন ও নহুষের সংবাদ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কাউকে দেখলে এবং তার সঙ্গে থাকলে কীরূপ স্নেহ হয় এবং গাভীদের মাহাত্ম্য কী ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে মহর্ষি চ্যবন এবং নহুষের সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করব। পূর্বকালের কথা, ভৃগুবংশে উৎপন্ন হওয়া মহর্ষি চ্যবন মহাব্রতের আশ্রয় নিয়ে জলের মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ এবং শোক পরিত্যাগ করে দৃঢ়তা সহকারে ব্রত পালনপূর্বক পূর্ণ বারো বছর জলের মধ্যে থাকলেন। তিনি সমস্ত প্রাণী বিশেষ করে জলচর প্রাণীদের পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। একবার তিনি দেবতাদের প্রণাম করে অত্যন্ত পবিত্র হয়ে গঙ্গা এবং যমুনার জলে (সঙ্গমে) প্রবেশ করে সেখানে বাঁধের মতো স্থিরভাবে বসলেন। গঙ্গা-যমুনার ভয়ংকর বেগ, যেখানে ভয়ানক শব্দ হচ্ছিল, তিনি নিজ মস্তকে সহ্য করতে লাগলেন ; কিন্তু গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি নদীগুলি এবং

সরোবর ঋষিকে শুধু পরিক্রমা করতেন, তাঁকে কষ্ট দিতেন না। তিনি কখনো জলের মধ্যে কাঠের মতো পড়ে থাকতেন, আবার কখনো তার ওপর দাঁড়িয়ে যেতেন। জলে বাস করা জীবেদের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, এইভাবে তিনি বহুদিন ধরে জলে বাস করলেন। তারপর এক সময় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী বহু ধীবর মাছ ধরার জন্য জাল নিয়ে সেইস্থানে এল, যেখানে মুনি অবস্থান করছিলেন। তারা অনেক চেষ্টা করে গঙ্গা ও যমুনার জলে জাল ফেলল। অনেক দূর পর্যন্ত তাদের সেই মজবুত নতুন সূতোর জাল ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ধীবরেরা নির্ভয়ে জলে নেমে সকলে মিলে জাল টানতে লাগল। সেই জালে মাছ ছাড়া অন্য জলজন্তুকেও তারা ধরেছিল। যখন জাল টানা হল তখন তাতে মৎস্য পরিবৃত ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনিও উঠে এলেন। তাঁর সমস্ত শরীর নদীর সবুজ শ্যাওলায় ভরা ছিল, তাঁর গোঁফ, দাড়ি ও জটা সবুজ রঙয়ের হয়েছিল এবং তাঁর দেহে শঙ্খ ইত্যাদি জলচর জীবেরা ছবির মতো লেগেছিল।

বেদের পারগামী মহর্ষিকে জালের সঙ্গে উঠে আসতে দেখে সমস্ত মৎস্যজীবী ধীবরগণ হাতজোড় করে তাঁর চরণে

মাথা রেখে প্রণাম করতে লাগল। অন্যদিকে জালের আকর্ষণের ঘসায় এবং স্থলের স্পর্শে বহু মাছ মারা গেল। মাছেদের এইভাবে মারা যেতে দেখে মুনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে ধীবরেরা বলল—'মহামুনে ! আমরা না জেনে যে পাপ করেছি, তারজন্য আপনি ক্ষমা করুন এবং আমাদের ওপর প্রসন্ন হোন। আপনি বলুন, আমরা আপনার কী সেবা করতে পারি ?' তাঁদের প্রশ্ন শুনে মহর্ষি চ্যবন বললেন—'ধীবরগণ ! এখন আমার সব থেকে বড় কাজ কী , তা মন দিয়ে শোনো। এই মাছগুলি যদি জীবিত থাকে, তবেই আমি জীবনধারণ করব, অন্যথায় এদের সঙ্গেই আমি প্রাণ বিসর্জন দেব। এরা আমার সহবাসী ছিল, আমি বহুদিন এদের সঙ্গে জলে বাস করেছি ; সুতরাং এদের আমি ত্যাগ করতে পারব না।' মুনির কথা শুনে ধীবরেরা অত্যন্ত ভীত হল। তারা কাঁপতে কাঁপতে রাজা নহুষের কাছে গিয়ে সব জানাল।

তাদের কাছে সব শুনে রাজা নহুষ তাঁর মন্ত্রী এবং পুরোহিতদের নিয়ে অতি শীঘ্র সেখানে এলেন। তিনি ভক্তিভরে হাতজোড় করে মহাত্মা চ্যবনকে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁকে বন্দনা ও পূজা করে বললেন—'বিপ্রবর ! বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি ?'

চ্যবন বললেন—রাজন্ ! মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী এই ধীবরেরা আজ খুব পরিশ্রম করেছে, সুতরাং আপনি ওদের আমার এবং এই মাছের দাম দিয়ে দিন।

নহুষ (পুরোহিতকে) বললেন—পুরোহিতমহাশয় ! ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবন যা আদেশ দিচ্ছেন, সেই অনুযায়ী এদের পরিবর্তে ধীবরদের এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিন।

চ্যবন বললেন—রাজন্ ! এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আমার উচিত মূল্য নয় ; আপনি ওদের উচিত মূল্য দিয়ে দিন।

নহুষ বললেন—পুরোহিতমহাশয় ! আপনি ধীবরদের এক লাখ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিন। (পরে চ্যবন মুনিকে লক্ষ্য করে বললেন) মুনিবর ! এটি আপনার উচিত মূল্য হয়েছে তো, না আরও কিছু চান ?

চ্যবন বললেন—রাজন্ ! আমার মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা ধরবেন না, মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে আমার উচিত মূল্য ধার্য করুন।

নহুষ বললেন—পুরোহিতমহাশয় ! তাহলে এই ধীবরদের এক কোটি মুদ্রা দিন এবং তাও যদি যোগ্যমূল্য না হয় তাহলে বলুন আরও বেশি কী দেওয়া উচিত ?

চ্যবন বললেন—রাজন্ ! এক কোটি অথবা তার অধিক মুদ্রাও আমার যোগ্য নয়। আপনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিচার করে উচিত মূল্য দিন।

নহুষ বললেন—বিপ্রবর ! যদি তাই হয়, তাহলে আমার অর্ধেক অথবা সমগ্র রাজ্যই ধীবরদের প্রদান করুন। আমার মনে এই আপনার যোগ্য মূল্য। নাহলে এবার আপনিই দয়া করে বলুন।

চ্যবন বললেন—আপনার অর্ধেক অথবা পুরো রাজত্বও আমি আমার উচিত মূল্য মনে করি না। আপনি ঋষিদের সঙ্গে আলোচনা করে তারপরে যা আমার যোগ্য বলে মনে হয়, সেই মূল্য দিন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মহর্ষির কথা শুনে নহুষ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন হলেন। সেই সময় ফলাহারী এক বনবাসী মুনি, যিনি গাভীর পেটে জন্মেছিলেন, রাজা নহুষের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ ! এই ঋষি কীভাবে সন্তুষ্ট হবেন, সেই উপায় আমি জানি। আমি অতি শীঘ্র এঁকে সন্তুষ্ট করব।'

নহুষ বললেন—'মহর্ষে ! ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনির যোগ্য মূল্য নির্ধারণ করুন এবং আমার কুলকে রক্ষা করুন। আমি আমার মন্ত্রী ও পুরোহিতসহ অগাধ দুঃখের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। আপনি আশ্রয় দিয়ে আমাদের সেখান থেকে পার করুন এঁর যোগ্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! রাজা নহুষের কথা শুনে সেই মহাপ্রতাপশালী মুনি রাজা এবং তাঁর মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'মহারাজ ! ব্রাহ্মণ সব বর্ণের মধ্যে উত্তম, তাঁদের এবং গাভীর কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, সুতরাং আপনি এঁর হিসাবে একটি গাভী প্রদান করুন।' মহর্ষির কথা শুনে মন্ত্রী ও পুরোহিত-সহ রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি উত্তম ব্রত পালনকারী ভৃগুনন্দন চ্যবনের কাছে গিয়ে তাঁকে সুমধুর বাক্যে তৃপ্ত করে বললেন—'ব্রহ্মর্ষে ! আমি একটি গাভী প্রদান করে আপনাকে কিনে নিয়েছি, সুতরাং আপনি কৃপা করে উঠুন ! আমি এটিই আপনার উচিত মূল্য বলে মনে করি।'

চ্যবন বললেন—মহারাজ ! এবার আমি উঠছি, আপনি আমাকে উচিত মূল্য দিয়ে কিনেছেন। আমি এই জগতে গাভীর মতো কোনো ধন দেখি না। বীরবর ! গাভীদের নাম এবং গুণকীর্তন করা, শোনা, গাভী দান করা এবং দর্শন করা—শাস্ত্রে এসবের অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। এসব কাজই সমস্ত পাপ দূর করে পরম কল্যাণ করে। গাভী লক্ষ্মীর রূপ, তার মধ্যে পাপের লেশমাত্র থাকে না। গাভীই মানুষকে দুগ্ধ ও দেবতাকে উত্তম হবিষ্য প্রদান করে। স্বাহা ও বষট্‌কার সর্বদা গাভীতেই প্রতিষ্ঠিত। গাভী যজ্ঞ সঞ্চালনকারী এবং তার মুখ। এরা বিকাররহিত দিব্য অমৃত ধারণ করে এবং অমৃত প্রদান করে। সারা জগৎ এদের সামনে মাথা নত করে। গাভীর মহাতেজ রাশি সমস্ত প্রাণীকে সুখ প্রদান করে। গাভীরা যেখানে নির্ভয়ে থাকে, সেই স্থানের শোভাবৃদ্ধি পায় এবং সেখানকার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। গাভী স্বর্গের সিঁড়িস্বরূপ, স্বর্গেও তাকে পূজা করা হয়। গাভী সমস্ত কামনা পূর্ণকারী দেবী, তার থেকে বড় আর কিছুই নেই। রাজা নহুষ ! আমি তোমাকে গাভীর মাহাত্ম্য জানালাম, এখানে গাভীর গুণগুলির এক অংশমাত্র বলা হয়েছে, তাদের সম্পূর্ণ গুণ কেউই বর্ণনা করতে পারে না।

ধীবরেরা বলল—মুনে ! সজ্জনদের সঙ্গে সাতপা হাঁটলেই মিত্রতা হয়। আমরা আপনাকে দর্শন করেছি এবং এতক্ষণ কথা বলেছি, অতএব আমাদের আপনি কৃপা করুন। বিদ্বন্ ! আমরা আপনাকে প্রসন্ন করতে চাই, আপনার চরণে আশ্রিত। আমাদের কৃপা করার জন্য আমাদের প্রদত্ত এই গাভী আপনি স্বীকার করুন।

চ্যবন বললেন—ধীবরগণ ! আমি তোমাদের প্রদত্ত গাভী স্বীকার করছি, গোদানের প্রভাবে তোমাদের সব পাপ দূর হয়েছে, এখন তোমরা এই মাছেদের সঙ্গেই স্বর্গে যাও।

ভীষ্ম বললেন—তারপর শুদ্ধহৃদয় মহর্ষি চ্যবনের প্রভাবে ধীবরগণ মাছেদের সঙ্গেই স্বর্গে গমন করল। ধীবর ও মাছেদের স্বর্গে যেতে দেখে রাজা নহুষ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তারপর গাভী থেকে উৎপন্ন মহর্ষি এবং ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজা নহুষকে বর চাইতে বললেন। রাজা প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আপনার কৃপাই আমার কাছে অনেক।' কিন্তু অনেক আগ্রহ প্রকাশ করায় ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী রাজা নহুষ ধর্মে স্থিত থাকার বর প্রার্থনা করলেন। ঋষিগণ 'তথাস্তু' বলায় রাজা তাঁদের যথা বিহিত পূজা করলেন। সেইদিন ঋষি চ্যবনের ব্রত সমাপ্ত হলে তিনি তাঁর আশ্রমে গমন করলেন। তারপর মহাতেজস্বী গোজাত ঋষিও নিজ আশ্রমে গেলেন। শেষে রাজা নহুষ উত্তম বরলাভ করে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি একথা জানালাম। দর্শন ও সহবাসে কীরূপ স্নেহ হয়, গাভীর কী মাহাত্ম্য এবং ধর্মানুকূল সিদ্ধান্ত কী করে নেওয়া যায়—এই প্রসঙ্গে সবই স্পষ্ট হয়ে যায়। এবার তোমাকে কী বলব, তোমার কী শোনার ইচ্ছা নির্দ্বিধায় বলো।

———০———

রাজা কুশিক এবং চ্যবন মুনির উপাখ্যান—মুনি কর্তৃক রাজার ধৈর্য পরীক্ষা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! রাজা কুশিক তো ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁর থেকে ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি কীভাবে হল ? মহাত্মা পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্র উভয়েরই অদ্ভুত প্রভাব ছিল। রাজা কুশিক এবং মহর্ষি ঋচীক—তাঁরাও নিজ নিজ বংশের প্রবর্তক। তাঁদের পুত্র জামদগ্নি এবং গাধিকে লঙ্ঘন করে পৌত্র পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্রের মধ্যেই এই বিজাতীয়তার দোষ এল কেন ? এর রহস্য কী ?

ভীষ্ম বললেন—ভারত ! এই ব্যাপারে রাজা কুশিক এবং মহর্ষি চ্যবনের কথোপকথনরূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। পূর্বকালে ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন জেনেছিলেন যে তাঁর বংশে কুশিক বংশের কন্যার সম্বন্ধ থেকে ক্ষত্রিয়ত্বের মহাদোষ আসবে, সেকথা জেনে তিনি কুশিকের সমস্ত কুল ভস্ম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং রাজা কুশিকের কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার কাছে কিছুদিন থাকতে চাই।' একথা শুনে রাজা মহর্ষিকে বসার জন্য আসন দিলেন এবং জল এনে পা ধোওয়ালেন। তারপর অর্ঘ্য ইত্যাদি দিলেন এবং শান্তভাবে মহর্ষিকে বিধিবৎ মধুপর্ক দিয়ে হাতজোড় করে বললেন—'মুনিবর ! আমরা পতি-পত্নী উভয়েই আপনারই অধীন। বলুন আমরা আপনার কী সেবা করব ? রাজ্য, ধন, গো-ধন এবং যজ্ঞের জন্য দান যা আপনি চান, আমরা সব দিতে প্রস্তুত। আমার প্রাসাদ, রাজ্য, রাজসিংহাসন সবই আপনার। আপনি রাজা, এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি আপনার আদেশ পালনকারী সেবক।'

রাজার এই কথায় মহর্ষি চ্যবন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'রাজন্ ! আমার রাজ্য, ধন, গাভী, দেশ এবং যজ্ঞের কোনো ইচ্ছা নেই, আমার কথা শুনুন। যদি আপনারা দুজনে একমত হন তাহলে আমি একটি নিয়ম প্রচলন করতে ইচ্ছা করি, সেই নিয়ম পালনকালে আপনারা সতর্ক থেকে নির্ভয়তার সঙ্গে আমার সেবা করবেন।'

মুনির কথা শুনে রাজদম্পতি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা বললেন—'যথা আজ্ঞা, আমরা আপনার সেবা করব।' তারপর রাজা কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁদের রাজমহলে নিয়ে গেলেন এবং একটি সুন্দর ঘর দেখিয়ে বললেন—'তপোধন ! এখানে শয্যা প্রস্তুত আছে, আপনি ইচ্ছামতো বিশ্রাম করুন। আমরা যথা সম্ভব আপনাকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করব।' এইরূপ কথাবার্তায় সূর্যাস্ত হয়ে গেল, মহর্ষি তখন রাজাকে অন্ন ও জল আনার নির্দেশ দিলেন। 'যা আদেশ করেন' বলে রাজা গিয়ে যা খাদ্য প্রস্তুত হয়েছিল তা এনে মুনির সামনে দিলেন। মুনি আহার করে রাজা ও রানিকে বললেন—'এবার আমি নিদ্রা যাব, তোমরা আমাকে নিদ্রাকালীন সময় ডেকো না। তোমরা এখানে বসে আমার পদসেবা করতে থাকো।' ধর্মাত্মা কুশিক নির্ভয়ে বললেন, 'আচ্ছা আমরা তাই করব।'

রাজাকে সেবা করার নির্দেশ দিয়ে মহর্ষি চ্যবন একুশ দিন ধরে একভাবে শুয়ে থাকলেন এবং রাজা কুশিক এবং তাঁর রানি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে একভাবে তাঁর সেবায় ব্যাপৃত থাকলেন। মহর্ষির উপাসনাতে তাঁরা অন্তরে অত্যন্ত প্রসন্নতা বোধ করছিলেন। বাইশ দিনের দিন চ্যবনমুনি নিজেই উঠে পড়লেন এবং রাজাকে কিছু না বলেই মহল থেকে বাইরে চলে গেলেন। রাজা-রানি দুজনেই ক্ষুধা ও পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁরা মুনিকে অনুসরণ করে বাইরে এলেন ; কিন্তু সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁদের

দিকে ফিরেও তাকালেন না। তাঁদের চোখের সামনে থেকে মহর্ষি অন্তর্ধান করলেন এবং রাজা বিষণ্ণ হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে উঠলেন এবং রানিকে সঙ্গে নিয়ে মুনিকে খুঁজতে বার

হলেন। কিন্তু কোথাও মুনিকে খুঁজে না পেয়ে রাজা ক্লান্ত হয়ে রানিকে নিয়ে ফিরে এলেন। তখন তাঁর অত্যন্ত সঙ্কোচ হচ্ছিল। নগরে ফিরে তিনি কাউকে কিছু না বলে দুঃখিত ভাবে মুনির কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি শূন্য হৃদয়ে রাজমহলে প্রবেশ করলেন ; মহলে ঢুকেই তিনি দেখলেন ভৃগুনন্দন চ্যবন তাঁর পালঙ্কে নিদ্রা যাচ্ছেন। ঋষিকে দেখে তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, তাঁদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হল। তাঁরা আগের মতো যথাস্থানে বসে মুনির পদসেবা করতে লাগলেন। এবার মহামুনি অন্য পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। আবার একুশ দিন পর তিনি নিজেই গাত্রোত্থান করলেন। রাজা ও রানি তাঁর ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, তাই তাঁরা মনে কোনো বিকার আসতে দিলেন না। জেগে উঠেই ঋষি বললেন—'আমি এবার স্নান করব, তোমার আমার গায়ে তেল মাখাও।' রাজা রানি যদিও ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে পরিশ্রান্ত ছিলেন, তবুও 'যথা আজ্ঞা' বলে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঋষির শরীরে তেলমালিশ করতে লাগলেন ; কিন্তু মহাতপস্বী চ্যবন একবারও তাঁদের বললেন না যে, 'ঠিক

আছে, আর করতে হবে না।' এতেও যখন রাজা-রানি কোনোপ্রকার বিরক্ত হলেন না, তখন মুনি হঠাৎ উঠে স্নান করতে চলে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই রাজোচিত স্নানের বস্তু সাজানো ছিল ; কিন্তু তিনি তা ব্যবহার না করেই রাজার চোখের সামনে অন্তর্ধান করলেন। তাসত্ত্বেও রাজদম্পতি তাঁর কোনো দোষ দেখলেন না। ঋষি তারপর স্নান সেরে পুনরায় তাঁদের দর্শন দিলেন। তাঁকে দেখে রাজা-রানি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। হাতজোড় করে তাঁরা বললেন—'ভগবন্ ! আহার প্রস্তুত।' মুনি বললেন—'নিয়ে এসো।' অনুমতি পেয়ে রাজা-রানি গৃহস্থ এবং বনবাসীদের উপযুক্ত নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী এনে মুনির সামনে সাজিয়ে দিলেন। মুনি সে-সব নিয়ে বিছানার সঙ্গে রাখলেন এবং সেগুলি উত্তম বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর আহারসামগ্রী-সহ সেই সব বস্ত্রে আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং আবার অন্তর্ধান করলেন ; কিন্তু তাতেও রাজদম্পতি ক্রোধ করলেন না। রাজর্ষি কুশিক সমস্ত রাত রানিকে নিয়ে জেগে বসে রইলেন।

এত চেষ্টার পরেও যখন মহর্ষি চ্যবন রাজার কোনো ছিদ্র খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি তাঁকে বললেন—'তুমি স্ত্রীসহ আমার রথ টানো আর আমি তাতে বসে যেখানে যেতে বলব, নিয়ে চলো।' রাজা নিঃশঙ্কে বললেন—'ঠিক আছে।' তারপর তিনি এক মস্ত বড় রথ নিয়ে এলেন। সেখানে বাঁদিকে স্ত্রীকে দিয়ে নিজে ডানদিকে ধরে দাঁড়ালেন। সেই রথে তিনি এমন একটি চাবুক রেখেছিলেন যেটির তিনটি মুখ এবং সেই মুখ তিনটি সূঁচের মুখের মতো তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত। এইসব ঠিক করে তিনি মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্ ! বলুন রথ কোন দিকে যাবে ? যেখানে যাবার জন্য আপনি আদেশ করবেন, সেদিকেই আপনার রথ যাবে।'

রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে চ্যবন বললেন—'তুমি আস্তে আস্তে এক পা করে চলো। খেয়াল রেখো, আমার যেন কষ্ট না হয়, যেন আরামে যেতে পারি। সেই সঙ্গে পথ থেকে কোনো পথিককে সরাবে না। আমার ইচ্ছা যে সবাই যেন তোমাকে এই রথ টানতে দেখে আর আমি তাদের ধন দান করি। পথে কোনো ব্রাহ্মণ যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাকে আমি তার ইচ্ছানুযায়ী ধনরত্নাদি দান করব। সুতরাং তুমি সে সবেরও ব্যবস্থা রেখো।' মুনির কথা শুনে রাজা তাঁর সেবকদের বললেন—'মুনি যেসব বস্তু আনার নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা নির্ভয়ে তা আনো।' রাজার আদেশানুসারে নানাপ্রকার রত্ন, নারী, বাহন, ছাগ, সুবর্ণ এবং পর্বতাকার গজ—এই সব মুনিকে অনুসরণ করতে লাগল। সেই সঙ্গে রাজার সব মন্ত্রীও ছিলেন। সেই সময় সমস্ত নগরী আর্তস্বরে হাহাকার করতে লাগল। মুনি সহসা

চাবুক তুলে তার তীক্ষ্ণ সূচিমুখ দিয়ে রাজা ও রানির পিঠ ও কোমরে আঘাত করতে লাগলেন ; কিন্তু তাঁরা নির্বিকার ভাবে রথ টানতে লাগলেন। পঞ্চাশ রাত ধরে উপবাসে থাকায় তাঁরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, সমস্ত শরীর কাঁপছিল, তবুও বীর দম্পতি সাহসের সঙ্গে রথের ভার টানছিলেন। চাবুকের আঘাতে তাঁদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তের ধারা বইছিল, রক্তে রাঙা তাঁদের দেহ পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দেখাচ্ছিল। তাঁদের এই অবস্থা দেখে পুরবাসীরা খুবই

দুঃখ পাচ্ছিল ; কিন্তু মুনির শাপের ভয়ে তারা কিছুই বলতে সাহস পাচ্ছিল না। তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগল—'ভাইসব ! শুদ্ধ হৃদয়সম্পন্ন এই মহর্ষির তপস্যার বল দেখো, এঁর শক্তি অদ্ভুত আর রাজা-রানির ধৈর্য দেখো ! তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েও কত কষ্টে এই রথ টানছেন, ভৃগুনন্দন চ্যবন এখনও পর্যন্ত এঁদের মধ্যে কোনো বিকার খুঁজে পেলেন না।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মহর্ষি চ্যবন যখন কোনোভাবে রাজা-রানির মনে কোনো মলিনতা দেখতে পেলেন না, তখন তিনি কুবেরের মতো অর্থ অপচয় করতে লাগলেন ; কিন্তু এই কাজেও রাজা কুশিক অত্যন্ত প্রসন্ন মনে ঋষির আদেশ পালন করতে লাগলেন। সবকিছু দেখে মহর্ষি চ্যবন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে রথ থেকে নেমে রাজা-রানিকে রথ টানার কাজ থেকে মুক্তি দিলেন। তারপর তিনি স্নেহপূর্ণ গম্ভীর স্বরে বললেন—'আমি তোমাদের দুজনকে বর দিতে চাই, বল কী চাও।' এই কথা বলতে বলতে তিনি তাদের আহত দেহের ক্ষতে স্নেহভরে তাঁর অমৃতসম কোমল হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর তিনি প্রসন্ন স্বরে রাজাকে বললেন—'পুত্র ! গঙ্গাতীরবর্তী এই স্থানটি অত্যন্ত
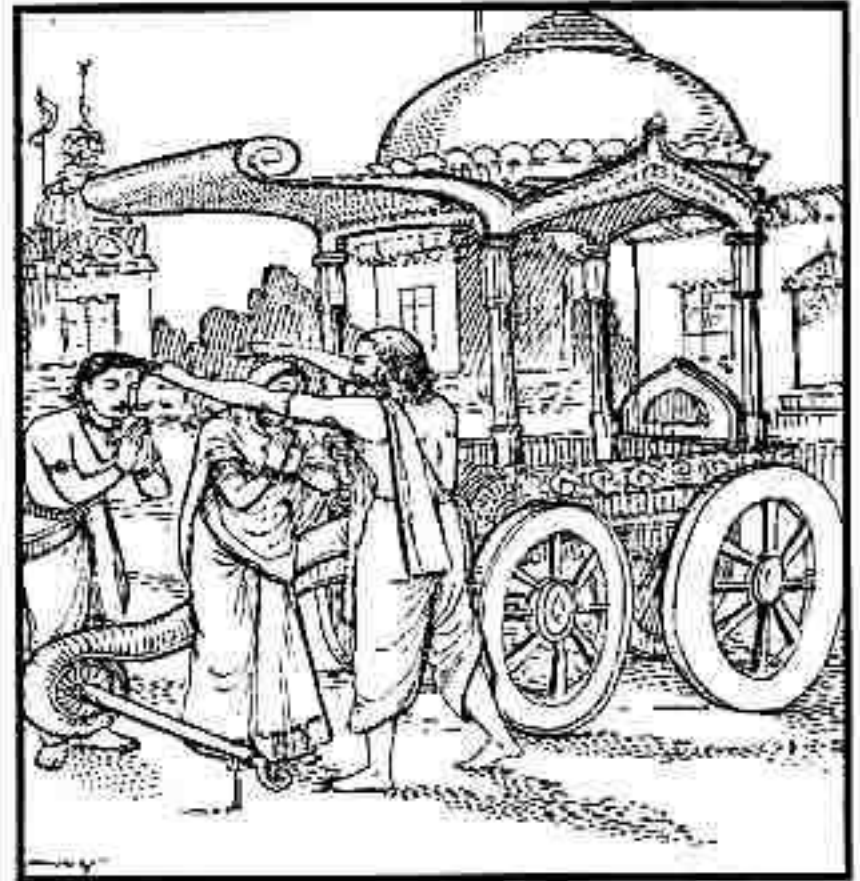
রমণীয়, আমি কিছুদিন এখানে থেকে ব্রতপালন করব। এখন তুমি নগরে ফিরে যাও, ক্লান্তি দূর করে কাল সকালে তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আবার এখানে এসো। আমি এখানেই থাকব, এখন তোমার কল্যাণের সময় হয়েছে। তোমার মনে যেসব ইচ্ছা আছে সবই পূর্ণ হবে।'

মুনির কথা শুনে রাজা কুশিক মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'মহাভাগ ! আপনি আমাদের পবিত্র করেছেন, আমরা নূতন যৌবন ফিরে পেয়েছি এবং আমাদের শরীর সুন্দর এবং বলশালী হয়ে উঠেছে। আপনি আমাদের দেহে চাবুকের আঘাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিলেন, তাও আর নেই। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং আমার রানিকেও অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী দেখাচ্ছে। এ সবই আপনার কৃপা। আপনার মতো তপস্বীর এরূপ শক্তি থাকা কোনো আশ্চর্যের কথা নয়।' এই বলে রাজর্ষি কুশিক মুনির অনুমতি নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে নগরের দিকে রওনা হলেন। তাঁর পুরোহিত এবং মন্ত্রীরাও সেইসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নগরে প্রবেশ করে তিনি পূর্বাহ্নের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করলেন এবং পত্নীর সঙ্গে আহার সমাপন করে

রাত্রে পালঙ্কে শয়ন করলেন। সেইসময় তাঁদের দেহ মুনি-প্রদত্ত নবীন শোভাযুক্ত হওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। অন্যদিকে ভৃগুকুলের কীর্তিবৃদ্ধিকারী, তপস্যার ধনে ধনী মহর্ষি চ্যবন গঙ্গাতীরের তপোবনকে নিজ সংকল্প বলে নানা প্রকার রত্নের দ্বারা সুশোভিত করে ইন্দ্রপুরীর থেকেও সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে দিলেন।

—o—

কুশিককে চ্যবনের স্বর্গীয় দৃশ্য দেখানো, তাঁকে গৃহে থাকার প্রয়োজন জানানো এবং তাঁর বংশকে ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির বরদান প্রদান

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! পরদিন মহামনা কুশিক নিদ্রাভঙ্গ হলে পূর্বাহ্ণের দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদন করে তাঁর রানির সঙ্গে তপোবনের দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বর্ণনির্মিত একটি মহল দেখতে পেলেন, যাতে মণিশোভিত একহাজার স্তম্ভ ছিল, তার শোভা গন্ধর্ব নগরকেও হার মানিয়ে দেয়। রাজা সেখানে আরও অনেক দিব্য পদার্থ দেখলেন, কোথাও রূপোর শিখরদ্বারা সুশোভিত পর্বত, কোথাও পদ্ম পরিপূর্ণ সরোবর, কোথাও নানাপ্রকার চিত্রশালা এবং উপাসনালয় শোভিত হচ্ছে। মাটিতে কোথাও স্বর্ণগালিচা পাতা, কোথাও শ্যামল-সবুজ ঘাসের বাহার। সেখানে নানাপ্রকার গাছে চিত্র-বিচিত্র সুগন্ধী পুষ্প শোভাবর্ধন করছিল। বিমানাকার পর্বতের ন্যায় বহু উচ্চ মহল দেখা যাচ্ছিল, সেগুলি অত্যন্ত রমণীয় এবং পত্র-পুষ্পে সুশোভিত, সমস্ত ঋতুতে সেগুলি তেমনই শোভিত থাকত।

সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রাজা ভাবতে লাগলেন 'এসব কী স্বপ্ন, না আমার চিত্তভ্রম হয়েছে অথবা এ সব সত্য। আমি হয়তো পরমগতি লাভ করেছি, নয়তো আমি উত্তরকুরু কিংবা অমরাবতীতে এসে গেছি। এই যে মহা আশ্চর্য দৃশ্য আমি দেখছি, এসব কী !' রাজা এইসব ভাবতে ভাবতে ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষিকে দেখতে পেলেন, তিনি মণিময় স্তম্ভযুক্ত এক সুবর্ণময় বিমানের মধ্যে বহুমূল্য দিব্য পালঙ্কে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে রাজা কুশিক অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে রানিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। এর মধ্যে মহর্ষি চ্যবন পালঙ্কসমেত অন্তর্ধান করলেন। তারপর এক মুহূর্তে সেই সুন্দর সুশোভিত বন বিলীন হয়ে গেল। রাজা কুশিক তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে অন্য বনে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন চ্যবন মুনি কুশাসনে বসে জপ করছেন। এইভাবে মহর্ষি চ্যবন তাঁর যোগবলে রাজাকে মোহগ্রস্ত করলেন। রাজা কুশিক এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে তাঁর পত্নীকে বললেন—'কল্যাণী ! আমরা ভৃগুকুলতিলক চ্যবন মুনির কৃপায় নানা বিচিত্র পরম দুর্লভ পদার্থ দর্শন করলাম। তপোবলের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন বল আছে বলো ? যে কথা মনে মনে কেবল কল্পনাই করা যায়, তা তপস্যার দ্বারাই সুলভ। ত্রিলোকের রাজ্যের থেকে তপই শ্রেষ্ঠ। নিষ্ঠাভরে তপস্যা করলে, তার শক্তিতে মোক্ষলাভও সম্ভব হয়ে যায়। ব্রহ্মর্ষি চ্যবনের প্রভাব অতি অদ্ভুত। ইনি ইচ্ছা করলেই দ্বিতীয় পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারেন। এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণই বাক্, পবিত্র বুদ্ধি এবং পবিত্র কর্মকারী হয়। মহর্ষি চ্যবন ব্যতীত অন্য কে এমন মহান কার্য করতে সক্ষম ?'

রাজা দাঁড়িয়ে এইসব কথা চিন্তা করছিলেন, তারমধ্যে মহর্ষি চ্যবন জানতে পেরেছিলেন যে রাজা-রানি এসেছেন। তিনি রাজাকে দেখে বললেন—'রাজন্ ! শীঘ্র এখানে এসো !' অনুমতি পেয়ে মহারাজ কুশিক তাঁর পত্নীকে নিয়ে সেখানে গেলেন এবং সেই বন্দনীয় মহাত্মাকে মাথা নত করে প্রণাম করলেন। মুনি তাঁকে আশীর্বাদ করে বসতে আদেশ করলেন। মুনি এবার শান্তভাবে মধুর স্বরে রাজাকে তৃপ্ত করে বললেন—'রাজন্ ! তুমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনকে উত্তমরূপে জয় করেছ। তাই তুমি মহাসংকট থেকে মুক্ত হয়েছ। আমার আরাধনাও করেছ অতি উত্তমভাবে ; ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো অপরাধই তুমি করোনি। এবার আমাকে যাওয়ার অনুমতি দাও, আমি যেভাবে এসেছিলাম, সেভাবেই ফিরে যাব। তোমার ওপর আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, সুতরাং তুমি আমার কাছে তোমার মনোমতো কোনো বর প্রার্থনা করো।'

কুশিক বললেন—ব্রহ্মন্ ! আপনি যে আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, এটিই আমার কাছে সব থেকে বড় বর এবং এই আমার জীবন ও রাজ্যের ফল। ভৃগুনন্দন ! আপনার যদি আমার ওপর ভালোবাসা থাকে, তবে আমার মনে একটি প্রশ্ন আছে, কৃপা করে তার উত্তর দিন।

চ্যবন বললেন—নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার কাছ থেকে বরও চাও আর মনে যে প্রশ্ন আছে তা বলো ; আমি তোমার সব ইচ্ছাই পূর্ণ করব।

কুশিক বললেন—ভার্গব ! আপনি যদি প্রসন্ন হন তাহলে বলুন যে আপনি আমার গৃহে এতদিন কেন কাটালেন ? আমি এর কারণ জানতে চাই। একুশ দিন যাবৎ একপাশে শয়ন, পরে উঠে কিছু না বলে চলে যাওয়া, সহসা অন্তর্ধান করা পরে দর্শন দিয়ে একুশ দিন অন্যপাশে শয়ন, জেগে উঠে তেল মালিশ করানো, পরে অন্তর্ধান করে চলে যাওয়া, পুনরায় মহলে এসে নানাপ্রকার খাদ্য একত্রিত করা এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করে চলে যাওয়া, আবার হঠাৎ রথে চড়ে নগর পরিক্রমা করা, ধন দান করা এবং বনে সুবর্ণমণ্ডিত মহল ও রত্নখচিত পালঙ্ক দেখানো, পরে সেসব অদৃশ্য করে দেওয়া—আপনার কার্যের আমি যথার্থ কারণ জানতে চাই।

চ্যবন ঋষি বললেন—রাজন্ ! যেজন্য আমি এসব কাজ করেছি, তা সবিস্তারে শোনো—অনেকদিনের কথা, একদিন দেবসভায় ব্রহ্মা বলছিলেন, 'ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিরোধ থাকায় উভয় কুলে সংকরতা এসে পড়বে।' তাঁর কাছে আমি এও শুনেছিলাম যে 'তোমার বংশের কন্যার দ্বারা আমার বংশে ক্ষত্রিয় তেজের সঞ্চার হবে এবং তোমার এক পৌত্র ব্রাহ্মণ-তেজসম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী হবে।' একথা শুনে আমি তোমার বংশ উচ্ছেদ করার বাসনায় এখানে এসেছিলাম। সেইসময় আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, 'আমি একটি ব্রত শুরু করব, তুমি আমার সেবা করো।' (এই ছুতোয় আমি তোমার দোষ খুঁজতে থাকলাম)। কিন্তু তোমার গৃহে থেকেও আমি আজ পর্যন্ত তোমার কোনো দোষ খুঁজে পেলাম না। একুশ দিন ধরে নিদ্রা গেলাম, কিন্তু তুমি বা তোমার পত্নী আমাকে জাগাতে সাহস করলে না। তারপর আমি অন্তর্ধান করলাম এবং পুনরায় তোমার গৃহে এসে যোগের আশ্রয় নিয়ে একুশ দিন ঘুমোলাম। আমি ভেবেছিলাম যে তোমরা ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমার নিন্দা করবে, সেই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদের ক্ষুধার্ত রেখে কষ্ট দিয়েছি। তাতেও তুমি বা তোমার স্ত্রী একটুও ক্ষোভ প্রকাশ করোনি। তাতে আমি তোমাদের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তারপর আমি যে খাদ্যদ্রব্য পুড়িয়ে দিয়েছি, তারও উদ্দেশ্য ছিল যে, তুমি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবে ; কিন্তু আমার সেই ব্যবহারও তুমি সহ্য করেছ। তারপর আমি রথে বসে তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে আমার রথ টানার আদেশ দিয়েছি, সে কাজও তোমরা নির্ভয়ে পূর্ণ করেছ। তারপর যখন তোমার অর্থ নষ্ট করতে লাগলাম, তখনও তুমি ক্রোধের বশীভূত হওনি। এইসব ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, তাই তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি এই বনে স্বর্গ দর্শন করিয়েছি। রাজন্ ! এই বনে তুমি যে দিব্য দৃশ্য দর্শন করেছ, তা স্বর্গের এক ঝলকমাত্র। তুমি তোমার পত্নীর সঙ্গে এই দেহেই কিছুক্ষণের জন্য স্বর্গীয় সুখ অনুভব করেছ। আমি এসবই তোমাকে দেখিয়েছি ধর্ম ও তপের প্রভাবে। এসব দেখার পর তোমার মনে যে ইচ্ছা হচ্ছে, তা আমি জেনেছি। তুমি সম্রাট এবং ইন্দ্রপদও তৃণবৎ মনে করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে চাও এবং তপ করার ইচ্ছা কর। তপ ও ব্রাহ্মণত্বের ব্যাপারে তুমি যে বিচার-বিবেচনা করছ, তা একেবারে ঠিক। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়া দুর্লভ, ব্রাহ্মণ হলেও ঋষি হওয়া এবং ঋষি হলেও তপস্বী হওয়া আরও দুর্লভ। তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ভৃগু বংশীয়দের তেজে

তোমার বংশ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে, তোমার পৌত্র অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং তপস্বী ব্রাহ্মণ হবে; সে তার প্রভাবে ত্রিলোককে প্রভাবিত করবে। তোমায় আমি একথা শপথ করে বলছি। রাজর্ষি ! এবার তুমি আমার কাছে তোমার মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করো। আমি তীর্থ যাত্রা করব, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কুশিক বললেন—মহামুনি ! আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, এই আমার কাছে অনেক বড় বর। আপনি যা বলছেন, তা যেন সত্য হয়—আমার পৌত্র ব্রাহ্মণ হোক। এখন আমি বিস্তারিতভাবে জানতে চাই যে আমার বংশ কীভাবে ব্রাহ্মণ হবে ? আমার কোন পৌত্র সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ হবে ?

চ্যবন বললেন—নরশ্রেষ্ঠ ! একথা তোমাকেই বলা যায়, শোনো—ক্ষত্রিয়রা সর্বদাই ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের যজমান ; কিন্তু প্রারব্ধবশত তাদের পতন হবে, তাই তারা দৈব প্রেরণায় সমস্ত ভৃগুবংশীয়দের সংহার করবে, গর্ভের সন্তানদেরও রাখবে না। তারপর আমার বংশের মহর্ষি উর্বের ঋচীক নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, প্রারব্ধবশত তার কাছে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের শেষ করার জন্য সম্পূর্ণ ধনুর্বেদ মূর্তিমান হয়ে উপস্থিত হবে। সেই ধনুর্বেদ গ্রহণ করে ঋচীক মুনি তার পুত্র জামদগ্নিকে তার শিক্ষা প্রদান করবে। জামদগ্নি নিজ তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধ অন্তঃকরণ লাভ করবে এবং সেই ধনুর্বেদ ধারণ করবে। সে তোমার কুলের কল্যাণ করার জন্য তোমার বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করবে, সেই কন্যা হবে রাজা গাধির সন্তান এবং তোমার পৌত্রী। তার গর্ভে মহর্ষি জামদগ্নি ক্ষত্রিয় ধর্ম আচরণকারী পুত্র উৎপন্ন করবে, যে ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণ-ধর্ম পালনকারী, বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানী এবং মহাতপস্বী হবে। এইভাবে ব্রাহ্মণকুলে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় কুলে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হওয়ার জন্য দুই নারী নিমিত্ত হবে। এসবই ব্রহ্মার প্রেরণাতে হবে। তোমার তৃতীয় বংশধর ব্রাহ্মণ হবে এবং তুমি পবিত্রাত্মা ভৃগুবংশীয়দের সম্বন্ধী হবে।

ভীষ্ম বললেন—মহাত্মা চ্যবন মুনির কথা শুনে রাজা কুশিক অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তারপর মহাতেজস্বী চ্যবন তাঁকে বর প্রার্থনা করার জন্য আবার আহ্বান করলেন। তখন রাজা বললেন—'মহামুনি ! আমার কুল যেন ব্রাহ্মণ হয়ে যায় এবং তাদের মন যেন ধর্মে ব্যাপৃত থাকে।' রাজা কুশিকের কথা শুনে চ্যবন মুনি বললেন—'আচ্ছা ! তাই হবে।' তারপর তিনি রাজার অনুমতি নিয়ে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে ভৃগুবংশীয় এবং কুশিক বংশীয়দের পরস্পর সম্বন্ধের কারণ জানালাম। চ্যবন ঋষি যেমন বলেছিলেন, সেইমতো পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়েছিল।

—o—

নানা প্রকার শুভ কর্ম এবং জলাশয় ও বাগিচা তৈরি করার ফল

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! এই পৃথিবীকে আমি যখন সম্পত্তিশালী রাজা বর্জিত দেখি, তখন আমার বড় চিন্তা এবং বুদ্ধিভ্রম হয়। যদিও আমি বহু রাজ্যের অধিকার লাভ করেছি এবং সমস্ত পৃথিবী জয় করেছি, কিন্তু তার জন্য আমার দ্বারা যে কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে, সেজন্য আমার অত্যন্ত মর্মবেদনা হচ্ছে। হায় ! তাদের অসহায় পত্নীদের কী দশা হবে, যারা আজ পতি ও বন্ধুহীন হয়েছে। এইসব ভেবে আমার ইচ্ছা হয় যে ভয়ংকর তপস্যা করে আমার শরীর শুষ্ক করে ফেলি ; এই ব্যাপারে আপনার কী মত ? আমি তা সঠিকভাবে জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে এক অদ্ভুত রহস্য জানাচ্ছি। মানুষের মৃত্যু হলে কোন কর্মে সে কীরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, তা শোনো। তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, তপস্যার দ্বারা সুযশ এবং তপস্যা দ্বারাই দীর্ঘায়ু লাভ হয়, উচ্চপদ এবং নানাপ্রকার ভোগপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, সম্পত্তি এবং সৌভাগ্যও তপস্যারই ফল। তপ করলে মানুষ ধন লাভ করে, মৌনব্রত আচরণ দ্বারা সকলের ওপর কর্তৃত্ব করে, দানের দ্বারা উপভোগ এবং ব্রহ্মচর্য পালন করলে দীর্ঘায়ু হয়। ব্রত দীক্ষা নিলে উত্তম কুলে জন্ম হয়, ফল-মূল আহারকারীদের রাজ্য এবং পাতা ভক্ষণকারীদের স্বর্গলাভ হয়। দুগ্ধপান করে থাকা মানুষ স্বর্গলাভ করে এবং দান করলে ধন লাভ হয়। গুরুসেবা দ্বারা বিদ্যা এবং নিত্য শ্রাদ্ধ করলে সন্তান বৃদ্ধি হয়। যে শুধু শাকাহার করে থাকে, সে গোধন লাভ করে। তৃণাহারী

স্বর্গে যায় এবং বায়ু আহারকারী যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে দ্বিজ নিত্য স্নান করে দুবার সন্ধ্যা উপাসনা করে সে দক্ষ প্রজাপতির সমান হয়। অন্ন-জল ত্যাগকারী স্বর্গগমন করে এবং উন্মুক্ত আকাশের নীচে যে শয়ন করে সে গৃহ ও শয্যা লাভ করে। চীর-বল্কলধারী উত্তম বস্ত্রালংকার প্রাপ্ত হয়, জলে বসে যে তপস্যা করে সে রাজা হয় এবং সত্যবাদী ব্যক্তি স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে আনন্দভোগ করে। দানের দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য এবং ব্রাহ্মণকে সেবার দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হয়। তৃষ্ণার্তকে জলদান করলে চিরস্থায়ী কীর্তি লাভ হয় এবং অন্নদান করলে সমস্ত কামনা ও উপভোগাদি প্রাপ্তি হয়। যে সকল প্রাণীকে সান্ত্বনা প্রদান করে, সে সর্বপ্রকার শোক থেকে মুক্তিলাভ করে। দেবতাদের সেবাদ্বারা রাজ্য ও দিব্যরূপ লাভ হয়। মন্দিরে দীপদান করলে মানুষের নেত্র নীরোগ হয়। সুন্দর বস্ত্র দানের দ্বারা বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি লাভ হয়। দ্বাদশ বৎসর উপবাস, দীক্ষা এবং ত্রিকাল স্নানের নিয়ম পালন করলে বীরদের থেকেও শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়। যজ্ঞ ও উপবাসের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। ফল ও ফুল দান করলে মানুষ মোক্ষদায়ক জ্ঞান লাভ করে।

যে ব্যক্তি গোবৎসা এবং স্বর্ণমণ্ডিত শিং-সহ কপিলা গাভী ও দুগ্ধ পাত্র দান করে সেই ব্যক্তি বহুগুণসম্পন্ন কামধেনু গাভী লাভ করে। সেই ব্যক্তি বহু বছর ধরে স্বর্গসুখ ভোগ করে এবং সেই কামধেনু গাভী তার পুত্র-পৌত্রাদি সাত পুরুষকে উদ্ধার করে। মহাসাগরে নৌকা যেমন বায়ুর সাহায্যে পারে এসে পৌঁছায়, তেমনই নিজ কর্মফলে আবদ্ধ এবং ভয়ানক অন্ধকারে পতিত মানুষকে একমাত্র গোদানই পার করতে সক্ষম। যে ব্যক্তি তার কন্যাকে ব্রাহ্মবিধিতে বিবাহ দেয়, ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে এবং বিধিবৎ অন্নদান করে, সে ইন্দ্রলোক লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়শীল এবং সদাচারী ব্রাহ্মণকে সর্বগুণসম্পন্ন গৃহদান করে, সে উত্তর কুরুদেশে জন্মগ্রহণ করে। ভারবহনকারী বলদ এবং গাভী দান করলে বসুলোক প্রাপ্তি হয়। সুবর্ণ দান করলে স্বর্গ লাভ হয়। ছাতা দান করলে উত্তম গৃহ, জুতা দান করলে গাড়ি, বস্ত্র দান করলে সুন্দর রূপ এবং গন্ধ দান করলে সুগন্ধিত দেহ লাভ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ফল-ফুলপূর্ণ বৃক্ষ দান করে, সে অনায়াসে রত্নপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী গৃহ লাভ করে। অন্ন, জল ও রসদানকারী ব্যক্তি তার ইচ্ছানুসারে রসলাভ করে এবং যে ব্যক্তি ঘর ও পরিধানের বস্ত্র দান করে, সে এইসব বস্তু লাভ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ফুলের মালা, ধূপ, চন্দন, স্নানের জল ও পুষ্প দান করে, সে নীরোগ এবং সুন্দর হয়। যে ব্যক্তি শয্যাসহ অন্নপূর্ণ গৃহ দান করে, সে অতি পবিত্র, মনোহর এবং নানারত্নপূর্ণ উত্তমস্থান লাভ করে। রণভূমিতে বীরশয্যায় শয়নকারী ব্যক্তি ব্রহ্মার সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! বাগিচা ও জলাশয় তৈরি করলে কী ফল লাভ হয় তা আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে স্থানের দৃশ্য সুন্দর, যেখানে ধান্য অধিক উৎপন্ন হয়, যেস্থান নানাপ্রকার ধাতুর দ্বারা ভূষিত, যেখানে সর্বপ্রকার প্রাণী বাস করে, সেই স্থানকে উত্তম বলে মনে করা হয়। সেটি কূপ এবং জলাশয় বা পুষ্করিণী নির্মাণ করার উত্তম ক্ষেত্র (তীর্থ)। এবার আমি পুষ্করিণী খনন করার পুণ্যের বর্ণনা করছি। পুষ্করিণী তৈরি করেন যে ব্যক্তি, তাঁকে ত্রিলোকে সর্বত্র পূজনীয় বলে মনে করা হয়। পুষ্করিণী মিত্র গৃহের ন্যায় উপকারী, সূর্যদেবকে প্রসন্নকারী এবং দেবগণের সন্তুষ্টি বৃদ্ধিকারী। পুষ্করিণী নির্মাণ নিজ কীর্তি বৃদ্ধি করার সর্বোত্তম উপায় ; এর দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ফল লাভ হয়। দেশে পুষ্করিণী নির্মাণ করানোর পুণ্য এক মহাক্ষেত্রের সমান, সেটি চারপ্রকার প্রাণীদের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যন্ত বড় আধার হয়ে ওঠে। দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, পিতৃগণ, নাগ, রাক্ষস এবং সমস্ত স্থাবর প্রাণী জলাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে ; তাই ঋষিগণ পুষ্করিণী নির্মাণ করানোতে যে ফললাভের কথা বলেছেন, তা আমি তোমাকে জানাচ্ছি, শোনো—যার নির্মিত পুষ্করিণীতে কেবল বর্ষাকালে জল থাকে সে অগ্নিহোত্রের ফল লাভ করে, যার পুষ্করিণীতে শরৎকাল পর্যন্ত জল থাকে, সে মৃত্যুর পর এক হাজার গোদানের ফল লাভ করে। যার জলাশয়ে হেমন্তকাল পর্যন্ত জল থাকে, সে এমন যজ্ঞের ফল পায়, যেখানে বহু স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে। যার পুকুরে বসন্তকাল পর্যন্ত জল থাকে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। যার নির্মিত পুকুরে গ্রীষ্মেও জল শুষ্ক হয় না, সে অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং যার পুকুরের জল পুনরায় বর্ষার আগমন পর্যন্ত থাকে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। যার পুকুরের জল গোরু এবং সাধু ব্যক্তিরা পান করে, সে তার সমস্ত কুলকে উদ্ধার করে। যার পুকুরের জল সকল পিপাসার্ত

প্রাণী পান করে, সে ব্যক্তিও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। যদি কারো পুকুরে লোকে স্নান করে, জলপান করে এবং বিশ্রাম করে তাহলে মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি অক্ষয় সুখ লাভ করে। জল অত্যন্ত পুণ্যের, তা পরলোকে পাওয়া আরও কঠিন, যে জলদান করে সে সদা পরলোকে তৃপ্ত থাকে। জলদান সব থেকে শ্রেষ্ঠ দান, তাই অবশ্যই জলদান করা উচিত।

আমি তোমাকে পুষ্করিণী নির্মাণের উত্তম ফলের বর্ণনা করলাম, এবার বৃক্ষ রোপণের সম্পর্কে বলছি। স্থাবর প্রাণীদের ছটি জাতির কথা বলা হয়েছে—বৃক্ষ (বট-অশ্বত্থাদি), গুল্ম (কুশাদি), লতা (বৃক্ষের ওপর ওঠা), বল্লী (জমিতে ছড়িয়ে পড়া গাছ), বাঁশ এবং তৃণ। এগুলির দ্বারা যে কার্যসিদ্ধি হয়, তা শোনো। বৃক্ষ রোপণ করে যে ব্যক্তি, তার ইহলোকে কীর্তি অক্ষয় হয় এবং মৃত্যুর পর উত্তম ফল প্রাপ্তি হয়। জগতে তার নাম থাকে, পরলোকে পিতৃগণ তাকে সম্মান করেন, দেবলোকে গেলেও তার কীর্তি বিনষ্ট হয় না। সে তার পিতৃকুল ও ভবিষ্যতের সন্তানদেরও উদ্ধার করে। তাই বৃক্ষ অবশ্যই লাগানো উচিত। বৃক্ষ রোপণকারী ব্যক্তির কাছে বৃক্ষ পুত্রতুল্য হয়, সেইজন্যই সে পরলোকে স্বর্গ ও অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষ তার ফুলে দেবতাকে, ফলে পিতৃগণকে এবং ছায়াদ্বারা অতিথিদের পূজা করে। কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, দেবতা, মানুষ, ঋষি—সকলেই বৃক্ষের আশ্রয় নেয়। ফুল ও ফলে বৃক্ষ জগতের মানুষকে তৃপ্ত করে। তাই মানুষের উচিত জলাশয় নির্মাণ করে তার ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ করা এবং সেগুলিকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করা ; কারণ ধর্মের দৃষ্টিতে বৃক্ষকে পুত্রই বলা হয়। যে জলাশয় তৈরি করে, গাছ লাগায়, যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সত্য বলে, সে স্বর্গে সম্মানিত হয়। তাই মানুষের উচিত জলাশয় নির্মাণ করা, গাছ লাগানো, নানাপ্রকার যজ্ঞ করা এবং সর্বদা সত্য কথা বলা।

উত্তম দান ও উত্তম ব্রাহ্মণদের ভীষ্মের প্রশংসা এবং তাঁদের আরাধনার উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! (যজ্ঞ) বেদীর বহির্ভূত যে দানের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে কোনটিকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন ? যে দানের পুণ্য দাতাকে অনুসরণ করে, কৃপা করে আমাকে তা বলুন।'

ভীষ্ম বললেন—'যুধিষ্ঠির ! সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করবে, সংকটের সময় তাদের দয়া করবে, তাদের ইঙ্গিত বস্তু প্রদান করবে এবং পিপাসার্তকে জল পান করাবে। স্বর্ণ, গাভী এবং জমি—এই তিন বস্তুর দান অত্যন্ত পবিত্র, এরদ্বারা পাপীও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। রাজন্ ! তুমি সাধু-ব্যক্তিদের সদাই এইসকল বস্তু দান করবে। এর দ্বারা মানুষ যে পাপ থেকে মুক্ত হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জগতে যেসব বস্তু অত্যন্ত প্রিয় এবং নিজ গৃহে যে প্রিয় বস্তু সঞ্চিত থাকে, তা গুণবান ব্যক্তিকে দান করা উচিত, তাহলে সেই দান অক্ষয় হয়। যে সর্বদা অপরের প্রিয় কাজ করে, তাদের প্রিয় বস্তু দান করে, সে ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রাণীর প্রিয় হয় এবং সে নিজে সর্বদা প্রিয় বস্তু লাভ করে। যে ব্যক্তি আসক্তিরহিত এবং অকিঞ্চন ব্যক্তির প্রার্থনাতেও অহংকারবশত নিজ শক্তি অনুসারে তার সংকার করে না, সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রূর। শত্রুও যদি দীন হয়ে শরণ পাবার আশায় গৃহে আসে, তাহলে তার সেই সংকটে যে ব্যক্তি তাকে দয়া করে, সে-ই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিদ্বান হলেও যার জীবিকা নষ্ট হয়ে গেছে, যে দীন-দুর্বল ও দুঃখী, সেইরূপ ব্যক্তির সাহায্যকারী মানুষের মতো পুণ্যাত্মা আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র পালনে অসমর্থ হওয়ায় অত্যন্ত কষ্টে পড়েও কারো কাছে কিছু চায় না এবং সর্বদা সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকে, তাকে নিজের কাছে ডেকে যথেষ্ট সাহায্য করা উচিত। যুধিষ্ঠির ! যে দেবতা এবং মানুষের থেকে কোনো বস্তু কামনা করে না, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে এবং যা পাওয়া যায় তাতেই জীবিকা নির্বাহ করে, এরূপ পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করে, তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর আবশ্যকীয় সামগ্রীদ্বারা পরিপূর্ণ সর্ব প্রকার সুখপূর্ণ গৃহ নিবেদন করে তাঁকে পূর্ণ সম্মান জানাবে। যদি তোমার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে পবিত্রভাবে এবং কর্তব্যের দৃষ্টিতে করা হয় তাহলে পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানকারী ধার্মিক ব্যক্তি তা উত্তম মনে করে স্বীকার করবেন। যে বিদ্বান, ব্রত পালনকারী, কারো সাহায্য ব্যতীত জীবন নির্বাহ করেন, নিজ স্বাধ্যায় এবং তপকে গুপ্ত রাখেন, কঠোর নিয়ম পালনকারী, শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও শুধুমাত্র নিজ স্ত্রীর সঙ্গেই

সম্পর্কিত, সেই উত্তম ব্রাহ্মণকে তুমি যা দানই করো, তাতে তোমার কল্যাণ হবে। দ্বিজগণ সায়ং-সন্ধ্যায় বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করে যে ফল প্রাপ্ত হন, সংযমী ব্রাহ্মণকে দান করলে সেই ফলই লাভ হয়। তোমার এই সুবিশাল দানসত্র অতিশয় শ্রদ্ধা ও পবিত্রভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটি সকল প্রকারের যজ্ঞ থেকেও শ্রেষ্ঠ, তুমি সর্বদা এরূপ করতে থাকবে।

যে ব্রাহ্মণ কখনো ক্রোধ করেন না, তৃণের জন্যও লোভ করেন না এবং সর্বদা মিষ্ট বাক্য বলেন তিনি আমার পরম পূজ্য। উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ নিঃস্পৃহ হওয়ায় অর্থের জন্য কোনো কাজ করেন না। তাঁকে পুত্রের মতো রক্ষা করা উচিত। তাঁকে বারংবার প্রণাম জানাই ; তাঁর থেকে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। ঋত্বিক, পুরোহিত এবং আচার্য—এঁরা প্রায়শ কোমল স্বভাববিশিষ্ট এবং বেদধারণকারী হন। ক্ষত্রিয়ের তেজ ব্রাহ্মণদের সম্মুখীন হলেই শান্ত হয়ে যায়, অতএব তুমি নিজেকে ধনী, বলবান এবং রাজা মনে করে ব্রাহ্মণদের অবহেলা করে নিজেই সব উপভোগ করবে না। তোমার কাছে যে ধন আছে তার সাহায্যে নিজে ধর্মানুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের পূজা করা উচিত। যথেচ্ছ বৃত্তিতে থাকা ব্রাহ্মণদের তুমি সর্বদা প্রণাম করবে, তারাও তোমার আশ্রয়ে উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে থাকবে। কুরুশ্রেষ্ঠ ! যাদের কৃপা অক্ষয়, যারা সকলের হিতসাধনে রত এবং অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে, সেই ব্রাহ্মণদের তুমি ছাড়া আর কে জীবিকা দিতে পারবে ? এই জগতে যেমন নারীদের সনাতনধর্ম পতির ওপর নির্ভরশীল, তেমনই আমাদের ভবিষ্যৎও ব্রাহ্মণদের ওপর নির্ভরশীল। তাত ! আমরা যদি ব্রাহ্মণদের পূজা না করি এবং ক্ষত্রিয়দের মতো সর্বদা নিষ্ঠুর আচরণ করি, তাহলে ব্রাহ্মণরা আমাদের পরিত্যাগ করবেন এবং আমরা বেদ, যজ্ঞ, উত্তমলোক ও জীবিকা থেকে ভ্রষ্ট হব ; সেই অবস্থায় বেঁচে থেকে আমাদের কী প্রয়োজন সিদ্ধ হবে ?

রাজন্ ! এবার আমি তোমাকে সনাতন কালের ধার্মিক ব্যবহারের কথা বলছি, শোনো। পূর্বকালে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের, বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের এবং শূদ্রগণ বৈশ্যদের সেবা করতেন। ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তাই শূদ্রদের দূর থেকেই তাঁদের সেবা করা উচিত। কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের শরীর স্পর্শ করে সেবা করা উচিত। ব্রাহ্মণগণ স্বভাবত কোমল, সত্যবাদী এবং সত্যধর্ম পালনকারী হয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁরা যখন ক্রুদ্ধ হন তখন বিষধর সাপের মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠেন, অতএব তুমি সর্বদা ব্রাহ্মণদের সেবা করবে। তেজ ও বলে তাপিত ক্ষত্রিয়ের তেজ ও তপস্যা ব্রাহ্মণদের দ্বারাই শান্ত হয়। তাত ! ব্রাহ্মণ আমার যত প্রিয়, আমার পিতা, পিতামহ অথবা নিজ শরীর ও প্রাণও তত প্রিয় নয়। এই পৃথিবীতে আমার পিতা, পিতামহ অথবা তোমার থেকে বেশি প্রিয় আমার আর কেউ নেই ; কিন্তু সকলের থেকে ব্রাহ্মণ আমার কাছে অগ্রগণ্য। পাণ্ডুনন্দন ! আমি তোমাকে সত্য কথা বলছি আর এই সত্যের প্রভাবে আমি আমার পিতা মহারাজ শান্তনু যেখানে আছেন সেই লোকে যাব এবং সৎপুরুষরা যে ব্রহ্মলোক লাভ করেন, সেই উত্তমলোক দর্শন করব। এবার আমাকে অতি শীঘ্র চিরকালের জন্য সেই লোকে চলে যেতে হবে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! উত্তম আচরণ, বিদ্যা এবং কুলে একরূপ প্রতীত হলেও দুজন ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি একজন যাচক ও অন্যজন অযাচক হয়, তাহলে কাকে দান করলে দানের উত্তম ফল পাওয়া যায় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্রাহ্মণ যাচনা করে তার থেকে যে ব্রাহ্মণ যাচনা করে না, তাকে দান করলে বিশেষ কল্যাণপ্রদ হয় এবং অধীর ধনসম্পন্ন কৃপণ ব্যক্তি অপেক্ষা ধৈর্যশীল ব্যক্তি বিশেষ সম্মানের পাত্র। রক্ষাকার্যে ধৈর্য ধারণকারী ক্ষত্রিয় এবং যাচনা না করায় দৃঢ়তা রক্ষাকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। যে ব্রাহ্মণ ধীর, সন্তুষ্ট এবং বিদ্বান, তিনিই দেবতাদের প্রসন্ন করেন। অন্তরে যাচনার মনোভাব তাঁদের পক্ষে অপমানের কারণ মানা হয় ; কারণ যাচক ডাকাতের মতো সর্বদা প্রাণীদের উদ্বিগ্ন করে রাখে। যাচক মরে যায় কিন্তু দাতা কখনো মরে না। যাচককে যে দান দেওয়া হয়, তা দয়ারূপ পরমধর্ম ; কিন্তু যাঁরা কষ্ট পেলেও যাচনা করেন না, সেরূপ ব্রাহ্মণকে নানা উপায়ের সাহায্যে দান করা কর্তব্য। যদি তোমার রাজ্যে কোনো উত্তম ব্রাহ্মণ আত্মগোপন করে থাকেন তাহলে সাদরে তাঁকে খুঁজে বার করতে হয় ; কারণ তপস্যা দ্বারা দেদীপ্যমান এই ব্রাহ্মণদের সম্মান না জানালে এঁরা ইচ্ছা করলে পৃথিবীকে ভস্ম করে দিতে পারেন, তাই সর্বদা তাঁদের পূজা করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তপস্যাযুক্ত, পূজনীয়, তাঁকে সর্বদা পূজা করা উচিত। যে যাচনা করে না, তোমার নিজে

তার কাছে গিয়ে নানাপ্রকার পদার্থ দান করা উচিত। সকাল ও সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্র করলে যে ফল লাভ হয়, বেদজ্ঞ ব্রতধারী ব্রাহ্মণকে দান করলেও সেই ফল পাওয়া যায়। যিনি বিদ্যা এবং বেদ ব্রতে জ্ঞানী, যিনি কারো আশ্রিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন না, যাঁর স্বাধ্যায় এবং তপস্যা গুপ্ত, যিনি উত্তম ব্রত পালন করেন, এইরূপ উত্তম ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে উত্তম গৃহে তাঁর আবশ্যকীয় সামগ্রীসহ থাকতে দেওয়া উচিত। সেই ধর্মজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণ কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা কৃত তোমার সেই শ্রদ্ধাযুক্ত দান অবশ্যই গ্রহণ করবেন। কৃষক যেমন বর্ষার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে, তেমনই যার ঘরে নারী অন্নের প্রতীক্ষায় থাকে, সেই ব্রাহ্মণের গৃহে দান করলে মহাপুণ্য হয়। নিয়মপূর্বক ব্রহ্মচর্য পালনকারী ব্রাহ্মণ যদি প্রাতঃকালে গৃহে ভোজন করেন, তাহলে তিনি অগ্নিকে তৃপ্ত করেন। দ্বিপ্রহরে তাঁকে গাভী, স্বর্ণ এবং বস্ত্রদান করলে ইন্দ্রদেবতা প্রসন্ন হন এবং তৃতীয় প্রহরে তুমি যে দেবতা, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দান কর, তা বিশ্বদেবকে সন্তুষ্ট করে থাকে। সর্বপ্রাণীর প্রতি অহিংসা ভাব বজায় রাখা, সকলকে তাদের যথাযোগ্য ভাগ অর্পণ করা, ইন্দ্রিয় সংযম, ত্যাগ, ধৈর্য এবং সত্য—এই সব গুণ তোমাকে যজ্ঞান্তে অবভৃথ-স্নানের ফল প্রদান করবে। এইভাবে তোমার যে শ্রদ্ধাপূত এবং দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের বিস্তার লাভ—তা সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ। তাত যুধিষ্ঠির! তুমি এই প্রকারের যজ্ঞানুষ্ঠান সর্বদা করতে থাকবে।

রাজার জন্য যজ্ঞ, দান এবং ব্রাহ্মণাদি প্রজাদের রক্ষা করার উপদেশ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! দান ও যজ্ঞ—এই দুটি ইহলোকে ফলপ্রদান করে, অথবা পরলোকেও এর মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই দুটির মধ্যে কোনটির ফল শ্রেষ্ঠতর? কীরূপ ব্যক্তিদের দান করা উচিত? কী প্রকারে এবং কখন যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত? আমি এইসব সঠিকভাবে জানতে চাই, সুতরাং আপনি দান-ধর্মের কথা বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র! ক্ষত্রিয়দের সর্বদা কঠোর কর্ম করতে হয়, তাই যজ্ঞ ও দানই তাকে পবিত্র করে। সাধু ব্যক্তিরা পাপাচারী রাজার দান গ্রহণ করেন না, সুতরাং পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য। সাধু ব্যক্তি যদি দান স্বীকার করেন, তাহলে রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ তাঁকে প্রতিদিন দান করা উচিত। কারণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করা হলে তা আত্মশুদ্ধির সর্বোত্তম সাধন হয়। তুমি নিয়মপূর্বক যজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে সুশীল, সদাচারী, তপস্বী, বেদবেত্তা, সকলের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষাকারী ও সাধুস্বভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের ধন দান করে সন্তুষ্ট করবে। তাঁরা যদি তোমার দান স্বীকার না করেন, তাহলে তোমার পুণ্য হবে না, তাই দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো এবং সাধু-ব্রাহ্মণদের সুস্বাদু অন্ন পরিবেশন করো। যাজ্ঞিক পুরুষদের দান করেই তুমি নিজেকে যজ্ঞ ও দানের পুণ্যভাগী বলে মনে করতে পারো। যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের সর্বদা সম্মান করবে, তাহলে তুমিও যজ্ঞের আংশিক ফল লাভ করবে। যারা বহুজনের উপকার করে, সন্তান-সন্ততিসহ ব্রাহ্মণদের পালন-পোষণ করে, তারা এই শুভকর্মের প্রভাবে প্রজাপতির ন্যায় সন্তান লাভ করে। পরোপকারী মহাত্মা পুরুষ সর্বদা উত্তম ধর্মের প্রসার ও প্রচার করে থাকেন। নিজ সর্বস্ব সমর্পণ করেও এরূপ ব্যক্তিদের পালন-পোষণ করা উচিত।

যুধিষ্ঠির! তুমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তাই ব্রাহ্মণদের গোধন, অন্ন, ছাতা, জুতা ও বস্ত্রদান করতে থাকবে। যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করেন, তাঁকে ঘৃত, অন্ন, অশ্বযুক্ত রথ, উত্তম গৃহ এবং শয্যা দান করবে। এই দান সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারী। যে ব্রাহ্মণের আচরণ নিন্দিত নয়, তিনি যদি জীবিকার অভাবে কষ্ট পান তাহলে তাঁকে খুঁজে বার করবে এবং গুপ্তভাবে অথবা প্রকাশ্যে তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করে সর্বদা তাঁকে পালন করতে থাকবে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই কর্ম রাজসূয় যজ্ঞ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের থেকেও কল্যাণকর। এরূপ করলে তুমি সর্বপাপ হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে স্বর্গে গমন করবে। নিজ সেবক এবং প্রজাদেরও তোমার নিজ পুত্রের ন্যায় পালন করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণদের কাছে যা নেই তা তাদের দান করা এবং যা আছে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কর্তব্য। সারা জীবন ধরেই তোমার ব্রাহ্মণদের সেবায় রত থাকা উচিত। ব্রাহ্মণের কাছে যদি বহু অর্থ জমে যায়, তাহলে তা তাদের কাছে অনর্থের কারণ হয়ে ওঠে; কারণ লক্ষ্মীর নিরন্তর সহবাসে তাঁরা দর্প ও মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণ মোহগ্রস্ত হলে তাঁদের অবশ্যই ধর্মনাশ হয়। কেননা ধর্মনাশ

হলে সেই প্রাণীরও বিনাশ হয়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। যে রাজা প্রজার নিকট থেকে কররূপে প্রাপ্ত অর্থ রাজকোষে গচ্ছিত রেখে যজ্ঞের জন্য পুনরায় কর্মচারীদের অর্থ আদায় করার নির্দেশ দেয় এবং কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে নিষ্ঠুরতাপূর্বক সংগৃহীত সেই অর্থদ্বারা যে যজ্ঞ করা হয়, সাধু ব্যক্তিরা সেই যজ্ঞের কখনো প্রশংসা করেন না। তাই যারা অত্যন্ত ধনী এবং বিনা প্ররোচনাতে যজ্ঞের জন্য ধন দান করে, তাদের প্রদত্ত ধনই ব্যবহার করা উচিত। এইরূপে সংগ্রহ করা ধনের দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত, বল-প্রয়োগে আনা অর্থে নয়। রাজার বিধিপূর্বক রাজ্যাভিষেকের পশ্চাৎ রাজাসনে আরোহণের পর মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে বহু ধন দক্ষিণা দেওয়া উচিত। রাজা বৃদ্ধ, বালক, দীন ও অন্ধ মানুষদের ধন রক্ষা করবে। অনাবৃষ্টিতে কৃষক যখন বহু কষ্টে জল সিঞ্চন করে কোনোমতে কিছু অন্ন উৎপাদন করে, রাজার তখন তার কাছ থেকে কর নেওয়া উচিত নয় এবং যে নারী কষ্টে পড়ে আছে, তার থেকেও অর্থ নেওয়া উচিত নয়। রাজা যদি দরিদ্রের অর্থ ছিনিয়ে নেন, তাহলে সেই ধন তাঁর রাজ্য ও লক্ষ্মী নাশ করে দেয়। যদি লোভনীয় আহারের দিকে দরিদ্র ক্ষুধার্ত বালক তৃষিত চোখে তাকিয়ে থাকে অথচ সেই খাদ্য খেতে পায় না, সেই খাদ্য গ্রহণকারী ভয়ানক পাপের ভাগী হয়। রাজন্ ! তোমার রাজ্যে যদি কোনো বিদ্বান ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কষ্ট পান, তাহলে তোমার ভ্রূণহত্যার পাপ হবে। রাজা শিবি বলেছিলেন 'যার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কষ্ট পায়, তার রাজ্যের উন্নতি হয় না, সেই রাজ্য শত্রুর হস্তগত হয়। যার রাজ্যে পতি এবং পুত্রের উপর নির্যাতন চালিয়ে তাদের চোখের সামনেই নারীকে বলপূর্বক অপহরণ করা হয়, সেই রাজ্যের রাজাকে জীবিত বলে মনে করা উচিত নয়, সে মৃতেরই সমান। যে প্রজাকে রক্ষা না করে তার অর্থ ছিনিয়ে নেয়, যার কাছে কোনো সুযোগ্য মন্ত্রী নেই, সেই নির্দয় রাজা কলিযুগেরই সমান। প্রজাদের উচিত এরূপ রাজাকে মেরে ফেলা। যে রাজা প্রজাদের বলে 'আমি তোমাদের রক্ষক' অথচ রক্ষা করে না, তাকে অবশ্যই বিনাশ করা উচিত। রাজার দ্বারা অরক্ষিত হয়ে প্রজারা যে পাপ করে, রাজা তার এক-চতুর্থাংশের ফল ভাগী হয়। এইরূপ রাজার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়ে প্রজারা যেসব শুভকর্ম করে তাদের পুণ্যের এক-চতুর্থাংশ ফলের ভাগ রাজা প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির ! সকল প্রাণী যেমন বাতাসের সাহায্যে জীবন ধারণ করে, পক্ষীকুল যেমন বৃহৎ বৃক্ষের আশ্রয়ে নিরাপদে থাকে এবং রাক্ষসকুল কুবেরের ও দেবগণ ইন্দ্রের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করেন, তেমনই তোমার জীবৎকালে সমস্ত প্রজা তোমার সাহায্যেই জীবিকা নির্বাহ করবে, তোমার সুহৃদ-মিত্র-ভ্রাতা-কুটুম্ব তোমাকেই অবলম্বন করে যেন তাদের জীবন অতিবাহিত করে।

ভূমিদানের মহত্ত্ব

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! শ্রুতি প্রকৃত সম্মানের সঙ্গে দানযোগ্য বস্তুর বিধান দেয়, শাস্ত্রেও রাজাদের জন্য নানাপ্রকার দানের নির্দেশ দেওয়া আছে ; সেই সব দানের মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! সব দানের থেকে পৃথিবী (ভূমি) দান সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। পৃথিবী মাতৃসমা, তা মানুষের সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। বস্ত্র, রত্ন, পশু, ধন-ধান্য ইত্যাদি সবই পৃথিবী থেকেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ভূমি দান করে সে বহুদিন সমৃদ্ধশালী থেকে সুখ ভোগ করে। যতদিন পৃথিবী বিরাজমান থাকে ততদিন ভূমিদানকারী ব্যক্তি উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে। এই জগতে ভূমিদানের থেকে বড় কোনো দান নেই। আমরা শুনেছি যে যারা অল্প পরিমাণ ভূমি দান করে, তারাও ভূমিদানের পূর্ণফল ভোগ করে। যে এই অক্ষয় পৃথিবীর জমি দান করে, সে পরজন্মে মানুষ হয়ে পৃথিবীর অধিপতি হয়। ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল যেমন দান করা হয়, তেমনই ভোগ প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করা অথবা জমি দান করা—এই দুটি কাজই ক্ষত্রিয়দের উত্তমলক্ষ্মী লাভের কারণ হয়ে থাকে। মানুষ যত বড় পাপী হোক, ব্রহ্মহত্যা করে থাকুক, মিথ্যাবাদী হোক, দানরূপে প্রদত্ত ভূমি তার সমস্ত পাপ প্রশমিত করে। সাধুব্যক্তি পাপী নৃপতিদের থেকে ভূমিদান গ্রহণ করলেও অন্য কোনো দান স্বীকার করেন না।

অযোগ্য পাত্রের ভূমিদান গ্রহণের কোনো অধিকার নেই। যে ভূমি দান করে দেওয়া হয়, দাতাকে সেটির দ্বারা নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধি করা উচিত নয়। জীবিকা অর্জনের উপায় না থাকায় মানুষ কষ্টে পড়ে যেসব পাপ কাজ করে ফেলে, সামান্যতম ভূমিদান করলেও সেই সব পাপ প্রশমিত হয়। যে রাজা কঠোর কর্ম করে, পাপপরায়ণ, তাকে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য ভূমিদান করার উপদেশ দেওয়া উচিত। প্রাচীনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা এবং ভূমিদান করা—এই দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য মনে করা হত না। যে ভূমিদান করে, সে তপ, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, নির্লোভ, সত্যবাদিতা, গুরু-সেবা এবং দেবার্চনার ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রভুর মঙ্গলের জন্য রণভূমিতে প্রাণ ত্যাগ করে এবং যে সিদ্ধ হয়ে ব্রহ্মলোকে যায়, তারাও ভূমিদানকারীর থেকে বেশি পুণ্যবান নয়। মাতা যেমন সন্তানকে নিজ দুগ্ধপ্রদান করে পালন করেন, পৃথিবীও তেমনই সর্বপ্রকার রসদান করে ভূমিদাতাকে অনুগ্রহ করেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমোগুণ, দারুণ অগ্নি এবং ভয়ংকর পাশ—এসব ভূমিদাতার কাছে আসতে পারে না। ভূমিদানকারী শান্তচিত্ত মানুষ, দেবতা এবং পিতৃকুলকেও তৃপ্ত করেন। দুর্বল, জীবিকাবিহীন দুঃখী, ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে উর্বর ভূমিদানকারী মানুষ যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি উর্বর চাষের ক্ষেত্র দান করে অথবা বিশাল ভবন নির্মাণ করে দান করে,তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি সদাচারী অগ্নিহোত্রী এবং উত্তম ব্রতধারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে, সে কখনো বিপদ্‌গ্রস্ত হয় না। চন্দ্রকলা যেমন প্রত্যহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনই দান করা জমিতে যতবার ফসল উৎপন্ন হয়, ততই দাতার দানের ফল বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে প্রাচীন লোকেরা পৃথিবী দ্বারা গীত এক গাথার কথা বলেন, যা শুনে পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কশ্যপ ঋষিকে দান করেছিলেন। সেই গাথাটি এইরূপ—(পৃথিবী বলে যে) 'আমাকে দান হিসাবে দাও এবং আমাকেই দানরূপে গ্রহণ করো। আমাকে দিলে আমাকেই পাবে ; কারণ মানুষ ইহলোকে যা কিছু দান করে, পরলোকে তাই সে পায়।' যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় পৃথিবীর এই বেদতুল্য গাথা পাঠ করে, সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত প্রবল কৃত্যার (মারণ শক্তির) প্রয়োগে যে ভীত হয়, তাকে শান্ত করার সবথেকে মহান সাধন হল ভূমিদান। ভূমিদান দ্বারা মানুষ তার পূর্ব এবং পরবর্তী দশ উত্তরাধিকারী পুরুষদের পবিত্র করে দেয়। যে ব্যক্তি বেদের সমানগণ্য এই পবিত্র ভূমিগাথা অবগত হয়, সে-ও তার দশপুরুষ উদ্ধার করে। এই পৃথিবী সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি স্থল এবং অগ্নি তার অধিষ্ঠাতা দেবতা। রাজাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে, পৃথিবীর এই গাথা তাঁকে শোনানো উচিত, যাতে তিনি ভূমিদান করেন এবং সৎব্যক্তিদের বৃত্তি দেওয়া বন্ধ না করেন।

যে রাজা ধর্ম জানে না এবং নাস্তিক, তার প্রজারা সুখে নিদ্রা যেতে পারে না, বরং সেই রাজার দুরাচারে সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। এরূপ রাজার রাজ্যে যোগক্ষেম প্রাপ্ত হয় না। যে দেশের রাজা ধার্মিক এবং বুদ্ধিমান, সেখানকার লোক সুখে নিদ্রা যায় এবং রাজার সদ্ব্যবহার ও সুন্দর রাজ্য-পরিচালনায় সন্তুষ্ট থাকে। সেই রাজ্যে সময়মতো বর্ষা হয় সেখানকার প্রজারা যোগক্ষেমদ্বারা সম্পন্ন এবং নিজ নিজ শুভকাজে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। যে ভূমিদান করে, সে-ই কুলীন, সে-ই বন্ধু, পুণ্যাত্মা, দাতা এবং পরাক্রমী। যে ব্যক্তি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে ধন-ধান্যসম্পন্ন ভূমিদান করে, সে এই পৃথিবীতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়। ক্ষেত্রে বপন করা বীজ যেমন অধিক অন্ন দান করে, তেমনই ভূমিদান করলে সর্বকামনা সফল হয়। আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি এবং ভগবান শংকর—এঁরা সকলেই ভূমিদানকারীকে সম্মান করেন। সমস্ত প্রাণী পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীতেই লীন হয়ে যায়। অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ—এই চারপ্রকার প্রাণীর শরীর পৃথিবীরই কার্য। পৃথিবীই এই জগতের মাতা-পিতা, এর সমকক্ষ অন্য আর কিছুই নেই।

যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ের জ্ঞানীরা বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের কথোপকথনরূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। প্রাচীনকালে ইন্দ্র যখন বহু দক্ষিণা দিয়ে বড় বড় শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ করেছিলেন তখন তিনি বিদ্বানশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ভগবন্ ! কোন বস্তু দান করলে স্বর্গসুখ লাভ হয় ? যার ফল অক্ষয় এবং সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ, কৃপা করে সেই দানের কথা আমাকে বলুন।'

বৃহস্পতি বললেন—ইন্দ্র ! যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুবর্ণ, গোধন, এবং পৃথিবী (ভূমি) দান করে, সে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। আমি ভূমিদানের থেকে আর কোনো দানই বড় বলে মানি না। অন্য বিদ্বানগণও তাই বলেন। যে নিজ প্রভুর মঙ্গলের জন্য যুদ্ধে নিজ শরীর ত্যাগ করে এবং যে

যোগযুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোক গমন করে, তারাও ভূমিদান-কারীর থেকে বড় নয়। ভূমিদানকারী ব্যক্তি পূর্ববর্তী পাঁচ পুরুষ এবং পরবর্তী ছয় পুরুষকে উদ্ধার করেন। যিনি রত্ন দক্ষিণাযুক্ত পৃথিবী দান করেন, তাঁর সর্ব পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা পাবার পথ প্রশস্ত হয়। রাজা ভূমিদান করলে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। যিনি আসমুদ্র পৃথিবী বাহুবলে জয় করে ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁর কীর্তি পৃথিবীতে ততদিন গীত হয়, যতদিন এই পৃথিবী বিরাজমান থাকে। যিনি পরম পবিত্র, শস্যসমৃদ্ধ, রসপরিপূর্ণ এই পৃথিবী দান করেন, সেই দানের প্রভাবে তিনি অক্ষয়-লোক লাভ করেন। যে রাজা ঐশ্বর্য এবং সুখ কামনা করেন, তাঁর সর্বদা সুব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা উচিত। মানুষ ভূমিদানের সঙ্গেই সমুদ্র, নদী, পর্বত, ধন, সরোবর, কূপ, ঝরনা, ঘৃত ইত্যাদি সর্বপ্রকার রসদানের ফল লাভ করে। বহু দক্ষিণা দিয়ে অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞ করলেও সেই ফললাভ করা যায় না, যা ভূমিদান করলে পাওয়া যায়। ভূমিদানকারী তার দশ পুরুষকে উদ্ধার করে এবং দান করে যে সেটি কেড়ে নেয়, সে তার দশ পুরুষকে নরকগামী করে এবং নিজেও নরকগামী হয়। যে দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও দান করে না অথবা দিয়েও পরে নিয়ে নেয়, সে মৃত্যুর নির্দেশে বরুণ শাপে আবদ্ধ হয়ে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে। যার জীবিকার কোনো উপায় নেই এরূপ ব্রাহ্মণের জন্য অপরের দেওয়া বৃত্তি কখনো কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণের জমি কেড়ে নিলে তার যে চোখের জল পড়ে তাতে লুণ্ঠনকারীর তিন পুরুষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি রাজ্যভ্রষ্ট রাজাকে আবার রাজসিংহাসনে বসায়, সে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। যে ভূমি অত্যন্ত উর্বর, সেখানে বহুপ্রকার চাষাবাদ হয়, নানাপ্রকার জীবজন্তু বাস করে এবং নানা উপকরণে সমৃদ্ধ সেই ভূমি নিজ বাহুবলে জয় করে যে রাজা তা দান করেন, তিনি অক্ষয়লোক লাভ করেন—একে ভূমিযজ্ঞ বলা হয়। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, সে তার সব পাপ বিনাশ করে বিশুদ্ধ এবং সৎব্যক্তিদের সম্মানের পাত্র হয়ে ওঠে। জগতে সজ্জন ব্যক্তিরা সর্বদাই তাকে আপ্যায়ন করে থাকে। পৃথিবী দানকারী ব্যক্তি অমৃত উৎপন্নকারী জমি লাভ করেন। ভূমি দানের সমান দান, মাতার ন্যায় গুরু, সত্যের সমান ধর্ম এবং দানের সমান রত্ন নেই।

ভীষ্ম বললেন—বৃহস্পতির কাছে ভূমিদানের এই মাহাত্ম্য শুনে ইন্দ্র ধন ও রত্নপূর্ণ এই পৃথিবী তাঁকে দান করে দিলেন। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় পৃথিবী দানের এই মাহাত্ম্য শোনে, তার শ্রাদ্ধকর্মে পিতৃপুরুষকে অর্পণ করার ভাগ রাক্ষস বা অসুররা পেতে পারে না। পিতৃপুরুষকে দেওয়া তার দান অক্ষয় হয়—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বিদ্বান ব্যক্তির উচিত শ্রাদ্ধে আহার গ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের এই ভূমিদানের মাহাত্ম্য অবশ্য শোনানো। যুধিষ্ঠির ! তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি সর্বদানের শ্রেষ্ঠ ভূমিদানের মাহাত্ম্য জানালাম।

অন্ন, সুবর্ণ এবং জল ইত্যাদি দান করার মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে রাজা দান করতে ইচ্ছুক, তিনি ইহলোকে গুণবান ব্রাহ্মণদের কী কী বস্তু দান করবেন ? কোন বস্তু দিলে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হন ? কোন দান ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদান করে ? আপনি সেসব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! পূর্বকালের কথা, আমি একবার দেবর্ষি নারদকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তোমাকে বলছি, শোনো।

দেবর্ষি নারদ বললেন—দেবতা ও ঋষি অন্নেরই প্রশংসা করেন। অন্নদ্বারাই লোকযাত্রা নির্বাহ হয় এবং তার সাহায্যেই বুদ্ধি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অন্নই সবকিছুর আধার। অন্নের সমতুল্য কোন দান ছিল না এবং হবে না ; তাই মানুষ অন্নই দান করতে চায়। অন্ন দেহের বলবৃদ্ধি করে, অন্নের আধারেই প্রাণ বজায় থাকে এবং সমস্ত জগৎকে অন্নই ধারণ করে রাখে। জগতে গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী সকলেই অন্নের দ্বারাই প্রাণধারণ করে। অন্নের দ্বারাই সকলের প্রাণ রক্ষা হয়, সকলেই একথা জানে। সুতরাং যারা নিজেদের মঙ্গল চায়, তারা স্ত্রীপুত্র দুঃখী, সন্তানসহ মহাত্মা ব্রাহ্মণদের এবং সন্ন্যাসীদের অন্নদান করবে। যারা ভিক্ষাকারী সুব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, তারা পরলোকে নিজেদের এক কোষাগার পূর্ণ করে। পথে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ পথিক যদি গৃহে আসে, তবে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী গৃহস্থের সেই

সম্মানীয় অতিথির সৎকার করা উচিত। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও অহংকার পরিত্যাগ করে সদ্ব্যবহারপূর্বক অন্নদান করে, সে ইহলোকে ও পরলোকে সুখপ্রাপ্ত হয়। গৃহে অতি নীচ ব্যক্তি এলেও তাকে অপমান করা উচিত নয়। চণ্ডাল অথবা কুকুরকে অন্নদান করলেও তা বৃথা যায় না। যে ব্যক্তি কষ্টে পড়া অপরিচিত পথিককে প্রসন্নতাপূর্বক অন্নদান করে, সে মহৎ ধর্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃগণ, ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং অতিথিকে অন্নদান দ্বারা সন্তুষ্ট করে, সে বিশেষ পুণ্যফলের ভাগী হয়। যে ব্যক্তি মহাপাপ করেও ভিক্ষার্থী মানুষকে, বিশেষত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সে মোহগ্রস্ত হয় না। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকেও অন্নদান করলে মহৎ ফল প্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণ যদি অন্ন ভিক্ষা করে, তাহলে তার গোত্রাদি বিষয়ে প্রশ্ন না করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্ন দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ এক মহান প্রাণী, তিনি যদি স্বয়ং অন্নভিক্ষা করেন, তাহলে সকাম অথবা নিষ্কাম—যে ভাবেই হোক, তাঁকে অন্নদান করে পুণ্যার্জন করা উচিত। ব্রাহ্মণ সব বর্ণের মানুষের নিকট অতিথিতুল্য এবং সর্বপ্রথম আহার গ্রহণের অধিকারী। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যে গৃহ থেকে সৎকারপূর্বক ভিক্ষাগ্রহণ করে, সেই গৃহের শ্রী বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি ইহলোকে সর্বদা অন্ন, গৃহ এবং মিষ্টান্ন দান করে, সে দেবতাদের কৃপা লাভ করে স্বর্গে নিবাস করে। অন্নই মানুষের প্রাণ, তাই অন্নদানকারী ব্যক্তি পশু, পুত্র, অর্থ, ভোগ, শক্তি ও রূপ লাবণ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি অন্নদান করে, তাকে জগতে প্রাণদাতা এবং সর্বস্ব দানকারী বলা হয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে অন্নদান করলে মানুষ পরলোকে সুখ পায় এবং দেবতাগণও তাকে সম্মান করেন।

যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী এবং উত্তম ক্ষেত্র, সেখানে বীজবপন করলে উত্তম ও মহান পুণ্যফল লাভ হয়। অন্নদান এমন এক দান, যা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই প্রত্যক্ষভাবে সন্তোষ প্রদান করে। এছাড়া অন্য সব দানের ফল পরোক্ষ। অন্ন থেকেই সন্তান উৎপন্ন হয়, অন্ন থেকেই ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি হয় এবং অন্নই রোগাদি নাশের কারণ হয়। পূর্বকালে প্রজাপতি অন্নকে অমৃত বলে জানিয়েছেন। অন্নাহার না পেলে শরীরের পঞ্চতত্ত্ব নষ্ট হয়ে যায়। অন্নাহার না পেলে বড় বড় শক্তিশালী ব্যক্তিরও শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। অন্ন ব্যতীত আমন্ত্রণ, বিবাহ এবং যজ্ঞাদিও হওয়া সম্ভব নয়। অন্ন বিনা বেদজ্ঞান বিস্মৃত হয়। এই সম্পূর্ণ জগৎ অন্নের আধারে প্রবাহমান। তাই বিদ্বানদের উচিত ধর্মের জন্য অবশ্যই অন্নদান করা। অন্নপ্রদানকারী ব্যক্তির, যশ এবং কীর্তি ত্রিলোকে ছড়িয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি গৃহে আসা যাচককে অন্নদান করে, সে সকল প্রাণীর প্রাণ ও তেজ দান করে।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! দেবর্ষি নারদ যখন আমাকে অন্নদানের মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন, তখন থেকে আমি সর্বদা অন্নদান করে থাকি। তুমিও ঈর্ষা ত্যাগ করে সর্বদা অন্নদান করবে। ব্রহ্মাপুত্র ভগবান অত্রি বলেন 'যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, সে যাচকের সমস্ত কামনাই যেন পূর্ণ করে দেয়।' রাজা হরিশ্চন্দ্র বলেছেন যে, 'সুবর্ণ পরম পবিত্র, আয়ু বৃদ্ধিকারী এবং পিতৃকুলের অক্ষয়গতি প্রদানকারী।' মনু বলেন—'জলদান সর্বদানের থেকে শ্রেষ্ঠ।' সেইজন্য কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করা উচিত। যার খনন করা কূপের পরিশ্রুত জল সর্বদা প্রাণীকূলের প্রয়োজন মেটায়, তার অর্ধেক পাপ বিনষ্ট হয়। যার খনন করা জলাশয়ের জল সর্বদা গাভী, ব্রাহ্মণ ও সাধুব্যক্তিরা পান করে, তার সমস্ত কুল উদ্ধার হয়। যার পুষ্করিণীতে গ্রীষ্মকালেও জল থাকে, সে কখনো ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয় না। ঘৃত দান করলে ভগবান বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, অশ্বিনীকুমার এবং অগ্নিদেব প্রসন্ন হন। ঘৃত সব থেকে উত্তম ঔষধ এবং যজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। এটি রসের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ফলদায়ক বস্তু। যার ফল, যশ এবং পুষ্টি লাভের ইচ্ছা বর্তমান, তার নিজ মনকে বশীভূত করে প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে ঘৃতদান করা উচিত। যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণদের ঘৃত দান করে, অশ্বিনীকুমার প্রীত হয়ে তাকে সুন্দর রূপ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি ঘৃত মিশ্রিত ক্ষীর ব্রাহ্মণদের ভোজন করায়, তার গৃহে কখনো রাক্ষসের আক্রমণ হয় না। যে জলভর্তি কমণ্ডলু দান করে, সে কখনো পিপাসায় কষ্ট পায় না। তার কাছে সব প্রয়োজনীয় জিনিস মজুদ থাকে, সে কখনো সংকটে পড়ে না। যে অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণের সামনে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করে, সে দানের ষষ্ঠাংশ পুণ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে আহারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করে, তার সমস্ত কামনা এবং নানাপ্রকার কার্য সিদ্ধ হয়, সে শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করে। শুধু তাই নয়, অগ্নিদেব সর্বদা তার ওপর প্রসন্ন থাকেন এবং সে সংগ্রামে জয় লাভ করে। যে ব্যক্তি ছাতা দান করে, সে পুত্র এবং লক্ষ্মী লাভ করে, তার মনে কখনো সন্তাপ হয় না। অতি কঠিন সংকট থেকেও সে মুক্তিলাভ করে। শাণ্ডিল্য ঋষি

বলেছেন যে 'রথ বা গোরুর গাড়ি দান উপরোক্ত সব দানের সমান।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! গ্রীষ্মের সময় জুতার অভাবে গরমে কষ্ট পান যে ব্রাহ্মণ, তাঁকে যে জুতাপ্রদান করে, সে কী ফল পায় ?'

ভীষ্ম বললেন—'যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণকে জুতাপ্রদান করে, সে তার সর্বকণ্টককে (শত্রুকে) পিষে ফেলার এবং কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার শক্তি পায়।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! তিল, ভূমি, গাভী এবং অন্নদান করলে যে ফল পাওয়া যায়, পুনরায় তা বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! তিলদানের ফলের কথা শোনো—ব্রহ্মা যে তিল উৎপন্ন করেছেন, তা পিতৃপুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আহার ; তাই তিল দান করলে পিতৃগণ অত্যন্ত প্রীত হন। যে ব্যক্তি মাঘ মাসে ব্রাহ্মণদের তিলদান করে, তাকে নরক দর্শন করতে হয় না। যে তিলের দ্বারা পিতৃগণের পূজা করে, তার সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানই সম্পন্ন হয়। তিল পুষ্টিকর পদার্থ, এটি সুন্দর রূপ প্রদান করে এবং পাপনাশক। তাই তিলদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বুদ্ধিমান মহর্ষি শঙ্খ, আপস্তম্ব, লিখিত এবং গৌতম—এঁরা তিলদান করেই দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। এইসকল ব্রাহ্মণ স্ত্রীসহবাস ত্যাগ করে তিলযজ্ঞ করতেন। সমস্ত দানের মধ্যে তিলদানকেই অক্ষয় বলা হয়। পূর্বকালে রাজর্ষি কুশিক হবিষ্য সমাপ্ত হলে তিলযজ্ঞ করে তিন অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিলেন, তাই তিনি উত্তম গতি লাভ করেছেন। যারা গবাদি জীবকে শীত ও বর্ষা থেকে রক্ষা করার জন্য ঘর তৈরি করে, তাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। যারা কৃষিকাজের জন্য জমি দান করে, তারা উত্তম লক্ষ্মীপ্রাপ্ত হয়। রত্নগর্ভা ভূমি দান করলে বংশবৃদ্ধি হয়। যে ভূমি উষর, শ্মশানের নিকটবর্তী এবং পাপী ব্যক্তিরা যেখানে বাস করে, সেই জমি ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি অন্যের জমিতে শ্রাদ্ধ করে অথবা অন্যের জমি দান করে, তার শ্রাদ্ধ ও দানের ফল পিতৃগণ নষ্ট করে দেন, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত জমি ক্রয় করে তারপর দান করা, তা যতই সামান্য হোক না কেন। নিজ জমিতে পিণ্ড দান করলে তা অক্ষয় হয়। বন, পর্বত, নদী এবং তীর্থাদির কোনো প্রভু হয় না, সুতরাং সেইসব স্থানে শ্রাদ্ধ করার জন্য ভূমি ক্রয় করার প্রয়োজন হয় না।

যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে ভূমিদানের ফলের কথা জানালাম, এবার গোদানের ফল জানাচ্ছি। গবাদি পশু সকল তপস্বীর থেকে বড়, তাই ভগবান শংকর গাভী সঙ্গে রেখে তপস্যা করেছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিরা যে ব্রহ্মলোকে যেতে চান, সেখানে গাভী চন্দ্রের সঙ্গে নিবাস করে। এরা তাদের দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময়, চর্ম, অস্থি, শৃঙ্গদ্বারা জগতের উপকার করে। শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে এরা বিচলিত হয় না। গাভী সর্বদাই তার কাজ করে যায়, তাই এরা ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে নিবাস করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ এবং গাভীকে সমকক্ষ বলে থাকেন। যে ব্যক্তি উত্তম ব্রাহ্মণকে গোদান করে, সে ঘোর সংকটে পড়লেও তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। দেবরাজ ইন্দ্র বলেন 'গোদুগ্ধ অমৃত'। তাই যে দুগ্ধ প্রদানকারী গাভী দান করে, সে অমৃতই দান করে। বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ বলেন—গোদুগ্ধের হবিষ্য যদি অগ্নিতে অর্পণ করা হয় তাহলে তা অবিনাশী ফলপ্রদান করে, সুতরাং যে গাভীদান করে, সে হবিষ্যই দান করে। বলদ স্বর্গের মূর্তিমান স্বরূপ। যে গুণবান ব্রাহ্মণকে বলদ দান করে, তার স্বর্গলোকে সম্মান লাভ হয়। গাভী প্রাণীদের দুধ পান করিয়ে পালন করে বলে তাকে প্রাণ বলা হয়। তাই যে ব্যক্তি দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করে, সে প্রাণই দান করে। বেদজ্ঞরা বলেন গাভী সমস্ত প্রাণীকে শরণ দান করে ; তাই যে ধেনুদান করে, সে সকলকে শরণ দান করে। যে ব্যক্তি বধ করার জন্য গাভী চায় তাকে এবং নাস্তিক, কসাই ও গোরুর দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারীদের কখনো গাভী দেওয়া উচিত নয়। মহর্ষিগণ একথা বলে থাকেন যে এরূপ পাপীদের গাভী দিলে নরক দর্শন করতে হয়। যে গাভী দুর্বল, যার শাবক মারা গেছে, যে রুগ্ন, বৃদ্ধ এরূপ গাভী ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত নয়।

আমি তোমাকে গোদান, তিলদান এবং ভূমিদানের মাহাত্ম্য জানালাম, এবার অন্নদানের মহিমা আবার বলছি শোনো। সবদানের প্রধান হল অন্নদান। রাজা রন্তিদেব অন্নদান করেই স্বর্গলাভ করেছেন। যে রাজা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ব্যক্তিকে অন্নদান করে, সে ব্রহ্মার পরমধাম প্রাপ্ত হয়। অন্নদানকারী ব্যক্তি যে স্থান প্রাপ্ত হয়, তা সোনা, বস্ত্র অথবা অন্য কোনো বস্তু দান করলে পাওয়া যায় না। অন্ন প্রথম দ্রব্য, একে লক্ষ্মীর উত্তম স্বরূপ বলে মনে

করা হয়। অন্নের দ্বারাই প্রাণ, তেজ, বল, বীর্যের পুষ্টি সাধন হয়। পরাশর মুনি বলেন 'যে ব্যক্তি সর্বদা একাগ্রচিত্তে অন্ন দান করে, সে কখনো দুঃখে পতিত হয় না।' মানুষকে প্রত্যহ শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা দেবতার পূজা করে তাঁদের অন্ন নিবেদন করা উচিত। যে ব্যক্তি যে অন্ন আহার করে, তার দেবতাও সেই অন্নই গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে অন্ন দান করে, সে সর্ব সংকট থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুর পর অক্ষয় সুখভোগ করে। যে ব্যক্তি নিজে উপবাসে থেকে একাগ্র মনে অতিথিকে অন্নদান করে, সে ব্রহ্মবেত্তাদের লোকে গমন করে। অন্নদানকারী ব্যক্তি ভীষণ বিপদে পড়লেও তা থেকে রক্ষা পেয়ে যায় এবং ক্রমে সব মন্দ ব্যবহার পরিত্যাগ করে পাপমুক্ত হয়। এভাবে আমি তোমাকে অন্ন, তিল, ভূমি ও গোদানের মাহাত্ম্য জানালাম।

——০——

নানাপ্রকার দানের বর্ণনা এবং ব্রাহ্মণের ধন নিয়ে নিলে যে অনিষ্ট হয় সেই সম্পর্কে রাজা নৃগের কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আমি অন্নদানের বিশেষ প্রশংসা শুনেছি ; জলদান করলে কী কী মহান ফল লাভ হয়, আমি বিস্তারিতভাবে সেকথা জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মানুষ অন্নদান ও জলদান করে যে মহাফল লাভ করে, তার বর্ণনা করছি শোনো। কোনো দানই অন্নদানের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। অন্ন দ্বারাই সবপ্রাণী জীবন ধারণ করে, তাই জগতে অন্নকেই সর্বোত্তম বলা হয়। অন্ন দ্বারাই প্রাণীদের তেজ ও বল বৃদ্ধি হয়, তাই প্রজাপতি অন্নদানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। পূর্বকালে মহারাজ শিবি কপোতকে (কবুতর) রক্ষার জন্য নিজ প্রাণ দান করে যে গতি লাভ করেছিলেন ব্রাহ্মণকে অন্নদান করলেও সেই গতি লাভ হয়। অন্নের উৎপত্তি জল থেকেই হয়। জল ব্যতীত কিছুই হয় না। গ্রহাদির প্রভু ভগবান সোম জল থেকেই উৎপন্ন। অমৃত, সুধা, স্বধা, অন্ন, ওষধি, তৃণ এবং লতাগুল্মও জল থেকেই উৎপন্ন হয়, যেগুলির সাহায্যে দেহধারীদের প্রাণের পুষ্টি হয়। দেবগণের অন্ন অমৃত, নাগেদের অন্ন সুধা, পিতৃগণের স্বধা এবং পশুগণের তৃণ-লতা ইত্যাদি। মনীষী ব্যক্তিগণ অন্নকে মানুষের প্রাণ বলে চিহ্নিত করেছেন ; সর্বপ্রকার অন্ন জল থেকেই উৎপন্ন হয় ; তাই জলদানের থেকে বড় কোনো দান নেই। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায়, তার প্রত্যহ জলদান করা উচিত। এতে ধন, যশ এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়। জলদানকারীর সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং জগতে তার কীর্তি বিস্তারলাভ করে। সে পাপমুক্ত হয়ে মৃত্যুর পর অক্ষয় আনন্দ অনুভব করে।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! তিলদান, দীপদান এবং বস্ত্রদানের মাহাত্ম্য আমাকে আবার বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! দীপদানকারী মানুষ নিজ পিতৃকুলকে উদ্ধার করে, তাই দেবতা এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সর্বদা দীপদান করা উচিত, এতে চোখের তেজ বৃদ্ধি পায়। রত্নদান করলেও অত্যন্ত পুণ্য হয়। যে ব্রাহ্মণ দানের রত্ন গ্রহণ করে সেটি বিক্রয় করে যজ্ঞ করে, তার পক্ষে এই প্রতিগ্রহ ভীতিকারক হয় না। যদি ব্রাহ্মণ কোনো দাতার থেকে রত্নদান নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়, তবে যে দেয় এবং যে নেয় উভয়েরই অক্ষয় পুণ্য হয়। যে ব্যক্তি নিজে ধর্মমর্যাদায় অবস্থিত হয়ে নিজের মতো স্থিতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দানে প্রাপ্ত বস্তু দান করে, সেই দুজনই অক্ষয় ধর্ম লাভ করে, ধর্মজ্ঞ মনু একথা বলেছেন। যে ব্যক্তি বস্ত্রদান করে, সে সুন্দর বস্ত্র ও সুন্দর বেশধারণ করে থাকে। যুধিষ্ঠির ! গোধন, সুবর্ণ এবং তিলদানের মাহাত্ম্য আমি অনেকবার শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি দানের উত্তম বিধি আবার বর্ণনা করুন। সকলেই যে দান করতে সক্ষম এবং বেদাদিতে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! গাভী, ভূমি এবং সরস্বতী —এই তিনটির একই নাম, গোধন। এক নাম বিশিষ্ট এই তিন বস্তু দান করা উচিত। এই তিনটি মানুষের সব কামনা পূর্ণ করে। যে ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যকে বেদ-বাণী (সরস্বতী) উপদেশ করেন, তিনি ভূমিদান ও গোদানের সমান ফলভোগ করেন। গোদানেরও এইরূপ প্রশংসা করা হয়েছে। গোদানের থেকে বড় কোনো দান নেই, এর ফল

অত্যন্ত শীঘ্র পাওয়া যায়। গাভীকে সকল প্রাণীর মাতা বলা হয়, সে সকলকে সুখপ্রদান করে। নিজ উন্নতি যারা চায় তাদের সর্বদা গাভীকে প্রদক্ষিণ করে চলা উচিত। গোরু মঙ্গলের আধারভূত দেবী, তাকে পূজা করা উচিত, বুদ্ধিমান মানুষের কখনো গোরুকে বিরক্ত করা উচিত নয়। গাভী তৃষ্ণার্ত হয়ে যখন তার প্রভুর দিকে তাকায় কিন্তু প্রভু তাকে জলপান করায় না তখন সেই ব্যক্তি সবান্ধব বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যার গোময় দ্বারা মন্দির এবং শ্রাদ্ধ স্থান পবিত্র করা হয়, তার থেকে পবিত্র আর কে হতে পারে? যে এক বছর প্রতিদিন আহারের পূর্বে অন্যের গাভীকে এক মুষ্টি ঘাস দেয়, তার এই ব্রত সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। তার পুত্র, যশ, ধন এবং সম্পত্তি লাভ হয়; তার সমস্ত অশুভ, দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে যায়।

দুরাচারী, পাপী, লোভী, অসত্যবাদী এবং দেবযজ্ঞ শ্রাদ্ধকর্ম না করে যে ব্রাহ্মণ, তাকে কখনো গোদান দেওয়া উচিত নয়। যার বহু সন্তান বর্তমান তেমন যাচক, শ্রোত্রিয় ও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে দশটি গাভী দান করলে দাতা উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়। যে জন্মদান করে, যে ভয় থেকে রক্ষা করে এবং যে জীবিকা দেয়—এই তিনজনই পিতৃতুল্য। তাই বেদান্তনিষ্ঠ, বহুজ্ঞ, জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, যত্নশীল, প্রিয়বাদী, ক্ষুধায় পীড়িত হয়েও অনুচিত কর্ম যে করে না, মৃদু, শান্ত, অতিথিপ্রেমী, সবার ওপর সমভাববিশিষ্ট এবং স্ত্রীপুত্রাদি-কুটুম্বযুক্ত এমন ব্রাহ্মণের জীবিকার ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত। সুপাত্র ব্রাহ্মণকে গোদান করলে যত পুণ্য হয়, তার ধন অপহরণ করলে ততই পাপ হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করবে না এবং তাদের নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না।

কুন্তীনন্দন ! এই বিষয়ে সাধু ব্যক্তিরা রাজা নৃগের উপাখ্যান শুনিয়ে থাকেন। কোনো এক সময় ব্রাহ্মণের ধন নিয়ে নেওয়ায় নৃগকে মহাকষ্ট ভোগ করতে হয়। পূর্বকালের কথা, দ্বারকাপুরীতে বসবাসকারী যদুবংশীয় বালকেরা জলের আশায় এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এর মধ্যে তাঁরা এক বিশাল কুয়া দেখতে পেলেন, যেটি ঘাস ও লতায় আচ্ছাদিত ছিল। বালকেরা বহু পরিশ্রম করে কুয়ার ওপরের ঘাস-পাতা পরিষ্কার করে দেখলেন, তার মধ্যে এক বিশাল গিরগিটি রয়েছে। ছেলেরা সংখ্যায় এক হাজার জন ছিলেন, তাঁরা সকলে সেই গিরগিটিকে বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু গিরগিটির শরীর একটা পাহাড়ের মতো ছিল, ছেলেরা দড়ি-লাঠি ইত্যাদি দিয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তাকে একটুও নড়াতে পারলেন না। যখন কিছুতেই তাঁরা তাকে বের করতে পারলেন না, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁরা বললেন—'আমরা এক বিশাল বড় গিরগিটি দেখেছি, সে সমস্ত কূপ দখল করে বসে আছে; ওকে কেউ বের করতে পারছে না।'

তাঁদের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কুয়ার কাছে গিয়ে তাকে বাইরে বার করে তার পূর্বজন্মের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সেই গিরগিটি বলল—'প্রভু ! আমি পূর্বজন্মে রাজা নৃগ ছিলাম, আমি হাজার হাজার যজ্ঞানুষ্ঠান করেছি।' তার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্! আপনি তো সর্বদা পুণ্য কাজই করেছেন, কখনো পাপ করেননি, তাহলে আপনি কেন এই দুর্গতিগ্রস্ত হলেন ? আমরা শুনেছি আপনি আগে কয়েকবারে একাশি লক্ষ দুই শত গাভী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন; সেই গোদানের ফল কোথায় গেল ?'

তখন রাজা নৃগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—প্রভু ! এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর একটি গাভী ছিল, সে একদিন তার স্থান থেকে পালিয়ে গোশালাতে চলে আসে। আমার গোপালক দানের জন্য আনীত এক হাজার গাভীর মধ্যে তাকেও গণনা করে ফেলে এবং আমি একজন ব্রাহ্মণকে তা দান করে দিই ! কিছুদিন পরে সেই ব্রাহ্মণ ফিরে এসে তাঁর গাভী খুঁজতে থাকেন।

খুঁজতে খুঁজতে তিনি যখন অন্যের ঘরে সেই গাভীটিকে দেখতে পেলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণকে তিনি বললেন— 'এটি আমার গাভী (অতএব আমি একে নিয়ে যাচ্ছি)।' এইভাবে দুজনের ঝগড়া আরম্ভ হল এবং দুজনেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমার কাছে এলেন। একজন বললেন— 'মহারাজ ! এই গাভী আপনি আমাকে দান করেছিলেন (আর এই ব্রাহ্মণ বলছেন এটি তার)।' অপরজন বললেন—'মহারাজ ! প্রকৃতপক্ষে এটি আমারই গাভী, আপনি একে চুরি করেছিলেন।' আমি তখন দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণকে বললাম—'মুনিবর ! আমি এই গাভীর পরিবর্তে আপনাকে দশ হাজার গোধন দিচ্ছি (আপনি এঁর গাভী দিয়ে দিন)।' তিনি উত্তর দিলেন—'মহারাজ ! এই গাভী কালের অনুরূপ, ভালো দুধ দেয়, সরল-শান্ত, দয়ালু স্বভাবের। এর দুধ অত্যন্ত মিষ্ট। আমি ধন্য যে, এ আমার গৃহে এসেছে ! এটি তার দুধের দ্বারা প্রত্যহ মাতৃহীন দুর্বল শিশুকে পালন করে ; আমি কখনো একে দিতে পারবো না।' এই বলে সেই ব্রাহ্মণ সেখান থেকে চলে গেলেন। তখন আমি অন্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করলাম, 'ভগবন্ ! আপনি তার পরিবর্তে এক লাখ গাভী নিয়ে নিন।' তিনি বললেন— 'মহারাজ ! আমি রাজাদের থেকে দান গ্রহণ করি না। আমার ওই গাভীটি শীঘ্রই আমাকে এনে দিন।' আমি তাঁকে সোনা, রূপা, রথ, ঘোড়া সব কিছু দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি কিছু না নিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেলেন। এর পরে কালের প্রেরণায় আমাকে দেহত্যাগ করতে হয় এবং পিতৃলোকে পৌঁছে আমি যমরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি সাদরে আমার সৎকার করে বললেন—'রাজন্ ! তোমার পুণ্যকর্ম গুণে শেষ করা যায় না ; কিন্তু অজান্তে তুমি এক পাপ করেছ। সেই পাপের ফল আগে ভোগ করবে, না পরে, সে তোমার ইচ্ছা।' আমি তখন ধর্মরাজকে বললাম—'প্রভু ! প্রথমে আমি পাপই ভোগ করব, তারপর পুণ্য উপভোগ করব।' এই কথা বলতেই আমি পৃথিবীতে ফিরে এলাম। সেই সময় যমরাজের উচ্চ কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, 'রাজন্ ! এক হাজার বছর পূর্ণ হলে তোমার পাপকর্মের ভোগ সমাপ্ত হবে। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে তোমাকে উদ্ধার করবেন এবং তুমি তোমার পুণ্যকর্মের প্রভাবে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হবে।' কুয়াতে পড়ার পর আমি দেখলাম আমি তির্যক যোনি প্রাপ্ত করেছি এবং আমার মাথা নীচের দিকে হয়েছে। কিন্তু এই জন্মেও আমার স্মরণশক্তি এতটুকু নষ্ট হয়নি। আজ আপনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। এবার আমাকে অনুমতি দিন, আমি স্বর্গে যাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং তিনি ভগবানকে প্রণাম করে দিব্যপথ ধরে স্বর্গলোকে চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটি বললেন—'বুদ্ধিমান মানুষের ব্রাহ্মণের জিনিস অপহরণ করা উচিত নয়। চুরি করা ব্রাহ্মণের ধন চোরকে তেমন করে বিনাশ করে যেমনভাবে রাজা নৃগকে ব্রাহ্মণের গাভী সর্বনাশ করেছিল।' কুন্তীনন্দন ! কোনো সজ্জন ব্যক্তি যদি সাধু-মহাত্মার সঙ্গে বাস করে, তাহলে তার সেই সঙ্গ কখনো ব্যর্থ হয় না। দেখো, সাধুসমাগমের জন্যই রাজা নৃগ নরক হতে উদ্ধার লাভ করেছিলেন। গোধন দান করলে উত্তম ফল পাওয়া যায়, তেমনই গোধনের সঙ্গে বিপরীত ব্যবহার করলে অত্যন্ত কুফল ভোগ করতে হয়, তাই গাভীকুলকে কখনো কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

---০---

ব্রহ্মার ইন্দ্রকে গোলোক, গোদান ও স্বর্ণ দক্ষিণার মহিমা এবং গাভী-চুরি পাপের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! গোলোকের বিষয়ে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। গোদানকারী ব্যক্তি যে লোকে বাস করেন, আমি তার যথার্থ বর্ণনা শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা এক পুরানো ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। একবার ইন্দ্র ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন—ভগবন্ ! আমি লক্ষ করেছি, গোলোকনিবাসী ব্যক্তিগণ তাদের তেজে স্বর্গবাসীদের কান্তি ম্লান করে তাদের লঙ্ঘন করে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাই আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে যে গোলোক কীরূপ ? সেখানে কী ফল পাওয়া যায় ? বহু দানকারী ব্যক্তি অল্প দানকারীর সমান এবং অল্পদানকারী ব্যক্তি অধিক দানকারীর সঙ্গে তুলনীয় হয় কীভাবে ? আমাকে এইসব সঠিকভাবে বলুন।

ব্রহ্মা বললেন—ইন্দ্র ! গবাদি লোক নানাপ্রকারের। সে

সবই আমার দৃষ্টির অন্তর্গত এবং পতিব্রতা নারীরাও সেই সব লোক দেখতে সক্ষম। উত্তম ব্রত পালনকারী শুদ্ধচেতা ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁদের শুভকর্মের প্রভাবে সেই লোকে সশরীরে পৌঁছে যান। শ্রেষ্ঠ ব্রত-আচরণধারী যোগীপুরুষ সমাধি-অবস্থায় অথবা মৃত্যুর সময় যখন শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তখন তিনি শুদ্ধচিত্তের দ্বারা স্বপ্নের মতো দর্শিত সেই লোকগুলি এখান থেকেই দর্শন করেন। এখন তুমি সেই লোকাদির বর্ণনা শোনো। সেখানে কাল, বৃদ্ধত্ব অথবা অগ্নির জোর চলে না। কারো কোনো অমঙ্গল হয় না। সেখানে রোগ অথবা শোক নেই। ইন্দ্র ! সেখানকার গাভীরা যেসব বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে, সেসবই তারা প্রাপ্ত হয়—এ আমার প্রত্যক্ষ দেখা। তারা যেখানে যেতে চায়, চলে যায় এবং যেভাবে চলতে চায়, চলে। ইচ্ছা করা মাত্রই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। নদী-সরোবর, বন-উপবন, গৃহ-প্রাসাদ, পাহাড়-পর্বত, সবই সেখানে বিদ্যমান। সেখানকার সববস্তুর ওপর সকলেরই সমান অধিকার। কোনো লোকই এত বিশাল নয়। যেসব ব্যক্তি সহনশীল, ক্ষমাশীল, দয়ালু, গুরুজনের নির্দেশ পালনকারী এবং অহংকাররহিত, তাঁরাই গোলোকে প্রবেশ করেন। যে ব্যক্তি কারো মাংস খায় না, যার হৃদয় পবিত্র ভাবপূর্ণ, যে ধর্মাত্মা, মাতা-পিতার ভক্ত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণদের সেবায় রত, নিন্দারহিত, গো-ব্রাহ্মণের ওপর ক্রোধ করে না, ধর্মপরায়ণ, গুরুসেবক, সারা জীবন সত্য ব্রতধারী, দানশীল, অপরাধীকেও ক্ষমা করে, মৃদু-স্বভাব, জিতেন্দ্রিয় দেবপূজক, সকলকে আতিথ্য প্রদানকারী এবং দয়ালু—এমন গুণসম্পন্ন মানুষই এই সনাতন, অবিনাশী গোলোকে গমন করে। পরস্ত্রীগামী, গুরুহত্যাকারী, অসত্যবাদী, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শত্রুতাকারী, মিত্রদ্রোহী, ঠগ, কৃতঘ্ন, শঠ, কুটিল, ধর্মদ্বেষী, ব্রহ্মহত্যাকারী—এই সবই দোষযুক্ত ; সেই দুরাত্মা মানুষ মনে মনেও কখনো গোলোক দর্শন করতে পারে না ; কারণ সেখানে পুণ্যাত্মারা বাস করেন।

ইন্দ্র ! আমি বিশেষভাবে গোলোকের মাহাত্ম্য জানালাম, এবার গোদানকারী যে ফল প্রাপ্ত হন, তা শোনো। যে ব্যক্তি তার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা গাভী ক্রয় করে দান করে, সে ধর্মপূর্বক উপার্জিত অক্ষয়লোক লাভ করে। পিতার অংশ থেকে ন্যায়পূর্বক প্রাপ্ত গাভী যে দান করে, সে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দানে প্রাপ্ত গাভী শুদ্ধ হৃদয়ে পুনরায় দান করে, সে-ও অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। যে জন্মাবধি সত্যকথা বলে, জিতেন্দ্রিয়, গুরু-ব্রাহ্মণের অপরাধ সহ্য করে এবং ক্ষমাশীল, সে গোলোকে যায়। ব্রাহ্মণকে কখনো কুবাক্য বলা উচিত নয় এবং মনে মনেও কখনো গাভীর মন্দচিন্তা করতে নেই। যে ব্রাহ্মণ গাভীর সেবাবৃত্তিতে থাকে, গাভীকে ঘাস ইত্যাদি খেতে দেয়, সত্য ও ধর্মপরায়ণ, সে যদি একটি গাভীও দান করে—তবে তা হাজার গোদানের সমান ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি সর্বদা উপরোক্ত বিধির ন্যায় আচরণ করে এবং যে সত্যবাদী, গুরু সেবাকারী, দক্ষ, ক্ষমাশীল, দেবভক্ত, শান্তচিত্ত, পবিত্র, জ্ঞানবান, ধর্মাত্মা ও অহংকারবর্জিত, সে যদি পূর্বোক্ত বিধিতে ব্রাহ্মণকে দুগ্ধ-প্রদানকারী গাভী প্রদান করে, তবে সে মহান ফল লাভ করে। যে সর্বদা একবার আহার করে নিত্য গোদান করে, সত্যে স্থিত থাকে, গুরু সেবা এবং বেদাদি স্বাধ্যায় করে, যার মনে গাভীর প্রতি ভক্তি থাকে, যে গাভী দান করে প্রসন্ন হয় তার প্রাপ্ত ফলের বর্ণনা শোনো। রাজসূয় যজ্ঞ করলে যে ফললাভ হয় এবং বহু স্বর্ণ দক্ষিণা-সহ যজ্ঞ করলে যে ফল পাওয়া যায়, উপরোক্ত মানুষ সেরূপ ফলই লাভ করে, সিদ্ধ-মহাত্মা এবং ঋষিগণ একথা বলেন। যে ব্যক্তি গো-সেবার ব্রত ধারণ করে প্রত্যহ আহারের পূর্বে গাভীদের 'গো-গ্রাস' অর্পণ করে এবং শান্ত ও নির্লোভ চিত্তে সদা সত্য পালন করে, সে প্রতি বৎসর এক হাজার গোদানের পুণ্যভাগী হয়। যে ব্যক্তি দিনে একবার আহার করে অন্য আহারের খরচ বাঁচিয়ে গাভী কিনে দান করে, সে অক্ষয় ফল লাভ করে। গাভীর প্রত্যেক লোমে অক্ষয় লোকের নিবাস। যে ব্যক্তি যুদ্ধে গবাদি পশু জয় করে সেগুলি দান করে, তার দান অক্ষয় বলে মনে করা হয়। যে ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি গাভীর অভাবে তিলের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করে দান করে, তাকে সেই গাভী অতি বড় সংকট থেকে পার করে দেয় এবং সে দুধের নদীতে স্নান করে প্রসন্ন হয়। শুধু গাভী দান করাই প্রশংসনীয় নয়, দান করার সময় পাত্র, কাল, গোদানের বিধি, সময়-স্থান, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর পার্থক্যও বিচার করা উচিত, সেই সঙ্গে এটিও দেখতে হবে যে, গাভী যেখানে যাচ্ছে সেখানে সে

যেন রোদ বা গরমে কষ্ট না পায়।

যে ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন, কুলীন, শান্তচিত্ত, যজ্ঞ-পরায়ণ, পাপে অনিচ্ছুক, বহুজ্ঞ, গাভীকে স্নেহের চক্ষে দেখে, মৃদুস্বভাব, শরণাগতবৎসল এবং জীবিকাহীন, তাকেই গোদান করা উচিত। যে জীবিকাবিহনে কষ্ট পাচ্ছে, যার যজ্ঞ বা কৃষিকার্য করতে, গুরুসেবা করতে, প্রসূতি স্ত্রীকে দুধ পান করাতে অথবা বালকের লালন-পালনের জন্য গাভীর প্রয়োজন, তাকে দেশ-কালের বিচার না করেও দুগ্ধপ্রদানকারী গাভী প্রদান করা উচিত। দুগ্ধবতী, ক্রয়করা অথবা বিদ্যার দ্বারা প্রাপ্ত, যুদ্ধে প্রাণ সংকট করে পরাক্রম দ্বারা প্রাপ্ত, পণে পাওয়া, সংকট থেকে মুক্ত করে আনা বা পালন-পোষণের জন্য নিজে থেকে আসা গাভীকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। হৃষ্ট-পুষ্ট, সহজ-সরল, উত্তম গন্ধযুক্ত গাভী প্রশংসনীয় বলা হয়। গঙ্গা যেমন সব নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনই কপিলা সব গাভীর মধ্যে উত্তম। গোদানের বিধি এইরূপ : দাতা তিন রাত্রি উপবাস করে শুধু জলপান করে থাকবে, মাটিতে শয়ন করবে এবং গাভীকে তৃণাদি খাইয়ে পূর্ণ তৃপ্ত করবে। তারপর ব্রাহ্মণদের ভোজন, দক্ষিণা ইত্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করে পরে গোদান করবে। গাভীর সঙ্গে হৃষ্ট-পুষ্ট গোবৎস থাকা চাই এবং গাভীও হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়া উচিত। গো-দানের পর তিন দিন শুধুমাত্র দুধ পান করা উচিত। যে গাভী শান্ত-শিষ্ট, দোহনের সময় বিরক্ত করে না, যার গোবৎসা সুন্দর, যে বন্ধন ছিঁড়ে পালায় না—এরূপ গাভীদান করলে দাতা বহু বৎসর পরলোকে সুখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মাল বহন করার উপযুক্ত, বলিষ্ঠ, শান্ত, হাল কর্ষণের উপযুক্ত বলদ দান করে সে দশটি গাভী দানের ফলস্বরূপ উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দুর্গম বনে পথ হারানো ব্রাহ্মণ ও গাভীকে উদ্ধার করে, সে তৎক্ষণাৎ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয় এবং সে নানাপ্রকার দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, সে গবাদি দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে সর্বত্র পূজিত হয়। যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিধির দ্বারা বনে বাস করে গাভীর সেবা করে এবং নিঃস্পৃহ, সংযমী এবং পবিত্র হয়ে ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন অতিবাহিত করে, সে অমর লোকে দেবগণের সঙ্গে আনন্দে নিবাস করে অথবা যেখানে তার থাকার ইচ্ছা সেখানেই সে গমন করে।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—প্রজাপতি ! যদি কেউ জেনে শুনে অন্যের গাভী অপহরণ করে অথবা ধনলোভে তা বিক্রয় করে তাহলে তার কী গতি হয় ?

ব্রহ্মা বললেন—যারা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গাভীকে হিংসা করে বা গোমাংস খায় ও স্বার্থবশত কশাইকে গাভী হত্যা করার পরামর্শ দেয়, তারা মহাপাপের ভাগী হয়। গাভী হত্যাকারী, গো-খাদক এবং গো-হত্যা অনুমোদনকারী ব্যক্তিকে গাভীর দেহের লোমকূপ সমান বৎসর ধরে নরক ভোগ করতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞনাশকারী ব্যক্তির যত পাপ হয়, অন্যের গাভী চুরি করা ও বিক্রি করাতেও সেইরূপ পাপ হয়। যে অন্যের গোরু চুরি করে ব্রাহ্মণকে দান করে, শাস্ত্রে গোদানের পুণ্য ভোগের যত সময় বলা হয়েছে, ততটা সময়ই তাকে নরক ভোগ করতে হয়।

গোদান করলে মানুষ তার পূর্বের সাত পুরুষ এবং পরের সাত পুরুষকে উদ্ধার করে ; এর সঙ্গে স্বর্ণদক্ষিণা দিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। স্বর্ণদান সর্বোত্তম দান, স্বর্ণ দক্ষিণা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্রকারী বস্তুর মধ্যে স্বর্ণ সর্বাধিক পবিত্র। বলা হয় স্বর্ণ সম্পূর্ণ কুলকে পবিত্র করে। আমি তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল দক্ষিণার কথা জানালাম।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মা ইন্দ্রকে উপরোক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন। ইন্দ্র রাজা দশরথ পুত্র শ্রীরামকে, শ্রীরাম প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এবং লক্ষ্মণ বনবাসের সময় ঋষিদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এইভাবে পরম্পরা প্রাপ্ত এই উপদেশ উত্তম ব্রত পালনকারী ঋষি ও ধার্মিক রাজারা পালন করছেন। আমাকে আমার গুরু পরশুরাম এর বর্ণনা করেছেন। যে ব্রাহ্মণ জনসমক্ষে প্রত্যহ এটির আলোচনা এবং যজ্ঞ ও গোদান কালেও চর্চা করেন, তিনি অক্ষয়লোক লাভ করেন।

—০—

ব্রত, নিয়ম ও দম ইত্যাদির প্রশংসা এবং গো-দানের বিধি

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ব্রত ও নিয়মাদির কী এবং কেমন ফল বলা হয়েছে ? স্বাধ্যায় করা, দান দেওয়া, বেদাদি স্মরণে রাখা এবং বেদ পাঠ করানোর ফল কী ? যে ব্যক্তি নিজে পাঠ করে এবং অপরকে পড়ায়, তার কী ফললাভ হয় ? নিজ কর্তব্য পালনকারী শূরবীরের কী ফল প্রাপ্তি হয় ? আমি যথার্থভাবে এই সব জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা কোনো ব্রত আরম্ভ করে সেটি অখণ্ড সম্পূর্ণ করে, সে সনাতনলোক প্রাপ্ত হয়। জগতে নিয়ম পালনের ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তুমিও যজ্ঞ এবং নিয়মেরই ফল লাভ করেছ। বেদাদির সম্যক স্বাধ্যায়ের ফলও ইহলোক ও পরলোকে দৃষ্টিগোচর হয়। বেদাধ্যয়নকারী ব্যক্তি ইহলোকেও সুখী হয় এবং পরলোকেও আনন্দ অনুভব করে। রাজন্ ! এবার তুমি বিস্তারিতভাবে দমের (ইন্দ্রিয়সংযমের) ফলের বর্ণনা শোনো। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সর্বত্র সুখী এবং সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি যেখানে খুশি যেতে পারেন, যা ইচ্ছা তাই লাভ করতে পারেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী ব্যক্তির সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। তিনি তাঁর তপস্যা, পরাক্রম, দান এবং নানা যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করেন। দমনশীল পুরুষ ক্ষমাশীল হয়ে থাকেন। দান হতে দমের স্থান উচ্চে। দানী ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কিছু দান করার সময় কখনো ক্রোধও করতে পারেন কিন্তু দম পালনকারী ব্যক্তি কখনো ক্রোধ করেন না ; তাই দানের থেকে দম শ্রেষ্ঠ। দান করার সময় ক্রোধ হলে, তা দানের ফল নষ্ট করে দেয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধরহিত হয়ে দান করে, সে সনাতনলোক প্রাপ্ত হয় ; এর দ্বারা দমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

শিষ্যকে বেদাধ্যয়নকারী অধ্যাপক অক্ষয়ফল লাভ করেন। অগ্নিতে বিধিমতো যজ্ঞকারী ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যিনি আচার্যের নিকট স্বয়ং বেদপাঠ করে নীতিমান শিষ্যকে শিক্ষা দেন, তিনিও উপরোক্ত ফল লাভ করেন। গুরুর কর্মের প্রশংসাকারী ছাত্র স্বর্গে সম্মান লাভ করে। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান কর্মে তৎপর এবং যুদ্ধে অন্যকে রক্ষা করে যে ক্ষত্রিয়, সেও স্বর্গে পূজিত হয়। নিজ কর্মে ব্যাপৃত বৈশ্য দান করলে মহৎ-পদ প্রাপ্ত হয় এবং স্বকর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত শূদ্র উচ্চবর্ণকে সেবা করলে স্বর্গলাভ করে। শূরবীরদের নানা ভেদের কথা বলা হয়েছে, তাদের স্বরূপ এবং শূর ও শূরবংশীয়দের প্রাপ্ত করা ফলের বর্ণনা শোনো। যিনি যজ্ঞের কাজে উৎসাহের সঙ্গে লিপ্ত থাকেন, তাঁকে যজ্ঞশূর বলা হয় এবং দৃঢ়তাপূর্বক ইন্দ্রিয়দমনকারীকে দমশূর বলা হয়। এইরূপ বহু সত্যশূর, যুদ্ধশূর, দানশূর, সাংখ্যশূর, মনোনিগ্রহশূর, যোগশূর, বনবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আর্জবশূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, অধ্যাপনশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃ-সেবাশূর, মাতৃসেবাশূর, ভিক্ষাশূর এবং অতিথি-পূজাশূর হয়ে থাকেন—এঁরা সকলেই তাঁদের নিজ নিজ কর্মদ্বারা লব্ধ উত্তম লোকে গমন করেন।

সমস্ত বেদ ধারণকারী এবং সমস্ত তীর্থে স্নান করার পুণ্যও সত্যবাদী পুরুষের পুণ্যের সমকক্ষ হতে পারে না। যদি ওজন যন্ত্রের একদিকে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং অন্যদিকে শুধু সত্যকে রাখা যায়, তবে হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের তুলনায় সত্যই ভারী হবে। সত্যের প্রভাবে সূর্য তাপপ্রদান করে, সত্যের প্রভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং সত্যের প্রভাবেই বায়ু সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। সবকিছু সত্যের ওপর আধারিত। দেবতা, পিতৃকুল, ব্রাহ্মণ সত্য দ্বারাই প্রসন্ন হন। সত্যকে সব থেকে বড় ধর্ম বলা হয় ; অতএব সত্যকে কখনো লঙ্ঘন করা উচিত নয়। মুনি-ঋষিগণ সত্যপরায়ণ, সত্যপরাক্রমী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তাই সত্য সর্বশ্রেষ্ঠ। সত্যকথা বলা মানুষ স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করে। আমি তোমাকে দম ও সত্য থেকে প্রাপ্ত হওয়া সর্বপ্রকার ফলের কথা বর্ণনা করলাম। যে বিনয়ী, সে নিঃসন্দেহে স্বর্গে সম্মানিত হয়। এবার তুমি ব্রহ্মচর্য পালনের গুণাবলি শোনো। যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকে, তার কাছে জগতে কিছুই দুর্লভ নয়। ব্রহ্মলোকে এরূপ কোটি কোটি ঋষি বাস করেন, যাঁরা ইহলোকে সর্বদা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং ঊর্ধ্বরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) ছিলেন। রাজন্ ! ব্রহ্মচর্য পালন করলে সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়। ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। কারণ ব্রাহ্মণদের অগ্নিস্বরূপ মনে করা হয়। তপস্বী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এটি প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। ব্রহ্মচারী রুষ্ট হলে ইন্দ্রও ভীত হন। ব্রহ্মচর্যের এই ফল এখানে ঋষিদের মধ্যে পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এবার

মাতা-পিতা এবং গুরুজনদের পূজা করলে যে ধর্ম হয়, সেই বিষয়ে শোনো। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু ও আচার্যের সেবা করে, কখনো তাঁদের দোষ দেখে না, সে স্বর্গলোকে সম্মানিত স্থান লাভ করে। তাকে কখনো নরক দর্শন করতে হয় না।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! যার দ্বারা সনাতনলোক প্রাপ্তি হয় আমি গোদানের সেই উত্তম বিধি যথার্থরূপে শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! গোদানের থেকে বড় আর কিছু নেই। যদি ন্যায়ভাবে প্রাপ্ত গাভী দান করা হয়, তাহলে তা তখনই সমস্ত কুল উদ্ধার করে। অতএব তুমি আদি কাল থেকে প্রচলিত গোদানের বিধি শ্রবণ করো। প্রাচীনকালের কথা, মহারাজ মান্ধাতার কাছে যখন বহু গাভী গোদানের জন্য আনয়ন করা হয় তখন তিনি 'কীভাবে গোদান করা যায়' এই চিন্তা করে তোমার মতো বৃহস্পতিকে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন বৃহস্পতি তাঁকে বলেছিলেন—''গোদানকারী মানুষদের ব্রত পালন করা কর্তব্য এবং ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের সৎকার করে জানিয়ে রাখা উচিত যে, 'আমি কাল প্রাতে আপনাদের গোদান করব।' তারপর গোদানের জন্য লাল রংয়ের গাভী এনে 'সমঙ্গে বহুলে' বলে গাভীদের সম্বোধন করবে। পরে গাভীদের মধ্যে গিয়ে নিম্নলিখিত শ্রুতির (যার সারাংশ এখানে দেওয়া হয়েছে) উচ্চারণ করবে, 'গাভী আমার মাতা ও প্রতিষ্ঠা, বলদ আমার পিতা। এরা আমাকে যেন ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রদান করে'—এই কথা বলে গাভীর শরণ নেবে এবং প্রভাত হলে গোদান করার সময় মৌনভঙ্গ করবে। এইভাবে গাভীদের সঙ্গে এক রাত্রি কাটিয়ে ব্রত পালন করে একাত্মভাব প্রাপ্ত হলে মানুষ তৎক্ষণাৎ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। গোদান করার পর এইভাবে প্রার্থনা করতে হয়—'গাভী উৎসাহসম্পন্ন, বল-বুদ্ধিযুক্ত, অমরত্ব প্রদানকারী যজ্ঞ সম্পর্কীয় হবিষ্যের ক্ষেত্রভূতা, জগতের প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী প্রকাশকারী, জগতের অনাদি প্রবাহ প্রবৃত্তকারী এবং প্রজাপতির কন্যা। সূর্য ও চন্দ্রের অংশ থেকে উৎপন্ন এই গাভী আমাদের পাপনাশ করুক, আমাদের উত্তমলোক প্রাপ্তিতে সহায়তা করুক, মাতার ন্যায় শরণ প্রদান করুক এবং যে ইচ্ছা আমরা প্রকাশ করতে পারি না, তা যেন গাভীর কৃপায় পূর্ণ হয়ে যায়। হে গাভী ! যেসব ব্যক্তি (তোমার পঞ্চগব্যাদি সেবন করে) তোমার আরাধনায় ব্যাপৃত থাকে, তাদের কর্মে প্রসন্ন হয়ে তুমি তাদের ক্ষয় ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্ত কর এবং (জ্ঞান লাভ করিয়ে) দেহ বন্ধন থেকেও মুক্ত করে দাও। যারা তোমার সেবা করে, তাদের কল্যাণের জন্য তুমি সরস্বতী নদীর ন্যায় সর্বদা আশীর্বাদ করো। গোমাতা ! আমাদের ওপর প্রসন্ন হও, আমাদের সমস্ত পুণ্যের দ্বারা প্রাপ্তকারী অভীষ্ট গতি প্রদান করো।' তারপর দাতা নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধ উচ্চারণ করবে—'**যা বৈ যূয়ং সোঽহমদ্যৈব ভাবো যুষ্মান্ দত্ত্বা চাহমাত্মপ্রদাতা**'। হে গাভী ! তোমার যে স্বরূপ আমারও তাই—তোমার সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্য নেই ; তাই আজ তোমাকে দান করে আমি নিজেকেই দান করলাম। দাতা এই কথা বললে গ্রহীতা ব্রাহ্মণ বাকি শ্লোকার্ধ উচ্চারণ করবেন—'**মনশ্চ্যুতা মন এবোপপন্নাঃ, সন্ধুক্ষধ্বং সৌম্যরূপোগ্ররূপাঃ।**' হে গাভী ! তুমি শান্ত ও প্রচণ্ডরূপ ধারণকারী, এখন তোমার ওপর আর দাতার অধিকার নেই ; এখন তুমি আমার অধিকারে এসেছ, সুতরাং অভীষ্ট ফল প্রদান করে তুমি আমাকে ও দাতাকে প্রসন্ন করো।

যে ব্যক্তি গাভীর পরিবর্তে তার মূল্য, বস্ত্র অথবা স্বর্ণ দান করে, তাকেও গোদাতা বলা উচিত। এইরূপে প্রদত্ত গাভীর নাম ক্রমশ '**ঊর্ধ্বাস্যা, ভবিতব্যা এবং বৈষ্ণবী**'। সংকল্পের সময় তাদের এই নামেরই উচ্চারণ করা উচিত। এদের দানের ফলও ক্রমশ এইরূপ হয়ে থাকে—গবাদির মূল্যপ্রদানকারী ছত্রিশ হাজার বছর ধরে, গাভীর স্থানে বস্ত্র প্রদান করলে আট হাজার বছর ধরে, গাভীর স্থানে স্বর্ণ প্রদান করলে কুড়ি হাজার বছর ধরে দাতা দিব্যলোকে সুখভোগ করে। এরূপে সাক্ষাৎ গাভীর পরিবর্তে প্রদত্ত নিষ্ক্রিয়দানের ক্রমান্বয়ে যে ফলের কথা বলা হয়েছে সেটি স্মরণে রাখা উচিত। গোদান নিয়ে ব্রাহ্মণ যখন তার গৃহের দিকে যায়, তখন তার আট পা যেতেই দাতা ফল প্রাপ্ত হয়। সাক্ষাৎ গোদানকারী শীলবান এবং তার মূল্যপ্রদানকারী নির্ভয় হয়। গাভীর পরিবর্তে ইচ্ছানুযায়ী স্বর্ণদানকারী মানুষ কখনো দুঃখে পতিত হয় না। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে নিত্য নিয়মাদি অনুষ্ঠান করে এবং মহাভারতের বিশেষজ্ঞ, সে এবং উপরে বর্ণিত গোদাতা ব্যক্তি চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে।

গোদান করার পর মানুষের তিন রাত গোব্রত পালন করা উচিত এবং এক রাত্রি গাভীদের সঙ্গে বাস করা

উচিত। কামাষ্টমী থেকে তিন রাত শুধু গোদুগ্ধ আহার করা উচিত। যে ব্যক্তি একটি বলদ দান করে, সে দেবব্রতী (সূর্যমণ্ডল ভেদ করে যাত্রাকারী ব্রহ্মচারী) হয়। যে ব্যক্তি একটি বলদ ও একটি গাভী দান করে, তার বেদপ্রাপ্তি হয় এবং যে বিধিপূর্বক গাভী দান করে, তার উত্তমলোক লাভ হয়। কিন্তু যে বিধি জানে না, সে উত্তম ফল থেকে বঞ্চিত হয়। যে মানুষ শিষ্য নয়, যে ব্রতপালন করে না, যার মধ্যে শ্রদ্ধার অভাব এবং যার বুদ্ধি কুটিল, তাদের গোদানের বিধি উপদেশ দেবে না ; কারণ এটি সব থেকে গোপনীয় ধর্ম। এর যত্র-তত্র প্রচার করা উচিত নয়। জগতে বহু শ্রদ্ধাহীন, ক্ষুদ্র এবং রাক্ষস-স্বভাবের মানুষ আছে এবং বহু ব্যক্তি নাস্তিকতা আশ্রয় করে আছে ; তাদের এই ধর্মোপদেশ দিলে অনিষ্ট হয়।"

রাজন্ ! বৃহস্পতির এই উপদেশ শুনে যে পুণ্যশীল রাজারা গোদান করেছিলেন এবং তার প্রভাবে যাঁরা উত্তম লোক প্রাপ্ত করেছিলেন, তাঁদের নাম আমি তোমাকে জানাচ্ছি, শোনো—উশীনর, বিশ্বগশ্ব, নৃগ, ভগীরথ, যৌবনাশ্ব (মান্ধাতা), মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, নৈষধ, সোমক, পুরূরবা, চক্রবর্তী ভরত এবং রাজা দিলীপ—এঁরা সকলেই গোদান করে স্বর্গলাভ করেছিলেন। সুতরাং কুন্তীনন্দন ! তুমিও বৃহস্পতির উপদেশ শিরোধার্য করো এবং কৌরব রাজ্য অধিকার করে উত্তম ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতাপূর্বক পবিত্র গোদান করো।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভীষ্ম যখন এইভাবে বিধিপূর্বক গোদানের নির্দেশ দিলেন, তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাই পালন করলেন এবং বৃহস্পতি মান্ধাতাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন, তা ভালোভাবে স্মরণে রাখলেন। তিনি গোদুগ্ধের সঙ্গে যবের কণা আহার করে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক মাটিতে শয়ন করতে লাগলেন। তাঁর মস্তকে জটা হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্মের সমান দেদীপ্যমান হয়েছিলেন। তিনি মনকে একাগ্র করে দেবতার ন্যায় গাভীদের স্তুতি করতেন এবং দেববুদ্ধিতে তাদের প্রণাম করতেন। তখন থেকে তিনি তাঁর রথে কখনো বলদ সংলগ্ন করেননি। ঘোড়া সংলগ্ন করা রথেই তিনি যাত্রা করতেন।

গো-দানের ফল, কপিলা গাভীর উৎপত্তি এবং গো-মাহাত্ম্যের বিষয়ে বশিষ্ঠ-সৌদাস সংবাদ

যুধিষ্ঠির বললেন—ভারত ! আপনি গোদানের উত্তম গুণসমূহ পুনরায় বর্ণনা করুন, আপনার মুখে এই অমৃতময় উপদেশ শুনে আমার জ্ঞান তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! বাৎসল্য গুণযুক্ত এবং উত্তম লক্ষণযুক্ত অল্পবয়স্ক গাভী ব্রাহ্মণকে দান করলে মানুষ সম্পূর্ণ পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং তাকে অন্ধকারময় লোকে (নরকে) যেতে হয় না। যে গাভী দানাপানি ত্যাগ করে জীর্ণশীর্ণ ও বৃদ্ধ হয়ে গেছে, এরূপ গাভী দান করলে ব্রাহ্মণকে বৃথা কষ্টদান করা হয় এবং দাতাও ঘোর নরকে পতিত হয়। রুগ্ন, ক্রোধী এবং যে গাভীর দাম শোধ করা হয়নি, তেমন গাভী কখনো দান করা উচিত নয়। হৃষ্টপুষ্ট, সবল-সুলক্ষণ গাভীর সকলেই প্রশংসা করে। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, গাভীর মধ্যে তেমন কপিলা গাভীকে উত্তম বলা হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে কোনো রংয়ের গাভী দান করলে, গোদান তো একপ্রকারেরই হবে—তাহলে সৎ পুরুষেরা কপিলা গাভীর বেশি প্রশংসা করেছেন কেন ? আমি কপিলা গাভীর প্রভাব বিশেষভাবে শুনতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! আমি প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে রোহিণী (কপিলা) গাভীর উৎপত্তির যে বৃত্তান্ত শুনেছি, তা তোমাকে বলছি। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে নির্দেশ দিলেন 'তুমি প্রজা সৃষ্টি করো'। কিন্তু দক্ষ প্রজাপতি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্বপ্রথম তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন। উৎপন্ন হয়েই সমস্ত প্রাণী জীবিকার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। ক্ষুধার্ত শিশু যেমন মাতা-পিতার শরণাপন্ন হয়, তেমনই সমস্ত প্রজা জীবিকাদাতা দক্ষের কাছে এল। প্রজাদের এই স্থিতি মনে মনে চিন্তা করে প্রজাপতি তাদের রক্ষার জন্য অমৃত পান করলেন। অমৃত পানে তৃপ্ত হলে দক্ষের মুখ থেকে

মনোহর সুগন্ধ বের হতে লাগল। সেই সুরভি গন্ধ থেকে সুরভি (গাভী) উৎপন্ন হল, প্রজাপতি তাঁর মুখনিঃসৃত এই সুরভিকে কন্যারূপে দেখতেন। সুরভি বহু কপিলা গাভীর জন্মদান করে, সেগুলি প্রজাদের মাতার ন্যায় ছিল এবং তাদের গাত্রবর্ণ ছিল কুন্দনের ন্যায় অতি উজ্জ্বল। এই গাভীগুলি ছিল প্রজাদের জীবিকা। এক দিনের কথা, ভগবান শংকর পৃথিবীতে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই সময় সুরভির এক গো-বৎস্যের মুখ থেকে দুগ্ধের ফেনা তাঁর মস্তকের ওপরে পড়ে। এতে ভগবান কুপিত হয়ে এমনভাবে তার দিকে তাকালেন, যেন ললাটাগ্নিতে তাকে ভস্ম করে ফেলবেন। রুদ্রের সেই ভয়ংকর তেজ যেসব কপিলার ওপর পড়ে, তাদের গাত্রবর্ণ নানাপ্রকারের হয়ে যায়, কিন্তু যারা সেখান থেকে পালিয়ে চন্দ্রের শরণ নেয়, তাদের রং পরিবর্তিত হয় না। তারা যেমন জন্মেছিল, তেমনই থাকল।

প্রজাপতি তখন মহাদেবকে ক্রুদ্ধ দেখে বললেন— 'প্রভু ! আপনার ওপর অমৃতের ছিটে পড়েছে। গো-বৎসা পান করলে গাভীর দুধ উচ্ছিষ্ট হয় না। চন্দ্র যেমন অমৃত সংগ্রহ করে বর্ষণ করে, এই গাভীরা তেমনই অমৃত থেকে উৎপন্ন দুগ্ধ প্রদান করে। যেমন বায়ু, অগ্নি, সুবর্ণ, সমুদ্র এবং দেবতাদের পান করা অমৃতে উচ্ছিষ্টের দোষ হয় না, তেমনই গো-বৎসা পান করলেও দুধকে দূষিত মানা হয় না। (অর্থাৎ দুধ পানের সময় গো-বৎস্যের মুখনিঃসৃত ফেনা অশুদ্ধ হয় না)। এই গাভীরা তাদের দুধ ও ঘি থেকে সমস্ত জগৎ পালন করবে। সকলেই এদের অমৃতময় দুধ পান করতে চায়।'

এই বলে প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে বহু গাভী এবং একটি বলদ উপহার দিয়ে তাঁকে শান্ত করলেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে সেই বৃষভকে নিজের বাহন করলেন এবং সেই চিহ্ন দ্বারা তাঁর ধ্বজাও সুশোভিত করলেন। তাই তিনি 'বৃষভধ্বজ' নামে প্রসিদ্ধ হন। তারপর দেবতারা মহাদেবকে পশুদের রাজা (পশুপতি) করলেন এবং গাভীদের কেন্দ্রবিন্দুরূপে তাঁর নাম রাখলেন 'বৃষভাঙ্ক'। এইভাবে কপিলা গাভী অত্যন্ত তেজস্বী এবং শান্ত বর্ণসম্পন্ন হল। তাই দান করা সব গাভীর মধ্যে কপিলাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। গাভী জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, তারা জগৎকে জীবন প্রদান করে। ভগবান শংকর সর্বদা তাদের সঙ্গে থাকেন। এরা চন্দ্র থেকে প্রবাহিত অমৃত থেকে উৎপন্ন ; শান্ত, পবিত্র, সমস্ত কামনাপূরণকারী এবং জগৎকে প্রাণদানকারী ; সুতরাং গোদানকারী মানুষকে সমস্ত কামনার দাতা বলে মনে করা হয়। অপবিত্র মানুষও যদি গাভীর উৎপত্তি সম্পর্কিত এই কথা পাঠ করে, তাহলে কলিযুগের দোষ থেকে মুক্ত হয় এবং সে পুত্র, লক্ষ্মী, ধন, পশুধন প্রাপ্ত করে। রাজন্ ! গোদানকারী হব্য, কব্য, তর্পণ ও শান্তি-কর্মের ফল এবং বাহন-বস্ত্র ও বালক-বৃদ্ধদের সন্তোষ লাভ করে। গোদানে এই সব গুণ বর্তমান।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভীষ্মের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা উত্তম ব্রাহ্মণদের স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট বলদ এবং উত্তম গাভী দান করলেন।

ভীষ্ম বললেন—ধর্মরাজ ! ইক্ষ্বাকুবংশে সৌদাস নামে এক রাজা ছিলেন। একবার তিনি ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! ত্রিলোকে এমন কী পবিত্র বস্তু আছে, যার নাম গ্রহণ করা মাত্রই মানুষ সর্বদা উত্তম পুণ্য অর্জন করতে পারে ?' মহর্ষি বশিষ্ঠ গাভীদের নমস্কার করে বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! গাভীদের দেহ

থেকে নানাপ্রকার মনোরম সুগন্ধ পাওয়া যায়। গাভী প্রাণীদের আধার এবং কল্যাণের নিধি। অতীত ও ভবিষ্যৎ গাভীদের ওপরই নির্ভর করে। তারাই পুষ্টির কারণ এবং লক্ষ্মীর মূল। গাভীর সেবার জন্য যা কিছু করা হয়, তার ফল অক্ষয় হয়ে থাকে। গাভী থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, দেবতাদের উত্তম হবিষ্য (ঘৃত) গাভী থেকেই হয় এবং স্বাহাকার (দেবযজ্ঞ) এবং বষট্‌কার (ইন্দ্রযজ্ঞ)ও সর্বদা গাভীর ওপরই নির্ভরশীল। গাভীই যজ্ঞের ফল প্রদানকারী এবং

তাতেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা। ঋষিদের সকাল-সন্ধ্যায় হোমের সময় গাভীই যজ্ঞের ঘৃত ইত্যাদি পদার্থের যোগান দেয়। যারা দুগ্ধপ্রদানকারী গাভী দান করে, তারা সমস্ত সংকট এবং পাপ থেকে রক্ষা পায়। যার কাছে দশটি গাভী আছে, সে একটি গাভী দান করবে, যে একশত গাভী রাখে, সে দশটি গাভী দান করবে এবং যার হাজার গাভী আছে সে একশত গাভী দান করবে—এরা সকলেই দানের একপ্রকার ফলই লাভ করবে। যেসব ব্যক্তি একশত গাভীর অধিকারী হয়েও অগ্নিহোত্র করে না, যারা হাজার গাভী পালন করেও যজ্ঞ করে না এবং যারা ধনী ব্যক্তি হয়েও কৃপণতা ত্যাগ করে না—তারা সম্মান পাবার যোগ্য নয়। যে ব্যক্তি উত্তম লক্ষণযুক্ত কপিলা গাভী গোবৎসাসহ দান করে এবং দুগ্ধ-দোহনের জন্য পাত্র দেয়, সে ইহলোক-পরলোক—উভয়ই জয় করে। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় গাভীকে প্রণাম করা উচিত। এর দ্বারা মানুষের শারীরিক পুষ্টি হয়। গোমূত্র এবং গোময়কে কখনো ঘৃণা করা উচিত নয়। গাভীকে কখনো অপমান করতে নেই। কুস্বপ্ন দেখলে গোমাতার নাম নেবে। গাভীর গোময়ে স্নান করবে। শুকনো গোময়ে আসন পেতে বসবে। তার ওপরে থুথু অথবা মল-মূত্র ত্যাগ করবে না। গাভীদের অবমাননা থেকে রক্ষা করবে। অগ্নিতে গাভীর ঘৃতের যজ্ঞ করবে, তার দ্বারা স্বস্তিবাচন করাবে, গব্যঘৃত দান এবং স্বয়ং তা ভক্ষণ করলে গোজাতীর বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার রত্ন যুক্ত তিলের ধেনুকে **'গোমা অগ্নে বিমাঁ অশ্বী'** ইত্যাদি গোমতী মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে তা ব্রাহ্মণকে দান করে, তার কখনো পাপ-পুণ্যের জন্য শোক করতে হয় না। রাত হোক বা দিন, সুসময় হোক বা দুঃসময়, যত ভয়ই উপস্থিত হোক না কেন, মানুষ যদি নিম্নলিখিত শ্লোকার্থ কীর্তন করে, তাহলে সে সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়—'নদীগুলি যেমন সমুদ্রের কাছে যায়, তেমনই স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত দুগ্ধবতী সুরভী এবং সৌরভেয়ী গাভী সকল আমার নিকট আসুক। আমি সর্বদা গাভী দর্শন করব এবং গাভীগণ আমার ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখুক। গাভীসকল আমার এবং আমি গাভীদের ; যেখানে গাভী থাকে, আমিও যেন সেখানে থাকি।'

প্রাচীনকালে গাভীগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য একলাখ বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যে 'ইহজগতে দক্ষিণা প্রদানযোগ্য যত বস্তু আছে তার মধ্যে আমাদেরই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলে মানা হবে। আমাদের যেন কোনো দোষ স্পর্শ না করে। দেবতা ও মানুষ পবিত্রতার জন্য সর্বদা আমাদের গোময় ব্যবহার করুক। জগতের সমস্ত প্রাণী আমাদের গোবর দ্বারা পবিত্র হোক এবং আমাদের দানকারী মানুষ উত্তমলোক (গোলোক)

প্রাপ্ত হোক।' এইরূপ সংকল্প নিয়ে যখন গাভীগণ তাদের তপস্যা পূর্ণ করে তখন ব্রহ্মা তাদের বরপ্রদান করেন, 'গাভীগণ ! তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ হোক এবং তোমরা জগতের জীবদের উদ্ধার করতে থাকো।'

এইভাবে তাদের কামনা সিদ্ধ হলে গাভীগণ তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হয় এবং জগতের কল্যাণ করতে থাকে। তাই এই মহাসৌভাগ্যশালিনী গাভীদের পরমপবিত্র মনে করা হয়। তারা সকল প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং বন্দনীয়। যারা সবৎসা দুগ্ধ প্রদানকারী সুলক্ষণা কপিলা গাভী দান করে, তারা ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। গোদানে সর্বদা অনুরাগ রক্ষাকারী ব্যক্তি সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বিমানে আরোহণ করে মেঘমণ্ডল ভেদ করে স্বর্গে গমন করে। বহুদিন স্বর্গবাস করার পর পুণ্য ক্ষীণ হলে মনুষ্যলোকে সম্পন্ন গৃহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

সকল মানুষের সকাল ও সন্ধ্যায় আচমন করে এইভাবে জপ করা উচিত—'ঘি এবং দুগ্ধপ্রদানকারী, ঘিয়ের উৎপত্তির আধার, ঘি প্রদানকারী গাভী সর্বদা আমার গৃহে বাস করুক। আমার চারদিকে সর্বদা গাভী উপস্থিত থাকুক,

আমি যেন গাভীর মধ্যেই সর্বদা নিবাস করি।' এইভাবে প্রতিদিন জপ করলে মানুষের সারা-দিনের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। গোদানকারী ব্যক্তি তার মাতা ও পিতার দশ পুরুষ পবিত্র করে তাদের পুণ্যময়লোকে প্রেরণ করে। যে গাভীর সমান তিলের গাভী তৈরি করে দান করে এবং যে জলদান করে, তাকে যমলোকে কোনো কষ্ট ভোগ করতে হয় না। গাভী সব থেকে বেশি পবিত্র, জগতের প্রতিষ্ঠা এবং দেবগণের মাতা। তাদের স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করবে এবং উত্তম সময় দেখে সুব্রাহ্মণকে গাভী দান করবে। গোদানের থেকে পবিত্র কোনো দান নেই এবং গোদানের ফলের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ফল নেই। জগতে গাভীর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো প্রাণী নেই। যে সমস্ত জগৎ চরাচর ব্যাপ্ত করে আছে, সেই ভূত-ভবিষ্যতের মাতা গাভীকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম জানাই। রাজন্ ! আমি তোমাকে গাভীদের গুণগুলির দিগ্‌দর্শন করালাম। গাভী দানের থেকে বড় কোনো দান এই জগতে নেই এবং এর সমান অন্য কোনো সাহায্যও নেই।

ভীষ্ম বললেন—মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শুনে ভূমিদানকারী মহাত্মা রাজা সৌদাস তা নিয়ে চিন্তা করলেন এবং সেটি সর্বতোভাবে উত্তম জেনে ব্রাহ্মণদের বহু গাভী দান করলেন। এর ফলে তিনি উত্তমলোক প্রাপ্ত হলেন।

ব্যাসদেব কর্তৃক শুকদেবকে গো-দানের মহিমা বর্ণনা এবং ভীষ্মের দ্বারা গাভী এবং লক্ষ্মীর সংবাদ শোনানো

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! জগতে যে বস্তু পবিত্র থেকেও পবিত্রতম, উত্তম এবং পরমপাবন, তার বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! গাভী মহান অর্থের সাধন, পরম পবিত্র এবং মানুষের ত্রাণকারী। এরা তাদের ঘি এবং দুগ্ধ থেকে প্রজাদের জীবন রক্ষা করে। গাভীর থেকে পবিত্র কোনো জীব নেই। এরা ত্রিলোকে পবিত্র, পুণ্যস্বরূপ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। গাভী দেবতাদেরও ওপরের লোকে নিবাস করে। যে ব্যক্তি এদের দান করে সেই মনীষী ব্যক্তি আত্মোদ্ধার করে স্বর্গগমন করে। মান্ধাতা, যযাতি এবং নহুষ সর্বদাই লক্ষ লক্ষ গাভী দান করতেন, সেইজন্য তাঁরা এমন উত্তম-লোক লাভ করেছেন, যা দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ। এই বিষয়ে আমি তোমাকে এক প্রাচীন বৃত্তান্ত শোনাচ্ছি। কোনো এক সময়ের কথা, পরমজ্ঞানী শুকদেব নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে পবিত্র এবং শুদ্ধচিত্তে সর্বলোকের অতীত ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তাঁর পিতা ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতা ! বিদ্বান ব্যক্তিরা কোন কর্মের অনুষ্ঠান করে উত্তম স্থান লাভ করেন ? পবিত্রের থেকেও পবিত্রতম বস্তু কী ? কৃপা করে আমাকে বলুন।'

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! গাভী সমস্ত প্রাণীর প্রতিষ্ঠা এবং পরম আশ্রয়। গাভী পুণ্যস্বরূপ, পবিত্র এবং পাবন, হব্য-কব্য প্রদানকারী, শুভ, পুণ্য, পবিত্র, সৌভাগ্যবতী ও দিব্য বিগ্রহসম্পন্ন। গাভী দিব্য এবং মহাতেজসম্পন্ন, শাস্ত্রে গোদানের প্রশংসা করা হয়েছে। যে সৎপুরুষ ঈর্ষা ত্যাগ করে গোদান করে, সে পবিত্র গোলোকে গমন করে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সেখানে সুখে বাস করেন। গোলোকবাসী শোক ও ক্রোধরহিত এবং পূর্ণকাম হন। তাঁরা বিচিত্র, রমণীয় বিমানে বিহার করে আনন্দ উপভোগ করেন। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকারে গাভীর অনুসরণ এবং সেবা করে, গাভী প্রসন্ন হয়ে তাকে দুর্লভ বর প্রদান করে। মনে মনেও গাভীর সঙ্গে দ্রোহ করা উচিত নয়, তাকে সর্বদা সুখী রাখবে এবং যথোচিত সৎকার ও প্রণাম করে পূজা করবে। দৈত্যরা যখন দেবতাদের পরাজিত করেছিলেন তখন তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত লাভ করে পুনরায় দেবত্ব লাভ করেন এবং মহাবলবান ও মহাসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। গাভী পরমপাবন, পবিত্র এবং পুণ্যস্বরূপা, ব্রাহ্মণকে গাভীদান করলে মানুষ স্বর্গ সুখ ভোগ করে পবিত্র জলে আচমন করে পবিত্র হয়ে গাভীদের মধ্যে গোমতী মন্ত্র (গোমা অগ্নে বিমাঁ অশ্বী) জপ করলে মানুষ অত্যন্ত শুদ্ধ এবং নির্মল পাপমুক্ত হয়ে যায়। বিদ্যা এবং বেদব্রতে নিষ্ণাত পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণদের উচিত যে, তাঁরা যেন অগ্নি, গাভী এবং ব্রাহ্মণদের সম্মুখে নিজ শিষ্যদের যজ্ঞতুল্য গোমতী মন্ত্রের শিক্ষা প্রদান করেন। যারা ত্রিরাত্রি উপবাস করে গোমতী মন্ত্র জপ করে, তারা

গাভীদের বরদান প্রাপ্ত হয়। পুত্র আকাঙ্ক্ষাকারী পুত্র, ধনাকাঙ্ক্ষী ধন এবং পতি আকাঙ্ক্ষাকারিণী নারী পতি লাভ করে। এইভাবে গাভী সকলের মনোস্কামনা পূর্ণ করে। এরা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ, এদের থেকে বড় আর কিছু নেই।

মহাত্মা পিতা এই কথা বলায় মহাতেজস্বী শুকদেব প্রতিদিন গাভীর পূজা করতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির ! তুমিও গাভীদের পূজা করো।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আমি শুনেছি গোময়ে লক্ষ্মীর বাস, সে বিষয়ে আপনি স্পষ্ট করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই বিষয়ে জ্ঞানী লোকেরা গাভী এবং লক্ষ্মীর সংবাদরূপ একটি প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা করেন। কোনো এক সময়ের কথা, লক্ষ্মী মনোহররূপ ধারণ করে গাভীদের দলে প্রবেশ করেন, তাঁর সুন্দর রূপ দেখে গাভীরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'দেবী ! তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছ ? তোমাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে। আমরা তোমার রূপ-বৈভব দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছি, তাই তোমার পরিচয় জানতে চাই। সুন্দরী, সত্য করে বলো, তুমি কে আর কোথায়

যাবে ?'

লক্ষ্মী বললেন—গাভীগণ ! তোমাদের কল্যাণ হোক, আমি এই জগতে লক্ষ্মী নামে প্রসিদ্ধ। সমস্ত জগৎ আমাকে কামনা করে। আমি দৈত্যদের পরিত্যাগ করেছি, তাই তারা চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমার আশ্রয়ে থাকার জন্য ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সর্বদা আনন্দ উপভোগ করছেন। দেবতা এবং ঋষিগণ আমার শরণ নিলে সিদ্ধিলাভ করেন। যার শরীরে আমি প্রবেশ করি না, সে সর্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আমার সহযোগেই ধর্ম-অর্থ-কাম সুখপ্রদান করতে সক্ষম হয়। সুখদায়িনী গাভীগণ ! আমার এমনই প্রভাব। এখন আমি তোমাদের দেহে সর্বদা বাস করতে চাই আর তার জন্য আমি নিজেই এসে প্রার্থনা জানাচ্ছি। তোমরা আমার আশ্রয় লাভ করে শ্রীসম্পন্ন হয়ে ওঠো।

গাভীরা বলল—দেবী ! তুমি অত্যন্ত চঞ্চলা, কোথাও স্থিরভাবে থাকো না। এছাড়াও বহুজনের সঙ্গেই তোমার একপ্রকার সম্বন্ধ, তাই আমরা তোমাকে ইচ্ছা করি না। তোমার কল্যাণ হোক, আমাদের শরীর এমনিই হৃষ্টপুষ্ট এবং সুন্দর। আমাদের তোমাকে কীসের প্রয়োজন ? তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন করো। তুমি যে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছ, এতেই আমরা কৃতার্থ বলে মনে করছি।

লক্ষ্মী বললেন—গাভীগণ ! তোমরা এ কী বলছ ? আমি অত্যন্ত দুর্লভ এবং সতী, তা সত্ত্বেও তোমরা কেন আমাকে স্বীকার করছ না, এর কারণ কী ? আজ আমি বুঝতে পারছি 'না ডাকলে কারো কাছে গেলে অনাদর হয়', এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উত্তম ব্রত পালনকারী ধেনুগণ ! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ, রাক্ষস এবং মানুষ অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করে, আমার সেবার সৌভাগ্য লাভ করে। আমার এই প্রভাবের কথা তোমাদের ভেবে দেখা উচিত। সুতরাং আমাকে স্বীকার করো। দেখো, এই চরাচর জগতে কেউই আমাকে অপমান করে না।

গাভীরা বলল—আমরা তোমার অপমান বা অনাদর করছি না, শুধু তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ তোমার চিত্ত চপল, তুমি কোথাও স্থির হয়ে থাকো না। এখন বেশি কথাবার্তায় কাজ নেই, তুমি যেখানে যেতে চাও, চলে যাও। আমাদের সকলের দেহই হৃষ্টপুষ্ট এবং প্রাকৃতিক শোভাযুক্ত। তাহলে তোমাকে নিয়ে আমরা কী করব ?

লক্ষ্মী বললেন—গাভীগণ ! তোমরা অপরকে সম্মান প্রদান কর, তোমরা যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে সমস্ত জগতে আমার অসম্মান হতে থাকবে, অতএব আমাকে কৃপা করো। তোমরা মহাসৌভাগ্যশালী এবং সকলকে শরণ প্রদানকারী, তাই আমি তোমাদের শরণাগত হয়েছি,

আমার কোনো দোষ নেই, আমি তোমাদের সেবিকা, এই জেনে আমাকে রক্ষা করো—আমাকে আপন করে নাও। আমি তোমাদের কাছ থেকে সম্মান চাইছি তোমরা সর্বদা সকলের কল্যাণ করে থাক, পুণ্যময়, পবিত্র এবং সৌভাগ্যশালী। আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমাদের দেহের কোন অংশে নিবাস করব ?

গাভীরা বলল—যশস্বিনী! তোমাকে অবশ্যই আমাদের সম্মান জানানো উচিত। ঠিক আছে, তুমি আমাদের গোময় এবং গোমূত্রে নিবাস করো ; কারণ আমাদের এই দুই বস্তু পরমপবিত্র।

লক্ষ্মী বললেন—আমি ধন্য ! তোমরা আমার ওপর অনুগ্রহ করেছ। আমি সেই মতোই কাজ করব। সুখদায়িনী গাভীসকল ! তোমরা আমার মর্যাদা রক্ষা করেছ, অতএব তোমাদের কল্যাণ হোক।

যুধিষ্ঠির ! গাভীদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করে লক্ষ্মী তাদের চোখের সামনে থেকে অন্তর্ধান করলেন। আমি তোমাকে গোময়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলাম। এখন পুনরায় গাভীদের মাহাত্ম্য শোনো।

ব্রহ্মার ইন্দ্রকে গোলোক এবং গাভীদের উৎকর্ষ জানানো, সুবর্ণের উৎপত্তি এবং তার দানের মহিমা সম্বন্ধে বশিষ্ঠ ও পরশুরামের আলোচনা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি সর্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন এবং গোদান করে, তার প্রত্যহ অন্নদান ও যজ্ঞের ফললাভ হয়। দধি এবং ঘৃত বিনা যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞে দধি, ঘৃত অপরিহার্য বস্তু। তাই গাভীদের যজ্ঞের মূল বলা হয়। সবপ্রকার দানে গোদানই উত্তম বলে গণ্য হয়। গাভীদের শ্রেষ্ঠ, পবিত্র এবং পাপবিনাশক বলা হয়। মানুষের নিজেদের পুষ্টি এবং সর্বপ্রকার বিঘ্নশান্তির জন্য গোসেবা করা উচিত। এদের দুধ-দই-ঘি সব পাপ থেকে মুক্ত করে। ইহলোকে ও পরলোকে গাভীকে মহাতেজস্বরূপ মানা হয়, এদের থেকে পবিত্র আর কিছুই নেই। এই বিষয়ে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের কথোপকথনরূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। পূর্বকালে দৈত্যরা পরাজিত হলে ইন্দ্র যখন ত্রিলোকের অধীশ্বর হলেন তখন সকল প্রজা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সত্য ও ধর্ম পালনে চিত্ত নিবেদন করল। একদিন ঋষি, গন্ধর্ব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, সুপর্ণ (পক্ষী) এবং প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত ছিলেন। সেইসময় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু ! গোলোকের স্থান সমস্ত দেবতা এবং লোকপালদের ঊর্ধ্বে কেন ? গাভীরা এমন কী তপস্যা করেছিল যাতে এরা রজোগুণরহিত হয়ে দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে আনন্দ সহকারে বাস করে, আমি এসব কথা জানতে চাই।'

ব্রহ্মা বললেন—ইন্দ্র ! তুমি সর্বদা গাভীদের অবহেলা করে থাক, তাই তুমি এদের মাহাত্ম্য জানো না ; এখন আমি

তোমাকে গাভীদের উত্তম প্রভাব এবং মাহাত্ম্য বলছি, শোনো—গাভীদের যজ্ঞের অঙ্গ এবং সাক্ষাৎ যজ্ঞরূপ বলা হয়েছে। এদের ছাড়া যজ্ঞ কোনোভাবেই হওয়া সম্ভব নয়। এরা এদের দুধ এবং ঘিয়ের দ্বারা প্রজাদের পালন-পোষণ করে, এদের পুত্র বলদ কৃষিকার্যে সাহায্য করে, যার দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয় এবং হব্য-কব্যের কাজ হয়। এদের থেকেই দুধ-দই-ঘি পাওয়া যায়। গাভী অত্যন্ত পবিত্র এবং বলদ ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে নানা বোঝা বহন করে। গোজাতি এইভাবে নিজ কর্মদ্বারা ঋষি এবং প্রজাপালন করে। এদের ব্যবহারে শঠতা বা মোহ থাকে না, এরা সর্বদা

পবিত্র কর্মে ব্যাপৃত থাকে। তাই গোজাতি আমাদের সকলের ওপরে অবস্থান করে। ইন্দ্র ! তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি জানালাম যে গো-জাতি কেন দেবতাদেরও ওপরে নিবাস করে। এতদ্ব্যতীত গাভী বরদানও প্রাপ্ত করেছে, প্রসন্ন হলে এরা অন্যকেও বরপ্রদানে সমর্থ। সুরভী গাভীকে পুণ্য কর্মকারী, পবিত্র এবং সুলক্ষণা বলা হয়। এরা যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে গেছে, তা আমি বলছি, শোনো। প্রথমে সত্যযুগে দেবতারা যখন ত্রিলোকে রাজত্ব করতেন, তখন ধর্মপরায়ণা দক্ষকন্যা সুরভী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কৈলাসের রমণীয় শিখরে, যেখানে দেবতা ও গন্ধর্ব সর্বদা বিরাজ করেন, সেখানে উত্তম যোগের আশ্রয়ে তিনি এগারো হাজার বৎসর এক পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তখন সেই তপস্বিনী দেবীর কাছে গিয়ে বললাম—'তুমি কী জন্য এই ভয়ানক তপস্যা করছ, তোমার তপস্যায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বরদান করতে প্রস্তুত।'

সুরভী বললেন—প্রভু ! আমার বর গ্রহণের কোনো

প্রয়োজন নেই, আমার পক্ষে সব থেকে বড় বর হল—আজ আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন।

ব্রহ্মা বললেন—ইন্দ্র ! সুরভী একথা বলায় আমি তাকে বললাম—'দেবী ! তুমি লোভ পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে তপস্যা করেছ, তাই আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, সুতরাং আমি তোমাকে অমর হওয়ার বরপ্রদান করছি। আমার কৃপায় ত্রিলোকের ওপর তোমার নিবাস হবে। তুমি যেখানে বাস করবে, সেই স্থান গোলোক নামে খ্যাত হবে। তোমার সব সুসন্তানেরা জগতে প্রাণীদের হিতসাধন করে সেখানে বাস করবে। তুমি মনে মনে যে দিব্য অথবা মানবীয় ভোগ চিন্তা করবে, সেসবই তুমি লাভ করবে এবং সর্বপ্রকার সুখ তোমার পক্ষে সর্বদা সুলভ হবে।'

ইন্দ্র ! সুরভীর নিবাস হল গোলোকে। সেখানে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। ওখানে মৃত্যু, বৃদ্ধত্ব এবং অগ্নির জোর চলে না। দুর্দৈব এবং অশুভও সেখানে পৌঁছায় না। ওই লোকে দিব্য বন, দিব্য ভবন এবং পরম সুন্দর ও ইচ্ছামতো বেড়াবার জন্য বিমান আছে। ব্রহ্মচর্য, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, নানাপ্রকার দান, পুণ্য, তীর্থসেবন, কঠোর তপস্যা ও অন্যান্য শুভ কর্মের অনুষ্ঠানের সাহায্যেই গোলোক প্রাপ্তি হতে পারে। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি সব কথা জানালাম। তোমার আর কখনো গাভীদের অনাদর করা উচিত নয়।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই কথা শোনার পর থেকে ইন্দ্র সর্বদা গাভীর পূজা করতে লাগলেন। তাঁর মনে গাভীর প্রতি বিশেষ আদরের ভাব জাগ্রত হল। পুত্র ! গাভীদের এই পরমপবিত্র ও অতি উত্তম মাহাত্ম্য আমি সম্পূর্ণভাবে তোমাকে জানালাম। এর কীর্তন করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যে সর্বদা পবিত্রচিত্ত হয়ে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধে হব্য-কব্য অর্পণের সময় ব্রাহ্মণদের এই প্রসঙ্গ শোনায়, তার দান সমস্ত কামনা পূর্ণকারী ও অক্ষয় হবে এবং পিতৃপুরুষগণ সেটি লাভ করবেন। গোভক্ত পুরুষ যে যে বস্তু কামনা করে, সেসবই সে প্রাপ্ত হয়। গোজাতিতে ভক্তি রাখা নারীগণও মনোবাঞ্ছিত কামনা প্রাপ্ত হন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি সব মানুষদের পক্ষে বিশেষ করে ধর্মে দৃষ্টি রাখা রাজাদের জন্য পরম উত্তম গোদানের বর্ণনা করলেন। বেদ এবং উপনিষদেও প্রত্যেক কর্মে দক্ষিণার বিধান আছে। সকল যজ্ঞে ভূমি, গো এবং সুবর্ণ দক্ষিণার কথা বলা আছে। এর মধ্যে সুবর্ণ সর্বাপেক্ষা উত্তম দক্ষিণা—শ্রুতি এই কথা বলে ; সুতরাং আমি এটি যথার্থরূপে শুনতে চাই। সুবর্ণ কী ? কবে এবং কীভাবে এর উৎপত্তি হয় ? সুবর্ণের উপাদান কী ? এর দেবতা কে ? সুবর্ণ দানের কী ফল ? সুবর্ণকে কেন উত্তম বলা হয় ? মনীষী বিদ্বানেরা এই দানকে

কেন বিশেষ সম্মান দেন ? যজ্ঞকর্মে সুবর্ণ দক্ষিণাপ্রদান করা কেন প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! শোনো, সুবর্ণের উৎপত্তির কারণ বহু বিস্তৃত—আমি আমার অনুভব অনুযায়ী তোমাকে সব বলছি। আমার মহাতেজস্বী পিতা মহারাজ শান্তনুর যখন দেহাবসান হয়, তখন আমি তাঁর শ্রাদ্ধ করার জন্য গঙ্গাদ্বার তীর্থে (হরিদ্বারে) গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে আমি পিতার শ্রাদ্ধ আরম্ভ করি ; এই কাজে মাতা গঙ্গাদেবী আমাকে সাহায্য করেন। বহু সিদ্ধ মহর্ষিদের সামনে আমি জলদান থেকে প্রারম্ভ করে সমস্ত কার্য সমাধা করি। একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রোক্ত বিধিমতো পিণ্ডদানের পূর্বের সমস্ত কাজ সমাপন করে পিণ্ডদানের কার্য আরম্ভ করি।

এরমধ্যেই পিণ্ডদান করার জন্য আমি যে কুশ পেতেছিলাম, তার থেকে এক অতি সুন্দর হাত বেরিয়ে এল। সেই বিশাল হাতে নানা সুন্দর গহনা সুসজ্জিত ছিল। সেটি দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম। আমার পিতাই পিণ্ড গ্রহণের জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন শাস্ত্রীয় বিধান নিয়ে চিন্তা করলাম তখন হঠাৎ আমার স্মরণ হল যে বেদে মানুষের জন্য হাতে পিণ্ডদান করার কোনো বিধান নেই। পিতৃপুরুষ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কখনো মানুষের হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণও করেন না। শাস্ত্রের বিধান হল কুশের ওপর পিণ্ডদান করা। এই কথা ভেবে আমি পিতার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হওয়া হাতকে সম্মান না দেখিয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ ও সূক্ষ্ম বিধির ওপর দৃষ্টি রেখে কুশের ওপরই পিণ্ডদান করি। এইভাবে শাস্ত্রপদ্ধতি মেনে পিণ্ডদান করায় আমার পিতার হাত অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর পিতৃপুরুষেরা আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'পুত্র ! আমরা তোমার শাস্ত্রীয় জ্ঞানে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি ; কারণ তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হওনি। তুমি শাস্ত্র প্রমাণ মেনে আত্মা, ধর্ম, শাস্ত্র, বেদ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, গুরু, প্রজাপতি ও ব্রহ্মা—সকলের মান বৃদ্ধি করেছ এবং যারা ধর্মে স্থিত, তাদেরও নিজের আদর্শ দেখিয়ে তুমি বিচলিত হতে দাওনি। তুমি এ অতি উত্তম কাজ করেছ ; কিন্তু এবার (আমাদের কথায়) ভূমিদান ও গোদানের পরিপূরকরূপে কিছু সুবর্ণ দানও করো। তাহলে আমরা এবং আমাদের সকল পিতামহ পবিত্র হয়ে যাব ; কারণ সুবর্ণ সর্বাপেক্ষা পবিত্র বস্তু। যিনি সুবর্ণ দান করেন, তিনি তাঁর পূর্বের এবং পরের দশ পুরুষকে উদ্ধার করেন।' পিতৃদেব এই কথা বলার পর নিদ্রাভঙ্গ হল, আমি সেই স্বপ্ন স্মরণ করে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম এবং সুবর্ণ দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

রাজন্ ! এবার (সুবর্ণের উৎপত্তি এবং তার দান-মাহাত্ম্য বিষয়ে) এক পুরাতন ইতিহাস শোনো, এটি জামদগ্নিনন্দন পরশুরামের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই উপাখ্যান ধন ও আয়ু বৃদ্ধিকারী। পূর্বকালের কথা, পরশুরাম ক্রোধান্বিত হয়ে একুশবার এই পৃথিবীর ক্ষত্রিয়দের নিধন করেছিলেন। তারপর সমস্ত পৃথিবী জয় করে সমস্ত কামনা পূর্ণকারী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সকল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ তাঁর সেই যজ্ঞের প্রশংসা করেছিলেন। যদিও অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্বপ্রাণীর পবিত্রকারক এবং তেজ ও কান্তি বৃদ্ধিকারী, তা সত্ত্বেও এটি তেজস্বী পরশুরামকে পাপমুক্ত করতে পারেনি। এতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে করলেন। তিনি প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন সেই মহা যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি এবং দেবতাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মহানুভবগণ ! কঠোর কর্মকারী মানুষদের পবিত্র করার যে সর্বোত্তম সাধন, তা আমাকে কৃপা করে বলুন।' পরশুরাম যখন দয়ায় দ্রবীভূত হয়ে এই প্রশ্ন করলেন, তখন বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষিগণ বললেন—'রাম ! তুমি বেদের প্রমাণের ওপর বিচার করে ব্রাহ্মণদের সেবা করো এবং সেই ব্রহ্মর্ষিদেরই তোমার

পবিত্র হওয়ার সাধন জিজ্ঞাসা করো। তাঁরা যা বলেন প্রসন্নতাপূর্বক তাই পালন করো।'

মহাতেজস্বী পরশুরাম তখন বশিষ্ঠ, নারদ, অগস্ত্য ও কশ্যপের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—'হে বিপ্রবরগণ ! আমি পবিত্র হতে চাই, বলুন, আমি কীকরে পবিত্র হব ? এরজন্য আমকে কোন কর্মানুষ্ঠান করতে হবে ? কী দান করব ? যদি আপনারা আমাকে কৃপা করতে চান, তাহলে বলুন, আমার পবিত্রকারী সাধন কী ?'

ঋষিগণ বললেন—ভৃগুনন্দন ! আমরা শুনেছি যে পাপী ব্যক্তি ভূমি, ধন ও গোদান করলে পবিত্র হয়ে যায়। এছাড়া আর একটি দানের কথা শোনো, যা সব থেকে বড় পাপনাশক। তা হল সুবর্ণদান। সুবর্ণের বর্ণ অত্যন্ত দিব্য এবং অদ্ভুত। অগ্নি থেকে এর উৎপত্তি। শোনা যায়, পূর্বকালে অগ্নি সম্পূর্ণ জগৎ ভস্মীভূত করে নিজ বীর্য থেকে সুবর্ণ উৎপন্ন করেছে। সেই সুবর্ণ দান করলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হবে। সমস্ত জগৎ মন্থন করে যে তেজরাশি উৎপন্ন হয়েছে, তাই সুবর্ণ ; তাই এটি সর্বোত্তম রত্ন। তাই দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, মানুষ এবং পিশাচ—এরা সকলে যত্ন সহকারে সুবর্ণ ধারণ করে। জগতে যত পবিত্র বস্তু আছে, সুবর্ণকে তার মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র বলে মানা হয়। এটি গাভী, ভূমি এবং সমস্ত রত্নের থেকেও উত্তম। ভূমি, গাভী এবং আর যা কিছু দান করা হয়, তার মধ্যে সবথেকে বড় হল সুবর্ণ দান। সুবর্ণ অক্ষয় এবং পাপনাশক দ্রব্য ; তুমি ব্রাহ্মণদের সুবর্ণই দান করো ; এটিই পবিত্রতার উত্তম সাধন। সব দক্ষিণাতেই সুবর্ণ দানের বিধান আছে। যে সুবর্ণ দান করে, সে সব কিছুই দান করতে পারে বলে মনে করা হয়। সুবর্ণদানকারী যেন দেবতাকেই দান করে, কারণ অগ্নি সমস্ত দেবতাদের স্বরূপ এবং সুবর্ণ অগ্নিময়। তাই যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, সে সমস্ত দেবতাকে দান করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি সুবর্ণদানের থেকে আর কিছুকেই বড় দান বলে মনে করে না। সুবর্ণদাতা যখন পরমগতি লাভ করে, সেই সময় তার জ্যোতির্ময়লোক লাভ হয় এবং স্বর্গলোকে তাকে কুবেরের পদে অভিষিক্ত করা হয়। যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় বিধিপূর্বক মন্ত্রপাঠ করে সুবর্ণদান করে, সে তার পাপ এবং দুঃস্বপ্নের বিনাশ করে। যে মধ্যাহ্নকালে স্বর্ণদান করে, তার ভবিষ্যতের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্রতপালন করে সন্ধ্যাকালে সুবর্ণদান করে, সে ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রলোকে যায় এবং ইন্দ্রাদি লোকেও সম্মান লাভ করে। সেই সঙ্গে সে ইহলোকে যশস্বী এবং পাপরহিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে। মৃত্যুর পর যখন সে পরলোকে যায়, তখন তাকে অনুপম পুণ্যাত্মা মনে করা হয়, কোথাও তার গতিরোধ হয় না এবং সে ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ করে। সুবর্ণ অক্ষয় দ্রব্য, তার দানকারী ব্যক্তির পুণ্যলোক থেকে নীচে আসতে হয় না। জগতে তার মহাযশ বিস্তার লাভ করে এবং সে বহু সমৃদ্ধিশালী-লোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় আগুন জেলে কোনো ব্রতের উদ্দেশ্যে সুবর্ণদান করে, তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। পরশুরাম ! সুবর্ণদান করলে যে লাভ হয়, তা বলা হল ; সুতরাং তুমি এবার সুবর্ণ দান করো।

ভীষ্ম বললেন—প্রতাপশালী পরশুরাম বশিষ্ঠাদি মুনির কথায় ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ দান করলেন ; তাতে তিনি সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির ! সুবর্ণের উৎপত্তি এবং তার দানের মাহাত্ম্য তোমাকে শোনালাম। তুমিও এবার ব্রাহ্মণদের প্রভূত স্বর্ণদান করো। তাহলে তুমি পাপ থেকে মুক্তিলাভ করবে।

বিভিন্ন তিথি এবং নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করার এবং তাতে তিল ইত্যাদি প্রদানের ফল

যুধিষ্ঠির বললেন—ধর্মাত্মন্ ! এবার আপনি আমাকে শ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ বিধি বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! শ্রাদ্ধকর্মের উত্তম বিধি তুমি মন দিয়ে শোনো ; পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ) ধন, যশ এবং পুত্র প্রাপ্তি করায়। দেবতা, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নরদেরও সর্বদা পিতৃগণের পূজা করা উচিত। প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ প্রসন্ন হন। এবার আমি তিথিগুলির গুণাগুণ জানাচ্ছি। (কৃষ্ণপক্ষের) প্রতিপদ তিথিতে পিতৃপূজা করলে বহু সুন্দর এবং সুযোগ্য সন্তানের জন্মপ্রদানকারী রূপবতী স্ত্রী লাভ হয়। দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করলে গৃহে কন্যা জন্ম নেয়, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করলে অশ্ব লাভ হয়। চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করলে বহু ছোট পশু গৃহে আসে। পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করলে বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করলে কৃষিকার্য ভালো হয়, অষ্টমীর শ্রাদ্ধে ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়। নবমীর শ্রাদ্ধে একক্ষুরসম্পন্ন পশু বৃদ্ধি পায়। দশমীতে শ্রাদ্ধ করলে সেই ব্যক্তির গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একাদশীতে শ্রাদ্ধ করলে বাসন ও বস্ত্র লাভ হয় এবং ব্রহ্মতেজসম্পন্ন পুত্র জন্ম নেয়। দ্বাদশীর শ্রাদ্ধ যাঁরা করেন তাঁদের সর্বদা সোনা-রূপা এবং ধন-বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের দ্বারা সম্মানিত হয়। কিন্তু যাঁরা চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁদের গৃহের মানুষ যৌবনেই দেহত্যাগ করে এবং শ্রাদ্ধকর্তাকে যুদ্ধে যেতে হয়। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করলে মানুষের সকল কামনা পূর্ণ হয়। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ব্যতীত দশমী থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত সকল তিথিই শ্রাদ্ধকার্যের জন্য উত্তম বলা হয় ; অন্য তিথিগুলি এর সমান নয়। শ্রাদ্ধের জন্য যেমন শুক্লপক্ষের থেকে কৃষ্ণপক্ষ শ্রেষ্ঠ, তেমনই পূর্বাহ্ণের থেকে অপরাহ্ণ কাল শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! পিতৃপুরুষকে কোন বস্তু দান করলে তা অক্ষয় হয় ? কোন হবিষ্য তাঁকে অধিককাল তৃপ্ত রাখে আর কোনটি অনন্ত কাল ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! শ্রাদ্ধের তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্বানেরা শ্রাদ্ধকল্পে যেসব বস্তু হবিষ্যরূপে গ্রাহ্য ও কামনাপূর্তির সাধন মনে করেছেন, সেসব বলছি। সেই সঙ্গে সেগুলির ব্যবহার করলে যে ফল লাভ হয় তারও বর্ণনা করছি, শোনো। তিল, চাল, যব, বিউলি ডাল, জল ও ফল-মূল দিলে পিতৃপুরুষ এক মাস তৃপ্তিতে থাকেন। মনু বলেন, 'যে শ্রাদ্ধে তিলের ব্যবহার বেশি হয়, তা অক্ষয় হয়।' তাই শ্রাদ্ধে প্রদত্ত ভোজনের মধ্যে তিলেরই প্রাধান্য থাকে। ঘৃত মিশ্রিত ক্ষীর প্রদান করলে পিতৃপুরুষ এক বছর তৃপ্ত থাকেন। পিতৃপুরুষেরা বলে থাকেন—'আমাদের বংশে এমন পুরুষ কামনা করি, যে দক্ষিণায়নে ত্রয়োদশী তিথি এবং মঘা নক্ষত্র যোগে আমাদের ঘৃতযুক্ত ক্ষীরের পিণ্ডদান করবে ! বহু পুত্রের অভিলাষ করা উচিত, তাহলে তাদের মধ্যে অন্তত একজন গয়াতীর্থে অক্ষয় বটের কাছে গিয়ে আমাদের জন্য শ্রাদ্ধ করবে, সেখানে শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধের ফল অক্ষয় হয়।' পিতার মৃত্যু তিথিতে জল, মূল, ফল এবং অন্ন ইত্যাদি যা কিছু দেওয়া হয়, সেসব মধুমিশ্রিত করে দিলে পিতৃপুরুষ অনন্তকাল ধরে তৃপ্ত থাকেন।

এবার যমরাজ রাজা শশবিন্দুকে বিভিন্ন নক্ষত্রে করা যেসব সকাম শ্রাদ্ধের বর্ণনা করেছেন, তা বলছি, শোনো—'যে ব্যক্তি সর্বদা কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগে শ্রাদ্ধ করে, সে পুত্রবান হয়ে অগ্নিস্থাপনপূর্বক নিত্যযজ্ঞ করতে সক্ষম হয় এবং তার শোক সন্তাপ দূর হয়। পুত্র কামনাকারী মানুষ রোহিণী নক্ষত্রে এবং তেজ ইচ্ছাকারীগণের মৃগশিরাতে শ্রাদ্ধ করা উচিত। আর্দ্রাতে শ্রাদ্ধকারী মানুষের ক্রূর কর্মে প্রবৃত্তি হয়। পুনর্বসুতে শ্রাদ্ধ করলে ধনের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে শরীরের পুষ্টি হয়। অশ্লেষাতে শ্রাদ্ধ করলে ধীর স্বভাবের পুত্র জন্মায়। মঘায় শ্রাদ্ধ করলে আত্মীয়-বন্ধুর কাছে সম্মান লাভ হয়। পূর্বফাল্গুনীতে শ্রাদ্ধে দান করলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে সন্তান প্রাপ্তি হয়। যে হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে অভীষ্ট ফল লাভ করে। চিত্রায় শ্রাদ্ধ করলে রূপবান পুত্র লাভ হয়। স্বাতী নক্ষত্রে পিতৃকুলের পূজা করলে ব্যবসায়ে উন্নতি হয়। পুত্র অভিলাষী ব্যক্তি বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে বহু পুত্র লাভ করে। অনুরাধাতে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি রাজাদের ওপর শাসন করে। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করে জ্যেষ্ঠাতে শ্রাদ্ধ করলে ঐশ্বর্য লাভ করে। মূলায় শ্রাদ্ধ করলে আরোগ্য এবং পূর্বাষাঢ়ে শ্রাদ্ধ করলে যশ লাভ হয়। উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ

করলে মানুষ জগতে শোকরহিত হয়ে বিচরণ করে, অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী বৈদ্য বৈদ্যশাস্ত্রে সাফল্য পায়। শ্রবণে শ্রাদ্ধ করলে সদ্গতি লাভ হয়। ধনিষ্ঠায় শ্রাদ্ধ করলে রাজ্যভাগী হয়। বৈদ্য শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে কর্মে সাফল্য পায়। পূর্বভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করলে বহু পশু লাভ হয়। উত্তরভাদ্র নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে সহস্র গাভী প্রাপ্ত হয়। রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের ধাতু (লৌহ-তাম্র প্রভৃতি) লাভ হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে অশ্ব প্রাপ্তি হয় ও ভরণীতে শ্রাদ্ধ করলে আয়ুবৃদ্ধি হয়।' রাজা শশবিন্দু শ্রাদ্ধের বিধি শুনে সেই অনুসারে শ্রাদ্ধ করলেন। তার প্রভাবে তিনি অনায়াসে সমগ্র পৃথিবী জয় করে শাসন করতে লাগলেন।

শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা—পংক্তিদূষক এবং পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণদের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! শ্রাদ্ধের দান কোন প্রকারের ব্রাহ্মণদের দেওয়া উচিত ? আপনি স্পষ্টভাবে তার বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! দান-ধর্মের জ্ঞাতা ক্ষত্রিয়দের দেবসম্পর্কীয় কর্মে (যাগ-যজ্ঞাদিতে) ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু পিতৃ-কর্মে (শ্রাদ্ধে) তাঁদের পরীক্ষা করা ন্যায়সঙ্গত মনে করা হয়। বিদ্বান ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় কুল, শীল, অবস্থা, রূপ, বিদ্যা এবং পূর্বপুরুষদের নিবাসস্থান ইত্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মণদের অবশ্যই পরীক্ষা করবেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু পংক্তিদূষক হন আর কিছু পংক্তিপাবন। প্রথমে পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণদের বর্ণনা করছি, শোনো। জুয়াড়ি, গর্ভনাশক, যক্ষ্মা রোগী, গোরুর দুধের ব্যবসাকারী, অশিক্ষিত, গ্রামের বার্তাবাহক, সুদখোর, গায়ক, সর্বপ্রকার বস্তু বিক্রয়কারী, অন্যের গৃহে কলহ সৃষ্টিকারী, বিষ প্রদানকারী, জারজ ব্যক্তির গৃহে অন্নগ্রহণকারী, মদ্য বিক্রয়কারী, সামুদ্রিক বিদ্যায় (হস্ত-রেখাদ্বারা) জীবিকা নির্বাহকারী, রাজার সেবক, তৈল বিক্রয়কারী, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকারী, পিতার সঙ্গে কলহকারী, কলঙ্কিত, চোর, শিল্পজীবী, বহুরূপী, নিন্দাকারী, মিত্রদ্রোহী, পরস্ত্রী-লম্পট, শূদ্রদের অধ্যাপক, অস্ত্র নির্মাণ ও বিক্রয়কারী, কুকুর নিয়ে ভ্রমণকারী, যাকে কুকুর কামড়েছে, যার ছোট ভাই বিবাহিত—এইরূপ অবিবাহিত ব্যক্তি, চর্মরোগী, গুরুস্ত্রীগামী, নট, মন্দিরের পূজায় জীবিকা নির্বাহকারী—এই সব ব্রাহ্মণ পংক্তির বাইরে রাখার যোগ্য। ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিদের বক্তব্য হল যে উপরোক্ত প্রকারের লোকেদের শ্রাদ্ধে যে ভোজন করানো হয়, তা রাক্ষসরা প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ-অন্ন ভোজন করে সেই দিন বেদ পাঠ করে এবং যে শূদ্রাণীর সঙ্গে সমাগম করে, তার পিতৃপুরুষ সেই দিন থেকে মাসাধিক কাল তারই বিষ্ঠাতে পড়ে থাকে। সোমরস বিক্রয়কারীকে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের অন্ন বিষ্ঠার সমান, বৈদ্যকে প্রদত্ত শ্রাদ্ধান্ন রক্ত এবং পুঁজের সমান মনে করা হয়। মন্দিরের পূজারিকে প্রদত্ত অন্ন নিষ্ফল হয়ে যায়। সুদখোরকে প্রদত্ত দানের ফল স্থায়ী হয় না এবং ব্যবসাদার ব্রাহ্মণকে যা কিছু দান করা হয় তা ইহলোক বা পরলোক—কোথাও কাজে আসে না। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছে, সেই ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হব্য-কব্য নিষ্ফল হয়ে যায়। যারা ধর্মহীন, দুরাচারী ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্য অর্পণ করে, তাদের দান পরলোকে ফলপ্রসূ হয় না। যে মূর্খ জেনেশুনে এরূপ ব্যক্তিকে দান করে তার পিতৃপুরুষ পরলোকে বিষ্ঠা ভোজন করে। উপরে বর্ণিত এই অধম ব্রাহ্মণদের অপাংক্তেয় (পংক্তিদূষক) বলে জানবে। যে মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ শূদ্রদের উপদেশ প্রদান করে, তাকেও এদের সমগোত্র বলে জানবে। শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে যদি কোনো দৃষ্টিহীন ব্যক্তি বসে, তাহলে সে ওই পংক্তির ষাটজন ব্রাহ্মণকে দূষিত করে। তেমনই নপুংসক একশত ব্রাহ্মণকে এবং কুষ্ঠরোগী যে কয়জন ব্যক্তির ওপর দৃষ্টিপাত করে, তাদের সকলকে অপবিত্র করে দেয়। মাথায় পাগড়ি বেঁধে, দক্ষিণ মুখে, জুতো পায়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ যত অন্নগ্রহণ করে, সেসব অসুরের ভাগ বলে বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি ঈর্ষা ও অশ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধের কাজে দান করে, ব্রহ্মা সেগুলিকে অসুররাজ বলির ভাগ বলে নিশ্চিত করেছেন। কুকুর এবং পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ কোনোমতেই যেন শ্রাদ্ধে দৃষ্টি দিতে না পারে, সেইজন্য চতুর্দিক ঢাকা স্থানে শ্রাদ্ধদানের ব্যবস্থা করা উচিত এবং সবদিক রক্ষার জন্য তিল ছেটানো উচিত। তিল না ছিটিয়ে এবং ক্রোধের বশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তার

হবিষ্য পিশাচ নষ্ট করে দেয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ পংক্তিতে বসে ভোজনকালে যেসব ব্রাহ্মণদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সেইসব ব্রাহ্মণদের ভোজনের দ্বারা যে ফল দাতার প্রাপ্য, সে তার থেকে বঞ্চিত হয়।

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এবার আমি তোমাকে পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণদের পরিচয় দিচ্ছি। যেসব ব্রাহ্মণ বিদ্যা এবং বেদব্রতে নিষ্পাত হয়ে সদাচারপরায়ণ থাকেন, তাঁরা সকলকে পবিত্র করেন এবং আমি তাঁদেরই পংক্তিতে বসানোর যোগ্য বলে মনে করি। তাঁদের পংক্তিপাবন বলে জানতে হবে। যাঁরা ত্রিণাচিকেত মন্ত্র অধ্যয়ন করেন, গার্হপত্য ইত্যাদি পঞ্চ অগ্নির উপাসক, ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের জ্ঞাতা, ষড়ঙ্গের বিদ্বান, ব্রহ্মবেত্তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী সামবেদের জ্ঞাতা, জ্যেষ্ঠ সামগানকারী এবং মাতা-পিতার আজ্ঞা-পালনকারী, যাঁদের বংশে দশপুরুষ ধরে বেদাধ্যয়নের পরম্পরা চলে আসছে, যেসব ব্রাহ্মণ ঋতুকালে নিজ স্ত্রীর সঙ্গেই সমাগমকারী—এরূপ বেদ-বিদ্যা এবং ব্রতে নিষ্ঠ প্রবীণ ব্রাহ্মণরা পংক্তিকে পবিত্র করেন। অথর্ববেদ জ্ঞাতা, ব্রহ্মচারী, নিয়মপূর্বক ব্রতপালনকারী, সত্যবাদী, ধর্মাত্মা, নিজ কর্তব্যে তৎপর ব্যক্তিও পংক্তিপাবন হয়। যিনি পুণ্যতীর্থে স্নান করার জন্য কষ্ট স্বীকার করেছেন, বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নানা যজ্ঞানুষ্ঠান করে অবভৃত স্নান করেছেন ; যিনি ক্রোধরহিত, গম্ভীর, ক্ষমাশীল, মনকে বশে রাখেন, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বপ্রাণীর হিতে রত, সেইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ জানানো উচিত ; কারণ এঁরা পংক্তিপাবন এবং এঁদের দান করলে সে দান অক্ষয় হয়। এঁরা ব্যতীত যাঁরা মোক্ষধর্মজ্ঞাতা যতি এবং উত্তম প্রকারের ব্রতপালনকারী যোগী, যাঁরা শুদ্ধ চিত্ত হয়ে উত্তম ব্রাহ্মণদের ইতিহাস শোনান, যাঁরা মহাভাষ্য এবং ব্যাকরণের বিদ্বান, যাঁরা পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র ন্যায়পূর্বক অধ্যয়ন করে তার নির্দেশানুসারে বিধিবৎ আচরণ করেন, যাঁরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গুরুকুলে বাস করে বেদাধ্যয়ন করেছেন, যাঁরা সহস্র সহস্র পরীক্ষায় সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছেন এবং যাঁরা চার বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং শিক্ষাদানে অগ্রগণ্য, এরূপ ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধ-পংক্তিতে বসে যতদূর পর্যন্ত দেখেন ততদূর পর্যন্ত উপবিষ্ট থাকা ব্রাহ্মণদের পবিত্র করেন। পংক্তিকে পবিত্র করেন বলেই তাঁদের পংক্তিপাবন বলা হয়। ব্রহ্মবাদীরা বলেন যে বেদ-শিক্ষাদানকারী এবং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষদের কুলে জন্ম নেওয়া ব্রাহ্মণ একাকী সাড়ে তিন ক্রোশ স্থান পবিত্র করতে সক্ষম, তাই নানাভাবে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই তাঁদের শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। যার করা শ্রাদ্ধের ভোজনে মিত্রদের প্রাধান্য থাকে, তার সেই শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন না এবং যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের ভোজনে নিমন্ত্রণ করে মিত্রতা করে, সে মৃত্যুর পর দেবযানমার্গ দিয়ে যেতে পারে না। শ্রাদ্ধকর্তার উচিত, শ্রাদ্ধকর্মে মিত্রদের আমন্ত্রণ না জানানো। মিত্রদের সন্তুষ্ট করার জন্য অর্থ দেওয়া উচিত। শ্রাদ্ধে এবং যজ্ঞে তাদেরই ভোজন করানো উচিত যারা শত্রু বা মিত্র নয় অর্থাৎ মধ্যস্থ। অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো শ্রাদ্ধের অন্ন ইহলোকেও লাভ দেয় না, পরলোকেও ফলপ্রসূ হয় না। ঘাস-পাতার আগুন যেমন শীঘ্র নিভে যায়, তেমনই স্বাধ্যায়হীন ব্রাহ্মণ তেজহীন হয়, তাই তাকে শ্রাদ্ধের দান দেওয়া উচিত নয়, কারণ ভস্মে কেউ যজ্ঞ করে না। যারা একে অপরের শ্রাদ্ধে ভোজন করে পরস্পর দক্ষিণা দান ও গ্রহণ করে, তাদের এই দান-দক্ষিণাকে পিশাচদক্ষিণা বলে। তা দেবতারাও পান না, পিতৃপুরুষেরাও নয়। যে গাভীর বৎস মারা গেছে সে যেমন দুঃখিত হয়ে গোশালাতে ঘুরে মরে, তেমনই নিজেদের মধ্যে দক্ষিণা দান ও গ্রহণ করলে, তা ইহলোকেই থেকে যায়, পিতৃপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছয় না। অগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেলে যদি ঘৃত দিয়ে যজ্ঞ করা হয়, তা দেবতারাও পান না, পিতৃপুরুষেরাও পান না, তেমনই নর্তক, গায়ক ও মিথ্যাবাদী অপাত্র ব্রাহ্মণকে দান করলে তা নিষ্ফল হয়। অপাত্র ব্যক্তিকে দক্ষিণা দিলে তা দাতাকে তৃপ্ত করে না, দান গ্রহণকারীকেও নয়, উভয়েই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, সেটি দক্ষিণাদাতার পিতৃপুরুষকে দেবযান মার্গ থেকে নীচে নিক্ষেপ করে। যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি সর্বদা ঋষিগণ বর্ণিত ধর্মপথে চলে, যার বুদ্ধি এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত এবং যে সম্পূর্ণ ধর্মের জ্ঞাতা, দেবতারা তাকেই ব্রাহ্মণ বলে মানেন। ঋষি-মুনিদের মধ্যে কেউ স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেউ জ্ঞাননিষ্ঠ, কেউ তপোনিষ্ঠ আবার কেউ কর্মনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ মহর্ষিদেরই শ্রাদ্ধের অন্ন দেওয়া উচিত। যারা ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে না, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। যারা কথায় কথায় ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে, তাদের শ্রাদ্ধে ভোজন করা উচিত নয়। আমি বানপ্রস্থ ঋষিদের কথা শুনেছি, তাঁরা বলেন—'যারা ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে তাদের তিন পুরুষ বিনষ্ট হয়।' বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের দূর

থেকেই পরীক্ষা করা উচিত। বেদজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয়, না অপ্রিয়, তা বিচার না করে শ্রাদ্ধে ভোজন করা উচিত। দশলাখ অপাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর পরিবর্তে একজন সদা সন্তুষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো শ্রেয় (অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মূর্খের থেকে একজন সৎ ব্রাহ্মণকে আহার করানো শ্রেষ্ঠ)।

শ্রাদ্ধের বিষয়ে মহর্ষি নিমিকে অত্রির উপদেশ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! শ্রাদ্ধ কবে প্রচলিত হয়েছে ? সর্বপ্রথম কোন মহর্ষি এর প্রচার করেন ? যদি ভৃগু এবং অঙ্গিরার সময়ে এটি শুরু হয়ে থাকে তাহলে কোন মুনি এটি প্রচার করেন ? শ্রাদ্ধে কী কী কর্ম, কী কী ফল-মূল এবং কী কী অন্ন ত্যাগ করতে হয় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! শ্রাদ্ধ যে সময়ে এবং যেভাবে প্রচলিত হয়েছে, যা এর স্বরূপ এবং সর্বপ্রথম যিনি এর প্রচার করেছিলেন, তোমাকে সব বলছি, শোনো। প্রাচীনকালে ব্রহ্মা হতে মহর্ষি অত্রির উৎপত্তি হয়, তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ঋষি ছিলেন। তাঁর বংশে ভগবান দত্তাত্রেয় আবির্ভূত হন। দত্তাত্রেয়র পুত্র নিমি, তিনি অত্যন্ত তেজস্বী তপস্বী ছিলেন। নিমিরও এক পুত্র ছিল, তার নাম শ্রীমান, সে অত্যন্ত সুন্দর ছিল। একহাজার বছর কঠোর তপস্যা করার পর সে কাল-ধর্মের অধীনে দেহত্যাগ করে। মহর্ষি নিমি পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হলেও শাস্ত্রবিধি অনুসারে অশৌচ-নিবারণের সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম সম্পন্ন করেন। তারপর চতুর্দশীর দিন শ্রাদ্ধে দানের যোগ্য সমস্ত বস্তু একত্রিত করে অমাবস্যার দিন শ্রাদ্ধ করার জন্য রাত্রি পোহালে গাত্রোত্থান করলেন। তাঁর মন পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যথিত ছিল, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিল ধীর-স্থির, ফলে তিনি মনকে শোক থেকে সরিয়ে একাগ্রচিত্তে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করলেন। শ্রাদ্ধের জন্য শাস্ত্রে যে-সকল ফল-মূল-অন্ন-ভোজ্য পদার্থের নির্দেশ ছিল, সেইসব এবং তাঁর পুত্রের প্রিয় পদার্থসমূহ—তিনি সব সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর সেই জ্ঞানী মুনি সাতজন ব্রাহ্মণকে অমাবস্যার দিন ডেকে তাঁদের পূজা করলেন এবং প্রদক্ষিণ করে, তাঁদের কুশাসনে বসালেন। তাঁদের সাতজনকে তিনি একসঙ্গে আহারের জন্য লবণবিহীন শ্যামাধান্য দিলেন। পরে আহার গ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের পায়ের নীচে আসনের ওপর তিনি দক্ষিণাগ্র কুশ রাখলেন এবং নিজের সামনেও দক্ষিণাগ্র কুশ রেখে পবিত্রভাবে সাবধানে পুত্র শ্রীমানের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করে কুশের ওপর পিণ্ডদান করলেন।

এইভাবে শ্রাদ্ধ করার পর মুনিশ্রেষ্ঠ নিমির অত্যন্ত অনুতাপ হল। বেদে পিতা-পিতামহের উদ্দেশ্যে যে শাস্ত্র বিধান আছে, আমি স্বেচ্ছায় তা পুত্রের জন্য করলাম—এই ভেবে তিনি নিজেকে সংকরতার দোষে দোষী মনে করলেন। তাই মনে মনে অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন—'হায় ! যে কাজ মুনিরা আগে কখনো করেননি, আমি তা কী করে করলাম ? আমার এই ইচ্ছামতো সম্পাদিত কর্ম দেখে ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই আমাকে শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলবেন।' এই কথা মনে হতেই তিনি তাঁর বংশ প্রবর্তক অত্রি-মুনিকে স্মরণ করলেন। নিমি ধ্যান করতেই তপোধন অত্রি সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এসে নিমিকে পুত্রশোকে কাতর দেখে মধুর বাক্যে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি যে এই পিতৃ-যজ্ঞ (শ্রাদ্ধ) করেছ, তাতে ভয় পেয়ো না। সর্বপ্রথম স্বয়ং ব্রহ্মা এই ধর্মজ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন, আর তিনিই এর প্রবর্তক। তুমি তাঁর দ্বারা বিহিত ধর্মেরই অনুষ্ঠান করেছ। ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কে শ্রাদ্ধবিধির উপদেশ দিতে পারেন ? এবার আমি তোমাকে স্বয়ম্ভু কথিত শ্রাদ্ধের উত্তম বিধি বর্ণনা করছি, এটি শোনো এবং সেই বিধি অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করো। প্রথমে বেদ-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অগ্নিকরণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে তারপরে অগ্নি, সোম, বরুণ এবং পিতৃপুরুষদের সঙ্গে থাকা বিশ্বদেবদের তাঁদের ভাগ অর্পণ করো। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা এই ভাগের কল্পনা করেছিলেন। তারপর, শ্রাদ্ধের আধারভূতা পৃথিবীর বৈষ্ণবী, কাশ্যপী, অক্ষয়া ইত্যাদি নামের দ্বারা স্তুতি করা উচিত। শ্রাদ্ধের জন্য জল আনার সময় ভগবান বরুণের স্তব করে অগ্নি এবং সোমকেও তৃপ্ত করা উচিত। ব্রহ্মার উৎপন্ন করা কিছু দেবতাই পিতৃ-পুরুষের নামে প্রসিদ্ধ ; তাঁদের 'উষ্ণপ'ও বলা হয়। স্বয়ম্ভু শ্রাদ্ধে তাঁদের ভাগ নিশ্চিত করেছেন। শ্রাদ্ধের দ্বারা তাঁদের পূজা করলে শ্রাদ্ধকর্তার পিতা-

পিতামহ প্রভৃতি পিতৃকুল নরক থেকে উদ্ধার লাভ করে। ব্রহ্মা পূর্বকালে অগ্নিষ্বাত্ত ইত্যাদি যে পিতৃপুরুষকে শ্রাদ্ধের অধিকারী বলেছেন, তাদের সংখ্যা হল সাত। বিশ্বদেবের কথা আমি আগেই বলেছি, অগ্নিই তাঁদের সকলের মুখ। তাঁরা সকলেই যজ্ঞের ভাগ পাওয়ার অধিকারী, এঁদের নাম হল—বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণিক্ষেমা, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান্, বীর্যবান্, হ্রীমান্, কীর্তিমান্, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য, দীপ্তরোমা, ভয়ংকর, অনুকর্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান, শৈলাভ, পরমক্রোধী, ধীরোষ্মী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চা, সোমবর্চা, সূর্যশ্রী, সোমপ, সূর্য, সাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শংকর, ভব, ঈশ, কর্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য, আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা এবং ঈশ্বর। সনাতন বিশ্বদেবদের এইসব নাম বলা হয়েছে।

'এবার শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ বস্তুগুলির বর্ণনা করছি। নিকৃষ্ট আনাজ ও ধান, হিং ইত্যাদি, রসুন ও পেঁয়াজ ; শাকের মধ্যে সজনে, কাঞ্চন বা বক ফুলের গাছ, কুমড়ো, গাজর, আমলকি, লাউ ইত্যাদি ; কালো নুন, কালো জিরা, শাক, বাঁশ ইত্যাদির অঙ্কুর এবং পানিফল—এইসব বস্তু শাস্ত্রে বর্জিত। সর্বপ্রকার লবণ, কালজাম এবং হাঁচি বা চোখের জলে দূষিত পদার্থ শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন নামক শাক নিন্দিত বলা হয়েছে। এর হবিষ্য দানে দেবতা ও পিতৃপুরুষ প্রসন্ন হন না। শ্রাদ্ধ করার সময় সেই স্থান থেকে চণ্ডালকে সরিয়ে দেওয়া উচিত, তেমনই গেরুয়াধারী, কুষ্ঠ রোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী, বর্ণসংকর ব্রাহ্মণ এবং ধর্মভ্রষ্ট আত্মীয়-স্বজনও যদি কাছাকাছি থাকে, তাহলে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। পিণ্ডদানের সময়ও এদের সকলকে দূরে রাখা উচিত।'

ভীষ্ম বললেন—এইভাবে মহাতপস্বী অত্রি মুনি তাঁর বংশধর মহর্ষি নিমিকে শ্রাদ্ধের উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মার দিব্য সভায় চলে গেলেন। ধর্মরাজ ! এইভাবে নিমি প্রথমে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করেন, তারপর তাঁর অনুকরণে সকল মহর্ষি শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন।

নিয়মপূর্বক ব্রতধারণকারী ধর্মপরায়ণ ঋষি পিণ্ডদানের পর তীর্থের জলেও পিতৃতর্পণ করেন। ক্রমশ চারবর্ণের লোকও শ্রাদ্ধে দেবতা এবং পিতৃপুরুষকে জল ও অন্নপ্রদান করতে লাগলেন। শ্রাদ্ধে ভোজন করে দেবতা ও পিতৃকুল তৃপ্ত হলেন। বহুদিন ধরে শ্রাদ্ধের ভোজন করতে করতে তাঁরা অজীর্ণতে কষ্ট পেতে লাগলেন। তখন তাঁরা সোম দেবতার কাছে গিয়ে বললেন—'প্রভু ! আমরা নিরন্তর শ্রাদ্ধের অন্নভোজন করায় অজীর্ণতে কষ্ট পাচ্ছি। আপনি আমাদের কল্যাণ করুন।' তখন সোম তাঁদের বললেন—'দেবগণ ! আপনারা যদি কল্যাণ চান, তাহলে ব্রহ্মার সভায় গমন করুন, তিনি আপনাদের কষ্ট দূর করবেন।' সোমের কথা শুনে দেবতা ও পিতৃগণ মেরু শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললেন—'হে দেব ! ক্রমাগত শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করে আমাদের অজীর্ণ হয়েছে, তাই আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছি, আপনি কৃপা করে আমাদের কল্যাণ করুণ।'

দেবতাদের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন—দেবগণ ! আমার কাছে যে অগ্নিদেব বিরাজ করছেন, তিনিই তোমাদের কল্যাণের কথা বলবেন। অগ্নি বললেন—'দেবগণ এবং পিতৃগণ ! এবার থেকে শ্রাদ্ধে আমরা একসঙ্গে ভোজন করব। আমার সঙ্গে থাকলে আপনাদের অজীর্ণ রোগ দূর হবে।' একথা শুনে তাঁদের চিন্তা দূর হল। তাই শ্রাদ্ধের আগে অগ্নিকে ভাগ দেওয়া হয়। অগ্নিতে যজ্ঞ করার পর পিতৃদের উদ্দেশ্যে যে পিণ্ডদান করা হয়, ব্রহ্মরাক্ষস তাকে দূষিত করতে পারে না। শ্রাদ্ধে অগ্নিদেব উপস্থিত থাকায়, রাক্ষসকুল সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সর্বপ্রথম পিতা, তারপর পিতামহ, তারপরে প্রপিতামহকে পিণ্ড দেওয়া উচিত—শ্রাদ্ধের এই নিয়ম। প্রত্যেক পিণ্ড দানের সময় একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী মন্ত্র জপ এবং '**সোমায় পিতৃমতে স্বাহা**' উচ্চারণ করা উচিত। রজস্বলা নারীকে শ্রাদ্ধভূমিতে আসতে দেবে না। অন্য কুলের নারীকে শ্রাদ্ধভোজন প্রস্তুত করতে দেবে না। তর্পণ করার সময় পিতা-পিতামহাদির নাম উচ্চারণ করবে। কোনো নদীর তীরে গেলে পিতৃপুরুষকে অবশ্যই পিণ্ডদান ও তর্পণ করবে। প্রথমে নিজ কুলের পিতৃগণকে জলদ্বারা তৃপ্ত করে পরে মিত্র এবং অন্য আত্মীয়দের জলদান করবে। যারা তর্পণের মহত্ত্ব জানে তারা নৌকায় বসে একাগ্র চিত্তে পিতৃপুরুষকে জলদান করবে। কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যার তিথিতে অবশ্যই শ্রাদ্ধ করা উচিত। পিতৃপুরুষকে ভক্তি করলে মানুষ পুষ্টি, আয়ু, বীর্য এবং লক্ষ্মীলাভ করে। ব্রহ্মা,

পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু এবং মহর্ষি কশ্যপ—এই সাতজন মহাঋষিকে যোগেশ্বর এবং পিতৃপুরুষ বলে মানা হয়। এখানে শাস্ত্রের উত্তম বিধিসমূহ বিবৃত হল। মৃত মানুষ তার বংশধর দ্বারা পিণ্ডদান লাভ করে প্রেতের কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করে। রাজা যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধের উৎপত্তির প্রসঙ্গ জানালাম।

উপবাস ও ব্রহ্মচর্যাদির লক্ষণ, প্রতিগ্রহের দোষ জানানোর জন্য রাজা বৃষাদর্ভি এবং সপ্তর্ষিগণের কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! কোনো ব্রতধারী বিপ্র কোনো ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপূর্ণ করার জন্য যদি তাঁর গৃহে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, তাহলে আপনি কী মনে করেন ? (নিজ ব্রত নষ্ট করা উচিত অথবা ব্রাহ্মণের প্রার্থনা নামঞ্জুর করা ?)

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যাঁরা বেদোক্ত ব্রত পালন করেন না, তাঁরা ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপূর্ণ করার জন্য (নিজের সাধারণ নিয়ম ত্যাগ করে) শ্রাদ্ধে আহার করতে পারেন ; কিন্তু যিনি বৈদিক ব্রত পালন করেন, তিনি যদি কারো অনুরোধে শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি ব্রতভঙ্গ করার দোষের ভাগী হন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সাধারণ মানুষেরা যে উপবাসকে তপস্যা বলে, সেই সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ? আমি জানতে চাই প্রকৃতপক্ষে উপবাসই কি তপ, না তার অন্য কোনো স্বরূপ আছে ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যাঁরা পনেরো দিন বা একমাস উপবাস করে তাকে তপস্যা বলে মনে করেন, তাঁরা বৃথাই নিজ শরীরকে কষ্ট দেন। প্রকৃতপক্ষে শুধু উপবাসকারীরা তপস্বীও নয়, ধর্মজ্ঞ নয়। ত্যাগই সব থেকে উত্তম তপস্যা। ব্রাহ্মণদের সর্বদা উপবাসী (ব্রতপরায়ণ), ব্রহ্মচারী, মুনি এবং বেদের স্বাধ্যায়ী হওয়া উচিত। ধর্মপালনের জন্যই তার স্ত্রী ইত্যাদি কুটুম্ব স্বীকার করা উচিত (বিষয় ভোগের জন্য নয়)। ব্রাহ্মণদের সর্বদা জাগ্রত থাকা উচিত, কখনো মাংস খাবে না, পবিত্রভাবে বেদপাঠ করবে, সদা সত্য কথা বলবে এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযমে রাখবে। তাদের সর্বদা অমৃতাশী, বিঘসাশী এবং অতিথিপ্রিয় হওয়া উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ব্রাহ্মণ কীভাবে সর্বদা উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী এবং অতিথিপ্রিয় হতে পারেন ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! যে ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে আহার করেন, মধ্যে আর কিছুই গ্রহণ করেন না, তাঁকে সর্বদা উপবাসী বলে বুঝতে হবে। যিনি শুধু ঋতুকালে ধর্মপত্নীর সঙ্গে সহবাস করেন, তাঁকে ব্রহ্মচারী বলে মানা হয়। দানশীল ব্যক্তিকে সত্যবাদী বলে মনে করা যেতে পারে। যিনি দিনে নিদ্রা যান না, তাঁকে সর্বদা জাগ্রত বলা হয়। যিনি সর্বদা ভৃত্যদের[1] এবং অতিথিদের আহারের পর নিজে আহার করেন, তিনি শুধু অমৃত ভক্ষণ করেন (অমৃতাশী) বলা হয়। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ ভোজন না করছেন, ততক্ষণ যে ব্যক্তি আহার করে না, সেই ব্যক্তি তার সেই ব্রতের প্রভাবে স্বর্গলোক জয় করে। যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং আশ্রিতদের আহার করাবার পর অবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে, তাকে বিঘসাশী বলা হয়, সেইসব ব্যক্তিরা ব্রহ্মধামে অক্ষয়লোক লাভ করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষ ব্রাহ্মণদের নানাপ্রকার বস্তু দান করেন, কিন্তু দাতা ও দান গ্রহীতার মধ্যে কী বিশেষত্ব থাকা উচিত ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণ সজ্জনের থেকেও দানগ্রহণ করেন, দুর্জনের থেকেও ; কিন্তু গুণবান (সজ্জন) ব্যক্তির থেকে দান গ্রহণ করলে তাঁর দোষ কম হয় কিন্তু গুণহীনের (দুর্জনের) থেকে দান গ্রহণ করলে তিনি অতল নরকে পতিত হন। এই বিষয়ে রাজা বৃষাদর্ভি এবং সপ্তর্ষিদের কথোপকথনরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময়ের কথা, কশ্যপ,

[1] মাতা, পিতা, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি কুটুম্বদের সকল প্রাণীকেই ভৃত্য (ভরণ-পোষণের যোগ্য) বলা হয়।

অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি এবং পতিব্রতা দেবী অরুন্ধতী—এরা সকলে সমাধির সাহায্যে সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় তপস্যা করে এই পৃথিবীতে বিচরণ করছিলেন। এঁদের সকলের সেবা করতেন গণ্ডা নামে এক দাসী। তার পশুসখ নামক এক শূদ্রের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল (পশুসখও এই মহর্ষিদের সঙ্গে থেকে সকলের সেবা করত)। একবার পৃথিবীতে বহুদিন ধরে বৃষ্টি হয়নি। জগতে অকাল দেখা দিল, বহু লোক ক্ষুধার্ত হয়ে মরে যেতে লাগল। সেই সময় রাজা শিবির পুত্র বৃষাদর্ভি ঘুরতে ঘুরতে সপ্তর্ষিদের স্থানে উপস্থিত হলেন। সপ্তর্ষিদের অন্নের অভাবে কষ্ট পেতে দেখে রাজা বৃষাদর্ভি বললেন—'হে তপোধন! আপনারা দান গ্রহণ করলে এই ক্ষুধার কষ্ট থেকে রক্ষা পাবেন। তাহলে আপনাদের দুর্বল শরীর বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। সুতরাং দান স্বীকার করে আমার কাছে ইচ্ছামতো সামগ্রী চেয়ে নিন। ব্রাহ্মণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। আপনারা চাইলে আমি প্রত্যেককে বহু গবাদি পশু, গ্রাম, খাদ্যবস্তু এবং নানা দুর্লভ বস্তু প্রদান করতে পারি; অতএব বলুন আপনাদের দেহের পুষ্টির জন্য কী দেব?'

ঋষিগণ বললেন—মহারাজ! রাজার প্রদত্ত দান বাহ্যত মধুর ন্যায় মিষ্ট হলেও, পরিণামে বিষের ন্যায় হয়। একথা জেনেও আপনি আমাদের প্রলুব্ধ করছেন কেন? ব্রাহ্মণদের শরীর দেবতাদের নিবাসস্থান। তাতে সকল দেবতা বিদ্যমান থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ এবং সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তিনি সকল দেবতাকে প্রসন্ন করেন। ব্রাহ্মণ সারাদিন যত তপ সংগ্রহ করেন, তা রাজার প্রতিগ্রহ গ্রহণ করলে দাবাগ্নির ন্যায় একনিমেষে ভস্ম হয়ে যায়। সুতরাং আপনি কুশলে থাকুন এবং দানের বস্তু আপনার কাছেই থাকুক। যাদের এই সব বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকে অথবা যারা এই সব আপনার কাছে চায়, তাদের দান করুন।

এই বলে ঋষিগণ অন্যপথে আহার-অন্বেষণের জন্য বনে প্রবেশ করলেন। তারপর রাজার ইচ্ছায় তাঁর মন্ত্রীরা বনে এসে ডালিম ফল পেড়ে তাঁদের দেওয়ার কথা ভাবলেন। মন্ত্রীরা সেই ফলগুলির মধ্যে সোনার টুকরো ভরে ভৃত্যদের হাতে দিলেন। ভৃত্যরা ঋষিদের ফলগুলি দেবার জন্য ছুটে গেল; কিন্তু মহর্ষি অত্রি সেইসব

ফলগুলিকে ভারী দেখে বললেন—'এই সব ফল আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের বুদ্ধিনাশ হয়নি, আমরা জেগেই আছি, ঘুমিয়ে নয়। আমরা জানি এর মধ্যে সোনার টুকরো ভরা আছে। যদি আজ আমরা এগুলি গ্রহণ করি, তাহলে পরলোকে ভীষণ কটু ফল ভোগ করতে হবে। যারা ইহলোক ও পরলোকে শান্তি পেতে চায়, তাদের প্রতিগ্রহ থেকে দূরে থাকা উচিত।'

বশিষ্ঠ বললেন—এক নিষ্ক (স্বর্ণমুদ্রা) দান গ্রহণ করলে রাজার নিষ্কের দান গ্রহণের দোষ হয়। এই অবস্থায় যে বহু নিষ্ক গ্রহণ করে, তাকে ভীষণ পাপময় গতিতে পতিত হতে হয়।

কশ্যপ বললেন—এই পৃথিবীতে যত খাদ্যদ্রব্য, স্বর্ণ, পশু ও নারী আছে, সেসবই যদি কোনো একজন পুরুষ প্রাপ্ত হয়, তাহলেও সে সন্তুষ্ট হবে না; এই কথা ভেবে বিদ্বান ব্যক্তিগণের মনের তৃষ্ণাকে দমন করা উচিত।

ভরদ্বাজ বললেন—মানুষের আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার কোনো সীমা নেই।

গৌতম বললেন—জগতে এমন কোনো দ্রব্য নেই, যা মানুষের আশা পূর্ণ করতে পারে। পুরুষের আশা সমুদ্রের সমান, তা কখনো পূর্ণ হয় না।

বিশ্বামিত্র বললেন—কোনো বস্তু কামনা করে মানুষের সেই কামনা যখন পূর্ণ হয়, তখনই অন্য নতুন কামনার উদয়

হয়। এইভাবে তৃষ্ণা তীরের মতো মানুষের মনকে আঘাত করতেই থাকে।

জামদগ্নি বললেন—প্রতিগ্রহ না নিলেই ব্রাহ্মণ তাঁর তপস্যা সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। তপস্যাই ব্রাহ্মণদের ধন। যে ব্যক্তি লৌকিক ধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, তার তপস্যারূপ ধন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

অরুন্ধতী বললেন—জগতে এক পক্ষের লোকের মত হল যে ধর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা উচিত ; কিন্তু আমার মত হল যে অর্থ সংগ্রহের থেকে তপস্যা সংগ্রহই শ্রেষ্ঠ।

গণ্ডা বললেন—আমার প্রভুগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েও যখন এই ভয়ংকর প্রতিগ্রহকে ভয় পাচ্ছেন, তখন আমার আর কী যোগ্যতা ? দুর্বল প্রাণীর মতো আমার এতে খুব ভয় করছে।

পশুসখ বললেন—ধর্মপালন করলে যে ধনলাভ হয়, তার থেকে বড়ো কোনো ধন নেই ; ব্রাহ্মণই সেই ধন জানেন ; সুতরাং আমিও সেই ধর্মময় ধন প্রাপ্তির উপায় শেখার জন্য বিদ্বান ব্রাহ্মণদের সেবায় ব্যাপৃত আছি।

ঋষিগণ বললেন—যার প্রজা এই কপটযুক্ত ফল দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছে এবং ফলরূপে যে আমাদের সুবর্ণদান করতে ইচ্ছুক সেই রাজার মঙ্গল হোক।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সমস্ত ব্রতধারী ঋষি এই কথা বলে সুবর্ণযুক্ত ফল পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। মন্ত্রীগণ তখন শৈব্যর কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ ! ফলগুলি দেখেই ঋষিদের সন্দেহ হয়েছিল যে তাঁদের ছলনা করা হচ্ছে, তাই তাঁরা ফলগুলি পরিত্যাগ করে অন্য পথে চলে গেছেন।' সেবকদের কথা শুনে রাজা বৃষাদর্ভি অত্যন্ত কুপিত হলেন। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম পালন করে তিনি আহনীয় অগ্নিতে আভিচারিক মন্ত্র পড়ে একটি একটি করে আহুতি দিতে লাগলেন। আহুতি সমাপ্ত হলে সেই অগ্নি থেকে এক ভয়ানক কৃত্যা প্রকাশিত হল। রাজা বৃষাদর্ভি তার নাম রাখলেন যাতুধানী। কালরাত্রির ন্যায় বিকটরূপ ধারণকারী সেই কৃত্যা হাত জোড় করে রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল—'মহারাজ ! আমি আপনার কোন আদেশ পালন করব ?'

রাজা বললেন—যাতুধানী ! তুমি বনে যাও, সেখানে অরুন্ধতী-সহ সপ্তঋষি, তাঁদের দাসী এবং দাসীর পতির নাম জেনে তার তাৎপর্য নিজ মনে ধারণ করো। এইভাবে তাঁদের সকলের নামের অর্থ বুঝে তাঁদের সকলকে মেরে ফেল ; তারপর যেখানে খুশি চলে যাও।

রাজার আদেশ শুনে যাতুধানী 'তথাস্তু' বলে তা স্বীকার করে যেখানে মহর্ষিগণ বিচরণ করছিলেন, সেই বনে গেল। সেই বনে অত্রি প্রমুখ মহর্ষিগণ ফলমূল আহার করে বিচরণ করছিলেন। তাঁদের সকলের সিদ্ধান্ত এবং কাজ এক প্রকারের ছিল, তাঁরা সেই বনে বিচরণ করে ফল-মূলাদি সংগ্রহ করছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা একসময় এক সুন্দর জলাশয় দেখতে পেলেন, তার জল অত্যন্ত পবিত্র ও স্বচ্ছ ছিল। তার চারধারে ঘন বৃক্ষের সারি শোভা পাচ্ছিল, জলাশয়ের মধ্যে সুন্দর কমল ফুটেছিল এবং নানা পক্ষী সেখানে জলপান করছিল। সেখানে যাওয়ার একটিই পথ ছিল। তার ঘাট এবং সিঁড়ি সুন্দরভাবে তৈরি করা, সেখানে কোনো নোংরা বা জঞ্জাল ছিল না। রাজা বৃষাদর্ভি প্রেরিত ভয়ানক আকার বিশিষ্ট যাতুধানী সেই জলাশয় দেখাশোনা করছিল।

জলাশয় দেখে মহর্ষিগণ মৃণাল নেবার জন্য পশুসখকে

নিয়ে সেখানে এলেন এবং তার ধারে সেই বিকট রাক্ষসীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন—'তুমি কে ? এখানে একাকী দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এখানে তোমার কী প্রয়োজন ? এই পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়িয়ে তুমি কোন্ কাজ করতে চাও ?'

যাতুধানী বলল—তপস্বীগণ ! আমি যেই হোই, তোমাদের আমার পরিচয় জানার প্রয়োজন নেই। তোমরা এটুকু শুধু জেনে রাখ যে আমি এই জলাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করি।

ঋষিগণ বললেন—ভদ্রে ! আমরা সকলে ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি। আমাদের খাওয়ার কিছু নেই। অতএব তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমরা এই পুকুর থেকে কিছু মৃণাল তুলে নিই।

যাতুধানী বলল—ঋষিগণ ! এক শর্তে তোমরা এখান থেকে ইচ্ছামতো মৃণাল নিতে পার। একজন একজন করে এসে নাম বলবে নামের ব্যাখ্যা করবে আর কমলের নাল নিয়ে যাবে, অন্যথা দেরি করবে না।

ভীষ্ম বললেন—তার কথা শুনে মহর্ষি অত্রি বুঝে গেলেন যে এ হল রাক্ষসী কৃত্যা আর আমাদের সকলকে বধ করার জন্য এখানে এসেছে। কিন্তু ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় তিনি উত্তর দিলেন—'কল্যাণী ! কামাদি শত্রুদের থেকে যে ত্রাণ করে, তাকে অরাত্রি বলে আর অৎ (মৃত্যু) থেকে যে রক্ষা করে, তাকে অত্রি বলে। তাই আমি অরাত্রি হওয়ায় অত্রি। যতক্ষণ জীবেদের একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞান হয় না, ততক্ষণের অবস্থাকে রাত্রি বলে। সেই অজ্ঞানাবস্থারহিত হওয়ার জন্যও আমি অরাত্রি এবং অত্রি নামে পরিচিত। সমস্ত প্রাণীর অজ্ঞাত হওয়ার জন্য যা রাত্রির সমান, সেই পরমাত্মতত্ত্বে আমি সর্বদা জাগ্রত থাকি ; সুতরাং তা আমার কাছে অরাত্রির সমান, সেই ব্যুৎপত্তি অনুসারেই আমি অরাত্রি এবং অত্রি (জ্ঞানী) নাম ধারণ করি। আমার নামের এই অর্থই জেনো।'

যাতুধানী বলল—তেজস্বী মহর্ষে ! আপনি আপনার নামের যে অর্থ বললেন, তা আমার পক্ষে বোঝা কঠিন। বেশ, আপনি জলে নামুন।

বশিষ্ঠ বললেন—আমার নাম বশিষ্ঠ ; সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় লোকে আমাকে বরিষ্ঠও বলে। আমি গৃহস্থাশ্রমে বাস করি ; সুতরাং বশিষ্ঠতা (ঐশ্বর্যসম্পত্তি) ও বাসের জন্য তুমি আমাকে বশিষ্ঠ জেনো।

যাতুধানী বলল—মুনে ! আপনি আপনার নামের যে ব্যাখ্যা করলেন, তা উচ্চারণ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি এ নাম স্মরণ করতে পারব না। আপনি জলে নামুন।

কশ্যপ বললেন—যাতুধানী ! কশ্য হচ্ছে শরীরের নাম, যে তাকে পালন করে, তাকে কশ্যপ বলা হয়। আমি প্রত্যেক কুলে (শরীরে) অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করে তাদের রক্ষা করি, তাই কশ্যপ। কু অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর বম অর্থাৎ বর্ষাকারী সূর্যও আমার স্বরূপ, তাই আমাকে কুবমও বলা হয়। আমার দেহকান্তি কাশ ফুলের মতো উজ্জ্বল, তাই আমি কাশ্য নামেও প্রসিদ্ধ। এই আমার নাম, এটি তুমি ধারণ করো।

যাতুধানী বলল— মহর্ষে ! আপনার নামের তাৎপর্য বোঝা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আপনিও কমলপরিপূর্ণ এই জলাশয়ে প্রবেশ করুন।

ভরদ্বাজ বললেন—কল্যাণী ! যারা আমার পুত্র ও শিষ্য নয়, আমি তাদেরও পালন করি এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, নিজ ধর্মপত্নীও দ্বাজ (বর্ণসংকর) মানুষদেরও ভরণ-পোষণ করি, তাই ভরদ্বাজ নামে আমি প্রসিদ্ধ।

যাতুধানী বলল—মুনিবর ! আপনার নামের অক্ষর উচ্চারণ করতেও আমার কষ্ট হচ্ছে, তাই আমি এটি ধারণ করতে পারছি না। যান, আপনিও এই সরোবরে অবতরণ করুন।

গোতম বললেন—কৃত্যে ! আমি ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা গো (পৃথিবী এবং স্বর্গ)-কে দমন করেছি, তাই 'গোদম' নাম ধারণ করেছি। আমি ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। সবকিছুতে সমদৃষ্টি রাখার জন্য তুমি বা অন্য কেউ আমাকে দমন করতে পারবে না। আমার দেহকান্তি (গো) অন্ধকার দূরকারী (অতম্), অতএব তুমি আমাকে গোতম জেনো।

যাতুধানী বলল—মহামুনে ! আপনার নামের ব্যাখ্যাও আমার বোধগম্য হল না। যান, সরোবরে নামুন।

বিশ্বামিত্র বললেন—যাতুধানী ! বিশ্বদেব আমার মিত্র এবং আমি গাভীদের ও সমস্ত বিশ্বের মিত্র, তাই জগতে বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ।

যাতুধানী বললেন—মহর্ষে ! আপনার নামের ব্যাখ্যাও আমার পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। আমি এটি স্মরণ রাখতে পারব না। যান, জলাশয়ে নামুন।

জামদগ্নি বললেন—কল্যাণী ! আমি জমৎ অর্থাৎ দেবতাদের আহ্বান করা অগ্নি থেকে উৎপন্ন হয়েছি, তাই আমি জামদগ্নি নামে বিখ্যাত বলে জানবে।

যাতুধানী বলল—মুনে ! আপনি যেভাবে আপনার নামের তাৎপর্য বললেন, তা বোঝা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এবার আপনি সরোবরে প্রবেশ করুন।

অরুন্ধতী বললেন—যাতুধানী ! আমি অরু অর্থাৎ পর্বত, পৃথিবী এবং দ্যুলোকে নিজ শক্তিতে ধারণ করি। নিজ স্বামীর থেকে কখনো দূরে থাকি না এবং তাঁর মন বুঝে

চলি, তাই আমার নাম অরুন্ধতী।

যাতুধানী বলল—দেবী ! আপনি আপনার নামের যে ব্যাখ্যা করলেন, তার একটি অক্ষরও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই এটিও আমি স্মরণে রাখতে পারব না। আপনি সরোবরে প্রবেশ করুন।

গণ্ড বলল—যাতুধানী ! গড়িধাতু থেকে গণ্ডিশব্দের সিদ্ধি হয়, এটি মুখের এক অংশ—কপোলের বাচক। আমার কপোল (গণ্ড) দেশ উচ্চ, তাই লোক আমাকে গণ্ড বলে।

যাতুধানী বলল—তোমার নামের ব্যাখ্যাও অনুধাবন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই এটি মনে রাখা অসম্ভব। যাও, তুমিও সরোবরে নামো।

পশুসখ বলল—অগ্নি থেকে উৎপন্ন কৃত্যে ! আমি পশুদের প্রসন্ন রাখি এবং তাদের প্রিয় সখা ; সেই গুণের জন্য আমার নাম পশুসখ।

যাতুধানী বলল—তুমি যে নামের ব্যাখ্যা করলে, তা উচ্চারণ করাও আমার পক্ষে কষ্টপ্রদ, তাই এটি স্মরণে থাকবে না, এখন তুমিও জলাশয়ে নামো।

এই ঋষিগণের সঙ্গে শুনঃসখ নামে এক সন্ন্যাসীও ছিলেন, তিনি তাঁর পরিচয় এইভাবে দিলেন—যাতুধানী ! এই ঋষিগণ যেভাবে তাঁদের নাম বললেন, সেভাবে আমি বলতে পারব না। তুমি আমার নাম শুনঃসখ (ধর্মের মিত্রসম্বন্ধী-মুনিদের মিত্র) জেনো।

যাতুধানী বলল—বিপ্রবর ! আপনি সন্দেহজনক ভাষায় আপনার নাম বলেছেন, সুতরাং স্পষ্টভাবে আর একবার নামের ব্যাখ্যা করুন।

শুনঃসখ বললেন—আমি একবার আমার নাম বলেছি, তাও তুমি মন দিয়ে শোনোনি, তাহলে নাও, আমার এই ত্রিদণ্ডের আঘাতে এখনই ভস্ম হয়ে যাও।

এই বলে সেই সন্ন্যাসী ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় তাঁর ত্রিদণ্ড দিয়ে এমন আঘাত করলেন যে যাতুধানী মাটিতে পড়ে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে গেল। শুনঃসখ এইভাবে সেই মহাবলবতী রাক্ষসীকে বধ করে ত্রিদণ্ডটি মাটিতে রেখে নিজেও সেইখানে ঘাসের ওপর বসলেন। তারপর সব মহর্ষি ইচ্ছামতো ফুল এবং মৃণাল নিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পুষ্করিণী থেকে উঠে এলেন এবং বহু পরিশ্রম করে মৃণাল আলাদা আলাদা করে বাঁধলেন। তারপর সেগুলি সরোবরের ধারে রেখে সেখানে জলতর্পণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা জল থেকে উঠে এসে সংগৃহীত মৃণাল দেখতে পেলেন না। তখন সকলে একসুরে বলে উঠলেন—'আরে ! আমরা সকলেই ক্ষুধায় কাতর, এখন আহার গ্রহণ করতে চাইছিলাম, এই সময়ে কোন হৃদয়হীন মানুষ আমাদের মৃণাল চুরি করল ?' যখন কিছুই জানা গেল না, তখন সকলেই নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সময় সকলেই ক্ষুধা ও পরিশ্রমে কাতর ছিলেন ; সুতরাং তাঁরা শপথ গ্রহণ করতে শুরু করলেন।

সর্বপ্রথম অত্রি বললেন—যে এই মৃণালগুলি চুরি করেছে, সে গাভীকে লাথি মারা, সূর্যের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করা এবং অনধ্যায়ের সময় অধ্যয়ন করার পাপে পাপী হবে।

বশিষ্ঠ বললেন—যে এই মৃণাল চুরি করেছে, সে নিষিদ্ধ সময়ে বেদপাঠ, কুকুর নিয়ে শিকার করা, সন্ন্যাসী হয়ে ইচ্ছামতো আচরণ করা, শরণাগতকে মারা, নিজকন্যাকে বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করা ও কৃষকের ধন অপহরণের পাপের ভাগী হবে।

কশ্যপ বললেন—যে মৃণালগুলি চুরি করেছে, তার সর্বত্র সর্বপ্রকার কথা বলা, অন্যের গচ্ছিত বস্তু নিয়ে নেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অপাত্রকে দান দেওয়া এবং দিবসে স্ত্রী-সমাগম করার দোষ হবে।

ভরদ্বাজ বললেন—যে মৃণাল চুরি করেছে, সেই নির্দয়ীর স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব এবং গাভীর সঙ্গে অধর্ম করা, ব্রাহ্মণকে বিবাদে পরাস্ত করা, উপাধ্যায় (গুরু)-কে নীচে বসিয়ে তার থেকে ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদ অধ্যয়ন করা এবং ঘাসপাতা আগুনে আহুতি দেবার পাপ হবে।

জমদগ্নি বলেন—যে মৃণাল অপহরণ করেছে, তারা জলে মলত্যাগ, গো হত্যা, গাভীর সঙ্গে দ্রোহ, বিনা ঋতুকালে মৈথুন এবং সকলের সঙ্গে দ্বেষ করা, স্ত্রীর অন্নে জীবিকা নির্বাহ করা, সকলের সঙ্গে শত্রুতা করা এবং একে অন্যের গৃহে অতিথি হওয়ার দোষ হবে।

গৌতম বললেন—যে মৃণাল চুরি করেছে, সে বেদাধ্যয়ন করে ভুলে যাওয়া, তিন অগ্নি পরিত্যাগ করা এবং সোমরস বিক্রির পাপের ভাগীদার হবে এবং এক কূপ সমন্বিত গ্রামে নিবাসকারী এবং শূদ্রের পত্নীর সঙ্গে সংসর্গকারী ব্রাহ্মণের যে গতি হয়, সেই গতি সেও পাবে।

বিশ্বামিত্র বললেন—যে এই মৃণাল অপহরণ করেছে, তার সেই পাপ হবে যা পুত্র জীবিত থাকলে তার মাতা-পিতা অন্যের দ্বারা পালিত হলে হয়। তার কোনো ঠিকানা থাকবে না, তার গৃহে বহু পুত্র হবে, সে অপবিত্র, বেদকে মিথ্যা মান্যকারী, অর্থের সম্পর্কে অহংকারী, অপরের

প্রতি দ্বেষসম্পন্ন, বর্ষাকালে পরদেশ যাত্রাকারী, বেতন নিয়ে কাজ করা, রাজার পুরোহিত এবং যজ্ঞের অনধিকারীর দ্বারা যজ্ঞকারী হবে।

অরুন্ধতী বললেন—যে মৃণাল চুরি করেছে সেই নারী সর্বদা নিজের শাশুড়ীকে অপমান করা, স্বামীর মনে দুঃখ দেওয়া, নিজে উৎকৃষ্ট আহার করা, গৃহে থেকে আত্মীয়-বন্ধুদের অসম্মান করা, নিজ চরিত্র কলঙ্কিত করা (ব্রাহ্মণী হয়ে ক্ষত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন) বীর পুত্রের জননী হওয়ার পাপভাগী হবে।

গণ্ডা বলল—যে নারী মৃণাল চুরি করেছে, তার মিথ্যা কথা বলা, বন্ধুদের বিরোধিতা করা, কন্যা বিক্রয় করা, আহার প্রস্তুত করে একাকী ভোজন করা এবং ব্যভিচারিণী হওয়ার পাপ হবে।

পশুসখ বলল—যে মৃণাল চুরি করেছে, সে দাসীর গর্ভে জন্ম নেবে, সন্তানহীন ও দরিদ্র থাকবে এবং দেবতাদের প্রণাম না করার পাপে বিদ্ধ হবে।

শুনঃসখ বললেন—যে এই মৃণাল চুরি করেছে সে যজুর্বেদ জ্ঞাতা ঋত্বিক অথবা সামবেদ জ্ঞাতা ব্রহ্মচারীকে কন্যাদান করার ফললাভ করবে এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বিধিবৎ স্নানের পুণ্যভাগী হবে।

সন্ন্যাসীর এইরূপ কথা শুনে সপ্তর্ষিগণ বললেন—শুনঃসখ ! তুমি যে শপথ করেছ, তা তো ব্রাহ্মণদের অভীষ্ট ! সুতরাং মনে হচ্ছে যে আমাদের মৃণালগুলি তুমিই চুরি করেছ।

শুনঃসখ বললেন—হে মুনিবরগণ ! আপনাদের কথা ঠিক। মৃণাল আমিই চুরি করেছি। আপনারা যখন তর্পণ করায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন আমি গোপনে মৃণালগুলি অন্যত্র রেখে দিয়েছি। দেখুন, এইখানে আপনাদের মৃণাল রয়েছে, আমি আপনাদের পরীক্ষা করার জন্যই এই কাজ করেছি। আমি সন্ন্যাসী নই, ইন্দ্র বলে জানবেন। আপনাদের রক্ষা করার জন্যই আমি এখানে এসেছি। রাজা বৃষাদর্ভি প্রেরিত অত্যন্ত ক্রূরকর্মা যাতুধানী কৃত্যা আপনাদের বধ করার জন্য এখানে এসেছিল। এই কৃত্যা অগ্নি থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। ও অত্যন্ত দুষ্টস্বভাবসম্পন্না। সে অবশ্যই আপনাদের মেরে ফেলত, সেইজন্য আমি ওই রাক্ষসীকে বধ করেছি। তপোধনগণ ! আপনারা লোভ পরিত্যাগ করায় অক্ষয়লোকের অধিকার লাভ করেছেন। সেই অক্ষয়লোক সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। এবার আপনারা সেখানে চলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্রের কথায় মহর্ষিগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁরা 'তথাস্তু' বলে দেবরাজের নির্দেশ মেনে নিলেন এবং সকলেই তাঁর সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। এই মহাত্মারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েও লোভ করেননি, তাই তাঁরা স্বর্গলাভ করেছিলেন। সুতরাং মানুষের সর্ব অবস্থায় লোভ পরিত্যাগ করা উচিত, সেটিই সব থেকে বড় ধর্ম।

—০—

ব্রহ্মসর তীর্থে অগস্ত্য ঋষির কমল চুরি হওয়ার পর ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিদের ধর্মোপদেশপূর্ণ শপথ

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! প্রাচীনকালে রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিগণ তীর্থযাত্রা করার সময় মৃণাল চুরি নিয়ে নিজেদের মধ্যে যে শপথ করেছিলেন, সেই পুরানো ইতিহাস তোমাকে বলছি, শোনো। পশ্চিমের প্রসিদ্ধ তীর্থ প্রভাস ক্ষেত্রে কিছু ঋষি এবং রাজাগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন যে 'আমরা সমস্ত পৃথিবীর পুণ্যতীর্থগুলি ভ্রমণ করব। আমাদের সকলের মনেই এই আগ্রহ আছে, সুতরাং সকলে একসঙ্গেই যাব।' এরূপ স্থির করে শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, গালব, অষ্টক, ভরদ্বাজ, অরুন্ধতী দেবী, বালখিল্য ঋষি, শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার এবং পুরু প্রমুখ রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সব তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে তাঁরা পবিত্র জলবাহী কৌশিকী নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন এবং সকলে সেখানে স্নান করলেন। এইভাবে বহুতীর্থে স্নান করে নির্মল হয়ে তাঁরা সকলে অত্যন্ত পবিত্র ব্রহ্মসর (সরোবর) নামক তীর্থে গেলেন, সেখানে ব্রহ্মার সরোবরে স্নান করে সেই অগ্নিসম তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণ এবং রাজর্ষিগণ কমল-পুষ্প ভোজন করলেন। তারপর কয়েকজন ব্রাহ্মণ মৃণাল চারা উপড়াতে লাগলেন এবং কেউ কেউ কমল সংগ্রহ করতে লাগলেন। অগস্ত্য ঋষি কিছু কমল তুলে তীরে রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু সরোবর থেকে উঠে সকলে দেখল অগস্ত্যের কমলগুলি চুরি হয়ে গেছে। তখন অগস্ত্য

সকল ঋষিদের জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার কমলগুলি কে চুরি করেছে ?' সব মহর্ষি তখন ভয় পেয়ে বলতে লাগলেন—'মুনিবর ! আমরা আপনার কমল চুরি করিনি। এই ব্যাপারে সত্যতা নির্ধারণের জন্য আমরা কঠিন শপথ করতে পারি।' এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই মহর্ষি এবং রাজাগণ তাঁদের পুত্র-পৌত্রের সঙ্গে ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে শপথ নিতে শুরু করলেন।

ভৃগু বললেন—হে মুনে ! যে আপনার কমল চুরি করেছে, তার গালি শুনে পরিবর্তে গালি দেওয়া এবং মার খেয়ে মার দেবার পাপ হবে।

বশিষ্ঠ বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে স্বাধ্যায়ে বিমুখ হবে, কুকুর সঙ্গে করে শিকার করবে এবং গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াবে।

কশ্যপ বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে সর্বত্র সর্বপ্রকার বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করবে। কারো গচ্ছিত বস্তু নিয়ে নেবে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে।

গোতম বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে অহংকারী, অকৃতজ্ঞ এবং অযোগ্যের সঙ্গ করবে, কৃষক ও ঈর্ষাযুক্ত হয়ে জীবন কাটাবে।

অঙ্গিরা বললেন—যে আপনার কমল নিয়ে গেছে, সে অপবিত্র, বেদকে মিথ্যা প্রমাণকারী, কুকুর সঙ্গে নিয়ে শিকারকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং নিজের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করা ব্যক্তি হবে।

ধুন্ধুমার বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, তার মিত্রদের উপকার না মানা, শূদ্র নারীর সংসর্গে সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং একাকী স্বাদু খাদ্য গ্রহণের পাপ হবে।

পুরু বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে যেন চিকিৎসা ব্যবসা (বৈদ্য বা ডাক্তারের পেশা) করে, স্ত্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করে এবং শ্বশুরবাড়ির আশ্রয়ে দিন কাটায়।

দিলীপ বললেন—এক কূপ সমন্বিত গ্রামে বাস করে শূদ্রানারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ব্রাহ্মণকে মৃত্যুর পর যে দুঃখদায়ক লোকে যেতে হয়, সেই লোক ওই মানুষটি যেন পায়, যে আপনার কমল চুরি করে নিয়ে গেছে।

শুক্র বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, তার দিনে মৈথুন এবং রাজকর্মচারী হওয়ার পাপ লাগবে।

জামদগ্নি বললেন—যে আপনার কমল নিয়েছে, সে নিষিদ্ধকালে অধ্যয়ন করবে, মিত্রকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাবে এবং নিজেও শূদ্রের শ্রাদ্ধে আহার করবে।

শিবি বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে যেন অগ্নিহোত্র না করেই মারা যায়, যজ্ঞে বিঘ্ন হয় এবং তপস্বীদের সঙ্গে বিরোধ করে।

যযাতি বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে সে ব্রতধারী হয়েও যেন ঋতুকালের অতিরিক্ত সময়ে স্ত্রী সমাগম করে এবং বেদখণ্ডন করে।

নহুষ বললেন—যে আপনার কমল অপহরণ করেছে, সে যেন সন্ন্যাসী হয়েও গৃহে থাকে, যজ্ঞের দীক্ষা নিয়েও যেন ইচ্ছামতো আচরণ করে এবং বেতন নিয়ে বিদ্যাপাঠ করাবে।

অম্বরীষ বললেন—যে আপনার কমল নিয়ে গেছে, সে যেন নৃশংস হয় ; নারী, বন্ধুবান্ধব এবং গাভীর প্রতি ধর্ম পালন না করে এবং যেন ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়।

নারদ ঋষি বললেন—যে আপনার কমল অপহরণ করেছে, সে যেন দেহরূপ গৃহকেই আত্মা মনে করে, মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে শাস্ত্র পাঠ করে, উঁচু-নীচু সুরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং গুরুজনদের অপমান করে।

নাভাগ বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে সর্বদা মিথ্যা কথা বলবে, সাধুদের সঙ্গে বিরোধ করবে এবং কন্যা বিক্রয় করবে।

কবি বললেন—যে আপনার কমল নিয়েছে, সে যেন গাভীকে লাথি মারা, সূর্যের দিকে ফিরে প্রস্রাব করা এবং শরণাগতকে ত্যাগ করার পাপের ভাগী হয়।

বিশ্বামিত্র বললেন—যে আপনার কমল তুলে নিয়ে গেছে, সে যেন রাজার পুরোহিত এবং অনধিকারীর যজ্ঞকারী হয়। কেনা দাসের নিজ প্রভুর ক্ষেতের ক্ষতি করলে যে পাপ হয়, তাই যেন তারও হয়।

পর্বত বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, সে যেন গ্রামের প্রধান হয়, গাধায় চড়ে যায় এবং আহারের জন্য কুকুর নিয়ে শিকার করে।

ভরদ্বাজ বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে সেই পাপীকে নির্দয়ী এবং অসত্যবাদী মানুষদের সমস্ত পাপ যেন স্পর্শ করে।

অষ্টক বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে, সেই রাজা মন্দবুদ্ধি, স্বেচ্ছাচারী এবং পাপী হয়ে যেন অধর্মপূর্বক পৃথিবীর রাজ্যশাসন করে।

গালব বললেন—যে আপনার কমল চুরি করেছে সে মহাপাতকের থেকেও নিন্দনীয়, নিজ বন্ধুদের অপকারকারী এবং দান করে নিজ মুখে ব্যাখ্যাকারী যেন হয়।

অরুন্ধতী বললেন—যে নারী আপনার কমল নিয়েছে, সে যেন তার শাশুড়ির নিন্দাকারী হয়, স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং একাকী স্বাদু খাদ্য গ্রহণ করে।

বালখিল্য বললেন—যে আপনার কমল নিয়েছে, সে যেন তার জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রামের দরজায় একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ধর্ম জেনেও তা পরিত্যাগ করে।

শুনঃসখ বললেন—যে দ্বিজ হয়েও সকাল-সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রকে অবহেলা করে সুখে নিদ্রা যায় এবং সন্ন্যাসী হয়েও ইচ্ছামতো আচরণ করে, এরূপ মানুষের যে পাপ হয়, সেই পাপ আপনার কমল চোরের যেন হয়।

সুরভী বললেন—যে গাভী আপনার কমল চুরি করেছে, তার পা চুলের দড়ি দিয়ে বেঁধে, অন্য বৎস দেখিয়ে যেন তার দুধ দোহন করে নেওয়া হয়।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! সকলে যখন এইভাবে শপথ গ্রহণ করল তখন দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মুনিবর অগস্ত্যের সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি মুনির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—'ব্রহ্মন্! যে আপনার কমল নিয়ে গেছে, সে যেন যজুর্বেদের জ্ঞাতা ঋত্বিককে অথবা সামবেদের বিদ্বান ব্রহ্মচারীকে কন্যাদানের ফললাভ করেন এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে স্নাতক হন। শুধু তাই নয়, সে সমস্ত বেদের স্বাধ্যায়ী, পুণ্যশীল এবং ধার্মিক হয়ে ব্রহ্মলোকে যেন গমন করেন।'

অগস্ত্য বললেন—ইন্দ্র! আপনি যে শপথ করলেন, তাতো আশীর্বাদ রূপ; সুতরাং আপনিই আমার কমল ফেরৎ দিন, এই হল সনাতন ধর্ম।

ইন্দ্র বললেন—মুনিবর! লোভবশত নয়, আমি ধর্ম শোনার ইচ্ছাতেই এই কমল নিয়েছিলাম, সুতরাং আপনার আমার ওপর ক্রোধ করা উচিত নয়। আজ আমি আপনাদের মুখ থেকে সেই আর্য সনাতন ধর্ম শ্রবণ করেছি, যা নিত্য, অবিকারী, অনাময় এবং সংসার সাগর পার করা সেতুর সমান। এর দ্বারা ধার্মিক শ্রুতিসমূহের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। আপনি এবার আপনার কমল গ্রহণ করুন এবং আমার

অপরাধ ক্ষমা করুন।

ইন্দ্রের কথা শুনে অগস্ত্যমুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কমল গ্রহণ করলেন। তারপর সকলে বনপথ ধরে পুনরায় তীর্থযাত্রা আরম্ভ করলেন। তাঁরা সকলে পুণ্যতীর্থে গিয়ে পুণ্যস্নান করতে লাগলেন। যে ব্যক্তি প্রত্যেক পর্বের পরে এই পবিত্র আখ্যান পাঠ করে, তার কোনো বিপদ হয় না এবং সে চিন্তা ও পাপরহিত হয়ে কল্যাণভাগী হয়। যে ব্যক্তি ঋষিদ্বারা সুরক্ষিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে অবিনাশী ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হয়।

—০—

ছত্র এবং পাদুকা দান করার বিষয়ে সূর্য ও জামদগ্নি মুনির কথোপকথন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! ছত্র এবং পাদুকাদানের প্রথা কে প্রবর্তন করেছিলেন ? আমি লক্ষ্য করেছি নানা পুণ্য অবসরে এই দান করা হয়, সুতরাং এই বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা শুনতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! ছত্র এবং পাদুকার উৎপত্তি ও তার প্রচারের বার্তা আমি বিস্তারিতভাবে বলছি, শোনো। এই দুই বস্তু দান কীভাবে অক্ষয় হয় এবং কীভাবে পুণ্য ফলদায়ী মনে করা হয়, সেই আলোচনাও করব। এই ব্যাপারে জামদগ্নি এবং ভগবান সূর্যের কথোপকথন প্রসিদ্ধ। পূর্বকালের কথা, একদিন ভৃগুনন্দন জামদগ্নি ধনুক নিয়ে অনুশীলন করছিলেন। তিনি বারংবার ধনুকে বাণ রেখে ছুঁড়ছিলেন আর তাঁর পত্নী রেণুকা সেই তেজস্বী বাণ তুলে আনছিলেন। এইভাবে দ্বিপ্রহর হয়ে গেল। মুনি পুনরায় বাণ দূরে ছুঁড়ে রেণুকাকে বললেন—'প্রিয়ে ! যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার ধনুক নিক্ষিপ্ত বাণটি তুলে আনো, আমি আবার সেটি নিক্ষেপ করব।' নির্দেশ পেয়ে রেণুকা ছুটে গেলেন। সূর্যের প্রখর তাপে তাঁর মাথা এবং তপ্ত মেঝেতে তাঁর পা জ্বলতে লাগল ; তাই তিনি এক বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বামীর শাপকে ভয় পেতেন, তাই বেশিক্ষণ সেখানে না দাঁড়িয়ে বাণ নিতে এগিয়ে গেলেন। বাণ নিয়ে যখন ফিরলেন তখন তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। গরমে পা পুড়ে যাওয়ার যে দুঃখ, তা তিনি কোনোমতে সহ্য করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে স্বামীর কাছে এলেন। সেই সময় মহর্ষি কুপিত হয়ে বারংবার ডাকতে লাগলেন—'রেণুকা ! তোমার আসতে এতো দেরি হচ্ছে কেন ?'

রেণুকা বললেন—তপোধন ! আমার মাথা তপ্ত হয়ে গেছে, পায়ে জ্বালা ধরেছে, সূর্যের প্রচণ্ড তেজে এগোবার সাহস হয়নি, তাই কিছুক্ষণ বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, সেইজন্য আপনার নির্দেশ পালনে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে, অতএব আপনি আমার ওপর ক্রোধ করবেন না।

জামদগ্নি বললেন—প্রিয়ে ! যে তোমাকে এতো কষ্ট দিয়েছে, সেই প্রচণ্ড সূর্যকে আমি বাণ মেরে নীচে ফেলব।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই বলে মহর্ষি জামদগ্নি তাঁর দিব্য ধনুকে টংকার দিয়ে অনেক বাণ হাতে করে

সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তাঁকে বাণ নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত দেখে সূর্যদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! সূর্য আপনার কী ক্ষতি করেছে ? সে আকাশে অবস্থান করে নিজ কিরণের সাহায্যে বসুধার রস আহরণ করে বর্ষার সময় পুনরায় তা বর্ষণের ব্যবস্থা করে দেয়। সেই বৃষ্টিতে মানুষের সুখপ্রদানকারী অন্ন উৎপন্ন হয়। অন্নই মানুষের প্রাণ—বেদে একথা বলা আছে। নিজ কিরণজালে মণ্ডিত ভগবান সূর্য সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীকে বর্ষার জলে প্লাবিত করে, তার ফলে নানাপ্রকার অন্ন, ফল, ফুল ও ঘাস পাতা উৎপন্ন হয়। জাতকর্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গো-দান, শাস্ত্রীয় দান, সংযোগ এবং ধন-সংগ্রহ ইত্যাদি সব কাজ অন্ন দ্বারাই সম্পন্ন হয়, একথা আপনিও জানেন। সূর্যকে মেরে নীচে নামালে আপনার কী লাভ হবে ? সুতরাং আমি আপনাকে প্রসন্ন হবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি (কৃপা করে সূর্যকে নাশ করার সংকল্প ত্যাগ করুন)।'

সূর্যদেব এইভাবে প্রার্থনা করাতেও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী জামদগ্নি মুনির ক্রোধ শান্ত হল না। তিনি বলতে লাগলেন—'আমি জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা জেনে নিয়েছি যে তুমিই সূর্য, সুতরাং আজ তোমাকে দণ্ড প্রদান করে বিনয় শেখাব। বাণের আঘাতে তোমার শরীর যে টুকরো করে

দেব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

সূর্য বললেন—ব্রহ্মর্ষে ! আপনি ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অবশ্যই আমার শরীর টুকরো করতে পারেন। আমি অপরাধী হলেও এখন আপনার শরণাগত—এই ভেবে আমাকে রক্ষা করুন।

একথা শুনে মহর্ষি জামদগ্নি হেসে উঠে বললেন—

'সূর্যদেব ! এখন আর তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই ; কারণ তুমি আমার শরণ গ্রহণ করেছ। যে শরণাগতকে মারে, তার গুরুপত্নীগমন, ব্রহ্মহত্যা এবং মদ্যপানের পাপ হয়। তাত ! এখন তুমি যে অপরাধ করেছ, তার সমাধান ভাবো (অর্থাৎ তোমার কিরণের তাপে মানুষ কী করে রক্ষা পায়, তার উপায় বলো)।' এই বলে জামদগ্নি মুনি চুপ করলেন। তখন সূর্য তাঁকে ছত্র ও পাদুকা দিয়ে বললেন—'মহর্ষে ! এই ছত্র আমার কিরণ নিবারণ করে মস্তক রক্ষা করবে এবং চর্মনির্মিত এই পাদুকা আপনার পদযুগলকে জ্বালার থেকে বাঁচাবে। আপনি এগুলি গ্রহণ করুন। আজ থেকে জগতে প্রত্যেক পুণ্য কাজে ছত্র ও পাদুকা-দান প্রচলিত হবে এবং এর ফল অক্ষয় হবে।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এইভাবে ভগবান সূর্য সর্বপ্রথম ছত্র ও পাদুকা দানের প্রথা প্রচলন করেন। এই বস্তুগুলির দান ত্রিলোকে পবিত্র মানা হয়। যার পা জ্বালা করছে তেমন স্নাতক ব্রাহ্মণকে যে পাদুকা দান করে সে দেহত্যাগের পর দেব-বন্দিত লোকে গমন করে এবং অত্যন্ত প্রসন্নতার সঙ্গে গোলোকে নিবাস করে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি ছত্র এবং পাদুকা দানের সম্পূর্ণ ফল জানালাম।

—০—

গৃহস্থ ধর্মের বিষয়ে পৃথিবী ও শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা এবং পুষ্প, ধূপ ও দীপদান, দেবতাদিকে বলি প্রদানের মাহাত্ম্য বলার জন্য বলি-শুক্র-সংবাদের উল্লেখ

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি এবার গার্হস্থ্য-আশ্রমের সমস্ত ধর্মগুলি বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! এই বিষয়ে আমি তোমাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পৃথিবীর আলোচনারূপ প্রাচীন ইতিহাস শোনাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—বসুন্ধরা ! আমি বা আমার মতো অন্য মানুষের গার্হস্থ্য ধর্মের আশ্রয় নিয়ে কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্যই করা উচিত ? কী করলে গৃহস্থরা সফলতা লাভ করে ?

পৃথিবী বললেন—মাধব ! গৃহস্থ মানুষদের সর্বদা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋষি ও মানুষদের পূজা এবং সৎকার করা উচিত। আমি এখন তার বিধি জানাচ্ছি, শুনুন। প্রতিদিন হোম-যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের, শ্রাদ্ধ-তর্পণ দ্বারা পিতৃপুরুষদের, অতিথি-সৎকারের দ্বারা মানুষকে এবং বেদ-স্বাধ্যায় করে পূজনীয় ঋষি-মহর্ষিদের পূজা করা উচিত। স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিরা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। প্রতিদিন আহারের পূর্বে অগ্নিহোত্র এবং অন্নের আহুতি করা আবশ্যক। এই কার্যে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। পিতৃপুরুষের প্রসন্নতার জন্য প্রত্যহ অন্ন-জল-দুধ অথবা ফল-মূলের দ্বারা শ্রাদ্ধ করা উচিত। রান্না করা অন্ন নিয়ে বিধিপূর্বক বলিবৈশ্বদেব পঞ্চযজ্ঞ করা উচিত। তারপর ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দিতে হয়। যদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তবে অন্ন

থেকে কিছু অগ্রভাগ নিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া উচিত। যে দিন পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করার ইচ্ছা হবে, সেদিন প্রথমে শ্রাদ্ধ ক্রিয়াই পূর্ণ করা উচিত। তারপর পিতৃতর্পণ দ্বারা অতিথিদেরও সন্তুষ্ট করবে, কিন্তু আহার পরিবেশন করার আগে তাদের বিধিসম্মতভাবে পূজা করে নেওয়া উচিত। তা হলে গৃহস্থ মানুষ অতিথিদের সন্তুষ্ট করতে পারে। যে নিত্যদিন গৃহে থাকে না এবং সেই গৃহের পরিবারের সদস্য নয় তাকে অতিথি বলে। আচার্য, পিতা, বিশ্বাসপাত্র মিত্র এবং অতিথিদের সর্বদা নিবেদন করা উচিত যে, 'এই বস্তু আমার গৃহে আছে, আপনি তা গ্রহণ করুন।' তারপর তাঁরা যে নির্দেশ দেন, তাই করবে। তাতে ধর্মপালন হয়। গৃহস্থ ব্যক্তির সর্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা উচিত। রাজা, ঋত্বিক, স্নাতক, গুরু এবং শ্বশুর—এঁরা যদি এক বৎসর পরে আসেন, তাহলে মধুপর্কের দ্বারা এঁদের পূজা করা উচিত। কুকুর, চণ্ডাল এবং পাখিদের জন্য মাটিতেই অন্ন রেখে দেওয়া উচিত। এটি বৈশ্বদেব নামক কর্ম। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এর অনুষ্ঠান করা হয়। যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করে এই গৃহস্থোচিত ধর্মপালন করে, সে ইহলোকে ঋষি-মহর্ষিদের বর প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর পুণ্যলোকে সম্মান লাভ করে।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! পৃথিবীদেবীর কথা শুনে প্রতাপশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই অনুসারে গার্হস্থ্যধর্ম বিধিবৎ পালন করেন। তোমারও সর্বদা এইরূপ করা উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! দীপদান কেমন করে করা হয়? কীভাবে এর উৎপত্তি হয়েছে এবং এর ফল কী?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে শুক্র ও বলির আলোচনারূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়, সেটি এরূপ—

রাজা বলি তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর! ফুল, ধূপ এবং দীপদান করার ফল কি, কৃপা করে তা বলুন।

শুক্রাচার্য বললেন—রাজন্! প্রথমে তপস্যার উৎপত্তি হয়, তারপরে ধর্মের। এর মধ্যে লতা ও ঔষধি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকারের সোমলতা, অমৃত, বিষ এবং নানাপ্রকার তৃণের প্রাদুর্ভাব হয়। যাকে দেখলেই মন প্রসন্ন হয়, তা হল অমৃত—এতে তৎক্ষণাৎ তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর যার গন্ধে চিত্তে গ্লানি জন্মায়, তা হল বিষ। অমৃত হল মঙ্গলকারী আর বিষ অমঙ্গলকারী। এবার আমি দেবতা, অসুর, রাক্ষস, নাগ, যক্ষ, পিতৃপুরুষ এবং মানুষের প্রিয় এবং নারীদের পছন্দের ফুলের বর্ণনা করছি। বহু ফুল গ্রামেও হয় জঙ্গলেও হয়। বহু বৃক্ষ মানুষে রোপণ করে আবার বহু নিজে থেকেই জন্মায়। এই সব বৃক্ষের মধ্যে কিছু কণ্টকপূর্ণ কিছু কণ্টকহীন। এই সবে রূপ-রস-গন্ধ থাকে; গন্ধ দু প্রকারের হয়—ভালো ও মন্দ। সুগন্ধী ফুল দেবতাদের প্রিয়। যে বৃক্ষে কাঁটা থাকে না, তার সাদা রংয়ের ফুলই দেবতারা বেশি পছন্দ করেন। অথর্ববেদে বলা আছে যে শত্রুদের অনিষ্ট করার জন্য যে অভিচার কর্ম করা হয় তাতে লালফুল যুক্ত কটু ও কণ্টকাকীর্ণ ঔষধির ব্যবহার করা উচিত। যে ফুলে কাঁটা বেশি থাকে, যা হাতে ধরা কঠিন, যার রং অত্যন্ত লাল বা কালো এবং যার প্রভাব তীক্ষ্ণ, এরূপ ফুল ভূত-প্রেতের কাজে আসে। যে ফুল দেখতে সুন্দর, মধুর গন্ধযুক্ত, দেখলে হৃদয়ে আনন্দ হয়, মানুষের সেই ফুলই প্রিয় হয়ে থাকে। শ্মশান বা জীর্ণ-শীর্ণ দেবালয়ে প্রাপ্ত ফুল বিবাহ বা শুভকর্মে ব্যবহার করা উচিত নয়। পর্বত শিখরে উৎপন্ন, সুন্দর, সুগন্ধ পুষ্প ধৌত করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে দেবতাকে সমর্পণ করা উচিত। দেবতা ফুলের সুগন্ধে, যক্ষ ও রাক্ষস তার দর্শনে, নাগেরা তাকে ভালোভাবে উপভোগ করায় এবং মানুষ তার গন্ধ, দর্শন এবং উপভোগ—এই

তিনেই সন্তুষ্ট হয়। ফুল দিলে ভগবান তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হয়ে যান এবং সিদ্ধ-সংকল্প-হওয়ার জন্যই তিনি মানুষদের মনোবাঞ্ছিত ভোগ প্রদান করে তাদের মঙ্গল করেন। দেবতাদের যদি সন্তুষ্ট এবং সম্মানিত করা হয়, তাহলে তাঁরাও মানুষদের সন্তোষ ও সম্মান প্রদান করেন। আর তাঁদের যদি অবজ্ঞা এবং অবহেলা করা হয় তাহলে তাঁরা অবজ্ঞাকারী নীচ মানুষদের নিজ ক্রোধাগ্নির দ্বারা ভস্ম করে ফেলেন।

এরপর ধূপদানের ফল শোনো—ধূপও ভালো, মন্দ নানা প্রকারের হয়। প্রধানত এর তিনটি ভাগ—নির্যাস, সারী এবং কৃত্রিম। এইসব ধূপেরও গন্ধ ভালো ও মন্দ দু প্রকারের হয়। সেকথা বিস্তারিতভাবে শোনো। বৃক্ষের রসকে নির্যাস বলে, সল্লকী বৃক্ষ ব্যতীত অন্য বৃক্ষ থেকে তৈরি নির্যাসময় ধূপ দেবতাদের অধিক প্রিয়। এরমধ্যে গুগ্গুল সর্বশ্রেষ্ঠ। যে কাঠ আগুনে জ্বালালে সুগন্ধ বের হয়, তাকে 'সারী' ধূপ বলে। এতে অগুরুর প্রাধান্য থাকে। 'সারী' ধূপ বিশেষভাবে যক্ষ, রাক্ষস ও নাগেদের সল্ল প্রিয় হয়। দৈত্যরা সল্ল বা সেইরূপ অন্য বৃক্ষের রস থেকে প্রস্তুত ধূপ পছন্দ করে। সর্জরস ইত্যাদি পার্থিব রস ও সুগন্ধী কাষ্ঠৌষধি মিশিয়ে মধু এবং ঘৃত যুক্ত করে যে ধূপ তৈরি করা হয়, তা কৃত্রিম। মানুষ সেগুলিই বিশেষভাবে ব্যবহার করে। এতে দেবতা-দানবও শীঘ্র সন্তুষ্ট হন। এছাড়া ভোগ-বিলাসের জন্যও আরও নানাপ্রকারের ধূপ আছে যা শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত। ফুল দেওয়ায় যে পুণ্যফল বলা হয়েছে, ধূপ নিবেদন করলেও তাই হয়। ধূপও দেবতার প্রসন্নতা বৃদ্ধি করে।

এবার দীপদানের উত্তম ফলের কথা বলছি। কখন, কেমন এবং কীভাবে দীপ দেওয়া উচিত, সে সবের বর্ণনা শোনো। প্রদীপ ঊর্ধ্বগামী তেজ, তা কীর্তি বিস্তার করে, সুতরাং দীপদান করলে মানুষের তেজ বৃদ্ধি পায়। অন্ধকারেই অন্ধতামিস্র নামক নরকরূপ আছে। দক্ষিণায়নও অন্ধকার দ্বারাই আচ্ছন্ন থাকে। তার বিপরীত হল উত্তরায়ণ, যা প্রকাশময়, তাই একে শ্রেষ্ঠ মানা হয়। সুতরাং অন্ধকারময় নরকের নিবৃত্তির জন্য দীপদানের প্রশংসা করা হয়েছে। দীপের শিখা ঊর্ধ্বগামী হয়, তা অন্ধকার দূর করার ঔষধ, তাই যে দীপদান করে সে নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। দেবতারা তেজস্বী, কান্তিমান এবং প্রকাশময় হয়ে থাকেন, তাই দেবতাদের জন্য দীপদান করা হয়। দীপদান করলে মানুষের চোখের তেজ বৃদ্ধি পায় এবং দীপদানকারী নিজেও তেজস্বী হয়। দান করার পর প্রদীপ নেভানো উচিত নয়, অন্যত্র নিয়েও যাবে না অথবা নষ্টও করবে না। যে ব্যক্তি প্রদীপ চুরি করে সে অন্ধ ও শ্রীহীন হয় এবং মৃত্যুর পর নরকে যায়, যে দীপদান করে সে স্বর্গে দীপমালার ন্যায় শোভিত হয়। ঘৃত প্রদীপ দান, প্রথম শ্রেণীর দান। তিল, সরষে ইত্যাদির তেলে জ্বালানো প্রদীপ দান, দ্বিতীয় শ্রেণীর দান। যে নিজ শরীরের পুষ্টি চায়, তার কখনো চর্বি বা পশুর রসে প্রদীপ জ্বালানো উচিত নয়। নিজ কল্যাণের জন্য মানুষের প্রতি সন্ধ্যায় পার্বত্য ঝরনার কাছে, বনে, মন্দিরে এবং চৌরাস্তায় দীপদান করা উচিত। দীপদানকারী ব্যক্তি নিজ কুল উদ্দীপ্তকারী, শুদ্ধ চিত্ত, শ্রীসম্পন্ন হয় এবং অন্তকালে প্রকাশময় লোকে গমন করে।

এবার আমি দেবতা, যক্ষ, সর্প, মানুষ, ভূত এবং রাক্ষসদের উদ্দেশ্যে বলি দিলে যে লাভ হয়, তার বর্ণনা করছি। যারা নিজেদের আহারের পূর্বে প্রথমে দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও বালকদের আহার করায় না, তাদের অমঙ্গলকারী রাক্ষস বলে জানবে। তাই গৃহস্থ মানুষের কর্তব্য হল দেবতার পূজা করে তাঁকে প্রণাম করে সর্বপ্রথম অন্ন তাঁকেই অর্পণ করা ; কারণ দেবতারা সর্বদা মানুষের অর্পণ করা ভোগ স্বীকার করে তাদের আশীর্বাদ করেন। আগত অতিথি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প প্রমুখ গৃহস্থ প্রদত্ত অন্নেই জীবন ধারণ করে এবং প্রসন্ন হয়ে গৃহস্থকে আয়ু, যশ ও ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করে। দেবতাকে যে ভোগ দেওয়া হয়, তা দুধ-দই দিয়ে প্রস্তুত পরম পবিত্র, সুগন্ধিত, দর্শনীয় এবং ফুলের দ্বারা সুশোভিত হওয়া উচিত। নাগেদের পদ্ম ও উৎপলযুক্ত ভোগ প্রিয়, ভূতেদের গুড় মিশ্রিত তিলের খাদ্য দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি দেবতা প্রভৃতিকে অগ্রভাগ দিয়ে ভোজন করে সে উত্তম ভোগের দ্বারা সম্পন্ন, বলবান এবং বীর্যবান হয় ; তাই দেবতাদের পূজা করে তাঁদের অবশ্যই অগ্রভাগ প্রদান করা উচিত। গৃহস্থের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বদাই তাদের গৃহে প্রকাশিত হয়ে থাকেন, তাই কল্যাণকামী মানুষের সর্বদা আহারের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁকে পূজা করা উচিত।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! শুক্রাচার্য এইভাবে এই প্রসঙ্গ অসুররাজ বলিকে শুনিয়েছিলেন এবং মনু সুবর্ণমুনিকে এর উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর সুবর্ণ নারদকে এবং নারদ আমাকে এই ধূপ-দীপ ইত্যাদি দানের গুণ বলেছিলেন। পুত্র ! এই বিধি জেনে তুমিও সেই অনুযায়ী সব কাজ করো।

—০—

অনশন-ব্রতের মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি অনেক প্রকার দান, শান্তি, সত্য এবং অহিংসা ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন, এবার বলুন কোন বল তপোবলের থেকে বড় ? তপস্যার থেকেও যদি কোন উৎকৃষ্ট সাধন থাকে, তা ব্যাখ্যা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মানুষ যেমন তপ করে, সেই অনুসারে সে উত্তমলোক লাভ করে ; সুতরাং তপের থেকে বড় কোনো সাধন নেই। কিন্তু আমার মতে সর্বপ্রকার তপস্যার মধ্যে অনশন-ব্রত শ্রেষ্ঠ। অনশনের থেকে বড় আর কোনো তপস্যা নেই। এই ব্যাপারে ভগীরথ এবং ব্রহ্মার আলোচনারূপ এক প্রচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। আমরা শুনেছি যে রাজা ভগীরথ দেবলোক লঙ্ঘন করে ঋষিদের জন্য নির্দিষ্ট ব্রহ্মলোকে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তাঁকে দেখে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন—'ভগীরথ ! এই লোকে আসা তো অত্যন্ত কঠিন, তুমি কী করে এলে ? মানুষ, দেবতা ও গন্ধর্বও তপস্যা না করে এখানে আসতে পারে না ; তাহলে তুমি কী প্রকারে এসেছ?'

ভগীরথ বললেন—প্রভু ! আমি ব্রহ্মচর্য পালন করে প্রত্যহ একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণদের দান করতাম ; কিন্তু তাতেও আমার এখানে আসা সম্ভব হয়নি। আমি এক রাত্রে এবং পাঁচ রাত্রে সমাপ্ত হওয়া যজ্ঞ দশ বার করে করেছি। একাদশ রাত্রে পূর্ণ হওয়া যজ্ঞ একাদশ বার অনুষ্ঠিত করেছি এবং একশত বার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের যজন করেছি ; কিন্তু সেই যজ্ঞগুলির জন্যও আমি এই লোক প্রাপ্ত হইনি। একশত বৎসর নিরন্তর আমি গঙ্গাতীরে বাস করে যে কঠোর তপস্যা করেছি এবং সেই স্থানে যে হাজার হাজার পশু ও কন্যাদান করেছি, সেই পুণ্যপ্রভাবেও আমি এখানে আসিনি। পুষ্করতীর্থে এক লক্ষ বার যে ব্রাহ্মণদের একলাখ ঘোড়া, দুলাখ গাভী ও সোনার গহনা বিভূষিত ষাট হাজার সুন্দরী কন্যা দান করেছি, সেই পুণ্যের প্রভাবেও আমি এখানে আসিনি। গোসব নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাতে একশো দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করেছি। তখন এক একজন ব্রাহ্মণ দশটি করে গাভী পেয়েছিলেন, প্রতিটি গাভীর সঙ্গে তার গোবৎস ও স্বর্ণময় দুগ্ধপাত্রও দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু সেই যজ্ঞও আমাকে এখানে আনেনি। বহুবার সোমযাগের দীক্ষা নিয়ে তাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রথম প্রসূতা দুগ্ধদানকারী দশটি করে গাভী এবং এক শত করে রোহিণী জাতির গাভী দান করি। তাছাড়াও দশ বার করে লাখ লাখ দুধেল গাভী প্রদান করি ; কিন্তু সেই পুণ্যেও আমি এই লোকে আসিনি। বাহ্লীক দেশে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণের এক লাখ ঘোড়াকে স্বর্ণ মালাতে সজ্জিত করে ব্রাহ্মণদের দান করেছি ; কিন্তু সেই পুণ্যের জোরেও আমি এখানে আসিনি। এক একটি যজ্ঞে আঠারো কোটি করে স্বর্ণমুদ্রা দান করেছি, কিন্তু তার জন্যও এখানে আসিনি। তারপর স্বর্ণমালা বিভূষিত সবুজ রংয়ের সতেরো কোটি শ্যামকর্ণ ঘোড়া, বিশাল দাঁতযুক্ত স্বর্ণমালামণ্ডিত সতেরো হাজার হাতি এবং স্বর্ণময় উপকরণে সাজানো, স্বর্ণমণ্ডিত ঘোড়াযুক্ত সতেরো হাজার রথ দান করেছি। এতদ্ব্যতীত বেদে যেসব বস্তু দক্ষিণার অঙ্গরূপে বলা আছে, দশ বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সে সবও আমি দান করেছি। যজ্ঞ ও পরাক্রমে যারা ইন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন, তেমন হাজার হাজার রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়েছি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কথায় পরাজিত রাজাদের বন্ধন মুক্ত করেছি)। জগতের সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে বহু ধন ব্যয় করে আট বার রাজসূয় যজ্ঞ করেছি ; কিন্তু কোনো যজ্ঞই আমাকে ব্রহ্মলোকে পাঠাতে সক্ষম হয়নি। আমার প্রদত্ত দক্ষিণাতে গঙ্গার সম্পূর্ণ স্রোত আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই কারণেও আমি ব্রহ্মলোকে পৌঁছতে সক্ষম হইনি। সেই যজ্ঞে আমি প্রতিটি ব্রাহ্মণকে তিন বার করে স্বর্ণালংকার বিভূষিত দুহাজার ঘোড়া এবং এক শত করে গ্রাম সমর্পণ করেছিলাম। মিতাহারী, মৌন এবং শান্তভাবে থেকে আমি হিমালয় পর্বতে বহুদিন ধরে তপস্যা করেছি, যাতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান শংকর গঙ্গামাতার দুঃসহ ধারা মস্তকে ধারণ করেন ; কিন্তু সেই তপস্যাও আমার এখানে আসার কারণ নয়। আমি বহুবার শম্যাপ্রাস যজ্ঞ[১] করেছি, দশ হাজার সাদ্যস্ক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছি, কতবার বারো-তেরো দিনে সমাপ্ত হওয়া যজ্ঞ এবং পুণ্ডরীক নামক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেছি ; কিন্তু তার ফলেও এখানে আসা সম্ভব হয়নি। শুধু

---

[১]যজ্ঞকর্তা 'শম্যা' নামক কাষ্ঠের শক্ত লাঠি খুব জোরে ছুঁড়ে ফেলে, সেই লাঠি যতদূরে গিয়ে পড়ে, ততদূরে যজ্ঞের বেদী প্রস্তুত করা হয় ; সেই বেদীর ওপরে যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে 'শম্যাক্ষেপ' অথবা 'শম্যাপ্রাস' যজ্ঞ বলা হয়ে থাকে।

তাই নয়, আমি আট হাজার শ্বেতবর্ণ বলদও ব্রাহ্মণদের দান করেছি, যার শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত। অনেক বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাতে বহু স্বর্ণরত্ন, রত্নময় পর্বত, ধনধান্যসম্পন্ন হাজার হাজার গ্রাম এবং দুগ্ধবতী সহস্র সহস্র গাভী ব্রাহ্মণদের দান করেছি ; কিন্তু সেইসব পুণ্যের ফলেও আমি এখানে আসিনি। আমি এক বার একাদশাহ এবং দুবার দ্বাদশাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি। আমি ষোলো বার আর্কায়ণ এবং অনেকবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছি ; কিন্তু তার জন্যও আমি এই লোকে আসিনি। চার ক্রোশ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থবিশিষ্ট এক বন, যার প্রত্যেক বৃক্ষ সোনা ও রত্নমণ্ডিত ছিল, আমি দান করেছি ; কিন্তু তার ফলও আমাকে এখানে আনতে সক্ষম হয়নি। আমি ত্রিশ বৎসর ধরে ক্রোধরহিত হয়ে 'তুরায়ণ' নামক এক দুস্তর ব্রত পালন করি, যাতে প্রত্যহ নয় শত গাভী ব্রাহ্মণদের দেওয়া হত। এছাড়া রোহিণী (কপিলা) জাতির বহু দুগ্ধবতী গাভী এবং বহু বলদও দান করেছিলাম ; কিন্তু সেই সব দানের ফলে এই লোকে আসিনি। আমি ত্রিশ বার অগ্নিচয়ন, আট বার সর্বমেধ এবং এক শত আঠাশ বার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেছি, কিন্তু তার ফলেও এখানে আসতে পারিনি। সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা এবং নৈমিষারণ্য তীর্থে গিয়ে আমি দশ লাখ গোদান করেছি ; কিন্তু তার ফলও আমাকে এখানে আনতে সক্ষম হয়নি। (কেবল অনশন-ব্রতের প্রভাবে আমি এই দুর্লভ লোক প্রাপ্তি হয়েছে।) প্রথমে ইন্দ্র স্বয়ং অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করে তা গুপ্ত রেখেছিলেন, তারপর শুক্রাচার্য তপস্যার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করেন ; পরে তাঁরই তেজে এই ব্রতের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। আমিও শেষে সেই ব্রতের সাধন আরম্ভ করি ; যখন তার পূর্তি হয়, সেই সময় হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ও ঋষি আমার কাছে পদার্পণ করেন। তাঁরা সকলেই আমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তাঁরা প্রসন্ন হয়ে আমাকে আদেশ দিলেন 'রাজন্ ! তুমি ব্রহ্মলোকে যাও।' এইভাবে (আমার অনশন-ব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে সেই) হাজার হাজার ব্রাহ্মণের আশীর্বাদের সাহায্যে আমার এই দুর্লভ লোকে আসার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে ; এর কোনো অন্যথা ভাববেন না। আমি নিজ ইচ্ছানুসারে বিধিপূর্বক অনশন-ব্রত পালন করেছি। আপনি জিজ্ঞাসা করায় সব কথা যথার্থরূপে নিবেদন করেছি। আমার মনে হয় অনশন ব্রতের থেকে বড়ো আর কোনো তপস্যা নেই। দেবেশ্বর ! আপনাকে সাদর প্রণাম, আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! রাজা এই কথাগুলি বলায় ব্রহ্মা তাঁকে বিধিসম্মতভাবে আতিথ্য-সৎকার করলেন। সুতরাং তুমিও সর্বদা অনশন-ব্রত পালন করে ব্রাহ্মণদের পূজা করো ; কারণ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে ইহলোকের ও পরলোকের সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

আয়ু বৃদ্ধি এবং হ্রাসকারী শুভাশুভ কর্মাদির বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে 'মানুষের আয়ু শত বর্ষের হয়, সে নানাপ্রকার শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।' কিন্তু দেখা যায় বহু মানুষ শিশুকালেই কালগ্রাসে পতিত হয় ; এর কারণ কী ? কী উপায়ে মানুষ তার পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত জীবিত থাকে ? কী কারণে তার আয়ু কম হয়ে যায় ? কী করলে যশ লাভ হয় এবং কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান করলে লক্ষ্মীলাভ হয় ? মানুষ কায়মনোবাক্যে তপ, ব্রহ্মচর্য, জপ, হোম এবং ঔষধাদি সাধনগুলির মধ্যে কীসের আশ্রয় গ্রহণ করবে, যাতে তার মঙ্গল হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি যা জিজ্ঞেস করছ তার উত্তর দিচ্ছি, শোনো। সদাচারের দ্বারাই মানুষের আয়ু, লক্ষ্মী এবং ইহলোকে-পরলোকে কীর্তি লাভ হয়। দুরাচারী ব্যক্তি, যার থেকে সমস্ত প্রাণী ভয় পায় এবং তিরস্কৃত হয়, সে এই জগতে দীর্ঘ আয়ু পায় না ; সুতরাং মানুষ যদি নিজের কল্যাণ চায়, তাহলে তাকে সদাচার পালন করতে হবে। যত বড় পাপী হোক না কেন, সদাচার তার কুপ্রবৃত্তিগুলি দমন করে। সদাচার ধর্মের এবং সচ্চরিত্র হল উত্তম পুরুষের লক্ষণ। সাধুপুরুষ যেমন ব্যবহার করেন, সদাচারের সেটিই স্বরূপ। যে ব্যক্তি ধর্মাচরণ করে এবং লোক-কল্যাণের কাজে ব্যাপৃত থাকে, তাকে সাক্ষাৎভাবে না পাওয়া গেলেও মানুষ শুধু তার নাম শুনেই তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। নাস্তিক, অকর্মণ্য, গুরু ও শাস্ত্র-নির্দেশ লঙ্ঘনকারী এবং ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ দুরাচারী ব্যক্তির

আয়ু ক্ষীণ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শীলবর্জিত, ধর্মের মর্যাদা ভঙ্গকারী এবং অন্য বর্ণের নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সে ইহলোকে অল্পায়ু হয় এবং মৃত্যুর পর নরকগামী হয়। সর্ব-প্রকার শুভলক্ষণ বর্জিত হয়েও যে ব্যক্তি সদাচারী, শ্রদ্ধালু এবং ঈর্ষারহিত হয়, সে এক শত বছর জীবিত থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধহীন, সত্যবাদী, প্রাণীদের হিংসা করে না, দোষদৃষ্টিরহিত এবং কপটতাশূন্য, তার আয়ু এক শত বছর হয়। যে ব্যক্তি সর্বদা অশুদ্ধ এবং চঞ্চল, সে দীর্ঘায়ু হয় না।

প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে) নিদ্রাভঙ্গ করে ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিচার করবে। তারপর শয্যাত্যাগ করে স্নানাদির পর আচমনপূর্বক দুহাত জোড় করে প্রাতঃকালীন উপাসনা করবে। সন্ধ্যার সময় এইভাবে মৌন হয়ে উপাসনা করবে। উদয়, অস্ত, গ্রহণ এবং মধ্যাহ্নের সময় সূর্যের দিকে তাকাবে না, জলেও ছায়া দেখবে না। ঋষিগণ প্রত্যহ সন্ধিকালে উপাসনা করার জন্যই দীর্ঘজীবী হয়ে থাকেন ; সুতরাং দ্বিজমাত্রেরই মৌনভাবে থেকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় অবশ্যই উপাসনা করা উচিত। যে দ্বিজ ওই উভয় সময়ে উপাসনা করে না, ধার্মিক রাজা তার দ্বারা শূদ্রের কাজ করাবেন। কোনো বর্ণের পুরুষেরই অপর কোনো বর্ণের নারীর সঙ্গে সংসর্গ করা উচিত নয়। পরস্ত্রীগমন করলে মানুষের আয়ু শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়। জগতে এর মতো আয়ুনাশকারী আর কিছুই নেই।

শারীরিক সমস্ত কাজ সেরে, পবিত্র হয়ে দেবতার পূজা করা—এইসব দিনের প্রথম প্রহরেই করে নেওয়া উচিত। মলমূত্রের দিকে তাকাবে না এবং তার ওপর পা দেবে না। অতি প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যার সময় কোথাও বাইরে যাবে না। কোনো অচেনা পুরুষের সঙ্গে যাবে না, শূদ্রের সঙ্গেও নয় এবং একাকীও যাবে না। ব্রাহ্মণ, গাভী, রাজা, বৃদ্ধ, গর্ভিণী নারী, দুর্বল এবং বোঝা বহনকারী মানুষ যদি সামনে আসতে দেখা যায় তাহলে নিজে পাশে সরে গিয়ে তাদের যাওয়ার রাস্তা করে দেবে। পথ চলার সময় পরিচিত বৃক্ষাদি ও চার রাস্তার সংযোগস্থলকে ডানদিকে রাখবে। প্রভাত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন এবং রাত্রে, বিশেষ করে অর্ধেক রাত্রে কখনো চৌরাস্তায় থাকবে না। অন্যের পরিহিত বস্ত্র বা জুতা পরবে না। সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন করবে। পায়ের ওপর পা রাখবে না। দুপক্ষেরই অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী এবং অষ্টমী তিথিতে স্ত্রী-সমাগম করা উচিত নয়। অন্যের নিন্দা, বদনাম করা উচিত নয়। কারো মনে আঘাত করবে না, ক্রূর বাক্য বলবে না, অপরকে অপমান করবে না। যে কথায় অপরের উদ্বেগ হয়, সেই রুক্ষ, কটু কথা পাপীদের লোকে নিয়ে যায় ; এরূপ শব্দ কখনো মুখ দিয়ে বের করতে নেই। বাক্যরূপ বাণ মুখ থেকে নির্গত হয়, এর আঘাতে মানুষ রাত-দিন শোকমগ্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং যাতে মানুষ মর্মে আঘাত পায়, বিদ্বান ব্যক্তিদের এমন কোনো বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। বাণবিদ্ধ আঘাত এবং কাঁটি দিয়ে কাটা বন পুনরায় ঠিক হয়ে যায় কিন্তু দুর্বাক্যরূপ শস্ত্রের ভয়ংকর আঘাত কখনো সারে না। তা সর্বদা হৃদয়ে কষ্ট দিয়ে থাকে। হীনাঙ্গ (অন্ধ, কালা-বোবা), অধিকাঙ্গ (যার একটি আঙুল বা হাত বেশি), অশিক্ষিত, কুরূপ, নির্ধন এবং মিথ্যাবাদী মানুষদের উপহাস করা উচিত নয়। নাস্তিকতা, বেদ-নিন্দা, দেবতার প্রতি অনুচিত আক্ষেপ, দ্বেষ, উগ্রতা এবং কঠোরতা—এইসকল দুর্গুণ ত্যাগ করা উচিত। ক্রোধান্বিত হয়ে পুত্র বা শিষ্য ব্যতীত কাউকে মারা উচিত নয়। শিক্ষার জন্য পুত্র ও শিষ্যকে তাড়না করা শাস্ত্রসম্মত। ব্রাহ্মণের নিন্দা থেকে দূরে থাকবে। গৃহে গৃহে গিয়ে নক্ষত্র-তিথীর প্রচার করবে না। এই সব নিয়ম পালন করলে মানুষের আয়ু কখনো ক্ষীণ হয় না।

মল-মূত্র ত্যাগ করা ও রাস্তা চলার পর এবং স্বাধ্যায় ও আহারের পূর্বে হাত পা ধৌত করা উচিত। যার ওপর কারো দূষিত দৃষ্টি পড়েনি, যা জল দিয়ে ধৌত করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণেরা যার প্রশংসা করে—এই তিন বস্তু দেবগণ ব্রাহ্মণদের ব্যবহারযোগ্য এবং পবিত্র বলে জানিয়েছেন। গৃহস্থ ব্যক্তির প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করা কর্তব্য ; সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা দেবে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথমে মাতা-পিতা, আচার্য এবং গুরুজনদের প্রণাম করা উচিত, এর দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ হয়। সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত কখনো শুয়ে থাকবে না ; কোনোদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে না জাগলে প্রায়শ্চিত্ত করবে। শাস্ত্রে যে বৃক্ষের ডালের দাঁতন নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, তা ব্যবহার করবে না। শাস্ত্রবিহিত বৃক্ষের ডালের দ্বারাই দন্ত ধাবন করবে, কিন্তু পর্বের দিন সেটিও ত্যাগ করবে। সর্বদা সাবধানে থেকে (দিনে) উত্তরদিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ করবে। দন্ত ধৌত না করে দেবতার পূজা করবে না, দেবপূজা না করে গুরু, বৃদ্ধ, ধার্মিক এবং বিদ্বান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কাছে যাবে না।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মলিন দর্পণে মুখ দেখবে না, গর্ভিণী

পত্নীর সঙ্গে সমাগম করবে না এবং উত্তর ও পশ্চিম দিকে মাথা করে শোবে না ; শুধুমাত্র পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মাথা করে শোবে। ভাঙা বা কমজোর খাটে শোওয়া উচিত নয়। অন্ধকারে পড়ে থাকা শয্যায় সহসা গিয়ে শয়ন করতে নেই (আলো জ্বেলে ভালোভাবে দেখে শয়ন করা উচিত)। খাটে বাঁকাভাবে শুতে নেই, সর্বদা সোজা হয়ে শোবে। কাজ থাকলেও নাস্তিক মানুষের সঙ্গে যাবে না ; তাঁর সঙ্গে কোনো কাজের প্রতিজ্ঞাও করবে না। আসনে পা দিয়ে টেনে বসবে না। কখনো উলঙ্গ হয়ে বা রাত্রে স্নান করবে না। স্নানের পর অঙ্গে তেল ইত্যাদি মালিশ করবে না। স্নান না করে চন্দন লাগাবে না। স্নানের পর ভেজা কাপড় পরবে না। গলায় পরিহিত মালা টানবে না, বস্ত্রের ওপরে মালা পরিধান করবে না এবং রজঃস্বলা নারীর সঙ্গেও কথা বলবে না। যে ক্ষেত্রে কৃষিকার্য হয় সেখানে, গ্রামের আশে-পাশে বা জলে কখনো মলমূত্র ত্যাগ করবে না। আহার গ্রহণ করার আগে তিন বার জল নিয়ে আচমন করবে এবং আহারের পরেও তিনবার আচমন করে দুবার মুখ ধোবে। সর্বদা পূর্ব দিকে মুখ করে মৌন হয়ে আহার করবে। পরিবেশন করা অন্নের নিন্দা করতে নেই। আহারের পর মনে মনে অগ্নির ধ্যান করা উচিত। যে ব্যক্তি পূর্ব দিকে মুখ করে আহার করে সে দীর্ঘায়ু, দক্ষিণ দিকে মুখ করে যে আহার করে তার যশ, যে পশ্চিম দিকে মুখ করে আহার করে তার ধন এবং যে উত্তরমুখে ভোজন করে তার সত্য প্রাপ্তি হয়। অগ্নি স্পর্শ করে জলের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়, সর্ব অঙ্গের, নাভির এবং দুই হাতের স্পর্শ করবে। ভস্ম, কেশ এবং মৃতের জিনিসের ওপর কখনো বসবে না। অপরের স্নান করা জল পরিত্যাগ করবে। শান্তি, হোম ও গায়ত্রী জপ করবে। উপবেশন করে আহার করবে, চলাফেরার সময় আহার করবে না। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে না। ছাইগাদা বা গোশালাতে প্রস্রাব করবে না। ভিজে পায়ে খাদ্যগ্রহণ করবে কিন্তু কখনো শোবে না। ভেজা পায়ে খাদ্যগ্রহণকারী মানুষ শতবৎসর জীবিত থাকে। আহারের পর হাত-মুখ না ধুলে মানুষ উচ্ছিষ্ট (অপবিত্র) থাকে। সেই অবস্থায় অগ্নি, গাভী এবং ব্রাহ্মণ—এই তিন তেজস্বীকে স্পর্শ করা উচিত নয়। এই বিধি মানলে আয়ু নাশ হয় না। উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র—এই ত্রিবিধ তেজের দিকে তাকানো উচিত নয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা এলে যুবা পুরুষের প্রাণ ওপর দিকে উঠতে থাকে ; সেই অবস্থায় যুবক ব্যক্তি যখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত ও প্রণাম জানায়, তখন তার প্রাণ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তাই যখন কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি কাছে আসেন, তাঁকে প্রণাম করে বসার আসন দিয়ে, তাঁর সেবায় উপস্থিত থাকবে। পরে তিনি যখন প্রস্থান করবেন, তখন তাঁর পিছন পিছন কিছু দূর যাবে।

জীর্ণ আসনে বসবে না, ভাঙা বাসনে কাজ করবে না। এক বস্ত্র (শুধু ধুতি) পরে আহার করবে না, সঙ্গে অন্তত গামছা রাখবে। উলঙ্গ হয়ে স্নান বা নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। উচ্ছিষ্ট অবস্থাতেও শয়ন করতে নেই, উচ্ছিষ্ট হাত মাথায় দেবে না ; কারণ সমস্ত প্রাণ মস্তকেই স্থিত। মাথার চুল ধরে টানা ও মাথায় আঘাত করা উচিত নয়। দুটি হাতের দ্বারা একসঙ্গে মাথা রগড়াবে না। বারবার মস্তকে জল দেবে না। এগুলি পালন করলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়। মাথায় তেল দিয়ে সেই হাত অন্য অঙ্গে দেবে না, তিলের তৈরি জিনিস খাওয়া উচিত নয়। এই বিধি মানলে আয়ু নাশ হয় না। উচ্ছিষ্ট মুখে পড়া বা পড়ানো উচিত নয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত হাওয়া প্রবাহিত হলে মনে মনেও স্বাধ্যায় চিন্তা করা উচিত নয়। প্রাচীন ব্যক্তিরা এই বিষয়ে যমরাজ গীত এক প্রাচীন ইতিহাস বলে থাকেন। (যমরাজ বলেন) 'যে ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট মুখে উঠে যায় এবং স্বাধ্যায় করে, আমি তার আয়ু নাশ করি এবং তার সন্তানদেরও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই। যে দ্বিজ অনধ্যায়ের সময় অধ্যয়ন করে, তার বৈদিক জ্ঞান এবং আয়ু বিনষ্ট হয়।' সুতরাং সাবধানী ব্যক্তির নিষিদ্ধ সময়ে কখনো অধ্যয়ন করা উচিত নয়।

যে ব্যক্তি সূর্য, অগ্নি, গাভী এবং ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করে এবং রাস্তার মধ্যে মূত্র ত্যাগ করে, সে গতায়ু হয়। দিবসকালে উত্তরাভিমুখে এবং রাত্রে দক্ষিণাভিমুখে মল-মূত্র ত্যাগ করলে আয়ু নাশ হয় না। যার দীর্ঘকাল জীবিত থাকার ইচ্ছা, সে যেন কখনো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং সর্প—এই তিন জনকে দুর্বল হলেও বিরক্ত না করে ; কারণ এরা সকলেই অত্যন্ত বিষধর। ক্রুদ্ধ সাপ যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর তাড়া করে দংশন করে। ক্ষত্রিয়ও ক্রুদ্ধ হলে নিজ শক্তির দ্বারা শত্রুকে শেষ করার চেষ্টা করে ; কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে তার দৃষ্টি ও সংকল্প দ্বারা অপমানকারী ব্যক্তির সমস্ত কুল দগ্ধ করে ফেলে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত, এদের যত্ন সহকারে সেবা করা। গুরুর সঙ্গে কখনো হঠকারিতা করা উচিত নয়। গুরু যদি অপ্রসন্ন হন, তাহলে তাঁকে নানাভাবে সম্মান জানিয়ে প্রসন্ন করার চেষ্টা করবে। গুরু প্রতিকূল ব্যবহার করলেও তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা উচিত। গুরুর নিন্দা করলে আয়ু নাশ হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিজ গৃহ হতে দূরে গিয়ে প্রস্রাব

করবে, দূরেই হাত-পা ধোবে এবং উচ্ছিষ্টাদি ফেলবে। বিদ্বান ব্যক্তির শ্বেতবর্ণের মালা ধারণ করা উচিত, লালবর্ণের নয়। তবে কমল লাল রংয়ের হলে কোনো বাধা নেই। লালফুল বা বন্যফুল মাথায় পরা উচিত। সোনার হার পরলে কখনো অশুদ্ধ হয় না। স্নানের পর কপালে চন্দনের টিপ পরা উচিত। অন্যের পরিহিত কাপড় পরবে না। শয়নের সময় আলাদা বস্ত্র, বাইরে যাওয়ার অন্য বস্ত্র এবং পূজার জন্য আলাদা বস্ত্র রাখা উচিত। চন্দন, বিল্ব, কেশর ইত্যাদি সুগন্ধী দ্রব্য শরীরে লাগানো উচিত। স্নান করে পবিত্র হয়ে বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে উপবাস করবে। সকল পর্বের সময় ব্রহ্মচর্য পালন করা প্রয়োজন। কারো সঙ্গে একপাত্রে আহার করা নিষিদ্ধ। রজস্বলা নারী যা ছুঁয়েছে এবং যার সার পদার্থ বেরিয়ে গেছে, সেরূপ অন্ন কখনো ভোজন করবে না। যে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে না দিয়ে আহার করবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো অপবিত্র মানুষ অথবা সাধু মানুষের সামনে বসে আহার করবে না। ধর্মশাস্ত্রে যা নিষিদ্ধ সেরূপ খাদ্য লুকিয়েও খাবে না। বিদ্বান ব্যক্তি হাতে লবণ নিয়ে চাটবে না। রাত্রে দই এবং ছাতু খাবে না। সাবধানে সকাল ও সন্ধ্যায় আহার করবে, এর মধ্যে কিছু খাবে না। বালকের সঙ্গে এক পাত্রে আহার করা নিষিদ্ধ। শত্রুর শ্রাদ্ধে কখনো অন্নগ্রহণ করবে না। আহারের সময় মৌন থাকা ও আসনে উপবেশন করা উচিত। আহারের সময় একবস্ত্র ধারণ করা, দাঁড়িয়ে থাকা, আহার্য বস্তু মাটিতে রেখে খাওয়া এবং কথা বলা নিষিদ্ধ। প্রথমে অতিথিকে খাদ্য পরিবেশন করে, পরে নিজে একাগ্র চিত্তে ভোজন করা উচিত। সকলকে একই পঙ্ক্তিতে বসিয়ে ভোজন করাবে, পঙ্ক্তিভেদ করবে না। যে নিজ সুহৃদদের না দিয়ে একাকী আহার করে, তার অন্ন বিষতুল্য। আহারের সময় (এই খাদ্য হজম হবে কি না এরূপ) আশঙ্কা করতে নেই এবং আহারের শেষে দই খাওয়া উচিত নয়, মাঠা (দই-এর ঘোল) খাওয়া উচিত। আহারের পর মুখ কুলকুচি করে ধোবে এবং পায়ে জল দেবে। তারপর জলদ্বারা চোখ, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদি ও নাভি স্পর্শ করে দুই হাত ধুয়ে ফেলবে। হাত ধোওয়ার পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেবে। আঙুলের মূলস্থানকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে, আঙুলের অগ্রভাগ দেবতীর্থ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ বলা হয়, শ্রাদ্ধতর্পণ ইত্যাদি পৈতৃক কর্ম শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্বদা পিতৃতীর্থেই করা উচিত।

যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল চায় তার অপরের নিন্দা এবং অপ্রিয় বাক্য বলা উচিত নয়, কাউকে ক্রুদ্ধ করে তোলা উচিত নয় এবং পতিত মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও উচিত নয়। তাদের দর্শন এবং স্পর্শও ত্যাগ করা উচিত। এরূপ করলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়। কুমারী কন্যা, কুলটা বা বেশ্যার সঙ্গে সংসর্গ করবে না। নিজ পত্নীর সঙ্গেও দিবসকালে বা ঋতুর অতিরিক্ত সময়ে সমাগম করবে না, এতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। নিজ নিজ তীর্থে আচমন করে কার্য আরম্ভ করবে এবং সেটি পূর্ণ হলে পুনরায় তিন বার আচমন করে দুবার মুখ মুছে নেবে—এতে মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায়। প্রথমে চক্ষু-নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদি একবার স্পর্শ করে তিন বার নিজের ওপর জল ছেটাবে ; তারপর বেদোক্ত বিধি অনুসারে দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ করবে।

এবার ব্রাহ্মণদের জন্য আদি ও অন্তে যে পবিত্র এবং হিতকারক শুদ্ধির বিধান আছে, তা জানাচ্ছি, শোনো। ব্রাহ্মণের প্রত্যেক শুদ্ধি-কর্মে ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করা উচিত। থুতু ফেলা ও হাঁচির পর আচমন করলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়। বৃদ্ধ আত্মীয় এবং দরিদ্র মিত্রকে নিজের গৃহে আশ্রয় দেওয়া উচিত ; এতে ধন ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। তোতা ও ময়না ইত্যাদি পাখি ঘরে থাকা অভ্যুদয়কারী ও মঙ্গলময় হয়। গৃধ্র, জঙ্গলি পায়রা (ঘুঘু) এবং ভ্রমর নামক পাখি কখনো গৃহে এলে শান্তিকর্ম করানো উচিত, কারণ এগুলি অমঙ্গলকারক হয়ে থাকে। মহাত্মা ব্যক্তিদের নিন্দাতেও মানুষের অকল্যাণ হয়। মহাত্মা পুরুষের গুপ্তকর্ম কখনো কোথাও প্রকাশ করতে নেই। অপরের স্ত্রীর সঙ্গে কখনো সংসর্গ করবে না। এটি মানলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হয়। উন্নতিকামী বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত ব্রাহ্মণের দ্বারা বাস্তু পূজা করে ভালো কারিগরের দ্বারা গৃহ তৈরি করে তাতে বাস করা। সন্ধ্যার সময় (গোধূলিতে) নিদ্রা যাওয়া, পড়া বা আহার করা নিষিদ্ধ বলা হয়, এই সব পালন করলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। যারা নিজ কল্যাণ চায় তাদের রাত্রে শ্রাদ্ধ করা, স্নান করা নিষেধ। খাওয়ার পর চুল আঁচড়াতে বারণ করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার বস্তু সঠিক মাত্রায় আহার করা উচিত। জল-পাত্রে রাখা জল পান করবে। রাত্রে বেশি পরিমাণে আহার করবে না। পক্ষীহিংসা থেকে দূরে থাকবে। উত্তম বংশজাত এবং যোগ্য বয়স প্রাপ্ত সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করবে। তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে বংশপরম্পরা রক্ষা করবে। জ্ঞান ও কুলধর্ম শিক্ষার জন্য পুত্রকে বিদ্বান গুরুর আশ্রমে পাঠাবে। কন্যা জন্মগ্রহণ করলে কুলীন এবং বুদ্ধিমান বরের সঙ্গে তার বিবাহ দেবে। পুত্রের বিবাহও উত্তম বংশজাত কন্যার সঙ্গে দেবে, ভৃত্যও

ভালোবংশ থেকে নিযুক্ত করবে। মাথা ভিজিয়ে স্নান করে দেবকার্য বা পিতৃকার্য করবে। যে নক্ষত্রে নিজের জন্ম, সেই নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা অনুচিত। পূর্বা, উত্তর ভাদ্রপদ এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রেও শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ। (অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূল ইত্যাদি) সম্পূর্ণ উগ্র নক্ষত্রসমূহ এবং প্রত্যরিতারা[1] ও পরিত্যাগ করা উচিত। সারাংশ হল এই যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যেসব নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ নিষেধ করা হয়েছে, সেই সব নক্ষত্রে পিতৃকার্য এবং দেবকার্য করা উচিত নয়। পূর্ব বা উত্তর মুখে ক্ষৌরকর্ম করা উচিত, তাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। নিন্দা করা অধর্ম, তাই অপরের বা নিজেরও নিন্দা করা উচিত নয়।

যে কন্যার কোনো অঙ্গ নেই অথবা যে অধিক অঙ্গসম্পন্ন, যার গোত্র এবং প্রবর নিজেরই সমান এবং যে মাতুলকুলে জন্ম নিয়েছে, তাকে বিবাহ করা উচিত নয়। যার কুল জানা নেই, যে নীচ কুলোদ্ভব, যার দেহবর্ণ হলুদ, যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত—এরূপ কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। যে কুলে কারো মৃগীরোগ, শ্বেতী বা যক্ষ্মারোগ আছে, সেই কুলের কন্যাও বিবাহযোগ্য নয়। যে নারী সুলক্ষণা, উত্তম আচরণসম্পন্ন এবং দেখতে সুন্দর, তাকেই বিবাহ করা উচিত। নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা সমান কুলে বিবাহ করা উচিত। নিজ কল্যাণে ইচ্ছুক ব্যক্তির নীচ জাতি এবং পতিত কন্যার পাণিগ্রহণ করা উচিত নয়। অগ্নিস্থাপন করে ব্রাহ্মণ কথিত সম্পূর্ণ বেদবিহিত ক্রিয়া যত্নপূর্বক অনুষ্ঠান করা উচিত। প্রত্যেক উপায়ে নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষা করলে আয়ু ক্ষীণ হয়, তাই ঈর্ষা ত্যাগ করা উচিত। সকালে, সূর্যোদয়ের সময় এবং দিবসে নিদ্রা গেলে আয়ু ক্ষীণ হয়। ভালো লোকেরা রাত্রে অপবিত্রভাবে নিদ্রা যায় না। পরনারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা এবং ক্ষৌরকর্মের পর স্নান না করা আয়ু নাশক হয়ে থাকে। অপবিত্র অবস্থায় বেদাভ্যাস যত্নপূর্বক ত্যাগ করবে। সন্ধ্যার সময় স্নান, ভোজন ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। সেই সময় শুদ্ধচিত্তে ধ্যান ব্যতীত অন্য কোনো কাজ করবে না। ব্রাহ্মণদের পূজা, দেবতাদের নমস্কার এবং গুরুজনদের প্রণাম স্নানের পরেই করা উচিত। বিনা আমন্ত্রণে কোথাও যাওয়া উচিত নয় ; কিন্তু যজ্ঞ দেখার জন্য কোনো আমন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। যেখানে সম্মান পাওয়া যায় না, সেখানে গেলে আয়ু নাশ হয়। একাকী বিদেশ যাত্রা এবং রাত্রে যাত্রা করা বারণ। কোনো কাজে বাইরে গেলে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। মাতা-পিতা এবং গুরুজনের আদেশ অবিলম্বে পালন করা উচিত। তাঁদের নির্দেশ হিতকর না অহিতকর, তা বিচার করা উচিত নয়।

যুধিষ্ঠির ! ক্ষত্রিয়ের বেদ ও ধনুর্বেদ যত্নপূর্বক অভ্যাস করা উচিত, হাতি-ঘোড়া চালনা করা, রথ চালনা করার নৈপুণ্যও থাকা উচিত। রাজন্ ! তুমি সর্বদা উদ্যোগী থাকবে ; উদ্যোগী মানুষই সুখী এবং উন্নতি করে। শত্রু, ভৃত্য, স্বজনও তাকে পরাজিত করতে পারে না। যে রাজা সর্বদা প্রজাদের রক্ষায় ব্যস্ত থাকে, তার কখনো কোনো ক্ষতি হয় না। তুমি তর্কশাস্ত্র এবং শব্দশাস্ত্র (ব্যাকরণ) অধ্যয়ন করো। সংগীত এবং সমস্ত কলাবিদ্যার জ্ঞানও আহরণ করো। তোমার প্রত্যহ পুরাণ, ইতিহাস, উপাখ্যান ও মহাত্মাদের জীবনচরিত শ্রবণ করা উচিত। নিজ পত্নী রজস্বলা হলে তার কাছে যাবে না এবং তাকেও নিজের কাছে ডাকবে না। চতুর্থ দিন স্নানের পর রাত্রে তার কাছে যাবে। পঞ্চম (ঋতুস্নানের দ্বিতীয়) দিবসে পত্নীর সঙ্গ করলে কন্যা, ষষ্ঠ (ঋতুস্নানের তৃতীয়) দিবসে সহবাস করলে পুত্র জন্ম নেয়। বিদ্বান ব্যক্তিদের এই নিয়মে স্ত্রী-সমাগম করা উচিত। স্বজাতীয় বন্ধু, সম্বন্ধী এবং মিত্রদের সর্বদা সম্মান করা উচিত। যজ্ঞ করে নিজ শক্তি অনুসারে নানাপ্রকার দক্ষিণা দেওয়া উচিত। তারপর গার্হস্থ্য কর্ম সমাপন হলে বাণপ্রস্থ নিয়মাদি পালন করে বনে নিবাস করা উচিত। যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে আয়ুবৃদ্ধিকারী সমস্ত নিয়ম সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। যা বাকি আছে তা তুমি বেদ-বিদ্বান ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ো। সদাচারই কল্যাণের জনক এবং কীর্তি বৃদ্ধিকারী, তাতেই আয়ুবৃদ্ধি হয় এবং কুলক্ষণগুলি দূরীভূত হয়। সম্পূর্ণ আগমে সদাচারকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সদাচার থেকেই ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং ধর্মের প্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়। পূর্বকালে ব্রহ্মা দয়া করে সব বর্ণের লোককে এই উপদেশ দান করেছিলেন। এটি যশ, আয়ু এবং স্বর্গপ্রাপ্তিকারী ও পরম কল্যাণের আধার।

—— ০ ——

[1]নিজের জন্ম-নক্ষত্র থেকে বর্তমান দিনের নক্ষত্র পর্যন্ত গণনা করবে, গোণার পর যত সংখ্যা হয় তাকে নয় দিয়ে ভাগ করবে, যদি পাঁচ বাকি থাকে, তাহলে সেই দিনের নক্ষত্রকে 'প্রত্যরিতারা' বলে জানবে।

ভ্রাতাদের পারস্পরিক ব্যবহার এবং উপবাসের ফল বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পারস্পরিক ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত ? কৃপা করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! তুমি তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে সব থেকে বড়, সুতরাং সেই মতোই ব্যবহার করো। গুরু শিষ্যদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেন, তেমনই তোমার নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। যদি গুরু এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিচার শুদ্ধ না হয়, তাহলে শিষ্য বা কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তার নির্দেশের অধীনে থাকতে পারে না। জ্যেষ্ঠ দীর্ঘদর্শী হলে কনিষ্ঠও দীর্ঘদর্শী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উচিত প্রয়োজনে ক্ষমা, সহনশীলতা প্রভৃতির দ্বারা সংঘাত এড়িয়ে কনিষ্ঠের কুমতি দূর করে সুমতি ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি কোনো অপরাধ করে ফেলে তবে তা দেখেও না দেখা, জেনেও অজ্ঞ হয়ে থাকা এবং তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলা যাতে তার অপরাধ করার প্রবৃত্তি দূর হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি প্রত্যক্ষভাবে অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রদান করে, তাহলে অগ্রজের ঐশ্বর্য-প্রতাপ দেখে হিংসাকারী শত্রু তার ভ্রাতাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুনীতির দ্বারা কুলকে উন্নত করে কিংবা কুনীতির আশ্রয়ে কুলকে বিনাশের গহ্বরে ফেলে দেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিন্তাধারা যদি খারাপ হয় সেখানে তার সমস্ত কুল নষ্ট হয়ে যায়। বড় হয়ে যে ছোটর সঙ্গে কুটিলতাপূর্ণ আচরণ করে, সে বড় বলারও যোগ্য নয় আর বড়র মর্যাদা পাওয়ারও অধিকারী নয়। সে রাজা দ্বারা দণ্ড পাওয়ার যোগ্য। কপট ব্যক্তি নিঃসন্দেহে পাপময়লোকে (নরকে) গমন করে। তার জন্ম বৃথা বলে মনে করা হয়। যে কুলে পাপী মানুষ জন্ম নেয়, সেটি সম্পূর্ণ অনর্থের কারণ হয়ে ওঠে। পাপী ব্যক্তি কুলে কলঙ্ক লেপন করে এবং সুযশ নাশ করে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি পাপকর্মে ব্যাপৃত হয়, তবে সে পৈতৃক ভাগ পাওয়ার অধিকারী হয় না। কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের তাদের ন্যায়োচিত ভাগ না দিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পণ হিসাবে দেবে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পৈতৃক অর্থের সাহায্য ছাড়া নিজ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করে, তবে সে সেই ধনের স্বতন্ত্র মালিক হয়। তার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে সে ভ্রাতাদের তার ভাগ নাও দিতে পারে। যদি ভ্রাতাদের সম্পত্তি ভাগ না হয়ে থাকে এবং সকলে একসঙ্গে ব্যবসার দ্বারা সম্পত্তির উন্নতি করে থাকে, সেই অবস্থায় পিতার জীবিতকালে যদি সকলে পৃথক হতে চায় তাহলে পিতার উচিত সব পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভালো কাজ করুক বা খারাপ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার তাকে অপমান করা উচিত নয়। তেমনই স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি কুপথে যায়, তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত, তাকে কোনোভাবে সুপথে নিয়ে আসা। ধর্মজ্ঞ মানুষেরা বলেন 'ধর্মই কল্যাণের শ্রেষ্ঠ সাধন।' গৌরবে দশ আচার্যের থেকে শ্রেষ্ঠ উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায়ের থেকে বড় পিতা এবং দশ পিতার থেকে বড় মাতা। মায়ের গৌরব সমগ্র পৃথিবীর থেকে বড়। তাঁর সমান গুরু কেউ নেই। মাতার গৌরব সর্বাধিক হওয়ায় লোকে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মান জানিয়ে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার সমান মনে করা উচিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য হল কনিষ্ঠ ভ্রাতার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা। কনিষ্ঠ ভ্রাতারও উচিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মান জানানো, তাঁর আদেশ পালন করা এবং তাঁকে পিতার মতো সম্মান করে তাঁর আশ্রয়ে জীবন যাপন করা। মাতা-পিতা শুধু শরীর উৎপন্ন করেন ; কিন্তু আচার্যের উপদেশে যে জ্ঞানরূপ নবীন জীবন লাভ হয়, তা সত্য, অজর এবং অমর। জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে মায়ের সমান মনে করা উচিত। তেমনই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী ও শিশুকালে দুধ পান করায় যে ধাই—তারাও মাতৃসম।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সকল বর্ণের এবং ম্লেচ্ছ জাতির লোকেরাও উপবাসে মন দেয় ; কিন্তু এর কারণ বোঝা যায় না। শোনা যায় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়মাদি পালন করা উচিত। কিন্তু উপবাসের দ্বারা কী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তা বুঝতে পারছি না। আপনি কৃপা করে আমাদের উপবাসের সমস্ত নিয়ম এবং বিধি বলুন। উপবাসকারী কী গতি লাভ করে, তাও বর্ণনা করুন। বলা হয় উপবাস অত্যন্ত দুর্লভ পুণ্য এবং সবথেকে বড় আশ্রয়। তাই আমি জানতে চাই উপবাস করে মানুষ কী ফল লাভ করে ? কোন্ কর্মের দ্বারা পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং কী করলে ধর্ম পালন হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! উপবাস করা যে অতি উত্তম কর্ম, সে সম্বন্ধে তুমি আজ আমাকে যেভাবে প্রশ্ন করছ,

আমিও পূর্বকালে পরম তপস্বী অঙ্গিরাকে এইভাবে প্রশ্ন করেছিলাম। আমার প্রশ্ন শুনে অগ্নিনন্দন অঙ্গিরা এই উত্তর দিয়েছিলেন—'কুরুনন্দন ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি উপবাস করার বিধান আছে। কোথাও কোথাও ছয় রাত ও এক রাতের উপবাসেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রজ্ঞেরা বৈশ্য এবং শূদ্রদের জন্য একাদিক্রমে দুই দিন উপবাসের কথা বলেছেন, তাদের জন্য ক্রমাগত তিন রাত উপবাসের বিধান নেই। মানুষ যদি পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং পূর্ণিমার দিন নিজ মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে উপবাস করে অথবা এক বেলা আহার করে, তাহলে সে ক্ষমাশীল, রূপবান এবং বিদ্বান হয় ; সে কখনো সন্তানহীন ও দরিদ্র হয় না। যে ব্যক্তি অষ্টমী এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে উপবাস করে, সে নীরোগ ও বলশালী হয়। যে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যাতেই মাত্র আহার করে, সে ছয় বর্ষের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করে এবং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, সে বিমানে চড়ে ব্রহ্মলোকে যায় এবং সেখানে এক হাজার বছর সসম্মানে বাস করে। পরে পুণ্য ক্ষয় হলে ইহলোকে এসে মহত্ত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। যে ব্যক্তি সারা বছর ধরে দুদিনে একবার আহার করে এবং সেই সঙ্গে অহিংসা, সত্য ও ইন্দ্রিয় সংযম পালন করে, সে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং দশ হাজার বছর স্বর্গলোকে সম্মান প্রাপ্ত হয়। যে সারা বছর তিন দিনে এক বার আহার করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয় এবং বিমানে চড়ে স্বর্গে গিয়ে চল্লিশ হাজার বছর আনন্দ উপভোগ করে। যে ব্যক্তি চারদিন পর পর খেয়ে এক বছর কাটায়, তার গবাময় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে স্বর্গে সুখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি এক এক পক্ষ উপবাস করে সারা বছর তপস্যা করে, তার ছয় মাস অনশন করার ফললাভ হয় এবং সে ষাট হাজার বছর স্বর্গবাস করে। যে এক বৎসর প্রতিমাসে একবার জলপান করে থাকে, তার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সে সত্তর হাজার বছর স্বর্গে আনন্দ অনুভব করে। একমাসের বেশি উপবাস কারো করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি রোগ-ব্যাধিরহিত অবস্থায় অনশন করে, সে পদে পদে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই ব্যক্তি দিব্য বিমানে করে স্বর্গে যায় এবং সেখানে এক লক্ষ বৎসর আনন্দ উপভোগ করে। দুঃখী অথবা রুগ্ন মানুষও যদি উপবাস করে, তাহলে সে এক লক্ষ বৎসর সুখপূর্বক স্বর্গে বাস করে। বেদের থেকে বড় কোনো শাস্ত্র নেই, মাতার সমান গুরু নেই, ধর্মের থেকে বড় কোনো লাভ নেই এবং উপবাসের থেকে বড় কোনো তপস্যা নেই। ইহলোকে এবং পরলোকে যেমন ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো পরিত্রাতা নেই, তেমনই উপবাসের মতো কোনো তপস্যা নেই। দেবতারা নিয়মপূর্বক উপবাস করেই স্বর্গলাভ করেছেন এবং ঋষিগণও উপবাস দ্বারাই উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। পরম বুদ্ধিমান বিশ্বামিত্র এক হাজার দিব্য বৎসর প্রতিদিন একবার আহার করে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে তপস্যায় রত ছিলেন, সেইজন্যই তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। চ্যবন, জামদগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম এবং ভৃগু—এই সকল ক্ষমাশীল মহর্ষি উপবাসের দ্বারাই দিব্যলোক লাভ করেছেন। কুন্তীনন্দন ! মহর্ষি অঙ্গিরা কথিত এই উপবাসব্রত বিধি যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠ করে ও শোনে, সেই ব্যক্তির পাপের বিনাশ হয়। সে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ পাপ থেকে মুক্তি পায় এবং তার মনে কখনো দোষের প্রভাব পড়ে না। শুধু তাই নয়, সে পশু-পক্ষীদের ভাষাও বুঝতে পারে এবং জগতে তার অক্ষয় কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে।

—০—

দরিদ্রদের জন্য যজ্ঞতুল্য ফলপ্রদানকারী উপবাস-ব্রতের উপদেশ এবং মানস ও পার্থিব তীর্থের মহত্ত্ব

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! রাজা এবং রাজকুমারদের কখনো অর্থাভাব হয় না। তারা একাকী বা অসহায়ও হয় না, সুতরাং তাদের দ্বারা বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়া সম্ভব ; কিন্তু অর্থহীন, গুণহীন, একাকী ও অসহায় মানুষ সেরূপ যজ্ঞ করতে পারে না। তাই যে কর্মের অনুষ্ঠান দরিদ্রদের পক্ষে সহজ এবং বড় বড় যজ্ঞের মতো ফলপ্রদায়িনী, তার বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! অঙ্গিরা মুনি কথিত উপবাস বিধি, যজ্ঞের মতোই ফলদায়ক। পুনরায় তার বর্ণনা করছি শোনো—যে ব্যক্তি অহিংসাপরায়ণ হয়ে নিত্য অগ্নিহোত্র

অনুষ্ঠান করে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ভোজন করে, মধ্যবর্তী সময়ে জলও পান করে না, সে ছয় বৎসরের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করে এবং অগ্নির ন্যায় তেজস্বী প্রজাপতিলোকে এক পদ্ম বৎসর নিবাস করে। যে ব্যক্তি এক-পত্নী ব্রত পালন করে নিরন্তর তিন বৎসর কাল প্রত্যহ একবার আহার করে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে নিত্য অগ্নিতে হোম করে এক বৎসর প্রতি দ্বিতীয় দিনে একবার আহার করে এবং সর্বদা প্রভাতে উঠে অগ্নিহোত্রের কার্যে ব্যাপৃত থাকে, সেও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞেরই ফলভাগী হয়। যে বারো মাস ধরে প্রতি তৃতীয় দিনে একবার ভোজন করে, নিত্য প্রভাতে অগ্নিহোত্র করে, সে অতিরাত্র যাগের সর্বোত্তম ফলপ্রাপ্ত হয় এবং তিন পদ্ম বর্ষ পর্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করে। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রপূর্বক বারো মাস ধরে প্রতি চতুর্থ দিনে এক বার আহার গ্রহণ করে, সে বাজপেয় যজ্ঞের উত্তম ফলভাগী হয় এবং ইন্দ্রলোকে বাস করে দেবরাজের ক্রীড়াদি প্রত্যক্ষ করে। বারো মাস ধরে প্রতি পঞ্চম দিনে একবার ভোজন করে নিত্য অগ্নিহোত্রকারী, লোভহীন, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত, অহিংসক, ঈর্ষারহিত এবং পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি দ্বাদশাহ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত করে এবং একান্ন পদ্ম বৎসর ধরে স্বর্গলোকে সুখ ভোগ করে। যে প্রতি ষষ্ঠ দিন একবেলা আহার করে বারো মাস যাবৎ মৌনভাবে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে, কারো দিকে দোষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, সেই ব্যক্তি দুই মহাপদ্ম, আঠারো পদ্ম, এক হাজার তিন শত কোটি এবং পঞ্চাশ অযুত বৎসর ধরে ব্রহ্মলোকে সম্মান লাভ করে। যে এক বৎসর ধরে প্রতি সপ্তম দিনে একবার ভোজন করে, নিত্য অগ্নিহোত্র করে, বাক্য সংযত রাখে এবং ব্রহ্মচর্য পালন করে, সে অসংখ্য বৎসর দেবতা ও ইন্দ্রলোকে নিবাস করে—যে যজ্ঞে বহু সুবর্ণ দক্ষিণা দেওয়া হয়, তারও ফলভাগী হয়। যে প্রতি অষ্টম দিনে একবার আহার করে বারো মাস ক্ষমাশীল, দেবকার্যপরায়ণ এবং অগ্নিহোত্রী হয়ে জীবন কাটায়, সে পুণ্ডরীক যজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল লাভ করে। যে প্রতি নবম দিনে একসময় অন্ন গ্রহণ করে বৎসরভর নিত্য অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে, সে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে এবং পুণ্ডরীকের সমান শ্বেতবর্ণের বিমানে রুদ্রলোকে গিয়ে সেখানে এক কল্প, লাখ কোটি এবং আঠারো হাজার বছর পর্যন্ত সুখ ভোগ করে। যে প্রতি দশম দিনে একবার আহার করে বারো মাস নিত্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, সে ব্রহ্মলোক নিবাসী হয়, তার এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের উত্তম ফললাভ হয়। সেই ব্যক্তি নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং বিচিত্র মণিমালা অলংকৃত শঙ্খধ্বনি পূর্ণ বিমান প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বারো মাস ধরে প্রতি এগারো দিনে আহার করে অগ্নিতে আহুতি দেয়, মন ও বাক্যে কখনো পরস্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা করে না, মাতা-পিতার জন্যও কখনো মিথ্যা বলে না, সে বিমানে বিরাজমান পরম শক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে গমন করে এবং হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। তার কাছে ব্রহ্মা প্রেরিত বিমান স্বতই উপস্থিত হয়। তাতেই বসে সে রুদ্রলোকে গমন করে এবং সেখানে অসংখ্য বৎসর নিবাস করে প্রত্যহ দেব-দানব বন্দিত ভগবান শংকরকে প্রণাম করে। ভগবানও তাকে প্রত্যহ দর্শন দান করেন। যে বারো মাস ধরে প্রতি বারো দিনে কেবল ঘি পান করে থাকে, তার সর্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে চড়ে ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সে বিশাল অট্টালিকাযুক্ত মহল প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে তার সেবার জন্য হাজার হাজার দাস-দাসী উপস্থিত থাকে। এইভাবে মহাভাগ অঙ্গিরা মুনি উপবাসের মহান ফলের কথা বলেছেন।

যুধিষ্ঠির ! এই উপবাস-ব্রত পালন করে দরিদ্র মানুষেরা যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি উপবাস করে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজায় ব্যাপৃত থাকে, সে পরম পদ লাভ করে। নিয়মশীল, সাবধান, পবিত্র, মহামনা, দম্ভবর্জিত, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, অচল এবং স্থির স্বভাবসম্পন্ন মানুষের জন্য আমি এই উপবাসের বিধি জানালাম, এতে তোমার কোনোরূপ সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! যা সব তীর্থের শ্রেষ্ঠ এবং যেখানে গেলে পরম শুদ্ধি লাভ হয়, তার বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সে-সব মনীষী ব্যক্তিদের মঙ্গল সাধন করে ; কিন্তু সে সবের মধ্যে যা পরম পবিত্র এবং প্রধান তীর্থ তার বর্ণনা করছি। একাগ্র চিত্তে শোনো—যাতে ধৈর্যরূপ কুণ্ড এবং সত্যরূপ জল পরিপূর্ণ এবং যা অগাধ, নির্মল এবং অত্যন্ত শুদ্ধ, সেই মানসতীর্থে সর্বদা সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিয়ে স্নান করা উচিত। কামনার অভাব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা,

অহিংসা, অক্রূরতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং মনোনিগ্রহ—এগুলিই এই মানসতীর্থ সেবনে প্রাপ্ত পবিত্রতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি মমতা, অহংকার, দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ভিক্ষার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করেন, সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণসম্পন্ন মহাত্মা ব্যক্তিই তীর্থস্বরূপ। যাঁর মনে তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ দূরীভূত হয়েছে, যিনি বাহ্য পবিত্রতা-অপবিত্রতার ওপর মন না দিয়ে নিজ কর্তব্যে (ব্রহ্ম বিচারে) পরায়ণ থাকেন, যাঁর সর্বস্ব ত্যাগেই প্রসন্নতা, যিনি সর্বজ্ঞ, সমদর্শী এবং শৌচাচার পরায়ণ, সেই সাধুপুরুষই পরমপবিত্র তীর্থস্বরূপ। শরীরকে শুধু জলে ভেজালেই তাকে স্নান বলে না ; সত্যকার স্নান তিনিই করেন, যিনি ইন্দ্রিয় সংযমী। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেই অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। যে নষ্ট হওয়া বিষয়াদির চিন্তা করে না, প্রাপ্ত বস্তুতে মমতা করে না এবং যার মনে কোনো ইচ্ছা জাগে না, সেই পরমপবিত্র। এই জগতে প্রজ্ঞানই শরীর বুদ্ধির বিশেষ সাধন। এইরূপ অকিঞ্চনতা এবং মনের প্রসন্নতাও শরীরকে শুদ্ধ করে। শুদ্ধি চার প্রকার —আচারশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, তীর্থশুদ্ধি ও জ্ঞানশুদ্ধি। এর মধ্যে জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত শুদ্ধিকেই সব থেকে শ্রেষ্ঠ মানা হয়। মানসতীর্থে প্রসন্ন মনে ব্রহ্মজ্ঞানরূপী জলের সাহায্যে যে স্নান করা হয়, সেই হল তত্ত্বজ্ঞানিদের স্নান। যে সর্বদা শৌচাচারসম্পন্ন, বিশুদ্ধ ভাবনাযুক্ত এবং সদ্‌গুণ বিভূষিত—সেই ব্যক্তিকে সর্বদা শুদ্ধ বলে জানবে।

আমি শরীরে অবস্থিত এইসব তীর্থের বর্ণনা করলাম, এবার পৃথিবীর পুণ্য তীর্থাদির মহত্ত্ব শোনো—যেমন শরীরের বিভিন্ন স্থানকে পবিত্র বলা হয়েছে, তেমনই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাগও পবিত্র তীর্থ এবং সেখানকার জল পুণ্যপ্রদ বলে মানা হয়। যেসব ব্যক্তি তীর্থাদির নাম নিয়ে, তীর্থে স্নান করে পিতৃতর্পণ করে নিজের পাপ ধৌত করে তারা অত্যন্ত সুখে স্বর্গে গমন করে। পৃথিবীর কিছু অংশ সাধু পুরুষদের নিবাসের দ্বারা এবং পৃথিবী ও জলের তেজে অত্যন্ত পবিত্র হয়ে উঠেছে। এইরূপ পৃথিবীতে এবং মনেও অনেক পুণ্যময় তীর্থ আছে। যারা এই দুই প্রকার তীর্থে স্নান করে, তারা শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করে।

বৃহস্পতির যুধিষ্ঠিরকে প্রাণীদের জন্মের প্রকার বর্ণনা এবং পাপের জন্য তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণের ক্রম জানানো

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! পৃথিবীবাসী মানুষ কোন আচরণের দ্বারা স্বর্গে এবং কোন আচরণের ফলে নরকে পতিত হয় ? মানুষ তার মৃত শরীরকে কাঠ ও মাটির ঢেলার মতো যখন এখানে ফেলে পরলোকের পথ ধরে তখন কে তাকে অনুসরণ করে ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! বৃহস্পতি ঋষি এদিকেই আসছেন, তাঁর কাছেই এই সনাতন গূঢ় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো।

তাঁরা দুজনে যখন এই নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, সেই সময়েই বৃহস্পতি সেখানে এসে পৌঁছলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সভাসদসহ তাঁর পূজা করে তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—'ঋষিবর ! আপনি সর্বধর্মের জ্ঞাতা এবং সব শাস্ত্রের বিদ্বান, সুতরাং আপনি বলুন পিতা, মাতা, পুত্র, গুরু, আত্মীয়, সম্বন্ধী এবং মিত্র প্রভৃতির মধ্যে মানুষের

প্রকৃত সহায়ক কে ? সকলেই যখন মৃত শরীরকে কাঠ ও মাটির ঢেলার মতো পরিত্যাগ করে চলে যায়, তখন জীবের সঙ্গে পরলোকে কে যায় ?'

বৃহস্পতি বললেন—রাজন্ ! প্রাণী একাই জন্মায়, একাই মরে, একাই দুঃখ থেকে পার হয় এবং একাই দুর্গতি ভোগ করে ; পিতা-মাতা-ভাই-পুত্র-গুরু-আত্মীয়-সম্বন্ধী বা মিত্রদের মধ্যে কেউই তার সহায়ক হয় না। লোকে তার মৃত শরীরকে কাঠ ও মাটির ঢেলার মতো ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ শোকপ্রকাশ করে, তারপর সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। সেইসময় শুধু ধর্মই জীবকে অনুসরণ করে ; সুতরাং ধর্মই সত্যকার সহায়ক। তাই মানুষের সর্বদা ধর্মেরই অনুসরণ করা উচিত। ধর্মযুক্ত প্রাণী স্বর্গে যায় এবং অধর্মপরায়ণ প্রাণী নরকে পতিত হয়। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তির উচিত ন্যায়দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে ধর্মানুষ্ঠান করা। একমাত্র ধর্মই মানুষের পরলোকে সহায়ক হয়। অবিবেচক ব্যক্তি লোভ, মোহ অথবা ভয়ের জন্য অপরের হয়ে পাপ করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুবর ! আপনার কাছ থেকে ধর্মযুক্ত এবং অত্যন্ত হিতকারক বাক্য শুনলাম। কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষের স্থূলদেহ তো এখানেই পড়ে থাকে আর তার সূক্ষ্মদেহ অব্যক্ত—চক্ষুর অতীত হয়ে যায়, সেই অবস্থায় ধর্ম কীভাবে তাকে অনুসরণ করে ?

বৃহস্পতি বললেন—ধর্মরাজ ! পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, মন, যম, বুদ্ধি ও আত্মা—এইসব একসঙ্গে সর্বদা মানুষের ওপর দৃষ্টি রাখে। দিন এবং রাত্রিও সমস্ত প্রাণীর কর্মের সাক্ষী। এই সবের সঙ্গে ধর্ম জীবকে অনুসরণ করে। তারপর ধর্মাধর্মযুক্ত প্রাণী (পরলোকে নিজের কর্ম ভোগ সমাপ্ত করে) যখন অন্য শরীর ধারণ করে। সেইসময় তার শরীরে স্থিত পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাতা দেবতা পুনরায় তার শুভাশুভ কর্মগুলি দেখতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ঋষিবর ! এখন আমি জানতে চাই এই শরীরে বীর্যের উৎপত্তি হয় কীভাবে ?

বৃহস্পতি বললেন—রাজন্ ! এই শরীরে স্থিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও মনের অধিষ্ঠাতা দেবতা যখন অন্ন ভক্ষণের দ্বারা পূর্ণ তৃপ্ত হন, তখন স্থূল বীর্য উৎপন্ন হয়। তারপর স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হলে সেই বীর্যই গর্ভে রূপ ধারণ করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুবর ! জীব ত্বক, অস্থি ও মাংসময় শরীর ত্যাগ করে যখন পঞ্চভূতের সম্পর্ক থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন সে কোথায় অবস্থান করে সুখ-দুঃখ অনুভব করে ?

বৃহস্পতি বললেন—ভারত ! জীব তার কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়ে শীঘ্রই বীর্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্ত্রীর রজে প্রবিষ্ট হয়ে সময়ানুসারে জন্মগ্রহণ করে। গর্ভে প্রবেশের আগে সে সূক্ষ্ম শরীরে থেকে নিজ দুষ্কর্মের জন্য যমদূতের প্রহার সহ্য করে, ক্লেশ সহন করে এবং দুঃখময় সংসার চক্রে দুর্গতি ভোগ করতে থাকে। প্রাণী যদি ইহলোকে আজন্ম পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকে, তাহলে সে ধর্মফলের আশ্রয় নিয়ে সেই অনুসারে সুখভোগ করে। যে নিজ শক্তি অনুসারে বাল্যকাল থেকেই ধর্মে তৎপর থাকে, সে মানুষ হয়ে সর্বদা সুখভোগ করে ; কিন্তু সেই ধর্মের মধ্যেও যদি সে কখনো-কখনো অধর্ম আচরণ করে বসে, তাহলে তাকে সুখের পর দুঃখও ভোগ করতে হয়। অধর্মপরায়ণ ব্যক্তি যমলোকে যায় এবং সেখানে মহাকষ্ট ভোগ করে পশু-পক্ষীর যোনিতে জন্ম নেয়। জীব মোহের বশে যে যে কর্মের ফলে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তা বলছি, শোনো—শাস্ত্র, ইতিহাস এবং বেদেও এই কথা বলা হয়েছে যে, মানুষ ইহলোকে পাপ করলে মৃত্যুর পর যমরাজের ভয়ংকর লোকে গমন করে। যে দ্বিজ চতুর্বেদ পাঠ করার পর মোহবশত পতিত মানুষের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে, সে গাধার জন্ম প্রাপ্ত হয়। পনেরো বছর গাধার শরীরে থাকার পর তার মৃত্যু হয়। তারপর সাত বছর বলদ জন্ম হয়, এরপর তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস হয় এবং তারপর পুনরায় ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করে। পতিত পুরুষের যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর পনেরো বছর কীট, পাঁচ বছর গাধা, পাঁচ বছর শূকর, পাঁচ বছর মোরগ, পাঁচ বছর শিয়াল এবং এক বছর কুকুর জন্মে থেকে শেষে মানুষজন্ম প্রাপ্ত হয়। যে শিষ্য মূর্খতাবশত তার অধ্যাপকের কাছে অপরাধ করে, সে প্রথমে কুকুর, তারপর রাক্ষস, পরে গাধা এবং অবশেষে কষ্ট ভোগকারী প্রেত হয়ে ব্রাহ্মণজন্ম লাভ করে। যে পাপাচারী শিষ্য মনে মনেও গুরুপত্নীর সঙ্গে সমাগমের কথা চিন্তা করে, সে তার মানসিক পাপের জন্য ভয়ংকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম তিন বৎসর কুকুর জীবন পায়, মৃত্যুর পর একবছর কীট জন্ম ভোগ করে, তারপর আবার ব্রাহ্মণ-জন্ম প্রাপ্ত হয়। গুরু যদি তার পুত্রের ন্যায়

প্রিয় শিষ্যকে অকারণে মারধর করে, তবে স্বেচ্ছাচারীতার জন্য সেই গুরুর হিংস্র পশু-জন্ম প্রাপ্তি হয়। যে পুত্র তার মাতা-পিতাকে অনাদর করে, মৃত্যুর পর সে গাধা-জন্ম প্রাপ্ত হয়। দশ বছর গাধা জন্মে থাকার পর এক বছর কুমির-জন্ম প্রাপ্ত হয়। যে পুত্রের উপর মাতা-পিতা দুজনেই রুষ্ট হয়, সে গুরুজনদের প্রতি অনিষ্ট চিন্তার কারণে মৃত্যুর পর দশ মাস গাধা, চোদ্দ মাস কুকুর এবং সাত মাস বিড়াল জন্মের পর শেষকালে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। মাতা-পিতাকে গালি দেয় যে পুত্র সে ময়না হয়ে জন্মায় এবং যে পুত্র মাতা-পিতাকে মারধোর করে সে দশ বছর কচ্ছপ, তিন বছর সাপ হয়ে জন্মায় এবং পরে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি রাজার অন্ন খেয়ে জীবনধারণ করেও মোহবশত সেই রাজার শত্রুর পক্ষ নেয়, সে মৃত্যুর পর দশ বছর বাঁদর, পাঁচ বছর ইঁদুর এবং ছয় মাস কুকুর-জন্ম প্রাপ্ত হয়ে তারপর আবার মানুষ-জন্ম পায়। অপরের গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করলে মানুষ যমলোকে যায় এবং ক্রমশ শত জন্ম পরিভ্রমণ করে শেষকালে কীট হয়ে জন্মায়। কীট হয়ে পনেরো বছর থাকার পর যখন তার পাপ ক্ষয় হয়ে যায় তখন সে আবার মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। অপরের দোষ দেখে যে ব্যক্তি, সে হরিণ যোনিতে জন্মায়। যে ব্যক্তি দুর্বুদ্ধিবশত কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আট বছর মাছ, চার মাস হরিণ, এক বছর ছাগল এবং এক বছর কীট হয়ে শেষকালে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি লজ্জা পরিত্যাগ করে অজ্ঞতা ও মোহের বশীভূত হয়ে লোকের শস্য (চাল, গম প্রভৃতি) চুরি করে বেড়ায়, সে মৃত্যুর পর প্রথমে ইঁদুর, পরে শূকর-জন্ম প্রাপ্ত হয়। তারপর পাঁচ বছর কুকুর হয়ে জীবন ধারণ করার পর মানুষ-জন্ম লাভ করে। পরস্ত্রীগমনের পাপে মানুষ ক্রমশ ভেড়া, কুকুর, শিয়াল, শকুন, সাপ ও বক হয়ে জন্ম নেয়। যে পাপাত্মা মোহবশত ভ্রাতার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, সে একবছর কোকিলরূপে জন্মে থাকে। যে কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য মিত্র, গুরু এবং রাজার স্ত্রীর সঙ্গে সমাগম করে, সে মৃত্যুর পর পাঁচ বছর শূকর, দশ বছর ভেড়া, পাঁচ বছর বিড়াল, দশবছর মোরগ, তিন মাস পিঁপড়ে এবং এক মাস কীট-জন্ম ভোগ করে পাপক্ষয় হলে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি বিবাহ, যজ্ঞ অথবা দানের সময় বিঘ্ন ঘটায়, সে পনেরো বছর কীট যোনিতে থেকে পাপক্ষয় হলে পুনরায় মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি একবার কন্যাদান করে পুনরায় সেই কন্যাকে অন্য ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করে, সে মৃত্যুর পর তেরো বছর কীট-জন্মে পাপ ক্ষয় করে পরে মানুষ-জন্ম পায়। যে ব্যক্তি দেবকার্য অথবা পিতৃকার্য সম্পন্ন না করে বলিবৈশ্বদেব (অন্ন-আহুতি) না করেই খাদ্য গ্রহণ করে, সে মৃত্যুর পর এক শত বছর কাক হয়ে থাকে। তারপর ক্রমশ মোরগ ও সাপ হয়ে পরে মানুষ-জন্ম পায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায় সম্মানীয় ; তাকে অসম্মান করলে মৃত্যুর পর ক্রৌঞ্চপক্ষী হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং একবছর পরে সে চীরক পাখি হয়ে জন্মায়। তারপর মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত করে। শূদ্র জাতির ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে সমাগম করলে দেহত্যাগের পর প্রথমে কীট-জন্ম প্রাপ্ত হয়, তারপর শূকর হয়ে জন্মায়। শূকররূপে জন্ম হলেই নানা রোগের শিকার হয়ে তার মৃত্যু হয় ; এরপর কুকুর হয়ে নিজ পাপকর্মের ভোগ সমাপ্ত হলে পরে মানুষ-জন্ম ধারণ করে। মানুষ-জন্মে সে একটিমাত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারপর ইঁদুর-জন্ম প্রাপ্ত হয়ে বাকি পাপ ক্ষয় করে। কৃতঘ্ন মানুষ মৃত্যুর পর যমলোকে গমন করে, সেখানে যমদূত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নির্দয়ভাবে তাকে প্রহার করে। যমলোকে সেই ব্যক্তিকে বহু ক্লেশ সহ্য করতে হয়। এই কষ্টভোগ করার পর সে পুনরায় এই জগতে কীট হয়ে জন্ম নেয় এবং পনেরো বছর কীট-জন্ম ভোগ করার পর তার মৃত্যু হয়। তারপর সে বারবার গর্ভে আসে এবং গর্ভেই মারা যেতে থাকে। এইভাবে বহুবার গর্ভে থাকার যন্ত্রণা ভোগ করার পর তার তির্যক যোনিতে জন্ম হয়। এই জন্মেও বহু কষ্ট পাওয়ার পর সে কচ্ছপ জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি দই চুরি করে সে বক, যে মধু চুরি করে সে উকুন, ফল-মূল ইত্যাদি চুরিকারী ব্যক্তি পিঁপড়ে হয়ে জন্মলাভ করে। যে নিষ্পাব নামক অন্ন চুরি করে, সে হলগোলক নামক কীট হয়ে জন্মায়। ক্ষীর চুরি করে যে, সে তীতর (পক্ষী বিশেষ), লোহা চোর কাক, কাঁসার বাসন চোর পাখি, রৌপ্য চোরের পায়রা ইত্যাদি যোনিতে জন্ম হয়।' যে ব্যক্তি লোভবশত চন্দন ইত্যাদি চুরি করে সে ইঁদুর-ছুঁচো হয়ে জন্মায়, পনেরো বছর সেইভাবে কাটানোর পর পাপ ক্ষয় হলে পরে তার মানুষ-জন্ম প্রাপ্তি হয়। দুধ চোর বক, তেল চুরি করে যে সে তেলপানকারী কীট হয়ে জন্মায়। কোনো নীচ ব্যক্তি যদি ধন বা শত্রুতার জন্য নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে সে গাধা হয়ে জন্মায়। দুবছর গাধা জন্মের পর সে সর্বদা প্রাণভয়ে ভীত হরিণ হয়ে জন্মায় এবং একবছর পর শস্ত্রাঘাতে নিহত

হয়ে সে মাছ হয়ে জন্মায় এবং চতুর্থ মাসে জালে বদ্ধ হয়ে মারা পড়ে। তারপর দশ বছর বাঘ ও পাঁচ বছর চিতা হয়ে থাকে। অতঃপর পাপক্ষয় হলে মৃত্যুর পর তার মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্তি হয়। যে দুষ্টবুদ্ধি মানুষ স্ত্রীহত্যা করে, সে যমলোকে গিয়ে বহু কষ্ট ভোগ করে। পরে কুড়ি বার নানা দুঃখদায়ক যোনি ভোগ করে শেষে কীট-জন্ম পায় এবং কুড়ি বছর কীটজন্মে থেকে পরে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। খাবার চুরি করলে মানুষ মাছি হয় এবং কয়েকমাস মাছি হয়ে থাকার পর পাপ ক্ষয় হলে আবার মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। ধান চুরি করা ব্যক্তি পরজন্মে রোমশ মানুষ হয়ে জন্মায়। যে ব্যক্তি তিলচূর্ণ মিশ্রিত খাদ্য চুরি করে সে নেউলের মতো বিশাল ইঁদুর হয়ে জন্মায় ও মানুষকে কামড়াতে থাকে। যে নির্বুদ্ধি ব্যক্তি ঘি চুরি করে সে কাকমদ্গু (শিংযুক্ত পাখি) হয়ে জন্মায়। যে ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু চুরি করে, মৃত্যুর পর সে মাছের জন্ম পায়, তারপরে মৃত্যুর পর মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। মানুষ হলেও সে অল্পায়ু হয়ে জন্মায়।

ভারত ! মানুষ পাপ করলে এইভাবে তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সেখানে তার নিজের উদ্ধারকারী ধর্মজ্ঞান থাকে না। যে পাপাচারী ব্যক্তি লোভ ও মোহের বশে পাপ করে ব্রত ইত্যাদির দ্বারা তা দূর করার চেষ্টা করে, সে সর্বদা সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকে, তার কোথাও স্থিতি হয় না এবং স্লেচ্ছ হয়ে সে বহু আঘাত পেতে থাকে। যে ব্যক্তি জন্ম থেকেই পাপ পরিত্যাগ করে, সে নীরোগ, রূপবান ও ধনী হয়। নারীগণ যদি উপরিউক্ত পাপ কর্ম করে, তাহলে তাদেরও পাপ হয় এবং তারা এইসব পাপভাগী প্রাণীদেরই স্ত্রী হয়। মহারাজ ! পূর্বকালে ব্রহ্মা দেবর্ষিদের উপস্থিতিতে এই প্রসঙ্গ বলছিলেন। আমি সেখানেই তাঁর মুখ থেকে এই সব শুনেছি এবং তোমার জিজ্ঞাসায় যথাবৎ বর্ণনা করলাম। এই উপদেশ শুনে তোমার সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত থাকা উচিত।

বৃহস্পতির যুধিষ্ঠিরকে অন্নদান ও অহিংসা-ধর্মের মহিমা জানানো

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! আমি এখন ধর্মের পরিণাম জানতে চাই। কোন কর্ম করলে মানুষ উত্তমগতি প্রাপ্ত হয় ?

বৃহস্পতি বললেন—রাজন্ ! যে মানুষ পাপকর্ম করে, সে অধর্মের বশীভূত হয় এবং তার মন ধর্মের বিপরীত পথে চলতে থাকে ; তাই তাকে নরকে যেতে হয়। যারা মোহবশত অধর্ম করে ফেলার পরে অনুতপ্ত হয়, তাদের উচিত মনকে বশে রেখে আর কখনো পাপকর্ম না করা। মানুষ যেসব পাপ কর্মকে নিন্দনীয় বলে মনে করে, সেই সকল পাপ থেকে সরে এসে দৈহিকরূপে সে ক্রমশ মুক্ত হতে থাকে। পাপী ব্যক্তি যদি ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট তার পাপের কথা প্রকাশ করে তাহলে সেই পাপের নিন্দা থেকে সে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করে। মানুষ যেমন যেমন তার পাপ স্বীকার করে তেমন সে তার পাপ থেকে মুক্ত হতে থাকে। এবার আমি দানের বর্ণনা করছি। সর্বপ্রকার দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ বলা হয়, সুতরাং যারা ধর্মে বিশ্বাসী তাদের সরলভাবে প্রথমে অন্নদানই করা উচিত। অন্ন মানুষের প্রাণ। অন্ন থেকেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং অন্নের আধারেই সব প্রাণী বেঁচে থাকে। তাই অন্নকেই সব থেকে উত্তম বলা হয়। দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও মানুষ সকলেই অন্নের প্রশংসা করে। রাজা রন্তিদেব অন্নদান করেই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণদের প্রসন্নচিত্তে ন্যায়োপার্জিত অন্নদান করা উচিত। যে ব্যক্তি দশ হাজার ব্রাহ্মণকে আহার করায় এবং সর্বদা যোগ সাধনায় ব্যাপৃত থাকে, সে পাপ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং তাকে আর তির্যক যোনিতে জন্ম নিতে হয় না। বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ যদি ভিক্ষার্জিত অন্ন বিপ্রকে দান করেন, তাহলে তিনি ইহলোকে সদা সুখী হন। যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ না করে ন্যায়সম্মতভাবে প্রজাপালন করে নিজ বলে অর্জিত অন্ন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ এবং সমাহিত চিত্তে দান করে, সে সেই অন্নদানের প্রভাবে তার পূর্বকৃত সমস্ত পাপ বিনাশ করতে সক্ষম হয়। বৈশ্য যদি কৃষিকার্য দ্বারা অন্নোৎপাদন করে তার ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণদের দান করে, তবে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়। শূদ্রও যদি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত অন্ন ব্রাহ্মণদের দান করে, তবে সে-ও পাপ হতে মুক্ত হয়। যে কোনো প্রাণীকে হিংসা না করে, নিজ বাহুবলে অর্জিত অন্ন বিপ্রকে দান করে, তাকে কখনো দুঃখের দিন দেখতে হয় না। ন্যায় অনুসারে

প্রাপ্ত অন্ন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের আনন্দসহকারে যে দান করে, সে পাপবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অন্নই বলবৃদ্ধিকারী, তাই এই জগতে অন্নদানকারী ব্যক্তি বলবান হয় এবং সৎপুরুষদের পথের আশ্রয় করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায়। দাতা ব্যক্তিরা যে পথে চলেছেন, বিদ্বান ব্যক্তিরাও সেই পথ অনুসরণ করেন। অন্নদানকারী ব্যক্তি বাস্তবিক প্রাণদানকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের জন্য সনাতন ধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানুষের প্রত্যেক অবস্থায় ন্যায়ত উপার্জিত অন্ন সৎপাত্রে দান করা উচিত ; কারণ অন্নই সব প্রাণীদের আধার। অন্নদান করলে মানুষকে কখনো নরকের ভয়ংকর ক্লেশ সহ্য করতে হয় না, সুতরাং ন্যায়োপার্জিত অন্ন সর্বদা দান করা উচিত। প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত প্রথমে ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে পরে স্বয়ং আহার গ্রহণ করা এবং অন্নদানের দ্বারা প্রতিটি দিন সফল করা। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম, ন্যায় এবং ইতিহাস জানা এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, সে নরক বা সংসার চক্রে পড়ে না ; ইহলোকে তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং মৃত্যুর পর সে স্বর্গ-সুখ ভোগ করে। রাজন্‌ ! অন্নদান সর্বপ্রকার ধর্ম এবং দানের মূল। আমি তোমাকে অন্নদানের মহান ফলের কথা জানালাম।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুবর ! অহিংসা, বেদোক্ত কর্ম, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপস্যা এবং গুরুশুশ্রূষা—এগুলির মধ্যে কোনটি মানুষের বিশেষ কল্যাণ করে ?

বৃহস্পতি বললেন—ভারত ! এই সকল কর্মই ধর্মানুকূল হওয়ায় কল্যাণের সাধন। এবার আমি মানুষের কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বর্ণনা করছি। যে ব্যক্তি অহিংসাযুক্ত ধর্মপালন করে, সে কাম, ক্রোধ ও লোভ রূপ তিন দোষ ত্যাগ করে সিদ্ধিলাভ করে। যে নিজ সুখের জন্য অহিংসক প্রাণীদের বধ করে সে পরলোকে সুখী হয় না। যে ব্যক্তি সব জীবকে নিজের মতো ভেবে কারোকে আঘাত করে না এবং নিজের ক্রোধকে বশীভূত করে রাখে, সে মৃত্যুর পর সুখী হয়। যে সমস্ত প্রাণীর সুখ দুঃখকে নিজেরই সুখ-দুঃখ বলে মনে করে এবং যে সমস্ত প্রাণীকে নিজের মধ্যেই স্থিত বলে দেখে, সেই গমনাগমনরহিত জ্ঞানীর গতির খবর রাখতে দেবতারাও মোহগ্রস্ত হয়ে যান। যা নিজের ভালো না লাগে, তা অপরের প্রতিও করা উচিত নয় ; এই হল ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মানুষ কামনা দ্বারা প্রেরিত হয়েই বিপরীত আচরণ করে বসে। চাইলে দেওয়া এবং না দেওয়া, সুখ-দুঃখ দেওয়া এবং প্রিয় ও অপ্রিয় করায় নিজের যেমন আনন্দ বা দুঃখ অনুভূত হয়, তেমনই অপরের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে। যেমন, এক ব্যক্তি অন্যকে আক্রমণ করে, তেমনই অন্য ব্যক্তিও উপযুক্ত সময়ে তাকে আক্রমণ করে, এটি তুমি ধর্ম-অধর্মের সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বলে জেনো এবং ধর্মে সুখ এবং অধর্মের দ্বারা দুঃখ প্রাপ্তি হয়—এটি নিশ্চিত জেনো।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে পরম বুদ্ধিমান দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের চোখের সামনেই স্বর্গে চলে গেলেন।

—o—

হিংসা ও মাংস খাওয়ার নিন্দা এবং মাংস না খাওয়ার প্রশংসা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক প্রমাণ অনুসারে সর্বদা অহিংসা-ধর্মের প্রশংসা করে থাকেন। সুতরাং আমি জানতে চাই মন-বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসা আচরণকারী মানুষ কীভাবে এই দুঃখজনক পরিণাম থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মবাদী পুরুষেরা মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং কর্মের দ্বারা হিংসা না করা এবং মাংস আহার না করা, এই চার উপায়ের দ্বারা অহিংসা পালনের কথা বলেছেন। এর মধ্যে একটি অংশও বাদ গেলে অহিংসা-ধর্ম পালন হয় না। চার পদবিশিষ্ট পশু যেমন তিন পায়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনই অহিংসা শুধুমাত্র তিনটি কারণের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। হাতির পায়ের চিহ্নে যেমন সকল প্রাণীর পদচিহ্ন মিশে

যায়, তেমনই অহিংসা-ধর্মে সকল ধর্ম সমাবিষ্ট হয়। এইভাবে অহিংসাকে ধর্মের স্বরূপ বলা হয়েছে। জীব মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা হিংসারূপী দোষে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমশ মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসা ত্যাগ করে ও মাংসাহার বর্জন করে, সে তিনপ্রকার হিংসা-দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণ হিংসা-দোষের তিনটি কারণ জানিয়েছেন—মন (মাংস খাওয়ার ইচ্ছা), বাক্য (মাংস খাওয়ার উপদেশ) এবং স্বাদ (প্রত্যক্ষভাবে মাংসের স্বাদ গ্রহণ)। এই তিনটিই হিংসার আধার।

এবার আমি মাংস খাওয়ার দোষ বলছি। যে অবিবেচক মানুষ মোহবশত মাংসাহার করে, তাকে অত্যন্ত নীচ মনে করা হয়। নারী-পুরুষের সংযোগে যেমন শিশুর জন্ম হয়, তেমনই হিংসা করলে সেই পাপী ব্যক্তিকে বহু পাপজন্ম গ্রহণ করতে হয়। জিভের রসাস্বাদে মানুষ যেমন তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে, তেমনই মাংস আস্বাদন করলে তার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। শাস্ত্রেও কথিত আছে যে বিষয়াদির আস্বাদনে তার প্রতি রাগ (আসক্তি) উৎপন্ন হয় এবং তা চিত্তকে বশীভূত করে। যার চিত্ত মাংস আস্বাদনের জন্য লোলুপ হয়, সে মাংসের এমন প্রশংসা করে যে যা মন, বাক্য ও চিত্তের দ্বারা কল্পনা করা যায় না। মাংসের প্রশংসা করলেও তাতে খাওয়ার পাপ হয় এবং তার ফলও ভোগ করতে হয়। কত সাধুপুরুষ নিজের প্রাণ দিয়ে অপরকে রক্ষা করেছেন, নিজের মাংসের দ্বারা অন্যের মাংস রক্ষা করে স্বর্গগমন করেছেন। যুধিষ্ঠির ! এইরূপ চার উপায়ের সাহায্যে যা পালন করা যায়, সেই অহিংসা-ধর্মের প্রতিপাদন করা হয়েছে। এটি সমস্ত ধর্মে ওতপ্রোত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি অনেক বার বলেছেন যে অহিংসা সব থেকে বড় ধর্ম। তাই আমি জানতে চাই যে মাংস খেলে কী ক্ষতি হয় ? আর না খেলে কী লাভ হয় ? যে নিজে পশুবধ করে মাংস খায় বা অন্যের বধ করা পশুর মাংস আহার করে অথবা যে অন্যের খাওয়ার জন্য পশুবধ করে বা কিনে এনে মাংস খায়, তাদের কী ফল প্রাপ্তি হয় ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মাংস না খেলে যে লাভ হয়, তার প্রকৃত বর্ণনা শোনো—যাঁরা সুন্দর রূপ, সুগঠিত দেহ, পূর্ণ আয়ু, উত্তম বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল ও স্মরণ শক্তি লাভ করতে চাইতেন, সেই মহাত্মাগণ হিংসা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে ঋষিদের মধ্যে বহু বাক্-বিতণ্ডা হয়েছে। শেষে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা বলছি শোনো, যে ব্যক্তি ব্রত পালন করে প্রতি মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং যে শুধু মধু ও মাংস পরিত্যাগ করে—তারা উভয়ে একই ফল লাভ করে। সপ্তর্ষি, বালখিল্য এবং মরীচি প্রমুখ মনীষী মাংস না খাওয়ারই প্রশংসা করেছেন। স্বায়ম্ভুব মনুর উক্তি হল, 'যে মানুষ মাংস খায় না, পশু হিংসা করে না এবং অপরের দ্বারাও হিংসা করায় না, সে সমস্ত প্রাণীদেরই মিত্র।' যে ব্যক্তি মাংস ত্যাগ করে, তাকে কেউই অসম্মান করে না, সে সকলের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠে এবং সাধুপুরুষরা সকলেই তাকে সম্মান করেন। ধর্মাত্মা নারদ বলেন—'যে ব্যক্তি অন্যের মাংসের দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায়, তাকে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করতে হয়।' বৃহস্পতির বক্তব্য হল 'যে ব্যক্তি মধু ও মাংস ত্যাগ করে, সে দান, যজ্ঞ ও তপস্যার ফল লাভ করে।' আমার তো এই বিশ্বাস যে, একজন মানুষ যদি একশত বছর ধরে প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং অন্য জন মাংসাহার না করার নিয়ম পালন করে, তাহলে দুজনের কার্যের একই ফল লাভ হয়। মধু ও মাংস ত্যাগকারী মানুষকে সর্বদা যজ্ঞকারী, সর্বদা দানকারী ও সর্বদা তপস্যাকারী বলে মনে করা হয়। যে পূর্বে মাংস ভক্ষণ করত এবং পরে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, তার যত পুণ্য হয়, তত পুণ্য সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন এবং সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করলেও হয় না। যে বিদ্বান সর্বজীবকে অভয় প্রদান করে, তাকে নিঃসন্দেহে জগতে প্রাণদাতা বলে মানা হয়। বিদ্বান ব্যক্তিরা এইরূপ অহিংসারূপ পরম ধর্মের প্রশংসা করেন। মানুষের যেমন নিজপ্রাণ প্রিয় হয়, তেমনই সমস্ত প্রাণীরই নিজ নিজ প্রাণ প্রিয় হয়, সুতরাং যারা বুদ্ধিমান ও পুণ্যাত্মা, তাদের উচিত সকল প্রাণীকেই নিজের মতো ভাবা। নিজ কল্যাণের ইচ্ছা পোষণকারী বিদ্বান ব্যক্তিদেরই যখন মৃত্যু ভয় থাকে, তাহলে জীবিত থাকার ইচ্ছাসম্পন্ন নীরোগ এবং নিরপরাধ প্রাণীদের—যাদের পাপী ব্যক্তিরা বলপূর্বক বধ করে, কেন ভয় হবে না ? অতএব তুমি মাংস পরিত্যাগ করাকেই ধর্ম, স্বর্গ এবং সুখের সর্বোত্তম আধার বলে জেনো। অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা পরম তপ এবং অহিংসা পরম সত্য। অহিংসা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। মাংস ঘাস-কাঠ-পাথর থেকে জন্মায় না, জীব হত্যা করলেই তা পাওয়া যায়, সুতরাং তা আহার করা অত্যন্ত দোষের। যারা স্বাহা (দেবযজ্ঞ) ও স্বধার

(পিতৃযজ্ঞের) অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে এবং সত্য ও সরলতার প্রেমিক, তারা দেবতুল্য পুরুষ। কিন্তু যারা কুটিলতা ও অসত্যভাষণে প্রবৃত্ত হয়ে সর্বদা মাংস ভক্ষণ করে, তাদের রাক্ষস বলে জানবে। যে ব্যক্তি মাংস খায় না, সে সংকটপূর্ণ স্থান, ভয়ংকর দুর্গ, গভীর বনে রাত-দিন ও সন্ধ্যায়, চৌরাস্তা বা সভার মধ্যে অস্ত্র হাতে মানুষ, সাপ কিংবা হিংস্র পশুদের মধ্যে পড়ে গেলেও তার কারো থেকে কোনো ভয় হয় না। শুধু তাই নয়, সেই ব্যক্তি সকলকে শরণ দান করে এবং সকলের বিশ্বাসের পাত্র হয়। জগতে যদি মাংসাহার করা ব্যক্তি না থাকে, তাহলে পশুদের হিংসা করার আর কেউ থাকবে না। হিংস্র মানুষেরা মাংসাহারীদের জন্যই পশুবধ করে। মাংস অভক্ষ্য ভেবে যদি সব মানুষ নিরামিষাশী হয়ে যায় তাহলে পশু হত্যা স্বতই বন্ধ হয়ে যাবে। হিংসাকারী ব্যক্তির আয়ু ক্ষীণ হয়, তাই যারা নিজেদের কল্যাণ চায় তাদের মাংস পরিত্যাগ করা উচিত। এখন যেমন লোকে হিংস্র পশু শিকার করে, তেমনই জীবেদের হিংসাকারী ভয়ংকর মানুষদের অন্য জন্মে সকলপ্রাণী থেকে কষ্ট পেতে হয় এবং তাদের সংকট থেকে রক্ষা করার কেউ থাকে না। লোভে, বুদ্ধির দোষে, বলবীর্য প্রাপ্তির জন্য অথবা পাপীর সংসর্গে আসায় মানুষের অধর্মে রুচি হয়। যে ব্যক্তি অন্যের মাংস খেয়ে নিজের মাংস বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, শান্তিতে থাকে না। নিয়ম পালনকারী মহর্ষিগণ মাংসাহার ত্যাগ করাকেই ধন, যশ, আয়ু এবং স্বর্গপ্রাপ্তির প্রধান উপায় এবং পরম কল্যাণের সাধন বলে জানিয়েছেন।

কুন্তীনন্দন ! পূর্বকালে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র মুখে মাংস খাওয়ার যে দোষের কথা শুনেছিলাম, তা বলছি—যে ব্যক্তি জীবিত থাকার ইচ্ছাযুক্ত প্রাণীকে বধ করে বা নিজে থেকে মরে যাবার পর সেই প্রাণীর মাংস খায়, তাকে সেই প্রাণীর হত্যাকারী বলা হয়। যে মাংস ক্রয় করে সে অর্থের দ্বারা, যে খায় সে উপভোগের দ্বারা এবং যে বধ করে সে অস্ত্রের আঘাতে বা ফাঁস লাগিয়ে পশুহত্যা করে। এই তিন প্রকারে প্রাণী হত্যা হয়। যে নিজে মাংস না খেয়েও যারা খায় তাদের সমর্থন করে, সেও পরোক্ষভাবে মাংস ভক্ষণের পাপভাগী হয়। তেমনই যারা হত্যাকারীকে উৎসাহ দেয়, তাদেরও হিংসার পাপ হয়। যে ব্যক্তি মাংস না খেয়ে সর্ব জীবে দয়া করে, তাকে কোনো প্রাণী অসম্মান করে না, সে দীর্ঘজীবী ও নীরোগ হয়। আমরা শুনেছি যে সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান করলে যে ধর্মলাভ হয়, মাংস ভক্ষণ না করলে তার থেকেও বিশিষ্ট ধর্মপ্রাপ্তি হয়। যারা মাংসাশী লোকেদের জন্য পশু হত্যা করে, তারা পুরুষদের মধ্যে অধম। হিংসার বেশি দোষ ঘাতকেরই হয়, ভক্ষণকারীর নয়। যেসব অজ্ঞান ব্যক্তি যাগ-যজ্ঞের নামে মাংসের লোভে প্রাণীহিংসা করে, তারা নরকগামী হয়। যে আগে মাংস খেলেও পরে তা ত্যাগ করে, সে মহানধর্ম লাভ করে ; কারণ সে পাপ থেকে সরে এসেছে। যে ব্যক্তি বধ করার জন্য পশু নিয়ে আসে, যে পশুহত্যার অনুমতি দেয়, যে তাকে বধ করে এবং যারা কেনে, বিক্রি করে, রান্না করে ও খায়, তারা সকলেই মাংস ভক্ষণকারী বলে গণ্য হয়। যে ব্যক্তি পরম শান্তিতে জীবন কাটাতে চায়, তার অন্য প্রাণীর মাংস গ্রহণ সর্বতোভাগে ত্যাগ করা উচিত। মাংস না খেলে নানাপ্রকার সুখ পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি একশত বছর তপস্যা করে এবং যে ব্যক্তি শুধু মাংসাহার পরিত্যাগ করেছে, তারা দুজনেই আমার কাছে সম্মানের। এইরূপে অহিংসাই সব থেকে উত্তম ধর্ম। যে মহাত্মা এটি পালন করেন, তিনি স্বর্গনিবাসী হন। যিনি সর্বদা ধর্ম আচরণ করে বাল্যকাল থেকেই মধু-মাংস-মদিরা পরিত্যাগ করেন, তাঁকে মুনি বলা হয়। যে ব্যক্তি মাংসাহার ত্যাগরূপ এই অহিংসা-ধর্ম নিজে আচরণ করে অন্যকেও তার উপদেশ দেয়, সে পূর্বে মহা দুরাচারী থাকলেও কখনো নরকে পতিত হয় না। যে ব্যক্তি মাংস-ভক্ষণ ত্যাগরূপ এই পরম পবিত্র, ঋষিদ্বারা প্রশংসিত বিধি সর্বদা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয় এবং তার সবকামনা পূর্ণ হয়। শুধু তাই নয়, এটি পাঠ ও শ্রবণ করলে বিপদগ্রস্ত মানুষ বিপদ থেকে, কয়েদি বন্ধন থেকে, রোগী রোগ থেকে, দুঃখী দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে। এর প্রভাবে মানুষকে তির্যক যোনিতে জন্ম নিতে হয় না এবং সে সুন্দর রূপ, সম্পত্তি এবং মহাযশ লাভ করে। এভাবে আমি তোমাকে ঋষিগণ কথিত মাংস-ত্যাগের বিধি জানালাম।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! অত্যন্ত দুঃখের কথা যে জগতের নির্দয় ব্যক্তিরা রাক্ষসের মতো নানা সুখাদ্য পরিত্যাগ করে মাংসের স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। নানা মিষ্টান্ন দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জীও তারা খেতে চায় না, মাংস ভক্ষণের জন্য তারা লোলুপ থাকে। সুতরাং আমি মাংস না খেলে যে লাভ হয় এবং মাংস ভক্ষণে যে ক্ষতি হয়, তা

পুনর্বার শুনতে চাইছি।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! মাংস ভক্ষণ না করলে অনেক লাভ, আমি সেসব বলছি, শোনো—যে অন্যের মাংস খেয়ে নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায়, তার থেকে নীচ ও নির্দয় মানুষ আর নেই ; জগতে নিজের প্রাণের থেকে প্রিয় অন্য কোনো বস্তু নেই ; তাই মানুষ যেভাবে নিজের ওপর দয়া চায়, তেমনভাবে তার অপরকেও দয়া করা উচিত। মাংস ভক্ষণ করলে মহাপাপ হয় এবং না খেলে নানা পুণ্য হয়। সমস্ত জীবকে দয়া করার মতো শ্রেষ্ঠ কোনো কাজ ইহলোক বা পরলোকে নেই। দয়ালু ব্যক্তিকে কখনো ভয়ের সম্মুখীন হতে হয় না, দয়ালু এবং তপস্বীদের কাছে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সুখপ্রদ হয়। যে ব্যক্তি দয়াপরায়ণ হয়ে সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান করে, সকল প্রাণীও তাকে অভয় দেয়। সেই ব্যক্তি যদি আহত হয়, পড়ে গিয়ে থাকে, জলের স্রোতে ভেসে যায় অথবা কোনো বিষম অবস্থায় পড়ে, তাহলে সব প্রাণীই তাকে রক্ষা করে। হিংস্র পশু, পিশাচ ও রাক্ষসেও তার প্রাণ সংশয় করে না। যে ব্যক্তি অপরকে ভয় থেকে রক্ষা করে, সে নিজেও ভয়ের থেকে মুক্তি পায়। প্রাণদানের মতো আর কোনো দান নেই এবং হবেও না। মৃত্যু কারোই আকাঙ্ক্ষিত নয় ; কারণ মৃত্যুকালে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। সমস্ত প্রাণীই এই সংসার-সমুদ্রে গর্ভবাস, জন্ম ও বৃদ্ধত্ব ইত্যাদি দুঃখের ভয়ে ভীত থাকে। এছাড়া মৃত্যু-ভয়ও তাদের অশান্ত করে রাখে। গর্ভস্থ প্রাণী গর্ভে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে থাকে। মাংসলোলুপ জীব জন্মের পরেও অন্যের বশে থাকে। বার বার তাদের বধ করে ভক্ষণ করা হয়, তাদের এই দুর্গতি প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। তারা নিজেদের পাপের জন্যই কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয় এবং বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। এইভাবে তাদের বারংবার সংসারচক্রে ঘুরে মরতে হয়।

এই পৃথিবীতে নিজের আত্মার থেকে প্রিয় আর কোনো বস্তু নেই। সুতরাং সব প্রাণীকে দয়া করবে এবং সকলকে আত্মভাবে দেখবে। যে ব্যক্তি সারা জীবনে কোনো জীবের মাংস গ্রহণ করে না, সে নিঃসন্দেহে স্বর্গলোকে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করে। যে ব্যক্তি জীবিত থাকার ইচ্ছাযুক্ত প্রাণীর মাংস খায়, তাকেও অপর জন্মে সেইসব প্রাণী ভক্ষণ করে, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। যুধিষ্ঠির ! (যাকে বধ করা হয়, সেই প্রাণী বলে—) **'মাং স ভক্ষয়তে যস্মাদ্ ভক্ষয়িষ্যে তমপ্যহম্'** অর্থাৎ 'আজ আমাকে যে খাচ্ছে, আমিও একদিন তাকে ভক্ষণ করব।' এটি মাংসের মাংস্ব—মাংস শব্দের এই অর্থ বুঝবে। এই জন্মে যে জীবকে হিংসা করা হয়, সে পরের জন্মে প্রথমেই তার ঘাতককে হত করে, তারপর যে তার মাংস খায় তাকে বধ করে। যে অপরের নিন্দা করে সে স্বয়ং ক্রোধ ও দ্বেষের পাত্র হয়। অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা পরম সংযম, অহিংসা পরম দান, অহিংসা পরম তপ, অহিংসা পরম যজ্ঞ, অহিংসা পরম ফল, অহিংসা পরম মিত্র এবং অহিংসা পরম সুখ। যদি সমস্ত যজ্ঞে দান করা হয়, সব তীর্থে স্নান করা হয় এবং সর্বপ্রকার দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহলেও অহিংসার সঙ্গে এসবের কোনো তুলনা হয় না। যে হিংসা করে না, তার তপস্যা অক্ষয় হয়, সে সর্বদা যজ্ঞ করার ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি হিংসা করে না সে সমস্ত প্রাণীর মাতা-পিতার সমান। যুধিষ্ঠির ! অহিংসার এইসব ফলের কথা বলা হয়েছে। অহিংসা থেকে যে ফল লাভ হয় তা শতবর্ষেও বর্ণনা করা যায় না।

ব্যাসদেবের একটি কীটকে কৃপা করা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যে যোদ্ধা মহাসংগ্রামে গিয়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করে, তার কী গতি হয় ? আপনি জানেন, প্রাণ ত্যাগ করা কত কঠিন। কেউ উন্নতির শিখরে থাকুক বা অবনতির গহ্বরে, সুখ বা দুঃখ—যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন : কিন্তু মরতে কেউই চায় না। তার কারণ কী ? আপনি সর্বজ্ঞ, দয়া করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! এই জগতে প্রাণী উন্নতি বা অবনতি, শুভ বা অশুভ—যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাতেই সে সুখ বলে ভাবে, মরতে চায় না, তার কারণ বলছি শোনো। এই বিষয়ে ভগবান ব্যাস ও একটি কীটের সুপ্রসিদ্ধ বার্তালাপের প্রাচীন ইতিহাস, তোমাকে

শোনাচ্ছি। পূর্বকালের কথা, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি পথে এক কীটকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যেতে দেখলেন। ব্যাসদেব সমস্ত প্রাণীর গতি সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং সকলের ভাষা বুঝতে সক্ষম ছিলেন। তিনি কীটকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কীট ! আজ তোমাকে অত্যন্ত ভীত ও উতলা দেখাচ্ছে, এত দ্রুত কোথায় যাচ্ছ ? কীসে তোমার ভয়, আমাকে বলো।'

কীট বলল—মুনিবর ! এক বিশাল গোরুর গাড়ি আসছে, তার ঘর্ঘর আওয়াজে আমার ভয় হচ্ছে, সেই আওয়াজ অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, কানে আসলে মনে হচ্ছে যে আমাকে চাপা দিয়ে দেবে, তাই দ্রুত এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। ওই শুনুন, বলদের ওপর চাবুকের আঘাত পড়ছে, ভারী বোঝা নিয়ে সেটি এদিকেই আসছে। গাড়ির আরোহী মানুষদের শব্দও শোনা যাচ্ছে। আমার মতো কীটের পক্ষে এই শব্দ ধৈর্যসহকারে শোনা কঠিন, তাই ওই দারুণ ভয় থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এখান থেকে পালাচ্ছি। মৃত্যু সকল প্রাণীর পক্ষেই দুঃখদায়ক। নিজের জীবন সকলের কাছেই দুর্লভ হয়ে থাকে। এমন না হয় যে আমি সুখ হতে দুঃখে পতিত হই ; তাই ভয়ে পালাচ্ছি।

ব্যাসদেব বললেন—কীট ! তোমার সুখ কোথায় ? তুমি তো তির্যক যোনিতেই পড়ে আছ। আমার মনে হয় মৃত্যুই তোমার পক্ষে সুখের। তুমি রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এবং ছোট-বড় সুখ ভোগ করতে পার না ; তোমার পক্ষে তো মৃত্যুই শ্রেয়।

কীট বলল—প্রভু ! জীব সকল যোনিতেই সুখ অনুভব করে। আমিও এই জন্মে সুখ পাই এবং তাই ভেবেই বেঁচে থাকতে চাই। এখানে এই শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ই উপলব্ধ হয়। মানুষ এবং স্থাবর প্রাণীদের ভোগ পৃথক পৃথক। পূর্ব জন্মে আমি এক মস্ত ধনী শূদ্র ছিলাম। ব্রাহ্মণদের জন্য আমার মনে একটুও সম্মানের ভাব ছিল না। আমি অত্যন্ত কৃপণ এবং সুদখোর ছিলাম। আমার স্বভাব ছিল তীক্ষ্ণ কটু বাক্য বলা, কৌশলে লোক ঠকানো এবং সকলকে হিংসা করা। মিথ্যা বলে লোককে ঠকানো এবং অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করা ছিল আমার পেশা। আমি এতো নির্দয় ছিলাম যে হিংসার বশে গৃহে আসা অতিথি এবং আশ্রিতদের আহার না করিয়ে একাকীই সব ভোজন করে নিতাম। ভীত-সন্ত্রস্ত বহু লোক আমার কাছে অভয় পাওয়ার জন্য আসত ; কিন্তু আমি তাদের উপযুক্ত সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে গিয়েও অকস্মাৎ সেখান থেকে বার করে দিতাম, তাদের রক্ষা করতাম না। অন্য লোকের কাছে ধনধান্য, সুন্দরী নারী, সুন্দর গাড়ি-বস্ত্র এবং উত্তম লক্ষ্মী দেখে আমি অকারণে ঈর্ষায় দগ্ধ হতাম। কারো ঐশ্বর্য আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমি ছিলাম কামনার দাস। অপরের ধর্ম-অর্থ-কাম বিনাশ করতে সর্বদা উদ্যত থাকতাম। পূর্বজন্মে আমি বহু ক্রূরকর্ম করেছি, সেসব স্মরণ করে খুব অনুতাপ হয়। সেসময় আমার শুভকর্মের ফল জানা ছিল না। জীবনে আমি শুধু বৃদ্ধা মায়ের সেবা করেছি এবং একদিন গৃহে আগত উপযুক্ত গুণসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ অতিথিকে সৎকার করেছি। সেই পুণ্য প্রভাবে আমার এখন পর্যন্ত পূর্বজন্মের স্মৃতি বজায় আছে। এবার আমি শুভ কর্ম করে ভবিষ্যতে পুণ্যবান হতে চাই। সুতরাং আমার যাতে কল্যাণ হয় তা আমাকে বলুন। আপনার কাছেই আমি তা শুনতে চাই।

ব্যাসদেব বললেন—কীট ! তুমি যে শুভকর্মের প্রভাবে এই জন্ম পেয়েও মোহগ্রস্ত হওনি, সে আমাকে দর্শন করার ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমি তপোবলের দ্বারা শুধু দর্শন দানেই তোমাকে উদ্ধার করব। তপোবলের থেকে বড় কোনো শ্রেষ্ঠ বল নেই। আমি জানি, পূর্বের পাপের জন্য তুমি কীট-জন্মে পতিত হয়েছ। এখন যদি তোমার ধর্মে শ্রদ্ধা হয় তবে অবশ্যই তুমি ধর্মলাভ করবে। দেবতা ও তির্যক যোনির প্রাণী এই কর্মভূমিতে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। অজ্ঞ মানুষের ধর্মপালনও কামনা পূর্তির উদ্দেশ্যে হয় এবং তারা কামনা সিদ্ধির জন্যই গুণাদির আশ্রয় নেয়। যাইহোক, এক স্থানে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করেন, তিনি সর্বদা সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করেন এবং লোকেদের পবিত্র কথা শোনান। তুমি সেখানেই তার পুত্ররূপে জন্মাবে এবং বিষয়াদি পঞ্চভূতের বিকার জেনে অনাসক্তভাবে তা উপভোগ করবে। সেইসময় আমি তোমার কাছে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেব, অথবা তুমি যে লোকে যেতে ইচ্ছা কর, সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাব।

———○———

কীটের ব্রাহ্মণ-জন্ম প্রাপ্ত করে ব্রহ্মলোক লাভ করা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ব্যাসদেবের কথা শুনে সেই কীট 'উত্তম কথা' বলে তাঁর নির্দেশ মেনে পথের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। এরমধ্যে এক বিশাল গোরুর-গাড়ি এসে পৌঁছাল এবং তার চাকায় পিষে সেই কীট মারা গেল। তারপর সে ক্রমশ যাড়, শূকর, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র, বৈশ্য প্রভৃতি জন্ম পার করে ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মাল। সেই সময় সে মহর্ষি ব্যাসদেবকে দর্শন করার জন্য বনে গেল এবং তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর চরণে প্রণাম করে হাত জোড় করে বলল—'মুনিবর ! আজ আমি সেই স্থান লাভ করেছি, যার কোনো তুলনা নেই ; যেটি আমি দশ জন্ম ধরে লাভ করতে চাইছিলাম। আপনার কৃপাতেই আমি নিজ দোষে কীট হয়েও আজ রাজকুমার হয়েছি। এখন স্বর্ণমাল্যভূষিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বলবান গজরাজ আমার বাহন রূপে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সুন্দর প্রাসাদে সুখপ্রদ শয্যায় আমি সসম্মানে নিদ্রা যাই। আপনি মহা তেজস্বী এবং

সত্যপ্রতিজ্ঞ। আপনার আশীর্বাদেই আমি কীট থেকে রাজপুত্র হয়েছি। মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনাকে নমস্কার। আপনার তপোবলের প্রভাবেই আমি এই রাজপদ লাভ করেছি ; অতএব আদেশ দিন, আমি আপনার কী সেবা করব।'

ব্যাসদেব বললেন—আজ তুমি যথার্থই আমার স্তুতি করেছ। এখন পর্যন্ত তোমার কীট-জন্মের কলুষিত স্মৃতি জাগরূক আছে। তুমি পূর্বজন্মে অর্থপরায়ণ, নৃশংস ও আততায়ী শূদ্র হয়ে যে পাপ সঞ্চয় করেছ, তা সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়নি। কীট-জন্মেও যে তুমি আমার দর্শন লাভ করেছ, সেই পুণ্যফলেই তুমি ক্ষত্রিয় হয়েছ এবং আজ যে তুমি আমার পূজা করেছ, তার জন্য তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে। রাজকুমার ! তুমি নানা সুখভোগ করে শেষকালে গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য যুদ্ধভূমিতে নিজের প্রাণবিসর্জন দেবে। তারপর ব্রাহ্মণরূপে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে অক্ষয় আনন্দ অনুভব করবে।

ভীষ্ম বললেন—এইভাবে পূর্বজন্মস্মরণকারী সেই কীট ক্ষত্রিয় জন্ম লাভ করে ক্ষাত্র-ধর্ম পালন করতে লাগল। তারপর সে ভীষণ তপস্যা শুরু করল। ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত সেই রাজকুমারের উগ্র তপস্যা দেখে বিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তার কাছে এসে বললেন—'কীট ! প্রাণীদের রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তুমি শুভ-অশুভ জ্ঞান প্রাপ্ত করে, নিজ মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করে ভালোভাবে প্রজাপালন করো। উত্তম ভোগাদি দান করে নিজ অশুভ দোষগুলির মার্জন করো, প্রসন্ন থাকো এবং আত্মজ্ঞান লাভ করো। আজীবন স্বধর্ম পালন করো। তারপর ক্ষত্রিয়-শরীর ত্যাগ করে তুমি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত করবে।'

যুধিষ্ঠির ! মহর্ষি ব্যাসদেবের কথা শুনে রাজকুমার ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করতে লাগল। প্রজাপালনরূপ ধর্ম আচরণ করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই সে যুদ্ধক্ষেত্রে শরীর ত্যাগ করে পরজন্মে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম নেয়। সে কথা জেনে মহাযশস্বী ব্যাসদেব পুনরায় তার কাছে এসে বললেন—'বিপ্রবর ! এবার আর তোমার কোনো ভয় নেই। যারা উত্তম কর্ম করে তারা উত্তম-জন্ম এবং পাপ কর্মকারী পাপ-জন্ম প্রাপ্ত হয়। মানুষ যেমন পাপ করে, সেই অনুযায়ী তাকে ফলভোগ করতে হয়। সুতরাং তুমি আর মৃত্যুভয় পেয়ো না। অবশ্য ধর্মলোপের ভয় তোমার হওয়া উচিত ; তাই তুমি উত্তম ধর্মাচরণ করতে থাকো।'

কীট বলল—মুনিবর ! আপনার কৃপায় আমি উত্তরোত্তর সুখের অবস্থা লাভ করেছি। ধর্মমূলক সম্পদ

লাভ করায় এখন আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়েছে।

ভীষ্ম বললেন—এইভাবে ভগবান ব্যাসদেবের কথানুসারে সেই কীট দুর্লভ ব্রাহ্মণ-জন্ম পেয়ে পৃথিবীতে বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিল। তারপর, ব্রহ্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে সে ব্রহ্মার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। ব্যাসদেবের কথানুযায়ী সে স্বধর্ম পালন করেছিল, তারই ফলস্বরূপ সে ব্রহ্মলোকে গিয়ে সনাতন ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। যুধিষ্ঠির! (ক্ষত্রিয়-জন্মে সে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেছিল, তাই সে উত্তম গতি লাভ করেছিল)। এইরূপ যেসব প্রধান ক্ষত্রিয় নিজ শক্তির পরিচয় দিয়ে এই রণভূমিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তারাও পুণ্যময় গতি লাভ করেছে ; সুতরাং তাদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

ব্যাসদেব-মৈত্রেয় বার্তালাপে দান, তপ ইত্যাদির প্রশংসা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! বিদ্যা, তপ ও দান—এর মধ্যে কোন কর্ম শ্রেষ্ঠ ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং মৈত্রেয়র বার্তালাপের এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময়ের কথা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস গুপ্তরূপে বিচরণ করতে করতে কাশী গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে মুনিদের মণ্ডলীতে মুনিবর মৈত্রেয় উপবেশন করেছিলেন। ব্যাসদেব সেখানে গেলে মৈত্রেয় বুঝতে পারলেন যে ইনি নিশ্চয়ই কোনো মহাত্মা পুরুষ, তখন শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজা করে মৈত্রেয় তাঁকে উত্তমরূপে আহার করালেন। সেই উত্তম, সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে মহামনা ব্যাসদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তারপর রওনা হওয়ার সময় তিনি মৃদুহাস্য করলেন। তাঁকে হাসতে দেখে মৈত্রেয় বললেন—'ধর্মাত্মন্! আমি আপনাকে প্রণাম করে জানতে চাই, আপনি হাসছেন কেন ?'

ব্যাসদেব বললেন—মৈত্রেয়! আমি আপনার এখানে অতিচ্ছেদ এবং অতিবাদ দর্শন করেছি। অর্থাৎ আপনার যে স্থিতি তা অসাধারণ কর্ম ব্যতীত প্রাপ্ত হওয়ার নয় ; কিন্তু আপনার কাছে এটি সহজভাবে উপস্থিত হয়েছে। একথা ভেবেই আমি বিস্ময়যুক্ত হাস্য করেছি। শাস্ত্রবিধি অনুসারে অন্নদানও মহান ফলদায়ক হয়। আপনি ঈর্ষারহিত হৃদয়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত প্রাণীকে দান করেন। আমিও ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত ছিলাম। এরূপ সময়ে আমাকে অন্নদান করে তৃপ্ত করেছেন। এই পুণ্যপ্রভাবে আপনি মহান যজ্ঞাদি দ্বারা প্রাপ্ত করা উত্তমলোক জয় করবেন। আমি আপনার পবিত্র দানে প্রকৃতই প্রসন্ন হয়েছি। আপনার এই বল পুণ্যেরই ফল এবং আপনাকে দর্শন করাও পুণ্যদর্শন। এই দানরূপ পুণ্য প্রভাবের জন্যই আপনার শরীর থেকে পবিত্র নির্যাস নির্গত হচ্ছে। তাত! দান করা তীর্থস্নান এবং বৈদিক ব্রত পূরণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যত পবিত্র কর্ম আছে তার মধ্যে দানই সব থেকে পবিত্র এবং কল্যাণকর। আপনি যেসব বেদোক্ত কর্মের প্রশংসা করেন, সে সবের মধ্যে দানই শ্রেষ্ঠ ; এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দাতারা যে উত্তম পথ প্রস্তুত করেছেন, মনীষীরা সেই পথই অবলম্বন করেন। দাতাকে প্রাণদাতা মনে করা হয়। তাতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যেমন বেদের স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয় সংযম এবং সর্বস্ব ত্যাগ করা উত্তম, তেমনই দানকেও এই জগতে অত্যন্ত উত্তম বলে মনে করা হয়। মহামতে! এই দানের জন্য আপনি উত্তম সুখ প্রাপ্ত করবেন। বুদ্ধিমান মানুষ দান করে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করে—এ আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ। আপনার মতো ব্যক্তি ধন লাভ করলে তা দিয়ে দান ও যজ্ঞ করে সুখ লাভ করে। কিন্তু যারা বিষয় সুখে আসক্ত, তারা সুখ থেকে দুঃখে পতিত হয় এবং যারা তপস্যাদির দ্বারা দুঃখ সহ্য করে, তাদের দুঃখ থেকেই সুখলাভ হতে দেখা যায়। বিদ্বানেরা ইহজগতে মানুষের তিন প্রকার আচরণের কথা বলেন—কীসে পুণ্য হয়, কীসে পাপ হয় এবং কীসে দুটিরই অভাব থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠ মানুষদের আচরণ পুণ্যময় বা পাপময়, কোনোটিই বলা যায় না, তাঁদের কর্মে দুটিরই অভাব থাকে। যারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে, তারা পুণ্যকর্ম করে থাকে। যারা প্রাণীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাদের পাপাচারী বলা হয়। যারা অপরের অর্থ অপহরণ করে, তারা দুঃখ ভোগ করে এবং নরকে পতিত হয়।

মৈত্রেয় বললেন—মুনে! আপনি দান সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, তা দোষরহিত এবং নির্মল। আপনি যে বিদ্যা ও

তপস্যা দ্বারা আপনার অন্তঃকরণকে পরম পবিত্র করে নিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি শুদ্ধচিত্ত, তাই আজ আপনার শুভাগমনে আমি অত্যন্ত লাভবান হয়েছি। আমি বারংবার বিচার করে দেখছি যে আপনি অত্যন্ত সমৃদ্ধ তপস্বী। আপনার দর্শনে আমার অভ্যুদয় হবে। আপনি যে এখানে কষ্ট করে এসেছেন, তাকে আমি আপনার কৃপা মনে করি এবং আপনার স্বাভাবিক কর্মকেই এর কারণ বলে মনে করি। ব্রাহ্মণত্বের তিনটি কারণ মানা হয়—তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। যারা এই তিন গুণযুক্ত, তারাই সত্যকার ব্রাহ্মণ। এরূপ ব্রাহ্মণ তৃপ্ত হলে দেবতা ও পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন। বিদ্বানদের পক্ষে ব্রাহ্মণের থেকে বড় আর কোনো মান্য ব্যক্তি নেই। ব্রাহ্মণ না থাকলে এই সমস্ত জগৎ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না এবং চার বর্ণের স্থিতি, ধর্ম-অধর্ম এবং সত্য-অসত্য কিছুই থাকবে না। মানুষ যেমন উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করে তার ফল পায়, তেমনই বিদ্বান ব্রাহ্মণকে দান করলে দাতা উত্তম ফল উপভোগ করে। যদি বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দান স্বীকার না করে তাহলে ধনবানদের ধন ব্যর্থ হয়ে যায়। মূর্খ ব্যক্তিকে অন্ন দান করলে, সে দান নষ্ট হয়, অর্থাৎ দাতা তার কোনো ফল পায় না, প্রদত্ত অন্ন সেই মূর্খের সর্বনাশ করে। যে ব্যক্তি সুপাত্র হওয়ায় ওই অন্নকে (এবং দাতাকে) রক্ষা করে, অন্নও তাকে রক্ষা করে। যে মূর্খ দানের ফল হনন করে, সে স্বয়ং মারা যায়। বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি অন্নগ্রহণ করে, তাহলে সে ওই অন্নের প্রভু হয় অর্থাৎ তা পরিপাক করার শক্তি রাখে এবং দাতা দানের অনুরূপ উত্তম ফল পায়। যদি ইতর মানুষ কারো অন্নগ্রহণ করে, তাহলে তাকে দাতার সন্তান মনে করা হয়। সুতরাং অযোগ্য ব্যক্তি দান গ্রহণ করলে এই সূক্ষ্মদোষ প্রাপ্ত হয় ; তাই তার কারো দান গ্রহণ করা উচিত নয়। দাতার যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য দান গ্রহণকারী যোগ্য অধিকারীও প্রাপ্ত হয় ; কারণ দুজনে একে অপরের উপকারক হয়। গাড়ি এক চাকায় চলে না—গ্রহীতা বিনা দাতার দান সফল হয় না—ঋষিগণ একথাই বলেন। যেখানে বিদ্বান ও সদাচারী ব্রাহ্মণ থাকে, সেখানে দান করলে তার ফল ইহলোক ও পরলোকে লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ কুলে জাত, তপস্যায় ব্যাপৃত, দাতা এবং অধ্যয়ন-সম্পন্ন, তাঁকে সর্বদাই পূজনীয় বলে মানা হয়। এরূপ সৎপুরুষেরা যে পথ প্রস্তুত করেছেন, সেই পথে যাঁরা চলেন তাঁরা কখনো মোহগ্রস্ত হন না।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মৈত্রেয়র কথা শুনে ভগবান বেদব্যাস বললেন—'আপনি অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী যে এরূপ জ্ঞানে রাখেন। অত্যন্ত সৌভাগ্যে আপনি এরূপ বুদ্ধিলাভ করেছেন। জগতে লোকে উত্তম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই অধিক প্রশংসা করেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে রূপ, অবস্থা এবং সম্পত্তির অহংকার আপনার মনে একটুও প্রভাব বিস্তার করেনি। এগুলি আপনি দেবতার অনুগ্রহ বলে জানবেন। যাইহোক, আমি এবার দানের থেকেও উত্তম ধর্মের বর্ণনা করছি। ইহজগতে যত শাস্ত্র ও প্রবৃত্তি মার্গ আছে, সে সবই ক্রমশ বেদের আধারে প্রচলিত। আমি শুনেছি, মানুষ তপ এবং বিদ্যা দ্বারাই মহান পদ প্রাপ্ত হয় এবং তপঃপ্রভাবেই পাপের নাশ করে। মানুষ যে সব অভিলাষ সিদ্ধির জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তা সবই তপ ও বিদ্যার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। যাকে পরাজিত করা, যা পাওয়া এবং যা রোধ করা কঠিন, সে সবই তপস্যার দ্বারা সম্ভব হয় ; কারণ তপস্যা সব থেকে বড়। মদ্যপায়ী, চোর, ভ্রূণহত্যাকারী, গুরুপত্নী গমনকারী পাপীও তপস্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করে, পাপ থেকে মুক্ত হয়। যে সর্বপ্রকার বিদ্যায় বিদ্বান, সেই চক্ষুষ্মান এবং তপস্বী যেমনই হোক সেও চক্ষুষ্মান। এদের দুজনকে সর্বদা নমস্কার করা উচিত। যিনি বিদ্বান এবং তপস্বী তাঁরা সকলেই পূজ্য এবং দাতাও ইহলোকে অর্থ ও পরলোকে সুখ পায়। জগতে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অন্নদান করে ইহলোকে সুখী হয় এবং মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য শক্তিশালী লোক প্রাপ্ত হয়। দাতা স্বয়ং পূজিত ও সম্মানিত হয়েও অন্যকে পূজা ও সম্মান করেন। তাঁরা যেখানে যান, সেখানেই লোকে তাঁদের প্রণাম জানায়। মৈত্রেয় ! আপনি তরুণ এবং ব্রতধারী, সর্বদা ধর্মপালনে ব্যাপৃত থাকুন। গৃহস্থের জন্য যা সব থেকে উত্তম ও মুখ্য কর্তব্য, তা মন দিয়ে শুনুন। যেখানে পতি তার পত্নীতে এবং পত্নী পতিতে সন্তুষ্ট থাকে সেখানে সর্বদা কল্যাণ হয়। যেমন জলে শরীরের ময়লা ধৌত হয়, অগ্নিপ্রভায় অন্ধকার দূর হয়, তেমনই দান ও তপস্যার দ্বারা মানুষের সর্বপাপ নাশ হয়। আপনার কল্যাণ হোক, এবার আমি আশ্রমে ফিরে যাচ্ছি। আমি যা বললাম, স্মরণে রাখবেন, এতে আপনার কল্যাণ হবে।

—o—

শাণ্ডিলী এবং সুমনার বার্তালাপ—পাতিব্রত্য-ধর্মের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনি সমস্ত ধর্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি আপনার কাছ থেকে সাধ্বী নারীদের সদাচারের বিষয়ে শুনতে চাই। আপনি তার বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—কোনো এক সময়ের কথা, সর্বপ্রকার তত্ত্ব জানা, সর্বজ্ঞ এবং মনস্বিনী শাণ্ডিলী দেবলোকে গিয়েছিলেন। সেখানে কৈকেয়ী সুমনা আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি শাণ্ডিলীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'কল্যাণী ! তুমি কেমন আচার-ব্যবহার করেছিলে যে সমস্ত পাপ নাশ করে এই দেবলোকে এসেছ ? এখন তুমি নিজ তেজে অগ্নির জ্যোতির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছ। তোমাকে দেখে অনুমান করছি যে সামান্য তপস্যা, সাধারণ দান বা ছোট খাটো নিয়ম পালন করে তুমি এই লোকে আসোনি ; দয়া করে তোমার সাধনার সম্পর্কে যথার্থ কথা আমাকে বলো।'

সুমনা মধুর বাক্যে যখন তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা

করলেন তখন মনোহর হাস্যকারিণী শাণ্ডিলী মৃদুস্বরে বললেন—'দেবী ! আমি গেরুয়া বস্ত্র ধারণ, বল্কল পরিধান, মস্তক মুণ্ডন অথবা জটা ধারণ করায় এই লোকে আসিনি। আমি সদা সতর্ক থেকে আমার পতিদেবের প্রতি কখনো অহিতকর ও কঠোর বাক্য বলিনি। আমি সর্বদা শ্বশুর-শাশুড়ির আদেশ মেনে চলেছি এবং দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণের পূজায় কখনো ভুল করিনি। কারো নামে বদনাম করিনি। কারো সঙ্গে বিবাদ করা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। আমি গৃহদ্বার ছেড়ে অন্যত্র দাঁড়াতাম না এবং কারো সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতাম না। আমি কখনো আড়ালে বা সামনে কারো সঙ্গে অশ্লীল পরিহাস করিনি এবং কারো কোনো অহিত কাজ করিনি। আমার স্বামী বাইরের কাজ করে ফিরলে আমি উঠে বসার আসন দিয়ে একাগ্র চিত্তে তাঁর সেবা করতাম। আমার স্বামী যা আহার করতে চাইতেন না, যে খাদ্য পছন্দ করতেন না, আমিও সেইসব আহার্য ত্যাগ করেছিলাম। আত্মীয়-স্বজনের সমস্ত কাজ আমি সকালে উঠেই সেরে নিতাম। কোনো প্রয়োজনে স্বামী অন্যত্র গেলে আমি তাঁর মঙ্গলের জন্য নিয়মাদি পালন করে মাঙ্গলিক পূজা করতাম এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনোপ্রকার সাজসজ্জা করতাম না। স্বামী নিদ্রামগ্ন থাকলে প্রয়োজন থাকলেও তাঁকে জাগাতাম না, এতে আমি মনে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করতাম। পরিবারের পালন-পোষণের কাজের জন্যও তাঁকে আমি বিরক্ত করতাম না। ঘরের গোপন কথা কাউকে বলতাম না এবং গৃহ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতাম। যে নারী সদা সতর্ক থেকে এই ধর্ম-পথ অবলম্বন করে, সে নারীদের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় সম্মানীয় হয় এবং স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সেই সৌভাগ্যশালিনী দেবী শাণ্ডিলী এইভাবে সুমনার কাছে পতিব্রত-ধর্ম বর্ণনা করে অন্তর্হিত হলেন।

———০———

সাম-গুণের প্রশংসা, রাক্ষস এবং ব্রাহ্মণের আলোচনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! সাম ও দানের মধ্যে আপনি কোনটি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র! কোনো মানুষ সামে প্রসন্ন হয়, আবার কেউ দানে। সুতরাং পুরুষের প্রকৃতি বুঝে দুইয়ের মধ্যে একটি প্রয়োগ করা উচিত। এখন তুমি সামের গুণগুলি শোনো। সামের দ্বারা অতি ভয়ংকর প্রাণীকেও বশ করা সম্ভব। এই বিষয়ে এক প্রাচীন কাহিনী বলছি। এক বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ নির্জন বনে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় এক রাক্ষস তাঁকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হল। ব্রাহ্মণ খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বিদ্বানও ছিলেন, তাই রাক্ষসের বিশাল আকৃতি দেখে এতটুকুও ভয় পেলেন না, বিচলিতও হলেন না। বরং তিনি তার প্রতি সামনীতি প্রয়োগ করতে লাগলেন। রাক্ষস ব্রাহ্মণের শান্তিপূর্ণ বাক্যের প্রশংসা করে বলল—'আমার প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে পার, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব। বল, আমি এতো দুর্বল এবং বিষণ্ণ

বোধ করছি কেন?'

তার কথা শুনে ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপরে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, রাক্ষস! মনে হচ্ছে তুমি সুহৃদদের থেকে পৃথক হয়ে অন্যত্র অজানা লোকের সঙ্গে থেকে অতুলনীয় বিষয় উপভোগ করছ। তোমার মিত্রেরা তোমার দ্বারা সম্মানিত হয়েও তাদের স্বভাব দোষে তোমার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকে। গুণে যারা তোমার থেকেও অত্যন্ত নিকৃষ্ট—সেই সাধারণ মানুষেরাও ধন ও ঐশ্বর্যে তোমার থেকে শ্রীসম্পন্ন হওয়ায় তোমাকে অবহেলা করে। সেইজন্য তুমি দুর্বল ও বিষণ্ণ হয়েছ। তুমি গুণবান, বিদ্বান এবং বিনীত হওয়া সত্ত্বেও সম্মান পাও না আর গুণহীন, মূর্খ ব্যক্তিদের চোখের সামনে সম্মানিত হতে দেখে থাকো! জীবিকা-নির্বাহের কোনো উপায় না হওয়ায় তুমি কষ্ট ভোগ কর, কিন্তু নিজের গৌরবের জন্য জীবিকার প্রতিগ্রহ ইত্যাদি উপায়ের নিন্দা করায় তাকে হয়তো স্বীকার করছ না; সম্ভবত এটিই তোমার দুর্বলতা ও বিষণ্ণতার কারণ। তুমি ভদ্রতার জন্য নিজ শরীরকে কষ্ট দিয়েও যখন হয়তো কারো উপকার করো, সে হয়তো মনে করে তুমি তার শক্তির কাছে পরাজিত। যাদের চিত্ত কাম-ক্রোধে আক্রান্ত, যারা কুপথে পড়ে কষ্ট ভোগ করছে, তুমি হয়তো তাদেরই নিয়ে চিন্তিত। তুমি অতীব বুদ্ধিমান হলেও হয়তো অজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিহাস করে এবং দুরাচারী মানুষেরা তোমাকে অসম্মান করে—হয়তো এটাই তোমার উদাসীনতা এবং বিষণ্ণতার কারণ। অথবা এমনও হতে পারে যে, কোনো শত্রু তোমার সঙ্গে মিত্রের মতো ব্যবহার করে তোমাকে ঠকিয়ে গেছে। তুমি অর্থজ্ঞানে কুশল, রহস্যকথা বুঝতে পারঙ্গম, বিদ্বান—তা সত্ত্বেও গুণবান ব্যক্তিরা হয়তো তোমাকে সম্মান করে না, তাই তুমি দুর্বল ও বিষণ্ণ হয়ে থাকো। তুমি সন্দেহরহিত হয়ে উত্তম উপদেশ প্রদান কর, তা সত্ত্বেও নীচ পুরুষদের মধ্যে তোমার গুণাদি প্রতিষ্ঠা পায় না। অথবা এমনও হতে পারে যে তুমি বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থে হীন হয়েও কেবল শারীরিক শক্তির দ্বারাই বড় হতে চাও এবং তাতে সফল হওনি। আমার তো মনে হচ্ছে যে তোমার মন তপস্যায় রত আছে, তাই তুমি জঙ্গলে থাকতে চাও; কিন্তু তোমার ভ্রাতা-বন্ধুরা তা পছন্দ করে না। এমনও হতে পারে যে তোমার স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী এবং তোমার কোনো প্রতিবেশী অত্যন্ত সুন্দর, ধনী, লম্পট এবং যুবক। অন্য এক সম্ভাবনাও থাকতে পারে, তুমি হয়তো ধনীদের মধ্যে গিয়ে উত্তম ও সময়োচিত কথা বল, কিন্তু তারা তা পছন্দ করে না অথবা তোমার কোনো প্রিয় ব্যক্তি মূর্খতাবশত তোমার ওপর কুপিত হয়েছে, তুমি হয়তো তাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারছ না। সম্ভবত এই সব কারণে তুমি দুর্বল ও উদাসীন হচ্ছ। মনে হচ্ছে কোনো

ব্যক্তি তোমাকে তার ইচ্ছানুযায়ী কাজে নিযুক্ত করে সর্বদা লাভান্বিত হতে চায় অথবা তুমি নিজ সৎ গুণের জন্য সম্মানিত হও অথচ তোমার বন্ধু-বান্ধব মনে করে যে তাদের প্রভাবেই তুমি সম্মানিত হচ্ছ আর তুমি লজ্জাবশত তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় কাউকে বলতে চাও না। জগতে নানাপ্রকার বুদ্ধি ও রুচিসম্পন্ন লোক থাকে, তাদের সকলকে তুমি নিজগুণে বশ করতে চাও। অথবা এমনও হতে পারে যে তুমি বিদ্বান না হয়েও বিদ্যাদ্বারা প্রাপ্ত যশলাভ করতে চাও, ভীতু হয়েও পরাক্রমজনিত কীর্তি অভিলাষ কর এবং তোমার কাছে অল্প ধন থাকলেও বৃহৎ দানের সুযশ লাভ করতে চাও, মনে হয় এটিই তোমার বিষণ্ণতা এবং দুর্বলতার কারণ। একটি কথা আরও মনে হচ্ছে যে তুমি নিজের কোনো দোষ দেখতে পাও না, তা সত্ত্বেও লোকে তোমাকেই অভিযুক্ত করে। হয়তো তুমি সাধু পুরুষদের গৃহস্থে, দুর্জনদের বনে এবং সন্ন্যাসীদের মঠ-মন্দিরে আসক্ত দেখো সেই চিন্তাতেও বিষণ্ণ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছ। তোমার স্নেহভাজন বন্ধু-বান্ধব কষ্টে পড়ে দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করছে আর তুমি তাদের উদ্ধার করতে পারছ না, তাই তুমি তোমার ধনহীন জীবন ব্যর্থ বলে মনে করছ। তোমার কথা ধর্ম-অর্থ-কামের অনুকূল এবং সাময়িক হলেও অন্য লোকে তা বিশ্বাস করে না। মনীষী হয়েও প্রাণধারণের জন্য অজ্ঞ ব্যক্তির প্রদত্ত ধনের ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। তোমার আত্মীয়রা পরস্পরের বিরোধিতা করে, তুমি তাদের ভালো করতে চাও। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম করতে এবং বিদ্বানদের ইন্দ্রিয়ের বশ হতে দেখে তুমি অত্যন্ত চিন্তিত থাক। সম্ভবত এইসব কারণেই তোমার দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এই কথা বলে ব্রাহ্মণ রাক্ষসকে সম্মান জানালে রাক্ষসও তাঁকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করল। সে তখনই ব্রাহ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল এবং তাঁকে মুক্ত করে প্রভূত ধনসম্পদ দান করল।

——০——

শ্রাদ্ধের বিষয়ে দেবদূত এবং পিতৃপুরুষের আর ধর্মের বিষয়ে ইন্দ্র এবং বৃহস্পতির কথোপকথন

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! পূর্বে ভগবান বেদব্যাস ধর্মের যে গূঢ় রহস্য আমাকে বলেছিলেন, তা বর্ণনা করছি, শোনো—যা করলে দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋষি, প্রমথ, লক্ষ্মী, চিত্রগুপ্ত এবং দিগ্‌গজ প্রসন্ন হন, যাতে মহাফল প্রদানকারী ঋষি-ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে এবং যে অনুষ্ঠান দ্বারা বড় বড় দান ও সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ধর্মকে জেনে যে সেই অনুযায়ী আচরণ করে, সে যদি পাপীও হয় তাহলে পাপমুক্ত হয়ে সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। দশজন কসাইয়ের সমান একজন তেলী, দশজন তেলীর সমান এক কালোয়ার, দশ কালোয়ারের সমান এক পতিতা, দশ পতিতার সমান একজন রাজা। সুতরাং রাজার দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলা হয়। যাতে ধর্ম, অর্থ ও কামনার বর্ণনা আছে, যা পবিত্র ও পুণ্যের পরিচায়ক, যাতে ধর্ম এবং তার রহস্যের ব্যাখ্যা থাকে এবং যা পরম পবিত্র, ধর্মযুক্ত এবং সাক্ষাৎ দেবতাদের দ্বারা নির্মিত, সেই শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত। যাতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের গূঢ় বিষয় জানানো আছে, যেখানে দেবতাদের রহস্য সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত এবং যাতে রহস্যসহ মহাফলদায়ক ঋষি-ধর্ম এবং বড় বড় যজ্ঞ ও সমস্ত দানের ফলগুলির প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেই শাস্ত্র যাঁরা সর্বদা পাঠ করেন, তাঁরা সাক্ষাৎ নারায়ণের স্বরূপ। যে সকল ব্যক্তি অতিথিদের পূজা করে, তারা গোদান, তীর্থস্নান এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করে। যারা শ্রদ্ধাসহকারে ধর্মশাস্ত্রাদি শ্রবণ করে এবং যাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়েছে, তারা অবশ্যই পুণ্যলোক জয় করে। শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্র-শ্রবণকারী ব্যক্তি পূর্বপাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। পরবর্তীকালে সে আর পাপ করে না। প্রতিদিন ধর্মানুষ্ঠান করতে থাকে এবং মৃত্যুর পর উত্তমলোক লাভ করে।

কোনো এক সময়ের কথা, এক দেবদূত পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের প্রশ্ন করলেন—কী কারণে শ্রাদ্ধের দিন

শ্রাদ্ধকর্তা এবং শ্রাদ্ধে ভোজনকারী ব্যক্তিদের মৈথুন নিষিদ্ধ করা হয়েছে ? শ্রাদ্ধে পৃথকভাগে তিনটি পিণ্ড কেন দেওয়া হয় ? প্রথম পিণ্ডটি কাকে দেওয়া উচিত ? দ্বিতীয়টি কে পায়, তৃতীয় পিণ্ডের অধিকারী কে ? আমি এইসব জানতে চাই।'

পিতৃপুরুষেরা বললেন—দেবদূত ! তোমার কল্যাণ হোক, আমরা তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি অত্যন্ত গূঢ় প্রশ্ন করেছ, তবুও আমরা তার উত্তর দিচ্ছি। শোনো—যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে দান দিয়ে অথবা শ্রাদ্ধে ভোজন করে স্ত্রীসহবাস করে, তার পিতৃপুরুষ সেই দিন থেকে এক মাস তার বীর্যে বাস করে। এবার আমি পিণ্ডের ভাগের ক্রম বলছি। শ্রাদ্ধে যে তিনটি পিণ্ডের বিধান আছে, তার প্রথম পিণ্ডটি জলে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্তার পত্নীকে খাইযে দেওয়া উচিত এবং তৃতীয় পিণ্ড অগ্নিতে প্রদান করতে হয়—শ্রাদ্ধের এই নিয়ম। যে এটি পালন করে তার কখনো ধর্মলোপ হয় না, তার পিতৃকুল সর্বদা প্রসন্ন চিত্ত থাকেন এবং তার প্রদত্ত দান অক্ষয় হয়।

দেবদূত জিজ্ঞাসা করলেন—পিতৃগণ ! আপনারা পিণ্ডের ভাগের ক্রম বলেছেন। প্রথম পিণ্ড যে জলে দান করার কথা বলেছেন, সেই অনুসারে পিণ্ড জলে দান করলে সেটি কে পায় ? কোন দেবতা সেই পিণ্ডতে প্রসন্ন হন ? পিতৃকুল কীভাবে তাতে উদ্ধারলাভ করেন ? তেমনই দ্বিতীয় পিণ্ডটি যদি পত্নীই খেয়ে নেয় তাহলে তার পিতৃকুল কীভাবে সেই পিণ্ড উপভোগ করেন ? শেষ পিণ্ডটি যদি অগ্নিতে প্রদান করা হয়, তাহলে তার কী গতি হয় ? সেটি কোন দেবতা পান ? আমি এই সব কথা শুনতে চাই।

পিতৃগণ বললেন— দেবদূতগণ ! প্রথম পিণ্ড জলের মধ্যে দেওয়া হয়, সেটি চন্দ্রকে তৃপ্ত করে এবং চন্দ্র নিজে দেবতা ও পিতৃকুলকে সন্তুষ্ট করেন। তেমনই পত্নী গুরুজনের আদেশে যে দ্বিতীয় পিণ্ডটি ভক্ষণ করে, তাতে প্রসন্ন হয়ে পিতামহ পুত্র আকাঙ্ক্ষাকারী পুরুষকে পুত্র প্রদান করেন আর অগ্নিতে যে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাতে তৃপ্ত হয়ে পিতৃগণ মানুষের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। তিন পিণ্ডের গতি-প্রকৃতি জানানো হল। ব্রাহ্মণের স্নানাদি করে পবিত্র হয়ে শ্রাদ্ধে আহার করা উচিত। শ্রাদ্ধে ভোজনকারী ব্রাহ্মণকে সেই দিন যজমানের পিতৃপুরুষ বলে মানা হয়, তাই তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা উচিত নয়। কারণ সেই দিন তার স্ত্রী তার কাছে অন্যের স্ত্রীর সমান হয়। যে ব্যক্তি এই নিয়ম অনুসারে শ্রাদ্ধের দান করে, তার বংশ বৃদ্ধি হয়।

পিতৃগণ এই কথা বলার পর বিদ্যুৎপ্রভ নামে এক তপস্বী মহর্ষি ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবরাজ ! মানুষ মোহবশত কীট, পিঁপড়া, সাপ, ভেড়া, মৃগ, পক্ষী ইত্যাদি তির্যকযোনির প্রাণীদের হিংসা করে যে মহাপাপের ভাগীদার হয়, তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার কী প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ?' তাঁর প্রশ্ন শুনে সকল দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণ তাঁর অশেষ প্রশংসা করতে লাগলেন।

ইন্দ্র উত্তর দিলেন—মানুষের মনে মনে ধ্যান করে কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর ক্ষেত্রের জলে স্নান করা উচিত—এই স্নানে সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি গাভীর পৃষ্ঠ স্পর্শ করে তার পুচ্ছকে প্রণাম করে, উপরিউক্ত তীর্থাদিতে তিন দিন উপবাস করে বসবাসের ও স্নান করার ফল সে লাভ করে।

তারপর ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে তাঁর গুরু বৃহস্পতিকে মধুর বাক্যে বললেন—'গুরুদেব ! মানুষকে সুখপ্রদান-কারী ধর্মের গূঢ় স্বরূপ বলুন, সেই সঙ্গে রহস্যসহ দোষগুলিরও বর্ণনা করুন।'

বৃহস্পতি বললেন—ইন্দ্র ! সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, সূর্য, পবন, অগ্নি এবং লোকমাতা গাভীদের সৃষ্টি করেছেন। এঁরা মনুষ্যলোকের দেবতা এবং সমস্ত জগৎ উদ্ধার করার শক্তি রাখেন। যে সকল নারী ও পুরুষ সূর্যের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করে, তারা ছিয়াশি বছর ধরে দুরাচারী ও

কুলকলঙ্কময় জীবন কাটায়। যে পবন (বায়ু) দেবতাকে দ্বেষ করে, তার সন্তান গর্ভে এসে নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি জ্বলন্ত অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করে না, অগ্নিহোত্রকালে তার হবিষ্য অগ্নিদেব গ্রহণ করেন না। যে গাভীর বৎস্য অত্যন্ত ছোট, সেই গোমাতার সমস্ত দুধ দোহন করে যারা পান করে, তাদের আর সন্তান হয় না। তাদের সন্তান এবং কুল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। উত্তম কুলে জন্মগ্রহণকারী বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা পূর্বকালে ওইসব পাপের এমনই ফল প্রাপ্ত হতে দেখেছেন। তাই শাস্ত্রে যেসব কর্ম নিষেধ করা হয়েছে, তা পরিত্যাগ করা উচিত এবং যেগুলি কর্তব্য বলে বলা হয়েছে সেইগুলির সর্বদা অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

তারপর সমস্ত দেবতা, মরুদ্‌গণ এবং ঋষিগণ পিতৃগণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মানুষেরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, সুতরাং কোন কর্মের দ্বারা তারা কাজ করে আপনাদের সন্তুষ্টিবিধান করবে, তা বলুন। শ্রাদ্ধে প্রদত্ত দান কীভাবে অক্ষয় হয় ? কোন কর্মের অনুষ্ঠান করলে মানুষ পিতৃঋণ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে ? এইসব কথা শোনার জন্য আমরা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছি।'

পিতৃগণ বললেন—দেবগণ ! উত্তম কর্ম করে যেসব মানুষ, তাদের যে কাজে আমরা সন্তুষ্ট হই, তা শুনুন। নীল রঙয়ের ষাঁড় (বৃষভ) উন্মুক্ত করলে, অমাবস্যা তিথিতে তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করলে এবং বর্ষাকালে দীপদান করলে মানুষ পিতৃঋণ থেকে উদ্ধার লাভ করে। এইরূপ নিষ্কপটভাবে করা দান অক্ষয় ও মহান ফলদায়ক হয় এবং আমরাও এতে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকি। যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সন্তান উৎপন্ন করে, সে তার প্রপিতামহকে দুর্গম নরক থেকে উদ্ধার করে। এইভাবে শ্রাদ্ধের কাল, ক্রম, বিধি, পাত্র ও ফলের যথাবৎ বর্ণনা করা হল।

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, লক্ষ্মী ও অঙ্গিরাদি ঋষিদের দ্বারা ধর্মের রহস্য বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! প্রাচীন কালের কথা, একবার দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা

করলেন—'দেবাদিদেব ! আপনি কোন কাজে প্রসন্ন হন ? আপনাকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায় ?'

বিষ্ণু বললেন—ইন্দ্র ! ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা আমার সঙ্গে মহাদ্বেষ করার সমান। ব্রাহ্মণদের পূজা করলে আমারও পূজা করা হয়—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি প্রত্যহ আহারের পর ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে, আমি তার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হই। যে ব্যক্তি নিজগৃহে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে উপস্থিত দেখে সর্বপ্রথম তাঁকে ভোজন করায় এবং পরে নিজে আহার করে, তার সেই আহার অমৃতের সমান বলে মানা হয়। যে প্রাতঃকালে উপাসনা করে সূর্যের সামনে দাঁড়ায়, তার সমস্ত তীর্থস্নানের ফল লাভ হয় এবং সে সর্ব পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে।

তখন বিশ্ববিখ্যাত বশিষ্ঠ প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং সকলে হাত জোড় করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মবেত্তা শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মুনি প্রশ্ন করলেন—'দেব ! আমি সমস্ত প্রাণী বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির হিতের দৃষ্টিতে একটি প্রশ্ন আপনার কাছে উপস্থিত করছি। এই জগতে সদাচারী মানুষ প্রায়শ নির্ধন হয়ে থাকে। তারা কীভাবে এবং কোন কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞের ফল লাভ করতে পারে ?'

ব্রহ্মা বললেন—মহা ভাগ্যশালী মহর্ষিগণ ! মানুষেরা

যেভাবে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হতে পারে, তা বলছি, শোনো। পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষে যে দিন রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয় সেই দিনের রাত্রে মানুষ স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে এক বস্ত্র ধারণ করে উন্মুক্ত মাঠে শয়ন করবে এবং শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা সহকারে চন্দ্রের কিরণ পান করবে (অনাহারে থাকবে)। এরূপ করলে সে মহাযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হবে। আমি তোমাদের এটি অত্যন্ত গুপ্ত কথা জানালাম।

অগ্নিদেব বললেন—যে ব্যক্তি পূর্ণিমা তিথির চন্দ্রোদয়ের সময় চন্দ্রের দিকে মুখ করে তাঁকে জলের এক অঞ্জলি (অর্ঘ্য), ঘি এবং তণ্ডুল অর্পণ করে, তার অগ্নিহোত্রের কাজ পূর্ণ হয়। তার গার্হপত্য ইত্যাদি তিন অগ্নিতে হবন করার ফল প্রাপ্তি হয়। যে মূর্খ অমাবস্যার দিন কোনো বৃক্ষ থেকে একটিও পাতা ছিঁড়ে নেয়, তার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। অমাবস্যাতে দাঁতন করে যে ব্যক্তি, সে চন্দ্রকে হিংসা করে এবং এতে তার পিতৃকুলও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, পর্বের দিনে তার প্রদত্ত হবিষ্য দেবতাগণ স্বীকার করেন না এবং পিতৃপুরুষও তার ওপর কুপিত হন, যাতে তার বংশ লোপ পায়।

লক্ষ্মী বললেন—যে ঘরে ভাঙা বাসনপত্র, ভাঙা ও ছিন্ন-ভিন্ন আসন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকে এবং যেখানে নারীদের মারধোর করা হয়, সেই গৃহ পাপে দূষিত হয়ে ওঠে। উৎসব এবং পর্বের সময় দেবতাগণ সেই স্থান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যান ; সেই গৃহের পূজা তাঁরা স্বীকার করেন না।

গার্গ্য বললেন—সর্বদা অতিথিদের আপ্যায়ন করবে, যজ্ঞশালাতে প্রদীপ জ্বালাবে, দিবসে নিদ্রা যাবে না, মাংসাহার করবে না, গো-ব্রাহ্মণ হত্যা করবে না এবং প্রত্যহ পুষ্কর-তীর্থের নাম স্মরণ করবে। এই রহস্যময় ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান ফলদায়ক। সহস্র বার করা যজ্ঞের ফলও ক্ষীণ হয়ে যায়, কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্বক উপরিউক্ত ধর্ম পালন করলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তা কখনো ক্ষয় হয় না। শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে, তীর্থে এবং পর্বাদির দিন দেবতাদের জন্য যে হবিষ্য তৈরি করা হয়, তা যদি রজস্বলা, কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অথবা বন্ধ্যানারী দেখে ফেলে তাহলে দেবগণ সেটি স্বীকার করেন না এবং পিতৃপুরুষ তেরো বছর পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন। শ্রাদ্ধ এবং যজ্ঞের দিন মানুষ স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করবে এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বস্তিবাচন ও মহাভারত (গীতা ইত্যাদি) পাঠ করাবে—এরূপ করলে তার প্রদত্ত হব্য ও কব্যের ফল অক্ষয় হয়।

ধৌম্য বললেন—গৃহে ভাঙা বাসন, ভাঙা খাট, মোরগ, কুকুর এবং বৃক্ষ থাকা ভালো বলে মনে করা হয় না। ভাঙা বাসনে কলিযুগের বাস বলা হয় (অর্থাৎ ভাঙা বাসন গৃহে থাকলে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে)। ভাঙা খাট থাকলে ধন হানি হয়। কুকুর এবং মুরগি পুষলে দেবতারা সেই গৃহের হবিষ্য গ্রহণ করেন না। গৃহের মধ্যে কোনো বড় গাছ থাকলে, তাতে সাপ-বিছে ইত্যাদির বাস অনিবার্য, তাই গৃহের মধ্যে গাছ লাগানো উচিত নয়।

জামদগ্নি বললেন—কেউ যদি অশ্বমেধ অথবা বাজপেয় যজ্ঞ পালন করে, বৃক্ষের সঙ্গে পা বেঁধে মাথা উলটে ঝুলতে থাকে অথবা মস্ত বড় অন্নসত্র খোলে ; কিন্তু তার হৃদয় যদি শুদ্ধ না হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই নরকে গমন করতে হবে। কারণ যজ্ঞ, সত্য এবং হৃদয়ের শুদ্ধি—এই তিনটিই এক সমান। প্রাচীনকালে এক ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হৃদয়ে এক সের ছাতু দান করেই ব্রহ্মলোক লাভ করেছিলেন। হৃদয়ের শুদ্ধতার মহত্ত্ব জানানোর জন্য এই একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

অরুন্ধতী, সূর্য, প্রমথ, মহেশ্বর, স্কন্দ, বিষ্ণু কথিত বিশেষ ধর্মের বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—তারপর সমস্ত ঋষি, পিতৃগণ, দেবতাগণ তপস্যায় শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত অরুন্ধতী দেবীকে, যিনি শীল ও শক্তিতে মহাত্মা বশিষ্ঠেরই সমকক্ষ ছিলেন, নিবেদন করলেন—'দেবী ! আপনার মুখ থেকে আমরা ধর্মের প্রকৃত রহস্য শুনতে চাই। অতএব আপনি কৃপা করে ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বলুন।'

অরুন্ধতী বললেন—দেবগণ ! আপনারা যে আমাকে স্মরণ করেছেন, তাতে আমার তপস্যা বৃদ্ধিলাভ করেছে। এখন আমি আপনাদেরই কৃপায় সনাতন ধর্মের বর্ণনা করছি। শ্রদ্ধাবিহীন, অহংকারী, ব্রহ্মঘাতী এবং গুরুপত্নীগামী—এই চার প্রকার মানুষদের সঙ্গে কথাও বলা উচিত নয়। এদের উপস্থিতিতে কখনো ধর্মতত্ত্ব আলোচনা

করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি বারো বছর প্রতিদিন একটি করে কপিলা গাভী দান করেন, প্রত্যেক মাসে যজ্ঞ করেন এবং পুষ্করতীর্থে গিয়ে লক্ষ লক্ষ গাভী দান করেন, তাঁর ধর্মের ফল কখনো সেই মানুষের সমান হয় না, যিনি সেবার দ্বারা অতিথিকে সন্তুষ্ট করেন। প্রাতে উঠে কুশ ও জল নিয়ে গাভীদের কাছে গিয়ে তাদের শিং-এ জলের ছিটা দিয়ে সেই শিং-এর জল নিজের মাথায় দিলে এবং সেই দিন উপবাসে থাকলে তাতে যে ফল হয় তা এইরূপ—ত্রিলোকসিদ্ধ চারণ ও মহর্ষিগণ সেবিত যত পুণ্যতীর্থ শোনা যায়, সেই সবে স্নান করলে যে ফল হয় সেই ফল লাভ করা যায়।

একথা শুনে দেবতা, পিতৃগণ এবং সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁরা একসুরে অরুন্ধতী দেবীকে সাধুবাদ জানিয়ে ভূরি ভূরি প্রশংসা করলেন। তারপর ব্রহ্মা বললেন—'মহাভাগে! তুমি ধন্যা, তুমি রহস্যসহিত অদ্ভুত ধর্মের বর্ণনা করেছ। তোমাকে বরপ্রদান করছি ; তোমার তপস্যা সর্বদা সিদ্ধিলাভ করুক।'

তখন মহা তেজস্বী ভগবান সূর্য দেবতা ও পিতৃগণকে বললেন—ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পরস্ত্রীগামী লম্পট, শ্রদ্ধাহীন এবং স্ত্রীর আয়ে জীবিকা নির্বাহকারী—এই পাঁচপ্রকার দুরাচারী নরাধম, সর্বতোভাবে ত্যজনীয়। এদের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। এদের পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। এই পাপীরা প্রেতলোকে (যমপুরীতে) গিয়ে সেখানকার নরকে সিদ্ধ হয় এবং সেখানে তাদের পুজ ও রক্ত খাদ্য হিসাবে প্রাপ্ত হয়। দেবতা, পিতৃকুল, স্নাতক, ব্রাহ্মণ এবং তপস্বী মুনিদের দৃষ্টিতে উপরিউক্ত পাপীদের সঙ্গে কথা বলাও উচিত নয়।

ভীষ্ম বললেন—তারপরে সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ এবং মহাভাগ্যশালী ঋষিগণ প্রমথদের জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা প্রত্যক্ষরূপে নিশাচর। অপবিত্র, অশুদ্ধ এবং ক্ষুদ্র মানুষদের আপনারা কেন হত করেন, বলুন। এমনকী উপায় আছে, যার আশ্রয় গ্রহণ করলে আপনি তাদের হত্যা করা থেকে বিরত হন ? কী কী রক্ষোঘ্নমন্ত্র আছে, যা উচ্চারণ করলে আপনাদের মতো নিশাচরেরা গৃহ থেকে বহির্গত হয় ? এইসব কথা আমরা আপনার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছুক।'

প্রমথগণ বললেন—যে ব্যক্তি সর্বদা স্ত্রী-সহবাসের জন্য দূষিত থাকে, গুরুজনদের অপমান করে, মোহবশত মাংসাহার করে, বৃক্ষমূলে শয়ন করে, মস্তকে মাংস বহন করে, শয্যায় পা রাখবার জায়গায় মাথা দিয়ে শয়ন করে এবং জলে মল-মূত্র ও থুতু ফেলে, সেই সব ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট (অপবিত্র) ও বহু দোষযুক্ত হয়। এরূপ মানুষদেরই আমরা বধ্য ও ভক্ষ্য বলে মনে করি। এবার শুনুন কোন কোন কারণে আমরা মানুষকে হিংসা করতে অসমর্থ হই। যে নিজ দেহে গোরোচন লেপন করে, হাতে 'বচা' (উদ্ভিদ-বিশেষের মূল) নিয়ে থাকে, কপালে ঘি এবং অক্ষত ধারণ করে, মাংসাহার করে না এবং যার গৃহে দিন-রাত হোমাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, আমরা তাদের হত্যা করি না।

মহেশ্বর বললেন—যার বুদ্ধি সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত এবং যে পরম শ্রদ্ধাময়, তাকেই মহান ফলপ্রদানকারী ধর্ম রহস্যসহ উপদেশ প্রদান করা উচিত। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ধৈর্য সহকারে গাভীকে ঘাস দেয়, নিজে একবার মাত্র আহার করে সে, যে ফল প্রাপ্ত হয়, তা শোনো। গাভীকে মহাসৌভাগ্য আনয়নকারী বলা হয়, এদের পরম পবিত্র মানা হয়। দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যসহ তিনলোককে গাভীই ধারণ করে আছে, এদের সেবা করলে অত্যন্ত পুণ্য হয় এবং মহান ফল প্রাপ্তি হয়। প্রত্যহ গাভীদের ঘাস-পাতা খাওয়ালে মানুষ মহা ধর্ম উপার্জন করে। প্রথমে সত্যযুগে আমি গাভীদের আমার কাছে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম, পদ্মযোনি ব্রহ্মাও তার জন্য আমার কাছে অনেক অনুরোধ করেছিলেন। তাই গাভীর দলে থাকা বৃষ আমার রথের ধ্বজাতে বিরাজ করে ; তাই গাভীকে সর্বদা পূজা করা উচিত। তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি, তারা বরদায়িনী, তাই উপাসনা করলে অভীষ্ট বরপ্রদান করে। যে একদিনও গাভীকে খাওয়ায়, সে সমস্ত ফলের এক-চতুর্থাংশ ফল লাভ করে।

স্কন্দ বললেন—দেবগণ ! এবার আমার ধারণানুযায়ী ধর্মের কিছু কথা শোন। যে ব্যক্তি নীল বর্ণের ষাঁড়ের শিং-এ লাগানো মাটি নিয়ে তিন দিন অভিষেক করে, তার সমস্ত পাপ দূর হয় এবং পরলোকে শান্তি লাভ করে। পরজন্মে সে মহা শূরবীর হয়। এখন ধর্মের অন্য গুপ্ত রহস্য শোন—পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয়ের সময় তামার বাসনে মধুমিশ্রিত অন্ন নিয়ে যে চন্দ্রকে বলি অর্পণ করে, তা সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মরুদ্গণ এবং বসুদেবতাও গ্রহণ করে, এতে চন্দ্র এবং সমুদ্রও বৃদ্ধিলাভ করে। আমি তোমাদের এক সুখদায়ক ধর্মের কথা

জানালাম।

ভগবান বিষ্ণু বললেন—যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা সহকারে দেবতা ও মহর্ষিদের কথিত ধর্মের এই গূঢ় রহস্য প্রতিদিন পাঠ করে, তার কখনো কোনো বিঘ্ন ঘটে না এবং সে নির্ভয় হয়ে থাকে। এখানে যেসব ধর্ম রহস্যসহ বর্ণিত হয়েছে, সে সবই শুভ এবং পবিত্র। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক এর মার্মিক ফল পরায়ণ করে, তার ওপর কখনো পাপের প্রভাব পড়ে না। সে সর্বদা পাপে নির্লিপ্ত থাকে। যে এটি পাঠ করে, অন্যকে শোনায় অথবা নিজে শোনে, সেও এই ধর্ম আচরণের ফল লাভ করে। সেই ব্যক্তির প্রদত্ত হব্য-কব্য অক্ষয় হয় এবং দেবতা ও পিতৃগণ তা অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে পর্বের দিন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ধর্মের এই রহস্য শ্রবণ করায়, সে সর্বদা দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের আদরের পাত্র হয় এবং তার সর্বদা ধর্মে প্রবৃত্তি থাকে।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির! দেবগণ কথিত ধর্মের এই রহস্য ব্যাসদেব আমাকে বলেছিলেন, সেগুলিই আমি তোমাকে জানালাম। একদিকে যদি রত্নপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী প্রদান করা হয় আর অন্যদিকে থাকে এই উত্তম জ্ঞান, তাহলে রত্নপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে এই জ্ঞানই শ্রবণ করা উচিত। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, ধর্মত্যাগী, নির্দয়, যুক্তিবাদের সাহায্যে অপরাধ করা ব্যক্তি, গুরুদ্রোহী এবং অনাত্মীয় ব্যক্তিকে এই ধর্ম উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।

—০—

গ্রাহ্যান্ন এবং ত্যাজ্যান্ন মানুষদের বর্ণনা এবং অযোগ্য দান ও অন্ন গ্রহণ করার প্রায়শ্চিত্ত

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কোন কোন মানুষের অন্ন গ্রহণ করা উচিত?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অন্ন গ্রহণ করা উচিত। শূদ্রের অন্ন তার পক্ষে নিষিদ্ধ। তেমনই ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অন্নগ্রহণ করা উচিত ; কিন্তু ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করে সকল প্রকারের খাদ্যগ্রহণকারী এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণকারী শূদ্রদের অন্নও এদের পক্ষে ত্যাজ্য। বৈশ্যদের মধ্যেও যারা নিত্য অগ্নিহোত্র করে, পবিত্রভাবে থাকে এবং চাতুর্মাস্য (বর্ষাকালে ২-৩ মাস একস্থানে বাস করে সাধনায় রত থাকা) ব্রত পালন করে, তাদের অন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গ্রহণ করতে পারে। যে দ্বিজ শূদ্রের অন্নগ্রহণ করে, সে সমস্ত পৃথিবী তথা মানুষের মল পান ও ভোজন করে। শূদ্রের আশ্রয়ে থাকা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য নরক যাতনা ভোগ করে। ব্রাহ্মণদের বেদের স্বাধ্যায় এবং মানুষের মঙ্গলকারী কর্মে ব্যাপৃত থাকা উচিত। ক্ষত্রিয়দের সকলকে রক্ষা করা উচিত এবং বৈশ্যদের প্রজাদের শারীরিক পুষ্টির জন্য কৃষি,গোরক্ষা ইত্যাদি কাজ করা কর্তব্য—এগুলিই বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম, তাদের এগুলিতে ঘৃণা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি নিজ বর্ণের বিহিত কর্ম পরিত্যাগ করে শূদ্রের কাজ করে, তাকে শূদ্র বলেই মনে করা উচিত। তার অন্ন কখনো গ্রহণ করা উচিত নয়। যেসব ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করে, অস্ত্র বিক্রি করে জীবিকা-নির্বাহ করে, গ্রামাধ্যক্ষ, ভাগ্য গণনাকারী এবং বেদ-শাস্ত্র ব্যতীত ব্যর্থ পুস্তক পাঠ করে, তারা সকলেই শূদ্রের সমান।

যারা লজ্জা ত্যাগ করে শূদ্রের ন্যায় কর্ম করা এই ব্রাহ্মণদের অন্ন আহার করে, তারা অভোক্ষ্য ভক্ষণের পাপের ভাগী হয়ে ঘোর বিপদে পড়ে। তাদের কুল, বীর্য ও তেজ নষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্মকর্মহীন হয়ে তারা কুকুরের মতো তির্যকযোনি প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসাকারীর অন্ন বিষ্ঠা, পতিতার অন্ন মূত্র এবং কারীগরের অন্নকে রক্ত বলা হয়। বিদ্যা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহকারীর অন্নও শূদ্রান্নের সমান, সুতরাং সাধু ব্যক্তির তা পরিত্যাগ করা উচিত। যে কলঙ্কিত মানুষের অন্ন খায়, তাকে রক্তের সরোবর বলা হয়। কলহকারীর অন্নকে ব্রহ্মহত্যাকারীর অন্নের সমকক্ষ বলা হয়েছে। অবহেলা এবং অনাদরপূর্বক প্রাপ্ত অন্ন কখনো গ্রহণ করা উচিত নয়। যে ব্রাহ্মণ এরূপ অন্ন ভোজন করে, সে রুগ্ন হয় এবং তার কুলের নাশ হয়। নগররক্ষকের অন্ন গ্রহণ করলে চণ্ডাল হয়ে জন্মাতে হয়। গো-হত্যাকারী, ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপ ও গুরুস্ত্রীগামী ব্যক্তিদের অন্নগ্রহণ করলে রাক্ষসকুলে জন্ম হয়। গচ্ছিত বস্তু হরণকারী, কৃতঘ্ন এবং নপুংসকের অন্ন খেলে ভীলেদের ঘরে জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির ! কোথায় অন্ন গ্রহণ যোগ্য, কোথায় নয় আমি বিধিপূর্বক তার পরিচয় দিলাম, এখন তুমি আর কী জানতে চাও ?

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! ব্রাহ্মণদের প্রায়শ হব্য-কব্যের প্রতিগ্রহ নিতে হয় এবং নানাপ্রকারের অন্নগ্রহণ করার পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সেই অবস্থায় তাদের যে পাপ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত কী—দয়া করে তা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের প্রতিগ্রহ নেওয়া এবং আহার করার পাপ থেকে যেভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছি, শোনো। ব্রাহ্মণ যদি ঘৃত দান গ্রহণ করে, তাহলে গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে অগ্নিতে সমিধ আহুতি করবে। তিল দান নিলেও এই প্রায়শ্চিত্ত করবে। মধু ও লবণ দান গ্রহণ করলে সেই সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হয়। সুবর্ণ দান নিলে গায়ত্রী জপ ও জনসমক্ষে লৌহ ধারণ করলে মুক্তি পাওয়া যায়। ধন, বস্ত্র, অন্ন, পায়েস ও আখের রস গ্রহণ করলে সুবর্ণ দানের মতোই প্রায়শ্চিত্ত করবে। আখ, তেল, কুশ গ্রহণ করলে ত্রিকাল স্নান করবে। ধান, ফুল, ফল, জল, মালপুয়া, যবের লস্যি, দুধ, দই প্রভৃতি দান নিলে এবং শ্রাদ্ধে পাদুকা, ছাতা গ্রহণ করলে একশত বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত। এর দ্বারা ওইসব বস্তুর প্রতিগ্রহের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। গ্রহণের সময় অথবা যার শিশুজন্মজনিত শৌচ হয়েছে, তার প্রদত্ত ভূমি গ্রহণ করলে তিন রাত্রি উপবাস করে সেই দোষ থেকে মুক্তি পেতে হয়। যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে করা পিতৃ শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণ করে, সে একদিন ও একরাত গত হলে শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণ যে দিন শ্রাদ্ধ ভোজন করে, সে দিন গায়ত্রী-জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক এবং দ্বিতীয়বার আহার ত্যাগ করবে, এতে তার শুদ্ধি হয়। তাই পিতৃগণের অপরাহ্নে শ্রাদ্ধের বিধান করা হয়েছে (যাতে প্রভাতের জপ-আহ্নিক হয়ে যায় এবং রাত্রে আহার করতে না হয়)। ব্রাহ্মণদের এক দিন আগে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা উচিত, যাতে তারা শ্রাদ্ধে ভালোভাবে আহার করতে পারে। যে গৃহে কেউ মারা গেছে, সেই গৃহে মরণাশৌচের তৃতীয় দিনে অন্নগ্রহণকারী ব্রাহ্মণ বারো দিন ত্রিকাল স্নান করলে শুদ্ধ হয়। বারো দিন ধরে স্নানের নিয়ম সমাপ্ত করে ত্রয়োদশ দিনে সে বিশেষভাবে স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণদের হবিষ্য ভোজন করাবে, তবে সে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। যে ব্যক্তি কারো গৃহে মরণাশৌচের দশ দিন পর্যন্ত অন্নগ্রহণ করে, তার গায়ত্রীমন্ত্র, রৈবত সাম, কুষ্মাণ্ড, অনুবাক এবং অঘমর্ষণ জপ করা উচিত। এগুলিই উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তেমনই কেউ যদি মরণাশৌচের গৃহে একাদিক্রমে তিন রাত আহার করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ সাতদিন ধরে ত্রিকাল স্নান করলে শুদ্ধ হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত করার পর সে দোষ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পায়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করে, তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। ব্রাহ্মণ যদি বৈশ্যের সঙ্গে এক পাত্রে আহার করে, তাহলে তিন রাত ব্রত করলে সে পাপমুক্ত হয়। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে এক পাত্রে আহার গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ বস্ত্র সহ স্নান করলে শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণের তেজে তার সঙ্গে আহারকারী শূদ্রের কুল, বৈশ্যের গবাদি পশু এবং ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্মী নাশ করে। তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং শান্তি হোম করা উচিত। গায়ত্রী, রৈবত সাম, পবিত্রেষ্টি, কুষ্মাণ্ড, অনুবাক ও অঘমর্ষণ মন্ত্রও জপ করা উচিত, তাতে পাপনিবৃত্তি হয়। কারো উচ্ছিষ্ট বা এক সঙ্গে একই বাসনে আহার করা উচিত নয়। প্রায়শ্চিত্ত করার পর গোরোচন, দূর্বা ও হলুদ ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত।

দৃষ্টান্তপূর্বক দানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এবং পাঁচ প্রকার দানের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি বলে থাকেন দান ও তপ—উভয়ের দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ; কিন্তু পৃথিবীতে এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হৃদয়যুক্ত যে সকল ধর্মাত্মা রাজা দানজনিত পুণ্য-প্রভাবে বহু উত্তমলোক লাভ করেছেন, তাঁদের নাম বলছি, শোনো— লোকমান্য মহর্ষি আত্রেয় তাঁর শিষ্যদের নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ দান করে উত্তমলোকে গমন করেছেন। কাশীর রাজা প্রতর্দন তাঁর প্রিয় পুত্রকে ব্রাহ্মণ সেবার জন্য অর্পণ করেছিলেন, যার জন্য তিনি ইহলোকে অনুপম কীর্তিলাভ করেন এবং পরলোকে অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করছেন। সংস্কৃতিনন্দন রাজা রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠ মুনিকে বিধিবৎ অর্ঘ্যদান করেছিলেন, যার ফলে তিনি শ্রেষ্ঠলোক লাভ করেছেন। দেবাবৃষ নামক রাজা যজ্ঞে স্বর্ণনির্মিত একশো দণ্ডযুক্ত দিব্য ছাতা দান করে স্বর্গলোক লাভ করেছেন। সূর্যপুত্র কর্ণ তাঁর দিব্যকুণ্ডল দান করে এবং মহারাজ জনমেজয় ব্রাহ্মণকে রথ ও গোদান করে উত্তমলোকে গমন করেছেন। রাজর্ষি বৃষাদর্ভি দ্বিজদের নানাপ্রকার রত্ন ও রমণীয় গৃহ প্রদান করে স্বর্গলোকে স্থান করে নিয়েছেন। বিদর্ভের পুত্র রাজা নিমি অগস্ত্য মুনিকে তাঁর কন্যা এবং রাজ্য দান করে পুত্র, পশু ও বান্ধবসহ স্বর্গে নিবাস করেন। মহাযশস্বী পরশুরাম ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে সেই অক্ষয় লোক লাভ করেছিলেন, যা তিনি কোনদিন কল্পনাও করেননি। একবার পৃথিবীতে বৃষ্টি না হওয়ায় মুনিবর বশিষ্ঠ সমস্ত প্রাণীর জীবনদান করেছিলেন, সেইজন্য তিনি অক্ষয়লোক লাভ করেন। রাজর্ষি কক্ষসেন মহাত্মা বশিষ্ঠকে সর্বস্ব দান করে স্বর্গে গমন করেছিলেন। করন্ধমের পৌত্র এবং অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুৎ অঙ্গিরা মুনিকে কন্যাদান করে স্বর্গে স্থান পেয়েছিলেন। পাঞ্চাল দেশের ধর্মাত্মা রাজা ব্রহ্মদত্ত নিধি নামের শঙ্খ দান করে পরম গতি লাভ করেছিলেন। মনুর পুত্র রাজা সুদ্যুম্ন মহাত্মা লিখিতকে ধর্মানুসারে দণ্ড প্রদান করে উত্তম স্থান লাভ করেছিলেন। মহাযশস্বী রাজর্ষি সহস্রচিত্ত ব্রাহ্মণের জন্য প্রিয় প্রাণ ত্যাগ করে শ্রেষ্ঠলোকে গিয়েছিলেন। মহারাজ শতদ্যুম্ন মৌদ্‌গল্য নামক ব্রাহ্মণকে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ সুবর্ণময় মহল দান করে স্বর্গলাভ করেছিলেন। রাজা সমন্যুন খাদ্যবস্তুর পর্বত সৃষ্টি করে সেটি শাণ্ডিল্যকে দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি স্বর্গ লাভ করেন। অত্যন্ত তেজস্বী শাল্বরাজা দ্যুতিমান ঋচীক মুনিকে রাজ্যদান করে উত্তমলোক লাভ করেন। রাজর্ষি মদিরাশ্ব তাঁর সুন্দরী কন্যা হিরণ্যহস্তকে দান করে দেবলোক নিবাসী হন। রাজর্ষি লোমপাদ তাঁর কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে দান করেছিলেন, এতে তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। রাজর্ষি ভগীরথ তাঁর যশস্বিনী কন্যা হংসীকে কৌৎস ঋষির সেবায় দান করেন, এতে তিনি উত্তমলোক লাভ করেন। যুধিষ্ঠির ! এরা এবং আরও বহু রাজা দান ও তপস্যা প্রভাবে বারংবার স্বর্গে গমন করেন এবং পুনরায় সেখান থেকে ফিরে ইহলোকে আসেন। যেসব গৃহস্থ দান ও তপস্যার বলে উত্তমলোক জয় করেছেন, যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, ততদিন তাঁদের কীর্তি বিরাজ করবে। এতক্ষণ শিষ্ট পুরুষদের চরিত্র বলা হল। এই সকল রাজারা দান, যজ্ঞ ও সন্তানোৎপাদন করে স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তুমিও সর্বদা দান করতে থাকো। তোমার বুদ্ধি দান ও যজ্ঞ ক্রিয়ায় সংলগ্ন হয়ে যেন ধর্মের উন্নতি করতে থাকে। এখন সন্ধ্যা সমাগত, এখনও যদি তোমার মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, তবে কাল প্রভাতে তার সমাধান করব।

(পরদিন প্রাতঃকালে) যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এবার আমি শুনতে চাই যে দান কাকে করা উচিত ? কী কারণে দান করা উচিত এবং দান কত প্রকার ?

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! সকল বর্ণের লোকেদের মধ্যে কাকে কী প্রকার দান করা উচিত, তা বলছি, শোনো—দানের পাঁচটি হেতু—ধর্ম, অর্থ, ভয়, কামনা ও দয়া। এই কারণে দানের পাঁচটি প্রকারভেদ মানা হয়। দান করা ব্যক্তি ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে উত্তম সুখ লাভ করে। তাই ঈর্ষারহিত হয়ে ব্রাহ্মণদের অবশ্যই দান করা উচিত, একে ধর্মমূলক দান বলা হয়। 'অমুক ব্যক্তি আমাকে দান করে অথবা করবে বা অমুক আমাকে দান করেছে' যাচকের মুখে এই কথা শুনে কীর্তির আকাঙ্ক্ষায় যে দান করা হয়, তা হল অর্থমূলক দান। 'আমি ওর কেউ নই, সেও আমার কেউ নয়, তবুও আমি যদি ওকে কিছু না দিই, তাহলে ও অপমানিত হয়ে আমার ক্ষতি করবে' বিদ্বান ব্যক্তি একথা ভেবে যে দান করেন, তা হল ভয়নিমিত্তক

দান।' 'এই ব্যক্তি আমার প্রিয়, আমিও ওই ব্যক্তির প্রিয়' এই ভেবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁর মিত্রকে যে দান করেন, তা হল কামনামূলক দান। 'এ বেচারা বড় গরিব, আমার কাছে কিছু চাইছে, কিছু দিলে খুব খুশি হবে এই ভেবে দরিদ্র মানুষকে যদি কিছু দেওয়া হয়, তাহলে তাকে দয়া নিমিত্তক দান বলা হয়। এইভাবে পুণ্য ও কীর্তি বৃদ্ধিকারী পাঁচ প্রকার দানের কথা বলা হল। প্রজাপতির কথন হল এই যে, 'সকলের নিজ শক্তি অনুসারে অবশ্যই দান করা উচিত।'

তপস্যারত ঋষিদের শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন, তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা এবং দেবর্ষি নারদ কর্তৃক শিব-পার্বতীর ধর্মবিষয়ক আলোচনার বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ! আপনি আমাদের কুলে সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ; সুতরাং এবার আপনার থেকে এমন বিষয় জানতে চাই, যা ধর্ম ও অর্থযুক্ত, ভবিষ্যতে সুখদায়ক এবং জগতের পক্ষে বিস্ময়কারী। আমার আত্মীয়স্বজনেরা এক দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে, আপনি ছাড়া অন্য কেউ এরূপ সর্বধর্মের উপদেশ দেবার মতো মহাপুরুষ নেই ; সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত রাজাদের সামনে আমার এবং আমার ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্য আপনি জিজ্ঞাস্য বিষয় বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র! এখন আমি তোমাকে একটি অত্যন্ত মনোহর কাহিনী শোনাচ্ছি। পূর্বকালে ভগবান নারায়ণ ও মহাদেবের যে প্রভাব আমি শুনেছিলাম, সেটি এবং পার্বতী সন্দেহ করায় শিব ও পার্বতীর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তাও বলছি, শোনো—পূর্বকালের কথা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারো বৎসর ব্যাপী এক ব্রতের দীক্ষা নিয়ে (এক পর্বতের ওপর) কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। তখন তাঁকে দর্শন করার জন্য নারদ, পর্বত, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, ধৌম্য, দেবল, কশ্যপ, হস্তিকাশ্যপ ও অন্যান্য দীক্ষা ও দমসম্পন্ন ঋষি-মহর্ষি তাঁদের শিষ্যাদি, সিদ্ধ, দেবোপম তপস্বীদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন চিত্তে দেবোচিত উপচারদ্বারা সেই মহর্ষিদের আতিথ্য সৎকার করলেন। ভগবান প্রদত্ত নানা রংয়ে রঞ্জিত কুশাসনে বিরাজিত হয়ে তাঁরা সেখানকার অধিবাসী রাজর্ষি এবং দেবতাদের সঙ্গে মধুর বাক্যে ধর্মবিষয়ক আলোচনা করতে লাগলেন। এরমধ্যে অদ্ভুত কর্মকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে তাঁর তপস্যার দ্বারা উৎপন্ন হওয়া তেজ বিচ্ছুরিত হয়ে বৃক্ষ, লতা, পক্ষী, মৃগ, শিকারি পশু ও সর্পসহ সেই পর্বতকে দগ্ধ করতে লাগল। সেইসময় চতুর্দিকে নানাপ্রকার জীবের হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই পর্বত শিখর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেখানে কোনো জীবিত প্রাণীই থাকল না। সেখানে শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। এইভাবে উচ্চ ইন্ধনযুক্ত সেই তেজঃস্বরূপ অগ্নি পর্বতের সমস্ত শিখর ভস্ম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে শিষ্যের ন্যায় তাঁকে প্রণাম জানাল। ভগবান তখন সেই পর্বতকে ভস্মীভূত দেখে তার ওপর নিজের শান্ত দৃষ্টি ন্যস্ত করলেন। তাতে পর্বত শিখর পুনরায় পূর্ব অবস্থায় পরিণত হল। সেখানে পূর্বেরই মতো প্রস্ফুটিত ফুলসহ লতা বৃক্ষ শোভা পেতে লাগল। পক্ষীর কলরব শোনা গেল এবং প্রাণীরা জীবিত হয়ে বিচরণ করতে লাগল। এই অদ্ভুত এবং অচিন্তনীয় ঘটনা দেখে মুনিরা বিস্ময়ে হতবাক হলেন, তাঁদের দেহে রোমাঞ্চ হতে লাগল এবং চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল।

ঋষিদের বিস্মিত হতে দেখে নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনয় ও স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন— মহর্ষিগণ ! আপনারা সকলেই সর্বদা আসক্তি ও মমত্ব রহিত, সকলেই শাস্ত্রজ্ঞানী, তাহলে আপনারা কেন আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন ?

ঋষিগণ বললেন—ভগবান ! আপনিই জগৎ সৃষ্টি করেন আবার আপনিই তা সংহার করেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা—এসব আপনারই স্বরূপ। এই পৃথিবীতে যত চরাচর প্রাণী আছে, তাদের সকলের পিতা-মাতা-ঈশ্বর এবং উৎপত্তির কারণ আপনিই। আপনার মুখ থেকে অগ্নির উদ্ভব দেখে আমরা মহা আশ্চর্যান্বিত হয়েছি ; কৃপা করে আপনি তার কারণ বলুন। তা শুনলে আমাদের ভয় দূর হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মুনিবরগণ ! আমার মুখ থেকে প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় যে তেজ উৎপন্ন হয়ে পর্বত দগ্ধ করেছিল, তা আমারই বৈষ্ণব তেজ। আমি এই পর্বতে আমার সমতুল্য বীর্যবান পুত্র লাভের ইচ্ছায় ব্রত (তপস্যা) পালন করতে এসেছি। আমার শরীরে অবস্থিত প্রাণই অগ্নি রূপে বাইরে এসে সকলের বর প্রদানকারী লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শনের জন্য তাঁর লোকে গিয়েছিল। ব্রহ্মা তাঁকে এই বার্তা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে 'ভগবান শংকরের অর্ধেক তেজই আমার পুত্ররূপে জন্ম নেবে।' সেই তেজোময় প্রাণ সেখান থেকে আমার কাছে ফিরে আসে এবং এখানে এসে শিষ্যের ন্যায় পরিচর্যা করার জন্য আমার চরণে প্রণাম করে। তারপর শান্ত হয়ে সে নিজের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এটিই হল আমার মুখ থেকে অগ্নি উৎপন্ন হওয়ার রহস্য ; আপনাদের অল্প কথায় আমি তা জানালাম, আপনারা ভীত হবেন না। আপনারা দীর্ঘদর্শী, আপনাদের গতি কখনো রুদ্ধ হয় না, তপস্বীর যোগ্য ব্রত আচরণ করায় আপনাদের শরীর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান আপনাদের শোভাবৃদ্ধি করছে ; তাই আমার প্রার্থনা, যদি আপনারা এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে কোনো মহা আশ্চর্যের বিষয় দেখে বা শুনে থাকেন, তাহলে আমাকে বলুন। আপনারা তপোবননিবাসী, সুতরাং আপনাদের অমৃতের ন্যায় মধুর বাক্য শোনার ইচ্ছা আমার সর্বদা জাগরূক থাকে। কারণ সৎপুরুষদের বলা এবং শোনা কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়। তা পাথরের ওপর কাটা দাগের মতো এই পৃথিবীতে বহুদিন বজায় থাকে।

একথা শুনে ভগবানের সমীপে উপবিষ্ট ঋষিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁরা কমলসদৃশ নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কেউ তাঁর অভ্যুদয় কামনা করতে লাগলেন, কেউ তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন আবার কেউ ঋগ্-বেদের মন্ত্র দ্বারা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। তারপর সকলে বার্তালাপে দক্ষ দেবর্ষি নারদকে ভগবানের কথার উত্তর দেবার জন্য প্রেরণ করলেন। তখন নারায়ণের সুহৃদ ভগবান নারদমুনি মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর যে কথোপকথন হয়েছিল, তা বলতে আরম্ভ করলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন—প্রভু ! যেখানে সিদ্ধ ও চারণ বিচরণ করে, যা নানাপ্রকার ঔষধি এবং পুষ্পে আচ্ছাদিত হওয়ায় অত্যন্ত রমণীয়, যেখানে দলে দলে অপ্সরাগণ ও ভূতগণ নিবাস করে ; সেই পরম পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরম ধর্মাত্মা দেবাদিদেব ভগবান শংকর একদা তপস্যারত ছিলেন। সেই সময় দেবী পার্বতী তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে ভূতেশ্বর ! আপনি সমস্ত প্রাণীর প্রভু এবং সকল ধর্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই আমি আপনার কাছে আমার মনের এক সন্দেহ প্রকাশ করতে চাই। এখানে মুনিরা সকলেই উপস্থিত আছেন, যাঁরা তপস্যায় রত থাকেন এবং নানাপ্রকার বেশ ধারণ করে জগতে বিচরণ করেন। আপনি এই ঋষিদের এবং আমার ভালোর জন্য আমার সন্দেহ দূর করুন। ধর্মের স্বরূপ কী ? যারা ধর্ম জানে না, তারা কীরূপে ধর্মাচরণ করবে ?'

পার্বতী দেবী এই প্রশ্ন করলে সমস্ত ঋষি ঋগ্বেদের অর্থযুক্ত শ্লোক দ্বারা স্তুতি করে যথোচিত প্রশংসা করলেন। তখন ভগবান মহেশ্বর বললেন—'দেবী ! কোনো জীবকে হিংসা না করা, সত্য কথা বলা, সর্বপ্রাণীকে দয়া করা, মন ও ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা এবং নিজের শক্তি অনুসারে দান করা—গৃহস্থ আশ্রমের এগুলিই উত্তম ধর্ম। গৃহস্থ ধর্ম পালন করা, অন্য নারীর সংসর্গ থেকে দূরে থাকা, গচ্ছিত দ্রব্য এবং নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করা, কাউকে কিছু না দিয়ে তার থেকে কিছু না নেওয়া এবং মদ্য-মাংস পরিত্যাগ করা—ধর্মের এই পাঁচটি ভাগ, যার দ্বারা সুখলাভ হয়। এই এক একটি ধর্মের বহু শাখা। যেসব ব্যক্তি ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে মানেন, তাঁদের অবশ্যই এই সকল ধর্মের পালন করা উচিত।'

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! চার বর্ণের যে যে ধর্ম নিজ নিজ বর্ণের পক্ষে বিশেষ লাভদায়ক, কৃপা করে আমাকে বলুন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের ধর্মের

পৃথক পৃথক স্বরূপ কী ?

মহেশ্বর বললেন—দেবী ! তুমি ন্যায় অনুসারে সব কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করেছ। আচ্ছা, এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর শোনো। ব্রাহ্মণদের এই পৃথিবীর দেবতা স্বীকার করা হয়েছে। উপবাস করা তাঁদের পরম ধর্ম। ধর্মার্থসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তাঁদের ধর্মের অনুষ্ঠান এবং বিধিবৎ ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। ব্রতপালনপূর্বক উপনয়ন-সংস্কার হওয়া তাঁদের পক্ষে পরম আবশ্যক ; কারণ এর দ্বারাই তাঁরা দ্বিজ হন। ব্রাহ্মণদের গুরু ও দেবতাদের পূজা, স্বাধ্যায় এবং অভ্যাসপূর্বক ধর্মপালন অবশ্যই করা উচিত। ব্রাহ্মণদের প্রধান ধর্ম হল, ধর্মের রহস্য শোনা, বেদোক্ত ব্রত পালন করা, হোম ও গুরু সেবা করা, ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করা, সর্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে থাকা, প্রত্যহ বেদের স্বাধ্যায় করা এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রমের নিয়ম পালন করা। ব্রহ্মচর্য-কাল সমাপ্ত হলে দ্বিজ গুরুর আদেশে সমাবর্তন করবে এবং গৃহে ফিরে এসে উপযুক্ত নারীকে শাস্ত্রীয় রীতিতে বিবাহ করবে। শূদ্রের অন্নগ্রহণ করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়। সদাচার পালন ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম। উপবাস, ব্রহ্মচর্য-পালন, অগ্নিহোত্র, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়সংযম, অতিথি এবং ভৃত্যদের আহার্য গ্রহণের পর অন্নগ্রহণ, আহার সংযম, সত্যভাষণ, পবিত্রভাবে থাকা, অতিথি-সৎকার করা, গার্হপত্য ইত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির পরিচর্যা করা, যজ্ঞ করা, জীবে হিংসা না করা, আগে আহার না করে গৃহে আগত আত্মীয়-বন্ধুদের আহারের পর আহার্যগ্রহণ—গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, বিশেষত শ্রোত্রিয়দের পরম ধর্ম। পতি ও পত্নীর স্বভাব একপ্রকারের হওয়া উচিত। তাহলেই গার্হস্থ্যধর্ম সঠিকভাবে পালিত হয়। গৃহের দেবতাদের প্রত্যহ পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করা, তাঁদের অন্নভোগ প্রদান করা, প্রত্যহ গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং প্রতিদিন ব্রত রাখাও গৃহস্থের ধর্ম। পরিষ্কার গৃহে ঘৃতযুক্ত আহুতি দ্বারা ধূমাচ্ছন্ন করা উচিত। ব্রাহ্মণদের এগুলিই গার্হস্থ্য ধর্ম, যা সংসারকে রক্ষা করে। সুব্রাহ্মণ সর্বদাই এই ধর্ম পালন করে থাকেন।

এবার আমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলছি। ক্ষত্রিয়ের সর্বপ্রথম ধর্ম হল প্রজাপালন। প্রজার আয়ের ষষ্ঠাংশ উপভোগকারী রাজা, ধর্মের ফল লাভ করেন। যে রাজা ধর্মপূর্বক প্রজাকে রক্ষা করেন, প্রজাপালনরূপ ধর্মের প্রভাবে সেই রাজার উত্তমলোক লাভ হয়। রাজার পরম ধর্ম হল ইন্দ্রিয় সংযম, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীত ধারণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, ধার্মিক কার্য সম্পাদন, পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ, শুরু করা কাজ সফলতার সঙ্গে শেষ করা, অপরাধ অনুসারে অপরাধীকে উচিত দণ্ড প্রদান, বেদোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, ন্যায় রক্ষা করা এবং সত্যভাষণে প্রীতি রাখা। যে রাজা দুঃখী মানুষকে সাহায্য করেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সম্মানিত হন। যিনি গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য জগতে পরাক্রম দেখিয়ে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে পরলোকে যে ফল লাভ হয় সেই উত্তমলোক অধিকার করেন।

পশুপালন, কৃষিকার্য, ব্যবসা, অগ্নিহোত্র, দান, অধ্যয়ন, সদাচার পালন, অতিথি-সৎকার, শম, দম, ব্রাহ্মণদের সৎকার এবং ত্যাগ—এইসব বৈশ্যদের সনাতন ধর্ম। ব্যবসাকারী সদাচারী বৈশ্যের তিল, চন্দন এবং রস বিক্রি করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—যথাযোগ্য শক্তিতে সকলেরই অতিথি সৎকার করা উচিত।

শূদ্রের পরম ধর্ম তিন বর্ণের সেবা করা। যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং গৃহাগত অতিথির সেবা করে, সে মহান তপ সংগ্রহ করে, তাকে উত্তম তপস্বী বলে জানতে হবে। যে শূদ্র নিত্য সদাচার পালন করে এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করে, সে ধর্মের বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। কল্যাণী ! আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে চার বর্ণের ধর্মের কথা জানালাম, এখন আর কী শুনতে চাও ?

পার্বতী বললেন—প্রভু ! আপনি চার বর্ণের হিতকারক ধর্মের পৃথক পৃথক বর্ণনা করলেন, এবার সেই ধর্মের কথা বলুন যা সর্বধর্মের পক্ষে সমভাবে উপযোগী।

মহাদেব বললেন—দেবী ! গুণাদির ওপর দৃষ্টিরক্ষাকারী এবং জগতের সারভূত ব্রহ্মা সমস্ত জগতের উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ এই ভূমণ্ডলের দেবতা, তাই প্রথমে তাঁদের আরও কিছু ধর্মের বর্ণনা করছি। (তারপর সকলের উপযোগী ধর্মের উপদেশ দেব)। ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ রক্ষার জন্য বৈদিক, স্মার্ত, শিষ্টাচার—এই তিন প্রকার ধর্মের বিধান করেছেন। ধর্মের এই তিনটি ভাগই সনাতন। যিনি তিন বেদের জ্ঞাতা এবং বিদ্বান, পড়া এবং পড়ানোর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ

করেন না, সর্বদা দান-অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কাম-ক্রোধ-লোভ ত্যাগ করেছেন এবং সর্বজীবে দয়া করেন—তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। সমস্ত লোকের প্রভু ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের জীবিকার জন্য যজ্ঞ করা এবং করানো, দান দেওয়া এবং নেওয়া, বেদ পড়া এবং পড়ানো—এই ছটি কর্মের কথা বলেছেন, এসবই ব্রাহ্মণদের সনাতন ধর্ম। এই সবগুলির মধ্যেও স্বাধ্যায়শীল হওয়া, যজ্ঞ করা এবং শক্তি অনুসারে বিধিপূর্বক দান করা—এই তিনটি কর্ম ব্রাহ্মণদের জন্য অত্যন্ত উত্তম বলে মানা হয়।

সর্ব বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়াকে শম বলা হয়, সৎব্যক্তিদের মধ্যে এটি সর্বদা দেখা যায়। এটি পালন করলে শুদ্ধচিত্তযুক্ত গৃহস্থের মহান ধর্মলাভ হয়। গৃহস্থ ব্যক্তির পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নিজ মনকে শুদ্ধ করা উচিত। যে গৃহস্থ সদা সত্য কথা বলে, অকারণে কারো প্রতি দোষারোপ করে না, দান করে, ব্রাহ্মণদের সৎকার করে, নিজ গৃহ পরিষ্কার করে রাখে, অহংকার ত্যাগ করে, সর্বদা সরলভাবে থাকে, স্নেহপূর্ণ কথা বলে, অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় নিযুক্ত থাকে, যজ্ঞশিষ্ট অন্ন ভোজন করে এবং অতিথিকে শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন-শয্যা-দীপ ও সন্তুষ্টি প্রদান করে, তাকে ধার্মিক বলে বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি প্রাতে উঠে স্নানাদি করে ব্রাহ্মণকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে এবং আহারের পর বিশ্রামান্তে গমনকালে তাঁকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে, তার দ্বারা সনাতন ধর্ম পালিত হয়। শূদ্র গৃহস্থের নিজ শক্তি অনুসারে সর্বদা সকলের অতিথি-সৎকার করা উচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—শূদ্রের ধর্ম হল এই তিন বর্ণের পরিচর্যাতে নিয়োজিত থাকা। গৃহস্থদের জন্য প্রবৃত্তিরূপ ধর্মের বিধান করা হয়েছে, এটি সব প্রাণীর পক্ষে হিতকর ও উত্তম। এবার আমি তারই বর্ণনা করব। নিজ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানুষের সর্বদা নিজ শক্তি অনুসারে দান, যজ্ঞ ও মঙ্গলজনক কাজ করা উচিত। ধর্মপথের আশ্রয় নিয়ে ধন উপার্জন করা উচিত এবং সেটি তিন ভাগ করে এক অংশের দ্বারা ধর্ম ও অর্থের সিদ্ধি করা উচিত, দ্বিতীয় অংশ উপভোগের জন্য ব্যয় করা উচিত এবং তৃতীয় অংশকে বৃদ্ধি করা উচিত। (এটি হল প্রবৃত্তি ধর্ম)।

নিবৃত্তিরূপ ধর্ম এর থেকে পৃথক। সেটি মোক্ষের সাধন। আমি এবার তার যথার্থ স্বরূপ বলছি, মন দিয়ে শোনো—মোক্ষাভিলাষী পুরুষের সর্বজীবে দয়া করা উচিত। সর্বদা একই স্থানে থাকা উচিত নয় এবং নিজের আশারূপ বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টা করতে হয়। মুমুক্ষুদের জন্য এটি প্রশংসনীয়। তাদের কমণ্ডলু, জল, কৌপীন, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি এমনকী গৃহের ওপরও আসক্তি রাখা উচিত নয়। মুমুক্ষু ব্যক্তিদের অধ্যাত্মজ্ঞানই চিন্তন ও মনন করা উচিত এবং সর্বদা তাতেই স্থিত থাকা উচিত। নিরন্তর যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে তত্ত্বচিন্তা করা উচিত। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের সর্বপ্রকার আসক্তি ও স্নেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বদা বৃক্ষতলে, শূন্য গৃহে অথবা নদীতীরে বাস করে, পরমাত্মার ধ্যান করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি যুক্তচিত্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এবং মোক্ষোপযোগী কর্ম—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা কাল যাপন করে নিষ্কাম জীবনযাপন করে, সে সনাতন ধর্মের মোক্ষরূপ ফল লাভ করে। সন্ন্যাসী ব্যক্তি কোনো এক স্থানে আসক্ত হবে না, দীর্ঘকাল একই গ্রামে বাস করবে না এবং একই নদীতীরে শয়ন করবে না। তার সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা উচিত। এটিই হল মোক্ষধর্ম জ্ঞাতা সৎপুরুষদের ধর্ম এবং বেদ প্রতিপাদিত সন্মার্গ। যে এই মার্গ অনুসরণ করে, সে সীমিত থাকে না (সে মুক্ত এবং সর্বব্যাপক হয়ে ওঠে)। সন্ন্যাসী চার প্রকারের হয়—কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস। এগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। এই পরমহংস ধর্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া আত্মজ্ঞানের থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নেই। এটি দুঃখ-সুখরহিত, সৌম্য, অজর, অমর এবং অবিনাশী পদ।

পার্বতী বললেন—পরমেশ্বর ! আপনি সৎপুরুষ দ্বারা আচরিত গার্হস্থ্য ধর্ম এবং মোক্ষ ধর্ম বর্ণনা করলেন, এই দুই পথই জীব জগতের মহাকল্যাণকারী। এরপর আমি ঋষিদের ধর্ম সম্পর্কে শুনতে চাই। মহেশ্বর ! তপোবন নিবাসী মুনিদের প্রতি আমার মনে অত্যন্ত স্নেহ আছে। তাঁরা যখন অগ্নিতে ঘৃতমিশ্রিত হবিষ্যের আহুতি প্রদান করেন, তখন ধূমের দ্বারা উৎপন্ন সুগন্ধে সমস্ত তপোবন ভরে ওঠে। তাতে আমার চিত্ত সদাপ্রসন্ন থাকে, তাই আমি মুনিদের ধর্মসম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। দেবাদিদেব ! আপনি সমস্ত ধর্মের তত্ত্ব জানেন ; সুতরাং আমি যা জানতে চাই তা পূর্ণরূপে বর্ণনা করুন।

ভগবান মহেশ্বর বললেন—কল্যাণী ! তোমার প্রশ্নে

আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি এখন মুনিদের উত্তম ধর্ম বর্ণনা করছি, যার আশ্রয়ে মুনিগণ তপস্যার সাহায্যে পরম সিদ্ধি লাভ করেন। সর্বপ্রথম ধর্মজ্ঞ ফেনপ[১] ঋষিদের ধর্ম শোনো। পূর্বকালে ব্রহ্মা যজ্ঞের সময় যা পান করেছিলেন এবং যা স্বর্গে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অমৃতকে (ব্রহ্মা পান করায়) ব্রাহ্ম বলা হয়। সেই ফেন অল্প পরিমাণে সংগ্রহ করে যারা সর্বদা পান করে (এবং তাতেই জীবন-নির্বাহ করে তপস্যায় রত থাকে), তাদের 'ফেনপ' বলা হয়। এই ধর্মাচরণের পথ সেই বিশুদ্ধ ফেনপ মহাত্মাদেরই পথ। এবার বালখিল্য মহর্ষিদের ধর্মকথা শোনো। বালখিল্যগণ তপসিদ্ধ মহাত্মা। এরা সর্বধর্ম জ্ঞাতা, সূর্যমণ্ডলে বাস করে এবং উঞ্ছবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে পাখিদের মতো এক এক দানা বেছে তার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করে। তারা মৃগচর্ম, চীর ও বল্কল ধারণ করে। এরা শীত-গ্রীষ্ম দ্বন্দ্বরহিত, সদাচার পালনকারী, তপস্যায় সমৃদ্ধ। এদের প্রত্যেকের দেহ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সমান। তারা নিজ নিজ কর্তব্যে স্থির হয়ে সর্বদাই তপস্যারত থাকে। তাদের ধর্মের ফল মহান। তারা তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপ দগ্ধ করে নিজ তেজে সমস্ত দিক প্রকাশিত করে এবং দেবতাদের কার্য সিদ্ধ করার জন্য তাঁদের মতো রূপ ধারণ করে। এরা ছাড়া আরও অনেক শুদ্ধচিত্ত, দয়া-ধর্মপরায়ণ এবং পুণ্যাত্মা মহর্ষি আছেন। যাঁদের মধ্যে কিছু চক্রচর (চক্রের ন্যায় ভ্রমণকারী), কিছু সোমলোকনিবাসী, কিছু পিতৃলোকের কাছে নিবাস করেন। এঁরা সকলে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। কোনো ঋষি সম্প্রক্ষাল[২], কেউ অশ্মকুট্ট[৩] আবার কেউ দন্তোলুখলিক[৪]। এঁরা সোমপ (চন্দ্রকিরণ পানকারী) এবং উষ্মপ (সূর্যকিরণ পানকারী) দেবতাদের নিকট বাস করে নিজ পত্নীসহ উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবন-নির্বাহ করে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত রাখে। অগ্নিহোত্র, পিতৃশ্রাদ্ধ, মহাযজ্ঞ—এসব তাদের মুখ্য ধর্ম। চক্রের ন্যায় বিচরণকারী এবং দেবলোক নিবাসী পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ সর্বদা এই ঋষিধর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। এতদ্ব্যতীত যে ঋষিধর্ম, তা শোনো।

আমার বিচারে সকল আর্য ধর্মে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। কাম ও ক্রোধ জয় করা উচিত। প্রত্যেক ঋষিকে অগ্নিতে ঘৃতের হোম, ধর্ম-সত্রের অনুষ্ঠান, সোমযজ্ঞ দ্বারা যজন, যজ্ঞ বিধির জ্ঞান এবং যজ্ঞে দক্ষিণা দান—এই পঞ্চকর্ম অবশ্যই করা উচিত। নিত্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং ধর্মপালন করা উচিত, দেবপূজা ও শ্রাদ্ধে অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা উপার্জিত অন্নে সকলের আতিথ্য সৎকার করা ঋষিদের পরম কর্তব্য। তাঁরা বিষয়ভোগে নিবৃত্ত থাকবেন, গোদুগ্ধ পান করবেন, শম-সাধনে প্রীতি রাখবেন, উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করবেন, যোগ-অভ্যাস করবেন, শাক-পাতা, ফল-মূল, বায়ু-জল আহার করবেন—এ সবই ঋষিদের নিয়ম। এইসব পালন করলে তাঁরা অজিত (সর্ব শ্রেষ্ঠ) গতি প্রাপ্ত হন। যখন গৃহস্থের ঘর থেকে রান্নার শব্দ বন্ধ হয়ে যায়, গৃহ নিস্তব্ধ থাকে, উনুনের আগুন নিভে যায়, গৃহের সকলের আহার সমাপ্ত হয়ে যায়, বাসনের আওয়াজ থেমে যায়, ভিক্ষুক ভিক্ষা নিয়ে চলে যায়, সেই সময় পর্যন্ত ঋষিদের অপেক্ষা করা উচিত এবং গৃহস্থের আহার-গ্রহণের পর অবশিষ্ট অন্ন ভিক্ষান্নরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। যে গর্ব ও অহংকার করে না, অপ্রসন্ন ও বিস্মিত হয় না, শত্রু-মিত্রকে সমভাবে দেখে এবং সকলের প্রতি মৈত্রীভাব বজায় রাখে, সে-ই ধর্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি।

———o———

[১] ফেন পান করে যারা থাকে।

[২] যারা আহারের পর পাত্র ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখে, পরের দিনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, তাদের বলা হয় সম্প্রক্ষাল।

[৩] পাথর দিয়ে ভেঙে যারা খায়।

[৪] যারা দাঁত দিয়ে ভাণ্ডার কাজ করে অর্থাৎ অন্নকে কিছু দিয়ে না পিষে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খায় তাদের দন্তোলুখলিক বলা হয়।

বাণপ্রস্থ-ধর্মের বর্ণনা

পার্বতী বললেন—মহেশ্বর ! ব্রত পালনকারী, বাণপ্রস্থী মহাত্মা নদীর তীরবর্তী রমণীয় স্থানে, ঝরনার নিকটবর্তী কুঞ্জে, পর্বতের ওপর, বনমধ্যে এবং ফল-মূল সম্পন্ন পবিত্র স্থানে বাস করেন। তাঁরা নিজেদের শরীরকে কষ্ট দিয়ে জীবন-নির্বাহ করেন। তাই আমি তাঁদের পালনীয় পবিত্র নিয়মাদি শ্রবণ করতে চাই।

মহেশ্বর বললেন—দেবী ! তুমি একাগ্রচিত্তে বাণপ্রস্থী মহাত্মাদের ধর্ম শোনো। তাঁদের দিনে তিনবার স্নান, দেবতা ও পিতৃগণের পূজা, অগ্নিহোত্র এবং বিধিবৎ পূজা করা উচিত। বাণপ্রস্থীদের জীবিকার জন্য ফল-মূল সেবন এবং প্রদীপ জ্বালানোর জন্য রেড়ির তেল ব্যবহার করা উচিত। তাঁরা যোগ অভ্যাস ও কাম-ক্রোধ ত্যাগ করবেন, বীরাসনে বসবেন এবং বীরস্থানে (যে স্থানে ভীরু ব্যক্তি থাকার সাহস করেন না, তেমনই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে) বাস করবেন। ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন বনবাসী মুনিদের বেদীতে শয়ন করা, ঠাণ্ডার সময় জলের মধ্যে অধিক সময় থাকা, বর্ষাকালে উন্মুক্ত স্থানে শয়ন এবং গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি সেবন করা উচিত। তাঁরা বায়ু অথবা জল পান করে থাকবেন, হাল্কা ভোজন করবেন, পাথর দিয়ে শস্য ও ফল ভেঙে খাবেন এবং দাঁত দিয়ে চিবিয়ে আহার করবেন। পরদিনের জন্য খাদ্য-সংগ্রহ করবেন না। চীর, বল্কল অথবা মৃগচর্ম—এই তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র হওয়া উচিত। সময়ানুসারে ধর্মের উদ্দেশ্যে তাঁদের বিধিপূর্বক তীর্থযাত্রা করা উচিত। বাণপ্রস্থীদের সর্বদা বনেই থাকা, বনেই বিচরণ করা, বনপথে চলা এবং বনেই জীবন-নির্বাহ করা উচিত। হোম, পঞ্চযজ্ঞ সেবন, পঞ্চযজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন আহার, বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান, অষ্টের শ্রাদ্ধ, চাতুর্মাস্য যজ্ঞ, দর্শ, পৌর্ণমাসাদি যাগ এবং নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁদের ধর্ম। বাণপ্রস্থী মুনিরা স্ত্রী-সমাগম, সর্বপ্রকার সংকট এবং সমস্ত পাপ থেকে দূরে থেকে বনে বিচরণ করেন। স্রুবাই হল তাঁদের পাত্র। তাঁরা সর্বদা আহ্বনীয়াদি ত্রিবিধ অগ্নির পরিচর্যায় ব্যাপৃত থাকেন এবং সন্মার্গতে চলেন। এইরূপ মুনিবৃত্তিতে অবস্থিত এই বাণপ্রস্থী সাধুগণ পরমগতি প্রাপ্ত হন। তাঁরা সত্য-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারী এবং সিদ্ধ, অতএব তাঁরা মহা পুণ্যময় ব্রহ্মলোক ও সনাতন সোমলোকে গমন করেন।

দেবী ! বাণপ্রস্থ নিয়ম পালনকারী এই তপস্বিদের কিছু তপস্যায় ব্যাপৃত থেকে সর্বদা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন এবং কিছু বাণপ্রস্থী স্ত্রীদের সঙ্গে বাস করেন। স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী মুনিরা মস্তক মুণ্ডন করে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁদের কোনো একটি স্থান থাকে না ; কিন্তু যাঁরা স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন, তাঁরা রাত্রে আশ্রমবাস করেন। দু-প্রকার ঋষিই তিনবার স্নান করে, প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি দেন, ঋষি-কথিত মহাধর্ম পালন করেন, সমাধিস্থ হন, সন্মার্গে চলেন এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন। আগে যে সব বনবাসীদের ধর্ম বলা হয়েছে, এঁরা সেগুলি পালন করলে তপস্যার পূর্ণ ফললাভ করেন। যে মুনি স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন, তিনিও এঁদের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক বেদবিহিত ধর্মাচরণ করেন। সেই ধর্মাত্মাগণও ঋষি-কথিত ধর্ম পালনের ফল লাভ করেন। ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখা মুনির কামনার বশ হয়ে কোনো ভোগ উপভোগ করা উচিত নয়। যিনি হিংসাদোষমুক্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তিনি ধর্মের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি সকল প্রাণীকে দয়া করেন, সবার সঙ্গে সরল আচরণ করেন এবং সমস্ত প্রাণীকে আত্মভাবে দেখেন, তিনিই ধর্মের ফললাভ করেন। চার বেদের তাৎপর্য অবগত হওয়া এবং সর্বজীবে সরল ব্যবহার রাখা—এই দুটিই সমান বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সরল ব্যবহারই বিশেষ ফলপ্রদ হয়। সরলতা ধর্ম, কুটিলতা অধর্ম। সরলভাবযুক্ত মানুষই ধর্মের বাস্তবিক ফল প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি সরল ব্যবহার পছন্দ করে, সে দেবতাদের নিকটে বাস করে ; তাই যে ব্যক্তি নিজ ধর্মের ফললাভ করতে চায় ; তার সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধজয়কারী, ধার্মিক ভাবযুক্ত, হিংসারহিত, ধর্মে মন দেওয়া ব্যক্তিই ধর্মের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি আলস্যরহিত, ধর্মাত্মা, সন্মার্গগামী, সচ্চরিত্র এবং জ্ঞানী হন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠেন।

———০———

উচ্চ ও নীচ বর্ণ প্রাপ্তির এবং বন্ধন, মুক্তি ও স্বর্গ প্রাপ্তি করার শুভাশুভ কর্মগুলির বর্ণনা

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন—মহেশ্বর ! আমার মনে একটি সংশয় আছে, ব্রহ্মা পূর্বকালে যে চার বর্ণের সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে কী কর্ম করলে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয় এবং শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় কীরূপ কর্ম করলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় ? আপনি আমার সন্দেহের নিরসন করুন।

মহেশ্বর বললেন—দেবী ! ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণ আমার বিচারে স্বভাবসিদ্ধ। তবে অবশ্যই দ্বিজ পাপকর্ম করলে তার স্থান অর্থাৎ নিজের মহত্ত্ব থেকে পতিত হয় ; সুতরাং উত্তম বর্ণে জন্মলাভ করে দ্বিজের নিজ পদ রক্ষা করা উচিত। ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম পালন করে ব্রাহ্মণত্বের সাহায্য গ্রহণ করে তাহলে তারাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়-ধর্মের অনুসরণ করে, সে ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্ষত্রিয় হয়ে জন্ম নেয়। তেমনই যে দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব পেয়ে নিজের মন্দবুদ্ধির জন্য লোভ-মোহের আশ্রয় নিয়ে বৈশ্যের কর্ম পালন করে সে বৈশ্য হয়ে জন্মায় অথবা বৈশ্য যদি শূদ্রের কর্ম করে তাহলে সেও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ জাতির পুরুষ যদি শূদ্রের কর্ম করে, তাহলে সে জীবিতকালেই ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে নরকে পতিত হয়। তারপর সে শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যদি কেউ নিজ কর্ম ত্যাগ করে শূদ্রের কর্ম করতে থাকে, তবে সে নিজ জাতি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বর্ণসংকর হয়ে যায় এবং পরজন্মে শূদ্র হয়ে জন্মায়। যে ব্যক্তি নিজ বর্ণ-ধর্ম পালন করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, পবিত্র এবং ধর্মজ্ঞ হয়ে ধর্মে ব্যাপৃত থাকে, সেই ধর্মের প্রকৃত ফল উপভোগ করে। দেবী ! ব্রহ্মা আরও একটি কথা বলেছেন, ধর্মের আকাঙ্ক্ষাকারী সৎপুরুষের অধ্যাত্মজ্ঞান সম্পাদন করা উচিত। উগ্র স্বভাবযুক্ত ব্যক্তির অন্ন নিন্দিত মানা হয়। জনসমুদায়ের, শ্রাদ্ধের, জন্মজনিত অশৌচ, দুষ্ট ব্যক্তির এবং শূদ্রের অন্নও নিষিদ্ধ, সেগুলি কখনোই গ্রহণ করা উচিত নয়। এই হল পিতামহের শ্রীমুখের বাণী ; সুতরাং এটি প্রমাণরূপে অবশ্যই মানা উচিত। শূদ্রের অন্ন ভোজনের পর সেই অবস্থায় মৃত্যু হলে সেই ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রী বা যজ্ঞকারী হোক না কেন, তাকে অবশ্যই শূদ্র হয়ে জন্মাতে হয়। যে উত্তম এবং দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে তা অবহেলা করে এবং অভক্ষ্য অন্নগ্রহণ করে, সে অবশ্যই ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়। মদ্যপ, ব্রহ্মহত্যাকারী, নীচকর্মকারী, চোর, ব্রতভঙ্গকারী, স্বাধ্যায়হীন, পাপী, লোভী, কপট, শঠ, ব্রত-ভঙ্গকারী, শূদ্রজাতির স্ত্রীর স্বামী, কুণ্ডাশী (যে বাসনে রান্না করে, তাতেই আহার করে), মদ বিক্রয়কারী এবং নীচ জাতির মানুষের সেবাকারী ব্রাহ্মণ নিজ জাতি থেকে পতিত হয়। যে গুরুর শয্যায় পা রাখে, গুরুর সঙ্গে বিদ্রোহ করে এবং গুরু নিন্দায় রত হয়, সে ব্রহ্মবেত্তা হলেও ব্রাহ্মণত্ব থেকে পতিত হয়। এইরূপ শুভ কর্মের আচরণ করলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মার বচন হল যে, শূদ্রও যদি জিতেন্দ্রিয় হয়ে পবিত্র কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে তোলে, তাহলে সে-ও দ্বিজের ন্যায় সম্মানীয় হয়ে ওঠে। আমার তো মনে হয় যদি শূদ্রের স্বভাব ও কর্ম উভয়ই উত্তম হয়, তাহলে দ্বিজজাতির থেকেও তাকে শ্রেষ্ঠ বলে মানা উচিত। শুধুমাত্র জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান এবং সন্ততি—ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির এগুলিই কারণ নয়। ব্রাহ্মণত্বের প্রধান হেতু হল সদাচার। সদাচারে স্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। ব্রহ্মের স্বরূপ সর্বত্র সমান। যার মধ্যে সেই নির্গুণ ও নির্মল ব্রহ্ম জ্ঞান থাকে, সেই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ। এই যে চার বর্ণের স্থান ও বিভাগ দেখানো হয়েছে, এই সবই নিজের উৎপত্তির অনুসারেই জানা উচিত। প্রজা সৃষ্টির সময় বরদাতা ব্রহ্মা স্বয়ং একথা বলেছেন। নিজের কল্যাণকামী ব্রাহ্মণদের উচিত, সজ্জনদের পথ অবলম্বন করে সর্বদা অতিথি ও পোষ্যবর্গকে আহার করানোর পর নিজে অন্ন গ্রহণ করা। বেদোক্ত পথের আশ্রয় নিয়ে সর্বদা উত্তম ব্যবহার করা উচিত। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ গৃহে প্রতিদিন সংহিতা পাঠ এবং শাস্ত্রাদি স্বাধ্যায় করবে। অধ্যয়নকে জীবিকার সাধন করবে না। যে ব্রাহ্মণ সন্মার্গে স্থিত হয়ে অগ্নিহোত্র এবং স্বাধ্যায়পূর্বক জীবন ব্যতীত করে, সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। দেবী ! শূদ্র ধর্মাচরণ করলে কেমনভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ স্বধর্ম ত্যাগ করলে জাতিভ্রষ্ট হয়ে কীভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়—এই গূঢ় রহস্য আমি তোমাকে জানালাম।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন—মহেশ্বর ! এবার আমাকে মানুষের ধর্ম ও অধর্মের বিষয় বলুন। মানুষ কীভাবে কর্মে আবদ্ধ হয়, মুক্ত হয় বা স্বর্গে যায় ?

মহেশ্বর বললেন—দেবী ! তুমি ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত এবং নিরন্তর ধর্মে ব্যাপৃত থাকো ; তাই তুমি এইসব প্রাণীদের হিতকারী ও বুদ্ধিবৃদ্ধিকারী প্রশ্ন করেছ। এখন এর উত্তর শোনো—যে ব্যক্তি ধর্মোপার্জিত ধন ভোগ করে এবং সত্যধর্মপরায়ণ থাকে সে স্বর্গে যায়। যার সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়েছে, যে উৎপত্তি ও প্রলয়ের তত্ত্ব জানে, সর্বজ্ঞ এবং সত্যদ্রষ্টা, যার আসক্তি দূর হয়েছে, কায়মনোবাক্যে যে কাউকে হিংসা করে না, সেই ব্যক্তিই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তাকে ধর্ম বা অধর্ম কোনোটিই আবদ্ধ করে না। যে কোথাও আসক্ত হয় না, কোনো প্রাণীকে হত্যা করে না, সুশীল ও দয়ালু, সেও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না, যে শত্রু ও মিত্রকে সমরূপে দেখে, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে সব প্রাণীকে দয়া করে, সকলের বিশ্বাসের পাত্র এবং হিংসাময় আচরণ ত্যাগ করেছে, সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে। যে অন্যের ধনে হিংসা করে না, পরস্ত্রী থেকে দূরে থাকে এবং ধর্মদ্বারা প্রাপ্ত অন্নই গ্রহণ করে, যার অপরের স্ত্রীর প্রতি মাতা-ভগিনী ও কন্যাসম ভাব থাকে, সে স্বর্গে যায়। যে সর্বদা নিজ ধনে সন্তুষ্ট হয়ে চুরির থেকে দূরে থাকে, যার নিজ ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস থাকে, যে নিজ স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট, ঋতুকালেই স্ত্রী-সমাগম করে এবং গ্রাম্যতায় লিপ্ত হয় না ; যে তার সচ্চরিত্রতার জন্য পরস্ত্রীর দিকে তাকায় না, যে ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে এবং শীলতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাতেই অবস্থিত থাকে, সেই ব্যক্তি স্বর্গে যায়। এটি দেবতা নির্মিত পথ। রাগ-দ্বেষ দূর করার জনাই এই মার্গের প্রবৃত্তি হয়েছে। বিদ্বান ব্যক্তিদের সর্বদাই এটি মেনে চলা উচিত। এই মার্গ দান, ধর্ম ও তপস্যাযুক্ত। শীল, শৌচ ও দয়া এর স্বরূপ। মানুষের জীবিকা, ধর্ম এবং আত্মোদ্ধারের জন্য সর্বদাই এই পথের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত (কারণ নিষ্কামভাবে সেবন করার ধর্ম পরম কল্যাণকারী হয়)।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন—ভূতনাথ ! কীরূপ বাক্য বললে মানুষ বন্ধন থেকে মুক্তি পায় ? দয়া করে তা বলুন।

মহেশ্বর বললেন—যে ব্যক্তি নিজের এবং অপরের জন্যও হাস্য-পরিহাসেও মিথ্যা বলে না, জীবিকা, ধর্ম অথবা কোনো কামনার জন্য অসত্য ভাষণ করে না, যার বাক্য মনে প্রিয় লাগে, যা কাউকে দুঃখ দেয় না, অবিচার করে না এবং আদর-আপ্যায়ন ভাবযুক্ত, যে কখনো রুক্ষ, কটু ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বাক্য মুখ থেকে বার করে না, সেই সজ্জন ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে। যে ব্যক্তি অপরকে তীক্ষ্ণ বাক্য বলা, দ্রোহ করা ত্যাগ করে সর্বপ্রাণীকে সমভাবে দেখে, ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, যার মুখ থেকে কখনো শঠতাপূর্ণ বাক্য বার হয় না, যে বিরোধপূর্ণ বাক্য পরিত্যাগ করে এবং ক্রোধ হলেও যার মুখ থেকে আত্মমর্যাদা-হানীকারী বাক্য বার হয় না—সেই সময়ও সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্য বলে, সে স্বর্গলাভ করে। দেবী ! এগুলি বাক্যের ধর্ম জানানো হল। মানুষের সর্বদা এগুলি মেনে চলা উচিত। বিদ্বানদের সর্বদা শুভ ও সত্য বাক্য বলা এবং মিথ্যা ত্যাগ করা উচিত।[1]

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন—দেবাদিদেব ! মানুষ কোন কর্ম করলে দীর্ঘায়ু হয় ? কোন কর্মে আয়ু ক্ষীণ হয় ? জগতে কত মানুষ কুলীন এবং কত অকুলীন ? কত পণ্ডিত এবং কত নির্বুদ্ধি ! এরূপ আবার অনেকে বহু প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং মহাবুদ্ধিমান হয়। কত লোকের ওপর নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন আসে আবার অনেকে বড় বড় বিপদের শিকার হয়, এর কারণ কী ? কৃপা করে এই সব বলুন।

মহেশ্বর বললেন—দেবী ! কর্মের ফল যেভাবে উদয় হয় এবং মর্তলোকে মানুষ যেভাবে নিজ কর্মফল ভোগ করে, সেইসব জানাচ্ছি, শোনো—যে ব্যক্তি প্রত্যহ অন্যের প্রাণহরণের জন্য অস্ত্র নিয়ে সর্বদা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে থাকে, যে প্রতিদিন অস্ত্রদ্বারা প্রাণী হত্যা করে, যার মধ্যে দয়া নেই, যে সর্বদা সমস্ত প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করে রাখে, যার নির্দয়তা পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছে, যে প্রাণীদের বিপদে রক্ষা করে না, সে ঘোর নরকে পতিত হয়। যার স্বভাব এর বিপরীত, সেই পুরুষ ধর্মাত্মা এবং রূপবান হয়। হিংসাপ্রেমিক মানুষ তার পাপকর্মের জন্য অপরের বধ্য, সর্বপ্রাণীর অপ্রিয় এবং অল্পায়ু হয়। যার চিত্ত হিংসাপ্রবণ, সে নরকে পতিত হয় আর যে হিংসা করে না, সে স্বর্গে গমন করে। নরকে পতিত জীবকে অত্যন্ত কঠোর এবং ভয়ংকর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কেউ যদি কখনো নরক থেকে মুক্তি পায়, তাহলে সে মনুষ্য-জন্ম

[1] উপরিউক্ত কর্মগুলি যারা নিষ্কামভাবে পালন করে, তারা পরমাত্মাকে লাভ করে।

লাভ করে ; কিন্তু সে অল্পায়ু হয়। কারণ যে হিংসাপ্রিয়, সে নিজ পাপ-কর্মে আবদ্ধ হওয়ায় সর্ব প্রাণীর অপ্রিয় এবং অল্পায়ু হয়। অন্যদিকে যে শুদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করেছে এবং জীবহিংসা থেকে দূরে থাকে, যে শস্ত্র এবং দণ্ড পরিত্যাগ করেছে, যার দ্বারা কখনো হিংসা কর্ম সংঘটিত হয়নি, যে আঘাত করে না, আঘাত করার নির্দেশ দেয় না এবং আঘাত করা অনুমোদনও করে না, যার মনে সকল প্রাণীর প্রতি স্নেহ বিদ্যমান, যে নিজের মতোই সবার প্রতি দয়াভাব রাখে, এরূপ ব্যক্তি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, যদি কখনো মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তাহলে সে দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়। এগুলি সৎকর্ম অনুষ্ঠানকারী সদাচারী এবং দীর্ঘজীবি মানুষদের পথ। জীবহিংসা পরিত্যাগ করলে এটি উপলব্ধি হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা এই মার্গের উপদেশ প্রদান করেছেন।

স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তকারী কর্মাদির বর্ণনা

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! কীরূপ শীল, আচরণ, কর্ম ও দানের দ্বারা মানুষ স্বর্গে যায় ?

মহেশ্বর বললেন—দেবী ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের সম্মান এবং দান করে ; দীন, দুঃখী এবং দরিদ্র মানুষদের ভক্ষ্য-ভোজ্য, অন্ন-পান এবং বস্ত্র প্রদান করে ; থাকার জায়গা, ধর্মশালা, কূপ, জলাশয় ইত্যাদি তৈরি করে ; দানগ্রহণকারীদের প্রয়োজন জেনে নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দান করে ; আসন, শয্যা, বাহন, গৃহ, রত্ন, ধন-ধান্য, গাভী, কৃষিক্ষেত্র এবং কন্যা প্রসন্নতাপূর্বক দান করে, তারা দেবলোকে বাস করে এবং পুণ্য কর্মাদির ভোগ সমাপ্ত হলে মনুষ্যলোকে সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করে। তার ধনধান্যের অভাব থকে না। দানকারী ব্যক্তিই এইরূপ মহাসৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মা অনেক আগেই একথা জানিয়েছেন। দাতা ব্যক্তি সকলেরই প্রিয় হয়। এতদ্ব্যতীত বহু মানুষ আছে, যারা কাউকে কিছু দিতে কৃপণতা করে। সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা, ব্রাহ্মণেরা কিছু চাইলে ধন থাকলেও, দেয় না। দীনদরিদ্র, অন্ধ, ভিখারি এবং অতিথি দেখলেই অন্যত্র সরে যায়, তারা ভিক্ষা চাইলেও কৃপণতাবশত দিতে অস্বীকার করে। এরা কখনো অন্ন-বস্ত্র-স্বর্ণ- গাভী ও খাদ্যসামগ্রী দান করে না। এইরূপ অধার্মিক, লোভী, নাস্তিক এবং দানে বিমুখ মূর্খ ব্যক্তি নরকে গমন করে। কালচক্রের ফেরে যদি সেই ব্যক্তিরা পুনরায় মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাহলে তারা নির্ধন কুলেই জন্মগ্রহণ করে এবং সবসময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পায়। তারা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং অর্থাভাবে পাপাচারে জীবন-নির্বাহ করতে বাধ্য হয় অথবা অল্প বৈভবসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করে অল্পসুখ লাভ করে।

এদের ছাড়াও আর একপ্রকার মানুষ আছে যারা সর্বদা গর্ব ও অহংকারে মগ্ন থাকে এবং পাপকর্মে রত থাকে। সেই মূর্খ ব্যক্তিরা যাবার জন্য পথ ছেড়ে দেয় না, পূজনীয় ব্যক্তিদের পাদ্য-অর্ঘ্য দেয় না, পূজা করে না, গুরু গৃহে এলে প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের সেবা করে না, অহংকার এবং লোভবশত সম্মানীয় ও বৃদ্ধদের অসম্মান করে—এরূপ ব্যবহারকারীরা নরকগামী হয়। এদের নরক ভোগ সমাপ্ত হলে পুনরায় অত্যন্ত নিন্দিত কুলে এদের জন্ম হয়। গুরু এবং বয়স্ক-বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অপমান করে যে সব মানুষ, তারা মূর্খ এবং চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করে। যাদের মধ্যে গর্ব ও অহংকারের লেশমাত্র নেই, যারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করে, জগতে পূজ্য ব্যক্তিদের মান্য করে, বড়দের প্রণাম করে, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সব বর্ণের প্রিয় ও হিতকারী, যাদের কারো সঙ্গে দ্বেষভাব নেই, যারা প্রসন্ন বদন এবং স্বভাব কোমল, স্বাগতপূর্ণ স্নেহযুক্ত কথা বলে, কোনো প্রাণীকে হিংসা করে না এবং সকলের সৎকার ও পূজা করে—এরূপ ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে। তারপর সেখানকার ভোগ সমাপ্ত হলে মনুষ্য-জন্মে উত্তম কুল লাভ করে। সেখানে সকলে তাকে সম্মান করে এবং তার সামনে মাথা নত করে। মানুষ এইভাবে নিজ কর্মের ফলই ভোগ করে থাকে। ধর্মাত্মা ব্যক্তি সর্বদা উত্তম কুল, উত্তম জাতি এবং উত্তম স্থানে জন্মগ্রহণ করে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কথিত এই ধর্ম আমি বর্ণনা করলাম।

যে ব্যক্তির আচরণ ক্রূরতায় ভরা, যে সমস্ত জীবের পক্ষে ভয়ংকর, যে নানাভাবে আঘাত করে জীবজন্তুদের কষ্ট দেয় ও ভয়াবহ রূপ ধরে তাদের আক্রমণ করে, এরূপ স্বভাবের মানুষ নরকে পতিত হয় এবং কালচক্রের গতিতে

যদি তাকে মানুষ হয়ে জন্ম নিতে হয়, তবে সে বহুপ্রকার বাধা-বিঘ্ন পায় । অতি অধম কুলে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুসারে জগতে নীচ বলে মান্য হয় এবং সকলেই তার প্রতি দ্বেষ ভাব পোষণ করে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াদৃষ্টি রাখে, সবাইকে মিত্র মনে করে, বয়োজ্যেষ্ঠদের পিতার ন্যায় সম্মান করে, কারো সঙ্গে শত্রুতা করে না, ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, কোনো প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করে না, সব প্রাণী যাকে বিশ্বাস করে, যার কর্ম মৃদু এবং যে সর্বদা দয়াভাব যুক্ত, এরূপ স্বভাব ও আচরণবিশিষ্ট মানুষ স্বর্গলোকের দিব্যভবনে দেবতার ন্যায় আনন্দে বাস করে। তারপর পুণ্যক্ষয় হলে যদি মনুষ্যলোকে জন্ম হয়, তাহলে তার বাধা-বিপত্তি অত্যন্ত কম হয়। সে নির্ভয়, সুখী এবং আয়াস ও উদ্বেগরহিত হয়ে জীবন কাটায়। দেবী ! এগুলি সজ্জন পুরুষের পথ, যেখানে কোনো প্রকার বাধা-বিঘ্ন আসতে পারে না।

দেবী পার্বতী কর্তৃক নারী-ধর্মের বর্ণনা

নারদ বললেন—তারপর, ভগবান শংকরও দেবী পার্বতীর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলেন। তাই তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট প্রিয় এবং অনুকূল ভার্যা পার্বতীকে বললেন—'দেবী ! তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানসম্পন্না এবং স্বয়ং ধর্মাচরণকারিণী, তাই আমি তোমার কাছে নারী-ধর্মের বর্ণনা শুনতে চাই। তুমি আমার সহধর্মিণী, তোমার শীল, ব্রত এবং বল ও পরাক্রম আমারই মতো। তুমি তীব্র তপস্যা করেছ। তুমি যদি নারী-ধর্ম বর্ণনা করো তবে তা বিশেষ লাভদায়ক হবে এবং জগতে প্রামাণ্য বলে মান্য হবে। নারীগণ সেটিকে সম্মান করবে ; কারণ স্ত্রীবর্গের পরমগতি গৌরীতেই প্রতিষ্ঠিত। এই কথা জগতে সর্বদাই বিদিত। শুভে ! সনাতন কাল থেকে নারীদের প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে তুমি অবহিত আছ, সুতরাং তুমি নারীদের স্ব-ধর্ম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করো।'

পার্বতী বললেন—হে দেবেশ্বর ! আপনি সমস্ত প্রাণীর প্রভু, আপনার প্রভাবে আমার বাক্‌শক্তিতে যেন সেই পটুতা আসে (যাতে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হই)। দেখুন ! এই নদী সমস্ত তীর্থের জল নিয়ে আপনার চরণ স্পর্শ করার জন্য আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছে। এদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি নারীদের ধর্ম বর্ণনা করব। নারী নারীদেরই অনুসরণ করে, অতএব আমি এই নদীগুলিকে সম্মান করব। এই হল পরম পবিত্র সরস্বতী নদী, যা সব নদীর মধ্যে উত্তম। নদীগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম এঁরই উৎপত্তি হয়েছিল। ইনি সমুদ্রে মিলিত হয়েছেন। এছাড়া এই বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু, দেবিকা, সিন্ধু, কৌশিকী এবং গৌতমী (গোদাবরী)ও এখানে বিরাজমান। নদীশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত তীর্থের জলে সম্পন্ন দেবনদী গঙ্গাও এখানে উপস্থিত, যিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণা।

মহাদেবকে এই কথা বলে পার্বতী নারী-ধর্মের জ্ঞানে কুশল গঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ নদীদের মৃদুহাস্যে বললেন—'নদীগণ ! ভগবান শংকর আমাকে নারী-ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন ; আমি আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।' পার্বতী যখন সেই পরম পবিত্র এবং কল্যাণময়ী নদীদের প্রশ্ন করলেন, তখন সকলে

দেবনদী গঙ্গাকেই সম্মানিত করে তাঁকেই উত্তর দেবার জন্য মনোনীত করলেন। তখন নানা বুদ্ধিসম্পন্না, নারী-ধর্ম জ্ঞাতা, পাপভয় দূরকারিণী, পরম পবিত্র, সর্ব ধর্ম কুশল ও বিনয়শীলা গঙ্গাদেবী মৃদুহাস্যে গিরিরাজকন্যা উমাকে বললেন—'দেবী! তুমি ধর্মে অত্যন্ত তৎপর এবং সমস্ত জগতের পূজনীয়া। তুমি যে আমার ন্যায় এক সাধারণ নদীকে প্রশ্ন করে সম্মান জানিয়েছ, তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য ও অনুগৃহীত বলে মনে করছি। যে সব কিছু জেনেও অপরকে প্রশ্ন করে এবং পবিত্র চিত্তে তাকে সম্মান জানায়, তাকেই প্রকৃত পণ্ডিত বলা হয়। যে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং বক্তার কাছে নিজ অভীষ্ট বিষয় জেনে নেয়, সে কখনো সংকটগ্রস্ত হয় না। বুদ্ধিমান মানুষ যখন সভায় কিছু বলেন তখন তার কথাগুলি সাধারণ মানুষের থেকে বিশিষ্ট—প্রাজ্ঞপূর্ণ হয়, কিন্তু বুদ্ধিহীন অহংকারী মানুষের কথা অন্যপ্রকার হয়, তাতে কোনো কিছুই থাকে না। সুতরাং দেবী! তুমি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, অতএব তুমিই আমাদের নারী ধর্মের উপদেশ করার যোগ্যা।'

দেবী গঙ্গা যখন এইভাবে পার্বতীকে নানা গুণের জন্য প্রশংসা করতে লাগলেন, তখন পার্বতী বললেন—'দেবী! নারী-ধর্ম সম্বন্ধে আমার যেমন জ্ঞান, সেই অনুযায়ী আমি বিধিবৎ বর্ণনা করছি, তুমি মন দিয়ে শোন—বিবাহের সময় কন্যার ভাই-বন্ধু তাকে নারী ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, তখন সে অগ্নির সমক্ষে পতির সহধর্মিণী হয়। যার স্বভাব, কথাবার্তা ও আচরণ উত্তম, যাকে দেখলে পতি সুখলাভ করে; যে নিজ পতি ছাড়া অন্য কারোতে মন নিবিষ্ট করে না, স্বামীর সামনে সর্বদা প্রসন্নমুখে থাকে, সেই নারীকে ধর্মাচরণকারী বলা হয়। যে সাধ্বী স্ত্রী তার স্বামীকে সর্বদা দেবতুল্য বলে মনে করে, সেই ধর্মপরায়ণা নারী-ধর্মের ফলভাগিনী হয়। যে পতিকে দেবতার ন্যায় সেবাশুশ্রূষা ও পরিচর্যা করে, পতি ভিন্ন আর কারো সঙ্গে প্রেম করে না, কখনো ক্রোধান্বিত হয় না, উত্তম ব্রত পালন করে, যে পুত্রমুখের ন্যায় সর্বদা স্বামীর মুখ অবলোকন করে, নিয়মিত আহার পরিবেশন করে, সেই সাধ্বী নারী ধর্মচারিণী হয়। 'পতি-পত্নীকে একসঙ্গে ধর্মাচরণ করা উচিত' এই মঙ্গলময় দাম্পত্য-ধর্মকথা শুনে নারী ধর্মপরায়ণা হয়, সে পতির ন্যায় ব্রত পালনকারী (পতিব্রতা) হয়। সাধ্বী নারী তার পতিকে দেবতার ন্যায় মনে করে। পতি ও পত্নীর এই সহধর্ম (একসঙ্গে থেকে ধর্মাচরণ করা) রূপ ধর্ম পরম মঙ্গলময়। যে হৃদয়ের অনুরাগবশত স্বামীর অধীন থাকে, নিজ চিত্তকে প্রসন্ন রাখে, উত্তম ব্রত পালন করে এবং সুন্দর বেশ ধারণ করে, যার চিত্ত নিজ পতি ব্যতীত আর কারো চিন্তা করে না, তাকে প্রসন্নবদনা ধর্মধারিণী নারী মনে করা হয়। যে নারী স্বামীর তিক্ত কথা শুনে বা ক্রূর দৃষ্টি দেখেও প্রসন্নভাবে থাকে, সেই নারীই পতিব্রতা। পতি ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষকে দেখা তো দূর, যে পুরুষের নাম ধারণকারী চন্দ্র, সূর্য, কিংবা কোনো বৃক্ষের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না, সে-ই পাতিব্রত্য ধর্ম পালনকারী। যে নারী তার দরিদ্র, রোগী, দীন অথবা ক্লান্ত পতিকে পুত্রের ন্যায় সেবা করে, সে-ই ধর্মের ফল ঠিকমতো লাভ করে। যে নারী তার হৃদয়কে শুদ্ধ রাখে, গৃহকার্যে কুশল, পতিকে ভালোবাসে ও নিজের প্রাণ বলে মনে করে, সেই ধর্মফল লাভের অধিকারিণী হয়। যে প্রসন্নচিত্তে পতির সেবায় ব্যাপৃত থাকে, পতির ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং তার সঙ্গে বিনয়যুক্ত আচরণ করে, সেই নারী-ধর্মের ফল পায়। যার হৃদয়ে কাম-ভোগ-ঐশ্বর্য বা সুখের অধিক পতিতে আগ্রহ থাকে, যে প্রত্যহ প্রাতে উঠে গৃহ-কর্ম করে, গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখে, পতির সঙ্গে নিত্য অগ্নিহোত্র করে, দেবতাকে পুষ্প ও ভোগ অর্পণ করে, দেবতা-অতিথি-শ্বশুর-শাশুড়িকে আহার করিয়ে নিয়ম অনুযায়ী সর্বশেষে আহার করে, গৃহবাসীদের সুস্থ ও সন্তুষ্ট রাখে, সেই নারীই নারী-ধর্ম পালনকারী। যে নারী উত্তমগুণাদি যুক্ত হয়ে সর্বদা শ্বশুর-শাশুড়ি এবং মাতা-পিতার প্রতি সেবা-যত্ন এবং ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হয়, সেই নারীকে তপস্বিনী মানা হয়। যে নারী ব্রাহ্মণ, দুর্বল, অনাথ, দীন, অন্ধ ও ভিখারিকে অন্ন দিয়ে তাদের পালন-পোষণ করে, সে পতিব্রতা-ধর্মের ফল লাভ করে। যে প্রত্যহ উত্তম ব্রত পালন করে, নিরন্তর পতির হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকে, তাকে পতিব্রতা বলে বুঝতে হবে। যে নারী পতিব্রতা ধর্মপালন করে স্বামী-সেবায় তৎপর থাকে, তার এই কাজ মহাপুণ্য, কঠিন তপস্যা এবং অক্ষয় স্বর্গের সাধন। পতিই নারীর দেবতা, তার বন্ধু এবং পরম গতি। নারীর কাছে পতির ন্যায় অন্য কেউ নেই, কোনো দেবতাও নয়। একদিকে পতির প্রসন্নতা অন্য দিকে স্বর্গ; নারীর কাছে এই দুটি সমতুল্য কিনা তাতে সন্দেহ আছে। আমার প্রাণনাথ মহেশ্বর! আমি তো আপনাকে অপ্রসন্ন রেখে স্বর্গেও যেতে

চাই না। পতি যদি দরিদ্র হয়, রুগ্ন হয়, বিপদগ্রস্ত হয়, শত্রুকবলিত হয় অথবা ব্রহ্মশাপে কষ্ট পায় এবং সেই অবস্থায় সে না করার যোগ্য কাজ, অধর্ম অথবা প্রাণত্যাগ করারও নির্দেশ দেয় তাহলে সেটি বিপদকালের ধর্ম মনে ভেবে নিঃশঙ্কভাবে তৎক্ষণাৎ তা পালন করা উচিত। প্রভু! আপনার আদেশে আমি নারী-ধর্ম বর্ণনা করলাম। যে নারী ওপরে বর্ণিত নির্দেশানুযায়ী নিজ জীবন গঠন করে, সে পাতিব্রত্য ধর্মের ফলভাগিনী হয়।'

পার্বতী বর্ণিত নারী-ধর্মের এইরূপ বর্ণনা শুনে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করলেন এবং সেখানে আগত সকলকে স্বস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন সমস্ত ভূত, নদী, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ ভগবান শংকরকে প্রণাম করে নিজেদের স্থানে গমন করলেন।

—০—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা

ঋষিগণ বললেন—বিশ্ববন্দিত ভগবান শংকর! এবার আমরা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করতে চাই।

মহেশ্বর বললেন—মুনিবরগণ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার

থেকেও শ্রেষ্ঠ। সেই সনাতন পুরুষকে শ্রীহরি বলা হয়। তাঁর দেহকান্তি জাম্বুনদ নামক সুবর্ণের ন্যায় তেজস্বী। তিনি মেঘবিহীন আকাশে উদিত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। তাঁর দশ হাত এবং সেগুলি মহান তেজসম্পন্ন। তিনি দেবতাদের চির শত্রু দৈত্যদের বিনাশকারী। তাঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন শোভা পায়। তিনি হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির প্রভু হওয়ায় তাঁকে হৃষীকেশ বলা হয়। সমস্ত দেবতা তাঁর পূজা করেন। ব্রহ্মা তাঁর উদর থেকে এবং আমি তাঁর মস্তক থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তাঁর মাথার চুল থেকে নক্ষত্র ও তারা উদ্ভূত হয়েছে। দেবতা এবং অসুর তাঁর দেহের রোম থেকে সৃষ্ট। সমস্ত ঋষি এবং সনাতনলোক তাঁর শ্রীবিগ্রহ থেকে উৎপন্ন। শ্রীহরি স্বয়ং সমস্ত দেবতা এবং ব্রহ্মার ধাম। তিনিই সমস্ত জগতের স্রষ্টা এবং ত্রিলোকের স্বামী। তিনিই সমস্ত চরাচরের প্রাণীদের সংহার করেন। তিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁদের রক্ষক এবং শত্রুসন্তপ্তকারী। তিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত, সর্বব্যাপক এবং সর্বদিকে মুখসম্পন্ন। তিনিই পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক এবং সর্বব্যাপী মহেশ্বর। ত্রিলোকে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। তিনিই সনাতন, মধুসূদন এবং গোবিন্দ ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। সজ্জনকে সম্মান প্রদর্শনকারী এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত রাজাদের সংহার করাবেন। তিনি দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য পৃথিবীতে মানব-শরীর ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন। তার শক্তি এবং সহায়তা ছাড়া দেবতারা কোনো কাজই করতে পারেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রাণীর অগ্রগণ্য, তাই সমস্ত দেবতা তাঁর চরণে মাথা নত করে। দেবতাদের রক্ষা এবং তাঁদের কার্য-সাধনে রত এই ভগবান বাসুদেব ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মর্ষিদের সর্বদা শরণ দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মা এবং আমি—দুজনেই তাঁর শরীরের মধ্যে অত্যন্ত সুখে অবস্থান করি। সমস্ত দেবতাও তাঁর শ্রীবিগ্রহে সুখপূর্বক বাস করেন।

তাঁর চোখদুটি কমলের মতো সুন্দর। তাঁর বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীর বাস, তিনি সর্বদা লক্ষ্মীর সঙ্গে বাস করেন। তাঁর বিশেষ অস্ত্র হল শার্ঙ্গধনুক, সুদর্শন চক্র, নন্দন নামক ধনুক। তাঁর ধ্বজাতে গরুড়ের চিহ্ন আছে। তিনি উত্তম শীল, শম, দম, পরাক্রম, বীর্য, সুন্দর দেহ, সুন্দর দর্শন, সুডৌল আকৃতি, ধৈর্য, সরলতা, কোমলতা, রূপ ও বল ইত্যাদি সদ্‌গুণসম্পন্ন। সর্বপ্রকার দিব্য এবং অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্র তাঁর কাছে সর্বদা মজুত থাকে। তিনি যোগমায়াসম্পন্ন এবং

সহস্র নেত্র সংবলিত। তাঁর কোনো বিনাশ নেই। তিনি উদারচিত্ত, মিত্রদের প্রশংসক, জ্ঞাতি এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহংকাররহিত, ব্রাহ্মণভক্ত, বেদ উদ্ধারকারী, ভয়ার্ত মানুষের ভয় হরণকারী ও মিত্রদের আনন্দবর্ধনকারী। তিনি সমস্ত প্রাণীকে শরণ প্রদান করেন, দীনার্তের রক্ষায় সদা তৎপর, শাস্ত্রজ্ঞাতা, অর্থসম্পন্ন, সমস্ত জগতের বন্দনীয়, শরণাগত শত্রুকেও আশ্রয় প্রদান করেন, ধর্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, নীতিমান, ব্রহ্মবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়। সেই পরমেশ্বরকে পূজা করলে পরম ধর্মের সিদ্ধি হয়। তিনি মহাতেজস্বী দেবতা। তিনি প্রজাহিতার্থে ধর্মের জন্য কোটি কোটি ঋষি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট সনৎকুমার প্রমুখ ঋষি আজও গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যায় রত আছেন, তাই ধর্মজ্ঞ উত্তম বক্তা বাসুদেবকে সর্বদা প্রণাম করা উচিত। ভগবান নারায়ণ দেবলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ। যে তাঁকে বন্দনা করে, তিনিও তার বন্দনা করেন। যে তাঁকে সম্মান করে, তিনিও তাঁর সম্মান করেন। এইরূপ অর্চিত হলে অর্চনা করেন, পূজিত হলে পূজা করেন, দর্শনকারীদের ওপর সর্বদা কৃপাদৃষ্টি রাখেন এবং শরণাগতকে শরণ প্রদান করেন। আদিদেব ভগবান বিষ্ণুর এই উত্তম ব্রত। সজ্জন ব্যক্তি সর্বদাই তাঁর এই ব্রত আচরণ করেন। তিনি সনাতন দেবতা, তাই দেবগণ সর্বদাই তাঁকে পূজা করেন। যারা তাঁর অনন্যভক্ত, তাঁরা নিজেদের সাধনার অনুরূপ নির্ভয়পদ প্রাপ্ত হন। দ্বিজগণের উচিত মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা সর্বদা সেই ভগবানের পূজা করা, প্রণাম করা এবং যত্নসহকারে উপাসনা করে দেবকীনন্দনকে দর্শন লাভ করা। মুনিবরগণ ! আমি আপনাদের এক উত্তম মার্গ জানালাম। কেবল ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করলে আপনাদের সব দেবতার দর্শন লাভ হবে। আমিও মহাবরাহরূপ ধারণকারী সর্বলোকপিতামহ জগদীশ্বরকে নিত্য প্রণাম করি। আমরা সকল দেবতা তাঁর শ্রীবিগ্রহে বাস করি, সুতরাং তাঁকে দর্শন করলে তিন দেবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের) দর্শন লাভ হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তপোধনগণ ! আমি আপনাদের ওপর অনুগ্রহ করে ভগবানের পবিত্র মাহাত্ম্য এই জন্য শোনালাম, যাতে আপনারা যত্ন সহকারে যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন—প্রভু ! ভগবান শংকর হিমালয় শিখরে যাঁর মাহাত্ম্য আমাদের বলেছিলেন, সেই ব্রহ্মভূত সনাতন পুরুষ আপনিই, শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার প্রভাবে আর

একটি আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে আমরা আপনাকে দেখে বিস্মিত হয়েছি এবং আমাদের পূর্বকথা স্মরণ হয়েছে। প্রভো ! দেবাদিদেব ভগবান শংকর আপনার এরূপ মাহাত্ম্যের কথাই বর্ণনা করেছিলেন।

তপোবন নিবাসী ঋষিগণ এরূপ বলায় দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন। তারপর মহর্ষিগণ পুনরায় সহর্ষে বললেন—'মধুসূদন ! আপনি কৃপা করে আমাদের বারংবার দর্শন দেবেন। আপনার যে অবতার অথবা মনুষ্যরূপে জন্ম হয়েছে এবং এর যা গুপ্ত কারণ, আমরা আমাদের চপলতার জন্য তা গোপন রাখতে অসমর্থ। তাই আপনার সামনেই আমরা ছোট মুখে বড় কথা বলছি। পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নেই, যা আপনার অজ্ঞাত। আপনি সব কিছু জানেন। এবার আমাদের যাবার অনুমতি প্রদান করুন।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! সেই মহর্ষিগণ তখন দেবাদিদেব পুরুষোত্তমকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। তারপর পরম কান্তিতে দেদীপ্যমান ভগবান নারায়ণ তাঁর ব্রত বিধিমতো সমাপ্ত করে দ্বারকাপুরীতে চলে গেলেন। তার দশমাস পর রুক্মিণীর গর্ভে অতি সুন্দর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তাঁর দেহকান্তি ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। তিনি ভগবানের বংশচালনাকারী এবং শূরবীর ছিলেন। সকল প্রাণীর মানসিক সংকল্পে ব্যাপ্ত থাকা আর দেবতা ও

অসুরেরও অন্তরে নিবাসকারী কামদেবই শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইনিই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর দেহের বর্ণ শ্যামল মেঘের মতো এবং চতুর্বাহুধারী। ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতা তাঁরই স্বরূপ, তিনি সমস্ত প্রাণীকে আশ্রয় প্রদানকারী আদিদেব মহাদেব। তিনি অনাদি, অনন্ত। সেই অব্যক্তস্বরূপ মহাতেজস্বী নারায়ণ দেবতাদের কার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি দুর্বোধ্য তত্ত্বের বক্তা এবং কর্তা। কুন্তীনন্দন ! তোমার এই বিজয়লাভ, অতুলনীয় কীর্তি এবং সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব—এসবই ভগবান নারায়ণের আশ্রয় নেওয়ার জন্যই তুমি লাভ করেছ। এই অচিন্ত্যস্বরূপ নারায়ণই তোমার রক্ষক এবং পরম গতি। তুমি স্বয়ং হোতা হয়ে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে স্রুবা (যজ্ঞে আহুতি প্রদানের জন্য হাতা-জাতীয় পাত্র-বিশেষ) করেছ এবং তাঁর দ্বারাই সমরাগ্নির লেলিহান শিখাতে সমস্ত রাজাদের আহুতি দিয়েছ। আজ দুর্যোধন তার পুত্র, ভাই এবং আত্মীয়সহ শোকমগ্ন হয়েছে ; কারণ ওই মূর্খ ক্রোধের বশে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল। বহু বিশাল দেহ মহাবলী দৈত্য ও দানব দাবানলে দগ্ধ হওয়া পতঙ্গের মতো শ্রীকৃষ্ণের চক্রে মৃত্যুবরণ করেছে। সত্ত্ব (ধৈর্য) শক্তি এবং বলে স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল মানুষ যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হতে সক্ষম নয়। অর্জুনও যোগশক্তিসম্পন্ন এবং যুগান্তকালের অগ্নির মতো তেজস্বী। তিনি বামহস্তেও অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারেন এবং রণাঙ্গনে সর্বাগ্রে অবস্থান করেন। নিজ তেজে তিনি দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য সংহার করেছেন, সুতরাং তোমার আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য শোক করা উচিত নয়।

পুত্র ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমি যেমন শুনেছি, তোমাকে জানালাম। তাঁর মহিমা বোঝার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট, সজ্জনদের নিকট দিগ্‌দর্শনই যথেষ্ট। আমি ব্যাসদেব এবং বুদ্ধিমান দেবর্ষি নারদের কথা শুনে পরম পূজ্য শ্রীকৃষ্ণ এবং মহর্ষিদের মহা প্রভাব জানালাম, সেই সঙ্গে শিব-পার্বতীর বার্তালাপও বর্ণনা করলাম। যে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রভাব শুনবেন এবং স্মরণে রাখবেন, তাঁর পরম কল্যাণ লাভ হবে। সুতরাং যার কল্যাণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার জনার্দনের শরণ গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মণেরাও সেই অক্ষয় পরমাত্মার স্তুতি করেন। রাজন্‌ তুমি সর্বদা ধর্মসহকারে প্রজাপালন করতে থাকো। প্রজা-রক্ষার্থে যে উচিত দণ্ডপ্রদান করা হয়, তাকেই ধর্ম বলা হয়। ভগবান শংকরের সঙ্গে পার্বতীর যে ধর্মবিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল, তা আমি এই সৎপুরুষদের সম্মুখে তোমাকে শোনালাম। যারা নিজেদের কল্যাণ চায় সেই ব্যক্তিদের এই আলোচনা শুনে অথবা শোনার আগ্রহ রেখে বিশুদ্ধভাবে ভগবান শংকরের পূজা করা উচিত। দেবর্ষি নারদই তাঁর পূজা করা সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন, সুতরাং তুমি তেমনই করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাদেবের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত পূর্বকালে হিমালয় পর্বতের ওপর সংঘটিত হয়েছিল। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন—এঁদের সত্যযুগ প্রভৃতি তিন যুগে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য 'ত্রিযুগ' বলা হয়। দেবর্ষি নারদ ও ব্যাসদেব আমাকে এই দুজনের স্বরূপ জানিয়েছিলেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ অল্প বয়সেই বন্ধুদের রক্ষার জন্য কংসবধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সনাতন পুরাণ-পুরুষ, তাঁর লীলা চরিত্রের কোনো সীমা-সংখ্যা নেই। নরশ্রেষ্ঠ ! তোমার অবশ্যই কল্যাণ হবে ; কারণ জনার্দন তোমার সখা। যদিও দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন পরলোক গমন করেছে, তবুও তার জন্য আমার শোক হচ্ছে ; কারণ তার জন্যই হাতি-ঘোড়াসহ সমস্ত পৃথিবী বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনি—এই চারজনের অপরাধে সমস্ত কৌরবকুল ধ্বংস হল।

বৈশম্পায়ন বললেন—গঙ্গানন্দন ভীষ্মের এইরূপ কথা শুনে মহাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। ভীষ্মের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ রাজাগণও অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মনে মনে হাত জোড় করে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে লাগলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও ভীষ্মের কথা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এইভাবে ভ্রাতাগণসহ ভীষ্মের সব অনুশাসন শুনলেন, যা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, সত্য এবং পরম পবিত্র। তারপর মহান দক্ষিণাকারী গঙ্গানন্দন ভীষ্মের বিশ্রাম নেওয়া সম্পন্ন হলে মহাবুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন।

বিষ্ণুসহস্রনাম

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ ধর্ম ও পাপক্ষয়কারী ধর্মরহস্য শুনে শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—

যুধিষ্ঠির বললেন—সমস্ত জগতে দেবপুরুষ একজনই—তিনি কে ? ইহলোকে একই পরম আশ্রয় স্থান কোনটি ? কাকে সাক্ষাৎ লাভ করলে জীবের অবিদ্যারূপ হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সব সংশয় নাশ হয় এবং সমস্ত কর্ম ক্ষীণ হয় ? কোন দেবতার স্তুতি-গুণকীর্তন করলে এবং কোন দেবতাকে নানাপ্রকার বাহ্য ও আন্তরিকভাবে পূজা করলে মানুষ কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারে ? আপনি সমস্ত ধর্মের মধ্যে পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত কোন ধর্মকে পরম শ্রেষ্ঠ মনে করেন ? কাকে জপ করলে মরণধর্মী জীব জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয় ?

ভীষ্ম বললেন—স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগতের প্রভু, ব্রহ্মাদি দেবতাদের দেব, দেশ-কাল-বস্তু হতে অপরিচ্ছিন্ন, ক্ষর-অক্ষর হতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমকে সহস্র নামের দ্বারা তৎপর হয়ে নিরন্তর গুণকীর্তন করলে মানুষ সব দুঃখ থেকে পার পেয়ে যায় এবং সেই বিনাশরহিত পুরুষকে সবসময় ভক্তি যুক্ত হয়ে পূজা করলে, তাঁর ধ্যান করলে এবং পূর্বোক্ত প্রকারে সহস্র নামের দ্বারা স্তব ও নমস্কার করলে পূজনকারী সব দুঃখ থেকে মুক্তি পায়। সেই জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি ছয় ভাব বিকাররহিত, সর্বব্যাপক, সমস্ত জগতের মহেশ্বর, লোকাধ্যক্ষ দেবতার নিরন্তর স্তুতি করলে মানুষ দুঃখ থেকে পার পায়। জগৎ সৃষ্টিকারী বৃদ্ধিকারী (তাদের মধ্যে নিজ শক্তিদ্বারা প্রবিষ্ট হয়ে), সমস্ত জগতের স্বামী, সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি-স্থান এবং জগতের কারণস্বরূপ পরমেশ্বরের স্তব করলে মানুষ সব দুঃখ থেকে মুক্তি পায়। যখন মানুষ তার হৃদয়কমলে বিরাজমান কমলনয়ন ভগবান বাসুদেবকে ভক্তিপূর্বক গুণকীর্তনরূপ স্তুতিদ্বারা সর্বদা অর্চনা করে—বিধিরূপ সমস্ত ধর্মের মধ্যে আমি সেই ধর্মকেই সব থেকে বড় বলে মানি। যে দেব পরম তেজ, পরম তপ, পরম ব্রহ্ম এবং পরম পরায়ণ, তিনিই সকল প্রাণীর পরম গতি। হে পৃথিবীপতে ! যা পবিত্রকারী তীর্থাদির মধ্যে পরম পবিত্র, মঙ্গলাদির মঙ্গল, দেবতাদের দেবতা এবং প্রাণীদের পিতা, কল্পের আদিতে যা হতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, যুগের ক্ষয় হলে মহাপ্রলয়ে যাতে সব বিলীন হয়ে যায়, সেই লোকপ্রধান, জগতের প্রভু, ভগবান বিষ্ণুর পাপ ও সংসারভয়দূরকারী সহস্র নাম আমার কাছ থেকে শোনো। যেসব নাম গুণের জন্য প্রচলিত, তাদের মধ্যে যে গুলি প্রসিদ্ধ এবং মন্ত্রদ্রষ্টা মুনিগণ যে সকল নাম সর্বত্র ভগবদ্ আলোচনাতে বর্ণনা করে থাকেন, সেই অচিন্ত্যপ্রভাব মহাত্মার নামসমূহ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য বর্ণনা করছি।

ওঁ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ১) **বিশ্বম্**—সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ, ২) **বিষ্ণুঃ**—সর্বব্যাপী, ৩) **বষট্‌কার**—যাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, ৪) **ভূতভব্যভবৎ প্রভুঃ**—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রভু, ৫) **ভূতকৃৎ**—রজোগুণের আশ্রয়ে ব্রহ্মারূপে সম্পূর্ণ ভূতাদি সৃষ্টিকারী, ৬) **ভূতভৃৎ**—সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে সমস্ত ভূতের পালন-পোষণকারী, ৭) **ভাবঃ**—নিত্যস্বরূপ হয়েও স্বত উৎপন্ন হওয়া, ৮) **ভূতাত্মা**—সমস্ত ভূতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, ৯) **ভূতভাবনঃ**—ভূতাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারী।

১০) **পূতাত্মা**—পবিত্রাত্মা, ১১) **পরমাত্মা**—পরমেশ্রেষ্ঠ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, ১২) **মুক্তানাং পরমা গতিঃ**—মুক্ত পুরুষদের সর্বশ্রেষ্ঠ গতিস্বরূপ, ১৩) **অব্যয়ঃ**—কখনো যাঁর বিনাশ হয় না, ১৪) **পুরুষঃ**—পুর অর্থাৎ শরীরে শয়নকারী, ১৫) **সাক্ষী**—ব্যবধান ছাড়াই সব কিছু যিনি অবলোকন করেন, ১৬) **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—ক্ষেত্র অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিরূপ শরীরকে যিনি পূর্ণত জানেন, ১৭) **অক্ষরঃ**—যা কখনো ক্ষীণ হয় না।

১৮) **যোগঃ**—মনসহ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিরোধরূপে যোগদ্বারা প্রাপ্তকারী, ১৯) **যোগবিদাং নেতা**—যোগ সম্বন্ধে জ্ঞাত ভক্তদের যোগক্ষেম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে সর্বদাই তৎপর, ২০) **প্রধানপুরুষেশ্বরঃ**—প্রকৃতি ও পুরুষের স্বামী, ২১) **নরসিংহবপুঃ**—মানুষ ও সিংহ উভয়ের মতোই শরীর ধারণকারী, নরসিংহরূপ, ২২) **শ্রীমান্**—বক্ষঃস্থলে সর্বদা শ্রীকে (লক্ষ্মীকে) ধারণকারী, ২৩) **কেশবঃ**—(ক) ব্রহ্মা, (অ) বিষ্ণু

এবং (ঈশ) মহাদেব—এই ত্রিমূর্তিস্বরূপ, ২৪) **পুরুষোত্তমঃ**—ক্ষর এবং অক্ষর থেকে সর্বতোভাবে উত্তম।

২৫) **সর্বঃ**—অসৎ ও সৎ—সবকিছুর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান, ২৬) **শর্বঃ**—সমস্ত প্রজাকে প্রলয়কালে সংহারকারী, ২৭) **শিবঃ**—ত্রিগুণের অতীত কল্যাণস্বরূপ, ২৮) **স্থাণুঃ**—স্থির, ২৯) **ভূতাদিঃ**—ভূতগণের আদি কারণ, ৩০) **নিধিরব্যয়ঃ**—প্রলয়কালে সব প্রাণীর লীন হওয়ার অবিনাশী স্থানরূপ, ৩১) **সম্ভবঃ**— স্বেচ্ছায় যথার্থভাবে প্রকটিত ৩২) **ভাবনঃ**—সকল ভোক্তার ফল উৎপন্নকারী, ৩৩) **ভর্তা**—সকলের ভরণকারী, ৩৪) **প্রভবঃ**—উৎকৃষ্ট (দিব্য) জন্মসম্পন্ন, ৩৫) **প্রভুঃ**—সকলের স্বামী, ৩৬) **ঈশ্বরঃ**—উপাধিরহিত ঐশ্বর্যসম্পন্ন।

৩৭) **স্বয়ম্ভূঃ**—স্বয়ং উৎপন্ন হওয়া, ৩৮) **শম্ভুঃ**—ভক্তদের জন্য সুখ উৎপন্নকারী, ৩৯) **আদিত্যঃ**—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য, ৪০) **পুষ্করাক্ষঃ**—কমলের ন্যায় নেত্রসম্পন্ন, ৪১) **মহাস্বনঃ**— বেদরূপ অত্যন্ত মহান ঘোষসম্পন্ন, ৪২) **অনাদিনিধনঃ**—জন্ম-মৃত্যুরহিত, ৪৩) **ধাতা**—বিশ্বের ধারণকারী, (৪৪) **বিধাতা**—কর্ম ও তার ফল সৃষ্টিকারী, ৪৫) **ধাতুরুত্তমঃ**—কার্যকারণরূপ সমস্ত প্রপঞ্চক ধারণকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪৬) **অপ্রমেয়ঃ**—প্রমাণাদির দ্বারা যাঁকে জানা যায় না, ৪৭) **হৃষীকেশঃ**—ইন্দ্রিয়াদির স্বামী, ৪৮) **পদ্মনাভঃ**—জগতের কারণরূপ কমলকে নিজ নাভিতে স্থান প্রদানকারী, ৪৯) **অমরপ্রভুঃ**—দেবতাদের স্বামী, ৫০) **বিশ্বকর্মা**—সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকারী, ৫১) **মনুঃ**—প্রজাপতি মনুরূপ, ৫২) **ত্বষ্টা**—সংহারের সময় সমস্ত প্রজাদের ক্ষীণকারী, ৫৩) **স্থবিষ্ঠঃ**—অত্যন্ত স্থূল, ৫৪) **স্থবিরো ধ্রুবঃ**—অতি প্রাচীন এবং অত্যন্ত স্থিররূপ।

৫৫) **অগ্রাহ্যঃ**—যাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, ৫৬) **শাশ্বতঃ**—সর্বকালে স্থিত, ৫৭) **কৃষ্ণঃ**—সকলের চিত্তকে সবলে নিজের প্রতি আকর্ষণকারী শ্যামসুন্দর সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ৫৮) **লোহিতাক্ষঃ**—লাল নেত্রসম্পন্ন, ৫৯) **প্রতর্দনঃ**—প্রলয়কালে প্রাণীদের সংহারকারী, ৬০) **প্রভূতঃ**—জ্ঞান, ঐশ্বর্য ইত্যাদি গুণসম্পন্ন, ৬১) **ত্রিককুব্ধাম**—ওপর-নীচ ও মধ্যভেদকারী তিন দিকের আশ্রয়স্বরূপ, ৬২) **পবিত্রম্**—সকলকে পবিত্রকারী, ৬৩) **মঙ্গলং পরম্**—পরম মঙ্গল।

৬৪) **ঈশানঃ**—সর্বভূতের নিয়ন্তা, ৬৫) **প্রাণদঃ**—সকলকে প্রাণদানকারী, ৬৬) **প্রাণঃ**—সকলের জীবনের আধার—প্রাণস্বরূপ, ৬৭) **জ্যেষ্ঠঃ**—সকলের কারণ হওয়ায় সবার থেকে বড়, ৬৮) **শ্রেষ্ঠঃ**—সব থেকে উৎকৃষ্ট, ৬৯) **প্রজাপতিঃ**—ঈশ্বররূপে সমস্ত প্রজাদের প্রভু, ৭০) **হিরণ্যগর্ভঃ**—ব্রহ্মাণ্ডরূপ হিরণ্ময় অণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মারূপে ব্যাপ্ত, ৭১) **ভূগর্ভঃ**—পৃথিবীকে গর্ভে ধারণকারী, ৭২) **মাধবঃ**—লক্ষ্মীর পতি, ৭৩) **মধুসূদনঃ**—মধু নামক দৈত্য বধকারী।

৭৪) **ঈশ্বরঃ**—সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ৭৫) **বিক্রমী**—শূরবীরতা দ্বারা যুক্ত, ৭৬) **ধন্বী**—শার্ঙ্গধনুক ধারণকারী, ৭৭) **মেধাবী**—অতিশয় বুদ্ধিমান, ৭৮) **বিক্রমঃ**—গরুড় পক্ষীদ্বারা গমনকারী, ৭৯) **ক্রমঃ**—ক্রম-বিস্তারের কারণ, ৮০) **অনুত্তমঃ**—সর্বোৎকৃষ্ট, ৮১) **দুরাধর্ষঃ**—যিনি কখনো কারো দ্বারা তিরস্কৃত হন না, ৮২) **কৃতজ্ঞঃ**—নিজের নিমিত্তে সামান্য ত্যাগ করলেও তাকে অনেক বলে মনে করা অর্থাৎ পত্র-পুষ্প ইত্যাদি অল্প বস্তু সমর্পণকারীকেও মোক্ষপ্রদানকারী, ৮৩) **কৃতিঃ**—পুরুষ-প্রযত্নের আধাররূপ, ৮৪) **আত্মবান্**—নিজ মহিমাতেই স্থিত।

৮৫) **সুরেশঃ**— দেবতাদের স্বামী, ৮৬) **শরণম্**—দীন-দুঃখীদের পরম আশ্রয়, ৮৭) **শর্ম**—পরমানন্দস্বরূপ, ৮৮) **বিশ্বরেতাঃ**—বিশ্বের কারণ, ৮৯) **প্রজাভবঃ**—সমস্ত প্রজার উৎপন্নকারী, ৯০) **অহঃ**—প্রকাশরূপ, ৯১) **সংবৎসরঃ**—কালস্বরূপে স্থিত, ৯২) **ব্যালঃ**—সর্পের ন্যায় যাকে কুক্ষিগত করা সম্ভব নয়, ৯৩) **প্রত্যয়ঃ**—উত্তম বুদ্ধিদ্বারা যাকে জানা যায়, ৯৪) **সর্বদর্শনঃ**—সবকিছুর দ্রষ্টা।

৯৫) **অজঃ**—জন্মরহিত, ৯৬) **সর্বেশ্বরঃ**—সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, ৯৭) **সিদ্ধঃ**—নিত্য সিদ্ধ, ৯৮) **সিদ্ধিঃ**—সকলের ফলস্বরূপ, ৯৯) **সর্বাদিঃ**—সকল ভূতের আদি কারণ, ১০০) **অচ্যুতঃ**—নিজ স্বরূপ-স্থিতি থেকে কখনো যিনি ত্রিকালে চ্যুত হন না, ১০১) **বৃষাকপিঃ**—ধর্ম এবং বরাহরূপ, ১০২) **অমেয়াত্মা**—অপ্রমেয় স্বরূপ, ১০৩) **সর্বযোগবিনিঃসৃতঃ**—নানাপ্রকার শাস্ত্রোক্ত

সাধনার দ্বারা যাঁকে জানা যায়।

১০৪) **বসুঃ**—সমস্ত ভূতের বাসস্থান এবং সর্ব ভূতে আশ্রয়কারী, ১০৫) **বসুমনাঃ**—উদার মনবিশিষ্ট, ১০৬) **সত্যঃ**—সত্যস্বরূপ, ১০৭) **সমাত্মা**—সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে এক আত্মারূপে বিরাজকারী, ১০৮) **অসম্মিতঃ**—সমস্ত পদার্থ দ্বারাও যাকে মাপা যায় না, ১০৯) **সমঃ**—সবসময় সর্ববিকাররহিত, ১১০) **অমোঘঃ**—ভক্তদের পূজা, স্তব এবং স্মরণ করাকে বৃথা না করে পূর্ণরূপে তার ফলপ্রদানকারী, ১১১) **পুণ্ডরীকাক্ষঃ**—কমলের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট, ১১২) **বৃষকর্মা**—যিনি ধর্মময় কর্ম করেন, ১১৩) **বৃষাকৃতিঃ**—ধর্ম স্থাপনার্থে বিগ্রহ ধারণকারী।

১১৪) **রুদ্রঃ**—দুঃখ বা দুঃখের কারণ দূরকারী, ১১৫) **বহুশিরাঃ**—বহুমস্তকবিশিষ্ট, ১১৬) **বভ্রুঃ**—লোকাদির ভরণকারী, ১১৭) **বিশ্বযোনি**—বিশ্ব উৎপন্নকারী, ১১৮) **শুচিশ্রবাঃ**—পবিত্র কীর্তিবিশিষ্ট, ১১৯) **অমৃতঃ**—যার কখনো মৃত্যু নেই, ১২০) **শাশ্বতস্থাণুঃ**—নিত্য সর্বদা একরসে অবস্থানকারী এবং স্থির, ১২১) **বরারোহঃ**—আরূঢ় হওয়ার জন্য পরম উত্তম অপুনরাবৃত্তি স্থানরূপ, ১২২) **মহাতপাঃ**—প্রতাপ (প্রভাব) রূপ মহাতপস্বী।

১২৩) **সর্বগঃ**—কারণ রূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, ১২৪) **সর্ববিদ্ভানুঃ**—সর্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রকাশরূপ, ১২৫) **বিষ্বক্সেনঃ**—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই দৈত্যসেনাদের ছিন্নভিন্নকারী, ১২৬) **জনার্দনঃ**—ভক্তদের অভ্যুদয় অর্থাৎ নিঃশ্রেয়সরূপ পরম পুরুষার্থের আকাঙ্ক্ষাকারী, ১২৭) **বেদঃ**—বেদরূপ, ১২৮) **বেদবিৎ**—বেদ এবং বেদের অর্থের যথার্থ জ্ঞাতা, ১২৯) **অব্যঙ্গঃ**—জ্ঞানাদি পরিপূর্ণ অর্থাৎ অপূর্ণ জ্ঞান নয়—সর্বাঙ্গপূর্ণ জ্ঞানরূপ, ১৩০) **বেদাঙ্গ**—বেদরূপ অঙ্গবিশিষ্ট, ১৩১) **বেদবিৎ**—বেদাদি বিচারকারী, ১৩২) **কবিঃ**—সর্বজ্ঞ।

১৩৩) **লোকাধ্যক্ষঃ**—সমস্ত লোকের (জগতের) অধিপতি, ১৩৪) **সুরাধ্যক্ষঃ**—দেবতাদের অধ্যক্ষ, ১৩৫) **ধর্মাধ্যক্ষঃ**—অনুরূপ ফল প্রদানের জন্য ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয়কারী, ১৩৬) **কৃতাকৃতঃ**—কার্যরূপে কৃত এবং কারণরূপে অকৃত, ১৩৭) **চতুরাত্মা**—সৃষ্টির উৎপত্তি ইত্যাদির জন্য চারটি পৃথক মূর্তিবিশিষ্ট, ১৩৮) **চতুর্ব্যূহঃ**—উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ এবং রক্ষারূপ চার ব্যূহবিশিষ্ট, ১৩৯) **চতুর্ভুজঃ**—চার বাহুবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান বিষ্ণু।

১৪১) **ভ্রাজিষ্ণুঃ**—একরস, প্রকাশস্বরূপ, ১৪২) **ভোজনম্**—জ্ঞানিগণ কর্তৃক উপভোগের যোগ্য অমৃত-স্বরূপ, ১৪৩) **ভোক্তা**—পুরুষরূপে ভোক্তা, ১৪৪) **সহিষ্ণুঃ**—সহনশীল, ১৪৫) **জগদাদিজঃ**—জগতের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে স্বয়ং উৎপন্ন, ১৪৬) **অনঘঃ**—পাপরহিত, ১৪৭) **বিজয়ঃ**—জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যাদি গুণে সবথেকে শ্রেষ্ঠ, ১৪৮) **জেতা**—স্বভাবদ্বারাই সমস্ত প্রাণীকে জয় করেন যিনি, ১৪৯) **বিশ্বযোনিঃ**—বিশ্বের কারণ, ১৫০) **পুনর্বসুঃ**—পুনঃ পুনঃ যিনি আত্মরূপে দেহে স্থিত হন, ১৫১) **উপেন্দ্রঃ**—ইন্দ্রের অনুজরূপে যাঁকে প্রাপ্ত করা যায়, ১৫২) **বামনঃ**—বামনরূপে অবতার গ্রহণকারী, ১৫৩) **প্রাংশুঃ**—ত্রিলোকে পদ ব্যাপ্তির উদ্দেশ্যে ত্রিবিক্রমরূপে বর্ধিত স্বরূপ, ১৫৪) **অমোঘঃ**—অব্যর্থ চেষ্টা সম্পন্ন, ১৫৫) **শুচিঃ**—স্মরণ, স্তুতি এবং পূজাকারীদের পবিত্র করেন যিনি, ১৫৬) **ঊর্জিতঃ**—অত্যন্ত বলশালী, ১৫৭) **অতীন্দ্রঃ**—স্বয়ং সিদ্ধ জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের কারণে ইন্দ্রের থেকেও শ্রেষ্ঠ, ১৫৮) **সংগ্রহঃ**—প্রলয়কালে সকলকে যিনি গুটিয়ে নেন, ১৫৯) **সর্গঃ**—সৃষ্টির কারণরূপ, ১৬০) **ধৃতাত্মা**—জন্মাদি রহিত হয়ে স্বেচ্ছায় স্বরূপ ধারণকারী, ১৬১) **নিয়মঃ**—প্রজাদের স্ব অধিকার পালনের মাধ্যমে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, ১৬২) **যমঃ**—অন্তরে অবস্থান করে নিয়ন্ত্রণকারী।

১৬৩) **বেদ্যঃ**—কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাকারীদের জানার যোগ্য, ১৬৪) **বৈদ্যঃ**—সর্ববিদ্যা বিশারদ, ১৬৫) **সদাযোগী**—সদা যোগে যিনি স্থিত, ১৬৬) **বীরহা**—ধর্ম রক্ষার জন্য অসুর যোদ্ধাদের নিধনকারী, ১৬৭) **মাধবঃ**—বিদ্যার প্রভু, ১৬৮) **মধুঃ**—অমৃতের ন্যায় সকলকে প্রসন্ন করেন যিনি, ১৬৯) **অতীন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয় থেকে সর্বতোভাবে অতীত, ১৭০) **মহামায়ঃ**—মায়াবিদের ওপরও যিনি মায়া বিস্তার করেন, মহামায়াবী, ১৭১) **মহোৎসাহঃ**—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য তৎপর, পরম উৎসাহী, ১৭২) **মহাবলঃ**—মহাবলশালী।

১৭৩) **মহাবুদ্ধিঃ**—মহাবুদ্ধিমান, ১৭৪) **মহাবীর্যঃ**—

মহাপরাক্রমশালী, ১৭৫) **মহাশক্তিঃ**—মহাসামর্থ্যশালী, ১৭৬) **মহাদ্যুতিঃ**—মহা কান্তিমান, ১৭৭) **অনির্দেশ্য বপুঃ**—অনির্দেশ্য বিগ্রহসম্পন্ন, ১৭৮) **শ্রীমান্**—ঐশ্বর্যশালী, ১৭৯) **অমেয়াত্মা**—যাকে অনুমান করা যায় না সেইরূপ আত্মাসম্পন্ন, ১৮০) **মহাদ্রিধৃক্**—অমৃত মন্থন ও গোরক্ষার সময় মন্দরাচল এবং গোবর্ধন নামক মহাপর্বতধারণকারী।

১৮১) **মহেষ্বাসঃ**—মহাধনুকধারী, ১৮২) **মহীভর্তা**—পৃথিবী ধারণকারী, ১৮৩) **শ্রীনিবাসঃ**—নিজ বক্ষঃস্থলে শ্রীকে (লক্ষ্মীদেবীকে) আশ্রয়কারী, ১৮৪) **সতাং গতিঃ**—সৎ ব্যক্তিদের আশ্রয়রূপ, ১৮৫) **অনিরুদ্ধঃ**—শুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত কারো দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হওয়া, ১৮৬) **সুরানন্দঃ**—দেবতাদের আনন্দবর্ধনকারী, ১৮৭) **গোবিন্দঃ**—বেদবাণীর দ্বারা যাঁকে লাভ করা যায়, ১৮৮) **গোবিদাং পতি**—বেদবাণীর বিজ্ঞগণের স্বামী।

১৮৯) **মরীচিঃ**—তেজস্বীদেরও পরম তেজরূপ, ১৯০) **দমনঃ**—প্রমাদকারী প্রজাদের যমাদিরূপে দমনকারী, ১৯১) **হংসঃ**—পিতামহ ব্রহ্মাকে বেদের জ্ঞান করাবার জন্য হংসরূপ ধারণকারী, ১৯২) **সুপর্ণঃ**—সুন্দর পাখাবিশিষ্ট গরুড়স্বরূপ, ১৯৩) **ভুজগোত্তমঃ**—সর্পাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শেষনাগরূপ, ১৯৪) **হিরণ্যনাভঃ**—হিতকারী এবং রমণীয় নাভিসম্পন্ন, ১৯৫) **সুতপাঃ**—বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণরূপে সুন্দরভাবে তপকারী, ১৯৬) **পদ্মনাভঃ**—কমলের ন্যায় সুন্দর নাভিবিশিষ্ট, ১৯৭) **প্রজাপতিঃ**—সমস্ত প্রজাদের স্বামী।

১৯৮) **অমৃত্যুঃ**—মৃত্যুরহিত, ১৯৯) **সর্বদৃক্**—সর্বদ্রষ্টা, ২০০) **সিংহঃ**—দুষ্টের বিনাশকারী, ২০১) **সংধাতা**—পুরুষদের তাদের ফলের সঙ্গে সংযুক্তকারী, ২০২) **সন্ধিমান্**—সমস্ত যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা, ২০৩) **স্থিরঃ**—সর্বদা একরূপ, ২০৪) **অজঃ**—ভক্তের হৃদয়ে বাসকারী এবং দুর্গুণ দূরকারী, ২০৫) **দুর্মর্ষণঃ**—যাঁর তেজ কেউ সহ্য করতে পারে না, ২০৬) **শাস্তা**—সকলের ওপর শাসনকারী, ২০৭) **বিশ্রুতাত্মা**—বেদশাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ স্বরূপবিশিষ্ট, ২০৮) **সুরারিহা**—দেবতাদের শত্রুবধকারী।

২০৯) **গুরুঃ**—সর্ববিদ্যা উপদেশকারী, ২১০) **গুরুতমঃ**—ব্রহ্মাদিকেও ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদানকারী, ২১১) **ধাম**—সমস্ত প্রাণীর কামনার আশ্রয়, ২১২) **সত্যঃ**—সত্যস্বরূপ, ২১৩) **সত্যপরাক্রমঃ**—অমোঘ পরাক্রমশালী, ২১৪) **নিমিষঃ**—যোগনিদ্রায় মুদ্রিত নেত্র, ২১৫) **অনিমিষঃ**—মৎস্যরূপে অবতার গ্রহণকারী, ২১৬) **স্রগ্বী**—বুদ্ধিযুক্ত সমস্ত বিদ্যার পতি।

২১৮) **অগ্রণীঃ**—মুমুক্ষুদের উত্তম পদে উন্নীতকারী, ২১৯) **গ্রামণীঃ**—ভূত সমুদায়ের নেতা, ২২০) **শ্রীমান্**—সর্বশ্রেষ্ঠ কান্তিমান, ২২১) **ন্যায়ঃ**—প্রমাণাদির আশ্রয়ভূত তর্কের মূর্তি, ২২২) **নেতা**—জগৎরূপ যন্ত্রচালনাকারী, ২২৩) **সমীরণঃ**—শ্বাসরূপে প্রাণীদের যিনি চালিত করেন, ২২৪) **সহস্রমূর্ধা**—হাজার মস্তকসংবলিত, ২২৫) **বিশ্বাত্মা**—বিশ্বের আত্মা, ২২৬) **সহস্রাক্ষঃ**—হাজার চক্ষুবিশিষ্ট, ২২৭) **সহস্রপাৎ**—হাজার পা সংবলিত।

২২৮) **আবর্তনঃ**—সংসারচক্র চালানোর স্বভাব-সম্পন্ন, ২২৯) **নিবৃত্তাত্মা**—সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত আত্মস্বরূপ, ২৩০) **সংবৃতঃ**—নিজ যোগমায়াদ্বারা আবৃত, ২৩১) **সম্প্রমর্দনঃ**—নিজ রুদ্রাদি স্বরূপ দ্বারা সকলের মর্দনকারী, ২৩২) **অহঃ সংবর্তকঃ**—সূর্যরূপে সম্যকরূপে দিনের প্রবর্তক, ২৩৩) **বহ্নিঃ**—হবি বহনকারী অগ্নিদেব, ২৩৪) **অনিলঃ**—প্রাণরূপে বায়ুস্বরূপ, ২৩৫) **ধরণীধরঃ**—বরাহ ও শেষনাগরূপে পৃথিবী ধারণকারী।

২৩৬) **সুপ্রসাদঃ**—শিশুপাল প্রমুখ অপরাধীদের ওপরও কৃপাকারী, ২৩৭) **প্রসন্নাত্মা**—প্রসন্ন স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ করুণাকারী, ২৩৮) **বিশ্বধৃক্**—জগৎ ধারণকারী, ২৩৯) **বিশ্বভুক্**—বিশ্ব ভোগকারী অর্থাৎ বিশ্বপালনকারী, ২৪০) **বিভুঃ**—সর্বব্যাপক, ২৪১) **সৎকর্তা**—ভক্তদের সৎকারকারী, ২৪২) **সৎকৃতঃ**—পূজিতের দ্বারাও পূজিত, ২৪৩) **সাধুঃ**—ভক্তদের কার্যসাধনকারী, ২৪৪) **জহ্নুঃ**—সংহারের সময় জীবেদের লয়কারী, ২৪৫) **নারায়ণঃ**—জলে শয়নকারী, ২৪৬) **নরঃ**—ভক্তদের যিনি পরমধামে নিয়ে যান।

২৪৭) **অসংখ্যেয়ঃ**—নাম ও গুণাদি সংখ্যা হতে শূন্য, ২৪৮) **অপ্রমেয়াত্মা**—কোনো কিছু দ্বারাই যাঁকে মাপা যায় না, ২৪৯) **বিশিষ্টঃ**—সর্বোৎকৃষ্ট, ২৫০) **শিষ্টকৃৎ**—শাসনকারী, ২৫১) **শুচিঃ**—পরম শুদ্ধ,

২৫২) **সিদ্ধার্থঃ**—ইপ্সিত অর্থ সর্বভাবে হস্তগতকারী, ২৫৩) **সিদ্ধসংকল্পঃ**—সত্য সংকল্পবিশিষ্ট, ২৫৪) **সিদ্ধিদঃ**—যারা কর্ম করে, তাদের অধিকার অনুসারে ফলপ্রদানকারী, ২৫৫) **সিদ্ধিসাধনঃ**—সিদ্ধিরূপ ক্রিয়ার সাধক।

২৫৬) **বৃষাহী**—দ্বাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞ নিজের মধ্যে স্থিত রাখেন যিনি, ২৫৭) **বৃষভঃ**—ভক্তদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বর্ষণকারী, ২৫৮) **বিষ্ণুঃ**—শুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি, ২৫৯) **বৃষপর্বা**—পরম ধামে আরূঢ় হওয়ার ইচ্ছাসম্পন্নদের জন্য ধর্মরূপ সোপান, ২৬০) **বৃষোদরঃ**—নিজ উদরে ধর্ম ধারণকারী, ২৬১) **বর্ধনঃ**—ভক্তদের বৃদ্ধিকারী, ২৬২) **বর্ধমানঃ**—সংসাররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্তকারী, ২৬৩) **বিবিক্তঃ**—সংসার থেকে পৃথকরূপে অবস্থানকারী, ২৬৪) **শ্রুতিসাগরঃ**—বেদরূপ নীর সমুদ্র।

২৬৫) **সুভুজঃ**—জগৎ রক্ষাকারী অতি সুন্দর বাহু-বিশিষ্ট, ২৬৬) **দুর্ধরঃ**—অন্যের দ্বারা ধারণ করা অসম্ভব যে পৃথিবী সেই লোক ধারক পদার্থ ধারণকারী এবং যাঁকে কেউ ধারণ করতে পারে না, ২৬৭) **বাগ্মী**—বেদময় বাণী সৃষ্টিকারী, ২৬৮) **মহেন্দ্রঃ**—ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, ২৬৯) **বসুদঃ**—ধন প্রদানকারী, ২৭০) **বসুঃ**—ধনরূপ, ২৭১) **নৈকরূপঃ**—অনেক রূপধারী, ২৭২) **বৃহদ্রূপঃ**—বিশ্বরূপধারী, ২৭৩) **শিপিবিষ্টঃ**—সূর্যকিরণে অবস্থিত, ২৭৪) **প্রকাশনঃ**—সর্বকিছুর প্রকাশক।

২৭৫) **ওজস্তেজোদ্যুতিধরঃ**—প্রাণ, বল, শৌর্য, ইত্যাদি গুণ এবং জ্ঞানের দীপ্তি ধারণকারী, ২৭৬) **প্রকাশাত্মা**—প্রকাশরূপ বিগ্রহ, ২৭৭) **প্রতাপনঃ**—সূর্য ইত্যাদি নিজ বিভূতিদ্বারা বিশ্বকে তাপিতকারী, ২৭৮) **ঋদ্ধঃ**—ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্পন্ন, ২৭৯) **স্পষ্টাক্ষরঃ**—ওঁ-কাররূপ স্পষ্ট অক্ষরবিশিষ্ট, ২৮০) **মন্ত্রঃ**—ঋক্, সাম ও যজুরূপ মন্ত্রদ্বারা জানার যোগ্য, ২৮১) **চন্দ্রাংশুঃ**—সংসার তাপ থেকে সন্তপ্ত-চিত্ত পুরুষদের চন্দ্র-কিরণের ন্যায় আহ্লাদিতকারী, ২৮২) **ভাস্করদ্যুতিঃ**—সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ॥

২৮৩) **অমৃতাংশুদ্ভবঃ**—সমুদ্র মন্থনের সময় চন্দ্র উৎপন্নকারী সমুদ্ররূপ, ২৮৪) **ভানুঃ**—যে ভেসে থাকে, ২৮৫) **শশবিন্দুঃ**—খরগোশের ন্যায় চিহ্নযুক্ত চন্দ্রের মতো সমস্ত প্রজাপোষণকারী, ২৮৬) **সুরেশ্বরঃ**—দেবতাদের ঈশ্বর, ২৮৭) **ঔষধম্**—সংসার-সাগর অতিক্রম রূপ ঔষধ, ২৮৮) **জগতঃ সেতুঃ**—সংসারসাগর পার করার সেতুরূপ, ২৮৯) **সত্যধর্মপরাক্রমঃ**—সত্যস্বরূপ ধর্ম ও পরাক্রমসম্পন্ন।

২৯০) **ভূতভব্যভবন্নাথঃ**—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব প্রাণীর স্বামী, ২৯১) **পবনঃ**—বায়ুরূপ, ২৯২) **পাবনঃ**—দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্রই জগৎ পবিত্রকারী, ২৯৩) **অনলঃ**—অগ্নিস্বরূপ, ২৯৪) **কামহা**—নিজ ভক্তদের সকামভাব নাশকারী, ২৯৫) **কামকৃৎ**—ভক্তদের কামনাপূরণকারী, ২৯৬) **কান্তঃ**—কমনীয়রূপ, ২৯৭) **কামঃ**—(ক) ব্রহ্মা, (অ) বিষ্ণু, (ম) মহাদেব—এই ত্রিদেবরূপ, ২৯৮) **কামপ্রদঃ**—ভক্তদের কাম্য বস্তু প্রদানকারী, ২৯৯) **প্রভুঃ**—সর্বোৎকৃষ্ট সর্বসামর্থ্যবান স্বামী।

৩০০) **যুগাদিকৃৎ**—যুগাদি আরম্ভকারী, ৩০১) **যুগাবর্তঃ**—চার যুগকে চক্রের ন্যায় ঘূর্ণনকারী, ৩০২) **নৈকমায়ঃ**—বহু মায়াধারণকারী, ৩০৩) **মহাশনঃ**—কল্পের শেষে সকলকে গ্রাসকারী, ৩০৪) **অদৃশ্যঃ**—সর্ব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, ৩০৫) **ব্যক্তরূপঃ**—স্থূলরূপে ব্যক্ত স্বরূপবিশিষ্ট, ৩০৬) **সহস্রজিৎ**—যুদ্ধে হাজার হাজার দেবশত্রু নিধনকারী, ৩০৭) **অনন্তজিৎ**—যুদ্ধ ও ক্রীড়া ইত্যাদিতে সর্বত্র সমস্ত প্রাণীকে পরাস্তকারী॥

৩০৮) **ইষ্টঃ**—পরমানন্দরূপ হওয়ায় সর্বপ্রিয় ৩০৯) **অবিশিষ্টঃ**—সমস্ত বিশেষণ রহিত সর্বশ্রেষ্ঠ, ৩১০) **শিষ্টেষ্টঃ**—শিষ্ট পুরুষদের ইষ্টদেব, ৩১১) **শিখণ্ডী**—ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা শিরোভূষণধারী, ৩১২) **নহুষঃ**—প্রাণীদের মায়ায় বন্ধনকারী, ৩১৩) **বৃষঃ**—কামনা-পূর্ণকারী ৩১৪) **ক্রোধহা**—ক্রোধনাশকারী, ৩১৫) **ক্রোধকৃৎকর্তা**—দুষ্টের ওপর ক্রোধকারী এবং জগৎকে তার কর্ম অনুসারে সৃষ্টিকারী, ৩১৬) **বিশ্ববাহুঃ**—সর্ব দিকে বাহু সংবলিত, ৩১৭) **মহীধরঃ**—পৃথিবী ধারণকারী।

৩১৮) **অচ্যুতঃ**—ছয় ভাববিকাররহিত, ৩১৯) **প্রথিতঃ**—জগৎ উৎপত্তি আদি কর্মের কারণ, ৩২০) **প্রাণঃ**—হিরণ্যগর্ভরূপে প্রজাদের জীবন রক্ষণকারী, ৩২১) **প্রাণদঃ**—সকলকে প্রাণদানকারী, ৩২২) **বাসবানুজঃ**—বামনাবতারে কাশ্যপ ও অদিতির দ্বারা ইন্দ্রের অনুজরূপে জাত, ৩২৩) **অপাংনিধিঃ**—জলকে

একত্রিত করে রাখা সমুদ্ররূপ, ৩২৪) **অধিষ্ঠানম্**—উপাদান-কারণরূপে সর্বভূতের আশ্রয়, ৩২৫) **অপ্রমত্তঃ**—অধিকারীদের তাদের কর্মানুসারে ফল প্রদান করতে যিনি কখনো ভুল করেন না, ৩২৬) **প্রতিষ্ঠিতঃ**—নিজ মহিমায় অধিষ্ঠিত।

৩২৭) **স্কন্দঃ**—স্বামী কার্তিকেয়রূপ, ৩২৮) **স্কন্দধরঃ**—ধর্মপথধারণকারী, ৩২৯) **ধুর্যঃ**—সমস্ত প্রাণীর জন্মাদিরূপ ধুর (অক্ষদণ্ড) ধারণকারী, ৩৩০) **বরদঃ**—আকাঙ্ক্ষিত বরপ্রদানকারী, ৩৩১) **বায়ুবাহনঃ**—সমস্ত বায়ু চালনাকারী, ৩৩২) **বাসুদেবঃ**—সমস্ত প্রাণীকে নিজের মধ্যে অবস্থিতকারী এবং সর্বভূতে সর্বাত্মারূপে অবস্থানকারী, দিব্যস্বরূপ, ৩৩৩) **বৃহদ্ভানুঃ**—মহাকিরণ যুক্ত এবং সম্পূর্ণ জগৎ প্রকাশকারী, ৩৩৪) **আদিদেবঃ**—সকলের আদি কারণ দেব, ৩৩৫) **পুরন্দরঃ**—অসুরদের নগর ধ্বংসকারী।

৩৩৬) **অশোকঃ**—সর্বপ্রকার শোকরহিত, ৩৩৭) **তারণঃ**—সংসার-সাগর থেকে ত্রাণকারী, ৩৩৮) **তারঃ**—জন্ম-জরা-মৃত্যুরূপ ভয় থেকে রক্ষাকারী, ৩৩৯) **শূরঃ**—পরাক্রমী, ৩৪০) **শৌরিঃ**—শূরবীর শ্রীবসুদেবের পুত্র, ৩৪১) **জনেশ্বরঃ**—সমস্ত জীবের স্বামী, ৩৪২) **অনুকূলঃ**—আত্মারূপ হওয়ায় সকলের অনুকূল, ৩৪৩) **শতাবর্তঃ**—ধর্মরক্ষার জন্য শত শত অবতার গ্রহণকারী, ৩৪৪) **পদ্মী**—নিজ হাতে কমল ধারণকারী, ৩৪৫) **পদ্মনিভেক্ষণঃ**—কমলের ন্যায় কোমলদৃষ্টিবিশিষ্ট।

৩৪৬) **পদ্মনাভ**—নিজ নাভিতে কমল ধারণ করেন যিনি, ৩৪৭) **অরবিন্দাক্ষঃ**—কমলের ন্যায় চক্ষু যার, ৩৪৮) **পদ্মগর্ভঃ**—হৃদয় কমলে ধ্যান করার যোগ্য, ৩৪৯) **শরীরভৃৎ**—অন্নরূপে সকলের শরীর ভরণকারী, ৩৫০) **মহর্দ্ধিঃ**—মহাবিভূতিসম্পন্ন, ৩৫১) **ঋদ্ধঃ**—সর্ব শ্রেষ্ঠ, ৩৫২) **বৃদ্ধাত্মা**—প্রাচীন আত্মবান, ৩৫৩) **মহাক্ষঃ**—বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট, ৩৫৪) **গরুড়ধ্বজঃ**—গরুড় চিহ্নসম্পন্ন ধ্বজাযুক্ত।

৩৫৫) **অতুলঃ**—তুলনারহিত, ৩৫৬) **শরভঃ**—শরীরকে প্রত্যগাত্মরূপে প্রকাশিতকারী, ৩৫৭) **ভীমঃ**—পাপীরা যাকে ভয় পায় তেমন ভয়ংকর, ৩৫৮) **সমযজ্ঞঃ**—সমভাবরূপ যজ্ঞদ্বারা প্রাপ্তব্য, ৩৫৯) **হবির্হরিঃ**—যজ্ঞাদিতে হবির্ভাগকে এবং নিজের স্মরণকারীদের পাপহরণকারী, ৩৬০) **সর্বলক্ষণ-লক্ষণ্যঃ**—সমস্ত লক্ষণ দ্বারা পরিলক্ষিত হওয়া, ৩৬১) **লক্ষ্মীবান্**—লক্ষ্মীদেবীকে সর্বদা নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণকারী, ৩৬২) **সমিতিঞ্জয়ঃ**—সংগ্রামবিজয়ী।

৩৬৩) **বিক্ষরঃ**—নাশরহিত, ৩৬৪) **রোহিতঃ**—মৎস্যের স্বরূপ নিয়ে অবতার ধারণকারী, ৩৬৫) **মার্গঃ**—পরমানন্দপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ, ৩৬৬) **হেতুঃ**—সংসারের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, ৩৬৭) **দামোদরঃ**—যশোদাদেবী কর্তৃক দড়ি দিয়ে বাঁধা উদরসম্পন্ন, ৩৬৮) **সহঃ**—ভক্তদের অপরাধ সহনকারী, ৩৬৯) **মহীধরঃ**—পর্বতরূপে পৃথিবীকে ধারণকারী, ৩৭০) **মহাভাগঃ**—মহাভাগ্যশালী, ৩৭১) **বেগবান্**—তীব্র গতিসম্পন্ন, ৩৭২) **অমিতাশনঃ**—সমস্ত বিশ্বগ্রাসকারী।

৩৭৩) **উদ্ভবঃ**—জগৎ উৎপত্তির উপাদানকারণ, ৩৭৪) **ক্ষোভণঃ**—জগৎ উৎপত্তির সময় প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের ক্ষুব্ধ করে তোলেন যিনি, ৩৭৫) **দেবঃ**—প্রকাশস্বরূপ, ৩৭৬) **শ্রীগর্ভঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্য নিজ উদরগর্ভে রক্ষাকারী, ৩৭৭) **পরমেশ্বরঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকারী, ৩৭৮) **করণম্**—জগৎ উৎপত্তির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাধন, ৩৭৯) **কারণম্**—জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ, ৩৮০) **কর্তা**—সর্বপ্রকারে স্বতন্ত্র, ৩৮১) **বিকর্তা**—বিচিত্র ভুবন সৃষ্টিকারী, ৩৮২) **গহনঃ**—নিজ বিশেষ স্বরূপ, সামর্থ্য এবং লীলার জন্য চিনতে অপারগ, ৩৮৩) **গুহঃ**—মায়াদ্বারা নিজ স্বরূপ আবৃতকারী।

৩৮৪) **ব্যবসায়ঃ**—জ্ঞানমাত্র স্বরূপ, ৩৮৫) **ব্যবস্থানঃ**—লোকপালদের, সমস্ত জীবদের, চার বর্ণাশ্রম এবং তার ধর্মসমূহ ব্যবস্থাপূর্বক সৃষ্টিকারী, ৩৮৬) **সংস্থানঃ**—প্রলয়ের সম্যক স্থান, ৩৮৭) **স্থানদঃ**—ধ্রুব এবং অন্যান্য ভক্তদের স্থান প্রদানকারী, ৩৮৮) **ধ্রুবঃ**—অবিনাশী, ৩৮৯) **পরর্দ্ধিঃ**—শ্রেষ্ঠ বিভূতিসম্পন্ন, ৩৯০) **পরমস্পষ্টঃ**—জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় পরম স্পষ্টরূপ, অবতার-বিগ্রহে সকলের সামনে প্রত্যক্ষরূপে যিনি প্রকটিত হন, ৩৯১) **তুষ্টঃ**—একমাত্র পরমানন্দস্বরূপ, ৩৯২) **পুষ্টঃ**—সর্বত্র পরিপূর্ণ, ৩৯৩) **শুভেক্ষণঃ**—দর্শনমাত্রেই কল্যাণ করেন যিনি।

৩৯৪) **রামঃ**—যোগীদের রমণ করার জন্য নিত্যানন্দ স্বরূপ, ৩৯৫) **বিরামঃ**—প্রলয়ের সময় প্রাণীদের

নিজেদের মধ্যে বিশ্রাম প্রদানকারী, ৩৯৬) **বিরতঃ**—রজোগুণ এবং তমোগুণ থেকে সর্বভাবে রহিত, ৩৯৭) **মার্গঃ**—মুমুক্ষুদের অমর হওয়ার সাধনস্বরূপ, ৩৯৮) **নেয়ঃ**—উত্তম জ্ঞানের দ্বারা গ্রহণ করার যোগ্য, ৩৯৯) **নয়ঃ**—সকলকে নিয়মে যিনি রাখেন, ৪০০) **অনয়ঃ**—স্বতন্ত্র, স্বাধীন, ৪০১) **বীরঃ**—পরাক্রমশালী, ৪০২) **শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠঃ**—শক্তিমানদের থেকেও শক্তিমান, ৪০৩) **ধর্মঃ**—শ্রুতি-স্মৃতিরূপ ধর্ম, ৪০৪) **ধর্মবিদুত্তমঃ**—সমস্ত ধর্মবেত্তাদের মধ্যে উত্তম।

৪০৫) **বৈকুণ্ঠঃ**—পরমধাম স্বরূপ, ৪০৬) **পুরুষঃ**—বিশ্বরূপ শরীরে শয়নকারী, ৪০৭) **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ুরূপে কার্য করেন যিনি, ৪০৮) **প্রাণদঃ**—সর্গের আদিতে প্রাণ প্রদানকারী, ৪০৯) **প্রণবঃ**—ওঁ-কার স্বরূপ, ৪১০) **পৃথুঃ**—বিরাটরূপে যিনি বিস্তৃত, ৪১১) **হিরণ্যগর্ভঃ**—ব্রহ্মারূপে যিনি প্রকটিত, ৪১২) **শত্রুঘ্নঃ**—শত্রু বধকারী, ৪১৩) **ব্যাপ্তঃ**—কারণরূপে সব কার্য ব্যাপ্তকারী, ৪১৪) **বায়ুঃ**—পবনরূপ, ৪১৫) **অধোক্ষজঃ**—নিজ স্বরূপ থেকে যিনি কখনো ক্ষীণ হন না।

৪১৬) **ঋতুঃ**—কালরূপে পরিলক্ষিত হন যিনি, ৪১৭) **সুদর্শনঃ**—ভক্তদের সহজেই দর্শনদানকারী, ৪১৮) **কালঃ**—সবকিছুর গণনাকারী, ৪১৯) **পরমেষ্ঠী**—নিজ প্রকৃষ্ট মহিমাতে স্থিত থাকা স্বভাববিশিষ্ট, ৪২০) **পরিগ্রহঃ**—শরণার্থীর দ্বারা সব দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য, ৪২১) **উগ্রঃ**—সূর্য ইত্যাদিরও ভয়ের কারণ, ৪২২) **সংবৎসরঃ**—সব প্রাণীর বাসস্থান, ৪২৩) **দক্ষঃ**—সমস্ত কাজ অত্যন্ত কুশলে সম্পন্নকারী, ৪২৪) **বিশ্রামঃ**—বিশ্রামে ইচ্ছুক মুমুক্ষুদের মোক্ষপ্রদানকারী, ৪২৫) **বিশ্বদক্ষিণঃ**—বলির যজ্ঞে সমস্ত বিশ্বকে দক্ষিণারূপে প্রাপ্তকারী।

৪২৬) **বিস্তারঃ**—সমস্ত জগতের বিস্তারের কারণ, ৪২৭) **স্থাবরস্থাণুঃ**—স্বয়ং স্থিতিশীল হয়ে পৃথিবী ইত্যাদি স্থিতিশীল পদার্থগুলি নিজ মধ্যে যিনি স্থিত রাখেন, ৪২৮) **প্রমাণম্**—জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় স্বয়ং প্রমাণরূপ, ৪২৯) **বীজমব্যয়ম্**—জগতের অবিনাশী কারণ, ৪৩০) **অর্থঃ**—সুখস্বরূপ হওয়ায় সকলেরই প্রার্থনীয়, ৪৩১) **অনর্থঃ**—পূর্ণকাম হওয়ায় প্রয়োজনরহিত, ৪৩২) **মহাকোশঃ**—বিশাল অর্থভাণ্ডারবিশিষ্ট, ৪৩৩) **মহাভোগঃ**—সুখরূপ মহাভোগসম্পন্ন, ৪৩৪) **মহাধনঃ**—প্রকৃত এবং অতিশয় ধনস্বরূপ।

৪৩৫) **অনির্বিণ্ণঃ**—নির্বেদরহিত, ৪৩৬) **স্থবিষ্ঠঃ**—বিরাটরূপে স্থিত, ৪৩৭) **অভূঃ**—অজন্মা, ৪৩৮) **ধর্মযূপঃ**—ধর্মের স্তম্ভরূপ, ৪৩৯) **মহামখঃ**—অর্পিত করা যজ্ঞাদিকে নির্বাণরূপ মহাফলদায়ক করেন যিনি, ৪৪০) **নক্ষত্র নেমিঃ**—সমস্ত নক্ষত্রের কেন্দ্রস্বরূপ, ৪৪১) **নক্ষত্রী**—চন্দ্ররূপ, ৪৪২) **ক্ষমঃ**—সমস্ত কার্যে সক্ষম, ৪৪৩) **ক্ষামঃ**—সমস্ত বিকার ক্ষীণ হলে যিনি পরমাত্মভাবে স্থিত, ৪৪৪) **সমীহনঃ**—সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য ভালোভাবে যিনি নিযুক্ত।

৪৪৫) **যজ্ঞঃ**—সর্বযজ্ঞস্বরূপ, ৪৪৬) **ইজ্যঃ**—পূজনীয়, ৪৪৭) **মহেজ্যঃ**—সর্বাধিক উপাস্য, ৪৪৮) **ক্রতুঃ**—যূপসংযুক্ত যজ্ঞস্বরূপ, ৪৪৯) **সত্রম্**—সৎ পুরুষদের রক্ষাকারী, ৪৫০) **সতাং গতিঃ**—সৎপুরুষদের পরম প্রাপনীয় স্থান, ৪৫১) **সর্বদর্শী**—সমস্ত প্রাণী এবং তাদের কার্যাদি যিনি অবলোকন করেন, ৪৫২) **বিমুক্তাত্মা**—জগৎ বন্ধনরহিত আত্মস্বরূপ, ৪৫৩) **সর্বজ্ঞঃ**—যিনি সবকিছু জানেন, ৪৫৪) **জ্ঞানমুত্তমম্**—সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ।

৪৫৫) **সুব্রতঃ**—প্রণতপালনাদি শ্রেষ্ঠ ব্রতধারী, ৪৫৬) **সুমুখঃ**—সুন্দর এবং প্রসন্ন মুখবিশিষ্ট, ৪৫৭) **সূক্ষ্মঃ**—অণুর থেকেও অণু, ৪৫৮) **সুঘোষঃ**—সুন্দর এবং গম্ভীর বাক্য যিনি বলেন, ৪৫৯) **সুখদঃ**—নিজ ভক্তদের সর্বপ্রকার সুখপ্রদানকারী, ৪৬০) **সুহৃৎ**—প্রাণীমাত্রেরই ওপর অহৈতুক দয়াবিশিষ্ট পরম মিত্র, ৪৬১) **মনোহরঃ**—নিজ রূপলাবণ্য এবং মধুর ভাষণে সকলের মন হরণকারী, ৪৬২) **জিতক্রোধঃ**—ক্রোধ জয়কারী অর্থাৎ অন্যায় ব্যবহারকারীদের ওপরও ক্রোধ করেন না, ৪৬৩) **বীরবাহুঃ**—অত্যন্ত পরাক্রমী বাহুযুক্ত, ৪৬৪) **বিদারণঃ**—অধর্মীদের নাশকারী।

৪৬৫) **স্বাপনঃ**—প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীকে অজ্ঞান নিদ্রায় নিক্ষেপকারী, ৪৬৬) **স্ববশঃ**—স্বতন্ত্র, স্বাধীন, ৪৬৭) **ব্যাপী**—আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, ৪৬৮) **নৈকাত্মা**—প্রত্যেক যুগে লোক উদ্ধারের জন্য নানারূপ ধারণকারী, ৪৬৯) **নৈককর্মকৃৎ**—জগতের উৎপত্তি-স্থিতি ও প্রলয়রূপ এবং বিভিন্ন অবতারে মনোহর লীলারূপ

বহু কর্ম করেন যিনি, ৪৭০) **বৎসরঃ**—সকলের নিবাস স্থান, ৪৭১) **বৎসলঃ**—ভক্তদের পরম স্নেহভাজন, ৪৭২) **বৎসী**—বৃন্দাবনে গো-বৎসদের পালনকারী, ৪৭৩) **রত্নগর্ভঃ**—রত্নসমূহকে নিজ গর্ভে ধারণকারী সমুদ্ররূপ, ৪৭৪) **ধনেশ্বরঃ**—সর্বপ্রকার ধনের স্বামী।

৪৭৫) **ধর্মগুপ্**—ধর্মরক্ষাকারী, ৪৭৬) **ধর্মকৃৎ**—ধর্মস্থাপনের জন্য স্বয়ং ধর্মাচরণকারী, ৪৭৭) **ধর্মী**—সমস্ত ধর্মের আধার, ৪৭৮) **সৎ**—সৎস্বরূপ, ৪৭৯) **অসৎ**—স্থূল জগৎস্বরূপ, ৪৮০) **ক্ষরম্**—সর্বভূতময়, ৪৮১) **অক্ষরম্**—অবিনাশী, ৪৮২) **অবিজ্ঞাতা**—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হয়, তার থেকে সবিশেষ ভগবান বিষ্ণু, ৪৮৩) **সহস্রাংশু**—সহস্র কিরণসম্পন্ন সূর্যস্বরূপ, ৪৮৪) **বিধাতা**—সকলকে ভালোভাবে ধারণকারী, ৪৮৫) **কৃতলক্ষণঃ**—শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ধারণকারী।

৪৮৬) **গভস্তিনেমিঃ**—কিরণের মধ্যে সূর্যরূপে স্থিত, ৪৮৭) **সত্ত্বস্থঃ**—যিনি অন্তর্যামীরূপে সমস্ত প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করেন, ৪৮৮) **সিংহঃ**—ভক্ত প্রহ্লাদের জন্য নৃসিংহরূপ ধারণকারী, ৪৮৯) **ভূতমহেশ্বরঃ**—সমস্ত প্রাণীর মহা ঈশ্বর, ৪৯০) **আদিদেবঃ**—সকলের আদি কারণ এবং দিব্যস্বরূপ, ৪৯১) **মহাদেবঃ**—জ্ঞানযোগ এবং ঐশ্বর্যাদি মহিমাদ্বারা যুক্ত, ৪৯২) **দেবেশঃ**—সমস্ত দেবতার স্বামী, ৪৯৩) **দেবভৃদ্গুরুঃ**—দেবতাদের পরম গুরু রূপে তাঁদের বিশেষরূপে ভরণপোষণকারী।

৪৯৪) **উত্তরঃ**—সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধারকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, ৪৯৫) **গোপতিঃ**—গোপালরূপে গোরুদের রক্ষাকারী, ৪৯৬) **গোপ্তা**—সমস্ত প্রাণীদের পালন ও রক্ষাকারী, ৪৯৭) **জ্ঞানগম্যঃ**—জ্ঞানের দ্বারা জানার যোগ্য, ৪৯৮) **পুরাতনঃ**—সর্বদা একভাবে অবস্থানকারী সকলের আদি পুরাণপুরুষ, ৪৯৯) **শরীরভূতভৃৎ**—শরীরের উৎপাদক পঞ্চভূতের প্রাণরূপে পালনকারী, ৫০০) **ভোক্তা**—নিরতিশয় আনন্দপুঞ্জের উপভোগকারী, ৫০১) **কপীন্দ্রঃ**—বানরদের প্রভু শ্রীরাম, ৫০২) **ভূরিদক্ষিণঃ**—শ্রীরাম এবং অন্যান্য অবতার কালে যজ্ঞের সময় বহু দক্ষিণা প্রদানকারী।

৫০৩) **সোমপঃ**—যজ্ঞাদিতে দেবরূপে এবং যজমানরূপে সোমরস পানকারী, ৫০৪) **অমৃতপঃ**—সমুদ্র মন্থন হতে উত্থিত অমৃত দেবতাদের পান করিয়ে স্বয়ং পানকারী, ৫০৫) **সোমঃ**—চন্দ্ররূপে ওষধিপোষণকারী, ৫০৬) **পুরুজিৎ**—বহুর ওপর বিজয়প্রাপ্তকারী, ৫০৭) **পুরুষোত্তমঃ**—বিশ্বরূপ এবং অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, ৫০৮) **বিনয়ঃ**—দুষ্টদের দণ্ডপ্রদানকারী, ৫০৯) **জয়ঃ**—সবার ওপর বিজয়লাভকারী, ৫১০) **সত্যসন্ধঃ**—সত্য প্রতিজ্ঞাকারী, ৫১১) **দাশার্হঃ**—দাশার্হ কুলে যিনি প্রকটিত, ৫১২) **সাত্বতাং পতিঃ**—যাদবদের এবং নিজ ভক্তদের প্রভু অর্থাৎ তাঁদের যোগক্ষেম বহনকারী।

৫১৩) **জীবঃ**—ক্ষেত্ররূপে প্রাণধারণকারী, ৫১৪) **বিনয়িতাসাক্ষী**—নিজ শরণাগত ভক্তদের বিনয়ভাবকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষরূপে অনুভবকারী, ৫১৫) **মুকুন্দঃ**—মুক্তিদাতা, ৫১৬) **অমিতবিক্রমঃ**—অপার পরাক্রমী, ৫১৭) **অম্ভোনিধিঃ**—জলের নিধান সমুদ্ররূপে কারণ-তত্ত্ব, ৫১৮) **অনন্তাত্মা**—অনন্তমূর্তি, ৫১৯) **মহোদধিশয়ঃ**—প্রলয়কালে মহাসমুদ্রে শয়নকারী, ৫২০) **অন্তকঃ**—প্রাণী সংহারকারী অর্থাৎ মৃত্যুস্বরূপ।

৫২১) **অজঃ**—জন্মবিকাররহিত, ৫২২) **মহার্হঃ**—পূজনীয়, ৫২৩) **স্বাভাব্যঃ**—নিত্য সিদ্ধ হওয়ায় স্বভাবতই অনুৎপন্নতত্ত্ব, ৫২৪) **জিতামিত্রঃ**—রাবণ, শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুজয়কারী, ৫২৫) **প্রমোদনঃ**—স্মরণমাত্রে যিনি নিত্য আহ্লাদিত করেন, ৫২৬) **আনন্দঃ**—আনন্দস্বরূপ, ৫২৭) **নন্দনঃ**—সকলকে প্রসন্ন করেন যিনি, ৫২৮) **নন্দঃ** —সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, ৫২৯) **সত্যধর্মা**—ধর্মজ্ঞান ইত্যাদি সর্বগুণাদিসম্পন্ন, ৫৩০) **ত্রিবিক্রমঃ**—তিন পা ফেলে ত্রিলোক ওজন করেন যিনি।

৫৩১) **মহর্ষিঃ কপিলাচার্যঃ**—সাংখ্যশাস্ত্রের প্রণেতা ভগবান কপিলাচার্য, ৫৩২) **কৃতজ্ঞঃ**—নিজ ভক্তদের সেবাকে অনেক মনে করে নিজেকে তার ঋণী বলে মনে করেন যিনি, ৫৩৩) **মেদিনীপতিঃ**—পৃথিবীর প্রভু, ৫৩৪) **ত্রিপদঃ**—ত্রিলোকরূপ ত্রিপাদবিশিষ্ট বিশ্বরূপ, ৫৩৫) **ত্রিদশাধ্যক্ষ**—দেবতাদের প্রভু, ৫৩৬) **মহাশৃঙ্গঃ**—মৎস্যাবতারে মহাশিং ধারণকারী, ৫৩৭) **কৃতান্তকৃৎ**—স্মরণকারীদের সমস্ত কর্মের অন্তকারী।

৫৩৮) **মহাবরাহঃ**—হিরণ্যাক্ষকে বধ করার জন্য মহাবরাহরূপধারণকারী, ৫৩৯) **গোবিন্দঃ**—বেদবাণী দ্বারা যাঁকে জানা যায়, ৫৪০) **সুষেণঃ**—পার্ষদের

সমুদায়রূপ সেনাদ্বারা সুসজ্জিত, ৫৪১) **কনকাঙ্গদী**—সুবর্ণ বাজুবন্দ ধারণকারী, ৫৪২) **গুহ্যঃ**—হৃদয়াকাশে লুক্কায়িত, ৫৪৩) **গভীরঃ**—অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবসম্পন্ন, ৫৪৪) **গহনঃ**—যাঁর স্বরূপে প্রবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত কঠিন—সেইরূপ, ৫৪৫) **গুপ্তঃ**—বাক্য ও মনের দ্বারা যাঁকে জানা যায় না, ৫৪৬) **চক্রগদাধরঃ**—ভক্তদের রক্ষার জন্য গদা, চক্র ইত্যাদি দিব্য অস্ত্রধারণকারী।

৫৪৭) **বেধাঃ**—সব কিছুর বিধানকারী, ৫৪৮) **স্বাঙ্গঃ**—কার্যে যিনি নিজেই সহকারী, ৫৪৯) **অজিতঃ**—কারো দ্বারা পরাজিত না হওয়া, ৫৫০) **কৃষ্ণঃ**—শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, ৫৫১) **দৃঢ়ঃ**—নিজ স্বরূপ ও সামর্থ্য থেকে যিনি কখনো চ্যুত হন না, ৫৫২) **সংকর্ষণোঽচ্যুত**—প্রলয়কালে সকলকে একসঙ্গে সংহার করেন যিনি এবং যাঁর কখনো কোনো কারণে পতন হয় না—এরূপ অবিনাশী, ৫৫৩) **বরুণঃ**—জলের প্রভু, ৫৫৪) **বারুণঃ**—বরুণের পুত্র বশিষ্ঠস্বরূপ, ৫৫৫) **বৃক্ষঃ**—অশ্বত্থ বৃক্ষরূপী, ৫৫৬) **পুষ্করাক্ষঃ**—কমলনয়ন, ৫৫৭) **মহামনাঃ**—সংকল্পমাত্রই উৎপত্তি, পালন ও সংহারাদি সমস্ত লীলা করতে যিনি শক্তিসম্পন্ন।

৫৫৮) **ভগবান**—উৎপত্তি ও প্রলয়, আসা ও যাওয়া এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা যিনি জানেন ও সর্বৈশ্বর্যাদি ছয়টি বিশেষ শক্তি সমন্বিত, ৫৫৯) **ভগহা**—নিজ ভক্তদের প্রেমবৃদ্ধি করার জন্য তাদের ঐশ্বর্য হরণকারী এবং প্রলয়কালে সকলের ঐশ্বর্য বিনাশকারী, ৫৬০) **আনন্দী**—পরমসুখস্বরূপ, ৫৬১) **বনমালী**—বৈজয়ন্তী বনমালা ধারণকারী, ৫৬২) **হলায়ুধ**—হলরূপ শস্ত্রধারণকারী বলভদ্রস্বরূপ, ৫৬৩) **আদিত্যঃ**—অদিতিপুত্র বামন ভগবান, ৫৬৪) **জ্যোতিরাদিত্যঃ**—সূর্যমণ্ডলে বিরাজমান জ্যোতিস্বরূপ, ৫৬৫) **সহিষ্ণুঃ**—সমস্ত দ্বন্দ্ব সহ্য করায় সক্ষম, ৫৬৬) **গতিসত্তমঃ**—সৎ পুরুষদের পরম গন্তব্য স্থান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

৫৬৭) **সুধন্বা**—অতি সুন্দর শার্ঙ্গধনুক ধারণকারী, ৫৬৮) **খণ্ডপরশুঃ**—শত্রু খণ্ডনকারী কুঠার ধারণকারী পরশুরাম স্বরূপ, ৫৬৯) **দারুণঃ**—সন্মার্গ বিরোধীদের পক্ষে মহা ভয়ংকররূপ, ৫৭০) **দ্রবিণপ্রদঃ**—অর্থার্থী ভক্তদের ধন-সম্পত্তি প্রদানকারী, ৫৭১) **দিবস্পৃক্**—স্বর্গলোক পর্যন্ত যাঁর ব্যাপ্তি, ৫৭২) **সর্বদৃগ্ ব্যাসঃ**—সব কিছুর দ্রষ্টা এবং বেদবিভাগকারী শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন স্বরূপ, ৫৭৩) **বাচস্পতিরযোনিজঃ**—বিদ্যার অধিপতি এবং যোনি ব্যতীত যিনি স্বয়ং প্রকটিত।

৫৭৪) **ত্রিসামা**—দেবব্রত ইত্যাদি ত্রয় সাম-শ্রুতিদ্বারা যাঁর স্তুতি করা হয়, সেই পরমেশ্বর, ৫৭৫) **সামগঃ**—সামবেদগানকারী, ৫৭৬) **সাম**—সামবেদস্বরূপ, ৫৭৭) **নির্বাণম্**—পরম শান্তির নিধান পরমানন্দস্বরূপ, ৫৭৮) **ভেষজম্**—সংসাররোগের ঔষধ, ৫৭৯) **ভিষক্**—সংসার রোগ নাশ করার জন্য গীতারূপ উপদেশামৃত যিনি পান করিয়েছেন—এরূপ পরমবেদ্য, ৫৮০) **সন্ন্যাসকৃৎ**—মোক্ষের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম এবং সন্ন্যাস যোগ নির্মাণকারী, ৫৮১) **শমঃ**—উপশমতার উপদেশ প্রদানকারী, ৫৮২) **শান্তঃ**—পরম শান্তাকৃতি, ৫৮৩) **নিষ্ঠা**—সকলের স্থিতির আধার অধিষ্ঠানস্বরূপ, ৫৮৪) **শান্তিঃ**—পরম শান্তিস্বরূপ, ৫৮৫) **পরায়ণম্**—মুমুক্ষু ব্যক্তিদের পরম প্রাপ্যস্থান।

৫৮৬) **শুভাঙ্গঃ**—অতি মনোহর পরম সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, ৫৮৭) **শান্তিদঃ**—পরমশান্তি প্রদানকারী, ৫৮৮) **স্রষ্টা**—সর্গের আদিতে সকলের সৃষ্টিকর্তা, ৫৮৯) **কুমুদঃ**—পৃথিবীতে আনন্দপূর্বক লীলাকারী, ৫৯০) **কুবলেশয়ঃ**—জলে শেষনাগের শয্যায় শয়নকারী, ৫৯১) **গোহিতঃ**—গোপালরূপে গরুদের এবং অবতার ধারণ-পূর্বক ভারবহন করে পৃথিবীর হিত সাধনকারী, ৫৯২) **গোপতিঃ**—পৃথিবী এবং গরুদের স্বামী, ৫৯৩) **গোপ্তা**—অবতার ধারণকালে সবার সামনে প্রকট হওয়ার সময় নিজ-মায়াদ্বারা নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিতকারী, ৫৯৪) **বৃষভাক্ষঃ**—সমস্ত কামনাবর্ষণকারী কৃপাদৃষ্টিযুক্ত, ৫৯৫) **বৃষপ্রিয়ঃ**—ধর্মের সঙ্গে প্রেম করেন যিনি।

৫৯৬) **অনিবর্তী**—রণে এবং ধর্মপালনে যিনি পশ্চাৎ-পদ হন না, ৫৯৭) **নিবৃত্তাত্মা**—স্বভাবত যিনি বিষয়বাসনাশূন্য নিত্যশুদ্ধ মনসম্পন্ন, ৫৯৮) **সংক্ষেপ্তা**—বিস্তৃত জগৎকে অল্পক্ষণের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বা সূক্ষ্মরূপে পরিবর্তনকারী, ৫৯৯) **ক্ষেমকৃৎ**—শরণাগতকে রক্ষাকারী, ৬০০) **শিবঃ**—স্মরণমাত্রে পবিত্রকারী কল্যাণস্বরূপ, ৬০১) **শ্রীবৎসবক্ষাঃ**—শ্রীবৎস নামক চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণকারী, ৬০২) **শ্রীবাসঃ**—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান, ৬০৩) **শ্রীপতিঃ**—পরমশক্তিরূপা

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্বামী, ৬০৪) **শ্রীমতাং বরঃ**—সর্বপ্রকার সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যযুক্ত ব্রহ্মাদি সমস্ত লোকপাল থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ।

৬০৫) **শ্রীদঃ**—ভক্তদের শ্রীপ্রদানকারী, ৬০৬) **শ্রীশঃ**—লক্ষ্মীনাথ, ৬০৭) **শ্রীনিবাসঃ**—লক্ষ্মীদেবীর হৃদয়ে নিত্য নিবাসকারী, ৬০৮) **শ্রীনিধিঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার, ৬০৯) **শ্রীবিভাবনঃ**—কর্মানুসারে সর্ব মানুষকে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য প্রদানকারী, ৬১০) **শ্রীধরঃ**—জগজ্জননী শ্রীকে বক্ষঃস্থলে ধারণকারী, ৬১১) **শ্রীকরঃ**—স্মরণ, স্তবন, অর্চন ইত্যাদি যে ভক্তগণ করে, তাদের শ্রী বিস্তারকারী, ৬১২) **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণস্বরূপ, ৬১৩) **শ্রীমান্**—সর্বপ্রকার শ্রী যুক্ত, ৬১৪) **লোকত্রয়াশ্রয়ঃ**—ত্রিলোকের আধার।

৬১৫) **স্বক্ষঃ**—মনোহর কৃপাকটাক্ষযুক্ত পরম সুন্দর চক্ষুসংবলিত, ৬১৬) **স্বঙ্গঃ**—অতি কোমল পরমসুন্দর মনোহর অঙ্গবিশিষ্ট, ৬১৭) **শতানন্দঃ**—লীলাভেদদ্বারা সহস্রাধিক বিভাগে বিভক্ত আনন্দস্বরূপ, ৬১৮) **নন্দীঃ**—পরমানন্দবিগ্রহ, ৬১৯) **জ্যোতির্গণেশ্বরঃ**—নক্ষত্র সমূহের ঈশ্বর, ৬২০) **বিজিতাত্মা**—মনজয়কারী, ৬২১) **অবিধেয়াত্মা**—যাঁর প্রকৃত স্বরূপ কোনোভাবেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তেমন অনির্বচনীয়স্বরূপ, ৬২২) **সৎকীর্তিঃ**—যথার্থ কীর্তিসম্পন্ন, ৬২৩) **ছিন্নসংশয়ঃ**—হস্তে আমলকীর ন্যায় সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় সর্বপ্রকার সংশয়বর্জিত।

৬২৪) **উদীর্ণঃ**—সব প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৬২৫) **সর্বতশ্চক্ষুঃ**—সর্ব বস্তু সর্ব দিক হতে সদা-সর্বদা প্রত্যক্ষ করার শক্তিসম্পন্ন, ৬২৬) **অনীশঃ**—যার আর অন্য কোনো শাসক নেই, এরূপ স্বাধীন, ৬২৭) **শাশ্বতস্থিরঃ**—সর্বদা একভাবে স্থিত নির্বিকার, ৬২৮) **ভূশয়ঃ**—লঙ্কা গমনের সময় পথপ্রার্থীরূপে সমুদ্রতীরের ভূমিতে শয়নকারী, ৬২৯) **ভূষণঃ**—স্বেচ্ছায় নানা অবতার রূপ ধারণ করে নিজ চরণ-চিহ্ন দ্বারা পৃথিবীর শোভাবৃদ্ধিকারী, ৬৩০) **ভূতিঃ**—অস্তিত্বস্বরূপ এবং সমস্ত বিভূতির আধারস্বরূপ, ৬৩১) **বিশোকঃ**—সর্বপ্রকার শোকরহিত, ৬৩২) **শোকনাশনঃ**—স্মৃতিমাত্রে ভক্তদের শোক সমূলে নাশকারী।

৬৩৩) **অর্চিষ্মান্**—চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি জ্যোতিসমূহকে দেদীপ্যমানকারী অত্যন্ত প্রকাশময় অনন্তকিরণযুক্ত, ৬৩৪) **অর্চিতঃ**—সমস্ত লোকের পূজ্য, ব্রহ্মাদি কর্তৃকও পূজিত, ৬৩৫) **কুম্ভঃ**—ঘটের ন্যায় সকলের নিবাসস্থল, ৬৩৬) **বিশুদ্ধাত্মা**—পরম শুদ্ধ নির্মল আত্মস্বরূপ, ৬৩৭) **বিশোধনঃ**—স্মরণমাত্রেই সমস্ত পাপ নাশ করে ভক্তের হৃদয় পরম শুদ্ধকারী, ৬৩৮) **অনিরুদ্ধঃ**—যাঁকে কেউ বন্ধন করে রাখতে পারে না, এরূপ চতুর্ব্যূহতে অনিরুদ্ধস্বরূপ, ৬৩৯) **অপ্রতিরথঃ**—প্রতিপক্ষশূন্য, ৬৪০) **প্রদ্যুম্নঃ**—পরম শ্রেষ্ঠ অপার ধনযুক্ত চতুর্ব্যূহে প্রদ্যুম্ন স্বরূপ, ৬৪১) **অমিতবিক্রমঃ**—অপার পরাক্রমী।

৬৪২) **কালনেমিনিহা**—কালনেমি নামক অসুর বধকারী, ৬৪৩) **বীরঃ**—পরম শূরবীর, ৬৪৪) **শৌরিঃ**—শূরকুলে উৎপন্ন হওয়া শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, ৬৪৫) **শূরজনেশ্বরঃ**—অত্যন্ত শৌর্যের কারণ ইন্দ্রাদি শূরবীরদেরও ইষ্ট, ৬৪৬) **ত্রিলোকাত্মা**—অন্তর্যামীরূপে ত্রিলোকের আত্মা, ৬৪৭) **ত্রিলোকেশঃ**—ত্রিলোকের প্রভু, ৬৪৮) **কেশবঃ**—সূর্যের কিরণরূপ কেশ সংবলিত, ৬৪৯) **কেশিহা**—কেশি নামক অসুর নিধনকারী, ৬৫০) **হরিঃ**—স্মরণমাত্রে সমস্ত পাপ ও সমূলে জগৎ হরণকারী।

৬৫১) **কামদেবঃ**—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—মানুষের অভিলষিত এই চার পুরুষার্থের সমস্ত কামনার অধিষ্ঠাতা পরমদেব, ৬৫২) **কামপালঃ**—সকাম ভক্তদের কামনা পূরণকারী, ৬৫৩) **কামী**—স্বভাবতই পূর্ণকাম এবং নিজ প্রিয়তমকে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন, ৬৫৪) **কান্তঃ**—পরম মনোহর শ্যামসুন্দর দেহধারণকারী গোপীজনবল্লভ, ৬৫৫) **কৃতাগমঃ**—সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রের রচনাকারী, ৬৫৬) **অনির্দেশ্যবপুঃ**—যাঁর দিব্যস্বরূপের বর্ণনা কোনোভাবেই করা সম্ভব নয়—এরূপ অনির্বচনীয় দেহ-সম্পন্ন, ৬৫৭) **বিষ্ণুঃ**—শেষশায়ী ভগবান বিষ্ণু, ৬৫৮) **বীরঃ**—বিনা পায়ে চলা ইত্যাদি নানা দিব্য শক্তিসম্পন্ন, ৬৫৯) **অনন্তঃ**—যাঁর স্বরূপ, শক্তি, ঐশ্বর্য, সামর্থ্য ইত্যাদি গুণের কোনো পার পাওয়া যায় না—এরূপ অবিনাশী গুণ, প্রভাব এবং শক্তিসম্পন্ন, ৬৬০) **ধনঞ্জয়ঃ**—দিগ্বিজয়ের সময় অর্জুনরূপে বহু ধন জয় করে আনয়ন করেন যিনি।

৬৬১) **ব্রহ্মণ্যঃ**—তপ, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানের রক্ষাকারী, ৬৬২) **ব্রহ্মকৃৎ**—পূর্বোক্ত তপ ইত্যাদির

রচনাকারী, ৬৬৩) **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মারূপে জগৎ উৎপন্নকারী, ৬৬৪) **ব্রহ্ম**—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ৬৬৫) **ব্রহ্মবিবর্ধনঃ**—পূর্বোক্ত ব্রহ্মশব্দবাচী তপ ইত্যাদি বৃদ্ধিকারী, ৬৬৬) **ব্রহ্মবিৎ**—যিনি বেদ এবং বেদার্থের সম্পূর্ণ জ্ঞাতা, ৬৬৭) **ব্রাহ্মণঃ**—সব কিছুকে ব্রহ্মরূপে যিনি দেখেন, ৬৬৮) **ব্রহ্মী**—ব্রহ্ম শব্দবাচী তপাদি সমস্ত পদার্থের অধিষ্ঠান, ৬৬৯) **ব্রহ্মজ্ঞঃ**—নিজ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মশব্দবাচী বেদকে যিনি সম্পূর্ণভাবে সঠিকরূপে জানেন, ৬৭০) **ব্রাহ্মণ প্রিয়ঃ**—ব্রাহ্মণদের পরম প্রিয় এবং যিনি ব্রাহ্মণদের অতিশয় প্রিয় বলে মানেন।

৬৭১) **মহাক্রমঃ**—অতি দ্রুত চলেন যিনি, ৬৭২) **মহাকর্মা**—বিভিন্ন অবতারে নানা প্রকার কর্ম করেন যিনি, ৬৭৩) **মহাতেজাঃ**—যাঁর তেজে সমস্ত তেজস্বী দেদীপ্যমান হন—এরূপ মহাতেজস্বী, ৬৭৪) **মহোরগঃ**—মস্ত বড় সাপ অর্থাৎ বাসুকিস্বরূপ, ৬৭৫) **মহাক্রতুঃ**—মহাযজ্ঞস্বরূপ, ৬৭৬) **মহাযজ্বা**—মহান যজমান অর্থাৎ লোক সংগ্রহের জন্য বিশাল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী, ৬৭৭) **মহাযজ্ঞঃ**—জপযজ্ঞ ইত্যাদি ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনরূপ সমস্ত যজ্ঞ যাঁর বিভূতি-এরূপ মহাযজ্ঞস্বরূপ, ৬৭৮) **মহাহবিঃ**—ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ করার যোগ্য প্রপঞ্চরূপ হবি যাঁর স্বরূপ-এরূপ মহা হবিঃস্বরূপ।

৬৭৯) **স্তব্যঃ**—সকলের দ্বারা স্তুতি করার যোগ্য, ৬৮০) **স্তবপ্রিয়ঃ**—স্তুতিদ্বারা যিনি প্রসন্ন হন, ৬৮১) **স্তোত্রম্**—যার সাহায্যে ভগবানের গুণ-প্রভাবের কীর্তন করা হয়, ৬৮২) **স্তুতিঃ**—স্তবক্রিয়াস্বরূপ, ৬৮৩) **স্তোতা**—স্তুতিকারী, ৬৮৪) **রণপ্রিয়ঃ**—যুদ্ধপ্রিয়, ৬৮৫) **পূর্ণঃ**—সমস্ত জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য এবং গুণাদি পরিপূর্ণ, ৬৮৬) **পূরয়িতা**—নিজ ভক্তদের যিনি সর্বপ্রকারে পূর্ণ করেন, ৬৮৭) **পুণ্যঃ**—স্মরণমাত্রে পাপনাশকারী পুণ্যস্বরূপ, ৬৮৮) **পুণ্যকীর্তিঃ**—পরমপবিত্র কীর্তিসম্পন্ন, ৬৮৯) **অনাময়ঃ**—অন্তরে ও বাহ্যে—সর্বপ্রকার ব্যাধিরহিত।

৬৯০) **মনোজবঃ**—মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন, ৬৯১) **তীর্থকর**—সকল বিদ্যার রচয়িতা এবং উপদেশকর্তা, ৬৯২) **বসুরেতাঃ**—হিরণ্ময় পুরুষ (প্রথম পুরুষ সৃষ্টির বীজ) যাঁর বীর্য, তেমন সুবর্ণবীর্য, ৬৯৩) **বসুপ্রদঃ**—প্রচুর ধন প্রদানকারী, ৬৯৪) **বসুপ্রদোঃ**—নিজ ভক্তদের মোক্ষরূপ মহা ধন প্রদানকারী, ৬৯৫) **বাসুদেবঃ**—বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, ৬৯৬) **বসুঃ**—সকলের অন্তরে নিবাসকারী, ৬৯৭) **বসুমনাঃ**—সমভাবে সবেতে নিবাস করার শক্তিদ্বারা যুক্ত মন যাঁর, ৬৯৮) **হবিঃ**—যজ্ঞে হবন করার যোগ্য হবিঃস্বরূপ।

৬৯৯) সদ্গতিঃ—সৎপুরুষের দ্বারা প্রাপ্ত করার যোগ্য গতিস্বরূপ, ৭০০) **সৎকৃতিঃ**—জগৎ রক্ষা ইত্যাদি সৎকর্ম করেন যিনি, ৭০১) **সত্তা**—সদা-সর্বদা বিদ্যমান অস্তিত্বরূপ, ৭০২) **সদ্ভূতিঃ**—বহু প্রকারে বহু রূপে ভাসিত হন যিনি, ৭০৩) **সৎপরায়ণঃ**—সৎপুরুষদের পরম প্রাপ্তব্য বস্তু, ৭০৪) **শূরসেনঃ**—হনুমান ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা দ্বারা যুক্ত সেনা সম্ভার, ৭০৫) **যদুশ্রেষ্ঠঃ**—যদুবংশীয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ৭০৬) **সন্নিবাসঃ**—সৎপুরুষদের আশ্রয়, ৭০৭) **সুযামুনঃ**—যাঁর পরিকর যমুনাতটনিবাসী গোপাল ইত্যাদি অতি সুন্দর, এরূপ শ্রীকৃষ্ণ।

৭০৮) **ভূতাবাসঃ**—সমস্ত প্রাণীর প্রধান নিবাসস্থান, ৭০৯) **বাসুদেবঃ**—নিজ মায়ায় জগৎ আচ্ছাদিতকারী পরম দেব, ৭১০) **সর্বাসুনিলয়ঃ**—সমস্ত প্রাণীর আধার, ৭১১) **অনলঃ**—অপার শক্তি ও সম্পদযুক্ত, ৭১২) **দর্পহা**—ধর্মবিরুদ্ধ পথে গমনকারীর অহংকার নাশকারী, ৭১৩) দর্পদঃ—নিজ ভক্তদের বিশুদ্ধ গৌরব প্রদানকারী, ৭১৪) দৃপ্তঃ—নিত্যানন্দমগ্ন, ৭১৫) **দুর্ধরঃ**—অতি কষ্টে যাঁকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়, ৭১৬) **অপরাজিতঃ**—কোনোভাবে যাকে জয় করা যায় না, অর্থাৎ যিনি ভক্তের অধীন।

৭১৭) **বিশ্বমূর্তিঃ**—সমস্ত বিশ্বই যাঁর মূর্তি—এরূপ বিরাট স্বরূপ, ৭১৮) **মহামূর্তিঃ**—সুন্দর রূপসম্পন্ন, ৭১৯) **দীপ্তমূর্তিঃ**—স্বেচ্ছায় ধারণ করা দেদীপ্যমান স্বরূপযুক্ত, ৭২০) **অমূর্তিমান্**—যাঁর কোনো মূর্তি নেই—এরূপ নিরাকার রূপ, ৭২১) **অনেকমূর্তিঃ**—বিভিন্ন অবতারে স্বেচ্ছায় লোকের উপকার করার জন্য বহু মূর্তি ধারণকারী, ৭২২) **অব্যক্তঃ**—বহু মূর্তি হওয়া সত্ত্বেও যাঁর স্বরূপ কোনোভাবেই ব্যক্ত করা যায় না, এরূপ অপ্রকট স্বরূপ, ৭২৩) **শতমূর্তিঃ**—শত-সহস্র মূর্তিবিশিষ্ট, ৭২৪) **শতাননঃ**—শত সহস্র মুখবিশিষ্ট।

৭২৫) **একঃ**—সর্বপ্রকার ভেদভাবরহিত—অদ্বিতীয়, ৭২৬) **নৈকঃ**—উপাধি ভেদে যিনি অনেক, ৭২৭) **সবঃ**—যাতে সোমনামের ঔষধির রস পাওয়া যায়—এরূপ যজ্ঞস্বরূপ, ৭২৮) **কঃ**—সুখস্বরূপ, ৭২৯) **কিম্**—বিচারণীয় ব্রহ্মস্বরূপ, ৭৩০) **যৎ**—স্বতঃসিদ্ধ, ৭৩১) তৎ—বিস্তারকারী, ৭৩২) **পদমনুত্তমম্**—মুমুক্ষু পুরুষদের প্রাপ্ত করার যোগ্য অত্যুত্তম পরমপদ, ৭৩৩) **লোকবন্ধুঃ** —সমস্ত প্রাণীর হিতকারী পরম মিত্র, ৭৩৪) **লোকনাথঃ** —সকলের প্রার্থনীয় লোকস্বামী, ৭৩৫) **মাধবঃ**—মধুকুলে যিনি উৎপন্ন, ৭৩৬) **ভক্তবৎসলঃ**—ভক্তদের ভালোবাসেন যিনি।

৭৩৭) **সুবর্ণবর্ণঃ**—স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ, ৭৩৮) **হেমাঙ্গঃ**—সোনার মতো উজ্জ্বল সুগঠিত অঙ্গ, ৭৩৯) **বরাঙ্গঃ**—পরম শ্রেষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, ৭৪০) **চন্দনাঙ্গদী**—চন্দন চর্চিত এবং বাজুবন্দ শোভিত, ৭৪১) **বীরহা**—রাগ-দ্বেষাদি প্রবল শত্রুর ভয়ে ভীত শরণ গ্রহণকারীদের অন্তরের সেই দুর্গুণাদির অভাবকারী, ৭৪২) **বিষমঃ**—যাঁর সমকক্ষ অন্য কেউ নেই—এরূপ অনুপম, ৭৪৩) **শূন্যঃ**—সমস্ত বিশেষণরহিত, ৭৪৪) **ঘৃতাশীঃ**—নিজ আশ্রিতদের জন্য কৃপাদ্বারা দ্রবীভূত কল্যাণের সংকল্পকারী, ৭৪৫) **অচলঃ**—কোনোভাবে যিনি বিচলিত হন না, অবিচল, ৭৪৬) **চলঃ**—বায়ুরূপে সর্বত্র গমনকারী।

৭৪৭) **অমানী**—নিজে যিনি মান চান না, অভিমান-রহিত, ৭৪৮) **মানদঃ**—অপরকে মান প্রদানকারী, ৭৪৯) **মান্যঃ**—সকলের পূজনীয়, माननীয়, ৭৫০) **লোকস্বামী**—চতুর্দশ ভুবনের স্বামী, ৭৫১) **ত্রিলোকধৃক্**—ত্রিলোক ধারণকারী, ৭৫২) **সুমেধাঃ**—অত্যন্ত উত্তম সুন্দর বুদ্ধিসম্পন্ন, ৭৫৩) **মেধজঃ**—যজ্ঞে প্রকটিত হন যিনি, ৭৫৪) **ধন্যঃ**—নিত্য কৃতকৃত্য হওয়ায় সর্বতোভাবে ধন্যবাদের পাত্র, ৭৫৫) **সত্যমেধাঃ**—সত্য ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন, ৭৫৬) **ধরাধরঃ**—অনন্ত ভগবানরূপে পৃথিবী ধারণকারী।

৭৫৭) **তেজোবৃষঃ**—আদিত্যরূপে তেজ বর্ষণকারী এবং ভক্তদের ওপর নিজ অমৃতময় তেজ বর্ষণকারী, ৭৫৮) **দ্যুতিধরঃ**—পরম কান্তি ধারণকারী, ৭৫৯) **সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ**—সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭৬০) **প্রগ্রহঃ**—ভক্তগণের দ্বারা অর্পিত পত্র-পুষ্পাদি গ্রহণকারী, ৭৬১) **নিগ্রহঃ**—সকলের নিগ্রহকারী, ৭৬২) **ব্যগ্রঃ**—নিজ ভক্তদের অভীষ্ট ফল দিতে ব্যাপৃত, ৭৬৩) **নৈকশৃঙ্গঃ**—নাম, অখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাতরূপ এরূপ চারটি শৃঙ্গ ধারণকারী শব্দব্রহ্মস্বরূপ, ৭৬৪) **গদাগ্রজঃ**—গদের পূর্বে জন্ম পরিগ্রহকারী।

৭৬৫) **চতুর্মূর্তিঃ**—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নরূপ—এই চার মূর্তিবিশিষ্ট, ৭৬৬) **চতুর্বাহুঃ**—চার হস্তবিশিষ্ট, ৭৬৭) **চতুর্ব্যূহঃ**—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চার ব্যূহদ্বারা যুক্ত, ৭৬৮) **চতুর্গতিঃ**—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্যরূপ চার পরম গতিস্বরূপ, ৭৬৯) **চতুরাত্মা**—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তরূপ চার অন্তঃকরণসম্পন্ন, ৭৭০) **চতুর্ভাবঃ**—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের উৎপত্তিস্থান, ৭৭১) **চতুর্বেদবিৎ**—চারটি বেদের অর্থ যিনি ভালোভাবে জানেন, ৭৭২) **একপাৎ**—এক পদবিশিষ্ট অর্থাৎ এক পাদ (অংশ) দ্বারা সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্তকারী।

৭৭৩) **সমাবর্তঃ**—ভালোভাবে সংসারচক্র পরিবর্তনকারী, ৭৭৪) **অনিবৃত্তাত্মা**—সর্বত্র ব্যাপ্তিস্বরূপ হওয়ায় কোথাও যাঁর অভাব নেই, ৭৭৫) **দুর্জয়ঃ**—কারো দ্বারা যিনি পরাজিত হন না, ৭৭৬) **দুরতিক্রমঃ**—যাঁর আদেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না, ৭৭৭) **দুর্লভঃ**—ভক্তি বিনা যাঁকে লাভ করা যায় না, ৭৭৮) **দুর্গমঃ**—যাঁকে কষ্টে জানা যায়, ৭৭৯) **দুর্গঃ**—কষ্ট করে যাঁকে পাওয়া যায়, ৭৮০) **দুরাবাসঃ**—অতি কষ্টে যোগিগণ যাকে হৃদয়ে স্থাপন করেন ৭৮১) **দুরারিহা**—দৈত্যদের বধ করেন যিনি।

৭৮২) **শুভাঙ্গঃ**—কল্যাণকারী সম্বোধন (নাম) যুক্ত, ৭৮৩) **লোকসারঙ্গঃ**—লোকের সার গ্রহণকারী, ৭৮৪) **সুতন্তুঃ**—সুন্দর বিস্তৃত জগৎরূপ তন্তুবিশিষ্ট, ৭৮৫) **তন্তুবর্ধনঃ**—পূর্বোক্ত জগৎ-তন্তু বৃদ্ধিকারী, ৭৮৬) **ইন্দ্রকর্মা**—ইন্দ্রের ন্যায় কর্মবিশিষ্ট ৭৮৭) **মহাকর্মা**—মহান কর্ম করেন যিনি, ৭৮৮) **কৃতকর্মা**—যিনি সমস্ত কর্তব্য কর্ম সমাপন করেছেন—এরূপ কৃতকৃত্য, ৭৮৯) **কৃতাগমঃ**—স্বয়ং-এর বিধানকারী বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণকারী।

৭৯০) **উদ্ভবঃ**—স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠ জন্ম ধারণকারী, ৭৯১) **সুন্দরঃ**—সর্বাধিক ভাগ্যশালী হওয়ায় পরম সুন্দর, ৭৯২)

সুন্দঃ—পরম করুণাশীল, ৭৯৩) রত্ননাভঃ—রত্নের ন্যায় সুন্দর নাভিসম্পন্ন, ৭৯৪) সুলোচনঃ—সুন্দর চক্ষুসম্পন্ন, ৭৯৫) অর্কঃ—ব্রহ্মাদি পূজ্য পুরুষদেরও পূজনীয় যিনি, ৭৯৬) বাজসনঃ—যাচনাকারীকে অন্নপ্রদান করেন যিনি, ৭৯৭) শৃঙ্গী—প্রলয়কালে শৃঙ্গযুক্ত মৎস্যবিশেষের রূপ ধারণকারী, ৭৯৮) জয়ন্তঃ—শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্তকারী, ৭৯৯) সর্ববিজয়ী—সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সব কিছু যিনি জানেন এবং সকলকে পরাস্তকারী।

৮০০) সুবর্ণবিন্দুঃ—সুন্দর অক্ষর এবং বিন্দুদ্বারা যুক্ত ওঁ-করস্বরূপ নাম ব্রহ্ম, ৮০১) অক্ষোভ্যঃ—কারো দ্বারা ক্ষুভিত হন না যিনি, ৮০২) সর্ব বাগীশ্বরেশ্বরঃ—সমস্ত বাণীপতিদের অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও স্বামী, ৮০৩) মহাহ্রদঃ—ধ্যানকারীগণ যাতে ডুব দিয়ে আনন্দে মগ্ন হন, তেমনই পরমানন্দের মহাসরোবর, ৮০৪) মহাগর্তঃ—মায়ারূপ মহাগর্ত, ৮০৫) মহাভূতঃ—ত্রিকালে কখনো বিনাশপ্রাপ্ত না হওয়া মহাভূতস্বরূপ, ৮০৬) মহানিধিঃ—সকলের মহান নিবাসস্থল।

৮০৭) কুমুদঃ—কু অর্থাৎ পৃথিবী হতে তার ভার লাঘব করে প্রসন্ন করেন যিনি, ৮০৮) কুন্দরঃ—হিরণ্যাক্ষকে বধ করার জন্য পৃথিবী বিদীর্ণ করেন যিনি, ৮০৯) কুন্দঃ—কশ্যপকে পৃথিবী প্রদানকারী, ৮১০) পর্জন্যঃ—বৃষ্টির মতো সমস্ত ইষ্ট বস্তু বর্ষণকারী, ৮১১) পাবনঃ—স্মরণ করা মাত্র পবিত্র করেন যিনি, ৮১২) অনিলঃ—সদা প্রবুদ্ধ এরূপ, ৮১৩) অমৃতাসঃ—যার আশা কখনো বিফল হয় না—এরূপ অমোঘসংকল্প, ৮১৪) অমৃতবপুঃ—যার দেহ (কলেবর) কখনো নষ্ট হয় না—এরূপ নিত্য বিগ্রহ, ৮১৫) সর্বজ্ঞঃ—সদা-সর্বদা যিনি সব জানেন, ৮১৬) সর্বতোমুখঃ—সর্বদিকে যার মুখ অর্থাৎ তাঁর ভক্তেরা ভক্তিপূর্বক যেখানে যা কিছু অর্পণ করে, তা যিনি ভক্ষণ করেন।

৮১৭) সুলভঃ—নিত্য নিরন্তর চিন্তাকারীকে এবং একনিষ্ঠ শ্রদ্ধালু ভক্তদের বিনা পরিশ্রমে সহজেই যিনি প্রাপ্ত হন, ৮১৮) সুব্রতঃ—সুন্দর ভোজনকারী অর্থাৎ নিজ ভক্তদের প্রীতিপূর্বক অর্পণ করা পত্র-পুষ্প ইত্যাদি সাধারণ বস্তুও শ্রেষ্ঠ মনে করে যিনি গ্রহণ করেন, ৮১৯) সিদ্ধঃ—স্বভাবতই সমস্ত সিদ্ধিযুক্ত, ৮২০) শত্রুজিৎ—দেবতা এবং সৎপুরুষদের শত্রুদের জয় করেন যিনি, ৮২১) শত্রুতাপনঃ—শত্রুদের অবদমন করেন যিনি, ৮২২) ন্যগ্রোধঃ—বটবৃক্ষরূপ, ৮২৩) উদুম্বরঃ—কারণরূপে আকাশেরও ওপরে অবস্থানকারী, ৮২৪) অশ্বত্থঃ—অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ, ৮২৫) চাণূরান্ধ্রনিষূদনঃ—চাণূর নামক অন্ধ্রজাতির বীর মল্লের নিধনকারী।

৮২৬) সহস্রার্চিঃ—অনন্ত কিরণযুক্ত, ৮২৭) সপ্তজিহ্বঃ—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, ধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গীনি এবং বিশ্বরুচি—এই সাত জিহ্বা সংবলিত অগ্নিস্বরূপ, ৮২৮) সপ্তৈধাঃ—সাত দীপ্তি সংবলিত অগ্নিস্বরূপ, ৮২৯) সপ্তবাহনঃ—সাতটি অশ্বযুক্ত সূর্যরূপ, ৮৩০) অমূর্তিঃ—মূর্তিরহিত নিরাকার, ৮৩১) অনঘঃ—সর্বপ্রকারে নিষ্পাপ, ৮৩২) অচিন্ত্যঃ—কোনোভাবেই চিন্তায় যিনি ধরা দেন না, ৮৩৩) ভয়কৃৎ—কুকর্মকারীদের ভীত-সন্ত্রস্তকারী, ৮৩৪) ভয়নাশনঃ—স্মরণকারী এবং সৎপুরুষদের ভয়নাশকারী।

৮৩৫) অণুঃ—অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ৮৩৬) বৃহৎ—সব থেকে বড়, ৮৩৭) কৃশঃ—অত্যন্ত ক্ষীণ ও হাল্কা, ৮৩৮) স্থূলঃ—অত্যন্ত মোটা ও ভারী, ৮৩৯) গুণভৃৎ—সমস্ত গুণ ধারণকারী, ৮৪০) নির্গুণঃ—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণরহিত, ৮৪১) মহান্—গুণ, প্রভাব ; ঐশ্বর্য এবং জ্ঞান প্রভৃতির আতিশয্যের জন্য পরম মহত্ত্বসম্পন্ন, ৮৪২) অধৃতঃ—যাঁকে কেউ ধারণ করতে পারে না—এরূপ নিরাধার, ৮৪৩) স্বধৃতঃ—নিজেরই মহিমায় স্থিত, ৮৪৪) স্বাস্যঃ—সুমুখশ্রীযুক্ত, ৮৪৫) প্রাগ্বংশঃ—যাঁর থেকে সমস্ত বংশপরম্পরা আরম্ভ হয়েছে—এরূপ সমস্ত পূর্বপুরুষদেরও আদিপুরুষ, ৮৪৬) বংশবর্ধনঃ—জগৎ প্রপঞ্চরূপ বংশ এবং যাদববংশ বৃদ্ধিকারী।

৮৪৭) ভারভৃৎ—শেষনাগ অর্থাৎ অনন্তাদি রূপে পৃথিবীতে ভার বহনকারী এবং নিজ ভক্তদের যোগক্ষেমরূপ ভার বহনকারী, ৮৪৮) কথিতঃ—বেদ, শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের দ্বারা যাঁর গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য এবং স্বরূপ বারংবার বলা হয়েছে, এরূপ সকলের দ্বারা বর্ণিত, ৮৪৯) যোগী—নিত্য সমাধিযুক্ত, ৮৫০) যোগীশঃ—সমস্ত যোগীর স্বামী, ৮৫১) সর্বকামদঃ—সমস্ত কামনা পূরণকারী, ৮৫২) আশ্রমঃ—সকলকে বিশ্রাম প্রদানকারী, ৮৫৩) শ্রমণঃ—দুষ্টদের সন্তপ্তকারী, ৮৫৪) ক্ষামঃ—প্রলয়কালে সমস্ত প্রজার নাশকারী,

৮৫৫) **সুপর্ণঃ**—সুন্দর পত্রবিশিষ্ট (সংসার বৃক্ষস্বরূপ), ৮৫৬) **বায়ুবাহনঃ**—বায়ুকে চলার জন্য শক্তিপ্রদানকারী।

৮৫৭) **ধনুর্ধরঃ**—ধনুকধারী শ্রীরাম, ৮৫৮) **ধনুর্বেদঃ**—ধনুর্বিদ্যার পারঙ্গম শ্রীরাম, ৮৫৯) **দণ্ডঃ**—দমনকারীদের দমন শক্তি, ৮৬০) **দময়িতা**—যম এবং রাজা প্রভৃতি রূপে দমনকারী, ৮৬১) **দমঃ**—দণ্ডের কার্য অর্থাৎ যাকে দণ্ড দেওয়া হয়, তাদের শোধনরূপ, ৮৬২) **অপরাজিতঃ**—যিনি শত্রুদের দ্বারা কখনো পরাজিত হন না, ৮৬৩) **সর্বসহঃ**—সব কিছু সহ্য করার সামর্থ্যযুক্ত, অতিশয় তিতিক্ষু, ৮৬৪) **নিয়ন্তা**—সকলকে নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োগকারী, ৮৬৫) **অনিয়মঃ**—নিয়মদ্বারা যিনি নিয়ন্ত্রিত নন, যাঁকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এরূপ পরম স্বাধীন, ৮৬৬) **অযমঃ**—যাঁর কোনো শাসক নেই অথবা মৃত্যুরহিত।

৮৬৭) **সত্ত্ববান্**—বল, বীর্য, সামর্থ্য ইত্যাদি সমস্ত সত্ত্বসম্পন্ন, ৮৬৮) **সাত্ত্বিকঃ**—সত্ত্বগুণ প্রধান বিগ্রহ, ৮৬৯) **সত্যঃ**—সত্যভাষণ স্বরূপ, ৮৭০) **সত্যধর্মপরায়ণঃ**—প্রকৃত ভাষণ এবং ধর্মের পরম আধার, ৮৭১) **অভিপ্রায়ঃ**—প্রেমিকেরা যাঁকে আকাঙ্ক্ষা করেন, এরূপ পরম ইষ্ট, ৮৭২) **প্রিয়ার্হঃ**—অত্যন্ত প্রিয়বস্তু সমর্পণ করার যোগ্য পাত্র, ৮৭৩) **অর্হঃ**—সকলের পরম পূজনীয়, ৮৭৪) **প্রিয়কৃৎ**—ভজনকারীদের প্রিয় করেন যিনি, ৮৭৫) **প্রীতিবর্ধনঃ**—নিজ প্রেমিকদের প্রেম বৃদ্ধিকারী।

৮৭৬) **বিহায়সগতিঃ**—আকাশে গমনকারী, ৮৭৭) **জ্যোতিঃ**—স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, ৮৭৮) **সুরুচিঃ**—সুন্দর রুচি এবং কান্তিসম্পন্ন, ৮৭৯) **হুতভুক্**—যজ্ঞে হবন করা সমস্ত হবিকে অগ্নিরূপে ভক্ষণকারী, ৮৮০) **বিভুঃ**—সর্বব্যাপী, ৮৮১) **রবিঃ**—সমস্ত রস শোষণকারী সূর্য, ৮৮২) **বিরোচনঃ**—বিবিধপ্রকারে জ্যোতি বিকীরণকারী, ৮৮৩) **সূর্যঃ**—শোভা প্রকাশকারী, ৮৮৪) **সবিতা**—সমস্ত জগতের প্রসব অর্থাৎ উৎপন্নকারী, ৮৮৫) **রবিলোচনঃ**—সূর্যরূপে নেত্রবিশিষ্ট।

৮৮৬) **অনন্তঃ**—সর্বপ্রকার অন্তরহিত, ৮৮৭) **হুতভুক্**—যজ্ঞে প্রদত্ত সামগ্রী সেই সেই দেবতার রূপে ভক্ষণকারী, ৮৮৮) **ভোক্তা**—প্রকৃতিকে ভোগকারী, ৮৮৯) **সুখদঃ**—ভক্তদের দর্শনরূপে পরমসুখ প্রদানকারী, ৮৯০) **নৈকজঃ**—ধর্মরক্ষা, সাধুরক্ষা প্রভৃতি পরম বিশুদ্ধ হেতুদ্বারা স্বেচ্ছায় বহু জন্মধারণকারী, ৮৯১) **অগ্রজঃ**—সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণকারী আদিপুরুষ, ৮৯২) **অনির্বিণ্ণঃ**—পূর্ণকাম হওয়ায় যিনি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য, ৮৯৩) **সদামর্ষী**—সৎপুরুষদের যিনি ক্ষমা করেন, ৮৯৪) **লোকাধিষ্ঠানম্**—সমস্ত লোকের আধার, ৮৯৫) **অদ্ভুতঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্যময়।

৮৯৬) **সনাৎ**—অনন্তকালস্বরূপ, ৮৯৭) **সনাতনতমঃ**—সকলের কারণ হওয়ায় ব্রহ্মাদি পুরুষদের থেকেও পরম পুরাণপুরুষ, ৮৯৮) **কপিলঃ**—মহর্ষি কপিল, ৮৯৯) **কপিঃ**—সূর্যদেব, ৯০০) **অপ্যয়ঃ**—সম্পূর্ণ জগতের লয়স্থান, ৯০১) **স্বস্তিদঃ**—পরমানন্দরূপ মঙ্গলদায়ক, ৯০২) **স্বস্তিকৃৎ**—আশ্রিতজনদের কল্যাণকারী, ৯০৩) **স্বস্তি**—কল্যাণস্বরূপ, ৯০৪) **স্বস্তিভুক্**—ভক্তদের পরম কল্যাণের রক্ষাকারী, ৯০৫) **স্বস্তিদক্ষিণঃ**—কল্যাণ করতে সক্ষম এবং শীঘ্রই যিনি কল্যাণ করেন।

৯০৬) **অরৌদ্রঃ**—সর্বপ্রকার রুদ্র (ক্রূর) ভাবরহিত, শান্তমূর্তি, ৯০৭) **কুণ্ডলী**—সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান মকরাকৃতি কুণ্ডলধারণকারী, ৯০৮) **চক্রী**—সুদর্শনচক্র ধারণকারী, ৯০৯) **বিক্রমী**—সবার থেকে বিশেষ পরাক্রমশালী, ৯১০) **উর্জিতশাসনঃ**—যাঁর শ্রুতি-স্মৃতিরূপ শাসন অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, এরূপ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শাসনকারী, ৯১১) **শব্দাতিগঃ**—শব্দ যেখানে পৌঁছায় না, এরূপ বাক্যের অবিষয়, ৯১২) **শব্দসহঃ**—সমস্ত বেদশাস্ত্র যাঁর মহিমা গান করে, ৯১৩) **শিশিরঃ**—ত্রিতাপপীড়িতদের শান্তি প্রদানকারী শীতলমূর্তি, ৯১৪) **শর্বরীকরঃ**—জ্ঞানীদের সংসার রাত্রি এবং অজ্ঞানীদের জ্ঞান রাত্রি—এই দুটি যিনি উৎপন্ন করেন।

৯১৫) **অক্রূরঃ**—সর্বপ্রকারের ক্রূরভাবরহিত, ৯১৬) **পেশলঃ**—মন, বাক্য ও কর্ম—সর্বভাবে সুন্দর হওয়ায় পরম সুন্দর, ৯১৭) **দক্ষঃ**—সর্বভাবে সমৃদ্ধ, পরম শক্তিশালী এবং ক্ষণমাত্রে অতি বৃহৎ কর্মসাধনে কুশল, ৯১৮) **দক্ষিণঃ**—সংহারকারী, ৯১৯) **ক্ষমিণাংবরঃ**—ক্ষমাশীলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ৯২০) **বিদ্বত্তমঃ**—বিদ্বানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরম বিদ্বান, ৯২১) **বীতভয়ঃ**—সর্বপ্রকার ভয়রহিত, ৯২২) **পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ**—যাঁর

নাম, গুণ, মহিমা এবং স্বরূপের শ্রবণ ও কীর্তন পরম পুণ্য অর্থাৎ পরম পবিত্ররূপ।

৯২৩) **উত্তারণঃ**—সংসার-সাগর পার করেন যিনি, ৯২৪) **দুষ্কৃতিহা**—পাপ এবং পাপী নাশকারী, ৯২৫) **পুণ্যঃ**—স্মরণকারী সমস্ত পুরুষদের পবিত্র করেন যিনি, ৯২৬) **দুঃস্বপ্ননাশনঃ**—ধ্যান, স্মরণ, কীর্তন এবং পূজা করলে দুঃস্বপ্ন এবং সংসাররূপ দুঃস্বপ্ন নাশকারী, ৯২৭) **বীরহা**—শরণাগতদের বিবিধ গতি অর্থাৎ সংসারচক্র-নাশকারী ৯২৮) **রক্ষণঃ**—সর্বপ্রকারে রক্ষাকারী, ৯২৯) **সন্তঃ**—বিদ্যা ও বিনয় প্রচার করার জন্য সন্তরূপে যিনি প্রকটিত হন, ৯৩০) **জীবনঃ**—সমস্ত প্রজাকে প্রাণরূপে যিনি জীবিত রাখেন, ৯৩১) **পর্যবস্থিতঃ**—সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে যিনি স্থিত।

৯৩২) **অনন্তরূপঃ**—অনন্ত-অমিতরূপসম্পন্ন, ৯৩৩) **অনন্তশ্রীঃ**—অনন্তশ্রী অর্থাৎ অপরিমিত পরাশক্তি যুক্ত, ৯৩৪) **জিতমন্যুঃ**—সর্বপ্রকারে ক্রোধজয়কারী, ৯৩৫) **ভয়াপহঃ**—ভক্তভয়কারী, ৯৩৬) **চতুরশ্রঃ**—চার বেদরূপে কোণ সম্বলিত মঙ্গলমূর্তি এবং ন্যায়শীল, ৯৩৭) **গভীরাত্মা**—গম্ভীর মনযুক্ত, ৯৩৮) **বিদিশঃ**—অধিকারীদের কর্মানুসারে বিভাগপূর্বক নানাপ্রকার ফলপ্রদানকারী, ৯৩৯) **ব্যাদিশঃ**—সকলকে যথাযোগ্য বিবিধ নির্দেশপ্রদানকারী, ৯৪০) **দিশঃ**— বেদরূপে সমস্ত কর্মের ফল ব্যক্তকারী।

৯৪১) **অনাদিঃ**—যার কোনো আদি নেই এরূপ সকলের কারণ স্বরূপ, ৯৪২) **ভূর্ভুবঃ**—পৃথিবীরও আধার, ৯৪৩) **লক্ষ্মীঃ**—সমস্ত শোভমান বস্তুর শোভা, ৯৪৪) **সুবীরঃ**—আশ্রিত জনেদের হৃদয়ে সুন্দর কল্যাণময় বিবিধ ভাবের প্রেরণাকারী, ৯৪৫) **রুচিরাঙ্গদঃ**—পরম রুচিকর কল্যাণময় বাজুবন্দ ধারণকারী, ৯৪৬) **জননঃ**—প্রাণীমাত্রেরই উৎপন্নকারী, ৯৪৭) **জনজন্মাদিঃ**—জন্মগ্রহণকারীদের জন্মের মূলকারণ, ৯৪৮) **ভীমঃ**—দুষ্টদের পক্ষে ভয়ংকর, ৯৪৯) **ভীমপরাক্রমঃ**—অত্যন্ত ভয় উৎপন্নকারী পরাক্রমযুক্ত।

৯৫০) **আধারনিলয়ঃ**—আধাররূপ পৃথিবী ইত্যাদি সমস্ত ভূতগণের স্থান, ৯৫১) **অধাতা**—যাকে কেউ সৃষ্টি করার নেই, তেমন স্বয়ং স্থিত, ৯৫২) **পুষ্পহাসঃ**—পুষ্পের ন্যায় উৎফুল্ল হাস্য সমন্বিত, ৯৫৩) **প্রজাগরঃ**—ভালোভাবে জাগ্রত থাকা নিত্য প্রবুদ্ধ, ৯৫৪) **উর্ধ্বগঃ**—সবার ওপরে যিনি অবস্থান করেন, ৯৫৫) **সৎপথাচারঃ**—সৎপুরুষদের পথ আচরণকারী মর্যাদা পুরুষোত্তম, ৯৫৬) **প্রাণদঃ**—পরীক্ষিৎ এবং অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের জীবনদায়ী ৯৫৭) **প্রণবঃ**—ওঁকারস্বরূপ, ৯৫৮) **পণঃ**—যথাযোগ্য আচরণকারী।

৯৫৯) **প্রমাণম্**—স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় স্বয়ং প্রমাণ স্বরূপ, ৯৬০) **প্রাণনিলয়ঃ**—প্রাণের আধারভূত, ৯৬১) **প্রাণভৃৎ**—সমস্ত প্রাণ পোষণকারী, ৯৬২) **প্রাণজীবনঃ**—প্রাণবায়ুর সঞ্চার দ্বারা প্রাণীদের জীবিত রাখেন যিনি, ৯৬৩) **তত্ত্বম্**—সঠিক তত্ত্বরূপ, ৯৬৪) **তত্ত্ববিৎ**—সঠিক তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে যিনি জানেন, ৯৬৫) **একাত্মা**—অদ্বিতীয়স্বরূপ, ৯৬৬) **জন্মমৃত্যুজরাতিগঃ**—জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধত্ব ইত্যাদি শরীর ধর্ম থেকে সর্বতোভাবে অতীত।

৯৬৭) **ভূর্ভুবঃ স্ব স্তরুঃ**—ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ রূপ ত্রিলোক ব্যাপ্তকারী এবং সংসার বৃক্ষস্বরূপ, ৯৬৮) **তারঃ**—সংসার-সাগর থেকে উদ্ধারকারী, ৯৬৯) **সবিতা**—সকলের উৎপাদনকারী পিতামহ, ৯৭০) **প্রপিতামহঃ**—পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা, ৯৭১) **যজ্ঞঃ**—যজ্ (স্বরূপ), ৯৭২) **যজ্ঞপতিঃ**—সমস্ত যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, ৯৭৩) **যজ্বা**—যজমানরূপে যজ্ঞকারী, ৯৭৪) **যজ্ঞাঙ্গঃ**—সমস্ত যজ্ঞরূপ অঙ্গ সম্বলিত, ৯৭৫) **যজ্ঞবাহনঃ**—যজ্ঞকে যিনি প্রচলিত রাখেন।

৯৭৬) **যজ্ঞভৃৎ**—যজ্ঞাদিকে যিনি ধারণ-পোষণ করেন, ৯৭৭) **যজ্ঞকৃৎ**—যজ্ঞাদির রচয়িতা, ৯৭৮) **যজ্ঞী**—সমস্ত যজ্ঞ যাঁতে সমাপ্ত হয় তেমন যজ্ঞশেষী, ৯৭৯) **যজ্ঞভুক্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, ৯৮০) **যজ্ঞসাধনঃ**—ব্রহ্মযজ্ঞ, জপযজ্ঞ প্রভৃতি বহু প্রকারের যজ্ঞ যাঁর প্রাপ্তির সাধন, ৯৮১) **যজ্ঞান্তকৃৎ**—যজ্ঞাদির অন্তকারী অর্থাৎ তার ফলপ্রদানকারী, ৯৮২) **যজ্ঞগুহ্যম্**—যজ্ঞে গুপ্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং নিষ্কাম যজ্ঞস্বরূপ, ৯৮৩) **অন্নম্**—সমস্ত প্রাণীকে অন্ন অর্থাৎ অন্নের ন্যায় তাদের সর্বপ্রকারে তুষ্টি-পুষ্টিকারী এবং, ৯৮৪) **অন্নাদঃ**—সকল অন্নের ভোক্তা।

৯৮৫) **আত্মযোনিঃ**—যার কারণ অন্য কেউ নয়—তেমন স্বয়ং যোনিস্বরূপ, ৯৮৬) **স্বয়ংজাতঃ**—নিজেই নিজের ইচ্ছায় প্রকটিত হন যিনি, ৯৮৭) **বৈখানঃ**—

পাতালবাসী হিরণ্যাক্ষকে বধ করার জন্য পৃথিবী খননকারী, ৯৮৮) **সামগায়নঃ**—সামগানকারী, ৯৮৯) **দেবকীনন্দনঃ**—দেবকীপুত্র, ৯৯০) **স্রষ্টা**—সমস্ত জগতের রচয়িতা, ৯৯১) **ক্ষিতীশঃ**—পৃথিবীপতি, ৯৯২) **পাপনাশনঃ**—স্মরণ, কীর্তন, পূজন ও ধ্যানাদি করলে সমস্ত পাপ যিনি নাশ করেন।

৯৯৩) **শঙ্খভৃত**—পাঞ্চজন্য শঙ্খধারণকারী, ৯৯৪) **নন্দকী**—নন্দক নামক খড়্গধারণকারী, ৯৯৫) **চক্রী**—সংসার-চক্রের চালনাকারী, ৯৯৬) **শার্ঙ্গধন্বা**—শার্ঙ্গধনুকধারী, ৯৯৭) **গদাধরঃ**—কৌমোদকি নামক গদা ধারণকারী, ৯৯৮) **রথাঙ্গপাণিঃ**—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্র ধারণকারী, ৯৯৯) **অক্ষোভ্যঃ**—যাঁকে কোনো কিছুর দ্বারা ক্ষোভিত—চলায়মান করা যায় না, ১০০০) **সর্বপ্রহরণায়ুধঃ**—জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত যত প্রকার অস্ত্র যুদ্ধে প্রয়োগ হয়, সেই সবই যিনি ধারণ করেন।

এখানে এক হাজার নামের সমাপ্তি দেখাবার জন্য অন্তিম নাম দুবার লেখা হয়েছে, মঙ্গলবাচক হওয়ায় ওঁ-কার স্মরণ করা হয়েছে, শেষে নমস্কার করে ভগবানের পূজা সম্পন্ন হয়েছে।

এইভাবে কীর্তন করার উপযুক্ত কেশবের দিব্য এক সহস্র নাম পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এই বিষ্ণু সহস্রনাম সর্বদা শ্রবণ করেন এবং যিনি প্রতিদিন এটি কীর্তন বা পাঠ করেন, তাঁর ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও কিছু অশুভ হয় না। এই বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ বা কীর্তন করলে ব্রাহ্মণ বেদান্তপারগামী হয় অর্থাৎ উপনিষদের অর্থরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করে। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে বিজয় লাভ করে, বৈশ্য ব্যবসায়ে ধন লাভ করে এবং শূদ্র সুখ পায়। ধর্ম আকাঙ্ক্ষাকারী ধর্মলাভ করে, ভোগইচ্ছাকারী ভোগ পায় এবং প্রজাইচ্ছাকারী প্রজালাভ করে। যে ভক্তিমান ব্যক্তি সর্বদা প্রাতঃকালে উঠে স্নান করে পবিত্র হয়ে মনে মনে বিষ্ণুর ধ্যান করে এই বাসুদেব সহস্রনাম পাঠ করে, সে মহাযশ লাভ করে, জাতির মধ্যে মহত্ত্ব পায়, অচল সম্পত্তি লাভ করে, অতি উত্তম গতি পায়, তার কোথাও ভয় থাকে না। সে বীর্য ও তেজ লাভ করে এবং আরোগ্যবান, কান্তিমান, বলবান, রূপবান, সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। রুগ্ন ব্যক্তির রোগ দূর হয়, বন্ধনদশাগ্রস্ত মানুষ বন্ধন মুক্ত হয়, ভীত ব্যক্তির ভয় দূর হয় এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের বিপদ দূর হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিসম্পন্ন হয়ে এই বিষ্ণুসহস্রনামের দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবানের প্রত্যহ স্তুতি করে, সে শীঘ্রই সমস্ত সংকট থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বাসুদেবের আশ্রিত এবং তাঁর পরায়ণ, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ হৃদয়ে সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। বাসুদেবের ভক্তদের কখনো কোথাও অশুভ হয় না এবং তাদের জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্তিভাবে এই বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করে, সে আত্মসুখ, ক্ষমা, লক্ষ্মী, ধৈর্য, স্মৃতি এবং কীর্তিলাভ করে। পুরুষোত্তমের পুণ্যাত্মা ভক্তদের কখনো ক্রোধ হয় না, ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না, লোভ হয় না এবং তাদের বুদ্ধি কখনো অশুদ্ধ হয় না। স্বর্গ, সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র খচিত আকাশ, দশ দিক, পৃথিবী এবং মহাসাগর—এ সবই বাসুদেবের বীর্য থেকে ধারণ করা হয়েছে। দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসসহ এই স্থাবর-জঙ্গম সংবলিত সমস্ত জগৎ শ্রীকৃষ্ণের অধীনে থেকে যথাযোগ্য কাজ করে চলেছে। ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৈর্য, ক্ষেত্র (শরীর) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা)—এ সবই শ্রীবাসুদেবের রূপ, বেদ এরকমই বলে থাকে। সব শাস্ত্রে আচারকে প্রথম বলে মানা হয়, আচার থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্মের স্বামী ভগবান অচ্যুত। ঋষি, পিতৃপুরুষ, দেবতা, পঞ্চমহাভূত, ধাতু ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ—এ সবই নারায়ণের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। যোগ-জ্ঞান-সাংখ্য-বিদ্যা-শিল্প ইত্যাদি কর্ম ; বেদ, শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান—এ সবই বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই সব বিশ্বের ভোক্তা এবং অবিনাশী বিষ্ণুই বহু রূপ ধারণ করে রয়েছেন এবং ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে সব কিছু ভোগ করছেন। যে ব্যক্তি পরম শ্রেয় ও সুখলাভ করতে চায়, সে ভগবান ব্যাসদেব কথিত এই বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করবে। যিনি বিশ্বের ঈশ্বর ; জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী, জন্মরহিত কমললোচন ভগবান বিষ্ণুর ভজন করেন, তিনি কখনো পরাভবের সম্মুখীন হন না।

জপযোগ্য মন্ত্র এবং সকাল-সন্ধ্যায় আরাধনা করার যোগ্য দেবতাদির মঙ্গলময় নাম-বর্ণনা এবং গায়ত্রী জপের ফল

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য জানেন, সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করছি যে প্রত্যহ কোন্ স্তোত্র বা মন্ত্র জপ করলে ধর্মের মহান ফল লাভ করা যায় ? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ বা কোনো কর্ম আরম্ভ করার সময় অথবা দেবযজ্ঞে বা শ্রাদ্ধের সময় কার জপ করলে কর্মের পূর্তি হয় ? শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শান্তিনাশ ও ভয়নিবারণকারী এমন কী জপ করা যায়, যা বেদের সমান গুরুত্বপূর্ণ ? কৃপা করে আপনি তা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি বেদব্যাসের বলা মন্ত্র আমি তোমাকে জানাচ্ছি, একাগ্র চিত্তে শোনো—সাবিত্রী দেবী এই মন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন এবং এটি সঙ্গে সঙ্গেই পাপ থেকে মুক্ত করে দেয়। যে এই মন্ত্র শোনে, সে দীর্ঘজীবী হয়, তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং সে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দ উপভোগ করে। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনকারী এবং সর্বদা সত্যব্রত আচরণে সংলগ্ন থাকা রাজর্ষিগণ সর্বদাই এই মন্ত্র জপ করতেন। যে রাজা ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্তিপূর্বক প্রত্যহ এই মন্ত্র পাঠ করেন, তিনি সর্বোত্তম সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

(সেই মন্ত্র এইরূপ—) মহাব্রতধারী বশিষ্ঠ, বেদনিধি, পরাশর, বিশাল, সর্পরূপধারী অনন্ত (শেষনাগ), অক্ষয় সিদ্ধগণ, ঋষিবৃন্দ ও পরাৎপর, দেবাদিদেব, বরদাতা এবং সহস্র মস্তক সমন্বিত শিব এবং সহস্র নামধারণকারী ভগবান জনার্দনকে নমস্কার।

অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, অপরাজিত, ঋৎ, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন এবং ঈশ্বর—এই একাদশ জন রুদ্র সুবিখ্যাত, যাঁরা ত্রিলোকের স্বামী। বেদের শতরুদ্রিয় প্রকরণে রুদ্রের শত শত নাম বলা হয়েছে। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর বরুণ, ধাতা, অর্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু—এই দ্বাদশ জন হলেন আদিত্য। এঁরা সকলেই কশ্যপের পুত্র। ধর, ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস—এঁরা হলে অষ্টবসু। নাসত্য ও দস্র—এঁরা দুজন অশ্বিনীকুমার নামে প্রসিদ্ধ। ভগবান সূর্যের বীর্য থেকে এঁদের উৎপত্তি। অশ্বরূপধারিণী সংজ্ঞাদেবীর নাক থেকে সৃষ্ট। (এঁরা হলেন তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ তেত্রিশ প্রকারের দেবতা)।

এবার আমি জগতে কর্মের ওপর দৃষ্টি রক্ষাকারী তথা যজ্ঞ, দান এবং সুকৃত যাঁরা জানেন, সেই দেবতাদের পরিচয় জানাচ্ছি। এই দেবগণ স্বয়ং অদৃশ্য থেকে সমস্ত প্রাণীর শুভাশুভ কর্মগুলি লক্ষ্য করেন। এঁদের নাম হল—মৃত্যু, কাল, বিশ্বদেব এবং পিতৃগণ। এতদ্ব্যতীত তপস্বী মুনি ও তপ এবং মোক্ষ সংলগ্ন সিদ্ধ মহর্ষিগণও সমস্ত জগতের ওপর দৃষ্টি রাখেন। এঁরা তাঁদের নাম কীর্তনকারী মানুষদের শুভফল প্রদান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা যে লোকগুলি সৃষ্টি করেছেন, সেই সবগুলিতে তিনি দিব্য তেজে নিবাস করেন এবং শুদ্ধভাবে সকলের কর্মাদি নিরীক্ষণ করেন। এঁরা সকলের প্রাণের স্বামী। যে ব্যক্তি শুদ্ধভাবে এঁদের আরাধনা করে, সে ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রভৃতির পর্যাপ্ত অধিকারী হয় এবং লোকনাথ ব্রহ্মারচিত মঙ্গলময় পবিত্রলোকে গমন করে। উপরে বর্ণিত তেত্রিশজন দেবতা সমস্ত প্রাণীর প্রভু। তেমনই নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, সমস্ত জগতের প্রভু গণেশ, বিনায়ক, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, যোগিগণ, ভূতগণ, নক্ষত্র, নদীসকল, আকাশ, পক্ষীরাজ গরুড়, পৃথিবীতে তপঃসিদ্ধ মহাত্মা, স্থাবর, জঙ্গম, হিমালয়, সমস্ত পর্বত, চার সমুদ্র, ভগবান শংকরের তুল্য মহাপরাক্রমশালী তাঁর অনুচরগণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, স্কন্দ এবং অম্বিকা—এই সকল নাম শুদ্ধভাবে কীর্তন করে যেসব মানুষ, তাদের সব পাপ বিনাশ হয়।

এবার আমি শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের নাম জানাচ্ছি—যবক্রীত্, রৈভ্য, অর্বাবসু, পরাবসু, উশিজের পুত্র কক্ষীবান্, অঙ্গিরানন্দন বল এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্বঋষি—এই সব ঋষি ব্রহ্মতেজসম্পন্ন এবং লোকস্রষ্টারূপে প্রসিদ্ধ। এঁদের তেজ রুদ্র, অগ্নি এবং বসুদের সমান। এঁরা পৃথিবীতে শুভকর্ম করে এখন স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে আনন্দপূর্বক বাস করে শুভফল উপভোগ করছেন। এই সাতজনই মহর্ষি মহেন্দ্রের গুরু (ঋত্বিক) এবং পূর্বদিকে বাস করেন। যে সকল ব্যক্তি শুদ্ধ চিত্তে এঁদের নাম কীর্তন করেন, তাঁরা ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, ঊর্ধ্ববাহু, তৃণ, সোমাঙ্গিরা এবং মিত্রাবরুণের পুত্র মহাপ্রতাপশালী অগস্ত্যমুনি—এই সাতজন ধর্মরাজের (যমের) ঋত্বিক এবং এঁরা দক্ষিণ দিকে বাস করেন। দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং অত্রির পুত্র সারস্বত মুনি—এই

সাতজন বরুণের ঋত্বিক এবং এঁরা পশ্চিম দিকে বাস করেন। অত্রি, ভগবান বশিষ্ঠ, মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র এবং ঋচীকনন্দন জমদগ্নি—এই সাতজন উত্তর দিকে অবস্থান করেন এবং এঁরা কুবেরের গুরু (ঋত্বিক)। এতদ্ব্যতীত আরও সাতজন মহর্ষি আছেন যাঁরা সমস্ত দিকেই বাস করেন। এঁরা হলেন জগৎ সৃষ্টিকারী। উপরিউক্ত মহর্ষিদের নাম স্মরণে মানুষের কীর্তি বৃদ্ধি এবং কল্যাণ হয়। ধর্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল—এই সাতজন পৃথিবী ধারণ করে থাকেন। এই মহাত্মাগণ ইহজগতের শান্তি ও কল্যাণ আনয়নকারী এবং দিকগুলির পালক। এঁরা যে যে দিকে নিবাস করেন সেইদিকে মুখ করে এঁদের শরণ নেওয়া উচিত। এঁদের সমস্ত ভূতাদির স্রষ্টা এবং লোকপাবন বলা হয়। সংবর্ত, মেরুসাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, সাংখ্য, যোগ, নারদ ও মহর্ষি দুর্বাসা—এই সাত ঋষি কঠোর তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় এবং ত্রিভুবন বিখ্যাত। এই সকল ঋষিগণ ব্যতীত আরও বহু মহর্ষি রুদ্রের ন্যায় প্রভাবশালী এবং ব্রহ্মলোক নিবাসকারী। এঁদের ধ্যান করলে মানুষের ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি হয়।

পূর্বকালে এই পৃথিবী যাঁর কন্যা ছিল, সেই বেননন্দন মহারাজ পৃথুর নাম ও গুণকীর্তন করা উচিত। যিনি সূর্যবংশে জন্মগ্রহণ করে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রম দেখিয়েছিলেন, যিনি ইলার গর্ভে উৎপন্ন হয়েছিলেন এবং বুধের প্রিয় পুত্র ছিলেন, সেই ত্রিলোক বিখ্যাত রাজা পুরুরবার নামও স্মরণ করা উচিত। এইরূপ ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ বীর ভরতের এবং যিনি সত্যযুগে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই তপস্বী রাজা রন্তিদেবেরও নামকীর্তন করা কর্তব্য। পরম কান্তিমান রাজা শ্বেত এবং গঙ্গাজলদ্বারা সগরপুত্রদের উদ্ধারকারী মহারাজ ভগীরথের নামও স্মরণযোগ্য। এই সকল রাজাই অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, মহাধৈর্যশালী এবং কীর্তি বৃদ্ধিকারী ছিলেন। এঁদের সকলেরই নামকীর্তন করা উচিত। শ্রুতির আধারভূত পরব্রহ্ম পরমাত্মার কীর্তন সমস্ত প্রাণীর পক্ষে মঙ্গলজনক। মানুষের প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ভগবদ্‌কীর্তনের সঙ্গে উপরিউক্ত দেবতাগণের, ঋষিগণের এবং রাজাদের নাম স্মরণ করা উচিত। এই সকল দেবতাই জগৎকে রক্ষা করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আলো এবং হাওয়া দেন ও প্রজা সৃষ্টি করেন। এঁরাই হলেন বিঘ্নের প্রভু বিনায়ক, শ্রেষ্ঠ, দক্ষ, ক্ষমাশীল এবং জিতেন্দ্রিয়। এই মহাত্মাগণ সকলের পাপ ও পুণ্যাদির সাক্ষী, এঁদের নাম স্মরণ করলে এঁরা মানুষের অমঙ্গল নাশ করেন। যে ব্যক্তি প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে এঁদের নাম ও গুণকীর্তন করেন, তিনি শুভ কর্ম ভোগ প্রাপ্ত হন। প্রতিদিন এই দেবতাদের নামকীর্তন করলে মানুষের দুঃস্বপ্ন নাশ হয় এবং পাপ হতে মুক্তিলাভ হয়। যে দ্বিজ দীক্ষার সময় নিয়মপূর্বক অবস্থান করে এই পবিত্র নামগুলি পাঠ করে, সে ন্যায়বান, আত্মনিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং দোষদৃষ্টি রহিত হয়। রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ এটি পাঠ করলে পাপমুক্ত এবং নীরোগ হয়। যে ব্যক্তি নিজ গৃহে এই নামগুলি পাঠ করে, তার কুলের কল্যাণ হয়। অন্যত্র যাত্রা করার সময় যে ব্যক্তি এই নামাবলি উচ্চারণ করে, তার যাত্রা কুশলে সমাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দেবযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের সময় উপরিউক্ত নাম পাঠ করে, তার হব্য দেবতাগণ ও কব্য পিতৃগণ সাদরে গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি কোথাও যাত্রাকালে অথবা রাজদরবারে যাবার সময় মনে মনে গায়ত্রী জপ করে, সে উত্তম সিদ্ধি লাভ করে। গায়ত্রী জপ করলে রাজা, পিশাচ, রাক্ষস, অগ্নি, জল, হাওয়া এবং সর্প ইত্যাদির ভয় থাকে না। গায়ত্রী মন্ত্র জপকারী ব্যক্তি চার বর্ণ এবং চার আশ্রমে শান্তি স্থাপন করে। যে গৃহে প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করা হয়, সেখানে আগুন লাগে না, বালকের মৃত্যু হয় না এবং সাপ বাস করে না। যে ব্যক্তি পরব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রীর গুণকীর্তন শ্রবণ করে, তার দুঃখ দূর হয় এবং সে পরম গতি লাভ করে। সিদ্ধি প্রাপ্ত মহর্ষি বেদব্যাস কথিত এটি পুরাতন ইতিহাস। এতে পরাশর মুনির দিব্য মতের বর্ণনা আছে। পূর্বকালে ইন্দ্রকে এই উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল, সেটিই আমি তোমাকে শোনালাম। সাবিত্রী মন্ত্র সত্য-সনাতন ব্রহ্মরূপ। এটি সমস্ত ভূতের হৃদয় এবং সনাতনী শ্রুতি। চন্দ্র, সূর্য, রঘু এবং পুরুবংশে উৎপন্ন সকল রাজাই পবিত্রভাবে প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করতেন। গায়ত্রী জগতের প্রাণীদের পরম গতি। কশ্যপ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি আদি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সর্বদা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। ভৃগুর নাম স্মরণ করলে ধর্মবৃদ্ধি হয়, বশিষ্ঠ মুনির নাম স্মরণ করে নমস্কার করলে বীর্যবৃদ্ধি হয়। রাজা রঘুকে প্রণাম করলে সংগ্রামে বিজয়লাভ হয় এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম করলে কখনো রোগ-ব্যাধির ভয় থাকে না। রাজন্! আমি তোমাকে সনাতন ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী জপের মাহাত্ম্য জানালাম।

—○—

ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা এবং কার্তবীর্য ও বায়ুদেবতার কথোপকথন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! জগতে কোন ব্যক্তি পূজনীয় ? কাকে নমস্কার করা উচিত ? কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা কর্তব্য এবং কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে কীরূপ আচরণ করলে ক্ষয়-ক্ষতি হয় না ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণদের অপমান দেবতাদেরও দুঃখ দেয়, সুতরাং রাজার উচিত তিনি যেন ব্রাহ্মণদের পূজা এবং তাঁদের নমস্কার করেন ও তাঁদের সঙ্গে পুত্রের ন্যায় বিনয়পূর্বক ব্যবহার করেন ; কারণ ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের ধর্মমর্যাদা সংরক্ষণকারী সেতুর ন্যায়। তাঁরা অর্থ ত্যাগ করে প্রসন্ন হন এবং বাক্-সংযম করেন। তাঁরা উত্তম নিধি, ব্রত পালন করেন, লোক ও শাস্ত্রের নির্মাতা এবং পরম যশস্বী। তপস্যা তাঁদের ধন এবং বাক্য তাঁদের মহান বল। তাঁরা ধর্মের কারণ, ধর্মজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী, ধর্মের ইচ্ছাকারী, পুণ্যকর্মাদি দ্বারা ধর্মে স্থিত থাকেন এবং ধর্মের সেতু। তাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেই চার প্রকারের প্রজা জীবন ধারণ করে। ব্রাহ্মণই সকলের পথপ্রদর্শক, নেতা, যজ্ঞের পৌরোহিত্যকারী এবং সনাতন। এঁরা দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিদের মুখ এবং হব্য-কব্যে প্রথম ভোজনের অধিকারী। ব্রাহ্মণ সকলকে উপদেশ প্রদান করেন। বেদই ব্রাহ্মণের সম্পদ। তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞান কুশল, মোক্ষধর্মের জ্ঞাতা, সব জীবের গতি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তাকারী। তাঁরা আদি, মধ্য ও অবসানের জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁরা সকল সংশয় থেকে মুক্ত। উচ্চ-নীচ এবং ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞাতা এবং পরম গতি সম্পর্কে অবহিত, সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত এবং নিষ্পাপ। তাঁদের চিত্তে দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ে না। তাঁরা সর্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করায় সম্মান লাভের অধিকারী। জ্ঞানী মহাত্মাগণ তাঁদের সর্বদাই সম্মান দিয়ে থাকেন। তাঁরা চন্দন এবং আবর্জনায়, আহার ও উপবাস এবং রেশম ও মৃগচর্মে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁরা ইচ্ছা করলে বহুদিন না খেয়ে থাকতে পারেন, নিজ ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে স্বাধ্যায় করে শরীর শুষ্ক করতে পারেন এবং যে দেবতা নয় তাকে দেবতা করে তুলতে পারেন। যদি এঁরা কুপিত হন তাহলে দেবতাদেরও দেবত্ব থেকে ভ্রষ্ট করে দিতে পারেন ; নতুন লোক এবং লোকপাল সৃষ্টি করতে পারেন। সেই মহাত্মাদের অভিশাপে সমুদ্রের জলও পানযোগ্য থাকেনি। তাঁদের ক্রোধাগ্নি দণ্ডকারণ্যে এখনও শান্ত হয়নি। এঁরা দেবতাদেরও দেবতা, কারণেরও কারণ এবং প্রমাণেরও প্রমাণ। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণদের অপমান করবে ? ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হোক বা বালক, উভয়েই সম্মানের যোগ্য। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে তপ ও বিদ্যার আধিক্য দেখে একে অন্যকে সম্মান করেন। বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণকেও দেবতার মতো পরম পবিত্র বলে মানা হয়, তাহলে যিনি বিদ্বান তাঁর জন্য আর বলার কী আছে ? তিনি তো মহান দেবতার সমান।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মহামতে ! আপনি কী ফল লক্ষ্য করে এবং কোন কর্মের উদয়ের কথা ভেবে ব্রাহ্মণদের পূজা করেন ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! এই ব্যাপারে কার্তবীর্য অর্জুন এবং বায়ুদেবতার আলোচনারূপ প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা করা হয়। পূর্বকালের কথা, মাহিষ্মতী নগরে সহস্র বাহুধারী কার্তবীর্য অর্জুন নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি মহাবলবান এবং সত্যপরাক্রমী ছিলেন। ইহলোকে সর্বত্র তাঁর আধিপত্য ছিল। এক সময় তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে বিনয় এবং শাস্ত্রসম্মতভাবে বহু দিন ধরে মুনি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করেন এবং নিজের সমস্ত সম্পদ তাঁর সেবাতে অর্পণ করেন। দত্তাত্রেয় তাঁর ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন এবং তিনটি বর চাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

রাজা তখন বললেন—'প্রভু ! আমি যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র বাহু সমন্বিত থাকি এবং গৃহে শুধু দুই হাতই থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে সকল সৈনিক যেন আমার সহস্র বাহু দৃষ্টিগোচর করে এবং আমি নিজ পরাক্রমে যেন পৃথিবী জয় করতে পারি। এইভাবে ধর্মানুসারে পৃথিবী লাভ করে আমি যেন আলস্যরহিত হয়ে তা পালন করি। এতদ্ব্যতীত আমি আর একটি জিনিস আপনার কাছে চাইছি, আপনি কৃপা করে তা পূর্ণ করুন। যদি সৎপথ পরিত্যাগ করে আমি অসত্য পথের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহলে সাধুব্যক্তি আমাকে যেন সঠিক পথে আসার শিক্ষা দেন।'

তাঁর এই প্রার্থনা শুনে দত্তাত্রেয় 'তথাস্তু' বলে তাঁকে উপরিউক্ত বর প্রদান করলেন। তখন রাজা কার্তবীর্য সূর্যের ন্যায় তেজঃপূর্ণ রথে উপবেশন করে (সমস্ত পৃথিবী জয় করার পর) বল ও অহংকারে মোহগ্রস্ত হয়ে বলতে লাগলেন—'ধৈর্য, বীর্য, যশ, শৌর্য, পরাক্রম এবং ওজতে আমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আর কে আছে ?' তাঁর কথা শেষ হতেই আকাশবাণী হল—'মূর্খ ! তুমি জানো না যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের থেকেও শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদের সাহায্যেই ক্ষত্রিয়রা ইহলোকে প্রজাশাসন করতে সক্ষম হয়।'

কার্তবীর্য বললেন—'আমি প্রসন্ন হলে প্রাণী সৃষ্টি করতে পারি এবং ক্রুদ্ধ হলে তাদের নাশও করতে পারি। মন-বাক্য বা ক্রিয়ার দ্বারা কোনোভাবেই ব্রাহ্মণ আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে থেকেই জীবিকা-নির্বাহ করে ; কিন্তু ক্ষত্রিয় কখনো ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে থাকে না। প্রজা-পালনরূপ ধর্ম ক্ষত্রিয়ের ওপরই নির্ভরশীল, ক্ষত্রিয়দের থেকেই ব্রাহ্মণেরা জীবিকা প্রাপ্ত হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ কী করে ক্ষত্রিয়ের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে ? এখন থেকে আমি সর্বদা ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্বাহকারী ব্রাহ্মণদের আমার অধীনে রাখব। আকাশস্থিত গায়ত্রী যে ব্রাহ্মণদের, ক্ষত্রিয়দের হতে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, তা একেবারে মিথ্যা। মৃগচর্মধারী সব ব্রাহ্মণই দুর্বল, আমি সকলকেই পরাজিত করব। ত্রিলোকে দেবতা বা মানুষ এমন কেউ নেই, যে আমাকে রাজ্যভ্রষ্ট করতে সক্ষম ; সুতরাং আমি ব্রাহ্মণদের থেকে শ্রেষ্ঠ। জগতে এতদিন ব্রাহ্মণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মান্য হত, কিন্তু আজ থেকে আমি ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য স্থাপন করব। যুদ্ধে আমার পরাক্রম কেউই সহ্য করতে পারবে না।'

তাঁর কথা শুনে অন্তরীক্ষে অবস্থিত বায়ুদেবতা বললেন—'কার্তবীর্য ! তুমি এই দুষ্ট চিন্তা ত্যাগ করো এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম করো। যদি তুমি এঁদের কোনো ক্ষতি কর, তাহলে তোমার রাজ্যে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে। ব্রাহ্মণ মহা শক্তিশালী, তুমি তাঁদের মাঙ্গলিক কর্মে বিঘ্নপ্রদান করলে, তাঁরা তোমাকে বিনাশ করবেন অথবা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করবেন।' এই কথা শুনে কার্তবীর্য জিজ্ঞাসা করলেন—'মহানুভব ! আপনি কে ?' উত্তর পেলেন—'আমি দেবতাদের দূত বায়ু এবং তোমার মঙ্গলের কথা বলছি।'

কার্তবীর্য বললেন—বায়ুদেব ! এই কথা বলে আপনি ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। ঠিক আছে, আপনার জানা যদি এমন কোনো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থাকেন যিনি পৃথিবী, বায়ু, জল, অগ্নি, সূর্য অথবা আকাশের সমতুল্য, তাহলে বলুন।

বায়ু বললেন—মূর্খ ! আমি ব্রাহ্মণদের কয়েকটি গুণের বর্ণনা করছি, শোনো—তুমি পৃথিবী, জল, অগ্নি ইত্যাদি যে সবের নাম করেছ, ব্রাহ্মণ এদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। একবার রাজা অঙ্গের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার জন্য পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর লোকধারণরূপ ধর্ম (ধরণীত্ব) পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। সেইসময় বিপ্রবর কশ্যপ নিজ শক্তির দ্বারা এই স্থূল পৃথিবীকে ধরে রেখেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ মর্ত্যলোকে এবং স্বর্গেও অজেয়। পূর্বের কথা, মহামনা অঙ্গিরা মুনি দুধ পান করার মতো জলপান করছিলেন। এভাবে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না, তাই পান করতে করতে তিনি পৃথিবীর সমস্ত জল পান করে ফেললেন। পৃথিবীতে জলাভাব দেখা দিলে তিনি আবার জলের মহাস্রোত এনে সমস্ত পৃথিবী পুনরায় জলে ভরে দিলেন। সেই অঙ্গিরা মুনিই একবার আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর ভয়ে আমি এই জগৎ ত্যাগ করে বহুদিন অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম। মহর্ষি গৌতম ইন্দ্রকে অহল্যার ওপর আসক্ত হওয়ার শাপ দিয়েছিলেন, শুধু ধর্মরক্ষার জন্য তিনি তাঁর প্রাণ নেননি। সমুদ্র আগে মিষ্টিজলে ভরা ছিল, ব্রাহ্মণের অভিশাপে তার জল লবণাক্ত হয়ে গেছে। অগ্নির রং আগে সোনার মতো সুন্দর ছিল, তাতে ধোঁয়া ছিল না এবং শিখা সবসময় ওপর দিকে উঠত ; কিন্তু ক্রোধান্বিত অঙ্গিরা ঋষি শাপ দেওয়ায় অগ্নির পূর্বোক্ত গুণসকল নষ্ট হয়ে গেছে। দেখো, ব্রহ্মর্ষি কপিলের শাপে দগ্ধ হওয়া সগরপুত্রদের, যাঁরা যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অশ্বের খোঁজ করতে সমুদ্র পর্যন্ত গিয়ে সেখানে ছাই হয়ে

গিয়েছিলেন। তাই রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ কখনো হতে পারবে না ; তাঁদের কাছ থেকে তোমার কল্যাণের উপায় জানার চেষ্টা করো। রাজা তো গর্ভস্থিত ব্রাহ্মণকেও প্রণাম করেন। দণ্ডকারণ্যের বিশাল সাম্রাজ্য ব্রাহ্মণেরাই বিনাশ করেছেন। মহাত্মা ঔর্ব একাকীই তালজঙ্ঘ নামক মহান ক্ষত্রিয় বংশ সংহার করেছেন। তুমিও যে পরম দুর্লভ বিশাল রাজ্য, বল, ধর্ম এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছ, এসবই বিপ্রবর দত্তাত্রেয়ের কৃপার ফল। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রত্যেক জীবের রক্ষাকর্তা এবং জীব জগতের সৃষ্টিকর্তা, এই কথা জেনেও তুমি কেন মোহগ্রস্ত হচ্ছ ? যিনি এই সম্পূর্ণ চরাচর সৃষ্টি করেছেন, সেই অব্যয়স্বরূপ অবিনাশী প্রজাপতি ব্রহ্মাও ব্রাহ্মণ।

তাঁর কথা শুনে রাজা কার্তবীর্য চিন্তামগ্ন হলেন। তারপর বায়ুদেবতা পুনরায় বলতে শুরু করলেন।

বায়ুদেব দ্বারা কশ্যপ, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, অত্রি ও চ্যবন মুনির মহিমার বর্ণনা

বায়ু বললেন—রাজন্! আগেকার কথা, অঙ্গ নামক এক রাজা এই পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করার কথা চিন্তা করেন, সেকথা জেনে পৃথিবী বিচলিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—'আমি সমস্ত প্রাণী ধারণকারী ব্রহ্মার কন্যা। আমাকে লাভ করে এই শ্রেষ্ঠ রাজা ব্রাহ্মণদের কেন আমাকে দান করতে চাইছেন ? তাঁর যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে আমিও ভূমিত্ব (লোক ধারণরূপ নিজ ধর্ম) পরিত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে চলে যাব, তাতে যদি এই রাজা রাজ্যসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয় তো হোক।' এরূপ স্থির করে পৃথিবী ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীকে যেতে উদ্যত দেখে যোগের আশ্রয়ে তৎক্ষণাৎ নিজ শরীর ত্যাগ করে পৃথিবীর স্থূল বিগ্রহে প্রবেশ করলেন। তিনি প্রবেশ করতেই পৃথিবী আগের থেকে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। চারদিকে বৃক্ষ-লতা-অন্ন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হতে লাগল, ধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকল, ভয় দূর হল। এইভাবে বিশাল ব্রত পালনকারী মহর্ষি কশ্যপ ত্রিশ হাজার দিবা বর্ষ ধরে সজাগ থেকে নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চারিত করে অবস্থান করলেন। তারপর পৃথিবী ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করে নিজেকে কশ্যপের কন্যা বলে মেনে নিলেন। তখন থেকেই পৃথিবীর নাম হল কাশ্যপী। রাজন্! কাশ্যপও ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁর এরূপ প্রভাব ছিল। তুমি যদি কাশ্যপের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ক্ষত্রিয়ের কথা জানো, তাহলে আমাকে বলো।

তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে কার্তবীর্য কোনো জবাব দিলেন না। তখন বায়ু আবার বলতে লাগলেন—রাজন্! এবার মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ করো। প্রাচীনকালে অসুরেরা দেবতাদের পরাস্ত করে তাদের উৎসাহ নষ্ট করে দিয়েছিল। তারা দেবতাদের যজ্ঞ, পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ এবং কর্মানুষ্ঠান লুপ্ত করে দিয়েছিল। নিজ ঐশ্বর্যচ্যুত হয়ে দেবতারা পৃথিবীতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে একদিন তাঁরা মহান ব্রত পালনকারী অতি তেজস্বী ঋষি অগস্ত্যের দর্শন পেলেন। দেবতারা তাঁকে প্রণাম করে বললেন—'মুনিশ্রেষ্ঠ! দানবেরা আমাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে আমাদের ঐশ্বর্য হরণ করেছে। আপনি আমাদের এই মহাভয় থেকে রক্ষা করুন।' দেবতাদের কথা শুনে তেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্যের দৈত্যদের ওপর অত্যন্ত ক্রোধ হল। তিনি প্রলয়কালের অগ্নির মতো জ্বলে উঠলেন। তাঁর শরীর থেকে নির্গত উদ্দীপ্ত কিরণে সহস্র সহস্র দানব ভস্ম হয়ে আকাশ থেকে মাটিতে পড়তে লাগল। দৈত্যগণ দুই লোক পরিত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেল। সেই সময় রাজা বলি পৃথিবীতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন, তাই যেসব দৈত্য তাঁর সঙ্গে ছিল এবং যারা পাতালে ছিল, তারা দগ্ধ হওয়ায় দেবতাদের ভয় দূর হল, তারা পুনরায় নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন। কার্তবীর্য! এরূপ প্রভাবশালী অগস্ত্য মুনির কথা তোমাকে শোনালাম, তুমি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ক্ষত্রিয়ের কথা জানলে বলো।

একথা শুনেও রাজা কার্তবীর্য মৌন হয়ে থাকলেন। তখন বায়ুদেবতা আবার বলতে শুরু করলেন—রাজন্! এবার তুমি পরম যশস্বী বশিষ্ঠ মুনির এক মহান কর্মের কথা শ্রবণ করো। একসময় দেবতারা মানস সরোবরের তীরে যজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই সরোবরের ধারে পর্বতের ন্যায় বিশাল আকার বিশিষ্ট বহু দানব বাস করত, যারা 'খলী' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দেবতাদের যজ্ঞ করতে দেখে দানবরা তাঁদের মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। তখন দুই দলে যুদ্ধ

বেধে গেল। মানস সরোবর সেখান থেকে খুবই কাছে ছিল এবং ব্রহ্মা দৈত্যদের বর দিয়েছিলেন যে সেই সরোবরে ডুব দিলে তারা নবীন জীবন লাভ করবে। সুতরাং যুদ্ধে দানবদের মধ্যে যারা হত বা আহত হত, অন্য দানবেরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে মানস সরোবরে ফেলে দিত এবং জলে পড়া মাত্রই তারা বেঁচে উঠত। তারপর তারা আবার অস্ত্রশস্ত্র, পর্বত, বৃক্ষ হাতে নিয়ে দেবতাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সংখ্যায় সেই দানবেরা দশ হাজার ছিল। তারা দেবতাদের অবস্থা শোচনীয় করে তুললে, দেবতারা পালিয়ে গিয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। ইন্দ্রও দৈত্যদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না, তখন সকলে বশিষ্ঠের শরণ নিলেন। ভগবান বশিষ্ঠ অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। দেবতাদের ক্লেশ দেখে তিনি তাঁদের অভয়-প্রদান করলেন এবং খলী নামবিশিষ্ট সমস্ত দানবদের নিজ তেজে অনায়াসে ভস্ম করে ফেললেন। তারপর সেই মহাতপস্বী মুনি কৈলাস পথে প্রবাহিত গঙ্গানদীকে মানস সরোবরে নিয়ে এলেন। গঙ্গা সেখানে আসতেই সেই সরোবরের বাঁধ ভেঙে গেল। সেখান থেকে যে স্রোত প্রবাহিত হল, সেটিই সরযূ নদী নামে প্রসিদ্ধ। যে স্থানে খলী নামক দানবেরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেইস্থান বর্তমানেও 'খলিন' নামে প্রসিদ্ধ। মহামুনি বশিষ্ঠ এইভাবে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে বরপ্রাপ্ত দৈত্যদেরও বিনাশ করেছিলেন। আমি বশিষ্ঠের কর্ম বর্ণনা করলাম। কার্তবীর্য ! যদি এঁর থেকে বড় কোনো ক্ষত্রিয় থাকে তাহলে আমাকে বলো।'

বায়ুদেবতা তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করলেও কার্তবীর্য অর্জুন চুপ করে রইলেন, তখন তিনি আবার বললেন—রাজন্ ! এবার মহাত্মা অত্রির অলৌকিক কর্মের কথা শোনো। একবার দেবতা এবং দানবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তাতে রাহু সূর্য এবং চন্দ্রকে বাণদ্বারা আহত করেছিল, এতে তাদের তেজ কমে গিয়েছিল এবং ঘোর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। তখন অন্ধকারে বুঝতে না পারায় দেবতারা দানবদের হাতেই মারা পড়তে লাগলেন। সেই মহাবলশালী অসুরদের আঘাতে আহত হওয়ায় দেবতাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হতে থাকল এবং তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে তপস্যারত ব্রাহ্মণ অত্রিমুনির কাছে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা ইন্দ্রিয়জয়ী সেই মহর্ষিকে বললেন—'প্রভু ! অসুরেরা চন্দ্র ও সূর্যকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করেছে, তাই সর্বত্র অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আমরা শত্রুর হাতে মারা পড়ছি। আমাদের একটুও শান্তি নেই, আপনি কৃপা করে আমাদের এই ভয় থেকে রক্ষা করুন।' অত্রি বললেন—'আমি কীভাবে আপনাদের রক্ষা করব ?' দেবতারা বললেন—'আপনি অন্ধকার বিনাশকারী চন্দ্র ও সূর্যের স্বরূপ ধারণ করুন এবং আমাদের শত্রুদের নাশ করুন।' তাঁদের কথা শুনে অত্রি অন্ধকার নাশকারী চন্দ্রের রূপ ধারণ করলেন এবং শান্তভাবে দেবতাদের দিকে তাকালেন। চন্দ্র ও সূর্যের জ্যোতি কম দেখে অত্রি তাঁর তপস্যাদ্বারা জ্যোতিবৃদ্ধি করলেন এবং সমস্ত জগতকে আলোকিত করে তুললেন। তিনি তাঁর তেজে দেবতাদের শত্রুদেরও পরাস্ত করলেন। অত্রির তেজে সেই মহা অসুরদের দগ্ধ হতে দেখে দেবতারাও নিজেদের পরাক্রমে অসুরদের পরাস্ত করতে লাগলেন। অত্রি এইভাবে সূর্যকে তেজস্বী করলেন, দেবতাদের উদ্ধার করলেন এবং অসুরদের বিনাশ করলেন। অত্রিমুনি গায়ত্রী জপকারী, মৃগচর্ম ধারণকারী এবং ফলাহার করে থাকা তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তিনি যে শক্তি দেখিয়েছিলেন, যেমন মহান কর্ম করেছিলেন, তুমি সেদিকে দৃষ্টি দাও এবং বলো তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ক্ষত্রিয় আছে কি ?'

একথা শুনেও কার্তবীর্য কোনো উত্তর দিলেন না, বায়ুদেবতা পুনরায় বলতে লাগলেন—রাজন্ ! এবার মহাত্মা চ্যবনের মহান কর্মকাহিনী শ্রবণ করো। পূর্বকালে চ্যবন মুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোম-পান করাবার প্রতিজ্ঞা করে ইন্দ্রকে বললেন—'দেবরাজ ! আপনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সঙ্গে সোমপানে সম্মিলিত করুন।'

ইন্দ্র বললেন—বিপ্রবর ! আমাদের মধ্যে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে নিন্দনীয় বলে মনে করা হয়, তাহলে তাঁরা সোমপানের অধিকারী হবেন কী করে ? তাঁরা দেবগণের সম্মানের পাত্র নন ; সুতরাং তাঁদের জন্য এরূপ কথা বলবেন না। আমরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে সোমপান করতে চাই না। এছাড়া আর যে কাজের নির্দেশ দেবেন, তা আমি পূরণ করব।

চ্যবন বললেন—দেবরাজ ! অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্যপুত্র হওয়ায় তাঁরাও দেবতা। অতএব তাঁরা আপনাদের সকলের সঙ্গে অবশ্যই সোমপানের অধিকারী। আপনারা সকলে আমার কথা মেনে নিন, এতেই আপনাদের মঙ্গল ; নচেৎ

এর পরিণাম ভালো হবে না।

ইন্দ্র বললেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমি অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে সোমপান করব না।

চ্যবন বললেন—ইন্দ্র ! তুমি যদি আমার আদেশ পালন না করো, তাহলে যজ্ঞে তোমার অভিমান চূর্ণ করে আমি জোর করে ওঁদের সঙ্গে তোমাকে সোমপান করাব।

তারপর, চ্যবন মুনি অশ্বিনীকুমারদের মঙ্গলের জন্য তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তা লক্ষ্য করে ইন্দ্র ক্রোধে অধীর হয়ে হাতে এক বিশাল পর্বত এবং বজ্র নিয়ে মুনির দিকে ছুটে গেলেন, তাঁর চোখ তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। মহাতপস্বী চ্যবন ইন্দ্রকে তাঁর ওপর আক্রমণ করতে দেখে এক ফোঁটা জল তাঁর ওপর ফেললেন এবং বজ্র ও পর্বতসহ তাঁকে জড়বৎ করে দিলেন। তারপর তিনি অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ইন্দ্রের জন্য এক অতি ভয়ংকর শত্রু উৎপন্ন করলেন, তার নাম ছিল মদ। সে মুখ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চিবুক মাটিতে লেগে ছিল আর ওপরের ঠোঁট আকাশ ছুঁয়েছিল। তার মুখে এক হাজার দাঁত একশত যোজন উঁচু দেখাচ্ছিল এবং তার চোয়াল দুশো যোজন লম্বা ছিল। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা তার জিভের নাগালে ছিল ; তখন মদের মুখে পড়া দেবতারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ইন্দ্রকে বললেন—'দেবরাজ ! আপনি বিপ্রবর চ্যবনকে প্রণাম করুন (এঁর বিরোধিতা করা ঠিক নয়)। আমরা নিঃসঙ্কোচে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে সোমপান করব।' তাঁদের কথায় ইন্দ্র মহামুনি চ্যবণকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর আদেশ মেনে নিলেন। তারপর চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের দেবগণের সঙ্গে সোমরসের ভাগী করলেন এবং যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন। তারপর তিনি জুয়া, শিকার, মদ্যপান এবং নারীদের মধ্যে মদকে ভাগ করে দিলেন। এই দোষগুলিতে আসক্ত মানুষ অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই দোষগুলি দূর থেকেই পরিত্যাগ করা উচিত। রাজন্ ! আমি তোমাকে চ্যবন মুনির মহান কর্মের কথা বর্ণনা করলাম। বলো, তাঁর থেকে বড় কোনো ক্ষত্রিয় আছে কি ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! বায়ু যখন এইভাবে ব্রাহ্মণদের মহত্ত্বের কথা শোনালেন, তখন কার্তবীর্য অর্জুন তাঁর কথার প্রশংসা করে বললেন—'প্রভু ! আমি সর্বপ্রকারে এবং সর্বদা ব্রাহ্মণদের জন্যই জীবন ধারণ করি, ব্রাহ্মণদের ভক্ত এবং প্রতিদিন তাঁদের প্রণাম করি। বিপ্রবর দত্তাত্রেয়ের কৃপায় আমি এই বল, উত্তম কীর্তি এবং মহান ধর্ম প্রাপ্ত করেছি। বায়ুদেব ! আপনি ব্রাহ্মণদের অদ্ভুত কর্ম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি মনোযোগ সহকারে সে সব শুনেছি।'

বায়ু বললেন—রাজন্ ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণদের রক্ষা এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কর।

—০—

ভীষ্ম কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! আপনি কী বিশেষত্ব দেখে উত্তম ব্রত আচরণকারী ব্রাহ্মণদের সর্বদা পূজা করে থাকেন ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! মহাব্রতধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ ব্রাহ্মণের পূজাদ্বারা যে লাভ হয়, তা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছেন। সুতরাং ইনিই তোমাকে এই বিষয়ে সব কথা বলবেন। এখন আমার শ্রবণ শক্তি, বাক্‌শক্তি, আমার মন এবং আমার দুই চক্ষু ক্রমশই শিথিল হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জ্ঞানও যেন নিশ্চল হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে আমার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নেই। পুরাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের ধর্মের যে কথা বলা হয়েছে এবং সব বর্ণের মানুষ যেসব ধর্মের উপাসনা করে, সে সবই আমি তোমাকে বলেছি। এখন যা বাকি থাকল, সেসব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকৃত স্বরূপ এবং যথার্থ ক্ষমতা, আমি তা ঠিকমতো জানি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপ্রমেয়, সুতরাং তোমার মনে কোনো প্রশ্ন এলে ইনিই তোমাকে ধর্মোপদেশ দেবেন। শ্রীকৃষ্ণই এই পৃথিবী আকাশ এবং স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন। ইনিই ভয়ংকর বলযুক্ত বরাহ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এই পুরাণপুরুষই পর্বত-সমূহ ও দিকসকল সৃষ্টি করেছেন। অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, চার দিক এবং চার কোণ—এ সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে স্থিত রয়েছে। তাঁর থেকেই এই সৃষ্টি পরম্পরা প্রচলিত, তিনিই এই সমগ্র বিশ্ব নির্মাণ করেছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে এঁর নাভি থেকে কমল উৎপন্ন হয়েছিল এবং তার মধ্যে থেকে অমিত তেজস্বী ব্রহ্মা স্বতই প্রকাশিত হন। ইনিই প্রাচীনকালে দৈত্য সংহার করেছিলেন এবং ইনিই দৈত্য

সম্রাট বলিরূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। এঁর থেকেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে। ভূত-ভবিষ্যৎ এঁরই স্বরূপ এবং ইনিই সমস্ত জগৎকে রক্ষা করেন। যখন ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ও মনুষ্যরূপে অবতার গ্রহণ করে স্বয়ং ধর্ম আচরণ করে তা যথাযথভাবে স্থাপন করেন এবং পর-অপর সমস্ত লোককে রক্ষা করেন। কুন্তীনন্দন! তিনি ত্যাজ্য বস্তু পরিত্যাগ করে অসুরদের বধ করার জন্য স্বয়ং কারণ হয়ে ওঠেন। কার্য ও কারণ এঁরই স্বরূপ। বিশ্বকর্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বভোক্তা, বিশ্ববিধাতা এবং বিশ্ববিজেতাও ইনিই। ইনিই এক হাতে ত্রিশূল এবং অন্য হাতে রক্তপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বিকট রূপ ধারণ করেন। নানাপ্রকার চরিত্রের দ্বারা জগৎ বিখ্যাত এই শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই স্তুতি করে। অসংখ্য গন্ধর্ব, অপ্সরা, দেবতা সর্বদা এঁর সেবায় উপস্থিত থাকে। রাক্ষসেরাও এঁর কৃপার আশায় থাকে। ইনিই একমাত্র ধনরক্ষক এবং বিশ্ববিজয়ী। যজ্ঞে যজ্ঞকারীগণ এঁরই স্তুতি করেন। সামগানকারী বিদ্বানেরা সামের দ্বারা এঁরই গুণগান করেন। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্রের দ্বারা এঁরই স্তব করেন এবং অধ্বর্যুগণ যজ্ঞে এঁকেই হবিষ্যের ভাগ দেন। পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গলোক সবই এই সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বশে থাকে। তিনিই সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু এবং প্রচণ্ড কিরণ শোভিত আদিদেব সূর্য। সমস্ত অসুরদের পরাজিত করে তিনিই বিজয়লাভ করেছেন এবং নিজ তিন পদে ত্রিলোক মেপেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং মানুষের আত্মা। যাজ্ঞিক পুরুষদের যজ্ঞ এঁকেই বলা হয়। ইনিই দিন ও রাতের ভাগ করে সূর্যরূপে উদিত হন। উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন এঁর দুটি পথ। ইনি প্রত্যেক মাসে যজ্ঞ করেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এঁর গুণগান করেন। এই মহাতেজস্বী এবং সর্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ একাকী সমস্ত জগৎ ধারণ করেন। যুধিষ্ঠির! এঁকে তুমি অন্ধকারনাশক সাক্ষাৎ সূর্য বলে জেনো। ইনি পঞ্চ মহাভূতাদির কেন্দ্র। ইনিই আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ, অন্তরিক্ষ, বন ও পর্বতাদি সৃষ্টি করেছেন। ইনিই ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তা ও পূর্ণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। বড় বড় যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণগণ ঋগ্বেদের সহস্র সহস্র মন্ত্রের দ্বারা এঁরই স্তুতি করে থাকেন। এই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ নেই, যিনি মহাতেজস্বী দুর্বাসাকে নিজ গৃহে স্থান দিতে পারেন। এঁকেই অদ্বিতীয় পুরাতন ঋষি বলা হয়। ইনি বিশ্বের রচয়িতা এবং নিজ স্বরূপ দ্বারাই নানা পদার্থ উৎপন্ন করে থাকেন। তিনি দেবতাদের দেবতা হয়েও বেদাদি অধ্যয়ন এবং প্রাচীন বিধিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। লৌকিক ও বৈদিক কর্মের যা ফল, তা সবই শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই সমস্ত জগতের শুক্লজ্যোতি এবং ত্রিলোক, তিন লোকপাল, ত্রিবিধ অগ্নি এবং সমস্ত দেবতাও এই দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই। সংবৎসর, ঋতু, পক্ষ, দিন এবং রাত, কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা, মুহূর্ত, লব এবং ক্ষণ—এই সবগুলি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ বলে জেনো। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, নক্ষত্র, যোগ এবং ঋতু—এই সবের উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণ থেকেই হয়েছে। রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ, প্রজাপতি, দেবমাতা অদিতি এবং সপ্তর্ষিও শ্রীকৃষ্ণ থেকেই উৎপন্ন। এই বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই বায়ুরূপ ধারণ করে সংসারকে সামর্থ্য প্রদান করেন, অগ্নিরূপ হয়ে সকলকে ভস্ম করেন, জলরূপ ধারণ করে জগৎকে জলমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ইনি নিজে বেদস্বরূপ হয়েও বেদবেদ্য তত্ত্ব জানার চেষ্টা করেন। বিধিরূপ হয়েও বিহিত কর্মাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিই ধর্ম, বেদ ও সামর্থ্যের আধার। তুমি সমস্ত চরাচর জগৎকে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ বলে জেনো। ইনি পরম জ্যোতির্ময় সূর্যের রূপ ধারণ করে পূর্ব দিকে উদিত হন, যাঁর প্রভায় সমস্ত বিশ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে। ইনি সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির স্থান। ইনি পূর্বকালে প্রথমে জল সৃষ্টি করে পর্যায়ক্রমে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করেছেন। ঋতু, নানা প্রকারের উৎপাত, নানা অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবত এবং সমস্ত চরাচর জগৎ এঁর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এঁকেই সমস্ত জগতের আত্মা—বিষ্ণু বলে জেনো। ইনি বিশ্বের নিবাসস্থল এবং নির্গুণ। এঁকেই বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ বলা হয়। এই আত্মযোনি পরমাত্মা সকলকে নিজ নির্দেশের অধীন রাখেন। ইনিই এই বিশ্বকে উৎপন্ন করেছেন। তিনিই আত্মশক্তির দ্বারা সকলকে জীবন প্রদান করেন। দেবতা, অসুর, মানুষ, লোক, ঋষি, পিতৃপুরুষ, প্রজা এবং সমস্ত প্রাণী এঁর থেকেই জীবন লাভ করে। ইনিই সর্বদা সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি ও পালন করেন। শুভ-অশুভ এবং স্থাবর-জঙ্গমরূপ এই সমস্ত জগৎ শ্রীকৃষ্ণ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সবই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। প্রাণীদের অন্তিম সময় এলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই মৃত্যুরূপ হয়ে ওঠেন। তিনি ধর্মের সনাতন রক্ষক। যা ঘটে গেছে, যার এখনও কিছু জানা যায়নি, সে সবেরই কারণ

শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিলোকে যা আছে সে সবই শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু আছে, একথা ভাবাও নিজ বিপরীত বুদ্ধিরই পরিচয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এমনই মহিমা, তিনি এর থেকেও অধিক প্রভাবশালী। তিনি পরমপুরুষ নারায়ণ এবং বিকাররহিত। তিনিই স্থাবর-জঙ্গমময় জগতের আদি-মধ্য ও অন্ত। জগতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণীদের কারণও তিনিই। এঁকেই অবিনাশী পরমাত্মা বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের মহিমা এবং ভগবান শংকরের মাহাত্ম্য বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মধুসূদন! ব্রাহ্মণের পূজা করলে কী ফললাভ হয়? আপনি তা বর্ণনা করুন; কারণ আপনি এই বিষয়টি ভালোভাবে জানেন এবং পিতামহও আপনাকে এই বিষয়ের জ্ঞাত বলে মানেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাজন্! আমি ব্রাহ্মণদের গুণাদি যথার্থরূপে বর্ণনা করছি, আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন। কোনো এক দিনের কথা, ব্রাহ্মণেরা আমার পুত্র প্রদ্যুম্নকে ক্রুদ্ধ করে দিয়েছিল। সেই সময় আমি দ্বারকায় ছিলাম। প্রদ্যুম্ন আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করল—'পিতা! ব্রাহ্মণদের পূজা করলে কী ফল পাওয়া যায়? এঁদের ইহলোক ও পরলোকে ঈশ্বর বলে কেন মানা হয়? আমার এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং আপনি স্পষ্টভাবে এর বর্ণনা করুন।' প্রদ্যুম্নর প্রশ্নে আমি তাকে যে উত্তর দিয়েছিলাম, আপনি একাগ্রচিত্তে তা শুনুন। আমি বললাম—'রুক্মিণীনন্দন! ব্রাহ্মণদের রাজা চন্দ্র, তাই তাঁরা ইহলোকে এবং পরলোকেও সুখ-দুঃখ প্রদান করতে সক্ষম। ব্রাহ্মণদের মধ্যে শান্ত ভাবের প্রাধান্য থাকে, এক্ষেত্রে অন্য চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। ব্রাহ্মণদের পূজা দ্বারা আয়ু, কীর্তি, যশ ও বল বৃদ্ধি হয়। সমস্ত লোক এবং লোকেশ্বর ব্রাহ্মণদের পূজা করেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধির জন্য, মোক্ষ লাভের জন্য এবং যশ, লক্ষ্মী, আরোগ্য উপলব্ধির জন্য, দেবতা ও পিতৃপুরুষের পূজার সময় ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, এই পরিস্থিতিতে আমরা কেন তাঁদের সম্মান করব না? ব্রাহ্মণদের ইহলোকে এবং পরলোকেও মহান বলে মানা হয়। তাঁরা সব কিছু প্রত্যক্ষ দেখতে পান। ক্রুদ্ধ হলে তাঁরা এই পৃথিবীকে ভস্ম করে ফেলতে পারেন, অন্যান্য লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করতে পারেন; সুতরাং তেজস্বী পুরুষ ব্রাহ্মণদের মহত্ত্ব ভালোভাবে জেনেও তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন না কেন?

রাজন্! প্রদ্যুম্নের জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি তাকে উত্তম ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য জানিয়েছিলাম, সুতরাং আপনিও সর্বদা মিষ্ট কথা বলে এবং নানাপ্রকার দান দিয়ে মহা সৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণদের পূজা করতে থাকুন। ভীষ্ম আমার বিষয়ে যা বলেছেন, তা সবই সত্য। এবার আমি ভগবান শংকরের মাহাত্ম্য জানাচ্ছি, আপনি মন দিয়ে শুনুন। বিদ্বান পুরুষ মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ এবং শিব ইত্যাদি অনেক নামে ডাকা হয়। বেদে তাঁর দুটি স্বরূপের কথা বলা আছে, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণেরা তা জানেন। তাঁর একটি স্বরূপ ভয়ংকর আর অন্যটি শিব। এই দুইয়েরও অনেক বিভাগ আছে। এঁর যে রূপ ভয়ংকর, সেটি ভীতিপ্রদ। তার অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য ইত্যাদি নানারূপ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত শিব নামের যে মূর্তি, তা পরম শান্ত এবং মঙ্গলময়। তার ধর্ম, জল ও চন্দ্র ইত্যাদি কয়েকটি রূপ আছে। মহাদেবের অর্ধেক দেহকে অগ্নি এবং অর্ধেককে সোম (চন্দ্র) বলা হয়। তাঁর শিবমূর্তি ব্রহ্মচর্য পালন করে এবং ভয়ংকর মূর্তি জগৎ সংহার করে। তাঁর মধ্যে মহত্ত্ব এবং ঈশ্বরত্ব থাকায় তাঁকে মহেশ্বর বলা হয়। তিনি সকলকে দগ্ধকারী, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উগ্র এবং প্রতাপশালী, তাই তাঁকে রুদ্র বলা হয়। ইনি দেবতাদের মধ্যে মহান এবং এই মহা বিশ্বকে রক্ষা করেন, তাঁকে তাই মহাদেব বলা হয়। তিনি সর্বপ্রকার কর্মদ্বারা সর্বদা সব লোকের উন্নতি করেন এবং সকলের কল্যাণ কামনা করেন, সেইজন্য তাঁর নাম শিব। তিনি ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত হয়ে দেহধারীদের প্রাণ নাশ করেন এবং সর্বদা স্থিরভাবে থাকেন, তাই তাঁকে স্থাণু বলা হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালে স্থাবর এবং জঙ্গমাদির আকারে তাঁর অনেকরূপ দেখা যায়, তাই তাঁকে বহুরূপী বলা হয়। তাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতার নিবাস, তাই তাঁকে বিশ্বরূপ বলা হয়। তাঁর চক্ষু থেকে তেজ নিঃসারিত হয় এবং তাঁর চক্ষু অসংখ্য, তাই তাঁকে সহস্রাক্ষ,

অজিতাক্ষ, সর্বতো অক্ষিময় বলা হয়। তিনি সর্বপ্রকার পশুপালন করেন এবং তাদের সঙ্গে থাকতেই ভালোবাসেন, তিনি পশুদের অধিপতি হওয়ায় তাঁর নাম পশুপতি। মানুষ যদি ব্রহ্মচর্য পালন করে প্রতিদিন স্থাপিত শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহলে মহাত্মা শংকর অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভক্তদের সুখপ্রদান করেন। ভগবান শংকরই অগ্নিরূপে শবকে দগ্ধ করেন এবং শ্মশানে বাস করেন। যারা তাঁকে সেখানে পূজা করে, তারা বীরপুরুষদের প্রাপ্য উত্তমলোক লাভ করে। ইনি প্রাণীদের দেহে অবস্থিত এবং তাদের মৃত্যুরূপ। তিনিই প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ুরূপে দেহের মধ্যে বাস করেন। তাঁর বিভিন্ন ভয়ংকর এবং উদ্দীপ্ত রূপ আছে, যা জগতে পূজিত হয়। বিদ্বান ব্রাহ্মণেরাই এই সব রূপ জানেন। মহত্ত্ব, ব্যাপতা ও দিব্য কর্মানুসারে দেবতাদের মধ্যে তাঁর বহু যথার্থ নাম প্রচলিত। বেদের শতরুদ্রিয়-প্রকরণে তাঁর অসংখ্য নাম আছে, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণই তা জানেন। মহর্ষি ব্যাসও তাঁর স্তব করেন। তিনি সমস্ত জগৎকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন। এই মহাবিশ্ব তাঁরই স্বরূপ বলা হয়। ব্রাহ্মণ ও ঋষি তাঁকে সর্বজ্যেষ্ঠ বলেন। তিনি দেবতাদের মধ্যে প্রধান। তিনি নিজ মুখ থেকে অগ্নি উৎপন্ন করেছেন এবং নানা বাধাবিঘ্নগ্রস্ত প্রাণীদের দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি এতোই শরণাগতবৎসল যে তাঁর শরণাগত কাউকেই তিনি ত্যাগ করেন না। তিনিই মানুষকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, ধন এবং সমস্ত কামনা প্রদান করেন এবং তিনিই আবার সব ফিরিয়ে নেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের ঐশ্বর্য তাঁরই প্রদত্ত। তিনি সর্বদা ত্রিলোকের শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি রাখেন। সমস্ত কামনার অধীশ্বর হওয়ায় তাঁকে ঈশ্বর বলা হয় এবং মহান লোকের ঈশ্বর হওয়ায় তাঁর নাম হয়েছে মহেশ্বর।

ধর্ম বিষয়ে আগম প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, ধর্ম-অধর্মের ফল, সজ্জন-দুর্জনদের লক্ষণ এবং শিষ্টাচারের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সমাপ্ত হলে যুধিষ্ঠির শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন—'পিতামহ ! ধর্ম বিষয় স্থির করার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, না আগমের ? এই দুটির মধ্যে কার দ্বারা প্রকৃত বাস্তব স্থির করা সম্ভব ?'

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! তুমি ঠিক প্রশ্নই করেছ, তার উত্তর দিচ্ছি, শোনো—ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা সহজ, কিন্তু তার সঠিক উত্তর নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ এবং আগম উভয়েরই কোনো অন্ত নেই। উভয় ক্ষেত্রেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করা হেতুবাদী তার্কিক প্রত্যক্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে পরোক্ষ বস্তুর অভাব মনে করেন, সত্য হলেও তার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন। কিন্তু এরা স্বল্পবিদ্যাসম্পন্ন, অহংকারবশত নিজেদের পণ্ডিত মনে করে ; সুতরাং এদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত নয়। (আকাশের রঙ নীল দেখা গেলেও, তা মিথ্যাই, তাই শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে সত্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ধর্ম, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ ; কারণ অন্য প্রমাণগুলি সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না)। যদি বল যে একমাত্র ব্রহ্ম কী করে জগতের কারণ হয় ? তাহলে তার উত্তর হল—তুমি আলস্য ত্যাগ করে দীর্ঘকাল ধরে যোগাভ্যাস করো এবং তত্ত্ব-সাক্ষাৎ করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা করতে থাকো, তাহলেই এর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। সমস্ত তর্ক যখন শেষ হয়ে যায় তখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞানই সমস্ত জগতের পক্ষে উত্তম জ্যোতি। নতুন তর্ক দ্বারা যে জ্ঞান হয় তা প্রকৃত জ্ঞান নয়, সুতরাং তাকে প্রামাণ্য বলে মানা উচিত নয়। বেদের দ্বারা যা প্রতিপাদিত হয়নি, তা পরিত্যাগ করাই উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম এবং নানাপ্রকার শিষ্টাচার—এই নানাপ্রকার প্রমাণ উপলব্ধ হয়। এর মধ্যে কোনটি প্রবল, কৃপা করে তা বলুন।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! বলবান পুরুষ যখন দুরাচারী হয়ে ধর্মনাশ করতে থাকে তখন সাধারণ মানুষ নিজেদের রক্ষায় তৎপর হলেও সময় সময় তাতে ব্যর্থতা এসেই যায়।

তখন আগাছায় আবৃত কূপের ন্যায় অধর্মই ধর্মের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হয়। তখন সদাচার হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে আচারহীন, ধর্মদ্রোহী ও বেদ-শাস্ত্র পরিত্যাগকারী মন্দবুদ্ধি পুরুষ ধর্মমর্যাদা ভঙ্গ করতে থাকে। সেই অবস্থায় ধর্মের বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ জাগে, এরূপ অবস্থায় যারা সাধুসঙ্গের জন্য নিত্য উৎকণ্ঠিত থাকে, যাদের বুদ্ধি আগম-প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানে, যারা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে, লোভ-মোহ অনুসরণকারী অর্থ ও কাম উপেক্ষা করে ধর্মকেই উত্তম বলে মনে করে, এরূপ মহাত্মা ব্যক্তির কাছে গিয়ে তোমার প্রশ্ন করা উচিত। সেই মহাত্মার সদাচার, যজ্ঞ এবং স্বাধ্যায় ইত্যাদি শুভ কর্মাদির অনুষ্ঠানে কখনো কোনো অন্তরায় হয় না। তাঁদের মধ্যে আচার, সেই আচারের বর্ণনাকারী বেদশাস্ত্র এবং ধর্ম—এই তিনের ঐক্য হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ! আমার বিচার-বিবেচনা শক্তি পুনরায় সংশয় সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। আমি এর সমাধান চাই কিন্তু বহু অনুসন্ধান করেও কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না। প্রত্যক্ষ, আগম এবং শিষ্টাচার—এই তিনটিই যদি প্রমাণরূপ হয়, অথচ এদের নির্দেশে তারতম্য দেখা যায়। ধর্ম তো এক ; তাহলে এই তিনটি কীকরে ধর্ম হতে পারে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্! তুমি যদি প্রমাণ ভেদে ধর্মকে তিনপ্রকার বলে মানো, তাহলে তোমার নির্ণয় যথার্থ নয়। তুমি এটি স্থির জেনো যে ধর্ম একই। তিনটি প্রমাণের দ্বারা একই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আমি মনে করি না যে এই তিনটি প্রমাণ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রতিপাদন করে। উক্ত তিনটি প্রমাণের দ্বারা যে ধর্মময় পথের কথা বলা হয়েছে, সেটিই অবলম্বন করো। তর্কের দ্বারা ধর্ম জিজ্ঞাসা করা কখনো উচিত নয়। আমার কথায় সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আমি যা বলি অন্ধ এবং মূক ব্যক্তির ন্যায় নিঃসঙ্কোচে তেমনই আচরণ করো। অজাতশত্রু ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ এবং দান—এই চারটি সনাতন ধর্ম, এগুলি সর্বদাই আচরণ করো। তোমার পিতা-পিতামহগণ ব্রাহ্মণদের প্রতি যেমন আচরণ করেছেন, তুমিও তারই অনুসরণ করো। ব্রাহ্মণই ধর্মের উপদেশ দানের অধিকারী। যে ব্যক্তি প্রমাণকেই অপ্রমাণ করার চেষ্টা করে, সে অজ্ঞানী। তার কথা প্রামাণ্য বলে মানা উচিত নয় ; কারণ সে শুধু তর্কেই রত থাকে। তুমি আদর-আপ্যায়নের দ্বারা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের সেবায় ব্যাপৃত থাকো এবং জেনে রাখো যে এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্রাহ্মণদের আধারের ওপরই অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! যারা ধর্মের নিন্দা করে এবং যারা ধর্মের আচরণ করে, তারা কোন্ লোকে গমন করে ? আপনি সেই বিষয়ে বর্ণনা করুন।

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! যেসব ব্যক্তি রজোগুণে ও তমোগুণে চিত্ত মলিন হওয়ায় ধর্মদ্রোহী, তারা নরকে পতিত হয় এবং যারা সর্বদা সরলতা ও সত্যভাষণে তৎপর হয়ে ধর্মপালন করে, তারা স্বর্গসুখ ভোগ করে। আচার্যের সেবা করাই যাদের একমাত্র ধর্ম এবং যারা সর্বদা ধর্মে স্থিত থাকে, তারা দেবলোকে গমন করে। মানুষ হোক বা দেবতা, যারা শরীরকে কষ্ট প্রদান করেও ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকে এবং লোভ-দ্বেষ ত্যাগ করে তারাই সুখ লাভ করে। মনীষী পুরুষেরা ধর্মকেই ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে থাকেন। খাদ্যরসিক যেমন সুপক্ব ফল অধিক পছন্দ করে, তেমনই ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ ধর্মেরই উপাসনা করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! সাধুপুরুষ কী কাজ করেন ? সজ্জন ও দুর্জন মানুষ কেমন হয় ?

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! দুর্জন মানুষ দুরাচারী, দুর্ধর্ষ (উদ্দণ্ড) এবং দুর্মুখ (কটু বাক্য বলা) হয় এবং সজ্জন ব্যক্তি সুশীল হয়। এখন শিষ্টাচারের কথা শোনো—ধর্মাত্মা ব্যক্তি পথে, গোধনের মধ্যে বা কৃষিক্ষেত্রে মল-মূত্র ত্যাগ করে না। সৎপুরুষ দেবতা, পিতৃপুরুষ, ভূত (প্রাণী), অতিথি ও কুটুম্ব—এই পাঁচজনকে ভোজন করিয়ে অবশেষে নিজে অন্নগ্রহণ করে, আহারের সময় কথা বলে না এবং আর্দ্র হাতে শয়ন করে না। যারা অগ্নি, বৃষ, দেবতা, গোশালা, ব্রাহ্মণ, ধার্মিক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রদক্ষিণ করে, যারা বয়স্ক মানুষ, মাথায় বোঝা বহনকারী মানুষ, নারী, গ্রামের অধিপতি, ব্রাহ্মণ ও রাজাকে সামনে আসতে দেখে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দেয়, তাদের সাধু ব্যক্তি বলে মনে করতে হবে। সৎপুরুষদের সমস্ত অতিথি, সেবক, স্বজন এবং শরণার্থী ব্যক্তিদের সাদরে রক্ষা করা উচিত। দেবতারা মানুষের জন্য সকাল এবং সন্ধ্যা, এই দুই সময় আহারের বিধান করেছেন, এর মধ্যে আহার করার বিধি দেখা যায় না। এই নিয়ম পালন করলে উপবাসের ফল পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঋতুকালের অতিরিক্ত সময়ে স্ত্রী-সমাগম করে না, তার দ্বারা ব্রহ্মচর্য পালন হয়। অমৃত,

ব্রাহ্মণ ও গোধন—এই তিনই সমান ; সুতরাং গো-ব্রাহ্মণকে সর্বদা বিধিপূর্বক পূজা করা উচিত। স্বদেশে হোক অথবা পরদেশে, কোনো অতিথি এসে উপস্থিত হলে তাকে ক্ষুধার্ত রাখা উচিত নয়, গুরু যে কাজের নির্দেশ দেন, তা সম্পূর্ণ করে তবে তা তাঁকে জানাতে হয়। গুরু এলে তাঁকে প্রণাম করে, বিধিমতো পূজা করে তাঁকে বসবার জন্য আসন দেবে। গুরুকে পূজা করলে আয়ু, যশ এবং লক্ষ্মী—এসবই বৃদ্ধিলাভ করে। বয়স্ক মানুষদের কখনো অপমান করবে না, তাঁদের কোনো কাজের জন্য বাহিরে যেতে বলবে না, বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি না বসা পর্যন্ত তাঁর সামনে বসবে না—এরূপ করলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হয়। উলঙ্গ নারী কিংবা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। মৈথুন ও ভোজন—এই দুটি কাজ একান্ত স্থানেই করবে। তীর্থের মধ্যে গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, পবিত্র বস্তুর মধ্যে হৃদয়ই অধিক পবিত্র, জ্ঞানের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সন্তোষই সব থেকে উত্তম সুখ। সকাল ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধ মানুষের কথা শোনা উচিত। যারা সর্বদা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবায় সংলগ্ন থাকে তারা শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করে। স্বাধ্যায় ও আহারের সময় ডান হাত ব্যবহার করা উচিত এবং মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়াদি সর্বদা নিজের বশে রাখা উচিত। ভালোভাবে প্রস্তুত করা খাদ্যবস্তুর দ্বারা দেবতা এবং পিতৃপুরুষের অষ্টকা শ্রাদ্ধ করা উচিত। নবগ্রহের পূজা করা উচিত। চুল বা দাড়ি কামাবার সময় মঙ্গলজনক শব্দের এবং অপরের হাঁচিতে শতং জীব বাক্যের দ্বারা আশীর্বাদ তথা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দীর্ঘায়ু হওয়ার শুভকামনা করে অভিনন্দন জানানো উচিত।

যুধিষ্ঠির ! অতি বড় সংকটে পড়লেও কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করবে না। বিদ্বান ব্যক্তিকে 'তুমি' বলে ডাকা এবং তাকে বধ করা একই ব্যাপার। যে তোমার সমকক্ষ, তোমার থেকে ছোটো অথবা তোমার শিষ্য, তাকে 'তুমি' বলাতে কোনো ক্ষতি নেই। পাপকারী পুরুষের হৃদয়ই তার পাপ প্রকট করে দেয়। দুরাচারী ব্যক্তি তার ইচ্ছাকৃত পাপ অন্যের থেকে লুকোবার চেষ্টা করে, কিন্তু মহাপুরুষদের সামনে পাপ গুপ্ত রাখলে তার ক্ষতি হয়ে যায়। পাপী ব্যক্তি মনে করে যে তাকে পাপ করতে কেউ দেখেনি, এই ভেবে সে তার পাপ লুকোবার চেষ্টা করে, কিন্তু এ তার ভুল। কারণ পাপপূর্বক গোপন করা পাপ নতুন পাপের সৃষ্টি করে। নুনের ডেলা জলে দিলে যেমন তা জলে গুলে যায়, তেমনই প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ হয়। তাই পাপ কখনো গোপন করা উচিত নয়। কারণ লুকিয়ে রাখলে তা বৃদ্ধি পায়। যদি কখনো পাপ কার্য হয়ে যায়, তবে তা সাধু ব্যক্তিদের কাছে স্বীকার করা উচিত। তাঁরা সেই পাপ প্রশমিত করেন। সাধুপুরুষেরা বলেন ধর্ম সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে, তাই সকলেরই ধর্মে ব্যাপৃত থাকা উচিত। মানুষের একাকীই ধর্মাচরণ করা উচিত ; কিন্তু ধর্মধ্বজী অর্থাৎ ধর্মের নামে ভণ্ডামী করা উচিত নয়। যারা ধর্মকে উপভোগের সাধন করে, তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তারা ধর্মের ব্যবসায়ী। দম্ভ পরিত্যাগ করে দেবতার পূজা করবে। ছল-কপট পরিত্যাগ করে গুরুজনদের সেবা করবে এবং দান করে পরলোকের জন্য পুণ্যরূপ ধন সংগ্রহ করবে।

শুভাশুভ কর্মাদিকে সুখ-দুঃখ প্রাপ্তির কারণ জানিয়ে ধর্ম অনুষ্ঠানের ওপর ভীষ্মের জোর দেওয়া

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! ভাগ্যহীন মানুষ বলবান হলেও ধন লাভ করে না আর যে ভাগ্যবান, সে বালক অথবা দুর্বল হলেও প্রভূত ধন লাভ করে। যতক্ষণ সম্পদ প্রাপ্তির সময় না হয় ততক্ষণ চেষ্টা করলেও অর্থ লাভ হয় না ; লাভের সময় হলে বিনা চেষ্টাতেই অত্যন্ত বড় সম্পদ হস্তগত হয়। প্রচেষ্টার দ্বারা যদি সাফল্য অর্জন অবশ্যম্ভাবী হত, তাহলে মানুষ সব কিছু পেয়ে যেত। কিন্তু যে বস্তু প্রারব্ধবশত মানুষের অলভ্য, চেষ্টা করলেও তা পাওয়া সম্ভব নয়। বহু মানুষকে দেখা যায় চেষ্টা করেও বিফল হয়। কত মানুষ অর্থের জন্য বহু কুকর্ম করেও ধনহীনই থেকে যায়। কত মানুষ ধর্মানুকূল কর্তব্য পালন করে ধনী হয় আবার কেউ কেউ নির্ধনই থেকে যায়। কোনো ব্যক্তি নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও নীতিজ্ঞ হয় না আবার কেউ নীতি-অনভিজ্ঞ হয়েও মন্ত্রী পদ পেয়ে যায়, এর কারণ কী ?

কখনো কখনো বিদ্বান এবং মূর্খ উভয়েরই একপ্রকার স্থিতি হয়। অল্পবুদ্ধি মানুষ ধনী হয়ে যায় (এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বান কানাকড়িও পায় না)। বিদ্যা লাভ করলে মানুষ যদি সুখ লাভ করতো, তাহলে বিদ্বানদের জীবিকার জন্য, কোনো মূর্খ ধনীর আশ্রয় নিতে হত না। জলপান করলে যেমন মানুষের তৃষ্ণা দূর হয়, তেমনই বিদ্যার দ্বারা যদি অভীষ্ট বস্তুর সিদ্ধি অনিবার্য হত তাহলে কোনো মানুষই বিদ্যাকে উপেক্ষা করত না। যার মৃত্যুর সময় হয়নি, তাকে শতশত বাণে বিদ্ধ করলেও সে মরে না, কিন্তু যার জীবন-কাল পূর্ণ হয়ে গেছে, একটি তৃণের আঘাতেই সে প্রাণত্যাগ করে।

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! নানা চেষ্টা এবং বহু উদ্যোগ করলেও মানুষ যদি ধন লাভ করতে না পারে, তাহলে তার উগ্র তপস্যা করা উচিত ; কারণ বীজ বপন না করলে অঙ্কুরোদগম হয় না। মনীষী ব্যক্তিরা বলেন মানুষ দান করলে উপভোগের সামগ্রী লাভ করে, গুরুজন-বৃদ্ধদের সেবা করলে উত্তম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অহিংসা ধর্ম পালনে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। তাই দান করবে, কারো কাছে কিছু চাইবে না, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পূজা করবে, মিষ্ট বাক্য বলবে, সকলের মঙ্গল করবে, শান্তভাবে থাকবে এবং প্রাণী হিংসা করবে না। যুধিষ্ঠির ! পিঁপড়ে, কীট, মশা, মাছি ইত্যাদি প্রাণীদের সেই যোনিতে জন্ম নিয়ে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া তাদের কর্মফল, এই ভেবে নিজ বুদ্ধি স্থির করো এবং (সৎকর্মে ব্যাপৃত হও)। মানুষ যেসকল শুভ ও অশুভ কর্ম করে এবং অপরকে দিয়ে করায়, উভয় প্রকার কর্মের মধ্যে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে তার প্রসন্ন হওয়া উচিত এবং কর্ম অশুভ হলে শুভ ফলের আশা রাখা উচিত নয়। ধর্মের ফল দেখে বুদ্ধির যখন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা হয়, তখন মানুষের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং তখনই তার মন ধর্মে আকৃষ্ট হয়। যতক্ষণ বুদ্ধি ধর্মে দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ কেউ তার ফলে বিশ্বাস করে না। প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হল যে তারা ধর্মের ফলে বিশ্বাস করে যেন সেইরূপ আচরণ করে। যার কর্তব্য ও অকর্তব্যের জ্ঞান থাকে, সেই ব্যক্তির একাগ্রচিত্তে ধর্মাচরণ করা উচিত। যারা অতুল ঐশ্বর্যের স্বামী, তাদের চিন্তা করা উচিত যে আমি যেন রজোগুণী হয়ে পুনরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত না হই এবং এইভাবে নিজ চেষ্টায় ধর্মানুষ্ঠান করে মহৎ পদ প্রাপ্তিতে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কাল কোনোভাবেই ধর্মকে অধর্মে পরিণত করতে পারে না অর্থাৎ ধর্ম পালনকারীকে দুঃখ প্রদান করে না ; তাই ধর্মাত্মা পুরুষকে বিশুদ্ধাত্মা বলে জানা উচিত। ধর্মের স্বরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। কাল তাকে সর্বদিক থেকে রক্ষা করে। সুতরাং অধর্মের এতো শক্তি নেই যে তা ধর্মকে ছুঁতে পারে। বিশুদ্ধি এবং পাপস্পর্শের অভাব—ধর্মের এই দুটি কাজ। ধর্ম বিজয় প্রাপ্ত করায় এবং ত্রিলোক আলোকিত করে। যে যতই বুদ্ধিমান হোক, সে কাউকে বলপূর্বক ধরেবেঁধে ধর্মপথে আনতে পারে না। এবার আমি চার বর্ণের সম্বন্ধে কিছু বলছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই সব বর্ণের মানুষের শরীরই পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এবং সকলেরই আত্মা একপ্রকার, তা সত্ত্বেও তাদের লৌকিক ধর্ম এবং বিশেষ ধর্মে ভেদাভেদ রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল যে সকলে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করে যেন পুনরায় একত্ব প্রাপ্ত হয়। যদি তুমি বল যে ধর্ম তো নিত্য, তাহলে তার দ্বারা স্বর্গাদি অনিত্যলোক প্রাপ্তি হয় কীভাবে ? তার উত্তর হল যে যখন ধর্মপালনের লক্ষ্য নিত্য হয় অর্থাৎ অনিত্য কামনা ত্যাগ করে নিষ্কামভাবের দ্বারা ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে ধর্মের দ্বারা সনাতন লোকই (নিত্য পরমাত্মার) প্রাপ্তি হয়।

———०———

পিতামহ ভীষ্মের দেবতা, ঋষি, পর্বত এবং নদী ইত্যাদির নাম জানিয়ে তাঁদের স্মরণে ধর্মপ্রাপ্তি জানানো এবং ভীষ্মের নির্দেশে যুধিষ্ঠিরের সপরিবারে হস্তিনাপুর গমন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! মানুষের কল্যাণের উপায় কী ? কী করলে মানুষ সুখী হয়, কোন্ কর্ম অনুষ্ঠান করলে তার পাপ দূর হয় ? কোন্ কর্ম বিনাশকারী হয় ?

ভীষ্ম বললেন—পুত্র ! ত্রিসন্ধ্যা পালন করার সময় যদি দেববংশ এবং ঋষিবংশাবলী পাঠ করা যায় তাহলে মানুষ দিনে রাতে, সকাল সন্ধ্যায়, নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে পাপ করে, সেসব থেকে সে মুক্তি পায় এবং সর্বদা পবিত্র থাকে। দেবর্ষি বংশ কীর্তনকারী মানুষ কখনো অন্ধ বা বধির হয় না এবং সর্বদা কল্যাণভাগী হয়। সে কখনো তির্যক যোনি বা নরকে পতিত হয় না, সংকর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না, দুঃখে ভীত হয় না এবং মৃত্যুর সময় ব্যাকুল হয় না। (দেবতা ও ঋষি আদির বংশের নামাবলী এইরূপ—) সর্বভূতনমস্কৃত দেবাসুরগুরু স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মা, তাঁর পত্নী সতী সাবিত্রী দেবী, বেদাদির উৎপত্তিস্থান জগৎকর্তা ভগবান নারায়ণ, ত্রিনেত্রধারী উমাপতি মহাদেব, দেবসেনাপতি স্কন্দ, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, শচীপতি ইন্দ্র, যমরাজ, তাঁর পত্নী ধূমোর্ণা, পত্নী গৌরীর সঙ্গে বরুণ, ঋদ্ধিসহ কুবের, সৌম্য স্বভাব সুরভী গাভী, মহর্ষি বিশ্রবা, সংকল্প, সাগর, গঙ্গা ইত্যাদি নদী, মরুদ্‌গণ, তপঃসিদ্ধ বালখিল্য ঋষি, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু, চিত্রসেন, দেবদূত, সৌভাগ্যশালিনী দেবকন্যাগণ, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া এবং তিলোত্তমাদি দিব্য অপ্সরাগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশরুদ্র, অশ্বিনীকুমার, পিতৃপুরুষ, ধর্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, দীক্ষা, ব্যবসায়, পিতামহ, রাতদিন, মরীচিনন্দন কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, নক্ষত্র, ঋতু, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, বিনতা পুত্র গরুড়, সমুদ্র, কদ্রুর পুত্র সর্পগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুষ্কর, গঙ্গা, মহানদী, বেণা, কাবেরী, নর্মদা, কুলম্পুনা, বিশল্যা, করতোয়া, অম্বুবাহিনী, সরযূ, গণ্ডকী, মহানদ শোণভদ্র, তাম্রা, অরুণা, বেত্রবতী, পর্ণাশা, গৌতমী, গোদাবরী, বেণ্যা, কৃষ্ণবেণা, অদ্রিজা, দৃষদ্বতী, চক্ষু, মন্দাকিনী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, বিশ্বেশ্বরের স্থান (কাশী), বিমল সরোবর, স্বচ্ছ সলিলযুক্ত পুণ্যতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, উত্তম সমুদ্র, তপস্যা, দান, জম্বুমার্গ, হিরণ্বতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী, বেদস্মৃতি, বেদবতী, মালবা, অশ্ববতী, পবিত্র ভূভাগ, গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), ঋষিকুল্যা, সমুদ্রগামিনী পবিত্র নদী, চর্মবতী, কৌশিকী, যমুনা, ভীমরথী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, নন্দা, অপরনন্দা, তীর্থভূত মহাহ্রদ, গয়া, ফল্গুতীর্থ, দেবগণযুক্ত ধর্মারণ্য, পবিত্র দেবনদী, ত্রিলোকে বিখ্যাত পবিত্র এবং পাপনাশক ব্রহ্মনির্মিত সরোবর (পুষ্করতীর্থ), দিব্য ঔষধিযুক্ত হিমবান পর্বত, নানাপ্রকার ধাতু, তীর্থাদি এবং ঔষধি সুশোভিত বিন্ধ্যপর্বত, মেরু, মহেন্দ্র, মলয়, রৌপ্যখনি যুক্ত শ্বেতগিরি, শৃঙ্গবান, মন্দর, নীল, নিষধ, দুর্দর, চিত্রকূট, অঞ্জনাভ, গন্ধমাদন, সোমগিরি ও অন্যান্য পর্বত, দিক, বিদিক, ভূমি, বৃক্ষ, বিশ্বদেব, আকাশ, নক্ষত্র, গ্রহগণ—এঁরা যেন সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন এবং যাঁদের নাম করা হয়েছে ও যাঁদের নাম করা হয়নি, সেই সকল দেবগণও যেন আমাদের রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি উপরিউক্ত দেবাদিগণের কীর্তন, স্তব এবং অভিনন্দন করে, সে সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। দেবতাদের স্তুতি ও অভিনন্দনকারী পুরুষ সর্বপ্রকার সংকীর্ণ পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

দেবতাদের পর সমস্ত পাপ থেকে মুক্তকারী তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিদের নাম বলছি। যবক্রীত, রৈভ্য, কক্ষীবান, ঔশিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি এবং সর্বগুণসম্পন্ন বর্হি—এঁরা পূর্বদিকে থাকেন। উন্মুচু, প্রমুচু, মুমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণের পুত্র মহাপ্রতাপশালী অগস্ত্য এবং পরম প্রসিদ্ধ ঋষিশ্রেষ্ঠ দৃঢ়ায়ু ও ঊর্ধ্ববাহু—এঁরা দক্ষিণ দিকে থাকেন। এবার পশ্চিম দিকে বাসকারী ঋষিদের নাম শোনো—নিজ সহোদর ভ্রাতাদের সঙ্গে উষঙ্গু শক্তিশালী পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতম, কশ্যপ, একত, দ্বিত, ত্রিত, মহর্ষি দুর্বাসা এবং সারস্বত। এইরূপ অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর নন্দন ব্যাস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, পরশুরাম, উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্মা, ধৌম্য, হস্তিকাশ্যপ, লোমশ, নাচিকেত, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা এবং ভৃগুনন্দন চ্যবন—এঁরা উত্তরদিকে নিবাস করেন। এই

দেবতা ও ঋষিদের নাম কীর্তন করলে মানুষ সর্বপাপ হতে মুক্ত হন।

এবার রাজর্ষিদের নাম শোনো—রাজা নৃগ, যযাতি, নহুষ, যদু, শক্তিশালী পুরু, ধুন্ধুমার, দিলীপ, প্রতাপশালী সগর, কৃশাশ্ব, যৌবনাশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান, দুষ্মন্ত, মহাযশস্বী চক্রবর্তী রাজা ভরত, পবন, জনক, দৃষ্টরথ, নরশ্রেষ্ঠ রঘু, দশরথ, রাক্ষসহন্তা বীরবর রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, দৃঢ়রথ, মহোদর্য, অলর্ক, এল (পুরুরবা), করন্ধম, কন্মোর, দক্ষ, অম্বরীষ, কুকুর, মহাযশস্বী রৈবত, কুরু, সংবরণ, সত্যপরাক্রমী মান্ধাতা, রাজর্ষি মুচুকুন্দ, গঙ্গাদ্বারা সেবিত রাজা জহ্নু, আদিরাজা বেননন্দন পৃথু, সকলের প্রিয়কারী মিত্রভানু, ত্রসদস্যু, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, শ্বেত, প্রসিদ্ধ রাজা মহাভিষ, নিমি, অষ্টক, আয়ু, রাজর্ষি ক্ষুপ, রাজা কক্ষেয়ু, প্রতর্দন, দিবোদাস, কোশলনরেশ সুদাস, রাজর্ষি নল, প্রজাপতি মনু, হবিধ্র, পৃষধ্র, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রচীনবর্হি, মহাযশস্বী ইক্ষ্বাকু, রাজা অনরণ্য, জানুজঙ্ঘ, রাজর্ষি কক্ষসেন। এছাড়াও পুরাণে যাঁদের কথা অনেক বার বলা হয়েছে, সেই সব পুণ্যাত্মা রাজারা প্রাতঃস্মরণীয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রভাতে উঠে স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই নামগুলি পাঠ করে, সে ধর্মের ফলভাগী হয়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আমার পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শায়িত কৌরব প্রবৃদ্ধ ধর্মজ্ঞ ভীষ্মের মুখ থেকে যখন ধর্ম সম্পর্কীয় শাস্ত্রীয় সকল কথা এবং দানের বিধি শুনলেন ও সব প্রশ্নের উত্তর জেনে নিলেন অর্থাৎ ধর্ম ও অর্থের বিষয়ে ওঠা সমস্ত সংশয় মিটিয়ে নিলেন, তারপর তিনি কী করলেন ? কৃপা করে সে কথা বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এরূপ উপদেশ প্রদান করে ভীষ্ম চুপ করলে উপস্থিত সমস্ত রাজন্যবর্গ কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর সত্যবতীনন্দন মহর্ষি ব্যাসদেব কিছুক্ষণ ধ্যান করে গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে বললেন—'নরশ্রেষ্ঠ ! রাজা যুধিষ্ঠির এবার শান্তচিত্ত হয়েছেন—তাঁর শোক এবং জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়েছে, তিনি তাঁর ভ্রাতা, অনুগামী রাজা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আপনার নিকটে বসে আছেন। এবার আপনি তাঁদের হস্তিনাপুর যাওয়ার আদেশ প্রদান করুন।'

ভগবান ব্যাসের কথা শুনে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মন্ত্রীসহ রাজা যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুর যাওয়ার নির্দেশ দেবার জন্য মধুর স্বরে বললেন—'রাজন্ ! এবার তুমি হস্তিনাপুরে যাও এবং চিন্তা ত্যাগ করো। রাজা যযাতির মতো শ্রদ্ধা এবং দমগুণসম্পন্ন হয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করে দেবতাদের পূজা ও পিতৃতর্পণ করতে থাকো। বহু অন্ন দিয়ে পর্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান করে নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করতে থাকো। তাহলে তোমার কল্যাণ হবে, এখন তোমার মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করা উচিত। রাজন্ ! প্রজাদের প্রসন্ন রাখবে, মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদিদের মনোবল অটুট রাখতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে এবং সুহৃদবর্গকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করবে। মন্দিরের কাছাকাছি বৃক্ষে যেমন বহু পাখি বাসা বেঁধে থাকে, তেমনই তোমার মিত্র এবং হিতৈষীরাও যেন তোমার আশ্রয়ে থেকে নির্বিঘ্নে জীবন নির্বাহ করে। পুত্র ! সূর্যদেব যখন দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে অগ্রসর হবেন, সেই সময় আমার কাছে এসো।'

তাঁর কথা শুনে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পিতামহের আদেশ স্বীকার করে তাঁকে প্রণাম করে পরিবারসহ হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। তাঁদের সঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং পতিব্রতা গান্ধারীও ছিলেন, সেই সঙ্গে ঋষিগণ, সকল ভ্রাতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নগর ও প্রান্তের লোক এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীরাও চললেন। এঁদের সকলের সঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

———৩———

অন্ত্যেষ্টিসংস্কার-সামগ্রী নিয়ে যুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্মের নিকট গমন এবং ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের কাছে দেহত্যাগের অনুমতি গ্রহণ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! হস্তিনাপুরে গিয়ে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নগর এবং প্রান্তের জনগণকে যথোচিত সম্মান জানালেন এবং তাঁদের নিজ নিজ গৃহে যাবার নির্দেশ দিলেন। এরপর যেসব নারীর পতি বা পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাঁদের বহু অর্থ প্রদান করে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল এবং তিনি মন্ত্রীবর্গকে তাদের উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করে বেদবেত্তা, গুণবান ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চাশ দিন হস্তিনাপুরে অতিবাহিত করার পর যখন সূর্যদেবকে দক্ষিণায়ন থেকে নিবৃত্ত হয়ে উত্তরায়ণের দিকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের মৃত্যুর কথা স্মরণ হল এবং তিনি যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে রওনা হতে উদ্যত হলেন। রওনা হওয়ার আগে তিনি ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃত, মালা, সুগন্ধ দ্রব্যাদি, রেশমি বস্ত্র, চন্দন, অগুরু, পুষ্পমাল্য, নানাপ্রকার রত্ন পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সঙ্গে নিয়ে মাতা কুন্তী, ভ্রাতাগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধিমান বিদুর ও সাত্যকির সঙ্গে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে রথ, হাতি, ঘোড়া, রাজোচিত উপকরণ ও সাজ-সজ্জা ছিল। বন্দীরা স্তুতি করতে করতে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির ভীষ্ম স্থাপিত ত্রিবিধ অগ্নি সম্মুখে রেখে নিজে তার পেছনে চলছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা কুরুক্ষেত্রে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। সেই সময় পরাশরনন্দন ব্যাস, দেবর্ষি নারদ এবং দেবল ঋষি পিতামহের কাছে বসেছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া, অন্যান্য দেশ থেকে আগত বহু রাজা ভীষ্মকে চারদিক থেকে রক্ষা করছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দূর থেকে বীরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে দর্শন করে ভ্রাতাসহ রথ থেকে নেমে ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁকে এবং ব্যাস অন্যান্য মহর্ষিদের প্রণাম করলেন। মহর্ষিরাও তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তখন তিনি ঋষিগণ পরিবেষ্টিত পিতামহের কাছে গিয়ে বললেন—'পিতামহ ! আমি যুধিষ্ঠির আপনার সেবাতে উপস্থিত হয়েছি, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি যদি আমার কথা শুনে থাকেন, তবে আদেশ দিন, আমি আপনার কী সেবা করব ? আপনার বলা সময় অনুসারে আমি অগ্নি ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আপনার মহাতেজস্বী পুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তাঁর মন্ত্রীসহ এখানে পদার্পণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সমস্ত রাজন্যবর্গ ও কুরুজাঙ্গালের লোকেরাও এখানে এসেছেন। আপনি চোখ খুলে এদের দেখুন। আপনার কথানুযায়ী যা কিছু করা প্রয়োজন, তা সব সম্পাদন করা হয়েছে। সব প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পরম বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম চোখ খুলে তাঁর চার দিকে দণ্ডায়মান সমস্ত ভরতবংশীয় রাজাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের

হাত ধরে মেঘমন্দ্র স্বরে সময়োচিত কথা বললেন—'পুত্র যুধিষ্ঠির ! তুমি যে তোমার মন্ত্রীবর্গসহ এখানে উপস্থিত হয়েছে, তা খুব ভালো হয়েছে। ভগবান সূর্য এখন দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণের দিকে এসেছেন। আমি আজ আটান্ন দিন ধরে এই তীক্ষ্ণ শরশয্যায় শায়িত আছি ; কিন্তু আমার কাছে এই দিনগুলি একশত বছরের মতো মনে হয়েছে। এখন চান্দ্রমাস অনুসারে মাঘ মাস হয়েছে এবং শুক্লপক্ষ চলছে, এর এক ভাগ সমাপ্ত হয়েছে, আরও তিন

ভাগ বাকি আছে।'

যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন—'রাজন্! তুমি ধর্মতত্ত্ব ভালোভাবে জানো। অর্থতত্ত্বও তুমি ভালোভাবে নির্ণয় করেছ। এখন তোমার মনে আর কোনোপ্রকারের প্রশ্ন নেই ; কারণ তুমি বহু শাস্ত্রজ্ঞানধারী বিদ্বান ব্যক্তিদের সেবা করেছ। বেদ, শাস্ত্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমার আছে, অতএব তোমার শোক করা উচিত নয়। যা হবার ছিল, তা হয়েছে। তুমি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছে দেবতাদের রহস্যও জেনেছ (সেই অনুযায়ী যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে)। এই পাণ্ডুর-পুত্র পাণ্ডবেরা ধর্মের দৃষ্টিতে তোমারও পুত্র। এরা সর্বদা গুরুজনদের সেবায় ব্যাপৃত থাকে। তুমি ধর্মে স্থিত হয়ে এদের নিজ পুত্রের মতো রক্ষা করবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয় অত্যন্ত শুদ্ধ, সে সর্বদা তোমার অধীনে থাকবে। আমি জানি ওর স্বভাব অত্যন্ত কোমল এবং গুরুজনের প্রতি সে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তোমার পুত্ররা অত্যন্ত দুরাত্মা, ক্রোধী, লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ এবং দুরাচারী ছিল, সুতরাং তাদের জন্য কখনো শোক করো না।'

ধৃতরাষ্ট্রকে একথা বলে ভীষ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—প্রভু! আপনি দেবতাদেরও দেবতা। দেবতা ও অসুর সকলেই আপনার পায়ে মাথা নত করে। আপনি ত্রিপদে ত্রিলোক পরিমাপকারী ভগবান বামন! আপনাকে প্রণাম। আপনি শঙ্খ, চক্র, গদাধারণকারী, বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পুরুষ, সবিতা, বিরাট, অনুরূপ জীব এবং সনাতন পরমাত্মাও আপনিই। কমলসম নেত্রবিশিষ্ট পুরুষোত্তম! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। শ্রীকৃষ্ণ! এবার আমাকে যাওয়ার আদেশ দিন এবং সর্বদা আপনার শরণে থাকা এই পাণ্ডু-পুত্রদের রক্ষা করতে থাকুন। আমি দুর্বুদ্ধি-সম্পন্ন দুর্যোধনকে এই বলে বুঝিয়েছিলাম যে, 'যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে ধর্ম এবং যেখানে ধর্ম সেই পক্ষের জয় নিশ্চিত। তাই পুত্র দুর্যোধন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও, এখন সন্ধির অতি উত্তম সুযোগ এসেছে।' এভাবে বার বার বলা সত্ত্বেও সেই মূর্খ আমার কথা মেনে নেয়নি এবং সমস্ত পৃথিবীর বীরকুল বিনাশ করে শেষে সে নিজেও মৃত্যুর গ্রাসে চলে যায়। মাধব! আমি আপনাকে জানি। আপনিই সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণ, যিনি চিরকাল নরের সঙ্গে বদরিকাশ্রমে নিবাস করেন। দেবর্ষি নারদ এবং মহাতপস্বী ব্যাসদেবও আমাকে বলেছেন যে, 'এই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ এবং নর, যাঁরা মানব শরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন।' শ্রীকৃষ্ণ! এবার আপনি অনুমতি দিন, আমি এই শরীর পরিত্যাগ করি। আপনার কৃপা পেলে আমার পরমগতি লাভ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভীষ্ম! আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ অনুমতি প্রদান করছি। আপনি বসুলোকে গমন করুন, ইহলোকে আপনার দ্বারা বিন্দুমাত্র পাপকার্য হয়নি। হে রাজর্ষি! আপনি দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃভক্ত ; তাই মৃত্যু বিনীত দাসীর ন্যায় আপনার বশীভূত।

ভগবান একথা বলায় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ সুহৃদদের বললেন—'এবার আমি দেহত্যাগ করতে চাই, তোমরা সকলে আমাকে অনুমতি দাও। তোমাদের সর্বদা সত্যধর্ম পালন করা উচিত ; কারণ সত্যই সব থেকে বড় শক্তি। তোমরা সকলের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবে, সর্বদা নিজেদের ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবে, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি রাখবে, ধর্মনিষ্ঠ এবং তপস্বী হবে।'

এই কথা বলে ভীষ্ম তাঁর সব সুহৃদদের আলিঙ্গন করলেন এবং তারপর যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্! তুমি সাধারণভাবে সকল ব্রাহ্মণকে, বিশেষ করে বিদ্বানদের এবং আচার্য ও ঋত্বিকদের সর্বদা পূজা করবে।'

ভীষ্মের দেহত্যাগ এবং ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের তাঁর অন্তিম সংস্কার, কৌরবদের দ্বারা গঙ্গাজলে ভীষ্মকে সমর্পণ করা, গঙ্গাদেবীর দর্শন দান এবং পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা-প্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কৌরবদের এই কথাগুলি বলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলেন। তারপর তিনি মনসহ প্রাণবায়ু ক্রমশ বিভিন্ন ধারণাতে স্থাপন করতে লাগলেন। এইভাবে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে মহাত্মা ভীষ্মের রুদ্ধ প্রাণ ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগল। সেই সময় সেইস্থানে একত্রিত সমস্ত সাধু-মহাত্মাদের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ব্যাসদেব এবং সমস্ত মহর্ষি লক্ষ্য করলেন শান্তনুনন্দন ভীষ্মের প্রাণ যে যে অঙ্গ থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে, সেই সেই অঙ্গের বাণ স্বতই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এবং বাণের ক্ষতও আপনিই ভরে যাচ্ছে। এইভাবে সকলের সম্মুখে ভীষ্মের শরীর থেকে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত বাণ পড়ে গেল। এই ঘটনা লক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্যাস প্রমুখ মহর্ষিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ভীষ্ম তাঁর দেহের সর্ব দ্বার বন্ধ করে প্রাণকে সব দিক দিয়ে রুদ্ধ করে রেখেছিলেন, তাই তাঁর প্রাণ তাঁর মস্তক (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করে আকাশে চলে গেল। সেই সময় দেবতারা দুন্দুভি বাজালেন এবং পুষ্পবর্ষণ করলেন। সিদ্ধ এবং ব্রহ্মর্ষিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, তাঁরা ভীষ্মকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন। ভীষ্মের প্রাণ তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সূর্যের ন্যায় আকাশে উঠে বিলীন হয়ে গেল। ভরত বংশের ভার বহনকারী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এইভাবে কালের অধীন হয়ে গেলেন।

তারপর নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য, কাঠ ইত্যাদি নিয়ে মহাত্মা পাণ্ডবগণ, বিদুর এবং যুযুৎসু চিতা তৈরি করতে লাগলেন, অন্যেরা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। এরপর যুধিষ্ঠির এবং বিদুর ভীষ্মের দেহ চিতার ওপর শায়িত করলেন এবং তাঁকে রেশম বস্ত্র ও ফুল দিয়ে ঢেকে দিলেন। যুযুৎসু তাঁর ওপর ছাতা ধরলেন, ভীমসেন ও অর্জুন শ্বেত চামর এবং ব্যজন করতে লাগলেন। মাদ্রীকুমার নকুল ও সহদেব উষ্ণীষ নিয়ে ভীষ্মের মাথায় পরিয়ে দিলেন। কুরুনারীগণ তালপাতার পাখা নিয়ে চতুর্দিক থেকে তাঁকে বাতাস করতে লাগলেন। পাণ্ডবেরা বিধিপূর্বক সময়োচিত পিতৃমেধ করে ভীষ্মের শব সংস্কার করে অগ্নিতে আহুতি

দিলেন। সেই সময় সামবেদের পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ সামগান করতে লাগলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র চন্দন কাঠ এবং সুগন্ধি বস্ত্র দ্বারা ভীষ্মের শরীর আচ্ছাদিত করে সেই চিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরবগণ সেই জ্বলন্ত চিতা প্রদক্ষিণ করলেন। ভীষ্মের দাহ সংস্কার করে সমস্ত কৌরব তাঁদের কুলের নারীদের নিয়ে ঋষি-মুনি সেবিত পরম পবিত্র গঙ্গাতীরে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে মহর্ষি ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, নগর নিবাসীগণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। গঙ্গাতীরে পৌঁছে সকলে বিধিপূর্বক মহাত্মা ভীষ্মকে জলাঞ্জলি দিলেন।

পুত্র ভীষ্মকে জলাঞ্জলি অর্পণ সম্পূর্ণ হলে ভগবতী ভাগীরথী জলের ওপর আবির্ভূত হয়ে শোকে বিহ্বল হলেন। দেবী গঙ্গা শোকবিমূঢ় হয়ে বলতে লাগলেন—'প্রিয় পুত্রগণ ! আমার কথা শোনো ভীষ্ম রাজোচিত সদাচারসম্পন্ন ছিলেন, তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত পবিত্র, তিনি অতি উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুরুকুলের বৃদ্ধ পুরুষদের সৎকারকারী এবং তিনি অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। তিনি আজীবন মহান ব্রত পালন করেছেন।

জামদগ্নিকুমার পরশুরামও তাঁর অস্ত্রের দ্বারা এঁকে পরাস্ত করতে পারেননি। কিন্তু সেই মহাপরাক্রমী বীর ভীষ্ম শিখণ্ডীর হাতে মারা গেলেন, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাথরে তৈরি, তাই নিজ পুত্রের মৃত্যু দেখেও এখনও তা বিদীর্ণ হয়নি। কাশীপুরীর স্বয়ংবর সভায় সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজা একত্রিত হয়েছিলেন ; ভীষ্ম একাকী তাঁদের সকলকে পরাজিত করে কাশীরাজকন্যাদের অপহরণ করেছিলেন। হায়! শক্তিতে যাঁর সমকক্ষ হওয়ার মতো কোনো বীর এই পৃথিবীতে নেই, তাঁকেই শিখণ্ডীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হল শুনে আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হল না? ওহ! যিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে পরশুরামকে অনায়াসে হারিয়ে কষ্টে ফেলেছিলেন, তিনিই শিখণ্ডীর হাতে মৃত্যু বরণ করলেন।'

গঙ্গাদেবী এইসব বলে বিলাপ করতে লাগলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'কল্যাণী! ধৈর্য ধারণ করুন, শোক ত্যাগ করুন। আপনার পুত্র ভীষ্ম উত্তমলোকে গমন করেছেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি মহাতেজস্বী বসু ছিলেন। বশিষ্ঠ মুনির শাপে মনুষ্য জন্ম ধারণ করেছিলেন। তাঁর জন্য আপনার শোক করা উচিত নয়। তিনি রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করেছেন এবং অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়েছেন ; শিখণ্ডীর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। দেবী! আপনার পুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যখন হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে থাকেন, তখন সাক্ষাৎ ইন্দ্রও তাঁকে মারতে সক্ষম হন না। তিনি নিজ ইচ্ছাতেই শরীর ত্যাগ করে দিব্যলোকে গমন করেছেন। সমস্ত দেবতা সম্মিলিতভাবেও তাঁকে যুদ্ধে মারার শক্তি রাখেন না, তাই আপনি কুরুনন্দন ভীষ্মের জন্য শোক করবেন না। তিনি বসুদেবস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর চিন্তা পরিত্যাগ করুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্যাসদেব যখন এইভাবে বোঝালেন, তখন নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গাদেবী শোক পরিত্যাগ করে জলে নেমে গেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও উপস্থিত অন্যান্যরা গঙ্গাদেবীকে সম্মান জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন।

॥ অনুশাসনপর্ব সমাপ্ত ॥

আশ্বমেধিকপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

যুধিষ্ঠিরের শোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান এবং যুধিষ্ঠিরকে বোঝাবার জন্য ব্যাসদেব কর্তৃক রাজা মরুত্তের বৃত্তান্ত শোনানো

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! ভীষ্মকে জলাঞ্জলি দেওয়ার পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুগমন করে মহাবাহু যুধিষ্ঠির জল থেকে উঠে এলেন। সেই সময় তিনি স্বজন বিয়োগে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। বাইরে এসে তাঁরা দুজনে গঙ্গার তীরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাজাকে এরূপ দীন এবং হতোৎসাহ দেখে পাণ্ডবেরা সকলেই শোকমগ্ন হয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে বসলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্! মানুষ যদি মৃত প্রাণীর জন্যে অত্যন্ত শোকাতুর হয় তাহলে তার পরলোকবাসী পিতা-পিতামহগণও অত্যন্ত সন্তপ্ত হন। সুতরাং আপনি বহু দক্ষিণাবিশিষ্ট নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করে সোমরস দ্বারা দেবগণকে এবং স্বধার (শ্রাদ্ধের) দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে তৃপ্ত করুন। অতিথিদের অন্ন ও জল প্রদান করে এবং অকিঞ্চন মানুষদের ইচ্ছা পূর্ণ করে তাদের সন্তুষ্ট করুন। আপনি তো সর্বপ্রকার তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছেন, করণীয় উপযুক্ত কাজও পূর্ণ করেছেন এবং ভীষ্ম, ব্যাস, নারদ ও বিদুরের কাছে রাজধর্ম শ্রবণ করেছেন। সুতরাং মূঢ় ব্যক্তির

ন্যায় আপনার শোক করা উচিত নয়। নিজের প্রতি আস্থা রাখুন, আপনার পিতা-পিতামহের কার্য অনুসরণ করে

করে রাজ্যভার গ্রহণ করুন। মহারাজ ! যা হওয়ার ছিল, সেইরূপই হয়েছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। এই যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে, আপনি তাদের আর কখনো ফিরে পাবেন না।'
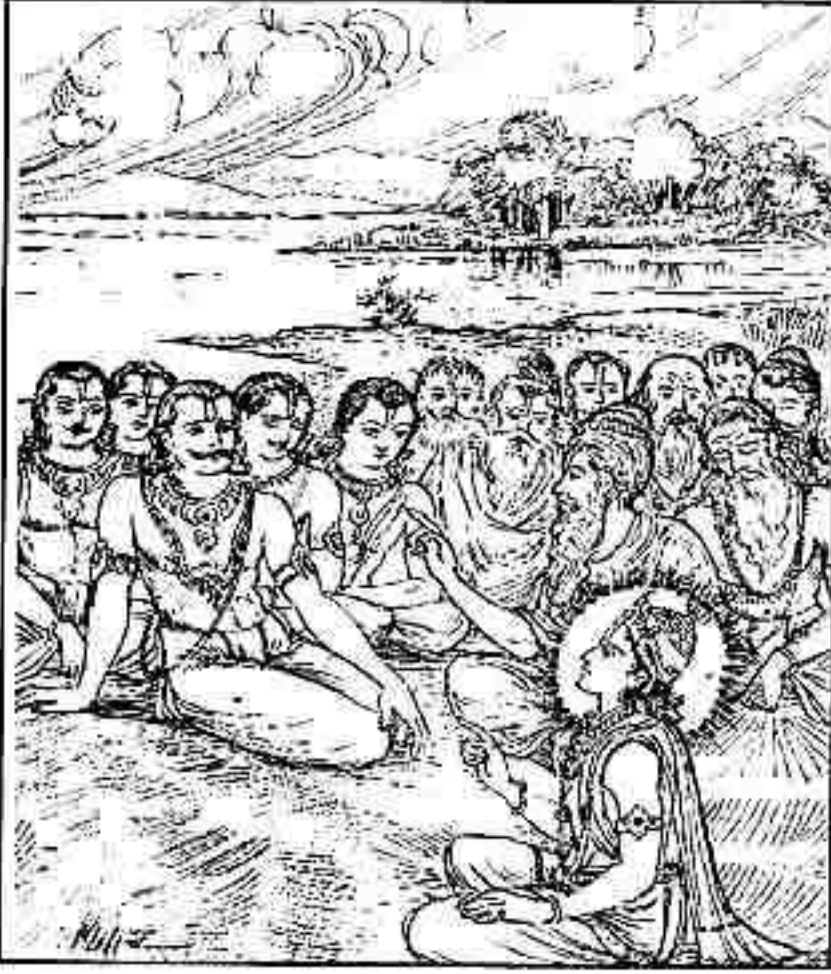
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বলে চুপ করলেন। তখন মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির বললেন—'গোবিন্দ ! আমার ওপর আপনার যে ভালোবাসা আছে, তা আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি স্নেহ ও সৌহার্দ্যবশত সর্বদাই আমাকে কৃপা করে থাকেন। গদাধর ! যদি প্রসন্নতাপূর্বক আপনি আমাকে তপোবনে যাওয়ার অনুমতি দেন, তাহলে সেটি আমার সব থেকে প্রিয় কাজ হয়। আমি পিতামহ ভীষ্ম এবং যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি যে কর্ণ, এঁদের হারিয়ে কখনো শান্তি পেতে পারি না। অতএব যেভাবে আমার এই ক্রূরতাপূর্ণ পাপ হতে মুক্তিলাভ হয়, যে কাজ করলে আমার চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাই করুন।'

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এভাবে কথা বলতে দেখে ধর্মতত্ত্বজ্ঞ মহাতেজস্বী ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! তোমার বুদ্ধি এখনো শুদ্ধ হয়নি। তুমি পুনরায় বালকের ন্যায় মোহগ্রস্ত হয়েছ। আমাদের বারংবার বোঝানো ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। যুদ্ধের দ্বারাই যাদের জীবিকা নির্বাহ হয়, সেই ক্ষত্রিয়দের ধর্ম তুমি ভালোমতো জানো। যেরূপ ব্যবহার করলে রাজাকে মানসিক চিন্তাগ্রস্ত হতে হয় না তাও তোমার অজানা নয়। মোক্ষধর্মও তুমি যথার্থরূপে শ্রবণ করেছ। আমিও অনেকবার তোমার সন্দেহ নিরসন করেছি। এতদ্ব্যতীত তুমি সমস্ত রাজধর্ম এবং দানধর্মও শুনেছ। এইরূপ সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা এবং সম্পূর্ণ শাস্ত্রের বিদ্বান ব্যক্তি হয়েও অজ্ঞতাবশত বারংবার কেন মোহগ্রস্ত হচ্ছ ? যুধিষ্ঠির ! আমার তো মনে হচ্ছে যে তোমার চিত্ত স্থির নেই (তাই তুমি সব দোষ নিজের ওপর নিচ্ছ)। আচ্ছা, তুমি যদি অনন্যোপায় হয়ে নিজেকেই যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী বলে মনে করো, তাহলে এক উপায় শোনো, যাতে এই পাপের নাশ হতে পারে। যে ব্যক্তি পাপ করে, সে তপস্যা, যজ্ঞ এবং দানের দ্বারাই নিজেকে উদ্ধার করে, এই কর্মগুলির দ্বারাই পাপ শুদ্ধি হয়। যজ্ঞের দ্বারাই দেবতাদের মাহাত্ম্য অধিক হয়েছে এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ দেবতাগণ যজ্ঞের বলেই দানবদের পরাস্ত করেছেন। দশরথনন্দন ভগবান রাম ও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র তোমার পূর্ব পিতামহ রাজা ভরত যেভাবে অশ্বমেধযজ্ঞ করেছিলেন, সেইরূপ তুমিও নানাপ্রকার দক্ষিণা দিয়ে বহু মনোবাঞ্ছিত পদার্থ, অন্ন ও ধন ইত্যাদি ব্যয় করে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করো।'

যুধিষ্ঠির বললেন—বিপ্রবর ! অশ্বমেধ যজ্ঞ যে রাজাকে পবিত্র করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমি আমার মনের একটি অভিপ্রায় আপনাকে জানাতে চাই, তা শুনুন। আমার ভ্রাতা-স্বজনদের এই মহা সংহার করার পরে আমার কাছে দক্ষিণা দেবার মতো অর্থ নেই, তাই এখন আমি অল্প পরিমাণ দান করতেও অপারগ। এখানে যেসব রাজকুমার রয়েছেন, তাঁরাও সকলেই সংকটগ্রস্ত। এঁদের দৈহিক ক্ষত এখনও সারেনি। এই যুদ্ধের জন্য এঁরা সকলেই অর্থশূন্য হয়ে পড়েছেন। তাই আমি এঁদের কাছ থেকেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারছি না। সমস্ত পৃথিবী বিনাশ করিয়ে আমি এমনিই শোকগ্রস্ত হয়ে রয়েছি। এখন এই সংকটগ্রস্তদের কাছ থেকে কীভাবে কর আদায় করব ? দুর্যোধনের অপরাধে এই পৃথিবী এবং এর অধিকাংশ রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে আর আমাদের মাথায় অপযশের কালি লেগেছে। ধনলোভে দুর্যোধন সমস্ত ভূমণ্ডল সংহার করেছে ; কিন্তু ধনপ্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, তার নিজের অর্থভাণ্ডারও শূন্য হয়ে গেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে সমগ্র পৃথিবীকে দক্ষিণা দেওয়া উচিত, বিদ্বানেরা এটিই মুখ্য কাজ বলে মনে করেন। এছাড়া আর যা কিছু করা হয়, তা বিধির বিপরীত। প্রধান বস্তুর অভাবে যখন অন্য কোনো বস্তু প্রদান করা হয়, তাকে প্রতিনিধি দক্ষিণা বলা হয় ; কিন্তু আমার প্রতিনিধি দক্ষিণা দেওয়ার ইচ্ছা

নেই ; অতএব কৃপা করে আপনি আমাকে এই বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করুন।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন—'ধর্মরাজ ! যদিও তোমার অর্থভাণ্ডার এখন খালি হয়ে রয়েছে, তবু খুব শীঘ্রই এটি পূর্ণ হয়ে যাবে। প্রাচীনকালে মহাত্মা রাজা মরুত্ত বিশাল যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের বহু স্বর্ণ দান করেছিলেন। তা এতো বেশি ছিল যে ব্রাহ্মণেরা তা নিয়ে যেতে পারেননি, সেখানেই ফেলে রেখে এসেছিলেন। সেই সমস্ত ধন আজও হিমালয় পর্বতের ওপর পড়ে আছে। তুমি সেগুলি সংগ্রহ করো, তোমার যজ্ঞের জন্য তা পর্যাপ্ত হবে।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মহর্ষি ! মহারাজা মরুত্ত কোন সময় পৃথিবীর রাজা ছিলেন ? তাঁর যজ্ঞে এতো ধন কীভাবে সংগৃহীত হয়েছিল ?

ব্যাসদেব বললেন—পুত্র ! সত্যযুগে রাজদণ্ড ধারণকারী বৈবস্বত মনু নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র মহাবাহু প্রসন্ধি নামে খ্যাত ছিলেন। প্রসন্ধির পুত্র ক্ষুপ এবং ক্ষুপের পুত্র ছিলেন মহারাজ ইক্ষাকু। ইক্ষাকুর একশত পুত্র ছিল, তাঁরা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি তাঁর সকল পুত্রদের এই পৃথিবীর রাজা করেছিলেন। তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল বিংশ, তিনি ধনুর্ধর বীরদের আদর্শ ছিলেন। বিংশের পুত্রের নাম ছিল বিবিংশ, তাঁর পনেরো জন পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পরাক্রমী, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, দান-ধর্মপরায়ণ, শান্ত এবং মধুরভাষী ছিলেন। এঁদের মধ্যে যে সব থেকে বড়, তার নাম ছিল খনীনেত্র, সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের অত্যন্ত কষ্ট দিত। সে ছিল অত্যন্ত পরাক্রমশালী, সকলকে পরাস্ত করে সে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করতে লাগল ; কিন্তু রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করতে সে অসমর্থ ছিল। প্রজারা তার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, তাই সকলে মিলে তাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তার পুত্র সুর্বচাকে রাজা করে। সুর্বচাকে রাজা করে প্রজারা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল। সুর্বচা তাঁর পিতার সেই দুর্দশা—তাকে রাজসিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়া দেখে অত্যন্ত শঙ্কিত ছিলেন। তাই প্রজাদের হিত করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি ব্রাহ্মণদের অতিশয় ভক্তি করতেন, সত্যকথা বলতেন, পবিত্রভাবে থাকতেন এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদি নিজ বশে রাখতেন। সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত সেই মনস্বী রাজার ওপর প্রজাদের বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মে প্রবৃত্ত থাকাতে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর অর্থভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল, তাঁর বাহনাদিও বিনষ্ট হল। সামন্ত রাজাদের কাছে তাঁর এই দুর্বলতা গোপন থাকল না। চারদিক থেকে তারা তাঁকে আক্রমণ করে বিরক্ত করতে লাগল। এই সংকটে রাজা সুর্বচা পুরবাসী ও তাঁর পরিবারবর্গ সমেত গভীর দুঃখে পতিত হলেন। তাঁর সেনা বিনষ্ট হয়ে গেলেও আক্রমণকারী রাজারা তাঁকে বধ করতে পারল না। কারণ তিনি সর্বদা ধর্মপালন করায় ধর্মই তাঁকে রক্ষা করেছিল। শত্রু অত্যন্ত প্রবল হলে, তিনি তাঁর হাত মুখে রেখে শঙ্খের মতো আওয়াজ করলেন, তাইতে এক বিশাল সৈন্যদল সৃষ্টি হল। তাদের সাহায্যে রাজা সুর্বচা সমস্ত শত্রুসৈন্যকে তাঁর রাজ্য থেকে অপসারিত করলেন। দু হাত দিয়ে আওয়াজ করায় রাজা সুর্বচা করন্ধম নামে পরিচিত হলেন।

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে করন্ধমের এক পুত্র হল, নাম অবিক্ষিৎ। তাঁর দেহকান্তি দেবরাজ ইন্দ্রের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। তাঁকে পরাস্ত করা দেবতাদের পক্ষেও কঠিন ছিল। পৃথিবীর সকল রাজা তাঁর অধীন ছিল। তিনি সদাচার ও বলের প্রভাবে সকলের সম্রাট হয়ে উঠলেন, শৌর্যে তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ, সর্বদা যজ্ঞ করতেন, ধর্মপরায়ণ, কান্তিমান ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির মতো বুদ্ধিমান এবং হিমালয়ের মতো স্থির স্বভাব। তিনি কর্ম, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয় সংযম এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা সর্বদা প্রজাদের প্রসন্ন রাখতেন। শাস্ত্রীয় রীতি মেনে তিনি একশত বার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, স্বয়ং অঙ্গিরা মুনি তাঁকে যজ্ঞ করিয়েছিলেন। রাজা অবিক্ষিতের পুত্র ছিলেন মহারাজ মরুত্ত। তিনি গুণে তাঁর পিতার থেকেও অধিক ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মতত্ত্বের জ্ঞাতা, মহাযশস্বী এবং চক্রবর্তী রাজা। তাঁর দেহে দশ হাজার হাতির বল ছিল। তাঁকে দ্বিতীয় বিষ্ণু বলে মনে করা হত। তিনি যজ্ঞ করার জন্য এক হাজার স্বর্ণের পাত্র তৈরি করিয়েছিলেন। হিমালয়ের উত্তর দিকে মেরু পর্বতের কাছে এক মহাসুবর্ণময় পর্বত আছে। তার কাছেই তিনি যজ্ঞশালা নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানেই যজ্ঞ আরম্ভ করেন। তিনি বহু স্বর্ণকারকে এনে অসংখ্য স্বর্ণকুণ্ড, স্বর্ণের পাত্র ও পালঙ্ক ইত্যাদি তৈরি করিয়েছিলেন। সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত হওয়ার পর ধর্মাত্মা মরুত্ত, অন্যরাজাদের সঙ্গে যথাযোগ্য যজ্ঞ করেন।

ইন্দ্রের প্রেরণায় বৃহস্পতির মনুষ্য দ্বারা কৃত যজ্ঞ না করার প্রতিজ্ঞা, মরুত্তের দেবর্ষি নারদের নির্দেশে সংবর্তের কাছে গমন এবং তাঁকে যজ্ঞের জন্য রাজি করানো

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তপোধন ! রাজা মরুত্তের পরাক্রম কীরূপ ছিল ? তিনি কীভাবে এতো স্বর্ণলাভ করলেন ? সেই সময় এতো ধন কোথায় পড়েছিল ? আমরা কীভাবে সেটি লাভ করতে পারি ?

ব্যাসদেব বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি অঙ্গিরার দুই পুত্র—একজন মহাতেজস্বী বৃহস্পতি, অন্যজন তপস্যায় রত থাকা সংবর্ত মুনি। তাঁরা দুজনেই ব্রতপালনে সমান উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ছিল। বৃহস্পতি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্তকে নানাভাবে বিরক্ত করতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুচিত ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে সংবর্ত ধন-দৌলতের মোহ পরিত্যাগ করে দিগম্বর হয়ে বনে বাস করতে লাগলেন। ঘরের চেয়ে বনে থেকেই তিনি সুখী ছিলেন। সেইসময় ইন্দ্র সমস্ত অসুরকে পরাস্ত করে ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন। এর আগে অঙ্গিরার যজমান ছিলেন রাজা করন্ধম। তাঁর মতো বলবান, সদাচারী এবং পরাক্রমশালী কেউ ছিল না। তিনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন আর তেজে ইন্দ্রের থেকেও বেশি। নিজ গুণের দ্বারা তিনি সমস্ত রাজাদের বশীভূত করেছিলেন। বলা হয় তিনি এই মনুষ্য দেহ নিয়েই স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন। তাঁরপর তাঁর পুত্র অবিক্ষিত পৃথিবীর রাজা হন, তিনিও যযাতির ন্যায় ধর্মজ্ঞ ছিলেন এবং পরাক্রম ও গুণে পিতার সমকক্ষ ছিলেন। তাঁরই পুত্র ছিলেন রাজা মরুত্ত, তিনি পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান ছিলেন। সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রজা তাঁর অনুরক্ত ছিল, মহারাজ মরুত্ত এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে সবসময় রেষারেষি লেগে থাকত। মরুত্ত অত্যন্ত পবিত্র এবং গুণবাণ ছিলেন। ইন্দ্র প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন ; কিন্তু কখনো সফল হননি। যখন কোনোভাবে এগোতে পারলেন না তখন তিনি বৃহস্পতিকে ডেকে দেবতাদের সামনে তাঁকে বললেন—'গুরুদেব ! আপনি যদি আমার প্রিয় কাজ করতে চান তাহলে রাজা মরুত্তের যজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধ করবেন না। আমিই হলাম ত্রিলোকের প্রভু ও দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। মরুত্ত শুধুমাত্র পৃথিবীর রাজা। আপনার কল্যাণ হোক। আপনি হয় মরুত্তকে পরিত্যাগ করে আমাকে আপনার যজমান করুন অথবা আমাকে ত্যাগ করে মরুত্তকে।'

ইন্দ্রের কথা শুনে বৃহস্পতি কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলেন—'দেবরাজ ! তুমি সমস্ত জীবের প্রভু। তোমার আধারের ওপরই সমস্ত লোক বজায় আছে। তুমি নমুচি, বিশ্বরূপ এবং বল নামক দৈত্য সংহার করেছ। তুমি দেবতাদের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর এবং সর্বোত্তম সম্পত্তির অধিকারী হয়েছ। তুমিই সর্বদা পৃথিবী ও স্বর্গপালন করো। তোমার পুরোহিত হয়ে আমি কীভাবে মরণশীল মরুত্তের যজ্ঞ করতে পারি ? তুমি ধৈর্য ধরো। আমি আর কোনো মানুষের যজ্ঞে কখনো স্রুবা গ্রহণ করব না। যদি অগ্নি নিস্তেজ হয়ে যায়, পৃথিবী স্থির হয়ে যায় এবং সূর্যদেব তাঁর আলো পরিত্যাগ করেন ; তবুও আমার এই সত্য প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ হবে না।'

বৃহস্পতির কথা শুনে ইন্দ্র তাঁর প্রশংসা করে নিজ ভবনে চলে গেলেন। রাজা মরুত্ত যখন শুনলেন যে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি মানুষের যজ্ঞ না করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, তখন তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। মনে মনে সেই যজ্ঞের সংকল্প করে তিনি বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন—'মুনিবর ! আমি আগে আপনার কাছে এসে যে যজ্ঞবিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনি যার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন, সেই যজ্ঞ আমি এখন আরম্ভ করতে চাই। আপনার কথা অনুযায়ী আমি সমস্ত সামগ্রী একত্রিত করেছি। এতদ্ব্যতীত আমি আপনার পুরানো যজমান, সুতরাং আপনি এসে আমার যজ্ঞ আরম্ভ করুন।'

বৃহস্পতি বললেন—রাজন্ ! আমি আর এখন তোমার যজ্ঞ করতে চাই না। দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে তাঁর পুরোহিত করেছেন এবং আমি তাঁর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে মানুষের যজ্ঞ আর করব না।

মরুত্ত বললেন—বিপ্রবর ! আমি আপনার পিতার সময় থেকেই আপনার যজমান, আপনাকে আমি বিশেষ

সম্মানও করি, আপনার চরণে আমার অত্যন্ত ভক্তি আছে ; সুতরাং আপনি আমাকে স্বীকার করুন।

বৃহস্পতি বললেন—মরুত্ত ! যিনি কখনো মৃত্যুর বশীভূত হন না, সেই দেবতাদের যজ্ঞ করাবার পর আমি এখন মরণশীল মানুষদের যজ্ঞ করাব কী করে ? তুমি অন্য কাউকে তোমার পুরোহিত নির্দিষ্ট করো, যে তোমায় যজ্ঞ করাবে। আজ থেকে আমি আর তোমার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করব না।

বৃহস্পতির উত্তর শুনে মহারাজ মরুত্তের অত্যন্ত সংকোচ হল। অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখনই পথে তাঁর সঙ্গে নারদের সাক্ষাৎ হল। রাজা মরুত্ত

তাঁর কাছে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। তখন নারদ তাঁকে বললেন—'রাজর্ষে ! তোমাকে প্রসন্ন দেখছি না, বলো তোমার সব কুশল তো ? এদিকে কোথায় গিয়েছিলে ? কী কারণে তুমি এতো বিষণ্ণ হয়ে রয়েছ ? যদি আমার শোনার যোগ্য হয় তো বলো, আমি তোমার দুঃখ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

দেবর্ষি নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় রাজা মরুত্ত উপাধ্যায়ের (পুরোহিতের) থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার সম্পূর্ণ ঘটনা জানালেন। তিনি বললেন—'দেবর্ষি নারদ ! আমি অঙ্গিরা পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তাঁকে আমার যজ্ঞের ঋত্বিক করব ; কিন্তু তিনি আমার প্রার্থনা মেনে নেননি, স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি আমার গুরু ছিলেন ; কিন্তু আজ তিনি আমাকে মরণশীল মানুষ হওয়ার দোষ জানিয়ে পরিত্যাগ করেছেন, তাই আমি আর বাঁচতে চাই না।'

রাজা মরুত্ত একথা বলায় দেবর্ষি নারদ তাঁর অমৃতময় বাক্য দ্বারা রাজাকে জীবন প্রদান করে বললেন—'রাজন্ ! অঙ্গিরার দ্বিতীয় পুত্র সংবর্ত অত্যন্ত ধার্মিক। তিনি দিগম্বর হয়ে নানা দিকে পরিভ্রমণ করছেন। বৃহস্পতি যদি তোমাকে তার যজমান করতে না চায়, তবে তুমি সংবর্তের কাছে চলে যাও, তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, তিনি প্রসন্ন হয়ে তোমার যজ্ঞে পৌরহিত্য করবেন।'

মরুত্ত জিজ্ঞাসা করলেন—দেবর্ষি ! আপনি একথা বলে আমাকে চিন্তামুক্ত করলেন। কিন্তু কৃপা করে বলুন আমি সংবর্ত মুনির দর্শন কোথায় পাব ? তাঁর সঙ্গে আমি কেমন ব্যবহার করব ?

নারদ বললেন—মহারাজ ! এখন তিনি বিশ্বনাথদেব দর্শনের জন্য কাশীপুরীতে পাগলের ন্যায় বেশধারণ করে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমি বিশ্বনাথ পুরীর প্রবেশ দ্বারে গিয়ে কোথাও থেকে এক মৃতদেহ এনে রেখে দেবে। প্রাতে বিশ্বনাথ দর্শনে যাওয়ার সময় যে ব্যক্তি ওই মৃতদেহ দেখে পিছু হটবে তাঁকেই সংবর্ত বলে জানবে এবং তিনি যেখানে যাবেন তাঁকে অনুসরণ করবে। যখন তিনি কোনো নির্জন স্থানে যাবেন তখন হাত জোড় করে তাঁর শরণাপন্ন হবে। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, 'তোমাকে আমার খবর কে দিয়েছে ?' তাহলে বলবে যে নারদ বলছেন, আপনিই মহাত্মা সংবর্ত।

তাঁর কথা শুনে রাজর্ষি মরুত্ত 'যথা আজ্ঞা' বলে নারদের নির্দেশ মেনে নিলেন এবং তাঁকে পূজা করে, তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে বারাণসীর দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে নারদের কথা স্মরণ করে তিনি কাশীপুরীর দ্বারে এক শব এনে রাখলেন। বিপ্রবর সংবর্ত সেখানে এসে সেই শব দেখে পিছু ফিরলেন। তা দেখে অবিক্ষিতনন্দন রাজা মরুত্ত সংবর্ত মুনির অনুসরণ করলেন। একান্তে পৌঁছে রাজাকে তাঁর পিছনে আসতে দেখে সংবর্ত মুনি বহু শাখা সম্বলিত এক বটগাছের শীতল ছায়ায় বসে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! তুমি আমাকে কী করে চিনতে পারলে ? তোমাকে আমার পরিচয় কে দিয়েছে ? যদি সত্য কথা বল, তাহলে
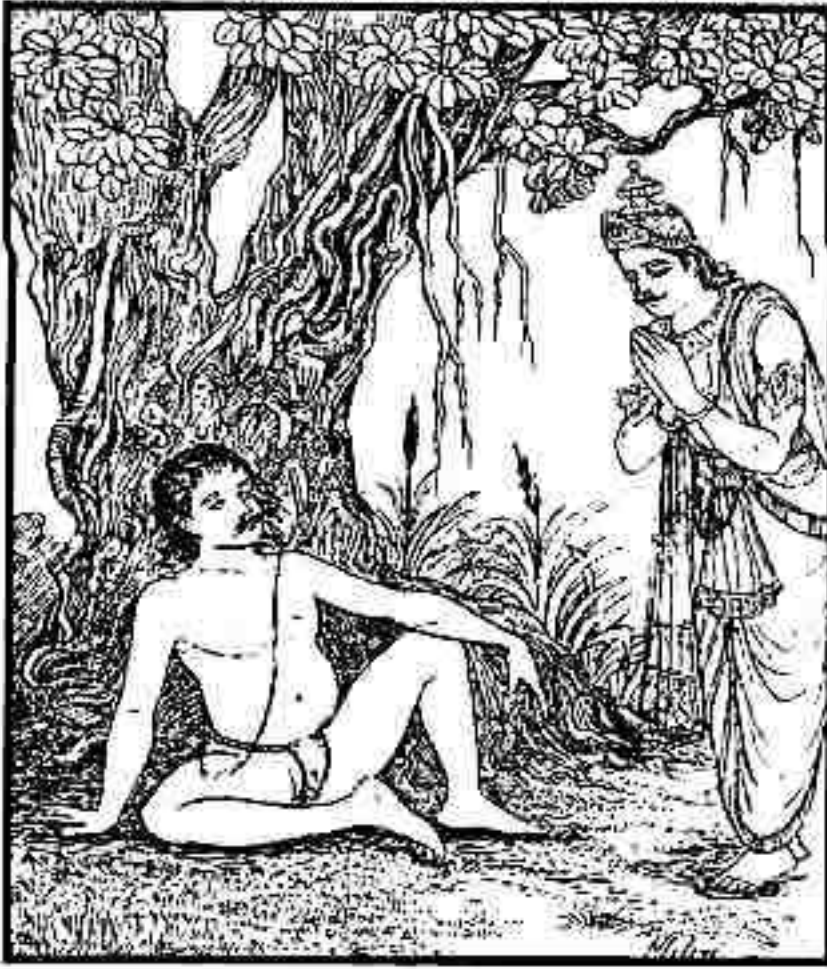
তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, আর যদি মিথ্যা বল, তাহলে তোমার মাথা শত টুকরো হয়ে যাবে।'

মরুত্ত বললেন—মুনিবর ! পথে দেবর্ষি নারদ আমাকে আপনার পরিচয় এবং অনুসন্ধান জানিয়েছেন। আপনি আমার গুরু ঋষি অঙ্গিরার পুত্র, একথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

সংবর্ত বললেন—রাজন্ ! তুমি ঠিক কথা বলেছ। নারদ জানেন যে আমি যজ্ঞ করাতে জানি। কিন্তু আমার স্বভাব হল ইচ্ছামতো কাজ করা, আমি কারো অধীনে থাকি না, তাহলে তুমি কেন আমাকে দিয়ে যজ্ঞ করাতে চাও ? আমার ভাই বৃহস্পতি এই কাজে পারদর্শী। আজকাল ইন্দ্রের সঙ্গে তার অত্যন্ত মেলামেশা। সে ইন্দ্রের যজ্ঞাদি করায়, সুতরাং তাকে দিয়েই তোমার যজ্ঞ করাও। গৃহের সমস্ত জিনিসপত্র, যজমান এবং গৃহ-দেবতাদের পূজা ইত্যাদি সবই আমার বড় ভাই অধিকার করে নিয়েছে। আমার কাছে শুধুমাত্র এই দেহটাই আছে।

মরুত্ত বললেন—ব্রহ্মন্ ! আমি আগে বৃহস্পতির কাছেই গিয়েছিলাম। সেকথা বলছি, শুনুন। তিনি ইন্দ্রকে প্রসন্ন রাখার জন্য এখন আর আমাকে তাঁর যজমান রাখতে চান না। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে 'অমর (দেবতা) যজমান লাভ করে এখন আমি আর মানুষের যজ্ঞ করাব না, তাছাড়া ইন্দ্র বারণও করেছেন যে আমি যেন মরুত্তের যজ্ঞ না করাই।' ইন্দ্রের কথা আপনার ভাই স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এখন আমার ইচ্ছা যে আমি আমার সর্বস্ব প্রদান করে আপনাকে দিয়েই যজ্ঞ করাব এবং আপনার সম্পাদিত গুণের দ্বারাই ইন্দ্রকে পরাজিত করব। এখন বৃহস্পতির কাছে যাওয়ার আমার আর ইচ্ছা নেই ; কারণ বিনা অপরাধে তিনি আমার প্রার্থনা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সংবর্ত বললেন—রাজন্ ! তুমি যদি আমার ইচ্ছানুসারে কাজ কর তাহলে যা চাইবে সেসব নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। আমি যখন তোমার যজ্ঞ করব, তখন ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দুজনেই ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে হিংসা করবেন। সেই সময় তোমাকে আমার পক্ষ সমর্থন করতে হবে। কিন্তু আমি কী করে একথা বিশ্বাস করব যে তুমি আমাকে সাহায্য করবে ? সুতরাং যেভাবে পারো আমার মনের সংশয় দূর করো, নাহলে এখনই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তোমাকে স্বজন-বান্ধবসহ ভস্ম করব।

মরুত্ত বললেন—ব্রহ্মন্ ! যদি আমি আপনার সঙ্গত্যাগ করি, তাহলে যতদিন সূর্য তাপ প্রদান করবে এবং যতদিন পর্বত স্থির থাকবে, ততদিন যেন আমি উত্তমলোক প্রাপ্তি না করি এবং কখনো যেন সুবুদ্ধি প্রাপ্ত না হই।

সংবর্ত বললেন—রাজন্ ! তোমার উত্তম বুদ্ধি যেন সর্বদা শুভকর্মে ব্যাপৃত থাকে। এবার আমার কথা শোনো—আমারও তোমায় যজ্ঞ করাবার ইচ্ছা আছে ; তাই তোমাকে অক্ষয় ধন প্রাপ্তির উপায় জানাব। সেই ধনের দ্বারা তুমি গন্ধর্বসহ দেবতাদের এবং ইন্দ্রকেও অবাক করে দিতে পারবে। আমি সত্য বলছি, আমার নিজের জন্য অর্থ বা যজমান সংগ্রহ করার কোনো লোভ নেই। আমি তোমার ভালো করতে চাই, সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাকে ইন্দ্রের সমকক্ষ করব।

—০—

স্বর্ণ প্রাপ্তির জন্য সংবর্তের মরুত্তকে মহাদেবের নামময় স্তুতি করার উপদেশ, মরুত্তের সম্পত্তিতে বৃহস্পতির চিন্তিত হওয়া এবং তাঁর প্রেরণায় ইন্দ্রের মরুত্তের কাছে অগ্নিকে প্রেরণ

সংবর্ত বললেন—রাজন্ ! হিমালয়ের পিছন দিকে মুঞ্জবান্ নামে এক পর্বত আছে, সেখানে ভগবান শংকর সর্বদা তপস্যা করেন। সেই পর্বতে রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, বসুগণ, যমরাজ, বরুণ, অনুচরগণ সহ কুবের, ভূত, পিশাচ, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, দেবর্ষি, আদিত্য, মরুৎ এবং যাতুধানগণ সব দিকে উমাপতি মহাদেবকে পরিবেষ্টন করে উপাসনা করে থাকেন। তাঁর শ্রীবিগ্রহ তেজে জাজ্বল্যমান থাকে। জগতের কোনো প্রাণীই তাদের চর্ম-চক্ষুর সাহায্যে তাঁর স্বরূপ দেখতে সক্ষম হয় না। সেখানে শীত বা গ্রীষ্ম—কোনোটিই অধিক হয় না, বায়ুর প্রকোপও বেশি নয়, সূর্যের তাপও নয়। সেই পর্বতের ওপরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কেউ কষ্ট পায় না, মৃত্যু এবং বৃদ্ধত্বের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই, অন্য কোনো ভয়ও সেখানে নেই। সেই পর্বত শিখরের চারদিকে সুবর্ণের বহু শিখর সূর্য কিরণের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কুবেরের অনুচরগণ তাদের প্রভুর জন্য সেই সুবর্ণ শিখর সর্বদা রক্ষা করে। সেখানে গিয়ে তুমি প্রথমে জগৎ-বিধাতা ভগবান শংকরকে নমস্কার করে এইভাবে তাঁর স্তুতি করবে—'দেবাদিদেব ! আপনি রুদ্র (দুঃখের কারণ দূরকারী), শিতিকণ্ঠ (গলায় নীল চিহ্ন ধারণকারী), পুরুষ (অন্তর্যামী), সুবর্চা (অত্যন্ত তেজস্বী), কপর্দী (জটাজুটধারী), করাল (ভয়ংকর রূপবিশিষ্ট), হর্যক্ষ (সবুজ নেত্রসম্পন্ন), বরদ (ভক্তদের অভীষ্ট বরপ্রদানকারী), ত্র্যক্ষ (ত্রিনেত্রধারী), পূষার দাঁত ভঙ্গকারী, বামন, শিব, যাম্য (যমরাজের গণস্বরূপ), অব্যক্তরূপ, সদ্‌বৃত্ত (সদাচারী), শংকর, ক্ষেম্য (কল্যাণকারী), হরিকেশ (মাটি রংয়ের চুলবিশিষ্ট), স্থাণু (স্থির), পুরুষ, হরিনেত্র, মুণ্ড, ক্রুদ্ধ, উত্তরণ (সংসার-সাগর পারকারী), ভাস্কর (সূর্যরূপ), সুতীর্থ (পবিত্র তীর্থস্বরূপ), দেবদেব, রংহস্ (বেগবান), উষ্ণীষী (মস্তকে পাগড়ি ধারণকারী), সুবক্ত্র (সুন্দর মুখ-বিশিষ্ট), সহস্রাক্ষ (সহস্র নেত্রবিশিষ্ট), মীঢ়বান্ (কামপূরক অথবা নন্দিকেশ্বর বৃষ), গিরিশ (পর্বতের ওপর শয়নকারী), প্রশান্ত যতি (সংযমী), চীরবাসা (চীরবস্ত্র ধারণকারী), বিল্বদণ্ড (বেলগাছের লাঠি ধারণকারী), সিদ্ধ, সর্বদণ্ডধর (সকলকে দণ্ডপ্রদানকারী), মৃগব্যাধ (আর্দ্রানক্ষত্ররূপ), মহান, ধন্বী (পিনাক নামক ধনুক ধারণকারী), সিদ্ধ, সর্বদণ্ডধর (সকলকে দণ্ডপ্রদানকারী), মৃগব্যাধ (আর্দ্রা নক্ষত্ররূপ), মহান্, ধন্বী (পিনাক নামক ধনুক ধারণকারী), ভব (জগৎ উৎপত্তিকারী), বর (শ্রেষ্ঠ), সোমবক্ত্র (চন্দ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট), সিদ্ধমন্ত্র (যিনি সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ করেছেন), চক্ষুষ্ (নেত্ররূপ), হিরণ্যবাহু (স্বর্ণের ন্যায় বাহুবিশিষ্ট), উগ্র (ভয়ংকর), দিক্‌পতি, লেলিহান (অগ্নিরূপে নিজ জিহ্বার দ্বারা হবিষ্য আস্বাদনকারী), গোষ্ঠ (গাভী অথবা বাণীর নিবাসস্থল), সিদ্ধমন্ত্র, বৃষ্ণি (কামনা বৃদ্ধিকারী), পশুপতি, ভূতপতি, বৃষ (ধর্মস্বরূপ), মাতৃভক্ত, সেনানী (কার্তিকেয়রূপ), মধ্যম, স্রুবহস্ত (হাতে স্রুবা গ্রহণকারী ঋত্বিকরূপ), পতি (সকলের পালনকারী), ভার্গব, অজ (জন্মরহিত), কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, তীক্ষ্ণ, বৈশ্বানরমুখ (অগ্নিরূপ মুখবিশিষ্ট), মহাদ্যুতি, অনঙ্গ (নিরাকার), সর্ব, বিশাম্পতি (সকলের পতি), বিলোহিত (রক্তবর্ণ), দীপ্ত (তেজস্বী), দীপ্তাক্ষ (দেদীপ্যমান চক্ষুবিশিষ্ট), মহৌজা (মহাবলী), বসুরেতা (হিরণ্যবীর্য অগ্নিরূপ), সুবপুষ (সুন্দর দেহবিশিষ্ট), পৃথু (স্থূল), কৃত্তিবাসা (মৃগচর্ম অথবা ভোজপত্র ধারণকারী), কপালমালী (মুণ্ডমালা ধারণকারী), সুবর্ণমুকুট, মহাদেব, কৃষ্ণ (সচ্চিদানন্দ স্বরূপ), ত্র্যম্বক (ত্রিনেত্রধারী), অনঘ (নিষ্পাপ), ক্রোধন (দুষ্টের ওপর ক্রোধকারী), অনৃশংস (কোমল স্বভাববিশিষ্ট), মৃদু, বাহুশালী, দণ্ডী, তপ্ততপা (তপস্বী), অক্রূরকর্মা (কঠোর কর্ম থেকে দূরে থাকেন যিনি), সহস্রশিরা (সহস্র মস্তকবিশিষ্ট), সহস্রচরণ, স্বধাস্বরূপ, বহুরূপ এবং দংষ্ট্রী নাম ধারণকারী। আপনাকে আমার প্রণাম। এইভাবে সেই পিনাকধারী মহাদেব, মহাযোগী, অবিনাশী, ত্রিশূল ধারণকারী, বরদায়ক, ত্র্যম্বক, ভুবনেশ্বর, ত্রিপুরাসুর বধকারী, ত্রিনেত্রধারী, ত্রিভুবনের স্বামী, মহাবলবান, সর্বজীবের উৎপত্তির কারণ,

সকলকে ধারণকারী, পৃথিবীর ভারবহনকারী, জগতের শাসক, কল্যাণকারী, সর্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ, বিশ্বেশ্বর, জগৎ উৎপন্নকারী, পার্বতীর পতি, পশুপালক, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, বিরূপাক্ষ, দশবাহুধারী, নিজ ধ্বজায় দিব্য বৃষচিহ্নধারী, উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, শর্ব, গৌরীশ, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজন্মা, শুক্র, পৃথু, পৃথুহর, বর, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপ, উমাপতি, কামদেব ভস্মকারী, হর, চতুর্মুখ। শরণাগত-বৎসল মহাদেবকে মস্তক নত করে প্রণাম করে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে যাবে। রাজন্ ! তিনি মহান দেবতা, মহাবেগবান এবং মহামনা। তাঁর চরণে মস্তক নত করলে তোমার স্বর্ণপ্রাপ্তি হবে। সুবর্ণ আনয়নের জন্য তোমার সেবকদেরও সেখানে যাওয়া উচিত।

সংবর্তের কথা শুনে রাজা মরুত্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি সযত্নে যজ্ঞের সামগ্রী জোগাড় করতে লাগলেন। তাঁর কারীগরেরা সেখানে থেকে বহু স্বর্ণপাত্র তৈরি করল। এদিকে বৃহস্পতি যখন শুনলেন যে রাজা মরুত্ত দেবতাদের থেকেও বেশি সম্পত্তি লাভ করেছেন, তখন তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হল। তিনি চিন্তায় দুর্বল হয়ে গেলেন এবং 'আমার শত্রু সংবর্ত অত্যন্ত ধনী হয়ে যাবে' ভেবে অত্যন্ত কৃশ হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যখন শুনলেন যে বৃহস্পতি মনে মনে সন্তপ্ত হয়েছেন তখন তিনি দেবতাদের নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'বিপ্রবর ! আপনি কীভাবে এই মানসিক ও শারীরিক দুঃখ প্রাপ্ত হলেন ? আপনি বিষণ্ণ ও দুর্বল হয়ে গেছেন কেন ? কৃপা করে বলুন, যারা আপনাকে দুঃখ দিয়েছে আমি তাদের বিনাশ করব।'

বৃহস্পতি বললেন—ইন্দ্র ! নানা জনে বলছে যে মহারাজ মরুত্ত উত্তম দক্ষিণাযুক্ত এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করতে উদ্যত হয়েছে এবং শোনা যাচ্ছে সংবর্তই আচার্য হয়ে সেই যজ্ঞ করাবে। আমার ইচ্ছা যে আচার্যের পদে সংবর্তের নির্দেশে এই যজ্ঞানুষ্ঠান যেন হতে না পারে।

ইন্দ্র বললেন—গুরুদেব ! আপনি তো দেবতাদের পুরোহিত। আপনি জরা ও মৃত্যু উভয়ই জয় করেছেন, তাহলে সংবর্ত আপনার কী ক্ষতি করবে ?

বৃহস্পতি বললেন—দেবরাজ ! শত্রুর সমৃদ্ধি দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। আমার শত্রু সংবর্ত সমৃদ্ধিশালী হতে চলেছে, তাই শুনে আমি বিষণ্ণ হচ্ছি। যে কোনো প্রকারে তুমি সংবর্ত অথবা রাজা মরুত্তকে বন্দী করো।

সেকথা শুনে ইন্দ্র অগ্নিদেবতাকে বললেন—'অগ্নিদেব ! আমি আপনাকে রাজা মরুত্তের কাছে পাঠাচ্ছি। তাঁর সম্মতি নিয়ে বৃহস্পতিকে এই সংবাদ দিন। সেখানে গিয়ে রাজাকে বলবেন যে বৃহস্পতিই আপনার যজ্ঞ করাবেন এবং তিনি আপনাকে অমরও করে দেবেন।'

অগ্নিদেব বললেন—দেবরাজ ! আমি বৃহস্পতিকে মরুত্তের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আপনার দূত হয়ে যাব এবং সেই কাজ করে আপনার নির্দেশ পালন ও বৃহস্পতিকে সম্মান জানাব।

একথা বলে ধূমময় ধ্বজাসম্পন্ন মহাত্মা অগ্নিদেব সেখান থেকে রওনা হলেন। তাঁকে আসতে দেখে মরুত্ত সংবর্তকে বললেন—'মুনিবর ! অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে অগ্নিদেব আজ মূর্তি পরিগ্রহ করে এখানে পদার্পণ করেছেন। আজ তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া গেছে। আপনি তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য প্রস্তুত করুন।'

অগ্নি বললেন—রাজন্ ! আমি আপনার প্রদত্ত পাদ্য-অর্ঘ্য ও আসন ইত্যাদি গ্রহণ করেছি, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমি ইন্দ্রের নির্দেশে দূতরূপে এখানে এসেছি।

মরুত্ত বললেন—অগ্নিদেব ! শ্রীমান দেবরাজ সুখী তো ? তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট তো ? সব দেবতা তাঁর নির্দেশের অধীন থাকেন তো ? আমাকে সব কথা ঠিকমতো বলুন।

অগ্নিদেব বললেন—রাজন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত সুখে আছেন। আপনার সঙ্গে অটুট মৈত্রীবন্ধন করতে চান। সমস্ত দেবতাও তাঁর অধীনে আছেন। এখন তিনি যে কাজের জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, তা শুনুন। তিনি আমার সঙ্গে বৃহস্পতিকে আপনার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, বৃহস্পতি আপনার গুরু, সুতরাং তিনিই আপনার যজ্ঞ করাবেন। আপনি মরণশীল মানুষ, তিনি আপনাকে অমর করে দেবেন।

মরুত্ত বললেন—অগ্নিদেব ! আমার যজ্ঞ করাবার জন্য বিপ্রবর সংবর্ত এখানে উপস্থিত আছেন। গুরু বৃহস্পতির জন্য আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের পুরোহিত, আমার মতো মানুষের যজ্ঞ করানো তাঁর শোভা পায় না।

অগ্নিদেব বললেন—রাজন্ ! বৃহস্পতি আপনার যজ্ঞ করালে দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হবেন এবং তিনি প্রসন্ন হলে দেবলোকের দুর্লভসমূহ আপনার পক্ষে অত্যন্ত সুলভ হবে। আপনি যশস্বী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বর্গে বিজয় প্রাপ্ত করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দিব্যলোক, প্রজাপতি লোক ও দেবতাদের রাজ্যের ওপরও আপনার পূর্ণ অধিকার হবে।

সংবর্ত বললেন—হে অগ্নি ! আমি তোমাকে সাবধান করছি, বৃহস্পতিকে মরুত্তের কাছে আর কখনো নিয়ে এস না। নাহলে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ানক দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে ভস্ম করে দেব।

সংবর্তের কথা শুনে অগ্নিদেব ভস্ম হওয়ার ভয়ে ঝড়ের মাঝে অশ্বত্থ গাছের পাতার মতো কাঁপতে লাগলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবতাদের কাছে ফিরে গেলেন। তাঁকে ফিরতে দেখে ইন্দ্র বৃহস্পতির সামনেই জিজ্ঞাসা করলেন—'অগ্নিদেব ! তুমি আমার নির্দেশে রাজা মরুত্তের কাছে তাঁর যজ্ঞে বৃহস্পতির পৌরোহিত্যের সংবাদ দিয়েছ। বলো, তিনি কী বললেন ? তিনি আমার কথা মেনে নিয়েছেন কি না ?

অগ্নি বললেন—দেবরাজ ! রাজা মরুত্তের আপনার কথা পছন্দ হয়নি। বৃহস্পতিকে তিনি আন্তরিক প্রণাম জানিয়েছেন। আমি বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উত্তর দিয়েছেন যে সংবর্তই তাঁর যজ্ঞ করাবেন।

ইন্দ্র বললেন—অগ্নিদেব ! আর একবার গিয়ে রাজা মরুত্তকে আমার কথা বলো। যদি এখনও তিনি মেনে না নেন, তাহলে আমি তাঁকে বজ্রাঘাত করব।

অগ্নি বললেন—দেবরাজ ! গন্ধর্বদের রাজা এখানে উপস্থিত আছেন। এঁকে দূত করে পাঠান। আমার ওখানে যেতে ভয় করছে ; কারণ ব্রহ্মচারী সংবর্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বলেছেন যে, 'হে অগ্নি ! যদি আবার বৃহস্পতিকে মরুত্তের কাছে নিয়ে আসো, তাহলে আমি দারুণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তোমাকে ভস্ম করে দেব।'

ইন্দ্র বললেন—অগ্নিদেব ! তোমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, কারণ তুমিই তো অন্যকে ভস্ম করে থাক। তোমাকে ভস্ম করার কেউ নেই, তোমার স্পর্শে তো সকলেই ভয় পায়।

অগ্নি বললেন—মহেন্দ্র ! জরা রাজা শর্যাতির যজ্ঞ স্মরণ করুন, যেখানে চ্যবন মুনি যজ্ঞকারী ছিলেন। আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বারণ করলেও তিনি একাকী নিজ প্রভাবে অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে সোমরস পান করেন। তখন আপনি অতি ভয়ংকর বজ্র নিয়ে তাঁকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর তপোবলে আপনার হাত বজ্রসমেত স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আপনাকে আবার তাঁরই শরণ নিতে হয়েছিল। সুতরাং ক্ষাত্রবলের থেকে ব্রহ্মবলই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবলের থেকে বড় আর কোনো বল নেই। আমি ভালোভাবেই ব্রহ্মতেজের কথা জানি, তাই আমি সংবর্তকে জয় করার সাহস করি না।

———○———

ইন্দ্রের গন্ধর্বরাজকে পাঠিয়ে মরুত্তকে ভয় দেখানো এবং সংবর্তের মন্ত্রবলের দ্বারা সব দেবতাদের ডেকে এনে মরুত্তের যজ্ঞ পূর্ণ করা

ইন্দ্র বললেন—একথা ঠিক যে ব্রহ্মবল সব থেকে বড়, ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই ; কিন্তু আমি রাজা মরুত্তের বল সহ্য করতে পারছি না। তাঁর ওপর অবশ্যই ভয়ংকর বজ্রাঘাত করব। গন্ধর্বরাজ এবার তুমি আমার কথায় ওখানে যাও এবং সংবর্তের সঙ্গে দেখা করে রাজা মরুত্তকে বল—'রাজন্ ! আপনি বৃহস্পতিকে আপনার যজ্ঞের আচার্য করুন। অন্যথায় দেবরাজ ইন্দ্র আপনার ওপর ভয়ংকর বজ্রাঘাত করবে।'

ইন্দ্রের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র মরুত্তের কাছে গিয়ে তাঁকে ইন্দ্রের সংবাদ জানালেন—'মহারাজ ! আমি ধৃতরাষ্ট্র নামক গন্ধর্ব, আপনার কাছে দেবরাজ ইন্দ্রের খবর জানাতে এসেছি। সমস্ত লোকের স্বামী ইন্দ্র বলেছেন যে, আপনি বৃহস্পতিকে আপনার যজ্ঞের পুরোহিত করুন। যদি তাঁর কথা মেনে না নেন, তাহলে তিনি আপনার ওপর ভয়ংকর বজ্রাঘাত করবেন।'

মরুত্ত বললেন—গন্ধর্বরাজ ! আপনি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব, বসু ও অশ্বিনীকুমার ইত্যাদি সকল দেবতাই একথা জানেন যে মিত্রের সঙ্গে দ্রোহ করলে ব্রহ্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ হয়। জগতে তার থেকে মুক্তি লাভের কোনো উপায় নেই। সুতরাং আমার যজ্ঞ এখন সংবর্তই করাবেন। বৃহস্পতি দেবতাদের এবং বজ্রধারী শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ করাবেন। এর বিপক্ষে আমি আপনার বা ইন্দ্রের কারো কথাই মেনে নেব না।

গন্ধর্বরাজ বললেন—মহারাজ ! ইন্দ্র আকাশে গর্জন করছেন। তাঁর ভয়ংকর সিংহনাদ শুনুন। মনে হচ্ছে তিনি এবার আপনার ওপর বজ্রাঘাত করতে চান ; অতএব আপনি আপনার রক্ষার উপায় ভাবুন ; এখন তা ভাবারই সময়।

গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলায় রাজা মরুত্ত আকাশে সিংহনাদ করা ইন্দ্রের গর্জন শুনে তপঃপরায়ণ সংবর্ত মুনিকে বললেন—'বিপ্রবর ! আমি আপনার শরণাগত এবং আপনার সাহায্যে রক্ষা পেতে চাই। সুতরাং আপনি কৃপা করে আমাকে অভয় প্রদান করুন। দেখুন, বজ্রধারী ইন্দ্র দশদিক আলোকিত করে এগিয়ে আসছেন। তাঁর ভয়ংকর সিংহনাদে আমার যজ্ঞশালার সদস্যগণ কম্পিত হয়ে উঠছেন।'

সংবর্ত বললেন—রাজন্ ! ইন্দ্রকে ভয় করো না। আমি স্তম্ভিনী বিদ্যা প্রয়োগ করে খুব শীঘ্রই তোমার এই ভয়ংকর সংকট দূর করে দিচ্ছি। বিশ্বাস রাখো এবং ইন্দ্রের কাছে পরাজিত হওয়ার ভয় ত্যাগ করো। আমি এখনই ওঁকে স্তম্ভিত করছি এবং সমস্ত দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রও ক্ষীণ করে দিচ্ছি।
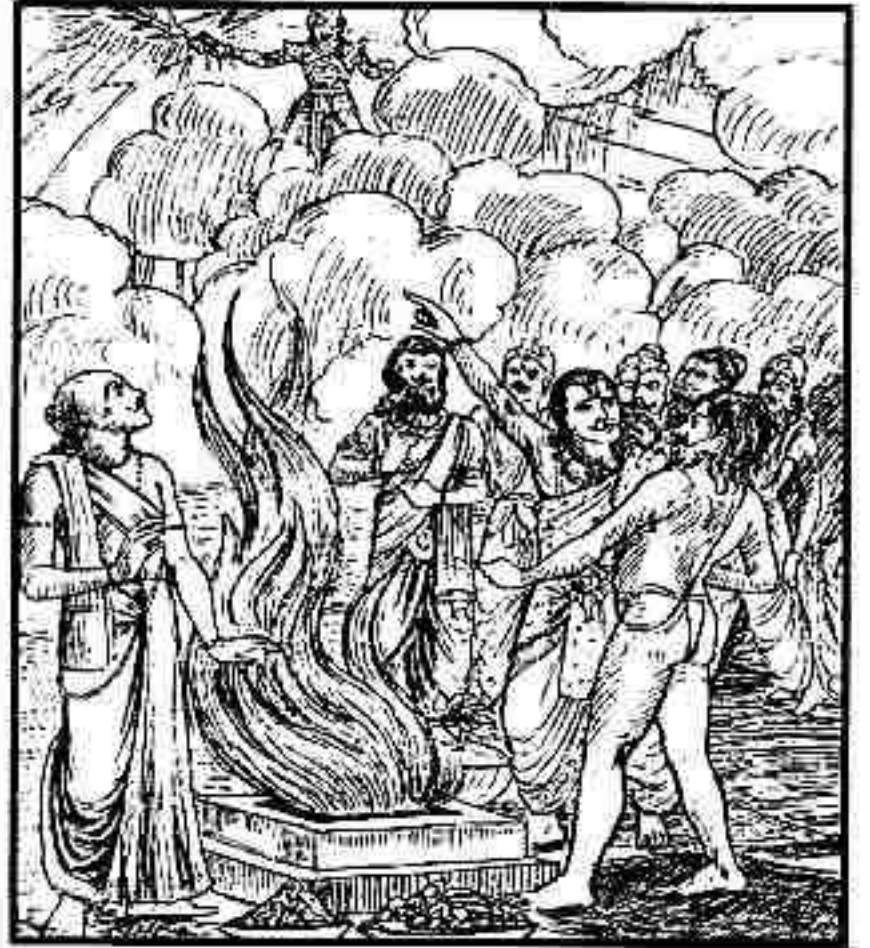
মরুত্ত বললেন—বিপ্রবর ! ঝড়ের সঙ্গে বজ্রের ভয়ংকর ধ্বনি জোরে শোনা যাচ্ছে ; তাতে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। মনে একটুও শান্তি পাচ্ছি না।

সংবর্ত বললেন—রাজন্ ! ইন্দ্রের ভীষণ বজ্রকে তোমার কখনো ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমি এখনই বায়ুর রূপ ধারণ করে বজ্রকে নিষ্ফল করে দিচ্ছি। এই ভয় পরিত্যাগ করে আমার কাছ থেকে অন্য কোনো বর প্রার্থনা করো। বলো, তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব ?

মরুত্ত বললেন—ব্রহ্মর্ষি ! যাতে সাক্ষাৎ ইন্দ্র আমার যজ্ঞে পদার্পণ করেন এবং নিজ ভাগ গ্রহণ করেন, আপনি তাই করুন। সেই সঙ্গে অন্য দেবতারাও এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন এবং সকলে যাতে একত্রে সোমরস

পান করেন।

তারপর সংবর্ত তাঁর মন্ত্র বলে সমস্ত দেবতাদের আবাহন করলেন। তারপর ইন্দ্র তাঁর রথে সুন্দর ঘোড়া লাগিয়ে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে সোমরস পানের জন্য অনুপম পরাক্রমশালী রাজা মরুত্তের যজ্ঞশালায় এলেন। দেববৃন্দের সঙ্গে ইন্দ্রকে আসতে দেখে রাজা মরুত্ত তাঁর পুরোহিত সংবর্ত মুনির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের স্বাগত জানালেন এবং সসম্মানে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পূজা করলেন।

সংবর্ত বললেন—দেবরাজ ! আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনার শুভ আগমনে এই যজ্ঞের শোভা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। আমার প্রস্তুত করা সোমরস তৈরি আছে, আপনারা পান করুন।

মরুত্ত বললেন—সুরেন্দ্র ! আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনি আমার ওপর কল্যাণময় দৃষ্টি দান করুন। আপনি পদার্পণ করায় আমার যজ্ঞ ও জীবন সফল হয়েছে। সংবর্ত মুনি আমার যজ্ঞ করাচ্ছেন।

ইন্দ্র বললেন—নরেন্দ্র ! আপনার গুরু সংবর্তকে আমি জানি, ইনি বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কঠোর তপস্বী। এঁর তেজ অত্যন্ত দুঃসহ। এঁর আবাহনের জন্যই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। এখন আমার সমস্ত ক্রোধ দূর হয়েছে এবং আপনার ওপর আমি বিশেষভাবে প্রসন্ন হয়েছি।

সংবর্ত বললেন—দেবরাজ ! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে যজ্ঞে যেসব ক্রিয়াকর্ম প্রয়োজন, তার উপদেশ দিন এবং নিজে অন্য সব দেবতাদের ভাগ নিশ্চিত করুন।

সংবর্ত এই কথা বলায় ইন্দ্র দেবতাদের নির্দেশ দিলেন যে 'তোমরা সকলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও চিত্র-বিচিত্র সুন্দর সভা-ভবন নির্মাণ করো, যাতে এই যজ্ঞশালা স্বর্গের ন্যায় মনোহর হয়।' তাই শুনে সমস্ত দেবতা অতি শীঘ্র ইন্দ্রের নির্দেশ পালন করলেন। ইন্দ্র তখন প্রসন্ন হয়ে রাজা মরুত্তের প্রশংসা করে বললেন—'রাজন্ ! এখানে আমার সঙ্গে তোমার পূর্বপুরুষগণ এবং সমস্ত দেবতা প্রসন্নতাপূর্বক একত্রিত হয়েছেন। এঁরা সকলেই তোমার প্রদত্ত হবিষ্য গ্রহণ করবেন।'

তারপর অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মহাত্মা সংবর্ত গম্ভীরস্বরে মন্ত্র পাঠ করে দেবতাদের নাম নিয়ে অগ্নিতে হবিষ্য দান করলেন। যজ্ঞের পর ইন্দ্র এবং সোমরসপানের অধিকারী অন্য দেবতারা উত্তম সোমরস পান করলেন। সকল দেবতাই এতে তৃপ্ত ও প্রসন্ন হলেন। অতঃপর সকল দেবতা রাজা মরুত্তের অনুমতি নিয়ে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। রাজা মরুত্ত অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ব্রাহ্মণদের প্রভূত স্বর্ণ ও অর্থ দক্ষিণা দিলেন। সেইসময় তাঁকে ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় দেখাচ্ছিল। ব্রাহ্মণেরা নিয়ে যাওয়ার পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়েছিল, রাজা মরুত্ত তা একস্থানে জমা করলেন। তারপর তিনি গুরু সংবর্তের অনুমতি নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ! রাজা মরুত্ত এমনই প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর যজ্ঞে বহু সুবর্ণ জমা করা হয়েছিল। তুমি সেই ধন সংগ্রহ করে যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের তৃপ্ত করো।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেবের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তিনি সেই সামগ্রীর দ্বারা যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে বোঝানো, ঋষিদের অন্তর্ধান হওয়া এবং পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্যদের শ্রাদ্ধকর্ম শেষে যুধিষ্ঠিরদের হস্তিনাপুর গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি বেদব্যাস যখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলেন, তখন তাঁকে আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত জেনে মহাতেজস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে আরম্ভ করলেন—'ধর্মরাজ ! কুটিলতা সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং সরলতা ব্রহ্মপ্রাপ্তি করায়, এই কথা ঠিকমতো বুঝে নেওয়াই জ্ঞান ; এর বিপরীতে যা কিছু তা অসার বাগাড়ম্বর মাত্র। এতে কার কী লাভ হবে ? এখন আপনাকে একাই আপনার মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, সেই যুদ্ধ সম্মুখে উপস্থিত ; সুতরাং তার জন্য আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে। নিজ কর্তব্য পালন করে যোগের দ্বারা মনকে বশীভূত করে আপনি এই মায়াময় জগতের অতীত—পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করুন। মনের সঙ্গে হওয়া এই যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র, সেবক বা বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন নেই, এতে আপনাকে একাই যুদ্ধ করতে হবে। যদি এই যুদ্ধে আপনি মনকে পরাস্ত করতে না পারেন, তাহলে জানি না, আপনার কী দশা হবে ! একথা ভালোভাবে বুঝে গেলে আপনি কৃতার্থ হয়ে যাবেন। সমস্ত প্রাণীরা এইভাবেই আসা-যাওয়া করে (জন্মাতে ও মরতে) থাকে। এটি নিশ্চিত জেনে আপনি আপনার পিতা-পিতামহের আচরিত ধর্মের পালন করে যথার্থভাবে রাজ্য শাসন করুন। ভারত ! শুধুমাত্র (রাজ্যাদি) বাহ্যবিষয় ত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। বাহ্য পদার্থ থেকে পৃথক হয়েও যারা শারীরিক সুখ-বিলাসে আসক্ত হয়, তারা যে ধর্ম ও সুখ প্রাপ্ত হয়, তা আপনার শত্রুরাই প্রাপ্ত করুক। 'মম' (আমার) এই দু অক্ষর মৃত্যু প্রাপ্তি করায়, আর 'ন মম' আমার নয়, এই তিন অক্ষর সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়। মমতা মৃত্যু আর সেটির ত্যাগ হল অমৃতত্ব প্রাপ্তি। চরাচর প্রাণীসহ সমগ্র পৃথিবী লাভ করেও যার তাতে মমতা নেই, সেই পুরুষের কী ক্ষতি হতে পারে ? কিন্তু বনে বাস করে ফলমূল দ্বারা জীবন নির্বাহ করেও যার দ্রব্যের ওপর মমতা থাকে, সে তো মৃত্যুমুখেই পড়ে আছে। আপনি বাইরের এবং ভেতরের শত্রুদের চরিত্রের ওপর দৃষ্টিপাত করুন (অর্থাৎ এরা সব মায়াময় হওয়ায় মিথ্যা এই সিদ্ধান্ত করুন)। যে ব্যক্তি মায়াময় পদার্থকে মমত্বের দৃষ্টিতে দেখে না, সে মহাভয় থেকে মুক্তি লাভ করে। যার মন কামনাসক্ত, সে সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করে না। বিনা কামনায় কোনো প্রবৃত্তি হয় না এবং সমস্ত কামনা মন থেকেই উদয় হয়। বিদ্বান পুরুষ কামনাই দুঃখের কারণ জেনে তা পরিত্যাগ করেন। যোগী পুরুষ বহু জন্মের অভ্যাসের দ্বারা যোগকেই মোক্ষের পথ স্থির করে কামনা নাশ করে ফেলেন। যিনি একথা জানেন তিনি দান, বেদাধ্যয়ন, তপ, বেদোক্ত কর্ম, ব্রত, যজ্ঞ, নিয়ম এবং ধ্যানযোগ ইত্যাদি কামনাপূর্বক অনুষ্ঠান করেন না এবং যে কর্মে তিনি কোনো কামনা রাখেন, তা ধর্মই নয়। বাস্তবে কামনার নিগ্রহই হল ধর্ম এবং তাই মোক্ষের বীজ।

এই বিষয়ে প্রাচীন কথা জানা বিদ্বানগণ 'কাম-গীতা' নামে প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন গাথা বর্ণনা করেন, আমি তা বর্ণনা করছি, শুনুন। কামনা বলে যে—'কোনো প্রাণী প্রকৃত উপায় (নির্মমতা এবং যোগাভ্যাস)-এর আশ্রয় না নিয়ে আমার বিনাশ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে অস্ত্রবলের আধিক্য অনুভব করে আমাকে বিনাশ করার চেষ্টা করে, তার সেই অস্ত্রবলে আমি অহংকার রূপে উৎপন্ন হই। যারা নানারূপ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে মারার উদ্যোগ করে, তাদের চিত্তে আমি সেইভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকি যেমন উত্তমকুলে ধর্মাত্মা ব্যক্তি জন্ম লাভ করেন। যারা বেদ ও বেদান্তের স্বাধ্যায়রূপ সাধনার দ্বারা আমাকে অবদমিত করার চেষ্টা করে, তাদের চিত্তে আমি স্থাবর প্রাণীর জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে নিবাস করি। যে সত্যপরাক্রমী পুরুষ ধৈর্যের বলে আমাকে দূর করার চেষ্টা করে, তার মানসিক ভাবের সঙ্গে আমি এত মিশে যাই যে সে আমাকে চিনতেই পারে না। উত্তম ব্রতধারী যে ব্যক্তি তপস্যার দ্বারা আমার অস্তিত্ব নষ্ট করার প্রয়াস করে, তার তপস্যাতেই আমি বিরাজ করি। যে ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী হয়ে আমার বিনাশের চেষ্টা করে, তার মোক্ষের আসক্তি দেখে আমার হাসি পায়, আমি আনন্দে নাচতে থাকি। আমি প্রাণীদের পক্ষে অবধ্য এবং সর্বদা বিরাজ করি। তাই রাজন্ ! আপনিও নানাপ্রকার দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদির দ্বারা আপনার কামনা ধর্মে ব্যাপৃত করুন। তাহলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। বিধি অনুসারে পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে আপনি অশ্বমেধ ও অন্যান্য যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। তাহলে আপনার ইহলোকে উত্তম কীর্তি ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ গতি

লাভ হবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ও শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণেরা এইভাবে বোঝালে যুধিষ্ঠিরের শোকজনিত দুঃখ দূর হয় এবং তিনি মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। তারপর মৃত আত্মীয়-বন্ধুদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে তিনি আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। সকলে বোঝাবার পর তাঁর চিত্ত শান্ত হলে তিনি নিজ রাজ্য গ্রহণ করে ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মুনিদের বললেন—'মহানুভবগণ ! আপনারা সকলে প্রবৃদ্ধ এবং মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনাদের কথায় আমি সান্ত্বনা লাভ করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো দুঃখ নেই। এদিকে পর্যাপ্ত ধনও লাভ হয়েছে, এর দ্বারা আমি ভালোভাবেই দেবতাদের যজ্ঞ করতে পারব। আপনাদের সামনেই এবার যজ্ঞ শুরু করব। পিতামহ (ব্যাসদেব) ! আমরা আপনার রক্ষণাবেক্ষণে থেকেই হিমালয় পর্বতে যাব। শোনা যায়, সেইস্থান নানা আশ্চর্যজনক দৃশ্যে পূর্ণ। আপনি, দেবর্ষি নারদ ও মুনিবর দেবস্থান সে সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা বলেছেন, সেগুলি আমার পক্ষে কল্যাণকারী। মহা সৌভাগ্যশালী পুরুষ ব্যতীত অন্য কেউই এই সংকটে আপনাদের মতো সাধু-সম্মানিত হিতৈষী গুরুজনদের দর্শন লাভ করতে পারে না।

রাজা যুধিষ্ঠির এরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় সকল মহর্ষি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁরা যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। সকল পাণ্ডব ভীষ্মের মৃত্যুর পর শৌচকার্য সম্পন্ন করে সেখানে কিছুদিন কাটালেন। তাঁরা ভীষ্ম, কর্ণ ও কুরুবংশীয়দের নিমিত্ত শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের প্রভূত দান করলেন। তারপর সকলে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন এবং ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে ভ্রাতাদের নিয়ে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

——○——

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমনের জন্য যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করে অর্জুনের কাছে প্রস্তাব

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর ! পাণ্ডবরা জয়লাভ করলে যখন রাজ্যের সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পাণ্ডবরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যখন রাজ্যের সর্বদিকে শান্তি স্থাপন করলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন স্বস্তি পেলেন। তাঁরা আনন্দিত চিত্তে বনে ও পর্বতের সুরম্য স্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। ঘুরে বেড়িয়ে তাঁরা পুনরায় ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে সেখানে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। এঁরা দুজন প্রাচীন ঋষি নর ও নারায়ণ, তাঁদের নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁরা দেবতা ও ঋষি বংশের আলোচনা করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি অর্জুনকে বিচিত্র অর্থ ও পদযুক্ত অত্যন্ত বিশিষ্ট ও মধুর কথা শোনালেন। কথা শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যুক্তিসংগত ও কোমল বাক্যে অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'পার্থ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবলের সাহায্যে এবং ভীমসেন ও নকুল-সহদেবের পরাক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে বিজয়লাভ করেছেন। এখন তিনি শত্রুহীন ভূমণ্ডলের রাজ্য ভোগ করছেন। এই নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য তিনি ধর্ম বলেই প্রাপ্ত হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অধর্মে রুচিসম্পন্ন, লোভী, কটুবাদী এবং দুরাত্মা ছিল, তাই তারা ভ্রাতা-বন্ধুসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্জুন ! তোমার সঙ্গে নির্জন বনে থাকলেও আমার সুখ হয়। আর যেখানে এত লোকজন এবং আমার পিসিমাতা কুন্তী রয়েছেন, সেখানের আর কথা কী ? যেখানে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবলী ভীমসেন এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব আছেন, সেখানে থাকলে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করি। এই সভা ভবনের রমণীয় এবং পবিত্র স্থান স্বর্গকেও হার মানিয়ে দেয়। এখানে তোমার সঙ্গে বহুদিন থাকা হল। এই দীর্ঘকাল আমি পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র এবং অন্যান্য বৃষ্ণি বংশীয়দের দেখিনি। তাই এখন দ্বারকাপুরী ফিরে যেতে চাই। আশাকরি তুমিও আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হবে। কুন্তিনন্দন ! তুমি যদি মনে করো, তাহলে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আমার দ্বারকা যাওয়ার প্রস্তাব করো। আমার প্রাণসংকট হলেও আমি ধর্মরাজের অপ্রিয় কাজ করতে পারব না। তাই দ্বারকা যাওয়ার জন্য

কীভাবে তাঁর মনে কষ্ট দেব। পার্থ ! আমি সত্য বলছি, আমি যা কিছু করেছি বা বলেছি, সব তোমার প্রসন্নতার জন্য ও তোমার হিতের কথা ভেবেই করেছি। এখন আমার এখানে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন তার সৈন্য ও সহায়কসহ বিনাশ হয়েছে এবং সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী ধর্মরাজের অধীন হয়েছে। সুতরাং তুমি এখন আমার সঙ্গে থেকে মহারাজকে আমায় দ্বারকা যাওয়া অনুমতি দিতে বলো। আমার যা কিছু সম্পত্তি এবং আমার এই শরীর—সবই ধর্মরাজের সেবায় সমর্পিত। তিনি আমার পরম প্রিয় এবং মাননীয়। এখন তোমার সঙ্গে গল্প করা ভিন্ন আমার আর এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলায় অমিত পরাক্রমী অর্জুন তাঁর কথায় সম্মান জানিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁর যাওয়ার প্রস্তাব মেনে নিলেন।

—০—

শ্রীকৃষ্ণকে গীতার বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে সিদ্ধ মহর্ষি ও কাশ্যপের সংবাদ বর্ণনা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! শত্রুবিনাশ হওয়ার পর যখন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সভাগৃহে কথাবার্তা বলতেন, তখন তাঁরা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! অর্জুন যখন রাজ্যে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করলেন তখন তিনি দিবা সভাগৃহে সানন্দে থাকতে লাগলেন। একদিন স্বজন পরিবৃত হয়ে এঁরা দুজন পরিভ্রমণকালে সভাগৃহের এমন স্থানে পৌঁছলেন যে স্থান স্বর্গের মতো সুন্দর। পাণ্ডুনন্দন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দে ছিলেন। তিনি সেই রমণীয় সভাগৃহের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ভগবানকে বললেন—'দেবকীনন্দন !

যুদ্ধ প্রারম্ভকালে আপনি আমাকে আপনার মাহাত্ম্য জ্ঞান এবং ঈশ্বরীয় স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন ; কিন্তু কেশব ! আপনি স্নেহবশত আমাকে তখন যে জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন বুদ্ধির দোষে এখন তা বিস্মৃত হয়েছি। সেই বিষয় শোনার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছি। আপনি শীঘ্রই দ্বারকায় ফিরে যাবেন ; সুতরাং তা পুনরায় আমাকে বলুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—অর্জুনের কথা শুনে বক্তাশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গন করে উত্তর দিতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন ! সেই সময় আমি তোমাকে অত্যন্ত গুহ্য বিষয় শুনিয়েছিলাম—নিজ স্বরূপভূত ধর্ম—সনাতন পুরুষোত্তম তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলাম এবং (শুক্ল-কৃষ্ণ গতির নিরূপণ করে) নিত্য লোকেরও বর্ণনা করেছিলাম ; কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ বুঝতে না পারায় সেই উপদেশ স্মরণে রাখোনি, তা জেনে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। সেই কথাগুলি এখন সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পাণ্ডুনন্দন ! তুমি অবশ্যই অত্যন্ত শ্রদ্ধাহীন, তোমার বুদ্ধি ঠিক মনে হচ্ছে না। এখন আমার পক্ষেও সেই উপদেশ একইভাবে বলা কঠিন। কারণ সেই সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করেছিলাম। এখন সেই বিষয় অবহিত করানোর জন্য আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি। এর দ্বারা তুমি শ্রেষ্ঠ এবং স্থির বুদ্ধি লাভ করবে এবং উত্তম গতি লাভ করবে। কোনো এক দিনের কথা, এক দুর্ধর্ষ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোক থেকে নেমে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁকে বিধিমতো পূজা করে মোক্ষধর্মের বিষয়ে প্রশ্ন
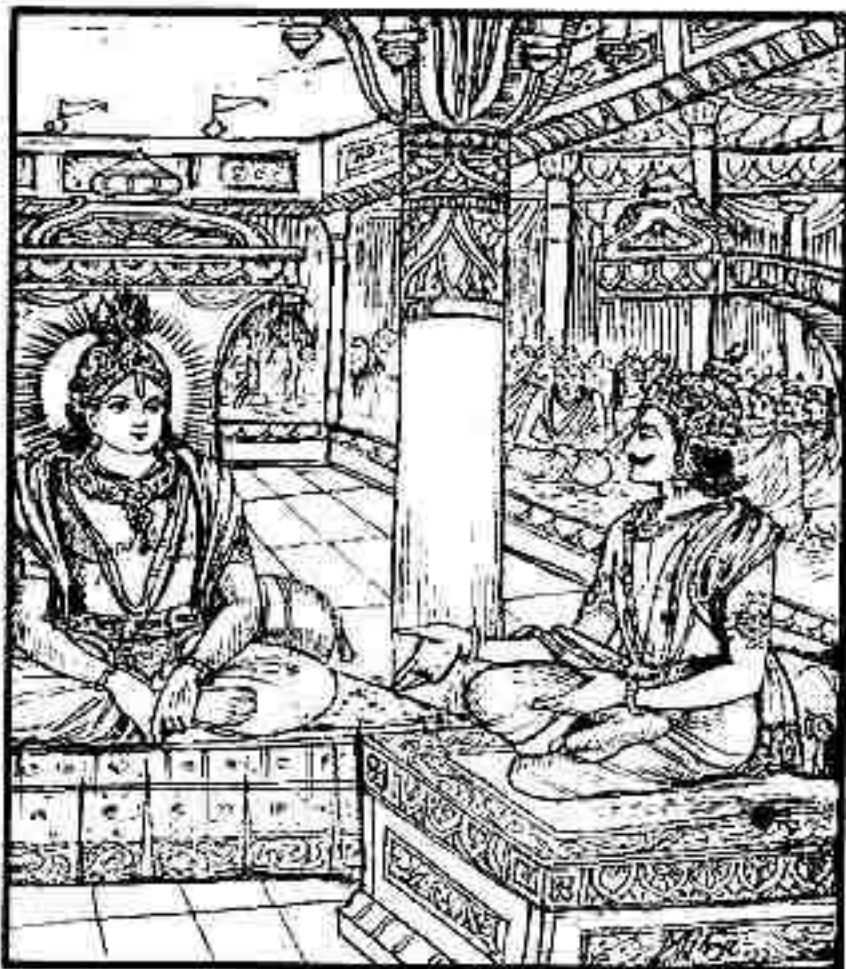
করি। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সে কথাই তোমাকে জানাচ্ছি। অন্য কিছু চিন্তা না করে মন দিয়ে এটি শোনো।

ব্রাহ্মণ বললেন—মধুসূদন ! তুমি সব প্রাণীর প্রতি কৃপাবশত তাদের মোহনাশ করার জন্য মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছ, আমি তার যথাবৎ উত্তর দিচ্ছি। সাবধানে আমার কথা শোনো—প্রাচীনকালে কাশ্যপ নামে এক ধর্মাত্মা, তপস্বী ব্রাহ্মণ কোনো সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষির কাছে গিয়েছিলেন। যিনি ধর্মের বিষয়ে শাস্ত্রের সমস্ত রহস্য জানতেন, অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবীণ, লোকতত্ত্বের জ্ঞানে কুশল, সুখ-দুঃখের রহস্যের জ্ঞাতা, জন্ম-মৃত্যু তত্ত্বজ্ঞ, পাপ-পুণ্যের সম্যক ফল সম্বন্ধে অবহিত এবং উচ্চ-নীচ প্রাণীদের কর্মানুসারে প্রাপ্ত করা গতির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি মুক্ত হয়ে বিচরণশীল, সিদ্ধ, শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান, সর্বত্র অবাধ গতি এবং অন্তর্ধান করার বিদ্যাও জানতেন। অদৃশ্যভাবে থাকা চক্রধারী সিদ্ধদের সঙ্গে তিনি বিচরণ করতেন, কথা বলতেন এবং তাঁদের সঙ্গে একান্তে কালযাপন করতেন। বায়ু যেমন কোথাও আসক্ত না হয়ে সর্বত্র প্রবাহিত হয়, তিনিও তেমনই স্বচ্ছন্দে অনাসক্তভাবে সর্বত্র বিচরণ করতেন। মহর্ষি কাশ্যপ তাঁর মহিমা শুনেই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে সেই মেধাবী, তপস্বী, ধর্মাভিলাষী এবং একাগ্রচিত্ত মহর্ষি ন্যায়ানুসারে সেই সিদ্ধ মহাত্মার চরণে প্রণাম জানালেন। তিনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত শক্তিমান সন্ত ছিলেন। তাঁর সর্বপ্রকার যোগ্যতা ছিল, তিনি শাস্ত্রজ্ঞাতা এবং সচ্চরিত্র ছিলেন। তাঁকে দর্শন করে কাশ্যপ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁকে গুরু বলে মেনে তাঁর সেবায় ব্যাপৃত হলেন এবং তাঁর বিশেষ শুশ্রূষা, গুরুভক্তি এবং শ্রদ্ধাভাবের দ্বারা তিনি সেই সিদ্ধ পরমাত্মাকে সন্তুষ্ট করলেন। জনার্দন ! শিষ্য কাশ্যপের ওপর প্রসন্ন হয়ে সেই সিদ্ধ মহর্ষি পরাসিদ্ধির সম্বন্ধে বিচার করে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা বলছি, শোনো।

সিদ্ধ বললেন—তাত কাশ্যপ ! মানুষ নানা শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে কেবল পুণ্যের সংযোগে ইহলোকে উত্তম ফল এবং দেবলোকে স্থান লাভ করে। জীব কোথাও পরম সুখলাভ করে না । কোনো লোকেই সে চিরকাল থাকতে পারে না। তপস্যাদির দ্বারা বহু কষ্ট সহ্য করে সে যতই উচ্চস্থান লাভ করুক না কেন, তাকে সেখান থেকে বারবার নীচে আসতে হয়। আমিও কাম-ক্রোধযুক্ত ও তৃষ্ণায় মোহিত হয়ে বহুবার পাপ করেছি এবং তার ফলস্বরূপ ভয়ংকর কষ্টপ্রদানকারী অশুভ গতি প্রাপ্ত হয়েছি। বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ সহ্য করেছি। নানাপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করেছি এবং অনেক স্তনাপান করেছি। বহু পিতা এবং নানারূপ মাতা পেয়েছি। বিচিত্র সব সুখ-দুঃখ অনুভব করেছি। কতবার প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করেছি আবার অপ্রিয় মানুষের সম্মুখীন হয়েছি। বহু কষ্টে যে অর্থ সংগ্রহ করি, আমার চোখের সামনে তা নষ্ট হয়ে যায়। রাজা এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বহুবার অনেক কষ্ট ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃসহ শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট সহ্য করেছি। আমি বহুবার ভীষণ অপমান, প্রাণান্ত দণ্ড এবং কঠিন কয়েদের সাজা ভোগ করেছি। নরকে গিয়ে যমলোকের দণ্ডলাভ করেছি। ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে বারংবার বৃদ্ধাবস্থা, রোগ, রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের কষ্ট অনুভব করেছি। এইভাবে বারংবার কষ্ট পেতে থাকায় একদিন আমার মনে বড় দুঃখ হল। আমি দুঃখে ভয় পেয়ে পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি এবং সমস্ত লোক-ব্যবহার পরিত্যাগ করি। এইরূপ অনুভব করার পর আমি এই পথের আশ্রয় গ্রহণ করি এবং এখন পরমাত্মার কৃপায় উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছি। আমি আর পুনরায় সংসারে প্রবেশ করব না। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে এবং যতদিন আমার মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন আমি আমার এবং অন্য প্রাণীর শুভগতি অবলোকন করব। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এইভাবে আমি উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। এর পরে আমি ক্রমশ উত্তম সত্যলোকে গমন করব এবং অব্যক্ত ব্রহ্মপদ (মোক্ষ) লাভ করব। এতে তুমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না। এখন আমার আর মর্ত্যলোকে গতি হবে না। মহামতে ! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বলো, তোমার কী প্রিয়কাজ করব ? তুমি যেজন্য আমার কাছে এসেছো, তা পূর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে। তোমার আসার কী উদ্দেশ্য তা আমি জানি আর শীঘ্রই আমি এখান থেকে চলে যাব। তাই তোমাকে প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি দিচ্ছি। বিদ্বন্ ! তোমার উত্তম আচরণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তুমি তোমার কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করো, আমি তোমার অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেব। কাশ্যপ ! আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি এবং অত্যন্ত সম্মানও করি। তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ, তাই বলছি তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

জীবের মৃত্যু এবং তার ত্রিবিধ গতির বর্ণনা

কাশ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন—মহাত্মন্ ! এই শরীর কীভাবে বিনাশ হয় ? তারপর অন্য শরীর কীভাবে লাভ হয় ? সংসারী আত্মা কীভাবে এই দুঃখময় জগৎ থেকে মুক্তিলাভ করে ? মূল অবিদ্যা এবং তার থেকে জাত এই শরীরকে কীভাবে পরিত্যাগ করে, এবং এক দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে অন্য দেহে কীভাবে প্রবেশ করে ? মানুষ তার কৃত শুভাশুভ কর্মের ফল কীভাবে ভোগ করে ? শরীর না থাকলে তার কর্ম কোথায় থাকে ?

ব্রাহ্মণ বললেন—কৃষ্ণ ! কাশ্যপ এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় সিদ্ধ মহর্ষি তার প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রমান্বয়ে দিতে শুরু করলেন।

সিদ্ধ বললেন—কাশ্যপ ! মানুষ ইহলোকে আয়ু ও কীর্তি বৃদ্ধিকারী যে কর্ম করে, সেইটিই শরীর প্রাপ্তির কারণ হয়। জীবদেহ গ্রহণের পর যখন এই কর্মগুলি ফলপ্রদান করে ক্ষয় হয়ে যায়, তখন জীবের আয়ুও শেষ হয়ে যায়। তখন সে বিপরীত কর্ম করতে থাকে এবং বিনাশকাল নিকট হলে জীবের বুদ্ধিও বিপরীত হয়। সেই সয়ম সত্ত্ব (ধৈর্য), বল এবং অনুকূল সময় জেনেও মন বশে না থাকায় অসময়ে এবং নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধ আহার করে। যেসব বস্তু অত্যন্ত ক্ষতিকর, সেইসব আহার করে। কখনো অত্যধিক আহার করে, কখনো নিরাহারে থাকে। কখনো দূষিত অন্নও আহার করে, কখনো দুটি বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন পদার্থ একই সঙ্গে গ্রহণ করে। কখনো আগের খাওয়া খাদ্য হজম হওয়ার আগেই আবার খাদ্য গ্রহণ করে। অধিক মাত্রায় ব্যায়াম এবং স্ত্রী-সম্ভোগ করে। কর্মে নিমজ্জিত হয়ে মল-মূত্রাদির বেগ দাবিয়ে রাখে। গুরপাক খাদ্য আহার করে, দিবসে নিদ্রা যায়। এইভাবে শরীরস্থ বাত-পিত্তাদিকে দূষিত করে তোলে। এগুলি দূষিত হলে প্রাণনাশক ব্যাধি আপনিই উপস্থিত হয়ে তার শরীর নষ্ট করে দেয়। এইভাবে জগতের সকল জীব দুঃখ-কষ্ট এবং জন্ম-মৃত্যু ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে।

দেহধারী জীব যে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা রূপ-রস ইত্যাদি বিষয় অনুভব করে তার দ্বারা আহারে পরিপুষ্ট হওয়া প্রাণ সম্বন্ধে সে জানতে পারে না। সনাতন জীব এই শরীরের মধ্যে থেকে সব কাজ করে। অন্তিম সময় উপস্থিত হলে তম (অবিদ্যা) দ্বারা জীবের জ্ঞানশক্তি বিলুপ্ত হয়, তার মর্মস্থান অবরুদ্ধ হয়। সেই সময় জীবের জন্য কোনো আধার থাকে না এবং বায়ু তাকে তার স্থান থেকে বিচলিত করে দেয়। তখন জীবাত্মা বারংবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাইরে বার হওয়ার সময় হঠাৎ সেই জড় দেহকে কম্পিত করে তোলে। শরীরের থেকে পৃথক হয়ে সে তার কৃত পাপ ও পুণ্য কর্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যাঁরা বেদ-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যথাবৎ অধ্যয়ন করেছেন, সেই জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ লক্ষণদ্বারা জেনে যান ওই ব্যক্তি পুণ্যাত্মা ছিল না পাপী। যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অন্ধকারেও জোনাকির আলো দেখতে পায়, তেমনই সিদ্ধপুরুষ তাঁর জ্ঞানদৃষ্টিতে জীবদের জন্ম-মৃত্যু, গর্ভে প্রবেশ করা দেখতে পান। শাস্ত্রানুসারে জীবের তিনটি স্থান দেখা যায় (মর্তালোক, স্বর্গলোক ও নরক)। এই মর্তলোক, যেখানে বহু প্রাণী বাস করে, তাকে কর্মভূমি বলে। এখানেই শুভাশুভ কর্ম করে সব মানুষ তার যথাযোগ্য ফল লাভ করে। এখানেই পুণ্যকর্মকারী জীব (স্বর্গে গিয়ে) নিজ কর্মানুসারে উত্তম ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং পাপকর্মকারী মানুষ নরক ভোগ করে। এটিই জীবের অধোগতি, যা ভয়ানক কষ্টদায়ক। এর থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই পাপকর্ম থেকে দূরে থেকে নরকবাস থেকে রক্ষা পাওয়ায় জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

এবার স্বর্গাদি ঊর্ধ্বলোকে গমন করা প্রাণীরা যেস্থানে নিবাস করে, তার বর্ণনা করছি, শোনো। এগুলি শুনলে তোমার কর্মের গতি স্থির হবে এবং তুমি নৈষ্ঠিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হবে। যেখানে সব নক্ষত্র থাকে, যেখানে চন্দ্র প্রকাশিত হয় এবং যে লোকে সূর্যমণ্ডল তাঁর কিরণে দেদীপ্যমান থাকেন, সেই সব স্থান তুমি পুণ্যকর্মকারী মানুষদের স্থান বলে জেনো। (পুণ্যাত্মা মানুষ সেইসব লোকে গিয়ে সেখানে নিজ পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করেন।) পুণ্যকর্মের ভোগ সমাপ্ত হলে সে আবার সেখান থেকে নীচে নেমে আসে। এই আসা-যাওয়ার পরম্পরা সর্বক্ষণ লেগেই থাকে। ওপরের লোকেও উচ্চ-নীচ ও মধ্যের পার্থক্য থাকে, তাই সেখানে নিবাসকারীদেরও অন্যের তেজ, ঐশ্বর্য নিজের থেকে বেশি দেখে মনে শান্তি থাকে না। এইভাবে আমি তোমাকে জীবের পৃথক পৃথক গতির বর্ণনা দিলাম। এবার জানাবো জীব কীভাবে গর্ভে এসে জন্মধারণ করে। তুমি একাগ্রচিত্তে তা শোনো।

জীবের গর্ভপ্রবেশ, আচার-ধর্ম, কর্মফলের অনিবার্যতা এবং জগৎ থেকে উদ্ধার পাবার উপায়

সিদ্ধ বললেন—কাশ্যপ ! ইহলোকে কৃত শুভ ও অশুভ কর্মাদির ফলভোগ না করে নাশ হয় না। এই কর্মগুলি একের পর এক শরীর ধারণ করিয়ে নিজের ফল ভোগ করাতে থাকে। ফলপ্রদানকারী গাছ যেমন ফল হওয়ার সময়ে বহু ফল প্রদান করে, তেমনই শুদ্ধ হৃদয়ে করা পুণ্যের ফল অধিক হয় এবং কলুষিত চিত্তে করা পাপের ফলও বৃদ্ধি লাভ করে ; কারণ জীবাত্মা মনকে সঙ্গে নিয়েই সর্বকর্মে প্রবৃত্ত হয়। কাম-ক্রোধ পরিবেষ্টিত মানুষ যেভাবে কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে গর্ভে প্রবেশ করে, তার বর্ণনা করছি, শোনো। জীব প্রথমে পুরুষের বীর্যে প্রবেশ করে, পরে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে গিয়ে তার রজতে মিলিত হয়। তারপর তার কর্মানুসারে শুভ বা অশুভ দেহ প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম এবং অব্যক্ত হওয়ায় সেই জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে শরীর লাভ করেও তার দোষে কখনো লিপ্ত হয় না। সে-ই সমস্ত ভূতাদির বীজ। তার দ্বারাই সব প্রাণী জীবিত থাকে। এরূপ হলেও সে অজ্ঞানবশত জীবভাবে বিভক্ত হয়ে গর্ভের প্রত্যেক অবয়বে ব্যাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়াদির স্থানে স্থিত হয়ে চিত্তের দ্বারা সকলকে ধারণ করে। জীব প্রবেশ করায় গর্ভ চেতন হয়ে যায় এবং তার দ্বারা সমস্ত অঙ্গ প্রস্তুত হতে থাকে। গলিত লোহা যে ছাঁচে ঢালা হয়, সেটি যেমন সেই ছাঁচের আকার ধারণ করে, তেমনই জীব যেরূপ শরীরে প্রবেশ করে, সেই আকার ধারণ করে। আগুন যেমন লোহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে তপ্ত করে অগ্নিময় করে তোলে, তেমনই জীবেরও গর্ভে প্রবেশের দ্বারা সারা শরীর চেতন এবং জীবময় হয়ে যায়। জ্বলন্ত প্রদীপ যেমন সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে তোলে, তেমনই জীবের চৈতন্যশক্তি শরীরের সব অবয়ব প্রকাশিত করে। দেহধারী জীব যেসব শুভ বা অশুভ কর্ম করে, অন্য জন্মে তাকে তার ফল ভোগ করতে হয়। পূর্বজন্মের দেহে করা সমস্ত কর্মের ফল তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তাতে যদিও পুরাতন কর্ম ক্ষয় হয় তবুও নতুন নতুন কর্মের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবের যতক্ষণ মোক্ষ ধর্মের জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ এই কর্মের পরম্পরা চলতে থাকে।

এবার যেভাবে বিভিন্ন শরীরে জন্মগ্রহণকারী জীব যা অনুষ্ঠান করলে সুখপ্রাপ্ত হবে, সেই কর্মগুলির বর্ণনা শোনো। দান, ব্রত, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্রোক্ত রীতিতে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শান্তি, সকল প্রাণীর ওপর দয়া, চিত্ত সংযম, কোমলতা, অন্যের ধন নেওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ, মনে মনেও জগতের প্রাণীর অহিত না করা, মাতাপিতার সেবা, দেবতা-অতিথি ও গুরুর সেবা, পূজা, দয়া, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়গুলি সর্বতোভাবে বশে রাখা এবং শুভকর্মের প্রচার করা—এ সবই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের আচরণ বলা হয়। সেই অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম হয়, যা সর্বদা প্রজাদের রক্ষা করে। সৎপুরুষদের মধ্যে সর্বদাই এই প্রকার ধার্মিক আচরণ দেখা যায়। এঁদের দ্বারাই ধর্মের স্থিতি অটল হয়, সদাচারের দ্বারাই ধর্মের স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তচিত্ত মহাত্মা ব্যক্তি সদাচারেই অবস্থান করেন। এই কর্মগুলিই সনাতন ধর্ম নামে প্রসিদ্ধ। যারা এই সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের কখনো দুর্গতি ভোগ করতে হয় না। যোগী এবং মুক্তপুরুষগণ, শুধু আচার-ধর্ম যারা পালন করে, তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন। যারা ধর্মানুসারে আচরণ করে, তাদের নিজ কর্মানুসারে উত্তম ফল প্রাপ্তি হয় এবং তারা ধীরে ধীরে সংসার সমুদ্র পার হয়ে যায়। জীব এইভাবে সর্বদা তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আত্মা নির্বিকার ব্রহ্ম হয়েও জীবরূপে বিকৃত হয়ে এই জগতে যে জন্মলাভ করে, কর্মই তার কারণ। আত্মার শরীর ধারণ করার প্রথা প্রথমে কে প্রচলিত করেন ? লোকের মনে প্রায়শই এই প্রশ্নের উদয় হয় ; সুতরাং এবার তারই উত্তর দিচ্ছি। সমস্ত জগতের পিতামহ ব্রহ্মা সর্বপ্রথম নিজেই শরীর ধারণ করেন। তারপর তিনি স্থাবর-জঙ্গমরূপ এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করেন। তিনি প্রধান নামক তত্ত্বের উৎপত্তি করেন, যাকে দেহধারী জীবদের প্রকৃতি বলা হয়। যার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই প্রাকৃত জগৎকে ক্ষর বলা হয়। এছাড়া জীবাত্মাকে অক্ষর বলা হয়। পিতামহ জীবের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শরীর ধারণ করে থাকা, বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করা এবং পরলোক থেকে ফিরে পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ করা, ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন। যিনি পূর্বজন্মে

আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন, তেমন মেধাবী ব্যক্তি জগতের অনিত্যতার বিষয়ে যেমন বলে থাকেন, আমিও তেমনই বলছি। আমার বলা সমস্ত কথাই যথার্থ ও যুক্তিসংগত। যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য তথা শরীরকে অনিত্যবস্তুর সমাহার এবং মৃত্যুকে কর্মের ফল বলে মনে করে আর সুখরূপে প্রতীত হওয়া সব কিছুকেই দুঃখ বলে মনে করে, সে ভয়ানক দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হয়ে যায়।

মোক্ষ-লাভের উপায় বর্ণনা

সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন—কাশ্যপ! যে ব্যক্তি (স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর থেকে ক্রমশ) পূর্বের সব অহংভাব পরিত্যাগ করে কোনো কিছু চিন্তা করে না এবং মৌনভাবে থেকে সকলের একমাত্র অধিষ্ঠান—পরব্রহ্ম পরমাত্মায় লীন হয়ে থাকে, সে-ই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। যে সকলের মিত্র, সব কিছু সহ্য করে, মনোনিগ্রহে তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, ভয় ও ক্রোধরহিত এবং মনস্বী ; যে নিয়মপরায়ণ এবং পবিত্রভাবে থেকে সব প্রাণীর প্রতি নিজের মতো ব্যবহার করে, যার মধ্যে সম্মান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই এবং যে অভিমান থেকে দূরে থাকে, সে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও প্রিয়-অপ্রিয়ে যার সমান দৃষ্টি ; যে কারো দ্রব্যে লোভ করে না, কাউকে অবহেলা করে না, যার মনে দ্বন্দ্বাদির প্রভাব পড়ে না, যার চিত্তের আসক্তি দূর হয়েছে ; যে কাউকে নিজের মিত্র, বন্ধু বা সন্তান বলে মনে করে আসক্ত হয় না ; যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করেছে, যে সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষারহিত, যার ধর্ম বা অধর্ম—কোনো কিছুতেই আসক্তি নেই, যে পূর্বের সঞ্চিত কর্মসমূহ ত্যাগ করেছে, বাসনা ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় যার চিত্ত শান্ত হয়েছে এবং যে সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত, সে মুক্ত হয়ে যায়। যে কাম্য কর্মাদির অনুষ্ঠান করে না, যার মনে কোনো কামনা নেই, যার দৃষ্টিতে এই জগৎ চিরস্থায়ী নয়, সর্বদা জগতকে জন্ম-মৃত্যু-জরা অবস্থায় অস্থির রূপে দেখে ; যার বুদ্ধি বৈরাগ্যে লিপ্ত, যে সর্বদা নিজ দোষের ওপর দৃষ্টি রাখে, সে শীঘ্রই নিজ বন্ধন বিনাশ করে। যে আত্মাকে গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দ ও পরিগ্রহরহিত ও অজ্ঞেয় বলে মানে ; যার দৃষ্টিতে আত্মা পাঞ্চভৌতিক গুণাদিহীন, নিরাকার, কারণরহিত, নির্গুণ এবং গুণাদির ভোক্তা, সে মুক্ত হয়ে যায়। যে বুদ্ধির দ্বারা বিচারপূর্বক শরীরিক ও মানসিক সব সংকল্প পরিত্যাগ করে, সে ইন্ধনবিহীন আগুনের ন্যায় ধীরে ধীরে শান্তিলাভ করে। যে সর্বপ্রকার বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহ মুক্ত হয়ে যায় এবং তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে অনাসক্তভাবে বিচরণ করে, তাকে মুক্ত বলেই জানা উচিত ; কারণ বাসনা-বন্ধন থেকে মুক্ত হলে মানুষ শান্ত, নিশ্চল, নিত্য, অবিনাশী এবং সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করে।

এবার আমি সেই পরম উত্তম যোগশাস্ত্রের বর্ণনা করছি, যে অনুসারে যোগসাধন করলে যোগী পুরুষ আত্মার সন্ধান লাভ করেন, প্রথমে তুমি সেই উপায়গুলি শ্রবণ করো। এর সাহায্যে চিত্তকে বশীভূত এবং অন্তর্মুখী করে যোগী তাঁর নিত্য আত্মার দর্শন লাভ করেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে সরিয়ে মনে এবং মনকে আত্মাতে স্থাপন করবে। এইভাবে প্রথমে তীব্র তপস্যা করে তারপর মোক্ষোপযোগী উপায় অবলম্বন করা উচিত। মনীষী পুরুষদের সর্বদা তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়ে এবং যত্ন সহকারে যোগশাস্ত্রের উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। তাহলে তিনি মনের সাহায্যে নিজ অন্তরে আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করবেন। একান্তবাসী সাধক যদি নিজ মনকে আত্মায় ব্যাপৃত রাখতে সফল হন, তবে তিনি অবশ্যই অন্তরে আত্মার দর্শন লাভ করবেন। যে সাধক সর্বদা সংযমপরায়ণ, যোগযুক্ত, মনকে বশীভূত রাখেন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কোন ব্যক্তিকে দেখে থাকলে জাগ্রত অবস্থায় তাকে দেখেই চিনে ফেলেন যে 'এ সেই স্বপ্নে দেখা ব্যক্তি'। তেমনই সাধন-পরায়ণ যোগী সমাধি অবস্থায় আত্মাকে যেরূপে দেখেন, পরেও তাকে সেই রূপেই দেখতে থাকেন। দেহধারী জীব যখন যোগের সাহায্যে আত্মাকে যথার্থরূপে দর্শন করেন, সেইসময় তাঁর ওপর ত্রিভুবনের অধীশ্বরেরও আধিপত্য থাকে না। তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার দেহধারণ

করতে পারেন। বৃদ্ধত্ব ও মৃত্যু তাঁর কাছে আসতে পারে না, শোক এবং হর্ষও তাঁর থেকে দূরে অবস্থান করে। নিজ ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা ব্যক্তি দেবতারও দেবতা হতে পারেন। তিনি এই অনিত্য দেহ ত্যাগ করে অবিনাশী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। সমস্ত প্রাণী বিনাশপ্রাপ্ত হলেও তিনি ভীত হন না। সকলে কষ্ট পেলেও তিনি কোনো কিছুর দ্বারাই ক্লেশপ্রাপ্ত হন না। শান্তচিত্ত, নিঃস্পৃহ যোগী আসক্তি এবং স্নেহদ্বারা প্রাপ্ত ভয়ংকর দুঃখ, শোক ও ভয়ে কখনো বিচলিত হন না। তাঁকে অস্ত্র আঘাত করতে পারে না, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, জগতে তাঁর থেকে সুখী আর কাউকে দেখা যায় না। তিনি মনকে আত্মায় লীন করে আত্মনিষ্ঠ হয়ে যান এবং বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে সুখে নিদ্রা যান, অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন। ভালোভাবে যোগাভ্যাস করে যোগী যখন নিজের মধ্যে আত্মার উপস্থিতি অনুভব করতে থাকেন, তখন তিনি ইন্দ্রপদ পাবারও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না।

একান্তে ধ্যানকারী ব্যক্তির যেভাবে যোগপ্রাপ্তি হয়, তা শ্রবণ করো। যে উপদেশ আগে শ্রুতিতে উপলব্ধ হয়েছে, তার চিন্তা করে শরীরের যে অংশে জীবের নিবাস চিহ্নিত হয়েছে, সেই স্থানে মনকে স্থাপন করবে, বাইরে কখনো যেতে দেবে না। তারপর নির্জন বনে, যেখানে কোনো শব্দ শোনা যায় না, সেইস্থানে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে একাগ্রচিত্তে নিজ অন্তরে পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করবে। প্রমাদ সর্বতোভাবে ত্যাগ করবে। এইভাবে সর্বদা ধ্যানের জন্য যত্নশীল ব্যক্তির চিত্ত শীঘ্রই প্রসন্নতা লাভ করে এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়। চর্ম-চক্ষুদ্বারা সেই পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায় না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ও তাকে নিজের বিষয় করতে সক্ষম হয় না। কেবল মনরূপ প্রদীপের সাহায্যেই সেই মহান আত্মার দর্শন হয়। তিনি সর্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট সর্বদিকে চক্ষু, মস্তক এবং সর্বত্র কর্ণ সমন্বিত। কারণ তিনি জগতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত। যিনি পরমাত্মাকে এইভাবে দর্শন করেন, তিনি তাঁরই আশ্রয় নিয়ে মুক্ত হয়ে যান। বিপ্রবর ! আমি তোমাকে সমস্ত রহস্য জানালাম। এবার আমি প্রস্থানের অনুমতি চাইছি। তুমিও সানন্দে তোমার নিজ স্থানে ফিরে যাও।

শ্রীকৃষ্ণ ! (আমিই সেই সিদ্ধ ব্রাহ্মণ !) আমি যখন উত্তম ব্রতপালনকারী মহাতপস্বী শিষ্য কাশ্যপকে এইরূপ উপদেশ দিয়েছিলাম তখন তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে নিজ অভীষ্ট স্থানে চলে যান।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন ! মোক্ষধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারী এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ মুনি আমাকে এই প্রসঙ্গ শুনিয়ে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। পার্থ ! তুমি আমার বলা এই উপদেশ একাগ্রচিত্তে শুনেছ কী ? আমার বিশ্বাস যার চিত্ত ব্যগ্র এবং যে জ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হয়নি, সেই ব্যক্তি এই বিষয় বুঝতে পারবে না। যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ, সেই এটি জানতে সক্ষম। আমি তোমাকে দেবতাদের পরম গোপনীয় রহস্য জানালাম। এই জগতে কখনো কোনো ব্যক্তি এই রহস্য শ্রবণ করেনি। তুমি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি এটি শোনার অধিকারী নয়। যার চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত, সে এটি ঠিকমতো বুঝতে পারবে না। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরম গতি। জ্ঞানী মানুষ দেহ পরিত্যাগ করে এই ব্রহ্মেই অমৃতত্ব লাভ করে চিরস্থায়ী সুখলাভ করে। নারী, বৈশ্য, শূদ্র, পাপযোনি, চণ্ডাল ইত্যাদিও এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং যারা নিজ ধর্মে বিশ্বাস রাখে এবং সর্বদা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সাধনে ব্যাপৃত—এরূপ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি তোমাকে মোক্ষধর্মের যুক্তিযুক্ত উপদেশ দিলাম, তার সাধনের উপায় জানালাম এবং সিদ্ধি, ফল, মোক্ষ এবং দুঃখের স্বরূপও নির্ণয় করলাম। এর থেকে শ্রেষ্ঠ সুখদায়ক কোনো ধর্ম নেই। পাণ্ডুনন্দন ! যে কোনো বুদ্ধিমান, শ্রদ্ধাযুক্ত এবং পরাক্রমী মানুষ লৌকিক সুখকে সারহীন মনে করে তা পরিত্যাগ করে, সে এই উপায়ের সাহায্যে অতি শীঘ্র পরমগতি লাভ করে। আমার শুধু এটুকু বলার ছিল। এর থেকে বেশি কিছু নয়। যে ব্যক্তি ছয়মাস নিরন্তর যোগাভ্যাস করে, সে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করবে।

ব্রাহ্মণের নিজ স্ত্রী দ্বারা ইন্দ্রিয় যজ্ঞ এবং মন-ইন্দ্রিয়-সংবাদের বর্ণনা

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন ! এই বিষয়ে পতি-পত্নীর সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুভবসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ একদিন একান্তে বসেছিলেন, তা দেখে তাঁর পত্নী ব্রাহ্মণী তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'প্রাণনাথ ! আমি শুনেছি যে পত্নীরা তাদের

পতির কর্মানুসারে প্রাপ্ত লোকে গমন করে ; কিন্তু আপনি তো কর্মত্যাগ করে চুপচাপ বসে থাকেন এবং আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন ; তাহলে আপনার মতো পতিলাভ করে আমি কোন্ গতি প্রাপ্ত হব ?'

পত্নীর কথা শুনে শান্তস্বভাববিশিষ্ট ব্রাহ্মণ মৃদুহাস্যে বললেন—'সুন্দরী ! তুমি যে কথা বলেছ, তাকে আমি খারাপ মনে নিচ্ছি না। জগতে গ্রহণ করার যোগ্য যেসব দীক্ষা, ব্রত ইত্যাদি আছে এবং চোখে দেখা যায় এমন সব স্থূল কর্ম, সেগুলিকেই কর্ম বলে মানা হয়েছে। কর্মঠ লোকেরা এমন কর্মকেই কর্ম বলে ; কিন্তু যারা জ্ঞানলাভ করেনি, তারা কর্মের দ্বারাই মোহ নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে একটি পুরাতন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। দশ হোতা মিলিত হয়ে যেভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তা শোনো—কর্ণ, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা (বাক ও রসনা), নাসিকা, হস্ত, পদ, উপস্থ এবং পায়ু—এই হল দশ হোতা। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতি, মূত্রত্যাগ ও মলত্যাগ—এই দশ হবিষ্য। দিক্, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও মিত্র—এই দশ দেবতা হলেন অগ্নি। সারাংশ হল যে দশ ইন্দ্রিয়রূপী হোতা, দশ দেবতারূপ অগ্নিতে দশ বিষয়রূপ হবিষ্য এবং সমিধার হোম করেন। (এইরূপ আমার অন্তরে নিরন্তর যজ্ঞ হয়ে চলেছে, তাহলে আমি অকর্মণ্য কীভাবে ?) এবার সাত হোতার যজ্ঞের বিধান শোনো—নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক, কর্ণ, মন ও বুদ্ধি—এই সাত হোতা পৃথকভাবে দেখতে পায় না—চেনে না। কল্যাণী ! এই সাত হোতাকে তুমি স্বভাব দ্বারা জানবে।'

ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামীন্ ! যখন সবই সূক্ষ্ম শরীরে বাস করে, তখন একে অপরকে কেন দেখতে পায় না ? তাদের স্বভাব কেমন ? কৃপা করে বলুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—প্রিয়ে ! এখানে দেখার অর্থ জানা। গুণগুলিকে জানার দ্বারাই গুণবানদের জানা হয় এবং গুণাদি না জানলে গুণবানকে জানা যায় না। এই নাসিকা ইত্যাদি সাত হোতা একে অপরের গুণ কখনো জানতে পারে না (তাই বলা হয় যে এরা একে অপরকে দেখে না)। জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, মন ও বুদ্ধি—গন্ধ বোধ করতে পারে না ; আবার নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, ত্বক, মন ও বুদ্ধি-রস আস্বাদন করতে পারে না, কেবল জিভ তা আস্বাদন করতে সক্ষম। নাসিকা, জিভ, কান, ত্বক, মন ও বুদ্ধি—এগুলি রূপ জ্ঞান অনুভব করতে পারে না, কিন্তু নেত্র তা পারে। নাসিকা, জিভ, চোখ, কান, বুদ্ধি ও মন—এরা স্পর্শ অনুভব করে না, সেই কাজ হল ত্বকের। নাসিকা, জিভ, চোখ, ত্বক, মন ও বুদ্ধি—এদের শব্দের জ্ঞান থাকে না, সেই জ্ঞান থাকে কানের। অনুরূপভাবে নাসিকা, জিভ, চোখ, ত্বক, কান ও মন—এরা কোনো কিছু স্থির করতে পারে না, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হল বুদ্ধির ধর্ম। এই বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদি ও মনের সংবাদরূপ এক পুরাতন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। একবার মন ইন্দ্রিয়গুলিকে বলে—'আমার সাহায্য ব্যতীত নাসিকা গন্ধ অনুভব করে না, জিভ স্বাদ পায় না, চক্ষু কিছু দেখতে পায় না, ত্বক স্পর্শ অনুভব করে না এবং কান কিছু শুনতে পায় না। সর্বভূতের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ এবং সনাতন। আমি ছাড়া সমস্ত ইন্দ্রিয় শূন্য গৃহের মতো শ্রীহীন হয়ে পড়ে। জগতের সকল জীব ইন্দ্রিয়-গুলির যত্ন করলেও আমি ছাড়া কেউই কিছু অনুভব করতে সক্ষম হয় না।'

এই কথা শুনে ইন্দ্রিয়গুলি বলল—'মহোদয় ! আপনিও যদি আমাদের সাহায্য বিনাই বিষয়াদি অনুভব করতে সক্ষম হতেন, তাহলে আমরা আপনার কথা সত্য বলে মেনে নিতাম। আমাদের লয় হবার পরেও যদি আপনি তৃপ্ত থাকতে পারতেন, জীবন ধারণ করতে পারতেন ও সকল প্রকারের ভোগাদির উপভোগ করতে সক্ষম হতেন তাহলে আপনি যা বলছেন তা সবই সম্ভব হত। অথবা আমরা সব ইন্দ্রিয়াদি যদি লীন হয়ে যাই বা বিষয়াদিতে স্থির থাকি আর আপনি আপনার ইচ্ছামাত্রেই বিষয়াদি অনুভব করার শক্তি রাখেন এবং তাতে সফল হন তাহলে নাকের সাহায্যে রূপ অনুভব করুন, চোখের দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করুন, কানের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করুন। এইভাবে আপনার শক্তির সাহায্যে জিভ দিয়ে স্পর্শ, ত্বকের দ্বারা শব্দ এবং বুদ্ধির দ্বারা স্পর্শ অনুভব করুন। আপনার মতো বলবান কোনো নিয়মের বন্ধনে থাকেন না, নিয়ম তো দুর্বলদের জন্য। আপনি নতুনভাবে নবীন ভোগ অনুভব করে দেখান। আমাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা আপনার শোভা পায় না। শিষ্য যেমন শ্রুতির অর্থ জানার উদ্দেশ্যে গুরুর কাছে যায় এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রুতির অর্থজ্ঞান প্রাপ্ত করে নিজে আবার বিচার করে, তেমনই আপনি শয়ন ও জাগরণের সময় আমাদের দেখানো ভূত ও ভবিষ্যতের বিষয়াদি উপভোগ করেন। আমরা যদিও স্ব-স্ব গুণে আসক্ত হয়ে পড়ি এবং একে অপরের গুণ জানতে সক্ষম নই তবুও একথা সত্য যে আপনি আমাদের সাহায্য ব্যতীত কোনো বিষয় অনুভব করতে সক্ষম নন, আপনি না থাকলে আমরা কেবলমাত্র হর্ষ থেকে বঞ্চিত হই।'

—o—

প্রাণ-অপান ইত্যাদির সংবাদ এবং ব্রহ্মার সবকিছুকে শ্রেষ্ঠ বলে জানানো

ব্রাহ্মণ বললেন—প্রিয়ে ! পঞ্চ হোতার যজ্ঞে যে বিধান আছে এবার তার বিষয়ে এক পুরাতন দৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে। প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান—এই পাঁচটি প্রাণ পাঁচ হোতা। বিদ্বান ব্যক্তিরা এগুলিকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মানেন।

ব্রাহ্মণী বললেন—আমি তো মনে করতাম যে সাতজন হোতা আছে ; কিন্তু এখন আপনার কাছে পাঁচ হোতার বিষয়ে জানলাম। এই পাঁচ হোতা কীরূপ ? আপনি এদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—প্রিয়ে ! বায়ু প্রাণের দ্বারা পুষ্ট হয়ে অপানরূপ, অপানের দ্বারা পুষ্ট হয়ে ব্যানরূপ, ব্যানের দ্বারা পুষ্ট হয়ে উদানরূপ এবং উদানদ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে সমানরূপ হয়। একবার এই পঞ্চ বায়ু পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন —'প্রজাপতি ! আমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তার নাম বলুন, সেই আমাদের মধ্যে প্রধান হবে।'

ব্রহ্মা বললেন—'বায়ুগণ ! প্রাণীধারীদের শরীরে স্থিত তোমাদের মধ্যে যে লয় হয়ে গেলে সকল প্রাণ লীন হয়ে যায় এবং যে সঞ্চারিত হলে সকলে সঞ্চারিত হতে থাকে, সে-ই শ্রেষ্ঠ। এখন তোমাদের যেখানে ইচ্ছা যাও।' এই কথা শুনে প্রাণবায়ু অপান ইত্যাদিকে বলল—'আমি লীন হলে প্রাণীদের শরীরে স্থিত সকল প্রাণ লীন হয়ে যায় এবং আমি সঞ্চারিত হলে সবই সঞ্চারিত হতে থাকে। তাই আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখো, আমি এবার লীন হয়ে যাচ্ছি (তখন তোমরাও লয় হয়ে যাবে)।'

এই বলে প্রাণবায়ু কিছুক্ষণের জন্য লীন হয়ে গেল, আবার তারপরে চলতে শুরু করল। তখন সমান এবং উদান বায়ু তাকে বলল—'প্রাণ ! তুমি আমাদের মতো এই শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে থাকো না, সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নও। কেবল অপান তোমার বশে থাকে (অতএব তোমার লয়প্রাপ্তি হলে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না)।' এদের দুজনের কথা শুনে প্রাণ কোনো উত্তর দিতে পারল না, সে আবার পূর্বের ন্যায় চলতে শুরু করল। তখন অপান বলল—'আমি লীন হয়ে গেলে প্রাণীর শরীরে স্থিত সকল প্রাণ লয়প্রাপ্ত হয় এবং আমি চললে পুনরায় সব চলতে থাকে, তাই আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখো, এখন আমি লীন হয়ে যাচ্ছি।'

তখন ব্যান এবং উদান উত্তর দিল—'অপান ! শুধু প্রাণ তোমার অধীন, অতএব তুমি আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারো না।' একথা শুনে অপান চুপ করে নিজের কাজ

করতে লাগল। তখন ব্যান বলল—'আমি সব থেকে শ্রেষ্ঠ। আমার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ শোনো। আমি লীন হলে প্রাণীদেহে স্থিত সমস্ত প্রাণ লয় হয়ে যায় এবং আমি চলতে থাকলে আবার সব চলতে শুরু করে, অতএব আমি সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখো, এখন আমি লুপ্ত হচ্ছি।' তারপর ব্যান কিছুক্ষণ লীন হয়ে আবার চলতে শুরু করল। তখন প্রাণ, অপান, উদান এবং সমান বলল—'ব্যান! শুধু সমান বায়ু তোমার অধিকারে থাকে, অতএব তুমি আমাদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারো না।'

এই কথা শুনে ব্যান পুনরায় আগের মতো চলতে শুরু করল। তখন সমান বলল—'আমি সব থেকে শ্রেষ্ঠ, তার যুক্তিযুক্ত কারণও আছে, সেই কারণ শোনো। আমি লয় হয়ে গেলে প্রাণধারীর শরীরে স্থিত সব প্রাণ লয় হয়ে যায় এবং আমি চললে পুনরায় সব চলতে শুরু করে, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ। দেখো, আমি এবার লীন হয় যাচ্ছি।' এই বলে সমানবায়ু কিছুক্ষণ লীন হয়ে থেকে পুনরায় চলতে শুরু করল।

তখন উদান বলল—'আমি সর্বশ্রেষ্ঠ! আমার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ শোনো—আমি লীন হলে প্রাণীর শরীরে স্থিত সমস্ত প্রাণ লয় হয়ে যায় এবং আমি চললে পুনর্বার সব চলতে শুরু করে, সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। দেখো আমি লীন হয়ে যাচ্ছি।' তারপর উদান কিছুক্ষণ লুপ্ত থেকে পুনরায় চলতে শুরু করল। তখন প্রাণ ইত্যাদি তাকে বলল—'উদান! শুধু ব্যানই তোমার বশীভূত, সুতরাং তুমি আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারো না।' তারপর সেই সব একত্রিত প্রাণকে প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন—'বায়ুগণ! তোমরা সকলেই শ্রেষ্ঠ অথবা তোমাদের মধ্যে কেউই শ্রেষ্ঠ নয়। তোমরা সকলের ধারণরূপ ধর্ম একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং তোমরা সকলেই নিজ নিজ স্থানে শ্রেষ্ঠ। তোমাদের কল্যাণ হোক। কুশলে থাকো এবং একে অন্যের হিতৈষী থেকে পরস্পরের উন্নতিতে সহায়তা করে একে অপরকে ধারণ করে থাকো।'

অন্তর্যামীর প্রাধান্য এবং ব্রহ্মরূপী বনের বর্ণনা

ব্রাহ্মণ বললেন—প্রিয়ে! একজনই জগতের শাসক, অন্য কেউ নয়। যিনি হৃদয়ের মধ্যে বিরাজমান, আমি সেই পরমাত্মাকেই সকলের শাসক বলে জানাচ্ছি। জল যেমন উচ্চ স্থান থেকে নিম্নে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই পরমাত্মার প্রেরণাতে আমি যেপ্রকার কাজে নিযুক্ত হই, তাই পালন করে থাকি। গুরু একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই। যিনি হৃদয়ে অবস্থান করেন, সেই পরমাত্মাকেই আমি গুরু মনে করি। একজনই বন্ধু, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো বন্ধু নেই। যিনি হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্মাই আমার বন্ধু। তাঁর উপদেশে বান্ধবগণ বন্ধুমান হয় এবং সপ্তর্ষিগণ আকাশে প্রকাশিত হন। একজনই শ্রোতা, অন্য কেউ নেই। হৃদয়ে স্থিত যে পরমাত্মা, তাঁকেই আমি শ্রোতা বলি। ইন্দ্র তাঁকেই গুরু মেনে গুরুকুলবাসের নিয়ম পূর্ণ করেছেন অর্থাৎ শিষ্যভাবে তিনি সেই অন্তর্যামীরই শরণাগত হয়েছিলেন। তাতেই তিনি সমস্ত লোকের সাম্রাজ্য এবং অমরত্ব লাভ করেছেন। সেই গুরুর প্রেরণাতেই জগতের সমস্ত সর্পকে সর্বদা দ্বেষের পাত্র বলে মনে করা হয়।

প্রাচীনকালে সর্প, দেবতা এবং ঋষিদের প্রজাপতির সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি। একবার দেবতা, ঋষি, নাগ ও অসুরেরা প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রজাপতি! আমাদের কল্যাণের কী উপায়? তা বলুন।' তাঁদের প্রশ্ন শুনে প্রজাপতি ব্রহ্মা একাক্ষর ব্রহ্ম—ওঁ-কারের উচ্চারণ করলেন। তাঁর প্রণবনাদ শুনে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন। তারপর তাঁরা সেই উপদেশের অর্থ যখন চিন্তা করলেন, তখন সর্বপ্রথম সর্পাদির মনে অপরকে কামড় দেবার ভাব উৎপন্ন হল, অসুরদের মধ্যে স্বাভাবিক দম্ভ আবির্ভূত হল এবং দেবতারা দান এবং মহর্ষিগণ দমকেই গ্রহণ করার স্থির করলেন। এইভাবে সর্প, দেবতা, ঋষি এবং দানব—এরা সকলে একই উপদেষ্টা গুরুর কাছে গিয়েছিলেন এবং একটি শব্দের উপদেশেই তাঁদের বুদ্ধির সংস্কার হয়। তবুও তাঁদের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপন্ন হয়। শ্রোতা গুরুর বলা উপদেশ শোনেন এবং তা তারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে। সুতরাং প্রশ্নকারী শিষ্যের কাছে নিজের অন্তর্যামীর থেকে বড় অন্য কোনো গুরু নেই। প্রথমে সে কর্ম অনুমোদন করে, তারপর

জীব সেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মাই গুরু, জ্ঞানী, শ্রোতা এবং দ্বেষ্টা।

জগতে যে পাপকাজ করে বিচরণ করে, তাকে পাপাচারী এবং যে শুভ কর্ম আচরণ করে তাকে শুভাচারী বলা হয়। তেমনই কামনার দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ মানুষকে কামচারী এবং ইন্দ্রিয় সংযমে প্রবৃত্ত থাকা পুরুষকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। যে ব্যক্তি ব্রত ও কর্ম ত্যাগ করে ব্রহ্মে স্থিত থাকে এবং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে জগতে বিচরণ করে, সেই প্রধান ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মাই তার সমিধ, ব্রহ্মই অগ্নি, ব্রহ্ম থেকেই সে উৎপন্ন হয়েছে, ব্রহ্মাই তার জল এবং ব্রহ্মই গুরু। তার চিত্তবৃত্তি সর্বদা ব্রহ্মেই লীন থাকে। বিদ্বানেরা একে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য বলে। আত্মজ্ঞানী পুরুষ এই ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ জেনে সর্বদা তা পালন করতে থাকেন।

যেখানে সংকল্পরূপী মশা, মাছির আধিক্য হয়, শোক এবং হর্ষরূপ শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট বজায় থাকে, মোহরূপ অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে, লোভ ও ব্যাধিরূপ সর্প বিচরণ করে, যেখানে বিষয়েরই উন্মুখ দুর্গম পথ একাকীই অতিক্রম করতে হয়। যেখানে কাম-ক্রোধরূপ শত্রু বাসা করে, সেই সংসাররূপ দুর্গম পথ উল্লঙ্ঘন করে আমি এখন ব্রহ্মরূপ মহা বনে প্রবেশ করেছি।

ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন—মহাপ্রাজ্ঞ ! সেই বন কোথায় ? সেখানে কী কী বৃক্ষ, পর্বত ও নদী আছে, সেটি কত দূরে ?

ব্রাহ্মণ বললেন—প্রিয়ে ! সেই বনে কোনো ভেদাভেদ নেই—তা দুয়েরই অতীত। সেখানে লৌকিক সুখ এবং দুঃখ—উভয়েরই অভাব। তার থেকে ছোট, তার থেকে বড় এবং তার বেশি সূক্ষ্ম অন্য কোনো বস্তু নেই। তার সমান সুখরূপও কিছু নেই। সেই বনে প্রবেশ করলে দ্বিজাতিদের হর্ষও হয় না, শোকও হয় না। সে নিজে কোনো প্রাণীকে ভয় পায় না এবং অন্য কোনো প্রাণীও তাকে ভয় পায় না। সেখানে মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পাঁচ তন্মাত্রারূপ বড় বড় বৃক্ষ আছে, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সংশয় এবং সিদ্ধান্ত—এই সাতটি সেই বৃক্ষের ফল এবং মহৎ-অহংকার ইত্যাদি পূর্বোক্ত তত্ত্বাদির অধিষ্ঠাতা দেবতারূপ সেই ফলগুলির ভোক্তা অতিথি। মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—সেই অতিথিদের সাত আশ্রম, সেখানে সাতপ্রকার সমাধি আছে এবং সাত প্রকারেরই দীক্ষা আছে। এই হল সেই বনের স্বরূপ। সেখানে মনরূপ বৃক্ষ শব্দাদি বিষয়াদির অনুভবরূপ পাঁচ প্রকারের দিব্য পুষ্পাদি এবং তার থেকে উৎপন্ন প্রীতি ইত্যাদিরূপ পাঁচ প্রকারের ফলাদি সৃষ্টি করে সর্বদিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে। চক্ষুরূপ বৃক্ষ সেই বনে শ্বেত-পীতাদি বর্ণরূপ পুষ্প এবং সেগুলি দেখে প্রাপ্ত হওয়া সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন করে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যজ্ঞাদিরূপ বৃক্ষ, পাপ-পুণ্যরূপ পুষ্প এবং স্বর্গ-নরক আদিরূপ ফল প্রদান করে। ধ্যানাদিরূপ বৃক্ষ কেবল সুখরূপ ফুল ও ফল প্রদান করে। মন ও বুদ্ধিরূপ দুটি বৃক্ষ মন্তব্য ও বোদ্ধব্যরূপ নানাপ্রকারের ফুল ও ফল সৃষ্টি করে সব দিকে ছড়িয়ে থাকে। সেই বনে আত্মাই অগ্নি, জীব ব্রাহ্মণ, মন ও বুদ্ধি স্রুক এবং স্রুবা ও পাঁচ ইন্দ্রিয় হল সমাধি। মন বুদ্ধিসহ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের আত্মাগ্নিতে পৃথক পৃথক হোম করার পর যে মোক্ষলাভ হয়, তা অপাদান ভেদে সাত প্রকার। এই যজ্ঞে দীক্ষার ফল অবশ্যই লাভ হয় ; কিন্তু সেই ফলকে গৌণ বলে মানা হয়। ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা দেবতাই সেই ফলের আশা করেন (যজ্ঞকর্তা পুরুষ নয়, তার তো মুক্তি হয়ে যায়)। মহর্ষিগণ (ইন্দ্রিয়গুলির অধিদেবতা) এই আত্মযজ্ঞতে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং পূজা স্বীকার করলেই তাঁদের লয় হয়ে যায়। তারপর সেই ব্রহ্মরূপ বিশেষ বন প্রকাশিত হয়। তাতে প্রজ্ঞারূপ বৃক্ষ শোভা পায়, মোক্ষরূপ ফল হতে থাকে এবং শান্তিময় ছায়া ছড়িয়ে থাকে। জ্ঞান সেখানকার আশ্রয়স্থল এবং তৃপ্তি তার জল। সেই বনের মধ্যে আত্মারূপ সূর্যের প্রকাশ ছড়িয়ে থাকে। যে সাধু ব্যক্তি সেই বনের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁর আর কোনো কিছুতে ভয় থাকে না। সেই বন চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত, তার কোনো অন্ত নেই। সেখানে ঘ্রাণ ইত্যাদি বৃত্তিরূপ সাতজন স্ত্রী বাস করে, যারা জীবন্মুক্ত পুরুষদের বশীভূত করতে না পেরে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকে। তাঁরা চিন্ময় জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হন এবং সেই বনে বসবাসকারী প্রজাদের সর্বপ্রকার উত্তম আনন্দ প্রদান করেন। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে যেমন বিরাট ব্যবধান থাকে, তেমনই বদ্ধ ও মুক্তের আনন্দেও সেরূপ ব্যবধান থাকে। যশ, প্রভা, ঐশ্বর্য, বিজয়, সিদ্ধি, ওজ এবং তেজ—এই সাতটি জ্যোতি উপরিউক্ত আত্মারূপ সূর্যকেই অনুসরণ করে। সেই ব্রহ্মেই গিরি, পর্বত, নদী, ঝর্না ইত্যাদি অবস্থিত। নদী-সঙ্গমও তার অত্যন্ত গূঢ় হৃদয়াকাশে অবস্থান করে। তিনিই সাক্ষাৎ পিতামহস্বরূপ। আত্মজ্ঞানে তৃপ্ত পুরুষ তাঁকেই লাভ করেন। যাঁর আশা ক্ষয় হয়েছে, যিনি উত্তম ব্রত পালনের

ইচ্ছা পোষণ করেন, তপস্যার দ্বারা যাঁর সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেছে, সেই পুরুষই নিজ বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ করে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। বিদ্যার (জ্ঞানের) প্রভাবেই ব্রহ্মরূপ বনের স্বরূপ বোঝা যায়—যেসব পুরুষ এই কথা জানেন ; তাঁরা এই বনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শমেরই (মনোনিগ্রহের) প্রশংসা করেন, যার দ্বারা বুদ্ধি স্থির হয়।

আত্মার নির্লিপ্ততা, পরশুরাম দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল সংহার এবং পিতামহ বোঝানোয় পরশুরামের তপস্যার জন্য গমন

ব্রাহ্মণ বললেন—দেবী ! আমি কখনো গন্ধ শুঁকি না, আহারের স্বাদ নিই না, রূপ দেখি না, স্পর্শ করি না, কোনো প্রকার শব্দ শুনি না এবং কোনো প্রকার সংকল্প করি না। আমার মনে কামনার প্রতি কোনো অনুরাগ নেই এবং দোষাদির প্রতি কোনো দ্বেষও নেই। পদ্মপাতায় যেমন জল পড়লেও তা লিপ্ত হয় না, তেমনই আমার ওপরও রাগদ্বেষের কোনো প্রভাব পড়ে না। আমার স্বভাব কখনো লুপ্ত হয় না। আকাশে যেমন সূর্যকিরণ লিপ্ত হয় না, তেমনই বিদ্বান ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হলেও তাঁর মনে এই দৃশ্য-জগতের ভোগের কোনো প্রভাব পড়ে না।

ভামিনি ! এখানে কার্তবীর্য এবং সমুদ্রের আলোচনারূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। পূর্বকালে কার্তবীর্য অর্জুন নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁর এক সহস্র বাহু ছিল। তিনি শুধু ধনুর্বাণের সহায়তায় আসমুদ্র পৃথিবী জয় করেছিলেন। শোনা যায়, একদিন রাজা কার্তবীর্য সমুদ্র তীরে বিচরণ করছিলেন। তিনি নিজ শক্তির অহংকারে শতশত বাণবর্ষণ করে সমুদ্রকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। সমুদ্র তখন সশরীরে তাঁর কাছে মস্তক অবনত করে জোড় হস্তে বললেন—'বীরবর ! আমার ওপর বাণবর্ষণ করবেন না, বলুন, আপনার কোন নির্দেশ পালন করব ? আপনার নিক্ষিপ্ত বাণে আমার আশ্রিত বহু প্রাণী বিপন্ন হচ্ছে। আপনি তাদের অভয়প্রদান করুন।

কার্তবীর্য অর্জুন বললেন—সমুদ্র ! যদি আমার মতো কোনো ধনুর্ধারী বীর থাকেন, যিনি যুদ্ধে আমার সমকক্ষ, তবে তার সন্ধান দিন (তাহলেই আমি আপনাকে ছেড়ে চলে যাব)।

সমুদ্র বললেন—রাজন্ ! আপনি যদি মহর্ষি জামদগ্নির নাম শুনে থাকেন, তবে তাঁর আশ্রমে চলে যান। তাঁর পুত্র পরশুরাম আপনার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

তারপর রাজা কার্তবীর্য অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহর্ষি জামদগ্নির আশ্রমে পরশুরামের কাছে গেলেন এবং আত্মীয়-বন্ধুসহ তাঁর প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে লাগলেন। তিনি তাঁর আচরণে মহাত্মা পরশুরামকে উদ্বিগ্ন করে তুললেন। তখন শত্রু সেনা ভস্মকারী অমিত তেজস্বী পরশুরামের তেজ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি নিজ অস্ত্র নিয়ে সহস্র বাহু-বিশিষ্ট রাজাকে বহু শাখাযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় কেটে ফেললেন। তাঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে যেতে দেখে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা একত্রিত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরশুরামের ওপর আক্রমণ করলেন। পরশুরামও ধনুক নিয়ে রথে আরোহণ করে বাণবর্ষণ করে তাঁদের সংহার করতে লাগলেন। সেই সময় বহু ক্ষত্রিয় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সিংহের আক্রমণে মৃগের ন্যায় পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয়োচিত কর্মও পরিত্যাগ করলেন। বহুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের দর্শন করতে না পারায়

তাঁরা ক্রমশ নিজ কর্মাদি ভুলে গিয়ে শূদ্র হয়ে গেলেন। এইভাবে দ্রাবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শবরদের সঙ্গে বাস করে তাঁরা ক্ষত্রিয় হয়েও ধর্মত্যাগ করায় শূদ্রের অবস্থায় পৌঁছলেন।

ক্ষত্রিয় বীরদের মৃত্যু হলে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের স্ত্রীর গর্ভে নিয়োগ বিধি অনুসারে পুত্র উৎপন্ন করলেন, কিন্তু তাঁরা বড় হলে, পরশুরাম তাঁদেরও মৃত্যু মুখে পাঠালেন। এইভাবে এক এক করে পরশুরাম যখন একুশ বার পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য করলেন, তখন তিনি আকাশবাণী শুনতে পেলেন 'পুত্র ! পরশুরাম ! এই হত্যাকর্ম থেকে নিবৃত্ত হও। বারংবার এই ক্ষত্রিয় বেচারিদের প্রাণ নিয়ে তোমার কী লাভ হচ্ছে ?' এইভাবে তাঁর পিতামহ ঋচীক আদি

ঋষিগণও তাঁকে বোঝালেন—'পুত্র ! এই কর্ম ত্যাগ করো, ক্ষত্রিয় হত্যা কোরো না। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার হাতে রাজাদের বিনাশ হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে আমরা তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাচ্ছি, তা শুনে সেই অনুযায়ী কাজ করো। আগেকার কথা, অলর্ক নামে এক রাজর্ষি প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি বড় তপস্বী, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, মহাত্মা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ধনুকের সাহায্যে আসমুদ্র পৃথিবী জয় করে অত্যন্ত দুষ্কর পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। এরপর তাঁর মন সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। তখন তিনি বড় বড় কর্মের সংসর্গ ত্যাগ করে এক বৃক্ষের নীচে গিয়ে বসে সূক্ষ্ম তত্ত্বের খোঁজে চিন্তা করতে লাগলেন।

অলর্ক বলতে লাগলেন—আমি মনের দ্বারাই বল লাভ করেছি, সুতরাং মনই সবথেকে প্রবল। মনকে জয় করলেই আমি স্থায়ী বিজয় লাভ করতে পারি। আমি অন্তরে ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত, সুতরাং বাইরের শত্রুদের ওপর আক্রমণ না করে এই ভিতরের শত্রুদেরই আমার অস্ত্রের লক্ষ্য করব। এই মন-চাঞ্চল্যের জন্যই সকল মানুষ নানাপ্রকার কর্ম করে থাকে, সুতরাং আমি এখন এই মনের ওপরই তীক্ষ্ণ বাণের আঘাত করব।

মন বলল—অলর্ক ! তোমার বাণ আমাকে কোনোভাবেই বিদ্ধ করতে পারবে না। তুমি যদি তীর নিক্ষেপ কর, তবে তা আমার মর্মস্থানেই আঘাত করবে এবং তাতে তোমার মৃত্যু হবে ; সুতরাং অন্য কোনো বাণের চিন্তা করো যাতে তুমি আমাকে মারতে পারো।

তার কথা শুনে অলর্ক কিছুক্ষণ চিন্তা করে নাসিকা লক্ষ্য করে বললেন—'আমার এই নাসিকা নানাপ্রকার সুগন্ধি গ্রহণ করে তাকেই আকাঙ্ক্ষা করে, তাই একে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা মেরে ফেলব।'

নাসিকা বলল—অলর্ক ! এই বাণ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এতে তোমারই মর্ম বিদীর্ণ হবে এবং তুমিই মরবে, তাই আমাকে মারবার জন্য অন্য প্রকার বাণ অনুসন্ধান করো।

অলর্ক তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিভকে লক্ষ্য করে বললেন—এই জিভ স্বাদু আহার গ্রহণ করে তাকেই পেতে চায়। তাই এখন একেই তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করব।

জিভ বলল—অলর্ক ! এই বাণ আমাকে বিদ্ধ করতে পারবে না ; এটি তোমারই মর্মস্থান বিদ্ধ করে তোমাকেই মৃত্যুমুখে পৌঁছে দেবে ; সুতরাং অন্য প্রকার বাণের কথা ভাবো, যার সাহায্যে তুমি আমাকে মারতে সক্ষম হবে।

তার কথা শুনে অলর্ক কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করতে লাগলেন, পরে ত্বকের ওপর কুপিত হয়ে বললেন—ত্বক নানাপ্রকার স্পর্শ অনুভব করে পুনরায় তারই কামনা করে, অতএব নানাপ্রকার বাণের সাহায্যে আমি একে বিদীর্ণ করে ফেলব।

ত্বক বলল—অলর্ক ! এই বাণ দিয়ে আমাকে নিশানা করতে পারবে না। এটি শুধু তোমারই মর্ম বিদীর্ণ করবে, তাতে তুমি মৃত্যু মুখে পড়বে। আমাকে মারার জন্য অন্য বাণের কথা ভাবো।

ত্বকের কথা শুনে অলর্ক কিছুক্ষণ চিন্তা করে, নেত্রকে লক্ষ্য করে বললেন—এই চক্ষুও বহুবার সুন্দর রূপ দর্শন করে পুনরায় সেগুলিই দেখতে চায়, সুতরাং একেই আমার

তীক্ষ্ণ বাণের লক্ষ্য করব।

চক্ষু বলল—অলর্ক ! এই বাণ আমাকে আঘাত করতে সক্ষম নয়, এটি তোমার মর্মস্থলই বিদ্ধ করবে এবং তুমি মৃত্যু মুখে পড়বে ; সুতরাং অন্য প্রকার বাণের চিন্তা করো, যার সাহায্যে তুমি আমাকে মারতে পারো।

তখন অলর্ক আবার ভেবে বললেন—বুদ্ধি তার প্রজ্ঞাশক্তির প্রভাবে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত নেয়, সুতরাং একেই বাণের দ্বারা আঘাত করব।

বুদ্ধি বলল—অলর্ক ! বাণ আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। এর দ্বারা শুধু তোমার মর্মই বিদীর্ণ হবে এবং তুমি মরে যাবে। যার দ্বারা তুমি আমাকে মারতে পারো, সেই বাণ এ নয়, অন্য কিছু। তার বিষয়ে চিন্তা করো।

তারপর অলর্ক সেই গাছের নীচে বসে ভীষণ তপস্যা করলেন ; কিন্তু তাতেও মন-বুদ্ধিসহ ইন্দ্রিয়াদি বধের যোগ্য কোনো উত্তম বাণের সন্ধান পেলেন না। তখন তিনি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করতে লাগলেন। বহু দিন ধরে নিরন্তর চিন্তা করতে করতে তিনি যোগের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো কল্যাণকর সাধন খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি মনকে একাগ্র করে স্থির হয়ে আসনে উপবেশন করে ধ্যানযোগে সাধন করতে লাগলেন। এই একটি মাত্র পদ্ধতিতেই তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে পরাজিত করে দিলেন—তিনি ধ্যানযোগের দ্বারা আত্মায় প্রবেশ করে পরাসিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হলেন। অলর্ক এই সাফল্যে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে এই গাথাটি গাইলেন—"আহা ! অত্যন্ত কষ্টের বিষয় যে আমি এতদিন বাহ্যকর্মে ব্যাপৃত ছিলাম এবং ভোগ-তৃষ্ণায় আবদ্ধ থেকে রাজ্যের কথাই ভেবেছি। 'ধ্যানযোগের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো উত্তম সুখের সাধন নেই'—একথা আমি অত্যন্ত দেরিতে অনুভব করলাম।"

পিতামহরা বললেন—পুত্র পরশুরাম ! এইসব বিষয় ভালো মতো চিন্তা করে তুমি ক্ষত্রিয়দের বিনাশ কোরো না। গভীর তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, তাতেই তোমার কল্যাণ হবে।

পিতামহদের কথা শুনে মহাসৌভাগ্যশালী জামদগ্নি-নন্দন পরশুরাম ভীষণ তপস্যা আরম্ভ করলেন এবং এর দ্বারাই তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

রাজা অম্বরীষের গীত গাথা এবং এক ব্রাহ্মণ ও জনকের কাহিনী

ব্রাহ্মণ বললেন—দেবী ! সংসারে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি হল আমার শত্রু। এইগুলি গুণাদি ভেদে নয় প্রকারের বলে মানা হয়। হর্ষ, প্রীতি ও আনন্দ—এই তিনটি সাত্ত্বিকগুণ ; তৃষ্ণা, ক্রোধ এবং অভিনিবেশ—এই তিনটি রজগুণ এবং শ্রম, তন্দ্রা ও মোহ—এই তিনটি তমগুণ। শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, আলস্যহীন ও ধৈর্যবান পুরুষ শম-দম ইত্যাদি বাণসমূহের দ্বারা পূর্বোক্ত গুণাদি উচ্ছেদ করে অবশিষ্ট গুণাদিকে জয় করতে সচেষ্ট হন। এই বিষয়ে পূর্বকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একটি গাথা শোনাতেন। শান্তিপরায়ণ মহারাজ অম্বরীষ এই গাথা গাইতেন। বলা হয়—যখন দোষের বল বৃদ্ধি পায় এবং ভালোগুণ অবদমিত হয়, তখন মহাযশস্বী মহারাজ অম্বরীষ রাজ্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। তিনি নিজের দোষগুলি দমন করে উত্তম গুণগুলিকে স্বাগত জানালেন। এর ফলে তিনি যথেচ্ছ সাফল্য লাভ করলেন এবং এই গাথা রচনা করলেন—'আমি বহু দোষ জয় করেছি এবং সমস্ত শত্রু বিনাশ করেছি ; তবু সব থেকে বড় একটি দোষ থেকে গেছে। যদিও সেটি বিনাশযোগ্য, তবুও আমি এখনও সেটি দূর করতে পারিনি। তারজন্যই প্রাণীদের বৈরাগ্য হয় না। তার বশীভূত হয়ে মানুষ নীচকর্ম করতে ব্যগ্র হয় এবং নিজ অবস্থা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান থাকে না। তার দ্বারা প্রেরিত হয়েই না-করার যোগ্য কাজও করে বসে। সেই দোষটির নাম হল লোভ। তাকে জ্ঞানরূপ তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলো, কেটে ফেলো। লোভ থেকে তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণা থেকে চিন্তা উৎপন্ন হয়। লোভী মানুষ প্রথমে রজোগুণের শিকার হয় এবং সেটির প্রাপ্তি হলে তার মধ্যে অধিকমাত্রায় তমোগুণ এসে যায়। সেই গুণাদির দ্বারা দেহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে বারবার জন্মগ্রহণ করে এবং নানাপ্রকার কর্ম করতে থাকে। তারপর জীবনের শেষ সময় এলে তার দেহের তত্ত্ব পৃথক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর আবার জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয় ; তাই এই লোভের স্বরূপ ভালোভাবে জেনে

ধৈর্যপূর্বক একে অবদমন করে আত্মরাজ্যের ওপর অধিকার লাভের ইচ্ছা করা উচিত। সেটিই হল প্রকৃত রাজ্য। আত্মার প্রকৃত জ্ঞানের অনুভূতি হলে সে-ই যথার্থ রাজা।'

যশস্বী রাজা অম্বরীষ এইভাবে আত্মরাজ্যকে সম্মুখে রেখে একমাত্র প্রবল শত্রু লোভের উচ্ছেদ করে উপরিউক্ত গাথাটি গেয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—দেবী ! এই প্রসঙ্গে এক ব্রাহ্মণ ও রাজা জনকের সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। কোনো এক সময় রাজা জনক এক ব্রাহ্মণকে কোনো অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করে দণ্ড দিতে উদ্যত হয়ে বলেন—'ব্রহ্মন্ ! আপনি আমার রাজ্যের বাইরে চলে যান।' তাঁর কথা শুনে ব্রাহ্মণ সেই শ্রেষ্ঠ রাজাকে উত্তর

দেন—'মহারাজ ! বলুন, আপনার অধিকারে কত রাজ্য আছে ? তা জেনে আমি শাস্ত্রানুসারে আপনার নির্দেশ পালন করার এবং অন্য রাজার রাজ্যে বাস করার প্রস্তুতি নেব।'

যশস্বী ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা জনক বারংবার দীর্ঘশ্বাস নিতে লাগলেন, কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! যদিও পিতৃ-পিতামহের সময় থেকেই মিথিলা প্রান্তের রাজ্যের ওপর আমার অধিকার, তবুও বিচারের দৃষ্টিতে দেখলে সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও কোথাও আমার নিজের রাজ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবীতে যখন আমার রাজ্যের সন্ধান পেলাম না, তখন আমি মিথিলাতে অনুসন্ধান করলাম। সেখানেও নিরাশ হয়ে আমি প্রজাদের ওপর আমার অধিকার সম্পর্কে জানতে চাইলাম ; কিন্তু সেখানেও অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম না। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে কোথাও আমার রাজ্য নেই অথবা সর্বত্রই আমার রাজ্য। এক দৃষ্টিতে এই শরীরও আমার নয় আবার অন্য দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীই আমার। এটি যেমন আমার, তেমনই অন্যেরও ; তাই আপনার যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই থাকুন।'

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজন্ ! যখন পিতৃ-পিতামহের সময় থেকেই মিথিলা প্রান্তের রাজ্যের ওপর আপনার অধিকার, তাহলে আপনি কীকরে তার ওপর থেকে আপনার মমত্ব ত্যাগ করছেন ? কোন বুদ্ধির আশ্রয়ে আপনি সর্বত্র নিজেরই রাজ্য বলে মনে করেন এবং কীভাবে কোথাওই আপনার রাজ্য নেই বলে মনে করেন ?

রাজা জনক বললেন—ব্রহ্মন্ ! এই জগতে কর্মানুসারে প্রাপ্ত হওয়া সমস্ত অবস্থারই একদিন অন্ত হয়, একথা আমি ভালোভাবেই জানি। বেদও বলে থাকে—'এ কার বস্তু ? কার ধন ? (অর্থাৎ কারোরই নয়)' তাই আমি যখন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি, তখন মনে হয় কোনো বস্তুকেই নিজের বলা যায় না। সেই বিচার করে আমি মিথিলা রাজ্য থেকে আমার মমত্ব সংযত করে নিয়েছি। এখন যে বুদ্ধির সাহায্যে আমি সর্বত্র নিজের রাজ্য বলে মনে করি, তা শুনুন। আমি আমার নাকে প্রবেশ করা সুগন্ধও নিজ সুখের জন্য গ্রহণ করি না। তাই আমি পৃথিবী জয় করেছি এবং তা সর্বদাই আমার বশে থাকে। আমি যে আহার গ্রহণ করি ; তা নিজের তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করি না, তাই জল-তত্ত্বের ওপর আমি বিজয় প্রাপ্ত করেছি এবং তা সর্বদাই আমার অধীনে থাকে। তেমনই নেত্রের বিষয় রূপ ও জ্যোতি, ত্বক-ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ, শ্রবণগোচর শব্দ এবং মনে উদিত মন্তব্য বিষয়-গুলিও নিজ সুখের জন্য অনুভব করতে চাই না। তাই আমি তেজ, বায়ু, আকাশ ও মনকে জয় করেছি এবং এগুলি সর্বদাই আমার বশে থাকে। আমার প্রত্যেক কার্যের শুরু হয় দেবতা, পিতৃপুরুষ, ভূত ও অতিথিদের নিমিত্ত করে।

জনকের কথা শুনে ব্রাহ্মণ অট্টহাস্য করে বললেন—'মহারাজ ! আপনার বোঝা উচিত ছিল যে, আমি ধর্ম এবং আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে এখানে এসেছি। এখন আমি নিশ্চিত হয়েছি যে জগতে সত্ত্বগুণরূপ নেমিদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে একমাত্র আপনিই ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ দুর্নিবার চক্র সঞ্চালনা করতে সক্ষম।

—০—

ব্রাহ্মণের নিজ জ্ঞাননিষ্ঠ স্বরূপের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে মোক্ষ-ধর্মের বিষয়ে গুরু ও শিষ্যের সংবাদ শোনানো

ব্রাহ্মণ বললেন—দেবী ! তুমি নিজ বুদ্ধিতে আমাকে যা মনে করে উপহাস করছ, আমি তেমন নই। আমি ইহলোকে দেহাভিমানকারীদের মতো আচরণ করি না। তুমি মনে করছ আমি পাপ-পুণ্যে আসক্ত, কিন্তু আমি বাস্তবিক তেমন নই। আমি ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত মহাত্মা, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী সব কিছু। এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখা যায়, সে সবই আমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। জ্ঞানই আমার ধন, ব্রহ্মবেত্তাদের এটিই একমাত্র পথ। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রমের যেখানেই থাকুন, তিনি জ্ঞানমার্গের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করেন। বিভিন্ন আশ্রমে থাকলেও যাঁর বুদ্ধি শান্তির সাধনে ব্যাপৃত থাকে, তিনিই অন্তকালে একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এই মার্গ বুদ্ধিগম্য, শরীরের দ্বারা একে লাভ করা যায় না। তাই কল্যাণী ! তোমার পরলোকের জন্য বিন্দুমাত্র ভয়ের কিছু নেই। তুমি আমার সঙ্গে একাত্মতা চিন্তা করতে করতে শেষকালে আমারই স্বরূপ লাভ করবে।

ব্রাহ্মণী বললেন—প্রভু ! আমি স্বল্পবুদ্ধি এবং আমার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ। সুতরাং আপনি সংক্ষেপে যে মহান জ্ঞানের উপদেশ দিলেন, তা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। তা শুনেও আমি ধারণ করতে পারিনি। অতএব আপনি এমন কোনো উপায় বলুন, যাতে আমার সেই যোগ্যতা লাভ হয়। আমার বিশ্বাস যে আমি আপনার থেকেই সেই উপায় জ্ঞাত হব।

ব্রাহ্মণ বললেন—দেবী ! তুমি বুদ্ধিকে নীচের অরণি (কাষ্ঠ বিশেষ) এবং গুরুকে ওপরের অরণী বলে জেনো। তপস্যা এবং বেদ-বেদান্তের শ্রবণ-মনন দ্বারা মন্থন করলে সেই অরণি থেকে জ্ঞানরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন—নাথ ! ক্ষেত্রজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ শরীরের অন্তর্বর্তী জীবাত্মাকে যে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হয়েছে, তা কীভাবে সম্ভব ? কারণ জীবাত্মা ব্রহ্মের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং যেটি যার নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেটি তারই যে স্বরূপ, তা সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মণ বললেন—দেবী ! বাস্তবে ক্ষেত্রজ্ঞ দেহ-সম্বন্ধরহিত এবং নির্গুণ ; কারণ ক্ষেত্রজ্ঞের সগুণ ও সাকার হওয়া সম্ভব নয় (সেই অবস্থায় সে ব্রহ্ম থেকে কীকরে ভিন্ন হতে পারে ?))।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন ! ব্রাহ্মণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করায় ব্রাহ্মণীর প্রথমে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হল, তারপর তার থেকে ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানদ্বারা তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করলেন।

অর্জুন বললেন—কৃষ্ণ ! এখন আপনার কৃপায় আমার মন সূক্ষ্ম বিষয় শ্রবণে একাগ্র হয়েছে, অতএব জানার উপযুক্ত পরব্রহ্ম স্বরূপের ব্যাখ্যা করুন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন ! এই বিষয়ে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মোক্ষবিষয়ক যে আলোচনা হয়েছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস বলা হচ্ছে। একদিন উত্তম ব্রত পালনকারী এক ব্রহ্মবেত্তা আচার্য তাঁর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় কোনো এক বুদ্ধিমান শিষ্য তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করল—প্রভু ! আমি কল্যাণমার্গে প্রবৃত্ত হয়ে আপনার

শরণাগত হয়েছি এবং আপনার চরণে মস্তক অবনত করে প্রার্থনা করছি যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আমি জানতে চাই শ্রেয় কী ? জগৎ চরাচরের জীব কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে ? কীসের দ্বারা জীবন ধারণ করে ? তাদের অধিকতম আয়ু কত ? সত্য এবং তপ কী ? সৎপুরুষেরা কোন্ কোন্ গুণের প্রশংসা করেন ? কোন্ কোন্ পথ

কল্যাণকর ? সর্বোত্তম সুখ কী ? পাপ কাকে বলা হয় ? এই সব জানার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, সুতরাং আপনি কৃপা করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউ এমন নেই যিনি সর্বপ্রকার রহস্যের সমাধান করতে পারেন।

অর্জুন ! সেই শিষ্যটি সম্পূর্ণভাবে গুরুর শরণাগত হয়েছিল এবং যথোচিত রীতিতে প্রশ্ন করেছিল। সে ছিল গুণবান এবং শান্ত। ছায়ার ন্যায় সে গুরুর সেবায় ব্যাপৃত থাকত এবং জিতেন্দ্রিয়, সংযমী ও ব্রহ্মচারী ছিল। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে মেধাবী এবং ব্রতধারী গুরু পূর্বোক্ত সমস্ত প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দিয়েছিলেন।

গুরু বললেন—পুত্র ! ব্রহ্মা বেদ-বিদ্যার আশ্রয় নিয়ে তোমার জিজ্ঞাসিত এই সব প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছেন এবং প্রধান ঋষিগণ সর্বদাই তা পালন করে থাকেন। ওই সকল প্রশ্নের উত্তরে পরমার্থবিষয় চিন্তা করা হয়েছে। আমি জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম এবং সন্ন্যাসকে উত্তম তপ বলে মনে করি। যে ব্যক্তি অবাধ জ্ঞানতত্ত্বকে স্থিরভাবে জেনে নিজেকে সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত দেখেন, তাঁকে সর্বগতি (সর্বজ্ঞ অথবা সর্বব্যাপক) বলে মানা হয়। যিনি কোনো বস্তু কামনা করেন না, যাঁর মনে কোনো কিছুতে অভিমান হয় না তিনি ইহলোকে বাস করেও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। যিনি মায়া ও সত্ত্বাদি গুণগুলিকে জানেন, যাঁর সমস্ত ভূতের কারণের জ্ঞান থাকে এবং যিনি মমত্ববোধ ও অহংকার রহিত হয়েছেন, তাঁর মুক্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই দেহ এক পঞ্চ বৃক্ষের ন্যায়, অজ্ঞান এর মূল অঙ্কুর (শিকড়), বুদ্ধি স্কন্ধ, অহংকার শাখা, পঞ্চ মহাভূত তার বিশেষ অবয়ব এবং ওই ভূতের বিশেষ পার্থক্য হল তার ছোট ছোট শাখা। এতে সর্বদাই সংকল্পরূপ পাতা অঙ্কুরিত হয় এবং কর্মরূপ ফুল প্রস্ফুটিত হয়। শুভাশুভ কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সুখ-দুঃখ হল সর্বদাই তাতে ফলে থাকা ফল। এইপ্রকার ব্রহ্মরূপ বীজ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রবাহরূপে সর্বদা অবস্থান করা দেহরূপ বৃক্ষ হল সমস্ত প্রাণীদের জীবনের আধার। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব ভালোভাবে জেনে জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা এটিকে কেটে ফেলেন, তিনি অমরত্ব লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তিলাভ করেন।

মহাপ্রাজ্ঞ ! যাতে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদির এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে, সিদ্ধগণ যা ভালোভাবে অবগত হয়েছেন, পূর্বকালে যার নির্ণয় করা হয়েছে এবং মনীষী পুরুষেরা যাকে জেনে সিদ্ধ হয়ে যান, সেই পরম উত্তম সনাতন জ্ঞান আমি এবার তোমাকে জানাচ্ছি। অনেকদিন আগেকার কথা, প্রজাপতি দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভৃগুনন্দন শুক্র, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র এবং অত্রি ইত্যাদি মহর্ষি কর্মবশত নানাস্থান ঘুরে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে একত্রে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরম বৃদ্ধ অঙ্গিরা মুনিকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং সেখানে সুখাসনে উপবেশন করে ব্রহ্মার দর্শন লাভ করে বিনয়পূর্বক তাঁকে প্রণাম করেন। তারপর তাঁরা তোমার মতোই ব্রহ্মার কাছে পরম কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন।

(তখন) ব্রহ্মা বললেন—উত্তম ব্রত পালনকারী

মহর্ষিগণ ! চরাচরের জীব সত্য (পরমাত্মা) থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তপ (কর্ম) দ্বারা জীবনধারণ করে। ব্রহ্মা সত্য, তপ সত্য এবং প্রজাপতিও সত্য। সত্য থেকেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে। এই ভৌতিক জগৎ সত্যরূপই। তাই সদা যোগে ব্যাপৃত, ক্রোধ ও সন্তাপ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নিয়মাদি পালনকারী ধর্মসেবী ব্রাহ্মণ সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাঁরা একে অপরকে নিয়মের মধ্যে রাখতে

সচেষ্ট, ধর্মমর্যাদার প্রবর্তক এবং বিদ্বান, সেই ব্রাহ্মণদের আমি লোককল্যাণকারী সনাতন ধর্ম উপদেশ দেব। প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমের জন্য পৃথকভাবে চার বিদ্যার বর্ণনা করব। মনীষী বিদ্বান চার চরণ সংবলিত এক ধর্মকে নিত্য বলে থাকেন। দ্বিজবরগণ ! পূর্বকালে মনীষী পুরুষ যার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির সুনিশ্চিত সাধন, সেই পরম মঙ্গলকারী কল্যাণময় পথের উপদেশ দিচ্ছি, মন দিয়ে শ্রবণ করো। এই সম্পূর্ণ উপদেশ পরম পদ প্রাপ্তির সাধন। আশ্রমগুলির মধ্যে ব্রহ্মচর্যকে প্রথম আশ্রম বলা হয়। গার্হস্থ্য দ্বিতীয় এবং বাণপ্রস্থ তৃতীয়, তারপর হল সন্ন্যাস আশ্রম। এতে আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য থাকে, সুতরাং এটিকে পরম পদস্বরূপ বলে জানতে হবে। যতক্ষণ অধ্যাত্মজ্ঞান প্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণই জ্যোতি, আকাশ, বায়ু, সূর্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি ইত্যাদিকে পৃথক পৃথক বলে মনে হয়। আত্মজ্ঞান হলে আর এগুলির বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই প্রথমে আত্মজ্ঞানের উপায় বলছি ; সকলে শোনো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন দ্বিজাতীয়দের জন্য বাণপ্রস্থ আশ্রমের বিধান আছে। বনে থেকে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে ফল-মূল ও বায়ু আহার করে জীবন নির্বাহ করলে বাণপ্রস্থ ধর্ম পালন হয়। গৃহস্থ-আশ্রমের বিধান সকল বর্ণের জন্য। বিদ্বান পুরুষেরা শ্রদ্ধাকেই ধর্মের লক্ষণ বলে জানিয়েছেন। ধৈর্যশীল সাধু-মহাত্মা তাঁদের কর্মদ্বারা ধর্ম-মর্যাদা পালন করেন। যে ব্যক্তি উত্তম ব্রতের আশ্রয় গ্রহণ করে উপরিউক্ত ধর্মের মধ্যে কোনো একটি দৃঢ়তা সহকারে পালন করে, সে কালক্রমে সমস্ত প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে। এখন আমি সঠিক যুক্তির সাহায্যে বিষয় স্থিত সমস্ত তত্ত্বাদির বিভাগপূর্বক বর্ণনা করছি। অব্যক্ত প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এবং তার শব্দাদি বিশেষ গুণ ও জীবাত্মা—এইভাবে পঁচিশটি তত্ত্ব বলা হয়েছে। যিনি এই সব তত্ত্বের উৎপত্তি ও লয় ঠিকমতো জানেন, তিনি কখনো মোহের বশীভূত হন না। যিনি সম্পূর্ণ তত্ত্ব, গুণ ও সমস্ত দেবতাকে যথার্থরূপে জানেন, তিনি পাপমুক্ত হন এবং বন্ধন মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ দিব্যলোকের সুখ অনুভব করেন।

ব্রহ্মা কর্তৃক তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের কার্যাদির বর্ণনা

ব্রহ্মা বললেন—মহর্ষিগণ ! তিন প্রকার গুণ যখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় অব্যক্ত প্রকৃতি। অব্যক্ত সবই প্রাকৃত কার্যে ব্যাপক, অবিনাশী এবং স্থির স্বভাববিশিষ্ট। উপরিউক্ত তিন গুণে যখন বৈষম্য আসে তখন সেটি পঞ্চভূতের রূপ ধারণ করে এবং তার থেকে নবদ্বারসম্পন্ন নগর (শরীর) উৎপন্ন হয়। এই নগরে জীবাত্মাকে বিষয়াদির দিকে প্রেরিতকারী একাদশ ইন্দ্রিয় থাকে। মনের দ্বারা তার অভিব্যক্তি হয়। বুদ্ধি এই নগরের প্রভু। এতে যে তিনটি স্রোত (চিত্তরূপ নদীর প্রবাহ), তা সর্বদা পূর্ণ থাকে। এগুলি পূর্ণ করার জন্য তিনটি গুণময় নাড়ি আছে। তাদের সত্ত্ব, রজ ও তম বলা হয়। এরা পরস্পর একে অন্যের আশ্রিত এবং একে অপরের সাহায্যে টিকে থাকে। যেখানে তমোগুণ বাধা পায় সেখানে রজোগুণ বৃদ্ধি পায়, যেখানে রজোগুণকে দমন করা হয় সেখানে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিলাভ করে। তমকে অন্ধকাররূপ বলে জানতে হবে। এর অপর নাম মোহ। এটি অধর্মের দিকে প্রেরণ করে এবং পাপকারীদের মধ্যে নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান থাকে। তমোগুণের এই স্বরূপ অন্যান্য গুণের সঙ্গেও মিশ্রিত দেখা যায়। রজোগুণ হল প্রকৃতিরূপ। এটি সৃষ্টির উৎপত্তির কারণ। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই এর প্রবৃত্তি দেখা যায়। এর দ্বারাই দৃশ্য জগতের উৎপত্তি হয়েছে। সর্ব প্রাণীতে স্থিত প্রকাশ, অহংকারশূন্যতা এবং শ্রদ্ধা—এগুলি সত্ত্বগুণের স্বরূপ। সাধু ব্যক্তিরা নিরহংকারের প্রশংসা করেছেন। এবার আমি যুক্তিপূর্বক, যথোপযুক্তভাবে এই তিন গুণাদির কার্যের যথার্থ বর্ণনা করছি। মন দিয়ে শোনো। মোহ, অজ্ঞান, ত্যাগহীনতা, কর্মাদির সম্বন্ধে নির্ণয় করতে না পারা, নিদ্রা, অহংকার, ভয়, লোভ, শোক, শুভ কর্মে দোষ দেখা, স্মরণ-শক্তির অভাব, পরিণাম চিন্তা না করা, নাস্তিকতা, দুশ্চারিত্র্য, নির্বিশেষতা (ভালো-মন্দ বিবেচনার অভাব), ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, হিংসাদি নিন্দনীয় দোষে প্রবৃত্ত হওয়া, অকার্যকে কার্য এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান বলে মনে করা, শত্রুতা, কাজে

মন না দেওয়া, অশ্রদ্ধা, মূর্খের মতো চিন্তা, কুটিলতা, কোনো কিছু বোঝার ক্ষমতা না থাকা, পাপ করা, অজ্ঞান, আলস্য ইত্যাদির জন্য দেহের জড়তা, ভাব-ভক্তি না থাকা, অজিতেন্দ্রিয়তা এবং নীচ কর্মে আসক্তি—এই সবই হল তমোগুণের কাজ। এতদ্ব্যতীত আরও যেসব বিষয় ইহলোকে নিষিদ্ধ বলা হয়, সেগুলিও তমোগুণের কার্য বলে জানবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বেদের নিন্দা করা, দান না করা, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহনশীলতা এবং মাৎসর্য—এসবই তামস আচরণ। (বিধি এবং শ্রদ্ধারহিত) বৃথা কার্য শুরু করা, দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলাপূর্বক দান করা, দেবতা ও অতিথিদের না দিয়ে আহার করাও তামসিক কার্য। অতিবাদ, অক্ষমা, মাৎসর্য, অভিমান এবং অশ্রদ্ধাকে তমোগুণের ফল বলে মানা হয়। জগতে এইরূপ আচরণবিশিষ্ট এবং ধর্ম মর্যাদা ভঙ্গকারী যেসব পাপী ব্যক্তি আছে, তাদের সকলকেই তমোগুণী বলা হয়। এরূপ পাপী মানুষদের পরবর্তী জন্মে যে যোনিতে যাওয়া অনিবার্য তার পরিচয় জানাচ্ছি। এদের মধ্যে অনেকে নরকগামী হয়, আর কিছু তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। স্থাবর (বৃক্ষ-পর্বত ইত্যাদি), পশু, মালবাহী জীব, রাক্ষস, সর্প, কীট-পতঙ্গ, পক্ষী, অণ্ডজ প্রাণী, চতুষ্পদ প্রাণী, মানসিক ভারসাম্যহীন, কালা-বোবা ইত্যাদি ও অন্যান্য যত পাপময় রোগযুক্ত (কুষ্ঠ ইত্যাদি) মানুষ, তারা সকলেই তমোগুণে আচ্ছন্ন রয়েছে। নিজ কর্মানুসারে উপযুক্ত এইসব দুরাচারী জীব সর্বদা দুঃখে নিমজ্জিত থাকে। তাদের চিত্তবৃত্তির প্রবাহ নিম্নগামী। তাই তাদের অর্বাক্ স্রোতা বলা হয়। এরা সকলেই তমোগুণী। তম (অবিদ্যা), মোহ (অস্মিতা), মহামোহ (রাগ, আসক্তি), ক্রোধ নামযুক্ত তামিস্র এবং মৃত্যুরূপ অন্ধতামিস্র—এই পাঁচপ্রকারকে তামসী প্রকৃতি বলা হয়। বিপ্রবরগণ ! বর্ণ, গুণ, যোনি এবং তত্ত্ব অনুসারে আমি তমোগুণের সম্পূর্ণ বর্ণনা করলাম। যাদের দৃষ্টি অসার তত্ত্বে নিবদ্ধ থাকে—এমন কোন্ ব্যক্তি এই বিষয়কে ভালোভাবে বুঝতে পারবে ? এই বিপরীত দৃষ্টিই তমোগুণের পরিচয়। তমোগুণের স্বরূপ ও তার কার্যাদির নানাপ্রকার গুণের যথাবৎ বর্ণনা করা হল। যে ব্যক্তি এই গুণগুলি ঠিকভাবে জানে, সে তামসিক গুণ থেকে সর্বদা মুক্ত থাকে।

মহর্ষিগণ ! এবার আমি তোমাদের রজোগুণের স্বরূপ এবং কার্যের গুণাদির যথাযথ বর্ণনা করব। মন দিয়ে শোনো—সন্তাপ, রূপ, আরাম, সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, ঐশ্বর্য, বিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, মন অপ্রসন্ন থাকা, বল, শৌর্য, অহংকার, রোষ, ব্যায়াম, বিবাদ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, পরচর্চা, যুদ্ধ করা, মমত্ব বোধ, কুটুম্ব পালন, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়-বিক্রয়, অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা, উগ্রতা, নিষ্ঠুরতা, চিৎকার, অন্যের দোষ দেখা, লৌকিক বিষয় চিন্তা করা, অনুতাপ, অসত্যভাষণ, মিথ্যা দান, সংশয়পূর্ণ বিচার, তিরস্কার, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, জোর খাটানো, স্বার্থের জন্য কাজ, তৃষ্ণা, অপরের আশ্রয়ে থাকা, ব্যবহার কুশলতা, নীতি, প্রমাদ, পরিবার এবং পরিগ্রহ—এগুলি সবই রজোগুণের কার্য। জগতে যে নারী, পুরুষ, ভূত, দ্রব্য এবং গৃহাদির পৃথক পৃথক সংস্কার হয়, সেগুলিও রজোগুণেরই প্রেরণার ফল। সন্তাপ, অবিশ্বাস, সকামভাবে ব্রত-নিয়মাদি পালন, কাম্যকর্ম, নানাপ্রকারের জলাশয় খনন, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্‌কার, যাজন, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত এবং মঙ্গলজনক কর্মকেও রাজস বলে মনে করা হয়। 'আমার এই বস্তু প্রাপ্তি হোক, অমুক জিনিস লাভ হোক'—এই প্রকার যার বিষয়াদি পাওয়ার জন্য আসক্তিমূলক উৎকণ্ঠা হয়, রজোগুণই তার কারণ। দ্রোণ, মায়া, শঠতা, মান, চুরি, হিংসা, ঘৃণা, পরিতাপ, জাগরণ, দম্ভ, দর্প, রাগ, বিষয়প্রেম, প্রমোদ, দ্যূতক্রীড়া, ঝগড়া-বিবাদ করা, নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি, গান-বাজনা, নৃত্য-গীতে আসক্ত হওয়া—এগুলি সবই রাজস গুণ। যারা এই পৃথিবীতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পদার্থের কথা চিন্তা করে, ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গের সেবায় ব্যাপৃত থাকে, ইচ্ছামতো আচরন করে এবং সর্বপ্রকার ভোগের সমৃদ্ধিতে আনন্দিত হয়, তারা রজোগুণে আবৃত, তাদের অর্বাক্স্রোতা বলা হয়। এরূপ লোক ইহলোকে বারংবার জন্ম নিয়ে বিষয়জনিত আনন্দে মগ্ন থাকে এবং ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভের জন্য চেষ্টা করে। মুনিবরগণ ! আমি তোমাদের নানাপ্রকার রাজসিক গুণ এবং তদনুকূল আচরণের যথাবৎ বর্ণনা করলাম। যেসব মানুষ এই গুণগুলিকে জানে, তারা সর্বদা এর বন্ধন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে।

মহর্ষিগণ ! এবার আমি তৃতীয় উত্তমগুণ (সত্ত্বগুণের) বর্ণনা করছি, এই গুণ জগতের সমস্ত প্রাণীদের হিতকারী এবং সাধুপুরুষদের প্রশংসনীয় ধর্ম। আনন্দ, প্রসন্নতা,

উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, কৃপণতার অভাব, নির্ভয়তা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সারল্য, ক্রোধহীনতা, অন্যের দোষ না দেখা, পবিত্রতা, চতুরতা ও পরাক্রম—এগুলি সত্ত্বগুণের কার্য। যারা এই ধর্মের আচরণ করে, তারা পরলোকে সুখভাগী হয়। মমত্ববোধ, অহংকার, আশা পরিত্যাগ করে সর্বত্র সমদৃষ্টি রাখা এবং সর্বতোভাবে নিষ্কাম হওয়াই সাধু পুরুষদের সনাতন ধর্ম। বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, পবিত্রতা, আলস্যবর্জন করা, কোমলতা, মোহগ্রস্ত না হওয়া, প্রাণীদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার, পরচর্চা না করা, হর্ষ, সন্তোষ, বিস্ময়, বিনয়, সত্যব্যবহার, শান্তিকর্মে শুদ্ধভাবে প্রবৃত্ত হওয়া, উত্তম বুদ্ধি, আসক্তি মুক্ত হওয়া, জগতের ভোগে উদাসীনতা, ব্রহ্মচর্য, সর্বপ্রকার ত্যাগ, নির্মমতা, ফলের কামনা না করা, নিরন্তর ধর্ম পালন করতে থাকা—এসবই সত্ত্বগুণের কার্য। যারা উপরিউক্ত আচরণ পালনপূর্বক এই জগতে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বেদের উৎপত্তির স্থানভূত পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিষ্ঠা রাখে, তাদেরই ধীর এবং সাধুদর্শী বলে মানা হয়। এই ধীর পুরুষেরা সব পাপ পরিত্যাগ করে শোকরহিত হন এবং স্বর্গলোকে গিয়ে অনেক শরীর সৃষ্টি করেন। সত্ত্বগুণভাবাপন্ন মহাত্মা স্বর্গবাসী দেবতাদের ন্যায় ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং লঘিমা ইত্যাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত করেন। তাঁদের উর্ধ্বস্রোতা এবং বৈকারিক দেবতা বলে মানা হয়। (যোগবলে) স্বর্গলাভ হলে তাঁদের চিত্ত ভোগজনিত সংস্কার দ্বারা বিকৃত হয়। সেইসময় তাঁরা যা চান, সেই বস্তুই পান এবং দান করেন। আমি তোমাদের সত্ত্বগুণের কার্যাদি বর্ণনা করলাম। যারা এই বিষয় ভালোভাবে জানে তারা মনোবাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে এবং সেই গুণের সেবনে রত থাকলে তাদের আর বন্ধন প্রাপ্তি হয় না।

—o—

সত্ত্বাদি গুণ, প্রকৃতির নাম এবং পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানের মহিমা

ব্রহ্মা বললেন—মহর্ষিগণ ! সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণগুলির পৃথকভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব ; কারণ এই তিনটি গুণ অবিচ্ছিন্ন (মিলিতভাবে) দেখা যায়। এগুলি সবই পরস্পর রঞ্জিত, একে অপরে অনুপ্রাণিত, অন্যান্যাশ্রিত এবং একটি অপরকে অনুসরণকারী। পৃথিবীতে যতদিন তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ থাকে, ততদিন যে রজোগুণও থাকবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এই গুণগুলি সর্বদা এক সঙ্গে থাকে, একই সঙ্গে বিচরণ করে, এক সমূহ হয়ে যাত্রা করে এবং শরীরে অবস্থান করে। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও এগুলির কোনোটির কোথাও ন্যূনতা দেখা যায়, কোথাও আধিক্য। এখন এই বিষয়টি যথাবৎ বর্ণনা করা হচ্ছে। তির্যক যোনির মধ্যে তমোগুণের আধিক্য দেখা যায়, সেখানে রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের অভাব জানতে হবে। মধ্যস্রোতা অর্থাৎ মনুষ্য জন্মে, যেখানে রজোগুণের মাত্রা অধিক হয়, সেখানে তমোগুণ ও সত্ত্বগুণের মাত্রা অত্যন্ত কম হয়ে যায়। এইভাবে উর্ধ্বস্রোতা অর্থাৎ দেবযোনিতে যেখানে সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেখানে তমোগুণ ও রজোগুণের ন্যূনতা দেখা যায়। সত্ত্বগুণ ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তির কারণ, তাকে বৈকারিক হেতু বলে মনে করা হয়। সেটি ইন্দ্রিয়াদি এবং তার বিষয় প্রকাশিত করে। সত্ত্বগুণের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ধর্ম নেই। সত্ত্বগুণে স্থিত পুরুষ স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে, রজোগুণে স্থিত পুরুষ মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যলোকেই থেকে যায় এবং তমোগুণের কার্যরূপ নিদ্রা, প্রমাদ এবং আলস্য ইত্যাদিতে স্থিত তামসিক ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়—নীচ যোনি অথবা নরকে গমন করে। শূদ্রদের মধ্যে তমোগুণের, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে রজোগুণের এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য দেখা যায়। এইভাবে এই তিন বর্ণের মধ্যে প্রধানত এই তিন গুণ থাকে। তমোগুণ, সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণ—এগুলি সর্বতোভাবে পৃথক পৃথক, এমন কখনো শোনা যায় না। সূর্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ, তার তাপ রজোগুণ এবং অমাবস্যার দিন তার ওপর যে গ্রহণ লাগে সেটি তমোগুণের কাজ। এইভাবে সকল জ্যোতিতে তিন গুণ ক্রমশ প্রকাশিত হয় এবং বিলীন হতে থাকে। গুণাদি ভেদে দিনেরও তিন প্রকার ভেদ আছে জানতে হবে। রাতও তিন প্রকারের হয় এবং মাস, পক্ষ, বর্ষ, ঋতু ও সন্ধ্যাও তিন প্রকার হয়। তিন প্রকার দান করা হয়, যজ্ঞও তিন প্রকারের হয়। লোক, দেব, বিদ্যা ও গতি তিন প্রকারের হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ধর্ম, অর্থ, কাম, প্রাণ, অপান ও উদান—এ সবই ত্রিগুণাত্মক। ইহ জগতে যা কিছু বস্তু

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হয়, সে সবই ত্রিগুণময়। সর্বত্র তিনগুণেরই অস্তিত্ব থাকে। এই তিন অব্যক্ত স্বরূপ। সত্ত্ব, রজ, তম—এগুলির সৃষ্টি সনাতন। প্রকৃতিকে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, প্রকৃতি, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, অব্যয়, অনুদ্রিক্ত, অন্যূন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ এবং ত্রিগুণাত্মক বলা হয়। অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তাকারীদের এই নামের জ্ঞান লাভ করা উচিত। যে ব্যক্তি প্রকৃতির এই সব নাম, সত্ত্বাদি গুণ এবং সম্পূর্ণ গতি ঠিকমতো জানে, সে গুণবিভাগের তত্ত্ব-জ্ঞাতা হয়। তার ওপর সাংসারিক দুঃখের কোনো প্রভাব পড়ে না। সে দেহত্যাগের পর সমস্ত গুণের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে।

মহর্ষিগণ ! পরমাত্মতত্ত্ব জানেন যেসব বিদ্বান ব্রাহ্মণ, তাঁরা কখনো মোহগ্রস্ত হন না। পরমাত্মা সর্বত্র হস্ত-পদ, সর্বদিকে নেত্র, মস্তক, চক্ষুবিশিষ্ট এবং সর্বদিকে কানবিশিষ্ট হন ; কারণ তিনি জগতে সব কিছু ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পুরুষের (পরমাত্মার) প্রভাব অত্যন্ত বেশি। অণিমা, লঘিমা এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধি তাঁর স্বরূপ। তিনি সকলের শাসনকর্তা, জ্যোতির্ময় এবং অবিনাশী। জগতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সদ্ভাবপরায়ণ, ধ্যানী, যোগী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান, লোভহীন, ক্রোধজয়কারী, প্রসন্ন চিত্ত, ধীর এবং মমত্ব বোধ ও অহংকাররহিত, তিনি মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেন। যিনি মহান আত্মার মহিমাকে জানেন তিনি পুণ্যদায়ক উত্তম গতি লাভ করেন। পঞ্চমহাভূত বিনাশের সময় যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত প্রাণীকে মহাভয়ের সম্মুখীন হতে হয় ; কিন্তু আত্মজ্ঞানী ধৈর্যশীল ব্যক্তি তখনও মোহগ্রস্ত হন না। যিনি এইরূপ বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, বিশ্বরূপ, পুরাণপুরুষ, হিরণ্ময় দেব ও জ্ঞানীদের পরম গতিরূপ পরম প্রভুকে জানেন, সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধির সীমা পার করে যান।

অহংকার থেকে পঞ্চমহাভূতাদি এবং ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি ; অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতের বর্ণনা ও নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ

ব্রহ্মা বললেন—মহর্ষিগণ ! অহংকার থেকে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ—এই পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়েছে। এই পঞ্চমহাভূতে অর্থাৎ তার শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ নামক বিষয়াদিতে সমস্ত প্রাণী মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। মহাভূতাদির বিনাশের কালে যখন প্রলয়ের সময় হয়, তখন সমস্ত প্রাণীকে মহাভয়ের সম্মুখীন হতে হয়। যে ভূত যার থেকে উৎপন্ন হয়, সে তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই ভূত অনুলোমক্রমে একের পর এক প্রকটিত হয় এবং বিলোমক্রমে এগুলি নিজ নিজ কারণে লয়প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সমস্ত চরাচর ভূতাদির লয় হলেও স্মরণশক্তি-সম্পন্ন ধৈর্যশীল যোগীপুরুষ লীন হন না। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ এবং এগুলি গ্রহণ করার ক্রিয়াদি সবই করণরূপে (অর্থাৎ সূক্ষ্ম মনঃস্বরূপ হওয়ায়) নিত্য, সুতরাং এগুলিও প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হয় না। স্থূল পদার্থ অনিত্য, এগুলিকে মোহ বলা হয়। শরীরের বাহ্য-অঙ্গ রক্ত-মাংসের সংঘাত ইত্যাদি স্থূল এবং অনিত্য। তাই এগুলিকে দীন ও হীন বলা হয়েছে। প্রাণ-অপান-উদান-সমান ও ব্যান—এই পাঁচবায়ু নিত্যরূপে শরীরের মধ্যে নিবাস করে ; সুতরাং এগুলি সূক্ষ্ম। মন-বাক্য-বুদ্ধির সঙ্গে এগুলিকে গণনা করলে এগুলির সংখ্যা হয় আট। এই আটটি এই জগতের উপাদান কারণ। যার নাক, কান, চক্ষু, রসনা ও ত্বক—এই ইন্দ্রিয়গুলি বশে থাকে, মন শুদ্ধ এবং বুদ্ধি সিদ্ধান্তে অচল থাকে ; যার মন উপরিউক্ত ইন্দ্রিয়াদিরূপ আট অগ্নিকে সন্তপ্ত করে না, সেই ব্যক্তি কল্যাণময় ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেন। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ হন না।

দ্বিজবরগণ ! অহংকার থেকে উৎপন্ন যে একাদশ ইন্দ্রিয়াদির কথা বলা হয়েছে, এখন সেগুলির বিশেষভাবে বর্ণনা করছি, শোনো—নাক, কান, ত্বক, চোখ, রসনা, হাত, পা, গুহ্য, উপস্থ এবং বাক্—এই দশটি ইন্দ্রিয়। মন একাদশতম ইন্দ্রিয়। মানুষের প্রথমে এই ইন্দ্রিয়াদির ওপর বিজয় লাভ করা উচিত। তারপর তার ব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ

হয়। এই ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। কান ইত্যাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয় এবং বাকি পাঁচ ইন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়। মনের সম্বন্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের সঙ্গেই থাকে এবং বুদ্ধি দ্বাদশ ইন্দ্রিয়। এভাবে ক্রমশ একাদশ ইন্দ্রিয়ের বর্ণনা করা হল। যে সকল বিদ্বান ব্যক্তি এগুলির সম্বন্ধে ভালোভাবে জানেন, তাঁরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন।

এবার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভূত, অধিভূত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়াদির বর্ণনা করা হচ্ছে। আকাশ প্রথম ভূত। কান তার অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয়), শব্দ তার অধিভূত (বিষয়) এবং দিকগুলি তার অধিদৈবত (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। বায়ু দ্বিতীয় ভূত, ত্বক তার অধ্যাত্ম, স্পর্শ অধিভূত এবং বিদ্যুৎ অধিদৈবত। তৃতীয় ভূতের নাম তেজ ; নেত্র তার অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত এবং সূর্য অধিদৈবত। জল হল চতুর্থ ভূত, রসনা তার অধ্যাত্ম, রস তার অধিভূত এবং চন্দ্র অধিদৈবত। পঞ্চম ভূত পৃথিবী, নাসিকা তার অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত, বায়ু অধিদৈবত। এই পাঁচ ভূতাদিতে যে অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব থাকে, তার বর্ণনা করা হয়েছে। এখন কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বিবিধ বিষয়াদি নিরূপণ করা হচ্ছে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ চরণদ্বয়কে বলেন অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থানকে অধিভূত এবং এবং মিত্র তার অধিদেবতা। সম্পূর্ণ প্রাণীর উৎপন্নকারী হল উপস্থ অধ্যাত্ম, বীর্য তার অধিভূত এবং প্রজাপতি তার অধিষ্ঠাতা দেবতা। দুই হাতকে অধ্যাত্ম বলা হয়, কর্ম তার অধিভূত এবং ইন্দ্র তার অধিদেবতা। বাণী অধ্যাত্ম, বক্তব্য তার অধিভূত এবং অগ্নি তার অধিদৈবত। পঞ্চভূত সঞ্চালনকারী মনকে অধ্যাত্ম বলা হয় ; সংকল্প তার অধিভূত এবং চন্দ্রকে তার অধিষ্ঠাতা দেবতা বলে মানা হয়। সমস্ত জগৎকে জন্মদানকারী অহংকার অধ্যাত্ম, অভিমান তার অধিভূত এবং রুদ্র তার অধিষ্ঠাতা দেবতা। চিন্তাকারী বুদ্ধিকে অধ্যাত্ম মানা হয়, মন্তব্য তার অধিভূত এবং ব্রহ্মা তার অধিদেবতা। প্রাণীদের থাকার তিনটি স্থান—জল, স্থল ও আকাশ। চতুর্থ স্থান সম্ভব নয়। দেহধারীদের জন্ম চার প্রকারে হয়—অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ এবং জরায়ুজ। বিদ্বানদের কর্তব্য হল—তপস্যা এবং পুণ্যকর্মানুষ্ঠান। কর্মের অনেক প্রকার ভাগ, তার মধ্যে যজ্ঞ এবং দান প্রধান। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে দ্বিজকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিদের জন্য বেদাদি অধ্যয়ন অত্যন্ত পুণ্যকর্ম। যে ব্যক্তি এটি বিধিপূর্বক জানেন, তিনি যোগী হন এবং সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। আমি তোমাদের অধ্যাত্ম-বিধি যথাবৎ বর্ণনা করলাম। জ্ঞানী পুরুষদের এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়াদি, তার বিষয় এবং পঞ্চ মহাভূতের ঐক্য বিচার করে তা ভালোভাবে মনে ধারণ করা উচিত। মন ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গেই সব বস্তু ক্ষয় হয়ে গেলে মনুষ্যজন্মের সুখের (লৌকিক সুখ-ভোগ ইত্যাদির) ইচ্ছা থাকে না। যাঁর অন্তর জ্ঞানসমৃদ্ধ, সেই বিদ্বান ব্যক্তি তাতেই সুখ অনুভব করেন।

মহর্ষিগণ ! এখন আমি মনের সূক্ষ্ম ভাবনা জাগ্রতকারী নিবৃত্তি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি। যেখানে গুণ থেকেও না থাকারই মতো, যিনি অভিমানরহিত এবং একান্তচর্যাযুক্ত ও যাঁর মধ্যে ভেদ-দৃষ্টির সর্বতোভাবে অভাব, একেই ব্রহ্মময় আচরণ বলা হয়, তিনিই সর্বসুখের একমাত্র আধার। কচ্ছপ যেমন তার সমস্ত শরীরকে সর্বভাবে গুটিয়ে নেয়, তেমনই যে ব্যক্তি তার সমস্ত কামনা সংকুচিত করে রজোগুণরহিত হয়, সে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত ও সুখী হয়। যে কামনাগুলিকে নিজ মধ্যে লীন করে তৃষ্ণারহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ হয়, সে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য পাত্র হয়ে ওঠে। বিষয় অভিলাষী সমস্ত ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করে জনবহুল স্থান ত্যাগ করলে মুনির অধ্যাত্মজ্ঞানরূপ তেজ অধিক প্রকাশিত হয়। আগুন যেমন ইন্ধন পেলে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে ; তেমনই ইন্দ্রিয় নিরোধ করলে পরমাত্মার প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যোগী যখন প্রসন্ন চিত্তে সম্পূর্ণ প্রাণীদের নিজ অন্তরে অবস্থিত দেখেন, তখন তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পরমাত্মাকে লাভ করেন। যিনি ইহলোকে ত্রিগুণসম্পন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহ-অভিমান ত্যাগ করেছেন, তাঁর হৃদয়াকাশে পরব্রহ্মস্বরূপ উত্তম পদ উপলব্ধ হয়। তিনি মোক্ষলাভ করেন। যাতে ইন্দ্রিয়রূপী পাঁচটি গভীর আবর্ত এবং যা মনোবেগরূপী ভয়ানক জলরাশিতে পূর্ণ ও যার অন্তর্গত মোহরূপী কুণ্ড বর্তমান—এরূপ দেহরূপী নদীকে লঙ্ঘন করে যিনি কাম-ক্রোধাদিকে জয় করেন, তিনিই সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেন। যিনি মনকে হৃদয়কমলে স্থাপন করে নিজের মধ্যে ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন লাভের চেষ্টা করেন, তিনি সর্বপ্রাণীর মধ্যে সর্বজ্ঞ হন এবং হৃদয়ে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন। একটি প্রদীপ থেকে যেমন অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো যায়, তেমনই এক পরমাত্মাই বহু রূপে উপলব্ধ হন। এরূপ স্থির জেনে

জ্ঞানী ব্যক্তি সব রূপকেই এক হতে উৎপন্ন বলে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্বব্যাপী, সমস্ত প্রাণীর হৃদয় এবং মহান আত্মা। ব্রাহ্মণগণ, দেবতা, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃগণ, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত এবং মহর্ষিগণও সর্বদা সেই মহাত্মার স্তুতি করেন।

চরাচর প্রাণিদের অধিপতিগণ, ধর্ম ইত্যাদির লক্ষণসমূহ, বিষয়াদির অনুভূতির সাধন সমূহের বর্ণনা এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষত্ব

ব্রহ্মা বললেন—বট, জাম, অশ্বত্থ, শিমুল, বাঁশ—এগুলি ইহলোকে বৃক্ষের রাজা। হিমবান, পারিযাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস, কোষ্ঠবান গুরুস্কন্ধ, মহেন্দ্র, মাল্যবান—এরা পর্বতের অধিপতি। সূর্য গ্রহাদির, চন্দ্র নক্ষত্রাদির, যমরাজ পিতৃগণের, সমুদ্র নদীসমূহের বরুণ জলের এবং ইন্দ্র মরুদ্‌গণের প্রভু। উষ্ণপ্রভার অধিপতি সূর্য, তারাদের অধিপতি চন্দ্র, ভূতাদির অধীশ্বর অগ্নিদেব। ব্রাহ্মণদের স্বামী বৃহস্পতি, ওষধির সোম, বলবানদের বিষ্ণু, রূপের ত্বষ্টা এবং পশুদের অধিপতি হলেন ভগবান শিব। দীক্ষা গ্রহণকারীদের যজ্ঞ এবং দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র। সর্বদিকের স্বামী উত্তরদিক, ব্রাহ্মণদের প্রতাপী রাজা সোম, সর্বপ্রকার রত্নের স্বামী কুবের এবং প্রজাদের স্বামী প্রজাপতি। আমি সমস্ত প্রাণীর মহান অধীশ্বর এবং ব্রহ্মময়। আমার থেকে অথবা বিষ্ণুর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। ব্রহ্মময় মহাবিষ্ণুই সকলের রাজাধিরাজ, তাঁকেই ঈশ্বর বলে জানা উচিত। সেই শ্রীহরি সকলের কর্তা ; কিন্তু তাঁর কোনো কর্তা নেই। তিনি মনুষ্য, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, দেব-দানব ও নাগ—সকলেরই অধীশ্বর।

রাজা ধর্মপালনে ইচ্ছুক হন এবং ব্রাহ্মণ ধর্মের সেতু ; সুতরাং রাজার উচিত সর্বদা ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা। যে রাজাদের রাজ্যে সাধু-পুরুষরা কষ্টে থাকেন, সেই রাজা সমস্ত রাজোচিত গুণহীন হয়ে মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। যার রাজ্যে সাধু-ব্রাহ্মণদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করা হয়, সেই রাজা ইহলোকে আনন্দের ভাগী হয় এবং পরলোকে সুখভোগ করে।

এখন আমি সকলের নিত্য ধর্ম এবং লক্ষণসমূহ বর্ণনা করছি। অহিংসা সব থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং হিংসা অধর্মের লক্ষণ (স্বরূপ)। প্রকাশ দেবতাদের, যজ্ঞাদি কর্ম মানুষের, শব্দ আকাশের, বায়ু স্পর্শের, রূপ তেজের, রস জলের এবং গন্ধ সমস্ত প্রাণীর ধারণকারী পৃথিবীর লক্ষণ। স্বরব্যঞ্জনের শুদ্ধি যুক্ত বাণীর লক্ষণ শব্দ। চিন্তা-ভাবনা মনের এবং সিদ্ধান্ত বুদ্ধির লক্ষণ ; কারণ মানুষ ইহ জগতে মনের দ্বারা চিন্তা করা বিষয় বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত করে। সাধুপুরুষদের লক্ষণ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যোগের লক্ষণ প্রবৃত্তি এবং সন্ন্যাসের লক্ষণ জ্ঞান। তাই বুদ্ধিমান পুরুষদের জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। জ্ঞানযুক্ত সন্ন্যাসী মৃত্যু ও বৃদ্ধাবস্থা লঙ্ঘন করে সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অতীত হয়ে অজ্ঞানান্ধকার থেকে পরমগতি লাভ করেন।

মহর্ষিগণ ! আমি তোমাদের সকলের ধর্ম এবং লক্ষণ সমূহ বিধিবৎ বর্ণনা করলাম, এবার কোন্ গুণ কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় তা জানাচ্ছি। পৃথিবীর গন্ধ নামক গুণ নাসিকার দ্বারা গ্রহণ করা হয়, নাসিকাতে স্থিত বায়ু সেই গন্ধ অনুভব করানোর সহায়ক হয়। জলের গুণ রস জিহ্বার দ্বারা গ্রহণ করা হয়, জিহ্বাতে স্থিত চন্দ্র সেই রস আস্বাদনের সহায়ক হয়। তেজের গুণ রূপ, নেত্রে স্থিত সূর্যদেবতার সহায়তায় নেত্র দ্বারা তা দেখা সম্ভব হয়। বায়ুর গুণ স্পর্শ, ত্বকের সাহায্যে তার জ্ঞান হয় এবং ত্বকে স্থিত বায়ুদেব সেই স্পর্শ অনুভব করতে সাহায্য করে। আকাশের গুণ শব্দ কানের দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং কানে স্থিত দিক্ শব্দ শ্রবণে সহায়ক বলা হয়। মনের গুণ চিন্তা, যা বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং হৃদয়ে স্থিত চেতন (আত্মা) মনকে চিন্তা কার্যে সাহায্য করে। সিদ্ধান্ত দ্বারা বুদ্ধির এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা মহত্ত্ব গ্রহণ করা হয়। এগুলির কার্য দ্বারাই এদের অস্তিত্ব স্থির হয় এবং এগুলির দ্বারাই ব্যক্ত বলে মানা হয় ; কিন্তু বাস্তবে অতীন্দ্রিয় হওয়ায় এই বুদ্ধি ইত্যাদিও অব্যক্ত, এতে

কোনোই সন্দেহ নেই। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার কোনো জ্ঞাপক লিঙ্গ নেই ; কারণ এটি (স্বয়ং প্রকাশ এবং) নির্গুণ। সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ অলিঙ্গ (কোনো বিশেষ লক্ষণরহিত), কেবল জ্ঞানই তার লক্ষণ (স্বরূপ) মানা হয়। গুণাদির উৎপত্তি ও লয়ের কারণভূত অব্যক্ত প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলা হয়। আত্মা তাকে জানে, তাই তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আদি, মধ্য ও অন্তযুক্ত সমস্ত অচেতন গুণকে জানে ; কিন্তু তাঁরা তাঁকে জানতে পারেন না। ক্ষেত্রজ্ঞকে কেউ জানতে পারে না, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ সকলকে জানেন। ইন্দ্রিয়াদির ভোগে যেসব গুণের প্রয়োজন থাকে, সেগুলির অতীত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সুতরাং ইহলোকে যার দোষাদি ক্ষয় হয়ে গেছে, সেই গুণাতীত পুরুষ সত্ত্ব (বুদ্ধি) এবং গুণাদি পরিত্যাগ করে ক্ষেত্রজ্ঞের শুদ্ধস্বরূপ পরমাত্মাতে প্রবেশ করে। ক্ষেত্রজ্ঞ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, অচল এবং অনিকেত। তিনিই সর্বব্যাপক পরমাত্মা।

সর্ব পদার্থের আদি-অন্ত, জ্ঞানের নিত্যতা ; দেহরূপ কালচক্র এবং গৃহস্থ ধর্মের বর্ণনা

ব্রহ্মা বললেন—মহর্ষিগণ ! এবার আমি পদার্থাদির আদি, মধ্য ও অন্তের যথার্থ বর্ণনা করছি। প্রথমে দিন, তারপর রাত্রি (তদনুরূপভাবে) শুক্লপক্ষ মাসের, শ্রবণ নক্ষত্রাদির এবং শীত ঋতুর আদি। গন্ধের আদি কারণ ভূমি, রসের জল, রূপাদির জ্যোতির্ময় আদিত্য, স্পর্শের বায়ু এবং শব্দের আদি কারণ আকাশ। এগুলি গন্ধাদি পঞ্চভূত থেকে উৎপন্ন গুণ। এখন আমি ভূতের আদির বর্ণনা করছি। সূর্য সমস্ত গ্রহের এবং জঠরানল সমস্ত প্রাণীর আদি বলা হয়েছে। সাবিত্রী সমস্ত বিদ্যার এবং প্রজাপতি দেবতাদের আদি। এই জগতে যা নিত্য উচ্চারিত হয়, সে সবকেই গায়ত্রী বলা হয়। ছন্দের আদি গায়ত্রী এবং প্রজার আদি সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল। গাভী চতুষ্পদাদির, ব্রাহ্মণ মনুষ্যাদির, ঈগল পক্ষীকুলের, উত্তম আহুতি যজ্ঞাদির, সাপ সরীসৃপ প্রাণীদের এবং সত্যযুগ সমস্ত যুগের আদি। রত্নের মধ্যে সুবর্ণ, অন্নের মধ্যে যব, এবং ভোজ্য পদার্থের মধ্যে অন্ন শ্রেষ্ঠ। বহমান এবং পানের যোগ্য পদার্থের মধ্যে জল উত্তম। সমস্ত স্থাবর ভূতাদির মধ্যে সাধারণত ব্রহ্মার ক্ষেত্র—পাকড় নামবিশিষ্ট বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ এবং তাকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। সমস্ত প্রজাপতির আদি আমি এবং আমার অচিন্ত্যাত্মা ভগবান বিষ্ণু। তাঁকেই স্বয়ম্ভু বলা হয়। পর্বতের মধ্যে সর্বপ্রথম মেরুপর্বতের উৎপত্তি হয়। দিক্-বিদিকের মধ্যে পূর্বদিক প্রধান বলে মানা হয়। সর্বনদীর শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ত্রিপথগা গঙ্গা। সরোবরের মধ্যে সর্বপ্রথম সমুদ্রের প্রাদুর্ভাব হয়। দেব, দানব, ভূত, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, মানুষ, কিন্নর এবং সমস্ত যক্ষের স্বামী ভগবান শংকর। সমস্ত জগতের আদি কারণ ব্রহ্মস্বরূপ মহাবিষ্ণু। ত্রিলোকে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সমস্ত আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জগতের আদি ও অন্ত অব্যক্ত প্রকৃতি। দিনের অন্ত সূর্যাস্ত আর রাত্রির অন্ত সূর্যোদয়। সুখের অন্ত সর্বদাই দুঃখ এবং দুঃখের অন্ত সর্বদা সুখ। সংগ্রহের অন্ত বিনাশ, উচ্চে আরোহণের অন্ত নিম্নে পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মৃত্যু। যে সব বস্তু সৃষ্টি হয়েছে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যে জন্ম নিয়েছে তার মৃত্যু নিশ্চিত। ইহ জগতে স্থাবর বা জঙ্গম কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যজ্ঞ, দান, তপ, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম—এ সবেরই অন্ত হয়, শুধু জ্ঞানের অন্ত হয় না। তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যার চিত্ত শান্ত হয়েছে, যার ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে এবং যে মমত্ববোধ ও অহংকাররহিত হয়েছে, সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মহর্ষিগণ ! মনের সমান বেগসম্পন্ন (দেহরূপ) কালচক্র নিরন্তর চলছে। এটি মহত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে স্থূল ভূত পর্যন্ত চব্বিশ তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট। এর গতি কোথাওই রুদ্ধ হয় না। এটি সংসার-বন্ধনের অনিবার্য কারণ। বৃদ্ধাবস্থা এবং শোক একে পরিবেষ্টন করে থাকে। এটি রোগ এবং দুর্ব্যসনের উৎপত্তি স্থান। দেশ ও কাল অনুসারে বিচরণ করতে থাকে। বুদ্ধি এই কালচক্রের সার, মন স্তম্ভ এবং

ইন্দ্রিয়াদি বন্ধন। এটি পঞ্চমহাভূতের সমূহে নির্মিত। শ্রম ও ব্যায়াম এর শব্দ, রাত ও দিন এর চক্র সঞ্চালন করে। শীত-গ্রীষ্ম তার পরিধি, সুখ-দুঃখ তার সংযোগস্থল, ক্ষুধা-পিপাসা তার কীলক এবং রৌদ্র-ছায়া তার রেখা। চক্ষু বন্ধ ও উন্মীলন দ্বারা তার ব্যাকুলতার (চঞ্চলতা) অনুভব হয়। ঘোর মোহরূপ জল (শোকাশ্রু) দ্বারা এ ব্যাপ্ত থাকে। এটি সর্বদা গতিশীল এবং অচেতন। মাস ও পক্ষের দ্বারা তার আয়ু গণনা করা হয়। এটি কখনো একই অবস্থায় থাকে না। ওপর-নীচ-মধ্যবর্তী লোকে সর্বদা ঘুরে বেড়ায়। তমোগুণের বশে থাকায় তার পাপপঙ্কে প্রবৃত্তি হয় এবং রজোগুণের বেগ একে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করে। সে মহাদর্পে উদ্দীপ্ত থাকে। ত্রিগুণানুসারে তার প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। মানসিক চিন্তাই এই চক্রের বন্ধন রজ্জু। এটি সর্বদা শোক ও মৃত্যুর বশীভূত থাকে এবং এটি ক্রিয়া ও কারণযুক্ত। আসক্তিই তার দীর্ঘবিস্তার (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ), লোভ ও তৃষ্ণা এই চক্রকে উচ্চ-নীচ স্থানে ফেলার হেতু। অদ্ভুত অজ্ঞান (মায়া) তার উৎপত্তির কারণ। ভয় ও মোহ একে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এটি প্রাণীদের মোহগ্রস্ত করে, আনন্দ ও প্রীতির জন্য বিচরণ করে এবং কাম ও ক্রোধ সংগ্রহ করে। এই রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বযুক্ত জড় দেহরূপ কালচক্রই দেবতাসহ সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কারণ। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির সাধনও এটিই। যে ব্যক্তি এই দেহময় কালচক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে ভালোভাবে জানে, সে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না এবং সমস্ত বাসনা, সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—শাস্ত্রে এই চার আশ্রমের কথা বলা আছে। গৃহস্থ আশ্রমই এইসবের মূল। এই জগতে যা কিছু বিধি-নিষেধরূপ শাস্ত্র আছে, তাতে যথার্থভাবে বিদ্বান হওয়া গৃহস্থ দ্বিজদের পক্ষে উত্তম ব্যাপার। এর দ্বারা সনাতন যশ প্রাপ্তি হয়। প্রথমে সর্বপ্রকার সংস্কারসম্পন্ন হয়ে বেদোক্ত বিধিদ্বারা অধ্যয়ন করার সময় ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করা উচিত। তারপর সমাবর্তন সংস্কার করে উত্তমগুণাদিযুক্ত কুলে বিবাহ করা কর্তব্য। নিজ স্ত্রীর ওপর প্রীতি রাখা, সর্বদা সৎপুরুষদের আচার পালন করা ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। তার শ্রদ্ধাপূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞের দ্বারা দেবতাদির পূজা করা উচিত। গৃহস্থের কর্তব্য হল দেবতা, অতিথিদের আহারের পরে অন্নগ্রহণ করা। বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে সংলগ্ন থাকা। নিজ শক্তি অনুসারে প্রসন্নতাপূর্বক যজ্ঞ করবে এবং দান করবে। হাত, পা, চোখ, বাণী ও শরীরের দ্বারা যে সব চপলতা হয় তা পরিত্যাগ করবে অর্থাৎ এগুলির দ্বারা কোনো অনুচিত কর্ম করবে না। এসবই সৎপুরুষদের আচরণ (শিষ্টাচার)। সর্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে থাকবে, পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করবে, উত্তম ব্রত পালন করবে, শৌচ-সন্তোষ ইত্যাদি নিয়ম এবং সত্য-অহিংসা ইত্যাদি যম পালন করে যথাশক্তি দান করতে থাকবে, শিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বাস করবে। শিষ্টাচার পালন কালে জিহ্বা এবং উপস্থকে বশে রাখবে। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবে। সর্বদা সঙ্গে বাঁশের লাঠি ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু রাখবে। ব্রাহ্মণদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন, দান-প্রতিগ্রহ —এই ছয়টি বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত। এর মধ্যে তিনটি কর্ম—যাজন (যজ্ঞ করানো), অধ্যাপন (পড়ানো) এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষদের থেকে দান গ্রহণ—এগুলি ব্রাহ্মণদের জীবিকার সাধন। বাকি তিনটি কর্ম—দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা—এগুলি ধর্ম উপার্জনের জন্য। ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের এগুলি পালনে কখনো ভুল করা উচিত নয়। ইন্দ্রিয়সংযমী, মিত্রভাবে যুক্ত, ক্ষমাশীল, সর্বপ্রাণীর প্রতি সমভাবাপন্ন, মননশীল, উত্তমব্রতপালনকারী এবং পবিত্রভাবে থাকা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সর্বদা সাবধানে থেকে নিজ শক্তি অনুসারে যদি উপরিউক্ত নিয়মাদি পালন করে, তাহলে সে স্বর্গলোক জয় করে নেয়।

—০—

ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম বর্ণনা

ব্রহ্মা বললেন—মহর্ষিগণ ! ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনকারী ব্যক্তির উচিত নিজ ধর্মে তৎপর থাকা, বিদ্বান হওয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ বশে রাখা, মৌন ব্রত পালন করা, গুরুর প্রিয় ও হিত কর্মে ব্যাপৃত থাকা, সত্য কথা বলা, ধর্মপরায়ণ হয়ে পবিত্রভাবে থাকা, গুরুর অনুমতি নিয়ে আহার করা। আহার করার সময় অন্নের নিন্দা করবে না। ভিক্ষার অন্ন হবিষ্য মনে করে গ্রহণ করবে। এক স্থানে থাকবে। এক আসনে উপবেশন করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ভ্রমণ করবে। পবিত্র ও একাগ্র চিত্তে দুবার হোম করবে। সর্বদা বেল বা পলাশের লাঠি নিয়ে থাকবে। রেশমি সুতিবস্ত্র বা মৃগচর্ম ধারণ করবে। ব্রাহ্মণের জন্য বস্ত্র গেরুয়া রংয়ের হওয়া উচিত। ব্রহ্মচারী মেখলা পরবে, জটা ধারণ করবে, প্রত্যহ স্নান করবে, যজ্ঞোপবীত ধারণ করবে, বেদের স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং নির্লোভ হয়ে নিয়মপূর্বক ব্রত পালন করবে। যে ব্রহ্মচারী সর্বদা নিয়মনিষ্ঠ হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুদ্ধ জলে দেবতাদের তর্পণ করে, সর্বত্র তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে।

এইরূপ পূর্বে বর্ণিত উত্তম গুণযুক্ত জিতেন্দ্রিয় বাণপ্রস্থী ব্যক্তিও উত্তমলোক জয় করেন। তিনি উত্তম স্থান লাভ করে পুনরায় ইহজগতে জন্মগ্রহণ করেন না। বাণপ্রস্থী মুনির গৃহ-মমতা ত্যাগ করে গ্রামের বাইরে কোনো বনে নিবাস করা উচিত। তিনি মৃগচর্ম অথবা বল্কল ধারণ করবেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্নান করবেন, সর্বদা বনেই থাকবেন, গ্রামে কখনো বসবাস করবেন না। অতিথিকে আশ্রয় দেবেন এবং তাদের সৎকার করবেন। জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করবেন। বন ছাড়া অন্য স্থানে জল-বায়ুও পান করবেন না। নিজ ব্রত অনুযায়ী সর্বদা সতর্ক থেকে ক্রমশ উপরিউক্ত বস্তু আহার করবেন। যদি কোনো অতিথি আসেন, তাহলে ফল-মূল দিয়ে তাঁর সৎকার করবেন। কখনো আলস্য করবেন না, নিজের কাছে আহারের জন্য যা থাকবে, তার থেকেই অতিথিকে খেতে দেবেন, পরে নিজে আহার্য গ্রহণ করবেন। কারো সাথে শত্রুতা রাখবেন না, হালকা খাবার গ্রহণ করবেন, দেবতাদের সাহায্য নেবেন, ইন্দ্রিয় সংযম করবেন, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবেন, ক্ষমাশীল হবেন, চুল বা দাড়ি কখনো কাটবেন না। সময় মতো অগ্নিহোত্র, বেদের স্বাধ্যায় ও সত্যধর্ম পালন করবেন। শরীরকে সর্বদা পবিত্র রাখবেন। ধর্ম-পালনে কুশলতা লাভে সচেষ্ট থাকবেন, সর্বদা বনে থেকে চিত্ত একাগ্র রাখবেন। এইভাবে উত্তম ধর্ম পালনকারী জিতেন্দ্রিয় বাণপ্রস্থী স্বর্গে বিজয়লাভ করেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ অথবা বাণপ্রস্থী সকলেই, যাঁরা মোক্ষলাভ করতে চান, তাঁদের উত্তম বৃত্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত।

(বাণপ্রস্থের কাল পূর্ণ করে) সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান করে কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস-ধর্ম পালন করতে হয়। সব প্রাণীর সুখে সুখী মনে করবেন, সকলের সঙ্গে মিত্রতাভাব রাখবেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম করে মুনি বৃত্তি পালন করবেন। বিনা কামনায়, বিনা সংকল্পে, প্রকৃতিতে যে আহার্য প্রাপ্ত হয়, তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন। গৃহস্থের রন্ধনশালায় যখন রন্ধন কার্য শেষ হয়ে যায়, সকলে আহার করে বিশ্রাম করে, সেই সময় মোক্ষ-ধর্ম জ্ঞাতা সন্ন্যাসীর ভিক্ষায় যাওয়া উচিত। ভিক্ষা পেলে আনন্দ, আর না পেলে বিষাদ করা উচিত নয়। (লোভবশত) অধিক ভিক্ষা সংগ্রহ করা উচিত নয়। যতটুকু দ্বারা প্রাণধারণ করা সম্ভব ততটুকুই নেওয়া উচিত। চিত্তকে একাগ্র রাখতে হয়। সাধারণ লাভের ইচ্ছা রাখবেন না। যেখানে অধিক সম্মান লাভ হয়, সেখানে আহার করবেন না। মান ও প্রতিষ্ঠা লাভে সন্ন্যাসীর ঘৃণা করা উচিত। তিনি উচ্ছিষ্ট, তেতো, কষা এবং কটু অন্ন আহার করবেন না। মধুর রসও আস্বাদন করবেন না। শুধুমাত্র জীবন নির্বাহের জন্য প্রাণধারণের উপযোগী অন্ন গ্রহণ করবেন। অন্য প্রাণীর কোনো ক্ষতি না করে যদি ভিক্ষা লাভ হয়, তবেই তা স্বীকার করবেন। ভিক্ষার সময় দাতা প্রদত্ত অন্ন ব্যতীত অন্য কোনো অন্ন নেওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত নয়। সন্ন্যাসীর কখনো নিজ ধর্ম প্রদর্শন করা উচিত নয়। রজোগুণ রহিত হয়ে নির্জন স্থানে থাকা উচিত। রাত্রে শয়নের জন্য শূন্য গৃহ, জঙ্গল, বৃক্ষের মূল, নদীর তীর বা পর্বত গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। কোনো গ্রামে এক রাত্রের বেশি থাকা উচিত নয় ; শুধু বর্ষার চার মাস কোনো একটি স্থানে কাটানো উচিত। যতক্ষণ সূর্য আকাশে থাকেন, সন্ন্যাসীর ততক্ষণ পথ চলা উচিত। তিনি ধীরে ধীরে পৃথিবীতে বিচরণ করবেন এবং চলার সময় জীবেদের প্রতি দয়া ভাব রেখে ভালোমতো দেখে রাস্তা চলবেন। কোনোপ্রকার সংগ্রহ

করবেন না এবং কারো স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়ে কোথাও নিবাস করবেন না।

মোক্ষধর্মের জ্ঞাতা সন্ন্যাসীর সর্বদা পবিত্র জলে কাজ করা কর্তব্য। যে জল তক্ষুণি আসে তাতে স্নান করা উচিত (পূর্বে তুলে রাখা জলে নয়)। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, সত্য, সরলতা, ক্রোধের অভাব, দোষ-দৃষ্টি ত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম এবং পরচর্চা না করা—এই আটটি ব্রত বিশেষভবে পালন করা উচিত। ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবেন। তার ব্যবহার সর্বদা পাপ, শঠতা এবং কুটিলতা রহিত হওয়া উচিত। যে অন্ন স্বতঃ পাওয়া যায়, তাই গ্রহণ করা উচিত ; কিন্তু তার জন্যও মনে কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত নয়। প্রাণরক্ষার জন্য যেটুকু অন্ন প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করবেন। ধর্মত প্রাপ্ত অন্নই গ্রহণ করবেন। ইচ্ছামতো আহার করবেন না। আহারের জন্য অন্ন এবং দেহ ঢাকার জন্য বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই সংগ্রহ করবেন না। ভিক্ষাও, এক সময় আহারের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই গ্রহণ করবেন। তার অধিক নয়। অপরের জন্য ভিক্ষা করবেন না। নিজেও কাউকে দেবেন না। কেউ নিজে থেকে না দিলে কারো কোনো বস্তু স্বীকার করবেন না। কোনো ভালো বস্তু উপভোগ করে পরে তার জন্য লোভ করবেন না। মাটি, জল, অন্ন, পত্র, পুষ্প ও ফল—এই বস্তুগুলি যদি কারো অধিকারের বস্তু না হয়, তবে প্রয়োজন হলে সন্ন্যাসী এর দ্বারা কার্য সমাধা করতে পারেন। সন্ন্যাসী কোনো শিল্পকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন না, সোনার প্রতি লোভ রাখবেন না, কাউকে দ্বেষ করবেন না, কাউকে উপদেশও প্রদান করবেন না। সর্বদা নির্বিকারভাবে থাকা উচিত। শ্রদ্ধাপূর্বক প্রাপ্ত পবিত্র অন্ন আহার করবেন, মনে কোনো নিমিত্ত রাখবেন না। সকলের সঙ্গে অমৃতের মতো মধুর ব্যবহার করবেন, কোথাও আসক্ত হবেন না এবং কোনো প্রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তা করবেন না। কামনা ও হিংসাযুক্ত কর্ম নিজেও করবেন না, অন্যকেও করতে উৎসাহ দেবেন না। সর্বপ্রকার পদার্থের আসক্তি উল্লঙ্ঘন করে অল্পে সন্তুষ্ট থেকে সর্বত্র বিচরণ করবেন। স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর প্রতি সমান ভাব রাখবেন, কোনো প্রাণীকে উদ্বেগে রাখবেন না, নিজেও কিছুতে উদ্বিগ্ন হবেন না। যে সর্বপ্রাণীর বিশ্বাসের পাত্র হয়, সে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মোক্ষ-ধর্মের জ্ঞাতা বলে পরিচিত হয়। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা উচিত নয়, বিগত চিন্তা পরিত্যাগ করবেন এবং বর্তমানকেও উপেক্ষা করবেন। শুধু কালের প্রতীক্ষা করে চিত্ত-বৃত্তি দমনের চেষ্টা করবেন। নেত্রদ্বারা, মনদ্বারা, বাক্যের দ্বারা কোনো বস্তু দূষিত করবেন না। সকলের সামনে অথবা আড়ালে কোনো খারাপ কাজ করবেন না। কচ্ছপ যেমন নিজ অঙ্গ সংকুচিত করে নেয়, সন্ন্যাসীরও সেরূপ ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে দুর্বল করে নিশ্চেষ্ট হয়ে যাবেন। তত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবেন। দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না, কারো সামনে মাথা নত করবেন না। স্বাহাকার (অগ্নিহোত্র) পরিত্যাগ করবেন। মমতা ও অহংকারী বোধরহিত হবেন, যোগক্ষেমের চিন্তা করবেন না। মনকে জয় করবেন। যে নিষ্কাম, নির্গুণ, শান্ত, অনাসক্ত, নিরাশ্রয়, আত্মপরায়ণ ও তত্ত্বজ্ঞাতা হন, সে নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়ে যায়। যে মানুষ হাত, পা, পিঠ, মাথা, উদর ইত্যাদি অঙ্গরহিত, গুণ-কর্মহীন, কেবল, নির্মল, স্থির, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দরহিত, জ্ঞেয়, অনাসক্ত, মান হীন, নিশ্চিন্ত, অবিনাশী, দিব্য এবং সম্পূর্ণ প্রাণীর মধ্যে স্থিত আত্মাকে দেখেন, তাঁর কখনো মৃত্যু হয় না। সেই আত্মতত্ত্ব পর্যন্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং দেবগণও পৌঁছতে পারেন না। বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপ ও ব্রতও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। কেবল জ্ঞানবান মহাত্মাই কোনো প্রকার বাহ্য চিহ্ন ব্যতীতই সেখানে যেতে সক্ষম হন। সুতরাং বাহ্য চিহ্নরহিত ধর্ম জেনে সেগুলি যথার্থরূপে পালন করা উচিত। বিদ্বান ব্যক্তিদের বিজ্ঞানের অনুরূপ আচরণ করা উচিত। মূঢ় না হয়েও মূঢ়ের ন্যায় আচরণ করবে ; কিন্তু নিজের কোনো ব্যবহার দ্বারাই ধর্মকে কলঙ্কিত করবে না। যে কাজ করলে সমাজের অন্য লোক অনাদর করে অথচ খুবই প্রয়োজনীয়, তেমন কাজই সর্বদা করতে থাকবে ; কিন্তু সৎপুরুষদের ধর্মের নিন্দা করবে না। যে এইরূপ আচরণ করে ধর্মপালন করে, তাকে শ্রেষ্ঠ মুনি বলা হয়। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়, তার বিষয়, পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রকৃতি ও পুরুষ—এইসব বিচার করে এর তত্ত্বগুলির যথাবৎ সিদ্ধান্ত নেয় এবং একান্তে থেকে পরমাত্মার ধ্যান করে, সে আকাশে বিচরণকারী বায়ুর ন্যায় সর্বপ্রকার আসক্তি-মুক্ত, পঞ্চকোশরহিত, নির্ভয় ও নিরাশ্রয় হয়ে মুক্তিলাভ করে এবং পরমাত্মাকে লাভ করে।

—○—

পরমাত্মা প্রাপ্তির উপায় বর্ণনা

ব্রহ্মা বললেন—মহর্ষিগণ ! নিশ্চিত বাক্য কথনকারী প্রবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসকে তপ বলেন এবং জ্ঞানকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলে মনে করেন। এই ব্রহ্ম অজ্ঞানীদের থেকে অত্যন্ত দূর, নির্দ্বন্দ্ব, নির্গুণ, নিত্য, অচিন্ত্য এবং শ্রেষ্ঠ। ধৈর্যশীল পুরুষ জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। যাঁর মনের কলুষ দূর হয়েছে, যিনি পরম পবিত্র ও রজোগুণ পরিত্যাগ করেছেন, যাঁর অন্তঃকরণ নির্মল, যিনি সন্ন্যাসপরায়ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞাতা, তিনি তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় পথের আশ্রয় গ্রহণ করেন—পরমেশ্বরকে লাভ করেন। জ্ঞানী পুরুষেরা বলেন যে, তপস্যা হল (পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত করার) প্রদীপ, আচার ধর্মের সাধক, জ্ঞান পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং সন্ন্যাসই উত্তম তপ। যিনি তত্ত্বকে পূর্ণভাবে জেনে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মাকে জেনে যান, তিনি সর্বত্র বিচরণকারী ও সর্বজ্ঞ হন। যিনি কোনো বস্তু কামনা করেন না অথবা কাউকে অবহেলা করেন না, তিনি ইহলোকে বাস করেও ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। যিনি সর্বভূতের মধ্যে প্রধান—প্রকৃতি এবং তার গুণ ও তত্ত্ব ভালোভাবে জেনে মমতা ও অহংকার রহিত হয়ে যান, তাঁর মুক্তি হওয়ায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। শুভ ও অশুভ সমস্ত ত্রিগুণাত্মক কর্ম এবং সত্য-অসত্যও ত্যাগ করলে জীব অবশ্যই মুক্তিলাভ করে। এই দেহ একটি বৃক্ষের ন্যায়। অজ্ঞান তার মূল অঙ্কুর (শিকড়), বুদ্ধি স্কন্ধ (দেহ), অহংকার শাখা, ইন্দ্রিয়াদি ফাঁপা স্থান এবং পঞ্চমহাভূত তার বিশাল অবয়ব, যা বৃক্ষের শোভাবৃদ্ধি করে। এতে সর্বদাই সংকল্পরূপ পাতার উদ্গম হতে থাকে এবং কর্মরূপ ফুল ফোটে। শুভাশুভ কর্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সুখ-দুঃখাদি এতে সর্বদা লেগে থাকা ফল। এইরূপ ব্রহ্মরূপী বীজ থেকে প্রকট হয়ে প্রবাহরূপে সর্বদা অবস্থান করা এই দেহরূপী বৃক্ষ সমস্ত প্রাণীর জীবনের আধার। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানরূপ খড়্গের সাহায্যে এই বৃক্ষ ছেদন করে যখন জন্ম-মৃত্যু-জরা অবস্থায় পতনকারী আসক্তিরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং মমতা ও অহংকাররহিত হয়, তখন সে অবশ্যই মুক্তি লাভ করে।

যে ব্যক্তি অন্তকালে আত্মার ধ্যান করে, নিঃশ্বাস গ্রহণে যে সময় ব্যয় হয় সেই স্বল্প সময়েও যদি সে সমভাবে স্থিত হয়, তাহলে সে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের অধিকারী হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এক নিমেষের জন্যও নিজ মনকে আত্মায় একাগ্র করে, সে অন্তরের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়ে বিদ্বানদের লাভ করা অক্ষয় গতি প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা পুনঃপুন প্রাণ সংযমকারী ব্যক্তিও প্রথমে নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ করে, সে যে যে বস্তু কামনা করে, সেই বস্তুই প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব (চিত্তশুদ্ধি) মহত্ত্ব জানা বিদ্বান ইহজগতে সত্ত্ব থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো বস্তুর প্রশংসা করেন না। দ্বিজবরগণ ! আমি অনুমান ও প্রমাণদ্বারা ভালোভাবেই জানি যে অন্তর্যামী পরমাত্মা সত্ত্বেই স্থিত। সত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনো পথ দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, জ্ঞান, ত্যাগ (দান) ও সন্ন্যাস—এগুলি সাত্ত্বিক আচরণের অন্তর্গত মানা হয় (এগুলির দ্বারাই পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়ে থাকে)।

সত্ত্ব এবং পুরুষের পার্থক্য, বুদ্ধিমানের প্রশংসা, পঞ্চভূতের গুণ এবং আত্মার শ্রেষ্ঠতার বর্ণনা

ব্রহ্মা বললেন—মহর্ষিগণ ! যারা প্রাণী-হিংসা করে, নাস্তিক বৃত্তির আশ্রয় নেয় এবং লোভ ও মোহে আবদ্ধ, তাদের নরকে পতন হয়। যে বিদ্বান আলস্য পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং তার ফলেতে আসক্ত হয় না, তাকে ধীর এবং উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন বলে মানা হয়।

এবার আমি জানাচ্ছি যে সত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর সংযোগ এবং বিয়োগ কীভাবে হয়। মন দিয়ে শোনো—এই দুটির মধ্যে বিষয়-বিষয়ীভাব সম্পর্ক মানা হয়। এদের মধ্যে পুরুষ বিষয়ী এবং সত্ত্ব বিষয়। মনীষী ব্যক্তিরা বলেন যে সত্ত্ব দ্বন্দ্বযুক্ত এবং ক্ষেত্রজ্ঞ নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্ফল, নিত্য এবং নির্গুণ। পদ্মপত্রে জলের বিন্দু পড়লে যেমন সেটি ভেজে

না, তেমনই বিদ্বান পুরুষ সমস্ত গুণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও কোনো কিছুতে লিপ্ত হন না। সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যে অসঙ্গ হন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

যার বুদ্ধি ভালো নয়, হাজার চেষ্টা করলেও তার জ্ঞান হয় না আর যে বুদ্ধিমান, সে একটু চেষ্টা করলেই জ্ঞান লাভ করে সুখ অনুভব করে। এরূপ চিন্তা করে যে কোনো উপায়ে ধর্মসাধনের জ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত। কারণ উপায় জানা মেধাবী ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভাগী হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি পথ খরচের ব্যবস্থা না করেই যাত্রা করে, তাহলে তাকে পথে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়, মধ্যপথে তার মৃত্যুও হতে পারে। এই কথা কর্ম সম্পর্কেও জানা উচিত (অর্থাৎ শুভ কর্মরূপ পাথেয় বিনা পরলোকের পথে সুখ যাওয়া যায় না)। যেমন না জেনে দূর রাস্তায় পদব্রজে চলা মানুষ তাড়াতাড়ি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না, সেরূপ বিষম পরিস্থিতি তত্ত্বজ্ঞানরহিত অজ্ঞান পুরুষেরও হয়। কিন্তু সেই পথে অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করে মানুষ যেমন শীঘ্র তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যায়, জ্ঞানী পুরুষদের গতি সেইরূপই হয়ে থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি রথ যাওয়ার পথ যতটা থাকে, সেখান পর্যন্ত রথে করে যায়, রথের পথ শেষ হলে পদব্রজে যাত্রা করে থাকে। সেইরূপ তত্ত্ব ও যোগবিধি জানা বুদ্ধিমান এবং গুণী ব্যক্তি ভালো মতো জেনে শুনে উত্তরোত্তর এগিয়ে চলেন। মূর্খতাবশত কোনো মানুষ যদি নৌকা ছাড়াই নিজ বাহু বলের ভরসায় সমুদ্র অতিক্রম করার ইচ্ছায় গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করে তবে সেই মূর্খ অবশ্যই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। তেমনই জ্ঞান নৌকার সাহায্য ব্যতীত মানুষ ভবসাগর পার হতে পারে না। বুদ্ধিমান মানুষ যেভাবে নৌকার সাহায্যে অনায়াসে সমুদ্রে অবতরণ করে এবং শীঘ্রই তা পার হয়ে নৌকার মমতা ত্যাগ করে চলে যায় তেমনই সংসার সাগর পার হয়ে গেলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পূর্বের সাধন সমূহের প্রতি মমতা ত্যাগ করে ; কিন্তু স্নেহবশত মোহগ্রস্ত মানুষ মমতায় আবদ্ধ হয়ে নৌকাতেই অবস্থান করে সেখানেই ঘুরপাক খেতে থাকে।

যা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শরহিত এবং মুনিগণ বুদ্ধির দ্বারা যার মনন করেন, তাকে প্রধান বলা হয় ; তার অপর নাম অব্যক্ত। অব্যক্তের কার্য মহত্ত্ব এবং মহত্ত্বের কার্য অহংকার। অহংকার থেকে পঞ্চমহাভূত প্রকটকারী গুণের উৎপত্তি হয়েছে। পঞ্চমহাভূতের কার্য রূপ, রস ইত্যাদি বিষয়। এগুলি পৃথক পৃথক নামে প্রসিদ্ধ। অব্যক্ত প্রকৃতি কারণরূপাও আবার কার্যরূপাও। এইরূপ মহত্ত্বেরও কারণ ও কার্য—দুই-ই স্বরূপ শোনা যায়। অহংকার তো কারণরূপই, কার্যরূপেও বারংবার পরিণত হতে থাকে। পঞ্চমহাভূতেও কারণত্ব এবং কার্যত্ব—উভয় ধর্ম থাকে। সেই ভূতাদির বিশেষ কার্য শব্দাদি বিষয়ও হল বীজধর্মী (কারণ), সেই সঙ্গে কার্যরূপেও পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশের একটিই গুণ মানা হয়। বায়ুর দুটি গুণ। তেজের তিনটি গুণ, জলের চারটি গুণ এবং পৃথিবীর পাঁচটি গুণ মানা হয়। এগুলি স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীর দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সমস্ত জীবের জন্ম-প্রদানকারী ও শুভ-অশুভের নির্দেশকারী। রূপ-রস, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—পৃথিবীর এই পাঁচটি গুণ। এর মধ্যে গন্ধের বিশেষ গুণ। গন্ধ নানাপ্রকারের হয়। আমি বিস্তারিতভাবে তার বর্ণনা করছি। ইষ্ট (সুগন্ধ), অনিষ্ট (দুর্গন্ধ), মধুর, অম্ল, কটু, নির্হারী (বহুদূর ছড়িয়ে পড়া), মিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ এবং বিশদ—পার্থিব গন্ধের এই আট প্রকার ভাগ বলা হয়েছে। শব্দ-স্পর্শ, রূপ ও রস—এগুলিকে জলের চারটি গুণ বলে মানা হয় (এর মধ্যে রসই জলের মুখ্য গুণ)। এবার আমি রস-বিজ্ঞানের বর্ণনা করছি। রসের নানাপ্রকার ভেদ আছে—মিষ্টি, টক, কটু, তিক্ত, কষায় এবং নোনতা। এইরূপ ছয় ভাগে জলময় রসের বিস্তার বলা হয়েছে। তেজের তিনটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এর মধ্যে রূপই তেজের প্রধান গুণ। রূপেরও কয়েক প্রকার ভেদ আছে—শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, ছোট, বড়, মোটা, কৃশ, চৌকো, গোল। তেজস রূপে এইরূপ দ্বাদশ প্রকার বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। বায়ুর দুটি গুণ হল শব্দ ও স্পর্শ, এর মধ্যে স্পর্শই বায়ুর প্রধান গুণ। স্পর্শও কয়েক প্রকারের হয়—রুক্ষ, ঠান্ডা, গরম, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), নরম, হালকা, পিচ্ছিল, কঠোর ও কোমল। এই দ্বাদশ প্রকার বায়ুর স্পর্শ গুণের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আকাশের একটিই গুণ শব্দ। শব্দেরও বহু প্রকার গুণ আছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছি—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, ইষ্ট (প্রিয়), অনিষ্ট (অপ্রিয়), সংহত

(শ্লিষ্ট)—আকাশজনিত শব্দের এই দশটি ভেদ। আকাশ সর্বভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তার থেকে শ্রেষ্ঠ অহংকার, অহংকার থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা (মহত্তত্ত্ব), তার থেকে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত প্রকৃতি এবং প্রকৃতির থেকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে ব্যক্তি সমস্ত ভূতাদির ভূত, ভবিষ্যতের জ্ঞাতা, সমস্ত কর্মের বিধি জানেন এবং সর্ব প্রাণীকে আত্মভাবে দেখেন, তিনি অবিনাশী পরমাত্মাকে লাভ করেন।

তপস্যার প্রভাব, আত্মার স্বরূপ এবং তার জ্ঞানের মহিমা ও অনুগীতার উপসংহার

ব্রহ্মা বললেন—মহর্ষিগণ ! সারথি যেমন ভালো ঘোড়াদের নিজ বশে রাখে, তেমনই মন সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শাসনে রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এইগুলি সর্বদা ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। যা ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়ায় সংযুক্ত এবং বুদ্ধিরূপ সারথির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই দেহরূপ রথে আরোহণকারী সেই ভূতাত্মা (ক্ষেত্রজ্ঞ) নিশ্চিন্তে নানা দিকে গমন করতে থাকে। ব্রহ্মময় রথ সর্বদা বিরাজ করে এবং তা মহান, ইন্দ্রিয়াদি তার ঘোড়া, মন সারথি এবং বুদ্ধি চাবুক। যে বিদ্বান সর্বদা এই ব্রহ্মময় রথ সম্পর্কে অবহিত থাকেন, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিনি ধৈর্যশীল এবং তিনি কখনো মোহগ্রস্ত হন না। বিশ্ব সৃষ্টিকারী মরীচি আদি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বারংবার পঞ্চভূত থেকে উৎপন্ন হন এবং সময়ানুসারে তাতেই লীন হয়ে যান। প্রজাপতি তাঁর তপঃশক্তিসম্পন্ন মনের দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং ঋষিগণও তপস্যার দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ফলাহারকারী সিদ্ধ মহাত্মা তপস্যার প্রভাবেই চিত্ত একাগ্র করে ত্রিলোকের ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখে থাকেন। আরোগ্যের সাধনভূত ঔষধ এবং নানাপ্রকার বিদ্যা তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সমস্ত সাধনারই মূল তপস্যা। যা পাওয়া, অভ্যাস করা, অবদমন করা, যার সঙ্গতি সম্পাদন করা নিতান্ত কঠিন, সে সবই তপস্যার দ্বারা হয়, কারণ তপস্যার প্রভাব দুর্লঙ্ঘ্য। মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতক, চোর, গর্ভ নষ্টকারী, গুরুপত্নীর শয্যায় শয়নকারী মহাপাপীও ভালোভাবে তপস্যা করে সেই মহাপাপ হতে মুক্তি পেতে পারে। মানুষ, পিতৃপুরুষ, দেবতা, পশু, পক্ষী ও অন্য যত চরাচর প্রাণী আছে, তারা সব সর্বদা তপস্যায় রত হয়ে সিদ্ধিলাভ করে। তপস্যার বলেই মহামায়াবী দেবতা স্বর্গে নিবাস করেন।

যারা আলস্য ত্যাগ করে অহংকার যুক্ত হয়ে সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে, তারা প্রজাপতির লোকে গমন করে। যারা ধ্যানযোগের আশ্রয় নিয়ে সর্বদা প্রসন্ন চিত্তে থাকে, সেই আত্মবেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ সুখের রাশিভূত অব্যক্ত পরমাত্মায় প্রবেশ করে, কিন্তু যারা ধ্যানযোগে অসফল হয়ে মমতা ও অহংকাররহিত জীবন যাপন করে, তারা অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। পরে অব্যক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে অব্যক্ত থেকেই তারা প্রকাশিত হয় এবং শুধুমাত্র সত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে তমোগুণ ও রজোগুণের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। যিনি সর্বপাপ হতে মুক্ত থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তাঁকে অখণ্ড ব্রহ্ম এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানা উচিত। যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন, তিনিই বেদবেত্তা। মুনির উচিত চিন্তার দ্বারা চেতনা (সম্যগ্ জ্ঞান) লাভ করে মন এবং ইন্দ্রিয়াদি একাগ্র করে পরমাত্মার ধ্যানে স্থিত হওয়া ; কারণ যার চিত্ত যাতে ব্যাপৃত হয়, সে অবশ্যই তার স্বরূপ হয়ে যায়—এই হল সনাতন গোপনীয় রহস্য।

দু অক্ষরের পদ 'মম' আমার (এটি আমার—এই ভাব) মৃত্যু রূপ এবং তিন অক্ষরের পদ 'ন মম' আমার নয় (এ আমার নয়—এই ভাব) সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্তিকারী। কিছু মন্দবুদ্ধি মানুষ (স্বর্গাদি ফল প্রদানকারী) কাম্য কর্মের প্রশংসা করে, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মাগণ তাকে উত্তম বলেন না ; কারণ সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করলে জীবকে ষোলোটি বিকারসম্পন্ন স্থূল দেহ ধারণ করে জন্ম নিতে হয় এবং সে সর্বদা অবিদ্যায় মগ্ন থাকে। শুধু তাই নয়, কর্মঠ পুরুষ দেবতাদেরও উপভোগের বিষয় হয়। তাই পারদর্শী বিদ্বানেরা কর্মে আসক্ত হন না ; কারণ এই পুরুষ (আত্মা) জ্ঞানময়, কর্মময় নয়। যিনি এইভাবে আত্মাকে অমৃতস্বরূপ, নিত্য, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন, অক্ষর, জিতাত্মা এবং অসঙ্গ মনে করেন, তিনি কখনো মৃত্যু বন্ধনে আবদ্ধ হন না। যাঁর দৃষ্টিতে আত্মা অপূর্ব (অনাদি), অকৃত (অজ), নিত্য, কূটস্থ, অগ্রাহ্য ও অমৃতাশী, তিনি এই গুণগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করলে নিজেও অগ্রাহ্য (ইন্দ্রিয়াতীত) এবং অমৃতস্বরূপ হয়ে ওঠেন। যিনি চিত্ত শুদ্ধকারী (মৈত্রী-করুণা ইত্যাদি)

সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করে মনকে আত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট করেন, তিনিই সেই কল্যাণময় ব্রহ্মকে লাভ করেন। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। জ্ঞাননিষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের এটি পরম গতি, বৈরাগী পুরুষদেরও এই গতি, এটিই সনাতন ধর্ম এবং এটিই জ্ঞানীদের প্রাপ্তব্য স্থান। যিনি সমস্ত ভূতে সমভাব রাখেন, লোভ ও কামনারহিত এবং যাঁর দৃষ্টি সর্বত্র সমানভাবে থাকে, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিও এই গতি লাভ করতে সক্ষম। ব্রহ্মর্ষিগণ ! আমি এই সব বিষয় বিস্তারিত ভাবে জানালাম, এই অনুযায়ী আচরণ করো, এর দ্বারা তোমরা শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করবে।

গুরু বললেন—পুত্র ! ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ প্রদান করায় মহাত্মা মুনিগণ সেই অনুযায়ী আচরণ করেন এবং উত্তমলোক লাভ করেন। মহাভাগ ! তোমার চিত্ত শুদ্ধ, অতএব তুমিও আমার কথানুযায়ী ব্রহ্মার উত্তম উপদেশ পালন করো। তাহলে তুমিও সিদ্ধিলাভ করবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন ! গুরুদেবের কথায় সেই শিষ্য সমস্ত উত্তম ধর্ম পালন করেন, তাতে তিনি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত ও কৃতার্থ হন। তিনি সেই পদ লাভ করেন, যেখানে গেলে শোক করতে হয় না।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—জনার্দন ! এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু এবং শিষ্য কারা ? যদি আমি শোনার যোগ্য হই, তবে কৃপা করে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহাবাহো ! মনে করো আমিই গুরু আর আমার মন শিষ্য। তোমার প্রতি স্নেহবশত আমি এই গোপনীয় রহস্য বর্ণনা করলাম। যদি আমার ওপর তোমার প্রেম থাকে, তবে এই অধ্যাত্মজ্ঞান শুনে যথাযথ পালন করো। প্রিয় সখা, আমি এবার পিতাকে দর্শন করতে চাই, বহুদিন তাঁকে দেখিনি। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি তাঁকে দর্শন করার জন্য দ্বারকা যেতে চাই।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন বললেন—'আমরা এবার এখান থেকে হস্তিনাপুর যাব। সেইখানে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে আপনি দ্বারকায় যাবেন।'

—০—

শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের সঙ্গে হস্তিনাপুর গমন এবং সেখানে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে সুভদ্রাসহ দ্বারকার উদ্দেশ্যে প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দারুককে রথ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। দারুক কিছুক্ষণ পরেই এসে জানালেন যে রথ প্রস্তুত। অর্জুনও তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দিলেন, 'সকলে প্রস্তুত হও, হস্তিনাপুর যাত্রা করতে হবে।' আদেশ পেয়েই সমস্ত সৈনিক তৈরি হয়ে গেল এবং মহাতেজস্বী অর্জুনের কাছে গিয়ে জানাল যে তারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন রথে আরোহণ করে প্রসন্ন মনে নানা আলোচনা করতে করতে হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। অর্জুন রথে বসে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন—'মধুসূদন ! আপনার কৃপাতেই মহারাজ যুধিষ্ঠির বিজয়লাভ করেছেন, শত্রুবধ করেছেন এবং নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা সকলেই আপনার জন্য সনাথ। আপনাকে নৌকারূপে পেয়ে আমরা কৌরব-সেনারূপ ভীষণ সমুদ্র পার হয়েছি। বিশ্বকর্মন্ ! আপনিই এই জগতের আত্মা এবং জগতে সবার শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে সেভাবেই জানি যেভাবে আপনি আমাকে জানেন। প্রভু ! আপনার তেজ থেকেই সমগ্র ভূতের উৎপত্তি। নানাপ্রকার লীলা আপনার রতি (মনোবিনোদ)। আকাশ ও পৃথিবী আপনার মায়া। আপনাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। (অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ—এই) চার প্রকার প্রাণী, পৃথিবী ও আকাশ আপনিই উৎপন্ন করেন। নির্মল চাঁদনিতে আপনার হাস্য ছটাই দেখা যায়। ঋতুগুলি আপনার ইন্দ্রিয় ও সর্বদা প্রবাহিত বায়ু আপনার প্রাণ। আপনার ক্রোধই শাশ্বত মৃত্যুরূপ। আপনার প্রসন্নতায় ভগবতী লক্ষ্মী নিবাস করেন। মহামতে ! আপনাতে রতি, তুষ্টি, ধৃতি, ক্ষান্তি, মতি এবং কান্তি ইত্যাদি গুণ ও চরাচর প্রাণীর নিত্য নিবাস বলে মনে করা হয়। প্রলয়কালে আপনাকেই মৃত্যু নামে ডাকা হয়। আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনার গুণাদি বর্ণনা করতে থাকলেও এর শেষ হওয়া সম্ভব নয়। কমলনয়ন ! আপনিই আত্মা এবং পরমাত্মা। আপনাকে আমার নমস্কার। অজেয়

পরমেশ্বর ! আমি দেবর্ষি নারদ, দেবল, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং পিতামহ ভীষ্মের কাছে আপনার মাহাত্ম্য জ্ঞান লাভ করেছি। সমস্ত জগৎ আপনাতেই ওতপ্রোত। আপনিই মানুষের একমাত্র অধীশ্বর। জনার্দন ! আপনি কৃপা করে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন, আমি তা যথাসাধ্য পালন করব। আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনি নানা অদ্ভুত কাজ করেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন যুদ্ধে বধ হয়েছে। কৌরব সেনাদের আপনি নিজ তেজে ভস্ম করেছেন, সেইজন্য আমরা যুদ্ধে বিজয়লাভ করতে পেরেছি। আপনি এমন সব উপায় করেছিলেন, যার জন্য আমাদের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। দুর্যোধনের সঙ্গে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আপনার বুদ্ধি এবং আপনার প্রদত্ত শক্তিতে আমাদের জয় হয়েছিল। কর্ণ, পাপী জয়দ্রথ এবং ভূরিশ্রবাকে বধের সঠিক উপায় আপনি জানিয়েছিলেন ; সুতরাং দেবকীনন্দন ! আপনি প্রেমবশত আমাকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, তা আমি অবশ্যই পালন করব। আপনার কোনো কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি দ্বারকায় যেতে চান তবে যেতে পারেন, তাতে আমার সম্মতি আছে। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আমিও আপনার যাওয়ার কথা বলব। এবার আপনি শীঘ্রই মামা এবং অজেয় বীর বলভদ্র ও অন্যান্য বৃষ্ণীবংশীয় বীরদের সাক্ষাৎ লাভ করবেন।'

এইরূপ কথাবার্তা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা নগরে প্রবেশ করতেই সেখানকারী নরনারী উল্লসিত হয়ে উঠল। তারপর ইন্দ্রমহলের ন্যায় শোভাযুক্ত রাজমহলে তাঁরা দুজনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, বুদ্ধিমান বিদুর, রাজা যুধিষ্ঠির, দুর্ধর্ষ বীর ভীমসেন, মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব, ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় তৎপর অপরাজিত বীর যুযুৎসু, বুদ্ধিমতী গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি ভরত বংশীয় সকল নারী-পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সর্বপ্রথম রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন নিজেদের নাম বলে তাঁর চরণ স্পর্শ করলেন। তারপর গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনের পদস্পর্শ করলেন। বিদুরের কাছে গিয়ে কুশল সমাচার নিলেন। কিছুক্ষণ সকলের সঙ্গে বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসলেন। পরে রাত্রি সমাগত হলে বুদ্ধিমান রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৌরবদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাজার নির্দেশে সকলে নিজ নিজ মহলে ফিরে এলেন। মহাপরাক্রমী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে তাঁর মহলে গেলেন। সেখানে তাঁদের বিধিসম্মতভাবে আদর-আপ্যায়ন করা হলে তাঁরা আহারাদি করে দুজনে একত্রে শয়ন করলেন। রাত্রি প্রভাত হলে তাঁরা দুজনে প্রাতের ক্রিয়াদি এবং সন্ধ্যা-বন্দনা করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মহলে গেলেন, তিনি সেখানে মন্ত্রীদের সঙ্গে উপবেশন করেছিলেন। সেই সুন্দর ভবনে প্রবেশ করে দুই মহাত্মা ধর্মরাজকে দর্শন করলেন। তাঁরা আসায় মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ধর্মরাজ অনুমতি দিলে তাঁরা দুজন উত্তম আসনে উপবেশন করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি এঁদের দুজনকে দেখেই অনুমান করলেন যে এঁরা কিছু বলতে চান। তাই তিনি বললেন—'বীরবরগণ ! মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে কিছু বলতে চাও ! যা বলার আছে বলো। আমি নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করব। তোমরা মনে কোনো চিন্তা কোরো না।'

তাঁর কথা শুনে বাকপটু অর্জুন ধর্মরাজের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন—'রাজন্ ! মহাপ্রতাপশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনেক দিন ধরে রয়েছেন। এখন তিনি আপনার অনুমতি নিয়ে তাঁর পিতাকে দর্শন করতে যেতে চান। আপনি সানন্দে অনুমতি দিন। তাহলে তিনি দ্বারকাপুরী যেতে পারেন। আমার অনুরোধ আপনি ওঁকে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মধুসূদন ! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি শূরনন্দন বসুদেবকে দর্শন করার জন্য আজই দ্বারকায় যাত্রা করুন। মহাবাহু ! আপনার এই যাত্রায় আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। আপনি আমার মাতুল এবং দেবকী দেবীকে বহুদিন দেখেননি ; সুতরাং সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মাতুলকে আমার প্রণাম জানিয়ে, ভ্রাতা বলরামকেও নমস্কার জানাবেন। ভক্তকে মান প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ ! দ্বারকায় গিয়ে আপনি ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে আমাকেও সর্বদা স্মরণে রাখবেন। জনার্দন ! আনর্ত দেশের প্রজা, আপনার মাতাপিতা এবং বৃষ্ণিবংশীয় আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পুনরায় আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় পদার্পণ করবেন। এই নানাপ্রকার রত্ন, ধন ও অন্যান্য বস্তু যা আপনার পছন্দ, সঙ্গে নিয়ে যান। কেশব ! আপনার কৃপাতেই আমাদের শত্রু নিধন হয়েছে

এবং সমগ্র পৃথিবী আমাদের হস্তগত হয়েছে (অতএব এসবই আপনার)।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহাবাহো ! এই রত্ন, ধন এবং সমগ্র পৃথিবী, সবই শুধু আপনার। শুধু তাই নয়, আমার গৃহেও যা ধন-বৈভব আছে, তা-ও আপনারই বলে জানবেন।' তিনি এই কথা বলায় যুধিষ্ঠির 'মহানুভব' বলে তাঁর কথাকে সম্মান জানালেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমাতা কুন্তীর কাছে গিয়ে কথাবার্তা বললেন এবং তাঁর কাছ থেকে যথোচিত আপ্যায়ন পেয়ে তাঁকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে বিদুর ও অন্যান্য সকলের কাছে সম্মান সহকারে বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি নিয়ে সুভদ্রাকে সঙ্গে করে তাঁর দিব্য রথে আরোহণপূর্বক হস্তিনাপুর থেকে রওনা হলেন। সেই সময় নগরবাসীগণ তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। কপিধ্বজ অর্জুন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব, অগাধ বুদ্ধিসম্পন্ন বিদুর এবং গজরাজের ন্যায় পরাক্রমী ভীম—এঁরা সকলেই কিছুদূর পর্যন্ত তাঁর পিছন পিছন গেলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সব কৌরবদের ফিরে যেতে বলে দারুক ও সাত্যকিকে বললেন—'এবার রথ জোরে চালাও।'

পথে শ্রীকৃষ্ণের কাছে কৌরবদের বিনাশের কথা শুনে উত্তঙ্ক মুনির কুপিত হওয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের তাঁকে শান্ত করে নিজ অধ্যাত্মজ্ঞান বর্ণনা করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাওয়ার সময় সকল পাণ্ডব তাঁকে বিদায় জানিয়ে আলিঙ্গন করে ফিরে এলেন। অর্জুন বারংবার তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং যতক্ষণ তাঁরা দৃষ্টির বাইরে না গেলেন, একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণেরও একই অবস্থা। রথ দূরে চলে গেলো, তখন অর্জুন বহুকষ্টে শ্রীকৃষ্ণের দিক থেকে চোখ সরিয়ে পিছন ফিরলেন। সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অতিকষ্টে অর্জুনের দিক থেকে দৃষ্টি সরালেন। ভগবানের যাত্রাপথে নানা অদ্ভুত লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া এসে তাঁর রথের সামনে থেকে ধুলো, কাঁকর উড়িয়ে দিচ্ছিল। ইন্দ্র পবিত্র, সুগন্ধিত জল ও দিব্য পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। সমতল পথ দিয়ে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ মারওয়াড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি অমিত তেজস্বী উত্তঙ্ক মুনিকে দর্শন এবং পূজা করলেন। তারপর মুনিও তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং দুজন দুজনকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তঙ্ক মুনি ভগবানকে প্রশ্ন করলেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি কি কৌরব এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলে ? ওদের মধ্যে অবিচল ভ্রাতৃভাব স্থাপন হয়েছে তো ? তারা তোমার আত্মীয় এবং পরম প্রিয় ; তাদের মধ্যে সন্ধি করেই ফিরে যাচ্ছে তো ? এবার থেকে পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তোমার সঙ্গে আনন্দে থাকতে পারবে তো ? কৌরবগণ সম্মত হওয়ায় তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে পাণ্ডবেরা নিজ রাজ্যে সুখে থাকতে পারবে তো ? তাত ! আমি সর্বদা

ভাবতাম যে তুমি চেষ্টা করলে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে অবশ্যই মিলন হবে। আমার সেই চিন্তা অসফল হয়নি তো ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহর্ষি ! আমি কৌরবদের কাছে গিয়ে তাদের বোঝাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম ; কিন্তু তারা কিছুতেই সন্ধির জন্য রাজি হয়নি। তাই সকলেই পুত্র-আত্মীয়-বান্ধবসহ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। কেউ নিজ বুদ্ধি ও বলের দ্বারা প্রারব্ধের বিধান দূর করতে পারে না। আপনি নিশ্চয়ই এসব জানেন। কৌরবেরা আমার, মহামতি ভীষ্ম ও বিদুরের মতকেও সম্মান দেয়নি।

তাই তারা যুদ্ধে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। পাণ্ডব-পক্ষেও কেবল যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচভাই জীবিত আছে। তাদের সকল পুত্রই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে (যুযুৎসু ব্যতীত) কেউই বেঁচে নেই। সকলেই তাদের বন্ধু-বান্ধবসহ মারা গেছে।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'মধুসূদন ! কৌরবগণ তোমার আত্মীয় এবং প্রিয় ছিল, তোমার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের রক্ষা করোনি ; সুতরাং আজ আমি তোমাকে অবশ্যই শাপ দেব। তুমি জোর করে তাদের থামাতে পারতে, কিন্তু তা করোনি। তাই আমি ক্রোধের বশে তোমাকে শাপ না দিয়ে পারছি না। ওঃ ! কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ বীরেরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গেল আর তোমার ক্ষমতা থাকতেও তুমি তা উপেক্ষা করেছ !'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভৃগুনন্দন ! আগে আমার কথা শুনুন। আপনি তপস্বী, সুতরাং আপনি একটি অনুরোধ মেনে নিন। আমি আপনাকে অধ্যাত্মতত্ত্ব শোনাচ্ছি। তা শোনার পর যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে শাপ দেবেন। শুধু স্মরণ রাখবেন যে কোনো ব্যক্তিই তার অল্প তপস্যার জোরে আমাকে অসম্মান করতে পারে না। আপনি তপস্বী শ্রেষ্ঠ, আপনার তপস্যার তেজ অত্যন্ত বেশি, আপনি আপনার গুরুজনদেরও সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করেছেন। বাল্যাবস্থা থেকেই আপনি ব্রহ্মচর্য পালনকারী—এসব আমি ভালোভাবেই জানি ; তাই এত কষ্টে সঞ্চিত আপনার তপ আমি বিনাশ করতে চাই না।

উত্তঙ্ক বললেন—কেশব ! তুমি তোমার কথানুযায়ী উত্তম অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করো। তা শুনে আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদ করব অথবা অভিশাপ দেব।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহর্ষে ! আপনি জানেন যে তমোগুণ, রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ—এই সব ভাব আমারই আশ্রিত। রুদ্র এবং বসুও আমা হতেই উৎপন্ন। আপনি একথা নিশ্চিতভাবে জানবেন যে সমস্ত ভূত আমাতে এবং আমি সমস্ত ভূতে অবস্থিত। সমস্ত দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ এবং অপ্সরাগণের আমার থেকে প্রাদুর্ভাব হয়েছে। বিদ্বানগণ যাকে সৎ-অসৎ, ব্যক্ত-অব্যক্ত এবং ক্ষর-অক্ষর বলেন, সে সবই আমার স্বরূপ। মুনে ! চার আশ্রমের যে চার ধর্ম প্রসিদ্ধ এবং বেদোক্ত যত কর্ম আছে, সেগুলির কোনোটিই আমার থেকে পৃথক নয়। অসৎ, সদসৎ এবং তার অতীত যে অব্যক্ত জগৎ, সেগুলিও আমার সনাতন দেবাধিদেবের থেকে ভিন্ন নয়। ওঁ-কার থেকে শুরু হওয়া চারটি বেদও 'আমি'। যজ্ঞে যূপ (হাড়িকাট), সোম, চরু, দেবতাদের তৃপ্তকারী হোম, হোতা এবং হোমের সামগ্রীও আমি। অধ্বর্যু, কল্পক এবং সংস্কার করা হবিষ্য—এগুলি সব আমারই স্বরূপ। বৃহৎ যজ্ঞের উদ্গাতা উচ্চৈঃস্বরে সামগান করে আমারই স্তুতি করে থাকে। প্রায়শ্চিত্ত কর্মে শান্তি-পাঠ ও মঙ্গলপাঠকারী ব্রাহ্মণ বিশ্বকর্মারূপ আমাকেই স্তব করে। সর্বপ্রাণীতে দয়া করার যে ধর্ম তা আমার জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র বলে জানবেন। আমি ধর্ম রক্ষা এবং স্থাপন করার জন্য নানা রূপে অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করি এবং বিভিন্নরূপে ও বেশে ত্রিলোকে বিচরণ করি। আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি ও সংহার আমা দ্বারাই হয়ে থাকে। যখনই যুগের পরিবর্তন হয়, তখনই আমি প্রজাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন রূপে জন্ম নিয়ে ধর্ম-মর্যাদা স্থাপন করি। যখন দেব যোনিতে জন্ম নিই, তখন আমি দেবতার ন্যায় সমস্ত আচার পালন করি। গন্ধর্বরূপে অবতার জন্ম নিলে সমস্ত আচরণ গন্ধর্বের মতোই হয়। এইভাবে নাগজন্মে নাগেদের ন্যায়, যক্ষ-রাক্ষস জন্মে তাদের মতো আচরণ করি। এখন মনুষ্য-অবতার ধারণ করেছি, তাই কৌরবদের ওপর শক্তি প্রয়োগ না করে দীনভাবে তাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম ; কিন্তু তারা মোহগ্রস্ত হওয়ায় আমার কথা মেনে নেয়নি। তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমি ভীষণ ভয় দেখিয়েছি এবং ধমক দিয়েছি, কিন্তু তারা অধর্মযুক্ত এবং কালগ্রস্ত হওয়ায় আমার কথায় রাজি হয়নি। তাই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করে তারা স্বর্গগমন করেছে। বিপ্রবর ! আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সমস্ত বিষয় আপনাকে সবিস্তারে জানালাম।

—০—

শ্রীকৃষ্ণের উত্তঙ্ক মুনিকে বিশ্বরূপ দর্শন করানো এবং মরুদেশে জল প্রাপ্ত হওয়ার বরপ্রদান

উত্তঙ্ক বললেন—জনার্দন ! আমি জানি আপনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর। আপনি যে জ্ঞানের উপদেশ আমাকে দিলেন, এ আমার প্রতি আপনার অশেষ কৃপা। আমার চিত্ত প্রসন্ন হয়ে আপনার প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, সুতরাং আমার শাপ দেওয়ার চিন্তা আর নেই। জনার্দন ! আমি যদি আপনার সামান্য কৃপালাভের অধিকারী হয়ে থাকি, তবে আপনি আমাকে আপনার ঈশ্বরীয় রূপ প্রদর্শন করুন, আমি সেটি দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মুনি এইভাবে প্রার্থনা জানানোতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর সনাতন বৈষ্ণব স্বরূপ প্রদর্শন করলেন, যুদ্ধের প্রারম্ভে যা তিনি অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। উত্তঙ্ক মুনি সেই বিরাট বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, যাঁর বিশাল লম্বা হাত, তিনি হাজার সূর্যের মতো দেদীপ্যমান, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং সমস্ত আকাশ ব্যাপৃত করে দণ্ডায়মান। তাঁর সবদিকে মুখ দেখা যাচ্ছিল। সেই ব্যাপক পরমাত্মার বৈষ্ণব রূপ দর্শন করে উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, তিনি তখন স্তুতি করতে লাগলেন—'বিশ্বকর্মন্ ! আপনাকে নমস্কার, বিশ্বাত্মন্ ! আপনার থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়েছে। পৃথিবী আপনার দুটি চরণে এবং আকাশ আপনার মস্তকে ব্যাপ্ত, এর মধ্য স্থল আপনার উদর দিয়ে পরিবেষ্টিত। সমস্ত দিকগুলি আপনার বাহুতে মিশে আছে। অচ্যুত ! এই সমগ্র দৃশ্য প্রপঞ্চ আপনারই স্বরূপ। দেবেশ্বর ! এবার আপনি আপনার এই উত্তম এবং অবিনাশী স্বরূপ সংহত করুন। আমি আবার আগের মতোই আপনাকে আপনার পূর্ব রূপে দেখতে ইচ্ছা করি।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মুনির কথা শুনে সদা প্রসন্নচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহর্ষি ! আপনি আমার কাছে বর চেয়ে নিন।' তখন উত্তঙ্ক বললেন—'পুরুষোত্তম ! আপনার যে স্বরূপ আজ আমি দেখলাম, তাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় বরপ্রদান।' তা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মুনিবর ! এতে আপনি অন্য কিছু ভাববেন না. আমার দর্শন অমোঘ হয় ; সুতরাং আপনার আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করাই উচিত।'

উত্তঙ্ক বললেন—প্রভু ! যদি বর নেওয়া আমার পক্ষে প্রয়োজন বলে মনে করেন, তাহলে এই বর দিন যেন আমি এখানে প্রচুর জলের সন্ধান পাই ; কারণ এই মরুভূমিতে জল অত্যন্ত দুর্লভ।

তারপর ভগবান নিজ তেজ সংহৃত করে উত্তঙ্ক মুনিকে বললেন—'মহর্ষি ! যখনই জলের প্রয়োজন হবে আমাকে স্মরণ করবেন।' বলে তিনি দ্বারকায় চলে গেলেন। পরে একদিন উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়েছেন, তিনি জলের জন্য চতুর্দিকে ঘুরছেন, ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। সেইসময় তিনি একজন অপরিচ্ছন্ন উলঙ্গ প্রায় চণ্ডালকে দেখতে পেলেন, যার দেহ কাদামাটিতে আবৃত এবং একপাল কুকুর তাকে ঘিরে ছিল। তার কোমরে তলোয়ার, হাতে তীরধনুক, তাকে দেখতে অত্যন্ত ভয়ংকর লাগছিল। সেই চণ্ডালের উপস্থ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। মহর্ষিকে তৃষ্ণার্ত দেখে সেই চণ্ডাল হেসে বলল—'উত্তঙ্ক ! এসো, আমার এই জল নিয়ে পান করো। তোমাকে তৃষ্ণায় কষ্ট পেতে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

চণ্ডালের কথায় উত্তঙ্ক মুনি সেই জল নিতে অস্বীকার করলেন এবং বরপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর বাক্য বললেন। উত্তঙ্ক ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জল তো গ্রহণ করলেনই না, উপরন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে চণ্ডালকে তিরস্কার

করতে লাগলেন। তিনি জল নিতে অস্বীকার করায় চণ্ডাল কুকুরসহ অন্তর্ধান করল। তা দেখে উত্তঙ্ক মুনি মনে মনে লজ্জিত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ছলনা করেছেন। এরমধ্যে সেই পথে শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণ করে মহাবুদ্ধিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। তখন উত্তঙ্ক তাঁকে বললেন—'পুরুষোত্তম ! ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের প্রস্রাব দেওয়া আপনার উচিত হয়নি।' তাঁর কথা শুনে ভগবান জনার্দন উত্তঙ্ক মুনিকে মধুর স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মুনিবর ! এস্থানে যেমন রূপ ধারণ করে আপনাকে জল দেওয়া উচিত ছিল, সেইভাবেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারেননি। আমি আপনার জন্য বজ্রধারী ইন্দ্রকে বলেছিলাম জলের রূপে আপনাকে অমৃত প্রদান করতে। আমার কথা শুনে ইন্দ্র বারংবার বলতে থাকেন—'মানুষ অমর হতে পারে না, সুতরাং আপনি তাঁকে অমৃত না দিয়ে অন্য কোনো বর দিন।' কিন্তু আমি জোর করি যে উত্তঙ্ক মুনিকে অমৃতই দিতে হবে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে প্রসন্ন করে বলেন—'মহামতে ! যদি উত্তঙ্ক মুনিকে অমৃত দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে আমি চণ্ডালের রূপ ধারণ করে তাঁকে অমৃত প্রদান করব, যদি তিনি এইভাবে গ্রহণ করতে স্বীকার করেন, তাহলে আমি এখনই যাচ্ছি। কিন্তু তিনি যদি অস্বীকার করেন, তবে আমি আর কিছুতেই তাঁকে অমৃত দান করতে রাজি হব না।' এইভাবে শর্ত করে সাক্ষাৎ ইন্দ্র চণ্ডালরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি আপনাকে অমৃত দান করছিলেন। কিন্তু আপনি তিরস্কার করে তাঁকে বিমুখ করেছেন, এ আপনার খুব অপরাধ হয়েছে। যাইহোক সে ঘটনা এখন অতীত। এখন আমি আপনার তৃষ্ণা দূর করার জন্য অন্য বর প্রদান করছি। ব্রহ্মন্ ! যখনই আপনার জলপান করার ইচ্ছা হবে তখনই মরুভূমির আকাশ জলপূর্ণ মেঘে ভরে যাবে, সেই মেঘ আপনাকে সুমিষ্ট জলপ্রদান করবে এবং সেটি 'উত্তঙ্ক মেঘ' নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হবে।

জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বিপ্রবর উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এখনও মরুভূমিতে উত্তঙ্ক নামের মেঘে বর্ষা হয়ে থাকে।

———০———

উত্তঙ্কের গুরুভক্তির বর্ণনা—গুরুপত্নীর নির্দেশে উত্তঙ্কের সৌদাসের কাছে গিয়ে তাঁর রানির কুণ্ডল যাচনা করা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! মহামনা উত্তঙ্ক মুনি এমন কী তপস্যা করেছিলেন যে তিনি তার শক্তিতে ভগবান বিষ্ণুকেও শাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত বড় তপস্বী, তেজস্বী এবং গুরুভক্ত ছিলেন। (তিনি যখন গুরুর কাছে ছিলেন, সেই সময় তাঁকে দেখে) সমস্ত ঋষি-কুমারদের মনে এরূপ ইচ্ছা হত যে আমাদেরও যেন উত্তঙ্কের ন্যায় গুরুভক্তি লাভ হয়। মহর্ষি গৌতমের অনেক শিষ্য ছিলেন ; কিন্তু তিনি উত্তঙ্ককেই সর্বাধিক স্নেহ করতেন। তাঁর ইন্দ্রিয় সংযম, আচার ব্যবহার, পুরুষার্থ এবং উত্তম সেবাপরায়ণতা দেখে গৌতম তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। গৌতমের কাছে হাজার হাজার শিষ্য এসেছিল এবং (গুরুকুলবাসের কাল পূর্ণ করে) তাঁর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ গৃহে চলে গিয়েছিল ; কিন্তু উত্তঙ্কের ওপর স্নেহ বেশি থাকায় তিনি তাঁকে গৃহে ফেরার অনুমতি দেননি। ধীরে ধীরে মহামুনি উত্তঙ্ক বৃদ্ধাবস্থায় গিয়ে পৌঁছলেন, কিন্তু গুরু-ভক্তিতে মগ্ন থাকায় তিনি তা অনুভব করতে পারলেন না। একদিন, তিনি জঙ্গলে কাঠ আনতে গেলেন এবং কাঠের মস্ত বড় ভারী বোঝা মাথায় করে ফিরে এলেন। বোঝাটি খুব ভারী থাকায় তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন। আশ্রমে এসে তিনি যখন বোঝাটি মাটিতে ফেলতে গেলেন তখন তাঁর পাকা চুলের জটা কাঠের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায়, তিনিও কাঠের সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন। উত্তঙ্ক মুনি সেই কাঠের নীচে চাপা পড়ে গেলেন, তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্তও ছিলেন। সেই সময় তিনি পাকাচুলের জটা দেখে নিজের বৃদ্ধাবস্থার কথা ভেবে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তখন মহর্ষি গৌতম এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র ! আজ তোমার মন দুঃখে ব্যাকুল হয়েছে কেন ? আমি তার কারণ জানতে চাই। তুমি নিঃসঙ্কোচে সব কথা আমাকে বলো।'

উত্তঙ্ক বললেন—গুরুদেব ! আমার মন আপনাতেই নিবিষ্ট থাকে। আপনার প্রিয় কাজ করার জন্য আমি সর্বদা

আপনার সেবাতে ব্যস্ত থাকি। আপনাকে শ্রদ্ধা করি এবং আপনাকেই ভক্তি করি। তাই আমি বুঝতেই পারিনি যে আমি কবে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম। আমি কখনো সুখ ভোগ করিনি, এখানে থাকতে থাকতে একশত বছর পার হলেও আপনি আমাকে গৃহে ফেরার অনুমতি দেননি। আমার পর শত সহস্র শিষ্য এখানে এসেছে এবং আপনার অনুমতি নিয়ে ফিরে গেছে (শুধু আমিই এখানে পড়ে আছি)।

গৌতম বললেন—ভৃগুনন্দন ! তোমার গুরুসেবা দেখে তোমার ওপর আমার অত্যন্ত ভালোবাসা জন্মেছিল ; তাই এতো বছর যে কেটে গেছে তা আমার মনেই হয়নি। ঠিক আছে, এখন তুমি যদি যেতে চাও তবে যেতে পারো আমি আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিচ্ছি, শীঘ্র যাও, দেরি কোরো না।

উত্তঙ্ক বললেন—গুরুদেব ! আমি আপনাকে কী গুরুদক্ষিণা দেব ? কৃপা করে বলুন। আপনার সেবায় তা অর্পণ করে, আপনার অনুমতি নিয়ে গৃহে যাব।

গৌতম বললেন—পুত্র ! সৎপুরুষদের মত হল গুরুজনদের সন্তুষ্ট করাই তাদের পক্ষে সবথেকে বড় দক্ষিণা। তুমি যা সেবা করেছ, তাতে আমি যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

তারপর উত্তঙ্ক যৌবনাবস্থা লাভ করে গুরুর নির্দেশে

গুরুপত্নীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'মাতা ! আমাকে অনুমতি দিন, গুরু দক্ষিণা হিসাবে আপনাকে কী দেব ? আমি ধন ও প্রাণ দিয়েও আপনার প্রিয় ও হিত কাজ করতে চাই। ইহলোকে যা অত্যন্ত দুর্লভ, অদ্ভুত এবং বহুমূল্য রত্ন, তাও আমি নিজ তপস্যার দ্বারা আনতে সক্ষম, এতে কোনো সংশয় নেই।

অহল্যা বললেন—পুত্র ! তোমার ভক্তিতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, সেটিই আমার কাছে পর্যাপ্ত দক্ষিণা। তোমার কল্যাণ হোক। এবার তুমি যেখানে যেতে চাও যেতে পারো।

তাঁর কথা শুনে উত্তঙ্ক আবার বললেন—'মাতা ! আপনার জন্য কিছু একটা প্রিয় কাজ করবই ; অতএব আদেশ করুন, কী করব।'

অহল্যা বললেন—পুত্র ! রাজা সৌদাসের রানি তাঁর কানে মণিমণ্ডিত দুটি দিব্য কুণ্ডল পরে আছেন। সেদুটি আমাকে এনে দাও। তাইতে তোমার গুরুদক্ষিণা পূর্ণ হবে। যাও তোমার কল্যাণ হোক।

জনমেজয় ! উত্তঙ্ক 'যথা আজ্ঞা' বলে গুরুপত্নীর আদেশ মেনে নিলেন এবং তাঁর প্রিয় কাজ করার জন্য কুণ্ডল আনতে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন। তিনি ক্রমশ নরমাংসাহারী সৌদাসের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

এদিকে উত্তঙ্ক মুনিকে আশ্রমে না দেখে গৌতম তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আজ উত্তঙ্ককে দেখছি না কেন ?' অহল্যা বললেন—'সে আমার জন্য কুণ্ডল আনতে গেছে।' তা শুনে মহর্ষি বললেন—'এ তুমি ভালো করোনি। রাজা সৌদাস ব্রাহ্মণদের শাপে নরমাংসাহারী রাক্ষস হয়ে গেছে ; সুতরাং সে অবশ্যই এই ব্রাহ্মণকে হত্যা করবে।'

অহল্যা বললেন—'স্বামীন্ ! আমি একথা জানতাম না ; তাই তাকে এমন কাজে পাঠিয়েছি। আমার বিশ্বাস আপনার কৃপায় তার কোনো বিপদ হবে না।'

পত্নীর কথা শুনে গৌতম বললেন—'আচ্ছা, তবে তাই হোক।' ওদিকে উত্তঙ্ক নির্জন বনে রাজা সৌদাসের দেখা পেলেন—তাঁর বড় ভীষণ আকৃতি। লম্বা লম্বা দাড়ি-গোঁফ, সমস্ত দেহ নর রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু তাঁকে দেখে উত্তঙ্ক একটুও ভয় পেলেন না। তাঁকে দেখেই যমরাজের মতো ভয়ংকর রাজা সৌদাস উঠে তাঁর কাছে এসে বললেন—'বিপ্রবর ! কী ভাগ্য যে দিনের ষষ্ঠ ভাগে আপনি নিজেই আমার কাছে এসেছেন। আমি এখন আহারেরই সন্ধান করছিলাম।'

উত্তঙ্ক বললেন—রাজন্ ! আমি গুরুদক্ষিণা দেওয়ার

জন্য ঘুরে ঘুরে এইখানে এসেছি। যে ব্যক্তি গুরু-দক্ষিণা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, তাকে হিংসা করা উচিত নয়—মনীষী ব্যক্তিরা একথা বলেন।

রাজা বললেন—বিপ্রবর ! আমি দিনের ষষ্ঠভাগে আহার করা নিয়ম করেছি এবং সেইক্ষণ উপস্থিত, আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি ; তাই আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

উত্তঙ্ক বললেন—মহারাজ ! ঠিক আছে, তাই হবে ; কিন্তু আমার একটি শর্ত মেনে নিন। আমি গুরুদক্ষিণা দিয়ে আপনার কাছে আসব। আমি গুরুকে যা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছি, সেটি আপনার কাছে আছে ; সুতরাং আপনার কাছে সেটি ভিক্ষা চাইছি। আপনি প্রত্যহ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বহু রত্ন দান করেন। এই পৃথিবীতে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ দাতারূপে পরিচিত, আমাকে দান গ্রহণের উত্তম পাত্র বলে জানবেন। আমি গুরুকে যা দিতে চাই, তা আপনার কাছেই আছে ; অতএব আমার অভীষ্ট বস্তু আমাকে দিয়ে দিন। মহারাজ ! আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে ওই বস্তু গুরুকে প্রদান করে শর্ত অনুসারে আপনার কাছে ফিরে আসব। আমার এই কথা কখনো মিথ্যা হবে না। আমি কখনো পরিহাস করেও মিথ্যা বলিনি, তাহলে এখন কেন বলব।

সৌদাস বললেন—ব্রহ্মন্ ! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা আমার কাছে থাকে, তবে তা পেয়ে গেছেন মনে করুন। আপনি যদি কোনো বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাহলে বলুন আমি আপনাকে কী দেব ?

উত্তঙ্ক বললেন—পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনার প্রদত্ত দান আমি সর্বদাই যোগ্য মনে করি। এখন আপনার রানির দুটি মণিমণ্ডিত কুণ্ডল চাইতে আপনার কাছে এসেছি।

সৌদাস বললেন—ব্রহ্মর্ষি ! ওই মণিমণ্ডিত কুণ্ডল আমার রানিরই যোগ্য। আপনি অন্য কোনো বস্তু চান, আমি অবশ্যই তা দেব।

উত্তঙ্ক বললেন—রাজন্ ! আপনার যদি আমার ওপর বিশ্বাস থাকে এবং আমাকে উত্তম পাত্র বলে মনে করেন, তবে অন্যথা করবেন না, ওই কুণ্ডল দুটি দিয়ে সত্য রক্ষা করুন।

উত্তঙ্ক এই কথা বলায় রাজা বললেন—'বিপ্রবর ! আপনি রানির কাছে গিয়ে তাঁকে আমার নির্দেশ জানিয়ে কুণ্ডল চেয়ে নিন। তিনি উত্তম ব্রতপালনকারী। আপনার কাছে আমার কথা শুনে নিঃসন্দেহে কুণ্ডল দিয়ে দেবেন।'

উত্তঙ্ক বললেন—মহারাজ ! আমি আপনার পত্নীকে কোথায় খুঁজতে যাব ? তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে কী প্রকারে ? আপনি নিজেই কেন তাঁর কাছে যাচ্ছেন না ?

সৌদাস বললেন—ব্রহ্মন্ ! আপনি তাঁকে জঙ্গলের মধ্যে কোনো ঝর্নার পাশে পাবেন। এখন দিনের ষষ্ঠভাগ (আমি আহারের সন্ধানে ব্যস্ত)। এখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারব না।

রাজার কথা শুনে উত্তঙ্ক মুনি তাঁর রানি মদয়ন্তীর কাছে গিয়ে তাঁকে নিজের আগমনের প্রয়োজন জানালেন। রাজার কথা শুনে বিশাল নয়না রানি মহাবুদ্ধিমান উত্তঙ্ক মুনিকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! মহারাজ যে আপনাকে কুণ্ডল দিতে বলেছেন, তা ঠিক কথা। আপনি মিথ্যাকথা বলছেন না, তবুও আমার বিশ্বাসের জন্য আপনার তাঁর কাছ থেকে কোনো চিহ্ন নিয়ে আসা উচিত। আমার এই মণিমণ্ডিত কুণ্ডল অত্যন্ত দিব্য, দেবতা, যক্ষ এবং মহর্ষিগণ এটি নানাভাবে চুরি করার চেষ্টা করেন। এটি মাটিতে রাখলে নাগ নিয়ে নেবে, অপবিত্র অবস্থায় ধারণ করলে যক্ষ নিয়ে যাবে এবং এটি পরে নিদ্রা গেলে দেবতারা জোর করে ছিনিয়ে নেবেন। এভাবে এটি সর্বদা হারাবার ভয় থাকে। দেবতা, রাক্ষস এবং নাগেদের থেকে সাবধানে থাকা মানুষই এটি ধারণ করতে পারে। এর থেকে রাত-দিন সোনা ঝরে পড়ে। রাত্রে নক্ষত্রের ন্যায় এটি চকমক করে। এটি পরিধান করলে বিষ, অগ্নি অথবা অন্য ভয়প্রদ জন্তু থেকে কখনো ভয় হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভয় তো থাকেই

না। ছোটো মাপের মানুষ এটি পরলে এটি ছোটো হয়ে যায় আর বলিষ্ঠ মানুষ পরলে এটি তার মতো বড় হয়ে যায়। এরূপ গুণযুক্ত হওয়ায় আমার এই কুণ্ডল দুটি সকলেরই প্রশংসার পাত্র। ত্রিলোকে এটি প্রসিদ্ধ, সুতরাং আপনি যদি রাজার আদেশে এটি নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে থাকেন, তাহলে রাজার কোনো পরিচয়পত্র নিয়ে আসুন।

কুণ্ডল নিয়ে উত্তঙ্কের ফেরা, পথে সেই কুণ্ডলগুলি অপহৃত হওয়া এবং অগ্নিদেবের কৃপায় তা ফিরে পেয়ে গুরুপত্নীকে প্রদান করা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রানি মদয়ন্তীর কথা শুনে উত্তঙ্ক মুনি মহারাজ মিত্রসহের (সৌদাসের) কাছে এসে তাঁর কোনো অভিজ্ঞান চাইলেন। তখন ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দের শ্রেষ্ঠ নরেশ তাঁর চিহ্নরূপে রানিকে শোনাবার জন্য নিম্নলিখিত সংবাদ দিলেন।

সৌদাস বললেন—প্রিয়ে ! আমি যে দুর্গতিতে পড়েছি, তা আমার পক্ষে কল্যাণকর নয়, কিন্তু এছাড়া আমার অন্য কোনো গতি নেই। আমার এই চিন্তা জেনে তুমি তোমার কুণ্ডল দুটি এই ব্রাহ্মণ দেবতাকে দান করো।

তাঁর কথা শুনে মহর্ষি উত্তঙ্ক রানির কাছে গিয়ে রাজার বলা কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন। মহারানি মদয়ন্তী স্বামীর কথা শুনে তখনই তাঁর মণিখচিত কুণ্ডল উত্তঙ্ক

মুনিকে দিয়ে দিলেন। কুণ্ডল পেয়ে উত্তঙ্ক মুনি পুনরায় রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ ! আপনার গূঢ় বচনের অর্থ কী, আমি শুনতে চাই।'

সৌদাস বললেন—ব্রহ্মন্ ! ক্ষত্রিয়েরা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই ব্রাহ্মণদের পূজা করে আসছে তবুও কখনো কখনো ব্রাহ্মণদের কাছে ক্ষত্রিয়ের বহু দোষ প্রকাশ হয়ে যায়। আমি সর্বদাই ব্রাহ্মণদের প্রণাম করতাম ; কিন্তু ব্রাহ্মণের শাপেই এই দোষ—আমি এই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েছি। আমি মদয়ন্তীর সঙ্গে এখানে থাকি। আমার এই দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় দেখছি না। এখন ইহলোকে থেকে সুখ পাবার অথবা পরলোকে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করার আর কোনো পথ দেখছি না। কোনো রাজা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধ করে ইহলোকে সুখে থাকতে পারে না এবং পরলোকেও সুখ পায় না (আমার গূঢ় সন্দেশের এই তাৎপর্য)। আপনার ইচ্ছানুসারে এই মণিময় কুণ্ডল আমি আপনাকে দিয়েছি। এবার আপনি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা সফল করুন।

উত্তঙ্ক বললেন—রাজন্ ! আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করে আবার আপনার অধীন হব ; কিন্তু এখন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য এখানে এসেছি।

সৌদাস বললেন—বিপ্রবর ! আপনি যেমন ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন, আমি তার উত্তর দেব। আপনার মনে যে সন্দেহ হবে, আমি তা নিবারণ করব। এতে আমার কোনো কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

উত্তঙ্ক বললেন—রাজন্ ! ধর্মজ্ঞ বিদ্বানগণ তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলেন যিনি নিজ বাক্য সংযম করেন, সত্যবাদী হন। যে ব্যক্তি মিত্রের সঙ্গে বিষম ব্যবহার করে, তাকে চোর বলা হয়। এখন আপনার সঙ্গে আমার মিত্রতা হয়েছে, আপনি আমায় সুপরামর্শ দিন। আপনি বলুন, আপনার ন্যায় পুরুষের কাছে আমার ফিরে আসা উচিত কি না ?

সৌদাস বললেন—বিপ্রবর ! আপনি যদি আমাকে দিয়ে উচিত বাক্য বলাতে চান, তাহলে আমার বক্তব্য হল, আপনি কিছুতেই আর আমার কাছে আসবেন না, তাতেই

আপনার কল্যাণ। এখানে এলে নিঃসন্দেহে আপনার মৃত্যু হবে।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! উত্তঙ্ক মুনি এইভাবে বুদ্ধিমান রাজা সৌদাসের কাছ থেকে উচিত ও হিতবাক্য শুনে, তাঁর অনুমতি নিয়ে অহল্যার কাছে চলে গেলেন। গুরুপত্নীর প্রিয়কাজ করার জন্য দুটি দিব্য কুণ্ডল নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গৌতমের আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। রানি মদয়ন্তীর কথা অনুযায়ী তাঁর কুণ্ডলদুটি রক্ষা করার কথাও মনে ছিল, তাই তিনি সেদুটি মৃগচর্মের মধ্যে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁর খুব ক্ষুধার উদ্রেক হল। তিনি কাছেই একটি বেলগাছ দেখলেন, সেটি ফলের ভারে ঝুঁকে পড়েছিল। মহর্ষি উত্তঙ্ক সেই বেলগাছে চড়ে, মৃগচর্মটি তার শাখায় বাঁধলেন ; তারপর বৃক্ষ থেকে মাটিতে বেল ফেলতে লাগলেন। সেই সময় তিনি বেলের দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন, সেগুলি কোথায় পড়ছে তার খেয়াল ছিল না। সব বেলই মৃগচর্মের ওপর পড়ছিল, সেখানেই কুণ্ডল দুটি বাঁধা ছিল। বেলের আঘাতে মৃগচর্মের বাঁধন খুলে কুণ্ডল দুটি মাটিতে গিয়ে পড়ল। সেখানে ঐরাবত কুলের এক নাগ উপস্থিত ছিল। সে সেই কুণ্ডলদুটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ মুখে পুরে দিল এবং একটি গর্তের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুণ্ডলদুটি সাপে চুরি করেছে ভেবে উত্তঙ্ক মুনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। নীচে এসে তিনি একটি লাঠির সাহায্যে সেই গর্তটি খুঁড়তে লাগলেন, তিনি একটুও ভয় পেলেন না। এক নাগাড়ে পঁয়ত্রিশ দিন ধরে তিনি সেই কাজে ব্যাপৃত থাকলেন, সেই অসহ্য বেগ পৃথিবী সহ্য করতে পারল না, লাঠির আঘাতে ব্যাকুল হয়ে পৃথিবী টলমল করে উঠল। ব্রহ্মর্ষি উত্তঙ্ক নাগলোকে যাওয়ার রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে মাটি খুঁড়তেই লাগলেন, তা লক্ষ্য করে মহাতেজস্বী ইন্দ্র হাতে বজ্র নিয়ে রথে করে সেখানে এসে বিপ্রবর উত্তঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি উত্তঙ্কের দুঃখে দুঃখিত হয়ে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! একাজ তোমার নয়, নাগলোকে এই স্থান থেকে হাজার হাজার যোজন দূরে। এই কাঠের লাঠি দিয়ে সেখানে যাবার রাস্তা করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় তোমার পক্ষে একাজ অত্যন্ত অসাধ্য।'

উত্তঙ্ক বললেন—ব্রহ্মন্ ! আমি যদি নাগলোকে গিয়ে কুণ্ডল না আনতে পারি, তবে এখনই আপনার সামনে
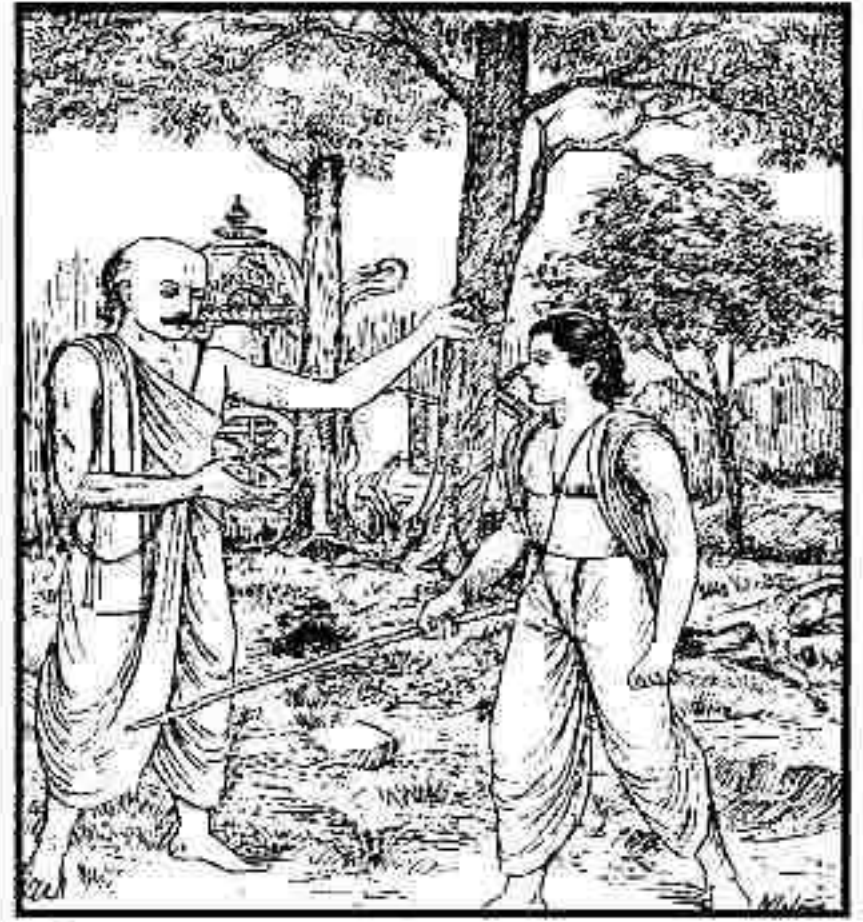
আমি প্রাণত্যাগ করব।

বজ্রধারী ইন্দ্র যখন কিছুতেই উত্তঙ্ককে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারলেন না, তখন তিনি সেই কাঠের অগ্রভাগে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র জুড়ে দিলেন। বজ্রের আঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে নাগলোকের রাস্তা তৈরি হল। সেই পথ দিয়ে গিয়ে উত্তঙ্ক দেখলেন নাগলোক হাজার হাজার যোজন বিস্তৃত। তার চারদিকে মণিমুক্তা দ্বারা অলংকৃত বহু প্রাকার। সেখানে স্ফটিক নির্মিত সিঁড়ি, নির্মল জলভরা অনেক নদী এবং বিহঙ্গ-কূজনে ভরা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। নাগলোকের বাইরের দরজা শত যোজন উচ্চ এবং পাঁচ যোজন বিস্তৃত। নাগলোকের এই বিশাল ব্যাপার দেখে উত্তঙ্ক মুনি হতোদ্যম হয়ে পড়লেন, কুণ্ডল ফিরে পাবার আশা তাঁর আর থাকল না। সেই সময় তাঁর কাছে একটি ঘোড়া এল, তার লেজটির রং সাদা এবং কালো আর চোখ ও মুখ লাল রং এর। সে নিজ তেজে প্রজ্বলিত ছিল। সেই ঘোড়া উত্তঙ্ককে বলল—'পুত্র ! আমার গুহ্য দ্বারে ফুঁ দাও, তাহলেই তুমি কুণ্ডল পেয়ে যাবে। ঐরাবতের পুত্র তোমার কুণ্ডল চুরি করে এনেছে। আমার গুহ্যদ্বারে ফুঁ দিতে তুমি ঘৃণা কোরো না ; কারণ তুমি গৌতমের আশ্রমে থাকার সময় বহুবার এই কাজ করেছ।'

উত্তঙ্ক জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুদেবের আশ্রমে আমি যে কখনো আপনাকে দেখেছি, তা আমার মনে নেই। আর আপনার কথা অনুযায়ী সেখানে থাকার সময় আগে আমি যে কাজ বহুবার করেছি, সেটি কী ? আমি তা শুনতে চাই।

ঘোড়া বলল—ব্রহ্মন্ ! আমি তোমার গুরুরও গুরু

জাতবেদা অগ্নি। তুমি সর্বদা পবিত্রভাবে থেকে গুরুর জন্য আমাকে যথাবিধি পূজা করেছ, তাই আমি তোমার কল্যাণ করব। এখন তুমি আমার কথানুযায়ী কাজ করো, দেরি কোরো না।

অগ্নিদেবের কথা শুনে উত্তঙ্ক তাঁর নির্দেশ পালন করলে, তাতে প্রসন্ন হয়ে নাগলোককে ভস্ম করার জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হল। ব্রাহ্মণ যেই ফুঁ দিলেন, তখনই অশ্বরূপধারী অগ্নির রোমকূপ থেকে তীব্র ধোঁয়া উঠতে লাগল, তাতে নাগলোক ভীত হয়ে পড়ল। ঐরাবতের গৃহে শোরগোল উঠল। বাসুকি প্রভৃতি প্রধান নাগেদের ঘর ধূমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল যেন কুয়াশা ঢাকা পর্বত। ধোঁয়ায় নাগেদের চোখ লাল হয়ে গেল। তারা অগ্নিতেজে সন্তপ্ত হতে লাগল। তখন সকলে মহামুনি উত্তঙ্কের সিদ্ধান্ত জানতে তাঁর কাছে এল। তারা সেই তেজস্বী মুনির দৃঢ় সিদ্ধান্ত জেনে ভয়ে কাতর হয়ে তাঁর বিধিমতো পূজা করল। শেষে সমস্ত নাগ তাঁর কাছে এসে মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে বলল—'মুনিবর! এর ওপর প্রসন্ন হোন (আমরা আপনার কুণ্ডল ফিরিয়ে দিচ্ছি)।' ব্রাহ্মণ দেবতাকে এইভাবে প্রসন্ন করে নাগেরা তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করে কুণ্ডল ফেরত দিল। তারপর নাগেদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে উত্তঙ্ক মুনি অগ্নিদেবকে প্রণাম করে গুরু

আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি গুরুপত্নীকে কুণ্ডল প্রদান করলেন এবং বাসুকি প্রভৃতি নাগেদের কথা সবিস্তারে গুরু মহর্ষি গৌতমকে জানালেন। জনমেজয়! মহাত্মা উত্তঙ্ক এইভাবে ত্রিলোক ঘুরে এই দিব্য মণিমণ্ডিত কুণ্ডল লাভ করেছিলেন। তিনি এমনই প্রভাবশালী এবং মহান তপস্বী ছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় পৌঁছে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং বসুদেব জিজ্ঞাসা করায় মহাভারত যুদ্ধের বৃত্তান্ত শোনানো

জনমেজয় বললেন—বিপ্রবর! উত্তঙ্ককে বরপ্রদান করে মহাযশস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারপর কী করলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! উত্তঙ্ককে বর প্রদান করে নিজ শীঘ্রগামী ঘোড়ার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহের দিকে চললেন। পথে বহু সরোবর, নদী, বন, পর্বত পার হয়ে পরম রমণীয় দ্বারকাপুরীতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেইসময় রৈবতক পর্বতে কোনো এক বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই উৎসবে গেলেন। রৈবতক পর্বতকে নানাপ্রকার অদ্ভুত রত্ন, সুন্দর স্বর্ণমালা, নানাপ্রকার পুষ্প, বস্ত্র এবং কল্পবৃক্ষদ্বারা অলংকৃত করা হয়েছিল। বৃক্ষাকারে সজ্জিত স্বর্ণদীপগুলি সেই স্থানের শোভা আরও বৃদ্ধি করছিল। গুহা এবং ঝর্নাগুলি দিনের আলোর মতো প্রকাশিত হচ্ছিল। দীন, অন্ধ এবং অনাথ ব্যক্তিদের নিরন্তর দান দেওয়া হচ্ছিল। সেইজন্য পর্বতের পরম কল্যাণময় সেই উৎসব অতি সুন্দরভাবে শোভাবর্ধন করছিল। সেই পুণ্য উৎসবে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের নিবাসের নিমিত্ত পর্বতে অনেক ঘর নির্মিত হয়েছিল। সেই গৃহগুলির জন্য রৈবতক গিরি দেবলোকের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসায় সেই অনুষ্ঠান ইন্দ্রভবনকে ছাপিয়ে গেল।

পরে সকলে মিলে এবং সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি নিজেদের ভবনে গেলেন। বহুদিন পর গৃহে ফিরে আসায় ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। সেইসময় ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশী বীরেরা সাক্ষাৎ

করতে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আদর-আপ্যায়ন করে কুশল সংবাদ নিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে পিতামাতার চরণে প্রণাম জানালেন। তাঁরা পুত্রকে আলিঙ্গন করে মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ জানালেন। পরে সব বৃষ্ণিবংশীয় তাঁকে ঘিরে বসলেন। তারপর পিতা জিজ্ঞাসা করলে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে মহাভারতের সমস্ত ঘটনা জানালেন।

বসুদেব জিজ্ঞাসা করলেন—পুত্র ! আমি প্রত্যহ লোকের মুখে কথাপ্রসঙ্গে শুনতাম যে মহাভারতের যুদ্ধ

অত্যন্ত অদ্ভুত ; তুমি তো তা স্বচক্ষে দেখেছ এবং তার স্বরূপও ভালোমত জানো, অতএব আমাকে তার বর্ণনা করো। মহাত্মা পাণ্ডবরা ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য ও শল্যের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করল ? অন্য সব দেশের অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ক্ষত্রিয় বীরেরা কেমনভাবে যুদ্ধ করল ?

পিতা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতার সামনেই কৌরব বীরদের মৃত্যু সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি বলতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পিতা ! মহাভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ক্ষত্রিয় মহাত্মাদের কর্ম অত্যন্ত অদ্ভুত। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে একশত বৎসরেও তা সমাপ্ত হবে না। তাই আমি মুখ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলছি। শুনুন। ইন্দ্র যেমন দেবসেনার অধিনায়ক, ভীষ্মও তেমন কৌরবসেনার সেনাপতি হয়েছিলেন। তাঁর অধীনে এগারো অক্ষৌহিণী সেনা ছিল। পাণ্ডবপক্ষের সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক ছিলেন শিখণ্ডী। সব্যসাচী অর্জুন তাঁর রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে দশদিন ধরে ভয়ানক রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল। দশম দিনে শিখণ্ডী অর্জুনের সহায়তায় ভীষ্মকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করে। আহত হয়ে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হন। যতদিন দক্ষিণায়ন ছিল, তিনি মুনিব্রত পালন করে শর-শয্যায় শায়িত ছিলেন। উত্তরায়ণ এলে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ভীষ্ম আহত হওয়ার পর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ আচার্য দ্রোণ কৌরব সেনাপতি নির্বাচিত হন। সেইসময় জীবিত নয় অক্ষৌহিণী সেনা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। দ্রোণ নিজে তো যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেনই, কৃপাচার্য এবং কর্ণও তাঁকে সতর্ক হয়ে রক্ষা করতেন। পাণ্ডবদের দিকে মহা অস্ত্রবিদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অধিনায়ক হলেন, ভীম তাঁর রক্ষার্থে রইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের দ্বারা তাঁর পিতার অপমানের কথা স্মরণ করে তাঁকে বধ করার জন্য যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম দেখালেন। তাঁদের দুজনের সেই ভীষণ সংগ্রামে নানা দিক থেকে আগত বহু রাজা নিহত হলেন। এই যুদ্ধ পাঁচদিন ধরে চলে। শেষে দ্রোণাচার্য ক্লান্ত হয়ে পড়লে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্রোণের মৃত্যুর পর কর্ণ হলেন কৌরব সেনার অধিপতি। তিনি জীবিত পাঁচ অক্ষৌহিণী সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধে এলেন, পাণ্ডবদের তখন মাত্র তিন অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, অর্জুন তাদের রক্ষা করছিলেন। কর্ণ দুদিন যুদ্ধ করেছিলেন, দ্বিতীয় দিনে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে জলন্ত অগ্নিতে ধাবমান পতঙ্গের ন্যায় নিহত হলেন। কর্ণের মৃত্যুতে কৌরবদের সব উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল, তাদের সব শক্তি নিস্তেজ হল। পরে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করে তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তারা যুদ্ধে অগ্রসর হল। পাণ্ডবদেরও বহু সৈন্যবাহন বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাদের আর যুদ্ধে উৎসাহ ছিল না, তা সত্ত্বেও তাঁরা বাকি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে শল্যের সম্মুখীন হলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত পরাক্রম দেখিয়ে মদ্ররাজ শল্যকে বধ করলেন।

শল্যের মৃত্যুর পর অমিতপরাক্রমী সহদেব কলহের গুরু শকুনিকে যমলোকে পাঠালেন। তাঁর মৃত্যুতে দুর্যোধন অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন। তাঁর বহু সৈন্য যুদ্ধে নিহত

হয়েছিল ; তাই দুর্যোধন একাকী গদাহস্তে রণভূমি থেকে পলায়ন করলেন। মহাপ্রতাপশালী ভীম তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দ্বৈপায়ন হ্রদের জলে লুক্কায়িত দুর্যোধনের সন্ধান পেয়ে ভীম সৈন্য নিয়ে সেই হ্রদ ঘিরে ফেললেন। পঞ্চপাণ্ডব প্রসন্ন মনে সেই হ্রদের কাছে গেলেন, তখন ভীম তাঁকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে লাগলেন। ভীমের কটুবাক্যে ক্রোধান্বিত হয়ে দুর্যোধন জল থেকে উঠে এলে মহাবলী ভীম সব রাজাদের সামনে গদাযুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করলেন। তারপর, সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য যখন রাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিল তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে নিদ্রারত পাণ্ডব সৈন্যদের হত্যা করেন। সেই সময় পাণ্ডবদের পুত্র ও মিত্রবর্গ সকলেই নিহত হয়। আমি ও সাত্যকি বাদে শুধু পঞ্চপাণ্ডব জীবিত আছে। কৌরব পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা জীবিত। পাণ্ডবদের আশ্রয় নেওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসু জীবিত আছেন। বন্ধু ও আত্মীয়সহ দুর্যোধন নিহত হওয়ায় বিদুর ও সঞ্জয় ধর্মরাজের আশ্রয়ে আছেন। মহাভারতের যুদ্ধ আঠারো দিন ধরে হয়েছিল। এই যুদ্ধে যেসব রাজা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা সব স্বর্গলাভ করেছেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে রোমাঞ্চকর এই বর্ণনা শুনে বৃষ্ণিবংশীয়েরা দুঃখে ও শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অভিমন্যুর মৃত্যুর ঘটনা শোনানো এবং ব্যাসদেবের উত্তরা এবং অর্জুনকে বুঝিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার নির্দেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পিতার সামনে মহাভারত যুদ্ধের বর্ণনা করার সময় মহাবুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ জেনেশুনেই অভিমন্যু-বধের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পিতা অভিমন্যুর মৃত্যুর মহা অমঙ্গলজনক ঘটনা শুনে দুঃখ-শোকে কাতর হবেন। যাতে তাঁর কোনো অনিষ্ট না হয়, তাই তিনি সেই প্রসঙ্গ তোলেননি ; কিন্তু সুভদ্রা যখন দেখলেন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা বলা হয়নি তখন তিনি স্মরণ করিয়ে বললেন—'ভ্রাতা ! আমার অভিমন্যু-বধের কথাও বলো।' এই বলে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনে বসুদেবও দুঃখ ও শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার প্রিয় অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা কেন বলোনি ? তার চোখ তোমার মতো সুন্দর ছিল। হায় ! তুমি থাকতে সে কীভাবে শত্রু হাতে মারা পড়ল ? মনে হচ্ছে সময় না হলে মানুষের মৃত্যু হওয়া অত্যন্ত কঠিন, তাই এই দারুণ সংবাদ শুনে দুঃখে আমার হৃদয় শত টুকরো হল না। সে যুদ্ধের থেকে পালাতে গিয়ে নিহত হয়নি তো ? মৃত্যুকালে তার মুখাকৃতি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়নি ? কৃষ্ণ ! সেই মহাতেজস্বী বালক তার বালক-স্বভাব অনুসারে আমার কাছে বিনীতভাবে তার বীরত্বের প্রশংসা করতো। দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাবলী কর্ণের সম্মুখীন হওয়ারও ক্ষমতা সে রাখতো। এমন হয়নি তো যে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য ইত্যাদি সকলে মিলে সেই বালককে কপট যুদ্ধে মেরে ফেলেছে ?'

জনমেজয় ! এইরূপ দুঃখিত হয়ে বসুদেব যখন বিলাপ করতে লাগলেন, তাঁর সেই অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় ভারাক্রান্ত হল। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'পিতা ! অভিমন্যু সংগ্রামে সম্মুখে থেকে অত্যন্ত পরাক্রম দেখিয়েছে, সে কখনো ভীত হয়নি, কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। লক্ষ লক্ষ রাজাকে বধ করে সে দ্রোণ ও কর্ণের সম্মুখীন হয়েছিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে দুঃশাসন পুত্র তাকে পরাস্ত করে। সে একাকী ব্যূহমধ্যে যুদ্ধ করেছিল। যদি একের পর এক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত, তাহলে ইন্দ্রও তাকে পরাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু ওখানে অন্য ব্যাপার ছিল। অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এই বালককে দ্রোণাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন বীর চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। সেই পরিস্থিতিতেও ভয়ানক যুদ্ধের পর বহু সৈন্য বধ করে সে দুঃশাসনকুমারের হাতে মৃত্যু বরণ করে। মহামতি ! অভিমন্যু অবশ্যই স্বর্গলোক লাভ করেছে, সুতরাং তার জন্য শোক করবেন না। পবিত্রবুদ্ধি সাধুগণ সংকটে

পড়লেও শোকের অধীন হন না। ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরদের সঙ্গে যে সমানভাবে যুদ্ধ করে, তার কেন স্বর্গপ্রাপ্তি হবে না ? অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। তার মৃত্যুতে আমার ভগিনী সুভদ্রা যখন দুঃখে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করছিল তখন কুন্তী তাকে বুঝিয়ে বলেন—'সুভদ্রে ! শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং অর্জুনের প্রিয় অভিমন্যু কালের প্রেরণাতেই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। মৃত্যুলোকে জন্ম নেওয়া মানুষের এই ধর্ম—তাকে একদিন মৃত্যুর বশ হতেই হয়, তাই শোক কোরো না। যদুনন্দিনী ! তোমার দুর্জয় পুত্র পরম উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছে। পুত্রী ! তুমি ক্ষত্রিয়দের উত্তমকুলে জন্মলাভ করেছ, অতএব শোক ত্যাগ করো। তোমার পুত্রবধূ উত্তরা গর্ভবতী। তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা ত্যাগ করো। সে শীঘ্রই অভিমন্যুর পুত্রের জন্ম দেবে। তাকে এইভাবে বুঝিয়ে কুন্তী অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলেন। তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং নকুল-সহদেবকে নির্দেশ দিয়ে নানাপ্রকার দান করালেন, ব্রাহ্মণদের গাভী দান করলেন এবং বিরাটনন্দিনী উত্তরাকে বললেন—'পুত্রী ! তোমার পতির জন্য আর অধিক শোক কোরো না। নিজ গর্ভের সন্তানের রক্ষার দিকে লক্ষ্য দাও।' এখন তার নির্দেশেই আমি সুভদ্রাকে আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। পিতা ! মহান যোদ্ধা অভিমন্যু এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি এখন আর তার জন্য শোক সন্তপ্ত হবেন না।'

পুত্র শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধর্মাত্মা বসুদেব শোক পরিত্যাগ করে উত্তম বিধি অনুসারে অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে তাঁর ভাগিনেয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া পূর্ণ করলেন। তিনি ষাট লক্ষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে আহার করালেন এবং তাঁদের এতো বস্ত্র ও ধন দিলেন যাতে তাঁদের ধনতৃষ্ণা দূর হয়ে গেল। তাঁরা প্রচুর সুবর্ণ, গাভী, শয্যা, বস্ত্র দান পেয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলভদ্র, সাত্যকি এবং সত্যকও অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ করলেন।

অন্যদিকে, হস্তিনাপুরে বিরাটকুমারী উত্তরা পতি-বিয়োগ দুঃখে বহুদিন পর্যন্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন, তাতে সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর সন্তান গর্ভে ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। দিব্যদৃষ্টিতে তাঁর এই

অবস্থা জেনে মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে এসে কুন্তী ও উত্তরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন—'মা উত্তরা ! শোক পরিত্যাগ করো। তোমার পুত্র মহা তেজস্বী হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব এবং আমার আশীর্বাদে সে পাণ্ডবদের পরে পৃথিবী পালন করবে।' তারপর ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়ে অর্জুনকে বললেন—'ধনঞ্জয় ! শীঘ্রই তোমার পৌত্র হবে, সে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী এবং মহা-মনস্বী হবে। আসমুদ্র পৃথিবী সে ধর্মানুসারে পালন করবে। অতএব অভিমন্যুর শোক পরিত্যাগ করো। এবিষয়ে চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার কথা সত্য হবে। বৃষ্ণিবংশের বীরপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগে যা বলেছেন, সেসবই সেইরূপ হবে। অভিমন্যু তার পরাক্রমে প্রাপ্য দেবতাদের অক্ষয় লোকে গমন করেছে। তোমার বা অন্য কুরুবংশীয়দের তার জন্য শোক করা উচিত নয়।'

পিতামহ ব্যাসদেবের এরূপ সান্ত্বনা প্রদান করায় ধর্মাত্মা অর্জুন শোক ত্যাগ করলেন। জনমেজয় ! সেই সময় তোমার পিতা পরীক্ষিৎ শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় উত্তরার গর্ভে বৃদ্ধি পাচ্ছিলেন। ব্যাসদেব তারপর ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার নির্দেশ দিলেন এবং সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। ব্যাসদেবের কথা শুনে পরম বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির হিমালয় থেকে সম্পদ-সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ভ্রাতাদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের হিমালয় গমন এবং সেখান থেকে সুবর্ণরাশি আনয়ন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্‌ ! মহাত্মা ব্যাসদেবের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে কী করলেন ? রাজা মরুত যে স্বর্ণময় রত্নসমূহ পৃথিবীতে রেখেছিলেন, তা তিনি কী করে পেলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্‌ ! মহর্ষি ব্যাসদেবের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব—সকল ভাইদের ডেকে বললেন—'ভ্রাতাগণ ! মহাত্মা ব্যাসদেব, মহাপরাক্রমশালী ভীষ্ম এবং পরম বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ সৌহার্দ্যবশত যে কথা বলেছেন, তোমরা সেসব শুনেছ। আমি এখন সেই অনুসারে কাজ আরম্ভ করতে চাই, তাতে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সকলের মঙ্গল হবে। ব্যাসদেব ব্রহ্মবাদী মহাত্মা, সুতরাং তাঁর কথা পরিণামে আমাদের কল্যাণকর হবে। এখন সমগ্র পৃথিবী ধনরত্নহীন হয়ে গেছে। তাই আমাদের আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্য ব্যাসদেব আমাদের মরুতের ধনের খবর জানিয়েছেন। তোমরা যদি সেই ধন পর্যাপ্ত বলে মনে করো এবং তা আনার সামর্থ্য আছে বলে মনে করো, তাহলে ব্যাসদেবের নির্দেশ মেনে ধর্মত তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করো অথবা ভীমসেন ! তুমি বলো, তোমার এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত ?

রাজার কথা শুনে ভীমসেন করজোড়ে বললেন—'মহাবাহু ! ব্যাসদেবের বলা সম্পদসমূহ আনার বিষয়ে আপনি যা বলেছেন, তা আমার পছন্দ হয়েছে। মহারাজ ! আমরা যদি মরুতের ধন পেয়ে যাই, তবে আমাদের সমস্ত কাজই সিদ্ধ হবে। আমরা ভগবান শংকরকে প্রণাম করে সেই ধন নিয়ে আসব। দেবাদিদেব মহাদেব এবং তাঁর অনুচরদের পূজা করে মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করব। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেই ধন লাভ করব। বিকটাকার ধারণ করে যে কিন্নর তার রক্ষায় নিযুক্ত, ভগবান শংকর প্রসন্ন হলে, সেও আমাদের অধীন হবে।'

ভীমের কথা শুনে যুধিষ্ঠির প্রসন্ন বোধ করলেন। অর্জুন, নকুল ও সহদেবও তাঁর কথা সমর্থন করলেন। তারপর সকল পাণ্ডব রত্ন আনয়নের সিদ্ধান্ত করে শুভদিন ও ধ্রুবসংজ্ঞক নক্ষত্রে সেনাদের তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের দিয়ে স্বস্তিবাচন করিয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের পূজা করে প্রসন্নতা সহকারে সকলে যাত্রা করতে উদ্যত হলেন। তাঁদের যাত্রার সময় নগরবাসী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা প্রসন্নচিত্তে মঙ্গলপাঠ করলেন। তারপর পাণ্ডবরা অগ্নিসহ ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে তাঁদের প্রদক্ষিণ করলেন, গান্ধারীসহ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর অনুমতি নিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসুকে রাজধানী রক্ষার ভার দিয়ে প্রস্থান করলেন। পথে বহু মানুষ প্রসন্ন হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিজয় লাভের জন্য আশীর্বাদ জানাচ্ছিলেন, তাঁরাও তা যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করছিলেন। রাজাকে বহু সৈন্য অনুসরণ করছিল, তাঁদের কোলাহলে সমস্ত আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। বহু সরোবর, নদী, বন-উপবন পার হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই পর্বতের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে রাজা মরুতের সঞ্চিত দ্রব্য রাখা ছিল। সেই স্থানে সমতল এবং সুন্দর স্থান দেখে রাজা যুধিষ্ঠির তপ, বিদ্যা এবং ইন্দ্রিয় সংযমী ব্রাহ্মণ এবং বেদ-বেদান্ত পারদর্শী বিদ্বান রাজপুরোহিত ধৌম্যকে সামনে রেখে সৈনিকদের সঙ্গে তাঁবু ফেললেন। তারপর ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়েরা শাস্ত্রীয় রীতিতে শান্তিপাঠ করলেন এবং রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যস্থলে রেখে সকলে চারদিক ঘিরে রইলেন। সকলের থাকার ব্যবস্থা হওয়ার পর রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন—'দ্বিজেন্দ্রগণ ! এই কাজের জন্য শুভদিন এবং শুভ নক্ষত্র দেখে যা করা উচিত তাই করুন।' রাজার কথা শুনে তাঁর প্রিয় কাজ করার ইচ্ছায় পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণরা বললেন—'রাজন্‌ ! আজই পরম পবিত্র এবং শুভ নক্ষত্রযুক্ত দিন ; সুতরাং আজ থেকেই আমাদের শুভ কার্য করার চেষ্টা করা উচিত।' পাণ্ডবরা রাত্রে উপবাস করে কুশাসনে উপবেশন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের উপদেশ শুনতে শুনতে রাত্রি কাটালেন। পরদিন নির্মল প্রভাতে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্‌ ! এবার আপনি ভগবান শংকরের পূজা করুন। তাঁকে নৈবেদ্য অর্পণ করে আমাদের কাজের উদ্যোগ করা উচিত।'

ব্রাহ্মণদের নির্দেশে রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবান শিবকে নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। তারপর তাঁর পুরোহিত শিবের পার্ষদ, যক্ষরাজ কুবের, মণিভদ্র এবং অন্যান্য যক্ষ ও ভূতাদির অধিপতিদের নানাপ্রকার নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। রাজা ব্রাহ্মণদের হাজার গোধন

দান করলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের সেই স্থান ধূপের সুগন্ধ ও পুষ্পে অলংকৃত হওয়ায় অত্যন্ত মনোরম হয়ে উঠেছিল। ভগবান শিব এবং তাঁর পার্ষদদের পূজা করে মহর্ষি ব্যাসদেবকে সঙ্গে নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে গেলেন, যেখানে সেই সুবর্ণরাশি সঞ্চিত ছিল। সেই স্থানে তাঁরা নানা ফুল ও নৈবেদ্যর দ্বারা ধনপতি কুবেরের পূজা করে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর সেই সামগ্রীর দ্বারা শঙ্খ ইত্যাদি নিধি এবং সমস্ত নিধিপালদের পূজা করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দিয়ে স্বস্তিবাচন করালেন।

ব্রাহ্মণদের পুণ্যাহ ঘোষণার দ্বারা মহাতেজ প্রাপ্ত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্নতাপূর্বক সেই ধন খনন করতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ খনন করার পরই সেখান থেকে স্বর্ণনির্মিত নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর বিচিত্র বাসন বেরিয়ে পড়তে লাগল। তাঁরা সেগুলি আনার জন্য বড় বড় সিন্দুক নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সিন্দুকগুলিতে স্বর্ণনির্মিত বাসনগুলি রাখা হতে লাগল। সেইগুলি বহন করে আনার জন্য রাজার সঙ্গে অনেক ভারবহনকারীরাও এসেছিল। ষাট হাজার উট, এক কোটি বিশ লক্ষ ঘোড়া, এক লক্ষ হাতি, এক লক্ষ রথ ইত্যাদি এসেছিল। মানুষ তো অসংখ্য এসেছিল। যুধিষ্ঠির সেখানে কত সম্পদ খননে উদ্ধার করেছিলেন, এইভাবে তার কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি প্রত্যেক উটে আট হাজার, প্রত্যেক গাড়িতে ষোলো হাজার, প্রত্যেক হাতিতে চব্বিশ হাজার সুবর্ণের ভার
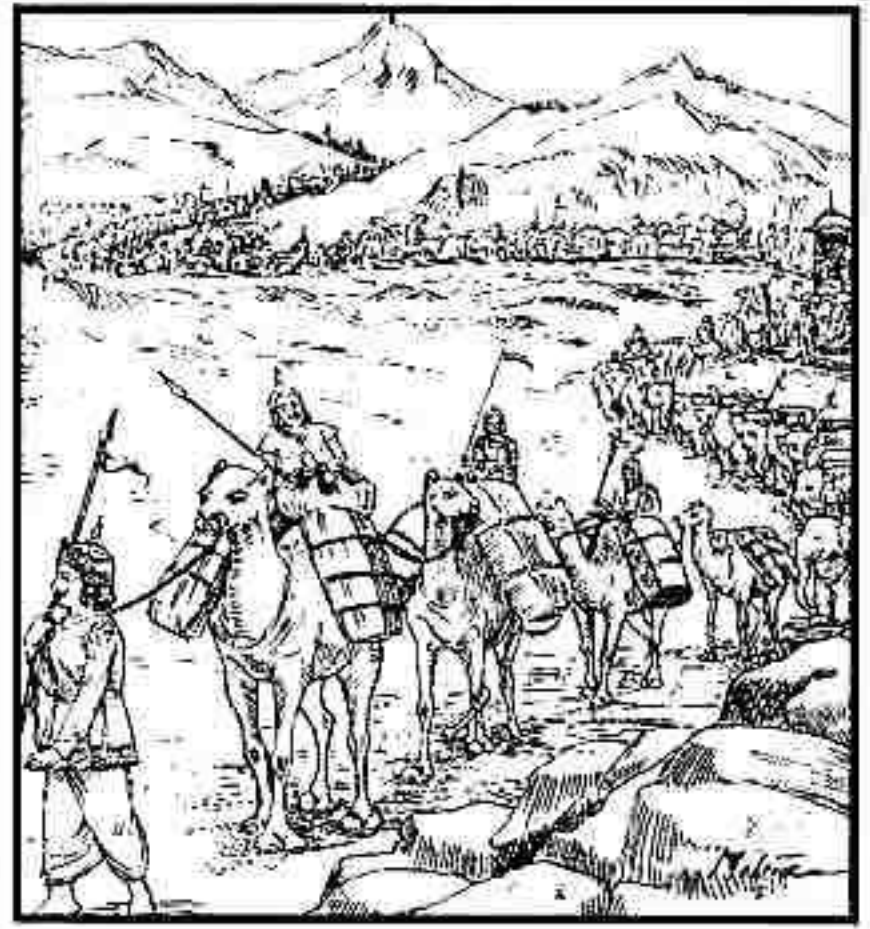
চাপিয়েছিলেন। (এইভাবে ঘোড়া, গাধা এবং মানুষের ওপরও যথাসম্ভব ভার দিয়েছিলেন)। এইসব ভার বাহনে উঠিয়ে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির পুনরায় মহাদেবের পূজা করে, ব্যাসদেবের অনুমতি নিয়ে পুরোহিত ধৌম্য মুনিকে অগ্রে রেখে হস্তিনাপুর রওনা হলেন। তিনি (বাহনদের বোঝা বেশি হওয়ায়) দু ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম দিচ্ছিলেন। দ্রব্যের ভারে কষ্ট পেতে থাকা সেই বিশাল সৈন্যদল পাণ্ডবদের আনন্দবর্ধন করতে করতে অত্যন্ত কষ্টে নগরের দিকে এগিয়ে চলল।

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন এবং উত্তরার মৃত পুত্রকে জীবনদানের জন্য তাঁর কাছে কুন্তী ও অন্য সকলের প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর মধ্যে বৃষ্ণিবংশীয়দের নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। তিনি দ্বারকায় যাওয়ার সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রারম্ভের বহু পূর্বেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানের সঙ্গে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, শাম্ব, গদ, কৃতবর্মা, সারণ, নিশঠ, উল্মুক, বলদেব এসেছিলেন যাদের পতি যুদ্ধে মারা গিয়েছিল সেই ক্ষত্রিয়ানিদের মনের জোর বাড়াবার জন্য তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের আসার খবর পেয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মহামনা বিদুর এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সম্মানে স্বাগত জানালেন। মহাতেজস্বী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু-বান্ধবসহ যুযুৎসু ও বিদুরের সঙ্গে সেখানে থাকতে লাগলেন। জনমেজয় ! বৃষ্ণিবংশীয়গণ সেখানে থাকার সময়ই তোমার পিতা পরীক্ষিতের জন্ম হয়। ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় মৃত অবস্থায় তার জন্ম হয়। প্রথমে পুত্র-জন্মের সংবাদ শুনে সকলেই আনন্দিত হন, কিন্তু তাঁর মধ্যে জীবনের লক্ষণ না দেখে সকলেই শোকসাগরে

নিমজ্জিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ শুনে সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গেলেন। সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন তাঁর পিসিমাতা কুন্তী অত্যন্ত দ্রুত তাঁর দিকে তাঁর নাম করতে করতে আসছেন। তাঁর পিছনে দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য নারীগণও করুণ সুরে বিলাপ করতে করতে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে কুন্তী করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"বাসুদেব! তোমার জন্য তোমার মাতা দেবকীকে উত্তম পুত্রবতী বলে মানা হয়, তুমিই আমাদের অবলম্বন এবং আধার। আমাদের এই কুলরক্ষার ভার তোমারই ওপর ন্যস্ত। দেখো, এই শিশু তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র, মৃত অবস্থাতেই জন্মেছে। কেশব ! এর জীবন-দান করো। অশ্বত্থামার জন্যই এ মারা গেছে, অশ্বত্থামা যখন বাণ প্রয়োগ করেছিল, তখন তুমি কথা দিয়েছিলে যে উত্তরার মৃত পুত্রকে জীবন-দান করবে। পুত্র ! এই সেই বালক, সে মৃতই জন্মেছে ; এর ওপর দৃষ্টিদান করো। একে জীবিত করে উত্তরা, সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীসহ আমাকে রক্ষা করো। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবেরও প্রাণ রক্ষা করো। আমার এবং পাণ্ডবদের প্রাণ এই বালকেরই অধীন। আমার পতি এবং তাঁর কুলের সকলের পিণ্ডের উত্তরাধিকারী এই বালকই। এর জীবন-দান করে পরলোকবাসী অভিমন্যুরও প্রিয় কাজ করো। শ্রীকৃষ্ণ ! আমার পুত্রবধূ উত্তরা অভিমন্যুর বলা একটি কথা বারবার বলত, অভিমন্যু কোনো সময় স্নেহবশত উত্তরাকে বলেছিল—'কল্যাণী ! তোমার পুত্র আমার মাতুলের কাছে বৃষ্ণি এবং অন্ধক কুলে গিয়ে ধনুর্বেদ, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং সম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করবে।' তার বলা এই কথা সত্য হওয়া উচিত। মধুসূদন ! এই কুলের মঙ্গলের জন্য আমরা তোমার কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি ; এই বালককে প্রাণদান করে কুরুবংশের কল্যাণ করো।"

এই বলে কুন্তী শোকে ব্যাকুল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে ধরে বসালেন এবং সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে তাঁকে ধৈর্য ধরতে বললেন। কুন্তী উঠে বসলে সুভদ্রা তাঁর ভ্রাতার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলেন, আর্তস্বরে তিনি বললেন—"ভাই ! তোমার সখা পার্থের পৌত্রের কী দশা দেখ। অভিমন্যুর পুত্র জন্মেই মারা গেছে—একথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কী বলবেন ? ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবও কী ভাববেন ? দ্রোণপুত্র আজ পাণ্ডবদের সর্বস্ব হরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ ! অভিমন্যু যে পাঁচ ভাইয়েরই প্রিয় ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার পুত্রের এই খবর জেনে অশ্বত্থামার অস্ত্রে পরাজিত পাণ্ডবরা কী বলবেন ? অভিমন্যুর মৃত পুত্র জন্ম নেবে, এর থেকে বেশি দুঃখের কথা আর কী হতে পারে ? ভ্রাতা ! আমি তোমার চরণে পড়ে তোমাকে প্রসন্ন করতে চাই। কুন্তী এবং দ্রৌপদীও তোমার পায়ে পড়েছেন, তাঁদের দেখো। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন এই গর্ভের সন্তানকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, তখন তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলেছিলে—'ব্রাহ্মণাধম ! তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। অর্জুনের পৌত্রকে আমি আমার প্রভাবে জীবিত করে দেব'—এই কথা আমি শুনেছি এবং তোমার শক্তিও আমি ভালোভাবে জানি। তাই আমার ইচ্ছা, তুমি প্রসন্ন হও যাতে অভিমন্যুর পুত্র জীবন লাভ করে। প্রতিজ্ঞা করেও যদি তা রক্ষা না করো, তবে জানবে আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করব। তুমি থাকতে যদি অভিমন্যুর পুত্র জীবন ফিরে না পায়, তাহলে আমার জীবনে কী লাভ ? মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে ধূসর জমিকে সবুজে পরিণত করে, তেমনই তুমি অভিমন্যুর মৃত পুত্রকে জীবিত করে দাও। কেশব ! তুমি ধর্মাত্মা, সত্যবাদী, সত্যপরাক্রমী, সুতরাং তোমার নিজের দেওয়া কথা তুমি অবশ্যই পূর্ণ করবে। শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ইচ্ছা করলে মৃত্যুমুখে পতিত ত্রিলোকের প্রাণীদের বাঁচাতে পারো। সুতরাং তোমার ভাগিনেয়ের এই পুত্রকে রক্ষা করা তোমার পক্ষে এমনকি বড়ো ব্যাপার ? আমি তোমার প্রভাব জানি। তাই প্রার্থনা করছি, পাণ্ডবদের অনুগ্রহ করো। ভ্রাতা ! তুমি মনে কর যে, এ আমার ভগিনী অথবা যার পুত্র মারা গেছে সে দুঃখিনী মা অথবা শরণাগত এবং অসহায় অবলা আমাকে দয়া করো।"

উত্তরার বিলাপপূর্ণ প্রার্থনা এবং শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষিৎকে জীবন-দান

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সুভদ্রার কথা শুনে ভগবান তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন—'ভদ্রে, শান্ত হও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে'। রৌদ্রস্নাত মানুষ যেমন ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শান্তি পায় তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অমৃতময় কথা শুনে অন্তঃপুরের রমণীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপর শীঘ্র তোমার পিতার জন্মস্থান সেই সূতিকাগারে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন সেই ঘরটি সাদা ফুলের মালায় বিধিপূর্বক সজ্জিত। তার চার দিকে জলপূর্ণ কলস রক্ষিত, নিন্দুক নামক কাঠের আগুন জ্বলছে, তাতে ঘিয়ের আহুতি দেওয়া হয়েছে। যত্র তত্র সরিষা ছড়ানো। অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং সবদিকে আগুন জ্বালানো হয়েছে। সেবা করার জন্য বৃদ্ধা ও যুবতী মহিলাগণ এবং কার্যকুশল কয়েকজন চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত। এতদ্ব্যতীত রাক্ষসভয় নিবারণের জন্য নানাদ্রব্যও সেখানে সংগ্রহ করা হয়েছে। সূতিকাগৃহ এইরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে এই সব ব্যবস্থার প্রশংসা করলেন।

তখনই অতি দ্রুত দ্রৌপদী সেখানে এসে উত্তরাকে বললেন—'কল্যাণী ! দেখো, তোমার শ্বশুরতুল্য, অচিন্ত্যাত্মা, অপরাজিত এবং সনাতন ঋষি ভগবান মধুসূদন এখানে আসছেন।' তাঁর কথা শুনে উত্তরা কান্না বন্ধ করে কাপড় দিয়ে সমস্ত দেহ ঢেকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভগবদ্ বুদ্ধি ছিল, তাই তাঁকে আসতে দেখে সেই তপস্বিনী নারী ব্যথিত হৃদয়ে করুণ স্বরে গদগদ কণ্ঠে বললেন—'জনার্দন ! দেখুন, আজ আমি এবং আমার পতি উভয়েই সন্তানহীন হলাম। অভিমন্যু তো আগেই মৃত্যুবরণ করেছে, এখন আমাকেও পুত্রশোকে মৃত বলে মনে করুন। মধুসূদন ! আপনার শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি যে আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ আমার পুত্রের জীবন-দান করুন। হায় ! এই গর্ভস্থ শিশুকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা মারার মতো ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম করে দুর্বুদ্ধি অশ্বত্থামা কী পেল জানি না। জনার্দন ! আমি আপনার পায়ে পড়ে এই বালকের প্রাণভিক্ষা করছি। যদি সে জীবিত না হয়, তাহলে আমিও প্রাণত্যাগ করব। একে নিয়ে আমি অনেক আশা করেছিলাম ; কিন্তু অশ্বত্থামা সবকিছুর ওপর জল ঢেলে দিয়েছে। আমার আর বেঁচে থাকার কী প্রয়োজন ? আমার ইচ্ছা ছিল যে পুত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব, কিন্তু সবই বৃথা হয়ে গেল। মধুসূদন, অভিমন্যুর আপনার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল, তাঁরই পুত্র আজ ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে মৃত ; ওকে একবার চেয়ে দেখুন। আমি পতির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তাঁর যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয়, তাহলে আমিও প্রাণত্যাগ করে তাঁর অনুগামিনী হব। কিন্তু আমি এতো কঠিন হৃদয় ও জীবনের প্রতি মোহকারী যে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারিনি। এখন দেহত্যাগ করে তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে কী বলবেন ?'

তপস্বিনী উত্তরা পুত্রশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় করুণ স্বরে বিলাপ করতে করতে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে বলতে লাগলেন—'পুত্র ! তুমি তো ধর্মজ্ঞ পিতার পুত্র, তাহলে বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে প্রণাম করছ না কেন ? উঠে দাঁড়াও আর কমলনয়ন জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখশোভা দেখ। আমি যেমন তোমার পিতার মুখশোভা দেখতাম, তেমন করে।' এইভাবে বিলাপ করতে করতে মৎসরাজকুমারী উত্তরা হাত জোড় করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। তাঁর ভীষণ বিলাপ শুনে শ্রীকৃষ্ণ আচমন করে অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত করে দিলেন। তারপর বালককে বাঁচিয়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করে তিনি সম্পূর্ণ জগৎকে শুনিয়ে উত্তরাকে বললেন—'পুত্রী ! আমি মিথ্যা বলি না, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা অবশ্যই সত্য হবে, দেখো ! আমি সকলের সামনে এখনই এই বালকের জীবন দান করব। আমি খেলাচ্ছলেও কখনো মিথ্যা বলিনি এবং যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিনি। এই সত্যের প্রভাবে অভিমন্যুর পুত্র যেন জীবিত হয়ে ওঠে। যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণ আমার বিশেষ প্রিয় হয়, তাহলে অভিমন্যুর এই পুত্র, যে জন্মেই মৃত্যুবরণ করেছে ; পুনরায় জীবন লাভ করুক। যদি আমার মধ্যে সত্য এবং ধর্মের নিরন্তর স্থিতি বজায় থাকে তাহলে এই মৃত বালক বেঁচে উঠবে। যদি কংস এবং কেশীকে আমি ধর্মপূর্বক বধ করে থাকি, তাহলে সেই সত্য প্রভাবের দ্বারা এই বালকের দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হোক।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বলায় সেই বালকের চেতনা ফিরে এল এবং সে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করল।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অভিমন্যুপুত্রের নামকরণ, পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আগমন এবং যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ আরম্ভ করার জন্য ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ প্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান ব্রহ্মাস্ত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ায় তোমার পিতার তেজে সূতিকাগৃহ দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। বিঘ্নপ্রদানকারী রাক্ষসেরাও তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করে অন্তর্ধান করল। সেই সময় আকাশবাণী হল—'কেশব ! তুমি ধন্য।' সেই সঙ্গে প্রজ্বলিত অস্ত্র ব্রহ্মলোকে চলে গেল। তোমরা পিতা এইভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলেন। উত্তরার শিশুপুত্র হাত-পা নাড়াতে লাগল, তাই দেখে ভরত বংশের রমণীগণ আনন্দে আপ্লুত হলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে স্বস্তিবাচন করালেন। তারপর সকলে আনন্দে মগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে লাগলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য নারীগণ নবজাতক জীবিত হওয়ায় অপার হর্ষান্বিত হলেন। সূত এবং মাগধেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন। উত্তরা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পুত্রকে ক্রোড়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন হয়ে নবজাতককে বহু উপহার দিলেন। যদুবংশীয়গণও শিশুকে নানাবস্ত্র উপহার দিলেন। তারপর সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তোমার পিতার নামকরণ করলেন—"কুরুকুল পরিক্ষীণ হয়ে যাওয়ার পর অভিমন্যুর এই সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাই এর নাম 'পরীক্ষিৎ' হওয়া উচিত।"

জনমেজয় ! নামকরণ হওয়ার পর তোমার পিতা পরীক্ষিৎ কালক্রমে বেড়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর দিকে তাকালে সকলেরই মন প্রসন্ন হয়ে উঠত। তোমার পিতা যখন একমাসের তখন পাণ্ডবরা বহু ধনরত্ন নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। যদুবংশীয়েরা যখন শুনলেন পাণ্ডবরা নগরের কাছাকাছি এসেছেন, তখন তাঁরা তাঁদের স্বাগত জানাতে নগরের বাইরে গেলেন। হস্তিনাপুরের পুরবাসীগণ নানা সুন্দর ফুল ও পতাকায় হস্তিনাপুর নগরীকে সাজালেন। তাঁরা নিজেদের ঘরও সাজালেন। বিদুর দেবমন্দিরগুলিতে বিশেষ পূজার নির্দেশ দিলেন।

পাণ্ডবদের আসার খবর পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সকলে একত্র হলে ধর্মানুসারে প্রণাম ও আলিঙ্গন করলেন, তারপর পাণ্ডব এবং যদুবংশীয় বীররা একসঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। ধনরাশি তাঁদের অগ্রে ছিল। পাণ্ডবগণ তাঁদের মিত্র এবং মন্ত্রীসহ অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তাঁরা একত্রে সর্বপ্রথম রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন এবং সকলে নিজ নিজ নাম বলে তাঁকে প্রণাম করলেন। এরপর তাঁরা গান্ধারী, কুন্তী এবং বিদুরকে সম্মান জানিয়ে তারপর যুযুৎসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা তোমার পিতার জন্মের অত্যন্ত অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক সংবাদ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্মের কথা শুনে তাঁর প্রশংসা করলেন।

এর কিছুদিন পর মহাতেজস্বী সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে পদার্পণ করলেন। পাণ্ডবরা তাঁর যথোচিত পূজা ও আপ্যায়ন করলেন এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরদের সঙ্গে তাঁর সেবায় রত হলেন। নানা কুশল সংবাদ আদান-প্রদানের পর ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বললেন—'মুনিবর ! আপনার কৃপায় যে রত্ন আনয়ন করা হয়েছে, অশ্বমেধ যজ্ঞে তা ব্যবহার করতে চাই। এরজন্য আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি। আমরা সকলে আপনার ও শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত।'

ব্যাসদেব বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাদের যজ্ঞ করার জন্য অনুমতি প্রদান করছি। এরপর যা প্রয়োজনীয় কর্ম, তা আরম্ভ করো। যথাযথ দক্ষিণা দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করো। অশ্বমেধ যজ্ঞ সব পাপ থেকে মুক্তিদান করে। সেই যজ্ঞ করে তুমি নিঃসন্দেহে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

ব্যাসদেবের কথা শুনে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মহর্ষি ব্যাসের অনুমতি নিয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন—'পুরুষোত্তম ! আমরা আপনার জন্যই এই সব উত্তম ভোগ উপভোগ করছি। আপনি নিজ পরাক্রম এবং বুদ্ধির সাহায্যে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করেছেন। সুতরাং আপনি যজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে শুভকাজ আরম্ভ করুন ; কারণ আপনি আমাদের পরম গুরু। আপনি যজ্ঞ করলে আমাদের সব পাপ অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আপনিই যজ্ঞ, অক্ষর, সর্বরূপ, ধর্ম, প্রজাপতি ও সমস্ত প্রাণীদের গতি—এ আমার নিশ্চিত ধারণা।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহারাজ ! এরূপ বলা আপনার

পক্ষেই যোগ্য। আমার বিশ্বাস যে আপনিই সমস্ত প্রাণীকে সাহায্য প্রদান করবেন ; কারণ আপনি ধর্মের দ্বারা সুশোভিত। আমরা সকলে আপনার অঙ্গ বা সহায়ক, আপনাকে আমাদের রাজা ও গুরুজন বলে মনে করি। সুতরাং আপনি আমাদের সম্মতিতে নিজেই এই যজ্ঞ করুন এবং আমাদের যাকে যে কাজের ভার দিতে চান, তার জন্য নির্দেশ প্রদান করুন। আমি আপনার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে আপনি যা বলবেন, তাই করব। আপনি যজ্ঞ করলে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবও প্রাপ্ত হবে।

—o—

ব্যাসদেবের নির্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য মনোনীত অশ্বের রক্ষার জন্য অর্জুনকে নিয়োগ করা এবং অশ্বকে সেনাসহ অর্জুনের অনুগমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে বললেন—মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি যখন যজ্ঞ আরম্ভ করার উপযুক্ত সময় বুঝবেন, তখন আমাকে যজ্ঞের দীক্ষা দেবেন। কারণ আমার যজ্ঞ আপনারই অধীন।

ব্যাসদেব বললেন—রাজন্ ! যজ্ঞের সময় যখন হবে, তখন আমি, যাজ্ঞবল্ক্য সকলে এসে পূর্ণমর্যাদায় তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন করাব। চৈত্র পূর্ণিমায় তোমাকে যজ্ঞের দীক্ষা প্রদান করা হবে, ততদিন তুমি তার জন্য জিনিসপত্র একত্রিত করো। অশ্ববিদ্যা স্নাত সূত এবং ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য পবিত্র অশ্ব পরীক্ষা করবেন। যে অশ্ব মনোনীত হবে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সে তোমার দেদীপ্যমান যশ ছড়াতে ছড়াতে আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে আসবে।

সেই কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির সম্মত হয়ে ব্যাসদেবের কথা অনুসারে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করলেন। তিনি মনে মনে যেসব সামগ্রী একত্রিত করার সংকল্প করেছিলেন, সেসব এনে মহর্ষি ব্যাসকে সংবাদ দিলেন। তখন ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! আমরা যথাসময় উত্তম যোগে তোমাকে দীক্ষা দিতে প্রস্তুত। এর মধ্যে তুমি সোনার 'স্ফ্য' এবং 'কূর্চ' তৈরি করিয়ে নাও, এছাড়া আরও যা সোনার জিনিস প্রয়োজন, তা-ও তৈরি করে ফেলো। শাস্ত্রবিধি অনুসারে আজ যজ্ঞসম্পর্কীয় অশ্বকে পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে হবে, সেইসঙ্গে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে সেই অশ্ব সুরক্ষিতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—মুনিবর ! অশ্ব এসে গেছে, একে কীভাবে ছাড়া হবে, যাতে এ তার ইচ্ছানুসারে সমগ্র পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন এবং বলুন এই ইচ্ছানুযায়ী ঘুরে বেড়ানো ঘোড়াটির রক্ষার জন্য কাকে নিযুক্ত করা যায় ?

জনমেজয় ! যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি ব্যাস বললেন—'রাজন্ ! সমস্ত ধনুর্ধারীর মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ, সে বিজয়লাভে উৎসাহী, সহনশীল এবং ধৈর্যবান। সুতরাং সে-ই এই অশ্ব রক্ষা করতে সক্ষম। সে নিবাত কবচ বিনাশ করেছে, সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল জয় করার শক্তি তার আছে, তার কাছে দিব্য অস্ত্র, দিব্য কবচ, দিব্য ধনুক ইত্যাদি আছে, সুতরাং অর্জুনেরই অশ্বের রক্ষক হিসাবে যাওয়া উচিত। সে ধর্ম ও অর্থ কুশল এবং সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী, সুতরাং সে শাস্ত্রবিধি অনুসারে অশ্ব সঞ্চালন করবে। অত্যন্ত তেজস্বী পরম পরাক্রমী ভীমসেন এবং নকুল—এই দুই বীর রাজ্য রক্ষায় পূর্ণ সক্ষম, সুতরাং এরা রাজকার্য দেখাশোনা করবে এবং পরম বুদ্ধিমান সহদেব আত্মীয়কুটুম্ব, মিত্র-বন্ধুদের দেখাশোনা করবে।

ব্যাসদেবের কথা শুনে যুধিষ্ঠির সেইমতো সব কাজ করলেন এবং অর্জুনকে ডেকে অশ্বের বিষয়ে জানালেন—'বীর অর্জুন ! তোমার ওপর এই অশ্বটির রক্ষার ভার অর্পণ করা হচ্ছে, পরম নিষ্ঠায় একে সংরক্ষণ করো। তুমিই একে রক্ষা করতে সক্ষম অন্য কারো দ্বারা এই কাজ হওয়া অসম্ভব। মহাবাহু ! তুমি অবশ্যই স্মরণ রেখো, অশ্বকে রক্ষা করার সময় যে রাজা তোমার সম্মুখীন হবেন, তাদের সঙ্গে যেন ভীষণ যুদ্ধ না করতে হয়, সেই চেষ্টা করবে এবং সেইসব রাজাদের আমার যজ্ঞের সংবাদ জানিয়ে তাঁদের যথাসময়ে যজ্ঞে আসার আমন্ত্রণ জানাবে।'

ভ্রাতা সব্যসাচী অর্জুনকে এইভাবে সবকিছু বুঝিয়ে

ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ভীম ও নকুলকে নগর রক্ষার ভার সমর্পণ করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে সহদেবকে আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনার ভার অর্পণ করলেন। তারপর দীক্ষা প্রদানের সময় হলে ব্যাসদেব এবং মহান ঋত্বিকেরা রাজাকে বিধিপূর্বক যজ্ঞের দীক্ষা দিলেন এবং যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট অশ্বকে স্বয়ং ব্রহ্মবাদী ব্যাসদেব শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ছেড়ে দিলেন। ধর্মরাজের নির্দেশে অর্জুন ঘোড়াকে অনুসরণ করতে লাগলেন। অশ্বটি কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় শ্যাম বর্ণের ছিল। অশ্বের পিছনে চলার সময় অর্জুন গাণ্ডীব ধনুকে টংকার দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর হাতে বৃষের চামড়ার দস্তানা পরেছিলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা

সহকারে অশ্বকে অনুসরণ করছিলেন। অর্জুনের রওনা হওয়ার সময় আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁকে দেখবার জন্য হস্তিনাপুরের পথে এসে দাঁড়ান। সেই সময় কলরব কোলাহলে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। উদারবুদ্ধি অর্জুন শুনতে লাগলেন—'ভারত ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি সুখে গমন করো এবং কুশলপূর্বক ফিরে এসো।' অন্যেরা বলতে লাগল—'অর্জুন ! তোমার যাত্রা সুখময় হোক, পথে যেন কোনো কষ্ট না হয়, কোনো ভয় না থাকে, তুমি নিশ্চয়ই কুশলে ফিরবে এবং আমাদের দর্শন দেবে।' অর্জুন যেতে যেতে এইভাবে মিষ্ট কথা শুনতে লাগলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনির এক বিদ্বান শিষ্য, যিনি যজ্ঞকর্মে চতুর এবং বেদ-পারঙ্গম, তিনি বিঘ্ন শান্তির জন্য অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তিনি ছাড়াও বহু বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ধর্মরাজের নির্দেশে পার্থকে অনুসরণ করলেন। সেই অশ্ব পাণ্ডবদের অস্ত্রবলে বিজিত পৃথিবীর নানা দেশ ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ করতে লাগল। সেই সব দেশগুলিতে শত্রুদের সঙ্গে অর্জুনকে যেসব যুদ্ধ করতে হল, তার বৃত্তান্ত শোনাচ্ছি। যজ্ঞের অশ্ব পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে করতে সর্বপ্রথম উত্তর দিকে গেল। তারপর বহু রাজ্য ভ্রমণ করে পূর্ব দিকে গেল। মহারথী অর্জুন তাকে অনুসরণ করছিলেন। সেই সময় কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের হাতে যাদের বন্ধুবান্ধব মারা পড়েছিল, সেইসব অসংখ্য রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হল। বহু কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ, যারা আগে পাণ্ডবদের হাতে পরাজিত হয়েছিল, তারা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। এইরূপ বিভিন্ন দেশের রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে অনেক বার যুদ্ধ করতে হল।

অর্জুন কর্তৃক ত্রিগর্তাদির পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেসব ত্রিগর্তবীর মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের মহারথী পুত্র এবং পৌত্রগণ অর্জুনের সঙ্গে শত্রুতা করতে লাগলেন। অর্জুন ত্রিগর্ত দেশে গেলে তাঁদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ হল। পাণ্ডবদের যজ্ঞের অশ্ব তাঁদের রাজ্য সীমায় উপস্থিত জেনে ত্রিগর্ত বীরেরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রথে করে যজ্ঞের ঘোড়াটিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁদের মনোভাব বুঝে তাঁদের নিরস্ত করার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁরা অর্জুনের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন বারবার নিষেধ করে তাঁদের ফিরে যেতে বললেন। তিনি প্রথমে যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না কারণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে এই বলে নিষেধ করেছিলেন যে, 'যে সব রাজাদের আত্মীয়স্বজন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁদের বধ

করা উচিত নয়।' ধর্মরাজের নির্দেশ মেনেই অর্জুন ত্রিগর্তদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁরা ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন ত্রিগর্তরাজ সূর্যবর্মাকে বাণ বিদ্ধ করে অর্জুন হাসতে লাগলেন। তা দেখে ত্রিগর্তদেশের বীরেরা রথের গুঞ্জনে সমস্ত দিক গুঞ্জরিত করে ধনঞ্জয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সূর্যবর্মা তাঁর হস্তকৌশল দেখাবার জন্য অর্জুনকে একশত বাণ মারলেন এবং তাঁর যেসব মহান ধনুর্ধারী বীর অনুচর ছিল, তারাও অর্জুনকে বধ করার ইচ্ছায় তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু অর্জুন তাঁর ধনুক থেকে বাণ নিক্ষেপ করে সমস্ত বাণ কেটে ফেললেন। সেই সব বাণ টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল।

সূর্যবর্মা পরাজিত হলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজস্বী নবযুবক কেতুবর্মা যশস্বী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কেতুবর্মাকে আক্রমণ করতে দেখে বীরবর অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে বধ করলেন। তাঁর মৃত্যু হলে মহারথী ধৃতবর্মা রথে করে শীঘ্রই সেখানে এসে অর্জুনের ওপর বাণের ঝড় বইয়ে দিলেন। ধৃতবর্মা বয়সে বালক হলেও, তাঁর এই দক্ষতা দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ধৃতবর্মা যে কখন বাণ হাতে নিচ্ছেন আর কখন তা নিক্ষেপ করছেন—অর্জুন তা বুঝতেই পারছিলেন না। শুধু বাণের বর্ষণই বুঝতে পারছিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে মনে মনে কিছুক্ষণ ধৃতবর্মার প্রশংসা করলেন এবং তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। ধৃতবর্মা যদিও সাপের মতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু কৌরববীর অর্জুন ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে রক্ষা করছিলেন, তাঁর প্রাণ হরণ করেননি। অমিত তেজস্বী অর্জুন তাঁকে জেনে শুনে ছেড়ে দেওয়ায় ধৃতবর্মা তাঁর ওপর এক প্রজ্বলিত বাণ নিক্ষেপ করলেন, তাতে অর্জুন হাতে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। অর্জুনের মাথা ঘুরে গেল এবং গাণ্ডীব ধনুক হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। ধৃতবর্মা তা দেখে অট্টহাস্য করে উঠলেন। অর্জুন হাতের রক্ত মুছে ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে ধনুক হাতে নিয়ে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন ত্রিগর্ত দেশের যোদ্ধারা চারদিক দিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ধরল। তা লক্ষ্য করে অর্জুন বজ্রসম লৌহ বাণবর্ষণ করে আঠারো জন যোদ্ধাকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন। তখন ত্রিগর্তের যোদ্ধারা পালাতে লাগল। অর্জুন তখন হাসতে হাসতে তাদের সর্পাকার বাণে মারতে লাগলেন। তাঁর বাণে আহত হয়ে ত্রিগর্ত বীরদের সাহস দূর হয়ে গেল, তারা চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। বহু যোদ্ধা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অর্জুনকে বলল—'পার্থ ! আমরা তোমার আদেশবহনকারী সেবক এবং সর্বদা তোমার অধীন থাকব। কৌরবনন্দন ! আমরা বিনীত দাসের মতো তোমার সামনে রয়েছি, আদেশ করো, কী করব ? আমরা তোমার সমস্ত প্রিয় কাজ করতে প্রস্তুত।' তাদের কথা শুনে অর্জুন বললেন—'রাজাগণ ! যদি জীবন রক্ষা করতে চাও, তাহলে আমাদের শাসন মেনে নাও।'

—o—

প্রাগজ্যোতিষপুরে বজ্রদত্তের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ এবং বজ্রদত্তের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! তারপর যজ্ঞের অশ্ব প্রাগজ্যোতিষপুরের কাছাকাছি বিচরণ করতে লাগল। ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত সেখানে রাজত্ব করতেন। তিনি যখন শুনলেন যে পাণ্ডবদের ঘোড়া তাঁর রাজ্য সীমানায় এসেছে, তিনি নগরের বাইরে বেরিয়ে সেই ঘোড়া ধরলেন এবং সেটি সঙ্গে করে নগরে ফিরতে লাগলেন। তাই দেখে মহাবাহু অর্জুন গাণ্ডীব ধনুকে টংকার দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত বাণে ব্যাকুল হয়ে রাজা বজ্রদত্ত ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে নগরে প্রবেশ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশাল গজে চড়ে যুদ্ধ করতে এলেন। মহারথী অর্জুনের কাছে এসে বালকসুলভ চাপল্যে তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। বজ্রদত্তের হাতি পর্বতের ন্যায় উঁচু ছিল। তার গণ্ডস্থল দিয়ে মদের ধারা বইছিল। সে প্রভুর অধীন থাকলেও যুদ্ধে মত্ত হয়ে উঠল। বজ্রদত্ত কুপিত হয়ে হাতির পিঠে উঠে অর্জুনের দিকে এগোলেন। রাজার অঙ্কুশের আঘাতে সেই মহাবলী গজ এমনভাবে এগোল, যেন আকাশে উড়ে যেতে চায়। বজ্রদত্তকে এইভাবে আক্রমণ করতে দেখে অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে পদব্রজেই হাতির ওপর আসীন বজ্রদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বজ্রদত্ত রোষভরে অর্জুনের ওপর অগ্নির ন্যায় বাণ নিক্ষেপ

করলেন। সেই অস্ত্র উড়ন্ত পতঙ্গের ন্যায় অর্জুনের দিকে এলে অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক থেকে বহু বাণ নিক্ষেপ করে সেই অস্ত্রকে শতচূর্ণ করে দিলেন। তা লক্ষ্য করে বজ্রদত্ত অর্জুনের ওপর নিরবচ্ছিন্ন বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুনও কুপিত হয়ে দ্রুত ভগদত্তের পুত্রকে বাণের নিশানা করলেন। সেই বাণের আঘাতে মহাতেজস্বী রাজা অত্যন্ত আহত হলেন এবং হাতির পিঠ থেকে নীচে পড়ে গেলেন ; কিন্তু তাতেও তিনি অচৈতন্য হননি। তারপর বজ্রদত্ত পুনরায় হাতিতে করে এসে ধৈর্য সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুনকে পরাস্ত করার জন্য তিনি তাঁর দিকে হাতি নিয়ে এগোলেন, তা লক্ষ্য করে অর্জুন ক্রোধান্বিত হয়ে হাতির ওপর জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বাণের আঘাত করলেন। সেই আঘাতে গজরাজের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তের ধারা বইতে লাগল। তখন সেই গজরাজকে দেখে মনে হচ্ছিল পর্বতের গা থেকে লাল ঝরনার জল পড়ছে।

রাজা বজ্রদত্তের সঙ্গে অর্জুনের তিন দিন ধরে সমানে যুদ্ধ হতে লাগল। চতুর্থ দিন মহাবলী বজ্রদত্ত অট্টহাস্য করে বললেন—'অর্জুন ! দাঁড়াও, আমি আর তোমাকে জীবিত রাখব না। তোমাকে মেরে পিতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করব। আমার পিতা ভগদত্ত তোমার পিতার মিত্র ছিলেন, তা সত্ত্বেও তুমি তাঁকে হত্যা করেছ। তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তুমি তাঁকে মারতে সক্ষম হয়েছিলে। তাঁর পুত্র আমি আজ তোমার সামনে উপস্থিত, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।' এই বলে ক্রোধভরে বজ্রদত্ত পুনরায় অর্জুনের দিকে হাতি নিয়ে এগোলেন। প্রভুর ইশারা বুঝে গজরাজ নৃত্য করতে করতে তৎক্ষণাৎ মহারথী অর্জুনের কাছে পৌঁছাল। তা দেখেও অর্জুন ভীত হলেন না, অপরপক্ষে তিনি পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তারপর বাণবর্ষণ করে গজরাজের গতি রুদ্ধ করলেন। হাতির গতি রুদ্ধ হতে দেখে ভগদত্তকুমার ক্রোধে আত্মহারা হয়ে অর্জুনের ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে পর্বতাকার গজরাজকে বলপূর্বক এগিয়ে নিয়ে চললেন। অর্জুন তা দেখে হাতির ওপর অগ্নিসম তেজস্বী নারাচ দিয়ে আঘাত করলেন। সেই নারাচ হাতির মর্মস্থানে গভীর আঘাতের সৃষ্টি করে এবং বজ্রাঘাতে যেমন পর্বত পতিত হয়, হাতিটিও তেমন করে মাটির ওপর সশব্দে পড়ল। সেই সঙ্গে বজ্রদত্তও নীচে পড়ে গেলেন। তাঁকে মাটিতে পড়তে দেখে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বললেন—রাজন্ ! ভয় পেয়ো না। আমি আসার সময় মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির বলে দিয়েছেন, 'ধনঞ্জয় ! তুমি কোনো রাজাকে হত্যা করবে না এবং যুদ্ধ শুরু করে যোদ্ধাদের প্রাণ নেবে না। পথে যে রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাদের নিমন্ত্রণ করে বলবে আপনারা আপনাদের আত্মীয়-বন্ধুসহ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে পদার্পণ করে সেখানে উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন।' ভ্রাতার নির্দেশ মেনে নিয়ে আমি তোমাকে বধ করব না। তোমার কোনো ভয় নেই। ওঠো এবং গৃহে ফিরে যাও। আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে ধর্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হবে। সেই সময় তুমি অবশ্যই উপস্থিত থাকবে।'

অর্জুনের কথা শুনে তাঁর দ্বারা পরাজিত বজ্রদত্ত বললেন—'যথা আজ্ঞা, আমি অবশ্যই যাব।'

অর্জুনের সৈন্ধব বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং দুঃশলার চেষ্টায় তার সমাপ্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এরপর মহাভারত যুদ্ধের পর জীবিত থাকা সিন্ধুদেশের বীরদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়। যজ্ঞের ঘোড়াকে নিজেদের রাজ্য সীমানার মধ্যে পেয়ে সিন্ধুদেশের ভয়ানক ক্ষত্রিয়গণ অর্জুনকে একটুও ভয় পেলেন না। তাঁরা আগে অর্জুনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এখন অর্জুনকে পরাস্ত করতে চাইছিলেন, তাই সেই মহাপরাক্রমী বীরগণ পার্থকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করে ঢেকে দিলেন। তাঁরা এক হাজার রথ এবং দশ হাজার ঘোড়ার দ্বারা ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন, এঁরা সেই কথা ভুলতে পারছিলেন না। এখন তাঁরা বৃষ্টির মতো বাণবর্ষণ করছিলেন। তাঁদের বাণে আচ্ছাদিত হয়ে কুন্তীনন্দন অর্জুন মেঘে ঢাকা সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁকে বাণের আঘাতে পীড়িত দেখে ত্রিলোকে হাহাকার পড়ে গেল। সেই সময় হতবুদ্ধি হয়ে অর্জুনের হাত থেকে ধনুক ও দস্তানা পড়ে গেল। তাঁকে অচেতন দেখে সিন্ধু বীরেরা ভীষণভাবে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুনের সংকটাপন্ন অবস্থা

দেখে দেবতারাও মনে মনে ভীত হয়ে শান্তির উপায় ভাবতে লাগলেন। তারপর দেবতাদের প্রচেষ্টায় অর্জুনের তেজ পুনরায় উদ্দীপ্ত হল এবং উত্তম অস্ত্রবিদ, পরম বুদ্ধিমান ধনঞ্জয় রণক্ষেত্রে পর্বতের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়ালেন। তিনি ধনুকে টংকার দিতে লাগলেন এবং ইন্দ্র যেমন জলবর্ষণ করেন, তেমনভাবে শত্রুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। পার্থের বাণে আচ্ছাদিত হয়ে সৈন্ধব বীররা পক্ষী আবৃত বৃক্ষের ন্যায় রাজার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বহু যোদ্ধা গাণ্ডীবের আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠলেন, আরও অনেকে ভয়ে পালিয়ে গেলেন, অনেকে শোকে অশ্রুজল ফেলতে লাগলেন। সেই সময় অর্জুন অলাতচক্রের ন্যায় ঘুরে ঘুরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি চারিদিকে ইন্দ্রজালের মতো বাণের জাল সৃষ্টি করলেন। এরপর সিন্ধুদেশের বীররা পুনরায় সংগঠিত হয়ে ফিরে এলেন এবং অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ অর্জুন তখন রণোন্মত্ত সিন্ধু বীরদের বললেন— 'যোদ্ধাগণ ! আমি তোমাদের কল্যাণের কথা বলছি, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ পরাজয় স্বীকার করে বলবে যে 'আমি আপনার, আপনি আমাকে যুদ্ধে জয় করেছেন', সে যদি সামনে এসে দাঁড়ায় তবুও তাকে আমি বধ করব না। আমার কথা শুনে তোমাদের যা মঙ্গল মনে হয়, তাই করো।' এই কথা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন অত্যন্ত কুপিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে সৈন্ধব বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সৈন্ধবেরা অর্জুনের ওপর লক্ষ লক্ষ বাণবর্ষণ করলেন। কিন্তু অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সব বাণ দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করতে লাগলেন। তা দেখে জয়দ্রথ-বধ স্মরণ করে সিন্ধু বীররা অর্জুনকে বধ করার জন্য পুনরায় তাঁর ওপর শক্তি ও প্রাস নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হল। মহাবলী ধনঞ্জয় তাঁদের শক্তি ও প্রাস মধ্যপথেই টুকরো করে দিয়ে ভীষণ জোরে গর্জন করে উঠলেন এবং বিজয় অভিলাষে আক্রমণকারী সিন্ধুবীরদের মস্তক ভল্লের আঘাতে কেটে ফেলতে লাগলেন।

সমস্ত সিন্ধুবীর কষ্ট পাচ্ছেন জেনে ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা তাঁর পুত্র সুরথের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে রথে করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সব যোদ্ধা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে যায়। তিনি অর্জুনের কাছে গিয়ে আর্তভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে ধনঞ্জয় ধনুক নীচে ফেলে দিলেন। পরে ভগিনীর বিধিমতো আপ্যায়ন করে বললেন—'কল্যাণী ! বল, তোমার জন্য কী করব ?' দুঃশলা বললেন— 'ভরতশ্রেষ্ঠ ! এ তোমার ভাগিনেয়র পুত্র, তোমাকে প্রণাম

জানাচ্ছে, একে দেখো।' একথা শুনে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগিনী ! এই বালকের পিতা কোথায় ?' দুঃশলা বললেন—'ভ্রাতা ! আমার পুত্র আগেই শুনেছিল যে অর্জুনের হাতে তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তারপর যখন তার কানে এই সংবাদ এল যে অর্জুন অশ্বের পিছনে এখানে এসে পৌঁছেছে, তখন সে দুঃখে পীড়িত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং তখনই তার প্রাণপাখি বেরিয়ে যায়। তার সেই অবস্থা দেখে শরণ নেবার জন্য আমি এখন তোমার কাছে এসেছি।' এই বলে দুঃশলা আর্তস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর এই দীন অবস্থা দেখে অর্জুনও দীনভাবে মাথা নীচু করলেন। দুঃশলা আবার বলতে লাগলেন—'ভ্রাতা ! তুমি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মজ্ঞ। এই দুঃখী ভগিনী এবং ভাগিনেয়র পুত্রকে দেখো। মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন এবং জয়দ্রথকে ভুলে যাও। যেমন অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, তেমনই সুরথের পুত্র আমার এই পৌত্র। একে ক্রোড়ে নিয়ে আমি তোমার শরণ নিতে এসেছি। আমি চাই সকল যোদ্ধা শান্ত হোক আর তুমি এই নিরীহ শিশুকে কৃপা করো। এ তোমার চরণে মাথা রেখে শান্তি ভিক্ষা করছে ; অতএব শান্ত হয়ে যাও। এই বালক নিতান্ত অবোধ— কিছুই জানে না, এর ভ্রাতা বন্ধু সব বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ; সুতরাং এর ওপর দয়া করো। ক্রোধ পরিত্যাগ করো।

দুঃশলার এই করুণ বাক্য শুনে অর্জুনের শোকাক্রান্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী দেবীর কথা স্মরণ হল, তিনি ক্ষত্রিয় ধর্মকে তিরস্কার করে বললেন—'রাজ্য লোভী এবং অভিমানের মূর্তি সেই নীচ দুর্যোধনকে ধিক্, যার জন্য আমরা আমাদের সকল আত্মীয়-বন্ধুকে যমালয়ে প্রেরণ করেছি।' এই বলে অর্জুন দুঃশলাকে অনেক সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে গৃহে পাঠালেন। দুঃশলাও সেই মহাযুদ্ধ থেকে তাঁর যোদ্ধাদের ফিরিয়ে আনলেন এবং অর্জুনের প্রশংসা করতে করতে গৃহে ফিরলেন। এইভাবে সিন্ধু বীরদের পরাজিত করে ধনঞ্জয় দ্রুত এগিয়ে যাওয়া স্বেচ্ছায় বিচরণকারী সেই অশ্বের পিছন পিছন তীব্র গতিতে চলতে লাগলেন। অশ্বটি ক্রমশ একের পর এক দেশ পেরিয়ে অর্জুনের পরাক্রম বৃদ্ধি করে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করতে থাকল। ঘুরতে ঘুরতে সেই অশ্ব অর্জুনসহ মণিপুর রাজার রাজ্যে গিয়ে পৌঁছাল।

—o—

অর্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ এবং অর্জুনের মৃত্যু

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন যখন তাঁর পিতা অর্জুনের আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে বহু ধন নিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর দর্শন লাভের জন্য নগরের বাইরে এলেন। মণিপুর নরেশকে এইভাবে আসতে দেখে পরম বুদ্ধিমান ধনঞ্জয় ক্ষত্রিয় ধর্ম স্মরণ করে তাঁকে সম্মান জানালেন না। উল্টে কুপিত হয়ে বললেন—'পুত্র ! তোমার এই কাজ ঠিক নয়। আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা করতে করতে তোমার রাজ্যের মধ্যে এসেছি ; তা সত্ত্বেও তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছ না কেন ? দুর্মতে ! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছ, তাই তোমাকে ধিক্। জগতে জীবিত থেকে তুমি কোনো পুরুষার্থ করোনি। তাই যুদ্ধের জন্য এসেছি জেনেও তুমি শান্তভাবে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছো। আমি যদি অস্ত্র ফেলে খালি হাতে তোমার কাছে আসতাম, তবে তোমার এই কাজ উপযুক্ত ছিল।'

অর্জুন যখন বভ্রুবাহনকে উপরিউক্ত কথাগুলি বলছিলেন, সেই সময় নাগকন্যা উলূপী মাটি ভেদ করে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁর নিজ স্বামীর কঠোর বাক্য সহ্য হল না। তাই তিনি বভ্রুবাহনকে ধর্মযুক্ত কথায় বললেন—'পুত্র ! আমি তোমার বিমাতা নাগকন্যা উলূপী। আমার কথা শোনো, তাহলে তুমি পরম ধর্ম লাভ করবে। তোমার পিতা কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হয়ে রয়েছেন ; সুতরাং এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করো (এঁর কাছে এটিই যোগ্য সমাদর) এবং তাহলেই ইনি তোমার ওপর বিশেষ প্রসন্ন হবেন।' বিমাতার কথা শুনে বভ্রুবাহন মনে মনে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সুবর্ণ কবচ পরিধান করে মস্তকে শিরস্ত্রাণ এবং তূণীর ভর্তি বাণ নিয়ে, সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, সিংহ চিহ্নিত ধ্বজা যুক্ত বেগবান অশ্ববাহিত স্বর্ণরথে করে অর্জুনের ওপর আক্রমণ চালালেন। সেই বীর পার্থের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা যজ্ঞের অশ্বটিকে অশ্বশিক্ষায় নিপুণ ব্যক্তিদের দ্বারা বন্দি করলেন। ঘোড়াটিকে ধরে নিতে দেখে ধনঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তিনি রথে উপবিষ্ট পুত্রকে যুদ্ধের ময়দানে এগোতে বাধা দিলেন। রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনকে বিষাক্ত সাপের ন্যায় তীক্ষ্ণ শত শত বাণে পীড়িত করতে লাগলেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই প্রসন্ন মনে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁদের যুদ্ধের কোনো তুলনা ছিল না। সেই সংগ্রাম দেবতা ও অসুরের সংগ্রামকেও হার মানিয়ে দিচ্ছিল। বভ্রুবাহন হাসতে হাসতে অর্জুনের গলাবক্ষে একটি বাণ মারলেন, সেই বাণ অর্জুনের দেহ বিদ্ধ করে মাটিতে গিয়ে গেঁথে গেল। সেই বাণে অর্জুন অত্যন্ত আঘাত পেলেন। তিনি ধনুকে ভর দিয়ে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে এলে পুত্র বভ্রুবাহনের প্রশংসা করে বললেন—'পুত্র ! তুমি ধন্য, চিত্রাঙ্গদানন্দন ! আজ তুমি যোগ্য পরাক্রম দেখিয়েছ, আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এবার আমি বাণ নিক্ষেপ করছি, তুমি সতর্ক হও।'

এই কথা বলে অর্জুন নারাচের বর্ষণ করতে লাগলেন। গাণ্ডীব ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত এই নারাচ ইন্দ্রের বজ্রের মতো মনে হচ্ছিল। কিন্তু রাজা বভ্রুবাহন ভল্লের আঘাতে সেগুলি টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন অর্জুন মৃদুহাস্য করে

ক্ষুরাকৃতি দিব্য বাণের আঘাতে বভ্রুবাহনের রথের সুন্দর তালবৃক্ষের সমান উচ্চ সুবর্ণময় ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং তার বেগবান ঘোড়াগুলিকেও মেরে ফেললেন। ঘোড়াগুলি মারা যাওয়ায় বভ্রুবাহন রথ থেকে নেমে পড়লেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পদব্রজেই পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। পুত্রের পরাক্রম দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং পুত্রকে আর বেশি আঘাত করলেন না। বভ্রুবাহন পিতাকে যুদ্ধে বিমুখ দেখে পুনরায় সাপের মতো বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। বালকস্বভাববশত পরিণাম চিন্তা না করেই বভ্রুবাহন পিতার বুক লক্ষ্য করে এক তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ অর্জুনের মর্মস্থানে প্রবেশ করে তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগল। অর্জুন সেই আঘাতে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বভ্রুবাহনও অর্জুনের বাণে আহত হয়েছিলেন, তিনিও অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদা পতি ও পুত্র দুজনকেই ধরাশায়ী হতে দেখে শঙ্কিত হৃদয়ে রণভূমিতে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর পতিদেব অর্জুন মৃত ; সেই অবস্থা দেখে তিনি কম্পিত হৃদয়ে শোকসন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, বভ্রুবাহনের শোক, উলূপীর প্রচেষ্টায় অর্জুনের পুনর্জীবন লাভ ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! চিত্রাঙ্গদা পতি শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে এলে তিনি দেখলেন নাগকন্যা উলূপী দিব্যরূপ ধারণ করে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে চিত্রাঙ্গদা বললেন—'উলূপী ! দেখো, তোমারই কথায় আমার পুত্র বাণ নিক্ষেপ করে সমরবিজয়ী অর্জুনকে বধ করেছে। রণভূমিতে মৃতাবস্থায় পড়ে থাকা স্বামীকে তুমিও প্রাণভরে দেখে নাও। তুমিতো অত্যন্ত ধর্মজ্ঞ এবং পতিব্রতা, তাই না ? তাই তোমার পতিদেব আজ তোমারই প্রচেষ্টায় মৃত হয়ে রণভূমিতে পড়ে আছেন। ভগিনী ! আমি তোমার কাছে অর্জুনের প্রাণভিক্ষা করছি, তুমি এঁকে জীবিত করে দাও। কল্যাণী ! তুমি ধর্মজ্ঞ, ত্রিলোকে তোমার খ্যাতি প্রসারিত (অতএব তুমিই আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারো।) আর্যে ! আমি আমার পুত্রের জন্য তত শোক করছি না, পতিদেবের জন্যই আমি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়েছি, যাঁকে আমার সামনে এইভাবে আপ্যায়ন করা হল !'

নাগকন্যা উলূপীকে কথাগুলি বলে পরম যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা তাঁর স্বামী অর্জুনের কাছে গিয়ে বললেন—'প্রিয়তম ! ওঠো, আমি তোমার ঘোড়া ছাড়িয়ে দিয়েছি। তোমাকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়ার পিছনে যেতে হবে ; তাহলে এখানে শুয়ে আছ কেন ? সমস্ত কৌরবের জীবন তোমারই অধীন। তুমি তো অন্যের প্রাণদাতা, তাহলে কী

করে প্রাণত্যাগ করলে ?' (তারপর পুনরায় উলূপীকে বলতে লাগলেন) 'উলূপী ! পতিদেব নিহত হয়ে পড়ে আছেন, তাঁকে ভালো করে দেখো। তুমি আমার পুত্রকে উত্তেজিত করেছ, তাতেই সে তার পিতাকে হত্যা করেছে, তোমার কি এর জন্য শোক হচ্ছে না ? মৃত্যুমুখে পতিত আমার পুত্র যদি চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়ে তো ঠিক আছে, কিন্তু নিদ্রাজয়ী অর্জুনের জীবন রক্ষা করা উচিত। বিধাতা পতি-পত্নীর ভালোবাসা চিরকালের জন্য অটুট করে তৈরি করেছেন, তোমারও এঁর সঙ্গে সেই একই প্রকারের

সম্বন্ধ। সেই সখ্যভাবের গুরুত্ব বুঝে কোনো উপায় করো, যাতে তোমার এঁর সঙ্গে স্থাপিত সম্বন্ধ সত্য এবং সার্থক হয়। তুমিই পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়ে আমার পতির জীবন নিয়েছ। আজ যদি এঁকে পুনরায় জীবিত না করো, তাহলে আমি প্রাণত্যাগ করব। আমার পতি ও পুত্র দুজনেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ; তাদের বিহনে আমি অনন্ত শোক সাগরে ডুবে আছি, তোমার সামনে এখানেই প্রায়োপবেশনে (আমরণ উপবাসের জন্য) বসছি।'

উলূপীকে এই কথা বলে চিত্রাঙ্গদা অনশন-ব্রত ধারণ করে নিশ্চুপ হয়ে বসলেন। তখন রাজা বভ্রুবাহনের চেতনা ফিরে এল। তিনি মাতাকে রণক্ষেত্রে বসে থাকতে দেখে দুঃখিত চিত্তে বললেন—'হায় ! যিনি এতোদিন ধরে অগাধ সুখে থেকে প্রতিপালিত, আমার সেই মাতা চিত্রাঙ্গদা আজ মৃত্যুর অধীন হয়ে পৃথিবীতে পড়ে থাকা স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছেন ! এর থেকে বেশি দুঃখের কথা আর কী হতে পারে ? যুদ্ধে যাঁকে বধ করা অন্যের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, সেই আমার পিতা অর্জুন আজ আমারই হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। মনে হচ্ছে মৃত্যুকাল না এলে কোনো জীবের পক্ষে প্রাণত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই এই সংকটের সময়ও আমার এবং আমার মাতার প্রাণ বিয়োগ হচ্ছে না। হায় ! আমাকে ধিক্ ! হে ব্রাহ্মণগণ, আমি পিতার হত্যাকারী, ক্রূরকর্মী এবং মহাপাপী। আপনারা বলুন আমি এখন কী প্রায়শ্চিত্ত করব ? নাগ রাজকন্যা উলূপী ! দেখো, আজ যুদ্ধে আমি তোমার স্বামীকে বধ করেছি, হয়তো এটি তোমার প্রিয় কাজ ; কিন্তু মাতা ! আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করে বলছি, এ জীবন আর রাখব না। আমার পিতা যেখানে গেছেন, আমিও সেইস্থানে যাব।' এই বলে রাজা বভ্রুবাহন দুঃখ-শোকে কাতর হয়ে আচমন করলেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগলেন—'জগতের চরাচর প্রাণীগণ এবং মাতা উলূপী ! আপনারা সকলে শুনুন, আমি সত্য কথা বলছি। আমার পিতা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন যদি জীবিত হয়ে না ওঠেন, তাহলে আমি এই রণক্ষেত্রেই উপবাস করে শরীর শুষ্ক করব। পিতাকে হত্যা করার পর আমার কাছে এছাড়া আর অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় মহা তেজস্বী, ধর্মাত্মা এবং আমার পিতা। এঁকে বধ করে আমি মহাপাপ করেছি, এখন আমি কী করে উদ্ধার লাভ করব ?' এই বলে অর্জুনকুমার বভ্রুবাহন পুনরায় আচমন করে আমরণ উপবাসের ব্রত নিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

উলূপী তখন সঞ্জীবন-মণিকে স্মরণ করলেন। নাগেদের জীবনের আধারভূত এই মণিকে স্মরণ করতেই সেটি এসে হাজির হল। সেটি হাতে নিয়ে নাগ রাজকুমারী বভ্রুবাহনকে বললেন—'পুত্র ! ওঠো, শোক কোরো না। অর্জুন তোমার দ্বারা পরাস্ত হয়নি। তিনি মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে অজেয়। ইন্দ্রাদি দেবতাও তাঁকে পরাভূত করতে পারেন না। আমি তোমার যশস্বী পিতার প্রিয় কাজ করার জন্য মোহিনী মায়া দেখিয়েছি। তুমি তোমার দ্বারা কৃত কোনো পাপের আশঙ্কা কোরো না। এই মহাত্মা সনাতন নর ঋষি এবং অবিনাশী। নাও, আমি এই দিব্য মণি নিয়ে এসেছি, এটি স্পর্শদ্বারা সর্বদা মৃত সর্পদের জীবিত করে থাকে। এটি তোমার পিতার বুকের ওপর রেখে দাও। এর স্পর্শে তোমার পিতা জীবিত হয়ে যাবেন।'

উলূপীর কথা শুনে অমিত তেজস্বী বভ্রুবাহন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পিতার বুকের ওপর মণিটি রেখে দিলেন। সেটি রেখে দিতেই নিদ্রোত্থিত মানুষের মতো অর্জুন জীবিত হয়ে উঠলেন। মনস্বী পিতাকে সুস্থ হয়ে চৈতন্য ফিরে পেতে দেখে বভ্রুবাহন তাঁর চরণে প্রণাম করলেন। ইন্দ্র সেই সময় অর্জুনের ওপর দিব্যপুষ্প বর্ষণ করলেন। দেবগণ দুন্দুভি না

বাজাতেই মেঘমন্দ্র রবে দুন্দুভিগুলি বেজে উঠল। আকাশে

'সাধুবাদ' শোনা গেল। মহাবাহু অর্জুন সুস্থ হয়ে উঠে বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করে তার মস্তকাঘ্রাণ নিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দৃষ্টি পড়ল কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা উলূপীর সঙ্গে বভ্রুবাহনের মাতার দিকে, যিনি শোকে-দুঃখে অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন। তাঁকে দেখে অর্জুন উলূপীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কল্যাণী ! তুমি এবং বভ্রুবাহনের মাতা এই রণভূমিতে কেন এসেছ ? আমি বা বভ্রুবাহন অজানতে তোমার কোনো ক্ষতি করিনি তো ? রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা তোমার কাছে কোনো অপরাধ করেনি তো ?' তাঁর প্রশ্ন শুনে উলূপী হেসে বললেন—'প্রাণনাথ ! আপনি বা বভ্রুবাহন কোনো অপরাধ করেননি এবং বভ্রুবাহনের মাতাও কোনো অপরাধ করেননি। ইনি তো সর্বদা দাসীর ন্যায় আমার আজ্ঞাধীন থাকেন। এখানে এসে আমি যে সব কাজ করেছি, তা বলছি শুনুন। প্রথমেই আপনার চরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি যে, আমি যেসব অপরাধ করেছি, সেসবই আপনার ভালোর জন্য, তাই আপনি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না। মহাভারতের যুদ্ধে শিখণ্ডীর সাহায্য নিয়ে আপনি যে ভীষ্মকে বধ করেছিলেন, সেই পাপের শান্তির জন্য বসুগণ এক উপায় নির্ধারণ করেন। কিছুদিন পূর্বের কথা, আমি গঙ্গাতীরে গিয়েছিলাম, ভীষ্মের মৃত্যুর পর দেবতা ও বসুগণ সেখানে একত্রে স্নান করতে আসেন। তাঁরা গঙ্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ভয়ংকর কথা বলেন—'দেবী ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যখন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন সব্যসাচী অর্জুন তাঁকে বধ করেন। সেই অপরাধের জন্য আমরা তাঁকে শাপ দিতে চাই (তার জন্য অনুমতি দিন)। একথা শুনে গঙ্গা বললেন—'হ্যাঁ, তেমনই হওয়া উচিত।' তাঁর কথা শুনে আমার অত্যন্ত দুঃখ হল, আমি পাতালে প্রবেশ করে আমার পিতাকে সব ঘটনা জানালাম। তিনি বসুদের কাছে গিয়ে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বারংবার অনুরোধ করায় বসুগণ প্রসন্ন হয়ে বললেন—'মহাভাগ ! মণিপুরের তরুণ রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনের পুত্র। সে সংগ্রাম করে যখন তার বাণে অর্জুনের প্রাণ নাশ করবে, তখন সে এই পাপ থেকে মুক্ত হবে। এখন তুমি ফিরে যাও।' বসুদের কথা শুনে পিতা গৃহে ফিরে এসে আমাকে এই কথা বললেন। তা শুনে আমি সেই অনুযায়ী চেষ্টা করেছি এবং আপনাকে পাপমুক্ত করেছি। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন না। পুত্র তো আপনারই আত্মা, তাই এর হাতেই আপনার পরাজয় হয়েছে।'

উলূপীর কথা শুনে অর্জুন প্রসন্ন হলেন, তিনি বললেন—'দেবী ! তুমি যা করেছ, তাতে আমার অত্যন্ত প্রিয় কাজ হয়েছে।' উলূপীকে এই কথা বলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে শুনিয়ে বভ্রুবাহনকে বললেন—'পুত্র ! আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে। তুমি তোমার দুই মাতা ও মন্ত্রিগণসহ সেখানে আসবে।' পিতার স্নেহপূর্ণ কথায় বভ্রুবাহনের চোখে জল এল। তিনি বললেন—'ধর্মজ্ঞ ! আপনার আদেশে আমি অবশ্যই অশ্বমেধ যজ্ঞে যাব এবং ব্রাহ্মণদের খাদ্য-পরিবেশন করব। এখন একটি প্রার্থনা আছে, আপনি আমার ওপর কৃপা করে দুই ধর্মপত্নীসহ নগরে প্রবেশ করুন, এটিও আপনার গৃহ। এখানে একরাত সুখে বাস করে, আগামীকাল প্রভাতে অশ্বসহ এগিয়ে যাবেন।' সেকথা শুনে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকুমারকে বললেন—'মহাবাহু ! তুমি তো জানো, আমি দীক্ষাগ্রহণ করে বিশেষ নিয়ম পালন করে বিচরণ করছি। তাই যতদিন দীক্ষা পূর্ণ না হয়, ততদিন আমি তোমার নগরে প্রবেশ করতে পারি না। যজ্ঞের ঘোড়া তার ইচ্ছানুসারে চলবে (এর কোথাও থামার নিয়ম নেই), তোমার কল্যাণ হোক, আমি এখন যেতে চাই। আমার থাকার কোনো উপায় নেই।'

তখন বভ্রুবাহন সসম্মানে অর্জুনের পূজা করলেন এবং অর্জুন তাঁর দুই পত্নীর অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে রওনা হলেন।

—০—

অর্জুনের মগধ, চেদি, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশের রাজাদের পরাস্ত করে গান্ধার দেশে পৌঁছানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এরপর সেই ঘোড়া আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা করে ফিরে এল। অর্জুনও তাকে অনুসরণ করে ফিরলেন। পথে রাজগৃহ নামে এক নগর পেলেন। সহদেবের পুত্র মেঘসন্ধি সেখানকার রাজা। তিনি যখন শুনলেন অর্জুন তাঁর নগর প্রান্তে এসেছেন, তখন ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে তিনি যুদ্ধের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রথে করে নগরের বাইরে এলেন। পদব্রজে আসা অর্জুনকে আক্রমণ করে তিনি বললেন—'ভারত ! ঘোড়ার পিছনে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ ? আমি এখনই একে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। শক্তি থাকে তো একে ছাড়িয়ে নাও। আমার পূর্বপুরুষেরা যদি কখনো তোমাকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ না করে থাকে, তাহলে আমি সেই ঘাটতি আজ পূর্ণ করব—আমি আজ তোমাকে বাণের দ্বারা আপ্যায়ন করব। তুমি আগে আমাকে আঘাত করো, তারপর আমি তোমাকে আঘাত করব।'

মেঘসন্ধির কথা শুনে অর্জুন হেসে বললেন—'রাজন্ ! আমার ব্রত হল, যে আমার কাজে বিঘ্ন প্রদান করবে, তাকে আমি বাধা দেব, সুতরাং তুমি পূর্ণ শক্তি দিয়ে আমাকে আঘাত করো।' তাঁর কথা শুনে মগধরাজ মেঘসন্ধি প্রথমে আঘাত করলেন। তিনি অর্জুনের ওপর হাজার হাজার বাণবর্ষণ করলেন ; কিন্তু গাণ্ডীবধারী অর্জুন তাঁর সব বাণ সায়কের দ্বারা টুকরো করে দিলেন। সেই সঙ্গে মেঘসন্ধির ধ্বজা, পতাকা দণ্ড, রথ, যন্ত্র, ঘোড়া এবং রথের অন্যান্য অংশে বহু প্রজ্বলিত বাণ নিক্ষেপ করলেন ; কিন্তু রাজার শরীর এবং সারথির ওপর একটিও বাণ মারলেন না। মগধরাজ মেঘসন্ধি এটি নিজের পরাক্রম মনে করে অর্জুনের ওপর নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই আঘাতে অর্জুন যখন ভীষণভাবে আহত হলেন, তখন তিনি তাঁর ধনুকে জোরে টংকার দিলেন এবং মেঘসন্ধির ঘোড়াগুলিকে বধ করে সারথিরও মাথা কেটে ফেললেন। তারপর ক্ষুরাকৃতি বাণে তাঁর ভীষণ ধনুকটিও কেটে দিলেন এবং হস্তত্রাণ নষ্ট করে তাঁর ধ্বজা এবং পতাকাও কেটে ফেলে দিলেন। মেঘসন্ধি তখন অত্যন্ত পীড়িত হয়ে গদা নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু সামনে আসতেই অর্জুন বহু বাণের আঘাতে তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত গদাটি টুকরো টুকরো করে দিলেন। এইভাবে মেঘসন্ধি যখন রথ, ধনুক, গদা সব থেকেই বঞ্চিত হলেন, তখন অর্জুন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে পূর্ণ পরাক্রম দেখিয়েছ, এখন গৃহে ফিরে যাও। তুমি এখনও বালক। এই যুদ্ধে তুমি যে শৌর্য দেখিয়েছ তা তোমার পক্ষে গৌরবের। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশ হল যে, যুদ্ধে রাজাদের বধ না করা, তাই আমার কাছে অপরাধ করেও তুমি এখনও জীবিত আছো।'

অর্জুনের কথা শুনে মেঘসন্ধির বিশ্বাস হল যে অর্জুন তাঁকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। তখন তিনি অর্জুনের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে তাঁকে সম্মান জানিয়ে বললেন—'বীরবর ! আমি পরাজিত হয়েছি। আপনার কল্যাণ হোক। আমি কী সেবা করব বলুন, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব।' তখন অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'রাজন্ ! আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে তোমার সাদর আমন্ত্রণ রইল।' তাঁর কথায় সহদেবপুত্র 'অতি উত্তম' বলে তাঁর আদেশ মেনে নিলেন এবং অর্জুনকে বিধিবৎ পূজা করলেন। তারপর সেই ঘোড়া পুনরায় তার ইচ্ছানুসারে সমুদ্রতীর ধরে বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশল ইত্যাদি দেশগুলিতে গেল এবং অর্জুনও সেইসব দেশে গিয়ে তাঁর গাণ্ডীব ধনুকের সাহায্যে ম্লেচ্ছাদি বহু সৈন্যকে পরাস্ত করলেন।

তারপর অর্জুন ঘোড়াকে অনুসরণ করে দক্ষিণ দিকে গেলেন। কিছুদিন পর সেদিক থেকে ফিরে সেই স্বেচ্ছাচারী অশ্ব চেদিদেশের রাজধানীতে পৌঁছাল। শিশুপালের পুত্র শরভ সেখানকার রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, পরে পরাস্ত হয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পূজা করলেন। চেদিরাজার পূজা স্বীকার করে সেই উত্তম অশ্ব কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত এবং তঙ্গণ ইত্যাদি দেশে গেল। সেইসব রাজ্যেই অর্জুনের সম্মান অভ্যর্থনা হল। সেখান থেকে তিনি দশার্ণ দেশে গেলেন। তখন সেখানে মহাবলী চিত্রাঙ্গদের রাজা ছিল। তাঁর সঙ্গে অর্জুনের ভয়ংকর যুদ্ধ হল, শেষে তাঁকে পরাস্ত করে তিনি নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে গেলেন। সেখানে একলব্যের পুত্র তাঁকে যুদ্ধের দ্বারা বাধা দিলেন। তখন নিষাদদের সঙ্গে তাঁর

অত্যন্ত রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল এবং অর্জুন বিজয়লাভ করলেন। তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে অশ্ব পুনরায় দক্ষিণ

সমুদ্রের দিকে এগোল। সেদিকেও দ্রাবিড়, অন্ধ্র, রৌদ্র, মাহিষক ও কোলচলের প্রান্তে বাস করা বীরদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হল। তাদের সহজেই পরাজিত করে তিনি অশ্বের সঙ্গে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ এবং প্রভাসক্ষেত্রে গেলেন। সেখান থেকে ঘোড়া বৃষ্ণি বীরদের দ্বারা সুরক্ষিত পরম রমণীয় দ্বারকা নগরীতে পৌঁছাল। সেখানে যেতেই যদুবংশীয় বালকেরা অশ্বটিকে বেঁধে নিয়ে চলল। সেই সময় রাজা উগ্রসেন বসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ছেলেদের ঘোড়া নিয়ে যেতে দেখে তাদের বারণ করলেন। তারপর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন। তারপর অর্জুন উভয়ের অনুমতি নিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ হয়ে পঞ্চনদের দেশে পৌঁছলেন। তাঁর ঘোড়া সেখানে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে করতে গান্ধার দেশে চলে গেল। সেখানে গান্ধাররাজ শকুনির পুত্রের সঙ্গে অর্জুনের ভয়ংকর যুদ্ধ হল।

গান্ধাররাজকে পরাজিত করে অর্জুনের ফিরে আসা, যজ্ঞভূমি নির্মাণ এবং নানা দেশ থেকে আগত রাজাদের যজ্ঞভূমির সাজসজ্জা অবলোকন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! শকুনির পুত্র গান্ধারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর এবং মহারথী ছিলেন। তিনি বিশাল সৈন্যসহ অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। তাঁর সৈনিকেরা শকুনি বধের কথা স্মরণ করে মর্মাহত হয়েছিল। সকলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পার্থকে আক্রমণ করল। পরম ধর্মাত্মা এবং অপরাজেয় বীর অর্জুন তাঁদের শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে যুদ্ধে বিরত থাকতে বললেন এবং যুধিষ্ঠিরের হিতকারক বার্তাও শোনালেন ; কিন্তু তারা ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হওয়ায় তাঁর কথা শুনতে রাজি হল না। বহু যোদ্ধা ঘোড়া নিয়ে চারদিক দিয়ে তাঁকে ধরার জন্য এগিয়ে এল। তা লক্ষ্য করে অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক থেকে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে অনায়াসেই তাদের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। এইভাবে বাণপীড়িত হয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে তীব্রবেগে অর্জুনের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও অর্জুন তাদের মাথা দেহ থেকে আলাদা করতে লাগলেন। চারদিকে যখন গান্ধার সৈন্য সংহার হতে লাগল, তখন শকুনির পুত্র এগিয়ে এসে অর্জুনকে বাধাপ্রদান করলেন। তখন অর্জুন যেভাবে জয়দ্রথের মাথা কেটেছিলেন, সেইভাবে শকুনিপুত্রের শিরস্ত্রাণটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণে কেটে ফেললেন। গান্ধারেরা তা লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং তারা সকলেই এবিষয়ে নিশ্চিত হল যে অর্জুন ইচ্ছা করেই গান্ধাররাজকে হত্যা করেননি। সেই সময় গান্ধাররাজ শকুনিপুত্রও সৈন্যদের সঙ্গে পলায়ন করছিলেন। সমস্ত সেনা হাতি-ঘোড়াসহ এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। অধিকাংশ সৈনিক যুদ্ধে নিহত হল এবং অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এদিক-ওদিক আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত হল।

তখন গান্ধাররাজের মাতা অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রবৃদ্ধ মন্ত্রীদের সঙ্গে করে উত্তম অর্ঘ্য নিয়ে নগরের বাইরে রণভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই তাঁর রণোন্মত্ত পুত্রকে যুদ্ধ থেকে বিরত করলেন এবং অর্জুনের

পূজা করে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। অর্জুনও আপ্যায়ন করে তাঁকে অনুগ্রহ করলেন এবং শকুনিপুত্রকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন—'মহাবাহু ! তুমি যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলে, তা আমার পছন্দ হয়নি ; কারণ তুমি আমার ভ্রাতা। আমি মাতা গান্ধারী এবং পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কথা স্মরণ করে যুদ্ধে তোমাকে উপেক্ষা করেছি, তাই তুমি এখনও জীবিত আছ। শুধু তোমার অনুগামী সৈনিকরাই নিহত হয়েছে। এখন আর আমাদের মধ্যে এরূপ হানাহানির মনোভাব রাখা উচিত নয়। নিজেদের মধ্যে শত্রুতা মিটিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তুমি আর কখনো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা ভেবো না। আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। তুমি অবশ্যই সেই যজ্ঞে উপস্থিত থাকবে।'

গান্ধাররাজকে এই কথা বলে অর্জুন ইচ্ছামতো বিচরণশীল ঘোড়ার পিছনে রওনা হলেন। এবার সেই ঘোড়া হস্তিনাপুরের পথে ফিরতে লাগল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির গুপ্তচরদের মুখে অর্জুনের ফিরে আসার খবর পেলেন। তিনি কুশলে ফিরে আসছেন এবং গান্ধার ও অন্য সব দেশেও তিনি অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছেন—এই কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের আনন্দের সীমা রইল না। সেদিন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি এবং উত্তম নক্ষত্রযোগ ছিল, একথা জেনে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাগণ ভীম, নকুল, সহদেবকে ডেকে ভীমকে সম্বোধন করে বললেন—'ভীমসেন তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসছে। এদিকে যজ্ঞ আরম্ভের সময় সমাগত। মাঘ পূর্ণিমা এসে গেল, মধ্যে শুধু ফাল্গুন মাস বাকি। সুতরাং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পাঠিয়ে অশ্বমেধযজ্ঞের জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করো।' তাঁর কথা শুনে ভীম তখনই রাজাজ্ঞা পালন করলেন। অর্জুনের ফিরে আসার সংবাদে তিনিও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তারপর ভীমসেন যজ্ঞকর্মকুশল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে কুশল কারীগরসহ নগরের বাইরে গিয়ে শালবৃক্ষ পরিবৃত সুন্দর স্থান ঠিক করে সেটি চারদিক থেকে সুরক্ষিত কিনা দেখে নিলেন। তারপর সেখানে উত্তম পথ ও সুশোভিত যজ্ঞভূমি তৈরি করালেন। সেই ভূমিতে বহু মহল নির্মিত হল, তার দেওয়ালগুলি রত্ন দ্বারা সুশোভিত। যজ্ঞশালা স্বর্ণ ও রত্নে সুসজ্জিত করা হল, সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং বিশাল তোরণ লাগান হল। ধর্মাত্মা ভীম যজ্ঞমণ্ডপের সকল স্থানে শুদ্ধ স্বর্ণ ব্যবহার করলেন। তিনি অন্তঃপুরের নারী, দেশ-বিদেশের রাজা এবং ব্রাহ্মণদের থাকার জন্য নানা উত্তম ভবন তৈরি করলেন। সেসবই শাস্ত্রবিধি অনুসারে নির্মিত হল।

এই সব কার্য সমাধা করে ভীমসেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে বিভিন্ন রাজাদের নিমন্ত্রণের জন্য দূত পাঠালেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজাগণ নানা রত্ন, নারী, ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। এইসব নবাগত অতিথিদের জন্য যুধিষ্ঠির অন্ন, পান ও সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা করেছিলেন। ধর্মরাজের সেই মহান যজ্ঞে বহু ব্রহ্মবাদী মুনি পদার্পণ করেন। উত্তম ব্রাহ্মণগণ তাঁদের শিষ্যসহ এলেন। মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির রাজকার্য ত্যাগ করে স্বয়ং তাঁদের আপ্যায়ন এবং যতক্ষণ তাঁদের যোগ্য স্থান নির্ধারিত না হয়, ততক্ষণে তাঁদের সঙ্গে থাকলেন। তারপর কারিগর এসে যজ্ঞমণ্ডপ তৈরি হওয়ার খবর দিলে তিনি ভ্রাতাগণসহ অত্যন্ত খুশি হলেন।

তারপর যজ্ঞে আসা রাজাগণ ভীম দ্বারা নির্মিত যজ্ঞমণ্ডপের সুন্দর সাজসজ্জা ঘুরে দেখতে লাগলেন। তাঁরা স্বর্ণনির্মিত তোরণ, শয্যা, বিহার, বস্ত্রসামগ্রী, বাসন সব দেখলেন। সেখানে এমন কোনো জিনিস ছিল না যা স্বর্ণ নির্মিত নয়। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কাষ্ঠযূপও স্বর্ণবেষ্টিত ছিল। এইসব দেখে রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের জন্য স্বাদু অন্নে ভাণ্ডার ভর্তি ছিল। প্রত্যহ এক লাখ ব্রাহ্মণ খাওয়ার পর বারংবার ঘণ্টা বাজানো হত, প্রতিদিন এইভাবে ধর্মরাজের যজ্ঞের আয়োজন সম্পন্ন হত। অন্নের পর্বত, দধির সরোবর এবং ঘৃতের পুকুর তৈরি হয়েছিল। বহু দেশের লোক সেই মহাযজ্ঞে একত্র হয়েছিল। হাজার প্রকারের জাতি বিভিন্ন পাত্রে দান গ্রহণের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল। হাজার হাজার ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের খাদ্য পরিবেশন করত। সেখানে ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত আহার পরিবেশন করা হত।

শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের সংবাদ প্রদান, অর্জুনের হস্তিনাপুরে আগমন এবং উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা সহ বভ্রুবাহনের আগমন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠির তাঁর ওখানে অনেক বেদজ্ঞ রাজাকে উপস্থিত দেখে ভীমকে বললেন—'ভ্রাতা ! এখানে যেসব রাজা পদার্পণ করেছেন, তাঁরা সকলেই শ্রেষ্ঠ ও পূজার যোগ্য, সুতরাং তুমি তাঁদের যথোচিত আপ্যায়ন করো।' রাজার নির্দেশে মহাতেজস্বী ভীমসেন নকুল এবং সহদেবকে সঙ্গে করে যজ্ঞস্থলে এসে রাজাদের আদর-আপ্যায়ন করতে লাগলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে সম্মুখে রেখে সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, গদ, নিশঠ, শাম্ব এবং কৃতবর্মা প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়দের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। ভীমসেন তাঁদেরও বিধিমতো আপ্যায়ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বসে কিছুক্ষণ কথা বললেন এবং জানালেন—'রাজন্ ! আমার কাছে দ্বারকাবাসী এক বিশ্বাসী ব্যক্তি এসেছিল, সে অর্জুনকে নিজ চক্ষে দেখেছে। অর্জুন বহুস্থানে যুদ্ধ করায় অত্যন্ত ক্লান্ত। সে বলেছে অর্জুন নগরের কাছে এসে গেছে, সুতরাং আপনি এবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আবশ্যক কর্ম আরম্ভ করুন।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'মাধব ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে অর্জুন কুশলপূর্বক ফিরে এসেছে। তিনি যেসব খবর দিয়েছেন, আমি আপনার কাছ থেকে সব শুনতে চাই।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহারাজ ! আমার কাছে যে এসেছিল, সে অর্জুনের কৃতিত্ব স্মরণ করে আমাকে বলেছিল—'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমার কথাগুলি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রায় সকল রাজাই আসবেন ; যাঁরা আসবেন, তাঁদের সকলেরই ভালোমতো আপ্যায়ন করা উচিত। সেটিই আমাদের উপযুক্ত কাজ। রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্য প্রদানের সময় যে দুর্ঘটনা হয়েছিল, তেমন এবার হওয়া উচিত নয়। রাজা যুধিষ্ঠির এবং আপনি পরামর্শ করে এমন উপায় ঠিক করুন, যাতে রাজারা দ্বেষবশত একে অপরের প্রজা সংহার না করেন।' রাজন্ ! সেই ব্যক্তি অর্জুনের বলা আরও একটি কথা বলেছে, তা হল—'এই যজ্ঞে আমার পুত্র মহাতেজস্বী, মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহনেরও আসার কথা। আমার প্রতি তার অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরক্তি, সে এলে তাকে আমার থেকে বেশি আদর-যত্ন করবেন।'

অর্জুনের সংবাদ শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—'ভগবান ! আপনি যে প্রিয় সংবাদ শোনালেন, তা আমি মন দিয়ে শুনলাম। আপনার অমৃতময় কথা আমার মনকে আনন্দমগ্ন করে তোলে। আমি শুনেছি যে বিভিন্ন দেশের রাজাদের সঙ্গে অর্জুনকে কয়েকবার যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর কারণ কী ? আমি একাকী যখন অর্জুনের কথা চিন্তা করি তখন মনে হয় যে, সর্বাধিক দুঃখের ভাগী অর্জুনই। সে সর্বশুভলক্ষণসম্পন্ন, তবুও তার মধ্যে কী অশুভ লক্ষণ আছে, যার জন্য তাকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয় !'

যুধিষ্ঠিরের এবংবিধ জিজ্ঞাসায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তা করে উত্তর দিলেন—'রাজন্ ! অর্জুনের পায়ের পেশী সাধারণের থেকে কিছু স্থূল, এছাড়া আর কোনো অশুভ লক্ষণ তাঁর শরীরে আমি দেখি না। পদপেশী স্থূল হওয়ায় তাঁকে সর্বদা পথ চলতে হয়। তাঁর দুঃখভোগের আর কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না।' অর্জুনের সম্বন্ধে নানা কথা শুনে ভীমসেনাদি পাণ্ডব এবং যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রসন্ন হচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে যখন অর্জুন-বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, তখনই অর্জুন প্রেরিত দূত এসে পৌঁছাল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সে অর্জুনের আসার সংবাদ দিল। তার কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল এবং তিনি এই প্রিয় খবর নিবেদন করার জন্য দূতকে বহু ধন পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। পরদিন প্রভাতে অর্জুন এসে পৌঁছলেন। চারদিকে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হওয়ায় কোলাহল শুরু হয়ে গেল। যজ্ঞের ঘোড়ার গা থেকে ধুলো উড়তে লাগল এবং সেই ঘোড়া সকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবার মতো শোভা পেতে লাগল। লোকের মুখে নানা আনন্দদায়ক কথা অর্জুন শুনতে লাগলেন, তাঁরা বলছিলেন—'পার্থ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে তুমি কুশলে ঘোড়া নিয়ে ফিরেছ। তোমাকে পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য। তুমি ব্যতীত আর কে এইভাবে ঘোড়া নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর রাজাদের পরাস্ত করে ফিরে আসতে পারত ? অতীতকালে যে সগর প্রমুখ রাজা জন্মেছিলেন, তাঁরাও যে কখনো এরূপ বীরত্বের কাজ করেছিলেন, তা আমরা

শুনিনি।'

লোকেদের এইসব কথা শুনতে শুনতে অর্জুন যজ্ঞশালার দিকে গেলেন। তখন মন্ত্রীসহ রাজা যুধিষ্ঠির, যদুনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। কাছে এসে অর্জুন প্রথমে পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্র এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম করলেন। তারপর ভীমসেন ও অন্যান্যদের বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁরা সকলে একত্রে অর্জুনকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন, অর্জুনও সকলকে বিধিমতো সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারপর তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন। সেইসময় বভ্রুবাহন তাঁর দুই মাতাসহ সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি কুরুকুলের প্রবৃদ্ধ ব্যক্তিদের এবং অন্য রাজাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম করে তাঁদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তারপর তিনি তাঁর পিতামহী কুন্তীর সুন্দর মহলে গেলেন।

বভ্রুবাহন ও অন্যাদের আপ্যায়ন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহলে প্রবেশ করে বভ্রুবাহন মিষ্ট বাক্য বলে তাঁর পিতামহীকে প্রণাম

করলেন। তারপর দেবী চিত্রাঙ্গদা এবং উলূপীও বিনীতভাবে কুন্তী ও দ্রৌপদীর চরণ স্পর্শ করলেন। পরে সুভদ্রা এবং কুরুকুলের অন্য নারীদেরও যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। কুন্তী তাঁদের দুজনকে নানা রত্ন উপহার দিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য নারীগণও তাঁদের নানা উপহার দিলেন। তারপর দুই দেবী বহুমূল্য শয্যায় আসীন হলেন। কুন্তী তাঁদের সাদর আপ্যায়ন করলেন। মহাতেজস্বী বভ্রুবাহন কুন্তীর কাছে আদর পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম জানালেন। তারপর তিনি রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন প্রমুখ সকল পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বিনয়পূর্বক অভিবাদন করলেন। তাঁরা সকলেই সস্নেহে তাঁকে আলিঙ্গন ও যথোচিত আপ্যায়ন করেন। এইভাবে তিনি প্রদ্যুম্নের ন্যায় বিনীতভাবে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এক বহুমূল্য রথ প্রদান করলেন, সেই রথ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত, অতি উত্তম ও সকলের দ্বারা প্রশংসিত। তাতে দিব্য ঘোড়া সংযুক্ত ছিল। তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলে পৃথক-পৃথকভাবে বভ্রুবাহনকে আপ্যায়ন করে তাকে বহু ধন প্রদান করলেন।

এর তৃতীয় দিনে সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন—"কুন্তীনন্দন ! তুমি আজ থেকে যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও, যজ্ঞের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত। যাজকেরা তোমাকে আহ্বান করছেন। তোমার এই যজ্ঞে কোনো কিছু ঘাটতি থাকবে না, অঙ্গহীন হবে না, সেইজন্য একে 'অহীন' (সর্বাঙ্গপূর্ণ) বলা হবে। এই যজ্ঞে সুবর্ণ দ্রব্যের আধিক্য, তাই এটি 'বহুসুবর্ণক' নামে বিখ্যাত হবে। মহারাজ ! যজ্ঞের প্রধান কারণ হল ব্রাহ্মণ, সুতরাং তুমি তাঁদের তিনগুণ দক্ষিণা প্রদান করবে ; তাহলে তুমি তিন অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হবে এবং জ্ঞাতিবধের পাপ থেকেও তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এই যজ্ঞের শেষে তুমি যে অবভৃথ-স্নান করবে, তা পরম পবিত্র এবং পাপ নাশক হবে।"

মহর্ষি ব্যাসের কথা শুনে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের সাফল্যের উদ্দেশ্যে সেই দিন দীক্ষাগ্রহণ করলেন এবং বহু অন্নদক্ষিণাযুক্ত, সমস্ত কামনা ও গুণসম্পন্ন সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। বেদজ্ঞাতা এবং সমস্ত বিধি জানা

যাজকেরাই সর্ব কর্ম সম্পন্ন করালেন। তাঁরা সবদিকে ঘুরে ঘুরে সুপরামর্শ দিচ্ছিলেন। তাঁরা যজ্ঞে কোনোপ্রকার ভুল করেননি, কোনো কাজ অসম্পূর্ণ করে রাখেননি। প্রত্যেক কাজ ক্রম অনুসারে এবং যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করছিলেন। সোমরস পানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সোমলতার নির্যাস বার করে প্রাতঃসেবন ইত্যাদি কর্ম ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে আগত কোনো ব্যক্তিই দীন, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত বা দুঃখী থাকেনি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে মহাতেজস্বী ভীমসেন ভোজনার্থীদের সেবায় সর্বদা তটস্থ থাকতেন। যজ্ঞবেদী নির্মাণে নিপুণ যাজকগণ প্রত্যহ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করতেন। সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী সকলেই বেদের ছটি অঙ্গে পারঙ্গম, ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনকারী, অধ্যাপনাকার্যে কুশল এবং বাদ-বিবাদে প্রবীণ ছিলেন।

তারপর যখন যূপস্থাপনের সময় হল তখন যাচকেরা যজ্ঞভূমিতে বেলের ছটি, খয়েরের ছটি, পলাশের ছটি, দেবদারুর দুটি এবং লসোড়ার (একটি বৃক্ষবিশেষ) একটি—এইভাবে একুশটি যূপ (হাড়িকাঠ) প্রতিষ্ঠা করলেন। এতদ্ব্যতীত ধর্মরাজের নির্দেশে ভীমসেন যজ্ঞের শোভাবৃদ্ধির জন্য আরও অনেক সুবর্ণময় যূপ সেখানে স্থাপন করলেন। যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করার জন্য সোনার ইঁট তৈরি করা হয়েছিল। সেই ইঁটের দ্বারা যখন বেদী নির্মাণ করা হল, তখন তা দক্ষ-প্রজাপতির বেদীর ন্যায় শোভা পেতে লাগল। সেই যজ্ঞমণ্ডপে অগ্নিচয়নের জন্য চারটি জায়গা তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলি আঠারো হাত করে দীর্ঘ। তার আকার গরুড়ের মতো, তাতে সোনার পাখা লাগানো ছিল। সেই বেদীর ওপর ত্রিকোণ কুণ্ড নির্মিত ছিল। তাতেই অগ্নিস্থাপনের কাজ হত। কিম্পুরুষ এবং কিন্নরগণ যজ্ঞশালার শোভাবর্ধন করছিলেন। চারদিকে সিদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল। ব্যাসদেবের শিষ্য, যিনি সমস্ত শাস্ত্রাদির প্রণেতা এবং যজ্ঞকর্মে কুশল, তিনি এই যজ্ঞের সদস্য ছিলেন। দেবর্ষি নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও গীতবাদ্যে কুশল অন্যান্য গন্ধর্বগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নৃত্য-গীত পারদর্শী গন্ধর্বগণ প্রত্যহ যজ্ঞকার্য সমাপ্ত হলে তাঁদের কলা চাতুর্যে ব্রাহ্মণদের মনোরঞ্জন করতেন।

—o—

যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা প্রদান এবং রাজাদের উপহার দিয়ে বিদায় জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইভাবে ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পূর্ণ হল। শিষ্যসহ ভগবান ব্যাসদেব তাঁকে 'অভ্যুদয়' হওয়ার আশীর্বাদ জানালেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের সম্মানে এক হাজার কোটি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে ব্যাসদেবকে সমগ্র পৃথিবী দান করলেন। সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সেই দান স্বীকার করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবী পুনরায় তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমাকে এর মূল্য দাও ; কারণ ব্রাহ্মণ ধন অভিলাষী হয় (রাজ্য নয়)।' তারপর মহামনা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন—'অশ্বমেধ-যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা দেওয়ার বিধান আছে। তাই অর্জুন দ্বারা জয় করা এই সমগ্র পৃথিবী আমি ঋত্বিকদের দান করেছি, এবার আমি বনে চলে যাব। আপনারা চাতুর্হোত্র বিধি অনুসারে এটি চার ভাগে ভাগ করে নিন। আমি ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি নিতে চাই না। আমার ভ্রাতাদের চিন্তাধারাও এইরূপই।'

যুধিষ্ঠির একথা বলায় ভীমসেন ও অন্য ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী একসুরে বললেন—'হ্যাঁ, মহারাজের কথা একদম ঠিক।' এই মহান ত্যাগের কথা শুনে সকলের রোমাঞ্চ হল। সেইসময় আকাশবাণী শোনা গেল—'পাণ্ডবগণ ! তোমরা ধন্য।' সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁদের সৎসাহসের প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন ভগবান ব্যাসদেব ব্রাহ্মণদের মধ্যে এসে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করে বললেন—'রাজন্ ! তুমি তো এই পৃথিবী আমাকে দান করেছ। এখন আমি একে ফিরিয়ে দিচ্ছি। এর পরিবর্তে ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ প্রদান করো এবং পৃথিবী তোমার কাছে রাখো।' তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ ! ভগবান ব্যাসদেব যে আদেশ করেন, সেই অনুযায়ী আপনার কাজ করা উচিত।' তাঁর কথা শুনে ভ্রাতাগণসহ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক কোটির তিনগুণ দক্ষিণা দিলেন। মহারাজ মরুত্তের পথ অনুসরণকারী রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় যেরূপ মহান ত্যাগ করেছিলেন, জগতে

তাঁর মতো তেমন ত্যাগ আর কেউ করতে পারেন না। মহর্ষি ব্যাস সেই সুবর্ণ রাশি নিয়ে ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিলেন এবং তাঁরা সেটি চার ভাগ করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন ; এইভাবে পৃথিবীর মূল্যরূপে স্বর্ণদান করে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণসহ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁদের সমস্ত পাপ বিনাশ হল এবং তাঁরা স্বর্গের অধিকার লাভ করলেন। ঋত্বিকেরা যে স্বর্ণসম্ভার লাভ করেছিলেন তা অত্যন্ত আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। যজ্ঞশালাতেও যা কিছু স্বর্ণের বাসন-ইঁট-গহনা ইত্যাদি ছিল সেগুলিও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। ব্রাহ্মণেরা নেবার পরে যে ধন সেখানে পড়ে থাকল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ম্লেচ্ছ জাতির লোকেরা সেগুলি নিয়ে নিল। সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল। সেই বিশাল সুবর্ণরাশির মধ্যে ভগবান ব্যাসের জন্য যে ভাগ প্রদত্ত ছিল, তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তা কুন্তীকে উপহার দিলেন। শ্বশুর কর্তৃক স্নেহপূর্বক প্রাপ্ত সেই ধন নিয়ে কুন্তীদেবী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কুন্তী সেই ধনরাশির দ্বারা বড় বড় পুণ্যকর্ম করলেন। যজ্ঞের শেষে অবভৃথ-স্নান করে পাপরহিত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে এমন শোভা পেতে লাগলেন যেন দেবতা পরিবৃত ইন্দ্র। পাণ্ডবেরা তারপর যজ্ঞে সমাগত রাজাদের নানাপ্রকার রত্ন, হাতি, ঘোড়া, বস্ত্র, অলংকার, স্বর্ণ উপহার দিলেন। রাজা বভ্রুবাহনকে বহু ধন দিয়ে বিদায় জানালেন। তারপর তাঁদের ভগিনী দুঃশলার প্রসন্নতার নিমিত্ত তাঁর পৌত্রকে সিন্ধুদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে সকল রাজাকে ধনরত্ন দিয়ে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করে বিদায় জানালেন। তারপর তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাবলী বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকল বৃষ্ণি বীরদের বিধিমতো পূজা করে তাদের দ্বারকা যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হল। এই যজ্ঞে অন্ন, ধন ও রত্নের পাহাড় হয়েছিল। কয়েকটি ঘৃতের পুকুর তৈরি হয়েছিল। রসের নদী প্রবাহিত হয়েছিল। যার যা ইচ্ছা, তাকে সেই বস্তু প্রদান করা হবে এবং সকলে ইচ্ছানুযায়ী আহার করবে—দিন রাত এই ঘোষণা করা হত। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞে জলের মতো ধনরত্নাদি দান করেছিলেন। সর্ব প্রকার কামনা, রত্ন, রস বর্ষণ করে, পাপরহিত ও কৃতার্থ হয়ে তিনি নিজ নগরে প্রবেশ করলেন।

—— ০ ——

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে এক নেউল-কর্তৃক উঞ্ছবৃত্তি পালনকারী ব্রাহ্মণের এক সের ছাতুদানের মহিমা জানানো

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! আমার প্রপিতামহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যদি কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা হয়ে থাকে, তবে কৃপা করে সেটি আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হল, সেই সময় এক অত্যন্ত উত্তম ও মহা আশ্চর্যের ঘটনা সংঘটিত হয়, তা বলছি শোনো—সেই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, আত্মীয়কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, রাজা, অন্ধ, দীনদরিদ্র সকলে তৃপ্ত হলে যুধিষ্ঠিরের মহান দানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর ওপর পুষ্প বর্ষণ হতে লাগল। সেই সময় সেখানে এক নেউল এল। তার চক্ষু নীল এবং দেহের একাংশ সোনার। সে এসেই বজ্রের ন্যায় ভয়ংকর আওয়াজ করে সমস্ত মৃগ ও পক্ষীকুলকে ভীত সন্ত্রস্ত করল। তারপর মানুষের ভাষায় বলল—'রাজাগণ ! তোমাদের এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্র নিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের এক সের ছাতু দানেরও সমকক্ষ হতে পারেনি।'

নেউলের কথা শুনে সমস্ত ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—'নকুল ! এই যজ্ঞে তো সাধুব্যক্তিদেরই সমাগম হয়েছে, তুমি কোথা থেকে এসেছ ? তোমার মধ্যে কী ক্ষমতা এবং কত শাস্ত্রজ্ঞান আছে ? তুমি কার আশ্রয়ে থাক, আমরা কীভাবে তোমার পরিচয় জানব ? তুমি কীসের জন্য আমাদের এই যজ্ঞের নিন্দা করছ ? আমরা নানাপ্রকার যজ্ঞ সামগ্রী একত্রিত করে শাস্ত্রবিধি মেনে এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ

করেছি। শাস্ত্র এবং ন্যায়ানুসারে প্রত্যেক কর্তব্য-কর্ম পালন করা হয়েছে। পূজ্য ব্যক্তিদের বিধিমতো পূজা করা হয়েছে, মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়েছে এবং ঈর্ষারহিত হয়ে দানযোগ্য বস্তু দান করা হয়েছে। এখানে নানা প্রকার দানের দ্বারা ব্রাহ্মণদের, উত্তম যুদ্ধের দ্বারা ক্ষত্রিয়দের, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃপুরুষদের, রক্ষার দ্বারা বৈশ্যদের, সমস্ত কামনা পূর্ণ করে উত্তম নারীদের, দয়ার দ্বারা শূদ্রদের, দান থেকে বেঁচে যাওয়া বস্তুদ্বারা অন্য মানুষদের এবং রাজার শুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা জ্ঞাতি ও কুটুম্বদের সন্তুষ্ট করা হয়েছে। তেমনই পবিত্র হবিষ্যের দ্বারা দেবতাদের এবং রক্ষার ভার নিয়ে শরণাগতদের প্রসন্ন করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও তুমি কী দেখেছ এবং শুনেছ, যার জন্য এই যজ্ঞের নিন্দা করছ ? তুমি আমাদের কাছে সত্য করে বলো ; কারণ তোমাকে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে এবং তুমি দিব্যরূপ ধারণ করে আছো। এখন তুমি ব্রাহ্মণদের সমাবেশে রয়েছ, সুতরাং আশা রাখি তুমি অবশ্যই আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবে।'

ব্রাহ্মণেরা তাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করলে, নেউল হেসে বলল—'বিপ্রবৃন্দ ! আমি মিথ্যা বা অহংকার করে কোনো কথা বলিনি। আমি বলেছি যে, ''আপনাদের এই যজ্ঞ উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পাদিত এক সের ছাতুদানের সমকক্ষ নয়'' তার কারণ অবশ্যই আপনাদের জানানো উচিত। এখন আমি যা বলছি শান্ত হয়ে শুনুন। কুরুক্ষেত্র নিবাসী উঞ্ছবৃত্তিধারী দানশীল ব্রাহ্মণের সম্পর্কে আমি যা দেখেছি এবং অনুভব করেছি, তা অতি উত্তম এবং অদ্ভুত। সেই ব্রাহ্মণের দ্বারা ন্যায়ত প্রাপ্ত সামান্য অন্নদানও অত্যন্ত উত্তম ফল প্রদান করেছে। সেই প্রসঙ্গই আপনাদের জানাচ্ছি। কিছুদিন আগের কথা, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, যেখানে বহু ধর্মজ্ঞ মহাত্মা বাস করতেন, সেখানে কোনো এক ব্রাহ্মণও বাস করতেন। তিনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাই জীবন-নির্বাহ করতেন। পায়রার মতো অন্নের দানা খুঁটে আনতেন এবং তার দ্বারাই পরিবার প্রতিপালন করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে থেকে তপস্যায় রত থাকতেন। ব্রাহ্মণ দেবতা শুদ্ধ আচার-বিচারসম্পন্ন, ধর্মাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি প্রত্যহ দিনের ষষ্ঠ ভাগে স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূর সঙ্গে আহার করতেন। যদি কোনোদিন আহার সংগ্রহ না হত, তাহলে পরদিন সেই একই সময়ে আহার করতেন। একবার সেখানে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ব্রাহ্মণের তো সংগ্রহে কোনো অন্ন ছিল না, খেতের অন্নও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর খাদ্যবস্তুর খুবই অভাব হল। দিনের ষষ্ঠ ভাগ অতীত হয়ে যেত ; কিন্তু তাঁদের খাদ্য সংগৃহীত হত না। সকলেই অনাহারে থাকতে লাগলেন। এক জ্যৈষ্ঠের শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহরে সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ ক্ষুধা এবং গরমের কষ্ট সহ্য করেও অন্নের সন্ধানে বার হলেন। ক্ষুধা ও পরিশ্রমে ব্যাকুল হয়ে নানা স্থানে ঘুরলেও এককণা খাদ্যও তিনি জোটাতে পারলেন না। অন্য দিনের মতো সেই দিনও সপরিবারে অনাহারে কাটালেন। ধীরে ধীরে তাঁদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হতে লাগল। এরমধ্যে একদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে তাঁরা সেরখানেক যব সংগ্রহ করলেন। সেই যব থেকে ছাতু তৈরি করে নিত্য জপ ও নিয়মাদি অনুষ্ঠান করে, অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে সেই ছাতু সকলে অল্প অল্প ভাগ করে আহারে বসলেন। এরমধ্যে এক অতিথি ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। অতিথিকে দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন। তাঁকে প্রণাম করে কুশল সংবাদ নিলেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলেই বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধালু, দোষদৃষ্টিবর্জিত, ক্রোধজয়ী, সজ্জন, ঈর্ষাভাবরহিত এবং ধর্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা অভিমান, অহংকার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণকে নিজ ব্রহ্মচর্য ও গোত্র পরিচয় প্রদান করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সেই উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ বললেন—'ব্রাহ্মণদেবতা ! আপনার জন্য পাদ্য,

অর্ঘ্য ও আসন রয়েছে এবং ন্যায়ত উপার্জিত এই পরম পবিত্র ছাতু আপনার জন্য রয়েছে। প্রসন্ন মনে এটি আপনাকে অর্পণ করছি, আপনি গ্রহণ করুন।'

তাঁর কথা শুনে অতিথি এক ভাগ ছাতু নিয়ে খেলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ক্ষুধা তৃপ্ত হল না। ব্রাহ্মণ দেখলেন অতিথি তখনও ক্ষুধার্ত রয়েছেন। তখন তিনি ভাবলেন 'এঁকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায় ?' তিনি তাঁর আহারের কথা ভাবতে লাগলেন। তখন ব্রাহ্মণ পত্নী বললেন—'নাথ ! আপনি অতিথিকে আমার ভাগটুকুও দিয়ে দিন। আমার অংশটুকু খেয়ে উনি তৃপ্তি লাভ করবেন।' নিজ পতিব্রতা পত্নীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ তাঁর অবস্থা চিন্তা করলেন। তিনি নিজে ক্ষুধায় যে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার দ্বারা অনুমান করতে কষ্ট হল না যে 'এই বেচারি নিজেই ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে।' তাছাড়া সেই তপস্বিনী বৃদ্ধা, ক্লান্ত ও অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তাঁর দেহ শুধু চর্মসার এবং দুর্বলতার কারণে সর্বদা কম্পমান ছিল। তাই অত্যন্ত ক্ষুধাতুর জেনে ব্রাহ্মণ তাঁর অংশের ছাতু নেওয়া উচিত বলে মনে করলেন না। অতএব তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন—'কল্যাণী ! কীট, পতঙ্গ, পশুদেরও নিজ স্ত্রীকে রক্ষা ও পালন-পোষণ করা কর্তব্য। পুরুষ হয়েও যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর দ্বারা নিজের পালন পোষণ ও সংরক্ষণ করে, সে দয়ার পাত্র। সে উজ্জ্বল কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং তার উত্তম লোক লাভ হয় না। ধর্ম, কাম ও অর্থসম্বন্ধীয় কাজ, সেবা-শুশ্রূষা, বংশ-পরম্পরা রক্ষা, পিতৃ কার্য এবং স্বধর্মের অনুষ্ঠান—এ সবই স্ত্রীর অধীন। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে রক্ষা করতে অক্ষম, সে জগতে মহা অপযশের ভাগী হয় এবং পরলোকে নরক গমন করে।'

পতির কথা শুনে ব্রাহ্মণী বললেন—'প্রাণনাথ ! আমাদের দুজনের ধর্ম ও অর্থ একই ; সুতরাং আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে আমার অংশের ছাতু অতিথিকে দিয়ে দিন। নারীর সত্য, ধর্ম, রতি, নিজ গুণের দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গ এবং সমস্ত অভিলাষ পতিরই অধীন। মাতার রজ এবং পিতার বীর্য—এই দুইয়ের মিলনেই বংশ পরম্পরা চলে থাকে। স্ত্রীর কাছে পতিই সব থেকে বড় দেবতা। স্ত্রী যে রতি ও পুত্ররূপ ফল প্রাপ্ত করে, তা পতিরই প্রসাদ। আপনি পালনকারী হওয়ায় পতি, ভরণ-পোষণ করায় ভর্তা এবং পুত্র প্রদান করায় বরদাতা ; সুতরাং আমার ভাগের ছাতু অতিথিদেবকে অর্পণ করুন। আপনিও তো জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ, ক্ষুধাতুর, অত্যন্ত দুর্বল, উপবাস দ্বারা ক্লান্ত এবং ক্ষীণকায় হয়ে গেছেন (তাই আপনি যেভাবে ক্লেশ সহ্য করছেন, আমিও সেইভাবে কষ্ট সহ্য করে নেব।)'

পত্নীর এবংবিধ কথা শুনে ব্রাহ্মণ ছাতু নিয়ে অতিথিকে বললেন—'দ্বিজবর ! এই ছাতুও গ্রহণ করুন।' অতিথি সেই ছাতুও খেয়ে নিলেন ; কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তা লক্ষ্য করে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত চিন্তিত হলেন।

তখন তাঁর পুত্র বললেন—'পিতা ! আমার ছাতু নিয়ে ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি একেই পুণ্য বলে মনে করি, তাই এই কথা বলছি। আমার সর্বদা আপনাকে পালন করা উচিত ; কারণ সাধু-ব্যক্তিরা সর্বদাই বৃদ্ধ পিতার পালন-পোষণের ইচ্ছা করে থাকে। শ্রুতির এই নির্দেশ ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ (সুতরাং আপনি এই ছাতু না দেওয়ার কথা চিন্তা করবেন না)।'

পিতা বললেন—পুত্র তুমি হাজার বৎসর বয়স্ক হলেও আমার কাছে বালকই থাকবে, পিতা পুত্রের জন্ম দিয়েই নিজেকে কৃতকৃত্য বলে মনে করে। আমি জানি অল্পবয়স্কদের ক্ষুধা অধিক হয় ; আমি তো বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত হলেও প্রাণধারণ করতে সক্ষম। জীর্ণ অবস্থা হওয়ায় আমার ক্ষুধায় অধিক কষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করেছি, সুতরাং আমার মৃত্যু-ভয় নেই। তুমি এই ছাতু খেয়ে প্রাণধারণ করো।

পুত্র বলল—পিতা ! আমি আপনার পুত্র ! পুরুষের ত্রাণ করার জন্যই সন্তানকে 'পুত্র' বলা হয়। এছাড়া পুত্রকে পিতার নিজ আত্মা বলা হয় ; সুতরাং আপনি আপনার

আত্মভূত পুত্রের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করুন।

পিতা বললেন—পুত্র ! তুমি রূপ, সদাচার ও ইন্দ্রিয় সংযমে আমারই সমকক্ষ। তোমার এই সব গুণ আমি অনেক বার পরীক্ষা করেছি। তোমার ছাতু আমি অতিথিকে প্রদান করছি।

একথা বলে ব্রাহ্মণ প্রসন্ন মনে ছাতু নিয়ে হাসতে হাসতে অতিথিকে পরিবেশন করলেন। সেটি গ্রহণ করেও অতিথি দেবতার ক্ষুধা নিবৃত্তি হল না। তা লক্ষ্য করে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ মহাসংকটে পড়লেন। তাঁর পুত্রবধূও অত্যন্ত সুশীলা ছিল। সে শ্বশুরের মনের অবস্থা বুঝে গেল এবং প্রিয় কাজ করার জন্য ছাতু নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে প্রসন্ন বদনে বলল—'পিতা ! আপনি আমার অংশের ছাতু নিয়ে ব্রাহ্মণ দেবতাকে নিবেদন করুন।'

শ্বশুর বললেন—'মা ! তুমি পতিব্রতা, এমনিই তোমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমার দেহলাবণ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্রত ও আচার পালন করে তুমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছ। ক্ষুধার কষ্টে তোমার চিত্ত ব্যাকুল, এই অবস্থায় আমি কী করে তোমার অংশের ছাতু নেব ? এতে আমার ধর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। তুমি প্রত্যহ শৌচ, সদাচার ও তপস্যায় প্রবৃত্ত থেকে দিনের ষষ্ঠ ভাগে আহার কর। আজ অন্ন না পাওয়ায় আমি কীকরে তোমাকে উপবাস করতে দেখব ? তুমি ক্ষুধায় কাতর এক অবলা বালিকা, উপবাস করে ক্লান্ত, তুমি সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-পরিজনকে সর্বদা সুখী রাখ, তাই তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।'

পুত্রবধূ বললেন—'ভগবন্ ! আপনি আমার গুরুরও গুরু এবং দেবতারও দেবতা, সুতরাং আমার নিবেদন করা ছাতু গ্রহণ করুন। আমার শরীর, প্রাণ, ধর্ম সবই বড়দের সেবার জন্য। আপনি প্রসন্ন হলেই আমি উত্তম লোক লাভ করব, সুতরাং আপনি আমাকে আপনার একান্ত ভক্ত অথবা কৃপাপাত্র মনে করে অতিথিকে দেবার জন্য এই ছাতু গ্রহণ করুন।'

শ্বশুর বললেন—'পুত্রী ! তুমি পতিব্রতা, সর্বদা এরূপ উত্তমশীল এবং সদাচার পালন করাই তোমার শোভা। তুমি ধর্ম ও ব্রত আচরণে সংলগ্ন থেকে সর্বদা গুরুজনের সেবায় রত থাক, তাই তোমাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করব না এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মাদের মধ্যে তোমাকে শ্রেণীভুক্ত করে তোমার নিবেদন করা ছাতু অবশ্যই গ্রহণ করব।'

ব্রাহ্মণ একথা বলে পুত্রবধূর অংশের ছাতুও অতিথিকে নিবেদন করলেন। উঞ্ছবৃত্তিধারী মহাত্মা ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত ত্যাগ দেখে অতিথি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ ধর্মই অতিথিরূপে এসেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন—'বিপ্রবর ! তুমি শক্তি অনুসারে ধর্মত উপার্জিত খাদ্য শুদ্ধ হৃদয়ে দান করেছ, তাই আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। স্বর্গে নিবাসকারী দেবতাগণও তোমার দানের প্রশংসা করছেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব এবং দেবদূতগণও তোমার দানে বিস্মিত হয়ে আকাশে দণ্ডায়মান হয়ে তোমার স্তুতি করছেন। ব্রহ্মলোকে বিচরণকারী ব্রহ্মর্ষি বিমানে বসে তোমার দর্শন লাভের প্রতীক্ষা করছেন। তুমি এবার দিব্যলোকে গমন করো। পিতৃলোকে তোমার যত পিতৃপুরুষ ছিলেন, তাঁদের সকলকেই তুমি ত্রাণ করেছো এবং ভবিষ্যতে বহু যুগ ধরে তোমার যেসব বংশধর জন্মগ্রহণ করবে, তারাও তোমার ব্রহ্মচর্য, দান, তপস্যা এবং শুদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য মুক্তিলাভ করবে। তুমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ তপস্যা করেছ, তার প্রভাবে এবং দানের ফলে সমস্ত দেবতা তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন। সংকট সময়েও তুমি শুদ্ধ হৃদয়ে সমস্ত ছাতু দান করেছ। ক্ষুধা মানুষের বুদ্ধি অপহরণ করে, তার ধার্মিক চিন্তাধারা লোপ পায় ; কিন্তু সেরূপ সময়েও যার দানের ইচ্ছা থাকে, তার ধর্ম হ্রাস পায় না। তুমি স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি স্নেহকে উপেক্ষা করে ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছ, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনোনি। মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম ন্যায়পূর্বক অর্থ প্রাপ্তির উপায় জানাই সূক্ষ্ম বিষয়। সেই ধন সৎপাত্রের সেবায় অর্পণ করা তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। সাধারণ সময়ে দান করার থেকে বিশেষ সময়ে দান করা আরও ভালো ; কিন্তু শ্রদ্ধার গুরুত্ব কালের থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধাপূর্বক দানকারী মানুষের যদি এক হাজার মুদ্রা দান করার শক্তি থাকে সে একশত দান করবে, একশতের শক্তি থাকলে দশটি দান করবে এবং যার কাছে কিছুই নেই সে যদি নিজ শক্তি অনুসারে জলও দান করে তাহলে এসবেরই সমান ফল মানা হয়। কথিত আছে যে রাজা রন্তিদেবের কাছে যখন দেবার মতো কিছুই ছিল না, তিনি তখন শুদ্ধ হৃদয়ে শুধু জলই দান করেছিলেন। অন্যায়পূর্বক প্রাপ্ত ধনের দ্বারা মহৎ ফলপ্রদানকারী বড় বড় দান করলে ধর্ম প্রসন্ন হন না। ধর্ম দেবতা ন্যায় উপার্জিত সামান্য অন্ন শ্রদ্ধা সহকারে দান করলে সন্তুষ্ট হন। রাজা নৃগ ব্রাহ্মণদের হাজার

হাজার গো-ধন দান করেছিলেন ; কিন্তু একটিই গাভী তিনি অপরকে দান করেছিলেন, যার জন্য অন্যায্যভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য দান করায় তাঁকে নরকে গমন করতে হয়। উশীনরের পুত্র রাজা শিবি শ্রদ্ধাপূর্বক নিজ শরীরের মাংস দান করে পুণ্যাত্মাদের লোকে আনন্দ ভোগ করছেন। ন্যায়পূর্বক সংগ্রহিত ধন দান করলে যে লাভ হয়, বহু দক্ষিণাসম্পন্ন অনেক রাজসূয়যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেও তা হয় না। তুমি সের খানেক ছাতু দান করে অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করেছ, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞও তোমার এই দানের সমকক্ষ হতে পারবে না। অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি রজোগুণরহিত ব্রহ্মধামে সুখের সঙ্গে পদার্পণ করো। তোমাদের জন্য দিব্য বিমান উপস্থিত, এতে উপবেশন করো। আমাকে দেখ, আমি সাক্ষাৎ ধর্ম। তুমি নিজেকে উদ্ধার করেছ, জগতে তোমার কীর্তি সর্বদাই বজায় থাকবে।'

নেউল বলল—ধর্ম এই কথা বলায় সেই ব্রাহ্মণদেবতা তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিমানে করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। তাঁদের যাওয়ার পর আমি নিজের গর্ত থেকে বেরিয়ে, অতিথি যেখানে আহার করেছিলেন, সেই স্থানে গিয়ে গড়াগড়ি দিলাম। সেই সময় ছাতুর গন্ধ শুঁকে, সেখানে পড়ে থাকা জলে গা ভেজাতে, সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের দান করার সময় পড়ে যাওয়া অন্নকণা মুখে লাগাতে এবং ব্রাহ্মণের তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক এবং অর্ধেক শরীর সোনায় পরিণত হল। তাঁদের তপস্যার এই মহান প্রভাব আপনারা স্বচক্ষে দেখুন। ব্রাহ্মণগণ ! আমার অর্ধেক শরীর সোনার হয়ে যাওয়ায় আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে বাকি শরীর কীভাবে ওইরূপ সোনার করা যায় ! সেই উদ্দেশ্যে আমি বহু তপোবন ও যজ্ঞস্থলে প্রসন্নতা সহকারে পরিভ্রমণ করে থাকি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞেরও অনেক আলোচনা শুনে, অনেক আশা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু এখানেও আমার দেহ সোনায় পরিণত হল না। তাই আমি হেসে বলেছিলাম যে 'এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রদত্ত সের খানেক ছাতুরও সমকক্ষ নয়।' কারণ সেই সময় সের খানেক ছাতুর সামান্য কিছু কণার প্রভাবেই আমার অর্ধ দেহ সুবর্ণময় হয়েছিল। কিন্তু এই মহান যজ্ঞ আমাকে তা করতে পারল না ; সুতরাং তার সঙ্গে এই যজ্ঞের কোনো তুলনা চলে না।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ব্রাহ্মণদের এই কথা বলে নেউল সেখান থেকে অন্তর্ধান করল এবং ব্রাহ্মণেরাও নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। আমি সমস্ত ঘটনা তোমাকে শোনালাম। সেই মহান অশ্বমেধ যজ্ঞে এই এক আশ্চর্যের ঘটনা হয়েছিল। সেই যজ্ঞে এরূপ ঘটনা শুনে তোমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। হাজার হাজার ঋষি যজ্ঞ না করে শুধুমাত্র তপস্যার বলে দিব্যলোক প্রাপ্ত করেছেন। কোনো প্রাণীর সঙ্গে অন্যায় না করা, সন্তোষ, শীল, সরলতা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্য ও দান—এর এক একটি গুণ বড় বড় যজ্ঞের সমকক্ষ হয়ে থাকে।

—০—

মহর্ষি অগস্ত্যের যজ্ঞের কথা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! উঞ্ছবৃত্তি ধারণকারী ব্রাহ্মণের ন্যায়ত প্রাপ্ত ছাতু দান করায় যে মহান ফল প্রাপ্তি হয়েছিল, আপনি তার বর্ণনা করেছেন। একথা নিঃসন্দেহে ঠিক ; কিন্তু সব যজ্ঞে এই উত্তম সিদ্ধান্ত কীভাবে কাজে পরিণত করা যায় ? (কারণ ন্যায্যত প্রাপ্ত অর্থ অত্যন্ত কম হয়, তার সাহায্যে বড় বড় যজ্ঞ কীভাবে করা সম্ভব ?)

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! (অধিক ধন সংগ্রহ না করেই মহান যজ্ঞানুষ্ঠান করা সম্ভব)। এই বিষয়ে প্রথমে অগস্ত্য মুনির মহান যজ্ঞে যা ঘটেছিল, সেই পুরাতন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল চিন্তায় রত মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য এক সময় দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই মহাত্মার যজ্ঞে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হোতা ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ফল-মূল আহারকারী অশ্মকুট[১], মরীচিপ[২], পরিপৃষ্টিক[৩], বৈঘসিক[৪] ও প্রসংখ্যান[৫] প্রভৃতি নানাপ্রকার যতি ও ভিক্ষু ছিলেন। এঁরা সকলেই ধর্মপালনকারী, ক্রোধজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, মনোনিগ্রহপরায়ণ, হিংসা ও দম্ভরহিত এবং সর্বদা শুদ্ধাচারী। এরূপ মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত

[১]খাদ্য পদার্থ পাথরের ওপর ভেঙে ভোজনকারী। [২]সূর্যকিরণ পানকারী। [৩]জিজ্ঞাসা করে প্রদত্ত অন্নই শুধু গ্রহণকারী। [৪]যজ্ঞশিষ্ট অন্নই শুধু ভোজনকারী। [৫]এক সময়ের জন্য শুধু অন্নগ্রহণ করেন অথবা তত্ত্ব-বিচার করেন।

ছিলেন। এঁরা ছাড়াও আরও বহু ঋষি-মুনি সেই মহান যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য যখন এই ভাবে যজ্ঞ করছিলেন, ইন্দ্র সেই সময় জগতে বৃষ্টির বর্ষণ বন্ধ করে দিলেন। তখন যজ্ঞকর্মের মধ্যে মুনিরা অগস্ত্যের সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন যে, 'ব্রাহ্মণগণ ! অগস্ত্য যজ্ঞকর্মে সংলগ্ন থেকে প্রতিদিন দ্বেষশূন্য হৃদয়ে অন্নদান করছেন। এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না ; এরূপ অবস্থায় অন্ন উদ্‌গম হবে কীভাবে ? এই মহান যজ্ঞ বারো বছর ধরে চলবে আর ততদিন ইন্দ্র জলবর্ষণ করবেন না। এই ব্যাপার নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করে আপনারা এই তপস্বী মহাত্মাকে অনুগ্রহ করুন।'

ঋষিদের কথা শুনে মহাপ্রতাপী অগস্ত্য মুনি মাথা নীচু করে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে বললেন—'ইন্দ্র যদি বারো বছর ধরে বৃষ্টি না করেন, তাহলে আমি চিন্তাযজ্ঞ করব অর্থাৎ সংকল্পমাত্র দ্বারা আমার যজ্ঞানুষ্ঠান চলতে থাকবে অথবা স্পর্শযজ্ঞ করব—সঞ্চিত দ্রব্য ব্যয় না করে তার স্পর্শমাত্রেই দেবতাদের সন্তুষ্ট করব। যজ্ঞের এও এক সনাতন বিধি অথবা বারো বছর ধরে যদি ইন্দ্র বৃষ্টি না করেন, তাহলে আমি ব্রত-নিয়মাদি পালন করে ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় রূপে স্থিত হয়ে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করব। এই বীজযজ্ঞ আমার দ্বারা বহু বৎসর ধরে চালু থাকতে পারে। বীজের দ্বারাই নিজের যজ্ঞ পূর্ণ করে নেব। তাতে কোনো বাধাবিঘ্ন আসবে না। ইন্দ্র বর্ষণ করুন বা না করুন ; আমার যজ্ঞ কখনো বন্ধ হবে না। আমি নিজেই ইন্দ্র হয়ে সকল প্রজার জীবনরক্ষা করব। যে প্রাণীর যা আহার্য সে তাই পাবে অথবা আমি প্রয়োজনানুসারে বিশেষ আহারের ব্যবস্থাও প্রচুর মাত্রায় করতে পারি। এখন ত্রিলোকে যত সোনা ও ধন আছে, তা এখানে একত্র হয়ে যাবে। দিব্য অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিশ্বাবসু এবং অন্যান্য স্বর্গবাসীগণও এখানে এসে আমার যজ্ঞের উপাসনা করুন। উত্তর কুরুদেশে যত ধন আছে, সেসব এখানে এসে উপস্থিত হোক। স্বর্গ, স্বর্গনিবাসী দেবতা এবং স্বয়ং ধর্মও এই যজ্ঞে এসে উপস্থিত

হোন।'

মহর্ষি অগস্ত্য এই কথাগুলি বলতেই তাঁর তপ প্রভাবে সব কিছু তেমনই হয়ে গেল। সেই মহাতেজস্বী মহর্ষির তপস্যার বল দেখে মুনিরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন—'মহর্ষি ! আপনার কথায় আমরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমরা আপনার যজ্ঞের দ্বারাই সন্তুষ্ট। ন্যায় উপার্জিত অন্নই আমাদের আহার। আমরা সর্বদা নিজ কর্মে ব্যাপৃত থাকি। এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই উপস্থিত থাকব এবং শেষে আপনার অনুমতি নিয়ে এখান থেকে যাব।' তাঁরা এইরূপ কথাবার্তা বলছিলেন, তার মধ্যে মহর্ষির তপোবল দেখে দেবরাজ ইন্দ্র জলবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। যতদিন তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত না হল, ততদিন সেখানে ইচ্ছানুসারে বৃষ্টি হতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই মুনির কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। তারপর যজ্ঞ পূর্ণ হলে অগস্ত্য অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সেখানে সমাগত সমস্ত মহর্ষিকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে সকলকে বিদায় জানালেন।

—o—

যুধিষ্ঠিরের বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ও নিজ মহিমা বর্ণন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! পূর্বকালে আমার প্রপিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হলে ধর্মবিষয়ক জিজ্ঞাসার সমাধানে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কী প্রশ্ন করেছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অবভৃত-স্নান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন—'ভগবান ! বৈষ্ণব ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কী ফল প্রাপ্তি হয় ? ব্রহ্মহত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, মাতৃঘাতী, গুরুপত্নীর শয্যায় শয়নকারী, আহার পরিবেশন কালে পংক্তি ভেদকারী, কৃতঘ্ন, মদ্যপ, বেদ-বিক্রেতা, মিত্র-বিশ্বাসঘাতক, কোনো বীরকে কপটভাবে হত্যাকারী, গর্ভস্থ সন্তান হত্যাকারী, তপস্যা ও দানের ফল বিক্রয়কারী, নিজ দেহ বিক্রয়কারী, মূর্খ, পাপকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, পাপী, শঠ, কপটাচারী, দাম্ভিক, অপরের ওপর দোষারোপকারী, শূদ্রের সেবায় রত, চোর, অন্যের গচ্ছিত দ্রব্য লুণ্ঠনকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, পরস্ত্রীগামী এবং আরও যত পাপী আছে, এরা সকলেই যে ধর্ম শ্রবণ করে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে তার বর্ণনা করুন। ভক্তবৎসল ! আমি সত্য সত্য ভক্তিভাব নিয়ে আপনার চরণে শরণাগত হয়েছি। আপনি যদি আমাকে আপনার প্রেমিক বা ভক্ত বলে মনে করেন আর আমি যদি আপনার অনুগ্রহের অধিকারী হয়ে থাকি, তা হলে আমাকে বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলুন। আমি সেই রহস্য যথার্থরূপে জানতে চাই। আমি মনু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, পরাশর, মৈত্রেয়, উমা, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, কার্তিকেয়, ভার্গব, যাজ্ঞবল্ক্য, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্র, জৈমিনি, পুলস্ত্য, পুলহ, অগ্নি, অগস্ত্য, মুদগল, শাণ্ডিল্য, শলভ, বালখিল্যগণ, সপ্তর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, প্রজাপতি, যম, মহেন্দ্র, ব্যাস, বিভাণ্ড, নারদ, কপোত, বিদুর, ভৃগু, অঙ্গিরা, সূর্য, হারীত, উদ্দালক, শুক্রাচার্য, বৈশম্পায়ন এবং অন্যান্য মহাত্মাদের কথিত ধর্ম শ্রবণ করেছি ; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আপনার মুখ থেকে যে ধর্ম বর্ণিত হবে ; তা অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় উপরিউক্ত সর্ব ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ হবে। তাই কেশব ! আপনার শরণাগত আমার ন্যায় ভক্তের কাছে আপনি পবিত্র ধর্ম বর্ণনা করুন।'

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করায় সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর কাছে ধর্মের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'কুন্তীনন্দন ! তুমি ধর্মের জন্য সতত যত্নশীল, তাই জগতে কোনো বস্তুই তোমার কাছে দুর্লভ হবে না। ধর্মই জীবের পিতামাতা, রক্ষক, সুহৃদ, ভ্রাতা, সখা এবং প্রভু। অর্থ, কাম, ভোগ, সুখ, উত্তম ঐশ্বর্য এবং সর্বোত্তম স্বর্গপ্রাপ্তিও ধর্মের দ্বারাই হয়ে থাকে। যদি বিশুদ্ধ ধর্মের পালন করা যায়, তবে তা মহাভয় থেকে রক্ষা করে। ধর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব ও দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। ধর্মই মানুষকে পবিত্র করে তোলে। যুধিষ্ঠির ! কালক্রমে যখন মানুষের পাপ বিনষ্ট হয়, তখন তার বুদ্ধি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়। হাজার হাজার জন্ম পরিভ্রমণ করার পরও মনুষ্যজন্ম লাভ করা কঠিন। এরূপ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেও যে ধর্মানুষ্ঠান না করে, সে মহালাভ থেকে বঞ্চিত হয়। আজ যাকে নিন্দিত, দরিদ্র, কুরূপ, রোগী, অন্যের দ্বেষের পাত্র ও মূর্খ বলে দেখা যায়, সে পূর্বজন্মে কখনোই ধর্মানুষ্ঠান করেনি। কিন্তু যে দীর্ঘজীবী, শূরবীর, পণ্ডিত, ভোগসামগ্রীসম্পন্ন, নীরোগ, রূপবান—তার দ্বারা নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে ধর্ম সম্পাদন হয়েছে। এরূপে শুদ্ধভাবে করা ধর্মানুষ্ঠান উত্তম গতি লাভ করায়। কিন্তু যারা অধর্মের সেবা করে, তাদের পশুপক্ষী হয়ে জন্ম নিতে হয়।

'পাণ্ডুনন্দন ! আমি এখন তোমাকে এক রহস্যের কথা বলছি, শোনো—তোমার কাছে পরম ধর্মের বর্ণনা অবশ্যই করব। তুমি আমার ভক্ত, অত্যন্ত প্রিয় এবং সর্বদা আমার শরণাগত। তুমি জিজ্ঞাসা করলে আমি পরম গোপনীয় আত্মতত্ত্বও বর্ণনা করতে পারি, ধর্মসংহিতার তো কথাই নেই। এখন ধর্মস্থাপন এবং দুষ্টবিনাশের জন্য আমি নিজ

মায়ায় মানবশরীরে অবতার রূপ ধারণ করেছি। যারা আমাকে শুধু মনুষ্য শরীরে সীমিত মনে করে আমার অবহেলা করে, তারা মূর্খ এবং তারা জগতে বারংবার তির্যকযোনিতে ঘুরে বেড়ায়। অন্যদিকে যারা জ্ঞানদৃষ্টিতে আমাকে সমস্ত ভূতে অবস্থিত দেখে, তারা সর্বদা আমাতে মন ন্যস্ত করে রাখে, আমার ভক্ত। এরূপ ভক্তদের আমি পরমধামে আমার কাছে ডেকে নিই। আমার ভক্তদের বিনাশ নেই, তারা নিষ্পাপ হয়। মানুষের মধ্যে যাঁরা আমার ভক্ত তাদেরই জন্ম সফল। হাজার হাজার জন্ম তপস্যা করে যখন মানুষের হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে ভক্তির উদয় হয়। আমার যা অত্যন্ত গোপনীয়, কূটস্থ, অচল এবং অবিনাশী পরস্বরূপ, তা আমার ভক্তেরা যেমন অনুভব করে তেমন দেবতাদেরও হয় না এবং যা আমার অপরস্বরূপ, তা অবতার গ্রহণ করলে দৃষ্টিগোচর হয়। জগতের সমস্ত জীব সর্বপ্রকার পদার্থের দ্বারা আমার স্বরূপের পূজা করে। যে ব্যক্তি আমাকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ জেনে আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি তাকে কৃপা করে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিই। আমিই দেবতাদের আদি। ব্রহ্মাদি দেবতাদের আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি নিজ প্রকৃতির সাহায্যে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করি। ব্রহ্মা থেকে কীটাণুকীট পর্যন্ত সকলের মধ্যেই আমি পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকি। দ্যুলোককে আমার মস্তক বলে জেনো। সূর্য এবং চন্দ্র আমার চক্ষু। গো, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ আমার মুখ, বায়ু আমার নিঃশ্বাস। অষ্টদিক আমার বাহু, নক্ষত্র আমার অলংকার, সমস্ত ভূতেদের আশ্রয়স্থল অন্তরীক্ষ আমার বক্ষস্থল। মেঘ এবং হাওয়া চলার যেটি পথ তাকে আমার অবিনাশী উদর বলে জানবে। দ্বীপ, সমুদ্র এবং জঙ্গলাকীর্ণ এই ভূমণ্ডল আমার দুটি পায়ের স্থানে অবস্থিত। আমার সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র মুখ, সহস্র সহস্র চক্ষু, বাহু, উদর, উরু ও পা। আমি পৃথিবীকে সর্বদিক থেকে ধারণ করে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙুল উচ্চে অর্থাৎ সবার অতীত হয়ে বিরাজ করি। আমি সর্বপ্রাণীর আত্মা, তাই আমাকে সর্বব্যাপী বলা হয়। আমি অচিন্ত্য, অনন্ত, অজর, অজন্মা, অনাদি, অবধ্য, অপ্রমেয়, অব্যয়, নির্গুণ, গূঢ়স্বরূপ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্মম, নিষ্ফল, নির্বিকার এবং মোক্ষের আদি কারণ। সুধা, স্বধা এবং স্বাহাও আমিই। আমি চতুরাশ্রমের ধর্ম, চার প্রকার হোতার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া যজ্ঞ, চতুর্ব্যূহ, চতুর্যজ্ঞ এবং চার আশ্রমের সৃষ্টিকারী। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ সংহার করে সেটি নিজ উদরে স্থাপন পূর্বক দিব্য যোগের আশ্রয় নিয়ে আমি একার্ণবের জলে শয়ন করি। এক হাজার যুগ ধরে থাকা ব্রহ্মার রাত্রি পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মহার্ণবে শয়ন করার পর স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করি। প্রত্যেক কল্পেই আমি জীবেদের সৃষ্টি ও সংহার করে থাকি ; কিন্তু আমার মায়ায় মোহিত হওয়ায় জীবসকল আমাকে জানতে পারে না। রাজন্ ! এমন বস্তু কখনো কোথাও নেই যাতে আমি নিবাস না করি এবং এমন কোনো জীব নেই যা আমাতে স্থিত নয়। আমি তোমাকে সত্য কথা বলছি, অতীত ও ভবিষ্যৎ যা কিছু আছে, সে সবই আমি। সমস্ত প্রাণী আমা হতেই উৎপন্ন হয় এবং তারা আমারই স্বরূপ। কিন্তু মায়াবদ্ধ হওয়ায় তারা আমার স্বরূপ জানে না। এইভাবে দেবতা, অসুর, মানুষসহ জগতের সমস্ত প্রাণী আমা হতেই জন্মগ্রহণ করে এবং আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।'

———o———

চতুর্বর্ণের কর্ম এবং তার ফলাদির বর্ণনা, ধর্মের বৃদ্ধি এবং পাপক্ষয় হওয়ার উপায়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সমস্ত জগৎ তাঁর হতে উৎপন্ন জানিয়ে ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পবিত্র ধর্মের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করলেন—'পাণ্ডুনন্দন ! যে ব্যক্তি পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হয়ে তপস্যারত থেকে স্বর্গ, যশ ও আয়ুপ্রদানকারী জানার যোগ্য ধর্ম শ্রবণ করে, সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির—বিশেষত আমার ভক্তের পূর্বসঞ্চিত যত পাপ থাকে, তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়।'

শ্রীকৃষ্ণের এই পরম পবিত্র ও সত্য কথা শুনে সমস্ত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, ভূত, যক্ষ, গ্রহ, গুহ্যক, সর্প, মহাত্মা বালখিল্য, তত্ত্বদর্শী যোগী এবং ভগবদ্‌ভক্ত পুরুষ মনে মনে প্রসন্ন হয়ে ধর্মের অদ্ভুত রহস্য চিন্তা করতে করতে উত্তম বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে সেখানে এলেন। তাঁরা এসে মাথা নত করে ভগবানকে প্রণাম করলেন। ভগবানের দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে সকলে নিষ্পাপ হয়ে গেলেন। তাঁদের সেখানে দেখে মহাপ্রতাপশালী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভগবানকে প্রণাম করে প্রশ্ন করলেন—'জগদীশ্বর ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কীরূপ পৃথক গতি হয় ? এঁদের সকলের কর্মের ফল বর্ণনা করুন।'

ভগবান বললেন—ধর্মরাজ ! ক্রমানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ধর্মের বর্ণনা শোনো। যে ব্রাহ্মণ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, সন্ধ্যা-উপাসনা করেন, পূর্ণাহুতি দেন, বিধিবৎ অগ্নিহোত্র করেন, বলিবৈশ্বদেব ও অতিথি সেবা করেন, নিত্য স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন ; যিনি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করার পরই অন্নগ্রহণ করেন, শূদ্র-অন্ন গ্রহণ করেন না, দম্ভ ও মিথ্যা ভাষণ থেকে দূরে থাকেন, নিজ স্ত্রীতে আসক্ত থাকেন এবং পঞ্চযজ্ঞ ও অগ্নিহোত্র করেন, সেই ব্রাহ্মণ পাপরহিত হয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও যিনি রাজসিংহাসনে আসীন হয়ে নিজ ধর্ম পালন ও প্রজাদের ভালোভাবে রক্ষা করেন, প্রজাদের আয়ের ষষ্ঠভাগ খাজনা হিসাবে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, যজ্ঞ এবং দান করতে থাকেন, ধৈর্যশীল, নিজ স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকেন, শাস্ত্রানুসারে চলেন, তত্ত্ববিদ এবং প্রজাদের মঙ্গলকার্যে ব্যাপৃত থাকেন, ব্রাহ্মণদের ইচ্ছাপূর্ণ করেন, পোষ্যপালনে তৎপর থাকেন, প্রতিজ্ঞা পালন করেন, সর্বদা পবিত্র থাকেন এবং লোভ ও দম্ভ পরিত্যাগ করেন, তিনি দেবতা তুল্য উত্তম গতি লাভ করেন।

যে বৈশ্য কৃষি ও গো-পালনে ব্যাপৃত থাকেন, ধর্ম অনুসন্ধান করেন ; দান, ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের সেবায় সংলগ্ন থাকেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, নিত্য পবিত্র, লোভ ও দম্ভরহিত, সরল, নিজ স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ও হিংসা-দ্রোহ থেকে দূরে থাকেন, যিনি কখনো বৈশ্য ধর্ম ত্যাগ করেন না এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজায় ব্যাপৃত সেই বৈশ্য অপ্সরা দ্বারা সম্মানিত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করেন।

শূদ্রদের মধ্যে যারা সর্বদা তিন বর্ণের সেবা করেন, বিশেষত ব্রাহ্মণের সেবার জন্য একাগ্র চিত্তে উপস্থিত থাকেন ; যিনি বিনা চাওয়াতেই দান করেন, সত্য ও শৌচ পালন করেন, গুরু ও দেবতাপূজায় প্রীতি রাখেন, পরস্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে থাকেন, অপরকে কষ্ট না দিয়ে কুটুম্ব পালন করেন এবং সর্বজীবকে অভয়প্রদান করেন, সেই শূদ্র স্বর্গ লাভ করেন।

এইরূপ ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো সাধন নেই। এগুলি নিষ্কামভাবে আচরণ করলে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ পাপ নাশের অন্য কোনো উপায় নেই ; তাই এই দুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করে সর্বদা ধর্মাচরণ করা কর্তব্য। ধর্মানুরাগী মানুষের জন্য জগতে কোনো বস্তুই দুর্লভ নয়। ব্রহ্মা এই জগতে যে বর্ণের জন্য যেরূপ ধর্মের বিধান দিয়েছেন, সেইমতো ধর্মের আচরণ করে মানুষ নিজ পাপ বিনাশ করতে সক্ষম হয়। মানুষের নিজ জাতিগত ধর্ম কখনো পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সেই ধর্ম নিষ্কামভাবে আচরণ করলে মানুষ সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করে। নিজ ধর্ম গুণরহিত হলেও তা পাপবিনাশ করে। এর বিপরীতে যদি মানুষের পাপবৃদ্ধি হয়, তাহলে সে তার ধর্মকে ক্ষীণ করে ফেলে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—কেশব ! শুভ এবং অশুভের বৃদ্ধি ও হ্রাস কীভাবে হয়, সেটি জানার জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হচ্ছে।

ভগবান বললেন—তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর শোনো। পাপ অন্যকে জানিয়ে দিলে এবং তার জন্য

অনুতাপ করলে প্রায়শ তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তেমনই আবার ধর্ম নিজ মুখে অন্যের কাছে প্রকাশ করলে তা নষ্ট হয়ে যায়। লুকিয়ে রাখলে দুটিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হল নিজ পাপ প্রকাশ করা, তা লুকোনোর চেষ্টা না করা। পাপের কথা বললে পাপের বিনাশ হয়, তাই সর্বদা পাপ প্রকাশ করা এবং ধর্ম গোপন রাখা উচিত।

নিরর্থক জন্ম, দান ও জীবনের বর্ণনা, সাত্ত্বিকাদি দানের লক্ষণ, দানের যোগ্য পাত্র ও ব্রাহ্মণের মহিমা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তারপর ভগবানকে পুনরায় ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করেন—'পুরুষোত্তম ! কোন কোন জন্ম ব্যর্থ মনে করা হয়, কত প্রকারের দান নিষ্ফল হয় এবং কোন কোন মানুষের জীবন নিরর্থক বলে মনে করা হয় ? সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক দান কী প্রকারের হয় ? তার দ্বারা কার তৃপ্তি হয় ? উত্তম দানের স্বরূপ কী ? তার দ্বারা কী ফল লাভ হয়, কৃপা করে এগুলি বলুন। আমি এইসব বিষয় জানতে চাই এবং এগুলি শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।'

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে ন্যায় অনুসারে যথার্থ এবং উত্তম উপদেশ শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শোনো। এ বিষয় পরম পবিত্র এবং সম্পূর্ণ পাপনাশকারী। চতুর্দশ জন্ম ব্যর্থ বলে মনে করা হয়। পঞ্চান্ন প্রকারের দান নিষ্ফল হয় এবং ছয় প্রকার মানুষের জীবন নিরর্থক হয়ে থাকে। সেসব আমি ক্রমশ বর্ণনা করছি। ধর্মনাশকারী, লোভী, পাপী, বলিবৈশ্বদেব না করে ভোজনকারী, পরস্ত্রীগামী, আহারে ভেদকারী, অসত্যভাষী, বন্ধুবান্ধবকে ক্লেশপ্রদান করে একাকী সুখগ্রহণকারী, মাতাপিতা, অধ্যাপক-গুরু ও গুরুজনদের গালি প্রদানকারী, ব্রাহ্মণ হয়েও সন্ধ্যা-পূজন করেন না যিনি, অগ্নিহোত্র ত্যাগকারী, শ্রাদ্ধ-তর্পণ থেকে দূরে থাকেন যিনি, ব্রাহ্মণ হয়েও শূদ্রান্ন ভোজনকারী এবং আমাকে, ভগবান শংকর ও ব্রহ্মাকে ভক্তিপ্রদান করেন না যিনি—এই চতুর্দশ প্রকারের মানুষ অধম হয়ে থাকে। এই পাপীদের জন্ম ব্যর্থ বলে জানবে।

যে দান অশ্রদ্ধা ও অপমানের সঙ্গে প্রদান করা হয়, যে দান লোককে দেখানোর জন্য করা হয়, যে দান পাষণ্ডীকে করা হয়, যে দান শূদ্রের ন্যায় আচরণকারী ব্যক্তি গ্রহণ করে, যে দান নিজ মুখে বারংবার বর্ণনা করা হয়, যে দান রোষপূর্বক প্রদান করা হয়, যা দান করার পরে তার জন্য দুঃখ বা শোক হয় ; দম্ভ দ্বারা উপার্জন করা অন্ন, মিথ্যা বলে নিয়ে আসা অন্ন, ব্রাহ্মণের ধন, চুরি করা দ্রব্য ; কলঙ্কিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত দান যা পতিত ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছে ; যে দানের বস্তু বেদবিহীন ব্যক্তি, সকলের কাছে ভিক্ষাকারী, সংস্কারহীন পতিত ব্যক্তি বা একবার সন্ন্যাসী হয়ে পুনর্বার সংসারে ফিরে আসা ব্যক্তি গ্রহণ করেছে ; যে দান বেশ্যাগৃহগামীকে এবং শ্বশুরালয়ে আশ্রয়গ্রহণকারী ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছে ; সমস্ত গ্রামের থেকে ভিক্ষাগ্রহণকারী, কৃতঘ্ন, উপপাতকী, বেদ বিক্রয়কারী, রাজসেবক, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, শূদ্রানারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী, অস্ত্রদ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী, সাপ ধরে যে ব্যক্তি, পুরোহিত, বৈদ্য, ব্যবসায়ী, মন্ত্র জপ করে জীবিকা নির্বাহকারী শূদ্র, শূদ্রের আশ্রয় গ্রহণকারী, অর্থ নিয়ে পূজা করে যে ব্যক্তি, দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎকারী, ছবি তৈরি করে যে ব্যক্তি, অভিনয় করে যে ব্যক্তি, মাংস বিক্রয়কারী, সেবাকারী, ব্রাহ্মণোচিত আচারহীন হয়েও যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে, উপদেশ প্রদানের শক্তিরহিত, সুদখোর, অনাচারী, অগ্নিহোত্র করে না যে, সন্ধ্যা-উপাসনা যে করে না, মিথ্যা সাধুবেশধারী, সব কিছু আহার গ্রহণকারী, নাস্তিক, ধর্মবিক্রেতা, নীচপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী, কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে যে ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে, এইসব ব্যক্তিদের যে দান করা হয়, তা নিষ্ফল হয়ে যায়। উপরিউক্ত ব্রাহ্মণদের বহু দান দিলেও তা ভস্মে দেওয়া ঘৃতাহুতির মতো ব্যর্থ হয়। এই সকল দান করার যে ফল, তা রাক্ষস ও পিশাচেরা ছিনিয়ে নেয়।

যুধিষ্ঠির ! এবার যেসব মানুষদের জীবন ব্যর্থ, তাদের পরিচয় জানাচ্ছি, শোনো ! যে সব ব্যক্তি ভগবান শংকর,

আমার এবং পৃথিবীর দেবতা ব্রাহ্মণদের শরণ গ্রহণ করে না, তাদের জীবন ব্যর্থ। যার বৃথা তর্কেই আসক্তি, যে নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে, যে আচার পরিত্যাগ করেছে এবং যে দেবতাদের নিন্দা করে, তাদের জীবনও ব্যর্থ। যে নরাধম ব্যক্তি নাস্তিকদের শাস্ত্র পাঠ করে ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞাদির নিন্দা করে, সে বৃথা জীবন ধারণ করে। যে মূঢ়, দুর্গা, কার্তিক, বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য, মাতাপিতা, গুরু, ইন্দ্র ও চন্দ্রের নিন্দা করে ও আচার পালন করে না, সে-ও বৃথা জীবন কাটায়। যে ব্যক্তি অর্থ থাকলেও দান ও ধর্ম পালন করে না, অন্যকে না দিয়ে নিজেই ভোগ করে, তার জীবনও নিরর্থক। এইসব বৃথা জীবনের কথা এখানে বলা হল।

এবার দানের সময়ের কথা বলছি। যে ব্যক্তি স্নান করে পবিত্র হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়াদি প্রসন্ন রেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করে, সে যৌবনাবস্থায় তার ফল ভোগ করে। যে স্বয়ং দানযোগ্য বস্তু ভক্তিপূর্বক সৎপাত্রে দান করে সে আমৃত্যু সর্বসময় সেই দানের ফল প্রাপ্ত হয়। দান এবং তার ফল সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন প্রকারের হয় এবং তার গতিও তিন প্রকারের হয়। সেই বিষয়ের বর্ণনা শোনো—দান করা কর্তব্য, এই কথা ভেবে কোনো উপকার করেননি সেরূপ ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, তা হল সাত্ত্বিক দান। যার পরিবার বৃহৎ এবং যে দরিদ্র ও বেদবিদ্বান, এরূপ ব্রাহ্মণকে প্রসন্নতাসহ যা দেওয়া হয়, তাও সাত্ত্বিক দানের অন্তর্গত। কিন্তু যে বেদ জানে না, যার গৃহে বহু সম্পত্তি আছে এবং যে আগে উপকার করেছে, সেই ব্রাহ্মণকে দেওয়া দান রাজস দানের অন্তর্গত। নিজ আত্মীয় এবং প্রমাদীকে দেওয়া, ফলের আশা করে দেওয়া এবং অপাত্রে দেওয়া দানকেও রাজস দান বলা হয়। যে ব্রাহ্মণ বলিবৈশ্বদেব করে না, যার বেদের জ্ঞান নেই এবং যে চুরি করে, তাকে যে দান করা হয়, সেই দান হল তামস দান। ক্রোধ, তিরস্কার, ক্লেশ ও অবহেলা সহকারে এবং সেবককে দেওয়া দানকেও তামস দান বলা হয়। সাত্ত্বিক দান দেবতা, পিতৃপুরুষ, মুনি এবং অগ্নি গ্রহণ করেন এবং তার দ্বারা তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। রাজস দান দানব, দৈত্য, গ্রহ, যক্ষ এবং রাক্ষসদের উপভোগে লাগে এবং তামস দান পাপী ও মলিন কর্মকারী প্রেত এবং পিশাচেরা প্রাপ্ত হয়। এবার ত্রিবিধ গতির বর্ণনা শোনো। সাত্ত্বিক দানের ফল উত্তম, রাজস দানের ফল মধ্যম এবং তামস দানের ফল অধম হয়। দানের উত্তম পাত্র অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, সেই দান অক্ষয় বলা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বেদবিদ্‌ হয়েও দরিদ্র, তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা নিজে করবে এবং সম্পত্তিশালী দ্বিজদের রক্ষা করবে। ধনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণদের দান দিয়ে তাদের ভালোভাবে সেবা করো। দাতার পাপ, দান করার সঙ্গে সঙ্গেই দানগ্রহীতার কাছে চলে যায় এবং তার পুণ্য দাতা লাভ করে, সুতরাং পরলোকে নিজ হিত আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তির সর্বদা দান করা উচিত। যে ব্যক্তি বেদবিদ্যা লাভ করে অত্যন্ত শুদ্ধ আচার-বিচারে থাকে এবং কখনো শূদ্রান্ন গ্রহণ করে না, এরূপ বিদ্বানদের যত্নপূর্বক দান করা কর্তব্য।

পাণ্ডুনন্দন ! যে ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ তাঁদের পতির আহারের শেষাংশ বহুগুণ লাভজনক মনে করে তা পাবার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেন, সেই ব্রাহ্মণদের তুমি আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের নিরাশ করে ফেরাবে না, তাহলে তাঁরা আশাহত হবেন। যাঁরা আমার ভক্ত, আমার শরণাগত, আমার পূজা করেন এবং নিয়মিত আমাতেই ঘনিষ্ঠভাবে থাকেন, তাঁদের যত্নসহকারে পূজা করা উচিত। যুধিষ্ঠির ! আমার সেই ভক্তদের পবিত্র করার জন্য আমি প্রতিদিন দুই বার আহ্নিকে ব্যাপৃত থাকি। আমার এই নিয়ম কখনো লঙ্ঘিত হয় না, তাই আমার নিষ্পাপ ভক্তদের আত্মশুদ্ধির জন্য সন্ধ্যার সময় নিরন্তর অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) জপ করা উচিত। আহ্নিক এবং অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করলে অন্য ব্রাহ্মণদেরও পাপ বিনাশ হয়। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উভয় কালে আহ্নিক করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ এইভাবে আহ্নিক, উপাসনা ও জপ করে থাকেন, তাঁকে দেবকার্য ও শ্রাদ্ধকার্যে নিযুক্ত করা উচিত। কখনো তার নিন্দা করতে নেই ; কারণ তাঁর নিন্দা করলে আগুন যেমন সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তেমনই ব্রাহ্মণ সেই শ্রাদ্ধকে সেভাবেই বিনষ্ট করেন। ধর্মজ্ঞ পুরুষের যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করা উচিত নয় ; এরূপ করলে যজমানের অত্যন্ত নিন্দা হয়। ব্রাহ্মণদের নিন্দাকারী মানুষ কুকুরের জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাঁকে দোষারোপকারী ব্যক্তি গাধা জন্ম পায় এবং তাঁকে তিরস্কার বা দ্বেষকারী ব্যক্তি কীট জন্ম প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত ক্ষত্রিয়, সাপ বা বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি দুর্বলও হয়, তাদের কখনো অপমান না করা ; কারণ এই তিন জন অপমানিত হলে মানুষের সর্বনাশ

করতে পারে। ব্রাহ্মণ জন্ম থেকেই ধর্মের সনাতন মূর্তি। ধর্মের জন্যই তার উৎপত্তি এবং মুক্তির ওপর তাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। ব্রাহ্মণ নিজ শক্তিতেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, অন্য মানুষেরা ব্রাহ্মণের দয়াতেই আহার প্রাপ্ত হয়, তাই ব্রাহ্মণকে কখনো অপমান করা উচিত নয়। কারণ তাঁরা সর্বদা আমাতেই ভক্তি রেখে থাকেন।

যে ব্রাহ্মণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আমার গূঢ় ও নিষ্কল স্বরূপের জ্ঞান ধারণ করেন, তাঁকে যত্নসহকারে পূজা করবে। গৃহেই থাকো বা বিদেশে, আমার ভক্ত ব্রাহ্মণদের নিত্য শ্রদ্ধাসহ পূজা করবে। ব্রাহ্মণের মতো কোনো দেবতা, ব্রাহ্মণের সমান গুরু, ব্রাহ্মণের থেকে বড় বন্ধু এবং ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো নিধি নেই। কোনো তীর্থ বা পুণ্য ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। ব্রাহ্মণের থেকে বড় পবিত্র কোনো কিছু নেই। ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং ব্রাহ্মণের থেকে উত্তম কোনো গতি নেই। পাপকর্মের জন্য নরকে পতনোন্মুখ মানুষকে একমাত্র সুব্রাহ্মণই উদ্ধার করতে সক্ষম। যিনি বাল্যকাল থেকেই অগ্নিহোত্র করেন, শান্ত, শূদ্রান্ন ত্যাগকারী, আমার ভক্ত এবং সর্বদা আমার পূজা করে থাকেন, তাঁকে দেওয়া দান অক্ষয় হয়ে থাকে। আমার ভক্ত ব্রাহ্মণকে দান দিয়ে তাঁর পূজা করলে, মাথা নত করলে, সৎকার করলে, আলাপ আলোচনা করলে অথবা দর্শন করলে, মানুষের দিব্যলোক লাভ হয়। যেসব ব্যক্তি আমার গুণ ও লীলাপাঠ, আমাকে নমস্কার ও ধ্যান করেন, তাঁদের দর্শন ও স্পর্শকারী ব্যক্তি সর্বপাপ হতে মুক্তিলাভ করে। যাঁরা আমার ভক্ত, যাদের প্রাণ আমাতেই সংলগ্ন, যাঁরা আমার মহিমা গীত করেন এবং আমার শরণে থাকেন, যাঁদের উৎপত্তি শুদ্ধ রজ-বীর্যে হয়, যাঁরা বেদবিদ্, জিতেন্দ্রিয় এবং শূদ্রান্ন গ্রহণ করেন না, তাঁদের দর্শন করলেই পবিত্র হওয়া যায়—এইসব ব্যক্তিদের গৃহে উপস্থিত হয়ে ভক্তিপূর্বক বিশেষরূপে দান করা উচিত। সেই দান সাধারণ দানের থেকে কোটিগুণ ফলপ্রদানকারী হয়। শয়নে-স্বপনে, দেশে-বিদেশে যে ব্রাহ্মণের হৃদয় থেকে আমি কখনো দূরে থাকি না, সেই ব্রাহ্মণের পূজা, দর্শন ও স্পর্শ বা সম্ভাষণ মাত্রেই মানুষ পবিত্র হয়ে ওঠে। এইরূপ সর্বাবস্থায় আমার ভক্তদের প্রদত্ত দান স্বর্গ প্রদানকারী হয়ে থাকে।

বীজ ও যোনি শুদ্ধি, গায়ত্রী-জপ এবং ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইভাবে সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক দান, তার ভিন্ন ভিন্ন গতি এবং পৃথক পৃথক ফলের বর্ণনা শুনে ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এই পরমপবিত্র ধর্মরূপ অমৃত পান করে তাঁর তৃপ্তি হল না, তাই তিনি পুনরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জগদীশ্বর ! আমাকে বীজ ও যোনি (বীর্য ও রজ) দ্বারা শুদ্ধ পুরুষদের লক্ষণ বলুন। বীজ দোষে কীরূপ মানুষ জন্মায়, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের উত্তম, মধ্যম ইত্যাদি বিশেষ পার্থক্য এবং তাঁদের গুণ-দোষেরও বর্ণনা করুন। আমি আপনার ভক্ত, অতএব আমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয় কৃপা করে বলুন।'

ভগবান বললেন—রাজন্ ! বীজ ও যোনির শুদ্ধি-অশুদ্ধির যথার্থ বর্ণনা শোনো। তার শুদ্ধির দ্বারাই এই জগৎ টিকে থাকে, আর অশুদ্ধিতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ বিধিবৎ ব্রহ্মচর্য পালন করেন, যাঁর ব্রত কখনো খণ্ডিত হয় না, তাকে শুদ্ধ বীজ বলে জানতে হবে। তার বীজই শুভ। তেমনই যে কন্যা বিশুদ্ধ পিতা ও মাতার দ্বারা উত্তম কুলে জন্ম নেয়, যার যোনি দূষিত হয়নি এবং যার ব্রাহ্ম ইত্যাদি উত্তম বিবাহবিধির দ্বারা বিবাহ হয়েছে, তাকে উত্তম বলে মানা হয়। তার যোনিই শ্রেষ্ঠ। যে নারী মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা পরপুরুষের সঙ্গে সমাগম করে, তার যোনি গর্ভাধানের যোগ্য নয়। যে পাপাত্মা পুরুষ সন্তান আকাঙ্ক্ষায় ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে স্বীকার করে, সে তার পূর্বপুরুষের দশপুরুষ এবং পরবর্তী দশপুরুষ সন্তানদের নরকে প্রেরণ করে। যে ব্যক্তি মূর্খতাবশত দূষিত যোনিতে বীর্য স্থাপন করে, সেই সন্তান ছয় অঙ্গের বিদ্বান হয়ে উঠলেও, সাধু পুরুষদের উচিত তাকে চণ্ডালের ন্যায় বহিষ্কার করা। যে নারী মন-বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা ব্যভিচার করে, তাকে কুলঘাতিনী বলে জানতে হবে। তার গর্ভে জন্ম নেওয়া বালক চণ্ডালের সমান হয়। দূষিত যোনিতে উৎপন্ন হওয়া মানুষ যজ্ঞ, দান, ভোজন, বার্তালাপ, শয়ন ও বিবাহ আদির দ্বারা সম্পর্ক ইত্যাদিতে যোগদানের যোগ্য হয় না। অবিবাহিত কন্যার গর্ভে উৎপন্ন, বিবাহের সময় গর্ভবতী কন্যার গর্ভে উৎপন্ন, পতির জীবিতাবস্থায় ব্যাভিচার দ্বারা

উৎপন্ন, পতির মৃত্যুর পর অন্যপুরুষের দ্বারা উৎপন্ন, সন্ন্যাসীর বীর্যে উৎপন্ন এবং পতিত মানুষের দ্বারা উৎপন্ন—এই ছয় প্রকারের ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়। এদের চণ্ডালের থেকেও নীচ বলে জানতে হয়। যেসব ব্যক্তি যেখানে সেখানে যে কোনো নারী বা শূদ্রনারীর সঙ্গে সমাগম করে, সেই পাপাত্মাকে স্বেচ্ছাচারী বলা হয়। তার বীজ অশুভ। সেই অশুদ্ধ বীর্য কোনো শুদ্ধ নারীর যোগ্য নয়। তার সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা শুদ্ধ যোনিও অশুদ্ধ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের বীর্য শূদ্র যোনিতে গিয়ে আত্মগ্লানি ভোগ করতে থাকে। বীর্যকে আত্মা বলা হয়, এ হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাই একে সর্বভাবে রক্ষা করতে হয়। মানুষ ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা আয়ু, তেজ, বল, বীর্য, বুদ্ধি, লক্ষ্মী, মহান যশ, পুণ্য এবং আমার ভক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে থেকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে পঞ্চযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে তৎপর হয়ে থাকে, সে পৃথিবীতে ধর্মস্থাপন করে। যে প্রত্যহ সন্ধ্যা ও প্রভাতে বিধি অনুসারে সন্ধ্যা-উপাসনা করে, সে বেদময় নৌকার সাহায্যে সংসার সমুদ্র নিজে পার হয় এবং অপরকেও পার করে দেয়। যে ব্রাহ্মণ সকলকে পবিত্রকারী বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করেন, তিনি আসমুদ্র পৃথিবী দান গ্রহণ করলেও প্রতিগ্রহ দোষে দুঃখ পান না এবং সূর্যাদি যেসব গ্রহ তাঁর পক্ষে অশুভ স্থানে থেকে অনিষ্টকারক হয়, সেগুলিও গায়ত্রী-জপের প্রভাবে শান্ত, শুভ ও কল্যাণকর হয়ে ওঠে। কোনো অশুভ, ভয়ংকর, ক্রূরকর্মকারী দুষ্কৃতিও সেই ব্রাহ্মণের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। বৈদিক ব্রত আচরণকারী ব্যক্তি পৃথিবীতে অপরকে পবিত্র করে তোলেন। প্রজাপতি মনু বলেন যে—'শীল, স্বাধ্যায়, দান, শৌচ, কোমলতা, সরলতা—এই সদ্‌গুণগুলি ব্রাহ্মণের কাছে বেদের থেকেও শ্রেষ্ঠ।' যে ব্রাহ্মণ 'ভূর্ভব স্বঃ' এই ব্যাহৃতি-সহ গায়ত্রী জপ করেন, বেদ-স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং নিজ স্ত্রীতে প্রীতি রাখেন, তিনিই জিতেন্দ্রিয়, তিনিই বিদ্বান এবং তিনিই এই ভূমণ্ডলের দেবতা।

যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গায়ত্রী উপাসনা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মলোক লাভ করেন। কেবল গায়ত্রী মন্ত্র জানা ব্রাহ্মণও যদি নিয়মে থাকেন, তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ চারবেদে বিদ্বান হয়েও সকলের অন্নগ্রহণ করেন, কোনো নিয়ম পালন করেন না, তাঁকে উত্তম বলে মানা হয় না। পূর্বকালে দেবতা এবং ঋষিগণ ব্রহ্মার সামনে গায়ত্রীমন্ত্র এবং চার বেদকে তৌলযন্ত্রে ওজন করেছিলেন। সেই সময় গায়ত্রী মন্ত্রের দিক, চার বেদের থেকে ভারী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ভ্রমর যেমন প্রস্ফুটিত ফুলের থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই সম্পূর্ণ বেদ মন্থন করে গায়ত্রীমন্ত্র গ্রহণ করা হয়েছে। তাই গায়ত্রীকে সমস্ত বেদের সার বলা হয়। বিনা গায়ত্রী সকল বেদই নির্জীব। নিয়ম এবং সদাচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ চারবেদে বিদ্বান হলেও নিন্দার পাত্র হয়ে থাকে ; কিন্তু শীল ও সদাচারযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি শুধুমাত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন তাহলে তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানা হয়। প্রতিদিন এক হাজার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উত্তম, শত মন্ত্র জপ করা মধ্যম এবং দশ মন্ত্র জপ করা কনিষ্ঠ বলা হয়। কুন্তীনন্দন ! গায়ত্রী মন্ত্র সর্বপাপ বিনাশকারী, অতএব তুমি সর্বদা সেটি জপ করবে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ত্রিলোকীনাথ ! আপনি সর্বভূতের আত্মা। আপনি কোন্ কর্মের দ্বারা সন্তুষ্ট হন, দয়া করে বলুন।

ভগবান বললেন—মহারাজ ! কেউ যদি এক হাজার ভার গুগ্গুল ইত্যাদি সুগন্ধ দ্বারা আমার উপাসনা করে, নিরন্তর প্রণাম জানায়, নিয়ত পূজা-অর্চনা করে এবং নানা বেদ ইত্যাদির দ্বারা আমার স্তব-স্তুতি করে, কিন্তু যদি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তবে আমি তার ওপর প্রসন্ন হই না। ব্রাহ্মণের পূজা করলে যে আমাকেই পূজা করা হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তাই ব্রাহ্মণকে কটুকথা শোনালে, তার লক্ষ্য আমিই হয়ে থাকি। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পূজা করে, তার পরমগতি আমাতেই হয় ; কারণ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদের রূপে আমিই নিবাস করি। যে বুদ্ধিমান পুরুষ আমাতে মন নিবিষ্ট করে ব্রাহ্মণদের পূজা করে, তাকে আমি নিজেরই স্বরূপ বলে মনে করি। ব্রাহ্মণ যদি কুরূপ-কালা-বোবা-দরিদ্র বা রোগী হন তাহলেও বিদ্বান ব্যক্তির তাঁকে অপমান করা উচিত নয়। কারণ তাঁরা সকলেই আমার স্বরূপ। আসমুদ্র পৃথিবীতে যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা সকলেই আমার স্বরূপ। তাঁদের পূজা করলে আমাকেই পূজা করা হয়। বহু অজ্ঞান ব্যক্তি জানে না যে আমি এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণরূপে বাস করি। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের অপমান করে, তাঁদের স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করে দেয়, দূত করে পাঠায় এবং তাঁদের সেবাগ্রহণ করে, সেই পাপীদের যমদূত ইচ্ছামতো শাস্তি দেন। যারা ব্রাহ্মণদের গালি দিয়ে, তাদের নিন্দা করে আনন্দিত হয়, তারা

যমলোকে গমন করে। যমরাজ তাদের নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি প্রদান করেন। যেসব পাপী ব্রাহ্মণদের দিকে পাপপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, ব্রাহ্মণদের ভক্তি করে না, বৈদিক মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে এবং সর্বদা ব্রাহ্মণদের দ্বেষ করে, তারা যমলোকে গেলেই যমরাজের নির্দেশে তাদের ভয়ানক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের প্রহার করে, তাদের শরীর থেকে রক্তপাত ঘটায় অথবা তাদের খুন করে, সেই ব্যক্তি একুশ প্রকার নরকে তার ফল ভোগ করে। প্রথমে তাকে শূলে চড়ানো হয়, পরে মাথা নীচু করে আগুনে ঝলসানো হয়, এইভাবে হাজার বছর ধরে সে শাস্তিভোগ করে। সেই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পাপ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রেহাই পায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রতি কখনো অমঙ্গলসূচক কথা বলা উচিত নয়, তাঁদের সঙ্গে রুক্ষ বা কঠোর কথা বলা এবং নির্দেশ অমান্য করা উচিত নয়। যারা ব্রাহ্মণকে ব্যঙ্গ করে বা গালি দেয়, তারা প্রকৃতপক্ষে আমাকেই গালি দেয়, উপহাস করে। যারা চন্দন, ধূপ-দীপাদির দ্বারা আমার কাষ্ঠময় মূর্তির পূজা করে, তাদের দ্বারা ভালোভাবে আমার পূজা হয় না ; কিন্তু ব্রাহ্মণের পূজা করলে আমার যথাযথ পূজা হয়। ব্রাহ্মণদের কৃপাতেই আমি এই পৃথিবী ধারণ করে আছি। ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহেই আমি অসুরদের ওপর বিজয় লাভ করেছি। ব্রাহ্মণদের প্রসাদেই আমার মধ্যে দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণ অবস্থিত আছে এবং ব্রাহ্মণদের দয়াতেই আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না।

যমলোকের পথের কষ্ট এবং তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—কেশব ! আপনি সর্বজ্ঞ, মনুষ্যলোক ও যমলোকের মধ্যে দূরত্ব কতটা, দয়া করে বলুন। যমলোক কেমন, কত বড় এবং কোথায় ? মানুষ কোন্ উপায়ে যমলোকের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে ? জীব যখন পাঞ্চভৌতিক শরীর থেকে পৃথক হয়ে অস্থি-মাংসরহিত হয়, সেইসময় সে সুখ-দুঃখ কীভাবে অনুভব করে ? দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করে যেসব ধর্মপরায়ণ মানুষ, তাদের স্বর্গযাত্রা কীভাবে হয় ? পাপী ব্যক্তিরা কীভাবে প্রেতলোকে গমন করে ? যমলোকে যাওয়ার সময় জীবের রূপ-রং কেমন হয় ? তার দেহ কেমন আকারে থাকে ? কৃপা করে এসব বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! তুমি আমার ভক্ত, তাই যা জিজ্ঞাসা করছ আমি তা যথার্থভাবে জানাচ্ছি। মনুষ্যলোক এবং যমলোকের মধ্যে ছিয়াশি হাজার যোজনের দূরত্ব। এই পথের মধ্যে না আছে বৃক্ষ ছায়া, না পুষ্করিণী, না ঝোপঝাড় এবং নেই কোনো জলাশয় বা কূপ। কোনো মণ্ডপ, গৃহ, পর্বত, নদী, গ্রাম, গুহা, আশ্রম, বাগান বা বিশ্রাম নেওয়ার স্থান নেই। জীবের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, সে বেদনায় ছটফট করে, সেই সময় কারণ তত্ত্ব শরীর ত্যাগ করে, প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত এসে যায় এবং জীবের প্রাণবায়ু শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। ছয় কোষবিশিষ্ট শরীর থেকে বেরিয়ে বায়ুরূপধারী জীব এক অন্য অদৃশ্য শরীরে প্রবেশ করে। সেই শরীরের রূপ-রং-আকার আগের শরীরের মতোই হয়। তাতে প্রবেশ করলেও জীবকে কেউ দেখতে পায় না। দেহধারীদের অন্তরাত্মা জীব অষ্ট অঙ্গযুক্ত হয়ে যমলোকে যাত্রা করে। তাকে কাটলে, আগুনে পোড়ালে বা মারলে নষ্ট হয় না। যমরাজের আদেশে নানাপ্রকার ভয়ংকর রূপ ধারণকারী অত্যন্ত ক্রোধী ও দুর্ধর্ষ যমদূত প্রচণ্ড হাতিয়ার নিয়ে এসে জীবকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সেই সময় স্ত্রী-পুত্রের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ জীব বিবশ হয়ে থাকে। যখন সে যেতে শুরু করে, তখন তার কৃত পাপ-পুণ্য তাকে অনুগমন করে এবং জীবের আত্মীয়স্বজন করুণ স্বরে বিলাপ করতে থাকে। জীব তখন সব কিছু ছেড়ে নিরপেক্ষভাবে চলতে থাকে। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র সকলেই কাঁদতে থাকে, তাদের সঙ্গ ভ্রষ্ট হয়ে তারও চোখ দিয়ে জল পড়ে, তার অবস্থা তখন অত্যন্ত করুণ হয়, কিন্তু তার আত্মীয়রা তখন আর তাকে দেখতে পায় না। সে নিজ শরীর ত্যাগ করে বায়ুরূপে সেই পথের দিকে রওনা হয়, সে পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি ভয়ংকর এবং তার কোনো সীমা দেখা যায় না। সেই পথে চলা পাপীরা শেষপর্যন্ত বহু দুঃখভোগ করে। তাদের পক্ষে সেই পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং দুস্তর। সেই পথে কারো সাহায্য পাওয়া যায় না, যার সময় উপস্থিত হয়, তাকে আত্মীয়-কুটুম্ব, ধন-দৌলত সব কিছু ছেড়ে এই পথ ধরেই যেতে হয়। স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীকেই একদিন যমলোকের পথিক হতে হয়। যমরাজের অধীনে থাকা দেবতা, অসুর-মানুষ ইত্যাদি সকল জীব, তা

সে নারী হোক বা পুরুষ অথবা নপুংসক, জন্মে থাকুক বা গর্ভে—সকলকেই একদিন এই মহাপথ ধরে যাত্রা করতে হয়। সকাল-সন্ধ্যা অথবা রাত্রি, এই পথ সর্বসময় যাত্রার জন্য উন্মুক্ত থাকে। সে জীব স্বদেশে থাকু বা বিদেশে, জঙ্গলে থাক বা পর্বতে, জলে থাক বা স্থলে, ঘরে থাক বা আকাশে, বসে থাক বা শুয়ে, জেগে থাক বা ঘুমিয়ে ; সব সময় সর্ব অবস্থায় তাকে ওই পথে প্রস্থান করতেই হয়। যমলোকের পথে কখনো ভীত হয়ে, কখনো পাগল অবস্থায়, কখনো ধাক্কা খেয়ে, কখনো বেদনার্ত হয়ে চিৎকার করে পথ চলতে হয়। যমদূতের ধমকে জীব ভীত-বিহ্বল হয়ে কাঁপতে থাকে, তাদের প্রহারে নানা পীড়া অনুভব হয়, তবুও এগিয়ে যেতে হয়। যে ব্যক্তি দান করে না, তাকে কণ্টকাকীর্ণ, তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে চলতে হয়। ধর্মহীন ব্যক্তিকে জ্বলন্ত কাঠ, পাথর, লাঠির আঘাত সহ্য করে এগোতে হয়। যারা অন্য জীবকে হত্যা করে, তাদের এতো কষ্ট দেওয়া হয় যে তারা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে যমপুরীর পথে চলতে থাকে। তাদের মধ্যে কারো হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়, কারো নাক-কান কেটে নেওয়া হয়, কারো গলা টিপে ধরা হয়। নানা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তাদের দুর্বল করে দিলে বন্য জন্তু এসে তাদের মাংস খুবলে খেতে থাকে। মাংসাশী ব্যক্তিদের নানা জন্তু এসে আঘাত করতে থাকে। যে ব্যক্তি বালক হত্যা করে, সেই পাপীকে তীক্ষ্ণ হুল বিশিষ্ট মাছি এসে চারদিক থেকে ঘিরে রক্তপান করতে থাকে। যে অন্য জীব ভক্ষণ করে, তাকে কুকুর ও রাক্ষস এসে কামড় দিয়ে খেতে থাকে। যে ব্যক্তি অপরের জিনিস চুরি করে, তাকে যমদূত পিশাচের ন্যায় উলঙ্গ করে নিয়ে যায়। যে দুরাত্মা পাপাচারী বলপূর্বক অন্যের গাভী, গৃহ অধিকার করে নেয়, যমলোকে যাবার সময় যমদূত তাকে জ্বলন্ত কাঠ ও অস্ত্রের দ্বারা মারতে মারতে নিয়ে যায়। তার সারা অঙ্গে কাটা-ঘা করে দেয়। যে ব্যক্তি নরকের ভয় না করে ব্রাহ্মণের অর্থ ছিনিয়ে নেয়, সে যখন যমপুরী যায়, তখন যমদূত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার জিভ, নাক ও চোখ কেটে গায়ে দুর্গন্ধি বস্তু ঢেলে দেয়, শকুন এসে খুবলে খুবলে তার মাংস খায় এবং ক্রুদ্ধ চণ্ডালেরা এসে চারদিক থেকে তাকে আঘাত করতে থাকে। যমলোকে নিয়ে গিয়ে তাকে বিষ্ঠার কূপে কোটি বছর ধরে ফেলে রাখে। তারপর সময় সমাপ্ত হলে ইহলোকে শতকোটি জন্ম ধরে বিষ্ঠার কীট রূপে তাকে জন্মাতে হয়। যেসব ব্যক্তি ধনী হয়েও লোভ, দম্ভ এবং অসত্যের বশীভূত হয়ে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের দান করে না, গলায় ফাঁস লাগিয়ে যমদূত তাদের তৃষ্ণার্ত-ক্ষুধার্ত অবস্থায় টানতে টানতে যমপুরীতে নিয়ে যায়। দান না করা জীবেদের কণ্ঠ, মুখ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হলে, তারা যমদূতের কাছে বারংবার কাতর অনুরোধ করতে থাকে, 'প্রভু ! আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি, চলতে কষ্ট হচ্ছে ; কৃপা করে একটু খাবার ও জল দিন'। তারা কাতরভাবে চাইলেও, যমদূতেরা কিছু না দিয়ে সেই অবস্থায় টানতে টানতে তাদের যমরাজের কাছে পৌঁছে দেয়।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে ভয়ংকর যম-যাতনার বর্ণনা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভয়ে কম্পিত হলেন এবং অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরে তিনি যখন ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরে পেলেন তখন ভগবান তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি মুখহাত প্রক্ষালন করে পুনরায় ভগবানকে বললেন—'দেবেশ্বর ! যমলোকের পথের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলাম। এখন কৃপা করে বলুন মানুষ কীভাবে এই বিকট পথ সুখে পার হতে পারবে ?'

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! ইহজগতে যারা ধর্মময় জীবনযাপন করে, জীবহিংসা থেকে দূরে থেকে গুরুজনদের সেবায় ব্যাপৃত থাকে ; দেবতা, ব্রাহ্মণদের পূজা করে এবং ব্রাহ্মণদের নানাবস্তু দান করে, তারা সুখপূর্বক যমলোকে যায়। যারা ব্রাহ্মণদের, বিশেষত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতাসহ ভালোভাবে উত্তম আহার করায়, সেই মহাত্মা ব্যক্তি উত্তম বিমানে করে যমলোকে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ নিষ্কপটভাবে সত্যভাষণ করে এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয়দের ধেনুদান করে, সেও বিমানে করে যমালয়ে গমন করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের ছাতা, জুতা, শয্যা, বস্ত্র, অলংকার, আসন দান করে, সে স্বর্ণসজ্জিত ঘোড়া, বলদ অথবা হাতিতে করে ধর্মরাজের সুন্দর নগরে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণকে সযত্নে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু শ্রদ্ধাসহ দান করে, সে চক্রবাক বাহিত বিমানে যমলোকে যাত্রা করে। সেই সময় নানা বাদ্য সহকারে গন্ধর্বগণ তার মনোরঞ্জন করতে করতে তার সঙ্গে গমন করেন। যে ব্যক্তি সুগন্ধি ফুল ও ফল দান করে, সে হংসযুক্ত বিমানে ধর্মরাজের নগরে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের ঘৃতপক্ব সুখাদ্য দান করে,

সে বায়ুগতিসম্পন্ন বিমানে বসে যমপুরী যাত্রা করে। যে সমস্ত প্রাণীর জীবন রক্ষাকারী জলদান করে, সে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে হংসবাহিত বিমানে সুখের সঙ্গে যমালয়ে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি শান্তভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিল অথবা তিলের ধেনু বা ঘৃতের ধেনু দান করে, সে সূর্যমণ্ডলের ন্যায় তেজস্বী বিমানে আরোহণ করে গন্ধর্বদের গীতবাদ্য শুনতে শুনতে যমলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে কূপ, পুষ্করিণী, সরোবর ইত্যাদি জলাশয় নির্মাণ করেছে, সে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল এবং দিব্য ঘণ্টানিনাদযুক্ত বিমানে করে যমলোকে যায় ; সেই সময় সেই মহাত্মাকে নিত্যতৃপ্ত এবং মহাকান্তিমানরূপে দেখা যায়। দিব্যলোকের পুরুষেরা তাকে পাখা এবং চামর দুলিয়ে বাতাস করেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে অতি বিচিত্র, বিস্তৃত, মনোহর, সুন্দর ও দর্শনীয় দেবমন্দির তৈরি করেছে, সে সাদা মেঘের মতো সুন্দর এবং বায়ুবেগসম্পন্ন বিমানে যমলোকে যাত্রা করে, সেখানে গেলে সে যমরাজকে অত্যন্ত সুখী ও প্রসন্নরূপে দেখে এবং তাঁর দ্বারা সম্মানিত হয়ে দেবলোক নিবাসী হয়। যারা দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ তৈরি করে তৃষ্ণার্ত মানুষকে ঠান্ডা জল পান করায়, তারা সেই মহান পথে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে সুখে গমন করে। পাদুকা ও জলদানকারী ব্যক্তি সেই পথ উত্তম রথে, স্বর্ণ সিঁড়িতে পা রেখে সুখে পরিক্রমা করে। যারা বড় বড় বাগান তৈরি করে বৃক্ষরোপণ করে, সেখানে জলসিঞ্চন করে বাগান ফুল ও ফলে সুশোভিত করে, তারা দিব্যবাহনে করে বৃক্ষের ছায়ায় সুশোভিত পথে দিব্য পুরুষদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে যমালয়ে গমন করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের ঘোড়া, বলদ অথবা হাতিযুক্ত রথ দান করে এবং যে ব্যক্তি সোনা-রূপা বা বস্ত্র দান করে, তারা স্বর্ণ-বিমানে করে যমপুরীতে গমন করে। ভূমিদানকারী ব্যক্তি সমস্ত কামনা তৃপ্ত হয়ে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বিমানে যমালয়ে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ভক্তিপূর্বক সুগন্ধি পদার্থ বা পুষ্প প্রদান করে, সে সুগন্ধপূর্ণ সুন্দর বেশভূষা পরিধান করে উত্তম কান্তিতে দেদীপ্যমান হয়ে বিচিত্র বিমানে চড়ে ধর্মরাজের নগরে যায়। দীপদানকারী ব্যক্তি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বিমানে দশদিক দেদীপ্যমান করে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয়ে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি গৃহ এবং আশ্রয় দান করে, সে স্বর্ণযুক্ত ও প্রাতঃসূর্যের ন্যায় কান্তিযুক্ত গৃহাদিসহ ধর্মরাজের নগরে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের চরণে দেবার তৈলাদি বস্তু, কেশ তৈল, পা ধোওয়ার জল এবং পান করার শরবৎ দেয়, সে ঘোড়ায় করে যমলোকে যায়। যে ব্যক্তি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করে তাঁকে আরাম দেয়, সে চক্রবাক বাহিত বিমানে যাত্রা করে। যে গৃহাগত ব্রাহ্মণকে সাদরে আসন দিয়ে তাঁর পূজা করে, সে যমালয়ের পথ আনন্দের সঙ্গে পরিক্রমা করে। যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করে **'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'** বলে প্রণাম করে এবং ব্রতধারী পুরুষের ন্যায় সর্বদা নিজ মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমে রাখে, সে সুখপূর্বক ধর্মরাজের স্থানে গমন করে। যে প্রতিদিন **'নমঃ সর্বসহাভ্যশ্চ'** বলে গাভীকে নমস্কার করে, সেও যমপুরীর পথে সুখে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে **'নমোঽস্তু বিপ্রদত্তায়ৈ'** বলে শয্যা ত্যাগ করে, সে সব কামনা দ্বারা তৃপ্ত হয়ে সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত হয়ে দিব্য বিমানে করে সুখে যমলোকে যায়। যে ব্যক্তি দেবতা ও অতিথিদের তৃপ্ত করার পর স্বয়ং আহার করে (অথবা যে ব্যক্তি প্রভাত ও সন্ধ্যা ব্যতীত মধ্যকালে আর কিছু খায় না), দম্ভ ও অসত্য থেকে দূরে থাকে, সেও সারসযুক্ত বিমানে সুখে যমলোকে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি দিন ও রাত্রে কেবল একবার আহার করে এবং দম্ভ অসত্য থেকে দূরে থাকে, সে হংসযুক্ত বিমানে যমলোকে যায়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি চতুর্থপ্রহরে অর্থাৎ একদিন উপবাস করে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আহার করে সে ময়ূরযুক্ত বিমানে করে যমালয়ে যায়। যে আমার ভক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে তীর্থ ভ্রমণ করে, সেই মহাত্মা সানন্দে বিমানে পথপরিক্রমা করে। যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ অধিক দক্ষিণাসহ যজ্ঞানুষ্ঠান করে সে হংস ও সারসযুক্ত বিমানে বসে যমলোকে যায়। যে ব্যক্তি অপরকে কষ্টপ্রদান না করে আত্মীয় পোষণ করে, সে সুবর্ণময় বিমানে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রাণীতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রাণীদের অভয়প্রদান করে, ক্রোধ ও লোভরহিত এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, সে মহান কান্তিমান দেবতা ও গন্ধর্ব সেবিত হয়ে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে বসে যমলোকে যাত্রা করে। যে প্রত্যহ ভগবানের পূজা, স্তুতি ও নমস্কার করে, সে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বিমানে আরোহিত হয়ে ধর্মরাজের নগরে যায়। সেখানে ধর্মরাজ স্বয়ং তাকে সুন্দর মালা অর্পণ করে তাঁর পূজা করেন।

—— o ——

জলদান, অন্নদান এবং অতিথি সৎকারের মাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যমপুরীর পথের বর্ণনা এবং সেখানে সুখপূর্বক যাওয়ার উপায় শুনে রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'দেবদেবেশ্বর ! আপনি দৈত্যবধকারী, ঋষি সমুদায় সর্বদা আপনারই স্তুতি করেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত, ভব-বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রদানকারী, শ্রীসম্পন্ন এবং সহস্র সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। আপনার থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। আপনি ধর্মজ্ঞাতা এবং ধর্মের প্রবর্তক। শান্তস্বরূপ অচ্যুত ! আমাকে সর্বপ্রকার দানের ফলের কথা বলুন। দানের প্রকারভেদ কী এবং কীভাবে ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত ? কী প্রকার তপের অনুষ্ঠান করলে কোথায় তার ফল লাভ করা যায় ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাজন্ ! মন দিয়ে শোনো—সর্বপ্রকার দানের ফল পরম পবিত্র, উত্তম এবং পাপনাশকারী হয়ে থাকে। একদিনের জন্যও যদি গাভীকে পিপাসা মেটানোর জল (যা নিজেই মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে) দান করা যায়, তাহলে পূর্বতন সাতপুরুষ উদ্ধার লাভ করে। জলকে প্রাণীদের জীবন বলা হয়, জলদান করলে জীবেরা তৃপ্তি লাভ করে। জলের গুণ দিব্য এবং জলদানের ফল পরলোকেও পাওয়া যায়। যমলোকে পুষ্পোদকী নামে এক পরম পবিত্র নদী আছে। সেটি জলদানকারী মানুষের সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। তার জল সুস্বাদু এবং শীতল। জলদানকারীকে তা সর্বদা সুখী করে। পিপাসার্ত মানুষের পিপাসা অন্নের দ্বারা তৃপ্ত হয় না, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উচিত পিপাসার্তকে সর্বদা জলদান করা। সব প্রাণী জল থেকেই উৎপন্ন হয় এবং জলের দ্বারাই জীবন ধারণ করে। তাই জলদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সর্বপ্রকার দান, তপ এবং যজ্ঞের দ্বারা যে উত্তম ফললাভ হয়, সেসব শুধুমাত্র জলদান করলেই যে পাওয়া যায়—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যারা ব্রাহ্মণকে সুপক্ব অন্নদান করে, তারা প্রাণদান করে থাকে বলে জানবে ; তেজ, বল, রূপ, সত্ত্ব, বীর্য, ধৃতি, দ্যুতি, জ্ঞান, মেধা ও আয়ু—এই সবেরই আধার অন্ন। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচটি প্রাণ অন্নের আধারে থেকেই দেহধারীদের ধারণ করে। সমস্ত বিদ্যালয় এবং পবিত্রকারী সকল যজ্ঞ অন্নের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। তাই অন্নকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। রুদ্রাদি সমস্ত দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নি অন্নদ্বারাই সন্তুষ্ট হন। প্রজাপতি প্রত্যেক কল্পে অন্নদ্বারাই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেছেন। তাই অন্ন থেকে বড় আর কোনো দান নেই এবং হবেও না। ধর্ম-অর্থ-কাম চরিতার্থ হয় অন্ন থেকেই ; সুতরাং ইহলোকে বা পরলোকে অন্ন থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো দান নেই। যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ, নাগ, ভূত এবং দানবও অন্নেই সন্তুষ্ট হয় ; তাই অন্নের মাহাত্ম্য সব থেকে বেশি। অপরের অন্নগ্রহণ করে যে ব্যক্তি, তার শুভ কর্মের এক ভাগ সে পেলেও তিন ভাগ পায় অন্নদাতা। তাই ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে অন্নদান করা উচিত। যে ব্যক্তি দম্ভ ও অসত্য পরিত্যাগ করে আমাতে পরম ভক্তি রেখে কালের ভেদাভেদ না করে দরিদ্র এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে এক বছর ধরে অন্নদান করে, সে এক লাখ বছর ধরে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেবলোকে নিবাস করে এবং সেখানে ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করে যথেচ্ছ বিচরণ করে। পরে পুণ্যক্ষয় হলে স্বর্গ থেকে মনুষ্যলোকে এসে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ছয় মাস অথবা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের প্রথম ভিক্ষা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দেয়, সে এক সহস্র গো-দানের ফল লাভ করে। যে এক বৎসর ধরে প্রত্যহ অগ্রভিক্ষা বস্ত্রদ্বারা ঢেকে অযাচিতভাবে ব্রাহ্মণের গৃহে পৌঁছে দেয়, সে হাজার কপিলা গাভী দানের পুণ্যফল লাভ করে ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা পায়। পাণ্ডুনন্দন ! দেশ-কাল অনুসারে প্রাপ্ত এবং পদব্রজে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করা উচিত। যে ধনী হয়েও যাচককে অন্নদান করে না, সেই লোভী মানুষ কীট পরিবৃত কালসূত্র নামক নরকে পতিত হয়। লোভ ও মোহবশত বিবেক হারানো ব্যক্তি সেই ঘোর নরকে দশ হাজার বছর ধরে বহু ক্লেশ ভোগ করতে থাকে। পরে দীর্ঘকাল পরে সেই নরক থেকে মুক্তি পেয়ে মর্তলোকে দরিদ্র চণ্ডালরূপে সে জন্ম নেয়।

যে ব্যক্তি বহুপথ অতিক্রম করে দুর্বল এবং ক্ষুধা-পিপাসা ও পরিশ্রমে কাতর, যে বড় কষ্টে পথ চলে এবং অত্যন্ত অসহায়, এরূপ ব্রাহ্মণ যদি ধূলোভর্তি পায়ে গৃহে এসে অন্নভিক্ষা করে, তাহলে যত্নসহকারে তার আপ্যায়ন করা উচিত, কারণ সেই অতিথি স্বর্গের সোপান হয়। সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হলে সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন। অতিথিকে পূজা করলে অগ্নিদেব যেমন প্রসন্ন হন, তাঁকে ফুল-চন্দন বা হবিষ্য দিয়ে পূজা করলে তিনি তেমন সন্তুষ্ট হন না। যা ব্রাহ্মণকে আহার করালে পাওয়া যায়, শ্রেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হয়ে কপিলা গাভী দান করলেও সেই ফল পাওয়া

যায় না। ব্রাহ্মণের চরণোদকে প্লাবিত এই পৃথিবী যতদিন থাকে, ততদিন অন্নদাতার পিতৃপুরুষ পদ্মপাতায় জল পান করেন। দেবতার স্থান থেকে পত্র-পুষ্পাদি সরিয়ে পরিষ্কার করা, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট বাসন ধোয়া, ক্লান্ত ব্রাহ্মণের সেবা করা, তাঁকে থাকার জন্য আশ্রয় ও শয্যাদান করা—এর এক একটি কাজের মহত্ত্ব গো-দানের থেকেও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের এরূপ সেবা করে, সে কখনো যমলোকে যায় না। রাজন্! ব্রাহ্মণ অতিথির সংকার এবং ভক্তিপূর্বক সেবা করলে তেত্রিশ দেবতার সেবা করা হয়। পূর্বপরিচিত ব্যক্তি গৃহে এলে তাকে অভ্যাগত বলা হয় আর অপরিচিত ব্যক্তিকে অতিথি বলা হয়। দ্বিজদের এই উভয়কেই আপ্যায়ন করতে হয়। এ হল পঞ্চম বেদ—পুরাণের শ্রুতি। যে ব্যক্তি অতিথির সেবা করে, অন্ন-জল দান করে, তার দ্বারা আমারও পূজা হয়ে থাকে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই মানুষ শীঘ্রই সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং আমার কৃপায় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বিমানে বসে আমার পরম

ধামে পদার্পণ করে। ক্লান্ত অভ্যাগত যখন গৃহে আসেন, তখন সমস্ত দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অগ্নি তাঁর সঙ্গে পদার্পণ করেন। সেই অভ্যাগতকে পূজা করলে, তাঁর সঙ্গে সমস্ত দেবতাও পূজিত হন আর অভ্যাগত নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে দেবতা ও পিতৃপুরুষগণও নিরাশ হয়ে ফিরে যান, এর ফলস্বরূপ গৃহস্বামীর পিতৃপুরুষ পনেরো বছর উপবাসে থাকেন। সেই লোভী ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নি দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে পনেরো বছর রৌরব নামক নরকে পড়ে থাকে, সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জগতে উচ্ছিষ্ট ভোগী হয়ে জন্মায়। যে ব্যক্তি বলিবৈশ্বদেব কর্মের সময় গৃহাগত অতিথির পূজা করে না সে চণ্ডাল হয়ে যায়। যে দেশ-কালানুযায়ী গৃহাগত ব্রাহ্মণকে আপ্যায়ন না করে, সে তখনই পতিত হয়। সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর এককোটি বছর রৌরব নরকে পড়ে থাকে ; পরে সময় হলে কুকুরজন্ম পেয়ে বারো বছর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করে। দেশ-কাল অনুসারে অন্নের আশায় যদি চণ্ডালও অতিথিরূপে আসে, তাহলে গৃহস্থের সর্বদা তাকেও সংকার করা উচিত। যে ব্যক্তি লোভ ও মোহবশত বিচারশূন্য হয়ে তাকে সংকার না করেই আহার করে নেয়, সে দশ বৎসর চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। যে ব্যক্তি অতিথিকে নিরাশ করে নিজে সানন্দে ভোজন করতে বসে, সে জানে না যে সে বিষ্ঠার কূপে পতিত হবে। যে অতিথির সংকার করে না—তার সাজ-সজ্জা, আহার-বিহার সবই ব্যর্থ। যে প্রত্যহ সর্বাঙ্গীণ বেদ অধ্যায় করে কিন্তু অতিথি-সেবা করে না, সে দ্বিজের জীবন বৃথা। যারা পাকযজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, সোমযাগ ইত্যাদির দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে কিন্তু গৃহাগত অতিথিসংকার করে না, সেই ব্যক্তিরা যশের আশায় যা কিছু দান করে, সেসবই ব্যর্থ হয়ে যায়। অতিথির আশা ব্যর্থ হলে মানুষের সমস্ত শুভকর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেশ-কাল-পাত্র-শক্তি বিচার করে সাধ্যমতো অতিথি-সংকার অবশ্যই করা উচিত। অতিথি গৃহে এলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত প্রসন্ন চিত্তে, হাসিমুখে অতিথিকে স্বাগত জানানো, আসন ও পা ধোওয়ার জল দিয়ে তার আপ্যায়ন করে পরে আহারের ব্যবস্থা করা। নিজ হিতৈষী, স্নেহের পাত্র, মূর্খ বা পণ্ডিত—যে কেউ বলিবৈশ্বদেবের পর গৃহে আসুক, সে স্বর্গের প্রেরিত অতিথি। কোনো ব্যক্তি যদি যজ্ঞের ফল লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর, দুঃখী ও দেশ-কাল অনুসারে প্রাপ্ত অতিথিকে অন্নদান করতে হয়। যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধে নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিধিবৎ আহার করানো উচিত। অন্ন মানুষের প্রাণ, অন্নদাতা প্রাণদাতা হয় ; তাই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের অন্নদান করার বিশেষ আগ্রহ থাকা উচিত। যে ব্যক্তি ধর্মপথে ধন-উপার্জন পূর্বক আহারে ভেদাভেদ না করে এক বছর ধরে অতিথি সংকার করে, তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

ভূমিদান, তিলদান এবং উত্তম ব্রাহ্মণের মহিমা

ভগবান বললেন—এবার আমি সব থেকে উত্তম ভূমি-দানের বর্ণনা করছি। ভূমিদানের থেকে বড় কোনো দান নেই এবং ভূমি কেড়ে নেওয়ার থেকে বড় কোনো পাপ নেই। অন্য দানগুলির পুণ্য সময় অতিক্রান্ত হলে ক্ষয় হয়ে যায় ; কিন্তু ভূমিদানের পুণ্য কখনো ক্ষয় হয় না। যেসব ব্যক্তি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের যজ্ঞ করে, তারাও ভূমিদানের সমান উত্তম ফল পায় না। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে পুনরায় তাতে অধিকার কায়েম করে না, সর্বত্র তার দানের চর্চা হতে থাকে এবং যতদিন এই জগৎ থাকে, ততদিন সে স্বর্গলোকে বাস করে পুণ্যের ফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কৃষিকার্যের জন্য ভূমিদান করে, তার পিতৃপুরুষ মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করলে সকল দেবতা, সূর্য, শংকর এবং আমি—সকলেই প্রসন্ন হই। ভূমিদানের পুণ্যে পবিত্রচিত্ত দাতা নিঃসন্দেহে আমার পুণ্যধামে নিবাস করে। মানুষ জীবিকার অভাবে যে পাপ করে, তার জন্য গোকর্ণ-মাত্র ভূমিদান করলেও মুক্তিলাভ করে। একমাস ধরে উপবাস, কৃচ্ছ্রসাধন, চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান এবং সমস্ত তীর্থে স্নান করলে যে পুণ্য হয়, সেই সমস্ত পুণ্য গোকর্ণ-মাত্র ভূমিদান করলে পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির বললেন—'দেবেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। কৃপা করে আমাকে গোকর্ণ-মাত্র ভূমির সঠিক পরিমাপ বলুন।'

ভগবান বললেন—রাজন্ ! পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ চারদিকে ত্রিশ দণ্ড করে মাপলে যতটা জমি হয়, তাকেই গোকর্ণ-মাত্র ভূমি বলা হয়। যতটা জমিতে একশত গাভী তাদের গো-বৎসা নিয়ে সুখে থাকতে পারে, ততটা জমিকে গোকর্ণ বলে। এই ভূমিদানকারীর কাছে যমরাজের দূত আসতে পারে না ; মৃত্যুর দণ্ড, দারুণ কুম্ভীপাক, ভয়ানক বরুণ পাশ, রৌরব ইত্যাদি নরক, বৈতরণী নদী এবং কঠোর যম-যাতনাও তাকে কষ্ট দিতে পারে না। চিত্রগুপ্ত, কলি, কাল, কৃতান্ত, মৃত্যু এবং সাক্ষাৎ ভগবান যমও ভূমিদানকারীর পূজা করেন। রুদ্র, প্রজাপতি, ইন্দ্র, দেবতা, ঋষি এবং আমি স্বয়ং—সকলেই প্রসন্ন হয়ে ভূমিদাতার পূজা করি। যার আত্মীয়-কুটুম্বগণ জীবিকার অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যার গৃহপালিত জন্তুগুলিও দুর্বল হয়ে গেছে এবং যে সর্বদা অতিথি-সৎকার করে, এরূপ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা উচিত, কারণ তা পরলোকের জন্য সঞ্চয়। যার আত্মীয়-পরিবার কষ্টে আছে—তেমন শ্রোত্রিয়, অগ্নিহোত্রী, ব্রতধারী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা উচিত। ধাত্রী যেমন তার দুধ পান করিয়ে পুত্রের লালন-পালন করে, দান করা ভূমিও তেমনই দাতার ওপর অনুগ্রহ করে। গাভী যেমন তার দুধ দিয়ে গোবৎস্যকে পালন করে, তেমনই সর্বগুণসম্পন্ন ভূমিদান দাতার কল্যাণ করে। জলসিঞ্চনের দ্বারা যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমনই ভূমিদাতার মনোরথও প্রতিদিন পূর্ণ হতে থাকে। সূর্যের তেজ যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনই ভূমিদান মানুষের সম্পূর্ণ পাপ নাশ করে। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশপুরুষ উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কারো জমি কেড়ে নেয় সে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশ পুরুষকে নরকে প্রেরণ করে। যে ভূমিদানের প্রতিজ্ঞা করে তা পালন করে না অথবা দিয়েও কেড়ে নেয়, তাকে বরুণের পাশে বেঁধে পূঁজ ও রক্তের কুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়। যে নিজের বা অপরের দান করা ভূমি কেড়ে নেয়, তার নরক থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনোই উপায় থাকে না, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের খেত কেড়ে নেয়, সে পূর্বের বারো পুরুষকে নরকে প্রেরণ করে এবং নিজেও কীট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তার কখনো মুক্তি হয় না। যে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে আবার তার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে, সে এক লক্ষ গো-হত্যার ফল ভোগ করে। তাকে এক হাজার দিব্য বর্ষ কুম্ভীপাক নরকে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর পাপ ক্ষয় হলে শত জন্ম ধরে কুকুরজন্ম ধারণ করতে হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে, শস্যশ্যামল জমি, যাতে চাষ করে ফসল লাগানো হয়েছে, তেমন খেতি জমি দেওয়া উচিত। অথবা যে জমির কাছে জলের সুবিধা থাকে, যা চাষের উপযোগী, তেমন জমি দান করা উচিত। এইভাবে প্রসন্ন চিত্তে যদি মানুষ দান করে, তাহলে সে প্রকৃত উত্তম ফল লাভ করে। বহু রাজা এইভাবে জমি দান করেছেন এবং অনেকে এখনও করছেন। ভূমি যখন যার অধিকারে থাকে, সেই সময় সেই ব্যক্তিই তা দান করতে পারে এবং তার ফলভোগ করতে পারে।

যার জীবিকার সংস্থান নেই এবং গাভীগুলি দুর্বল হয়ে

পড়েছে, তেমন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে রুপো দান করে, সে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। পরে পুণ্যক্ষয় হলে ইহলোকে মহাপরাক্রমী রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে—বিশেষত দরিদ্রকে তিলের পর্বত দান করে, সে দশ হাজার বৃষোৎসর্গের পুণ্য লাভ করে নিষ্পাপ হয়ে যায়। তিলদানকারী মানুষ মহাযশ এবং ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করার শক্তি লাভ করে সাত হাজার বছর পিতৃলোকে সুখ ও আনন্দ ভোগ করে। যে ব্যক্তি দরিদ্র ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিলের গাভী দান করে, সে এক হাজার বছর ধরে গাভী দানের সুফল ভোগ করে। যে যতগুলি কুণ্ড (লৌহ কিংবা কাঠের তৈরি পাত্র বিশেষ যা চার আঙুল লম্বা-চওড়া এবং চার আঙুল গভীর হয়ে থাকে) তিলে পরিপূর্ণ করে তার দ্বারা গাভী নির্মাণ করে দান করে, সে তত কোটি বছর ধরে স্বর্গে বাস করে। তিল, গাভী, স্বর্ণ, অন্ন, ভূমি—এইসব পদার্থ ব্রাহ্মণকে দান করলে, তাদের আশীর্বাদ দাতাকে পরলোকে উত্তম পথের পথিক করে। সদাচার-সম্পন্ন, অগ্নিহোত্রী এবং লোভহীন ব্রাহ্মণকে সসম্মানে পূজা করলে, তা পরলোকে কাজ দেয়। যে ব্রাহ্মণ বেদের বিদ্বান, অগ্নিহোত্রপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, শূদ্রান্ন গ্রহণ করেন না এবং দরিদ্র, তাঁকে সযত্নে পূজা করা উচিত। যে প্রত্যহ তর্পণ করে, সর্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, স্বাধ্যায়-পরায়ণ, ঋতুকালে নিজ পত্নীতে সমাগম করে এবং বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করে, সেই ব্রাহ্মণ অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। যে আমার ভক্ত, আমাতে অনুরক্ত, আমার ভজন-পরায়ণ এবং আমাকেই সব কর্মফল অর্পণ করে, সেই ব্রাহ্মণ অবশ্যই অপরকে সংসার-সমুদ্র থেকে পার করতে সক্ষম হয়।

বিবিধ প্রকার দানের মহিমা

যুধিষ্ঠির বললেন—মাধব ! আপনার মুখ থেকে এই ধর্মময় অমৃত শ্রবণ করে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। এবার অন্য প্রকার দান, যা আপনি এখনও বলেননি, তার বর্ণনা করুন এবং কৃপা করে তার ফলও বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! গাড়ি টানা একটি বলদ দশটি গাভীর সমান। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয়, সদাচারী, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভারী বোঝা বহনকারী এক জোড়া বলদ দান করে, সে এক হাজার গাভীদানের ফল লাভ করে। পাণ্ডুনন্দন ! দরিদ্রকেই দান করা উচিত, ধনীকে নয়। বর্ষার সুফল পুকুরেই দেখা যায়, সমুদ্রে নয়। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ধনহীন ব্রাহ্মণকে শয্যা-আসন বিভূষিত, নানাবাসন-সামগ্রীযুক্ত, ধন-ধান্য অলংকৃত, দাস-দাসী-গো-ভূমি সংবলিত, পরিপূর্ণ আলোকিত গৃহ প্রদান করে, দেবতা, পিতৃপুরুষ, অগ্নি, ঋষিগণ প্রসন্ন হয়ে তাকে সূর্যের ন্যায় তেজঃপূর্ণ বিমান প্রদান করেন। সে সেই বিমানে আরোহণ করে, অনুপম শোভাসম্পন্ন হয়ে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করে এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত সেখানে অত্যন্ত আনন্দে বিরাজ করে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহ বস্ত্র, মালা ও চন্দন দিয়ে ব্রাহ্মণের পূজা করে এবং তাঁকে শয্যাদান করে, সে বেদমন্ত্রের দ্বারা চালিত সুন্দর বিমানে করে সপ্তর্ষিলোকে গমন করে এবং সেখানে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ দ্বারা পূজিত হয়। সেই লোকে ত্রিশ চতুর্যুগ দেবতাদের ন্যায় ক্রীড়া করার পর ইহলোকে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পথশ্রমে ক্লান্ত, দুর্বল ব্রাহ্মণকে সেবা করে এবং বিশ্রাম দেয়, তার সারা বছরের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। সে সেই ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে দিলে তার দশ বছরের পাপ দূর হয়। যদি তাঁর পদ-সেবা করে তাঁর পূজা করে, তবে তার বারো বছরের পাপ তখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গৃহাগত ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানিয়ে, আসন দিয়ে পূজা করে, সে দেবতাদের প্রিয় হয়। অতিথিকে স্বাগত জানালে অগ্নি, আসন দিলে ইন্দ্র এবং আবাহন করলে অতিথিদের ওপর প্রীতিসম্পন্ন পিতৃপুরুষগণ প্রসন্ন হন। এইভাবে অগ্নি, ইন্দ্র ও পিতৃপুরুষগণ প্রসন্ন হলে মানুষের সারা বছরের পাপ তখনই নষ্ট হয়ে যায়। যে মানুষ ব্রাহ্মণকে ঘোড়াদান করে, সে রত্নদ্বারা চিত্রিত বিমানে স্বর্গলোকে যায়। যে ব্যক্তি ফুল-ফল-পাতা সমন্বিত বৃক্ষকে বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিত করে চন্দন ও ফুল দিয়ে পূজা করে এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে দক্ষিণা-সহ সেই বৃক্ষ তাঁকে দান করে, সে সুবর্ণমণ্ডিত বিমানে জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে ইন্দ্রলোকে গমন করে এবং সেখানে কল্পবৃক্ষ তার সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক মন্দির নির্মাণ করে আমার মূর্তি স্থাপন করিয়ে, অন্যের দ্বারা অথবা নিজে

ভক্তি সহকারে পূজা করে, সে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে আমার পরম ধামে যায় এবং সেখান থেকে কখনো তাকে আর ইহলোকে ফিরে আসতে হয় না। যে ব্যক্তি দেবমন্দিরে, ব্রাহ্মণের গৃহে, গোশালাতে এবং চৌরাস্তায় প্রদীপ জ্বালে, সে সুবর্ণময় বিমানে চতুর্দিক আলোকিত করে সূর্যলোকে গমন করে, সেইসময় দেবতারা তার অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকেন। সেই মহাতপস্বী ব্যক্তি কোটি কোটি বছর সূর্যলোকে যথেচ্ছ বিহার করে মর্তলোকে এসে বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম-গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু, পানপাত্র এবং মহার্ঘ জলপূর্ণপাত্র দান করে, সে সর্বদা তৃপ্ত থাকে। সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার সুগন্ধবস্তু সুলভে প্রাপ্ত হয় এবং তার মন ও ইন্দ্রিয়াদি সর্বদা প্রসন্ন থাকে। শুধু তাই নয়, সে হংস ও সারসবাহিত সুন্দর বিমানে দিব্য গন্ধর্বদ্বারা সেবিত বরুণলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি গ্রীষ্মের তিন মাস প্রাণীদের জীবনভূত জলদান করে, সে এক কোটি কপিলাগাভী দানের পুণ্যফল লাভ করে এবং পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশযুক্ত বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রভবনে যাত্রা করে। সেখানে দেবতা-গন্ধর্বের দ্বারা সেবিত হয়ে ত্রিশ কোটি যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের পর ইহলোকে চার বেদের জ্ঞাতা ব্রাহ্মণরূপে জন্ম নেয়। মাথার তেল দান করলে মানুষ তেজস্বী, দর্শনীয়, সুন্দর, রূপবান, শূরবীর এবং পণ্ডিত হয়। বস্ত্রদানকারী ব্যক্তিও তেজস্বী, দর্শনীয়, সুন্দর, শ্রীসম্পন্ন ও মনোরম হয়। যে ব্যক্তি জুতা ও ছাতা দান করে সে মহাতেজসম্পন্ন হয়ে স্বর্ণনির্মিত সুন্দর রথে করে ইন্দ্রলোকে যায়। যে কাষ্ঠখড়ম দান করে, সে কাষ্ঠনির্মিত বিমানে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সেবিত হয়ে ধর্মরাজের রমণীয় নগরে প্রবেশ করে। দাঁতন দান করলে মানুষ মধুর ভাষী হয়, তার মুখ থেকে সুগন্ধ বার হয়, সে লক্ষ্মীবান ও বুদ্ধি-সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে বিশাখা নক্ষত্রের দিনে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক সূর্যদেবের প্রসন্নতার জন্য ব্রাহ্মণদের বিধিবৎ পূজা করে তিল ও গুড়ের নাড়ু দান করে, সে গোদানের ফললাভ করে এবং আমার লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে ব্যক্তি অতিথি-কুটুম্বদের আহারের পর নিজে আহার করে, সর্বদা ব্রত পালন করে, সত্যভাষী, অক্রোধী, স্নানাদির দ্বারা পবিত্র, সে দিব্য বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রলোকে যাত্রা করে। যে এক বছর ধরে প্রত্যহ একবার আহার করে, ব্রহ্মচারী হয়ে থাকে, ক্রোধজয় করে এবং সত্য ও শৌচপালন করে, সেও দিব্য বিমানে করে ইন্দ্রলোকে পদার্পণ করে। যে ব্যক্তি এক বছর ধরে চতুর্থ প্রহর অর্থাৎ প্রতি দ্বিতীয় দিনে আহার করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, সে বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট ময়ূর বাহিত অদ্ভুত ধ্বজা শোভিত দিব্য বিমানে করে মহেন্দ্রলোকে গমন করে এবং সেখানে বারো কোটি বছর আনন্দ অনুভব করে। যে আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এক মাস উপবাস করে এবং প্রত্যহ স্নান করে ইন্দ্রিয়-ক্রোধ-মন-বুদ্ধিকে বশে রাখে, এই নিয়ম পালন শেষ হওয়ার পর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে তাদের প্রসন্নচিত্তে দক্ষিণা দেয়, সেই মহাতেজস্বী ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মালোকে যায় এবং দিব্য ঋষিগণ দ্বারা সেবিত হয়ে শত কোটি বছর ধরে আনন্দ উপভোগ করে।

যে ব্যক্তি পবিত্র ও আমার সেবাপরায়ণ হয়ে আমার শ্রীবিগ্রহে মন নিবিষ্ট করে (আমার ধ্যান করে), চতুর্দশীর দিন রুদ্র বা দক্ষিণামূর্তিতে চিত্ত একাগ্র করে, সেই মহাতেজস্বী ব্যক্তি, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবতা দ্বারা পূজিত হয়ে গন্ধর্ব ও ভূতাদির সংগীত শুনতে শুনতে আমাতে বা শংকরের মধ্যে লীন হয়ে যায়, তার আর জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি গো-নারী-গুরু ও ব্রাহ্মণের রক্ষায় প্রাণদান করে, সে ইন্দ্রলোকে যায় এবং সেখানে ইচ্ছানুসারে বিচরণশীল স্বর্ণনির্মিত বিমানে থেকে এক মন্বন্তর দিব্য আনন্দ উপভোগ করে। দেবার প্রতিজ্ঞা করে না দিলে অথবা দান করে কেড়ে নিলে সারা জন্মের দানের পুণ্য নষ্ট হয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান না করা হলে, তার কোনো ফল লাভ হয় না। যেখানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আহার করে না, দেবতারাও সেখানে আহার গ্রহণ করেন না। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের থেকে কোনো দেবতাই বড় নয় এবং তাঁদের আহার করাবার থেকে বড় কোনো পুণ্য নেই।

---o---

পঞ্চমহাযজ্ঞ, বিধিবৎ স্নান ও তার অঙ্গভূত কর্ম, ভগবানের প্রিয় পুষ্প ও ভগবৎ ভক্তদের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—হৃষিকেশ ! দ্বিজাতিদের কীভাবে পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত ? সেই যজ্ঞগুলির নামও কৃপা করে বলুন।

ভগবান বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহী মানুষদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, আমি তার বর্ণনা করছি ; শোনো। ঋভুযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ—এগুলিকে পঞ্চযজ্ঞ বলা হয়। এগুলির মধ্যে তর্পণকে 'ঋভুযজ্ঞ' বলা হয়, 'ব্রহ্মযজ্ঞ' স্বাধ্যায়ের নাম, সকল প্রাণীর জন্য অন্নদানকে 'ভূতযজ্ঞ' বলা হয়। অতিথি পূজাকে 'মনুষ্যযজ্ঞ' বলে এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় 'পিতৃযজ্ঞ'। হুত, অহুত, প্রহুত, প্রাশিত ও বলিদান—এগুলিকে পাকযজ্ঞ বলা হয়। বৈশ্বদেব ইত্যাদি কর্মে যে দেবতাদের জন্য হোম করা হয়, বিদ্বান ব্যক্তিরা তাকে 'হুত' বলেন। দান করা বস্তুকে 'অহুত' বলে ; ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোকে 'প্রহুত' বলে। প্রাণাগ্নিহোত্রের বিধিতে যে প্রাণগুলিকে পঞ্চগ্রাস অর্পণ করা হয়, তার সংজ্ঞা 'প্রাশিত' এবং গবাদি প্রাণীদের তৃপ্তির জন্য যে অন্ন দান করা হয়, তাকে বলে বলিদান। এই পাঁচ কর্মগুলিকে পাকযজ্ঞ বলা হয়। অনেক বিদ্বান এই পাকযজ্ঞগুলিকেই পঞ্চমহাযজ্ঞ বলেন। কিন্তু যাঁরা মহাযজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ জানেন তাঁরা ব্রহ্মযজ্ঞাদিকেই পঞ্চমহাযজ্ঞ বলে মানেন। এই সবই সর্বপ্রকারের মহাযজ্ঞ বলে অভিহিত। গৃহে আগত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণদের যথাশক্তি খাদ্য বস্তু দেওয়া উচিত, তাদের নিরাশ করে ফেরানো উচিত নয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করেই আহার করে, আহারের নামে সে শুধু মলভক্ষণ করে। তাই বিদ্বান দ্বিজদের প্রত্যহ স্নান করে যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত। তা না হলে ভোজনকারী দ্বিজ প্রায়শ্চিত্তের ভাগী হয়।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবদেবেশ্বর ! এবার আপনি আপনার এই ভক্তকে স্নান করার নিয়ম বলুন।

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! যে নিয়মানুসারে স্নান করলে দ্বিজগণ সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়, সেই পরম পবিত্র পাপনাশক বিধি পূর্ণরূপে শোনো। মাটি, গোবর, তিল, কুশ এবং ফুল ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত সামগ্রী নিয়ে জলের কাছে যাবে। শ্রেষ্ঠ দ্বিজের কর্তব্য হল নদীতে স্নান করার পর অন্য কোনো জলে স্নান না করা। বৃহৎ জলাশয় কাছে থাকলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নান করা উচিত নয়। জলাশয়ের কাছে শুদ্ধ ও পরিষ্কার স্থানে মাটি, গোবর ইত্যাদি সামগ্রী রেখে জলের বাইরে পা ধুয়ে দুবার আচমন করবে। তারপর জলাশয়কে প্রদক্ষিণ করে জলকে নমস্কার করবে। জলাশয়ের জলে হাত-পা ধোবে না, কারণ জল সমস্ত দেবতা এবং আমারও স্বরূপ। জলাশয়ের ধারটি পরিষ্কার করে নেবে, তারপর জলে নেমে শুধুমাত্র একবার ডুব দেবে, গায়ের ময়লা পরিষ্কার করবে না। পরে আবার আচমন করে দুহাত জোড় করে তিন বার জল পান করবে, তারপর পায়ে জল ছিটিয়ে মুখে জলস্পর্শ করবে। এরপর চোখ, কান, নাক ইত্যাদিতে জল দেবে, পরে দুহাত, হৃদয় ও নাভিতে জলস্পর্শ করাবে। এইভাবে প্রত্যেক অঙ্গে জল স্পর্শ করিয়ে তারপর মাথায় জল ছেটাবে। পরে 'আপঃ পুনন্তু' মন্ত্র পাঠ করে আবার আচমন করবে অথবা আচমনের সময় ওঁ-কার এবং ব্যাহৃতিয়োসহ 'সদসম্পতিম্' মন্ত্র পাঠ করবে। আচমনের পরে মাটি নিয়ে সেটি তিন ভাগ করবে এবং 'ইদং বিষ্ণু' মন্ত্র পাঠ করে শরীরের উপরিভাগ, মধ্যভাগ ও নিম্নভাগে প্রলেপ দেবে। তারপর বারুণসূক্ত দ্বারা জলকে নমস্কার করে স্নান করবে। যদি নদী হয়, তাহলে যে দিক থেকে জলধারা আসছে, সেইদিকে মুখ করে এবং অন্য জলাশয় হলে সূর্যের দিকে মুখ করে স্নান করবে। ওঁ-কার উচ্চারণপূর্বক আস্তে ডুব দেবে, জলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে না। এরপর গোময় জলে গুলে সেটিও মাটির মতো শরীরের উপর-মধ্য ও নিম্নভাগে লাগাবে। সেই সময় প্রণব এবং গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করবে। পরে আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে আচমন করে 'আপো হিষ্ঠা ময়ো' ইত্যাদি তিন মন্ত্রের দ্বারা, 'তরৎসমন্দীভিঃ' ইত্যাদি চার মন্ত্রের দ্বারা এবং গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, বৈষ্ণবসূক্ত, বারুণসূক্ত, সাবিত্রসূক্ত, ঐন্দ্রসূক্ত, বাসদেবাসূক্ত এবং আমাতে সম্বন্ধিত অন্য সামমন্ত্রাদির দ্বারা শুদ্ধ জলে নিজেকে মার্জনা করবে। পরে জলে স্থিত হয়ে অঘমর্ষণসূক্ত জপ করবে অথবা প্রণব এবং গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবে অথবা যতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ থাকবে ততক্ষণ আমাকে স্মরণ করে প্রণব জপ করতে থাকবে।

এইভাবে স্নান করে জলাশয়ের বাইরে এসে ধৌত শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করবে। চাদর কোমরে বাঁধবে না। যারা বস্ত্রকে কোমরে দড়ির মতো বেঁধে বৈদিক কর্ম করে, তাদের কর্ম রাক্ষস-দানব-দৈত্যগণ সহর্ষে বিনাশ করে ; তাই কোমরে বস্ত্র বাঁধা উচিত নয়, একথা স্মরণে রাখা উচিত। বস্ত্র পরিধান করে হাত-পা মাটি দিয়ে মেখে ভালো করে ধুয়ে ফেলবে, তারপর গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে আচমন করবে এবং পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে একাগ্রচিত্তে বেদাদি স্বাধ্যায় করবে। দ্বিজ জলে দাঁড়িয়ে জলেই আচমন করে শুদ্ধ হয়ে যায় এবং ভূমিতে দণ্ডায়মান দ্বিজ আচমনের দ্বারা ভূমিতে শুদ্ধি লাভ করে ; সুতরাং জলে বা স্থলে কোনো এক স্থানে স্থিত হয়ে দ্বিজের আত্মশুদ্ধি করার জন্য আচমন করা উচিত। এরপর সন্ধ্যা উপাসনা করার সময় হাতে কুশ নিয়ে পূর্বাভিমুখ হয়ে কুশাসনে বসবে এবং আমাতে মন একাগ্র করে প্রাণায়াম করবে। একাগ্রচিত্তে এক হাজার অথবা ন্যূনতম একশত বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে। মন্দেহ নামক রাক্ষসদের বিনাশের উদ্দেশ্যে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত জল নিয়ে সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করবে। তারপর আচমন করে **'উদ্বর্গোঽসি'** এই মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের জন্য জল নিক্ষেপ করবে। অতঃপর সুগন্ধ পুষ্প ও জল অঞ্জলিতে নিয়ে সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করবে এবং আকাশমুদ্রা প্রদর্শন করবে। তারপর সূর্যের এক অক্ষর মন্ত্র দ্বাদশ বার জপ করে তার ষড়ক্ষরাদি মন্ত্র ছয় বার পুনরাবৃত্তি করবে। আকাশমুদ্রা ডানদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিজ মুখে বিলীন করবে। তারপর দুহাত তুলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে একাগ্রচিত্তে তার মণ্ডলে স্থিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী তেজোমূর্তি নারায়ণের ধ্যান করবে। সেই সময় **'উদুত্যম্' 'চিত্রং দেবানাম্' 'তচ্চক্ষুঃ'**—এই মন্ত্রগুলি, গায়ত্রী মন্ত্র ও আমার সঙ্গে সম্বন্ধিত সূক্তাদি জপ করে আমার সামমন্ত্র এবং পুরুষসূক্তও পাঠ করবে। তারপর **'হংসঃ শুচিষৎ'** এই মন্ত্র পাঠ করে সূর্যের দিকে তাকাবে এবং প্রদক্ষিণ পূর্বক তাঁকে নমস্কার করবে।

এইভাবে সন্ধ্যা-উপাসনা সম্পন্ন হলে ক্রমশ ব্রহ্মার, আমার, শংকরের, প্রজাপতির, দেবতাদের ও দেবর্ষিদের, বেদ-বেদাঙ্গের, ইতিহাসের, যজ্ঞাদির, সমস্ত পুরাণের, অপ্সরাদের, ঋতু-কলা-কাষ্ঠারূপ সংবৎসর ও ভূত সমুদায়ের, ভূতাদির, নদীসমূহের, সমুদ্রাদির, পর্বতাদির, তার ওপর অবস্থিত দেবতাদের, ঔষধিসমূহের এবং বনস্পতিসমূহের জলদ্বারা তর্পণ করবে। তর্পণের সময় পৈতা বামস্কন্ধে রাখবে এবং ডান ও বাঁ হাত অঞ্জলি করে জল দেবার সময় উপরিউক্ত দেবতাদের প্রত্যেকের নাম করে **'তৃপ্যতাম্'** পদটি উচ্চারণ করবে (যদি দুই বা অধিক দেবতাদের এক সঙ্গে জল দেওয়া হয় তাহলে দ্বিবচন, বহুবচন—**'তৃপ্যেতাম্'** এবং **'তৃপ্যন্তাম্'** এই পদ উচ্চারণ করা উচিত)। বিদ্বান ব্যক্তিদের উচিত মন্ত্রদ্রষ্টা মরীচি ইত্যাদি ও নারদাদি ঋষিদের তর্পণকালে পৈতাটি গলায় মালার মতো করে একাগ্র চিত্তে তর্পণ করা। এরপর পৈতা ডান কাঁধে নিয়ে পূর্বোক্ত পিতৃসম্বন্ধীয় দেবতা এবং পিতৃপুরুষের তর্পণ করবে। কব্যবাট্ অগ্নি, সোম, বৈবস্বত, অর্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপা—এঁরা পিতৃ সম্বন্ধীয় দেবতা। এঁদের তিলসহ জলদ্বারা কুশের ওপর তর্পণ করবে এবং **'তৃপ্যতাম্'** পদ উচ্চারণ করবে। তারপর পিতৃপুরুষদের তর্পণ করবে ; তাঁদের ক্রম হবে এই প্রকার—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহী। এছাড়া গুরু, আচার্য, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, মাতামহী, উপাধ্যায়, মিত্র, বন্ধু, শিষ্য, ঋত্বিক, জাতি-ভাই ইত্যাদির মধ্যে যারা মৃত, ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করে তাদেরও তর্পণ করা কর্তব্য।

তর্পণের পর আচমন করে স্নানের সময় পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে নিংড়ে ফেলবে। সেই বস্ত্রের জলে কুলের মৃত সন্তানহীন পুরুষদের ভাগ থাকে। সেই জল তাঁদের স্নান ও তৃষ্ণা দূর করে। সুতরাং সেই জলের দ্বারা তাঁদের তর্পণ করা উচিত, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা এই কথা বলে থাকেন। পূর্বোক্ত দেবতা ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ না করে কাপড় ধোয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত তর্পণের আগেই পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে ফেলে, সে ঋষি এবং দেবতাদের কষ্ট প্রদান করে। তখন তার পিতৃপুরুষ তাকে অভিশাপ দিয়ে ফিরে যান। তাই তর্পণের পর আচমন করে তবেই বস্ত্র ধৌত করতে হয়। তর্পণ ক্রিয়া সমাপ্ত হলে দুপায়ে মাটি লাগিয়ে তা ধুয়ে ফেলতে হয় এবং পুনরায় আচমন করে পবিত্র হয়ে কুশাসনে বসে, হাতে কুশ নিয়ে স্বাধ্যায় আরম্ভ করবে। প্রথমে বেদ পাঠ করে পরে তার অন্য অঙ্গাদি অধ্যয়ন করা হয়। নিজ শক্তি অনুসারে প্রত্যহ যা অধ্যয়ন করা হয়, তাকে স্বাধ্যায় বলে। ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ স্বাধ্যায় করবে। ইতিহাস ও পুরাণাদি অধ্যয়নও ত্যাগ করবে না। স্বাধ্যায় পূর্ণ করে দাঁড়িয়ে, দিক্‌সকল, তার দেবতাগণ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, ঔষধি, বাণী, বাচস্পতি, নদীসকল ও আমাকে প্রণাম করবে। তারপর জল নিয়ে প্রণবযুক্ত

'নমোহস্ত্বদ্ভ্যঃ' মন্ত্র পাঠ করে পূর্ববৎ জলদেবতাকে নমস্কার করবে। তারপর ঘৃণি, সূর্য ও আদিত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্বক দুই হাত জোড় করে সূর্যদেবকে প্রণাম করবে এবং প্রণব মন্ত্র জপ করে একাগ্রচিত্তে তাঁকে দর্শন করবে। তারপর আমার প্রিয় পুষ্পের দ্বারা প্রতিদিন আমার পূজা করবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—মাধব ! যে পুষ্প আপনার অত্যন্ত প্রিয় এবং যাতে আপনার নিবাস, সেসব আমাকে বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমার যেসব ফুল প্রিয়, তার নাম বলছি ; শ্রবণ করো। কুমুদ, করবী, চণক, চম্পা, মালতী, জাতি-পুষ্প, নন্দ্যাবর্ত, নন্দিক, পলাশের ফুল এবং পাতা, দূর্বা, ভৃঙ্গ ও বনমালা—এই সব ফুল আমার বিশেষ প্রিয়। উৎপল ফুল হল সব ফুলের চেয়ে হাজার গুণে ভালো। উৎপলের থেকে পদ্ম, পদ্মের থেকে শতদল, শতদলের থেকে সহস্রদল, সহস্রদলের থেকে পুণ্ডরীক এবং হাজার পুণ্ডরীকের থেকে তুলসীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তুলসী থেকে শ্রেষ্ঠ বকফুল এবং তার থেকেও উত্তম সৌবর্ণ ; সৌবর্ণের ফুলের থেকে বেশি অন্য কোনো ফুলই আমার প্রিয় নয়। ফুল না পেলে তুলসী পাতার দ্বারা, পাতা না পাওয়া গেলে তার শাখা দিয়ে, শাখা না পেলে তুলসীর মূলের টুকরো দিয়ে আমার পূজা করবে। যদি তাও পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে যেখানে তুলসীগাছ ছিল, তার মাটি দ্বারাই আমাকে ভক্তিসহকারে পূজা করবে। এবার যেসব ফুল ত্যজনীয় তার নাম বলছি, মন দিয়ে শোনো। কিঙ্কিণী, মুনি পুষ্প, ধুর্ধুর, পাটল, অতিমুক্তক, পুন্নাগ, নক্তমালিক, যৌথিক, ক্ষীরিকাপুষ্প, নির্গুণ্ডী, লাঙ্গুলী, জপা, অশোক, সেমলের ফুল, ককুভ, কোবিদার, বৈভীতক, পুরণ্টক, কল্লক, কালক, অঙ্কোল, গিরিকর্ণী, নীলবর্ণ ফুল, পাখনা যুক্ত ফুল—এই সব ফুল ত্যাগ করা উচিত। আম এবং আমের পাতার ওপর রাখা ফুলও বর্জনীয়। নিমফুলও পরিত্যাগ করা উচিত। এছাড়া যেগুলি নিষেধ করা হয়নি, তেমন শ্বেতবর্ণ ফুল, সুগন্ধযুক্ত, তা দিয়ে ভক্তের আমার পূজা করা উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মাধব ! আপনার ভক্ত কীরূপ হয় এবং তাদের নিয়ম কেমন—কৃপা করে তা বলুন ; কারণ আমিও আপনার চরণে ভক্তি রাখি।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে ব্যক্তি অন্য কোনো দিকে আকৃষ্ট না হয়ে শুধু আমারই শরণ নিয়েছে এবং আমার ভক্তগণের সঙ্গে প্রীতি-সম্পর্ক রাখে, তাদেরই আমার ভক্ত বলা হয়। যা যশ ও স্বর্গপ্রদানকারী এবং আমার বিশেষ প্রিয়, আমার ভক্তেরা এরূপ ব্রতই পালন করে। ভক্ত-পুরুষের জলে সাঁতার কাটার সময় একবস্ত্র ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র ধারণ করা উচিত নয়। সুস্থ থাকলে দিবসে নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। মধু ও মাংস ত্যাগ করা উচিত এবং পথে ব্রাহ্মণ, গাভী, পীপল ও অগ্নি দেখলে, তা প্রদক্ষিণ করে যাওয়া উচিত। বৃষ্টিপাতের সময় দৌড়তে নেই, শুধু লবণ খাওয়া উচিত নয়। গাভীকে প্রত্যহ খাদ্য অর্পণ করবে, অন্নের সঙ্গে টক দ্রব্য খাবে না ; অন্যের ঘর থেকে তুলে আনা খাবার, বাসি অন্ন এবং ভগবানকে ভোগ না দেওয়া পদার্থ ত্যাগ করবে। কষ্টে পড়লেও ব্রাহ্মণ ও দেবতার নিন্দা করবে না। চতুর্বেদী বিদ্বান, ক্রিয়াপরায়ণ এবং বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের দেহেও ছয়টি বৃষল বাস করে। ক্ষত্রিয়ের দেহে সাত, বৈশ্যের দেহ আট ও শূদ্রের দেহে একুশ বৃষলের নিবাস বলে মানা হয়। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মহামোহ—এই ছটি বৃষল ব্রাহ্মণ শরীরে স্থিত বলা হয়। গর্ব, স্তম্ভ (জড়ত্ব), অহংকার, ঈর্ষা, দ্রোহ, পারুষ্য (কঠোর ভাষা বলা) এবং ক্রূরতা—ক্ষত্রিয় শরীরে এই সাতটি বৃষল বাস করে। তীক্ষ্ণতা, কপটতা, মায়া, শঠতা, দম্ভ, সারল্যের অভাব, পরনিন্দা, অসত্যভাষণ—এই আটটি বৈশ্য দেহের বৃষল। তৃষ্ণা, খাওয়ার ইচ্ছা, অসময়ে নিদ্রা, আলস্য, নির্দয়তা, ক্রূরতা, মানসিক চিন্তা, বিষাদ, প্রমাদ, অধৈর্য, ভয়, অস্থিরতা, জড়ত্ব, পাপ, ক্রোধ, আশা, অশ্রদ্ধা, অনবস্থা, নিরঙ্কুশতা, অপবিত্রতা এবং মলিনতা—শূদ্রের দেহে এই একুশটি বৃষল থাকে। এই সব বৃষল যার ভেতর দেখা যায় না, তাকেই প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ বলা হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ যদি আমার প্রিয় হতে চায়, তবে তাকে সাত্ত্বিক, পবিত্র ও ক্রোধহীন হয়ে সর্বদা আমার পূজা করা উচিত। যার জিহ্বা চঞ্চল নয়, যে ধৈর্য ধারণ করে থাকে এবং যে চার হাত সামনে দৃষ্টি রেখে চলে, যে নিজ চঞ্চল মন ও বাণী বশ করে ভব থেকে মুক্তিলাভ করেছে, তাকে আমার ভক্ত বলা হয়। এরূপ অধ্যাত্ম জ্ঞানযুক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তি সহকারে যার গৃহে আহার করেন, তার পিতৃপুরুষ সেই ভোজনে পূর্ণ তৃপ্ত হন। ধর্মের জয় হয়, অধর্মের নয় ; সত্যের বিজয় হয়, অসত্যের নয় এবং ক্ষমার জয় হয়, ক্রোধের নয়। তাই ব্রাহ্মণের ক্ষমাশীল হওয়াই উচিত।

কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য এবং তার দশ প্রকার বিভেদ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দান ও তপস্যার পুণ্য-ফল শুনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মধুসূদন ! ব্রহ্মা অগ্নিহোত্র সিদ্ধির জন্য পূর্বকালে যাকে উৎপন্ন করেছিলেন এবং যাকে সর্বদা পবিত্র বলে মানা হয়, সেই কপিলা গাভী ব্রাহ্মণদের কীভাবে দান করা উচিত ? সেই পবিত্র লক্ষণযুক্ত গাভী কোন দিনে, কীভাবে ব্রাহ্মণকে দিতে হয় ? ব্রহ্মা কত প্রকারের কপিলা গাভীর কথা বলেছেন ? এইসব আমি আপনার কাছে সঠিকভাবে শুনতে চাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! এ বিষয় অত্যন্ত পবিত্র এবং পাপনাশক, এটি শ্রবণ করলে পাপীব্যক্তিও পাপমুক্ত হয়ে যায় ; সুতরাং মন দিয়ে শোনো। পূর্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অগ্নিহোত্র এবং ব্রাহ্মণদের জন্য সমস্ত তেজ সংগ্রহ করে কপিলা গাভী উৎপন্ন করেন। কপিলা গাভী পবিত্র বস্তুর মধ্যে সব থেকে বেশি পবিত্র, মঙ্গলজনক পদার্থের মধ্যে সর্বাধিক মঙ্গলকারিণী এবং পুণ্যাদিতে পরম পুণ্যস্বরূপা। এটি তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত, দানের শ্রেষ্ঠ দান এবং সকলের অক্ষয় কারণ। পৃথিবীতে যত পবিত্র তীর্থ ও মন্দির এবং জগতে যা কিছু পবিত্র ও রমণীয় বস্তু আছে, সেই সব থেকে শক্তি নিয়ে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা জগতের উদ্ধারের জন্য কপিলা গাভীকে সৃষ্টি করেন। কপিলা সমস্ত শক্তির পুঞ্জ। সে অমৃতস্বরূপ, মেধা, শুদ্ধ, পবিত্রকারী এবং উত্তম। দ্বিজাতীয়দের উচিত সকাল ও সন্ধ্যায় কপিলা গাভীর দুধ-দই অথবা ঘৃতের দ্বারা অগ্নিহোত্র করা। যে ব্রাহ্মণ কপিলা গাভীর ঘৃত, দধি অথবা দুধের দ্বারা বিধিবৎ অগ্নিহোত্র করেন, ভক্তিপূর্বক অতিথি সেবা করেন, শূদ্রান্ন থেকে দূরে থাকেন এবং দম্ভ ও অসত্য পরিত্যাগ করেন, তিনি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বিমানে সূর্যমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পরম উত্তম ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেখানে ব্রহ্মার দিব্যধামে ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করে যথেচ্ছ বিচরণ করে এক কল্প পর্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেন এবং ব্রহ্মাদ্বারা সর্বদা সম্মান লাভ করেন। কপিলা গাভী এইরূপ পরম পবিত্র ও অমৃতময় দুগ্ধপ্রদানকারী অরণী। পূর্বকালে ব্রহ্মা একে অগ্নির অভ্যন্তরে উৎপন্ন করেছিলেন।

যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মার আদেশে কপিলার শিং-এর অগ্রভাগে সর্বদা সম্পূর্ণ তীর্থ অবস্থান করে। যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠে কপিলা গাভীর শিং থেকে পড়া জলধারা নিজ মস্তকে ধারণ করে, সে সেই পুণ্য প্রভাবে পাপরহিত হয়ে যায়। অগ্নি যেমন তৃণকে পুড়িয়ে দেয়, তেমনই ওই জল মানুষের তিন জন্মের পাপ ভস্ম করে ফেলে। যে ব্যক্তি কপিলার মূত্র নিয়ে নিজ নেত্রাদিতে লাগায় বা তাতে স্নান করে, সে ওই পুণ্যে নিষ্পাপ হয়ে যায় ; তার ত্রিশ জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। যে প্রাতঃকালে কপিলা গাভীকে ভক্তিসহ ঘাস অর্পণ করে, তার এক মাসের পাপ নাশ হয়। যে তাকে প্রাতে উঠে প্রদক্ষিণ করে তার সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করা হয় এবং এক একটি পরিক্রমাতে দশ রাতের পাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি কপিলা গাভীর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করে শুদ্ধ হয়, সে গঙ্গা স্নানের সমান পুণ্যলাভ করে। সেই স্নানে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির দশরাতের পাপ বিনাশ হয়। যে ব্যক্তি স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে কপিলা গাভীকে স্পর্শ করে, তার এক বৎসরের পাপ দূর হয়। কোনো ব্যক্তি যদি একহাজার গাভী দান করে এবং অন্যজন একটিমাত্র কপিলা গাভী দান করে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা দুটিরই এক ফল বলে জানিয়েছেন। তেমনই কোনো ব্যক্তি যদি ভুলবশত একটি কপিলা গাভী হত্যা করে, তবে সে এক হাজার গো-হত্যা পাপের ভাগী হয়।

ব্রহ্মা দশপ্রকার কপিলা গাভীর দশপ্রকার কথা বলেছেন ; তার বর্ণনা করছি, শোনো। প্রথম স্বর্ণকপিলা[১], দ্বিতীয় গৌরপিঙ্গলা[২], তৃতীয় আরক্ত পিঙ্গাক্ষী[৩], চতুর্থ গলপিঙ্গলা[৪], পঞ্চম বভ্রুবর্ণাভা[৫], ষষ্ঠ শ্বেতপিঙ্গলা[৬], সপ্তম রক্তপিঙ্গাক্ষী[৭], অষ্টম খুরপিঙ্গলা[৮], নবম পাটলা[৯] এবং দশম পুচ্ছপিঙ্গলা[১০]—এই দশপ্রকার কপিলা গাভীর কথা বলা হয়েছে, যারা সর্বদা মানুষকে উদ্ধার করে থাকে। এরা সকলে মঙ্গলময়ী, পবিত্র এবং পাপনাশকারিণী। গাড়ি টানা বলদেরও এইরূপ দশপ্রকার বিভেদ বলা হয়েছে। শুধু ব্রাহ্মণই যেন সেই বলদগুলিকে গাড়ি টানতে ব্যবহার করেন। অন্য বর্ণের মানুষের সেই টানাগাড়িতে ওঠা উচিত

---

[১]সোনার মতো হলুদবর্ণ বিশিষ্ট। [২]গৌর ও হলুদবর্ণ বিশিষ্ট। [৩]ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হলুদ চোখ, [৪]যার গলার লোম ঈষৎ হলুদবর্ণ, [৫]যার সমস্ত দেহ হলুদবর্ণ। [৬]অল্প সাদা মিশ্রিত হলুদ রোমযুক্ত। [৭]কোমল হলুদ চক্ষু বিশিষ্ট। [৮]যার খুর হলুদ বর্ণের। [৯]যার দেহবর্ণ ঈষৎ লাল। [১০]যার পুচ্ছের লোম হলুদ বর্ণের।

নয়। গাড়িতে চড়ে সেই বলদকে লাঠি বা বেত দিয়ে আঘাত করা উচিত নয়, গলার আওয়াজে অথবা ছোট ডাল দিয়ে আঘাত করতে হয়। বলদ যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর থাকে, তখন তাকে বিশ্রাম দিতে হয়। বলদের যতক্ষণ খাওয়া না হয়, ততক্ষণ নিজের আহার করা উচিত নয়। তাকে জল ও আহার দিয়ে তবেই খাবে। সেবাকারী ব্যক্তিদের কাছে কপিলা গাভী মাতা ও বলদ পিতা। দিনের প্রথম ভাগে ভারবহনকারী বলদকে দিয়ে গাড়িবহন করা উচিত। দ্বিপ্রহরে তাকে বিশ্রাম দিতে হয়, দিনের শেষভাগে প্রয়োজন থাকলে তাকে দিয়ে কাজ করাবে। যদি জরুরি প্রয়োজন থাকে অথবা পথে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তবে বিশ্রামের সময় গাড়ি বহন করালে পাপ হয় না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাজ করালে তার ভ্রূণ-হত্যার সমান পাপ হয়। এবং সেই ব্যক্তি রৌরব নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত বলদের দেহের রক্তপাত ঘটায়, সেই ব্যক্তি তার পাপের প্রভাবে নিঃসন্দেহে নরকে পতিত হয়। সে নরকে শত শত বৎসর থেকে ইহলোকে বলদজন্ম প্রাপ্ত হয়। তাই যারা এই জগৎ থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের কপিলা গাভী দান করা উচিত। যে শূদ্র লোভ বশে কপিলা গাভীকে গাড়িতে জোতে, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তার পিতৃপুরুষদেরও সর্বদা কষ্ট দেয় এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত এক নরক থেকে অন্য নরকে ঘুরে বেড়ায়।

কপিলা জাতির বলদ পরিশ্রান্ত হয়ে যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তখন সে তার কষ্টপ্রদানকারী ব্যক্তির কুলনাশ করে দেয়। তার শরীরে যত লোম থাকে তত বৎসর তার কষ্টপ্রদানকারী ব্যক্তি নরকে কষ্ট পেতে থাকে। সর্বপ্রকার যজ্ঞে দক্ষিণা প্রদানের জন্য কপিলা গাভী সৃষ্ট হয়েছে ; তাই দ্বিজাতীয়দের যজ্ঞে অবশ্যই কপিলা গাভী দান করা উচিত। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোমের জন্য তেজস্বী, ধনহীন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যত্ন সহকারে কপিলা গাভী দান করে, সে শুদ্ধচিত্ত হয়ে আমার গোলোকধামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কপিলার দেহে যত লোম থাকে, দাতা তত হাজার বছর স্বর্গলোকে সম্মান লাভ করে। যে ব্যক্তি কপিলার শিং ও খুর সোনায় মুড়ে, বিষুবযোগে অথবা উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নের প্রারম্ভে দান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং সেই পুণ্যপ্রভাবে আমার লোকে গমন করে। যে গাভীর শিং সোনা ও খুর রূপা মণ্ডিত, যে গাভী বস্ত্রও ফুলচন্দনে সুসজ্জিত, তাকে দান করার সময় কাংস্য নির্মিত দুগ্ধপাত্র ও গোবৎস্য সঙ্গে দেওয়া উচিত। আমার বিচারে স্বর্ণ পবিত্র বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই গাভীকে স্বর্ণভূষণে সজ্জিত করে দান করা উচিত। এইভাবে দান করলে দাতা তার সাত পূর্বপুরুষ এবং সাত পরবর্তী পুরুষকে অবশ্যই মুক্ত করে দেয়। এক হাজার অগ্নিষ্টোমের সমান এক বাজপেয় যজ্ঞ হয়, এক হাজার বাজপেয়র সমান এক অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় এবং এক হাজার অশ্বমেধের সমান এক রাজসূয় যজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা এক হাজার কপিলা গাভী দান করে, সে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়ে আমার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হয় ; তার আর ইহলোকে জন্ম নিতে হয় না। যে ব্যক্তি কপিলা গাভীকে স্বর্ণালংকারে সুসজ্জিত করে গোবৎসা সহ দান করে, সেই গাভী তার কাছে ওইসব গুণাদিযুক্ত কামধেনু রূপে উপস্থিত হয়। বায়ুচালিত নৌকা যেমন মানুষকে মহাসাগরে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, তেমনি দানপ্রদত্ত গাভী ঘোর পাপী মানুষকে অন্ধকারপূর্ণ নরকে পতন থেকে রক্ষা করে। পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি সাতপুরুষকে সেই গাভী উদ্ধার করে। যতদিন পৃথিবী মানুষ ধারণ করে, ততদিন সেই দানপ্রদত্ত গাভী পরলোকে দাতাকে ধারণ করে রাখে। মন্ত্রের সঙ্গে প্রদত্ত ঔষধ প্রয়োগে যেমন মানুষের রোগ নাশ হয়, তেমনই কপিলা গাভী সুপাত্রকে দান করলে মানুষের সব পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। প্রজ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহের অন্ধকারকে দূর করে, তেমনই কপিলা গাভী দান করলে মানুষের সব পাপ দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করেন, অতিথি সেবা করেন, শূদ্রান্ন থেকে তফাতে থাকেন, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী এবং স্বাধ্যায়পরায়ণ, তাঁকে গাভী দান করলে, সেই দান দাতাকে পরলোকে অবশ্যই উদ্ধার করে।

———o———

কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য, অযোগ্য ব্রাহ্মণ, নরক ও স্বর্গে নিয়ে যাওয়া পাপ ও পুণ্যের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পরম পুণ্যময় কপিলা গাভীর উত্তম দানের বর্ণনা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন—'দেবদেবেশ্বর ! কপিলা গাভী ব্রাহ্মণদের দান করার সময় সম্পূর্ণ অঙ্গে কীভাবে অবস্থান করেন ? আপনি যে দশপ্রকার কপিলা গাভীর কথা বলেছেন, তার মধ্যে কাকে কাকে পুণ্যময় বলে মানা হয় ? দেবতা এবং পিতৃপুরুষগণ তাদের ওপর কীপ্রকার অনুগ্রহ করেছিলেন ? সেই গাভীদের রং কীরূপ হয় ?—এসব জানার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছি।'

ভগবান বললেন—রাজন্ ! পরম পবিত্র, গোপনীয় এবং উত্তম ধর্মের বর্ণনা করছি, শোনো। গাভী যখন বৎস প্রসব করে, মুনিগণ সেটিকেই উত্তম দানের সময় বলে জানিয়েছেন। যতক্ষণ গো-বৎস মাটিতে ভূমিষ্ঠ না হয় অর্থাৎ গো-বৎসটি মাতৃগর্ভ থেকে পূর্ণরূপে বহির্গত না হওয়া পর্যন্ত সেই গাভীকে পৃথিবীর স্বরূপ বলে মনে করা হয়, তাই সেই অবস্থায় গো-দান করা সর্বোত্তম। প্রসবকালে বৎসসহ মাতার গায়ে যত লোম থাকে, তত হাজার বছর দাতা স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৎসসহ কপিলা গাভীকে স্বর্ণালংকারে সজ্জিত করে তিলের সঙ্গে দান করা উচিত। যে এইরূপ দান করে, তার নদী-পর্বত-সমুদ্র-সহ সমস্ত পৃথিবী দান করা হয়, এই দান পৃথিবী দানের সমান। মানুষ এর দ্বারা সংসার-সমুদ্র পার হয়ে প্রজাপতি লোকে যায়। ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গো-হত্যা, গুরুপত্নীগমন ইত্যাদি মহাপাপযুক্ত মানুষও উপরিউক্ত প্রকারে কপিলা গাভী দান করলে শুদ্ধ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠে আমাতে ভক্তি রেখে এই পরম পুণ্যময় উত্তম কপিলা দানের মাহাত্ম্যপাঠ করে, তার পুণ্যফলের কথা শোনো। এই অধ্যায় পাঠকারী মানুষ রাত্রে মন-বাক্য-ক্রিয়ার দ্বারা কৃত সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। যে শ্রাদ্ধকালে এই অধ্যায় পাঠ করে ব্রাহ্মণকে আহার দিয়ে তৃপ্ত করে, তার পিতৃপুরুষ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে অমৃত ভোজন করেন। যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এই প্রসঙ্গ ভক্তিপূর্বক শোনে, তার এক রাতের সমস্ত পাপ তখনই নষ্ট হয়ে যায়।

এবার আমি কপিলা গাভীর সম্পর্কে বিশেষ কথা বলছি। আগে আমি তোমাকে দশ প্রকার কপিলা গাভীর কথা বলেছিলাম, তার মধ্যে চার প্রকার কপিলা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, পুণ্যপ্রদানকারী ও পাপনাশকারী। সুবর্ণকপিলা, রক্তাক্ষ-পিঙ্গলা, পিঙ্গলাক্ষী এবং পিঙ্গলপিঙ্গলা—এই চার প্রকার কপিলা শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পাপদূরকারী। এদের দর্শন ও নমস্কার দ্বারা মানুষের পাপ বিনাশ হয়। এই পাপনাশিনী কপিলা গাভী যে গৃহে থাকে, সেখানে শ্রী, বিজয় ও কীর্তি নিত্য নিবাস করে। এর দুধে ভগবান শংকর, দধিতে সমস্ত দেবতা এবং ঘৃতে অগ্নিদেব তৃপ্ত হন। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহকে একবার কপিলা গাভীর দুধ দিলে কোটি বৎসর তৃপ্ত থাকেন। কপিলা গাভীর ঘি, দুধ, দই অথবা ক্ষীর একবার যদি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তবে মানুষ সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় থেকে একদিন-একরাত উপবাস করে কপিলা গাভীর পঞ্চগব্য পান করে, আমাতে চিত্ত স্থির করে শুভ মুহূর্তে কপিলা গাভীর পঞ্চগব্যের আচমন করে তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বিষুবযোগে পৃথক পৃথক মন্ত্র পাঠ করে কপিলার পঞ্চগব্যে আমার বা শংকরের মূর্তিকে স্নান করায়, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। সে নিষ্পাপ এবং শুদ্ধচিত্ত হয়ে আকাশের শোভাবর্ধনকারী বিমানের দ্বারা আমার অথবা রুদ্রের লোকে গমন করে। পূর্বকালে ব্রহ্মা উত্তম বেদমন্ত্রের দ্বারা অগ্নিকুণ্ড থেকে সুবর্ণের ন্যায় কান্তিময়ী কপিলা গাভী উৎপন্ন করেছিলেন। সেই হোম-ধেনুর প্রভা বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কপিলা উৎপন্ন হতেই রুদ্র আদি দেবতা, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি, বেদ, বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, সমুদ্র, নদী, পর্বত, মেঘ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ এবং নাগ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং নানাপ্রকার মন্ত্র পাঠ করে তার স্তুতি করতে লাগলেন। সেই গাভীর শিং খুব বড় ছিল না, তার তিনটি চোখ ছিল, গো-বৎসা তার সঙ্গেই ছিল এবং সেই কপিলা-বৎসটি দুগ্ধরূপ অমৃত দান করার জন্য অরণীর ন্যায় ছিল। সকল দেবতা হাতজোড় করে সেই গাভীকে প্রণাম জানালেন এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে বললেন—'প্রজাপতি ! বলুন আমরা আপনার কী নির্দেশ পালন করব ?'

দেবতারা এইরূপ প্রশ্ন করায় ব্রহ্মা বললেন—'আপনারা এই দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটি হোমের সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এ নিজ হবিষাদ্বারা তিন অগ্নিকেই তৃপ্ত করবে। অগ্নিদেব যখন নিজে
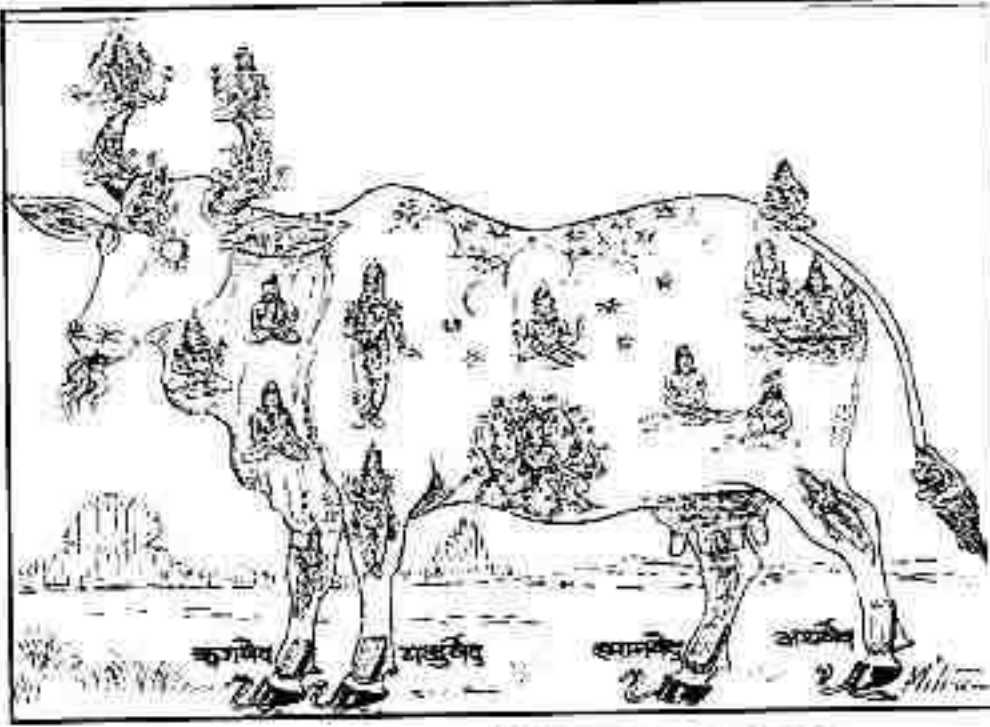
তৃপ্ত হবেন তখন আপনাদেরও তৃপ্তি হবে। তার দুগ্ধরূপ অমৃতে আপনাদের বল এবং পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে, আপনারা ইচ্ছা করলেই দানবদের পরাজিত করতে পারবেন।' ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তাঁরা কপিলা গাভীকে বরদান করে বললেন—'দেবী ! ব্রহ্মা সমস্ত জগতের হিতের উদ্দেশ্যে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ; তাই তুমি পরম পবিত্র, শুদ্ধ এবং পাপনাশকারী হও। যে ব্যক্তি তোমাকে শ্রদ্ধা করবে অথবা যে নিজ হাতে তোমাকে স্পর্শ করবে, তোমাতে ভক্তিযুক্ত সেই ব্যক্তিদের এক বৎসরের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হবে। যে তোমাকে দর্শন করে প্রণাম করবে, তার অনিচ্ছাকৃত, অজানতে অথবা অলক্ষ্যে ঘটিত পাপরাশি সেইভাবেই দূরীভূত হবে, যেভাবে সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়।'

কপিলা গাভীকে এই বরদান দিয়ে দেবতারা সেখান থেকে ফিরে গেলেন। কপিলা গাভী মানুষকে উদ্ধার করার জন্য জগতে বিচরণ করতে লাগল। তার দেহ থেকে আরও নয়টি কপিলা উৎপন্ন হল। তারা সকলেই জগতের হিতের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগল। পরলোকে হিতকামী মানুষদের কপিলা গাভী অবশ্যই দান করা উচিত। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে যখন কপিলা গাভী দান করা হয়, সেই সময় তার শিং-এর উপর অংশে বিষ্ণু ও ইন্দ্র নিবাস করেন। শিং-এর মূলে চন্দ্র এবং বজ্রধারী ইন্দ্র থাকেন। শিং এর মধ্যভাগে ব্রহ্মা এবং ললাটে ভগবান শংকর নিবাস করেন। দুই কানে অশ্বিনীকুমার, চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তগুলিতে মরুদ্গণ, জিহ্বাতে সরস্বতী, রোমকূপগুলিতে মুনিগণ, ত্বকে প্রজাপতি, নিঃশ্বাসে ষড়ঙ্গ, পদ ও ক্রমসহ চতুর্বেদ, নাসিকাছিদ্রে গন্ধ ও সুগন্ধ পুষ্প, নিম্নোষ্ঠে বসুগণ, মুখে অগ্নি, কক্ষে সাধ্য-দেবতা, গলায় পার্বতী, পিঠে নক্ষত্র, ককুদ স্থানে আকাশ, অপানে সর্বতীর্থ, মূত্রে সাক্ষাৎ গঙ্গা, গোবরে লক্ষ্মীদেবী, নাসিকাতে জ্যেষ্ঠাদেবী, নিতম্বে পিতৃপুরুষ, পুচ্ছে ভগবতী রমা, দুই পাঁজরে বিশ্বদেব, বুকে শক্তিধারী কার্তিক, হাঁটু, জানু ও উরুগুলিতে পঞ্চবায়ু, খুরের মধ্যে গন্ধর্ব এবং অগ্রভাগে সর্প নিবাস করে। চার সমুদ্র তার চারটি স্তন। রতি, মেধা, ক্ষমা, স্বাহা, শ্রদ্ধা, শান্তি, ধৃতি, স্মৃতি, কীর্তি, দীপ্তি, ক্রিয়া, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, সন্ততি, দিশা এবং প্রদিশা ইত্যাদি দেবীগণ সর্বদা কপিলা গাভীকে সেবা করে থাকেন। দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, লোক, দ্বীপ, সমুদ্র, গঙ্গা ইত্যাদি নদী এবং অঙ্গাদি ও যজ্ঞাদি-সহ সম্পূর্ণ বেদ, নানাপ্রকার মন্ত্রের দ্বারা কপিলা গাভীকে প্রসন্নতা পূর্বক স্তুতি করে থাকেন। তাঁরা বলেন—'সমস্ত দেবতাদ্বারা বন্দিতা পুণ্যময়ী কপিলা দেবী ! তোমাকে নমস্কার। ব্রহ্মা তোমাকে অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন করেছেন। তোমার প্রভা বিস্তৃত এবং শক্তি মহান। সমস্ত তীর্থ তোমারই স্বরূপ এবং তুমি সকলের মঙ্গলকারী। সমস্ত দেবতা আকাশে দণ্ডায়মান হয়ে বারংবার বলে থাকেন—'ওহো ! এই কপিলা, গৌরাঙ্গী বস্তু কত পবিত্র এবং উত্তম ! এ সব দুঃখ দূর করে দেয়। এ ধর্মদ্বারা উপার্জিত, শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ ও মহান ধন। কপিলা গাভী ইচ্ছা করলে সমস্ত ভূলোকবাসীকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যেতে সক্ষম। পৃথিবী, ঘোড়া, সোনা, গাভী, রূপা, তিল ও যব—এই পদার্থ প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে দান করলে দাতা মহা আনন্দ লাভ করে।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবদেবেশ্বর ! যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধ করার উত্তম সময় কী ? তাতে কোন্ ব্রাহ্মণদের পূজা করা উচিত এবং কোন্ ব্রাহ্মণদের পরিত্যাগ করতে হয় ?

ভগবান বললেন—যুধিষ্ঠির ! দেবকর্ম (যজ্ঞ) পূর্বাহ্ণ কালে করা কর্তব্য। পিতৃকর্ম (শ্রাদ্ধ) অপরাহ্ণ কালে। অযোগ্য সময়ে করা দানকে রাক্ষস মানা হয়। যে দানের কথা লোকের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে, যার থেকে কোনো অসত্যবাদী মানুষ আহার করেছে, যা কুকুরে স্পর্শ করেছে, সেই অন্ন রাক্ষসের ভাগ বলে মনে করতে হবে। পতিত, জড় এবং উন্মত্ত ব্রাহ্মণদের দেবযজ্ঞে বা পিতৃযজ্ঞে আহ্বান

করা উচিত নয়। নপুংসক, অঙ্গহীন, কুষ্ঠরোগী, রাজযক্ষ্মা এবং মৃগী রোগীদেরও শ্রাদ্ধে স্বাগত জানানো উচিত নয়। বৈদ্য, পূজারি, কপট নিয়মধারী (পাষণ্ড) ও মদবিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে আপ্যায়ন পাওয়ার অধিকারী নয়। নৃত্য-গীতকারী, বাক্যবাগীশ, পালোয়ান, অগ্নিহোত্র বর্জনকারী, শববহনকারী, চোর, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মে সংলগ্ন, অপরিচিত ব্রাহ্মণ—এদেরও শ্রাদ্ধে আপ্যায়ন করা উচিত নয়। যার পিতার ঠিক নেই, যে পুত্রিকা-ধর্মানুসারে মাতামহের গৃহে থাকে, সেই ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধের অধিকারী নয়। যুদ্ধে নিযুক্ত, উপার্জনশীল ও পশুপক্ষী বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহকারী ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে সংকার পাওয়ার অধিকারী নয়।

কিন্তু যেসব ব্রাহ্মণ ব্রত আচরণ পরায়ণ, গুণবান, সর্বদা স্বাধ্যায়শীল, গায়ত্রী মন্ত্রের জ্ঞাতা এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ, তাঁদের সংকারের যোগ্য বলে মানা হয়। শ্রাদ্ধে সব থেকে দুর্লভ বস্তু হল সুযোগ্য ব্রাহ্মণ জোগাড় করা। যেসময় ব্রাহ্মণ-দধি-ঘৃত-কুশ-ফুল-উত্তম স্থান পাওয়া যায়, সেই সময়েই শ্রাদ্ধের নিমিত্ত দান করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ সদাচারী, অল্প আয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন, দুর্বল, তপস্বী, ভিক্ষায় দিন কাটান, তিনি যদি কিছু চাইতে আসেন, তাহলে তাঁকে প্রদত্ত দান মহান ফল দেয়। যুধিষ্ঠির ! এই সব কথা সম্পূর্ণভাবে জেনে যিনি ধনহীন এবং যিনি উপকার করেন না সেই বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে দান করবে। তুমি যদি তোমার দানকে অক্ষয় করতে চাও, তবে যে দান তোমার প্রিয় এবং যা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ পছন্দ করেন, সেই দানই করো।

যুধিষ্ঠির ! এবারে যে ব্যক্তিরা নরকে যায় তাদের বর্ণনা শোনো। যে ব্রাহ্মণ গুরুকে রক্ষা করা বা নিজেকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য সময়েও মিথ্যা কথা বলে, সে নরকে গমন করে। যারা পরস্ত্রী অপহরণ করে, পরনারীর সঙ্গে ব্যাভিচার করে এবং অন্য নারীদের পরপুরুষের সঙ্গে মিলন ঘটায়, তারাও নরকে পতিত হয়। নিন্দাকারী, চোর, অন্যের অর্থে জীবিকা নির্বাহকারী, বর্ণ ও আশ্রমের বিরুদ্ধাচরণকারী, পাষণ্ড, পাপাচারী, বেদ বিক্রয়কারী, বেদ নিন্দাকারী, বেদ লিখনকারী, বিষ ও দুধ বিক্রয়কারী মানুষও নরকগামী হয়। যে নরাধম ধনলোভে অথবা আসক্তিবশত চণ্ডালকেও দুধ প্রদান করে, পশুদের দমন করে, সেও নরকে যায়। যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধনলোভে দান করে না, দীন ও অন্ধদের কৃপা করে না এবং নিজের সঙ্গে বহুকাল ধরে থাকা সহনশীল, জিতেন্দ্রিয়, দুর্বল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশক্ত হয়ে পড়লে তাকে ত্যাগ করে, সে-ও নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি শিশু, বৃদ্ধ এবং পরিশ্রান্ত মানুষদের খাবার না দিয়ে একাই খেতে থাকে, তাকেও নরকে যেতে হয়। প্রাচীনকালের ঋষিরা নরকগামী মানুষদের এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

এবার স্বর্গগামীদের বর্ণনা শোনো। যেসব ব্যক্তি দান, তপস্যা, সত্যভাষণ এবং ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা নিরন্তর ধর্মাচরণে ব্যাপৃত থাকে, যারা উপাধ্যায়কে সেবা করে তাঁর কাছে থেকে বেদ পাঠ করে এবং প্রতিগ্রহে আসক্তি রাখে না, তারা স্বর্গগামী হয়। যারা মধু, মাংস, মদ থেকে নিবৃত্ত হয়ে উত্তম ব্রত পালন করে, পরনারী সংসর্গ থেকে দূরে থাকে, মাতাপিতার সেবা করে, ভাইদের প্রতি স্নেহশীল হয়, আহারের সময় বাইরে গিয়ে অতিথি সেবা করে, তাদের জন্য কখনো স্বর্গদ্বার বন্ধ থাকে না, তারা স্বর্গগামী হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র কন্যাদের ধনীদের সঙ্গে বিবাহ করায় অথবা নিজে ধনী হয়েও দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করে এবং শ্রদ্ধাপূর্বক রস, বীজ ও ঔষধ দান করে, সে স্বর্গগামী হয়। যে ব্যক্তি পথে জিজ্ঞাসাকারী পথিককে ভালো-মন্দ, সুখদায়ক-দুঃখদায়ক পথের ঠিকমতো পরিচয় দেয় এবং যে ব্যক্তি অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী—এই সব তিথিতে, সন্ধিকালে, আর্দ্রা নক্ষত্রে স্ত্রী-সমাগম থেকে দূরে থাকে, সেই ব্যক্তিও স্বর্গগমন করে। রাজন্ ! এইরূপ হব্য-কব্যের বিধানের সময় বলা হয়েছে এবং স্বর্গ ও নরকে যাওয়ার ধর্ম-অধর্মের বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আর কী শুনতে চাও ?

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মাধব ! মানুষ ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা না করেই ব্রহ্মহত্যা পাপে কীভাবে লিপ্ত হয়, কৃপা করে সেই বিষয়টি ঠিকমতো বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে ব্যক্তি জীবিকাবিহীন ব্রাহ্মণকে ডেকে পরে ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে, তাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলা হয়। যে দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের জীবিকা কেড়ে নেয়, সেও ব্রহ্মঘাতী হয়। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে কোনো আশ্রম, গৃহ অথবা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়, তৃষ্ণার্ত গাভীকে জলের কাছে যেতে বাধা দেয় এবং বৈদিক শ্রুতি বা ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের ওপর অকারণ দোষারোপ করে, সেও ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যে ব্যক্তি অন্ধ, পঙ্গু, বোবা মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করে, যে

মূর্খতাবশত গুরুকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে, হুংকার দিয়ে অপমান করে এবং তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তাকেও ব্রহ্মঘাতী বলা হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ বা দ্বেষবশত অথবা কটুকথা শুনে ঋতুকালে স্ত্রীর কামবাসনা পূর্ণ করে না এবং যে দরিদ্রের সর্বস্ব অপহরণ করে, তাকেও ব্রহ্মহত্যাকারী বলে জানবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবেশ্বর ! যে দানকে সর্বদানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তার কথা বলুন এবং যে ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণযোগ্য নয়, তার পরিচয় দিন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই অন্নের প্রশংসা করেন, সুতরাং অন্নের সমান কোনো দান হয়নি এবং হবে না ; কারণ অন্নই এই জগতে বলপ্রদানকারী এবং অন্নের আধারে প্রাণ বজায় থাকে। এবার আমি সেই সব লোকের পরিচয় জানাচ্ছি, যাদের অন্ন গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করা হয়—মন দিয়ে শোনো। যজ্ঞে দীক্ষিত, কদর্য, ক্রোধী, শঠ, শাপগ্রস্ত, নপুংসক, আহারে বিভেদকারী, বৈদ্য, দূত, উচ্ছিষ্টভোজী, বর্ণসংকর, এবং অশৌচে পড়া মানুষের অন্ন, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ও শত্রুর অন্ন খাওয়া উচিত নয়। এইরূপ পতিত, নিন্দাকারী, যজ্ঞের ফল বিক্রয়কারী, নট, কাপড় বুননকারী, কৃতঘ্ন, নিষাদ, রঙ্গভূমিতে নাটক প্রদর্শনকারী, স্বর্ণকার, বীণাবাদক, শস্ত্র বিক্রেতা, সূত, মদ্য বিক্রেতা, ধোপা, স্ত্রৈণ, ক্রূর এবং মহিষচরানো ব্যক্তির অন্নও অগ্রাহ্য বলা হয়। যাদের মৃতাশৌচের দশ দিন কাটেনি, তাদের এবং বেশ্যাদের অন্নও খাওয়া উচিত নয়। কয়েদি, জুয়াড়ি, দ্যূতবিদ্যা জানা, পরিবিত্ত (বিবাহিত ছোট ভাইয়ের অবিবাহিত বড় ভাই) এবং পরিবেত্তা (অবিবাহিত বড় ভাইয়ের বিবাহিত ছোট ভাই), এদের অন্নও গ্রহণযোগ্য নয়। যার বড় বোন অবিবাহিত, সেই কন্যার সঙ্গে বিবাহকারী ব্রাহ্মণ এবং ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে উপভোগকারী পুরুষের এবং রাজার অন্নও ত্যাগ করা উচিত। রাজার অন্ন শক্তি, শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণত্ব, স্বর্ণকারের অন্ন আয়ু এবং চামারের অন্ন সুযশ নাশ করে। বেশ্যার অন্নও নিন্দিত বলা হয়। ব্যভিচারিণীর পতির অন্ন বীর্যের সমান মানা হয় ; তাই তা ত্যাগ করা উচিত। যে তার অন্নগ্রহণ করে সে তার চর্ম, রোম এবং অস্থি ভোজন করে। যদি না জেনে এদের অন্ন গ্রহণ করা হয়, তবে তিন দিন উপবাস করতে হয় ; কিন্তু জেনেশুনে একবারও এদের খাদ্য গ্রহণ করা দ্বিজকে প্রাজাপত্য-ব্রত আচরণ করা উচিত।

পাণ্ডুনন্দন ! এবার আমি দানের যথার্থ ফল বলছি, শোনো। জলদানকারী তৃপ্তি লাভ করে, অন্নদানকারী অক্ষয় সুখ লাভ করে, তিলদানকারী তার মনের মতো সন্তান এবং দীপদানকারী ব্যক্তি উত্তম নেত্র লাভ করে। ভূমিদানকারী ভূমি, স্বর্ণদানকারী দীর্ঘায়ু, গৃহদানকারী সুন্দর ভবন, রৌপ্যদানকারী উত্তম রূপ প্রাপ্ত হয়। বস্ত্রদানকারী চন্দ্রলোকে, অশ্বদানকারী অশ্বিনীকুমারদের লোকে যায়। গাড়িবহনকারী বলদ দান করলে লক্ষ্মীলাভ হয়, গো-দানকারী পুরুষ গোলোকের সুখ অনুভব করে। গাড়ি ও শয্যাদানকারী পুরুষ স্ত্রী এবং অভয়দানকারী ঐশ্বর্য লাভ করে। ধান্যদানকারী পুরুষ শাশ্বত সুখ পায় এবং বেদপ্রদানকারী পুরুষ পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি সোনা, ভূমি, গো, অশ্ব, বস্ত্র, ছাগ, শয্যা ও আসনাদি বস্তু সম্মানপূর্বক গ্রহণ করে এবং যে দাতা ন্যায়ানুসারে সম্মান সহকারে দান করে, তারা উভয়েই স্বর্গে যায় ; কিন্তু যারা এর বিপরীত আচরণ করে, তাদের দুজনকেই নরকে পতিত হতে হয়। বিদ্বান ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলবে না, তপস্যা করে অহংকার করবে না, কষ্টে পড়লেও ব্রাহ্মণদের অনাদর করবে না এবং দান করে প্রচার করবে না। মিথ্যা বললে যজ্ঞের, অহংকার করলে তপস্যার, ব্রাহ্মণের অপমান করলে আয়ু ও নিজ মুখে দানের কথা বললে সেসব বিনষ্ট হয়।

জীব একাকী জন্মায়, একাই মরে এবং একাই পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে। বন্ধুবান্ধব মানুষের মৃত শরীরকে সংকার করে মাটির ঢেলার মতো ফেলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। সেই সময় শুধু ধর্মই (তার দ্বারা কৃতকর্ম) জীবকে অনুসরণ করে। মানুষের মন ভবিষ্যৎ কর্মের হিসাব করতে থাকে, তখন কাল তার বিনাশশীল দেহকে লক্ষ করে মৃদুহাস্য করে ; তাই ধর্মকে সহায়ক মনে করে সদা তার সংগ্রহতেই ব্যাপৃত থাকা উচিত। কারণ মানুষ ধর্মের সাহায্যে দুস্তর নরক পার হয়ে যায়। যাঁরা অধিক জলপূর্ণ বহু সরোবর, ধর্মশালা, কূপ ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন এবং যাঁরা সর্বদা অন্নদান করেন ও মিষ্ট বাক্য বলেন, তাঁদের ওপর যমরাজের জোর চলে না।

ধর্ম ও শৌচের লক্ষণ, সন্ন্যাসী এবং অতিথি সৎকারের উপদেশ, শিষ্টাচার, দানের যোগ্য ব্রাহ্মণ ও অন্নদানের প্রশংসা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—জনার্দন ! মনীষী ব্যক্তিগণ ধর্মকে বহু প্রকারের এবং বহুপথ সম্পন্ন বলে থাকেন। বাস্তবে তার লক্ষণ কী তা কৃপা করে বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! তুমি ধর্ম ও শৌচের বিধি ক্রমানুসারে সংক্ষেপে শোনো। অহিংসা, শৌচ, অক্রোধ, ক্রূরতার অভাব, দম, শম এবং সরলতা—ধর্মের এগুলি অমোঘ লক্ষণ। ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, ক্ষমা, মদ্য-মাংস ত্যাগ, ধর্মমর্যাদার মধ্যে অবস্থান করা এবং মনকে বশে রাখা—এগুলি শৌচের (পবিত্রতার) লক্ষণ। মানুষের বাল্যকালে বিদ্যাধ্যয়ন করা কর্তব্য, যুবাবস্থায় বিবাহ করা এবং বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থ গ্রহণ করা উচিত ; কিন্তু সর্বদা, সর্বাবস্থায় ধর্মাচরণ করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণদের অপমান না করা, গুরুজনের নিন্দা না করা এবং সন্ন্যাসী মহাত্মাদের প্রতি অনুকূল আচরণ করা—এগুলিই সনাতন ধর্ম। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণদের গুরু, ব্রাহ্মণ চার বর্ণের গুরু, পতি তার পত্নীর গুরু এবং রাজা সকলের গুরু। যদি সন্ন্যাসী এক রাতের জন্যও গৃহস্থের ঘরে অবস্থান করেন ; তবে জেনে-শুনে অথবা অজানতে করা সমস্ত পাপ তিনি নাশ করে দেন। সন্ন্যাসী এক দণ্ড ধারণ করুন কিংবা তিন দণ্ড, জটাজুট সমন্বিত হোন অথবা মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বসন ধারণ করুন বা না করুন, তাঁকে সর্বদা পূজা করা উচিত। যদি গৃহস্থ মানুষ সন্ন্যাসী বা অতিথির পূজা না করে, অথবা তাঁদের অপমান করে, তাহলে তাঁদের মনোবেদনা সেই গৃহস্থকে নরকে প্রেরণ করে। তাই যারা পরলোকে কল্যাণ কামনা করে, তাদের উচিত সমস্ত কর্ম আমায় অর্পণকারী আমার শরণাগত ভক্তদের ভক্তিভরে পূজা করা। ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তুলবে না, গাভীকে মারবে না ; যারা এই দুইয়ের ওপর হাত তোলে, তাদের ভ্রূণহত্যার সমান পাপ হয়। অগ্নিতে ফুঁ দেবে না, আগুনে পা গরম করবে না, আগুনকে পা দিয়ে নেভাবে না এবং আগুনের দিকে পিঠ করবে না। দুই দিকে আগুন জ্বললে তার মাঝখান দিয়ে যাবে না। আগুনে কোনো অপবিত্র বস্তু দেবে না, উচ্ছিষ্ট বা অশৌচ অবস্থায় অগ্নি স্পর্শ করবে না। অগ্নি সর্বদেবতারূপ, সুতরাং শুদ্ধ হয়ে তাকে স্পর্শ করা উচিত। মল-মূত্রের বেগ অনুভব হলে বুদ্ধিমান মানুষের আগুন ছোঁওয়া উচিত নয় কারণ সে অবস্থায় সে অশুদ্ধ থাকে। আহার তৈরি করার জন্য অন্যের গৃহ থেকে আগুন আনা উচিত নয় ; কারণ সেই অগ্নিতে তৈরি করা অন্নের দ্বারা কোনো শুভকর্ম করলে তার অর্ধভাগ অগ্নিদানকারীর প্রাপ্য হয়। তাই নিজ গৃহের অগ্নি কখনো নেভাতে নেই। যদি অসাবধানে গৃহের আগুন নিভে যায়, তাহলে অরণী কাষ্ঠ মন্থন করে আগুন জ্বালাতে হয় অথবা কোনো শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে তা চেয়ে আনতে হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—জনার্দন ! যাঁদের দান করলে মহাফল প্রাপ্তি হয়, সেই সাধু ব্রাহ্মণেরা কেমন হয়ে থাকেন ?

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যাঁরা ক্রোধ করেন না, সত্যবাদী, সর্বদা ধর্মে ব্যাপৃত, জিতেন্দ্রিয়, তাঁরাই সাধু ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের দান করলে মহাফল প্রাপ্তি হয়। যাঁরা অভিমানশূন্য, সর্বংসহা, শাস্ত্রীয় অর্থ জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্বপ্রাণীর হিতকারী, সকলের সঙ্গে মৈত্রী ভাবাপন্ন, নির্লোভ, পবিত্র, বিদ্বান, সত্যবাদী এবং স্বধর্মপরায়ণ এরূপ ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত দান মহাফল-প্রাপ্তিকারী হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন অঙ্গসহ চতুর্বেদ স্বাধ্যায় করেন এবং যিনি শূদ্রান্ন গ্রহণ করেননি, ঋষিগণ সেই ব্যক্তিকে দান করাকে উত্তম বলেন। যুধিষ্ঠির ! যদি শুদ্ধ বুদ্ধি, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সদাচার এবং উত্তম শীলযুক্ত একজন ব্রাহ্মণও দান গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি দাতার সমস্ত কুল উদ্ধার করে দেন। এরূপ ব্রাহ্মণকে গাভী, ঘোড়া, অন্ন এবং ধন দান করা উচিত। সৎব্যক্তির দ্বারা সম্মানিত কোনো গুণবান ব্রাহ্মণের নাম শুনে তাঁকে ডেকে এনে সম্মান সহকারে তাঁর আপ্যায়ন ও পূজা করা উচিত।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবেশ্বর ! ধর্ম ও অধর্মের এই বিধি পিতামহ ভীষ্ম সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। আপনি তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপ করে সারধর্ম কী সেটি বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! চরাচর জগৎ অন্নের আধারেই অবস্থিত। অন্ন থেকেই প্রাণের উৎপত্তি। একথা প্রত্যক্ষ, তাই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানুষের দেশ-কাল বিচার করে ভিক্ষুককে অবশ্যই অন্নদান করা উচিত। ব্রাহ্মণ বালক

হোক বা বৃদ্ধ, যদি সে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গৃহে আসে তবে গৃহস্থের উচিত সানন্দে গুরুর ন্যায় তার পূজা করা। পরলোকে কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য নিজ উদ্‌গত ক্রোধকে বশ করে, ঈর্ষা ত্যাগ করে প্রসন্নতা সহকারে অতিথির পূজা করা উচিত। গৃহস্থ ব্যক্তি কখনো অতিথির অনাদর করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না এবং তার গোত্র, শাখা ও অধ্যয়নের বিষয়ে কখনো প্রশ্ন করবে না। আহারের সময় চণ্ডাল বা মহাচণ্ডাল এলেও পরলোকে হিতকামী মানুষ তাকে অন্নের দ্বারা সেবা করবে। যে (ভিক্ষুকের ভয়ে) নিজ গৃহদ্বার বন্ধ করে আনন্দে আহার করে, সে নিজ হাতে স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষ, দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও নিরাশ্রয় মানুষদের অন্নদ্বারা তৃপ্ত করে সে মহা পুণ্যফল লাভ করে। যে ব্যক্তি বহু পাপ করে, সেও যদি যাচক ব্রাহ্মণকে বিশেষভাবে অন্নদান করে তবে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। জগতে অন্নদাতা পুরুষকে প্রাণদাতা বলে মানা হয় এবং যে প্রাণদাতা, সেই সব কিছুর দাতা হয়। অন্নকে অমৃত বলা হয় এবং অন্নকেই প্রজাদের জীবনরক্ষাকারী বলে মনে করা হয়। অন্ন নাশ হলে শরীরের পঞ্চধাতুও নাশ হয়। বলবান ব্যক্তি অন্নত্যাগ করলে বলহীন হয়ে পড়ে। তাই শ্রদ্ধাসহ চেষ্টাপূর্বক অন্নদান করা উচিত। সূর্য তার কিরণদ্বারা পৃথিবীর রস আহরণ করে, বাতাস সেই রস মেঘে স্থাপন করে। মেঘে থাকা সেই রস ইন্দ্র পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। তাতে পৃথিবী বর্ষণ সিক্ত হয়ে তৃপ্ত হয় এবং তার থেকে অন্নের চারা উদ্‌গত হয়, যার দ্বারা সমস্ত প্রজার জীবন-নির্বাহ হয়। এইরূপ সূর্য-বায়ু-মেঘ ও ইন্দ্র—এগুলি একই সমুদায়ের অন্তর্গত। এর দ্বারাই ভূতাদির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আকাশে এই মহাত্মাদের বহু দিব্য ভবন আছে, যা বিভিন্ন প্রকারে নির্মিত এবং পৃথক-পৃথক ভূমিতে অবস্থিত। তার মধ্যে কারো ভবন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, কারো উদয়কালীন সূর্যের ন্যায় রক্তিম। সেই লোকাদিতে স্থাবর জঙ্গম সর্বপ্রকারের প্রাণী নিবাস করে। অন্নদাতারা এই লোকই প্রাপ্ত হয়, তাই সর্বদা অন্নদান করা উচিত।

—— ◻ ——

আহারের নিয়ম, গাভীদের ঘাস দেওয়ার বিধান ও মাহাত্ম্য এবং ব্রাহ্মণদের জন্য তিল ও ইক্ষু পেষণের নিষেধ বার্তা

যুধিষ্ঠির বললেন—মধুসূদন ! অন্নদানের ফল শুনে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এবার আপনি কৃপা করে ভোজনের নিয়ম বলুন।

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! দ্বিজাতিদের ভোজনের নিয়ম শোনো। শ্রেষ্ঠ দ্বিজের উচিত স্নান করে পবিত্র হয়ে শুদ্ধ ও একান্ত স্থানে বসে অগ্নিতে হোম করা। ব্রাহ্মণ হলে চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয় হলে গোলাকার এবং বৈশ্য হলে অর্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল নির্মাণ করবে। তারপর হাত-পা ধুয়ে মণ্ডল আসন পেতে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করে দুই পা অথবা এক পায়ে ভূমি স্পর্শ করে থাকবে। এক বস্ত্র পরিধান করে বা সমস্ত দেহ আবৃত করে আহার করবে না। ভাঙা বাসনে বা উল্টো পাতাতেও আহার করবে না। আহার গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রসন্নচিত্তে প্রথমে অন্নকে নমস্কার করতে হয়। অন্ন ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় এবং পরিবেশিত খাদ্যেরও নিন্দা করতে নেই। আহার শুরু করার আগে হাতে জল নিয়ে অন্নের চারদিকে প্রদক্ষিণ করবে, তারপর মন্ত্র পড়ে পৃথক পৃথক পাঁচ প্রাণকে অন্ন আহুতি দেবে। অন্ন, অন্নাদ এবং পাঁচ প্রাণের তত্ত্ব জেনে যে ব্যক্তি প্রাণাগ্নিহোত্র করে, তার পঞ্চবায়ুকে যজ্ঞ করা হয়। প্রাণেদের আহুতি দেবার পর এক এক গ্রাস করে আহার

করবে। এক গ্রাস অন্ন মুখে দেবার পর অবশিষ্ট অংশকে উচ্ছিষ্ট বলা হয়। মুখ থেকে পড়ে যাওয়া অন্নকে অখাদ্য বলে জানবে এবং সেটি খেলে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করবে। যে নিজ উচ্ছিষ্ট খায় এবং একবার খেয়ে পরে অবশিষ্ট খাদ্য আবার গ্রহণ করে, তার চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র অথবা প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করা উচিত। যে ব্যক্তি পত্নীর আহার করা পাত্রে ভোজন করে, স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট খায় বা স্ত্রীর সঙ্গে এক বাসনে আহার করে, জেনো সে মদিরা পান করে। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই পাপমুক্তির জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত বলেননি। জলপান করতে করতে যদি জলবিন্দু ভোজ্য সামগ্রীর ওপর পড়ে, তবে তা আর ভোজনযোগ্য থাকে না। যে সেটি খেয়ে নেয়, তার চান্দ্রায়ণ-ব্রত করা উচিত। তেমনই পান করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তা আর পানযোগ্য থাকে না। কোনো ব্রাহ্মণ যদি ভুলবশত সেই জল পান করে ফেলেন, তবে তাঁকে চান্দ্রায়ণ-ব্রত করতে হয়। ব্রাহ্মণের কোনো দিকে না তাকিয়ে আহার করা উচিত, তাঁদের উচিত কারোকে নিজ উচ্ছিষ্ট না দেওয়া, কখনো অত্যধিক বা অত্যল্প আহার গ্রহণ না করা। প্রত্যহ এমন আহার গ্রহণ করবে যাতে কষ্ট না হয়। আহার গ্রহণের সময় যদি রজস্বলা নারী, চণ্ডাল, কুকুর বা শুয়োর এসে যায়, তাহলে আহার ত্যাগ করবে। যে ভ্রমবশত এরূপ অবস্থায় আহার ত্যাগ করে না তাকে চান্দ্রায়ণ-ব্রত করতে হয়। আহারে যদি কেশ বা কীট পড়ে থাকে অথবা ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়, তবে তা অখাদ্য বলে ত্যাগ করা উচিত। এরূপ অন্ন গ্রহণ করলেও চান্দ্রায়ণ-ব্রত করতে হয়। আহারের স্থান থেকে উঠে যাওয়ার সময় যদি পা দিয়ে আহার স্পর্শ হয়ে যায় বা ডিঙিয়ে যাওয়া হয়, তবে সেই অন্ন রাক্ষসের খাওয়ার উপযুক্ত মনে করে পরিত্যাগ করতে হয়। রাক্ষসের উচ্ছিষ্ট ভাগ গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ তার পূর্বতন এবং অধস্তন সাতপুরুষকে রৌরব নরকে প্রেরণ করে। আহার শেষ হলে, যে পাত্রে আহার করা হয়েছে, তাতে আচমন করা উচিত। আচমন না করেই যদি আহার গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ আসন ত্যাগ করে, তাহলে তার তৎক্ষণাৎ স্নান করা উচিত, না হলে সে অপবিত্রই থেকে যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! গাভীদের ঘাস দেবার বিধান ও মাহাত্ম্য কী এবং ইক্ষু থেকে চন্দ্র কীভাবে উৎপন্ন হয়েছে, কৃপা করে বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! বলদকে জগতের পিতা এবং গাভীদের জগতের মাতা বলে জানবে ; এদের পূজা করলে সমস্ত পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পূজা করা হয়। যাদের গোময় লেপন করলে সভা-ভবন, গৃহ ও দেব-মন্দির শুদ্ধ হয়ে যায়, তাদের থেকে আর কোন্ প্রাণী শ্রেষ্ঠ ? যে ব্যক্তি এক বছর ধরে আহারের পূর্বে প্রত্যহ অন্যের গাভীকে এক মুষ্ঠি ঘাস খাওয়ায়, সে সবসময় এই গো-সেবার ফল পায়। (গাভীকে ঘাস দেবার বিধান এইরূপ—) গোমাতার সামনে ঘাস রেখে এইভাবে বলতে হয়—'জগতের সমস্ত গাভী আমার মাতা এবং সমস্ত বৃষভ আমার পিতা। গোমাতাগণ ! আমি তোমার সেবায় এই ঘাস অর্পণ করছি, এগুলি গ্রহণ করো।'[১] এই মন্ত্র পাঠ করে অথবা গায়ত্রী উচ্চারণ করে একাগ্রচিত্তে ঘাস অভিমন্ত্রিত করে গাভীকে খাওয়াবে। এরূপ করলে যে পুণ্যফল প্রাপ্তি হয়, তা শোনো। সেই ব্যক্তি জেনে অথবা না জেনে যেসব পাপ করে, তা সব নষ্ট হয়ে যায়, সে কখনো দুঃস্বপ্ন দেখে না। তিল অত্যন্ত পবিত্র এবং পাপনাশক ; ভগবান নারায়ণ থেকে এর উৎপত্তি, তাই শ্রাদ্ধে এর অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। তিল দান অতি উত্তম দান বলা হয়, তিল দান করবে, তিল ভক্ষণ করবে এবং প্রভাতে তিল বাটা গায়ে লাগিয়ে স্নান করবে এবং সর্বদা 'তিল তিল' উচ্চারণ করবে। কারণ তিল সর্বপাপ বিনাশকারী। দ্বিজাতিদের তিল কিনে অথবা দানে পেয়ে বিক্রয় করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তিল আহার করা, তিল বাটা গায়ে মাখা বা তিল দানের অতিরিক্ত অন্য কোনো কাজে তিল ব্যবহার করে, সে কীট হয়ে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কুকুরের বিষ্ঠায় অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের নিজে তিল পেষণের যন্ত্রে তিল পেষণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি মোহবশত তিল পেষণ করে, সে রৌরব নরকে পতিত হয়। চন্দ্র ইক্ষুর বংশে উৎপন্ন হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ চন্দ্র বংশে উৎপন্ন, তাই ব্রাহ্মণের ইক্ষুপেষণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যদি ইক্ষুপেষণ করে, তবে এক একটি ইক্ষুতে এক একটি ব্রহ্মহত্যার পাপে সে পাপী হয়।

---

[১]গাবো মে মাতরঃ সর্বাঃ পিতরশ্চৈব গোবৃষাঃ। গ্রাসমুষ্টিং ময়া দত্তং প্রতি গৃহ্ণিত মাতরঃ॥

আপদ্ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ এবং নিন্দনীয় ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধের উত্তম কাল এবং মানব ধর্মের সার বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—কেশব ! আপনার কৃপায় আমি সর্বধর্মের কথা শুনলাম এবং কোন্ অন্ন ভোজনের যোগ্য, কোন্‌টি নয় তাও জানলাম। এবার কৃপা করে আপদ্ ধর্মের বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! দেশে যখন অকাল হয়, রাষ্ট্রে কোনো বিপদ আসে, জন্ম বা মৃত্যুর অশৌচ বা ভীষণ রৌদ্রে পথ চলতে হয় এবং এই সব কারণে নিয়ম পালন করা সম্ভব না হয় বা দূরপথ অতিক্রম করার জন্য ক্লান্তি আসে, সেই অবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য না পেলে শূদ্রের কাছ থেকে জীবন-নির্বাহের জন্য সামান্য চাল (সিধা হিসাবে) গ্রহণ করা যায়। রোগী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত যদি আহার-সম্বন্ধীয় নিয়ম-পালন করতে সক্ষম না হয় তাহলেও তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। জল, মূল, ঘি, দুধ, হবি, ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণ করা, গুরু-আদেশ পালন করা এবং ঔষধ—এই আটটি সেবনে ব্রতভঙ্গ হয় না। যে ব্যক্তি বিধিপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করতে অক্ষম, সে বিদ্বানের কথায় বা দানের দ্বারাও শুদ্ধ হতে পারে। দূর-দেশে থাকা ব্যক্তি কিছুদিনের জন্য যদি গৃহে আসে, তখন ঋতুকালে বা অন্যসময়ে, রাতে বা দিনে স্ত্রীসমাগম করে, তাহলে সে প্রায়শ্চিত্তের ভাগী হয় না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! কীরূপ ব্রাহ্মণ প্রশংসার যোগ্য হন এবং কারা নিন্দার যোগ্য। অষ্ট-শ্রাদ্ধের সময় কখন—আমাকে বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! উত্তম কুলে জন্ম, শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানকারী, বিদ্বান, দয়ালু, শ্রীসম্পন্ন, সরল এবং সত্যবাদী—এসব ব্রাহ্মণকে সুপাত্র (প্রশংসার যোগ্য) মনে করা হয়। তাঁরা সর্বাগ্রে উপবেশন করে সর্বপ্রথম ভোজনের অধিকারী এবং দর্শনমাত্রেই সেই পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট সকলকে পবিত্র করেন। যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার শরণাগত ভক্ত, তাঁদের পঙ্‌ক্তিপাবন বলে জেনো। তাঁরা বিশেষভাবে পূজা পাওয়ার যোগ্য। এবার নিন্দার যোগ্য ব্রাহ্মণের বর্ণনা শোনো। যে ব্রাহ্মণ জগতে কপটতাপূর্ণ ব্যবহার করে, সে বেদপারঙ্গমী ব্রাহ্মণ হলেও পাপাচারী। যে অগ্নিহোত্র ও স্বাধ্যায় করে না, সর্বদা দান গ্রহণ করতে চায় এবং যত্র তত্র ভোজন করে, তাকে ব্রাহ্মণ জাতির কলঙ্ক বলে জানবে। যার দেহ মরণাশৌচের অন্নগ্রহণ করে হৃষ্ট হয়েছে, যে শূদ্রান্ন ভোজন করে, শূদ্রান্নের রসেই পুষ্ট, সেই ব্রাহ্মণ প্রত্যহ স্বাধ্যায়, জপ ও হোম করলেও উত্তম গতি লাভ করে না। যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করলেও শূদ্রান্ন থেকে দূরে থাকে না, তার আত্মা, বেদাধ্যয়ন এবং তিন অগ্নি—এই পাঁচটি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শূদ্রের সেবাকারী ব্রাহ্মণকে খাওয়ার জন্য মাটিতেই অন্ন দেওয়া উচিত, কারণ সে কুকুরেরই সমান। যে ব্রাহ্মণ মূর্খতাবশত মৃত শূদ্রের শবের সঙ্গে শ্মশানে যায়, তার ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। তিন রাত পার হলে সমুদ্রে মিলিত হওয়া নদীতে স্নান এবং একশতবার প্রাণায়াম করে ঘি পান করলে তবে সে শুদ্ধ হয়। যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ কোনো অনাথ ব্রাহ্মণের শব শ্মশানে নিয়ে যায়, সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং সে স্নান করামাত্রই শুদ্ধ হয়ে যায়। নিবৃত্তিমার্গপরায়ণ ব্রাহ্মণের শূদ্রের গৃহে দুধ বা দই খাওয়া উচিত নয়। সেটিও শূদ্রান্ন বলে জানা উচিত। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের খাওয়ার অন্নে যে ব্যক্তি বিঘ্নপ্রদান করে তার থেকে বড় পাপী আর কেউ নয়।

রাজন্ ! ব্রাহ্মণ যদি শীল ও সদাচারবর্জিত হয় তাহলে ষড়াঙ্গসহ সম্পূর্ণ বেদ, সাংখ্য, পুরাণ এবং উত্তম কুলে জন্ম—এই সব মিলেও তার সদ্‌গতি করতে সক্ষম হয় না। গ্রহণের সময়, বিষুব যোগে, অয়ন সমাপ্ত হলে, পিতৃকর্মে (শ্রাদ্ধাদিতে), মঘা-নক্ষত্রে, পুত্র জন্ম হলে এবং গয়াতে পিণ্ডদানের সময় যে সামান্যতম দান করে, সেই দান এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দানের সমান হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্তিক শুক্লপক্ষের নবমী, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, মাঘের অমাবস্যা, চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের প্রারম্ভিক দিন—এগুলি শ্রাদ্ধের উত্তম কাল। এই দিনগুলিতে মানুষ পবিত্রচিত্ত হলে যদি পিতৃপুরুষের জন্য তিলমিশ্রিত জলও দান করে, তাহলে তার এক হাজার বছর ধরে শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। এই রহস্য স্বয়ং পিতৃপুরুষের দ্বারা জানানো হয়েছে। যে ব্যক্তি স্নেহ বা ভয়ের জন্য অথবা ধনলাভের আশায় এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট লোকেদের আহার পরিবেশনে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাকে বিদ্বান ব্যক্তিরা ক্রূর, দুরাচারী, অজিতাত্মা

ও ব্রহ্মঘাতক বলে থাকে। যার ধনভাণ্ডার পূর্ণ এবং যে পরলোক বিষয়ে কিছু না জানায় সর্বদা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, সে কেবল দৈহিক সুখেই আসক্ত হয় ; তার কাছে ইহলোকের সুখই সুলভ হয়। পারলৌকিক সুখ কখনো তার কপালে থাকে না। যে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে, নিত্য স্বাধ্যায় করে, ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে, প্রাণীদের হিত সাধনে রত থাকে, তার কাছে ইহলোকের সুখও সুলভ হয় এবং পরলোকেরও। কিন্তু যে মূর্খ বিদ্যালাভ করে না, তপস্যা করে না, দান করে না এবং অন্য সুখেরও জ্ঞান নেই তার জন্যে ইহলোকেও সুখ নেই, যার পরলোকেও নয়।

যুধিষ্ঠির বললেন—হৃষিকেশ ! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, ঈশ্বর এবং সমস্ত জগতের নিবাসস্থান। আপনাকে নমস্কার। এখন আমি সর্বধর্মের সার শুনতে চাই।

ভগবান বললেন—মহাপ্রাজ্ঞ ! মনু যে ধর্মের সারতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন, তা পুরাণাদির অনুকূল এবং বেদ দ্বারা সমর্থিত। আমি তা বর্ণনা করছি, শোনো। অগ্নিহোত্রী দ্বিজ, কপিলা গাভী, যজ্ঞকারী ব্যক্তি, রাজা, সন্ন্যাসী এবং মহাসাগর—এগুলি দর্শনমাত্রেই মানুষকে পবিত্র করে দেয়, তাই সর্বদা এগুলি দর্শন করা উচিত। একটি গাভী একজনকেই দান করা উচিত, অনেককে নয় (অনেককে দিলে তারা ওই গাভীকে বিক্রয় করে নিজেদের মধ্যে মূল্য ভাগ করে নেবে)। যদি সেই গাভীটি বিক্রয় করা হয়, তবে সে দাতার সাতপুরুষ পাপযুক্ত করে দেয়। একটি গাভী, একটি বস্ত্র, একটি শয্যা এবং একটি নারী কখনো অনেক মানুষের অধিকারে দিতে নেই ; কারণ তাহলে দাতা দানের ফল পায় না। ব্রাহ্মণ এবং গাভী যদি অনার্য ব্যক্তির গৃহে নিজে গিয়ে আহার গ্রহণ করে, তাহলে সেই অনার্য রাজসূয় যজ্ঞের থেকে বড় পুণ্যের ভাগী হয় । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও গাভীকে খাবার দেবার সময় 'দিও না' বলে বাধা দেয়, সে একশো বার পশুপক্ষী রূপে জন্ম নেবার পর চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের, দেবতার, দরিদ্রের এবং গুরুর ধন যদি চুরি করা হয় তাহলে সে স্বর্গবাসীদেরও নীচে পতিত করে দেয়। যে ধর্মের তত্ত্ব জানতে চায়, তার জন্য বেদ প্রধান প্রমাণ, ধর্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ এবং লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ। পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্তী যে দেশ, তাকে বলা হয় আর্যাবর্ত। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী—এই দুই দেব নদীর মধ্যে দেবতা দ্বারা রচিত যে দেশ, তাকে বলা হয় ব্রহ্মাবর্ত। যে দেশে চার বর্ণ এবং তাদের অবান্তর পার্থক্যের যে আচার-ব্যবহার পূর্বপরম্পরা থেকে চলে আসছে, তাকেই তাদের সদাচার বলা হয়। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং শূরসেন—এগুলি ব্রহ্মর্ষিদের দেশ এবং ব্রহ্মাবর্তের নিকটবর্তী। এই দেশের ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে পৃথিবীর সব মানুষের আচার-ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। হিমালয় এবং বিন্ধ্যাচলের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পূর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ আছে, তাকে মধ্যদেশ বলা হয়। যে দেশে কৃষ্ণসার নামক মৃগ বিচরণ করে, সেই দেশই যজ্ঞের উপযোগী ; তার থেকে পৃথক ম্লেচ্ছদের দেশ। এই দেশগুলির পরিচয় লাভ করে দ্বিজাতীয়দের তাতে বাস করা উচিত ; কিন্তু শূদ্রেরা জীবিকা না পেলে জীবন-নির্বাহের জন্য যে কোনো দেশে নিবাস করতে পারে। সদাচার, অহিংসা, সত্য, শক্তি অনুযায়ী দান এবং যম-নিয়মাদি পালন—এগুলি মুখ্য ধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সব সংস্কার বেদোক্ত বিধি অনুসারে করা উচিত ; কারণ সংস্কার ইহলোকে ও পরলোকে পবিত্রকারী হয়ে থাকে। গর্ভাধান-সংস্কারে করা যজ্ঞের দ্বারা এবং জাতকর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, যজ্ঞোপবিত (পৈতে ধারণ), বেদাধ্যয়ন, বেদোক্ত ব্রতাদি পালন, স্নাতকের পালনীয় ব্রত, বিবাহ, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য যজ্ঞের দ্বারা এই শরীরকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য তৈরি করা হয়। যার দ্বারা ধর্মেরও লাভ হয় না এবং অর্থ ও বিদ্যা-প্রাপ্তির অনুকূল সেবাও যে করে না, সেই শিষ্যকে বিদ্যাদান করা উচিত নয়, যেমন অনুর্বর খেতে বীজরোপণ করা উচিত নয়, তেমনই। যে ব্যক্তির থেকে লৌকিক, বৈদিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়, সেই গুরুকে প্রথম প্রণাম করা উচিত। নিজ দক্ষিণ হাতে গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হাতে বাম চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা উচিত। গুরুকে কখনো এক হাতে প্রণাম করতে নেই। যিনি গর্ভাধান ইত্যাদি সমস্ত সংস্কার বিধিমতো করান এবং বেদপাঠ করান, তাঁকে গুরু বলা হয়। যিনি উপনয়ন সংস্কার করে কল্প ও রহস্যসহ বেদাদি নিত্য অধ্যয়ন করান, তাঁকে উপাধ্যায় বলা হয়। যিনি যড়ঙ্গযুক্ত বেদাদি পাঠ করিয়ে বৈদিক ব্রতের শিক্ষা দেন এবং মন্ত্র-ব্যাখ্যা করেন, তাঁকে আচার্য বলা হয়। গৌরবে দশ উপাধ্যায়ের থেকে বড় একজন আচার্য, শত আচার্যের থেকে বড় পিতা, শত পিতার থেকে বড় মাতা ; কিন্তু জ্ঞান

প্রদান করেন যে গুরু, তিনি এঁদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। গুরুর থেকে বড় কেউ হয়নি, হবেও না। তাই মানুষের উপরিউক্ত গুরুজনদের অধীনে থেকে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষাতে ব্যাপৃত থাকতে হয়। গুরুজনদের অপমান করলে যে নরকে পতন হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা কোনো অঙ্গ হীন, যার কোনো অঙ্গ অধিক, যে বিদ্যাহীন, অবস্থাগতিকে বৃদ্ধ, রূপ ও ধনহীন এবং নীচজাতির, তাদের আক্ষেপ করা উচিত নয় ; কারণ যে আক্ষেপ করে তার পুণ্য, যার জন্য আক্ষেপ করা হয়, তার কাছে চলে যায়। নাস্তিকতা, বেদ ও দেবতাদের নিন্দা, দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ ও কঠোরতা—এগুলি পরিত্যাগ করা উচিত।

অগ্নির স্বরূপ, অগ্নিহোত্রের বিধি এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবদেবেশ্বর ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের কীভাবে যজ্ঞ করা উচিত ? অগ্নির ভেদ কয় প্রকারের ? তার পৃথক পৃথক স্বরূপ কী ? কোন্ অগ্নির কোথায় স্থান ? অগ্নিহোত্রী পুরুষ কোন্ অগ্নিতে যজ্ঞ করে কোন্ লোক প্রাপ্ত হন ? পূর্বকালে অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত কী ছিল ? দেবতাদের জন্য কীরূপ যজ্ঞ করা হয় এবং কীভাবে তাঁদের তৃপ্তি হয় ? অগ্নিহোত্রী কোন্ গতি প্রাপ্ত হন ? তিন অগ্নির স্বরূপ না জেনে যদি তাতে অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করা হয় অথবা উপাসনাতে ত্রুটি থেকে যায়, তবে এই ত্রিবিধ অগ্নি অগ্নিহোত্রীর কী অনিষ্ট করে ? যে ব্যক্তি অগ্নি পরিত্যাগ করেছে, সেই পাপাত্মা কী জন্ম পরিগ্রহ করে ? এই সব বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বলুন ; কারণ আমি ভক্তিভাবে আপনার শরণ গ্রহণ করেছি। প্রভু ! আপনি সর্বজ্ঞ, সব থেকে মহান ; তাই আমি আপনাকে স্মরণ করি।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! এই মহাপুণ্যদায়ক এবং পরম ধর্মরূপ অমৃতের বর্ণনা শোনো—ধর্মপরায়ণ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে এটি ভবসাগর থেকে পার করে দেয়। আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মারূপে সমস্ত লোকের সৃষ্টি করেছি এবং সকলের মঙ্গলের জন্য নিজ মুখ থেকে সর্বপ্রথম অগ্নি সৃষ্টি করেছি। এইভাবে আমা কর্তৃক সর্বভূতের আগে অগ্নি-তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে, তাই পুরাণ-দ্রষ্টা মনীষী বিদ্বানগণ তাকে অগ্নি বলেন। সমস্ত কার্যে সর্বাগ্রে প্রজ্বলিত অগ্নিতেই আহুতি প্রদান করা হয়, তাই এর নাম অগ্নি। একে ভালোভাবে পূজা করলে ব্রাহ্মণদের অগ্রগতি (পরমপদ) প্রাপ্ত হয়, তারজন্যও দেবতাদের মধ্যে অগ্নি নাম বিখ্যাত। যদি বিধি লঙ্ঘন করে এতে যজ্ঞ করা হয়, তবে এক মুহূর্তেই এটি যজ্ঞকারীকে গ্রাস করার শক্তিধারণ করে ; তাই অগ্নিকে ক্রব্যাদ্ বলা হয় । এই অগ্নি সমস্ত ভূতের স্বরূপ এবং দেবতাদের মুখ। অন্নপাক করার জন্য একে পচন বলা হয়। একে উপাসনা করা হয়, তাই একে ঔপাসন বলা হয়। 'আহুতি' শব্দের দ্বারা সকলের বোধ হয় ; সেই সর্বস্বরূপ আহুতিতে অগ্নির আবসথ—নিবাস ; তাই ব্রহ্মবাদী মানুষেরা একে 'আবসথ্য' বলেন। যে ব্রাহ্মণের গৃহে ধর্মানুসারে পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তিনি চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত হয়ে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করেন। ইন্দ্রিয়াদি ও মন-বুদ্ধিতে সংযম রক্ষাকারী সিদ্ধ সপ্তর্ষিগণ অগ্নির আরাধনায় তৎপর থাকার জন্যই দেবতাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অন্য বিদ্বানগণ আবসথ্য অগ্নিকেই পচনাগ্নি বলেন ; কারণ এতেই পঞ্চমহাযজ্ঞের স্থিতি। স্থালীপাক ও গৃহ্যকর্ম সব এতেই প্রতিষ্ঠিত। গৃহ্যকর্মের আধার হওয়ায় একে গৃহপতিও বলা হয়। কিছু ব্রহ্মবেত্তাদের মতে ঔপাসন, আবসথ্য, সভ্য এবং পচন নামক অগ্নিও এটিই। আমারও তাই মত।

রাজন্! এবার একাগ্রচিত্তে অগ্নিহোত্রের প্রকার শোনো। গুণানুসারে নামধারণকারী যে ত্রিবিধ অগ্নি, তার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হচ্ছে। গৃহাদির আধিপত্যকেই গৃহপত্য বলা হয়। এই গৃহপত্য যে অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত, সেটিই গার্হপত্য অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। যে অগ্নি যজমানকে দক্ষিণ মার্গের দ্বারা স্বর্গে নিয়ে যায়, ব্রাহ্মণেরা তাকে দক্ষিণাগ্নি বলেন। 'আহুতি' শব্দ সর্বের বাচক এবং হবন হল 'যজ্ঞ'। সর্বপ্রকার যজ্ঞ স্বীকারকারী বহ্নিকে আহবনীয় অগ্নি বলা হয়। যে আবসথ্য নামক মূল অগ্নিতে ব্রাহ্মণ বিধিপূর্বক যজ্ঞ করে, তাকে পচনাগ্নিও বলা হয়। সেই অগ্নিতে স্থিত একটি অন্য অগ্নি আছে, যাকে সভ্য বলা হয়। আবসথ্য নামক যে প্রথম অগ্নি, সেটি প্রজাপতির স্বরূপ। গার্হস্থ্য অগ্নি ব্রহ্মার স্বরূপ ; কারণ ব্রহ্মা থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছে এবং এই

দক্ষিণাগ্নি রুদ্রস্বরূপ। হোমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার মুখে আহুতি প্রদান করা হয়, সেই আহবনীয় অগ্নি স্বয়ং আমি, সভ্য নামক যে পঞ্চ অগ্নি, তা কার্তিকেয় স্বামীর স্বরূপ। পৃথিবী গার্হপত্যাগ্নি, অন্তরীক্ষ দক্ষিণাগ্নি এবং স্বর্গ আহবনীয়াগ্নি। অগ্নির এইরূপ তিন প্রকার ভেদ বলা হয়েছে। গার্হপত্য অগ্নি গোলাকার ; কারণ তার স্বরূপভূতা পৃথিবী গোল। অন্তরীক্ষের আকার অর্ধচন্দ্রের ন্যায়, তাই দক্ষিণাগ্নিকেও সেইরূপ মনে করা হয়। স্বর্গলোক নির্মল, নিরাময় এবং চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, তাই আহবনীয় অগ্নিকেও চতুষ্কোণ বলা হয়। যে ব্যক্তি গার্হপত্য অগ্নিতে যজ্ঞ করে, সে পৃথিবীতে বিজয়ী হয়। দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞকারী ব্যক্তি অন্তরীক্ষ জয় করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত চিত্তে প্রত্যহ আহবনীয় অগ্নিতে যজ্ঞ করে, সে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং ঋষিগণসহ স্বর্গলোকের ওপর বিজয় লাভ করে।

যজ্ঞে সবদিক থেকে অগ্নির মুখে হোম করা হয়, তাই সেই অত্যন্ত কান্তিমান অগ্নি 'আহবনীয়' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। অগ্নিহোত্র অথবা অন্যান্য যজ্ঞে হোমের আরম্ভেই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়, তার জন্যও একে আহবনীয় বলা হয়। যে দ্বিজ আবসথ্য নামক মূল অগ্নিতে বিধিমতো হোম করে, সে তার পত্নীর সঙ্গে সপ্তর্ষিলোকে গমন করে আনন্দ উপভোগ করে এবং সমস্ত অগ্নির প্রিয় হয়। আবসথ্য অগ্নিতে যে হোম করা হয়, তাকে অগ্নিহোত্র বলা হয়। সেটি 'হো' অর্থাৎ দুঃখ থেকে যজমানকে ত্রাণ করে, তাই একে অগ্নিহোত্র বলা হয়। আত্মবেত্তা বিদ্বানেরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই তিন প্রকারের দুঃখ হয় বলে জানিয়েছেন। বিধিবৎ হোম করলে অগ্নি এই তিন প্রকার দুঃখ থেকে সেই ব্যক্তিকে ত্রাণ করে, তাই এই কর্মকে বেদে অগ্নিহোত্র নাম দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাই সর্বপ্রথম অগ্নিহোত্র সৃষ্টি করেছিলেন। বেদ এবং অগ্নিহোত্র স্বত উৎপন্ন হয়েছে—এর অন্য কোনো কর্তা নেই। বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র (অর্থাৎ বেদপাঠ করে যে অগ্নিহোত্র করে না, তার বেদ পাঠ নিষ্ফল)। শাস্ত্রজ্ঞানের ফল শীল এবং সদাচার, স্ত্রীর ফল রতি এবং পুত্র এবং ধনের ফল সাফল্য দান এবং উপভোগ। তিন বেদের মন্ত্রাদির সংযোগে অগ্নিহোত্রের প্রবৃত্তি হয়। ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদের পবিত্র মন্ত্রাদি ও মীমাংসা-সূত্রাদির দ্বারা অগ্নিহোত্র কর্ম প্রতিপাদন করা হয়।

বসন্ত ঋতুকে ব্রাহ্মণের স্বরূপ বলে জানা উচিত এবং তা বেদের যোনিরূপ, তাই ব্রাহ্মণের বসন্ত ঋতুতে অগ্নিস্থাপনা করা উচিত। যে বসন্ত ঋতুতে অগ্ন্যাধান করে, সেই ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তার বৈদিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বসন্ত ঋতুতে অগ্ন্যাধান শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। যে ক্ষত্রিয় গ্রীষ্ম-ঋতুতে অগ্নিস্থাপনা করে, তার সম্পত্তি, প্রজা, পশু, ধন, তেজ, বল ও যশের অভিবৃদ্ধি হয়। শরৎকালের রাত্রি সাক্ষাৎ বৈশ্যের স্বরূপ, তাই বৈশ্যের শরৎ ঋতুতে অগ্নিস্থাপনা করতে হয়, তাহলে তার সম্পত্তি, প্রজা, আয়ু, পশু ও ধন বৃদ্ধি হয়। সর্বপ্রকারের রস, ঘি ইত্যাদি স্নিগ্ধ পদার্থ, সুগন্ধ দ্রব্য, রত্ন, মণি, সুবর্ণ ও লৌহ—এই সব অগ্নিহোত্রের জন্যই উৎপন্ন হয়েছে। অগ্নিহোত্রকে জানার জন্যই আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, মীমাংসা, বিস্তৃত ন্যায়শাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র রচনা করা হয়েছে। ছন্দ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং নিরুক্তও অগ্নিহোত্রের জন্যই উৎপন্ন হয়েছে। অগ্নিহোত্রকে জানার জন্যই আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, মীমাংসা, বিস্তৃত ন্যায়শাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র নির্মাণ করা হয়েছে। ছন্দ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং নিরুক্তও অগ্নিহোত্রের জন্যই রচিত হয়েছে। ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, উপনিষদ এবং অথর্ববেদের কর্মও অগ্নিহোত্রেরই জন্য। তিথি, নক্ষত্র, যোগ, মুহূর্ত এবং করণরূপ কালের জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য পূর্বকালে জ্যোতিষশাস্ত্র নির্মিত হয়েছিল। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদের মন্ত্রাদির ছন্দের জ্ঞান লাভ করার জন্য ও সংশয় এবং বিকল্পের নিরাকরণপূর্বক তার তাত্ত্বিক অর্থ বোঝার জন্য ছন্দঃশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। বর্ণ, অক্ষর এবং পদের অর্থ, সন্ধি ও লিঙ্গের এবং নাম ও ধাতুর বিবেক জাগ্রত করার জন্য পূর্বকালে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের প্রণয়ন হয়েছিল। যূপ, বেদী এবং যজ্ঞের স্বরূপ জানার জন্য, প্রোক্ষণ, শ্রপণ (চরু তৈরি) ইত্যাদি ইতি কর্তব্য বোঝার জন্য এবং যজ্ঞ ও দেবতার সম্বন্ধে লাভ প্রাপ্ত করার জন্য শিক্ষা নামক বেদাঙ্গ রচনা করা হয়েছিল। যজ্ঞপাত্রাদির শুদ্ধি, যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সামগ্রী সমূহের সংগ্রহ এবং সমস্ত যজ্ঞের বৈকল্পিক বিধানের জ্ঞান লাভ করার জন্য কল্পের নির্মাণ হয়েছে। সমস্ত বেদে প্রযুক্ত নাম, ধাতু এবং বিকল্পাদির তাত্ত্বিক অর্থ স্থির করার জন্য ঋষিগণ নিরুক্তের রচনা করেছিলেন। যজ্ঞের বেদী নির্মাণ এবং অন্য সামগ্রী ধারণ করার জন্য ব্রহ্মা পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন। সমিধ এবং যূপ তৈরির

জন্য বনস্পতি সৃষ্টি করেছেন। যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রাদির বিনিয়োগ, যজ্ঞীয় পদার্থের প্রোক্ষণ, চরু তৈরি, দর্শ এবং পৌর্ণমাসের অঙ্গভূত অনুযাজ এবং প্রযাজ, বায়ুদেবতার স্তব, সামবেদের উদ্গাতার কর্ম, প্রতিপ্রস্থাতার কর্ম, দক্ষিণা, অবভৃতস্নান, ত্রিকালপূজা, উচিত স্থানে দেবতাদের নৈবেদ্য অর্পণ করা, দেবতাদের আবাহন, বিসর্জন এবং হবিষ্য তৈয়ারি ইত্যাদি কর্ম জানে না, সে অন্ধকারময় ভীষণ রৌরব নরকে পতিত হয়।

স্বর্ণ এবং রৌপ্য—এগুলি যজ্ঞের পাত্র, কলস ইত্যাদির জন্য সৃষ্ট হয়েছে। কুশের উৎপত্তি হয়েছে যজ্ঞকুণ্ডের চারদিকে রাখার জন্য এবং রাক্ষসদের হাত থেকে যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য। যজ্ঞ এবং পূজার কার্য করার জন্য ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে। ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করা হয়েছে সকলকে রক্ষার জন্য। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদির জীবিকার সাধন তৈরি করার জন্য বৈশ্যের উৎপত্তি। তিন বর্ণের মানুষের সেবার জন্য ব্রহ্মা শূদ্র জাতিকে সৃষ্টি করেন। সমস্ত জগৎ এইভাবে অগ্নিহোত্রের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তি অন্ধকারে আচ্ছাদিত হওয়ায় এই কথা জানে না, সে রৌরব নামক ভয়ানক নরকে পতিত হয় এবং সেখানে পাপ ক্ষয় হলে কীটজন্ম প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র পালন করেন, তাঁর দ্বারা দান, হোম, যজ্ঞ এবং অধ্যাপন—সমস্ত কর্মই পূর্ণ হয়ে যায়। এইরূপ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অন্য যেসব কার্য হয়, সেইসব পুণ্য নিয়ে আমি সূর্যমণ্ডলে স্থাপন করি। আমার দ্বারা স্থাপিত সংসারের পুণ্য এবং অগ্নিহোত্রাদির সুকৃতি সূর্যদেব ধারণ করেন। অগ্নিহোত্রী পুরুষ স্বর্গে গিয়ে অগ্নিহোত্রের পুণ্যফল উপভোগ করেন এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত তিনি দেবতাদের ন্যায় সেখানেই বাস করেন। কপটতাপূর্বক বীরদের যে হত্যা করে সেই দুরাচারী মানুষ দরিদ্র, অঙ্গহীন এবং রুগ্ন হয়ে শূদ্রজন্ম প্রাপ্ত হয় (যারা অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, তাদেরও এই গতি হয়)। তাই যেসব দ্বিজ দূর-দেশে বাস করে না এবং ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করতে চায়, তাদের প্রত্যহ বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করা উচিত। অগ্নিহোত্রকে নিজের আত্মার সমান মনে করে তাকে কখনো অপমান বা ত্যাগ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি বাল্যকাল থেকে অগ্নিহোত্র পালন করে এবং শূদ্রান্ন থেকে দূরে থাকে, যার ওপর ক্রোধ বা লোভের প্রভাব পড়ে না, যে প্রত্যহ প্রভাতে স্নানের পর জিতেন্দ্রিয়ভাবে বিধিবৎ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করে, অতিথি সেবায় ব্যাপৃত থাকে এবং শান্তভাবে দিনে দুবার আমার ধ্যান করে, সে সূর্যমণ্ডল ভেদ করে আমার পরমধাম লাভ করে, সেখান থেকে তার পুনরাগমন হয় না। সে প্রভাত সূর্যের ন্যায় বিমানে বসে স্ত্রীসহ আমার লোকে গমন করে বালসূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়ে ইচ্ছামতো রূপধারণ করে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে। তারা ঈশ্বরীয় গুণসম্পন্ন হয়ে ইচ্ছামতো ক্রীড়া করে। পাণ্ডুনন্দন ! অগ্নিহোত্রীদের এমনই বিভূতি। জগতে কিছু মূর্খ শ্রুতিতে দোষারোপ করে তার নিন্দা করে এবং তাকে প্রমাণভূত বলে মানে না, তাদের অত্যন্ত দুর্গতি হয়। কিন্তু যে দ্বিজ আস্তিক্য বুদ্ধিতে বেদ ও ইতিহাসকে প্রামাণিক বলে মানে, সে দেবতার সাযুজ্য লাভ করে।

চান্দ্রায়ণ-ব্রতের বিধি, তা করার নিমিত্ত এবং মহিমার বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—গরুড়ধ্বজ ! এবার আপনি আমাকে চান্দ্রায়ণের পরম পবিত্র বিধির বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! সকল পাপনাশকারী চান্দ্রায়ণ ব্রতের যথার্থ বর্ণনা শোনো। এর আচরণ দ্বারা পাপী মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায়। উত্তম ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য—যে কেউই চান্দ্রায়ণ-ব্রত বিধিমতো পালন করতে চায়, তার প্রথম কাজ হল, নিয়মে থেকে পঞ্চগব্যের দ্বারা সমস্ত দেহ শোধন করা। পরে কৃষ্ণপক্ষ শেষ হলে দাড়ি-গোঁফসহ মস্তক মুণ্ডন করা। তারপর স্নান করে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করে, কোমরে মেখলা বেঁধে পলাশের দণ্ড নিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে থাকা। দ্বিজের উচিত প্রথম দিন উপবাস করে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে নদী সঙ্গমে, কোনো পবিত্র স্থানে বা গৃহেই ব্রত আরম্ভ করা। প্রথমে নিত্য নিয়ম শেষ করে একটি বেদীর ওপর অগ্নিস্থাপন করে তাতে ক্রমশ আঘার, আজ্যভাগ, প্রণব, মহাব্যাহৃতি এবং পঞ্চবারুণ হোম করে সত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মর্ষিগণ, ব্রহ্মা, বিশ্বদেব এবং প্রজাপতি—এই ছয় দেবতার জন্য হোম করা। শেষে প্রায়শ্চিত্ত হোম করে যজ্ঞ কার্য সমাপ্ত করবে। পরে শান্তি ও পৌষ্টিক কর্মের অনুষ্ঠান করে অগ্নি ও সোমদেবকে প্রণাম করবে এবং যথানিয়মে শরীর

ভস্মাচ্ছাদিত করে নদীতীরে গিয়ে বিশুদ্ধ চিত্তে সোম, বরুণ ও আদিত্যকে প্রণাম করে একাগ্রভাবে জলে স্নান করবে। তারপর আচমন করে পূর্বাভিমুখ হয়ে বসবে এবং প্রাণায়াম করে কুশের দ্বারা শরীর মার্জনা করবে। পরে আচমন করে দুবাহু তুলে সূর্য দর্শন করে, হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করবে। সেই সময় নারায়ণ, রুদ্র, ব্রহ্মা অথবা বরুণ সম্বন্ধীয় সূক্ত পাঠ করবে অথবা বীরঘ্ন, ঋষভ, অঘমর্ষণ, গায়ত্রী বা আমার সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করবে। এই জপ শত বার, একশো আট বার বা এক হাজার বার করা উচিত। তারপর পবিত্র এবং একাগ্র চিত্ত হয়ে মধ্যাহ্নে ক্ষীর বা যবের পায়েস তৈরি করবে। পরে সাত ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা চাইবে, সাত জনের বেশি কারো গৃহে ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করবে না, মৌন থাকবে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবে। ভিক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি হাসবে না, এদিক-ওদিক তাকাবে না এবং কোনো নারীর সঙ্গে কথা বলবে না। যদি মল, মূত্র, চণ্ডাল, রজস্বলা নারী, পতিত ব্যক্তি কিংবা কুকুর দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সূর্য দর্শন করবে।

তারপর নিজ গৃহে এসে ভিক্ষাপাত্র রেখে হাত-পা ভালো করে ধোবে। পরে জল দিয়ে আচমন করে অগ্নি ও ব্রাহ্মণের পূজা করবে। এরপর সেই ভিক্ষাপ্রাপ্ত দ্রব্য পাঁচ বা সাত ভাগ করে তাতে পিণ্ড প্রস্তুত করবে। তার থেকে এক একটি পিণ্ড ক্রমশ সূর্য, ব্রহ্মা, অগ্নি, সোম, বরুণ ও বিশ্বদেবকে নিবেদন করবে, শেষে যে পিণ্ডটি থাকবে সেটি যাতে সহজে মুখে যায়, তেমন করে তৈরি করবে। তারপর পবিত্রভাবে পূর্বমুখ হয়ে সেই পিণ্ডে ডানহাতের আঙুল রেখে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে তিন আঙুলের দ্বারা মুখে পুরতে হবে। চন্দ্রের কলা যেমন শুক্লপক্ষে প্রত্যহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনই পিণ্ডের মাত্রাও শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ হবে[1]। চান্দ্রায়ণ ব্রতধারীদের প্রত্যহ তিন-বার, দু-বার বা এক বার স্নান করার বিধান আছে। তাকে সর্বদা ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে। দিনে এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে না, রাত্রে বীরাসনে বসবে অথবা বেদী বা বৃক্ষমূলে শয়ন করবে। বল্কল, রেশম, সন বা সুতীবস্ত্র পরবে। এইভাবে একমাস পর চান্দ্রায়ণ-ব্রত পূর্ণ হলে, আয়োজন করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে এবং তাঁদের দক্ষিণা দেবে। চান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণে মানুষের সমস্ত পাপ অগ্নিতে শুষ্ক কাঠের ন্যায় একমুহূর্তে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্বর্ণের চুরি, ভ্রূণহত্যা, মদ্যপান ও গুরু-পত্নী-গমন ইত্যাদি সব পাপ চান্দ্রায়ণব্রতে নষ্ট হয়ে যায়। যে গাভীর বৎস হওয়ার দশ দিন পার হয়নি, তার দুধ বা তেমনই ভেড়ার দুধ পান করলে এবং মরণাশৌচ বা জননাশৌচের অন্ন অথবা পতিতের অন্ন এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট আহার করলে চান্দ্রায়ণ-ব্রত পালন করা উচিত। বৃক্ষে ঝুলে থাকা ফল, হাতে রাখা, নীচে পড়ে থাকা এবং অন্যের হাতের থেকে অন্ন গ্রহণ করলেও চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করা আবশ্যক হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ করা এবং অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন, পূজারির অন্ন এবং পুরোহিতের অন্ন-গ্রহণ করলেও চান্দ্রায়ণ-ব্রত করা উচিত। মদিরা, আমক, ঘি, লাক্ষা, লবণ ও তেল বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণেরও চান্দ্রায়ণ ব্রত করা আবশ্যক। যে দ্বিজ জনতার মধ্যে বা ভাঙা বাসনে খায়, যে উপনয়ন-সংস্কার রহিত বালক, কন্যা এবং স্ত্রীর সঙ্গে একই পাত্রে আহার করে এবং যে মোহবশত নিজ উচ্ছিষ্ট অন্যকে দেয়, সেই ব্রাহ্মণেরও চান্দ্রায়ণ-ব্রত করা উচিত। দ্বিজ যদি গাজর, পিঁয়াজ, রসুন, বাসি অন্ন, অন্যের গৃহে রাঁধা আহার সামগ্রী বা রজস্বলা নারী, কুকুর ও চণ্ডালের দ্বারা দেখা অন্ন খায়, তাহলে তার চান্দ্রায়ণ-ব্রত করা অনিবার্য হয়। পূর্বকালে ঋষিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এই ব্রত পালন করতেন, এটি সমস্ত প্রাণীর পবিত্রকারী ও পুণ্যরূপ। যে দ্বিজ এই পরম গোপনীয়, পবিত্র, পাপনাশক ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে পবিত্রাত্মা এবং নির্মল সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়ে স্বর্গলোক লাভ করে।

---

[1]অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক পিণ্ড, দ্বিতীয়াতে দুই পিণ্ড আহার করা উচিত। তেমনই পূর্ণিমাতে পনেরো গ্রাস আহার করে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত প্রত্যহ এক এক গ্রাস কম করা উচিত। অমাবস্যার উপবাস করার পর এই ব্রত সমাপ্ত হয়। এটি এক প্রকারের চান্দ্রায়ণ। স্মৃতিগুলিতে আরও অনেক প্রকার চান্দ্রায়ণ-ব্রতের বর্ণনা আছে।

সর্বহিতকারী ধর্মের বর্ণনা, দ্বাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবেশ ! আপনি এবার আমাকে সমস্ত প্রাণীর হিতকারক ধর্মের বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—যুধিষ্ঠির ! যে ধর্ম দরিদ্র মানুষেরও স্বর্গ ও সুখ প্রদানকারী এবং সমস্ত পাপনাশক, তার বর্ণনা করছি, শোনো। যে মানুষ এক বছর ধরে প্রত্যহ একবার আহার করে, ব্রহ্মচারী থাকে, ক্রোধকে বশে রাখে, মাটিতে শয়ন করে এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখে ; যে স্নান করে পবিত্র থাকে, ব্যগ্র হয় না, সত্যভাষণ করে, কারো দোষ দেখে না এবং আমাতে চিত্ত একাগ্র করে সর্বদা আমার পূজায় নিমগ্ন থাকে ; যে উভয় সন্ধ্যাকালে একাগ্র চিত্তে আমার সঙ্গে সম্বন্ধিত গায়ত্রী জপ করে, **'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'** বলে সর্বদা আমাকে প্রণাম করে, ব্রাহ্মণদের আহার করাবার পরে নিজে মৌন হয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন করে এবং **'নমোঽস্তু বাসুদেবায়'** বলে ব্রাহ্মণদের চরণে প্রণাম করে ; যে প্রত্যেক মাসের শেষে পবিত্র ব্রাহ্মণদের আহার করায় এবং এক বছর ধরে এই নিয়ম পালন করে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণারূপে মাখন অথবা তিলের গাভী দান করে, ব্রাহ্মণের হাত থেকে স্বর্ণযুক্ত জল নিয়ে নিজ শরীরে ছেটায়, তার জেনে অথবা না জেনে করা দশ জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এ কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন—প্রভু ! সর্বপ্রকার উপবাসের মধ্যে যা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহান ফলদাতা এবং কল্যাণের সর্বোত্তম সাধন, কৃপা করে তার বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে ব্রত আমারও অত্যন্ত প্রিয়, তার বর্ণনা করছি, শোনো। যে ব্যক্তি স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে পঞ্চমীর দিন ভক্তিপূর্বক উপবাস করে এবং তিন সন্ধ্যা আমার পূজায় সংলগ্ন থাকে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করে আমার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা—এই দুটি পর্ব, দুটি পক্ষের দ্বাদশী এবং শ্রবণ নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী—এই পাঁচটি তিথিকে আমার পঞ্চমী বলা হয়। এগুলি আমার বিশেষ প্রিয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উচিত যে তাঁরা আমার প্রিয় কাজ করার জন্য আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এই তিথিগুলিতে যেন উপবাস করেন। যাঁরা সবগুলিতে উপবাস করতে না পারেন, তাঁরা শুধু দ্বাদশীতেই যেন উপবাস করেন ; এতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হই। যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে দিন-রাত উপবাস করে 'কেশব' নামে আমার পূজা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। যিনি পৌষ মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করে 'নারায়ণ' নামে আমার পূজা করেন, তিনি বাজিমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি মাঘের দ্বাদশীতে উপবাস করে 'মাধব' নামে আমার পূজা করেন, তিনি রাজসূয় যজ্ঞের ফল পান। ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করে যিনি 'গোবিন্দ' নামে আমার অর্চনা করেন, তিনি অতিরাত্র যাগের ফল প্রাপ্ত হন। চৈত্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে ব্রত ধারণ করে যিনি 'বিষ্ণু' নামে আমার পূজা করেন, তিনি পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফলভাগী হন। বৈশাখের দ্বাদশীতে উপবাস করে 'মধুসূদন' নামে আমার পূজা করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করে 'ত্রিবিক্রম' নামে আমার পূজা করেন, তিনি গোমেধ ফলের ভাগী হন। আষাঢ়-মাসের দ্বাদশীতে ব্রত রেখে 'বামন' নামে আমার পূজনকারী ব্যক্তি নরমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। শ্রাবণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করে যিনি 'শ্রীধর' নামে আমার পূজা করেন, তিনি পঞ্চ-যজ্ঞের ফল পান। ভাদ্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করে 'হৃষীকেশ' নামে আমার অর্চনাকারী সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। আশ্বিনের দ্বাদশীতে উপবাস করে যিনি 'পদ্মনাভ' নামে আমার অর্চনা করেন, তিনি এক সহস্র গো-দানের ফল লাভ করেন। কার্তিক মাসের দ্বাদশী তিথিতে ব্রত রেখে যিনি 'দামোদর' নামে আমার পূজা করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন। যিনি দ্বাদশীতে শুধুমাত্র উপবাস করেন, তিনি পূর্বোক্ত ফলের অর্ধেক প্রাপ্ত করেন। উপরিউক্তভাবে প্রতিমাসে আলস্য ত্যাগ করে আমার পূজা করতে করতে এক বৎসর পূর্ণ হলে পুনরায় দ্বিতীয় বৎসরেও মাসের পূজা আরম্ভ করবে। এইভাবে তৎপরতার সঙ্গে যে ভক্ত বিনা বাধায় আমার আরাধনায় তৎপর থাকে, সে আমার স্বরূপ লাভ করে। যে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথিতে প্রেমপূর্বক আমার এবং বেদসংহিতার পূজা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত ফল লাভ করেন। যিনি দ্বাদশী তিথিতে আমাকে চন্দন, পুষ্প, ফল, জল, পত্র বা মূল অর্পণ করেন, তার মতো

প্রিয়ভক্ত আমার আর কেউ নয়। যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা উপরিউক্ত বিধিতে আমার ভজনা করায় আজ স্বর্গীয় সুখ ভোগ করছেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করায় রাজা যুধিষ্ঠির করজোড়ে ভক্তিসহকারে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'হৃষীকেশ ! আপনি সম্পূর্ণ জগতের প্রভু এবং দেবতাদেরও ঈশ্বর, আপনাকে প্রণাম। সহস্র সহস্র নেত্র ধারণকারী পরমেশ্বর ! আপনার সহস্র সহস্র মস্তক, আপনাকে আমি প্রণাম করি। বেদত্রয় আপনার স্বরূপ, তিন বেদের আপনি অধীশ্বর, বেদত্রয়ের দ্বারা আপনারই স্তুতি করা হয়েছে ; আপনাকে বারংবার প্রণাম। আপনি চতুর্বাহুধারী, বিশ্বরূপ, জগতের অধীশ্বর এবং সমস্ত জগতের আবাসস্থল, আপনাকে প্রণাম। নরসিংহ ! আপনিই এই জগতের সৃষ্টি এবং সংহারকারী, আপনাকে নমস্কার। ভক্তদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকে বারংবার প্রণাম। ভক্তবৎসল ! আপনি সমস্ত জগৎ চরাচর ও যোগীদের প্রিয়, যোগিগণের স্বামী। আপনিই হয়গ্রীব অবতার রূপ ধারণ করেছিলেন। চক্রপাণে ! আপনাকে বারংবার প্রণাম জানাই।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন ভক্তিগদগদ হয়ে ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন তখন ভগবান প্রসন্ন হয়ে ধর্মরাজের হাত ধরে তাঁকে বাধাপ্রদান করে বললেন—'রাজন্ ! এ কী ? তুমি কেন আমার স্তুতি করছ ? এসব বন্ধ করে আগের মতোই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে কীভাবে আপনার পূজা করা উচিত ? এই ধর্মযুক্ত বিষয় বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমি আগের মতোই তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, শোনো ! কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে আমার পূজা করলে বহু বড় ফল লাভ হয়। একাদশীতে উপবাস করে দ্বাদশীতে আমার পূজা করা উচিত। সেই দিন ভক্তিযুক্ত চিত্তে ব্রাহ্মণদেরও পূজা করা উচিত। এরূপ করলে মানুষ দক্ষিণামূর্তিকে অথবা আমাকে প্রাপ্ত করে।

বিষুব যোগ এবং গ্রহণ ইত্যাদিতে দানের মহিমা, অশ্বত্থ বৃক্ষের মহত্ত্ব, তীর্থের গুণাদির প্রশংসা ও উত্তম প্রায়শ্চিত্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ দেওয়ায় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় দানের সময় এবং তার বিশেষ বিধি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন—মাধব ! বিষুব যোগে ও সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণের সময় দান করলে কী ফল পাওয়া যায়, কৃপা করে তা বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! বিষুবযোগে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় এবং ব্যতীপাত যোগে যে দান করা হয়, তা অক্ষয়ফল প্রদানকারী হয় ; সেই বিষয়ে বর্ণনা করছি, শোনো। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যভাগে যখন রাত ও দিন সমান হয়, তাকে 'বিষুব যোগ' বলা হয়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমি, ব্রহ্মা এবং মহাদেব ক্রিয়া, করণ এবং কার্যাদির ঐক্য বিচার করার জন্য একবার একত্রিত হই। যে মুহূর্তে আমরা মিলিত হই, তা পরম পবিত্র এবং বিষুবপর্ব নামে প্রসিদ্ধ ; তাকে অক্ষরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মও বলা হয়। সেই মুহূর্তে সকলেই পরম পদের চিন্তা করে। দেবতা, বসু, রুদ্র, পিতৃপুরুষ, অশ্বিনীকুমার, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, সোম ইত্যাদি গ্রহ, নদী, সমুদ্র, মরুৎ, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যক—এরা এবং অন্য দেবতাও বিষুবপর্বে ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক উপবাস করেন এবং যত্নপূর্বক পরমাত্মার ধ্যানে ব্যাপৃত থাকেন। তাই যুধিষ্ঠির ! তুমি অন্ন, গাভী, তিল, ভূমি, কন্যা, ঘর, বিশ্রামস্থান, ধন, বাহন, শয্যা এবং আরও যেসব বস্তু দানের যোগ্য বলা হয়েছে, সেসব বিষুবপর্বে দান করো। সেই সময় বিশেষভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের যে দান করা হয়, তা কখনোই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে পেতে কোটি গুণ হয়ে ওঠে।

আকাশে যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়, সেই সময় যে ব্যক্তি আমার অথবা ভগবান শংকরের নিমিত্ত গায়ত্রী জপ করেন এবং ভক্তি সহকারে শঙ্খ বা অন্য বাদ্যযন্ত্র বাজান, তাঁর পুণ্যফলের বর্ণনা শোনো। আমার সামনে স্তুতি, হোম,

জপ করলে বা আমার উত্তম নাম জপ করলে রাহু দুর্বল এবং চন্দ্র বলবান হয়। সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণের সময় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের যে দান করা হয়, তা হাজার গুণ হয়ে দাতার কাছে ফিরে আসে। মহাপাতক মানুষও সেই দানের দ্বারা তৎক্ষণাৎ পাপরহিত হয় এবং সুন্দর বিমানে করে চন্দ্রলোকে গমন করে, সেখানে যতদিন চাঁদ-তারা বিরাজমান থাকে ততদিন সম্মানের সঙ্গে চন্দ্রলোকে নিবাস করে। সময় শেষে জগতে এসে সে বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শী বিদ্বানরূপে জন্মলাভ করে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ ! আপনার নিমিত্ত গায়ত্রী জপ কীভাবে করা যায় এবং তার কী ফল হয়—কৃপা করে বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! দ্বাদশী তিথিতে, বিষুব পর্বে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের আরম্ভের দিন, শ্রবণ নক্ষত্রে ও ব্যতীপাত যোগে পীপলের ও আমার দর্শন হলে আমার গায়ত্রী অথবা অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) জপ করা উচিত। তাহলে মানুষের পূর্বার্জিত সমস্ত পাপ নিঃসন্দেহে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেব ! এবার বলুন অশ্বত্থ দর্শন আপনার দর্শনের সমান বলে কেন মানা হয় ; আমি তা শোনার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমিই অশ্বত্থ বৃক্ষরূপে ত্রিলোক পালন করি। যেখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ নেই, সেখানে আমার বাস নেই। যেখানে আমি থাকি, সেখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা করে, তার দ্বারা আমার পূজা হয় এবং যে ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থকে প্রহার করে, সে বাস্তবে আমাকেই প্রহারের লক্ষ্য করে। তাই অশ্বত্থকে সর্বদা প্রদক্ষিণ করা উচিত, তাকে কেটে ফেলা উচিত নয়। ব্রতপালন, সরলতা, দেবতাদের সেবা, গুরু শুশ্রূষা, পিতামাতার সেবা, নিজ পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখা, গৃহস্থ ধর্ম পালন করা, অতিথি সেবায় ব্যাপৃত থাকা, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য পালন, আহ্বানীয় তিন প্রকার অগ্নি—এগুলি সব পরম পবিত্র সনাতন তীর্থ। এই সবের মূল ধর্ম—এরূপ জেনে এগুলিতে মন নিবিষ্ট করবে এবং তীর্থভ্রমণ করবে। কারণ ধর্ম করলে ধর্মের বৃদ্ধি হয়। তীর্থ দুই প্রকারের—স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর তীর্থের থেকে জঙ্গম তীর্থ শ্রেষ্ঠ ; কারণ তাতে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। ইহলোকে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির হৃদয়ে সব তীর্থ বাস করে, তাই তাঁকে তীর্থস্বরূপ বলা হয়। গুরুরূপী তীর্থের দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হয়, তাই তার থেকে বড় কোনো তীর্থ নেই। জ্ঞানতীর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ব্রহ্মতীর্থ সনাতন।

পাণ্ডুনন্দন ! সকল তীর্থের মধ্যে ক্ষমা সবচেয়ে বড় তীর্থ। ক্ষমাশীল মানুষের ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ হয়। কেউ মান দিক অথবা অপমান, পূজা করুক বা অসম্মান, গালি দিক বা অহংকার দেখাক, এই সকল অবস্থায় যে ক্ষমাশীল হয়ে থাকে, তাকে তীর্থ বলে। ক্ষমাই যশ, দান, যজ্ঞ এবং মনোনিগ্রহ। অহিংসা, ধর্ম, ইন্দ্রিয় সংযম এবং দয়াও ক্ষমারই স্বরূপ। ক্ষমার ওপরেই সমস্ত জগৎ বিরাজমান ; সুতরাং যে ব্রাহ্মণ ক্ষমাশীল, তাঁকে দেবতা বলা হয়, তিনি সবথেকে শ্রেষ্ঠ। ক্ষমাশীল ব্যক্তি স্বর্গ, যশ ও মোক্ষলাভ করেন ; তাই ক্ষমাশীল মানুষকে সাধু বলা হয়। রাজন্ ! আত্মারূপ নদী পরম পবিত্র তীর্থ, তা সব তীর্থের প্রধান। আত্মাকে সর্বদা যজ্ঞরূপ বলে মানা হয়। স্বর্গ, মোক্ষ—সবই আত্মার অধীন। যে ব্যক্তি সদাচার পালন করে অত্যন্ত নির্মল হয়ে গেছে এবং সত্য ও ক্ষমার দ্বারা যার মধ্যে অতুলনীয় শীতলতা এসেছে—এরূপ জ্ঞানরূপ জলে প্রতিনিয়ত স্নানকারী ব্যক্তির অন্য তীর্থের কী প্রয়োজন ?

যুধিষ্ঠির বললেন—হৃষিকেশ ! এখন আমাকে এমন কোনো প্রায়শ্চিত্তের কথা বলুন, যা করা সহজ এবং যা সমস্ত পাপ বিনাশক।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছি। অধর্মে রুচি রাখা মানুষেরা একথা শোনার যোগ্য নয়। কোনো পবিত্র ব্রাহ্মণকে সামনে দেখলে সহসা আমাকে স্মরণ করবে এবং 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়' বলে ভগবৎ বুদ্ধিতে তাঁকে প্রণাম করবে। তারপর অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে ব্রাহ্মণ দেবতাকে পরিক্রমা করবে, এরূপ করলে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হন এবং আমি সেই প্রণামকারী মানুষের সমস্ত পাপ বিনাশ করি। যে ব্যক্তি সূর্যগ্রহণের সময় পূর্ববাহিনী নদীর তীরে গিয়ে আমার মন্দিরের কাছে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের জলে অথবা কপিলা গাভীর শিংয়ের স্পর্শ করা জলে একবার স্নান করে, তার সমস্ত সঞ্চিত পাপ এক মুহূর্তে বিনাশ হয়। যে পূর্ণিমায় উপবাস করে পঞ্চগব্য পান করে, তারও সমস্ত পাপ বিনাশ হয়। এখন আমি ব্রহ্মকূর্চ এবং তার পাত্রের বর্ণনা করছি, শোনো। পলাশ বা পদ্মপত্রে অথবা তাম্র বা স্বর্ণপাত্রে

ব্রহ্মকূর্চ রেখে পান করা উচিত। এগুলিই উপযুক্ত পাত্র। (ব্রহ্মকূর্চের বিধি হল—) গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে গোমূত্র **'গন্ধদ্বারাং'** ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গোবর, **'অপ্যায়স্ব'** এই মন্ত্রে গোদুগ্ধ, **'দধিক্রাব্নঃ'** এই মন্ত্রে দধি, **'তেজোঽসি শুক্রম্'** এই মন্ত্রে ঘি, **'দেবস্য ত্বা'** ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশের জল এবং **'আপো হি ষ্ঠা ময়ো'** এই ঋচার দ্বারা যবের আটা নিয়ে সবকিছু মিশিয়ে দেবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যথাবিহিত হোম করে প্রণব উচ্চারণ পূর্বক উপরিউক্ত বস্তুগুলি আলোড়ন ও মন্থন করবে। পরে প্রণব উচ্চারণ করে সেগুলি পাত্র থেকে হাতে নেবে এবং প্রণব পাঠ করতে করতে পান করবে। এই ভাবে ব্রহ্মকূর্চ পান করলে মানুষ অতি বড় পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি জলের মধ্যে বসে অথবা সূর্যের দিকে দৃষ্টি রেখে **'ভদ্রং নঃ'** এই মন্ত্রের একটি চরণ বা ঋক্‌সংহিতা পাঠ করে, তার সর্বপাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে প্রতিদিন আমার সূক্ত (পুরুষসূক্ত) পাঠ করে, সে জলে নির্লিপ্ত পদ্ম পাত্রের ন্যায় কখনো পাপে লিপ্ত হয় না।

—○—

উত্তম এবং অধম ব্রাহ্মণের লক্ষণ ; ভক্ত, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং অশ্বত্থের মহিমা ও ব্রাহ্মণত্ব থেকে পতনকারক কর্ম

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! যাঁদের ভাব শুদ্ধ, সেই পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ কেমন হয়ে থাকেন, ব্রাহ্মণদের নিজ কর্মে সাফল্য না পাওয়ার কারণ কী—কৃপা করে আমাকে বলুন।

ভগবান বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! ব্রাহ্মণদের কর্ম কেন সফল হয় এবং কেন নিষ্ফল—এই সব বিষয় আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে বলছি, শোনো ! যদি হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ না হয়, তাহলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌন অবলম্বন, জটাধারণ, মস্তক মুণ্ডন, বল্কল বা মৃগচর্ম পরিধান, ব্রত পালন, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, গৃহস্থ-ধর্মপালন, স্বাধ্যায়ে সংলগ্ন থাকা, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা—এই সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল, দমপালনকারী, ক্রোধরহিত, মন ও ইন্দ্রিয় বশে রাখেন, তাঁকেই আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে মনে করি। এই সকল গুণ ছাড়া যারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত, তাদের শূদ্র বলে মানা হয়। যাঁরা অগ্নিহোত্র, ব্রত এবং স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন, পবিত্র, উপবাসকারী এবং জিতেন্দ্রিয়, সেই পুরুষদেরই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলে মানেন। শুধু জাতির দ্বারা কারোর পূজা করা হয় না, উত্তম গুণই কল্যাণকারী হয়। মনঃশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি, কুলশুদ্ধি, শরীরশুদ্ধি এবং বাক্‌শুদ্ধি—এই পাঁচ প্রকারের শুদ্ধি বলা হয়েছে। এই পাঁচ শুদ্ধির মধ্যে হৃদয়ের শুদ্ধি সবথেকে শ্রেষ্ঠ। হৃদয়ের শুদ্ধির দ্বারাই মানুষ স্বর্গে যেতে পারে। যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করে ক্রয়-বিক্রয়ে মনোনিবেশ করে তাকে বর্ণসংকার প্রচারকারী শূদ্রের সমকক্ষ বলে মানা হয়। যে ব্যক্তি বৈদিক শ্রুতি পরিত্যাগ করেছে, যে জমি চাষ করে এবং নিজ বর্ণের বিরুদ্ধ কাজ করে, সেই ব্রাহ্মণকে বৃষল বলা হয়। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম ; তাকে যে লয় করে, দেবতারা তাকে বৃষল বলে মানেন। সে চণ্ডালের থেকেও নীচ হয়। যে পাপাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মগীতা ইত্যাদি দ্বারা আমার স্তুতি না করে কোনো শূদ্রের স্তব করে, সে চণ্ডালের সমান। কুকুরের স্পর্শ করা হবিষ্য যেমন অশুদ্ধ হয়, তেমনই বৃষল মানুষের বুদ্ধিতে স্থিত বেদও দূষিত হয়ে যায়। চার বেদ, ছয় অঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ—এই হল চোদ্দ প্রকারের বিদ্যা। ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য এগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং শূদ্রদের তা স্পর্শ করা উচিত নয়। শূদ্রের সংস্পর্শে এলে সব বস্তুই অপবিত্র হয়ে যায়। এই জগতে তিন অপবিত্র এবং পাঁচ অভেদ্য বস্তু আছে। কুকুর, শূদ্র, চণ্ডাল—এই তিনটি অপবিত্র এবং অশ্লীল গায়ক , মুরগি বধ করার জন্য পশুদের যাতে বাঁধা হয় সেই খুঁটি, রজস্বলা নারী, বৃষল জাতির স্ত্রীকে বিবাহকারী দ্বিজ—এই পাঁচটিকে অভেদ্য মানা হয়, এগুলিকে কখনো স্পর্শ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ এই আটজনের মধ্যে কাউকে স্পর্শ করলে বস্ত্রসহ জলে নেমে স্নান করে নেবেন। যে ব্যক্তি আমার ভক্তদের শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করায় অপমান করে সে কোটি বৎসর নরকে বাস করে ; সুতরাং চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাকে অপমান করা উচিত নয়। অপমান করলে অপমানকারী রৌরব নরক প্রাপ্ত হয়। যে

ব্যক্তি আমার ভক্তদের ভক্ত হয়, তাদের ওপর আমার বিশেষ প্রীতি থাকে। তাই আমার ভক্তের ভক্তদের বিশেষভাবে সম্মান করা উচিত। আমাতে চিত্ত মগ্ন হলে পশুপক্ষীও উর্ধ্বগতি লাভ করে, জ্ঞানীদের তো কথাই নেই। শূদ্র যদি আমার ভক্ত হয়ে পত্র-পুষ্প-ফল-জল অর্পণ করে তবে আমি তা মস্তকে ধারণ করি। যে ব্রাহ্মণ সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান আমার এই পরমেশ্বর রূপকে বেদোক্ত রীতিতে পূজা করেন, তিনি আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির ! আমি আমার ভক্তদের হিতার্থেই অবতাররূপ ধারণ করি, সুতরাং আমার প্রত্যেক অবতার-বিগ্রহের পূজা করা উচিত। যে ব্যক্তি আমার অবতার-মূর্তির কোনো একটিরও ভক্তিভাবে আরাধনা করেন, আমি নিঃসন্দেহে তাঁর ওপর প্রসন্ন হই। ক্রমশ মাটি, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, মণি বা রত্নের মূর্তি তৈরি করে আমার পূজা করা উচিত। এইরূপ মূর্তি পূজাকে দশগুণ অধিক পুণ্য বলে জানবে। যদি ব্রাহ্মণের বিদ্যার, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধজয়ের, বৈশ্যের অর্থের এবং শূদ্রের সুখরূপ ফল ও নারীগণের সর্বপ্রকার কামনা থাকে, তাহলে আমার আরাধনার দ্বারা এদের সর্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! আপনি কীরূপ শূদ্রের পূজা গ্রহণ করেন না ?

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে ব্রতপালনকারী অথচ আমার ভক্ত নয়, সেই শূদ্রকৃত পূজা আমি গ্রহণ করি না। গো, ব্রাহ্মণ, অশ্বত্থ বৃক্ষ—এই তিনটি দেবরূপ ; এগুলিকে আমার ও ভগবান শংকরের স্বরূপ বলে জানবে। আমার ভক্তরা এই তিনটিকে কখনো অপমান করবে না, কারণ এরা মানুষের সাতপুরুষকে নরকে প্রেরণ করে। যুধিষ্ঠির ! আমার স্বরূপ হওয়ায় এরা মানুষের উদ্ধারকারী হয়, অতএব তুমি যত্নসহকারে এদের পূজা করো।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মাধব ! মানুষ ব্রাহ্মণ-শরীরে কীভাবে শূদ্র হয় ? তার ব্রাহ্মণত্ব কীভাবে বিনষ্ট হয়—কৃপা করে তা বলুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! যে দ্বাদশ বৎসর শুধু কূপের জলে স্নান করে এবং তত বৎসর ধরে রাজার আশ্রয়ে থেকে জীবিকা-নির্বাহ করে, সেই ব্রাহ্মণ বেদপারঙ্গম বিদ্বান হলেও শূদ্রভাব প্রাপ্ত হয়। যে কোনো নগরে বা শহরতলিতে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর বাস করে, সেই ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহে শূদ্র হয়ে যায়। যে ব্রাহ্মণ কামমোহিত হয়ে শূদ্র নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়, তার ব্রাহ্মণত্ব তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির ! যারা দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে উপরোক্ত পথে চলে তা নাশ করে, তাদের জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় ; তাই যে ব্রাহ্মণ আমাতে প্রীতি রাখে, তাকে যত্নশীল হতে হবে, যাতে তার ধর্মবিরুদ্ধ কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব ভ্রষ্ট না হয়ে যায়।

—০—

ভগবানের উপদেশের উপসংহার এবং দ্বারকাগমন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেশ্বর ! কোনো ব্রাহ্মণ যদি অন্যত্র গমন করেন এবং কালের প্রেরণায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সংস্কার কীভাবে সম্ভব হবে ?

ভগবান বললেন—রাজন্ ! কোনো অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের যদি এইভাবে মৃত্যু হয়, তাহলে প্রেতকল্পের নির্দেশানুসারে তার কাঠের মূর্তি তৈরি করতে হবে, সেটি পলাশ কাঠ হওয়া চাই। মানুষের দেহে তিনশত ষাটটি অস্থি আছে। শাস্ত্ররীতিতে সেই সব কল্পনা করে সেই মূর্তি দাহ করা উচিত।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! যে সকল ভক্ত তীর্থযাত্রা করতে অক্ষম, তাদের ত্রাণ করার জন্য কোনো বিশেষ তীর্থের ধর্মানুসারে বর্ণনা করুন।

ভগবান বললেন—রাজন্ ! সামবেদ গান করেন যেসব বিদ্বান তাঁরা বলেন যে, সত্য সব তীর্থকে পবিত্র করে। সত্য কথা বলা এবং কোনো জীবকে হিংসা না করা—একেই তীর্থ বলা হয়। তপ, দয়া, শীল, স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকা—এই সকল সদ্‌গুণও তীর্থস্বরূপ। পতিব্রতা নারী, সন্তোষযুক্ত ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানকেও তীর্থ বলা হয়। আমার এবং শংকরের ভক্ত, সন্ন্যাসী, বিদ্বান এবং অন্যকে শরণপ্রদানকারী পুরুষও তীর্থ। জীবেদের অভয়প্রদান করাকেও তীর্থ বলা হয়। ত্রিলোকে আমি উদ্বেগশূন্য। দিন বা রাত, আমার কাছে সব সমান। দেবতা, দৈত্য বা রাক্ষস থেকেও আমি ভয় পাই না। কিন্তু যে শূদ্র বেদ উচ্চারণ করে,

তাতে আমার সর্বদা চিন্তা হয়ে থাকে। তাই শূদ্রদের আমার নামও প্রণবের সঙ্গে উচ্চারণ করা উচিত নয়। কারণ বেদবেত্তা এই জগতে প্রণবকেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদ বলে মানেন। শূদ্র আমাতে ভক্তি বজায় রেখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করবে—এটিই তাদের পরম ধর্ম। দ্বিজদের সেবাদ্বারাই তারা পরম কল্যাণের ভাগী হয়। এছাড়া এদের উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নেই। রাগ, দ্বেষ, মোহ, কঠোরতা, ক্রূরতা, শঠতা, বেশিদিন শত্রুতা রাখা, অধিক অভিমান, সরলতার অভাব, মিথ্যা বলা ,নিন্দা করা, অত্যন্ত লোভ করা, হিংসা, চুরি, মিথ্যা, অপবাদ দেওয়া, ক্রোধ, লোভ, মূর্খতা, নাস্তিকতা, ভয়, আলস্য, অপবিত্রতা, কৃতঘ্নতা, দম্ভ, জড়তা, কপট ও অজ্ঞান—শূদ্রের শরীরে জন্মাতেই এই সমস্ত দুর্গুণ প্রবেশ করে। ব্রহ্মা শূদ্রকে সৃষ্টি করে তাকে দ্বিজদের সেবারূপ কর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। দ্বিজকে ভক্তি করলে শূদ্রের তামসভাব নষ্ট হয়ে যায়। শূদ্রও যদি ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র-পুষ্প-ফল-জল অর্পণ করে তাহলে আমি তার ভক্তিসহ প্রদত্ত উপহার সাদরে মস্তকে ধারণ করি। সমস্ত পাপযুক্ত হয়েও যদি কোনো ব্রাহ্মণ সর্বদা আমার ধ্যান করতে থাকে, তাহলে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন এবং বেদপারঙ্গম বিদ্বান হয়েও যে ব্রাহ্মণ আমাকে ভক্তি করে না, সে চণ্ডালের সমান। যে দ্বিজ আমার ভক্ত নয় ; তার দান, তপ, যজ্ঞ, হোম এবং অতিথি সৎকার—সবই বৃথা।

পাণ্ডুনন্দন ! মানুষ যখন সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের এবং মিত্র ও শত্রুর মধ্যে সমদৃষ্টি করে, তখন সে আমার সত্যকার ভক্ত হয়ে ওঠে। ক্রূরতার অভাব, অহিংসা, সত্য, সরলতা, কোনো প্রাণীকে হিংসা না করা—এগুলি আমার ভক্তদের ব্রত। যে ব্যক্তি আমার ভক্তকে শ্রদ্ধাপূর্বক নমস্কার করে, সে যদি চণ্ডালও হয়, তাহলেও সে অক্ষয় লোক লাভ করে। ধর্মরাজ ! যারা আমার ভক্ত, যাদের প্রাণ আমাতেই সংলগ্ন, যারা সর্বদা আমারই নাম ও গুণাদি কীর্তন করে, তারা যদি লক্ষ্মীসহ আমারই পূজা করে, তবে তাদের সদ্গতির বিষয়ে আর কী চিন্তা থাকে ? বহুবৎসর ধরে তপস্যাকারী মানুষও সেই পদ লাভ করতে পারে না, যা আমার ভক্ত অনায়াসে প্রাপ্ত হয়। তাই রাজেন্দ্র ! তুমি সর্বদা সতর্ক থেকে নিরন্তর আমারই ধ্যান করতে থাকো ; তাহলেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে এবং পরম পদ সাক্ষাৎ করতে পারবে। যারা বৃথা বাক্যব্যয় করে, তারা আমার ভক্ত নয়, তারা শূদ্র ; কিন্তু যারা আমার ভক্ত, তারা জন্মসূত্রে শূদ্র হলেও প্রকৃতপক্ষে শূদ্র নয়। ভগবদ্ভক্তকে ব্রাহ্মণেরই সমান বলে মানা হয়। যে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের জ্ঞাতা এবং নিরন্তর পঞ্চযাম সেবাবিধি জানে, সেই উত্তম ভক্ত। যে ব্যক্তি হোতা হয়ে ঋগ্বেদের দ্বারা, অধ্বর্যু হয়ে যজুর্বেদের দ্বারা, উদ্গাতা হয়ে পরম পবিত্র সামবেদের দ্বারা ও অথর্ববেদীয় দ্বিজরূপে অথর্ববেদের দ্বারা সবসময় আমার স্তুতি করে, তাকে ভগবদ্ভক্ত বলে মানা হয়। যজ্ঞ বেদাদির অধীন এবং দেবতা যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণাদির অধীন হয়, তাই ব্রাহ্মণ দেবতা।

কারো সাহায্য ব্যতীত কেউ উচ্চে আরোহণ করতে পারে না, তাই সকলেরই কোনো প্রধান আশ্রয়ের সাহায্য প্রয়োজন হয়। দেবতারা ভগবান রুদ্রের আশ্রয়ে থাকেন, রুদ্র ব্রহ্মার আশ্রিত এবং ব্রহ্মা আমার আশ্রয়ে থাকেন ; কিন্তু আমি কারো আশ্রিত নই। আমার কোনো আশ্রয় নেই। আমিই সকলের আশ্রয়। রাজন্ ! আমি তোমাকে এই উত্তম রহস্যের কথা জানালাম ; কারণ তুমি ধার্মিক। এবার তুমি এই উপদেশানুসারেই কর্ম পালন করো। এই পবিত্র কাহিনী পুণ্যদায়ক এবং বেদের সমান মান্য। যে আমার দ্বারা কথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রত্যহ পাঠ করবে, তার ধর্ম বৃদ্ধি হবে এবং বুদ্ধি নির্মল হবে। সেই সঙ্গে তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে পরম কল্যাণের বিস্তার হবে। এই প্রসঙ্গ পরম পবিত্র, পুণ্যদায়ক, পাপনাশক এবং অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। সকল মানুষের, বিশেষত শ্রোত্রিয় দ্বিজদের এটি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করা উচিত। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এটি শোনায় এবং যে পবিত্রচিত্তে এটি শোনে, তারা অবশ্যই আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্তিতে তৎপর থেকে যে ভক্তপুরুষ শ্রাদ্ধে এই ধর্ম শ্রবণ করে, তার পিতৃপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল পর্যন্ত সর্বদা তৃপ্ত থাকেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে ভাগবত-ধর্ম শ্রবণ করে এই অসাধারণ প্রসঙ্গ চিন্তা করতে করতে ঋষি ও পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সকলে ভগবানকে প্রণাম করলেন। ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির বারংবার গোবিন্দকে পূজা করলেন। দেবতা, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, ঋষি, মহাত্মা, গুহ্যক, সর্প, মহাত্মা বালখিল্য, তত্ত্বদর্শী যোগী, ভগবদ্ভক্ত পুরুষ—যারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উপদেশ শুনতে পদার্পণ করেছিলেন, এই পরম পবিত্র

বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ শুনতে শুনতে নিষ্পাপ এবং পবিত্র হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তির বিকাশ হল। তখন সকলে ভগবানের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করে তাঁর উপদেশের প্রশংসা করে বললেন—'দেবেশ্বর ! এবার পুনরায় আমরা দ্বারকায় আপনাকে, জগদ্‌গুরুকে দর্শন করব।' এই কথা বলে সকল ঋষি প্রসন্নচিত্তে দেবতাদের সঙ্গে নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন। তাঁরা চলে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির সঙ্গে দারুককে স্মরণ করলেন। সারথি দারুক কাছেই বসেছিলেন, তিনি নিবেদন করলেন—'প্রভু ! রথ প্রস্তুত, পদার্পণ করুন।' তাঁর কথা শুনে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তাঁরা হাত জোড় করে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখবোধ হওয়ায় কথা প্রকাশ করতে পারলেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের অবস্থা দেখে দুঃখিত হলেন। তিনি কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, দ্রৌপদী, মহর্ষি ব্যাস এবং অন্যান্য ঋষি ও মন্ত্রীদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে সুভদ্রা ও পুত্রসহ উত্তরার পিঠে

হাত রেখে তাঁদের আশীর্বাদ জানালেন। তারপর তিনি রাজভবন থেকে বাইরে এলেন এবং শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামক ঘোড়া সংবলিত রথে গিয়ে উঠলেন। সেই সময় কুরুদেশের রাজা যুধিষ্ঠির বিহ্বল চিত্তে তাঁর রথে গিয়ে উঠলেন এবং সাত্যকিকে তাঁর স্থান থেকে সরিয়ে ঘোড়ার রাশ নিজ হাতে নিলেন। তখন অর্জুনও রথে উঠে স্বর্ণদণ্ডযুক্ত বিশাল চামর হাতে নিয়ে ডান দিক থেকে ভগবানের মস্তকে হাওয়া করতে লাগলেন। সেইসময় মহাবলী ভীমসেনও রথে গিয়ে উঠলেন এবং ভগবানের ওপর ছাতা ধরে দাঁড়ালেন। সেই ছত্র দিব্য জ্যোতিসম্পন্ন। তার দণ্ডটি বৈদুর্যমণি মণ্ডিত এবং ছাতাটি স্বর্ণ ঝালরে শোভিত। নকুল এবং সহদেবও হাতে শ্বেত চামর নিয়ে রথে গিয়ে উঠলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তিন যোজন (অর্থাৎ চব্বিশ মাইল) যাওয়ার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণে আশ্রিত পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং দ্বারকার দিকে রওনা হলেন। এইভাবে ভগবানকে প্রণাম করে যখন তাঁরা গৃহে ফিরে এলেন তখন সর্বদা ধর্মে তৎপর থেকে কপিলা গাভী দান করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করে তাঁরা বারংবার মনকে সান্ত্বনা দিতেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ধ্যানদ্বারা ভগবানকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করে তাঁর স্মরণে মগ্ন থাকতেন, তাঁকে স্মরণ করতেন এবং যোগযুক্ত হয়ে ভগবানের যজন করে তাঁর পরায়ণ হয়ে গেলেন। জনমেজয় ! এইভাবে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ আমি তোমাকে শোনালাম। এটি পরম পবিত্র এবং পাপনাশকারী। ভগবান বিষ্ণুর বলা এই ধর্ম তুমি নিরন্তর শ্রবণ করতে থাকো। এর দ্বারা তুমি বিষ্ণুর পরম ধামে যেতে সক্ষম হবে। তাঁকে লাভ করার আর অন্য কোনো উপায় নেই।

॥ আশ্বমেধিকপর্ব সমাপ্ত ॥

আশ্রমবাসিকপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

কুন্তী, অন্যান্য নারীগণ ও ভ্রাতাসহ রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর অনুকূল আচরণ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! আমার প্রপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যে অধিকার লাভ করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন ? রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রী ও পুত্রদের মৃত্যুতে নিরাশ্রয় হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ঐশ্বর্য অপহৃত হয়েছিল ; সেই অবস্থায় তিনি এবং তাঁর যশস্বিনী পত্নী গান্ধারী দেবী কীভাবে জীবন কাটাতেন ? আমার প্রপিতামহ কতদিন রাজ্য উপভোগ করেছিলেন ? কৃপা করে সেসব কথা আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকেই শিরোমণি করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। বিদুর, সঞ্জয় এবং যুযুৎসু—এরা সর্বদা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত থাকতেন এবং পাণ্ডবরাও প্রত্যেক কাজে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁরা পনেরো বছর ধরে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশানুসারেই সব কাজ করেছিলেন। বীর পাণ্ডবরা প্রত্যহ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর সেবার জন্য কাছে বসতেন। ধৃতরাষ্ট্রও স্নেহবশত তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁদের নিত্যকর্মের অনুমতি দিলে তারপর তাঁরা নিজ নিজ কাজে যেতেন। কুন্তীও সর্বদা গান্ধারীর সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং পাণ্ডবদের অন্য পত্নীরাও কুন্তী ও গান্ধারী—উভয় শ্বশ্রূমাতাকে সমানভাবে সেবা করতেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহুমূল্য শয্যা, বস্ত্র-অলংকার এবং রাজার ব্যবহারযোগ্য সর্বপ্রকার উত্তম বস্তু, ভোজ্য পদার্থ ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারের জন্য তাঁকে সমর্পণ করতেন। কুন্তীদেবী গান্ধারীকে নিজ শ্বশ্রূমাতার মতো পরিচর্যা করতেন। মহান ধনুর্ধর কৃপাচার্য সেইসময় ধৃতরাষ্ট্রের

কাছেই থাকতেন। ভগবান ব্যাসদেবও প্রত্যহ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রাচীন ঋষি, দেবর্ষি, পিতৃপুরুষ এবং রাক্ষসের কাহিনী শোনাতেন। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ধর্ম ও ব্যবহারিক সমস্ত কার্য বিদুরই দেখাশোনা করতেন। তাঁর সুনীতির প্রভাবে রাজার বহুপ্রকার প্রিয় কার্য সামান্য ব্যয়েই সামন্তের (অধীন ভূপতি) দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যেত। তাঁরা বন্দিদের বন্দিদশা থেকে মুক্তিপ্রদান করতেন এবং বধের যোগ্য মানুষদেরও প্রাণ দান করে মুক্ত করে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেসব নিয়ে তাঁদের কখনো কোনো কথা বলতেন না। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় আগের মতোই রন্ধনকার্যে নিপুণ আরালিক[১], সূপকার[২] ও রাগখাণ্ডবিক[৩] উপস্থিত থাকত। পাণ্ডবরা তাদের বহুমূল্য বস্ত্র এবং নানা প্রকার অলংকার উপহার দিতেন। পানের জন্য মিষ্ট শরবৎ এবং নানাস্বাদের খাবার দিতেন। বিভিন্ন দেশের যেসব রাজা সেখানে আসতেন তাঁরা পূর্বের মতোই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবাতেই উপস্থিত হতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নাগকন্যা উলূপী, দেবী চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেতুর ভগ্নী ও জরাসন্ধের পুত্রি—এঁরা সকলে এবং অন্যান্য নারীগণ দাসীর ন্যায় গান্ধারীর সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যহ তাঁর ভ্রাতাদের শিক্ষাপ্রদান করতেন যে, 'ধৃতরাষ্ট্রের নিজ সন্তানগণ স্বর্গারোহণ করেছেন, তোমরা কখনো এমন ব্যবহার কোরো না, যাতে তাঁর মনে একটুও আঘাত অনুভূত হয়।' ধর্মরাজের এই অর্থপূর্ণ কথা শুনে ভীমসেন ব্যতীত অন্য ভ্রাতারা তাঁর নির্দেশ বিশেষভাবে পালন করতেন। বীরবর ভীমসেন কখনো ভুলতে পারেননি—পাশা খেলার সময় যে অনর্থ হয়েছিল, তা ধৃতরাষ্ট্রের মন্দবুদ্ধিরই পরিণাম।

এইভাবে পাণ্ডবদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র আগের মতোই ঋষিদের সঙ্গে সুখে সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের দানের যোগ্য শ্রেষ্ঠবস্তু দান করতেন, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁর সর্বকার্যে সহযোগিতা করতেন। যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ক্রূরতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি সর্বদা প্রসন্ন থাকতেন এবং নিজ ভ্রাতা ও মন্ত্রীদের বলতেন—'রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমার এবং আপনাদের মাননীয়, যে তাঁর আদেশ পালন করবে, সে আমার সুহৃদ আর যে তাঁর বিপরীত আচরণ করবে, সে আমার দণ্ডের ভাগী হবে।' পিতা-পিতামহদের মৃত্যু তিথি এলে এবং পুত্র ও হিতৈষীদের শ্রাদ্ধকার্যে মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র যত ধন ব্যয় করতে চাইতেন, তাই করতেন। তিনি পূজনীয় ব্রাহ্মণদের যোগ্যতা অনুসারে বহু ধন দিতেন এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব তাঁর প্রিয় কাজ করার ইচ্ছায় সব কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁরা সবসময় চিন্তা করতেন যে পুত্র-পৌত্রদের মৃত্যুতে দুঃখিত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের দিক থেকে কোনো আঘাত পেয়ে যেন শোকে প্রাণত্যাগ না করেন ! তাঁর পুত্রদের জীবিতকালে তিনি যত সুখ ও ভোগ লাভ করেছিলেন—সেসব যেন এখনও পূর্ণভাবে উপভোগ করেন। পাণ্ডবেরা তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এইভাবে শীল ও সদাচার যুক্ত হয়ে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাগণ ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের পরম বিনীত, তাঁর নির্দেশানুসারে চালিত এবং শিষ্যভাবে সেবায় ব্যাপৃত দেখে, পিতার ন্যায় তাঁদের স্নেহ করতেন। গান্ধারী দেবীও তাঁর পুত্রদের জন্য নানা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, ব্রাহ্মণদের ইচ্ছানুসারে ধন দান করে পুত্রশোকের ভার মুক্ত হয়ে যান।

ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে তাঁর ভ্রাতাসহ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদর-আপ্যায়নে ব্যাপৃত থাকলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এমন কোনো আচরণ দেখেননি, যা তাঁর অপ্রিয়। পাণ্ডবদের সদাচার দেখে অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ওপর প্রসন্ন ছিলেন এবং রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারী দেবীও তাঁদের নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অথবা তপস্বিনী গান্ধারী দেবী ছোট বড় যে কোনো কাজের কথা বলতেন, তাঁদের আদেশ শিরোধার্য করে যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করতেন। এতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন এবং নিজ পুত্র দুর্যোধনের কথা স্মরণ করে অনুতাপ করতেন। প্রতিদিন প্রভাতে স্নান এবং ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করার পর তিনি পাণ্ডবদের যুদ্ধ-বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দিতেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে অগ্নিতে হোম করার পর সর্বদা তাঁদের শুভ কামনা করতেন 'পাণ্ডুপুত্রেরা

[১]'অরা' নামক অস্ত্র দ্বারা কেটে তৈরি করা শাকসব্জী ইত্যাদিকে 'অরালু' বলা হয় ; সেগুলি সুন্দর করে রন্ধন করা পাচককে 'আরালিক' বলা হয়। [২]ডাল ইত্যাদি রন্ধনকারীদের সাধারণত 'সূপকার' বলা হয়। [৩]নানাপ্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করে মুগের রসা তৈরিকারী পাচককে 'রাগখাণ্ডবিক' বলা হয়।

দীর্ঘজীবী হোক।' রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদের ব্যবহারে এতো প্রসন্ন ছিলেন, তিনি তত প্রসন্ন কখনো নিজ পুত্রদের আচরণে হননি। যুধিষ্ঠির তাঁর সুব্যবহারের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁদের সঙ্গে যে অসৎ ব্যবহার করেছিলেন, তিনি সেসব ভুলে ধৃতরাষ্ট্র-আদির সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। যুধিষ্ঠিরের ভয়ে কোনো ব্যক্তি কখনো ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধনের অনুচিত কাজের আলোচনা করত না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর সকলেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। কিন্তু ভীমসেনের ব্যবহারে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। যদিও ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশানুসারেই চলতেন, তবুও ধৃতরাষ্ট্রকে দেখে তাঁর মনে সর্বদা দুর্ভাবনা ভেসে বেড়াত। রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অনুকূল আচরণ করতে দেখে তিনি নিজেও ওপর ওপর অনুকূল আচরণ করতেন, কিন্তু তাঁর অন্তর ধৃতরাষ্ট্র থেকে বিমুখ হয়ে থাকত।

গান্ধারীসহ ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাওয়ার প্রস্তুতি এবং যুধিষ্ঠিরের শোক

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা যুধিষ্ঠির এবং ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রেমবন্ধন ছিল, রাজ্যের লোকেরা কখনো তাতে কোনো বিচ্ছেদ আসতে দেখেনি ; কিন্তু ভীমসেন গুপ্তভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কাজ করতেন। তিনি তাঁর নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করাতেন। কোনো এক দিনের কথা, ভীমসেন গর্বভরে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনিয়ে নিজ মিত্রদের কঠোর ভাষায় বলছিলেন—'ভাই ! আমার বাহুগুলি দণ্ডের ন্যায় দৃঢ়। আমিই এই অন্ধ রাজার সমস্ত পুত্রদের যমলোকে পাঠিয়েছি। দেখো, আমার হাত দুটি, এ অতি সুদৃঢ় এবং দুর্ধর্ষ। এই হাতেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মৃত্যু হয়েছে।' ভীমসেনের এই মর্মভেদী কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সময়ের বিপরীত গতি উপলব্ধকারী, ধর্মজ্ঞা, বুদ্ধিমতী গান্ধারীও এই কঠোর বাক্য শুনেছিলেন। ততদিন তাঁরা পনেরো বছর যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে কাটিয়েছেন। সেদিন ভীমসেনের বাক্যবাণে ব্যথিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অত্যন্ত মর্মবেদনা হল ; কিন্তু যুধিষ্ঠির তা জানতে পারলেন না। অর্জুন, কুন্তী, যশস্বিনী দ্রৌপদী এবং ধর্মজ্ঞ নকুল-সহদেব—এঁরা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের মনের অনুকূল ব্যবহার করতেন, কখনো কোনো অপ্রিয় কথা বলতেন না।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সুহৃদদের ডেকে তাঁদের পূর্ণ সম্মান জানিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদ বাক্যে বললেন—'মিত্রগণ ! আপনারা তো জানেন যে কৌরবরা কীভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেসব আমারই অপরাধের ফল। দুর্যোধন দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল, সে তার জ্ঞাতি-ভাইদের ভীতি বৃদ্ধি করত ; কিন্তু আমি মূর্খতাবশত তাকে কৌরবদের রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণকর পরামর্শ শুনিনি, পুত্রস্নেহে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তখন মনীষী ব্যক্তিরা আমাকে হিতপ্রদ বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে, দুষ্টবুদ্ধি পাপী দুর্যোধনকে তার মন্ত্রীসহ বধ করা উচিত ; কিন্তু আমি তা করিনি। বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং ভগবান ব্যাসও পদে পদে আমাকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। সঞ্জয় এবং গান্ধারীও অনেক বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু আমি কারো কথায় কান দিইনি। এখন তাই অত্যন্ত অনুতাপ হচ্ছে। মহাত্মা পাণ্ডবরা গুণসম্পন্ন ছিল, তবুও আমি তাদের পিতা-পিতামহের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারিনি। এইরূপ আমার কৃত হাজার হাজার ভুল আমার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, যা এখন কাঁটার মতো বিঁধছে। বিশেষ করে এই পনেরো বছর পরে আমার চোখ খুলে গেল। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিয়মপূর্বক থেকে কখনো চতুর্থ, কখনো অষ্টম প্রহরে শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার করি, একথা শুধু গান্ধারীই জানেন। অন্য সকলে জানে আমি প্রত্যহ পূর্ণ আহার করি। যুধিষ্ঠিরের ভয়েই আমার কাছে লোক আসে। আমি নিয়ম পালনের ছলে মৃগচর্ম ধারণ করে কুশ আসনে আসীন হয়ে জপে ব্যাপৃত থাকি এবং মাটিতে শয়ন করি। যশস্বিনী গান্ধারীরও আমার মতোই অবস্থা। আমাদের একশত পুত্র নিহত হয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই ; কারণ তারা ক্ষত্রিয় ধর্ম অবগত ছিল এবং সেই অনুসারেই তারা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছে।

সুহৃদদের এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'কুন্তীনন্দন ! তোমার কল্যাণ হোক, আমার কথা শোনো। তোমার এখানে থেকে আমি বড় সুখে দিন

কাটিয়েছি, বড় বড় দান করেছি এবং অনেক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছি। দ্রৌপদীর সঙ্গে অত্যাচার করে তোমার ঐশ্বর্য অপহরণকারী আমার ক্রূরকর্মা পুত্রেরা ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধে হত হয়েছে। এখন আর তার জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই ; কারণ তারা শস্ত্রধারীর উপযুক্ত লোকে গমন করেছে। এখন আমার ও গান্ধারীর নিজেদের হিতার্থে পুণ্যকর্ম করার প্রয়োজন, তার জন্য তুমি অনুমতি দাও। তোমার অনুমতি পেলে আমি বনে চলে যাব এবং সেখানে গান্ধারীর সঙ্গে চীর-বল্কল ধারণ করে তোমাকে আশীর্বাদ করতে করতে বাস করব। বনে বায়ুপান করে অথবা উপবাস করে থাকব এবং সপত্নীক কঠোর তপস্যা করব। পুত্র ! তুমিও সেই তপস্যার অংশীদার হবে ; কারণ তুমি রাজা এবং রাজা তার রাজ্যের মধ্যে হওয়া সমস্ত ভালোমন্দ কর্মের ফলভাগী হয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজ ! আপনি এখানে থেকে যে এরূপ দুঃখ ভোগ করছিলেন—তা জেনে আমার এই রাজ্যে একটুও সুখ পাচ্ছি না। আমার ন্যায় দুর্বুদ্ধিকে ধিক্। আমি এতো প্রমাদী এবং রাজ্যে আসক্ত যে আজ পর্যন্ত আমি এবং আমার ভাইয়েরা জানতেই পারিনি যে আপনি দুঃখভারে পীড়িত এবং উপবাস করে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে মাটিতে শয়ন করছেন। হায় ! আপনি নিজ চিন্তা লুকিয়ে আমার মতো মূর্খকে অন্ধকারে রেখেছিলেন, আমাকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে আপনি সুখী অথচ দুঃখভোগ করছিলেন। এই রাজ্যে, এই সব ভোগে, নানাপ্রকার যজ্ঞ করে অথবা এইসব সুখ-সামগ্রীতে আমার কী প্রয়োজন, যখন আমার কাছে থেকে আপনাকে এতো কষ্ট সহ্য করতে হল ! আপনিই আমার পিতা, মাতা এবং পরম গুরু। আপনার থেকে পৃথক হয়ে আমি কোথায় থাকব ? যুযুৎসু আপনার ঔরসজাত পুত্র, একে বা অন্য কাউকে যাকে আপনি চান, রাজা করুন অথবা নিজেই রাজ্যশাসন করুন ; আমি বনে চলে যাব। পিতা ! আমি আগেই অপযশে জ্বলে গেছি ; আপনি আমাকে আর দগ্ধ করবেন না। আমি রাজা নই, রাজা আপনি। আমি আপনার আদেশ পালনকারী সেবক। আমি কী করে আপনাকে অনুমতি দেব ? দুর্যোধনের অপরাধের জন্য আমাদের মনে একটুও ক্ষোভ নেই। যা হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল। দুর্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র ছিল, আমরাও তাই। আমার কাছে গান্ধারী ও কুন্তীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আপনি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যান, তাহলে আমি শপথ করে বলছি যে আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব। আপনি না থাকলে এই ধন-ধান্যপূর্ণ আসমুদ্র পৃথিবীর রাজত্ব আমাকে প্রসন্ন রাখতে পারবে না। মহারাজ ! এ সব কিছুই আপনার। আমি আপনার চরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি যে, আপনি প্রসন্ন হোন ; আমরা সকলে আপনারই অধীন। সৌভাগ্যবশত যদি আমার আপনাকে সেবা করার সুযোগ হয়, তাহলে আমার মানসিক চিন্তা দূর হবে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—পুত্র ! আমার মন তপস্যাতেই ভরে আছে এবং জীবনের অন্তিম সময়ে বনে যাওয়া আমাদের কুলের উচিত কাজ। আমি দীর্ঘকাল তোমার কাছে থেকেছি, তুমিও বহুদিন আমার সেবা-শুশ্রূষা করেছ, এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা হয়েছে। এবার আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে যুধিষ্ঠির কেঁপে উঠলেন এবং হাত জোড় করে চুপচাপ বসে রইলেন। তখন অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা সঞ্জয় এবং মহারথী কৃপাচার্যকে বললেন—'আমি আপনাদের রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে বলছি। একে তো আমি অধিক বৃদ্ধ, তাতে বলার পরিশ্রম, তাই আমার চিত্তবিভ্রম হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে আসছে।'

একথা বলতে বলতে তিনি গান্ধারীর সাহায্যে নির্জীব হয়ে শয়ন করলেন। তা লক্ষ্য করে রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন—'ওহো ! যাঁর

শরীরে সহস্র হাতির বল ছিল, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র আজ তাঁর স্ত্রীর সাহায্যে শয়ন করছেন। যিনি আগে ভীমের লৌহময় মূর্তি চূর্ণ করেছিলেন, সেই মহাবলী রাজাকে এক অবলা

নারীর সাহায্য নিতে হচ্ছে। আমার মতো পাপীকে ধিক্। ধিক্ আমার বুদ্ধি এবং বিদ্যাকেও, যার জন্য মহারাজ এই সময় অসহায় অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবী যদি আহার না করেন, তাহলে আমিও এঁদের মতো উপবাস করব।'

এই কথা বলে ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির হাতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রের বুকে ও মুখে দিতে লাগলেন। তাঁর হাতের স্পর্শে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মূর্ছা দূর হল এবং তিনি চৈতন্য ফিরে পেয়ে বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! তুমি আমার শরীরে হাত বোলাও আর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরো। তোমার সুখদায়ক স্পর্শে আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। তোমার দুহাতের স্পর্শে আমার মহাতৃপ্তি হচ্ছে। চারদিন ধরে আমি অন্ন গ্রহণ করিনি, তাই আমার শরীরে জোর নেই। তোমাকে অনুরোধ করার জন্য বলার সময় আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে ; তাই আমি অচৈতন্য-প্রায় হয়ে পড়েছিলাম। তোমার হাতের স্পর্শে শরীরে যেন অমৃত স্পর্শ পেলাম, তাতে আমি নতুন জীবন যেন ফিরে পেলাম।'

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত স্নেহে তাঁর সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর স্পর্শে ধৃতরাষ্ট্রের দেহে যেন নতুন জীবন ফিরে এল, তিনি দুহাতে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করলেন। বিদুর ও অন্য সকলে এই করুণ দৃশ্য দেখে দুঃখিত চিত্তে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কুন্তীর সঙ্গে অন্যান্য কুরুনারীও শোকগ্রস্ত হয়ে তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আবার বললেন—'পুত্র ! বারবার বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমাকে তপস্যা করার অনুমতি দাও।' তাঁকে এইভাবে কথা বলতে দেখে সেখানে উপস্থিত সকলে আর্তভাবে হাহাকার করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে উপবাস পীড়িত, ক্লান্ত ও দুর্বল দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং নিজ শোকাশ্রু অবদমন করে বললেন—'নরশ্রেষ্ঠ ! আমার রাজ্য বা জীবনের কোনো ইচ্ছা নেই ; আপনার যাতে ভালো হয়, আমি তাই করতে চাই। আপনি যদি আমাকে আপনার কৃপার পাত্র বলে মনে করেন এবং আমি যদি আপনার প্রিয় হই, তাহলে আমার অনুরোধে আপনি এখন আহার করুন। তারপর অন্য কথা ভাবব।' তাঁর কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! তুমি আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দিলে তবে আমি আহার করব, এই আমার ইচ্ছা।' রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন এই কথা বলছিলেন, সেইসময় সত্যবতীনন্দন মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বলতে লাগলেন—

ব্যাসদেবের যুধিষ্ঠিরকে বোঝানো এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক রাজনীতির শিক্ষা প্রদান

ব্যাসদেব বললেন—যুধিষ্ঠির ! মহাতেজস্বী ধৃতরাষ্ট্র যা বলছেন, তাই করো ; তাঁর জন্য আর চিন্তা কোরো না।
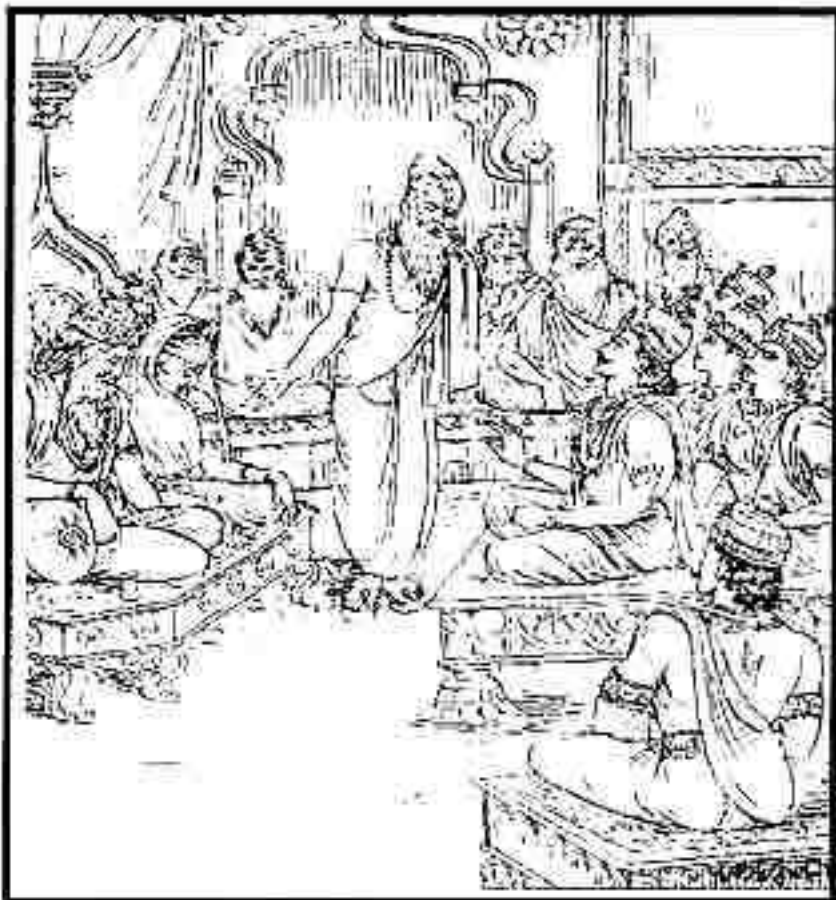
এখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, বিশেষ করে এঁর সব পুত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার বিশ্বাস তিনি এই কষ্ট আর বেশিদিন সহ্য করতে পারবেন না। সৌভাগ্যবতী গান্ধারী পরম বিদুষী, তাই তিনি মহাধৈর্য সহকারে পুত্রশোক সহ্য করছেন। আমার কথা শোনো, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বনে যাওয়ার অনুমতি দাও, আমি তোমাকে এই পরামর্শই দিচ্ছি। নাহলে ইনি এখানে থাকলে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। তিনি যাতে প্রাচীন রাজর্ষিদের পথ অনুসরণ করতে পারেন, তাঁকে তুমি সেই সুযোগ দাও। রাজর্ষিগণ জীবনের অন্তিম সময়ে বনেরই আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

অদ্ভুতকর্মা মহামুনি ব্যাস এইকথা বলায় মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—'প্রভু ! আপনি আমাদের মাননীয় গুরু, এই রাজ্য ও কুলের পরম আধারও আপনি। আপনি আমার পিতা, আমি আপনার পুত্র। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তেমনই আমার গুরু (আমি কী করে তাঁকে কোনো আদেশ দিতে পারি)। পুত্রই পিতার আদেশ পালন করবে, ধর্মে তো

সেরূপ নির্দেশই দেওয়া আছে।' যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে মহাতেজস্বী ব্যাসদেব তাঁকে আবার বললেন—'রাজন্‌ ! তোমার কথা সত্য। কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ হয়েছেন এবং অন্তিম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছেন ; তাই তিনি এখন আমার ও তোমার অনুমতি নিয়ে তপস্যার দ্বারা তাঁর মনোরথ পূর্ণ করবেন। তুমি এই শুভকার্যে বিঘ্নপ্রদান কোরো না। যুধিষ্ঠির ! রাজর্ষিদের পরমধর্ম হল যুদ্ধে বা বনে মৃত্যুবরণ করা। তোমার পিতা রাজা পাণ্ডুও ধৃতরাষ্ট্রকে গুরুর সমান মেনে শিষ্যভাবে তাঁর সেবা করেছেন, পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করেছেন, প্রজাদের ভালোভাবে পালন করেছেন এবং বহু ধন-রত্ন দান করেছেন। নিজ সেবকদের নিয়ে তুমিও এঁকে এবং গান্ধারীকে গুরুবৎ সেবা-শুশ্রূষা ও আরাধনা করেছ। এখন এঁর তপস্যা করার সময়, সুতরাং তুমি তোমার পিতাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দাও। তোমার ওপর এঁর মনে বিন্দুমাত্রও ক্রোধ নেই।'

এই বলে মহর্ষি ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজি করালেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির যখন 'যথা আজ্ঞা' বলে তাঁর নির্দেশ মেনে নিলেন, তখন ব্যাসদেব বনে নিজের আশ্রমে চলে গেলেন। ভগবান ব্যাস চলে গেলে রাজা যুধিষ্ঠির অতি নম্র-ভাবে ধীরে ধীরে তাঁর বৃদ্ধ পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'পিতা ! মহর্ষি ব্যাস যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপনি যা করা স্থির করেছেন, মহা ধনুর্ধর কৃপাচার্য, বিদুর, যুযুৎসু ও সঞ্জয় যেমন বলবেন, নিঃসন্দেহে আমি তাই করব ; কিন্তু এখন আপনার পায়ে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি, যে আপনি আগে আহার করে নিন, তারপর আশ্রমে যাবেন।'

তারপর রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে তাঁর মহলে গেলেন। তাঁর হাঁটার শক্তি কমে গিয়েছিল, বড় কষ্টে চলছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিদুর, সঞ্জয় এবং কৃপাচার্যও গেলেন। মহলে গিয়ে তিনি পূর্বাহ্নের ধার্মিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন, তারপর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আহারে তৃপ্ত করে স্বয়ং আহার করলেন। মনস্বিনী গান্ধারীও কুন্তী এবং অন্যান্য পুত্রবধূদের দ্বারা পূজিত হয়ে অন্নগ্রহণ করলেন। তাঁদের আহার হলে বিদুর এবং অন্যান্য পাণ্ডবরাও আহার করে ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত হলেন। সেইসময় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে একান্তে বসে থাকতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—'কুরুনন্দন ! এই অষ্টাঙ্গসম্পন্ন রাজ্যে তুমি সর্বদা ধর্মকেই সামনেই রেখো এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে

রাজ্য পরিচালনা কোরো। ধর্মের দ্বারাই রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব—তুমি নিজেও একথা জানো, তবু আমার কাছ থেকেও শোনো। সর্বদা বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে, তাঁরা যা বলেন, মন দিয়ে শুনবে এবং বিনা বিচারে তা পালন করবে। প্রভাতে সেই বিদ্বান ব্যক্তিদের যথোচিত সম্মান করবে এবং প্রয়োজনের সময় তাঁদের কাছে তোমার কর্তব্য জিজ্ঞাসা করবে। তোমার নিজ হিতার্থে তুমি অবশ্যই তাদের সম্মান করবে। সম্মানিত হলে তাঁরা সর্বদা তোমাকে হিতের কথা বলবেন। সারথি যেমন ঘোড়াকে বশে রাখে, তুমিও তেমনই তোমার ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবে, তাহলে সঞ্চিত অর্থের ন্যায় এগুলি ভবিষ্যতে তোমার পক্ষে হিতকর হবে। যারা জেনেবুঝে, নিষ্কপটভাবে কাজ করে, যারা পিতা-পিতামহের সময় থেকে কাজ করে আসছে এবং যারা অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ, সংযমী, পুণ্যকর্মকারী, পরম পবিত্র, সেই মন্ত্রীদের সর্বপ্রকার কাজে নিযুক্ত করবে। যার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, যে নিজ রাজ্যেই বসবাস করে এবং যাকে শত্রুরা চেনে না, এরূপ বহু গোয়েন্দা পাঠিয়ে তাদের সাহায্যে শত্রুদের গোপনীয় খবর জেনে নিতে হবে। নগর রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে—তার চারদিকের প্রাচীর এবং প্রধান ফটক যেন খুব মজবুত হয়। মধ্যখানে, চারপাশে বড় বড় উঁচু অট্টালিকা থাকবে। নগরের সমস্ত দ্বার বিশাল হবে এবং তাতে পাহারা দেওয়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে। দ্বারগুলি ঠিক স্থানে হওয়া চাই এবং চারদিক থেকে তার রক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রহরী থাকা উচিত। যাদের

বংশ পরিচয় ঠিকমতো জানা আছে, তাদেরই কাজে নিযুক্ত করবে। আহার-বিহার-শয়ন, পোষাক পরিধান, মালা পরা ইত্যাদির সময় সতর্ক থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কুলীন, শীলবান, বিদ্বান, বিশ্বাসপাত্র এবং প্রবৃদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা নিজের রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করবে।

'যুধিষ্ঠির ! তুমি সেইসব ব্রাহ্মণদের মন্ত্রী করবে, যাঁরা বিদ্যায় কুশলী, বিনয়ী, কুলীন, ধর্ম ও অর্থ কুশল এবং সরল স্বভাববিশিষ্ট ; তাঁদের সঙ্গেই তুমি গূঢ় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু বেশি লোক নিয়ে বহুক্ষণ ধরে মন্ত্রণা করবে না। সমস্ত মন্ত্রীদের অথবা তাদের মধ্যে দু-একজনকে কোনো কাজের ছলে বন্ধ ঘরে অথবা উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ করবে। যেখানে বেশি ঘাস-পাতা নেই, তেমন জঙ্গলেও মন্ত্রণা করা যেতে পারে ; কিন্তু রাত্রিকালে এরূপস্থলে কোনো গুপ্ত পরামর্শ করা উচিত নয়। মন্ত্রণা কক্ষে পশুপক্ষী বা অন্য মানুষকে আসতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশিত হলে রাজাকে যে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়, তা নিবারণ করা সম্ভব হয় না—আমার এমনই বিশ্বাস। মন্ত্রণা প্রচার হলে যে দোষ হয়, তা তুমি সর্বদা মন্ত্রীমণ্ডলের সামনে বলতে থাকবে। তোমরা প্রতি নগর ও নগরপ্রান্তের লোকেদের হৃদয়ের ভাব সর্বদা জানতে চেষ্টা করবে। ন্যায়কার্যে তুমি সর্বদা এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবে, যে বিশ্বাসের পাত্র, সন্তোষী, হিতৈষী, গুপ্তচর দ্বারা সর্বদা তার কাজের ওপর দৃষ্টি রাখবে। তোমার এমন বিধান করা উচিত, যাতে তোমার নিযুক্ত ন্যায়াধিকারী ব্যক্তি অপরাধীদের অপরাধ ঠিকমতো অনুসন্ধান করে তাকে উচিত দণ্ডপ্রদান করে। যার অপরের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভ্যাস থাকে, যে অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করে, যার কঠিন দণ্ডদানের প্রবৃত্তি থাকে, যে মিথ্যা বিচার দেয়, কটুবাদী, লোভী, অপরের ধন অপহরণকারী, দুঃসাহসী, সভাভবন ভঙ্গকারী এবং বর্ণসংকর দোষের প্রচারক হয়, দেশকালের ওপর নজর রেখে সেই ব্যক্তিকে আর্থিকদণ্ড বা প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত। প্রাতে উঠে (নিত্য নিয়ম পালনের পর) প্রথমে সেই সব লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যারা তোমার অর্থ খরচের কাজে নিযুক্ত ; তারপর পোষাক পরিচ্ছদ এবং আহারের দিকে নজর দেবে। পরে সৈনিকদের হর্ষ ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। দূত এবং গুপ্তচরদের সঙ্গে সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করবে। একপ্রহর রাত বাকি থাকতে উঠে আগে সারাদিনের কর্তব্য ঠিক করে নেবে। অর্ধরাত্রে এবং দ্বিপ্রহরে নিজে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে। সর্বদা ন্যায়ের পথ অনুসরণ করেই তোমার রাজকোষ বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। ন্যায়ের বিপরীত পথ অবলম্বন করবে না। প্রথমে কাজ দেখে পরে লোককে কর্মে নিযুক্ত করবে। যে তোমার আশ্রয়ে থাকে, সে কোনো স্থায়ী কাজে নিযুক্ত হোক বা না হোক, তাকে দিয়ে সবসময় কাজ করাবে। তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করবে, যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শূরবীর, কষ্ট সহ্য করতে পারে, হিতৈষী, পুরুষার্থী এবং প্রভুভক্ত। তোমার রাজ্যে বসবাসকারী কারিগর যদি তোমার কাজ করে, তাহলে তুমি তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। নিজের এবং শত্রুদের দুর্বলতাগুলি সর্বদা খেয়াল রাখবে। নিজ দেশের পুরুষদের মধ্যে যারা কোনো কাজে বিশেষ কুশল এবং হিতৈষী, তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কর্ম দিয়ে কাছে নিযুক্ত রাখবে। বুদ্ধিমান রাজার কর্তব্য হল গুণবান ব্যক্তির গুণবৃদ্ধির চেষ্টা করা।

'ভারত ! তুমি তোমার শত্রুদের, উদাসীন রাজাদের এবং মধ্যস্থ পুরুষ সমুদায়ের ওপর দৃষ্টি রাখবে। চার প্রকারের শত্রু, ছয় প্রকারের আততায়ী, নিজ মিত্র এবং শত্রুর মিত্র—এই বারো প্রকার মানুষের সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকবে। মন্ত্রী, দেশ, দুর্গ এবং সেনা—এগুলির ওপর শত্রুদের লক্ষ্য থাকে। তাই এদের সাবধানে রক্ষা করবে। উপরিউক্ত বারো প্রকারের মানুষ রাজাদের মুখ্য বিষয়। মন্ত্রীদের অধীন কৃষি ইত্যাদি ষাট গুণ এবং পূর্বোক্ত বারো মানুষ—নীতিজ্ঞ আচার্যেরা এগুলিকে 'মণ্ডল' আখ্যা দিয়েছেন। রাজার এ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত থাকা উচিত। কারণ রাজ্য রক্ষার ছটি উপায়ের যথার্থ ব্যবহার এদেরই অধীন। রাজার নিজ বৃদ্ধি, ক্ষয় ও স্থিতির সর্বদা জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং যখন নিজপক্ষ বলশালী ও শত্রুপক্ষ নির্বল বলে মনে হবে, সেই সময় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে জেতার চেষ্টা করবে ; কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ প্রবল ও নিজপক্ষ দুর্বল, তখন শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবে। রাজার সবসময় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখা উচিত। যখন শত্রুর ওপর আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না, তখন সেই পরিস্থিতিতে

রাজার কর্তব্য হল বস্তুস্থিতি ভালোমতো বিচার করা। শত্রুকে কিছু অনুর্বর জমি, অল্প স্বর্ণ ও অন্যান্য কম মূল্যবান জিনিস দিয়ে সন্ধি করতে হয় ; কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব আসবে, তখন উর্বর জমি, মূল্যবান ধাতু এবং বলবান মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে সন্ধি করা উচিত অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রাজকুমারকে জামিন হিসাবে নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করা উচিত, এর বিপরীত আচরণ করা উচিত নয়। যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে উচিত উপায় এবং মন্ত্রণার জ্ঞাতা রাজার তার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। প্রজাদের মধ্যে যারা দীন-দরিদ্র, রাজার উচিত তাদের ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখা। নিজ বৃদ্ধি চান যে রাজা তাঁর কখনো সম্মুখে উপস্থিত সামন্ত রাজাকে বধ করা উচিত নয়। যিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করতে চান, তাঁর কখনো হিংসা করা উচিত নয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, দুষ্ট ব্যক্তিদের বন্দি করে শাস্তি প্রদান করবে। বলবান ব্যক্তির কখনো দুর্বলের বিনাশ করা উচিত নয়। যুধিষ্ঠির ! তোমার বেতের ন্যায় নমনীয়তার আশ্রয় নেওয়া উচিত। যদি কোনো দুর্বল রাজাকে কোনো বলবান রাজা আক্রমণ করে, তাহলে নিজের মধ্যে যুদ্ধের শক্তি না থাকলে মন্ত্রীদের নিয়ে তার শরণ গ্রহণ করবে এবং অর্থ, নগরের মানুষ, অন্য প্রিয় বস্তু দিয়ে সাম আদি উপায়ের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে বিরত করার চেষ্টা করবে। যদি কোনোভাবেই সন্ধি করা সম্ভব না হয়, তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলে বীরপুরুষ মুক্তিলাভ করে।

যুধিষ্ঠির ! সন্ধি ও বিগ্রহের দিকেও তোমার দৃষ্টি রাখা উচিত। শত্রু প্রবল হলে তার সঙ্গে সন্ধি করা এবং দুর্বল হলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা—সন্ধি ও বিগ্রহের এই দুটি আধার। এগুলি প্রয়োগের নানা উপায় ও প্রকার আছে। নিজ দ্বিবিধ অবস্থা—শক্তি-সামর্থ্য ভালোমতো চিন্তা করে শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা যুদ্ধ করা কর্তব্য। শত্রু যদি মনস্বী হয়, তার সৈন্যদল বলশালী ও সন্তুষ্ট হয় তাহলে তাদের সহসা আক্রমণ না করে, পরাস্ত করার অন্য উপায় খুঁজতে হবে। আক্রমণ তখনই করতে হয় যখন শত্রু উপযুক্ত অবস্থায় না থাকে। শত্রুদের ওপর আক্রমণকারী রাজার নিজ এবং বিপক্ষের ত্রিবিধ শক্তি ভালোভাবে বিচার করা উচিত। শত্রু থেকে অধিক উৎসাহী, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাজাই সফলভাবে আক্রমণ করতে সক্ষম। এর বিপরীত অবস্থা হলে আক্রমণের চিন্তা ত্যাগ করা উচিত। রাজার নিজের সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, অরণ্যবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল সংগ্রহে থাকা উচিত। এরমধ্যে মিত্রবল ও ধনবল সর্বশ্রেষ্ঠ। দেশ-কালের আনুকূল্য থাকলে রাজা রাজোচিত গুণাদিযুক্ত হয়ে সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করবেন। যুদ্ধের সময় পরামর্শ করে নানাপ্রকার ব্যূহ নির্মাণ করবে। শুক্রাচার্যের গ্রন্থে এই বিধান আছে। গুপ্তচর দ্বারা শত্রুর এবং নিজের সৈন্যের গুণাগুণ নির্ধারণ করে নিজ বা শত্রুর দেশে যুদ্ধ আরম্ভ করবে। রাজার উচিত সৈন্যদের পারিতোষিক ইত্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা এবং বলশালী ব্যক্তিদের সেনাদলে নিয়োগ করা। যে রাজা এইসব বিষয় চিন্তা করে ঠিকমতো আচরণ ও প্রজাদের ধর্মপূর্বক পালন করে, সে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যায়। পুত্র ! তুমিও এইরূপ ইহলোক ও পরলোকে সুখ পাবার জন্য সর্বদা প্রজাদের হিতে ব্যাপৃত থাকবে। ভীষ্ম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিদুর তোমাকে এ সকল উপদেশই দিয়েছেন। আমারও তোমার ওপর ভালোবাসা আছে, তাই আমিও তোমাকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি ; এই সব ব্যাপার যথোচিতভাবে পালন করবে। এরদ্বারা তুমি প্রজাদের প্রিয় হবে এবং স্বর্গেও সুখ লাভ করবে। রাজা এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক অথবা ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করুন ; উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়।*

—০—

প্রজাবর্গের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের বনে যাওয়ার অনুমতি নেওয়ার সময় ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাদের কাছে যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ

যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজ ! আপনি যেমন বলছেন, সেই মতোই কাজ করব। এখন আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন। ভীষ্ম স্বর্গগমন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়েছেন, বিদুর এবং সঞ্জয়ও আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন আমাকে উপদেশ দিতে আর কে থাকছেন ? আমার হিতের কথা চিন্তা করে এখন আপনি যা উপদেশ দিচ্ছেন, সেই অনুসারে আমি সব কাজ করব।

ধর্মরাজের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! এখন থাক, কথা বলায় আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হচ্ছে। এবার আমি যাওয়ার অনুমতি চাইছি।' এই বলে তিনি গান্ধারীর মহলে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে আসনে উপবিষ্ট হলে ধর্মপরায়ণা গান্ধারী দেবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রাণনাথ ! মহর্ষি ব্যাস নিজে এসে আপনাকে বনে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতিও পাওয়া গেছে। কবে আপনি বনগমন করবেন ?'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—গান্ধারী ! বনে যাওয়ার আর বেশি দেরি নেই। আমার ইচ্ছা প্রজাদের ডেকে আমার মৃত পুত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু ধন দান করি।

এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নিজের চিন্তাধারা জানালেন। যুধিষ্ঠির তাঁর নির্দেশানুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। তারপর (রাজার খবর পেয়ে) কুরুজাঙ্গাল দেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে এসে উপস্থিত হল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে নগর ও প্রান্তের প্রজাদের উপস্থিত দেখে বললেন—'সজ্জনগণ ! আপনারা এবং কৌরবরা চিরকাল একসঙ্গে বসবাস করেছেন। আপনাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ স্নেহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আপনারা সর্বদাই একে অপরের হিতে ব্যাপৃত রয়েছেন। আমি এখন আপনাদের কিছু নিবেদন করতে চাই। বিনা বিচারে কৃপা করে তা স্বীকার করুন। আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মহর্ষি ব্যাস এবং কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি আমরা পেয়েছি। এবার আপনারাও আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন, এতে আর অন্য কিছু চিন্তা করবেন না। আপনাদের সঙ্গে আমার যে প্রীতি-সম্পর্ক চিরকাল ধরে চলে আসছে, আমার মনে হয় অন্য দেশের প্রজাদের সঙ্গে রাজাদের তেমন সম্পর্ক কদাচিৎ হয়। এই বৃদ্ধাবস্থা আমাকে ও গান্ধারীকে অত্যন্ত কাহিল করে দিয়েছে, তারপর উপবাস করে আমরা দুজনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমি অত্যন্ত সুখে ছিলাম। আমার মনে হয় দুর্যোধনের রাজ্যকালে আমার এত সুখ হয়নি। একে তো আমি জন্মান্ধ, আর বৃদ্ধ হয়েছি ; তারপর আমার পুত্ররাও যুদ্ধে নিহত (সেই শোক কখনো দূর হয় না)। এই অবস্থায় বনে যাওয়া ব্যতীত আমার কল্যাণের আর কী উপায় থাকতে পারে ? অতএব আপনারা আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।'

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত কুরুজাঙ্গাল নিবাসী সকল মানুষেরই অশ্রুধারা বইতে লাগল, তাঁরা সকলেই দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তাদের কোনো উত্তর দিতে না দেখে ধৃতরাষ্ট্র আবার বলতে লাগলেন—'ভ্রাতাগণ ! মহারাজ এই পৃথিবী যথাবিহিত পালন করেছিলেন। তারপর ভীষ্মের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে রাজা বিচিত্রবীর্য রাজত্ব করেন। তিনি যেভাবে রাজ্য রক্ষা করেছিলেন, আপনারা সকলেই তা অবগত আছেন। তারপর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু বিধিবৎ এই রাজ্য পালন করেছেন, তা-ও আপনারা জানেন। তাঁর প্রজাপালনরূপ গুণের জন্যই তিনি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পাণ্ডুর পরে আমি ভালো-মন্দ যেমনই হোক, সেবা করেছি। সেই সময় আমি আপনাদের কাছে যে অপরাধ করেছি, তারজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। দুর্যোধন যখন নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করেছিল, তখন সেও আপনাদের কোনো ক্ষতি করেনি (শুধু পাণ্ডবদের সঙ্গেই অন্যায় ব্যবহার করেছিল)। কিন্তু তার দুর্বুদ্ধির অপরাধ ও অভিমানে এবং আমার কৃত অন্যায়ে অসংখ্য রাজার মহা সংহার হয়েছে। সেই সময় আমার দ্বারা ভালো-মন্দ যা কিছু হয়েছে, সেসব আপনারা ভুলে যান ; আমি হাত জোড় করে সেই প্রার্থনা করছি। আমাকে বৃদ্ধ, দুঃখী এবং প্রাচীন রাজাদের উত্তরাধিকারী মনে করে ক্ষমা করুন। এই বেচারি তপস্বিনী গান্ধারীও আমার সঙ্গে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। আমরা দুজনেই বৃদ্ধ এবং পুত্র শোকে কাতর—একথা জেনে আপনারা আমাদের ক্ষমা করে বনে যাওয়ার

অনুমতি দিন। আপনাদের কল্যাণ হোক। আমরা দুজনে আপনাদের শরণাগত। এই কুরুকুলভূষণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আপনাদের রাজা, ভালো-মন্দ—সব সময়ে আপনারা এঁর ওপর কৃপা দৃষ্টি বজায় রাখবেন। লোকপালদের ন্যায় মহা তেজস্বী, ধর্ম ও অর্থের মর্মজ্ঞ ভীমসেন ইত্যাদি চার ভাই যাঁর মন্ত্রী, সেই রাজা যুধিষ্ঠির কখনো সংকটগ্রস্ত হন না ; তবুও আপনারা তাঁর জন্য খেয়াল রাখবেন। সমস্ত জগতের প্রভু ভগবান ব্রহ্মার ন্যায় এই মহা তেজস্বী যুধিষ্ঠির আপনাদের যথাবিহিত পালন করবেন। আমি এঁকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করছি এবং আপনাদেরও এঁর হাতে সমর্পণ করছি। আপনারা অত্যন্ত গুরুভক্ত, তাই আমি হাত জোড় করে সকলকে প্রণাম করছি। আমার পুত্রদের বুদ্ধি চঞ্চল ছিল, তারা লোভী এবং স্বেচ্ছাচারী ছিল, তাদের অপরাধের জন্য আমি ও গান্ধারী উভয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।'

ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে বলায় নগর ও প্রান্তের সকল ব্যক্তি চক্ষে অশ্রু নিয়ে একে অপরের দিকে দেখতে লাগলেন। কেউ কোনো উত্তর দিলেন না।

শাম্ব নামক ব্রাহ্মণের প্রজাদের হয়ে উত্তর প্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কুরুরাজের করুণাপূর্ণ কথা শুনে সেখানে একত্রিত সকলে চাদর ও হাত দিয়ে নিজেদের মুখ ঢেকে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। নিজের সন্তানকে বিদায় দেওয়ার সময় পিতামাতার যত দুঃখ হয়, কুরুজাঙ্গালনিবাসী মানুষেরাও ততটাই দুঃখিত হল। তারা শোকসন্তপ্ত হয়ে নিজেদের শূন্য হৃদয়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রবাসজনিত দুঃখ ধারণ করে হতবাক হয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে সেই বিয়োগব্যথা প্রশমিত করে সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করল। তারপর একমত হয়ে তারা এক ব্রাহ্মণের ওপর রাজার কথার উত্তর দেবার ভার সমর্পণ করল। সেই ব্রাহ্মণদেবতা সদাচারী, সকলের মাননীয় এবং অর্থজ্ঞানে নিপুণ ছিলেন। তাঁর নাম শাম্ব। তিনি ঋগ্বেদের বিদ্বান, নির্ভীক বক্তা এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি উঠে মহারাজকে সম্মান জানিয়ে এবং সমস্ত সভাকে প্রসন্ন করে বলতে আরম্ভ করলেন—'রাজন্ ! এখানে উপস্থিত সকল ব্যক্তি তাদের কথা জানাবার সমস্ত ভার আমার ওপর ন্যস্ত করেছেন, তাই আমি তাঁদের কথা আপনাকে নিবেদন করছি। আপনি কৃপা করে শুনুন। মহারাজ ! আপনি যা বলেছেন, তা সবই ঠিক ; তাতে বিন্দুমাত্র অসত্য নেই। আমাদের সঙ্গে আপনাদের নিঃসন্দেহে ঘনিষ্ঠ স্নেহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই রাজবংশে কখনো এমন রাজা হননি, যিনি শাসনকালে প্রজাদের প্রিয় ছিলেন না। আপনারা আমাদের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পালন করেছেন। রাজা দুর্যোধনও কখনো আমাদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেননি। পরম ধর্মাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেব আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, আপনি তাই করুন ; কারণ তিনি আমাদের সকলের পরম গুরু। আপনার বিহনে আমরা অনেকদিন দুঃখ ও শোকে ডুবে থাকব। আপনার শত শত গুণের স্মৃতি আমরা কখনো ভুলব না। মহারাজ শান্তনু, রাজা চিত্রাঙ্গদ এবং ভীষ্মদ্বারা সুরক্ষিত আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য যেভাবে এই পৃথিবী পালন করেছিলেন এবং আপনার তত্ত্বাবধানে থেকে রাজা পাণ্ডু যেভাবে এই রাজ্য রক্ষা করেছিলেন, আপনার পুত্রও আমাদের সেইভাবে পালন করেছেন। তিনি আমাদের একটুও কষ্ট দেননি। আমরা তাঁকে পিতার মতো বিশ্বাস করতাম এবং তাঁর রাজ্যে অত্যন্ত সুখে জীবন কাটিয়েছি, আপনি একথা জানেন। ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির বড় বড় দক্ষিণা প্রদান করে প্রাচীনকালের পুণ্যাত্মা রাজর্ষি কুরু ও সংবরণ প্রমুখ এবং রাজা ভরতের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। এঁদের রাজত্বে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কোনো দোষ নজরে পড়ে না। তাঁদের রাজ্যে আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আমরা সর্বদা সুখেই থেকেছি। আপনার অথবা আপনার পুত্রের কোনো সূক্ষ্ম অপরাধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। মহাভারত যুদ্ধে যে জাতি-ভাই সংহার হয়েছে এবং সেই বিষয়ে আপনি যে দুর্যোধনের অপরাধের আলোচনা করলেন, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে কিছু নিবেদন করতে চাই। কৌরবদের মৃত্যুতে দুর্যোধনেরও কোনো হাত নেই, আপনারও না ; কর্ণ বা শকুনিও কিছু করেননি। আমাদের মনে হয় এ সব দৈবের বিধান, যা কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। পুরুষার্থের দ্বারা

দৈবকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। সেই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্রিত হয়েছিল ; কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং কৃপাচার্য প্রভৃতি কৌরব পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবাদি পাণ্ডব পক্ষের বীরগণ আঠারো দিনেই সকলকে সংহার করে। এরূপ ভয়ংকর সংহার দৈবী শক্তি ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং সেই রাজাদের সংহারের জন্য আপনার পুত্র দুর্যোধন, আপনি, আপনার সেবক, মহাবীর কর্ণ বা শকুনিও কারণ নন। সেই সময় যে হাজার হাজার রাজা মৃত্যুবরণ করেছিল, সে সবই দৈবের কাণ্ড বলে জানবেন। এই ব্যাপারে আর কে কী বলবে। আপনি এই জগতের প্রভু, তাই আমরা আপনাকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মাত্মা বলে মনে করি। আপনার ও আপনার পুত্রদের প্রতি হার্দিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। পরমাত্মা করুন, মহারাজ দুর্যোধন ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে তাঁর সাহায্যকারীসহ যেন বীরগতি প্রাপ্ত হন। আপনিও ধর্মে উচ্চ স্থান এবং পুণ্যলাভ করুন। আপনি সমস্ত ধর্ম সঠিক জানেন, তাই উত্তম ব্রত অনুষ্ঠানে রত হন। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আগের রাজাদের কাজ ঠিকমতো রক্ষা করছেন। তিনি দীর্ঘদর্শী, কোমল স্বভাববিশিষ্ট এবং জিতেন্দ্রিয়। তাঁর মন্ত্রীরাও উচ্চবিচারের, তাঁদের হৃদয়ও বিশাল। তাঁরা শত্রুদেরও দয়া করেন এবং তাঁরা পরম পবিত্র। এঁরা বুদ্ধিমান এবং আমাদের সর্বদা পুত্রবৎ পালন করেন। তাঁরা পাঁচ ভাই অত্যন্ত পরাক্রমশালী, মহাত্মা এবং পুরবাসীদের হিতে তৎপর। কুন্তী, দ্রৌপদী, উলূপী এবং সুভদ্রাও কখনো কোনো প্রজার সঙ্গে প্রতিকূল ব্যবহার করেন না। প্রজার সঙ্গে আপনার যে ব্যবহার ছিল, যুধিষ্ঠির তা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেছেন। নগর ও প্রান্তের লোকেরা কখনো তাঁকে অবহেলা করতে পারবে না। অতএব মহারাজ ! আপনি যুধিষ্ঠিরের বিষয়ে চিন্তা পরিত্যাগ করুন এবং আপনার ধার্মিক কাজে ব্রতী হন। সমস্ত প্রজার আপনাকে প্রণাম।'

শাম্বের ধর্মানুকূল ও গুণযুক্ত ভাষণ শুনে সমস্ত প্রজা তাঁকে সাধুবাদ দিতে লাগল এবং সকলেই তাঁর কথা অনুমোদন করল। ধৃতরাষ্ট্রও বারংবার শাম্বের কথার প্রশংসা করতে লাগলেন এবং তিনি সমবেত সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়ে ধীরে ধীরে সবাইকে বিদায় জানালেন। তারপর হাত জোড় করে সেই ব্রাহ্মণ-দেবতাকে আপ্যায়ন করলেন এবং গান্ধারীর সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজ মহলে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্ম ও অন্যান্যদের শ্রাদ্ধকর্ম করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর রাত্রি প্রভাত হলে অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের মহলে

পাঠালেন। রাজার নির্দেশে মহাতেজস্বী বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, আগামী কার্তিক পূর্ণিমাতে তিনি বনযাত্রা করবেন। এখন তোমার কাছে কিছু অর্থ চাইছেন। তাঁর ইচ্ছা মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক এবং তাঁর মৃত পুত্রগণ ও সুহৃদগণের শ্রাদ্ধ করে তাঁদের নামে দান করা। তোমার অনুমতি থাকলে তিনি জয়দ্রথের শ্রাদ্ধও করবেন।' বিদুরের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। কিন্তু ভীমসেনের হৃদয়ে অত্যন্ত ক্রোধ জমা হয়েছিল। তাঁর দুর্যোধনের অত্যাচারের কথা মনে পড়ছিল। তাই তিনি বিদুরের কথা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর মনোভাব অর্জুন বুঝে গেলেন, তিনি তাই বিনীতভাবে বললেন—'ভ্রাতা ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের জ্যেষ্ঠতাত এবং এখন তিনি বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাওয়ার আগে তিনি ভীষ্ম এবং অন্য সুহৃদদের শ্রাদ্ধ করতে চান ; আপনার

তাতে সহযোগিতা করা উচিত। সৌভাগ্যের কথা যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এখন আমাদের কাছে অর্থ সাহায্য চাইছেন। সময়ের বিপরীত ভাব লক্ষ্য করুন। আগে আমরা যার কাছে কিছু চাইতাম, আজ তিনিই আমাদের কাছে হাত পাতছেন। যিনি সমস্ত পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি আজ বনে যেতে চাইছেন ; সুতরাং আপনি তাঁকে অর্থ দেওয়া ছাড়া অন্য চিন্তা মনে আনবেন না। তাঁরা ইচ্ছা পূর্ণ না করলে আমরা অত্যন্ত কলঙ্কের এবং মহা অধর্মের ভাগী হব। আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরের আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন ; কারণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বরের সমান হয়ে থাকেন।'

অর্জুনের কথা শুনে ধর্মরাজ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ভীমসেন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'অর্জুন ! আমরা নিজেরাই মহাত্মা ভীষ্ম, রাজা সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, রাজর্ষি বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধ করব। আমাদের মাতা কুন্তী কর্ণের পিণ্ডদান করবেন। তারজন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয়, তাঁর উপরিউক্ত মহানুভবদের শ্রাদ্ধ না করাই উচিত। তুমি কি তাঁর সব কর্মগুলি ভুলে গেছ ? ইনিই আমাদের কুলে অগ্নিসংযোগকারী। তাঁর বুদ্ধি এমনই মন্দ যে কপট-দ্যূত আরম্ভ করিয়ে তিনি বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে 'এইবারে আমরা কী কী জিতলাম ?' ভীমকে এইকথা বলতে দেখে রাজা যুধিষ্ঠির তাকে ধমক দিয়ে বললেন—'ভীম ! চুপ করো।'

অর্জুন বললেন—ভ্রাতা ! আপনি আমার বড় এবং গুরুজন, তাই আমি আপনাকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাই না। শুধু এই নিবেদন যে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র আমাদের দ্বারা সর্বতোভাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। সাধু স্বভাবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অন্যের অপরাধ স্মরণ করেন না। বরং সকলের উপকারের কথাই স্মরণে রাখেন।

মহাত্মা অর্জুনের কথা শুনে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির বিদুরকে বললেন—'খুল্লতাত ! আপনি আমার হয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলুন যে তিনি তাঁর পুত্রদের শ্রাদ্ধের জন্য যত অর্থ চান, তা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। আমি আমার ভাণ্ডার থেকে এই অর্থ দেব। তারজন্য ভীমের দুঃখ পাবার কিছু নেই।' বিদুরকে একথা বলে ধর্মরাজ অর্জুনের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। ভীমসেন তখন একটু সংকুচিত হয়ে অর্জুনের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে বললেন—'আপনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে একথাও বলবেন যে আপনার বনবাসে যাওয়ার দুঃখ ভীমের ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে ; তাই সে দুঃখে যা কিছু বলছে বা করছে, তা নিয়ে যেন কিছু না ভাবেন। আমার এবং অর্জুনের যত সম্পত্তি আছে, তার মালিক স্বয়ং মহারাজই। তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী তা ব্যয় করুন এবং ব্রাহ্মণকে দান করুন ! আজ তিনি যেন তাঁর পুত্রাদি ও সুহৃদদের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। আমার শরীর ও অর্থ—এ সবই তাঁর, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলায় বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—''মহারাজ ! আমি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আপনার কথা বলছি। সেই কথা শুনে তিনি আপনার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। মহাতেজস্বী অর্জুন তো তাঁর গৃহ, সম্পত্তি এবং প্রাণ পর্যন্ত আপনার সেবায় সমর্পণ করতে প্রস্তুত। আপনার পুত্র যুধিষ্ঠিরেরও তাই মত। তিনি তাঁর রাজ্য, ধন-প্রাণ, যা কিছু আছে সবই আপনাকে দিয়ে দিতে চান। কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন আগের সমস্ত কষ্টের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত কষ্টে আপনার আদেশ মেনে নিয়েছেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন তাঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে তাঁর মনে আপনার প্রতি সৌহার্দ্যের ভাব উৎপন্ন করে দিয়েছেন। ধর্মরাজ আপনাকে জানিয়েছেন যে 'ভীমসেন পূর্বের বৈরিতা স্মরণ করে যদি কখনো আপনার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে বসেন, তারজন্য আপনি ভীমের ওপর ক্রোধ করবেন না। ভীমসেনের খারাপ ব্যবহারের জন্য আমি ও অর্জুন দুজনে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি প্রসন্ন হোন। আমার যা আছে, আপনিই তার প্রভু। আপনি যত ধনদান করতে ইচ্ছুক, দান করুন। আপনিই আমার রাজ্য ও প্রাণের অধীশ্বর। পুত্রদের শ্রাদ্ধ করুন, ব্রাহ্মণদের জমিদান করুন।' যুধিষ্ঠির একথাও বলেছেন—'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার থেকে নানাপ্রকার রত্ন, গাভী, দাস-দাসী নিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করুন।' তিনি আমাকে বলেছেন—'বিদুর ! আপনি দীন-দুঃখী-কাঙালদের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রচুর অন্ন-পানীয়পূর্ণ ধর্মশালা নির্মাণ করিয়ে দিন এবং গাভীদের খাবার ও জলের জন্য জায়গা তৈরি করিয়ে দিন। সেই সঙ্গে অন্যান্য পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানও করুন।' আমাকে রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন যা বলেছিলেন, সে সবই আপনাকে জানালাম। এবার কী করতে হবে, বলুন।''

বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অত্যন্ত প্রশংসা

করলেন এবং কার্তিক পূর্ণিমাতে বিশাল দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কাজে অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। ভীষ্ম ও অন্যান্যদের শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্র যোগ্য ব্রাহ্মণ এবং শ্রেষ্ঠ ঋষিদের হাজার হাজার সংখ্যায় নিমন্ত্রণ করে তাঁদের অন্ন, পান, গাড়ি, পরিধানের বস্ত্র, মণি, রত্ন, স্বর্ণ, কম্বল, গ্রাম, জমি, ধন ও অলংকার-সহ হাতি ঘোড়া প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। তারপর এক একজন মৃত ব্যক্তির নাম করে সকলের জন্য পৃথক পৃথকভাবে দান করলেন। দ্রোণ, ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, রাজা দুর্যোধন ও অন্য পুত্রদের এবং জয়দ্রথ প্রভৃতি সকল আত্মীয়স্বজনের নাম উচ্চারণ করে সকলের উদ্দেশ্যে দান করলেন। যুধিষ্ঠিরের সম্মতিতে সেই শ্রাদ্ধ-যজ্ঞে বহু ধন ও নানাপ্রকারের রত্ন দক্ষিণা দেওয়া হল। ধর্মরাজের নির্দেশে বহু আজ্ঞাবহ সেখানে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন যে 'বলুন, এদের কী দেওয়া হবে ? সবই প্রস্তুত রয়েছে।' ধৃতরাষ্ট্রের মুখ থেকে কথা নিঃসৃত হতেই দান করা হত। বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে শতের স্থানে সহস্র এবং সহস্রের স্থানে দশ সহস্র দান করা হত। মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে জমি ভরিয়ে দেয়, তেমনই রাজা ধৃতরাষ্ট্র অর্থবর্ষণ করে সমস্ত ব্রাহ্মণদের তৃপ্ত করে দিয়েছিলেন। পরে সকল বর্ণের লোককে নানাপ্রকার খাদ্য-পানীয়ের দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলেন। এইভাবে তিনি পুত্র, পৌত্র এবং পিতৃপুরুষের, এমনকি নিজের ও গান্ধারীরও শ্রাদ্ধ করলেন। বহুপ্রকার দান করে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি দানযজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেই মহাদানযজ্ঞ এইভাবে পূর্ণ হল। এক নাগাড়ে দশ দিন ধরে দান করে তিনি পুত্র ও পৌত্রাদির ঋণ থেকে নিজেকে মুক্ত বোধ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কুন্তী প্রভৃতির সঙ্গে বনগমন এবং কুন্তীর যুধিষ্ঠিরাদিকে বুঝিয়ে গৃহে ফেরত পাঠানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর একাদশ দিনের প্রাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীসহ বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পাণ্ডবদের ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের অভিনন্দিত করলেন। সেইদিন ছিল কার্তিক পূর্ণিমা। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা যাত্রাকালোচিত ইষ্টি (যজ্ঞ) করিয়ে বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করলেন এবং অগ্নিহোত্র সঙ্গে করে রাজমহল থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন ; পরে ফুলের দ্বারা সেই গৃহের পূজা করে তাঁরা ভৃত্যদের অর্থদান করলেন এবং সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করে রওনা হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে কম্পিত দেহে জলপূর্ণ নেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন, অশ্রুতে তাঁর গলা ধরে গিয়েছিল। ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য, ধৌম্য এবং আরও বহু ব্রাহ্মণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁদের পেছন পেছন যেতে লাগলেন। আগে আগে কুন্তী গান্ধারীর হাত ধরে চলছিলেন, গান্ধারীর চোখে কাপড়ের বন্ধনী ছিল। তিনি কুন্তীর কাঁধে হাত রেখে যাচ্ছিলেন আর রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কাঁধে হাত দিয়ে নিশ্চিন্তে চলছিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, শিশুপুত্র কোলে উত্তরা এবং কুরুকুলের অন্য নারীগণ নিজ নিজ পুত্রবধূদের
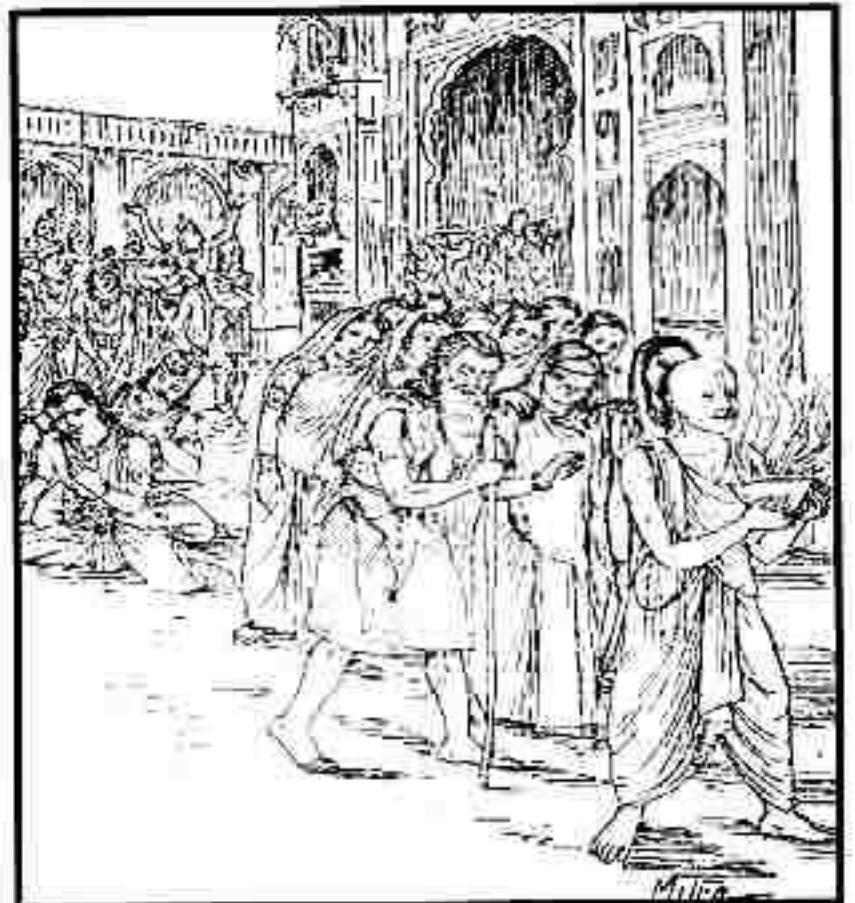
নিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যাচ্ছিলেন এবং দুঃখের আবেগে তাঁরা বিলাপ করছিলেন। কুরুনারীদের ক্রন্দনের ধ্বনি শুনে চারদিক থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নারীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। যেসব রমণী কখনো অন্তঃপুরের বাইরে এসে সূর্য বা চন্দ্র পর্যন্ত দেখেননি,

তাঁরাও কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বনে প্রস্থান করার সময় শোকে ব্যাকুল হয়ে উন্মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে এলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বর্ধমান নামক দ্বার পথে হস্তিনাপুর নগরের বাইরে এলেন। সেখানে এসে তিনি বারংবার সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর সঙ্গে আসা জনগণকে বিদায় জানালেন। বিদুর এবং সঞ্জয় রাজার সঙ্গেই বনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাই তাঁরা দুজন ফিরলেন না ; কিন্তু কৃপাচার্য ও মহারথী যুযুৎসুকে তাঁরা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করে ফিরিয়ে দিলেন। পুরবাসীগণ ফিরে গেলে রাজা যুধিষ্ঠির মহলের নারীদের নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বনের দিকে যেতে থাকা তাঁরা মাতা কুন্তীকে বললেন—'মাতা ! আপনি আপনার বধূদের সঙ্গে নগরে ফিরে যান। আমি মহারাজের সঙ্গে যাব। এই ধর্মাত্মা রাজা তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সুতরাং এঁকে বনে যেতে দিন।' ধর্মরাজের কথা শুনে কুন্তীর চোখ জলে ভরে উঠল, তা সত্ত্বেও তিনি গান্ধারীর হাত ধরে পথ চলতে লাগলেন। যেতে যেতেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ ! তুমি সহদেবকে কখনো অনাদর কোরো না, সে তোমার ও আমার পরমভক্ত। সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি যে কর্ণ, তোমার সেই ভ্রাতাকে সর্বদা স্মরণে রেখো ; কারণ আমারই দুর্বুদ্ধিবশত সেই বীর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। পুত্র এই অভাগিনীর হৃদয় অবশ্যই লৌহনির্মিত, তাই আজ কর্ণকে হারিয়েও এটি শত টুকরো হয়নি। তুমি তোমার ভাইদের নিয়ে তার জন্য দান-পুণ্য করবে। আমার বধূ দ্রৌপদীরও সর্বদা প্রিয়কাজ করবে। ভীম, অর্জুন ও নকুলদের সর্বদা কুশলে রাখবে ; আজ থেকে সমস্ত কুরুকুলের ভার তোমারই ওপর। এখন আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে থেকে তপস্যা করব এবং তাঁদের শ্রীচরণের সেবায় ব্যাপৃত থাকব।'

কুন্তীর এবংবিধ বাক্যে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে তিনি কিছু ভাবলেন ; পরে শোকাকুল হয়ে মাতাকে বললেন—'মাতা ! আপনি এসব কী মনে স্থান দিয়েছেন ? আপনার এমন করা উচিত নয়। আমি এরজন্য অনুমতি দিতে পারবো না। আমাদের প্রতি কৃপা করে ফিরে চলুন। আগে আপনিই বিদুলার প্রদত্ত উপদেশ স্মরণ করিয়ে আমাদের ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালনে উৎসাহিত করতেন। পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখেই আপনার সিদ্ধান্ত শুনে আমরা রাজাদের সংহার করে এই রাজ্য অধিকার করেছি। কোথায় আপনার সেই পরামর্শ আর কোথায় আপনার আজকের এই সিদ্ধান্ত ! আমাদের ক্ষত্রিয় ধর্মে স্থিত হওয়ার উপদেশ দিয়ে আপনি নিজেই তার থেকে সরে যেতে চাইছেন। আমাদের, আপনার এই বধূদের এবং এই রাজ্য ছেড়ে আপনি ওই দুর্গম বনে কীভাবে থাকবেন ? সুতরাং আমাদের কৃপা করুন।'

নিজ পুত্রের এই অশ্রুগদগদ কথা শুনে কুন্তীর চোখে জল ভরে এল। কিন্তু কুন্তী থামলেন না, এগোতেই লাগলেন। তখন ভীমসেন বললেন—'মাতা ! যখন পুত্রদের জয় করা এই রাজ্য ভোগ করার সময় এল, রাজধর্ম পালনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হল, তখন আপনার বুদ্ধি কীভাবে পরিবর্তিত হল ? কী কারণে আপনি আমাদের পরিত্যাগ করে বনে যেতে চান ? যদি বনেই থাকার ছিল, তাহলে বাল্যকালে আমাদের এবং দুঃখ-শোকে কাতর এই মাদ্রীকুমারদের কেন নগরে নিয়ে এলেন ? মাতা ! আমাদের ওপর প্রসন্ন হোন এবং ধর্মযুদ্ধে প্রাপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী উপভোগ করুন।' একথা শুনেও কুন্তী তাঁর বনবাসের সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হলেন না। তাঁর পুত্ররা নানাভাবে বিলাপ করলেও, কুন্তী তাঁদের কথা শুনলেন না। শাশুড়িকে এইভাবে বনবাসে যেতে দেখে দ্রৌপদীও অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন এবং সুভদ্রার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে অনুগমন করতে লাগলেন। কুন্তী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ধৈর্যশীলা ছিলেন, তাই তিনি ক্রন্দনরত পুত্রদের দেখেও মুষড়ে পড়লেন না। পাণ্ডবরা তাঁদের সেবক এবং অন্তঃপুরের নারীদের নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তখন চোখ মুছে কুন্তী তাঁর পুত্রদের বললেন—'মহাবাহু ! তোমাদের কথা ঠিক। পূর্বে তোমরা নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করেছিলে, তাই আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম। পাশা খেলায় তোমরা রাজ্য হারিয়েছিলে, তোমরা সুখ-সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলে, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধু তোমাদের অসম্মান করত ; সেইজন্য আমি তোমাদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিয়েছিলাম। পাণ্ডুর সন্তানেরা যাতে বিনাশ প্রাপ্ত না হয় এবং তোমাদের সুযশ যেন নাশ না হয় সেই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম (এতে আমার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না)। আমি আমার স্বামী মহারাজ পাণ্ডুর বিশাল রাজ্য ভোগ করেছি। আমি নিজের লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিনি। বিদুলার কথা শুনিয়ে তার দ্বারা তোমাদের যে

সংবাদ পাঠিয়েছিলাম, সেসবই তোমাদের রক্ষার জন্য। পুত্র যুধিষ্ঠির ! এখন আমি তপস্যা করে আমার পতির পবিত্র লোকে যেতে চাই। তাই বনবাসে এঁদের সেবা করে তপস্যার দ্বারা এই শরীর শুষ্ক করব। তুমি ভীমসেনদের নিয়ে ফিরে যাও। আমি আশীর্বাদ করছি—তোমার বুদ্ধি ধর্মে স্থিত হোক এবং তোমার হৃদয় আরও উদার হোক।'

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখের গঙ্গাতীরে বিশ্রাম নিতে নিতে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে ভয়ানক তপস্যা করা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কুন্তীর কথা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত কাতর হলেন এবং তাঁকে ফেরাতে সফল না হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণ এবং প্রণাম করে দ্রৌপদীসহ নগরে ফিরে গেলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরের সাহায্য নিয়ে বললেন—'গান্ধারী ! যুধিষ্ঠিরের মাতা কুন্তীকে ফিরে যেতে দাও। যুধিষ্ঠির ঠিক কথাই বলছে। কুন্তী রাজ্যে বাস করে বড় বড় দান এবং তপস্যা করতে সক্ষম। ভ্রাতৃবধূ কুন্তীর সেবা-শুশ্রূষাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট, সুতরাং তুমি ওঁকে গৃহে যাবার নির্দেশ দাও।' রাজার কথায় গান্ধারী দেবী কুন্তীকে সেই সংবাদ জানালেন এবং নিজেও তাঁকে ফিরে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন। কিন্তু ধর্মপরায়ণা সতী কুন্তীদেবী বনবাসের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাই গান্ধারীও তাঁকে ফেরাতে পারলেন না। কুরুকুলের নারীরা কুন্তীর এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে পাণ্ডবদের নিরাশ হয়ে ফিরতে দেখে কাঁদতে লাগলেন। বধূদের নিয়ে পাণ্ডবরা ফিরে গেলে, ধৃতরাষ্ট্র বনের দিকে রওনা হলেন। সেই সময় পাণ্ডবরা অত্যন্ত দীন ও দুঃখ-শোকে মগ্ন ছিলেন। তাঁরা বাহনে করে নারীগণ-সহ নগরে প্রবেশ করলেন। সেইদিন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাসহ সমস্ত হস্তিনাপুর নগর হর্ষ ও আনন্দরহিত, উৎসবশূন্য এবং উদাসীন হয়ে গেল। কারো কোনো উৎসাহ ছিল না। কুন্তী বিহনে পাণ্ডবদের অবস্থা আরও করুণ হয়েছিল।

অন্যদিকে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেদিন বহু দূর পথ যাত্রা করে গঙ্গার তীরে বিশ্রাম নিলেন। সেখানকার তপোবনে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিধিপূর্বক সৃষ্ট অগ্নি যত্র তত্র প্রজ্বলিত ছিল। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও অগ্নি সৃষ্টি করে তার বিধিবৎ আরাধনা করে তাতে আহুতি দিলেন। তারপর সূর্যদেব সন্ধ্যায় অস্ত গেলে তার উপস্থান করলেন। বিদুর ও সঞ্জয় রাজার জন্য কুশের শয্যা প্রস্তুত করলেন। গান্ধারীর জন্যও তাঁর পাশে পৃথক আসন বিছালেন। উত্তম ব্রত পালনকারী কুন্তী গান্ধারীর কাছে কুশাসনে শয়ন করে, তাতেই সুখ মনে করলেন। বিদুর ও অন্যান্য সকলে তাঁদের কাছাকাছি শয়ন করলেন, যাতে তাঁদের আওয়াজ শোনা
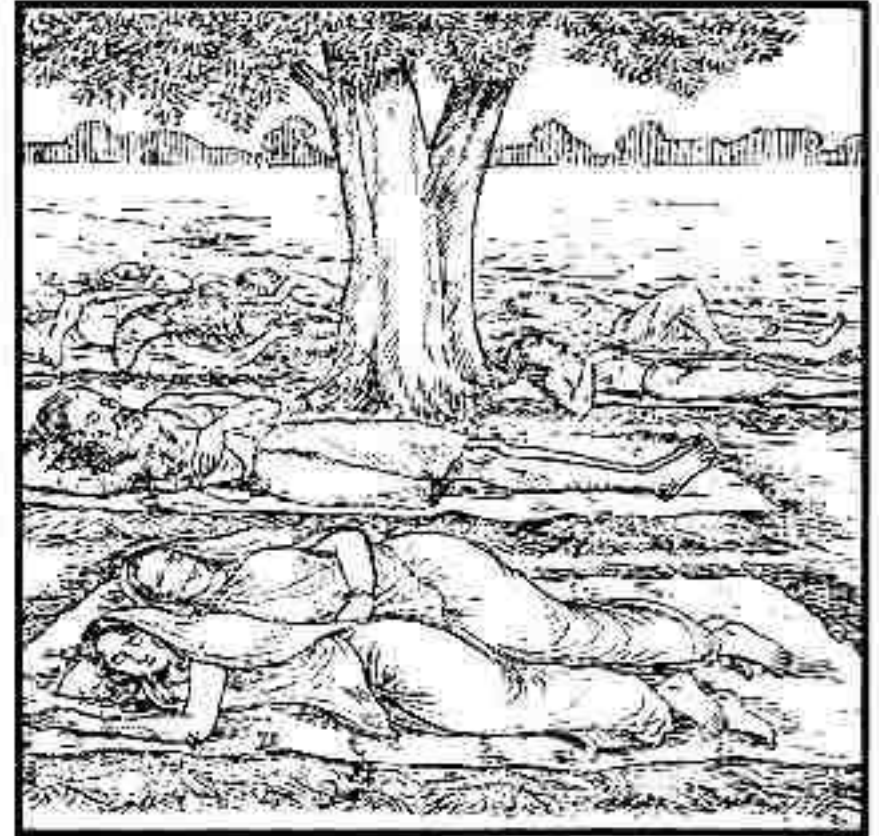
যায়। যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ এবং রাজার সঙ্গে আসা বিপ্রগণও যথাযোগ্য স্থানে শয়ন করলেন। সেই তপোবনে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ স্বাধ্যায় করতেন, তাই বহুস্থানে অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। তাই সেই রাত্রি তাঁদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল। প্রভাত হলে সকলে পূর্বাহ্ণের ক্রিয়া সমাপ্ত করে বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করে উত্তর দিকে এগোতে লাগলেন। কেউ আহার করেননি, সকলেই উপবাসব্রত পালন করছিলেন।

তারপর, দিন কেটে গেলে বিদুরের কথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের বাসযোগ্য ভাগীরথীর পবিত্র তীরে বাস করতে লাগলেন। সেখানকার বনবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বহু সংখ্যায় একত্রিত হয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নানা কথাবার্তার দ্বারা তাঁদের প্রসন্ন করলেন এবং ব্রাহ্মণ ও তাঁদের শিষ্যদের শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট করে বিদায় জানালেন। তারপর সায়ংকালে রাজা ও গান্ধারীদেবী

জলে পুণ্য স্নান করলেন এবং বিদুর ও অন্যান্যেরাও গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে স্নান করে সন্ধ্যা উপাসনা ও সমস্ত শুভক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। স্নানাদির পর কুন্তী বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীদেবীকে গঙ্গা কিনারে নিয়ে এলেন। সেখানে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ রাজার জন্য এক যজ্ঞবেদী প্রস্তুত করেছিলেন, সেখানে অগ্নিস্থাপন করে তিনি বিধিবৎ অগ্নিহোত্র করলেন। নিত্যকর্মের থেকে নিবৃত্ত হয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক নিয়মাদি পালন করে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঙ্গাতীর থেকে কুরুক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে এক আশ্রমে রাজর্ষি শতযূপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। এই রাজর্ষি আগে কেকয়দেশের রাজা ছিলেন। নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি বনে চলে আসেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রমে গেলেন এবং সসম্মানে তাঁর পূজা-অর্চনা করলেন। তারপর তাঁর কাছ থেকে বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করে শতযূপের আশ্রমে এসে থাকতে লাগলেন। মহামতি রাজা শতযূপ ব্যাসদেবের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্রকে বনবাসের সমস্ত বিধি জানালেন। তখন মহামনা ধৃতরাষ্ট্র নিজেই তপ করতে লাগলেন এবং তাঁর অনুচরদেরও তপস্যায় নিয়োজিত করলেন। গান্ধারী দেবীও কুন্তীর সঙ্গে মৃগছাল ও বল্কল ধারণ করে ধৃতরাষ্ট্রের মতোই ব্রত পালন করতে লাগলেন। উভয় নারী ইন্দ্রিয় সংযত করে কায়-মনো-বাক্যে, কর্ম ও নেত্রের দ্বারা কঠোর তপস্যা

করতে লাগলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দেহ শুষ্ক হয়ে গেল, তিনি অস্থি-চর্মবিশিষ্ট হয়ে মস্তকে জটা ও মৃগচর্ম-বল্কল ধারণ করে মহর্ষিদের ন্যায় তীব্র তপস্যায় রত হলেন। তাঁর চিত্তের সমস্ত মোহ দূর হয়েছিল। ধর্ম ও অর্থের জ্ঞাতা এবং উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট বিদুরও সঞ্জয়সহ বল্কল ও চীরবস্ত্র ধারণ করে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন এবং মনকে নিজ বশে রেখে দুর্বল শরীরে ঘোর তপস্যা করতেন।

দেবর্ষি নারদের ধৃতরাষ্ট্রকে তপস্যার মহত্ত্ব জানানো এবং পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অতঃপর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নারদ, পর্বত, মহাতপস্বী দেবল, সশিষ্য মহর্ষি ব্যাসদেব ও অন্যান্য সিদ্ধ মহর্ষি সেখানে এলেন। পরম ধার্মিক রাজর্ষি শতযূপও তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন। কুন্তীদেবী তাঁদের সকলকে যথারীতি স্বাগত-সৎকার করলেন, ঋষিগণও কুন্তীর সেবা ও তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মন ভালো করার জন্য অনেক ধার্মিক কথা শোনালেন। সব কিছু প্রত্যক্ষ দর্শনকারী দেবর্ষি নারদ কোনো কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—'রাজন ! রাজর্ষি শতযূপের পিতামহ মহারাজ সহস্রচিত্ত কেকয়দেশের রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন ছিলেন আর কাউকে ভয় পেতেন না। তিনি তাঁর পরম ধার্মিক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিয়ে তপস্যা করার জন্য বনে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তীব্র তপস্যা করে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন। তপস্যার দ্বারা তাঁর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়েছে। আমি ইন্দ্রলোকে যাতায়াতের পথে অনেক বার সেই পরম প্রসন্ন রাজর্ষিকে দেখেছি। তেমনই ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈলালয়ও তপস্যা বলে ইন্দ্রলোকে গেছেন। রাজা পৃষধ্র ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনিও তপস্যা করে স্বর্গলোক লাভ করেছেন।

থেকে ওখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সংকোচবশত আপনাকে বলতে পারিনি। সৌভাগ্যবশত এই সুযোগ আপনিই এসে গেল। মাতা কুন্তী তপস্যায় রত হয়েছেন, তাঁর মাথার চুল হয়তো জটায় পরিণত হয়েছে, তাঁর বৃদ্ধ শরীর কুশ ও কাশের শয্যায় শয়ন করে বোধহয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে ; তাঁর দর্শন লাভ করলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করব।'

সহদেবের কথা শুনে দ্রৌপদী দেবী রাজার সৎকার করে তাঁকে প্রসন্ন করে বললেন—'প্রভু ! আমি কবে আমাদের রাজমাতা দর্শন করব ? তাঁরা কি এখনও জীবিত আছেন ? এ জীবনে তাঁদের দর্শন লাভ করলে আমি অত্যন্ত খুশি হব। অন্তঃপুরের সকল বধূই বনে যাওয়ার জন্য উৎসুক। সকলের মনে কুন্তী, গান্ধারী ও মহারাজকে দর্শন করার জন্য উৎকণ্ঠা রয়েছে।'

দ্রৌপদীর কথা শুনে ধর্মরাজ সমস্ত সেনাপতিদের ডেকে বললেন—'তোমরা অনেক রথ এবং হাতি ঘোড়ায় সুসজ্জিত সেনা তৈরি করো। আমি বনবাসী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করতে যাব।' তারপর অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদের নির্দেশ দিলেন—'তোমরা সকলে বহু সংখ্যায় নানাপ্রকার পালকি ও বাহন প্রস্তুত করো। (প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে ভরে) বাজার, দোকান, রাজকোষ, কারিগর এবং কোষাধ্যক্ষ—এরা যেন কুরুক্ষেত্রের আশ্রমের দিকে রওনা হয়ে যায়। নগরবাসীদের মধ্যে যারা মহারাজকে দর্শন করতে চায়, তাদেরও বিনাবাধায় সুরক্ষিতভাবে নিয়ে যাওয়া হোক। পাকশালার অধ্যক্ষ এবং রন্ধনপ্রস্তুতকারী প্রয়োজনীয় সব জিনিস গাড়িতে যেন নিয়ে রওনা হয়ে যায়। নগরে ঘোষণা করা হোক যে 'কাল প্রভাতে যাত্রা করা হবে, তাই যারা যাবে, তারা যেন বিলম্ব না করে। পথে আমাদের থাকার জন্য আজই কিছু শিবির তৈরি করা হোক।' এই ভাবে নির্দেশ দিয়ে প্রভাত হতেই ভ্রাতাগণ-সহ রাজা যুধিষ্ঠির নারী ও বৃদ্ধদের সামনে রেখে নগর থেকে প্রস্থান করলেন। নগরের বাইরে তিনি পাঁচ দিন ধরে পুরবাসী মানুষদের জন্য প্রতীক্ষা করলেন। তারপর সকলকে নিয়ে বনে রওনা হলেন।

সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের দর্শন এবং সব ঋষিদের সঙ্গে সঞ্জয়ের পরিচয় করানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর রাজা যুধিষ্ঠির লোকপালদের ন্যায় পরাক্রমশালী অর্জুন ও অন্যান্য বীরদের দ্বারা সুরক্ষিত সেনাদের এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ পেয়েই সকলে রওনা হল। কিছু লোক বাহনে করে, কিছু পদব্রজে রওনা হল। কেউ বেগসম্পন্ন ঘোড়ায়, কেউ স্বর্ণময় রথে, কেউ গজে আবার কেউ উটে চড়ে যাত্রা করল। নগর এবং নগর প্রান্তের লোকেরাও ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করার জন্য নানা বাহনে করে যুধিষ্ঠিরদের অনুসরণ করল। রাজার কথায় সেনাপতি কৃপাচার্যও সেনাসহ আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির বহু ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করলেন। বহু সূত, মাগধ, বন্দি রাজার স্তুতিগান করতে করতে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। রাজার মাথায় শ্বেতছত্র ধারণ করেছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিল বহু রথী সৈন্য। ভীষণকর্মা ভীমসেন এক পর্বতাকার গজরাজে যাচ্ছিলেন। নকুল-সহদেব ঘোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। মহাতেজস্বী অর্জুন শ্বেত অশ্ববাহিত, সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রথে রাজা যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করছিলেন। দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীরা শিবিকায় চড়ে দরিদ্রদের ধন বিতরণ করতে করতে যাচ্ছিলেন, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। বহু বাদ্যের তুমুল ধ্বনিযুক্ত হওয়ায় তাঁদের যাত্রা অত্যন্ত শোভাযুক্ত হয়েছিল। তাঁরা নানা নদী তীরে শিবির স্থাপন করতে করতে এগোতে লাগলেন। মহাতেজস্বী যুযুৎসু এবং পুরোহিত ধৌম্য মুনি যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে হস্তিনাপুর নগর রক্ষায় ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির চলতে চলতে পরম পবিত্র যমুনা নদী পার হয়ে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে দূর থেকেই রাজর্ষি শতযূপ এবং কুরুবংশী ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে পেলেন। আশ্রম দর্শনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সকলেই বাহন থেকে নেমে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পদব্রজে রাজার আশ্রমে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পবিত্র আশ্রমের চারদিকে মৃগের দল দেখা

যাচ্ছিল এবং কলাগাছ সেই স্থানের শোভাবর্ধন করছিল। পাণ্ডবগণ আশ্রমে পৌঁছলে বহু ব্রতধারী তপস্বী কৌতূহলবশত তাঁদের দেখতে সেখানে একত্রিত হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবরগণ ! আমাদের জ্যেষ্ঠতাত কোথায় ?' তাঁরা উত্তর দিলেন—'রাজন্ ! তিনি স্নান করতে, ফুল তুলতে এবং জল আনতে যমুনা নদীর তীরে গেছেন।'

তাঁদের কথা শুনে তখন সকলেই যমুনার দিকে গেলেন। কিছুদূর যেতেই তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রদের ফিরে আসতে দেখলেন। সকলেই তাঁকে দর্শনের আশায় দ্রুত সেইদিকে এগিয়ে চললেন। সহদেব অতি শীঘ্রই কুন্তীর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রিয় পুত্রকে এমতাবস্থায় দেখে কুন্তীও কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও নকুলকে দেখে তিনি আকুল হয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলেন। মাতাকে আসতে দেখে পাণ্ডবরা মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। তারপর চোখের জল মুছে তাঁরা গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র এবং কুন্তীর চরণস্পর্শ করে প্রণাম করার পর তাঁদের হাত থেকে জলপূর্ণ কলস নিয়ে নিলেন। হস্তিনাপুরের সকল লোক এবং অন্তঃপুরের নারীরা তাঁদের দর্শন করলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সকলের নাম জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের কাছে পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হল, তাঁর মনে হল তিনি যেন হস্তিনাপুরের রাজসভাতেই আসীন। দ্রৌপদী ও অন্যান্য রাজবধূরা ধৃতরাষ্ট্রদের প্রণাম করলে তাঁরা আশীর্বাদ জানালেন। তারপর তাঁরা আশ্রমে ফিরে এলেন, তখন মনে হল সেই আশ্রমটি যেন তারায় পরিপূর্ণ আকাশের মতো দর্শকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে আশ্রমে বিরাজমান হলে বহু দেশের মহাভাগ্যশালী তপস্বীগণ পাণ্ডবদের দর্শনের নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—'এখানে আগত লোকেদের মধ্যে যুধিষ্ঠির কে এবং ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, যশস্বিনী দ্রৌপদী দেবী কোথায় ? আমরা সকলের পরিচয় জানতে আগ্রহী।'

তাঁদের এবংবিধ প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় সমস্ত পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী প্রমুখ কুরুকুলের নারীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—'এই স্বর্ণের ন্যায় গৌর, উচ্চ নাসিকা, বিশাল লালিমা যুক্ত নেত্র, সিংহের মতো উপবিষ্ট, ইনি কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। মত্ত গজের ন্যায় চাল চলন, তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, বৃষস্কন্ধ, বিশাল বাহু সমন্বিত, ইনি ভীমসেন। তাঁর পাশে মহাধনুর্ধর, শ্যামবর্ণের তরুণ, সিংহের ন্যায় স্কন্ধ, কমলের ন্যায় নেত্র, ইনি বীরবর অর্জুন। কুন্তীর কাছে যে দুজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ উপবিষ্ট, তাঁরা একসঙ্গে উৎপন্ন নকুল ও সহদেব। রূপ, বল ও শীলতায় এঁদের দুজনের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। নীলকমলের ন্যায় এই শ্যামরূপা সুন্দরী, যিনি মূর্তিমতী লক্ষ্মী, দেবতাদেরও দেবী বলে প্রতীত, তিনি মহারানি দ্রৌপদী। তাঁর পাশে স্বর্ণের থেকেও অতীব কান্তিময়ী চন্দ্রের প্রভার ন্যায় বিরাজমান, ইনি অনুপম প্রভাবশালী চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা। ওইদিকে বিশুদ্ধ স্বর্ণকান্তি সুন্দরী দেবী নাগরাজকন্যা উলূপী বসে আছেন। যাঁর শরীরের রং মধুক-পুষ্পের শোভাকেও হার মানায়—তিনি রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা, এঁরা দুজনেই অর্জুনের পত্নী। এই যে ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণা রাজমহিলা বিরাজমান, ইনি রাজসেনাপতির ভগিনী, ভীমসেনের পত্নী, তাঁর সঙ্গে চম্পকবর্ণা যে সুন্দরী উপবিষ্ট, তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা এবং সহদেবের পত্নী। তাঁর পাশে নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণা নারী, মাদ্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নকুলের পত্নী এবং এই তপ্ত কুন্দনের ন্যায় গৌরবর্ণা তরুণী বালক ক্রোড়ে উপবিষ্ট, ইনি রাজা বিরাটের কন্যা এবং অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা। এঁরা ছাড়া আরও যেসব শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা বিধবা উপবিষ্ট, যাঁদের সীমান্ত সিঁদুর শূন্য—তাঁরা সকলে দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতার পত্নী এবং বৃদ্ধ মহারাজের পুত্রবধূ। এঁদের সকলেরই পতি-পুত্র রণে মৃত হয়েছেন। মহর্ষিগণ ! আপনাদের প্রশ্নের জবাবে আমি প্রধান ব্যক্তিদের পরিচয় জানালাম।'

সঞ্জয়ের কাছে সবার পরিচয় জেনে তপস্বীগণ চলে গেলেন। পাণ্ডবদের সৈনিকেরা আশ্রমের সীমানার বাইরে শিবির স্থাপন করল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে সেই শিবিরে বিশ্রাম নিতে গেল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সঙ্গে কুশলবার্তা বিনিময় করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তা এবং বিদুরের যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি নগর ও নগরপ্রান্তের সমস্ত প্রজা এবং ভ্রাতাসহ কুশলে আছো তো ? তোমার আশ্রয়ে থাকা জীবন-নির্বাহকারী মন্ত্রী, পরিচারক ও গুরুজনেরা নীরোগে আছে তো ? তোমার রাজ্যে এরা নির্ভয়ে বাস করে তো ? তুমি প্রাচীন রাজর্ষি পালিত পুরাতন রীতি-নীতি পালন করো তো ? অন্যায়ভাবে রাজস্ব আদায় কর না তো ? শত্রু-মিত্র ও উদাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করো তো ? তোমার আচরণে ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট থাকেন তো ? পুরবাসী, সেবক, স্বজনদের কথা বাদ দাও, শত্রুরাও তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকে তো ? তুমি শ্রদ্ধা সহকারে দেবতা ও পিতৃপুরুষের পূজা এবং অতিথি সৎকার করো তো ? তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং কুটুম্বেরা ন্যায়পথে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে তো ? নারী-পুরুষ-বালককে কোনো কষ্ট ভোগ করতে হয় না তো ? কেউ জীবিকার জন্য ভিক্ষা করে না তো ? তোমার গৃহে নারীরা সম্মান লাভ করে তো ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে কুশল সমাচার জানতে চাইলে ন্যায়বেত্তা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—'রাজন্ ! আমার ওখানে সব কুশল। আপনার তপ, ইন্দ্রিয়সংযম এবং মনোনিগ্রহ ইত্যাদি সদ্‌গুণ বৃদ্ধিলাভ করছে তো ? আমার মাতা কুন্তীর আপনার সেবা করায় কোনো ত্রুটি হচ্ছে না তো ? আমার জ্যেষ্ঠা মাতা, ভয়ানক তপস্যারতা গান্ধারী দেবী তাঁর মহাপরাক্রমশালী মৃত পুত্রদের জন্য আর শোক করেন না তো ? পিতা ! সঞ্জয় কুশলতা সহকারে তপস্যারত আছেন তো ? বিদুর এখন কোথায়, তাঁকে এখনও দেখতে পেলাম না ?'

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! বিদুর কুশলে আছেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় রত। নিরন্তর উপবাসে এবং বায়ুপান করে থাকায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছেন। তাঁর দেহের শিরা-উপশিরা দেখা যায়। এই নির্জন বনে কখনো কখনো ব্রাহ্মণেরা তাঁর সাক্ষাৎ পান।' রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন এই কথা বলছিলেন তখনই মুখে পাথরের টুকরো নিয়ে জটাধারী বিদুরকে দূর থেকে আসতে দেখা গেল। তাঁর উলঙ্গ দেহ ধুলো-বালিতে ভরা, তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল দেখাচ্ছিল। তিনি আশ্রমের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিরে

গেলেন। তা লক্ষ্য করে রাজা যুধিষ্ঠির একাকী তাঁর পেছনে দৌড়লেন। বিদুরকে কখনো দেখা যাচ্ছিল, কখনো তিনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন। এইভাবে তিনি ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলেন আর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর পেছন পেছন এই বলে দৌড়চ্ছিলেন যে, 'পিতৃব্য ! আমি আপনার পরম প্রিয় যুধিষ্ঠির (আপনাকে দর্শন করতে এসেছি)।' এইভাবে অত্যন্ত নির্জন বনের মধ্যে পৌঁছে বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর একটি গাছকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি এতো দুর্বল হয়েছিলেন যে তাঁর দেহ অস্থিসার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরম বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির তাঁকে চিনতে পেরে 'আমি যুধিষ্ঠির'—বলে তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌঁছে যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম করলেন।

তখন মহাত্মা বিদুর একাগ্রচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে, শরীর শরীরে, প্রাণকে প্রাণে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে ইন্দ্রিয়াদিতে মিশিয়ে তাঁর সঙ্গে একাকার হয়ে গেলেন। এইভাবে নিজ তেজে প্রজ্বলিত হয়ে বিদুর ধর্মরাজের দেহে প্রবেশ করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দেখলেন বিদুরের চোখ আগের মতোই স্থির, তাঁর শরীরও আগের মতোই বৃক্ষের সাহায্যে দণ্ডায়মান, কিন্তু তাঁর দেহে আর চেতনা নেই। অন্য দিকে যুধিষ্ঠির নিজের মধ্যে বিশেষ বল

এবং গুণ অনুভব করলেন। তখন তাঁর মনে বিদুরের দেহ দাহ-সংস্কারের ইচ্ছা হল। সেইসময় আকাশবাণী শোনা গেল—'রাজন্ ! বিদুর সন্ন্যাসধর্ম পালন করতেন, সুতরাং তাঁর দেহ দাহ কোরো না, সেটিই সনাতন ধর্ম। তিনি সান্তানিক নামক লোক লাভ করবেন, অতএব তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।'

সেকথা শুনে যুধিষ্ঠির সেখান থেকে ফিরে এসে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সব কথা জানালেন। বিদুরের দেহত্যাগের অদ্ভুত খবর শুনে তেজস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীম সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'পুত্র ! আমার প্রদত্ত ফল-মূল-জল গ্রহণ করো। মানুষের কাছে তার ব্যবহারের যে বস্তু থাকে, তাই দিয়েই অতিথির সৎকার করা উচিত।' তাঁর কথা শুনে যুধিষ্ঠির 'যথা আজ্ঞা' বলে তাঁর নির্দেশ স্বীকার করে তাঁর প্রদত্ত ফল-মূল নিয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে আহার করলেন। তারপর সকলে বৃক্ষের নীচে শয়ন করে রাত্রি কাটালেন।

—০—

যুধিষ্ঠিরাদির ঋষিদের আশ্রম পরিদর্শন এবং মহর্ষি ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা প্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পরদিন প্রভাতে রাজা যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্নের নিত্য নিয়মাদি সম্পূর্ণ করে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে মুনিদের আশ্রম দেখতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর চার ভ্রাতা, অন্তঃপুরের নারীগণ, পরিচারক এবং পুরোহিতও গেলেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলেন—বেদীর ওপর আগুন রয়েছে এবং ঋষি-মুনিগণ স্নান সমাপ্ত করে আগুনে আহুতি প্রদান করছেন। কোনো কোনো স্থানে দ্বিজগণ মনোহর ধ্বনিতে বেদের স্বাধ্যায় দ্বারা আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি করছেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় তপস্বীগণের জন্য আনীত স্বর্ণ, তাম্রকলস, মৃগচর্ম, কম্বল, কমণ্ডলু, থালা ইত্যাদি তাঁদের প্রদান করলেন। তাঁর কাছে যে যা চাইল, তিনি তাকে তাই দিলেন। এইভাবে নানাস্থানে ঘুরে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমে এসে তিনি দেখলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যকর্মের পর গান্ধারীর সঙ্গে শান্তভাবে উপবিষ্ট এবং কিছু দূরে শিষ্টাচার পালনকারী মাতা কুন্তী শিষ্যার ন্যায় বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। যুধিষ্ঠির নিজের নাম বলে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বসার অনুমতি দিলে তিনি কুশাসনে বসলেন। ভীমসেন প্রভৃতি সকলেই তাঁকে প্রণাম করে তাঁর নির্দেশে বসলেন। এঁরা বসার পর কুরুক্ষেত্র নিবাসী শতযূপ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ এবং মহাতেজস্বী ব্যাস দর্শন দিলেন। ব্যাসদেবের সঙ্গে অনেক দেবর্ষি এবং শিষ্যবৃন্দও ছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতা-গণসহ উঠে তাঁদের প্রণাম করলেন। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বসার অনুমতি দিলেন এবং তাঁর জন্য কালো মৃগচর্ম আচ্ছাদিত যে কুশাসন পাতা হয়েছিল, তাতে উপবেশন করলেন। পরে ব্যাসদেবের নির্দেশে অন্য ঋষি- মহর্ষিগণও কুশাসনে উপবেশন করলেন।

তারপর সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! তোমার তপস্যা ঠিকমতো চলছে তো ? বনবাসে তোমার মন লাগছে তো ? এখন আর তোমার মনে পুত্রশোক নেই তো ? তোমার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্মল হয়েছে তো ? তুমি তোমার বুদ্ধিকে দৃঢ় করে বনবাসের কঠোর নিয়মাদি পালন করছো তো ? আমার বধূমাতা গান্ধারী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সে ধর্ম ও অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং জন্ম-মৃত্যুতত্ত্বও জানে ; সে শোকগ্রস্ত হয় না তো ? আর কুন্তী—যে তার পুত্রদের মমতা ত্যাগ করে গুরুজনের সেবায় ব্যাপৃত হয়েছে, অহংভাব ত্যাগ করে তোমাদের সেবা করছে তো ? তুমি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে সান্ত্বনা দিয়েছো তো ? এদের দেখে তুমি খুশি হয়েছো তো ? এদের প্রতি তোমার মন প্রসন্ন তো ? তোমার হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ হয়েছে তো ? মহারাজ ! কারো প্রতি শত্রুতা রেখো না, সত্যভাষণ করো এবং ক্রোধ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করো—এই তিনটি গুণ সর্বপ্রাণীর জন্য শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মহাত্মা বিদুরের পরলোক গমনের সংবাদ তো তুমি জানো। সাক্ষাৎ ধর্মই মাণ্ডব্য ঋষির শাপে বিদুরের রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পরম বুদ্ধিমান, মহাযোগী, মহাত্মা এবং মহামনস্বী ছিলেন। দেবতাদের মধ্যে বৃহস্পতি এবং অসুরদের মধ্যে শুক্রাচার্যও এতো বুদ্ধিমান ছিলেন না, যেমন ছিলেন কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর। তোমার ভ্রাতা বিদুর দেবতাদেরও দেবতা এবং সনাতন ধর্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ ছিলেন। যিনি সত্য,

ইন্দ্রিয়সংযম, মনোনিগ্রহ, অহিংসা এবং দান ইত্যাদির রূপে বিশ্বের কল্যাণ করেন, সেই তেজস্বী সনাতন ধর্ম বিদুরের থেকে পৃথক নয়। যিনি যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম দিয়েছেন, সেই ধর্ম নামক দেবতাও বিদুরেরই স্বরূপ। যেমন অগ্নি, বায়ু, জল, মাটি ও আকাশের অস্তিত্ব ইহলোকে এবং পরলোকেও আছে, ধর্মও তেমনই উভয় লোকে পরিব্যাপ্ত। ধর্মের গতি সর্বত্র এবং তা সমস্ত জগৎ চরাচর ব্যাপ্ত করে নিত্য স্থিত। যাঁর সমস্ত পাপ ধৌত হয়েছে, সেই সিদ্ধ পুরুষ এবং দেবতাদের দেবতাই ধর্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন। যাকে ধর্ম বলা হয়, তিনিই ছিলেন বিদুর এবং যিনি বিদুর ছিলেন তিনিই এই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির—যিনি এখন তোমার সামনে দাসের ন্যায় দণ্ডায়মান। মহাযোগবলসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমানেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার ভ্রাতা বিদুর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সামনে দেখে এঁরই দেহে প্রবিষ্ট হয়েছেন। এবার তোমাকেও শীঘ্রই কল্যাণের ভাগী করব। পুত্র ! এখন আমি তোমার সংশয় দূর করতে এসেছি। যে কাজ পূর্বকালে কোনো মহর্ষি আজ পর্যন্ত করেননি, সেই চমৎকারপূর্ণ কাজ আমি আজ তোমাদের প্রত্যক্ষ করে দেখাবো। আজ আমি তোমাকে আমার তপস্যার আশ্চর্যজনক প্রভাব দেখাচ্ছি। বলো, তুমি কোন অভীষ্ট বস্তু আমার কাছ থেকে পেতে চাও ? যদি কাউকে দেখতে, শুনতে বা স্পর্শ করতে তোমার ইচ্ছা হয় তো বল, আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করব।'

———०———

ব্যাসদেবের কাছে গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত পুত্রাদিকে দর্শন করানোর জন্য অনুরোধ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে পাণ্ডবদের থাকাকালীন পরম তেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেব যে আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখাবার শপথ করেছিলেন, তা কীরূপ ছিল, কৃপা করে বলুন। রাজা যুধিষ্ঠির পুরবাসী-সহ কতদিন বনে ছিলেন ? তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্ত এবং অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে কী আহার করতেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে নানাপ্রকার আহার করতেন এবং তাঁর আশ্রমে সুখে থাকতেন। তাঁরা একমাস সেই তপোবনে বাস করেছিলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে উপরিউক্ত কথা বলেন, তখন সেই সময় সেখানে আরও অনেক ঋষি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নারদ, পর্বত, দেবল, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু এবং চিত্রসেনও ছিলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সেই সব মহাত্মাদেরও স্বাগত-সম্ভাষণ জানান। তাঁরা উত্তম আসনে উপবেশন করলে পাণ্ডব-সহ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও আসন গ্রহণ করেন। গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী এবং অন্যান্য নারীগণও নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। তখন সেই স্থানে নানা ধর্মবিষয়ক আলোচনা হতে লাগল। আলোচনার শেষে বক্তাশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী, বেদবিদ মহর্ষি ব্যাস প্রসন্ন হয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'মহারাজ ! তুমি এবং গান্ধারী নিরন্তর মৃত পুত্রদের শোকে দগ্ধ হচ্ছ, তোমাদের হৃদয়ে সর্বদা দুঃখের যে জ্বালা রয়েছে, আমি তা জানি। কুন্তী এবং দ্রৌপদীর অন্তরেও সেই দুঃখ আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী তার পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর যে তীব্র দুঃখ সহ্য করছে, তা আমার অজানা নয়। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সকলের এখানে আসার খবর শুনেই আমি তোমাদের মানসিক সন্দেহ দূর করার জন্যই এখানে এসেছি। দেবতা, গন্ধর্ব এবং মহর্ষিগণ আজ আমার চিরসঞ্চিত তপস্যার প্রভাব দেখুন। মহারাজ ! বলো, তোমার কোন্ কামনা আমি পূর্ণ করব ? আজ আমি তোমাকে মনোবাঞ্ছিত বর দিতে প্রস্তুত। তুমি আমার তপস্যার ফল দেখো।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—মুনিশ্রেষ্ঠ ! আজ আপনার মতো সাধু-পুরুষদের সমাগম হয়েছে—আমার প্রতি আপনার এ মহান অনুগ্রহ। আমি এতে নিজেকে ধন্য মনে করছি, আমার জীবন সার্থক। আপনাদের দর্শনে আমি যে পবিত্র হয়েছি, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে একটি সংশয় আছে—মহাভারত যুদ্ধে আমার যে পুত্র ও পৌত্রেরা নিহত হয়েছে, তাদের কী গতি হবে ? তাদের স্মরণ করে আমার হৃদয় সর্বদা সন্তপ্ত থাকে। আমার পাপী পুত্র পৃথিবীর রাজ্য পাওয়ার লোভে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের সঙ্গে বিশাল সৈন্যদের হত্যা করিয়ে সমস্ত কুলকে সংহার করেছে—এই সব বিষয় নিরন্তর স্মরণ করে আমি অনুতাপের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি। দুঃখ শোকের আঘাতে এক মুহূর্তের জন্যও আমি শান্তি

পাচ্ছি না।

রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বিলাপ শুনে গান্ধারীর শোক পুনর্জীবিত হল। তিনি পুত্র শোকে অধীর হয়ে শ্বশুরের কাছে হাত জোড় করে বললেন—'মুনিবর ! মৃত পুত্রদের জন্য শোক করতে করতে এই মহারাজের ষোলো বছর কেটে গেছে ; কিন্তু এখনো তিনি শান্তিলাভ করেননি। পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়ে সর্বদা হাহাকার করে থাকেন। রাতভোর তাঁর চোখে নিদ্রা আসে না (সুতরাং একবার এঁকে তাঁর পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন, তাহলে তাঁর দুঃখ কমবে)। আপনি নিজ তপোবলে নতুন লোক সৃষ্টি করতে সক্ষম ; তাই রাজাকে তাঁর পরলোকবাসী পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো আপনার কাছে কোনো সমস্যার বিষয় নয়। দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণা আমার সমস্ত পুত্রবধূদের মধ্যে সব থেকে প্রিয়। এরও ভাই-বন্ধু-পুত্র সকলেই মারা গেছে, তাই এও অত্যন্ত শোকমগ্ন থাকে। সর্বদা কল্যাণময় কথা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভগিনী সুভদ্রাও অভিমন্যু-বধে শোক-সন্তপ্ত হয়ে আছে ; আর এই ভূরিশ্রবার পত্নী, সেও স্বামীর মৃত্যুতে বড়ই দুঃখে আছে। এই মহারাজের যে শতপুত্র রণাঙ্গণে নিহত হয়েছে, তাদের শত পত্নীও এখানে উপস্থিত। এই সব আমার বিধবা পুত্রবধূরা দুঃখ ও শোকের আঘাত সহ্য করে আমাদের শোককে আরও বাড়িয়ে তুলছে। আমার মহাত্মা শ্বশুর ভীষ্ম এবং মহারথী সোমদত্ত কোন্ গতি লাভ করবেন, এই মহা সন্দেহ দূর হচ্ছে না। মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি এমন কৃপা করুন যাতে এই মহারাজের, আমার আপনার বধূ মাতা কুন্তীরও শোক দূরীভূত হয়।'

গান্ধারী যখন এই কথাগুলি বলছেন, তখন কুন্তী গুপ্তভাবে জাত সূর্যসম তেজস্বী তাঁর পুত্র কর্ণকে স্মরণ করলেন। ভগবান ব্যাসদেব তাঁর দুঃখ দেখে বললেন—'পুত্রী ! তোমার যদি কিছু বলার থাকে, তবে বলো।' তাঁর কথা শুনে কুন্তী দেবী মাথা নত করে শ্বশুরকে প্রণাম করলেন এবং লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—'মুনিবর ! আপনি আমার শ্বশুর, আমার দেবতারও দেবতা ; সুতরাং আমার কাছে দেবতার থেকে বড়। আমি আপনার কাছে (নিজের জীবনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করছি) সত্য কথা জানাচ্ছি, শুনুন। কোনো এক সময়—পরম ক্রোধী মহর্ষি দুর্বাসা আমার পিতার কাছে ভিক্ষার জন্য আসেন। আমি সেবা দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করি। আমার আচরণ ও হৃদয় শুদ্ধ ছিল। তাঁর ক্রোধের কোনো স্থান আমি রাখিনি, আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে বরপ্রদান করেন, তিনি বলেন—'আমার প্রদত্ত বর তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।' তাঁর কথা শুনে শাপের ভয়ে আমি বলি—'আপনার আদেশ আমি মেনে নেব।' তখন তিনি বলেন—'ভদ্রে ! তুমি যে যে দেবতাকে আবাহন করবে, তাঁরা সকলেই তোমার অধীন হবেন।' এই বলে তিনি অন্তর্ধান করেন। তাঁর কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হই, কোনো অবস্থাতেই আমি তাঁর বরদানের কথা ভুলতে পারি না। একদিন আমি আমার মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই সময় সূর্যদেবের উদয় হয়। মহর্ষি দুর্বাসার কথা স্মরণ করে আমি তাঁর দিকে আকাঙ্ক্ষাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। ভগবান সূর্য তখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি দুটি দেহ ধারণ করেছিলেন, একটির দ্বারা সমস্ত ভুবন আলোকিত করে ছিলেন, অন্যটির দ্বারা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন। সূর্যদেবকে সেইরূপে দেখে আমি কম্পিত হই। তিনি আমাকে বলেন—'দেবী ! আমার কাছে বরপ্রার্থনা করো' ; আমি তাঁকে প্রণাম করে বলি—'সূর্যদেব ! আমি কিছু চাই না, আপনি কৃপা করে চলে যান।' তিনি বলেন—'দেবী ! আমাকে আবাহন করলে, তা ব্যর্থ হয় না। তুমি কোনো একটি বর প্রার্থনা করো, নাহলে আমি তোমাকে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে ভস্ম করে ফেলব।' তখন আমি বললাম—'প্রভু ! আমার একটি আপনার মতো পুত্র হোক।' এই কথা বলতেই সূর্যদেব আমাকে মোহিত করে নিজ তেজের দ্বারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হলেন এবং বললেন—'দেবী ! তোমার একটি পুত্র হবে।' তারপর তিনি আকাশে চলে গেলেন। আমি তখন থেকে পিতার কাছে এই খবর লুকিয়ে রাখার জন্য মহলের ভেতরেই থাকতে আরম্ভ করি এবং যখন আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন গোপনে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিই। কর্ণই আমার সেই পুত্র। তার জন্মের পর আমি ভগবান সূর্যদেবের কৃপায় কন্যাভাব প্রাপ্ত হই। আমার সেই কাজ পাপ হোক বা অপাপ, আমি আপনাকে জানালাম। যদি পাপ হয় আপনিই তা দূর করতে পারেন। এখন আমি সেই পুত্র কর্ণকে দেখতে চাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের কথাও আপনি জানেন, সুতরাং তাঁর ইচ্ছাও এখন পূর্ণ করা উচিত।'

কুন্তীর সব কথা শুনে শ্রেষ্ঠ বেদবিদ মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন—'পুত্রী ! তুমি সত্য কথাই বলেছ। এসবই হওয়ার ছিল ; এতে তোমার কোনো অপরাধ নেই ; কারণ

তখন তুমি নিতান্ত বালিকা ছিলে। দেবতাগণ অণিমাদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন হন, তাঁরা অন্যের দেহে প্রবেশ করতে পারেন। তাঁরা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ এবং হর্ষোৎপাদন দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করতে সক্ষম। দেবধর্মের দ্বারা মনুষ্য ধর্ম দূষিত হয় না—এই কথা জেনে তুমি তোমার মানসিক চিন্তা ত্যাগ করো।'

ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের পূর্বজন্মের পরিচয় এবং ব্যাসদেবের মৃত বীরদের উপস্থিত করে তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো

মহর্ষি ব্যাস তখন গান্ধারীকে বললেন—'কন্যা গান্ধারী ! আজ রাত্রে তুমি তোমার পুত্রগণ ও ভ্রাতাগণকে দর্শন করবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে এবং দ্রৌপদী তার পিতা, পুত্র এবং ভ্রাতাদের দর্শন করবে। তোমাদের সেই মহাত্মা ক্ষত্রিয় ব্যক্তিদের জন্য শোক করা উচিত নয় ; কারণ এরা সব ক্ষত্রিয়ধর্মে তৎপর থেকে মৃত্যুলাভ করেছে। এসবই দেবতাদের কাজ এবং এইভাবেই হওয়ার ছিল ; সব দেবতাই তাঁদের নিজ নিজ অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গন্ধর্বদের রাজা ধৃতরাষ্ট্রই তোমার পতিরূপে ইহলোক অবতীর্ণ হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান বিষ্ণুর অংশে মহারাজ পাণ্ডু জন্ম নিয়েছিল। বিদুর এবং যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশাবতার, দুর্যোধনকে কলিযুগ এবং শকুনিকে দ্বাপর বলে জেনো। দুঃশাসন ইত্যাদি সকল ভ্রাতারা রাক্ষস ছিল। মহাবলী ভীম মরুদ্‌গণ থেকে উৎপন্ন। অর্জুনকে পুরাতন ঋষি নর এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলে জেনো, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অবতার। যুদ্ধে যে অভিমন্যুকে ছয় মহারথী মিলে বধ করেছে, সেই সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু সাক্ষাৎ চন্দ্রের অংশ ছিল এবং কর্ণরূপে সাক্ষাৎ সূর্যদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে উৎপন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশ ছিল আর শিখণ্ডী ছিল রাক্ষস। দ্রোণাচার্য ছিল বৃহস্পতির অংশ এবং অশ্বত্থামা ভগবান শংকরের অংশে উৎপন্ন। গঙ্গানন্দন ভীষ্ম মনুষ্যভাব প্রাপ্ত একজন বসু ছিলেন। এইভাবে যেসব দেবতা কার্যবশত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে পুনরায় স্বর্গে গমন করেছেন। তোমাদের হৃদয়ে পারলৌকিক ভয়ের জন্য চিরকাল ধরে যে দুঃখ পূর্ণ হয়ে আছে, তা আজ দূর করে দেব। এখন সকলে গঙ্গাতীরে চলো, সেখানেই সকলে মৃত পুত্রদের দর্শন করবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি ব্যাসের কথায় সকলে হর্ষধ্বনি করতে করতে প্রসন্নতা সহকারে গঙ্গাতীরের দিকে রওনা হলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রী, পাণ্ডব, মুনিগণ এবং গন্ধর্ব সমুদয়ের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গেলেন। ধীরে ধীরে সেই জনসমুদ্র গঙ্গাতীরে পৌঁছল এবং সকলে নিজ নিজ পছন্দমতো স্থান গ্রহণ করলেন। মৃত রাজাদের দর্শন করার আশায় সকলে রাত্রের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর সূর্য অস্ত গেলে, সন্ধ্যা হলে, সকলেই নিজ নিজ সায়ংকালীন নিত্য কর্ম সমাপন করে ভগবান ব্যাসের কাছে গেলেন। ধর্মাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র পবিত্র এবং একাগ্রচিত্তে পাণ্ডব ও ঋষিদের সঙ্গে ব্যাসদেবের কাছে বসলেন। কুরুনারীগণ গান্ধারীর কাছে বসলেন। নগরের লোকেরা নিজ পছন্দমতো স্থানে বসলেন।

তারপর মহাতেজস্বী মুনি ব্যাসদেব ভাগীরথীর পবিত্র
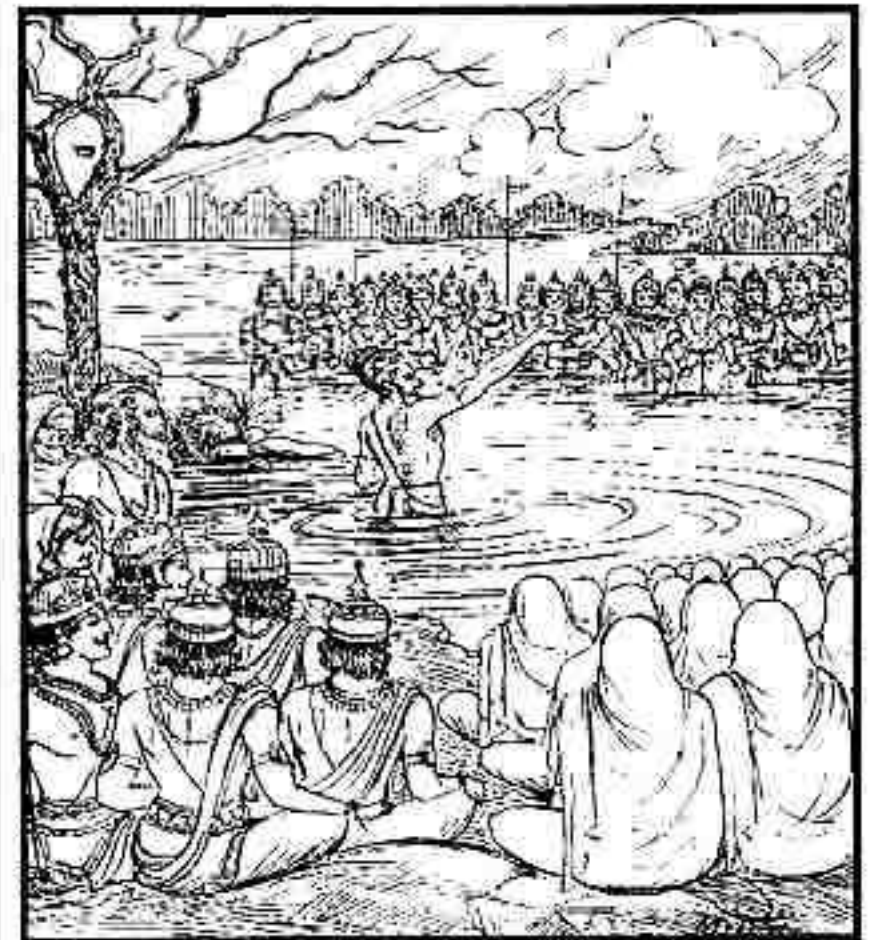
জলে নেমে পাণ্ডব-কৌরব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধা এবং

বিভিন্ন দেশের রাজাদের আবাহন করলেন। সেই সময় জলের মধ্যে সেইরূপ তুমুল ধ্বনি শোনা গেল, যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডব সেনা একত্রিত হলে শোনা গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য হাজার হাজার বীর সৈনিকদের সঙ্গে জলের বাইরে এলেন। পুত্র এবং সেনাসহ রাজা বিরাট, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, কর্ণ, দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, জরাসন্ধ পুত্র সহদেব, ভগদত্ত, জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, শল, শলা, ভ্রাতাগণ সহ বৃষসেন, রাজকুমার লক্ষ্মণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডীর পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, চেকিতান এবং আরও বহু বীর দেদীপ্যমান দেহধারণ করে জল থেকে উত্থিত হলেন। যুদ্ধের সময় সকল বীরগণের যেমন যেমন বেশ, ধ্বজা ও বাহন ছিল, তাঁরা সেইভাবেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দিব্য বসন-ভূষণে সজ্জিত ছিলেন। তাঁরা এই সময় শত্রুতা, অহংকার, ক্রোধ ও মাৎসর্য ত্যাগ করেছিলেন। গন্ধর্বগণ তাঁদের যশ ও বন্দীগণ স্তুতি গান করছিলেন।

সত্যবতীনন্দন মহর্ষি ব্যাস প্রসন্ন হয়ে নিজ তপের প্রভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেন, যশস্বিনী গান্ধারীও দিব্য জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। তাঁরা দুজনে যুদ্ধে মৃত পুত্রদের ও অন্যান্য আত্মীয়দের দেখলেন, সে এক অদ্ভুত, অচিন্ত্য এবং রোমাঞ্চকর দৃশ্য। প্রজারা সকলে অত্যাশ্চর্য হয়ে এক দৃষ্টিতে সেই ঘটনা দেখতে লাগল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের কৃপায় আনন্দমগ্ন হয়ে পুত্রদের দেখতে লাগলেন।

তারপর ক্রোধ ও পাপশূন্য হয়ে সেই সব নরশ্রেষ্ঠ বীর ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা সৃষ্ট উত্তম প্রণালী অনুসারে একে অন্যের সঙ্গে প্রীতি সহকারে মিলিত হলেন। সকলের মনই তখন আনন্দপূর্ণ ছিল। পুত্র পিতা-মাতার সঙ্গে, স্ত্রী পতি-পুত্রের সঙ্গে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন। পাণ্ডবরা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রকে হর্ষান্বিত হয়ে আলিঙ্গন করলেন। পরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁরা কর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সৌহার্দাপূর্ণ আচরণ করলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে গুরুজন, বান্ধব ও পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সারারাত তাঁরা একসঙ্গে থাকায় সকলেই খুব আনন্দিত হলেন। সেই সময় কারো মনে কোনোপ্রকার দুঃখ-শোক-ভয়-উদ্বেগ বা অপযশের স্থান ছিল না। সকলেরই মনের দুঃখ দূরীভূত হয়েছিল। সারারাত একসঙ্গে থাকার পর তাঁরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। ব্যাসদেব তখন তাঁদের সকলকে বিসর্জন দিলেন, তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে গঙ্গার জলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং যে যার প্রাপ্ত লোকে চলে গেলেন। কেউ ব্রহ্মলোকে, কেউ দেবলোকে, কিছু লোক বরুণ, কুবের, সূর্যলোকে গেলেন। কতজন গেলেন রাক্ষস ও পিশাচলোকে। এইভাবে সকলে নানা বিচিত্র গতি প্রাপ্ত করলেন। তাঁরা যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই ফিরে গেলেন।

তাঁরা সকলে অদৃশ্য হলে মহামুনি ব্যাসদেব জলে দণ্ডায়মান বিধবা নারীদের বললেন—'দেবীগণ ! তোমাদের মধ্যে যারা নিজ পতির সঙ্গে যেতে চাও, আলস্য ত্যাগ করে তারা গঙ্গায় ডুব দাও।' তাঁর কথা শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না সতী নারীগণ গঙ্গায় ডুব দিলেন এবং মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে পতিকে অনুগমন করলেন। এইভাবে পতিব্রতা পালনকারী সুশীলা ক্ষত্রিয় নারীগণ দিব্য বস্ত্রাভূষণ পরিহিত হয়ে দিব্যদেহ নিয়ে দিব্য বিমানে করে নিজ নিজ যোগ্য স্থানে গমন করলেন। সেই সময় যার যার মনে যে যে কামনা ছিল, ধর্মবৎসল ভগবান ব্যাস তা পূর্ণ করলেন। সংগ্রামে মৃত রাজাদের পুনরাগমনের বৃত্তান্ত শুনে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা অত্যন্ত আশ্চর্য ও আনন্দিত হলেন। যারা কৌরব-পাণ্ডবদের এই প্রিয়জন সমাগমের বৃত্তান্ত শ্রবণ করবে, তারা ইহলোকে ও পরলোকে প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত করবে এবং অনায়াসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হবে আর কোনো দুঃখ-শোক তাদের স্পর্শ করবে না। যে বিদ্বান ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই প্রসঙ্গ শোনাবে, সে ইহলোকে যশ এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ করবে। স্বাধ্যায়পরায়ণ, তপস্বী, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়, পাপরহিত, সরল, শুদ্ধ, শান্ত, অহিংসক, সত্যবাদী, আস্তিক, শ্রদ্ধাবান, ধৈর্যশীল মানুষ এই আশ্চর্যজনক পর্ব শুনে অতি উত্তম গতি লাভ করবে।

———০———

জনমেজয়ের পরীক্ষিতের দর্শন লাভ এবং যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়া

জনমেজয় বললেন—ব্রহ্মন্ ! বরদাতা ভগবান ব্যাসদেব যদি আমার পিতাকেও সেই রূপ, বেশ ও অবস্থায় আমাকে দর্শন করিয়ে দেন তাহলে আপনার বলা সব কথাতেই আমার বিশ্বাস হবে এবং আমি কৃতার্থ হয়ে আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। আজ মহর্ষির কৃপায় আমার ইচ্ছাও পূর্ণ হওয়া উচিত।

রাজা এইভাবে বলায় পরম প্রতাপশালী মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁকে কৃপা করে তাঁর পিতা পরীক্ষিৎকে সেই যজ্ঞ-ভূমিতে ডেকে পাঠালেন। রাজা দেখলেন—পিতা সেই রূপ, বেশ এবং অবস্থায় আকাশ থেকে নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে মহাত্মা শমীক এবং তাঁর পুত্র শৃঙ্গ ঋষিও ছিলেন। রাজা পরীক্ষিতের মন্ত্রীকেও তাঁদের সঙ্গে দেখা গেল। রাজা পরীক্ষিৎ তখন প্রসন্ন হয়ে যজ্ঞান্তস্নানের পূর্বে তাঁর পিতাকে স্নান করিয়ে পরে নিজে স্নান করলেন। স্নানের পর তিনি যাযাবর-কুলে উদ্ভূত জরৎকারুপুত্র আস্তীককে বললেন—'বিপ্রবর ! আমার মনে হচ্ছে যে আমার এই যজ্ঞ নানাপ্রকার আশ্চর্যের কেন্দ্র হচ্ছে ; কারণ শোকবিনাশকারী আমার পিতাও আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন।'

আস্তীক বললেন—রাজন্ ! যাঁর যজ্ঞে তপস্যার নিধি পুরাণপুরুষ মহর্ষি ব্যাসদেব বিদ্যমান, তাঁর দুই লোকেই জয় হয়। তুমি এই বিচিত্র উপাখ্যান শুনেছ, তোমার শত্রু সর্পেরা ভস্ম হয়ে তোমার পিতার গতি প্রাপ্ত হয়েছে। তোমার সত্যপরায়ণতার জন্য কোনোভাবে তক্ষকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। তুমি সমস্ত ঋষিদের পূজা করেছ, মহাত্মা ব্যাসদেবের প্রভাব দর্শন করেছ এবং এই পাপনাশক কথা শুনে মহান ধর্ম লাভ করেছ। উদার হৃদয়সম্পন্ন সাধুগণের দর্শনে তোমার হৃদয়ের বন্ধন খুলে গেছে—তোমার সর্ব সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে। এখন ধর্ম সমর্থনকারী, সদাচারী মহাত্মা—যাঁদের দর্শনে সর্বপাপ নাশ হয়, তাঁদের তোমার প্রণাম করা উচিত।

সৌতি বললেন—বিপ্রবর ! আস্তীকের কথা শুনে রাজা জনমেজয় মহর্ষি ব্যাসদেবকে বারবার পূজা ও আপ্যায়ন করলেন। তারপর মুনিবর বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মন্ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠির পুত্র-পৌত্র ও আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে কী করলেন ?'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের দর্শনরূপ মহাচমৎকার দেখে শোকরহিত হয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। অন্য সকলে এবং মহর্ষিগণও তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ সৈনিক ও নারীগণ সমভিব্যাহারে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুসরণ করলেন। আশ্রমে পৌঁছে লোকপূজিত মহর্ষি ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'মহাভাগ ! তুমি ধর্মজ্ঞ প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে নানাপ্রকার ধর্মকথা শুনেছো। এখন আর শোক কোরো না ; কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রারব্ধের বিধানে দুঃখ পায় না। পরম বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির তার সমস্ত ভ্রাতা, সুহৃদ এবং নারীদের সঙ্গে নিজে তোমার সেবা করছে। এবার ওদের ফিরে যেতে বলো। তারা গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করুক, এরা একমাসের অধিককাল এই বনে এসে রয়েছে।'

ব্যাসদেবের কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন—'অজাতশত্রো ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি ভাইদের সঙ্গে আমার কথা শোনো ! তোমার জন্যই আমার সমস্ত শোক অপনীত হয়েছে। এবার তুমি আর দেরি না করে রাজধানীতে ফিরে যাও। তোমাদের দুই মাতাই শুকনো পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করছেন, এঁরা আর বেশিদিন জীবিত থাকবেন না। ভগবান ব্যাসের তপোবলে এবং তোমাদের আগমনে আমি পরলোকবাসী দুর্যোধনাদি পুত্রদের দর্শন করেছি ; সুতরাং আমার জীবনের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এবার আমি কঠোর তপস্যা করব, তুমি আমাকে অনুমতি দাও। আজ থেকে পিতৃপুরুষের পিণ্ড, যশ এবং কুলের ভার, সবই তোমার ওপর ; অতএব পুত্র ! আজ অথবা কাল তুমি আর দেরি না করে ফিরে যাও। তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছ।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'জ্যেষ্ঠতাত ! আপনি ধর্মজ্ঞ, আমাকে ত্যাগ করবেন না ; আমি সর্বতোভাবে নিরপরাধ। আমার সব ভ্রাতা এবং সেবক এখান থেকে চলে যাক, আমি সংযম ও ব্রত পালন করে আপনার এবং দুই মাতার সেবা করব।' তাঁর কথা শুনে গান্ধারী বললেন—'পুত্র ! এমন কথা বোলো না। আমি যা বলি শোনো। তুমি অনেক করেছ। তুমি আমাদের খুব ভালোভাবেই আদর-যত্ন করেছ। এখন মহারাজ যা আদেশ করেন, সেইমতো কাজ করো ; কারণ পিতার নির্দেশ মানা করা তোমার কর্তব্য।'

গান্ধারীর আদেশ শুনে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়নে কুন্তীকে বললেন—'মাতা ! রাজা এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবী আমাকে গৃহে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমার মন আপনার ওপর পড়ে আছে। যাওয়ার কথাতেই আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, কী করে যাব ? আমি আপনাদের তপস্যাতে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না ; কেননা তপস্যার থেকে বড় আর কিছু নেই। তপস্যার দ্বারা পরব্রহ্ম লাভ হয়। এখন আমার হৃদয় আগের মতো রাজ্য-কাজে ব্যাপৃত হয় না, এইরূপ তপস্যা করার ইচ্ছা হয়। সমস্ত পৃথিবী আমার শূন্য মনে হয়, সুতরাং শুধু ধর্মপালনের জন্য আমি এখানে থেকে যেতে চাই। আপনার কল্যাণময়ী দৃষ্টিতে আমাদের সকলকে অনুগৃহীত করুন।'

তাঁর কথা শুনে সহদেবের চোখে জল ভরে এল। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'ভ্রাতা ! আমার মাকে ছেড়ে যাওয়ার সাহস নেই। আপনি শীঘ্র ফিরে যান। আমি এঁর সঙ্গে থেকে তপস্যায় শরীর শুষ্ক করব। আমি মহারাজ এবং দুই মাতার সেবায় ব্যাপৃত থাকতে চাই।' তাঁর কথা শুনে কুন্তী সহদেবকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'পুত্র ! এমন কথা বোলো না, আমার কথা শোনো, গৃহে ফিরে যাও। তোমরা থাকলে আমার তপস্যায় বিঘ্ন হবে, তোমাদের মমতায় আবদ্ধ হয়ে আমি উত্তম তপস্যা থেকে চ্যুত হব ; সুতরাং পুত্র ! তোমরা ফিরে যাও, আমরা আর অল্পদিনই বেঁচে থাকব।'

কুন্তী এইভাবে নানা কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দিলেন। তখন মাতা এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবগণ তাঁদের প্রণাম করে বললেন—'রাজন্ ! আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা রাজধানীতে ফিরে যেতে প্রস্তুত।' ধর্মরাজের কথা শুনে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের আশীর্বাদ করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারপর মহাবলী ভীমকে সান্ত্বনা দিলেন। ভীমও তাঁর আদেশ সর্বান্তকরণে মেনে নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন-নকুল-সহদেবকেও আলিঙ্গন করে তাঁদের আশীর্বাদ করে বিদায় জানালেন। তারপর তাঁরা সকলে গান্ধারীর পদধূলি নিলেন এবং তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করলেন। মাতা কুন্তীকে প্রণাম করলে তিনি সকলকে আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করলেন, সকলে তাঁদের পরিক্রমা করলেন। দ্রৌপদী এবং অন্যান্য কুলনারীগণ সকলকে প্রণাম করলেন। দুই শ্বশ্রূমাতা তাঁদের আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ জানালেন। তাঁরা বধূদের নানাপ্রকার কর্তব্যের উপদেশ দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারপর সকলে রওনা হলেন। কিছুক্ষণ পরে সারথিদের হাঁক-ডাক শোনা গেল। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা, কুলনারী ও সৈনিক সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুর ফিরে গেলেন।

দেবর্ষি নারদের কাছে ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের মৃত্যুর খবর জেনে যুধিষ্ঠিরাদির শোক এবং তিনজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবরা তপোবন থেকে ফিরে আসার দু-বছর পরে একদিন দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে সসম্মানে পূজা করলেন। তারপর আসন গ্রহণ করে দেবর্ষি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর ! অনেকদিন আমরা আপনার দর্শন লাভ করিনি ; সব কুশল তো ? এখন আপনি কোন্ কোন্ দেশ ঘুরে এলেন ? আপনার কী সেবা করব, বলুন ? আপনিই আমাদের পরম গতি।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—রাজন্ ! তুমি ঠিকই বলেছো। বহুদিন পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এখন আমি

তপোবন থেকে আসছি। পথে ভগবতী গঙ্গা এবং বহু তীর্থ দর্শন করতে করতে এসেছি।

যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর ! গঙ্গাতীরে বসবাসকারী মানুষ আমাকে এসে বলেন যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আজকাল অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় ব্যাপৃত ; আপনি কি তাঁদের দেখেছেন, তাঁরা কুশলে আছেন তো ? গান্ধারী, কুন্তী, সঞ্জয় এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এখন কেমন আছেন ? আমি তাঁদের কথা সব শুনতে চাই। যদি আপনি তাঁদের দেখে থাকেন, তাহলে কৃপা করে বলুন।

নারদ বললেন—মহারাজ ! আমি সেই তপোবনে যা দেখেছি ও শুনেছি, সেসব বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছি, তুমি স্থিরচিত্তে শোনো—তোমরা ওখান থেকে চলে আসার পর তোমার জ্যেষ্ঠতাত গান্ধারী ও কুন্তীর সঙ্গে গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) চলে যান। সঞ্জয় এবং যজ্ঞকারী পুরোহিতও অগ্নিহোত্রের সামগ্রী নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যান। সেখানে পৌঁছে তোমার জ্যেষ্ঠতাত তীব্র তপস্যা শুরু করেন। তিনি মুখে পাথরের টুকরো নিয়ে বায়ু-ভক্ষণ করতেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কখনো দেখা যেত, কখনো তিনি অদৃশ্য থাকতেন। তাঁর কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। তিনি বনের চতুর্দিকে বিচরণ করতেন। গান্ধারী ও কুন্তী তাঁর পিছনে থাকতেন। সঞ্জয়ও তাঁদের অনুসরণ করতেন। উচ্চ-নীচ স্থানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সাহায্য করতেন, গান্ধারীকে কুন্তীদেবী।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গা কিনারে বিচরণ করতে করতে গঙ্গাজলে নেমে স্নান করে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললেন। এমন সময় অত্যন্ত জোরে হাওয়া প্রবাহিত হল এবং তাতে ভয়ংকর দাবাগ্নি জ্বলে উঠল। সমস্ত জঙ্গল ধূ ধূ করে জ্বলতে লাগল, মৃগদল পুড়তে লাগল, বন্য শূকরেরা জলাশয়ে আশ্রয় নিল। সমস্ত বন লেলিহান আগুনে জ্বলে উঠল, এঁরা গভীর সংকটে পড়লেন, ধৃতরাষ্ট্রের দেহ উপবাসের কারণে দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তিনি ছুটতে পারলেন না। তোমার দুই মাতাও অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন ; তাঁরা দৌড়তে অক্ষম ছিলেন। সেই সময় আগুন এগিয়ে আসায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সারথিকে বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি এমন স্থানে চলে যাও, যাতে এই দাবাগ্নি তোমাকে দগ্ধ করতে না পারে। আমরা এখানে আমাদের পরমগতি লাভ করব।' তাঁর কথা শুনে সঞ্জয় ভয় পেয়ে বলল—'মহারাজ ! এই লৌকিক অগ্নিতে আপনাদের মৃত্যু হওয়া ঠিক নয় (আপনাদের দেহে দাহ-সংস্কার তো যজ্ঞের অগ্নিতে হওয়া উচিত) ; কিন্তু এখন দাবানল থেকে মুক্তিলাভের কোনো উপায় দেখছি না। কৃপা করে বলুন এখন কী করা উচিত ?' সঞ্জয়ের প্রশ্নের উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র আবার বললেন—'সঞ্জয় ! আমরা স্বেচ্ছায় গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে এসেছি। সুতরাং আমাদের পক্ষে এই প্রকার মৃত্যু অনিষ্টকারী নয়। জল, অগ্নি বা বায়ু সংযোগে অথবা উপবাস করে প্রাণত্যাগ করা তপস্বীদের পক্ষে প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় ; সুতরাং তুমি দেরি না করে শীঘ্র চলে যাও।' এই বলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ মন একাগ্র করে কুন্তী ও গান্ধারীকে নিয়ে পূর্বাভিমুখে বসলেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে সঞ্জয় তাঁদের পরিক্রমা করে বললেন—'মহারাজ ! আপনি নিজেকে যোগযুক্ত করুন।' তাঁর কথায় রাজা সমাধিস্থ হলেন, ইন্দ্রিয়াদি রোধ করে কাঠের মতো নিশ্চল হয়ে রইলেন। তারপর দেবী গান্ধারী, তোমার মাতা কুন্তী এবং পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র—তিনজনে দাবাগ্নিতে পুড়ে

ভস্ম হয়ে গেলেন ; কিন্তু সঞ্জয় প্রাণে বেঁচে গেলেন। আমি তাঁকে গঙ্গাতীরে তপস্বী পরিবৃত থাকতে দেখেছি। সঞ্জয় সেই তপস্বীদের ডেকে সব জানিয়ে নিজে হিমালয় পর্বতে চলে গেছে। মহামনা ধৃতরাষ্ট্র এবং তোমার দুই মাতা এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। বনে বিচরণ করার সময় অকস্মাৎ তাঁদের মৃতদেহ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। রাজার এইরূপ মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনে সমস্ত তপস্বী সেইস্থানে

একত্রিত হন, কিন্তু কেউই তাঁদের জন্য শোক করেননি। কারণ তাঁদের মনে ওঁদের সদ্গতির বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। যুধিষ্ঠির ! আমি সেখানেই তাঁদের দগ্ধ হওয়ার সমাচার শুনেছি। তোমাদেরও তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয় ; কারণ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী স্বেচ্ছায় দাবাগ্নিতে শরীর আহুতি দিয়েছেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পরলোক-গমনের সংবাদ শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন এবং তাঁদের অন্তঃপুর মহা দুঃখে ভরে উঠল। সকলেই কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চোখের জল মুছে নারদকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আমরা জীবিত থাকতেই কঠোর তপস্যারত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বনে যে অনাথের ন্যায় মৃত্যু হল, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা ! যশস্বিনী গান্ধারীর জন্য আমার তত শোক হয়নি ; কারণ তিনি পতিব্রতাধর্ম পালন করে নিজ পতির লোকে গমন করেছেন। আমি মাতা কুন্তীকে স্মরণ করে শোক-সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি, যিনি তাঁর পুত্রদের সমৃদ্ধশালী ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনে থাকা পছন্দ করেছিলেন। হায় ! সেই মহাবনে মন্ত্রদ্বারা পবিত্র যজ্ঞাগ্নি থাকতেও আমার পিতা কীভাবে লৌকিক অগ্নিতে দাহ হলেন ?'

নারদ বললেন—রাজন্ ! ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিতে দাহ হননি। আমি শুনেছি যে, বায়ুপান করে থাকা রাজর্ষি যখন গঙ্গাতীরের তপোবনে প্রবেশ করছিলেন, সেই সময় তিনি যাজককেদের দ্বারা ইষ্টি সম্পাদিত হবার পর আহবনীয় আদি অগ্নিকে সেখানেই পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর যাজকেরা সেই অগ্নিকে নির্জন বনে রেখে নিজ নিজ স্থানে চলে গিয়েছিলেন। তপস্বীরা বলেন যে সেই অগ্নিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বনে আগুন ধরায় এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আদি সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে তাঁরই স্থাপন করা বৈদিক অগ্নিতে ভস্ম হয়েছেন এবং পরমগতি লাভ করেছেন। অতএব তুমি তাঁদের জন্য শোক কোরো না। গুরুজনদের সেবা করায় তোমার মাতা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করেছেন—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। এখন তোমরা সব ভ্রাতারা গিয়ে তাঁদের তিনজনকে জলাঞ্জলি দাও।

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা এবং কুলবধূদের নিয়ে নগরের বাইরের গঙ্গাতীরে গেলেন, নগরের প্রজারাও রাজভক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে এক বস্ত্র ধারণ করে গঙ্গাতীরে গেলেন ; সকলে গঙ্গায় স্নান করে যুযুৎসুকে সঙ্গে নিয়ে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর নামে পৃথকভাবে গোত্র ইত্যাদি উচ্চারণ করে জলে অঞ্জলি দিলেন। তারপর অশৌচ-নিবৃত্তির জন্য কার্য করতে পাণ্ডবরা নগরের বাইরে থাকলেন। যেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দগ্ধ হয়েছিলেন, যুধিষ্ঠির বিধিনিয়ম জানা বিশ্বাসযোগ্য ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে—সেই স্থানে (হরিদ্বারে) শ্রাদ্ধকর্ম করার নির্দেশ দিয়ে দানযোগ্য নানাবস্তু তাদের অর্পণ করলেন। শৌচ-সম্পাদনের জন্য দশাদি কর্ম করার পর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিনে ধৃতরাষ্ট্র ও মাতাদের উদ্দেশ্যে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করলেন এবং ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্য সোনা, রূপা, গাভী এবং বহুমূল্য শয্যাদান করলেন। এইভাবে মাতা গান্ধারী এবং কুন্তীর উদ্দেশ্যেও পৃথকভাবে দান করলেন। সেই সময় যে, যে বস্তু যতটা আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তাকে সেই বস্তুই তত মাত্রায় দান করা হয়। এইভাবে শ্রাদ্ধকর্ম ও দান করে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। যাদের হরিদ্বারে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারাও রাজার নির্দেশানুসারে শ্রাদ্ধ করে তিনজনের অস্থি সংগ্রহ করে ফুল-চন্দনে পূজা করে গঙ্গায় বিসর্জন করে। পরে হস্তিনাপুরে ফিরে তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে সমস্ত সমাচার নিবেদন করে। দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজ অভীষ্ট স্থানে চলে গেলেন। এইভাবে (যুদ্ধ সমাপ্ত হলে) রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর জাতি-ভাই, আত্মীয়-কুটুম্ব, মিত্র-বন্ধুদের দান দিয়ে পনেরো বছর হস্তিনাপুরে বাস করেন এবং তিন বছর বনে তপস্যা করে মৃত্যুবরণ করেন।

॥ আশ্রমবাসিকপর্ব সমাপ্ত ॥

মৌসলপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

যুধিষ্ঠিরের অলক্ষণ দর্শন এবং দ্বারকাতে উৎপাত দেখে শ্রীকৃষ্ণের যাদবগণকে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার নির্দেশ দান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাভারত যুদ্ধের পর ছত্রিশতম বৎসর আরম্ভ হলে রাজা যুধিষ্ঠির নানাপ্রকার অলক্ষণ দেখতে লাগলেন। প্রচণ্ড বেগে ঝড়-তুফান এবং পাথর বর্ষণ হতে লাগল। পাখিরা ডানদিকে মণ্ডলাকারে উড়তে লাগল। নদীগুলির জল বালিতে গতি হারাল এবং সর্বদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হল। আকাশ থেকে উল্কাবর্ষণ হতে লাগল। সূর্যমণ্ডল ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের সময় সূর্যে তেজ থাকত না এবং তার মণ্ডলে কবন্ধ (মস্তকবিহীন শরীর) দেখা যেত। সূর্য ও চন্দ্রের চারদিকে ভয়ানক বলয় দৃষ্টিগোচর হত। তার পাশে লাল, কালো ও ধূসর—তিনটি রং দেখা যেত। আরও নানা ভীতিপ্রদ উৎপাত দেখা যাচ্ছিল। এর কিছুদিন পরেই যুধিষ্ঠির খবর পেলেন যে 'মুষল দ্বারা সমস্ত বৃষ্ণিবংশের সংহার হয়েছে, শুধু শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামই তার থেকে রক্ষা পেয়েছেন।' রাজা যুধিষ্ঠির এই সংবাদ শুনে ভ্রাতাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এখন আমাদের কী করা উচিত ?' ব্রহ্মদণ্ডের প্রভাবে বৃষ্ণিবংশের বিনাশের খবর শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁরা দুঃখশোকে হতাশ হয়ে গেলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—বিপ্রবর ! বৃষ্ণি, অন্ধক এবং ভোজবংশের বীরদের কে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁদের সংহার হল কৃপা করে এই প্রসঙ্গ আপনি বিস্তারিতভাবে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! কোনো এক সময়ের কথা—মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব এবং তপোধন নারদ দ্বারকাতে গিয়েছিলেন। তাঁদের দেখে দৈবের বশে সারণ ইত্যাদি বীর শাম্বকে নারীবেশে সাজিয়ে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—'মহর্ষিগণ ! এ মহাতেজস্বী বভ্রুর স্ত্রী। বভ্রু পুত্রের জন্য অত্যন্ত লালায়িত। আপনারা ভালোভাবে দেখে

বলুন, এর গর্ভে কী জন্মগ্রহণ করবে ?' এই বলে তাঁরা যখন মিথ্যাদ্বারা ঋষিদের অপমান করেন তখন মুনিরা ক্রোধান্বিত হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বললেন—'মূর্খগণ ! এই শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশ বিনাশ করার জন্য এক ভয়ংকর মুষল প্রসব করবে, যার দ্বারা তোমাদের মতো দুরাচারী, ক্রূর এবং ক্রোধীরা নিজেদের সমস্ত কুল ধ্বংস করে ফেলবে, শুধুমাত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ওপর এটি কার্যকরী হবে না। বলরাম নিজেই শরীর ত্যাগ করে সমুদ্রে প্রবেশ করবেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যখন ভূমিতে শয়ন করবেন, তখন জরা নামক ব্যাধ তাঁকে বাণে বিদ্ধ করবে।' এই কথা বলে মুনিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সংবাদ শুনে মধুসূদন বৃষ্ণিবংশীয়দের সেই সংবাদ জানালেন। তিনি সকলের বিনাশ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন ; তাই তিনি যাদবদের বললেন 'ঋষিদের এই কথা অবশ্যই সত্য হবে।' এই বলে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তা সত্ত্বেও তিনি যদুবংশীয়দের পরিণাম রদ করতে চাইলেন না।

পরদিন শাম্ব একটি মুষল প্রসব করলেন। যাদবেরা উগ্রসেনকে সেই সংবাদ জানালেন। রাজা সেই খবরে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলেন, তিনি সেই মুষলটি চূর্ণ করিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন। তারপর উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র এবং বভ্রুর আজ্ঞানুসারে নগরে ঘোষণা করা হল যে 'এখন থেকে কোনো বৃষ্ণিবংশীয় বা অন্ধক বংশীয় নগরবাসী যেন গৃহে মদ তৈরি না করে। কোনো ব্যক্তি গোপনে যদি এইরূপ পানীয় তৈরি করে, তাহলে তাকে আত্মীয়-বন্ধুসহ শূলে চড়ানো হবে।' এই ঘোষণা শুনে সমস্ত দ্বারকাবাসী রাজার ভয়ে মদ প্রস্তুত না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ আসন্ন সংকট নিবারণের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা নিচ্ছিল ; কিন্তু কাল ক্রমশ তাদেরকে ঘিরে ধরছিল। তার আকৃতি অতি ভয়ংকর, বিকট বেশ, দেহের বর্ণ কালো-হলুদ। সে মুণ্ডিত মস্তকে পুরুষ বেশে বৃষ্ণিদের ঘরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেত। তাকে দেখতে পেলে ধনুর্ধর বীরেরা বাণবর্ষণ করত, কিন্তু সে ছিল অশরীরী, তাই বাণ তাকে বিদ্ধ করতে পারত না। প্রতিদিন ভয়ংকর ঝড় উঠতে লাগল। ইঁদুররা সংখ্যায় এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে রাস্তায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত, রাত্রে মানুষের নখ, চুল কেটে নিত, ঘরে সর্বক্ষণ তাদের চিঁ চিঁ শব্দ শোনা যেত। কালের প্রেরণায় বৃষ্ণি ও অন্ধকদের গৃহে সাদা পাখা আর রক্তবর্ণ পা সম্পন্ন পায়রা ঘুরে বেড়াত। গাভীর গর্ভে গর্দভ, ঘোড়ার গর্ভে হাতি, কুকুরের দ্বারা বিড়াল এবং নেউলের পেট থেকে ইঁদুরের জন্ম হতে লাগল। সেই সময় যদুবংশীয়রা পাপকাজ করতে লজ্জা পেত না। তারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃপুরুষ ও গুরুজনদেরও অপমান করত। শুধু বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তাদের অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেতেন। যখন শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি হত, তখন যদুবংশীয়দের গৃহের চারদিকে গাধার ভীষণ ডাক শোনা যেত। এইভাবে কালের বিপরীত গতি দেখে এবং পক্ষের ত্রয়োদশ দিনে অমাবস্যা জেনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীদের বললেন—'বীরগণ ! মহাভারত যুদ্ধের সময় যেমন যোগ হয়েছিল, এবার আমাদের সংহারের জন্য সেই যোগ উপস্থিত হয়েছে।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ কালের অবস্থান বিচার করতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল 'পুত্র-পরিজন মারা যাওয়ার পর পুত্রশোকে সন্তপ্ত গান্ধারী যদুবংশীদের যে শাপ দিয়েছিলেন, মনে হয় সেই সময় উপস্থিত—ছত্রিশতম বছর আগত।' এই ভেবে গান্ধারীর শাপ সত্য করার জন্য তিনি যদুবংশীয়দের তীর্থযাত্রার আদেশ দিলেন। ভগবানের আদেশে রাজপুরুষেরা সমস্ত নগরে ঘোষণা করল যে, 'সকলে সমুদ্রতীরে প্রভাসতীর্থে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।'

যদুবংশের সংহার

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্বারকার নারীগণ রাত্রে স্বপ্ন দেখতেন যে, এক কৃষ্ণবর্ণা নারী সাদা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে তাদের মাথার সিঁদুর মুছে দিয়ে নগরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পুরুষেরা স্বপ্ন দেখতেন যে ভয়ংকর এক গৃধ্র এসে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের মানুষদের ধরে ধরে খাচ্ছে। অত্যন্ত ভীষণ এক রাক্ষস তাঁদের বসন-ভূষণ-ধ্বজা কবচ চুরি করে পালাচ্ছে। তখন বৃষ্ণি ও অন্ধক মহারথীগণ তাঁদের পরিবারসহ্ তীর্থযাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর তাঁরা রথ, ঘোড়া, হাতিতে করে নগর থেকে বার হলেন। সমস্ত যাদব নারীপুরুষ প্রভাস ক্ষেত্রে পৌঁছে নিজ নিজ স্থানে আশ্রয় নিলেন। যোগবেত্তা উদ্ধব যখন শুনলেন যে যদুবংশীয় বীরেরা প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে বাস করছেন, তখন তিনি সেখানে এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদায় নিলেন। তাঁর যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। ভগবান যদুবংশীয়দের বিনাশের কথা জানতেন, তাই তিনি গমনোদ্যত উদ্ধবকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করেননি।

তারপর একদিন যাদব গোষ্ঠীতে উপবিষ্ট সাত্যকি মদের নেশায় কৃতবর্মাকে উপহাস ও অসম্মান করে বললেন—'হার্দিক্য ! এমন কে বীর আছে যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে মনে করে, অথচ তোমার মতো রাত্রিবেলা ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন মানুষকে হত্যা করে ? তুমি যে অন্যায় করেছে, কোনো যদুবংশীয় বীর কখনো তা ক্ষমা করবে না।' সাত্যকির কথা শুনে প্রদ্যুম্নও তা অনুমোদন করে কৃতবর্মাকে অপমান করলেন। তাঁদের কথা শুনে কৃতবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাঁ হাত তুলে সাত্যকিকে অপমান করে বললেন—'আরে ! ভূরিশ্রবার যখন হাত কেটে গিয়েছিল এবং তিনি আমৃত্যু উপবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে রণভূমিতে বসেছিলেন, সেই অবস্থায় বীর হয়েও তুমি তাঁকে কী করে নৃশংসভাবে হত্যা করলে ?' তাঁর কথা শুনে সাত্যকি ক্রোধে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আমি সত্য শপথ করে বলছি আজ এই পাপীকে হত্যা করে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর কাছে পাঠিয়ে দেব।' এই বলে সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে লাফিয়ে উঠে এসে তরবারি দিয়ে কৃতবর্মার মাথা দেহের থেকে আলাদা করে দিলেন। তারপর তিনি অন্য বীরদেরও মৃত্যুমুখে পাঠাতে লাগলেন। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বাধা দেবার জন্য ছুটলেন।
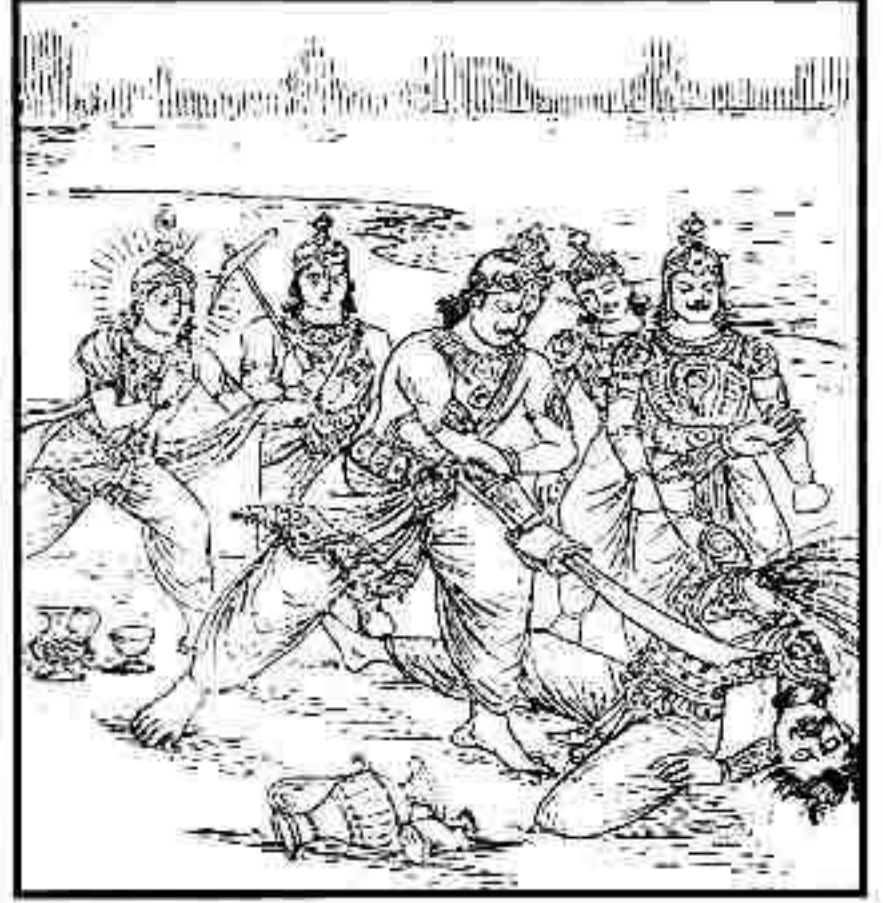
ইতিমধ্যে কালের প্রেরণায় ভোজ ও অন্ধকবংশের বীরেরা সাত্যকিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। তাঁদের ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকিকে আক্রমণ করতে দেখে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ক্রোধপূর্ণ হয়ে সাত্যকিকে রক্ষা করার জন্য ভোজবংশীয় বীরদের আক্রমণ করলেন। অন্যদিকে সাত্যকি অন্ধক-বংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে উঠলেন। দুই বীর অত্যন্ত উৎসাহ ও পরিশ্রমে বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন কিন্তু বিপক্ষের সংখ্যা বেশি থাকায় তাঁরা তাঁদের পরাজিত করতে পারলেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের সামনেই দুজনে মৃত্যুবরণ করলেন। নিজ পুত্র প্রদ্যুম্ন এবং সাত্যকিকে মারা যেতে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ একমুষ্টি ঘাস ছিঁড়ে নিলেন। তিনি হাতে নিতেই সেই ঘাস বজ্রের ন্যায় লৌহ মূষলে পরিণত হল। তখন তাঁর সামনে যারা ছিল, তাঁদের সকলকেই ভগবান সেই মূষলের দ্বারা মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিলেন। সেই সময় কালের প্রেরণায় অন্ধক, ভোজ, শিনি এবং বৃষ্ণিবংশের বীরেরা সেই হাঙ্গামায় একে অপরকে মূষলের আঘাতে ধরাশায়ী করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে যে কেউই এরকম ঘাস হাতে নিচ্ছিলেন, সেটিই বজ্রের মতো হয়ে যাচ্ছিল। জনমেজয় ! এসবই ব্রাহ্মণদের শাপের প্রভাব যে তৃণও মূষলে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। সেই তৃণের দ্বারা যাকেই প্রহার করা যাচ্ছিল, সেই অভেদ্য বস্তুও তৃণের আঘাতে বিদ্ধ হচ্ছিল। তার দ্বারা পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে হত্যা করছিল। মত্ত যদুবংশীয়েরা নিজেদের মধ্যে

যুদ্ধ করে ধরাশায়ী হতে লাগল। আগুনে প্রাণ দেওয়া পতঙ্গের মতো অন্ধকবংশের যোদ্ধাগণসহ অন্যান্যরা প্রাণত্যাগ করতে লাগল, তবুও কেউ সেখান থেকে পালিয়ে গেল না। শ্রীকৃষ্ণের সামনেই শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গদের মৃত্যু হল। তা দেখে তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেল, শঙ্খ, চক্র, গদাধারণকারী প্রভু তখন অন্য জীবিত বীরদের সংহার করলেন। তা দেখে মহাতেজস্বী বভ্রু এবং দারুক তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'প্রভু! এখন সকলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এঁদের অধিকাংশই আপনার হাতে মারা গেছেন। এখন বলদেবের অনুসন্ধান করা উচিত। চলুন, আমরা তিনজনে ঐদিকে যাই, যেদিকে বলরাম গিয়েছেন।'

—— ০ ——

বলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম-গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! তারপর দারুক, বভ্রু ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনজনে বলরামের চরণ চিহ্ন ধরে রওনা হলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা অনন্ত পরাক্রমশালী বলভদ্রকে এক বৃক্ষের নীচে বিরাজ করতে দেখলেন, তিনি একান্তে বসে কিছু চিন্তা করছিলেন। তাঁর কাছে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে নির্দেশ দিলেন যে 'তুমি শীঘ্র কুরুদের রাজধানী হস্তিনাপুরে গিয়ে অর্জুনকে যাদবদের এই মহাসংহারের সংবাদ জানাও। ব্রাহ্মণদের শাপে যদুবংশীয়দের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অর্জুন যেন শীঘ্রই দ্বারকায় আসে।' শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে দারুক রথে করে কুরুদেশে রওনা হলেন। তাঁর যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে দণ্ডায়মান বভ্রুকে বললেন—'আপনি নারীদের রক্ষা করার জন্য শীঘ্র দ্বারকায় যান। এমন না হয় যে ধনলোভে ডাকাতরা তাদের মেরে ফেলে!' বভ্রু তাঁর ভ্রাতা ও বন্ধুদের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যেই তিনি দ্বারকাপুরী গমন করতে উদ্যত হলেন, অমনি ব্রাহ্মণের শাপের প্রভাবে উৎপন্ন হওয়া এক মুষল ব্যাধের লৌহময় মুদ্গর থেকে তাঁর ওপরে এসে পড়ল এবং সেই আঘাতে বভ্রু মৃত্যুবরণ করলেন। বভ্রুকে মৃত দেখে অত্যন্ত তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বললেন—'ভ্রাতা! আপনি এখানেই আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন; আমি নারীদের আত্মীয় স্বজনের কাছে সমর্পণ করে আসছি। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে গিয়ে তাঁর পিতা বসুদেবকে বললেন—'তাত! আপনি অর্জুনের জন্য অপেক্ষা করুন এবং নারীদের রক্ষা করুন। বলরাম বনের ভেতর আমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। আমি স্বচক্ষে যদুবংশীয়দের বিনাশ দেখেছি, বীরশূন্য এই দ্বারকাপুরী আর আমি দেখতে পারছি না।'

এই কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতার চরণে প্রণাম করে শীঘ্র রওনা হয়ে গেলেন। তার মধ্যেই নগরের নারী ও শিশুদের তীব্র ক্রন্দন ও আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। যুবতীদের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'দেবীগণ! নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন শীঘ্রই এই নগরে আসবেন। তিনি তোমাদের সংকট থেকে রক্ষা করবেন।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। বনে গিয়ে তিনি বলরামকে দর্শন করলেন, তিনি যোগযুক্ত হয়ে সমাধিতে বসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তাঁর মুখ দিয়ে এক শ্বেত বর্ণের বিশাল সর্প বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। তার হাজার হাজার মাথা ছিল এবং মুখ ছিল রক্ত বর্ণের। সমুদ্র স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হয়ে সেই ভগবান অনন্তকে স্বাগত জানালেন। সেই সঙ্গে দিব্য নাগ এবং নদীগুলিও তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, অরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ,

পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্মুখ এবং অম্বরীষ প্রভৃতি নাগও তাঁর সেবায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা বরুণও স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলে এগিয়ে এসে অনন্ত ভগবানকে স্বাগত, অভিনন্দন এবং পাদ্য-অর্ঘ্যের দ্বারা পূজা করলেন। ভাই বলরাম পরমধাম গমন করলে সম্পূর্ণ গতিবিধি জানা দিব্যদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই শূন্য বনে বিচরণ করতে লাগলেন। বনে বিচরণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ একস্থানে বসে চিন্তায় মগ্ন হলেন। পূর্বে গান্ধারী দেবী যে শাপ দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তর্ধানের উপযুক্ত সময় আগত। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অর্থের তত্ত্ববেত্তা এবং অবিনাশী দেবতা ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ত্রিলোক রক্ষার নিমিত্ত পরমধামে গমনের উদ্দেশ্যে মন-বাক্য-ইন্দ্রিয়াদি সংযমপূর্বক মহাযোগ (সমাধি) অবলম্বন করে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সেই সময় জরা নামক এক ব্যাধ হরিণের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে যোগে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বাণের আঘাতে ক্ষয়ের সৃষ্টি করল। সে মৃগবধ করতে এসে শ্রীকৃষ্ণকেই মৃগ বলে ভুল করে। বাণবিদ্ধ করে সে শিকার ধরতে এলে যোগস্থ চতুর্ভুজ সমন্বিত পীতাম্বরধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সে দেখতে পেল। জরা নিজেকে অপরাধী ভেবে শঙ্কিত হৃদয়ে ভগবানের পদপ্রান্তে পড়ল। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাকে আশ্বস্ত করে নিজ কান্তিতে আকাশ, পৃথিবী ব্যাপ্ত করে ঊর্ধ্বলোকে (নিজ পরম ধামে) গমন করলেন। অন্তরীক্ষে পৌঁছলে ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ এবং অপ্সরাসহ প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। তারপর অনন্ত তেজস্বী, জগৎ সৃষ্টিকারী, অবিনাশী এবং যোগশাস্ত্রের আচার্য ভগবান নারায়ণ অনন্ত তেজে পৃথিবী এবং আকাশকে প্রজ্বলিত করে নিজ পরম ধাম—অপ্রমেয় পদ প্রাপ্ত হলেন। তাঁর পরম ধামে যাত্রা করার সময় দেবতা, ঋষি, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও সাধ্যগণ বিনীতভাবে তাঁর পূজা করেন। দেবতাগণ অভিনন্দন, মুনিগণ ঋগ্বেদের মন্ত্রোচ্চারণ, গন্ধর্বদের স্তবপাঠ এবং ইন্দ্র প্রীতিপূর্বক তাঁকে স্বাগত-সম্ভাষণ করেন।

দ্বারকায় এসে অর্জুনের বসুদেবের সঙ্গে আলোচনা এবং বসুদেবের নিধন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! দারুক কুরুদেশে গিয়ে মহারথী পাণ্ডবদের জানাল যে সমস্ত যদুবংশীয় বীর নিজেদের মধ্যে মুষলদ্বারা মারামারি করে নিহত হয়েছে। বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক এবং কুকুর বংশের বীরদের বিনাশ হওয়ার কথা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জুন সহসা একথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মাতুল বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দারুকের সঙ্গে বৃষ্ণিদের গৃহে পৌঁছে তিনি দেখলেন দ্বারকা নগরী বিধবা নারীর ন্যায় শ্রীহীন হয়ে রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোলো হাজার রানি অর্জুনকে দেখে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁদের দেখে অর্জুনের চোখেও জল ভরে এল। পতি-পুত্র-হীনা সেই অবলা নারীদের দিকে তিনি তাকাতে পারছিলেন না। দ্বারকা নগরী এবং শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের এই দুরবস্থা দেখে অর্জুন মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা এবং রুক্মিণী ও অন্যান্য পাটরানিরাও অর্জুনের কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা অর্জুনকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর চারপাশে চুপ করে বসলেন। সেইসময় পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নানাগুণের কথা বলে সেই দুঃখিনী নারীদের

সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর তিনি তাঁর মাতুল বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর মহলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে শোকার্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। মাতুলের এই অবস্থা দেখে অর্জুন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দুই পা ধরলেন। বসুদেব

দুহাতে অর্জুনকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সব পুত্র, পৌত্র, ভাই, দৌহিত্র, মিত্রদের স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন।

বসুদেব বললেন—অর্জুন ! যে বীরেরা শতশত দৈত্য এবং রাজাদের পরাজয় করেছিল, আজ আর তারা কেউ নেই, এতেও আমার প্রাণ নির্গত হয়নি। যারা তোমার প্রিয় শিষ্য ছিল এবং যাদের তুমি অত্যন্ত সম্মান করতে, বৃষ্ণিবংশের বীরদের মধ্যে যে দুজনকে অতিরথ বলা হত এবং তুমি যাদের প্রশংসা করতে শ্রীকৃষ্ণের সেই স্নেহভাজন প্রদ্যুম্ন এবং সাত্যকিই বৃষ্ণিবংশীয়দের বিনাশের প্রধান কারণ হয়েছিল। আর আমি কেনই বা সাত্যকি, কৃতবর্মা, অক্রূর ও প্রদ্যুম্নের নিন্দা করছি ? প্রকৃতপক্ষে ঋষিদের শাপই এই সর্বনাশের প্রধান কারণ। যে জগদীশ্বর কেশী, কংস, চেদিরাজ, শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য, কলিঙ্গ, মগধ, গান্ধার, কাশীরাজ ও মরুভূমির রাজাদের যমলোকের অতিথি করেছিলেন ; যিনি পূর্ব, দক্ষিণ এবং পার্বত্য-প্রান্তের নরেশদের সংহার করেছেন, সেই মধুসূদন অনীতির জন্য উপস্থিত এই সংকটকে বালকের ন্যায় উপেক্ষা করেছেন। তুমি, দেবর্ষি নারদ এবং অন্যান্য মহর্ষিরাও শ্রীকৃষ্ণকে পাপ সম্পর্করহিত সনাতন পরমেশ্বর বলে মেনে থাকেন ; সেই পরমাত্মা নির্বিবাদে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের হত্যাকাণ্ড দেখলেন এবং উদাসীন হয়ে রইলেন। মনে হয় আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ জগদীশ্বর, গান্ধারী এবং ঋষিদের বাক্য অন্যথা করতে চাননি। অর্জুন ! সকলের চোখে দেখা ঘটনা হল তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার হাতে নিহত হয়েও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে জীবিত হয়েছিল। এতো শক্তিশালী হয়েও তোমার সখা নিজের আত্মীয়-কুটুম্বকে রক্ষা করেননি। যখন পুত্র, পৌত্র, ভাই, মিত্র—সকলে একে অন্যের হাতে মরে ধরাশায়ী হয়ে যায়, সেই অবস্থায় তাদের দেখে শ্রীকৃষ্ণ এসে আমাকে বলে—'পিতা ! এই কুল আজ শেষ হয়ে গেল। অর্জুন দ্বারকাপুরীতে আসবেন ; তিনি এলে তাঁকে বৃষ্ণিবংশ মহানাশের খবর জানাবেন। অর্জুন মহাতেজস্বী। যদুবংশীয়দের নিধনের খবর শুনে তিনি শীঘ্রই যে এখানে এসে পড়বেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি যা, অর্জুনও তাই, অর্জুন যে, আমিও সেই। অর্জুন যা বলেন, তাই করবেন। যেসব নারীর সন্তান প্রসবকাল সমাগত, অর্জুন তাদের ওপর বিশেষ নজর দেবেন এবং তিনিই আপনার ঊর্ধ্বদেহিক সংস্কার করবেন। অর্জুন এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেই চতুঃপার্শ্বের প্রাচীর ও অট্টালিকাসহ এই নগরী সমুদ্র গ্রাস করবে। আমি কোনো পবিত্রস্থানে অবস্থান করে ব্রত-নিয়ম পালন করে বলরামের সঙ্গে কালের প্রতীক্ষা করব।' অচিন্ত্য পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে নারী ও বালকদের সঙ্গে আমাকে এখানেই রেখে নিজে কোনো অজ্ঞাতস্থানে চলে গেলেন। তখন থেকে আমি তোমার দুই ভ্রাতা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এবং অন্যান্য আত্মীয়দের কথা স্মরণ করে শোকমগ্ন হয়ে আছি। আহার করতে পারিনি। আমি আর আহারও গ্রহণ করব না এবং এই জীবনও রাখব না। পাণ্ডুনন্দন ! সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি এখানে এসে গেছ। এখন শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে কাজ করো। এই রাজ্য, নারীরা এবং রত্নসামগ্রী সবই তোমার অধীন। এবার আমি নিশ্চিন্তে প্রাণত্যাগ করব।

মাতুলের কথা শুনে অর্জুন মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বসুদেবকে বললেন—'মাতুল ! বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভ্রাতাদের না থাকায় এই পৃথিবী আমি আর দেখতে পারছি না। রাজা যুধিষ্ঠির, আর্য ভীমসেন, নকুল, সহদেব এবং

দ্রৌপদীও আর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সহ্য করবেন না, আমাদের সকলেরই এক হৃদয়। রাজা যুধিষ্ঠিরেরও পরলোক-গমনের সময় এসে গেছে। এখন আমি বৃষ্ণিবংশীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাব।' তারপর তিনি দারুককে বললেন—'আমি বৃষ্ণিবংশের বীর মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।' তারপর তিনি শোক জ্ঞাপন করতে করতে সুধর্মা-সভায় প্রবেশ করে এক সিংহাসনে উপবেশন করলেন। সেইসময় রাজ্যের অঙ্গভূত সমস্ত অমাত্যগণ (মন্ত্রী আদি) এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণেরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করলেন ; তাঁরা সকলেই, দীন, মোহগ্রস্ত ও অচেতন-প্রায় হয়েছিলেন, অর্জুনের অবস্থা আরও কাহিল। তিনি সভাসদদের বললেন—'আমি বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশের লোকদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাব ; কারণ সমুদ্র এখন এই নগরীকে গ্রাস করবে। সুতরাং আপনারাও ধন-সামগ্রীসহ প্রস্তুত হন। ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে আপনাদের রাজা করে দেওয়া হবে। আজ থেকে সপ্তম দিনে সূর্যোদয় হলেই আমরা এই নগর থেকে রওনা হয়ে যাব। সুতরাং আপনারা শীঘ্র প্রস্তুত হোন।'

অর্জুনের নির্দেশে সমস্ত মন্ত্রী তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শীঘ্রই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহলে অর্জুন সেই রাত কাটালেন। পরদিন প্রভাতে বসুদেব নিজ চিত্ত সমাহিত করে যোগের দ্বারা উত্তমগতি লাভ করলেন। তাঁর মহলে ক্রন্দনের রোল উঠল। সব নারী বিস্রস্ত বেশে, আলুলায়িত কেশে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। অর্জুন এক বহুমূল্য পালঙ্ক সাজিয়ে তাতে বসুদেবের মরদেহ শোয়ালেন, তারপর বহু মানুষ তাঁকে কাঁধে করে নগরের বাইরে নিয়ে গেলেন। সেই সময় সমস্ত দ্বারকাবাসী এবং আশপাশের বহুলোক দুঃখশোকে মগ্ন হয়ে বসুদেবের শবানুগমন করল। তাঁর মৃতদেহকে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যবহৃত ছাতা এবং অগ্নিহোত্রের অগ্নি নিয়ে যাজক ব্রাহ্মণগণ অনুগমন করছিলেন। তাঁদের পেছনে বসুদেবের পত্নীগণ বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে হাজার হাজার পুত্রবধূদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। বসুদেবের জীবিতকালে যে স্থান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, সেইস্থানে তাঁর দাহকার্য সমাপন করা হল। চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হলে বসুদেবের চার পত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা চিতায় গিয়ে বসলেন এবং বসুদেবের সঙ্গেই উত্তমগতি প্রাপ্ত করে পরলোক গমন করলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জুন মালা-চন্দন দ্বারা বিভূষিত করে অগ্নি সংস্কার কার্য সমাপন করলেন। দাহকার্য সমাপ্ত হলে বজ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ চিতায় জল সমর্পণ করলেন। পরে যেখানে বৃষ্ণিদের সংহার হয়েছিল, অর্জুন সেই স্থানে গিয়ে বীরদের মৃতদেহ দেখে শোকমগ্ন হলেন এবং তাদের সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করলেন। বিধিমতো সকলের মৃত্যোত্তর কার্য সমাপন হলে সপ্তম দিনে অর্জুন দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ঘোড়া, বলদ, উটের গাড়ি ও রথে করে শোকদুর্বল বৃষ্ণিবংশীয় বীরদের পিতা-পুত্র ও পত্নীরা চললেন। অর্জুনের নির্দেশে তাঁদের পরিচারক, ঘোড়সওয়ার এবং অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নী ও তাঁদের পৌত্র বজ্রের সঙ্গে চললেন। সেই বিশাল বাহিনী জনসমুদ্রের ন্যায় অর্জুনের সঙ্গে চলল। তাঁরা সকলে নগরের বাইরে গেলে হাঙর-কুমীর-পরিবৃত সমুদ্র দ্বারকানগরী গ্রাস করল।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দ্বারকাবাসীগণ দ্রুত চলতে লাগলেন। সেই সময় তাঁরা বারংবার বলতে লাগলেন—'দৈবের লীলা কী অদ্ভুত।' অর্জুন সুন্দর সুন্দর স্থানে শিবির স্থাপন করে এগোতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা সমৃদ্ধিশালী পঞ্চনদের দেশে এসে পৌঁছলেন। সেই দেশ গবাদি পশু এবং ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। অর্জুন সেইস্থানে শিবির স্থাপন করলেন। একাকী অর্জুনের সংরক্ষণে এই বিশাল জনসমুদ্র দেখে সেখানকার তস্করদের মনে লোভ উৎপন্ন হল, তারা সব আভীর জাতির লোক। একত্রিত হয়ে তারা পরামর্শ করল—'ভাই! দেখ, ধনুর্ধর অর্জুন আমাদের গুরুত্ব না দিয়ে একাই এই বালক-বৃদ্ধ-নারীদের নিয়ে যাচ্ছেন। এদের সব সৈনিককেও হতোদ্যম বলে মনে হচ্ছে। (এদের এখন আক্রমণ করা উচিত)।' এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে লুটপাট করার জন্য লাঠিসোঁটা নিয়ে হাজার হাজার লোকে সিংহগর্জন করে বৃষ্ণিবংশীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে দেখে কুন্তীনন্দন অর্জুন তাঁর পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে সহসা পেছনে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং হাসতে হাসতে বললেন—'পাপীগণ ! যদি বাঁচতে চাও তাহলে ফিরে যাও, নাহলে আমার বাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হবে।'

বীরবর অর্জুনের কথা শুনে তারা সেই কথায় গুরুত্ব দিল না এবং বারংবার বারণ করা সত্ত্বেও তারা এঁদের আক্রমণ করল। তখন অর্জুন তাঁর দিব্য গাণ্ডীব ধনুকে বাণ

চড়ালেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর অস্ত্রশস্ত্র স্মরণ করতে গেলেন, তখন তাঁর কিছুই মনে পড়ল না। তাতে অর্জুন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। গজারোহী এবং রথী সৈনিকরাও ডাকাতদের হাত থেকে নিজেদের লোকদের রক্ষা করতে পারল না। এদের মধ্যে নারীরাই সংখ্যাধিক্য ছিলেন, ডাকাতরা তাঁদের আক্রমণ করলে, অর্জুন তাঁদের রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। সব যোদ্ধাদের সামনেই ডাকাতেরা সুন্দরী নারীদের টেনে নিয়ে যেতে লাগল। অন্যের এই দুর্দশা দেখে বহু নারী চুপচাপ নিজেদের ডাকাতের হাতে সমর্পণ করল। অর্জুন তা লক্ষ্য করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে গাণ্ডীব ধনুক থেকে বাণবর্ষণ করে ডাকাত সংহার করতে আরম্ভ করলেন ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বাণ ফুরিয়ে গেল। বাণের অভাবে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ধনুকের আঘাতেই ডাকাত বধ করতে লাগলেন। জনমেজয় ! তখন পার্থের সামনেই ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীরা বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সুন্দরীদের লুঠ করে নিয়ে গেল। অর্জুন এটি দৈবের বিধান মনে করে দুঃখে শোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর অস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছিল, বাহুতে আগের মতো শক্তি ছিল না, ধনুক ঠিকমতো ধরতে পারছিলেন না এবং অক্ষয়-বাণও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। এসবই দৈবের লীলা ভেবে অর্জুন অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন এবং লুণ্ঠনকারীদের অনুসরণ না করে ফিরে এলেন। তারপর অন্য যারা সঙ্গে ছিলেন তাঁদের এবং তস্করদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ধনরত্ন নিয়ে তিনি কুরুক্ষেত্রে এলেন। এইভাবে অর্জুন বৃষ্ণিবংশীয়দের অবশিষ্ট পরিবারদের নিয়ে এসে, তাদের সেইখানে বসতি করে দিলেন। কৃতবর্মার পুত্রকে মার্তিকাবৎ রাজ্য প্রদান করলেন এবং ভোজরাজের পরিবারের নারীদের তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর অন্যসব বালক-বৃদ্ধ-নারীদের সঙ্গে করে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন। অর্জুন সাত্যকির প্রিয় পুত্রকে সরস্বতীর তীরের (সারস্বত) দেশের অধিকারী করলেন এবং বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রদান করলেন। বজ্র বহু বাধা দিলেও অক্রূরের পত্নীগণ বনে তপস্যা করতে চলে গেলেন। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জাম্ববতী দেবী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সত্যভামা ও অন্যান্য দেবীগণ তপস্যা করার জন্য বনে গেলেন। যেসব দ্বারকার লোক পার্থের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁদের যথাযোগ্য ভাগ করে অর্জুন বজ্রের কাছে তাঁদের সমর্পণ করলেন। এইরূপ সময়োচিত ব্যবস্থা করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে দর্শন করলেন।

—o—

অর্জুন ও ব্যাসদেবের আলাপ-আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহান ব্রতধারী এবং ধর্মজ্ঞ ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে 'আমি অর্জুন' বলে ধনঞ্জয় তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে মহামুনি ব্যাস প্রসন্ন হয়ে বললেন—'পুত্র ! তোমাকে স্বাগত জানাই ; এসো, বোসো।' অর্জুনের চিত্ত অশান্ত ছিল, তিনি বিষণ্ণ মনে বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন—'পার্থ ! তোমার ওপর অশুদ্ধ জল পড়েনি তো ? তুমি রজস্বলা নারীর সঙ্গে সমাগম বা ব্রহ্মহত্যা করনি তো ? যুদ্ধে পরাস্ত হওনি তো ? তোমাকে এতো শ্রীহীন দেখাচ্ছে কেন ? যদি আমার শোনার যোগ্য হয়, তাহলে শীঘ্র সব বলো।'

অর্জুন বললেন—মুনিবর ! যাঁর সুন্দর দেহ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং নেত্র কমলদলের মতো বিশাল, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ পরমধামে গমন করেছেন। ব্রাহ্মণদের

শাপে মুষল-যুদ্ধে বৃষ্ণিবীরেরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রভাসক্ষেত্রে রোমাঞ্চকারী সংগ্রামে সব বীরই নিহত হয়েছে। মহাবলী ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধকবংশীয় বীরেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে মারা গেছে। সময়ের বিপরীত আচরণ দেখুন, যাদের বাহু সুদীর্ঘ বিশাল ছিল এবং যাঁরা গদা ও নানা অস্ত্রের আঘাত অক্লেশে সহ্য করতেন, সেই বীরসকল ঘাসের আঘাতে মারা গেলেন ? সেই অনন্ত তেজস্বী বীরদের বিনাশের দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি না। যদুবংশের সংহারের কথা ভেবে আমার মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, পর্বত ভেঙে পড়েছে, আকাশ নেমে এসেছে এবং আগুন শীতল হয়ে গেছে ! এ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবুও তা সত্য। এছাড়া আর একটি ঘটনা আরও দুঃখদায়ক। পঞ্চনদ নিবাসী আভীরেরা আমার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমার চোখের সামনেই বৃষ্ণিবংশীয় অসংখ্য নারীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমার কাছে ধনুক থাকা সত্ত্বেও আমি শরসন্ধান করতে পারিনি। আগের মতো আমার বাহুবল নেই, অস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমার সব বাণ মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যাঁর স্বরূপ অপ্রমেয়, যিনি শঙ্খ-চক্র-গদাধারণকারী, চতুর্ভুজ, পীতাম্বরধারী, শ্যামসুন্দর তথা কমলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট যে পরমপুরুষ গোবিন্দ তাঁর অনন্ত প্রভা প্রসার করে আমার রথের অগ্রভাগে অবস্থান করে শত্রুসেনা ভস্ম করতেন, তাঁকে আমি আর দেখতে পাই না। তাঁর দর্শন না পেয়ে আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে, আমি এক মুহূর্তও শান্তি পাচ্ছি না। বীরবর জনার্দন ছাড়া আমি আর বেঁচে থাকতে পারছি না। তাঁর অন্তর্ধানের কথা শুনে আমার দিকভ্রম হয়েছে। আমার আত্মীয় বিনাশ তো হয়েছেই, আমার পরাক্রমও নষ্ট হয়ে গেছে। শূন্য হৃদয়ে এখন আমি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি কৃপা করে আমাকে উপদেশ দিন, আমার কল্যাণ কীসে হবে ?

ব্যাসদেব বললেন—কুরুশ্রেষ্ঠ ! বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশের মহারথীরা ব্রাহ্মণদের শাপে দগ্ধ হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, তুমি তাদের জন্য শোক কোরো না। তাদের এমনই ভবিতব্য ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাদের এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীর গতিই উলটে দিতে পারতেন ; তাহলে যাদবদের শাপ বিনষ্ট করা তাঁর কাছে এমন কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। যিনি স্নেহবশত তোমার রথের অগ্রভাগে অবস্থান করতেন (সারথির কাজ করতেন), সেই বাসুদেব কোনো সাধারণ মানুষ নন, তিনি সাক্ষাৎ গদা-চক্রধারী আদি-ঋষি নারায়ণ। সেই বিশাল চক্ষুসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীকে ভারমুক্ত করে পরমধামে গমন করেছেন। বীরবর ! তুমিও ভীম এবং নকুল-সহদেবের সাহায্যে দেবতাদের মহান কার্য সম্পন্ন করেছ। আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের সমস্ত কর্তব্য পূর্ণ করেছ। তোমরা সর্বপ্রকারে সাফল্যলাভ করেছ। এবার তোমাদের পরলোক গমনের সময় হয়েছে এবং তাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। যখন উদ্ভবের সময় হয় তখন এইভাবেই মানুষের বুদ্ধি, তেজ ও জ্ঞানের বিকাশ হয় আর যখন বিপরীত সময় উপস্থিত হয় তখন এইসব বিনষ্ট হয়ে যায়। কালই এই সবের মূল। সংসারের উৎপত্তির বীজও কাল। তোমার অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনও পূর্ণ হয়েছে ; তাই সেগুলি যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেছে। এখন তোমাদের উত্তমগতি লাভ করার সময় উপস্থিত। আমার মনে হয় এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অমিত তেজস্বী ব্যাসদেবের কথার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বুঝে অর্জুন তাঁর নির্দেশে হস্তিনাপুর গেলেন এবং সেখানে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সমস্ত সংবাদ বিস্তারিতভাবে জানালেন

॥ মৌষলপর্ব সমাপ্ত ॥

মহাপ্রাস্থানিকপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের বীরদের মধ্যে মুষল-যুদ্ধের সংবাদ শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনের পর পাণ্ডবেরা কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! কুরুরাজ যুধিষ্ঠির যখন বৃষ্ণিবংশীয়দের এইরূপ মহাসংহারের সংবাদ শুনলেন তখন মহাপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্জুনকে বললেন—'মহামতে ! কালই সমস্ত প্রাণীকে বিনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এখন কালের বন্ধন মেনে নিচ্ছি, তুমিও সেই সম্বন্ধে নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে পারো।' ভ্রাতার কথায় অর্জুনও কালের অনিবার্যতা বলে তাঁর কথা অনুমোদন করলেন। অর্জুনের মনোভাব জেনে ভীমসেন এবং নকুল সহদেবও তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলেন। যুধিষ্ঠির তখন যুযুৎসুকে আহ্বান করে তাঁর ওপর সমস্ত রাজ্যের দেখাশোনার ভার সমর্পণ করলেন এবং পরীক্ষিৎকে তাঁর রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। তারপর তিনি দুঃখিত চিত্তে সুভদ্রাকে বললেন—'মা ! তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ কৌরবদের রাজা হবে এবং যদুবংশে যারা বেঁচে আছেন শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র বজ্রকে তাঁদের রাজা করা হয়েছে। পরীক্ষিতের রাজ্য হবে হস্তিনাপুরে আর বজ্রের ইন্দ্রপ্রস্থে। তুমি রাজা বজ্রকেও দেখাশোনা করবে।' তারপর ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের, বৃদ্ধ মাতুল বসুদেবের এবং বলরাম ও অন্যান্যদের তর্পণ করলেন এবং অন্য সকলের নামে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করলেন। তারপর দ্বৈপায়ন ব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সাদরে আমন্ত্রণ করে ভগবৎপ্রীত্যর্থ তাঁদের স্বাদু অন্ন পরিবেশন করলেন এবং ভগবৎনাম কীর্তন করতে করতে উত্তম ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার রত্ন, বস্ত্র, গ্রাম, ঘোড়া, রথ প্রদান করলেন। তারপর গুরুবর কৃপাচার্যের পূজা করে নগরনিবাসী-সহ পরীক্ষিৎকে তাঁর সেবায় সমর্পণ করলেন। পরে সমস্ত প্রজাদের আহ্বান করে রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাদের মহাপ্রস্থান বিষয়ক সিদ্ধান্ত জানালেন। তাঁর কথা শুনেই নগর ও নগরপ্রান্তের লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল—

'মহারাজ ! আপনি এমন কাজ করবেন না (আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না)।' ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাদের নানাভাবে বুঝিয়ে রাজি করালেন এবং ভ্রাতাদের নিয়ে চলে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁর বস্ত্রালংকার ছেড়ে বল্কল ধারণ করলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীও তাই করলেন। সকলে বল্কল বস্ত্র ধারণ করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিধিপূর্বক উৎসর্গকালীন ইষ্টি করিয়ে অগ্নিকে জলে বিসর্জন দিলেন এবং মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। পূর্বে পাশা খেলায় পরাস্ত হয়ে পাণ্ডবেরা যেমন বনগমন করেছিলেন, তেমনই দ্রৌপদীসহ তাঁদের যেতে দেখে নগরের নারীরা কাঁদতে লাগলেন ; কিন্তু পঞ্চভ্রাতা এই যাত্রায় অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। সকল পাণ্ডব, দ্রৌপদী ও একটি কুকুর—একসঙ্গে যেতে লাগল। তাঁরা যখন হস্তিনাপুর নগরীর বাইরে গেলেন তখন নগরনিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বহুদূর পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে গেল ; কিন্তু কোনো ব্যক্তিই রাজা যুধিষ্ঠিরকে ফেরার কথা বলতে পারল না। ধীরে ধীরে সমস্ত পুরবাসী ও কৃপাচার্য প্রমুখ যুযুৎসুর সঙ্গে ফিরে এলেন। নাগকন্যা উলূপী গঙ্গায় প্রবেশ করলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুর নগরে চলে গেলেন এবং বাকি মায়েরা পরীক্ষিৎকে নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীদেবীসহ উপবাস করতে করতে পূর্বদিকে রওনা হলেন। তাঁরা সকলেই যোগযুক্ত, মহাত্মা ও ত্যাগ-ধর্ম পালনকারী ছিলেন। তাঁরা বহুদেশ, নদী, সমুদ্র যাত্রা করলেন। প্রথমে যুধিষ্ঠির, তাঁর পেছনে ভীম, ভীমের পেছনে অর্জুন, তারপর ক্রমশ নকুল ও সহদেব চলছিলেন। নারীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী সবার পেছনে ছিলেন। এইভাবে তাঁরা ক্রমশ লালসাগরের তীরে পৌঁছলেন। অর্জুন দিব্য রত্ন মনে করে তখনও তাঁর গাণ্ডীব ধনুক এবং অক্ষয় তূণীর পরিত্যাগ করেননি। সেখানে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন পুরুষরূপধারী সাক্ষাৎ অগ্নিদেব তাঁদের পথরোধ করে উপস্থিত। সাত প্রকার জ্বালারূপ জিহ্বায় সুশোভিত অগ্নিদেব পাণ্ডবদের বললেন—

'মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! ভীমসেন এবং অর্জুন, নকুল, সহদেব ! তোমাদের জানা উচিত যে আমি অগ্নি। এখন তোমরা আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আমি নর স্বরূপ অর্জুন এবং নারায়ণ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই খাণ্ডববন দহন করেছিলাম। এখন অর্জুনের এই উত্তম অস্ত্র গাণ্ডীব ধনুক এখানেই পরিত্যাগ করে বনে যাওয়া উচিত ; কেননা এর আর কোনো প্রয়োজন নেই। এই গাণ্ডীব ধনুক সর্ব প্রকার ধনুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি এটি অর্জুনের জন্যই বরুণের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলাম, এখন এটি আবার বরুণকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

তাঁর কথা শুনে সকলেই অর্জুনকে সেই ধনুক ত্যাগ করতে বললেন। অর্জুন তাঁদের কথামতো ধনুক ও তূণীর জলে ফেলে দিলেন। তখন অগ্নিদেব অন্তর্ধান করলেন এবং পাণ্ডবেরা দক্ষিণাভিমুখে চললেন। যেতে যেতে তাঁরা লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোতে লাগলেন। তারপর পশ্চিম দিকে ঘুরে অগ্রসর হয়ে তাঁরা সমুদ্রে নিমজ্জিত দ্বারকাপুরীকে দেখলেন। পরে যোগ ও ধর্মেস্থিত পাণ্ডবগণ পৃথিবী পরিক্রমা পূর্ণ করার ইচ্ছায় সেখান থেকে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

---o---

পথে দ্রৌপদী ও সহদেবাদি চার পাণ্ডবের পতন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! নিয়মপালনকারী যোগযুক্ত পাণ্ডবগণ পশ্চিম থেকে উত্তর দিকে এসে মহাগিরি সুমেরু দর্শন করলেন। সমস্ত পাণ্ডব একাগ্রচিত্তে অত্যন্ত দ্রুতভাবে এগোচ্ছিলেন। তাঁদের পেছনে আসতে আসতে দ্রৌপদী মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁকে পড়ে যেতে দেখে মহাবলী ভীম ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভ্রাতা ! রাজকুমারী দ্রৌপদী কখনো কোনো পাপ করেনি ; তাহলে সে কেন নীচে পড়ে গেল বলুন ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'নরশ্রেষ্ঠ ! এর মনে অর্জুনের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল, আজ সে তারই ফল ভোগ করছে।'

একথা বলে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর দিকে না তাকিয়ে নিজ চিত্ত একাগ্র করে এগিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে সহদেবও পড়লেন। তাঁকে পড়ে যেতে দেখে ভীম রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভ্রাতা ! মাদ্রীনন্দন সহদেব, যে সর্বদা আমাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকত এবং অহংকারকে কাছে আসতে দিত না, সে কেন আজ ধরাশায়ী হল ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—রাজকুমার সহদেব মনে করতে তার মতো বিদ্বান কেউ নেই, সেই দোষের জন্যই আজ তার পতন হল।

দ্রৌপদী ও সহদেবের পতন দেখে ভ্রাতৃপ্রেমিক শূরবীর নকুল শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়ে গেলেন। তাই দেখে ভীম পুনরায় রাজাকে প্রশ্ন করলেন—'ভ্রাতা ! জগতে যার রূপের সমকক্ষ কেউ ছিল না, যে কখনো ধর্মে কোনো ত্রুটি করেনি এবং সর্বদা আমাদের আদেশ পালন করত, আমাদের সেই প্রিয় ভ্রাতা নকুলের কেন পতন হল ?' ভীমসেনের জিজ্ঞাসার উত্তরে যুধিষ্ঠির নকুলের সম্পর্কে বললেন—'ভীম ! নকুল সর্বদা ভাবত তার মতো রূপবান কেউ নেই, তার মনে সবসময় এই কথা থাকত। তাই আজ তার পতন হল। তাদের তিনজনকে পড়ে যেতে দেখে অর্জুন অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন এবং তিনিও অনুতপ্ত হয়ে পড়ে গেলেন। দুর্ধর্ষ বীর অর্জুনকে পড়তে এবং মরণাপন্ন হতে দেখে ভীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—'ভ্রাতা ! মহাত্মা অর্জুন কখনো পরিহাস করেও মিথ্যা বলেছে, একথা আমার মনে পড়ে না ; তাহলে এ কোন্ কর্মের ফল, যার জন্য তারও পতন হল ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—অর্জুনের নিজের বীরত্বের অহংকার ছিল। সে বলেছিল যে 'আমি একদিনেই শত্রুদের ভস্ম করে ফেলব' কিন্তু তা করেনি। তাই আজ ওকে ধরাশায়ী হতে হল। শুধু তাই নয়, সে সমস্ত ধনুর্ধরদেরও অপমান করেছিল (যার ফল তাকে পেতে হচ্ছে) ; তাই নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তিদের এরূপ করা উচিত নয়।

এই বলে যুধিষ্ঠির এগিয়ে চললেন। তারপরেই ভীমসেনেরও পতন হল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন—'রাজন্ ! আমাকে একটু দেখুন। আমি আপনার প্রিয় ভীমসেন, ধরাশায়ী। আপনি যদি আমার পতনের কারণ জানেন, তাহলে বলুন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—ভীম ! তুমি অত্যধিক আহার করতে এবং অন্যদের ছোট করে নিজের শক্তির অহংকার করতে ; সেইজন্যই তোমার পতন হল।

এই কথা বলে মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাঁর দিকে না তাকিয়েই এগিয়ে চললেন। শুধু একটি কুকুর সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করছিল।

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্র ও ধর্মের সঙ্গে কথাবার্তা এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় তখন আকাশ ও পৃথিবীতে তুমুল শব্দের ধ্বনি তুলে দেবরাজ ইন্দ্র রথ নিয়ে সেখানে হাজির হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'কুন্তীনন্দন ! তুমি এই রথে আরোহণ করো।' যুধিষ্ঠির তখন তাঁর পড়ে যাওয়া ভ্রাতাদের দিকে তাকিয়ে শোকসন্তপ্ত হয়ে ইন্দ্রকে বললেন—'দেবেশ্বর ! আমার ভ্রাতারা পথে পড়ে রয়েছে। এরাও যাতে আমার সঙ্গে যায়, সেই ব্যবস্থা করুন ; আমি এদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে চাই না। রাজকুমারী দ্রৌপদী অত্যন্ত কোমল, তাঁকেও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।'

ইন্দ্র বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! তোমার ভ্রাতারা তোমার আগেই স্বর্গে গিয়েছে ; দ্রৌপদীও তাদের সঙ্গে আছে। ওখানে গেলে সকলের সঙ্গেই তোমার সাক্ষাৎ হবে। সুতরাং তাদের জন্য শোক কোরো না। তারা মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে স্বর্গগমন করেছে ; কিন্তু তুমি এই দেহ ধারণ করেই স্বর্গে যেতে পারো।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবরাজ ! এই কুকুরটি আমার অত্যন্ত ভক্ত, সর্বদা সে আমার সঙ্গে রয়েছে ; সুতরাং একেও আমার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।

ইন্দ্র বললেন—রাজন্ ! তুমি অমরত্ব, আমার সমান ঐশ্বর্য, পূর্ণ লক্ষ্মী এবং অনেক বড় সিদ্ধি লাভ করেছ ; সেই সঙ্গে স্বর্গীয় সুখও লাভ করেছ। অতএব এই কুকুরটিকে পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলো। এতে কোনো নির্দয়তা নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবেশ ! আর্য পুরুষের দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর কাজ হওয়া কঠিন ; আমি এমন লক্ষ্মী কখনো লাভ করতে চাই না, যার জন্য ভক্তকে ত্যাগ করতে হয়।

ইন্দ্র বললেন—ধর্মরাজ ! কুকুরের জন্য স্বর্গলোকে কোনো স্থান নেই। তাদের যারা আশ্রয় দেয়, তারাও স্বর্গলোকে স্থান পায় না। তারা যে যজ্ঞ করে, রাক্ষস তার পুণ্য হরণ করে ; তাই ভেবে-চিন্তে কাজ করো। এই কুকুরটিকে ছেড়ে দাও এতে তোমার কোনো নিষ্ঠুর কাজ করা হবে না।

যুধিষ্ঠির বললেন—মহেন্দ্র ! ভক্তকে ত্যাগ করলে যে পাপ হয়, তার কোনোদিন শেষ হয় না, জগতে তা ব্রহ্মহত্যার সমান বলে মানা হয়। সুতরাং আমি নিজের সুখের জন্য কখনো কোনোভাবে এই কুকুরটিকে ত্যাগ করতে পারব না। যে ভয় পেয়েছে, ভক্ত, 'আমার অন্য কোনো আশ্রয় নেই'—এই বলে আর্তভাবে যে শরণ গ্রহণ করে, নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম, দুর্বল এবং নিজের প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তেমন মানুষকে প্রাণ গেলেও আমি পরিত্যাগ করব না—এ আমার চিরকালের ব্রত।

ইন্দ্র বললেন—বীরবর ! মানুষ যা কিছু দান, স্বাধ্যায়, হোম ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করে, তাতে যদি কুকুরের দৃষ্টি পড়ে তবে তার ফল ক্রোধবশ নামক রাক্ষস হরণ করে ; অতএব এই কুকুরটিকে ত্যাগ করো, তাহলে তুমি দেবলোক প্রাপ্ত হবে। তুমি ভ্রাতাদের এবং প্রিয় পত্নী দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করে তোমার পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ দেবলোক লাভ করেছ, তাহলে এই কুকুরকে কেন ছেড়ে দিচ্ছ না। সবকিছু ছেড়ে এখন কুকুরের মোহে আবদ্ধ হলে কেন ?

যুধিষ্ঠির বললেন—দেবরাজ ! জগতে একথা নিশ্চিত যে মৃতব্যক্তির সঙ্গে কারো মিলনও হয় না, বিরোধও নয়। দ্রৌপদী এবং আমার ভ্রাতাদের জীবিত করা আমার সাধ্যাতীত ; তাই তারা মারা যাওয়ায় আমি তাদের ত্যাগ করেছি, জীবিতাবস্থায় নয়। শরণাগতকে ভয় দেখানো, নারী হত্যা, ব্রাহ্মণের ধন হরণ এবং মিত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা—এই চার অধর্ম একদিকে আর অন্যদিকে ভক্তকে পরিত্যাগ করা, আমার মনে হয় এই একটিই ওই চার অধর্মের সমান।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! (কুকুরের দেহ ধারণ করে আগত) ধর্মস্বরূপ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর স্তুতি করে মধুর বাক্যে বললেন—''রাজেন্দ্র ! তুমি তোমার সদাচার, বুদ্ধি এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়ার জন্য তোমার পিতার নাম উজ্জ্বল করেছ। পুত্র ! আমি আগে একবার দ্বৈতবনেও তোমার পরীক্ষা নিয়েছিলাম, যখন তোমার সকল ভ্রাতাই জল আনতে গিয়ে মারা পড়েছিল। সেই সময় তুমি কুন্তী ও মাদ্রী—উভয় মাতার মধ্যে সমানভাব রেখে নিজ সহোদর ভাই ভীম ও অর্জুনের প্রাণ না চেয়ে শুধু নকুলকে বাঁচাতে চেয়েছিলে। এখনও 'এই কুকুরটি আমার ভক্ত' মনে করে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের রথও পরিত্যাগ করেছ। অতএব স্বর্গলোকে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই তুমি তোমার এই দেহেই অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি পরম উত্তম দিব্য গতি লাভ করেছ।''

এই কথা বলে ধর্ম, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমার, দেবতা এবং দেবর্ষিগণ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রথে বসিয়ে নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করে স্বর্গলোকে রওনা হলেন। তাঁরা সকলেই নিজ ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী, রজোগুণশূন্য, পুণ্যাত্মা, পবিত্র বাণীযুক্ত, বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সিদ্ধ ছিলেন। ইন্দ্রের রথে বসে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর তেজে পৃথিবী এবং আকাশকে দেদীপ্যমান করে অত্যন্ত বেগে ওপর দিকে যেতে লাগলেন। সেইসময় সমস্ত লোকের বৃত্তান্ত জানা, বচনকুশল, মহাতপস্বী নারদ দেবমণ্ডলে অবস্থান করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'যত রাজর্ষি এই স্বর্গে এসেছেন, তাঁরা সকলেই এখানে উপস্থিত, কিন্তু কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নিজ সুযশে তাঁদের সমস্ত কীর্তি আচ্ছাদিত করে বিরাজমান হয়েছেন। নিজ যশ, তেজ এবং সদাচাররূপ সম্পদে ত্রিলোক আবৃত করে নিজ ভৌতিক শরীরে স্বর্গলোকে আসার সৌভাগ্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যতীত আর কেউ প্রাপ্ত হয়েছেন—একথা আমি কখনো শুনিনি। যুধিষ্ঠির ! পৃথিবীতে থাকার সময় তুমি আকাশে নক্ষত্র ও তারারূপে যত জ্যোতি দেখেছ, সেগুলিই এই দেবতাদের হাজার হাজার লোক ; তাদের দিকে তাকাও।'

নারদের কথা শুনে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির দেবগণ ও নিজ পক্ষের রাজাদের অনুমতি নিয়ে বললেন—'আমার ভ্রাতারা ভালো-মন্দ যে স্থান লাভ করেছে, আমিও সেই স্থান লাভ করতে চাই। তাদের ছাড়া, অন্য কোনো লোকে যাওয়ার আমার ইচ্ছা নেই।' তাঁর কথা শুনে ইন্দ্র কোমল স্বরে বললেন—'মহারাজ ! তুমি নিজ শুভ কর্মদ্বারা প্রাপ্ত এই স্বর্গলোকে নিবাস করো। মনুষ্যলোকের স্নেহপাশকে কেন এখনও টেনে আনছ ? তুমি এমন উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছ যা অন্যের পক্ষে দুর্লভ। তোমার ভ্রাতারা সেই স্থান লাভ করতে পারেনি। এখনও মনুষ্যলোকের চিন্তা তোমার সঙ্গ ছাড়েনি ? এটি স্বর্গলোক ; স্বর্গবাসী দেবর্ষি এবং সিদ্ধদের দিকে দৃষ্টি দাও।'

দেবেন্দ্রের এরূপ কথা শুনে যুধিষ্ঠির আবার বললেন—'দেবরাজ ! আমার ভ্রাতাদের ছাড়া এখানে থাকার ইচ্ছা আমার নেই। আমার ভ্রাতারা যেখানে গেছে, যেখানে সত্ত্বগুণসম্পন্না দ্রৌপদী বিরাজমান, সেখানেই আমি যেতে চাই।'

॥ মহাপ্রাস্থানিকপর্ব সমাপ্ত ॥

স্বর্গারোহণপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

স্বর্গে নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথাবার্তা এবং যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আমার প্রপিতামহ পাণ্ডবগণ যখন স্বর্গে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাঁদের এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কোন্ কোন্ স্থান প্রাপ্তি হল ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তোমার প্রপিতামহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দেখলেন যে দুর্যোধন স্বর্গীয় শোভাসম্পন্ন হয়ে দেবতা ও সাধ্যগণের সঙ্গে এক দিব্য সিংহাসনে বসে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে শোভা পাচ্ছেন। তাঁর সেই ঐশ্বর্য দেখে যুধিষ্ঠির সহসা পেছন ফিরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন—'দেবগণ ! যার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত সুহৃদ এবং বন্ধুদের সংহার করেছি, যার প্রেরণায় নিত্য ধর্মাচরণকারিণী আমাদের পত্নী পাঞ্চাল-রাজকুমারী দ্রৌপদীকে পূর্ণ সভাগৃহে গুরুজনদের সামনে টেনে আনা হয়েছিল, সেই দুর্যোধনের সঙ্গে এই স্বর্গলোকে আমি থাকতে চাই না।' তাঁর কথা শুনে দেবর্ষি নারদ হেসে উঠলেন, তিনি বললেন—'বীরবর ! স্বর্গে আসার পর মৃত্যুলোকের শত্রুতা-বিবাদ থাকে না, সুতরাং মহারাজ দুর্যোধনের বিষয়ে তোমার এরূপ বলা কখনো উচিত নয়। স্বর্গলোকে যত বিশিষ্ট রাজা আছেন, তাঁরা এবং সমস্ত দেবতাও এখানে রাজা দুর্যোধনকে বিশেষ সম্মান করেন। একথা সত্য যে ইনি সর্বদাই তোমাদের কষ্টপ্রদান করেছেন কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করায় ইনি বীরলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব এঁর দ্বারা দ্রৌপদী যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েছে, তা ভুলে এঁর সঙ্গে ন্যায়পূর্বক ব্যবহার করো। এ হল স্বর্গলোক, এখানে এলে পূর্বের শত্রুতা থাকে না।'

নারদের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—

'ব্রহ্মন্ ! যারা মহান ব্রতধারী, মহাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিশ্ববিখ্যাত বীর এবং সত্যবাদী ছিল, আমার সেই ভ্রাতারা কোন্ লোক প্রাপ্ত হয়েছে ? তাদের আমি দেখতে চাই। সত্যে দৃঢ় থাকা কুন্তীপুত্র কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রদেরও আমি দেখতে আকাঙ্ক্ষা করি। এরা ছাড়া যেসব রাজা ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে মারা গেছে, তারা এখন কোথায় ? তাদের তো এখানে দেখতে পাচ্ছি না ! রাজা বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, পাঞ্চাল রাজকুমার শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং দুর্ধর্ষ বীর অভিমন্যুর সঙ্গেও আমি সাক্ষাৎ করতে চাই।'

পুনরায় যুধিষ্ঠির দেবতাদের বললেন—"দেবগণ ! এখানে যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা—এই দুই ভ্রাতাকে কেন দেখতে পাচ্ছি না ? যেসব মহারথী রাজাগণ ও রাজকুমারগণ সমরাগ্নিতে নিজেদের আহুতি দিয়েছেন, যাঁরা আমার জন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, সেই সিংহের ন্যায় পরাক্রমী বীরেরা কোথায় ? তাঁরাও কি এই লোকে অধিকার লাভ করেছেন ? সেইসব মহারথীও যদি এখানে এসে থাকেন, তাহলে আমি সেই মহাত্মাদের সঙ্গে এখানে থাকব ; কিন্তু তাঁরা যদি এই শুভ এবং অক্ষয় লোক লাভ না করে থাকেন, তাহলে আমি আমার ভ্রাতা-বন্ধু-আত্মীয়দের ছাড়া এখানে সুখে থাকতে পারব না। যুদ্ধের পর আমি যখন আমার মৃত আত্মীয়দের জলাঞ্জলি দিচ্ছিলাম, তখন আমার মাতা কুন্তী আমাকে বলেছিলেন—'পুত্র ! কর্ণের জন্যও জলাঞ্জলি প্রদান করো।' মায়ের কথা শুনে যখন আমি বুঝতে পারি যে মহাত্মা কর্ণ আমারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তখন থেকে আমার মনে বড়ই দুঃখ হয়। এইকথা ভেবে আমার আরও অনুতাপ হয় যে মহামনা কর্ণের দুটি চরণ আমার মাতা কুন্তীর মতো দেখেও আমি কেন তাঁর অনুগামী হইনি। কর্ণ যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন, তাহলে ইন্দ্রও যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত করতে পারতেন না। সেই সূর্যনন্দন কর্ণ যেখানেই থাকুন, আমি তাঁর দর্শনলাভ করতে চাই। আমার প্রাণের থেকে প্রিয় ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং ধর্মপরায়ণা দ্রৌপদীকেও দেখতে চাই। এখানে থাকার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। আমি আপনাদের সত্যকথাই জানাচ্ছি। ভ্রাতাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার স্বর্গ হতে কী পাওয়ার আছে ? যেখানে আমার ভ্রাতারা আছে, সেখানেই আমার স্বর্গ। এই লোককে আমি স্বর্গ বলে মনে করি না।"

দেবতারা বললেন—রাজন্ ! ভ্রাতাদের প্রতি যদি তোমার এতোই প্রীতি, তাহলে চলো, বিলম্ব কোরো না। আমরা দেবরাজের নির্দেশে সর্বভাবে তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে চাই।

এই কথা বলে দেবতারা দেবদূতকে নির্দেশ দিলেন—'তুমি যুধিষ্ঠিরকে এঁর সুহৃদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।' এরপর রাজা যুধিষ্ঠির এবং দেবদূত দুজনে একসঙ্গে সেই স্থানে চললেন, যেখানে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন প্রমুখ ছিলেন। আগে আগে দেবদূত ও তাঁর পেছনে যুধিষ্ঠির যাচ্ছিলেন। তাঁরা দুজনে এমন এক পথে এলেন, যা অত্যন্ত বন্ধুর ; তার ওপর দিয়ে চলাই মুশকিল। পাপাচারী ব্যক্তিরাই সেই পথে যাতায়াত করে। সেখানে সর্বত্র অন্ধকার ঘনিয়ে ছিল। চতুর্দিক থেকে দুর্গন্ধ আসছিল, এদিক-ওদিক পচা মৃতদেহ পড়ে ছিল। যেখানে সেখানে অস্থি-চুল ছড়িয়ে ছিল। কাক-

শকুন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নানা আকারের প্রেত চারদিকে ঘুরছিল। প্রেতেদের কারো দেহ থেকে রক্ত-মাংস বেরিয়েছিল, কারো হাত-পা বা মাথা ছিল না। ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে সেই পথ পার হয়ে এলেন। তিনি দেখলেন সেখানে ফুটন্ত জলের তীব্র স্রোতা নদী প্রবাহিত, তার অপর পারে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অপরদিকে তীক্ষ্ণ তলোয়ার ন্যায় পাতাবহুল অসিপত্র নামক বন। কোথাও গরম বালি ছড়ানো, কোথাও তপ্ত লোহার বিশাল কড়াই রাখা রয়েছে। সবদিকে লোহার পাত্রে তেল ফোটানো হচ্ছে। যত্রতত্র তীক্ষ্ণ কাঁটায় ভরা সেমল বৃক্ষ,

যাতে হাত দেওয়া কঠিন। এই সব ব্যতীত সেই স্থানে পাপীদের যেমন কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল, যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি সেইদিকেও পড়ল। সেখানকার দুর্গন্ধে বিরক্ত হয়ে তিনি দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সুধী ! এমন পথ দিয়ে আমাদের আর কতদূর যেতে হবে ? আমার ভ্রাতারা কোথায় ?'

ধর্মরাজের কথা শুনে দেবদূত ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন—"পথ চলা সমাপ্ত, এই পর্যন্তই আপনার আসবার ছিল। মহারাজ ! দেবতারা আমাকে বলেছিলেন যে 'যুধিষ্ঠির যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখন তাঁকে ফিরিয়ে আনবে।' সুতরাং এখন আমি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আমার সঙ্গে আসুন।" যুধিষ্ঠির সেই দুর্গন্ধে অবশ হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই ভীত হয়ে ফেরবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যখনই সেই স্থান থেকে ফিরতে উদ্যত হলেন, তখনই তাঁর কানে চারদিক থেকে দুঃখী জীবদের ডাক শোনা গেল—'ধর্মনন্দন ! আপনি আমাদের ওপর কৃপা করে এখানে একটু দাঁড়ান। আপনি আসতেই পরম পবিত্র সুগন্ধ হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে, তাতে আমরা খুব তৃপ্তি পেয়েছি। কুন্তীনন্দন ! বহু দিন পরে আজ আপনার দর্শন পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি ; সুতরাং আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ান। আপনি থাকলে এখানকার কষ্ট আমাদের বেদনা দেয় না।' এইভাবে সেই কষ্ট পাওয়া দুঃখী জীবদের নানাপ্রকার আর্তবাক্য শুনে রাজা যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত দয়া হল। তিনি সহসা বলে ফেললেন—'ওঃ বেচারাদের বড় কষ্ট।' বলে তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আবার আগের মতো দুঃখী জীবদের আর্তনাদ শুনতে লাগলেন ; কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না একথা কে বলছে। যখন কিছুতেই তিনি তাদের পরিচয় জানতে পারলেন না তখন তিনি সেই দুঃখী জীবদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা কে আর এখানে কেন থাকেন ?' তার জিজ্ঞাসায় চারদিক থেকে উত্তর আসতে লাগল—'আমি কর্ণ', 'আমি ভীমসেন', 'আমি অর্জুন', 'আমি নকুল', 'আমি সহদেব', 'আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন', 'আমি দ্রৌপদী' এবং 'আমরা দ্রৌপদীর পুত্র'। এইভাবে সকলে নিজ নিজ নাম বলে বিলাপ করতে লাগল। এই সব শুনে রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'দৈবের এ কেমন বিধান ?' আমার মহাত্মা ভ্রাতা ভীমসেন, কর্ণ, দ্রৌপদীর পুত্রেরা, অন্য ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী এমন কী পাপ করেছে যে তাদের এই দুর্গন্ধপূর্ণ ভয়ানক স্থানে থাকতে হচ্ছে ? তারা সকলেই পুণ্যাত্মা ছিল। আমি যতদূর জানি, তারা কোনো পাপ করেনি ; তাহলে কোন্ কর্মের ফলে তারা এই নরকে পড়ে আছে ? আমার ভ্রাতারা সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, শূরবীর, সত্যবাদী এবং শাস্ত্রের অনুগামী। তারা ক্ষত্রিয় ধর্মে তৎপর থেকে বড় বড় যজ্ঞ করেছে এবং বহু দক্ষিণা প্রদান করেছে। তবুও কেন তাদের এই দুর্গতি হল ? আমি ঘুমিয়ে আছি, না জেগে ? আমার চেতনা আছে, না নেই ? এ আমার চিত্ত বিকার অথবা ভ্রম নয় তো ?'

এইরূপ নানা কথা ভাবতে ভাবতে রাজা যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বললেন—"তুমি যাঁর দূত, তাঁর কাছে ফিরে যাও ; আমি সেখানে যাবো না। তোমার প্রভুকে গিয়ে বলো—যুধিষ্ঠির ওখানেই থাকবে।" আমি এখানে থাকলে আমার ভাই-বন্ধুরা একটু শান্তি পাবে। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন এবং যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন এবং যা করতে চাইছিলেন, সবই দেবরাজকে নিবেদন করলেন।

—০—

ইন্দ্র ও ধর্মের যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান এবং পার্থিব শরীর ত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরের দিব্যলোকে গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেখানে দাঁড়াবার পর এক মুহূর্ত না যেতেই ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাক্ষাৎ ধর্মও দেহধারণ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। সেই তেজঃপূর্ণ দেবতারা আসতেই সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেল। পাপীদের কষ্ট পাওয়ার দৃশ্য দেখা গেল না। শীতল মৃদুগতি সুগন্ধবায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। ইন্দ্রসহ মরুদ্গণ, বসু, অশ্বিনীকুমার, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য এবং অন্যান্য স্বর্গবাসী দেবতা সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ মহাতেজস্বী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে সমবেত হলেন। ইন্দ্র তখন

যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'মহারাজ ! এতক্ষণ যা হয়েছে, তা হয়েছে, এখন আর এতে কষ্ট পাওয়ার প্রয়োজন নেই। এসো, আমার সঙ্গে চলো। তুমি পরম সিদ্ধিলাভ করেছ, সেই সঙ্গে অক্ষয়লোকও প্রাপ্ত হয়েছ। তোমাকে যে নরকদর্শন করতে হল, তার জন্য দুঃখ কোরো না। মানুষ নিজের জীবনে শুভ এবং অশুভ—দু-প্রকার কর্মরাশি সঞ্চিত করে। যে প্রথমে শুভকর্মের ফল ভোগ করে, তাকে পরে নরক ভোগ করতে হয় আর যে আগে নরকের কষ্ট সহ্য করে, সে পরে স্বর্গসুখ অনুভব করে। যার পাপকর্ম বেশি এবং পুণ্য অল্প, সে প্রথমে স্বর্গসুখ ভোগ করে (এবং যে পুণ্য অধিক এবং পাপ কম করে, সে প্রথমে নরক ভোগ করে পরে স্বর্গের আনন্দ লাভ করে)। সেই নিয়মানুসারে তোমার মঙ্গলের কথা চিন্তা করে আমি আগে তোমাকে নরক দর্শন করিয়েছি। তুমি অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা বলে ছলনা করে দ্রোণাচার্যকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ বিশ্বাস করিয়েছিলে, তাই তোমাকেও ছলনা করে নরক দর্শন করানো হয়েছে। তোমার পক্ষের যত রাজা যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তারা সকলেই স্বর্গলোকে পৌঁছে গেছে। মহান ধনুর্ধর ও শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী কর্ণ, যার জন্য তুমি সর্বদা দুঃখিত হয়ে থাকো, সে-ও উত্তম সিদ্ধি লাভ করেছে। তোমার অন্য ভ্রাতারা এবং পাণ্ডবপক্ষের অন্য রাজারাও নিজ নিজ যোগ্য স্থান প্রাপ্ত করেছে। আমার সঙ্গে গিয়ে তাদের সকলকে দেখো এবং মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে স্বর্গে বিহার করো। তোমার কৃত পুণ্যকর্ম ও তপ-দানের ফল ভোগ করো। রাজসূয়যজ্ঞে জয় করা সমৃদ্ধিশালী লোক স্বীকার করো এবং তপস্যার মহান ফল ভোগ করো। যুধিষ্ঠির ! তোমার প্রাপ্ত সম্পূর্ণ লোক রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকের ন্যায় সমস্ত রাজাদের লোকের থেকে উঁচে, সেখানেই তুমি অবস্থান করবে। রাজর্ষি মান্ধাতা, রাজা ভগীরথ, দুষ্যন্তকুমার ভরত যেখানে গিয়েছেন, সেই লোকে নিবাস করে তুমিও দিব্যসুখ ভোগ করবে। মহারাজ ! দেখো, ত্রিভুবন পবিত্রকারিণী দেবনদী মন্দাকিনী সামনেই দেখা যাচ্ছে ; তার পবিত্র জলে স্নান করে তুমি দিব্যলোকে যেতে পারবে। ওই জলে ডুব দিলেই তোমার মানব-স্বভাব দূর হবে ; তোমার মনের শোক-সন্তাপ, গ্লানি এবং শত্রুতা ইত্যাদি সকল দোষ অপসৃত হবে।'

দেবরাজের কথা শেষ হলে শরীর ধারণ করে আসা সাক্ষাৎ ধর্ম বললেন—'পুত্র ! তোমার ধর্মবিষয়ক অনুরাগ, সত্যভাষণ, ক্ষমা এবং ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি গুণাবলির জন্য আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার দ্বারা এ তোমার তৃতীয় পরীক্ষা। কোনো যুক্তিতে আমরা কেউই তোমাকে তোমার স্বভাব থেকে বিচলিত করতে পারিনি। দ্বৈতবনে অরণীকাষ্ঠ অপহরণের পর যখন যক্ষরূপে তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম, সেটি তোমার প্রথম পরীক্ষা ছিল ; তাতে তুমি ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছিলে। তারপর দ্রৌপদীসহ তোমার সব ভ্রাতাদের মৃত্যু হলে কুকুরের রূপ ধারণ করে তোমাকে আমি দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করেছিলাম। তাতেও তুমি সাফল্য লাভ করেছ। এটি তোমার তৃতীয় পরীক্ষা ছিল ; এইবারও তুমি সুখের আশা না করে ভ্রাতাদের হিতের জন্য নরকেই থাকতে চেয়েছিলে ; সুতরাং তুমি সর্বভাবে শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছ। তোমার মধ্যে পাপের নামও নেই, অতএব তুমি স্বর্গের সুখ উপভোগ করো। তোমার ভ্রাতারা নরকের যোগ্য নয়। তুমি যে তোমার ভ্রাতাদের নরকভোগ করতে দেখেছ, তা দেবরাজ ইন্দ্রের সৃষ্টি করা মায়া। অর্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সত্যবাদী শূরবীর কর্ণ এবং রাজকুমারী দ্রৌপদী—এরা কেউই নরকে যাওয়ার যোগ্য নয়। ভরতশ্রেষ্ঠ ! এসো, আমার সঙ্গে গিয়ে ত্রিলোকগামিনী গঙ্গাদেবীকে দর্শন করবে।'

জনমেজয় ! ধর্মের কথা শুনে তোমার প্রপিতামহ রাজর্ষি যুধিষ্ঠির ধর্ম এবং সমস্ত স্বর্গবাসী দেবতাদের সঙ্গে গিয়ে মুনিজনবন্দিত পরম পবিত্র দেবনদী গঙ্গাতে স্নান করলেন। স্নান করতেই তাঁর মানবদেহ পরিত্যক্ত হয়ে দেহ দিব্য হল। তাঁর হৃদয়ের শোক-দুঃখ, শত্রুতা সব দূর হল। তারপর তিনি দেবতা পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষিদের স্তুতি শুনতে শুনতে ধর্মের সঙ্গে সেই স্থানে এলেন, যেখানে তাঁর চার পাণ্ডব ভ্রাতা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ক্রোধ পরিত্যাগ করে স্বর্গীয় আনন্দে বসবাস করছিলেন।

দিব্যলোকে যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের দর্শন লাভ, ভীষ্মাদির মূল স্বরূপে মিলন এবং মহাভারতের উপসংহার ও মাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দেবতা, ঋষি ও মরুদ্গণের মুখে নিজ প্রশংসা শুনতে শুনতে রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমশ যেস্থানে কুরুশ্রেষ্ঠরা বিরাজ করছিলেন সেখানে (ভগবানের সেই পরমধামে) পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্রাহ্মবিগ্রহ ধারণ করে বিরাজমান। তাঁর স্বরূপ পূর্ব রূপেরই মতো, তাই পূর্বে দেখা রূপ হওয়ায় যুধিষ্ঠির অনায়াসেই তাঁকে চিনতে পারলেন, তাঁর শ্রীবিগ্রহ থেকে দিব্যজ্যোতি স্ফূরিত হচ্ছিল। চক্র ইত্যাদি দিব্যাস্ত্র দেবতাদের ন্যায় রূপ ধারণ করে তাঁর সেবায় উপস্থিত। তেজস্বী বীর অর্জুন ভগবানের আরাধনায় ব্যাপৃত। দেবপূজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে উপস্থিত হতে দেখে তাঁকে যথাবৎ সম্মান করলেন। এরপর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতে যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী কর্ণকে দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় তেজোময় স্বরূপ ধারণ করে বিরাজমান দেখলেন। অন্য স্থানে ভীমসেনকে দেখা গেল, তিনি আগের মতোই শরীর ধারণ করে মূর্তিমান বায়ু দেবতার পাশে বসেছিলেন। তাঁর চারপাশে মরুদ্গণকে দেখা যাচ্ছিল, তাঁদের দিব্যবিগ্রহ উত্তম কান্তিতে দেদীপ্যমান। তিনিও উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে বসেছিলেন। দুই ভ্রাতাও তাঁদের দিব্য-তেজে দেদীপ্যমান দেখাচ্ছিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—'যুধিষ্ঠির ! এই যে কমনীয় বিগ্রহযুক্ত পবিত্র গন্ধসম্পন্ন দেবীকে দেখা যাচ্ছে, ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী। ইনিই তোমাদের জন্য মনুষ্য লোকে গিয়ে অযোনিসম্ভূতা দ্রৌপদীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান শংকর তোমাদের প্রসন্নতার জন্য এঁকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং ইনি দ্রুপদকুলে জন্মধারণ করে তোমাদের সেবা করেছিলেন। এদিকে এই যে অগ্নির ন্যায় পঞ্চ তেজস্বী গন্ধর্বকে দেখা যাচ্ছে, এঁরা তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতার ঔরসে উৎপন্ন হওয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র। এই পরম বুদ্ধিমান গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করো, ইনি তোমার পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ওই দেখো, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ সূর্যের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন। ওদিকে বৃষ্ণি, অন্ধক এবং ভোজবংশের সাত্যকি প্রভৃতি এবং মহাবলী বীরদের দেখো ; তাঁরা সাধ্য, বিশ্বদেব এবং মরুদ্গণের মধ্যে বিরাজমান। যাকে যুদ্ধে কেউ পরাজিত করতে পারেনি, সেই মহান ধনুর্ধর সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে দেখো। সে চন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রেরই ন্যায় কান্তিযুক্ত হয়ে বিরাজমান। অন্য দিকে দেখো কুন্তী ও মাদ্রীর সঙ্গে তোমার পিতা পাণ্ডু বসে আছেন। তিনি বিমানে করে সর্বদা আমার কাছে আসা-যাওয়া করেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বসুদের সঙ্গে এবং তোমাদের গুরু দ্রোণাচার্য বৃহস্পতির কাছে বসে আছেন—এঁদের দুজনকে দর্শন করো। তোমার পক্ষের অন্যান্য রাজারা গন্ধর্ব, যক্ষ এবং পুণ্যজনের সঙ্গে যাচ্ছে। কেউ কেউ গুহ্যকদের লোক প্রাপ্ত হয়েছে। এরা সকলে যুদ্ধে শরীর ত্যাগ করে নিজ নিজ পবিত্র বাণী, বুদ্ধি এবং কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকের অধিকার লাভ করেছে।'

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! ভীষ্ম, দ্রোণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু ও শকুনি প্রমুখ এবং তেজস্বী শরীর ধারণকারী অন্যান্য রাজারা কত সময় স্বর্গলোকে একসঙ্গে ছিলেন ? সেখানে তাঁরা সকলে সনাতন স্থান লাভ করেছিলেন, না কী অন্য কোনো গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন ? আমি আপনার কাছ থেকে এই সব সবিস্তারে শুনতে চাই।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এটি দেবতাদের গূঢ় রহস্য, তুমি প্রশ্ন করায় তোমাকে বলছি। যাঁর অগাধ বুদ্ধি, যিনি সমগ্র কর্মের গতি জানেন এবং সর্বজ্ঞ, সেই মহাব্রতধারী সনাতন মুনি পরাশরনন্দন ব্যাসদেব আমাকে বলেছিলেন যে এই সকল বীর অন্ততোগত্বা নিজ মূল স্বরূপেই মিলিত হন। মহাতেজস্বী ভীষ্ম বসুদেব স্বরূপে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাই অষ্ট বসুর নাম সুপ্রসিদ্ধ। (নাহলে ভীষ্মকে নিয়ে নয়জন হয়ে যেতেন)। আচার্য দ্রোণ বৃহস্পতিতে প্রবেশ করেছিলেন, কৃতবর্মা মরুদ্গণের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন, প্রদ্যুম্ন যেমন এসেছিলেন, তেমনই সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কুবেরের দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও তাঁর সঙ্গে গমন করেছিলেন। রাজা পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নী সহ ইন্দ্রভবনে স্থান পেয়েছিলেন। বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিশঠ, অক্রূর, শাম্ব, ভানু, কম্প, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, শল,

ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর এবং শঙ্খ—এরা বিশ্বদেবে মিলিত হয়েছেন। চন্দ্রের মহাতেজস্বী পুত্র বর্চাই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে এমন যুদ্ধ করেছিলেন, যার কোনো তুলনা নেই। সেই ধর্মাত্মা মহারথী অভিমন্যু তাঁর অবতারের কাজ সম্পূর্ণ করে চন্দ্রেতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ কর্ণ সূর্যে, শকুনি দ্বাপরে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির স্বরূপে প্রবেশ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র মহাবলী যাতুধানের (রাক্ষসদের) সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বিদুর এবং রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত করেছিলেন। যিনি ব্রহ্মার অনুরোধে নিজ যোগশক্তির আশ্রয় নিয়ে এই পৃথিবী ধারণ করে থাকেন, সেই ভগবান অনন্ত (বলরাম) রসাতলে চলে গিয়েছিলেন। যিনি সনাতন দেবাধিদেব নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, তাঁর অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবতারের প্রয়োজন পূর্ণ করে তিনি তাঁর মূল স্বরূপে স্থিত হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নী সময়মতো সরস্বতী নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে অপ্সরারূপে ভগবানের সেবায় উপস্থিত হন। এইভাবে মহাভারতের যুদ্ধে মৃত বীর-মহারথী নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে দেবতা ও যক্ষদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কেউ ইন্দ্রভবনে পৌঁছেছিলেন, কেউ কুবেরের। কত মহাপুরুষ বরুণলোক লাভ করেছিলেন। জনমেজয় ! আমি তোমাকে কৌরব ও পাণ্ডবদের সমস্ত চরিত্র বিস্তারিতভাবে শোনালাম।

সৌতি বললেন—দ্বিজবরগণ ! মহারাজ জনমেজয় তাঁর যজ্ঞে বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ মহাভারতের ইতিহাস শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের বাকি কার্য সম্পূর্ণ করে যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন। সর্পদের সংকট থেকে রক্ষা করে আস্তীক মুনিও অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজা যজ্ঞ কর্মে আসা সমস্ত ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন এবং ব্রাহ্মণেরাও রাজার কাছে যথোচিত সম্মান লাভ করে হৃষ্ট চিত্তে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। তাঁদের বিদায় জানিয়ে রাজাও তক্ষশিলা থেকে হস্তিনাপুরে রওনা হলেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ব্যাসদেবের নির্দেশে মুনিবর বৈশম্পায়ন যে ইতিহাস বলেছিলেন, আমি তা আপনাদের কাছে বর্ণনা করলাম। এই পুণ্যময় ইতিহাস অত্যন্ত পবিত্র এবং উত্তম। সত্যবাদী, সর্বজ্ঞ, বিধি-বিধানের জ্ঞাতা, ধর্মজ্ঞ, সাধু, ইন্দ্রিয় সংযমী, শুদ্ধ, তপ-প্রভাবে পবিত্র অন্তঃকরণসম্পন্ন, সাংখ্য ও যোগের বিদ্বান এবং নানাশাস্ত্রে পারদর্শী মুনিবর ব্যাসদেব দিব্য দৃষ্টিতে সবকিছু দেখে মহাত্মা পাণ্ডব এবং অন্য তেজস্বী রাজাদের কীর্তি প্রসারিত করার জন্য এই ইতিহাস রচনা করেছেন। যে বিদ্বান প্রতিটি পর্বে এটি অপরকে পড়ে শোনায়, তার সমস্ত পাপ ধৌত হয়। সে স্বর্গের অধিকার এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করার যোগ্যতা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় এই উপাখ্যান 'কার্ষ্ণ বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণ করে, তার কোটি কোটি পাপ বিনাশ হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্মে ব্রাহ্মণদের মহাভারতের সামান্য অংশও শোনায়, তার প্রদত্ত অন্ন-জল অক্ষয় হয়ে পিতৃপুরুষগণ লাভ করেন। মানুষ তাদের ইন্দ্রিয়াদি ও মনের দ্বারা সারাদিনে যে পাপ করে, সায়ংকালে সন্ধ্যার সময় মহাভারত পাঠ করলে সে সেই পাপ হতে মুক্তিলাভ করে এবং রাত্রিকালে যে পাপ তার দ্বারা হয়, প্রাতঃকালে উপসনাদির সময় মহাভারত পাঠ করলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ভরত বংশীয়দের মহান জন্মকর্মের বর্ণনা আছে, তাই একে 'মহাভারত' বলা হয়। মহান এবং ভারী হওয়ার জন্যও এর নাম 'মহাভারত'। যে ব্যক্তি মহাভারতের ব্যুৎপত্তি জেনে যায়, সে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। বেদবিদ্যার মহাসাগর এবং অষ্টাদশ পুরাণাদির নির্মাতা মহর্ষি বেদব্যাসের সিংহগর্জন শোনো। ইনি বলেন—'অষ্টাদশ পুরাণ, সমস্ত ধর্মশাস্ত্র এবং ষড়াঙ্গসহ চতুর্বেদ এক দিকে এবং অন্যদিকে শুধুমাত্র মহাভারত ; এটি একাই তাদের সমান।'

মুনিবর ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসরে সমস্ত মহাভারত পূর্ণ করেছিলেন। যে ব্যক্তি 'জয়' নামক এই মহাভারত ইতিহাস সর্বদা ভক্তিসহকারে শুনতে থাকে, সে শ্রী, কীর্তি ও বিদ্যালাভ করে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের বিষয়ে মহাভারতে যা কিছু বলা হয়েছে, সে-সবই অন্যত্র উল্লিখিত আছে। যা এখানে নেই, তা কোথাওই নেই। মোক্ষলাভের ইচ্ছা রাখা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং গর্ভিণী নারীর এই 'জয়' নামক ইতিহাস শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত শ্রবণ বা পাঠকারী মানুষ যদি স্বর্গলাভের ইচ্ছা করে, তাহলে সে স্বর্গলাভ করে এবং যুদ্ধে জয় লাভ করতে চাইলে জয়লাভ করে। তেমনই গর্ভিণী নারী মহাভারত শ্রবণ করলে সুযোগ্য পুত্র অথবা সৌভাগ্যশালিনী কন্যা লাভ করে। নিত্যমুক্ত স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধর্মের কামনায় এই

ভারত-সন্দর্ভ রচনা করেছেন। প্রথমে তিনি ষাট লাখ শ্লোকের মহাভারত সংহিতা রচনা করেছিলেন ; তার মধ্যে ত্রিশ লাখ শ্লোকের সংহিতা দেবলোকে প্রচারিত হয়েছে, পনেরো লাখের দ্বিতীয় সংহিতা পিতৃলোকে প্রচারিত হয়েছে, চোদ্দ লাখ শ্লোকের তৃতীয় সংহিতা যক্ষলোকে সমাদৃত হয়েছে এবং এক লাখ শ্লোকের চতুর্থ সংহিতা মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত। দেবতাদের দেবর্ষি নারদ, পিতৃগণকে অসিত-দেবল, যক্ষ এবং রাক্ষসদের শুকদেব এবং মানুষদের বৈশম্পায়নই প্রথমবার মহাভারত-সংহিতা শুনিয়েছেন। শৌনক ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে গভীর অর্থপূর্ণ ও বেদের সমকক্ষ ব্যাসপ্রণীত এই পবিত্র গ্রন্থ শ্রবণ করে, সে ইহজগতে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগ এবং উত্তম কীর্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরম সিদ্ধিও লাভ করে—এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মহাভারতের এক অংশও শোনে বা অপরকে শোনায়, সে সমগ্র মহাভারত অধ্যয়নের পুণ্যফল লাভ করে এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে উত্তম সিদ্ধি লাভ করে। যে ভগবান ব্যাসদেব এই পবিত্র সংহিতা বর্ণনা করে নিজ পুত্র শুকদেবকে পাঠ করিয়েছিলেন, তিনি মহাভারতের সারভূত উপদেশের বর্ণনা এইভাবে করেছেন : 'মানুষ ইহজগতে হাজার হাজার মাতাপিতা এবং অসংখ্য স্ত্রী-পুত্রাদির সংযোগ-বিয়োগ অনুভব করেছে, করে এবং করতে থাকবে[১]। অজ্ঞান ব্যক্তি প্রত্যহ হাজার হাজার হর্ষ ও ভয়ের সম্মুখীন হয় ; কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তির মনে এগুলির কোনো প্রভাব পড়ে না[২]। আমি দু-হাত তুলে চিৎকার করে এই কথা বলছি, কিন্তু কেউ আমার কথা শোনে না। ধর্মের দ্বারা মোক্ষ তো সিদ্ধ হয়ই, অর্থ-কামও সিদ্ধ হয়, তবুও লোকে কেন তা সেবন করে না[৩]। কামনার জন্য, ভয়ের জন্য, লোভের জন্য অথবা প্রাণরক্ষার জন্যও ধর্ম পরিত্যাগ করবে না। ধর্ম নিত্য আর সুখ-দুঃখ অনিত্য। সেইরূপ জীবাত্মা নিত্য এবং তার বন্ধনের হেতু অনিত্য[৪]। মহাভারতের সারভূত এই উপদেশ ভারত-সাবিত্রী নামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে এটি পাঠ করে, সে সম্পূর্ণ মহাভারত অধ্যয়নের ফল লাভ করে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে[৫]। যেমন সমুদ্র এবং হিমালয় পর্বত উভয়কেই রত্নের নিধি মনে করা হয়, তেমনই মহাভারতকেও নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ রত্নের ভাণ্ডার বলা হয়। যে বিদ্বান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দ্বারা রচিত মহাভারতরূপ এই পঞ্চম বেদ শোনায়, তার অর্থপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই ভারত-উপাখ্যান পাঠ করে, সে মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করে। এই বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

—o—

॥ স্বর্গারোহণপর্ব সমাপ্ত ॥

—o—

[১]মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ। সংসারেষ্বনুভূতানি যান্তি যাস্যন্তি চাপরে॥

[২]হর্ষস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ। দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥

[৩]ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে। ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥

[৪]ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

[৫]ইমাং ভারতসাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। স ভারতফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

মহাভারত শ্রবণবিধি, মাহাত্ম্য, এবং তার ফল

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! বিদ্বানদের কোন্ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা উচিত ? মহাভারত শুনলে কী ফললাভ হয় ? প্রত্যেক পর্ব সমাপ্তির পরে কী দান করা উচিত ? এই কথার বক্তা কেমন হওয়া প্রয়োজন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহাভারত শোনার যে নিয়ম এবং তা শ্রবণে যে ফললাভ হয়, সেসব বলছি ; শোনো। মানুষের নিজ মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করে, পবিত্র হয়ে, যথোক্ত বিধি-নিয়ম অনুসারে এই ইতিহাস শোনা এবং ক্রমশ এর সমাপ্তি করা উচিত। যে ব্যক্তি অন্তর-বাহিরে পবিত্র, শীলসম্পন্ন, সদাচারী, শুদ্ধবস্ত্র ধারণকারী, জিতেন্দ্রিয়, সংস্কারসম্পন্ন, সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, শ্রদ্ধাযুক্ত, দোষদৃষ্টিরহিত, সৌভাগ্যশালী, মনকে বশে রাখেন এবং সত্যবাদী, তাঁকে দান ও মানের দ্বারা অনুগৃহীত করে বাচক বা বক্তা করা উচিত। বক্তার অত্যন্ত থেমে থেমেও কথা বলা উচিত নয় এবং খুব তাড়াতাড়িও বলা উচিত নয়। শান্তভাবে ধীর গতিতে সুস্পষ্ট উচ্চারণসহ মহাভারতের কথা বলা উচিত। মিষ্ট স্বরে, ভাবার্থ বুঝে কথা পাঠ করবে। ৬৩ অক্ষরের পাঠকে আটটি স্থানে বিভক্ত করে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করবে। কথা শোনানোর সময় বক্তার স্বস্থ এবং একাগ্রচিত্ত হওয়া প্রয়োজন ; তার বসার আসন এমন হবে যাতে সে সুখপূর্বক বসতে পারে। অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর নিত্যসখা নরস্বরূপ নরবর অর্জুন, তাঁদের লীলা প্রকাশকারী ভগবতী সরস্বতী এবং বক্তা মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করে আসুরী সম্পদের উপর বিজয়প্রাপ্তিপূর্বক অন্তঃকরণ শুদ্ধকারী মহাভারত গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

রাজন্ ! মহাভারতের কথা আরম্ভ হয়ে গেলে প্রত্যেক পর্বে ক্ষত্রিয়দের জাতি, সত্যতা, তাদের দেশ, মাহাত্ম্য এবং ধর্ম জেনে ব্রাহ্মণদের যেসব বস্তু দান করা উচিত, তার বর্ণনা করছি, শোনো। প্রথমে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে কথা-পাঠের কার্য আরম্ভ করাবে। পরে পর্ব সমাপ্ত হলে নিজ ক্ষমতা অনুসারে সেই ব্রাহ্মণদের পূজা করবে। আদিপর্বের কথার সময় বক্তাকে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে চন্দন ইত্যাদির দ্বারা তাঁর পূজা করবে এবং রীতি অনুসারে তাঁকে মিষ্ট পায়েস আহারের জন্য প্রদান করবে। তারপর আস্তীকপর্বের কথা হওয়ার সময় ব্রাহ্মণকে মধু ও ঘৃতযুক্ত পায়েস, মিষ্টান্ন ও ফল-মূল দিয়ে তুষ্ট করবে। সভাপর্ব আরম্ভ হওয়ার সময় মালপোয়া, কচুরি এবং মিঠাইয়ের সঙ্গে পায়েস ভোজন করাবে। বনপর্বে ফল-মূল দ্বারা ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করবে। অরণী পর্বে পৌঁছে জলপূর্ণ কলস দান করবে এবং যিনি আহার করতে ভালোবাসেন, তাঁকে উত্তম ফল-মূল এবং সর্বগুণসম্পন্ন আহার প্রদান করবে। বিরাটপর্বে নানাপ্রকার বস্ত্রপ্রদান করবে এবং উদ্যোগপর্বে ব্রাহ্মণদের চন্দন ও ফুলমালায় বিভূষিত করে উত্তম আহার পরিবেশন করবে। ভীষ্মপর্বে উত্তম যান ও উত্তম ভোজন পরিবেশন করবে। দ্রোণপর্বে ব্রাহ্মণদের উত্তম ভোজন করাবে। কর্ণপর্বেও ব্রাহ্মণদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুখাদ্য প্রদান করা উচিত। শল্যপর্বে নিজ মনকে একাগ্র করে মিষ্ট ভাত, মালপোয়া, তৃপ্তিদায়ক ফল এবং মিঠাই-এর সঙ্গে সর্বপ্রকার অন্ন দান করা উচিত। গদাপর্বে মুগমিশ্রিত অন্ন প্রদান করা উচিত। স্ত্রীপর্বে সৎব্রাহ্মণদের নানাপ্রকার রত্ন প্রদান করে সন্তুষ্ট করবে। ঐষীকপর্বে প্রথমে ঘৃতমিশ্রিত অন্ন পরিবেশন করবে, পরে সর্বপ্রকার গুণাদিযুক্ত, স্বাদিষ্ট অন্ন ভোজন করাবে। শান্তিপর্বে ব্রাহ্মণদের হবিষ্য প্রদান করবে। আশ্বমেধিক পর্বে পৌঁছালে সকলকে তাঁদের রুচি অনুযায়ী আহার প্রদান করবে এবং আশ্রমবাসিকপর্বে হবিষ্য ভোজন করাবে। মৌসলপর্বে সর্বগুণসম্পন্ন অন্ন, চন্দন, মালা এবং অনুলেপন প্রদান করবে। মহাপ্রস্থানিকপর্বেও তাই করবে। তারপর স্বর্গারোহণ পর্বে ব্রাহ্মণদের পায়েস প্রদান করবে।

এইভাবে সব পর্বের সংহিতাগুলি সমাপ্ত করে শাস্ত্রবেত্তা ব্যক্তিদের উচিত মহাভারত গ্রন্থটিকে রেশম বস্ত্রে জড়িয়ে কোনো উত্তম স্থানে রাখা। স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে, ফুলের মালা ও অলংকার ধারণ করে চন্দন-মালা ইত্যাদি উপচার দ্বারা গ্রন্থটিকে পূজা করবে। পূজার সময় চিত্ত একাগ্র করে এবং শুদ্ধভাবে থেকে নানাপ্রকার উত্তম ভোক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় ও পুষ্পাদি সামগ্রী অর্পণ করে সুবর্ণময় দক্ষিণা প্রদান করা প্রয়োজন। পুস্তকের ওপর তিন পল করে সোনা রাখা উচিত। তা না পারলে অন্তত দেড় পল করে সোনা রাখবে, তাও সম্ভব না হলে পৌণে এক পল সোনা রাখবে। অর্থ থাকতে কৃপণতা

করা উচিত নয়। যেসব বস্তু নিজের প্রিয়, সেইসব বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। কথা-পাঠকারী নিজ গুরুর সমতুল্য, সুতরাং তাঁকে সর্বদা ভক্তিপূর্বক সন্তুষ্ট রাখা উচিত। সেই সময় সমস্ত দেবতা এবং ভগবান নর-নারায়ণের কীর্তন করা উচিত। তারপর উত্তম ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মালা-চন্দনে বিভূষিত করে তাঁদের নানাপ্রকার মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করা কর্তব্য এবং নানাপ্রকার ছোট বড় প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করা উচিত। এরূপ করলে মানুষ অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ এবং প্রত্যেক পর্বের সমাপ্তির পরে ব্রাহ্মণের পূজা করলে শ্রোতা যজ্ঞের ফল লাভ করে। কথা-পাঠকারীর বিদ্বান হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক পদ, অক্ষর এবং স্বর স্পষ্ট উচ্চারণ করে মহাভারতের কথা শোনানো উচিত। সম্পূর্ণ কথা সমাপ্ত হলে সৎব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে তাদের যথাবৎ দক্ষিণা প্রদান করবে। পরে বক্তাকেও বস্ত্র ও অলংকার দ্বারা বিভূষিত করে উত্তম আহার পরিবেশন করবে। কথক সন্তুষ্ট হলেই উত্তম আনন্দ লাভ হয়। ব্রাহ্মণরা সন্তুষ্ট হলে শ্রোতার ওপর সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হন ; তাই সাধুস্বভাব শ্রোতাদের উচিত, তাঁরা যেন ন্যায়সম্মতভাবে ব্রাহ্মণদের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করে তাঁদের যথোচিতভাবে পূজা করেন।

রাজন্ ! তোমার জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি মহাভারত শোনার এবং তার পারায়ণ করার বিধি-নিয়ম জানালাম। এতে শ্রদ্ধা কোরো এবং যদি নিজের পরম কল্যাণ চাও তাহলে সর্বদা যত্ন সহকারে এটি পালন করতে থাকো। মানুষের সর্বদাই মহাভারত শ্রবণ ও কীর্তন করা উচিত। যার গৃহে মহাভারত গ্রন্থ থাকে, তার সর্বদা জয় হয়। ভারত পরম পবিত্র গ্রন্থ, তাতে নানাপ্রকার উপাখ্যান আছে। দেবতারাও ভারতগ্রন্থ পাঠ করেন। ভারত পরমপদস্বরূপ। এটি সকল শাস্ত্রের মধ্যে উত্তম। এর দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়—এটি আমি সত্য করে জানাচ্ছি। মহাভারত-ইতিহাস, পৃথিবী, গাভী, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ এবং ভগবান বাসুদেবের কীর্তনকারী মানুষ কখনো বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। জনমেজয় ! বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির আদি-মধ্য ও অন্তে সর্বত্র ভগবান নারায়ণেরই যশগান করা হয়েছে। মহাভারতে নারায়ণের দিব্য কথাসমূহ এবং সনাতন শ্রুতি সমাবিষ্ট। যে ব্যক্তি পরমপদ লাভ করতে চায়, তার সর্বদা এগুলি শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত পরম পবিত্র, ধর্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ কারক এবং সর্বপ্রকার গুণসম্পন্ন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের সর্বদা এটি অবশ্য শ্রবণ করা উচিত। মহাভারত শ্রবণের দ্বারা কায়-মনো-বাক্যে সঞ্চিত সমস্ত পাপ এমনভাবে নষ্ট হয়, যেমন সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে থাকে। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যে ফল হয়, তার সমস্ত ফল ভগবদ্‌ভক্ত পুরুষ শুধু মহাভারত শ্রবণ করলেই প্রাপ্ত হয়। নারী হোক বা পুরুষ, এর শ্রবণের দ্বারা সকলেই বৈষ্ণব পদ লাভ করে। শাস্ত্রোক্ত ফল প্রাপ্তির কামনাকারী ব্যক্তির উচিত, মহাভারত শ্রবণের পর বক্তাকে সোনার পাঁচটি সিকি দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করা এবং নিজ শক্তি অনুসারে কপিলা গাভীর শিং স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করে তাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে গো-বৎসসহ বক্তাকে দান করা। এরদ্বারা শ্রোতা কল্যাণ লাভ করে। এতদ্ব্যতীত বক্তার জন্য দুই হাতে বালা, কানের কুণ্ডল এবং ধন প্রদান করা উচিত। রাজন্ ! বক্তাকে ভূমিদান করা অবশ্য কর্তব্য ; কারণ ভূমিদানের সমান আর কোনো দান নেই এবং হবেও না। যে ব্যক্তি সর্বদা মহাভারত শুনতে এবং শোনাতে থাকে, সে সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, সে নিজের একাদশ পূর্বপুরুষ এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও উদ্ধার করে। মহাভারত শোনার পর তার দশাংশ হোম করাও প্রয়োজন। আমি এইভাবে তোমার কাছে সব কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম।

॥ মহাভারত শ্রবণবিধি সমাপ্ত ॥